রবীন্দ্র রচনাবলী

চতুর্দশ খণ্ড

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র-রচনাবলী

চতুর্দশ খণ্ড

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

70,758

বিশ্বভারতী

২, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ চৈত্র, ১৩৪৯
পুনর্মুদ্রণ আষাঢ়, ১৩৬০

কাগজের মলাট ৮৲
রেক্সিনে বাঁধাই ১১৲

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন

সূচী

চিত্রসূচী ।৶০

কবিতা ও গান

পূরবী ১

লেখন ১৫৫

নাটক ও প্রহসন

মুক্তধারা ১৮৫

উপন্যাস ও গল্প

গল্পগুচ্ছ ২৪৩

প্রবন্ধ

শান্তিনিকেতন ৪-১০ ২৮৩

গ্রন্থ-পরিচয় ৫২১

বর্ণানুক্রমিক সূচী ৫৪১

চিত্রসূচী

তৃতীয়া	৩
‘আশা’ কবিতার পাণ্ডুলিপি	৬৯
রবীন্দ্রনাথ ও ‘বিজয়া’	১০৫
পূরবীর পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠার কবিকৃত লিপিচিত্রণ	১১২

কবিতা ও গান

পূরবী

উৎসর্গ

বিজয়ার করকমলে

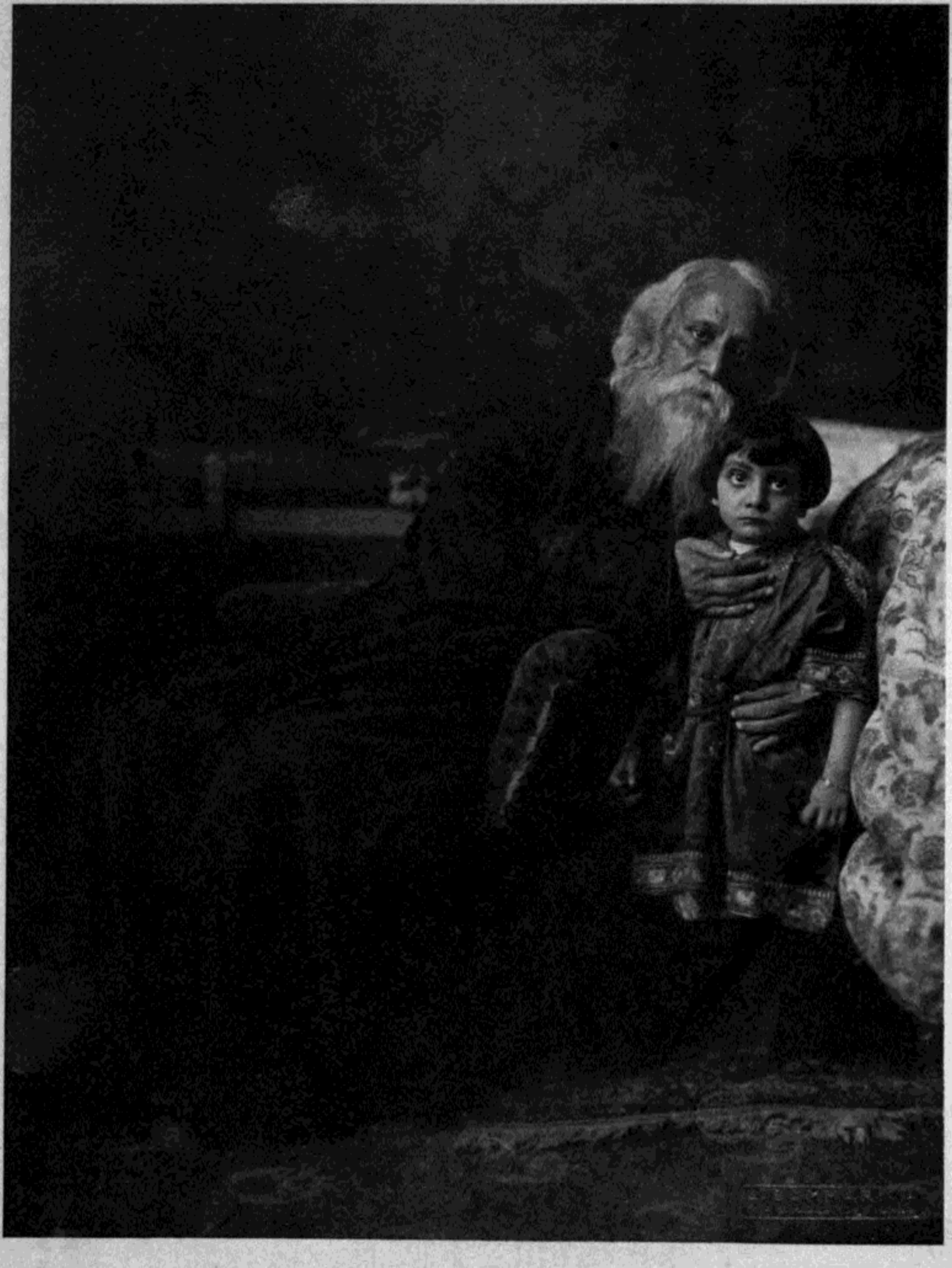

তৃতীয়া

পূরবী

পূরবী

যারা আমার সাঁঝ-সকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো
আপন হিয়ার পরশ দিয়ে ; এই জীবনের সকল সাদা কালো
যাদের আলো-ছায়ার লীলা ; সেই যে আমার আপন মানুষগুলি
নিজের প্রাণের স্রোতের 'পরে আমার প্রাণের ঝরনা নিল তুলি ;
তাদের সাথে একটি ধারায় মিলিয়ে চলে, সেই তো আমার আয়ু,
নাই সে কেবল দিন-গণনার পাঁজির পাতায়, নয় সে নিশ্বাস-বায়ু।
তাদের বাঁচায় আমার বাঁচা আপন সীমা ছাড়ায় বহু দূরে ;
নিমেষগুলির ফল পেকে যায় নানা দিনের সুধার রসে পুরে ;
অতীত কালের আনন্দরূপ বর্তমানের বৃন্ত-দোলায় দোলে,—
গর্ভ হতে মুক্ত শিশু তবুও যেন মায়ের বক্ষে কোলে
বন্দী থাকে নিবিড় প্রেমের বাঁধন দিয়ে। তাই তো যখন শেষে
একে একে আপন জনে সূর্য-আলোর অন্তরালের দেশে
আঁখির নাগাল এড়িয়ে পালায়, তখন রিক্ত শীর্ণ জীবন মম
শুষ্ক রেখায় মিলিয়ে আসে বর্ষাশেষের নির্ঝরিণী সম
শূন্য বালুর একটি প্রান্তে ক্লান্ত বারি স্রস্ত অবহেলায়।
তাই যারা আজ রইল পাশে এই জীবনের অপরাহ্নবেলায়
তাদের হাতে হাত দিয়ে তুই গান গেয়ে নে থাকতে দিনের আলো,—
বলে নে ভাই, "এই যা দেখা, এই যা ছোঁওয়া, এই ভালো এই ভালো।
এই ভালো আজ এ সংগমে কান্নাহাসির গঙ্গা-যমুনায়
ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।
এই ভালো রে প্রাণের রঙ্গে এই আসঙ্গ সকল অঙ্গে মনে
পুণ্য ধরার ধুলো মাটি ফল হাওয়া জল তৃণ তরুর সনে।
এই ভালো রে ফুলের সঙ্গে আলোয় জাগা, গান গাওয়া এই ভাষায়,
তারার সাথে নিশীথ রাতে ঘুমিয়ে পড়া নূতন প্রাতের আশায়।"

বিজয়ী

তখন তারা দৃপ্ত-বেগের বিজয়-রথে
ছুটছিল বীর মত্ত অধীর, রক্ত-ধূলির পথবিপথে।
তখন তাদের চতুর্দিকেই রাত্রিবেলার প্রহর যত
স্বপ্নে-চলার পথিক-মতো
মন্দগমন ছন্দে লুটায় মন্থর কোন ক্লান্ত বায়ে;
বিহঙ্গ-গান শান্ত তখন অন্ধ রাতের পক্ষছায়ে।

মশাল তাদের রুদ্রজ্বালায় উঠল জ্বলে,—
অন্ধকারের ঊর্ধ্বতলে
বহ্নিদলের রক্তকমল ফুটল প্রবল দম্ভভরে;
দূর-গগনের স্তব্ধ তারা মুগ্ধ ভ্রমর তাহার 'পরে।
ভাবল পথিক, এই যে তাদের মশাল-শিখা,
নয় সে কেবল দণ্ডপলের মরীচিকা।

ভাবল তা'রা, এই শিখাটাই ধ্রুবজ্যোতির তারার সাথে
মৃত্যুহীনের দখিন হাতে
জ্বলবে বিপুল বিশ্বতলে।
ভাবল তা'রা এই শিখারই ভীষণ বলে
রাত্রি-রানীর দুর্গ-প্রাচীর দগ্ধ হবে,
অন্ধকারের রুদ্ধ কপাট দীর্ণ করে ছিনিয়ে লবে
নিত্যকালের বিত্তরাশি;
ধরিত্রীকে করবে আপন ভোগের দাসী।

ঐ বাজে রে ঘণ্টা বাজে।
চমকে উঠেই হঠাৎ দেখে অন্ধ ছিল তন্দ্রামাঝে।
আপনাকে হায় দেখছিল কোন্ স্বপ্নাবেশে
যক্ষপুরীর সিংহাসনে লক্ষমণির রাজার বেশে;
মহেশ্বরের বিশ্ব যেন লুঠ করেছে অট্ট হেসে।

শূন্যে নবীন সূর্য জাগে।
ঐ যে তাহার বিশ্ব-চেতন কেতন-আগে
জ্বলছে নূতন দীপ্তিরতন তিমির-মথন শুভ্ররাগে ;
মশাল-ভস্ম সুপ্তি-ধুলায় নিত্যদিনের স্বপ্তি মাগে।
আনন্দলোক দ্বার খুলেছে, আকাশ পুলকময়,
জয় ভূলোকের, জয় দ্যুলোকের, জয় আলোকের জয়।

মাটির ডাক

১

শালবনের ঐ আঁচল ব্যেপে
যেদিন হাওয়া উঠত খেপে
ফাগুন-বেলার বিপুল ব্যাকুলতায়,
যেদিন দিকে দিগন্তরে
লাগত পুলক কী মন্তরে
কচি পাতার প্রথম কলকথায়,
সেদিন মনে হত কেন
ঐ ভাষারি বাণী যেন
লুকিয়ে আছে হৃদয়কুঞ্জছায়ে ;
তাই অমনি নবীন রাগে
কিশলয়ের সাড়া লাগে
শিউরে-ওঠা আমার সারা গায়ে।
আবার যেদিন আশ্বিনেতে
নদীর ধারে ফসল-খেতে
সূর্য-ওঠার রাঙা-রঙিন বেলায়
নীল আকাশের কূলে কূলে
সবুজ সাগর উঠত দুলে
কচি ধানের খামখেয়ালি খেলায়—

সেদিন আমার হত মনে
ঐ সবুজের নিমন্ত্রণে
যেন আমার প্রাণের আছে দাবি ;
তাই তো হিয়া ছুটে পালায়
যেতে তারি যজ্ঞশালায়,
কোন্ ভুলে হায় হারিয়েছিল চাবি ।

২

কার কথা এই আকাশ বেয়ে
ফেলে আমার হৃদয় ছেয়ে,
বলে দিনে, বলে গভীর রাতে,
"যে-জননীর কোলের 'পরে
জন্মেছিলি মর্ত-ঘরে,
প্রাণ ভরা তোর যাহার বেদনাতে,
তাহার বক্ষ হতে তোরে
কে এনেছে হরণ করে,
ঘিরে তোরে রাখে নানান পাকে !
বাঁধন-ছেঁড়া তোর সে নাড়ী
সইবে না এই ছাড়াছাড়ি,
ফিরে ফিরে চাইবে আপন মাকে ।"
শুনে আমি ভাবি মনে,
তাই ব্যথা এই অকারণে,
প্রাণের মাঝে তাই তো ঠেকে ফাঁকা,
তাই বাজে কার করুণ সুরে—
"গেছিস দূরে, অনেক দূরে,"
কী যেন তাই চোখের 'পরে ঢাকা ।
তাই এতদিন সকল খানে
কিসের অভাব জাগে প্রাণে
ভালো করে পাই নি তাহা বুঝে ;

ফিরেছি তাই নানামতে
নানান হাটে, নানান পথে
হারানো কোল কেবল খুঁজে খুঁজে।

৩

আজকে খবর পেলেম খাঁটি—
মা আমার এই শ্যামল মাটি,
অন্নে ভরা শোভার নিকেতন;
অভ্রভেদী মন্দিরে তার
বেদী আছে প্রাণদেবতার,
ফুল দিয়ে তার নিত্য আরাধন।
এইখানে তার অঙ্ক-মাঝে
প্রভাতরবির শঙ্খ বাজে;
আলোর ধারায় গানের ধারা মেশে,
এইখানে সে পূজার কালে
সন্ধ্যারতির প্রদীপ জ্বালে
শান্ত মনে ক্লান্ত দিনের শেষে।
হেথা হতে গেলেম দূরে
কোথা যে ইটকাঠের পুরে
বেড়া-ঘেরা বিষম নির্বাসনে,
তৃপ্তি যে নাই, কেবল নেশা,
ঠেলাঠেলি, নাই তো মেশা,
আবর্জনা জমে উপার্জনে।
যন্ত্র-জাঁতায় পরান কাঁদায়,
ফিরি ধনের গোলকধাঁধায়,
শূন্যতারে সাজাই নানা সাজে;
পথ বেড়ে যায় ঘুরে ঘুরে,
লক্ষ্য কোথায় পালায় দূরে,
কাজ ফলে না অবকাশের মাঝে।

৪

যাই ফিরে যাই মাটির বুকে,
যাই চলে যাই মুক্তি-সুখে,
ইঁটের শিকল দিই ফেলে দিই টুটে,
আজ ধরণী আপন হাতে
অন্ন দিলেন আমার পাতে,
ফল দিয়েছেন সাজিয়ে পত্রপুটে।
আজকে মাঠের ঘাসে ঘাসে
নিঃশ্বাসে মোর খবর আসে
কোথায় আছে বিশ্বজনের প্রাণ,
ছয় ঋতু ধায় আকাশ-তলায়,
তার সাথে আর আমার চলায়
আজ হতে না রইল ব্যবধান।
যে-দূতগুলি গগনপারের,
আমার ঘরের রুদ্ধ দ্বারের
বাইরে দিয়েই ফিরে ফিরে যায়,
আজ হয়েছে খোলাখুলি
তাদের সাথে কোলাকুলি,
মাঠের ধারে পথতরুর ছায়।
কী ভুল ভুলেছিলেম, আহা,
সব চেয়ে যা নিকট, তাহা
সুদূর হয়ে ছিল এতদিন,
কাছেকে আজ পেলেম কাছে—
চারদিকে এই যে ঘর আছে
তার দিকে আজ ফিরল উদাসীন।

২৩ ফাল্গুন, ১৩২৮

পঁচিশে বৈশাখ

রাত্রি হল ভোর।
আজি মোর
জন্মের স্মরণপূর্ণ বাণী,
প্রভাতের রৌদ্রে-লেখা লিপিখানি
হাতে করে আনি',
দ্বারে আসি দিল ডাক
পঁচিশে বৈশাখ।

দিগন্তে আরক্ত রবি;
অরণ্যের ম্লান ছায়া বাজে যেন বিষণ্ণ ভৈরবী।
শাল-তাল-শিরীষের মিলিত মর্মরে
বনান্তের ধ্যান ভঙ্গ করে।
রক্তপথ শুষ্ক মাঠে,
যেন তিলকের রেখা সন্ন্যাসীর উদার ললাটে।

এই দিন বৎসরে বৎসরে
নানা বেশে ফিরে আসে ধরণীর 'পরে,—
আতাম্র আম্রের বনে ক্ষণে ক্ষণে সাড়া দিয়ে,
তরুণ তালের গুচ্ছে নাড়া দিয়ে,
মধ্যদিনে অকস্মাৎ শুষ্কপত্রে তাড়া দিয়ে,
কখনো বা আপনারে ছাড়া দিয়ে
কালবৈশাখীর মত্ত মেঘে
বন্ধহীন বেগে।
আর সে একান্তে আসে
মোর পাশে

পীত উত্তরীয়তলে লয়ে মোর প্রাণদেবতার
স্বহস্তে সজ্জিত উপহার—
নীলকান্ত আকাশের থালা,
তারি 'পরে ভুবনের উচ্ছলিত সুধার পিয়ালা।

এই দিন এল আজ প্রাতে
যে অনন্ত সমুদ্রের শঙ্খ নিয়ে হাতে,
তাহার নির্ঘোষ বাজে
ঘন ঘন মোর বক্ষ-মাঝে।
জন্ম-মরণের
দিগ্বলয়-চক্ররেখা জীবনেরে দিয়েছিল ঘের,
সে আজি মিলাল।
শুভ্র আলো
কালের বাঁশরি হতে উচ্ছ্বসি যেন রে
শূন্য দিল ভরে।
আলোকের অসীম সংগীতে
চিত্ত মোর ঝংকারিছে সুরে সুরে রণিত তন্ত্রীতে।

উদয় দিক্‌প্রান্ত-তলে নেমে এসে
শান্ত হেসে
এই দিন বলে আজি মোর কানে,
"অম্লান নূতন হয়ে অসংখ্যের মাঝখানে
একদিন তুমি এসেছিলে
এ নিখিলে
নবমল্লিকার গন্ধে,
সপ্তপর্ণ-পল্লবের পবন হিল্লোল-দোল-ছন্দে,
শ্যামলের বুকে,
নির্নিমেষ নীলিমার নয়নসম্মুখে।

সেই যে নূতন তুমি,
তোমারে ললাট চুমি
এসেছি জাগাতে
বৈশাখের উদ্দীপ্ত প্রভাতে।

হে নূতন,
দেখা দিক্ আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ।
আচ্ছন্ন করেছে তারে আজি
শীর্ণ নিমেষের যত ধূলিকীর্ণ জীর্ণ পত্ররাজি।
মনে রেখো, হে নবীন,
তোমার প্রথম জন্মদিন
ক্ষয়হীন ;—
যেমন প্রথম জন্ম নির্ঝরের প্রতি পলে পলে ;
তরঙ্গে তরঙ্গে সিন্ধু যেমন উছলে
প্রতিক্ষণে
প্রথম জীবনে।
হে নূতন,
হ'ক তব জাগরণ
ভস্ম হতে দীপ্ত হুতাশন।

হে নূতন,
তোমার প্রকাশ হ'ক কুজ্ঝটিকা করি' উদ্‌ঘাটন
সূর্য্যের মতন।
বসন্তের জয়ধ্বজা ধরি,
শূন্য শাখে কিশলয় মুহূর্তে অরণ্য দেয় ভরি—
সেই মতো, হে নূতন,
রিক্ততার বক্ষ ভেদি আপনারে করো উন্মোচন।
ব্যক্ত হ'ক জীবনের জয়,
ব্যক্ত হ'ক, তোমা মাঝে অনন্তের অক্লান্ত বিস্ময়।"

উদয়-দিগন্তে ঐ শুভ্র শঙ্খ বাজে
মোর চিত্তমাঝে
চির-নূতনেরে দিল ডাক
পঁচিশে বৈশাখ।

২৫ বৈশাখ, ১৩২৯

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

বর্ষার নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্বদ্বারে,
বাজাইল বজ্রভেরী। হে কবি, দিবে না সাড়া তারে
তোমার নবীন ছন্দে? আজিকার কাজরি গাথায়
ঝুলনের দোলা লাগে ডালে ডালে পাতায় পাতায়;
বর্ষে বর্ষে এ দোলায় দিত তাল তোমার যে-বাণী
বিদ্যুৎ-নাচন গানে, সে আজি ললাটে কর হানি
বিধবার বেশে কেন নিঃশব্দে লুটায় ধূলি-'পরে?
আশ্বিনে উৎসব-সাজে শরৎ সুন্দর শুভ্র করে
শেফালির সাজি নিয়ে দেখা দিবে তোমার অঙ্গনে;
প্রতি বর্ষে দিত সে যে শুক্লরাতে জ্যোৎস্নার চন্দনে
ভালে তব বরণের টিকা; কবি, আজ হতে সে কি
বারে বারে আসি তব শূন্যকক্ষে, তোমারে না দেখি
উদ্দেশে ঝরায়ে যাবে শিশির-সিঞ্চিত পুষ্পগুলি
নীরব-সংগীত তব দ্বারে?

জানি তুমি প্রাণ খুলি
এ সুন্দরী ধরণীরে ভালোবেসেছিলে। তাই তারে
সাজায়েছ দিনে দিনে নিত্য নব সংগীতের হারে।
অন্যায় অসত্য যত, যত কিছু অত্যাচার পাপ
কুটিল কুৎসিত ক্রূর, তার 'পরে তব অভিশাপ
বর্ষিয়াছ ক্ষিপ্রবেগে অর্জুনের অগ্নিবাণ সম,
তুমি সত্যবীর, তুমি সুকঠোর, নির্মল, নির্মম,

করুণ, কোমল। তুমি বঙ্গভারতীর তন্ত্রী 'পরে
একটি অপূর্ব তন্ত্র এসেছিলে পরাবার তরে।
সে-তন্ত্র হয়েছে বাঁধা ; আজ হতে বাণীর উৎসবে
তোমার আপন সুর কখনো ধ্বনিবে মন্দ্ররবে,
কখনো মঞ্জুল গুঞ্জরণে। বঙ্গের অঙ্গনতলে
বর্ষা-বসন্তের নৃত্যে বর্ষে বর্ষে উল্লাস উথলে ;
সেথা তুমি এঁকে গেলে বর্ণে বর্ণে বিচিত্র রেখায়
আলিম্পন ; কোকিলের কুহুরবে, শিখীর কেকায়
দিয়ে গেলে তোমার সংগীত ; কাননের পল্লবে কুসুমে
রেখে গেলে আনন্দের হিল্লোল তোমার। বঙ্গভূমে
যে তরুণ যাত্রিদল রুদ্ধদ্বার-রাত্রি-অবসানে
নিঃশঙ্কে বাহির হবে নবজীবনের অভিযানে
নব নব সংকটের পথে পথে, তাহাদের লাগি
অন্ধকার নিশীথিনী তুমি, কবি, কাটাইলে জাগি
জয়মাল্য বিরচিয়া, রেখে গেলে গানের পাথেয়
বহ্নিতেজে পূর্ণ করি ; অনাগত যুগের সাথেও
ছন্দে ছন্দে নানাসূত্রে বেঁধে গেলে বন্ধুত্বের ডোর,
গ্রন্থি দিলে চিন্ময় বন্ধনে, হে তরুণ বন্ধু মোর,
সত্যের পূজারি।

আজো যারা জন্মে নাই তব দেশে,
দেখে নাই যাহারা তোমারে, তুমি তাদের উদ্দেশে
দেখার অতীত রূপে আপনারে করে গেলে দান
দূরকালে। তাহাদের কাছে তুমি নিত্য-গাওয়া গান
মূর্তিহীন। কিন্তু যারা পেয়েছিল প্রত্যক্ষ তোমায়
অনুক্ষণ তারা যা হারাল তার সন্ধান কোথায়,
কোথায় সান্ত্বনা? বন্ধুমিলনের দিনে বারংবার।
উৎসব-রসের পাত্র পূর্ণ তুমি করেছ আমার
প্রাণে তব, গানে তব, প্রেমে তব, সৌজন্যে, শ্রদ্ধায়,
আনন্দের দানে ও গ্রহণে। সখা, আজ হতে, হায়,

জানি মনে, ক্ষণে ক্ষণে চমকি উঠিবে মোর হিয়া
তুমি আস নাই বলে, অকস্মাৎ রহিয়া রহিয়া
করুণ স্মৃতির ছায়া ম্লান করি দিবে সভাতলে
আলাপ আলোক হাস্য প্রচ্ছন্ন গভীর অশ্রুজলে।

আজিকে একেলা বসি শোকের প্রদোষ-অন্ধকারে,
মৃত্যুতরঙ্গিণীধারা-মুখরিত ভাঙনের ধারে
তোমারে শুধাই,—আজি বাধা কি গো ঘুচিল চোখের
সুন্দর কি ধরা দিল অনিন্দিত নন্দন-লোকের
আলোকে সম্মুখে তব, উদয়শৈলের তলে আজি
নবসূর্য বন্দনায় কোথায় ভরিলে তব সাজি
নব ছন্দে, নূতন আনন্দগানে ? সে-গানের সুর
লাগিছে আমার কানে অশ্রুসাথে মিলিত মধুর
প্রভাত-আলোকে আজি ; আছে তাহে সমাপ্তির ব্যথা,
আছে তাহে নবতন আরম্ভের মঙ্গল-বারতা ;
আছে তাহে ভৈরবীতে বিদায়ের বিষণ্ন মূর্ছনা,
আছে ভৈরবের সুরে মিলনের আসন্ন অর্চনা।

যে খেয়ার কর্ণধার তোমারে নিয়েছে সিন্ধুপারে
আষাঢ়ের সজল ছায়ায়, তার সাথে বারে বারে
হয়েছে আমার চেনা ; কতবার তারি সারিগানে
নিশান্তের নিদ্রা ভেঙে ব্যথায় বেজেছে মোর প্রাণে
অজানা পথের ডাক, সূর্যাস্তপারের স্বর্ণরেখা
ইঙ্গিত করেছে মোরে। পুনঃ আজ তার সাথে দেখা
মেঘে-ভরা বৃষ্টিঝরা দিনে। সেই মোরে দিল আনি
ঝরে-পড়া কদম্বের কেশর-সুগন্ধি লিপিখানি
তব শেষ-বিদায়ের। নিয়ে যাব ইহার উত্তর
নিজ হাতে কবে আমি, ওই খেয়া 'পরে করি' ভর,

না জানি সে কোন্ শান্ত শিউলি-ঝরার শুক্লরাতে,
দক্ষিণের দোলা-লাগা পাখি-জাগা বসন্তপ্রভাতে ;
নবমল্লিকার কোন্ আমন্ত্রণ-দিনে ; শ্রাবণের
ঝিল্লিমন্দ্র-সঘন সন্ধ্যায় ; মুখরিত প্লাবনের
অশান্ত নিশীথ রাত্রে ; হেমন্তের দিনান্তবেলায়
কুহেলি-গুণ্ঠনতলে ।

ধরণীতে প্রাণের খেলায়
সংসারের যাত্রাপথে এসেছি তোমার বহু আগে,
সুখে দুঃখে চলেছি আপন মনে ; তুমি অনুরাগে
এসেছিলে আমার পশ্চাতে, বাঁশিখানি লয়ে হাতে
মুক্ত মনে, দীপ্ত তেজে, ভারতীর বরমাল্য মাথে ।
আজ তুমি গেলে আগে ; ধরিত্রীর রাত্রি আর দিন
তোমা হতে গেল খসি, সর্ব আবরণ করি লীন
চিরন্তন হলে তুমি, মর্ত্য কবি, মুহূর্তের মাঝে ।
গেলে সেই বিশ্বচিত্তলোকে, যেথা সুগম্ভীর বাজে
অনন্তের বীণা, যার শব্দহীন সংগীতধারায়
ছুটেছে রূপের বন্যা গ্রহে সূর্যে তারায় তারায় ।
সেথা তুমি অগ্রজ আমার ; যদি কভু দেখা হয়,
পাব তবে সেথা তব কোন্ অপরূপ পরিচয়
কোন্ ছন্দে, কোন্ রূপে ? যেমনি অপূর্ব হ'ক নাকো,
তবু আশা করি যেন মনের একটি কোণে রাখ
ধরণীর ধূলির স্মরণ, লাজে ভয়ে দুঃখে সুখে
বিজড়িত,—আশা করি, মর্ত্যজন্মে ছিল তব মুখে
যে-বিনম্র স্নিগ্ধ হাস্য, যে স্বচ্ছ সতেজ সরলতা,
সহজ সত্যের প্রভা, বিরল সংযত শান্ত কথা,
তাই দিয়ে আরবার পাই যেন তব অভ্যর্থনা
অমর্ত্যলোকের দ্বারে,—ব্যর্থ নাহি হ'ক এ কামনা ।

আষাঢ়, ১৩২৯

শিলঙের চিঠি

শ্রীমতী শোভনা দেবী ও শ্রীমতী নলিনী দেবী কল্যাণীয়াসু

ছন্দে লেখা একটি চিঠি চেয়েছিলে মোর কাছে,
ভাবছি বসে, এই কলমের আর কি তেমন জোর আছে।
তরুণ বেলায় ছিল আমার পদ্য লেখার বদ-অভ্যাস,
মনে ছিল হই বুঝি বা বাল্মীকি কি বেদব্যাস,
কিছু না হ'ক 'লঙ্‌ফেলো'দের হব আমি সমান তো,
এখন মাথা ঠাণ্ডা হয়ে হয়েছে সেই ভ্রমান্ত।
এখন শুধু গদ্য লিখি, তাও আবার কদাচিৎ,
আসল ভালো লাগে খাটে থাকতে পড়ে সদা চিৎ।
যা হ'ক একটা খ্যাতি আছে অনেক দিনের তৈরি সে,
শক্তি এখন কম পড়েছে তাই হয়েছে বৈরী সে;
সেই সেকালের নেশা তবু মনের মধ্যে ফিরছে তো,
নতুন যুগের লোকের কাছে বড়াই রাখার ইচ্ছে তো।
তাই বসেছি ডেস্কে আমার, ডাক দিয়েছি চাকরকে,
"কলম লে আও, কাগজ লে আও, কালি লে আও, খাঁ করকে
ভাবছি যদি তোমরা দুজন বছর তিরিশ পূর্বেতে
গরজ ক'রে আসতে কাছে, কিছু তবু সুর পেতে।
সেদিন যখন আজকে দিনের বাপ-খুড়ো সব নাবালক,
বর্তমানের সুবুদ্ধিরা প্রায় ছিল সব হাবা লোক,
তখন যদি বলতে আমায় লিখতে পয়ার মিল করে,
লাইনগুলো পোকার মতো বেরোত পিল-পিল ক'রে।
পঞ্জিকাটা মান না কি, দিন দেখাটায় লক্ষ্য নেই?
লগ্নটি সব বইয়ে দিয়ে আজ এসেছ অক্ষণেই।
যা হ'ক তবু যা পারি তাই জুড়ব কথা ছন্দেতে,
কবিত্ব-ভূত আবার এসে চাপুক আমার স্কন্ধেতে।

শিলংগিরির বর্ণনা চাও ? আচ্ছা না হয় তাই হবে,
উচ্চদরের কাব্যকলা না যদি হয় নাই হবে,—
মিল বাঁচাব, মেনে যাব মাত্রা দেবার বিধান তো ;
তার বেশি আর করলে আশা ঠকবে এবার নিতান্ত।

গর্মি যখন ছুটল না আর পাখার হাওয়ায় শরবতে,
ঠাণ্ডা হতে দৌড়ে এলুম শিলঙ নামক পর্বতে।
মেঘ-বিছানো শৈলমালা গহন-ছায়া অরণ্যে
ক্লান্ত জনে ডাক দিয়ে কয়, "কোলে আমার শরণ নে।
ঝরনা ঝরে কলকলিয়ে আঁকাবাঁকা ভঙ্গিতে,
বুকের মাঝে কয় কথা যে সোহাগ-ঝরা সংগীতে।
বাতাস কেবল ঘুরে বেড়ায় পাইন বনের পল্লবে,
নিঃশ্বাসে তার বিষ নাশে আর অবল মানুষ বল লভে।
পাথর-কাটা পথ চলেছে বাঁকে বাঁকে পাক দিয়ে,
নতুন নতুন শোভার চমক দেয় দেখা তার ফাঁক দিয়ে
দার্জিলিঙের তুলনাতে ঠাণ্ডা হেথায় কম হবে,
একটা খদর চাদর হলেই শীত-ভাঙানো সম্ভবে।
চেরাপুঞ্জি কাছেই বটে, নামজাদা তার বৃষ্টিপাত ;
মোদের 'পরে বাদল মেঘের নেই ততদূর দৃষ্টিপাত।

এখানে খুব লাগল ভালো গাছের ফাঁকে চন্দ্রোদয়,
আর ভালো এই হাওয়ায় যখন পাইন-পাতার গন্ধ বয় ;
বেশ আছি এই বনে বনে, যখন-তখন ফুল তুলি,
নাম-না-জানা পাখি নাচে, শিষ দিয়ে যায় বুলবুলি।
ভালো লাগে দুপুরবেলায় মন্দমধুর ঠাণ্ডাটি,
ভোলায় রে মন দেবদারু-বন গিরিদেবের পাণ্ডাটি।
ভালো লাগে আলোছায়ার নানারকম আঁক কাটা,
দিব্যি দেখায় শৈলবুকে শস্য-খেতের থাক কাটা

ভালো লাগে রৌদ্র যখন পড়ে মেঘের ফন্দিতে,
রবির সাথে ইন্দ্র মেলেন নীল-সোনালির সন্ধিতে।
নয় ভালো এই গুর্খাদলের কুচকাওয়াজের কাণ্ডটা,
তা ছাড়া ঐ ব্যাগ্‌পাইপ নামক বাদ্যভাণ্ডটা।
ঘন ঘন বাজায় শিঙা—আকাশ করে সরগরম,
গুলিগোলার ধড়ধড়ানি, বুকের মধ্যে থরথরম।
আর ভালো নয় মোটরগাড়ির ঘোর বেসুরো হাঁক দেওয়া,
নিরপরাধ পদাতিকের সর্বদেহে পাঁক দেওয়া।
তা ছাড়া সব পিসু মাছি কাশি হাঁচি ইত্যাদি,
কখনো বা খাওয়ার দোষে রুখে দাঁড়ায় পিত্তাদি;
এমনতরো ছোটোখাটো একটা কিংবা অর্ধটা
যৎসামান্য উপদ্রবের নাই বা দিলাম ফর্দটা।
দোষ গাইতে চাই যদি তো তাল করা যায় বিন্দুকে;
মোটের উপর শিলঙ ভালোই যাই না বলুক নিন্দুকে।
আমার মতে জগৎটাতে ভালোটারই প্রাধান্য,—
মন্দ যদি তিন-চল্লিশ, ভালোর সংখ্যা সাতান্ন।
বর্ণনাটা ক্ষান্ত করি, অনেকগুলো কাজ বাকি,
আছে চায়ের নেমন্তন্ন, এখনো তার সাজ বাকি।

ছড়া কিংবা কাব্য কভু লিখবে পরের ফরমাশে
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জেনো নয়কো তেমন শর্মা সে।
তথাপি এই ছন্দ রচে করেছি কাল নষ্ট তো;
এইখানেতে কারণটি তার বলে রাখি স্পষ্টত,—
তোমরা দুজন বয়সেতে ছোটোই হবে বোধ করি,
আর আমি তো পরমায়ুর ষাট দিয়েছি শোধ করি
তবু আমার পক্ক কেশের লম্বা দাড়ির সম্ভ্রমে.
আমাকে যে ভয় কর নি দুর্বাসা কি যম ভ্রমে,
মোর ঠিকানায় পত্র দিতে হয় নি কলম কম্পিত,
কবিতাতে লিখতে চিঠি হুকুম এল লম্ফিত,

এইটে দেখে মনটা আমার পূর্ণ হল উৎসাহে,
মনে হল, বৃদ্ধ আমি মন্দ লোকের কুৎসা এ।
মনে হল আজো আছে কম বয়সের রঙ্গিমা
জরার কোপে দাড়ি গোঁপে হয় নি জবড়জঙ্গিমা।
তাই বুঝি সব ছোটো যারা তারা যে কোন্ বিশ্বাসে
এক বয়সী বলে আমায় চিনেছে এক নিঃশ্বাসে।
এই ভাবনায় সেই হতে মন এমনিতরো খুশ আছে,
ডাকছে ভোলা "খাবার এল" আমার কি তার হুঁশ আছে ?
জানলা দিয়ে বৃষ্টিতে গা ভেজে যদি ভিজুক তো,
ভুলেই গেলাম লিখতে নাটক আছি আমি নিযুক্ত।
মনকে ডাকি, "হে আত্মারাম, ছুটুক তোমার কবিত্ব,
ছোট্টো দুটি মেয়ের কাছে ফুটুক রবির রবিত্ব।"

জিৎভূমি, শিলং
২৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০

যাত্রা

আশ্বিনের রাত্রিশেষে ঝরে-পড়া শিউলি-ফুলের
আগ্রহে আকুল বনতল ; তারা মরণকূলের
উৎসবে ছুটেছে দলে দলে ; শুধু বলে, "চলো চলো।"
অশ্রুবাষ্প-কুহেলিতে দিগন্তের চক্ষু ছলছল,
ধরিত্রীর আর্দ্রবক্ষে তৃণে তৃণে কম্পন সঞ্চারে,
তবু ওই প্রভাতের যাত্রিদল বিদায়ের দ্বারে
হাস্যমুখে ঊর্ধ্বপানে চায়, দেখে অরুণ আলোর
তরণী দিয়েছে খেয়া, হংসশুভ্র মেঘের ঝালর
দোলে তার চন্দ্রাতপতলে।

ওরে, এতক্ষণে বুঝি
তারা ঝরা নির্ঝরের স্রোতঃপথে পথ খুঁজি খুঁজি
গেছে সাত ভাই চম্পা ; কেতকীর রেণুতে রেণুতে
ছেয়েছে যাত্রার পথ ; দিগ্বধূর বেণুতে বেণুতে

বেজেছে ছুটির গান ; ভাঁটার নদীর ঢেউগুলি
মুক্তির কল্লোলে মাতে, নৃত্যবেগে ঊর্ধ্বে বাহু তুলি'
উচ্ছলিয়া বলে, "চলো, চলো।" বাউল উত্তরে-হাওয়া
ধেয়েছে দক্ষিণ মুখে, মরণের রুদ্রনেশা-পাওয়া ;
বাজায় অশান্ত ছন্দে তাল পল্লবের করতাল,
ফুকারে বৈরাগ্যমন্ত্র ; স্পর্শে তার হয়েছে মাতাল
প্রান্তরের প্রান্তে প্রান্তে কাশের মঞ্জরী, কাঁপে তারা
ভয়কুণ্ঠ উৎকণ্ঠিত সুখে—বলে, "বৃন্তবন্ধহারা
যাব উদ্দামের পথে, যাব আনন্দিত সর্বনাশে,
রিক্তবৃষ্টি মেঘ সাথে, সৃষ্টিছাড়া ঝড়ের বাতাসে,
যাব, যেথা শংকরের টলমল চরণ পাতনে
জাহ্নবীতরঙ্গমন্দ্র-মুখরিত তাণ্ডব-মাতনে
গেছে উড়ে জটাভ্রষ্ট ধুতুরার ছিন্নভিন্ন দল,
কক্ষচ্যুত ধূমকেতু লক্ষ্যহারা প্রলয়-উজ্জ্বল
আত্মঘাত-মদমত্ত আপনারে দীর্ণ কীর্ণ করে
নির্মম উল্লাসবেগে, খণ্ড খণ্ড উল্কাপিণ্ড ঝরে,
কণ্টকিয়া তোলে ছায়াপথ।"
ওরা ডেকে বলে, "কবি,
সে তীর্থে কি তুমি সঙ্গে যাবে, যেথা অস্তগামী রবি
সন্ধ্যামেঘে রচে বেদী নক্ষত্রের বন্দনাসভায়,
যেথা তার সর্বশেষ রশ্মিটির রক্তিম জবায়
সাজায় অন্তিম অর্ঘ্য ; যেথায় নিঃশব্দ বেণু 'পরে
সংগীত স্তম্ভিত থাকে মরণের নিস্তব্ধ অধরে।"

কবি বলে, "যাত্রী আমি, চলিব রাত্রির নিমন্ত্রণে
যেখানে সে চিরন্তন দেয়ালির উৎসবপ্রাঙ্গণে
মৃত্যুদূত নিয়ে গেছে আমার আনন্দদীপগুলি,
যেথা মোর জীবনের প্রত্যুষের সুগন্ধি শিউলি
মাল্য হয়ে গাঁথা আছে অনন্তের অঙ্গদে কুণ্ডলে,
ইন্দ্রাণীর স্বয়ম্বর-বরমাল্য সাথে ; দলে দলে

যেথা মোর অকৃতার্থ আশাগুলি, অসিদ্ধ সাধনা,
মন্দির-অঙ্গনদ্বারে প্রতিহত কত আরাধনা
নন্দন-মন্দারগন্ধ-লুব্ধ যেন মধুকর-পাঁতি,
গেছে উড়ি মর্ত্যের দুর্ভিক্ষ ছাড়ি।
আমি তব সাথি,
হে শেফালি, শরৎ-নিশির স্বপ্ন, শিশিরসিঞ্চিত
প্রভাতের বিচ্ছেদবেদনা, মোর সুচিরসঞ্চিত
অসমাপ্ত সংগীতের ডালিখানি নিয়ে বক্ষতলে,
সমর্পিব নির্বাকের নির্বাণ বাণীর হোমানলে।"

৫ আশ্বিন, ১৩৩০

তপোভঙ্গ

যৌবনবেদনা-রসে উচ্ছল আমার দিনগুলি,
হে কালের অধীশ্বর, অন্যমনে গিয়েছ কি ভুলি,
হে ভোলা সন্ন্যাসী।
চঞ্চল চৈত্রের রাতে
কিংশুকমঞ্জরী সাথে
শূন্যের অকূলে তারা অযত্নে গেল কি সব ভাসি?

আশ্বিনের বৃষ্টিহারা শীর্ণশুভ্র মেঘের ভেলায়
গেল বিস্মৃতির ঘাটে স্বেচ্ছাচারী হাওয়ার খেলায়
নির্মম হেলায়?

একদা সে দিনগুলি তোমার পিঙ্গল জটাজালে
শ্বেত রক্ত নীল পীত নানা পুষ্পে বিচিত্র সাজালে,
গেছ কি পাসরি।
দস্যু তারা হেসে হেসে
হে ভিক্ষুক, নিল শেষে
তোমার ডম্বরু শিঙা, হাতে দিল মঞ্জিরা বাঁশরি।

গন্ধভারে আমন্থর বসন্তের উন্মাদন-রসে
ভরি' তব কমণ্ডলু নিমজ্জিল নিবিড় আলসে
মাধুর্যরভসে।

সেদিন তপস্যা তব অকস্মাৎ শূন্যে গেল ভেসে
শুষ্ক-পত্রে ঘূর্ণ-বেগে গীত-রিক্ত হিম-মরুদেশে,
উত্তরের মুখে।

তব ধ্যানমন্ত্রটিরে
আনিল বাহির তীরে
পুষ্পগন্ধে লক্ষ্যহারা দক্ষিণের বায়ুর কৌতুকে।

সে-মন্ত্রে উঠিল মাতি সেঁউতি কাঞ্চন করবিকা,
সে-মন্ত্রে নবীনপত্রে জ্বালি দিল অরণ্যবীথিকা
শ্যাম বহ্নিশিখা।

বসন্তের বন্যাস্রোতে সন্ন্যাসের হল অবসান ;
জটিল জটার বন্ধে জাহ্নবীর অশ্রু-কলতান
শুনিলে তন্ময়।

সেদিন ঐশ্বর্য তব
উন্মেষিল নব নব
অন্তরে উদ্বেল হল আপনাতে আপন বিস্ময়।

আপনি সন্ধান পেলে আপনার সৌন্দর্য উদার,
আনন্দে ধরিলে হাতে জ্যোতির্ময় পাত্রটি সুধার
বিশ্বের ক্ষুধার।

সেদিন, উন্মত্ত তুমি, যে-নৃত্যে ফিরিলে বনে বনে
সে-নৃত্যের ছন্দে-লয়ে সংগীত রচিনু ক্ষণে ক্ষণে
তব সঙ্গ ধ'রে।

ললাটের চন্দ্রালোকে
নন্দনের স্বপ্ন-চোখে
নিত্য-নূতনের লীলা দেখেছিনু চিত্ত মোর ভ'রে।

দেখেছিনু সুন্দরের অন্তর্লীন হাসির রঙ্গিমা,
দেখেছিনু লজ্জিতের পুলকের কুণ্ঠিত ভঙ্গিমা,
রূপ-তরঙ্গিমা।

সেদিনের পানপাত্র, আজ তার ঘুচালে পূর্ণতা ?
মুছিলে, চুম্বনরাগে চিহ্নিত বঙ্কিম রেখা-লতা
রক্তিম-অঙ্কনে ?
অগীত সংগীতধার,
অশ্রুর সঞ্চয়ভার
অযত্নে লুণ্ঠিত সে কি ভগ্নভাণ্ডে তোমার অঙ্গনে ?

তোমার তাণ্ডব নৃত্যে চূর্ণ চূর্ণ হয়েছে সে ধূলি ?
নিঃস্ব কালবৈশাখীর নিঃশ্বাসে কি উঠিছে আকুলি
লুপ্ত দিনগুলি ?

নহে নহে, আছে তারা ; নিয়েছ তাদের সংহরিয়া
নিগূঢ় ধ্যানের রাত্রে, নিঃশব্দের মাঝে সম্বরিয়া
রাখ সংগোপনে।
তোমার জটায় হারা
গঙ্গা আজ শান্তধারা,
তোমার ললাটে চন্দ্র গুপ্ত আজি সুপ্তির বন্ধনে।

আবার কী লীলাচ্ছলে অকিঞ্চন সেজেছ বাহিরে।
অন্ধকারে নিঃস্বনিছে যত দূরে দিগন্তে চাহি রে—
"নাহি রে, নাহি রে।"

কালের রাখাল তুমি, সন্ধ্যায় তোমার শিঙা বাজে,
দিন-ধেনু ফিরে আসে স্তব্ধ তব গোষ্ঠগৃহমাঝে,
উৎকণ্ঠিত বেগে।
নির্জন প্রান্তরতলে
আলেয়ার আলো জ্বলে,
বিদ্যুৎ-বহ্নির সর্প হানে ফণা যুগান্তের মেঘে।

চঞ্চল মুহূর্ত যত অন্ধকারে দুঃসহ নৈরাশে
নিবিড় নিবদ্ধ হয়ে তপস্যার নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে
শান্ত হয়ে আসে।

জানি জানি, এ তপস্যা দীর্ঘরাত্রি করিছে সন্ধান
চঞ্চলের নৃত্যস্রোতে আপন উন্মত্ত অবসান
দুরন্ত উল্লাসে।
বন্দী যৌবনের দিন
আবার শৃঙ্খলহীন
বারে বারে বাহিরিবে ব্যগ্র বেগে উচ্চ কলোচ্ছ্বাসে।

বিদ্রোহী নবীন বীর, স্থবিরের শাসন-নাশন,
বারে বারে দেখা দিবে ; আমি রচি তারি সিংহাসন,
তারি সম্ভাষণ।

তপোভঙ্গ-দূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুদ্র সন্ন্যাসী,
স্বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি যুগে যুগে আসি
তব তপোবনে।
দুর্জয়ের জয়মালা
পূর্ণ করে মোর ডালা,
উদ্দামের উতরোল বাজে মোর ছন্দের ক্রন্দনে।

ব্যথার প্রলাপে মোর গোলাপে গোলাপে জাগে বাণী,
কিশলয়ে কিশলয়ে কৌতূহল-কোলাহল আনি'
মোর গান হানি।

হে শুষ্ক বল্কলধারী বৈরাগী, ছলনা জানি সব,
সুন্দরের হাতে চাও আনন্দে একান্ত পরাভব
ছদ্মরণবেশে।
বারে বারে পঞ্চশরে
অগ্নিতেজে দগ্ধ করে
দ্বিগুণ উজ্জ্বল করি' বারে বারে বাঁচাইবে শেষে।

বারে বারে তারি তূণ সম্মোহনে ভরি দিব ব'লে
আমি কবি সংগীতের ইন্দ্রজাল নিয়ে আসি চলে
মৃত্তিকার কোলে।

জানি জানি, বারংবার প্রেয়সীর পীড়িত প্রার্থনা
শুনিয়া জাগিতে চাও আচম্বিতে, ওগো অন্যমনা,
নূতন উৎসাহে।

তাই তুমি ধ্যানচ্ছলে
বিলীন বিরহতলে,
উমাকে কাঁদাতে চাও বিচ্ছেদের দীপ্তদুঃখদাহে।

ভগ্ন তপস্যার পরে মিলনের বিচিত্র সে ছবি
দেখি আমি যুগে যুগে, বীণাতন্ত্রে বাজাই ভৈরবী,
আমি সেই কবি।

আমারে চেনে না তব শ্মশানের বৈরাগ্যবিলাসী,
দারিদ্র্যের উগ্র দর্পে খলখল ওঠে অট্টহাসি
দেখে মোর সাজ।

হেনকালে মধুমাসে
মিলনের লগ্ন আসে,
উমার কপোলে লাগে স্মিতহাস্য-বিকশিত লাজ।

সেদিন কবিরে ডাকো বিবাহের যাত্রাপথতলে,
পুষ্পমাল্যমাঙ্গল্যের সাজি লয়ে, সপ্তর্ষির দলে
কবি সঙ্গে চলে।

ভৈরব, সেদিন তব প্রেতসঙ্গিদল রক্ত-আঁখি
দেখে তব শুভ্রতনু রক্তাংশুকে রহিয়াছে ঢাকি,
প্রাতঃসূর্যরুচি।

অস্থিমালা গেছে খুলে
মাধবীবল্লরীমূলে,

ভালে মাখা পুষ্পরেণু, চিতাভস্ম কোথা গেছে মুছি
কৌতুকে হাসেন উমা কটাক্ষে লক্ষিয়া কবি পানে ;
সে হাস্যে মন্দ্রিল বাঁশি সুন্দরের জয়ধ্বনিগানে
কবির পরানে।

কার্তিক, ১৩৩০

ভাঙা মন্দির

১

পুণ্যলোভীর নাই হল ভিড়
শূন্য তোমার অঙ্গনে,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়।
অর্ঘ্যের আলো নাই বা সাজাল
পুষ্পে প্রদীপে চন্দনে,
যাত্রীরা তব বিস্মৃত-পরিচয়।
সম্মুখপানে দেখো দেখি চেয়ে,
ফাল্গুনে তব প্রাঙ্গণ ছেয়ে
বনফুলদল ঐ এল ধেয়ে
উল্লাসে চারিধারে।
দক্ষিণ বায়ে কোন্ আহ্বান
শূন্যে জাগায় বন্দনাগান,
কী খেয়াতরীর পায় সন্ধান
আসে পৃথ্বীর পারে?
গন্ধের থালি বর্ণের ডালি
আনে নির্জন অঙ্গনে,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়,
বকুল শিমুল আকন্দ ফুল
কাঞ্চন জবা রঙ্গনে
পূজা-তরঙ্গ দুলে অম্বরময়।

২

প্রতিমা না হয় হয়েছে চূর্ণ,
বেদীতে না হয় শূন্যতা,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়,
না হয় ধুলায় হল লুণ্ঠিত
আছিল যে-চূড়া উন্নতা,
সজ্জা না থাকে কিসের লজ্জা ভয় ?
বাহিরে তোমার ঐ দেখো ছবি,
ভগ্নভিত্তিলগ্ন মাধবী,
নীলাম্বরের প্রাঙ্গণে রবি
হেরিয়া হাসিছে স্নেহে।
বাতাসে পুলকি আলোকে আকুলি
আন্দোলি উঠে মঞ্জরীগুলি,
নবীন প্রাণের হিল্লোল তুলি
প্রাচীন তোমার গেহে।
সুন্দর এসে ঐ হেসে হেসে
ভরি দিল তব শূন্যতা,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়।
ভিত্তিরন্ধ্রে বাজে আনন্দে
ঢাকি দিয়া তব ক্ষুণ্ণতা
রূপের শঙ্খে অসংখ্য জয় জয়।

৩

সেবার প্রহরে নাই আসিল রে
যত সন্ন্যাসী-সজ্জনে,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়।
নাই মুখরিল পার্বণ-ক্ষণ
ঘন জনতার গর্জনে,
অতিথি-ভোগের না রহিল সঞ্চয়।

পূজার মঞ্চে বিহঙ্গদল
কুলায় বাঁধিয়া করে কোলাহল,
তাই তো হেথায় জীববৎসল
আসিছেন ফিরে ফিরে।
নিত্য সেবার পেয়ে আয়োজন
তৃপ্ত পরানে করিছে কূজন,
উৎসবরসে সেই তো পূজন
জীবন-উৎসতীরে।
নাইকো দেবতা ভেবে সেই কথা
গেল সন্ন্যাসী-সজ্জনে,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়।
সেই অবকাশে দেবতা যে আসে,—
প্রসাদ-অমৃত-মজ্জনে
স্খলিত ভিত্তি হল যে পুণ্যময়॥

মাঘ, ১৩৩০

আগমনী

মাঘের বুকে সকৌতুকে কে আজি এল, তাহা
বুঝিতে পার তুমি?
শোন নি কানে, হঠাৎ গানে কহিল, "আহা, আহা,"
সকল বনভূমি?
শুষ্ক জরা পুষ্প-ঝরা,
হিমের বায়ে কাঁপন-ধরা
শিথিল মন্থর;
"কে এল" বলি তরাসি উঠে শীতের সহচর।

গোপনে এল, স্বপনে এল, এল সে মায়া-পথে,
পায়ের ধ্বনি নাহি।

ছায়াতে এল, কায়াতে এল, এল সে মনোরথে
দখিন-হাওয়া বাহি
অশোক-বনে নবীন পাতা
আকাশ পানে তুলিল মাথা,
কহিল, "এসেছ কি ?"
মর্মরিয়া থরথর কাঁপিল আমলকী।

কাহারে চেয়ে উঠিল গেয়ে দোয়েল চাঁপা-শাখে
"শোনো গো, শোনো শোনো।"
শ্যামা না জানে প্রভাতী-গানে কী নামে তারে ডাকে
আছে কি নাম কোনো ?
কোকিল শুধু মুহুর্মুহু
আপন মনে কুহরে কুহু
ব্যথায় ভরা বাণী।
কপোত বুঝি শুধায় শুধু, "জানি কি, তারে জানি ?"

আমের বোলে কী কলরোলে সুবাস ওঠে মাতি'
অসহ উচ্ছ্বাসে।
আপন মনে মাধবী ভনে কেবলি দিবারাতি,
"মোরে সে ভালোবাসে।"
অধীর হাওয়া নদীর পারে
খ্যাপার মতো কহিছে কারে
"বলো তো কী-যে করি ?"
শিহরি উঠি শিরীষ বলে, "কে ডাকে মরি, মরি।"

কেন যে আজি উঠিল বাজি আকাশ-কাঁদা বাঁশি
জানিস তাহা না কি ?
রঙিন যত মেঘের মতো কী যায় মনে ভাসি
কেন যে থাকি থাকি ?

অবুঝ তোরা, তাহারে বুঝি
দূরের পানে ফিরিস খুঁজি ;
বাহিরে আঁখি বাঁধা,
প্রাণের মাঝে চাহিস না যে তাই তো লাগে ধাঁধা।

পুলকে-কাঁপা কনকচাঁপা বুকের মধু-কোষে
পেয়েছে দ্বার নাড়া,
এমন করে কুঞ্জ ভরে সহজে তাই তো সে
দিয়েছে তারি সাড়া।
সহসা বনমল্লিকা যে
পেয়েছে তারে আপন মাঝে,
ছুটিয়া দলে দলে
"এই যে তুমি, এই যে তুমি" আঙুল তুলে বলে।

পেয়েছে তারা, গেয়েছে তারা, জেনেছে তারা সব
আপন মাঝখানে,
তাই এ শীতে জাগাল গীতে বিপুল কলরব
দ্বিধাবিহীন তানে।
ওদের সাথে জাগ্‌ রে কবি,
হৃৎকমলে দেখ্‌ সে ছবি,
ভাঙুক মোহঘোর।
বনের তলে নবীন এল, মনের তলে তোর।

আলোতে তোরে দিক না ভরে ভোরের নব রবি,
বাজ্‌ রে বীণা বাজ্‌।
গগন-কোলে হাওয়ার দোলে ওঠ্‌ রে দুলে কবি,
ফুরাল তোর কাজ।
বিদায় নিয়ে যাবার আগে
পড়ুক টান ভিতর বাগে,
বাহিরে পাস ছুটি।
প্রেমের ডোরে বাঁধুক তোরে বাঁধন যাক টুটি॥

মাঘ, ১৩৩০

উৎসবের দিন

ভয় নিত্য জেগে আছে প্রেমের শিয়র-কাছে,
মিলন-সুখের বক্ষোমাঝে।
আনন্দের হৃৎস্পন্দনে আন্দোলিছে ক্ষণে-ক্ষণে
বেদনার রুদ্র দেবতা যে।
তাই আজ উৎসবের ভোরবেলা হতে
বাষ্পাকুল অরুণের করুণ আলোতে
উল্লাস-কল্লোলতলে ভৈরবী রাগিণী কেঁদে বাজে
মিলন-সুখের বক্ষোমাঝে।

নবীন পল্লবপুটে মর্মরি মর্মরি উঠে
দূর বিরহের দীর্ঘশ্বাস;
উষার সীমন্তে লেখা উদয়-সিন্দুর-রেখা
মনে আনে সন্ধ্যার আকাশ।
আম্রের মুকুল-গন্ধে ব্যাকুল কী সুর
অরণ্যছায়ার হিয়া করিছে বিধুর;
অশ্রুর অশ্রুত ধ্বনি ফাল্গুনের মর্মে করে বাস,
দূর বিরহের দীর্ঘশ্বাস।

দিগন্তের স্বর্ণদ্বারে কতবার বারে বারে
এসেছিল সৌভাগ্য-লগন।
আশার লাবণ্যে-ভরা জেগেছিল বসুন্ধরা,
হেসেছিল প্রভাত-গগন।
কত না উৎসুক-বুকে পথপানে ধাওয়া,
কত না চকিত-চক্ষে প্রতীক্ষার চাওয়া
বারেবারে বসন্তেরে করেছিল চাঞ্চল্যে-মগন,
এসেছিল সৌভাগ্য-লগন।

আজ উৎসবের সুরে তারা মরে ঘুরে ঘুরে ;
বাতাসেরে করে যে উদাস।
তাদের পরশ পায়, কী মায়াতে ভরে যায়
প্রভাতের স্নিগ্ধ অবকাশ।
তাদের চমক লাগে চম্পকশাখায়,
কাঁপে তারা মৌমাছির গুঞ্জিত পাখায়,
সেতারের তারে তারে মূর্ছনায় তাদের আভাস
বাতাসেরে করিল উদাস।

কালস্রোতে এ অকূলে আলোচ্ছায়া দুলে দুলে
চলে নিত্য অজানার টানে।
বাঁশি কেন রহি রহি সে-আহ্বান আনে বহি'
আজি এই উল্লাসের গানে ?
চঞ্চলেরে শুনাইছে স্তব্ধতার ভাষা,
যার রাত্রি-নীড়ে আসে যত শঙ্কা আশা।
বাঁশি কেন প্রশ্ন করে, "বিশ্ব কোন্ অনন্তের পানে
চলে নিত্য অজানার টানে ?"

যায় যাক, যায় যাক্, আসুক দূরের ডাক,
যাক ছিঁড়ে সকল বন্ধন।
চলার সংঘাত-বেগে সংগীত উঠুক জেগে
আকাশের হৃদয়-নন্দন।
মুহূর্তের নৃত্যচ্ছন্দে ক্ষণিকের দল
যাক পথে মত্ত হয়ে বাজায়ে মাদল ;
অনিত্যের স্রোত বেয়ে যাক ভেসে হাসি ও ক্রন্দন,
যাক ছিঁড়ে সকল বন্ধন।

ফাল্গুন, ১৩৩০

গানের সাজি

গানের সাজি এনেছি আজি
ঢাকাটি তার লও গো খুলে
দেখো তো চেয়ে কী আছে।
যে থাকে মনে স্বপন-বনে
ছায়ার দেশে ভাবের কূলে
সে বুঝি কিছু দিয়াছে।
কী যে সে তাহা আমি কি জানি,
ভাষায় চাপা কোন্ সে বাণী
সুরের ফুলে গন্ধখানি
ছন্দে বাঁধি গিয়াছে,
সে ফুল বুঝি হয়েছে পুঁজি,
দেখো তো চেয়ে কী আছে।

দেখো তো, সখী দিয়েছে ও কি
সুখের কাঁদা দুখের হাসি,
দুরাশাভরা চাহনি?
দিয়েছে কি না ভোরের বীণা,
দিয়েছে কি সে রাতের বাঁশি
গহন-গান গাহনি?
বিপুল ব্যথা ফাগুন-বেলা,
সোহাগ কভু, কভু বা হেলা,
আপন মনে আগুন-খেলা
পরানমন-দাহনি,—
দেখো তো ডালা, সে স্মৃতি-ঢালা
আছে আকুল চাহনি?

ডেকেছ কবে মধুর রবে
মিটালে কবে প্রাণের ক্ষুধা
তোমার করপরশে,
সহসা এসে করুণ হেসে
কখন চোখে ঢালিলে সুধা
ক্ষণিক তব দরশে,—
বাসনা জাগে নিভৃতে চিতে
সে-সব দান ফিরায়ে দিতে
আমার দিনশেষের গীতে ;
সফল তারে করো সে।
গানের সাজি খোলো গো আজি
করুণ করপরশে।

রসে বিলীন সে-সব দিন
ভরেছে আজি বরণডালা
চরম তব বরণে।
সুরের ডোরে গাঁথনি ক'রে
রচিয়া মম বিরহমালা
রাখিয়া যাব চরণে।
একদা তব মনে না রবে,
স্বপনে এরা মিলাবে কবে,
তাহারি আগে ঝরুক তবে
অমৃতময় মরণে
ফাগুনে তোরে বরণ ক'রে
সকল শেষ বরণে॥

ফাল্গুন, ১৩৩০

লীলাসঙ্গিনী

দুয়ার-বাহিরে যেমনি চাহি রে
মনে হল যেন চিনি,—
কবে, নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা,
ছিলে লীলাসঙ্গিনী ?
কাজে ফেলে মোরে চলে গেলে কোন্ দূরে,
মনে পড়ে গেল আজি বুঝি বন্ধুরে ?
ডাকিলে আবার কবেকার চেনা সুরে—
বাজাইলে কিঙ্কিণী।
বিস্মরণের গোধূলিক্ষণের
আলোতে তোমারে চিনি।

এলোচুলে বহে এনেছ কী মোহে
সেদিনের পরিমল ?
বকুলগন্ধে আনে বসন্ত
কবেকার সম্বল ?
চৈত্র-হাওয়ায় উতলা কুঞ্জমাঝে
চারু চরণের ছায়ামঞ্জীর বাজে,
সেদিনের তুমি এলে এদিনের সাজে
ওগো চিরচঞ্চল।
অঞ্চল হতে ঝরে বায়ুস্রোতে
সেদিনের পরিমল।

মনে আছে সে কি সব কাজ, সখী,
ভুলায়েছ বারে বারে।
বন্ধ দুয়ার খুলেছ আমার
কঙ্কণ-ঝংকারে।

ইশারা তোমার বাতাসে বাতাসে ভেসে
ঘুরে ঘুরে যেত মোর বাতায়নে এসে,
কখনো আমের নবমুকুলের বেশে,
কভু নবমেঘভারে।
চকিতে চকিতে চল-চাহনিতে
ভুলায়েছ বারে বারে।

নদী-কূলে কূলে কল্লোল তুলে
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে।
বনপথে আসি করিতে উদাসী
কেতকীর রেণু মেখে।
বর্ষাশেষের গগন-কোনায় কোনায়,
সন্ধ্যামেঘের পুঞ্জ সোনায় সোনায়
নির্জন ক্ষণে কখন অন্যমনায়
ছুঁয়ে গেছ থেকে থেকে।
কখনো হাসিতে কখনো বাঁশিতে
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে।

কী লক্ষ্য নিয়ে এসেছ এ-বেলা
কাজের কক্ষ-কোণে ?
সাথি খুঁজিতে কি ফিরিছ একেলা
তব খেলা-প্রাঙ্গণে ?
নিয়ে যাবে মোরে নীলাম্বরের তলে
ঘরছাড়া যত দিশাহারাদের দলে,
অযাত্রা-পথে যাত্রী যাহারা চলে
নিষ্ফল আয়োজনে ?
কাজ ভোলাবারে ফেরো বারে বারে
কাজের কক্ষ-কোণে।

আবার সাজাতে হবে আভরণে
মানসপ্রতিমাগুলি ?
কল্পনাপটে নেশার বরনে
বুলাব রসের তুলি ?
বিবাগি মনের ভাবনা ফাগুন-প্রাতে
উড়ে চলে যাবে উৎসুক বেদনাতে,
কলগুঞ্জিত মৌমাছিদের সাথে
পাখায় পুষ্পধূলি।
আবার নিভৃতে হবে কি রচিতে
মানস প্রতিমাগুলি ?

দেখো না কি, হায়, বেলা চলে যায়,—
সারা হয়ে এল দিন।
বাজে পূরবীর ছন্দে রবির
শেষ রাগিণীর বীন।
এতদিন হেথা ছিনু আমি পরবাসী,
হারিয়ে ফেলেছি সেদিনের সেই বাঁশি,
আজ সন্ধ্যায় প্রাণ ওঠে নিঃশ্বাসি
গানহারা উদাসীন।
কেন অবেলায় ডেকেছ খেলায়,
সারা হয়ে এল দিন।

এবার কি তবে শেষ খেলা হবে
নিশীথ-অন্ধকারে ?
মনে মনে বুঝি হবে খোঁজাখুঁজি
অমাবস্যার পারে ?
মালতীলতায় যাহারে দেখেছি প্রাতে
তারায় তারায় তারি লুকাচুরি রাতে ?
সুর বেজেছিল যাহার পরশ-পাতে
নীরবে লভিব তারে ?

দিনের দুরাশা স্বপনের ভাষা
রচিবে অন্ধকারে ?

যদি রাত হয়—না করিব ভয়,—
চিনি যে তোমারে চিনি।
চোখে নাই দেখি, তবু ছলিবে কি,
হে গোপন-রঙ্গিণী ?
নিমেষে আঁচল ছুঁয়ে যায় যদি চলে
তবু সব কথা যাবে সে আমায় বলে,
তিমিরে তোমার পরশ-লহরী দোলে
হে রস-তরঙ্গিণী !
হে আমার প্রিয়, আবার ভুলিয়ো,
চিনি যে তোমারে চিনি।

ফাল্গুন, ১৩৩০

শেষ অর্ঘ্য

যে-তারা মহেন্দ্রক্ষণে প্রত্যূষবেলায়
প্রথম শুনাল মোরে নিশান্তের বাণী
শান্তমুখে নিখিলের আনন্দমেলায়
স্নিগ্ধকণ্ঠে ডেকে নিয়ে এল ; দিল আনি
ইন্দ্রাণীর হাসিখানি দিনের খেলায়
প্রাণের প্রাঙ্গণে ; যে সুন্দরী, যে ক্ষণিকা
নিঃশব্দ চরণে আসি, কম্পিত পরশে
চম্পক-অঙ্গুলি-পাতে তন্দ্রাযবনিকা
সহাস্যে সরায়ে দিল, স্বপ্নের আলসে
ছোঁয়াল পরশমণি জ্যোতির কণিকা ;
অন্তরের কণ্ঠহারে নিবিড় হরষে
প্রথম দুলায়ে দিল রূপের মণিকা ;
এ-সন্ধ্যার অন্ধকারে চলিনু খুঁজিতে,
সঞ্চিত অশ্রুর অর্ঘ্যে তাহারে পূজিতে।

ফাল্গুন, ১৩৩০

বেঠিক পথের পথিক

বেঠিক পথের পথিক আমার
অচিন সে জন রে।
চকিত চলার ক্বচিৎ হাওয়ায়
মন কেমন করে।
নবীন চিকন অশথ-পাতায়,
আলোর চমক কানন মাতায়,
যে রূপ জাগায় চোখের আগায়
কিসের স্বপন সে।
কী চাই, কী চাই, বচন না পাই
মনের মতন রে।

অচিন বেদন আমার ভাষায়
মিশায় যখন রে
আপন গানের গভীর নেশায়
মন কেমন করে।
তরল চোখের তিমির তারায়
যখন আমার পরান হারায়,
বাজায় সেতার সেই অচেনার
মায়ার স্বপন যে।
কী চাই, কী চাই, সুর যে না পাই
মনের মতন রে।

হেলায় খেলায় কোন্ অবেলায়
হঠাৎ মিলন রে।
সুখের দুখের দুয়ের মেলায়
মন কেমন করে।
বঁধুর বাহুর মধুর পরশ
কায়ায় জাগায় মায়ার হরষ,

তাহার মাঝার সেই অচেনার
চপল স্বপন যে,
কী চাই, কী চাই, বাঁধন না পাই
মনের মতন রে।

প্রিয়ার হিয়ার ছায়ায় মিলায়
অচিন সে জন যে।
ছুঁই কি না ছুঁই বুঝি না কিছুই
মন কেমন করে।
চরণে তাহার পরান বুলাই
অরূপ দোলায় রূপেরে দুলাই ;
আঁখির দেখায় আঁচল ঠেকায়
অধরা স্বপন যে।
চেনা অচেনায় মিলন ঘটায়
মনের মতন রে।

ফাল্গুন, ১৩৩০

বকুল-বনের পাখি

শোনো শোনো ওগো, বকুল-বনের পাখি,
দেখো তো, আমায় চিনিতে পারিবে না কি ?
নই আমি কবি, নই জ্ঞান-অভিমানী,
মান-অপমান কী পেয়েছি নাহি জানি,
দেখেছ কি মোর দূরে-যাওয়া মনখানি,
উড়ে-যাওয়া মোর আঁখি ?
আমাতে কি কিছু দেখেছ তোমারি সম,
অসীম-নীলিমা-তিয়াষি বন্ধু মম ?

শোনো শোনো ওগো, বকুল-বনের পাখি,
কবে দেখেছিলে মনে পড়ে সে-কথা কি ?

বালক ছিলাম, কিছু নহে তার বাড়া,
রবির আলোর কোলেতে ছিলেম ছাড়া,
চাঁপার গন্ধ বাতাসের প্রাণ-কাড়া
যেত মোরে ডাকি ডাকি।
সহজ রসের ঝরনা-ধারার 'পরে
গান ভাসাতেম সহজ সুখের ভরে।

শোনো শোনো, ওগো বকুল-বনের পাখি,
কাছে এসেছিনু ভুলিতে পারিবে তা কি ?
নগ্ন পরান লয়ে আমি কোন্ সুখে
সারা আকাশের ছিনু যেন বুকে বুকে,
বেলা চলে যেত অবিরত কৌতুকে
সব কাজে দিয়ে ফাঁকি।
শ্যামলা ধরার নাড়ীতে যে-তাল বাজে
নাচিত আমার অধীর মনের মাঝে।

শোনো শোনো, ওগো বকুল-বনের পাখি,
দূরে চলে এনু, বাজে তার বেদনা কি ?
আষাঢ়ের মেঘ রহে না কি মোরে চাহি ?
সেই নদী যায় সেই কলতান গাহি,—
তাহার মাঝে কি আমার অভাব নাহি ?
কিছু কি থাকে না বাকি ?
বালক গিয়েছে হারায়ে, সে-কথা লয়ে
কোনো আঁখিজল যায় নি কোথাও বয়ে ?

শোনো শোনো, ওগো বকুল-বনের পাখি,
আর বার তারে ফিরিয়া ডাকিবে না কি ?
যায় নি সেদিন যেদিন আমারে টানে,
ধরার খুশিতে আছে সে সকল খানে ;
আজ বেঁধে দাও আমার শেষের গানে
তোমার গানের রাখি।

আবার বারেক ফিরে চিনে লও মোরে,
বিদায়ের আগে লও গো আপন ক'রে।

শোনো শোনো, ওগো বকুল-বনের পাখি,
সেদিন চিনেছ আজিও চিনিবে না কি ?
পারঘাটে যদি যেতে হয় এইবার,
খেয়াল-খেয়ায় পাড়ি দিয়ে হব পার,
শেষের পেয়ালা ভরে দাও, হে আমার
সুরের সুরার সাকী।
আর কিছু নই, তোমারি গানের সাথি,
এই কথা জেনে আসুক ঘুমের রাতি।

শোনো শোনো, ওগো বকুল-বনের পাখি,
মুক্তির টিকা ললাটে দাও তো আঁকি।
যাবার বেলায় যাব না ছদ্মবেশে,
খ্যাতির মুকুট খসে যাক নিঃশেষে,
কর্মের এই বর্ম যাক না ফেঁসে,
কীর্তি যাক না ঢাকি।
ডেকে লও মোরে নামহারাদের দলে
চিহ্নবিহীন উধাও পথের তলে।

শোনো শোনো, ওগো বকুল-বনের পাখি
যাই যবে যেন কিছুই না যাই রাখি।
ফুলের মতন সাঁঝে পড়ি যেন ঝরে,
তারার মতন যাই যেন রাত-ভোরে,
হাওয়ার মতন বনের গন্ধ হ'রে
চলে যাই গান হাঁকি'।
বেণুপল্লব-মর্মর-রব সনে
মিলাই যেন গো সোনার গোধূলি-খনে।

ফাল্গুন, ১৩৩০

সাবিত্রী

ঘন অশ্রুবাষ্পে ভরা মেঘের দুর্যোগে খড়্গ হানি
ফেলো, ফেলো টুটি।
হে সূর্য, হে মোর বন্ধু, জ্যোতির কনকপদ্মখানি
দেখা দিক্ ফুটি।
বহ্নিবীণা বক্ষে লয়ে, দীপ্ত কেশে, উদ্বোধিনী বাণী
সে-পদ্মের কেন্দ্রমাঝে নিত্য রাজে, জানি তারে জানি।
মোর জন্মকালে
প্রথম প্রত্যূষে মম তাহারি চুম্বন দিলে আনি
আমার কপালে।

সে-চুম্বনে উচ্ছলিল জ্বালার তরঙ্গ মোর প্রাণে,
অগ্নির প্রবাহ।
উচ্ছ্বসি উঠিল মন্দ্রি বারংবার মোর গানে গানে
শান্তিহীন দাহ।
ছন্দের বন্যায় মোর রক্ত নাচে সে-চুম্বন লেগে
উন্মাদ সংগীত কোথা ভেসে যায় উদ্দাম আবেগে,
আপনা-বিস্মৃত।
সে চুম্বন-মন্ত্রে বক্ষে অজানা ক্রন্দন উঠে জেগে
ব্যথায় বিস্মিত।

তোমার হোমাগ্নি মাঝে আমার সত্যের আছে ছবি,
তারে নমো নম।
তমিস্র সুপ্তির কূলে যে-বংশী বাজাও, আদি কবি,
ধ্বংস করি তম,
সে-বংশী আমারি চিত্ত, রন্ধ্রে তারি উঠিছে গুঞ্জরি
মেঘে মেঘে বর্ণচ্ছটা, কুঞ্জে কুঞ্জে মাধবীমঞ্জরী,
নির্ঝরে কল্লোল।

তাহারি ছন্দের ভঙ্গে সর্ব অঙ্গে উঠিছে সঞ্চরি
জীবনহিল্লোল ॥

এ প্রাণ তোমারি এক ছিন্ন তান, সুরের তরণী ;
আয়ুস্রোত-মুখে
হাসিয়া ভাসায়ে দিলে লীলাচ্ছলে, কৌতুকে ধরণী
বেঁধে নিল বুকে।
আশ্বিনের রৌদ্রে সেই বন্দী প্রাণ হয় বিস্ফুরিত
উৎকণ্ঠার বেগে, যেন শেফালির শিশিরচ্ছুরিত
উৎসুক আলোক।
তরঙ্গহিল্লোলে নাচে রশ্মি তব, বিস্ময়ে পূরিত
করে মুগ্ধ চোখ।

তেজের ভাণ্ডার হতে কী আমাতে দিয়েছ যে ভরে
কেই বা সে জানে ?
কী জাল হতেছে বোনা স্বপ্নে স্বপ্নে নানা বর্ণডোরে
মোর গুপ্ত-প্রাণে ?
তোমার দূতীরা আঁকে ভুবন-অঙ্গনে আলিম্পনা।
মুহূর্তে সে ইন্দ্রজাল অপরূপ রূপের কল্পনা
মুছে যায় সরে।
তেমনি সহজ হ'ক হাসিকান্না ভাবনাবেদনা,
না বাঁধুক মোরে।

তারা সবে মিলে থাক্ অরণ্যের স্পন্দিত পল্লবে,
শ্রাবণ-বর্ষণে ;
যোগ দিক নির্ঝরের মঞ্জীর-গুঞ্জন-কলরবে
উপলঘর্ষণে।
ঝঞ্ঝার মদিরামত্ত বৈশাখের তাণ্ডবলীলায়
বৈরাগী বসন্ত যবে আপনার বৈভব বিলায়;
সঙ্গে যেন থাকে।

তার পরে যেন তারা সর্বহারা দিগন্তে মিলায়,
চিহ্ন নাহি রাখে।

হে রবি, প্রাঙ্গণে তব শরতের সোনার বাঁশিতে
জাগিল মূর্ছনা।
আলোতে শিশিরে বিশ্ব দিকে দিকে অশ্রুতে হাসিতে
চঞ্চল উন্মনা।
জানি না কী মত্ততায়, কী আহ্বানে আমার রাগিণী
ধেয়ে যায় অন্যমনে শূন্যপথে হয়ে বিবাগিনী,
লয়ে তার ডালি।
সে কি তব সভাস্থলে স্বপ্নাবেশে চলে একাকিনী
আলোর কাঙালি ?

দাও, খুলে দাও দ্বার, ওই তার বেলা হল শেষ,
বুকে লও তারে।
শান্তি-অভিষেক হ'ক, ধৌত হ'ক সকল আবেশ
অগ্নি-উৎসধারে।
সীমন্তে, গোধূলি-লগ্নে দিয়ো এঁকে সন্ধ্যার সিন্দুর,
প্রদোষের তারা দিয়ে লিখো রেখা আলোক-বিন্দুর
তার স্নিগ্ধ ভালে।
দিনান্ত-সংগীতধ্বনি সুগম্ভীর বাজুক সিন্ধুর
তরঙ্গের তালে॥

হারুনা-মারু জাহাজ
২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২৪

পূর্ণতা

১

স্তব্ধরাতে একদিন
নিদ্রাহীন
আবেগের আন্দোলনে তুমি
বলেছিলে নতশিরে
অশ্রুনীরে
ধীরে মোর করতল চুমি—
"তুমি দূরে যাও যদি,
নিরবধি
শূন্যতার সীমাশূন্য ভারে
সমস্ত ভুবন মম
মরুসম
রুক্ষ হয়ে যাবে একেবারে।
আকাশ-বিস্তীর্ণ ক্লান্তি
সব শান্তি
চিত্ত হতে করিবে হরণ,—
নিরানন্দ নিরালোক
স্তব্ধ শোক
মরণের অধিক মরণ॥"

২

শুনে, তোর মুখখানি
বক্ষে আনি
বলেছিনু তোরে কানে কানে,-
"তুই যদি যাস দূরে
তোরি সুরে
বেদনা-বিদ্যুৎ গানে গানে

ঝলিয়া উঠিবে নিত্য,
মোর চিত্ত
সচকিবে আলোকে আলোকে
বিরহ বিচিত্র খেলা
সারা বেলা
পাতিবে আমার বক্ষে চোখে।
তুমি খুঁজে পাবে প্রিয়ে,
দূরে গিয়ে
মর্মের নিকটতম দ্বার,—
আমার ভুবনে তবে
পূর্ণ হবে
তোমার চরম অধিকার॥"

৩

দুজনের সেই বাণী
কানাকানি,
শুনেছিল সপ্তর্ষির তারা;
রজনীগন্ধার বনে
ক্ষণে ক্ষণে
বহে গেল সে বাণীর ধারা।
তার পরে চুপে চুপে
মৃত্যুরূপে
মধ্যে এল বিচ্ছেদ অপার।
দেখাশুনা হল সারা,
স্পর্শহারা
সে অনন্তে বাক্য নাহি আর
তবু শূন্য শূন্য নয়,
ব্যথাময়
অগ্নিবাষ্পে পূর্ণ সে গগন।

একা-একা সে অগ্নিতে
দীপ্তগীতে
সৃষ্টি করি স্বপ্নের ভুবন ॥

হারুনা-মারু জাহাজ,
১ অক্টোবর, ১৯২৪

আহ্বান

আমারে যে ডাক দেবে, এ জীবনে তারে বারম্বার
ফিরেছি ডাকিয়া।
সে নারী বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে খুলিয়াছে দ্বার
থাকিয়া থাকিয়া।
দীপখানি তুলে ধ'রে, মুখে চেয়ে, ক্ষণকাল থামি
চিনেছে আমারে।
তারি সেই চাওয়া, সেই চেনার আলোক দিয়ে আমি
চিনি আপনারে ॥

সহস্রের বন্যাস্রোতে জন্ম হতে মৃত্যুর আঁধারে
চলে যাই ভেসে।
নিজেরে হারায়ে ফেলি অস্পষ্টের প্রচ্ছন্ন পাথারে
কোন্ নিরুদ্দেশে।
নামহীন দীপ্তিহীন তৃপ্তিহীন আত্মবিস্মৃতির
তমসার মাঝে
কোথা হতে অকস্মাৎ কর মোরে খুঁজিয়া বাহির
তাহা বুঝি না যে ॥

তব কণ্ঠে মোর নাম যেই শুনি, গান গেয়ে উঠি—
"আছি আমি আছি।"
সেই আপনার গানে লুপ্তির কুয়াশা ফেলে টুটি,
বাঁচি, আমি বাঁচি।

তুমি মোরে চাও যবে, অব্যক্তের অখ্যাত আবাসে
আলো উঠে জ্বলে,
অসাড়ের সাড়া জাগে, নিশ্চল তুষার গলে আসে
নৃত্য-কলরোলে ॥

নিঃশব্দচরণে উষা নিখিলের সুপ্তির দুয়ারে
দাঁড়ায় একাকী,
রক্ত-অবগুণ্ঠনের অন্তরালে নাম ধরি কারে
চলে যায় ডাকি।
অমনি প্রভাত তার বীণা হাতে বাহিরিয়া আসে,
শূন্য ভরে গানে,
ঐশ্বর্য ছড়ায়ে দেয় মুক্তহস্তে আকাশে আকাশে,
ক্লান্তি নাহি জানে ॥

কোন্ জ্যোতির্ময়ী হোথা অমরাবতীর বাতায়নে
রচিতেছে গান
আলোকের বর্ণে বর্ণে; নির্নিমেষ উদ্দীপ্ত নয়নে
করিছে আহ্বান।
তাই তো চাঞ্চল্য জাগে মাটির গভীর অন্ধকারে;
রোমাঞ্চিত তৃণে
ধরণী ক্রন্দিয়া উঠে, প্রাণস্পন্দ ছুটে চারিধারে
বিপিনে বিপিনে ॥

তাই তো গোপন ধন খুঁজে পায় অকিঞ্চন ধূলি
নিরুদ্ধ ভাণ্ডারে।
বর্ণে গন্ধে রূপে রসে আপনার দৈন্য যায় ভুলি
পত্রপুষ্পভারে।
দেবতার প্রার্থনায় কার্পণ্যের বন্ধ মুষ্টি খুলে,
রিক্ততারে টুটি

রহস্য সমুদ্রতল উন্মথিয়া উঠে উপকূলে
রত্ন মুঠি মুঠি ॥

তুমি সে আকাশভ্রষ্ট প্রবাসী আলোক, হে কল্যাণী,
দেবতার দূতী।
মর্ত্যের গৃহের প্রান্তে বহিয়া এনেছে তব বাণী
স্বর্গের আকূতি।
ভঙ্গুর মাটির ভাণ্ডে গুপ্ত আছে যে অমৃতবারি
মৃত্যুর আড়ালে,
দেবতার হয়ে হেথা তাহারি সন্ধানে তুমি, নারী,
দু-বাহু বাড়ালে ॥

তাই তো কবির চিত্তে কল্পলোকে টুটিল অর্গল
বেদনার বেগে,
মানসতরঙ্গতলে বাণীর সংগীত-শতদল
নেচে ওঠে জেগে।
সুপ্তির তিমির বক্ষ দীর্ণ করে তেজস্বী তাপস
দীপ্তির কৃপাণে;
বীরের দক্ষিণ হস্ত মুক্তিমন্ত্রে বজ্র করে বশ,
অসত্যেরে হানে ॥

হে অভিসারিকা, তব বহুদূর পদধ্বনি লাগি,
আপনার মনে,
বাণীহীন প্রতীক্ষায় আমি আজ একা বসে জাগি,
নির্জন প্রাঙ্গণে।
দীপ চাহে তব শিখা, মৌনী বীণা ধেয়ায় তোমার
অঙ্গুলি-পরশ।
তারায় তারায় খোঁজে তৃষ্ণায় আতুর অন্ধকার
সঙ্গসুধারস ॥

নিদ্রাহীন বেদনায় ভাবি, কবে আসিবে পরানে
চরম আহ্বান ?
মনে জানি, এ জীবনে সাঙ্গ হয় নাই পূর্ণ তানে
মোর শেষ গান।
কোথা তুমি, শেষবার যে ছোঁয়াবে তব স্পর্শমণি
আমার সংগীতে ?
মহানিস্তব্ধের প্রান্তে কোথা বসে রয়েছ, রমণী,
নীরব নিশীথে ?

মহেন্দ্রের বজ্র হতে কালো চক্ষে বিদ্যুতের আলো
আনো, আনো ডাকি,
বর্ষণ-কাঙাল মোর মেঘের অন্তরে বহ্নি জ্বালো,
হে কালবৈশাখী।
অশ্রুভারে ক্লান্ত তার স্তব্ধ মূক অবরুদ্ধ দান
কালো হয়ে উঠে।
বন্যাবেগে মুক্ত করো, রিক্ত করি করো পরিত্রাণ,
সব লও লুটে॥

তার পরে যাও যদি যেয়ো চলি ; দিগন্ত অঙ্গন
হয়ে যাবে স্থির।
বিরহের শুভ্রতায় শূন্যে দেখা দিবে চিরন্তন
শান্তি সুগভীর।
স্বচ্ছ আনন্দের মাঝে মিলে যাবে সর্বশেষ লাভ,
সর্বশেষ ক্ষতি ;
দুঃখে সুখে পূর্ণ হবে অরূপ-সুন্দর আবির্ভাব,
অশ্রুধৌত জ্যোতি॥

ওরে পান্থ, কোথা তোর দিনান্তের যাত্রাসহচরী ?
দক্ষিণ-পবন

বহুক্ষণ চলে গেছে অরণ্যের পল্লব মর্মরি' ;
নিকুঞ্জভবন
গন্ধের ইঙ্গিত দিয়ে বসন্তের উৎসবের পথ
করে না প্রচার।
কাহারে ডাকিস তুই, গেছে চলে তার স্বর্ণরথ
কোন্ সিন্ধুপার ॥

জানি জানি আপনার অন্তরের গহনবাসীরে
আজিও না চিনি।
সন্ধ্যারতিলগ্নে কেন আসিলে না নিভৃত মন্দিরে
শেষ পূজারিনী ?
কেন সাজালে না দীপ, তোমার পূজার মন্ত্র-গানে
জাগায়ে দিলে না
তিমির রাত্রির বাণী, গোপনে যা লীন আছে প্রাণে
দিনের অচেনা ॥

অসমাপ্ত পরিচয়, অসম্পূর্ণ নৈবেদ্যের থালি
নিতে হল তুলে।
রচিয়া রাখে নি মোর প্রেয়সী কি বরণের ডালি
মরণের কূলে ?
সেখানে কি পুষ্পবনে গীতহীনা রজনীর তারা
নব জন্ম লভি
এই নীরবের বক্ষে নব ছন্দে ছুটাবে ফোয়ারা
প্রভাতী ভৈরবী ॥

হারুনা-মারু জাহাজ,
১ অক্টোবর, ১৯২৪

ছবি

স্বচ্ছ চিহ্ন এঁকে দিয়ে শান্ত সিন্ধুবুকে
তরী চলে পশ্চিমের মুখে।
আলোক-চুম্বনে নীল জল
করে ঝলমল।
দিগন্তে মেঘের জালে বিজড়িত দিনান্তের মোহ,
সূর্যাস্তের শেষ সমারোহ।
ঊর্ধ্বে যায় দেখা
তৃতীয়ার শীর্ণ শশিলেখা।
যেন কে উলঙ্গ শিশু কোথায় এসেছে জানে না সে,
নিঃসংকোচে হাসে।
বহে মন্দ মন্থর বাতাস
সঙ্গশূন্য সায়াহ্নের বৈরাগ্য-নিঃশ্বাস।
স্বর্গসুখে ক্লান্ত কোন্ দেবতার বাঁশির পূরবী
শূন্যতলে ধরে এই ছবি।
ক্ষণকাল পরে যাবে ঘুচে,
উদাসীন রজনীর কালো কেশে সব দেবে মুছে॥

এমনি রঙের খেলা নিত্য খেলে আলো আর ছায়া,
এমনি চঞ্চল মায়া
জীবন-অম্বরতলে ;
দুঃখে সুখে বর্ণে বর্ণে লিখা
চিহ্নহীন পদচারী কালের প্রান্তরে মরীচিকা।
তার পরে দিন যায়, অস্ত যায় রবি ;
যুগে যুগে মুছে যায় লক্ষ লক্ষ রাগরক্ত ছবি।
তুই হেথা কবি,
এ বিশ্বের মৃত্যুর নিঃশ্বাস
আপন বাঁশিতে ভরি গানে তারে বাঁচাইতে চাস।

হারুনা-মারু জাহাজ
২ অক্টোবর, ১৯২৪

লিপি

হে ধরণী, কেন প্রতিদিন
তৃপ্তিহীন
একই লিপি পড় ফিরে ফিরে ?
প্রত্যূষে গোপনে ধীরে ধীরে
আঁধারের খুলিয়া পেটিকা,
স্বর্ণবর্ণে লিখা
প্রভাতের মর্মবাণী
বক্ষে টেনে আনি'
গুঞ্জরিয়া কত সুরে আবৃত্তি কর যে মুগ্ধমনে ॥

বহুযুগ হয়ে গেল কোন্ শুভক্ষণে
বাষ্পের গুণ্ঠনখানি প্রথমে পড়িল যবে খুলে,
আকাশে চাহিলে মুখ তুলে।
অমর জ্যোতির মূর্তি দেখা দিল আঁখির সম্মুখে।
রোমাঞ্চিত বুকে
পরম বিস্ময় তব জাগিল তখনি।
নিঃশব্দ বরণ-মন্ত্রধ্বনি
উচ্ছ্বসিল পর্বতের শিখরে শিখরে।
কলোল্লাসে উদ্‌ঘোষিল নৃত্যমত্ত সাগরে সাগরে
জয়, জয়, জয়।
ঝঞ্ঝা তার বন্ধ টুটে ছুটে ছুটে কয়
"জাগো রে, জাগো রে,"
বনে বনান্তরে ॥

প্রথম সে দর্শনের অসীম বিস্ময়
এখনো যে কাঁপে বক্ষোময়।

তলে তলে আন্দোলিয়া উঠে তব ধূলি
তৃণে তৃণে কণ্ঠ তুলি
ঊর্ধ্বে চেয়ে কয়—
জয়, জয়, জয়।
সে বিস্ময় পুষ্পে পর্ণে গন্ধে বর্ণে ফেটে ফেটে পড়ে;
প্রাণের দুরন্ত ঝড়ে,
রূপের উন্মত্ত নৃত্যে, বিশ্বময়
ছড়ায় দক্ষিণে বামে সৃজন প্রলয়;
সে বিস্ময় সুখে দুঃখে গর্জি উঠি কয়,—
জয়, জয়, জয়॥

তোমাদের মাঝখানে আকাশ অনন্ত ব্যবধান;
ঊর্ধ্ব হতে তাই নামে গান।
চিরবিরহের নীল পত্রখানি 'পরে
তাই লিপি লেখা হয় অগ্নির অক্ষরে।
বক্ষে তারে রাখ,
শ্যাম আচ্ছাদনে ঢাক;
বাক্যগুলি
পুষ্পদলে রেখে দাও তুলি,—
মধুবিন্দু হয়ে থাকে নিভৃত গোপনে;
পদ্মের রেণুর মাঝে গন্ধের স্বপনে
বন্দী কর তারে;
তরুণীর প্রেমাবিষ্ট আঁখির ঘনিষ্ঠ অন্ধকারে
রাখ তারে ভরি;
সিন্ধুর কল্লোলে মিলি, নারিকেল পল্লবে মর্মরি,
সে বাণী ধ্বনিতে থাকে তোমার অন্তরে;
মধ্যাহ্নে শোনো সে বাণী অরণ্যের নির্জন নির্ঝরে॥

বিরহিণী, সে-লিপির যে-উত্তর লিখিতে উন্মনা
আজো তাহা সাঙ্গ হইল না।

যুগে যুগে বারম্বার লিখে লিখে
বারম্বার মুছে ফেল ; তাই দিকে দিকে
সে ছিন্ন কথার চিহ্ন পুঞ্জ হয়ে থাকে ;
অবশেষে একদিন জলজ্জটা ভীষণ বৈশাখে
উন্মত্ত ধূলির ঘূর্ণিপাকে
সব দাও ফেলে
অবহেলে,
আত্মবিদ্রোহের অসন্তোষে।
তার পরে আর বার বসে বসে
নূতন আগ্রহে লেখ নূতন ভাষায়।
যুগযুগান্তর চলে যায়॥

কত শিল্পী, কত কবি তোমার সে লিপির লিখনে
বসে গেছে একমনে।
শিখিতে চাহিছে তব ভাষা,
বুঝিতে চাহিছে তব অন্তরের আশা।
তোমার মনের কথা আমারি মনের কথা টানে,
চাও মোর পানে।
চকিত ইঙ্গিত তব, বসনপ্রান্তের ভঙ্গীখানি
অঙ্কিত করুক মোর বাণী।
শরতে দিগন্ততলে
ছলছলে
তোমার যে অশ্রুর আভাস,
আমার সংগীতে তারি পড়ুক নিঃশ্বাস।
অকারণ চাঞ্চল্যের দোলা লেগে
ক্ষণে ক্ষণে ওঠে জেগে
কটিতটে যে কলকিঙ্কিণী,
মোর ছন্দে দাও ঢেলে তারি রিনিঝিনি,
ওগো বিরহিণী॥

দূর হতে আলোকের বরমাল্য এসে
খসিয়া পড়িল তব কেশে,
স্পর্শে তারি কভু হাসি কভু অশ্রুজলে
উৎকণ্ঠিত আকাঙ্ক্ষায় বক্ষতলে
ওঠে যে ক্রন্দন,
মোর ছন্দে চিরদিন দোলে যেন তাহারি স্পন্দন।
স্বর্গ হতে মিলনের সুধা
মর্ত্যের বিচ্ছেদ-পাত্রে সংগোপনে রেখেছ, বসুধা,
তারি লাগি নিত্যক্ষুধা,
বিরহিণী অয়ি,
মোর সুরে হ'ক জ্বালাময়ী॥

হারুনা-মারু জাহাজ
৪ অক্টোবর, ১৯২৪

ক্ষণিকা

খোলো খোলো হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা,-
খুঁজে নিতে দাও সেই আনন্দের হারানো কণিকা।
কবে সে যে এসেছিল আমার হৃদয়ে যুগান্তরে,
গোধূলিবেলার পান্থ জনশূন্য এ মোর প্রান্তরে,
লয়ে তার ভীরু দীপশিখা।
দিগন্তের কোন্ পারে চলে গেল আমার ক্ষণিকা॥

ভেবেছিনু গেছি ভুলে ; ভেবেছিনু পদচিহ্নগুলি
পদে পদে মুছে নিল সর্বনাশী অবিশ্বাসী ধূলি।
আজ দেখি সেদিনের সেই ক্ষীণ পদধ্বনি তার
আমার গানের ছন্দ গোপনে করেছে অধিকার ;
দেখি তারি অদৃশ্য অঙ্গুলি
স্বপ্নে অশ্রুসরোবরে ক্ষণে ক্ষণে দেয় ঢেউ তুলি॥

বিরহের দূতী এসে তার সে স্তিমিত দীপখানি
চিত্তের অজানা কক্ষে কখন রাখিয়া দিল আনি।
সেখানে যে বীণা আছে অকস্মাৎ একটি আঘাতে
মুহূর্ত বাজিয়াছিল ; তার পরে শব্দহীন রাতে
বেদনাপদ্মের বীণাপাণি
সন্ধান করিছে সেই অন্ধকারে-থেমে-যাওয়া বাণী ॥

সেদিন ঢেকেছে তারে কী এক ছায়ার সংকোচন,
নিজের অধৈর্য দিয়ে পারে নি তা করিতে মোচন।
তার সেই ত্রস্ত আঁখি, সুনিবিড় তিমিরের তলে
যে-রহস্য নিয়ে চলে গেল, নিত্য তাই পলে পলে
মনে মনে করি যে লুণ্ঠন।
চিরকাল স্বপ্নে মোর খুলি তার সে অবগুণ্ঠন ॥

হে আত্মবিস্মৃত, যদি দ্রুত তুমি না যেতে চমকি,
বারেক ফিরায়ে মুখ পথমাঝে দাঁড়াতে থমকি,
তা হলে পড়িত ধরা রোমাঞ্চিত নিঃশব্দ নিশায়
দুজনের জীবনের ছিল যা চরম অভিপ্রায়।
তা হলে পরমলগ্নে, সখী
সে ক্ষণকালের দীপে চিরকাল উঠিত আলোকি ॥

হে পান্থ, সে পথে তব ধূলি আজ করি যে সন্ধান ;—
বঞ্চিত মুহূর্তখানি পড়ে আছে, সেই তব দান।
অপূর্ণের লেখাগুলি তুলে দেখি বুঝিতে না পারি,
চিহ্ন কোনো রেখে যাবে, মনে তাই ছিল কি তোমারি ?
ছিন্ন ফুল, এ কি মিছে ভান ?
কথা ছিল শুধাবার, সময় হল যে অবসান ॥

গেল না ছায়ার বাধা ; না-বোঝার প্রদোষ-আলোকে
স্বপ্নের চঞ্চল মূর্তি জাগায় আমার দীপ্ত চোখে

সংশয়-মোহের নেশা ;—সে মূর্তি ফিরিছে কাছে কাছে
আলোতে আঁধারে মেশা,—তবু সে অনন্ত দূরে আছে
মায়াচ্ছন্ন লোকে।
অচেনার মরীচিকা আকুলিছে ক্ষণিকার শোকে॥

খোলো খোলো হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা।
খুঁজিব তারার মাঝে চঞ্চলের মালার মণিকা।
খুঁজিব সেথায় আমি যেথা হতে আসে ক্ষণতরে
আশ্বিনে গোধূলি আলো, যেথা হতে নামে পৃথ্বী'পরে
শ্রাবণের সায়াহ্ন-যূথিকা ;
যেথা হতে পরে ঝড় বিদ্যুতের ক্ষণদীপ্ত টিকা॥

হারুনা-মারু জাহাজ
৬ অক্টোবর, ১৯২৪

খেলা

সন্ধ্যাবেলায় এ কোন্ খেলায় করলে নিমন্ত্রণ,
ওগো খেলার সাথি!
হঠাৎ কেন চমকে তোলে শূন্য এ প্রাঙ্গণ
রঙিন শিখার বাতি।
কোন্ সে ভোরের রঙের খেয়াল কোন্ আলোতে ঢেকে
সমস্ত দিন বুকের তলায় লুকিয়ে দিলে রেখে,
অরুণ-আভাস ছানিয়ে নিয়ে পদ্মবনের থেকে
রাঙিয়ে দিলে রাতি ?
উদয়-ছবি শেষ হবে কি অস্ত-সোনায় এঁকে
জ্বালিয়ে সাঁঝের বাতি॥

হারিয়ে-ফেলা বাঁশি আমার পালিয়েছিল বুঝি
লুকোচুরির ছলে ?

বনের পারে আবার তারে কোথায় পেলে খুঁজি
শুকনো পাতার তলে ?
যে-সুর তুমি শিখিয়েছিলে বসে আমার পাশে
সকালবেলায় বটের তলায় শিশির-ভেজা ঘাসে,
সে আজ ওঠে হঠাৎ বেজে বুকের দীর্ঘশ্বাসে,
উছল চোখের জলে,—
কাঁপত যে-সুর ক্ষণে ক্ষণে দুরন্ত বাতাসে
শুকনো পাতার তলে ॥

মোর প্রভাতের খেলার সাথি আনত ভরে সাজি
সোনার চাঁপাফুলে।
অন্ধকারে গন্ধ তারি ঐ যে আসে আজি
একি পথের ভুলে ?
বকুলবীথির তলে তলে আজ কি নতুন বেশে
সেই খেলাতেই ডাকতে এল আবার ফিরে এসে ?
সেই সাজি তার দখিন হাতে, তেমনি আকুল কেশে
চাঁপার গুচ্ছ দুলে।
সেই অজানা হতে আসে এই অজানার দেশে
এ কি পথের ভুলে ॥

আমার কাছে কী চাও তুমি, ওগো খেলার গুরু,
কেমন খেলার ধারা।
চাও কি তুমি যেমন করে হল দিনের শুরু,
তেমনি হবে সারা।
সেদিন ভোরে দেখেছিলাম প্রথম জেগে উঠে
নিরুদ্দেশের পাগল হাওয়ায় আগল গেছে টুটে,
কাজ-ভোলা সব খ্যাপার দলে তেমনি আবার জুটে
করবে দিশেহারা।
স্বপন-মৃগ ছুটিয়ে দিয়ে পিছনে তার ছুটে
তেমনি হব সারা ॥

বাঁধা পথের বাঁধন মেনে চলতি কাজের স্রোতে
চলতে দেবে নাকো ?
সন্ধ্যাবেলায় জোনাক-জ্বালা বনের আঁধার হ'তে
তাই কি আমায় ডাক ?
সকল চিন্তা উধাও ক'রে অকারণের টানে,
অবুঝ ব্যথার চঞ্চলতা জাগিয়ে দিয়ে প্রাণে,
থরথরিয়ে কাঁপিয়ে বাতাস ছুটির গানে গানে
দাঁড়িয়ে কোথায় থাক ?
না জেনে পথ পড়ব তোমার বুকেরি মাঝখানে
তাই আমারে ডাক ॥

জানি জানি, তুমি আমার চাও না পূজার মালা,
ওগো খেলার সাথি।
এই জনহীন অঙ্গনেতে গন্ধপ্রদীপ জ্বালা,
নয় আরতির বাতি।
তোমার খেলায় আমার খেলা মিলিয়ে দেব তবে
নিশীথিনীর স্তব্ধ সভায় তারার মহোৎসবে,
তোমার বীণার ধ্বনির সাথে আমার বাঁশির রবে
পূর্ণ হবে রাতি।
তোমার আলোয় আমার আলো মিলিয়ে খেলা হবে,
নয় আরতির বাতি ॥

হারুনা-মারু জাহাজ
৭ অক্টোবর, ১৯২৪

অপরিচিতা

পথ বাকি আর নাই তো আমার, চলে এলাম একা ;
তোমার সাথে কই হল গো দেখা ?
কুয়াশাতে ঘন আকাশ, ম্লান শীতের ক্ষণে
ফুল-ঝরাবার বাতাস বেড়ায় কাঁপন-লাগা বনে।
সকল শেষের শিউলিটি যেই ধুলায় হবে ধূলি,
সঙ্গিনীহীন পাখি যখন গান যাবে তার ভুলি
হয়তো তুমি আপন মনে আসবে সোনার রথে
শুকনো পাতা ঝরা ফুলের পথে ॥

পুলক লেগেছিল মনে পথের নূতন বাঁকে
হঠাৎ সেদিন কোন্ মধুরের ডাকে।
দূরের থেকে ক্ষণে-ক্ষণে রঙের আভাস এসে
গগন-কোণে চমক হেনে গেছে কোথায় ভেসে ;
মনের ভুলে ভেবেছিলাম তুমিই বুঝি এলে,
গন্ধরাজের গন্ধে তোমার গোপন মায়া মেলে।
হয়তো তুমি এসেছিলে, যায় নি আড়ালখানা,
চোখের দেখায় হয় নি প্রাণের জানা ॥

হয়তো সেদিন তোমার আঁখির ঘন তিমির ব্যেপে
অশ্রুজলের আবেশ গেছে কেঁপে
হয়তো আমায় দেখেছিলে বাঁকিয়ে বাঁকা ভুরু,
বক্ষ তোমার করেছিল ক্ষণেক দুরু দুরু
সেদিন হতে স্বপ্ন তোমার ভোরের আধো-ঘুমে
রাঙিয়েছিল হয়তো ব্যথার রক্তিম কুঙ্কুমে ;
আধেক চাওয়ায় ভুলে যাওয়ায় হয়েছে জাল-বোনা,
তোমায় আমায় হয় নি জানাশোনা ॥

তোমার পথের ধারে ধারে তাই এবারের মতো
রেখে গেলাম গান গাঁথিলাম যত।
মনের মাঝে বাজল যেদিন দূর চরণের ধ্বনি
সেদিন আমি গেয়েছিলাম তোমার আগমনী ;
দখিন বাতাস ফেলেছে শ্বাস রাতের আকাশ ঘেরি
সেদিন আমি গেয়েছি গান তোমার বিরহেরি ;
ভোরের বেলায় অশ্রুভরা অধীর অভিমান
ভৈরবীতে জাগিয়েছিল গান ॥

এ গানগুলি তোমার বলে চিনবে কখনো কি ?
ক্ষতি কি তায়, নাই চিনিলে, সখী।
তবু তোমায় গাইতে হবে, নাই তাহে সংশয়,
তোমার কণ্ঠে বাজবে তখন আমার পরিচয় ;
যারে তুমি বাসবে ভালো, আমার গানের সুরে
বরণ করে নিতে হবে সেই তব বন্ধুরে।
রোদন খুঁজে ফিরবে তোমার প্রাণের বেদনখানি,
আমার গানে মিলবে তাহার বাণী ॥

তোমার ফাগুন উঠবে জেগে, ভরবে আমের বোলে,
তখন আমি কোথায় যাব চলে।
পূর্ণ চাঁদের আসবে আসর, মুগ্ধ বসুন্ধরা,
বকুলবীথির ছায়াখানি মধুর মূর্ছাভরা ;
হয়তো সেদিন বক্ষে তোমার মিলন-মালা গাঁথা ;
হয়তো সেদিন ব্যর্থ আশায় সিক্ত চোখের পাতা ;
সেদিন আমি আসব না তো নিয়ে আমার দান ;
তোমার লাগি রেখে গেলেম গান ॥

আণ্ডেস জাহাজ
১৮ অক্টোবর, ১৯২৪

আনমনা

আনমনা গো, আনমনা,
তোমার কাছে আমার বাণীর মালাখানি আনব না।
বার্তা আমার ব্যর্থ হবে, সত্য আমার বুঝবে কবে?
তোমারো মন জানব না,
আনমনা গো আনমনা।
লগ্ন যদি হয় অনুকূল মৌন মধুর সাঁঝে,
নয়ন তোমার মগ্ন যখন ম্লান আলোর মাঝে,
দেব তোমায় শান্ত সুরের সান্ত্বনা
আনমনা গো আনমনা॥

জনশূন্য তটের পানে ফিরবে হাঁসের দল;
স্বচ্ছ নদীর জল
আকাশ পানে রইবে পেতে কান,
বুকের তলে শুনবে বলে গ্রহতারার গান;
কুলায়-ফেরা পাখি
নীল আকাশের বিরামখানি রাখবে ডানায় ঢাকি;
বেণুশাখার অন্তরালে অস্তপারের রবি
আঁকবে মেঘে মুছবে আবার শেষ-বিদায়ের ছবি;
স্তব্ধ হবে দিনের বেলার ক্ষুব্ধ হাওয়ার দোলা,
তখন তোমার মন যদি রয় খোলা;—
তখন সন্ধ্যাতারা
পায় যদি তার সাড়া
তোমার উদার আঁখিতারার পারে;
কনকচাঁপার গন্ধ-ছোঁওয়া বনের অন্ধকারে
ক্লান্তি-অলস ভাবনা যদি ফুল বিছানো ভুঁয়ে
মেলিয়ে ছায়া এলিয়ে থাকে শুয়ে;

ছন্দে গাঁথা বাণী তখন পড়ব তোমার কানে
মন্দ মৃদুল তানে,
ঝিল্লি যেমন শালের বনে নিদ্রানীরব রাতে
অন্ধকারের জপের মালায় একটানা সুর গাঁথে।
একলা তোমার বিজন প্রাণের প্রাঙ্গণে
প্রান্তে বসে একমনে
এঁকে যাব আমার গানের আলপনা,
আনমনা গো আনমনা।

আণ্ডেস জাহাজ
১৮ অক্টোবর, ১৯২৪

বিস্মরণ

মনে আছে কার দেওয়া সেই ফুল?
সে-ফুল যদি শুকিয়ে গিয়ে থাকে
তবে তারে সাজিয়ে রাখাই ভুল,
মিথ্যে কেন কাঁদিয়ে রাখ তাকে?
ধুলায় তারি শান্তি, তারি গতি,
এই সমাদর ক'রো তাহার প্রতি
সময় যখন গেছে, তখন তারে
ভুলো একেবারে।

মাঘের শেষে নাগকেশরের ফুলে
আকাশে বয় মন-হারানো হাওয়া;
বনের বক্ষ উঠেছে আজ দুলে,
চামেলি ওই কার যেন পথ-চাওয়া।
ছায়ায় ছায়ায় কাদের কানাকানি,
চোখে-চোখে নীরব জানাজানি,
এ উৎসবে শুকনো ফুলের লাজ
ঘুচিয়ে দিয়ো আজ।

যদি বা তার ফুরিয়ে থাকে বেলা,
মনে জেনো দুঃখ তাহে নাই ;
করেছিল ক্ষণকালের খেলা,
পেয়েছিল ক্ষণকালের ঠাঁই ।
অলকে সে কানের কাছে দুলি
বলেছিল নীরব কথাগুলি,
গন্ধ তাহার ফিরেছে পথ ভুলে
তোমার এলোচুলে ।

সেই মাধুরী আজ কি হবে ফাঁকি ?
লুকিয়ে সে কি রয় নি কোনোখানে ?
কাহিনী তার থাকবে না আর বাকি
কোনো স্বপ্নে, কোনো গন্ধে গানে ?
আরেক দিনের বনচ্ছায়ায় লিখা
ফিরবে না কি তাহার মরীচিকা ?
অশ্রুতে তার আভাস দিবে নাকি
আরেক দিনের আঁখি ।

না-হয় তা-ও লুপ্ত যদিই হয়,
তার লাগি শোক, সে-ও তো সেই পথে ।
এ জগতে সদাই ঘটে ক্ষয়,
ক্ষতি তবু হয় না কোনোমতে ।
শুকিয়ে-পড়া পুষ্পদলের ধূলি
এ ধরণী যায় যদি বা ভুলি—
সেই ধূলারি বিস্মরণের কোলে
নতুন কুসুম দোলে ।

আণ্ডেস জাহাজ
১৯ অক্টোবর, ১৯২৪

আশা

মস্ত যে-সব কাণ্ড করি, শক্ত তেমন নয় ;
জগৎ-হিতের তরে ফিরি বিশ্বজগৎময় ।
সঙ্গীর ভিড় বেড়ে চলে ; অনেক লেখাপড়া,
অনেক ভাষায় বকাবকি, অনেক ভাঙাগড়া ।
ক্রমে ক্রমে জাল গেঁথে যায়, গিঁঠের পরে গিঁঠ,
মহল পরে মহল ওঠে, ইঁটের পরে ইঁট ।
কীর্তিরে কেউ ভালো বলে, মন্দ বলে কেহ,
বিশ্বাসে কেউ কাছে আসে, কেউ করে সন্দেহ ।
কিছু খাঁটি, কিছু ভেজাল, মসলা যেমন জোটে,
মোটের 'পরে একটা কিছু হয়ে ওঠেই ওঠে ।

কিন্তু যে-সব ছোটো আশা করুণ অতিশয়,
সহজ বটে শুনতে লাগে, মোটেই সহজ নয় ।
একটুকু সুখ গানে সুরে ফুলের গন্ধে মেশা,
গাছের-ছায়ায়-স্বপ্ন-দেখা অবকাশের নেশা,
মনে ভাবি চাইলে পাব ; যখন তারে চাহি,
তখন দেখি চঞ্চলা সে কোনোখানেই নাহি ।
অরূপ অকূল বাষ্পমাঝে বিধি কোমর বেঁধে
আকাশটারে কাঁপিয়ে যখন সৃষ্টি দিলেন ফেঁদে,
আদ্যযুগের খাটুনিতে পাহাড় হল উচ্চ,
লক্ষযুগের স্বপ্নে পেলেন প্রথম ফুলের গুচ্ছ ।

বহুদিন মনে ছিল আশা
ধরণীর এক কোণে
রহিব আপন মনে ;
ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা
করেছিনু আশা ।
গাছটির স্নিগ্ধ ছায়া, নদীটির ধারা,
ঘরে আনা গোধূলিতে সন্ধ্যাটির তারা,

চামেলির গন্ধটুকু জানালার ধারে,
ভোরের প্রথম আলো জলের ওপারে।
তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
ভরিয়া তুলিবে ধীরে
জীবনের কদিনের কাঁদা আর হাসা;
ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা
করেছিনু আশা।

বহুদিন মনে ছিল আশা
অন্তরের ধ্যানখানি
লভিবে সম্পূর্ণ বাণী;
ধন নয়, মান নয়, আপনার ভাষা
করেছিনু আশা।
মেঘে মেঘে এঁকে যায় অস্তগামী রবি
কল্পনার শেষ রঙে সমাপ্তির ছবি,
আপন স্বপনলোক আলোকে ছায়ায়
রঙে রসে রচি দিব তেমনি মায়ায়।
তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
ভরিয়া তুলিবে ধীরে
জীবনের কদিনের কাঁদা আর হাসা।
ধন নয়, মান নয়, ধেয়ানের ভাষা
করেছিনু আশা।

বহুদিন মনে ছিল আশা
প্রাণের গভীর ক্ষুধা
পাবে তার শেষ সুধা;
ধন নয়, মান নয়, কিছু ভালোবাসা
করেছিনু আশা।
হৃদয়ের সুর দিয়ে নামটুকু ডাকা,
অকারণে কাছে এসে হাতে হাত রাখা,

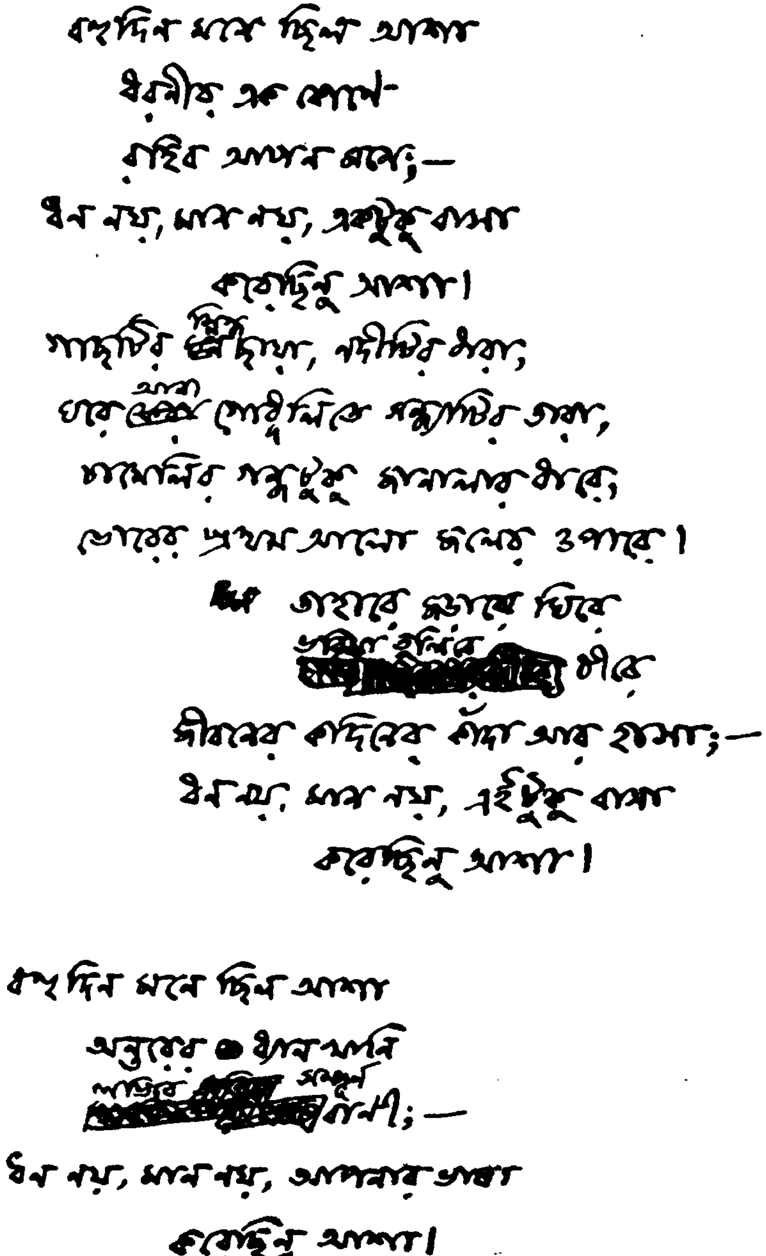

বহুদিন মনে ছিল আশা
ধরণীর এক কোণে
রহিব আপন মনে;—
ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা
করেছিনু আশা।
গাছটির স্নিগ্ধ ছায়া, নদীটির ধারা,
ঘরে আনা গোধূলিতে সন্ধ্যাটির তারা,
চামেলির গন্ধটুকু জানালার ধারে,
ভোরের প্রথম আলো জলের ওপারে।
তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
ভরিয়া তুলিব ধীরে
জীবনের কদিনের কাঁদা আর হাসা;—
ধন নয়, মান নয়, এইটুকু বাসা
করেছিনু আশা।

বহুদিন মনে ছিল আশা
অন্তরের ধ্যানখানি
লভিবে সম্পূর্ণ বাণী;—
ধন নয়, মান নয়, আপনার ভাষা
করেছিনু আশা।

'আশা' কবিতার পাণ্ডুলিপি

দূরে গেলে একা বসে মনে মনে ভাবা,
কাছে এলে দুই চোখে কথা-ভরা আভা।
তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
ভরিয়া তুলিবে ধীরে
জীবনের কদিনের কাঁদা আর হাসা।
ধন নয়, মান নয়, কিছু ভালোবাসা
করেছিনু আশা।

আণ্ডেস জাহাজ
১৯ অক্টোবর, ১৯২৪

বাতাস

গোলাপ বলে, ওগো বাতাস, প্রলাপ তোমার বুঝতে কে বা পারে,
কেন এসে ঘা দিলে মোর দ্বারে?
বাতাস বলে, ওগো গোলাপ, আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ,
আমি জানি কাহার পরশ খোঁজ;
সেই প্রভাতের আলো এল, আমি কেবল ভাঙিয়ে দিলাম ঘুম
হে মোর কুসুম।

পাখি বলে, ওগো বাতাস, কী তুমি চাও বুঝিয়ে বলো মোরে,
কুলায় আমার দুলাও কেন ভোরে?
বাতাস বলে, ওগো পাখি, আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ,
আমি জানি তুমি কারে খোঁজ;
সেই আকাশে জাগল আলো আমি কেবল দিনু তোমায় আনি
সীমাহীনের বাণী।

নদী বলে, ওগো বাতাস, বুঝতে নারি কী-যে তোমার কথা,
কিসের লাগি এতই চঞ্চলতা।
বাতাস বলে, ওগো নদী, আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ,
জানি তোমার বিলয় যেথা খোঁজ;
সেই সাগরের ছন্দ আমি এনে দিলাম তোমার বুকের কাছে,
তোমার ঢেউয়ের নাচে।

অরণ্য কয়, ওগো বাতাস, নাহি জানি বুঝি কি নাই বুঝি
তোমার ভাষায় কাহার চরণ পূজি।
বাতাস বলে, হে অরণ্য, আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ,
আমি জানি কাহার মিলন খোঁজ ;
সেই বসন্ত এল পথে, আমি কেবল সুর জাগাতে পারি
তাহার পূর্ণতারি।

শুধায় সবে, ওগো বাতাস, তবে তোমার আপন কথা কী যে
বলো মোদের, কী চাও তুমি নিজে ?
বাতাস বলে, আমি পথিক, আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ
আমি বুঝি তোমরা কারে খোঁজ,—
আমি শুধু যাই চলে আর সেই অজানার আভাস করি দান,
আমার শুধু গান।

লিসবন বন্দর, আণ্ডেস জাহাজ
২০ অক্টোবর, ১৯২৪

স্বপ্ন

তোমায় আমি দেখি নাকো, শুধু তোমার স্বপ্ন দেখি,
তুমি আমায় বারে বারে শুধাও, "ওগো সত্য সে কি ?"
কী জানি গো, হয়তো বুঝি
তোমার মাঝে কেবল খুঁজি
এই জনমের রূপের তলে আর-জনমের ভাবের স্মৃতি।
হয়তো হেরি তোমার চোখে
আদিযুগের ইন্দ্রলোকে
শিশু চাঁদের পথ-ভোলানো পারিজাতের ছায়াবীথি।
এই কূলেতে ডাকি যখন সাড়া যে দাও সেই ওপারে,
পরশ তোমার ছাড়িয়ে কান্না বাজে মায়ার বীণার তারে।
হয়তো-হবে সত্য তাই,
হয়তো তোমার স্বপন, আমার আপন মনের মত্ততাই।

আমি বলি স্বপ্ন যাহা তার চেয়ে কি সত্য আছে ?
যে-তুমি মোর দূরের মানুষ সেই-তুমি মোর কাছের কাছে।
সেই-তুমি আর নও তো বাঁধন,
স্বপ্নরূপে মুক্তিসাধন,
ফুলের সাথে তারার সাথে তোমার সাথে সেথায় মেলা।
নিত্যকালের বিদেশিনী,
তোমায় চিনি, নাই বা চিনি,
তোমার লীলায় ঢেউ তুলে যায় কভু সোহাগ, কভু হেলা।
চিত্তে তোমার মূর্তি নিয়ে ভাবসাগরের খেয়ায় চড়ি।
বিধির মনের কল্পনারে আপন মনে নতুন গড়ি।
আমার কাছে সত্য তাই,
মন-ভরানো পাওয়ায় ভরা বাইরে-পাওয়ার ব্যর্থতাই।

আপনি তুমি দেখেছ কি আপন মাঝে সত্য কী যে ?
দিতে যদি চাও তা কারে, দিতে কি তাই পার নিজে ?
হয়তো তারে দুঃখদিনে
অগ্নি-আলোয় পাবে চিনে,
তখন তোমার নিবিড় বেদন নিবেদনের জ্বালবে শিখা।
অমৃত যে হয় নি মথন,
তাই তোমাতে এই অযতন ;
তাই তোমারে ঘিরে আছে ছলন-ছায়ার কুহেলিকা।
নিত্যকালের আপন তোমার লুকিয়ে বেড়ায় মিথ্যা সাজে,—
ক্ষণে ক্ষণে ধরা পড়ে শুধু আমার স্বপন-মাঝে।
আমি জানি সত্য তাই,
মরণ-দুঃখে অমর জাগে, অমৃতেরি তত্ত্ব তাই।

পুষ্পমালার গ্রন্থিখানা অনাদরে পড়ুক ছিঁড়ে,
ফুরাক বেলা, জীর্ণ খেলা হারাক হেলাফেলার ভিড়ে।
ছল করে যা পিছু ডাকে
পিছন ফিরে চাস নে তাকে,

ডাকে না যে যাবার বেলায় যাস নে তাহার পিছে পিছে।
যাওয়া-আসা-পথের ধুলায়
চপল পায়ের চিহ্নগুলায়
গনে গনে আপন মনে কাটাস নে দিন মিছে মিছে।
কী হবে তোর বোঝাই করে ব্যর্থ দিনের আবর্জনা;
স্বপ্ন শুধুই মর্ত্যে অমর, আর সকলি বিড়ম্বনা।
নিত্য প্রাণের সত্য তাই,
প্রাণ দিয়ে তুই রচিস যারে,—অসীম পথের পথ্য তাই।

লিসবন বন্দর, আণ্ডেস জাহাজ
২০ অক্টোবর, ১৯২৪

সমুদ্রে

হে সমুদ্র, স্তব্ধচিত্তে শুনেছিনু গর্জন তোমার
রাত্রিবেলা; মনে হল গাঢ় নীল নিঃসীম নিদ্রার
স্বপ্ন ওঠে কেঁদে কেঁদে। নাই, নাই তোমার সান্ত্বনা;
যুগযুগান্তর ধরি নিরন্তর সৃষ্টির যন্ত্রণা
তোমার রহস্য-গর্ভে ছিন্ন করি কৃষ্ণ আবরণ
প্রকাশ সন্ধান করে। কত মহাদ্বীপ মহাবন
এ তরল রঙ্গশালে রূপে প্রাণে কত নৃত্যে গানে
দেখা দিয়ে কিছুকাল, ডুবে গেছে নেপথ্যের পানে
নিঃশব্দ গভীরে। হারানো সে চিহ্নহারা যুগগুলি
মূর্তিহীন ব্যর্থতায় নিত্য অন্ধ আন্দোলন তুলি
হানিছে তরঙ্গ তব। সব রূপ সব নৃত্য তার
ফেনিল তোমার নীলে বিলীন তুলিছে একাকার।
স্থলে তুমি নানা গান উৎক্ষেপে করেছ আবর্জন,
জলে তব এক গান, অব্যক্তের অস্থির গর্জন।

২

হে সমুদ্র, একা আমি মধ্যরাতে নিদ্রাহীন চোখে
কল্লোল-মন্দ্রর মধ্যে দাঁড়াইয়া স্তব্ধ ঊর্ধ্বলোকে

চাহিলাম ; শুনিলাম নক্ষত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাজে
আকাশের বিপুল ক্রন্দন ; দেখিলাম শূন্যমাঝে
আঁধারের আলোক-ব্যগ্রতা। কত শত মন্বন্তরে
কত জ্যোতির্লোক গূঢ় বহ্নিময় বেদনার ভরে
অস্ফুটের আচ্ছাদন দীর্ণ করি' তীক্ষ্ণ রশ্মিঘাতে
কালের বক্ষের মাঝে পেল স্থান প্রোজ্জ্বল প্রভাতে
প্রকাশ-উৎসবদিনে। যুগসন্ধ্যা কবে এল তার
ডুবে গেল অলক্ষ্যে অতলে। রূপ-নিঃস্ব হাহাকার
অদৃশ্য বুভুক্ষু ভিক্ষু ফিরিছে বিশ্বের তীরে তীরে,
ধুলায় ধুলায় তার আঘাত লাগিছে ফিরে ফিরে।
ছিল যা প্রদীপ্তরূপে নানা ছন্দে বিচিত্র চঞ্চল
আজ অন্ধ তরঙ্গের কম্পনে হানিছে শূন্যতল।

৩

হে সমুদ্র, চাহিলাম আপন গহন চিত্তপানে ;
কোথায় সঞ্চয় তার, অস্ত তার কোথায় কে জানে।
ওই শোনো সংখ্যাহীন সংজ্ঞাহীন অজানা ক্রন্দন
অমূর্ত আঁধারে ফিরে, অকারণে জাগায় স্পন্দন
বক্ষতলে। এক কালে ছিল রূপ, ছিল বুঝি ভাষা ;
বিশ্বগীতি-নির্ঝরের তীরে তীরে বুঝি কত বাসা
বেঁধেছিল কোন্ জন্মে ;—দুঃখে সুখে নানা বর্ণে রাঙি
তাহাদের রঙ্গমঞ্চ হঠাৎ পড়িল কবে ভাঙি
অতৃপ্ত আশার ধূলিস্তূপে। আকার হারাল তারা,
আবাস তাদের নাহি। খ্যাতিহারা সেই স্মৃতিহারা
সৃষ্টিছাড়া ব্যর্থ ব্যথা প্রাণের নিভৃত লীলাঘরে
কোণে কোণে ঘোরে শুধু মূর্তি তরে, আশ্রয়ের তরে।
রাগে অনুরাগে যারা বিচিত্র আছিল কত রূপে,
আজ শূন্য দীর্ঘশ্বাস আঁধারে ফিরিছে চুপে চুপে।

আণ্ডেস জাহাজ
২১ অক্টোবর, ১৯২৪

মুক্তি

মুক্তি নানা মূর্তি ধরি দেখা দিতে আসে নানা জনে,—
এক পন্থা নহে।
পরিপূর্ণতার সুধা নানা স্বাদে ভুবনে ভুবনে
নানা স্রোতে বহে।
সৃষ্টি মোর সৃষ্টি সাথে মেলে যেথা, সেথা পাই ছাড়া,
মুক্তি যে আমারে তাই সংগীতের মাঝে দেয় সাড়া,
সেথা আমি খেলা-খ্যাপা বালকের মতো লক্ষ্মীছাড়া,
লক্ষ্যহীন নগ্ন নিরুদ্দেশ।
সেথা মোর চির নব, সেথা মোর চিরন্তন শেষ।

মাঝে মাঝে গানে মোর সুর আসে, যে সুরে, হে গুণী,
তোমারে চিনায়।
বেঁধে দিয়ো নিজ হাতে সেই নিত্য সুরের ফাল্গুনী
আমার বীণায়।
তাহলে বুঝিব আমি ধূলি কোন্ ছন্দে হয় ফুল
বসন্তের ইন্দ্রজালে অরণ্যেরে করিয়া ব্যাকুল;
নব নব মায়াচ্ছায়া কোন্ নৃত্যে নিয়ত দোদুল
বর্ণ বর্ণ ঋতুর দোলায়।
তোমারি আপন সুর কোন্ তালে তোমারে ভোলায়।

যেদিন আমার গান মিলে যাবে তোমার গানের
সুরের ভঙ্গীতে
মুক্তির সংগমতীর্থ পাব আমি আমারি প্রাণের
আপন সংগীতে।

সেদিন বুঝিব মনে নাই নাই বস্তুর বন্ধন,
শূন্যে শূন্যে রূপ ধরে তোমারি এ বীণার স্পন্দন ;
নেমে যাবে সব বোঝা, থেমে যাবে সকল ক্রন্দন,
ছন্দে তালে ভুলিব আপনা,
বিশ্বগীত-পদ্মদলে স্তব্ধ হবে অশান্ত ভাবনা।

সঁপি দিব সুখ দুঃখ আশা ও নৈরাশ্য যত কিছু
তব বীণাতারে,—
ধরিবে গানের মূর্তি, একান্তে করিয়া মাথা নিচু
শুনিব তাহারে।
দেখিব তাদের যেথা ইন্দ্রধনু অকস্মাৎ ফুটে ;
দিগন্তে বনের প্রান্তে উষার উত্তরী যেথা লুটে ;
বিবাগি ফুলের গন্ধ মধ্যাহ্নে যেথায় যায় ছুটে ;
নীড়ে-ধাওয়া পাখির ডানায়
সায়াহ্ন-গগন যেথা দিবসেরে বিদায় জানায়।

সেদিন আমার রক্তে শুনা যাবে দিবসরাত্রির
নৃত্যের নূপুর।
নক্ষত্র বাজাবে বক্ষে বংশীধ্বনি আকাশযাত্রীর
আলোকবেণুর।
সেদিন বিশ্বের তৃণ মোর অঙ্গে হবে রোমাঞ্চিত,
আমার হৃদয় হবে কিংশুকের রক্তিমালাঞ্ছিত ;
সেদিন আমার মুক্তি, যবে হবে, হে চিরবাঞ্ছিত,
তোমার লীলায় মোর লীলা,—
যেদিন তোমার সঙ্গে গীতরঙ্গে তালে তালে মিলা।

আণ্ডেস জাহাজ
২২ অক্টোবর, ১৯২৪

ঝড়

অন্ধ কেবিন আলোয় আঁধার গোলা,
বন্ধ বাতাস কিসের গন্ধে ঘোলা।
মুখ-ধোবার ঐ ব্যাপারখানা দাঁড়িয়ে আছে সোজা,
ক্লান্ত চোখের বোঝা।
দুলছে কাপড় peg এ
বিজলি-পাখার হাওয়ার ঝাপট লেগে।
গায়ে গায়ে ঘেঁষে
জিনিসপত্র আছে কায়ক্লেশে।
বিছানাটা কৃপণ-গতিকের
অনিচ্ছাতে ক্ষণকালের সহায় পথিকের।
ঘরে আছে যে-কটা আসবাব
নিত্য যতই দেখি, ভাবি ওদের মুখের ভাব
নারাজ ভৃত্যসম,
পাশেই থাকে মম,
কোনোমতে করে কেবল কাজচলাগোছ সেবা।
এমন ঘরে আঠারো দিন থাকতে পারে কেবা?
কষ্ট বলে একটা দানব ছোট্টো খাঁচায় পুরে
নিয়ে চলে আমায় কত দূরে।
নীল আকাশে নীল সাগরে অসীম আছে বসে,
কী জানি কোন্ দোষে
ঠেলেঠুলে চেপেচুপে মোরে
সেখান হতে করেছে একঘরে।

হেনকালে ক্ষুদ্র দুখের ক্ষুদ্র ফাটল বেয়ে
কেমন করে এল হঠাৎ ধেয়ে
বিশ্বধরার বক্ষ হতে বিপুল দুখের প্রবল বন্যাধারা;
এক নিমেষে আমারে সে করলে আত্মহারা,
আনলে আপন বৃহৎ সান্ত্বনারে,
আনলে আপন গর্জনেতে ইন্দ্রলোকের অভয়ঘোষণারে।

মহাদেবের তপের জটা হতে
মুক্তিমন্দাকিনী এল কূল-ডোবানো স্রোতে ;
বললে আমার চিত্ত ঘিরে ঘিরে,
ভস্ম আবার ফিরে পাবে জীবন-অগ্নিরে।
বললে, আমি সুরলোকের অশ্রুজলের দান,
মরুর পাথর গলিয়ে ফেলে ফলাই অমর প্রাণ।
মৃত্যুজয়ের ডমরুরব শোনাই কলস্বরে,
মহাকালের তাণ্ডবতাল সদাই বাজাই উদ্দাম নির্ঝরে।

স্বপ্নসম টুটে
এই কেবিনের দেওয়াল গেল ছুটে।
রোগশয্যা মম
হল উদার কৈলাসেরি শৈলশিখর সম।
আমার মনপ্রাণ
উঠল গেয়ে রুদ্রেরি জয়গান :

সুপ্তির জড়িমাঘোরে
তীরে থেকে তোরা ও'রে
করেছিস ভয়,
যে-ঝড় সহসা কানে
বজ্রের গর্জন আনে—
"নয়, নয়, নয়।"

তোরা বলেছিলি তাকে
"বাঁধিয়াছি ঘর।
মিলেছে পাখির ডাকে
তরুর মর্মর।
পেয়েছি তৃষ্ণার জল,
ফলেছে ক্ষুধার ফল,
ভাণ্ডারে হয়েছে ভরা লক্ষ্মীর সঞ্চয়।"

ঝড়, বিদ্যুতের ছন্দে
ডেকে ওঠে মেঘমন্দ্রে,—
"নয়, নয়, নয়।"

সমুদ্রে আমার তরী ;
আসিয়াছি ছিন্ন করি'
তীরের আশ্রয়।
ঝড় বন্ধু তাই কানে
মাঙ্গল্যের মন্ত্র আনে—
"জয়, জয়, জয়।"

আমি যে সে-প্রচণ্ডেরে
করেছি বিশ্বাস,—
তরীর পালে সে যে রে
রুদ্রেরি নিঃশ্বাস।
বলে সে বক্ষের কাছে,
"আছে আছে, পার আছে,
সন্দেহ-বন্ধন ছিঁড়ি, লহ পরিচয়।"
বলে ঝড় অবিশ্রান্ত,
"তুমি পান্থ, আমি পান্থ,
জয়, জয়, জয়।"

যায় ছিঁড়ে, যায় উড়ে—
বলেছিলি মাথা খুঁড়ে,
"এ দেখি প্রলয়
ঝড় বলে, "ভয় নাই,
যাহা দিতে পার, তাই
রয়, রয়, রয়।"

চলেছি সম্মুখ-পানে
　　চাহিব না পিছু।
ভাসিল বন্যার টানে
　　ছিল যত কিছু।
রাখি যাহা, তাই বোঝা,
তারে খোওয়া, তারে খোঁজা,
নিত্যই গণনা তারে, তারি নিত্য ক্ষয়।
ঝড় বলে, "এ তরঙ্গে
যাহা ফেলে দাও রঙ্গে
　　রয়, রয়, রয়।"

এ মোর যাত্রীর বাঁশি
ঝঙ্কার উদ্দাম হাসি
　　নিয়ে গাঁথে সুর—
বলে সে, "বাসনা অন্ধ,
নিশ্চল শৃঙ্খল-বন্ধ
　　দূর, দূর, দূর।"

গাহে "পশ্চাতের কীর্তি,
　　সম্মুখের আশা
তার মধ্যে ফেঁদে ভিত্তি
　　বাঁধিস নে বাসা।
নে তোর মৃদঙ্গে শিখে
তরঙ্গের ছন্দটিকে,
বৈরাগীর নৃত্যভঙ্গী চঞ্চল সিন্ধুর
যত লোভ, যত শঙ্কা
দাসত্বের জয়ডঙ্কা,
　　দূর, দূর, দূর।"

এস গো ধ্বংসের নাড়া,
পথভোলা, ঘরছাড়া,
এস গো দুর্জয়।
ঝাপটি মৃত্যুর ডানা
শূন্যে দিয়ে যাও হানা—
"নয়, নয়, নয়।"

আবেশের রসে মত্ত
আরামশয্যায়
বিজড়িত যে-জড়ত্ব
মজ্জায় মজ্জায়,—
কার্পণ্যের বদ্ধ দ্বারে,
সংগ্রহের অন্ধকারে
যে আত্মসংকোচ নিত্য গুপ্ত হয়ে রয়,
হানো তারে হে নিঃশঙ্ক,
ঘোষুক তোমার শঙ্খ—
"নয়, নয়, নয়।"

আণ্ডেস জাহাজ
২৪ অক্টোবর, ১৯২৪

পদধ্বনি

আঁধারে প্রচ্ছন্ন ঘন বনে
আশঙ্কার পরশনে
হরিণের থরথর হৃৎপিণ্ড যেমন—
সেইমতো রাত্রি দ্বিপ্রহরে
শয্যা মোর ক্ষণতরে
সহসা কাঁপিল অকারণ

পদধ্বনি, কার পদধ্বনি
শুনিনু তখনি ?
মোর জন্মনক্ষত্রের অদৃশ্য জগতে
মোর ভাগ্য মোর তরে বার্তা লয়ে ফিরিছে কি পথে ?

পদধ্বনি, কার পদধ্বনি ?
অজানার যাত্রী কে গো ? ভয়ে কেঁপে উঠিল ধরণী।
এই কি নির্মম সেই যে আপন চরণের তলে
পদে পদে চিরদিন
উদাসীন
পিছনের পথ মুছে চলে ?
এ কি সেই নিত্যশিশু, কিছু নাহি চাহে,—
নিজের খেলেনা-চূর্ণ
ভাসাইছে অসম্পূর্ণ
খেলার প্রবাহে ?
ভাঙিয়া স্বপ্নের ঘোর,
ছিঁড়ি মোর
শয্যার বন্ধনমোহ, এ রাত্রিবেলায়
মোরে কি করিবে সঙ্গী প্রলয়ের ভাসান-খেলায় ?

হ'ক তাই
ভয় নাই, ভয় নাই,
এ খেলা খেলেছি বারম্বার
জীবনে আমার।
জানি জানি, ভাঙিয়া নূতন করে তোলা ;
ভুলায়ে পূর্বের পথ অপূর্বের পথে দ্বার খোলা ;
বাঁধন গিয়েছে যবে চুকে
তারি ছিন্ন রশিগুলি কুড়ায়ে কৌতুকে

বার বার গাঁথা হল দোলা।
নিয়ে যত মুহূর্তের ভোলা
চিরস্মরণের ধন
গোপনে হয়েছে আয়োজন।

পদধ্বনি, কার পদধ্বনি
চিরদিন, শুনেছি এমনি
বারে বারে?
একি বাজে মৃত্যুসিন্ধুপারে?
একি মোর আপন বক্ষেতে?
ডাকে মোরে ক্ষণে ক্ষণে কিসের সংকেতে?
তবে কি হবেই যেতে?
সব বন্ধ করিবে ছেদন?
ওগো কোন্ বন্ধু তুমি, কোন্ সঙ্গী দিতেছ বেদন
বিচ্ছেদের তীর হতে?
তরী কি ভাসাব স্রোতে?
হে বিরহী,
আমার অন্তরে দাও কহি
ডাক মোরে কী খেলা খেলাতে
আতঙ্কিত নিশীথবেলাতে?
বারে বারে দিয়েছ নিঃসঙ্গ করি;
এ শূন্য প্রাণের পাত্র কোন্ সঙ্গসুধা দিয়ে ভরি
তুলে নেবে মিলন-উৎসবে?
সূর্যাস্তের পথ দিয়ে যবে
সন্ধ্যাতারা উঠে আসে নক্ষত্রসভায়,
প্রহর না যেতে যেতে
কী সংকেতে
সব সঙ্গ ফেলে রেখে অস্তপথে ফিরে চলে যায়?
সেও কি এমনি
শোনে পদধ্বনি?

তারে কি বিরহী
বলে কিছু দিগন্তের অন্তরালে রহি ?

পদধ্বনি, কার পদধ্বনি ?
দিনশেষে
কম্পিত বক্ষের মাঝে এসে
কী শব্দে ডাকিছে কোন্ অজানা রজনী

আণ্ডেস জাহাজ
২৪ অক্টোবর, ১৯২৪

প্রকাশ

খুঁজতে যখন এলাম সেদিন কোথায় তোমার গোপন অশ্রুজল,
সে-পথ আমায় দাও নি তুমি বলে।
বাহির-দ্বারে অধীর খেলা, ভিড়ের মধ্যে হাসির কোলাহল,
দেখে এলেম চলে।
এই ছবি মোর ছিল মনে,—
নির্জন মন্দিরের কোণে
দিনের অবসানে
সন্ধ্যাপ্রদীপ আছে চেয়ে ধ্যানের চোখে সন্ধ্যাতারার পানে।
নিভৃত ঘর কাহার লাগি
নিশীথ রাতে রইল জাগি,
খুলল না তার দ্বার।
হে চঞ্চলা, তুমি বুঝি
আপনিও পথ পাও নি খুঁজি,
তোমার কাছে সে ঘর অন্ধকার।

জানি তোমার নিকুঞ্জে আজ পলাশ-শাখায় রঙের নেশা লাগে,
আপন গন্ধে বকুল মাতোয়ারা।

কাঙাল সুরে দখিন বাতাস বনে বনে গুপ্ত কী ধন মাগে,
বেড়ায় নিদ্রাহারা।
হায় গো তুমি জান না যে
তোমার মনের তীর্থমাঝে
পূজা হয় নি আজো।
দেবতা তোমার বুভুক্ষিত, মিথ্যা-ভূষায় কী সাজ তুমি সাজ।
হল সুখের শয়ন পাতা,
কণ্ঠহারের মানিক গাঁথা,
প্রমোদ-রাতের গান,
হয় নি কেবল চোখের জলে
লুটিয়ে মাথা ধুলার তলে
আপনভোলা সকল-শেষের দান।

ভোলাও যখন, তখন সে কোন্ মায়ার ঢাকা পড়ে তোমার 'পরে;
ভুলবে যখন, তখন প্রকাশ পাবে,—
উষার মতো অমল হাসি জাগবে তোমার আঁখির নীলাম্বরে
গভীর অনুভাবে।
ভোগ সে নহে, নয় বাসনা,
নয় আপনার উপাসনা,
নয়কো অভিমান;
সরল প্রেমের সহজ প্রকাশ, বাইরে যে তার নাই রে পরিমাণ।
আপন প্রাণের চরম কথা
বুঝবে যখন, চঞ্চলতা
তখন হবে চুপ।
তখন দুঃখ-সাগরতীরে
লক্ষ্মী উঠে আসবে ধীরে
রূপের কোলে পরম অপরূপ।

আণ্ডেস জাহাজ
২৬ অক্টোবর, ১৯২৪

শেষ

হে অশেষ, তব হাতে শেষ
ধরে কী অপূর্ব বেশ,
কী মহিমা।
জ্যোতির্হীন সীমা
মৃত্যুর অগ্নিতে জ্বলি
যায় গলি,
গড়ে তোলে অসীমের অলংকার।
হয় সে অমৃতপাত্র, সীমার ফুরালে অহংকার।
শেষের দীপালি-রাত্রে, হে অশেষ
অমা-অন্ধকার-রন্ধ্রে দেখা যায় তোমার উদ্দেশ।

ভোরের বাতাসে
শেফালি ঝরিয়া পড়ে ঘাসে,
তারাহারা রাত্রির বীণার
চরম ঝংকার।
যামিনীর তন্দ্রাহীন দীর্ঘ পথ ঘুরি
প্রভাত-আকাশে চন্দ্র, করুণ মাধুরী
শেষ করে যায় তার,
উদয়সূর্যের পানে শান্ত নমস্কার।
যখন কর্মের দিন
ম্লান ক্ষীণ,
গোষ্ঠে-চলা ধেনুসম সন্ধ্যার সমীরে
চলে ধীরে আঁধারের তীরে—
তখন সোনার পাত্র হতে
কী অজস্র স্রোতে
তাহারে করাও স্নান অন্তিমের সৌন্দর্যধারায়?
যখন বর্ষার মেঘ নিঃশেষে হারায়
বর্ষণের সকল সম্বল,
শরতে শিশুর জন্ম দাও তারে শুভ্র সমুজ্জ্বল।—

হে অশেষ, তোমার অঙ্গনে
ভারমুক্ত তার সাথে ক্ষণে ক্ষণে
খেলায়ে রঙের খেলা,
ভাসায়ে আলোর ভেলা,
বিচিত্র করিয়া তোল তার শেষ বেলা।

ক্লান্ত আমি তারি লাগি, অন্তর তৃষিত—
কত দূরে আছে সেই খেলাভরা মুক্তির অমৃত।
বধূ যথা গোধূলিতে শেষ ঘট ভ'রে,
বেণুচ্ছায়াঘন পথে অন্ধকারে ফিরে যায় ঘরে,
সেই মতো, হে সুন্দর, মোর অবসান
তোমার মাধুরী হতে
সুধাস্রোতে
ভরে নিতে চায় তার দিনান্তের গান।
হে ভীষণ, তব স্পর্শঘাত
অকস্মাৎ
মোর গূঢ় চিত্ত হতে কবে
চরম বেদনা-উৎস মুক্ত করি অগ্নিমহোৎসবে
অপূর্ণের যত দুঃখ, যত অসম্মান
উচ্ছ্বাসিত রুদ্র হাস্যে করি দিবে শেষ দীপ্যমান।

আণ্ডেস জাহাজ
২৯ অক্টোবর, ১৯২৪
Equator পার হয়ে আজ দক্ষিণ মেরুর মুখে

দোসর

দোসর আমার, দোসর ওগো, কোথা থেকে
কোন্ শিশুকাল হতে আমায় গেলে ডেকে।
তাই তো আমি চিরজনম একলা থাকি,
সকল বাঁধন টুটল আমার, একটি কেবল রইল বাকি—
সেই তো তোমার ডাকার বাঁধন, অলখ ডোরে
দিনে দিনে বাঁধল মোরে।

দোসর ওগো, দোসর আমার, সে ডাক তব
কত ভাষায় কয় যে কথা নব নব।
চমকে উঠে ছুটি যে তাই বাতায়নে,
সকল কাজে বাধা পড়ে, বসে থাকি আপন মনে ;—
পারের পাখি আকাশে ধায় উধাও গানে
চেয়ে থাকি তাহার পানে।

দোসর আমার, দোসর ওগো, যে বাতাসে
বসন্ত তার পুলক জাগায় ঘাসে ঘাসে,
ফুল-ফোটানো তোমার লিপি সেই কি আনে
গুঞ্জরিয়া মর্মরিয়া কী বলে যায় কানে কানে,
কে যেন তা বোঝে আমার বক্ষতলে,
ভাসে নয়ন অশ্রুজলে।

দোসর ওগো, দোসর আমার, কোন্ সুদূরে
ঘরছাড়া মোর ভাবনা বাউল বেড়ায় ঘুরে।
তারে যখন শুধাই, সে তো কয় না কথা,
নিয়ে আসে শুব্ধ গভীর নীলাম্বরের নীরবতা।
একতারা তার বাজায় কভু গুনগুনিয়ে,
রাত কেটে যায় তাই শুনিয়ে।

দোসর ওগো, দোসর আমার, উঠল হাওয়া,—
এবার তবে হ'ক আমাদের তরী বাওয়া।
দিনে দিনে পূর্ণ হল ব্যথার বোঝা,
তীরে তীরে ভাঙন লাগে, মিথ্যে কিসের বাসা খোঁজা।
একে একে সকল রশি গেছে খুলে,
ভাসিয়ে এবার দাও অকূলে।

দোসর ওগো, দোসর আমার, দাও না দেখা,
সময় হল একার সাথে মিলুক একা।

নিবিড় নীরব অন্ধকারে রাতের বেলায়
অনেক দিনের দূরের ডাকা পূর্ণ করো কাছের খেলায়।
তোমায় আমায় নতুন পালা হ'ক না এবার
হাতে হাতে দেবার নেবার।

আণ্ডেস জাহাজ
২৮ অক্টোবর, ১৯২৪

অবসান

পারের ঘাটা পাঠাল তরী ছায়ার পাল তুলে,
আজি আমার প্রাণের উপকূলে।
মনের মাঝে কে কয় ফিরে ফিরে—
বাঁশির সুরে ভরিয়া দাও গোধূলি-আলোটিরে।
সাঁঝের হাওয়া করুণ হ'ক দিনের অবসানে
পাড়ি দেবার গানে।

সময় যদি এসেছে তবে সময় যেন পাই,
নিভৃত খনে আপন মনে গাই।
আভাস যত বেড়ায় ঘুরে মনে—
অশ্রুঘন কুহেলিকায় লুকায় কোণে কোণে,—
আজিকে তারা পড়ুক ধরা, মিলুক পূরবীতে
একটি সংগীতে।

সন্ধ্যা মম, কোন্ কথাটি প্রাণের কথা তব,
আমার গানে, বলো, কী আমি কব।
দিনের শেষে যে-ফুল পড়ে ঝরে
তাহারি শেষ নিঃশ্বাসে কি বাঁশিটি নেব ভরে?
অথবা ব'সে বাঁধিব সুর যে-তারা ওঠে রাতে
তাহারি মহিমাতে।

সন্ধ্যা মম, যে-পার হতে ভাসিল মোর তরী
পাব কি আজি বিদায়গান ওরি ?
অথবা সেই অদেখা দূর পারে
প্রাণের চিরদিনের আশা পাঠাব অজানারে ?
বলিব,—যত হারানো বাণী তোমার রজনীতে
চলিনু খুঁজে নিতে।

আণ্ডেস জাহাজ
৩০ অক্টোবর, ১৯২৪

তারা

আকাশভরা তারার মাঝে আমার তারা কই ?
ওই হবে কি ওই ?
রাঙা আভার আভাস মাঝে, সন্ধ্যারবির রাগে
সিন্ধুপারের ঢেউয়ের ছিটে ওই যাহারে লাগে,
ওই যে লাজুক আলোখানি, ওই যে গো নামহারা,
ওই কি আমার হবে আপন তারা ?

জোয়ারভাঁটার স্রোতের টানে আমার বেলা কাটে
কেবল ঘাটে ঘাটে।
এমনি করে পথে পথে অনেক হল খোঁজা,
এমনি করে হাটে হাটে জমল অনেক বোঝা ;—
ইমনে আজ বাঁশি বাজে, মন যে কেমন করে
আকাশে মোর আপন তারার তরে।

দূরে এসে তার ভাষা কি ভুলেছি কোন্‌খনে ?
পড়বে না কি মনে ?
ঘরে-ফেরার প্রদীপ আমার রাখল কোথায় জেলে
পথে-চাওয়া করুণ চোখের কিরণখানি মেলে ?
কোন্ রাতে যে মেটাবে মোর তপ্ত দিনের তৃষা,
খুঁজে খুঁজে পাব না তার দিশা ?

ক্ষণে ক্ষণে কাজের মাঝে দেয় নি কি তার নাড়া—
পাই নি কি তার সাড়া ?
বাতায়নের মুক্তপথে স্বচ্ছ শরৎ-রাতে
তার আলোটি মেশে নি কি মোর স্বপনের সাথে ?
হঠাৎ তারি সুরখানি কি ফাগুন-হাওয়া বেয়ে
আসে নি মোর গানের 'পরে ধেয়ে ?

কানে কানে কথাটি তার অনেক সুখে দুখে
বেজেছে মোর বুকে ।
মাঝে মাঝে তারি বাতাস আমার পালে এসে
নিয়ে গেছে হঠাৎ আমায় আনমনাদের দেশে,
পথ-হারানো বনের ছায়ায় কোন্ মায়াতে ভুলে
গেঁথেছি হায় নাম-না-জানা ফুলে ।

আমার তারার মন্ত্র নিয়ে এলেম ধরাতলে
লক্ষ্যহারার দলে ।
বাসায় এল পথের হাওয়া, কাজের মাঝে খেলা,
ভাসল ভিড়ের মুখর স্রোতে একলা প্রাণের ভেলা,
বিচ্ছেদেরি লাগল বাদল মিলন-ঘন রাতে
বাঁধনহারা শ্রাবণ-ধারাপাতে ।

ফিরে যাবার সময় হল তাই তো চেয়ে রই,
আমার তারা কই ?
গভীর রাতে প্রদীপগুলি নিবেছে এই পারে
বাসাহারা গন্ধ বেড়ায় বনের অন্ধকারে ;
সুর ঘুমাল নীরব নীড়ে, গান হল মোর সারা,
কোন্ আকাশে আমার আপন তারা ?

আণ্ডেস জাহাজ
১ নভেম্বর, ১৯২৪

কৃতজ্ঞ

বলেছিনু "ভুলিব না", যবে তব ছল-ছল আঁখি
নীরবে চাহিল মুখে। ক্ষমা ক'রো যদি ভুলে থাকি।
সে যে বহুদিন হল। সেদিনের চুম্বনের 'পরে
কত নববসন্তের মাধবীমঞ্জরী থরে থরে
শুকায়ে পড়িয়া গেছে; মধ্যাহ্নের কপোতকাকলি
তারি 'পরে ক্লান্ত ঘুম চাপা দিয়ে এল গেল চলি
কতদিন ফিরে ফিরে। তব কালো নয়নের দিঠি
মোর প্রাণে লিখেছিল প্রথম প্রেমের সেই চিঠি
লজ্জাভয়ে; তোমার সে হৃদয়ের স্বাক্ষরের 'পরে
চঞ্চল আলোকছায়া কত কাল প্রহরে প্রহরে
বুলায়ে গিয়েছে তুলি, কত সন্ধ্যা দিয়ে গেছে এঁকে
তারি 'পরে সোনার বিস্মৃতি, কত রাত্রি গেছে রেখে
অস্পষ্ট রেখার জালে আপনার স্বপনলিখন,
তাহারে আচ্ছন্ন করি। প্রতিমুহূর্তটি প্রতিক্ষণ
বাঁকাচোরা নানা চিত্রে চিন্তাহীন বালকের প্রায়
আপনার স্মৃতিলিপি চিত্তপটে এঁকে এঁকে যায়,
লুপ্ত করি পরস্পরে বিস্মৃতির জাল দেয় বুনে।
সেদিনের ফাল্গুনের বাণী যদি আজি এ ফাল্গুনে
ভুলে থাকি, বেদনার দীপ হতে কখন নীরবে
অগ্নিশিখা নিবে গিয়ে থাকে যদি, ক্ষমা ক'রো তবে।
তবু জানি, একদিন তুমি দেখা দিয়েছিলে বলে
গানের ফসল মোর এ জীবনে উঠেছিল ফলে,
আজো নাই শেষ; রবির আলোক হতে একদিন
ধ্বনিয়া তুলেছে তার মর্মবাণী, বাজায়েছে বীন
তোমার আঁখির আলো। তোমার পরশ নাহি আর,
কিন্তু কী পরশমণি রেখে গেছ অন্তরে আমার,—
বিশ্বের অমৃতছবি আজিও তো দেখা দেয় মোরে
ক্ষণে ক্ষণে,—অকারণ আনন্দের সুধাপাত্র ভ'রে

আমারে করায় পান। ক্ষমা ক'রো যদি ভুলে থাকি।
তবু জানি একদিন তুমি মোরে নিয়েছিলে ডাকি
হৃদিমাঝে; আমি তাই আমার ভাগ্যেরে ক্ষমা করি—
যত দুঃখে যত শোকে দিন মোর দিয়েছে সে ভরি
সব ভুলে গিয়ে। পিপাসার জলপাত্র নিয়েছে সে
মুখ হতে, কতবার ছলনা করেছে হেসে হেসে,
ভেঙেছে বিশ্বাস, অকস্মাৎ ডুবায়েছে ভরা তরী
তীরের সম্মুখে নিয়ে এসে,—সব তার ক্ষমা করি।
আজ তুমি আর নাই, দূর হতে গেছ তুমি দূরে,
বিধুর হয়েছে সন্ধ্যা মুছে-যাওয়া তোমার সিন্দুরে,
সঙ্গীহীন এ জীবন শূন্যঘরে হয়েছে শ্রীহীন,
সব মানি,—সব চেয়ে মানি তুমি ছিলে একদিন।

আণ্ডেস জাহাজ
২ নভেম্বর, ১৯২৪

দুঃখ-সম্পদ

দুঃখ, তব যন্ত্রণায় যে-দুর্দিনে চিত্ত উঠে ভরি,
দেহে মনে চতুর্দিকে তোমার প্রহরী
রোধ করে বাহিরের সান্ত্বনার দ্বার,
সেইক্ষণে প্রাণ আপনার
নিগূঢ় ভাণ্ডার হতে গভীর সান্ত্বনা
বাহির করিয়া আনে; অমৃতের কণা
গলে আসে অশ্রুজলে;
সে-আনন্দ দেখা দেয় অন্তরের তলে
যে আপন পরিপূর্ণতায়
আপন করিয়া লয় দুঃখবেদনায়।

তখন সে মহা-অন্ধকারে
অনির্বাণ আলোকের পাই দেখা অন্তরমাঝারে।
তখন বুঝিতে পারি আপনার মাঝে
আপন অমরাবতী চিরদিন গোপনে বিরাজে।

আণ্ডেস জাহাজ
৪ নভেম্বর, ১৯২৪

মৃত্যুর আহ্বান

জন্ম হয়েছিল তোর সকলের কোলে
আনন্দকল্লোলে।
নীলাকাশ, আলো, ফুল, পাখি,
জননীর আঁখি,
শ্রাবণের বৃষ্টিধারা, শরতের শিশিরের কণা,
প্রাণের প্রথম অভ্যর্থনা।
জন্ম সেই
এক নিমিষেই
অন্তহীন দান,
জন্ম সে যে গৃহমাঝে গৃহীরে আহ্বান।

মৃত্যু তোর হ'ক দূরে নিশীথে নির্জনে
হ'ক সেই পথে যেথা সমুদ্রের তরঙ্গগর্জনে
গৃহহীন পথিকেরি
নৃত্যছন্দে নিত্যকাল বাজিতেছে ভেরী।
অজানা অরণ্যে যেথা উঠিতেছে উদাস মর্মর,
বিদেশের বিবাগি নির্ঝর
বিদায়-গানের তালে হাসিয়া বাজায় করতালি।
যেথায় অপরিচিত নক্ষত্রের আরতির থালি
চলিয়াছে অনন্তের মন্দির-সন্ধানে,
পিছু ফিরে চাহিবার কিছু যেথা নাই কোনোখানে

দুয়ার রহিবে খোলা ; ধরিত্রীর সমুদ্র-পর্বত
কেহ ডাকিবে না কাছে, সকলেই দেখাইবে পথ।
শিয়রে নিশীথরাত্রি রহিবে নির্বাক,
মৃত্যু সে যে পথিকেরে ডাক।

আণ্ডেস জাহাজ
৩ নভেম্বর, ১৯২৪

দান

কাঁকনজোড়া এনে দিলেম যবে
ভেবেছিলেম হয়তো খুশি হবে।
তুলে তুমি নিলে হাতের 'পরে,
ঘুরিয়ে তুমি দেখলে ক্ষণেক তরে,
পরেছিলে হয়তো গিয়ে ঘরে,
হয়তো বা তা রেখেছিলে খুলে
এলে যেদিন বিদায় নেবার রাতে
কাঁকন দুটি দেখি নাই তো হাতে,
হয়তো এলে ভুলে

দেয় যে জনা কী দশা পায় তাকে ?
দেওয়ার কথা কেনই মনে রাখে ?
পাকা যে ফল পড়ল মাটির টানে
শাখা আবার চায় কি তাহার পানে ?
বাতাসেতে উড়িয়ে-দেওয়া গানে
তারে কি আর স্মরণ করে পাখি ?
দিতে যারা জানে এ সংসারে
এমন করেই তারা দিতে পারে
কিছু না রয় বাকি।

নিতে যারা জানে তারাই জানে,
বোঝে তারা মূল্যটি কোন্‌খানে।
তারাই জানে বুকের রত্নহারে
সেই মণিটি কজন দিতে পারে
হৃদয় দিয়ে দেখিতে হয় যারে
যে পায় তারে পায় সে অবহেলে।
পাওয়ার মতন পাওয়া যারে কহে
সহজ বলেই সহজ তাহা নহে,
দৈবে তারে মেলে।

ভাবি যখন ভেবে না পাই তবে
দেবার মতো কী আছে এই ভবে।
কোন্‌ খনিতে কোন্‌ ধনভাণ্ডারে,
সাগরতলে কিম্বা সাগরপারে,
যক্ষরাজের লক্ষমণির হারে
যা আছে তা কিছুই তো নয়, প্রিয়ে।
তাই তো বলি যা কিছু মোর দান
গ্রহণ করেই করবে মূল্যবান,
আপন হৃদয় দিয়ে।

আণ্ডেস জাহাজ
৩ নভেম্বর, ১৯২৪

সমাপন

এবারের মতো করো শেষ
প্রাণে যদি পেয়ে থাক চরমের পরম উদ্দেশ ;
যদি অবসান সুমধুর
আপন বীণার তারে সকল বেসুর
সুরে বেঁধে তুলে থাকে ;
অস্তরবি যদি তোরে ডাকে

দিনেরে মাভৈঃ বলে যেমন সে ডেকে নিয়ে যায়
অন্ধকার অজানায় ;
সুন্দরের শেষ অর্চনায়
আপনার রশ্মিচ্ছটা সম্পূর্ণ করিয়া দেয় সারা ;
যদি সন্ধ্যাতারা
অসীমের বাতায়নতলে
শান্তির প্রদীপশিখা দেখায় কেমন করে জ্বলে ;
যদি রাত্রি তার
খুলে দেয় নীরবের দ্বার,
নিয়ে যায় নিঃশব্দ সংকেতে ধীরে ধীরে
সকল বাণীর শেষ সাগর-সংগম তীর্থতীরে
সেই শতদল হতে যদি গন্ধ পেয়ে থাক তার
মানস-সরসে যাহা শেষ অর্ঘ্য, শেষ নমস্কার।

আণ্ডেস জাহাজ
৫ নভেম্বর, ১৯২৪

ভাবী কাল

ক্ষমা ক'রো, যদি গর্বভরে
মনে মনে ছবি দেখি,— মোর কাব্যখানি লয়ে করে
দূর ভাবী শতাব্দীর অয়ি সপ্তদশী
একেলা পড়িছ তব বাতায়নে বসি।
আকাশেতে শশী
ছন্দের ভরিয়া রন্ধ্র ঢালিছে গভীর নীরবতা
কথার অতীত সুরে পূর্ণ করি কথা ;
হয়তো উঠিছে বক্ষ নেচে
হয়তো ভাবিছ, "যদি থাকিত সে বেঁচে,
আমারে বাসিত বুঝি ভালো।"

হয়তো বলিছ মনে, "সে নাহি আসিবে আর কভু,
তারি লাগি তবু
মোর বাতায়নতলে আজ রাত্রে জ্বালিলাম আলো।"

আণ্ডেস জাহাজ
৬ নভেম্বর, ১৯২৪

অতীত কাল

সেই ভালো, প্রতি যুগ আনে না আপন অবসান,
সম্পূর্ণ করে না তার গান ;
অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস রেখে দিয়ে যায় সে বাতাসে।
তাই যবে পরযুগে বাঁশির উচ্ছ্বাসে
বেজে ওঠে গানখানি
তার মাঝে সুদূরের বাণী
কোথায় লুকায়ে থাকে, কী বলে সে বুঝিতে কে পারে ;
যুগান্তরের ব্যথা প্রত্যহের ব্যথার মাঝারে
মিলায় অশ্রুর বাষ্পজাল ;
অতীতের সূর্যাস্তের কাল
আপনার সকরুণ বর্ণচ্ছটা মেলে
মৃত্যুর ঐশ্বর্য দেয় ঢেলে,
নিমেষের বেদনারে করে সুবিপুল।
তাই বসন্তের ফুল
নাম-ভুলে-যাওয়া
প্রেয়সীর নিঃশ্বাসের হাওয়া
যুগান্তর-সাগরের দ্বীপান্তর হতে বহি আনে।
যেন কী অজানা ভাষা মিশে যায় প্রণয়ীর কানে
পরিচিত ভাষাটির সাথে,—
মিলনের রাতে।

আণ্ডেস জাহাজ
৭ নভেম্বর, ১৯২৪

বেদনার লীলা

গানগুলি বেদনার খেলা যে আমার,
কিছুতে ফুরায় না সে আর।
যেখানে স্রোতের জল পীড়নের পাকে
আবর্তে ঘুরিতে থাকে ;—
সূর্যের কিরণ সেথা নৃত্য করে ;—
ফেনপুঞ্জ স্তরে স্তরে
দিবারাতি
রঙের খেলায় ওঠে মাতি।
শিশু রুদ্র হাসে খল খল,
দোলে টল মল
লীলাভরে।
প্রচণ্ডের সৃষ্টিগুলি প্রহরে প্রহরে
ওঠে পড়ে আসে যায় একান্ত হেলায়,
নিরর্থ খেলায়।
গানগুলি সেইমতো বেদনার খেলা যে আমার,
কিছুতে ফুরায় না সে আর।

আণ্ডেস জাহাজ
৭ নভেম্বর, ১৯২৪

শীত

শীতের হাওয়া হঠাৎ ছুটে এল
গানের বেলা শেষ না হতে হতে ?
মনের কথা ছড়িয়ে এলোমেলো
ভাসিয়ে দিল শুকনো পাতার স্রোতে।
মনের কথা যত
উজান তরীর মতো ;

পালে যখন হাওয়ার বলে
মরণ-পারে নিয়ে চলে,
চোখের জলের স্রোত যে তাদের টানে
পিছু ঘাটের পানে
যেথায় তুমি, প্রিয়ে,
একলা বসে আপন মনে
আঁচল মাথায় দিয়ে।

ঘোরে তারা শুকনো পাতার পাকে,
কাঁপন-ভরা হিমের বায়ুভরে ?
ঝরা ফুলের পাপড়ি তাদের ঢাকে,
লুটায় কেন মরা ঘাসের 'পরে ?
হল কি দিন সারা ?
বিদায় নেবে তারা ?
এবার বুঝি কুয়াশাতে
লুকিয়ে তারা পৌউষ-রাতে
ধুলার ডাকে সাড়া দিতে চলে
যেথায় ভূমিতলে
একলা তুমি, প্রিয়ে,
বসে আছ আপন মনে
আঁচল মাথায় দিয়ে ?

মন যে বলে, নয় কখনোই নয়,
ফুরায় নি তো, ফুরাবার এই ভান ;
মন যে বলে, শুনি আকাশময়
যাবার মুখে ফিরে আসার গান।
শীর্ণ শীতের লতা
আমার মনের কথা
হিমের রাতে লুকিয়ে রাখে
নগ্ন শাখার ফাঁকে ফাঁকে,

ফাল্গুনেতে ফিরিয়ে দেবে ফুলে
তোমার চরণমূলে
যেথায় তুমি, প্রিয়ে,
একলা বসে আপন মনে
আঁচল মাথায় দিয়ে।

বুয়েনোস এয়ারিস
১০ নভেম্বর, ১৯২৪

কিশোর প্রেম

অনেক দিনের কথা সে যে অনেক দিনের কথা ;
পুরানো এই ঘাটের ধারে
ফিরে এল কোন্ জোয়ারে
পুরানো সেই কিশোর প্রেমের করুণ ব্যাকুলতা ?
সে যে অনেক দিনের কথা।

আজকে মনে পড়েছে সেই নির্জন অঙ্গন।
সেই প্রদোষের অন্ধকারে
এল আমার অধর-পারে
ক্লান্ত ভীরু পাখির মতো কম্পিত চুম্বন।
সেদিন নির্জন অঙ্গন।

তখন জানা ছিল না তো ভালোবাসার ভাষা ;
যেন প্রথম দখিন বায়ে
শিহর লেগেছিল গায়ে ;
চাঁপাকুঁড়ির বুকের মাঝে অস্ফুট কোন্ আশা,
সে যে অজানা কোন্ ভাষা।

সেই সেদিনের আসাযাওয়া, আধেক জানাজানি,
হঠাৎ হাতে হাতে ঠেকা,
বোবা চোখের চেয়ে দেখা,
মনে পড়ে ভীরু হিয়ার না-বলা সেই বাণী,
সেই আধেক জানাজানি।

এই জীবনে সেই তো আমার প্রথম ফাগুন মাস।
ফুটল না তার মুকুলগুলি,
শুধু তারা হাওয়ায় দুলি
অবেলাতে ফেলে গেছে চরম দীর্ঘশ্বাস,
আমার প্রথম ফাগুন মাস।

ঝরে-পড়া সেই মুকুলের শেষ-না-করা কথা
আজকে আমার সুরে গানে
পায় খুঁজে তার গোপন মানে,
আজ বেদনায় উঠল ফুটে তার সেদিনের ব্যথা,
সেই শেষ-না-করা কথা।

পারে যাওয়ার উধাও পাখি সেই কিশোরের ভাষা,
প্রাণের পারের কুলায় ছাড়ি
শূন্য আকাশ দিল পাড়ি,
আজ এসে মোর স্বপন মাঝে পেয়েছে তার বাসা,
আমার সেই কিশোরের ভাষা।

বুয়েনোস এয়ারিস
১১ নভেম্বর, ১৯২৪

প্রভাত

স্বর্ণসুধা-ঢালা এই প্রভাতের বুকে
যাপিলাম সুখে,
পরিপূর্ণ অবকাশ করিলাম পান।
মুদিল অলস পাখা মুগ্ধ মোর গান।
যেন আমি নিস্তব্ধ মৌমাছি
আকাশ-পদ্মের মাঝে একান্ত একেলা বসে আছি।
যেন আমি আলোকের নিঃশব্দ নির্ঝরে
মন্থর মুহূর্তগুলি ভাসায়ে দিতেছি লীলাভরে।
ধরণীর বক্ষ ভেদি যেথা হতে উঠিতেছে ধারা
পুষ্পের ফোয়ারা,
তৃণের লহরী,
সেখানে হৃদয় মোর রাখিয়াছি ধরি ;
ধীরে চিত্ত উঠিতেছে ভরি
সৌরভের স্রোতে।
ধূলি-উৎস হতে
প্রকাশের অক্লান্ত উৎসাহ,
জন্মমৃত্যু-তরঙ্গিত রূপের প্রবাহ
স্পন্দিত করিছে মোর বক্ষস্থল আজি।
রক্তে মোর উঠে বাজি
তরঙ্গের অরণ্যের সম্মিলিত স্বর,
নিখিল মর্মর।
এ বিশ্বের স্পর্শের সাগর
আজ মোর সর্ব অঙ্গ করেছে মগন।
এই স্বচ্ছ উদার গগন
বাজায় অদৃশ্য শঙ্খ শব্দহীন সুর।
আমার নয়নে মনে ঢেলে দেয় সুনীল সুদূর।

বুয়েনোস এয়ারিস
১১ নভেম্বর, ১৯২৪

বিদেশী ফুল

হে বিদেশী ফুল, যবে আমি পুছিলাম—
"কী তোমার নাম",
হাসিয়া দুলালে মাথা, বুঝিলাম তবে
নামেতে কী হবে।
আর কিছু নয়,
হাসিতে তোমার পরিচয়।

হে বিদেশী ফুল, যবে তোমারে বুকের কাছে ধরে
শুধালেম, "বলো বলো মোরে
কোথা তুমি থাক,"
হাসিয়া দুলালে মাথা, কহিলে, "জানি না, জানি নাকো।"
বুঝিলাম তবে
শুনিয়া কী হবে
থাক কোন্ দেশে।
যে তোমারে বোঝে ভালোবেসে
তাহার হৃদয়ে তব ঠাঁই,
আর কোথা নাই।

হে বিদেশী ফুল, আমি কানে কানে শুধানু আবার,
"ভাষা কী তোমার?"
হাসিয়া দুলালে শুধু মাথা,
চারিদিকে মর্মরিল পাতা।
আমি কহিলাম, "জানি, জানি,
সৌরভের বাণী
নীরবে জানায় তব আশা।
নিঃশ্বাসে ভরেছে মোর সেই তব নিঃশ্বাসের ভাষা।"

হে বিদেশী ফুল, আমি যেদিন প্রথম এনু ভোরে—
শুধালেম, "চেন তুমি মোরে?"

রবীন্দ্রনাথ ও 'বিজয়া' ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো

হাসিয়া দুলালে মাথা, ভাবিলাম, তাহে একরতি
নাহি কারো ক্ষতি
কহিলাম, "বোঝ নি কি তোমার পরশে
হৃদয় ভরেছে মোর রসে ?
কেই বা আমারে চেনে এর চেয়ে বেশি,
হে ফুল বিদেশী।"

হে বিদেশী ফুল, যবে তোমারে শুধাই, "বলো দেখি,
মোরে ভুলিবে কি ?"
হাসিয়া দুলাও মাথা ; জানি জানি মোরে ক্ষণে ক্ষণে
পড়িবে যে মনে।
দুই দিন পরে
চলে যাব দেশান্তরে,
তখন দূরের টানে স্বপ্নে আমি হব তব চেনা ;—
মোরে ভুলিবে না।

বুয়েনোস এয়ারিস
১২ নভেম্বর, ১৯২৪

অতিথি

প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করি দিলে, নারী,
মাধুর্যসুধায় ; কত সহজে করিলে আপনারি
দূরদেশী পথিকেরে ; যেমন সহজে সন্ধ্যাকাশে
আমার অজানা তারা স্বর্গ হতে স্থির স্নিগ্ধ হাসে
আমারে করিল অভ্যর্থনা ; নির্জন এ বাতায়নে
একেলা দাঁড়ায়ে যবে চাহিলাম দক্ষিণ-গগনে
ঊর্ধ্ব হতে একতানে এল প্রাণে আলোকেরি বাণী,—
শুনিনু গম্ভীর স্বর, "তোমারে যে জানি মোরা জানি ;
আঁধারের কোল হতে যেদিন কোলেতে নিল ক্ষিতি
মোদের অতিথি তুমি, চিরদিন আলোর অতিথি।"

তেমনি তারার মতো মুখে মোর চাহিলে, কল্যাণী,
কহিলে তেমনি স্বরে, "তোমারে যে জানি আমি জানি
জানি না তো ভাষা তব, হে নারী, শুনেছি তব গীতি,
"প্রেমের অতিথি কবি, চিরদিন আমারি অতিথি।"

বুয়েনোস এয়ারিস
১৫ নভেম্বর, ১৯২৪

অন্তর্হিতা

প্রদীপ যখন নিবেছিল,
আঁধার যখন রাতি,
দুয়ার যখন বন্ধ ছিল,
ছিল না কেউ সাথি।
মনে হল অন্ধকারে
কে এসেছে বাহির-দ্বারে,
মনে হল শুনি যেন
পায়ের ধ্বনি কার,
রাতের হাওয়ায় বাজল বুঝি
কঙ্কণ-ঝংকার।

বারেক শুধু মনে হল
খুলি, দুয়ার খুলি।
ক্ষণেক পরে ঘুমের ঘোরে
কখন গেনু ভুলি।
"কোন্ অতিথি দ্বারের কাছে
একলা রাতে বসে আছে?"
ক্ষণে ক্ষণে তন্দ্রা ভেঙে
মন শুধাল যবে,
বলেছিলেম, আর কিছু নয়,
স্বপ্ন আমার হবে।

মাঝ-গগনে সপ্ত-ঋষি
স্তব্ধ গভীর রাতে
জানলা হতে আমায় যেন
ডাকল ইশারাতে।
মনে হল, শয়ন ফেলে
দিই না কেন আলো জ্বেলে,
আলসভরে রইনু শুয়ে
হল না দীপ জ্বালা।
প্রহর পরে কাটল প্রহর,
বন্ধ রইল তালা।

জাগল কখন দখিন-হাওয়া
কাঁপল বনের হিয়া,
স্বপ্নে কথা-কওয়ার মতো
উঠল মর্মরিয়া।
যূথীর গন্ধ ক্ষণে ক্ষণে
মূর্ছিল মোর বাতায়নে,
শিহর দিয়ে গেল, আমার
সকল অঙ্গ চুমে।
জেগে উঠে আবার কখন
ভরল নয়ন ঘুমে।

ভোরের তারা পুব-গগনে
যখন হল গত
বিদায়রাতির একটি ফোঁটা
চোখের জলের মতো,
হঠাৎ মনে হল তবে,
যেন কাহার করুণ রবে

শিরীষ ফুলের গন্ধে আকুল
বনের বীথি ব্যেপে
শিশির-ভেজা তৃণগুলি
উঠল কেঁপে কেঁপে।

শয়ন ছেড়ে উঠে তখন
খুলে দিলেম দ্বার,
হায় রে, ধুলায় বিছিয়ে গেছে
যূথীর মালা কার।
ঐ যে দূরে, নয়ন নত
বনের ছায়ায় ছায়ার মতো
মায়ার মতো মিলিয়ে গেল
অরুণ-আলোয় মিশে,
ঐ বুঝি মোর বাহির-দ্বারের
রাতের অতিথি সে।

আজ হতে মোর ঘরের দুয়ার
রাখব খুলে রাতে।
প্রদীপখানি রইবে জ্বালা
বাহির-জানালাতে।
আজ হতে কার পরশ লাগি
পথ তাকিয়ে রইব জাগি ;
আর কোনোদিন আসবে না কি
আমার পরান ছেয়ে
যূথীর মালার গন্ধখানি
রাতের বাতাস বেয়ে ?

বুয়েনোস এয়ারিস
১৬ নভেম্বর, ১৯২৪

আশঙ্কা

ভালোবাসার মূল্য আমায় দু-হাত ভরে
যতই দেবে বেশি করে,
ততই আমার অন্তরের এই গভীর ফাঁকি
আপনি ধরা পড়বে না কি ?
তাহার চেয়ে ঋণের রাশি রিক্ত করি
যাই না নিয়ে শূন্য তরী।
বরং রব ক্ষুধায় কাতর ভালো সে-ও,
সুধায় ভরা হৃদয় তোমার
ফিরিয়ে নিয়ে চলে যেয়ো।

পাছে আমার আপন ব্যথা মিটাইতে
ব্যথা জাগাই তোমার চিতে,
পাছে আমার আপন বোঝা লাঘব তরে
চাপাই বোঝা তোমার 'পরে,
পাছে আমার একলা প্রাণের ক্ষুব্ধ ডাকে
রাত্রে তোমায় জাগিয়ে রাখে,
সেই ভয়েতেই মনের কথা কই নে খুলে ;
ভুলতে যদি পার তবে
সেই ভালো গো যেয়ো ভুলে।

বিজন পথে চলেছিলেম, তুমি এলে
মুখে আমার নয়ন মেলে।
ভেবেছিলেম বলি তোমায়, সঙ্গে চলো,
আমায় কিছু কথা বলো।
হঠাৎ তোমার মুখে চেয়ে কী কারণে
ভয় হল যে আমার মনে।

দেখেছিলেম সুপ্ত আগুন লুকিয়ে জ্বলে
তোমার প্রাণের নিশীথ রাতের
অন্ধকারের গভীর তলে।

তপস্বিনী, তোমার তপের শিখাগুলি
হঠাৎ যদি জাগিয়ে তুলি,
তবে যে সেই দীপ্ত আলোয় আড়াল টুটে
দৈন্য আমার উঠবে ফুটে।
হবি হবে তোমার প্রেমের হোমাগ্নিতে
এমন কী মোর আছে দিতে।
তাই তো আমি বলি তোমায় নতশিরে
তোমার দেখার স্মৃতি নিয়ে
একলা আমি যাব ফিরে।

বুয়েনোস এয়ারিস
১৭ নভেম্বর, ১৯২৪

শেষ বসন্ত

আজিকার দিন না ফুরাতে
হবে মোর এ আশা পুরাতে—
শুধু এবারের মতো
বসন্তের ফুল যত
যাব মোরা দুজনে কুড়াতে।
তোমার কাননতলে ফাল্গুন আসিবে বারম্বার,
তাহারি একটি শুধু মাগি আমি দুয়ারে তোমার।

বেলা কবে গিয়াছে বৃথাই
এত কাল ভুলে ছিনু তাই।

হঠাৎ তোমার চোখে
দেখিয়াছি সন্ধ্যালোকে
আমার সময় আর নাই।
তাই আমি একে একে গনিতেছি কৃপণের সম
ব্যাকুল সংকোচভরে বসন্তশেষের দিন মম।

ভয় রাখিয়ো না তুমি মনে ;
তোমার বিকচ ফুলবনে
দেরি করিব না মিছে
ফিরে চাহিব না পিছে,
দিনশেষে বিদায়ের ক্ষণে।
চাব না তোমার চোখে আঁখিজল পাব আশা করি',
রাখিবারে চিরদিন স্মৃতিরে করুণা-রসে ভরি।

ফিরিয়া যেয়ো না শোন শোন,
সূর্য অস্ত যায় নি এখনো।
সময় রয়েছে বাকি ;
সময়েরে দিতে ফাঁকি
ভাবনা রেখো না মনে কোনো।
পাতার আড়াল হতে বিকালের আলোটুকু এসে
আরো কিছুখন ধরে ঝলুক তোমার কালো কেশে।

হাসিয়ো মধুর উচ্চহাসে
অকারণ নির্মম উল্লাসে,
বনসরসীর তীরে
ভীরু কাঠবিড়ালিরে
সহসা চকিত ক'রো ত্রাসে।
ভুলে-যাওয়া কথাগুলি কানে কানে করায়ে স্মরণ
দিব না মন্থর করি ওই তব চঞ্চল চরণ।

তার পরে যেয়ো তুমি চলে
ঝরা পাতা দ্রুতপদে দলে,
নীড়ে-ফেরা পাখি যবে
অস্ফুট কাকলিরবে
দিনান্তেরে ক্ষুব্ধ করি তোলে।
বেণুবনচ্ছায়াঘন সন্ধ্যায় তোমার ছবি দূরে
মিলাইবে গোধূলির বাঁশরির সর্বশেষ সুরে।

রাত্রি যবে হবে অন্ধকার
বাতায়নে বসিয়ো তোমার।
সব ছেড়ে যাব, প্রিয়ে,
সমুখের পথ দিয়ে,
ফিরে দেখা হবে না তো আর।
ফেলে দিয়ো ভোরে-গাঁথা ম্লান মল্লিকার মালাখানি
সেই হবে স্পর্শ তব, সেই হবে বিদায়ের বাণী।

বুয়েনোস এয়ারিস
২১ নভেম্বর, ১৯২৪

বিপাশা

মায়ামৃগী, নাই বা তুমি
পড়লে প্রেমের ফাঁদে
ফাগুন-রাতে চোরা মেঘে
নাই হরিল চাঁদে।
বাঁধন-কাটা ভাবনা তোমার
হাওয়ায় পাখা মেলে,
দেহমনে চঞ্চলতার
নিত্য যে ঢেউ খেলে।

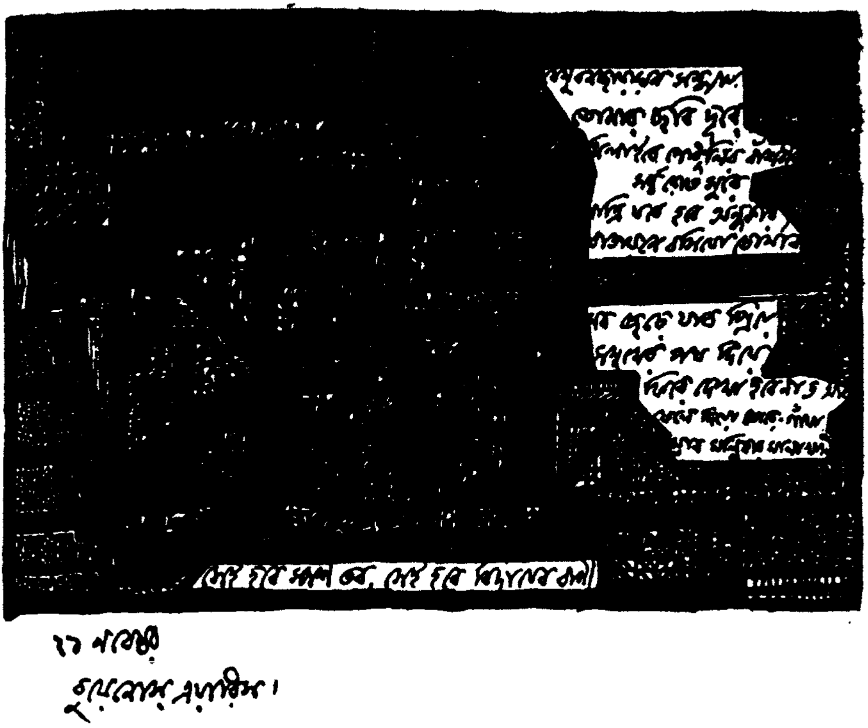

পূরবীর পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠার কবিকৃত লিপিচিত্রণ

ঝরনা-ধারার মতো সদাই
মুক্ত তোমার গতি,
নাই বা নিলে তটের শরণ
তায় বা কিসের ক্ষতি ?
শরৎপ্রাতের মেঘ যে তুমি
শুভ্র আলোয় ধোওয়া,
একটুখানি অরুণ-আভার
সোনার হাসি-ছোঁওয়া ;
শূন্য পথে মনোরথে
ফের আকাশ পার,
বুকের মাঝে নাই বহিলে
অশ্রু-জলের ভার ?
এমনি করেই যাও খেলে যাও
অকারণের খেলা ;
ছুটির স্রোতে যাক না ভেসে
হালকা খুশির ভেলা।
পথে চাওয়ার ক্লান্তি কেন
নামবে আঁখির পাতে,
কাছের সোহাগ ছাড়বে কেন
দূরের দুরাশাতে ;
তোমার পায়ের নূপুরখানি
বাজাক নিত্যকাল
অশোকবনের চিকন পাতার
চমক-আলোর তাল।
রাতের গায়ে পুলক দিয়ে
জোনাক যেমন জ্বলে
তেমনি তোমার খেয়ালগুলি
উড়ুক স্বপনতলে।
যারা তোমার সঙ্গ-কাঙাল
বাইরে বেড়ায় ঘুরে,

ভিড় যেন না করে তোমার
মনের অন্তঃপুরে।
সরোবরের পদ্ম তুমি,
আপন চারিদিকে
মেলে রেখো তরল জলের
সরল বিস্ময়টিকে।
গন্ধ তোমার হ'ক না সবার,
মনে রেখো তবু
বৃন্ত যেন চুরির ছুরি
নাগাল না পায় কভু।
আমার কথা শুধাও যদি—
চাবার তরেই চাই,
পাবার তরে চিত্তে আমার
ভাবনা কিছুই নাই।
তোমার পানে নিবিড় টানের
বেদন-ভরা সুখ
মনকে আমার রাখে যেন
নিয়ত উৎসুক।
চাই না তোমায় ধরতে আমি
মোর বাসনায় ঢেকে,
আকাশ থেকেই গান গেয়ে যাও
নয় খাঁচাটার থেকে।

বুয়েনোস এয়ারিস
২২ নভেম্বর, ১৯২৪

চাবি

বিধাতা যেদিন মোর মন
করিলা সৃজন
বহু কক্ষে ভাগ করা হর্ম্যের মতন,
শুধু তার বাহিরের ঘরে
প্রস্তুত রহিল সজ্জা নানামতো অতিথির তরে ;
নীরব নির্জন অন্তঃপুরে
তালা তার বন্ধ করি চাবিখানি ফেলি দিলা দূরে।
মাঝে মাঝে পান্থ এসে দাঁড়ায়েছে দ্বারে,
বলিয়াছে, "খুলে দাও"। উপায় জানি না খুলিবারে।
বাহিরে আকাশ তাই ধুলায় আকুল করে হাওয়া ;
সেখানেই যত খেলা, যত মেলা, যত আসাযাওয়া।

অন্তরের জনহীন পথে
হিমে-ভেজা ঘাসে ঘাসে শেফালিকা লুটায় শরতে।
আষাঢ়ের আর্দ্রবায়ুভরে
কদম্বকেশরে
চিহ্ন তার পড়ে ঢাকা।
চৈত্র সে বিচিত্র বর্ণে কুসুমের আলিম্পনে আঁকা।
সেথায় লাজুক পাখি ছায়াঘন শাখে,
মধ্যাহ্নে করুণ কণ্ঠে উদাসীন প্রেয়সীরে ডাকে।
সন্ধ্যাতারা দিগন্তের কোণে
শিরীষ পাতার ফাঁকে কান পেতে শোনে
যেন কার পদধ্বনি দক্ষিণ-বাতাসে।
ঝরাপাতা-বিছানো সে ঘাসে
বাঁশরি বাজাই আমি কুসুম-সুগন্ধি অবকাশে।

দূরে চেয়ে থাকি একা
মনে করি যদি কভু পাই তার দেখা

যে-পথিক একদিন অজানা সমুদ্র উপকূলে
কুড়ায়ে পেয়েছে চাবি ; বক্ষে নিয়ে তুলে
শুনিতে পেয়েছে যেন অনাদি কালের কোন্ বাণী ;
সেই হতে ফিরিতেছে বিরাম না জানি।
অবশেষে
মৌমাছির পরিচিত এ নিভৃত পথপ্রান্তে এসে
যাত্রা তার হবে অবসান ;
খুলিবে সে গুপ্ত দ্বার কেহ যার পায় নি সন্ধান

বুয়েনোস এয়ারিস
২৬ নভেম্বর, ১৯২৪

বৈতরণী

ওগো বৈতরণী,
তরল খড়্গের মতো ধারা তব, নাই তার ধ্বনি,
নাই তার তরঙ্গভঙ্গিমা ;
নাই রূপ, নাই স্পর্শ, ছন্দে তার নাই কোনো সীমা ;
অমাবস্যা রজনীর
সুপ্তি সুগম্ভীর
মৌনী প্রহরের মতো
নিরাকার পদচারে শূন্যে শূন্যে ধায় অবিরত।
প্রাণের অরণ্যতট হতে
দণ্ড পল খসে খসে পড়ে তব অন্ধকার স্রোতে।
রূপের না থাকে চিহ্ন, নাহি থাকে বর্ণের বর্ণনা,
বাণীর না থাকে এক কণা।

ওগো বৈতরণী,
কতবার খেয়ার তরণী
এসেছিল এই ঘাটে আমার এ বিশ্বের আলোতে।
নিয়ে গেল কালহীন তোমার কালোতে

কত মোর উৎসবের বাতি,
আমার প্রাণের আশা, আমার গানের কত সাথি,
দিবসেরে রিক্ত করি', তিক্ত করি' আমার রাত্রিরে।
সেই হতে চিত্ত মোর নিয়েছে আশ্রয় তব তীরে।

ওগো বৈতরণী,
অদৃষ্টের উপকূলে থেমে গেছে যেথায় ধরণী
সেথায় নির্জনে
দেখি আমি আপনার মনে
তোমার অরূপ-তলে সব রূপ পূর্ণ হয়ে ফুটে,
সব গান দীপ্ত হয়ে উঠে,
শ্রবণের পরপারে
তব নিঃশব্দের কণ্ঠহারে।
যে-সুন্দর বসেছিল মোর পাশে এসে
ক্ষণিকের ক্ষীণ ছদ্মবেশে,
যে চিরমধুর।
দ্রুতপদে চলে গেল নিমেষের বাজায়ে নূপুর,
প্রলয়ের অন্তরালে গাহে তারা অনন্তের সুর।
চোখের জলের মতো
একটি বর্ষণে যারা হয়ে গেছে গত,
চিত্তের নিশীথ রাত্রে গাঁথে তারা নক্ষত্রমালিকা;
অনির্বাণ আলোকেতে সাজায় অক্ষয় দীপালিকা।

বুয়েনোস এয়ারিস
২৭ নভেম্বর, ১৯২৪

প্রভাতী

চপল ভ্রমর, হে কালো কাজল আঁখি,
খনে খনে এসে চলে যাও থাকি থাকি।
হৃদয়কমল টুটিয়া সকল বন্ধ
বাতাসে বাতাসে মেলি দেয় তার গন্ধ,
তোমারে পাঠায় ডাকি,
হে কালো কাজল আঁখি।

যেথায় তাহার গোপন সোনার রেণু
সেথা বাজে তার বেণু;
বলে, এস, এস, লও খুঁজে লও মোরে,
মধুসঞ্চয় দিয়ো না ব্যর্থ করে,
এস এ বক্ষ মাঝে,
কবে হবে দিন আঁধারে বিলীন সাঁঝে।

দেখো চেয়ে কোন্ উতলা পবনবেগে
সুরের আঘাত লেগে
মোর সরোবরে জলতল ছলছলি
এপারে ওপারে করে কী যে বলাবলি,
তরঙ্গ উঠে জেগে।
গিয়েছে আঁধার গোপনে-কাঁদার রাতি,
নিখিল ভুবন হেরো কী আশায় মাতি
আছে অঞ্জলি পাতি।

হেরো গগনের নীল শতদলখানি
মেলিল নীরব বাণী।
অরুণ-পক্ষ প্রসারি সকৌতুকে
সোনার ভ্রমর আসিল তাহার বুকে
কোথা হতে নাহি জানি।

চপল ভ্রমর, হে কালো কাজল আঁখি
এখনো তোমার সময় আসিল না কি ?
মোর রজনীর ভেঙেছে তিমির বাঁধ
পাও নি কি সংবাদ ?
জেগে-ওঠা প্রাণে উথলিছে ব্যাকুলতা,
দিকে দিকে আজি রটে নি কি সে-বারতা ?
শোন নি কী গাহে পাখি ?
হে কালো কাজল আঁখি।

শিশির-শিহরা পল্লব ঝলমল,
বেণুশাখাগুলি খনে খনে টলমল,
অকৃপণ বনে ছেয়ে গেল ফুলদল
কিছু না রহিল বাকি।
এল যে আমার মন-বিলাবার বেলা,
খেলিব এবার সব-হারাবার খেলা,
যা-কিছু দেবার রাখিব না আর ঢাকি,
হে কালো কাজল আঁখি।

বুয়েনোস এয়ারিস
১ ডিসেম্বর, ১৯২৪

মধু

মৌমাছির মতো আমি চাহি না ভাণ্ডার ভরিবারে
বসন্তেরে ব্যর্থ করিবারে।
সে তো কভু পায় না সন্ধান
কোথা আছে প্রভাতের পরিপূর্ণ দান।
তাহার শ্রবণ ভরে
আপন গুঞ্জনস্বরে,
হারায় সে নিখিলের গান।

জানে না ফুলের গন্ধে আছে কোন করুণ বিষাদ,
সে জানে তা সংগ্রহের পথের সংবাদ।
চাহে নি সে অরণ্যের পানে,
লতার লাবণ্য নাহি জানে,
পড়ে নি ফুলের বর্ণে বসন্তের মর্মবাণী লেখা।
মধুকণা লক্ষ্য তার, তারি কক্ষ আছে শুধু শেখা।

পাখির মতন মন শুধু উড়িবার সুখ চাহে
উধাও উৎসাহে;
আকাশের বক্ষ হতে ডানা ভরি তার
স্বর্ণ-আলোকের মধু নিতে চায়, নাহি যার ভার,
নাহি যার ক্ষয়,
নাহি যার নিরুদ্ধ সঞ্চয়,
যার বাধা নাই,
যারে পাই তবু নাহি পাই,
যার তরে নহে লোভ, নহে ক্ষোভ, নহে তীক্ষ্ণ রীষ,
নহে শূল, নহে গুপ্ত বিষ।

বুয়েনোস এয়ারিস
৪ ডিসেম্বর, ১৯২৪

তৃতীয়া

কাছের থেকে দেয় না ধরা, দূরের থেকে ডাকে
তিন বছরের প্রিয়া আমার, দুঃখ জানাই কাকে।
কণ্ঠেতে ওর দিয়ে গেছে দখিন-হাওয়ার দান
তিন বসন্তে দোয়েল শ্যামার তিন বছরের গান।
তবু কেন আমারে ওর এতই কৃপণতা,
বারেক ডেকে দৌড়ে পালায়, কইতে না চায় কথা।

তবু ভাবি, যাই কেন হ'ক অদৃষ্ট মোর ভালো,
অমন সুরে ডাকে আমার মানিক আমার আলো।
কপাল মন্দ হলে টানে আরো নিচের তলায়,
হৃদয়টি ওর হ'ক না কঠোর, মিষ্টি তো ওর গলায়।

আলো যেমন চমকে বেড়ায় আমলকীর ঐ গাছে
তিন বছরের প্রিয়া আমার দূরের থেকে নাচে।
লুকিয়ে কখন বিলিয়ে গেছে বনের হিল্লোল
অঙ্গে উহার বেণুশাখার তিন ফাগুনের দোল।
তবু ক্ষণিক হেলাভরে হৃদয় করি লুট
শেষ না হতেই নাচের পালা কোন্‌খানে দেয় ছুট।
আমি ভাবি এই বা কী কম, প্রাণে তো ঢেউ তোলে,
ওর মনেতে যা হয় তা হ'ক আমার তো মন দোলে।
হৃদয় না হয় নাই বা পেলাম মাধুরী পাই নাচে,
ভাবের অভাব রইল না হয়, ছন্দটা তো আছে।

বন্দী হতে চাই যে কোমল ঐ বাহুবন্ধনে,
তিন বছরের প্রিয়ার আমার নাই সে খেয়াল মনে।
সোনার প্রভাত দিয়েছে ওর সর্বদেহ ছুঁয়ে
শিউলি ফুলের তিন শরতের পরশ দিয়ে ধুয়ে
বুঝতে নারি আমার বেলায় কেন টানাটানি।
ক্ষয় নাহি যার সেই সুধা নয় দিত একটুখানি।
তবু ভাবি বিধি আমায় নিতান্ত নয় বাম,
মাঝে মাঝে দেয় সে দেখা তারি কি কম দাম?
পরশ না পাই, হরষ পাব চোখের চাওয়া চেয়ে,
রূপের ঝোরা বইবে আমার বুকের পাহাড় বেয়ে।

কবি ব'লে লোকসমাজে আছে তো মোর ঠাঁই,
তিন বছরের প্রিয়ার কাছে কবির আদর নাই।
জানে না যে ছন্দে আমার পাতি নাচের ফাঁদ,
দোলার টানে বাঁধন মানে দূর আকাশের চাঁদ।

পলাতকার দল যত সব দখিন-হাওয়ার চেলা
আপনি তারা বশ মেনে যায় আমার গানের বেলা।
ছোট্টো ওরি হৃদয়খানি দেয় না শুধু ধরা,
ঝগড়ু বোকার বরণমালা গাঁথে স্বয়ম্বরা।
যখন দেখি এমন বুদ্ধি, এমন তাহার রুচি,
আমারে ওর পছন্দ নয়, যায় সে লজ্জা ঘুচি।

এমন দিনও আসবে আমার, আছি সে-পথ চেয়ে,
তিন বছরের প্রিয়া হবেন বিশ বছরের মেয়ে।
স্বর্গ-ভোলা পারিজাতের গন্ধখানি এসে
খ্যাপা হাওয়ায় বুকের ভিতর ফিরবে ভেসে ভেসে।
কথায় যারে যায় না ধরা এমন আভাস যত
মর্মরিবে বাদল-রাতের রিমিঝিমির মতো।
সৃষ্টিছাড়া ব্যথা যত, নাই যাহাদের বাসা,
ঘুরে ঘুরে গানের সুরে খুঁজবে আপন ভাষা।
দেখবে তখন ঝগড়ু বোকা কী করতে বা পারে,
শেষকালে সেই আসতে হবেই এই কবিটির দ্বারে।

বুয়েনোস এয়ারিস
৪ ডিসেম্বর, ১৯২৪

অদেখা

আসিবে সে, আজি সেই আশাতে
শোন নি কি, দু-জনাকে
নাম ধরে ঐ ডাকে
নিশিদিন আকাশের ভাষাতে?
সুর বুকে আসে ভাসি,
পথ চেনাবার বাঁশি
বাজে কোন্ ওপারের বাসাতে।

ফুল ফোটে বনতলে
ইশারায় মোরে বলে
"আসিবে সে" ; আছি সেই আশাতে।

এল না তো এখনো সে এল না।
আলো-আঁধারের ঘোরে
যে-ডাক শুনিনু ভোরে,
সে শুধু স্বপন, সে কি ছলনা?
হায় বেড়ে যায় বেলা,
কবে শুরু হবে খেলা,
সাজায়ে বসিয়া আছি খেলনা,
কিছু ভালো কিছু ভাঙা,
কিছু কালো, কিছু রাঙা,
যারে নিয়ে খেলা সে তো এল না।

আসে নি তো এখনো সে আসে নি।
ভেবেছিনু আসে যদি,
পাড়ি দেব ভরা নদী,
বসে আছি, আজো তরী ভাসে নি।
মিলায় সিঁদুর আলো,
গোধূলি সে হয় কালো,
কোথা সে স্বপন-বন-বাসিনী?
মালতীর মালাগাছি,
কোলে নিয়ে বসে আছি,
যারে দেব, এখনো সে আসে নি।

এসেছে সে, মন বলে, এসেছে।
সুবাস-আভাসখানি
মনে হয় যেন জানি,
রাতের বাতাসে আজ ভেসেছে।

বুঝিয়াছি অনুভবে
বনমর্মর-রবে
সে তার গোপন হাসি হেসেছে।
অদেখার পরশেতে
আঁধার উঠেছে মেতে,
মন জানে, এসেছে সে এসেছে।

বুয়েনোস এয়ারিস
৭ ডিসেম্বর, ১৯২৪

চঞ্চল

হায় রে তোরে রাখব ধরে,
ভালোবাসা,
মনে ছিল এই দুরাশা।
পাথর দিয়ে ভিত্তি ফেঁদে
বাসা যে তোর দিলেম বেঁধে
এল তুফান সর্বনাশা!
মনে আমার ছিল যে রে
ঘিরব তোরে হাসির ঘেরে;—
চোখের জলে হল ভাসা।
অনেক দুঃখে গেছে বোঝা
বেঁধে রাখা নয় তো সোজা,
সুখের ভিতে নহে তোমার
অচল বাসা।

এবার আমি সব-ফুরানো
পথের শেষে
বাঁধব বাসা মেঘের দেশে

ক্ষণে ক্ষণে নিত্যনব
বদল ক'রো মূর্তি তব
রঙ-ফেরানো মায়ার বেশে।
কখনো বা জ্যোৎস্নাভরা
কখনো বা বাদলঝরা
খেয়াল তোমার কেঁদে হেসে।
যেই হাওয়াতে হেলাভরে
মিলিয়ে যাবে দিগন্তরে
সেই হাওয়াতেই ফিরে ফিরে
আসবে ভেসে।

কঠিন মাটি বানের জলে
যায় যে বয়ে,
শৈলপাষাণ যায় তো খয়ে।
কালের ঘায়ে সেই তো মরে
অটল বলের গর্বভরে
থাকতে যে চায় অচল হয়ে।
জানে যারা চলার ধারা
নিত্য থাকে নূতন তারা,
হারায় যারা রয়ে রয়ে।
ভালোবাসা, তোমারে তাই
মরণ দিয়ে বরিতে চাই,
চঞ্চলতার লীলা তোমার
রইব সয়ে।

বুয়েনোস এয়ারিস
১০ ডিসেম্বর, ১৯২৪

প্রবাহিনী

দুর্গম দূর শৈলশিরের
 স্তব্ধ তুষার নই তো আমি ;
আপনাহারা ঝরনা-ধারা
 ধূলির ধরায় যাই যে নামি।
সরোবরের গম্ভীরতায়
 ফেনিল নাচের মাতন ঢালি ;
অচল শিলার ভ্রূ-ভঙ্গিমায়
 বাজাই চপল করতালি।
মন্দ্র-স্বরের মন্ত্র শুনাই
 গভীর গুহার আঁধার তলে,
গহন বনের ভাঙাই ধেয়ান
 উচ্চহাসির কোলাহলে।
শুভ্র ফেনের কুন্দমালায়
 বিন্ধ্যগিরির বক্ষ সাজাই,
যোগীশ্বরের জটার মধ্যে
 তরঙ্গিণীর নূপুর বাজাই।
বৃদ্ধ বটের লুব্ধ শিকড়
 আমার বেণী ধরিতে চায় ;
সূর্যকিরণ শিশুর মতন
 অঙ্ক আমার ভরিতে চায়।
নাই কোনো মোর ভয়ভাবনা,
 নাই কোনো মোর অচল রীতি।
গতি আমার সকল দিকেই,
 শুভ আমার সকল তিথি।
বক্ষে আমার কালোর ধারা,
 আলোর ধারা আমার চোখে,
স্বর্গে আমার সুর চলে যায়,
 নৃত্য আমার মর্ত্যলোকে।

অশ্রুহাসির যুগল ধারা
ছোটে আমার ডাইনে বামে।
অচল গানের সাগরমাঝে
চপল গানের যাত্রা থামে।

বুয়েনোস এয়ারিস
১১ ডিসেম্বর, ১৯২৪

আকন্দ

সন্ধ্যা-আলোর সোনার খেয়া পাড়ি যখন দিল গগন-পারে
অকূল অন্ধকারে,
ঝমঝমিয়ে এল রাত্তি ভুবনডাঙার মাঠে
একলা আমি গোয়ালপাড়ার বাটে।
নতুন-কোঁটা গানের কুঁড়ি দেব বলে দিনুর হাতে আনি
মনে নিয়ে সুরের গুনগুনানি
চলেছিলেম, এমন সময় যেন সে কোন্ পরীর কণ্ঠখানি
বাতাসেতে বাজিয়ে দিল বিনা ভাষার বাণী,
বললে আমায় "দাঁড়াও ক্ষণেক তরে,
ওগো পথিক তোমার লাগি চেয়ে আছি যুগে যুগান্তরে।
আমায় নেবে চিনে
সেই সুলগন এল এতদিনে।
পথের ধারে দাঁড়িয়ে আমি, মনে গোপন আশা,
কবির ছন্দে বাঁধব আমার বাসা।"
দেখা হল, চেনা হল সাঁঝের আঁধারেতে,
বলে এলেম, "তোমার আসন কাব্যে দেব পেতে।"

সেই কথা আজ পড়ল মনে হঠাৎ হেথায় এসে
সাগরপারের দেশে,—
মন-কেমনের হাওয়ার পাকে অনেক স্মৃতি বেড়ায় মনে ঘুরে'
তারি মধ্যে বাজল করুণ সুরে—

"ভুলো না গো ভুলো না এই পথবাসিনীর কথা,
আজো আমি দাঁড়িয়ে আছি, বাসা আমার কোথা?"
শপথ আমার, তোমরা ব'লো তারে,
তার কথাটি দাঁড়িয়েছিল মনের পথের ধারে,—
ব'লো তারে চোখের দেখা ফুটেছে আজ গানে,—
লিখনখানি রাখিনু এইখানে।

আকন্দবল্লভ রবি

যেদিন প্রথম কবি-গান
বসন্তের জাগাল আহ্বান
ছন্দের উৎসবসভাতলে,
সেদিন মালতী যূথী জাতি
কৌতূহলে উঠেছিল মাতি
ছুটে এসেছিল দলে দলে।
আসিল মল্লিকা চম্পা কুরুবক কাঞ্চন করবী
সুরের বরণমাল্যে সবারে বরিয়া নিল কবি।
কী সংকোচে এলে না যে, সভার দুয়ার হল বন্ধ।
সব পিছে রহিলে আকন্দ।

মোরে তুমি লজ্জা কর নাই,
আমার সম্মান মানি তাই,
আমারে সহজে নিলে ডাকি।
আপনারে আপনি জানালে;
উপেক্ষার ছায়ার আড়ালে
পরিচয় রাখিলে না ঢাকি।
মনে পড়ে একদিন সন্ধ্যাবেলা চলেছিনু একা,
তুমি বুঝি ভেবেছিলে কী জানি না পাই পাছে দেখা,
অদৃশ্য লিখনখানি, তোমার করুণ ভীরু গন্ধ
বায়ুভরে পাঠালে আকন্দ।

হিয়া মোর উঠিল চমকি
পথমাঝে দাঁড়ানু থমকি,
তোমারে খুঁজিনু চারিধারে।
পল্লবের আবরণ টানি
আছিলে কাব্যের দুয়োরানী
পথপ্রান্তে গোপন আঁধারে।
সঙ্গী যারা ছিল ঘিরে তারা সবে নামগোত্রহীন,
কাড়িতে জানে না তারা পথিকের আঁখি উদাসীন
ভরিল আমার চিত্ত বিস্ময়ের গভীর আনন্দ,
চিনিলাম তোমারে আকন্দ।

দেখা হয় নাই তোমা সনে
প্রাসাদের কুসুমকাননে,
জনতার প্রগল্‌ভ আদরে।
নিদ্রাহীন প্রদীপ-আলোকে
পড় নি অশান্ত মোর চোখে
প্রমোদের মুখর বাসরে।
অবজ্ঞার নির্জনতা তোমারে দিয়েছে কাছে আনি,
সন্ধ্যার প্রথম তারা জানে তাহা, আর আমি জানি।
নিভৃতে লেগেছে প্রাণে তোমার নিঃশ্বাস মৃদু মন্দ,
নম্রহাসি উদাসী আকন্দ।

আকাশের একবিন্দু নীলে
তোমার পরান ডুবাইলে,
শিখে নিলে আনন্দের ভাষা।
বক্ষে তব শুভ্র রেখা এঁকে
আপন স্বাক্ষর গেছে রেখে
রবির সুদূর ভালোবাসা।

দেবতার প্রিয় তুমি, গুপ্ত রাখ গৌরব তোমার,
শান্ত তুমি, তৃপ্ত তুমি, অনাদরে তোমার বিহার।
জেনেছি তোমারে, তাই জানাতে রচিনু এই ছন্দ,
মৌমাছির বন্ধু হে আকন্দ।

চাপাড মালাল
১৬ ডিসেম্বর, ১৯২৪

কঙ্কাল

পশুর কঙ্কাল ওই মাঠের পথের একপাশে
পড়ে আছে ঘাসে,
যে-ঘাস একদা তারে দিয়েছিল বল,
দিয়েছিল বিশ্রাম কোমল।

পড়ে আছে পাণ্ডু অস্থিরাশি,
কালের নীরস অট্টহাসি।
সে যেন রে মরণের অঙ্গুলিনির্দেশ,
ইঙ্গিতে কহিছে মোরে, একদা পশুর যেথা শেষ,
সেথায় তোমারো অন্ত, ভেদ নাহি লেশ।
তোমারো প্রাণের সুরা ফুরাইলে পরে
ভাঙা পাত্র পড়ে রবে অমনি ধুলায় অনাদরে।

আমি বলিলাম, মৃত্যু, করি না বিশ্বাস
তব শূন্যতার উপহাস।
মোর নহে শুধুমাত্র প্রাণ
সর্ব বিত্ত রিক্ত করি যার হয় যাত্রা অবসান;
যাহা ফুরাইলে দিন
শূন্য অস্থি দিয়ে শোধে আহারনিদ্রার শেষ ঋণ।

ভেবেছি জেনেছি যাহা, বলেছি, শুনেছি যাহা কানে,
সহসা গেয়েছি যাহা গানে
ধরে নি তা মরণের বেড়া-ঘেরা প্রাণে ;
যা পেয়েছি, যা করেছি দান
মর্ত্যে তার কোথা পরিমাণ ?

আমার মনের নৃত্য, কতবার জীবন-মৃত্যুরে
লঙ্ঘিয়া চলিয়া গেছে চিরসুন্দরের সুরপুরে।
চিরকাল তরে সে কি থেমে যাবে শেষে
কঙ্কালের সীমানায় এসে ?
যে আমার সত্য পরিচয়
মাংসে তার পরিমাপ নয় ;
পদাঘাতে জীর্ণ তারে নাহি করে দণ্ডপলগুলি,
সর্বস্বান্ত নাহি করে পথপ্রান্তে ধূলি।

আমি যে রূপের পদ্মে করেছি অরূপ-মধু পান,
দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান,
অনন্ত মৌনের বাণী শুনেছি অন্তরে,
দেখেছি জ্যোতির পথ শূন্যময় আঁধার প্রান্তরে
নহি আমি বিধির বৃহৎ পরিহাস,
অসীম ঐশ্বর্য দিয়ে রচিত মহৎ সর্বনাশ।

চাপাড মালাল
১৭ ডিসেম্বর, ১৯২৪

চিঠি

শ্রীমান দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কল্যাণীয়েষু,

দূর প্রবাসে সন্ধ্যাবেলায় বাসায় ফিরে এনু,
হঠাৎ যেন বাজল কোথায় ফুলের বুকের বেণু।
আতি-পাতি খুঁজে শেষে বুঝি ব্যাপারখানা,
বাগানে সেই জুঁই ফুটেছে চিরদিনের জানা।
গন্ধটি তার পুরোপুরি বাংলাদেশের বাণী,
একটুও তো দেয় না আভাস এই দেশী ইস্পানি
প্রকাশে তার থাক্ না যতই সাদা মুখের চঙ।
কোমলতায় লুকিয়ে রাখে শ্যামল বুকের রঙ।
হেথায় মুখর ফুলের হাটে আছে কি তার দাম?
চারু কণ্ঠে ঠাঁই নাহি তার, ধুলায় পরিণাম।

মূখী বলে,"আতিথ্য নও, একটুখানি বসো।"
আমি বলি চমকে উঠে, আরে রসো, রসো;
জিতবে গন্ধ হারবে কি গান? নৈব কদাচিৎ।
তাড়াতাড়ি গান রচিলাম; জানিনে কার জিৎ।
তিনটে সাগর পাড়ি দিয়ে একদা এই গান,
অবশেষে বোলপুরে সে হবে বিদ্যমান।
এই বিরহীর কথা স্মরি গেয়ো সেদিন, দিনু,
জুঁইবাগানের আরেক দিনের গান যা রচেছিনু।
ঘরের খবর পাই নে কিছুই, গুজোব শুনি নাকি
কুলিশপাণি পুলিস সেথায় লাগায় হাঁকাহাঁকি।
শুনছি নাকি বাংলাদেশের গান হাসি সব ঠেলে
কুলুপ দিয়ে করছে আটক আলিপুরের জেলে।
হিমালয়ে যোগীশ্বরের রোষের কথা জানি,
অনঙ্গেরে জ্বালিয়েছিলেন চোখের আগুন হানি।
এবার নাকি সেই ভূধরে কলির ভূদেব যারা
বাংলাদেশের যৌবনেরে জ্বালিয়ে করবে সারা।
সিমলে নাকি দারুণ গরম, শুনছি দার্জিলিঙে
নকল শিবের তাণ্ডবে আজ পুলিস বাজায় শিঙে।

জানি তুমি বলবে আমায়, থামো একটুখানি,
বেণুবীণার লয় এ নয়, শিকল ঝমঝমানি।
শুনে আমি রাগব মনে, ক'রো না সেই ভয়,
সময় আমার আছে বলেই এখন সময় নয়।
যাদের নিয়ে কাণ্ড আমার তারা তো নয় ফাঁকি,
গিলটি-করা তকমা ঝোলা নয় তাহাদের খাকি।
কপাল জুড়ে নেই তো তাদের পালোয়ানের টিকা,
তাদের তিলক নিত্যকালের সোনার রঙে লিখা।
যেদিন তবে সাঙ্গ হবে পালোয়ানির পালা,
সেদিনো তো সাজাবে জুঁই দেবার্চনার থালা।
সেই থালাতে আপন ভাইয়ের রক্ত ছিটোয় যারা,
লড়বে তারাই চিরটা কাল? গড়বে পাষাণ-কারা?
রাজপ্রতাপের দম্ভ সে তো এক দমকের বায়ু,
সবুর করতে পারে এমন নাই তো তাহার আয়ু।
ধৈর্য বীর্য ক্ষমা দয়া ন্যায়ের বেড়া টুটে
লোভের ক্ষোভের ক্রোধের তাড়ায় বেড়ায় ছুটে ছুটে।
আজ আছে কাল নাই বলে তাই তাড়াতাড়ির তালে
কড়া মেজাজ দাপিয়ে বেড়ায় বাড়াবাড়ির চালে।
পাকা রাস্তা বানিয়ে বসে দুঃখীর বুক জুড়ি
ভগবানের ব্যথার 'পরে হাঁকায় সে চার-ঘুড়ি।
তাই তো প্রেমের মাল্য গাঁথার নাইকো অবকাশ,
হাতকড়ারই কড়াকড়ি, দড়াদড়ির ফাঁস।
শান্ত হবার সাধনা কই, চলে কলের রথে,
সংক্ষেপে তাই শান্তি খোঁজে উলটো-দিকের পথে।
জানে সেথায় বিধির নিষেধ, তর সহে না তবু,
ধমে রে যায় ঠেলা মেরে গায়ের-জোরের প্রভু।
রক্ত-রঙের ফসল ফলে তাড়াতাড়ির বীজে,
বিনাশ তারে আপন গোলায় বোঝাই করে নিজে।
রাহুর দন্ত, রাহুর মতো, একটু সময় পেলে
নিত্যকালের সূর্যকে সে এক-গরাসে গেলে।
নিমেষ পরেই উগরে দিয়ে মেলায় ছায়ার মতো,
সূর্যদেবের গায়ে কোথাও রয় না কোনো ক্ষত।
বারে বারে সহস্রবার হয়েছে এই খেলা,
নতুন রাহু ভাবে তবু হবে না মোর বেলা।

কাণ্ড দেখে পশুপক্ষী ফুকরে ওঠে ভয়ে,
অনন্ত দেব শান্ত থাকেন ক্ষণিক অপচয়ে।

টুটল কত বিজয় তোরণ, লুটল প্রাসাদ চুড়ো,
কত রাজার কত গারদ ধুলোয় হ'লো গুঁড়ো।
আলিপুরের জেলখানাও মিলিয়ে যাবে যবে
তখনো এই বিশ্ব দুলাল ফুলের সবুর সবে।
রঙিন কুর্তি, সঙিন মূর্তি রইবে না কিছুই,
তখনো এই বনের কোণে ফুটবে লাজুক জুঁই।
ভাঙবে শিকল টুকরো হয়ে ছিঁড়বে রাঙা পাগ,
চূর্ণ করা দর্পে মরণ খেলবে হোলির ফাগ।
পাগলা আইন লোক হাসাবে কালের প্রহসনে,
মধুর আমার বঁধু রবেন কাব্য-সিংহাসনে।
সময়েরে ছিনিয়ে নিলেই হয় সে অসময়,
ক্রুদ্ধ প্রভুর সয় না সবুর, প্রেমের সবুর সয়।
প্রতাপ যখন চেঁচিয়ে করে দুঃখ দেবার বড়াই,
জেনো মনে, তখন তাহার বিধির সঙ্গে লড়াই।
দুঃখ সহার তপস্যাতেই হ'ক বাঙালির জয়,
ভয়কে যারা মানে তারাই জাগিয়ে রাখে ভয়।
মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তারেই টানে,
মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় বাঁচতে তারাই জানে।
পালোয়ানের চেলারা সব ওঠে যেদিন খেপে,
ফোঁসে সর্প হিংসা-দর্প সকল পৃথ্বী ব্যেপে,
বীভৎস তার ক্ষুধার জ্বালায় জাগে দানব ভায়া,
গর্জি বলে আমিই সত্য; দেবতা মিথ্যা মায়া;
সেদিন যেন কৃপা আমায় করেন ভগবান,
মেশীন-গান-এর সম্মুখে গাই জুঁই ফুলের এই গান;

স্বপ্নসম পরবাসে এলি পাশে কোথা হতে তুই,
ও আমার জুঁই।
অজানা ভাষার দেশে
সহসা বলিলি এসে,
"আমারে চেন কি?"

তোর পানে চেয়ে চেয়ে
হৃদয় উঠিল গেয়ে,
চিনি, চিনি, সখী।
কত প্রাতে জানায়েছে চিরপরিচিত তোর হাসি,
"আমি ভালোবাসি।"

বিরহব্যথার মতো এলি প্রাণে কোথা হতে তুই,
ও আমার জুঁই।
আজ তাই পড়ে মনে
বাদল-সাঁঝের বনে
ঝর ঝর ধারা,
মাঠে মাঠে ভিজে হাওয়া
যেন কী স্বপনে-পাওয়া,
ঘুরে ঘুরে সারা।
সজল তিমির-তলে তোর গন্ধ বলেছে নিঃশ্বাসি',
"আমি ভালোবাসি।"

মিলন-সুখের মতো কোথা হতে এসেছিস তুই,
ও আমার জুঁই।
মনে পড়ে কত রাতে
দীপ জ্বলে জানালাতে
বাতাসে চঞ্চল।
মাধুরী ধরে না প্রাণে,
কী বেদনা বক্ষে আনে,
চক্ষে আনে জল।
সে-রাতে তোমার মালা বলেছে মর্মের কাছে আসি',
"আমি ভালোবাসি।"

অসীম কালের যেন দীর্ঘশ্বাস বহেছিস তুই,
ও আমার জুঁই।

বক্ষে এনেছিস কার
যুগযুগান্তের ভার,
ব্যর্থ পথ-চাওয়া ;
বারে বারে দ্বারে এসে
কোন্‌ নীরবের দেশে
ফিরে ফিরে যাওয়া ?
তোর মাঝে কেঁদে বাজে চিরপ্রত্যাশার কোন্‌ বাঁশি
"আমি ভালোবাসি।"

বুয়েনোস এয়ারিস
২০ ডিসেম্বর, ১৯২৪

বিরহিণী

তিন বছরের বিরহিণী জানলাখানি ধরে
কোন্‌ অলক্ষ্য তারার পানে তাকাও অমন করে ?
অতীত কালের বোঝার তলায় আমরা চাপা থাকি,
ভাবী কালের প্রদোষ-আলোয় মগ্ন তোমার আঁখি।
তাই তোমার ঐ কাঁদন-হাসির সবটা বুঝি না যে,
স্বপন দেখে অনাগত তোমার প্রাণের মাঝে।
কোন্‌ সাগরের তীর দেখেছ জানে না তো কেউ,
হাসির আভায় নাচে সে কোন্‌ সুদূর অশ্রু-ঢেউ।
সেখানে কোন্‌ রাজপুত্তুর চিরদিনের দেশে
তোমার লাগি সাজতে গেছে প্রতিদিনের বেশে।
সেখানে সে বাজায় বাঁশি রূপকথারি ছায়ে,
সেই রাগিণীর তালে তোমার নাচন লাগে গায়ে।
আপনি তুমি জান না তো আছ কাহার আশায়,
অনামারে ডাক দিয়েছ চোখের নীরব ভাষায়।

হয়তো সে কোন্ সকালবেলা শিশির-ঝরা পথে
জাগরণের কেতন তুলে আসবে সোনার রথে,
কিম্বা পূর্ণ চাঁদের লগ্নে, বৃহস্পতির দশায় ;—
দুঃখ আমার, আর সে যে হ'ক, নয় সে দাদামশায়।

বুয়েনোস এয়ারিস
২০ ডিসেম্বর, ১৯২৪

না-পাওয়া

ওগো মোর না-পাওয়া গো, ভোরের অরুণ-আভাসনে
ঘুমে ছুঁয়ে যাও মোর পাওয়ার পাখিরে ক্ষণে ক্ষণে।
সহসা স্বপন টুটে'
তাই সে যে গেয়ে উঠে,
কিছু তার বুঝি নাহি বুঝি।
তাই সে যে পাখা মেলে
উড়ে যায় ঘর ফেলে,
ফিরে আসে কারে খুঁজি খুঁজি।

ওগো মোর না-পাওয়া গো, সায়াহ্নের করুণ কিরণে
পূরবীতে ডাক দাও আমার পাওয়ারে ক্ষণে ক্ষণে।
হিয়া তাই ওঠে কেঁদে,
রাখিতে পারি না বেঁধে,
অকারণে দূরে থাকে চেয়ে,—
মলিন আকাশতলে
যেন কোন্ খেয়া চলে,
কে যে যায় সারি গান গেয়ে।

ওগো মোর না-পাওয়া গো, বসন্তনিশীথ-সমীরণে
অভিসারে আসিতেছ আমার পাওয়ার কুঞ্জবনে।
কে জানাল সে-কথা যে
গোপন হৃদয়মাঝে
আজো তাহা বুঝিতে পারি নি
মনে হয় পলে পলে
দূর পথে বেজে চলে
ঝিল্লি-রবে তাহার কিঙ্কিণী ॥

ওগো মোর না-পাওয়া গো, কখন আসিয়া সংগোপনে
আমার পাওয়ার বীণা কাঁপাও অঙ্গুলিপরশনে।
কার গানে কার সুর
মিলে গেছে সুমধুর
ভাগ করে কে লইবে চিনে।
ওরা এসে বলে, এ কী,
বুঝাইয়া বলো দেখি।
আমি বলি, বুঝাতে পারি নে।

ওগো মোর না-পাওয়া গো, শ্রাবণের অশান্ত পবনে
কদম্ববনের গন্ধে জড়িত বৃষ্টির বরিষণে
আমার পাওয়ার কানে
জানি নে তো মোর গানে
কার কথা বলি আমি কারে।
"কী কহ," সে যবে পুছে
তখন সন্দেহ ঘুচে,
আমার বন্দনা না-পাওয়ারে।

বুয়েনোস এয়ারিস
২৪ ডিসেম্বর, ১৯২৪

সৃষ্টিকর্তা

জানি আমি মোর কাব্য ভালোবেসেছেন মোর বিধি,
ফিরে যে পেলেন তিনি দ্বিগুণ আপন-দেওয়া নিধি।
তাঁর বসন্তের ফুল বাতাসে কেমন বলে বাণী
সে যে তিনি মোর গানে বারম্বার নিয়েছেন জানি।
আমি শুনায়েছি তাঁরে, শ্রাবণরাত্রির বৃষ্টিধারা
কী অনাদি বিচ্ছেদের জাগায় বেদন সঙ্গীহারা।
যেদিন পূর্ণিমা রাতে পুষ্পিত শালের বনে বনে
শরীরী ছায়ার মতো একা ফিরি আপনার মনে
গুঞ্জরিয়া অসমাপ্ত সুর, শালের মঞ্জরী যত
কী যেন শুনিতে চাহে ব্যগ্রতায় করি' শির নত,
ছায়াতে তিনিও সাথে ফেরেন নিঃশব্দ পদচারে,
বাঁশির উত্তর তাঁর আমার বাঁশিতে শুনিবারে।
যেদিন প্রিয়ার কালো চক্ষুর সজল করুণায়
রাত্রির প্রহরমাঝে অন্ধকারে নিবিড় ঘনায়
নিঃশব্দ বেদনা, তার দুটি হাতে মোর হাত রাখি'
স্তিমিত প্রদীপালোকে মুখে তার স্তব্ধ চেয়ে থাকি,
তখন আঁধারে বসি' আকাশের তারকার মাঝে
অপেক্ষা করেন তিনি, শুনিতে কখন বীণা বাজে
যে-সুরে আপনি তিনি উন্মাদিনী অভিসারিণীরে
ডাকিছেন সর্বহারা মিলনের প্রলয়তিমিরে।

বুয়েনোস এয়ারিস
২৫ ডিসেম্বর, ১৯২৪

বীণা-হারা

যবে এসে নাড়া দিলে দ্বার
চমকি উঠিনু লাজে,
খুঁজে দেখি গৃহমাঝে
বীণা ফেলে এসেছি আমার,
ওগো বীনকার।
সেদিন মেঘের ভারে
নদীর পশ্চিম পারে
ঘন হল দিগন্তের ভুরু,
বৃষ্টির নাচনে মাতা,
বনে মর্মরিল পাতা,
দেয়া গরজিল গুরু গুরু।
ভরা হল আয়োজন,
ভাবিনু ভরিবে মন
বক্ষে জেগে উঠিবে মল্লার,
হায়, লাগিল না সুর
কোথায় সে বহুদূর
বীণা ফেলে এসেছি আমার।

কণ্ঠে নিয়ে এলে পুষ্পহার।
পুরস্কার পাব আশে
খুঁজে দেখি চারিপাশে
বীণা ফেলে এসেছি আমার,
ওগো বীনকার।
প্রবাসে বনের ছায়ে
সহসা আমার গায়ে
ফাল্গুনের ছোঁয়া লাগে একী?

এপারের যত পাখি
সবাই কহিল ডাকি'
ওপারের গান গাও দেখি।
ভাবিলাম মোর ছন্দে
মিলাব ফুলের গন্ধে
আনন্দের বসন্তবাহার।
খুঁজিয়া দেখিনু বুকে,
কহিলাম নতমুখে,
"বীণা ফেলে এসেছি আমার।"

এল বুঝি মিলনের বার
আকাশ ভরিল ওই;
শুধাইলে, "সুর কই?"
বীণা ফেলে এসেছি আমার
ওগো বীনকার।
অস্তরবি গোধূলিতে
বলে গেল পূরবীতে
আর তো অধিক নাই দেরি।
রাঙা আলোকের জবা
সাজিয়ে তুলেছে সভা,
সিংহদ্বারে বাজিয়াছে ভেরি।
সুদূর আকাশতলে
ধ্রুবতারা ডেকে বলে,
"তারে তারে জাগাও ঝংকার।"
কানাড়াতে সাহানাতে
জাগিতে হবে যে রাতে,—
বীণা ফেলে এসেছি আমার।

এলে নিয়ে শিখা বেদনার।
গানে যে বরিব তা'রে,—
চাহিলাম চারিধারে,—
বীণা ফেলে এসেছি আমার,
ওগো বীনকার।

কাজ হয়ে গেছে সারা,
নিশীথে উঠেছে তারা,
মিলে গেছে বাটে আর মাঠে।
দীপহীন বাঁধা তরী
সারা দীর্ঘ রাত ধরি'
ঢুলিয়া ঢুলিয়া ওঠে ঘাটে।
যে-শিখা গিয়েছে নিবে
অগ্নি দিয়ে জ্বেলে দিবে
সে-আলোতে হতে হবে পার।
শুনেছি গানের তালে
সুবাতাস লাগে পালে;
বীণা ফেলে এসেছি আমার।

সান ইসিড্রো
২৭ ডিসেম্বর, ১৯২৪

বনস্পতি

পূর্ণতার সাধনায় বনস্পতি চাহে উর্ধ্বপানে;
পুঞ্জ পুঞ্জ পল্লবে পল্লবে
নিত্য তার সাড়া জাগে বিরাটের নিঃশব্দ আহ্বানে,
মন্ত্র জপে মর্মরিত রবে।
ধ্রুবত্বের মূর্তি সে যে, দৃঢ়তা শাখায় প্রশাখায়
বিপুল প্রাণের বহে ভার।
তবু তার শ্যামলতা কম্পমান ভীরু বেদনায়
আন্দোলিয়া উঠে বারম্বার।

দয়া ক'রো, দয়া ক'রো, আরণ্যক এই তপস্বীরে,
ধৈর্য ধরো, ওগো দিগঙ্গনা,
ব্যর্থ করিবারে তায় অশান্ত আবেগে ফিরে ফিরে
বনের অঙ্গনে মাতিয়ো না।
এ কী তীব্র প্রেম, এ যে শিলাবৃষ্টি নির্মম দুঃসহ,—
দুরন্ত চুম্বন-বেগে তব
ছিঁড়িতে ঝরাতে চাও অন্ধ সুখে, কহ মোরে কহ,
কিশোর কোরক নব নব॥

অকস্মাৎ দস্যুতায় তারে রিক্ত করি নিতে চাও
সর্বস্ব তাহার তব সাথে?
ছিন্ন করি লবে যাহা চিহ্ন তার রবে না কোথাও,
হবে তারে মুহূর্তে হারাতে।
যে লুব্ধ ধূলির তলে লুকাতে চাহিবে তব লাভ
সে তোমারে ফাঁকি দেবে শেষে।
লুণ্ঠনের ধন লুঠি সর্বগ্রাসী দারুণ অভাব
উঠিবে কঠিন হাসি হেসে॥

আসুক তোমার প্রেম দীপ্তিরূপে নীলাম্বরতলে,
শান্তিরূপে এস দিগঙ্গনা।
উঠুক স্পন্দিত হয়ে শাখে শাখে পল্লবে বল্কলে
সুগম্ভীর তোমার বন্দনা।
দাও তারে সেই তেজ মহত্ত্বে যাহার সমাধান,
সার্থক হ'ক সে বনস্পতি।
বিশ্বের অঞ্জলি যেন ভরিয়া করিতে পারে দান
তপস্যার পূর্ণ পরিণতি।

উঠুক তোমার প্রেম রূপ ধরি তার সর্বমাঝে
নিত্য নব পত্রে ফলে ফুলে।
গোপনে আঁধারে তার যে অনন্ত নিয়ত বিরাজে
আবরণ দাও তার খুলে।

তাহার গৌরবে নহ তোমারি স্পর্শের পরিচয়,
আপনার চরম বারতা।
তারি লাভে লাভ করো বিনা লোভে সম্পদ অক্ষয়,
তারি ফলে তব সফলতা।

সান ইসিড্রো
২৮ ডিসেম্বর, ১৯২৪

পথ

আমি পথ, দূরে দূরে দেশে দেশে ফিরে ফিরে শেষে
দুয়ার-বাহিরে থামি এসে
ভিতরেতে গাঁথা চলে নানা সূত্রে রচনার ধারা,
আমি পাই ক্ষণে ক্ষণে তারি ছিন্ন অংশ অর্থহারা,
সেথা হতে লেখে মোর ধূলিপটে দীপরশ্মিরেখা
অসম্পূর্ণ লেখা।

জীবনের সৌধমাঝে কত কক্ষ কত না মহলা,
তলার উপরে কত তলা।
আজন্মবিধবা তারি এক প্রান্তে রয়েছি একাকী,
সবার নিকটে থেকে তবুও অসীম-দূরে থাকি,
লক্ষ্য নহি, উপলক্ষ্য, দেশ নহি আমি যে উদ্দেশ,
মোর নাহি শেষ।

উৎসবসভায় যেতে যে পায় আহ্বান-পত্রখানি
তাহারে বহন করে আনি।
সে-লিপির খণ্ডগুলি মোর বক্ষে উড়ে এসে পড়ে,
ধুলায় করিয়া লুপ্ত তাদের উড়ায়ে দিই ঝড়ে,
আমি মালা গেঁথে চলি শত শত জীর্ণ শতাব্দীর
বহু বিস্মৃতির।

কেহ যারে নাহি শোনে, সবাই যাহারে বলে, "জানি",
আমি সেই পুরাতন বাণী।
বণিকের পণ্যযান, হে তুমি রাজার জয়রথ,
আমি চলিবার পথ, সেই আমি ভুলিবার পথ,
তীব্র-দুঃখ মহা-দম্ভ, চিহ্ন মুছে গিয়েছে সবাই
কিছু নাই, নাই।

কভু সুখে, কভু দুঃখে নিয়ে চলি ; সুদিন দুর্দিন
নাহি বুঝি আমি উদাসীন।
বারবার কচি ঘাস কোথা হতে আসে মোর কোলে,
চলে যায়,—সে-ও যায় যে যায় তাহারে দ'লে দ'লে,
বিচিত্রের প্রয়োজনে অবিচিত্র আমি শূন্যময়,
কিছু নাহি রয়।

বসিতে না চাহে কেহ, কাহারো কিছু না সহে দেরি,
কারো নই, তাই সকলেরি।
বামে মোর শস্যক্ষেত্র দক্ষিণে আমার লোকালয়,
প্রাণ সেথা দুই হস্তে বর্তমান আঁকড়িয়া রয়।
আমি সর্ববন্ধহীন নিত্য চলি তারি মধ্যখানে,
ভবিষ্যের পানে।

তাই আমি চির-রিক্ত কিছু নাহি থাকে মোর পুঁজি,
কিছু নাহি পাই, নাহি খুঁজি।
আমারে ভুলিবে ব'লে যাত্রীদল গান গাহে সুরে,
পারি নে রাখিতে তাহা, সে-গান চলিয়া যায় দূরে।
বসন্ত আমার বুকে আসে যবে ধুলায় আকুল,
নাহি দেয় ফুল।

পৌঁছিয়া ক্ষতির প্রান্তে বিত্তহীন একদিন শেষে
শয্যা পাতে মোর পাশে এসে।

পান্থের পাথেয় হতে খসে পড়ে যাহা ভাঙাচোরা,
ধূলিরে বঞ্চনা করি কাড়িয়া তুলিয়া লয় ওরা ;
আমি রিক্ত, ওরা রিক্ত, মোর 'পরে নাই প্রীতিলেশ,
মোরে করে দ্বেষ।

শুধু শিশু বোঝে মোরে, আমারে সে জানে ছুটি ব'লে,
ঘর ছেড়ে আসে তাই চলে।
নিষেধ বা অনুমতি মোর মাঝে না দেয় পাহারা,
আবশ্যকে নাহি রচে বিবিধের বস্তুময় কারা,
বিধাতার মতো শিশু লীলা দিয়ে শূন্য দেয় ভরে
শিশু বোঝে মোরে।

বিলুপ্তির ধূলি দিয়ে যাহা খুশি সৃষ্টি করে তাই,
এই আছে এই তারা নাই।
ভিত্তিহীন ঘর বেঁধে আনন্দে কাটায়ে দেয় বেলা
মূল্য যার কিছু নাই তাই দিয়ে মূল্যহীন খেলা,
ভাঙাগড়া দুই নিয়ে নৃত্য তার অখণ্ড উল্লাসে,
মোরে ভালোবাসে।

সান ইসিড্রো
২৯ ডিসেম্বর, ১৯২৪

মিলন

জীবন-মরণের স্রোতের ধারা
যেখানে এসে গেছে থামি
সেখানে মিলেছিনু সময়হারা
একদা তুমি আর আমি।
চলেছি আজ একা ভেসে
কোথা যে কত দূর দেশে,

তরণী দুলিতেছে ঝড়ে ;—
এখন কেন মনে পড়ে
যেখানে ধরণীর সীমার শেষে
স্বর্গ আসিয়াছে নামি
সেখানে একদিন মিলেছি এসে
কেবল তুমি আর আমি।

সেখানে বসেছিনু আপন-ভোলা
আমরা দোঁহে পাশে পাশে।
সেদিন বুঝেছিনু কিসের দোলা
দুলিয়া উঠে ঘাসে ঘাসে।
কিসের খুশি উঠে কেঁপে
নিখিল চরাচর ব্যেপে,
কেমনে আলোকের জয়
আঁধারে হল তারাময় ;
প্রাণের নিশ্বাস কী মহাবেগে
ছুটেছে দশদিক্‌গামী,
সেদিন বুঝেছিনু যেদিন জেগে
চাহিনু তুমি আর আমি।

বিজনে বসেছিনু আকাশ চাহি
তোমার হাত নিয়ে হাতে
দোঁহার কারো মুখে কথাটি নাহি,
নিমেষ নাহি আঁখিপাতে।
সেদিন বুঝেছিনু প্রাণে
ভাষার সীমা কোন্‌খানে,
বিশ্ব-হৃদয়ের মাঝে
বাণীর বীণা কোথা বাজে,

কিসের বেদনা সে বনের বুকে
কুসুমে ফোটে দিনযামী,
বুঝিনু, যবে দোঁহে ব্যাকুল সুখে
কাঁদিনু তুমি আর আমি।

বুঝিনু কী আগুনে ফাগুন হাওয়া
গোপনে আপনারে দাহে ;—
কেন-যে অরুণের করুণ চাওয়া
নিজেরে মিলাইতে চাহে ;
অকূলে হারাইতে নদী
কেন যে ধায় নিরবধি ;
বিজুলি আপনার বাণে
কেন যে আপনারে হানে ;
রজনী কী খেলা যে প্রভাত সনে
খেলিছে পরাজয়কামী,
বুঝিনু যবে দোঁহে পরান-পণে
খেলিনু তুমি আর আমি।

জুলিয়ো চেজারে জাহাজ
৯ জানুয়ারি, ১৯২৫

অন্ধকার

উদয়াস্ত দুই তটে অবিচ্ছিন্ন আসন তোমার,
নিগূঢ় সুন্দর অন্ধকার।
প্রভাত-আলোকচ্ছটা শুভ্র তব আদি শঙ্খধ্বনি
চিত্তের কন্দরে মোর বেজেছিল, একদা যেমনি
নূতন চেয়েছি আঁখি তুলি ;
সে তব সংকেত-মন্ত্র ধ্বনিয়াছে, হে মৌনী মহান,
কর্মের তরঙ্গে মোর ; স্বপ্ন-উৎস হতে মোর গান
উঠেছে ব্যাকুলি।

নিস্তব্ধের সে আহ্বানে, বাহিয়া জীবনযাত্রা মম,
—সিন্ধুগামী তরঙ্গিণীসম—
এতকাল চলেছিনু তোমারি সুদূর অভিসারে
বঙ্কিম জটিল পথে সুখে দুঃখে বন্ধুর সংসারে
অনির্দেশ অলক্ষ্যের পানে।
কভু পথতরুচ্ছায়ে খেলাঘর করেছি রচনা,
শেষ না হইতে খেলা চলিয়া এসেছি অন্যমনা
অশেষের টানে।

আজি মোর ক্লান্তি ঘেরি দিবসের অন্তিম প্রহর
গোধূলির ছায়ায় ধূসর।
হে গম্ভীর, আসিয়াছি তোমার সোনার সিংহদ্বারে
যেখানে দিনান্তরবি আপন চরম নমস্কারে
তোমার চরণে নত হল।
যেথা রিক্ত নিঃস্ব দিবা প্রাচীন ভিক্ষুর জীর্ণবেশে
নূতন প্রাণের লাগি তোমার প্রাঙ্গণতলে এসে
বলে "দ্বার খোলো"।

দিনের আড়ালে থেকে কী চেয়েছি পাই নি উদ্দেশ,
আজ সে-সন্ধান হ'ক শেষ।
হে চিরনির্মল, তব শান্তি দিয়ে স্পর্শ করো চোখ,
দৃষ্টির সম্মুখে মম এইবার নির্বারিত হ'ক
আঁধারের আলোকভাণ্ডার।
নিয়ে যাও সেইখানে নিঃশব্দের গূঢ় গুহা হতে
যেখানে বিশ্বের কণ্ঠে নিঃসরিছে চিরন্তন স্রোতে
সংগীত তোমার।

দিনের সংগ্রহ হতে আজি কোন্ অর্ঘ্য নিয়ে যাই
তোমার মন্দিরে ভাবি তাই।
কত না শ্রেষ্ঠীর হাতে পেয়েছি কীর্তির পুরস্কার,
সযত্নে এসেছি বহে সেই সব রত্ন-অলংকার,

ফিরিয়াছি দেশ হতে দেশে।
শেষে আজ চেয়ে দেখি, যবে মোর যাত্রা হল সারা,
দিনের আলোর সাথে ম্লান হয়ে এসেছে তাহারা
তব দ্বারে এসে।

রাত্রির নিকষে হায় কত সোনা হয়ে যায় মিছে,
সে-বোঝা ফেলিয়া যাব পিছে।
কিছু বাকি আছে তবু, প্রাতে মোর যাত্রাসহচরী
অকারণে দিয়েছিল মোর হাতে মাধবীমঞ্জরী,
আজো তাহা অম্লান বিরাজে।
শিশিরের ছোঁয়া যেন এখনো রয়েছে তার গায়,
এ জন্মের সেই দান রেখে দেব তোমার থালায়
নক্ষত্রের মাঝে।

হে নিত্য নবীন, কবে তোমারি গোপন কক্ষ হতে
পাড়ি দিল এ ফুল আলোতে।
সুপ্তি হতে জেগে দেখি, বসন্তে একদা রাত্রিশেষে
অরুণকিরণ সাথে এ মাধুরী আসিয়াছে ভেসে
হৃদয়ের বিজন পুলিনে।
দিবসের ধুলা এরে কিছুতে পারে নি কাড়িবারে,
সেই তব নিজ দান বহিয়া আনিনু তব দ্বারে,
তুমি লও চিনে।

হে চরম, এরি গন্ধে তোমারি আনন্দ এল মিশে,
বুঝেও তখন বুঝি নি সে।
তব লিপি বর্ণে বর্ণে লেখা ছিল এরি পাতে পাতে,
তাই নিয়ে গোপনে সে এসেছিল তোমারে চিনাতে,
কিছু যেন জেনেছি আভাসে।
আজিকে সন্ধ্যায় যবে সব শব্দ হল অবসান
আমার ধেয়ান হতে জাগিয়া উঠিছে এরি গান
তোমার আকাশে।

জুলিয়ো চেজারে জাহাজ
১০ জানুয়ারি, ১৯২৫

প্রাণগঙ্গা

প্রতিদিন নদীস্রোতে পুষ্পপত্র করি অর্ঘ্য দান
পূজারির পূজা অবসান।
আমিও তেমনি যত্নে মোর ডালি ভরি
গানের অঞ্জলি দান করি
প্রাণের জাহ্নবী-জলধারে,
পূজি আমি তারে।

বিগলিত প্রেমের আনন্দবারি সে যে,
এসেছে বৈকুণ্ঠধাম ত্যেজে।
মৃত্যুঞ্জয় শিবের অসীম জটাজালে
ঘুরে ঘুরে কালে কালে
তপস্যার তাপ লেগে প্রবাহ পবিত্র হল তার।
কত না যুগের পাপভার
নিঃশেষে ভাসায়ে দিল অতলের মাঝে।
তরঙ্গে তরঙ্গে তার বাজে
ভবিষ্যের মঙ্গলসংগীত।
তটে তটে বাঁকে বাঁকে অনন্তের চলেছে ইঙ্গিত।

দৈবস্পর্শে তার
আমারে সে ধূলি হতে করিল উদ্ধার;
অঙ্গে অঙ্গে দিল তার তরঙ্গের দোল;
কণ্ঠে দিল আপন কল্লোল।
আলোকের নৃত্যে মোর চক্ষু দিল ভরি
বর্ণের লহরী।
খুলে গেল অনন্তের কালো উত্তরীয়,
কত রূপে দেখা দিল প্রিয়,
অনির্বচনীয়।

তাই মোর গান
কুসুম-অঞ্জলি-অর্ঘ্যদান
প্রাণজাহ্নবীরে।
তাহারি আবর্তে ফিরে ফিরে
এ পূজার কোনো ফুল মাও যদি ভাসে চিরদিন,
বিস্মৃতির তলে হয় লীন,
তবে তার লাগি, কহ,
কার সাথে আমার কলহ?
এই নীলাম্বরতলে তৃণরোমাঞ্চিত ধরণীতে,
বসন্তে বর্ষায় গ্রীষ্মে শীতে
প্রতিদিবসের পূজা প্রতিদিন করি' অবসান
ধন্য হয়ে ভেসে যাক গান।

জুলিয়ো চেজারে জাহাজ
১৬ জানুয়ারি, ১৯২৫

বদল

হাসির কুসুম আনিল সে, ডালি ভরি
আমি আনিলাম দুখ-বাদলের ফল।
শুধালেম তারে "যদি এ বদল করি
হার হবে কার বল্।"
হাসি' কৌতুকে কহিল সে সুন্দরী
"এস না, বদল করি।
দিয়ে মোর হার লব ফলভার
অশ্রুর রসে ভরা।"
চাহিয়া দেখিনু মুখপানে তার
নিদয়া সে মনোহরা।

সে লইল তুলে আমার ফলের ডালা,
করতালি দিল হাসিয়া সকৌতুকে।
আমি লইলাম তাহার ফুলের মালা,
তুলিয়া ধরিনু বুকে।
"মোর হল জয়" হেসে হেসে কয়,
দূরে চলে গেল ত্বরা।
উঠিল তপন মধ্যগগনদেশে,
আসিল দারুণ খরা,
সন্ধ্যায় দেখি তপ্ত দিনের শেষে
ফুলগুলি সব ঝরা।

জুলিয়ো চেজারে জাহাজ
১৭ জানুয়ারি, ১৯২৫

ইটালিয়া

কহিলাম, "ওগো রানী,
কত কবি এল চরণে তোমার উপহার দিল আনি।
এসেছি শুনিয়া তাই,
উষার দুয়ারে পাখির মতন গান গেয়ে চলে যাই।"
শুনিয়া দাঁড়ালে তব বাতায়ন-'পরে
ঘোমটা আড়ালে কহিলে করুণ স্বরে,
"এখন শীতের দিন
কুয়াশায় ঢাকা আকাশ আমার, কানন কুসুমহীন।"

কহিলাম, "ওগো রানী,
সাগরপারের নিকুঞ্জ হতে এনেছি বাঁশরিখানি।
উতারো ঘোমটা তব,
বারেক তোমার কালো নয়নের আলোখানি দেখে লব।"

কহিলে, "আমার হয় নি রঙিন সাজ,
হে অধীর কবি, ফিরে যাও তুমি আজ ;
মধুর ফাগুন মাসে
কুসুম-আসনে বসিব যখন ডেকে লব মোর পাশে।"

কহিলাম, "ওগো রানী,
সফল হয়েছে যাত্রা আমার শুনেছি আশার বাণী।
বসন্তসমীরণে
তব আহ্বানমন্ত্র ফুটিবে কুসুমে আমার বনে।
মধুপমুখর গন্ধমাতাল দিনে
ওই জানালার পথখানি লব চিনে,
আসিবে সে সুসময়।
আজিকে বিদায় নেবার বেলায় গাহিব তোমার জয়।"

মিলান
২৪ জানুয়ারি, ১৯২৫

লেখক

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বুডাপেস্ট

২৬ কার্ত্তিক

১৩৩৩

ভূমিকা

এই লেখাগুলি শুরু হয়েছিল চীনে জাপানে। পাখায় কাগজে রুমালে কিছু লিখে দেবার জন্যে লোকের অনুরোধে এর উৎপত্তি। তারপরে স্বদেশে ও অন্য দেশেও তাগিদ পেয়েছি। এমনি করে এই টুকরো লেখাগুলি জমে উঠল। এর প্রধান মূল্য হাতের অক্ষরে ব্যক্তিগত পরিচয়ে। সে পরিচয় কেবল অক্ষরে নয়, দ্রুতলিখিত ভাবের মধ্যেও ধরা পড়ে। ছাপার অক্ষরে সেই ব্যক্তিগত সংস্পর্শ নষ্ট হয়— সে অবস্থায় এই সব লেখা বাতি-নেবা চীনলণ্ঠনের মতো হাল্কা ও ব্যর্থ হতে পারে। সেই [illegible] হাতের অক্ষর ছাপাবার উপায় আছে খবর পেয়ে লেখাগুলি ছাপিয়ে দেওয়া গেল। অব্যবস্থায় কাটাকুটি ভুলচুক ঘটেছে। সে সব ত্রুটিতেও ব্যক্তিগত পরিচয়েরই আভাস রয়ে গেল॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

The lines in the following pages had their origin in China and Japan where the author was asked for his writings on fans or pieces of silk.

Rabindranath Tagore

Nov. 7. 1926
Balatonfüred. Hungary.

লেখন

স্বপ্ন আমার জোনাকি,
দীপ্ত প্রাণের মণিকা,
স্তব্ধ আঁধার নিশীথে
উড়িছে আলোর কণিকা॥

My fancies are fireflies
speaks of living light—
twinkling in the dark.

আমার লিখন ফুটে পথধারে
ক্ষণিক কালের ফুলে,
চলিতে চলিতে দেখে যারা তারে
চলিতে চলিতে ভুলে॥

The same voice murmurs
in these desultory lines
which is born in wayside pansies
letting hasty glances pass by.

প্রজাপতি সেতো বরষ না গণে,
নিমেষ গণিয়া বাঁচে,
সময় তাহার যথেষ্ট তাই আছে॥

The butterfly does not count years
but moments
and therefore has enough time.

ঘুমের আঁধার কোটরের তলে স্বপ্ন পাখির বাসা
কুড়ায়ে এনেছে মুখর দিনের খসে-পড়া ভাঙা ভাষা।

ভারী কাজের বোঝাই তরী কালের পারাবারে
পাড়ি দিতে গিয়ে কখন ডোবে আপন ভারে।
তার চেয়ে মোর এই ক-খানা হালকা কথার গান
হয়তো ভেসে রইবে স্রোতে তাই করে যাই দান।

বসন্ত সে কুঁড়ি ফুলের দল
হাওয়ায় কত ওড়ায় অবহেলায়।
নাহি ভাবে ভাবী কালের ফল,
ক্ষণকালের খামখেয়ালি খেলায়।

স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেল
ক্ষণকালের ছন্দ।
উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেল
সেই তারি আনন্দ।

সুন্দরী ছায়ার পানে তরু চেয়ে থাকে,
সে তার আপন, তবু পায় না তাহাকে।

আমার প্রেম রবি-কিরণ হেন
জ্যোতির্ময় মুক্তি দিয়ে তোমারে ঘেরে যেন।

মাটির সুপ্তিবন্ধন হতে আনন্দ পায় ছাড়া,
ঝলকে ঝলকে পাতায় পাতায় ছুটে এসে দেয় নাড়া।

অতল আঁধার নিশা-পারাবার, তাহারি উপরিতলে।
দিন সে রঙিন বুদ্বুদ সম অসীমে ভাসিয়া চলে।

ভীরু মোর দান ভরসা না পায়
মনে সে যে রবে কারো,
হয়তো বা তাই তব করুণায়
মনে রাখিতেও পারো।

ফাগুন. শিশুর মতো, ধূলিতে রঙিন ছবি আঁকে,
ক্ষণে ক্ষণে মুছে ফেলে, চলে যায়, মনেও না থাকে।

দেবমন্দির-আঙিনাতলে শিশুরা করেছে মেলা,
দেবতা ভোলেন পূজারি দলে, দেখেন শিশুর খেলা।

তোমার বনে ফুটেছে শ্বেত করবী,
আমার বনে রাঙা,
দোঁহার আঁখি চিনিল দোঁহে নীরবে
ফাগুনে ঘুম ভাঙা।

আকাশ ধরারে বাহুতে বেড়িয়া রাখে,
তবুও আপনি অসীম সুদূরে থাকে।

দূর এসেছিল কাছে,
ফুরাইলে দিন, দূরে চলে গিয়ে আরো সে নিকটে আছে।

ওগো অনন্ত কালো,
ভীরু এ দীপের আলো,
তারি ছোট ভয় করিবারে জয় অগণ্য তারা জ্বালো।

আমার বাণীর পতঙ্গ গুহাচর
আয় গহ্বর ছেড়ে
গোধূলিতে এল শেষ যাত্রার অবসর,
হারিয়ে যা পাখা নেড়ে।

দাঁড়ায়ে গিরি, শির
মেঘে তুলে,
দেখে না সরসীর
বিনতি।
অচল উদাসীর
পদমূলে
ব্যাকুল রূপসীর
মিনতি।

ভাসিয়ে দিয়ে মেঘের ভেলা
খেলেন আলো-ছায়ার খেলা,
শিশুর মতো শিশুর সাথে
কাটান হেসে প্রভাত বেলা।

মেঘ সে বাষ্পগিরি,
গিরি সে বাষ্পমেঘ,
কালের স্বপ্নে যুগে যুগে ফিরি ফিরি
এ কিসের ভাবাবেগ।

চান ভগবান প্রেম দিয়ে তাঁর
গড়া হবে দেবালয়,
মানুষ আকাশে উঁচু করে তোলে
ইঁট পাথরের জয়।

শিখারে কহিল
হাওয়া,
"তোমারে তো চাই
পাওয়া।"
যেমনি জিনিতে চাহিল ছিনিতে
নিবে গেল দাবি-দাওয়া।

দুই তীরে তার বিরহ ঘটায়ে
সমুদ্র করে দান
অতল প্রেমের অশ্রু জলের গান।

তারার দীপ জ্বালেন যিনি
গগনতলে
থাকেন চেয়ে ধরার দীপ
কখন জ্বলে।

মোর গানে গানে, প্রভু, আমি পাই পরশ তোমার,
নির্ঝরধারায় শৈল যেমন পরশে পারাবার।

নানা রঙের ফুলের মতো উষা মিলায় যবে
শুভ্র ফলের মতন সূর্য জাগেন সগৌরবে।

আঁধার সে যেন বিরহিণী বধূ
অঞ্চলে ঢাকা মুখ,
পথিক আলোর ফিরিবার আশে
বসে আছে উৎসুক।

হে আমার ফুল, ভোগী মূর্খের মালে
না হ'ক তোমার গতি,
এই জেনো তব নবীন প্রভাতকালে
আশিস তোমার প্রতি।

চলিতে চলিতে খেলার পুতুল খেলার বেগের সাথে
একে একে কত ভেঙে পড়ে যায়, পড়ে থাকে পশ্চাতে।

বিলম্বে উঠেছ তুমি কৃষ্ণপক্ষ শশী,
রজনীগন্ধা যে তবু চেয়ে আছে বসি।

আকাশে উঠিল বাতাস তবুও নোঙর রহিল পাঁকে,
অধীর তরণী খুঁজিয়া না পায় কোথায় সে মুখ ঢাকে।

আকাশের নীল
বনের শ্যামলে চায়।
মাঝখানে তার
হাওয়া করে হায় হায়।

কীটেরে দয়া করিয়ো, ফুল,
সে নহে মধুকর।
প্রেম যে তার বিষম ভুল
করিল জর্জর।

মাটির প্রদীপ সারা দিবসের অবহেলা লয় মেনে,
রাত্রে শিখার চুম্বন পাবে জেনে।

দিনের রৌদ্রে আবৃত বেদনা বচনহারা,
আঁধারে যে তাহা জলে রজনীর দীপ্ত তারা।

গানের কাঙাল এ বীণার তার বেসুরে মরিছে কেঁদে।
দাও তার সুর বেঁধে।

নিভৃত প্রাণের নিবিড় ছায়ায় নীরব নীড়ের 'পরে
কথাহীন ব্যথা একা একা বাস করে।

আলো যবে ভালোবেসে মালা দেয় আঁধারের গলে,
সৃষ্টি তারে বলে।

আলোকের স্মৃতি ছায়া বুকে করে রাখে,
ছবি বলি তাকে।

ফুলে ফুলে যবে ফাগুন আত্মহারা
প্রেম যে তখন মোহন মদের ধারা।
কুসুম-ফোটার দিন হলে অবসান
তখন সে প্রেম প্রাণের অন্নপান।

দিন হয়ে গেল গত।
শুনিতেছি বসে নীরব আঁধারে
আঘাত করিছে হৃদয় দুয়ারে
দূর-প্রভাতের ঘরে-ফিরে আসা
পথিক দুরাশা যত।

জীর্ণ জয়-তোরণ-ধূলি 'পর
ছেলেরা রচে ধূলির খেলাঘর।

রঙের খেয়ালে আপনা খোয়ালে
হে মেঘ, করিলে খেলা।
চাঁদের আসরে যবে ডাকে তোরে
ফুরাল যে তোর বেলা।

খলিত পালক ধূলায় জীর্ণ
পড়িয়া থাকে।
আকাশে ওড়ার স্মরণচিহ্ন
কিছু না রাখে।

পথে হল দেরি, ঝরে গেল চেরি
দিন বৃথা গেল, প্রিয়া।
তবুও তোমার ক্ষমা-হাসি বহি
দেখা দিল আজেলিয়া।

যখন পথিক এলেম কুসুমবনে
শুধু আছে কুঁড়ি দুটি।
চলে যাব যবে, বসন্ত সমীরণে
কুসুম উঠিবে ফুটি।

হে মহাসাগর বিপদের লোভ দিয়া
ভুলায়ে বাহির করেছ মানবহিয়া।
নিত্য তোমার ভয়ের ভীষণ বাণী
দুঃসাহসের পথে তারে আনে টানি।

গগনে গগনে নব নব দেশে রবি
নব প্রাতে জাগে নূতন জনম লভি।

জোনাকি সে ধূলি খুঁজে সারা,
জানে না আকাশে আছে তারা।

যবে কাজ করি
প্রভু দেয় মোরে মান।
যবে গান করি
ভালোবাসে ভগবান।

একটি পুষ্পকলি
এনেছিনু দিব বলি',
হায় তুমি চাও সমস্ত বনভূমি,
লও, তাই লও তুমি।

বসন্ত, তুমি এসেছ হেথায়
বুঝি হল পথ ভুল।
এলে যদি তবে জীর্ণ শাখায়
একটি ফুটাও ফুল।

চাহিয়া প্রভাত রবির নয়নে
গোলাপ উঠিল ফুটে।
"রাখিব তোমায় চিরকাল মনে"
বলিয়া পড়িল টুটে।

আকাশে তো আমি রাখি নাই, মোর
উড়িবার ইতিহাস।
তবু, উড়েছিনু এই মোর উল্লাস।

লাজুক ছায়া বনের তলে
আলোরে ভালোবাসে।
পাতা সে কথা ফুলেরে বলে,
ফুল তা শুনে হাসে।

আকাশের তারায় তারায়
বিধাতার যে হাসিটি জ্বলে
ক্ষণজীবী জোনাকি এনেছে
সেই হাসি এ ধরণীতলে।

কুয়াশা যদি বা ফেলে পরাভবে ঘিরি
তবু নিজ মহিমায় অবিচল গিরি।

পর্বতমালা আকাশের পানে চাহিয়া না কহে কথা,
অগমের লাগি ওরা ধরণীর স্তম্ভিত ব্যাকুলতা।

একদিন ফুল দিয়েছিলে, হায়,
কাঁটা বিঁধে গেছে তার।
তবু, সুন্দর, হাসিয়া তোমায়
করিনু নমস্কার।

হে বন্ধু, জেনো মোর ভালোবাসা,
কোনো দায় নাহি তার।
আপনি সে পায় আপন পুরস্কার।

স্বল্প সেও স্বল্প নয় বড়োকে ফেলে ছেয়ে।
দু-চারিজন অনেক বেশি বহুজনের চেয়ে।

সংগীতে যখন সত্য শোনে নিজ বাণী
সৌন্দর্যে তখন ফোটে তার হাসিখানি।

আমি জানি মোর ফুলগুলি ফুটে হরষে
না-জানা সে কোন্ শুভ চুম্বন পরশে।

বুদ্বুদ সে তো বদ্ধ আপন ঘেরে,
শূন্যে মিলায়, জানে না সমুদ্রেরে।

বিরহপ্রদীপে জলুক দিবসরাতি
মিলনস্মৃতির নির্বাণহীন বাতি।

মেঘের দল বিলাপ করে
আঁধার হল দেখে।
ভুলেছে বুঝি নিজেই তারা
সূর্য দিল ঢেকে।

ভিক্ষুবেশে দ্বারে তার "দাও" বলি দাঁড়ালে দেবতা
মানুষ সহসা পায় আপনার ঐশ্বর্যবারতা।

গুণীর লাগিয়া বাঁশি চাহে পথপানে,
বাঁশির লাগিয়া গুণী ফিরিছে সন্ধানে।

অসীম আকাশ শূন্য প্রসারি রাখে,
হোথায় পৃথিবী মনে মনে তার
অমরার ছবি আঁকে।

কুন্দকলি ক্ষুদ্র বলি নাই দুঃখ, নাই তার লাজ,
পূর্ণতা অন্তরে তার অগোচরে করিছে বিরাজ।
বসন্তের বাণীখানি আবরণে পড়িয়াছে বাঁধা,
সুন্দর হাসিয়া বহে প্রকাশের সুন্দর এ বাধা।

ফুলগুলি যেন কথা,
পাতাগুলি যেন চারিদিকে তার
পুঞ্জিত নীরবতা।

দিবসের অপরাধ সন্ধ্যা যদি ক্ষমা করে তবে
তাহে তার শান্তিলাভ হবে।

আকর্ষণগুণে প্রেম এক ক'রে তোলে।
শক্তি শুধু বেঁধে রাখে শিকলে শিকলে।

মহাতরু বহে
বহু বরষের ভার।
যেন সে বিরাট
এক মুহূর্ত তার।

পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়,
পথের দুধারে আছে মোর দেবালয়।

ধরায় যেদিন প্রথম জাগিল
কুসুমবন
সেদিন এসেছে আমার গানের
নিমন্ত্রণ।

হিতৈষীর স্বার্থহীন অত্যাচার যত
ধরণীরে সব চেয়ে করেছে বিক্ষত।

স্তব্ধ অতল শব্দবিহীন মহাসমুদ্রতলে
বিশ্ব ফেনার পুঞ্জ সদাই ভাঙিয়া জুড়িয়া চলে।

নব-জনমের পুরা দাম দিব যেই
তখনি মুক্তি পাওয়া যাবে সহজেই।

গোঁয়ার কেবল গায়ের জোরেই বাঁকাইয়া দেয় চাবি,
শেষকালে তার কুড়াল ধরিয়া করে মহা দাবাদাবি।

জন্ম মোদের রাতের আঁধার
রহস্য হতে
দিনের আলোর সুমহত্তর
রহস্যস্রোতে।

আমার প্রাণের গানের পাখির দল
তোমার কণ্ঠে বাসা খুঁজিবারে
হল আজি চঞ্চল।

নিমেষকালের খেয়ালের লীলাভরে
অনাদরে যাহা দান কর অকাতরে
শরৎ-রাতের খসে-পড়া তারাসম
উজ্জ্বলি উঠে প্রাণের আঁধার মম।

মোর কাগজের খেলার নৌকা ভেসে চলে যায় সোজা
বহিয়া আমার অকাজ দিনের অলসবেলার বোঝা।

অকালে যখন বসন্ত আসে শীতের আঙিনা ’পরে
ফিরে যায় দ্বিধাভরে।
আমের মুকুল ছুটে বাহিরায়, কিছু না বিচার করে,
ফেরে না সে, শুধু মরে।

হে প্রেম, যখন ক্ষমা কর তুমি সব অভিমান ত্যেজে,
কঠিন শাস্তি সে যে।
হে মাধুরী, তুমি কঠোর আঘাতে যখন নীরব রহ
সেই বড়ো দুঃসহ।

দেবতার সৃষ্টি বিশ্ব মরণে নূতন হয়ে উঠে।
অসুরের অনাসৃষ্টি আপন অস্তিত্বভারে টুটে।

বৃক্ষ সে তো আধুনিক, পুষ্প সেই অতি পুরাতন,
আদিম বীজের বার্তা সেই আনে করিয়া বহন।

নূতন প্রেম সে ঘুরে ঘুরে মরে শূন্য আকাশমাঝে
পুরানো প্রেমের রিক্ত বাসায় বাসা তার মেলে না যে।

সকল চাঁপাই দেয় মোর প্রাণে আনি
চির পুরাতন একটি চাঁপার বাণী।

দুঃখের আগুন কোন্ জ্যোতির্ময় পথরেখা টানে
বেদনার পরপার পানে।

ফেলে যবে যাও একা থুয়ে
আকাশের নীলিমায় কার ছোঁওয়া যায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে।
বনে বনে বাতাসে বাতাসে
চলার আভাস কার শিহরিয়া উঠে ঘাসে ঘাসে।

উষা একা একা আঁধারের দ্বারে ঝংকারে বীণাখানি
যেমনি সূর্য বাহিরিয়া আসে মিলায় ঘোমটা টানি।

শিশির রবিরে শুধু জানে
বিন্দুরূপে আপন বুকের মাঝখানে।

আপন অসীম নিষ্ফলতার পাকে
মরু চিরদিন বন্দী হইয়া থাকে।

ধরণীর যজ্ঞ-অগ্নি বৃক্ষরূপে শিখা তার তুলে;
স্ফুলিঙ্গ ছড়ায় ফুলে ফুলে।

ফুরাইলে দিবসের পালা
আকাশ সূর্যেরে জপে লয়ে তারকার জপমালা।

দিনে দিনে মোর কর্ম আপন দিনের মজুরি পায়।
প্রেম সে আমার চিরদিবসের চরম মূল্য চায়।

কর্ম আপন দিনের মজুরি রাখিতে চাহে না বাকি।
যে প্রেমে আমার চরম মূল্য তারি তরে চেয়ে থাকি।

আলোকের সাথে মেলে আঁধারের ভাষা,
মেলে না কুয়াশা।

বিদেশে অচেনা ফুল পথিক কবিরে ডেকে কহে—
"যে দেশ আমার, কবি, সেই দেশ তোমারো কি নহে ?"

পুঁথি-কাটা ওই পোকা
মানুষকে জানে বোকা।
বই কেন সে যে চিবিয়ে খায় না
এই লাগে তার ধোঁকা।

আকাশে মন কেন তাকায় ফলের আশা পুষি ?
কুসুম যদি ফোটে শাখায় তা নিয়ে থাক্ খুশি।

অনন্তকালের ভালে মহেন্দ্রের বেদনার ছায়া,
মেঘান্ধ অম্বরে আজি তারি যেন মূর্তিমতী মায়া।

সূর্যাস্তের রঙে রাঙা ধরা যেন পরিণত ফল,
আঁধার রজনী তারে ছিঁড়িতে বাড়ায় করতল।

প্রজাপতি পায় অবকাশ
ভালোবাসিবারে কমলেরে।
মধুকর সদা বারোমাস
মধু খুঁজে খুঁজে শুধু ফেরে।
মায়াজাল দিয়া কুয়াশা জড়ায়
প্রভাতেরে চারিধারে,—
অন্ধ করিয়া বন্দী করে যে তারে।

শুকতারা মনে করে   শুধু একা মোর তরে
অরুণের আলো।
ঊষা বলে, "ভালো, সেই ভালো"।

অজানা ফুলের গন্ধের মতো
তোমার হাসিটি, প্রিয়,
সরল মধুর, কি অনির্বচনীয়।

মৃতের যতই বাড়াই মিথ্যা মূল্য,
মরণেরি শুধু ঘটে ততই বাহুল্য।

পারের তরীর পালের হাওয়ার পিছে
তীরের হৃদয় কান্না পাঠায় মিছে।

সত্য তার সীমা ভালোবাসে
সেথায় সে মেলে আসি সুন্দরের পাশে।

নটরাজ নৃত্য করে নব নব সুন্দরের নাটে,
বসন্তের পুষ্পরঙ্গে শস্যের তরঙ্গে মাঠে মাঠে।
তাঁহারি অক্ষয় নৃত্য, হে গৌরী, তোমার অঙ্গে মনে,
চিত্তের মাধুর্যে তব, ধ্যানে তব, তোমার লিখনে।

দিন দেয় তার সোনার বীণা
নীরব তারার করে—
চিরদিবসের সুর বাঁধিবার তরে।

ভক্তি ভোরের পাখি
রাতের আঁধার শেষ না হতেই "আলো" ব'লে ওঠে ডাকি।

সন্ধ্যায় দিনের পাত্র রিক্ত হলে ফেলে দেয় তারে
নক্ষত্রের প্রাঙ্গণমাঝারে।
রাত্রি তারে অন্ধকারে ধৌত করে পুন ভরি দিতে
প্রভাতের নবীন অমৃতে।

দিনের কর্মে মোর প্রেম যেন
শক্তি লভে,
রাতের মিলনে পরম শান্তি
মিলিবে তবে।

ভোরের ফুল গিয়েছে যারা
দিনের আলো ত্যেজে
আঁধারে তা'রা ফিরিয়া আসে
সাঁঝের তারা সেজে।

যাবার যা সে যাবেই, তারে
না দিলে খুলে দ্বার
ক্ষতির সাথে মিলায়ে বাধা
করিবে একাকার।

সাগরের কানে জোয়ার-বেলায়
ধীরে কয় তটভূমি ;
"তরঙ্গ তব যা বলিতে চায়
তাই লিখে দাও তুমি।"
সাগর ব্যাকুল ফেন-অক্ষরে
যতবার লেখে লেখা
চির-চঞ্চল অতৃপ্তিভরে
ততবার মোছে রেখা।

পুরানো মাঝে যা কিছু ছিল
চিরকালের ধন
নূতন, তুমি এনেছ তাই
করিয়া আহরণ।

মিলননিশীথে ধরণী ভাবিছে
চাঁদের কেমন ভাষা,
কোনো কথা নেই, শুধু মুখ চেয়ে হাসা।

স্তব্ধ হয়ে কেন্দ্র আছে না দেখা যায় তারে
চক্র যত নৃত্য করি ফিরিছে চারিধারে।

দিবসের দীপে শুধু থাকে তেল
রাতে দীপ আলো দেয়।
দোঁহার তুলনা করা শুধু অন্যায়।

গিরি যে তুষার নিজে রাখে, তার
ভার তারে চেপে রহে।
গলায়ে যা দেয় ঝরনাধারায়
চরাচর তারে বহে।

কাছে থাকার আড়ালখানা
ভেদ ক'রে
তোমার প্রেম দেখিতে যেন
পায় মোরে।

ওই শুন বনে বনে কুঁড়ি বলে তপনেরে ডাকি—
"খুলে দাও আঁখি"।

ধরার মাটির তলে বন্দী হয়ে যে-আনন্দ আছে
কচিপাতা হয়ে এল দলে দলে অশথের গাছে।
বাতাসে মুক্তির দোলে ছুটি পেল ক্ষণিক বাঁচিতে
নিস্তব্ধ অন্ধের স্বপ্ন দেহ নিল আলোয় নাচিতে।

খেলার খেয়ালবশে কাগজের তরী
স্মৃতির খেলেনা দিয়ে দিয়েছিনু ভরি;
যদি ঘাটে গিয়ে ঠেকে প্রভাতবেলায়
তুলে নিয়ো তোমাদের প্রাণের খেলায়।

দিনের আলোক যবে রাত্রির অতলে
হয়ে যায় হারা
আঁধারের ধ্যাননেত্রে দীপ্ত হয়ে জ্বলে
শত লক্ষ তারা।

আলোহীন বাহিরের আশাহীন দয়াহীন ক্ষতি
পূর্ণ করে দেয় যেন অন্তরের অন্তহীন জ্যোতি।

অস্তরবির আলো-শতদল
মুদিল অন্ধকারে।
ফুটিয়া উঠুক নবীন ভাষায়
ভ্রান্তিবিহীন নবীন আশায়
নব উদয়ের পারে।

জীবন খাতার অনেক পাতাই
এমনিতরো শূন্য থাকে।
আপন মনের খেয়ান দিয়ে
পূর্ণ করে লও না তাকে।
সেথায় তোমার গোপন কবি
রচুক আপন স্বর্গছবি,
পরশ করুক দৈববাণী
সেথায় তোমার কল্পনাকে।

দেবতা যে চায় পরিতে গলায়
মানুষের গাঁথা মালা,
মাটির কোলেতে তাই রেখে যায়
আপন ফুলের ডালা।

সূর্যপানে চেয়ে ভাবে মল্লিকামুকুল
কখন ফুটিবে মোর অত বড়ো ফুল।

সোনার মুকুট ভাসাইয়া দাও
সন্ধ্যা মেঘের তরীতে।
যাও চলে রবি বেশভূষা খুলে
মরণ মহেশ্বরের দেউলে
নীরবে প্রণাম করিতে।

সন্ধ্যার প্রদীপ মোর রাত্রির তারারে
বন্দে নমস্কারে।

শিশিরের মালা গাঁথা শরতের তৃণাগ্র-সূচিতে
নিমেষে মিলায়,—তবু নিখিলের মাধুর্য-রুচিতে
স্থান তার চির স্থির ; মণিমালা রাজেন্দ্রের গলে
আছে, তবু নাই সে যে, নিত্য নষ্ট প্রতি পলে পলে।

দিবসে যাহারে করিয়াছিলাম হেলা
সেই তো আমার প্রদীপ রাতের বেলা।

ঝরে-পড়া ফুল আপনার মনে বলে—
বসন্ত আর নাই এ ধরণীতলে।

বসন্তবায়ু, কুসুম-কেশর
গেছ কি ভুলি ?
নগরের পথে ঘুরিয়া বেড়াও
উড়ায়ে ধূলি।

হে অচেনা, তব আঁখিতে আমার
আঁখি কারে পায় খুঁজি।
যুগান্তরের চেনা চাহনিটি
আঁধারে লুকানো বুঝি।

দখিন হতে আনিলে, বায়ু,
ফুলের জাগরণ,
দখিন মুখে ফিরিবে যবে
উজাড় হবে বন।

ওগো হংসের পাঁতি,
শীত-পবনের সাথি,
ওড়ার মদিরা পাখায় করিছ পান।
দূরের স্বপনে মেশা
নভো-নীলিমার নেশা,
বলো, সেই রসে কেমনে ভরিব গান।

শিশির-সিক্ত বন-মর্মর
ব্যাকুল করিল কেন।
ভোরের স্বপনে অনামা প্রিয়ার
কানে কানে কথা যেন।

দিনান্তের ললাট লেপি'
রক্ত আলো চন্দনে
দিগ্বধূরা ঢাকিল আঁখি
শব্দহীন ক্রন্দনে।

নীরব যিনি তাঁহার বাণী নামিলে মোর বাণীতে
তখন আমি তাঁরেও জানি মোরেও পাই জানিতে

কাঁটাতে আমার অপরাধ আছে
দোষ নাহি মোর ফুলে।
কাঁটা, ওগো প্রিয়, থাক্ মোর কাছে,
ফুল তুমি নিয়ো তুলে।

চেয়ে দেখি হোথা তব জানালায়
স্তিমিত প্রদীপখানি
নিবিড় রাতের নিভৃত বীণায়
কী বাজায় কী বা জানি।

পৌরপথের বিরহী তরুর কানে
বাতাস কেন বা বনের বারতা আনে।

ও যে চেরিফুল তব বন-বিহারিণী,
আমার বকুল বলিছে "তোমারে চিনি"।

ধনীর প্রাসাদ বিকট ক্ষুধিত রাহু
বস্তুপিণ্ড-বোঝায় বদ্ধ বাহু।
মনে পড়ে সেই দীনের রিক্ত ঘরে
বাহুবিমুক্ত আলিঙ্গনের তরে।

গিরির দুরাশা উড়িবারে
ঘুরে মরে মেঘের আকারে

দূর হতে যারে পেয়েছি পাশে
কাছের চেয়ে সে কাছেতে আসে।

উতল সাগরের অধীর ক্রন্দন
নীরব আকাশের মাগিছে চুম্বন।

চাঁদ কহে, "শোন্
শুকতারা,
রজনী যখন
হল সারা
যাবার বেলায়
কেন শেষে
দেখা দিতে হায়
এলি হেসে,
আলো আঁধারের
মাঝে এসে
করিলি আমায়
দিশে হারা।"

হতভাগ্য মেঘ পায় প্রভাতের সোনা,—
সন্ধ্যা না হতে ফুরায়ে ফেলিয়া
ভেসে যায় আনমনা।

ভেবেছিনু গনি গনি লব সব তারা
গনিতে গনিতে রাত হয়ে যায় সারা,
বাছিতে বাছিতে কিছু না পাইনু বেছে।
আজ বুঝিলাম, যদি না চাহিয়া চাই
তবেই তো একসাথে সব-কিছু পাই ;
সিন্ধুরে তাকায়ে দেখো, মরিয়ো না সেঁচে

তোমারে, প্রিয়ে, হৃদয় দিয়ে
জানি তবুও জানি নি।
সকল কথা বল নি অভিমানিনী।

লিলি, তোমারে গেঁথেছি হারে, আপন বলে চিনি,
তবুও তুমি রবে কি বিদেশিনী।

ফুলের লাগি তাকায়ে ছিলি শীতে
ফলের আশা ওরে!
ফুটিল ফুল ফাগুন-রজনীতে
বিফলে গেল ঝরে।

নিমেষকালের অতিথি যাহারা পথে আনাগোনা করে,
আমার গাছের ছায়া তাহাদেরি তরে।
যে জনার লাগি চিরদিন মোর আঁখি পথ চেয়ে থাকে
আমার গাছের ফল তারি তরে পাকে।

বহ্নি যবে বাঁধা থাকে তরুর মর্মের মাঝখানে
ফলে ফুলে পল্লবে বিরাজে।
যখন উদ্দাম শিখা লজ্জাহীনা বন্ধন না মানে
মরে যায় ব্যর্থ ভস্মমাঝে।

কানন কুসুম-উপহার দেয় চাঁদে
সাগর আপন শূন্যতা নিয়ে কাঁদে।

লেখনী জানে না কোন্ অঙ্গুলি লিখিছে
লেখে যাহা তাও তার কাছে সবি মিছে।

মন্দ যাহা নিন্দা তার রাখ না বটে বাকি।
ভালো যেটুকু মূল্য তার কেন বা দাও ফাঁকি।

আকাশ কভু পাতে না ফাঁদ
কাড়িয়ে নিতে চাঁদে,
বিনা বাঁধনে তাই তো চাঁদ
নিজেরে নিজে বাঁধে।

সমস্ত আকাশভরা আলোর মহিমা
তৃণের শিশিরমাঝে খোঁজে নিজ সীমা,

প্রভাত-আলোরে বিদ্রূপ করে ও কি
ক্ষুরের ফলার নিষ্ঠুর ঝকমকি?

একা এক শূন্যমাত্র নাই অবলম্ব,
দুই দেখা দিলে হয় একের আরম্ভ।

প্রভেদেরে মান যদি ঐক্য পাবে তবে,
প্রভেদ ভাঙিতে গেলে ভেদবৃদ্ধি হবে।

মৃত্যুর ধর্মই এক, প্রাণধর্ম নানা,
দেবতা মরিলে হবে ধর্ম একখানা।

আঁধার একেরে দেখে একাকার ক'রে,
আলোক একেরে দেখে নানাদিক ধ'রে।

ফুল দেখিবার যোগ্য চক্ষু যার রহে
সেই যেন কাঁটা দেখে, অন্যে নহে নহে।

ধুলায় মারিলে লাথি ঢোকে চোখে মুখে।
জল ঢালো, বালাই নিমেষে যাবে চুকে।

ভালো করিবারে যার বিষম ব্যস্ততা
ভালো হইবারে তার অবসর কোথা।

ভালো যে করিতে পারে ফেরে দ্বারে এসে,
ভালো যে বাসিতে পারে সর্বত্র প্রবেশে।

আগে খোঁড়া করে দিয়ে পরে লও পিঠে
তারে যদি দয়া বল, শোনায় না মিঠে।

হয় কাজ আছে তব নয় কাজ নাই
কিন্তু "কাজ করা যাক" বলিয়ো না ভাই।

কাজ সে তো মানুষের, এই কথা ঠিক।
কাজের মানুষ কিন্তু ধিক তারে ধিক।

একাকী গর্জে শেষে আপনারি মাঝে,
সিন্ধুর সঙ্গীত শেষ সিন্ধুর তরঙ্গে ॥

প্রাণেরে মৃত্যুর ছাপ মূল্য করে দান,
প্রাণ দিয়ে লভি তাই যাহা মূল্যবান ॥

রস যেথা নাই সেথা যত কিছু খোঁচা,
মরুভূমে জন্মে শুধু কাঁটাগাছ বোঁচা ॥

দর্পণে যাহারে দেখি সেই আমি ছায়া,
তারে লয়ে গর্ব করি অপূর্ব এ মায়া ॥

আপনি আপনা চেয়ে বড়ো যদি হবে
নিজেকে নিজের কাছে নত করো তবে ॥

প্রেমেরে যে করিয়াছে ব্যবসার অঙ্গ
প্রেম দূরে বসে বসে দেখে তার রঙ্গ ॥

দুঃখেরে যখন প্রেম করে শিরোমণি
তাহারে আনন্দ বলে চিনি তো তখনি ॥

অমৃত যে সত্য, তার নাহি পরিমাণ,
মৃত্যু তারে নিত্য নিত্য করিছে প্রমাণ ॥

নাটক ও প্রহসন

১৪।১৩

মুক্তধারা

মুক্তধারা

উত্তরকূট পার্বত্য প্রদেশ। সেখানকার উত্তরভৈরব-মন্দিরে যাইবার পথ। দূরে আকাশে একটা অভ্রভেদী লৌহযন্ত্রের মাথাটা দেখা যাইতেছে এবং তাহার অপরদিকে ভৈরব-মন্দির-চূড়ার ত্রিশূল। পথের পার্শ্বে আমবাগানে রাজা রণজিতের শিবির। আজ অমাবস্যায় ভৈরবের মন্দিরে আরতি, সেখানে রাজা পদব্রজে যাইবেন, পথে শিবিরে বিশ্রাম করিতেছেন। তাঁহার সভার যন্ত্ররাজ বিভূতি বহুবৎসরের চেষ্টায় লৌহযন্ত্রের বাঁধ তুলিয়া মুক্তধারা ঝরনাকে বাঁধিয়াছেন। এই অসামান্য কীর্তিকে পুরস্কৃত করিবার উপলক্ষ্যে উত্তরকূটের সমস্ত লোক ভৈরব-মন্দির-প্রাঙ্গণে উৎসব করিতে চলিয়াছে। ভৈরব-মন্ত্রে দীক্ষিত সন্ন্যাসিদল সমস্তদিন স্তবগান করিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের কাহারও হাতে ধূপাধারে ধূপ জ্বলিতেছে, কাহারও হাতে শঙ্খ, কাহারও ঘণ্টা। গানের মাঝে মাঝে তালে তালে ঘণ্টা বাজিতেছে।

গান

জয় ভৈরব, জয় শংকর,
জয় জয় জয় প্রলয়ংকর,
শংকর শংকর।
জয় সংশয়ভেদন,
জয় বন্ধন-ছেদন,
জয় সংকট-সংহর
শংকর শংকর।

[সন্ন্যাসিদল গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিল

পূজার নৈবেদ্য লইয়া একজন বিদেশী পথিকের প্রবেশ

উত্তরকূটের নাগরিককে সে প্রশ্ন করিল

পথিক। আকাশে ওটা কী গড়ে তুলেছে? দেখতে ভয় লাগে।

নাগরিক। জান না? বিদেশী বুঝি? ওটা যন্ত্র।

পথিক। কিসের যন্ত্র?

নাগরিক। আমাদের যন্ত্ররাজ বিভূতি পঁচিশ বছর ধরে যেটা তৈরি করছিল, সেটা ওই তো শেষ হয়েছে, তাই আজ উৎসব।

পথিক। যন্ত্রের কাজটা কী?

নাগরিক। মুক্তধারা ঝরনাকে বেঁধেছে।

পথিক। বাবা রে। ওটাকে অসুরের মাথার মতো দেখাচ্ছে, মাংস নেই, চোয়াল ঝোলা। তোমাদের উত্তরকূটের শিয়রের কাছে অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে; দিনরাত্তির দেখতে দেখতে তোমাদের প্রাণপুরুষ যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে।

নাগরিক। আমাদের প্রাণপুরুষ মজবুত আছে, ভাবনা ক'রো না।

পথিক। তা হতে পারে, কিন্তু ওটা অমনতরো সূর্যতারার সামনে মেলে রাখবার জিনিস নয়, ঢাকা দিতে পারলেই ভালো হত। দেখতে পাচ্ছ না যেন দিনরাত্তির সমস্ত আকাশকে রাগিয়ে দিচ্ছে।

নাগরিক। আজ ভৈরবের আরতি দেখতে যাবে না?

পথিক। দেখব বলেই বেরিয়েছিলুম। প্রতিবৎসরই তো এই সময় আসি, কিন্তু মন্দিরের উপরের আকাশে কখনো এমনতরো বাধা দেখি নি। হঠাৎ ওইটের দিকে তাকিয়ে আজ আমার গা শিউরে উঠল—ও যে অমন করে মন্দিরের মাথা ছাড়িয়ে গেল এটা যেন স্পর্ধার মতো দেখাচ্ছে। দিয়ে আসি নৈবেদ্য, কিন্তু মন প্রসন্ন হচ্ছে না। [প্রস্থান

একজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ

একখানি শুভ্র চাদর তাহার মাথা ঘিরিয়া সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িতেছে

স্ত্রীলোক। সুমন। আমার সুমন। (নাগরিকের প্রতি) বাবা আমার সুমন এখনও ফিরল না। তোমরা তো সবাই ফিরেছ।

নাগরিক। কে তুমি?

স্ত্রীলোক। আমি জনাই গাঁয়ের অম্বা। সে যে আমার চোখের আলো, আমার প্রাণের নিশ্বাস, আমার সুমন।

নাগরিক। তার কী হয়েছে বাছা?

অম্বা। তাকে যে কোথায় নিয়ে গেল। আমি ভৈরবের মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলুম—ফিরে এসে দেখি তাকে নিয়ে গেছে।

পথিক। তা হলে মুক্তধারার বাঁধ বাঁধতে তাকে নিয়ে গিয়েছিল।

অম্বা। আমি শুনেছি এই পথ দিয়ে তাকে নিয়ে গেল, ওই গৌরীশিখরের পশ্চিমে—সেখানে আমার দৃষ্টি পৌঁছয় না, তার পরে আর পথ দেখতে পাই নে।

পথিক। কেঁদে কী হবে? আমরা চলেছি ভৈরবের মন্দিরে আরতি দেখতে। আজ আমাদের বড়ো দিন, তুমিও চলো।

অম্বা। না বাবা, সেদিনও তো ভৈরবের আরতিতে গিয়েছিলুম। তখন থেকে পুজো দিতে যেতে আমার ভয় হয়। দেখো আমি বলি তোমাকে, আমাদের পুজো বাবার কাছে পৌঁছচ্ছে না—পথের থেকে কেড়ে নিচ্ছে।

নাগরিক। কে নিচ্ছে?

অম্বা। যে আমার বুকের থেকে সুমনকে নিয়ে গেল সে। সে যে কে এখনও তো বুঝলুম না। সুমন, আমার সুমন, বাবা সুমন। [উভয়ের প্রস্থান

উত্তরকূটের যুবরাজ অভিজিৎ যন্ত্ররাজ বিভূতির নিকট দূত পাঠাইয়াছেন। বিভূতি যখন মন্দিরের দিকে চলিয়াছে তখন দূতের সহিত তাহার সাক্ষাৎ।

দূত। যন্ত্ররাজ বিভূতি, যুবরাজ আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

বিভূতি। কী তাঁর আদেশ?

দূত। এতকাল ধরে তুমি আমাদের মুক্তধারার ঝরনাকে বাঁধ দিয়ে বাঁধতে লেগেছ। বারবার ভেঙে গেল, কত লোক ধুলোবালি চাপা পড়ল, কত লোক বন্যায় ভেসে গেল। আজ শেষে—

বিভূতি। তাদের প্রাণ দেওয়া ব্যর্থ হয় নি। আমার বাঁধ সম্পূর্ণ হয়েছে।

দূত। শিবতরাইয়ের প্রজারা এখনও এ খবর জানে না। তারা বিশ্বাস করতেই পারে না যে, দেবতা তাদের যে জল দিয়েছেন কোনো মানুষ তা বন্ধ করতে পারে।

বিভূতি। দেবতা তাদের কেবল জলই দিয়েছেন, আমাকে দিয়েছেন জলকে বাঁধবার শক্তি।

দূত। তারা নিশ্চিন্ত আছে, জানে না আর সপ্তাহ পরেই তাদের চাষের খেত—

বিভূতি। চাষের খেতের কথা কী বলছ?

দূত। সেই খেত শুকিয়ে মারাই কি তোমার বাঁধ বাঁধার উদ্দেশ্য ছিল না?

বিভূতি। বালি-পাথর-জলের ষড়যন্ত্র ভেদ করে মানুষের বুদ্ধি হবে জয়ী এই ছিল উদ্দেশ্য। কোন্ চাষির কোন্ ভুট্টার খেত মারা যাবে সে-কথা ভাববার সময় ছিল না।

দূত। যুবরাজ জিজ্ঞাসা করছেন এখনও কি ভাববার সময় হয় নি?

বিভূতি। না, আমি যন্ত্রশক্তির মহিমার কথা ভাবছি।

দূত। ক্ষুধিতের কান্না তোমার সে ভাবনা ভাঙাতে পারবে না?

বিভূতি। না। জলের বেগে আমার বাঁধ ভাঙে না, কান্নার জোরে আমার যন্ত্র টলে না।

দূত। অভিশাপের ভয় নেই তোমার?

বিভূতি। অভিশাপ! দেখো, উত্তরকূটে যখন মজুর পাওয়া যাচ্ছিল না তখন রাজার আদেশে চণ্ডপত্তনের প্রত্যেক ঘর থেকে আঠারো বছরের উপর বয়সের ছেলেকে আমরা আনিয়ে নিয়েছি। তারা তো অনেকেই ফেরে নি। সেখানকার কত মায়ের অভিশাপের উপর আমার যন্ত্র জয়ী হয়েছে। দৈবশক্তির সঙ্গে যার লড়াই, মানুষের অভিশাপকে সে গ্রাহ্য করে?

দূত। যুবরাজ বলছেন কীর্তি গড়ে তোলবার গৌরব তো লাভ হয়েছেই, এখন কীর্তি নিজে ভাঙবার যে আরও বড়ো গৌরব তাই লাভ করো।

বিভূতি। কীর্তি যখন গড়া শেষ হয় নি তখন সে আমার ছিল; এখন সে উত্তরকূটের সকলের। ভাঙবার অধিকার আর আমার নেই।

দূত। যুবরাজ বলছেন ভাঙবার অধিকার তিনিই গ্রহণ করবেন।

বিভূতি। স্বয়ং উত্তরকূটের যুবরাজ এমন কথা বলেন? তিনি কি আমাদেরই নন? তিনি কি শিবতরাইয়ের?

দূত। তিনি বলেন—উত্তরকূটে কেবল যন্ত্রের রাজত্ব নয়, সেখানে দেবতাও আছেন, এই কথা প্রমাণ করা চাই।

বিভূতি। যন্ত্রের জোরে দেবতার পদ নিজেই নেব এই কথা প্রমাণ করবার ভার আমার উপর। যুবরাজকে ব'লো আমার এই বাঁধযন্ত্রের মুঠো একটুও আলগা করতে পারা যায় এমন পথ খোলা রাখি নি।

দূত। ভাঙনের যিনি দেবতা তিনি সব সময় বড়ো পথ দিয়ে চলাচল করেন না। তাঁর জন্যে যে-সব ছিদ্রপথ থাকে সে কারও চোখে পড়ে না।

বিভূতি। (চমকিয়া) ছিদ্র? সে আবার কী? ছিদ্রের কথা তুমি কী জান?

দূত। আমি কি জানি? যাঁর জানবার দরকার তিনি জেনে নেবেন।

[দূতের প্রস্থান

উত্তরকূটের নাগরিকগণ উৎসব করিতে মন্দিরে চলিয়াছে। বিভূতিকে দেখিয়া

১। বাঃ যন্ত্ররাজ, তুমি তো বেশ লোক। কখন ফাঁকি দিয়ে আগে চলে এসেছ টেরও পাই নি।

২। সে তো ওর চিরকালের অভ্যেস। ও কখন ভিতরে ভিতরে এগিয়ে সবাইকে ছাড়িয়ে চলে যায় বোঝাই যায় না। সেই তো আমাদের চবুয়াগাঁয়ের নেড়া বিভূতি, আমাদের একসঙ্গেই কৈলেস-গুরুর কানমলা খেলে, আর কখন সে আমাদের সবাইকে ছাড়িয়ে এসে এতবড়ো কাণ্ডটা করে বসল।

৩। ওরে গবরু, ঝুড়িটা নিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? বিভূতিকে আর কখনো চক্ষে দেখিস নি কি? মালাগুলো বের কর্, পরিয়ে দিই।

বিভূতি। থাক্ থাক্ আর নয়।

৩। আর নয় তো কী? যেমন তুমি হঠাৎ মস্ত হয়ে উঠেছ তেমনি তোমার গলাটা যদি উটের মতো হঠাৎ লম্বা হয়ে উঠত আর উত্তরকূটের সব মানুষে মিলে তার উপর তোমার গলায় মালার বোঝা চাপিয়ে দিত তাহলেই ঠিক মানাত।

২। ভাই, হরিশ ঢাকি তো এখনও এসে পৌঁছোল না।

১। বেটা কুঁড়ের সদ্দার, ওর পিঠের চামড়ায় ঢাকের চাঁটি লাগালে তবে—

৩। সেটা কাজের কথা নয়। চাঁটি লাগাতে ওর হাত আমাদের চেয়ে মজবুত।

৪। মনে করেছিলুম বিশাই সামন্তের রথটা চেয়ে এনে আজ বিভূতিদাদার রথযাত্রা করাব। কিন্তু রাজাই নাকি আজ পায়ে হেঁটে মন্দিরে যাবেন।

৫। ভালোই হয়েছে। সামন্তের রথের যে দশা, একেবারে দশরথ। পথের মধ্যে কথায় কথায় দশখানা হয়ে পড়ে।

৩। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। দশরথ। আমাদের লম্বু এক-একটা কথা বলে ভালো। দশরথ।

৫। সাধে বলি। ছেলের বিয়েতে ওই রথটা চেয়ে নিয়েছিলুম। যত চড়েছি তার চেয়ে টেনেছি অনেক বেশি।

৪। এক কাজ কর্। বিভূতিকে কাঁধে করে নিয়ে যাই।

বিভূতি। আরে কর কী। কর কী।

৫। না, না, এই তো চাই। উত্তরকূটের কোলে তোমার জন্ম, কিন্তু তুমি আজ তার ঘাড়ে চেপেছ। তোমার মাথা সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছে।

[কাঁধের উপর লাঠি সাজাইয়া তাহার উপর বিভূতিকে তুলিয়া লইল।

সকলে। জয় যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়।

গান

নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র।
তুমি চক্রমুখরমন্দ্রিত,
তুমি বজ্রবহ্নিবন্দিত,
তব বস্তুবিশ্ববক্ষোদংশ
ধ্বংস-বিকট দন্ত।

তব দীপ্ত অগ্নি শত শতঘ্নী
বিঘ্নবিজয় পন্থ।
তব লৌহগলন শৈলদলন
অচল-চলন মন্ত্র।
কভু কাষ্ঠলোষ্ট্রইষ্টকদৃঢ়
ঘনপিনদ্ধ কায়া,
কভু ভূতল-জল-অন্তরীক্ষ-
লঙ্ঘন লঘুমায়া,
তব খনি-খনিত্র-নখ-বিদীর্ণ
ক্ষিতি বিকীর্ণ-অন্ত্র,
তব পঞ্চভূত-বন্ধনকর
ইন্দ্রজাল তন্ত্র।

[বিভূতিকে লইয়া সকলে প্রস্থান করিল

উত্তরকূটের রাজা রণজিৎ ও তাঁহার মন্ত্রী শিবিরের দিক হইতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন

রণজিৎ। শিবতরাইয়ের প্রজাদের কিছুতেই তো বাধ্য করতে পারলে না। এতদিন পরে মুক্তধারার জলকে আয়ত্ত করে বিভূতি ওদের বশ মানাবার উপায় করে দিলে। কিন্তু মন্ত্রী তোমার তো তেমন উৎসাহ দেখছি নে। ঈর্ষা?

মন্ত্রী। ক্ষমা করবেন, মহারাজ। খন্তা-কোদাল হাতে মাটি-পাথরের সঙ্গে পালোয়ানি আমাদের কাজ নয়। রাষ্ট্রনীতি আমাদের অস্ত্র, মানুষের মন নিয়ে আমাদের কারবার। যুবরাজকে শিবতরাইয়ের শাসনভার দেবার মন্ত্রণা আমিই দিয়েছিলুম, তাতে যে বাঁধ বাঁধা হতে পারত সে কম নয়।

রণজিৎ। তাতে ফল হল কী? দুবছর খাজনা বাকি। এমনতরো দুর্ভিক্ষ তো সেখানে বারে বারেই ঘটে, তাই বলে রাজার প্রাপ্য তো বন্ধ হয় না।

মন্ত্রী। খাজনার চেয়ে দুর্মূল্য জিনিস আদায় হচ্ছিল, এমন সময় তাঁকে ফিরে আসতে আদেশ করলেন। রাজকার্যে ছোটোদের অবজ্ঞা করতে নেই। মনে রাখবেন, যখন অসহ্য হয় তখন দুঃখের জোরে ছোটোরা বড়োদের ছাড়িয়ে বড়ো হয়ে ওঠে।

রণজিৎ। তোমার মন্ত্রণার সুর ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। কতবার বলেছ উপরে চড়ে বসে নিচে চাপ দেওয়া সহজ, আর বিদেশী প্রজাদের সেই চাপে রাখাই রাজনীতি।— এ-কথা বল নি?

মন্ত্রী। বলেছিলুম। তখন অবস্থা অন্যরকম ছিল, আমার মন্ত্রণা সময়োচিত হয়েছিল। কিন্তু এখন—

রণজিৎ। যুবরাজকে শিবতরাইয়ে পাঠাবার ইচ্ছে আমার একেবারেই ছিল না।

মন্ত্রী। কেন মহারাজ?

রণজিৎ। যে প্রজারা দূরের লোক, তাদের কাছে গিয়ে ঘেঁষাঘেঁষি করলে তাদের ভয় ভেঙে যায়। প্রীতি দিয়ে পাওয়া যায় আপন লোককে, পরকে পাওয়া যায় ভয় জাগিয়ে রেখে।

মন্ত্রী। মহারাজ, যুবরাজকে শিবতরাইয়ে পাঠাবার আসল কারণটা ভুলছেন। কিছুদিন থেকে তাঁর মন অত্যন্ত উতলা দেখা গিয়েছিল। আমাদের সন্দেহ হল যে, তিনি হয়তো কোনো সূত্রে জানতে পেরেছেন যে তাঁর জন্ম রাজবাড়িতে নয়, তাঁকে মুক্তধারার ঝরনাতলা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া গেছে। তাই তাঁকে ভুলিয়ে রাখবার জন্যে—

রণজিৎ। তা তো জানি—ইদানীং ও যে প্রায় রাত্রে একলা ঝরনাতলায় গিয়ে শুয়ে থাকত। খবর পেয়ে একদিন রাত্রে সেখানে গেলুম, ওকে জিজ্ঞাসা করলুম, "কী হয়েছে অভিজিৎ, এখানে কেন?" ও বললে, "এই জলের শব্দে আমি আমার মাতৃভাষা শুনতে পাই।"

মন্ত্রী। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, "তোমার কী হয়েছে যুবরাজ? রাজবাড়িতে আজকাল তোমাকে প্রায় দেখতে পাই নে কেন?" তিনি বললেন, "আমি পৃথিবীতে এসেছি পথ কাটবার জন্যে, এই খবর আমার কাছে এসে পৌঁছেছে।"

রণজিৎ। ওই ছেলের যে রাজচক্রবর্তীর লক্ষণ আছে এ বিশ্বাস আমার ভেঙে যাচ্ছে।

মন্ত্রী। যিনি এই দৈবলক্ষণের কথা বলেছিলেন তিনি যে মহারাজের গুরুর গুরু অভিরামস্বামী।

রণজিৎ। ভুল করেছেন তিনি। ওকে নিয়ে কেবলই আমার ক্ষতি হচ্ছে। শিবতরাইয়ের পশম যাতে বিদেশের হাটে বেরিয়ে না যায় এইজন্যে পিতামহদের আমল থেকে নন্দিসংকটের পথ আটক করা আছে। সেই পথটাই অভিজিৎ কেটে দিলে। উত্তরকূটের অন্নবস্ত্র দুর্মূল্য হয়ে উঠবে যে।

মন্ত্রী। অল্প বয়স কিনা। যুবরাজ কেবল শিবতরাইয়ের দিক থেকেই—

রণজিৎ। কিন্তু এ যে নিজের লোকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। শিবতরাইয়ের ওই যে ধনঞ্জয় বৈরাগীটা প্রজাদের খেপিয়ে বেড়ায়, এর মধ্যে নিশ্চয় সেও আছে। এবার কণ্ঠিসুদ্ধ তার কণ্ঠটা চেপে ধরতে হবে। তাকে বন্দী করা চাই।

মন্ত্রী। মহারাজের ইচ্ছায় প্রতিবাদ করতে সাহস করি নে। কিন্তু জানেন তো এমন সব দুর্যোগ আছে যাকে আটকে রাখার চেয়ে ছাড়া রাখাই নিরাপদ।

রণজিৎ। আচ্ছা সেজন্যে চিন্তা ক'রো না।

মন্ত্রী। আমি চিন্তা করি না, মহারাজকেই চিন্তা করতে বলি।

প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতিহারী। মোহনগড়ের খুড়া মহারাজ বিশ্বজিৎ অদূরে। [প্রস্থান

রণজিৎ। ওই আর-একজন। অভিজিৎকে নষ্ট করার দলে উনি অগ্রগণ্য। আত্মীয়রূপী পর হচ্ছে কুঁজো মানুষের কুঁজ, পিছনে লেগেই থাকে, কেটেও ফেলা যায় না, বহন করাও দুঃখ।—ও কিসের শব্দ ?

মন্ত্রী। ভৈরবপন্থীর দল মন্দির প্রদক্ষিণে বেরিয়েছে।

ভৈরবপন্থীদের প্রবেশ ও গান

তিমির-হৃদবিদারণ
জলদগ্নি-নিদারুণ,
মরুশ্মশান-সঞ্চর,
শংকর শংকর।
বজ্রঘোষ-বাণী,
রুদ্র, শূলপাণি,
মৃত্যুসিন্ধু-সন্তর,
শংকর শংকর। [প্রস্থান

রণজিতের খুড়া মোহনগড়ের রাজা বিশ্বজিৎ প্রবেশ করিলেন

তাঁর শুভ্র কেশ, শুভ্র বস্ত্র, শুভ্র উষ্ণীষ

রণজিৎ। প্রণাম। খুড়া মহারাজ, তুমি আজ উত্তরভৈরবের মন্দিরে পূজায় যোগ দিতে আসবে এ সৌভাগ্য প্রত্যাশা করি নি।

বিশ্বজিৎ। উত্তরভৈরব আজকের পূজা গ্রহণ করবেন না এই কথা জানাতে এসেছি।

রণজিৎ। তোমার এই দুর্বাক্য আমাদের মহোৎসবকে আজ—

বিশ্বজিৎ। কী নিয়ে মহোৎসব ? বিশ্বের সকল তৃষিতের জন্যে দেবদেবের কমণ্ডলু যে জলধারা ঢেলে দিচ্ছেন সেই মুক্ত জলকে তোমরা বন্ধ করলে কেন ?

রণজিৎ। শত্রু দমনের জন্যে।

বিশ্বজিৎ। মহাদেবকে শত্রু করতে ভয় নেই?

রণজিৎ। যিনি উত্তরকূটের পুরদেবতা, আমাদের জয়ে তাঁরই জয়। সেইজন্তেই আমাদের পক্ষ নিয়ে তিনি তাঁর নিজের দান ফিরিয়ে নিয়েছেন। তৃষ্ণার শূলে শিবতরাইকে বিদ্ধ করে তাকে তিনি উত্তরকূটের সিংহাসনের তলায় ফেলে দিয়ে যাবেন।

বিশ্বজিৎ। তবে তোমাদের পূজা পূজাই নয়, বেতন।

রণজিৎ। খুড়া মহারাজ, তুমি পরের পক্ষপাতী, আত্মীয়ের বিরোধী। তোমার শিক্ষাতেই অভিজিৎ নিজের রাজ্যকে নিজের বলে গ্রহণ করতে পারছে না।

বিশ্বজিৎ। আমার শিক্ষায়? একদিন আমি তোমাদেরই দলে ছিলেম না? চণ্ডপত্তনে যখন তুমি বিদ্রোহ সৃষ্টি করেছিলে সেখানকার প্রজার সর্বনাশ করে সে বিদ্রোহ আমি দমন করি নি? শেষে কখন ওই বালক অভিজিৎ আমার হৃদয়ের মধ্যে এল— আলোর মতো এল। অন্ধকারে না দেখতে পেয়ে যাদের আঘাত করেছিলুম তাদের আপন বলে দেখতে পেলুম। রাজচক্রবর্তীর লক্ষণ দেখে যাকে গ্রহণ করলে তাকে তোমার ওই উত্তরকূটের সিংহাসনটুকুর মধ্যেই আটকে রাখতে চাও?

রণজিৎ। মুক্তধারার ঝরনাতলায় অভিজিৎকে কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছিল এ-কথা তুমিই ওর কাছে প্রকাশ করেছ বুঝি?

বিশ্বজিৎ। হাঁ, আমিই। সেদিন আমাদের প্রাসাদে ওর দেয়ালির নিমন্ত্রণ ছিল। গোধূলির সময় দেখি অলিন্দে ও একলা দাঁড়িয়ে গৌরীশিখরের দিকে তাকিয়ে আছে। জিজ্ঞাসা করলুম, "কী দেখছ, ভাই?" সে বললে, "যে-সব পথ এখনও কাটা হয় নি ওই দুর্গম পাহাড়ের উপর দিয়ে সেই ভাবীকালের পথ দেখতে পাচ্ছি—দূরকে নিকট করবার পথ।" শুনে তখনই মনে হল, মুক্তধারার উৎসের কাছে কোন্ ঘরছাড়া মা ওকে জন্ম দিয়ে গেছে, ওকে ধরে রাখবে কে? আর থাকতে পারলুম না, ওকে বললুম, "ভাই, তোমার জন্মক্ষণে গিরিরাজ তোমাকে পথে অভ্যর্থনা করেছেন,—ঘরের শঙ্খ তোমাকে ঘরে ডাকে নি।"

রণজিৎ। এতক্ষণে বুঝলুম।

বিশ্বজিৎ। কী বুঝলে?

রণজিৎ। এই কথা শুনেই উত্তরকূটের রাজগৃহ থেকে অভিজিতের মমতা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সেইটেই স্পর্ধা করে দেখাবার জন্তে নন্দিসংকটের পথ সে খুলে দিয়েছে।

বিশ্বজিৎ। ক্ষতি কী হয়েছে? যে পথ খুলে যায় সে পথ সকলেরই—যেমন উত্তরকূটের তেমনি শিবতরাইয়ের।

রণজিৎ। খুড়া মহারাজ, তুমি আত্মীয়, গুরুজন, তাই এতকাল ধৈর্য রেখেছি। কিন্তু আর নয়, স্বজনবিদ্রোহী তুমি, এ রাজ্য ত্যাগ করে যাও।

বিশ্বজিৎ। আমি ত্যাগ করতে পারব না। তোমরা আমাকে ত্যাগ যদি কর তবে সহ্য করব। [প্রস্থান

অম্বার প্রবেশ

অম্বা। (রাজার প্রতি) ওগো তোমরা কে? সূর্য তো অস্ত যায়—আমার সুমন তো এখনও ফিরল না।

রণজিৎ। তুমি কে?

অম্বা। আমি কেউ না। যে আমার সব ছিল তাকে এই পথ দিয়ে নিয়ে গেল। এ পথের শেষ কি নেই? সুমন কি তবে এখনও চলেছে, কেবলই চলেছে, পশ্চিমে গৌরীশিখর পেরিয়ে যেখানে সূর্য ডুবছে, আলো ডুবছে, সব ডুবছে?

রণজিৎ। মন্ত্রী, এ বুঝি—

মন্ত্রী। হাঁ মহারাজ, সেই বাঁধ বাঁধার কাজেই—

রণজিৎ। (অম্বাকে) তুমি খেদ ক'রো না। আমি জানি, পৃথিবীতে সকলের চেয়ে চরম যে দান তোমার ছেলে আজ তাই পেয়েছে।

অম্বা। তাই যদি সত্যি হবে তাহলে সে-দান সন্ধ্যেবেলায় সে আমার হাতে এনে দিত, আমি যে তার মা।

রণজিৎ। দেবে এনে। সেই সন্ধ্যে এখনও আসে নি।

অম্বা। তোমার কথা সত্যি হ'ক, বাবা। ভৈরবমন্দিরের পথে পথে আমি তার জন্যে অপেক্ষা করব। সুমন। [প্রস্থান

একদল ছাত্র লইয়া অদূরে গাছের তলায় উত্তরকূটের গুরুমশায় প্রবেশ করিল

গুরু। খেলে, খেলে, বেত খেলে দেখছি। খুব গলা ছেড়ে বল্, জয় রাজরাজেশ্বর।

ছাত্রগণ। জয় রাজরা—

গুরু। (হাতের কাছে দুই একটা ছেলেকে থাবড়া মারিয়া)—জেশ্বর।

ছাত্রগণ। জেশ্বর।

গুরু। শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী—

ছাত্রগণ। শ্রী শ্রী শ্রী—

গুরু। (ঠেলা মারিয়া) পাঁচবার।

ছাত্রগণ। পাঁচবার।

গুরু। লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর। বল্‌ শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী—

ছাত্রগণ। শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী—

গুরু। উত্তরকূটাধিপতির জয়—

ছাত্রগণ। উত্তরকূটা—

গুরু। —ধিপতির

ছাত্রগণ। ধিপতির

গুরু। জয়।

ছাত্রগণ। জয়।

রণজিৎ। তোমরা কোথায় যাচ্ছ?

গুরু। আমাদের যন্ত্ররাজ বিভূতিকে মহারাজ শিরোপা দেবেন তাই ছেলেদের নিয়ে যাচ্ছি আনন্দ করতে। যাতে উত্তরকূটের গৌরবে এরা শিশুকাল হতেই গৌরব করতে শেখে তার কোনো উপলক্ষ্যই বাদ দিতে চাই নে।

রণজিৎ। বিভূতি কি করেছে এরা সবাই জানে তো?

ছেলেরা। (লাফাইয়া হাততালি দিয়া) জানি, শিবতরাইয়ের খাবার জল বন্ধ করে দিয়েছেন।

রণজিৎ। কেন দিয়েছেন?

ছেলেরা। (উৎসাহে) ওদের জব্দ করার জন্যে।

রণজিৎ। কেন জব্দ করা?

ছেলেরা। ওরা যে খারাপ লোক।

রণজিৎ। কেন খারাপ?

ছেলেরা। ওরা খুব খারাপ, ভয়ানক খারাপ, সবাই জানে।

রণজিৎ। কেন খারাপ তা জান না?

গুরু। জানে বই কি, মহারাজ। কী রে, তোরা পড়িস নি—বইয়ে পড়িস নি—ওদের ধর্ম খুব খারাপ—

ছেলেরা। হাঁ, হাঁ, ওদের ধর্ম খুব খারাপ।

গুরু। আর ওরা আমাদের মতো—কী বল্‌ না—(নাক দেখাইয়া)

ছেলেরা। নাক উঁচু নয়।

গুরু। আচ্ছা, আমাদের গণাচার্য কী প্রমাণ করে দিয়েছেন—নাক উঁচু থাকলে কী হয়?

ছেলেরা। খুব বড়ো জাত হয়।

গুরু। তারা কী করে? বল্ না—পৃথিবীতে—বল্—তারাই সকলের উপর জয়ী হয়, না?

ছেলেরা। হাঁ, জয়ী হয়।

গুরু। উত্তরকূটের মানুষ কোনোদিন যুদ্ধে হেরেছে জানিস?

ছেলেরা। কোনোদিনই না।

গুরু। আমাদের পিতামহ-মহারাজ প্রাগ্‌জিৎ দু-শ তিরেনব্বই জন সৈন্য নিয়ে একত্রিশ হাজার সাড়ে সাত-শ দক্ষিণী বর্বরদের হটিয়ে দিয়েছিলেন না?

ছেলেরা। হাঁ দিয়েছিলেন।

গুরু। নিশ্চয়ই জানবেন, মহারাজ, উত্তরকূটের বাইরে যে হতভাগারা মাতৃগর্ভে জন্মায়, একদিন এইসব ছেলেরাই তাদের বিভীষিকা হয়ে উঠবে। এ যদি না হয় তবে আমি মিথ্যে গুরু। কতবড়ো দায়িত্ব যে আমাদের সে আমি একদণ্ডও ভুলি নে। আমরাই তো মানুষ তৈরি করে দিই, আপনার অমাত্যরা তাঁদের নিয়ে ব্যবহার করেন। অথচ তাঁরাই বা কী পান আর আমরাই বা কী পাই তুলনা করে দেখবেন।

মন্ত্রী। কিন্তু ওই ছাত্ররাই যে তোমাদের পুরস্কার।

গুরু। বড়ো সুন্দর বলেছেন, মন্ত্রীমশায়, ছাত্ররাই আমাদের পুরস্কার। আহা, কিন্তু খাদ্যসামগ্রী বড়ো দুর্মূল্য—এই দেখেন না কেন, গব্যঘৃত, যেটা ছিল—

মন্ত্রী। আচ্ছা বেশ, তোমার এই গব্যঘৃতের কথাটা চিন্তা করব। এখন যাও, পূজার সময় নিকট হল।

[জয়ধ্বনি করাইয়া ছাত্রদের লইয়া গুরুমশায় প্রস্থান করিল।

রণজিৎ। তোমার এই গুরুর মাথার খুলির মধ্যে অন্য কোনো ঘৃত নেই, গব্যঘৃতই আছে।

মন্ত্রী। পঞ্চগব্যের একটা কিছু আছেই। কিন্তু, মহারাজ, এইসব মানুষই কাজে লাগে। ওকে যেমনটি বলে দেওয়া গেছে, দিনের পর দিন ও ঠিক তেমনিটি করে চলেছে। বুদ্ধি বেশি থাকলে কাজ কলের মতো চলে না।

রণজিৎ। মন্ত্রী, ওটা কী, আকাশে?

মন্ত্রী। মহারাজ, ভুলে যাচ্ছেন, ওটাই তো বিভূতির সেই যন্ত্রের চূড়া।

রণজিৎ। এমন স্পষ্ট তো কোনোদিন দেখা যায় না।

মন্ত্রী। আজ সকালে ঝড় হয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে, তাই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

রণজিৎ। দেখেছ, ওর পিছন থেকে সূর্য যেন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। আর ওটাকে দানবের উদ্যত মুষ্টির মতো দেখাচ্ছে। অতটা বেশি উঁচু করে তোলা ভালো হয় নি।

মন্ত্রী। আমাদের আকাশের বুকে যেন শেল বিঁধে রয়েছে মনে হচ্ছে।

রণজিৎ। এখন মন্দিরে যাবার সময় হল। [উভয়ের প্রস্থান

উত্তরকূটের দ্বিতীয়দল নাগরিকের প্রবেশ

১। দেখলি তো, আজকাল বিভূতি আমাদের কী রকম এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। ও যে আমাদের মধ্যেই মানুষ সে কথাটাকে চামড়ার থেকে ঘষে ফেলতে চায়। একদিন বুঝতে পারবেন খাপের চেয়ে তলোয়ার বড়ো হয়ে উঠলে ভালো হয় না।

২। তা যা বলিস, ভাই, বিভূতি উত্তরকূটের নাম রেখেছে বটে।

১। আরে রেখে দে, তোরা ওকে নিয়ে বড়ো বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছিস। ওই যে বাঁধটি বাঁধতে ওর জিব বেরিয়ে পড়েছে ওটা কিছু না হবে তো দশবার ভেঙেছে।

৩। আবার যে ভাঙবে না তাই বা কে জানে?

১। দেখেছিস তো বাঁধের উত্তর দিকের সেই ঢিবিটা?

২। কেন, কেন, কী হয়েছে?

১। কী হয়েছে? এটা জানিস নে? যে দেখছে সেই তো বলছে—

২। কী বলছে ভাই?

১। কী বলছে? ন্যাকা নাকি রে? এও আবার জিগ্‌গেস করতে হয় নাকি? আগাগোড়াই—সে আর কী বলব।

২। তবু ব্যাপারটা কী একটু বুঝিয়ে বল্‌ না—

১। রঞ্জন, তুই অবাক করলি। একটু সবুর কর্‌ না, পষ্ট বুঝবি হঠাৎ যখন একেবারে—

২। সর্বনাশ। বলিস কী দাদা? হঠাৎ একেবারে?

১। হাঁ ভাই, ঝগড়ুর কাছে শুনে নিস। সে নিজে মেপে জুখে দেখে এসেছে।

২। ঝগড়ুর ওই গুণটি আছে, ওর মাথা ঠাণ্ডা। সবাই যখন বাহবা দিতে থাকে, ও তখন কোথা থেকে মাপকাটি বের করে বসে।

৩। আচ্ছা ভাই, কেউ কেউ যে বলে বিভূতির যা কিছু বিদ্যে সব—

১। আমি নিজে জানি বেঙ্কটবর্মার কাছ থেকে চুরি। হাঁ, সে ছিল বটে গুণীর মতো গুণী—কত বড়ো মাথা—ওরে বাস রে! অথচ বিভূতি পায় শিরোপা, আর সে গরিব না খেতে পেয়েই মারা গেল।

৩। শুধুই কি না খেতে পেয়ে?

১। আরে না খেতে পেয়ে কি কার হাতের দেওয়া কী খেতে পেয়ে সে কথায় কাজ কী? আবার কে কোন্ দিক থেকে—নিন্দুকের তো অভাব নেই। এ দেশের মানুষ যে কেউ কারও ভালো সইতে পারে না।

২। তা তোরা যাই বলিস লোকটা কিন্তু—

১। আহা, তা হবে না কেন? কোন্ মাটিতে ওর জন্ম, বুঝে দেখ্‌। ওই চবুয়া গাঁয়ে আমার বুড়ো দাদা ছিল, তার নাম শুনেছিস তো?

২। আরে বাস রে! তাঁর নাম উত্তরকূটের কে না জানে? তিনি তো সেই—ওই যে কী বলে—

১। হাঁ, হাঁ, ভাস্কর। নস্যি তৈরি করার এত বড়ো ওস্তাদ এ মুলুকে হয় নি। তাঁর হাতের নস্যি না হলে রাজা শত্রুজিতের একদিনও চলত না।

৩। সে সব কথা হবে, এখন মন্দিরে চল্‌। আমরা হলুম বিভূতির এক গাঁয়ের লোক—আমাদের হাতের মালা আগে নিয়ে তবে অন্য কথা। আর আমরাই তো বসব তার ডাইনে।

নেপথ্যে। যেয়ো না ভাই, যেয়ো না, ফিরে যাও।

২। ওই শোনো বটুক বুড়ো বেরিয়েছে।

বটুকের প্রবেশ

গায়ে ছেঁড়া কম্বল, হাতে বাঁকা ডালের লাঠি, চুল উস্কোখুস্কো

১। কী বটু, যাচ্ছ কোথায়?

বটু। সাবধান, বাবা, সাবধান। যেয়ো না ও পথে, সময় থাকতে ফিরে যাও।

২। কেন বলো তো?

বটু। বলি দেবে, নরবলি। আমার দুই জোয়ান নাতিকে জোর করে নিয়ে গেল, আর তারা ফিরল না।

৩। বলি কার কাছে দেবে, খুড়ো?

বটু। তৃষ্ণা, তৃষ্ণা দানবীর কাছে।

২। সে আবার কে?

বটু। সে যত খায় তত চায়—তার শুষ্ক রসনা ঘি-খাওয়া আগুনের শিখার মতো কেবলই বেড়ে চলে।

১। পাগলা! আমরা তো যাচ্ছি উত্তর-ভৈরবের মন্দিরে, সেখানে তৃষ্ণা দানবী কোথায়?

বটু। খবর পাও নি? ভৈরবকে যে আজ ওরা মন্দির থেকে বিদায় করতে চলেছে। তৃষ্ণা বসবে বেদীতে।

২। চুপ চুপ পাগলা। এসব কথা শুনলে উত্তরকূটের মানুষ তোকে কুটে ফেলবে।

বটু। তারা তো আমার গায়ে ধুলো দিচ্ছে, ছেলেরা মারছে ঢেলা। সবাই বলে তোর নাতি দুটো প্রাণ দিয়েছে সে তাদের সৌভাগ্য।

১। তারা তো মিথ্যে বলে না।

বটু। বলে না মিথ্যে? প্রাণের বদলে প্রাণ যদি না মেলে, মৃত্যু দিয়ে যদি মৃত্যুকেই ডাকা হয়, তবে ভৈরব এত বড়ো ক্ষতি সইবেন কেন? সাবধান, বাবা, সাবধান, যেয়ো না ও পথে। [প্রস্থান

২। দেখো, দাদা, আমার গায়ে কিন্তু কাঁটা দিয়ে উঠছে।

১। মধু, তুই বেজায় ভীতু। চল্ চল্। [সকলের প্রস্থান

যুবরাজ অভিজিৎ ও রাজকুমার সঞ্জয়ের প্রবেশ

সঞ্জয়। বুঝতে পারছি নে, যুবরাজ, রাজবাড়ি ছেড়ে কেন বেরিয়ে যাচ্ছ?

অভিজিৎ। সব কথা তুমি বুঝবে না। আমার জীবনের স্রোত রাজবাড়ির পাথর ডিঙিয়ে চলে যাবে এই কথাটা কানে নিয়েই পৃথিবীতে এসেছি।

সঞ্জয়। কিছু দিন থেকেই তোমাকে উতলা দেখছি। আমাদের সঙ্গে তুমি যে বাঁধনে বাঁধা সেটা তোমার মনের মধ্যে আলগা হয়ে আসছিল। আজ কি সেটা ছিঁড়ল।

অভিজিৎ। ওই দেখো সঞ্জয়, গৌরীশিখরের উপর সূর্যাস্তের মূর্তি। কোন্ আগুনের পাখি মেঘের ডানা মেলে রাত্রির দিকে উড়ে চলেছে। আমার এই পথযাত্রার ছবি অস্তসূর্য আকাশে এঁকে দিলে।

সঞ্জয়। দেখছ না, যুবরাজ, ওই যন্ত্রের চূড়াটা সূর্যাস্ত-মেঘের বুক ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেন উড়ন্ত পাখির বুকে বাণ বিঁধেছে, সে তার ডানা ঝুলিয়ে রাত্রির গহ্বরের দিকে পড়ে যাচ্ছে। আমার এ ভালো লাগছে না। এখন বিশ্রামের সময় এল। চলো, যুবরাজ, রাজবাড়িতে।

অভিজিৎ। যেখানে বাধা সেখানে কি বিশ্রাম আছে?

সঞ্জয়। রাজবাড়িতে যে তোমার বাধা, এতদিন পরে সে কথা তুমি কি করে বুঝলে?

অভিজিৎ। বুঝলুম, যখন শোনা গেল মুক্তধারায় ওরা বাঁধ বেঁধেছে।

সঞ্জয়। তোমার এ কথার অর্থ আমি পাই নে।

অভিজিৎ। মানুষের ভিতরকার রহস্য বিধাতা বাইরের কোথাও না কোথাও লিখে রেখে দেন; আমার অন্তরের কথা আছে ওই মুক্তধারার মধ্যে। তারই পায়ে ওরা যখন লোহার বেড়ি পরিয়ে দিলে তখন হঠাৎ যেন চমক ভেঙে বুঝতে পারলুম উত্তরকূটের সিংহাসনই আমার জীবন-স্রোতের বাঁধ। পথে বেরিয়েছি তারই পথ খুলে দেবার জন্যে।

সঞ্জয়। যুবরাজ, আমাকেও তোমার সঙ্গী করে নাও।

অভিজিৎ। না ভাই, নিজের পথ তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে। আমার পিছনে যদি চল তাহলে আমিই তোমার পথকে আড়াল করব।

সঞ্জয়। তুমি অত কঠোর হ'য়ো না, আমাকে বাজছে।

অভিজিৎ। তুমি আমার হৃদয় জান, সেইজন্যে আঘাত পেয়েও তুমি আমাকে বুঝবে।

সঞ্জয়। কোথায় তোমার ডাক পড়েছে তুমি চলেছ, তা নিয়ে আমি প্রশ্ন করতে চাই নে। কিন্তু যুবরাজ, এই যে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, রাজবাড়িতে ওই যে বন্দীরা দিনাবসানের গান ধরলে, এরও কি কোনো ডাক নেই? যা কঠিন তার গৌরব থাকতে পারে, কিন্তু যা মধুর তারও মূল্য আছে।

অভিজিৎ। ভাই, তারই মূল্য দেবার জন্যেই কঠিনের সাধনা।

সঞ্জয়। সকালে যে আসনে তুমি পূজায় বস, মনে আছে তো সেদিন তার সামনে একটি শ্বেত পদ্ম দেখে তুমি অবাক হয়েছিলে? তুমি জাগবার আগেই কোন্ ভোরে ওই পদ্মটি লুকিয়ে কে তুলে এনেছে, জানতে দেয় নি সে কে—কিন্তু এইটুকুর মধ্যে কত সুধাই আছে সে কথা কি আজ মনে করবার নেই? সেই ভীরু, যে আপনাকে গোপন করেছে, কিন্তু আপনার পূজা গোপন করতে পারে নি, তার মুখ তোমার মনে পড়ছে না?

অভিজিৎ। পড়ছে বই কি। সেইজন্যেই সইতে পারছি নে ওই বীভৎসটাকে যা এই ধরণীর সংগীত রোধ করে দিয়ে আকাশে লোহার দাঁত মেলে অট্টহাস্য করছে। স্বর্গকে ভালো লেগেছে বলেই দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করতে যেতে দ্বিধা করি নে।

সঞ্জয়। গোধূলির আলোটি ওই নীল পাহাড়ের উপরে মূর্ছিত হয়ে রয়েছে, এর মধ্যে দিয়ে একটা কান্নার মূর্তি তোমার হৃদয়ে এসে পৌঁছচ্ছে না?

অভিজিৎ। হাঁ, পৌঁছচ্ছে। আমারও বুক কান্নায় ভরে রয়েছে। আমি কঠোরতার অভিমান রাখি নে।—চেয়ে দেখো ওই পাখি দেবদারু-গাছের চূড়ার ডালটির উপর একলা বসে আছে; ও কি নীড়ে যাবে, না, অন্ধকারের ভিতর দিয়ে দূর প্রবাসের অরণ্যে

যাত্রা করবে জানি নে; কিন্তু ও যে এই সূর্যাস্তের আকাশের দিকে চুপ করে চেয়ে আছে সেই চেয়ে থাকার সুরটি আমার হৃদয়ে এসে বাজছে, সুন্দর এই পৃথিবী। যা কিছু আমার জীবনকে মধুময় করেছে সে সমস্তকেই আজ আমি নমস্কার করি।

বটুর প্রবেশ

বটু। যেতে দিলে না, মেরে ফিরিয়ে দিলে।

অভিজিৎ। কি হয়েছে, বটু, তোমার কপাল ফেটে রক্ত পড়ছে যে।

বটু। আমি সকলকে সাবধান করতে বেরিয়েছিলুম, বলছিলুম, "যেয়ো না ও পথে, ফিরে যাও।"

অভিজিৎ। কেন, কী হয়েছে?

বটু। জান না, যুবরাজ? ওরা যে আজ যন্ত্রবেদীর উপর তৃষ্ণারাক্ষসীর প্রতিষ্ঠা করবে। মানুষ-বলি চায়।

সঞ্জয়। সে কী কথা?

বটু। সেই বেদী গাঁথবার সময় আমার দুই নাতির রক্ত ঢেলে দিয়েছে। মনে করেছিলুম পাপের বেদী আপনি ভেঙে পড়ে যাবে। কিন্তু এখনও তো ভাঙল না, ভৈরব তো জাগলেন না।

অভিজিৎ। ভাঙবে। সময় এসেছে।

বটু। (কাছে আসিয়া চুপে চুপে) তবে শুনেছ বুঝি? ভৈরবের আহ্বান শুনেছ?

অভিজিৎ। শুনেছি।

বটু। সর্বনাশ। তবে তো তোমার নিষ্কৃতি নেই।

অভিজিৎ। না, নেই।

বটু। এই দেখছ না, আমার মাথা দিয়ে রক্ত পড়ছে, সর্বাঙ্গে ধুলো। সইতে পারবে কি, যুবরাজ, যখন বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে যাবে!

অভিজিৎ। ভৈরবের প্রসাদে সইতে পারব।

বটু। চারিদিকে সবাই যখন শত্রু হবে? আপন লোক যখন ধিক্‌কার দেবে?

অভিজিৎ। সইতেই হবে।

বটু। তাহলে ভয় নেই?

অভিজিৎ। না ভয় নেই।

বটু। বেশ বেশ। তাহলে বটুকে মনে রেখো। আমিও ওই পথে। ভৈরব আমার কপালে এই যে রক্ততিলক এঁকে দিয়েছেন তার থেকে অন্ধকারেও আমাকে চিনতে পারবে। [বটুর প্রস্থান

রাজপ্রহরী উদ্ধবের প্রবেশ

উদ্ধব। নন্দিসংকটের পথ কেন খুলে দিলে যুবরাজ ?

অভিজিৎ। শিবতরাইয়ের লোকদের নিত্যদুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচাবার জন্যে।

উদ্ধব। মহারাজ তো তাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত, তাঁর তো দয়ামায়া আছে।

অভিজিৎ। ডান-হাতের কার্পণ্য দিয়ে পথ বন্ধ করে বাঁ-হাতের বদান্যতায় বাঁচানো যায় না। তাই ওদের অন্ন-চলাচলের পথ খুলে দিয়েছি। দয়ার উপর নির্ভর করার দীনতা আমি দেখতে পারি নে।

উদ্ধব। মহারাজ বলেন, নন্দিসংকটের গড় ভেঙে দিয়ে তুমি উত্তরকূটের ভোজন-পাত্রের তলা খসিয়ে দিয়েছ।

অভিজিৎ। চিরদিন শিবতরাইয়ের অন্নজীবী হয়ে থাকবার দুর্গতি থেকে উত্তর-কূটকে মুক্তি দিয়েছি।

উদ্ধব। দুঃসাহসের কাজ করেছ। মহারাজ খবর পেয়েছেন এর বেশি আর কিছু বলতে পারব না। যদি পার তো এখনই চলে যাও। পথে দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে কথা কওয়াও নিরাপদ নয়। [উদ্ধবের প্রস্থান

অম্বার প্রবেশ

অম্বা। সুমন। বাবা সুমন। যে পথ দিয়ে তাকে নিয়ে গেল সে পথ দিয়ে তোমরা কি কেউ যাও নি ?

অভিজিৎ। তোমার ছেলেকে নিয়ে গেছে ?

অম্বা। হাঁ, ওই পশ্চিমে, যেখানে সূয্যি ডোবে, যেখানে দিন ফুরোয়।

অভিজিৎ। ওই পথেই আমি যাব।

অম্বা। তাহলে দুঃখিনীর একটা কথা রেখো—যখন তার দেখা পাবে, ব'লো মা তার জন্যে পথ চেয়ে আছে।

অভিজিৎ। বলব।

অম্বা। বাবা, তুমি চিরজীবী হও। সুমন, আমার সুমন। [প্রস্থান

ভৈরবপন্থীদের প্রবেশ

গান

জয় ভৈরব, জয় শংকর,
জয় জয় জয় প্রলয়ংকর।
জয় সংশয়-ভেদন জয় বন্ধন-ছেদন
জয় সংকট-সংহর,
শংকর, শংকর। [প্রস্থান

সেনাপতি বিজয়পালের প্রবেশ

বিজয়পাল। যুবরাজ, রাজকুমার, আমার বিনীত অভিবাদন গ্রহণ করুন। মহারাজের কাছ থেকে আসছি।

অভিজিৎ। কী তাঁর আদেশ?

বিজয়পাল। গোপনে বলব।

সঞ্জয়। (অভিজিতের হাত চাপিয়া ধরিয়া) গোপন কেন? আমার কাছেও গোপন?

বিজয়পাল। সেই তো আদেশ। যুবরাজ একবার রাজশিবিরে পদার্পণ করুন।

সঞ্জয়। আমিও সঙ্গে যাব।

বিজয়পাল। মহারাজ তা ইচ্ছা করেন না।

সঞ্জয়। আমি তবে এই পথেই অপেক্ষা করব।

[অভিজিৎকে লইয়া বিজয়পাল শিবিরের দিকে প্রস্থান করিল

বাউলের প্রবেশ

গান

ও তো আর ফিরবে না রে, ফিরবে না আর, ফিরবে না রে।
ঝড়ের মুখে ভাসল তরী
কূলে আর ভিড়বে না রে।
কোন্ পাগলে নিল ডেকে,
কাঁদন গেল পিছে রেখে,
ওকে তোর বাহুর বাঁধন ঘিরবে না রে। [প্রস্থান

ফুলওয়ালীর প্রবেশ

ফুলওয়ালী। বাবা, উত্তরকূটের বিভূতি মানুষটি কে?

সঞ্জয়। কেন, তাকে তোমার কী প্রয়োজন?

ফুলওয়ালী। আমি বিদেশী, দেওতলি থেকে আসছি। শুনেছি উত্তরকূটের সবাই তাঁর পথে পথে পুষ্পবৃষ্টি করছে। সাধুপুরুষ বুঝি? বাবার দর্শন করব বলে নিজের মালঞ্চের ফুল এনেছি।

সঞ্জয়। সাধুপুরুষ না হ'ক, বুদ্ধিমান পুরুষ বটে।

ফুলওয়ালী। কী কাজ করেছেন তিনি?

সঞ্জয়। আমাদের ঝরনাটাকে বেঁধেছেন।

ফুলওয়ালী। তাই পুজো? বাঘে কি দেবতার কাজ হবে?

সঞ্জয়। না, দেবতার হাতে বেড়ি পড়বে।

ফুলওয়ালী। তাই পুষ্পবৃষ্টি? বুঝলুম না।

সঞ্জয়। না বোঝাই ভালো। দেবতার ফুল অপাত্রে নষ্ট ক'রো না, ফিরে যাও।— শোনো, শোনো, আমাকে তোমার ওই শ্বেতপদ্মটি বেচবে?

ফুলওয়ালী। সাধুকে দেব মনন করে যে ফুল এনেছিলুম সে তো বেচতে পারব না।

সঞ্জয়। আমি যে-সাধুকে সব চেয়ে ভক্তি করি তাঁকেই দেব।

ফুলওয়ালী। তবে এই নাও। না, মূল্য নেব না। বাবাকে আমার প্রণাম জানিয়ো। ব'লো আমি দেওতলির দুখনী ফুলওয়ালী। [প্রস্থান

বিজয়পালের প্রবেশ

সঞ্জয়। দাদা কোথায়?

বিজয়পাল। শিবিরে তিনি বন্দী।

সঞ্জয়। যুবরাজ বন্দী! এ কী স্পর্ধা।

বিজয়পাল। এই দেখো মহারাজের আদেশপত্র।

সঞ্জয়। এ কার ষড়যন্ত্র? তাঁর কাছে আমাকে একবার যেতে দাও।

বিজয়পাল। ক্ষমা করবেন।

সঞ্জয়। আমাকেও বন্দী করো, আমি বিদ্রোহী।

বিজয়পাল। আদেশ নেই।

সঞ্জয়। আচ্ছা, আদেশ নিতে এখনই চল্লুম। (কিছু দূরে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া) বিজয়পাল, এই পদ্মটি আমার নাম করে দাদাকে দিয়ো। [উভয়ের প্রস্থান

শিবতরাইয়ের বৈরাগী ধনঞ্জয়ের প্রবেশ[১]

গান

আমি মায়ের সাগর পাড়ি দেব
বিষম ঝড়ের বায়ে
আমার ভয়-ভাঙা এই নায়ে।
মাভৈঃ বাণীর ভরসা নিয়ে
ছেঁড়াপালে বুক ফুলিয়ে

১ এই নাটকের পাত্র ধনঞ্জয় ও তাহার কথোপকথনের অনেকটা অংশ "প্রায়শ্চিত্ত" নামক আমার একটি নাটক হইতে লওয়া। সেই নাটক এখন হইতে পনেরো বছরেরও পূর্বে লিখিত।

তোমার ওই পারেতেই যাবে তরী
ছায়াবটের ছায়ে।
পথ আমারে সেই দেখাবে
যে আমারে চায়—
আমি অভয়মনে ছাড়ব তরী
এই শুধু মোর দায়।
দিন ফুরোলে জানি জানি
পৌঁছে ঘাটে দেব আনি
আমার দুঃখদিনের রক্তকমল
তোমার করুণ পায়ে।

শিবতরাইয়ের একদল প্রজার প্রবেশ

ধনঞ্জয়। একেবারে মুখ চুন যে! কেন রে, কী হয়েছে?

১। প্রভু, রাজশ্যালক চণ্ডপালের মার তো সহ্য হয় না। সে আমাদের যুবরাজকেই মানে না, সেইটেতেই আরও অসহ্য হয়।

ধনঞ্জয়। ওরে আজও মারকে জিততে পারলি নে? আজও লাগে?

২। রাজার দেউড়িতে ধরে নিয়ে মার। বড়ো অপমান।

ধনঞ্জয়। তোদের মানকে নিজের কাছে রাখিস নে; ভিতরে যে ঠাকুরটি আছেন তাঁরই পায়ের কাছে রেখে আয়, সেখানে অপমান পৌঁছোবে না।

গণেশ সর্দারের প্রবেশ

গণেশ। আর সহ্য হয় না, হাত দুটো নিশপিশ করছে।

ধনঞ্জয়। তাহলে হাত দুটো বেহাত হয়েছে বল্।

গণেশ। ঠাকুর, একবার হুকুম করো ওই যণ্ডামার্ক চণ্ডপালের দণ্ডটা খসিয়ে নিয়ে মার কাকে বলে একবার দেখিয়ে দিই।

ধনঞ্জয়। মার কাকে না বলে তা দেখাতে পারিস নে? জোর বেশি লাগে বুঝি? ঢেউকে বাড়ি মারলে ঢেউ থামে না, হালটাকে স্থির করে রাখলে ঢেউ জয় করা যায়।

৪। তাহলে কী করতে বল?

ধনঞ্জয়। মার জিনিসটাকেই একেবারে গোড়া ঘেঁষে কোপ লাগাও।

৩। সেটা কী করে হবে প্রভু?

ধনঞ্জয়। মাথা তুলে যেমনি বলতে পারবি লাগছে না, অমনি মারের শিকড় যাবে কাটা।

২। লাগছে না বলা যে শক্ত।

ধনঞ্জয়। আসল মানুষটি যে, তার লাগে না, সে যে আলোর শিখা। লাগে জন্তুটার, সে যে মাংস, মার খেয়ে কেঁই কেঁই করে মরে। হাঁ করে রইলি যে? কথাটা বুঝলি নে?

২। তোমাকেই আমরা বুঝি, কথা তোমার নাই বা বুঝলুম।

ধনঞ্জয়। তাহলেই সর্বনাশ হয়েছে।

গণেশ। কথা বুঝতে সময় লাগে, সে তর সয় না; তোমাকে বুঝে নিয়েছি, তাতেই সকাল-সকাল তরে যাব।

ধনঞ্জয়। তার পরে বিকেল যখন হবে। তখন দেখবি কূলের কাছে তরী এসে ডুবেছে। যে কথাটা পাকা, সেটাকে ভিতর থেকে পাকা করে না যদি বুঝিস তো মজবি।

গণেশ। ও কথা ব'লো না, ঠাকুর। তোমার চরণাশ্রয় যখন পেয়েছি তখন যে করে হ'ক বুঝেছি।

ধনঞ্জয়। বুঝিস নি যে তা আর বুঝতে বাকি নেই। তোদের চোখ রয়েছে রাঙিয়ে, তোদের গলা দিয়ে স্বর বেরোল না। একটু স্বর ধরিয়ে দেব?

গান

আরো, আরো, প্রভু, আরো, আরো।
এমনি করেই মারো, মারো।

ওরে ভীতু, মার এড়াবার জন্যেই তোরা হয় মরতে নয় পালাতে থাকিস, দুটো একই কথা। দুটোতেই পশুর দলে ভেড়ায়, পশুপতির দেখা মেলে না।

লুকিয়ে থাকি আমি পালিয়ে বেড়াই,
ভয়ে ভয়ে কেবল তোমায় এড়াই;
যা-কিছু আছে সব কাড়ো কাড়ো।

দেখ বাবা, আমি মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে বোঝা-পড়া করতে চলেছি। বলতে চাই, "মার আমায় বাজে কি না তুমি নিজে বাজিয়ে নাও।" যে ভয়ে কিম্বা ভয় দেখায় তার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে এগোতে পারব না।

এবার যা করবার তা সারো, সারো,
আমিই হারি, কিম্বা তুমিই হার।

হাটে ঘাটে বাটে করি খেলা,
কেবল হেসে খেলে গেছে বেলা,
দেখি কেমনে কাঁদাতে পার।

সকলে। শাবাশ, ঠাকুর, তাই সই।—
দেখি কেমনে কাঁদাতে পার।

২। কিন্তু তুমি কোথায় চলেছ, বলো তো ?

ধনঞ্জয়। রাজার উৎসবে।

৩। ঠাকুর, রাজার পক্ষে যেটা উৎসব তোমার পক্ষে সেটা কী দাঁড়ায় বলা যায় কি ? সেখানে কী করতে যাবে ?

ধনঞ্জয়। রাজসভায় নাম রেখে আসব।

৪। রাজা তোমাকে একবার হাতের কাছে পেলে—না, না, সে হবে না।

ধনঞ্জয়। হবে না কী রে ? খুব হবে, পেট ভরে হবে।

১। রাজাকে ভয় কর না তুমি, কিন্তু আমাদের ভয় লাগে।

ধনঞ্জয়। তোরা যে মনে মনে মারতে চাস তাই ভয় করিস, আমি মারতে চাই নে তাই ভয় করি নে। যার হিংসা আছে ভয় তাকে কামড়ে লেগে থাকে।

২। আচ্ছা, আমরাও তোমার সঙ্গে যাব।

৩। রাজার কাছে দরবার করব।

ধনঞ্জয়। কী চাইবি রে ?

৩। চাইবার তো আছে ঢের, দেয় তবে তো ?

ধনঞ্জয়। রাজত্ব চাইবি নে ?

৩। ঠাট্টা করছ, ঠাকুর ?

ধনঞ্জয়। ঠাট্টা কেন করব ? এক পায়ে চলার মতো কি দুঃখ আছে ? রাজত্ব একলা যদি রাজারই হয়, প্রজার না হয়, তাহলে সেই খোঁড়া রাজত্বের লাফানি দেখে তোরা চমকে উঠতে পারিস কিন্তু দেবতার চোখে জল আসে। ওরে রাজার খাতিরেই রাজত্ব দাবি করতে হবে।

২। যখন তাড়া লাগাবে ?

ধনঞ্জয়। রাজদরবারের উপরতলার মানুষ যখন নালিশ মঞ্জুর করেন তখন রাজার তাড়া রাজাকেই তেড়ে আসে।

গান

ভুলে যাই থেকে থেকে
তোমার আসন 'পরে বসাতে চাও
নাম আমাদের হেঁকে হেঁকে।

সত্যি কথা বলব, বাবা? যতক্ষণ তাঁরই আসন বলে না চিনবি ততক্ষণ সিংহাসনে দাবি খাটবে না, রাজারও নয়, প্রজারও না। ও তো বুক-ফুলিয়ে বসবার জায়গা নয়, হাত জোড় করে বসা চাই।

দ্বারী মোদের চেনে না যে,
বাধা দেয় পথের মাঝে,
বাহিরে দাঁড়িয়ে আছি,
লও ভিতরে ডেকে ডেকে।

দ্বারী কি সাধে চেনে না? ধুলোয় ধুলোয় কপালের রাজটিকা যে মিলিয়ে এসেছে। ভিতরে বশ মানল না, বাইরে রাজত্ব করতে ছুটবি? রাজা হলেই রাজাসনে বসে; রাজাসনে বসলেই রাজা হয় না।

মোদের প্রাণ দিয়েছ আপন হাতে
মান দিয়েছ তারি সাথে।
থেকেও সে মান থাকে না যে
লোভে আর ভয়ে লাজে,
ম্লান হয় দিনে দিনে,
যায় ধুলোতে ঢেকে ঢেকে।

১। যাই বল, রাজদুয়োরে কেন যে চলেছ বুঝতে পারলুম না।

ধনঞ্জয়। কেন, বলব? মনে বড়ো ধোঁকা লেগেছে।

১। সে কী কথা?

ধনঞ্জয়। তোরা আমাকে যত জড়িয়ে ধরছিস তোদের সাঁতার শেখা ততই পিছিয়ে যাচ্ছে। আমারও পার হওয়া দায় হল। তাই ছুটি নেবার জন্যে চলেছি সেইখানে, যেখানে আমাকে কেউ মানে না।

১। কিন্তু রাজা তোমাকে তো সহজে ছাড়বে না।

ধনঞ্জয়। ছাড়বে কেন রে। যদি আমাকে বাঁধতে পারে তাহলে আর ভাবনা রইল কী?

গান

আমাকে যে বাঁধবে ধরে এই হবে যার সাধন,
সে কি অমনি হবে ?
আমার কাছে পড়লে বাঁধা সেই হবে মোর বাঁধন,
সে কি অমনি হবে ?
কে আমারে ভরসা করে আনতে আপন বশে ?
সে কি অমনি হবে ?
আপনাকে সে করুক না বশ, মজুক প্রেমের রসে,
সে কি অমনি হবে ?
আমাকে যে কাঁদাবে তার ভাগ্যে আছে কাঁদন
সে কি অমনি হবে ?

২। কিন্তু বাবাঠাকুর, তোমার গায়ে যদি হাত তোলে সইতে পারব না।

ধনঞ্জয়। আমার এই গা বিকিয়েছি যাঁর পায়ে তিনি যদি সন, তবে তোদেরও সইবে।

১। আচ্ছা, চলো ঠাকুর, শুনে আসি, শুনিয়ে আসি, তার পরে কপালে যা থাকে।

ধনঞ্জয়। তবে তোরা এইখানে ব'স, এ জায়গায় কখনো আসি নি, পথঘাটের খবরটা নিয়ে আসি। [প্রস্থান

১। দেখছিস, ভাই, কী চেহারা ওই উত্তরকূটের মানুষগুলোর? যেন একতাল মাংস নিয়ে বিধাতা গড়তে শুরু করেছিলেন শেষ করে উঠতে ফুরসৎ পান নি।

২। আর দেখেছিস ওদের মালকোঁচা মেরে কাপড় পরবার ধরনটা?

৩। যেন নিজেকে বস্তায় বেঁধেছে, একটুখানি পাছে লোকসান হয়।

১। ওরা মজুরি করবার জন্যেই জন্ম নিয়েছে, কেবল সাত ঘাটের জল পেরিয়ে সাত হাটেই ঘুরে বেড়ায়।

২। ওদের যে শিক্ষাই নেই, ওদের যা শাস্তর তার মধ্যে আছে কী?

১। কিছু না, কিছু না, দেখিস নি তার অক্ষরগুলো উইপোকার মতো।

২। উইপোকাই তো বটে। ওদের বিদ্যে যেখানে লাগে সেখানে কেটে টুকরো টুকরো করে।

৩। আর গড়ে তোলে মাটির ঢিবি।

২। ওদের অস্তর দিয়ে মারে প্রাণটাকে, আর শাস্তর দিয়ে মারে মনটাকে।

২। পাপ, পাপ। আমাদের গুরু বলে ওদের ছায়া মাড়ানো নৈব নৈবচ। কেন জানিস?

৩। কেন বল তো?

২। তা জানিস নে? সমুদ্রমন্থনের পর দেবতার ভাঁড় থেকে অমৃত গড়িয়ে যে মাটিতে পড়েছিল আমাদের শিবতরাইয়ের পূর্বপুরুষ সেই মাটি দিয়ে গড়া। আর দৈত্যরা যখন দেবতার উচ্ছিষ্ট ভাঁড় চেটে চেটে নর্দমায় ফেলে দিলে তখন সেই ভাঁড়-ভাঙা পোড়া-মাটি দিয়ে উত্তরকূটের মানুষকে গড়া হয়। তাই ওরা শক্ত, কিন্তু থুঃ—অপবিত্র।

৩। এ তুই কোথায় পেলি?

২। স্বয়ং গুরু বলে দিয়েছেন।

৩। (উদ্দেশে প্রণাম করিয়া) গুরু, তুমিই সত্য।

উত্তরকূটের একদল নাগরিকের প্রবেশ

উ ১। আর সব হল ভালো, কিন্তু কামারের ছেলে বিভূতিকে রাজা একেবারে ক্ষত্রিয় করে নিলে সেটা তো—

উ ২। ওসব হল ঘরের কথা, সে আমাদের গাঁয়ে ফিরে গিয়ে বুঝে পড়ে নেব। এখন বল্, জয় যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়।

উ ৩। ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রে বৈশ্যের যন্ত্রে যে মিলিয়েছে, জয় সেই যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়।

উ ১। ও ভাই, ওই যে দেখি শিবতরাইয়ের মানুষ।

উ ২। কী করে বুঝলি?

উ ১। কান-ঢাকা টুপি দেখছিস নে? কীরকম অদ্ভুত দেখতে? যেন উপর থেকে থাবড়া মেরে হঠাৎ কে ওদের বাড় বন্ধ করে দিয়েছে।

উ ২। আচ্ছা, এত দেশ থাকতে ওরা কান-ঢাকা টুপি পরে কেন? ওরা কি ভাবে কানটা বিধাতার মতিভ্রম?

উ ১। কানের উপর বাঁধ বেঁধেছে বুদ্ধি পাছে বেরিয়ে যায়। (সকলের হাস্য)

উ ৩। তাই? না, ভুলক্রমে বুদ্ধি পাছে ভিতরে ঢুকে পড়ে। (হাস্য)

উ ১। পাছে উত্তরকূটের কানমলার ভূত ওদের কানদুটোকে পেয়ে বসে। (হাস্য) ওরে শিবতরাইয়ের অজবুগের দল, সাড়া নেই, শব্দ নেই, হয়েছে কী রে?

উ ৩। জানিস নে আজ আমাদের বড়ো দিন। বল্ যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়।

উ ১। চুপ করে রইলি যে? গলা বুজে গেছে? টুঁটি চেপে না ধরলে আওয়াজ বেরোবে না বুঝি? বল্ যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়!

গণেশ। কেন বিভূতির জয়? কী করেছে সে?

উ ১। বলে কী? কী করেছে? এত বড়ো খবরটা এখনও পৌঁছয় নি? কান-ঢাকা টুপির গুণ দেখলি তো?

উ ৩। তোদের পিপাসার জল যে তার হাতে; সে দয়া না করলে অনাবৃষ্টির ব্যাঙগুলোর মতো শুকিয়ে মরে যাবি।

শি ২। পিপাসার জল বিভূতির হাতে? হঠাৎ সে দেবতা হয়ে উঠল নাকি?

উ ২। দেবতাকে ছুটি দিয়ে দেবতার কাজ নিজেই চালিয়ে নেবে।

শি ১। দেবতার কাজ! তার একটা নমুনা দেখি তো?

উ ১। ওই যে মুক্তধারার বাঁধ। [শিবতরাইয়ের সকলের উচ্চহাস্য

উ ১। এটা কি তোরা ঠাট্টা ঠাউরেছিস?

গণেশ। ঠাট্টা নয়? মুক্তধারা বাঁধবে? ভৈরব স্বহস্তে যা দিয়েছেন, তোমাদের কামারের ছেলে তাই কাড়বে?

উ ১। স্বচক্ষে দেখ্‌ না, ওই আকাশে।

শি ১। বাপ রে। ওটা কী রে?

শি ২। যেন মস্ত একটা লোহার ফড়িং, আকাশে লাফ মারতে যাচ্ছে।

উ ১। ওই ফড়িঙের ঠ্যাং দিয়ে তোমাদের জল আটকেছে।

গণেশ। রেখে দাও সব বাজে কথা। কোন্‌ দিন বলবে ওই ফড়িঙের ডানায় বসে তোমাদের কামারের পো চাঁদ ধরতে বেরিয়েছে।

উ ১। ওই দেখো কান ঢাকার গুণ! ওরা শুনেও শুনবে না তাই তো মরে।

শি ১। আমরা মরেও মরব না পণ করেছি।

উ ৩। বেশ করেছ, বাঁচাবে কে?

গণেশ। আমাদের দেবতাকে দেখ নি? প্রত্যক্ষ দেবতা? আমাদের ধনঞ্জয় ঠাকুর? তার একটা দেহ মন্দিরে, একটা দেহ বাইরে।

উ ৩। কানঢাকারা বলে কী? ওদের মরণ কেউ ঠেকাতে পারবে না।

[উত্তরকূটের দলের প্রস্থান

ধনঞ্জয়ের প্রবেশ

ধনঞ্জয়। কী বলছিলি রে বোকা? আমারই উপর তোদের বাঁচাবার ভার? তাহলে তো সাতবার মরে ভূত হয়ে রয়েছিস।

গণেশ। উত্তরকূটের ওরা আমাদের শাসিয়ে গেল যে, বিভূতি মুক্তধারার বাঁধ বেঁধেছে।

ধনঞ্জয়। বাঁধ বেঁধেছে, বললে ?

গণেশ। হাঁ, ঠাকুর।

ধনঞ্জয়। সব কথাটা শুনলি নে বুঝি ?

গণেশ। ও কি শোনবার কথা ? হেসে উড়িয়ে দিলুম।

ধনঞ্জয়। তোদের সব কানগুলো একা আমারই জিম্মায় রেখেছিস ? তোদের সবার শোনা আমাকেই শুনতে হবে ?

শি ৩। ওর মধ্যে শোনবার আছে কী, ঠাকুর ?

ধনঞ্জয়। বলিস কী রে ? যে শক্তি দুরন্ত তাকে বেঁধে ফেলা কি কম কথা ? তা সে অন্তরেই হ'ক আর বাইরেই হ'ক।

গণেশ। ঠাকুর, তাই বলে আমাদের পিপাসার জল আটকাবে ?

ধনঞ্জয়। সে হল আর-এক কথা। ওটা ভৈরব সইবেন না। তোরা ব'স, আমি সন্ধান নিয়ে আসি গে। জগৎটা বাণীময় রে, তার যেদিকটাতে শোনা বন্ধ করবি সেইদিক থেকেই মৃত্যুবাণ আসবে। [ধনঞ্জয়ের প্রস্থান

শিবতরাইয়ের একজন নাগরিকের প্রবেশ

শি ৩। এ কী বিষণ যে। খবর কী ?

বিষণ। যুবরাজকে রাজা শিবতরাই থেকে ডেকে নিয়ে এসেছে, তাকে সেখানে আর রাখবে না।

সকলে। সে হবে না, কিছুতেই হবে না।

বিষণ। কী করবি ?

সকলে। ফিরিয়ে নিয়ে যাব।

বিষণ। কী করে ?

সকলে। জোর করে।

বিষণ। রাজার সঙ্গে পারবি ?

সকলে। রাজাকে মানি নে।

রণজিৎ ও মন্ত্রীর প্রবেশ

রণজিৎ। কাকে মানিস নে ?

সকলে। প্রণাম।

গণেশ। তোমার কাছে দরবার করতে এসেছি।

রণজিৎ। কিসের দরবার ?

সকলে। আমরা যুবরাজকে চাই!

রণজিৎ। বলিস কী?

১। হাঁ, যুবরাজকে শিবতরাইয়ে নিয়ে যাব।

রণজিৎ। আর মনের আনন্দে খাজনা দেবার কথাটা ভুলে যাবি?

সকলে। অন্ন বিনে মরছি যে।

রণজিৎ। তোদের সর্দার কোথায়?

২। (গণেশকে দেখাইয়া) এই যে আমাদের গণেশ সর্দার।

রণজিৎ। ও নয়, তোদের বৈরাগী।

গণেশ। ওই আসছেন।

ধনঞ্জয়ের প্রবেশ

রণজিৎ। তুমি এই সমস্ত প্রজাদের খেপিয়েছ?

ধনঞ্জয়। খ্যাপাই বই কি, নিজেও খেপি।

গান

আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায় কোন্ খ্যাপা সে?
ওরে আকাশ জুড়ে মোহন সুরে
কী যে বাজায় কোন্ বাতাসে?
গেল রে গেল বেলা,
পাগলের কেমন খেলা?
ডেকে সে আকুল করে, দেয় না ধরা,
তারে কানন গিরি খুঁজে ফিরি
কেঁদে মরি হোন্ হুতাশে।

রণজিৎ। পাগলামি করে কথা চাপা দিতে পারবে না। খাজনা দেবে কি না, বলো।

ধনঞ্জয়। না, মহারাজ, দেব না।

রণজিৎ। দেবে না? এত বড়ো আস্পর্ধা?

ধনঞ্জয়। যা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পারব না।

রণজিৎ। আমার নয়?

ধনঞ্জয়। আমার উদ্বৃত্ত অন্ন তোমার, ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়।

রণজিৎ। তুমিই প্রজাদের বারণ কর খাজনা দিতে?

ধনঞ্জয়। ওরা তো ভয়ে দিয়ে ফেলতে চায়, আমি বারণ করে বলি, প্রাণ যিনি তাঁকেই প্রাণ দিয়েছেন যিনি।

রণজিৎ। তোমার ভরসা চাপা দিয়ে ওদের ভয়টাকে ঢেকে রাখছ বই তো নয়। বাইরের ভরসা একটু ফুটো হলেই ভিতরের ভয় সাতগুণ জোরে বেরিয়ে পড়বে। তখন ওরা মরবে যে। দেখো, বৈরাগী, তোমার কপালে দুঃখ আছে।

ধনঞ্জয়। যে দুঃখ কপালে ছিল সে দুঃখ বুকে তুলে নিয়েছি। দুঃখের উপরওআলা সেইখানে বাস করেন।

রণজিৎ। (প্রজাদের প্রতি) আমি তোদের বলছি, তোরা শিবতরাইয়ে ফিরে যা। বৈরাগী, তুমি এইখানেই রইলে।

সকলে। আমাদের প্রাণ থাকতে সে হবে না।

ধনঞ্জয়। গান

রইল বলে রাখলে কারে ?
হুকুম তোমার ফলবে কবে ?
টানাটানি টিকবে না, ভাই,
রবার যেটা সেটাই রবে।

রাজা, টেনে কিছুই রাখতে পারবে না। সহজে রাখবার শক্তি যদি থাকে তবেই রাখা চলবে।

রণজিৎ। মানে কী হল ?

ধনঞ্জয়। যিনি সব দেন তিনিই সব রাখেন। লোভ করে যা রাখতে চাইবে সে হল চোরাই মাল, সে টিঁকবে না।

গান

যা-খুশি তাই করতে পার,
গায়ের জোরে রাখ মার,
যাঁর গায়ে তার ব্যথা বাজে
তিনিই যা সন সেটাই সবে।

রাজা, ভুল করছ এই, যে, ভাবছ জগৎটাকে কেড়ে নিলেই জগৎ তোমার হল। ছেড়ে রাখলেই যাকে পাও, মুঠোর মধ্যে চাপতে গেলেই দেখবে সে ফসকে গেছে।

গান

ভাবছ, হবে তুমি যা চাও,
জগৎটাকে তুমিই নাচাও,

দেখবে হঠাৎ নয়ন মেলে
হয় না যেটা সেটাও হবে।

রণজিৎ। মন্ত্রী, বৈরাগীকে এইখানেই ধরে রেখে দাও।

মন্ত্রী। মহারাজ—

রণজিৎ। আদেশটা তোমার মনের মতো হচ্ছে না?

মন্ত্রী। শাসনের ভীষণ যন্ত্র তো তৈরি হয়েছে, তার উপরে ভয় আরও চড়াতে গেলে সব যাবে ভেঙে।

প্রজারা। এ আমাদের সহ্য হবে না।

ধনঞ্জয়। যা বলছি, ফিরে যা।

১। ঠাকুর, যুবরাজকেও যে হারিয়েছি, শোন নি বুঝি?

২। তাহলে কাকে নিয়ে মনের জোর পাব?

ধনঞ্জয়। আমার জোরেই কি তোদের জোর? একথা যদি বলিস তাহলে যে আমাকে সুদ্ধ দুর্বল করবি।

গণেশ। ওকথা বলে আজ ফাঁকি দিয়ো না। আমাদের সকলের জোর একা তোমারই মধ্যে।

ধনঞ্জয়। তবে আমার হার হয়েছে। আমাকে সরে দাঁড়াতে হল।

সকলে। কেন ঠাকুর?

ধনঞ্জয়। আমাকে পেয়ে আপনাকে হারাবি? এত বড়ো লোকসান মেটাতে পারি এমন সাধ্য কি আমার আছে? বড়ো লজ্জা পেলুম।

১। সে কী কথা ঠাকুর? আচ্ছা, যা করতে বল তাই করব।

ধনঞ্জয়। আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যা।

২। চলে গিয়ে কী করব? তুমি আমাদের ছেড়ে থাকতে পারবে? আমাদের ভালোবাস না?

ধনঞ্জয়। ভালোবেসে তোদের চেপে মারার চেয়ে ভালোবেসে তোদের ছেড়ে থাকাই ভালো। যা, আর কথা নয়, চলে যা।

সকলে। আচ্ছা, ঠাকুর চললুম, কিন্তু—

ধনঞ্জয়। কিন্তু কী রে। একেবারে নিকিন্তু হয়ে যা, উপরে মাথা তুলে।

সকলে। আচ্ছা, তবে চলি।

ধনঞ্জয়। ওকে চলা বলে? জোরে।

গণেশ। চললুম, কিন্তু আমাদের বলবুদ্ধি রইল এইখানে পড়ে। [প্রস্থান

রণজিৎ। কী বৈরাগী, চুপ করে রইলে যে।

ধনঞ্জয়। ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে, রাজা।

রণজিৎ। কিসের ভাবনা?

ধনঞ্জয়। তোমার চণ্ডপালের দণ্ড লাগিয়েও যা করতে পার নি আমি দেখছি তাই করে বসে আছি। এতদিন ঠাউরেছিলুম আমি ওদের বলবুদ্ধি বাড়াচ্ছি; আজ মুখের উপর বলে গেল আমিই ওদের বলবুদ্ধি হরণ করেছি।

রণজিৎ। এমনটা হয় কী করে?

ধনঞ্জয়। ওদের যতই মাতিয়ে তুলেছি ততই পাকিয়ে তোলা হয় নি আর কি। দেনা যাদের অনেক বাকি, শুধু কেবল দৌড় লাগিয়ে দিয়ে তাদের দেনা শোধ হয় না তো। ওরা ভাবে আমি বিধাতার চেয়ে বড়ো, তাঁর কাছে ওরা যা ধারে আমি যেন তা নামঞ্জুর করে দিতে পারি। তাই চক্ষু বুজে আমাকেই আঁকড়ে থাকে।

রণজিৎ। ওরা যে তোমাকেই দেবতা বলে জেনেছে।

ধনঞ্জয়। তাই আমাতেই এসে ঠেকে গেল, আসল দেবতা পর্যন্ত পৌঁছোল না। ভিতরে থেকে যিনি ওদের চালাতে পারতেন বাইরে থেকে তাঁকে রেখেছি ঠেকিয়ে।

রণজিৎ। রাজার খাজনা যখন ওরা দিতে আসে তখন বাধা দাও, আর দেবতার পুজো যখন তোমার পায়ের কাছে এসে পড়ে তখন তোমার বাজে না?

ধনঞ্জয়। ওরে বাপ রে। বাজে না তো কী। দৌড় মেরে পালাতে পারলে বাঁচি। আমাকে পুজো দিয়ে ওরা অন্তরে অন্তরে দেউলে হতে চলল, সে দেনার দায় যে আমারও ঘাড়ে পড়বে, দেবতা ছাড়বেন না।

রণজিৎ। এখন তোমার কর্তব্য?

ধনঞ্জয়। তফাতে থাকা। আমি যদি পাকা করে ওদের মনের বাঁধ বেঁধে থাকি, তা হলে তোমার বিভূতিকে আর আমাকে ভৈরব যেন এক সঙ্গেই তাড়া লাগান।

রণজিৎ। তবে আর দেরি কেন? সরো না।

ধনঞ্জয়। আমি সরে দাঁড়ালেই ওরা একেবারে তোমার চণ্ডপালের ঘাড়ের উপর গিয়ে চড়াও হবে। তখন যে-দণ্ড আমার পাওনা সেটা পড়বে ওদেরই মাথার খুলির উপরে। এই ভাবনায় সরতে পারি নে।

রণজিৎ। নিজে সরতে না পার আমিই সরিয়ে দিচ্ছি। উদ্ধব, বৈরাগীকে এখন শিবিরে বন্দী করে রাখো।

ধনঞ্জয়। গান

তোর শিকল আমায় বিকল করবে না।
তোর মারে মরম মরবে না।
তাঁর আপন হাতের ছাড়-চিঠি সেই যে,
আমার মনের ভিতর রয়েছে এই যে,
তোদের ধরা আমায় ধরবে না।
যে-পথ দিয়ে আমার চলাচল
তোর প্রহরী তার খোঁজ পাবে কী বল?
আমি তাঁর দুয়ারে পৌঁছে গেছি রে,
মোরে তোর দুয়ারে ঠেকাবে কি রে?
তোর ভয়ে পরান ভরবে না।

[ধনঞ্জয়কে লইয়া উদ্ধবের প্রস্থান

রণজিৎ। মন্ত্রী, বন্দিশালায় অভিজিৎকে দেখে এস গে। যদি দেখ সে আপন কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত, তাহলে—

মন্ত্রী। মহারাজ, আপনি স্বয়ং গিয়ে একবার—

রণজিৎ। না, না, সে নিজরাজ্যবিদ্রোহী, যতক্ষণ অপরাধ স্বীকার না করে ততক্ষণ তার মুখদর্শন করব না। আমি রাজধানীতে যাচ্ছি, সেখানে আমাকে সংবাদ দিয়ো।

[রাজার প্রস্থান

ভৈরবপন্থীর প্রবেশ

গান

তিমির-হৃদ্‌বিদারণ
জলদগ্নি-নিদারুণ,
মরু-শ্মশান-সঞ্চর,
শংকর শংকর।
বজ্রঘোষ বাণী,
রুদ্র, শূলপাণি,
মৃত্যুসিন্ধু-সন্তর,
শংকর, শংকর। [প্রস্থান

উদ্ধবের প্রবেশ

উদ্ধব। এ কী? যুবরাজের সঙ্গে দেখা না করেই মহারাজ চলে গেলেন?

মন্ত্রী। পাছে মুখ দেখে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় এই ভয়ে। এতক্ষণ ধরে বৈরাগীর সঙ্গে কথা কচ্ছিলেন মনের মধ্যে এই দ্বিধা নিয়ে। শিবিরের মধ্যেও যেতে পারছিলেন না, শিবির ছেড়ে যেতেও পা উঠছিল না। যাই যুবরাজকে দেখে আসি গে। [প্রস্থান

দুইজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ

১। মাসী, ওরা কেন সবাই এমন রেগে উঠেছে? কেন বলছে যুবরাজ অন্যায় করেছেন—আমি এ বুঝতেও পারি নে, সইতেও পারি নে।

২। বুঝতে পারিস নে উত্তরকূটের মেয়ে হয়ে? উনি নন্দিসংকটের রাস্তা খুলে দিয়েছেন।

১। আমি জানি নে তাতে অপরাধ কী হয়েছে। কিন্তু আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি নে যে যুবরাজ অন্যায় করেছেন।

২। তুই ছেলেমানুষ, অনেক দুঃখ পেয়ে তবে একদিন বুঝবি বাইরে থেকে যাদের ভালো বলে বোধ হয় তাদেরই বেশি সন্দেহ করতে হয়।

১। কিন্তু যুবরাজকে কী সন্দেহ করছ তোমরা?

২। সবাই বলছে যে শিবতরাইয়ের লোকদের বশ করে নিয়ে, উনি এখনই উত্তরকূটের সিংহাসন জয় করতে চান,—ওঁর আর তর সইছে না।

১। সিংহাসনের কী দরকার ছিল ওঁর। উনি তো সবারই হৃদয় জয় করে নিয়েছেন। যারা ওঁর নিন্দে করছে তাদেরই বিশ্বাস করব আর যুবরাজকে বিশ্বাস করব না?

২। তুই চুপ কর্। একরত্তি মেয়ে, তোর মুখে এসব কথা সাজে না। দেশসুদ্ধ লোক যাকে অভিসম্পাত করছে তুই হঠাৎ তার—

১। আমি দেশসুদ্ধ লোকের সামনে দাঁড়িয়ে একথা বলতে পারি যে—

২। চুপ চুপ।

২। কেন চুপ? আমার চোখ ফেটে জল বেরোতে চায়। যুবরাজকে আমি সবচেয়ে বিশ্বাস করি এই কথাটা প্রকাশ করবার জন্যে আমার যা হয় একটা কিছু করতে ইচ্ছা করছে। আমার এই লম্বা চুল আমি আজ ভৈরবের কাছে মানত করব—বলব, "বাবা, তুমি জানিয়ে দাও যে যুবরাজেরই জয়, যারা নিন্দুক তারা মিথ্যে।"

২। চুপ চুপ চুপ। কোথা থেকে কে শুনতে পাবে। মেয়েটা বিপদ ঘটাবে দেখছি। [উভয়ের প্রস্থান

উত্তরকূটের একদল নাগরিকের প্রবেশ

১। কিছুতেই ছাড়ছি নে, চল্ রাজার কাছে যাই।

২। ফল কী হবে? যুবরাজ যে রাজার বক্ষের মানিক, তাঁর অপরাধের বিচার করতে পারবেন না, মাঝের থেকে রাগ করবেন আমাদের 'পরে।

১। করুন রাগ, স্পষ্ট কথা বলব কপালে যাই থাক।

৩। এদিকে যুবরাজ আমাদের এত ভালোবাসা দেখান, ভাব করেন যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেড়ে দেবেন, আর তলে তলে তাঁরই এই কীর্তি? হঠাৎ শিবতরাই তাঁর কাছে উত্তরকূটের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠল?

১। এমন হলে পৃথিবীতে আর ধর্ম রইল কোথা? বলো তো দাদা?

৩। কাউকে চেনবার জো নেই।

১। রাজা ওঁকে শাস্তি না দেন তো আমরা দেব।

২। কী করবি?

১। এদেশে ওঁর ঠাঁই হচ্ছে না। যে পথ কেটেছেন সেই পথ দিয়ে ওঁকেই বেরিয়ে যেতে হবে।

৩। কিন্তু ওই তো চবুয়া গাঁয়ের লোক বললে, তিনি শিবতরাইয়ে নেই, এখানে রাজার বাড়িতেও তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না।

১। রাজা তাকে নিশ্চয়ই লুকিয়েছে।

৩। লুকিয়েছে? ইস, দেয়াল ভেঙে বের করব।

১। ঘরে আগুন লাগিয়ে বের করব।

৩। আমাদের ফাঁকি দেবে? মরি মরব তবু—

উদ্ধবের সহিত মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। কী হয়েছে?

১। লুকোচুরি চলবে না। বের করো যুবরাজকে।

মন্ত্রী। আরে বাপু, আমি বের করবার কে?

২। তোমরাই তো মন্ত্রণা দিয়ে তাঁকে—পারবে না কিন্তু, আমরা টেনে বের করব।

মন্ত্রী। আচ্ছা, তবে নিজের হাতে রাজত্ব নাও, রাজার গারদ থেকে ছাড়িয়ে আনো।

৩। গারদ থেকে?

মন্ত্রী। মহারাজ তাকে বন্দী করেছেন।

সকলে। জয় মহারাজের, জয় উত্তরকূটের।

২। চল্‌ রে, আমরা গারদে ঢুকব, সেখানে গিয়ে—

মন্ত্রী। গিয়ে কী করবি ?

২। বিভূতির গলার মালা থেকে ফুল খসিয়ে দড়িগাছটা ওর গলায় ঝুলিয়ে আসব।

৩। গলায় কেন, হাতে। বাঁধ বাঁধার সম্মানের উচ্ছিষ্ট দিয়ে পথ-কাটার হাতে দড়ি পড়বে।

মন্ত্রী। যুবরাজ পথ ভেঙেছেন বলে অপরাধ, আর তোমরা ব্যবস্থা ভাঙবে, তাতে অপরাধ নেই ?

২। আহা, ও যে সম্পূর্ণ আলাদা কথা। আচ্ছা বেশ, যদি ব্যবস্থা ভাঙি তো কী হবে ?

মন্ত্রী। পায়ের তলার মাটি পছন্দ হল না বলে শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়া হবে। সেটাও পছন্দ হবে না বলে রাখছি। একটা ব্যবস্থা আগে করে তবে অন্য ব্যবস্থাটা ভাঙতে হয়।

৩। আচ্ছা, তবে গারদ থাক, রাজবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে মহারাজের জয়ধ্বনি করে আসি গে।

৩। ও ভাই, ওই দেখ্‌। সূর্য অস্ত গেছে, আকাশ অন্ধকার হয়ে এল, কিন্তু বিভূতির যন্ত্রের ওই চূড়াটা এখনও জ্বলছে। রোদ্দুরের মদ খেয়ে যেন লাল হয়ে রয়েছে।

২। আর ভৈরব-মন্দিরের ত্রিশূলটাকে অস্তসূর্যের আলো আঁকড়ে রয়েছে যেন ডোববার ভয়ে। কী রকম দেখাচ্ছে। [নাগরিকদের প্রস্থান

মন্ত্রী। মহারাজ কেন যে যুবরাজকে এই শিবিরে বন্দী করতে বলেছিলেন এখন বুঝেছি।

উদ্ধব। কেন ?

মন্ত্রী। প্রজাদের হাত থেকে ওঁকে বাঁচাবার জন্যে। কিন্তু ভালো ঠেকছে না। লোকের উত্তেজনা কেবলই বেড়ে উঠছে।

সঞ্জয়ের প্রবেশ

সঞ্জয়। মহারাজকে বেশি আগ্রহ দেখাতে সাহস করলুম না, তাতে তাঁর সংকল্প আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে।

মন্ত্রী। রাজকুমার, শান্ত থাকবেন, উৎপাতকে আরও জটিল করে তুলবেন না।

সঞ্জয়। বিদ্রোহ ঘটিয়ে আমিও বন্দী হতে চাই।

মন্ত্রী। তার চেয়ে মুক্ত থেকে বন্ধন মোচনের চিন্তা করুন।

সঞ্জয়। সেই চেষ্টাতেই প্রজাদের মধ্যে গিয়েছিলুম। জানতুম যুবরাজকে তারা প্রাণের অধিক ভালোবাসে,—তাঁর বন্ধন ওরা সইবে না। গিয়ে দেখি নন্দিসংকটের খবর পেয়ে তারা আগুন হয়ে আছে।

মন্ত্রী। তবেই বুঝছেন, বন্দিশালাতেই যুবরাজ নিরাপদ।

সঞ্জয়। আমি চিরদিন তাঁরই অনুবর্তী, বন্দিশালাতেও আমাকে তাঁর অনুসরণ করতে দাও।

মন্ত্রী। কী হবে?

সঞ্জয়। পৃথিবীতে কোনো একলা মানুষই এক নয়, সে অর্ধেক। আর-এক জনের সঙ্গে মিল হলে তবেই সে ঐক্য পায়। যুবরাজের সঙ্গে আমার সেই মিল।

মন্ত্রী। রাজকুমার, সে কথা মানি। কিন্তু সেই সত্য মিল যেখানে, সেখানে কাছে কাছে থাকবার দরকার হয় না। আকাশের মেঘ আর সমুদ্রের জল অন্তরে একই, তাই বাইরে তারা পৃথক হয়ে ঐক্যটিকে সার্থক করে। যুবরাজ আজ যেখানে নেই, সেইখানেই তিনি তোমার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পান।

সঞ্জয়। মন্ত্রী, এ তো তোমার নিজের কথা বলে শোনাচ্ছে না, এ যেন যুবরাজের মুখের কথা।

মন্ত্রী। তাঁর কথা এখানকার হাওয়ায় ছড়িয়ে আছে, ব্যবহার করি, অথচ ভুলে যাই তাঁর কি আমার।

সঞ্জয়। কিন্তু কথাটি মনে করিয়ে দিয়ে ভালো করেছ, দূর থেকে তাঁরই কাজ করব। যাই মহারাজের কাছে।

মন্ত্রী। কী করতে?

সঞ্জয়। শিবতরাইয়ের শাসনভার প্রার্থনা করব।

মন্ত্রী। সময় যে বড়ো সংকটের, এখন কি—

সঞ্জয়। সেইজন্যেই এই তো উপযুক্ত সময়। [উভয়ের প্রস্থান

বিশ্বজিতের প্রবেশ

বিশ্বজিৎ। ও কে ও? উদ্ধব বুঝি?

উদ্ধব। হাঁ, খুড়া মহারাজ।

বিশ্বজিৎ। অন্ধকারের জন্যে অপেক্ষা করছিলুম, আমার চিঠি পেয়েছ তো?

উদ্ধব। পেয়েছি।

বিশ্বজিৎ। সেই মতো কাজ হয়েছে?

উদ্ধব। অল্প পরেই জানতে পারবে। কিন্তু—

বিশ্বজিৎ। মনে সংশয় ক'রো না। মহারাজ ওকে নিজে মুক্তি দিতে প্রস্তুত নন, কিন্তু তাঁকে না জানিয়ে কোনো উপায়ে আর কেউ যদি একাজ সাধন করে তাহলে তিনি বেঁচে যাবেন।

উদ্ধব। কিন্তু সেই আর-কেউকে কিছুতে ক্ষমা করবেন না।

বিশ্বজিৎ। আমার সৈন্য আছে, তারা তোমাকে আর তোমার প্রহরীদের বন্দী করে নিয়ে যাবে। দায় আমারই।

নেপথ্যে। আগুন, আগুন।

উদ্ধব। ওই হয়েছে। বন্দিশালার সংলগ্ন পাকশালার তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। এই সুযোগে বন্দী ছুটিকে বের করে দিই।

কিছুক্ষণ পরে অভিজিতের প্রবেশ

অভিজিৎ। এ কী দাদামশায় যে।

বিশ্বজিৎ। তোমাকে বন্দী করতে এসেছি। মোহনগড়ে যেতে হবে।

অভিজিৎ। আমাকে আজ কিছুতেই বন্দী করতে পারবে না, না ক্রোধে, না স্নেহে। তোমরা ভাবছ তোমরাই আগুন লাগিয়েছ? না, এ আগুন যেমন করেই হ'ক লাগত। আজ আমার বন্দী থাকবার অবকাশ নেই।

বিশ্বজিৎ। কেন, ভাই, কী তোমার কাজ?

অভিজিৎ। জন্মকালের ঋণ শোধ করতে হবে। স্রোতের পথ আমার ধাত্রী, তার বন্ধন মোচন করব।

বিশ্বজিৎ। তার অনেক সময় আছে, আজ নয়।

অভিজিৎ। সময় এখনই এসেছে এই কথাই জানি, কিন্তু সময় আবার আসবে কি না সে কথা কেউ জানি নে।

বিশ্বজিৎ। আমরাও তোমার সঙ্গে যোগ দেব।

অভিজিৎ। না, সকলের এক কাজ নয়, আমার উপর যে কাজ পড়েছে সে একলা আমারই।

বিশ্বজিৎ। তোমার শিবতরাইয়ের ভক্তদল যে তোমার কাজে হাত দেবার জন্যে অপেক্ষা করে আছে, তাদের ডাকবে না?

অভিজিৎ। যে ডাক আমি শুনেছি সেই ডাক যদি তারাও শুনত তবে আমার জন্যে অপেক্ষা করত না। আমার ডাকে তারা পথ ভুলবে।

বিশ্বজিৎ। ভাই, অন্ধকার হয়ে এসেছে যে।

অভিজিৎ। যেখান থেকে ডাক এসেছে সেইখান থেকে আলোও আসবে।

বিশ্বজিৎ। তোমাকে বাধা দিতে পারি এমন শক্তি আমার নেই। অন্ধকারের মধ্যে একলা চলেছ তবুও তোমাকে বিদায় দিয়ে ফিরতে হবে। কেবল একটি আশ্বাসের কথা বলে যাও যে, আবার মিলন ঘটবে।

অভিজিৎ। তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হবার নয় এই কথাটি মনে রেখো।

[দুই জনের দুই পথে প্রস্থান

ধনঞ্জয়ের প্রবেশ

গান

আগুন, আমার ভাই,
আমি তোমারি জয় গাই।
তোমার শিকল-ভাঙা এমন রাঙা
মূর্তি দেখি নাই।
দুহাত তুলে আকাশ পানে
মেতেছ আজ কিসের গানে?
এ কী আনন্দময় নৃত্য অভয়
বলিহারি যাই।
যেদিন ভবের মেয়াদ ফুরোবে, ভাই,
আগল যাবে সরে
সেদিন হাতের দড়ি পায়ের দড়ি
দিবি রে ছাই করে।
সেদিন আমার অঙ্গ তোমার অঙ্গে
ঐ নাচনে নাচবে রঙ্গে,
সকল দাহ মিটবে দাহে,
ঘুচবে সব বালাই।

বটুর প্রবেশ

বটু। ঠাকুর, দিন তো গেল, অন্ধকার হয়ে এল।

ধনঞ্জয়। বাবা, বাইরের আলোর উপর ভরসা রাখাই অভ্যাস, তাই অন্ধকার হলেই একেবারে অন্ধকার দেখি।

বটু। ভেবেছিলুম ভৈরবের নৃত্য আজই আরম্ভ হবে, কিন্তু যন্ত্ররাজ কি তাঁরও হাত পা যন্ত্র দিয়ে বেঁধে দিলে?

ধনঞ্জয়। ভৈরবের নৃত্য যখন সবে আরম্ভ হয় তখন চোখে পড়ে না। যখন শেষ হবার পালা আসে তখন প্রকাশ হয়ে পড়ে।

বটু। ভরসা দাও, প্রভু, বড়ো ভয় ধরিয়েছে।—জাগো, ভৈরব, জাগো। আলো নিবেছে, পথ ডুবেছে, সাড়া পাই নে মৃত্যুঞ্জয়! ভয়কে মারো ভয় লাগিয়ে। জাগো, ভৈরব, জাগো! [প্রস্থান

উত্তরকূটের নাগরিকদলের প্রবেশ

১। মিথ্যে কথা। রাজধানীর গারদে সে নেই। ওকে লুকিয়ে রেখেছে।

২। দেখব, কোথায় লুকিয়ে রাখে।

ধনঞ্জয়। না, বাবা, কোথাও পারবে না লুকিয়ে রাখতে। পড়বে দেয়াল, ভাঙবে দরজা, আলো ছুটে বের হয়ে আসবে—সমস্ত প্রকাশ হয়ে পড়বে।

১। এ আবার কে রে? বুকের ভিতরটায় হঠাৎ চমকিয়ে দিলে।

৩। তা বেশ হয়েছে। একজন কাউকে চাই। তা এই বৈরাগীটাকেই ধর। ওকে বাঁধ।

ধনঞ্জয়। যে মানুষ ধরা দিয়ে বসে আছে তাকে ধরবে কী করে?

১। সাধুগিরি রাখো, আমরা ও সব মানি নে।

ধনঞ্জয়। না মানাই তো ভালো। প্রভু স্বয়ং হাতে ধরে তোমাদের মানিয়ে নেবেন। তোমরা ভাগ্যবান। আমি যে-সব অভাগাদের জানি তারা কেবল মেনে মেনেই গুরুকে খোয়ালে। আমাকে সুদ্ধ তারা মানার তাড়ায় দেশছাড়া করেছে।

১। তাদের গুরু কে?

ধনঞ্জয়। যার হাতে তারা মার খায়।

১। তা হলে তোমার উপর গুরুগিরি আমরাই শুরু করি না কেন?

ধনঞ্জয়। রাজি আছি, বাবা। দেখে নিই ঠিকমতো পাঠ দিতে পারি কি না। পরীক্ষা হ'ক।

২। সন্দেহ হচ্ছে তুমিই আমাদের যুবরাজকে নিয়ে কিছু চালাকি করেছ।

ধনঞ্জয়। তোমাদের যুবরাজ আমার চেয়েও চালাক, তাঁর চালাকি আমাকে নিয়ে।

২। দেখলি তো, কথাটার মানে আছে। দুজনে একটা কী ফন্দি চলছে।

১। নইলে এত রাত্রে এখানে ঘুরে বেড়ায় কেন? যুবরাজকে শিবতরাইয়ে

সরাবার চেষ্টা। এইখানেই ওকে বেঁধে রেখে যাই। তার পরে যুবরাজের সন্ধান পেলে ওর সঙ্গে বোঝা-পড়া করব। ওহে, কুন্দন, বাঁধো না। দড়িগাছটা তো তোমার কাছেই আছে।

কুন্দন। এই নাও না দড়ি, তুমিই বাঁধো না।

২। ওরে, তোরা কি উত্তরকূটের মানুষ? দে, আমাকে দে। (বাঁধিতে বাঁধিতে) কেমন হে, গুরু কী বলছেন?

ধনঞ্জয়। কষে চেপে ধরেছেন, সহজে ছাড়ছেন না।

ভৈরবপন্থীর প্রবেশ

গান

তিমির-হৃদ্‌বিদারণ
জলদগ্নি-নিদারুণ,
মরুশ্মশান-সঞ্চর,
শংকর শংকর।
বজ্রঘোষ-বাণী
রুদ্র, শূলপাণি,
মৃত্যু-সিন্ধু-সন্তর,
শংকর শংকর। [প্রস্থান

কুন্দন। ওই দেখো চেয়ে। গোধূলির আলো যতই নিবে আসছে আমাদের যন্ত্রের চূড়াটা ততই কালো হয়ে উঠছে।

১। দিনের বেলায় ও সূর্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এসেছে, অন্ধকারে ও রাত্রিবেলাকার কালোর সঙ্গে টক্কর দিতে লেগেছে। ওকে ভূতের মতো দেখাচ্ছে।

কুন্দন। বিভূতি তার কীর্তিটাকে এমন করে গড়ল কেন ভাই? উত্তরকূটের যে দিকেই ফিরি ওর দিকে না তাকিয়ে থাকবার জো নেই, ও যেন একটা বিকট চীৎকারের মতো।

চতুর্থ নাগরিকের প্রবেশ

৪। খবর পাওয়া গেল, ওই আমবাগানের পিছনে রাজার শিবির পড়েছে, সেখানে যুবরাজকে রেখে দিয়েছে।

২। এতক্ষণে বোঝা গেল। তাই বটে বৈরাগী এই পথেই ঘুরছে। ও থাক্ এইখানেই বাঁধা পড়ে। ততক্ষণ দেখে আসি। [নাগরিকদের প্রস্থান

ধনঞ্জয়। গান

শুধু কি তার বেঁধেই তোর কাজ ফুরাবে,
গুণী মোর, ও গুণী ?
বাঁধাবীণা রইবে পড়ে এমনি ভাবে,
গুণী মোর, ও গুণী ?
তাহলে হার হল যে হার হল
শুধু বাঁধাবাঁধিই সার হল
গুণী মোর, ও গুণী !
বাঁধনে যদি তোমার হাত লাগে,
তাহলেই সুর জাগে,
গুণী মোর, ও গুণী।
না হলে ধুলায় পড়ে লাজ কুড়াবে।

নাগরিকদের পুনঃপ্রবেশ

১। এ কী কাণ্ড ?

২। খুড়ো মহারাজ যুবরাজকে সমস্ত প্রহরীসুদ্ধ মোহনগড়ে নিয়ে গেলেন। এর মানে কী হল ?

কুন্দন। উত্তরকূটের রক্ত তো ওঁর শিরায় আছে। পাছে এখানে যুবরাজের উচিত বিচার না হয় সেইজন্যে তাঁকে জোর করে বন্দী করে নিয়ে গেছেন।

১। ভারি অন্যায়। একে অত্যাচার বলে। আমাদের যুবরাজকে আমরা শাস্তি দিতে পারব না ?

২। এর উচিত বিধান হচ্ছে—বুঝলে, দাদা—

১। হাঁ, হাঁ, ওঁদের সেই সোনার খনিটা—

কুন্দন। আর জানিস তো, ভাই, ওঁর গোষ্ঠে কিছু না হবে তো পঁচিশ হাজার গোরু আছে।

১। তার সব কটি গুনে নিয়ে তবে—কী অন্যায়। অসহ্য অন্যায়।

৩। আর ওঁদের সেই জাফরানের খেত, তার থেকে অন্তত পক্ষে বৎসরে—

২। হাঁ, হাঁ, সেটা দিতে হবে ওঁকে দণ্ড। কিন্তু এখন এই বৈরাগীকে নিয়ে কী করা যায় ?

১। ও ওইখানেই থাক্ না পড়ে। [নাগরিকদের প্রস্থান

ধনঞ্জয়। গান

ফেলে রাখলেই কি পড়ে রবে? (ও অবোধ)
যে তার দাম জানে সে কুড়িয়ে লবে। (ও অবোধ)
ওযে কোন্ রতন তা দেখ্ না ভাবি,
ওর 'পরে কি ধুলোর দাবি?
ও হারিয়ে গেলে তাঁরি গলার
হার গাঁথা যে ব্যর্থ হবে।
ওর খোঁজ পড়েছে জানিস নে তা?
তাই দূত বেরোল হেথা সেথা।
যারে করলি হেলা সবাই মিলি,
আদর যে তার বাড়িয়ে দিলি,
যারে দরদ দিলি, তার ব্যথা কি
সেই দরদির প্রাণে স'বে?

কুন্দনের পুনঃপ্রবেশ

কুন্দন। ঠাকুর, তোমার বাঁধনটা খুলে দি, অপরাধ নিয়ো না। তুমি এখনই বাড়ি পালাও। কী জানি আজ রাত্রে—

ধনঞ্জয়। কী জানি আজ রাত্রে যদি ডাক পড়ে সেইজন্তেই তো বাড়ি পালাবার জো নাই।

কুন্দন। এখানে তোমার ডাক কোথায়?

ধনঞ্জয়। উৎসবের শেষ পালাটায়।

কুন্দন। তুমি শিবতরাইয়ের মানুষ হয়ে উত্তরকূটের—

ধনঞ্জয়। ভৈরবের উৎসবে এখন শিবতরাইয়ের আরতিই কেবল বাকি আছে।

নেপথ্যে। জাগো, ভৈরব, জাগো!

কুন্দন। আমার ভালো বোধ হচ্ছে না, চললেম। [উভয়ের প্রস্থান

উত্তরকূটের দুইজন রাজদূতের প্রবেশ

১। এখন কোন্ দিকে যাই? নওআমুড়ে যারা ছাগল চরায় তারা তো বললে, তারা দেখেছে যুবরাজ একলা এই পথ দিয়ে পশ্চিমের দিকে গেছেন।

২। আজ রাত্রে তাঁকে খুঁজে বের করতেই হবে মহারাজের হুকুম।

১। মোহনগড়ে তাঁকে নিয়ে গেছে বলে কথা উঠেছে। কিন্তু অন্ধা পাগলীর কথা শুনে স্পষ্ট বোধ হচ্ছে সে যাকে দেখেছে সে আমাদের যুবরাজ—আর তিনি এই পথ দিয়েই উঠেছেন।

২। কিন্তু এই অন্ধকারে তিনি একলা কোথায় যে যাবেন বোঝা যাচ্ছে না।

১। আলো না হলে আমরা তো এক পা এগোতে পারব না। কোটপালের কাছ থেকে আলো সংগ্রহ করে আনি গে। [উভয়ের প্রস্থান

একজন পথিকের প্রবেশ

পথিক (চীৎকার করিয়া)। ওরে বুধ—ন, শম্ভু—উ। বিপদে ফেললে। আমাকে এগিয়ে দিলে, বললে, চড়াই পথ বেয়ে সোজা এসে আমাকে ধরবে। কারও দেখা নেই। অন্ধকারে ওই কালো যন্ত্রটা ইশারা করছে। ভয় লাগিয়ে দিলে। কে আসে? কে হে? জবাব দাও না কেন? বুধন না কি?

২ পথিক। আমি নিমকু, বাতিওআলা। রাজধানীতে সমস্ত রাত আলো জ্বলবে, বাতির দরকার। তুমি কে?

১ পথিক। আমি হুব্বা, যাত্রার দলে গান করি। পথের মধ্যে দেখতে পেলে কি আন্দু অধিকারীর দল?

নিমকু। অনেক মানুষ আসছে, কাকে চিনব?

হুব্বা। অনেক মানুষের মধ্যে তাকে ধ'রো না, আমাদের আন্দু। সে একেবারে আস্ত একখানি মানুষ—ভিড়ের মধ্যে তাকে খুঁটে বের করতে হয় না—সবাইকে ঠেলে দেখা দেয়। দাদা, তোমার ওই ঝুড়িটার মধ্যে বোধ করি বাতি অনেকগুলো আছে, একখানা দাও না। ঘরের লোকের চেয়ে রাস্তার লোকের আলোর দরকার বেশি।

নিমকু। দাম কত দেবে?

হুব্বা। দামই যদি দিতে পারতুম তবে তো তোমার সঙ্গে হেঁকে কথা কইতুম, মিঠে সুর বের করব কেন?

নিমকু। রসিক বট হে। [প্রস্থান

হুব্বা। বাতি দিলে না, কিন্তু রসিক বলে চিনে নিলে। সেটা কম কথা নয়। রসিকের গুণ এই, ঘোর অন্ধকারেও তাকে চেনা যায়।—উঃ, ঝিঁঝির ডাকে আকাশটার গা ঝিমঝিম করছে। নাঃ বাতিওআলার সঙ্গে রসিকতা না করে ডাকাতি করলে কাজে লাগত।

আর-একজন পথিকের প্রবেশ

পথিক। হেইয়ো!

হুব্বা। বাবা রে, চমকিয়ে দাও কেন?

পথিক। এখন চলো!

হুব্বা। চলব বলেই তো বেরিয়েছিলুম। দলের লোককে ছাড়িয়ে চলতে গিয়ে কি রকম অচল হয়ে পড়তে হয় সেই তত্ত্বটা মনে মনে হজম করবার চেষ্টা করছি।

পথিক। দলের লোক তৈরি আছে এখন তুমি গিয়ে জুটলেই হবে।

হুব্বা। কথাটা কী বললে? আমরা তিনমোহনার লোক, আমাদের একটা বদ অভ্যেস আছে পষ্ট কথা না হলে বুঝতেই পারি নে। দলের লোক বলছ কাকে?

পথিক। আমরা চবুয়া গাঁয়ের লোক, পষ্ট বোঝাবার বদ অভ্যেসে হাত পাকিয়েছি। (ধাক্কা দিয়া) এইবার বুঝলে তো?

হুব্বা। উঃ বুঝেছি। ওর সোজা মানে হচ্ছে, আমাকে চলতেই হবে মর্জি থাক আর না থাক। কোথায় চলব? এবার একটু মোলায়েম করে জবাব দিয়ো। তোমার আলাপের প্রথম ধাক্কাতেই আমার বুদ্ধি পরিষ্কার হয়ে এসেছে।

পথিক। শিবতরাইয়ে যেতে হবে।

হুব্বা। শিবতরাইয়ে? এই অমাবস্যারাত্রে? সেখানে পালাটা কিসের?

পথিক। নন্দিসংকটের ভাঙা গড় ফিরে গাঁথবার পালা।

হুব্বা। ভাঙা গড় আমাকে দিয়ে গাঁথাবে? দাদা, অন্ধকারে আমার চেহারাটা দেখতে পাচ্ছ না বলেই এত বড়ো শক্ত কথাটা বললে। আমি হচ্ছি—

পথিক। তুমি যেই হও না কেন, দুখানা হাত আছে তো?

হুব্বা। নেহাত না থাকলে নয় বলেই আছে নইলে একে কি—

পথিক। হাতের পরিচয় মুখের কথায় হয় না, যথাস্থানেই হবে, এখন ওঠো।

দ্বিতীয় পথিকের প্রবেশ

২ পথিক। ওই আর-একজন লোককে পেয়েছি কম্বর।

কম্বর। লোকটা কে?

৩। আমি কেউ না, বাবা, আমি লছমন, উত্তরভৈরবের মন্দিরে ঘণ্টা বাজাই।

কম্বর। সে তো ভালো কথা, হাতে জোর আছে। চলো শিবতরাই।

লছমন। যাব তো, কিন্তু মন্দিরের ঘণ্টা—

কম্বর। বাবা ভৈরব নিজের ঘণ্টা নিজেই বাজাবেন।

লছমন। দোহাই তোমাদের, আমার স্ত্রী রোগে ভুগছে।

কঙ্কর। তুমি চলে গেলে তার রোগ হয় সারবে, নয় সে মরবে ; তুমি থাকলেও ঠিক তাই হত।

হুব্বা। ভাই লছমন, চুপ করে মেনে যাও। কাজটাতে বিপদ আছে বটে, কিন্তু আপত্তিতেও বিপদ কম নেই, আমি একটু আভাস পেয়েছি।

কঙ্কর। ওই যে, নরসিঙের গলা শোনা যাচ্ছে। কী নরসিং খবর ভালো তো।

কয়েকজন লোককে লইয়া নরসিঙের প্রবেশ

নরসিং। এই দেখো, দল জুটিয়ে এনেছি। আরও কয়দল আগেই রওনা হয়েছে।

কঙ্কর। তা হলে চলো, পথের মধ্যে আরও কিছু কিছু জুটবে।

দলের একজন। আমি যাব না।

কঙ্কর। কেন যাবে না? কী হয়েছে?

উক্ত ব্যক্তি। কিছু হয় নি, আমি যাব না।

কঙ্কর। লোকটার নাম কী, নরসিং?

নরসিং। ওর নাম বনোয়ারি, পদ্মবীজের মালা তৈরি করে।

কঙ্কর। আচ্ছা, ওর সঙ্গে একটু বোঝাপড়া করে নিই—কেন যাবে না বলো তো?

বনোয়ারি। প্রবৃত্তি নেই। শিবতরাইয়ের লোকের সঙ্গে আমার ঝগড়া নেই। ওরা আমাদের শত্রু নয়।

কঙ্কর। আচ্ছা, না হয় আমরাই ওদের শত্রু হলুম, তারও তো একটা কর্তব্য আছে?

বনোয়ারি। আমি অন্যায় করতে পারব না।

কঙ্কর। ন্যায় অন্যায় ভাববার স্বাতন্ত্র্য যেখানে সেইখানেই অন্যায় হচ্ছে অন্যায়। উত্তরকূট বিরাট, তার অংশরূপে যে কাজ তোমার দ্বারা হবে তার কোনো দায়িত্বই তোমার নেই।

বনোয়ারি। উত্তরকূটকে ছাড়িয়ে থাকেন এমন বিরাটও আছেন। উত্তরকূটও তাঁর যেমন অংশ, শিবতরাইও তেমনি।

কঙ্কর। ওহে নরসিং, লোকটা তর্ক করে যে। দেশের পক্ষে ওর বাড়া আপদ আর নেই।

নরসিং। শক্ত কাজে লাগিয়ে দিলেই তর্ক ঝাড়াই হয়ে যায়। তাই ওকে টেনে নিয়ে চলেছি।

বনোয়ারি। তাতে তোমাদের ভার হয়ে থাকব, কোনো কাজে লাগব না।

কম্বর। উত্তরকূটের ভার তুমি, তোমাকে বর্জন করবার উপায় খুঁজছি।

ধনঞ্জয়। বনোয়ারি খুড়ো, তুমি বিচার করে সব কথা বুঝতে চাও বলেই, যারা বিনা বিচারে বুঝিয়ে থাকে তাদের সঙ্গে তোমার এত ঠোকাঠুকি বাধে। হয় তাদের প্রণালীটা কায়দা করে নাও, নয় নিজের প্রণালীটা ছেড়ে ঠাণ্ডা হয়ে বসে থাকো।

বনোয়ারি। তোমার প্রণালীটা কী।

ধনঞ্জয়। আমি গান গাই। সেটা এখানে খাটবে না বলেই সুর বের করছি নে— নইলে এতক্ষণে তান লাগিয়ে দিতুম।

কম্বর। (বনোয়ারির প্রতি) এখন তোমার অভিপ্রায় কী ?

বনোয়ারি। আমি এক পা নড়ব না।

কম্বর। তাহলে আমরাই তোমাকে নড়াব। বাঁধো ওকে।

ধনঞ্জয়। একটা কথা বলি, কম্বর দাদা, রাগ ক'রো না। ওকে বয়ে নিয়ে যেতে যে জোরটা খরচ করবে সেইটে বাঁচাতে পারলে কাজে লাগত।

কম্বর। উত্তরকূটের সেবায় যারা অনিচ্ছুক তাদের দমন করা একটা কাজ, সময় থাকতে এই কথাটা বুঝে দেখো।

ধনঞ্জয়। এরই মধ্যে বুঝে নিয়েছি। [নরসিং ও কম্বর ছাড়া আর সকলের প্রস্থান

নরসিং। ওই যে বিভূতি আসছে। যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়।

বিভূতির প্রবেশ

কম্বর। কাজ অনেকটা এগিয়েছে, লোকও কম জোটে নি। কিন্তু তুমি এখানে কেন ? তোমাকে নিয়ে সবাই যে উৎসব করবে।

বিভূতি। উৎসবে আমার শখ নেই।

নরসিং। কেন বলো তো ?

বিভূতি। আমার কীর্তি খর্ব করবার জন্যেই নন্দিসংকটের গড় ভাঙার খবর ঠিক আজ এসে পৌঁছোল। আমার সঙ্গে একটা প্রতিযোগিতা চলছে।

কম্বর। কার প্রতিযোগিতা, যন্ত্ররাজ ?

বিভূতি। নাম করতে চাই নে, সবাই জান। উত্তরকূটে তাঁর বেশি আদর হবে, না আমার, এই হয়ে দাঁড়াল সমস্যা। একটা কথা তোমাদের জানা নেই ; এর মধ্যে

আমার কাছে কোনো পক্ষ থেকে দূত এসেছিল আমায় মন ভাঙাতে ; আমার মুক্তধারার বাঁধ ভাঙবে এমন শাসনবাক্যেরও আভাস দিয়ে গেল।

নরসিং। এত বড়ো কথা ?

কম্বর। তুমি সহ্য করলে, বিভূতি ?

বিভূতি। প্রলাপবাক্যের প্রতিবাদ চলে না।

কম্বর। কিন্তু বিভূতি, এত বেশি নিঃসংশয় হওয়া কি ভালো ? তুমিই তো বলেছিলে বাঁধের বন্ধন দুই এক জায়গায় আলগা আছে, তার সন্ধান জানলে অল্প একটুখানিতেই—

বিভূতি। সন্ধান যে জানবে সে এও জানবে যে, সেই ছিদ্র খুলতে গেলে তার রক্ষা নেই, বন্যায় তখনই ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

নরসিং। পাহারা রাখলে ভালো করতে না ?

বিভূতি। সে ছিদ্রের কাছে যম স্বয়ং পাহারা দিচ্ছেন। বাঁধের জন্যে কিছুমাত্র আশঙ্কা নেই। আপাতত ওই নন্দিসংকটের পথটা আটকে দিতে পারলে আমার আর কোনো খেদ থাকে না।

কম্বর। তোমার পক্ষে এ তো কঠিন নয়।

বিভূতি। না, আমার যন্ত্র প্রস্তুত আছে। মুশকিল এই যে, ওই গিরিপথটা সংকীর্ণ, অনায়াসেই অল্প কয়েক জনেই বাধা দিতে পারে।

নরসিং। বাধা কত দেবে ? মরতে মরতে গেঁথে তুলব।

বিভূতি। মরবার লোক বিস্তর চাই।

কম্বর। মারবার লোক থাকলে মরবার লোকের অভাব ঘটে না।

নেপথ্যে। জাগো, ভৈরব, জাগো।

ধনঞ্জয়ের প্রবেশ

কম্বর। ওই দেখো, যাবার মুখে অযাত্রা।

বিভূতি। বৈরাগী, তোমাদের মতো সাধুরা ভৈরবকে এ পর্যন্ত জাগাতে পারলে না, আর যাকে পাষণ্ড বল সেই আমি ভৈরবকে জাগাতে চলেছি।

ধনঞ্জয়। সে কথা মানি, জাগাবার ভার তোমাদের উপরেই।

বিভূতি। এ কিন্তু তোমাদের ঘণ্টা নেড়ে আরতির দীপ জ্বালিয়ে জাগানো নয়।

ধনঞ্জয়। না, তোমরা শিকল দিয়ে তাঁকে বাঁধবে, তিনি শিকল ছেঁড়বার জন্যে জাগবেন।

বিভূতি। সহজ শিকল আমাদের নয়, পাকের পর পাক, গ্রন্থির পর গ্রন্থি।

ধনঞ্জয়। সব চেয়ে দুঃসাধ্য যখন হয় তখনই তাঁর সময় আসে।

ভৈরবপন্থীর প্রবেশ

গান

জয় ভৈরব, জয় শংকর,
জয় জয় জয় প্রলয়ংকর।
জয় সংশয়-ভেদন,
জয় বন্ধন-ছেদন,
জয় সংকট-সংহর,
শংকর, শংকর। [প্রস্থান

রণজিৎ ও মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। মহারাজ, শিবির একেবারে শূন্য, অনেকখানি পুড়েছে। অল্প কয়জন প্রহরী ছিল, তারা তো—

রণজিৎ। তারা যেখানেই থাক না, অভিজিৎ কোথায় জানা চাই।

কম্বর। মহারাজ, যুবরাজের শাস্তি আমরা দাবি করি।

রণজিৎ। শাস্তির যে যোগ্য তার শাস্তি দিতে আমি কি তোমাদের অপেক্ষা করে থাকি?

কম্বর। তাঁকে খুঁজে না পেয়ে লোকের মনে সংশয় উপস্থিত হয়েছে।

রণজিৎ। কী! সংশয়! কার সম্বন্ধে?

কম্বর। ক্ষমা করবেন, মহারাজ। প্রজাদের মনের ভাব আপনার জানা চাই। যুবরাজকে খুঁজে পেতে যতই বিলম্ব হচ্ছে ততই তাদের অধৈর্য এত বেড়ে উঠছে যে, যখন তাঁকে পাওয়া যাবে তখন তারা শাস্তির জন্যে মহারাজের অপেক্ষা করবে না।

বিভূতি। মহারাজের আদেশের অপেক্ষা না করেই নন্দিসংকটের ভাঙা দুর্গ গড়ে তোলবার ভার আমরা নিজের হাতে নিয়েছি।

রণজিৎ। আমার হাতে কেন রাখতে পারলে না?

বিভূতি। যেটা আপনারই বংশের অপকীর্তি, তাতে আপনারও গোপন সম্মতি আছে এ রকম সন্দেহ হওয়া মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক।

মন্ত্রী। মহারাজ, আজ জনসাধারণের মন একদিকে আত্মশ্লাঘায় অন্যদিকে ক্রোধে উত্তেজিত। আজ অধৈর্যের দ্বারা অধৈর্যকে উদ্দাম করে তুলবেন না।

রণজিৎ। ওখানে ও কে দাঁড়িয়ে? ধনঞ্জয় বৈরাগী?

ধনঞ্জয়। বৈরাগীটাকেও মহারাজের মনে আছে দেখছি।

রণজিৎ। যুবরাজ কোথায় তা তুমি নিশ্চিত জান।

ধনঞ্জয়। না, মহারাজ, যা আমি নিশ্চিত জানি তা চেপে রাখতে পারি নে, তাই বিপদে পড়ি।

রণজিৎ। তবে এখানে কী করছ?

ধনঞ্জয়। যুবরাজের প্রকাশের জন্যে অপেক্ষা করছি।

নেপথ্যে। সুমন, বাবা সুমন। অন্ধকার হয়ে এল, সব অন্ধকার হয়ে এল।

রাজা। ও কে ও?

মন্ত্রী। সেই অম্বা পাগলী।

অম্বার প্রবেশ

অম্বা। কই, সে তো ফিরল না।

রণজিৎ। কেন খুঁজছ তাকে? সময় হয়েছিল, ভৈরব তাকে ডেকে নিয়েছেন।

অম্বা। ভৈরব কি কেবল ডেকেই নেন? ভৈরব কি কখনো ফিরিয়ে দেন না? চুপিচুপি? গভীর রাত্রে?—সুমন, সুমন। [প্রস্থান

চরের প্রবেশ

চর। শিবতরাই থেকে হাজার হাজার লোক চলে আসছে।

বিভূতি। সে কী কথা? আমরা হঠাৎ গিয়ে তাদের নিরস্ত্র করব এই তো ঠিক ছিল। নিশ্চয় তোমাদের কোনো বিশ্বাসঘাতক তাদের খবর দিয়েছে। কঙ্কর, তোমরা কয়জন ছাড়া ভিতরের কথা কেউ তো জানে না। তাহলে কী করে—

কঙ্কর। কী বিভূতি! আমাদেরও সন্দেহ কর না কি?

বিভূতি। সন্দেহ করার সীমা কোথাও নেই।

কঙ্কর। তাহলে আমরাও তোমাকে সন্দেহ করি।

বিভূতি। সে অধিকার তোমাদের আছে। যাই হ'ক সময় হলে এর একটা বোঝা-পড়া করতে হবে।

রণজিৎ। (চরের প্রতি) তারা কী অভিপ্রায়ে আসছে তুমি জান?

চর। তারা শুনেছে—যুবরাজ বন্দী হয়েছেন, তাই পণ করেছে তাঁকে খুঁজে বের করবে। এখান থেকে মুক্ত করে তাঁকে ওরা শিবতরাইয়ের রাজা করতে চায়।

বিভূতি। আমরাও খুঁজছি যুবরাজকে, আর ওরাও খুঁজছে, দেখি কার হাতে পড়েন।

ধনঞ্জয়। তোমাদের দুই দলেরই হাতে পড়বেন, তাঁর মনে পক্ষপাত নেই।

চর। ওই যে আসছে শিবতরাইয়ের গণেশ সর্দার।

গণেশের প্রবেশ

গণেশ (ধনঞ্জয়ের প্রতি)। ঠাকুর, পাব তো তাঁকে ?

ধনঞ্জয়। হাঁ রে, পাবি।

গণেশ। নিশ্চয় করে বলো।

ধনঞ্জয়। পাবি রে।

রণজিৎ। কাকে খুঁজছিস ?

গণেশ। এই যে রাজা, ছেড়ে দিতে হবে।

রণজিৎ। কাকে রে ?

গণেশ। আমাদের যুবরাজকে। তোমরা তাকে চাও না, আমরা তাকে চাই। আমাদের সবই তোমরা আটক করে রাখবে ? ওকেও ?

ধনঞ্জয়। মানুষ চিনলি নে, বোকা ? ওকে আটক করে এমন সাধ্য আছে কার ?

গণেশ। ওকে আমাদের রাজা করে রাখব।

ধনঞ্জয়। রাখবি বই কি। ও রাজবেশ পরে আসবে।

ভৈরবপন্থীর প্রবেশ

গান

তিমির-হৃদ্‌বিদারণ
জলদগ্নি-নিদারুণ,
মরুশ্মশান-সঞ্চর,
শংকর, শংকর।
বজ্রঘোষ-বাণী,
রুদ্র, শূলপাণি,
মৃত্যুসিন্ধু-সন্তর,
শংকর, শংকর। [প্রস্থান

নেপথ্যে। মা ডাকে, মা ডাকে। ফিরে আয়, সুমন ফিরে আয়।

বিভূতি। ও কী শুনি? ও কিসের শব্দ?

ধনঞ্জয়। অন্ধকারের বুকের ভিতর খিল খিল করে হেসে উঠল যে।

বিভূতি। আঃ থামো না, শব্দটা কোন্ দিকে বলো তো?

নেপথ্যে। জয় হ'ক, ভৈরব।

বিভূতি। এ তো স্পষ্টই জলস্রোতের শব্দ।

ধনঞ্জয়। নাচ আরম্ভের প্রথম ডমরুধ্বনি।

বিভূতি। শব্দ বেড়ে উঠছে যে, বেড়ে উঠছে।

কঙ্কর। এ যেন—

নরসিং। বোধ হচ্ছে যেন—

বিভূতি। হাঁ, হাঁ, সন্দেহ নেই। মুক্তধারা ছুটেছে। বাঁধ কে ভাঙলে? কে ভাঙলে?—তার নিস্তার নেই। [কঙ্কর, নরসিং ও বিভূতির দ্রুত প্রস্থান

রণজিৎ। মন্ত্রী, এ কী কাণ্ড?

ধনঞ্জয়। বাঁধ-ভাঙার উৎসবে ডাক পড়েছে।

গান

বাজে রে বাজে ডমরু বাজে
হৃদয় মাঝে, হৃদয় মাঝে।

মন্ত্রী। মহারাজ এ যেন—

রণজিৎ। হাঁ, এ যেন তাঁরই—

মন্ত্রী। তিনি ছাড়া আর তো কারও—

রণজিৎ। এমন সাহস আর কার?

ধনঞ্জয়। গান

নাচে রে নাচে চরণ নাচে,
প্রাণের কাছে, প্রাণের কাছে।

রণজিৎ। শাস্তি দিতে হয় আমি শাস্তি দেব। কিন্তু এইসব উন্মত্ত প্রজাদের হাত থেকে—আমার অভিজিৎ দেবতার প্রিয়, দেবতারা তাকে রক্ষা করুন।

গণেশ। প্রভু, ব্যাপার কী হল কিছু তো বুঝতে পারছি নে।

ধনঞ্জয়। গান

প্রহর জাগে, প্রহরী জাগে,
তারায় তারায় কাঁপন লাগে।

রণজিৎ। ওই পায়ের শব্দ শুনছি যেন। অভিজিৎ, অভিজিৎ।

মন্ত্রী। ওই যেন আসছেন।

ধনঞ্জয়। গান

মরমে মরমে বেদনা ফুটে,
বাঁধন টুটে, বাঁধন টুটে।

সঞ্জয়ের প্রবেশ

রণজিৎ। এ যে সঞ্জয়। অভিজিৎ কোথায়?

সঞ্জয়। মুক্তধারার স্রোত তাঁকে নিয়ে গেল, আমরা তাঁকে পেলুম না।

রণজিৎ। কি বলছ, কুমার।

সঞ্জয়। যুবরাজ মুক্তধারার বাঁধ ভেঙেছেন।

রণজিৎ। বুঝেছি, সেই মুক্তিতে তিনি মুক্তি পেয়েছেন। সঞ্জয়, তোমাকে কি তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন?

সঞ্জয়। না, কিন্তু আমি মনে বুঝেছিলুম তিনি ওইখানেই যাবেন, আমি গিয়ে অন্ধকারে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলুম, কিন্তু ওই পর্যন্ত—বাধা দিলেন, আমাকে শেষ পর্যন্ত যেতে দিলেন না।

রণজিৎ। কী হল আর-একটু বলো।

সঞ্জয়। ওই বাঁধের একটা ত্রুটির সন্ধান কী করে তিনি জেনেছিলেন। সেইখানে যন্ত্রাসুরকে তিনি আঘাত করলেন, যন্ত্রাসুর তাঁকে সেই আঘাত ফিরিয়ে দিলে। তখন মুক্তধারা তাঁর সেই আহত দেহকে মায়ের মতো কোলে তুলে নিয়ে চলে গেল।

গণেশ। যুবরাজকে আমরা যে খুঁজতে বেরিয়েছিলুম তাহলে তাঁকে কি আর পাব না।

ধনঞ্জয়। চিরকালের মতো পেয়ে গেলি।

ভৈরবপন্থীর প্রবেশ

গান

জয় ভৈরব, জয় শংকর,
জয় জয় জয় প্রলয়ংকর।

জয় সংশয়-ভেদন,
জয় বন্ধন-ছেদন,
জয় সংকট-সংহর,
শংকর, শংকর।
তিমির-হৃদ্‌বিদারণ
জলদগ্নি নিদারুণ,
মরু-শ্মশান-সঞ্চর,
শংকর, শংকর।
বজ্রঘোষ-বাণী,
রুদ্র, শূলপাণি,
মৃত্যুসিন্ধু-সন্তর,
শংকর, শংকর।

পৌষসংক্রান্তি, ১৩২৮
শান্তিনিকেতন

উপন্যাস ও গল্প

গল্পগুচ্ছ

গল্পগুচ্ছ

ঘাটের কথা

পাষাণে ঘটনা যদি অঙ্কিত হইত তবে কতদিনকার কত কথা আমার সোপানে সোপানে পাঠ করিতে পারিতে। পুরাতন কথা যদি শুনিতে চাও, তবে আমার এই ধাপে বইস; মনোযোগ দিয়া জলকল্লোলে কান পাতিয়া থাকো, বহুদিনকার কত বিস্মৃত কথা শুনিতে পাইবে।

আমার আর-একদিনের কথা মনে পড়িতেছে। সেও ঠিক এইরূপ দিন। আশ্বিন মাস পড়িতে আর দুই-চারি দিন বাকি আছে। ভোরের বেলায় অতি ঈষৎ মধুর নবীন শীতের বাতাস নিদ্রোত্থিতের দেহে নূতন প্রাণ আনিয়া দিতেছে। তরু-পল্লব অমনি একটু একটু শিহরিয়া উঠিতেছে।

ভরা গঙ্গা। আমার চারিটিমাত্র ধাপ জলের উপরে জাগিয়া আছে। জলের সঙ্গে স্থলের সঙ্গে যেন গলাগলি। তীরে আম্রকাননের নিচে যেখানে কচুবন জন্মিয়াছে, সেখান পর্যন্ত গঙ্গার জল গিয়াছে। নদীর ওই বাঁকের কাছে তিনটে পুরাতন ইঁটের পাঁজা চারিদিকে জলের মধ্যে জাগিয়া রহিয়াছে। জেলেদের যে নৌকাগুলি ডাঙার বাবলাগাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা ছিল সেগুলি প্রভাতে জোয়ারের জলে ভাসিয়া উঠিয়া টলমল করিতেছে—দুরন্তযৌবন জোয়ারের জল রঙ্গ করিয়া তাহাদের দুই পাশে ছল ছল আঘাত করিতেছে, তাহাদের কর্ণ ধরিয়া মধুর পরিহাসে নাড়া দিয়া যাইতেছে।

ভরা গঙ্গার উপরে শরৎপ্রভাতের যে রৌদ্র পড়িয়াছে, তাহার কাঁচা সোনার মতো রং, চাঁপা ফুলের মতো রং। রৌদ্রের এমন রং আর কোনো সময়ে দেখা যায় না। চড়ার উপরে কাশবনের উপরে রৌদ্র পড়িয়াছে। এখনও কাশফুল সব ফুটে নাই, ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র।

রাম রাম বলিয়া মাঝিরা নৌকা খুলিয়া দিল। পাখিরা যেমন আলোতে পাখা মেলিয়া আনন্দে নীল আকাশে উড়িয়াছে, ছোটো ছোটো নৌকাগুলি তেমনি ছোটো ছোটো পাল ফুলাইয়া সূর্যকিরণে বাহির হইয়াছে। তাহাদের পাখি বলিয়া মনে

হয়; তাহারা রাজহাঁসের মতো জলে ভাসিতেছে, কিন্তু আনন্দে পাখা দুটি আকাশে ছড়াইয়া দিয়াছে।

ভট্টাচার্য মহাশয় ঠিক নিয়মিত সময়ে কোশাকুশি লইয়া স্নান করিতে আসিয়াছেন। মেয়েরা দুই-একজন করিয়া জল লইতে আসিয়াছে।

সে বড়ো বেশি দিনের কথা নহে। তোমাদের অনেক দিন বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু আমার মনে হইতেছে এই সেদিনের কথা। আমার দিনগুলি কিনা গঙ্গার স্রোতের উপর খেলাইতে খেলাইতে ভাসিয়া যায়, বহুকাল ধরিয়া স্থিরভাবে তাহাই দেখিতেছি—এইজন্য সময় বড়ো দীর্ঘ বলিয়া মনে হয় না। আমার দিনের আলো রাত্রের ছায়া প্রতিদিন গঙ্গার উপরে পড়ে আবার প্রতিদিন গঙ্গার উপর হইতে মুছিয়া যায়, কোথাও তাহাদের ছবি রাখিয়া যায় না। সেইজন্য, যদিও আমাকে বৃদ্ধের মতো দেখিতে হইয়াছে, আমার হৃদয় চিরকাল নবীন। বহুবৎসরের স্মৃতির শৈবালভারে আচ্ছন্ন হইয়া আমার সূর্যকিরণ মারা পড়ে নাই। দৈবাৎ একটা ছিন্ন শৈবাল ভাসিয়া আসিয়া গায়ে লাগিয়া থাকে, আবার স্রোতে ভাসিয়া যায়। তাই বলিয়া যে কিছু নাই এমন বলিতে পারি না। যেখানে গঙ্গার স্রোত পৌঁছায় না, সেখানে আমার ছিদ্রে ছিদ্রে যে লতাগুল্মশৈবাল জন্মিয়াছে, তাহারাই আমার পুরাতনের সাক্ষী, তাহারাই পুরাতন কালকে স্নেহপাশে বাঁধিয়া চিরদিন শ্যামল মধুর চিরদিন নূতন করিয়া রাখিয়াছে। গঙ্গা প্রতিদিন আমার কাছ হইতে এক-এক ধাপ সরিয়া যাইতেছেন, আমিও এক-এক ধাপ করিয়া পুরাতন হইতেছি।

চক্রবর্তীদের বাড়ির ওই যে বৃদ্ধা স্নান করিয়া নামাবলী গায়ে কাঁপিতে কাঁপিতে মালা জপিতে জপিতে বাড়ি ফিরিয়া যাইতেছেন উঁহার মাতামহী তখন এতটুকু ছিল। আমার মনে আছে তাহার এক খেলা ছিল, সে প্রত্যহ একটা ঘৃতকুমারীর পাতা গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিত; আমার দক্ষিণ বাহুর কাছে একটা পাকের মতো ছিল, সেইখানে পাতাটা ক্রমাগত ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, সে কলসী রাখিয়া দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিত। যখন দেখিলাম কিছুদিন বাদে সেই মেয়েটিই আবার ডাগর হইয়া উঠিয়া তাহার নিজের একটি মেয়ে সঙ্গে লইয়া জল লইতে আসিল, সে মেয়েও আবার বড়ো হইল, বালিকারা জল ছুড়িয়া দুরন্তপনা করিলে তিনিও আবার তাহাদিগকে শাসন করিতেন ও ভদ্রোচিত ব্যবহার শিক্ষা দিতেন, তখন আমার সেই ঘৃতকুমারীর নৌকা ভাসানো মনে পড়িত ও বড়ো কৌতুক বোধ হইত।

যে-কথাটা বলিব মনে করি সে আর আসে না। একটা কথা বলিতে বলিতে স্রোতে আর-একটা কথা ভাসিয়া আসে। কথা আসে, কথা যায়, ধরিয়া রাখিতে পারি

না। কেবল এক-একটা কাহিনী সেই মৃতকুমারীর নৌকাগুলির মতো পাকে পড়িয়া অবিশ্রাম ফিরিয়া ফিরিয়া আসে। তেমনি একটা কাহিনী তাহার পসরা লইয়া আজ আমার কাছে ফিরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে কখন ডোবে কখন ডোবে। পাতাটুকুরই মতো সে অতি ছোটো, তাহাতে বেশি কিছু নাই, দুটি খেলার ফুল আছে। তাহাকে ডুবিতে দেখিলে কোমলপ্রাণা বালিকা কেবলমাত্র একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাড়ি ফিরিয়া যাইবে।

মন্দিরের পাশে যেখানে ওই গোঁসাইদের গোয়ালঘরের বেড়া দেখিতেছ, ওইখানে একটা বাবলা গাছ ছিল। তাহারই তলায় সপ্তাহে একদিন করিয়া হাট বসিত। তখনও গোঁসাইরা এখানে বসতি করে নাই। যেখানে তাহাদের চণ্ডীমণ্ডপ পড়িয়াছে, ওইখানে একটা গোলপাতার ছাউনি ছিল মাত্র।

এই যে অশথ গাছ আজ আমার পঞ্জরে পঞ্জরে বাহু প্রসারণ করিয়া সুবিকট সুদীর্ঘ কঠিন অঙ্গুলিজালের ন্যায় শিকড়গুলির দ্বারা আমার বিদীর্ণ পাষাণ-প্রাণ মুঠা করিয়া রাখিয়াছে, এ তখন এতটুকু একটুখানি চারা ছিল মাত্র। কচি কচি পাতাগুলি লইয়া মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল। রৌদ্র উঠিলে ইহার পাতার ছায়াগুলি আমার উপর সমস্ত দিন ধরিয়া খেলা করিত, ইহার নবীন শিকড়গুলি শিশুর অঙ্গুলির ন্যায় আমার বুকের কাছে কিলবিল করিত। কেহ ইহার একটি পাতা ছিঁড়িলে আমার ব্যথা বাজিত।

যদিও বয়স অনেক হইয়াছিল তবু তখনও আমি সিধা ছিলাম। আজ যেমন মেরুদণ্ড ভাঙিয়া অষ্টাবক্রের মতো বাঁকিয়া চুরিয়া গিয়াছি, গভীর ত্রিবলিরেখার মতো সহস্র জায়গায় ফাটল ধরিয়াছে, আমার গর্ভের মধ্যে ঝিঁঝের ভেক তাহাদের শীতকালের সুদীর্ঘ নিদ্রার আয়োজন করিতেছে, তখন আমার সে দশা ছিল না। কেবল আমার বামবাহুর বাহিরের দিকে দুইখানি ইঁটের অভাব ছিল, সেই গর্তটির মধ্যে একটা ফিঙে বাসা করিয়াছিল। ভোরের বেলায় যখন সে উসুখুসু করিয়া জাগিয়া উঠিত, মৎস্যপুচ্ছের ন্যায় তাহার জোড়াপুচ্ছ দুই-চারিবার দ্রুত নাচাইয়া শিস দিয়া আকাশে উড়িয়া যাইত, তখন জানিতাম, কুসুমের ঘাটে আসিবার সময় হইয়াছে।

যে মেয়েটির কথা বলিতেছি ঘাটের অন্যান্য মেয়েরা তাহাকে কুসুম বলিয়া ডাকিত। বোধ করি কুসুমই তাহার নাম হইবে। জলের উপরে যখন কুসুমের ছোটো ছায়াটি পড়িত, তখন আমার সাধ যাইত সে ছায়াটি যদি ধরিয়া রাখিতে পারি, সে ছায়াটি যদি আমার পাষাণে বাঁধিয়া রাখিতে পারি; এমনি তাহার একটি মাধুরী ছিল। সে যখন আমার পাষাণের উপর পা ফেলিত ও তাহার চারগাছি মল বাজিতে থাকিত, তখন

আমার শৈবালগুল্মগুলি যেন পুলকিত হইয়া উঠিত। কুসুম যে খুব বেশি খেলা করিত বা গল্প করিত, বা হাসিতামাশা করিত তাহা নহে, তথাপি আশ্চর্য এই, তাহার যত সঙ্গিনী এমন আর কাহারও নয়। যত দুরন্ত মেয়েদের তাহাকে না হইলে চলিত না। কেহ তাহাকে বলিত কুসি, কেহ তাহাকে বলিত খুশি, কেহ তাহাকে বলিত রাক্কুসি। তাহার মা তাহাকে বলিত কুসমি। যখন তখন দেখিতাম কুসুম জলের ধারে বসিয়া আছে। জলের সঙ্গে তাহার হৃদয়ের সঙ্গে বিশেষ যেন কী মিল ছিল। সে জল ভারি ভালোবাসিত।

কিছুদিন পরে কুসুমকে আর দেখিতে পাই না। ভুবন আর স্বর্ণ ঘাটে আসিয়া কাঁদিত। শুনিলাম তাহাদের কুসি-খুশি-রাক্কুসিকে শ্বশুরবাড়ি লইয়া গিয়াছে। শুনিলাম, যেখানে তাহাকে লইয়া গেছে, সেখানে নাকি গঙ্গা নাই। সেখানে আবার কারা সব নূতন লোক, নূতন ঘরবাড়ি, নূতন পথঘাট। জলের পদ্মটিকে কে যেন ডাঙায় রোপণ করিতে লইয়া গেল।

ক্রমে কুসুমের কথা একরকম ভুলিয়া গেছি। এক বৎসর হইয়া গেছে। ঘাটের মেয়েরা কুসুমের গল্পও বড়ো করে না। একদিন সন্ধ্যার সময়ে বহুকালের পরিচিত পায়ের স্পর্শে সহসা যেন চমক লাগিল। মনে হইল যেন কুসুমের পা। তাহাই বটে, কিন্তু সে পায়ে আর মল বাজিতেছে না। সে পায়ের সে সংগীত নাই। কুসুমের পায়ের স্পর্শ ও মলের শব্দ চিরকাল একত্র অনুভব করিয়া আসিতেছি—আজ সহসা সেই মলের শব্দটি না শুনিতে পাইয়া সন্ধ্যাবেলাকার জলের কল্লোল কেমন বিষণ্ণ শুনাইতে লাগিল, আম্রবনের মধ্যে পাতা ঝরঝর করিয়া বাতাস কেমন হা হা করিয়া উঠিল।

কুসুম বিধবা হইয়াছে। শুনিলাম তাহার স্বামী বিদেশে চাকরি করিত; দুই-একদিন ছাড়া স্বামীর সহিত সাক্ষাৎই হয় নাই। পত্রযোগে বৈধব্যের সংবাদ পাইয়া আট বৎসর বয়সে মাথার সিঁদুর মুছিয়া গায়ের গহনা ফেলিয়া আবার তাহার দেশে সেই গঙ্গার ধারে ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু, তাহার সঙ্গিনীদেরও বড়ো কেহ নাই। ভুবন স্বর্ণ অমলা শ্বশুরঘর করিতে গিয়াছে। কেবল শরৎ আছে, কিন্তু শুনিতেছি অগ্রহায়ণ মাসে তাহারও বিবাহ হইয়া যাইবে। কুসুম নিতান্ত একলা পড়িয়াছে। কিন্তু, সে যখন দুটি হাঁটুর উপর মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া আমার ধাপে বসিয়া থাকিত, তখন আমার মনে হইত যেন নদীর ঢেউগুলি সবাই মিলিয়া হাত তুলিয়া তাহাকে কুসি-খুশি-রাক্কুসি বলিয়া ডাকাডাকি করিত।

বর্ষার আরম্ভে গঙ্গা যেমন প্রতিদিন দেখিতে দেখিতে ভরিয়া উঠে, কুসুম তেমনি দেখিতে দেখিতে প্রতিদিন সৌন্দর্যে যৌবনে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু তাহার মলিন

বসন করুণ মুখ শান্ত স্বভাবে তাহার যৌবনের উপর এমন একটি ছায়াময় আবরণ রচনা করিয়া দিয়াছিল যে, সে যৌবন সে বিকশিত রূপ সাধারণের চোখে পড়িত না। কুসুম যে বড়ো হইয়াছে এ যেন কেহ দেখিতে পাইত না। আমি তো পাইতাম না। আমি কুসুমকে সেই বালিকাটির চেয়ে বড়ো কখনো দেখি নাই। তাহার মল ছিল না বটে, কিন্তু সে যখন চলিত আমি সেই মলের শব্দ শুনিতে পাইতাম। এমনি করিয়া দশ বৎসর কখন কাটিয়া গেল গাঁয়ের লোকেরা কেহ যেন জানিতেই পারিল না।

এই আজ যেমন দেখিতেছ, সে বৎসরেও ভাদ্র মাসের শেষাশেষি এমন একদিন আসিয়াছিল। তোমাদের প্রপিতামহীরা সেদিন সকালে উঠিয়া এমনিতরো মধুর সূর্যের আলো দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহারা যখন এতখানি ঘোমটা টানিয়া কলসী তুলিয়া লইয়া আমার উপরে প্রভাতের আলো আরও আলোময় করিবার জন্য গাছপালার মধ্য দিয়া গ্রামের উঁচুনিচু রাস্তার ভিতর দিয়া গল্প করিতে করিতে চলিয়া আসিতেন তখন তোমাদের সম্ভাবনাও তাঁহাদের মনের এক পার্শ্বে উদিত হইত না। তোমরা যেমন ঠিক মনে করিতে পার না, তোমাদের দিদিমারাও সত্যসত্যই একদিন খেলা করিয়া বেড়াইতেন, আজিকার দিন যেমন সত্য, যেমন জীবন্ত, সেদিনও ঠিক তেমনি সত্য ছিল, তোমাদের মতো তরুণ হৃদয়খানি লইয়া সুখে দুঃখে তাঁহারা তোমাদেরই মতো টলমল করিয়া দুলিয়াছেন, তেমনি আজিকার এই শরতের দিন,—তাঁহারা-হীন, তাঁহাদের সুখদুঃখের স্মৃতিলেশমাত্রহীন আজিকার এই শরতের সূর্যকরোজ্জ্বল আনন্দচ্ছবি—তাঁহাদের কল্পনার নিকটে তদপেক্ষাও অগোচর ছিল।

সেদিন ভোর হইতে প্রথম উত্তরের বাতাস অল্প অল্প করিয়া বহিতে আরম্ভ করিয়া ফুটন্ত বাবলা ফুলগুলি আমার উপরে এক-আধটা উড়াইয়া ফেলিতে ছিল। আমার পাষাণের উপরে একটু একটু শিশিরের রেখা পড়িয়াছিল। সেই দিন সকালে কোথা হইতে গৌরতনু সৌম্যোজ্জ্বলমুখচ্ছবি দীর্ঘকায় এক নবীন সন্ন্যাসী আসিয়া আমার সম্মুখস্থ ওই শিবমন্দিরে আশ্রয় লইলেন। সন্ন্যাসীর আগমনবার্তা গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। মেয়েরা কলসী রাখিয়া বাবাঠাকুরকে প্রণাম করিবার জন্য মন্দিরে গিয়া ভিড় করিল।

ভিড় প্রতিদিন বাড়িতে লাগিল। একে সন্ন্যাসী, তাহাতে অনুপম রূপ, তাহাতে তিনি কাহাকেও অবহেলা করিতেন না, ছেলেদের কোলে লইয়া বসাইতেন, জননী-দিগকে ঘরকন্নার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। নারীসমাজে অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার অত্যন্ত প্রতিপত্তি হইল। তাঁহার কাছে পুরুষও বিস্তর আসিত। কোনোদিন ভাগবত পাঠ করিতেন, কোনোদিন ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা করিতেন, কোনোদিন মন্দিরে বসিয়া নানা শাস্ত্র লইয়া আন্দোলন করিতেন। তাঁহার নিকটে কেহ উপদেশ লইতে আসিত, কেহ

মন্ত্র লইতে আসিত। কেহ রোগের ঔষধ জানিতে আসিত। মেয়েরা ঘাটে আসিয়া বলাবলি করিত—আহা কী রূপ! মনে হয় যেন মহাদেব সশরীরে তাঁহার মন্দিরে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

যখন সন্ন্যাসী প্রতিদিন প্রত্যুষে সূর্যোদয়ের পূর্বে শুকতারাকে সম্মুখে রাখিয়া গঙ্গার জলে নিমগ্ন হইয়া ধীরগম্ভীরস্বরে সন্ধ্যাবন্দনা করিতেন, তখন আমি জলের কল্লোল শুনিতে পাইতাম না। তাঁহার সেই কণ্ঠস্বর শুনিতে শুনিতে প্রতিদিন গঙ্গার পূর্ব উপকূলের আকাশ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিত, মেঘের ধারে ধারে অরুণ রঙের রেখা পড়িত, অন্ধকার যেন বিকাশোন্মুখ কুঁড়ির আবরণ-পুটের মতো ফাটিয়া চারিদিকে নামিয়া পড়িত ও আকাশ-সরোবরে উষাকুসুমের লাল আভা অল্প অল্প করিয়া বাহির হইয়া আসিত। আমার মনে হইত যে, এই মহাপুরুষ গঙ্গার জলে দাঁড়াইয়া পূর্বের দিকে চাহিয়া যে এক মহামন্ত্র পাঠ করেন তাহারই এক-একটি শব্দ উচ্চারিত হইতে থাকে আর নিশীথিনীর কুহক ভাঙিয়া যায়, চন্দ্র-তারা পশ্চিমে নামিয়া পড়ে, সূর্য পূর্বাকাশে উঠিতে থাকে, জগতের দৃশ্যপট পরিবর্তিত হইয়া যায়। এ কে মায়াবী। স্নান করিয়া যখন সন্ন্যাসী হোমশিখার ন্যায় তাঁহার দীর্ঘ শুভ্র পুণ্যতনু লইয়া জল হইতে উঠিতেন, তাঁহার জটাজূট হইতে জল ঝরিয়া পড়িত, তখন নবীন সূর্যকিরণ তাঁহার সর্বাঙ্গে পড়িয়া প্রতিফলিত হইতে থাকিত।

এমন আরও কয়েক মাস কাটিয়া গেল। চৈত্র মাসে সূর্যগ্রহণের সময় বিস্তর লোক গঙ্গাস্নানে আসিল। বাবলাতলায় মস্ত হাট বসিল। এই উপলক্ষে সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্যও লোকসমাগম হইল। যে গ্রামে কুসুমের শ্বশুরবাড়ি সেখান হইতেও অনেক-গুলি মেয়ে আসিয়াছিল।

সকালে আমার ধাপে বসিয়া সন্ন্যাসী জপ করিতেছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়াই সহসা একজন মেয়ে আর-এক জনের গা টিপিয়া বলিয়া উঠিল, "ওলো, এ যে আমাদের কুসুমের স্বামী।"

আর-একজন দুই আঙুলে ঘোমটা কিছু ফাঁক করিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "ওমা, তাইতো গা, এ যে আমাদের চাটুজ্যেদের বাড়ির ছোটোদাদাবাবু।"

আর একজন ঘোমটার বড়ো ঘটা করিত না, সে কহিল, "আহা, তেমনি কপাল, তেমনি নাক, তেমনি চোখ।"

আর-একজন সন্ন্যাসীর দিকে মনোযোগ না করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কলসী দিয়া জল ঠেলিয়া বলিল, "আহা সে কি আর আছে। সে কি আর আসবে। কুসুমের কি তেমনি কপাল।"

তখন কেহ কহিল, "তার এত দাড়ি ছিল না।"

কেহ বলিল, "সে এমন একহারা ছিল না।"

কেহ কহিল, "সে যেন এতটা লম্বা নয়।"

এইরূপে এ-কথাটার একরূপ নিষ্পত্তি হইয়া গেল, আর উঠিতে পাইল না।

গ্রামের আর সকলেই সন্ন্যাসীকে দেখিয়াছিল, কেবল কুসুম দেখে নাই। অধিক লোকসমাগম হওয়াতে কুসুম আমার কাছে আসা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিল। একদিন সন্ধ্যাবেলা পূর্ণিমা তিথিতে চাঁদ উঠিতে দেখিয়া বুঝি আমাদের পুরাতন সম্বন্ধ তাহার মনে পড়িল।

তখন ঘাটে আর কেহ লোক ছিল না। ঝিঁঝি পোকা ঝিঁ ঝিঁ করিতেছিল। মন্দিরের কাঁসর ঘণ্টা বাজা এই কিছুক্ষণ হইল শেষ হইয়া গেল, তাহার শেষ শব্দতরঙ্গ ক্ষীণতর হইয়া পরপারের ছায়াময় বনশ্রেণীর মধ্যে ছায়ার মতো মিলাইয়া গেছে। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না। জোয়ারের জল ছল ছল করিতেছে। আমার উপরে ছায়াটি ফেলিয়া কুসুম বসিয়া আছে। বাতাস বড়ো ছিল না, গাছপালা নিস্তব্ধ। কুসুমের সম্মুখে গঙ্গার বক্ষে অবারিত প্রসারিত জ্যোৎস্না—কুসুমের পশ্চাতে আশে পাশে ঝোপে ঝাপে গাছে পালায়, মন্দিরের ছায়ায়, ভাঙা ঘরের ভিত্তিতে, পুষ্করিণীর ধারে, তালবনে অন্ধকার গা ঢাকা দিয়া মুখে মুড়ি দিয়া বসিয়া আছে। ছাতিম গাছের শাখায় বাদুড় ঝুলিতেছে। মন্দিরের চূড়ায় বসিয়া পেচক কাঁদিয়া উঠিতেছে। লোকালয়ের কাছে শৃগালের ঊর্ধ্ব-চীৎকার ধ্বনি উঠিল ও থামিয়া গেল।

সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে মন্দিরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। ঘাটে আসিয়া দুই-এক সোপান নামিয়া একাকিনী রমণীকে দেখিয়া ফিরিয়া যাইবেন মনে করিতেছেন—এমন সময়ে সহসা কুসুম মুখ তুলিয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল।

তাহার মাথার উপর হইতে কাপড় পড়িয়া গেল। ঊর্ধ্বমুখ ফুটন্ত ফুলের উপরে যেমন জ্যোৎস্না পড়ে, মুখ তুলিতেই কুসুমের মুখের উপর তেমনি জ্যোৎস্না পড়িল। সেই মুহূর্তেই উভয়ের দেখা হইল। যেন চেনাশোনা হইল। মনে হইল যেন পূর্বজন্মের পরিচয় ছিল।

মাথার উপর দিয়া পেচক ডাকিয়া চলিয়া গেল। শব্দে সচকিত হইয়া আত্মসংবরণ করিয়া কুসুম মাথার কাপড় তুলিয়া দিল। উঠিয়া সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে লুটাইয়া প্রণাম করিল।

সন্ন্যাসী আশীর্বাদ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কী।"

কুসুম কহিল, "আমার নাম কুসুম।"

সে-রাত্রে আর কোনো কথা হইল না। কুসুমের ঘর খুব কাছেই ছিল, কুসুম ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। সে-রাত্রে সন্ন্যাসী অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমার সোপানে বসিয়া ছিলেন। অবশেষে যখন পূর্বের চাঁদ পশ্চিমে আসিল, সন্ন্যাসীর পশ্চাতের ছায়া সম্মুখে আসিয়া পড়িল, তখন তিনি উঠিয়া মন্দিরে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

তাহার পরদিন হইতে আমি দেখিতাম কুসুম প্রত্যহ আসিয়া সন্ন্যাসীর পদধূলি লইয়া যাইত। সন্ন্যাসী যখন শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতেন তখন সে একধারে দাঁড়াইয়া শুনিত। সন্ন্যাসী প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন করিয়া কুসুমকে ডাকিয়া তাহাকে ধর্মের কথা বলিতেন। সব কথা সে কি বুঝিতে পারিত। কিন্তু অত্যন্ত মনোযোগের সহিত সে চুপ করিয়া বসিয়া শুনিত। সন্ন্যাসী তাহাকে যেমন উপদেশ করিতেন সে অবিকল তাহাই পালন করিত। প্রত্যহ সে মন্দিরের কাজ করিত—দেবসেবায় আলস্য করিত না—পূজার ফুল তুলিত—গঙ্গা হইতে জল তুলিয়া মন্দির ধৌত করিত।

সন্ন্যাসী তাহাকে যে-সকল কথা বলিয়া দিতেন, আমার সোপানে বসিয়া সে তাহাই ভাবিত। ধীরে ধীরে তাহার যেন দৃষ্টি প্রসারিত হইয়া গেল, হৃদয় উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। সে যাহা দেখে নাই তাহা দেখিতে লাগিল, যাহা শোনে নাই তাহা শুনিতে লাগিল। তাহার প্রশান্ত মুখে যে একটি ম্লান ছায়া ছিল, তাহা দূর হইয়া গেল। সে যখন ভক্তিভরে প্রভাতে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িত, তখন তাহাকে দেবতার নিকটে উৎসর্গীকৃত শিশিরধৌত পূজার ফুলের মতো দেখাইত। একটি সুবিমল প্রফুল্লতা তাহার সর্বশরীর আলো করিয়া তুলিল।

শীতকালের এই অবসান সময়ে শীতের বাতাস বয়, আবার এক-একদিন সন্ধ্যাবেলায় সহসা দক্ষিণ হইতে বসন্তের বাতাস দিতে থাকে, আকাশে হিমের ভাব একেবারে দূর হইয়া যায়—অনেক দিন পরে গ্রামের মধ্যে বাঁশি বাজিয়া উঠে, গানের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। মাঝিরা স্রোতে নৌকা ভাসাইয়া দাঁড় বন্ধ করিয়া শ্যামের গান গাহিতে থাকে। শাখা হইতে শাখান্তরে পাখিরা সহসা পরম উল্লাসে উত্তর-প্রত্যুত্তর করিতে আরম্ভ করে। সময়টা এইরূপ আসিয়াছে।

বসন্তের বাতাস লাগিয়া আমার পাষাণ-হৃদয়ের মধ্যে অল্পে অল্পে যেন যৌবনের সঞ্চার হইতেছে; আমার প্রাণের ভিতরকার সেই নবযৌবনোচ্ছ্বাস আকর্ষণ করিয়াই যেন আমার লতাগুল্মগুলি দেখিতে দেখিতে ফুলে ফুলে একেবারে বিকসিত হইয়া উঠিতেছে। এ সময়ে কুসুমকে আর দেখিতে পাই না। কিছুদিন হইতে সে আর মন্দিরেও আসে না, ঘাটেও আসে না, সন্ন্যাসীর কাছে তাহাকে আর দেখা যায় না।

ইতিমধ্যে কী হইল আমি কিছুই জানিতে পারি নাই। কিছুকাল পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমারই সোপানে সন্ন্যাসীর সহিত কুসুমের সাক্ষাৎ হইল।

কুসুম মুখ নত করিয়া কহিল, "প্রভু, আমাকে কি ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন।"

"হাঁ তোমাকে দেখিতে পাই না কেন। আজকাল দেবসেবায় তোমার এত অবহেলা কেন।"

কুসুম চুপ করিয়া রহিল।

"আমার কাছে তোমার মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলো।"

কুসুম ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া কহিল, "প্রভু, আমি পাপীয়সী সেইজন্যই এই অবহেলা।"

সন্ন্যাসী অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "কুসুম, তোমার হৃদয়ে অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে, আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি।"

কুসুম যেন চমকিয়া উঠিল—সে হয়তো মনে করিল, সন্ন্যাসী কতটা না জানি বুঝিয়াছেন। তাহার চোখ অল্পে অল্পে জলে ভরিয়া আসিল, সে সেইখানে বসিয়া পড়িল; মুখে আঁচল ঢাকিয়া সোপানে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী কিছুদূরে সরিয়া গিয়া কহিলেন, "তোমার অশান্তির কথা আমাকে সমস্ত ব্যক্ত করিয়া বলো, আমি তোমাকে শান্তির পথ দেখাইয়া দিব।"

কুসুম অটল ভক্তির স্বরে কহিল, কিন্তু মাঝে মাঝে থামিল, মাঝে মাঝে কথা বাধিয়া গেল—"আপনি আদেশ করেন তো অবশ্য বলিব। তবে, আমি ভালো করিয়া বলিতে পারিব না, কিন্তু আপনি বোধ করি মনে মনে সকলই জানিতেছেন। প্রভু, আমি একজনকে দেবতার মতো ভক্তি করিতাম, আমি তাঁহাকে পূজা করিতাম, সেই আনন্দে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া ছিল। কিন্তু একদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখিলাম যেন তিনি আমার হৃদয়ের স্বামী, কোথায় যেন একটি বকুলবনে বসিয়া তাঁহার বামহস্তে আমার দক্ষিণ হস্ত লইয়া আমাকে তিনি প্রেমের কথা বলিতেছেন। এ ঘটনা আমার কিছুই অসম্ভব কিছুই আশ্চর্য মনে হইল না। স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল, তবু স্বপ্নের ঘোর ভাঙিল না। তাহার পরদিন যখন তাঁহাকে দেখিলাম আর পূর্বের মতো দেখিলাম না। মনে সেই স্বপ্নের ছবিই উদয় হইতে লাগিল। ভয়ে দূরে পলাইলাম, কিন্তু সে ছবি আমার সঙ্গে সঙ্গে রহিল। সেই অবধি আমার হৃদয়ের অশান্তি আর দূর হয় না—আমার সমস্ত অন্ধকার হইয়া গেছে।"

যখন কুসুম অশ্রু মুছিয়া মুছিয়া এই কথাগুলি বলিতেছিল, তখন আমি অনুভব করিতেছিলাম সন্ন্যাসী সবলে তাঁহার দক্ষিণ পদতল দিয়া আমার পাষাণ চাপিয়া ছিলেন।

কুসুমের কথা শেষ হইলে সন্ন্যাসী বলিলেন, "যাহাকে স্বপ্ন দেখিয়াছ সে কে বলিতে হইবে।"

কুসুম জোড়হাতে কহিল, "তাহা বলিতে পারিব না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "তোমার মঙ্গলের জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি, সে কে স্পষ্ট করিয়া বলো।"

কুসুম সবলে নিজের কোমল হাত দুটি পীড়ন করিয়া হাতজোড় করিয়া বলিল, "নিতান্ত সে কি বলিতেই হইবে।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "হাঁ বলিতেই হইবে।"

কুসুম তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "প্রভু, সে তুমি।"

যেমনি তাহার নিজের কথা নিজের কানে গিয়া পৌঁছিল, অমনি সে মূর্ছিত হইয়া আমার কঠিন কোলে পড়িয়া গেল। সন্ন্যাসী প্রস্তরের মূর্তির মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন।

যখন মূর্ছা ভাঙিয়া কুসুম উঠিয়া বসিল, তখন সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে কহিলেন, "তুমি আমার সকল কথাই পালন করিয়াছ; আর একটি কথা বলিব পালন করিতে হইবে। আমি আজই এখান হইতে চলিলাম, আমার সঙ্গে তোমার দেখা না হয়। আমাকে তোমার ভুলিতে হইবে। বলো এই সাধনা করিবে।" কুসুম উঠিয়া দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসীর মুখের পানে চাহিয়া ধীর স্বরে কহিল, "প্রভু, তাহাই হইবে।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "তবে আমি চলিলাম।"

কুসুম আর কিছু না বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, তাঁহার পায়ের ধুলা মাথায় তুলিয়া লইল। সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন।

কুসুম কহিল, "তিনি আদেশ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাকে ভুলিতে হইবে।" বলিয়া ধীরে ধীরে গঙ্গার জলে নামিল।

এতটুকু বেলা হইতে সে এই জলের ধারে কাটাইয়াছে, শ্রান্তির সময় এ জল যদি হাত বাড়াইয়া তাহাকে কোলে করিয়া না লইবে, তবে আর কে লইবে। চাঁদ অস্ত গেল, রাত্রি ঘোর অন্ধকার হইল। জলের শব্দ শুনিতে পাইলাম, আর কিছু বুঝিতে পারিলাম না। অন্ধকারে বাতাস হুহু করিতে লাগিল; পাছে তিলমাত্র কিছু দেখা যায় বলিয়া সে যেন ফুঁ দিয়া আকাশের তারাগুলিকে নিবাইয়া দিতে চায়।

আমার কোলে যে খেলা করিত সে আজ তাহার খেলা সমাপন করিয়া আমার কোল হইতে কোথায় সরিয়া গেল, জানিতে পারিলাম না।

কার্তিক, ১২৯১

রাজপথের কথা

আমি রাজপথ। অহল্যা যেমন মুনির শাপে পাষাণ হইয়া পড়িয়া ছিল, আমিও যেন তেমনি কাহার শাপে চিরনিদ্রিত সুদীর্ঘ অজগর সর্পের ন্যায় অরণ্যপর্বতের মধ্য দিয়া, বৃক্ষশ্রেণীর ছায়া দিয়া, সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের বক্ষের উপর দিয়া দেশদেশান্তর বেষ্টন করিয়া বহুদিন ধরিয়া জড়শয়নে শয়ান রহিয়াছি। অসীম ধৈর্যের সহিত ধুলায় লুটাইয়া শাপান্তকালের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছি। আমি চিরদিন স্থির অবিচল, চিরদিন একই ভাবে শুইয়া আছি, কিন্তু তবুও আমার এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্রাম নাই। এতটুকু বিশ্রাম নাই যে, আমার এই কঠিন শুষ্ক শয্যার উপরে একটিমাত্র কচি স্নিগ্ধ শ্যামল ঘাস উঠাইতে পারি; এতটুকু সময় নাই যে, আমার শিয়রের কাছে অতি ক্ষুদ্র একটি নীলবর্ণের বনফুল ফুটাইতে পারি। কথা কহিতে পারি না, অথচ অন্ধভাবে সকলই অনুভব করিতেছি। রাত্রিদিন পদশব্দ; কেবলই পদশব্দ। আমার এই গভীর জড়-নিদ্রার মধ্যে লক্ষ লক্ষ চরণের শব্দ অহর্নিশ দুঃস্বপ্নের ন্যায় আবর্তিত হইতেছে। আমি চরণের স্পর্শে হৃদয় পাঠ করিতে পারি। আমি বুঝিতে পারি, কে গৃহে যাইতেছে কে বিদেশে যাইতেছে, কে কাজে যাইতেছে, কে বিশ্রামে যাইতেছে, কে উৎসবে যাইতেছে, কে শ্মশানে যাইতেছে। যাহার সুখের সংসার আছে, স্নেহের ছায়া আছে, সে প্রতি পদক্ষেপে সুখের ছবি আঁকিয়া আঁকিয়া চলে; সে প্রতি পদক্ষেপে মাটিতে আশার বীজ রোপিয়া রোপিয়া যায়, মনে হয় যেখানে যেখানে তাহার পা পড়িয়াছে, সেখানে যেন মুহূর্তের মধ্যে এক-একটি করিয়া লতা অঙ্কুরিত পুষ্পিত হইয়া উঠিবে। যাহার গৃহ নাই আশ্রয় নাই, তাহার পদক্ষেপের মধ্যে আশা নাই অর্থ নাই, তাহার পদক্ষেপের দক্ষিণ নাই, বাম নাই, তাহার চরণ যেন বলিতে থাকে, আমি চলিই বা কেন থামিই বা কেন, তাহার পদক্ষেপে আমার শুষ্ক ধূলি যেন আরও শুকাইয়া যায়।

পৃথিবীর কোনো কাহিনী আমি সম্পূর্ণ শুনিতে পাই না। আজ শত শত বৎসর ধরিয়া আমি কত লক্ষ লোকের কত হাসি কত গান কত কথা শুনিয়া আসিতেছি; কিন্তু কেবল খানিকটা মাত্র শুনিতে পাই। বাকিটুকু শুনিবার জন্য যখন আমি কান পাতিয়া থাকি, তখন দেখি সে লোক আর নাই। এমন কত বৎসরের কত ভাঙা কথা ভাঙা গান আমার ধূলির সহিত ধূলি হইয়া গেছে, আমার ধূলির সহিত উড়িয়া বেড়ায়, তাহা কি কেহ জানিতে পায়। ওই শুন, এক জন গাহিল, "তারে বলি বলি আর বলা হল না।"—আহা, একটু দাঁড়াও, গানটা শেষ করিয়া যাও, সব কথাটা শুনি। কই আর দাঁড়াইল। গাহিতে গাহিতে কোথায় চলিয়া গেল, শেষটা শোনা

গেল না। ওই একটিমাত্র পদ অর্ধেক রাত্রি ধরিয়া আমার কানে ধ্বনিত হইতে থাকিবে। মনে মনে ভাবিব, ও কে গেল। কোথায় যাইতেছে না জানি। যে কথাটা বলা হইল না, তাহাই কি আবার বলিতে যাইতেছে। এবার যখন পথে আবার দেখা হইবে, সে যখন মুখ তুলিয়া ইহার মুখের দিকে চাহিবে, তখন বলি বলি করিয়া আবার যদি বলা না হয়। তখন নত শির করিয়া মুখ ফিরাইয়া অতি ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিবার সময় আবার যদি গায় "তারে বলি বলি আর বলা হল না।"

সমাপ্তি ও স্থায়িত্ব হয়তো কোথাও আছে, কিন্তু আমি তো দেখিতে পাই না। একটি চরণচিহ্নও তো আমি বেশিক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারি না। অবিশ্রাম চিহ্ন পড়িতেছে, আবার নূতন পদ আসিয়া অন্য পদের চিহ্ন মুছিয়া যাইতেছে। যে চলিয়া যায় সে তো পশ্চাতে কিছু রাখিয়া যায় না, যদি তাহার মাথার বোঝা হইতে কিছু পড়িয়া যায়, সহস্র চরণের তলে অবিশ্রাম দলিত হইয়া কিছুক্ষণেই তাহা ধূলিতে মিশাইয়া যায়। তবে এমনও দেখিয়াছি বটে, কোনো কোনো মহাজনের পুণ্যস্তূপের মধ্য হইতে এমন সকল অমর বীজ পড়িয়া গেছে যাহা ধূলিতে পড়িয়া অঙ্কুরিত ও বর্ধিত হইয়া আমার পার্শ্বে স্থায়ীরূপে বিরাজ করিতেছে, এবং নূতন পথিকদিগকে ছায়া দান করিতেছে।

আমি কাহারও লক্ষ্য নহি, আমি সকলের উপায়মাত্র। আমি কাহারও গৃহ নহি, আমি সকলকে গৃহে লইয়া যাই। আমার অহরহ এই শোক, আমাতে কেহ চরণ রাখে না, আমার উপরে কেহ দাঁড়াইতে চাহে না। যাহাদের গৃহ সুদূরে অবস্থিত, তাহারা আমাকেই অভিশাপ দেয়, আমি যে পরম ধৈর্যে তাহাদিগকে গৃহের দ্বার পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিই তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা কই পাই। গৃহে গিয়া বিরাম, গৃহে গিয়া আনন্দ, গৃহে গিয়া সুখসম্মিলন, আর আমার উপরে কেবল শ্রান্তির ভার, কেবল অনিচ্ছাকৃত শ্রম, কেবল বিচ্ছেদ। কেবল কি সুদূর হইতে, গৃহবাতায়ন হইতে, মধুর হাস্যলহরী পাখা তুলিয়া সূর্যালোকে বাহির হইয়া আমার কাছে আসিবামাত্র সচকিতে শূন্যে মিলাইয়া যাইবে। গৃহের সেই আনন্দের কণা আমি কি একটুখানি পাইব না!

কখনো কখনো তাহাও পাই। বালকবালিকারা হাসিতে হাসিতে কলরব করিতে করিতে আমার কাছে আসিয়া খেলা করে। তাহাদের গৃহের আনন্দ তাহারা পথে লইয়া আসে। তাহাদের পিতার আশীর্বাদ মাতার স্নেহ গৃহ হইতে বাহির হইয়া পথের মধ্যে আসিয়াও যেন গৃহ রচনা করিয়া দেয়। আমার ধূলিতে তাহারা স্নেহ দিয়া যায়। আমার ধূলিকে তাহারা রাশীকৃত করে, ও তাহাদের ছোটো ছোটো হাতগুলি দিয়া সেই স্তূপকে মৃদু মৃদু আঘাত করিয়া পরম স্নেহে ঘুম পাড়াইতে চায়। বিমল হৃদয়

লইয়া বসিয়া বসিয়া তাহার সহিত কথা কয়। হায় হায়, এত স্নেহ পাইয়াও সে তাহার উত্তর দিতে পারে না।

ছোটো ছোটো কোমল পাগুলি যখন আমার উপর দিয়া চলিয়া যায়, তখন আপনাকে বড়ো কঠিন বলিয়া মনে হয়; মনে হয় উহাদের পায়ে বাজিতেছে। কুসুমের দলের ন্যায় কোমল হইতে সাধ যায়। রাধিকা বলিয়াছেন—

যাঁহা যাঁহা অরুণ-চরণ চলি যাতা,
তাঁহা তাঁহা ধরণী হই এ মঝু গাতা।

অরুণ-চরণগুলি এমন কঠিন ধরণীর উপরে চলে কেন। কিন্তু তা যদি না চলিত, তবে বোধ করি কোথাও শ্যামল তৃণ জন্মিত না।

প্রতিদিন যাহারা নিয়মিত আমার উপরে চলে, তাহাদিগকে আমি বিশেষরূপে চিনি। তাহারা জানে না তাহাদের জন্য আমি প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। আমি মনে মনে তাহাদের মূর্তি কল্পনা করিয়া লইয়াছি। বহুদিন হইল, এমনি একজন কে তাহার কোমল চরণ দুখানি লইয়া প্রতিদিন অপরাহ্ণে বহুদূর হইতে আসিত—ছোটো দুটি নূপুর রুনু ঝুনু করিয়া তাহার পায়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাজিত। বুঝি তাহার ঠোঁট দুটি কথা কহিবার ঠোঁট নহে, বুঝি তাহার বড়ো বড়ো চোখ দুটি সন্ধ্যার আকাশের মতো বড়ো ম্লানভাবে মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। যেখানে ওই বাঁধানো বটগাছের বামদিকে আমার একটি শাখা লোকালয়ের দিকে চলিয়া গেছে, সেখানে সে শ্রান্তদেহে গাছের তলায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। আর একজন কে দিনের কাজ সমাপন করিয়া অন্যমনে গান গাহিতে গাহিতে সেই সময়ে লোকালয়ের দিকে চলিয়া যাইত। সে বোধ করি, কোনো দিকে চাহিত না, কোনোখানে দাঁড়াইত না,—হয়তো বা আকাশের তারার দিকে চাহিত, তাহার গৃহের দ্বারে গিয়া পূরবী গান সমাপ্ত করিত। সে চলিয়া গেলে বালিকা শ্রান্তপদে আবার যে-পথ দিয়া আসিয়াছিল, সেই পথে ফিরিয়া যাইত। বালিকা যখন ফিরিত তখন জানিতাম অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে; সন্ধ্যার অন্ধকার হিমস্পর্শ সর্বাঙ্গে অনুভব করিতে পারিতাম। তখন গোধূলির কাকের ডাক একেবারে থামিয়া যাইত; পথিকেরা আর কেহ বড়ো চলিত না। সন্ধ্যার বাতাসে থাকিয়া থাকিয়া বাঁশবন ঝরঝর ঝরঝর শব্দ করিয়া উঠিত। এমন কতদিন, এমন প্রতিদিন, সে ধীরে ধীরে আসিত ধীরে ধীরে যাইত। একদিন ফাল্গুন মাসের শেষাশেষি অপরাহ্ণে যখন বিস্তর আম্রমুকুলের কেশর বাতাসে ঝরিয়া পড়িতেছে—তখন আর একজন যে আসে সে আর আসিল না। সেদিন অনেক রাত্রে বালিকা বাড়িতে ফিরিয়া গেল। যেমন মাঝে মাঝে গাছ হইতে শুষ্ক পাতা ঝরিয়া পড়িতেছিল, তেমনি মাঝে মাঝে দুই এক ফোঁটা অশ্রুজল

আমার নীরস তপ্ত ধূলির উপরে পড়িয়া মিলাইতেছিল। আবার তাহার পরদিন অপরাহ্ণে বালিকা সেইখানে সেই তরুতলে আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু সেদিনও আর একজন আসিল না। আবার রাত্রে সে ধীরে ধীরে বাড়িমুখে ফিরিল। কিছুদূরে গিয়া আর সে চলিতে পারিল না। আমার উপরে ধূলির উপরে লুটাইয়া পড়িল। দুই বাহুতে মুখ ঢাকিয়া বুক ফাটিয়া কাঁদিতে লাগিল। কে গো মা, আজি এই বিজন রাত্রে আমার বক্ষেও কি কেহ আশ্রয় লইতে আসে। তুই যাহার কাছ হইতে ফিরিয়া আসিলি সে কি আমার চেয়েও কঠিন। তুই যাহাকে ডাকিয়া সাড়া পাইলি না সে কি আমার চেয়েও মূক। তুই যাহার মুখের পানে চাহিলি সে কি আমার চেয়েও অন্ধ।

বালিকা উঠিল, দাঁড়াইল, চোখ মুছিল—পথ ছাড়িয়া পার্শ্ববর্তী বনের মধ্যে চলিয়া গেল। হয়তো সে গৃহে ফিরিয়া গেল, হয়তো এখনও সে প্রতিদিন শান্তমুখে গৃহের কাজ করে—হয়তো সে কাহাকেও কোনো দুঃখের কথা বলে না; কেবল এক-একদিন সন্ধ্যাবেলায় গৃহের অঙ্গনে চাঁদের আলোতে পা ছড়াইয়া বসিয়া থাকে, কেহ ডাকিলেই আবার তখনই চমকিয়া উঠিয়া ঘরে চলিয়া যায়। কিন্তু তাহার পরদিন হইতে আজ পর্যন্তও আমি আর তাহার চরণস্পর্শ অনুভব করি নাই।

এমন কত পদশব্দ নীরব হইয়া গেছে, আমি কি এত মনে করিয়া রাখিতে পারি। কেবল সেই পায়ের করুণ নূপুরধ্বনি এখনও মাঝে মাঝে মনে পড়ে। কিন্তু আমার কি আর একদণ্ড শোক করিবার অবসর আছে। শোক কাহার জন্য করিব। এমন কত আসে, কত যায়।

কী প্রখর রৌদ্র। উহু-হুহু। এক-একবার নিশ্বাস ফেলিতেছি আর তপ্ত ধুলা সুনীল আকাশ ধূসর করিয়া উড়িয়া যাইতেছে। ধনী দরিদ্র, সুখী দুঃখী, জরা যৌবন, হাসি কান্না, জন্ম মৃত্যু সমস্তই আমার উপর দিয়া একই নিশ্বাসে ধূলির স্রোতের মতো উড়িয়া চলিয়াছে। এই জন্য পথের হাসিও নাই, কান্নাও নাই। গৃহই অতীতের জন্য শোক করে, বর্তমানের জন্য ভাবে, ভবিষ্যতের আশা-পথ চাহিয়া থাকে। কিন্তু পথ প্রতি বর্তমান নিমেষের শতসহস্র নূতন অভ্যাগতকে লইয়াই ব্যস্ত। এমন স্থানে নিজের পদগৌরবের প্রতি বিশ্বাস করিয়া অত্যন্ত সদর্পে পদক্ষেপ করিয়া কে নিজের চির-চরণচিহ্ন রাখিয়া যাইতে প্রয়াস পাইতেছে। এখানকার বাতাসে যে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া যাইতেছ, তুমি চলিয়া গেলে কি তাহারা তোমার পশ্চাতে পড়িয়া তোমার জন্য বিলাপ করিতে থাকিবে, নূতন অতিথিদের চক্ষে অশ্রু আকর্ষণ করিয়া আনিবে? বাতাসের উপরে বাতাস কি স্থায়ী হয়। না না, বৃথা চেষ্টা। আমি কিছুই পড়িয়া থাকিতে দিই না, হাসিও না, কান্নাও না। আমিই কেবল পড়িয়া আছি।

অগ্রহায়ণ, ১২৯১

মুকুট

প্রথম পরিচ্ছেদ

ত্রিপুরার রাজা অমরমাণিক্যের কনিষ্ঠ পুত্র রাজধর সেনাপতি ইশা খাঁকে বলিলেন, "দেখো, সেনাপতি, আমি বারবার বলিতেছি তুমি আমাকে অসম্মান করিয়ো না।"

পাঠান ইশা খাঁ কতকগুলি তীরের ফলা লইয়া তাহাদের ধার পরীক্ষা করিতেছিলেন। রাজধরের কথা শুনিয়া কিছুই বলিলেন না, কেবল মুখ তুলিয়া ভুরু উঠাইয়া একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। আবার তখনই মুখ নত করিয়া তীরের ফলার দিকে মনোযোগ দিলেন।

রাজধর বলিলেন, "ভবিষ্যতে যদি তুমি আমার নাম ধরিয়া ডাক, তবে আমি তাহার সমুচিত প্রতিবিধান করিব।"

বৃদ্ধ ইশা খাঁ সহসা মাথা তুলিয়া বজ্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "বটে!"

রাজধর তাঁহার তলোয়ারের খাপের আগা মেঝের পাথরের উপরে ঠক করিয়া ঠুকিয়া বলিলেন, "হাঁ।"

ইশা খাঁ বালক রাজধরের বুক ফুলানোর ভঙ্গি ও তলোয়ারের আস্ফালন দেখিয়া থাকিতে পারিলেন না—হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। রাজধরের সমস্ত মুখ, চোখের সাদাটা পর্যন্ত লাল হইয়া উঠিল।

ইশা খাঁ উপহাসের স্বরে হাসিয়া হাত জোড় করিয়া বলিলেন, "মহামহিম মহারাজাধিরাজকে কী বলিয়া ডাকিতে হইবে। হুজুর, জনাব, জাঁহাপনা, শাহেন শা—"

রাজধর তাঁহার স্বাভাবিক কর্কশ স্বর দ্বিগুণ কর্কশ করিয়া কহিলেন, "আমি তোমার ছাত্র বটে, কিন্তু আমি রাজকুমার—তাহা তোমার মনে নাই!"

ইশা খাঁ তীব্রস্বরে কহিলেন, "বস্। চুপ। আর অধিক কথা কহিয়ো না। আমার অন্য কাজ আছে।" বলিয়া পুনরায় তীরের ফলার প্রতি মন দিলেন।

এমন সময় ত্রিপুরার দ্বিতীয় রাজপুত্র ইন্দ্রকুমার তাঁহার দীর্ঘপ্রস্থ বিপুল বলিষ্ঠ দেহ লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। মাথা হেলাইয়া হাসিয়া বলিলেন, "খাঁ সাহেব, আজিকার ব্যাপারটা কী।"

ইন্দ্রকুমারের কণ্ঠ শুনিয়া বৃদ্ধ ইশা খাঁ তীরের ফলা রাখিয়া সস্নেহে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন—হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"শোনো তো বাবা, বড়ো তামাশার কথা।

তোমার এই কনিষ্ঠটিকে, মহারাজ চক্রবর্তীকে জাঁহাপনা জনাব বলিয়া না ডাকিলে উঁহার অপমান বোধ হয়।" বলিয়া আবার তীরের ফলা লইয়া পড়িলেন।

"সত্য নাকি।" বলিয়া ইন্দ্রকুমার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

রাজধর বিষম ক্রোধে বলিলেন, "চুপ করো দাদা।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "রাজধর, তোমাকে কী বলিয়া ডাকিতে হইবে। জাঁহাপনা। হা হা হা হা।"

রাজধর কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "দাদা, চুপ করো বলিতেছি।"

ইন্দ্রকুমার আবার হাসিয়া বলিলেন, "জনাব।"

রাজধর অধীর হইয়া বলিলেন, "দাদা, তুমি নিতান্ত নির্বোধ।"

ইন্দ্রকুমার হাসিয়া রাজধরের পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "ঠাণ্ডা হও ভাই, ঠাণ্ডা হও। তোমার বুদ্ধি তোমার থাক্। আমি তোমার বুদ্ধি কাড়িয়া লইতেছি না।"

ইশা খাঁ কাজ করিতে করিতে আড়চোখে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "উঁহার বুদ্ধি সম্প্রতি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "নাগাল পাওয়া যায় না।"

রাজধর গসগস করিয়া চলিয়া গেলেন। চলনের দাপে খাপের মধ্যে তলোয়ারখানা ঝনঝন করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজকুমার রাজধরের বয়স উনিশ বৎসর। শ্যামবর্ণ, বেঁটে, দেহের গঠন বলিষ্ঠ। সেকালে অন্য রাজপুত্রেরা যেমন বড়ো বড়ো চুল রাখিতেন ইঁহার তেমন ছিল না। ইঁহার সোজা সোজা মোটা চুল ছোটো করিয়া ছাঁটা। ছোটো ছোটো চোখ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। দাঁতগুলি কিছু বড়ো। গলার আওয়াজ ছেলেবেলা হইতেই কেমন কর্কশ। রাজধরের বুদ্ধি অত্যন্ত বেশি এইরূপ সকলের বিশ্বাস, তাঁহার নিজের বিশ্বাসও তাই। এই বুদ্ধির বলে তিনি আপনার দুই দাদাকে অত্যন্ত হেয়জ্ঞান করিতেন। রাজধরের প্রবল প্রতাপে বাড়িসুদ্ধ সকলে অস্থির। আবশ্যক থাক্ না থাক্ একখানা তলোয়ার মাটিতে ঠুকিয়া ঠুকিয়া তিনি বাড়িময় কর্তৃত্ব করিয়া বেড়ান। রাজবাটীর চাকরবাকরেরা তাঁহাকে রাজা বলিয়া মহারাজ বলিয়া হাতজোড় করিয়া সেলাম করিয়া প্রণাম করিয়া কিছুতে নিস্তার পায় না। সকল জিনিসেই তাঁহার হাত, সকল জিনিসই তিনি নিজে দখল করিতে চান। সে-বিষয়ে তাঁহার চক্ষুলজ্জাটুকু পর্যন্ত নাই। একবার যুবরাজ

চন্দ্রনারায়ণের একটা ঘোড়া তিনি রীতিমত দখল করিয়াছিলেন, দেখিয়া যুবরাজ ঈষৎ হাসিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। আর একবার কুমার ইন্দ্রকুমারের রুপার পাত লাগানো একটা ধনুক অম্লানবদনে অধিকার করিয়াছিলেন—ইন্দ্রকুমার চটিয়া বলিলেন, "দেখো, যে জিনিস লইয়াছ উহা আমি আর ফিরাইয়া লইতে চাহি না, কিন্তু ফের যদি তুমি আমার জিনিসে হাত দাও, তবে আমি এমন করিয়া দিব যে, ও-হাতে আর জিনিস তুলিতে পারিবে না।" কিন্তু রাজধর দাদাদের কথা বড়ো গ্রাহ্য করিতেন না। লোকে তাঁহার আচরণ দেখিয়া আড়ালে বলিত, "ছোটোকুমারের রাজার ঘরে জন্ম বটে, কিন্তু রাজার ছেলের মতো কিছুই দেখি না।"

কিন্তু মহারাজা অমরমাণিক্য রাজধরকে কিছু বেশি ভালোবাসিতেন। রাজধর তাহা জানিতেন। আজ পিতার কাছে গিয়া ইশা খাঁর নামে নালিশ করিলেন।

রাজা ইশা খাঁকে ডাকাইয়া আনিলেন। বলিলেন, "সেনাপতি, রাজকুমারদের এখন বয়স হইয়াছে। এখন উঁহাদিগকে যথোচিত সম্মান করা উচিত।"

"মহারাজ বাল্যকালে যখন আমার কাছে যুদ্ধ শিক্ষা করিতেন তখন মহারাজকে যেরূপ সম্মান করিতাম, রাজকুমারগণকে তাহা অপেক্ষা কম সম্মান করি না।"

রাজধর বলিলেন, "আমার অনুরোধ, তুমি আমার নাম ধরিয়া ডাকিয়ো না।"

ইশা খাঁ বিদ্যুদ্বেগে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, "চুপ করো বৎস। আমি তোমার পিতার সহিত কথা কহিতেছি। মহারাজ, মার্জনা করিবেন, আপনার এই কনিষ্ঠ পুত্রটি রাজপরিবারের উপযুক্ত হয় নাই। ইহার হাতে তলোয়ার শোভা পায় না। এ বড়ো হইলে মুনশির মতো কলম চালাইতে পারিবে—আর কোনো কাজে লাগিবে না।"

এমন সময়ে চন্দ্রনারায়ণ ও ইন্দ্রকুমার সেখানে উপস্থিত হইলেন। ইশা খাঁ তাঁহাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "চাহিয়া দেখুন মহারাজ, এই তো যুবরাজ বটে। এই তো রাজপুত্র বটে।"

রাজা রাজধরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "রাজধর, খাঁ সাহেব কী বলিতেছেন। তুমি অস্ত্রবিদ্যায় উঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পার নাই?"

রাজধর বলিলেন, "মহারাজ, আমাদের ধনুর্বিদ্যার পরীক্ষা গ্রহণ করুন, পরীক্ষায় যদি আমি সর্বশ্রেষ্ঠ না হই তবে আমাকে পরিত্যাগ করিবেন। আমি রাজবাটী ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।"

রাজা বলিলেন, "আচ্ছা, আগামী সপ্তাহে পরীক্ষা হইবে। তোমাদের মধ্যে যিনি উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহাকে আমার হীরকখচিত তলোয়ার পুরস্কার দিব।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইন্দ্রকুমার ধনুর্বিদ্যায় অসাধারণ ছিলেন। শুনা যায় একবার তাঁহার এক অনুচর প্রাসাদের ছাদের উপর হইতে একটা মোহর নিচে ফেলিয়া দেয়, সেই মোহর মাটিতে পড়িতে না পড়িতে তীর মারিয়া কুমার তাহাকে শত হাত দূরে ফেলিয়াছিলেন। রাজধর রাগের মাথায় পিতার সম্মুখে দম্ভ করিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু মনের ভিতরে বড়ো ভাবনা পড়িয়া গেল। যুবরাজ চন্দ্রনারায়ণের জন্য বড়ো ভাবনা নাই— তীর-ছোঁড়া বিদ্যা তাঁহার ভালো আসিত না, কিন্তু ইন্দ্রকুমারের সঙ্গে আঁটিয়া উঠা দায়। রাজধর অনেক ভাবিয়া অবশেষে একটা ফন্দি ঠাওরাইলেন। হাসিয়া মনে মনে বলিলেন, "তীর ছুঁড়িতে পারি না-পারি, আমার বুদ্ধি তীরের মতো—তাহাতে সকল লক্ষ্যই ভেদ হয়।"

কাল পরীক্ষার দিন। যে-জায়গাতে পরীক্ষা হইবে, যুবরাজ, ইশা খাঁ ও ইন্দ্রকুমার সেই জমি তদারক করিতে গিয়াছেন। রাজধর আসিয়া বলিলেন, "দাদা, আজ পূর্ণিমা আছে—আজ রাত্রে যখন বাঘ গোমতী নদীতে জল খাইতে আসিবে, তখন নদীতীরে বাঘ শিকার করিতে গেলে হয় না?"

ইন্দ্রকুমার আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "কী আশ্চর্য। রাজধরের যে আজ শিকারে প্রবৃত্তি হইল? এমন তো কখনো দেখা যায় না।"

ইশা খাঁ রাজধরের প্রতি ঘৃণার কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "উনি আবার শিকারি নন, উনি জাল পাতিয়া ঘরের মধ্যে শিকার করেন। উঁহার বড়ো ভয়ানক শিকার। রাজসভায় একটি জীব নাই যে উঁহার ফাঁদে একবার-না-একবার না পড়িয়াছে।"

চন্দ্রনারায়ণ দেখিলেন কথাটা রাজধরের মনে লাগিয়াছে—ব্যথিত হইয়া বলিলেন, "সেনাপতি সাহেব, তোমার তলোয়ারও যেমন তোমার কথাও তেমনি, উভয়ই শাণিত—যাহার উপরে গিয়া পড়ে, তাহার মর্মচ্ছেদ করে।"

রাজধর হাসিয়া বলিলেন, "না দাদা, আমার জন্য বেশি ভাবিয়ো না। খাঁ সাহেব অনেক শান দিয়া কথা কহেন বটে, কিন্তু আমার কানের মধ্যে পালকের মতো প্রবেশ করে।"

ইশা খাঁ হঠাৎ চটিয়া উঠিয়া পাকা গোঁফে চাড়া দিয়া বলিলেন, "তোমার কান আছে নাকি। তা যদি থাকিত, তাহা হইলে এতদিন তোমাকে সিধা করিতে পারিতাম।" বৃদ্ধ ইশা খাঁ কাহাকেও বড়ো মান্য করিতেন না।

ইন্দ্রকুমার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। চন্দ্রনারায়ণ গম্ভীর হইয়া রহিলেন, কিছু বলিলেন না। যুবরাজ বিরক্ত হইয়াছেন বুঝিয়া ইন্দ্রকুমার তৎক্ষণাৎ হাসি থামাইয়া তাঁহার কাছে গেলেন—মৃদুভাবে বলিলেন, "দাদা তোমার কী মত। আজ রাত্রে শিকার করিতে যাইবে কি।"

চন্দ্রনারায়ণ কহিলেন, "তোমার সঙ্গে ভাই শিকার করিতে যাওয়া মিথ্যা, তাহা হইলে নিতান্ত নিরামিষ শিকার করিতে হয়। তুমি বনে গিয়া যত জন্তু মারিয়া আন, আর আমরা কেবল লাউ কুমড়া কচু কাঁঠাল শিকার করিয়া আনি।"

ঈশা খাঁ পরম হৃষ্ট হইয়া হাসিতে লাগিলেন—সস্নেহে ইন্দ্রকুমারের পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "যুবরাজ ঠিক কথা বলিতেছেন পুত্র। তোমার তীর সকলের আগে গিয়া ছোটে এবং নির্ঘাত গিয়া লাগে। তোমার সঙ্গে কে পারিয়া উঠিবে।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "না না দাদা, ঠাট্টা নয়—যাইতে হইবে। তুমি না গেলে কে শিকার করিতে যাইবে।"

যুবরাজ বলিলেন, "আচ্ছা চলো। আজ রাজধরের শিকারের ইচ্ছা হইয়াছে, উহাকে নিরাশ করিব না।"

সহাস্য ইন্দ্রকুমার চকিতের মধ্যে ম্লান হইয়া বলিলেন, "কেন দাদা, আমার ইচ্ছা হইয়াছে বলিয়া কি যাইতে নাই।"

চন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, "সে কী কথা ভাই, তোমার সঙ্গে তো রোজই শিকারে যাইতেছি—"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "তাই সেটা পুরাতন হইয়া গেছে।"

চন্দ্রনারায়ণ বিমর্ষ হইয়া বলিলেন, "তুমি আমার কথা এমন করিয়া ভুল বুঝিলে বড়ো ব্যথা লাগে।"

ইন্দ্রকুমার হাসিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না দাদা, আমি ঠাট্টা করিতেছিলাম। শিকারে যাইব না তো কী। চলো তার আয়োজন করি গে।"

ঈশা খাঁ মনে মনে কহিলেন, "ইন্দ্রকুমার বুকে দশটা বাণ সহিতে পারে, কিন্তু দাদার একটু সামান্য অনাদর সহিতে পারে না।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শিকারের বন্দোবস্ত সমস্ত স্থির হইলে পরে রাজধর আস্তে আস্তে ইন্দ্রকুমারের স্ত্রী কমলাদেবীর কক্ষে গিয়া উপস্থিত। কমলাদেবী হাসিয়া বলিলেন, "এ কী ঠাকুরপো। একেবারে তীরধনুক বর্মচর্ম লইয়া যে। আমাকে মারিবে নাকি।"

রাজধর বলিলেন, "ঠাকুরানী, আমরা আজ তিন ভাই শিকার করিতে যাইব তাই এই বেশ।"

কমলাদেবী আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, "তিন ভাই! তুমিও যাইবে না কি। আজ তিন ভাই একত্র হইবে। এ তো ভালো লক্ষণ নয়। এ যে ত্র্যহস্পর্শ হইল।"

যেন বড়ো ঠাট্টা হইল এই ভাবে রাজধর হা হা করিয়া হাসিলেন, কিন্তু বিশেষ কিছু বলিলেন না।

কমলাদেবী কহিলেন, "না না, তাহা হইবে না—রোজ-রোজ শিকার করিতে যাইবেন আর আমি ঘরে বসিয়া ভাবিয়া মরি।"

রাজধর বলিলেন, "আজ আবার রাত্রে শিকার।"

কমলাদেবী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "সে কখনোই হইবে না। দেখিব আজ কেমন করিয়া যান।"

রাজধর বলিলেন, "ঠাকুরানী, এক কাজ করো, ধনুকবাণগুলি লুকাইয়া রাখো।"

কমলাদেবী কহিলেন, "কোথায় লুকাইব।"

রাজধর। আমার কাছে দাও, আমি লুকাইয়া রাখিব।

কমলাদেবী হাসিয়া কহিলেন, "মন্দ কথা নয়, সে বড়ো রঙ্গ হইবে।" কিন্তু মনে মনে বলিলেন, "তোমার একটা কী মতলব আছে। তুমি যে কেবল আমার উপকার করিতে আসিয়াছ তাহা বোধ হয় না।"

"এস, অস্ত্রশালায় এস" বলিয়া কমলাদেবী রাজধরকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। চাবি লইয়া ইন্দ্রকুমারের অস্ত্রশালার দ্বার খুলিয়া দিলেন। রাজধর যেমন ভিতরে প্রবেশ করিলেন অমনি কমলাদেবী দ্বারে তালা লাগাইয়া দিলেন, রাজধর ঘরের মধ্যে বন্ধ হইয়া রহিলেন। কমলাদেবী বাহির হইতে হাসিয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো, আমি তবে আজ আসি।"

এদিকে সন্ধ্যার সময় ইন্দ্রকুমার অন্তঃপুরে আসিয়া অস্ত্রশালার চাবি কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছেন না। কমলাদেবী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হাঁগা, আমাকে খুঁজিতেছ বুঝি, আমি তো হারাই নাই।" শিকারের সময় বহিয়া যায় দেখিয়া ইন্দ্রকুমার দ্বিগুণ ব্যস্ত হইয়া খোঁজ করিতে লাগিলেন। কমলাদেবী তাঁহাকে বাধা দিয়া আবার তাঁহার মুখের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন—হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হাঁগা, দেখিতে কি পাও না। চোখের সম্মুখে তবু ঘরময় বেড়াইতেছ।" ইন্দ্রকুমার কিঞ্চিৎ কাতরস্বরে কহিলেন, "দেবী, এখন বাধা দিয়ো না—আমার একটা বড়ো আবশ্যকের জিনিস হারাইয়াছে।"

কমলাদেবী কহিলেন, "আমি জানি তোমার কী হারাইয়াছে। আমার একটা কথা যদি রাখ তো খুঁজিয়া দিতে পারি।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "আচ্ছা রাখিব।"

কমলাদেবী বলিলেন, "তবে শোনো। আজ তুমি শিকার করিতে যাইতে পারিবে না। এই লও তোমার চাবি।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "সে হয় না—এ-কথা রাখিতে পারি না।"

কমলাদেবী বলিলেন, "চন্দ্রবংশে জন্মিয়া এই বুঝি তোমার আচরণ। একটা সামান্য প্রতিজ্ঞা রাখিতে পার না।"

ইন্দ্রকুমার হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তোমার কথাই রহিল। আজ আমি শিকারে যাইব না।"

কমলাদেবী। তোমাদের আর কিছু হারাইয়াছে? মনে করিয়া দেখো দেখি।

ইন্দ্রকুমার। কই, মনে পড়ে না তো।

কমলাদেবী। তোমাদের সাত-রাজার-ধন মানিক? তোমাদের সোনার চাঁদ?

ইন্দ্রকুমার মৃদু হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন। কমলাদেবী কহিলেন, "তবে এস, দেখো'সে।" বলিয়া অস্ত্রশালার দ্বারে গিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। কুমার দেখিলেন রাজধর ঘরের মেজেতে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন—দেখিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন—"এ কী, রাজধর অস্ত্রশালায় যে।"

কমলাদেবী বলিলেন, "উনি আমাদের ব্রহ্মাস্ত্র।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "তা বটে, উনি সকল অস্ত্রের চেয়ে তীক্ষ্ণ।"

রাজধর মনে মনে বলিলেন, "তোমাদের জিহ্বার চেয়ে নয়।" রাজধর ঘর হইতে বাহির হইয়া বাঁচিলেন।

তখন কমলাদেবী গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "না কুমার, তুমি শিকার করিতে যাও। আমি তোমার সত্য ফিরাইয়া লইলাম।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "শিকার করিব? আচ্ছা।" বলিয়া ধনুকে তীর যোজনা করিয়া অতিধীরে কমলাদেবীর দিকে নিক্ষেপ করিলেন। তীর তাঁহার পায়ের কাছে পড়িয়া গেল—কুমার বলিলেন, "আমার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইল।"

কমলাদেবী বলিলেন, "না, পরিহাস না। তুমি শিকারে যাও।"

ইন্দ্রকুমার কিছু বলিলেন না। ধনুর্বাণ ঘরের মধ্যে ফেলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। যুবরাজকে বলিলেন, "দাদা, আজ শিকারের সুবিধা হইল না।" চন্দ্রনারায়ণ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "বুঝিয়াছি।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আজ পরীক্ষার দিন। রাজবাটির বাহিরের মাঠে বিস্তর লোক জড়ো হইয়াছে। রাজার ছত্র ও সিংহাসন প্রভাতের আলোকে ঝকঝক করিতেছে। জায়গাটা পাহাড়ে, উঁচুনিচু—লোকে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, চারিদিকে যেন মানুষের মাথার ঢেউ উঠিয়াছে। ছেলেগুলো গাছের উপর চড়িয়া বসিয়াছে। একটা ছেলে গাছের ডাল হইতে আস্তে আস্তে হাত বাড়াইয়া একজন মোটা মানুষের মাথা হইতে পাগড়ি তুলিয়া আর-এক-জনের মাথায় পরাইয়া দিয়াছে। যাহার পাগড়ি সে-ব্যক্তি চটিয়া ছেলেটাকে গ্রেফতার করিবার জন্য নিষ্ফল প্রয়াস পাইতেছে, অবশেষে নিরাশ হইয়া সজোরে গাছের ডাল নাড়া দিতেছে, ছোঁড়াটা মুখভঙ্গি করিয়া ডালের উপর বাঁদরের মতো নাচিতেছে। মোটা মানুষের দুর্দশা ও রাগ দেখিয়া সেদিকে একটা হো হো হাসি পড়িয়া গিয়াছে। একজন একহাঁড়ি দই মাথায় করিয়া বাড়ি যাইতেছিল, পথে জনতা দেখিয়া সে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল—হঠাৎ দেখে তাহার মাথায় হাঁড়ি নাই, হাঁড়িটা মুহূর্তের মধ্যে হাতে হাতে কতদূর চলিয়া গিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই—দইওআলা খানিকক্ষণ হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। একজন বলিল, "ভাই, তুমি দইয়ের বদলে ঘোল খাইয়া গেলে, কিঞ্চিৎ লোকসান হইল বই তো নয়।" দইওআলা পরম সান্ত্বনা পাইয়া গেল। হারু নাপিতের 'পরে গাঁ-সুদ্ধ লোক চটা ছিল। তাহাকে ভিড়ের মধ্যে দেখিয়া লোকে তাহার নামে ছড়া কাটিতে লাগিল। সে যত খেপিতে লাগিল খেপাইবার দল তত বাড়িয়া উঠিল—চারিদিকে চটাপট হাততালি পড়িতে লাগিল। আটাম্র প্রকার আওয়াজ বাহির হইতে লাগিল। সে-ব্যক্তি মুখচক্ষু লাল করিয়া চটিয়া গলদ্‌ঘর্ম হইয়া, চাদর ভূমিতে লুটাইয়া, একপাটি চটিজুতা ভিড়ের মধ্যে হারাইয়া বিশ্বের লোককে অভিশাপ দিতে দিতে বাড়ি ফিরিয়া গেল। ঠাসাঠাসি ভিড়ের মাঝে মাঝে এক-একটা ছোটো ছেলে আত্মীয়ের কাঁধের উপর চড়িয়া কান্না জুড়িয়া দিয়াছে। এমন কত জায়গায় কত কলরব উঠিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। হঠাৎ নহবত বাজিয়া উঠিল। সমস্ত কোলাহল ভাসাইয়া দিয়া জয় জয় শব্দে আকাশ প্লাবিত হইয়া গেল। কোলের ছেলে যতগুলো ছিল ভয়ে সমস্বরে কাঁদিয়া উঠিল—গাঁয়ে গাঁয়ে পাড়ায় পাড়ায় কুকুরগুলো উর্ধ্বমুখ হইয়া খেউ খেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। পাখি যেখানে যত ছিল ভয়ে গাছের ডাল ছাড়িয়া আকাশে উড়িল। কেবল গোটাকতক বুদ্ধিমান কাক সুদূরে গাম্ভারি গাছের ডালে বসিয়া দক্ষিণে ও বামে ঘাড় হেলাইয়া একাগ্রচিত্তে অনেক বিবেচনা করিতে লাগিল এবং একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ অসন্দিগ্ধচিত্তে কা কা

করিয়া ডাকিয়া উঠিতে লাগিল। রাজা আসিয়া সিংহাসনে বসিয়াছেন। পাত্রমিত্র সভাসদ্‌গণ আসিয়াছেন। রাজকুমারগণ ধনুর্বাণ হস্তে আসিয়াছেন। নিশান লইয়া নিশানধারী আসিয়াছে। ভাট আসিয়াছে। সৈন্যগণ পশ্চাতে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়াছে। বাজনদারগণ মাথা নাড়াইয়া নাচিয়া সবলে পরমোৎসাহে ঢোল পিটাইতেছে। মহা ধুম পড়িয়া গিয়াছে। পরীক্ষার সময় যখন হইল, ঈশা খাঁ রাজকুমারগণকে প্রস্তুত হইতে কহিলেন। ইন্দ্রকুমার যুবরাজকে কহিলেন, "দাদা, আজ তোমাকে জিতিতে হইবে, তাহা না হইলে চলিবে না।"

যুবরাজ হাসিয়া বলিলেন, "চলিবে না তো কী। আমার একটা ক্ষুদ্র তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেও জগৎ সংসার যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিবে। আর যদিই বা না চলিত, তবু আমার জিতিবার কোনো সম্ভাবনা দেখিতেছি না।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "দাদা, তুমি যদি হার তো আমিও ইচ্ছাপূর্বক লক্ষ্যভ্রষ্ট হইব।"

যুবরাজ ইন্দ্রকুমারের হাত ধরিয়া কহিলেন, "না ভাই, ছেলেমানুষি করিয়ো না— ওস্তাদের নাম রক্ষা করিতে হইবে।"

রাজধর বিবর্ণ শুষ্ক চিন্তাকুল মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ঈশা খাঁ আসিয়া কহিলেন, "যুবরাজ, সময় হইয়াছে, ধনুক গ্রহণ করো।"

যুবরাজ দেবতার নাম করিয়া ধনুক গ্রহণ করিলেন। প্রায় দুইশত হাত দূরে গোটাপাঁচ-ছয় কলাগাছের গুঁড়ি একত্র বাঁধিয়া স্থাপিত হইয়াছে। মাঝে একটা কচুর পাতা চোখের মতো করিয়া বসানো আছে। তাহার ঠিক মাঝখানে চোখের তারার মতো আকারে কালো চিহ্ন অঙ্কিত। সেই চিহ্নই লক্ষ্যস্থল। দর্শকেরা অর্ধচন্দ্র আকারে মাঠ ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে—যেদিকে লক্ষ্য স্থাপিত, সেদিকে যাওয়া নিষেধ।

যুবরাজ ধনুকে বাণ যোজনা করিলেন। লক্ষ্য স্থির করিলেন। বাণ নিক্ষেপ করিলেন। বাণ লক্ষ্যের উপর দিয়া চলিয়া গেল। ঈশা খাঁ তাঁহার গোঁফসুদ্ধ দাড়িসুদ্ধ মুখ বিকৃত করিলেন—পাকা ভুরু কুঞ্চিত করিলেন। কিন্তু কিছু বলিলেন না। ইন্দ্রকুমার বিষণ্ণ হইয়া এমন ভাব ধারণ করিলেন, যেন তাঁহাকেই লজ্জিত করিবার জন্য দাদা ইচ্ছা করিয়া এই কীর্তিটি করিলেন। অস্থিরভাবে ধনুক নাড়িতে নাড়িতে ঈশা খাঁকে বলিলেন, "দাদা মন দিলেই সমস্ত পারেন, কিন্তু কিছুতেই মন দেন না।"

ঈশা খাঁ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তোমার দাদার বুদ্ধি আর-সকল জায়গাতেই খেলে, কেবল তীরের আগায় খেলে না, তার কারণ, বুদ্ধি তেমন সূক্ষ্ম নয়।"

ইন্দ্রকুমার ভারি চটিয়া একটা উত্তর দিতে যাইতেছিলেন। ঈশা খাঁ বুঝিতে পারিয়া

দ্রুত সরিয়া গিয়া রাজধরকে বলিলেন, "কুমার, এবার তুমি লক্ষ্যভেদ করো মহারাজা দেখুন।"

রাজধর বলিলেন, "আগে দাদার হউক।"

ঈশা খাঁ রুষ্ট হইয়া কহিলেন, "এখন উত্তর করিবার সময় নয়। আমার আদেশ পালন করো।"

রাজধর চটিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। ধনুর্বাণ তুলিয়া লইলেন। লক্ষ্য স্থির করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। তীর মাটিতে বিদ্ধ হইল। যুবরাজ রাজধরকে কহিলেন, "তোমার বাণ অনেকটা নিকটে গিয়াছে—আর-একটু হইলেই লক্ষ্য বিদ্ধ হইত।"

রাজধর অম্লানবদনে কহিলেন, "লক্ষ্য তো বিদ্ধ হইয়াছে, দূর হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না।"

যুবরাজ কহিলেন, "না, তোমার দৃষ্টির ভ্রম হইয়াছে, লক্ষ্য বিদ্ধ হয় নাই।"

রাজধর কহিলেন, "হাঁ, বিদ্ধ হইয়াছে। কাছে গেলেই দেখা যাইবে।" যুবরাজ আর কিছু বলিলেন না।

অবশেষে ঈশা খাঁর আদেশক্রমে ইন্দ্রকুমার নিতান্ত অনিচ্ছাসহকারে ধনুক তুলিয়া লইলেন। যুবরাজ তাঁহার কাছে গিয়া কাতরস্বরে কহিলেন, "ভাই, আমি অক্ষম—আমার উপর রাগ করা অন্যায়—তুমি যদি আজ লক্ষ্য ভেদ করিতে না পার, তবে তোমার ভ্রষ্টলক্ষ্য তীর আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিবে, ইহা নিশ্চয় জানিয়ো।"

ইন্দ্রকুমার যুবরাজের পদধূলি লইয়া কহিলেন, "দাদা, তোমার আশীর্বাদে আজ লক্ষ্য ভেদ করিব, ইহার অন্যথা হইবে না।"

ইন্দ্রকুমার তীর নিক্ষেপ করিলেন, লক্ষ্য বিদ্ধ হইল। বাজনা বাজিল। চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠিল। যুবরাজ যখন ইন্দ্রকুমারকে আলিঙ্গন করিলেন, আনন্দে ইন্দ্রকুমারের চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল। ঈশা খাঁ পরম স্নেহে কহিলেন, "পুত্র, আল্লার কৃপায় তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া থাকো।"

মহারাজা যখন ইন্দ্রকুমারকে পুরস্কার দিবার উদ্‌যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে রাজধর গিয়া কহিলেন, "মহারাজ, আপনাদের ভ্রম হইয়াছে। আমার তীর লক্ষ্য ভেদ করিয়াছে।"

মহারাজ কহিলেন, "কখনোই না।"

রাজধর কহিলেন, "মহারাজ, কাছে গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুন।"

সকলে লক্ষ্যের কাছে গেলেন। দেখিলেন যে-তীর মাটিতে বিদ্ধ তাহার ফলায় ইন্দ্রকুমারের নাম খোদিত—আর যে-তীর লক্ষ্যে বিদ্ধ তাহাতে রাজধরের নাম খোদিত।

রাজধর কহিলেন, "বিচার করুন মহারাজ।"

ইশা খাঁ কহিলেন, "নিশ্চয়ই তূণ বদল হইয়াছে।"

কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল তূণ বদল হয় নাই। সকলে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিলেন।

ইশা খাঁ বলিলেন, "পুনর্বার পরীক্ষা করা হউক।"

রাজধর বিষম অভিমান করিয়া কহিলেন, "তাহাতে আমি সম্মত হইতে পারি না। আমার প্রতি এ বড়ো অন্যায় অবিশ্বাস। আমি তো পুরস্কার চাই না, মধ্যম কুমার বাহাদুরকে পুরস্কার দেওয়া হউক।" বলিয়া পুরস্কারের তলোয়ার ইন্দ্রকুমারের দিকে অগ্রসর করিয়া দিলেন।

ইন্দ্রকুমার দারুণ ঘৃণার সহিত বলিয়া উঠিলেন, "ধিক্। তোমার হাত হইতে এ পুরস্কার গ্রাহ্য করে কে। এ তুমি লও।" বলিয়া তলোয়ারখানা ঝনঝন করিয়া রাজধরের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিলেন। রাজধর হাসিয়া নমস্কার করিয়া তাহা তুলিয়া লইলেন।

তখন ইন্দ্রকুমার কম্পিতস্বরে পিতাকে কহিলেন, "মহারাজ, আরাকানপতির সহিত শীঘ্রই যুদ্ধ হইবে। সেই যুদ্ধে গিয়া আমি পুরস্কার আনিব। মহারাজ, আদেশ করুন।"

ইশা খাঁ ইন্দ্রকুমারের হাত ধরিয়া কঠোরস্বরে কহিলেন, "তুমি আজ মহারাজের অপমান করিয়াছ। উঁহার তলোয়ার ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছ। ইহার সমুচিত শাস্তি আবশ্যক।"

ইন্দ্রকুমার সবলে হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিলেন, "বৃদ্ধ, আমাকে স্পর্শ করিয়ো না।"

বৃদ্ধ ইশা খাঁ সহসা বিষণ্ন হইয়া ক্ষুব্ধস্বরে কহিলেন, "পুত্র, এ কী পুত্র। আমার 'পরে এই ব্যবহার। তুমি আজ আত্মবিস্মৃত হইয়াছ বৎস।"

ইন্দ্রকুমারের চোখে জল উথলিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "সেনাপতি সাহেব, আমাকে মাপ করো, আমি আজ যথার্থই আত্মবিস্মৃত হইয়াছি।"

যুবরাজ স্নেহের স্বরে কহিলেন, "শান্ত হও ভাই—গৃহে ফিরিয়া চলো।"

ইন্দ্রকুমার পিতার পদধূলি লইয়া কহিলেন, "পিতা, অপরাধ মার্জনা করুন।" গৃহে ফিরিবার সময় যুবরাজকে কহিলেন, "দাদা, আজ আমার যথার্থই পরাজয় হইয়াছে।"

রাজধর যে কেমন করিয়া জিতিলেন তাহা কেহ বুঝিতে পারিলেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাজধর পরীক্ষা-দিনের পূর্বে যখন কমলাদেবীর সাহায্যে ইন্দ্রকুমারের অস্ত্রশালায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখনই ইন্দ্রকুমারের তূণ হইতে ইন্দ্রকুমারের নামাঙ্কিত একটি তীর নিজের তূণে তুলিয়া লইয়া ছিলেন এবং নিজের নামাঙ্কিত একটি তীর ইন্দ্রকুমারের তূণে এমন স্থানে এমন ভাবে স্থাপিত করিয়াছিলেন, যাহাতে সেইটিই সহজে ও সর্বাগ্রে তাঁহার হাতে উঠিতে পারে। রাজধর যাহা মনে করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। ইন্দ্রকুমার দৈবক্রমে রাজধরের স্থাপিত তীরই তুলিয়া লইয়াছিলেন—সেইজন্যই পরীক্ষাস্থলে এমন গোলমাল হইয়াছিল। কালক্রমে যখন সমস্ত শান্তভাব ধারণ করিল তখন ইন্দ্রকুমার রাজধরের চাতুরী কতকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু সে-কথা আর কাহাকেও কিছু বলিলেন না—কিন্তু রাজধরের প্রতি তাঁহার ঘৃণা আরও দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল।

ইন্দ্রকুমার মহারাজের কাছে বার বার বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ, আরাকানপতির সহিত যুদ্ধে আমাকে পাঠান।"

মহারাজ অনেক বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

আমরা যে-সময়ের গল্প বলিতেছি সে আজ প্রায় তিন-শ বৎসরের কথা। তখন ত্রিপুরা স্বাধীন ছিল এবং চট্টগ্রাম ত্রিপুরার অধীন ছিল। আরাকান চট্টগ্রামের সংলগ্ন। আরাকানপতি মাঝে মাঝে চট্টগ্রাম আক্রমণ করিতেন। এইজন্য আরাকানের সঙ্গে ত্রিপুরার মাঝে মাঝে বিবাদ বাধিত। অমরমাণিক্যের সহিত আরাকানপতির সম্প্রতি সেইরূপ একটি বিবাদ বাধিয়াছে। যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখিয়া ইন্দ্রকুমার যুদ্ধে যাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। রাজা অনেক বিবেচনা করিয়া অবশেষে সম্মতি দিলেন। তিন ভাইয়ে পাঁচ হাজার করিয়া পনেরো হাজার সৈন্য লইয়া চট্টগ্রাম অভিমুখে চলিলেন। ইশা খাঁ সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া গেলেন।

কর্ণফুলি নদীর পশ্চিম ধারে শিবির-স্থাপন হইল। আরাকানের সৈন্য কতক নদীর ওপারে কতক এপারে। আরাকানপতি অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া নদীর পরপারে আছেন। এবং তাঁহার বাইশ হাজার সৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া আক্রমণের প্রতীক্ষায় নদীর পশ্চিম পারে অপেক্ষা করিয়া আছে।

যুদ্ধের ক্ষেত্র পর্বতময়। সমুখাসমুখি দুই পাহাড়ের উপর দুই পক্ষের সৈন্য স্থাপিত হইয়াছে। উভয় পক্ষে যদি যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হয়, তবে মাঝের উপত্যকায় দুই সৈন্যের সংঘর্ষ উপস্থিত হইতে পারে। পর্বতের চারিদিকে হরীতকী আমলকী শাল ও

গাম্ভারির বন। মাঝে মাঝে গ্রামবাসীদের শূন্য গৃহ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহারা ঘর ছাড়িয়া পালাইয়াছে। মাঝে মাঝে শস্যক্ষেত্র। পাহাড়িরা সেখানে ধান কাপাস তরমুজ আলু একত্রে রোপণ করিয়া গিয়াছে। আবার এক-এক জায়গায় জুমিয়া চাষারা এক-একটা পাহাড় সমস্ত দগ্ধ করিয়া কালো করিয়া রাখিয়াছে, বর্ষার পর সেখানে শস্য বপন হইবে। দক্ষিণে কর্ণফুলি, বামে দুর্গম পর্বত।

এইখানে প্রায় এক সপ্তাহকাল উভয় পক্ষ পরস্পরের আক্রমণপ্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। ইন্দ্রকুমার যুদ্ধের জন্য অস্থির হইয়াছেন, কিন্তু যুবরাজের ইচ্ছা বিপক্ষপক্ষেরা আগে আসিয়া আক্রমণ করে। সেইজন্য বিলম্ব করিতেছেন—কিন্তু তাহারাও নড়িতে চাহে না, স্থির হইয়া আছে। অবশেষে আক্রমণ করাই স্থির হইল।

সমস্ত রাত্রি আক্রমণের আয়োজন চলিতে লাগিল। রাজধর প্রস্তাব করিলেন, "দাদা, তোমরা দুইজনে তোমাদের দশ হাজার সৈন্য লইয়া আক্রমণ করো। আমার পাঁচ হাজার হাতে থাক্, আবশ্যকের সময় কাজে লাগিবে।"

ইন্দ্রকুমার হাসিয়া বলিলেন, "রাজধর তফাতে থাকিতে চান।"

যুবরাজ কহিলেন, "না, হাসির কথা নয়। রাজধরের প্রস্তাব আমার ভালো বোধ হইতেছে।" ঈশা খাঁও তাহাই বলিলেন। রাজধরের প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল।

যুবরাজ ও ইন্দ্রকুমারের অধীনে দশ হাজার সৈন্য পাঁচ ভাগে ভাগ করা হইল। প্রত্যেক ভাগে দুই হাজার করিয়া সৈন্য রহিল। স্থির হইল, একেবারে শত্রুব্যূহের পাঁচ জায়গায় আক্রমণ করিয়া ব্যূহভেদ করিবার চেষ্টা করা হইবে। সর্বপ্রথম সারে ধানুকীরা রহিল, তার পরে তলোয়ার বর্শা প্রভৃতি লইয়া অন্য পদাতিকেরা রহিল এবং সর্বশেষে অশ্বারোহীরা সার বাঁধিয়া চলিল।

আরাকানের মগ সৈন্যেরা দীর্ঘ এক বাঁশবনের পশ্চাতে ব্যূহরচনা করিয়াছিল। প্রথম দিনের আক্রমণে কিছুই হইল না। ত্রিপুরার সৈন্য ব্যূহ ভেদ করিতে পারিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় দিন সমস্ত দিন নিষ্ফল যুদ্ধ অবসানে রাত্রি যখন নিশীথ হইল—যখন উভয় পক্ষের সৈন্যেরা বিশ্রামলাভ করিতেছে, দুই পাহাড়ের উপর দুই শিবিরের স্থানে স্থানে কেবল এক-একটা আগুন জ্বলিতেছে, শৃগালেরা রণক্ষেত্রে ছিন্ন হস্তপদ ও মৃতদেহের মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া দলে দলে কাঁদিয়া উঠিতেছে—তখন শিবিরের দুই ক্রোশ দূরে রাজধর তাঁহার পাঁচ হাজার সৈন্য লইয়া সারবন্দি নৌকা বাঁধিয়া কর্ণফুলি

নদীর উপরে নৌকার সেতু নির্মাণ করিয়াছেন। একটি মশাল নাই, শব্দ নাই, সেতুর উপর দিয়া অতিসাবধানে সৈন্য পার করিতেছেন। নিচে দিয়া যেমন অন্ধকারে নদীর স্রোত বহিয়া যাইতেছে তেমনই উপর দিয়া মানুষের স্রোত অবিচ্ছিন্ন বহিয়া যাইতেছে। নদীতে ভাঁটা পড়িয়াছে। পরপারের পর্বতময় দুর্গম পাড় দিয়া সৈন্যেরা অতিকষ্টে উঠিতেছে। রাজধরের প্রতি সৈন্যাধ্যক্ষ ইশা খাঁর আদেশ ছিল যে, রাজধর রাত্রিযোগে তাঁহার সৈন্যদের লইয়া নদী বাহিয়া উত্তর দিকে যাত্রা করিবেন—তীরে উঠিয়া বিপক্ষ সৈন্যদের পশ্চাদ্ভাগে লুক্কায়িত থাকিবেন। প্রভাতে যুবরাজ ও ইন্দ্রকুমার সম্মুখভাগে আক্রমণ করিবেন—বিপক্ষেরা যুদ্ধে শ্রান্ত হইলে পর সংকেত পাইলে রাজধর সহসা পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিবেন। সেইজন্যই এত নৌকার বন্দোবস্ত হইয়াছে। কিন্তু রাজধর ইশা খাঁর আদেশ কই পালন করিলেন। তিনি তো সৈন্য লইয়া নদীর পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি আর-এক কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু কাহাকেও কিছু বলেন নাই। তিনি নিঃশব্দে আরাকানের রাজার শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। চতুর্দিকে পর্বত, মাঝে উপত্যকা, রাজার শিবির তাহারই মাঝখানেই অবস্থিত। শিবিরে নির্ভয়ে সকলে নিদ্রিত। মাঝে মাঝে অগ্নিশিখা দেখিয়া দূর হইতে শিবিরের স্থান নির্ণয় হইতেছে। পর্বতের উপর হইতে বড়ো বড়ো বনের ভিতর দিয়া রাজধরের পাঁচ হাজার সৈন্য অতি সাবধানে উপত্যকার দিকে নামিতে লাগিল—বর্ষাকালে যেমন পর্বতের সর্বাঙ্গ দিয়া গাছের শিকড় ধুইয়া ঘোলা হইয়া জলধারা নামিতে থাকে, তেমনি পাঁচ সহস্র মানুষ, পাঁচ সহস্র তলোয়ার, অন্ধকারের ভিতর দিয়া গাছের নিচে দিয়া সহস্র পথে আঁকিয়া বাঁকিয়া যেন নিম্নাভিমুখে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কিছু শব্দ নাই, মন্দগতি। সহসা পাঁচ সহস্র সৈন্যের ভীষণ চীৎকার উঠিল—ক্ষুদ্র শিবির যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল—এবং তাহার ভিতর হইতে মানুষগুলা কিলবিল করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। কেহ মনে করিল দুঃস্বপ্ন, কেহ মনে করিল প্রেতের উৎপাত, কেহ কিছুই মনে করিতে পারিল না।

রাজা বিনা রক্তপাতে বন্দী হইলেন। রাজা বলিলেন, "আমাকে বন্দী করিলে বা বধ করিলে যুদ্ধের অবসান হইবে না। আমি বন্দী হইবামাত্র সৈন্যেরা আমার ভাই হামচুপামুকে রাজা করিবে। যুদ্ধ যেমন চলিতেছিল তেমনই চলিবে। আমি বরঞ্চ পরাজয় স্বীকার করিয়া সন্ধিপত্র লিখিয়া দিই, আমার বন্ধন মোচন করিয়া দিন।"

রাজধর তাহাতেই সম্মত হইলেন। আরাকানরাজ পরাজয় স্বীকার করিয়া সন্ধিপত্র লিখিয়া দিলেন। একটি হস্তিদন্তনির্মিত মুকুট, পাঁচশত মণিপুরী ঘোড়া ও তিনটে বড়ো হাতি উপহার দিলেন, এইরূপ নানা ব্যবস্থা করিতে করিতে প্রভাত হইল—বেলা

হইয়া গেল। সুদীর্ঘ রাত্রে সমস্তই ভূতের ব্যাপার বলিয়া মনে হইতেছিল, দিনের বেলা আরাকানের সৈন্যগণ আপনাদের অপমান স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিল। চারিদিকে বড়ো বড়ো পাহাড় সূর্যালোকে সহস্রচক্ষু হইয়া তাহাদিগের দিকে তাকাইয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। রাজধর আরাকানপতিকে কহিলেন, "আর বিলম্ব নয়—শীঘ্র যুদ্ধ নিবারণ করিবার এক আদেশপত্র আপনার সেনাপতির নিকট পাঠাইয়া দিন। ওপারে এতক্ষণে ঘোর যুদ্ধ বাধিয়া গেছে।"

কতকগুলি সৈন্য সহিত দূতের হস্তে আদেশপত্র পাঠানো হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অতি প্রত্যুষেই অন্ধকার দূর হইতে না হইতেই যুবরাজ ও ইন্দ্রকুমার দুই ভাগে পশ্চিমে ও পূর্বে মগদিগকে আক্রমণ করিতে চলিয়াছেন। সৈন্যের অল্পতা লইয়া রূপনারায়ণ হাজারি দুঃখ করিতেছিলেন—তিনি বলিতেছিলেন—আর পাঁচ হাজার লইয়া আসিলেই আর ভাবনা ছিল না। ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "ত্রিপুরারির অনুগ্রহ যদি হয় তবে এই কয় জন সৈন্য লইয়াই জিতিব, আর যদি না হয় তবে বিপদ আমাদের উপর দিয়াই যাক, ত্রিপুরাবাসী যত কম মরে ততই ভালো। কিন্তু হরের কৃপায় আজ আমরা জিতিবই।" এই বলিয়া হর হর বোম্ বোম্ রব তুলিয়া কৃপাণ বর্শা লইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া বিপক্ষদের অভিমুখে ছুটিলেন—তাঁহার দীপ্ত উৎসাহ তাঁহার সৈন্যদের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। গ্রীষ্মকালে দক্ষিনা বাতাসে খড়ের চালের উপর দিয়া আগুন যেমন ছোটে তাঁহার সৈন্যেরা তেমনি ছুটিতে লাগিল। কেহই তাহাদের গতিরোধ করিতে পারিল না। বিপক্ষদের দক্ষিণ দিকের ব্যূহ ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। হাতাহাতি যুদ্ধ বাধিল। মানুষের মাথা ও দেহ কাটা-শস্যের মতো শস্যক্ষেত্রের উপর গিয়া পড়িতে লাগিল। ইন্দ্রকুমারের ঘোড়া কাটা পড়িল। তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন। রব উঠিল তিনি মারা পড়িয়াছেন। কুঠারঘাতে এক মগ অশ্বারোহীকে অশ্বচ্যুত করিয়া ইন্দ্রকুমার তৎক্ষণাৎ তাহার ঘোড়ার উপর চড়িয়া বসিলেন। রেকাবের উপর দাঁড়াইয়া তাঁহার রক্তাক্ত তলোয়ার আকাশে সূর্যালোকে উঠাইয়া বজ্রস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "হর হর বোম্ বোম্।" যুদ্ধের আগুন দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া মগদিগের বামদিকের ব্যূহের সৈন্যগণ আক্রমণের প্রতীক্ষা না করিয়া সহসা বাহির হইয়া যুবরাজের সৈন্যের উপর গিয়া পড়িল। যুবরাজের সৈন্যগণ সহসা এরূপ আক্রমণ প্রত্যাশা করে নাই। তাহারা মুহূর্তের মধ্যে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল।

তাহাদের নিজের অশ্ব নিজের পদাতিকদের উপর গিয়া পড়িল, কোন্ দিকে যাইবে ঠিকানা পাইল না। যুবরাজ ও ইশা খাঁ আসমসাহসের সহিত সৈন্যদের সংযত করিয়া লইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। অদূরে রাজধরের সৈন্য লুক্কায়িত আছে কল্পনা করিয়া সংকেতস্বরূপ বার বার তূরীনিনাদ করিলেন কিন্তু রাজধরের সৈন্যের কোনো লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। ইশা খাঁ বলিলেন, "তাঁহাকে ডাকা বৃথা। সে শৃগাল দিনের বেলা গর্ত হইতে বাহির হইবে না।" ইশা খাঁ ঘোড়া হইতে মাটিতে লাফাইয়া পড়িলেন। পশ্চিম মুখ হইয়া সত্বর নামাজ পড়িয়া লইলেন। মরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া মরিয়া হইয়া লড়িতে লাগিলেন। চারিদিকে মৃত্যু যতই ঘেরিতে লাগিল, দুর্দান্ত যৌবন ততই যেন তাঁহার দেহে ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

এমন সময় ইন্দ্রকুমার শত্রুদের এক অংশ সম্পূর্ণ জয় করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন যুবরাজের একদল অশ্বারোহী সৈন্য ছিন্নভিন্ন হইয়া পালাইতেছে, তিনি তাহাদিগকে ফিরাইয়া লইলেন। বিদ্যুদ্‌বেগে যুবরাজের সাহায্যার্থে আসিলেন। কিন্তু সে বিশৃঙ্খলার মধ্যে কিছুই কূলকিনারা পাইলেন না। ঘূর্ণা বাতাসে মরুভূমির বালুকারাশি যেমন ঘুরিতে থাকে, উপত্যকার মাঝখানে যুদ্ধ তেমনই পাক খাইতে লাগিল। রাজধরের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বার বার তূরীধ্বনি উঠিল, কিন্তু তাহার উত্তর পাওয়া গেল না।

সহসা কী মন্ত্রবলে সমস্ত থামিয়া গেল, যে যেখানে ছিল স্থির হইয়া দাঁড়াইল—আহতের আর্তনাদ ও অশ্বের হ্রেষা ছাড়া আর শব্দ রহিল না। সন্ধির নিশান লইয়া লোক আসিয়াছে। মগদের রাজা পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন। হর হর বোম্ বোম্ শব্দে আকাশ বিদীর্ণ হইয়া গেল। মগ-সৈন্যগণ আশ্চর্য হইয়া পরস্পরের মুখ চাহিতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ

রাজধর যখন জয়োপহার লইয়া আসিলেন, তখন তাঁহার মুখে এত হাসি যে তাঁহার ছোটো চোখ দুটা বিন্দুর মতো হইয়া পিট পিট করিতে লাগিল। হাতির দাঁতের মুকুট বাহির করিয়া ইন্দ্রকুমারকে দেখাইয়া কহিলেন, "এই দেখো, যুদ্ধের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই পুরস্কার পাইয়াছি।"

ইন্দ্রকুমার ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "যুদ্ধ? যুদ্ধ তুমি কোথায় করিলে। এ পুরস্কার তোমার নহে। এ মুকুট যুবরাজ পরিবেন।"

রাজধর কহিলেন, "আমি জয় করিয়া আনিয়াছি; এ মুকুট আমি পরিব।"

যুবরাজ কহিলেন, "রাজধর ঠিক কথা বলিতেছেন, এ মুকুট রাজধরেরই প্রাপ্য।"

ইশা খাঁ চটিয়া রাজধরকে বলিলেন, "তুমি মুকুট পরিয়া দেশে যাইবে! তুমি সৈন্যাধ্যক্ষের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া যুদ্ধ হইতে পালাইলে এ কলঙ্ক একটা মুকুটে ঢাকা পড়িবে না। তুমি একটা ভাঙা হাঁড়ির কানা পরিয়া দেশে যাও, তোমাকে সাজিবে ভালো।"

রাজধর বলিলেন, "খাঁ সাহেব, এখন তো তোমার মুখে খুব বোল ফুটিতেছে—কিন্তু আমি না থাকিলে তোমরা এতক্ষণ থাকিতে কোথায়।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "যেখানেই থাকি, যুদ্ধ ছাড়িয়া গর্তের মধ্যে লুকাইয়া থাকিতাম না।"

যুবরাজ বলিলেন, "ইন্দ্রকুমার, তুমি অন্যায় বলিতেছ, সত্য কথা বলিতে কী, রাজধর না থাকিলে আজ আমাদের বিপদ হইত।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "রাজধর না থাকিলে আজ আমাদের কোনো বিপদ হইত না। রাজধর না থাকিলে এ মুকুট আমি যুদ্ধ করিয়া আনিতাম—রাজধর চুরি করিয়া আনিয়াছে। দাদা, এ মুকুট আনিয়া আমি তোমাকে পরাইয়া দিতাম—নিজে পারিতাম না।"

যুবরাজ মুকুট হাতে লইয়া রাজধরকে বলিলেন, "ভাই, তুমিই আজ জিতিয়াছ। তুমি না থাকিলে অল্প সৈন্য লইয়া আমাদের কী বিপদ হইত জানি না। এ মুকুট আমি তোমাকে পরাইয়া দিতেছি।" বলিয়া রাজধরের মাথায় মুকুট পরাইয়া দিলেন।

ইন্দ্রকুমারের বক্ষ যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল—তিনি রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "দাদা, রাজধর শৃগালের মতো গোপনে রাত্রিযোগে চুরি করিয়া এই রাজমুকুট পুরস্কার পাইল; আর আমি যে প্রাণপণে যুদ্ধ করিলাম—তোমার মুখ হইতে একটা প্রশংসার বাক্যও শুনিতে পাইলাম না। তুমি কি না বলিলে রাজধর না থাকিলে কেহ তোমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারিত না। কেন দাদা, আমি কি সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমার চোখের সামনে যুদ্ধ করি নাই—আমি কি যুদ্ধ ছাড়িয়া পালাইয়া গিয়াছিলাম—আমি কি কখনো ভীরুতা দেখাইয়াছি। আমি কি শত্রু-সৈন্যকে ছিন্নভিন্ন করিয়া তোমার সাহায্যের জন্য আসি নাই। কী দেখিয়া তুমি বলিলে যে, তোমার পরম স্নেহের রাজধর ব্যতীত কেহ তোমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারিত না।"

যুবরাজ একান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, "ভাই, আমি নিজের বিপদের কথা বলিতেছি না—"

কথা শেষ হইতে না হইতে অভিমানে ইন্দ্রকুমার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ইশা খাঁ যুবরাজকে বলিলেন, "যুবরাজ, এ মুকুট তোমার কাহাকেও দিবার অধিকার নাই। আমি সেনাপতি, এ মুকুট আমি যাহাকে দিব তাহারই হইবে।" বলিয়া ইশা খাঁ রাজধরের মাথা হইতে মুকুট তুলিয়া যুবরাজের মাথায় দিতে গেলেন।

যুবরাজ সরিয়া গিয়া বলিলেন, "না, এ আমি গ্রহণ করিতে পারি না।"

ইশা খাঁ বলিলেন, "তবে থাক্। এ মুকুট কেহ পাইবে না।" বলিয়া পদাঘাতে মুকুট কর্ণফুলি নদীর জলে ফেলিয়া দিলেন। বলিলেন, "রাজধর যুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন—রাজধর শাস্তির যোগ্য।"

দশম পরিচ্ছেদ

ইন্দ্রকুমার তাঁহার সমস্ত সৈন্য লইয়া আহতহৃদয়ে শিবির হইতে দূরে চলিয়া গেলেন। যুদ্ধ অবসান হইয়া গিয়াছে। ত্রিপুরার সৈন্য শিবির তুলিয়া দেশে ফিরিবার উপক্রম করিতেছে। এমন সময় সহসা এক ব্যাঘাত ঘটিল।

ইশা খাঁ যখন মুকুট কাড়িয়া লইলেন, তখন রাজধর মনে মনে কহিলেন, "আমি না থাকিলে তোমরা কেমন করিয়া উদ্ধার পাও একবার দেখিব।"

তাহার পরদিন রাজধর গোপনে আরাকানপতির শিবিরে এক পত্র পাঠাইয়া দিলেন। এই পত্রে তিনি ত্রিপুরার সৈন্যের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদের সংবাদ দিয়া আরাকান-পতিকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন।

ইন্দ্রকুমার যখন স্বতন্ত্র হইয়া সৈন্যসমেত স্বদেশাভিমুখে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন এবং যুবরাজের সৈন্যেরা শিবির তুলিয়া গৃহের অভিমুখে যাত্রা করিতেছে, তখন সহসা মগেরা পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিল—রাজধর সৈন্য লইয়া কোথায় সরিয়া পড়িলেন তাহার উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

যুবরাজের হতাবশিষ্ট তিন সহস্র সৈন্য প্রায় তাহার চতুর্গুণ মগ-সৈন্য কর্তৃক হঠাৎ বেষ্টিত হইল। ইশা খাঁ যুবরাজকে বলিলেন, "আজ আর পরিত্রাণ নাই। যুদ্ধের ভার আমার উপর দিয়া তুমি পলায়ন করো।"

যুবরাজ দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "পালাইলেও তো একদিন মরিতে হইবে।" চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন, "পালাইব বা কোথা। এখানে মরিবার যেমন সুবিধা পালাইবার তেমন সুবিধা নাই। হে ঈশ্বর, সকলই তোমার ইচ্ছা।"

ইশা খাঁ বলিলেন, "তবে আইস, আজ সমারোহ করিয়া মরা যাক।" বলিয়া

প্রাচীরবৎ শত্রুসৈন্যের এক দুর্বল অংশ লক্ষ্য করিয়া সমস্ত সৈন্য বিদ্যুদ্‌বেগে ছুটাইয়া দিলেন। পালাইবার পথ রুদ্ধ দেখিয়া সৈন্যেরা উন্মত্তের ন্যায় লড়িতে লাগিল। ইশা খাঁ দুই হাতে দুই তলোয়ার লইলেন—তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে একটি লোক তিষ্ঠিতে পারিল না। যুদ্ধক্ষেত্রের একস্থানে একটি ক্ষুদ্র উৎস উঠিতেছিল তাহার জল রক্তে লাল হইয়া উঠিল।

ইশা খাঁ শত্রুর ব্যূহ ভাঙিয়া ফেলিয়া লড়িতে লড়িতে প্রায় পর্বতের শিখর পর্যন্ত উঠিয়াছেন, এমন সময় এক তীর আসিয়া তাঁহার বক্ষে বিদ্ধ হইল। তিনি আল্লার নাম উচ্চারণ করিয়া ঘোড়ার উপর হইতে পড়িয়া গেলেন।

যুবরাজের জানুতে এক তীর, পৃষ্ঠে এক তীর এবং তাঁহার বাহন হাতির পঞ্জরে এক তীর বিদ্ধ হইল। মাহুত হত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে। হাতি যুদ্ধক্ষেত্র ফেলিয়া উন্মাদের মতো ছুটিতে লাগিল। যুবরাজ তাহাকে ফিরাইবার অনেক চেষ্টা করিলেন, সে ফিরিল না। অবশেষে তিনি যন্ত্রণায় ও রক্তপাতে দুর্বল হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অনেক দূরে কর্ণফুলি নদীর তীরে হাতির পিঠ হইতে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

আজ রাত্রে চাঁদ উঠিয়াছে। অন্যদিন রাত্রে যে সবুজ মাঠের উপরে চাঁদের আলো বিচিত্রবর্ণ ছোটো ছোটো বনফুলের উপর আসিয়া পড়িত, আজ সেখানে সহস্র সহস্র মানুষের হাতপা কাটামুণ্ড ও মৃতদেহের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে—যে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ উৎসের জলে সমস্ত রাত ধরিয়া চন্দ্রের প্রতিবিম্ব নৃত্য করিত, সে উৎস মৃত অশ্বের দেহে প্রায় রুদ্ধ—তাহার জল রক্তে লাল হইয়া গেছে। কিন্তু দিনের বেলা মধ্যাহ্নের রৌদ্রে যেখানে মৃত্যুর ভীষণ উৎসব হইতেছিল, ভয় ক্রোধ নিরাশা হিংসা সহস্র হৃদয় হইতে অনবরত ফেনাইয়া উঠিতেছিল, অস্ত্রের ঝন ঝন উন্মাদের চীৎকার আহতের আর্তনাদ অশ্বের হ্রেষা রণশঙ্খের ধ্বনিতে নীল আকাশ যেন মথিত হইতেছিল—রাত্রে চাঁদের আলোতে সেখানে কী অগাধ শান্তি কী সুগভীর বিষাদ। মৃত্যুর নৃত্য যেন ফুরাইয়া গেছে, কেবল প্রকাণ্ড নাট্যশালার চারিদিকে উৎসবের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। সাড়াশব্দ নাই, প্রাণ নাই, চেতনা নাই, হৃদয়ের তরঙ্গ স্তব্ধ। একদিকে পর্বতের সুদীর্ঘ ছায়া পড়িয়াছে—একদিকে চাঁদের আলো। মাঝে মাঝে পাঁচ-ছয়টা করিয়া বড়ো বড়ো গাছ ঝাঁকড়া মাথা লইয়া শাখাপ্রশাখা জটাজুট আঁধার করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

ইন্দ্রকুমার যুদ্ধের সমস্ত সংবাদ পাইয়া যখন যুবরাজকে খুঁজিতে আসিয়াছেন, তখন তিনি কর্ণফুলি নদীর তীরে ঘাসের শয্যার উপর শুইয়া আছেন। মাঝে মাঝে অঞ্জলি পুরিয়া জলপান করিতেছেন, মাঝে মাঝে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া চোখ বুজিয়া আসিতেছে। দূর সমুদ্রের দিক হইতে বাতাস আসিতেছে। কানের কাছে কুল কুল করিয়া নদীর জল বহিয়া আসিতেছে। জনপ্রাণী নাই। চারিদিকে বিজন পর্বত দাঁড়াইয়া আছে, বিজন অরণ্য ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে—আকাশে চন্দ্র একাকী, জ্যোৎস্নালোকে অনন্ত নীলাকাশ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

এমন সময়ে ইন্দ্রকুমার যখন বিদীর্ণহৃদয়ে "দাদা" বলিয়া ডাকিয়া উঠিলেন, তখন আকাশপাতাল যেন শিহরিয়া উঠিল। চন্দ্রনারায়ণ চমকিয়া জাগিয়া "এস ভাই" বলিয়া আলিঙ্গনের জন্য দুই হাত বাড়াইয়া দিলেন। ইন্দ্রকুমার দাদার আলিঙ্গনের মধ্যে বদ্ধ হইয়া শিশুর মতো কাঁদিতে লাগিলেন।

চন্দ্রনারায়ণ ধীরে ধীরে বলিলেন, "আঃ বাঁচিলাম ভাই। তুমি আসিবে জানিয়াই এতক্ষণে কোনোমতে আমার প্রাণ বাহির হইতেছিল না। ইন্দ্রকুমার, তুমি আমার উপরে অভিমান করিয়াছিলে, তোমার সেই অভিমান লইয়া কি আমি মরিতে পারি। আজ আবার দেখা হইল, তোমার প্রেম আবার ফিরিয়া পাইলাম—এখন মরিতে আর কোনো কষ্ট নাই।" বলিয়া দুই হাতে তাঁহার তীর উৎপাটন করিলেন। রক্ত ছুটিয়া পড়িল, তাঁহার শরীর হিম হইয়া আসিল—মৃদুস্বরে বলিলেন, "মরিলাম তাহাতে দুঃখ নাই কিন্তু আমাদের পরাজয় হইল।"

ইন্দ্রকুমার কাঁদিয়া কহিলেন, "পরাজয় তোমার হয় নাই দাদা, পরাজয় আমারই হইয়াছে।"

চন্দ্রনারায়ণ ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া হাতজোড় করিয়া কহিলেন, "দয়াময়, ভবের খেলা শেষ করিয়া আসিলাম, এখন তোমার কোলে স্থান দাও।" বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

ভোরের বেলা নদীর পশ্চিম পাড়ে চন্দ্র যখন পাণ্ডুবর্ণ হইয়া আসিল চন্দ্রনারায়ণের মুদ্রিতনেত্র মুখচ্ছবিও তখন পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। চন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার জীবন অস্তমিত হইল।

পরিশিষ্ট

বিজয়ী মগ সৈন্যেরা সমস্ত চট্টগ্রাম ত্রিপুরার নিকট হইতে কাড়িয়া লইল। ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুর পর্যন্ত লুণ্ঠন করিল। অমরমাণিক্য দেওঘাটে পালাইয়া গিয়া অপমানে আত্মহত্যা করিয়া মরিলেন। ইন্দ্রকুমার মগদের সহিত যুদ্ধ করিয়াই মরেন—জীবন ও কলঙ্ক লইয়া দেশে ফিরিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না।

রাজধর রাজা হইয়া কেবল তিন বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন—তিনি গোমতীর জলে ডুবিয়া মরেন।

ইন্দ্রকুমার যখন যুদ্ধে যান তখন তাঁহার স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন। তাঁহারই পুত্র কল্যাণমাণিক্য রাজধরের মৃত্যুর পরে রাজা হন। তিনি পিতার ন্যায় বীর ছিলেন। যখন সম্রাট শাজাহানের সৈন্য ত্রিপুরা আক্রমণ করে, তখন কল্যাণমাণিক্য তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১২৯২

প্রবন্ধ

শান্তিনিকেতন

শান্তিনিকেতন

৪

পাওয়া

শক্তির ক্ষেত্রে যারা কাজ করে তারা অনন্ত উন্নতির কথা বলে। অর্থাৎ অনন্ত গতির উপরেই তারা জোর দেয়, অনন্ত স্থিতির উপর নয়। তারা অনন্ত চেষ্টার কথাই বলে, অনন্ত লাভের কথা বলে না।

এইজন্য ধর্মনীতিই তাদের শেষ সম্বল। নীতি কিনা নিয়ে যাবার জিনিস—তা পথের পাথেয়। যারা পথকেই মানে তারা নীতিকেই চরমরূপে মানে—তারা গৃহের সম্বলের কথা চিন্তা করে না। কারণ যে গৃহে কোনোকালেই মানুষ পৌঁছোবে না, সে গৃহকে মানলেও হয়, না মানলেও হয়। যে উন্নতি অনন্ত উন্নতি তাকে উন্নতি না বললে ক্ষতি হয় না।

কিন্তু শক্তিভক্তেরা বলে চলাটাই আনন্দ—কারণ তাতে শক্তির চালনা হয়; লাভে শক্তির কর্ম শেষ হয়ে গিয়ে নিশ্চেষ্ট তামসিকতায় নিয়ে গিয়ে ফেলে; বস্তুতঃ ঐশ্বর্য-পদার্থের গৌরবই এই যে সে আমাদের কোনো লাভের মধ্যে এনে ধরে রাখে না, সে আমাদের অগ্রসর করতে থাকে।

যতক্ষণ আমাদের শক্তি থাকে ততক্ষণ ঐশ্বর্য আমাদের থামতে দেয় না;—কিন্তু দুর্গতির পূর্বে দেখতে পাই মানুষ বলতে থাকে, এইটেই আমি চেয়েছিলুম এবং এইটেই আমি পেয়েছি। তখন পথিকধর্ম সে বিসর্জন দিয়ে সঞ্চয়ীর ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে—তখন সে আর সম্মুখের দিকে তাকায় না, যা পেয়েছে সেইটেকে কী করলে আটেঘাটে বাঁধা যায় রক্ষা করা যায়, সেই কথাই সে ভাবতে থাকে।

কিন্তু সংসার জিনিসটা যে কেবলই সরে, কেবলই সরায়। এখানে হয় সরতে থাকো, নয় মরতে থাকো। এখানে যে বলেছে আমার যথেষ্ট হয়েছে, এইবার যথেষ্টের মধ্যে বাসা বাঁধব, সেই ডুবেছে।

ইতিহাসে বড়ো বড়ো জাতির মধ্যেও দেখতে পাই যে, তারা এক জায়গায় এসে বলে এইবার আমার পূর্ণতা হয়েছে—এইবার আমি সঞ্চয় করব, রক্ষা করব, বাঁধাবাঁধি হিসাব বরাদ্দ করব, এইবার আমি ভোগ করব;—তখন আর সে নূতন তত্ত্বকে বিশ্বাস

করে না—তখন তার এতদিনের পথের সম্বল ধর্মনীতিকে দুর্বলতা বলে উপহাস ও অপমান করতে থাকে, মনে করে এখন আর এর প্রয়োজন নেই—এখন আমি বলী, আমি জয়ী, আমি প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু প্রবাহের উপরে যে লোক প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করতে চায় তার যে দশা হয় সে কারও অগোচর নেই। তাকে ডুবতেই হয়। এমন কত জাতি ডুবে গেছে।

কেবলই উন্নতি, কেবলই গতি, পরিণাম কোথাও নেই এমন একটা অদ্ভুত কথার উৎপত্তি হয়েছে এই কারণেই। কারণ, মানুষ দেখেছে সংসারে থামতে গেলেই মরতে হয়। এই নিয়মকে যারা উপলব্ধি করেছে তারা স্থিতি ও লাভকে অস্বীকার করে।

স্থিতিহীন গতি, লাভহীন চেষ্টাই যদি মানুষের ভাগ্য হয় তবে এমন ভয়ানক দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে। এ-কথা ঐশ্বর্য-গর্বের উন্মত্ততায় অন্ধ হয়ে বলা চলে কিন্তু এ-কথা আমাদের অন্তরাত্মা কখনোই সম্পূর্ণ সম্মতির সঙ্গে বলতে পারে না।

তার কারণ, একটা জায়গায় আমাদের পাওয়ার পন্থা আছে। সে হচ্ছে যেখানে ঈশ্বর স্বয়ং নিজেকে ধরা দিয়েছেন। সেখানে আমরা তাঁকে পাই কেন, না তিনি নিজেকে দিতে চান বলেই পাই।

কোথায় পাই? বাহিরে নয়, প্রকৃতিতে নয়, বিজ্ঞানতত্ত্বে নয়, শক্তিতে নয়—পাই জীবাত্মায়। কারণ, সেখানে তাঁর আনন্দ, তাঁর প্রেম। সেখানে তিনি নিজেকে দিতেই চান। যদি কোনো বাধা থাকে তো সে আমাদেরই দিকে—তাঁর দিকে নয়।

এই প্রেমে পাওয়ার মধ্যে তামসিকতা নেই জড়ত্ব নেই। এই যে লাভ এ চরম লাভ বটে কিন্তু পঞ্চত্বলাভের মতো এতে আমরা বিনষ্ট হই নে। তার কারণ আমরা পূর্বেই একদিন আলোচনা করেছি। শক্তির পাওয়া ব্যাপারে পেলেই শক্তি নিশ্চেষ্ট হয় কিন্তু প্রেমের পাওয়ায় পেলে প্রেম নিশ্চেষ্ট হয় না—বরঞ্চ তার চেষ্টা আরও গভীররূপে জাগ্রত হয়।

এইজন্যে এই যে প্রেমের ক্ষেত্রে ঈশ্বর আমাদের কাছে ধরা দেন—এই ধরা দেওয়ার দরুন তিনি আমাদের কাছে ছোটো হয়ে যান না—তাঁর পাওয়ার আনন্দ নিরন্তর প্রবাহিত হয়—সেই পাওয়া নিত্য নূতন থাকে।

মানুষের মধ্যেও যখন আমাদের সত্য প্রেম জাগ্রত হয়ে ওঠে তখন সেই প্রেমের বিষয়কে লাভ করেও লাভের অন্ত থাকে না—এমন স্থলে ব্রহ্মের কথা কী বলব? সেই কথায় উপনিষৎ বলেছেন—

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন

ব্রহ্মের আনন্দ ব্রহ্মের প্রেম যিনি জেনেছেন তিনি কোনোকালেই আর ভয় পান না।

অতএব মানুষের একটা এমন পাওয়া আছে যার সম্বন্ধে চিরকালের কথাটা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ভারতবর্ষ এই পাওয়ার দিকেই খুব করে মন দিয়েছিলেন। সেইজন্যেই ভারতবর্ষের হৃদয় মৈত্রেয়ীর মুখ দিয়ে বলেছেন—যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্? সেইজন্যে মৃত্যুর দিক থেকে অমৃতের দিকে ভারতবর্ষ আপনার আকাঙ্ক্ষা প্রেরণ করেছিলেন।

সেদিকে যারা মন দিয়েছে বাইরে থেকে দেখে তাদের বড়ো বলে তো বোধ হয় না। তাদের উপকরণ কোথায়? ঐশ্বর্য কোথায়?

শক্তির ক্ষেত্রে যারা সফল হয় তারা আপনাকে বড়ো করে সফল হয়—আর অধ্যাত্মক্ষেত্রে যারা সফল হয় তারা আপনাকে ত্যাগ করে সফল হয়। এইজন্য দীন যে সে সেখানে ধন্য। যে অহংকার করবার কিছুই রাখে নি সেই ধন্য—কেননা, ঈশ্বর স্বয়ং যেখানে নত হয়ে আমার কাছে এসেছেন, সেখানে যে নত হতে পারবে সেই তাঁকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারবে। এইজন্যেই প্রতিদিন প্রার্থনা করি, "নমস্তেঽস্তু"—তোমাকে যেন নমস্কার করতে পারি, যেন নত হতে পারি, নিজের অভিমান কোথাও কিছু যেন না থাকে।

জগতে তুমি রাজা অসীম প্রতাপ,
হৃদয়ে তুমি হৃদয়নাথ হৃদয়হরণ রূপ।
নীলাম্বর জ্যোতি-খচিত চরণপ্রান্তে প্রসারিত,
ফিরে সভয়ে নিয়মপথে অনন্তলোক।
নিভৃত হৃদয়মাঝে কিবা প্রসন্ন মুখচ্ছবি,
প্রেমপরিপূর্ণ মধুরভাতি।
ভকতহৃদয়ে তব করুণারস সতত বহে,
দীনজনে সতত কর অভয়দান।

২৫ পৌষ

সমগ্র

এই প্রাতঃকালে যিনি আমাদের জাগালেন তিনি আমাদের সবদিক দিয়েই জাগালেন। এই যে আলোটি ফুটে পড়েছে এ আমাদের কর্মের ক্ষেত্রেও আলো দিচ্ছে, জ্ঞানের ক্ষেত্রেও আলো দিচ্ছে—সৌন্দর্যক্ষেত্রকেও আলোকিত করছে। এই

ভিন্ন ভিন্ন পথের জন্তে তিনি ভিন্ন ভিন্ন দূত পাঠান নি—তাঁর একই দূত সকল পথেরই দূত হয়ে হাস্তমুখে আমাদের সম্মুখে অবতীর্ণ হয়েছে।

কিন্তু আমাদের বোঝবার প্রক্রিয়াই এই যে সত্যকে আমরা একমুহূর্তে সমগ্র করে দেখতে পাই নে। প্রথম খণ্ড খণ্ড করে, তার পরে জোড়া দিয়ে দেখি। এই উপায়ে খণ্ডের হিসাবে সত্য করে দেখতে গিয়ে সমগ্রের হিসাবে ভুল করে দেখি। ছবিতে একটি পরিপ্রেক্ষণতত্ত্ব আছে—তদনুসারে দূরকে ছোটো করে এবং নিকটকে বড়ো করে আঁকতে হয়। তা যদি না করি তবে ছবিটি আমাদের কাছে সত্য বলে মনে হয় না। কিন্তু সমগ্র সত্যের কাছে দূর নিকট নেই, সবই সমান নিকট। এইজন্তে নিকটকে বড়ো করে ও দূরকে ছোটো করে দেখা সারা হলে তার পরে সমগ্র সত্যের মধ্যে তাকে সংশোধন করে নিতে হয়।

মানুষ একসঙ্গে সমস্তকে দেখবার চেষ্টা করলে সমস্তকেই ঝাপসা দেখে বলেই প্রথমে খণ্ড খণ্ড করে তার পরে সমস্তর মধ্যে সেটা মিলিয়ে নেয়। এইজন্য কেবল খণ্ডকে দেখে সমগ্রকে যদি সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তবে তার ভয়ংকর জবাবদিহি আছে; আবার কেবল সমগ্রকে লক্ষ্য করে খণ্ডকে যদি বিলুপ্ত করে দেখে তবে সেই শূন্যতা তার পক্ষে একেবারে ব্যর্থ হয়।

এ কয়দিন আমরা প্রাকৃতিক ক্ষেত্র এবং আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রকে স্বতন্ত্র করে দেখছিলুম। এ রকম না করলে তাদের সুস্পষ্ট চিত্র আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হতে পারে না। কিন্তু প্রত্যেকটিকে যখন সুস্পষ্টভাবে জানা সারা হয়ে যায় তখন একটা মস্ত ভুল সংশোধনের সময় আসে। তখন পুনর্বার এই দুটিকে একের মধ্যে যদি না দেখি তাহলে বিপদ ঘটে।

এই প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক যেখানে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করেছে সেখান থেকে আমাদের লক্ষ্য যেন একান্ত স্খলিত না হয়। যেখানে সত্যের মধ্যে উভয়ের আত্মীয়তা আছে সেখানে মিথ্যার দ্বারা আত্মবিচ্ছেদ না ঘটাই। কেবলমাত্র ভাষা, কেবল তর্ক, কেবল মোহের দ্বারা প্রাচীর গেঁথে তুলে সেইটাকেই সত্য পদার্থ বলে যেন ভুল না করি।

পূর্ব এবং পশ্চিম দিক যেমন একটি অখণ্ড গোলকের মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে—প্রাকৃতিক এবং আধ্যাত্মিক তেমনি একটি অখণ্ডতার দ্বারা বিধৃত। এর মধ্যে একটিকে পরিহার করতে গেলেই আমরা সমগ্রতার কাছে অপরাধী হব—এবং সে অপরাধের দণ্ড অবশ্যম্ভাবী।

ভারতবর্ষ যে পরিমাণে আধ্যাত্মিকতার দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক দিয়ে প্রকৃতির দিকে ওজন হারিয়েছে, সেই পরিমাণে তাকে আজ পর্যন্ত জরিমানার টাকা গুনে দিয়ে আসতে

হচ্ছে। এমন কি, তার যথাসর্বস্ব বিকিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। ভারতবর্ষ যে আজ শ্রীভ্রষ্ট হয়েছে তার কারণ এই যে সে একচক্ষু হরিণের মতো জানত না যে, যেদিকে তার দৃষ্টি থাকবে না সেই দিক থেকেই ব্যাধের মৃত্যুবাণ এসে তাকে আঘাত করবে। প্রাকৃতিক দিকে সে নিশ্চিন্তভাবে কানা ছিল—প্রকৃতি তাকে মৃত্যুবাণ মেরেছে।

এ-কথা যদি সত্য হয় যে পাশ্চাত্য জাতি প্রাকৃতিক ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ জয়লাভ করবার স্বপ্নে একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে তাহলে একথা নিশ্চয় জানতে হবে একদিন তার পরাজয়ের ব্রহ্মাস্ত্র অন্যদিক থেকে এসে তার মর্মস্থানে বাজবে।

মূলে যাদের ঐক্য আছে, সেই ঐক্য মূল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলে তারা যে কেবল পৃথক হয়, তা নয়, তারা পরস্পরের বিরোধী হয়। ঐক্যের সহজ টানে যারা আত্মীয়রূপে থাকে, বিচ্ছিন্নতার ভিতর দিয়ে তারা প্রলয়সংঘাতে আকৃষ্ট হয়।

অর্জুন এবং কর্ণ সহোদর ভাই। মাঝখানে কুন্তীর বন্ধন তারা যদি না হারিয়ে ফেলত তাহলে পরস্পরের যোগে তারা প্রবল বলী হত;—সেই মূল বন্ধনটি বিস্মৃত হওয়াতেই তারা কেবলই বলেছে, হয় আমি মরব, নয় তুমি মরবে।

তেমনি আমাদের সাধনাকে যদি অত্যন্ত ভাবে প্রকৃতি অথবা আত্মার দিকে স্থাপন করি তাহলে আমাদের ভিতরকার প্রকৃতি এবং আত্মার মধ্যে লড়াই বেধে যায়। তখন প্রকৃতি বলে, আত্মা মরুক আমি থাকি, আত্মা বলে প্রকৃতিটা নিঃশেষে মরুক আমি একাধিপত্য করি। তখন প্রকৃতির দলের লোকেরা কর্মকেই প্রচণ্ড এবং উপকরণকেই প্রকাণ্ড করে তুলতে চেষ্টা করে; এর মধ্যে আর দয়ামায়া নেই, বিরাম বিশ্রাম নেই। ওদিকে আত্মার দলের লোকেরা প্রকৃতির রসদ একেবারে বন্ধ করে বসে, কর্মের পাট একেবারে তুলে দেয়, নানাপ্রকার উৎকট কৌশলের দ্বারা প্রকৃতিকে একেবারে নির্মূল করতে চেষ্টা করে—জানে না সেই একই মূলের উপরে তার আত্মার কল্যাণও অবস্থিত।

এইরূপে যে দুইটি পরস্পরের পরমাত্মীয় পরম সহায়, মানুষ তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ স্থাপন করে তাদের পরম শত্রু করে তোলে। এমন নিদারুণ শত্রুতা আর নেই—কারণ, এই দুই পক্ষই পরম ক্ষমতাশালী।

অতএব, প্রকৃতি এবং আত্মা, মানুষের এই দুই দিককে আমরা যখন স্বতন্ত্র করে দেখেছি তখন যত শীঘ্র সম্ভব এদের দুটিকে পরিপূর্ণ অখণ্ডতার মধ্যে সম্মিলিতরূপে দেখা আবশ্যক। আমরা যেন এই দুটি অনন্তবন্ধুর বন্ধুত্বসূত্রে অন্যায় টান দিতে গিয়ে উভয়কে কুপিত করে না তুলি।

২৬ পৌষ

কর্ম

আমাদের দেশের জ্ঞানী সম্প্রদায় কর্মকে বন্ধন বলে থাকেন। এই বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে নিষ্ক্রিয় হওয়াকেই তাঁরা মুক্তি বলেন। এইজন্য কর্মক্ষেত্র প্রকৃতিকে তাঁরা ধ্বংস করে নিশ্চিন্ত হতে চান।

এইজন্য ব্রহ্মকেও তাঁরা নিষ্ক্রিয় বলেন এবং যা কিছু জাগতিক ক্রিয়া, একে মায়া বলে একেবারে অস্বীকার করেন।

কিন্তু উপনিষৎ বলেন—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ব্রহ্ম।

যাঁর থেকে সমস্তই জন্মাচ্ছে, যাঁর দ্বারা জীবন ধারণ করছে, যাঁতে প্রয়াণ ও প্রবেশ করছে তাঁকে জানতে ইচ্ছা করো, তিনিই ব্রহ্ম।

অতএব উপনিষদের ব্রহ্মবাদী বলেন, ব্রহ্মই সমস্ত ক্রিয়ার আধার।

তা যদি হয় তবে কি তিনি এই সকল কর্মের দ্বারা বদ্ধ?

একদিকে কর্ম আপনিই হচ্ছে, আর একদিকে ব্রহ্ম স্বতন্ত্র হয়ে রয়েছেন, পরস্পরে কোনো যোগ নেই, এ কথাও যেমন আমরা বলতে পারি নে, তেমনি তাঁর কর্ম মাকড়সার জালের মতো শামুকের খোলার মতো তাঁর নিজেকে বদ্ধ করছে একথাও বলা চলে না।

এই জন্যই পরক্ষণে ব্রহ্মবাদী বলছেন—

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। সেই আনন্দ হতেই সমস্ত উৎপন্ন, জীবিত, সচেষ্ট এবং রূপান্তরিত হচ্ছে।

কর্ম দুই রকমে হয়—এক অভাবের থেকে হয়, আর প্রাচুর্য থেকে হয়। অর্থাৎ প্রয়োজন থেকে হয় বা আনন্দ থেকে হয়।

প্রয়োজন থেকে অভাব থেকে আমরা যে কর্ম করি সেই কর্মই আমাদের বন্ধন, আনন্দ থেকে যা করি সে তো বন্ধন নয়—বস্তুত সেই কর্মই মুক্তি।

এই জন্য আনন্দের স্বভাবই হচ্ছে ক্রিয়া—আনন্দ স্বতই নিজেকে বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে মুক্তিদান করতে থাকে। সেই জন্যই অনন্ত আনন্দের অনন্ত প্রকাশ। ব্রহ্ম যে আনন্দ সে এই অনিঃশেষ প্রকাশধর্মের দ্বারাই অহরহ প্রমাণ হচ্ছে। তাঁর ক্রিয়ার মধ্যে তিনি আনন্দ এইজন্য তাঁর কর্মের মধ্যেই তিনি মুক্তস্বরূপ।

আমরাও দেখেছি আমাদের আনন্দের কর্মের মধ্যেই আমরা মুক্ত। আমরা প্রিয়-বন্ধুর যে কাজ করি সে কাজ আমাদের দাসত্বে বদ্ধ করে না। শুধু বদ্ধ করে না তা নয় সেই কর্মই আমাদের মুক্ত করে। কারণ, আনন্দের নিষ্ক্রিয়তাই তার বন্ধন, কর্মই তার মুক্তি।

তবে কর্ম কখন বন্ধন? যখন তার মূল আনন্দ থেকে সে বিচ্যুত হয়। বন্ধুর বন্ধুত্বটুকু যদি আমাদের অগোচর থাকে যদি কেবল তার কাজমাত্রই আমাদের চোখে পড়ে তবে সেই বিনাবেতনের প্রাণপণ কাজকে তার প্রতি একটা ভয়ংকর অত্যাচার বলে আমাদের কাছে প্রতিভাত হবে।

কিন্তু বস্তুত তার প্রতি অত্যাচার কোন্‌টা হবে? যদি তার কাজ বন্ধ করে দিই। কারণ কর্মের মুক্তি আনন্দের মধ্যে এবং আনন্দের মুক্তি কর্মে। সমস্ত কর্মের লক্ষ্য আনন্দের দিকে এবং আনন্দের লক্ষ্য কর্মের দিকে।

এইজন্য উপনিষৎ আমাদের কর্ম নিষেধ করেন নি। ঈশোপনিষৎ বলেছেন, মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হবে না এ কোনোমতে হতেই পারে না।

এইজন্য তিনি পুনশ্চ বলেছেন যারা কেবল অবিদ্যায় অর্থাৎ সংসারের কর্মে রত তারা অন্ধকারে পড়ে, আর যারা বিদ্যায় অর্থাৎ কেবল ব্রহ্মজ্ঞানে রত তারা ততোধিক অন্ধকারে পড়ে।

এই সমস্যার মীমাংসাস্বরূপ বলেছেন কর্ম এবং ব্রহ্মজ্ঞান উভয়েরই প্রয়োজন আছে।

অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।

কর্মের দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হয়ে বিদ্যাদ্বারা জীব অমৃত লাভ করে।

ব্রহ্মহীন কর্ম অন্ধকার এবং কর্মহীন ব্রহ্ম ততোধিক শূন্যতা। কারণ, তাকে নাস্তিকতা বললেও হয়। যে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম হতে সমস্ত কিছুই হচ্ছে সেই ব্রহ্মকে এই সমস্ত-কিছু-বিবর্জিত করে দেখলে সমস্তকে ত্যাগ করা হয়, সেই সঙ্গে তাঁকেও ত্যাগ করা হয়।

যাই হ'ক আনন্দের ধর্ম যদি কর্ম হয় তবে কর্মের দ্বারাই সেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সঙ্গে আমাদের যোগ হতে পারে। গীতায় একেই বলে কর্মযোগ।

কর্মযোগের একটি লৌকিকরূপ পৃথিবীতে আমরা দেখেছি। সে হচ্ছে পতিব্রতা স্ত্রীর সংসারযাত্রা। সতী স্ত্রীর সমস্ত সংসার-কর্মের মূলে আছে স্বামীর প্রতি প্রেম; স্বামীর প্রতি আনন্দ। এইজন্য, সংসারকর্মকে তিনি স্বামীর কর্ম জেনেই আনন্দ বোধ করেন—কোনো ক্রীতদাসীও তাঁর মতো এমন করে কাজ করতে পারে না। এই কাজ যদি একান্ত তাঁর নিজের প্রয়োজনের কাজ হত তাহলে এর ভার বহন করা তাঁর পক্ষে

দুঃসাধ্য হত। কিন্তু এই সংসারকর্ম তাঁর পক্ষে কর্মযোগ। এই কর্মের দ্বারাই তিনি স্বামীর সঙ্গে বিচিত্রভাবে মিলিত হচ্ছেন।

আমাদের কর্মক্ষেত্র এই কর্মযোগের যদি তপোবন হয় তবে কর্ম আমাদের পক্ষে বন্ধন হয় না। তাহলে, সতী স্ত্রী যেমন কর্মের দ্বারাই কর্মকে উত্তীর্ণ হয়ে প্রেমকে লাভ করেন আমরাও তেমনি কর্মের দ্বারাই কর্মের সংসারকে উত্তীর্ণ হয়ে—মৃত্যুং তীর্ত্বা—অমৃতকে লাভ করি।

এইজন্যই গৃহস্থের প্রতি উপদেশ আছে তিনি যে যে কাজ করবেন তা নিজেকে যেন নিবেদন না করেন—তা করলেই কর্ম তাঁকে নাগপাশে বাঁধবে এবং ঈর্ষাদ্বেষ লোভক্ষোভের বিষনিঃশ্বাসে তিনি জর্জরিত হতে থাকবেন, তিনি—যদ্‌যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ—যে যে কর্ম করবেন সমস্ত ব্রহ্মকে সমর্পণ করবেন। তাহলে, সতী গৃহিণী যেমন সংসারের সমস্ত ভোগের অংশ পরিত্যাগ করেন অথচ সংসারের সমস্ত ভার অশ্রান্ত যত্নে বহন করেন—কারণ কর্মকে তিনি স্বার্থসাধনরূপে জানেন না আনন্দ-সাধনরূপেই জানেন—আমরাও তেমনি কর্মের আসক্তি দূর করে কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষা বিসর্জন করে, কর্মকে বিশুদ্ধ আনন্দময় করে তুলতে পারব—এবং যে আনন্দ আকাশে না থাকলে—কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ—কেই বা কিছুমাত্র চেষ্টা করত, কেই বা প্রাণ ধারণ করত। জগতের সেই সকল চেষ্টার আকর পরমানন্দের সঙ্গে আমাদের সকল চেষ্টাকে যুক্ত করে জেনে আমরা কোনোকালেও এবং কাহা হতেও ভয়প্রাপ্ত হব না।

২৭ পৌষ

শক্তি

জ্ঞান, প্রেম ও শক্তি এই তিন ধারা যেখানে একত্র সংগত সেইখানেই আনন্দতীর্থ। আমাদের মধ্যে জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের যে পরিমাণে পূর্ণ মিলন সেই পরিমাণেই আমাদের পূর্ণ আনন্দ। বিচ্ছেদ ঘটলেই পীড়া উৎপন্ন হয়।

এইজন্যে কোনো একটা সংক্ষেপ উপায়ের প্রলোভনে যেখানে আমরা ফাঁকি দেব সেখানে আমরা নিজেকেই ফাঁকি দেব। যদি মনে করি দ্বারীকে ডিঙিয়ে রাজার সঙ্গে দেখা করব তাহলে দেউড়িতে এমনি আমাদের লাঞ্ছনা হবে যে, রাজদর্শনই দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে। যদি মনে করি নিয়মকে বর্জন করে নিয়মের উধ্বে উঠব তাহলে কুপিত নিয়মের হাতে আমাদের দুঃখের একশেষ হবে।

বিধানকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে তবেই বিধানের মধ্যে আমাদের কর্তৃত্ব জন্মে। গৃহের যে কর্তা হতে চায় গৃহের সমস্ত নিয়ম সংযম তাকেই সকলের চেয়ে বেশি মানতে হয়—সেই স্বীকারের দ্বারাই সেই কর্তৃত্বের অধিকার লাভ করে।

এই কারণেই বলছিলুম, সংসারের মধ্যে থেকেই আমরা সংসারের ঊর্ধ্বে উঠতে পারি—কর্মের মধ্যে থেকেই আমরা কর্মের চেয়ে বড়ো হতে পারি। পরিত্যাগ করে, পলায়ন করে কোনোমতেই তা সম্ভব হয় না।

কারণ, আমাদের যে মুক্তি, সে স্বভাবের দ্বারা হলেই সত্য হয়, অভাবের দ্বারা হলে হয় না। পূর্ণতার দ্বারা হলেই তবে সে সার্থক হয়, শূন্যতার দ্বারা সে শূন্য ফলই লাভ করে।

অতএব যিনি মুক্তস্বরূপ সেই ব্রহ্মের দিকে লক্ষ্য করো। তিনি না-রূপেই মুক্ত নন তিনি হাঁ-রূপেই মুক্ত। তিনি ওঁ; অর্থাৎ তিনি হাঁ।

এইজন্য ব্রহ্মর্ষি তাঁকে নিষ্ক্রিয় বলেন নি, অত্যন্ত স্পষ্ট করেই তাঁকে সক্রিয় বলেছেন। তাঁরা বলেছেন—

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।

শুনেছি এঁর পরমা শক্তি এবং এঁর বিবিধা শক্তি এবং এঁর জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়া স্বাভাবিকী।

ব্রহ্মের পক্ষে ক্রিয়া হচ্ছে স্বাভাবিক—অর্থাৎ তাঁর স্বভাবেই সেই ক্রিয়ার মূল, বাইরে নয়। তিনি করছেন, তাঁকে কেউ করাচ্ছে না।

এইরূপে তিনি তাঁর কর্মের মধ্যেই মুক্ত—কেননা এই কর্ম তাঁর স্বাভাবিক। আমাদের মধ্যেও কর্মের স্বাভাবিকতা আছে। আমাদের শক্তি, কর্মের মধ্যে উন্মুক্ত হতে চায়। কেবল বাইরের প্রয়োজনবশত নয়, অন্তরের স্ফূর্তিবশত।

সেই কারণে কর্মেই আমাদের স্বাভাবিক মুক্তি। কর্মেই আমরা বাহির হই প্রকাশ পাই। কিন্তু যাতেই মুক্তি তাতেই বন্ধন ঘটতে পারে। নৌকোর যে গুণ দিয়ে তাকে টেনে নেওয়া যায় সেই গুণ দিয়েই তাকে বাঁধা যেতে পারে। গুণ যখন তাকে বাইরের দিকে টানে তখনই সে চলে, যখন নিজের দিকেই বেঁধে রাখে তখনই সে পড়ে থাকে।

আমাদেরও কর্ম যখন স্বার্থের সংকীর্ণতার মধ্যেই কেবল পাক দিতে থাকে তখন কর্ম ভয়ংকর বন্ধন। তখন আমাদের শক্তি সেই পরাশক্তির বিরুদ্ধে চলে, বিবিধা শক্তির বিরুদ্ধে চলে। তখন সে ভূমার দিকে চলে না, বহুর দিকে চলে না, নিজের ক্ষুদ্রতার মধ্যেই আবদ্ধ হয়। তখন এই শক্তিতে আমাদের মুক্তি দেয় না, আনন্দ দেয় না, তার বিপরীতেই আমাদের নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি কর্মহীন অলস সেই রুদ্ধ। যে ব্যক্তি ক্ষুদ্রকর্মা স্বার্থপর, জগৎসংসার তার সত্রস্র কারাবাস। সে স্বার্থের কারাগারে অহোরাত্র একটা ক্ষুদ্র পরিধির কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে ঘানি টানছে এবং এই পরিশ্রমের ফলকে সে

যে চিরদিনের মতো আয়ত্ত করে রাখবে এমন সাধ্য তার নেই ; এ তাকে পরিত্যাগ করতেই হয়, তার কেবল পরিশ্রমই সার।

অতএব কর্মকে স্বার্থের দিক থেকে পরমার্থের দিকে নিয়ে যাওয়াই মুক্তি—কর্মত্যাগ করা মুক্তি নয়। আমরা যে-কোনো কর্মই করি—তা ছোটোই হ'ক আর বড়োই হ'ক সেই পরমাত্মার স্বাভাবিকী বিশ্বক্রিয়ার সঙ্গে তাকে যোগযুক্ত করে দেখলে সেই কর্ম আমাদের আর বদ্ধ করতে পারবে না—সেই কর্ম সত্যকর্ম, মঙ্গলকর্ম এবং আনন্দের কর্ম হয়ে উঠবে।

২৮ পৌষ

প্রাণ

আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ

ব্রহ্মবিদদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ পরমাত্মায় তাঁদের ক্রীড়া, পরমাত্মায় তাঁদের আনন্দ এবং তাঁরা ক্রিয়াবান।

শুধু তাঁদের আনন্দ নয়, তাঁদের কর্মও আছে।

এই শ্লোকটির প্রথমার্ধটুকু তুললেই কথাটার অর্থ স্পষ্টতর হবে।

প্রাণোহ্যেষ যঃ সর্বভূতৈর্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।

এই যিনি প্রাণরূপে সকলের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছেন—এঁকে যিনি জানেন তিনি এঁকে অতিক্রম করে কোনো কথা বলেন না।

প্রাণের মধ্যে আনন্দ এবং কর্ম এই দুটো জিনিস একত্র মিলিত হয়ে রয়েছে। প্রাণের সচেষ্টতাতেই প্রাণের আনন্দ—প্রাণের আনন্দেই তার সচেষ্টতা।

অতএব, ব্রহ্মই যদি সমস্ত সৃষ্টির প্রাণস্বরূপ হন, তিনিই যদি সৃষ্টির মধ্যে গতির দ্বারা আনন্দ ও আনন্দের দ্বারা গতি সঞ্চার করছেন, তবে যিনি ব্রহ্মবাদী তিনি শুধু ব্রহ্মকে নিয়ে আনন্দ করবেন না তো, তিনি ব্রহ্মকে নিয়ে কর্মও করবেন।

তিনি যে ব্রহ্মবাদী। তিনি তো শুধু ব্রহ্মকে জানেন তা নয়, তিনি যে ব্রহ্মকে বলেন। না বললে তাঁর আনন্দ বাঁধ মানবে কেন? তিনি বিশ্বের প্রাণস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাণের মধ্যে নিয়ে "ভবতে নাতিবাদী।" অর্থাৎ ব্রহ্মকে বাদ দিয়ে কোনো কথা বলতে চান না—তিনি ব্রহ্মকেই বলতে চান।

মানুষ ব্রহ্মকে কেমন করে বলে? সেতারের তার যেমন করে গানকে বলে। সে নিজের সমস্ত গতির দ্বারা, স্পন্দনের দ্বারা, ক্রিয়ার দ্বারাই বলে—সর্বতোভাবে গানকে প্রকাশের দ্বারাই সে নিজের সার্থকতা সাধন করে।

ব্রহ্ম, নিজেকে কেমন করে বলছেন? নিজের ক্রিয়ার দ্বারা অনন্ত আকাশকে আলোকে ও আকারে পরিপূর্ণ করে স্পন্দিত করে ঝংকৃত করে তিনি বলছেন—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি—তিনি কর্মের মধ্যেই আপন আনন্দবাণী বলছেন, আপন অমৃতসংগীত বলছেন। তাঁর সেই আনন্দ এবং তাঁর কর্ম একেবারে একাকার হয়ে দ্যুলোকে ভূলোকে বিকীর্ণ হয়ে পড়েছে।

ব্রহ্মবাদীও যখন ব্রহ্মকে বলবেন তখন আর কেমন করে বলবেন? তাঁকে কর্মের দ্বারাই বলতে হবে। তাঁকে ক্রিয়াবান হতে হবে।

সে কর্ম কেমন কর্ম? না, যে কর্মদ্বারা প্রকাশ পায় তিনি "আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ" পরমাত্মায় তাঁর ক্রীড়া, পরমাত্মায় তাঁর আনন্দ। যে কর্মে প্রকাশ পায় তাঁর আনন্দ নিজের স্বার্থসাধনে নয়, নিজের গৌরব বিস্তারে নয়। তিনি যে "নাতিবাদী"—তিনি পরমাত্মাকে ছাড়া নিজের কর্মে আর কাউকেই প্রকাশ করতে চান না।

তাই সেই "ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ" তাঁর জীবনের প্রত্যেক কাজে নানা ভাষায় নানা রূপে এই সংগীত ধ্বনিত করে তুলছেন—শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্। জগৎক্রিয়ার সঙ্গে তাঁর জীবনক্রিয়া এক ছন্দে এক রাগিণীতে গান করছে।

অন্তরের মধ্যে যা আত্মক্রীড়া, যা পরমাত্মার সঙ্গে ক্রীড়া, বাহিরে সেইটিই যে জীবনের কর্ম। অন্তরের সেই আনন্দ বাহিরের সেই কর্মে উচ্ছ্বসিত হচ্ছে, বাহিরের সেই কর্ম অন্তরের সেই আনন্দে আবার ফিরে ফিরে যাচ্ছে। এমনি করে অন্তরে বাহিরে আনন্দ ও কর্মের অপূর্ব সুন্দর আবর্তন চলছে এবং সেই আবর্তনবেগে নব নব মঙ্গললোকের সৃষ্টি হচ্ছে। সেই আবর্তনবেগে জ্যোতি উদ্দীপ্ত হচ্ছে, প্রেম উৎসারিত হয়ে উঠছে।

এমনি করে, যিনি চরাচর নিখিলে প্রাণরূপে অর্থাৎ একইকালে আনন্দ ও কর্মরূপে প্রকাশমান সেই প্রাণকে ব্রহ্মবিৎ আপনার প্রাণের দ্বারাই প্রকাশ করেন।

সেইজন্যে আমার প্রার্থনা এই যে, হে প্রাণস্বরূপ, আমার সেতারের তারে যেন মরচে না পড়ে, যেন ধুলো না জমে—বিশ্বপ্রাণের স্পন্দনাভিঘাতে সে দিনরাত বাজতে থাকুক—কর্ম সংগীতে বাজতে থাকুক—তোমারই নামে বাজতে থাকুক। প্রবল আঘাতে মাঝে মাঝে যদি তার ছিঁড়ে যায় তো সেও ভালো কিন্তু শিথিল না হয়, মলিন না হয়, ব্যর্থ না হয়। ক্রমেই তার সুর প্রবল হ'ক, গভীর হ'ক, সমস্ত অস্পষ্টতা পরিহার করে সত্য হয়ে উঠুক—প্রকৃতির মধ্যে ব্যাপ্ত এবং মানবাত্মার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হ'ক—হে আবি তোমার আবির্ভাবের দ্বারা সে ধন্য হ'ক।

২৯ পৌষ

১৪।২০

জগতে মুক্তি

ভারতবর্ষে একদিন অদ্বৈতবাদ কর্মকে অজ্ঞানের, অবিদ্যার কোঠায় নির্বাসিত করে অত্যন্ত বিশুদ্ধ হতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন ব্রহ্ম যখন নিষ্ক্রিয় তখন ব্রহ্মলাভ করতে গেলে কর্মকে সমূলে ছেদন করা আবশ্যক।

সেই অদ্বৈতবাদের ধারা ক্রমে যখন দ্বৈতবাদের নানা শাখাময়ী নদীতে পরিণত হল তখন ব্রহ্ম এবং অবিদ্যাকে নিয়ে একটা দ্বিধা উৎপন্ন হল।

তখন দ্বৈতবাদী ভারত জগৎ এবং জগতের মূলে দুইটি তত্ত্ব স্বীকার করলেন। প্রকৃতি ও পুরুষ।

অর্থাৎ ব্রহ্মকে তাঁরা নিষ্ক্রিয় নির্গুণ বলে একপাশে সরিয়ে রেখে দিলেন এবং শক্তিকে জগৎক্রিয়ার মূলে যেন স্বতন্ত্র সত্তারূপে স্বীকার করলেন। এইরূপে ব্রহ্ম যে কর্ম দ্বারা বদ্ধ নন এ কথাও বললেন অথচ কর্ম যে একেবারে কিছুই নয় তাও বলা হল না। শক্তি ও শক্তির কার্য থেকে শক্তিমানকে দূরে বসিয়ে তাঁকে একটা খুব বড়ো পদ দিয়ে তাঁর সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ একেবারে পরিত্যাগ করলেন।

শুধু তাই নয়, এই ব্রহ্মই যে পরাস্ত, তিনিই যে ছোটো সে-কথাও নানা রূপকের দ্বারা প্রচার করতে লাগলেন।

এমনটি যে ঘটল তার মূলে একটি সত্য আছে।

মুক্তির মধ্যে একইকালে একটি নির্গুণ দিক এবং একটি সগুণ দিক দেখা যায়। তারা একত্র বিরাজিত। আমরা সেটা আমাদের নিজের মধ্যে থেকেই বুঝতে পারি। সেই কথাটার আলোচনা করবার চেষ্টা করা যাক।

একদিন জগতের মধ্যে একটি অখণ্ড নিয়মকে আমরা আবিষ্কার করি নি। তখন মনে হয়েছে, জগতে কোনো এক বা অনেক শক্তির কৃপা আছে কিন্তু বিধান নেই। যখন তখন যা খুশি তাই হতে পারে। অর্থাৎ যা কিছু হচ্ছে তা এমনি একতরফা হচ্ছে যে আমার দিক থেকে তার দিকে যে যাব এমন রাস্তা বন্ধ—সমস্ত রাস্তাই হচ্ছে তার দিক থেকে আমার দিকে—আমার পক্ষে কেবল ভিক্ষার রাস্তাটি খোলা।

এমন অবস্থায় মানুষকে কেবলই সকলের হাতে পায়ে ধরে বেড়াতে হয়। আগুনকে বলতে হয় তুমি দয়া করে জ্বলো, বাতাসকে বলতে হয় তুমি দয়া করে বও, সূর্যকে বলতে হয় তুমি যদি কৃপা করে না উদয় হও তবে আমার রাত্রি দূর হবে না।

ভয় কিছুতেই ঘোচে না। অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ংকরঃ—যেখানে

ব্যবস্থা দেখতে পাই নে প্রসাদেও মন নিশ্চিন্ত হয় না। কারণ, সেই প্রসাদের উপর আমার নিজের কোনো দাবি নেই, সেটা একেবারেই একতরফা জিনিস।

অথচ যার সঙ্গে এতবড়ো কারবার তার সঙ্গে মানুষ নিজের একটা যোগের পথ না খুলে যে বাঁচতে পারে না। কিন্তু তার মধ্যে যদি কোনো নিয়ম না থাকে তবে তার সঙ্গে যোগেরও তো কোনো নিয়ম থাকতে পারে না।

এমন অবস্থায় যে লোকই তাকে যে রকমই তুকতাক বলে তাই সে আঁকড়ে থাকতে চায়, সেই তুকতাক যে মিথ্যে তাও তাকে বোঝানো অসম্ভব—কারণ, বোঝাতে গেলেও নিয়মের দোহাই দিয়েই তো বোঝাতে হয়। কাজেই মানুষ মন্ত্রতন্ত্র তাগা-তাবিজ এবং অর্থহীন বিচিত্র বাহ্যপ্রক্রিয়া নিয়ে অস্থির হয়ে বেড়াতে থাকে।

জগতে এ রকম করে থাকা ঠিক পরের বাড়ি থাকা। সেও আবার এমন পর যে খামখেয়ালিতার অবতার। হয়তো পাত পেড়ে দিয়ে গেল কিন্তু অন্ন আর দিলই না, হয়তো হঠাৎ হুকুম হল আজই এখনই ঘর ছেড়ে বেরোতে হবে।

এই রকম জগতে, পরান্নভোজী পরাবসথশায়ী হয়ে মানুষ পীড়িত এবং অবমানিত হয়। সে নিজেকে বদ্ধ বলেই জানে ও দীন বলে শোক করতে থাকে।

এর থেকে মুক্তি কখন পাই? এর থেকে পালিয়ে গিয়ে নয়—কারণ, পালিয়ে যাব কোথায়? মরবার পথও যে এ আগলে বসে আছে।

জ্ঞান যখন বিশ্বজগতে অখণ্ড নিয়মকে আবিষ্কার করে—যখন দেখে কার্যকারণের কোথাও ছেদ নেই তখন সে মুক্তিলাভ করে।

কেননা, জ্ঞান তখন জ্ঞানকেই দেখে। এমন কিছুকে পায় যার সঙ্গে তার যোগ আছে, যা তার আপনারই। তার নিজের যে আলোক সর্বত্রই সেই আলোক। এমন কি, সর্বত্রই সেই আলোক অখণ্ডরূপে না থাকলে সে নিজেই বা কোথায় থাকত।

এতদিনে জ্ঞান মুক্তি পেলে। সে আর তো বাধা পেল না। সে বলল, আঃ বাঁচা গেল, এ যে আমাদেরই বাড়ি—এ যে আমার পিতৃভবন। আর তো আমাকে সংকুচিত হয়ে অপমানিত হয়ে থাকতে হবে না। এতদিন স্বপ্ন দেখছিলুম যেন কোন্ পাগলাগারদে আছি—আজ স্বপ্ন ভেঙেই দেখি—শিয়রের কাছে পিতা বসে আছেন, সমস্তই আমার আপনার।

এই তো হল জ্ঞানের মুক্তি। বাইরের কিছু থেকে নয়—নিজেরই কল্পনা থেকে।

কিন্তু এই মুক্তির মধ্যেই জ্ঞান চুপচাপ বসে থাকে না। তার মন্ত্রতন্ত্র তাগা-তাবিজের শিকল ছিন্ন ভিন্ন করে এই মুক্তির ক্ষেত্রে তার শক্তিকে প্রয়োগ করে।

যখন আমরা আত্মীয়ের পরিচয় পাই তখন সেই পরিচয়ের উপরেই তো চুপচাপ করে বসে থাকতে পারি নে, তখন আত্মীয়ের সঙ্গে আত্মীয়তার আদান প্রদান করবার জন্ত উদ্যত হয়ে উঠি।

জ্ঞান যখন জগতে জ্ঞানের পরিচয় পায় তখন তার সঙ্গে কাজে যোগ দিতে প্রবৃত্ত হয়। তখন পূর্বের চেয়ে তার কাজ ঢের বেড়ে যায়—কারণ, মুক্তির ক্ষেত্রে শক্তির অধিকার বহুবিস্তৃত হয়ে পড়ে। তখন জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের যোগে জাগ্রত শক্তি বহুধা হয়ে প্রসারিত হতে থাকে।

তবেই দেখা যাচ্ছে জ্ঞান বিশ্বজ্ঞানের মধ্যে আপনাকে উপলব্ধি ক'রে আর চুপ ক'রে থাকতে পারে না। তখন শক্তিযোগে কর্মদ্বারা নিজেকে সার্থক করতে থাকে।

প্রথমে অজ্ঞান থেকে মুক্তির মধ্যে জ্ঞান নিজেকে লাভ করে—তার পরে নিজেকে দান করা তার কাজ। কর্মের দ্বারা সে নিজেকে দান করে, সৃষ্টি করে, অর্থাৎ সর্জন করে, অর্থাৎ যে শক্তিকে পরের ঘরে বন্দীর মতো থেকে কেবলই বদ্ধ করে রেখেছিল সেই শক্তিকেই আত্মীয় ঘরে নিয়তই ত্যাগ করে সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

অতএব দেখা যাচ্ছে মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই কর্মের বৃদ্ধি বই হ্রাস নয়।

কিন্তু কর্ম যে অধীনতা। সে কথা স্বীকার করতেই হবে। কর্মকে সত্যের অনুগত হতেই হবে, নিয়মের অনুগত হতেই হবে, নইলে সে কর্মই হতে পারবে না।

তা কী করা যাবে? নিন্দাই কর আর যাই কর, আমাদের ভিতরকার শক্তি সত্যের অধীন হতেই চাচ্ছেন। সেই তাঁর প্রার্থনা। সেইজন্তেই মহাদেবের প্রসাদপ্রার্থী পার্বতীর মতো তিনি তপস্যা করছেন।

জ্ঞান যে দিন পুরোহিত হয়ে সত্যের সঙ্গে আমাদের শক্তির পরিণয় সাধন করিয়ে দেন তখনই আমাদের শক্তি সতী হন—তখন তাঁর বন্ধ্যাদশা আর থাকে না। তিনি সত্যের অধীন হওয়াতেই সত্যের ঘরে কর্তৃত্বলাভ করতে পারেন।

অতএব, কেবল মুক্তির দ্বারা সাফল্য নয়—তারও পরের কথা হচ্ছে অধীনতা। দানের দ্বারা অর্জন যেমন তেমনি এই অধীনতার দ্বারাই মুক্তি সম্পূর্ণ সার্থক হয়। এইজন্যই দ্বৈতশাস্ত্রে নির্গুণ ব্রহ্মের উপরে সগুণ ভগবানকে ঘোষণা করেন। আমাদের প্রেম, জ্ঞান ও শক্তি এই তিনকেই পূর্ণভাবে ছাড়া দিতে পারলেই তবেই তো তাকে মুক্তি বলব—নির্গুণ ব্রহ্মে তার যে কোনো স্থান নেই।

১ মাঘ

সমাজে মুক্তি

মানুষের কাছে কেবল জগৎপ্রকৃতি নয় সমাজপ্রকৃতি বলে আর একটি আশ্রয় আছে। এই সমাজের সঙ্গে মানুষের কোন্ সম্বন্ধটা সত্য সে কথা ভাবতে হয়। কারণ সেই সত্য সম্বন্ধেই মানুষ সমাজে মুক্তিলাভ করে—মিথ্যাকে সে যতখানি আসন দেয় ততখানিই বদ্ধ হয়ে থাকে।

আমরা অনেক সময় বলেছি ও মনে করেছি প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ সমাজে বদ্ধ হয়েছে। আমরা একত্রে দল বাঁধলে বিস্তর সুবিধা আছে। রাজা আমার বিচার করে, পুলিস আমার পাহারা দেয়, পৌরপরিষৎ আমার রাস্তা ঝাঁট দিয়ে যায়, ম্যাঞ্চেস্টার আমার কাপড় জোগায় এবং জ্ঞানলাভ প্রভৃতি আরও বড়ো বড়ো উদ্দেশ্যও এই উপায়ে সহজ হয়ে আসে। অতএব মানুষের সমাজ সমাজস্থ প্রত্যেকের স্বার্থ সাধনের প্রকৃষ্ট উপায়।

এই প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ সমাজে আবদ্ধ হয়েছে এই কথাকেই অন্তরের সঙ্গে যদি সত্য বলে জানি তাহলে সমাজকে মানবহৃদয়ের কারাগার বলতে হয়—সমাজকে একটা প্রকাণ্ড এঞ্জিনওআলা কারখানা বলে মানতে হয়—ক্ষুধানলদীপ্ত প্রয়োজনই সেই কলের কয়লা জোগাচ্ছে।

যে হতভাগ্য এই রকম অত্যন্ত প্রয়োজনওআলা হয়ে সংসারের খাটুনি খেটে মরে সে তো কৃপাপাত্র সন্দেহ নেই।

সংসারের এই বন্দিশাল-মূর্তি দেখেই তো সন্ন্যাসী বিদ্রোহ করে ওঠে—সে বলে প্রয়োজনের তাড়ায় আমি সমাজের হরিণবাড়িতে পাথর ভেঙে মরব? কোনোমতেই না। জানি আমি প্রয়োজনের অনেক বড়ো। ম্যাঞ্চেস্টার আমার কাপড় জোগাবে? দরকার কী। আমি কাপড় ফেলে দিয়ে বনে চলে যাব। বাণিজ্যের জাহাজ দেশ-বিদেশ থেকে আমার খাদ্য এনে দেবে? দরকার নেই—আমি বনে গিয়ে ফল মূল খেয়ে থাকব!

কিন্তু বনে গেলেও যখন প্রয়োজন আমার পিছনে পিছনে নানা আকারে তাড়া করে তখন এতবড়ো স্পর্ধা আমাদের মুখে সম্পূর্ণ শোভা পায় না।

তবে সংসারের মধ্যে আমাদের মুক্তি কোন্‌খানে? প্রেমে। যখনই জানব প্রয়োজনই মানবসমাজের মূলগত নয়—প্রেমই এর নিগূঢ় এবং চরম আশ্রয়—তখনই এক মুহূর্তে আমরা বন্ধনমুক্ত হয়ে যাব। তখনই বলে উঠব—প্রেম! আঃ

বাঁচা গেল। তবে আর কথা নেই। কেননা, প্রেম যে আমারই জিনিস। এ তো আমাকে বাহির থেকে তাড়া লাগিয়ে বাধ্য করে না। প্রেমই যদি মানব-সমাজের তত্ত্ব হয় তবে সে তো আমারই তত্ত্ব। অতএব প্রেমের দ্বারা মুহূর্তেই আমি প্রয়োজনের সংসার থেকে মুক্ত আনন্দের সংসারে উত্তীর্ণ হলুম।—যেন পলকে স্বপ্ন ভেঙে গেল।

এই তো গেল মুক্তি। তার পরে; তার পরে অধীনতা। প্রেম মুক্তি পাবামাত্রই সেই মুক্তিক্ষেত্রে আপনার শক্তিকে চরিতার্থ করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন তার কাজ পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি বেড়ে ওঠে। তখন সে পৃথিবীর দীন দরিদ্রেরও দাস, তখন সে মূঢ় অধমেরও সেবক। এই হচ্ছে মুক্তির পরিণাম।

যে মুক্ত তার তো ওজর নেই। সে তো বলতে পারবে না, আমার আপিস আছে, আমার মনিব আছে, বাইরে থেকে তাড়া আছে। কাজেই যেখান থেকে ডাক পড়ে তার আর না বলবার জো নেই। মুক্তির এত বড়ো দায়। আনন্দের দায়ের মতো দায় আর কোথায় আছে।

যদি বলি মানুষ মুক্তি চায় তবে মিথ্যা কথা বলা হয়। মানুষ মুক্তির চেয়ে ঢের বেশি চায় মানুষ অধীন হতেই চায়। যার অধীন হলে অধীনতার অন্ত থাকে না তারই অধীন হবার জন্যে সে কাঁদছে। সে বলছে হে পরম প্রেম, তুমি যে আমার অধীন, আমি কবে তোমার অধীন হব! অধীনতার সঙ্গে অধীনতার পূর্ণ মিলন হবে কবে। যেখানে আমি উদ্ধত, গর্বিত, স্বতন্ত্র সেইখানেই আমি পীড়িত, আমি ব্যর্থ। হে নাথ আমাকে অধীন করে নত করে বাঁচাও। যতদিন আমি এই মিথ্যেটাকে অত্যন্ত করে জেনেছিলুম যে আমিই হচ্ছে আমি, তার অধিক আমি আর নেই ততদিন আমি কী ঘোরাই ঘুরেছি। আমার ধন আমার মনের বোঝা নিয়ে মরেছি। যখনই স্বপ্ন ভেঙে যায় বুঝতে পারি তুমি পরম আমি আছ—আমার আমি তারই জোরে আমি—তখনই এক মুহূর্তে মুক্তিলাভ করি। কিন্তু শুধু তো মুক্তিলাভ নয়। তার পরে পরম অধীনতা। পরম আমির কাছে সমস্ত আমিত্বর অভিমান জলাঞ্জলি দিয়ে একেবারে অনন্ত পরিপূর্ণ অধীনতার পরমানন্দ।

১ মাঘ

মত

আত্মা যে শরীরকে আশ্রয় করে সেই শরীর তাকে ত্যাগ করতে হয়। কারণ, আত্মা শরীরের চেয়ে বড়ো। কোনো বিশেষ এক শরীর যদি আত্মাকে বরাবর ধারণ করে থাকতে পারত তাহলে আত্মা যে শরীরের মধ্যে থেকেও শরীরকে অতিক্রম করে তা আমরা জানতেই পারতুম না। এই কারণেই আমরা মৃত্যুর দ্বারা আত্মার মহত্ত্ব অবগত হই।

আত্মা এই হ্রাসবৃদ্ধিমরণশীল শরীরের মধ্যে নিজেকে ব্যক্ত করে। তার এই প্রকাশ বাধাপ্রাপ্ত প্রকাশ, সম্পূর্ণ প্রকাশ নয়; এই জন্যে শরীরকেই আত্মা বলে যে জানে সে সম্পূর্ণ সত্য জানে না।

মানুষের সত্যজ্ঞান এক-একটি মতবাদকে আশ্রয় করে নিজেকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু সেই মতবাদটি সত্যের শরীর, সুতরাং এক হিসাবে সত্যের চেয়ে অনেক ছোটো এবং অসম্পূর্ণ।

এই জন্যে সত্যকে বারংবার মতদেহ পরিবর্তন করতে হয়। বৃহৎ সত্য তার অসম্পূর্ণ মতদেহের সমস্ত শক্তিকে শেষ করে ফেলে, তাকে জীর্ণ করে, বৃদ্ধ করে, অবশেষে যখন কোনো দিকেই আর কুলোয় না, নানা প্রকারেই সে অপ্রয়োজনীয় বাধাস্বরূপ হয়ে আসে তখন তার মৃত্যুর সময় আসে; তখন তার নানাপ্রকার বিকার ও ব্যাধি ঘটতে থাকে ও শেষে মৃত্যু হয়।

আত্মা যে কোনো একটা বিশেষ শরীর নয় এবং সমস্ত বিশেষ শরীরকেই সে অতিক্রম করে এই কথাটা যেমন উপলব্ধি করা আমাদের দরকার এবং এই উপলব্ধি জন্মালে যেমন আত্মার বিকার ও মৃত্যুর কল্পনায় আমরা ভীত ও পীড়িত হই নে—সেই রকম, মানুষ যে সকল মহৎ সত্যকে নানা দেশে নানা কালে নানা রূপে প্রকাশ করতে চেষ্টা করছে এক-একবার তাকে তার মতদেহ থেকে স্বতন্ত্র করে সত্য আত্মাকে স্বীকার করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক। তাহলেই সত্যের অমৃতস্বরূপ জানতে পেরে আমরা আনন্দিত হই।

নইলে কেবলই মত এবং বাক্য নিয়ে বিবাদ করে আমরা অধীর হতে থাকি, এবং আমার মত স্থাপন করব ও অন্যের মত খণ্ডন করব এই অহংকার সুতীব্র হয়ে উঠে জগতে পীড়ার সৃষ্টি করে। এইরূপ বিবাদের সময় মতই প্রবল হয়ে উঠে সত্যকে যতই দূরে ফেলতে থাকে বিরোধের বিষও ততই তীব্রতর হয়ে ওঠে। এই

কারণে, মতের অত্যাচার যেমন নিষ্ঠুর ও মতের উন্মত্ততা যেমন উদ্দাম এমন আর কিছুই না। এই কারণেই সত্য আমাদের ধৈর্যদান করে কিন্তু মত আমাদের ধৈর্যহরণ করে।

দৃষ্টান্তস্বরূপে বলতে পারি অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ নিয়ে যখন আমরা বিবাদ করি তখন আমরা মত নিয়েই বিবাদ করি, সত্য নিয়ে নয়—সুতরাং সত্যকে আচ্ছন্ন করে বিস্মৃত হয়ে আমরা একদিকে ক্ষতিগ্রস্ত হই, আর একদিকে বিরোধ করে আমাদের দুঃখ ঘটে।

আমাদের মধ্যে যাঁরা নিজেকে দ্বৈতবাদী বলে ঘোষণা করেন তাঁরা অদ্বৈতবাদকে বিভীষিকা বলে কল্পনা করেন। সেখানে তাঁরা মতের সঙ্গে রাগারাগি করে সত্যকে পর্যন্ত এক-ঘরে করতে চান।

যাঁরা "অদ্বৈতম্‌" এই সত্যটিকে লাভ করেছেন তাঁদের সেই লাভটির মধ্যে প্রবেশ করো। তাঁদের কথায় যদি এমন কিছু থাকে যা তোমাকে আঘাত করে সেদিকে মন দেবার দরকার নেই।

মায়াবাদ! শুনলেই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠ কেন? মিথ্যা কি নেই? নিজের মধ্যে তার কি কোনো পরিচয় পাওয়া যায় নি? সত্য কি আমাদের কাছে একেবারেই উন্মুক্ত? আমরা কি এককে আর বলে জানি নে? কাঠকে দগ্ধ করে যেমন আগুন জ্বলে আমাদের অজ্ঞানকে, অবিদ্যাকে, মায়াকে দগ্ধ করেই কি আমাদের সত্যের জ্ঞান জ্বলছে না? আমাদের পক্ষে সেই মায়ার ইন্ধন জ্ঞানের জ্যোতি লাভের জন্য প্রয়োজনীয় হতে পারে কিন্তু এই মিথ্যা কি ব্রহ্মে আছে?

অনন্তের মধ্যে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান যে একেবারে পর্যবসিত হয়ে আছে, অথচ আমার কাছে খণ্ডভাবে তা পরিবর্তনপরম্পরারূপে চলেছে, কোথাও তার পর্যাপ্তি নেই। এক জায়গায় ব্রহ্মের মধ্যে যদি কোনো পরিসমাপ্তি না থাকে তবে আমরা এই যে খণ্ড কালের ক্রিয়াকে অসমাপ্ত বলছি একে অসমাপ্ত আখ্যা দেবারও কোনো তাৎপর্য থাকত না।

এই খণ্ডকালের অসমাপ্তি একদিকে অনন্তকে প্রকাশও করছে একদিকে আচ্ছন্নও করছে। যেদিকে আচ্ছন্ন করছে সেদিকে তাকে কী বলব? তাকে মায়া বলব না কি, মিথ্যা বলব না কি? তবে "মিথ্যা" শব্দটার স্থান কোথায়?

যিনি খণ্ড কালের সমস্ত খণ্ডতা সমস্ত ক্রমিকতার আক্রমণ থেকে ক্ষণকালের জন্যও বিমুক্ত হয়ে অনন্ত পরিসমাপ্তির নির্বিকার নিরঞ্জন অতলস্পর্শ মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে নিমজ্জিত করে দিয়ে সেই স্তব্ধ শান্ত গভীর অদ্বৈতরসসমুদ্রে নিবিড়ানন্দের নিশ্চল

স্থিতিলাভ করেছেন তাঁকে আমি ভক্তির সঙ্গে নমস্কার করি। আমি তাঁর সঙ্গে কোনো কথা নিয়ে বাদপ্রতিবাদ করতে চাই নে।

কেননা, আমি যে অনুভব করছি, মিথ্যার বোঝায় আমার জীবন ক্লান্ত। আমি যে দেখতে পাচ্ছি, যে পদার্থটাকে "আমি" বলে ঠিক করে বসে আছি, তারই থালা ঘটি বাটি তারই স্থাবর অস্থাবরের বোঝাকে সত্য পদার্থ বলে ভ্রম করে সমস্ত জীবন টেনে বেড়াচ্ছি—যতই দুঃখ পাই কোনোমতেই তাকেই ফেলতে পারি নে। অথচ অন্তরাত্মার ভিতরে একটা বাণী আছে, ও সমস্ত মিথ্যা, ও সমস্ত তোমাকে ত্যাগ করতেই হবে। মিথ্যার বস্তাকে সত্য বলে বহন করতে গেলে তুমি বাঁচবে না—তাহলে তোমার "মহতী বিনষ্টিঃ"।

নিজের অহংকারকে, নিজের দেহকে, টাকাকড়িকে, খ্যাতি-প্রতিপত্তিকে একান্ত সত্য বলে জেনে অস্থির হয়ে বেড়াচ্ছি এই যদি হয় তবে এই মিথ্যার সীমা কোথায় টানব? বুদ্ধির মূলে যে ভ্রম থাকাতে আমি নিজেকে ভুল জানছি, সেই ভ্রমই কি সমস্ত জগৎ-সম্বন্ধেও আমাদের ভোলাচ্ছে না? সেই ভ্রমই কি আমার জগতের কেন্দ্রস্থলে আমার "আমি"টিকে স্থাপন করে মরীচিকা রচনা করছে না? তাই, ইচ্ছা কি করে না, এই মাকড়সার জাল একেবারে ছিন্ন ভিন্ন পরিষ্কার করে দিয়ে সেই পরমাত্মার, সেই পরম-আমির, সেই একটিমাত্র আমির মাঝখানে অহংকারের সমস্ত আবরণ-বিবর্জিত হয়ে অবগাহন করি—ভারমুক্ত হয়ে, বাসনামুক্ত হয়ে, মলিনতামুক্ত হয়ে একেবারে সুবৃহৎ পরিত্রাণ লাভ করি।

এই ইচ্ছা যে অন্তরে আছে, এই বৈরাগ্য যে সমস্ত উপকরণের ধাঁধার মাঝখানে পথভ্রষ্ট বালকের মতো থেকে থেকে কেঁদে উঠছে। তবে আমি মায়াবাদকে গাল দেব কোন্ মুখে। আমার মনের মধ্যে যে এক শ্মশানবাসী বসে আছে, সে যে আর কিছুই জানে না, সে যে কেবল জানে—একমেবাদ্বিতীয়ম্।

২ মাঘ

নির্বিশেষ

সংসার পদার্থটা আলো-আঁধার ভালোমন্দ জন্মমৃত্যু প্রভৃতি দ্বন্দ্বের নিকেতন এ কথা অত্যন্ত পুরাতন। এই দ্বন্দ্বের দ্বারাই সমস্ত খণ্ডিত। আকর্ষণ-শক্তি বিপ্রকর্ষণ-শক্তি, কেন্দ্রানুগ শক্তি কেন্দ্রাতিগ শক্তি কেবলই বিরুদ্ধতা দ্বারাই সৃষ্টিকে জাগ্রত করে রেখেছে।

কিন্তু এই বিরুদ্ধতাই যদি একান্ত সত্য হত তাহলে জগতের মধ্যে আমরা যুদ্ধকেই দেখতুম—শান্তিকে কোথাও কিছুমাত্র দেখতুম না।

অথচ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সমস্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধের উপরে অখণ্ড শান্তি বিরাজমান। তার কারণ এই বিরোধ সংসারেই আছে ব্রহ্মে নেই।

আমরা তর্কের জোরে সোজা লাইনকে অনন্তকাল সোজা করে টেনে নিয়ে চলতে পারি। আমরা মনে করি অন্ধকারকে সোজা করে টেনে চললে সে অনন্তকাল অন্ধকারই থাকবে—কারণ, অন্ধকারের একটা বিশিষ্টতা আছে সেই বিশিষ্টতার কুত্রাপি অবসান নেই।

তর্কে এই প্রকার সোজা লাইন থাকতে পারে কিন্তু সত্যে নেই। সত্যে গোল লাইন। অন্ধকারকে টেনে চলতে গেলে ধীরে ধীরে বেঁকে বেঁকে একজায়গায় সে আলোয় গোল হয়ে ওঠে। দুখকে সোজা লাইনে টানতে গেলে সে দুঃখে এসে বেঁকে দাঁড়ায়—ভ্রমকে ঠেলে চলতে চলতে এক জায়গায় সে সংশোধনের রেখায় আপনি এসে পড়ে।

এর একটিমাত্র কারণ অনন্তের মধ্যে বিরুদ্ধতার পক্ষপাত নেই। অখণ্ড আকাশ-গোলকের মধ্যে পূর্বদিকের পূর্বত্ব নেই—পশ্চিমের পশ্চিমত্ব নেই—পূর্ব পশ্চিমের মাঝখানে কোনো বিরোধ নেই, এমন কি, বিচ্ছেদও নেই। পূর্বপশ্চিমের বিশেষত্ব খণ্ড-আমির বিশেষত্বকে আশ্রয় করেই আছে।

এই যে জিনিসটা ব্রহ্মের স্বরূপে নেই অথচ আছে তাকে কী নাম দেওয়া যেতে পারে? বেদান্ত তাকে মায়া নাম দিয়েছেন—অর্থাৎ ব্রহ্ম যে সত্য, এ সে সত্য নয়। এ মায়া। যখনই ব্রহ্মের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে যাই তখনই একে আর দেখা যায় না। ব্রহ্মের দিক থেকে দেখতে গেলেই এ সমস্তই অখণ্ড গোলকে অনন্তভাবে পরিসমাপ্ত। আমার দিক দিয়ে দেখতে গেলেই বিরোধের মধ্যে প্রভেদের মধ্যে বহুর মধ্যে বিচিত্র বিশেষে বিভক্ত।

এইজন্য যাঁরা সেই অখণ্ড অদ্বৈতের সাধনা করেন তাঁরা ব্রহ্মকে বিশেষ হতে মুক্ত করে বিশুদ্ধভাবে জানেন। ব্রহ্মকে নির্বিশেষ জানেন। এবং এই নির্বিশেষকে উপলব্ধি করাকেই তাঁরা জ্ঞানের চরম লক্ষ্য করেন।

এই যে অদ্বৈতের বিরাট সাধনা, ছোটো বড়ো নানা মাত্রায় মানুষ এতে প্রবৃত্ত আছে। একেই মানুষ মুক্তি বলে। আপেল ফল পড়াকে মানুষ এক সময়ে একটা স্বতন্ত্র বিশেষ ঘটনা বলেই জানত। তারপরে তাকে একটা বিশ্বব্যাপী অতিবিশেষের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে জ্ঞানের বন্ধনমোচন করে দিলে। এইটি করাতেই মানুষ জ্ঞানের সার্থকতা লাভ করলে।

মানুষ অহংকারকে যখন একান্ত বিশেষ করে জানে তখন সে নিজের সেই আমিকে নিয়ে সকল দুষ্কর্মই করতে পারে। মানুষের ধর্মবোধ তাকে নিয়তই শিক্ষা দিচ্ছে তোমার আমি একান্ত নয়। তোমার আমিকে সমাজ-আমির মধ্যে মুক্তি দাও। অর্থাৎ তোমার বিশেষত্বকে অতিবিশেষের অভিমুখে নিয়ে চলো।

এই অতিবিশেষের অভিমুখে যদি বিশেষত্বকে না নিয়ে যাই তাহলে সংসার নিদারুণ বিশিষ্ট মূর্তি ধারণ করে আমাদের ঘাড়ের উপর চেপে বসে—তার সমস্ত পদার্থই একান্ত বোঝা হয়ে ওঠে। টাকা তখন অত্যন্ত একান্ত হয়ে উঠে অ-টাকাকে এমনি বিরুদ্ধ করে তোলে যে টাকার বোঝা কিছুতেই আর আমরা নামাতে পারি নে।

এই বন্ধন এই বোঝা থেকে মুক্তি দেবার জন্যে মানুষের মধ্যে বড়ো বড়ো ভাব, মঙ্গল ভাব, ধর্মভাব কত রকম করে কাজ করছে। বড়োর মধ্যে ছোটোর বিশেষত্বগুলি নিজের ঐকান্তিকতা ত্যাগ করে, এই জন্যে বড়োর মধ্যে বিশেষের দৌরাত্ম্য কম পড়াতে মানুষ বড়ো ভাবের আনন্দে ছোটোর বন্ধন, টাকার বন্ধন, খ্যাতির বন্ধন ত্যাগ করতে পারে।

তাই দেখা যাচ্ছে নির্বিশেষের অভিমুখেই মানুষের সমস্ত উচ্চ আকাঙ্ক্ষা সমস্ত উন্নতির চেষ্টা কাজ করছে।

অদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ, বৈরাগ্যবাদ মানুষের এই ভাবকে এই সত্যকে সমুজ্জ্বল করে দেখেছে। সুতরাং মানুষকে অদ্বৈতবাদ একটা বৃহৎ সম্পদ দান করেছে। তার মধ্যে নানা অব্যক্ত অর্ধব্যক্তভাবে যে-সত্য কাজ করছিল, সমস্ত আবরণ সরিয়ে দিয়ে তাঁরই সম্পূর্ণ পরিচয় দিয়েছে।

কিন্তু যেখানেই হ'ক বিশিষ্টতা বলে একটা পদার্থ এসেছে। তাকে মিথ্যাই বলি মায়াই বলি, তার মস্ত একটা জোর, সে আছে। এই জোর সে পায় কোথা থেকে?

ব্রহ্ম ছাড়া আর কোনো শক্তি (তাকে শয়তান বল বা আর কোনো নাম দাও) কি বাইরে থেকে জোর করে এই মায়াকে আরোপ করে দিয়েছে? সে তো কোনোমতে মনেও করতে পারি নে।

উপনিষদে এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে; ব্রহ্মের আনন্দ থেকেই এ সমস্ত যা কিছু হচ্ছে। এ তাঁর ইচ্ছা—তাঁর আনন্দ। বাইরের জোর নয়।

এমনি করে বিশেষের পথ পার হয়ে সেই নির্বিশেষে আনন্দের মধ্যে যেমনি পৌঁছোনো যায় অমনি লাইন ঘুরে আবার বিশেষের দিকে ফিরে আসে। কিন্তু তখন এই সমস্ত বিশেষকে আনন্দের ভিতর দিয়ে দেখতে পাই—আর সে আমাদের বদ্ধ করতে

পারে না। কর্ম তখন আনন্দের কর্ম হয়ে ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে বেঁচে যায়—সংসার তখন আনন্দময় হয়ে ওঠে। কর্মই তখন চরম হয় না, সংসারই তখন চরম হয় না, আনন্দই তখন চরম হয়।

এমনি করে মুক্তি আমাদের যোগে নিয়ে আসে, বৈরাগ্য আমাদের প্রেমে উত্তীর্ণ করে দেয়।

৩ মাঘ

দুই

স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।

উপনিষদের এই মন্ত্রটিকে আমি অনেকদিন অবজ্ঞা করে এসেছি। নানা কারণেই এই মন্ত্রটিকে খাপছাড়া এবং অদ্ভুত মনে হত।

বাল্যকাল থেকে আমরা এই মন্ত্রের অর্থ এইভাবে শুনে আসছি—

তিনি সর্বব্যাপী, নির্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ব্রণরহিত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ। তিনি সর্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা, সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বপ্রকাশ; তিনি সর্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থসকল বিধান করিতেছেন।

ঈশ্বরের নাম এবং স্বরূপের তালিকা নানা স্থানে শুনে শুনে আমাদের অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এখন এগুলি আবৃত্তি করা এত সহজ হয়ে পড়েছে যে এজন্য আর চিন্তা করতে হয় না—সুতরাং যে শোনে তারও চিন্তা উদ্রেক করে না।

বাল্যকালে উল্লিখিত মন্ত্রটিকে আমি চিন্তার দ্বারা গ্রহণ করি নি, বরঞ্চ আমার চিন্তার মধ্যে একটি বিদ্রোহ ছিল। প্রথমত এর ব্যাকরণ এবং রচনা-প্রণালীতে ভারি একটা শৈথিল্য দেখতে পেতুম। তিনি সর্বব্যাপী—এই কথাটাকে একটা ক্রিয়াপদের দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে, যথা—স পর্যগাৎ; তার পরে তাঁর অন্য সংজ্ঞাগুলি শুক্রম্ অকায়ম্ প্রভৃতি বিশেষণ-পদের দ্বারা ব্যক্ত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, শুক্রম্ অকায়ম্ এগুলি ক্লীবলিঙ্গ, তার পরেই হঠাৎ কবির্মনীষী প্রভৃতি পুংলিঙ্গ বিশেষণের প্রয়োগ হয়েছে। তৃতীয়ত ব্রহ্মের শরীর নেই এই পর্যন্তই সহ্য করা যায় কিন্তু ব্রণ নেই স্নায়ু নেই বললে এক তো বাহুল্য বলা হয় তার পরে আবার কথাটাকে অত্যন্ত নামিয়ে নিয়ে আসা হয়। এই সকল কারণে আমাদের উপাসনার এই মন্ত্রটি দীর্ঘকাল আমাকে পীড়িত করেছে।

অন্তঃকরণ যখন ভাবকে গ্রহণ করবার জন্তে প্রস্তুত থাকে না তখন শ্রদ্ধাহীন শ্রোতার কাছে কথাগুলি তার সমস্ত অর্থটা উদ্‌ঘাটিত করে দেয় না। অধ্যাত্মমন্ত্রকে যখন সাহিত্য-সমালোচকের কান দিয়ে শুনেছি তখন সাহিত্যের দিক দিয়েও তার ঠিক বিচার করতে পারি নি।

আমি সেজন্তে অনুতপ্ত নই বরঞ্চ আনন্দিত। মূল্যবান জিনিসকে তখনই লাভ করা সৌভাগ্য যখন তার মূল্য বোঝবার শক্তি কিছু পরিমাণে হয়েছে—যথার্থ অভাবের পূর্বে পেলে পাওয়ার আনন্দ ও সফলতা থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

পূর্বে আমি দেখতে পাই নি যে এই মন্ত্রের দুটি ছত্রে দুটি ক্রিয়াপদ প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। একটি হচ্ছে পর্যগাৎ—তিনি সর্বত্রই গিয়েছেন সর্বত্রই আছেন। আর একটি হচ্ছে ব্যদধাৎ—তিনি সমস্তই করেছেন। এই মন্ত্রের এক অর্ধে তিনি আছেন, অন্ত অর্ধে তিনি করছেন।

যেখানে আছেন সেখানে ক্লীবলিঙ্গ বিশেষণ-পদ, যেখানে করছেন সেখানে পুংলিঙ্গ বিশেষণ। অতএব বাহুল্য কোনো কথা না বলে একটি ব্যাকরণের ইঙ্গিতের দ্বারা এই মন্ত্র একটি গভীর সার্থকতা লাভ করেছে।

তিনি সর্বত্র আছেন কেননা তিনি মুক্ত তাঁর কোথাও কোনো বাধা নেই। না আছে শরীরের বাধা, না আছে পাপের বাধা। তিনি আছেন এই ধ্যানটিকে সম্পূর্ণ করতে গেলে তাঁর সেই মুক্ত বিশুদ্ধ স্বরূপকে মনে উজ্জ্বল করে দেখতে হয়। তিনি যে কিছুতেই বদ্ধ নন এইটিই সর্বব্যাপিত্বের লক্ষণ।

শরীর যার আছে সে সর্বত্র নেই। শুধু সর্বত্র নেই তা নয় সে সর্বত্র নির্বিকারভাবে থাকতে পারে না কারণ শরীরের ধর্মই বিকার। তাঁর শরীর নেই সুতরাং তিনি নির্বিকার, তিনি অব্রণ। যার শরীর আছে সে ব্যক্তি স্নায়ু প্রভৃতির সাহায্যে নিজের প্রয়োজন সাধন করে—সে রকম সাহায্য তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশুক। শরীর নেই বলার দরুন কী বলা হল তা ওই অব্রণ ও অস্নাবির বিশেষণের দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে—তাঁর শারীরিক সীমা নেই সুতরাং তাঁর বিকার নেই এবং খণ্ডভাবে খণ্ড উপকরণের দ্বারা তাঁকে কাজ করতে হয় না। তিনি শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং—কোনো প্রকার পাপ প্রবৃত্তি তাঁকে একদিকে হেলিয়ে একদিকে বেঁধে রাখে না। সুতরাং তিনি সর্বত্রই সম্পূর্ণ সমান। এই তো গেল—স পর্যগাৎ।

তার পরে—স ব্যদধাৎ; যেমন অনন্ত দেশে তিনি পর্যগাৎ তেমনি অনন্তকালে তিনি ব্যদধাৎ। ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। নিত্য কাল হতে বিধান করেছেন এবং নিত্য কালের জন্ত বিধান করছেন। সে বিধান কিছুমাত্র এলোমেলো নয়—

যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ—যেখানকার যেটি অর্থ ঠিক সেইটেই একেবারে যথাতথরূপে বিধান করছেন। তার আর লেশমাত্র ব্যত্যয় হবার জো নেই।

এই যিনি বিধান করেন তাঁর স্বরূপ কী? তিনি কবি। এস্থলে কবি শব্দের প্রতিশব্দস্বরূপ সর্বদর্শী কথাটা ঠিক চলে না। কেননা এখানে তিনি যে কেবল দেখছেন তা নয় তিনি করছেন। কবি শুধু দেখেন জানেন তা নয় তিনি প্রকাশ করেন। তিনি যে কবি, অর্থাৎ তাঁর আনন্দ যে একটি সুশৃঙ্খল সুষমার মধ্যে সুবিহিত ছন্দে নিজেকে প্রকাশ করছে, তা তাঁর এই জগৎ মহাকাব্য দেখলেই টের পাওয়া যায়। জগৎ-প্রকৃতিতে তিনি কবি, মানুষের মনঃপ্রকৃতিতে তিনি অধীশ্বর। বিশ্বমানবের মন যে আপনা-আপনি যেমন-তেমন করে একটা কাণ্ড করছে তা নয় তিনি তাকে নিগূঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে ক্ষুদ্র থেকে ভূমার দিকে, স্বার্থ থেকে পরমার্থের দিকে নিয়ে চলেছেন। তিনিই হচ্ছেন পরিভূঃ। কী জগৎপ্রকৃতি কী মানুষের মন সর্বত্র তাঁর প্রভুত্ব। কিন্তু তাঁর কবিত্ব ও প্রভুত্ব বাইরের কিছু থেকে নিয়মিত হচ্ছে না; তিনি স্বয়ম্ভু—তিনি নিজেকেই নিজে প্রকাশ করেন। এই জন্যে তাঁর কর্মকে তাঁর বিধানকে বাইরে থেকে দেশে বা কালে বাধা দেবার কিছুই নেই—এবং এই কারণেই শাশ্বতকালে তাঁর বিধান, এবং যথাতথরূপে তাঁর বিধান।

আমাদের স্বভাবেও এই রকম ভাববাচ্য ও কর্মবাচ্য দুই বাচ্য আছে। আমরাও হই এবং করি। আমাদের হওয়া যতই বাধামুক্ত ও সম্পূর্ণ হবে আমাদের করাও ততই সুন্দর ও যথাযথ হয়ে উঠবে। আমাদের হওয়ার পূর্ণতা কিসে? না, পাপশূন্য বিশুদ্ধতায়। বৈরাগ্যদ্বারা আসক্তিবন্ধন থেকে মুক্ত হও—পবিত্র হও, নির্বিকার হও। সেই ব্রহ্মচর্য সাধনায় তোমার হওয়া যেমন সম্পূর্ণ হতে থাকবে, যতই তুমি তোমার বাধামুক্ত নিষ্পাপ চিত্তের দ্বারা সর্বত্র ব্যাপ্ত হতে থাকবে, যতই সকলের মধ্যে প্রবেশের অধিকার লাভ করবে—ততই তুমি সংসারকে কাব্য করে তুলবে, মনকে রাজ্য করে তুলবে, বাহিরে এবং অন্তরে প্রভুত্ব লাভ করবে। অর্থাৎ আত্মার স্বয়ম্ভুত্ব সুস্পষ্ট হবে, অনুভব করবে তোমার মধ্যে একটি মুক্তির অধিষ্ঠান আছে।

একই অনন্তচক্রে ভাব এবং কর্ম কেমন মিলিত হয়েছে, হওয়া থেকে করা স্বতই নিজের স্বয়ম্ভু আনন্দে কেমন করে সৌন্দর্যে ও ঐশ্বর্যে বহুধা হয়ে উঠেছে, বিশুদ্ধ নির্বিশেষ বিচিত্র বিশেষের মধ্যে কেমন ধরা দিয়েছেন, যিনি অকায় তিনি কায়ের কাব্যরচনা করছেন, যিনি অপাপবিদ্ধ তিনি পাপপুণ্যময় মনের অধিপতি হয়েছেন—কোনোখানে এর আর ছেদ পাওয়া যায় না—উপনিষদের ওই একটি ছোটো মন্ত্রে সে-কথা সমস্তটা বলা হয়েছে।

৪ মাঘ, কলিকাতা

বিশ্বব্যাপী

যো দেবোঽগ্নৌ, যোঽপ্সু, যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ,
য ওষধিষু, যো বনস্পতিষু, তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি বিশ্বভুবনে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে সেই দেবতাকে বারবার নমস্কার করি।

ঈশ্বর সর্বত্র আছেন এ-কথাটা আমাদের কাছে অত্যন্ত অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এইজন্য এই মন্ত্র আমাদের কাছে অনাবশ্যক ঠেকে। অর্থাৎ এই মন্ত্রে আমাদের মনের মধ্যে কোনো চিন্তা জাগ্রত হয় না।

অথচ এ-কথাও সত্য যে ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্ব সম্বন্ধে আমরা যতই নিশ্চিন্ত হয়ে থাকি না কেন, তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ—এ আমাদের অভিজ্ঞতার কথা নয়—আমরা সেই দেবতাকে নমস্কার করতে পারি নে। ঈশ্বর সর্বব্যাপী এ আমাদের শোনা কথা মাত্র। শোনা কথা পুরাতন হয়ে যায় মৃত হয়ে যায়। এ-কথাও আমাদের পক্ষে মৃত।

কিন্তু এ-কথা যাঁরা কানে শুনে বলেন নি—যাঁরা মন্ত্রদ্রষ্টা, মন্ত্রটিকে যাঁরা দেখেছেন তবে বলতে পেরেছেন—তাঁদের সেই প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বাণীকে অন্যমনস্ক হয়ে শুনলে চলে না। এ বাক্য যে কতখানি সত্য তা আমরা যেন সম্পূর্ণ সচেতনভাবে গ্রহণ করি।

যে জিনিসকে আমরা সর্বদাই ব্যবহার করি, যাতে আমাদের প্রয়োজন সাধন হয়, আমাদের কাছে তার তাৎপর্য অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে যায়। স্বার্থ জিনিসটা যে কেবল নিজে ক্ষুদ্র তা নয় যার প্রতি সে হস্তক্ষেপ করে তাকেও ক্ষুদ্র করে তোলে। এমন কি, যে মানুষকে আমরা বিশেষভাবে প্রয়োজনে লাগাই সে আমাদের কাছে তার মানবত্ব পরিহার করে বিশেষ যন্ত্রের শামিল হয়ে ওঠে। কেরানি তার আপিসের মনিবের কাছে প্রধানত যন্ত্র, রাজার কাছে সৈন্যেরা যন্ত্র, যে চাষা আমাদের অন্নের সংস্থান করে দেয় সে সজীব লাঙল বললেই হয়। কোনো দেশের অধিপতি যদি একথা অত্যন্ত করে জানেন যে সেই দেশ থেকে তাঁদের নানাপ্রকার সুবিধা ঘটছে, তবে সেই দেশকে তাঁরা সুবিধার কঠিন জড় আবরণে বেষ্টিত করে দেখেন—প্রয়োজন-সম্বন্ধের অতীত যে চিত্ত তাকে তাঁরা দেখতে পারেন না।

জগৎকে আমরা অত্যন্ত ব্যবহারের সামগ্রী করে তুলেছি। এইজন্য তার জলস্থল-বাতাসকে আমরা অবজ্ঞা করি—তাদের আমরা অহংকৃত হয়ে ভৃত্য বলি এবং জগৎ আমাদের কাছে একটা যন্ত্র হয়ে ওঠে।

এই অবজ্ঞার দ্বারা আমরা নিজেকেই বঞ্চিত করি। যাকে আমরা বড়ো করে পেতুম তাকে ছোটো করে পাই, যাতে আমাদের চিত্তও পরিতৃপ্ত হত তাতে আমাদের কেবল পেট ভরে মাত্র।

যাঁরা জলস্থলবাতাসকে কেবল প্রতিদিনের ব্যবহারের দ্বারা জীর্ণ সংকীর্ণ করে দেখেন নি, যাঁরা নিত্য নবীন দৃষ্টি ও উজ্জ্বল জাগ্রত চৈতন্যের দ্বারা বিশ্বকে অন্তরের মধ্যে সমাদৃত অতিথির মতো গ্রহণ করেছেন এবং চরাচর সংসারের মাঝখানে জোড়হস্তে দাঁড়িয়ে উঠে বলেছেন—

যো দেবোঽগ্নৌ, যোঽপ্সু, যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ,
য ওষধিষু, যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

তাঁদের উচ্চারিত এই সজীব মন্ত্রটিকে জীবনের মধ্যে গ্রহণ করে ঈশ্বর যে সর্বব্যাপী এই জ্ঞানকে সর্বত্র সার্থক করো। যিনি সর্বত্র প্রত্যক্ষ, তাঁর প্রতি তোমার ভক্তি সর্বত্র উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠুক।

বোধশক্তিকে আর অলস রেখো না, দৃষ্টির পশ্চাতে সমস্ত চিত্তকে প্রেরণ করো। দক্ষিণে বামে, অধোতে উর্ধ্বে, সম্মুখে পশ্চাতে চেতনার দ্বারা চেতনার স্পর্শলাভ করো। তোমার মধ্যে অহোরাত্র যে ধীশক্তি বিকীর্ণ হচ্ছে সেই ধীশক্তির যোগে ভূর্ভুবঃস্বর্লোকে সর্বব্যাপী ধীকে ধ্যান করো—নিজের তুচ্ছতাদ্বারা অগ্নি জলকে তুচ্ছ ক'রো না। সমস্তই আশ্চর্য, সমস্তই পরিপূর্ণ। নমোনমঃ, নমোনমঃ— সর্বত্রই মাথা নত হ'ক হৃদয় নম্র হ'ক এবং আত্মীয়তা প্রসারিত হয়ে যাক। যাকে বিনামূল্যে পেয়েছ তাকে সচেতন সাধনার মূল্যে লাভ করো, যে অজস্র অক্ষয় সম্পদ বাহিরে রয়েছে তাকে অন্তরে গ্রহণ করে ধন্য হও।

য ওষধিষু, যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ—পূর্বছত্রে আছে যিনি অগ্নিতে, জলে, যিনি বিশ্বভুবনে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন। তার পরে আছে যিনি ওষধিতে বনস্পতিতে তাঁকে বারবার নমস্কার করি।

হঠাৎ মনে হতে পারে প্রথম ছত্রেই কথাটা নিঃশেষ হয়ে গেছে—তিনি বিশ্বভুবনেই আছেন—তবে কেন শেষের দিকে কথাটাকে এত ছোটো করে ওষধি বনস্পতির নাম করা হল।

বস্তুত মানুষের কাছে এইটেই শেষের কথা। ঈশ্বর বিশ্বভুবনে আছেন একথা বলা শক্ত নয় এবং আমরা অনায়াসেই বলে থাকি, এ-কথা বলতে গেলে আমাদের উপলব্ধিকে অত্যন্ত সত্য করে তোলার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তার পরেও যে-ঋষি বলেছেন তিনি এই ওষধিতে এই বনস্পতিতে আছেন সে-ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টা। মন্ত্রকে তিনি কেবল মননের

দ্বারা পান নি দর্শনের দ্বারা পেয়েছেন। তিনি তাঁর তপোবনের তরুলতার মধ্যে কেমন পরিপূর্ণ চেতনভাবে ছিলেন, তিনি যে-নদীর জলে স্নান করতেন সে স্নান কী পবিত্র স্নান, কী সত্য স্নান, তিনি যে-ফল ভক্ষণ করেছিলেন তার স্বাদের মধ্যে কী অমৃতের স্বাদ ছিল, তাঁর চক্ষে প্রভাতের সূর্যোদয় কী গভীর গম্ভীর কী অপরূপ প্রাণময় চৈতন্যময় সূর্যোদয়—সে-কথা মনে করলে হৃদয় পুলকিত হয়।

তিনি বিশ্বভুবনে আছেন এ-কথা বলে তাঁকে সহজে বিদায় করে দিলে চলবে না—কবে বলতে পারব তিনি এই ওষধিতে আছেন এই বনস্পতিতে আছেন।

৫ মাঘ

মৃত্যুর প্রকাশ

আজ পিতৃদেবের মৃত্যুর বাৎসরিক।

তিনি একদিন ৭ই পৌষে ধর্মদীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। শান্তিনিকেতনের আশ্রমে সেই তাঁর দীক্ষাদিনের বার্ষিক উৎসব আমরা সমাধা করে এসেছি।

সেই ৭ই পৌষে তিনি যে-দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন ৬ই মাঘ মৃত্যুর দিনে সেই দীক্ষাকে সম্পূর্ণ করে তাঁর মহৎ জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন করে গেছেন।

শিখা থেকে শিখা জ্বালাতে হয়। তাঁর সেই পরিপূর্ণ জীবন থেকে আমাদের অগ্নি গ্রহণ করতে হবে।

এইজন্য ৭ই পৌষে যদি তাঁর দীক্ষা হয় ৬ই মাঘ আমাদের দীক্ষার দিন। তাঁর জীবনের সমাপ্তি আমাদের জীবনকে দীক্ষা দান করে। জীবনের দীক্ষা।

জীবনের ব্রত অতি কঠিন ব্রত, এই ব্রতের ক্ষেত্র অতি বৃহৎ, এর মন্ত্র অতি দুর্লভ, এর কর্ম অতি বিচিত্র, এর ত্যাগ অতি দুঃসাধ্য। যিনি দীর্ঘজীবনের নানা সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, মানে অপমানে তাঁর একটি মন্ত্র কোনোদিন বিস্মৃত হন নি, তাঁর একটি লক্ষ্য হতে কোনোদিন বিচলিত হন নি, যাঁর জীবনে এই প্রার্থনা সত্য হয়ে উঠেছিল—মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাম্ মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ, অনিরাকরণমস্তু—আমাকে ব্রহ্ম ত্যাগ করেন নি, আমি যেন তাঁকে ত্যাগ না করি, যেন তাঁকে পরিত্যাগ না হয়,—তাঁরই কাছ থেকে আজ আমরা বিক্ষিপ্ত জীবনকে এক পরমলক্ষ্যে সার্থকতা দান করবার মন্ত্র গ্রহণ করব।

পরিপক্ব ফল যেমন বৃন্তচ্যুত হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ দান করে—তেমনি মৃত্যুর দ্বারাই তিনি তাঁর জীবনকে আমাদের দান করে গেছেন। মৃত্যুর ভিতর দিয়ে না পেলে এমন

সম্পূর্ণ করে পাওয়া যায় না। জীবন নানা সীমার দ্বারা আপনাকে বেষ্টিত করে রক্ষা করে—সেই সীমা কিছু-না-কিছু বাধা রচনা করে।

মৃত্যুর দ্বারাই সেই মহাপুরুষ তাঁর জীবনকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করেছেন—তার সমস্ত বাধা দূর হয়ে গেছে—এই জীবনকে নিয়ে আমাদের কোনো সাংসারিক প্রয়োজনের তুচ্ছতা নেই, কোনো লৌকিক ও সাময়িক সম্বন্ধের ক্ষুদ্রতা নেই। তার সঙ্গে কেবল একটি মাত্র সম্পূর্ণ যোগ হয়েছে, সে হচ্ছে অমৃতের যোগ। মৃত্যুই এই অমৃতকে প্রকাশ করে।

মৃত্যু আজ তাঁর জীবনকে আমাদের প্রত্যেকের নিকটে এনে দিয়েছে, প্রত্যেকের অন্তরে এনে দিয়েছে। এখন আমরা যদি প্রস্তুত থাকি, যদি তাঁকে গ্রহণ করি, তবে তাঁর জীবনের সঙ্গে আমাদের জীবনের রাসায়নিক সম্মিলনের কোনো ব্যাঘাত থাকে না। তাঁর পার্থিব জীবনের উৎসর্গ আজ কিনা ব্রহ্মের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে সেইজন্যে তিনি আজ সম্পূর্ণরূপে আমাদের সকলের হয়েছেন। বনের ফুল পূজা-অবসানে প্রসাদীফুল হয়ে আজ বিশেষরূপেই সকলের সামগ্রী হয়েছেন। আজ সেই ফুলে তাঁর পূজার পুণ্য সম্পূর্ণ হয়েছে, আজ সেই ফুলে তাঁর দেবতার আশীর্বাদ মূর্তিমান হয়েছে। সেই পবিত্র নির্মাল্যটি মাথায় করে নিয়ে আজ আমরা বাড়ি চলে যাব এইজন্য তাঁর মৃত্যুদিনের উৎসব। বিশ্বপাবন মৃত্যু আজ স্বয়ং সেই মহৎজীবনকে আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটন করে দাঁড়িয়েছেন—অগ্যকার দিন আমাদের পক্ষে যেন ব্যর্থ না হয়।

একদিন কোন্ ৭ই পৌষে তিনি একলা অমৃতজীবনের দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, সেদিনকার সংবাদ খুব অল্পলোকেই জেনেছিল। ৬ই মাঘে মৃত্যু যখন যবনিকা উদ্‌ঘাটন করে দাঁড়াল তখন কিছুই আর প্রচ্ছন্ন রইল না। তাঁর একদিনের সেই একলার দীক্ষা আজ আমরা সকলে মিলে গ্রহণ করবার অধিকারী হয়েছি। সেই অধিকারকে আমরা সার্থক করে যাব।

৬ মাঘ, কলিকাতা

৫

নবযুগের উৎসব

নিজের অসম্পূর্ণতার মধ্যে সম্পূর্ণ সত্যকে আবিষ্কার করতে সময় লাগে। আমরা যে যথার্থ কী, আমরা যে কী করছি, তার পরিণাম কী, তার তাৎপর্য কী সেইটি স্পষ্ট বোঝা সহজ কথা নয়।

বালক নিজেকে ঘরের ছেলে বলেই জানে। তার ঘরের সম্বন্ধকেই সে চরম সম্বন্ধ বলে জ্ঞান করে। সে জানে না সে ঘরের চেয়ে অনেক বড়ো। সে জানে না মানব-জীবনে সকলের চেয়ে বড়ো সম্বন্ধ তার ঘরের বাইরেই।

সে মানুষ সুতরাং সে সমস্ত মানবের। সে যদি ফল হয় তবে তার বাপ মা কেবল বৃন্তমাত্র; সমস্ত মানববৃক্ষের সঙ্গে একেবারে শিকড় থেকে ডাল পর্যন্ত তার মজ্জাগত যোগ।

কিন্তু সে যে একান্তভাবে ঘরেরই নয়, সে যে মানুষ, এ-কথা শিশু অনেকদিন পর্যন্ত একেবারেই জানে না। তবু এ-কথা একদিন তাকে জানতেই হবে যে ঘর তাকে ঘরের মধ্যেই সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করবার জন্যে পালন করছে না, সে মানবসমাজের জন্যেই বেড়ে উঠছে।

আমরা আজ পঞ্চাশবৎসরের ঊর্ধ্বকাল এই ১১ই মাঘের উৎসব করে আসছি। আমরা কী করছি, এ উৎসব কিসের উৎসব, সে-কথা আমাদের বোঝবার সময় হয়েছে; আর বিলম্ব করলে চলবে না।

আমরা মনে করেছিলুম আমাদের এই উৎসব ব্রাহ্মসমাজের উৎসব। ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁদের সংবৎসরের ক্লান্তি ও অবসাদকে উৎসবের আনন্দে বিসর্জন দেবেন, তাঁদের ক্ষয়গ্রস্ত জীবনের ক্ষতিপূরণ করবেন, প্রতিদিনের সঞ্চিত মলিনতা ধৌত করে নেবেন, মহোৎসবক্ষেত্রে চিরনবীনতার যে অমৃত-উৎস আছে তারই জল পান করবেন এবং তাতেই স্নান করে নবজীবনে সদ্যোজাত শিশুর মতো প্রফুল্ল হয়ে উঠবেন।

এই লাভ এই আনন্দ ব্রাহ্মসমাজ উৎসবের থেকে গ্রহণ যদি করতে পারেন তবে ব্রাহ্মসম্প্রদায় ধন্য হবেন কিন্তু এইটুকুতেই উৎসবের শেষ পরিচয় আমরা লাভ করতে পারি নে। আমাদের এই উৎসব ব্রাহ্মসমাজের চেয়ে অনেক বড়ো; এমন কি, একে যদি ভারতবর্ষের উৎসব বলি তাহলেও একে ছোটো করা হবে।

আমি বলছি আমাদের এই উৎসব মানবসমাজের উৎসব। এ-কথা যদি সম্পূর্ণ প্রত্যয়ের সঙ্গে আজ না বলতে পারি তাহলে চিত্তের সংকোচ দূর হবে না; তাহলে এই উৎসবের ঐশ্বর্যভাণ্ডার আমাদের কাছে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হবে না; আমরা ঠিক জেনে যাব না কিসের যজ্ঞে আমরা আহূত হয়েছি।

আমাদের উৎসবকে ব্রহ্মোৎসব বলব কিন্তু ব্রাহ্মোৎসব বলব না এই সংকল্প মনে নিয়ে আমি এসেছি; যিনি সত্যম্ তাঁর আলোকে এই উৎসবকে সমস্ত পৃথিবীতে আজ প্রসারিত করে দেখব; আমাদের এই প্রাঙ্গণ আজ পৃথিবীর মহাপ্রাঙ্গণ; এর ক্ষুদ্রতা নেই।

একদিন ভারতবর্ষ তাঁর তপোবনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে দিব্যধামানি তস্থুঃ,
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

হে অমৃতের পুত্রগণ যারা দিব্যধামে আছ সকলে শোনো—আমি জ্যোতির্ময় মহান পুরুষকে জেনেছি।

প্রদীপ আপনার আলোককে কেবল আপনার মধ্যে গোপন করে রাখতে পারে না। মহান্তম্ পুরুষং—মহান্ পুরুষকে মহৎ সত্যকে যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা আর তো দরজা বন্ধ করে থাকতে পারেন না; এক মুহূর্তেই তাঁরা একেবারে বিশ্বলোকের মাঝখানে এসে দাঁড়ান; নিত্যকাল তাঁদের কণ্ঠকে আশ্রয় করে আপন মহাবাণী ঘোষণা করেন; দিব্যধামকে তাঁরা তাঁদের চারিদিকেই প্রসারিত দেখেন; আর, যে মানুষের মুখেই দৃষ্টিপাত করেন—সে মূর্খই হ'ক আর পণ্ডিতই হ'ক, সে রাজচক্রবর্তী হ'ক আর দীন দরিদ্রই হ'ক—অমৃতের পুত্র বলে তার পরিচয় প্রাপ্ত হন।

সেই যেদিন ভারতবর্ষের তপোবনে অনন্তের বার্তা এসে পৌঁচেছিল, সেদিন ভারতবর্ষ আপনাকে দিব্যধাম বলে জানতেন, সেদিন তিনি অমৃতের পুত্রদের সভায় অমৃতমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন; সেদিন তিনি বলেছিলেন—

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি,
সর্বভূতেষু চাত্মানাং ততো ন বিজুগুপ্সতে।

যিনি সর্বভূতকেই পরমাত্মার মধ্যে এবং পরমাত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি কাউকেই আর ঘৃণা করেন না।

ভারতবর্ষ বলেছিলেন—

তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি।

যিনি সর্বব্যাপী, তাঁকে সর্বত্রই প্রাপ্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে যোগযুক্ত ধীরেরা সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেন।

সেদিন ভারতবর্ষ নিখিল লোকের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন; জলস্থল-আকাশকে পরিপূর্ণ দেখেছিলেন, উর্ধ্বং পূর্ণংমধ্যং পূর্ণমধঃপূর্ণং দেখেছিলেন। সেদিন সমস্ত অন্ধকার তাঁর কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন—বেদাহং। আমি জেনেছি, আমি পেয়েছি।

সেই দিনই ভারতবর্ষের উৎসবের দিন ছিল; কেননা সেইদিনই ভারতবর্ষ তাঁর অমৃতযজ্ঞে সর্বমানবকে অমৃতের পুত্র বলে আহ্বান করেছিলেন—তাঁর ঘৃণা ছিল না, অহংকার ছিল না। তিনি পরমাত্মার যোগে সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেছিলেন। সে-দিন তাঁর আমন্ত্রণধ্বনি জগতের কোথাও সংকুচিত হয় নি; তাঁর ব্রহ্মমন্ত্র বিশ্বসংগীতের সঙ্গে একতানে মিলিত হয়ে নিত্যকালের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল—সেই তাঁর ছিল উৎসবের দিন।

তার পরে বিধাতা জানেন কোথা হতে অপরাধ প্রবেশ করল। বিশ্বলোকের দ্বার চারিদিক হতে বন্ধ হতে লাগল নির্বাপিত প্রদীপের মতো ভারতবর্ষ আপনার মধ্যে আপনি অবরুদ্ধ হল। প্রবল স্রোতস্বিনী যখন মরে আসতে থাকে তখন যেমন দেখতে দেখতে পদে পদে বালির চর জেগে উঠে তার সমুদ্রগামিনী ধারার গতিরোধ করে দেয়, তাকে বহুতর ছোটো ছোটো জলাশয়ে বিভক্ত করে;—যে-ধারা দূরদূরান্তরের প্রাণদায়িনী ছিল, যা দেশদেশান্তরে সম্পদ বহন করে নিয়ে যেত, যে অশ্রান্ত ধারার কলধ্বনি জগৎসংগীতের তানপুরার মতো পর্বতশিখর থেকে মহাসমুদ্র পর্যন্ত নিরন্তর বাজতে থাকত—সেই বিশ্বকল্যাণী ধারাকে কেবল খণ্ড খণ্ড ভাবে এক-একটা ক্ষুদ্র গ্রামের সামগ্রী করে তোলে, সেই খণ্ডতাগুলি আপন পূর্বতন ঐক্যটিকে বিস্মৃত হয়ে বিশ্বনৃত্যে আর যোগ দেয় না, বিশ্বগীতসভায় আর স্থান পায় না,—সেই রকম করেই নিখিল মানবের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধের পুণ্যধারা সহস্র সাম্প্রদায়িক বালুর চরে খণ্ডিত হয়ে গতিহীন হয়ে পড়ল।—তার পরে, হায়, সেই বিশ্ববাণী কোথায়? কোথায় সেই বিশ্বপ্রাণের তরঙ্গদোলা? রুদ্ধ জল যেমন কেবলই ভয় পায় অল্পমাত্র অশুচিতার পাছে তাকে কলুষিত করে, এইজন্যে সে যেমন স্নান-পানের নিষেধের দ্বারা নিজের চারিদিকে বেড়া তুলে দেয়, তেমনি আজ বদ্ধ ভারতবর্ষ কেবলই কলুষের আশঙ্কায় বাহিরের বৃহৎ সংস্রবকে সর্বতোভাবে দূরে রাখবার জন্যে নিষেধের প্রাচীর তুলে দিয়ে সূর্যালোক এবং বাতাসকে পর্যন্ত

তিরস্কৃত করেছেন,—কেবলই বিভাগ, কেবলই বাধা। বিশ্বের লোক গুরুর কাছে বসে যে দীক্ষা নেবে সে দীক্ষার মন্ত্র কোথায়, সে দীক্ষার অবারিত মন্দির কোথায়। সে আহ্বানবাণী কোথায় যে বাণী একদিন চারিদিকে এই বলে ধ্বনিত হয়েছিল—

যথাপঃ প্রবতাযন্তি যথা মাসা অহর্জরম্ এবং মাং ব্রহ্মচারিণোধাত আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা।

জল যেমন স্বভাবতই নিম্নদেশে গমন করে, মাসসকল যেমন স্বভাবতই সংবৎসরের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি সকল দিক হইতেই ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকট আসুন, স্বাহা।

কিন্তু সেই স্বভাবের পথ যে আজ রুদ্ধ। ধর্ম জ্ঞান সমাজ তাদের সিংহদ্বার বন্ধ করে বসে আছে—কেবল অন্তঃপুরের যাতায়াতের জন্যে খিড়কির দরজার ব্যবহার চলছে মাত্র।

সত্যসম্পদের দারিদ্র্য না ঘটলে এমন দুর্গতি কখনোই হয় না। যে বলতে পেরেছে—বেদাহং, আমি জেনেছি, তাকে বেরিয়ে আসতেই হবে, তাকে বলতেই হবে—শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।

এই রকম দৈন্যের নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত দ্বার জানালা বন্ধ করে যখন ঘুমোচ্ছিলুম এমন সময় একটি ভোরের পাখির কণ্ঠ থেকে আমাদের রুদ্ধ ঘরের মধ্যে বিশ্বের নিত্যসংগীতের সুর এসে পৌঁছোল—যে সুরে লোকলোকান্তর, যুগ-যুগান্তর সুর মিলিয়েছে, যে-সুরে পৃথিবীর ধূলির সঙ্গে সূর্য তারা একই আত্মীয়তার আনন্দে ঝংকৃত হয়েছে—সেই সুর একদিন শোনা গেল।

আবার যেন কে বললে—বেদাহমেতং, আমি এঁকে জেনেছি। কাকে জেনেছ? আদিত্যবর্ণং—জ্যোতির্ময়কে জেনেছি যাঁকে কেউ গোপন করতে পারে না। জ্যোতির্ময়? কই তাঁকে তো আমার গৃহসামগ্রীর মধ্যে দেখছি নে। না, তোমার অন্ধকার দিয়ে ঢেকে তাঁকে তোমার ঘরের মধ্যে চাপা দিয়ে রাখ নি। তাঁকে দেখছি তমসঃ পরস্তাৎ—তোমাদের সমস্ত রুদ্ধ অন্ধকারের পরপার হতে। তুমি যাকে তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যে ধরে রেখেছ, পাছে আর কেউ সেখানে প্রবেশ করে বলে মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছ, সে যে অন্ধকার। নিখিল মানব সেখান থেকে ফিরে ফিরে যায়, সূর্য চন্দ্র সেখানে দৃষ্টিপাত করে না। সেখানে জ্ঞানের স্থানে শাস্ত্রের বাক্য, ভক্তির স্থানে পূজাপদ্ধতি, কর্মের স্থানে অভ্যস্ত আচার। সেখানে দ্বারে একজন ভয়ংকর 'না' বসে আছে, সে বলছে, না না, এখানে না—দূরে যাও, দূরে যাও। সে বলছে কান বন্ধ করো পাছে মন্ত্র কানে যায়, সরে বসো পাছে স্পর্শ লাগে, দরজা ঠেলো না পাছে তোমার দৃষ্টি পড়ে। এত 'না' দিয়ে তুমি যাকে ঢেকে রেখেছ আমি সেই অন্ধকারের কথা বলছি নে। কিন্তু—বেদাহমেতং। আমি তাঁকে জেনেছি যিনি নিখিলের; যাঁকে জানলে আর কাউকে

ঠেকিয়ে রাখা যায় না, কাউকে ঘৃণা করা যায় না; যাঁকে জানলে নিম্ন দেশ যেমন জলসকলকে স্বভাবতই আহ্বান করে, সংবৎসর যেমন মাসসকলকে স্বভাবতই আহ্বান করে তেমনি স্বভাবত সকলকেই অবাধে আহ্বান করবার অধিকার জন্মে, তাঁকেই জেনেছি।

ঘরের লোক ক্রুদ্ধ হয়ে ভিতর থেকে গর্জন করে উঠল—দূর করো, দূর করো, একে বের করে দাও। এ তো আমার ঘরের সামগ্রী নয়। এ তো আমার নিয়মকে মানবে না।

না, এ তোমার ঘরের না, এ তোমার নিয়মের বাধ্য নয়। কিন্তু পারবে না—আকাশের আলোককে গায়ের জোর দিয়ে ঠেলে ফেলতে পারবে না। তার সঙ্গে বিরোধ করতে গেলেও তাকে স্বীকার করতে হবে, প্রভাত এসেছে।

প্রভাত এসেছে, আমাদের উৎসব এই কথা বলছে। আমাদের এই উৎসব ঘরের উৎসব নয়, ব্রাহ্মসমাজের উৎসব নয়, মানবের চিত্তগগনে যে প্রভাতের উদয় হচ্ছে এ যে সেই সুমহৎ প্রভাতের উৎসব।

বহু যুগ পূর্বে এই প্রভাত-উৎসবের পবিত্র গম্ভীর মন্ত্র এই ভারতবর্ষের তপোবনে ধ্বনিত হয়েছিল—একমেবাদ্বিতীয়ম্। অদ্বিতীয় এক। পৃথিবীর এই পূর্বদিগন্তে আবার কোন্ জাগ্রত মহাপুরুষ অন্ধকার রাত্রির পরপার হতে সেই মন্ত্র বহন করে এনে স্তব্ধ আকাশের মধ্যে স্পন্দন সঞ্চার করে দিলেন। একমেবাদ্বিতীয়ম্। অদ্বিতীয় এক।

এই যে প্রভাতের মন্ত্র উদয়শিখরের উপরে দাঁড়িয়ে জানিয়ে দিলে যে, একসূর্য উদয় হচ্ছেন, এবার ছোটো ছোটো অসংখ্য প্রদীপ নেবাও। এই মন্ত্র কোনো এক-ঘরের মন্ত্র নয়, এই প্রভাত কোনো একটি দেশের প্রভাত নয়—হে পশ্চিম, তুমিও শোনো তুমি জাগ্রত হও। শৃণ্বন্তু বিশ্বে। হে বিশ্ববাসী, সকলে শোনো। পূর্বগগনের প্রান্তে একটি বাণী জেগে উঠেছে—বেদাহমেতং, আমি জানতে পারছি। তমসঃ পরস্তাৎ, অন্ধকারের পরপার থেকে আমি জানতে পারছি। নিশাবসানের আকাশ উদয়োন্মুখ আদিত্যের আসন্ন আবির্ভাবকে যেমন করে জানতে পারে তেমনি করে—

* বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

এই নূতন যুগে পৃথিবীর মানবচিত্তে যে প্রভাত আসছে সেই নব প্রভাতের বার্তা বাংলাদেশে আজ আশি বৎসর হল প্রথম এসে উপস্থিত হয়েছিল। তখন পৃথিবীতে দেশের সঙ্গে দেশের বিরোধ, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের সংগ্রাম; তখন শাস্ত্রবাক্য এবং বাহ্য প্রথার লৌহসিংহাসনে বিভাগই ছিল রাজা—সেই ভেদবুদ্ধির প্রাচীরবদ্ধ অন্ধকারের মধ্যে রাজা রামমোহন যখন অদ্বিতীয় একের আলোক তুলে ধরলেন তখন তিনি দেখতে পেলেন যে, যে ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান ও খ্রীস্টানধর্ম আজ একত্র সমাগত হয়েছে সেই ভারতবর্ষেই বহু পূর্ব যুগে এই বিচিত্র আতিথিদের একসভায় বসাবার জন্যে আয়োজন

হয়ে গেছে। মানবসভ্যতা যখন দেশে দেশে নব নব বিকাশের শাখা-প্রশাখায় ব্যাপ্ত হতে চলেছিল তখন এই ভারতবর্ষ বারংবার মন্ত্র জপ করছিলেন—এক এক এক! তিনি বলছিলেন—ইহ চেৎ অবেদীৎ অথ সত্যমস্তি—এই এককেই যদি মানুষ জানে তবে সে সত্য হয়। ন চেৎ ইহ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ—এই এককে যদি না জানে তবে তার মহতী বিনষ্টি। এ-পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মিথ্যার প্রাদুর্ভাব হয়েছে সে কেবল এই মহান্ একের উপলব্ধি অভাবে। যত ক্ষুদ্রতা নিষ্ফলতা দৌর্বল্য সে এই একের থেকে বিচ্যুতিতে। যত মহাপুরুষের আবির্ভাব সে এই একক প্রচার করতে। যত মহাবিপ্লবের আগমন সে এই একক উদ্ধার করবার জন্যে।

যখন ঘোরতর বিভাগ বিরোধ বিক্ষিপ্ততার দুর্দিনের মধ্যে এই বাংলা দেশে অপ্রত্যাশিত অভাবনীয় রূপে এই বিশ্বব্যাপী একের মন্ত্র একমেবাদ্বিতীয়ম্ দ্বিধাবিহীন সুস্পষ্টস্বরে উচ্চারিত হয়ে উঠল তখন এ-কথা নিশ্চয় জানতে হবে, সমস্ত মানবচিত্তে কোথা হতে একটি নিগূঢ় জাগরণের বেগ সঞ্চারিত হয়েছে, এই বাংলা দেশে তার প্রথম সংবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

আমাদের দেশে আজ বিরাট মানবের আগমন হয়েছে। এখানে আমাদের রাজ্য নেই, বাণিজ্য নেই, গৌরব নেই, পৃথিবীতে আমরা সকলের চেয়ে মাথা নিচু করে রয়েছি—আমাদেরই এই দরিদ্র ঘরের অপমানিত শূন্যতার মাঝখানে বিরাট মানবের অভ্যুদয় হয়েছে। তিনি আজ আমাদেরই কাছে কর গ্রহণ করবেন বলে এসেছেন। সকল মানুষের কাছে নিত্যকালের ডালায় সাজিয়ে ধরতে পারি এমন কোনো রাজদুর্লভ অর্ঘ্য আমাদের এখানে সংগ্রহ হয়েছে নইলে আমাদের এ সৌভাগ্য হত না। আমাদের এই উৎসর্গ বটের তলায় নয়, ঘরের দালানে নয়, গ্রামের মণ্ডপে নয়, এ উৎসর্গ বিশ্বের প্রাঙ্গণে। এইখানেই তাঁর প্রাপ্য নেবেন বলে বিশ্বমানব তাঁর দূতকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন; তিনি আমাদের মন্ত্র দিয়ে গিয়েছেন—একমেবাদ্বিতীয়ম্। বলে গিয়েছেন, মনে রাখিস, সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে মনে রাখিস অদ্বিতীয় এক। সকল বিরোধের মধ্যে ধরে রাখিস অদ্বিতীয় এক।

সেই মন্ত্রের পর থেকেই আর আমাদের নিদ্রা নেই দেখছি। "এক" আমাদের স্পর্শ করেছেন, আর আমরা সুস্থির থাকতে পারছি নে। আজ আমরা ঘর ছেড়ে দল ছেড়ে গ্রাম ছেড়ে বিশ্বপথের পথিক হব বলে চঞ্চল হয়ে উঠেছি। এ-পথের পাথেয় আছে বলে জানতুম না—এখন দেখছি অভাব নেই। ঘরে বাহিরে অনৈক্যের দ্বারা যারা নিতান্ত বিচ্ছিন্ন সমস্ত মানুষের মধ্যে তারাই "এক"কে প্রচার করবার হুকুম পেয়েছে। এক জায়গায় সম্বল আছে বলেই এমন হুকুম এসে পৌঁছোল।

তার পর থেকে আনাগোনা তো চলেইছে; একে একে দূত আসছে। এই দেশে এমন একটি বাণী তৈরি হচ্ছে যা পূর্বপশ্চিমকে এক দিব্যধামে আহ্বান করবে, যা একের আলোকে অমৃতের পুত্রগণকে অমৃতের পরিচয়ে মিলিত করবে। রামমোহন রায়ের আগমনের পর থেকে আমাদের দেশের চিন্তা বাক্য ও কর্ম, সম্পূর্ণ না জেনেও, একটি চিরন্তনের অভিমুখে চলেছে। আমরা কোনো একটি জায়গায় নিত্যকে লাভ করব এবং প্রকাশ করব এমন একটি গভীর আবেগ আমাদের অন্তরের মধ্যে জোয়ারের প্রথম টানের মতো স্ফীত হয়ে উঠছে। আমরা অনুভব করছি, সমাজের সঙ্গে সমাজ, বিজ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞান, ধর্মের সঙ্গে ধর্ম যে এক পরমতীর্থে এক সাগর-সংগমে পুণ্যস্নান করতে পারে তারই রহস্য আমরা আবিষ্কার করব। সেই কাজ যেন ভিতরে ভিতরে আরম্ভ হয়ে গেছে; আমাদের দেশে পৃথিবীর যে একটি প্রাচীন গুরুকুল ছিল সেই গুরুকুলের দ্বার আবার যেন এখনই খুলবে এমনি আমাদের মনে হচ্ছে। কেননা কিছুকাল পূর্বে যেখানে একেবারে নিঃশব্দ ছিল এখন যে সেখানে কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। আর ওই যে দেখছি বাতায়নে এক-একজন মাঝে মাঝে এসে দাঁড়াচ্ছেন, তাঁদের মুখ দেখে চেনা যাচ্ছে তাঁরা মুক্ত পৃথিবীর লোক, তাঁরা নিখিল মানবের আত্মীয়। পৃথিবীতে কালে কালে যে-সকল মহাপুরুষ ভিন্ন ভিন্ন দেশে আগমন করেছেন সেই যাজ্ঞবল্ক্য বিশ্বামিত্র বুদ্ধ খ্রীস্ট মহম্মদ সকলকেই তাঁরা ব্রহ্মের ব'লে চিনেছেন; তাঁরা মৃত বাক্য মৃত আচারের গোরস্থানে প্রাচীর তুলে বাস করেন না; তাঁদের বাক্য প্রতিধ্বনি নয়, কার্য অনুকরণ নয়, গতি অনুবৃত্তি নয়; তাঁরা মানবাত্মার মাহাত্ম্য-সংগীতকে এখনই বিশ্বলোকের রাজপথে ধ্বনিত করে তুলবেন। সেই মহা-সংগীতের মূল ধুয়াটি আমাদের গুরু ধরিয়ে দিয়ে গেছেন—একমেবাদ্বিতীয়ম্। সকল বিচিত্র তানকেই এই ধুয়াতেই বারংবার ফিরিয়ে আনতে হবে একমেবাদ্বিতীয়ম্।

আর আমাদের লুকিয়ে থাকবার জো নেই। এবার আমাদের প্রকাশিত হতে হবে—ব্রহ্মের আলোকে সকলের সামনে প্রকাশিত হতে হবে। বিশ্ববিধাতার নিকট থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে সমুদয় মানুষের কাছে এসে দাঁড়াতে হবে। সেই পরিচয়পত্রটি তিনি তাঁর দূতকে দিয়ে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কোন্ পরিচয় আমাদের? আমাদের পরিচয় এই যে, আমরা তারা যারা বলে না যে ঈশ্বর বিশেষ স্থানে বিশেষ স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত। আমরা তারাই যারা বলে—একোবশী সর্বভূতান্তরাত্মা। সেই এক প্রভুই সর্বভূতের অন্তরাত্মা। আমরা তারাই যারা বলে না যে বাহিরের কোনো প্রক্রিয়া দ্বারা ঈশ্বরকে জানা যায় অথবা কোনো বিশেষ শাস্ত্রে ঈশ্বরের জ্ঞান বিশেষ লোকের জন্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। আমরা বলি—হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তঃ—হৃদয়স্থিত সংশয়রহিত বুদ্ধির দ্বারাই তাঁকে

জানা যায়। আমরা তারাই যারা ঈশ্বরকে কোনো বিশেষ জাতির বিশেষ লভ্য বলি নে। আমরা বলি তিনি অবর্ণঃ, এবং—বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি, সর্ব বর্ণেরই প্রয়োজন বিধান করেন কোনো বর্ণকে বঞ্চিত করেন না; আমরা তারাই যারা এই বাণী ঘোষণার ভার নিয়েছি এক এক অদ্বিতীয় এক। তবে আমরা আর স্থানীয় ধর্ম এবং সাময়িক লোকাচারের মধ্যে বাঁধা পড়ে থাকব কেমন করে। আমরা একের আলোকে সকলের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে প্রকাশ পাব। আমাদের উৎসব সেই প্রকাশের উৎসব, সেই বিশ্বলোকের মধ্যে প্রকাশের উৎসব, সেই কথা মনে রাখতে হবে। এই উৎসবে সেই প্রভাতের প্রথম রশ্মিপাত হয়েছে যে-প্রভাত একটি মহাদিনের অভ্যুদয় সূচনা করেছে।

সেই মহাদিন এসেছে অথচ এখনও সে আসে নি। অনাগত মহাভবিষ্যতে তার মূর্তি দেখতে পাচ্ছি। তার মধ্যে যে-সত্য বিরাজ করছে সে তো এমন সত্য নয় যাকে আমরা একেবারে লাভ করে আমাদের সম্প্রদায়ের লোহার সিন্দুকে দলিল-দস্তাবেজের সঙ্গে চাবি বন্ধ করে বসে আছি, যাকে বলব এ আমাদের ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ের। না। আমরা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করি নি; আমরা যে কিসের জন্য এই উৎসবকে বর্ষে বর্ষে বহন করে আসছি তা ভালো করে বুঝতে পারি নি। আমরা স্থির করেছিলুম এই দিনে একদা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়েছিল আমরা ব্রাহ্মরা তাই উৎসব করি। কথাটা এমন ক্ষুদ্র নয়। এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ, এই যে মহান আত্মা এই যে বিশ্বকর্মা দেবতা যিনি সর্বদা জনগণের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন তিনিই আজ বর্তমান যুগে জগতে ধর্মসমন্বয় জাতিসমন্বয়ের আহ্বান এই অখ্যাত বাংলাদেশের দ্বার হতে প্রেরণ করেছেন। আমরা তাই বলছি ধন্য, ধন্য, আমরা ধন্য। এই আশ্চর্য ইতিহাসের আনন্দকে আমরা মাঘোৎসবে জাগ্রত করছি। এই মহৎ-সত্যে আজ আমাদের উদ্বোধিত হতে হবে, বিধাতার এই মহতী কৃপায় যে গম্ভীর দায়িত্ব তা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। বুদ্ধিকে প্রশস্ত করো, হৃদয়কে প্রসারিত করো, নিজেকে দরিদ্র বলে জেনো না, দুর্বল বলে মেনো না। তপস্যায় প্রবৃত্ত হও, দুঃখকে বরণ করো, ক্ষুদ্র সমাজের মধ্যে আরাম ভোগ করবার জন্যে জ্ঞানকে মৃতপ্রায় এবং কর্মকে যন্ত্রবৎ ক'রো না—সত্যকে সকলের উর্ধ্বে স্বীকার করো এবং ব্রহ্মের আনন্দে জীবনকে পরিপূর্ণ করে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করো।

হে জনগণের হৃদয়াসন-সন্নিবিষ্ট-বিশ্বকর্মা, তুমি যে আজ আমাদের নিয়ে তোমার কোন্ মহৎকর্ম রচনা করেছ, হে মহান আত্মা, তা এখনও আমরা সম্পূর্ণ বুঝতে পারি নি। তোমার ভগবৎশক্তি আমাদের বুদ্ধিকে কোন্‌খানে স্পর্শ করেছে, সেখানে কোথায় তোমার সৃষ্টিলীলা চলছে তা এখনও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি, জগৎ সংসারে

আমাদের গৌরববাঞ্ছিত ভাগ্য যে কোন্ দিগন্তরালে আমাদের জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে তা বুঝতে পারছি নে বলে আমাদের চেষ্টা ক্ষণে ক্ষণে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে, আমাদের দৈন্য-বুদ্ধি ঘুচছে না, আমাদের সত্য উজ্জ্বল হয়ে উঠছে না, আমাদের দুঃখ এবং ত্যাগ মহত্ত্ব লাভ করছে না। সমস্তই ছোটো হয়ে পড়েছে, স্বার্থ আরাম অভ্যাস এবং লোকভয়ের চেয়ে বড়ো কিছুকেই চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি নে। এ-কথা বলবার বল পাচ্ছি নে যে, সমস্ত সংসার যদি আমার বিরুদ্ধ হয় তবু আমার পক্ষে তুমি আছ, কেননা, তোমার সংকল্প আমাতে সিদ্ধ হচ্ছে, আমার মধ্যে তোমার জয় হবে। হে পরমাত্মন, এই আত্ম-অবিশ্বাসের আশাহীন অন্ধকার থেকে, এই জীবনযাত্রায় নাস্তিকতার নিদারুণ কর্তৃত্ব থেকে আমাদের উদ্ধার করো, উদ্ধার করো, আমাদের সচেতন করো। তোমার যে অভি-প্রায়কে আমরা বহন করছি তার মহত্ত্ব উপলব্ধি করাও, তোমার আদেশে জগতে আমরা যে নবযুগের সিংহদ্বার উদ্‌ঘাটন করবার জন্যে যাত্রা করেছি সে পথের লক্ষ্য কী তা যেন সাম্প্রদায়িক মূঢ়তায় আমরা পথিমধ্যে বিস্মৃত হয়ে না বসে থাকি। জগতে তোমার বিচিত্র আনন্দরূপের মধ্যে এক অপরূপ অরূপকে নমস্কার করি, নানাদেশে নানাকালে তোমার নানা বিধানের মধ্যে এক শাশ্বত বিধানকে আমরা মাথা পেতে নিই—ভয় দূর হ'ক, অশ্রদ্ধা দূর হ'ক, অহংকার দূর হ'ক। তোমার থেকে কিছুই বিচ্ছিন্ন নেই, সমস্তই তোমার এক অমোঘ শক্তিতে বিধৃত এবং এক মঙ্গল-সংকল্পের বিশ্বব্যাপী আকর্ষণে চালিত এই কথা নিঃসংশয়ে জেনে সর্বত্রই ভক্তিকে প্রসারিত করে নতমস্তকে জোড়হাতে তোমারই সেই নিগূঢ় সংকল্পকে দেখবার চেষ্টা করি। তোমার সেই সংকল্প কোনো দেশে বদ্ধ নয় কোনো কালে খণ্ডিত নয়, পণ্ডিতেরা তাকে ঘরে বসে গড়তে পারে না, রাজা তাকে কৃত্রিম নিয়মে বাঁধতে পারে না এই কথা নিশ্চিত জেনে এবং সেই মহা সংকল্পের সঙ্গে আমাদের সমুদয় সংকল্পকে স্বেচ্ছাপূর্বক সম্মিলিত করে দিয়ে তোমার রাজধানীর রাজপথে যাত্রা করে বেরোই; আশার আলোকে আমাদের আকাশ প্লাবিত হয়ে যাক, হৃদয় বলতে থাক্—আনন্দং পরমানন্দং, এবং আমাদের এই দেশ আপনার বেদীর উপরে আর একবার দাঁড়িয়ে উঠে মানবসমাজের সমস্ত ভেদবিভেদের উপরে এই বাণী প্রচার করে দিক—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ভাবুকতা ও পবিত্রতা

ভাবরসের জন্যে আমাদের হৃদয়ের একটা লোভ রয়েছে। আমরা কাব্য থেকে শিল্পকলা থেকে গল্প গান অভিনয় থেকে নানা উপায়ে ভাবরস সম্ভোগ করবার জন্যে নানা আয়োজন করে থাকি।

অনেক সময় আমরা উপাসনাকে সেই প্রকার ভাবের তৃপ্তিস্বরূপে অবলম্বন করতে ইচ্ছা করি। কিছুক্ষণের জন্যে একটা বিশেষ রস ভোগ করে আমরা মনে করি যেন আমরা একটা কিছু লাভ করলুম। ক্রমে এই ভোগের অভ্যাসটি একটি নেশার মতো হয়ে দাঁড়ায়। তখন মানুষ অন্যান্য রসলাভের জন্যে যেমন নানা আয়োজন করে, নানা লোক নিযুক্ত করে, নানা পণ্যদ্রব্য বিস্তার করে, এই রসের অভ্যস্ত নেশার জন্যেও সেই রকম নানাপ্রকার আয়োজন করে। যাঁরা ভালো করে বলতে পারেন সেই রকম লোক সংগ্রহ করে রসোদ্রেক করবার জন্যে নিয়মিত বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করা হয়—ভগবৎ-রস নিয়মিত যোগান দেবার নানা দোকান তৈরি হয়ে ওঠে।

এই রকম ভাবের পাওয়াকেই পাওয়া ব'লে ভুল করা মানুষের দুর্বলতার একটি লক্ষণ। সংসারে নানাপ্রকারে আমরা তার পরিচয় পাই। এমন লোক দেখা যায় যারা অতি সহজেই গদ্‌গদ হয়ে ওঠে, সহজেই গলা জড়িয়ে ধরে মানুষকে ভাই বলতে পারে—যাদের দয়া সহজেই প্রকাশ পায়, অশ্রু সহজেই নিঃসারিত হয় এবং সেইরূপ ভাব-অনুভব ও ভাব-প্রকাশকেই তারা ফললাভ বলে গণ্য করে। সুতরাং ওইখানেই থেমে পড়ে, আর বেশিদূর যায় না।

এই ভাবের রসকে আমি নিরর্থক বলি নে। কিন্তু একেই যদি লক্ষ্য বলে ভুল করি তাহলে এই জিনিসটি যে কেবল নিরর্থক হয় তা নয়, এ অনিষ্টকর হয়ে ওঠে। এই ভাবকেই লক্ষ্য বলে ভুল মানুষ সহজেই করে, কারণ এর মধ্যে একটা নেশা আছে।

ঈশ্বরের আরাধনা-উপাসনার মধ্যে দুটি পাবার পন্থা আছে।

গাছ দুরকম করে খাদ্য সংগ্রহ করে। এক তার পল্লবগুলি দিয়ে বাতাস ও আলোক থেকে নিজের পুষ্টি গ্রহণ করে—আর এক তার শিকড় থেকে সে নিজের খাদ্য আকর্ষণ করে নেয়।

কখনো বৃষ্টি হচ্ছে, কখনো রৌদ্র উঠছে, কখনো শীতের বাতাস দিচ্ছে, কখনো বসন্তের হাওয়া বইছে—পল্লবগুলি চঞ্চল হয়ে উঠে তারই থেকে আপনার যা নেবার তা নিচ্ছে। তার পরে আবার শুকিয়ে ঝরে পড়ছে—আবার নতুন পাতা উঠছে।

কিন্তু শিকড়ের চাঞ্চল্য নেই। সে নিরন্ত স্তব্ধ হয়ে দৃঢ় হয়ে গভীরতার মধ্যে নিজেকে বিকীর্ণ করে দিয়ে নিরত আপনার খাদ্য নিজের একান্ত চেষ্টায় গ্রহণ করছে।

আমাদেরও শিকড় এবং পল্লব এই দুটো দিক আছে। আমাদের আধ্যাত্মিক খাদ্য এই দুই দিক থেকেই নিতে হবে।

শিকড়ের দিক থেকে নেওয়া হচ্ছে প্রধান ব্যাপার। এইটিই হচ্ছে চরিত্রের দিক, এটা ভাবের দিক নয়। উপাসনার মধ্যে এই চরিত্র দিয়ে যা আমরা গ্রহণ করি তাই আমাদের প্রধান খাদ্য। সেখানে চাঞ্চল্য নেই, সেখানে বৈচিত্র্যের অন্বেষণ নেই— সেইখানেই আমরা শান্ত হই, স্তব্ধ হই, ঈশ্বরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হই। সেই জায়গাটির কাজ বড়ো অলক্ষ্য বড়ো গভীর। সে ভিতরে ভিতরে শক্তি ও প্রাণ সঞ্চার করে কিন্তু ভাব-ব্যক্তির দ্বারা নিজেকে প্রকাশ করে না। সে ধারণ করে, পোষণ করে এবং গোপনে থাকে।

এই চরিত্র যে-শক্তির দ্বারা প্রাণ বিস্তার করে তাকে বলে নিষ্ঠা। সে অশ্রুপূর্ণ ভাবের আবেগ নয়, সে নিষ্ঠা। সে নড়তে চায় না, সে যেখানে ধরে আছে সেখানে ধরেই আছে, কেবলই গভীর থেকে গভীরতরে গিয়ে নাবছে। সে শুদ্ধচারিণী স্নাত পবিত্র সেবিকার মতো সকলের নিচে জোড়হাতে ভগবানের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে— দাঁড়িয়েই আছে।

হৃদয়ের কত পরিবর্তন। আজ তার যে-কথায় তৃপ্তি কাল তার তাতে বিতৃষ্ণা। তার মধ্যে জোয়ার ভাঁটা খেলছে, কখনো তার উল্লাস কখনো অবসাদ। গাছের পল্লবের মতো তার বিকাশ আজ নূতন হয়ে উঠছে কাল জীর্ণ হয়ে পড়ছে। এই পল্লবিত চঞ্চল হৃদয় নব নব ভাব-সংস্পর্শের জন্য ব্যাকুলতায় স্পন্দিত।

কিন্তু মূলের সঙ্গে চরিত্রের সঙ্গে যদি তার অবিচলিত অবিচ্ছিন্ন যোগ না থাকে তাহলে এই সকল ভাব-সংস্পর্শ তার পক্ষে আঘাত ও বিনাশেরই কারণ হয়। যে-গাছের শিকড় কেটে দেওয়া হয়েছে সূর্যের আলো তাকে শুকিয়ে ফেলে, বৃষ্টির জল তাকে পচিয়ে দেয়।

আমাদের চরিত্রের ভিতরকার নিষ্ঠা যদি যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য জোগানো বন্ধ করে দেয় তাহলে ভাবের ভোগ আমাদের পুষ্টিসাধন করে না কেবল বিকৃতি জন্মাতে থাকে। দুর্বল ক্ষীণ চিত্তের পক্ষে ভাবের খাদ্য কুপথ্য হয়ে ওঠে।

চরিত্রের মূল থেকে প্রত্যহ আমরা পবিত্রতা লাভ করলে তবেই ভাবুকতা আমাদের সহায় হয়। ভাবরসকে খুঁজে বেড়াবার দরকার নেই; সংসারে ভাবের বিচিত্র প্রবাহ নানা দিক থেকে আপনিই এসে পড়ছে। পবিত্রতাই সাধনার সামগ্রী। সেটা বাইরের

থেকে বর্ষিত হয় না—সেটা নিজের থেকে আকর্ষণ করে নিতে হয়। এই পবিত্রতাই আমাদের মূলের জিনিস, আর ভাবুকতা পল্লবের।

প্রত্যহ আমাদের উপাসনায় আমরা সুগভীর নিস্তব্ধভাবে সেই পবিত্রতা গ্রহণের দিকেই আমাদের চেতনাকে যেন উদ্বোধিত করে দিই। আর বেশি কিছু নয়, আমরা প্রতিদিন প্রভাতে সেই যিনি শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করব। তাঁকে নত হয়ে প্রণাম করে বলব, তোমার পায়ের ধুলো নিলুম আমার ললাট নির্মল হয়ে গেল। আজ আমার সমস্ত দিনের জীবনযাত্রার পাথেয় সঞ্চিত হল। প্রাতে তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়েছি, তোমাকে প্রণাম করেছি, তোমার পদধূলি মাথায় তুলে সমস্ত দিনের কর্মে নির্মল সতেজভাবে তার পরিচয় গ্রহণ করব।

২ ফাল্গুন, ১৩১৫

অন্তর বাহির

আমরা মানুষ, মানুষের মধ্যে জন্মেছি। এই মানুষের সঙ্গে নানাপ্রকারে মেলবার জন্যে, তাদের সঙ্গে নানাপ্রকার আবশ্যকের ও আনন্দের আদানপ্রদান চালাবার জন্যে আমাদের অনেকগুলি প্রবৃত্তি আছে।

আমরা লোকালয়ে যখন থাকি তখন মানুষের সংসর্গে উত্তেজিত হয়ে সেই সমস্ত প্রবৃত্তি নানাদিকে নানাপ্রকারে নিজেকে প্রয়োগ করতে থাকে। কত দেখাশোনা, কত হাস্যালাপ, কত নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ, কত লীলাখেলায় সে যে নিজেকে ব্যাপৃত করে তার সীমা নেই।

মানুষের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক প্রেমবশতই যে আমাদের এই চাঞ্চল্য এবং উদ্যম প্রকাশ পায় তা নয়। সামাজিক এবং প্রেমিক একই লোক নয়—অনেক সময় তার বিপরীতই দেখতে পাই। অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় সামাজিক ব্যক্তির মনে গভীরতর প্রেম ও দয়ার স্থান নেই।

সমাজ আমাদের ব্যাপৃত রাখে;—নানা প্রকার সামাজিক আলাপ, সামাজিক কাজ, সামাজিক আমোদ সৃষ্টি করে আমাদের মনের উদ্যমকে আকর্ষণ করে নেয়। এই উদ্যমকে কোন্ কাজে লাগিয়ে কেমন করে মনকে শান্ত করব সে-কথা আর চিন্তা করতেই হয় না—লোক-লৌকিকতার বিচিত্র কৃত্রিম নালায় আপনি সে প্রবাহিত হয়ে যায়।

যে-ব্যক্তি অমিতব্যয়ী সে যে লোকের দুঃখ দূর করবার জন্যে দান করে নিজেকে নিঃস্ব করে তা নয়—ব্যয় করবার প্রবৃত্তিকে সে সংবরণ করতে পারে না। নানা রকমের খরচ করে তার উদ্যম ছাড়া পেয়ে খেলা করে খুশি হয়।

সমাজে আমাদের সামাজিকতা বহুলাংশে সেই ভাবে নিজের শক্তিকে খরচ করে, সে যে সমাজের লোকের প্রতি বিশেষ প্রীতিবশত তা নয় কিন্তু নিজেকে খরচ করে ফেলবার একটা প্রবৃত্তিবশত।

চর্চা দ্বারা এই প্রবৃত্তি কীরকম অপরিমিতরূপে বেড়ে উঠতে পারে তা য়ুরোপে যারা সমাজ-বিলাসী তাদের জীবন দেখলে বোঝা যায়। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত তাদের বিশ্রাম নেই—উত্তেজনার পর উত্তেজনার আয়োজন। কোথায় শিকার, কোথায় নাচ, কোথায় খেলা, কোথায় ভোজ, কোথায় ঘোড়দৌড় এই নিয়ে তারা উন্মত্ত। তাদের জীবন কোনো লক্ষ্য স্থির করে কোনো পথ বেয়ে চলছে না, কেবল দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি এই উন্মাদনার রাশিচক্রে ঘুরছে।

আমাদের জীবনীশক্তির মধ্যে এত বেশি বেগ নেই বলে আমরা এতদূর যাই নে কিন্তু আমরাও সমস্ত দিন অপেক্ষাকৃত মৃদুতর ভাবে সামাজিক বাঁধা পথে কেবলমাত্র মনের শক্তিকে খরচ করবার জন্যেই খরচ করে থাকি। মনকে মুক্তি দেবার, শক্তিকে খাটিয়ে নেবার আর কোনো উপায় আমরা জানি নে।

দানে এবং ব্যয়ে অনেক তফাত। আমরা মানুষের জন্যে যা দান করি তা এক দিকে খরচ হয়ে অন্যদিকে মঙ্গলে পূর্ণ হয়ে ওঠে, কিন্তু মানুষের কাছে যা ব্যয় করি তা কেবলমাত্রই খরচ। তাতে দেখতে পাই আমাদের গভীরতর চিত্ত কেবলই নিঃস্ব হতে থাকে, সে ভরে ওঠে না। তার শক্তি হ্রাস হয়, তার ক্লান্তি আসে, অবসাদ আসে—নিজের রিক্ততা ও ব্যর্থতার ধিক্কারকে ভুলিয়ে রাখবার জন্যে কেবলই তাকে নূতন নূতন কৃত্রিমতা রচনা করে চলতে হয়—কোথাও থামতে গেলেই তার প্রাণ বেরিয়ে যায়।

এইজন্যে যাঁরা সাধক, পরমার্থ লাভের জন্যে নিজের শক্তিকে যাঁদের খাটানো আবশ্যক, তাঁরা অনেক সময়ে পাহাড়ে পর্বতে নির্জনে লোকালয় থেকে দূরে চলে যান। শক্তির নিরন্তর অজস্র অপব্যয়কে তাঁরা বাঁচাতে চান।

কিন্তু বাইরে এই নির্জনতা এই পর্বতগুহা কোথায় খুঁজে বেড়াব? সে তো সব সময় জোটে না। এবং মানুষকে একেবারে ত্যাগ করে যাওয়াও তো মানুষের ধর্ম নয়।

এই নির্জনতা এই পর্বতগুহা এই সমুদ্রতীর আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছে—আমাদের অন্তরের মধ্যেই আছে। যদি না থাকত তাহলে নির্জনতায় পর্বতগুহায় সমুদ্রতীরে তাকে পেতুম না।

সেই অন্তরের নিভৃত আশ্রমের সঙ্গে আমাদের পরিচয় সাধন করতে হবে। আমরা বাইরেকেই অত্যন্ত বেশি করে জানি, অন্তরের মধ্যে আমাদের যাতায়াত প্রায় নেই, সেই জন্যেই আমাদের জীবনের ওজন নষ্ট হয়ে গেছে। অর্থাৎ আমরা নিজের সমস্ত শক্তিকে বাইরেই অহরহ এই যে নিঃশেষ করে ফতুর হয়ে যাচ্ছি—বাইরের সংস্রব পরিহার করাই তার প্রতিকার নয়, কারণ মানুষকে ছেড়ে মানুষকে চলে যেতে বলা, রোগের চেয়ে চিকিৎসাকে গুরুতর করে তোলা। এর যথার্থ প্রতিকার হচ্ছে ভিতরের দিকেও আপনার প্রতিষ্ঠা লাভ করে অন্তরে বাহিরে নিজের সামঞ্জস্য স্থাপন করা। তাহলেই জীবন সহজেই নিজেকে উন্মত্ত অপব্যয় থেকে রক্ষা করতে পারে।

নইলে একদল ধর্মলুব্ধ লোককে দেখতে পাই তারা নিজের কথাকে, হাসিকে, উদ্যমকে কেবলই মানদণ্ড হাতে করে হিসাবি কৃপণের মতো খর্ব করছে। তারা নিজের বরাদ্দ যতদূর কমানো সম্ভব তাই কমিয়ে নিজের মনুষ্যত্বকে কেবলই শুষ্ক কৃশ আনন্দহীন করাকেই সিদ্ধির লক্ষণ বলে মনে করছে।

কিন্তু এমন করলে চলবে না। আর যাই হ'ক মানুষকে সম্পূর্ণ সহজ হতে হবে উদ্দামভাবে বেহিসাবি হলেও চলবে না, কৃপণভাবে হিসাবি হলেও চলবে না।

এই মাঝখানের রাস্তায় দাঁড়াবার উপায় হচ্ছে, বাহিরের লোকালয়ের মধ্যে থেকেও অন্তরের নিভৃত নিকেতনের মধ্যে নিজের প্রতিষ্ঠা রক্ষা করা। বাহিরই আমাদের একমাত্র নয় অন্তরেই আমাদের গোড়াকার আশ্রয় রয়েছে তা বারংবার সকল আলাপের মধ্যে, আমোদের মধ্যে, কাজের মধ্যে অনুভব করতে হবে। সেই নিভৃত ভিতরের পথটিকে এমনি সরল করে তুলতে হবে যে, যখন-তখন ঘোরতর কাজকর্মের গোলযোগেও ধাঁ করে সেইখানে একবার ঘুরে আসা কিছুই শক্ত হবে না।

সেই যে আমাদের ভিতরের মহলটি আমাদের জনতাপূর্ণ কলরবমুখর কাজের ক্ষেত্রের মাঝখানে একটি অবকাশকে সর্বদা ধারণ করে আছে বেষ্টন করে আছে, এই অবকাশ তো কেবল শূন্যতা নয়। তা স্নেহে প্রেমে আনন্দে কল্যাণে পরিপূর্ণ। সেই অবকাশটিই হচ্ছেন তিনি যাঁর দ্বারা উপনিষৎ জগতের সমস্ত কিছুকেই আচ্ছন্ন দেখতে বলেছেন। ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। সমস্ত কাজকে বেষ্টন করে সমস্ত মানুষকে বেষ্টন করে সর্বত্রই সেই পরিপূর্ণ অবকাশটি আছেন; তিনিই পরস্পরের যোগসাধন করছেন এবং পরস্পরের সংঘাত নিবারণ করছেন। সেই তাঁকেই নিভৃত চিত্তের মধ্যে নির্জন অবকাশরূপে নিরন্তর উপলব্ধি করবার অভ্যাস করো, শান্তিতে মঙ্গলে ও প্রেমে নিবিড়ভাবে পরিপূর্ণ অবকাশরূপে তাঁকে হৃদয়ের মধ্যে সর্বদাই জানো। যখন হাসছ খেলছ কাজ করছ তখনও একবার সেখানে যেতে

যেন কোনো বাধা না থাকে—বাহিরের দিকেই একেবারে কাত হয়ে উল্টে পড়ে তোমার সমস্ত কিছুকেই নিঃশেষ করে ঢেলে দিয়ো না। অন্তরের মধ্যে সেই প্রগাঢ় অমৃতময় অবকাশকে উপলব্ধি করতে থাকলে তবেই সংসার আর সংকটময় হয়ে উঠবে না, বিষয়ের বিষ আর জমে উঠতে পারবে না—বায়ু দূষিত হবে না, আলোক মলিন হবে না, তাপে সমস্ত মন তপ্ত হয়ে উঠবে না।

ভাবো তাঁরে অন্তরে যে বিরাজে, অন্য কথা ছাড়ো না।
সংসার সংকটে ত্রাণ নাহি কোনোমতে বিনা তাঁর সাধনা।

৩ ফাল্গুন

তীর্থ

আজ আবার বলছি—ভাবো তাঁরে অন্তরে যে বিরাজে! এই কথা যে প্রতিদিন বলার প্রয়োজন আছে। আমাদের অন্তরের মধ্যেই যে আমাদের চির আশ্রয় আছেন এ-কথা বলার প্রয়োজন কবে শেষ হবে?

কথা পুরাতন হয়ে ম্লান হয়ে আসে, তার ভিতরকার অর্থ ক্রমে আমাদের কাছে জীর্ণ হয়ে ওঠে, তখন তাকে আমরা অনাবশ্যক বলে পরিহার করি। কিন্তু প্রয়োজন দূর হয় কই?

সংসারে এই বাহিরটাই আমাদের সুপরিচিত, এইজন্যে বাহিরকেই আমাদের মন একমাত্র আশ্রয় বলে জানে। আমাদের অন্তরে যে অনন্ত জগৎ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে সেটা যেন আমাদের পক্ষে একেবারেই নেই। যদি তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় বেশ সুস্পষ্ট হত তাহলে বাহিরের একাধিপত্য আমাদের পক্ষে এমন উদগ্র হয়ে উঠত না; তাহলে বাহিরে একটা ক্ষতি হবামাত্র সেটাকে এমন একান্ত ক্ষতি বলে মনে করতে পারতুম না, এবং বাহিরের নিয়মকেই চরম নিয়ম মনে করে তার অনুগত হয়ে চলাকেই আমাদের একমাত্র গতি বলে স্থির করতুম না।

আজ আমাদের মানদণ্ড, তুলাদণ্ড, কষ্টিপাথর সমস্তই বাইরে। লোকে কী বলবে, লোকে কী করবে সেই অনুসারেই আমাদের ভালোমন্দ সমস্ত ঠিক করে বসে আছি—এইজন্য লোকের কথা আমাদের মর্মে বাজে, লোকের কাজ আমাদের এমন করে বিচলিত করে, লোকভয় এমন চরম ভয়, লোকলজ্জা এমন একান্ত লজ্জা। এইজন্যে লোকে যখন আমাদের ত্যাগ করে তখন মনে হয় জগতে আমার আর কেউ নেই। তখন আমরা এ-কথা বলবার ভরসা পাই নে যে—

সবাই ছেড়েছে নাই যার কেহ,
তুমি আছ তার, আছে তব স্নেহ,
নিরাশ্রয় জন পথ যার গেহ
সেও আছে তব ভবনে।

সবাই যাকে পরিত্যাগ করেছে তার আত্মার মধ্যে সে যে এক মুহূর্তের জন্যে পরিত্যক্ত নয়; পথ যার গৃহ তার অন্তরের আশ্রয় যে কোনো মহাশক্তি অত্যাচারীও এক মুহূর্তের জন্যে কেড়ে নিতে পারে না; অন্তর্যামীর কাছে যে ব্যক্তি অপরাধ করে নি বাইরের লোক যে তাকে জেলে দিয়ে ফাঁসি দিয়ে কোনোমতেই দণ্ড দিতে পারে না।

অরাজক রাজত্বের প্রজার মতো আমরা সংসারে আছি, আমাদের কেউ রক্ষা করছে না, আমরা বাইরে পড়ে রয়েছি, আমাদের নানা শক্তিকে নানাদিকে কেড়েকুড়ে নিচ্ছে, কত অকারণ লুটপাট হয়ে যাচ্ছে তার ঠিকানা নেই। যার অস্ত্র শাণিত সে আমাদের মর্ম বিদ্ধ করছে, যার শক্তি বেশি সে আমাদের পায়ের তলায় রাখছে। সুখসমৃদ্ধির জন্যে আত্মরক্ষার জন্যে দ্বারে দ্বারে নানা লোকের শরণাপন্ন হয়ে বেড়াচ্ছি। একবার খবরও রাখি নে যে, অন্তরাত্মার অচল সিংহাসনে আমাদের রাজা বসে আছেন।

সেই খবর নেই বলেই তো সমস্ত বিচারের ভার বাইরের লোকের উপর দিয়ে বসে আছি, এবং আমিও অন্য লোককে বাইরে থেকে বিচার করছি। কাউকে সত্যভাবে ক্ষমা এবং নিত্যভাবে প্রীতি করতে পারছি নে, মঙ্গল-ইচ্ছা কেবলই সংকীর্ণ ও প্রতিহত হয়ে যাচ্ছে।

যতদিন সেই সত্যকে, সেই মঙ্গলকে, সেই প্রেমকে সম্পূর্ণ সহজভাবে না পাই, ততদিন প্রত্যহই বলতে হবে—ভাবো তাঁরে অন্তরে যে বিরাজে। নিজের অন্তরাত্মার মধ্যে সেই সত্যকে যথার্থ উপলব্ধি করতে না পারলে অন্যের মধ্যেও সেই সত্যকে দেখতে পাব না এবং অন্যের সঙ্গে আমাদের সত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হবে না। যখন জানব যে পরমাত্মার মধ্যে আমি আছি এবং আমার মধ্যে পরমাত্মা রয়েছেন তখন অন্যের দিকে তাকিয়ে নিশ্চয় দেখতে পাব সেও পরমাত্মার মধ্যে রয়েছে এবং পরমাত্মা তার মধ্যে রয়েছেন—তখন তার প্রতি ক্ষমা প্রীতি সহিষ্ণুতা আমার পক্ষে সহজ হবে, তখন সংযম কেবল বাহিরের নিয়মপালনমাত্র হবে না। যে-পর্যন্ত তা না হয়, যে-পর্যন্ত বাহিরই আমাদের কাছে একান্ত, যে-পর্যন্ত বাহিরই সমস্তকে অত্যন্ত আড়াল করে দাঁড়িয়ে সমস্ত অবকাশ রোধ করে ফেলে—সে-পর্যন্ত কেবলই বলতে হবে—

ভাবো তাঁরে অন্তরে যে বিরাজে, অন্য কথা ছাড়ো না।
সংসার সংকটে ত্রাণ নাহি কোনোমতে বিনা তাঁর সাধনা।

কেননা, সংসারকে একমাত্র জানলেই সংসার সংকটময় হয়ে ওঠে—তখনই সে অসহায় অনাথকে পেয়ে বসে, তার সর্বনাশ করে ছাড়ে।

প্রতিদিন এস, অন্তরে এস। সেখানে সব কোলাহল নিরস্ত হ'ক, কোনো আঘাত না পৌঁছোক, কোনো মলিনতা না স্পর্শ করুক। সেখানে ক্রোধকে পালন ক'রো না, ক্ষোভকে প্রশ্রয় দিয়ো না, বাসনাগুলিকে হাওয়া দিয়ে জ্বালিয়ে রেখো না, কেননা সেই-খানেই তোমার তীর্থ, তোমার দেবমন্দির। সেখানে যদি একটু নিরালা না থাকে তবে জগতে কোথাও নিরালা পাবে না, সেখানে যদি কলুষ পোষণ কর তবে জগতে তোমার সমস্ত পুণ্যস্থানের ফটক বন্ধ। এস সেই অক্ষুব্ধ নির্মল অন্তরের মধ্যে এস, সেই অনন্তের সিন্ধুতীরে এস, সেই অত্যুচ্চের গিরিশিখরে এস। সেখানে করজোড়ে দাঁড়াও, সেখানে নত হয়ে নমস্কার করো। সেই সিন্ধুর উদার জলরাশি থেকে, সেই গিরিশৃঙ্গের নিত্যবহমান নির্ঝরধারা থেকে পুণ্যসলিল প্রতিদিন উপাসনান্তে বহন করে নিয়ে তোমার বাহিরের সংসারের উপর ছিটিয়ে দাও; সব পাপ যাবে, সব দাহ দূর হবে।

৪ ফাল্গুন

বিভাগ

ভিতরের সঙ্গে বাহিরের যে একটি সুনির্দিষ্ট বিভাগ থাকলে আমাদের জীবন সুবিহিত সুশৃঙ্খল সুসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে সেইটে আমাদের ঘটে নি।

বিভাগটি ভালোরকম না হলে ঐক্যটিও ভালোরকম হয় না। অপরিণতি যখন পিণ্ডাকারে থাকে, যখন তার কলেবর বৈচিত্র্যে বিভক্ত না হয়েছে, তখন তার মধ্যে একের মূর্তি পরিস্ফুট হয় না।

আমাদের মধ্যে খুব একটি বড়ো বিভাগের স্থান আছে, সেটি হচ্ছে অন্তর এবং বাহিরের বিভাগ। যতদিন সেই বিভাগটি বেশ সুনির্দিষ্ট না হবে ততদিন অন্তর ও বাহিরের ঐক্যটিও পরিপূর্ণ তাৎপর্যে সুন্দর হয়ে উঠবে না।

এখন আমাদের এমনি হয়েছে আমাদের একটি মাত্র মহল। স্বার্থপরমার্থ নিত্য-অনিত্য সমস্তই আমাদের ওই এক জায়গায় যেমন-তেমন করে রাখা ছাড়া উপায় নেই। সেইজন্যে একটা অন্যটাকে আঘাত করে, বাধা দেয়, একের ক্ষতি অন্যের ক্ষতি হয়ে ওঠে।

যে-জিনিসটা বাহিরের তাকে বাহিরেই রাখতে হবে তাকে অন্তরে নিয়ে গিয়ে তুললে

সেখানে সেটা জঞ্জাল হয়ে ওঠে। যেখানে যার স্থান নয় সেখানে সে যে অনাবশ্যক তা নয় সেখানে সে অনিষ্টকর।

অতএব আমাদের জীবনের প্রধান সাধনাই এই বাহিরের জিনিস যাতে বাহিরেই থাকতে পারে ভিতরে গিয়ে যাতে সে বিকারের সৃষ্টি না করে।

সংসারে আমাদের পদে পদে ক্ষতি হয়, আজ যা আছে কাল তা থাকে না। সেই ক্ষতিকে আমরা বাহিরের সংসারেই কেন রাখি না, তাকে আমরা ভিতরে নিয়ে গিয়ে তুলি কেন?

গাছের পাতা আজ কিশলয়ে উদ্‌গত হয়ে কাল জীর্ণ হয়ে ঝরে পড়ে। কিন্তু সে তো বাইরেই ঝরে পড়ে যায়। সেই তার বাহিরের অনিবার্য ক্ষতিকে গাছ তার মজ্জার ভিতরে তো পোষণ করে না। বাহিরের ক্ষতি বাইরেই থাকে, অন্তরের পুষ্টি অন্তরেই অব্যাহতভাবে চলে।

কিন্তু আমরা সেই ভেদটুকুকে রক্ষা করি নে। আমরা বাইরের সমস্ত জমাখরচ ভিতরের খাতাতে পাকা করে লিখে অমন সোনার জলে বাঁধানো দামি বইটাকে নষ্ট করি। বাইরের বিকারকে ভিতরে পাপকল্পনারূপে চিহ্নিত করি, বাইরের আঘাতকে ভিতরে বেদনায় জমা করে রাখতে থাকি।

আমাদের ভিতরের মহলে একটা স্থায়িত্বের ধর্ম আছে—সেখানে জমা করবার জায়গা। এইজন্যে সেখানে এমন কিছু নিয়ে গিয়ে ফেলা ঠিক নয় যা জমাবার জিনিস নয়। তা নিতে গেলেই বিকারকে স্থায়ী করে তোলা হয়। মৃতদেহকে কেউ অন্তঃপুরের ভাণ্ডারে তুলে রাখে না, তাকে বাইরে মাটিতে, জলে বা আগুনেই সমর্পণ করে দিতে হয়।

মানুষের মধ্যে এই দুটি কক্ষ আছে, স্থায়িত্বের এবং অস্থায়িত্বের—অন্তরের এবং সংসারের।

অন্য জন্তুদের মধ্যেও সেটা অস্ফুটভাবে আছে—তেমন গভীরভাবে নেই। সেইজন্যে অন্য জন্তুরা একটা বিপদ থেকে বেঁচে গেছে। তারা, যেটা স্থায়ী নয় সেটাকে স্থায়ী করবার চেষ্টাও করে না, কারণ, স্থায়ী করবার উপায় তাদের হাতে নেই।

মানুষও অস্থায়ীকে একেবারে চিরস্থায়িত্ব দান করতে পারে না বটে কিন্তু অন্তরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে তার উপরে স্থায়িত্বের মালমসলা প্রয়োগ ক'রে তাকে যতদিন পারে টিঁকিয়ে রাখতে ত্রুটি করে না। তার অন্তরপ্রকৃতি নাকি স্থায়িত্বের নিকেতন এই জন্যেই তার সুবিধাটা ঘটেছে।

তার ফল হয়েছে এই যে, জন্তুদের মধ্যে যে-সকল প্রবৃত্তি প্রয়োজনের অনুগত হয়ে

আপন স্বাভাবিক কর্ম সমাধা করে একেবারে নিরস্ত হয়ে যায় মানুষ তাকে নিজের অন্তরের মধ্যে নিয়ে কল্পনার রসে ডুবিয়ে তাকে সঞ্চিত করে রাখে। প্রয়োজন সাধনের সঙ্গে সঙ্গে তাকে মরতে দেয় না। এইজন্যে বাইরে যথাস্থানে যার একটি যাথার্থ্য আছে অন্তরের মধ্যে সে পাপরূপে স্থায়ী হয়ে বসে। বাইরে যে-জিনিসটা অন্ন-সংগ্রহ-চেষ্টারূপে প্রাণ রক্ষা করবার উপায়, তাকেই যদি ভিতরে টেনে নিয়ে সঞ্চিত কর তবে সেইটেই তৃপ্তিহীন ঔদরিকতার নিত্যমূর্তি ধারণ করে স্বাস্থ্যকে নষ্ট করতেই থাকে।

তাই দেখতে পাচ্ছি আমাদের মধ্যে এই নিত্যের নিকেতন, পুণ্যের নিকেতন আছে বলেই আমাদের মধ্যে পাপের স্থান আছে। যা অনিত্য, বিশেষ সাময়িক প্রয়োজনে বিশেষ স্থানে যার প্রয়োগ এবং তার পরে যার শান্তি, তাকেই আমাদের অন্তরের নিত্যনিকেতনে নিয়ে বাঁধিয়ে রাখা এবং প্রত্যহই তার অনাবশ্যক খাদ্য জোগানোর জন্যে ঘুরে মরা, এইটেই হচ্ছে পাপ।

পুরাণে বলেছে অমৃত দেবতারই ভোগ্য, তা দৈত্যের খাদ্য নয়। যে-দৈত্য চুরি করে সেই অমৃত পান করেছিল তারই মাথাটা রাহু এবং লেজটা কেতু আকারে বৃথা বেঁচে থেকে নিদারুণ অমঙ্গলরূপে সমস্ত জগৎকে দুঃখ দিচ্ছে।

আমাদের যে-অন্তরভাণ্ডার দেবভোগ্য অমৃতের পাত্র রক্ষা করবার আগার, সেইখানে যদি দৈত্যকে গোপনে প্রবেশ করবার অধিকার দিই তবে সে চুরি করে অমৃত পান করে অমর হয়ে ওঠে। তার পর থেকে প্রতিদিন সেই বিকট অমঙ্গলটার খোরাক জোগাতে আমাদের স্বাস্থ্য সুখ সম্বল সংগতি নিঃশেষ হয়ে যায়। অমৃতের ভাণ্ডার আছে বলেই আমাদের এই দুর্গতি।

এই অমৃতের নিত্যনিকেতনে দৈত্যের কোনো অধিকার নেই বটে কিন্তু বাহিরে কর্মের ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন যথেষ্ট। সে দুর্গম পথে ভার বহন করতে পারে, সে পর্বত বিদীর্ণ করে পথ করে দিতে পারে। তাকে দাসের বেতন যদি দাও তবে সে প্রভুর কাজ উদ্ধার করে দিয়ে কৃতার্থ হয়। কিন্তু অমৃত তো দাসের বেতন নয়, সে যে দেবতার পূজার ভোগ-সামগ্রী। তাকে অপাত্রে উৎসর্গ করাই পাপ। যাকে যথাকালে বাইরে থেকে মরতে দেওয়াই উচিত তাকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বাঁচিয়ে রাখলেই নিজের হাতে পাপকে সৃষ্টি করা হয়।

তাই বলছিলুম, যেটা বাইরের সেটাকে বাইরে রাখবার সাধনাই জীবনযাত্রার সাধনা।

৫ ফাল্গুন ১৩১৫

দ্রষ্টা

অন্তরকে বাইরের আক্রমণ থেকে বাঁচাও। দুইকে মিশিয়ে এক করে দেখো না। সমস্তটাকেই কেবলমাত্র সংসারের অন্তর্গত করে জেনো না। তা যদি কর তবে সংসার-সংকট থেকে উদ্ধার পাবার কোনো রাস্তা খুঁজে পাবে না।

থেকে থেকে ঘোরতর কর্মসংঘাতের মাঝখানেই নিজের অন্তরকে নির্লিপ্ত বলে অনুভব ক'রো। এই রকম ক্ষণে ক্ষণে বারংবার উপলব্ধি করতে হবে। খুব কোলাহলের ভিতরে থেকে একবার চকিতের মতো দেখে নিতে হবে, সেই অন্তরের মধ্যে কোনো কোলাহল পৌঁছোচ্ছে না। সেখানে শান্ত স্তব্ধ নির্মল। না, কোনোমতেই সেখানে বাহিরের কোনো চাঞ্চল্যকে প্রবেশ করতে দেব না। এই যে আনাগোনা, লোকলৌকিকতা, হাসি-খেলার মহা জনতা, এর মধ্যে বিদ্যুদ্বেগে একবার অন্তরের অন্তরে ঘুরে এস—দেখে এস সেখানে নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপটি জ্বলছে, অনুত্তরঙ্গ সমুদ্র আপন অতলস্পর্শ গভীরতায় স্থির হয়ে রয়েছে, শোকের ক্রন্দন সেখানে পৌঁছোয় না, ক্রোধের গর্জন সেখানে শান্ত।

এই বিশ্বসংসারে এমন কিছু নেই, একটি কণাও নেই যার মধ্যে পরমাত্মা ওতপ্রোত হয়ে না রয়েছেন কিন্তু তবু তিনি দ্রষ্টা—কিছুর দ্বারা তিনি অধিকৃত নন। এই জগৎ তাঁরই বটে, তিনি এর সর্বত্রই আছেন বটে কিন্তু তবু তিনি এর অতীত হয়ে আছেন।

আমাদের অন্তরাত্মাকেও সেই রকম করেই জানবে—সংসার তাঁর, শরীর তাঁর, বুদ্ধি তাঁর, হৃদয় তাঁর। এই সংসারে, শরীরে, বুদ্ধিতে, হৃদয়ে তিনি পরিব্যাপ্ত হয়েই আছেন কিন্তু তবু আমাদের অন্তরাত্মা এই সংসার, শরীর, বুদ্ধি ও হৃদয়ের অতীত। তিনি দ্রষ্টা। এই যে-আমি সংসারে জন্মলাভ করে বিশেষ নাম ধরে নানা সুখ দুঃখ ভোগ করছে এই তাঁর বহিরংশকে তিনি সাক্ষীরূপেই দেখে যাচ্ছেন। আমরা যখন আত্মবিৎ হই, এই অন্তরাত্মাকে যখন সম্পূর্ণ উপলব্ধি করি, তখন আমরা নিজের নিত্য স্বরূপকে নিশ্চয় জেনে সমস্ত সুখ-দুঃখের মধ্যে থেকেও সুখ-দুঃখের অতীত হয়ে যাই, নিজের জীবনকে সংসারকে দ্রষ্টারূপে জানি।

এমনি করে সমস্ত কর্ম থেকে, সংসার থেকে, সমস্ত ক্ষোভ থেকে বিবিক্ত করে আত্মাকে যখন বিশুদ্ধ স্বরূপে জানি তখন দেখতে পাই তা শূন্য নয়, তখন নিজের অন্তরে সেই নির্মল নিস্তব্ধ পরম ব্যোমকে সেই চিদাকাশকে দেখি যেখানে—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম নিহিতং গুহায়াং। নিজের মধ্যে সেই আশ্চর্য জ্যোতির্ময় পরম কোষকে জানতে পারি যেখানে সেই অতি শুভ্র জ্যোতির জ্যোতি বিরাজমান।

এইজন্যই উপনিষৎ বারংবার বলেছেন, অন্তরাত্মাকে জানো তাহলেই অমৃতকে জানবে, তাহলেই পরব্রহ্মকে জানবে। তাহলে সমস্তের মাঝখানে থেকেই, সকলের মধ্যে প্রবেশ করেই, কিছু পরিত্যাগ না করে মুক্তি পাবে—নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

৬ ফাল্গুন

নিত্যধাম

উপনিষৎ বলেছেন—

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।

ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জেনেছেন তিনি কদাচই ভয় পান না।

সেই ব্রহ্মের আনন্দকে কোথায় দেখব, তাকে জানব কোন্‌খানে? অন্তরাত্মার মধ্যে।

আত্মাকে একবার অন্তর-নিকেতনে, তার নিত্যনিকেতনে দেখো—যেখানে আত্মা বাহিরের হর্ষশোকের অতীত, সংসারের সমস্ত চাঞ্চল্যের অতীত, সেই নিভৃত অন্তরতম গুহার মধ্যে প্রবেশ করে দেখো—দেখতে পাবে আত্মার মধ্যে পরমাত্মার আনন্দ নিশিদিন আবির্ভূত হয়ে রয়েছে একমুহূর্ত তার বিরাম নেই। পরমাত্মা এই জীবাত্মায় আনন্দিত। যেখানে সেই প্রেমের নিরন্তর মিলন সেইখানে প্রবেশ করো, সেইখানে তাকাও। তাহলেই ব্রহ্মের আনন্দ যে কী, তা নিজের অন্তরের মধ্যেই উপলব্ধি করবে, এবং তাহলেই কোনোদিন কিছু হতেই তোমার আর ভয় থাকবে না।

ভয় তোমার কোথায়? যেখানে আধিব্যাধি জরা-মৃত্যু বিচ্ছেদ-মিলন, যেখানে আনাগোনা, যেখানে সুখদুঃখ। আত্মাকে কেবলই যদি সেই বাহিরের সংসারেই দেখ—যদি তাকে কেবলই কার্য থেকে কার্যান্তরে, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরেই উপলব্ধি করতে থাক, তাকে বিচিত্রের সঙ্গে চঞ্চলের সঙ্গেই একেবারে জড়িত মিশ্রিত করে এক করে জান, তাহলেই তাকে নিতান্ত দীন করে মলিন করে দেখবে, তাহলেই তাকে মৃত্যুর দ্বারা বেষ্টিত দেখে কেবলই শোক করতে থাকবে, যা সত্য নয় স্থায়ী নয় তাকেই আত্মার সঙ্গে জড়িত করে সত্য বলে স্থায়ী বলে ভ্রম করবে এবং শেষকালে সে-সমস্ত যখন সংসারের নিয়মে খসে পড়তে থাকবে তখন মনে হবে যেন আত্মারই ক্ষয় হচ্ছে বিনাশ হচ্ছে—এমনি করে বারংবার শোকে নৈরাশ্যে দগ্ধ হতে থাকবে। সংসারকেই তুমি ইচ্ছা করে বড় পদ দেওয়াতে সংসার তোমার দত্ত সেই জোরে তোমার আত্মাকে পদে পদে অভিভূত পরাস্ত করে দেবে। কিন্তু আত্মাকে অন্তরধামে নিত্যের মধ্যে ব্রহ্মের মধ্যে

দেখো তাহলেই হর্ষশোকের সমস্ত জোর চলে যাবে। তাহলে ক্ষতিতে, নিন্দাতে, পীড়াতে, মৃত্যুতে কিসেই বা ভয়? জয়ী, আত্মা জয়ী। আত্মা ক্ষণিক সংসারের দাসানুদাস নয়—আত্মা অনন্তে অমরতায় প্রতিষ্ঠিত। আত্মায় ব্রহ্মের আনন্দ আবির্ভূত। সেইজন্য আত্মাকে যাঁরা সত্যরূপে জানেন তাঁরা ব্রহ্মের আনন্দকে জানেন এবং ব্রহ্মের আনন্দকে যাঁরা জানেন তাঁরা—ন বিভেতি কদাচন।

পরমে ব্রহ্মণি যোজিতচিত্তঃ
নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব।

পরমব্রহ্মের মধ্যে যাঁরা আপনাকে যুক্ত করে দেখেছেন তাঁরা নন্দিত হন, নন্দিত হন, নন্দিতই হন।

আর সংসারে যাঁরা নিজেকে যুক্ত করে জানেন তাঁরা শোচতি শোচতি শোচত্যেব।

৭ ফাল্গুন ১৩১৫

পরিণয়

চারিদিকে সংসারে আমরা দেখছি—সৃষ্টিব্যাপার চলছেই। যা ব্যাপ্ত তা সংহত হচ্ছে, যা সংহত তা ব্যাপ্ত হচ্ছে। আঘাত হতে প্রতিঘাত, রূপ হতে রূপান্তর চলেইছে,—এক মুহূর্ত তার কোথাও বিরাম নেই। সকল জিনিসই পরিবর্তনের পথে চলেছে কিন্তু কোনো জিনিসেরই পরিসমাপ্তি নেই। আমাদের শরীর-বুদ্ধি-মনও প্রকৃতির এই চক্রে ঘুরছে, ক্রমাগতই তার সংযোগ বিয়োগ হ্রাসবৃদ্ধি তার অবস্থান্তর চলেছে।

প্রকৃতির এই সূর্যতারাময় লক্ষকোটি চাকার রথ ধাবিত হচ্ছে—কোথাও এর শেষ গম্যস্থান দেখি নে, কোথাও এর স্থির হবার নেই। আমরাও কি এই রথে চড়েই এই লক্ষ্যহীন অনন্তপথেই চলেছি, যেন এক জায়গায় যাবার আছে এইরকম মনে হচ্ছে অথচ কোনোকালে কোথাও পৌঁছোতে পারছি নে? আমাদের অস্তিত্বই কি এই রকম অবিশ্রাম চলা, এই রকম অনন্ত সন্ধান? এর মধ্যে কোথাও কোনোরকম প্রাপ্তির, কোনোরকম স্থিতির তত্ত্ব নেই?

এই যদি সত্য হয়, দেশকালের বাইরে আমাদের যদি কোনো গতিই না থাকে তাহলে যিনি দেশকালের অতীত, যিনি অভিব্যজ্যমান নন, যিনি আপনাতে পরিসমাপ্ত, তিনি আমাদের পক্ষে একেবারেই নেই। সেই পূর্ণতার স্থিতিধর্ম যদি আমাদের মধ্যে একান্তই না থাকে তবে অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মের প্রতি আমরা যা-কিছু বিশেষণ প্রয়োগ করি সে কেবল কতকগুলি কথা মাত্র, আমাদের কাছে তার কোনো

তা যদি হয় তবে এই ব্রহ্মের কথাটাকে একেবারেই ত্যাগ করতে হয়। যাকে কোনো কালেই পাব না তাঁকে অনন্তকাল খোঁজার মতো বিড়ম্বনা আর কী আছে? তাহলে এই কথাই বলতে হয় সংসারকেই পাওয়া যায়, সংসারই আমার আপনার, ব্রহ্ম আমার কেউ নন।

কিন্তু সংসারকেও তো পাওয়া যায় না। সংসার তো মায়ামৃগের মতো আমাদের কেবলই এগিয়ে নিয়ে দৌড় করায়, শেষ ধরা তো দেয় না। কেবলই খাটিয়ে মারে ছুটি দেয় না—ছুটি যদি দেয় তো একেবারে বরখাস্ত করে। এমন কোনো সম্বন্ধ স্বীকার করে না যা চরম সম্বন্ধ। ঠাকরা গাড়ির গাড়োয়ানের সঙ্গে ঘোড়ার যে সম্বন্ধ তার সঙ্গে আমাদেরও সেই সম্বন্ধ। অর্থাৎ সে কেবলই আমাদের চালাবে, খাওয়াবে সেও চালাবার জন্যে, মাঝে মাঝে যেটুকু বিশ্রাম করাবে সেও কেবল চালাবার জন্যে, চাবুক লাগাম সমস্তই চালাবার উপকরণ। যখন না চলব তখন খাওয়াবেও না, আস্তাবলেও রাখবে না, ভাগাড়ে ফেলে দেবে। অথচ এই চালাবার ফল ঘোড়া পায় না। ঘোড়া স্পষ্ট করে জানেও না সে ফল কে পাচ্ছে। ঘোড়া কেবল জানে যে তাকে চলতেই হবে; সে মূঢ়ের মতো কেবলই নিজেকে প্রশ্ন করছে, কোনো কিছুই পাচ্ছি নে, কোথাও গিয়ে পৌঁছোচ্ছি নে তবু দিনরাত কেবলই চলছি কেন? পেটের মধ্যে অগ্নিময় ক্ষুধার চাবুক পড়ছে, হৃদয় মনের মধ্যে কত শত জ্বালাময় ক্ষুধার চাবুক পড়ছে, কোথাও স্থির থাকতে দিচ্ছে না। এর অর্থ কী?

যাই হ'ক কথা হচ্ছে এই যে, সংসারকে তো কোনোখানেই পাচ্ছি নে, তার কোনোখানে এসেই থামছি নে—ব্রহ্মও কি সেই সংসারেরই মতো? তাঁকেও কি কোনোখানেই পাওয়া যাবে না? তিনিও কি আমাদের অনন্তকালই চালাবেন এবং সেই পাওয়াহীন চলাকেই অনন্ত উন্নতি বলে আমরা নিজের মনকে কেবলই কোনো-মতে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করব?

তা নয়। ব্রহ্মকেই পাওয়া যায়, সংসারকে পাওয়া যায় না। কারণ, সংসারের মধ্যে পাওয়ার তত্ত্ব নেই—সংসারের তত্ত্বই হচ্ছে সরে যাওয়া, সুতরাং তাকেই চরমভাবে পাবার চেষ্টা করলে কেবল দুঃখই পাওয়া হবে। কিন্তু ব্রহ্মকেও চরমভাবে পাবার চেষ্টা করলে কেবল চেষ্টাই সার হবে একথা বলা কোনোমতেই চলবে না। পাওয়ার তত্ত্ব কেবল একমাত্র ব্রহ্মেই আছে। কেননা তিনিই হচ্ছেন সত্য।

আমাদের অন্তরাত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে পাওয়া পরিসমাপ্ত হয়ে আছে। আমরা যেমন যেমন বুদ্ধিতে হৃদয়ে উপলব্ধি করছি তেমনি তেমনি তাঁকে পাচ্ছি—এ হতেই পারে না। অর্থাৎ যেটা ছিল না সেইটেকে আমরা গড়ে তুলছি, তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধটা আমাদের

নিজের এই ক্ষুদ্র হৃদয় ও বুদ্ধির দ্বারা সৃষ্টি করছি এ ঠিক নয়। এই সম্বন্ধ যদি আমাদেরই দ্বারা গড়া হয় তবে তার উপরে আস্থা রাখা চলে না, তবে সে আমাদের আশ্রয় দিতে পারবে না। আমাদের মধ্যেই একটি নিত্যধাম আছে। সেখানে দেশ-কালের রাজত্ব নয়, সেখানে ক্রমশ সৃষ্টির পালা নেই। সেই অন্তরাত্মার নিত্যধামে পরমাত্মার পূর্ণ আবির্ভাব পরিসমাপ্ত হয়েই আছে। তাই উপনিষৎ বলছেন—

সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্ সোঽশ্নুতে সর্বানি কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।

সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যোম যে পরম ব্যোম যে চিদাকাশ অন্তরাকাশ সেইখানে আত্মার মধ্যে যিনি সত্যজ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মকে গভীরভাবে অবস্থিত জানেন তাঁর সমস্ত বাসনা পরিপূর্ণ হয়।

ব্রহ্ম কোনো একটি অনির্দেশ্য অন্তরের মধ্যে পরিপূর্ণ হয়ে আছেন একথা বলবার কোনো মানে নেই। তিনি আমাদেরই অন্তরাকাশে আমাদেরই অন্তরাত্মায় সত্যং জ্ঞানমনন্তং রূপে সুগভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত আছেন, এইটি ঠিকমতো জানলে বাসনায় আমাদের আর বৃথা ঘুরিয়ে মারে না পরিপূর্ণতার উপলব্ধিতে আমরা স্থির হতে পারি।

সংসার আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু ব্রহ্ম আমাদের মধ্যেই আছেন। এইজন্য সংসারকে সহস্র চেষ্টায় আমরা পাই নে, ব্রহ্মকে আমরা পেয়ে বসে আছি।

পরমাত্মা আমাদের আত্মাকে বরণ করে নিয়েছেন—তাঁর সঙ্গে এর পরিণয় একেবারে সমাধা হয়ে গেছে। তার আর কোনো কিছু বাকি নেই কেননা তিনি একে স্বয়ং বরণ করেছেন। কোন্ অনাদিকালে সেই পরিণয়ের মন্ত্র পড়া হয়ে গেছে। বলা হয়ে গেছে—যদেতং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব। এর মধ্যে আর ক্রমাভিব্যক্তির পৌরোহিত্য নেই। তিনি "অস্য" "এষ" হয়ে আছেন। তিনি এর এই হয়ে বসেছেন, নাম করবার জো নেই। তাই তো ঋষি কবি বলেন—

এষাস্য পরমা গতিঃ, এষাস্য পরমা সম্পৎ, এষোঽস্য পরমোলোকঃ, এষোঽস্য পরম আনন্দঃ।

পরিণয় তো সমাপ্তই হয়ে গেছে, সেখানে আর কোনো কথা নেই। এখন কেবল অনন্ত প্রেমের লীলা। যাঁকে পাওয়া হয়ে গেছে তাঁকেই নানারকম করে পাচ্ছি—সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, লোকে লোকান্তরে। বধূ যখন সেই কথাটা ভালো করে বোঝে তখন তার আর কোনো ভাবনা থাকে না। তখন সংসারকে তার স্বামীর সংসার বলে জানে, সংসার তাকে আর পীড়া দিতে পারে না—সংসারে তার আর ক্লান্তি নেই, সংসারে তার প্রেম। তখন সে জানে যিনি সত্যং জ্ঞানমনন্তং হয়ে অন্তরাত্মাকে চিরদিনের মতো গ্রহণ করে আছেন, সংসারে তাঁরই আনন্দরূপমমৃতং বিভাতি—সংসারে তাঁরই প্রেমের

লীলা। এইখানেই নিত্যের সঙ্গে অনিত্যের চিরযোগ—আনন্দের অমৃতের যোগ। এইখানেই আমাদের সেই বরকে, সেই চিরপ্রাপ্তকে, সেই একমাত্র প্রাপ্তকে বিচিত্র বিচ্ছেদ-মিলনের মধ্যে দিয়ে, পাওয়া-না-পাওয়ার বহুতর ব্যবধান-পরম্পরার ভিতর দিয়ে নানা রকমে পাচ্ছি ;—যাঁকে পেয়েছি, তাঁকেই আবার হারিয়ে হারিয়ে পাচ্ছি, তাঁকেই নানা রসে পাচ্ছি। যে বধূর মূঢ়তা ঘুচেছে, এই কথাটা যে জেনেছে, এই রস যে বুঝেছে, সেই আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন। যে না জেনেছে, যে সেই বরকে ঘোমটা খুলে দেখে নি—বরের সংসারকেই কেবল দেখেছে সে যেখানে তার রানীর পদ সেখানে দাসী হয়ে থাকে। ভয়ে মরে, দুঃখে কাঁদে, মলিন হয়ে বেড়ায়—

সৌভিক্যাৎ যাতি সৌভিক্যং ক্লেশাৎ ক্লেশং ভয়াৎ ভয়ম্।

৯ ফাল্গুন ১৩১৫

৬

তিনতলা

আমাদের তিনটে অবস্থা দেখতে পাই। তিনটে বড়ো বড়ো স্তরে মানবজীবন গড়ে তুলছে; একটা প্রাকৃতিক, একটা ধর্মনৈতিক, একটা আধ্যাত্মিক।

প্রথম অবস্থায় প্রকৃতিই আমাদের সব। তখন আমরা বাইরেই থাকি। তখন প্রকৃতিই আমাদের সমস্ত উপলব্ধির ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। তখন বাইরের দিকেই আমাদের সমুদয় প্রবৃত্তি, সমুদয় চিন্তা, সমুদয় প্রয়াস। এমন কি, আমাদের মনের মধ্যে যা গড়ে ওঠে তাকেও আমরা বাইরে স্থাপন না করে থাকতে পারি না—আমাদের মনের জিনিসগুলিও আমাদের কল্পনায় বাহ্যরূপ গ্রহণ করতে থাকে। আমরা সত্য তাকেই বলি যাকে দেখতে ছুঁতে পাওয়া যায়। এইজন্য আমাদের দেবতাকেও আমরা কোনো বাহ্য পদার্থের মধ্যে বদ্ধ করে অথবা তাঁকে কোনো বাহ্যরূপ দান করে আমরা তাঁকে প্রাকৃতিক বিষয়েরই শামিল করে দিই। বাহিরের এই দেবতাকে আমরা বাহ্য প্রক্রিয়াদ্বারা শান্ত করবার চেষ্টা করি। তাঁর সম্মুখে বলি দিই, খাদ্য দিই, তাঁকে কাপড় পরাই। তখন দেবতার অনুশাসনগুলিও বাহ্য অনুশাসন। কোন্ নদীতে স্নান করলে পুণ্য, কোন্ খাদ্য আহার করলে পাপ, কোন্ দিকে মাথা রেখে শুতে হবে, কোন্ মন্ত্র কী-রকম নিয়মে কোন্ তিথিতে কোন্ দণ্ডে উচ্চারণ করা আবশ্যক, এই সমস্তই তখন ধর্মানুষ্ঠান।

এমনি করে দৃষ্টি ঘ্রাণ স্পর্শাদি দ্বারা মনের দ্বারা কল্পনার ভয়ের দ্বারা ভক্তির দ্বারা বাহিরকে নানারকম করে নেড়েচেড়ে তাকে নানারকমে আঘাত করে এবং তার দ্বারা আঘাত খেয়ে আমরা বাহিরের পরিচয়ের সীমায় এসে ঠেকি। তখন বাহিরকেই আর পূর্বের মতো একমাত্র বলে মনে হয় না। তখন তাকেই আমাদের একমাত্র গতি, একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র সম্পদ বলে আর জানি নে। সে আমাদের সম্পূর্ণ আশাকে জাগিয়ে তুলে একদিন আমাদের সমস্ত মনকে টেনে নিয়েছিল বলেই যখন আমরা তার সীমা দেখতে পেলুম তখন তার উপরে আমাদের একান্ত অশ্রদ্ধা জন্মাল। তখন প্রকৃতিকে মায়াবিনী বলে গাল দিতে লাগলুম, সংসারকে একেবারে সর্বতোভাবে অস্বীকার করবার জন্যে মনে বিদ্রোহ জন্মাল। তখন বলতে লাগলুম, যার মধ্যে কেবলই আধিব্যাধি মৃত্যু, কেবলই ঘানির বলদের চলার মতো অনন্ত প্রদক্ষিণ

তাকেই আমরা সত্য বলে তারই কাছে আমরা সমস্ত আত্মসমর্পণ করেছিলুম, আমাদের এই মূঢ়তাকে ধিক্।

তখন বাহিরকে নিঃশেষে নিরস্ত করে দিয়ে আমরা অন্তরেই বাসা বাঁধবার চেষ্টা করলুম। যে-বাহিরকে একদিন রাজা বলে মেনেছিলুম তাকে কঠোর যুদ্ধে পরাস্ত করে দিয়ে ভিতরকেই জয়ী বলে প্রচার করলুম। যে-প্রবৃত্তিগুলি এতদিন বাহিরের পেয়াদা হয়ে আমাদের সর্বদাই বাহিরের তাগিদেই ঘুরিয়ে মেরেছিল তাদের জেলে দিয়ে শূলে চড়িয়ে ফাঁসি দিয়ে একেবারে নির্মূল করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলুম। যে সমস্ত কষ্ট ও অভাবের ভয় দেখিয়ে বাহির আমাদের দাসত্বের শৃঙ্খল পরিয়েছিল সেই সকল কষ্ট ও অভাবকে আমরা একেবারে তুচ্ছ করে দিলুম। রাজসূয় যজ্ঞ করে উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে বাহিরের সমস্ত দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজাকে হার মানিয়ে জয়পতাকা আমাদের অন্তর-রাজধানীর উচ্চ প্রাসাদ-চূড়ায় উড়িয়ে দিলুম। বাসনার পায়ে শিকল পরিয়ে দিলুম। সুখ-দুঃখকে কড়া পাহারায় রাখলুম, পূর্বতন রাজত্বকে আগাগোড়া বিপর্যস্ত করে তবে ছাড়লুম।

এমনি করে বাহিরের একান্ত প্রভুত্বকে খর্ব করে যখন আমাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠা-লাভ করলুম তখন অন্তরতম গুহার মধ্যে এ কী দেখি? এ তো জয়গর্ব নয়। এ তো কেবল আত্মশাসনের অতি-বিস্তারিত সুব্যবস্থা নয়। বাহিরের বন্ধনের স্থানে এ তো কেবল অন্তরের নিয়ম-বন্ধন নয়। শান্তদান্ত সমাহিত নির্মল চিদাকাশে এমন আনন্দ-জ্যোতি দেখলুম যা অন্তর এবং বাহির উভয়কেই উদ্ভাসিত করেছে, অন্তরের নিগূঢ় কেন্দ্র থেকে নিখিল বিশ্বের অভিমুখে যার মঙ্গলরশ্মিরাজি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

তখন ভিতর বাহিরের সমস্ত দ্বন্দ্ব দূর হয়ে গেল। তখন জয় নয় তখন আনন্দ, তখন সংগ্রাম নয় তখন লীলা, তখন ভেদ নয় তখন মিলন, তখন আমি নয় তখন সব;—তখন বাহিরও নয়, ভিতরও নয়, তখন ব্রহ্ম—তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ। তখন আত্মা পরমাত্মার পরম মিলনে বিশ্বজগৎ সম্মিলিত। তখন স্বার্থবিহীন করুণা, ঔদ্ধত্যবিহীন ক্ষমা, অহংকারবিহীন প্রেম—তখন জ্ঞানভক্তিকর্মে বিচ্ছেদবিহীন পরিপূর্ণতা।

১০ ফাল্গুন ১৩১৫

বাসনা, ইচ্ছা, মঙ্গল

আমাদের সমস্ত কর্মচেষ্টাকে উদ্বোধিত করে তোলবার ভার সবপ্রথমে বাহিরের উপরেই ন্যস্ত থাকে। সে আমাদের নানা দিক দিয়ে নানা প্রকারে সজাগ চঞ্চল করে তোলে।

সে আমাদের জাগাবে, অভিভূত করবে না এই ছিল কথা। জাগব এইজন্যে যে নিজের চৈতন্যময় কর্তৃত্বকে অনুভব করব—দাসত্বের বোঝা বহন করব বলে নয়।

রাজার ছেলেকে মাস্টারের হাতে দেওয়া হয়েছে। মাস্টার তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে তার মূঢ়তা জড়তা দূর করে তাকে রাজত্বের পূর্ণ অধিকারের যোগ্য করে দেবে, এই ছিল তার সঙ্গে বোঝাপড়া। রাজা যে কারও দাস নয় এই শিক্ষাই হচ্ছে তার সকল শিক্ষার শেষ।

কিন্তু মাস্টার অনেক সময় তার ছাত্রকে এমনি নানা প্রকারে অভিভূত করে ফেলে, মাস্টারের প্রতিই একান্ত নির্ভর করার মুগ্ধ সংস্কারে এমনি জড়িত করে যে, বড়ো হয়ে সে নামমাত্র সিংহাসনে বসে, সেই মাস্টারই রাজার উপর রাজত্ব করতে থাকে।

তেমনি বাহিরও যখন শিক্ষাদানের চেয়ে বেশি দূরে গিয়ে পৌঁছোয়, যখন সে আমাদের উপর চেপে পড়বার জো করে তখন তাকে একেবারে বরখাস্ত করে দিয়ে তার জাল কাটাবার পন্থাই হচ্ছে শ্রেয়ের পন্থা।

বাহির যে-শক্তি দ্বারা আমাদের চেষ্টাকে বাইরের দিকে টেনে নিয়ে যায় তাকে আমরা বলি বাসনা। এই বাসনায় আমাদের বাইরের বিচিত্র বিষয়ের অনুগত করে। যখন যেটা সামনে এসে দাঁড়ায় তখন সেইটেই আমাদের মনকে কাড়ে—এমনি করে আমাদের মন নানার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হয়ে বেড়ায়। নানার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের এই হচ্ছে সহজ উপায়।

এই বাসনা যদি ঠিক জায়গায় না থামে—এই বাসনার প্রবলতাই যদি জীবনের মধ্যে সব চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে, তাহলে আমাদের জীবন তামসিক অবস্থাকে ছাড়াতে পারে না, আমরা নিজের কর্তৃত্বকে অনুভব ও সপ্রমাণ করতে পারি না। বাহিরই কর্তা হয়ে থাকে, কোনোপ্রকার ঐশ্বর্যলাভ আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়। উপস্থিত অভাব, উপস্থিত আকর্ষণই আমাদের এক ক্ষুদ্রতা থেকে আর-এক ক্ষুদ্রতায় ঘুরিয়ে মারে। এমন অবস্থায় কোনো স্থায়ী জিনিসকে মানুষ গড়ে তুলতে পারে না।

এই বাসনা কোন্ জায়গায় গিয়ে থামে? ইচ্ছায়। বাসনার লক্ষ্য যেমন বাইরের

বিষয়ে, ইচ্ছার লক্ষ্য তেমনি ভিতরের অভিপ্রায়ে। উদ্দেশ্য জিনিসটা অন্তরের জিনিস। ইচ্ছা আমাদের বাসনাকে বাইরের পথে যেমন-তেমন করে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে দেয় না— সমস্ত চঞ্চল বাসনাকে সে একটা কোনো আন্তরিক উদ্দেশ্যের চারিদিকে বেঁধে ফেলে।

তখন কী হয়? না, যে-সকল বাসনা নানা প্রভুর আহ্বানে বাইরে ফিরত, তারা এক প্রভুর শাসনে ভিতরে স্থির হয়ে বসে। অনেক থেকে একের দিকে আসে।

টাকা করতে হবে এই উদ্দেশ্য যদি মনের ভিতরে রাখি তাহলে আমাদের বাসনাকে যেমন-তেমন করে ঘুরে বেড়াতে দিলে চলে না। অনেক লোভ সংবরণ করতে হয়, অনেক আরামের আকর্ষণকে বিসর্জন দিতে হয়, কোনো বাহ্য বিষয় যাতে আমাদের বাসনাকে এই উদ্দেশ্যের আনুগত্য থেকে ভুলিয়ে না নিতে পারে সে-জন্যে সর্বদাই সতর্ক থাকতে হয়। কিন্তু বাসনাই যদি আমাদের ইচ্ছার চেয়ে প্রবল হয় সে যদি উদ্দেশ্যকে না মানতে চায়, তাহলেই বাহিরের কর্তৃত্ব বড়ো হয়ে ভিতরের কর্তৃত্বকে খাটো করে দেয় এবং উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে যায়। তখন মানুষের সৃষ্টিকার্য চলে না। বাসনা যখন তার ভিতরের কূল পরিত্যাগ করে তখন সে সমস্ত ছারখার করে দেয়।

যেখানে ইচ্ছাশক্তি বলিষ্ঠ, কর্তৃত্ব যেখানে অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত, সেখানে তামসিকতার আকর্ষণ এড়িয়ে মানুষ রাজসিকতার উৎকর্ষ লাভ করে। সেইখানে বিদ্যায় ঐশ্বর্যে প্রতাপে মানুষ ক্রমশই বিস্তার প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু বাসনার বিষয় যেমন বহির্জগতে বিচিত্র তেমনি ইচ্ছার বিষয়ও তো অন্তর্জগতে একটি আধটি নয়। কত অভিপ্রায় মনে জাগে তার ঠিক নেই। বিদ্যার অভিপ্রায়, ধনের অভিপ্রায়, খ্যাতির অভিপ্রায় প্রভৃতি সকলেই স্ব স্ব প্রধান হয়ে উঠতে চায়। সেই ইচ্ছার অরাজক বিক্ষিপ্ততাও বাসনার বিক্ষিপ্ততার চেয়ে তো কম নয়।

তা ছাড়া আর একটা জিনিস দেখতে পাই। যখন বাসনার অনুগামী হয়ে বাহিরের সহস্র রাজাকে প্রভু করেছিলুম তখন যে-বেতন মিলত তাতে তো পেট ভরত না। সেইজন্যেই মানুষ বারংবার আক্ষেপ করে বলেছে বাসনার চাকরি বড়ো দুঃখের চাকরি। এতে যে খাদ্য পাই তাতে ক্ষুধা কেবল বাড়িয়ে তোলে এবং সহস্রের টানে ঘুরিয়ে মেরে কোনো জায়গায় শান্তি পেতে দেয় না।

আবার ইচ্ছার অনুগত হয়ে ভিতরের এক-একটি অভিপ্রায়ের পশ্চাতে যখন ঘুরে বেড়াই তখনও তো অনেক সময়ে মেকি টাকায় বেতন মেলে। শান্তি আসে, অবসাদ আসে, দ্বিধা আসে। কেবলই উত্তেজনার মদিরার প্রয়োজন হয়—শান্তিরও অভাব ঘটে। বাসনা যেমন বাহিরের ধন্দায় ঘোরায়, ইচ্ছা তেমনি ভিতরের ধন্দায় ঘুরিয়ে মারে, এবং শেষকালে মজুরি দেবার বেলায় ফাঁকি দিয়ে সারে।

এইজন্য, বাসনাগুলোকে ইচ্ছার শাসনাধীনে ঐক্যবদ্ধ করা যেমন মানুষের ভিতরকার কামনা—সে-রকম না করতে পারলে সে যেমন কোনো সফলতা দেখতে পায় না তেমনি ইচ্ছাগুলিকেও কোনো এক প্রভুর অনুগত করা তার মূলগত প্রার্থনার বিষয়। এ না হলে সে বাঁচে না। বাহিরের শত্রুকে জয় করবার জন্যে ভিতরের যে সৈন্যদল সে জড় করলে নায়কের অভাবে সেই দুর্দান্ত সৈন্যগুলার হাতেই সে মারা পড়বার জো হয়। সৈন্যনায়ক রাজ্য দস্যুবিজিত রাজ্যের চেয়ে ভালো বটে, কিন্তু সেও সুখের রাজ্য নয়। তামসিকতায় প্রবৃত্তির প্রাধান্য, রাজসিকতায় শক্তির প্রাধান্য। এখানে সৈন্যের রাজত্ব।

কিন্তু রাজার রাজত্ব চাই। সেই সরাজকতার পরম কল্যাণ কখন উপভোগ করি? যখন বিশ্বইচ্ছার সঙ্গে নিজের সমস্ত ইচ্ছাকে সংগত করি।

সেই ইচ্ছাই জগতের এক ইচ্ছা, মঙ্গল ইচ্ছা। সে কেবল আমার ইচ্ছা নয়, কেবল তোমার ইচ্ছা নয়, সে নিখিলের মূলগত নিত্যকালের ইচ্ছা। সেই সকলের প্রভু। সেই এক প্রভুর মহারাজ্যে যখন আমার ইচ্ছার সৈন্যদলকে দাঁড় করাই তখনই তারা ঠিক জায়গায় দাঁড়ায়। তখন ত্যাগে ক্ষতি হয় না, ক্ষমায় বীর্যহানি হয় না, সেবায় দাসত্ব হয় না। তখন বিপদ ভয় দেখায় না, শাস্তি দণ্ড দিতে পারে না, মৃত্যু বিভীষিকা পরিহার করে। একদিন সকলে আমাকে পেয়েছিল, অবশেষে রাজাকে যখন পেলুম তখন আমি সকলকে পেলুম। যে বিশ্ব থেকে নিজের অন্তরের দুর্গে আত্মরক্ষার জন্যে প্রবেশ করেছিলুম সেই বিশ্বেই আবার নির্ভয়ে বাহির হলুম, রাজার ভৃত্যকে সেখানে সকলে সমাদর ক'রে গ্রহণ করলে।

১১ ফাল্গুন

স্বাভাবিকী ক্রিয়া

যে এক ইচ্ছা বিশ্বজগতের মূলে বিরাজ করছে তারই সম্বন্ধে উপনিষৎ বলেছেন—স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ। সেই একেরই জ্ঞানক্রিয়া এবং বলক্রিয়া স্বাভাবিকী। তা সহজ, তা স্বাধীন, তার উপরে বাইরের কোনো কৃত্রিম তাড়না নেই।

আমাদের ইচ্ছা যখন সেই মূল মঙ্গলইচ্ছার সঙ্গে সংগত হয় তখন তারও সমস্ত ক্রিয়া স্বাভাবিকী হয়। অর্থাৎ তার সমস্ত কাজকে কোনো প্রবৃত্তির তাড়নার দ্বারা ঘটায় না—অহংকার তাকে ঠেলা দেয় না, লোকসমাজের অনুকরণ তাকে সৃষ্টি করে না,

লোকের খ্যাতিই তাকে কোনোরকমে জীবিত করে রাখে না, সাম্প্রদায়িক দলবদ্ধতার উৎসাহ তাকে শক্তি জোগায় না, নিন্দা তাকে আঘাত করে না, উৎপীড়ন তাকে বাধা দেয় না, উপকরণের দৈন্য তাকে নিরস্ত করে না।

মঙ্গলইচ্ছার সঙ্গে যাঁদের ইচ্ছা সম্মিলিত হয়েছে তাঁরা যে বিশ্বজগতের সেই অমর শক্তি সেই স্বাভাবিকী ক্রিয়াশক্তিকে লাভ করেন ইতিহাসে তার অনেক প্রমাণ আছে। বুদ্ধদেব কপিলবাস্তুর সুখসমৃদ্ধি পরিহার করে যখন বিশ্বের মঙ্গল প্রচার করতে বেরিয়েছিলেন তখন কোথায় তাঁর রাজকোষ, কোথায় তাঁর সৈন্যসামন্ত। তখন বাহ্য উপকরণে তিনি তাঁর পৈতৃক রাজ্যের দীনতম অক্ষমতম প্রজার সঙ্গে সমান। কিন্তু তিনি যে বিশ্বের মঙ্গলইচ্ছার সঙ্গে তাঁর ইচ্ছাকে যোজিত করেছিলেন সেইজন্য তাঁর ইচ্ছা সেই পরাশক্তির স্বাভাবিকী ক্রিয়াকে লাভ করেছিল। সেইজন্যে কত শত শতাব্দী হল তাঁর মৃত্যু হয়ে গেছে কিন্তু তাঁর মঙ্গলইচ্ছার স্বাভাবিকী ক্রিয়া আজও চলছে। আজও বুদ্ধগয়ার নিভৃত মন্দিরে গিয়ে দেখি সুদূর জাপানের সমুদ্রতীর থেকে সংসার-তাপতাপিত জেলে এসে অন্ধকার অর্ধরাত্রে বোধিদ্রুমের সম্মুখে বসে সেই বিশ্বকল্যাণী ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে দিয়ে জোড়হাতে বলছে—বুদ্ধস্ত শরণং গচ্ছামি। আজও তাঁর জীবন মানুষকে জীবন দিচ্ছে, তাঁর বাণী মানুষকে অভয় দান করছে—তাঁর সেই বহু সহস্র বৎসর পূর্বের ইচ্ছার ক্রিয়ার আজও ক্ষয় হল না।

যিশু কোন্ অখ্যাত গ্রামের প্রান্তে কোন্ এক পশুরক্ষণশালায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কোনো পণ্ডিতের ঘরে নয়, কোনো রাজার প্রাসাদে নয়, কোনো মহৈশ্বর্যশালী রাজধানীতে নয়, কোনো মহাপুণ্যক্ষেত্র তীর্থস্থানে নয়। যারা মাছ ধরে জীবিকা অর্জন করত এমন কয়েকজন মাত্র ইহুদি যুবক তাঁর শিষ্য হয়েছিল। যেদিন তাঁকে রোমরাজের প্রতিনিধি অনায়াসেই ক্রুসে বিদ্ধ করবার আদেশ দিলেন সেই দিনটি জগতের ইতিহাসে যে চিরদিন ধন্য হবে এমন কোনো লক্ষণ সেদিন কোথাও প্রকাশ পায় নি। তাঁর শত্রুরা মনে করলে সমস্তই চুকে বুকে গেল—এই অতি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গটিকে একেবারে দলন করে নিবিয়ে দেওয়া গেল। কিন্তু কার সাধ্য নেবায়। ভগবান যিশু তাঁর ইচ্ছাকে তাঁর পিতার ইচ্ছার সঙ্গে যে মিলিয়ে দিয়েছিলেন—সেই ইচ্ছার মৃত্যু নেই, তার স্বাভাবিকী ক্রিয়ার ক্ষয় নেই। অত্যন্ত কৃশ এবং দীনভাবে যা নিজেকে প্রকাশ করেছিল তাই আজ দুই সহস্র বৎসর ধরে বিশ্বজয় করছে।

অখ্যাত অজ্ঞাত দৈন্যদারিদ্র্যের মধ্যেই সেই পরম মঙ্গলশক্তি যে আপনার স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াকে প্রকাশ করেছেন ইতিহাসে বারংবার তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। হে অবিশ্বাসী, হে ভীরু, হে দুর্বল, সেই শক্তিকে আশ্রয় করো, সেই ক্রিয়াকে

লাভ করো—নিজেকে শক্তিহীন বলে বাইরের দিকে ভিক্ষাপাত্র তুলে ধরে বৃথা আক্ষেপে কাল হরণ ক'রো না—তোমার সামান্ত যা সম্বল আছে তা রাজার ঐশ্বর্যকে লজ্জা দেবে।

১১ ফাল্গুন

পরশরতন

তাঁর নাম পরশরতন
পাপি-হৃদয়-তাপহরণ—
প্রসাদ তাঁর শান্তিরূপ ভকতহৃদয়ে জাগে।

সেই পরশরতনটি প্রাতঃকালের এই উপাসনায় কি আমরা লাভ করি? যদি তার একটি কণামাত্রও লাভ করি তবে কেবল মনের মধ্যে একটি ভাবরসের উপলব্ধির মধ্যেই তাকে আবদ্ধ করে যেন না রাখি। তাকে স্পর্শ করাতে হবে—তার স্পর্শে আমার সমস্ত দিনটিকে সোনা করে তুলতে হবে।

দিনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে সেই পরশরতনটি দিয়ে আমার মুখের কথাকে স্পর্শ করাতে হবে, আমার মনের চিন্তাকে স্পর্শ করাতে হবে—আমার সংসারের কর্মকে স্পর্শ করাতে হবে।

তাহলে, যা হালকা ছিল একমুহূর্তে তাতে গৌরব সঞ্চার হবে, যা মলিন ছিল তা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, যার কোনো দাম ছিল না তার মূল্য অনেক বেড়ে যাবে।

আমাদের সকালবেলাকার এই উপাসনাটিকে ছোঁয়াব, সমস্তদিন সব-তাতে ছোঁয়াব—তাঁর নামকে ছোঁয়াব, তাঁর ধ্যানকে ছোঁয়াব, "শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্" এই মন্ত্রটিকে ছোঁয়াব, উপাসনাকে কেবল হৃদয়ের ধন করব না—তাকে চরিত্রের সম্বল করব, তার দ্বারা কেবল স্নিগ্ধতালাভ করব না—প্রতিষ্ঠালাভ করব।

লোকে প্রচলিত আছে প্রভাতের মেঘ ব্যর্থ হয়, তাতে বৃষ্টি দেয় না। আমাদের এই প্রভাতের উপাসনা যেন তেমনি ক্ষণকালের জন্ম আবির্ভূত হয়ে সকালবেলাকার হাওয়াতেই উড়ে চলে না যায়।

কেননা, যখন রৌদ্র প্রখর তখনই স্নিগ্ধতার দরকার, যখন তৃষ্ণা প্রবল তখনই বর্ষণ কাজে লাগে। সংসারের ঘোরতর কাজের মাঝখানেই শুষ্কতা আসে, দাহ জন্মায়। ভিড় যখন খুব জমেছে, কোলাহল যখন খুব জেগেছে তখনই আপনাকে হারিয়ে ফেলি।

আমাদের প্রভাতের সঙ্কল্পকে সেই সময়েই যদি কোনো কাজে লাগাতে না পারি, সে যদি দেবত্র সম্পত্তির মতো মন্দিরেরই পুজার্চনার কাজে নিযুক্ত থাকে, সংসারের প্রয়োজনে তাকে খাটাবার জো না থাকে—তাহলে কোনো কাজ হল না।

দিনের মধ্যে এক-একটা সময় আছে যে সময়টা অত্যন্ত নীরস অত্যন্ত অনুদার। যে সময়ে ভূমা সকলের চেয়ে প্রচ্ছন্ন থাকেন—যে সময়ে, হয় আমরা একান্তই আপিসের জীব হয়ে উঠি, নয়তো আহার-পরিপাকের জড়তায় আমাদের অন্তরাত্মার উজ্জ্বলতা অত্যন্ত ম্লান হয়ে আসে, সেই শুষ্কতা ও জড়ত্বের আবেশকালে তুচ্ছতার আক্রমণকে আমরা যেন প্রশ্রয় না দিই—আত্মার মহিমাকে তখনও যেন প্রত্যক্ষগোচর করে রাখি। যেন তখনই মনে পড়ে আমরা দাঁড়িয়ে আছি ভূর্ভুবঃস্বর্লোকে, মনে পড়ে যে অনন্ত চৈতন্য-স্বরূপ এই মুহূর্তে আমাদের অন্তরে চৈতন্য বিকীর্ণ করছেন, মনে পড়ে যে সেই শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং এই মুহূর্তে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন। সমস্ত হাস্যালাপ, সমস্ত কাজকর্ম, সমস্ত চাঞ্চল্যের অন্তরতম মূলে যেন একটি অবিচলিত পরিপূর্ণতার উপলব্ধি কখনো না সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

তাই বলে একথা যেন কেউ না মনে করেন যে, সংসারের সমস্ত হাসিগল্প সমস্ত আমোদ-আহ্লাদকে একেবারে বিসর্জন দেওয়াই সাধনা। যার সঙ্গে আমাদের যেটুকু স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে তাকে রক্ষা না করলেই সে আমাদের অস্বাভাবিক রকম করে পেয়ে বসে—ত্যাগ করবার কৃত্রিম চেষ্টাতেই ফাঁস আরও বেশি করে আঁট হয়ে ওঠে। স্বভাবত যে জিনিসটা বাইরের ক্ষণিক জিনিস, ত্যাগের চেষ্টায় অনেক সময় সেইটাই আমাদের অন্তরের ধ্যানের সামগ্রী হয়ে দাঁড়ায়।

ত্যাগ করব না, রক্ষা করব, কিন্তু ঠিক জায়গায় রক্ষা করব। ছোটোকে বড়ো করে তুলব না, শ্রেয়কে প্রেমের আসনে বসতে দেব না এবং সকল সময়ে সকল কর্মেই অন্তরের গূঢ় কক্ষের অচল দরবারে উপাসনাকে চলতে দেব। তিনি নেই এমন কথাটাকে কোনো সময়েই কোনোমতেই মনকে বুঝতে দেব না—কেননা সেটা একেবারেই মিথ্যা কথা।

প্রভাতে একান্ত ভক্তিতে তাঁর চরণের ধূলি মনের ভিতরে তুলে নিয়ে যাও—সেই আমাদের পরশরতন। আমাদের হাসিখেলা আমাদের কাজকর্ম আমাদের বিষয়-আশয় যা কিছু আছে তার উপর সেই ভক্তি ঠেকিয়ে দাও। আপনিই সমস্ত বড়ো হয়ে উঠবে, সমস্ত পবিত্র হয়ে উঠবে, সমস্তই তাঁর সম্মুখে উৎসর্গ করে দেবার যোগ্য হয়ে দাঁড়াবে।

১২ ফাল্গুন

অভ্যাস

যিনি পরম চৈতন্যস্বরূপ তাঁকে আমরা নির্মল চৈতন্যের দ্বারাই অন্তরাত্মার মধ্যে উপলব্ধি করব এই রয়েছে কথা। তিনি আর কোনোরকমে সস্তায় আমাদের কাছে ধরা দেবেন না—এতে যতই বিলম্ব হ'ক। সেইজন্যেই তাঁর দেখা দেওয়ার অপেক্ষায় কোনো কাজ বাকি নেই—আমাদের আহার ব্যবহার প্রাণন মনন সমস্তই চলছে। আমাদের জীবনের যে বিকাশ তাঁর দর্শনে গিয়ে পরিসমাপ্ত সে ধীরে ধীরে হ'ক বিলম্বে হ'ক, সেজন্যে তিনি কোনো অস্ত্রধারী পেয়াদাকে দিয়ে তাগিদ পাঠাচ্ছেন না। সেটি একটি পরিপূর্ণ সামগ্রী কি না, অনেক রৌদ্রবৃষ্টির পরম্পরায়, অনেক দিন ও রাত্রির শুশ্রূষায় তার হাজারটি দল একটি বৃন্তে ফুটে উঠবে।

সেইজন্যে মাঝে মাঝে আমার মনে এই সংশয়টি আসে যে, এই যে আমরা প্রাতঃকালে উপাসনার জন্যে অনেকে সমবেত হয়েছি, এখানে আমরা অনেক সময়েই অনেকেই আমাদের সম্পূর্ণ চিত্তটিকে তো আনতে পারি নে—তবে এ-কাজটি কি আমাদের ভালো হচ্ছে? নির্মল চৈতন্যের স্থানে অচেতনপ্রায় অভ্যাসকে নিযুক্ত করায় আমরা কি অন্যায় করছি নে?

আমার মনে এক-এক সময় অত্যন্ত সংকোচ বোধ হয়। মনে ভাবি যিনি আপনাকে প্রকাশ করবার জন্যে আমাদের ইচ্ছার উপর কিছুমাত্র জবরদস্তি করেন না তাঁর উপাসনায় পাছে আমরা লেশমাত্র অনিচ্ছাকে নিয়ে আসি, পাছে এখানে আসবার সময় কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ করি, কিছুমাত্র আলস্যের বাধা ঘটে, পাছে তখন কোনো আমোদের বা কাজের আকর্ষণে আমাদের ভিতরে ভিতরে একটা বিমুখতার সৃষ্টি করে। উপাসনায় শৈথিল্য করলে, অন্য যাঁরা উপাসনা করেন তাঁরা যদি কিছু মনে করেন, যদি কেউ নিন্দা করেন বা বিরক্ত হন, পাছে এই তাগিদটাই সকলের চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে। সেই জন্যে এক-এক সময়ে বলতে ইচ্ছা করে মন সম্পূর্ণ অনুকূল সম্পূর্ণ ইচ্ছুক না হলে এ জায়গায় কেউ এসো না।

কিন্তু সংসারটা যে কী জিনিস তা যে জানি। এ-সংসারের অনেকটা পথ মাড়িয়ে আজ বার্ধক্যের দ্বারে এসে উত্তীর্ণ হয়েছি। জানি দুঃখ কাকে বলে, আঘাত কী প্রচণ্ড, বিপদ কেমন অভাবনীয়। যে-সময়ে আশ্রয়ের প্রয়োজন সকলের বেশি সেই সময়ে আশ্রয় কিরূপ দুর্লভ। তিনিহীন জীবন যে অত্যন্ত গৌরবহীন, চারদিকেই তাকে টানাটানি করে মারে। দেখতে দেখতে তার সুর নেবে যায়, তার কথা, চিন্তা, কাজ,

তুচ্ছ হয়ে আসে। সে জীবন যেন অনাবৃত—সে এবং তার বাইরের মাঝখানে কেউ যেন তাকে ঠেকাবার নেই। ক্ষতি একেবারেই তার গায়ে এসে লাগে, নিন্দা একেবারেই তার মর্মে এসে আঘাত করে, দুঃখ কোনো ভাবরসের মাঝখান দিয়ে সুন্দর বা মহৎ হয়ে ওঠে না। সুখ একেবারে মত্ততা এবং শোকের কারণ একেবারে মৃত্যুবাণ হয়ে এসে তাকে বাজে। এ-কথা যখন চিন্তা করে দেখি তখন সমস্ত সংকোচ মন হতে দূর হয়ে যায়—তখন ভীত হয়ে বলি, না, শৈথিল্য করলে চলবে না। একদিনও ভুলব না, প্রতিদিনই তাঁর সামনে এসে দাঁড়াতেই হবে, প্রতিদিন কেবল সংসারকেই প্রশ্রয় দিয়ে তাকেই কেবল বুকের সমস্ত রক্ত খাইয়ে প্রবল করে তুলে নিজেকে এমন অসহায়ভাবে একান্তই তার হাতে আপাদমস্তক সমর্পণ করে দেব না, দিনের মধ্যে অন্তত একবার এই কথাটা প্রত্যহই বলে যেতে হবে তুমি সংসারের চেয়ে বড়ো তুমি সকলের চেয়ে বড়ো।

যেমন করে পারি তেমনি করেই বলব। আমাদের শক্তি ক্ষুদ্র অন্তর্যামী তা জানেন। কোনোদিন আমাদের মনে কিছু জাগে কোনোদিন একেবারেই জাগে না—মনে বিক্ষেপ আসে, মনে ছায়া পড়ে। উপাসনার যে-মন্ত্র আবৃত্তি করি প্রতিদিন তার অর্থ উজ্জ্বল থাকে না। কিন্তু তবু নিষ্ঠা হারাব না। দিনের পর দিন এই দ্বারে এসে দাঁড়াব, দ্বার খুলুক আর নাই খুলুক। যদি এখানে আসতে কষ্ট বোধ হয় তবে সেই কষ্টকে অতিক্রম করেই আসব। যদি সংসারের কোনো বন্ধন মনকে টেনে রাখতে চায় তবে ক্ষণকালের জন্যে সেই সংসারকে এক পাশে ঠেলে রেখেই আসব।

কিছু না-ই জোটে যদি তবে এই অভ্যাসটুকুকেই প্রত্যহ তাঁর কাছে এনে উপস্থিত করব। সকলের চেয়ে যেটা কম দেওয়া অন্তত সেই দেওয়াটাও তাঁকে দেব। সেইটুকু দিতেও যে বাধাটা অতিক্রম করতে হয় যে জড়তা মোচন করতে হয় সেটাতেও যেন কুণ্ঠিত না হই। অত্যন্ত দরিদ্রের যে রিক্তপ্রায় দান সেও যেন প্রত্যহই নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর কাছে এনে দিতে পারি। যাঁকে সমস্ত জীবন উৎসর্গ করবার কথা, দিনের সকল কর্মে সকল চিন্তায় যাঁকে রাজা করে বসিয়ে রাখতে হবে, তাঁকে কেবল মুখের কথা দেওয়া, কিন্তু তাও দিতে হবে। আগাগোড়া সমস্তই কেবল সংসারকে দেব আর তাঁকে কিছুই দেব না, তাঁকে প্রত্যেক দিনের মধ্যে একান্তই "না" করে রেখে দেব, এ তো কোনোমতেই হতে পারে না।

দিনের আরম্ভে প্রভাতের অরুণোদয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এই কথাটা একবার স্বীকার করে যেতেই হবে যে, পিতা নোঽসি—তুমি পিতা, আছ। আমি স্বীকার করছি তুমি পিতা। আমি স্বীকার করছি তুমি আছ। একবার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে

দাঁড়িয়ে কেবল এই কথাটি বলে যাবার জন্যে তোমাদের সংসার ফেলে চলে আসতে হবে। কেবল সেইটুকু সময় থাক্‌ তোমাদের কাজকর্ম, থাক্‌ তোমাদের আমোদ-প্রমোদ। আর সমস্ত কথার উপরে এই কথাটি বলে যাও—পিতা নোঽসি।

তাঁর জগৎসংসারের কোলে জন্মে, তাঁর চন্দ্রসূর্যের আলোর মধ্যে চোখ মেলে জাগরণের প্রথম মুহূর্তে এই কথাটি তোমাদের জোড়হাতে প্রত্যহ বলে যেতে হবে: ওঁ পিতা নোঽসি। এ আমি তোমাদের জোর করেই বলে রাখছি। এত বড়ো বিশ্বে এবং এমন মহৎ মানবজীবনে তাঁকে কোনো জায়গাতেই একটুও স্বীকার করবে না—এ তো কিছুতেই হতে পারবে না। তোমার অপরিস্ফুট চেতনাকেও উপহার দাও, তোমার শূন্য হৃদয়কেও দান করো, তোমার শুষ্কতা রিক্ততাকেই তাঁর সম্মুখে ধরো, তোমার সুগভীর দৈন্যকেই তাঁর কাছে নিবেদন করো। তাহলেই যে দয়া অযাচিতভাবে প্রতিমুহূর্তেই তোমার উপরে বর্ষিত হচ্ছে সেই দয়া ক্রমশই উপলব্ধি করতে থাকবে। এবং প্রত্যহ ওই যে অল্প একটু বাতায়ন খুলবে সেইটুকু দিয়েই অন্তর্যামীর প্রেমমুখের প্রসন্ন হাস্য প্রত্যহই তোমার অন্তরকে জ্যোতিতে অভিষিক্ত করতে থাকবে।

১৩ ফাল্গুন

প্রার্থনা

হে সত্য, আমার এই অন্তরাত্মার মধ্যেই যে তুমি অন্তহীন সত্য—তুমি আছ। এই আত্মায় তুমি যে আছ, দেশে কালে গভীরতায় নিবিড়তায় তার আর সীমা নাই। এই আত্মা অনন্তকাল এই মন্ত্রটি বলে আসছে—সত্যং। তুমি আছ, তুমিই আছ। আত্মার অতলস্পর্শ গভীরতা হতে এই যে মন্ত্রটি উঠছে, তা যেন আমার মনের এবং সংসারের অন্যান্য সমস্ত শব্দকে ভরে সকলের উপরে জেগে ওঠে—সত্যং সত্যং সত্যং। সেই সত্যে আমাকে নিয়ে যাও—সেই আমার অন্তরাত্মার গূঢ়তম অনন্ত সত্যে—যেখানে "তুমি আছ" ছাড়া আর কোনো কথাটি নেই।

হে জ্যোতির্ময়, আমার চিদাকাশে তুমি জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ। তোমার অনন্ত আকাশের কোটি সূর্যলোকে যে জ্যোতি কুলোয় না, সেই জ্যোতিতে আমার অন্তরাত্মা চৈতন্যে সমুদ্ভাসিত। সেই আমার অন্তরাকাশের মাঝখানে আমাকে দাঁড় করিয়ে আমাকে আদ্যোপান্ত প্রদীপ্ত পবিত্রতায় ক্ষালন করে ফেলো, আমাকে জ্যোতির্ময় করো, আমার অন্য সমস্ত পরিবেষ্টনকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে সেই শুভ্র শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ জ্যোতিঃশরীরকে লাভ করি।

হে অমৃতস্বরূপ, আমার অন্তরাত্মার নিভৃত ধামে তুমি আনন্দং পরমানন্দং। সেখানে কোনোকালেই তোমার মিলনের অন্ত নেই। সেখানে তুমি কেবল আছ না তুমি মিলেছ, সেখানে তোমার কেবল সত্য নয় সেখানে তোমার আনন্দ। সেই তোমার অনন্ত আনন্দকে তোমার জগৎসংসারে ছড়িয়ে দিয়েছ। গতিতে প্রাণে সৌন্দর্যে সে আর কিছুতে ফুরোয় না, অনন্ত আকাশে তাকে আর কোথাও ধরে না। সেই তোমার সীমাহীন আনন্দকেই আমার অন্তরাত্মার উপরে স্তব্ধ করে রেখেছি। সেখানে তোমার সৃষ্টির কাউকে প্রবেশ করতে দাও নি; সেখানে আলোক নেই, রূপ নেই, গতি নেই; কেবল নিস্তব্ধ নিবিড় তোমার আনন্দ রয়েছে। সেই আনন্দধামের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একবার ডাক দাও প্রভু। আমি যে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছি, তোমার অমৃত-আহ্বান আমার সংসারের সর্বত্র ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হক, অতি দূরে চলে যাক, অতি গোপনে প্রবেশ করুক। সকল দিক থেকেই আমি যেন যাই যাই বলে সাড়া দিই। ডাক দাও— ওরে আয় আয়, ওরে ফিরে আয়, চলে আয়। এই অন্তরাত্মার অনন্ত আনন্দধামে আমার যা-কিছু সমস্তই এক জায়গায় এক হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে চুপ করে বসুক, খুব গভীরে খুব গোপনে।

হে প্রকাশ, তোমার প্রকাশের দ্বারা আমাকে একেবারে নিঃশেষ করে ফেলো— আমার আর কিছুই বাকি রেখো না, কিছুই না, অহংকারের লেশমাত্র না। আমাকে একেবারেই তুমিময় করে তোলো। কেবলই তুমি, তুমি, তুমিময়। কেবলই তুমিময় জ্যোতি, কেবলই তুমিময় আনন্দ।

হে রুদ্র, পাপ দগ্ধ হয়ে ভস্ম হয়ে যাক। তোমার প্রচণ্ড তাপ বিকীর্ণ করো। কোথাও কিছু লুকিয়ে না থাকুক, শিকড় থেকে বীজভরা ফল পর্যন্ত সমস্ত দগ্ধ হয়ে যাক। এ যে বহুদিনের বহু দুশ্চেষ্টার ফল, শাখার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে পাতার আড়ালে আড়ালে ফলে রয়েছে। শিকড় হৃদয়ের রসাতল পর্যন্ত নেমে গিয়েছে। তোমার রুদ্রতাপের এমন ইন্ধন আর নেই। যখন দগ্ধ হবে তখনই এ সার্থক হতে থাকবে। তখন আলোকের মধ্যে তার অন্ত হবে।

তার পরে হে প্রসন্ন, তোমার প্রসন্নতা আমার সমস্ত চিন্তায় বাক্যে কর্মে বিকীর্ণ হতে থাক্। আমার সমস্ত শরীরের রোমে রোমে সেই তোমার পরমপুলকময় প্রসন্নতা প্রবেশ করে এই শরীরকে ভাগবতী তনু করে তুলুক। জগতে এই শরীর তোমার প্রসাদ-অমৃতের পবিত্র পাত্র হয়ে বিরাজ করুক। তোমার সেই প্রসন্নতা আমার বুদ্ধিকে প্রশান্ত করুক, হৃদয়কে পবিত্র করুক, শক্তিকে মঙ্গল করুক। তোমার প্রসন্নতা তোমার বিচ্ছেদসংকট থেকে আমাকে চিরদিন রক্ষা করুক। তোমার প্রসন্নতা আমার চিরন্তন

অন্তরের ধন হয়ে আমার চিরজীবনপথের সম্বল হয়ে থাক্‌। আমারই অন্তরাত্মার মধ্যে তোমার যে সত্য, যে জ্যোতি, যে অমৃত, যে প্রকাশ রয়েছে তোমার প্রসন্নতার দ্বারা যখন তাকে উপলব্ধি করব তখনই রক্ষা পাব।

১৪ ফাল্গুন

বৈরাগ্য

যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন—

ন বা অরে পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি—আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি।

অর্থাৎ

পুত্রকে কামনা করছ বলেই যে পুত্র তোমার প্রিয় হয় তা নয় কিন্তু আত্মাকেই কামনা করছ বলে পুত্র প্রিয় হয়।

এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, আত্মা পুত্রের মধ্যে আপনাকেই অনুভব করে বলেই পুত্র তার আপন হয়, এবং সেইজন্যেই পুত্রে তার আনন্দ।

আত্মা যখন স্বার্থ এবং অহংকারের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে নিরবচ্ছিন্ন একলা হয়ে থাকে তখন সে বড়োই ম্লান হয়ে থাকে, তখন তার সত্য স্ফূর্তি পায় না। এইজন্যেই আত্মা পুত্রের মধ্যে মিত্রের মধ্যে নানা লোকের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করে আনন্দিত হয়ে থাকে কারণ তার সত্য পূর্ণতর হয়ে উঠতে থাকে।

ছেলেবেলায় বর্ণপরিচয়ে যখন ক খ গ প্রত্যেক অক্ষরকে স্বতন্ত্র করে শিখছিলুম তখন তাতে আনন্দ পাইনি। কারণ, এই স্বতন্ত্র অক্ষরগুলির কোনো সত্য পাচ্ছিনুম না। তার পরে অক্ষরগুলি যোজনা করে যখন "কর" "খল" প্রভৃতি পদ পাওয়া গেল তখন অক্ষর আমার কাছে তার তাৎপর্য প্রকাশ করাতে আমার মন কিছু কিছু সুখ অনুভব করতে লাগল। কিন্তু এরকম বিচ্ছিন্ন পদগুলি চিত্তকে যথেষ্ট রস দিতে পারে না—এতে ক্লেশ এবং ক্লান্তি এসে পড়ে। তার পরে আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে যেদিন "জল পড়ে" "পাতা নড়ে" বাক্যগুলি পড়েছিলুম সেদিন ভারি আনন্দ হয়েছিল, কারণ, শব্দগুলি তখন পূর্ণতর অর্থে ভরে উঠল। এখন শুদ্ধমাত্র "জল পড়ে" "পাতা নড়ে" আবৃত্তি করতে মনে সুখ হয় না বিরক্তিবোধ হয়, এখন ব্যাপক অর্থযুক্ত বাক্যাবলীর মধ্যেই শব্দবিন্যাসকে সার্থক বলে উপলব্ধি করতে চাই।

বিচ্ছিন্ন আত্মা তেমনি বিচ্ছিন্ন পদের মতো। তার একার মধ্যে তার তাৎপর্যকে পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না। এইজন্যেই আত্মা নিজের সত্যকে নানার মধ্যে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে। সে যখন আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন সে নিজের

সার্থকতার একটা রূপ দেখতে পায়—সে যখন আত্মীয় পরকীয় বহুতর লোককে আপন করে জানে তখন সে আর ছোটো আত্মা থাকে না, তখন সে মহাত্মা হয়ে ওঠে।

এর একমাত্র কারণ আত্মার পরিপূর্ণ সত্যটি আছে পরমাত্মার মধ্যে। আমার আমি সেই একমাত্র মহা আমিতেই সার্থক। এইজন্যে সে জেনে এবং না জেনেও সেই পরম আমিকেই খুঁজছে। আমার আমি যখন পুত্রের আমিতে গিয়ে সংযুক্ত হয় তখন কী ঘটে? তখন, যে পরম আমি আমার আমির মধ্যেও আছেন পুত্রের আমির মধ্যেও আছেন তাঁকে উপলব্ধি করে আমার আনন্দ হয়।

কিন্তু তখন মুশকিল হয় এই যে, আমার আমি এই উপলক্ষে যে সেই বড়ো আমির কাছেই একটুখানি এগোল তা সে স্পষ্ট বুঝতে পারে না। সে মনে করে সে পুত্রকেই পেল এবং পুত্রের কোনো বিশেষ গুণবশতই পুত্র আনন্দ দেয়। সুতরাং এই আসক্তির বন্ধনেই সে আটকা পড়ে যায়। তখন সে পুত্র-মিত্রকে কেবলই জড়িয়ে বসে থাকতে চায়। তখন সে এই আসক্তির টানে অনেক পাপেও লিপ্ত হয়ে পড়ে।

এইজন্য সত্যজ্ঞানের দ্বারা বৈরাগ্য উদ্রেক করবার জন্যেই যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন আমরা যথার্থত পুত্রকে চাই নে আত্মাকেই চাই। এ কথাটিকে ঠিকমতো বুঝলেই পুত্রের প্রতি আমাদের মুগ্ধ আসক্তি দূর হয়ে যায়। তখন উপলক্ষ্যই লক্ষ্য হয়ে আমাদের পথরোধ করতে পারে না।

যখন আমরা সাহিত্যের বৃহৎ তাৎপর্য বুঝে আনন্দ বোধ করতে থাকি, তখন প্রত্যেক কথাটি স্বতন্ত্রভাবে আমি আমি করে আমাদের মনকে আর বাধা দেয় না, প্রত্যেক কথা অর্থকেই প্রকাশ করে নিজেকে নয়। তখন কথা আপনার স্বাতন্ত্র্য যেন বিলুপ্ত করে দেয়।

তেমনি যখন আমরা সত্যকে জানি তখন সেই অখণ্ড সত্যের মধ্যেই সমস্ত খণ্ডতাকে জানি—তারা স্বতন্ত্র হয়ে উঠে আর আমার জ্ঞানকে আটক করে না। এই অবস্থাই বৈরাগ্যের অবস্থা। এই অবস্থায় সংসার আপনাকেই চরম ব'লে আমাদের সমস্ত মনকে কর্মকে গ্রাস করতে থাকে না।

কোনো কাব্যের তাৎপর্যের উপলব্ধি যখন আমাদের কাছে গভীর হয় উজ্জ্বল হয় তখনই তার প্রত্যেক শব্দের সার্থকতা সেই সমগ্র ভাবের মাধুর্যে আমাদের কাছে বিশেষ সৌন্দর্যময় হয়ে ওঠে। তখন যখন ফিরে দেখি দেখতে পাই কোনো শব্দটিই নিরর্থক নয় সমগ্রের রসটি প্রত্যেক পদের মধ্যেই প্রকাশ পাচ্ছে। তখন সেই কাব্যের প্রত্যেক পদটিই আমাদের কাছে বিশেষ আনন্দ ও বিস্ময়ের কারণ হয়ে ওঠে।

তখন তার পদগুলি সমগ্রের উপলব্ধিতে আমাদের বাধা না দিয়ে সহায়তা করে বলেই আমাদের কাছে বড়োই মূল্যবান হয়ে ওঠে।

তেমনি বৈরাগ্যে যখন স্বাতন্ত্র্যের মোহ কাটিয়ে ভূমার মধ্যে আমাদের মহাসত্যের পরিচয় সাধন করিয়ে দেয়, তখন সেই বৃহৎ পরিচয়ের ভিতর দিয়ে ফিরে এসে প্রত্যেক স্বাতন্ত্র্য সেই ভূমার রসে রসপরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। একদিন যাদের বানান করে পড়তে হচ্ছিল, যারা পদে পদে আমাদের পথরোধ করছিল, তারা প্রত্যেকে সেই ভূমার প্রতিই আমাদের বহন করে, রোধ করে না।

তখন যে আনন্দ সেই আনন্দই প্রেম। সেই প্রেমে বেঁধে রাখে না—সেই প্রেমে টেনে নিয়ে যায়। নির্মল নির্বাধ প্রেম। সেই প্রেমই মুক্তি—সমস্ত আসক্তির মৃত্যু। এই মৃত্যুরই সংকারমন্ত্র হচ্ছে—

মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।
মধু নক্তম্ উতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাং অস্তু সূর্যঃ।

বায়ু মধু বহন করছে, নদীসিন্ধুসকল মধু ক্ষরণ করছে। ওষধি বনস্পতি সকল মধুময় হ'ক, রাত্রি মধু হ'ক, উষা মধু হ'ক, পৃথিবীর ধূলি মধুমৎ হ'ক, সূর্য মধুমান হ'ক।

যখন আসক্তির বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে তখন জলস্থল-আকাশ, জড়জন্তু মনুষ্য সমস্তই অমৃতে পরিপূর্ণ—তখন আনন্দের অবধি নেই।

আসক্তি আমাদের চিত্তকে বিষয়ে আবদ্ধ করে। চিত্ত যখন সেই বিষয়ের ভিতরে বিষয়াতীত সত্যকে লাভ করে তখন প্রজাপতি যেমন গুটি কেটে বের হয় তেমনি সে বৈরাগ্য দ্বারা আসক্তি বন্ধন ছিন্ন করে ফেলে। আসক্তি ছিন্ন হয়ে গেলেই পূর্ণ সুন্দর প্রেম আনন্দরূপে সর্বত্রই প্রকাশ পায়। তখন, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি—এই মন্ত্রের অর্থ বুঝতে পারি। যা-কিছু প্রকাশ পাচ্ছে সমস্তই সেই আনন্দরূপ সেই অমৃতরূপ। কোনো বস্তুই তখন আমি প্রকাশ হচ্ছি বলে আর অহংকার করে না প্রকাশ হচ্ছেন কেবল আনন্দ কেবল আনন্দ। সেই প্রকাশের মৃত্যু নেই। মৃত্যু অন্য সমস্তের কিন্তু সেই প্রকাশই অমৃত।

১৫ ফাল্গুন ১৩১৫

বিশ্বাস

সাধনা-আরম্ভে প্রথমেই সকলের চেয়ে একটি বড়ো বাধা আছে—সেইটি কাটিয়ে উঠতে পারলে অনেকটা কাজ এগিয়ে যায়।

সেটি হচ্ছে প্রত্যয়ের বাধা। অজ্ঞাতসমুদ্র পার হয়ে একটি কোনো তীরে গিয়ে ঠেকবই এই নিশ্চিত প্রত্যয়ই হচ্ছে কলম্বসের সিদ্ধির প্রথম এবং মহৎ সম্বল। আরও অনেকেই আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে আমেরিকায় পৌঁছোতে পারত কিন্তু তাদের দীনচিত্তে ভরসা ছিল না; তাদের বিশ্বাস উজ্জ্বল ছিল না যে, কূল আছে; এইখানেই কলম্বসের সঙ্গে তাদের পার্থক্য।

আমরাও অধিকাংশ লোক সাধনাসমুদ্রে যে পাড়ি জমাই নে, তার প্রধান কারণ আমাদের অত্যন্ত নিশ্চিত প্রত্যয় জন্মে নি যে সে সমুদ্রের পার আছে। শাস্ত্র পড়েছি, লোকের কথাও শুনেছি, মুখে বলি হাঁ হাঁ বটে বটে, কিন্তু মানবজীবনের যে একটা চরম লক্ষ্য আছে সে-প্রত্যয় নিশ্চিত বিশ্বাসে পরিণত হয় নি। এইজন্য ধর্মসাধনটা নিতান্তই বাহ্যব্যাপার, নিতান্তই দশজনের অনুকরণ মাত্র হয়ে পড়ে। আমাদের সমস্ত আন্তরিক চেষ্টা তাতে উদ্বোধিত হয় নি।

এই বিশ্বাসের জড়তাবশতই লোককে ধর্মসাধনে প্রবৃত্ত করতে গেলে আমরা তাকে প্রতারণা করতে চেষ্টা করি, আমরা বলি এতে পুণ্য হবে। পুণ্য জিনিসটা কী? না, পুণ্য হচ্ছে একটি হ্যাণ্ডনোট যাতে ভগবান আমাদের কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন, কোনো একরকম টাকায় তিনি কোনো এক সময়ে সেটা পরিশোধ করে দেবেন।

এই রকম একটা সুস্পষ্ট পুরস্কারের লোভ আমাদের স্থূল প্রত্যয়ের অনুকূল। কিন্তু সাধনার লক্ষ্যকে এইরকম বহির্বিষয় করে তুললে তার পথও ঠিক অন্তরের পথ হয় না, তার লাভও অন্তরের লাভ হয় না। সে একটা পারলৌকিক বৈষয়িকতার সৃষ্টি করে। সেই বৈষয়িকতা অন্যান্য বৈষয়িকতার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

কিন্তু সাধনার লক্ষ্য হচ্ছে মানবজীবনের চরম লক্ষ্য। সে লক্ষ্য কখনোই বাহিরের কোনো স্থান নয়, যেমন স্বর্গ; বাহিরের কোনো পদ নয়, যেমন ইন্দ্রপদ; এমন কিছুই নয় যাকে দূরে গিয়ে সন্ধান করে বের করতে হবে, যার জন্যে পাণ্ডা পুরোহিতের শরণাপন্ন হতে হবে। এ কিছুতে হতেই পারে না।

মানবজীবনের চরম লক্ষ্য কী এই প্রশ্নটি নিজেকে জিজ্ঞাসা করে নিজের কাছ থেকে এর একটি স্পষ্ট উত্তর বের করে নিতে হবে। কারও কোনো শোনা কথায়

এখানে কাজ চলবে না—কেননা এটি কোনো ছোটো কথা নয়, এটি একেবারে শেষ কথা। এটিকে যদি নিজের অন্তরাত্মার মধ্যে না পাই তবে বাইরে খুঁজে পাব না।

এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে আমি এসে দাঁড়িয়েছি এটি একটি মহাশ্চর্য ব্যাপার। এর চেয়ে বড়ো ব্যাপার আর কিছু নেই। আশ্চর্য এই আমি এসেছি—আশ্চর্য এই চারিদিক।

এই যে আমি এসে দাঁড়িয়েছি, কেবল খেয়ে ঘুমিয়ে গল্প করে কি এই আশ্চর্যটাকে ব্যাখ্যা করা যায়? প্রবৃত্তির চরিতার্থতাই কি একে প্রতিমুহূর্তে অপমানিত করবে এবং শেষ মুহূর্তে মৃত্যু এসে একে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিয়ে চলে যাবে?

এই ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের মাঝখানটিতে দাঁড়িয়ে নিজের অন্তরাকাশের চৈতন্যলোকের মধ্যে নিস্তব্ধ হয়ে নিজেকে প্রশ্ন করো—কেন? এ সমস্ত কী জন্যে? এ প্রশ্নের উত্তর জল-স্থল-আকাশের কোথাও নেই—এ প্রশ্নের উত্তর নিজের অন্তরের মধ্যে নিহিত হয়ে রয়েছে।

এর একমাত্র উত্তর হচ্ছে আত্মাকে পেতে হবে। এ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো কথা নেই। আত্মাকেই সত্য করে পূর্ণ করে জানতে হবে।

আত্মাকে যেখানে জানলে সত্য জানা হয় সেখানে আমরা দৃষ্টি দিচ্ছি নে। এইজন্যে আত্মাকে জানা বলে যে একটা পদার্থ আছে এই কথাটা আমাদের বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই এসে পৌঁছোয় না।

আত্মাকে আমরা সংসারের মধ্যেই জানতে চাচ্ছি। তাকে কেবলই ঘর-দুয়োর ঘটিবাটির মধ্যেই জানছি। তার বেশি তাকে আমরা জানিই নে—এইজন্যে তাকে পাচ্ছি আর হারাচ্ছি, কেবল কাঁদছি আর ভয় পাচ্ছি। মনে করছি এটা না পেলেই আমি মলুম, আর ওটা পেলেই একেবারে ধন্য হয়ে গেলুম। এটাকে এবং ওটাকেই প্রধান করে জানছি, আত্মাকে তার কাছে খর্ব করে সেই প্রকাণ্ড দৈন্যের বোঝাকেই ঐশ্বর্যের গর্বে বহন করছি।

আত্মাকে সত্য করে জানলেই আত্মার সমস্ত ঐশ্বর্য লাভ হয়। মৃত্যুর সামগ্রীর মধ্যে অহরহ তাকে জড়িত করে তাকে শোকের বাষ্পে ভয়ের অন্ধকারে লুপ্তপ্রায় করে দেখার দুর্দিন কেটে যায়। পরমাত্মার মধ্যেই তার পরিপূর্ণ সত্য পরিপূর্ণ স্বরূপ প্রকাশ পায়—সংসারের মধ্যে নয়, বিষয়ের মধ্যে নয়, তার নিজের অহংকারের মধ্যে নয়।

আত্মা সত্যের পরিপূর্ণতার মধ্যে নিজেকে জানবে, সেই পরম উপলব্ধি দ্বারা সে বিনাশকে একেবারে অতিক্রম করবে। সে জ্ঞানজ্যোতির নির্মলতার মধ্যেই নিজেকে

জানবে। কামক্রোধলোভ যে-সমস্ত বিকারের অন্ধকার রচনা করে, তার থেকে আত্মা বিশুদ্ধ শুভ্র নির্মুক্ত পবিত্রতার মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে এবং সর্বপ্রকার আসক্তির মৃত্যুবন্ধন থেকে প্রেমের অমৃতলোকে মুক্তিলাভ করে সে নিজেকে অমর বলেই জানবে। সে জানবে কার প্রকাশের মধ্যে তার প্রকাশ সত্য—সেই আবিঃ সেই প্রকাশস্বরূপকেই সে আত্মার পরম প্রকাশ বলে নিজের সমস্ত দৈন্য দূর করে দেবে এবং অন্তরে বাহিরে সর্বত্রই একটি প্রসন্নতা লাভ করে সে স্পষ্ট জানতে পারবে যে চিরদিনের জন্য রক্ষা পেয়েছে। সমস্ত ভয় হতে, সমস্ত শোক হতে, সমস্ত ক্ষুদ্রতা হতে রক্ষা পেয়েছে।

আত্মাকে পরমাত্মার মধ্যে লাভ করাই যে জীবনের চরম লক্ষ্য এই লক্ষ্যটিকে একান্ত প্রত্যয়ের সঙ্গে একাগ্রচিত্তে স্থির করে নিতে হবে। দেখো, দেখো, নিরীক্ষণ করে দেখো, সমস্ত চেষ্টাকে শুদ্ধ করে সমস্ত মনকে নিবিষ্ট করে নিরীক্ষণ করে দেখো। একটি চাকা কেবলই ঘুরছে তারই মাঝখানে একটি বিন্দু স্থির হয়ে আছে। সেই বিন্দুটিকে অর্জুন বিদ্ধ করে দ্রৌপদীকে পেয়েছিলেন। তিনি চাকার দিকে মন দেন নি বিন্দুর দিকেই সমস্ত মন সংহত করেছিলেন। সংসারের চাকা কেবলই ঘুরছে, লক্ষ্যটি তার মাঝখানে ধ্রুব হয়ে আছে। সেই ধ্রুবের দিকেই মন দিয়ে লক্ষ্য স্থির করতে হবে, চলার দিকে নয়। লক্ষ্যটি যে আছে সেটা নিশ্চয় করে দেখে নিতে হবে—চাকার ঘূর্ণাগতির মধ্যে দেখা বড়ো শক্ত—কিন্তু সিদ্ধি যদি চাই প্রথমে লক্ষ্যটিকে স্থির যেন দেখতে পারি।

১৬ ফাল্গুন ১৩১৫

সংহরণ

আমাদের সাধনার দ্বিতীয় বড়ো বাধা হচ্ছে সাধনার অনভ্যাস। কোনো রকম সাধনাতেই হয়তো আমাদের অভ্যাস হয় নি। যখন যেটা আমাদের সমুখে এসেছে সেইটের মধ্যেই হয়তো আমরা আকৃষ্ট হয়েছি, যেমন-তেমন করে ভাসতে ভাসতে যেখানে সেখানে ঠেকতে ঠেকতে আমরা চলে যাচ্ছি। সংসারের স্রোত আমাদের বিনা চেষ্টাতেই চলছে বলেই আমরা চলছি—আমাদের দাঁড়ও নেই, হালও নেই, পালও নেই।

কোনো একটি উদ্দেশ্যের একান্ত অনুগত করে শক্তিকে প্রবৃত্তিকে চতুর্দিক হতে সংগ্রহ করে আনা আমরা চর্চাই করি নি। এইজন্তে তারা সকলেই হাতের বার হয়ে যাবার জো হয়েছে। কে কোথায় যে আছে তার ঠিকানা নেই—ডাক দিলেই যে ছুটে

আসবে এমন সম্ভাবনা নেই। যে সব খাদ্য তাদের অভ্যস্ত এবং রুচিকর তারই প্রলোভন পেলে তবেই তারা আপনি জড় হয় নইলে কিছুতেই নয়।

নিজেকে চারিদিকে কেবল ছড়াছড়ি করাটাই অভ্যাস হয়ে গেছে। চিন্তাও ছড়িয়ে পড়ে, কর্মও এলিয়ে যায়, কিছুই আঁট বাঁধে না।

এরকম অবস্থায় যে কেবল সিদ্ধি নেই তা নয়, সত্যকার সুখও নেই। এতে আছে কেবল জড়তার তামসিক আবেশমাত্র।

কারণ, যখন আমাদের শক্তিকে প্রবৃত্তিকে কোনো উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত করে দিই তখন সেই উদ্দেশ্যই তাদের বহন করে নিয়ে চলে। তখন তাদের ভার আর আমাদের নিজের ঘাড়ে পড়ে না। নতুবা তাদের বহন করে একবার এর উপর রাখছি একবার তার উপর রাখছি এমনি করে কেবলই টানাটানি করে নিয়ে বেড়াতে হয়। যখন কোথাও নামিয়ে রাখবার কোনো উপায় না পাই তখন কৃত্রিম উপায় সৃষ্টি করতে থাকি। কতই বাজে খেলা, বাজে আমোদ, বাজে উপকরণ। অবশেষে সেই কৃত্রিম আয়োজন-গুলোও দ্বিতীয় বোঝা হয়ে আমাদের চতুর্দিকে চেপে ধরে। এমনি করে জীবনের ভার কেবলই জমে উঠতে থাকে, জীবনান্তকাল পর্যন্ত কোনোমতেই তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাই নে।

তাই বলছিলুম কেবলমাত্র সাধনার অবস্থাতেই একটা আনন্দ আছে সিদ্ধির কথা দূরে থাক্। মহৎলক্ষ্য অনুসরণে নিজের বিক্ষিপ্ততাকে একাগ্র করে এনে তাকে এক পথে চালনা করলে তাতেই যেন প্রাণ বেঁচে যায়। যেটুকু সচেষ্টতা থাকলে আমরা সাধনাকে আনন্দ বলে কোমর বেঁধে বক্ষ প্রসারিত করে প্রবৃত্ত হতে পারি সেটুকুও যদি আমাদের ভিতর থেকে খয়ে গিয়ে থাকে তবে বড়ো বিপদ। যেমন করে হ'ক, বারংবার স্খলিত হয়েও সেই সমস্ত শক্তিকে একাগ্র করবার চেষ্টাকে শক্ত করে তুলতে হবে। শিশু যেমন পড়তে পড়তে আঘাত পেতে পেতে চলতে শেখে তেমনি করেই তাকে চলতে শেখাতে হবে। কেননা সিদ্ধিলাভে প্রথমে লক্ষ্যটা যে সত্য সেই বিশ্বাসটি জাগানো চাই, তার পরে লক্ষ্যটি বাইরে না ভিতরে, পরিধিতে না কেন্দ্রে সেটি জানা চাই, তার পরে চাই সোজা পথ বেয়ে চলতে শেখা। স্থৈর্য এবং গতি দুই চাই। বিশ্বাসে চিত্ত স্থির হবে—এবং সাধনায় চেষ্টা গতি লাভ করবে।

১৬ ফাল্গুন ১৩১৫

নিষ্ঠা

যখন সিদ্ধির মূর্তি কিছু পরিমাণে দেখা দেয় তখন আনন্দে আমাদের আপনি টেনে নিয়ে চলে—তখন থামায় কার সাধ্য। তখন শ্রান্তি থাকে না, দুর্বলতা থাকে না।

কিন্তু সাধনার আরম্ভেই সেই সিদ্ধির মূর্তি তো নিজেকে এমন করে দূর থেকেও প্রকাশ করে না। অথচ পথটিও তো সুগম পথ নয়। চলি কিসের জোরে?

এই সময়ে আমাদের চালাবার ভার যিনি নেন তিনিই নিষ্ঠা। ভক্তি যখন জাগে, হৃদয় যখন পূর্ণ হয় তখন তো আর ভাবনা থাকে না, তখন তো পথকে আর পথ বলেই জ্ঞান হয় না, তখন একেবারে উড়ে চলি। কিন্তু ভক্তি যখন দূরে, হৃদয় যখন শূন্য সেই অত্যন্ত দুঃসময়ে আমাদের সহায় কে?

তখন আমাদের একমাত্র সহায় নিষ্ঠা। শুষ্ক চিত্তের মৃতভারকে সেই বহন করতে পারে।

মরুভূমির পথে যাদের চলতে হয় তাদের বাহন হচ্ছে উট। অত্যন্ত শক্ত সবল বাহন—এর কিছুমাত্র শৌখিনতা নেই। খাদ্য পাচ্ছে না তবু চলছে। পানীয় রস পাচ্ছে না তবু চলছে। বালি তপ্ত হয়ে উঠেছে তবু চলছে, নিঃশব্দে চলছে। যখন মনে হয় সামনে বুঝি এ মরুভূমির অন্ত নেই, বুঝি মৃত্যু ছাড়া আর গতি নেই তখনও তার চলা বন্ধ হয় না।

তেমনি শুষ্কতা রিক্ততার মরুপথে কিছু না খেয়ে কিছু না পেয়েও আমাদের চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে সে কেবল নিষ্ঠা—তার এমনি শক্ত প্রাণ যে নিন্দাগ্লানির ভিতর থেকে কাঁটাগুল্মের মধ্যে থেকেও সে নিজের খাদ্য সংগ্রহ করে নিতে পারে। যখন মরুবায়ুর মৃত্যুময় ঝঞ্ঝা উন্মত্তের মতো ছুটে আসে, তখন সে ধুলোর উপর মাথা সম্পূর্ণ নত করে ঝড়কে মাথার উপর দিয়ে চলে যেতে দেয়। তার মতো এমন ধীর সহিষ্ণু এমন অধ্যবসায়ী কে আছে?

একঘেয়ে একটানা প্রান্তর—মাঝে মাঝে কেবল কল্পনার মরীচিকা পথ ভোলাতে আসে। সার্থকতার বিচিত্র রূপ ক্ষণে ক্ষণে দেখা দেয় না। মনে হয় যেন কালও যেখানে ছিলুম আজও সেখানেই আছি। মন দিতে চাই, মন ঘুরে বেড়ায়; হৃদয়কে ডাকাডাকি করি, হৃদয় সাড়া দেয় না। কেবলই মনে হয় ব্যর্থ উপাসনার চেষ্টায় ক্লিষ্ট হচ্ছি। কিন্তু সেই ব্যর্থ উপাসনার ভয়ানক ভার বহন করে নিষ্ঠা প্রত্যেক দিনই চলতে পারে—দিনের পর দিন, দিনের পর দিন।

অগ্রসর হচ্ছেই অগ্রসর হচ্ছেই—প্রতিদিন যে গম্যস্থানের কিছু কিছু করে কাছে আসছে তাতে সন্দেহমাত্র নেই। ওই দেখো হঠাৎ একদিন কোথা হতে ভক্তির ওয়েসিস দেখা দেয়—সুদূরপ্রসারিত দগ্ধ পাণ্ডুরতার মধ্যে মধুফলগুচ্ছপূর্ণ খর্জুরকুঞ্জের সুস্নিগ্ধ শ্যামলতা। সেই নিভৃত ছায়াতলে শীতল জলের উৎস বয়ে যাচ্ছে। সেই জল পান করে তাতে স্নান করে ছায়ায় বিশ্রাম করে আবার পথে যাত্রা করি। কিন্তু ভক্তির সেই মধুরতা সেই শীতল সরসতা তো বরাবর সঙ্গে সঙ্গে চলে না। তখন আবার সেই কঠিন শুষ্ক অশ্রান্ত নিষ্ঠা। তার একটি গুণ আছে, ভক্তির জল যদি সে কোনো সুযোগে একদিন পান করতে পায় তবে সে অনেকদিন পর্যন্ত তাকে ভিতরের গোপন আধারে জমিয়ে রাখতে পারে। ঘোরতর নীরসতার দিনেও সেই তার পিপাসার সম্বল।

সাধনায় যাঁকে পাওয়া যায় তাঁর প্রতি ভক্তিকেই আমরা ভক্তি বলি, কিন্তু নিষ্ঠা হচ্ছে সাধনারই প্রতি ভক্তি। এই কঠোর কঠিন শুষ্ক সাধনাই হচ্ছে নিষ্ঠার প্রাণের ধন। এতে তার একটি গভীরতর আনন্দই আছে। সে একটি অহেতুক পবিত্র আনন্দ। এই বজ্রসার আনন্দে সে নৈরাশ্যকে দূরে রেখে দেয়—সে মৃত্যুকেও ভয় করে না। এই আমাদের মরুপথের একমাত্র সঙ্গিনী নিষ্ঠা যেদিন পথের অন্তে এসে পৌঁছোয় সেদিন সে ভক্তির হাতে আমাদের সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দিয়ে নিজেকে তার দাসীশালায় লুকিয়ে রেখে দেয়; কোনো অহংকার করে না, কোনো দাবি করে না—সার্থকতার দিনে আপনাকে অন্তরালে প্রচ্ছন্ন করেই তার সুখ।

১৭ ফাল্গুন

নিষ্ঠার কাজ

নিষ্ঠা যে কেবল আমাদের শুষ্ক কঠিন পথের উপর দিয়ে অক্লান্ত অধ্যবসায়ে চালন করে নিয়ে যায় তা নয়, সে আমাদের কেবলই সতর্ক করে দেয়। রোজই একভাবে চলতে চলতে আমাদের শৈথিল্য এবং অমনোযোগ আসতে থাকে। নিষ্ঠা কখনো ভুলতে চায় না—সে আমাদের ঠেলে দিয়ে বলে এ কী হচ্ছে। এ কী করছ। সে মনে করিয়ে দেয় ঠাণ্ডার সময় যদি এগিয়ে না থাক তবে রৌদ্রের সময় যে কষ্ট পাবে। সে দেখিয়ে দেয় তোমার জলাধারের ছিদ্র দিয়ে জল পড়ে যাচ্ছে পিপাসার সময় উপায় কী হবে।

আমরা সমস্ত দিন কত রকম করে যে শক্তির অপব্যয় করে চলি তার ঠিকানা নেই—কত বাজে কথায়, কত বাজে কাজে। নিষ্ঠা হঠাৎ স্মরণ করিয়ে দেয়, এই

যে-জিনিসটা এমন করে ফেলাছড়া করছ এটার যে খুব প্রয়োজন আছে। একটু চুপ করো, একটু স্থির হও, অত বাড়িয়ে ব'লো না, অমন মাত্রা ছাড়িয়ে চ'লো না, যে জল পান করবার জন্যে যত্নে সঞ্চিত করা দরকার সে জলে থামকা পা ডুবিয়ে ব'সো না। আমরা যখন খুব আত্মবিস্মৃত হয়ে একটা তুচ্ছতার ভিতরে একেবারে গলা পর্যন্ত নেবে গিয়েছি তখনও সে আমাদের ভোলে না—বলে, ছি, এ কী কাণ্ড! বুকের কাছেই সে বসে আছে, কিছুই তার দৃষ্টি এড়াতে চায় না।

সিদ্ধিলাভের কাছাকাছি গেলে প্রেমের সহজ প্রাজ্ঞতা লাভ হয়, তখন মাত্রাবোধ আপনি ঘটে। সহজ কবি যেমন সহজেই ছন্দোরক্ষা করে চলে আমরা তেমনি সহজেই জীবনকে আগাগোড়া সৌন্দর্যের মধ্যে বিশুদ্ধরূপে নিয়মিত করতে পারি। তখন স্খলন হওয়াই শক্ত হয়। কিন্তু রিক্ততার দিনে সেই আনন্দের সহজ শক্তি যখন থাকে না, তখন পদে পদে যতিপতন হয়; যেখানে থামবার নয় সেখানে আলস্য করি, যেখানে থামবার সেখানে বেগ সামলাতে পারি নে। তখন এই কঠোর নিষ্ঠাই আমাদের একমাত্র সহায়। তার ঘুম নেই সে জেগেই আছে। সে বলে ও কী! ওই যে একটা রাগের রক্ত আভা দেখা দিল। ওই যে নিজেকে একটু বেশি করে বাড়িয়ে দেখবার জন্যে তোমার চেষ্টা আছে। ওই যে শত্রুতার কাঁটা তোমার স্মৃতিতে বিঁধেই রইল। কেন, হঠাৎ গোপনে তোমার এত ক্ষোভ দেখি কেন! এই যে রাত্রে শুতে যাচ্ছ এই পবিত্র নির্মল নিদ্রার কক্ষে প্রবেশ করতে যাবার মতো শান্তি তোমার অন্তরে কোথায়!

সাধনার দিনে নিষ্ঠার এই নিত্য সতর্কতার স্পর্শই আমাদের সকলের চেয়ে প্রধান আনন্দ। এই নিষ্ঠা যে জেগে আছেন এইটে যতই জানতে পাই ততই বক্ষের মধ্যে নির্ভর অনুভব করি। যদি কোনোদিন কোনো আত্মবিস্মৃতির দুর্যোগে এঁর দেখা না পাই তবেই বিপদ গনি। যখন চরম সুহৃদকে না পাই তখন এই নিষ্ঠাই আমাদের পরম সুহৃদরূপে থাকেন। তাঁর কঠোর মূর্তি প্রতিদিন আমাদের কাছে শুভ্র সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে ওঠে। এই চাঞ্চল্যবর্জিত ভোগবিরত পুণ্যশ্রী তাপসিনী আমাদের রিক্ততার মধ্যে শক্তি শান্তি এবং জ্যোতি বিকীর্ণ করে দারিদ্র্যকে রমণীয় করে তোলেন।

গম্যস্থানের প্রতি কলম্বসের বিশ্বাস যখন সুদৃঢ় হল তখন নিষ্ঠাই তাঁকে পথচিহ্নহীন অপরিচিত সমুদ্রের পথে প্রত্যহ ভরসা দিয়েছিল। তাঁর নাবিকদের মনে সে বিশ্বাস দৃঢ় ছিল না, তাদের সমুদ্রযাত্রায় নিষ্ঠাও ছিল না। তারা প্রতিদিনই বাইরে থেকে একটা কিছু সফলতার মূর্তি দেখবার জন্যে ব্যস্ত ছিল; কিছু একটা না পেলে তাদের শক্তি অবসন্ন হয়ে পড়ে, এই জন্যে দিন যতই যেতে লাগল সমুদ্র যতই শেষ হয় না, তাদের অধৈর্য ততই বেড়ে উঠতে থাকে। তারা বিদ্রোহ করবার উপক্রম করে, তারা

ফিরে যেতে চায়। তবু কলম্বসের নিষ্ঠা বাইরে থেকে কোনো নিশ্চয় চিহ্ন না দেখতে পেয়েও নিঃশব্দে চলতে থাকে। কিন্তু এমন হয়ে এসেছে নাবিকদের আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না, তারা জাহাজ ফেরায় বা! এমন সময় চিহ্ন দেখা দিল, তীর যে আছে তার আর কোনো সন্দেহ রইল না। তখন সকলেই আনন্দিত, সকলেই উৎসাহে এগিয়ে যেতে চায়। তখন কলম্বসকে সকলেই বন্ধু জ্ঞান করে, সকলেই তাকে ধন্যবাদ দেয়।

সাধনার প্রথমাবস্থায় সহায় কেউ নেই—সকলেই সন্দেহ প্রকাশ করে, সকলেই বাধা দেয়। বাইরেও এমন কোনো স্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পাই নে যাকে আমরা সত্যবিশ্বাসের স্পষ্ট প্রমাণ বলে নিজের ও সকলের কাছে ধরে দেখাতে পারি। তখন সেই সমুদ্রের মাঝখানে সন্দেহ ও বিরুদ্ধতার মধ্যে নিষ্ঠা যেন এক মুহূর্ত সঙ্গ ত্যাগ না করে। যখন তীর কাছে আসবে, যখন তীরের পাখি তোমার মাস্তুলের উপর উড়ে বসবে, যখন তীরের ফুল সমুদ্রের তরঙ্গের উপর নৃত্য করবে তখন সাধুবাদ ও আনুকূল্যের অভাব থাকবে না; কিন্তু ততকাল প্রতিদিনই কেবল নিষ্ঠা—নৈরাশ্যজয়ী নিষ্ঠা, আঘাতসহিষ্ণু নিষ্ঠা, বাহিরের উৎসাহ-নিরপেক্ষ নিষ্ঠা, নিন্দায় অবিচলিত নিষ্ঠা—কোনো মতে কোনো কারণেই সেই নিষ্ঠা যেন ত্যাগ না করে। সে যেন কম্পাসের দিকে চেয়েই থাকে, সে যেন হাল আঁকড়ে বসেই থাকে।

১৭ ফাল্গুন

বিমুখতা

সেই বিশ্বকর্মা মহাত্মা যিনি জনগণের হৃদয়ের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়ে কাজ করছেন—তিনি বড়ো প্রচ্ছন্ন হয়েই কাজ করেন। তাঁর কাজ অগ্রসর হচ্ছেই সন্দেহ নেই—কেবল সে কাজ যে চলছে তা আমরা জানি নে বলেই নিরানন্দ আছে। সেই কাজে আমাদের যেটুকু যোগ দেবার আছে তা দিই নি বলেই আমাদের জীবন যেন তাৎপর্যহীন হয়ে রয়েছে। কিন্তু তবু বিশ্বকর্মা তাঁর স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়ার আনন্দে প্রতিদিনই প্রতি মুহূর্তেই কাজ করছেন। তিনি আমার জীবনের একটি সূর্যকরোজ্জ্বল দিনকে চন্দ্রতারা-খচিত রাত্রির সঙ্গে গাঁথছেন, আবার সেই জ্যোতিষ্কপুঞ্জখচিত রাত্রিকে জ্যোতির্ময় আর একটি দিনের সঙ্গে গেঁথে চলেছেন। আমার এই জীবনের মণিহার রচনায় তাঁর বড়ো আনন্দ। আমি যদি তাঁর সঙ্গে যোগ দিতুম তবে সেই আনন্দ আমারও হত। এই আশ্চর্য শিল্পরচনায় কত ছিদ্র করতে হচ্ছে, কত বিদ্ধ করতে হচ্ছে, কত দগ্ধ করতে

হচ্ছে, কত আঘাত করতে হচ্ছে—সেই সমস্ত আঘাতের মধ্যেই বিশ্বকর্মার সৃজনের আনন্দে আমার অধিকার জন্মাত।

কিন্তু যে অন্তরের গুহার মধ্যে আনন্দিত বিশ্বকর্মা দিন রাত্রি বসে কাজ করছেন সেদিকে আমি তো তাকালুম না—আমি সমস্ত জীবন বাইরের দিকেই হাঁ করে তাকিয়ে রইলুম। দশজনের সঙ্গে মিলছি মিশছি হাসি গল্প করছি আর ভাবছি কোনো মতে দিন কেটে যাচ্ছে—যেন দিনটা কাটানোই হচ্ছে দিনটা পাবার উদ্দেশ্য। যেন দিনের কোনো অর্থ নেই।

আমরা যেন মানবজীবনের নাট্যশালায় প্রবেশ করে যেদিকে অভিনয় হচ্ছে সেদিকে মূঢ়ের মতো পিঠ ফিরিয়ে বসে আছি। নাট্যশালার থামগুলো চৌকিগুলো এবং লোক-জনের ভিড়ই দেখছি। তার পরে যখন আলো নিবে গেল, যবনিকা পড়ে গেল, আর কিছুই দেখতে পাই নে, অন্ধকার নিবিড়—তখন হয়তো নিজেকে জিজ্ঞাসা করি, কী করতে এসেছিলুম, কেনই বা টিকিটের দাম দিলুম, এই থাম চৌকির অর্থ কী, এতগুলো লোকই বা এখানে জড় হয়েছে কী করতে? সমস্তই ফাঁকি, সমস্তই অর্থহীন ছেলেখেলা। হায়, আনন্দের অভিনয় যে নাট্যমঞ্চে হচ্ছে সে-দিকের কোনো খবরই পাওয়া গেল না।

জীবনের আনন্দলীলা যিনি করছেন তিনি যে এই ভিতরে বসেই করছেন—ওই থাম চৌকিগুলো যে বহিরঙ্গ মাত্র। ওইগুলিই প্রধান সামগ্রী নয়। একবার অন্তরের দিকে চোখ ফেরাও—তখনই সমস্ত মানে বুঝতে পারবে।

যে কাণ্ডটা হচ্ছে সমস্তই যে অন্তরে হচ্ছে। এই যে অন্ধকার কেটে গিয়ে এখনই ধীরে ধীরে সূর্যোদয় হচ্চে একি কেবলই তোমার বাইরে? বাইরেই যদি হত তবে তুমি সেখানে কোন্ দিক দিয়ে প্রবেশ করতে? বিশ্বকর্মা যে তোমার চৈতন্যাকাশকে এই মুহূর্তে একেবারে অরুণরাগে প্লাবিত করে দিলেন। চেয়ে দেখো তোমারই অন্তরে তরুণ সূর্য সোনার পদ্মের কুঁড়ির মতো মাথা তুলে উঠচে, একটু একটু করে জ্যোতির পাপড়ি চারিদিকে ছড়িয়ে দেবার উপক্রম করছে—তোমারই অন্তরে। এই তো বিশ্বকর্মার আনন্দ। তোমারই এই জীবনের জমিতে তিনি এত সোনার সুতো রুপোর সুতো এত রং-বেরঙের সুতো দিয়ে অহরহ এতবড়ো একটা আশ্চর্য বুনানি বুনছেন—এ যে তোমার ভিতরেই—যা একেবারে বাইরে সে যে তোমার নয়।

তবে এখনই দেখো। এই প্রভাতকে তোমারই অন্তরের প্রভাত বলে দেখো, তোমারই চৈতন্যের মধ্যে তাঁর আনন্দ-সৃষ্টি বলে দেখো। এ আর কারও নয়, এ আর কোথাও নেই—তোমার এই প্রভাতটি একমাত্র তোমারই মধ্যে রয়েছে এবং সেখানে একলামাত্র তিনিই রয়েছেন। তোমার এই সুগভীর নির্জনতার মধ্যে তোমার এই

অন্তহীন চিদাকাশের মধ্যে তাঁর এই অদ্ভুত বিরাট লীলা— দিনে রাত্রে অবিশ্রাম। এই আশ্চর্য প্রভাতের দিকে পিঠ ফিরিয়ে একে কেবলই বাইরের দিকে দেখতে গেলে এতে আনন্দ পাবে না অর্থ পাবে না।

যখন আমি ইংলণ্ডে ছিলুম আমি তখন বালক। লণ্ডন থেকে কিছু দূরে এক জায়গায় আমার নিমন্ত্রণ ছিল। আমি সন্ধ্যার সময় রেলগাড়িতে চড়লুম। তখন শীতকাল। সেদিন কুহেলিকায় চারিদিক আচ্ছন্ন—বরফ পড়ছে। লণ্ডন ছাড়িয়ে স্টেশনগুলি বাম দিকে আসতে লাগল। যখন গাড়ি থামে আমি জানলা খুলে বাম দিকে মুখ বাড়িয়ে সেই কুয়াশালিপ্ত অস্পষ্টতার মধ্যে কোনো একব্যক্তিকে ডেকে স্টেশনের নাম জেনে নিতে লাগলুম। আমার গম্য স্টেশনটি শেষ স্টেশন। সেখানে যখন গাড়ি থামল আমি বাম দিকেই তাকালুম—সে-দিকে আলো নেই প্ল্যাটফর্ম নেই দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রইলুম। ক্ষণকাল পরেই গাড়ি আবার লণ্ডনের অভিমুখে পিছোতে আরম্ভ করল। আমি বলি, এ কী হল। পরের স্টেশনে যখন থামল, জিজ্ঞাসা করলুম অমুক স্টেশন কোথায়? উত্তর শুনলুম সেখান থেকে তুমি যে এইমাত্র আসছ। । তাড়াতাড়ি নেবে পড়ে জিজ্ঞাসা করলুম এর পরের গাড়ি কখন পাওয়া যাবে? উত্তর পেলুম— অর্ধরাত্রে। গম্য স্টেশনটি ডান দিকে ছিল।

আমরা জীবনযাত্রায় কেবল বাঁ দিকের স্টেশনগুলিরই খোঁজ নিয়ে চলেছি। ডান-দিকে কিছুই নেই বলে একেবারে নিশ্চিন্ত। একটার পর একটা পার হয়ে গেলুম। যে-স্থানে নামবার ছিল সেখানেও সংসারের দিকেই—ওই বামদিকেই—চেয়ে দেখলুম। দেখলুম সমস্ত অন্ধকার, সমস্ত কুয়াশায় অস্পষ্ট। যে-সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল সে-সুযোগ কেটে গেল—গাড়ি ফিরে চলেছে। যেখানে নিমন্ত্রণ ছিল সেখানে আমোদ আহ্লাদ অতীত হতে চলল। আবার গাড়ি কখন পাওয়া যাবে। এই যে সুযোগ পেয়েছিলুম ঠিক এমন সুযোগ কখন পাব—কোন্ অর্ধরাত্রে।

মানবজীবনের ভিতর দিয়েই যে চরম স্থানে যাওয়া যেতে পারে এমন একটা স্টেশন আছে। সেখানে যদি না নামি—সেখানকার প্ল্যাটফর্ম যেদিকে সেদিকে যদি না তাকাই তবে সমস্ত যাত্রাই যে আমার কাছে একটা নিতান্ত কুহেলিকাবৃত নিরর্থক ব্যাপার বলে ঠেকবে তাতে সন্দেহ কী আছে। কেন যে টিকিটের দাম দিলুম, কেন যে গাড়িতে উঠলুম, অন্ধকার রাত্রির ভিতর দিয়ে কেন যে চললুম, কী যে হল কিছুই বোঝা গেল না। নিমন্ত্রণ আমার কোথায় ছিল, ভোজের আয়োজনটা কোথায় হয়েছে, ক্ষুধা আমার কোন্‌খানে মিটবে, আশ্রয় আমি কোন্‌খানে পাব—সে প্রশ্নের কোনো উত্তর না পেয়েই হতবুদ্ধি হয়ে যাত্রা শেষ করতে হল।

হে সত্য, আর কিছু নয়, যেদিকে তুমি, যেদিকে সত্য, সেইদিকে আমার মুখ ফিরিয়ে দাও—আমি যে কেবল অসত্যের দিকেই তাকিয়ে আছি। তোমার আনন্দলীলা-মঞ্চে তুমি সারি সারি আলো জ্বালিয়ে দিয়েছ—আমি তার উলটোদিকের অন্ধকারে তাকিয়ে ভেবে মরছি এ সমস্ত কী। তোমার জ্যোতির দিকে আমাকে ফেরাও। আমি কেবলই দেখছি মৃত্যু—তার কোনো মানেই ভেবে পাচ্ছি নে, ভয়ে সারা হয়ে যাচ্ছি। ঠিক তার ওপাশেই যে অমৃত রয়েছে, তার মধ্যে সমস্ত মানে রয়েছে সে-কথা আমাকে কে বুঝিয়ে দেবে? হে আবিঃ—তুমি যে প্রকাশরূপে নিরন্তর রয়েছ—সেই প্রকাশের দিকেই আমার দৃষ্টি নেই। আমি হতভাগ্য। সেইজন্য আমি কেবল তোমাকে রুদ্রই দেখছি—তোমার প্রসন্নতা যে আমার আত্মাকে নিয়ত পরিবেষ্টিত করে রয়েছে তা জানতেই পারছি নে। মার দিকে পিঠ করে শিশু অন্ধকার দেখে কেঁদে মরে—একবার পাশ ফিরলেই জানতে পারে মা যে তাকে আলিঙ্গন করেই রয়েছেন। তোমার প্রসন্নতার দিকেই তুমি আমাদের পাশ ফিরিয়ে নাও হে জননী, তাহলেই এক মুহূর্তে জানতে পারব আমি রক্ষা পেয়েই আছি, অনন্তকাল আমার রক্ষা, নইলে অরক্ষা-ভয়ের কান্না কোনোমতেই থামবে না।

১৮ ফাল্গুন

মরণ

ঈশ্বরের সঙ্গে খুব একটা শৌখিন রকমের যোগ রক্ষা করার মতলব মানুষের দেখতে পাই। যেখানে যা যেমন আছে তা ঠিক সেইরকম রেখে সেইসঙ্গে অমনি ঈশ্বরকেও রাখবার চেষ্টা। তাতে কিছুই নাড়ানাড়ি করতে হয় না। ঈশ্বরকে বলি, তুমি ঘরের মধ্যে এস কিন্তু সমস্ত বাঁচিয়ে এস—দেখো আমার কাঁচের ফুলদানিটা যেন না পড়ে যায়, ঘরের নানাস্থানে যে নানা পুতুল সাজিয়ে রেখেছি তার কোনোটা যেন ঘা লেগে ভেঙে না যায়। এ আসনটায় ব'সো না এটাতে আমার অমুক বসে, এ জায়গায় নয় এখানে আমি অমুক কাজ করে থাকি, এ ঘর নয় এ আমার অমুকের জন্যে সাজিয়ে রাখছি। এই করতে করতে সবচেয়ে কম জায়গা এবং সবচেয়ে অনাবশ্যক স্থানটাই আমরা তাঁর জন্যে ছেড়ে দিই।

মনে আছে আমার পিতার কোনো ভৃত্যের কাছে ছেলেবেলায় আমরা গল্প শুনেছি যে, সে যখন পুরীতীর্থে গিয়েছিল তার মহা ভাবনা পড়েছিল জগন্নাথকে কী দেবে। তাঁকে যা দেবে সে তো কখনো সে আর ভোগ করতে পারবে না সেইজন্যে সে যে

জিনিসের কথাই মনে করে কোনোটাই তার দিতে মন সরে না—যাতে তার অল্পমাত্রও লোভ আছে সেটাও, চিরদিনের মতো দেবার কথায়, মন আকুল করে তুলতে লাগল। শেষকালে বিস্তর ভেবে সে জগন্নাথকে বিলিতি বেগুন দিয়ে এল। এই ফলটিতেই সে লোকের সবচেয়ে কম লোভ ছিল।

আমরাও ঈশ্বরের জন্যে কেবলমাত্র সেইটুকুই ছাড়তে চাই যেটুকুতে আমাদের সবচেয়ে কম লোভ—যেটুকু আমাদের নিতান্ত উদ্‌বৃত্তের উদ্‌বৃত্ত। ঈশ্বরের নামগাঁথা দুটো একটা মন্ত্র পাঠ করা গেল, দুটি একটি সংগীত শোনা গেল, যাঁরা বেশ ভালো বক্তৃতা করতে পারেন তাঁদের কাছ থেকে নিয়মিত বক্তৃতা শোনা গেল। বললুম বেশ হল, বেশ লাগল, মনটা এখন বেশ পবিত্র ঠেকছে আমি ঈশ্বরের উপাসনা করলুম।

একেই আমরা বলি উপাসনা। যখন বিদ্যার ধনের বা মানুষের উপাসনা করি তখন সেটা এত সহজ উপাসনা হয় না, তখন উপাসনা যে কাকে বলে তা বুঝতে বাকি থাকে না। কেবল ঈশ্বরের উপাসনাটাই হচ্ছে উপাসনার মধ্যে সবচেয়ে ফাঁকি।

এর মানে আর কিছুই নয়, নিজের অংশটাকেই সবচেয়ে বড়ো করে ঘের দিয়ে নিয়ে ঈশ্বরকে একপাই অংশের শরিক করি এবং মনে করি আমার সকল দিক রক্ষা হল।

আমাদের দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে "যা দ্বয়লোকসাধনী তনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী"—যাতে দুই লোকেরই সাধনা হয় মানুষের সেই চাতুরীই চাতুরী।

কিন্তু যে-চাতুরী দুইলোক রক্ষার ভার নেয় শেষকালে সে ওই দুই লোকের মধ্যে একটা লোকের কথা ভুলতে থাকে, তার চাতুরী ঘুচে যায়। যে-লোকটি আমার দিকের লোক অধিকাংশ স্থলে সেই দিকের সীমানাই অজ্ঞাতসারে এবং জ্ঞাতসারে বেড়ে চলতে থাকে। ঈশ্বরের জন্যে ওই যে একপাই জমি রেখেছিলুম যদি তাতে কোনো পদার্থ থাকে, যদি সেটা নিতান্তই বালিচাপা মরুভূমি না হয়, তবে একটু একটু করে লাঙল ঠেলে ঠেলে সেটা আত্মসাৎ করে নেবার চেষ্টা করি। "আমি" জিনিসটা যে একটা মস্ত পাথর, তার ভার যে ভয়ানক ভার। যে-দিকটাতে সেই আমিটাকে চাপাই সেই দিকটাতেই যে ধীরে ধীরে সমস্তটাই কাত হয়ে পড়তে চায়। যদি রক্ষা পেতে চাও তবে ওইটেকেই একেবারে জলের মধ্যে ফেলে দিতে পারলেই ভালো হয়।

আসল কথা, সবটাই যদি ঈশ্বরকে দিতে পারি তাহলেই দুইলোক রক্ষা হয়—চাতুরী করতে গেলে হয় না। তাঁর মধ্যেই দুই লোক আছে। তাঁর মধ্যেই যদি আমাকে পাই তবে একসঙ্গেই তাঁকেও পাই আমাকেও পাই। আর তাঁর সঙ্গে যদি ভাগ বিভাগ করে সীমানা টেনে পাকা দলিল করে নিয়ে কাজ চালাতে চাই তাহলে সেটা একেবারেই পাকা কাজ হয় না, সেটা বিষয়কর্মের নামান্তর হয়। বিষয়কর্মের যে গতি তারও সেই

গতি—অর্থাৎ তার মধ্যে নিত্যতার লক্ষণ নেই—তার মধ্যে বিকার আসে এবং ক্রমে মৃত্যু দেখা দেয়।

ও সমস্ত চাতুরী ছেড়ে দিয়ে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণই আত্মসমর্পণ করতে হবে এই কথাটাকেই পাকা করা যাক। আমার দুইয়ে কাজ নেই আমার একই ভালো। আমার অন্তরাত্মার মধ্যে একটি সতীর লক্ষণ আছে, সে চতুরা নয়, সে যথার্থই দুইকে চায় না, সে একককেই চায়; যখন সে এককে পায় তখনই সে সমস্তকেই পায়।

একাগ্র হয়ে সেই একের সাধনাই করব কিন্তু কঠিন সংকট এই যে, আজ পর্যন্ত সে জন্যে কোনো আয়োজন করা হয় নি। সেই পরমকে বাদ দিয়েই সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়ে গেছে। জীবন এমনি ভাবে তৈরি হয়ে গেছে যে, কোনোমতে ঠেলে ঠুলে তাঁকে জায়গা করে দেওয়া একেবারে অসম্ভব হয়ে এসেছে।

পৃথিবীতে আর সমস্তই গোঁজামিলন দেওয়া যায়, যেখানে পাঁচজনের বন্দোবস্ত সেখানে ছজনকে ঢুকিয়ে দেওয়া খুব বেশি শক্ত নয়, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে সেরকম গোঁজামিলন চালাতে গেলে একেবারেই চলে না। তিনি "পুনশ্চ নিবেদনের" সামগ্রী নন। তাঁর কথা যদি গোড়া থেকে ভুলেই থাকি তবে গোড়াশুড়ি সে ভুলটা সংশোধন না করে নিলে উপায় নেই। যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে এখন অমনি এক রকম করে কাজ সেরে নেও এ-কথা তাঁর সম্বন্ধে কোনোমতেই খাটবে না।

ঈশ্বর-বিবর্জিত যে জীবনটা গড়ে তুলেছি তার আকর্ষণ যে কত প্রবল তা তখনই বুঝতে পারি যখন তাঁর দিকে যেতে চাই। যখন তার মধ্যেই বসে আছি তখন সে যে আমাকে বেঁধেছে তা বুঝতেই পারি নে। কিন্তু প্রত্যেক অভ্যাস প্রত্যেক সংস্কারটিই কী কঠিন গ্রন্থি। জ্ঞানে তাকে যতই তুচ্ছ বলে জানি নে কেন, কাজে তাকে ছাড়াতে পারি নে। একটা ছাড়ে তো দেখতে পাই তার পিছনে আরও পাঁচটা আছে।

সংসারকে চরম আশ্রয় বলে জেনে এতদিন বহুযত্নে দিনে দিনে একটি একটি করে অনেক জিনিস সংগ্রহ করেছি—তাদের প্রত্যেকটির ফাঁকে ফাঁকে আমার কত শিকড় জড়িয়ে গেছে তার ঠিকানা নেই—তারা সবাই আমার। তাদের কোনোটাকেই একটু-মাত্র স্থানচ্যুত করতে গেলেই মনে হয় তবে আমি বাঁচব কী করে। তারা যে বাঁচবার জিনিস নয় তা বেশ জানি তবু চিরজীবনের সংস্কার তাদের প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে বলতে থাকে এদের না হলে আমার চলবে না যে। ধনকে আপনার বলে জানা যে নিতান্তই অভ্যাস হয়ে গেছে। সেই ধনের ঠিক ওজনটি যে আজ বুঝব সে শক্তি কোথায় পাই। বহুদীর্ঘকাল ধরে আমির ভারে সেই ধন যে পর্বতসমান ভারি হয়ে উঠেছে, তাকে একটুও নড়াতে গেলে যে বুকের পাঁজরে বেদনা ধরে।

এইজন্যেই ভগবান বিশু বলেছেন, যে-ব্যক্তি ধনী তার পক্ষে মুক্তি অত্যন্ত কঠিন। ধন এখানে শুধু টাকা নয়, জীবন যা-কিছুকেই দিনে দিনে আপনার বলে সঞ্চয় করে তোলে, যাকেই সে নিজের বলে মনে করে এবং নিজের দিকেই আঁকড়ে রাখে—সে ধনই হ'ক আর খ্যাতিই হ'ক এমন কি পুণ্যই হ'ক।

এমন কি, ওই পুণ্যের সঞ্চয়টা কম ঠকায় না। ওর একটি ভাব আছে যেন ও যা নিচ্ছে তা সব ঈশ্বরকেই দিচ্ছে। লোকের হিত করছি, ত্যাগ করছি, কষ্ট স্বীকার করছি, অতএব আর ভাবনা নেই। আমার সমস্ত উৎসাহ ঈশ্বরের উৎসাহ, সমস্ত কর্ম ঈশ্বরের কর্ম। কিন্তু এর মধ্যে যে অনেকখানি নিজের দিকেই জমাচ্ছি সে খেয়ালমাত্র নেই।

যেমন মনে করো আমাদের এই বিদ্যালয়। যেহেতু এটা মঙ্গলকাজ সেই হেতু এর যেন আর হিসেব দেখবার দরকার নেই, যেন এর সমস্তই ঈশ্বরের খাতাতেই জমা হচ্ছে। আমরা যে প্রতিদিন তহবিল ভাঙছি তার খোঁজও রাখি নে। এ বিদ্যালয় আমাদের বিদ্যালয়, এর সফলতা আমাদের সফলতা, এর দ্বারা আমরাই হিত করছি, এমনি করে এ বিদ্যালয় থেকে আমার দিকে কিছু কিছু করে জমা হচ্ছে। সেই সংগ্রহ আমার অবলম্বন হয়ে উঠছে, সেটা একটা বিষয় সম্পত্তির মতো হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই কারণে তার জন্যে রাগারাগি টানাটানি হতে পারে, তার জন্যে মিথ্যে সাক্ষী সাজাতেও ইচ্ছা করে। পাছে কেউ কোনো ত্রুটি ধরে ফেলে এই ভয় হয়—লোকের কাছে এর অনিন্দনীয়তা প্রমাণ করে তোলবার জন্যে একটু বিশেষভাবে ঢাকাঢুকি দেবার আগ্রহ জন্মে। কেননা এসব যে আমার অভ্যাস, আমার নেশা, আমার খাদ্য হয়ে উঠছে। এর থেকে যদি ঈশ্বর আমাকে একটু বঞ্চিত করতে চান আমার সমস্ত প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে। প্রতিদিনের অভ্যাসে বিদ্যালয় থেকে এই যে-অংশটুকু নিজের ভাগেই সঞ্চয় করে তুলছি সেইটে সরিয়ে দাও দেখি, মনে হবে এর কোথাও যেন আর আশ্রয় পাচ্ছি নে। তখন ঈশ্বরকে আর আশ্রয় বলে মনে হবে না।

এইজন্যে সঞ্চয়ীর পক্ষেই বড়ো শক্ত সমস্যা। সে ওই সঞ্চয়কেই চরম আশ্রয় বলে একেবারে অভ্যাস করে বসে আছে, ঈশ্বরকে তাই সে চারিদিকে সত্য করে অনুভব করতে পারে না, শেষ পর্যন্তই সে নিজের সঞ্চয়কে আঁকড়ে বসে থাকে।

অনেকদিন থেকে অনেক সঞ্চয় করে যে বসেছি—সে-সমস্তর কিছু বাদ দিতে মন সরে না। সেইজন্যে মনের মধ্যে যে চতুর হিসাবি কানে কলম গুঁজে বসে আছে সে কেবলই পরামর্শ দিচ্ছে—কিছু বাদ দেবার দরকার নেই, এরই মধ্যে কোনো রকম করে ঈশ্বরকে একটুখানি জায়গা করে দিলেই হবে।

না, তা হবে না—তার চেয়ে অসাধ্য আর কিছুই হতে পারে না। তবে কী করা কর্তব্য ?

একবার সম্পূর্ণ মরতে হবে—তবেই নূতন করে ভগবানে জন্মানো যাবে। একেবারে গোড়াশুদ্ধি মরতে হবে।

এটা বেশ করে জানতে হবে, যে-জীবন আমার ছিল, সেটা সম্বন্ধে আমি মরে গেছি। আমি সে-লোক নই, আমার যা ছিল তার কিছুই নেই। আমি ধনে মরেছি, খ্যাতিতে মরেছি, আরামে মরেছি, আমি কেবলমাত্রই ভগবানে বেঁচেছি। নিতান্ত সদ্যোজাত শিশুটির মতো নিরুপায় অসহায় অনাবৃত হয়ে তাঁর কোলে জন্মগ্রহণ করেছি। তিনি ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। তার পরে তাঁর সন্তানজন্ম সম্পূর্ণভাবে শুরু করে দাও, কিছুর পরে কোনো মমতা রেখো না।

পুনর্জন্মের পূর্বে এখন সেই মৃত্যুবেদনা। যাকে নিশ্চিত চরম বলে অত্যন্ত সত্য বলে জেনেছিলুম একটি একটি করে একটু একটু করে তার থেকে মরতে হবে। এস মৃত্যু এস—এস অমৃতের দূত এস—

এস অপ্রিয় বিরস তিক্ত,
এস গো অশ্রুসলিলসিক্ত
এস গো ভূষণবিহীন রিক্ত,
এস গো চিত্তপাবন।
এস গো পরম দুঃখনিলয়,
আশা-অঙ্কুর করহ বিলয়;
এস সংগ্রাম, এস মহাজয়,
এস গো মরণ-সাধন।

১৯ ফাল্গুন

ফল

ভিতরের সাধনা যখন আরম্ভ হয়ে গেছে তখন বাইরে তার কতকগুলি লক্ষণ আপনি প্রকাশ হয়ে পড়তে থাকে; সে লক্ষণগুলি কীরকম তা একটি উপমার সাহায্যে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করি।

গাছের ফলকে মানুষ বরাবর নিজের সার্থকতার সঙ্গে তুলনা করে এসেছে। বস্তুত মানুষের লক্ষ্যসিদ্ধি, মানুষের চেষ্টার পরিণামের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে এমন জিনিস যদি

জগতে কোথাও থাকে তবে সে গাছের ফলে। নিজের কর্মের রূপটিকে নিজের জীবনের পরিণামকে যেন ফলের মধ্যে আমরা চক্ষে প্রত্যক্ষ দেখতে পাই।

ফল জিনিসটা সমগ্র গাছের শেষ লক্ষ্য—পরিণত মানুষটি তেমনি সমস্ত সংসার-বৃক্ষের শেষলাভ।

কিন্তু মানুষের পরিণতি যে আরম্ভ হয়েছে তার লক্ষণ কী? একটি আমফল যে পাকছে তারই বা লক্ষণ কী?

সব প্রথমে দেখা যায়, তার বাইরে একটা প্রান্তে একটু রং ধরতে আরম্ভ করেছে, তার শ্যামবর্ণ ঘুচবে ঘুচবে করছে—সোনা হয়ে ওঠবার চেষ্টা।

আমাদেরও ভিতরে যখন পরিণতি আরম্ভ হয় বাইরে তার দীপ্তি দেখা দেয়। কিন্তু সব জায়গায় সমান নয়, কোথাও কালো কোথাও সোনা। তার সকল কাজ সকল ভাব সমান উজ্জ্বলতা পায় না, কিন্তু এখানে-ওখানে যেন জ্যোতি দেখা দিতে থাকে।

নিজের পাতারই সঙ্গে ফলের যে বর্ণসাদৃশ্য ছিল সেটা ক্রমশ ঘুচে আসতে থাকে, চারিদিকে আকাশের আলোর যে রং সেই রঙের সঙ্গেই তার মিলন হয়ে আসে। যে গাছে তার জন্ম সেই গাছের সঙ্গে নিজের রঙের পার্থক্য সে আর কিছুতেই সংবরণ করতে পারে না—চারিদিকের নিবিড় শ্যামলতার আচ্ছাদন থেকে সে বাহিরের আকাশে প্রকাশ পেয়ে উঠতে থাকে।

তার পরে তার বাহিরটি ক্রমশই কোমল হয়ে আসে। আগে বড়ো শক্ত আঁট ছিল কিন্তু এখন আর সে কঠোরতা নেই। দীপ্তিময় সুগন্ধময় কোমলতা।

পূর্বে তার যে-রস ছিল সে-রসে তীব্র অম্লতা ছিল এখন সমস্ত মাধুর্যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। অর্থাৎ এখন তার বাইরের পদার্থ সমস্ত বাইরেরই হয়, সকলেরই ভোগের হয়, সকলকে আহ্বান করে কাউকে ঠেকাতে চায় না। সকলের কাছে সে কোমল সুন্দর হয়ে ওঠে। গভীরতর সার্থকতার অভাবেই মানুষের তীব্রতা কঠিনতা এমন উগ্রভাবে প্রকাশ পায়—সেই আনন্দের দৈন্যেই তার দৈন্য, সেইজন্যেই সে বাহিরকে আঘাত করতে উদ্যত হয়।

তার পরে তার ভিতরকার যেটি আসল জিনিস, তার আঁটি—যেটিকে বাইরে দেখাই যায় না, তার সঙ্গে তার বাহিরের অংশের একটা বিশ্লিষ্টতা ঘটতে থাকে। সেটা যে তার নিত্যপদার্থ নয় তা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে আসে। তার শক্ত অংশের সঙ্গে তার ছালটা পৃথক হতে থাকে, ছাল অনায়াসে শাঁস থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া যায়, আবার তার শাঁসও আঁটি থেকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে ফেলা সহজ হয়। তার বোঁটা এতদিন গাছকে আঁকড়ে ছিল, তাও আলগা হয়ে আসে। গাছের সঙ্গে নিজেকে সে আর অত্যন্ত এক

করে রাখে না—নিজের বাহিরের আচ্ছাদনের সঙ্গেও নিজের ভিতরের আঁটিকে সে নিতান্ত একাকার করে থাকে না।

সাধক তেমনি যখন নিজের ভিতরে নিজের অমরত্বকে লাভ করতে থাকেন, সেখানটি যখন সুদৃঢ় সুসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন তাঁর বাইরের পদার্থটি ক্রমশই শিথিল হয়ে আসতে থাকে—তখন তাঁর লাভটা হয় ভিতরে, আর দানটা হয় বাইরে।

তখন তাঁর ভয় নেই, কেননা তখন তাঁর বাইরের ক্ষতিতে তাঁর ভিতরের ক্ষতি হয় না। তখন শাঁসকে আঁটি আঁকড়ে থাকে না; শাঁস কাটা পড়লে অনাবৃত আঁটির মৃত্যু-দশা ঘটে না। তখন পাখিতে যদি ঠোকরায় ক্ষতি নেই, ঝড়ে যদি আঘাত করে বিপদ নেই, গাছ যদি শুকিয়ে যায় তাতেও মৃত্যু নেই। কারণ, ফল তখন আপন অমরত্বকে আপন অন্তরের মধ্যে নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি করে, তখন সে "অতিমৃত্যুমেতি"। তখন সে আপনাকে আপনার নিত্যতার মধ্যেই সত্য বলে জানে, অনিত্যতার মধ্যেই নিজেকে সে নিজে বলে জানে না—নিজেকে সে শাঁস বলে জানে না, খোসা বলে জানে না, বোঁটা বলে জানে না—সুতরাং ওই শাঁস খোসা বোঁটার জন্যে তার আর কোনো ভয় ভাবনাই নেই।

এই অমৃতকে নিজের মধ্যে বিশেষরূপে লাভ করার অপেক্ষা আছে। সেইজন্যেই উপনিষৎ বারংবার বলেছেন, অমরতাকে লাভ করার একটি বিশেষ অবস্থা আছে—"য এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।"

ভিতরে যখন সেই অমৃতের সঞ্চার হয় তখন অমরাত্মা বাইরেকে আর একান্তরূপে ভোগ করতে চায় না। তখন, তার যা গন্ধ, যা বর্ণ, যা রস, যা আচ্ছাদন তাতে তার নিজের কোনো প্রয়োজন নেই—সে এ-সমস্তের মধ্যেই নিহিত থেকে একান্ত নির্লিপ্ত, এর ভালোমন্দ তার ভালোমন্দ আর নয়, এর থেকে সে কিছুই প্রার্থনা করে না।

তখন ভিতরে সে লাভ করে, বাইরে সে দান করে; ভিতরে তার দৃঢ়তা, বাইরে তার কোমলতা; ভিতরে সে নিত্যসত্যের, বাইরে সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের; ভিতরে সে পুরুষ, বাইরে সে প্রকৃতি। তখন বাইরে তার প্রয়োজন থাকে না বলেই পূর্ণভাবে বাইরের প্রয়োজন সাধন করতে থাকে, তখন সে ফলভোগী পাখির ধর্ম ত্যাগ করে ফলদর্শী পাখির ধর্ম গ্রহণ করে। তখন সে আপনাতে আপনি সমাপ্ত হয়ে নির্ভয়ে নিঃসংকোচে সকলের জন্যে আপনাকে সমর্পণ করতে পারে। তখন তার যা-কিছু, সমস্তই তার প্রয়োজনের অতীত, সুতরাং সমস্তই তার ঐশ্বর্য।

২০ ফাল্গুন ১৩১৫

৭

সত্যকে দেখা

আমাদের ধ্যানের দ্বারা সৃষ্টিকর্তাকে তাঁর সৃষ্টির মাঝখানে ধ্যান করি। ভূর্ভুবঃস্বঃ তাঁ হতেই সৃষ্টি হচ্ছে, সূর্যচন্দ্র গ্রহতারা প্রতিমুহূর্তেই তাঁর থেকে প্রকাশ হচ্ছে, আমাদের চৈতন্য প্রতিমুহূর্তেই তাঁর থেকে প্রেরিত হচ্ছে, তিনিই অবিরত সমস্ত প্রকাশ করছেন, এই হচ্ছে আমাদের ধ্যান।

এই দেখাকেই বলে সত্যকে দেখা। আমরা সমস্ত ঘটনাকে কেবল বাহ্যঘটনা বলেই দেখি। তাতে আমাদের কোনো আনন্দ নেই। সে আমাদের কাছে পুরাতন হয়ে যায়, সে আমাদের কাছে দম-দেওয়া কলের মতো আকার ধারণ করে; এইজন্যে পাথরের নুড়ির উপর দিয়ে যেমন স্রোত চলে যায় সেই রকম করে জগৎস্রোত আমাদের মনের উপর দিয়ে অবিশ্রাম বয়ে যাচ্ছে। চিত্ত তাতে সাড়া দিচ্ছে না, চারিদিকের দৃশ্য-গুলো তুচ্ছ এবং দিনগুলো অকিঞ্চিৎকর হয়ে দেখা দিচ্ছে। সেইজন্যে কৃত্রিম উত্তেজনা এবং নানা বৃথা কর্ম সৃষ্টিদ্বারা আমরা চেতনাকে জাগিয়ে রেখে তবে আমোদ পাই।

যখন কেবল ঘটনার দিকে তাকিয়ে থাকি তখন এই রকমই হয়। সে আমাদের রস দেয় না, খাদ্য দেয় না। সে কেবল আমাদের ইন্দ্রিয়কে মনকে হৃদয়কে কিছু দূর পর্যন্ত অধিকার করে, শেষ পর্যন্ত পৌঁছোয় না। এইজন্যে তার যেটুকু রস আছে তা উপরের থেকেই শুকিয়ে আসে, তা আমাদের গভীরতর চেতনাকে উদ্বোধিত করে না। সূর্য উঠছে তো উঠছে, নদী বইছে তো বইছে, গাছপালা বাড়ছে তো বাড়ছে, প্রতিদিনের কাজ নিয়মমতো চলছে তো চলছে। সেইজন্যে এমন কোনো দৃশ্য দেখতে ইচ্ছা করি যা প্রতিদিন দেখি নে, এমন কোনো ঘটনা জানতে কৌতূহল হয় যা আমাদের অভ্যস্ত ঘটনার সঙ্গে মেলে না।

কিন্তু সত্যকে যখন জানি তখন আমাদের আত্মা পরিতৃপ্ত হয়। সত্য চিরনবীন— তার রস অক্ষয়। সমস্ত ঘটনাবলীর মাঝখানে সেই অন্তরতম সত্যকে দেখলে দৃষ্টি সার্থক হয়। তখন সমস্তই মহত্ত্বে বিস্ময়ে আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এইজন্যেই আমাদের ধ্যানের মন্ত্রে আমরা প্রতিদিন অন্তত একবার সমস্ত বিশ্ব-ব্যাপারের মাঝখানে বিশ্বের যিনি পরমসত্য তাঁকে ধ্যান করবার চেষ্টা করে থাকি। ঘটনাপুঞ্জের মাঝখানে যিনি এক মূলশক্তি তাঁকে দর্শন করবার জন্যে দৃষ্টিকে অন্তরে

ফেরাই। তখন দৃষ্টি থেকে জড়ত্বের আবরণ ঘুচে যায়, জগৎ একটা যন্ত্রের মতো আমাদের অভ্যাসের কক্ষ জুড়ে পড়ে থাকে না, প্রতিমুহূর্তেই এই অনন্ত আকাশব্যাপী প্রকাণ্ড প্রকাশ একটি জ্ঞানময় সত্তা হতে নিঃসৃত হচ্ছে বিকীর্ণ হচ্ছে ইহাই অনুভব করে আমাদের চেতনা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তখন অগ্নি জল ওষধি বনস্পতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলতে পারি, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত ব্রহ্ম, সর্বত্রই আনন্দরূপে অমৃতরূপে তাঁর প্রকাশ।

অগণ্য ঘটনাকে অগণ্য ঘটনারূপে দেখেই চলে যাব না—তার মাঝখানে অনন্ত সত্যকে স্থির হয়ে স্তব্ধ হয়ে দেখব এইজন্যই আমাদের ধ্যানের মন্ত্র গায়ত্রী।

ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ।

ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, ইহাই যিনি নিয়ত সৃষ্টি করছেন, সেই দেবতার বরণীয় শক্তিকে ধ্যান করি—যিনি আমাদের ধীশক্তিকেও নিয়ত প্রেরণ করছেন।

৩ চৈত্র ১৩১৫

সৃষ্টি

এই যে আমরা কয়জন প্রাতঃকালে এইখানে উপাসনা করতে বসি—এও একটি সৃষ্টি। এর মাঝখানেও সেই সবিতা আছেন।

আমরা বলে থাকি এটা এইরকম হয়ে উঠেছে। আমরা দু-চার জনে পরামর্শ করলুম, তার পরে একত্র হয়ে বসলুম, তার পরে রোজ রোজ এই রকম চলে আসছে।

ঘটনা এই বটে কিন্তু সত্য এই নয়। ঘটনার দিক থেকে দেখলে এ একটি সামান্য ব্যাপার কিন্তু সত্যের দিক থেকে দেখলে এ বড়ো আশ্চর্য প্রতিদিনই আশ্চর্য। সত্য মাঝখানে এসে নানা অপরিচিতকে নানা দিক থেকে টেনে এই একটি উপাসনামণ্ডলী নিরন্তর সৃষ্টি করছেন। আমরা মনে করছি আমরা এখানে খানিকক্ষণের জন্যে বসে কাজ সেরে তার পরে অন্য কাজে চলে গেলুম, বাস চুকে গেল—কিন্তু এ তো ছোটো ব্যাপার নয়। আমরা যখন পড়ছি, পড়াচ্ছি, খাচ্ছি, বেড়াচ্ছি, তখনও এই আমাদের মণ্ডলীটির সৃষ্টিকর্তা এরই সৃষ্টিকার্যে রয়েছেন। সেই জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ বিশ্বকর্মা আমাদের মধ্যে কাজ করে চলেছেন, তিনি আমাদের এই কয় জন ভিন্ন ভিন্ন লোকের মনে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এর উপকরণ সাজিয়ে তুলেছেন। তাঁর যেন আর অন্য কোনো কাজ নেই, বিশ্বসৃষ্টি তাঁর যত বড়ো কাজ এও যেন তাঁর তত বড়োই কাজ। আমাদের এই উপাসনালোকটি কেবলই হচ্ছে, হচ্ছে, হয়ে উঠছে—দিনরাত, দিনরাত। আমরা

যখন ঘুমোচ্ছি তখনও হচ্ছে, আমরা যখন ভুলে আছি তখনও হচ্ছে। সত্য যখন আছে, তখন কিছুই হচ্ছে না, বা একমুহূর্তও তার বিরাম আছে এ কখনো হতেই পারে না।

বিশ্বভুবনের মাঝখানে একটি সত্যং বিরাজ করছেন বলেই প্রতিদিনই বিশ্বভুবনকে তার যথাস্থানে যথানিয়মে দেখতে পাচ্ছি। আমাদের কয়জনের মাঝখানে একটি সত্যং কাজ করছেন বলেই প্রতিদিন প্রাতঃকালে আমরা এখানে এসে বসেছি। বিশ্বভুবন সেই এক সত্যকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করছে। যেখানে আমাদের দূরবীন পৌঁছোয় না, মন পৌঁছোয় না, সেখানেও কত জ্যোতির্ময় লোক তাঁকে বেষ্টন করে করে বলছে নমোনমঃ। আমরাও তেমনি করেই আমাদের এই উপাসনালোকের সত্যকে বেষ্টন করে বসেছি, যিনি লোক-লোকান্তরের মাঝখানে বসে আছেন তিনি এই প্রাঙ্গণে বসে আছেন; কেবল যে আমাদের মধ্যে চৈতন্য বিকীর্ণ করছেন তা নয়, আমাদের কয়জনকে নিয়ে যে বিশেষ সৃষ্টি চলছে তারও শক্তি বিকীর্ণ করছেন, আমাদের কয়েকজনের মনকে এই বিশেষ ব্যাপারে নানারকম করে চালাচ্ছেন, আমাদের কয়জনের প্রকৃতি সংস্কার ও শিক্ষার নানা বৈচিত্র্যকে সেই এক এই মুহূর্তেই একটি ঐক্যের মধ্যে গড়ে তুলছেন এবং আমরা যখন এখান থেকে উঠে অন্যত্র চলে যাব তখনও তিনি তাঁর এই কাজে বিশ্রাম দেবেন না।

আমাদের মাঝখানের সেই সত্যকে আমাদের উপাসনাজগতের সেই সবিতাকে এইখানে প্রত্যক্ষ দর্শন করে যাব, তাঁকে প্রদক্ষিণ করে তাঁকে একসঙ্গে প্রণাম করে যাব। আমরা প্রত্যহ জেনে যাব, সূর্যচন্দ্র গ্রহতারা যেমন তাঁর অনন্ত সৃষ্টি আমাদের কয়জনকে যে এখানে বসিয়েছেন এও তাঁর তেমনি সৃষ্টি। তাঁর অবিরাম আনন্দ এই কাজটিতে প্রকাশিত হচ্ছে, সেই প্রকাশকে আমরা দেখে যাব।

৩ চৈত্র ১৩১৫

মৃত্যু ও অমৃত

সম্প্রতি অকস্মাৎ আমার একটি বন্ধুর মৃত্যু হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে জগতে সকলের চেয়ে পরিচিত যে মৃত্যু তার সঙ্গে আর একবার নূতন পরিচয় হল।

জগৎটা গায়ের চামড়ার মতো আঁকড়ে ধরেছিল, মাঝখানে কোনো ফাঁক ছিল না। মৃত্যু যখন প্রত্যক্ষ হল তখন সেই জগৎটা যেন কিছু দূরে চলে গেল, আমার সঙ্গে আর যেন সে অত্যন্ত সংলগ্ন হয়ে রইল না।

এই বৈরাগ্যের দ্বারা আত্মা যেন নিজের স্বরূপ কিছু উপলব্ধি করতে পারল। সে যে

জগতের সঙ্গে একেবারে অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত নয় তার যে একটি স্বকীয় প্রতিষ্ঠা আছে মৃত্যুর শিক্ষায় এই কথাটা যেন অনুভব করতে পারলুম।

যাঁর মৃত্যু হল তিনি ভোগী ছিলেন এবং তাঁর ঐশ্বর্যের অভাব ছিল না। তাঁর সেই ভোগের জীবন ভোগের আয়োজন—যা কেবল তাঁর কাছে নয়, সর্বসাধারণের কাছে অত্যন্ত সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছিল, যা বহুপ্রকার সাজে সজ্জায় জাঁকেজমকে লোকের চক্ষুকর্ণকে ঈর্ষা ও লুব্ধতায় আকৃষ্ট করে আকাশে মাথা তুলেছিল তা একটি মুহূর্তেই শ্মশানের ভস্মমুষ্টির মধ্যে অনাদরে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

সংসার যে এতই মিথ্যা, তা যে কেবল স্বপ্ন কেবল মরীচিকা, নিশ্চিত মৃত্যুকে স্মরণ করে শাস্ত্র সেই কথা চিন্তা করবার জন্যে বারবার উপদেশ করেছেন। নতুবা আমরা কিছুই ত্যাগ করতে পারি নে এবং ভোগের বন্ধনে জড়িত থেকে আত্মা নিজের বিশুদ্ধ মুক্তস্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না।

কিন্তু সংসারকে মিথ্যা মরীচিকা বলে ত্যাগকে সহজ করে তোলার মধ্যে সত্যও নেই গৌরবও নেই। যে দেশে আমাদের টাকা চলে না সেই দেশে এখানকার টাকার বোঝাটাকে জঞ্জালের মতো মাটিতে ফেলে দেওয়ার মধ্যে ঔদার্য কিছুই নেই। কোনোপ্রকারে সংসারকে যদি একেবারেই অলীক বলে নিজের কাছে যথার্থই সপ্রমাণ করতে পারি তাহলে ধনজনমান তো মন থেকে খসে পড়ে একেবারেই শূন্যের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে।

কিন্তু সেরকম ছেড়ে দেওয়া ফেলে দেওয়া নিতান্তই একটা রিক্ততা মাত্র। সে যেন স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার মতো—যা ছিলনা তাকেই চমকে উঠে নেই বলে জানা।

বস্তুত সংসার তো মিথ্যা নয়, জোর করে তাকে মিথ্যা বলে লাভ কী। যিনি গেলেন তিনি গেলেন বটে কিন্তু সংসারে তো ক্ষতির কোনো লক্ষণই দেখি নে। সূর্যালোকে তো কোনো কালিমা পড়ে নি—আকাশের নীল নির্মলতায় মৃত্যুর চাকা তো ক্ষতির একটি রেখাও কাটতে পারে নি; অফুরান সংসারের ধারা আজও পূর্ণবেগেই চলেছে।

তবে অসত্য কোন্‌টা? এই সংসারকে আমার বলে জানা। এর একটি সূচ্যগ্র বিন্দুকেও আমার বলে আমি ধরে রাখতে পারব না। যে ব্যক্তি চিরজীবন কেবল ওই আমার উপরেই সমস্ত জিনিসের প্রতিষ্ঠা করতে চায় সেই বালির উপর ঘর বাঁধে। মৃত্যু যখন ঠেলা দেয় তখন সমস্তই ধুলায় পড়ে ধূলিসাৎ হয়।

আমি বলে যে কাঙালটা সব জিনিসকেই গালের মধ্যে দিতে চায়, সব জিনিসকেই মুঠোর মধ্যে পেতে চায়, মৃত্যু কেবল তাকেই ফাঁকি দেয়—তখন সে মনের খেদে সমস্ত সংসারকেই ফাঁকি বলে গাল দিতে থাকে, কিন্তু সংসার যেমন তেমনিই থেকে যায়, মৃত্যু তার গায়ে আঁচড়টি কাটতে পারে না।

অতএব মৃত্যুকে যখন কোথাও দেখি তখন সর্বত্রই তাকে দেখতে থাকা মনের একটা বিকার। যেখানে অহং সেইখানেই কেবল মৃত্যুর হাত পড়ে, আর কোথাও না। জগৎ কিছুই হারায় না, যা হারাবার সে কেবল অহং হারায়।

অতএব আমাদের যা কিছু দেবার সে কাকে দেব? সংসারকেই দেব, অহংকে দেব না। কারণ সংসারকে দিলেই সত্যকে দেওয়া হবে, অহংকে দিলেই মৃত্যুকে দেওয়া হবে। সংসারকে যা দেব সংসার তা রাখবে, অহংকে যা দেব অহং তা শত চেষ্টাতেও রাখতে পারবে না।

যে ব্যক্তি ভোগী সে অহংকেই সমস্ত পূজা জোগায়, সে চিরজীবন এই অহং-এর মুখ তাকিয়ে খেটে মরে। মৃত্যুর সময় তার সেই ভোগস্ফীত ক্ষুধার্ত অহং কপালে হাত দিয়ে বলে সমস্তই রইল পড়ে কিছুই নিয়ে যেতে পারলুম না।

মৃত্যুর কথা চিন্তা করে এই অহংটাকেই যদি চিরন্তন বলে না জানি তাহলেই যথেষ্ট হল না—কারণ, সেরকম বৈরাগ্যে কেবল শূন্যতাই আনে। সেই সঙ্গে এও জানতে হবে যে এই সংসারটা থাকবে। অতএব আমার যা কিছু দেবার তা শূন্যের মধ্যে ত্যাগরূপে দেব না, সংসারের মধ্যে দানরূপে দিতে হবে। এই দানের দ্বারাই আত্মার ঐশ্বর্য প্রকাশ হবে ত্যাগের দ্বারা নয়;—আত্মা নিজে কিছু নিতে চায় না সে দিতে চায়, এতেই তার মহত্ত্ব। সংসার তার দানের ক্ষেত্র এবং অহং তার দানের সামগ্রী।

ভগবান এই সংসারের মাঝখানে থেকে নিজেকে কেবলই দিচ্ছেন, তিনি নিজের জন্যে কিছুই নিচ্ছেন না। আমাদের আত্মাও যদি ভগবানের সেই প্রকৃতিকে পায় তবে সত্যকে লাভ করে। সেও সংসারের মাঝখানে ভগবানের পাশে তাঁর সখারূপে দাঁড়িয়ে নিজেকে সংসারের জন্য উৎসর্গ করবে, নিজের ভোগের জন্য লালায়িত হয়ে সমস্তই নিজের দিকে টানবে না। এই দেবার দিকেই অমৃত, নেবার দিকেই মৃত্যু। টাকাকড়ি শক্তি-সামর্থ্য সমস্তই সত্য যদি তা দান করি—যদি তা নিজে নিতে চাই তো সমস্তই মিথ্যা। সেই কথাটা যখন ভুলি তখন সমস্তই উলটা-পালটা হয়ে যায়—তখনই শোক দুঃখ ভয়, তখনই কাম ক্রোধ লোভ। তখনই, স্রোতের মুখে যে নৌকা আমাকেই বহন করে নিয়ে যেত, উজানে তাকে প্রাণপণে বহন করবার জন্য আমাকেই ঠেলাঠেলি টানাটানি করে মরতে হয়। যে জিনিস স্বভাবতই দেবার তাকে নেবার চেষ্টা করার এই পুরস্কার। যখন মনে করি যে নিজে নিচ্ছি তখন দিই সেটা মৃত্যুকে—এবং সেই সঙ্গে শোক চিন্তা ভয় প্রভৃতি মৃত্যুর অনুচরকে তাদের খোরাকিস্বরূপ হৃদয়ের রক্ত জোগাতে থাকি।

৪ চৈত্র

তরী বোঝাই

সোনার তরী বলে একটা কবিতা লিখেছিলুম এই উপলক্ষ্যে তার একটা মানে বলা যেতে পারে।

মানুষ সমস্ত জীবন ধরে ফসল চাষ করছে। তার জীবনের খেতটুকু দ্বীপের মতো, চারিদিকেই অব্যক্তের দ্বারা সে বেষ্টিত, ওই একটুখানিই তার কাছে ব্যক্ত হয়ে আছে। সেইজন্যে গীতা বলেছেন—

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা।

যখন কাল ঘনিয়ে আসছে, যখন চারিদিকের জল বেড়ে উঠছে, যখন আবার অব্যক্তের মধ্যে তার ওই চরটুকু তলিয়ে যাবার সময় হল—তখন তার সমস্ত জীবনের কর্মের যা কিছু নিত্য ফল তা সে ওই সংসারের তরণীতে বোঝাই করে দিতে পারে। সংসার সমস্তই নেবে, একটি কণাও ফেলে দেবে না। কিন্তু যখন মানুষ বলে ওই সঙ্গে আমাকেও নাও আমাকেও রাখো, তখন সংসার বলে তোমার জন্যে জায়গা কোথায়? তোমাকে নিয়ে আমার হবে কী? তোমার জীবনের ফসল যা কিছু রাখবার তা সমস্তই রাখব কিন্তু তুমি তো রাখবার যোগ্য নও।

প্রত্যেক মানুষ জীবনের কর্মের দ্বারা সংসারকে কিছু-না কিছু দান করছে, সংসার তার সমস্তই গ্রহণ করছে, রক্ষা করছে, কিছুই নষ্ট হতে দিচ্ছে না—কিন্তু মানুষ যখন সেই সঙ্গে অহংকেই চিরন্তন করে রাখতে চাচ্ছে তখন তার চেষ্টা বৃথা হচ্ছে। এই যে জীবনটি ভোগ করা গেল অহংটিকেই তার খাজনাস্বরূপ মৃত্যুর হাতে দিয়ে হিসাব চুকিয়ে যেতে হবে। ওটি কোনোমতেই জমাবার জিনিস নয়।

৪ চৈত্র

স্বভাবকে লাভ

আমাদের জীবনের একটিমাত্র সাধনা এই যে, আমাদের আত্মার যা স্বভাব সেই স্বভাবটিকেই যেন বাধামুক্ত করে তুলি।

আত্মার স্বভাব কী? পরমাত্মার যা স্বভাব আত্মারও স্বভাব তাই। পরমাত্মার স্বভাব কী? তিনি গ্রহণ করেন না, তিনি দান করেন।

তিনি সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি করার অর্থই হচ্ছে বিসর্জন করা। এই যে তিনি বিসর্জন করেন এর মধ্যে কোনো দায় নেই, কোনো বাধ্যতা নেই। আনন্দের ধর্মই হচ্ছে স্বতই দান করা, স্বতই বিসর্জন করা। আমরাও তা জানি। আমাদের আনন্দ আমাদের প্রেম বিনা কারণে আত্মবিসর্জনেই আপনাকে চরিতার্থ করে। এইজন্যেই উপনিষৎ বলেন—আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। সেই আনন্দময়ের স্বভাবই এই।

আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার একটি সাধর্ম্য আছে। আমাদের আত্মাও নিয়ে খুশি নয় সে দিয়ে খুশি। নেব, কাড়ব, সঞ্চয় করব, এই বেগই যদি ব্যাধির বিকারের মতো জেগে ওঠে তাহলে ক্ষোভের ও তাপের সীমা থাকে না। যখন আমরা সমস্ত মন দিয়ে বলি, দেব, তখনই আমাদের আনন্দের দিন। তখনই সমস্ত ক্ষোভ দূর হয়, সমস্ত তাপ শান্ত হয়ে যায়।

আত্মার এই আনন্দময় স্বরূপটিকে উপলব্ধি করবার সাধনা করতে হবে। কেমন করে করব?

ওই যে একটা ক্ষুধিত অহং আছে, যে-কাঙাল সব জিনিসই মুঠো করে ধরতে চায়, যে-কৃপণ নেবার মতলব ছাড়া কিছু দেয় না ফলের মতলব ছাড়া কিছু করে না, সেই অহংটাকে বাইরে রাখতে হবে, তাকে পরমাত্মীয়ের মতো সমাদর করে অন্তঃপুরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। সে বস্তুত আত্মার আত্মীয় নয় কেননা সে যে মরে, আর আত্মা যে অমর।

আত্মা যে, ন জায়তে ম্রিয়তে, না জন্মায় না মরে। কিন্তু ওই অহংটা জন্মেছে, তার একটা নামকরণ হয়েছে; কিছু না পারে তো অন্তত তার ওই নামটাকে স্থায়ী করবার জন্যে তার প্রাণপণ যত্ন।

এই যে আমার অহং, একে একটা বাইরের লোকের মতো আমি দেখব। যখন তার দুঃখ হবে তখন বলব তার দুঃখ হয়েছে। শুধু দুঃখ কেন, তার ধন জন খ্যাতি প্রতিপত্তি কিছুতে আমি অংশ নেব না।

আমি বলব না যে এ সমস্ত আমি পাচ্ছি আমি নিচ্ছি। প্রতিদিনই এই চেষ্টা করব আমার অহং যা কিছুকে আঁকড়ে ধরতে চায় আমি তাকে যেন গ্রহণ না করি। আমি বারবার করে বলব, ও আমার নয়, ও আমার বাইরে।

যা বাইরেকার তাকে বাইরে রাখতে প্রাণ সরে না বলে আবর্জনায় ভরে উঠলুম, বোঝায় চলা দায় হল। সেই মৃত্যুময় উপকরণের বিকারে প্রতিদিনই আমি মরছি।

এই মরণধর্মী অহংটাকেই আত্মার সঙ্গে জড়িয়ে তার শোকে, তার দুঃখে, তার ভারে ক্লান্ত হচ্ছি।

অহং-এর স্বভাব হচ্ছে নিজের দিকে টানা, আর আত্মার স্বভাব হচ্ছে বাইরের দিকে দেওয়া—এইজন্যে এই দুটোতে জড়িয়ে গেলে ভারি একটা পাকের সৃষ্টি হয়। একটা বেগ প্রবাহিত হয়ে যেতে চায়, আর একটা বেগ কেবলই ভিতরের দিকে আকর্ষণ করতে থাকে, ভারি একটা সংকট ঘনিয়ে ওঠে। আত্মা তার স্বভাবের বিরুদ্ধে আকৃষ্ট হয়ে ঘূর্ণিত হতে থাকে, সে অনন্তের অভিমুখে চলে না, সে একই বিন্দুর চারিদিকে ঘানির বলদের মতো পাক খায়। সে চলে অথচ এগোয় না—সুতরাং এ চলায় কেবল তার কষ্ট, এতে তার সার্থকতা নয়।

তাই বলছিলুম এই সংকট থেকে উদ্ধার পেতে হবে। অহং-এর সঙ্গে একেবারে এক হয়ে মিলে যাব না, তার সঙ্গে বিচ্ছেদ রাখব। দান করব, কর্ম করব, কিন্তু অহং যখন সেই কর্মের ফল হাতে করে তাকে লেহন করে দংশন করে নাচতে নাচতে উপস্থিত হবে তখন তার সেই উচ্ছিষ্ট ফলকে কোনোমতেই গ্রহণ করব না।

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

৫ চৈত্র

অহং

তবে অহং আছে কেন? এই অহং-এর যোগে আত্মা জগতের কোনো জিনিসকে আমার বলতে চায় কেন?

তার একটি কারণ আছে।

ঈশ্বর যা সৃষ্টি করেন তার জন্যে তাঁকে কিছুই সংগ্রহ করতে হয় না। তাঁর আনন্দ স্বভাবতই দানরূপে বিকীর্ণ হচ্ছে।

আমাদের তো সে ক্ষমতা নেই। দান করতে গেলে আমাদের যে উপকরণ চাই। সেই উপকরণ তো কেবলমাত্র আনন্দের দ্বারা আমরা সৃষ্টি করতে পারি নে।

তখন আমার অহং উপকরণ সংগ্রহ করে আনে। সে যা-কিছু সংগ্রহ করে তাকে সে আমার বলে। কারণ, তাকে নানা বাধা কাটিয়ে সংগ্রহ করতে হয়, এই বাধা কাটাতে তাকে শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। সেই শক্তির দ্বারা এই উপকরণে তার অধিকার জন্মায়।

শক্তির দ্বারা অহং শুধু যে উপকরণ সংগ্রহ করে তা নয়, সে উপকরণকে বিশেষ-

তাবে সাজায়, তাকে একটি বিশেষত্ব দান করে গড়ে তোলে। এই বিশেষত্ব-দানের দ্বারা সে যা-কিছু গড়ে তোলে তাকে সে নিজের জিনিস বলেই গৌরব বোধ করে।

এই গৌরবটুকু ঈশ্বর তাকে ভোগ করতে দিয়েছেন। এই গৌরবটুকু যদি সে বোধ না করবে তবে সে দান করবে কী করে? যদি কিছুই তার "আমার" না থাকে তবে সে দেবে কী?

অতএব দানের সামগ্রীটিকে প্রথমে একবার "আমার" করে নেবার জন্যে এই অহং-এর দরকার। বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর বলে রেখেছেন জগতের মধ্যে যেটুকুকেই আমার আত্মা এই অহং-এর গণ্ডি দিয়ে ঘিরে নিতে পারবে তাকে তিনি আমার বলতে দেবেন—কারণ তার প্রতি যদি মমত্বের অধিকার না জন্মে তবে আত্মা যে একেবারেই দরিদ্র হয়ে থাকবে। সে দেবে কী? বিশ্বভুবনের কিছুকেই তার আমার বলবার নেই।

ঈশ্বর ওইখানে নিজের অধিকারটি হারাতে রাজি হয়েছেন। বাপ যেমন ছোটো শিশুর সঙ্গে কুস্তির খেলা খেলতে খেলতে ইচ্ছাপূর্বক হার মেনে পড়ে যান, নইলে কুস্তির খেলাই হয় না, নইলে স্নেহের আনন্দ জমে না, নইলে ছেলের মুখে হাসি ফোটে না, সে হতাশ হয়ে পড়ে; তেমনি ঈশ্বর আমাদের মতো অনধিকারী শক্তিহীনের কাছে এক জায়গায় হার মানেন, এক জায়গায় তিনি হাসিমুখে বলতে দেন যে আমাদেরই জিত, বলতে দেন যে আমার শক্তিতেই হল, বলতে দেন যে আমারই টাকাকড়ি ধনজন আমারই সসাগরা বসুন্ধরা।

তা যদি না দেন তবে তিনি যে-খেলা খেলেন সেই আনন্দের খেলায়, সেই সৃষ্টির খেলায়, আমার আত্মা একেবারেই যোগ দিতে পারে না। তাকে খেলা বন্ধ করে হতাশ হয়ে চুপ করে বসে থাকতে হয়। সেইজন্য তিনি কাঠবিড়ালির পিঠে করুণ হাত বুলিয়ে বলেন, বাবা, কালসমুদ্রের উপরে তুমিও সেতু বাঁধছ বটে, শাবাশ তোমাকে!

এই যে তিনি আমার বলবার অধিকার দিয়েছেন, এই অধিকারটি কেন? এর চরম উদ্দেশ্যটি কী?

এর চরম উদ্দেশ্য এই যে পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার যে একটি সমান ধর্ম আছে সেই ধর্মটি সার্থক হবে। সেই ধর্মটি হচ্ছে সৃষ্টির ধর্ম অর্থাৎ দেবার ধর্ম। দেবার ধর্মই হচ্ছে আনন্দের ধর্ম। আত্মার যথার্থস্বরূপ হচ্ছে আনন্দময়স্বরূপ—সেই স্বরূপে সে সৃষ্টিকর্তা, অর্থাৎ দাতা। সেই স্বরূপে সে কৃপণ নয়, সে কাঙাল নয়। অহং-এর দ্বারা আমরা 'আমার' জিনিস সংগ্রহ করি, নইলে বিসর্জন করবার আনন্দ যে ম্লান হয়ে যাবে।

নদীর জল যখন নদীতে আছে তখন সে সকলেরই জল—যখন আমার ঘড়ায় তুলে

আনি তখন সে আমার জল, তখন সেই জল আমার ঘড়ার বিশেষত্ব দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। কোনো তৃষ্ণাতুরকে যদি বলি নদীতে গিয়ে জল খাও গে তাহলে জল দান করা হল না—যদিচ সে জল প্রচুর বটে, এবং নদীও হয় তো অত্যন্ত কাছে। কিন্তু আমার পাত্র থেকে সেই নদীরই জল এক গণ্ডূষ দিলেও সেটা জল দান করা হল।

বনের ফুল তো দেবতার সম্মুখেই ফুটেছে। কিন্তু তাকে আমার ডালিতে সাজিয়ে একবার আমার করে নিলে তবে তার দ্বারা দেবতার পূজা হয়। দেবতাও তখন হেসে বলেন, হাঁ তোমার ফুল পেলুম। সেই হাসিতেই আমার ফুল তোলা সার্থক হয়ে যায়।

অহং আমাদের সেই ঘট, সেই ডালি। তার বেষ্টনের মধ্যে যা এসে পড়ে তাকেই "আমার" বলবার অধিকার জন্মায়—একবার সেই অধিকারটি না জন্মালে দানের অধিকার জন্মায় না।

তবেই দেখা যাচ্ছে, অহং-এর ধর্মই হচ্ছে সংগ্রহ করা, সঞ্চয় করা। সে কেবলই নেয়। পেলুম বলে যতই তার গৌরব বোধ হয় ততই তার নেবার আগ্রহ বেড়ে যায়। অহং-এর যদি এই রকম সব জিনিসেই নিজের নাম নিজের সিলমোহর চিহ্নিত করবার স্বভাব না থাকত তাহলে আত্মার যথার্থ কাজটি চলত না, সে দরিদ্র এবং জড়বৎ হয়ে থাকত।

কিন্তু অহং-এর এই নেবার ধর্মটিই যদি একমাত্র হয়ে ওঠে, আত্মার দেবার ধর্ম যদি আচ্ছন্ন হয়ে যায়, তবে কেবলমাত্র নেওয়ার লোলুপতার দ্বারা আমাদের দারিদ্র্য বীভৎস হয়ে দাঁড়ায়। তখন আত্মাকে আর দেখা যায় না, অহংটাই সর্বত্র ভয়ংকর হয়ে প্রকাশ পায়। তখন আমার আনন্দময়স্বরূপ কোথায়? তখন কেবল ঝগড়া, কেবল কান্না, কেবল ভয়, কেবল ভাবনা।

তখন ডালির ফুল নিয়ে আত্মা পূজা করতে পায় না। অহং বলে এ সমস্তই আমি নিলুম।

সে মনে করে আমি পেয়েছি। কিন্তু ডালির ফুল তো বনের ফুল নয় যে, কখনো ফুরোবে না, নিত্যই নূতন নূতন করে ফুটবে। পেলুম বলে যখন সে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে ফুল তখন শুকিয়ে যাচ্ছে। দুদিনে সে কালো হয়ে গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যায়, পাওয়া একেবারে ফাঁকি হয়ে যায়।

তখন বুঝতে পারি পাওয়া জিনিসটা নেওয়া জিনিসটা কখনোই নিত্য হতে পারে না। আমরা পাব নেব, আমার করব, কেবল দেওয়ার জন্য। নেওয়াটা কেবল দেওয়ারই উপলক্ষ্য—অহংটা কেবল অহংকারকে বিসর্জন করতে হবে বলেই। নিজের

দিকে একবার টেনে আনব বিশ্বের দিকে উৎসর্গ করবার অভিপ্রায়ে। ধনুকে তীর যোজনা করে প্রথমে নিজের দিকে তাকে যে আকর্ষণ করি সে তো নিজেকে বিদ্ধ করবার জন্যে নয়, সম্মুখেই তাকে ক্ষেপণ করবার জন্যে।

তাই বলছিলুম অহং যখন তার নিজের সঞ্চয়গুলি এনে আত্মার সম্মুখে ধরবে তখন আত্মাকে বলতে হবে, না ও আমার নয়, ও আমি নেব না। ও সমস্তই বাইরে রাখতে হবে, 'বাইরে দিতে হবে, ওর এক কণাও আমি ভিতরে তুলব না। অহং-এর এই সমস্ত নিরন্তর সঞ্চয়ের দ্বারা আত্মাকে বদ্ধ হয়ে থাকলে চলবে না। কারণ এই বদ্ধতা আত্মার স্বাভাবিক নয়, আত্মা দানের দ্বারা মুক্ত হয়। পরমাত্মা যেমন সৃষ্টির দ্বারা বদ্ধ নন, তিনি সৃষ্টির দ্বারাই মুক্ত, কেননা তিনি নিচ্ছেন না তিনি দিচ্ছেন, আত্মাও তেমনি অহং-এর রচনা দ্বারা বদ্ধ হবার জন্যে হয় নি, এই রচনাগুলিদ্বারাই সে মুক্ত হবে, তার আনন্দস্বরূপ মুক্ত হবে, কারণ এইগুলিই সে দান করবে। এই দানের দ্বারাই তার যথার্থ প্রকাশ। ঈশ্বরেরও আনন্দরূপ অমৃতরূপ বিসর্জনের দ্বারাই প্রকাশিত। সেই জন্য অহং তখনই আত্মার যথার্থ প্রকাশ হয়, যখন আত্মা তাকে উৎসর্গ করে দেয়, আত্মা তাকে নিজেই গ্রহণ না করে।

৬ চৈত্র

নদী ও কূল

অমর আত্মার সঙ্গে এই মরণধর্মী অহংটা আলোর সঙ্গে ছায়ার মতো যে নিয়তই লেগে রয়েছে। শিক্ষার দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা, ঘটনাসংঘাতের দ্বারা, স্থানিক এবং সাময়িক নানা প্রভাবের দ্বারা, শরীর মন হৃদয়ের প্রকৃতিগত প্রবৃত্তির বেগের দ্বারা অহরহ নানা সংস্কার গড়ে তুলছে এবং কেবলই এই সংস্কার-দেহটির পরিবর্তন ঘটাচ্ছে, আমাদের আত্মার নামরূপময় একটি চিরচঞ্চল পরিবেষ্টন তৈরি করছে। এই অহংকে যদি একেবারে মিথ্যা মায়া বলে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করি তাহলেই সে যে ঘরে গিয়ে মরে থাকবে এমন আশঙ্কা নেই। যেমন সংসারকে মনের ক্ষোভে মিথ্যা বললেই সে মিথ্যা হয় না তেমনি এই অহংকে রাগ করে মিথ্যা অপবাদ দিলে তার তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি ঘটে না।

আত্মার সঙ্গে তার একটি সত্য সম্বন্ধ আছে সেইখানেই সে সত্য, সেই সম্বন্ধের বিকার ঘটলেই সে মিথ্যা। এই উপলক্ষ্যে আমি একটি উপমার অবতারণ করতে চাই।

নদীর ধারাটা চিরন্তন। সে পর্বতের গুহা থেকে নিঃসৃত হয়ে সমুদ্রের অতলের মধ্যে প্রবেশ করছে। সে যে-ক্ষেত্রের উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে সেই ক্ষেত্র থেকে উপকরণ-রাশি তার গতিবেগে আহরিত হয়ে চর বেঁধে উঠছে—কোথাও নুড়ি, কোথাও বালি, কোথাও মাটি জমছে, তার সঙ্গে নানা দেশের কত ধাতুকণা এবং জৈব পদার্থ এসে মিলছে। এই চর কতবার ভাঙছে, কতবার গড়ছে, কত স্থান ও আকার পরিবর্তন করছে। এর কোথাও বা গাছপালা উঠছে, কোথাও বা মরুভূমি। কোথাও জলাশয়ে পাখি চরছে কোথাও বা বালির উপর কুমিরের ছানা হাঁ করে পড়ে রোদ পোয়াচ্ছে।

এই চিরপরিবর্তনশীল চরগুলিই যদি একান্ত প্রবল হয়ে ওঠে তাহলেই নদীর চিরন্তন ধারা বাধা পায়। ক্রমে ক্রমে নদী হয়ে পড়ে গৌণ, চরই হয়ে পড়ে মুখ্য। শেষকালে ফল্গুর মতো নদীটা একেবারেই আচ্ছন্ন হয়ে যেতে পারে।

আত্মা সেই চিরস্রোত নদীর মতো। অনাদি তার উৎপত্তিশিখর, অনন্ত তার সঞ্চারক্ষেত্র। আনন্দই তাকে গতিবেগ দিয়েছে, সেই গতির বিরাম নেই।

এই আত্মা যে-দেশ দিয়ে যে-কাল দিয়ে চলেছে তার গতিবেগে সেই দেশ ও সেই কালের নানা উপকরণ সঞ্চিত হয়ে তার একটি সংস্কাররূপ তৈরি হতে থাকে—এই জিনিসটি কেবলই ভাঙছে, গড়ছে, কেবলই আকার পরিবর্তন করছে।

কিন্তু সৃষ্টি কোনো কোনো অবস্থায় সৃষ্টিকর্তাকে ছাপিয়ে উঠতে পারে। আত্মাকেও তার দেশকালজাত অহং প্রবল হয়ে উঠে অবরুদ্ধ করতে পারে। এমন হতে পারে অহংটাকেই তার স্তূপাকার উপকরণসমেত দেখা যায়, আত্মাকে আর দেখা যায় না। অহং চারিদিকেই বড়ো হয়ে উঠে আত্মাকে বলতে থাকে—তুমি চলতে পাবে না, তুমি এইখানেই থেকে যাও; তুমি এই ধন-দৌলতেই থাকো, এই ঘরবাড়িতেই থাকো, এই খ্যাতি প্রতিপত্তিতেই থাকো।

যদি আত্মা আটকা পড়ে তবে তার স্বরূপ ক্লিষ্ট হয়, তার স্বভাব নষ্ট হয়। সে তার গতি হারায়। অনন্তের মুখে সে আর চলে না, সে মজে যায়, সে মরতে থাকে।

আত্মা দেশকালপাত্রের মধ্যে দিয়ে নানা উপকরণে এই যে নিজের উপকূল রচনা করতে থাকে তার প্রধান সার্থকতা এই যে, এই কূলের দ্বারাই তার গতি সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। এই কূল না থাকলে সে ব্যাপ্ত হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে অচল হয়ে থাকত। অহং লোকে লোকান্তরে আত্মার গতিবেগকে বাড়িয়ে তার গতিপথকে এগিয়ে নিয়ে চলে। উপকূলই নদীর সীমা এবং নদীর রূপ—অহংই আত্মার সীমা আত্মার রূপ। এই রূপের

মধ্য দিয়েই আত্মার প্রবাহ, আত্মার প্রকাশ। এই প্রকাশ-পরম্পরার ভিতর দিয়েই সে নিজেকে নিয়ত উপলব্ধি করছে, অনন্তের মধ্যে সঞ্চরণ করছে। এই অহং-উপকূলের নানা ঘাতে প্রতিঘাতেই তার তরঙ্গ তার সংগীত।

কিন্তু যখনই উপকূলই প্রধান হয়ে উঠতে থাকে, যখন সে নদীর আনুগত্য না করে, তখনই গতির সহায় না হয়ে সে গতি রোধ করে। তখন অহং নিজে ব্যর্থ হয় এবং আত্মাকে ব্যর্থ করে। যেটুকু বাধায় আত্মা বেগ পায় তার চেয়ে অধিক বাধায় আত্মা অবরুদ্ধ হয়। তখন উপকূল নদীর সামগ্রী না হয়ে নদীই উপকূলের সামগ্রী হয়ে ওঠে এবং আত্মাই অহং-এর বশীভূত হয়ে নিজের অমরত্ব ভুলে সংসারে নিতান্ত দীনহীন হয়ে বাস করতে থাকে। নিজেকে দানের দ্বারা যে সার্থক হত, সঞ্চয়ের বহুতর শুষ্কবালুময় বেষ্টনের মধ্যে সে মৃত্যুশয্যায় পড়ে থাকে। তবু মরে না, কেবল নিজের দুর্গতিকেই ভোগ করে।

৭ চৈত্র

আত্মার প্রকাশ

প্রকাশ এবং যাঁর প্রকাশ উভয়ের মধ্যে একটি বৈপরীত্য থাকে, সেই বৈপরীত্যের সামঞ্জস্যের দ্বারাই উভয়ে সার্থকতা লাভ করে। বস্তুত বিরোধের মিলন ছাড়া প্রকাশ হতেই পারে না।

কর্মের মধ্যে শক্তির একটি বাধা আছে—সেই বাধাকে অতিক্রম করে কর্মের সঙ্গে সংগত হয় বলেই শক্তিকে শক্তি বলি। কর্মের মধ্যে শক্তির সেই বিরোধ যদি না থাকত তাহলে শক্তিকে শক্তিই বলতুম না। আবার, যদি কেবল বিরোধই থাকত তার কোনো সামঞ্জস্যই না থাকত তাহলেও শক্তিকে শক্তি বলা যেত না।

জগতের মধ্যে জগদীশ্বরের যে প্রকাশ, সে হচ্ছে সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশ। এই সীমায় অসীমে বৈপরীত্য আছে, তা না হলে অসীমের প্রকাশ হতে পারত না। কিন্তু কেবলই যদি বৈপরীত্যই থাকত তাহলেও সীমা অসীমকে আচ্ছন্ন করেই থাকত।

এক জায়গায় সীমার সঙ্গে অসীমের সামঞ্জস্য আছে। সে কোথায়? যেখানে সীমা আপনার সীমার মধ্যেই স্থির হয়ে বসে নেই, যেখানে সে অহরহই অসীমের দিকে চলেছে। সেই চলায় তার শেষ নেই—সেই চলায় সে অসীমকে প্রকাশ করছে।

মনে করো একটি বৃহৎ দৈর্ঘ্য স্থির হয়ে রয়েছে, ছোটো মাপকাঠি কী করে সেই দৈর্ঘ্যের বৃহত্ত্বকে প্রকাশ করে। না, ক্রমাগতই সেই স্তব্ধ দৈর্ঘ্যের পাশে পাশে চঞ্চল হয়ে

অগ্রসর হতে হতে। সে প্রত্যেকবার অগ্রসর হয়ে বলে, না এখনও শেষ হল না। সে যদি চুপ করে পড়ে থাকত তাহলে বৃহত্ত্বের সঙ্গে কেবলমাত্র নিজের বৈপরীত্যটুকুই জানত কিন্তু সে নাকি চলেছে এই চলার দ্বারাই বৃহত্ত্বকে পদে পদে উপলব্ধি করে চলেছে। এই চলার দ্বারা মাপকাঠি ক্ষুদ্র হয়েও বৃহত্ত্বকে প্রচার করছে। এইরূপে ক্ষুদ্রে বৃহতে বৈপরীত্যের মধ্যে যেখানে একটা সামঞ্জস্য ঘটছে সেইখানেই ক্ষুদ্রের দ্বারা বৃহতের প্রকাশ হচ্ছে।

জগৎও তেমনি সীমাবদ্ধভাবে কেবল স্থির নিশ্চল নয়—তার মধ্যে নিরন্তর একটি অভিব্যক্তি আছে একটি গতি আছে। রূপ হতে রূপান্তরে চলতে চলতে সে ক্রমাগতই বলছে আমার সীমার দ্বারা তাঁর প্রকাশকে শেষ করতে পারলুম না। এইরূপে রূপের দ্বারা জগৎ সীমাবদ্ধ হয়ে গতির দ্বারা অসীমকে প্রকাশ করছে। রূপের সীমাটি না থাকলে তার গতিও থাকতে পারত না, তার গতি না থাকলে অসীম তো অব্যক্ত হয়েই থাকতেন।

আত্মার প্রকাশরূপ যে অহং তার সঙ্গে আত্মার একটি বৈপরীত্য আছে। আত্মা ন জায়তে ম্রিয়তে। না জন্মায় না মরে। অহং জন্মমরণের মধ্য দিয়ে চলেছে। আত্মা দান করে, অহং সংগ্রহ করে, আত্মা অন্তরের মধ্যে সঞ্চরণ করতে চায়, অহং বিষয়ের মধ্যে আসক্ত হতে থাকে।

এই বৈপরীত্যের বিরোধের মধ্যে যদি একটি সামঞ্জস্য স্থাপিত না হয় তবে অহং আত্মাকে প্রকাশ না করে তাকে আচ্ছন্নই করবে।

অহং আপনার মৃত্যুর দ্বারাই আত্মার অমরত্ব প্রকাশ করে। কোনো সীমাবদ্ধ পদার্থ নিশ্চল হয়ে এই অমর আত্মাকে নিজের মধ্যে একভাবে রুদ্ধ করে রাখতে পারে না। অহং-এর মৃত্যুর দ্বারা আত্মা রূপকে বর্জন করতে করতেই নিজের রূপাতীত স্বরূপকে প্রকাশ করে। রূপ কেবলই বলে, একে আমি বাঁধতে পারলুম না, এ আমাকে নিরন্তর ছাড়িয়ে চলছে। এই জন্মমৃত্যুর দ্বারগুলি আত্মার পক্ষে রুদ্ধ দ্বার নয়। সে যেন তার রাজপথের বিজয়তোরণের মতো, তার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করতে করতে সে চলে যাচ্ছে, এগুলি কেবল তার গতির পরিমাপ করছে মাত্র। অহং নিরন্ত চঞ্চল হয়ে আত্মাকে কেবল মাপছে আর কেবলই বলছে—না, একে আমি সীমাবদ্ধ করে রাখতে পারলুম না। সে যেমন সব জিনিসকেই বদ্ধ করে রাখতে চায় তেমনি আত্মাকেও সে বাঁধতে চায়। বদ্ধ করতে চাওয়াই তার ধর্ম। অথচ একেবারে বদ্ধ করে রাখা তার ক্ষমতার মধ্যে নেই। যেমন বদ্ধ করা তার প্রবৃত্তি তেমনি বদ্ধ করাই যদি তার ক্ষমতা হত তবে অমন সর্বনেশে জিনিস আর কী হত।

তাই বলছিলুম অহং আত্মাকে যে কেবলই বাঁধছে এবং ছেড়ে দিচ্ছে সেই বাঁধা এবং ছেড়ে দেওয়ার দ্বারাই সে আত্মার মুক্ত-স্বভাবকে প্রকাশ করছে। যদি না বাঁধত তা হলে এই মুক্তির প্রকাশ কোথায় থাকত, যদি না ছেড়ে দিত তাহলেই বা কোথায় থাকত ?

আত্মা দান করে এবং অহং সংগ্রহ করে, এই বৈপরীত্যের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায় সে কথার আলোচনা কাল করেছি। আত্মা দান করবে বলেই অহং সংগ্রহ করে, এইটেই হচ্ছে ওর সামঞ্জস্য। অহং সে কথা ভোলে—সে মনে করে সংগ্রহ করা ভোগেরই জন্যে। এই মিথ্যাকে যতই সে আঁকড়ে ধরতে চায় এই মিথ্যা ততই তাকে দুঃখ দেয় ফাঁকি দেয়। আত্মা তার অহংবৃক্ষে ফল ফলাবে বটে কিন্তু ফল আত্মসাৎ করবে না, দান করবে।

আমাদের জীবনের সাধনা এই যে, অহং-এর দ্বারা আমরা আত্মাকে প্রকাশ করব। যখন তা না করে ধনকে মানকে বিদ্যাকেই প্রকাশ করতে চাই তখন অহং নিজেকেই প্রকাশ করে, আত্মাকে প্রকাশ করে না। তখন ভাষা নিজের বাহাদুরি দেখাতে চায়, ভাব ম্লান হয়ে যায়।

যাঁরা সাধুপুরুষ তাঁদের অহং চোখেই পড়ে না, তাঁদের আত্মাকেই দেখি। সেই জন্যে তাঁদের মহাধনী মহামানী মহাবিদ্বান বলি নে—তাঁদের মহাত্মা বলি। তাঁদের জীবনে আত্মারই প্রকাশ সুতরাং তাঁদের জীবন সার্থক। তাঁদের অহং আত্মাকে মুক্তই করছে, বাধাগ্রস্ত করছে না।

এইজন্যেই আমাদের প্রার্থনা যে, আমরা যেন এই মানবজীবনে সত্যকেই প্রকাশ করি, অসত্যকে নিয়েই দিনরাত ব্যস্ত হয়ে না থাকি। আমরা যেন প্রবৃত্তির অন্ধকারের মধ্যেই আত্মাকে আচ্ছন্ন করে না রাখি, আত্মা যেন এই ঘোর অন্ধকারে আপনাকে আপনি না হারায়, মোহমুক্ত নির্মল জ্যোতিতে আপনাকে আপনি উপলব্ধি করে, সে যেন নানা অনিত্য উপকরণের সঞ্চয়ের মধ্যে পদে পদে আঘাত খেতে খেতে হাতড়ে না বেড়ায়, সে যেন আপনার অমৃতরূপকে আনন্দরূপকে তোমার মধ্যে লাভ করে। হে স্বপ্রকাশ, আত্মা যেন নিজের সকল প্রকাশের মধ্যে তোমাকেই প্রকাশ করে ; নিজের অহংকেই প্রকাশ না করে ; মানবজীবনকে একেবারে নিরর্থক করে না দেয়।

৮ চৈত্র

আদেশ

কোন্ কোন্ মন্দ কাজ করবে না। তার বিশেষ উল্লেখ করে সেইগুলিকে ধর্মশাস্ত্র ঈশ্বরের বিশেষ নিষেধরূপে প্রচার করেছেন।

সেরকম ভাবে প্রচার করলে মনে হয় যেন ঈশ্বর কতকগুলি নিজের ইচ্ছামত আইন করে দিয়েছেন সেই আইনগুলি লঙ্ঘন করলে বিশ্বরাজের কোপে পড়তে হবে। সে কথাটাকে এইরূপ ক্ষুদ্র ও কৃত্রিমভাবে মানতে পারি নে। তিনি কোনো বিশেষ আদেশ জানান নি, কেবল তাঁর একটি আদেশ তিনি ঘোষণা করেছেন, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপরে তাঁর সেই আদেশ, সেই একমাত্র আদেশ।

তিনি কেবলমাত্র বলেছেন, প্রকাশিত হও। সূর্যকেও তাই বলেছেন, পৃথিবীকেও তাই বলেছেন, মানুষকেও তাই বলেছেন। সূর্য তাই জ্যোতির্ময় হয়েছে, পৃথিবী তাই জীবধাত্রী হয়েছে, মানুষকেও তাই আত্মাকে প্রকাশ করতে হবে।

বিশ্বজগতের যে-কোনো প্রান্তে তাঁর এই আদেশ বাধা পাচ্ছে, সেইখানেই কুঁড়ি মুষড়ে যাচ্ছে, সেইখানেই নদী স্রোতোহীন হয়ে শৈবালজালে রুদ্ধ হচ্ছে—সেইখানেই বন্ধন বিকার বিনাশ।

বুদ্ধদেব যখন বেদনাপূর্ণ চিত্তে ধ্যান দ্বারা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছিলেন যে, মানুষের বন্ধন বিকার বিনাশ কেন, দুঃখ জরা মৃত্যু কেন, তখন তিনি কোন্ উত্তর পেয়ে আনন্দিত হয়ে উঠেছিলেন? তখন তিনি এই উত্তরই পেয়েছিলেন যে, মানুষ আত্মাকে উপলব্ধি করলেই আত্মাকে প্রকাশ করলেই মুক্তিলাভ করবে। সেই প্রকাশের বাধাতেই তার দুঃখ—সেইখানেই তার পাপ।

এইজন্যে তিনি প্রথমে কতকগুলি নিষেধ স্বীকার করিয়ে মানুষকে শীল গ্রহণ করতে আদেশ করেন। তাকে বললেন তুমি লোভ ক'রো না, হিংসা ক'রো না, বিলাসে আসক্ত হ'য়ো না। যে-সমস্ত আবরণ তাকে বেষ্টন করে ধরেছে সেইগুলি প্রতিদিনের নিয়ত অভ্যাসে মোচন করে ফেলবার জন্যে তাকে উপদেশ দিলেন। সেই আবরণগুলি মোচন হলেই আত্মা আপনার বিশুদ্ধ স্বরূপটি লাভ করবে।

সেই স্বরূপটি কী? শূন্যতা নয়, নৈষ্কর্ম্য নয়। সে হচ্ছে মৈত্রী, করুণা, নিখিলের প্রতি প্রেম। বুদ্ধ কেবল বাসনা ত্যাগ করতে বলেন নি তিনি প্রেমকে বিস্তার করতে বলেছেন। কারণ এই প্রেমকে বিস্তারের দ্বারাই আত্মা আপন স্বরূপকে পায়—সূর্য যেমন আলোককে বিকীর্ণ করার দ্বারাই আপনার স্বভাবকে পায়।

সর্বলোকে আপনাকে পরিকীর্ণ করা আত্মার ধর্ম—পরমাত্মারও সেই ধর্ম। তাঁর

সেই ধর্ম পরিপূর্ণ, কেননা তিনি শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং। তিনি নির্বিকার, তাঁতে পাপের কোনো বাধা নেই। সেইজন্যে সর্বত্রই তাঁর প্রবেশ।

পাপের বন্ধন মোচন করলে আমাদেরও প্রবেশ অব্যাহত হবে। তখন আমরা কী হব? পরমাত্মার মতো সেই স্বরূপটি লাভ করব যে স্বরূপে তিনি কবি, মনীষী, প্রভু, স্বয়ম্ভু। আমরাও আনন্দময় কবি হব, মনের অধীশ্বর হব, দাসত্ব থেকে মুক্ত হব, আপন নির্মল আলোকে আপনি প্রকাশিত হব। তখন আত্মা সমস্ত চিন্তায় বাক্যে কর্মে আপনাকে শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্‌রূপে প্রকাশ করবে—আপনাকে ক্ষুব্ধ করে লুব্ধ করে খণ্ডবিখণ্ডিত করে দেখাবে না।

মৈত্রেয়ীর প্রার্থনাও সেই প্রকাশের প্রার্থনা। যে-প্রার্থনা বিশ্বের সমস্ত কুঁড়ির মধ্যে, কিশলয়ের মধ্যে, যে-প্রার্থনা দেশকালের অপরিতৃপ্ত গভীরতার মধ্য হতে নিয়ত উঠছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অণুতে পরমাণুতে যে-প্রার্থনা, যে-প্রার্থনার যুগযুগান্তরব্যাপী ক্রন্দনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে বলেই বেদে এই অন্তরীক্ষকে ক্রন্দসী রোদসী বলেছে সেই মানবাত্মার চিরন্তন প্রার্থনাই মৈত্রেয়ীর প্রার্থনা। আমাকে প্রকাশ করো, আমাকে প্রকাশ করো। আমি অসত্যে আচ্ছন্ন আমাকে সত্যে প্রকাশ করো। আমি অন্ধকারে আবিষ্ট আমাকে জ্যোতিতে প্রকাশ করো, আমি মৃত্যুর দ্বারা আবিষ্ট আমাকে অমৃতে প্রকাশ করো। হে আবিঃ, হে পরিপূর্ণ প্রকাশ, তোমার মধ্যেই আমার প্রকাশ হ'ক, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ কোনো বাধা না পাক—সেই প্রকাশ নির্মুক্ত হলেই তোমার দক্ষিণ মুখের জ্যোতিতে আমি চিরকালের জন্যে রক্ষা পাব। সেই প্রকাশের বাধাতেই তোমার অপ্রসন্নতা।

বুদ্ধ সমস্ত মানবের হয়ে নিজের জীবনে এই পরিপূর্ণ প্রকাশের প্রার্থনাই করেছিলেন—এ ছাড়া মানুষের আর দ্বিতীয় কোনো প্রার্থনাই নেই।

৯ চৈত্র

সাধন

আমরা অনেকেই প্রতিদিন এই বলে আক্ষেপ করছি যে, আমরা ঈশ্বরকে পাচ্ছি নে কেন? আমাদের মন বসছে না কেন? আমাদের ভাব জমছে না কেন?

সে কি অমনি হবে, আপনি হয়ে উঠবে? এতবড়ো লাভের খুব একটা বড়ো সাধনা নেই কি? ঈশ্বরকে পাওয়া বলতে কতখানি বোঝায় তা ঠিকমতো জানলে এ সম্বন্ধে বৃথা চঞ্চলতা অনেকটা দূর হয়।

ব্রহ্মকে পাওয়া বলতে যদি একটা কোনো চিন্তায় মনকে বসানো বা একটা কোনো ভাবে মনকে রসিয়ে তোলা হত তাহলে কোনো কথাই ছিল না—কিন্তু ব্রহ্মকে পাওয়া তো অমন একটি ছোটো ব্যাপার নয়। তার জন্যে শিক্ষা হল কই? তার জন্যে সমস্ত চিত্তকে একমনে নিযুক্ত করলুম কই? তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। অর্থাৎ তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মকে বিশেষরূপে জানতে চাও, এই যে উপদেশ সে-উপদেশের মতো তপস্যা হল কই।

কেবল কি নিয়মিত সময়ে তাঁর নাম করা নাম শোনাই তপস্যা? জীবনের অল্প একটু উদ্‌বৃত্ত জায়গা তাঁর জন্যে ছেড়ে দেওয়াই কি তপস্যা? সেইটুকুমাত্র ছেড়ে দিয়েই তুমি রোজ তার হিসেব নিকেশ করে নেবার তাগাদা কর। বল যে, এই তো উপাসনা করছি কিন্তু ব্রহ্মকে পাচ্ছি নে কেন? এত সস্তায় কোন্ জিনিসটা পেয়েছ?

কেবল পাঁচজন মানুষের সঙ্গে মিলে থাকবার উপযুক্ত হবার জন্যে কী তপস্যাই না করতে হয়েছে? বাপ মার কাছে শিক্ষা, প্রতিবেশীর কাছে শিক্ষা, বন্ধুর কাছে শিক্ষা, শত্রুর কাছে শিক্ষা, ইস্কুলে শিক্ষা, আপিসে শিক্ষা; রাজার শাসন, সমাজের শাসন, শাস্ত্রের শাসন। সেজন্য ক্রমাগতই প্রবৃত্তিকে দমন করতে হয়েছে, ব্যবহারকে সংযত করতে হয়েছে, ইচ্ছাবৃত্তিকে পরিমিত করতে হয়েছে। এত করেও পরিপূর্ণ সামাজিক জীব হয়ে উঠি নি,—কত অসতর্কতা কত শৈথিল্যবশত কত অপরাধ করি তার ঠিক নেই। তাই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমাদের সমাজসাধনা চলেইছে।

সমাজবিহারের জন্য যদি এত কঠিন ও নিরন্তর সাধনা তবে ব্রহ্মবিহারের জন্য বুঝি কেবল মাঝে মাঝে নিয়মমত দুই চারিটি কথা শুনে বা দুই চারিটি কথা বলেই কাজ হয়ে যাবে।

এরকম আশা যদি কেউ করে তবে বোঝা যাবে সে-ব্যক্তি মুখে যাই বলুক, সাধনার লক্ষ্য যেখানে সে স্থাপন করেছে সেটা একটা ছোটো জায়গা। সে জায়গায় এমন কিছুই নেই যা তোমার সমস্ত সংসারের চেয়েও বড়ো—বরং এমন কিছু আছে যার চেয়ে তোমার সংসারের অধিকাংশ জিনিসই বড়ো।

এইটি মনে রাখতে হবে প্রতিদিন সকল কর্মের মধ্যে আমাদের সাধনাকে জাগিয়ে রাখতে হবে। এই সাধনাটিকে আমাদের গড়তে হবে। শরীরটিকে মনটিকে হৃদয়টিকে সকল দিক দিয়ে ব্রহ্মবিহারের অনুকূল করে তুলতে হবে।

সমাজের জন্য আমাদের এই শরীর মন হৃদয়কে আমরা তো একটু একটু করে গড়ে তুলেছি। শরীরকে সমাজের উপযোগী সাজ করতে অভ্যাস করিয়েছি—শরীর সমাজের উপযোগী লজ্জাসংকোচ করতে শিখেছে। তার হাত পা চাহনি হাসি সমাজের প্রয়োজন

অনুসারে শায়েস্তা হয়ে এসেছে। সভাস্থলে স্থির হয়ে বসতে তার আর কষ্ট হয় না, পরিচিত ভদ্রলোক দেখলে হাসিমুখে শিষ্ট সম্ভাষণ করতে তার আর চেষ্টা করতে হয় না। সমাজের সঙ্গে মিলে থাকবার জন্যে বিশেষ অভ্যাসের দ্বারা অনেক ভালোলাগা মন্দলাগা অনেক ঘৃণা ভয় এমন করে গড়ে তুলতে হয়েছে যে, সেগুলি শারীরিক সংস্কারে পরিণত হয়েছে; এমন কি, সেগুলি আমাদের সহজ সংস্কারের চেয়েও বড়ো হয়ে উঠেছে। এমনি করে কেবল শরীর নয় হৃদয় মনকে প্রতিদিন সমাজের ছাঁচে ফেলে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে গড়ে তুলতে হয়েছে।

ব্রহ্মবিহারের জন্যও শরীর মন হৃদয়কে সকল দিক দিয়েই সকল প্রকারেই নিজের চেষ্টায় গড়ে তুলতে হবে। যদি প্রশ্ন করবার কিছু থাকে তবে এইটেই প্রশ্ন করবার যে, আমি কি সেই চেষ্টা করছি? আমি কি ব্রহ্মকে পেয়েছি, সে প্রশ্ন এখন থাক্‌।

প্রথমে শরীরটাকে তো বিশুদ্ধ করে তুলতে হবে। আমাদের চোখ মুখ হাত পাকে এমন করতে হবে যে, পবিত্র সংযম তাদের পক্ষে একেবারে সংস্কারের মতো হয়ে আসবে। সম্মুখে যেখানে লজ্জার বিষয় আছে সেখানে মন লজ্জা করবার পূর্বে চক্ষু আপনি লজ্জিত হবে—যে-ঘটনায় সহিষ্ণুতার প্রয়োজন আছে সেখানে মন বিবেচনা করবার পূর্বে বাক্য আপনি ক্ষান্ত হবে, হাত পা আপনি স্তব্ধ হবে। এর জন্যে মুহূর্তে মুহূর্তে আমাদের চেষ্টার প্রয়োজন। তনুকে ভাগবতী তনু করে তুলতে হবে—এ তনু তপোবনের সঙ্গে কোথাও বিরোধ করবে না, অতি সহজেই সর্বত্রই তাঁর অনুগত হবে।

প্রতিদিন প্রত্যেক ব্যাপারে আমাদের বাসনাকে সংযত করে আমাদের ইচ্ছাকে মঙ্গলের মধ্যে বিস্তীর্ণ করতে হবে, অর্থাৎ ভগবানের যে-ইচ্ছা সর্বজীবের মধ্যে প্রসারিত, নিজের রাগ-দ্বেষ লোভ-ক্ষোভ ভুলে সেই ইচ্ছার সঙ্গে সচেষ্টভাবে যোগ দিতে হবে। সেই ইচ্ছার মধ্যে প্রত্যহই আমাদের ইচ্ছাকে অল্প অল্প করে ব্যাপ্ত করে দিতে হবে। যে পরিমাণে ব্যাপ্ত হতে থাকবে ঠিক সেই পরিমাণেই আমরা ব্রহ্মকে পাব। এক জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে যদি বলি যে দূর লক্ষ্যস্থানে পৌঁছোচ্ছি না কেন সে যেমন অসংগত বলা, নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে স্বার্থবেষ্টনের কেন্দ্রে অচল হয়ে বসে কেবলমাত্র জপতপের দ্বারা ব্রহ্মকে পাচ্ছি নে কেন, এ প্রশ্নও তেমনি অদ্ভুত।

১০ চৈত্র

ব্রহ্মবিহার

ব্রহ্মবিহারের এই সাধনার পথে বুদ্ধদেব মানুষকে প্রবর্তিত করবার জন্যে বিশেষরূপে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি জানতেন কোনো পাবার যোগ্য জিনিস ফাঁকি দিয়ে পাওয়া যায় না, সেইজন্যে তিনি বেশি কথা না বলে একেবারে ভিত খোঁড়া থেকে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন শীল গ্রহণ করাই মুক্তিপথের পাথেয় গ্রহণ করা। চরিত্র শব্দের অর্থ ই এই যাতে করে চলা যায়। শীলের দ্বারা সেই চরিত্র গড়ে ওঠে। শীল আমাদের চলবার সম্বল।

পাণং ন হানে, প্রাণীকে হত্যা করবে না, এই কথাটি শীল। ন চ দিন্নমাদিয়ে, যা তোমাকে দেওয়া হয় নি তা নেবে না। এই একটি শীল। মুসা ন ভাসে, মিথ্যা কথা বলবে না, এই একটি শীল। ন চ মজ্জপো সিয়া, মদ খাবে না, এই একটি শীল। এমনি করে যথাসাধ্য একটি একটি করে শীল সঞ্চয় করতে হবে।

আর্য শ্রাবকেরা প্রতিদিন নিজেদের এই শীলকে স্মরণ করেন—ইধ অরিয়সাবকো অত্তনো সীলানি অনুস্সরতি। শীলসকলকে কী বলে অনুস্মরণ করেন।

অখণ্ডানি, অচ্ছিদ্দানি, অসবলানি, অকম্মাসানি ভুজিস্সানি, বিঞ্ঞূপসত্থানি, অপরামট্‌ঠানি, সমাধিসংবত্তনিকানি।

অর্থাৎ

আমার এই শীল খণ্ডিত হয় নি, এতে ছিদ্র হয় নি, আমার এই শীল জোর করে রক্ষিত হয় নি অর্থাৎ ইচ্ছা করেই রাখছি, এই শীলে পাপ স্পর্শ করে নি, এই শীল ধন মান প্রভৃতি কোনো স্বার্থসাধনের জন্য আচরিত নয়, এই শীল বিজ্ঞজনের অনুমোদিত, এই শীল বিচলিত হয় নি এবং এই শীল মুক্তিপ্রবর্তন করবে।

এই বলে আর্যশ্রাবকগণ নিজ নিজ শীলের গুণ বারংবার স্মরণ করেন।

এই শীলগুলিই হচ্ছে মঙ্গল। মঙ্গললাভই প্রেম ও মুক্তিলাভের সোপান। বুদ্ধদেব কাকে যে মঙ্গল বলছেন তা "মঙ্গল সুত্তে" কথিত আছে। সেটি অনুবাদ করে দিই,

বহূ দেবা মনুস্সা চ মঙ্গলানি অচিন্তয়ুং
আকঙ্খমানা সোত্থানং ব্রূহি মঙ্গলমুত্তমং।

বুদ্ধকে প্রশ্ন করা হচ্ছে যে,

বহু দেবতা বহু মানুষ যাঁরা শুভ আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁরা মঙ্গলের চিন্তা করে এসেছেন, সেই মঙ্গলটি কী বলো।

বুদ্ধ উত্তর দিচ্ছেন,

অসেবনা চ বালানং পণ্ডিতানঞ্চ সেবনা
পূজা চ পূজনেয্যানং এতং মঙ্গলমুত্তমং।

অসৎগণের সেবা না করা, সজ্জনের সেবা করা, পূজনীয়কে পূজা করা এই হচ্ছে উত্তম মঙ্গল।

পতিরূপদেসবাসো, পুব্বে চ কতপুঞ্‌ঞতা,
অত্তসম্মাপণিধি চ, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

যে দেশে ধর্মসাধন বাধা পায় না সেই দেশে বাস, পূর্বকৃত পুণ্যকে বর্ধিত করা, আপনাকে সৎকর্মে প্রণিধান করা এই উত্তম মঙ্গল।

বাহুসচ্চঞ্চ সিপ্‌পঞ্চ, বিনয়ো চ সুসিক্‌খিতো
সুভাসিতা চ যা বাচা, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন, বহু শিল্পশিক্ষা, বিনয়ে সুশিক্ষিত হওয়া এবং সুভাষিত বাক্য বলা এই উত্তম মঙ্গল।

মাতাপিতু-উপট্‌ঠানং পুত্তদারস্‌স সংগহো,
অনাকুলা চ কম্মানি এতং মঙ্গলমুত্তমং।

মাতা পিতাকে পূজা করা, স্ত্রী পুত্রের কল্যাণ করা, অনাকুল কর্ম করা এই উত্তম মঙ্গল।

দানঞ্চ ধম্মচরিয়ঞ্চ ঞাতকানঞ্চ সংগহো
অনবজ্জানি কম্মানি, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

দান, ধর্মচর্যা, জ্ঞাতিবর্গের উপকার, অনিন্দনীয় কর্ম এই উত্তম মঙ্গল।

আরতী বিরতি পাপা, মজ্জপানা চ সঞ্‌ঞমো
অপ্‌পমাদো চ ধম্মেসু, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

পাপে অনাসক্তি এবং বিরতি, মদ্যপানে বিতৃষ্ণা, ধর্মকর্মে অপ্রমাদ এই উত্তম মঙ্গল।

গারবো চ নিবাতো চ, সন্তুট্‌ঠী চ কতঞ্‌ঞুতা
কালেন ধম্মসবনং এতং মঙ্গলমুত্তমং।

গৌরব অথচ নম্রতা, সন্তুষ্টি, কৃতজ্ঞতা, যথাকালে ধর্মকথাশ্রবণ এই উত্তম মঙ্গল।

খন্তী চ সোবচস্‌সতা সমণানঞ্চ দস্‌সনং
কালেন ধম্মসাকচ্ছা এতং মঙ্গলমুত্তমং।

ক্ষমা, প্রিয়বাদিতা, সাধুগণকে দর্শন, যথাকালে ধর্মালোচনা এই উত্তম মঙ্গল।

তপো চ ব্রহ্মচরিয়ঞ্চ অরিয়সচ্চান দস্‌সনং
নিব্বানসচ্ছিকিরিয়া এতং মঙ্গলমুত্তমং।

তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, শ্রেষ্ঠ সত্যকে জানা, মুক্তিলাভের উপযুক্ত সৎকার্য এই উত্তম মঙ্গল।

ফুট্‌ঠস্‌স লোকধম্মেহি চিত্তং যস্‌স ন কম্পতি
অসোকং বিরজং খেমং এতং মঙ্গলমুত্তমং।

লাভ ক্ষতি নিন্দা প্রশংসা প্রভৃতি লোকধর্মের দ্বারা আঘাত পেলেও যার চিত্ত কম্পিত হয় না, যার শোক নেই, মলিনতা নেই, যার ভয় নেই সে উত্তম মঙ্গল পেয়েছে।

এতাদিসানি কত্বান, সব্বত্থমপরাজিতা
সব্বত্থ সোত্থি গচ্ছন্তি তেসং মঙ্গলমুত্তমন্তি

এই রকম যারা করেছে, তারা সর্বত্র অপরাজিত, তারা সর্বত্র স্বস্তি লাভ করে তাদের উত্তম মঙ্গল হয়।

যারা বলে ধর্মনীতিই বৌদ্ধধর্মের চরম তারা ঠিক কথা বলে না। মঙ্গল একটা উপায় মাত্র। তবে নির্বাণই চরম? তা হতে পারে কিন্তু সেই নির্বাণটি কী? সে কি শূন্যতা?

যদি শূন্যতাই হত তবে পূর্ণতার দ্বারা তাতে গিয়ে পৌঁছোনো যেত না। তবে কেবলই সমস্তকে অস্বীকার করতে করতে নয় নয় নয় বলতে বলতে একটার পর একটা ত্যাগ করতে করতেই সেই সর্বশূন্যতার মধ্যে নির্বাপণ লাভ করা যেত।

কিন্তু বৌদ্ধধর্মে সে পথের ঠিক উলটা পথ দেখি যে। তাতে কেবল তো মঙ্গল দেখছি নে—মঙ্গলের চেয়েও বড়ো জিনিসটি দেখছি যে।

মঙ্গলের মধ্যেও একটা প্রয়োজনের ভাব আছে। অর্থাৎ তাতে একটা কোনো ভালো উদ্দেশ্য সাধন করে, কোনো একটা সুখ হয় বা সুযোগ হয়।

কিন্তু প্রেম যে সকল প্রয়োজনের বাড়া। কারণ প্রেম হচ্ছে স্বতই আনন্দ, স্বতই পূর্ণতা, সে কিছুই নেওয়ার অপেক্ষা করে না, সে যে কেবলই দেওয়া।

যে দেওয়ার মধ্যে কোনো নেওয়ার সম্বন্ধ নেই সেইটেই হচ্ছে শেষের কথা—সেইটেই ব্রহ্মের স্বরূপ—তিনি নেন না।

এই প্রেমের ভাবে, এই আদানবিহীন প্রদানের ভাবে আত্মাকে ক্রমশ পরিপূর্ণ করে তোলবার জন্যে বুদ্ধদেবের উপদেশ আছে, তিনি তার সাধনপ্রণালীও বলে দিয়েছেন।

এ তো বাসনা-সংহরণের প্রণালী নয়, এ তো বিশ্ব হতে বিমুখ হবার প্রণালী নয়, এ যে সকলের অভিমুখে আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পদ্ধতি। এই প্রণালীর নাম মেত্তিভাবনা—মৈত্রীভাবনা।

প্রতিদিন এই কথা ভাবতে হবে—

সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু, অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্‌ঝা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু; সব্বে সত্তা মা যথালদ্ধসম্পত্তিতো বিগচ্ছন্তু।

সকল প্রাণী সুখিত হ'ক, শত্রুহীন হ'ক, অহিংসিত হ'ক, সুখী আত্মা হয়ে কাল হরণ করুক। সকল প্রাণী আপন যথালব্ধসম্পত্তি হতে বঞ্চিত না হ'ক।

১৪।২৬

মনে ক্রোধ দ্বেষ লোভ ঈর্ষা থাকলে এই মৈত্রিভাবনা সত্য হয় না—এইজন্য শীল-গ্রহণ শীল-সাধন প্রয়োজন। কিন্তু শীলসাধনার পরিণাম হচ্ছে সর্বত্র মৈত্রীকে দয়াকে বাধাহীন করে বিস্তার। এই উপায়েই আত্মাকে সকলের মধ্যে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়।

এই মৈত্রীভাবনার দ্বারা আত্মাকে সকলের মধ্যে প্রসারিত করা এ তো শূন্যতার পন্থা নয়।

তা যে নয় তা বুদ্ধ যাকে ব্রহ্মবিহার বলছেন তা অনুশীলন করলেই বোঝা যাবে।

করণীয় মত্থ কুসলেন
যন্তং সন্তং পদং অভিসমেচ্চ
সক্কো উজু চ সুহুজূচ,
সুবচো চস্‌স মুদু অনতিমানী।

শান্তপদ লাভ করে পরমার্থকুশল ব্যক্তির যা করণীয় তা এই—তিনি শক্তিমান, সরল, অতি সরল, সুভাষী, মৃদু, নম্র এবং অনভিমানী হবেন।

সন্তুস্‌সকো চ সুভরো চ,
অপ্‌পকিচ্চো চ সল্লহুকবুত্তি,
সন্তিন্দ্রিয়ো চ নিপকো চ
অপ্‌পগব্‌ভো কুলেসু অননুগিদ্ধো।

তিনি সন্তুষ্টহৃদয় হবেন, অল্পেই তাঁর ভরণ হবে, তিনি নিরুদ্বেগ, অল্পভোজী, শান্তেন্দ্রিয়, সদ্বিবেচক, অপ্রগল্‌ভ এবং সংসারে অনাসক্ত হবেন।

ন চ খুদ্দং সমাচরে কিঞ্চি
যেন বিঞ্‌ঞূ পরে উপবদেয়্যুং।
সুখিনো বা খেমিনো বা
সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা।

এমন ক্ষুদ্র অন্যায়ও কিছু আচরণ করবেন না যার জন্যে অন্যে তাঁকে নিন্দা করতে পারে। তিনি কামনা করবেন সকল প্রাণী সুখী হ'ক নিরাপদ হ'ক সুস্থ হ'ক।

যে কেচি পাণভূতত্থি
তসা বা থাবরা বা অনবসেসা।
দীঘা বা যে মহন্তা বা
মজ্ঝিমা রস্‌সকা অণুকথূলা।
দিট্‌ঠা বা যে চ অদিট্‌ঠা
যে চ দূরে বসন্তি অবিদূরে।

ভূতা বা সম্ভবেসী বা
সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা।

যে কোনো প্রাণী আছে, কী সবল কী দুর্বল, কী দীর্ঘ কী প্রকাণ্ড, কী মধ্যম কী হ্রস্ব, কী সূক্ষ্ম কী স্থূল, কী দৃষ্ট কী অদৃষ্ট, যারা দূরে বাস করছে বা যারা নিকটে, যারা জন্মেছে বা যারা জন্মাবে অবশেষে সকলেই সুখী আত্মা হ'ক।

ন পরোপরং নিকুব্বেথ
নাতিমঞ্‌ঞেথ কথচি ন কঞ্চি
ব্যারোসনা পটিঘ সঞ্‌ঞা
নঞ্‌ঞ মঞ্‌ঞস্‌স দুক্খমিচ্ছেয্য।

পরস্পরকে বঞ্চনা ক'রো না—কোথাও কাউকে অবজ্ঞা ক'রো না, কায়ে বাক্যে বা মনে ক্রোধ করে অন্যের দুঃখ ইচ্ছা ক'রো না।

মাতা যথা নিযং পুত্তং
আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে
এবম্পি সব্বভূতেসু
মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং।

মা যেমন একটি মাত্র পুত্রকে নিজের আয়ু দিয়ে রক্ষা করেন সমস্ত প্রাণীতে সেই প্রকার অপরিমিত মানস রক্ষা করবে।

মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং
মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।
উদ্ধং অধো চ তিরিয়ঞ্চ
অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।

ঊর্ধ্বে অধোতে চারদিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাহীন, হিংসাহীন, শত্রুতাহীন অপরিমিত মানস এবং মৈত্রী রক্ষা করবে।

তিট্‌ঠং চরং নিসিন্নো বা
সয়ানো বা যাবতস্‌স বিগতমিদ্ধো
এতং সতিং অধিট্‌ঠেয্য
ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু।

যখন দাঁড়িয়ে আছ বা চলছ, বসে আছ বা শুয়ে আছ, যে পর্যন্ত না নিদ্রা আসে সে পর্যন্ত এই প্রকার স্মৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকাকে ব্রহ্মবিহার বলে।

অপরিমিত মানসকে প্রীতিভাবে মৈত্রীভাবে বিশ্বলোকে ভাবিত করে তোলাকে

ব্রহ্মবিহার বলে। সে প্রীতি সামান্য প্রীতি নয়—মা তাঁর একটিমাত্র পুত্রকে যেরকম ভালোবাসেন সেইরকম ভালোবাসা।

ব্রহ্মের অপরিমিত মানস যে বিশ্বের সর্বত্রই রয়েছে, একপুত্রের প্রতি মাতার যে প্রেম সেই প্রেম যে তাঁর সর্বত্র। তাঁরই সেই মানসের সঙ্গে মানস, প্রেমের সঙ্গে প্রেম না মেশালে সে তো ব্রহ্মবিহার হল না।

কথাটা খুব বড়ো। কিন্তু বড়ো কথাই যে হচ্ছে। বড়ো কথাকে ছোটো কথা করে তো লাভ নেই। ব্রহ্মকে চাওয়াই যে সকলের চেয়ে বড়োকে চাওয়া। উপনিষৎ বলেছেন ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। ভূমাকেই—সকলের চেয়ে বড়োকেই—জানতে চাইবে।

সেই চাওয়া সেই পাওয়ার রূপটা কী সে তো স্পষ্ট করে পরিষ্কার করে সম্মুখে ধরতে হবে। ভগবান বুদ্ধ ব্রহ্মবিহারকে সুস্পষ্ট করে ধরেছেন—তাকে ছোটো করে ঝাপসা করে সকলের কাছে চলনসই করবার চেষ্টা করেন নি।

অপরিমিত মানসে অপরিমিত মৈত্রীকে সর্বত্র প্রসারিত করে দিলে ব্রহ্মের বিহারক্ষেত্রে ব্রহ্মের সঙ্গে মিলন হয়।

এই তো হল লক্ষ্য। কিন্তু এ তো আমরা একেবারে পারব না। এইদিকে আমাদের প্রত্যহ চলতে হবে। এই লক্ষ্যের সঙ্গে তুলনা করে প্রত্যহ বুঝতে পারব আমরা কতদূর অগ্রসর হলুম।

ঈশ্বরের প্রতি আমার প্রেম জন্মাচ্ছে কি না সে সম্বন্ধে আমরা নিজেকে নিজে ভোলাতে পারি। কিন্তু সকলের প্রতি আমার প্রেম বিস্তৃত হচ্ছে কিনা, আমার শত্রুতা ক্ষয় হচ্ছে কিনা, আমার মঙ্গলভাব বাড়ছে কিনা তার পরিমাণ স্থির করা শক্ত নয়।

একটা কোনো নির্দিষ্ট সাধনার সুস্পষ্ট পথ পাবার জন্যে মানুষের একটা ব্যাকুলতা আছে। বুদ্ধদেব একদিকে উদ্দেশ্যকে যেমন খর্ব করেন নি তেমনি তিনি পথকেও খুব নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কেমন করে ভাবতে হবে এবং কেমন করে চলতে হবে তা তিনি খুব স্পষ্ট করে বলেছেন। প্রত্যহ শীলসাধনা দ্বারা তিনি আত্মাকে মোহ থেকে মুক্ত করতে উপদেশ দিয়েছেন এবং মৈত্রীভাবনা দ্বারা আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পথ দেখিয়েছেন। প্রতিদিন এই কথা স্মরণ করো যে আমার শীল অখণ্ড আছে অচ্ছিদ্র আছে এবং প্রতিদিন চিত্তকে এই ভাবনায় নিবিষ্ট করো যে ক্রমশ সকল বিরোধ কেটে গিয়ে আমার আত্মা সর্বভূতে প্রসারিত হচ্ছে। অর্থাৎ একদিকে বাধা কাটছে আর একদিকে স্বরূপ লাভ হচ্ছে। এই পদ্ধতিকে তো কোনোক্রমেই শূন্যতালাভের পদ্ধতি বলা যায় না। এই তো নিখিললাভের পদ্ধতি, এই তো আত্মলাভের পদ্ধতি, পরমাত্মলাভের পদ্ধতি।

১১ চৈত্র

পূর্ণতা

আর এক মহাপুরুষ যিনি তাঁর পিতার মহিমা প্রচার করতে জগতে এসেছিলেন, তিনি বলেছেন, তোমার পিতা যেরকম সম্পূর্ণ তুমি তেমনি সম্পূর্ণ হও।

এ-কথাটিও ছোটো কথা নয়। মানবাত্মার সম্পূর্ণতার আদর্শকে তিনি পরমাত্মার মধ্যে স্থাপন করে সেইদিকেই আমাদের লক্ষ্য স্থির করতে বলেছেন। সেই সম্পূর্ণতার মধ্যেই আমাদের ব্রহ্মবিহার, কোনো ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে নয়। পিতা যেমন সম্পূর্ণ, পুত্র তেমনি সম্পূর্ণ হতে নিয়ত চেষ্টা করবে। এ না হলে পিতাপুত্রে সত্যযোগ হবে কেমন করে।

এই সম্পূর্ণতার যে একটি লক্ষণ নির্দেশ করেছেন সেও বড়ো কম নয়। যেমন বলেছেন তোমার প্রতিবেশীকে তোমার আপনার মতো ভালোবাসো। কথাটাকে লেশমাত্র খাটো করে বলেন নি। বলেন নি যে প্রতিবেশীকে ভালোবাসো; বলেছেন, প্রতিবেশীকে আপনারই মতো ভালোবাসো। যিনি ব্রহ্মবিহার কামনা করেন তাঁকে এই ভালোবাসায় গিয়ে পৌঁছোতে হবে—এই পথেই তাঁকে চলা চাই।

ভগবান যিশু বলেছেন, শত্রুকেও প্রীতি করবে। শত্রুকে ক্ষমা করবে বলে ভয়ে ভয়ে মাঝপথে থেমে যান নি। শত্রুকে প্রীতি করবে বলে তিনি ব্রহ্মবিহার পর্যন্ত লক্ষ্যকে টেনে নিয়ে গিয়েছেন। বলেছেন, যে তোমার গায়ের জামা কেড়ে নেয় তাকে তোমার উত্তরীয় পর্যন্ত দান করো।

সংসারী লোকের পক্ষে এগুলি একেবারে অত্যুক্তি। তার কারণ, সংসারের চেয়ে বড়ো লক্ষ্যকে সে মনের সঙ্গে বিশ্বাস করে না। সংসারকে সে তার জামা ছেড়ে উত্তরীয় পর্যন্ত দিয়ে ফেলতে পারে যদি তাতে তার সাংসারিক প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। কিন্তু ব্রহ্মবিহারকে সে যদি প্রয়োজনের চেয়ে ছোটো বলে জানে তবে জামাটুকু দেওয়াও শক্ত হয়।

কিন্তু যাঁরা জীবের কাছে সেই ব্রহ্মকে সেই সকলের চেয়ে বড়োকেই ঘোষণা করতে এসেছেন তাঁরা তো সংসারী লোকের দুর্বল বাসনার মাপে ব্রহ্মকে অতি ছোটো করে দেখাতে চান নি। তাঁরা সকলের চেয়ে বড়ো কথাকেই অসংকোচে একেবারে শেষ পর্যন্ত বলেছেন।

এই বড়ো কথাকে এত বড়ো করে বলার দরুন তাঁরা আমাদের একটা মস্ত ভরসা দিয়েছেন। এর দ্বারা তাঁরা প্রকাশ করেছেন মনুষ্যত্বের গতি এতদূর পর্যন্তই যায়, তার প্রেম এত বড়োই প্রেম, তার ত্যাগ এত বড়োই ত্যাগ।

অতএব এই বড়ো লক্ষ্য এবং বড়ো পথে আমাদের হতাশ না করে আমাদের সাহস দেবে। নিজের অন্তরতর মাহাত্ম্যের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাকে বাড়িয়ে দেবে। আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে পূর্ণভাবে উদ্বোধিত করে তুলবে।

লক্ষ্যকে অসত্যের দ্বারা ছেঁটে ক্ষুদ্র করলে, উপায়কে দুর্বলতার দ্বারা বেড়া দিয়ে সংকীর্ণ করলে তাতে আমাদের ভরসাকে কমিয়ে দেয়—যা আমাদের পাবার তা পাই নে, যা পারবার তা পারি নে।

কিন্তু মহাপুরুষেরা আমাদের কাছে যখন মহৎ লক্ষ্য স্থাপিত করেছেন তখন তাঁরা আমাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। বুদ্ধ আমাদের কারও প্রতি অশ্রদ্ধা অনুভব করেন নি, যখন তিনি বলেছেন—মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং। যিশু আমাদের মধ্যে দীনতমের প্রতিও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নি যখন তিনি বলেছেন, তোমার পিতা যেমন সম্পূর্ণ তুমি তেমনি সম্পূর্ণ হও।

তাঁদের সেই শ্রদ্ধায় আমরা নিজের প্রতি শ্রদ্ধালাভ করি। তখন আমরা ভূমাকে পাবার এই দুরূহ পথকে অসাধ্য পথ বলি নে—তখন আমরা তাঁদের কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে তাঁদের মাভৈঃ বাণী অনুসরণ করে এই অপরিমাণের মহাযাত্রায় আনন্দের সঙ্গে যাত্রা করি। যিশুর বাণী অত্যুক্তি নয়। যদি শ্রেয় চাও তবে এই সম্পূর্ণসত্যের সম্পূর্ণতাই শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করো।

একবার ভিতরের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখো—প্রতি দিন কোন্‌খানে ঠেকছে। একজন মানুষের সঙ্গেও যখন মিলতে যাচ্ছি তখন কত জায়গায় বেধে যাচ্ছে। তার সঙ্গে মিল সম্পূর্ণ হচ্ছে না। অহংকারে ঠেকছে, স্বার্থে ঠেকছে, ক্রোধে ঠেকছে, লোভে ঠেকছে—অবিবেচনার দ্বারা আঘাত করছি, উদ্ধত হয়ে আঘাত পাচ্ছি। কোনোমতেই সেই নম্রতা মনের মধ্যে আনতে পারছি নে যার দ্বারা আত্মসমর্পণ অত্যন্ত সহজ এবং মধুর হয়। এই বাধা যখন স্পষ্ট রয়েছে দেখতে পাচ্ছি তখন আমার প্রকৃতিতে ব্রহ্মের সঙ্গে মিলনের বাধা যে অসংখ্য আছে তাতে কি আর সন্দেহ আছে? যাতে আমাকে একটি মানুষের সঙ্গেও সম্পূর্ণভাবে মিলতে দেবে না তাতেই যে ব্রহ্মের সঙ্গেও মিলনের বাধা স্থাপন করবে। যাতে প্রতিবেশী পর হবে তাতে তিনিও পর হবেন, যাতে শত্রুকে আঘাত করব তাতে তাঁকেও আঘাত করব। এইজন্য ব্রহ্মবিহারের কথা বলবার সময় সংসারের কোনো কথাকেই এতটুকু বাঁচিয়ে বলবার জো নেই। যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা কিছুই বাঁচিয়ে বলেন নি—হাতে রেখে কথা কন নি। তাঁরা বলছেন একেবারে নিঃশেষে মরে তবে তাঁতে বেঁচে উঠতে হবে। তাঁদের সেই পথ অবলম্বন করে প্রতিদিন অহংকারের দিকে স্বার্থের দিকে আমাদের নিঃশেষে মরতে হবে এবং মৈত্রীর দিকে

প্রেমের দিকে পরমাত্মার দিকে অপরিমাণরূপে বাঁচতে হবে। যাঁরা এই মহাপথে যাত্রা করবার জন্ত মানবকে নির্ভর দিয়েছেন একান্ত ভক্তির সঙ্গে প্রণাম করে তাঁদের শরণাপন্ন হই।

১২ চৈত্র

নীড়ের শিক্ষা

এই অপরিমাণ পথটি নিঃশেষ না করে পরমাত্মার কোনো উপলব্ধি নেই, এ-কথা বললে মানুষের চেষ্টা অসাড় হয়ে পড়ে। এতদিন তাহলে খোরাক কী? মানুষ বাঁচবে কী নিয়ে?

শিশু মাতৃভাষা শেখে কী করে? মায়ের মুখ থেকে শুনতে শুনতে খেলতে খেলতে আনন্দে শেখে।

যতটুকুই সে শেখে—ততটুকুই সে প্রয়োগ করতে থাকে। তখন তার কথাগুলি আধো-আধো, ব্যাকরণ-ভুলে পরিপূর্ণ। তখন সেই অসম্পূর্ণ ভাষায় সে যতটুকু ভাব ব্যক্ত করতে পারে তাও খুব সংকীর্ণ। কিন্তু তবু শিশুবয়সে ভাষা শেখবার এই একটি স্বাভাবিক উপায়।

শিশুর ভাষার এই অশুদ্ধতা এবং সংকীর্ণতা দেখে যদি শাসন করে দেওয়া যায় যে যতক্ষণ পর্যন্ত নিঃশেষে ব্যাকরণের সমস্ত নিয়মে না পাকা হতে পারবে ততক্ষণ ভাষায় শিশুর কোনো অধিকার থাকবে না, ততক্ষণ তাকে কথা শুনতে বা পড়তে দেওয়া হবে না, এবং সে কথা বলতেও পারবে না—তা হলে ভাষাশিক্ষা তার পক্ষে যে কেবল কষ্টকর হবে তা নয় তার পক্ষে অসাধ্য হয়ে উঠবে।

শিশু মুখে মুখে যে ভাষা গ্রহণ করছে, ব্যাকরণের ভিতর দিয়ে তাকেই আবার তাকে শিখে নিতে হবে, সেটাকে সর্বত্র পাকা করে নিতে হবে, কেবল সাধারণভাবে মোটামুটি কাজ চালাবার জন্যে নয়, তাকে গভীরতর, উচ্চতর, ব্যাপকতর ভাবে শোনা বলা ও লেখায় ব্যবহার করবার উপযোগী করতে হবে বলে রীতিমত চর্চার দ্বারা শিক্ষা করতে হবে। একদিকে পাওয়া আর-একদিকে শেখা। পাওয়াটা মুখের থেকে মুখে, প্রাণের থেকে প্রাণে, ভাবের থেকে ভাবে—আর শেখাটা নিয়মে, কর্মে; সেটা ক্রমে ক্রমে, পদে পদে। এই পাওয়া এবং শেখা দুটোই যদি পাশাপাশি না চলে, তাহলে হয় পাওয়াটা কাঁচা হয় নয় শেখাটা নীরস ব্যর্থ হতে থাকে।

বুদ্ধদেব কঠোর শিক্ষকের মতো দুর্বল মানুষকে বলেছিলেন এরা ভারি ভুল করে,

কাকে কী বোঝে, কাকে কী বলে তার কিছুই ঠিক নেই। তার একমাত্র কারণ এরা শেখবার পূর্বেই পাবার কথা তোলে। অতএব আগে এরা শিক্ষাটা সমাধা করুক তাহলে যথাসময়ে পাবার জিনিসটা এরা আপনিই পাবে—আগেভাগে চরম কথাটার কোনো উত্থাপনমাত্র এদের কাছে করা হবে না।

কিন্তু ওই চরম কথাটি কেবল যে গম্যস্থান তা তো নয়, ওটা যে পাথেয়ও বটে। ওটি কেবল স্থিতি দেবে তা নয় ও যে গতিও দেবে।

অতএব আমরা যতই ভুল করি যাই করি, কেবলমাত্র ব্যাকরণশিক্ষার কথা মানতে পারব না। কেবল পাঠশালায় শিক্ষকের কাছেই শিখব এ চলবে না, মায়ের কাছেও শিক্ষা পাব।

মায়ের কাছে যা পাই তার মধ্যে অনেক শক্ত নিয়ম অজ্ঞাতসারে আপনি অন্তঃসাৎ হয়ে থাকে, সেই সুযোগটুকু কি ছাড়া যায়?

পক্ষিশাবককে একদিন চরে খেতে হবে সন্দেহ নেই, একদিন তাকে নিজের ডানা বিস্তার করে উড়তে হবে। কিন্তু ইতিমধ্যে মার মুখ থেকে সে খাবার খায়। যদি তাকে বলি, যে পর্যন্ত না চরে খাবার শক্তি সম্পূর্ণ হবে সে পর্যন্ত খেতেই পাবে না তাহলে সে যে শুকিয়ে মরে যাবে।

আমরা যতদিন অশক্ত আছি ততদিন যেমন অল্প অল্প করে শক্তির চর্চা করব তেমনি প্রতিদিন ঈশ্বরের প্রসাদের জন্যে ক্ষুধিত চঞ্চুপুট মেলতে হবে; তাঁর কাছ থেকে সহজ কৃপার দৈনিক খাদ্যটুকু পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে কলরব করতে হবে। এ ছাড়া উপায় দেখি নে।

এখন তো অনন্তে ওড়বার ডানা পাকা হয় নি, এখন তো নীড়েই পড়ে আছি। ছোটোখাটো কুটোকাটা দিয়ে যে সামান্য বাসা তৈরি হয়েছে এই আমার আশ্রম। এই আশ্রমের মধ্যে বদ্ধ থেকেই অনন্ত আকাশ হতে আহরিত খাদ্যের প্রত্যাশা যদি আমাদের একেবারেই ছেড়ে দিতে হয় তাহলে আমাদের কী দশা হবে?

তুমি বলতে পার ওই খাদ্যের দিকেই যদি তুমি তাকিয়ে থাক তাহলে চিরদিন নিশ্চেষ্ট হয়েই থাকবে, নিজের শক্তির পরিচয় পাবে না।

সে-শক্তিকে যে একেবারে চালনা করব না সে কথা বলি নে। ওড়বার প্রয়াসে দুর্বল পাখা আন্দোলন করে তাকে শক্ত করে তুলতে হবে। কিন্তু কৃপার খাদ্যটুকু প্রেমের পুষ্টিটুকু প্রতিদিনই সঙ্গে সঙ্গে চাই।

সেটি যদি নিয়মিত লাভ করি তাহলে যখনই পুরোপুরি বল পাব তখন নীড়ে ধরে রাখে এমন সাধ্য কার? দ্বিজ-শাবকের স্বাভাবিক ধর্মই যে অনন্ত আকাশে ওড়া।

তখন নিজের প্রকৃতির গরজেই, সে সংসারনীড়ে বাস করবে বটে কিন্তু অনন্ত আকাশে বিহার করবে।

এখন সে অক্ষম ডানাটি নিয়ে বাসায় পড়ে পড়ে কল্পনাও করতে পারে না যে আকাশে ওড়া সম্ভব। তার যে শক্তিটুকু আছে সেইটুকুকে অনেক পরিমাণে বাড়িয়ে দেখলেও সে কেবল ডালে ডালে লাফাবার কথাই মনে করতে পারে। সে যখন তার কোনো প্রবীণ সহোদরের কাছে আকাশে উধাও হবার কথা শোনে তখন সে মনে করে দাদা একটি অত্যুক্তি প্রয়োগ করছেন—যা বলছেন তার ঠিক মানে কখনোই এ নয় যে সত্যিই আকাশে ওড়া। ওই যে লাফাতে গেলে মাটির সংস্রব ছেড়ে যেটুকু নিরাধার উর্ধ্বে উঠতে হয় সেই ওঠাটুকুকেই তাঁরা আকাশে ওড়া বলে প্রকাশ করছেন—ওটা কবিত্বমাত্র, ওর মানে কখনোই এতটা হতে পারে না।

বস্তুত এই সংসারনীড়ের মধ্যে আমরা যে অবস্থায় আছি তাতে বুদ্ধদেব যাকে ব্রহ্মবিহার বলেছেন ভগবান যিশু যাকে সম্পূর্ণতালাভ বলেছেন, তাকে কোনোমতেই সম্পূর্ণ সত্য বলে মনে করতে পারি নে।

কিন্তু এ-সব আশ্চর্য কথা তাঁদেরই কথা যাঁরা জেনেছেন যাঁরা পেয়েছেন। সেই আশ্বাসের আনন্দ যেন একান্ত ভক্তিভরে গ্রহণ করি। আমাদের আত্মা দ্বিজশাবক, সে আকাশে ওড়বার জন্যেই প্রস্তুত হচ্ছে সেই বার্তা যাঁরা দিয়েছেন তাঁদের প্রতি যেন শ্রদ্ধা রক্ষা করি, তাঁদের বাণীকে আমরা যেন খর্ব করে তার প্রাণশক্তিকে নষ্ট করবার চেষ্টা না করি। প্রতিদিন ঈশ্বরের কাছে যখন তাঁর প্রসাদসুধা চাইব সেই সঙ্গে এই কথাও বলব আমার ডানাকেও তুমি সক্ষম করে তোলো। আমি কেবল আনন্দ চাই নে শিক্ষা চাই, ভাব চাই নে কর্ম চাই।

১৩ চৈত্র

ভূমা

বুদ্ধকে যখন মানুষ জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় থেকে এই সমস্ত হয়েছে, আমরা কোথা থেকে এসেছি, আমরা কোথায় যাব; তখন তিনি বললেন, তোমার ও সব কথায় কাজ কী? আপাতত তোমার যেটা অত্যন্ত দরকার সেইটেতে তুমি মন দাও। তুমি বড়ো দুঃখে পড়েছ, তুমি যা চাও তা পাও না, যা পাও তা রাখতে পার না, যা রাখ তাতে তোমার আশা মেটে না। এই নিয়ে তোমার দুঃখের অবধি নেই। সেইটে মেটাবার

উপায় করে তবে অন্য কথা। এই বলে দুঃখনিবৃত্তিকেই তিনি পরম লক্ষ্য বলে তার থেকে মুক্তির পথে আমাদের ডাক দিলেন।

কিন্তু কথা এই যে, একান্ত দুঃখনিবৃত্তিকেই তো মানুষ পরম লক্ষ্য বলে ধরে নিতে পারে না। সে যে তার স্বভাবই নয়। আমি যে স্পষ্ট দেখছি দুঃখকে অঙ্গীকার করে নিতে সে আপত্তি করে না। অনেক সময় গায়ে পড়ে সে দুঃখকে বরণ করে নেয়।

আল্‌প্‌স্‌ পর্বতের দুর্গম শিখরের উপর একবার কেবল পদার্পণ করে আসবার জন্যে প্রাণপণ করা তার পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, কিন্তু বিনা কারণে মানুষ সেই দুঃখ স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়। এমন দৃষ্টান্ত ঢের আছে।

তার কারণ কী? তার কারণ এই যে, দুঃখের সম্বন্ধে মানুষের একটা স্পর্ধা আছে। আমি দুঃখ সইতে পারি। আমার মধ্যে সেই শক্তি আছে এ-কথা মানুষ নিজেকে এবং অন্যকে জানাতে চায়।

আসল কথা, মানুষের সকলের চেয়ে সত্য ইচ্ছা হচ্ছে বড়ো হবার ইচ্ছা, সুখী হবার ইচ্ছা নয়। আলেকজাণ্ডারের হঠাৎ ইচ্ছা হল দুর্গম নদীগিরি মরু সমুদ্র পার হয়ে দিগ্বিজয় করে আসবেন। রাজসিংহাসনের আরাম ছেড়ে এমন দুঃসহ দুঃখের ভিতর দিয়ে তাঁকে পথে পথে ঘোরায় কে? ঠিক রাজ্যলোভ নয়, বড়ো হবার ইচ্ছা। বড়ো হওয়ার দ্বারা নিজের শক্তিকে বড়ো করে উপলব্ধি করা। এই অভিপ্রায়ে মানুষ কোনো দুঃখ থেকে নিজেকে বাঁচাতে চায় না।

যে-লোক লক্ষপতি হবে বলে দিন রাত টাকা জমাচ্ছে—বিশ্রামের সুখ নেই, খাবার সুখ নেই, রাত্রে ঘুম নেই, লাভক্ষতির নিরন্তর আন্দোলনে মনে চিন্তার সীমা নেই—সে কীজন্যে এই অসহ্য কষ্ট স্বীকার করে নিয়েছে? ধনের পথে যতদূর সম্ভব বড়ো হয়ে ওঠবার জন্যে।

তাকে এ-কথা বলা মিথ্যা যে তোমাকে দুঃখনিবারণের পথ বলে দিচ্ছি। তাকে এ-কথাও বলা মিথ্যা যে ভোগের বাসনা ত্যাগ করো, আরামের আকাঙ্ক্ষা মনে রেখো না। ভোগ এবং আরাম সে যেমন ত্যাগ করেছে এমন আর কে করতে পারে।

বুদ্ধদেব যে দুঃখ-নিবৃত্তির পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, সে-পথের একটা সকলের চেয়ে বড়ো আকর্ষণ কী? সে এই যে, অত্যন্ত দুঃখ স্বীকার করে এই পথে অগ্রসর হতে হয়। এই দুঃখস্বীকারের দ্বারা মানুষ আপনাকে বড়ো করে জানে। খুব বড়োরকম করে ত্যাগ, খুব বড়োরকম করে ব্রতপালনের মাহাত্ম্য মানুষের শক্তিকে বড়ো করে দেখায় বলে মানুষের মন তাতে ধাবিত হয়।

এই পথে অগ্রসর হয়ে যদি সত্যিই এমন কোনো একটা জায়গায় মানুষ ঠেকতে পারত যেখানে একান্ত দুঃখনিবৃত্তির শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নেই তাহলে ব্যাকুল হয়ে তাকে জগতে দুঃখের সন্ধানে বেরোতে হত।

অতএব মানুষকে যখন বলি দুঃখনিবৃত্তির উদ্দেশে তোমাকে সমস্ত সুখের বাসনা ত্যাগ করতে হবে তখন সে রাগ করে বলতে পারে, চাই নে আমি দুঃখনিবৃত্তি। ওর চেয়ে বড়ো কিছু একটাকে দিতে হবে কারণ মানুষ বড়োকেই চায়।

সেইজন্যে উপনিষৎ বলেছেন ভূমৈব সুখং। অর্থাৎ সুখ সুখই নয় বড়োই সুখ। ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ—এই বড়োকেই জানতে হবে এঁকেই পেতে হবে। এই কথাটির তাৎপর্য যদি ঠিকমতো বুঝি তাহলে কখনোই বলি নে যে, চাই নে তোমার বড়োকে।

কেননা, টাকায় বল, বিদ্যাতে বল, খ্যাতিতে বল, কোনো-না-কোনো বিষয়ে আমরা সুখকে ত্যাগ করে বড়োকেই চাচ্ছি। অথচ যাকে বড়ো বলে চাচ্ছি সে এমন বড়ো নয় যাকে পেয়ে আমার আত্মা বলতে পারে আমার সব পাওয়া হল।

অতএব যিনি ব্রহ্ম যিনি ভূমা যিনি সকলের বড়ো তাঁকেই মানুষের সামনে লক্ষ্যরূপে স্থাপন করলে মানুষের মন তাতে সায় দিতে পারে, দুঃখনিবৃত্তিকে নয়।

কেউ কেউ এ কথা বলতে পারেন তাঁকে উদ্দেশ্যরূপে স্থাপন করলেই কী আর না করলেই কী। এই সিদ্ধি এতই দূরে যে এখন থেকে এ সম্বন্ধে চিন্তা না করলেও চলে। আগে বাসনা দূর করো, শুচি হও; সবল হও— আগে কঠোর সাধনার সুদীর্ঘ পথ নিঃশেষে উত্তীর্ণ হও তার পরে তাঁর কথা হবে।

যিনি উদ্দেশ্য তাঁকে যদি গোড়া থেকেই সাধনার পথে কিছু-না-কিছু পাই তাহলে এই দীর্ঘ অরাজকতার অবকাশে সাধনাটাই সিদ্ধির স্থান অধিকার করে, শুচিতাটাই প্রাপ্তি বলে মনে হয়, অনুষ্ঠানটিই দেবতা হয়ে ওঠে; পদে পদে সকল বিষয়েই মানুষের এই বিপদ দেখা গেছে। অহরহ ব্যাকরণ পড়তে পড়তে মানুষ কেবলই বৈয়াকরণ হয়ে ওঠে, ব্যাকরণ যে সাহিত্যের সোপান সেই সাহিত্যে সে প্রবেশই করে না।

দুধে তেঁতুল দিয়ে সেই দুধকে দধি করবার চেষ্টা করলে হয়তো বহু চেষ্টাতেও সে দুধ না জমে উঠতে পারে, কিন্তু যে দইয়ে তার পরিণতি সেই দই গোড়াতেই যোগ করে দিলে দেখতে দেখতে দুধ সহজেই দই হয়ে উঠতে থাকে। তেমনি যেটা আমাদের পরিণামে, সেটাকে গোড়াতেই যোগ করে দিলে স্বভাবের সহজ নিয়মে পরিণাম সুসিদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে।

আমরা যাঁকে সাধনার দ্বারা চাই, গোড়াতেই তাঁর হাতে আমাদের হাত সমর্পণ

করে দিতে হবে, তিনিই আমাদের হাতে ধরে তাঁরই দিকে নিয়ে চলবেন। তাহলে চলাও আনন্দ, পৌঁছনোও আনন্দ হয়ে উঠবে। তাহলে, অভাব থেকে ভাব হয় না, অসৎ থেকে সৎ হয় না, একেবারে না পাওয়া থেকে পাওয়া হয় না—এই উপদেশটাকে মেনে চলা হবে। যিনিই আনন্দরূপে আমাদের কাছে চিরদিন ধরা দেবেন, তিনিই কৃপারূপে আমাদের প্রতিদিন ধরে নিয়ে যাবেন।

১৪ চৈত্র

৮

ওঁ

ওঁ শব্দের অর্থ, হাঁ। আছে এবং পাওয়া গেল এই কথাটাকে স্বীকার। কাল আমরা ছান্দোগ্য উপনিষৎ আলোচনা করতে করতে ওঁ শব্দের এই তাৎপর্যের আভাস পেয়েছি।

যেখানে আমাদের আত্মা "হাঁ"কে পায় সেইখানেই সে বলে ওঁ।

দেবতারা এই হাঁকে যখন খুঁজতে বেরিয়েছিলেন তখন তাঁরা কোথায় খুঁজে শেষে কোথায় পেলেন? প্রথমে তাঁরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারে দ্বারে আঘাত করলেন। বললেন চোখে দেখার মধ্যে এই হাঁকে পাওয়া যাবে। কিন্তু দেখলেন চোখে দেখার মধ্যে সম্পূর্ণতা নেই—তা হাঁ এবং নায়ে খণ্ডিত। তার মধ্যে পরিপূর্ণ বিশুদ্ধতা নেই—তা ভালোও দেখে মন্দও দেখে, খানিকটা দেখে খানিকটা দেখে না; সে দেখে কিন্তু শোনে না।

এমনি করে কান নাক বাক্য মন সর্বত্রই সন্ধান করে দেখলেন, সর্বত্রই খণ্ডতা আছে সর্বত্রই দ্বন্দ্ব আছে।

অবশেষে প্রাণের প্রাণে গিয়ে যখন পৌছোলেন তখন এই শরীরের মধ্যে একটা হাঁ পেলেন। কারণ এই প্রাণই শরীরের সব প্রাণকে অধিকার করে আছে। এই প্রাণের মধ্যেই সকল ইন্দ্রিয়ের সকল শক্তির ঐক্য। এই মহাপ্রাণ যতক্ষণ আছে ততক্ষণই চোখও দেখছে কানও শুনছে নাসিকাও ঘ্রাণ করছে। এর মধ্যে যে কেবল একটা "হাঁ" এবং অন্যটা "না" হয়ে আছে তা নয়, এর মধ্যে দৃষ্টি শ্রুতি আঘ্রাণ সকলগুলিই এক জায়গায় হাঁ হয়ে আছে। অতএব শরীরের মধ্যে এইখানেই আমরা পেলুম ওঁ। বাস, অঞ্জলি ভরে উঠল।

ছান্দোগ্য বলছেন মিথুনের মাঝখানে অর্থাৎ দুই যেখানে মিলেছে সেইখানেই এই ওঁ। যেখানে একদিকে ঋক্ একদিকে সাম, একদিকে বাক্য একদিকে সুর, একদিকে সত্য একদিকে প্রাণ ঐক্য লাভ করেছে সেইখানেই এই পরিপূর্ণতার সংগীত ওঁ।

যাঁর মধ্যে কিছুই বাদ পড়ে নি, যাঁর মধ্যে সমস্ত খণ্ডই অখণ্ড হয়েছে, সমস্ত বিরোধ মিলিত হয়েছে আমাদের আত্মা তাঁকেই অঞ্জলি জোড় করে হাঁ বলে স্বীকার করে নিতে চায়। তার পূর্বে সে নিজের পরম পরিতৃপ্তি স্বীকার করতে পারে না; তাকে ঠেকতে হয়, তাকে ঠকতে হয়, মনে করে ইন্দ্রিয়েই হাঁ, ধনেই হাঁ, মানেই হাঁ।

শেষকালে দেখে, এর সব তাতেই পাপ আছে, দ্বন্দ্ব আছে, "না" তার সঙ্গে মিশিয়ে আছে।

সকল দ্বন্দ্বের সমাধানের মধ্যে উপনিষৎ সেই পরম পরিপূর্ণকে দেখেছেন বলেই সত্যের একদিকেই সমস্ত ঝোঁকটা দিয়ে তার অন্য দিকটাকে একেবারে নির্মূল করে দিতে চেষ্টা করেন নি। সেইজন্যে তিনি যেমন বলেছেন

এতজ্‌ জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং
নাতঃপরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।

অর্থাৎ

আত্মাতেই যিনি নিত্য স্থিতি করছেন তিনিই জানবার যোগ্য, তাঁর পর জানবার যোগ্য আর কিছুই নেই।

তেমনি আবার বলেছেন,—

তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি।

অর্থাৎ—

সেই ধীরেরা যুক্তাত্মা হয়ে সর্বব্যাপীকে সকল দিক হতেই লাভ করে সর্বত্রই প্রবেশ করেন।

আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি—নয়, কেবল আত্মার মধ্যেই আত্মাকে দেখা নয়, সেই দেখাই আবার সর্বত্রেই।

আমাদের ধ্যানের মন্ত্রে এক সীমায় রয়েছে ভূর্ভুবঃস্বঃ, অন্য সীমায় রয়েছে আমাদের ধী আমাদের চেতনা। মাঝখানে এই দুইকেই এক বেঁধে সেই বরণীয় দেবতা আছেন যিনি একদিকে ভূর্ভুবঃস্বঃকেও সৃষ্টি করছেন আর-এক দিকে আমাদের ধীশক্তিকেও প্রেরণ করছেন। কোনোটাকেই বাদ দিয়ে তিনি নেই। এইজন্যই তিনি ওঁ।

এইজন্যেই উপনিষৎ বলেছেন যারা অবিদ্যাকেই সংসারকেই একমাত্র করে জানে তারা অন্ধকারে পড়ে, আবার যারা বিদ্যাকে ব্রহ্মজ্ঞানকে ঐকান্তিক করে বিচ্ছিন্ন করে জানে তারা গভীরতর অন্ধকারে পড়ে। একদিকে বিদ্যা আর একদিকে অবিদ্যা, এক দিকে ব্রহ্মজ্ঞান এবং আর-একদিকে সংসার। এই দুইয়ের যেখানে সমাধান হয়েছে সেই-খানেই আমাদের আত্মার স্থিতি।

দূরের দ্বারা নিকট বর্জিত নিকটের দ্বারা দূর বর্জিত, চলার দ্বারা থামা বর্জিত থামার দ্বারা চলা বর্জিত, অন্তরের দ্বারা বাহির বর্জিত বাহিরের দ্বারা অন্তর বর্জিত। কিন্তু

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যা

তিনি চলেন অথচ চলেন না, তিনি দূরে অথচ নিকটে, তিনি সকলের অন্তরে অথচ তিনি সকলের বাহিরেও।

অর্থাৎ চলা না-চলা, দূর নিকট, ভিতর বাহির সমস্তর মাঝখানে সমস্তকে নিয়ে তিনি, কাউকে ছেড়ে তিনি নন। এইজন্য তিনি ওঁ।

তিনি প্রকাশ ও অপ্রকাশের মাঝখানে। একদিকে সমস্তই তিনি প্রকাশ করছেন আর-একদিকে কেউ তাঁকে প্রকাশ করে উঠতে পারছে না। তাই উপনিষদ বলেন—

ন তত্র সূর্যোভাতি ন চন্দ্রতারকা
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।

সেখানে সূর্য আলো দেয় না, চন্দ্র তারাও না, এই বিদ্যুৎসকলও দীপ্তি দেয় না, কোথায় বা আছে এই অগ্নি—তিনি প্রকাশিত তাই সমস্ত প্রকাশমান, তাঁর আভাতেই সমস্ত বিভাত।

তিনি শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্। শান্তম্ বলতে এ বোঝায় না সেখানে গতির সংস্রব নেই। সকল বিরুদ্ধ গতিই সেখানে শান্তিতে ঐক্যলাভ করেছে। কেন্দ্রাতিগ এবং কেন্দ্রানুগ গতি, আকর্ষণের গতি এবং বিকর্ষণের গতি পরস্পরকে কাটতে চায় কিন্তু এই দুই বিরুদ্ধ গতিই তাঁর মধ্যে অবিরুদ্ধ বলেই তিনি শান্তম্। আমার স্বার্থ তোমার স্বার্থকে মানতে চায় না, তোমার স্বার্থ আমার স্বার্থকে মানতে চায় না, কিন্তু মাঝখানে যেখানে মঙ্গল সেখানে তোমার স্বার্থই আমার স্বার্থ এবং আমার স্বার্থই তোমার স্বার্থ। তিনি শিব, তাঁর মধ্যে সকলেরই স্বার্থ মঙ্গলে নিহিত রয়েছে। তিনি অদ্বিতীয় তিনি এক। তার মানে এ নয় যে, তবে এ সমস্ত কিছুই নেই। তার মানে, এই সমস্তই তাঁতে এক। আমি বলছি, আমি তুমি নয়, তুমি বলছ তুমি আমি নয়, এমন বিরুদ্ধ আমাকে-তোমাকে এক করে রয়েছেন সেই অদ্বৈতম্।

মিথুন যেখানে মিলেছে সেইখানেই হচ্ছেন তিনি—কেউ যেখানে বর্জিত হয় নি সেইখানেই তিনি। এই যে পরিপূর্ণতা যা সমস্তকে নিয়ে অথচ যা কোনো খণ্ডকে আশ্রয় করে নয়, যা চন্দ্রে নয় সূর্যে নয় মানুষে নয় অথচ সমস্ত চন্দ্র সূর্য মানুষে, যা কানে নয় চোখে নয় বাক্যে নয় মনে নয় অথচ সমস্ত কানে চোখে বাক্যে মনে, সেই এককেই, সেই হাঁকেই, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে সেই পরিপূর্ণতাকেই স্বীকার হচ্ছে ওংকার।

১৫ চৈত্র

স্বভাবলাভ

মানুষের এক দিন ছিল যখন, সে যেখানে কিছু অদ্ভুত দেখত সেইখানে ঈশ্বরের কল্পনা করত। যদি দেখলে কোথাও জলের থেকে আগুন উঠছে অমনি সেখানে পূজার আয়োজন করত। তখন সে কোনো একটা অসামান্য লক্ষণ দেখে বা কল্পনা করে বলত, অমুক মানুষে দেবতা ভর করেছেন, অমুক গাছে দেবতার আবির্ভাব হয়েছে, অমুক মূর্তিতে দেবতা জাগ্রত হয়ে আছেন।

ক্রমে অখণ্ড বিশ্বনিয়মকে চরাচরে যখন সর্বত্র এক বলে দেখবার শিক্ষা মানুষের হল তখন সে জানতে পারল যে, যাকে অসামান্য বলে মনে হয়েছিল সেও সামান্য নিয়ম হতে ভ্রষ্ট নয়। তখনই ব্রহ্মের আবির্ভাবকে অখণ্ডভাবে সর্বত্র ব্যাপ্ত করে দেখবার অধিকার সে লাভ করল। এবং সেই বিরাট অবিচ্ছিন্ন ঐক্যের ধারণায় সে আনন্দ ও আশ্রয় পেল। তখনই মানুষের জ্ঞান প্রেম কর্ম মোহমুক্ত হয়ে প্রশস্ত এবং প্রসন্ন হয়ে উঠল। তার ধর্ম থেকে সমাজ থেকে রাজ্য থেকে মূঢ়তা ক্ষুদ্রতা দূর হতে লাগল।

এই দেখা হচ্ছে ব্রহ্মকে সর্বত্র দেখা, স্বভাবে দেখা।

কিন্তু সমস্ত স্বভাব থেকে চুরি করে এনে তাঁকে স্বেচ্ছাপূর্বক কোনো একটা কৃত্রিমতার মধ্যে বিশেষ করে দেখবার চেষ্টা এখনও মানুষের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। এমন কি কেউ কেউ স্পর্ধা করে বলেন সেইরকম করে দেখাই হচ্ছে প্রকৃষ্ট দেখা। সব রূপ হতে ছাড়িয়ে একটি কোনো বিশেষরূপে, সব মানুষ হতে সরিয়ে একটি কোনো বিশেষ মানুষে ঈশ্বরকে পূজা করাই তাঁরা বলেন পূজার চরম।

জানি, মানুষ এরকম কৃত্রিম উপায়ে কোনো একটা হৃদয়বৃত্তিকে অতিপরিমাণে বিক্ষুব্ধ করে তুলতে পারে, কোনো একটা রসকে অত্যন্ত তীব্র করে দাঁড় করাতে পারে। কিন্তু সেইটে করাই কি সাধনার লক্ষ্য ?

অনেক সময় দেখা যায় অন্ধ হলে স্পর্শশক্তি অতিরিক্ত বেড়ে যায়। কিন্তু সেইরকম একদিকের চুরির দ্বারা অন্যদিককে উপচিয়ে তোলাকেই কি বলে শক্তির সার্থকতা ? যেদিকটা নষ্ট হল সেদিকটার হিসাব কি দেখতে হবে না ? সেদিকের দণ্ড হতে কি আমরা নিষ্কৃতি পাব ?

কোনোপ্রকার বাহ্য ও সংকীর্ণ উপায়ের দ্বারা সম্মোহনকে মেসমেরিজ্‌মকে ধর্ম-সাধনার প্রধান অঙ্গ করে তুললে আমাদের চিত্ত স্বাস্থ্য থেকে স্বভাব থেকে সুতরাং

মঙ্গল থেকে বিচ্যুত হবেই হবে। আমরা ওজন হারাব—আমরা যেদিকটাতে এইরকম অসংগত ঝোঁক দেব সেইদিকটাকেই বিপর্যস্ত করে দেব।

বস্তুত স্বভাবের পরিপূর্ণতাকে লাভ করাই ধর্ম ও ধর্মনীতির শ্রেষ্ঠ লাভ। মানুষ নানা কারণে তার স্বভাবের ওজন রাখতে পারে না, সে সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলে—এই তো তার পাপের মূল এবং ধর্মনীতি তো এইজন্যই তাকে সংযমে প্রবৃত্ত করে।

এই সংযমের কাজটা কী? প্রবৃত্তিকে উন্মূল করা নয় প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করা। কোনো একটা প্রবৃত্তি যখন বিশেষরূপ প্রশ্রয় পেয়ে স্বভাবের সামঞ্জস্যকে পীড়িত করে তখনই পাপের উৎপত্তি হয়। অর্জনস্পৃহা যখন অত্যন্ত উগ্র হয়ে উঠে টাকা অর্জনের দিকেই মানুষের শক্তিকে একান্ত বাঁধতে চায় তখনই সেটা লোভ হয়ে দাঁড়ায়। তখনই সে মানুষের চিত্তকে তার সমস্ত স্বাভাবিক দিক থেকে চুরি করে এই দিকেই জড়ো করে। এই প্রকারে স্বভাব থেকে যে-ব্যক্তি ভ্রষ্ট হয় সে কখনোই যথার্থ মঙ্গলকে পায় না সুতরাং ঈশ্বরকে লাভ তার পক্ষে অসাধ্য। কোনো মানুষের প্রতি অনুরাগ যখন স্বভাব থেকে আমাদের বিচ্যুত করে তখনই তা কাম হয়ে ওঠে। সেই কাম আমাদের ঈশ্বরলাভের বাধা।

এইজন্য সামঞ্জস্য থেকে বিকৃতি থেকে মানুষের চিত্তকে স্বভাবে উদ্ধার করাই হচ্ছে ধর্মনীতির একান্ত চেষ্টা।

উপনিষদে ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলবার সময় যখন তাঁকে অপাপবিদ্ধ বলা হয়েছে তখন তার তাৎপর্য এই। তিনি স্বভাবে অবাধে পরিব্যাপ্ত। পাপ তাঁকে কোনো একটা বিশেষ সংকীর্ণতায় আকৃষ্ট আবদ্ধ করে অন্যত্র থেকে পরিহরণ করে নেয় না—এই গুণেই তিনি সর্বব্যাপী। আমাদের মধ্যে পাপ সমগ্রের ক্ষতি করে কোনো একটাকেই স্ফীত করতে থাকে। তাতে করে কেবল যে নিজের স্বভাবের মধ্যে নিজের সামঞ্জস্য থাকে না তা নয়, চারিদিকের সঙ্গে সমাজের সঙ্গে আমাদের সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে যায়।

ধর্মনীতিতে আমরা এই যে স্বভাবলাভের সাধনায় প্রবৃত্ত আছি, সমাজ এবং নীতি-শাস্ত্র এজন্যে দিনরাত তাড়না করছে। এইখানেই কি এর শেষ? ঈশ্বরসাধনাতেও কি এই নিয়মের স্থান নেই? সেখানেও কি আমরা কোনো একটি ভাবকে কোনো একটি রসকে সংকীর্ণ অবলম্বনের দ্বারা অতিমাত্র আন্দোলিত করে তোলাকেই মানুষের একটি চরম লাভ বলে গণ্য করব?

দুর্বলের মনে একটা উত্তেজনা জাগিয়ে তার হৃদয়কে প্রবুদ্ধ করবার জন্যে এই সকল উপায়ের প্রয়োজন এমন কথা অনেকে বলেন।

যে লোক মদ খেয়ে আনন্দ পায় তার সম্বন্ধে কি আমরা ওইরূপ তর্ক করতে পারি?

আমরা কি বলতে পারি মদেই যখন ও বিশেষ আনন্দ পায় তখন ওইটেই ওর পক্ষে শ্রেয়।

আমরা বরং এই কথাই বলি যে যাতে স্বাভাবিক সুখেই মাতালের অনুরাগ জন্মে সেই চেষ্টাই উচিত। যাতে বই পড়তে ভালো লাগে, যাতে লোকজনের সঙ্গে সহজে মিশে ওর সুখ হয়, যাতে প্রাত্যহিক কাজকর্মে ওর মন সহজে নিবিষ্ট হয় সেই পথই অবলম্বন করা কর্তব্য। যাতে একমাত্র মদের সংকীর্ণ উত্তেজনায় ওর চিত্ত আসক্ত না থেকে জীবনের বৃহৎ স্বভাবক্ষেত্রে সহজভাবে ব্যাপ্ত হয় সেইটে করাই মঙ্গল।

ভগবানের ধারণাকে একটা সংকীর্ণতার মধ্যে বেঁধে ভক্তির উত্তেজনাকে উগ্র নেশার মতো করে তোলাই যে মনুষ্যত্বের সার্থকতা এ-কথা বলা চলে না। ভগবানকেও তাঁর স্বভাবে পাবার সাধনা করতে হবে তাহলেই সেটা সত্য সাধনা হবে—তাঁকে আমাদের নিজের কোনো বিকৃতির উপযোগী করে নিয়ে তাঁকে নিয়ে মাতামাতি করাকেই আমরা মঙ্গল বলতে পারব না। তার মধ্যে একটা কোথাও সত্য চুরি আছে। তার মধ্যে এমন একটা অসামঞ্জস্য আছে যে, যে-ক্ষেত্রে তার আবির্ভাব সেখানে মোহকে আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না। যিনি শক্ত লোক তিনি মদ সহ্য করতে পারেন তাঁর পক্ষে একরকম চলে যায় কিন্তু তাঁর দলে এসে যারা জমে তাদের আর কিছুই ঠিক-ঠিকানা থাকে না; তাদের আলাপ ক্রমেই প্রলাপ হয়ে ওঠে এবং উত্তেজনা উন্মাদনার পথে অপঘাত মৃত্যু লাভ করে।

১৬ চৈত্র

অখণ্ড পাওয়া

ব্রহ্মকে পেতে হবে। কিন্তু পাওয়া কাকে বলে?

সংসারে আমরা অশন বসন জিনিস পত্র প্রতিদিন কত কী পেয়ে এসেছি। পেতে হবে বললে মনে হয় তবে তেমনি করেই পেতে হবে। তেমনি করে না পেলে মনে করি তবে তো পাচ্ছি নে। তখন ব্যস্ত হয়ে ভগবানকে পাওয়াও যাতে আমাদের অন্যান্য পাওয়ার শামিল হয় সেই চেষ্টা করতে চাই। অর্থাৎ আমাদের আসবাবপত্রের যে ফর্দটা আছে, যাতে ধরা আছে আমার ঘোড়া আছে গাড়ি আছে আমার ঘটি আছে বাটি আছে তার মধ্যে ওটাও ধরে দিতে হবে আমার একটি ভগবান আছে।

কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখার দরকার এই যে ঈশ্বরকে পাবার জন্যে আমাদের আত্মার যে একটি গভীর আকাঙ্ক্ষা আছে সেই আকাঙ্ক্ষার প্রকৃতি কী? সে কি অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে আরও একটা বড়ো জিনিসকে যোগ করবার আকাঙ্ক্ষা?

তা কখনোই নয়। কেননা যোগ করে করে জড়ো করে আমরা যে গেলুম। তেমনি করে সামগ্রীগুলোকে নিয়তই জোড়া দেবার নিরন্তর কষ্ট থেকে বাঁচাবার জন্যেই কি আমরা ঈশ্বরকে চাই নে? তাঁকেও কি আবার একটা তৃতীয় সামগ্রী করে আমাদের বিষয় সম্পত্তির সঙ্গে জোড়া দিয়ে বসব? আরও জঞ্জাল বাড়াব?

কিন্তু আমাদের আত্মা যে ব্রহ্মকে চায় তার মানেই হচ্ছে, সে বহুর দ্বারা পীড়িত এইজন্য সে এককে চায়, সে চঞ্চলের দ্বারা বিক্ষিপ্ত এইজন্য সে ধ্রুবকে চায়, নূতন কিছুকে বিশেষ কিছুকে চায় না। যিনি নিত্যোঽনিত্যানাং, সমস্ত অনিত্যের মধ্যে নিত্য হয়েই আছেন সেই নিত্যকে উপলব্ধি করতে চায়। যিনি রসানাং রসতমঃ, সমস্ত রসের মধ্যেই যিনি রসতম, তাঁকেই চায়; আর-একটা কোনো নূতন রসকে চায় না।

সেইজন্যে আমাদের প্রতি এই সাধনার উপদেশ যে, ঈশাবাস্য মিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, জগতে যা কিছু আছে তারই সমস্তকে ঈশ্বরের দ্বারাই আবৃত করে দেখবে। আর-একটা কোনো অতিরিক্ত দেখবার জিনিস সন্ধান বা নির্মাণ করবে না। এই হলেই আত্মা আশ্রয় পাবে আনন্দ পাবে।

এমনি করে তো নিখিলের মধ্যে তাঁকে জানবে। আর ভোগ করবে কী? না, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, তিনি যা দান করছেন তাই ভোগ করবে। মাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং, আর কারও ধনে লোভ করবে না।

এর মানে হচ্ছে এই যে, যেমন জগতে যা কিছু আছে তার সমস্তই তিনি পরিপূর্ণ করে আছেন এইটেই উপলব্ধি করতে হবে তেমনি তুমি যা কিছু পেয়েছ সমস্তই তিনি দিয়েছেন বলে জানতে হবে। তা হলেই কী হবে? না, তুমি যা কিছু পেয়েছ তার মধ্যেই তোমার পাওয়া তৃপ্ত হবে। আরও কিছু যোগ করে দাও এটা আমাদের প্রার্থনার বিষয় নয়—কারণ সে রকম দিয়ে দেওয়ার শেষ কোথায়? কিন্তু আমি যা-কিছু পেয়েছি সমস্তই তিনি দিয়েছেন এইটেই যেন উপলব্ধি করতে পারি। তাহলেই অল্পই হবে বহু, তাহলেই সীমার মধ্যে অসীমকে পাব। নইলে সীমাকেই ক্রমাগত জুড়ে জুড়ে বড়ো করে কখনোই অসীমকে পাওয়া যায় না—এবং কোটির পরে কোটিকে উপাসনা করেও সেই একের উপাসনায় গিয়ে পৌঁছোনো যেতে পারে না। জগতের সমস্ত খণ্ড প্রকাশ সার্থকতা লাভ করেছে তাঁর অখণ্ড প্রকাশে এবং আমাদের অসংখ্য ভোগের বস্তু সার্থকতা লাভ করেছে তাঁরই দানে। এইটেই ঠিকমতো জানতে পারলে ঈশ্বরকে পাবার জন্যে কোনো বিশেষ স্থানের কোনো বিশেষ রূপের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াতে হয় না। এবং ভোগের তৃপ্তিহীন স্পৃহা মেটাবার জন্যে কোনো বিশেষ ভোগের সামগ্রীর জন্যে বিশেষভাবে লোলুপ হয়ে উঠতে হয় না।

১৭ চৈত্র

আত্মসমর্পণ

তাই বলছিলুম, ব্রহ্মকে ঠিক পাওয়ার কথাটা বলা চলে না। কেননা তিনি তো আপনাকে দিয়েই বসে আছেন—তাঁর তো কোনোখানে কমতি নেই—এ কথা তো বলা চলে না যে, এই জায়গায় তাঁর অভাব আছে অতএব আর-এক জায়গায় তাঁকে খুঁজে বেড়াতে হবে।

অতএব ব্রহ্মকে পেতে হবে এ-কথাটা বলা ঠিক চলে না—আপনাকে দিতে হবে বলতে হবে। ওইখানেই অভাব আছে—সেইজন্যেই মিলন হচ্ছে না। তিনি আপনাকে দিয়েছেন আমরা আপনাকে দিই নি। আমরা নানা প্রকার স্বার্থের অহংকারের ক্ষুদ্রতার বেড়া দিয়ে নিজেকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র, এমন কি, বিরুদ্ধ করে রেখেছি।

এইজন্যই বুদ্ধদেব এই স্বাতন্ত্র্যের অতি কঠিন বেষ্টন নানা চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে ক্ষয় করে ফেলবার উপদেশ করেছেন। এর চেয়ে বড়ো সত্তা বড়ো আনন্দ যদি কিছুই না থাকে তাহলে এই ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নিরন্তর অভ্যাসে নষ্ট করে ফেলবার কোনো মানে নেই। কারণ, কিছুই যদি না থাকে তাহলে তো আমাদের এই অহং এই ব্যক্তিগত বিশেষত্বই একেবারে পরম লাভ—তাহলে একে আঁকড়ে না রেখে এত করে নষ্ট করব কেন?

কিন্তু আসল কথা এই যে, যিনি পরিপূর্ণরূপে নিজেকে দান করেছেন আমরাও তাঁর কাছে পরিপূর্ণরূপে নিজেকে দান না করলে তাঁকে প্রতিগ্রহ করাই হবে না। আমাদের দিকেই বাকি আছে।

তাঁর উপাসনা তাঁকে লাভ করবার উপাসনা নয়—আপনাকে দান করবার উপাসনা। দিনে দিনে ভক্তি দ্বারা ক্ষমা দ্বারা সন্তোষের দ্বারা সেবার দ্বারা তাঁর মধ্যে নিজেকে মঙ্গলে ও প্রেমে বাধাহীনরূপে ব্যাপ্ত করে দেওয়াই তাঁর উপাসনা।

অতএব আমরা যেন না বলি যে তাঁকে পাচ্ছি নে কেন, আমরা যেন বলতে পারি তাঁকে দিচ্ছি নে কেন? আমাদের প্রতিদিনের আক্ষেপ হচ্ছে এই যে—

> আমার যা আছে আমি, সকল দিতে
> পারি নি তোমারে নাথ।
> আমার লাজ ভয়, আমার মান অপমান
> সুখ দুখ ভাবনা।

দাও দাও দাও, সমস্ত ক্ষয় করো, সমস্ত খরচ করে ফেলো, তাহলেই পাওয়াতে একেবারে পূর্ণ হয়ে উঠবে।

মাঝে রয়েছে আবরণ কত শত কত মতো
তাই কেঁদে ফিরি, তাই তোমারে না পাই
মনে থেকে যায় তাই হে মনের বেদনা।

আমাদের যত দুঃখ যত বেদনা সে কেবল আপনাকে ঘোচাতে পারছি নে বলেই—সেইটে ঘুচলেই যে তৎক্ষণাৎ দেখতে পাব আমার সকল পাওয়াকে চিরকালই পেয়ে বসে আছি।

উপনিষৎ বলেছেন, ব্রহ্ম তল্লক্ষ্য মুচ্যতে—ব্রহ্মকেই লক্ষ্য বলা হয়। এই লক্ষ্যটি কিসের জন্যে? কিছুকে আহরণ করে নিজের দিকে টানবার জন্যে নয়—নিজেকে একেবারে হারাবার জন্যে। শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ। শর যেমন লক্ষ্যের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রবেশ করে তন্ময় হয়ে যায় তেমনি করে তাঁর মধ্যে একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে যেতে হবে।

এই তন্ময় হয়ে যাওয়াটা কেবল যে একটা ধ্যানের ব্যাপার আমি তা মনে করি নে। এটা হচ্ছে সমস্ত জীবনেরই ব্যাপার। সকল অবস্থায়, সকল চিন্তায়, সকল কাজে এই উপলব্ধি যেন মনের এক জায়গায় থাকে যে, আমি তাঁর মধ্যেই আছি; কোথাও বিচ্ছেদ নেই। এই জ্ঞানটি যেন মনের মধ্যে প্রতিদিনই ক্রমে ক্রমে একান্ত সহজ হয়ে আসে যে, কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। আমার শরীর মনের তুচ্ছতম চেষ্টাটিও থাকত না যদি আকাশপরিপূর্ণ আনন্দ না থাকতেন, তাঁরই আনন্দ, শক্তিরূপে ছোটো বড়ো সমস্ত ক্রিয়াকেই চেষ্টা দান করছে। আমি আছি তাঁরই মধ্যে, আমি করছি তাঁরই শক্তিতে এবং আমি ভোগ করছি তাঁরই দানে এই জ্ঞানটিকে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো সহজ করে তুলতে হবে এই আমাদের সাধনার লক্ষ্য। এই হলেই জগতে আমাদের থাকা করা এবং ভোগ, আমাদের সত্য মঙ্গল এবং সুখ সমস্তই সহজ হয়ে যাবে—কেননা যিনি স্বয়ম্ভূ, যাঁর জ্ঞান শক্তি ও কর্ম স্বাভাবিক তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগকে আমরা চেতনার মধ্যে প্রাপ্ত হব। এইটি পাওয়ার জন্যেই আমাদের সকল চাওয়া।

১৮ চৈত্র

সমগ্র এক

পরমাত্মার মধ্যে আত্মাকে এইরূপ যোগযুক্ত করে উপলব্ধি করা এ কি কেবল জ্ঞানের দ্বারা হবে? তা কখনোই না। এতে প্রেমেরও প্রয়োজন।

কেননা আমাদের জ্ঞান যেমন সমস্ত খণ্ডতার মধ্যে সেই এক পরম সত্যকে চাচ্ছে তেমনি আমাদের প্রেমও সমস্ত ক্ষুদ্র রসের ভিতরে সেই সকল রসের রসতমকে সেই পরমানন্দস্বরূপকে চাচ্ছে—নইলে তার তৃপ্তি নেই।

জীবাত্মা যা কিছু নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে পেয়েছে তাই সে পরমাত্মার মধ্যে অসীমরূপে উপলব্ধি করতে চায়।

নিজের মধ্যে আমরা কী কী দেখছি।

প্রথমে দেখছি আমি আছি—আমি সত্য।

তার পরে দেখছি যেটুকু এখনই আছি এইটুকুতেই আমি শেষ নই। যা আমি হব, যা এখনও হই নি তাও আমার মধ্যে আছে। তাকে ধরতে পারি নে ছুঁতে পারি নে কিন্তু তা একটি রহস্যময় পদার্থরূপে আমার মধ্যে রয়েছে।

একে আমি বলি শক্তি। আমার দেহের শক্তি যে কেবল বর্তমানেই দেহকে প্রকাশ করে কৃতার্থ হয়ে বসে আছে তা নয়—সেই শক্তি দশ বৎসরের পরেও আমার এই দেহকে পুষ্ট করবে বর্ধিত করবে। যে পরিণাম এখন উপস্থিত নেই সেই পরিণামের দিকে শক্তি আমাকে বহন করবে।

আমাদের মানসিক শক্তিরও এইরূপ প্রকৃতি। আমাদের চিন্তাশক্তি যে কেবলমাত্র আমাদের চিন্তিত বিষয়গুলির মধ্যেই সম্পূর্ণ পর্যাপ্ত তা নয়—যা চিন্তা করি নি ভবিষ্যতে করব তার সম্বন্ধেও সে আছে। যা চিন্তা করতে পারতুম, প্রয়োজন উপস্থিত হলে যা চিন্তা করতুম তার সম্বন্ধেও সে আছে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যা প্রত্যক্ষ সত্যরূপে বর্তমান, তার মধ্যে আর একটি পদার্থ বিদ্যমান, যা তাকে অতিক্রম করে অনাদি অতীত হতে অনন্ত ভবিষ্যতের দিকে ব্যাপ্ত।

এই যে শক্তি, যা আমাদের সত্যকে নিশ্চল জড়ত্বের মধ্যে নিঃশেষ করে রাখে নি, যা তাকে ছাড়িয়ে গিয়ে তাকে অনন্তের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এ যে কেবলমাত্র গতিরূপে অহরহ আপনাকে অনাগতের অভিমুখে প্রকাশ করে চলেছে তা নয়, এর আর-একটি ভাব দেখছি। এ একের সঙ্গে আরকে, ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টিকে যোজনা করছে।

যেমন আমাদের দেহের শক্তি। এ যে কেবল আমাদের আজকের এই দেহকে কালকের দেহের মধ্যে পরিণত করছে তা নয়, এ আমাদের দেহটিকে নিরন্তর একটি সমগ্রদেহ করে বেঁধে রাখছে। এ এমন করে কাজ করছে যাতে আমাদের শরীরের "আজ"ই একান্ত হয়ে না দাঁড়ায় শরীরের "কাল"ও আপনার দাবি রক্ষা করতে পারে—তেমনি আমাদের শরীরের একাংশই একান্ত হয়ে না ওঠে, শরীরের অন্যাংশের সঙ্গে তার এমন সম্বন্ধ থাকে যাতে পরস্পর পরস্পরের সহায় হয়। পায়ের জন্যে হাত মাথা পেট সকলেই খাটছে আবার হাত মাথা পেটের জন্যেও পা খেটে মরছে। এই

শক্তি হাতের স্বার্থকে পায়ের স্বার্থ করে রেখেছে পায়ের স্বার্থকে হাতের স্বার্থ করে রেখেছে।

এইটিই হচ্ছে শরীরের পক্ষে মঙ্গল। তার প্রত্যেক প্রত্যঙ্গ সমস্ত অঙ্গকে রক্ষা করছে, সমগ্র অঙ্গ প্রত্যেক প্রত্যঙ্গকে পালন করছে। অতএব শক্তি আয়ুরূপে শরীরকে অনাগত পরিণামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং মঙ্গলরূপে তাকে অখণ্ড সমগ্রতায় বন্ধন করছে, ধারণ করছে।

এই শক্তির প্রকাশ শুধু যে মঙ্গলে তা তো নয়, কেবল যে তার দ্বারা যন্ত্রের মতো রক্ষাকার্য চলে যাচ্ছে তা নয়, এর মধ্যে আবার একটি আনন্দ রয়েছে।

আয়ুর মধ্যে আনন্দ আছে। সমগ্র শরীরের মঙ্গলের মধ্যে স্বাস্থ্যের মধ্যে একটি আনন্দ আছে।

এই আনন্দকে ভাগ করলে দুটি জিনিস পাওয়া যায়, একটি হচ্ছে জ্ঞান এবং আর একটি প্রেম।

আমার মধ্যে যে একটি সমগ্রতা আছে তার সঙ্গে জ্ঞান আছে—সে জানছে আমি হচ্ছি আমি; আমি হচ্ছি একটি সম্পূর্ণ আমি।

শুধু জানছে নয় এই জানায় তার একটি প্রীতি আছে। এই একটি সম্পূর্ণতাকে সে এত ভালোবাসে যে এর কোনো ক্ষতি সে সহ্য করতে পারে না। এর মঙ্গলে তার লাভ, এর সেবায় তার আনন্দ।

তাহলে দেখতে পাচ্ছি, শক্তি একটি সমগ্রতাকে বাঁধছে, রাখছে এবং তাকে অহরহ একটি ভাবী সম্পূর্ণতার দিকে চালনা করে নিয়ে যাচ্ছে।

তার পরে দেখতে পাচ্ছি এই যে সমগ্রতা যার মধ্যে একটি সক্রিয় শক্তি অংশ প্রত্যংশকে এক করে রয়েছে, অতীত অনাগতকে এক করে রয়েছে—সেই শক্তির মধ্যে কেবল যে মঙ্গল রয়েছে অর্থাৎ সত্তা কেবল সমগ্র আকারে রক্ষা পাচ্ছে ও পরিণতি লাভ করছে তা নয়, তার মধ্যে একটি আনন্দ রয়েছে। অর্থাৎ তার মধ্যে একটি সমগ্রতার জ্ঞান এবং সমগ্রতার প্রেম আছে। সে সমস্তকে জানে এবং সমস্তকে ভালোবাসে।

যেটি আমার নিজের মধ্যে দেখছি, ঠিক এইটেই আবার সমাজের মধ্যে দেখছি। সমাজ-সত্তার ভিতরে একটি শক্তি বর্তমান, যা সমাজকে কেবলই বর্তমানে আবদ্ধ করছে না তাকে তার ভাবী পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, সমাজস্থ প্রত্যেকের স্বার্থকে সকলের স্বার্থ এবং সকলের স্বার্থকে প্রত্যেকের স্বার্থ করে তুলছে।

কিন্তু এই ব্যক্তিগত স্বার্থকে সমষ্টিগত মঙ্গলে পরিণত করাটা যে কেবল যন্ত্রবৎ জড় শাসনে ঘটে উঠছে তা নয়। এর মধ্যে প্রেম আছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনে

একটা রস আছে। স্নেহ প্রেম দয়া দাক্ষিণ্য আমাদের পরস্পরের যোগকে স্বেচ্ছাকৃত আনন্দময় অর্থাৎ জ্ঞান ও প্রেমময় যোগরূপে জাগিয়ে তুলছে। আমরা দায়ে পড়ে নয় আনন্দের সঙ্গে স্বার্থ বিসর্জন করছি। মা ইচ্ছা করেই সন্তানের সেবা করছে; মানুষ অন্ধভাবে নয় সজ্ঞানে প্রেমের দ্বারাই সমাজের হিত করছে। এই যে বৃহৎ আমি, সামাজিক আমি, স্বাদেশিক আমি, মানবিক আমি, এর প্রেমের জোর এত যে, এই চৈতন্য যাকে যথার্থভাবে অধিকার করে সে এই বৃহতের প্রেমে নিজের ক্ষুদ্র আমির সুখ দুঃখ জীবন মৃত্যু সমস্ত অকাতরে তুচ্ছ করে। সমগ্রতার মধ্যে এতই আনন্দ; বিচ্ছিন্নতার মধ্যেই দুঃখ দুর্বলতা। তাই উপনিষৎ বলেছেন—ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।

বিশ্বব্যাপী সমগ্রতার মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি কেবল যে সত্যের সত্য ও মঙ্গলের মঙ্গলরূপে আছে তা নয় সেই শক্তি অপরিমেয় আনন্দরূপে বিরাজ করছে। এই বিশ্বের সমগ্রতাকে ব্রহ্ম জ্ঞানের দ্বারা পূর্ণ করে এবং প্রেমের দ্বারা আলিঙ্গন করে রয়েছেন। তাঁর সেই জ্ঞান এবং সেই প্রেম চিরনির্ঝরধারারূপে জীবাত্মার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, কোনোদিন সে আর নিঃশেষ হল না।

এইজন্যেই পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার যে মিলন, সে জ্ঞান প্রেম কর্মের মিলন। সেই মিলনই আনন্দের মিলন। সম্পূর্ণের সঙ্গে মিলতে গেলে সম্পূর্ণতার দ্বারাই মিলতে হবে—তবেই আমাদের যা কিছু আছে সমস্তই চরিতার্থ হবে।

১৯ চৈত্র

আত্মপ্রত্যয়

আমার দেহ প্রাণ চৈতন্য বুদ্ধি হৃদয় সমস্তটা নিয়ে আমি একটি এক। এই যে সমগ্রতা সম্পূর্ণতা, এ একটি এক বস্তু বলেই নিজেকে জানে এবং নিজেকে ভালোবাসে।

শুধু তাই নয় এইজন্য সর্বত্রই সে এককে সন্ধান করে এবং এককে পেলেই আনন্দিত হয়। বিচ্ছিন্নতা তাকে ক্লেশ দেয়—সে সম্পূর্ণতাকে চায়।

বস্তুত সে যা কিছু চায় তা কোনো-না-কোনো রূপে এই সম্পূর্ণতার সন্ধান। সে নিজের একের সঙ্গে চারিদিকের বহুকে বেঁধে নিয়ে ক্ষুদ্র এককে বৃহত্তর এক করে তুলতে চায়।

আমরা প্রত্যেকে নিজের মধ্যে এই যে ঐক্যের সম্পূর্ণতা লাভ করেছি এরই শক্তিতে আমরা জগতের আর সমস্ত ঐক্য উপলব্ধি করতে পারি। আমরা সমাজকে এক বলে

বুঝতে পারি, মানবকে এক বলে বুঝতে পারি, সমস্ত বিশ্বকে এক বলে বুঝতে পারি—এমন কি, সেই রকম এক করে যাকে না বুঝতে পারি তার তাৎপর্য পাই নে—তাকে নিয়ে আমাদের বুদ্ধি কেবল হাতড়ে বেড়াতে থাকে।

অতএব আমরা যে পরম এককে খুঁজছি সে কেবল আমাদের নিজের এই একের তাগিদেই। এই এক নিজের ঐক্যকে সেই পর্যন্ত না নিয়ে গিয়ে মাঝখানে কিছুতেই থামতে পারে না।

আমরা সমাজকে যে এক বলে জানি সেই জানবার ভিত্তি হচ্ছে আমাদের আত্মা—মানবকে এক বলে জানি সেই জানার ভিত্তি হচ্ছে এই আত্মা—বিশ্বকে যে এক বলে জানি তারও ভিত্তি হচ্ছে এই আত্মা এবং পরমাত্মাকে যে অদ্বৈতম্ বলে জানি তারও ভিত্তি হচ্ছে এই আত্মা। এইজন্যই উপনিষৎ বলেন, সাধক—আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি—আত্মাতেই পরমাত্মাকে দেখেন। কারণ, আত্মাতে যে ঐক্য আছে সেই ঐক্যই পরম ঐক্যকে খোঁজে এবং পরম ঐক্যকে পায়। যে জ্ঞান তার নিজের ঐক্যকে আশ্রয় করে আত্মজ্ঞান হয়ে আছে সেই জ্ঞানই পরমাত্মার পরম জ্ঞানের মধ্যে চরম আশ্রয় পায়। এইজন্যই পরমাত্মাকে "একাত্মপ্রত্যয়সারং" বলা হয়েছে। অর্থাৎ নিজের প্রতি আত্মার যে একটি সহজ প্রত্যয় আছে সেই প্রত্যয়েরই সার হচ্ছেন তিনি। আমাদের আত্মা যে স্বভাবতই নিজেকে এক বলে জানে সেই এক জানারই সার হচ্ছে পরম এককে জানা। তেমনি আমাদের যে একটি আত্মপ্রেম আছে, আত্মাতে আত্মার আনন্দ, এই আনন্দই হচ্ছে মানবাত্মার প্রতি প্রেমের ভিত্তি, বিশ্বাত্মার প্রতি প্রেমের ভিত্তি, পরমাত্মার প্রতি প্রেমের ভিত্তি। অর্থাৎ এই আত্মপ্রেমেরই পরিপূর্ণতম সত্যতম বিকাশ হচ্ছে পরমাত্মার প্রতি প্রেম—সেই ভূমানন্দেই আত্মার আনন্দের পরিণতি। আমাদের আত্মপ্রেমের চরম সেই পরমাত্মায় আনন্দ। তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ অন্তরতর যদয়মাত্মা।

২১ চৈত্র

ধীর যুক্তাত্মা

এই কথাটিকে আলোচনা করে কেবল কঠিন করে তোলা হচ্ছে। অথচ এইটিই আমাদের সকলের চেয়ে সহজ কথা—একেবারে গোড়াকার প্রথম কথা এবং শেষের শেষ কথা। আমরা নিজের মধ্যে একটি এক পেয়েছি এবং এককেই আমরা বহুর মধ্যে সর্বত্রই খুঁজে বেড়াচ্ছি। এমন কি, শিশু যখন নানা জিনিসকে ছুঁয়ে শুঁকে খেয়ে দেখবার

জন্যে চারিদিকে হাত বাড়াচ্ছে তখনও সে সেই এককেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমরাও শিশুরই মতো নানা জিনিসকে ছুঁচ্ছি শুঁকছি মুখে দিচ্ছি, তাকে আঘাত করছি তার থেকে আঘাত পাচ্ছি, তাকে জমাচ্ছি এবং তাকে আবর্জনার মতো ফেলে দিচ্ছি। এই সমস্ত পরীক্ষা এই সমস্ত চেষ্টার ভিতর দিয়ে সমস্ত দুঃখে সমস্ত লাভে আমরা সেই একককেই চাচ্ছি। আমাদের জ্ঞান একে পৌঁছোতে চায়, আমাদের প্রেম একে মিলতে চায়। এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো কথা নেই।

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দ আপনাকে নানারূপে নানাকালে প্রকাশ করছেন, আমরা সেই নানারূপকেই কেবল দেখছি, কিন্তু আমাদের আত্মা দেখতে চায় নানার ভিতর দিয়ে সেই মূল এক আনন্দকে। যতক্ষণ সেই মূল আনন্দের কোনো আভাস না দেখি ততক্ষণ কেবলই বস্তুর পর বস্তু, ঘটনার পর ঘটনা আমাদের ক্লান্ত করে ক্লিষ্ট করে আমাদের অন্তহীন পথে ঘুরিয়ে মারে। আমাদের বিজ্ঞান সমস্ত বস্তুর মধ্যে এক সত্যকে খুঁজছে, আমাদের ইতিহাস সমস্ত ঘটনার মধ্যে এক অভিপ্রায়কে খুঁজছে, আমাদের প্রেম সমস্ত সত্তার মধ্যে এক আনন্দকে খুঁজছে। নইলে সে কোনোখানেই বলতে পারছে না—ওঁ। বলতে পারছে না—হাঁ, পাওয়া গেল।

আমরা যখন একটা অন্ধকার ঘরে আমাদের প্রার্থনীয় বস্তুকে খুঁজে বেড়াই তখন চারিদিকে মাথা ঠুকতে থাকি উঁচট খেতে থাকি, তখন কত ছোটো জিনিসকে বড়ো মনে করি, কত তুচ্ছ জিনিসকে বহুমূল্য বলে মনে করি, কত জিনিসকে আঁকড়ে ধরে বলি এই তো পেয়েছি। তার পরে দেখি মুঠোর মধ্যেই সেটা গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যায়।

আসল কথা এই অন্ধকারে আমি জানিই নে আমি কাকে চাচ্ছি। কিন্তু যেমনি একটি আলো জ্বালা হয় অমনি এক মুহূর্তেই সমস্ত সহজ হয়ে যায়—অমনি এতদিনের এত খোঁজা এত মাথা ঠোকার পরে এক পলকেই জানতে পারি যে, যা-সমস্ত আমার হাতে ঠেকছিল তাই আমার প্রার্থনীয় জিনিস নয়। যে মা এই সমস্ত ঘরটি সাজিয়ে চুপ করে বসে ছিলেন তিনিই আমার যথার্থ কামনার ধন। যেমনি আলোটি জ্বলল অমনি সব জিনিস ছেড়ে দু-হাত বাড়িয়ে ছুটে তাঁর কাছে গেলুম।

অথচ মাকে পাবামাত্রই অমনি তাঁর সঙ্গে সব জিনিসকেই একত্রে পাওয়া গেল, কোনো জিনিস স্বতন্ত্র হয়ে আমার পথের বাধারূপে আমাকে আটক করলে না। মাকে জানবামাত্র মায়ের এই সাজানো ঘরটি আমারই হয়ে গেল। তখন ঘরের সমস্ত আসবাব-পত্রের মধ্যে আমার সঞ্চরণ অবাধ হয়ে উঠল, তখন যে-জিনিসের ঠিক যে-ব্যবহার তা আমার আয়ত্ত হয়ে গেল, তখন জিনিসগুলো আমাকে অধিকার করল না, আমিই তাদের অধিকার করলুম।

তাই বলছিলুম কী জ্ঞানে কী প্রেমে কী কর্মে সেই এককে সেই আসল জিনিসটিকে পেলেই সমস্তই সহজ হয়ে যায়—জিনিসের সমস্ত ভার এক মুহূর্তে লাঘব হয়ে যায়। সাঁতারটি যেমনি জেনেছি অমনি অগাধ জলে বিহারও আমার পক্ষে যেন স্বাভাবিক হয়ে যায়, তখন অতল জলে ডুব দিলেও বিনাশে তলিয়ে যাই নে, আপনি ভেসে উঠি। এই সাঁতারটি না জানলেই জল প্রতিপদে আমাকে বাধা দেয় আমাকে মারতে চায়। যে জলে সঞ্চরণ সাঁতার জানলে আমার পক্ষে লীলা আমার পক্ষে আনন্দ, সাঁতার না জানলে সেই জলে সঞ্চরণই আমার পক্ষে দুঃখ আমার পক্ষে মৃত্যু। তখন অল্প জলেও হাত-পা ছুঁড়ে হাঁসফাঁস করে ক্লান্ত হয়ে পড়ি।

আমাদের আসল জানবার বিষয়কে পাবার বিষয়কে যেমনি লাভ করি অমনি এই সংসারের বিচিত্রতা আর আমাদের বাঁধতে পারে না, ঠেকাতে পারে না, মারতে পারে না। তখন, পূর্বে যা বিভীষিকা ছিল এখন সেইটেই সহজ হয়ে যায়—সংসারে তখন আমরা মুক্তভাবে আনন্দ পাই। সংসার তখন আমাদের অধিকার করে না, আমরাই সংসারকে অধিকার করি। তখন, পূর্বে পদে পদে আমাদের যে আক্ষেপ বিক্ষেপ যে-শক্তির অপব্যয় ছিল সেটা কেটে যায়।

সেইজন্যই উপনিষৎ বলেছেন, তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি, সেই সর্বব্যাপীকে যাঁরা সকল দিক থেকেই পেয়েছেন তাঁরা ধীর হয়ে যুক্তাত্মা হয়ে সর্বত্রই প্রবেশ করেন। প্রথমে তাঁরা ধৈর্য লাভ করেন, আর তাঁরা নানা বিষয় ও নানা ব্যাপারের মধ্যে কেবলই বিক্ষিপ্ত হয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বেড়ান না, তাঁরা অপ্রগল্‌ভ অপ্রমত্ত ধীর হন। তাঁরা যুক্তাত্মা হন, সেই পরম একের সঙ্গে যোগযুক্ত হন। নিজেকে কোনো অহংকার কোনো আসক্তি দ্বারা স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন করেন না, একের সঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দে বিশ্বের সমস্ত বহুর মধ্যে প্রবেশ করেন, সমস্ত বহু তখন তাঁদের পথ ছেড়ে দেয়।

সেই সকল ধীর সেই সকল যুক্তাত্মাদের প্রণাম করে তাঁদেরই পথ আমরা অনুসরণ করব। সেই হচ্ছে একের সঙ্গে যোগের পথ, সেই হচ্ছে সকলের মধ্যেই প্রবেশের পথ, জ্ঞান প্রেম এবং কর্মের চরম পরিতৃপ্তির পথ।

২২ চৈত্র

শক্ত ও সহজ

সাধনার দুই অঙ্গ আছে। একটি ধরে রাখা আর একটি ছেড়ে দেওয়া। এক জায়গায় শক্ত হওয়া, আর এক জায়গায় সহজ হওয়া।

জাহাজ যে চলে তার দুটি অঙ্গ আছে। একটি হচ্ছে হাল, আর একটি হচ্ছে পাল। হাল খুব শক্ত করেই ধরে রাখতে হবে। ধ্রুবতারার দিকে লক্ষ্য স্থির রেখে সিধে পথ ধরে চলা চাই। এর জন্যে দিক জানা দরকার, নক্ষত্র পরিচয় হওয়া চাই, কোন্‌খানে বিপদ কোন্‌খানে সুযোগ সে সমস্ত সর্বদা মন দিয়ে বুঝে না চললে চলবে না। এর জন্যে অহরহ সচেষ্ট সতর্কতা এবং দৃঢ়তার প্রয়োজন। এর জন্যে জ্ঞান এবং শক্তি চাই।

আর একটি কাজ হচ্ছে অনুকূল হাওয়ার কাছে জাহাজকে সমর্পণ করা। জাহাজের যত পাল আছে সমস্তকে এমন করে ছড়িয়ে ধরা যে বাতাসের সুযোগ হতে সে যেন লেশমাত্র বঞ্চিত না হয়।

আধ্যাত্মিক সাধনাতেও তেমনি। যেমন একদিকে নিজের জ্ঞানকে বিশুদ্ধ এবং শক্তিকে সচেষ্ট রাখতে হবে তেমনি আর-একদিকে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদন করে দিতে হবে। তাঁর মধ্যে একেবারে সহজ হয়ে যেতে হবে।

নিজেকে নিয়মের পথে দৃঢ় করে ধরে রাখবার সাধনা অনেক জায়গায় দেখা যায় কিন্তু নিজেকে তাঁর হাতে সমর্পণ করে দেবার সাধনা অল্পই দেখতে পাই। এখানেও মানুষের যেন একটা কৃপণতা আছে। সে নিজেকে নিজের হাতে রাখতে চায়, ছাড়তে চায় না। একটা কোনো কঠোর ব্রতে সে প্রতিদিন নিজের শক্তির পরিচয় পায়। প্রতিদিন একটা হিসাব পেতে থাকে যে, নিয়ম দৃঢ় রেখে এতখানি চলা হল। এতেই তার একটা বিশেষ অভিমানের আনন্দ আছে।

নিজের জীবনকে ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করে দেবার এ মানে নয় যে, আমি যা করছি সমস্তই তিনি করছেন এইটি কল্পনা করা। করছি কাজ আমি, অথচ নিচ্ছি তাঁর নাম, এবং দায়িক করছি তাঁকে—এমন দুর্বিপাক না যেন ঘটে।

ঈশ্বরের হাওয়ার কাছে জীবনটাকে একেবারে ঠিক করে ধরে রাখতে হবে। সেটিকে সম্পূর্ণ মানতে হবে। কাত হয়ে সেটিকে পাশ কাটিয়ে চললে হবে না। তাঁর আহ্বান তাঁর প্রেরণাকে পুরাপুরি গ্রহণ করবার মুখে জীবন প্রতিমুহূর্তে যেন আপনাকে

প্রসারিত করে রাখে। "কী ইচ্ছা প্রভু, কী আদেশ" এই প্রবৃত্তিকে জাগ্রত করে রেখে সে যেন সর্বদা প্রস্তুত হয়ে থাকে। যা শ্রেয় তা যেন সহজেই তাকে চালায় এবং শেষ পর্যন্তই তাকে নিয়ে যায়।

জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ,
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

এ শ্লোকের মানে এমন নয় যে আমি ধর্মেই থাকি আর অধর্মেই থাকি তুমি আমাকে যেমন চালাচ্ছ আমি তেমনি চলছি। এর ভাব এই যে আমার প্রবৃত্তির উপরেই যদি আমি ভার দিই তবে সে আমাকে ধর্মের দিকে নিয়ে যায় না, অধর্ম থেকে নিরস্ত করে না; তাই হে প্রভু, স্থির করেছি তোমাকেই আমি হৃদয়ে রাখব এবং তুমি আমাকে যেদিকে চালাবে সেই দিকে চলব। স্বার্থ আমাকে যেদিকে চালাতে চায় সেদিকে চলব না, অহংকার আমাকে যে পথ থেকে নিবৃত্ত করতে চায় আমি সে পথ থেকে নিবৃত্ত হব না।

অতএব তাঁকে হৃদয়ের মধ্যে স্থাপিত করে তাঁর হাতে নিজের ভার সমর্পণ করা, প্রত্যহ আমাদের ইচ্ছাশক্তির এই একটিমাত্র সাধনা হ'ক।

এইটি করতে গেলে গোড়াতেই অহংকারকে তার চূড়ার উপর থেকে একেবারে নামিয়ে আনতে হবে। পৃথিবীর সকলের সঙ্গে সমান হও, সকলের পিছনে এসে দাঁড়াও, সকলের নীচে গিয়ে বসো, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। তোমার দীনতা ঈশ্বরের প্রসাদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক, তোমার নম্রতা সুমধুর অমৃত-ফলভারে সার্থক হউক। সর্বদা লড়াই করে নিজের জন্যে ওই একটুখানি স্বতন্ত্র জায়গা বাঁচিয়ে রাখবার কী দরকার, তার কী মূল্য? জগতের সকলের সমান হয়ে বসতে লজ্জা ক'রো না—সেইখানেই তিনি বসে আছেন। যেখানে সকলের চেয়ে উঁচু হয়ে থাকবার জন্যে তুমি একলা বসে আছ সেখানে তাঁর স্থান অতি সংকীর্ণ।

যতদিন তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ না করবে ততদিন তোমার হার-জিত তোমার সুখদুঃখ ঢেউয়ের মতো কেবলই টলাবে কেবলই ঘোরাবে। প্রত্যেকটার পুরো আঘাত তোমাকে নিতে হবে। যখন তোমার পালে তাঁর হাওয়া লাগবে তখন তরঙ্গ সমানই থাকবে কিন্তু তুমি হু হু করে চলে যাবে। তখন সেই তরঙ্গ আনন্দের তরঙ্গ। তখন প্রত্যেক তরঙ্গটি কেবল তোমাকে নমস্কার করতে থাকবে এবং এই কথাটিরই প্রমাণ দেবে যে, তুমি তাঁকে আত্মসমর্পণ করেছ।

তাই বলছিলুম জীবনযাত্রার সাধনায় নিজের শক্তির চর্চা যতই করি, ঈশ্বরের চিরপ্রবাহিত অনুকূল দক্ষিণ বায়ুর কাছে সমস্ত পালগুলি একেবারেই পূর্ণভাবে ছড়িয়ে দেবার কথাটা না ভুলি যেন।

২৪ চৈত্র

নমস্তেঽস্তু

কোনো লতা গোল গোল আঁকড়ি দিয়ে আপনার আশ্রয়কে বেষ্টন করে, কোনো লতা সরু সরু শিকড় মেলে দিয়ে আশ্রয়কে চেপে ধরে, কোনো লতা নিজের সমস্ত দেহকে দিয়েই তার অবলম্বনকে ঘিরে ফেলে।

আমরাও যে-সকল সম্বন্ধ দিয়ে ঈশ্বরকে ধরব তা একরকম নয়। আমরা তাঁকে পিতাভাবেও আশ্রয় করতে পারি, প্রভুভাবেও পারি, বন্ধুভাবেও পারি। জগতে যতরকম সম্বন্ধসূত্রেই আমরা নিজেকে বাঁধি সমস্তের মূলে তিনিই আছেন। যে-রসের দ্বারা সেই সেই সকল সম্বন্ধ পুষ্ট হয় সে রস তাঁরই। এইজন্যে সব সম্বন্ধই তাঁতে খাটতে পারে, সকল রকম ভাব দিয়েই মানুষ তাঁকে পেতে পারে।

সব সম্বন্ধের মধ্যে প্রথম সম্বন্ধ হচ্ছে পিতাপুত্রের সম্বন্ধ।

পিতা যত বড়োই হ'ন আর পুত্র যত ছোটোই হ'ক, উভয়ের মধ্যে শক্তির যতই বৈষম্য থাক তবু উভয়ের মধ্যে গভীরতর ঐক্য আছে। সেই ঐক্যটির যোগেই এতটুকু ছেলে তার এত বড়ো বাপকে লাভ করে।

ঈশ্বরকেও যদি পেতে চাই তবে তাঁকে একটি কোনো সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে পেতে হবে, নইলে তিনি আমাদের কাছে কেবলমাত্র একটি দর্শনের তত্ত্ব, ন্যায়শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হয়ে থাকবেন, আমাদের আপন হয়ে উঠবেন না।

তিনি তো কেবল আমাদের বুদ্ধির বিষয় নন, তিনি তার চেয়ে অনেক বেশি; তিনি আমাদের আপন। তিনি যদি আমাদের আপন না হতেন তা হলে সংসারে কেউ আমাদের আপন হত না, তা হলে আপন কথাটার কোনো মানেই থাকত না। তিনি যেমন বৃহৎ সূর্যকে এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর আপন করে এত লক্ষ যোজন ক্রোশের দূরত্ব ঘুচিয়ে মাঝখানে রয়েছেন, তেমনি তিনিই নিজে এক মানুষের সঙ্গে আর এক মানুষের সম্বন্ধরূপে বিরাজ করছেন। নইলে একের সঙ্গে আরের ব্যবধান যে অনন্ত; মাঝখানে যদি অনন্ত মিলনের সেতু না থাকতেন তাহলে এই অনন্ত ব্যবধান পার হতুম কী করে!

অতএব তিনি দুরূহ তত্ত্বকথা নন তিনি অত্যন্ত আপন। সকল আপনের মধ্যেই তিনি একমাত্র চিরন্তন অখণ্ড আপন। গাছের ফলকে তিনি যে কেবল একটি সত্যরূপে গাছে ঝুলিয়ে রেখেছেন তা নয়, স্বাদে গন্ধে শোভায় তিনি বিশেষরূপে তাকে আমার আপন করে রেখেছেন। তিনিই আমার আপন বলে ফলকে নানা রসে আমার আপন করেছেন, নইলে ফলনামক সত্যটিকে আমি কোনোদিক থেকেই কোনো রকমেই এতটুকুও নাগাল পেতুম না।

কিন্তু আপন যে কতদূর পর্যন্ত যায়, কত গভীরতা পর্যন্ত, তা তিনি মানুষের সম্বন্ধে মানুষকে দেখিয়েছেন—শরীর মন হৃদয় সর্বত্র তার প্রবেশ, কোথাও তার বিচ্ছেদ নেই, বিরহ এবং মৃত্যুও তাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না।

সেইজন্যে মানুষের এই সম্বন্ধগুলির মধ্য দিয়েই আমরা কতকটা উপলব্ধি করতে পারি, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যিনি আমাদের নিত্যকালের আপন তিনি আমাদের কী? সেই তিনি তাঁকে সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম বলে আমাদের শেষ কথা বলা হয় না। তার চেয়ে চরমতর অন্তরতর কথা হচ্ছে, তুমি আমার আপন, তুমি আমার মাতা, আমার পিতা, আমার বন্ধু, আমার প্রভু, আমার বিদ্যা, আমার ধন, ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব। তুমি আমার এবং আমি তোমার, তোমাতে আমাতে এই যে যোগ, এই যোগটিই আমার সকলের চেয়ে বড়ো সত্য, আমার সকলের চেয়ে বড়ো সম্পদ। তুমি আমার মহত্তম সত্যতম আপনস্বরূপ।

ঈশ্বরের সঙ্গে এই যোগ উপলব্ধি করবার একটি মন্ত্র হচ্ছে—পিতা নোঽসি, তুমি আমাদের পিতা। যিনি অনন্ত সত্য তাঁকে আমাদের আপন সত্য করবার এই একটি মন্ত্র, তুমি আমাদের পিতা।

আমি ছোটো, তুমি ব্রহ্ম, তবু তোমাতে আমাতে মিল আছে, তুমি পিতা। আমি অবোধ, তুমি অনন্ত জ্ঞান, তবু তোমাতে আমাতে মিল আছে, তুমি পিতা।

এই যে যোগ, এই যোগটি দিয়ে তোমাতে আমাতে বিশেষভাবে যাতায়াত, তোমাতে আমাতে বিশেষভাবে দেনাপাওনা। এই যোগটিকে যেন আমি সম্পূর্ণ সজ্ঞানে সম্পূর্ণ সবলে অবলম্বন করি। তাই আমার প্রার্থনা এই যে, পিতা নোবোধি, তুমি যে পিতা আমাকে সেই বোধটি দাও। তুমি তো—পিতা নোঽসি, পিতা আছ; কিন্তু শুধু আছ বললে তো হবে না—পিতা নোবোধি, তুমি আমার পিতা হয়ে আছ এই বোধটি আমাকে দাও।

আমার চৈতন্য ও বুদ্ধি যোগে যে-কিছু জ্ঞান আমি পাচ্ছি সমস্তই তাঁর কাছ থেকে পাচ্ছি—ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ, যিনি আমাদের ধীশক্তিসকল প্রেরণ করছেন। যিনি

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অখণ্ড এক করে রয়েছেন, তাঁর কাছ থেকে ছাড়া কোনো জ্ঞান, আর কোথা পাব! কিন্তু সেই সঙ্গে যেন এই বোধটুকু পাই যে তিনিই দিচ্ছেন।

তিনিই পিতারূপে আমাকে জ্ঞান দিচ্ছেন এই বোধটুকু আমার অন্তরে থাকলে তবেই তাঁকে আমি যথার্থভাবে নমস্কার করতে পারি। আমি সমস্তই তাঁর কাছ থেকে নিচ্ছি পাচ্ছি, তবু তাঁকে নমস্কার করতে পারছি নে, আমার মন শক্ত হয়েই আছে, মাথা উদ্ধত হয়েই রয়েছে। কেননা তাঁর সঙ্গে আমার যে যোগ সেটা আমার বোধে খুঁজে পাচ্ছি নে।

তাই আমাদের প্রার্থনা এই যে, নমস্তেঽস্তু। তোমাতে আমাদের নমস্কারটি যেন হয়। সেটি যেন নম্রতায় আত্মসমর্পণে পরিপূর্ণ হয়ে তোমার পায়ের কাছে এসে নামে। আমার সমস্ত জীবন যেন তোমার প্রতি নমস্কাররূপে পরিণত হয়।

তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধই এই যে, তুমি আমাকে দেবে আর আমি নমস্কারে নত হয়ে পড়ে তা গ্রহণ করব। এই নমস্কারটি অতি মধুর। এ জলভারনত মেঘের মতো, ফলভারনত শাখার মতো রসে ও মঙ্গলে পরিপূর্ণ। এই নমস্কারের দ্বারা জীবন কল্যাণে ভরে ওঠে, সৌন্দর্যে উপচে পড়ে। এই নমস্কার যে কেবল নিবিড় মাধুর্য তা নয় এ প্রবল শক্তি। এ যেমন অনায়াসে গ্রহণ করে ও বহন করে উদ্ধত অহংকার তেমন করে পারে না। একে কেউ পরাভূত করতে পারে না। জীবন এই নমস্কারের দ্বারা সমস্ত আঘাত ক্ষতি বিপদ ও মৃত্যুর উপরে অতি সহজেই জয়ী হয়। এই নমস্কারের দ্বারা জীবনের সমস্ত ভার এক মুহূর্তে লঘু হয়ে যায়, পাপ তার উপর দিয়ে মুহূর্তকালীন বন্যার মতো চলে যায়, তাকে ভেঙে দিয়ে যেতে পারে না। এইজন্য প্রতিদিনই প্রার্থনা করি, নমস্তেঽস্তু। তোমাতে আমার নমস্কার হউক। সুখ আসুক দুঃখ আসুক, নমস্তেঽস্তু। মান আসুক অপমান আসুক, নমস্তেঽস্তু। তুমি শিক্ষা দিচ্ছ এই জেনে—নমস্তেঽস্তু। তুমি রক্ষা করছ এই জেনে—নমস্তেঽস্তু। তুমি নিত্য নিয়তই আমার কাছে আছ এই জেনে—নমস্তেঽস্তু। তোমার গৌরবেই আমার একমাত্র গৌরব এই জেনেই—নমস্তেঽস্তু। অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের অনন্তকালের অধীশ্বর তুমিই পিতা নোঽসি এই জেনেই—নমস্তেঽস্তু নমস্তেঽস্তু। বিষয়কেই আশ্রয় বলে জানা ঘুচিয়ে দাও, নমস্তেঽস্তু। সংসারকে প্রবল বলে জানা ঘুচিয়ে দাও, নমস্তেঽস্তু। আমাকেই বড়ো বলে জানা ঘুচিয়ে দাও, নমস্তেঽস্তু। তোমাকেই যথার্থরূপে নমস্কার করে চিরদিনের মতো পরিত্রাণ লাভ করি।

২৬ চৈত্র

মন্ত্রের বাঁধন

বীণায় কোনো তার পিতলের, কোনো তার ইস্পাতের, কোনো তার মোটা, কোনো তার সরু, কোনো তার মধ্যম সুরে বাঁধবার, কোনো তার পঞ্চমে। কিন্তু তবু বাঁধতে হবে, তার থেকে একটা কোনো বিশুদ্ধ সুর জাগিয়ে তুলতে হবে, নইলে সব মাটি।

জগতে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের কোনো বিশেষ আপন সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে। একটা কোনো বিশেষ সুর বাজাতে হবে।

সূর্য চন্দ্র তারা ওষধি বনস্পতি সকলেই এই বিশাল বিশ্বসংগীতে নিজের একটা-না-একটা বিশেষ সুর যোগ করে দিয়েছে। মানুষের জীবনকেও কি এই চির-উদ্গীত সংগীতে যোগ দিতে হবে না?

কিন্তু এখনও এই জীবনটাকে তারের মতো বাঁধি নি। এর মধ্যে এখনও কোনো গানের আবির্ভাব হয় নি। এ জীবন সূত্রবিচ্ছিন্ন বিচিত্র তুচ্ছতার মধ্যে অকৃতার্থ হয়ে আছে। যেমন করেই পারি এর একটি কোনো নিত্য সুরকে ধ্রুব করে তুলতে হবে।

তারকে বাঁধব কেমন করে?

ঈশ্বরের বীণায় অনেকগুলি বাঁধবার সম্বন্ধ আছে, তার মধ্যে নিজের মনের মতো একটি কিছু স্থির করে নিতে হবে।

মন্ত্র জিনিসটি একটি বাঁধবার উপায়। মন্ত্রকে অবলম্বন করে আমরা মননের বিষয়কে মনের সঙ্গে বেঁধে রাখি। এ যেন বীণার কানের মতো। তারকে এঁটে রাখে, খুলে পড়তে দেয় না।

বিবাহের সময় স্ত্রীপুরুষের কাপড়ে কাপড়ে গ্রন্থি বেঁধে দেয়, সেই সঙ্গে মন্ত্র পড়ে দেয়। সেই মন্ত্র মনের মধ্যেও গ্রন্থি বাঁধতে থাকে।

ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের যে গ্রন্থিবন্ধনের প্রয়োজন আছে মন্ত্র তার সহায়তা করে। এই মন্ত্রকে অবলম্বন করে আমরা তাঁর সঙ্গে একটা কোনো বিশেষ সম্বন্ধকে পাকা করে নেব।

সেইরূপ একটি মন্ত্র হচ্ছে—পিতা নোঽসি।

এই সুরে জীবনটাকে বাঁধলে সমস্ত চিন্তায় ও কর্মে একটি বিশেষ রাগিণী জেগে উঠবে। আমি তাঁর পুত্র এইটেই মূর্তি ধরে আমার সমস্তের মধ্যেই এই কথাটাই প্রকাশ করবে যে, আমি তাঁর পুত্র।

আজ আমি কিছুই প্রকাশ করছি নে। আহার করছি কাজ করছি বিশ্রাম করছি এই পর্যন্তই। কিন্তু অনন্ত কালে অনন্ত জগতে আমার পিতা যে আছেন তার কোনো

লক্ষণই প্রকাশ পাচ্ছে না। অনন্তের সঙ্গে আজও আমার কোনো গ্রন্থি কোথাও বাঁধা হয় নি।

ওই মন্ত্রটিকে দিয়ে জীবনের তার আজ বাঁধা যাক। আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে ওই মন্ত্রটি বারংবার আমার মনের মধ্যে বাজতে থাক্, পিতা নোঽসি। জগতে আমার পিতা আছেন এই কথাটি সকলেই জানুক কারও কাছে গোপন না থাক্।

ভগবান যিশু ওই সুরটিকে পৃথিবীতে বাজিয়ে গিয়েছেন। এমনি ঠিক করে তাঁর জীবনের তার বাঁধা ছিল যে মরণান্তিক যন্ত্রণার দুঃসহ আঘাতেও সেই তার লেশমাত্র বেসুর বলে নি—সে কেবলই বলেছে, পিতা নোঽসি।

সেই যে সুরের আদর্শটি তিনি দেখিয়ে গেছেন সেই খাঁটি আদর্শের সঙ্গে একান্ত যত্নে মিশিয়ে তারটি বাঁধতে হবে, যাতে আর ভাবতে না হয়, যাতে সুখে দুঃখে প্রলোভনে আপনিই সে গেয়ে ওঠে, পিতা নোঽসি।

হে পিতা, আমি যে তোমার পুত্র এই সুরটি ঠিকমতো প্রকাশ করা বড়ো কম কথা নয়। কেননা, আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ। পুত্র যে পিতারই প্রকাশ। সন্তানের মধ্যে পিতাই যে স্বয়ং সম্ভূত হন। তোমারই অপাপবিদ্ধ আনন্দময় পরিপূর্ণতাকে যদি ব্যক্ত করে না তুলতে পারি তবে তো এই সুর বাজবে না যে, পিতা নোঽসি।

সেইজন্যেই এই আমার প্রতিদিনের একান্ত প্রার্থনা হ'ক, পিতা নো বোধি, নমস্তেঽস্তু।

২৭ চৈত্র

প্রাণ ও প্রেম

পিতানোঽসি এই মন্ত্রটি আমরা জীবনের মধ্যে গ্রহণ করব। কার কাছ থেকে গ্রহণ করব। যিনি পিতা তাঁর কাছ থেকেই গ্রহণ করব। তাঁকে বলব, তুমি যে পিতা, সে তুমিই আমাকে বুঝিয়ে দাও। আমার জীবনের সমস্ত ইতিহাসের ভিতর দিয়ে সমস্ত সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

পিতার সঙ্গে আমাদের যে সম্বন্ধ সে তো কোনো তৈরি করা সম্বন্ধ নয়। রাজার সঙ্গে প্রজার, প্রভুর সঙ্গে ভৃত্যের একটা পরস্পর বোঝাপড়া আছে, সেই বোঝাপড়ার উপরেই তাদের সম্বন্ধ। কিন্তু পিতার সঙ্গে পুত্রের সম্বন্ধ বাহ্যিক নয় সে একেবারে আন্তরিক সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধ পুত্রের অস্তিত্বের মূলে। অতএব এই গভীর আত্মীয়

সম্বন্ধ কোনো বাহ্য অনুষ্ঠান কোনো ক্রিয়াকলাপের দ্বারা রক্ষিত হয় না, কেবল ভক্তির দ্বারা এবং ভক্তিজনিত কর্মের দ্বারাই এই সম্বন্ধকে স্বীকার করতে হয়।

পিতার সঙ্গে পুত্রের মূল সম্বন্ধটি কোথায়? প্রাণের মধ্যে। পিতার প্রাণই সন্তানের প্রাণে সঞ্চারিত।

কেনোপনিষৎ প্রশ্ন করেছেন—কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ? প্রাণ কাহার দ্বারা তার প্রথম প্রৈতি (energy) লাভ করেছে? এই প্রশ্নের মধ্যেই উত্তরটি প্রচ্ছন্ন রয়েছে, যিনি মহাপ্রাণ তাঁর দ্বারা।

জগতে কোনো প্রাণই তো একটি সংকীর্ণ সীমার মধ্যে নিজের মধ্যে নিজে আবদ্ধ নয়। সমস্ত জগতের প্রাণের সঙ্গে তার যোগ। আমার এই শরীরের মধ্যে যে প্রাণের চেষ্টা চলছে সে তো কেবলমাত্র এই শরীরের নয়। জগৎজোড়া আকর্ষণ বিকর্ষণ, জগৎজোড়া রাসায়নিক শক্তি, জল, বাতাস, আলোক ও উত্তাপ একে নিখিলপ্রাণের সঙ্গে যুক্ত করে রেখেছে। বিশ্বের প্রত্যেক অণুপরমাণুর মধ্যেও যে অবিশ্রাম চেষ্টা আছে আমার এই শরীরের চেষ্টাও সেই বিরাট প্রাণেরই একটি মাত্রা। সেইজন্যই উপনিষৎ বলেছেন—যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্, বিশ্বে এই যা কিছু চলছে সমস্তই প্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই স্পন্দিত হচ্ছে। এই প্রাণের স্পন্দন দূরতম নক্ষত্রেও যেমন আমার হৃৎপিণ্ডেও তেমন, ঠিক একই সুরে একই তালে।

প্রাণ কেবল শরীরের নয়। মনেরও প্রাণ আছে। মনের মধ্যেও চেষ্টা আছে। মন চলছে, মন বাড়ছে, মনের ভাঙাগড়া পরিবর্তন হচ্ছে। এই স্পন্দিত তরঙ্গিত মন কখনোই কেবল আমার ক্ষুদ্র বেড়াটির মধ্যে আবদ্ধ নয়। ওই নর্তমান প্রাণের সঙ্গেই হাতধরাধরি করে নিখিল বিশ্বে সে আন্দোলিত হচ্ছে, নইলে আমি তাকে কোনোমতেই পেতে পারতুম না। মনের দ্বারা আমি সমস্ত জগতের মনের সঙ্গেই যুক্ত। সেইজন্যেই সর্বত্র তার গতিবিধি। নইলে আমার এই একঘরে অন্ধ মন কেবল আমারই অন্ধ-কারাগারে পড়ে দিনরাত্রি কেঁদে মরত।

আমার মনপ্রাণ অবিচ্ছিন্নভাবে নিখিল বিশ্বের ভিতর দিয়ে সেই অনন্ত কারণের সঙ্গে যোগযুক্ত। প্রতিমুহূর্তেই সেইখান হতে আমি প্রাণ, চৈতন্য, ধীশক্তি লাভ করছি। এই কথাটিকে কেবল বিজ্ঞানে জানা নয় এই কথাটিকে ভক্তিদ্বারা উপলব্ধি করতে পারলে তবে ওই মন্ত্র সার্থক হবে, ওঁ পিতা নোহসি। আমার প্রাণের মধ্যে বিশ্বপ্রাণ, মনের মধ্যে বিশ্বমন আছে বললে এত বড়ো কথাটাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করা হয় না, একে বাইরেই বসিয়ে রাখা হয়। আমার প্রাণের মধ্যে পিতার প্রাণ আমার মনের মধ্যে পিতার মন আছে এই কথাটি নিজেকে ভালো করে বলাতে হবে।

পিতার দিক থেকে কেবল যে আমাদের দিকে প্রাণ প্রবাহিত হচ্ছে তা নয়। তাঁর দিক থেকে আমাদের দিকে অবিশ্রাম প্রেম সঞ্চারিত হচ্ছে। আমাদের মধ্যে কেবল যে একটা চেষ্টা আছে গতি আছে তা নয়, একটা আনন্দ আছে। আমরা কেবল বেঁচে আছি কাজ করছি নয়, আমরা রস পাচ্ছি। আমাদের দেখায় শোনায়, আহারে বিহারে, কাজে কর্মে, মানুষের সঙ্গে নানাপ্রকার যোগে নানা সুখ নানা প্রেম।

এই রসটি কোথা থেকে পাচ্ছি? এইটিই কি আমাদের মধ্যে বিচ্ছিন্ন? এটা কেবল আমার এই একটি ছোটো কারখানাঘরের সুড়ঙ্গের মধ্যে অন্ধকারে তৈরি হচ্ছে?

তা নয়। বিশ্বভুবনের মধ্যে সমস্তকে পরিপূর্ণ করে তিনি আনন্দিত। জলে স্থলে আকাশে তিনি আনন্দময়। তাঁর সেই আনন্দকে সেই প্রেমকে তিনি নিয়তই প্রেরণ করছেন, সেইজন্তেই আমি বেঁচে থেকে আনন্দিত, কাজ করে আনন্দিত, জেনে আনন্দিত, মানুষের সঙ্গে নানা সম্বন্ধে আনন্দিত। তাঁরই প্রেমের তরঙ্গ আমাকে কেবলই স্পর্শ করছে, আঘাত করছে, সচেতন করছে।

এই যে অহোরাত্র সেই ভূমার প্রেম নানা বর্ণে গন্ধে গীতে নানা স্নেহে সখ্যে শ্রদ্ধায় জোয়ারের বেগের মতো আমাদের মধ্যে এসে পড়ছে, এই বোধের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যেন আমরা বলি, ওঁ পিতা নোঽসি। কেবলই তিনি প্রাণে ও প্রেমে আমাকে ভরে দিচ্ছেন, এই অনুভূতিটি যেন আমরা না হারাই। এই অনুভূতি যাঁদের কাছে অত্যন্ত উজ্জ্বল ছিল তাঁরাই বলেছেন—কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষোহ্যেবানন্দয়াতি। কেই বা কিছুমাত্র শরীরচেষ্টা প্রাণের চেষ্টা করত। আকাশে যদি আনন্দ না থাকতেন। এই আনন্দই সকলকে আনন্দ দিচ্ছেন।

২৮ চৈত্র

ভয় ও আনন্দ

ওঁ পিতা নোঽসি এই মন্ত্রে দুটি ভাবের সামঞ্জস্য আছে। এক দিকে পিতার সঙ্গে পুত্রের সাম্য আছে। পুত্রের মধ্যে পিতা আপনাকেই প্রকাশ করেছেন।

আর এক দিকে পিতা হচ্ছেন বড়ো, পুত্র ছোটো।

এক দিকে অভেদের গৌরব, আর-এক দিকে ভেদের প্রণতি। পিতার সঙ্গে অভেদ নিয়ে আমরা আনন্দ করতে পারি কিন্তু স্পর্ধা করতে পারি নে। আমার যেখানে সীমা আছে সেখানে মাথা নত করতে হবে।

কিন্তু এই নতির মধ্যে অপমান নেই। কেননা তিনি কেবলমাত্র আমার বড়ো নন তিনি আমার আপন, আমার পিতা। তিনি আমারই বড়ো, আমি তাঁরই ছোটো। তাঁকে প্রণাম করে আমি আমার বড়ো আমাকেই প্রণাম করি। এর মধ্যে বাইরের কোনো তাড়না নেই—জবরদস্তি নেই। যে বড়োর মধ্যে আমি আছি, যে বড়োর মধ্যেই পরিপূর্ণ সার্থকতা তাঁকে প্রণাম করাই একমাত্র স্বাভাবিক প্রণাম। কিছু পাব বলে প্রণাম নয়, কিছু দেব বলে প্রণাম নয়, ভয়ে প্রণাম নয়, জোরে প্রণাম নয়। আমারই অনন্ত গৌরবের উপলব্ধির কাছে প্রণাম। এই প্রণামটির মহত্ত্ব অনুভব করেই প্রার্থনা করা হয়েছে, নমস্তেঽস্তু, তোমাতে আমার নমস্কার সত্য হয়ে উঠুক।

তাঁকে পিতা নোঽসি বলে স্বীকার করলে তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের একটি পরিমাণ রক্ষা হয়। তাঁকে নিয়ে কেবল ভাবরসে প্রমত্ত হবার যে একটি উচ্ছৃঙ্খল আত্মবিস্মৃতি আছে সেটি আমাদের আক্রমণ করতে পারে না। সম্ভ্রমের দ্বারা আমাদের আনন্দ গাম্ভীর্য লাভ করে, অচঞ্চল গৌরব প্রাপ্ত হয়।

প্রাচীন বেদ সমস্ত মানব-সম্বন্ধের মধ্যে কেবল এই পিতার সম্বন্ধটিকেই ঈশ্বরের মধ্যে বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করেছেন। মাতার সম্বন্ধকেও সেখানে তাঁরা স্থান দেন নি।

কারণ, মাতার সম্বন্ধেও একদিকে যেন ওজন কম আছে, একদিকে সম্পূর্ণতার অভাব আছে।

মাতা সন্তানের সুখ দেখেন, আরাম দেখেন; তার ক্ষুধাতৃপ্তি করেন, তার শোকে সান্ত্বনা দেন, তার রোগে শুশ্রূষা করেন। এ সমস্তই সন্তানের উপস্থিত অভাবনিবৃত্তির প্রতিই লক্ষ্য করে।

পিতার দৃষ্টি সন্তানের সমস্ত জীবনের বৃহৎক্ষেত্রে। তার সমস্ত জীবন সমগ্রভাবে সার্থক হবে এই তিনি কামনা করেন। এইজন্যই সন্তানের আরাম ও সুখই তাঁর কাছে একান্ত নয়। এইজন্য তিনি সন্তানকে দুঃখও দেন। তাকে শাসন করেন, তাকে বঞ্চিত করেন, যাতে নিয়ম লঙ্ঘন করে ভ্রষ্টতা প্রাপ্ত না হয় সেদিকে তিনি সর্বদা সতর্ক থাকেন।

অর্থাৎ পিতার মধ্যে মাতার স্নেহ আছে কিন্তু সে-স্নেহ সংকীর্ণ সীমায় বদ্ধ নয় বলেই তাকে অতি প্রকট করে দেখা যায় না এবং তাকে নিয়ে যেমন ইচ্ছা খেলা চলে না।

সেইজন্যে পিতাকে নমস্কার করবার সময় বলা হয়েছে, নমঃ সম্ভবায় চ ময়োভবায় চ; যিনি সুখকর তাঁকে নমস্কার যিনি কল্যাণকর তাঁকে নমস্কার।

পিতা কেবল আমাদের সুখের আয়োজন করেন না, তিনি মঙ্গলের বিধান করেন।

সেইজন্তেই সুখেও তাঁকে নমস্কার, দুঃখেও তাঁকে নমস্কার। ওইখানেই পিতার পূর্ণতা; তিনি দুঃখ দেন।

উপনিষৎ একদিকে বলেছেন, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দ হতেই যা কিছু সমস্ত জন্মেছে। আবার আর-একদিকে বলেছেন, ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ। ইহার ভয়ে অগ্নি জলছে, ইহার ভয়ে সূর্য তাপ দিচ্ছে।

তাঁর আনন্দ উচ্ছৃঙ্খল আনন্দ নয়, তার মধ্যে একটি অমোঘ নিয়মের শাসন আছে। অনন্ত দেশে অনন্তকালে কোথাও একটি কণাও লেশমাত্র ভ্রষ্ট হতে পারে না। সেই অমোঘ নিয়মই হচ্ছে ভয়। তার সঙ্গে কিছুমাত্র চাতুরী খাটে না, সে কোথাও কাউকে তিলমাত্র প্রশ্রয় দেয় না।

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্। এই যা কিছু জগৎ সমস্তই প্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পিত হচ্ছে—সেই যে প্রাণ, যাঁর থেকে সমস্ত উদ্ভূত হয়েছে এবং যাঁর মধ্যে সমস্তই চলছে তিনি কী রকম? না, তিনি উদ্যত বজ্রের মতো মহা ভয়ংকর। সেইজন্তেই তো সমস্ত চলছে—নইলে বিশ্বব্যবস্থা উন্মত্ত প্রলাপের মতো অতি নিদারুণ হয়ে উঠত। আমাদের পিতা যে ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং। এই ভয়ের দ্বারাই অনাদি কাল থেকে সর্বত্র সকলের সীমা ঠিক আছে, সর্বত্র সকলের পরিমাণ রক্ষা হচ্ছে।

আমাদেরও যেদিকটা চলবার দিক, কী বাক্যে, কী ব্যবহারে সেই দিকে পিতা দাঁড়িয়ে আছেন—মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং। সেদিকে কোনো ব্যত্যয় নেই কোনো স্খলনের ক্ষমা নেই, কোনো পাপের নিষ্কৃতি নেই।

অতএব আমরা যখন বলি, পিতা নোঽসি, তার মধ্যে আদরের দাবি নেই, উন্মত্ততার প্রশ্রয় নেই। অত্যন্ত সংযত আত্মসংবৃত বিনম্র নমস্কার আছে। যে বলে পিতা নোঽসি, সে তাঁর সামনে "শান্তোদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতঃ" হয়ে থাকে। সে নিজেকে প্রত্যেক ক্ষুদ্র অধৈর্য ক্ষুদ্র আত্মবিস্মৃতি থেকে রক্ষা করে চলতে থাকে।

২৯ চৈত্র

নিয়ম ও মুক্তি

সুখ জিনিসটা কেবল আমার, কল্যাণ জিনিসটা সমস্ত জগতের। পিতার কাছে যখন প্রার্থনা করি—যদ্‌ভদ্রং তন্ন আসুব, যা ভালো তাই আমাদের দাও, তার মানে হচ্ছে সমস্ত জগতের ভালো আমাদের মধ্যে প্রেরণ করো। কারণ সেই ভালোই আমার পক্ষেও সত্য ভালো, আমার পক্ষেও নিত্য ভালো। যা বিশ্বের ভালো, তাই আমার ভালো কারণ যিনি বিশ্বের পিতা তিনিই আমার পিতা।

যেখানে কল্যাণ নিয়ে অর্থাৎ বিশ্বের ভালো নিয়ে কথা সেখানে অত্যন্ত কড়া নিয়ম। সেখানে উপস্থিত সুখসুবিধা কিছুই খাটে না; সেখানে ব্যক্তিবিশেষের আরাম বিরামের স্থান নেই। সেখানে দুঃখও শ্রেয়, মৃত্যুও বরণীয়।

যেখানে বিশ্বের ভালো নিয়ে কথা সেখানে সমস্ত নিয়ম একেবারে শেষ পর্যন্ত মানতেই হবে। সেখানে কোনো বন্ধন কোনো দায়কেই অস্বীকার করতে পারব না।

আমাদের পিতা এইখানেই মহদ্‌ভয়ং বজ্রমুদ্যতং। এইখানেই তিনি পুত্রকে এক চুল প্রশ্রয় দেন না। বিশ্বের ভাগ থেকে একটি কণা হরণ করেও তিনি কোনো বিশেষ পুত্রের পাতে দেন না। এখানে কোনো স্তব-স্তুতি অনুনয়-বিনয় খাটে না।

তবে মুক্তি কাকে বলে? এই নিয়মকে পরিপূর্ণভাবে আত্মসাৎ করে নেওয়াকেই বলে মুক্তি। নিয়ম যখন কোনো জায়গায় আমার বাইরের জিনিস হবে না সম্পূর্ণ আমার ভিতরকার জিনিস হবে তখনই সেই অবস্থাকে বলব মুক্তি।

এখনও নিয়মের সঙ্গে আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য হয় নি। এখনও চলতে ফিরতে বাধে। এখনও সকলের ভালোকে আমার ভালো বলে অনুভব করি নে। সকলের ভালোর বিরুদ্ধে আমার অনেক স্থানেই বিদ্রোহ আছে।

এইজন্যে পিতার সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ মিলন হচ্ছে না—পিতা আমার পক্ষে রুদ্র হয়ে আছেন। তাঁর শাসনকেই আমি পদে পদে অনুভব করছি তাঁর প্রসন্নতাকে নয়। পিতার মধ্যে পুত্রের সম্পূর্ণ মুক্তি হচ্ছে না।

অর্থাৎ মঙ্গল এখনও আমার পক্ষে ধর্ম হয়ে ওঠে নি। যার ধর্ম যেটা, সেটা তার পক্ষে বন্ধন নয় সেইটেই তার আনন্দ। চোখের ধর্ম দেখা, তাই দেখাতেই চোখের আনন্দ, দেখায় বাধা পেলেই তার কষ্ট। মনের ধর্ম মনন করা, মননেই তার আনন্দ, মননে বাধা পেলেই তার দুঃখ।

বিশ্বের ভালো যখন আমার ধর্ম হয়ে উঠবে তখন সেইটেতেই আমার আনন্দ এবং তার বাধাতেই আমার পীড়া হবে।

মায়ের ধর্ম যেমন পুত্রস্নেহ ঈশ্বরের ধর্মই তেমনি মঙ্গল। সমস্ত জগৎচরাচরের ভালো করাই তাঁর স্বভাব, তাতেই তাঁর আনন্দ।

আমাদের স্বভাবেও সেই মঙ্গল আছে, সমগ্র হিতেই নিজের হিতবোধ মানুষের একটা ধর্ম। এই ধর্ম স্বার্থের বন্ধন কাটিয়ে পূর্ণপরিণত হয়ে ওঠবার জন্যে নিয়তই মনুষ্যসমাজে প্রয়াস পাচ্ছে। আমাদের এই ধর্ম অপরিণত এবং বাধাগ্রস্ত বলেই আমরা দুঃখ পাচ্ছি, পূর্ণ মঙ্গলের সঙ্গে মিলনের আনন্দ ঘটে উঠছে না।

যতদিন ভিতরের থেকে এই পরিণতিলাভ না হবে, এই বাধা কেটে গিয়ে আমাদের স্বভাব নিজেকে উপলব্ধি না করবে ততদিন বাহিরের বন্ধন আমাদের মানতেই হবে। ছেলের পক্ষে যতদিন চলাফেরা স্বাভাবিক হয়ে না ওঠে, ততদিন ধাত্রী বাইরে থেকে তার হাত ধরে তাকে চালায়। তখনই তার মুক্তি হয়, যখন চলার শক্তি তার স্বাভাবিক শক্তি হয়।

অতএব নিয়মের শাসন থেকে আমরা মুক্তিলাভ করব নিয়মকে এড়িয়ে নয়, নিয়মকে আপন করে নিয়ে। আমাদের দেশে একটা শ্লোক প্রচলিত আছে—প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ, ষোলো বছর বয়স হলে পুত্রের প্রতি মিত্রের মতো ব্যবহার করবে।

তার কারণ কী? তার কারণ এই, যে পর্যন্ত না পুত্রের শিক্ষা পরিণতি লাভ করবে, অর্থাৎ সেই সমস্ত শিক্ষা তার স্বভাবসিদ্ধ হয়ে উঠবে, ততক্ষণ তার প্রতি একটি বাইরের শাসন রাখার দরকার হয়। বাইরের শাসন যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ পুত্রের সঙ্গে পিতার অন্তরের যোগ কখনোই সম্পূর্ণ হতে পারে না। যখনই সেই বাইরের শাসনের প্রয়োজন চলে যায় তখনই পিতাপুত্রের মাঝখানের আনন্দ-সম্বন্ধ একেবারে অব্যাহত হয়ে ওঠে। তখনই সমস্ত অসত্য সত্যে বিলীন হয়, অন্ধকার জ্যোতিতে উদ্‌ভাসিত হয়, মৃত্যু অমৃতে নিঃশেষিত হয়ে যায়। তখনই পিতার প্রকাশ পুত্রের কাছে সম্পূর্ণ হয়। তখনই যিনি রুদ্ররূপে আঘাত করেছিলেন তিনিই প্রসন্নতাদ্বারা রক্ষা করেন। ভয় তখন আনন্দে এবং শাসন তখন মুক্তিতে পরিণত হয়; সত্য তখন প্রিয়-অপ্রিয়ের দ্বন্দ্ববর্জিত সৌন্দর্যে উজ্জ্বল হয়, মঙ্গল তখন ইচ্ছা-অনিচ্ছার দ্বিধাবর্জিত প্রেমে এসে উপনীত হয়। তখনই আমাদের মুক্তি। সে মুক্তিতে কিছুই বাদ পড়ে না, সমস্ত সম্পূর্ণ হয়; বন্ধন শূন্য হয়ে যায় না, বন্ধনই অবন্ধন হয়ে ওঠে, কর্ম চলে যায় না কিন্তু কর্মই আসক্তিশূন্য বিরামস্বরূপ ধারণ করে।

৩০ চৈত্র

দশের ইচ্ছা

আমার সমস্ত জীবন একদিন তাঁকে পিতা নোহসি বলতে পারবে, আমি তাঁরই পুত্র এই কথাটা একদিন সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে, এই আকাঙ্ক্ষাটিকে উজ্জ্বল করে ধরে রাখা বড়ো কঠিন।

অথচ আমাদের মনে কত অত্যাকাঙ্ক্ষা আছে, কত অসাধ্যসাধনের সংকল্প আছে, কিছুতেই সেগুলি নিরস্ত হতে চায় না। বাইরে থেকে যদি বা খাদ্য জোগাতে নাও পারি তবু বুকের রক্ত দিয়ে তাকে পোষণ করি।

অথচ যে-আকাঙ্ক্ষা সকলের চেয়ে বড়ো, যা সকলের চেয়ে চরমের দিকে যায়, তাকে প্রতিদিন জাগ্রত করে রাখা এত শক্ত কেন?

তার কারণ আছে। আমরা মনে করি আকাঙ্ক্ষা জিনিসটা আমার নিজেরই মনের সামগ্রী—আমিই ইচ্ছা করছি এবং সে ইচ্ছার আরম্ভ আমারই মধ্যে।

বস্তুত তা নয়। আমার মধ্যে আমার চতুর্দিক ইচ্ছা করে। আমার জারক রস আমার জঠরেরই উৎপন্ন সামগ্রী বটে কিন্তু আমার ইচ্ছা কেবল আমারই মনের উৎপন্ন পদার্থ নয়। অনেকের ইচ্ছা আমার মধ্যে ইচ্ছিত হয়ে ওঠে।

মাড়োয়ারিদিগের মধ্যে অনেক লোকেই টাকাকে ইচ্ছা করে। মাড়োয়ারির ঘরে একটি ছোটো ছেলেও টাকার ইচ্ছাকে পোষণ করে। কিন্তু এই ইচ্ছা কি তার একান্ত নিজের ইচ্ছা? সে ছেলে কিছুমাত্র বিচার করে দেখে না টাকা জিনিসটা কেন লোভনীয়। টাকার সাহায্যে যে ভালো খাবে ভালো পরবে সে-কথা তার মনেও নেই। কারণ বস্তুতই টাকার লোভে সে ভালো খাওয়া পরা পরিত্যাগ করেছে। টাকার দ্বারা সে অন্য কোনো সুখকে চাচ্ছে না, অন্য সব সুখকে অবজ্ঞা করছে, সে টাকাকেই চাচ্ছে।

এমনতরো একটা অহেতুক চাওয়া নিশিদিন মাড়োয়ারি ছেলের মনে প্রচণ্ড হয়ে আছে তার কারণ, এই ইচ্ছা তার একলার নয়, সকলে মিলেই তাকে ইচ্ছা করাচ্ছে, কোনোমতেই তার ইচ্ছাকে থামতে দিচ্ছে না।

কোনো সমাজে যদি কোনো একটা নিরর্থক আচরণের বিশেষ গৌরব থাকে তবে অনেক লোককেই দেখা যাবে সেই আচারের জন্য তারা নিজের সুখসুবিধা পরিত্যাগ করে তাতেই নিযুক্ত আছে। দশজনে এইটে আকাঙ্ক্ষা করে এই হচ্ছে ওর জোর, আর কোনো তাৎপর্য নেই।

যে-দেশে অনেক লোকেই দেশকে খুব বড়ো জিনিস বলে জানে সে-দেশে বালকেও দেশের জন্যে প্রাণ দিতে ব্যগ্র হয়ে ওঠে। অন্য দেশে এই দেশানুরাগের উপযোগিতা উপকারিতা সম্বন্ধে যতই আলোচনা হ'ক না তবু দেশহিতের আকাঙ্ক্ষা সত্য হয়ে মনের মধ্যে জেগে ওঠে না। কারণ দশের ইচ্ছা প্রত্যেকের ইচ্ছাকে জন্ম দিচ্ছে না, পালন করছে না।

বিশ্বপিতার সঙ্গে পুত্ররূপে আমাদের মিলন হবে, রাজচক্রবর্তী হওয়ার চেয়েও এটা বড়ো ইচ্ছা। কিন্তু এতবড়ো ইচ্ছাকেও অহরহ সত্য করে জাগিয়ে রাখা কঠিন হয়েছে এই জন্যেই। আমার চারিদিকের লোক এই ইচ্ছাটা আমার মধ্যে করছে না। এর চেয়ে ঢের যৎসামান্য, এমন কি, ঢের অর্থহীন ইচ্ছাকেও তারা আমার মনে সত্য করে তুলেছে এবং তাকে কোনোমতে নিবে যেতে দিচ্ছে না।

এখানে আমাকে একলাই ইচ্ছা করতে হবে। এই একটি মহৎ ইচ্ছাকে আমার নিজের মধ্যেই আমার নিজের শক্তিতেই সার্থক করে রাখতে হবে। দশ জনের কাছে আনুকূল্য প্রত্যাশা করলে হতাশ হব।

শুধু তাই নয়, শত সহস্র ক্ষুদ্র অর্থকে কৃত্রিম অর্থকে সংসারের লোক রাত্রিদিন আমার কাছে অত্যন্ত বড়ো করে সত্য করে রেখেছে। সেই ইচ্ছাগুলিকে শিশুকাল হতে একেবারে আমার সংস্কারগত করে রেখেছে। তারা কেবলই আমার মনকে টানছে, আমার চেষ্টাকে কাড়ছে। বুদ্ধিতে যদি বা বুঝি তারা তুচ্ছ এবং নিরর্থক কিন্তু দশের ইচ্ছাকে ঠেলতে পারি নে।

দশের ইচ্ছা যদি কেবল বাইরে থেকে তাড়না করে তবে তাকে কাটিয়ে ওঠা যায় কিন্তু সে যখন আমারই ইচ্ছা আকার ধরে আমারই চূড়ার উপরে বসে হাল চেপে ধরে, আমি যখন জানতেও পারি নে যে বাইরে থেকে সে আমার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে তখন তার সঙ্গে লড়াই করবার ইচ্ছামাত্রও চলে যায়।

এত বড়ো একটা সম্মিলিত বিরুদ্ধতার প্রতিকূলে আমার একলা মনের ইচ্ছাটিকে জাগিয়ে রাখতে হবে এই হয়েছে আমার কঠিন সাধনা।

কিন্তু আশার কথা এই যে, নারায়ণকে যদি সারথি করি তবে অক্ষৌহিণী সেনাকে ভয় করতে হবে না। লড়াই এক দিনে শেষ হবে না কিন্তু শেষ হবেই, জিত হবে তার সন্দেহ নেই।

এই একলা লড়াইয়ের একটা মস্ত সুবিধা যে, এর মধ্যে কোনোমতেই ফাঁকি ঢোকাবার জো নেই। দশ জনের সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে কোনো কৃত্রিমতাকে ঘটিয়ে তোলবার আশঙ্কা নেই। নিতান্ত খাঁটি হয়ে চলতে হবে।

টাকা, বিদ্যা, খ্যাতি প্রভৃতির একটা আকর্ষণ এই যে সেগুলোকে নিয়ে সকলে মিলে কাড়াকাড়ি করে। অতএব আমি যদি তার কিছু পাই তবে অন্যের চেয়ে আমার জিত হয়। এইজন্যেই সমস্ত উপার্জনের মধ্যে এত ঈর্ষা ক্রোধ লোভ রয়েছে। এই জন্যে লোকে এত ফাঁকি চালায়। যার অর্থ কম সে প্রাণপণে দেখাতে চেষ্টা করে তার অর্থ বেশি, যার বিদ্যা অল্প সে সেটা যথাসাধ্য গোপন করবার চেষ্টায় ফেরে।

এইসকল জিনিসের দ্বারা মানুষ মানুষের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চায়, সুতরাং জিনিসে যদি কম পড়ে তবে ফাঁকিতে সেটা পূরণ করবার ইচ্ছা হয়। মানুষকে ঠকানোও একেবারে অসাধ্য নয়, এইজন্যে সংসারে অনেক প্রতারণা অনেক আড়ম্বর চলে, এইজন্যে ভিতরে যদি বা কিছু জমাতে পারি বাইরে তার সাজসরঞ্জাম করি অনেক বেশি।

যে-সব সামগ্রী দশের কাড়াকাড়ির সামগ্রী সেইগুলির সম্বন্ধে এই ফাঁকি অলক্ষ্যে নিজের অগোচরেও এসে পড়ে। ঠাট বজায় রাখবার চেষ্টাকে আমরা দোষের মনে করি নে। এমন কি, বাহিরের সাজের দ্বারা আমরা ভিতরের জিনিসকে পেলুম বলে নিজেকেও ভোলাই।

কিন্তু যেখানে আমার আকাঙ্ক্ষা ঈশ্বরের মধ্যেই প্রতিষ্ঠালাভের আকাঙ্ক্ষা সেখানে যদি ফাঁকি চালাবার চেষ্টা করি তবে যে একেবারে মূলেই ফাঁকি হবে। গয়লা দশের দুধে জল মিশিয়ে ব্যবসা চালাতে পারে কিন্তু নিজের দুধে জল মিশিয়ে তার মুনফা কী হবে।

অতএব এইখানে একেবারে সম্পূর্ণ সত্য হতে হবে। যিনি সত্যস্বরূপ তাঁকে কেউ কোনোদিন ফাঁকি দিয়ে পার পাবে না। যিনি অন্তর্যামী তাঁর কাছে জাল-জালিয়াতি খাটবে না। আমি তাঁর কাছে কতটা খাঁটি হলুম তা তিনিই জানবেন—মানুষকে যদি জানাবার ইচ্ছা মনের মধ্যে আসে তবে কোনো দিন জালদলিল বানিয়ে তাঁকে সুদ্ধ মানুষের হাটে বিকিয়ে দিয়ে বসে থাকবে। ওইখানে দশকে আসতে দিয়ো না, নিজেকে খুব করে বাঁচাও। তুমি যে তাঁকে চাও এই আকাঙ্ক্ষাটির দ্বারা তুমি তাঁকেই লাভ করতে চেষ্টা করো, এর দ্বারা মানুষকে ভোলাবার ইচ্ছা যেন তোমার মনের এক কোণেও না আসে। তোমার এই সাধনায় সবাই যদি তোমাকে পরিত্যাগ করে তাতে তোমার মঙ্গলই হবে, কারণ, ঈশ্বরের আসনে সবাইকে বসাবার প্রলোভন তোমার কেটে যাবে। ঈশ্বরকে যদি কোনোদিন পাও তবে কখনো তাঁকে একলা নিজের মধ্যে ধরে রাখতে পারবে না। কিন্তু সে একটি কঠিন সময়। দশের মধ্যে এসে পড়লেই জল মেশাবার লোভ সামলানো শক্ত হয়, মানুষ তখন মানুষকে চকস করে, তখন খাঁটি ভগবানকে

চালাতে পারি নে, লুকিয়ে লুকিয়ে খানিকটা নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে বসে থাকি। ক্রমে নিজের মিশালটাই বেড়ে উঠতে থাকে, ক্রমে সত্যের বিকারে অমঙ্গলের সৃষ্টি হয়। অতএব পিতাকে যেদিন পিতা বলতে পারব সেদিন পিতাই যেন সে-কথা আমার মুখ থেকে শোনেন, মানুষ যদি শুনতে পায় তো যেন পাশের ঘর থেকেই শোনে।

৩১ চৈত্র

বর্ষশেষ

যাওয়া আসায় মিলে সংসার। এই দুটির মাঝখানে বিচ্ছেদ নেই। বিচ্ছেদ আমরা মনে মনে কল্পনা করি। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় একেবারেই এক হয়ে আছে। সর্বদাই এক হয়ে আছে। সেই এক হয়ে থাকাকেই বলে জগৎসংসার।

আজ বর্ষশেষের সঙ্গে কাল বর্ষারম্ভের কোনো ছেদ নেই—একেবারে নিঃশব্দে অতি সহজে এই শেষ ওই আরম্ভের মধ্যে প্রবেশ করছে।

কিন্তু এই শেষ এবং আরম্ভের মাঝখানে একবার থেমে দাঁড়ানো আমাদের পক্ষে দরকার। যাওয়া এবং আসাকে একবার বিচ্ছিন্ন করে জানতে হবে, নইলে এই দুটিকে মিলিয়ে জানতে পারব না।

সেইজন্যে আজ বর্ষশেষের দিনে আমরা কেবল যাওয়ার দিকেই মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছি। অস্তাচলকে সম্মুখে রেখে আজ আমাদের পশ্চিম মুখ করে উপাসনা। যং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি—সমস্ত যাওয়াই যাঁর মধ্যে প্রবেশ করছে, দিবসের শেষ মুহূর্তে যাঁর পায়ের কাছে সকলে নীরবে ভূমিষ্ঠ হয়ে নত হয়ে পড়ছে, আজ সায়াহ্নে তাঁকে আমরা নমস্কার করব।

অবসানকে বিদায়কে মৃত্যুকে আজ আমরা ভক্তির সঙ্গে গভীরভাবে জানব—তার প্রতি আমরা অবিচার করব না। তাকে তাঁরই ছায়া বলে জানব, যস্য ছায়ামৃতম্ যস্য মৃত্যুঃ।

মৃত্যু বড়ো সুন্দর বড়ো মধুর। মৃত্যুই জীবনকে মধুময় করে রেখেছে। জীবন বড়ো কঠিন; সে সবই চায়, সবই আঁকড়ে ধরে; তার বজ্রমুষ্টি কৃপণের মতো কিছুই ছাড়তে চায় না। মৃত্যুই তার কঠিনতাকে রসময় করেছে, তার আকর্ষণকে আলগা করেছে; মৃত্যুই তার নীরস চোখে জল এনে দেয়, তার পাষাণস্থিতিকে বিচলিত করে।

আসক্তির মতো নিষ্ঠুর শক্ত কিছুই নেই; সে নিজেকেই জানে, সে কাউকে দয়া করে

না, সে কারও জন্যে কিছুমাত্র পথ ছাড়তে চায় না। এই আসক্তিই হচ্ছে জীবনের ধর্ম; সমস্তকেই সে নেবে বলে সকলের সঙ্গেই সে কেবল লড়াই করছে।

ত্যাগ বড়ো সুন্দর, বড়ো কোমল। সে দ্বার খুলে দেয়। সঞ্চয়কে সে কেবল এক জায়গায় স্তূপাকাররূপে উদ্ধত হয়ে উঠতে দেয় না। সে ছড়িয়ে দেয়, বিলিয়ে দেয়। মৃত্যুরই সেই ঔদার্য। মৃত্যুই পরিবেষণ করে, বিতরণ করে। যা এক জায়গায় বড়ো হয়ে উঠতে চায় তাকে সর্বত্র বিস্তীর্ণ করে দেয়।

সংসারের উপরে মৃত্যু আছে বলেই আমরা ক্ষমা করতে পারি। নইলে আমাদের মনটা কিছুতে নরম হত না। সব যায়, চলে যায়, আমরাও যাই। এই বিষাদের ছায়ায় সর্বত্র একটি করুণা মাখিয়ে দিয়েছে। চারিদিকে পূরবী রাগিণীর কোমল সুরগুলি বাজিয়ে তুলে আমাদের মনকে আর্দ্র করেছে। এই বিদায়ের সুরটি যখন কানে এসে পৌঁছোয় তখন ক্ষমা খুবই সহজ হয়ে যায়, তখন বৈরাগ্য নিঃশব্দে এসে আমাদের নেবার জেদটাকে দেবার দিকে আস্তে আস্তে ফিরিয়ে দেয়।

কিছুই থাকে না এইটে যখন জানি তখন পাপকে দুঃখকে ক্ষতিকে আর একান্ত বলে জানি নে। দুর্গতি একটা ভয়ংকর বিভীষিকা হয়েই উঠত যদি জানতুম সে যেখানে আছে সেখান থেকে তার আর নড়চড় নেই। কিন্তু আমরা জানি সমস্তই সরছে এবং সেও সরছে সুতরাং তার সম্বন্ধে আমাদের হতাশ হতে হবে না। অনন্ত চলার মাঝখানে পাপ কেবল একটা জায়গাতেই পাপ, কিন্তু সেখান থেকে সে এগোচ্ছে। আমরা সব সময়ে দেখতে পাই নে কিন্তু সে চলছে। ওইখানেই তার পথের শেষ নয়—সে পরিবর্তনের মুখে, সংশোধনের মুখেই রয়েছে। পাপীর মধ্যে পাপ যদি স্থির হয়েই থাকত তাহলে সেই স্থিরত্বের উপর রুদ্রের অসীম শাসনদণ্ড ভয়ানক ভার হয়ে তাকে একেবারে বিলুপ্ত করে দিত। কিন্তু বিধাতার দণ্ড তো তাকে এক জায়গায় চেপে রাখছে না, সেই দণ্ড তাকে তাড়না করে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই চালানোই তাঁর ক্ষমা। তাঁর মৃত্যু কেবলই মার্জনা করছে, কেবলই ক্ষমার অভিমুখে বহন করছে।

আজ বর্ষশেষ আমাদের জীবনকে কি তাঁর সেই ক্ষমার দ্বারে এনে উপনীত করবে না? যার উপরে মরণের শিলমোহর দেওয়া আছে, যা যাবার জিনিস তাকে কি আজও আমরা যেতে দেব না। বছর ভরে যেসব পাপের আবর্জনা সঞ্চয় করেছি, আজ বৎসরকে বিদায় দেবার সময় কি তার কিছুই বিদায় দিতে পারব না? ক্ষমা করে ক্ষমা নিয়ে নির্মল হয়ে নব বৎসরে প্রবেশ করতে পাব না?

আজ আমার মুষ্টি শিথিল হ'ক। কেবল কাড়ব এবং কেবল রাখব এই করে কোনো সুখ কোনো সার্থকতা পাই নি। যিনি সমস্ত গ্রহণ করেন আজ তাঁর সম্মুখে এসে,

ছাড়ব এবং মরব এই কথাটা আমার মন বলুক। আজ তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ ছাড়তে সম্পূর্ণ মরতে এক মুহূর্তে পারব না; তবু ওই দিকেই মন নত হ'ক, নিজেকে দেবার দিকেই তার অঞ্জলি প্রসারিত করুক, সূর্যাস্তের সুরেই বাঁশি বাজতে থাক্, মৃত্যুর মোহন রাগিণীতেই প্রাণ কেঁদে উঠুক। নববর্ষের ভারগ্রহণের পূর্বে আজ সন্ধ্যাবেলায় সেই সর্বভার মোচনের সমুদ্রতটে সকল বোঝাই নামিয়ে দিয়ে আত্মসমর্পণের মধ্যে অবগাহন করি, নিস্তরঙ্গ নীল জলরাশির মধ্যে শীতল হই, বৎসরের অবসানকে অন্তরের মধ্যে পূর্ণভাবে গ্রহণ করে শুদ্ধ হই শান্ত হই পবিত্র হই।

৩১ চৈত্র

অনন্তের ইচ্ছা

আমার শরীরের মধ্যে কতকগুলি ইচ্ছা আছে যা আমার শরীরের গোচর। যেমন আমার খেতে ইচ্ছা করে, স্নান করতে ইচ্ছা করে, শীতের সময় গরম হতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু সমস্ত শরীরের মধ্যে একটি ইচ্ছা আছে যা আমার অগোচরেই আছে। সেটি হচ্ছে স্বাস্থ্যের ইচ্ছা সে আমাকে খবর না জানিয়েই রোগে এবং অরোগে নিয়ত কাজ করছে। সে ব্যাধির সময় কত রকম প্রতিকারের আশ্চর্য ব্যবস্থা করছে তা আমরা জানিই নে এবং অরোগের সময় সমস্ত শরীরের মধ্যে বিচিত্র ক্রিয়ার সামঞ্জস্য-স্থাপনার জন্যে তার কৌশলের অন্ত নেই, তারও কোনো খবর সে আমাদের জানায় না। এই স্বাস্থ্যের ইচ্ছাটি শরীরের মূলে আমাদের চেতনার অগোচরে রাত্রিদিন নিদ্রায় জাগরণে অবিশ্রাম বিরাজ করছে।

শরীর সম্বন্ধে যে ব্যক্তি জ্ঞানী তিনি এইটিকেই জানেন। তিনি জানেন আমাদের মধ্যে একটি স্বাস্থ্যতত্ত্ব আছে। শরীরের এই মূল অব্যক্ত ইচ্ছাটিকে যিনি জেনেছেন তিনি শরীরগত সমস্ত ব্যক্ত ইচ্ছাকে এর অনুগত করে তোলেন। ব্যক্ত ইচ্ছা যখন খাব বলে আবদার করছে তখন তাকে তিনি এই অব্যক্ত স্বাস্থ্যের ইচ্ছারই শাসনে নিয়মিত করবার চেষ্টা করেন। শরীর সম্বন্ধে এইটেই হচ্ছে সাধনা।

পাঁচজনের সঙ্গে মিলে আমরা যে একটা সামাজিক শরীর রচনা করে আছি, তার মধ্যেও ব্যক্ত এবং অব্যক্ত ইচ্ছা আছে। সমাজের প্রত্যেকের নিজের স্বার্থ সুবিধা সুখ ও স্বাধীনতার জন্যে যে ইচ্ছা এইটেই তার ব্যক্ত ইচ্ছা। সকলেই বেশি পেতে চাচ্ছে, সকলেই জিততে চাচ্ছে, যত কম মূল্য দিয়ে যত বেশি পরিমাণ আদায় করতে পারে এই

সকলের ইচ্ছা। এই ইচ্ছার সংঘাতে কত ফাঁকি কত যুদ্ধ কত দলাদলি চলছে তার আর সীমা নেই।

কিন্তু এরই মধ্যে একটি অব্যক্ত ইচ্ছা ধ্রুব হয়ে আছে। তাকে প্রত্যক্ষ দেখা যাচ্ছে না কিন্তু সে আছেই না থাকলে কোনোমতেই সমাজ রক্ষা পেত না, সে হচ্ছে মঙ্গলের ইচ্ছা। অর্থাৎ সমস্ত সমাজের সুখ হ'ক ভালো হ'ক এই ইচ্ছা প্রত্যেকের মধ্যে নিগূঢ়ভাবেই আছে। এই থাকার উপরেই সমাজ বেঁধে উঠেছে, কোনো প্রত্যক্ষ সুবিধার উপরে নয়।

সমাজ সম্বন্ধে যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা এইটেই জেনেছেন। তাঁরা সমুদয় সুখ সুবিধা স্বাধীনতার ব্যক্ত ইচ্ছাকে এই গভীরতর অব্যক্ত মঙ্গল ইচ্ছার অনুগত করতে চেষ্টা করেন। তাঁরা এই নিগূঢ় নিত্য ইচ্ছার কাছে সমস্ত অনিত্য ইচ্ছাকে ত্যাগ করতে পারেন।

আমাদের আত্মার মধ্যেও ব্যক্ত এবং অব্যক্ত ইচ্ছা আছে। আত্মা আপনাকে নানা দিকে বড়ো বলে অনুভব করতে চায়। সে ধনে বড়ো বিদ্যায় বড়ো খ্যাতিতে বড়ো হয়ে নিজেকে বড়ো জানতে চায়। এর জন্যে কাড়াকাড়ি মারামারির অন্ত নেই।

কিন্তু তার মধ্যে প্রতিনিয়ত একটি অব্যক্ত ইচ্ছা রয়েইছে। সকলের বড়ো, যিনি অনন্ত অখণ্ড এক, সেই ব্রহ্মের মধ্যে মিলনেই নিজেকে উপলব্ধি করবার ইচ্ছা তার মধ্যে নিগূঢ়রূপে ধ্রুবরূপে রয়েছে। এই অব্যক্ত ইচ্ছাই তার সকলের চেয়ে বড়ো ইচ্ছা।

তিনিই আত্মবিৎ যিনি এই কথাটি জানেন। তিনি আত্মার সমস্ত ইচ্ছাকে সেই নিগূঢ় এক ইচ্ছার অধীন করেন।

শরীরের নানা ইচ্ছা ঐক্যলাভ করেছে একটি একের মধ্যে সেইটি হচ্ছে স্বাস্থ্যের ইচ্ছা, এই গভীর ইচ্ছাটি শরীরের সমস্ত বর্তমান ইচ্ছাকে অতিক্রম করে অনাগতের মধ্যে চলে গেছে। শরীরের যে ভবিষ্যৎটি এখন নেই সেই ভবিষ্যৎকেও সে অধিকার করে রয়েছে।

সমাজশরীরেও নানা ইচ্ছা এক অন্তরতম গোপন ইচ্ছার মধ্যে ঐক্যলাভ করেছে; সে ওই মঙ্গলইচ্ছা। সে ইচ্ছাও বর্তমান সুখদুঃখের সীমা ছাড়িয়ে ভবিষ্যতের অভিমুখে চলে গেছে।

আত্মার অন্তরতম ইচ্ছা দেশে কালে কোথাও বদ্ধ নয়। তার যে-সকল ইচ্ছা কেবল পৃথিবীতেই সার্থক হতে পারে সেইসকল ইচ্ছার মধ্যেই তার সমাপ্তি নয়, অনন্তের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষাই তার জ্ঞান প্রেম কর্মকে কেবলই আকর্ষণ করছে; সে যেখানে গিয়ে পৌঁছচ্ছে সেখানে গিয়ে থামতে পারছে না। কেবলই ছাড়িয়ে নিয়ে যাবার ইচ্ছা তার সমস্ত ইচ্ছার ভিতরে নিরন্তর জাগ্রত হয়ে রয়েছে।

শরীরের মধ্যে এই স্বাস্থ্যের শান্তি, সমাজের মধ্যে মঙ্গল এবং আত্মার মধ্যে অদ্বিতীয়ের প্রেম, ইচ্ছারূপে বিরাজ করছে। এই ইচ্ছা অনন্তের ইচ্ছা, ব্রহ্মের ইচ্ছা। তাঁর এই ইচ্ছার সঙ্গে আমাদের সচেতন ইচ্ছাকে সংগত করে দেওয়াই আমাদের মুক্তি। এই ইচ্ছার সঙ্গে অসামঞ্জস্যই আমাদের বন্ধন, আমাদের দুঃখ। ব্রহ্মের যে ইচ্ছা আমাদের মধ্যে আছে সে আমাদের দেশকালের বাইরের দিকে নিয়ে যাবার ইচ্ছা, কোনো বর্তমানের বিশেষ স্বার্থ বা সুখের মধ্যে আবদ্ধ করবার ইচ্ছা নয়। সে-ইচ্ছা কিনা তাঁর প্রেম এইজন্যে সে তাঁরই দিকে আমাদের টানছে। এই অনন্ত প্রেম যা আমাদের মধ্যেই আছে, তার সঙ্গে আমাদের প্রেমকে যোগ করে দিয়ে আমাদের আনন্দকে বাধামুক্ত করে দেওয়াই আমাদের সাধনা। কী শরীরে, কী সমাজে, কী আত্মায়, সর্বত্রই আমরা এই যে দুটি ইচ্ছার ধারাকে দেখতে পাচ্ছি, একটি আমাদের গোচর অথচ চিরপরিবর্তনশীল, আর-একটি আমাদের অগোচর অথচ চিরন্তন; একটি কেবল বর্তমানের প্রতিই আকৃষ্ট, আর একটি অনাগতের দিকে আকর্ষণকারী; একটি কেবল ব্যক্তিবিশেষের মধ্যেই বদ্ধ, আর একটি নিখিলের সঙ্গে যোগযুক্ত। এই দুটি ইচ্ছার গতি নিরীক্ষণ করো, এর তাৎপর্য গ্রহণ করো। এদের উভয়ের মধ্যে মিলিত হবার যে একটা তত্ত্ব বিরোধের দ্বারাই নিজেকে ব্যক্ত করছে সেইটি উপলব্ধি করে এই মিলনের জন্যই সমস্ত জীবন প্রতিদিনই আপনাকে প্রস্তুত করো।

৩ বৈশাখ

পাওয়া ও না-পাওয়া

সেই পাওয়াতেই মানুষের মন আনন্দিত যে পাওয়ার সঙ্গে না-পাওয়া জড়িত হয়ে আছে।

যে-সুখ কেবলমাত্র পাওয়ার দ্বারাই আমাদের উন্মত্ত করে তোলে না—অনেকখানি না-পাওয়ার মধ্যে যার স্থিতি আছে বলেই যার ওজন ঠিক আছে—সেইজন্যেই যাকে আমরা গভীর সুখ বলি—অর্থাৎ, যে-সুখের সকল অংশই একেবারে সুস্পষ্ট সুব্যক্ত নয়, যার এক অংশ নিগূঢ়তার মধ্যে অগোচর, যা প্রকাশের মধ্যেই নিঃশেষিত নয়, তাকেই আমরা উচ্চ শ্রেণীর সুখ বলি।

পেট ভরে আহার করলে পর আহার করবার সুখটা সম্পূর্ণ পাওয়া যায়, দর্শনে স্পর্শনে ঘ্রাণে স্বাদে সর্বপ্রকারে তাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা হয়। সে-সুখের প্রতি যতই লোভ থাকুক মানুষ তাকে আনন্দের কোঠায় ফেলে না।

কিন্তু যে-সৌন্দর্যবোধকে আমরা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়বোধের দ্বারা সেরে ফেলতে পারি নে—যা বীণার অনুরণনের মতো চেতনার মধ্যে স্পন্দিত হতে থাকে, যা সমাপ্ত হতেই চায় না, সে-আনন্দকে আমরা আহারের আনন্দের সঙ্গে এক শ্রেণীতে গণ্যই করি নে। কেবলমাত্র পাওয়া তাকে অপমানিত করে না, না পাওয়া তাকে গৌরব দান করে।

আমরা জগতে পাওয়ার মতো পাওয়া তাকেই বলি যে-পাওয়ার মধ্যে অনির্বচনীয়তা আছে। যে-জ্ঞান কেবলমাত্র একটি খবর, তার মূল্য অতি অল্প কেননা, সেটা একটা সংকীর্ণ জানার মধ্যেই ফুরিয়ে যায়। কিন্তু যে জ্ঞান তথ্য নয়, তত্ত্ব, অর্থাৎ যাকে কেবল একটি ঘটনার মধ্যে নিঃশেষ করা যায় না, যা অসংখ্য অতীত ঘটনার মধ্যেও আছে এবং যা অসংখ্য ভাবী ঘটনার মধ্যেও আপনাকে প্রকাশ করবে, যা কেবল ঘটনা-বিশেষের মধ্যে ব্যক্ত বটে কিন্তু অনন্তের মধ্যে অব্যক্তরূপে বিরাজমান, সেই জ্ঞানেই আমাদের আনন্দ; কেবলমাত্র বিচ্ছিন্ন তুচ্ছ খবরে নিতান্ত জড়বুদ্ধি অলস লোকের বিলাস।

ক্ষণিক আমোদ বা ক্ষণিক প্রয়োজনে আমরা অনেক লোকের সঙ্গে মিলি, আমাদের কাছে তারা সেইটুকুর মধ্যেই নিঃশেষিত। কিন্তু যে আমার প্রিয়, কোনো এক সময়ের আলাপে আমোদে কোনো এক সময়ের প্রয়োজনে তার শেষ পাই নে। তার সঙ্গে যে-সময়ে যে-আলাপে যে-কর্মে নিযুক্ত আছি, সে-সময়কে সেই আলাপকে সেই কর্মকে বহুদূরে ছাড়িয়ে সে রয়েছে। কোনো বিশেষ দেশে বিশেষ কালে বিশেষ ঘটনায় আমরা তাকে সমাপ্ত করলুম বলে মনেই করতে পারি নে, সে আমার কাছে প্রাপ্ত অথচ অপ্রাপ্ত, এই অপ্রাপ্তি তাকে আমার কাছে এমন আনন্দময় করে রেখেছে।

এর থেকে বোঝা যায় আমাদের আত্মা যে পেতেই চাচ্ছে তা নয় সে না পেতেও চায়। এইজন্যেই সংসারের সমস্ত দৃষ্টস্পৃষ্টের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে বলছে কেবলই পেয়ে পেয়ে আমি শ্রান্ত হয়ে গেলুম, আমার না-পাওয়ার ধন কোথায়? সেই চির-দিনের না-পাওয়াকে পেলে যে আমি বাঁচি।

> যতোবাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
> আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।

বাক্য মন যাঁকে না পেয়ে ফিরে আসে সেই আমার না-পাওয়া ব্রহ্মের আনন্দে আমি সমস্ত ভয় হতে যে রক্ষা পেতে পারি।

এইজন্যেই উপনিষৎ বলেছেন, অবিজ্ঞাতম্ বিজানতাং বিজ্ঞাতম্ অবিজানতাম্, যিনি বলেন আমি তাঁকে জানি নি তিনিই জানেন, যিনি বলেন আমি জেনেছি তিনি জানেন না।

১৪।২৯

আমি তাঁকে জানতে পারলুম না এ কথাটা জানবার অপেক্ষা আছে। পাখি যেমন করে জানে আমি আকাশ পার হতে পারলুম না তেমনি করে জানা চাই, পাখি আকাশকে জানে বলেই সে জানে যে আকাশ পার হওয়া গেল না। আকাশ পার হওয়া গেল না জানে বলেই তার আনন্দ, এইজন্যেই সে আকাশে উড়ে বেড়ায়। কোনো প্রাপ্তি নয়, কোনো সমাপ্তি নয়, কোনো প্রয়োজন নয়, কিন্তু উড়েই তার আনন্দ।

পাখি আকাশকে জানে বলেই সে জানে আমি আকাশকে শেষ করে জানলুম না এবং এই জেনে না-জানাতেই তার আনন্দ, ব্রহ্মকে জানার কথাতেও এই কথাটাই খাটে। সেইজন্যেই উপনিষৎ বলেন, নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ, আমি যে ব্রহ্মকে বেশ জেনেছি এও নয় আমি যে একেবারে জানি নে এও নয়।

কেউ কেউ বলেন আমরা ব্রহ্মকে একেবারেই জানতে চাই, যেমন করে এই সমস্ত জিনিসপত্র জানি; নইলে আমার কিছুই হল না।

আমি বলছি আমরা তা চাই নে। যদি চাইতুম তাহলে সংসারই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এখানে জিনিসপত্রের অন্ত কোথায়? এর উপরে আবার কেন? নীড়ের পাখি যেমন আকাশকে চায় তেমনি আমরা এমন কিছুকে চাই যাকে পাওয়া যায় না।

আমার মনে আছে, যাঁরা ব্রহ্মকে চান তাঁদের প্রতি বিদ্রূপ প্রকাশ করে একজন পণ্ডিত অনেকদিন হল বলেছিলেন—একদল গাঁজাখোর রাত্রে গাঁজা খাবার সভা করেছিল। টিকা ধরাবার আগুন ফুরিয়ে যাওয়াতে তারা সংকটে পড়েছিল। তখন রক্তবর্ণ হয়ে চাঁদ আকাশে উঠছিল। একজন বললে, ওই যে, ওই আলোতে টিকা ধরাব। বলে টিকা নিয়ে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে চাঁদের অভিমুখে বাড়িয়ে ধরলে। টিকা ধরল না। তখন আর একজন বললে, দূর চাঁদ বুঝি অত কাছে! দে আমাকে দে। বলে সে আরও কিছু দূরে গিয়ে টিকা বাড়িয়ে ধরলে। এমনি করে সমস্ত গাঁজাখোরের শক্তি পরাস্ত হল—টিকা ধরল না।

এই গল্পের ভাবখানা হচ্ছে এই যে, যে-ব্রহ্মের সীমা পাওয়া যায় না তাঁর সঙ্গে কোনো সম্বন্ধস্থাপনের চেষ্টা এই রকম বিড়ম্বনা।

এর থেকে দেখা যাচ্ছে কারও কারও মতে সাংসারিক প্রার্থনা ছাড়া আমাদের মনে আর কোনো প্রার্থনা নেই। আমরা কেবল প্রয়োজনসিদ্ধিই চাই—টিকের আমাদের আগুন ধরাতে হবে।

এ কথাটা যে কত অমূলক তা ওই চাঁদের কথা ভাবলেই বোঝা যাবে। আমরা

দেশলাইকে যে ভাবে চাই চাঁদকে সে ভাবে চাই নে, চাঁদকে চাঁদ বলেই চাই, চাঁদ আমাদের বিশেষ কোনো সংকীর্ণ প্রয়োজনের অতীত বলেই তাকে চাই। সেই চির-অতৃপ্ত অসমাপ্ত পাওয়ার চাওয়াটাই সবচেয়ে বড়ো চাওয়া। সেইজন্যেই পূর্ণচন্দ্র আকাশে উঠলেই নদীতে নৌকায় ঘাটে গ্রামে পথে নগরের হর্ম্যতলে গাছের নীচে চারিদিক থেকে গান জেগে ওঠে, কারও টিকের আগুন ধরে না বলে কোথাও কোনো ক্ষোভ থাকে না।

ব্রহ্ম তো তাল বেতাল নন যে তাঁকে আমরা বশ করে নিয়ে প্রয়োজন সিদ্ধি করব। কেবল প্রয়োজন সিদ্ধিতেই পাওয়ার দরকার, আনন্দের পাওয়াতে ঠিক তার উলটো। তাতে না-পাওয়াটাই হচ্ছে সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস। যে-জিনিস আমরা পাই তাতে আমাদের যে সুখ সে অহংকারের সুখ। আমার আয়ত্তের জিনিস আমার ভৃত্য আমার অধীন, আমি তার চেয়ে বড়ো।

কিন্তু এই সুখই মানুষের সবচেয়ে বড়ো সুখ নয়। আমার চেয়ে যে বড়ো তার কাছে আত্মসমর্পণ করার সুখই হচ্ছে আনন্দ। আমার যিনি অতীত আমি তাঁরই, এইটি জানাতেই অভয়, এইটি অনুভব করাতেই আনন্দ। যেখানে ভূমানন্দ সেখানে আমি বলি, আমি আর পারলুম না, আমি হাল ছেড়ে দিলুম, আমি গেলুম। গেল আমার অহংকার, গেল আমার শক্তির ঔদ্ধত্য। এই না পেয়ে ওঠার মধ্যে এই না পাওয়ার মধ্যে নিজেকে একান্ত ছেড়ে দেওয়াই মুক্তি।

মানুষ তো সমাপ্ত নয়, সে তো হয়ে বয়ে যায় নি, সে যেটুকু হয়েছে সে তো অতি অল্পই। তার না-হওয়াই যে অনন্ত। মানুষ যখন আপনার এই হওয়া-রূপী জীবের বর্তমান প্রয়োজন সাধন করতে চায় তখন প্রয়োজনের সামগ্রীকে নিজের অভাবের সঙ্গে একেবারে সম্পূর্ণ করে চারিদিকে মিলিয়ে নিতে হয়, তার বর্তমানটি একেবারে সম্পূর্ণ বর্তমানকেই চাচ্ছে। কিন্তু সে তো কেবলই বর্তমান নয়, সে তো কেবলই হওয়া-রূপী নয়, তার না-হওয়ারূপী অনন্ত যদি কিছুই না পায় তবে তার আনন্দ নেই। পাওয়ার সঙ্গে অনন্ত না-পাওয়া তার সেই অনন্ত না-হওয়াকে আশ্রয় দিচ্ছে, খাদ্য দিচ্ছে। এই জন্যেই মানুষ কেবলই বলে, অনেক দেখলুম অনেক শুনলুম অনেক বুঝলুম, কিন্তু আমার না-দেখার ধন না-শোনার ধন না-বোঝার ধন কোথায়? যা অনাদি বলেই অনন্ত, যা হয় না বলেই যায় না, যাকে পাই নে বলেই হারাই নে, যা আমাকে পেয়েছে বলেই আমি আছি, সেই অশেষের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষ করবার জন্যেই আত্মা কাঁদছে। সেই অশেষকে সশেষ করতে চায় এমন ভয়ংকর নির্বোধ সে নয়। যাকে আশ্রয় করবে তাকে আশ্রয় দিতে চায় এমন সমূলে আত্মঘাতী নয়।

৪ বৈশাখ

হওয়া

পাওয়া মানেই আংশিকভাবে পাওয়া। প্রয়োজনের জন্যে আমরা যাকে পাই তাকে তো কেবল প্রয়োজনের মতোই পাই তার বেশি তো পাই নে। অন্ন কেবল খাওয়ার সঙ্গে মেলে, বস্ত্র কেবল পরার সঙ্গেই মেলে, বাড়ি কেবল বাসের সঙ্গে মেলে। এদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ওইসকল ক্ষুদ্র প্রয়োজনের সীমান্তে এসে ঠেকে, সেটাকে আর লঙ্ঘন করা যায় না।

এইরকম বিশেষ প্রয়োজনের সংকীর্ণ পাওয়াকেই আমরা লাভ বলি। সেইজন্যে ঈশ্বরকে লাভের কথা যখন ওঠে তখনও ভাষা এবং অভ্যাসের টানে ওইরকম লাভের কথাই মনে উদয় হয়। সে যেন কোনো বিশেষ স্থানে কোনো বিশেষ কালে লাভ, তাঁকে দর্শন মানে কোনো বিশেষ মূর্তিতে কোনো বিশেষ মন্দিরে বা বিশেষ কল্পনায় দর্শন।

কিন্তু পাওয়া বলতে যদি আমরা এই বুঝি তবে ঈশ্বরকে পাওয়া হতেই পারে না। আমরা যা-কিছুকে পেলুম বলে মনে করি সে আমাদের ঈশ্বর নয়। তিনি আমাদের পাওয়ার সম্পূর্ণ অতীত। তিনি আমাদের বিষয়-সম্পত্তি নন।

ও জায়গায় আমাদের কেবল হওয়া, পাওয়া নয়। তাঁকে আমরা পাব না, তাঁর মধ্যে আমরা হব। আমার সমস্ত শরীর মন হৃদয় নিয়ে আমি কেবলই হয়ে উঠতে থাকব। ছাড়তে ছাড়তে বাড়তে বাড়তে মরতে মরতে বাঁচতে বাঁচতে আমি কেবলই হব। পাওয়াটা কেবল এক অংশে পাওয়া, হওয়াটা যে একেবারে সমগ্রভাবে হওয়া, সে তো লাভ নয় সে বিকাশ।

ভীরু লোকে বলবে, বল কী। তুমি ব্রহ্ম হবে। এমন কথা তুমি মুখে আন কী করে!

হাঁ, আমি ব্রহ্মই হব। এ-কথা ছাড়া অন্য কথা আমি মুখে আনতে পারি নে। আমি অসংকোচেই বলব, আমি ব্রহ্ম হব। কিন্তু আমি ব্রহ্মকে পাব এতবড়ো স্পর্ধার কথা বলতে পারি নে।

তবে কি ব্রহ্মেতে আমাতে তফাত নেই? মস্ত তফাত আছে। তিনি ব্রহ্ম হয়েই আছেন, আমাকে ব্রহ্ম হতে হচ্ছে। তিনি হয়ে রয়েছেন, আমি হয়ে উঠছি, আমাদের দুজনের মধ্যে এই লীলা চলছে। হয়ে থাকার সঙ্গে হয়ে ওঠার নিয়ত মিলনেই আনন্দ।

নদী কেবলই বলছে আমি সমুদ্র হব। সে তার স্পর্ধা নয়—সে যে সত্য কথা,

সুতরাং সেই তার বিনয়। তাই সে সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে ক্রমাগতই সমুদ্র হয়ে যাচ্ছে—তার আর সমুদ্র হওয়া শেষ হল না।

বস্তুত চরমে সমুদ্র হতে থাকা ছাড়া তার আর গতিই নেই। তার দুই দীর্ঘ উপকূলে কত খেত কত শহর কত গ্রাম কত বন আছে তার ঠিক নেই। নদী তাদের তুষ্ট করতে পারে পুষ্ট করতে পারে, কিন্তু তাদের সঙ্গে মিলে যেতে পারে না। এই সমস্ত শহর গ্রাম বনের সঙ্গে তার কেবল আংশিক সম্পর্ক। নদী হাজার ইচ্ছা করলেও শহর গ্রাম বন হয়ে উঠতে পারে না।

সে কেবল সমুদ্রই হতে পারে। তার ছোটো সচল জল সেই বড়ো অচল জলের একই জাত। এইজন্যে তার সমস্ত উপকূল পার হয়ে বিশ্বের মধ্যে সে কেবল ওই বড়ো জলের সঙ্গেই এক হতে পারে।

সে সমুদ্র হতে পারে কিন্তু সে সমুদ্রকে পেতে পারে না। সমুদ্রকে সংগ্রহ করে এনে নিজের কোনো বিশেষ প্রয়োজনে তাকে কোনো বিশেষ গুহা গহ্বরে লুকিয়ে রাখতে পারে না, যদি কোনো ছোটো জলকে দেখিয়ে সে মূঢ়ের মতো বলে, হাঁ সমুদ্রকে এইখানে আমি নিজের সম্পত্তি করে রেখেছি তাকে উত্তর দেব, ও তোমার সম্পত্তি হতে পারে কিন্তু ও তোমার সমুদ্র নয়। তোমার চিরন্তন জলধারা এই জলটাকে চায় না, সে সমুদ্রকেই চায়। কেননা সে সমুদ্র হতে চাচ্ছে সে সমুদ্রকে পেতে চাচ্ছে না।

আমরাও কেবল ব্রহ্মই হতে পারি আর কিছুই হতে পারি নে। আর কোনো হওয়াতে তো আমরা সম্পূর্ণ হই নে। সমস্তই আমরা পেরিয়ে যাই; পেরোতে পারি নে ব্রহ্মকে। ছোটো সেখানে বড়ো হয়। কিন্তু তার সেই বড়ো হওয়া শেষ হয় না, এই তার আনন্দ।

আমরা এই আনন্দেরই সাধনা করব। আমরা ব্রহ্মে মিলিত হয়ে অহরহ কেবল ব্রহ্মই হতে থাকব। যেখানে বাধা পাব সেখানে হয় ভেঙে নয় এড়িয়ে যাব। অহংকার, স্বার্থ এবং জড়তা যেখানে নিষ্ফল বালির স্তূপ হয়ে পথরোধ করে দাঁড়াবে সেখানে প্রতিমুহূর্তে তাকে ক্ষয় করে ফেলব।

সকালবেলায় এইখানে বসে যে একটুখানি উপাসনা করি এই দেশকালবদ্ধ আংশিক জিনিসটাকে আমরা যেন সিদ্ধি বলে ভ্রম না করি। একটু রস, একটু ভাব, একটু চিন্তাই ব্রহ্ম নয়। এইটুকুমাত্রকে নিয়ে কোনোদিন জমছে কোনোদিন জমছে না বলে খুঁত খুঁত ক'রো না। এই সময় এবং এই অনুষ্ঠানটিকে একটি অভ্যস্ত আরামে পরিণত করে সেটাকে একটা পরমার্থ বলে কল্পনা ক'রো না। সমস্ত দিন সমস্ত চিন্তায় সমস্ত কাজে একেবারে সমগ্র নিজেকে ব্রহ্মের অভিমুখে চালনা করো—উলটোদিকে নয়,

নিজের দিকে নয়, কেবলই সেই ভূমার দিকে, শ্রেয়ের দিকে, অমৃতের দিকে। সমুদ্রে নদীর মতো তাঁর সঙ্গে মিলিত হও—তাহলে তোমার সমস্ত সত্তার ধারা কেবলই তিনিময় হতে থাকবে, কেবলই তুমি ব্রহ্ম হয়ে উঠবে। তাহলে তুমি তোমার সমস্ত জীবন দিয়ে সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে জানতে পারবে ব্রহ্মই তোমার পরমা গতি, পরমা সম্পৎ, পরম আশ্রয়, পরম আনন্দ, কেননা তাঁতেই তোমার পরম হওয়া।

৬ বৈশাখ

মুক্তি

এই যে সকালবেলাটি প্রতিদিন আমাদের কাছে প্রকাশিত হয় এতে আমাদের আনন্দ অল্পই। এই সকাল আমাদের অভ্যাসের দ্বারা জীর্ণ হয়ে গেছে।

অভ্যাস আমাদের নিজের মনের তুচ্ছতা দ্বারা সকল মহৎ জিনিসকেই তুচ্ছ করে দেয়। সে নাকি নিজে বদ্ধ এইজন্যে সে সমস্ত জিনিসকেই বদ্ধ করে দেয়।

আমরা যখন বিদেশে বেড়াতে যাই তখন কোনো নূতন পৃথিবীকে দেখতে যাই নে। এই মাটি এই জল এই আকাশকেই আমাদের অভ্যাস থেকে বিমুক্ত করে দেখতে যাই। আবরণটাকে ঘুচিয়ে এই পৃথিবীর উপরে চোখ মেললেই এই চিরদিনের পৃথিবীতেই সেই অভাবনীয়কে দেখতে পাই যিনি কোনোদিন পুরাতন নন। তখনই আনন্দ পাই।

যে আমাদের প্রিয়, অভ্যাস তাকে সহজে বেষ্টন করতে পারে না। এইজন্যই প্রিয়জন চিরদিনই অভাবনীয়কে অনন্তকে আমাদের কাছে প্রকাশ করতে পারে। তাকে যে আমরা দেখি সেই দেখাতেই আমাদের দেখা শেষ হয় না—সে আমাদের দেখা শোনা আমাদের সমস্ত বোধকেই ছাড়িয়ে বাকি থাকে। এইজন্যেই তাতে আমাদের আনন্দ।

তাই উপনিষৎ—আনন্দরূপমমৃতং—ঈশ্বরের আনন্দরূপকে অমৃত বলেছেন। আমাদের কাছে যা মরে যায় যা ফুরিয়ে যায় তাতে আমাদের আনন্দ নেই—যেখানে আমরা সীমার মধ্যে অসীমকে দেখি অমৃতকে দেখি সেইখানেই আমাদের আনন্দ।

এই অসীমই সত্য—তাঁকে দেখাই সত্যকে দেখা। যেখানে তা না দেখবে সেই খানেই বুঝতে হবে আমাদের নিজের জড়তা মূঢ়তা অভ্যাস ও সংস্কারের দ্বারা আমরা সত্যকে অবরুদ্ধ করেছি, সেইজন্যে তাতে আমরা আনন্দ পাচ্ছি নে।

বৈজ্ঞানিক বল, দার্শনিক বল, কবি বল, তাঁদের কাজই মানুষের এই সমস্ত মূঢ়তা ও

অভ্যাসের আবরণ মোচন করে এই জগতের মধ্যে সত্যের অনন্তরূপকে দেখানো, যা-কিছু দেখছি একেই সত্য করে দেখানো, নূতন কিছু তৈরি করা নয় কল্পনা করা নয়। এই সত্যকে মুক্ত করে দেখানোর মানেই হচ্ছে মানুষের আনন্দের অধিকার বাড়িয়ে দেওয়া।

যেমন ঘর ছেড়ে গিয়ে কোনো দূরদেশে যাওয়াকে অন্ধকারমুক্তি বলে না, ঘরের দরজাকে খুলে দেওয়াই বলে অন্ধকার-মোচন, তেমনি জগৎসংসারকে ত্যাগ করাই মুক্তি নয়; পাপ স্বার্থ অহংকার জড়তা মূঢ়তা ও সংস্কারের বন্ধন কাটিয়ে, যা দেখছি একেই সত্য করে দেখা, যা করছি একেই সত্য করে করা, যার মধ্যে আছি এরই মধ্যে সত্য করে থাকাই মুক্তি।

যদি এই কথাই সত্য হয় যে, ব্রহ্ম কেবল আপনার অব্যক্তস্বরূপেই আনন্দিত তাহলে তাঁর সেই অব্যক্তস্বরূপের মধ্যে বিলীন না হলে নিরানন্দের হাত থেকে আমাদের কোনোক্রমেই নিস্তার থাকত না। কিন্তু তা তো নয়, প্রকাশেই যে তাঁর আনন্দ। নইলে এই জগৎ তিনি প্রকাশ করলেন কেন? বাইরে থেকে কোনো প্রকাণ্ড পীড়া জোর করে তাঁকে প্রকাশ করিয়েছে? মায়া নামক কোনো একটা পদার্থ ব্রহ্মকে একেবারে অভিভূত করে নিজেকে প্রকাশমান করেছে?

সে তো হতেই পারে না। তাই উপনিষৎ বলেছেন, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি, এই যে প্রকাশমান জগৎ এ আর কিছু নয়, তাঁর মৃত্যুহীন আনন্দই রূপধারণ করে প্রকাশ পাচ্ছে। আনন্দই তাঁর প্রকাশ, প্রকাশেই তাঁর আনন্দ।

তিনি যদি প্রকাশেই আনন্দিত তবে আমি কি আনন্দের জন্যে অপ্রকাশের সন্ধান করব। তাঁর যদি ইচ্ছাই হয় প্রকাশ, তবে আমার এই ক্ষুদ্র ইচ্ছাটুকুর দ্বারা আমি তাঁর সেই প্রকাশের হাত এড়াই বা কেমন করে?

তাঁর আনন্দের সঙ্গে যোগ না দিয়ে আমি কিছুতেই আনন্দিত হতে পারব না। এর সঙ্গে যেখানেই আমার যোগ সম্পূর্ণ হবে সেইখানেই আমার মুক্তি হবে সেইখানেই আমার আনন্দ হবে। বিশ্বের মধ্যে তাঁর প্রকাশকে অবাধে উপলব্ধি করেই আমি মুক্ত হব—নিজের মধ্যে তাঁর প্রকাশকে অবাধে দীপ্যমান করেই আমি মুক্ত হব। ভববন্ধন অর্থাৎ হওয়ার বন্ধন ছেদন করে মুক্তি নয়—হওয়াকেই বন্ধনস্বরূপ না করে মুক্তিস্বরূপ করাই হচ্ছে মুক্তি। কর্মকে পরিত্যাগ করাই মুক্তি নয়, কর্মকে আনন্দোদ্ভব কর্ম করাই মুক্তি। তিনি যেমন আনন্দ প্রকাশ করছেন তেমনি আনন্দেই প্রকাশকে বরণ করা, তিনি যেমন আনন্দে কর্ম করছেন তেমনি আনন্দেই কর্মকে গ্রহণ করা, একেই বলি মুক্তি। কিছুই বর্জন না করে সমস্তকেই সত্যভাবে স্বীকার করে মুক্তি।

প্রতিদিনের এই যে অভ্যস্ত পৃথিবী আমার কাছে জীর্ণ, অভ্যস্ত প্রভাত আমার কাছে ম্লান, কবে এরাই আমার কাছে নবীন ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে? যেদিন প্রেমের দ্বারা আমার চেতনা নবশক্তিতে জাগ্রত হয়। যাকে ভালোবাসি আজ তার সঙ্গে দেখা হবে এই কথা স্মরণ হলে কাল যা কিছু শ্রীহীন ছিল আজ সেই সমস্তই সুন্দর হয়ে ওঠে। প্রেমের দ্বারা চেতনা যে পূর্ণশক্তি লাভ করে সেই পূর্ণতার দ্বারাই সে সীমার মধ্যে অসীমকে রূপের মধ্যে অপরূপকে দেখতে পায় তাকে নূতন কোথাও যেতে হয় না। ওই অভাবটুকুর দ্বারাই অসীম সত্য তার কাছে সীমায় বদ্ধ হয়ে ছিল।

বিশ্ব তাঁর আনন্দরূপ, কিন্তু আমরা রূপকে দেখছি আনন্দকে দেখছি নে, সেইজন্যে রূপ কেবল পদে পদে আমাদের আঘাত করছে, আনন্দকে যেমনি দেখব অমনি কেউ আর আমাদের কোনো বাধা দিতে পারবে না। সেই তো মুক্তি।

সেই মুক্তি বৈরাগ্যের মুক্তি নয় সেই মুক্তি প্রেমের মুক্তি। ত্যাগের মুক্তি নয় যোগের মুক্তি। লয়ের মুক্তি নয় প্রকাশের মুক্তি।

৭ বৈশাখ

মুক্তির পথ

যে-ভাষা জানি নে সেই ভাষার কাব্য যদি শোনা যায় তবে শব্দগুলো কেবলই আমার কানে ঠেকতে থাকে, সেই ভাষা আমাকে পীড়া দেয়।

ভাষার সঙ্গে যখন পরিচয় হয় তখন শব্দ আর আমার বাধা হয় না। তখন তার ভিতরকার ভাবটি গ্রহণ করবামাত্র শব্দই আনন্দকর হয়ে ওঠে, তখন তাকে কাব্য বলে বুঝতে পারি ভোগ করতে পারি।

বালক যখন কোনো দুর্বোধ ভাষার কাব্য শোনার পীড়া হতে মুক্তি প্রার্থনা করে তখন কাব্যপাঠ বন্ধ করে তাকে যে মুক্তি দেওয়া যায় সে মুক্তির মূল্য অতি তুচ্ছ। কিন্তু সেই পাঠটিকে তার পক্ষে সত্য করে তুলে পূর্ণ করে তুলে তাকে যে মূঢ়তার পীড়া হতে মুক্তি দেওয়া হয় সেই হচ্ছে যথার্থ মুক্তি, চিরন্তন মুক্তি।

পৃথিবীতে তেমনি হওয়াতেই যদি আমরা দুঃখ পাই, তাকে আমরা ভবযন্ত্রণা বলি। জগৎ যদি আমাদের আনন্দ না দেয়, তবে বিশ্বকবির এই বিরাট কাব্যকে অর্থহীন অমূলক পদার্থ বলে এর থেকে নিষ্কৃতি পাওয়াকেই আমরা চরিতার্থতা বলব।

কিন্তু এই কাব্যখানিকে আমরা নিজের ইচ্ছামত ছিঁড়ে পুড়িয়ে একেবারে এর চিহ্ন লোপ করে দিতে পারি এমন কথা মনে করবার কোনো হেতু নেই।

সমুদ্রকে বিলুপ্ত করে দিয়ে সমুদ্র পার হবার চেষ্টা করার চেয়ে সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে পার হওয়া ঢের বেশি সহজ। এ পর্যন্ত কোনো দেশের মানুষ সমুদ্র সেঁচে ফেলবার চেষ্টা করে নি, তারা সাধ্যমতো নৌকো জাহাজ বানিয়েছে।

বিশ্বকাব্যকে নিরর্থক অপবাদ দিয়ে পুড়িয়ে নষ্ট করবার তপস্যায় প্রবৃত্ত না হয়ে বিশ্বকাব্য শোনাকে সার্থক করে তোলাই হচ্ছে যথার্থ মুক্তি।

এই বিশ্বপ্রকাশের রূপের মধ্যে যখন আনন্দকে দেখব কেবলই রূপকে দেখব না, তখন রূপ আমাকে আর বাধা দেবে না। সে যে কেবল পথ ছেড়ে দেবে তা নয় আনন্দই দেবে। ভাবটি বোঝবামাত্র ভাষা যে কেবল তার পীড়াকরতা ত্যাগ করে তা নয় ভাষা তখন নিজের সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটন করে আনন্দময় হয়ে ওঠে, ভাবে ভাষায় অন্তরে বাহিরে মিলন তখন আমাদের মুগ্ধ করে। তখন সেই ভাষার উপরে যদি কেউ কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ করে সে আমাদের পক্ষে অসহ্য হয়ে ওঠে।

কিন্তু এই যে ভিতরকার আনন্দ এটা বাইরে থেকে বোঝা যায় না, এটা নিজের ভিতর থেকেই বুঝতে হয়। যে ভাষা জানি নে কেবলমাত্র বাইরে থেকে বইয়ের উপর চোখ বুলিয়ে বুলিয়ে কোনো কালেই তাকে পাওয়া যায় না। চোখ কান সেখান থেকে প্রতিহতই হতে থাকে। নিজের ভিতরকার জ্ঞানের শক্তিতেই তাকে বুঝতে হয়। যখন একবার ভিতর বুঝি তখন বাইরে আর কোনো বাধা থাকে না। তখন বাইরেও আনন্দ প্রকাশিত হয়।

আমার মধ্যে যখন আনন্দের আবির্ভাব হয় তখন বাইরের আনন্দরূপ আপনি আমার কাছে অমৃতে পূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। পাওয়াই পাওয়াকে টেনে নিয়ে আসে। মরুভূমির রসহীন তপ্ত বাতাসের ঊর্ধ্ব দিয়ে কত মেঘ চলে যায়—শুষ্ক হাওয়া তার কাছ থেকে বৃষ্টি আদায় করে নিতে পারে না। যেখানে হাওয়ার মধ্যেই জল আছে সেখানে সজল মেঘের সঙ্গে তার যোগ হয়ে বর্ষণ উপস্থিত হয়।

আমার মধ্যে যদি আনন্দ না থাকে তবে বিশ্বের চিরানন্দপ্রবাহ আমার উপর দিয়ে নিরর্থক হয়েই চলে যায়—আমি তার কাছ থেকে রস আদায় করতে পারি নে।

আমার মধ্যে জ্ঞানের উন্মেষ হলে তখন সেই জ্ঞানদৃষ্টিতেই জানতে পারি বিশ্বের কোথাও জ্ঞানের ব্যত্যয় নেই, তাকেই আমরা বিজ্ঞান বলি। যে মূঢ়, যার জ্ঞানদৃষ্টি খোলে নি সে বিশ্বেও সর্বত্র মূঢ়তা দেখে, বিশ্ব তার কাছে ভূতপ্রেত দৈত্যদানায় বিভীষিকাপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এমনি সকল বিষয়েই। আমার মধ্যে যদি প্রেম না জাগে আনন্দ না থাকে তবে

বিশ্ব আমার পক্ষে কারাগার। সেই কারাগার থেকে পালাবার চেষ্টা মিথ্যা, প্রেমকে জাগিয়ে তোলাই মুক্তি। কোনো ব্যায়ামের দ্বারা কোনো কৌশলের দ্বারা মুক্তি নেই।

বিজ্ঞানের সাধনা যেমন আমাদের প্রাকৃতিক জ্ঞানের বন্ধন মোচন করছে তেমনি মঙ্গলের সাধনাই আমাদের প্রেমের, আমাদের আনন্দের বন্ধন মোচন করে দেয়। এই মঙ্গলসাধনাই আমাদের সংকীর্ণ প্রেমকে প্রশস্ত, খামখেয়ালি প্রেমকে জ্ঞানসম্মত করে তোলে।

বিজ্ঞানে প্রকৃতির মধ্যে আমাদের জ্ঞান যোগযুক্ত হয়। সে বিচ্ছিন্ন জ্ঞান নয়, সে অতীতে বর্তমানে ভবিষ্যতে দূরে ও নিকটে সর্বত্র ঐক্যের দ্বারা অনন্তের সঙ্গে যুক্ত। মঙ্গলেও তেমনি প্রেম সর্বত্র যোগযুক্ত হয়। সমস্ত সাময়িকতা ও স্থানিকতাকে অতিক্রম করে সে অনন্তে মিলিত হয়। তার কাছে দূর নিকটের ভেদ ঘোচে, পরিচিত অপরিচিতের ভেদ ঘুচে যায়। তখনই প্রেমের বন্ধন মোচন হয়ে যায়। একেই তো বলে মুক্তি।

বুদ্ধদেব শূন্যকে মানতেন কি পূর্ণকে মানতেন সে তর্কের মধ্যে যেতে চাই নে। কিন্তু তিনি মঙ্গলসাধনার দ্বারা প্রেমকে বিশ্বচরাচরে মুক্ত করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর মুক্তির সাধনাই ছিল স্বার্থত্যাগ অহংকারত্যাগ ক্রোধত্যাগের সাধনা, ক্ষমার সাধনা দয়ার সাধনা প্রেমের সাধনা। এমনি করে প্রেম যখন অহং-এর শাসন অতিক্রম করে বিশ্বের মধ্যে অনন্তের মধ্যে মুক্ত হয়, তখন সে যা পায় তাকে যে নামই দাও না কেন, সে কেবল ভাষার বৈচিত্র্যমাত্র, কিন্তু সেই-ই মুক্তি। এই প্রেম যা যেখানে আছে কিছুকেই ত্যাগ করে না, সমস্তকেই সত্যময় করে পূর্ণতর করে উপলব্ধি করে। নিজেকে পূর্ণের মধ্যে সমর্পণ করবার কোনো বাধাই মানে না।

আত্মার মধ্যে পরমাত্মার অনন্ত প্রেম অনন্ত আনন্দকে অবাধে উপলব্ধি করবার উপায় হচ্ছে, পাপপরিশূন্য মঙ্গলসাধন। সেই উপলব্ধি যতই বন্ধনহীন যতই সত্য হতে থাকবে ততই বিশ্বসংসারে সমস্ত ইন্দ্রিয়বোধে চিন্তায় ভাবে কর্মে আমাদের আনন্দ অব্যাহত হবে। আমরা তখন পরমাত্মার দিক্‌ থেকেই জগৎকে দেখব—নিজের দিক থেকে নয়। তখনই জগতের সত্য আমাদের কাছে আনন্দে পরিপূর্ণ হবে, মহাকবির চিরন্তন কাব্য আমাদের কাছে সার্থক হয়ে উঠবে।

৭ বৈশাখ

৯

আশ্রম

শান্তিনিকেতনের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে

প্রভাতের সূর্য যে উৎসবদিনটির পত্রদলগুলিকে দিকে দিকে উদ্‌ঘাটিত করে দিলেন তারই মর্মকোষের মধ্যে প্রবেশ করবার জন্যে আজ আমাদের আহ্বান আছে। তার স্বর্ণরেণুর অন্তরালে যে মধু সঞ্চিত আছে, সেখান থেকে কি কোনো সুগন্ধ আজ আমাদের হৃদয়ের মাঝখানে এসে পৌঁছোয় নি? এই বিশ্ব-উপবনের রহস্য-নিলয়ের ভিতরটিতে প্রবেশের সহজ অধিকার আছে যার, সেই চিত্তমধুকর কি আজও এখনও জাগল না? কোনো বাতাসে এখনও সে কি খবর পায় নি? আজকের দিন যে একটি অনেক দিনের খবর নিয়ে বেরিয়েছে এবং সে যে সম্মুখের অনেক দিনের দিকেই চলেছে। সে যে দূর ভবিষ্যতের পথিক। আজ তাকে ধরে, দাঁড় করিয়ে আমাদের প্রশ্ন করতে হবে, তার যা কিছু কথা আছে সমস্ত আদায় করে নেওয়া চাই। সমস্ত মন দিয়ে না জিজ্ঞাসা করলে সে কাউকে কিছুই বলে না, তখন আমরা মনে করি, এই গান, এই বাদ্যধ্বনি, এই জনতার কোলাহল, এই বুঝি তার যা ছিল সমস্ত, আর বুঝি তার কোনো বাণী নেই। কিন্তু এমন করে তাকে যেতে দেওয়া হবে না, আজ এই সমস্ত কোলাহলের মধ্যে যে নিস্তব্ধ হয়ে আছে সেই পথিকটিকে জিজ্ঞাসা করো, আজ এ কিসের উৎসব?

প্রতি বৎসর বসন্তে আমের বনে ফলভরা শাখার মধ্যে দক্ষিণের বাতাস বইতে থাকে, সেই সময়ে আমের বনে তার বার্ষিক উৎসবের ঘটা। কিন্তু এই উৎসবের উৎসবত্ব কী নিয়ে, কিসের জন্যে? না, যে বীজ থেকে আমের গাছ জন্মেছে সেই বীজ অমর হয়ে গেছে এই শুভ খবরটি দেবার জন্যে। বৎসরে বৎসরে ফল ধরছে, সে ফলের মধ্যে সেই একই বীজ, সেই পুরাতন বীজ। সে আর কিছুতেই ফুরোচ্ছে না, সে নিত্যকালের পথে নিজেকে দ্বিগুণিত চতুর্গুণিত সহস্রগুণিত করে চলেছে।

শান্তিনিকেতনের সাংবৎসরিক উৎসবের সফলতার মর্মস্থান যদি উদ্‌ঘাটন করে দেখি তবে দেখতে পাব এর মধ্যে সেই বীজ অমর হয়ে আছে যে বীজ থেকে এই আশ্রমবনস্পতি জন্মলাভ করেছে।

সে হচ্ছে সেই দীক্ষাগ্রহণের বীজ। মহর্ষির সেই জীবনের দীক্ষা এই আশ্রম-বনস্পতিতে আজ আমাদের জন্যে ফলছে এবং আমাদের আগামীকালের উত্তর-বংশীয়দের জন্যে ফলতেই চলবে।

বহুকাল পূর্বে কোন্ একদিনে মহর্ষি দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন, সে খবর কজন লোকই বা জানত? যারা জেনেছিল যারা দেখেছিল তারা মনে মনে ঠিক করেছিল এই একটি ঘটনা আজকে ঘটল এবং আজকেই এটা শেষ হয়ে গেল।

কিন্তু এই দীক্ষাগ্রহণ ব্যাপারটিকে সেই সুদূর কালের ৭ই পৌষ নিজের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নিঃশেষ করে ফেলতে পারে নি। সেই একটি দিনের মধ্যেই একে কুলিয়ে উঠল না। সেদিন যার খবর কেউ পায় নি এবং তারপরে বহুকাল পর্যন্ত যার পরিচয় পৃথিবীর কাছে অজ্ঞাত ছিল, সেই ৭ই পৌষের দীক্ষার দিন আজ অমর হয়ে বৎসরে বৎসরে উৎসবফল প্রসব করছে।

আমাদের জীবনে কত শত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে কিন্তু চিরপ্রাণ তো তাদের স্পর্শ করে না, তারা ঘটছে এবং মিলিয়ে যাচ্ছে তার হিসেব কোথাও থাকছে না।

কিন্তু মহাপ্রাণ এসে কার জীবনের কোন্ মুহূর্তটিকে কখন লুকিয়ে স্পর্শ করে দেন, তার উপরে নিজের অদৃশ্য চিহ্নটি লিখে দিয়ে চলে যান, তারপরে তাকে কেউ না দেখুক না জানুক, সে হেলায় ফেলায় পড়ে থাক্, তাকে আবর্জনা বলে লোকে ঝেঁটিয়ে ফেলুক, সেদিনকার এবং তারপরে বহুদিনকার ইতিহাসের পাতে তার কোনো উল্লেখ না থাকুক, কিন্তু সে রয়ে গেল। জগতের রাশি রাশি মৃত্যু ও বিস্মৃতির মাঝখান থেকে সে আপনার অঙ্কুরটি নিয়ে অতি অনায়াসে মাথা তুলে ওঠে, নিত্যকালের সূর্যালোক এবং নিত্যকালের সমীরণ তাকে পালন করবার ভার গ্রহণ করে, সদাচঞ্চল সংসারের ভয়ংকর ঠেলাঠেলিতেও তাকে আর সরিয়ে ফেলতে পারে না।

মহর্ষির জীবনের একটি ৭ই পৌষকে সেই প্রাণস্বরূপ অমৃতপুরুষ একদিন নিঃশব্দে স্পর্শ করে গিয়েছেন, তার উপরে আর মৃত্যুর অধিকার রইল না। সেই দিনটি তাঁর জীবনের সমস্ত দিনকে ব্যাপ্ত করে কীরকম করে প্রকাশ পেয়েছে তা কারও অগোচর নেই। তারপরে তাঁর দীর্ঘ জীবনের মধ্যেও সেই দিনটির শেষ হয় নি। আজও সে বেঁচে আছে—শুধু বেঁচে নেই, তার প্রাণশক্তির বিকাশ ক্রমশই প্রবলতর হয়ে উঠছে।

পৃথিবীতে আমরা অধিকাংশ লোকই প্রচ্ছন্ন হয়ে আছি আমাদের মধ্যে সেই প্রকাশ নেই, যে-প্রকাশকে ঋষি আহ্বান করে বলেছেন, আবিরাবীর্ম এধি—হে

প্রকাশ, তুমি আমাতে প্রকাশিত হও। তাঁর সেই প্রকাশ যাঁর জীবনে আবির্ভূত তিনি তো আর নিজের ঘরের প্রাচীরের দ্বারা নিজেকে আড়াল করে রাখতে পারেন না এবং তিনি নিজের আয়ুটুকুর মধ্যেই নিজে সমাপ্ত হয়ে থাকেন না। নিজের মধ্যে থেকে তাঁকে সর্বদেশে এবং নিত্যকালে বাহির হতেই হবে। সেই জন্যেই উপনিষৎ বলেছেন

যদৈতম্ অনুপশ্যতি আত্মানং দেবম্ অঞ্জসা
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে।

যখন এই দেবতাকে এই পরমাত্মাকে এই ভূতভবিষ্যতের ঈশ্বরকে কোনো ব্যক্তি সাক্ষাৎ দেখতে পান তখন তিনি আর গোপনে থাকতে পারেন না।

তাঁকে যিনি সাক্ষাৎ দেখেছেন অর্থাৎ একেবারে নিজের অন্তরাত্মার মাঝখানেই দেখেছেন তাঁর আর পর্দা নেই, দেয়াল নেই, প্রাচীর নেই। তিনি সমস্ত দেশের, সমস্ত কালের। তাঁর কথার মধ্যে, আচরণের মধ্যে, নিত্যতার লক্ষণ আপনিই প্রকাশ পেতে থাকে।

এর কারণ কী? এর কারণ হচ্ছে এই যে, তিনি যে আত্মানং, সকল আত্মার আত্মাকে দেখেছেন। যারা সেই আত্মাকে দেখে নি তারা অহংকেই বড়ো করে দেখে। তারা বাহিরের দরজার কাছেই ঠেকে গিয়েছে। তারা কেবল আমার খাওয়া আমার পরা, আমার বুদ্ধি আমার মত, আমার খ্যাতি আমার বিত্ত—একেই প্রধান করে দেখে। এই যে অহংকার এতে সত্য নেই, নিত্য নেই; এ আলোকের দ্বারা নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না, আঘাতের দ্বারা প্রকাশ করতে চেষ্টা করে।

কিন্তু যে-লোক আত্মাকে দেখেছে সে আর অহং-এর দিকে দৃক্‌পাত করতে চায় না। তার সমস্ত অহং-এর আয়োজন পুড়ে ছাই হয়ে যায়। যে-প্রদীপে আলোকের শিখা ধরে নি সেই তো নিজের প্রচুর তেল ও সলতের সঞ্চয় নিয়ে গর্ব করে। আর যাতে আলো একবার ধরে গিয়েছে সে কি আর নিজের তেল সলতের দিকে ফিরে তাকায়? সে ওই আলোটির পিছনে তার সমস্ত তেল সমস্ত সলতে উৎসর্গ করে দেয়। কিন্তু সে একেবারে প্রকাশ হয়ে পড়ে, সে আর নিজের আড়ালে গোপনে থাকতে পারে না।

ন ততো বিজুগুপ্সতে। কেন? কেননা তিনি অনুপশ্যতি আত্মানং দেবং। তিনি আত্মাকে দেখেছেন, দেবকে দেখেছেন। দেব শব্দের অর্থ দীপ্তিমান। আত্মা যে দেব, আত্মা যে জ্যোতির্ময়। আত্মা যে স্বতঃপ্রকাশিত। অহং প্রদীপ মাত্র, আর আত্মা যে আলোক। অহং দীপ যখন এই দীপ্তিকে এই আত্মাকে উপলব্ধি করে তখন

সে কি আর অহংকারের সঞ্চয় নিয়ে থাকে? তখন সে আপনার সব দিয়েই সেই আলোককেই প্রকাশ করে।

সে যে তাঁকে দেখেছে যিনি ঈশানো ভূতভব্যস্য, যিনি অতীত ও ভবিষ্যতের অধিপতি। সেই জন্তেই সে যে সেই বৃহৎ কালের ক্ষেত্রেই আপনাকে এবং সব কিছুকেই দেখতে পায়। সে তো কোনো সাময়িক আসক্তির দ্বারা বদ্ধ হয় না, কোনো সাময়িক ক্ষোভের দ্বারা বিচলিত হতে পারে না। এই জন্তই তার বাক্য ও কর্ম নিত্য হয়ে ওঠে। তা কালে কালে ক্রমশই প্রবলতর হয়ে ব্যক্ত হতে থাকে। যদি বা কোনো এক সময়ে কোনো কারণে তা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তবে নিজের আচ্ছাদনকে দগ্ধ করে আবার নবীনতর উজ্জ্বলতায় সে দীপ্যমান হয়ে ওঠে।

মহর্ষির ৭ই পৌষের দীক্ষার উপরে আত্মার দীপ্তি পড়েছিল, তার উপরে ভূত ভবিষ্যতের যিনি ঈশান তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। এই জন্তে সেই দীক্ষা ভিতরে থেকে তাঁর জীবনকে ধনী গৃহের প্রস্তরকঠিন আচ্ছাদন থেকে সর্বদেশ সর্বকালের দিকে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছে। এবং সেই ৭ই পৌষ এই শান্তিনিকেতন আশ্রমকে সৃষ্টি করেছে এবং এখনও প্রতিদিন একে সৃষ্টি করে তুলছে।

তিনি আজ প্রায় অর্ধ শতাব্দী হল যেদিন এর সপ্তপর্ণের ছায়ায় এসে বসলেন সেদিন তিনি জানতেন না যে, তাঁর জীবনের সাধনা এইখানে নিত্য হয়ে বিরাজ করবে। তিনি ভেবেছিলেন নির্জন উপাসনার জন্তে এখানে তিনি একটি বাগান তৈরি করেছেন। কিন্তু ন ততো বিজুগুপ্সতে। যে-জায়গায় বড়ো এসে দাঁড়ান সে-জায়গাকে ছোটো বেড়া দিয়ে আর ঘেরা যায় না। ধনীর সন্তান নিজেকে যেমন পারিবারিক ধনমানসম্ভ্রমের মধ্যে ধরে রাখতে পারেন নি সকলের কাছে তাঁকে বেরিয়ে পড়তে হয়েছে, তেমনি এই শান্তিনিকেতনকেও তিনি আর বাগান করে রাখতে পারলেন না। এ তাঁর বিষয়সম্পত্তির আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে বেরিয়ে পড়েছে। এ আপনিই আজ আশ্রম হয়ে দাঁড়িয়েছে। যিনি ঈশানো ভূতভব্যস্য, তাঁর স্পর্শে বোলপুরের মাঠের এই ভূখণ্ডটুকু ভূত ও ভবিষ্যতের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে দেখা দিয়েছে।

এই আশ্রমটির মধ্যে ভারতবর্ষের একটি ভূতকালের আবির্ভাব আছে। সে হচ্ছে সেই তপোবনের কাল। যে-কালে ভারতবর্ষ তপোবনে শিক্ষালাভ করেছে, তপোবনে সাধনা করেছে এবং সংসারের কর্ম সমাধা করে তপোবনে জীবিতেশ্বরের কাছে জীবনের শেষ নিশ্বাস নিবেদন করে দিয়েছে। যে-কালে ভারতবর্ষ জল স্থল আকাশের সঙ্গে আপনার যোগ স্থাপন করেছে এবং তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে আপনার বিচ্ছেদ দূর করে দিয়ে—সর্বভূতেষু চাত্মানং—আত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দর্শন করেছে।

শুধু ভূতকাল নয়, এই আশ্রমটির মধ্যে একটি ভবিষ্যৎকালের আবির্ভাব আছে। কারণ, সত্য কোনো অতীতকালের জিনিস হতেই পারে না। যা একেবারেই হয়ে চুকে গেছে, যার মধ্যে ভবিষ্যতে আর হবার কিছুই নেই তা মিথ্যা, তা মায়া। বিশ্বপ্রকৃতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আত্মার সঙ্গে ভূমার যোগসাধনা এই যদি সত্য সাধনা হয়, তবে এই সাধনার মধ্যে এসে উপস্থিত না হলে কোনো কালের কোনো সমস্যার মীমাংসা হতে পারবে না। এই সাধনা না থাকলে সত্যের সঙ্গে মঙ্গলকে আমরা এক করে দেখতে পাব না, মঙ্গলের সঙ্গে সুন্দরের আমরা বিচ্ছেদ ঘটিয়ে বসব। এই সাধনা না থাকলে আমরা জগতে অনৈক্যকেই বড়ো করে জানব এবং স্বাতন্ত্র্যকেই পরম পদার্থ বলে জ্ঞান করব, পরস্পরকে খর্ব করে প্রবল হয়ে ওঠবার জন্য কেবলই ঠেলাঠেলি করতে থাকব। সমস্তকে এক করে নিয়ে যিনি শান্তং শিবং অদ্বৈতং-রূপে বিরাজ করছেন তাঁকে সর্বত্র উপলব্ধি করবার জন্যে না পাব অবকাশ না পাব মনের শান্তি।

অতএব সংসারের সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাত কাড়াকাড়ি-মারামারি যাতে একান্ত হয়ে উত্তপ্ত হয়ে না ওঠে সে জন্যে এক জায়গায় শান্তং শিবং অদ্বৈতং-এর সুরটিকে বিশুদ্ধভাবে জাগিয়ে রাখবার জন্যে তপোবনের প্রয়োজন। সেখানে ক্ষণিকের আবর্ত নয়, সেখানে নিত্যের আবির্ভাব, সেখানে পরস্পরের বিচ্ছেদ নয় সেখানে সকলের সঙ্গে যোগের উপলব্ধি। সেখানকারই প্রার্থনামন্ত্র হচ্ছে, অসতোমা সদ্গময়, তমসোমা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতংগময়।

সেই তপোবনটি মহর্ষির জীবনের প্রভাবে এখানে আপনি হয়ে উঠেছে। এখানকার বিরাট প্রান্তরের মধ্যে তপস্যার দীপ্তি আপনিই বিস্তীর্ণ হয়েছে। এখানকার তরুলতার মধ্যে সাধনার নিবিড়তা আপনিই সঞ্চিত হয়ে উঠেছে। ঈশানো ভূতভব্যস্য এখানকার আকাশের মধ্যে তাঁর একটি বড়ো আসন পেতেছেন। সেই মহৎ আবির্ভাবটি আশ্রমবাসী প্রত্যেকের মধ্যে প্রতিদিন কাজ করছে। প্রত্যেক দিনটি প্রান্তরের প্রান্ত হতে নিঃশব্দে উঠে এসে তাদের দুই চক্ষুকে আলোকের অভিষেকে নির্মল করে দিচ্ছে। সমস্ত দিনই আকাশ অলক্ষ্যে তাদের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে জীবনের সমস্ত সংকোচগুলিকে দুই হাত দিয়ে ধীরে ধীরে প্রসারিত করে দিচ্ছে। তাদের হৃদয়ের গ্রন্থি অল্পে অল্পে মোচন হচ্ছে, তাদের সংস্কারের আবরণ ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, তাদের ধৈর্য দৃঢ়তর ক্ষমা গভীরতর হয়ে উঠছে এবং আনন্দময় পরমাত্মার সঙ্গে তাদের অব্যবহিত চেতনাময় যোগের ব্যবধান একদিন ক্ষীণ হয়ে দূর হয়ে যাবে সেই শুভক্ষণের জন্যে তারা প্রতিদিন পূর্ণতর আশার সঙ্গে প্রতীক্ষা করে আছে। তারা দুঃখকে

অপমানকে আঘাতকে উদার শক্তির সঙ্গে বহন করবার জন্য দিনে দিনে প্রস্তুত হচ্ছে এবং যে জ্যোতির্ময় পরমানন্দধারা বিশ্বের দুই কূলকে উদ্বেল করে দিয়ে নিরন্তর-ধারায় দিগ্‌দিগন্তরে ঝরে পড়ে যাচ্ছে জীবনকে তারই কাছে নত করে ধরবার জন্যে তারা একটি আহ্বান শুনতে পাচ্ছে।

এই তপোবনটির মধ্যে একটি নিগূঢ় রহস্যময় সৃষ্টির কাজ চলছে সেই রহস্যটি আমাদের মধ্যে কে দেখতে পাচ্ছে! যে একটি জীবন দেহের আবরণ আজ ঘুচিয়ে দিয়ে পরমপ্রাণের পদপ্রান্তে আপনাকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দিয়েছে সেই জীবনের ভারমুক্ত স্বরমুক্ত অতি বিশুদ্ধ আনন্দ এখানকার নিস্তব্ধ আকাশের মধ্যে নির্মল ভক্তিরসে সরস একটি পবিত্র বাণীকে কেবলই বিকীর্ণ করছে, কেবলই বলছে তিনি আমার প্রাণের আরাম আত্মার শান্তি মনের আনন্দ, সে বলা আর শেষ হচ্ছে না। সেই আনন্দের কাজ আর ফুরোল না।

জগতে একমাত্র আনন্দই যে সৃষ্টি করে, সৃষ্টির শক্তি তো আর কিছুরই নেই। এখানকার আকাশপ্লাবী অবারিত আলোকের মাঝখানে বসে আনন্দের সঙ্গে তাঁর যে আনন্দ মিলেছিল, সেই আনন্দ সেই আনন্দসম্মিলন তো শূন্যতার মধ্যে বিলীন হতে পারে না। এই আনন্দই আজও সৃষ্টি করছে, এই আশ্রমকে সৃষ্টি করে তুলছে, এখানকার গাছপালা শ্যামলতার উপরে একটি প্রগাঢ় শান্তির সুস্নিগ্ধ অঞ্জন প্রতিদিন যেন নিবিড় করে মাখিয়ে দিচ্ছে। অনেকদিনের অনেক সুগভীর আনন্দ-মুহূর্ত এখানকার সূর্যোদয়কে, সূর্যাস্তকে এবং নিশিথ রাত্রের নীরব নক্ষত্রলোককে দেবর্ষি নারদের বীণার তারগুলির মতো অনির্বচনীয় ভক্তির সুরে আজও কম্পিত করে তুলছে। সেই আনন্দসৃষ্টির অমৃতময় রহস্য আমরা আশ্রমবাসীরা কি প্রতিদিন উপলব্ধি করতে পারব না? একদিন একজন সাধক অকস্মাৎ কোথা থেকে কোথায় যেতে এই ছায়াশূন্য বিপুল প্রান্তরের মধ্যে যুগল সপ্তপর্ণ গাছের তলায় বসলেন, সেই দিনটি আর মরল না। সেই দিনটি বিশ্বকর্মার সৃষ্টিশক্তির মধ্যে চিরদিনের মতো আটকা পড়ে গেল। শূন্য প্রান্তরের পটের উপরে রঙের পর রং, প্রাণের পর প্রাণ ফলিয়ে তুলতে লাগল। যেখানে কিছুই ছিল না, যেখানে ছিল বিভীষিকা সেখানে একটি পূর্ণতার মূর্তি প্রথমে আভাসে দেখা দিল তার পরে ক্রমে ক্রমে দিনে দিনে বর্ণে বর্ণে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল। এই যে আশ্চর্য রহস্য, জীবনের নিগূঢ় ক্রিয়া, আনন্দের নিত্যলীলা, সে কি আমরা এখানকার শালবনের মর্মরে, এখানকার আম্রবনের ছায়াতলে উপলব্ধি করতে পারব না? শরতের অপরিমেয় শুভ্রতা যখন এখানে শিউলি ফুলের অজস্র বিকাশের মধ্যে আপনাকে প্রভাতের পর প্রভাতে ব্যক্ত করে করে কিছুতে আর ক্লান্তি মানতে

চায় না তখন সেই অপর্যাপ্ত পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে আরও একটি অপরূপ শুভ্রতায় অমৃতবর্ষণ কি নিঃশব্দে আমাদের জীবনের মধ্যে অবতীর্ণ হতে থাকে না? এই পৌষের শীতের প্রভাতে দিক্‌প্রান্তের উপর থেকে একটি সূক্ষ্ম শুভ্র কুহেলিকার আচ্ছাদন যখন উঠে যায়, আমলকীকুঞ্জের ফলভারপূর্ণ কম্পিত শাখাগুলির মধ্যে উত্তর বায়ু সূর্যকিরণকে পাতায় পাতায় নৃত্য করাতে থাকে এবং সমস্ত দিন শীতের রৌদ্র এখানকার অবাধ-প্রসারিত মাঠের উপরকার সুদূরতাকে একটি অনির্বচনীয় বাণীর দ্বারা ব্যাকুল করে তোলে, তখন এর ভিতর থেকে আর একটি গভীরতর আনন্দ-সাধনার স্মৃতি কি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে না? একটি পবিত্র প্রভাব, একটি অপরূপ সৌন্দর্য, একটি পরম প্রেম কি ঋতুতে ঋতুতে ফলপুষ্পপল্লবের নব নব বিকাশে আমাদের সমস্ত অন্তঃকরণে তার অধিকার বিস্তার করছে না? নিশ্চয়ই করছে। কেননা এই খানেই যে একদিন সকলের চেয়ে বড়ো রহস্যনিকেতনের একটি দ্বার খুলে গিয়েছে। এখানে গাছের তলায় প্রেমের সঙ্গে প্রেম মিলেছে, দুই আনন্দ এক হয়েছে। যেই—এষঃ অস্য পরম আনন্দঃ, যে ইনি ইহার পরমানন্দ সেই ইনি এবং এ কতদিন এইখানে মিলেছে—হঠাৎ কত উষার আলোয়, কত দিনের অবসানবেলায়, কত নিশীথ রাত্রের নিস্তব্ধ প্রহরে—প্রেমের সঙ্গে প্রেম, আনন্দের সঙ্গে আনন্দ! সেদিন যে-দ্বার খোলা হয়েছে সেই দ্বারের সম্মুখে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি, কিছুই কি শুনতে পাব না? কাউকেই কি দেখা যাবে না? সেই মুক্ত দ্বারের সামনে আজ আমাদের উৎসবের মেলা বসেছে, ভিতর থেকে কি একটি আনন্দগান বাহির হয়ে এসে আমাদের এই সমস্ত দিনের কলরবকে সুধাসিক্ত করে তুলবে না? না, তা কখনোই হতে পারে না। বিমুখ চিত্তও ফিরবে, পাষাণহৃদয়ও গলবে, শুষ্ক শাখাতেও ফুল ফুটে উঠবে। হে শান্তিনিকেতনের অধিদেবতা, পৃথিবীতে যেখানেই মানুষের চিত্ত বাধামুক্ত পরিপূর্ণ প্রেমের দ্বারা তোমাকে স্পর্শ করেছে সেইখানেই অমৃতবর্ষণে একটি আশ্চর্য শক্তি সঞ্জাত হয়েছে। সে-শক্তি কিছুতেই নষ্ট হয় না, সে-শক্তি চারিদিকের গাছপালাকেও জড়িয়ে ওঠে, চারিদিকের বাতাসকে পূর্ণ করে। কিন্তু তোমার এই একটি আশ্চর্য লীলা, শক্তিকে তুমি আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ করে রেখে দিতে চাও না। তোমার পৃথিবী আমাদের একটি প্রচণ্ড টানে টেনে রেখেছে, কিন্তু তার দড়িদড়া তার টানাটানি কিছুই চোখে পড়ে না। তোমার বাতাস আমাদের উপর যে ভার চাপিয়ে রেখেছে সেটি কম ভার নয়, কিন্তু বাতাসকে আমরা ভারী বলেই জানি নে। তোমার সূর্যালোক নানাপ্রকারে আমাদের উপর যে শক্তিপ্রয়োগ করছে যদি গণনা করতে যাই তার পরিমাণ দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়ে যাই কিন্তু তাকে আমরা আলো বলেই জানি শক্তি বলে জানি নে।

তোমার শক্তির উপরে তুমি এই একটি হুকুম জারি করেছ সে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের কাজ করবে এবং দেখাবে যেন সে খেলা করছে।

কিন্তু তোমার এই আধিভৌতিক শক্তি, যা আলো হয়ে আমাদের সামনে নানা রঙের ছবি আঁকছে, যা বাতাস হয়ে আমাদের কানে নানা সুরে গান করছে, যা বলছে "আমি জল," ব'লে আমাদের স্নান করাচ্ছে, যা বলছে "আমি স্থল," ব'লে আমাদের কোলে করে রেখেছে—যখন শক্তির সঙ্গে আমাদের জ্ঞানের যোগ হয়, যখন তাকে আমরা শক্তি বলেই জানতে পারি—তখন তার ক্রিয়াকে আমরা অনেক বেশি করে অনেক বিচিত্র করে লাভ করি। তখন তোমার যে-শক্তি আমাদের কাছে সম্পূর্ণ আত্মগোপন করে কাজ করছিল সে আর ন ততো বিজুগুপ্সতে। তখন বাষ্পের শক্তি আমাদের দূরে বহন করে, বিদ্যুতের শক্তি আমাদের দুঃসাধ্য প্রয়োজন সাধন করতে থাকে। তেমনি তোমার অধ্যাত্ম শক্তি আনন্দের প্রস্রবণ থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে এই আশ্রমটির মধ্যে আপনিই নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছে, দিনে দিনে ধীরে ধীরে গভীরে গোপনে। কিন্তু সচেতন সাধনার দ্বারা যে মুহূর্তে আমাদের বোধের সঙ্গে তার যোগ ঘটে যায় সেই মুহূর্ত হতেই সেই শক্তির ক্রিয়া দেখতে দেখতে আমাদের জীবনের মধ্যে পরিব্যাপ্ত ও বিচিত্র হয়ে ওঠে। তখন সেই যে কেবল একলা কাজ করে তা নয়, আমরাও তখন তাকে কাজে লাগাতে পারি। তখন তাতে আমাতে মিলে সে এক আশ্চর্য ব্যাপার হয়ে উঠতে থাকে। তখন যাকে কেবলমাত্র চোখে দেখতুম, কানে শুনতুম, অন্তর বাহিরের যোগে তার অনন্ত আনন্দরূপটি একেবারে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে—সে আর ন ততো বিজুগুপ্সতে। সে তো কেবল বস্তু নয়, কেবল ধ্বনি নয়, সেই আনন্দ, সেই আনন্দ।

জ্ঞানের যোগে আমরা জগতে তোমার শক্তিরূপ দেখি, অধ্যাত্মযোগে জগতে তোমার আনন্দরূপ দেখতে পাই। তোমার সাধকের এই আশ্রমটির যে একটি আনন্দরূপ আছে সেইটি দেখতে পেলেই আমাদের আশ্রমবাসের সার্থকতা হবে। কিন্তু সেটি তো অচেতনভাবে হবে না, সেটি তো মুখ ফিরিয়ে থাকলে পাব না। হে যোগী, তুমি যে আমাদের দিক থেকেও যোগ চাও—জ্ঞানের যোগ, প্রেমের যোগ, কর্মের যোগ। আমরা শক্তির দ্বারাই তোমার শক্তিকে পাব ভিক্ষার দ্বারা নয়, এই তোমার অভিপ্রায়। তোমার জগতে যে ভিক্ষুকতা করে সেই সবচেয়ে বঞ্চিত হয়। যে-সাধক আত্মার শক্তিকে জাগ্রত করে আত্মানং পরিপশ্যতি, ন ততো বিজুগুপ্সতে। সে এমনি পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে যে আপনাকে আর গোপন করতে পারে না। আজ উৎসবের দিনে তোমার কাছে সেই শক্তির দীক্ষা আমরা গ্রহণ করব। আমরা আজ

জাগ্রত হব, চিত্তকে সচেতন করব, হৃদয়কে নির্মল করব, আমরা আজ যথার্থভাবে এই আশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করব। আমরা এই আশ্রমকে গভীর করে, বৃহৎ করে, সত্য করে, ভূত ও ভবিষ্যতের সঙ্গে একে সংযুক্ত করে দেখব, যে-সাধক এখানে তপস্যা করেছেন তাঁর আনন্দময় বাণী এর সর্বত্র বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে সেটি আমরা অন্তরের মধ্যে অনুভব করব—এবং তাঁর সেই জীবনপূর্ণ বাণীর দ্বারা বাহিত হয়ে এখানকার ছায়ায় এবং আলোকে, আকাশে এবং প্রান্তরে, কর্মে এবং বিশ্রামে, আমাদের জীবন তোমার অচল আশ্রয়ে, নিবিড় প্রেমে, নিরতিশয় আনন্দে গিয়ে উত্তীর্ণ হবে এবং চন্দ্র সূর্য অগ্নি বায়ু তরুলতা পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ সকলের মধ্যে তোমার গভীর শান্তি, উদার মঙ্গল ও প্রগাঢ় অদ্বৈতরস অনুভব করে শক্তিতে এবং ভক্তিতে সকল দিকেই পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকবে।

৭ পৌষ, প্রাতঃকাল, ১৩১৬

তপোবন

আধুনিক সভ্যতালক্ষ্মী যে-পদ্মের উপর বাস করেন সেটি ইঁট কাঠে তৈরি, সেটি শহর। উন্নতির সূর্য যতই মধ্যগগনে উঠছে ততই তার দলগুলি একটি একটি করে খুলে গিয়ে ক্রমশই চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে। চুন সুরকির জয়যাত্রাকে বসুন্ধরা কোথাও ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না।

এই শহরেই মানুষ বিদ্যা শিখছে, বিদ্যা প্রয়োগ করছে, ধন জমাচ্ছে, ধন খরচ করছে, নিজেকে নানাদিক থেকে শক্তি ও সম্পদে পূর্ণ করে তুলছে। এই সভ্যতায় সকলের চেয়ে যা কিছু শ্রেষ্ঠ পদার্থ তা নগরের সামগ্রী।

বস্তুত এ ছাড়া অন্য রকম কল্পনা করা শক্ত। যেখানে অনেক মানুষের সম্মিলন সেখানে বিচিত্র বুদ্ধির সংঘাতে চিত্ত জাগ্রত হয়ে ওঠে এবং চারদিক থেকে ধাক্কা খেয়ে প্রত্যেকের শক্তি গতি প্রাপ্ত হয়। এমনি করে চিত্তসমুদ্রের মন্থন হতে থাকলে মানুষের নিগূঢ় সার পদার্থসকল আপনিই ভেসে উঠতে থাকে।

তার পরে মানুষের শক্তি যখন জেগে ওঠে তখন সে সহজেই এমন ক্ষেত্র চায় যেখানে আপনাকে ফলাও রকম করে প্রয়োগ করতে পারে। সে ক্ষেত্র কোথায়? যেখানে অনেক মানুষের অনেক প্রকার উদ্যম নানা সৃষ্টিকার্যে সর্বদাই সচেষ্ট হয়ে রয়েছে। সেই ক্ষেত্রই হচ্ছে শহর।

গোড়ায় মানুষ যখন খুব ভিড় করে এক জায়গায় শহর সৃষ্টি করে বসে, তখন সেটা

সভ্যতার আকর্ষণে নয়। অধিকাংশ স্থলেই শত্রুপক্ষের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে কোনো সুরক্ষিত সুবিধার জায়গায় মানুষ একত্র হয়ে থাকবার প্রয়োজন অনুভব করে। কিন্তু যে কারণেই হ'ক, অনেকে একত্র হবার একটা উপলক্ষ্য ঘটলেই সেখানে নানা লোকের প্রয়োজন এবং বুদ্ধি একটা কলেবরবদ্ধ আকার ধারণ করে এবং সেইখানেই সভ্যতার অভিব্যক্তি আপনি ঘটতে থাকে।

কিন্তু ভারতবর্ষে এই একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেছে, এখানকার সভ্যতার মূল প্রস্রবণ শহরে নয়, বনে। ভারতবর্ষের প্রথমতম আশ্চর্য বিকাশ যেখানে দেখতে পাই সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষ অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি করে একেবারে পিণ্ড পাকিয়ে ওঠে নি। সেখানে গাছপালা নদী সরোবর মানুষের সঙ্গে মিলে থাকবার যথেষ্ট অবকাশ পেয়েছিল। সেখানে মানুষও ছিল, ফাঁকাও ছিল, ঠেলাঠেলি ছিল না। অথচ এই ফাঁকায় ভারতবর্ষের চিত্তকে জড়প্রায় করে দেয় নি বরঞ্চ তার চেতনাকে আরও উজ্জ্বল করে দিয়েছিল। এরকম ঘটনা জগতে আর কোথাও ঘটেছে বলে দেখা যায় না।

আমরা এই দেখেছি, যে-সব মানুষ অবস্থাগতিকে বনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তারা বুনো হয়ে ওঠে। হয় তারা বাঘের মতো হিংস্র হয়, নয় তারা হরিণের মতো নির্বোধ হয়।

কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষে দেখতে পাই অরণ্যের নির্জনতা মানুষের বুদ্ধিকে অভিভূত করে নি বরঞ্চ তাকে এমন একটি শক্তি দান করেছিল যে, সেই অরণ্যবাসনিঃসৃত সভ্যতার ধারা সমস্ত ভারতবর্ষকে অভিষিক্ত করে দিয়েছে এবং আজ পর্যন্ত তার প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় নি।

এই রকমে আরণ্যকদের সাধনা থেকে ভারতবর্ষ সভ্যতার যে প্রৈতি (energy) লাভ করেছিল সেটা নাকি বাইরের সংঘাত থেকে ঘটে নি, নানা প্রয়োজনের প্রতি-যোগিতা থেকে জাগে নি। এইজন্যে সেই শক্তিটা প্রধানত বহিরভিমুখী হয় নি। সে ধ্যানের দ্বারা বিশ্বের গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করেছে, নিখিলের সঙ্গে আত্মার যোগ স্থাপন করেছে। সেইজন্যে ঐশ্বর্যের উপকরণেই প্রধানভাবে ভারতবর্ষ আপনার সভ্যতার পরিচয় দেয় নি। এই সভ্যতার যাঁরা কাণ্ডারী তাঁরা নির্জনবাসী, তাঁরা বিরলবসন তপস্বী।

সমুদ্রতীর যে-জাতিকে পালন করেছে তাকে বাণিজ্যসম্পদ দিয়েছে, মরুভূমি যাদের অন্নস্তন্যদানে ক্ষুধিত করে রেখেছে তারা দিগ্বিজয়ী হয়েছে। এমনি করে এক-একটি বিশেষ সুযোগে মানুষের শক্তি এক-একটি বিশেষ পথ পেয়েছে।

সমতল আর্যাবর্তের অরণ্যভূমিও ভারতবর্ষকে একটি বিশেষ সুযোগ দিয়েছিল। ভারতবর্ষের বুদ্ধিকে সে জগতের অন্তরতম রহস্যলোকের আবিষ্কারে প্রেরণ করেছিল। সেই মহাসমুদ্রতীরের নানা সুদূর দ্বীপ-দ্বীপান্তর থেকে সে যে-সমস্ত সম্পদ আহরণ করে এনেছিল, সমস্ত মানুষকেই দিনে দিনে তার প্রয়োজন স্বীকার করতেই হবে। যে ওষধি-বনস্পতির মধ্যে প্রকৃতির প্রাণের ক্রিয়া দিনে রাত্রে ও ঋতুতে ঋতুতে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে এবং প্রাণের লীলা নানা অপরূপ ভঙ্গিতে, ধ্বনিতে ও রূপবৈচিত্র্যে নিরন্তর নূতন নূতন ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে তারই মাঝখানে ধ্যানপরায়ণ চিত্ত নিয়ে যাঁরা ছিলেন তাঁরা নিজের চারিদিকেই একটি আনন্দময় রহস্যকে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন। সেইজন্যে তাঁরা এত সহজে বলতে পেরেছিলেন, যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং, এই যা কিছু সমস্তই পরমপ্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণের মধ্যেই কম্পিত হচ্ছে। তাঁরা স্বরচিত ইটকাঠলোহার কঠিন খাঁচার মধ্যে ছিলেন না, তাঁরা যেখানে বাস করতেন সেখানে বিশ্বব্যাপী বিরাট জীবনের সঙ্গে তাঁদের জীবনের অবারিত যোগ ছিল। এই বন তাঁদের ছায়া দিয়েছে, ফল ফুল দিয়েছে, কুশসমিৎ জুগিয়েছে, তাঁদের প্রতিদিনের সমস্ত কর্ম অবকাশ ও প্রয়োজনের সঙ্গে এই বনের আদানপ্রদানের জীবনময় সম্বন্ধ ছিল। এই উপায়েই নিজের জীবনকে তাঁরা চারিদিকের একটি বড়ো জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে জানতে পেরেছিলেন। চতুর্দিককে তাঁরা শূন্য বলে, নির্জীব বলে, পৃথক বলে জানতেন না। বিশ্বপ্রকৃতির ভিতর দিয়ে আলোক, বাতাস, অন্নজল প্রভৃতি যে-সমস্ত দান তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন সেই দানগুলি যে মাটির নয়, গাছের নয়, শূন্য আকাশের নয়, একটি চেতনাময় অনন্ত আনন্দের মধ্যেই তার মূল প্রস্রবণ, এইটি তাঁরা একটি সহজ অনুভবের দ্বারা জানতে পেরেছিলেন। সেইজন্যেই নিশ্বাস আলো অন্নজল সমস্তই তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। এইজন্যেই নিখিলচরাচরকে নিজের প্রাণের দ্বারা, চেতনার দ্বারা, হৃদয়ের দ্বারা, বোধের দ্বারা, নিজের আত্মার সঙ্গে আত্মীয়রূপে এক করে পাওয়াই ভারতবর্ষের পাওয়া।

এর থেকেই বোঝা যাবে বন ভারতবর্ষের চিত্তকে নিজের নিভৃত ছায়ার মধ্যে নিগূঢ় প্রাণের মধ্যে কেমন করে পালন করেছে। ভারতবর্ষে যে দুই বড়ো বড়ো প্রাচীনযুগ চলে গেছে, বৈদিকযুগ ও বৌদ্ধযুগ, সেই দুই যুগকে বনই ধাত্রীরূপে ধারণ করেছে। কেবল বৈদিক ঋষিরা নন, ভগবান বুদ্ধও কত আম্রবন, কত বেণুবনে তাঁর উপদেশ বর্ষণ করেছেন। রাজপ্রাসাদে তাঁর স্থান কুলোয় নি, বনই তাঁকে বুকে করে নিয়েছিল।

ক্রমশ ভারতবর্ষে রাজ্য সাম্রাজ্য নগরনগরী স্থাপিত হয়েছে, দেশ-বিদেশের সঙ্গে তার পণ্য আদানপ্রদান চলেছে, অন্নলোলুপ কৃষিক্ষেত্র অল্পে অল্পে ছায়ানিভৃত অরণ্যগুলিকে দূর হতে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সেই প্রতাপশালী ঐশ্বর্যপূর্ণ যৌবনদৃপ্ত ভারতবর্ষ বনের কাছে নিজের ঋণ স্বীকার করতে কোনো দিন লজ্জাবোধ করে নি। তপস্যাকেই সে সকল প্রয়াসের চেয়ে বেশি সম্মান দিয়েছে, এবং বনবাসী পুরাতন তপস্বীদেরই আপনাদের আদি পুরুষ বলে জেনে ভারতবর্ষের রাজা মহারাজাও গৌরব বোধ করেছেন। ভারতবর্ষের পুরাণ-কথায় যা কিছু মহৎ আশ্চর্য পবিত্র, যা কিছু শ্রেষ্ঠ এবং পূজ্য সমস্তই সেই প্রাচীন তপোবন-স্মৃতির সঙ্গেই জড়িত। বড়ো বড়ো রাজার রাজত্বের কথা সে মনে করে রাখবার জন্যে চেষ্টা করে নি কিন্তু নানাবিপ্লবের ভিতর দিয়েও বনের সামগ্রীকেই তার প্রাণের সামগ্রী করে আজ পর্যন্ত সে বহন করে এসেছে। মানব-ইতিহাসে এইটেই হচ্ছে ভারতবর্ষের বিশেষত্ব।

ভারতবর্ষে বিক্রমাদিত্য যখন রাজা, উজ্জয়িনী যখন মহানগরী, কালিদাস যখন কবি, তখন এদেশে তপোবনের যুগ চলে গেছে। তখন মানবের মহামেলার মাঝখানে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি। তখন, চীন, হূন, শক, পারসিক, গ্রীক, রোমক, সকলে আমাদের চারিদিকে ভিড় করে এসেছে। তখন জনকের মতো রাজা একদিকে স্বহস্তে লাঙল নিয়ে চাষ করছেন, অন্য দিকে দেশ-দেশান্তর হতে আগত জ্ঞানপিপাসুদের ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছেন, এ দৃশ্য দেখবার আর কাল ছিল না। কিন্তু সেদিনকার ঐশ্বর্যমদগর্বিত যুগেও তখনকার শ্রেষ্ঠ কবি তপোবনের কথা কেমন করে বলেছেন তা দেখলেই বোঝা যায় যে, তপোবন যখন আমাদের দৃষ্টির বাহিরে গেছে তখনও কতখানি আমাদের হৃদয় জুড়ে বসেছে।

কালিদাস যে বিশেষভাবে ভারতবর্ষের কবি, তা তাঁর তপোবন-চিত্র থেকেই সপ্রমাণ হয়। এমন পরিপূর্ণ আনন্দের সঙ্গে তপোবনের ধ্যানকে আর কে মূর্তিমান করতে পেরেছে!

রঘুবংশ কাব্যের যবনিকা যখনই উদ্‌ঘাটিত হল তখন প্রথমেই তপোবনের শান্ত সুন্দর পবিত্র দৃশ্যটি আমাদের চোখের সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়ল।

সেই তপোবনে বনান্তর হতে কুশসমিৎ ফল আহরণ করে তপস্বীরা আসছেন এবং যেন একটি অদৃশ্য অগ্নি তাঁদের প্রত্যুদ্‌গমন করছে। সেখানে হরিণগুলি ঋষিপত্নীদের সন্তানের মতো; তারা নীবার ধান্যের অংশ পায় এবং নিঃসংকোচে কুটিরের দ্বার রোধ করে পড়ে থাকে। মুনিকন্যারা গাছে জল দিচ্ছেন এবং

আলবাল যেমনি জলে ভরে উঠছে অমনি তাঁরা সরে যাচ্ছেন। পাখিরা নিঃশঙ্কমনে আলবালের জল খেতে আসে, এই তাঁদের অভিপ্রায়। রৌদ্র পড়ে এসেছে, নীবার ধান্য কুটিরের প্রাঙ্গণে রাশীকৃত, এবং সেখানে হরিণরা শুয়ে রোমন্থন করছে। আহুতির সুগন্ধ ধূম বাতাসে প্রবাহিত হয়ে এসে আশ্রমোন্মুখ অতিথিদের সর্বশরীর পবিত্র করে দিচ্ছে।

তরুলতা পশুপক্ষী সকলের সঙ্গে মানুষের মিলনের পূর্ণতা, এই হচ্ছে এর ভিতরকার ভাব।

সমস্ত অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের মধ্যে, ভোগলালসানিষ্ঠুর রাজপ্রাসাদকে ধিক্‌কার দিয়ে যে একটি তপোবন বিরাজ করছে তারও মূল সুরটি হচ্ছে ওই, চেতন অচেতন সকলেরই সঙ্গে মানুষের আত্মীয়-সম্বন্ধের পবিত্র মাধুর্য।

কাদম্বরীতে তপোবনের বর্ণনায় কবি লিখছেন—সেখানে বাতাসে লতাগুলি মাথা নত করে প্রণাম করছে, গাছগুলি ফুল ছড়িয়ে পূজা করছে, কুটিরের অঙ্গনে শ্যামাক ধান শুকোবার জন্যে মেলে দেওয়া আছে, সেখানে আমলক লবলী লবঙ্গ কদলী বদরী প্রভৃতি ফল সংগ্রহ করা হয়েছে; বটুদের অধ্যয়নে বনভূমি মুখরিত, বাচাল শুকেরা অনবরত-শ্রবণের দ্বারা অভ্যস্ত আহুতিমন্ত্র উচ্চারণ করছে, অরণ্যকুক্কুটেরা বৈশ্বদেব-বলিপিণ্ড আহার করছে; নিকটে জলাশয় থেকে কলহংসশাবকেরা এসে নীবারবলি খেয়ে যাচ্ছে; হরিণীরা জিহ্বাপল্লব দিয়ে মুনিবালকদের লেহন করছে।

এর ভিতরকার কথাটা হচ্ছে ওই। তরুলতা জীবজন্তুর সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ দূর করে তপোবন প্রকাশ পাচ্ছে, এই পুরানো কথাই আমাদের দেশে বরাবর চলে এসেছে।

কেবল তপোবনের চিত্রেই যে এই ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে তা নয়। মানুষের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির সম্মিলনই আমাদের দেশের সমস্ত প্রসিদ্ধ কাব্যের মধ্যে পরিস্ফুট। যে-সকল ঘটনা মানবচরিত্রকে আশ্রয় করে ব্যক্ত হতে থাকে তাই না কি প্রধানত নাটকের উপাদান এই জন্যেই অন্যদেশের সাহিত্যে দেখতে পাই বিশ্বপ্রকৃতিকে নাটকে কেবল আভাসে রক্ষা করা হয় মাত্র, তার মধ্যে তাকে বেশি জায়গা দেবার অবকাশ থাকে না। আমাদের দেশের প্রাচীন যে নাটকগুলি আজ পর্যন্ত খ্যাতি রক্ষা করে আসছে তাতে দেখতে পাই প্রকৃতিও নাটকের মধ্যে নিজের অংশ থেকে বঞ্চিত হয় না।

মানুষকে বেষ্টন করে এই যে জগৎপ্রকৃতি আছে এ যে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে মানুষের সকল চিন্তা সকল কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। মানুষের লোকালয় যদি কেবলই

একান্ত মানবময় হয়ে ওঠে, এর ফাঁকে ফাঁকে যদি প্রকৃতি কোনোমতে প্রবেশাধিকার না পায় তাহলে আমাদের চিন্তা ও কর্ম ক্রমশ কলুষিত ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে নিজের অতল-স্পর্শ আবর্জনার মধ্যে আত্মহত্যা করে মরে। এই যে প্রকৃতি আমাদের মধ্যে নিত্য-নিয়ত কাজ করছে অথচ দেখাচ্ছে যেন সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেন আমরাই সব মস্ত কাজের লোক আর সে বেচারা নিতান্ত একটা বাহার মাত্র, এই প্রকৃতিকে আমাদের দেশের কবিরা বেশ করে চিনে নিয়েছেন। এই প্রকৃতি মানুষের সমস্ত সুখদুঃখের মধ্যে যে অনন্তের সুরটি মিলিয়ে রাখছে সেই সুরটিকে আমাদের দেশের প্রাচীন কবিরা সর্বদাই তাঁদের কাব্যের মধ্যে বাজিয়ে রেখেছেন।

ঋতুসংহার কালিদাসের কাঁচাবয়সের লেখা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর মধ্যে তরুণ-তরুণীর যে মিলনসংগীত আছে তাতে স্বরগ্রাম লালসার নিচের সপ্তক থেকেই শুরু হয়েছে, শকুন্তলা কুমারসম্ভবের মতো তপস্যার উচ্চতম সপ্তকে গিয়ে পৌঁছোয় নি।

কিন্তু কবি নবযৌবনের এই লালসাকে প্রকৃতির বিচিত্র ও বিরাট সুরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে মুক্ত আকাশের মাঝখানে তাকে ঝংকৃত করে তুলেছেন। ধারাযন্ত্র-মুখরিত নিদাঘদিনান্তের চন্দ্রকিরণ এর মধ্যে আপনার সুরটুকু যোজনা করেছে, বর্ষায় নবজলসেকে ছিন্নতাপ বনান্তে পবনচলিত কদম্বশাখা এর ছন্দে আন্দোলিত; আপক্বশালি-রুচিরা শারদলক্ষ্মী তাঁর হংসরব-নূপুরধ্বনিকে এর তালে তালে মন্ত্রিত করেছেন এবং বসন্তের দক্ষিণবায়ুচঞ্চল কুসুমিত আম্রশাখার কলমর্মর এরই তানে তানে বিস্তীর্ণ।

বিরাট প্রকৃতির মাঝখানে যেখানে যার স্বাভাবিক স্থান সেখানে তাকে স্থাপন করে দেখলে তার অত্যুগ্রতা থাকে না, সেইখান থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে কেবলমাত্র মানুষের গণ্ডির মধ্যে সংকীর্ণ করে দেখলে তাকে ব্যাধির মতো অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং রক্তবর্ণ দেখতে হয়। শেক্‌স্‌পীয়রের দুই একটি খণ্ডকাব্য আছে নরনারীর আসক্তি তার বর্ণনীয় বিষয়। কিন্তু সেইসকল কাব্যে আসক্তিই একেবারে একান্ত, তার চারদিকে আর কিছুরই স্থান নেই; আকাশ নেই, বাতাস নেই, প্রকৃতির যে গীত-গন্ধবর্ণবিচিত্র বিশাল আবরণে বিশ্বের সমস্ত লজ্জা রক্ষা করে আছে তার কোনো সম্পর্ক নেই। এইজন্যে সেসকল কাব্যে প্রবৃত্তির উন্মত্ততা অত্যন্ত দুঃসহরূপে প্রকাশ পাচ্ছে।

কুমারসম্ভবে তৃতীয় সর্গে যেখানে মদনের আকস্মিক আবির্ভাবে যৌবনচাঞ্চল্যের উদ্দীপনা বর্ণিত হয়েছে, সেখানে কালিদাস উন্মত্ততাকে একটি সংকীর্ণ সীমার মধ্যেই সর্বময় করে দেখাবার প্রয়াসমাত্র পান নি। আতশকাচের ভিতর দিয়ে একটি

বিন্দুমাত্রে সূর্যকিরণ সংহত হয়ে পড়লে সেখানে আগুন জলে ওঠে, কিন্তু সেই সূর্যকিরণ যখন আকাশের সর্বত্র স্বভাবত ছড়িয়ে থাকে তখন সে তাপ দেয় বটে কিন্তু দগ্ধ করে না। কালিদাস বসন্ত-প্রকৃতির সর্বব্যাপী যৌবনলীলার মাঝখানে হরপার্বতীর মিলনচাঞ্চল্যকে নিবিষ্ট করে তার সম্ভ্রম রক্ষা করেছেন।

কালিদাস পুষ্পধনুর জ্যা-নির্ঘোষকে বিশ্বসংগীতের সুরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ও বেসুরো করে বাজান নি। যে-পটভূমিকার উপরে তিনি তাঁর ছবিটি এঁকেছেন সেটি তরুলতা পশুপক্ষীকে নিয়ে সমস্ত আকাশে অতি বিচিত্রবর্ণে বিস্তারিত।

কেবল তৃতীয় সর্গ নয় সমস্ত কুমারসম্ভব কাব্যটিই একটি বিশ্বব্যাপী পটভূমিকার উপরে অঙ্কিত। এই কাব্যের ভিতরকার কথাটি একটি গভীর এবং চিরন্তন কথা। যে পাপ দৈত্য প্রবল হয়ে উঠে হঠাৎ স্বর্গলোককে কোথা থেকে ছারখার করে দেয় তাকে পরাভূত করবার মতো বীরত্ব কোন্ উপায়ে জন্মগ্রহণ করে।

এই সমস্যাটি মানুষের চিরকালের সমস্যা। প্রত্যেক লোকের জীবনের সমস্যাও এই বটে আবার এই সমস্যা সমস্ত জাতির মধ্যে নূতন নূতন মূর্তিতে নিজেকে প্রকাশ করে।

কালিদাসের সময়েও একটি সমস্যা ভারতবর্ষে অত্যন্ত উৎকট হয়ে দেখা দিয়েছিল তা কবির কাব্য পড়লেই স্পষ্ট বোঝা যায়। প্রাচীনকালে হিন্দুসমাজে জীবনযাত্রায় যে একটি সরলতা ও সংযম ছিল তখন সেটি ভেঙে এসেছিল। রাজারা তখন রাজধর্ম বিস্মৃত হয়ে আত্মসুখপরায়ণ ভোগী হয়ে উঠেছিলেন। এদিকে শকদের আক্রমণে ভারতবর্ষ তখন বারংবার দুর্গতি প্রাপ্ত হচ্ছিল।

তখন বাহিরের দিক থেকে দেখলে ভোগবিলাসের আয়োজনে, কাব্য সংগীত শিল্পকলার আলোচনায় ভারতবর্ষ সভ্যতার প্রকৃষ্টতা লাভ করেছিল। কালিদাসের কাব্যকলার মধ্যেও তখনকার সেই উপকরণবহুল সম্ভোগের সুর যে বাজে নি তা নয়। বস্তুত তাঁর কাব্যের বহিরংশ তখনকার কালেরই কারুকার্যে খচিত হয়েছিল। এই রকম একদিকে তখনকার কালের সঙ্গে তখনকার কবির যোগ আমরা দেখতে পাই।

কিন্তু এই প্রমোদভবনের স্বর্ণখচিত অন্তঃপুরের মাঝখানে বসে কাব্যলক্ষ্মী বৈরাগ্য-বিকল চিত্তে কিসের ধ্যানে নিযুক্ত ছিলেন? হৃদয় তো তাঁর এখানে ছিল না। তিনি এই আশ্চর্য কারুবিচিত্র মাণিক্যকঠিন কারাগার হতে কেবলই মুক্তিকামনা করছিলেন।

কালিদাসের কাব্যে বাহিরের সঙ্গে ভিতরের, অবস্থার সঙ্গে আকাঙ্ক্ষার একটা

বদ্ধ আছে। ভারতবর্ষের যে তপস্যার যুগ তখন অতীত হয়ে গিয়েছিল, ঐশ্বর্যশালী রাজসিংহাসনের পাশে বসে কবি সেই নির্মল সুদূরকালের দিকে একটি বেদনা বহন করে তাকিয়ে ছিলেন।

রঘুবংশ কাব্যে তিনি ভারতবর্ষের পুরাকালীন সূর্যবংশীয় রাজাদের চরিতগানে যে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তার মধ্যে কবির সেই বেদনাটি নিগূঢ় হয়ে রয়েছে। তার প্রমাণ দেখুন।

আমাদের দেশের কাব্যে পরিণামকে অশুভকর ভাবে দেখানো ঠিক প্রথা নয়। বস্তুত যে-রামচন্দ্রের জীবনে রঘুর বংশ উচ্চতম চূড়ায় অধিরোহণ করেছে সেইখানেই কাব্য শেষ করলে তবেই কবির ভূমিকার বাক্যগুলি সার্থক হত।

তিনি ভূমিকায় বলেছেন—সেই যাঁরা জন্মকাল অবধি শুদ্ধ, যাঁরা ফলপ্রাপ্তি অবধি কর্ম করতেন, সমুদ্র অবধি যাঁদের রাজ্য, এবং স্বর্গ অবধি যাঁদের রথবর্ত্ম; যথাবিধি যাঁরা অগ্নিতে আহুতি দিতেন, যথাকাম যাঁরা প্রার্থীদের অভাব পূর্ণ করতেন, যথাপরাধ যাঁরা দণ্ড দিতেন এবং যথাকালে যাঁরা জাগ্রত হতেন; যাঁরা ত্যাগের জন্মে অর্থ সঞ্চয় করতেন, যাঁরা সত্যের জন্য মিতভাষী, যাঁরা যশের জন্য জয় ইচ্ছা করতেন এবং সন্তানলাভের জন্য যাঁদের দারগ্রহণ; শৈশবে যাঁরা বিদ্যাভ্যাস করতেন, যৌবনে যাঁদের বিষয়-সেবা ছিল, বার্ধক্যে যাঁরা মুনিবৃত্তি গ্রহণ করতেন এবং যোগান্তে যাঁদের দেহত্যাগ হত—আমি বাক্‌সম্পদে দরিদ্র হলেও সেই রঘুরাজদের বংশ কীর্তন করব, কারণ তাঁদের গুণ আমার কর্ণে প্রবেশ করে আমাকে চঞ্চল করে তুলেছে।

কিন্তু গুণকীর্তনেই এই কাব্যের শেষ নয়। কবিকে যে কিসে চঞ্চল করে তুলেছে, তা রঘুবংশের পরিণাম দেখলেই বুঝা যায়।

রঘুবংশ যাঁর নামে গৌরবলাভ করেছে তাঁর জন্মকাহিনী কী? তাঁর আরম্ভ কোথায়?

তপোবনে দিলীপদম্পতির তপস্যাতেই এমন রাজা জন্মেছেন। কালিদাস তাঁর রাজপ্রভুদের কাছে এই কথাটি নানা কাব্যে নানা কৌশলে বলেছেন যে, কঠিন তপস্যার ভিতর দিয়ে ছাড়া কোনো মহৎ ফললাভের কোনো সম্ভাবনা নেই। যে-রঘু উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমের সমস্ত রাজাকে বীরতেজে পরাভূত করে পৃথিবীতে একচ্ছত্র রাজত্ব বিস্তার করেছিলেন তিনি তাঁর পিতামাতার তপঃসাধনার ধন। আবার যে-ভরত বীর্যবলে চক্রবর্তী সম্রাট হয়ে ভারতবর্ষকে নিজ নামে ধন্য করেছেন তাঁর জন্ম-ঘটনায় অবারিত প্রবৃত্তির যে কলঙ্ক পড়েছিল কবি তাকে তপস্যার অগ্নিতে দগ্ধ এবং দুঃখের অশ্রুজলে সম্পূর্ণ ধৌত না করে ছাড়েন নি।

রঘুবংশ আরম্ভ হল রাজোচিত ঐশ্বর্যগৌরবের বর্ণনায় নয়। সুদক্ষিণাকে বামে নিয়ে রাজা দিলীপ তপোবনে প্রবেশ করলেন। চতুঃসমুদ্র যাঁর অনন্যশাসনা পৃথিবীর পরিখা সেই রাজা অবিচলিত নিষ্ঠায় কঠোর সংযমে তপোবনধেনুর সেবায় নিযুক্ত হলেন।

সংযমে তপস্যায় তপোবনে রঘুবংশের আরম্ভ, আর মদিরায় ইন্দ্রিয়মত্ততায় প্রমোদ-ভবনে তার উপসংহার। এই শেষ সর্গের চিত্রে বর্ণনায় উজ্জ্বলতা যথেষ্ট আছে। কিন্তু যে-অগ্নি লোকালয়কে দগ্ধ করে সর্বনাশ করে সেও তো কম উজ্জ্বল নয়। এক পত্নীকে নিয়ে দিলীপের তপোবনে বাস শান্ত এবং অনতিপ্রকটবর্ণে অঙ্কিত, আর বহু নায়িকা নিয়ে অগ্নিবর্ণের আত্মঘাতসাধন অসংবৃত বাহুল্যের সঙ্গে যেন জ্বলন্ত রেখায় বর্ণিত।

প্রভাত যেমন শান্ত, যেমন পিঙ্গল-জটাধারী ঋষিবালকের মতো পবিত্র, প্রভাত যেমন মুক্তাপাণ্ডুর সৌম্য আলোকে শিশিরস্নিগ্ধ পৃথিবীর উপরে ধীরপদে অবতরণ করে এবং নবজীবনের অভ্যুদয়-বার্তায় জগৎকে উদ্‌বোধিত করে তোলে, কবির কাব্যেও তপস্যার দ্বারা সুসমাহিত রাজমাহাত্ম্য তেমনি স্নিগ্ধতেজে এবং সংযত বাণীতেই মহোদয়শালী রঘুবংশের সূচনা করেছিল। আর নানাবর্ণবিচিত্র মেঘজালের মধ্যে আবিষ্ট অপরাহ্ন আপনার অদ্ভুত রশ্মিচ্ছটায় পশ্চিম আকাশকে যেমন ক্ষণকালের জন্যে প্রগল্‌ভ করে তোলে এবং দেখতে দেখতে ভীষণ ক্ষয় এসে তার সমস্ত মহিমা অপহরণ করতে থাকে, অবশেষে অনতিকালেই বাক্যহীন কর্মহীন অচেতন অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত বিলুপ্ত হয়ে যায় কবি তেমনি করেই বাক্যের শেষ সর্গে বিচিত্র ভোগায়োজনের ভীষণ সমারোহের মধ্যেই রঘুবংশ-জ্যোতিষ্কের নির্বাপণ বর্ণনা করেছেন।

কাব্যের এই আরম্ভ এবং শেষের মধ্যে কবির একটি অন্তরের কথা প্রচ্ছন্ন আছে। তিনি নীরব দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে বলছেন, ছিল কী, আর হয়েছে কী। সেকালে যখন সম্মুখে ছিল অভ্যুদয় তখন তপস্যাই ছিল সকলের চেয়ে প্রধান ঐশ্বর্য আর একালে যখন সম্মুখে দেখা যাচ্ছে বিনাশ তখন বিলাসের উপকরণরাশির সীমা নেই, আর ভোগের অতৃপ্ত বহ্নি সহস্র শিখায় জ্বলে উঠে চারিদিকের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।

কালিদাসের অধিকাংশ কাব্যের মধ্যেই এই দ্বন্দ্বটি সুস্পষ্ট দেখা যায়। এই দ্বন্দ্বের সমাধান কোথায় কুমারসম্ভবে তাই দেখানো হয়েছে। কবি এই কাব্যে বলেছেন ত্যাগের সঙ্গে ঐশ্বর্যের, তপস্যার সঙ্গে প্রেমের সম্মিলনেই শৌর্যের উদ্ভব, সেই শৌর্যেই মানুষ সকলপ্রকার পরাভব হতে উদ্ধার পায়।

অর্থাৎ ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্যেই পূর্ণ শক্তি। ত্যাগী শিব যখন একাকী সমাধিমগ্ন তখনও স্বর্গরাজ্য অসহায়, আবার সতী যখন তাঁর পিতৃভবনের ঐশ্বর্যে একাকিনী আবদ্ধ তখনও দৈত্যের উপদ্রব প্রবল।

প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠলেই ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্য ভেঙে যায়।

কোনো একটি সংকীর্ণ জায়গায় যখন আমরা অহংকারকে বা বাসনাকে ঘনীভূত করি তখন আমরা সমগ্রের ক্ষতি করে অংশকে বড়ো করে তুলতে চেষ্টা করি। এর থেকে ঘটে অমঙ্গল। অংশের প্রতি আসক্তিবশত সমগ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এই হচ্ছে পাপ।

এই জন্যই ত্যাগের প্রয়োজন। এই ত্যাগ নিজেকে রিক্ত করার জন্যে নয়, নিজেকে পূর্ণ করবার জন্যেই। ত্যাগ মানে আংশিককে ত্যাগ সমগ্রের জন্য, ক্ষণিককে ত্যাগ নিত্যের জন্য, অহংকারকে ত্যাগ প্রেমের জন্য, সুখকে ত্যাগ আনন্দের জন্য। এই জন্যেই উপনিষদে বলা হয়েছে, ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে, আসক্তির দ্বারা নয়।

প্রথমে পার্বতী মদনের সাহায্যে শিবকে চেয়েছিলেন, সে চেষ্টা ব্যর্থ হল, অবশেষে ত্যাগের সাহায্যে তপস্যার দ্বারাতেই তাঁকে লাভ করলেন।

কাম হচ্ছে কেবল অংশের প্রতিই আসক্ত, সমগ্রের প্রতি অন্ধ। কিন্তু শিব হচ্ছেন সকল দেশের সকল কালের, কামনা ত্যাগ না হলে তাঁর সঙ্গে মিলন ঘটতেই পারে না।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করবে এইটি উপনিষদের অনুশাসন, এইটেই কুমারসম্ভব কাব্যের মর্মকথা, এবং এইটেই আমাদের তপোবনের সাধনা। লাভ করবার জন্যে ত্যাগ করবে।

Sacrifice এবং resignation, আত্মত্যাগ এবং দুঃখস্বীকার—এই দুটি পদার্থের মাহাত্ম্য আমরা কোনো কোনো ধর্মশাস্ত্রে বিশেষভাবে বর্ণিত দেখেছি। জগতের সৃষ্টিকার্যে উত্তাপ যেমন একটি প্রধান জিনিস, মানুষের জীবনগঠনে দুঃখও তেমনি একটি খুব বড়ো রাসায়নিক শক্তি; এর দ্বারা চিত্তের দুর্ভেদ্য কাঠিন্য গলে যায় এবং অসাধ্য হৃদয়গ্রন্থির ছেদন হয়। অতএব সংসারে যিনি দুঃখকে দুঃখরূপেই নম্রভাবে স্বীকার করে নিতে পারেন তিনি যথার্থ তপস্বী বটেন।

কিন্তু কেউ যেন মনে না করেন এই দুঃখস্বীকারকেই উপনিষৎ লক্ষ্য করছেন। ত্যাগকে দুঃখরূপে অঙ্গীকার করে নেওয়া নয়, ত্যাগকে ভোগরূপেই বরণ করে নেওয়া উপনিষদের অনুশাসন। উপনিষৎ যে-ত্যাগের কথা বলছেন সেই ত্যাগই পূর্ণতর

গ্রহণ, সেই ত্যাগই গভীরতর আনন্দ। সেই ত্যাগই নিখিলের সঙ্গে যোগ, ভূমার সঙ্গে মিলন। অতএব ভারতবর্ষের যে আদর্শ তপোবন, সে-তপোবন শরীরের বিরুদ্ধে আত্মার, সংসারের বিরুদ্ধে সন্ন্যাসের একটা নিরন্তর হাতাহাতি যুদ্ধ করবার মল্লক্ষেত্র নয়। যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, অর্থাৎ যা-কিছু-সমস্তের সঙ্গে ত্যাগের দ্বারা বাধাহীন মিলন, এইটেই হচ্ছে তপোবনের সাধনা। এই জন্যেই তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে ভারতবর্ষের আত্মীয়-সম্বন্ধের যোগ এমন ঘনিষ্ঠ যে, অন্যদেশের লোকের কাছে সেটা অদ্ভুত মনে হয়।

এই জন্যেই আমাদের দেশের কবিত্বে যে প্রকৃতিপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় অন্য-দেশের কাব্যের সঙ্গে তার যেন একটা বিশিষ্টতা আছে। আমাদের এ প্রকৃতির প্রতি প্রভুত্ব করা নয়, প্রকৃতিকে ভোগ করা নয়, এ প্রকৃতির সঙ্গে সম্মিলন।

অথচ এই সম্মিলন অরণ্যবাসীর বর্বরতা নয়। তপোবন আফ্রিকার বন যদি হত তাহলে বলতে পারতুম প্রকৃতির সঙ্গে মিলে থাকা একটা তামসিকতা মাত্র। কিন্তু মানুষের চিত্ত যেখানে সাধনার দ্বারা জাগ্রত আছে সেখানকার মিলন কেবলমাত্র অভ্যাসের জড়ত্বজনিত হতে পারে না। সংস্কারের বাধা ক্ষয় হয়ে গেলে যে-মিলন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে তপোবনের মিলন হচ্ছে তাই।

আমাদের কবিরা সকলেই বলেছেন, তপোবন শান্তরসাস্পদ। তপোবনের যে একটি বিশেষ রস আছে সেটি শান্তরস। শান্তরস হচ্ছে পরিপূর্ণতার রস। যেমন সাতটা বর্ণরশ্মি মিলে গেলে তবে সাদা রং হয় তেমনি চিত্তের প্রবাহ নানাভাগে বিভক্ত না হয়ে যখন অবিচ্ছিন্নভাবে নিখিলের সঙ্গে আপনার সামঞ্জস্যকে একেবারে কানায় কানায় ভরে তোলে তখনই শান্তরসের উদ্ভব হয়।

তপোবনে সেই শান্তরস। এখানে সূর্য অগ্নি বায়ু জল স্থল আকাশ তরুলতা মৃগ পক্ষী সকলের সঙ্গেই চেতনার একটি পরিপূর্ণ যোগ। এখানে চতুর্দিকের কিছুর সঙ্গেই মানুষের বিচ্ছেদ নেই এবং বিরোধ নেই।

ভারতবর্ষের তপোবনে এই যে একটি শান্তরসের সংগীত বাঁধা হয়েছিল এই সংগীতের আদর্শেই আমাদের দেশে অনেক মিশ্র রাগ-রাগিণীর সৃষ্টি হয়েছে। সেই জন্যেই আমাদের কাব্যে মানবব্যাপারের মাঝখানে প্রকৃতিকে এত বড়ো স্থান দেওয়া হয়েছে। এ কেবল সম্পূর্ণতার জন্যে আমাদের যে একটি স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা আছে সেই আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করবার উদ্দেশে।

অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে যে দুটি তপোবন আছে সে দুটিই শকুন্তলার সুখদুঃখকে একটি বিশালতার মধ্যে সম্পূর্ণ করে দিয়েছে। তার একটি তপোবন পৃথিবীতে, আর

একটি স্বর্গলোকের সীমায়। একটি তপোবনে সহকারের সঙ্গে নবমল্লিকার মিলনোৎসবে নবযৌবনা ঋষিকন্যারা পুলকিত হয়ে উঠছেন, মাতৃহীন মৃগশিশুকে তাঁরা নীবারমুষ্টি দিয়ে পালন করছেন, কুশসূচিতে তার মুখ বিদ্ধ হলে ইঙ্গুদী তৈল মাখিয়ে শুশ্রূষা করছেন; এই তপোবনটি দুষ্মন্তশকুন্তলার প্রেমকে সারল্য, সৌন্দর্য এবং স্বাভাবিকতা দান করে তাকে বিশ্বসুরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছে।

আর সন্ধ্যামেঘের মতো কিম্পুরুষ-পর্বত যে হেমকূট, যেখানে সুরাসুরগুরু মরীচি তাঁর পত্নীর সঙ্গে মিলে তপস্যা করছেন, লতাজালজড়িত যে হেমকূট পক্ষিনীড়খচিত অরণ্যজটামণ্ডল বহন করে যোগাসনে অচল শিবের মতো সূর্যের দিকে তাকিয়ে ধ্যান-মগ্ন, যেখানে কেশর ধরে সিংহশিশুকে মাতার স্তন থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যখন দুরন্ত তপস্বিবালক তার সঙ্গে খেলা করে তখন পশুর সেই দুঃখ ঋষিপত্নীর পক্ষে অসহ্য হয়ে ওঠে,—সেই তপোবন শকুন্তলার অপমানিত বিচ্ছেদদুঃখকে অতি বৃহৎ শান্তি ও পবিত্রতা দান করেছে।

একথা স্বীকার করতে হবে প্রথম তপোবনটি মর্ত্যলোকের, আর দ্বিতীয়টি অমৃত-লোকের। অর্থাৎ প্রথমটি হচ্ছে যেমন হয়ে থাকে, দ্বিতীয়টি হচ্ছে যেমন হওয়া ভালো। এই "যেমন-হওয়া-ভালো"র দিকে "যেমন-হয়ে-থাকে" চলেছে। এরই দিকে চেয়ে সে আপনাকে শোধন করছে, পূর্ণ করছে। "যেমন-হয়ে-থাকে" হচ্ছেন সতী অর্থাৎ সত্য, আর "যেমন-হওয়া-ভালো" হচ্ছেন শিব অর্থাৎ মঙ্গল। কামনা ক্ষয় করে তপস্যার মধ্য দিয়ে এই সতী ও শিবের মিলন হয়। শকুন্তলার জীবনেও "যেমন-হয়ে-থাকে" তপস্যার দ্বারা অবশেষে "যেমন-হওয়া-ভালো"র মধ্যে এসে আপনাকে সফল করে তুলেছে। দুঃখের ভিতর দিয়ে মর্ত্য শেষকালে স্বর্গের প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে।

মানসলোকের এই যে দ্বিতীয় তপোবন এখানেও প্রকৃতিকে ত্যাগ করে মানুষ স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে নি। স্বর্গে যাবার সময় যুধিষ্ঠির তাঁর কুকুরকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতের কাব্যে মানুষ যখন স্বর্গে পৌঁছোয় প্রকৃতিকে সঙ্গে নেয়, বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজে বড়ো হয়ে ওঠে না। মরীচির তপোবনে মানুষ যেমন তপস্বী হেমকূটও তেমনি তপস্বী, সিংহও সেখানে হিংসা ত্যাগ করে, গাছপালাও সেখানে ইচ্ছাপূর্বক প্রার্থীর অভাব পূরণ করে। মানুষ একা নয়, নিখিলকে নিয়ে সে সম্পূর্ণ, অতএব কল্যাণ যখন আবির্ভূত হয় তখন সকলের সঙ্গে যোগেই তার আবির্ভাব।

রামায়ণে রামের বনবাস হল। কেবল রাক্ষসের উপদ্রব ছাড়া সে বনবাসে তাঁদের আর কোনো দুঃখই ছিল না। তাঁরা বনের পর বন, নদীর পর নদী, পর্বতের পর

পর্বত পার হয়ে গেছেন, তাঁরা পর্ণকুটীরে বাস করেছেন, মাটিতে শুয়ে রাত্রি কাটিয়েছেন কিন্তু তাঁরা ক্লেশবোধ করেন নি। এই সমস্ত নদীগিরি অরণ্যের সঙ্গে তাঁদের হৃদয়ের মিলন ছিল। এখানে তাঁরা প্রবাসী নন।

অন্য দেশের কবি রাম লক্ষ্মণ সীতার মাহাত্ম্যকে উজ্জ্বল করে দেখাবার জন্যেই বনবাসের দুঃখকে খুব কঠোর করেই চিত্রিত করতেন। কিন্তু বাল্মীকি একেবারেই তা করেন নি—তিনি বনের আনন্দকেই বারংবার পুনরুক্তিদ্বারা কীর্তন করে চলেছেন।

রাজৈশ্বর্য যাঁদের অন্তঃকরণকে অভিভূত করে আছে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মিলন কখনোই তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক হতে পারে না। সমাজগত সংস্কার ও চিরজন্মের কৃত্রিম অভ্যাস পদে পদেই তাঁদের বাধা না দিয়ে থাকতে পারে না। সেই সকল বাধার ভিতর থেকে প্রকৃতিকে তাঁরা কেবল প্রতিকূলই দেখতে থাকেন।

আমাদের রাজপুত্র ঐশ্বর্যে পালিত কিন্তু ঐশ্বর্যের আসক্তি তাঁর অন্তঃকরণকে অভিভূত করে নি। ধর্মের অনুরোধে বনবাস স্বীকার করাই তার প্রথম প্রমাণ। তাঁর চিত্ত স্বাধীন ছিল, শান্ত ছিল, এইজন্যেই তিনি অরণ্যে প্রবাসদুঃখ ভোগ করেন নি; এইজন্যেই তরুলতা পশুপক্ষী তাঁর হৃদয়কে কেবলই আনন্দ দিয়েছে। এই আনন্দ প্রভুত্বের আনন্দ নয়, ভোগের আনন্দ নয়, সম্মিলনের আনন্দ। এই আনন্দের ভিত্তিতে তপস্যা, আত্মসংযম। এর মধ্যেই উপনিষদের সেই বাণী, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।

কৌশল্যার রাজগৃহবধূ সীতা বনে চলেছেন—

একৈকং পাদপং গুল্মং লতাং বা পুষ্পশালিনীম্
অদৃষ্টরূপাং পশ্যন্তী রামং পপ্রচ্ছ সাবলা।
রমণীয়ান্ বহুবিধান্ পাদপান্ কুসুমোৎকরান্
সীতাবচনসংরব্ধ আনয়ামাস লক্ষ্মণঃ।
বিচিত্রবালুকাজলাং হংসসারসনাদিতাম্।
রেমে জনকরাজস্য সুতা প্রেক্ষ্য তদা নদীম্।

যে সকল তরুগুল্ম কিংবা পুষ্পশালিনী লতা সীতা পূর্বে কখনো দেখেন নি তাদের কথা তিনি রামকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। লক্ষ্মণ তাঁর অনুরোধে তাঁকে পুষ্পমঞ্জরীতে ভরা বহুবিধ গাছ তুলে এনে দিতে লাগলেন। সেখানে বিচিত্রবালুকাজলা হংসসারসমুখরিতা নদী দেখে জানকী মনে আনন্দ বোধ করলেন।

প্রথম বনে গিয়ে রাম চিত্রকূট পর্বতে যখন আশ্রয় গ্রহণ করলেন, তিনি

সুরম্যমাসাদ্য তু চিত্রকূটং
নদীঞ্চ তাং মাল্যবতীং সুতীর্থাং
ননন্দ হৃষ্টো মৃগপক্ষিজুষ্টাং
জহৌ চ দুঃখং পুরবিপ্রবাসাৎ।

সেই সুরম্য চিত্রকূট, সেই সুতীর্থা মাল্যবতী নদী, সেই মৃগপক্ষিসেবিতা বনভূমিকে প্রাপ্ত হয়ে পুরবিপ্রবাসের দুঃখকে ত্যাগ করে হৃষ্টমনে রাম আনন্দ করতে লাগলেন।

দীর্ঘকালোষিতস্তস্মিন্ গিরৌ গিরিবনপ্রিয়ঃ—গিরিবনপ্রিয় রাম দীর্ঘকাল সেই গিরিতে বাস করে একদিন সীতাকে চিত্রকূটশিখর দেখিয়ে বলছেন—

ন রাজ্যভ্রংশনং ভদ্রে ন সুহৃদ্ভির্বিনাভবঃ
মনো মে বাধতে দৃষ্ট্বা রমণীয়মিমং গিরিম্।

রমণীয় এই গিরিকে দেখে রাজ্যভ্রংশনও আমাকে দুঃখ দিচ্ছে না, সুহৃদ্‌গণের কাছ থেকে দূরে বাসও আমার পীড়ার কারণ হচ্ছে না।

সেখান থেকে রাম যখন দণ্ডকারণ্যে গেলেন সেখানে গগনে সূর্যমণ্ডলের মতো দুর্দর্শ প্রদীপ্ত তাপসাশ্রমমণ্ডল দেখতে পেলেন। এই আশ্রম শরণ্যং সর্বভূতানাম্। ইহা ব্রাহ্মীলক্ষ্মী দ্বারা সমাবৃত। কুটিরগুলি সুমার্জিত, চারিদিকে কত মৃগ কত পক্ষী।

রামের বনবাস এমনি করেই কেটেছিল—কোথাও বা রমণীয় বনে, কোথাও বা পবিত্র তপোবনে।

রামের প্রতি সীতার ও সীতার প্রতি রামের প্রেম তাঁদের পরস্পর থেকে প্রতিফলিত হয়ে চারিদিকের মৃগ পক্ষীকে আচ্ছন্ন করেছিল। তাঁদের প্রেমের যোগে তাঁরা কেবল নিজেদের সঙ্গে নয়, বিশ্বলোকের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়েছিলেন। এইজন্য সীতাহরণের পর রাম সমস্ত অরণ্যকেই আপনার বিচ্ছেদবেদনার সহচর পেয়েছিলেন। সীতার অভাব কেবল রামের পক্ষে নয়—সমস্ত অরণ্যই যে সীতাকে হারিয়েছে। কারণ, রামসীতার বনবাসকালে অরণ্য একটি নূতন সম্পদ পেয়েছিল—সেটি হচ্ছে মানুষের প্রেম। সেই প্রেমে তার পল্লবঘনশ্যামলতাকে, তার ছায়াগম্ভীর গহনতার রহস্যকে একটি চেতনার সঞ্চারে রোমাঞ্চিত করে তুলেছিল।

শেক্স্‌পীয়রের As you like it নাটক একটি বনবাসকাহিনী—টেম্পেস্টও তাই, Midsummer night's dream ও অরণ্যের কাব্য। কিন্তু সে সকল কাব্যে মানুষের প্রভুত্ব ও প্রবৃত্তির লীলাই একেবারে একান্ত—অরণ্যের সঙ্গে সৌহার্দ্য দেখতে পাই নে।

অরণ্যবাসের সঙ্গে মানুষের চিত্তের সামঞ্জস্যসাধন ঘটে নি। হয় তাকে জয় করবার, নয় তাকে ত্যাগ করবার চেষ্টা সর্বদাই রয়েছে; হয় বিরোধ, নয় বিরাগ, নয় ঔদাসীন্য। মানুষের প্রকৃতি বিশ্বপ্রকৃতিকে ঠেলেঠুলে স্বতন্ত্র হয়ে উঠে আপনার গৌরব প্রকাশ করেছে।

মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট কাব্যে আদি মানবদম্পতির স্বর্গারণ্যে বাস বিষয়টিই এমন যে অতি সহজেই সেই কাব্যে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির মিলনটি সরল প্রেমের সম্বন্ধে বিরাট ও মধুর হয়ে প্রকাশ পাবার কথা। কবি প্রকৃতিসৌন্দর্যের বর্ণনা করেছেন, জীবজন্তুরা সেখানে হিংসা পরিত্যাগ করে একত্রে বাস করছে তাও বলেছেন, কিন্তু মানুষের সঙ্গে তাদের কোনো সাত্ত্বিক সম্বন্ধ নেই। তারা মানুষের ভোগের জন্যেই বিশেষ করে সৃষ্ট, মানুষ তাদের প্রভু। এমন আভাসটি কোথাও পাই নে যে এই আদি দম্পতি প্রেমের আনন্দ-প্রাচুর্যে তরুলতা পশুপক্ষীর সেবা করছেন, ভাবনাকে কল্পনাকে নদীগিরিঅরণ্যের সঙ্গে নানালীলায় সম্মিলিত করে তুলছেন। এই স্বর্গারণ্যের যে নিভৃত নিকুঞ্জটিতে মানবের প্রথম পিতামাতা বিশ্রাম করতেন সেখানে "Beast, bird, insect or worm durst enter none; such was their awe of man."—অর্থাৎ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ কেউ প্রবেশ করতে সাহস করত না, মানুষের প্রতি এমনি তাদের একটি সভয় সম্ভ্রম ছিল।

এই যে নিখিলের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ, এর মূলে একটি গভীরতর বিচ্ছেদের কথা আছে। এর মধ্যে—ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—জগতে যা কিছু আছে সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা সমাবৃত করে জানবে, এই বাণীটির অভাব আছে। এই পাশ্চাত্য কাব্য ঈশ্বরের সৃষ্টি ঈশ্বরের যশোকীর্তন করবার জন্যেই; ঈশ্বর স্বয়ং দূরে থেকে তাঁর এই বিশ্বরচনা থেকে বন্দনা গ্রহণ করছেন।

মানুষের সঙ্গেও আংশিক পরিমাণে প্রকৃতির সেই সম্বন্ধ প্রকাশ পেয়েছে অর্থাৎ প্রকৃতি মানুষের শ্রেষ্ঠতা প্রচারের জন্যে।

ভারতবর্ষও যে মানুষের শ্রেষ্ঠতা অস্বীকার করে তা নয়। কিন্তু প্রভুত্ব করাকেই ভোগ করাকেই সে শ্রেষ্ঠতার প্রধান লক্ষণ বলে মানে না। মানুষের শ্রেষ্ঠতার সর্বপ্রধান পরিচয়ই হচ্ছে এই যে, মানুষ সকলের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। সে-মিলন মূঢ়তার মিলন নয় সে-মিলন চিত্তের মিলন, সুতরাং আনন্দের মিলন। এই আনন্দের কথাই আমাদের কাব্যে কীর্তিত।

উত্তরচরিতে রাম ও সীতার যে প্রেম, সেই প্রেম আনন্দের প্রাচুর্যবেগে চারি দিকের জলস্থল আকাশের মধ্যে প্রবেশ করেছে। তাই রাম দ্বিতীয়বার গোদাবরীর

গিরিতট দেখে বলে উঠেছিলেন, যত্র দ্রুমা অপি মৃগা অপি বন্ধবো মে। তাই সীতাবিচ্ছেদকালে তিনি তাঁদের পূর্বনিবাসভূমি দেখে আক্ষেপ করেছিলেন যে, মৈথিলী তাঁর করকমলবিকীর্ণ জল নীবার ও তৃণ দিয়ে যে-সকল গাছ পাখি ও হরিণদের পালন করেছিলেন তাদের দেখে আমার হৃদয় পাষাণগলার মতো গলে যাচ্ছে।

মেঘদূতে যক্ষের বিরহ নিজের দুঃখের টানে স্বতন্ত্র হয়ে একলা কোণে বসে বিলাপ করছে না। বিরহ-দুঃখই তার চিত্তকে নববর্ষায় প্রফুল্ল পৃথিবীর সমস্ত নগনদী-অরণ্যনগরীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছে। মানুষের হৃদয়বেদনাকে কবি সংকীর্ণ করে দেখান নি, তাকে বিরাটের মধ্যে বিস্তীর্ণ করেছেন; এই জন্যই প্রভু-শাপগ্রস্ত একজন যক্ষের দুঃখবার্তা চিরকালের মতো বর্ষাঋতুর মর্মস্থান অধিকার করে প্রণয়ী-হৃদয়ের খেয়ালকে বিশ্বসংগীতের ধ্রুপদে এমন করে বেঁধে দিয়েছে।

ভারতবর্ষের এইটেই হচ্ছে বিশেষত্ব। তপস্যার ক্ষেত্রেও এই দেখি, যেখানে তার হৃদয়বৃত্তির লীলা সেখানেও এই দেখতে পাই।

মানুষ দুই রকম করে নিজের মহত্ত্ব উপলব্ধি করে—এক, স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে, আর-এক মিলনের মধ্যে। এক, ভোগের দ্বারা, আর-এক যোগের দ্বারা। ভারতবর্ষ স্বভাবতই শেষের পথ অবলম্বন করেছে। এইজন্যেই দেখতে পাই যেখানেই প্রকৃতির মধ্যে কোনো বিশেষ সৌন্দর্য বা মহিমার আবির্ভাব সেইখানেই ভারতবর্ষের তীর্থস্থান। মানবচিত্তের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির মিলন যেখানে স্বভাবতই ঘটতে পারে সেই স্থানটিকেই ভারতবর্ষ পবিত্র তীর্থ বলে জেনেছে। এ সকল জায়গায় মানুষের প্রয়োজনের কোনো উপকরণই নেই, এখানে চাষও চলে না বাসও চলে না, এখানে পণ্য-সামগ্রীর আয়োজন নেই, এখানে রাজার রাজধানী নয়,—অন্তত সেই সমস্তই এখানে মুখ্য নয়। এখানে নিখিল প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ আপনার যোগ উপলব্ধি ক'রে আত্মাকে সর্বগ ও বৃহৎ বলে জানে। এখানে প্রকৃতিকে নিজের প্রয়োজন সাধনের ক্ষেত্র বলে মানুষ জানে না, তাকে আত্মার উপলব্ধি সাধনের ক্ষেত্র বলেই মানুষ অনুভব করে, এইজন্যেই তা পুণ্যস্থান।

ভারতবর্ষের হিমালয় পবিত্র, ভারতবর্ষের বিন্ধ্যাচল পবিত্র, ভারতবর্ষের যে নদী-গুলি লোকালয়সকলকে অক্ষয়ধারায় স্তন্য দান করে আসছে তারা সকলেই পুণ্য-সলিলা। হরিদ্বার পবিত্র, হৃষীকেশ পবিত্র, কেদারনাথ বদরিকাশ্রম পবিত্র, কৈলাস পবিত্র, মানস সরোবর পবিত্র, গঙ্গার মধ্যে যমুনার মিলন পবিত্র, সমুদ্রের মধ্যে গঙ্গার অবসান পবিত্র। যে বিরাট প্রকৃতির দ্বারা মানুষ পরিবেষ্টিত, যার আলোক এসে তার চক্ষুকে সার্থক করেছে, যার উত্তাপ তার সর্বাঙ্গে প্রাণকে স্পন্দিত করে তুলছে,

যার জলে তার অভিষেক, যার অন্নে তার জীবন, যার অভ্রভেদী রহস্য-নিকেতনের নানা দ্বার দিয়ে নানা দূত বেরিয়ে এসে শব্দে গন্ধে বর্ণে ভাবে মানুষের চৈতন্যকে নিত্যনিয়ত জাগ্রত করে রেখে দিয়েছে ভারতবর্ষ সেই প্রকৃতির মধ্যে আপনার ভক্তি-বৃত্তিকে সর্বত্র ওতপ্রোত করে প্রসারিত করে দিয়েছে। । জগৎকে ভারতবর্ষ পূজার দ্বারা গ্রহণ করেছে, তাকে কেবলমাত্র উপভোগের দ্বারা খর্ব করে নি, তাকে ঔদাসীন্যের দ্বারা নিজের কর্মক্ষেত্রের বাইরে দূরে সরিয়ে রেখে দেয় নি; এই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে পবিত্র যোগেই ভারতবর্ষ আপনাকে বৃহৎ করে সত্য করে জেনেছে, ভারতবর্ষের তীর্থস্থানগুলি এই কথাই ঘোষণা করছে।

বিদ্যালাভ করা কেবল বিদ্যালয়ের উপরেই নির্ভর করে না। প্রধানত ছাত্রের উপরেই নির্ভর করে। অনেক ছাত্র বিদ্যালয়ে যায়, এমন কি উপাধিও পায়, অথচ বিদ্যা পায় না। তেমনি তীর্থে অনেকেই যায় কিন্তু তীর্থের যথার্থ ফল সকলে লাভ করতে পারে না। যারা দেখবার জিনিসকে দেখবে না, পাবার জিনিসকে নেবে না, শেষ পর্যন্তই তাদের বিদ্যা পুঁথিগত ও ধর্ম বাহ্য আচারে আবদ্ধ থাকে। তারা তীর্থে যায় বটে কিন্তু যাওয়াকেই তারা পুণ্য মনে করে, পাওয়াকে নয়। তারা বিশেষ জল বা বিশেষ মাটির কোনো বস্তুগুণ আছে বলেই কল্পনা করে, এতে মানুষের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়, যা চিত্তের সামগ্রী তাকে বস্তুর মধ্যে নির্বাসিত করে নষ্ট করে। আমাদের দেশে সাধনামার্জিত চিত্তশক্তি যতই মলিন হয়েছে এই নিরর্থক বাহ্যিকতা ততই বেড়ে উঠেছে এ-কথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু আমাদের এই দুর্গতির দিনের জড়ত্বকেই আমি কোনোমতেই ভারতবর্ষের চিরন্তন অভিপ্রায় বলে গ্রহণ করতে পারি নে।

কোনো একটি বিশেষ নদীর জলে স্নান করলে নিজের অথবা ত্রিকোটিসংখ্যক পূর্বপুরুষের পারলৌকিক সদ্‌গতি ঘটার সম্ভাবনা আছে এ-বিশ্বাসকে আমি সমূলক বলে মেনে নিতে রাজি নই এবং এ-বিশ্বাসকে আমি বড়ো জিনিস বলে শ্রদ্ধা করি নে। কিন্তু অবগাহন স্নানের সময় নদীর জলকে যে-ব্যক্তি যথার্থ ভক্তির দ্বারা সর্বাঙ্গে এবং সমস্ত মনে গ্রহণ করতে পারে আমি তাকে ভক্তির পাত্র বলেই জ্ঞান করি। কারণ, নদীর জলকে সামান্য তরল পদার্থ বলে সাধারণ মানুষের যে একটা স্থূল সংস্কার, একটা তামসিক অবজ্ঞা আছে, সাত্ত্বিকতার দ্বারা অর্থাৎ চৈতন্যময়তার দ্বারা সেই জড় সংস্কারকে সে-লোক কাটিয়ে উঠেছে—এই জন্যে নদীর জলের সঙ্গে কেবলমাত্র তার শারীরিক ব্যবহারের বাহ্য সংস্রব ঘটে নি, তার সঙ্গে তার চিত্তের যোগসাধন হয়েছে। এই নদীর ভিতর দিয়ে পরম চৈতন্য তার চেতনাকে একভাবে স্পর্শ করেছেন। সেই

স্পর্শের দ্বারা স্নানের জল কেবল তার দেহের মলিনতা নয়, তার চিত্তেরও মোহপ্রলেপ মার্জনা করে দিচ্ছে।

অগ্নি জল মাটি অন্ন প্রভৃতি সামগ্রীর অনন্ত রহস্য পাছে অভ্যাসের দ্বারা আমাদের কাছে একেবারে মলিন হয়ে যায় এই জন্তে প্রত্যহই নানা কর্মে নানা অনুষ্ঠানে তাদের পবিত্রতা আমাদের স্মরণ করবার বিধি আছে। যে-লোক চেতনভাবে তাই স্মরণ করতে পারে, তাদের সঙ্গে যোগে ভূমার সঙ্গে আমাদের যোগ এ-কথা যার বোধশক্তি স্বীকার করতে পারে সে-লোক খুব একটি মহৎ সিদ্ধি লাভ করেছে। স্নানের জলকে আহারের অন্নকে শ্রদ্ধা করবার যে শিক্ষা সে মূঢ়তার শিক্ষা নয় তাতে জড়ত্বের প্রশ্রয় হয় না; কারণ, এই সমস্ত অভ্যস্ত সামগ্রীকে তুচ্ছ করাই হচ্ছে জড়তা, তার মধ্যেও চিত্তের উদ্‌বোধন এ কেবল চৈতন্তের বিশেষ বিকাশেই সম্ভবপর। অবশ্য, যে-ব্যক্তি মূঢ়, সত্যকে গ্রহণ করতে যার প্রকৃতিতে স্থূল বাধা আছে, সমস্ত সাধনাকেই সে বিকৃত করে এবং লক্ষ্যকে সে কেবলই ভুল জায়গায় স্থাপন করতে থাকে এ-কথা বলাই বাহুল্য।

বহুকোটি লোক, প্রায় একটি সমগ্র জাতি, মৎস্ত মাংস আহার একেবারে পরিত্যাগ করেছে—পৃথিবীতে কোথাও এর তুলনা পাওয়া যায় না। মানুষের মধ্যে এমন জাতি দেখি নে যে আমিষ আহার না করে।

ভারতবর্ষ এই যে আমিষ পরিত্যাগ করেছে সে কৃচ্ছ্রব্রত সাধনের জন্তে নয়, নিজের শরীরের পীড়া দিয়ে কোনো শাস্ত্রোপদিষ্ট পুণ্যলাভের জন্তে নয়। তার একমাত্র উদ্দেশ্য, জীবের প্রতি হিংসা ত্যাগ করা।

এই হিংসা ত্যাগ না করলে জীবের সঙ্গে জীবের যোগসামঞ্জস্য নষ্ট হয়। প্রাণীকে যদি আমরা খেয়ে ফেলবার, পেট ভরাবার জিনিস বলে দেখি তবে কখনোই তাকে সত্যরূপে দেখতে পারি নে। তবে প্রাণ জিনিসটাকে এতই তুচ্ছ করে দেখা অভ্যস্ত হয়ে যায় যে, কেবল আহারের জন্য নয়, শুদ্ধমাত্র প্রাণিহত্যা করাই আমোদের অঙ্গ হয়ে ওঠে। এবং নিদারুণ অহৈতুকী হিংসাকে জলে স্থলে আকাশে গুহায় গহ্বরে দেশে বিদেশে মানুষ ব্যাপ্ত করে দিতে থাকে।

এই যোগভ্রষ্টতা, এই বোধশক্তির অসাড়তা থেকে ভারতবর্ষ মানুষকে রক্ষা করবার জন্তে চেষ্টা করেছে।

মানুষের জ্ঞান বর্বরতা থেকে অনেক দূরে অগ্রসর হয়েছে তার একটি প্রধান লক্ষণ কী? না, মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে জগতের সর্বত্রই নিয়মকে দেখতে পাচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তা না দেখতে পাচ্ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত তার জ্ঞানের সম্পূর্ণ সার্থকতা ছিল না।

ততক্ষণ বিশ্বচরাচরে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করছিল—সে দেখছিল জ্ঞানের নিয়ম কেবল তার নিজের মধ্যেই আছে আর এই বিরাট বিশ্ব-ব্যাপারের মধ্যে নেই। এই জন্যেই তার জ্ঞান আছে বলেই সে যেন জগতে একঘরে হয়ে ছিল। কিন্তু আজ তার জ্ঞান অণু হতে অণুতম ও বৃহৎ হতে বৃহত্তম সকলের সঙ্গেই নিজের যোগস্থাপনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছে। এই হচ্ছে বিজ্ঞানের সাধনা।

ভারতবর্ষ যে-সাধনাকে গ্রহণ করেছে সে হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ, আত্মার যোগ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগ। কেবল জ্ঞানের যোগ নয়, বোধের যোগ।

গীতা বলেছেন

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ,
মনসস্তু পরাবুদ্ধির্যোবুদ্ধেঃপরতস্তু সঃ।

ইন্দ্রিয়গণকে শ্রেষ্ঠ পদার্থ বলা হয়ে থাকে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ, আবার মনের চেয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, আর বুদ্ধির চেয়ে যা শ্রেষ্ঠ তা হচ্ছেন তিনি।

ইন্দ্রিয়সকল কেন শ্রেষ্ঠ, না, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যোগসাধন হয়, কিন্তু সে যোগ আংশিক। ইন্দ্রিয়ের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ, কারণ মনের দ্বারা যে জ্ঞানময় যোগ ঘটে তা ব্যাপকতর। কিন্তু জ্ঞানের যোগেও সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ দূর হয় না। মনের চেয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, কারণ বোধের দ্বারা যে চৈতন্যময় যোগ, তা একেবারে পরিপূর্ণ। সেই যোগের দ্বারাই আমরা সমস্ত জগতের মধ্যে তাঁকেই উপলব্ধি করি যিনি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

এই সকলের-চেয়ে-শ্রেষ্ঠকে সকলের মধ্যেই বোধের দ্বারা অনুভব করা ভারতবর্ষের সাধনা।

অতএব যদি আমরা মনে করি ভারতবর্ষের এই সাধনাতেই দীক্ষিত করা ভারত-বাসীর শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত তবে এটা মনে স্থির রাখতে হবে যে কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে। অর্থাৎ কেবল কারখানায় দক্ষতা-শিক্ষা নয়, স্কুল-কলেজে পরীক্ষায় পাস করা নয়, আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে; প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে, তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে।

আমাদের স্কুল-কলেজেও তপস্যা আছে কিন্তু সে মনের তপস্যা, জ্ঞানের তপস্যা। বোধের তপস্যা নয়।

জ্ঞানের তপস্যায় মনকে বাধামুক্ত করতে হয়। যেসকল পূর্বসংস্কার আমাদের মনের ধারণাকে এক-ঝোঁকা করে রাখে তাদের ক্রমে ক্রমে পরিষ্কার করে দিতে হয়।

যা নিকটে আছে বলে বড়ো এবং দূরে আছে বলে ছোটো, যা বাইরে আছে বলেই প্রত্যক্ষ এবং ভিতরে আছে বলেই প্রচ্ছন্ন, যা বিচ্ছিন্ন করে দেখলে নিরর্থক, সংযুক্ত করে দেখলেই সার্থক তাকে তার যাথার্থ্য রক্ষা করে দেখবার শিক্ষা দিতে হয়।

বোধের তপস্যার বাধা হচ্ছে রিপুর বাধা; প্রবৃত্তি অসংযত হয়ে উঠলে চিত্তের সাম্য থাকে না সুতরাং বোধ বিকৃত হয়ে যায়। কামনার জিনিসকে আমরা শ্রেয় দেখি, সে জিনিসটা সত্যই শ্রেয় বলে নয় আমাদের কামনা আছে বলেই; লোভের জিনিসকে আমরা বড়ো দেখি, সে জিনিসটা সত্যই বড়ো বলে নয় আমাদের লোভ আছে বলেই।

এই জন্যে ব্রহ্মচর্যের সংযমের দ্বারা বোধশক্তিকে বাধামুক্ত করবার শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। ভোগবিলাসের আকর্ষণ থেকে অভ্যাসকে মুক্তি দিতে হয়, যে সমস্ত সাময়িক উত্তেজনা লোকের চিত্তকে ক্ষুব্ধ এবং বিচারবুদ্ধিকে সামঞ্জস্যভ্রষ্ট করে দেয় তার ধাক্কা থেকে বাঁচিয়ে বুদ্ধিকে সরল করে বাড়তে দিতে হয়।

যেখানে সাধনা চলছে, যেখানে জীবনযাত্রা সরল ও নির্মল, যেখানে সামাজিক সংস্কারের সংকীর্ণতা নেই, যেখানে ব্যক্তিগত ও জাতিগত বিরোধবুদ্ধিকে দমন করবার চেষ্টা আছে, সেইখানেই ভারতবর্ষ যাকে বিশেষভাবে বিদ্যা বলেছে তাই লাভ করবার স্থান।

আমি জানি অনেকেই বলে উঠবেন এ একটা ভাবুকতার উচ্ছ্বাস, কাণ্ডজ্ঞান-বিহীনের দুরাশামাত্র। কিন্তু সে আমি কোনোমতেই স্বীকার করতে পারি নে। যা সত্য তা যদি অসাধ্য হয় তবে তা সত্যই নয়। অবশ্য, যা সকলের চেয়ে শ্রেয় তাই যে সকলের চেয়ে সহজ তা নয়, সেই জন্যেই তার সাধনা চাই। আসলে, প্রথম শক্ত হচ্ছে সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা করা। টাকা জিনিসটার দরকার আছে এই বিশ্বাস যখন ঠিক মনে জন্মায় তখন এ আপত্তি আমরা আর করি নে যে টাকা উপার্জন করা শক্ত। তেমনি ভারতবর্ষ যখন বিদ্যাকেই নিশ্চয়রূপে শ্রদ্ধা করেছিল তখন সেই বিদ্যালাভের সাধনাকে অসাধ্য বলে হেসে উড়িয়ে দেয় নি। তখন তপস্যা আপনি সত্য হয়ে উঠেছিল।

অতএব প্রথমত দেশের সেই সত্যের প্রতি দেশের লোকের শ্রদ্ধা যদি জন্মে তবে দুর্গম বাধার মধ্য দিয়েও তার পথ আপনিই তৈরি হয়ে উঠবে।

বর্তমানকালে এখনই দেশে এই রকম তপস্যার স্থান। এই রকম বিদ্যালয় যে অনেকগুলি হবে আমি এমনতরো আশা করি নে। কিন্তু আমরা যখন বিশেষভাবে জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে সম্প্রতি জাগ্রত হয়ে উঠেছি তখন ভারতবর্ষের

বিদ্যালয় যেমনটি হওয়া উচিত অন্তত তার একটিমাত্র আদর্শ দেশের নানা চাঞ্চল্য, নানা বিরুদ্ধভাবের আন্দোলনের ঊর্ধ্বে জেগে ওঠা দরকার হয়েছে।

ন্যাশনাল বিদ্যাশিক্ষা বলতে য়ুরোপ যা বোঝে আমরা যদি তাই বুঝি তবে তা নিতান্তই বোঝার ভুল হবে। আমাদের দেশের কতকগুলি বিশেষ সংস্কার, আমাদের জাতের কতকগুলি লোকাচার, এইগুলির দ্বারা সীমাবদ্ধ করে আমাদের স্বাজাত্যের অভিমানকে অত্যুগ্র করে তোলবার উপায়কে আমি কোনোমতে ন্যাশনাল শিক্ষা বলে গণ্য করতে পারি নে। জাতীয়তাকে আমরা পরম পদার্থ বলে পূজা করি নে এইটেই হচ্ছে আমাদের জাতীয়তা—ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি, ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ, এইটিই হচ্ছে আমাদের জাতীয়তার মন্ত্র।

প্রাচীন ভারতের তপোবনে যে মহাসাধনার বনস্পতি একদিন মাথা তুলে উঠেছিল এবং সর্বত্র তার শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে সমাজের নানাদিক্‌কে অধিকার করে নিয়েছিল সেই ছিল আমাদের ন্যাশনাল সাধনা। সেই সাধনা যোগসাধনা। যোগসাধনা কোনো উৎকট শরীরিক মানসিক ব্যায়ামচর্চা নয়। যোগসাধনা মানে সমস্ত জীবনকে এমনভাবে চালনা করা যাতে স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা বিক্রমশালী হয়ে ওঠাই আমাদের লক্ষ্য না হয়, মিলনের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠাকেই আমরা চরম পরিণাম বলে মানি, ঐশ্বর্যকে সঞ্চিত করে তোলা নয় আত্মাকে সত্যে উপলব্ধি করাই আমরা সফলতা বলে স্বীকার করি।

বহু প্রাচীনকালে একদিন অরণ্যসংকুল ভারতবর্ষে আমাদের আর্য পিতামহেরা প্রবেশ করেছিলেন। আধুনিক ইতিহাসে য়ুরোপীয়দল ঠিক তেমনি করেই নূতন আবিষ্কৃত মহাদ্বীপের মহারণ্যে পথ উদ্‌ঘাটন করেছেন। তাঁদের মধ্যে সাহসিকগণ অগ্রগামী হয়ে অপরিচিত ভূখণ্ডসকলকে অনুবর্তীদের জন্যে অনুকূল করে নিয়েছেন। আমাদের দেশেও অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিরা অগ্রগামী ছিলেন। তাঁরা অপরিচিত দুর্গমতার বাধা অতিক্রম করে গহন অরণ্যকে বাসোপযোগী করে তুলেছিলেন। পূর্বতন অধিবাসীদের সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই তখনও যেমন হয়েছিল এখনও তেমনি হয়েছে। কিন্তু এই দুই ইতিহাসের ধারা যদিও ঠিক একই অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তবু একই সমুদ্রে এসে পৌঁছোয় নি।

আমেরিকার অরণ্যে যে তপস্যা হয়েছে তার প্রভাবে বনের মধ্যে থেকে বড়ো বড়ো শহর ইন্দ্রজালের মতো জেগে উঠেছে। ভারতবর্ষেও তেমন করে শহরের সৃষ্টি হয় নি তা নয় কিন্তু ভারতবর্ষ সেই সঙ্গে অরণ্যকেও অঙ্গীকার করে নিয়েছিল। অরণ্য ভারতবর্ষের দ্বারা বিলুপ্ত হয় নি, ভারতবর্ষের দ্বারা সার্থক হয়েছিল, যা বর্বরের

আবাস ছিল তাই ঋষির তপোবন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমেরিকার অরণ্য যা অবশিষ্ট আছে তা আজ আমেরিকার প্রয়োজনের সামগ্রী, কোথাও বা তা ভোগের বস্তুও বটে, কিন্তু যোগের আশ্রম নয়। ভূমার উপলব্ধি দ্বারা এই অরণ্যগুলি পুণ্যস্থান হয়ে ওঠে নি। মানুষের শ্রেষ্ঠতর অন্তরতর প্রকৃতির সঙ্গে এই আরণ্য প্রকৃতির পবিত্র মিলন স্থাপিত হয় নি। অরণ্যকে নব্য আমেরিকা আপনার বড়ো জিনিস কিছুই দেয় নি, অরণ্যও তাকে আপনার বড়ো পরিচয় থেকে বঞ্চিত করেছে। নূতন আমেরিকা যেমন তার পুরাতন অধিবাসীদের প্রায় লুপ্তই করেছে আপনার সঙ্গে যুক্ত করে নি তেমনি অরণ্যগুলিকে আপনার সভ্যতার বাইরে ফেলে দিয়েছে তার সঙ্গে মিলিত করে নেয় নি। নগর-নগরীই আমেরিকার সভ্যতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন—এই নগর-স্থাপনার দ্বারা মানুষ আপনার স্বাতন্ত্র্যের প্রতাপকে অভ্রভেদী করে প্রচার করেছে। আর তপোবনই ছিল ভারতবর্ষের সভ্যতার চরম নিদর্শন; এই বনের মধ্যে মানুষ নিখিল প্রকৃতির সঙ্গে আত্মার মিলনকেই শান্ত সমাহিতভাবে উপলব্ধি করেছে।

কেউ না মনে করেন ভারতবর্ষের এই সাধনাকেই আমি একমাত্র সাধনা বলে প্রচার করতে ইচ্ছা করি। আমি বরঞ্চ বিশেষ করে এই কথাই জানাতে চাই যে, মানুষের মধ্যে বৈচিত্র্যের সীমা নেই। সে তালগাছের মতো একটিমাত্র ঋজুরেখায় আকাশের দিকে ওঠে না, সে বটগাছের মতো অসংখ্য ডালেপালায় আপনাকে চারিদিকে বিস্তীর্ণ করে দেয়। তার যে-শাখাটি যেদিকে সহজে যেতে পারে তাকে সেই দিকেই সম্পূর্ণভাবে যেতে দিলে তবেই সমগ্র গাছটি পরিপূর্ণতা লাভ করে, সুতরাং সকল শাখারই তাতে মঙ্গল।

মানুষের ইতিহাস জীবধর্মী। সে নিগূঢ় প্রাণশক্তিতে বেড়ে ওঠে। সে লোহা পিতলের মতো ছাঁচে ঢালবার জিনিস নয়। বাজারে কোনো বিশেষকালে কোনো বিশেষ সভ্যতার মূল্য অত্যন্ত বেড়ে গেছে বলেই সমস্ত মানবসমাজকে একই কারখানায় ঢালাই করে ফ্যাশনের বশবর্তী মূঢ় খরিদ্দারকে খুশি করে দেবার দুরাশা একেবারেই বৃথা।

ছোটো পা সৌন্দর্য বা অভিজাত্যের লক্ষণ, এই মনে করে কৃত্রিম উপায়ে তাকে সংকুচিত করে চীনের মেয়ে ছোটো পা পায় নি, বিকৃত পা পেয়েছে। ভারতবর্ষও হঠাৎ জবরদস্তি দ্বারা নিজেকে য়ুরোপীয় আদর্শের অনুগত করতে গেলে প্রকৃত য়ুরোপ হবে না, বিকৃত ভারতবর্ষ হবে মাত্র।

এ-কথা দৃঢ়রূপে মনে রাখতে হবে, এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির অনুকরণ অনুসরণের সম্বন্ধ নয়, আদান-প্রদানের সম্বন্ধ। আমার যে-জিনিসের অভাব নেই

তোমারও যদি ঠিক সেই জিনিসটাই থাকে তবে তোমার সঙ্গে আমার আর অদলবদল চলতে পারে না, তাহলে তোমাকে সমকক্ষভাবে আমার আর প্রয়োজন হয় না। ভারতবর্ষ যদি খাঁটি ভারতবর্ষ হয়ে না ওঠে তবে পরের বাজারে মজুরিগিরি করা ছাড়া পৃথিবীতে তার আর কোনো প্রয়োজনই থাকবে না। তাহলে তার আপনার প্রতি আপনার সম্মান-বোধ চলে যাবে এবং আপনাতে আপনার আনন্দও থাকবে না।

তাই আজ আমাদের অবহিত হয়ে বিচার করতে হবে যে, যে-সত্যে ভারতবর্ষ আপনাকে আপনি নিশ্চিতভাবে লাভ করতে পারে সে সত্যটি কী। সে সত্য প্রধানত বণিগ্‌বৃত্তি নয়, স্বারাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয়; সে সত্য বিশ্বজাগতিকতা। সেই সত্য ভারতবর্ষের তপোবনে সাধিত হয়েছে, উপনিষদে উচ্চারিত হয়েছে, গীতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে। বুদ্ধদেব সেই সত্যকে পৃথিবীতে সর্বমানবের নিত্যব্যবহারে সফল করে তোলবার জন্যে তপস্যা করেছেন এবং কালক্রমে নানাবিধ দুর্গতি ও বিকৃতির মধ্যেও কবির, নানক প্রভৃতি ভারতবর্ষের পরবর্তী মহাপুরুষগণ সেই সত্যকেই প্রচার করে গেছেন। ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্মে যোগসাধনা। ভারতবর্ষের অন্তরের মধ্যে যে উদার তপস্যা গভীরভাবে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে, সেই তপস্যা আজ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ এবং ইংরেজকে আপনার মধ্যে এক করে নেবে বলে প্রতীক্ষা করছে; দাসভাবে নয়, জড়ভাবে নয়, সাত্ত্বিকভাবে, সাধক-ভাবে। যতদিন তা না ঘটবে ততদিন আমাদের দুঃখ পেতে হবে, অপমান সইতে হবে, ততদিন নানাদিক থেকে আমাদের বারংবার ব্যর্থ হতে হবে। ব্রহ্মচর্য, ব্রহ্মজ্ঞান, সর্বজীবে দয়া, সর্বভূতে আত্মোপলব্ধি একদিন এই ভারতে কেবল কাব্যকথা কেবল মতবাদরূপে ছিল না; প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে একে সত্য করে তোলবার জন্যে অনুশাসন ছিল; সেই অনুশাসনকে আজ যদি আমরা বিস্মৃত না হই, আমাদের সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষাকে সেই অনুশাসনের যদি অনুগত করি, তবেই আমাদের আত্মা বিরাটের মধ্যে আপনার স্বাধীনতা লাভ করবে এবং কোনো সাময়িক বাহ্য অবস্থা আমাদের সেই স্বাধীনতাকে বিলুপ্ত করতে পারবে না।

প্রবলতার মধ্যে সম্পূর্ণতার আদর্শ নেই। সমগ্রের সামঞ্জস্য নষ্ট করে প্রবলতা নিজেকে স্বতন্ত্র করে দেখায় বলেই তাকে বড়ো মনে হয় কিন্তু আসলে সে ক্ষুদ্র। ভারতবর্ষ এই প্রবলতাকে চায় নি, সে পরিপূর্ণতাকেই চেয়েছিল। এই পরিপূর্ণতা নিখিলের সঙ্গে যোগে, এই যোগ অহংকারকে দূর করে বিনম্র হয়ে। এই বিনম্রতা একটি আধ্যাত্মিক শক্তি, এ দুর্বল স্বভাবের অধিগম্য নয়। বায়ুর যে প্রবাহ নিত্য,

শান্ততার দ্বারাই ঝড়ের চেয়ে তার শক্তি বেশি। এই জন্যেই ঝড় চিরদিন টিঁকতে পারে না, এই জন্যেই ঝড় কেবল সংকীর্ণ স্থানকেই কিছুকালের জন্য ক্ষুব্ধ করে, আর শান্ত বায়ুপ্রবাহ সমস্ত পৃথিবীকে নিত্যকাল বেষ্টন করে থাকে। যথার্থ নম্রতা, যা সাত্ত্বিকতার তেজে উজ্জ্বল, যা ত্যাগ ও সংযমের কঠোর শক্তিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত সেই নম্রতাই সমস্তের সঙ্গে অবাধে যুক্ত হয়ে সত্যভাবে নিত্যভাবে সমস্তকে লাভ করে। সে কাউকে দূর করে না, বিচ্ছিন্ন করে না, আপনাকে ত্যাগ করে এবং সকলকেই আপন করে। এই জন্যেই ভগবান যিশু বলেছেন যে, যে বিনম্র সেই পৃথ্বীবিজয়ী, শ্রেষ্ঠধনের অধিকার একমাত্র তারই।

ছুটির পর

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে

ছুটির পর আমরা সকলে আবার এখানে একত্র হয়েছি। কর্ম থেকে মাঝে মাঝে আমরা যে এইরূপ অবসর নিই সে কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হবার জন্য নয়—কর্মের সঙ্গে যোগকে নবীন রাখবার এই উপায়।

মাঝে মাঝে কর্মক্ষেত্র থেকে যদি এই রকম দূরে না যাই তবে কর্মের যথার্থ তাৎপর্য আমরা বুঝতে পারি নে। অবিশ্রাম কর্মের মাঝখানে নিবিষ্ট হয়ে থাকলে কর্মটাকেই অতিশয় একান্ত করে দেখা হয়। কর্ম তখন মাকড়সার জালের মতো আমাদের চারদিক থেকে এমনি আচ্ছন্ন করে ধরে যে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য কী তা বুঝবার সামর্থ্যই আমাদের থাকে না। এই জন্য অভ্যস্ত কর্মকে পুনরায় নূতন করে দেখবার সুযোগ লাভ করব বলেই এক একবার কর্ম থেকে আমরা সরে যাই। কেবল মাত্র ক্লান্ত শক্তিকে বিশ্রাম দেওয়াই তার উদ্দেশ্য নয়।

আমরা কেবলই কর্মকেই দেখব না। কর্তাকেও দেখতে হবে। কেবল আগুনের প্রখর তাপ ও এঞ্জিনের কঠোর শব্দের মধ্যে আমরা এই সংসার-কারখানার মুটে-মজুরের মতোই সর্বাঙ্গে কালিঝুল মেখে দিন কাটিয়ে দেব না। একবার দিনান্তে স্নান করে কাপড় ছেড়ে কারখানার মনিবকে যদি দেখে আসতে পারি তবে তাঁর সঙ্গে আমাদের কাজের যোগ নির্ণয় করে কলের একাধিপত্যের হাত এড়াতে পারি, তবেই কাজে আমাদের আনন্দ জন্মে। নতুবা কেবলই কলের চাকা চালাতে চালাতে আমরাও কলেরই শামিল হয়ে উঠি।

আজ ছুটির শেষে আমরা আবার আমাদের কর্মক্ষেত্রে এসে পৌঁছেছি। এবার কি আবার নূতন দৃষ্টিতে কর্মকে দেখছি না? এই কর্মের মর্মগত সত্যটি অভ্যাসবশত আমাদের কাছে ম্লান হয়ে গিয়েছিল তাকে পুনরায় উজ্জ্বল করে দেখে কি আনন্দ বোধ হচ্ছে না?

এ আনন্দ কিসের জন্যে? এ কি সফলতার মূর্তিকে প্রত্যক্ষ দেখে? এ কি এই মনে করে যে, আমরা যা করতে চেয়েছিলুম তা করে তুলেছি? এ কি আমাদের আত্মকীর্তির গর্বানুভবের আনন্দ?

তা নয়। কর্মকেই চরম মনে করে তার মধ্যে ডুবে থাকলে মানুষ কর্মকে নিয়ে আত্মশক্তির গর্ব উপলব্ধি করে। কিন্তু কর্মের ভিতরকার সত্যকে যখন আমরা দেখি তখন কর্মের চেয়ে বহুগুণে বড়ো জিনিসটিকে দেখি। তখন যেমন আমাদের অহংকার দূর হয়ে যায়, সম্ভ্রমে মাথা নত হয়ে পড়ে, তেমনি আর একদিকে আনন্দে আমাদের বক্ষ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। তখন আমাদের আনন্দময় প্রভুকে দেখতে পাই, কেবল লৌহময় কলের আস্ফালনকে দেখি না।

এখনকার এই বিদ্যালয়ের মধ্যে একটি মঙ্গলচেষ্টা আছে। কিন্তু সে কি কেবল একটি মঙ্গলের কল মাত্র। কেবল নিয়ম রচনা এবং নিয়মে চালানো? কেবল ভাষা শেখানো, অঙ্ক কষানো, খেটে মরা এবং খাটিয়ে মারা? কেবল মস্ত একটা ইস্কুল তৈরি করে মনে করা খুব একটা ফল পেলুম? তা নয়।

এই চেষ্টাকে বড়ো করে দেখা, এই চেষ্টার ফলকেই বড়ো ফল বলে গর্ব করা সে নিতান্তই ফাঁকি। মঙ্গল অনুষ্ঠানে মঙ্গল ফল লাভ হয় সন্দেহ নেই কিন্তু সে গৌণ ফল মাত্র। আসল কথাটি এই যে, মঙ্গল কর্মের মধ্যে মঙ্গলময়ের আবির্ভাব আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যদি ঠিক জায়গায় দৃষ্টি মেলে দেখি তবে মঙ্গল কর্মের উপরে সেই বিশ্বমঙ্গলকে দেখতে পাই। মঙ্গল অনুষ্ঠানের চরম সার্থকতা তাই। মঙ্গল কর্ম সেই বিশ্বকর্মাকে সত্যদৃষ্টিতে দেখবার একটি সাধনা। অলস যে, সে তাঁকে দেখতে পায় না। নিরুদ্যম যে, তার চিত্তে তাঁর প্রকাশ আচ্ছন্ন। এই জন্যই কর্ম, নইলে কর্মের মধ্যেই কর্মের গৌরব থাকতে পারে না।

যদি মনে জানি আমাদের এই কর্ম সেই কল্যাণময় বিশ্বকর্মাকেই লাভ করবার একটি সাধনা তাহলে কর্মের মধ্যে যা কিছু বিঘ্ন অভাব প্রতিকূলতা আছে তা আমাদের হতাশ করতে পারে না। কারণ, বিঘ্নকে অতিক্রম করাই যে আমাদের সাধনার অঙ্গ। বিঘ্ন না থাকলে যে আমাদের সাধনাই অসম্পূর্ণ হয়। তখন প্রতিকূলতাকে দেখলে কর্মনাশের ভয়ে আমরা ব্যাকুল হয়ে উঠি নে; কারণ, কর্মফলের

চেয়ে আরও যে বড়ো ফল আছে। প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করলে আমরা কৃতকার্য হব বলে কোমর বাঁধলে চলবে না, বস্তুত কৃতকার্য হব কি না তা জানি নে, কিন্তু প্রতিকূলতার সহিত সংগ্রাম করতে করতে আমাদের অন্তরের বাধা ক্ষয় হয়, তাতে আমাদের তেজ ভস্মমুক্ত হয়ে ক্রমশ দীপ্যমান হয়ে ওঠে এবং সেই দীপ্তিতেই, যিনি বিশ্বপ্রকাশ, আমার চিত্তে তাঁর প্রকাশ উন্মুক্ত হতে থাকে। আনন্দিত হও যে, কর্মে বাধা আছে। আনন্দিত হও যে, কর্ম করতে গেলেই তোমাকে নানাদিক থেকে নানা আঘাত সইতে হবে এবং তুমি যেমনটি কল্পনা করছ বারংবার তার পরাভব ঘটবে। আনন্দিত হও যে, লোকে তোমাকে ভুল বুঝবে ও অপমানিত করবে। আনন্দিত হও যে, তুমি যে-বেতনটি পাবে বলে লোভ করে বসেছিলে বারংবার তা হতে বঞ্চিত হবে। কারণ, সেই তো সাধনা। যে-ব্যক্তি আগুন জ্বালতে চায়, সে-ব্যক্তির কাঠ পুড়ছে বলে দুঃখ করলে চলবে কেন? যে-কৃপণ শুধু শুষ্ক কাঠই স্তূপাকার করে তুলতে চায় তার কথা ছেড়ে দাও! তাই ছুটির পরে কর্মের সমস্ত বাধাবিঘ্ন সমস্ত অভাব অসম্পূর্ণতার মধ্যে আজ আনন্দের সঙ্গে প্রবেশ করছি। কাকে দেখে? যিনি কর্মের উপরে বসে আছেন তাঁর দিকেই চেয়ে।

তাঁর দিকে চাইলে কর্মের বল বাড়ে অথচ উগ্রতা চলে যায়। চেষ্টায় চেষ্টারূপ আর দেখতে পাই নে, তার শান্তিমূর্তিই ব্যক্ত হয়। কাজ চলতে থাকে অথচ স্তব্ধতা আসে, ভরা জোয়ারের জলের মতো সমস্ত থমথম করতে থাকে। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি ঘোষণা রটনা এ সমস্ত একেবারেই ঘুচে যায়। চিন্তায় বাক্যে কর্মে বাড়াবাড়ি কিছুমাত্র থাকে না। শক্তি তখন আপনাকে আপনি আড়াল করে দিয়ে সুন্দর হয়ে ওঠে—যেমন সুন্দর আজকের এই সন্ধ্যাকাশের নক্ষত্রমণ্ডলী! তার প্রচণ্ড তেজ, প্রবল গতি, তার ভয়ংকর উদ্যম কী পরিপূর্ণ শান্তির ছবি বিস্তার করে কী কমনীয় হাসিই হাসছে! আমরাও আমাদের কর্মের আসনে পরমশক্তির সেই শান্তিময় মহাসুন্দররূপ দেখে উদ্ধত চেষ্টাকে প্রশান্ত করব। কর্মের উদগ্র আক্ষেপকে সৌন্দর্যে মণ্ডিত করে আচ্ছন্ন করে দেব। আমাদের কর্ম—মধু দ্যৌঃ, মধু নক্তম্, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ—এই সমস্তের সঙ্গে মিলে মধুময় হয়ে উঠবে।

বর্তমান যুগ

আমি পূর্বেই একটি কথা তোমাদিগকে বলেছি—তোমরা যে এই সময়ে জন্মগ্রহণ করতে পেরেছ, এ তোমাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলতে হবে। তোমরা জান না এই কাল কত বড়ো কাল, এর অভ্যন্তরে কী প্রচ্ছন্ন আছে। হাজার হাজার শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবীতে এমন শতাব্দী খুব অল্পই এসেছে। কেবল আমাদের দেশে নয়, পৃথিবী জুড়ে এক উত্তাল তরঙ্গ উঠেছে। বিশ্বমানবপ্রকৃতির মধ্যে একটা চাঞ্চল্য প্রকাশ পেয়েছে—সবাই আজ জাগ্রত। পুরাতন জীর্ণ সংস্কার ত্যাগ করবার জন্য সকল প্রকার অন্যায়কে চূর্ণ করবার জন্য মানবমাত্রেই উঠে পড়ে লেগেছে—নূতন ভাবে জীবনকে দেশকে গড়ে তুলবে। বসন্ত এলে বৃক্ষ যেমন করে তার দেহ হতে শুষ্ক পত্র ঝেড়ে ফেলে নব পল্লবে সেজে ওঠে, মানবপ্রকৃতি কোন্ এক প্রাণপূর্ণ হাওয়ায় ঠিক তেমনি করে সেজে ওঠবার জন্য ব্যাকুল। মানবপ্রকৃতি পূর্ণতার আস্বাদ পেয়েছে একে এখন কোনোমতেই বাইরের শক্তি দ্বারা চেপে ছোটো করে রাখা চলবে না।

আসল জিনিসটা সহসা আমাদের চোখে পড়ে না, অনেক সময়ে এমন কি তার অস্তিত্ব পর্যন্তও অস্বীকার করে বসি। আজ আমরা বাহির হতে দেখছি চারিদিকে একটা তুমুল আন্দোলন উপস্থিত, যাকে আমরা পলিটিক্স (Politics) বলি। তাকে যত বড়ো করেই দেখি না কেন, সে নিতান্তই বাহিরের জিনিস। আমাদের আত্মাকে কিছুতে যদি জাগরিত করছে সত্য হয়, তবে তা ধর্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ধর্মের মূল-শক্তিটি প্রচ্ছন্ন থেকে কাজ করছে বলেই আমাদের চোখে ধরা পড়ছে না; পলিটিক্সের চাঞ্চল্যই আমাদের সমস্ত চিত্তকে আকর্ষণ করেছে। আমরা উপরকার তরঙ্গটাকেই দেখে থাকি, ভিতরকার স্রোতটাকে দেখি না। কিন্তু বস্তুত ভগবান যে মানবসমাজকে ধর্মের ভিতর দিয়ে একটা মস্ত নাড়া দিয়েছেন, এই তো বিংশ শতাব্দীর বার্তা। বিশ্বাস করো, অনুভব করো, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সমস্ত বিশ্বের ভিতর দিয়ে আজ এই ধর্মের বৈদ্যুতশক্তি ছুটে চলেছে। পৃথিবীতে আজ যে-কোনো তাপস সাধনায় প্রবৃত্ত আছে, তার পক্ষে এমন অনুকূল সময় আর আসবে না। আজ কি তোমাদের নিশ্চেষ্ট থাকবার দিন? তন্দ্রা কি ছুটবে না? আকাশ হতে যখন বর্ষণ হয়, ছোটো বড়ো যেখানে যত জলাশয় খনন করা আছে, জলে পূর্ণ হয়ে ওঠে। পৃথিবীতে আজ যেখানেই কোনো মঙ্গলের আধার পূর্ব হতে প্রস্তুত হয়ে আছে, সেখানেই তা কল্যাণে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। সার্থকতা আজ সহজ হয়ে এসেছে; এমন সুযোগকে ব্যর্থ হতে দিলে চলবে না। তোমরা আশ্রমবাসী

এই শুভযোগে আশ্রমকে সার্থক করে তোলো। প্রস্তরের উপর দিয়ে জলস্রোত যেমন করে বহে যায়, সেখানে দাঁড়াবার কোনোই স্থান পায় না, আমাদের হৃদয়ের উপর দিয়ে তেমনি করে এই প্রবাহ যেন বহে না যায়! ঈশ্বরের প্রসাদস্রোত আজ সমস্ত পৃথিবীর উপর দিয়ে বিশেষভাবে প্রবাহিত হবার সময় এখানে এসে একবারটি যেন পাক খেয়ে দাঁড়ায়। সমস্ত আশ্রমটি যেন কানায় কানায় ভরে ওঠে। শুধু আমাদের এই ক্ষুদ্র আশ্রমটি কেন, পৃথিবীর যেখানে যে-কোনো ছোটো বড়ো সাধনার ক্ষেত্র আছে মঙ্গল-বারিতে আজ পূর্ণ হ'ক। আশ্রমে বাস করে এই দিনে জীবনকে ব্যর্থ হতে দিও না। এখানে কি শুধু তুচ্ছ কথায় মেতে হিংসা দ্বেষের মধ্যে থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে দিন কাটাতে এসেছ? শুধু পড়া মুখস্থ করে পরীক্ষা পাস করে ফুটবল খেলে এতবড়ো একটা জীবনকে নিঃশেষ করে দেবে? কখনোই না—এ হতে পারে না। এই যুগের ধর্ম তোমাদের প্রাণকে স্পর্শ করুক। তপস্যার দ্বারা সুন্দর হয়ে তোমরা ফুটে ওঠো। আশ্রম-বাস তোমাদের সার্থক হ'ক। তোমরা যদি মনুষ্যত্বের সাধনাকে প্রাণপণ করে ধরে না রাখ, শুধু খেলা ধুলা পড়া শুনার ভিতর দিয়েই যদি জীবনকে চালিয়ে দাও, তবে যে তোমাদের অপরাধ হবে, তার আর মার্জনা নেই, কারণ তোমরা আশ্রমবাসী।

আবার বলি, তোমরা কোন্ কালে এই পৃথিবীতে এসেছ, ভালো করে সেই কালের বিষয় ভেবে দেখো। বর্তমান কালের একটি সুবিধা এই, বিশ্বের মধ্যে যে চাঞ্চল্য উঠেছে একই সময়ে সকল দেশের লোক তা অনুভব করছে। পূর্বে একস্থানে তরঙ্গ উঠলে অন্য স্থানের লোকেরা তার কোনোই খবর পেত না। প্রত্যেক দেশটি স্বতন্ত্র ছিল। এক দেশের খবর অন্য দেশে গিয়ে পৌঁছোবার উপায় ছিল না। এখন আর সে দিন নেই। দেশের কোনো স্থানে ঘা লেগে তরঙ্গ উঠলে সেই তরঙ্গ শুধু দেশের মধ্যে না, সমস্ত পৃথিবীর ভিতর দিয়ে তীরের মতো ছুটে চলে। আমরা সকলে এক হয়ে দাঁড়াই। কত দিক হতে আমরা বল পাই; সত্যকে আঁকড়ে ধরবার যে মহা নির্যাতন তাকে অনায়াসেই সহ্য করতে পারি; নানাদিক হতে দৃষ্টান্ত ও সমবেদনা এসে জোর দেয়—এ কি কম কথা। নিজেকে অসহায় বলে মনে করি-না। এই তো মহা সুযোগ। এমন দিনে আশ্রম-বাসের সুযোগকে হারিও না। জীবন যদি তোমাদের ব্যর্থ হয়, আশ্রমের কিছুই আসে যায় না—ক্ষতি তোমাদেরই। গাছ ভরে বউল আসে। সকল বউলেই যে ফল হয় এমন নয়। কত ঝরে পড়ে, শুকিয়ে যায়, তবু ফলের অভাব হয় না। ডাল ভরে ফল ফলে ওঠে। ফল হল না বলে গাছ দুঃখ করে না, দুঃখ ঝরা-বউলের, তারা যে ফলে পরিণত হয়ে উঠতে পারল না।

এই আশ্রম যখন প্রস্তুত হতেছিল, বৃক্ষগুলি যখন ধীরে ধীরে আলোর দিকে মাথা তুলে ধরছিল, তখনও নূতন যুগের কোনোই সংবাদ এসে পৃথিবীতে পৌঁছোয় নি। অজ্ঞাতসারেই আশ্রমের ঋষি এই যুগের জন্য আশ্রমের রচনাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন; তখনও বিশ্বমন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয় নি, শঙ্খ ধ্বনিত হয়ে ওঠে নি। বিংশ শতাব্দীর জন্য বিশ্ব-দেবতা গোপনে গোপনে কি যে এক বিপুল আয়োজন করছিলেন, তার লেশমাত্রও আমরা জানতুম না। আজ সহসা মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হল—আমাদের কী পরম সৌভাগ্য। আজ বিশ্বদেবতাকে দর্শন করতেই হবে, অন্ধ হয়ে ফিরে গেলে কিছুতেই চলবে না। আজ প্রকাণ্ড উৎসব; এই উৎসব একদিনের নয়, দু দিনের নয়—শতাব্দী-ব্যাপী উৎসব। এই উৎসব কোনো বিশেষ স্থানের নয় কোনো বিশেষ জাতির নয়। এই উৎসব সমগ্র মানব-জাতির জগৎ-জোড়া উৎসব। এস আমরা সকলে একত্র হই, বাহির হয়ে পড়ি। দেশে কোনো রাজার যখন আগমন হয় তাঁকে দেখবার জন্য যখন পথে বাহির হয়ে আসি তখন মলিন জীর্ণ বস্ত্রকে ত্যাগ করতে হয়, তখন নবীন বস্ত্রে দেহকে সজ্জিত করি। আজ দেশের রাজা নন সমগ্র জগতের রাজা এসে সম্মুখে দাঁড়িয়েছেন। নত করো উদ্ধত মস্তক। দূর করো সমস্ত বর্ষের সঞ্চিত আবর্জনা। মনকে শুভ্র করে তোলো। শান্ত হও, পবিত্র হও। তাঁর চরণে প্রণাম করে গৃহে ফেরো। তিনি তোমাদের শিরে আশীর্বাদ ঢেলে দিন—মঙ্গল করুন, মঙ্গল করুন, মঙ্গল করুন।

১০

ভক্ত

কবির কাব্যের মধ্যে যেমন কবির পরিচয় থাকে তেমনি এই যে শান্তিনিকেতন আশ্রমটি তৈরি হয়ে উঠেছে, উঠেছে কেন, প্রতিদিনই তৈরি হয়ে উঠছে এর মধ্যে একটি জীবনের পরিচয় আছে।

সেই জীবন কী চেয়েছিল এবং কী পেয়েছিল তা এই আশ্রমের মধ্যে যেমন করে লিখে গিয়েছে এমন আর কোথাও লিখে যেতে পারে নি। অনেক বড়ো বড়ো রাজা তাম্রশাসনে, শিলালিপিতে তাঁদের জয়লব্ধ রাজ্যের কথা ক্ষোদিত করে রেখে যান। কিন্তু এমন লিপি কোথায় পাওয়া যায়। এমন অবাধ মাঠে, এমন উদার আকাশে, এমন জীবনময় অক্ষর, এমন ঋতুতে ঋতুতে পরিবর্তনশীল নব নব বর্ণের লিপি!

মহর্ষি তাঁর জীবনে অনেক সভা স্থাপন করেছেন, অনেক ব্রাহ্মসমাজগৃহের প্রতিষ্ঠা করেছেন, অনেক উপদেশ দিয়েছেন, অনেক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু সে-সমস্ত কাজের সঙ্গে তাঁর এই আশ্রমের একটি পার্থক্য আছে। যেমন গাছের ডাল থেকে খুঁটি হতে পারে, তাকে চিরে তার থেকে নানা প্রকার জিনিস তৈরি হতে পারে, কিন্তু সেই গাছে যে ফুলটি ফোটে যে ফলটি ধরে, সে এই সমস্ত জিনিস থেকেই পৃথক, তেমনি মহর্ষির জীবনের অন্যান্য সমস্ত কর্মের থেকে এই আশ্রমের একটি বিশিষ্টতা আছে। এর জন্যে তাঁকে চিন্তা করতে হয় নি, চেষ্টা করতে হয় নি, বাইরের লোকের সঙ্গে মিলতে হয় নি, চারিদিকের সঙ্গে কোনো ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করতে হয় নি। এ তাঁর জীবনের মধ্যে থেকে একটি মূর্তি ধরে আপনাআপনি উদ্ভিন্ন হয়ে উঠেছে। এই জন্যেই এর মধ্যে এমন একটি সৌন্দর্য, এমন একটি সম্পূর্ণতা রয়ে গেছে। এই জন্যেই এর মধ্যে এমন একটি সুধাগন্ধ, এমন একটি মধুসঞ্চয়। এই জন্যেই এর মধ্যে তাঁর আত্মপ্রকাশ যেমন সহজ যেমন গভীর এমন আর কোথাও নেই।

এই আশ্রমে আছে কী? মাঠ এবং আকাশ এবং ছায়াগাছগুলি, চারিদিকে একটি বিপুল অবকাশ এবং নির্মলতা। এখানকার আকাশে মেঘের বিচিত্র লীলা এবং চন্দ্রসূর্য-গ্রহতারার আবর্তন কিছুতে আচ্ছন্ন হয়ে নেই। এখানে প্রান্তরের মাঝখানে ছোটো বনটিতে ঋতুগুলি নিজের মেঘ আলো বর্ণগন্ধ ফুল ফল নিজের সমস্ত বিচিত্র

আয়োজন নিয়ে সম্পূর্ণ মূর্তিতে আবির্ভূত হয়। কোনো বাধার মধ্যে তাদের খর্ব হয়ে থাকতে হয় না। চারিদিকে বিশ্বপ্রকৃতির এই অবাধ প্রকাশ এবং তার মাঝখানটিতে শান্তং শিবমদ্বৈতম্-এর দুই সন্ধ্যা নিত্য আরাধনা—আর কিছুই নয়। গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে, উপনিষদের মন্ত্র পঠিত হচ্ছে, স্তবগান ধ্বনিত হচ্ছে, দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, সেই নিভৃতে সেই নির্জনে, সেই বনের মর্মরে, সেই পাখির কূজনে, সেই উদার আলোকে, সেই নিবিড় ছায়ায়।

এই আশ্রমের মধ্যে থেকে দুটি সুর উঠেছে—একটি বিশ্বপ্রকৃতির সুর, একটি মানবাত্মার সুর। এই দুটি সুরধারার সংগমের মুখেই এই তীর্থটি স্থাপিত। এই দুটি সুরই অতি পুরাতন এবং চিরদিনই নূতন। এই আকাশ নিরন্তর যে নীরব মন্ত্র জপ করছে সে আমাদের পিতামহেরা আর্যাবর্তের সমতল প্রান্তরের উপরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে কত শতাব্দী পূর্বেও চিত্তের গভীরতার মধ্যে গ্রহণ করেছেন। এই যে বনটির পল্লবঘন নিস্তব্ধতার মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে ছায়া এবং আলো দুই ভাই-বোনে মিলে পৃথিবীর উপরে নামাবলীর উত্তরীয় রচনা করছে, সেই পবিত্র শিল্পচাতুরী আমাদের বনবাসী আদি পুরুষেরা সেদিনও দেখেছেন যেদিন তাঁরা সরস্বতীর কূলে প্রথম কুটির নির্মাণ করতে আরম্ভ করেছেন। এ সেই আকাশ, এ সেই ছায়ালোক, এ সেই অনির্বচনীয় একটি প্রকাশের ব্যাকুলতা, যার দ্বারা সমস্ত শূন্যকে ক্রন্দিত করে শুনেছিলেন বলেই ঋষি-পিতামহেরা এই অন্তরীক্ষকে ক্রন্দসী নাম দিয়েছিলেন।

আবার এখানে মানবের কণ্ঠ থেকে যে মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে সেও কত যুগের প্রাচীন বাণী। পিতা নোঽসি, পিতা নোবোধি, নমস্তেঽস্তু—এই কথাটি কত সরল, কত পরিপূর্ণ এবং কত পুরাতন। যে-ভাষায় এ বাণীটি প্রথম ব্যক্ত হয়েছিল সে ভাষা আজ প্রচলিত নেই কিন্তু এই বাক্যটি আজও বিশ্বাসে ভক্তিতে নির্ভরে ব্যগ্রতায় এবং বিনতিতে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। এই কটি মাত্র কথায় মানবের চিরদিনের আশা এবং আশ্বাস এবং প্রার্থনা ঘনীভূত হয়ে রয়ে গেছে।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, এই অত্যন্ত ছোটো অথচ অত্যন্ত বড়ো কথাটি কোন্ সুদূর কালের! আধুনিক যুগের সভ্যতা তখন বর্বরতার গর্ভের মধ্যে গুপ্ত ছিল, সে ভূমিষ্ঠও হয় নি। কিন্তু অন্তরের উপলব্ধি আজও এই বাণীকে নিঃশেষ করতে পারে নি।

অসতোমা সদ্গময়, তমসোমা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতংগময়—এত বড়ো প্রার্থনা যেদিন নরকণ্ঠ হতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল সেদিনকার ছবি ইতিহাসের দূরবীক্ষণ দ্বারাও আজ স্পষ্টরূপে গোচর হয়ে ওঠে না। অথচ এই পুরাতন প্রার্থনাটির মধ্যে মানবাত্মার সমস্ত প্রার্থনা পর্যাপ্ত হয়ে রয়েছে।

একদিকে এই পুরাতন আকাশ, পুরাতন আলোক এবং তরুলতার মধ্যে পুরাতন জীবনবিকাশের নিত্য নূতনতা, আর-একদিকে মানবচিত্তের মৃত্যুহীন পুরাতন বাণী, এই দুইকে এক করে নিয়ে এই শান্তিনিকেতনের আশ্রম।

বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবচিত্ত, এই দুইকে এক করে মিলিয়ে আছেন যিনি তাঁকে এই দুয়েরই মধ্যে একরূপে জানবার যে ধ্যানমন্ত্র, সেই মন্ত্রটিকেই ভারতবর্ষ তার সমস্ত পবিত্র শাস্ত্রের সার মন্ত্র বলে বরণ করেছে। সেই মন্ত্রটিই গায়ত্রী, ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি, ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ।

একদিকে ভূলোক অন্তরীক্ষ জ্যোতিষ্কলোক, আর একদিকে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, আমাদের চেতনা—এই দুইকেই যাঁর এক শক্তি বিকীর্ণ করছে, এক দুইকেই যাঁর এক আনন্দ যুক্ত করছে—তাঁকে, তাঁর এই শক্তিকে বিশ্বের মধ্যে এবং আপনার বুদ্ধির মধ্যে ধ্যান করে উপলব্ধি করবার মন্ত্র হচ্ছে এই গায়ত্রী।

যাঁরা মহর্ষির আত্মজীবনী পড়েছেন তাঁরা সকলেই জানেন তিনি তাঁর দীক্ষার দিনে এই গায়ত্রীমন্ত্রকেই বিশেষ করে তাঁর উপাসনার মন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই দীক্ষার মন্ত্রটিই শান্তিনিকেতনের আশ্রমকে আকার দান করছে—এই নিভৃতে মানুষের চিত্তকে প্রকৃতির প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত করে, বরেণ্যং ভর্গঃ, সেই বরণীয় তেজকে ধ্যানগম্য করে তুলছে।

এই গায়ত্রী মন্ত্রটি আমাদের দেশের অনেকেরই জপের মন্ত্র—কিন্তু এই মন্ত্রটি মহর্ষির ছিল জীবনের মন্ত্র। এই মন্ত্রটিকে তিনি তাঁর জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং তাঁর সমস্ত জীবনের ভিতর থেকে প্রকাশ করেছিলেন।

এই মন্ত্রটিকে তিনি যে গ্রহণ করেছিলেন এবং রক্ষা করেছিলেন লোকাচারের অনুসরণ তার কারণ নয়। হাঁস যেমন স্বভাবতই জলকে আশ্রয় করে তিনি তেমনি স্বভাবতই এই মন্ত্রটিকে অবলম্বন করেছিলেন।

শিশু যেমন মাতৃস্তন্যের জন্য কেঁদে ওঠে, তখন তাকে আর কিছু দিয়েই থামিয়ে রাখা যায় না। তেমনি মহর্ষির হৃদয় একদিন তাঁর যৌবনারম্ভে কী অসহ্য ব্যাকুলতায় ক্রন্দন করে উঠেছিল সে-কথা আপনারা সকলেই জানেন।

সে ক্রন্দন কিসের? চারদিকে তিনি কোন্ জিনিসটি কোনোমতেই খুঁজে পাচ্ছিলেন না? যখন আকাশের আলো তাঁর চোখে কালো হয়ে উঠেছিল, যখন তাঁর পিতৃগৃহের অতুল ঐশ্বর্যের আয়োজন এবং মানসম্ভ্রমের গৌরব তাঁর মনকে কোনোমতেই শান্তি দিচ্ছিল না, তখন তাঁর যে কী প্রয়োজন, কী হলে তাঁর হৃদয়ের ক্ষুধা মেটে তা তিনি নিজেই বুঝতে পারছিলেন না।

ভোগবিলাসে তাঁর অরুচি জন্মে গিয়েছিল এবং তাঁর ভক্তিবৃত্তি নিজের চরিতার্থতা অন্বেষণ করছিল, কেবল এই কথাটুকুই সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ ভক্তিবৃত্তিকে ভুলিয়ে রাখবার আয়োজন কি তাঁর ঘরের মধ্যেই ছিল না? যে দিদিমার সঙ্গে তিনি ছায়ার মতো সর্বদা ঘুরে বেড়াতেন তিনি জপতপ দানধ্যান পূজা-অর্চনা নিয়েই তো দিন কাটিয়েছেন, তাঁর সমস্ত ক্রিয়াকলাপেই শিশুকাল থেকেই মহর্ষি তাঁর সঙ্গের সঙ্গী ছিলেন। যখন বৈরাগ্য উপস্থিত হল, যখন ধর্মের জন্ত তাঁর ব্যাকুলতা জন্মাল তখন এই অভ্যস্ত পথেই তাঁর সমস্ত মন কেন ছুটে গেল না? ভক্তিবৃত্তিকে ব্যাপৃত করে রাখবার উপকরণ তো তাঁর খুব নিকটেই ছিল।

তাঁর ভক্তিকে যে এইদিকে তিনি কখনো নিয়োজিত করেন নি তা নয়। তিনি যখন বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে যেতেন পথিমধ্যে দেবীমন্দিরে ভক্তিভরে প্রণাম করতে ভুলতেন না; তিনি একবার এত সমারোহে সরস্বতীর পূজা করেছিলেন যে সেবার পূজার দিনে শহরে গাঁদাফুল দুর্লভ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যেদিন শ্মশানঘাটে পূর্ণিমার রাতে তাঁর চিত্ত জাগ্রত হয়ে উঠল সেদিন এই সকল চিরাভ্যস্ত পথকে তিনি পথ বলেই লক্ষ্য করলেন না। তাঁর তৃষ্ণার জল যে এদিকে নেই তা বুঝতে তাঁকে চিন্তামাত্র করতে হয় নি।

তাই বলছিলুম, ভক্তিকে বাইরের দিকে নিয়োজিত করে তিনি নিজেকে ফাঁকি দিতে পারেন নি। অন্তঃপুরে তাঁর ডাক পড়েছিল। তিনি জগতের মধ্যেই জগদীশ্বরকে, অন্তরাত্মার মধ্যেই পরমাত্মাকে দর্শন করতে চেয়েছিলেন। তাঁকে আর কিছুতে ভুলিয়ে রাখে কার সাধ্য! যারা নানা ক্রিয়াকর্মে আপনাকে ব্যাপৃত রাখতে চায় তাদের নানা উপায় আছে, যারা ভক্তির মধুর রসকে আস্বাদন করতে চায় তাদেরও অনেক উপলক্ষ্য মেলে। কিন্তু যারা একেবারে তাঁকেই চেয়ে বসে, তাদের তো ওই একটি বই আর দ্বিতীয় কোনো পন্থা নেই। তারা কি আর বাইরে ঘুরে বেড়াতে পারে? তাদের সামনে কোনো রঙিন জিনিস সাজিয়ে তাদের কি কোনোমতেই ভুলিয়ে রাখা যায়? নিখিলের মধ্যে এবং আত্মার মধ্যে তাদের প্রবেশ করতেই হবে।

কিন্তু এই অধ্যাত্মলোকের এই বিশ্বলোকের মন্দিরের পথ তাঁর চারদিকে যে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। অন্তরের ধনকে দূরে সন্ধান করবার প্রণালীই যে সমাজে চারিদিকে প্রচলিত ছিল, এই নির্বাসনের মধ্যে থেকেই তো তাঁর সমস্ত প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। তাঁর আত্মা যে-আশ্রয় চাচ্ছিল, সে আশ্রয় বাইরের খণ্ডতার রাজ্যে সে কোথায় খুঁজে পাবে?

আত্মার মধ্যেই পরমাত্মাকে, জগতের মধ্যেই জগদীশ্বরকে দেখতে হবে, এই

কথাটি এতই অত্যন্ত সহজ যে হঠাৎ মনে হয় এ নিয়ে এত খোঁজাখুঁজি কেন, এত কান্নাকাটি কিসের জন্যে ? কিন্তু বরাবর মানুষের ইতিহাসে এই ঘটনাটি ঘটে এসেছে। মানুষের প্রবৃত্তি কিনা বাইরের দিকে ছোটবার জন্যে সহজেই প্রবণ, এই কারণে সেই ঝোঁকের মাথায় সে মূল কেন্দ্রের আকর্ষণ এড়িয়ে শেষে কোথায় গিয়ে পৌঁছোয় তার ঠিকানা পাওয়া যায় না। সে বাহ্যিকতাকেই দিনে দিনে এমনি বৃহৎ ও জটিল করে দাঁড় করায় যে অবশেষে একদিন আসে, যখন যা তার আন্তরিক, যা তার স্বাভাবিক তাকেই খুঁজে বের করা তার পক্ষে সকলের চেয়ে কঠিন হয়ে ওঠে। এত কঠিন হয় যে তাকে সে আর খোঁজেই না, তার কথা সে ভুলেই যায়, তাকে আর সত্য বলে উপলব্ধিই করে না; বাহ্যিকতাকেই একমাত্র জিনিস বলে জানে, আর কিছুকে বিশ্বাসই করতে পারে না।

মেলার দিনে ছোটো ছেলে মার হাত ধরে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু তার মন কিনা চারিদিকে এইজন্যে মুঠো কখন সে ছেড়ে দেয়, তার পর থেকেই ভিড়ের মধ্যে গোলমালের মধ্যে কেবলই সে বাইরে থেকে বাইরে দূরে থেকে দূরে চলে যেতে থাকে। ক্রমে মার কথা তার আর মনেই থাকে না, বাইরের যে-সমস্ত সামগ্রী সে দেখে সেই-গুলিই তার সমস্ত হৃদয়কে অধিকার করে বড়ো হয়ে ওঠে। যে মা তার সব চেয়ে আপন, তিনিই তার কাছে সব চেয়ে ছায়াময় সব চেয়ে দূর হয়ে ওঠেন। শেষকালে এমন হয় যে অন্য সমস্ত জিনিসের মধ্যেই সে আহত প্রতিহত হয়ে বেড়ায়, কেবল নিজের মাকে খুঁজে পাওয়াই সন্তানের পক্ষে সব চেয়ে কঠিন হয়ে ওঠে। আমাদের সেই দশা ঘটে।

এমন সময়ে এক-একজন মহাপুরুষ জন্মান যাঁরা সেই অনেক দিনকার হারিয়ে যাওয়া স্বাভাবিকের জন্যে আপনি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। যার জন্যে চারিদিকের কারও কিছুমাত্র দরদ নেই তারই জন্যে তাঁদের কান্না কোনোমতেই থামতে চায় না। তাঁরা একমুহূর্তে বুঝতে পারেন আসল জিনিসটি আছে অথচ কোথাও তাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। সেইটিই একমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিস অথচ কেউ তার কোনো খোঁজ করছে না। জিজ্ঞাসা করলে, হয় হেসে উড়িয়ে দিচ্ছে, নয় ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে আঘাত করতে আসছে।

এমনি করে যেটি সহজ, যেটি স্বাভাবিক, যেটি সত্য যেটি না হলে নয়, পৃথিবীতে এক-একজন লোক আসেন সেটিকেই খুঁজে বের করতে। ঈশ্বরের এই এক লীলা, যেটি সব চেয়ে সহজ, তাকে তিনি শক্ত করে তুলতে দেন। যা নিতান্তই কাছের তাকে তিনি হারিয়ে ফেলতে দেন, পাছে সহজ বলেই তাকে না দেখতে পাওয়া যায়, পাছে

খুঁজে বের করতে না হলে তার সমস্ত তাৎপর্যটি আমরা না পাই। যিনি আমাদের অন্তরতর তাঁর মতো এত সহজ আর কী আছে। তিনি আমাদের নিশ্বাসপ্রশ্বাসের চেয়ে সহজ, তবু তাঁকে আমরা হারাই, সে কেবল তাঁকে আমরা খুঁজে বের করব বলেই। হঠাৎ যখন তিনি ধরা পড়েন, হঠাৎ যখন কেউ হাততালি দিয়ে বলে ওঠে, এই যে এইখানেই। আমরা ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করি, কই কোথায়? এই যে হৃদয়ের হৃদয়ে, এই যে আত্মার আত্মায়। যেখানে তাঁকে পাওয়ার বড়োই দরকার, সেইখানেই তিনি বরাবর বসে আছেন, কেবল আমরাই দূরে দূরে ছুটোছুটি করে মরছিলুম, এই সহজ কথাটি বোঝার জন্যেই, এই যিনি অত্যন্তই কাছে আছেন তাঁকেই খুঁজে পাবার জন্যে এক-একজন লোকের এত কান্নার দরকার। এই কান্না মিটিয়ে দেবার জন্যে যখনই তিনি সাড়া দেন তখনই ধরা পড়ে যান। তখনই সহজ আবার সহজ হয়ে আসে।

নিজের রচিত জটিল জাল ছেদন করে চিরন্তন আকাশ চিরন্তন আলোকের অধিকার আবার ফিরে পাবার জন্য মানুষকে চিরকালই এইরকম মহাপুরুষদের মুখ তাকাতে হয়েছে। কেউ বা ধর্মের ক্ষেত্রে কেউ বা জ্ঞানের ক্ষেত্রে কেউ বা কর্মের ক্ষেত্রে এই কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন। যা চিরদিনের জিনিস তাকে তাঁরা ক্ষণিকের আবরণ থেকে মুক্ত করবার জন্যে পৃথিবীতে আসেন। বিশেষ স্থানে গিয়ে, বিশেষ মন্ত্র পড়ে, বিশেষ অনুষ্ঠান করে মুক্তি লাভ করা যায় এই বিশ্বাসের অরণ্যে যখন মানুষ পথ হারিয়েছিল তখন বুদ্ধদেব এই অত্যন্ত সহজ কথাটি আবিষ্কার ও প্রচার করবার জন্যে এসেছিলেন যে, স্বার্থত্যাগ করে, সর্বভূতে দয়া বিস্তার করে, অন্তর থেকে বাসনাকে ক্ষয় করে ফেললে তবেই মুক্তি হয়। কোনো স্থানে গেলে, বা জলে স্নান করলে, বা অগ্নিতে আহুতি দিলে বা মন্ত্র উচ্চারণ করলে হয় না। এই কথাটি শুনতে নিতান্তই সরল, কিন্তু এই কথাটির জন্যে একটি রাজপুত্রকে রাজ্যত্যাগ করে বনে বনে পথে পথে ফিরতে হয়েছে, মানুষের হাতে এটি এতই কঠিন হয়ে উঠেছিল। য়িহুদিদের মধ্যে ফ্যারিসি সম্প্রদায়ের অনুশাসনে যখন বাহ্য নিয়মপালনই ধর্ম বলে গণ্য হয়ে উঠেছিল, যখন তারা নিজের গণ্ডির বাইরে অন্য জাতি, অন্য ধর্মপন্থীদের ঘৃণা করে তাদের সঙ্গে একত্রে আহার বিহার বন্ধ করাকেই ঈশ্বরের বিশেষ অভিপ্রায় বলে স্থির করেছিল, যখন য়িহুদির ধর্মানুষ্ঠান য়িহুদি জাতিরই নিজস্ব স্বতন্ত্র সামগ্রী হয়ে উঠেছিল তখন যিশু এই অত্যন্ত সহজ কথাটি বলবার জন্যেই এসেছিলেন যে, ধর্ম অন্তরের সামগ্রী, ভগবান অন্তরের ধন, পাপপুণ্য বাহিরের কৃত্রিম বিধি-নিষেধের অনুগত নয়; সকল মানুষই ঈশ্বরের সন্তান, মানুষের প্রতি ঘৃণাহীন প্রেম ও পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাসপূর্ণ ভক্তির দ্বারাই ধর্মসাধনা হয়; বাহ্যিকতা মৃত্যুর নিদান, অন্তরের সার পদার্থেই প্রাণ পাওয়া যায়। কথাটি এতই

অত্যন্ত সরল যে শোনবামাত্রই সকলকেই বলতে হয় যে, হাঁ, কিন্তু তবুও এই কথাটিকেই সকল দেশেই মানুষ এতই কঠিন করে তুলেছে যে, এর জন্যে বিশুকে মরুপ্রান্তরে গিয়ে তপস্যা করতে এবং ক্রুসের উপরে অপমানিত মৃত্যুদণ্ডকে গ্রহণ করতে হয়েছে।

মহম্মদকেও সেই কাজ করতে হয়েছিল। মানুষের ধর্মবুদ্ধি খণ্ড খণ্ড হয়ে বাহিরে ছড়িয়ে পড়েছিল তাকে তিনি অন্তরের দিকে অখণ্ডের দিকে অনন্তের দিকে নিয়ে গিয়েছেন। সহজে পারেন নি, এর জন্যে সমস্ত জীবন তাঁকে মৃত্যুসংকুল দুর্গম পথ মাড়িয়ে চলতে হয়েছে, চারিদিকে শত্রুতা ঝড়ের সমুদ্রের মতো ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে তাঁকে নিরন্তর আক্রমণ করেছে। মানুষের পক্ষে যা যথার্থ স্বাভাবিক, যা সরল সত্য, তাকেই স্পষ্ট অনুভব করতে ও উদ্ধার করতে, মানুষের মধ্যে যাঁরা সর্বোচ্চশক্তিসম্পন্ন তাঁদেরই প্রয়োজন হয়।

মানুষের ধর্মরাজ্যে যে তিনজন মহাপুরুষ সর্বোচ্চ চূড়ায় অধিরোহণ করেছেন এবং ধর্মকে দেশগত জাতিগত লোকাচারগত সংকীর্ণ সীমা থেকে মুক্ত করে দিয়ে তাকে সূর্যের আলোকের মতো, মেঘের বারিবর্ষণের মতো সর্বদেশ ও সর্বকালের মানবের জন্য বাধাহীন আকাশে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন তাঁদের নাম করেছি। ধর্মের প্রকৃতি যে বিশ্বজনীন, তাকে যে কোনো বিশেষ দেশের প্রচলিত মূর্তি বা আচার বা শাস্ত্র কৃত্রিম বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখতে পারে না এই কথাটি তাঁরা সর্বমানবের ইতিহাসের মধ্যে নিজের জীবন দিয়ে লিখে দিয়ে গেছেন। দেশে দেশে কালে কালে সত্যের দুর্গম পথে কারা যে ঈশ্বরের আদেশে আমাদের পথ দেখাবার জন্যে নিজের জীবন-প্রদীপকে জ্বালিয়ে তুলেছেন সে আজ আমরা আর ভুল করতে পারব না, তাঁদের আদর্শ থেকেই স্পষ্ট বুঝতে পারব। সে-প্রদীপটি কারও বা ছোটো হতে পারে কারও বা বড়ো হতে পারে—সেই প্রদীপের আলো কারও বা দিগ্‌দিগন্তরে ছড়িয়ে পড়ে কারও বা নিকটের পথিকদেরই পদক্ষেপের সহায়তা করে, কিন্তু সেই শিখাটিকে আর চেনা শক্ত নয়।

তাই বলছিলুম মহর্ষি যে অত্যন্ত একটি সহজকে পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন তাঁর চারদিকে তার কোনো সহায়তা ছিল না। সকলেই তাকে হারিয়ে বসেছিল, সে-পথের চিহ্ন কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। সেই জন্যে যেখানে সকলেই নিশ্চিন্তমনে বিচরণ করছিল সেখানে তিনি যেন মরুভূমির পথিকের মতো ব্যাকুল হয়ে লক্ষ্য স্থির করবার জন্যে চারিদিকে তাকাচ্ছিলেন, মধ্যাহ্নের আলোকও তাঁর চক্ষে কালিমাময় হয়ে উঠেছিল এবং ঐশ্বর্যের ভোগায়োজন তাঁকে মৃগতৃষ্ণিকার মতো পরিহাস করছিল। তাঁর হৃদয় এই অত্যন্ত সহজ প্রার্থনাটি নিয়ে দিকে দিকে ঘুরে

বেড়াচ্ছিল যে, পরমাত্মাকে আমি আত্মার মধ্যেই পাব, জগদীশ্বরকে আমি জগতের মধ্যেই দেখব, আর কোথাও নয়, দূরে নয়, বাইরে নয়, নিজের কল্পনার মধ্যে নয়, অন্য দশজনের চিরাভ্যস্ত জড়তার মধ্যে নয়। এই সহজ প্রার্থনার পথটিই চারিদিকে এত বাধাগ্রস্ত এত কঠিন হয়ে উঠেছিল বলেই তাঁকে এত খোঁজ খুঁজতে হয়েছে এত কান্না কাঁদতে হয়েছে।

এ-কান্না যে সমস্ত দেশের কান্না। দেশ আপনার চিরদিনের যে-জিনিসটি মনের ভুলে হারিয়ে বসেছিল, তার জন্যে কোনোখানেই বেদনা বোধ না হলে সে দেশ বাঁচবে কী করে! চারদিকেই যখন অসাড়তা তখন এমন একটি হৃদয়ের আবশ্যক যার সহজ-চেতনাকে সমাজের কোনো সংক্রামক জড়তা আচ্ছন্ন করতে পারে না। এই চেতনাকে অতি কঠিন বেদনা ভোগ করতে হয়, সমস্ত দেশের হয়ে বেদনা। যেখানে সকলে সংজ্ঞাহীন হয়ে আছে সেখানে একলা তাকে হাহাকার বহন করে আনতে হয়, সমস্ত দেশের স্বাস্থ্যকে ফিরে পাবার জন্যে একলা তাঁকে কান্না জাগিয়ে তুলতে হয়, বোধহীনতার জন্যেই চারিদিকের জনসমাজ যে সকল কৃত্রিম জিনিস নিয়ে অনায়াসে ভুলে থাকে অসহ্য ক্ষুধাতুরতা দিয়ে তাকে জানাতে হয় প্রাণের খাদ্য তার মধ্যে নেই। যে-দেশ কাঁদতে ভুলে গেছে, খোঁজবার কথা যার মনেও নেই তার হয়ে একলা কাঁদা, একলা খোঁজা এই হচ্ছে মহত্ত্বের একটি অধিকার। অসাড় দেশকে জাগাবার জন্যে যখন বিধাতার আঘাত এসে পড়তে থাকে তখন যেখানে চৈতন্য আছে সেইখানেই সমস্ত আঘাত বাজতে থাকে, সেইখানকার বেদনা দিয়েই দেশের উদ্বোধন আরম্ভ হয়।

আমরা যাঁর কথা বলছি তাঁর সেই সহজচেতনা কিছুতেই লুপ্ত হয় নি, সেই তাঁর চেতনা চেতনাকেই খুঁজছিল, স্বভাবতই কেবল সেই দিকেই সে হাত বাড়াচ্ছিল, চারদিকে যে সকল স্থূল জড়ত্বের উপকরণ ছিল তাকে সে প্রাণপণ বলে ঠেলে ফেলে দিচ্ছিল, চৈতন্য না হলে চৈতন্য আশ্রয় পায় না যে।

এমন সময় এই অত্যন্ত ব্যাকুলতার মধ্যে তাঁর সামনে উপনিষদের একখানি ছিন্ন পত্র উড়ে এসে পড়ল। মরুভূমির মধ্যে পথিক যখন হতাশ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন অকস্মাৎ জলচর পাখিকে আকাশে উড়ে যেতে দেখে সে যেমন জানতে পারে তার তৃষ্ণার জল যেখানে সেখানকার পথ কোন্ দিকে, এই ছিন্ন পত্রটিও তেমনি তাঁকে একটি পথ দেখিয়ে দিলে। সেই পথটি সকলের চেয়ে প্রশস্ত এবং সকলের চেয়ে সরল, যৎ কিঞ্চ জগত্যাংজগৎ, জগতে যেখানে যা কিছু আছে সমস্তর ভিতর দিয়েই সে পথ চলে গিয়েছে, এবং সমস্তর ভিতর দিয়েই সেই পরম চৈতন্যস্বরূপের কাছে গিয়ে পৌঁচেছে যিনি সমস্তকেই আচ্ছন্ন করে রয়েছেন।

তার পর থেকে তিনি নদীপর্বত সমুদ্রপ্রান্তরে যেখানেই ঘুরে বেড়িয়েছেন কোথাও আর তাঁর প্রিয়তমকে হারান নি,—কেননা তিনি যে সর্বত্রই, আর তিনি যে আত্মার মাঝখানেই। যিনি আত্মার ভিতরেই তাঁকেই আবার দেশে দেশে দিকে দিকে সর্বত্রই ব্যাপক ভাবে দেখতে পাবার কত সুখ, যিনি বিশাল বিশ্বের সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে রূপরস গীতগন্ধের নব নব রহস্যকে নিত্য নিত্য জাগিয়ে তুলে সমস্তকে আচ্ছন্ন করে রয়েছেন তাঁকেই আত্মার অন্তরতম নিভৃতে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করবার কত আনন্দ!

এই উপলব্ধি করার মন্ত্রই হচ্ছে গায়ত্রী। অন্তরকে এবং বাহিরকে, বিশ্বকে এবং আত্মাকে একের মধ্যে যোগযুক্ত করে জানাই হচ্ছে এই মন্ত্রের সাধনা এবং এই সাধনাই ছিল মহর্ষির জীবনের সাধনা।

জীবনের এই সাধনাটিকে তিনি তাঁর উপদেশ ও বক্তৃতার মধ্যে ভাষার দ্বারা প্রকাশ করেছেন কিন্তু সকলের চেয়ে সম্পূর্ণ সৌন্দর্যে প্রকাশ পেয়েছে শান্তিনিকেতন আশ্রমটির মধ্যে। কারণ, এই প্রকাশের ভার তিনি একলা নেন নি। এই প্রকাশের কাজে একদিকে তাঁর ভগবৎ-পূজায় উৎসর্গকরা সমস্ত জীবনটি রয়ে গেছে, আর-একদিকে আছে সেই প্রান্তর, সেই আকাশ, সেই তরুশ্রেণী,—এই দুই এখানে মিলিত হয়েছে, ভূর্ভুবঃ স্বঃ এবং ধিয়ঃ। এমনি করে গায়ত্রীমন্ত্র যেখানেই প্রত্যক্ষরূপ ধারণ করেছে, যেখানেই সাধকের মঙ্গলপূর্ণ চিত্তের সঙ্গে প্রকৃতির শান্তিপূর্ণ সৌন্দর্য মিলিত হয়ে গেছে সেইখানেই পুণ্যতীর্থ।

আমরা যারা এই আশ্রমে বাস করছি, হে শান্তিনিকেতনের অধিদেবতা, আজ উৎসবের শুভদিনে তোমার কাছে আমাদের এই প্রার্থনা, তুমি আমাদের সেই চেতনাটি সর্বদা জাগিয়ে রেখে দাও যাতে আমরা যথার্থ তীর্থবাসী হয়ে উঠতে পারি। গ্রন্থের মধ্যে কীট যেমন তীক্ষ্ণ ক্ষুধার দংশনে গ্রন্থকে কেবল নষ্টই করে তার সত্যকে লেশমাত্রও লাভ করে না, আমরাও যেন তেমনি করে নিজেদের অসংযত প্রবৃত্তিসকল নিয়ে এই আশ্রমের মধ্যে কেবল ছিদ্র বিস্তার করতে না থাকি, আমরা এর ভিতরকার আনন্দময় সত্যটিকে যেন প্রতিদিন জীবনের মধ্যে গ্রহণ করবার জন্যে প্রস্তুত হতে পারি। আমরা যে সুযোগ যে-অধিকার পেয়েছি অচেতন হয়ে কেবলই যেন তাকে নষ্ট করতে না থাকি। এখানে যে সাধকের চিত্তটি রয়েছে সে যেন আমাদের চিত্তকে উদ্বোধিত করে তোলে, যে-মন্ত্রটি রয়েছে সে যেন আমাদের মননের মধ্যে ধ্বনিত হয়ে ওঠে; আমরাও যেন আমাদের জীবনটিকে এই আশ্রমের সঙ্গে এমনভাবে মিলিয়ে যেতে পারি যে, সেটি এখানকার পক্ষে চিরদিনের দানস্বরূপ হয়। হে আশ্রমদেব, দেওয়া এবং পাওয়া যে

একই কথা। আমরা যদি নিজেকে না দিতে পারি তাহলে আমরা পাবও না, আমরা যদি এখান থেকে কিছু পেয়ে যাই এমন ভাগ্য আমাদের হয় তাহলে আমরা দিয়েও যাব—তাহলে আমাদের জীবনটি আশ্রমের তরুপল্লবের মর্মরধ্বনির মধ্যে চিরকাল মর্মরিত হতে থাকবে। এখানকার আকাশের নির্মল নীলিমার মধ্যে আমরা মিশব, এখানকার প্রান্তরের উদার বিস্তারের মধ্যে আমরা বিস্তীর্ণ হব, আমাদের আনন্দ এখানকার পথিকদের স্পর্শ করবে, এখানকার অতিথিদের অভ্যর্থনা করবে। এখানে যে সৃষ্টিকার্যটি নিঃশব্দে চিরদিনই চলছে তারই মধ্যে আমরাও চিরকালের মতো ধরা পড়ে যাব। বৎসরের পর বৎসর যেমন আসবে, ঋতুর পর ঋতু যেমন ফিরবে, তেমনি এখানকার শালবনে ফুল ফোটার মধ্যে, পূর্বদিগন্তে মেঘ ওঠার মধ্যে এই কথাটি চিরদিন ফিরে ফিরে আসবে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে যে, হে আনন্দময় তোমার মধ্যে আনন্দ পেয়েছি, হে সুন্দর তোমার পানে চেয়ে মুগ্ধ হয়েছি, হে পবিত্র তোমার শুভ্র হস্ত আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে; হে অন্তরের ধন তোমাকে বাহিরে পেয়েছি, হে বাহিরের ঈশ্বর তোমাকে অন্তরের মধ্যে লাভ করেছি।

হে ভক্তের হৃদয়ানন্দ, আমরা যে তোমাকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভক্তি করতে পারি নে তার একটিমাত্র কারণ এই, আমরা তোমার মতো হতে পারি নি। তুমি আত্মদা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তুমি আপনাকে অজস্র দান করছ। আমরা স্বার্থ নিয়েই আছি, আমাদের ভিক্ষুকতা কিছুতেই ঘোচে না। আমাদের কর্ম, আমাদের ত্যাগ, স্বত-উচ্ছ্বসিত আনন্দের মধ্য থেকে উদ্বেল হয়ে উঠছে না। সেইজন্যে তোমার সঙ্গে আমাদের মিল হচ্ছে না। আনন্দের টানে আপনি আমরা আনন্দস্বরূপের মধ্যে গিয়ে পৌঁছোতে পারছি নে, আমাদের ভক্তি তাই সহজ ভক্তি হয়ে উঠছে না। তোমার যাঁরা ভক্ত তাঁরাই আমাদের এই অনৈক্যের সেতুস্বরূপ হয়ে তোমার সঙ্গে আমাদের মিলিয়ে রেখে দেন, আমরা তোমার ভক্তদের ভিতর দিয়ে তোমাকে দেখতে পাই, তোমারই স্বরূপকে মানুষের ভিতর দিয়ে ঘরের মধ্যে লাভ করি। দেখি যে তাঁরা কিছু চান না কেবল আপনাকে দান করেন, সে-দান মঙ্গলের উৎস থেকে আপনিই উৎসারিত হয়, আনন্দের নির্ঝর থেকে আপনিই ঝরে পড়ে, তাঁদের জীবন চারিদিকে মঙ্গললোক সৃষ্টি করতে থাকে, সেই সৃষ্টি আনন্দের সৃষ্টি। এমনি করে তাঁরা তোমার সঙ্গে মিলেছেন। তাঁদের জীবনে ক্লান্তি নেই, ভয় নেই, ক্ষতি নেই, কেবলই প্রাচুর্য, কেবলই পূর্ণতা। দুঃখ যখন তাঁদের আঘাত করে তখনও তাঁরা দান করেন, সুখ যখন তাঁদের ঘিরে থাকে তখনও তাঁরা বর্ষণ করেন। তাঁদের মধ্যে মঙ্গলের এই রূপ যখন দেখতে পাই, আনন্দের এই প্রকাশ যখন উপলব্ধি করি তখন, হে পরম মঙ্গল পরমানন্দ,

তোমাকে আমরা কাছে পাই; তখন তোমাকে নিঃসংশয় সত্যরূপে বিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে তেমন অসাধ্য হয় না। ভক্তের হৃদয়ের ভিতর দিয়ে তোমার যে মধুময় প্রকাশ ভক্তের জীবনের উপর দিয়ে তোমার প্রসন্ন মুখের যে প্রতিফলিত স্নিগ্ধ রশ্মি, সেও তোমার জগদ্ব্যাপী বিচিত্র আত্মদানের একটি বিশেষ ধারা; ফুলের মধ্যে যেমন তোমার গন্ধ, ফলের মধ্যে যেমন তোমার রস, ভক্তের ভিতর দিয়েও তোমার আত্মদানকে আমরা যেন তেমনি আনন্দের সঙ্গে ভোগ করতে পারি। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে এই ভক্তিসুধা-সরস তোমার অতি মধুর লাবণ্য যেন আমরা না দেখে চলে না যাই। তোমার এই সৌন্দর্য তোমার কত ভক্তের জীবন থেকে কত রং নিয়ে যে মানবলোকের আনন্দকানন সাজিয়ে তুলেছে তা যে দেখেছে সেই মুগ্ধ হয়েছে। অহংকারের অন্ধতা থেকে যেন এই দেবদুর্লভ দৃশ্য হতে বঞ্চিত না হই। যেখানে তোমার একজন ভক্তের হৃদয়ের প্রেমস্রোতে তোমার আনন্দধারা একদিন মিলেছিল আমরা সেই পুণ্যসংগমের তীরে নিভৃত বনচ্ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছি, মিলন-সংগীত এখনও সেখানকার সূর্যোদয়ে সূর্যাস্তে সেখানকার নিশীথরাত্রের নিস্তব্ধতায় বেজে উঠছে। থাকতে থাকতে শুনতে শুনতে সেই সংগীতে আমরাও যেন কিছু সুর মিলিয়ে যেতে পারি এই আশীর্বাদ করো। কেননা জগতে যত সুর বাজে তার মধ্যে এই সুরই সবচেয়ে গভীর সব চেয়ে মিষ্ট। মিলনের আনন্দে মানুষের আত্মার এই গান, ভক্তিবীণায় এই তোমার অঙ্গুলির স্পর্শ, এই সোনার তারের মূর্ছনা।

৭ই পৌষ, রাত্রি, ১৩১৬

চিরনবীনতা

প্রভাত এসে প্রতিদিনই একটি রহস্যকে উদ্‌ঘাটিত করে দেয়, প্রতিদিনই সে একটি চিরন্তন কথা বলে অথচ প্রতিদিন মনে হয় সে-কথাটি নূতন। আমরা চিন্তা করতে করতে, কাজ করতে করতে, লড়াই করতে করতে প্রতিদিনই মনে করি, বহুকালের এই জগৎটা ক্লান্তিতে অবসন্ন, ভাবনায় ভারাক্রান্ত এবং ধূলায় মলিন হয়ে পড়েছে। এমন সময় প্রত্যুষে প্রভাত এসে পূর্ব আকাশের প্রান্তে দাঁড়িয়ে স্মিতহাস্যে জাদুকরের মতো জগতের উপর থেকে অন্ধকারের ঢাকাটি আস্তে আস্তে খুলে দেয়। দেখি সমস্তই নবীন, যেন সৃজনকর্তা এই মুহূর্তেই জগৎকে প্রথম সৃষ্টি করলেন। এই যে প্রথমকালের এবং চিরকালের নবীনতা এ আর কিছুতেই শেষ হচ্ছে না, প্রভাত এই কথাই বলছে।

আজ এই যে দিনটি দেখা দিল এ কি আজকের? এ যে কোন্ যুগারম্ভে জ্যোতির্বাষ্পের আবরণ ছিন্ন করে যাত্রা আরম্ভ করেছিল সে কি কেউ গণনায় আনতে পারে? এই দিনের নিমেষহীন দৃষ্টির সামনে তরল পৃথিবী কঠিন হয়ে উঠেছে, কঠিন পৃথিবীতে জীবনের নাট্য আরম্ভ হয়েছে এবং সেই নাট্যে অঙ্কের পর অঙ্কে কত নূতন নূতন প্রাণী তাদের জীবলীলা আরম্ভ করে সমাধা করে দিয়েছে; এই দিন মানুষের ইতিহাসের কত বিস্মৃত শতাব্দীকে আলোক দান করেছে, এবং কোথাও বা সিন্ধুতীরে কোথাও মরুপ্রান্তরে কোথাও অরণ্যচ্ছায়ায় কত বড়ো বড়ো সভ্যতার জন্ম এবং অভ্যুদয় এবং বিনাশ দেখে এসেছে, এ সেই অতিপুরাতন দিন যে এই পৃথিবীর প্রথম জন্মমুহূর্তেই তাকে নিজের শুভ্র আঁচল পেতে কোলে তুলে নিয়েছিল, সৌরজগতের সকল গণনাকেই যে একেবারে প্রথম সংখ্যা থেকেই আরম্ভ করে দিয়েছিল। সেই অতি প্রাচীন দিনই হাস্যমুখে আজ প্রভাতে আমাদের চোখের সামনে বীণাবাদক প্রিয়দর্শন বালকটির মতো এসে দাঁড়িয়েছে। এ একেবারে নবীনতার মূর্তি, সদ্যোজাত শিশুর মতোই নবীন। এ যাকে স্পর্শ করে সেই তখনই নবীন হয়ে ওঠে, এ আপনার গলার হারটিতে চিরযৌবনের স্পর্শমণি ঝুলিয়ে এসেছে।

এর মানে কী? এর মানে হচ্ছে এই, চিরনবীনতাই জগতের অন্তরের ধন, জগতের নিত্য সামগ্রী। পুরাতনতা জীর্ণতা তার উপর দিয়ে ছায়ার মতো আসছে যাচ্ছে, দেখা দিতে না দিতেই মিলিয়ে যাচ্ছে, একে কোনোমতেই আচ্ছন্ন করতে পারছে না। জরা মিথ্যা, মৃত্যু মিথ্যা, ক্ষয় মিথ্যা। তারা মরীচিকার মতো, জ্যোতির্ময় আকাশের উপরে তারা ছায়ার নৃত্য নাচে এবং নাচতে নাচতে তারা দিক্‌প্রান্তরের অন্তরালে বিলীন হয়ে যায়। সত্য কেবল নিঃশেষহীন নবীনতা, কোনো ক্ষতি তাকে স্পর্শ করে না, কোনো আঘাত তাতে চিহ্ন আঁকে না, প্রতিদিন প্রভাতে এই কথাটি প্রকাশ পায়।

এই যে পৃথিবীর অতিপুরাতন দিন, একে প্রত্যহ প্রভাতে নূতন করে জন্মলাভ করতে হয়। প্রত্যহই একবার করে তাকে আদিতে ফিরে আসতে হয়, নইলে তার মূল সুরটি হারিয়ে যায়। প্রভাত তাকে তার চিরকালের ধুয়োটি বারবার করে ধরিয়ে দেয়, কিছুতেই ভুলতে দেয় না। দিন ক্রমাগতই যদি একটানা চলে যেত, কোথাও যদি তার চোখে নিমেষ না পড়ত, ঘোরতর কর্মের ব্যস্ততা এবং শক্তির ঔদ্ধত্যের মাঝখানে একবার করে যদি অতলস্পর্শ অন্ধকারের মধ্যে সে নিজেকে ভুলে না যেত এবং তার পরে আবার সেই আদিম নবীনতার মধ্যে যদি তার নবজন্মলাভ না হত তাহলে ধুলার পর ধুলা আবর্জনার পর আবর্জনা কেবলই জমে উঠত। চেষ্টার

ক্ষোভে, অহংকারের তাপে, কর্মের ভারে তার চিরন্তন সত্যটি আচ্ছন্ন হয়ে থাকত। তাহলে কেবলই মধ্যাহ্নের প্রখরতা, প্রয়াসের প্রবলতা, কেবলই কাড়তে যাওয়া, কেবলই ধাক্কা খাওয়া, কেবলই অন্তহীন পথ, কেবলই লক্ষ্যহীন যাত্রা—এরই উন্মাদনার তপ্ত বাষ্প জমতে জমতে পৃথিবীকে যেন একদিন বুদ্‌বুদের মতো বিদীর্ণ করে ফেলত।

এখনও দিনের বিচিত্র সংগীত তার সমস্ত মূর্ছনার সঙ্গে বেজে ওঠে নি। কিন্তু এই দিন যতই অগ্রসর হবে, কর্মসংঘাত ততই বেড়ে উঠতে থাকবে, অনৈক্য এবং বিরোধের সুরগুলি ক্রমেই উগ্র হয়ে উঠতে চাইবে। দেখতে দেখতে পৃথিবী জুড়ে উদ্বেগ তীব্র, ক্ষুধাতৃষ্ণার ক্রন্দনস্বর প্রবল এবং প্রতিযোগিতার ক্ষুব্ধ গর্জন উন্মত্ত হয়ে উঠবে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্নিগ্ধ প্রভাত প্রতিদিনই দেবদূতের মতো এসে ছিন্ন তারগুলিকে সেরেসুরে নিয়ে যে মূল সুরটিকে বাজিয়ে তোলে সেটি যেমন সরল তেমনি উদার, যেমন শান্ত তেমনি গম্ভীর, তার মধ্যে দাহ নেই, সংঘর্ষ নেই, তার মধ্যে খণ্ডতা নেই, সংশয় নেই। সে একটি বৃহৎ সমগ্রতার সম্পূর্ণতার সুর। নিত্যরাগিণীর মূর্তিটি অতি সৌম্য-ভাবে তার মধ্যে থেকে প্রকাশ পেয়ে ওঠে।

এমনি করে প্রতিদিনই প্রভাতের মুখ থেকে আমরা ফিরে ফিরে এই একটি কথা শুনতে পাই যে, কোলাহল যতই বিষম হ'ক না কেন তবু সে চরম নয়, আসল জিনিসটি হচ্ছে শান্তম্‌। সেইটিই ভিতরে আছে, সেইটিই আদিতে আছে, সেইটিই শেষে আছে। সেইজন্যই দিনের সমস্ত উন্মত্ততার পরও প্রভাতে আবার যখন সেই শান্তকে দেখি তখন দেখি তাঁর মূর্তিতে একটু আঘাতের চিহ্ন নেই একটু ধূলির রেখা নেই। সে মূর্তি চিরস্নিগ্ধ, চিরশুভ্র, চিরপ্রশান্ত।

সমস্ত দিন সংসারের ক্ষেত্রে দুঃখ দৈন্য মৃত্যুর আলোড়ন চলেইছে কিন্তু রোজ সকাল-বেলায় একটি বাণী আমাদের এই কথাটিই বলে যায় যে, এই সমস্ত অকল্যাণই চরম নয়, চরম হচ্ছেন শিবম্‌। প্রভাতে তাঁর একটি নির্মল মূর্তিকে দেখতে পাই—চেয়ে দেখি সেখানে ক্ষতির বলিরেখা কোথায়? সমস্তই পূরণ হয়ে আছে। দেখি যে, বুদ্‌বুদ যখন কেটে যায় সমুদ্রের তখনও কণামাত্র ক্ষয় হয় না। আমাদের চোখের উপরে যতই উলটপালট হয়ে যাক না তবু দেখি যে সমস্তই ধ্রুব হয়ে আছে, কিছুই নড়ে নি। আদিতে শিবম্‌, অন্তে শিবম্‌ এবং অন্তরে শিবম্‌।

সমুদ্রের ঢেউ যখন চঞ্চল হয়ে ওঠে তখন সেই ঢেউদের কাণ্ড দেখে সমুদ্রকে আর মনে থাকে না। তারাই অসংখ্য, তারাই প্রকাণ্ড, তারাই প্রচণ্ড এই কথাই কেবল মনে হতে থাকে। তেমনি সংসারের অনৈক্যকে বিরোধকেই সব চেয়ে প্রবল বলে মনে হয়। তা ছাড়া আর যে কিছু আছে তা কল্পনাতেও আসে না। কিন্তু প্রভাতের

মুখে একটি মিলনের বার্তা আছে যদি তা কান পেতে শুনি তবে শুনতে পাব এই বিরোধ এই অনৈক্যই চরম নয়, চরম হচ্ছেন অদ্বৈতম্। আমরা চোখের সামনে দেখতে পাই হানাহানির সীমা নেই, কিন্তু তারপরে দেখি ছিন্নবিচ্ছিন্নতার চিহ্ন কোথায়? বিশ্বের মহাসেতু লেশমাত্রও টলে নি। গণনাহীন অনৈক্যকে একই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে বেঁধে চিরদিন বসে আছেন, সেই অদ্বৈতম্, সেই একমাত্র এক। আদিতে অদ্বৈতম্, অন্তে অদ্বৈতম্, অন্তরে অদ্বৈতম্।

মানুষ যুগে যুগে প্রতিদিন প্রাতঃকালে দিনের আরম্ভে প্রভাতের প্রথম জাগ্রত আকাশ থেকে এই মন্ত্রটি অন্তরে বাহিরে শুনতে পেয়েছে, শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্। একবার তার সমস্ত কর্মকে থামিয়ে দিয়ে তার সমস্ত প্রবৃত্তিকে শান্ত করে নবীন আলোকের এই আকাশব্যাপী বাণীটি তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে, শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্—এমন হাজার হাজার বৎসর ধরে প্রতিদিনই এই একই বাণী, তার কর্মারম্ভের এই একই দীক্ষামন্ত্র।

আসল সত্য কথাটা হচ্ছে এই যে, যিনি প্রথম তিনি আজও প্রথম হয়েই আছেন। মুহূর্তে মুহূর্তেই তিনি সৃষ্টি করছেন, নিখিল জগৎ এইমাত্র প্রথম সৃষ্টি হল এ-কথা বললে মিথ্যা বলা হয় না। জগৎ একদিন আরম্ভ হয়েছে তার পরে তার প্রকাণ্ড ভার বহন করে তাকে কেবলই একটা সোজা পথে টেনে আনা হচ্ছে এ-কথা ঠিক নয়। জগৎকে কেউ বহন করছে না, জগৎকে কেবলই সৃষ্টি করা হচ্ছে। যিনি প্রথম, জগৎ তাঁর কাছ থেকে নিমেষে নিমেষেই আরম্ভ হচ্ছে। সেই প্রথমের সংস্রব কোনো মতেই ঘুচছে না। এইজন্যেই গোড়াতেও প্রথম, এখনও প্রথম, গোড়াতেও নবীন, এখনও নবীন। বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ—বিশ্বের আরম্ভেও তিনি, অন্তেও তিনি, সেই প্রথম, সেই নবীন, সেই নির্বিকার।

এই সত্যটিকে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, আমাদের মুহূর্তে মুহূর্তে নবীন হতে হবে, আমাদের ফিরে ফিরে নিমেষে নিমেষে তাঁর মধ্যে জন্মলাভ করতে হবে। কবিতা যেমন প্রত্যেক মাত্রায় মাত্রায় আপনার ছন্দটিতে গিয়ে পৌঁছোয়, প্রত্যেক মাত্রায় মাত্রায় মূল ছন্দটিকে নূতন করে স্বীকার করে, এবং সেই জন্যেই সমগ্রের সঙ্গে তার প্রত্যেক অংশের যোগ সুন্দর হয়ে ওঠে। আমাদেরও তাই করা চাই। আমরা প্রবৃত্তির পথে স্বাতন্ত্র্যের পথে একেবারে একটানা চলে যাব তা হবে না, আমাদের চিত্ত বারংবার সেই মূলে ফিরে আসবে, সেই মূলে ফিরে এসে তাঁর মধ্যে সমস্ত চরাচরের সঙ্গে আপনার যে অখণ্ড যোগ সেইটিকে বারবার অনুভব করে নেবে, তবেই সে মঙ্গল হবে, তবেই সে সুন্দর হবে।

এ যদি না হয়, আমরা যদি মনে করি সকলের সঙ্গে যে-যোগে আমাদের মঙ্গল, আমাদের স্থিতি, আমাদের সামঞ্জস্য, যে-যোগ আমাদের অস্তিত্বের মূলে তাকে ছাড়িয়ে নিজে অত্যন্ত উন্নত হয়ে ওঠবার আয়োজন করব, নিজের স্বাতন্ত্র্যকেই একেবারে নিত্য এবং উৎকট করে তোলবার চেষ্টা করব, তবে তা কোনোমতেই সফল এবং স্থায়ী হতে পারবেই না। একটা মস্ত ভাঙাচোরার মধ্যে তার অবসান হতেই হবে।

জগতে যত কিছু বিপ্লব, সে এমনি করেই হয়েছে। যখনই প্রতাপ এক জায়গায় পুঞ্জিত হয়েছে, যখনই বর্ণের, কুলের, ধনের, ক্ষমতার ভাগ-বিভাগ ভেদ-বিচ্ছেদ পরস্পরের মধ্যে ব্যবধানকে একেবারে দুর্লঙ্ঘ করে তুলেছে তখনই সমাজে ঝড় উঠেছে। যিনি অদ্বৈতম্, যিনি নিখিল জগতের সমস্ত বৈচিত্র্যকে একের সীমা লঙ্ঘন করতে দেন না তাঁকে একাকী ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে জয়ী হতে পারবে এত বড়ো শক্তি কোন্ রাজার বা রাজ্যের আছে। কেননা সেই অদ্বৈতের সঙ্গে যোগেই শক্তি, সেই যোগের উপলব্ধিকে শীর্ণ করলেই দুর্বলতা। এইজন্যেই অহংকারকে বলে বিনাশের মূল, এই জন্যেই ঐক্যহীনতাকেই বলে শক্তিহীনতার কারণ।

অদ্বৈতই যদি জগতের অন্তরতররূপে বিরাজ করেন এবং সকলের সঙ্গে যোগসাধনই যদি জগতের মূলতত্ত্ব হয় তবে স্বাতন্ত্র্য জিনিসটা আসে কোথা থেকে, এই প্রশ্ন মনে আসতে পারে। স্বাতন্ত্র্যও সেই অদ্বৈত থেকেই আসে, স্বাতন্ত্র্যও সেই অদ্বৈতেরই প্রকাশ।

জগতে এই সব স্বাতন্ত্র্যগুলি কেমন? না, গানের যেমন তান। তান যতদূর পর্যন্ত যাক না, গানটিকে অস্বীকার করতে পারে না, সেই গানের সঙ্গে তার মূলে যোগ থাকে। সেই যোগটিকে সে ফিরে ফিরে দেখিয়ে দেয়। গান থেকে তানটি যখন হঠাৎ ছুটে বেরিয়ে চলে তখন মনে হয় সে বুঝি বিক্ষিপ্ত হয়ে উধাও হয়ে চলে গেল বা, কিন্তু তার সেই ছুটে যাওয়া কেবল মূল গানটিতে আবার ফিরে আসবার জন্যেই, এবং সেই ফিরে আসার রসটিকেই নিবিড় করার জন্যে। বাপ যখন লীলাচ্ছলে দুই হাতে করে শিশুকে আকাশের দিকে তোলেন, তখন মনে হয় যেন তিনি তাকে দূরেই নিক্ষেপ করতে যাচ্ছেন,—শিশুর মনের ভিতরে ভিতরে তখন একটু ভয় ভয় করতে থাকে, কিন্তু একবার তাকে উৎক্ষিপ্ত করেই আবার পরমুহূর্তেই তাকে বুকের কাছে টেনে ধরেন। বাপের এই লীলার মধ্যে সত্য জিনিস কোন্‌টা? বুকের কাছে টেনে ধরাটাই, তাঁর কাছ থেকে ছুঁড়ে ফেলাটাই নয়। বিচ্ছেদের ভাবটি এবং ভয়টুকুকে সৃষ্টি করা এই জন্যে যে সত্যকার বিচ্ছেদ নেই সেই আনন্দকেই বারংবার পরিস্ফুট করে তুলতে হবে বলে।

অতএব গানের তানের মতো আমাদের স্বাতন্ত্র্যের সার্থকতা হচ্ছে সেই পর্যন্ত যে পর্যন্ত মূল ঐক্যকে সে লঙ্ঘন করে না, তাকেই আরও অধিক করে প্রকাশ করে; সমস্তের মূলে যে শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্ আছে যতক্ষণ পর্যন্ত তার সঙ্গে সে নিজের যোগ স্বীকার করে—অর্থাৎ যে-স্বাতন্ত্র্য লীলারূপেই সুন্দর, তাকে বিদ্রোহরূপে বিকৃত না করে। বিদ্রোহ করে মানুষের পরিত্রাণই বা কোথায়? যতদূরই যাক না সে যাবে কোথায়? তাঁর মধ্যে ফেরবার সহজ পথটি যদি সে না রাখে, যদি সে প্রবৃত্তির বেগে একেবারে হাউইয়ের মতোই উধাও হয়ে চলে যেতে চায়, কোনোমতেই নিখিলের সেই মূলকে মানতে না চায় তবে তবু তাকে ফিরতেই হবে। কিন্তু সেই ফেরা প্রলয়ের দ্বারা পতনের দ্বারা ঘটবে, তাকে বিদীর্ণ হয়ে দগ্ধ হয়ে নিজের সমস্ত শক্তির অভিমানকে ভস্মসাৎ করেই ফিরতে হবে। এই কথাটিকেই খুব জোর করে সমস্ত প্রতিকূল সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষ প্রচার করেছে,

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি,
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।

অধর্মের দ্বারা লোকে বৃদ্ধিপ্রাপ্তও হয়, তাতেই সে ইষ্টলাভ করে, তার দ্বারা সে শত্রুদের জয়ও করে থাকে কিন্তু একেবারে মূলের থেকে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

কেননা সমস্তের মূলে যিনি আছেন তিনি শান্ত, তিনি মঙ্গল, তিনি এক—তাঁকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে যাবার জো নেই। কেবল তাঁকে ততটুকুই ছাড়িয়ে চাওয়া চলে যাতে ফিরে আবার তাঁকেই নিবিড় করে পাওয়া যায়, যাতে বিচ্ছেদের দ্বারা তাঁর প্রকাশ প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে।

এইজন্যে ভারতবর্ষে জীবনের আরম্ভেই সেই মূল সুরে জীবনটিকে বেশ ভালো করে বেঁধে নেবার আয়োজন ছিল। আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্যই ছিল তাই। এই অনন্তের সুরে সুর মিলিয়ে নেওয়াই ছিল ব্রহ্মচর্য—খুব বিশুদ্ধ করে, নিখুঁত করে, সমস্ত তারগুলিকেই সেই আসল গানটির অনুগত করে বেশ টেনে বেঁধে দেওয়া, এই ছিল জীবনের গোড়াকার সাধনা।

এমনি করে বাঁধা হলে, মূল গানটি উপযুক্তমতো সাধা হলে, তার পরে গৃহস্থাশ্রমে ইচ্ছামতো তান খেলানো চলে, তাতে আর সুর-লয়ের স্খলন হয় না; সমাজের নানা সম্বন্ধের মধ্যে সেই একের সম্বন্ধকেই বিচিত্রভাবে প্রকাশ করা হয়।

সুরকে রক্ষা করে গান শিখতে মানুষকে কতদিন ধরে কত সাধনাই করতে হয়। তেমনি যারা সমস্ত মানবজীবনটিকেই অনন্তের রাগিণীতে বাঁধা একটি সংগীত বলে জেনেছিল তারাও সাধনায় শৈথিল্য করতে পারে নি। সুরটিকে চিনতে এবং

কণ্ঠটিকে সত্য করে তুলতে তারা উপযুক্ত গুরুর কাছে ব্রহ্মচর্য সংযম সাধন করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল।

এই ব্রহ্মচর্য-আশ্রমটি প্রভাতের মতো সরল, নির্মল, স্নিগ্ধ। মুক্ত আকাশের তলে, বনের ছায়ায় নির্মল স্রোতস্বিনীর তীরে তার আশ্রয়। জননীর কোল এবং জননীর দুই বাহু বক্ষই যেমন নগ্ন শিশুর আবরণ, এই আশ্রমে তেমনি নগ্নভাবে অবারিত ভাবে সাধক বিরাটের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে থাকেন, ভোগবিলাস ঐশ্বর্য-উপকরণ খ্যাতি-প্রতিপত্তির কোনো ব্যবধান থাকবে না। এ একেবারে সেই গোড়ায় গিয়ে শান্তের সঙ্গে মঙ্গলের সঙ্গে একের সঙ্গে গায়ে গায়ে সংলগ্ন হয়ে বসা—কোনো প্রমত্ততা, কোনো বিকৃতি সেখান থেকে তাকে বিক্ষিপ্ত করতে না পারে এই হচ্ছে সাধনা।

তার পরে গৃহস্থাশ্রমের কত কাজকর্ম, অর্জন ব্যয়, লাভ ক্ষতি, কত বিচ্ছেদ ও মিলন। কিন্তু এই বিক্ষিপ্ততাই চরম নয়। এরই মধ্যে দিয়ে যতদূর যাবার গিয়ে আবার ফিরতে হবে। ঘর যখন ভরে গেছে, ভাণ্ডার যখন পূর্ণ, তখন তারই মধ্যে আবদ্ধ হয়ে বসলে চলবে না। আবার প্রশস্ত পথে বেরিয়ে পড়তে হবে—আবার সেই মুক্ত আকাশ, সেই বনের ছায়া, সেই ধনহীন উপকরণহীন জীবনযাত্রা। নাই আভরণ, নাই আবরণ, নাই কোনো বাহ্য আয়োজন। আবার সেই বিশুদ্ধ সুরটিতে পৌঁছোনো, সেই সমে এসে শান্ত হওয়া। যেখান থেকে আরম্ভ সেইখানেই প্রত্যাবর্তন—কিন্তু এই ফিরে আসাটি মাঝখানের কর্মের ভিতর দিয়ে বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে গভীরতা লাভ করে। যাত্রা করার সময়ে গ্রহণ করার সাধনা আর ফেরবার সময়ে আপনাকে দান করার সাধনা।

উপনিষৎ বলছেন আনন্দ হতেই সমস্ত জীবের জন্ম, আনন্দের মধ্যেই সকলের জীবন-যাত্রা এবং সেই আনন্দের মধ্যেই আবার সকলের প্রত্যাবর্তন। বিশ্বজগতে এই যে আনন্দসমুদ্রে কেবলই তরঙ্গলীলা চলছে প্রত্যেক মানুষের জীবনটিকে এরই ছন্দে মিলিয়ে নেওয়া হচ্ছে জীবনের সার্থকতা। প্রথমেই এই উপলব্ধি তাকে পেতে হবে যে সেই অনন্ত আনন্দ হতেই সে জেগে উঠছে, আনন্দ হতেই তার যাত্রারম্ভ, তার পরে কর্মের বেগে সে যতদূর পর্যন্তই উচ্ছ্রিত হয়ে উঠুক না এই অনুভূতিটিই যেন সে রক্ষা করে যে সেই অনন্ত আনন্দসমুদ্রেই তার লীলা চলছে—তার পরে কর্ম সমাধা করে আবার যেন সে অতি সহজেই নত হয়ে সেই আনন্দসমুদ্রের মধ্যেই আপনার সমস্ত বিক্ষেপকে প্রশান্ত করে দেয়। এই হচ্ছে যথার্থ জীবন। এই জীবনের সঙ্গেই সমস্ত জগতের মিল। সেই মিলেই শান্তি এবং মঙ্গল এবং সৌন্দর্য প্রকাশ পায়।

হে চিত্ত, এই মিলটিকেই চাও। প্রবৃত্তির বেগে সমস্তকে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা

ক'রো না। সকলের চেয়ে বড়ো হব, সকলের চেয়ে কৃতকার্য হয়ে উঠব এইটেকেই তোমার জীবনের মূল তত্ত্ব বলে জেনো না। এ-পথে অনেকে অনেক পেয়েছে, অনেক সঞ্চয় করেছে, প্রতাপশালী হয়ে উঠেছে তা আমি জানি, তবু বলছি এ পথ তোমার না হ'ক। তুমি প্রেমে নত হতে চাও, নত হয়ে একেবারে সেইখানে গিয়ে তোমার মাথা ঠেকুক যেখানে জগতের ছোটো বড়ো সকলেই এসে মিলেছে। তুমি তোমার স্বাতন্ত্র্যকে প্রত্যহই তাঁর মধ্যে বিসর্জন করে তাকে সার্থক করো। যতই উঁচু হয়ে উঠবে ততই নত হয়ে তাঁর মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে থাকবে, যতই বাড়বে ততই ত্যাগ করবে, এই তোমার সাধনা হ'ক। ফিরে এস, ফিরে এস, বারবার তাঁর মধ্যে ফিরে ফিরে এস—দিনের মধ্যে মাঝে মাঝে ফিরে এস সেই অনন্তে। তুমি ফিরে আসবে বলেই এমন করে সমস্ত সাজানো রয়েছে। কত কথা, কত গোলমাল, বাইরের দিকে কত টানাটানি, সব ভুল হয়ে যায়, কোনো কিছুর পরিমাণ ঠিক থাকে না এবং সেই অসত্যের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির মধ্যে বিকৃতি এসে পড়ে। প্রতিদিন মুহূর্তে মুহূর্তে এই রকম ঘটছে, তারই মাঝখানে সতর্ক হও, টেনে আনো আপনাকে, ফিরে এস, আবার ফিরে এস, সেই গোড়ায়, সেই শান্তের মধ্যে, মঙ্গলের মধ্যে, সেই একের মধ্যে। কাজ করতে করতে কাজের মধ্যে একেবারে হারিয়ে যেয়ো না, তারই মাঝে মাঝে ফিরে ফিরে এসো তাঁর কাছে; আমোদ করতে করতে আমোদের মধ্যে একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে যেয়ো না, তারই মাঝে মাঝে ফিরে ফিরে এসো যেখানে সেই তাঁর কিনারা। শিশু খেলতে খেলতে মার কাছে বারবার ফিরে আসে; সেই ফিরে আসার যোগ যদি একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে তার আনন্দের খেলা কি ভয়ংকর হয়ে ওঠে! তোমার সংসারের কর্ম সংসারের খেলা ভয়ংকর হয়ে উঠবে যদি তাঁর মধ্যে ফেরবার পথ বন্ধ হয়ে যায়, সে পথ যদি অপরিচিত হয়ে ওঠে। বারবার যাতায়াতের দ্বারা সেই পথটি এমনি সহজ করে রাখো যে অমাবস্যার রাতেও সেখানে তুমি অনায়াসে যেতে পার, দুর্যোগের দিনেও সেখানে তোমার পা পিছলে না পড়ে। দিনে দুপুরে বেলায় অবেলায় যখন তখন সেই পথ দিয়ে যাও আর আসো, তাতে যেন কাঁটাগাছ জন্মাবার অবকাশ না ঘটে।

সংসারে দুঃখ আছে শোক আছে, আঘাত আছে অপমান আছে, হার মেনে তাদের হাতে আপনাকে একেবারে সমর্পণ করে দিয়ো না, মনে ক'রো না তারা তোমাকে ভেঙে ফেলেছে, গ্রাস করেছে, জীর্ণ করেছে। আবার ফিরে এস তাঁর মধ্যে, একেবারে নবীন হয়ে নাও। দেখতে দেখতে তুমি সংস্কারে জড়িত হয়ে পড়, লোকাচার তোমার ধর্মের স্থান অধিকার করে, যা তোমার আন্তরিক ছিল তাই

বাহ্যিক হয়ে দাঁড়ায়, যা চিন্তার দ্বারা বিচারের দ্বারা সচেতন ছিল তাই অভ্যাসের দ্বারা অন্ধ হয়ে ওঠে, যেখানে তোমার দেবতা ছিলেন সেখানেই অলক্ষ্যে সাম্প্রদায়িকতা এসে তোমাকে বেষ্টন করে ধরে। বাঁধা প'ড়ো না এর মধ্যে। ফিরে এস তাঁর কাছে, বার বার ফিরে এস। জ্ঞান আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, বুদ্ধি আবার নূতন হবে। জগতে যা কিছু তোমার জানবার বিষয় আছে, বিজ্ঞান বল, দর্শন বল, ইতিহাস বল, সমাজতত্ত্ব বল সমস্তকেই থেকে থেকে তাঁর মধ্যে নিয়ে যাও, তাঁর মধ্যে রেখে দেখো। তাহলেই তাদের উপরকার আবরণ খুলে যাবে, সমস্তই প্রশস্ত হয়ে সত্য হয়ে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে। জগতের সমস্ত সংকোচ, সমস্ত আচ্ছাদন, সমস্ত পাপ, এমনি করে বারবার তাঁর মধ্যে গিয়ে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এমনি করে জগৎ যুগের পর যুগ সুস্থ হয়ে সহজ হয়ে আছে। তুমিও তাঁর মধ্যে তেমনি সুস্থ হও, সহজ হও; বারবার করে তাঁর মধ্যে দিয়ে পূর্ণ হয়ে এস, তোমার দৃষ্টিকে, তোমার চিত্তকে, তোমার হৃদয়কে, তোমার কর্মকে নির্মলরূপে সত্য করে তোলো।

একদিন এই পৃথিবীতে নগ্ন শিশু হয়ে প্রবেশ করেছিলুম—হে চিত্ত, তুমি যখন সেই অনন্ত নবীনতার একেবারে কোলের উপরে খেলা করতে। এইজন্যে সেদিন তোমার কাছে সমস্তই অপরূপ ছিল, ধুলাবালিতেও তখন তোমার আনন্দ ছিল; পৃথিবীর সমস্ত বর্ণগন্ধরস যা কিছু তোমার হাতের কাছে এসে পড়ত তাকেই তুমি লাভ বলে জানতে, দান বলে গ্রহণ করতে। এখন তুমি বলতে শিখেছ, এটা পুরানো, ওটা, সাধারণ, এর কোনো দাম নেই। এমনি করে জগতে তোমার অধিকার সংকীর্ণ হয়ে আসছে। জগৎ তেমনিই নবীন আছে, কেননা এ যে অনন্ত রসসমুদ্রে পদ্মের মতো ভাসছে; নীলাকাশের নির্মল ললাটে বার্ধক্যের চিহ্ন পড়ে নি; আমাদের শিশুকালের সেই চিরসুহৃদ্ চাঁদ আজও পূর্ণিমার পর পূর্ণিমায় জ্যোৎস্নার দানসাগর ব্রত পালন করছে; ছয় ঋতুর ফুলের সাজি আজও ঠিক তেমনি করে আপনাআপনি ভরে উঠছে; রজনীর নীলাম্বরের আঁচলা থেকে আজও একটি চুমকিও খসে নি; আজও প্রতিরাত্রির অবসানে প্রভাত তার সোনার ঝুলিটিতে আশাময় রহস্য বহন করে জগতের প্রত্যেক প্রাণীর মুখের দিকে চেয়ে হেসে বলছে, বলো দেখি আমি তোমার জন্যে কী এনেছি! তবে জগতে জরা কোথায়? জরা কেবল কুঁড়ির উপরকার পত্রপুটের মতো নিজেকে বিদীর্ণ করে খসিয়ে খসিয়ে ফেলছে, চিরনবীনতার পুষ্পই ভিতর থেকে কেবলই ফুটে ফুটে উঠছে। মৃত্যু কেবলই আপনাকে আপনি ধ্বংস করছে—সে যা-কিছুকে সরাচ্ছে তাতে কেবল আপনাকেই সরিয়ে ফেলছে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বৎসর ধরে তার আক্রমণে এই জগৎপাত্রের অমৃতে একটি কণারও ক্ষয় হয় নি।

হে আমার চিত্ত, আজ এই উৎসবের দিনে তুমি একেবারে নবীন হও, এখনই তুমি নবীনতার মধ্যে জন্মগ্রহণ করো, জরাজীর্ণতার বাহ্য আবরণ তোমার চারদিক থেকে কুয়াশার মতো মিলিয়ে যাক, চিরনবীন চিরসুন্দরকে আজ ঠিক একেবারে তোমার সম্মুখেই চেয়ে দেখো—শৈশবের সত্যদৃষ্টি ফিরে আসুক, জলস্থল আকাশ রহস্যে পূর্ণ হয়ে উঠুক, মৃত্যুর আচ্ছাদন থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে চিরযৌবন দেবতার মতো করে একবার দেখো, সকলকে অমৃতের পুত্র বলে একবার বোধ করো। সংসারের সমস্ত আবরণকে ভেদ করে আজ একবার আত্মাকে দেখো—কত বড়ো একটি মিলনের মধ্যে সে নিমগ্ন হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে রয়েছে, সে কী নিবিড়, কী নিগূঢ়, কী আনন্দময়! কোনো ক্লান্তি নেই, জরা নেই, ম্লানতা নেই। সেই মিলনেরই বাঁশি জগতের সমস্ত সংগীতে বেজে উঠছে, সেই মিলনেরই উৎসবসজ্জা সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত হয়েছে। এই জগৎজোড়া সৌন্দর্যের কেবল একটিমাত্র অর্থ আছে, তোমার সঙ্গে তাঁর মিলন হয়েছে সেই জন্যেই এত শোভা, এত আয়োজন। এই সৌন্দর্যের সীমা নেই, এই আয়োজনের ক্ষয় নেই, চিরযৌবন তুমি চিরযৌবন, চিরসুন্দরের বাহুপাশে তুমি চিরদিন বাঁধা, সংসারের সমস্ত পর্দা সরিয়ে ফেলে সমস্ত লোভ মোহ অহংকারের জঞ্জাল কাটিয়ে আজ একবার সেই চিরদিনের আনন্দের মধ্যে পরিপূর্ণ ভাবে প্রবেশ করো, সত্য হ'ক তোমার জীবন তোমার জগৎ, জ্যোতির্ময় হ'ক, অমৃতময় হ'ক।

দেখো, আজ দেখো, তোমার গলায় কে পারিজাতের মালা নিজের হাতে পরিয়েছেন—কার প্রেমে তুমি সুন্দর, কার প্রেমে তোমার মৃত্যু নেই, কার প্রেমের গৌরবে তোমার চারিদিক থেকে তুচ্ছতার আবরণ কেবলই কেটে কেটে যাচ্ছে—কিছুতেই তোমাকে চিরদিনের মতো আবৃত আবদ্ধ করতে পারছে না। বিশ্বে তোমার বরণ হয়ে গেছে—প্রিয়তমের অনন্তমহল বাড়ির মধ্যে তুমি প্রবেশ করেছ, চারিদিকে দিকেদিগন্তে দীপ জ্বলছে, সুরলোকের সপ্তঋষি এসেছেন তোমাকে আশীর্বাদ করতে। আজ তোমার কিসের সংকোচ। আজ তুমি নিজেকে জানো, সেই জানার মধ্যে প্রফুল্ল হয়ে ওঠো, পুলকিত হয়ে ওঠো। তোমারই আত্মার এই মহোৎসব-সভায় স্বপ্নাবিষ্টের মতো একধারে পড়ে থেকো না, যেখানে তোমার অধিকারের সীমা নেই সেখানে ভিক্ষুকের মতো উঞ্ছবৃত্তি ক'রো না।

হে অন্তরতর, আমাকে বড়ো করে জানাবার ইচ্ছা তুমি একেবারেই সব দিক থেকে ঘুচিয়ে দাও। তোমার সঙ্গে মিলিত করে আমার যে জানা সেই আমাকে জানাও। আমার মধ্যে তোমার যা প্রকাশ তাই কেবল সুন্দর, তাই কেবল মঙ্গল, তাই কেবল নিত্য। আর সমস্তের কেবল এইমাত্র মূল্য যে তারা সেই প্রকাশের উপকরণ। কিন্তু

তা না হয়ে যদি তারা বাধা হয় তবে নির্মমভাবে তাদের চূর্ণ করে দাও। আমার ধন যদি তোমার ধন না হয় তবে দারিদ্র্যের দ্বারা আমাকে তোমার বুকের কাছে টেনে নাও, আমার বুদ্ধি যদি তোমার শুভবুদ্ধি না হয় তবে অপমানে তার গর্ব চূর্ণ করে তাকে সেই ধুলায় নত করে দাও যে-ধুলার কোলে তোমার বিশ্বের সকল জীব বিশ্রাম লাভ করে। আমার মনে যেন এই আশা সর্বদাই জেগে থাকে যে, একেবারে দূরে তুমি আমাকে কখনোই যেতে দেবে না, ফিরে ফিরে তোমার মধ্যে আসতেই হবে, বারংবার তোমার মধ্যে নিজেকে নবীন করে নিতেই হবে। দাহ বেড়ে চলে, বোঝা ভারি হয়, ধুলো জমে ওঠে, কিন্তু এমন করে বরাবর চলে না, দিনের শেষে জননীর হাতে পড়তেই হয়, অনন্ত সুধাসমুদ্রে অবগাহন করতেই হয়, সমস্ত জুড়িয়ে যায়, সমস্ত হালকা হয়, ধুলার চিহ্ন থাকে না; একেবারে তোমারই যা সেই গোড়াটুকুতেই গিয়ে পৌঁছোতে হয়, যা কিছু আমার সে সমস্ত জঞ্জাল ঘুচে যায়। মৃত্যুর আঁচলের মধ্যে ঢেকে তুমি একেবারে তোমার অবারিত হৃদয়ের উপরে আমাদের টেনে নাও। তখন কোনো ব্যবধান রাখ না। তার পরে বিরাম-রাত্রির শেষে হাতে পাথেয় দিয়ে মুখচুম্বন করে হাসিমুখে জীবনের স্বাতন্ত্র্যের পথে আবার পাঠিয়ে দাও। নির্মল প্রভাতে প্রাণের আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, গান করতে করতে বেরিয়ে পড়ি, মনে গর্ব হয়, বুঝি নিজের শক্তিতে নিজের সাহসে, নিজের পথেই দূরে চলে যাচ্ছি। কিন্তু প্রেমের টান তো ছিন্ন হয় না, শুষ্ক গর্ব নিয়ে তো আত্মার ক্ষুধা মেটে না। শেষকালে নিজের শক্তির গৌরবে ধিক্‌কার জন্মে, সম্পূর্ণ বুঝতে পারি এই শক্তিকে যতক্ষণ তোমার মধ্যে না নিয়ে যাই ততক্ষণ এ কেবল দুর্বলতা। তখন গর্বকে বিসর্জন দিয়ে নিখিলের সমান ক্ষেত্রে এসে দাঁড়াতে চাই। তখনই তোমাকে সকলের মাঝখানে পাই কোথাও আর কোনো বাধা থাকে না। সেইখানে এসে সকলের সঙ্গে একত্রে বসে যাই যেখানে—মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে। শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্ এই মন্ত্র গভীর স্বরে বাজুক, সমস্ত মনের তারে, সমস্ত কর্মের ঝংকারে। বাজতে বাজতে একেবারে নীরব হয়ে যাক। শান্তের মধ্যে, শিবের মধ্যে, একের মধ্যে, তোমার মধ্যে নীরব হয়ে যাক। পবিত্র হয়ে পরিপূর্ণ হয়ে সুধাময় হয়ে নীরব হয়ে যাক। সুখদুঃখ পূর্ণ হয়ে উঠুক, জীবনমৃত্যু পূর্ণ হয়ে উঠুক, অন্তর-বাহির পূর্ণ হয়ে উঠুক, ভূর্ভুবঃস্বঃ পূর্ণ হয়ে উঠুক। বিরাজ করুন অনন্ত দয়া, অনন্ত প্রেম, অনন্ত আনন্দ। বিরাজ করুন শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্।

বিশ্ববোধ

প্রত্যেক জাতিই আপনার সভ্যতার ভিতর দিয়ে আপনার শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে প্রার্থনা করছে। গাছের শিকড় থেকে আর ডালপালা পর্যন্ত সমস্তেরই যেমন একমাত্র চেষ্টা এই যে, যেন তার ফলের মধ্যে তার সকলের চেয়ে ভালো বীজটি জন্মায়; অর্থাৎ তার শক্তির যতদূর পরিণতি হওয়া সম্ভব তার বীজে যেন তারই আবির্ভাব হয়। তেমনি মানুষের সমাজও এমন মানুষকে চাচ্ছে যার মধ্যে সে আপনার শক্তির চরম পরিণতিকে প্রত্যক্ষ করতে পারে।

এই শক্তির চরম পরিণতিটি যে কী, সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বলতে যে কাকে বোঝায় তার কল্পনা প্রত্যেক জাতির বিশেষ ক্ষমতা অনুসারে উজ্জ্বল অথবা অপরিস্ফুট। কেউ বা বাহুবলকে, কেউ বুদ্ধিচাতুরীকে, কেউ চারিত্রনীতিকেই মানুষের শ্রেষ্ঠতার মুখ্য উপাদান বলে গণ্য করেছে এবং সেই দিকেই অগ্রসর হবার জন্যে নিজের সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা শাস্ত্রশাসনকে নিযুক্ত করছে।

ভারতবর্ষও একদিন মানুষের পূর্ণ শক্তিকে উপলব্ধি করবার জন্যে সাধনা করেছিল। ভারতবর্ষ মনের মধ্যে আপনার শ্রেষ্ঠ মানুষের ছবিটি দেখেছিল। সে শুধু মনের মধ্যেই কি? বাইরে যদি মানুষের আদর্শ একেবারেই দেখা না যায় তাহলে মনের মধ্যেও তার প্রতিষ্ঠা হতে পারে না।

ভারতবর্ষ আপনার সমস্ত গুণী জ্ঞানী শূর বীর রাজা মহারাজার মধ্যে এমন কোন মানুষদের দেখেছিল যাঁদের নরশ্রেষ্ঠ বলে বরণ করে নিয়েছিল? তাঁরা কে?

সংপ্রাপ্যৈনম্ ঋষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ
তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি।

তাঁরা ঋষি। সেই ঋষি কারা? না, যাঁরা পরমাত্মাকে জ্ঞানের মধ্যে পেয়ে জ্ঞানতৃপ্ত, আত্মার মধ্যে মিলিত দেখে কৃতাত্মা, হৃদয়ের মধ্যে উপলব্ধি করে বীতরাগ, সংসারের কর্মক্ষেত্রে দর্শন করে প্রশান্ত। সেই ঋষি তাঁরা যাঁরা পরমাত্মাকে সর্বত্র হতেই প্রাপ্ত হয়ে ধীর হয়েছেন, সকলের সঙ্গেই যুক্ত হয়েছেন, সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেছেন।

ভারতবর্ষ আপনার সমস্ত সাধনার দ্বারা এই ঋষিদের চেয়েছিল। এই ঋষিরা ধনী নন, ভোগী নন, প্রতাপশালী নন, তাঁরা ধীর, তাঁরা যুক্তাত্মা।

এর থেকেই দেখা যাচ্ছে পরমাত্মার যোগে সকলের সঙ্গেই যোগ উপলব্ধি করা, সকলের মধ্যেই প্রবেশ লাভ করা, এইটেকেই ভারতবর্ষ মনুষ্যত্বের চরম সার্থকতা বলে গণ্য করেছিল। ধনী হয়ে, প্রবল হয়ে, নিজের স্বাতন্ত্র্যকেই চারিদিকের সকলের চেয়ে উচ্চে খাড়া করে তোলাকেই ভারতবর্ষ সকলের চেয়ে গৌরবের বিষয় বলে মনে করে নি।

মানুষ বিনাশ করতে পারে, কেড়ে নিতে পারে, অর্জন করতে পারে, সঞ্চয় করতে পারে, আবিষ্কার করতে পারে, কিন্তু এই জন্যেই যে মানুষ বড়ো তা নয়। মানুষের মহত্ত্ব হচ্ছে মানুষ সকলকেই আপন করতে পারে। মানুষের জ্ঞান সব জায়গায় পৌঁছোয় না, তার শক্তি সব জায়গায় নাগাল পায় না, কেবল তার আত্মার অধিকারের সীমা নেই। মানুষের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁরা পরিপূর্ণ বোধশক্তির দ্বারা এই কথা বলতে পেরেছেন যে, ছোট হ'ক বড়ো হ'ক, উচ্চ হ'ক নীচ হ'ক, শত্রু হ'ক মিত্র হ'ক সকলেই আমার আপন।

মানুষের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁরা এমন জায়গায় সকলের সঙ্গে সমান হয়ে দাঁড়ান যেখানে সর্বব্যাপীর সঙ্গে তাঁদের আত্মার যোগস্থাপন হয়। যেখানে মানুষ সকলকে ঠেলেঠুলে নিজে বড়ো হয়ে উঠতে চায় সেখানেই তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে। সেই জন্যেই যাঁরা মানবজন্মের সফলতা লাভ করেছেন উপনিষৎ তাঁদের ধীর বলেছেন, যুক্তাত্মা বলেছেন। অর্থাৎ তাঁরা সকলের সঙ্গে মিলে আছেন বলেই শান্ত, তাঁরা সকলের সঙ্গে মিলে আছেন বলেই সেই পরম একের সঙ্গে তাঁদের বিচ্ছেদ নেই, তাঁরা যুক্তাত্মা।

খ্রীস্টের উপদেশ-বাণীর মধ্যেও এই কথাটির আভাস আছে। তিনি বলেছেন সূচির ছিদ্রের ভিতর দিয়ে যেমন উট প্রবেশ করতে পারে না, ধনীর পক্ষে মুক্তিলাভও তেমনি দুঃসাধ্য।

তার মানে হচ্ছে এই যে, ধন বল, মান বল যা কিছু আমরা জমিয়ে তুলি তার দ্বারা আমরা স্বতন্ত্র হয়ে উঠি, তার দ্বারা সকলের সঙ্গে আমাদের যোগ নষ্ট হয়। তাকেই বিশেষভাবে আগলাতে সামলাতে গিয়ে সকলকে দূরে ঠেকিয়ে রাখি। সঞ্চয় যতই বাড়তে থাকে ততই সকলের চেয়ে নিজেকে স্বতন্ত্র বলে গর্ব হয়। সেই গর্বের টানে এই স্বাতন্ত্র্যকে কেবলই বাড়িয়ে নিয়ে চলতে চেষ্টা হয়। এর আর সীমা নেই— আরও বড়ো, আরও বড়ো, আরও বেশি, আরও বেশি। এমনি করে মানুষ সকলের সঙ্গে যোগ হারাবার দিকেই চলতে থাকে, তার সর্বত্র প্রবেশের অধিকার কেবল নষ্ট হয়। উট যেমন সূচির ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে গলতে পারে না সেও তেমনি কেবলই স্থূল হয়ে উঠে নিখিলের কোনো পথ দিয়েই গলতে পারে না, সে আপনার বড়োত্বের মধ্যেই

বন্দী। সে-ব্যক্তি মুক্তস্বরূপকে কেমন করে পাবে যিনি এমন প্রশস্ততম জায়গায় থাকেন যেখানে জগতের ছোটোবড়ো সকলেরই সমান স্থান।

সেই জন্যে আমাদের দেশে এই একটি অত্যন্ত বড়ো কথা বলা হয়েছে যে, তাঁকে পেতে হলে সকলকেই পেতে হবে। সমস্তকে ত্যাগ করাই তাঁকে পাওয়ার পন্থা নয়।

য়ুরোপের কোনো কোনো আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানী, যাঁরা পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে উপনিষদের কাছেই বিশেষভাবে ঋণী, তাঁরা সেই ঋণকে অস্বীকার করেই বলে থাকেন, ভারতবর্ষের ব্রহ্ম একটি অবচ্ছিন্ন (abstract) পদার্থ। অর্থাৎ জগতে যেখানে যা কিছু আছে সমস্তকে ত্যাগ করে বাদ দিয়েই সেই অনন্ত স্বরূপ—অর্থাৎ এক কথায় তিনি কোনোখানেই নেই, আছেন কেবল তত্ত্বজ্ঞানে।

এ রকম কোনো দার্শনিক মতবাদ ভারতবর্ষে আছে কিনা সে-কথা আলোচনা করতে চাই নে কিন্তু এটি ভারতবর্ষের আসল কথা নয়। বিশ্বজগতের সমস্ত পদার্থের মধ্যেই অনন্ত স্বরূপকে উপলব্ধি করার সাধনা ভারতবর্ষে এতদূরে গেছে যে অন্য দেশের তত্ত্বজ্ঞানীরা সাহস করে ততদূরে যেতে পারেন না।

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—জগতে যেখানে যা কিছু আছে সমস্তকেই ঈশ্বরকে দিয়ে আচ্ছন্ন করে দেখবে এই তো আমাদের প্রতি উপদেশ।

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

একেই কি বলে বিশ্ব থেকে বাদ দিয়ে তাঁকে দেখা? তিনি যেমন অগ্নিতেও আছেন তেমনি জলেও আছেন, অগ্নি ও জলের কোনো বিরোধ তাঁর মধ্যে নেই। ধান, গম, যব প্রভৃতি যে সমস্ত ওষধি কেবল কয়েক মাসের মতো পৃথিবীর উপর এসে আবার স্বপ্নের মতো মিলিয়ে যায় তার মধ্যেও সেই নিত্য সত্য যেমন আছেন, আবার যে বনস্পতি অমরতার প্রতিমাস্বরূপ সহস্র বৎসর ধরে পৃথিবীকে ফল ও ছায়া দান করছে তার মধ্যেও তিনি তেমনিই আছেন। শুধু আছেন এইটুকুকে জানা নয়, নমোনমঃ; তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার; সর্বত্রই তাঁকে নমস্কার।

আবার আমাদের ধ্যানের মন্ত্রেরও সেই একই লক্ষ্য—তাঁকে সমস্তর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা, ভূলোকের সঙ্গে নক্ষত্রলোকের, বাহিরের সঙ্গে অন্তরের।

আমাদের দেশে বুদ্ধ এসেও বলে গিয়েছেন যা কিছু উর্ধ্বে আছে অধোতে

আছে, দূরে আছে নিকটে আছে, গোচরে আছে অগোচরে আছে সমস্তের প্রতিই বাধাহীন হিংসাহীন শত্রুতাহীন অপরিমিত মানস এবং মৈত্রী রক্ষা করবে। যখন দাঁড়িয়ে আছ বা চলছ, বসে আছ বা শুয়ে আছ, যে পর্যন্ত না নিদ্রা আসে সে পর্যন্ত এই প্রকার স্মৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকাকেই বলে ব্রহ্মবিহার।

অর্থাৎ ব্রহ্মের যে ভাব সেই ভাবটির মধ্যে প্রবেশ করাই হচ্ছে ব্রহ্মবিহার। ব্রহ্মের সেই ভাবটি কী?

যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বানুভূঃ, যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ সর্বানুভূ হয়ে আছেন তিনিই ব্রহ্ম। সর্বানুভূ, অর্থাৎ সমস্তই তিনি অনুভব করছেন এই তাঁর ভাব। তিনি যে কেবল সমস্তর মধ্যে ব্যাপ্ত তা নয়, সমস্তই তাঁর অনুভূতির মধ্যে। শিশুকে মা যে বেষ্টন করে থাকেন সে কেবল তাঁর বাহু দিয়ে তাঁর শরীর দিয়ে নয় তাঁর অনুভূতি দিয়ে। সেইটিই হচ্ছে মাতার ভাব, সেই তাঁর মাতৃত্ব। শিশুকে মা আদ্যোপান্ত অত্যন্ত প্রগাঢ়রূপে অনুভব করেন। তেমনি সেই অমৃতময় পুরুষের অনুভূতি সমস্ত আকাশকে পূর্ণ করে সমস্ত জগৎকে সর্বত্র নিরতিশয় আচ্ছন্ন করে আছে। সমস্ত শরীরে মনে আমরা তাঁর অনুভূতির মধ্যে মগ্ন হয়ে রয়েছি। অনুভূতি, অনুভূতি—তাঁর অনুভূতির ভিতর দিয়ে বহু যোজন ক্রোশ দূর হতে সূর্য পৃথিবীকে টানছে, তাঁরই অনুভূতির মধ্য দিয়ে আলোকতরঙ্গ লোক হতে লোকান্তরে তরঙ্গিত হয়ে চলেছে। আকাশে কোথাও তার বিচ্ছেদ নেই, কালে কোথাও তার বিরাম নেই।

শুধু আকাশে নয়—যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বানুভূঃ—এই আত্মাতেও তিনি সর্বানুভূ। যে আকাশ ব্যাপ্তির রাজ্য সেখানেও তিনি সর্বানুভূ, যে আত্মা সমাপ্তির রাজ্য সেখানেও তিনি সর্বানুভূ।

তাহলেই দেখা যাচ্ছে যদি সেই সর্বানুভূকে পেতে চাই তাহলে অনুভূতির সঙ্গে অনুভূতি মেলাতে হবে। বস্তুত মানুষের যতই উন্নতি হচ্ছে ততই তার এই অনুভূতির বিস্তার ঘটছে। তার কাব্য দর্শন বিজ্ঞান কলাবিদ্যা ধর্ম সমস্তই কেবল মানুষের অনুভূতিকে বৃহৎ হতে বৃহত্তর করে তুলছে। এমনি করে অনুভূ হয়েই মানুষ বড়ো হয়ে উঠছে প্রভু হয়ে নয়। মানুষ যতই অনুভূ হবে প্রভুত্বের বাসনা ততই তার খর্ব হতে থাকবে। জায়গা জুড়ে থেকে মানুষ অধিকার করে না, বাহিরের ব্যবহারের দ্বারাও মানুষের অধিকার নয়—যে পর্যন্ত মানুষের অনুভূতি সেই পর্যন্তই সে সত্য, সেই পর্যন্তই তার অধিকার।

ভারতবর্ষ এই সাধনার 'পরেই সকলের চেয়ে বেশি জোর দিয়েছিল এই বিশ্ববোধ,

সর্বানুভূতি। গায়ত্রীমন্ত্রে এই বোধকেই ভারতবর্ষ প্রত্যহ ধ্যানের দ্বারা চর্চা করেছে, এই বোধের উদ্বোধনের জন্যেই উপনিষৎ সর্বভূতকে আত্মায় ও আত্মাকে সর্বভূতে উপলব্ধি করে ঘৃণা পরিহারের উপদেশ দিয়েছেন এবং বুদ্ধদেব এই বোধকেই সম্পূর্ণ করবার জন্যে সেই প্রণালী অবলম্বন করতে বলেছেন যাতে মানুষের মন অহিংসা থেকে দয়ায়, দয়া থেকে মৈত্রীতে সর্বত্র প্রসারিত হয়ে যায়।

এই যে সমস্তকে পাওয়া, সমস্তকে অনুভব করা, এর একটি মূল্য দিতে হয়। কিছু না দিয়ে পাওয়া যায় না। এই সকলের চেয়ে বড়ো পাওয়ার মূল্য কী? আপনাকে দেওয়া। আপনাকে দিলে তবে সমস্তকে পাওয়া যায়। আপনার গৌরবই তাই— আপনাকে ত্যাগ করলে সমস্তকে লাভ করা যায়, এইটেই তার মূল্য, এইজন্যই সে আছে।

তাই উপনিষদে একটি সংকেত আছে—ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, ত্যাগের দ্বারাই লাভ করো, ভোগ করো। মা গৃধঃ, লোভ ক'রো না।

বুদ্ধদেবের যে শিক্ষা সেও বাসনাবর্জনের শিক্ষা; গীতাতেও বলছে, ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে নিরাসক্ত হয়ে কাজ করবে। এইসকল উপদেশ হতেই অনেকে মনে করেন ভারতবর্ষ জগৎকে মিথ্যা বলে কল্পনা করে বলেই এই প্রকার উদাসীনতার প্রচার করেছে। কিন্তু কথাটা ঠিক এর উলটো।

যে-লোক আপনাকেই বড়ো করে চায় সে আর-সমস্তকেই খাটো করে। যার মনে বাসনা আছে সে কেবল সেই বাসনার বিষয়েই বদ্ধ, বাকি সমস্তের প্রতিই উদাসীন। উদাসীন শুধু নয়, হয়তো নিষ্ঠুর। এর কারণ এই, প্রভুত্বে কেবল তারই রুচি যে-ব্যক্তি সমগ্রের চেয়ে আপনাকেই সত্যতম ব'লে জানে, বাসনার বিষয়ে তারই রুচি যার কাছে সেই বিষয়টি সত্য আর সমস্তই মায়া। এই সকল লোকেরা হচ্ছে যথার্থ মায়াবাদী।

মানুষ নিজেকে যতই ব্যাপ্ত করতে থাকে ততই তার অহংকার এবং বাসনার বন্ধন কেটে যায়। মানুষ যখন নিজেকে একেবারে একলা বলে না জানে, যখন সে বাপ মা ভাই বন্ধুদের সঙ্গে নিজেকে এক বলে উপলব্ধি করে তখনই সে সভ্যতার প্রথম সোপানে পা ফেলে, তখনই সে বড়ো হতে শুরু করে। কিন্তু সেই বড়ো হবার মূল্যটি কী? নিজের প্রবৃত্তিকে বাসনাকে অহংকারকে খর্ব করা। এ না হলে পরিবারের মধ্যে তার আত্মোপলব্ধি সম্ভবপর হয় না। গৃহের সকলেরই কাছে আপনাকে ত্যাগ করলে তবেই যথার্থ গৃহী হতে পারা যায়।

এমনি করে গৃহী হবার জন্যে, সামাজিক হবার জন্যে, স্বাদেশিক হবার জন্যে

মানুষকে শিশুকাল থেকে কী সাধনাই না করতে হয়। তার যে-সকল প্রবৃত্তি নিজেকে বড়ো ক'রে পরকে আঘাত করে তাকে কেবলই খর্ব করতে হয়। তার যে-সকল হৃদয়বৃত্তি সকলের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে চায় তাকেই উৎসাহ দ্বারা এবং চর্চার দ্বারা কেবল বাড়িয়ে তুলতে হয়। পরিবারবোধের চেয়ে সমাজবোধে, সমাজবোধের চেয়ে স্বদেশ-বোধে মানুষ একদিকে যতই বড়ো হয় অন্যদিকে ততই তাকে আত্মবিলোপ সাধন করতে হয়। ততই তার শিক্ষা কঠিন হয়ে ওঠে, ততই তাকে বৃহৎ ত্যাগের জন্যে প্রস্তুত হতে হয়। একেই তো বলে বীতরাগ হওয়া। এই জন্যেই মহত্ত্বের সাধনামাত্রই মানুষকে বলে, ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। বলে, মা গৃধঃ। এইরূপে নিজের ঐক্যবোধের ক্ষেত্রকে ক্রমশ বড়ো করে তোলবার চেষ্টা, এই হচ্ছে মনুষ্যত্বের চেষ্টা। আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি পাশ্চাত্যদেশে এই চেষ্টা সাম্রাজ্যিকতাবোধে গিয়ে পৌঁচেছে। এক জাতির সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে-সমস্ত রাজ্য আছে তাদের সমস্তকে এক সাম্রাজ্যসূত্রে গেঁথে বৃহৎভাবে প্রবল হয়ে ওঠবার একটা ইচ্ছা সেখানে জাগ্রত হয়েছে। এই বোধকে সাধারণের মধ্যে উজ্জ্বল করে তোলবার জন্যে বহুতর অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা হচ্ছে। বিদ্যালয়ে নাট্যশালায় গানে কাব্যে উপন্যাসে ভূগোলে ইতিহাসে সর্বত্রই এই সাধনা ফুটে উঠেছে।

সাম্রাজ্যিকতা-বোধকে য়ুরোপ যেমন পরম মঙ্গল বলে মনে করছে এবং সে জন্যে বিচিত্রভাবে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে—বিশ্ববোধকেই ভারতবর্ষ মানবাত্মার পক্ষে তেমনি চরম পদার্থ বলে জ্ঞান করেছিল এবং এইটিকে উদ্বোধিত করবার জন্যে নানা দিকেই তার চেষ্টাকে চালনা করেছে। শিক্ষায় দীক্ষায় আহারে বিহারে সকল দিকেই সে তার এই অভিপ্রায় বিস্তার করেছে। এই হচ্ছে সাত্ত্বিকতার অর্থাৎ চৈতন্যময়তার সাধনা। তুচ্ছ বৃহৎ সকল ব্যাপারেই প্রবৃত্তিকে খর্ব করে সংযমের দ্বারা চৈতন্যকে নির্মল উজ্জ্বল করে তোলার সাধনা। কেবল জীবের প্রতি অহিংসামাত্র নয়, নানা উপলক্ষ্যে পশুপক্ষী, এমন কি, গাছপালার প্রতিও সেবাধর্মের চর্চা করা—অন্নজল নদী পর্বতের প্রতিও হৃদয়ের একটি সম্বন্ধ-সূত্র প্রসারিত করা; ধর্মের যোগ যে সকলের সঙ্গেই এই সত্যটিকে নানা ধ্যানের দ্বারা, স্মরণের দ্বারা, কর্মের দ্বারা মনের মধ্যে বদ্ধমূল করে দেওয়া। বিশ্ববোধ ব্যাপারটি যত বড়ো তার চৈতন্যও তত বড়ো হওয়া চাই, এই জন্যই গৃহীর ভোগে এবং যোগীর ত্যাগে সর্বত্রই এমনতরো সাত্ত্বিক সাধনা।

ভারতবর্ষের কাছে অনন্ত সকল ব্যবহারের অতীত শূন্য পদার্থ নয়, কেবল তত্ত্বকথা নয়, অনন্ত তার কাছে করতলন্যস্ত আমলকের মতো স্পষ্ট বলেই তো জলে স্থলে আকাশে অন্নে পানে বাক্যে মনে সর্বত্র সর্বদাই এই অনন্তকে সর্বসাধারণের প্রত্যক্ষ

বোধের মধ্যে সুপরিস্ফুট করে তোলবার জন্যে ভারতবর্ষ এত বিচিত্র ব্যবস্থা করেছে এবং এই জন্যেই ভারতবর্ষ ঐশ্বর্য বা স্বদেশ বা স্বাজাতিকতার মধ্যেই মানুষের বোধ-শক্তিকে আবদ্ধ করে তাকেই একান্ত ও অত্যুগ্র করে তোলবার দিকে লক্ষ্য করে নি।

এই যে বাধাহীন চৈতন্যময় বিশ্ববোধটি ভারতবর্ষে অত্যন্ত সত্য হয়ে উঠেছিল এই কথাটি আজ আমরা যেন সম্পূর্ণ গৌরবের সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করি। এই কথাটি স্মরণ করে আমাদের বক্ষ যেন প্রশস্ত হয়, আমাদের চিত্ত যেন আশান্বিত হয়ে ওঠে। যে-বোধ সকলের চেয়ে বড়ো সেই বিশ্ববোধ, যে-লাভ সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সেই ব্রহ্মলাভ কাল্পনিকতা নয়, তারই সাধনা প্রচার করবার জন্যে এদেশে মহাপুরুষেরা জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ব্রহ্মকেই সমস্তের মধ্যে উপলব্ধি করাটাকে তাঁরা এমন একটি অত্যন্ত নিশ্চিত পদার্থ বলে জেনেছেন যে জোরের সঙ্গে এই কথা বলেছেন—

ইহ চেৎ অবেদীৎ অথ সত্যমস্তি,
ন চেৎ ইহ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ,
ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাৎ অমৃতা ভবন্তি।

এঁকে যদি জানা গেল তবেই সত্য হওয়া গেল—এঁকে যদি না জানা গেল তবেই মহাবিনাশ; ভূতে ভূতে সকলের মধ্যেই তাঁকে চিন্তা করে ধীরেরা অমৃতত্ব লাভ করেন।

ভারতবর্ষের এই মহৎ সাধনার উত্তরাধিকার যা আমরা লাভ করেছি তাকে আমরা অন্য দেশের শিক্ষা ও দৃষ্টান্তে ছোটো করে মিথ্যা করে তুলতে পারব না। এই মহৎ সত্যটিকেই নানাদিক দিয়ে উজ্জ্বল করে তোলবার ভার আমাদের দেশের উপরেই আছে। আমাদের দেশের এই তপস্যাটিকেই বড়ো রকম করে সার্থক করবার দিন আজ আমাদের এসেছে। জিগীষা নয়, জিঘাংসা নয়, প্রভুত্ব নয়, প্রবলতা নয়, বর্ণের সঙ্গে বর্ণের, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের, সমাজের সঙ্গে সমাজের, স্বদেশের সঙ্গে বিদেশের ভেদ বিরোধ বিচ্ছেদ নয়; ছোটো বড়ো আত্মপর সকলের মধ্যেই উদারভাবে প্রবেশের যে সাধনা, সেই সাধনাকেই আমরা আনন্দের সঙ্গে বরণ করব। আজ আমাদের দেশে কত ভিন্ন জাতি, কত ভিন্ন ধর্ম, কত ভিন্ন সম্প্রদায় তা কে গণনা করবে? এখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের কথায় কথায় পদে পদে যে ভেদ, এবং আহারে বিহারে সর্ব বিষয়েই মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহারে যে নিষ্ঠুর অবজ্ঞা ও ঘৃণা প্রকাশ পায় জগতের অন্য কোথাও তার আর তুলনা পাওয়া যায় না। এতে করে আমরা হারাচ্ছি তাঁকে যিনি সকলকে নিয়েই এক হয়ে আছেন; যিনি তাঁর প্রকাশকে বিচিত্র করেছেন

কিন্তু বিরুদ্ধ করেন নি। তাঁকে হারানো মানেই হচ্ছে মঙ্গলকে হারানো, শক্তিকে হারানো, সামঞ্জস্যকে হারানো এবং সত্যকে হারানো। তাই আজ আমাদের মধ্যে দুর্গতির সীমা পরিসীমা নেই, যা ভালো তা কেবলই বাধা পায়, পদেপদেই খণ্ডিত হতে থাকে, তার ক্রিয়া সর্বত্র ছড়াতে পায় না। সদনুষ্ঠান একজন মানুষের আশ্রয়ে মাথা তোলে এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হয়, কালে কালে পুরুষে পুরুষে তার অনুবৃত্তি থাকে না। দেশে যেটুকু কল্যাণের উদ্ভব হয় তা কেবলই পদ্মপত্রে শিশির বিন্দুর মতো টলমল করতে থাকে। তার কারণ আর কিছুই নয় আমরা খাওয়া শোওয়া ওঠা বসায় যে সাত্ত্বিকতার সাধনা বিস্তার করেছিলুম তাই আজ লক্ষ্যহীন প্রাণহীন হয়ে বিকৃত হয়ে উঠেছে। তার যা উদ্দেশ্য ছিল ঠিক তারই বিপরীত কাজ করছে। যে-বিশ্ববোধকে সে অবারিত করবে তাকেই সে সকলের চেয়ে আবরিত করছে। দুই পা অন্তর এক-একটি প্রভেদকে সে সৃষ্টি করে তুলছে এবং মানব-ঘৃণার কাঁটাগাছ দিয়ে অতি নিবিড় করে তার বেড়া নির্মাণ করছে। এমনি করেই ভূমাকে আমরা হারালুম, মনুষ্যত্বকে তার বৃহৎক্ষেত্রে দাঁড় করাতে আর পারলুম না, নিরর্থক কতকগুলি আচার মেনে চলাই আমাদের কর্ম হয়ে দাঁড়াল শক্তিকে বিচিত্র পথে উদারভাবে প্রসারিত করা হল না, চিত্তের গতিবিধির পথ সংকীর্ণ হয়ে এল, আমাদের আশা ছোটো হয়ে গেল, ভরসা রইল না, পরস্পরের পাশে এসে দাঁড়াবার কোনো টান নেই, কেবলই তফাতে তফাতে সরে যাবার দিকেই তাড়না, কেবলই টুকরো টুকরো করে দেওয়া, কেবলই ভেঙে ভেঙে পড়া—শ্রদ্ধা নেই, সাধনা নেই, শক্তি নেই, আনন্দ নেই; যে-মাছ সমুদ্রের সে যদি অন্ধকার গুহার ক্ষুদ্র বদ্ধ জলের মধ্যে গিয়ে পড়ে তবে সে যেমন ক্রমে অন্ধ হয়ে ক্ষীণ হয়ে আসে, তেমনি আমাদের যে আত্মার স্বাভাবিক বিহারক্ষেত্র হচ্ছে বিশ্ব, আনন্দলোক হচ্ছেন ভূমা, তাকে এই সমস্ত শত-খণ্ডিত খাওয়া-ছোঁওয়ার ছোটো ছোটো গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে প্রতিদিন তার বুদ্ধিকে অন্ধ, হৃদয়কে বন্দী এবং শক্তিকে পঙ্গু করে ফেলা হচ্ছে। নিতান্ত প্রত্যক্ষ এই মহতী বিনষ্টি হতে কে আমাদের বাঁচাবে? আমাদের সত্য করে তুলবে কিসে? এর যে যথার্থ উত্তর সে আমাদের দেশেই আছে। ইহ চেৎ অবেদীৎ অথ সত্যমস্তি, নচেৎ ইহ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ। ইহাকে যদি জানা গেল তবেই সত্য হওয়া গেল, ইহাকে যদি না জানা গেল তবেই মহাবিনাশ। এঁকে কেমন করে জানতে হবে? না, ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য—প্রত্যেকের মধ্যে সকলেরই মধ্যে তাঁকে চিন্তা করে তাঁকে দর্শন করে। গৃহেই বল, সমাজেই বল, রাষ্ট্রেই বল, যে-পরিমাণে সকলের মধ্যে আমরা সেই সর্বানুভূকে উপলব্ধি করি সেই পরিমাণেই সত্য হই; যে-পরিমাণে না করি সেই

পরিমাণেই আমাদের বিনাশ। এইজন্য সকল দেশেই সর্বত্রই মানুষ জেনে এবং না জেনে এই সাধনাই করছে, সে বিশ্বানুভূতির মধ্যেই আত্মার সত্য উপলব্ধি খুঁজছে, সকলের মধ্যে দিয়ে সেই এককেই সে চাচ্ছে, কেননা সেই একই অমৃত, সেই একের থেকে বিচ্ছিন্নতাই মৃত্যু।

কিন্তু আমার মনে কোনো নৈরাশ্য নেই। আমি জানি অভাব যেখানে অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে মূর্তি ধারণ করে সেখানেই তার প্রতিকারের শক্তি সম্পূর্ণ বেগে প্রবল হয়ে ওঠে। আজ যে-সকল দেশ স্বজাতি স্বরাজ্য সাম্রাজ্য প্রভৃতি নিয়ে অত্যন্ত ব্যাপৃত হয়ে আছে তারাও বিশ্বের ভিতর দিয়ে সেই পরম একের সন্ধানে সজ্ঞানে প্রবৃত্ত নেই, তারাও সেই একের বোধকে এক জায়গায় এসে আঘাত করছে কিন্তু তবু তারা বৃহতের অভিমুখে আছে—একটা বিশেষ সীমার মধ্যে ঐক্যবোধকে তারা প্রশস্ত করে নিয়েছে। সেইজন্যে জ্ঞানে ভাবে কর্মে এখনও তারা ব্যাপ্ত হচ্ছে, তাদের শক্তি এখনও কোথাও তেমন করে অভিহত হয় নি। তারা চলেছে তারা বদ্ধ হয় নি। কিন্তু সেই জন্যেই তাদের পক্ষে সুস্পষ্ট করে বোঝা শক্ত পরম পাওয়াটি কী? তারা মনে করছে তারা যা নিয়ে আছে তাই বুঝি চরম, এর পরে বুঝি আর কিছু নেই, যদি থাকে মানুষের তাতে প্রয়োজন নেই। তারা মনে করে মানুষের যা কিছু প্রয়োজন তা বুঝি ভোট দেবার অধিকারের উপর নির্ভর করছে, আজকালকার দিনে উন্নতি বলতে লোকে যা বোঝে তাই বুঝি মানুষের চরম অবলম্বন।

কিন্তু বিধাতা এই ভারতবর্ষেই সমস্যাকে সব চেয়ে ঘনীভূত করে তুলেছেন, সেই জন্যে আমাদেরই এই সমস্যার আসল উত্তরটি দিতে হবে, এবং এর উত্তর আমাদের দেশের বাণীতে যেমন অত্যন্ত স্পষ্ট করে ব্যক্ত হয়েছে এমন আর কোথাও হয় নি।

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি,
সর্বভূতেষু চাত্মানং ন ততো বিজুগুপ্সতে।

যিনি সমস্ত ভূতকে পরমাত্মার মধ্যেই দেখেন এবং পরমাত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি আর কাউকেই ঘৃণা করেন না।

সর্বব্যাপী স ভগবান তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ। সেই ভগবান সর্বব্যাপী এইজন্যে তিনিই হচ্ছেন সর্বগত মঙ্গল। বিভাগের দ্বারা, বিরোধের দ্বারা যতই তাঁকে খণ্ডিত করে জানব ততই সেই সর্বগত মঙ্গলকে বাধা দেব।

একদিন ভারতবর্ষের বাণীতে মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো সমস্যার যে উত্তর দেওয়া হয়েছে, আজ ইতিহাসের মধ্যে আমাদের সেই উত্তরটি দিতে হবে। আজ

আমাদের দেশে নানা জাতি এসেছে, বিপরীত দিক থেকে নানা বিরুদ্ধ শক্তি এসে পড়েছে, মতের অনৈক্য, আচারের পার্থক্য, স্বার্থের সংঘাত ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে ভারতবর্ষের বাণীকে আজই সত্য করে তোলবার সময় এসেছে। যতক্ষণ তা না করব ততক্ষণ বারবার কেবলই আঘাত পেতে থাকব,—কেবলই অপমান কেবলই ব্যর্থতা ঘটতে থাকবে, বিধাতা একদিনের জন্যেও আমাদের আরামে বিশ্রাম করতে দেবেন না।

আমরা মানুষের সমস্ত বিচ্ছিন্নতা মিটিয়ে দিয়ে তাকে যে এক করে জানবার সাধনা করব তার কারণ এ নয় যে, সেই উপায়ে আমরা প্রবল হব, আমাদের বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়বে, আমাদের স্বজাতি সকল জাতির চেয়ে বড়ো হয়ে উঠবে কিন্তু তার একটি মাত্র কারণ এই যে, সকল মানুষের ভিতর দিয়ে আমাদের আত্মা সেই ভূমার মধ্যে সত্য হয়ে উঠবে যিনি "সর্বগতঃ শিবঃ," যিনি "সর্বভূতগুহাশয়ঃ" যিনি "সর্বানুভূঃ"। তাঁকেই চাই, তিনিই আরম্ভে, তিনিই শেষে। যদি বল এমন করে দেখলে আমাদের উন্নতি হবে না তাহলে আমি বলব আমাদের বিনতিই ভাল। যদি বল এই সাধনায় আমাদের স্বজাতীয়তা দৃঢ় হয়ে উঠবে না, তাহলে আমি বলব স্বজাতি-অভিমানের অতি নিষ্ঠুর মোহ কাটিয়ে ওঠাই যে মানুষের পক্ষে শ্রেয় এই শিক্ষা দেবার জন্যেই ভারতবর্ষ চিরদিন প্রস্তুত হয়েছে। ভারতবর্ষ এই কথাই বলেছে যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্—সমস্ত উদ্ধত সভ্যতার সভাদ্বারে দাঁড়িয়ে আবার একবার ভারতবর্ষকে বলতে হবে, যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্। প্রবলরা দুর্বল বলে অবজ্ঞা করবে, ধনীরা তাকে দরিদ্র বলে উপহাস করবে কিন্তু তবু তাকে এই কথা বলতে হবে, যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্। এই কথা বলবার শক্তি আমাদের কণ্ঠে তিনিই দিন, য একঃ, যিনি এক; অবর্ণঃ, যাঁর বর্ণ নেই; বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ, যিনি সমস্তের আরম্ভে এবং সমস্তের শেষে—সনোবুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু, তিনি আমাদের শুভবুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত করুন, শুভবুদ্ধির দ্বারা দূর নিকট আত্মপর সকলের সঙ্গে যুক্ত করুন।

হে সর্বানুভূ, তোমার যে অমৃতময় অনন্ত অনুভূতির দ্বারা বিশ্বচরাচরের যা কিছু সমস্তকেই তুমি নিবিড় করে বেষ্টন করে ধরেছ, সেই তোমার অনুভূতিকে এই ভারতবর্ষের উজ্জ্বল আকাশের তলে দাঁড়িয়ে একদিন এখানকার ঋষি তাঁর নিজের নির্মল চেতনার মধ্যে যে কী আশ্চর্য গভীররূপে উপলব্ধি করেছেন তা মনে করলে আমার হৃদয় পুলকিত হয়। মনে হয় যেন তাঁদের সেই উপলব্ধি এদেশের এই বাধাহীন নীলাকাশে এই কুহেলিকাহীন উদার আলোকে আজও সঞ্চারিত হচ্ছে। মনে হয় যেন

এই আকাশের মধ্যে আজও হৃদয়কে উদ্‌ঘাটিত করে নিস্তব্ধ করে ধরলে তাঁদের সেই বৈদ্যুতময় চেতনার অভিঘাত আমাদের চিত্তকে বিশ্বস্পন্দনের সমান ছন্দে তরঙ্গিত করে তুলবে। কী আশ্চর্য পরিপূর্ণতার মূর্তিতে তুমি তাঁদের কাছে দেখা দিয়েছিলে—এমন পূর্ণতা যে কিছুতে তাঁদের লোভ ছিল না। যতই তাঁরা ত্যাগ করেছেন ততই তুমি পূর্ণ করেছ এইজন্যে ত্যাগকেই তাঁরা ভোগ বলেছেন। তাঁদের দৃষ্টি এমন চৈতন্যময় হয়ে উঠেছিল যে, লেশমাত্র শূন্যকে কোথাও তাঁরা দেখতে পান নি, মৃত্যুকেও বিচ্ছেদরূপে তাঁরা স্বীকার করেন নি। এইজন্যে অমৃতকে যেমন তাঁরা তোমার ছায়া বলেছেন তেমনি মৃত্যুকেও তাঁরা তোমার ছায়া বলেছেন, যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ। এইজন্যে তাঁরা বলেছেন, প্রাণো মৃত্যুঃ প্রাণ স্তক্মা—প্রাণই মৃত্যু, প্রাণই বেদনা। এইজন্যেই তাঁরা ভক্তির সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে বলেছেন—নমস্তে অস্ত আয়তে, নমো অস্ত পরায়তে—যে প্রাণ আসছ তোমাকে নমস্কার, যে প্রাণ চলে যাচ্ছ তোমাকে নমস্কার। প্রাণে হ ভূতং ভব্যং চ—যা চলে গেছে তা প্রাণেই আছে, যা ভবিষ্যতে আসবে তাও প্রাণের মধ্যেই রয়েছে। তাঁরা অতি সহজেই এই কথাটি বুঝেছিলেন যে, যোগের বিচ্ছেদ কোনোখানেই নেই। প্রাণের যোগ যদি জগতের কোনো এক জায়গাতেও বিচ্ছিন্ন হয় তাহলে জগতে কোথাও একটি প্রাণীও বাঁচতে পারে না। সেই বিরাট প্রাণ-সমুদ্রই তুমি। যদিদং কিঞ্চ প্রাণ এজতি নিঃসৃতং—এই যা কিছু সমস্তই সেই প্রাণ হতে নিঃসৃত হচ্ছে এবং প্রাণের মধ্যেই কম্পিত হচ্ছে। নিজের প্রাণকে তাঁরা অনন্তের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি সেই জন্যেই প্রাণকে তাঁরা সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত দেখে বলেছেন প্রাণো বিরাট্। সেই প্রাণকেই তাঁরা সূর্যচন্দ্রের মধ্যে অনুসরণ করে বলেছেন, প্রাণো হ সূর্যশ্চন্দ্রমা। নমস্তে প্রাণ ক্রন্দায়, নমস্তে স্তনয়িত্নবে—যে প্রাণ ক্রন্দন করছ সেই তোমাকে নমস্কার, যে প্রাণ গর্জন করছ সেই তোমাকে নমস্কার। নমস্তে প্রাণ বিদ্যুতে, নমস্তে প্রাণ বর্ষতে—যে প্রাণ বিদ্যুতে জ্বলে উঠছ সেই তোমাকে নমস্কার, যে প্রাণ বর্ষণে গলে পড়ছ সেই তোমাকে নমস্কার। প্রাণ, প্রাণ, প্রাণ, সমস্ত প্রাণময়—কোথাও তার রন্ধ্র নেই, অন্ত নেই। এমনতরো অখণ্ড অনবচ্ছিন্ন উপলব্ধির মধ্যে তোমার যে সাধকেরা একদিন বাস করেছেন তাঁরা এই ভারতবর্ষেই বিচরণ করেছেন। তাঁরা এই আকাশের দিকেই চোখ তুলে একদিন এমন নিঃসংশয় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলে উঠেছিলেন, কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ—কেই বা শরীর-চেষ্টা করত কেই বা জীবনধারণ করত যদি এই আকাশে আনন্দ না থাকতেন। যাঁরা নিজের বোধের মধ্যে সমস্ত আকাশকেই আনন্দময় বলে জেনেছিলেন তাঁদের পদধূলি এই ভারতবর্ষের মাটির

মধ্যে রয়েছে। সেই পবিত্র ধূলিকে মাথায় নিয়ে, হে সর্বব্যাপী পরমানন্দ, তোমাকে সর্বত্র স্বীকার করবার শক্তি আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হ'ক। যাক সমস্ত বাধাবন্ধ ভেঙে যাক। দেশের মধ্যে এই আনন্দবোধের বন্যা এসে পড়ুক। সেই আনন্দের বেগে মানুষের সমস্ত ঘরগড়া ব্যবধান চূর্ণ হয়ে যাক, শত্রু মিত্র মিলে যাক, স্বদেশ বিদেশ এক হ'ক। হে আনন্দময় আমরা দীন নই, দরিদ্র নই। তোমার অমৃতময় অনুভূতি দ্বারা আমরা আকাশে এবং আত্মায়, অন্তরে বাহিরে পরিবেষ্টিত এই অনুভূতি আমাদের দিনে দিনে জাগ্রত হয়ে উঠুক। তাহলেই আমাদের ত্যাগই ভোগ হবে, অভাবও ঐশ্বর্যময় হবে, দিন পূর্ণ হবে, রাত পূর্ণ হবে, নিকট পূর্ণ হবে, দূর পূর্ণ হবে, পৃথিবীর ধূলি পূর্ণ হবে, আকাশের নক্ষত্রলোক পূর্ণ হবে। যাঁরা তোমাকে নিখিল আকাশে পরিপূর্ণভাবে দেখেছেন তাঁরা তো কেবল তোমাকে জ্ঞানময় বলে দেখেন নি। কোন প্রেমের সুগন্ধ বসন্তবাতাসে তাঁদের হৃদয়ের মধ্যে এই বার্তা সঞ্চারিত করেছে যে, তোমার যে বিশ্বব্যাপী অনুভূতি তা রসময় অনুভূতি। বলেছেন রসো বৈ সঃ—সেই জন্যেই জগৎ জুড়ে এত রূপ, এত রং, এত গন্ধ, এত গান, এত সখ্য, এত স্নেহ, এত প্রেম। এতস্যৈবানন্দস্যান্যানিভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি—তোমার এই অখণ্ড পরমানন্দ রসকেই আমরা সমস্ত জীবজন্তু দিকে দিকে মুহূর্তে মুহূর্তে মাত্রায় মাত্রায় কণায় কণায় পাচ্ছি—দিনে রাত্রে, ঋতুতে ঋতুতে, অন্নে জলে, ফুলে ফলে, দেহে মনে, অন্তরে বাহিরে বিচিত্র করে ভোগ করছি। হে অনির্বচনীয় অনন্ত, তোমাকে রসময় বলে দেখলে সমস্ত চিত্ত একেবারে সকলের নিচে নত হয়ে পড়ে। বলে, দাও দাও, আমাকে তোমার ধুলার মধ্যে তৃণের মধ্যে ছড়িয়ে দাও। দাও আমাকে রিক্ত করে কাঙাল করে, তার পরে দাও আমাকে রসে ভরে দাও। চাই না ধন, চাই না মান, চাই না কারও চেয়ে কিছুমাত্র বড়ো হতে। তোমার যে রস হাটবাজারে কেনবার নয়, রাজভাণ্ডারে কুলুপ দিয়ে রাখবার নয়, যা আপনার অন্তহীন প্রাচুর্যে আপনাকে আর ধরে রাখতে পারছে না, চারিদিকে ছড়াছড়ি যাচ্ছে, তোমার যে-রসে মাটির উপর ঘাস সবুজ হয়ে আছে, বনের মধ্যে ফুল সুন্দর হয়ে আছে, যে-রসে সকল দুঃখ, সকল বিরোধ, সকল কাড়াকাড়ির মধ্যেও আজও মানুষের ঘরে ঘরে ভালোবাসার অজস্র অমৃতধারা কিছুতেই শুকিয়ে যাচ্ছে না ফুরিয়ে যাচ্ছে না—মুহূর্তে মুহূর্তে নবীন হয়ে উঠে পিতায় মাতায়, স্বামী-স্ত্রীতে, পুত্রে কন্যায়, বন্ধুবান্ধবে নানাদিকে নানা শাখায় বয়ে যাচ্ছে, সেই তোমার নিখিল রসের নিবিড় সমষ্টিরূপ যে-অমৃত তারই একটু কণা আমার হৃদয়ের মাঝখানটিতে একবার ছুঁইয়ে দাও। তার পর থেকে আমি দিনরাত্রি তোমার সবুজ ঘাসপাতার সঙ্গে আমার প্রাণকে সরস করে

মিলিয়ে দিয়ে তোমার পায়ের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে থাকি। যারা তোমারই সেই তোমার-সকলের মাঝখানেই গরিব হয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে খুশি হয়ে যে-জায়গাটিতে কারও লোভ নেই সেইখানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তোমার প্রেমমুখশ্রীর চিরপ্রসন্ন আলোকে পরিপূর্ণ হয়ে থাকি। হে প্রভু, কবে তুমি আমাকে সম্পূর্ণ করে সত্য করে জানিয়ে দেবে যে, রিক্ততার প্রার্থনাই তোমার কাছে চরম প্রার্থনা। আমার সমস্তই নাও, সমস্তই ঘুচিয়ে দাও, তাহলেই তোমার সমস্তই পাব, মানবজীবনে সকলের এই শেষ কথাটি ততক্ষণ বলবার সাহস হবে না যতক্ষণ অন্তরের ভিতর থেকে বলতে না পারব, রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি—তিনিই রস, যা কিছু আনন্দ সে এই রসকে পেয়েই।

গ্রন্থ-পরিচয়

[রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশের তারিখ ও গ্রন্থসংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য গ্রন্থপরিচয়ে সংকলিত হইল। এই খণ্ডে মুদ্রিত কোনো কোনো রচনা সম্বন্ধে কবির নিজের মন্তব্যও মুদ্রিত হইল। পূর্ণতর তথ্যসংগ্রহ সর্বশেষ খণ্ডে একটি পঞ্জীতে প্রকাশিত হইবে।]

পূরবী

পূরবী ১৩৩২ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থখানি দুই অংশে বিভক্ত, 'পূরবী' ও 'পথিক'[১]। ১৩২৪-১৩৩০ সালে রচিত কবিতা 'পূরবী' অংশে ও ১৩৩১ সালে য়ুরোপ ও দক্ষিণ-আমেরিকা ভ্রমণকালে লিখিত কবিতা 'পথিক' অংশে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পথিক অংশের অনেক কবিতার ইতিহাস 'যাত্রী' গ্রন্থের 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি' অংশে সন্নিবদ্ধ আছে।

পথিক অংশের প্রথম কবিতা 'সাবিত্রী' (২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৪) প্রসঙ্গে 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি'র এই অংশগুলি দ্রষ্টব্য :

হারুনা-মারু জাহাজ
২৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৪

সকাল আটটা। আকাশে ঘন মেঘ, দিগন্ত বৃষ্টিতে ঝাপসা, বাদলার হাওয়া খুঁতখুঁতে ছেলের মতো কিছুতেই শান্ত হতে চাচ্ছে না। বন্দরের শান-বাঁধানো বাঁধের ওপারে দুরন্ত সমুদ্র লাফিয়ে লাফিয়ে গর্জে উঠছে, কাকে যেন ঝুঁটি ধরে পেড়ে ফেলতে চায়, নাগাল পায় না।...

২৫ সেপ্টেম্বর

কাল সমস্তদিন জাহাজ মাল বোঝাই করছিল। রাত্রে যখন ছাড়ল তখন বাতাসের আক্ষেপ কিছু শান্ত কিন্তু তখনো মেঘগুলো দল পাকিয়ে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে। আজ সকালে একখানা ভিজে অন্ধকারে আকাশ ঢাকা। এবার আলোকের অভিনন্দন পেলুম না।...

১ পূরবীর প্রথম মুদ্রণে তৃতীয় একটি অংশ ছিল "সঞ্চিতা"—পুরাতন যে-সব কবিতা অন্য কোনো বইতে গ্রথিত হয় নাই সেগুলি এই বিভাগে মুদ্রিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে এই বিভাগটি পরিত্যক্ত হয়, রচনাবলীতেও বর্জিত হইল। এই বিভাগে মুদ্রিত কয়েকটি কবিতা রবীন্দ্র-রচনাবলীর দশম খণ্ডের সংযোজনে মুদ্রিত হইয়াছে।

২৩ সেপ্টেম্বর

আজ ক্ষণে ক্ষণে রৌদ্র উঁকি মারছে, কিন্তু সে যেন তার গারদের গরাদের ভিতর থেকে। তার সংকোচ এখনো ঘুচল না। বাদল-রাজের কালো-উর্দিপরা মেঘগুলো দিকে দিকে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।

আচ্ছন্ন সূর্যের আলোয় আমার চৈতন্যের স্রোতস্বিনীতে যেন ভাঁটা পড়ে গেছে। জোয়ার আসবে রৌদ্রের সঙ্গে।

পশ্চিমে, বিশেষত আমেরিকায়, দেখেছি বাপমায়ের সঙ্গে অধিকাংশ বয়স্ক ছেলে-মেয়ের নাড়ীর টান ঘুচে গেছে। আমাদের দেশে শেষ পর্যন্তই সেটা থাকে। তেমনিই দেখেছি সূর্যের সঙ্গে মানুষের প্রাণের যোগ সেদেশে তেমন যেন অন্তরঙ্গভাবে অনুভব করে না। সেই বিরলরৌদ্রের দেশে তারা ঘরে সূর্যের আলো ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে যখন পর্দা কখনো বা অর্ধেক কখনো বা সম্পূর্ণ নামিয়ে দেয়, তখন সেটাকে আমি ঔদ্ধত্য বলে মনে করি।

প্রাণের যোগ নয় তো কী। সূর্যের আলোর ধারা তো আমাদের নাড়ীতে নাড়ীতে বইছে। আমাদের প্রাণমন আমাদের রূপরস সবই তো উৎসরূপে রয়েছে ওই মহা জ্যোতিষ্কের মধ্যে। সৌরজগতের সমস্ত ভাবীকাল একদিন তো পরিকীর্ণ হয়ে ছিল ওরই বহ্নিবাষ্পের মধ্যে। আমার দেহের কোষে কোষে ওই তেজই তো শরীরী, আমার ভাবনার তরঙ্গে তরঙ্গে ওই আলোই তো প্রবহমান। বাহিরে ওই আলোরই বর্ণচ্ছটায় মেঘে মেঘে পত্রে পুষ্পে পৃথিবীর রূপ বিচিত্র, অন্তরে ওই তেজই মানসভাব ধারণ ক'রে আমাদের চিন্তায় ভাবনায় বেদনায় রাগে অনুরাগে রঞ্জিত। সেই এক জ্যোতিরই এত রং এত রূপ এত ভাব এত রস। ওই যে-জ্যোতি আঙুরের গুচ্ছে গুচ্ছে এক-এক চুমুক মদ হয়ে সঞ্চিত, সেই জ্যোতিই তো আমার গানে গানে সুর হয়ে পুঞ্জিত হল। এখনি আমার চিত্ত হতে এই যে চিন্তা ভাষার ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে সে কি সেই জ্যোতিরই একটি চঞ্চল চিন্ময়স্বরূপ নয়, যে-জ্যোতি বনস্পতির শাখায় শাখায় স্তব্ধ ওংকার-ধ্বনির মতো সংহত হয়ে আছে?

হে সূর্য, তোমারই তেজের উৎসের কাছে পৃথিবীর অন্তর্গূঢ় প্রার্থনা ঘাস হয়ে গাছ হয়ে আকাশে উঠছে, বলছে, জয় হোক। বলছে, অপাবৃণু, ঢাকা খুলে দাও। এই ঢাকা খোলাই তার প্রাণের লীলা, এই ঢাকা খোলাই তার ফুলফলের বিকাশ। অপাবৃণু, এই প্রার্থনারই নির্ঝরধারা আদিম জীবাণু থেকে যাত্রা করে আজ মানুষের মধ্যে এসে উপস্থিত, প্রাণের ঘাট পেরিয়ে চিত্তের ঘাটে পাড়ি দিয়ে চলল। আমি তোমার দিকে বাহু তুলে বলছি, হে পূষণ, হে পরিপূর্ণ, অপাবৃণু, তোমার হিরণ্ময় পাত্রের আবরণ

খোলো, আমার মধ্যে যে গুহাহিত সত্য তোমার মধ্যে তার অবারিত জ্যোতিঃস্বরূপ দেখে নিই। আমার পরিচয় আলোকে আলোকে উদ্‌ঘাটিত হোক।

২৬ সেপ্টেম্বর

কাল অপরাহ্ণে আচ্ছন্ন সূর্যের উদ্দেশে একটা কবিতা শুরু করেছি, আজ সকালে শেষ হল।

ঘন অশ্রুবাষ্পে ঘেরা মেঘের দুর্যোগে খড়্‌গ হানি
ফেলো, ফেলো টুটি।…

"লিপি" (৪ অক্টোবর ১৯২৪) কবিতা-প্রসঙ্গে 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'র এই অংশ পঠনীয় :

৩ অক্টোবর, ১৯২৪
হারুনা-মারু জাহাজ

এখনো সূর্য ওঠে নি। আলোকের অবতরণিকা পূর্ব-আকাশে। জল স্থির হয়ে আছে সিংহবাহিনীর পায়ের তলাকার সিংহের মতো। সূর্যোদয়ের এই আগমনীর মধ্যে মজে গিয়ে আমার মুখে হঠাৎ ছন্দে-গাঁথা এই কথাটা আপনিই ভেসে উঠল :

হে ধরণী, কেন প্রতিদিন
তৃপ্তিহীন
একই লিপি পড় বারে বারে ?

বুঝতে পারলুম, আমার কোনো একটি আগন্তুক কবিতা মনের মধ্যে এসে পৌঁছবার আগেই তার ধুয়োটা এসে পৌঁছেছে। এইরকমের ধুয়ো অনেক সময়ে উড়ো বীজের মতো মনে এসে পড়ে, কিন্তু সব সময়ে তাকে এমন স্পষ্ট করে দেখতে পাওয়া যায় না।

সমুদ্রের দূরতীরে যে-ধরণী আপনার নানা-রঙা আঁচলখানি বিছিয়ে দিয়ে পুবের দিকে মুখ করে একলা বসে আছে, ছবির মতো দেখতে পেলুম তার কোলের উপর একখানি চিঠি পড়ল খসে কোন্ উপরের থেকে। সেই চিঠিখানি বুকের কাছে তুলে ধরে সে একমনে পড়তে বসে গেল; তাল-তমালের নিবিড় বনচ্ছায়া পিছনে রইল এলিয়ে, নুয়ে-পড়া মাথার থেকে ছড়িয়ে পড়া এলোচুল।

আমার কবিতার ধুয়ো বলছে, প্রতিদিন সেই একই চিঠি, সেই একখানির বেশি আর দরকার নেই; সে-ই ওর যথেষ্ট। সে এত বড়ো, তাই সে এত সরল। সেই এক-খানিতেই সব-আকাশ এমন সহজে ভরে গেছে।

ধরণী পাঠ করছে কত যুগ থেকে। সেই পাঠ-করাটা আমি মনে মনে চেয়ে দেখছি। সুরলোকের বাণী পৃথিবীর বুকের ভিতর দিয়ে কণ্ঠের ভিতর দিয়ে রূপে রূপে বিচিত্র হয়ে উঠল। বনে বনে হল গাছ, ফুলে ফুলে হল গন্ধ, প্রাণে প্রাণে হল নিঃশ্বসিত, একটি চিঠির সেই একটিমাত্র কথা,—সেই আলো, সেই সুন্দর, সেই ভীষণ; সেই হাসির ঝিলিকে ঝিকিমিকি, সেই কান্নার কাঁপনে ছলছল।

এই চিঠি-পড়াটাই সৃষ্টির স্রোত,—যে দিচ্ছে আর যে পাচ্ছে, সেই দুজনের কথা এতে মিলেছে, সেই মিলনেই রূপের ঢেউ। সেই মিলনের জায়গাটা হচ্ছে বিচ্ছেদ। কেননা দূর-নিকটের ভেদ না ঘটলে স্রোত বয় না, চিঠি চলে না। সৃষ্টি-উৎসের মুখে কী একটা কাণ্ড আছে, সে এক ধারাকে দুই ধারায় ভাগ করে। বীজ ছিল নিতান্ত এক, তাকে দ্বিধা করে দিয়ে দুখানি কচি পাতা বেরল, তখনি সেই বীজ পেল তার বাণী; নইলে সে বোবা, নইলে সে কৃপণ, আপন ঐশ্বর্য আপনি ভোগ করতে জানে না। বীজ ছিল একা, বিদীর্ণ হয়ে স্ত্রী-পুরুষে সে দুই হয়ে গেল। তখনি তার সেই বিভাগের ফাঁকের মধ্যে বসল তার ডাক-বিভাগ। ডাকের পর ডাক, তার অন্ত নেই। বিচ্ছেদের এই ফাঁক একটা বড়ো সম্পদ, এ নইলে সব চুপ সব বন্ধ। এই ফাঁকটার বুকের ভিতর দিয়ে একটা অপেক্ষার ব্যথা একটা আকাঙ্ক্ষার টান টনটন করে উঠল, দিতে-চাওয়ার আর পেতে-চাওয়ার উত্তর-প্রত্যুত্তর এপারে-ওপারে চালাচালি হতে লাগল। এতেই দুলে উঠল সৃষ্টিতরঙ্গ, বিচলিত হল ঋতুপর্যায়; কখনো বা গ্রীষ্মের তপস্যা, কখনো বর্ষার প্লাবন, কখনো বা শীতের সংকোচ, কখনো বা বসন্তের দাক্ষিণ্য। একে যদি মায়া বল তো দোষ নেই, কেননা এই চিঠি লিখনের অক্ষরে আবছায়া, ভাষায় ইশারা;—এর আবির্ভাব-তিরোভাবের পুরো মানে সব সময়ে বোঝা যায় না। যাকে চোখে দেখা যায় না, সেই উত্তাপ কখন আকাশ-পথ থেকে মাটির আড়ালে চলে যায়; মনে ভাবি একেবারেই গেল বুঝি। কিছুকাল যায়, একদিন দেখি মাটির পর্দা ফাঁক করে দিয়ে একটি অঙ্কুর উপরের দিকে কোন্-এক আর-জন্মের চেনা-মুখ খুঁজছে। যে-উত্তাপটা ফেরার হয়েছে বলে সেদিন রব উঠল, সেই তো মাটির তলায় অন্ধকারে সেঁধিয়ে কোন্ ঘুমিয়ে-পড়া বীজের দরজায় বসে বসে ঘা দিচ্ছিল। এমনি করেই কত অদৃশ্য ইশারার উত্তাপ এক হৃদয়ের থেকে আর-এক হৃদয়ের ফাকে ফাঁকে কোন্ চোর-কোঠায় গিয়ে ঢোকে, সেখানে কার সঙ্গে কী কানাকানি করে জানি নে, তার পরে কিছু-দিন বাদে একটি নবীন বাণী পর্দার বাইরে এসে বলে, "এসেছি।"

আমার সহযাত্রী বন্ধু আমার ডায়ারি পড়ে বললেন—তুমি ধরণীর চিঠি পড়ায় আর মানুষের চিঠি পড়ায় মিশিয়ে দিয়ে একটা যেন কী গোল পাকিয়েছ। কালিদাসের মেঘদূতে

বিরহী-বিরহিণীর বেদনাটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। তোমার এই লেখায় কোন্‌খানে রূপক কোন্‌খানে সাদা কথা বোঝা শক্ত হয়ে উঠেছে। আমি বললুম—কালিদাস যে মেঘদূত কাব্য লিখেছেন সেটাও বিশ্বের কথা। নইলে তার একপ্রান্তে নির্বাসিত যক্ষ রামগিরিতে, আর-একপ্রান্তে বিরহিণী কেন অলকাপুরীতে? স্বর্গ-মর্তের এই বিরহই তো সকল সৃষ্টিতে। এই মন্দাক্রান্তা-ছন্দেই তো বিশ্বের গান বেজে উঠছে। বিচ্ছেদের ফাঁকের ভিতর দিয়ে অণু-পরমাণু নিত্যই যে অদৃশ্য চিঠি চালাচালি করে, সেই চিঠিই সৃষ্টির বাণী। স্ত্রী-পুরুষের মাঝখানেও, চোখে-চোখেই হোক, কানে-কানেই হোক, মনে-মনেই হোক, আর কাগজে-পত্রেই হোক, যে-চিঠি চলে সেও ওই বিশ্ব-চিঠিরই একটি বিশেষ রূপ।

"পূরবী" কবিতাটির পূর্ব পাঠ পলাতকায় "শেষ গান" নামে মুদ্রিত হইয়াছে। "পূরবী" ও "বিজয়ী" ১৩২৪ সালে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, রচনা-তারিখ পাওয়া যায় নাই।

১৩২৯ সালে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পরলোকগমনে কলিকাতায় যে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবিতাটি তথায় পাঠ করেন। ঐ কবিতাটির 'দিয়ে গেলে তোমার সংগীত' (পৃ. ১৩) স্থলে 'দিয়েছ সংগীত তব' এবং 'রেখে গেলে' স্থলে 'রেখে গেছ' পরিবর্তন কবি করিয়াছিলেন; পূরবীর কোনো সংস্করণে এই সংশোধনটি সন্নিবিষ্ট হয় নাই; এই সংশোধন করিয়া কবিতাটি পড়িতে হইবে। কবিকৃত এইরূপ আর-একটি সংশোধন, "আনমনা" কবিতার (পৃ ৬৪) দ্বিতীয় ছত্রে 'মালাখানি' স্থলে 'মাল্যখানি'। "বেঠিক পথের পথিক" কবিতাটি প্রবাসীতে প্রকাশিত হইবার সময় এই পাঠনির্দেশ মুদ্রিত ছিল: "এই কবিতাটির অকারান্ত সমস্ত শব্দকে হসন্তরূপে গণ্য করিতে হইবে ও কবিতাটি দাদরা তালে পড়িতে হইবে।" অকারান্ত সব শব্দ হসন্তযোগে মুদ্রিত ছিল।

"তৃতীয়া" ও "বিরহিণী" কবিতা দুইটি কবির পৌত্রী শ্রীমতী নন্দিনীর উদ্দেশে রচিত; রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডের প্রারম্ভে নন্দিনীর চিত্র মুদ্রিত হইয়াছে।

রবীন্দ্র-ভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি সাহায্যে কোনো কোনো কবিতার তারিখ ও পাঠ সংশোধিত হইয়াছে। পাণ্ডুলিপির কোনো কোনো অংশ গ্রন্থপ্রকাশকালে বর্জিত হইয়াছে, নিচে সেগুলি উদ্ধৃত হইল।

"সাবিত্রী", ষষ্ঠ স্তবক 'চিহ্ন নাহি রাখে'র পর

তোমার উৎসবধারা আসা-যাওয়া দু-কূল ধ্বনিয়া
নিত্য ছুটে যায়।

তোমার নর্তকীদল বিরহমিলন ঝঞ্ঝনিয়া
খঞ্জনী বাজায়।
স্মৃতি-বিস্মৃতির ছন্দ-আন্দোলনে উত্তালছন্দিত
মুক্তি আর বন্ধ দোঁহে নৃত্য করে নূপুর-মন্দ্রিত,
দুঃখ আর সুখ।
বিশ্বের হৃৎপিণ্ড সেই দ্বন্দ্ববেগে ব্যথিত স্পন্দিত,
করে ধুকধুক।

এই ভালো, এই মন্দ, এই দ্বন্দ্ব আঘাতে সংঘাতে
নিক মোরে টেনে।
আলো-আঁধারের দোলে পুনঃপুনঃ আশা-আশঙ্কাতে
যাক মোরে হেনে।
সেই তরঙ্গের ঊর্ধ্বে দিক দেখা, হে রুদ্র নিষ্ঠুর,
জ্যোতিঃশতদল তব স্থির দীপ্ত আসন বিস্তুর,
অম্লান-মহিমা।
সব দ্বন্দ্ব মগ্ন করে গন্ধ তার আনন্দের সুর
নাহি তার সীমা।

"মুক্তি", প্রথম স্তবক 'সেথা মোর চিরন্তন শেষ'-এর পর

পথে যেতে যদি কভু সাথি বলে চিনি বিশ্বপতি,
তোমারে কোথাও ;—
প্রভু, যদি কভু তব প্রভুত্বের দাবি মোর প্রতি
ছেড়ে দিতে চাও!
তাহলে আসুক সন্ধ্যা বিরামের মহাসিন্ধুতটে,
শান্তিবারি পূর্ণ হোক গোধূলির স্বর্ণময় ঘটে ;
শিশুর মতন তুমি এঁকে দাও আকাশের পটে
আনমনে যাহা-তাহা ছবি।
শিশুর মতন বসি একাসনে তোমা সনে কবি।

"দুঃখসম্পদ", 'চিরদিন গোপনে বিরাজে'র পর

যখনি কুঁড়ির বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দেয় তাপে,
তখনি তো জানি, ফুল চিরদিন ছিল তারি চাপে।

দুঃখ চেয়ে আরো বড়ো না থাকিত কিছু
জীবনের প্রতিদিন হত মাথা নিচু,
তবে জীবনের অবসান
মৃত্যুর বিদ্রূপহাস্তে আনিত চরম অসম্মান।

"কিশোর প্রেম", তৃতীয় স্তবক 'অজানা কোন্ ভাষা'র পর

তার পরে সেই তীরে বসে কত কাঁদন কাঁদা।
ওপার পানে যাবার লাগি
আঁধার রাতে ছিলাম জাগি,
কে জানিত তটচ্ছায়ায় তরী ছিল বাঁধা,
মিছে কত কাঁদন কাঁদা।

"আনমনা" ও "বদল" কবিতা দুইটির গীত-রূপ প্রথম সংস্করণ তৃতীয় খণ্ড গীতবিতানে দ্রষ্টব্য। গান দুইটির প্রথম ছত্র যথাক্রমে "আনমনা, আনমনা" ও "তার হাতে ছিল হাসির ফুলের ভার"।

লেখন

লেখন ১৩৩৪ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রবাসীতে (কার্তিক ১৩৩৫) যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন তাহা নিচে মুদ্রিত হইল।

লেখন

যখন চীনে জাপানে গিয়েছিলেম প্রায় প্রতিদিনই স্বাক্ষরলিপির দাবি মেটাতে হত। কাগজে, রেশমের কাপড়ে, পাখায় অনেক লিখতে হয়েছে। সেখানে তারা আমার বাংলা লেখাই চেয়েছিল, কারণ বাংলাতে একদিকে আমার, আবার আর-এক দিকে সমস্ত বাঙালী জাতিরই স্বাক্ষর। এমনি করে যখন-তখন পথে-ঘাটে যেখানে-সেখানে দু-চার লাইন কবিতা লেখা আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। এই লেখাতে আমি আনন্দও পেতুম। দু-চারটি বাক্যের মধ্যে এক-একটি ভাবকে নিবিষ্ট করে দিয়ে তার যে একটি বাহুল্যবর্জিত রূপ প্রকাশ পেত তা আমার কাছে বড়ো লেখার চেয়ে অনেক সময় আরো বেশি আদর পেয়েছে। আমার নিজের বিশ্বাস বড়ো বড়ো কবিতা পড়া আমাদের অভ্যাস বলেই কবিতার আয়তন কম হলে তাকে কবিতা বলে উপলব্ধি

করতে আমাদের বাধে। অতিভোজনে যারা অভ্যস্ত, জঠরের সমস্ত জায়গাটা বোঝাই না হলে আহারের আনন্দ তাদের অসম্পূর্ণ থাকে; আহার্যের শ্রেষ্ঠতা তাদের কাছে খাটো হয়ে যায় আহারের পরিমাণ পরিমিত হওয়াতেই। আমাদের দেশে পাঠকদের মধ্যে আয়তনের উপাসক অনেক আছে—সাহিত্য সম্বন্ধেও তারা বলে, নারে সুখমস্তি—নাট্য সম্বন্ধেও তারা রাত্রি তিনটে পর্যন্ত অভিনয় দেখার দ্বারা টিকিট কেনার সার্থকতা বিচার করে।

জাপানে ছোটো কাব্যের অমর্যাদা একেবারেই নেই। ছোটোর মধ্যে বড়োকে দেখতে পাওয়ার সাধনা তাদের—কেননা তারা জাত-আর্টিস্ট। সৌন্দর্য-বস্তুকে তারা গজের মাপে বা সেরের ওজনে হিসাব করবার কথা মনেই করতে পারে না। সেইজন্যে জাপানে যখন আমার কাছে কেউ কবিতা দাবি করেছে, দুটি-চারটি লাইন দিতে আমি কুণ্ঠিত হই নি। তার কিছুকাল পূর্বেই আমি যখন বাংলাদেশে গীতাঞ্জলি প্রভৃতি গান লিখছিলুম, তখন আমার অনেক পাঠকই লাইন গণনা করে আমার শক্তির কার্পণ্যে হতাশ হয়েছিলেন—এখনো সে-দলের লোকের অভাব নেই।

এইরকম ছোটো ছোটো লেখায় একবার আমার কলম যখন রস পেতে লাগল তখন আমি অনুরোধনিরপেক্ষ হয়েও খাতা টেনে নিয়ে আপন মনে যা-তা লিখেছি এবং সেই সঙ্গে পাঠকদের মন ঠাণ্ডা করবার জন্যে বিনয় করে বলেছি :

আমার লিখন ফুটে পথধারে
ক্ষণিক কালের ফুলে,
চলিতে চলিতে দেখে যারা তারে
চলিতে চলিতে ভুলে।

কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে এটা ক্ষণিক কালের ফুলের দোষ নয়, চলতে চলতে দেখারই দোষ। যে-জিনিসটা বহরে বড়ো নয় তাকে আমরা দাঁড়িয়ে দেখি নে, যদি দেখতুম তবে মেঠো ফুল দেখে খুশি হলেও লজ্জার কারণ থাকত না। তার চেয়ে কুমড়োফুল যে রূপে শ্রেষ্ঠ তা নাও হতে পারে।

গেলবারে যখন ইটালিতে গিয়েছিলুম, তখন স্বাক্ষরলিপির খাতায় অনেক লিখতে হয়েছিল। লেখা যাঁরা চেয়েছিলেন তাঁদের অনেকেরই ছিল ইংরেজি লেখারই দাবি। এবারেও লিখতে লিখতে কতক তাঁদের খাতায় কতক আমার নিজের খাতায় অনেকগুলি ওইরকম ছোটো ছোটো লেখা জমা হয়ে উঠল। এইরকম অনেক সময়ই অনুরোধের খাতিরে লেখা শুরু হয়, তার পরে ঝোঁক চেপে গেলে আর অনুরোধের দরকার থাকে না।

জার্মানিতে গিয়ে দেখা গেল, এক উপায় বেরিয়েছে তাতে হাতের অক্ষর থেকেই ছাপানো চলে। বিশেষ কালি দিয়ে লিখতে হয় এল্যুমিনিয়মের পাতের উপরে, তার থেকে বিশেষ ছাপার যন্ত্রে ছাপিয়ে নিলেই কম্পোজিটারের শরণাপন্ন হবার দরকার হয় না।

তখন ভাবলেম, ছোটো লেখাকে যাঁরা সাহিত্য হিসাবে অনাদর করেন তাঁরা কবির স্বাক্ষর হিসাবে হয়তো সেগুলোকে গ্রহণ করতেও পারেন। তখন শরীর যথেষ্ট অসুস্থ, সেই কারণে সময় যথেষ্ট হাতে ছিল, সেই সুযোগে ইংরেজি বাংলা এই ছুটকো লেখাগুলি এল্যুমিনিয়ম পাতের উপর লিপিবদ্ধ করতে বসলুম।

ইতিমধ্যে ঘটনাক্রমে আমার কোনো তরুণ বন্ধু বললেন, "আপনার কিছুকাল পূর্বেকার লেখা কয়েকটি ছোটো ছোটো কবিতা আছে। সেইগুলিকে এই উপলক্ষে যাতে রক্ষা করা হয় এই আমার একান্ত অনুরোধ।"

আমার ভোলবার শক্তি অসামান্য এবং নিজের পূর্বের লেখার প্রতি প্রায়ই আমার মনে একটা অহেতুক বিরাগ জন্মায়। এইজন্যই তরুণ লেখকরা সাহিত্যিক-পদবী থেকে আমাকে যখন বরখাস্ত করবার জন্যে কানাকানি করতে থাকেন তখন আমার মন আমাকে পরামর্শ দেয় যে, "আগেভাগে নিজেই তুমি মানে মানে রেজিগনেশন-পত্র পাঠিয়ে যৎসামান্য কিছু পেনসনের দাবি রেখে দাও।" এটা যে সম্ভব হয় তার কারণ আমার পূর্বেকার লেখাগুলো আমি যে-পরিমাণে ভুলি সেই পরিমাণেই মনে হয় তারা ভোলবারই যোগ্য।

তাই প্রস্তুত হয়েছিলেম, আমার বন্ধু পুরোনো ইতিহাসের ক্ষেত্র থেকে উঞ্ছস্বরূপ যা-কিছু সংগ্রহ করে আনবেন আবার তাদেরকে পুরোনোর তমিস্রলোকে বৈতরণী পার করে ফেরত পাঠাব।

গুটিপাঁচেক ছোটো কবিতা তিনি আমার সম্মুখে উপস্থিত করলেন। আমি বললেম, "কিছুতেই মনে পড়বে না এগুলি আমার লেখা," তিনি জোর করেই বললেন, "কোনো সংশয় নেই।"

আমার রচনা-সম্বন্ধে আমার নিজের সাক্ষ্যকে সর্বদাই অবজ্ঞা করা হয়। আমার গানে আমি সুর দিয়ে থাকি। যাকে হাতের কাছে পাই তাকে সেই সদ্যোজাত সুর শিখিয়ে দিই। তখন থেকে সে-গানের সুরগুলি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার ছাত্রের। তার পর আমি যদি গাইতে যাই তারা এ-কথা বলতে সংকোচমাত্র করে না যে, আমি ভুল করছি। এ-সম্বন্ধে তাদের শাসন আমাকে বারবার স্বীকার করে নিতে হয়।

কবিতা কয়টি যে আমারই সেও আমি স্বীকার করে নিলেম। পড়ে বিশেষ তৃপ্তি

বোধ হল—মনে হল ভালোই লিখেছি। বিস্মরণশক্তির প্রবলতাবশত নিজের কবিতা থেকে নিজের মন যখন দূরে সরে যায় তখন সেই কবিতাকে অপর সাধারণ পাঠকের মতোই নিরাসক্তভাবে আমি প্রশংসা এবং নিন্দাও করে থাকি। নিজের পুরোনো লেখা নিয়ে বিস্ময় বোধ করতে বা স্বীকার করতে আমার সংকোচ হয় না—কেননা তার সম্বন্ধে আমার অহমিকার ধার ক্ষয় হয়ে যায়। পড়ে দেখলাম :

তোমারে ভুলিতে মোর হল না যে মতি,
এ জগতে কারো তাহে নাই কোনো ক্ষতি।
আমি তাহে দীন নহি, তুমি নহ ঋণী,
দেবতার অংশ তাও পাইবেন তিনি।

নিজের লেখা জেনেও আমাকে স্বীকার করতে হল যে, ছোট্টোর মধ্যে এই কবিতাটি সম্পূর্ণ ভরে উঠেছে। পেটুকচিত্ত পাঠকের পেট ভরাবার জন্যে একে পঁচিশ-ত্রিশ লাইন পর্যন্ত বাড়িয়ে তোলা যেতে পারত—এমন কি, একে বড়ো আকারে লেখাই এর চেয়ে হত সহজ। কিন্তু লোভে পড়ে একে বাড়াতে গেলেই একে কমানো হত। তাই নিজের অলুব্ধ কবিবুদ্ধির প্রশংসাই করলেম।

তার পরে আর-একটা কবিতা :

ভোর হতে নীলাকাশ ঢাকে কালো মেঘে,
ভিজে ভিজে এলোমেলো বায়ু বহে বেগে।
কিছুই নাহি যে হায় এ বুকের কাছে—
যা কিছু আকাশে আর বাতাসেতে আছে।

আবার বললেম, শাবাশ। হৃদয়ের ভিতরকার শূন্যতা বাইরের আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ করে হাহাকার করে উঠছে এ-কথাটা এত সহজে এমন সম্পূর্ণ করে বাংলা সাহিত্যে আর কে বলেছে ? ওর উপরে আর একটি কথাও যোগ করবার জো নেই। ক্ষীণদৃষ্টি পাঠক এতটুকু ছোটো কবিতার সৌন্দর্য দেখতে পাবে না জেনেও আমি যে নিজের লেখনীকে সংযত করেছিলেম এজন্যে নিজেকে মনে মনে বলতে হল ধন্য।

তার পরে আর-একটি কবিতা :

আকাশে গহন মেঘে গভীর গর্জন,
শ্রাবণের ধারাপাতে প্লাবিত ভুবন।
কেন এতটুকু নামে সোহাগের ভরে
ডাকিলে আমারে তুমি ? পূর্ণ নাম ধরে

আজি ডাকিবার দিন, এ হেন সময়
শরম সোহাগ হাসি কৌতুকের নয়।
আঁধার অম্বর পৃথ্বী পথচিহ্নহীন,
এল চিরজীবনের পরিচয়-দিন।

'মানসী' লেখবার যুগে—সে আজকের কথা নয়—এই ভাবের দুই-একটা কবিতা লিখেছিলেম বলে মনে পড়ে। কিন্তু কোন্ অণিমাসিদ্ধি দ্বারা ভাবটি তনু আকারেই সম্পূর্ণ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

আর-একটি ছোটো কবিতা :

প্রভু, তুমি দিয়েছ যে-ভার
যদি তাহা মাথা হতে এই জীবনের পথে
নামাইয়া রাখি বার বার
জেনো তা বিদ্রোহ নয়, ক্ষীণ শ্রান্ত এ হৃদয়,
বলহীন পরান আমার।

লেখাটি একেবারেই নিরাভরণ বলেই এর ভিতরকার বেদনা যেন বৃষ্টিক্লান্ত জুঁইফুলটির মতো ফুটে উঠেছে।

আমি বিশেষ তৃপ্তি এবং গর্বের সঙ্গেই এই কবিতা কয়টি এল্যুমিনিয়মের পাতের উপর স্বহস্তে নকল করে নিলেম। যথাসময়ে আমার অন্যান্য কবিতিকার সঙ্গে এ-কয়টিও আমার লেখন নামধারী গ্রন্থে প্রকাশিত হয়ে গেল।

আজ প্রায় মাসখানেক পূর্বে কল্যাণীয়া শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবীর কাছে 'লেখন' এক-খণ্ড পাঠিয়ে দিয়েছিলেম। তিনি যে-পত্র লিখেছেন সেটা উদ্ধৃত করে দিই :

লেখন পড়লাম। এর কতকগুলি ছোটো ছোটো কবিতা বড়ো চমৎকার—দু-চার ছত্রে সম্পূর্ণ। কিন্তু যেন এক-একটি সু-সংস্কৃত মণি, আলো ঠিকরে পড়ছে। লেখনে দেখলাম ২৩এর পৃষ্ঠায় আমার চারটি কবিতা সম্পূর্ণ গেছে, আর একটির প্রথম দু লাইন। যথা

১। তোমারে ভুলিতে মোর হল নাকো মতি
২। ভোর হতে নীলাকাশ ঢাকা ঘন মেঘে
৩। আকাশে গহন মেঘে গভীর গর্জন
৪। প্রভু তুমি দিয়েছ যে ভার
৫। শুধু এইটুকু সুখ অতি সুকুমার (প্রথম দু লাইন।)[১]

১ এই পাঁচটি কবিতাই রবীন্দ্র-রচনাবলীতে বর্জিত হইয়াছে। পঞ্চম কবিতাটির অবশিষ্ট দুই ছত্র :
স্থির হয়ে সহ্য করো পরিপূর্ণ ক্ষতি,
শেষটুকু দিয়ে যাক মিষ্টুর বিরতি।

সবগুলিই 'পত্রলেখা'র ছাপা হয়ে গিয়েছে, ১৯০৮ সালে। তবে এ নিয়ে আর কাউকে যেন কিছু বলবেন না।

তখন আমার মনে পড়ল যখন 'পত্রলেখা'র পাণ্ডুলিপি প্রথম আমি পড়ে দেখি তখন প্রিয়ম্বদার বিরলভূষণ বাহুল্যবর্জিত কবিতার আমি যথেষ্ট সাধুবাদ দিয়েছি। বোধ করি, সেই কারণেই কবিতাগুলি যথোচিত সম্মান লাভ করে নি। অন্তত 'পত্র-লেখা'র কয়েকটি কবিতা সম্বন্ধে আমার ভ্রান্তিকে নিজের হাতের অক্ষরে আমার আপন রচনার মধ্যে স্থান দিয়ে তাঁর কবিতার প্রতি সমাদর প্রকাশ করতে পেরেছি বলে খুশি হলেম।

এই প্রসঙ্গে এ-কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে "এই লেখনগুলি শুরু" "চীনে জাপানে" হয় নাই, চীনে জাপানে যাইবার পূর্বেও কবিকে "স্বাক্ষরলিপির দাবি" মিটাইতে হইয়াছে, এবং লেখনের সব কবিতাই এইরূপ দাবি মিটাইবার জন্য রচিত নহে ; ১৮০ পৃষ্ঠার 'একা একা শূন্য মাত্র নাহি অবলম্ব' হইতে ১৮২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অধিকাংশ কবিতা ১৯১২-১৩ সালে বিদেশভ্রমণের সময় জাহাজ, আরোগ্যশালা প্রভৃতি নানাস্থানে রচিত। এই কবিতাগুচ্ছ 'দ্বিপদী' নামে ১৩২০ সালের প্রবাসীতে মুদ্রিত হয়।

লেখন আদ্যোপান্ত কবির হস্তাক্ষরের প্রতিলিপিরূপে মুদ্রিত হইয়াছিল। তাহার নিদর্শনমাত্রস্বরূপ প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র, ভূমিকা, প্রথম পৃষ্ঠা, ও শেষ পৃষ্ঠার প্রতিলিপি রচনাবলী সংস্করণে মুদ্রিত হইল। লেখনে ইংরেজি কবিতাও মুদ্রিত হইয়াছিল, রচনাবলী-সংস্করণে লেখনের প্রথম পৃষ্ঠায় তাহার নিদর্শন রহিয়াছে।

মুক্তধারা

মুক্তধারা ১৩২৯ সালের বৈশাখে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ঐ মাসের প্রবাসীতে নাটকটি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

শ্রীকালিদাস নাগকে লিখিত একটি চিঠিতে (২১ বৈশাখ, ১৩২৯) রবীন্দ্রনাথ মুক্তধারা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

আমি 'মুক্তধারা' বলে একটি ছোটো নাটক লিখেছি এতদিনে প্রবাসীতে সেটা পড়ে থাকবে। তার ইংরেজি অনুবাদ মডার্ন রিভিউতে বেরিয়েছে। তোমার চিঠিতে তুমি machine সম্বন্ধে যে আলোচনার কথা লিখেছ সেই machine এই নাটকের

একটা অংশ। এই যন্ত্র প্রাণকে আঘাত করছে, অতএব প্রাণ দিয়েই সেই যন্ত্রকে অভিজিৎ ভেঙেছে, যন্ত্র দিয়ে নয়। যন্ত্র দিয়ে যারা মানুষকে আঘাত করে তাদের একটা বিষম শোচনীয়তা আছে—কেননা যে-মনুষ্যত্বকে তারা মারে সেই মনুষ্যত্ব যে তাদের নিজের মধ্যেও আছে—তাদের যন্ত্রই তাদের নিজের ভিতরকার মানুষকে মারছে আমার নাটকের অভিজিৎ হচ্ছে সেই মারনেওয়ালার ভিতরকার পীড়িত মানুষ নিজের যন্ত্রের হাত থেকে নিজে মুক্ত হবার জন্যে সে প্রাণ দিয়েছে। আর ধনঞ্জয় হচ্ছে যন্ত্রের হাতে মারখানেওয়ালার ভিতরকার মানুষ। সে বলছে, "আমি মারের উপরে; মার আমাতে এসে পৌঁছয় না—আমি মারকে না-লাগা দিয়ে জিতব, আমি মারকে না-মার দিয়ে ঠেকাব।" যাকে আঘাত করা হচ্ছে সে সেই আঘাতের দ্বারাই আঘাতের অতীত হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু যে-মানুষ আঘাত করছে আত্মার ট্র্যাজেডি তারই—মুক্তির সাধনা তাকেই করতে হবে, যন্ত্রকে প্রাণ দিয়ে ভাঙবার ভার তারই হাতে। পৃথিবীতে যন্ত্রী বলছে "মার লাগিয়ে জয়ী হব।" পৃথিবীতে মন্ত্রী বলছে, "হে মন, মারকে ছাড়িয়ে উঠে জয়ী হও।" আর নিজের যন্ত্রে নিজে বন্দী মানুষটি বলছে, "প্রাণের দ্বারা যন্ত্রের হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে মুক্তি দিতে হবে।" যন্ত্রী হচ্ছে বিভূতি, মন্ত্রী হচ্ছে ধনঞ্জয়, আর মানুষ হচ্ছে অভিজিৎ।...

'মুক্তধারা'র পূর্বকল্পিত নাম ছিল 'পথ'; শ্রীমতী রানু অধিকারীকে একটি চিঠিতে (৪ মাঘ ১৩২৮) রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

আমি সমস্ত সপ্তাহ ধরে একটা নাটক লিখছিলুম—শেষ হয়ে গেছে তাই আজ আমার ছুটি। এ নাটকটা 'প্রায়শ্চিত্ত' নয়, এর নাম 'পথ'। এতে কেবল প্রায়শ্চিত্ত নাটকের সেই ধনঞ্জয় বৈরাগী আছে, আর কেউ নেই—সে গল্পের কিছু এতে নেই, সুরমাকে এতে পাবে না।[১]

গল্পগুচ্ছ

রচনাবলীর বর্তমান খণ্ড হইতে গল্পগুচ্ছ, সাময়িক পত্রে প্রকাশকালের অনুক্রম যতদূর জানা যায়, তদনুসারে, মুদ্রণ আরম্ভ হইল।

বর্তমান খণ্ডে প্রকাশিত গল্পগুলি সাময়িক পত্রে প্রকাশের নির্দেশ দেওয়া গেল:

ঘাটের কথা	কার্তিক ১২৯১, ভারতী
রাজপথের কথা	অগ্রহায়ণ ১২৯১, নবজীবন
মুকুট	বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ১২৯২, বালক

১ 'ভানুসিংহের পত্রাবলী', পত্র ৪৩

"ঘাটের কথা" ও "রাজপথের কথা" সর্বপ্রথম 'ছোট গল্প' (১৫ ফাল্গুন ১৩০০) পুস্তকে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। "মুকুট" 'ছুটির পড়া' পুস্তকে প্রকাশিত হয়। মুকুটের নাট্যরূপ রবীন্দ্র-রচনাবলী অষ্টম খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের ছোটো গল্প বিভিন্ন সময়ে নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহে সংকলিত হয় :

ছোট গল্প। ১৫ ফাল্গুন ১৩০০
বিচিত্র গল্প, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ। ১৩০১
কথা-চতুষ্টয়। ১৩০১
গল্প-দশক। ১৩০২
গল্পগুচ্ছ ১ম খণ্ড।[১] ১৩০৭
গল্প (গল্পগুচ্ছ) ২য় খণ্ড। ১৩০৭
কর্মফল। ১৩১০
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী।[২] হিতবাদীর উপহার। ১৩১১
আটটি গল্প[৩] [২০ নবেম্বর ১৯১১]
গল্প চারিটি [১৮ মার্চ ১৯১২]
গল্পসপ্তক [১৩২৩]
পয়লা নম্বর। ১৩২৭
তিন সঙ্গী। পৌষ ১৩৪৭

এই সংগ্রহের কোনোটিতেই রবীন্দ্রনাথের সমস্ত ছোটো গল্প সংগৃহীত হয় নাই। বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত তিন খণ্ডে সমাপ্ত গল্পগুচ্ছেই সর্বাপেক্ষা অধিক গল্প আছে। তৃতীয় খণ্ডের শেষ সংস্করণে 'গল্পসপ্তকে'র পরবর্তী এবং 'তিন সঙ্গী'র পূর্ববর্তী গল্প, যেগুলি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয় নাই, সেগুলিও সংকলিত হইয়াছে; 'তিন সঙ্গী' প্রকাশিত হইবার পর ইহার নূতন সংস্করণ হয় নাই। 'তিন সঙ্গী' প্রকাশের পরে রবীন্দ্রনাথ যে-সকল গল্প বা গল্পের খসড়া লিখিয়াছিলেন সেগুলি এখনো কোনো গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। রবীন্দ্র-রচনাবলীতে গল্পগুচ্ছ পর্যায়ে এই সব গল্পই ক্রমশ প্রকাশিত হইবে।

১ ১৯০৮-৯ সালে ইণ্ডিয়ান প্রেস ছোট গল্পের সংগ্রহ গল্পগুচ্ছ পাঁচ ভাগে প্রকাশ করেন। ১৯২৬ সালে তিন ভাগে বিশ্বভারতী-সংস্করণ গল্পগুচ্ছ প্রকাশিত হয়।

২ এই গ্রন্থাবলীর 'সংসার চিত্র', 'সমাজ চিত্র', 'রঙ্গচিত্র' ও 'বিচিত্র চিত্র' বিভাগে ছোট গল্পগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল।

৩ বালকপাঠ্য গল্পের সঙ্কলন।

১২৮৪ সালের শ্রাবণ-ভাদ্রের ভারতীতে প্রকাশিত "ভিখারিণী" গল্প সাময়িক পত্রে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছোটো গল্প বলিয়া অনুমিত। কোনো পুস্তকে এই গল্পটি রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেন নাই; এই জন্য রবীন্দ্র-রচনাবলীতে গল্পগুচ্ছের মূল পর্যায় হইতে এটি পরিত্যক্ত হইল। অন্যান্য বর্জিত রচনার সহিত এটি মুদ্রিত হইবে।

উপরে যে-সকল গল্পসংগ্রহের তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহা ছাড়া, নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিতে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্ররূপের গল্প স্থান পাইয়াছে; এগুলি রচনাবলীতে 'উপন্যাস ও গল্প' বিভাগে প্রকাশিত হইবে, কিন্তু 'গল্পগুচ্ছ' পর্যায়ে নহে।

লিপিকা। ১৯২২

সে। বৈশাখ ১৩৪৪

গল্পসল্প। বৈশাখ ১৩৪৮

স্বরচিত ছোটো গল্প সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রসঙ্গে যে-সকল উল্লেখ ও মন্তব্য করিয়াছেন নিচে তাহা উদ্ধৃত হইল।

১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

বর্ষার সমান সুরে অন্তর বাহির পুরে
সংগীতের মুষলধারায়,
পরানের বহুদূর কূলে কূলে ভরপুর,
বিদেশী কাব্যে সে কোথা হায়।
তখন সে পুঁথি ফেলি দুয়ারে আসন মেলি
বসি গিয়ে আপনার মনে,
কিছু করিবার নাই চেয়ে চেয়ে ভাবি তাই
দীর্ঘদিন কাটিবে কেমনে।
মাথাটি করিয়া নিচু বসে বসে রচি কিছু
বহুযত্নে সারাদিন ধরে,—
ইচ্ছা করে অবিরত আপনার মনোমত
গল্প লিখি একেকটি করে।
ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা, ছোটো ছোটো দুঃখকথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি,
তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।

নাহি বর্ণনার ছটা, ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।
জগতের শত শত অসমাপ্ত কথা যত,
অকালের বিচ্ছিন্ন মুকুল,
অজ্ঞাত জীবনগুলা, অখ্যাত কীর্তির ধুলা
কত ভাব, কত ভয় ভুল
সংসারের দশদিশি ঝরিতেছে অহর্নিশি
ঝরঝর বরষার মতো—
ক্ষণ-অশ্রু ক্ষণ-হাসি পড়িতেছে রাশি রাশি
শব্দ তার শুনি অবিরত।
সেই সব হেলাফেলা, নিমেষের লীলাখেলা
চারিদিকে করি স্তূপাকার,
তাই দিয়ে করি সৃষ্টি একটি বিস্মৃতি বৃষ্টি
জীবনের শ্রাবণ-নিশার।

—"বর্ষাযাপন", 'সোনার তরী'

সাজাদপুর ৩০ আষাঢ় ১৮৯৩

…আমি বাস্তবিক ভেবে পাই নে কোন্‌টা আমার আসল কাজ। এক-একসময় মনে হয় আমি ছোটো ছোটো গল্প অনেক লিখতে পারি এবং মন্দ লিখতে পারি নে—লেখবার সময় সুখও পাওয়া যায়। মদগর্বিতা যুবতী যেমন তার অনেকগুলি প্রণয়ীকে নিয়ে কোনোটিকেই হাতছাড়া করতে চায় না, আমার কতকটা যেন সেই দশা হয়েছে। 'মিউজ'দের মধ্যে আমি কোনোটিকেই নিরাশ করতে চাইনে—কিন্তু তাতে কাজ অত্যন্ত বেড়ে যায়… —ছিন্নপত্র

শিলাইদা ২৭ জুন ১৮৯৪

কাল থেকে হঠাৎ আমার মাথায় একটা হ্যাপ ধট এসেছে। আমি চিন্তা করে দেখলুম পৃথিবীর উপকার করব ইচ্ছা থাকলেও কৃতকার্য হওয়া যায় না; কিন্তু তার বদলে যেটা করতে পারি সেইটে করে ফেললে অনেক সময় আপনিই পৃথিবীর উপকার হয়, নিদেন যাহোক একটা কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। আজকাল মনে হচ্ছে, যদি আমি

আর কিছুই না করে ছোটো ছোটো গল্প লিখতে বসি তাহলে কতকটা মনের সুখে থাকি এবং কৃতকার্য হ'তে পারলে হয়তো পাঁচজন পাঠকেরও মনের সুখের কারণ হওয়া যায়। গল্প লেখবার একটা সুখ এই, যাদের কথা লিখব তারা আমার দিনরাত্রির সমস্ত অবসর একেবারে ভরে রেখে দেবে, আমার একলা মনের সঙ্গী হবে, বর্ষার সময় আমার বদ্ধঘরের সংকীর্ণতা দূর করবে এবং রৌদ্রের সময় পদ্মাতীরের উজ্জ্বল দৃশ্যের মধ্যে আমার চোখের পরে বেড়িয়ে বেড়াবে। আজ সকালবেলায় তাই গিরিবালা নাম্নী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ একটি ছোটো অভিমানী মেয়েকে আমার কল্পনারাজ্যে অবতারণ করা গেছে। সবেমাত্র পাঁচটি লাইন লিখেছি এবং সে পাঁচ লাইনে কেবল এই কথা বলেছি যে, কাল বৃষ্টি হয়ে গেছে, আজ বর্ষণ-অন্তে চঞ্চল মেঘ এবং চঞ্চল রৌদ্রের পরস্পর শিকার চলছে, হেনকালে পূর্বসঞ্চিত বিন্দু বিন্দু বারিশীকরবর্ষী তরুতলে গ্রামপথে উক্ত গিরিবালার আসা উচিত ছিল, তা না হয়ে আমার বোটে আমলাবর্গের সমাগম হল— তাতে করে সম্প্রতি গিরিবালাকে কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা করতে হল। তা হোক তবু সে মনের মধ্যে আছে।…আমি ভাবলুম এই তো আমি কোনো উপকরণ না নিয়ে কেবল গল্প লিখে—নিজেকে নিজে সুখী করতে পারি।… —ছিন্নপত্র

বোলপুর ২৮ ভাদ্র ১৩১৭

…সাধনা পত্রিকায় অধিকাংশ লেখা আমাকে লিখিতে হইত এবং অন্য লেখকদের রচনাতেও আমার হাত ভূরিপরিমাণে ছিল।

এই সময়েই বিষয়কর্মের ভার আমার প্রতি অর্পিত হওয়াতে সর্বদাই আমাকে জলপথে ও স্থলপথে পল্লীগ্রামে ভ্রমণ করিতে হইত—কতকটা সেই অভিজ্ঞতার উৎসাহে আমাকে ছোটো গল্প রচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল।

সাধনা বাহির হইবার পূর্বেই হিতবাদী কাগজের জন্ম হয়।…সেই পত্রে প্রতি সপ্তাহেই আমি ছোটো গল্প সমালোচনা ও সাহিত্যপ্রবন্ধ লিখিতাম। আমার ছোটো গল্প লেখার সূত্রপাত ওইখানেই। ছয় সপ্তাহকাল লিখিয়াছিলাম।

সাধনা চারি বৎসর চলিয়াছিল। বন্ধ হওয়ার কিছুদিন পরে এক বৎসর ভারতীর সম্পাদক ছিলাম, এই উপলক্ষ্যেও গল্প ও অন্যান্য প্রবন্ধ কতকগুলি লিখিতে হয়।…

—শ্রীপদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লিখিত পত্র[১]

[চৈত্র ১৩৪৭]

…আমার রচনায় যাঁরা মধ্যবিত্ততার সন্ধান করে পান নি বলে নালিশ করেন

১ দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্রনাথ, 'আত্মপরিচয়', পরিশিষ্ট

তাঁদের কাছে আমার একটা কৈফিয়ত দেবার সময় এল।…একসময়ে মাসের পর মাস আমি পল্লীজীবনের গল্প রচনা করে এসেছি। আমার বিশ্বাস এর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে পল্লীজীবনের চিত্র এমন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হয় নি। তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লেখকের অভাব ছিল না। তাঁরা প্রায় সকলেই প্রতাপসিংহ বা প্রতাপাদিত্যের ধ্যানে নিবিষ্ট ছিলেন। আমার আশঙ্কা হয় একসময় গল্পগুচ্ছ বুর্জোয়া লেখকের সংসর্গদোষে অসাহিত্য বলে অস্পৃশ্য হবে। এখনি যখন আমার লেখার শ্রেণীনির্ণয় করা হয় তখন এই লেখাগুলির উল্লেখমাত্র হয় না, যেন ওগুলির অস্তিত্বই নেই। জাতে ঠেলাঠেলি আমাদের রক্তের মধ্যে আছে তাই ভয় হয় এই আগাছাটাকে উপড়ে ফেলা শক্ত হবে।… —শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্তকে লিখিত পত্র[১]

মে ১৯৪১]

…অসংখ্য ছোটো ছোটো লীরিক লিখেছি—বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোনো কবি এত লেখেন নি—কিন্তু আমার অবাক লাগে তোমরা যখন বল যে আমার গল্পগুচ্ছ গীতধর্মী। একসময়ে ঘুরে বেড়িয়েছি বাংলার নদীতে নদীতে, দেখেছি বাংলার পল্লীর বিচিত্র জীবনযাত্রা। একটি মেয়ে নৌকো করে শ্বশুরবাড়ি চলে গেল, তার বন্ধুরা ঘাটে নাইতে-নাইতে বলাবলি করতে লাগল, আহা, যে পাগলাটে মেয়ে, শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ওর কি না জানি দশা হবে। কিংবা ধরো একটা খ্যাপাটে ছেলে সারা গ্রাম দুষ্টুমির চোটে মাতিয়ে বেড়ায়, তাকে হঠাৎ একদিন চলে যেতে হল শহরে তার মামার কাছে। এইটুকু চোখে দেখেছি, বাকিটা নিয়েছি কল্পনা করে। একে কি তোমরা গানজাতীয় পদার্থ বলবে? আমি বলব আমার গল্পে বাস্তবের অভাব কখনো ঘটে নি। যা-কিছু লিখেছি নিজে দেখেছি, মর্মে অনুভব করেছি, সে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। গল্পে যা লিখেছি তার মূলে আছে আমার অভিজ্ঞতা, আমার নিজের দেখা। তাকে গীতধর্মী বললে ভুল করবে। 'কঙ্কাল' কি 'ক্ষুধিত পাষাণ'কে হয়তো খানিকটা বলতে পার, কারণ সেখানে কল্পনার প্রাধান্য, কিন্তু তাও পুরোপুরি নয়। তোমরা আমার ভাষার কথা বল, বল যে গদ্যেও আমি কবি। আমার ভাষা যদি কখনো আমার গল্পাংশকে অতিক্রম করে স্বতন্ত্র মূল্য পায়, সেজন্য আমাকে দোষ দিতে পার না। এর কারণ, বাংলা গদ্য আমার নিজেকেই গড়তে হয়েছে। ভাষা ছিল না, পর্বে পর্বে স্তরে স্তরে তৈরি করতে হয়েছে আমাকে। আমার প্রথম দিককার গদ্যে, যেমন "কাব্যের উপেক্ষিতা", "কেকাধ্বনি", এ-সব প্রবন্ধে, পদ্যের ঝোঁক খুব

১ দ্রষ্টব্য: রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্যের স্বরূপ', "সাহিত্যবিচার"; 'কবিতা', আষাঢ় ১৩৪৮

বেশি ছিল, ও-সব যেন অনেকটা গল্প-পদ্য গোছের। গদ্যের ভাষা গড়তে হয়েছে আমার গল্পপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে। মোপাসাঁর মতো যে-সব বিদেশী লেখকের কথা তোমরা প্রায়ই বল, তাঁরা তৈরি ভাষা পেয়েছিলেন। লিখতে লিখতে ভাষা গড়তে হলে তাঁদের কী দশা হত জানি নে।

ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে আমি যে ছোটো ছোটো গল্পগুলো লিখেছি, বাঙালি সমাজের বাস্তবজীবনের ছবি তাতেই প্রথম ধরা পড়ে। বঙ্কিম যে 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' লিখেছিলেন, সে-সব কি সত্যি ছিল? সে-সব romantic situation কি তখন ঘটতে পারত? সত্যি হচ্ছে এই যে, তিনি পড়েছিলেন ইংরেজি রোমান্স, পড়ে ভালো লেগেছিল। তৃপ্তির একটা ক্ষেত্র তো চাই। বঙ্কিম পেয়েছিলেন সে ক্ষেত্র, আমাদের দিয়েছিলেন। আমি তাই বলি, বঙ্কিমের রচনায় আমরা যা পাই তা সামন্ত-তন্ত্র নয়। তাকে নতুন একটা পিপাসা বলতে পার, যা মেটাবার রস তিনি যেখান থেকে হোক সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর বইগুলোতে যে-সব কাণ্ডকারখানা আছে, সেগুলো তাঁর স্মৃতির মধ্যেও ছিল না। আর মজা এই, আমাদের তা ভালোও লেগেছে, কারণ এ স্বাদ আমরা আগে কখনো পাই নি। নিন্দে করতে পারব না বঙ্কিমকে, নিশ্চয়ই বলব তিনি ও-রসের জোগান দিয়েছিলেন বলেই বেঁচে গিয়েছিলুম। কী dull সমাজ ছিল তখন। তারই মধ্যে বিদেশ থেকে আমদানি এ-সব রাজার লড়াই ইত্যাদি আমাদের গরিবের মনে একটা উন্মাদনা এনে দিয়েছিল। বিদেশ থেকে আমদানি ব'লে একে আমি ছোটো করছি না। এতে সন্দেহ নেই যে, ইংরেজ ওদের যে-সাহিত্য আমাদের দেশে আনলে, তা আমাদের চিত্তবৃত্তিতে বিপ্লব ঘটিয়েছে। তবে এও সত্য যে, বাংলাদেশে ক্ষেত্রও প্রস্তুত ছিল,—আমাদের মনটাই সাহিত্যিক। য়ুরোপীয় কালচার ঠিক জায়গা পেয়েছিল আমাদের মধ্যে। সোনার ফসল ফলল ইংরেজ আসার দরুন নয়, আমরা ওদের সাহিত্য পেয়েছিলুম ব'লে। ইংরেজ না হয়ে ফরাসি যদি হত আজ আমরা সব মোপাসাঁ হয়ে উঠতুম। আমরা ব্যাকুল হয়ে ছিলুম, তাই পাওয়ামাত্র আগ্রহভরে নিয়েছি।

বঙ্কিমের গল্প এখন হয়তো তোমাদের কাছে আজগুবি ঠেকে, কিন্তু আমরা তাতে যে নতুন রস পেয়েছিলুম, তা ভুলতে পারি নে। এখন তোমরা বল তোমাদের সমাজেই সব আছে, গল্পের সব উপাদানই পাও তা থেকে। কিন্তু এখনকার সুখ দুঃখ ভালোবাসা কি তখন ছিল না? তখনও ছিল, চোখে পড়ে নি। আবরণ রচনা করেছিল বিদেশী রোমান্স।... —শ্রীবুদ্ধদেব বসুর সহিত আলোচনার অনুলিপি[১]

১ দ্রষ্টব্য: "সাহিত্য, গান, ছবি", প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৮

[২৪ মে ১৯৪১]

…আমি একদা যখন বাংলাদেশের নদী বেয়ে তার প্রাণের লীলা অনুভব করেছিলুম তখন আমার অন্তরাত্মা আপন আনন্দে সেই সকল সুখদুঃখের বিচিত্র আভাস অন্তঃকরণের মধ্যে সংগ্রহ করে মাসের পর মাস বাংলার যে পল্লীচিত্র রচনা করেছিল তার পূর্বে আর কেউ করে নি। কারণ সৃষ্টিকর্তা তাঁর রচনাশালায় একলা কাজ করেন। সে বিশ্বকর্মারই মতন আপনাকে দিয়ে রচনা করে। সেদিন কবি যে পল্লীচিত্র দেখেছিল নিঃসন্দেহ তাঁর মধ্যে রাষ্ট্রিক ইতিহাসের আঘাতপ্রতিঘাত ছিল। কিন্তু তাঁর সৃষ্টিতে মানবজীবনের সেই সুখদুঃখের ইতিহাস, যা সকল ইতিহাসকে অতিক্রম ক'রে বরাবর চলে এসেছে কৃষিক্ষেত্রে পল্লীপার্বণে আপন প্রাত্যহিক সুখদুঃখ নিয়ে। কখনো বা মোগল রাজত্বে কখনো বা ইংরেজ রাজত্বে তার অতিসরল মানবত্ব প্রকাশ নিত্য চলেছে, সেইটেই প্রতিবিম্বিত হয়েছিল গল্পগুচ্ছে, কোনো সামন্ততন্ত্র নয় কোনো রাষ্ট্রতন্ত্র নয়।… —শ্রীবুদ্ধদেব বসুকে লিখিত পত্র [১]

উত্তরায়ণ, ৯ জুন ১৯৪১

আমার বয়স তখন অল্প ছিল। বাংলাদেশের পল্লীতে ঘাটে ঘাটে ভ্রমণ করে ফিরেছি। সেই আনন্দের পূর্ণতায় গল্পগুলি লেখা। চিরদিন এই গল্পগুলি আমার অত্যন্ত প্রিয় অথচ আমাদের দেশ গল্পগুলিকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করে নেয় নি, এই দুঃখ আমার মনে ছিল। এবার তোমাদের 'পরিচয়ে'[২] এতদিন পরে আমি যথোচিত পুরস্কার পেয়েছি। তার মধ্যে কোনো দ্বিধা নেই, পুরোপুরি সম্ভোগের কথা। এই কৃতজ্ঞতা তোমাকে না জানিয়ে পারলুম না।…—শ্রীহিরণকুমার সান্যালকে লিখিত পত্র

শান্তিনিকেতন

বর্তমান খণ্ডে শান্তিনিকেতন ৪-১০ খণ্ড প্রকাশিত হইল। রচনাবলী পঞ্চদশ খণ্ডে শান্তিনিকেতন ১১-১২ এবং ষোড়শ খণ্ডে ১৩-১৭ প্রকাশিত হইবে ও শান্তিনিকেতন গ্রন্থপর্যায় সমাপ্ত হইবে।

১ দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্যের স্বরূপ', "সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা" ; 'কবিতা', আশ্বিন ১৩৪৮
২ দ্রষ্টব্য : পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮, শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র, "গল্পগুচ্ছের রবীন্দ্রনাথ"

বর্ণানুক্রমিক সূচী

অকালে যখন বসন্ত আসে … … ১৬৯
অখণ্ড পাওয়া … … ৪০৮
অজানা ফুলের গন্ধের মতো … … ১৭২
অতল আঁধার নিশা-পারাবার … … ১৬০
অতিথি … … ১০৫
অতীত কাল … … ৯৮
অদেখা … … ১২২
অনন্তকালের ভালে … … ১৭১
অনন্তের ইচ্ছা .. … ৪৩৬
অনেকদিনের কথা সে যে … … ১০১
অন্তর বাহির … … ৩২৪
অন্তর্হিতা … … ১০৬
অন্ধ কেবিন আলোয় আঁধার গোলা … … ৭৭
অন্ধকার … … ১৪৮
অপরিচিতা … … ৬২
অবকাশ কর্মে খেলে … … ১৮২
অবসান … … ৮৯
অভ্যাস … … ৩৪৬
অমৃত যে সত্য তার নাহি পরিমাণ … … ১৮২
অসীম আকাশ শূন্য প্রসারি রাখে … … ১৬৮
অস্তরবির আলো-শতদল … … ১৭৫
অহং … … ৩৭৭
আক্রন্দ … … ১২৭
আকর্ষণগুণে প্রেম এক করে তোলে … … ১৬৮
আকাশ কভু পাতে না ফাঁদ … … ১৮০
আকাশ ধরারে বাহুতে বেড়িয়া রাখে … … ১৬১

আকাশভরা তারার মাঝে	...	...	৯০
আকাশে উঠিল বাতাস	...	...	১৬৩
আকাশে তো আমি রাখি নাই	...	...	১৬৬
আকাশে মন কেন তাকায়	...	...	১৭১
আকাশের তারায় তারায়	...	...	১৬৬
আকাশের নীল	...	...	১৬৩
আগমনী	...	...	২৮
আগুন আমার ভাই	..	...	২২৫
আগে খোঁড়া করে দিয়ে	. .	...	১৮১
আজিকার দিন না ফুরাতে	...	...	১১০
আত্মপ্রত্যয়	...	...	৪১৪
আত্মসমর্পণ	...	...	৪১০
আত্মার প্রকাশ	...	...	৩৮২
আদেশ	...	...	৩৮৫
আঁধার সে যেন বিরহিণী বধূ	...	...	১৬৩
আঁধার একেরে দেখে একাকার করে	...	...	১৮১
আঁধারে প্রচ্ছন্ন ঘন বনে	...	...	৮১
আনমনা	...	...	৬৪
আনমনা গো আনমনা	...	...	৬৪
আপন অসীম নিষ্ফলতার পাকে	...	...	১৭০
আপনি আপনা চেয়ে	...	...	১৮২
আমাকে যে বাঁধবে ধরে	...	...	২১১
আমার প্রাণের গানের পাখির দল	...	...	১৬৯
আমার প্রেম রবি-কিরণ হেন	...	...	১৬০
আমার বাণীর পতঙ্গ গুহাচর	...	...	১৬১
আমার লিখন ফুটে পথধারে	...	...	১৫৯
আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায়	...	...	২১৫
আমারে যে ডাক দেবে	...	...	৪৮
আমি জানি মোর ফুলগুলি	...	...	১৬৭
আমি পথ দূরে দূরে দেশে দেশে	.	. .	১৪৪

আমি মায়ের সাগর পাড়ি দেব	২০৬
আরো আরো প্রভু আরো আরো	২০৮
আলো যবে ভালোবেসে মালা দেয়	১৬৪
আলোকের সাথে মেলে	১৭১
আলোকের স্মৃতি ছায়া	১৬৪
আলোহীন বাহিরের	১৭৫
আশঙ্কা	১০৯
আশা	৬৭
আশ্রম	৪৪৯
আশ্বিনের রাত্রিশেষে ঝরে-পড়া	১৯
আসিবে সে আছি সেই আশাতে	১২২
আহ্বান	৪৮
ইটালিয়া	১৫৩
উৎসবের দিন	৩১
উত্তল সাগরের অধীর ক্রন্দন	১৭৮
উদয়াস্ত দুই তটে	১৪৮
উষা একা একা আঁধারের দ্বারে	১৭০
একটি পুষ্পকলি	১৬৬
একদিন ফুল দিয়েছিলে হায়	১৬৭
একা এক শূন্যমাত্র নাই অবলম্ব	১৮০
এবারের মতো করো শেষ	৯৬
ওঁ	৪০৩
ও তো আর ফিরবে না রে	২০৫
ও যে চেরিফুল তব বন-বিহারিণী	১৭৭
ওই শুন বনে বনে	১৭৪
ওগো অনন্ত কালো	১৬১
ওগো বৈতরণী	১১৬
ওগো মোর না-পাওয়া গো	১৩৭
ওগো হংসের পাঁতি	১৭৬
ওরে আকাশ জুড়ে মোহন সুরে	২১৫

কঙ্কাল	...	...	১৩০
কর্ম	...	...	২৯০
কর্ম আপন দিনের মজুরি	...	...	১৭১
কহিলাম ওগো রানী	...	...	১৫৩
কাঁকনজোড়া এনে দিলেম যবে	...	...	৯৫
কাছে থাকার আড়ালখানা	...	...	১৭৪
কাছের থেকে দেয় না ধরা	...	...	১২০
কাজ সে তো মানুষের এই কথা ঠিক	...	...	১৮১
কাঁটাতে আমার অপরাধ আছে	...	...	১৭৭
কানন কুসুম উপহার দেয় চাঁদে	...	...	১৮০
কিশোর প্রেম	...	...	১০১
কীটেরে দয়া করিয়ো ফুল	...	...	১৬৩
কুন্দকলি ক্ষুদ্র বলি	...	...	১৬৮
কুয়াশা যদি বা ফেলে পরাভবে ঘিরি	...	...	১৬৬
কৃতজ্ঞ	...	...	৯২
ক্ষণিকা	...	...	৫৭
ক্ষমা ক'রো যদি গর্বভরে	...	...	৯৭
ক্ষুদ্র চিহ্ন এঁকে দিয়ে	...	...	৫৩
খুঁজতে যখন এলাম সেদিন	...	...	৮৪
খেলা	...	...	৫৯
খেলার খেয়ালবশে কাগজের তরী	...	...	১৭৪
খোলো খোলো হে আকাশ	...	...	৫৭
গগনে গগনে নব নব দেশে রবি	...	...	১৬৫
গানগুলি বেদনার খেলা যে আমার	...	...	৯৯
গানের কাঙাল এ বীণার তার	...	...	১৬৪
গানের সাজি	...	...	৩৩
গানের সাজি এনেছি আজি	...	...	৩৩
গিরি যে তুষার	...	...	১৭৪
গিরির দুরাশা উড়িবারে	...	...	১৭৮
গুণীর লাগিয়া বাঁশি চাহে পথপানে	...	...	১৬৭

গোঁয়ার কেবল গায়ের জোরেই ১৬৯
গোলাপ বলে, ওগো বাতাস ৭০
ঘন অশ্রুবাষ্পে ভরা মেঘের দুর্যোগে ৪৩
ঘাটের কথা ২৪৫
ঘুমের আঁধার কোটরের তলে ১৬০
চঞ্চল ১২৪
চপল ভ্রমর হে কালো কাজল আঁখি ১১৮
চলিতে চলিতে খেলার পুতুল ১৬৩
চাঁদ কহে শোন্ ১৭৮
চান ভগবান প্রেম দিয়ে তাঁর ১৬২
চাবি ১১৫
চাহিয়া প্রভাত রবির নয়নে ১৬৬
চিঠি ১৩২
চিরনবীনতা ৪৯৬
চেয়ে দেখি হোথা তব ১৭৭
ছন্দে লেখা একটি চিঠি ১৬
ছবি ৫৩
ছুটির পর ৪৮০
জগতে মুক্তি ২৯৬
জন্ম মোদের রাতের আঁধার ১৬৯
জন্ম হয়েছিল তোর সকলের কোলে ৯৪
জয় ভৈরব জয় শংকর ১৮৭, ১৯৪
জানি আমি মোর কাব্য ১৩৯
জীবন-খাতার অনেক পাতাই ১৭৫
জীর্ণ জয়-তোরণ-ধূলি 'পর ১৬৪
জীবন-মরণের স্রোতের ধারা ১৪৬
জোনাকি সে ধূলি খুঁজে সারা ১৬৫
ঝরে-পড়া ফুল আপনার মনে বলে ১৭৬
ঝড় ৭৭
ঝড়ের মুখে ভাসল তরী ২০৫

তখন তারা দৃপ্ত-বেগের	...	...	৪
তপোবন	...	...	৪৫৭
তপোভঙ্গ	...	...	২১
তরী বোঝাই	...	...	৩৭৫
তারা	...	...	৯০
তারার দীপ জ্বালেন যিনি	...	...	১৬২
তিন বছরের বিরহিণী জানলাখানি ধরে	...	...	১৩৬
তিনতলা	...	...	৩৩৮
তীর্থ	...	...	৩২৭
তৃতীয়া	...	...	১২০
তোমায় আমি দেখি নাকো	...	...	৭১
তোমার বনে ফুটেছে শ্বেত করবী	...	...	১৬১
তোমারে প্রিয়ে হৃদয় দিয়ে	...	...	১৭৯
তোর শিকল আমায় বিকল করবে না	...	...	২১৯
দখিন হতে আনিলে বায়ু	...	...	১৭৬
দর্পণে যাহারে দেখি	...	...	১৮২
দশের ইচ্ছা	...	...	৪৩১
দাঁড়ায়ে গিরি শির	...	...	১৬১
দান	...	...	৯৫
দিন দেয় তার সোনার বীণা	...	...	১৭২
দিন হয়ে গেল গত	...	...	১৬৪
দিনান্তের ললাট লেপি	...	...	১৭৭
দিনে দিনে মোর কর্ম	...	...	১৭১
দিনের আলোক যবে রাত্রির অতলে	...	...	১৭৪
দিনের কর্মে মোর প্রেম যেন	...	...	১৭৩
দিনের রৌদ্রে আবৃত বেদনা	...	...	১৬৪
দিবসের অপরাধ	...	...	১৬৮
দিবসের দীপে শুধু থাকে তেল	...	...	১৭৪
দিবসে যাহারে করিয়াছিলাম হেলা	...	...	১৭৬
দুই	...	...	৩০৬

দুই তীরে তার বিরহ ঘটায়ে	...	...	১৬২
দুঃখ তব যন্ত্রণায়	...	...	৯৩
দুঃখ-সম্পদ	...	...	৯৩
দুঃখের আগুন কোন্ জ্যোতির্ময়	...	...	১৭০
দুঃখেরে যখন প্রেম করে শিরোমণি	...	...	১৮২
দুয়ার-বাহিরে যেমনি চাহি রে	...	...	৩৫
দুর্গম দূর শৈলশিরের	...	...	১২৬
দূর এসেছিল কাছে	...	...	১৬১
দূর প্রবাসে সন্ধ্যাবেলায়	...	...	১৩২
দূর হতে যারে পেয়েছি পাশে	...	...	১৭৮
দেবতা যে চায় পরিতে গলায়	...	...	১৭৫
দেবতার সৃষ্টি বিশ্ব	...	...	১৭০
দেবমন্দির-আঙিনাতলে	...	...	১৬১
দোসর	...	...	৮৭
দোসর আমার দোসর ওগো	...	...	৮৭
দ্রষ্টা	...	...	৩৩২
ধনীর প্রাসাদ বিকট ক্ষুধিত রাহু	...	...	১৭৮
ধরণীর যজ্ঞ-অগ্নি	...	...	১৭০
ধরায় যেদিন প্রথম জাগিল	...	...	১৬৮
ধরার মাটির তলে বন্দী হয়ে	...	...	১৭৪
ধীর যুক্তাত্মা	...	...	৪১৫
ধূলায় মারিলে লাথি	...	...	১৮১
নটরাজ নৃত্য করে নব নব	...	...	১৭২
নদী ও কূল	...	...	৩৮০
নবযুগের উৎসব	...	...	৩১৩
নমস্তেঽস্তু	...	...	৪২০
নমো যন্ত্র নমো যন্ত্র	...	...	১৯১
নর-জনমের পুরা দাম দিব যেই	...	...	১৬৯
না-পাওয়া	...	...	১৩৭
নানা রঙের ফুলের মতো	...	...	১৬৩

নিত্যধাম ৩৩৩
নিভৃত প্রাণের নিবিড় ছায়ায় ১৬৪
নিমেষকালের অতিথি যাহারা ১৭৯
নিমেষকালের খেয়ালের লীলাভরে ১৬৯
নিয়ম ও মুক্তি ৪২৯
নির্বিশেষ ৩০৩
নিষ্ঠা ৩৫৭
নিষ্ঠার কাজ ৩৫৮
নীড়ের শিক্ষা ৩৯৭
নীরব যিনি তাঁহার বাণী ১৭৭
নূতন প্রেম সে ঘুরে ঘুরে মরে ১৭০
পঁচিশে বৈশাখ ৯
পদধ্বনি ৮১
পথ ১৪৪
পথ বাকি আর নাই তো আমার ৬২
পথে হল দেরি ঝরে গেল চেরি ১৬৫
পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয় ১৬৮
পরশরতন ৩৪৪
পরিণয় ৩৩৪
পর্বতমালা আকাশের পানে ১৬৬
পশুর কঙ্কাল ওই ১৩০
পাওয়া ২৮৫
পাওয়া ও না-পাওয়া ৪৩৮
পারের ঘাটা পাঠাল তরী ৮৯
পারের তরীর পালের হাওয়ার ১৭২
পুণ্যলোভীর নাই হল ভিড় ২৬
পুঁথি-কাটা ওই পোকা ১৭১
পুরানো মাঝে যা কিছু ছিল ১৭৩
পূরবী ৩
পূর্ণতা ৪৬

পূর্ণতা	...	...	৩১৫
পূর্ণতার সাধনায় বনস্পতি চাহে	...	...	১৪২
পৌষপথের বিরহী তরুর কানে	...	...	১৭৭
প্রকাশ	...	...	৮৪
প্রজাপতি পায় অবকাশ	...	...	১৭১
প্রজাপতি সে তো বরষ না গণে	...	...	১৫৯
প্রতিদিন নদীস্রোতে পুষ্পপত্র করি	...	...	১৫১
প্রদীপ যখন নিবেছিল	...	...	১০৬
প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করি	...	...	১০৫
প্রবাহিণী	...	...	১২৬
প্রভাত	...	...	১০৩
প্রভাত-আলোরে বিদ্রূপ করে	...	...	১৮০
প্রভাতী	...	...	১১৮
প্রভেদেরে মান যদি ঐক্য পাবে তবে	...	...	১৮১
প্রাণ	...	...	২৯৪
প্রাণ ও প্রেম	...	...	৪২৪
প্রাণগঙ্গা	...	...	১৫১
প্রাণেরে মৃত্যুর ছাপ	...	...	১৮২
প্রার্থনা	...	...	৩৪৮
প্রেমেরে যে করিয়াছে ব্যবসার অঙ্গ	...	...	১৮২
ফল	...	...	৩৬৭
ফাগুন শিশুর মতো	...	...	১৬১
ফুরাইলে দিবসের পালা	...	...	১৭০
ফুল দেখিবার যোগ্য চক্ষু যার রহে	...	...	১৮১
ফুলগুলি যেন কথা	...	...	১৬৮
ফুলে ফুলে যবে	...	...	১৬৪
ফুলের লাগি তাকায়ে ছিলি শীত	...	...	১৭৯
ফেলে যবে যাও একা থুয়ে	...	...	১৭০
ফেলে রাখলেই কি পড়ে রবে	...	...	২২৯
বকুল-বনের পাখি	...	...	৪০
বদল	...	...	১৫২
বনস্পতি	...	...	১৪২
বর্তমান যুগ	...	...	৪৮৩
বর্ষশেষ	...	...	৪৩৪
বর্ষার নবীন মেঘ	...	...	১২
বলেছিনু ভুলিব না	...	...	৯২
বসন্ত তুমি এসেছ হেথায়	...	...	১৬৬

বসন্ত সে কুঁড়ি ফুলের দল	...	...	১৬০
বসন্তবায়ু কুসুমকেশর	...	...	১৭৬
বহুদিন মনে ছিল আশা	...	...	৬৭
বহ্নি যবে বাঁধা থাকে	...	...	১৮০
বাজে রে বাজে ডমরু বাজে	...	...	২৩৮
বাতাস	...	...	৭০
বাসনা, ইচ্ছা, মঙ্গল	...	...	৩৪০
বিজয়ী	...	...	৪
বিদেশী ফুল	...	...	১০৪
বিদেশে অচেনা ফুল	...	...	১৭১
বিধাতা যেদিন মোর মন	...	...	১১৫
বিপাশা	...	...	১১২
বিভাগ	...	...	৩২৯
বিমুখতা	...	...	৩৬০
বিরহপ্রদীপে জলুক দিবসরাতি	...	...	১৬৭
বিরহিণী	...	...	১৩৬
বিলম্বে উঠেছ তুমি কৃষ্ণপক্ষ শশী	...	...	১৬৩
বিশ্ববোধ	...	...	৫০৭
বিশ্বব্যাপী	...	...	৩০৯
বিশ্বাস	...	...	৩৫৩
বিস্মরণ	...	...	৬৫
বীণা-হারা	...	...	১৪০
বুদ্বুদ সে তো বদ্ধ আপন ঘেরে	...	...	১৬৭
বৃক্ষ সে তো আধুনিক	...	...	১৭০
বেঠিক পথের পথিক	...	...	৩৯
বেঠিক পথের পথিক আমার	...	...	৩৯
বেদনার লীলা	...	...	৯৯
বৈতরণী	...	...	১১৬
বৈরাগ্য	...	...	৩৫০
ব্রহ্মবিহার	...	...	৩৮৯
ভক্ত	...	...	৪৮৬
ভক্তি ভোরের পাখি	...	...	১৭২
ভয় ও আনন্দ	...	...	৪২৬
ভয় নিত্য জেগে আছে	...	...	৩১
ভাঙা মন্দির	...	...	২৬
ভাবীকাল	...	...	৯৭
ভাবুকতা ও পবিত্রতা	...	...	৩২২

ভারী কাজের বোঝাই তরী	...	...	১৬০
ভালো করিবারে যার বিষম ব্যস্ততা	...	...	১৮১
ভালো যে করিতে পারে	...	...	১৮১
ভালোবাসার মূল্য আমায়	...	...	১০৯
ভাসিয়ে দিয়ে মেঘের ভেলা	...	...	১৬২
ভিক্ষুবেশে দ্বারে তার	...	...	১৬৭
ভীরু মোর দান ভরসা না পায়	...	...	১৬০
ভুলে যাই থেকে থেকে	...	...	২১০
ভূমা	...	...	৩৯৯
ভেবেছিনু গনি গনি লব সব তারা	...	...	১৭৯
ভোরের ফুল গিয়েছে যারা	...	...	১৭৩
মত	...	...	৩০১
মধু	...	...	১১৯
মনে আছে কার দেওয়া সেই ফুল	...	...	৬৫
মন্ত্রের বাঁধন	...	...	৪২৩
মন্দ যাহা নিন্দা তার	...	...	১৮০
মরণ	...	...	৩৬৩
মস্ত যে-সব কাণ্ড করি	...	...	৬৭
মহাতরু বহে	...	...	১৬৮
মাঘের বুকে সকৌতুকে কে আজি এল	...	...	২৮
মাটির ডাক	...	...	৫
মাটির প্রদীপ সারা দিবসের	...	...	১৬৩
মাটির সৃষ্টিবন্ধন হতে	...	..	১৬০
মায়াজাল দিয়া কুয়াশা জড়ায়	...	...	১৭১
মায়ামৃগী নাই বা তুমি	...	...	১১২
মিলন	...	...	১৪৬
মিলননিশীথে ধরণী ভাবিছে	...	...	১৭৩
মুক্তি	...	...	৭৫
মুক্তি	...	...	৪৪৪
মুক্তি নানা মূর্তি ধরি	...	...	৭৫
মুক্তির পথ	...	...	৪৪৬
মৃতের যতই বাড়াই মিথ্যা মূল্য	...	...	১৭২
মুকুট	...	...	২৫৯
মৃত্যু ও অমৃত	...	.	৩৭২
মৃত্যুর আহ্বান	...	...	৯৪
মৃত্যুর ধর্মই এক প্রাণধর্ম নানা	...	...	১৮১
মৃত্যুর প্রকাশ	...	...	৩১১

মেঘ সে বাষ্পগিরি	১৬২
মেঘের দল বিলাপ করে	১৬৭
মোর কাগজের খেলার নৌকা	১৬৯
মোর গানে গানে প্রভু	১৬২
মৌমাছির মতো আমি চাহি না	১১৯
যখন পথিক এলেম কুসুমবনে	১৬৫
যবে এসে নাড়া দিলে দ্বার	১৪০
যবে কাজ করি	১৬৫
যাত্রা	১৯
যাবার যা সে যাবেই তারে	১৭৩
যারা আমার সাঁঝ-সকালের	৩
যে-তারা মহেন্দ্রক্ষণে প্রত্যুষবেলায়	৩৮
যেদিন প্রথম কবি-গান	১২৮
যৌবনবেদনা-রসে উচ্ছল আমার দিনগুলি	২১
রইল বলে রাখলে কারে	২১৬
রঙের খেয়ালে আপনা খোয়ালে	১৬৪
রস যেথা নাই সেথা	১৮২
রাজপথের কথা	২৫৫
রাত্রি হল ভোর	৯
লাজুক ছায়া বনের তলে	১৬৬
লিপি	৫৪
লিলি তোমারে গেঁথেছি হারে	১৭৯
লীলাসঙ্গিনী	৩৫
লেখনী জানে না কোন্ অঙ্গুলি লিখিছে	১৮০
শক্ত ও সহজ	৪১৮
শক্তি	২৯২
শালবনের ঐ আঁচল ব্যেপে	৫
শিখারে কহিল	১৬২
শিশির রবিরে শুধু জানে	১৭০
শিলঙের চিঠি	১৬
শিশির-সিক্ত বনমর্মর	১৭৭
শিশিরের মালাগাঁথা শরতের	১৭৬
শীত	৯৯
শীতের হাওয়া হঠাৎ ছুটে এল	৯৯
শুধু কি তার বেঁধেই তোর	২২৮
শুকতারা মনে করে	১৭২
শেষ	৮৬

শেষ অর্ঘ্য ৩৮
শেষ বসন্ত ১১০
শোনো শোনো ওগো, বকুলবনের পাখি ৪০
সংগীতে যখন সত্য ১৬৭
সংহরণ ৩৫৫
সকল চাঁপাই দেয় মোর প্রাণে ১৭০
সত্যকে দেখা ৩৭০
সত্য তার সীমা ভালোবাসে ১৭২
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১২
সন্ধ্যা-আলোর সোনার খেয়া ১২৭
সন্ধ্যাবেলায় এ কোন্ খেলায় ৫৯
সন্ধ্যায় দিনের পাত্র ১৭২
সন্ধ্যার প্রদীপ মোর ১৭৫
সমগ্র ২৮৭
সমগ্র এক ৪১১
সমস্ত আকাশভরা আলোর মহিমা ১৮০
সমাজে মুক্তি ২৯৯
সমাপন ৯৬
সমুদ্র ৭৩
সাগরের কানে জোয়ার-বেলায় ১৭৩
সাধন ৩৮৬
সাবিত্রী ৪৩
সুন্দরী ছায়ার পানে ১৬০
সুপ্তির জড়িমাঘোরে ৭৮
সূর্যপানে চেয়ে ভাবে মল্লিকা-মুকুল ১৭৫
সূর্যাস্তের রঙে রাঙা ১৭১
সৃষ্টি ৩৭১
সৃষ্টিকর্তা ১৩৯
সেই ভালো, প্রতি যুগ আনে না ৯৮
সোনার মুকুট ভাসাইয়া দাও ১৭৫
স্খলিত পালক ধূলায় জীর্ণ ১৬৫
স্তব্ধ অতল শব্দবিহীন ১৬৯
স্তব্ধ রাতে একদিন ৪৬
স্তব্ধ হয়ে কেন্দ্র আছে ১৭৪
স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেল ১৬০
স্বপ্ন ৭১
স্বপ্ন আমার জোনাকি ১২৯

স্বপ্নসম পরবাসে এলি পাশে	১৩৪
স্বভাবকে লাভ	৩৭৫
স্বভাবলাভ	৪০৬
স্বর্ণসুধা-ঢালা এই প্রভাতের বুকে	১০৩
স্বপ্ন সেও স্বপ্ন নয়	১৬৭
স্বাভাবিকী ক্রিয়া	৩৪২
হওয়া	৪৪২
হতভাগা মেঘ পায় প্রভাতের সোনা	১৭৯
হয় কাজ আছে তব	১৮১
হায় রে তোরে রাখব ধরে	১২৪
হাসির কুসুম আনিল সে ডালি ভরি	১৫২
হিতৈষীর স্বার্থহীন অত্যাচার যত	১৬৮
হে অচেনা তব আঁখিতে আমার	১৭৬
হে অশেষ, তব হাতে শেষ	৮৬
হে আমার ফুল ভোগী মূর্খের মালে	১৬৩
হে ধরণী কেন প্রতিদিন	৫৪
হে প্রেম যখন ক্ষমা কর তুমি	১৬৯
হে বন্ধু জেনো মোর ভালোবাসা	১৬৭
হে বিদেশী ফুল	১০৪
হে মহাসাগর বিপদের লোভ দিয়া	১৬৫
হে সমুদ্র স্তব্ধচিত্তে শুনেছিনু	৭৩

রবীন্দ্র রচনাবলী

পঞ্চদশ খণ্ড

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র-রচনাবলী

পঞ্চদশ খণ্ড

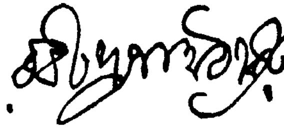

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা

প্রকাশ চৈত্র ১৩৪৯
সংস্করণ চৈত্র ১৩৫০
পুনর্মুদ্রণ আশ্বিন ১৩৬০
ফাল্গুন ১৩৭০ : ১৮৮৫ শক

মূল্য : কাগজের-মলাট দশ টাকা
রেক্সিন-বাঁধাই তেরো টাকা

© বিশ্বভারতী ১৯৬৪

প্রকাশক শ্রীকানাই সামন্ত
বিশ্বভারতী। ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

মুদ্রক শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস। ৩০ বিধান সরণী। কলিকাতা ৬

সূচী

চিত্রসূচী ।৶০

কবিতা ও গান

মহুয়া ১

বনবাণী ১১১

পরিশেষ ১৫৫

সংযোজন ২৮৭

নাটক ও প্রহসন

বসন্ত ৩১৭

রক্তকরবী ৩৪১

উপন্যাস ও গল্প

গল্পগুচ্ছ ৪০৩

প্রবন্ধ

শান্তিনিকেতন ১১-১২ ৪৪১

গ্রন্থপরিচয় ৫১৭

বর্ণানুক্রমিক সূচী ৫৫৩

চিত্রসূচী

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অঙ্কিত মহুয়ার নামপত্র ১

শুধায়ো না কবে কোন্ গান

কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত মহুয়ার উৎসর্গপত্র ৩

তেহেরান, ২৫ বৈশাখ ১৩৩৯

পারস্যে জন্মদিনে ৭

শান্তিনিকেতন-শালবীথিকায় রবীন্দ্রনাথ ১৩০

কবিতা ও গান

শুধায়ো না, কবে কোন্ গান
কাহারে করিয়াছিনু দান।
পথের ধূলার পরে
পড়ে আছে তারি তরে
যে তাহারে দিতে পারে মান।

তুমি কি শুনেছ মোর বাণী,
হৃদয়ে নিয়েছ তারে টানি'?
জানি না তোমার নাম,
তোমারেই সঁপিলাম
আমার ধ্যানের ধনখানি॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উজ্জীবন

ভস্ম-অপমানশয্যা ছাড়ো পুষ্পধনু,
রুদ্রবহ্নি হতে লহ জ্বলদর্চি তনু।
যাহা মরণীয় যাক মরে,
জাগো অবিস্মরণীয় ধ্যানমূর্তি ধরে।
যাহা রূঢ়, যাহা মূঢ় তব,
যাহা স্থূল, দগ্ধ হোক, হও নিত্য নব
মৃত্যু হতে জাগো পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু

মৃত্যুঞ্জয় তব শিরে মৃত্যু দিলা হানি ;
অমৃত সে-মৃত্যু হতে দাও তুমি আনি।
সেই দিব্য দীপ্যমান দাহ
উন্মুক্ত করুক অগ্নি-উৎসের প্রবাহ।
মিলনেরে করুক প্রখর,
বিচ্ছেদেরে করে দিক দুঃসহ সুন্দর।
মৃত্যু হতে জাগো পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু।

দুঃখে সুখে বেদনায় বন্ধুর যে-পথ
সে দুর্গমে চলুক প্রেমের জয়রথ।
তিমিরতোরণে রজনীর
মন্দ্রিবে সে রথচক্রনির্ঘোষ গম্ভীর।
উল্লঙ্ঘিয়া তুচ্ছ লজ্জা ত্রাস
উচ্ছলিবে আত্মহারা উদ্‌বেল উল্লাস।
মৃত্যু হতে ওঠো পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু।

[ভাদ্র ?] ১৩৩৬
[শান্তিনিকেতন]

পারস্যে জন্মদিনে

তেহেরান। ২৫ বৈশাখ ১৩৩৯

পৃ ২৮৩

মহুয়া

বোধন

মাঘের সূর্য উত্তরায়ণে
পার হয়ে এল চলি,
তার পানে হায় শেষ চাওয়া চায়
করুণ কুন্দকলি।
উত্তর বায় একতারা তার
তীব্র নিখাদে দিল ঝংকার,
শিথিল যা ছিল তারে ঝরাইল—
গেল তারে দলি দলি।

শীতের রথের ঘূর্ণিধূলিতে
গোধূলিরে করে ম্লান'।
তাহারি আড়ালে নবীন কালের
কে আসিছে সে কি জান'।
বনে বনে তাই আশ্বাসবাণী
করে কানাকানি 'কে আসে কী জানি',
বলে মর্মরে 'অতিথির তরে
অর্ঘ্য সাজায়ে আনো'।

নির্মম শীত তারি আয়োজনে
এসেছিল বনপারে।
মার্জিয়া দিল শ্রান্তি ক্লান্তি,
মার্জনা নাহি কারে।

ম্লান চেতনার আবর্জনায়
পান্থের পথে বিঘ্ন ঘনায়,
নবযৌবনদূতরূপী শীত
দূর করি দিল তারে।

ভরা পাত্রটি শূন্য করে সে
ভরিতে নূতন করি।
অপব্যয়ের ভয় নাহি তার
পূর্ণের দান স্মরি।
অলস ভোগের গ্লানি সে ঘুচায়,
মৃত্যুর স্নানে কালিমা মুছায়,
চিরপুরাতনে করে উজ্জ্বল
নূতন চেতনা ভরি।

নিত্যকালের মায়াবী আসিছে
নব পরিচয় দিতে।
নবীন রূপের অপরূপ জাদু
আনিবে সে ধরণীতে।
লক্ষ্মীর দান নিমেষে উজাড়ি
নির্ভয় মনে দূরে দেয় পাড়ি,
নব বর সেজে চাহে লক্ষ্মীরে
ফিরে জয় করে নিতে।

বাঁধন ছেঁড়ার সাধন তাহার,
সৃষ্টি তাহার খেলা।
দস্যুর মতো ভেঙেচুরে দেয়
চিরাভ্যাসের মেলা।
মূল্যহীনেরে সোনা করিবার
পরশপাথর হাতে আছে তার,

তাই তো প্রাচীন সঞ্চিত ধনে
উদ্ধত অবহেলা।

বলো 'জয় জয়', বলো 'নাহি ভয়' ;—
কালের প্রয়াণপথে
আসে নির্দয় নবযৌবন
ভাঙনের মহারথে।
চিরন্তনের চঞ্চলতায়
কাঁপন লাগুক লতায় লতায়,
থরথর করি উঠুক পরান
প্রান্তরে পর্বতে।

বার্তা ব্যাপিল পাতায় পাতায়,—
'করো ত্বরা, করো ত্বরা।
সাজাক পলাশ আরতিপাত্র
রক্তপ্রদীপে ভরা।
দাড়িম্ববন প্রচুর পরাগে
হোক প্রগল্‌ভ রক্তিমরাগে,
মাধবিকা হোক সুরভিসোহাগে
মধুপের মনোহরা।'

কে বাঁধে শিথিল বীণার তন্ত্র
কঠোর যতন ভরে,—
ঝংকারি উঠে অপরিচিতার
জয়সংগীতস্বরে।
নগ্ন শিমুলে কার ভাণ্ডার
রক্ত দুকূল দিল উপহার,
দ্বিধা না রহিল বকুলের আর
রিক্ত হবার তরে।

দেখিতে দেখিতে কী হতে কী হল
শূন্য কে দিল ভরি।
প্রাণবন্যায় উঠিল ফেনায়ে
মাধুরীর মঞ্জরি।
ফাগুনের আলো সোনার কাঠিতে
কী মায়া লাগালো, তাই তো মাটিতে
নবজীবনের বিপুল ব্যথায়
জাগে শ্যামাসুন্দরী।

দোলপূর্ণিমা [২২ ফাল্গুন] ১৩৩৪
[শান্তিনিকেতন]

বসন্ত

ওগো বসন্ত, হে ভুবনজয়ী,
বাজে বাণী তব 'মাভৈঃ মাভৈঃ',
বন্দীরা পেল ছাড়া।
দিগন্ত হতে শুনি' তব সুর
মাটি ভেদ করি উঠে অঙ্কুর,
কারাগারে দিল নাড়া
জীবনের রণে নব অভিযানে
ছুটিতে হবে-যে নবীনেরা জানে,
দলে দলে আসে আমের মুকুল
বনে বনে দেয় সাড়া।

কিশলয়দল হল চঞ্চল,
উতল প্রাণের কলকোলাহল
শাখায় শাখায় উঠে

মুক্তির গানে কাঁপে চারিধার,
কানা দানবের মানা-দেওয়া দ্বার
আজ গেল সব টুটে।
মরুযাত্রার পাথেয়-অমৃতে
পাত্র ভরিয়া আসে চারিভিতে
অগণিত ফুল, গুঞ্জনগীতে
জাগে মৌমাছিপাড়া।

ওগো বসন্ত, হে ভুবনজয়ী,
দুর্গ কোথায়, অস্ত্র বা কই,
কেন সুকুমার বেশ।
মৃত্যুদমন শৌর্য আপন
কী মায়ামন্ত্রে করিলে গোপন,
তূণ তব নিঃশেষ।
বর্ম তোমার পল্লবদলে,
আগ্নেয়বাণ বনশাখাতলে
জ্বলিছে শ্যামল শীতল অনলে
সকল তেজের বাড়া।

জড়দৈত্যের সাথে অনিবার
চিরসংগ্রামঘোষণা তোমার
লিখিছ ধূলির পটে—
মনোহর রঙে লিপি ভূমিতলে
যুদ্ধের বাণী বিস্তারি চলে
সিন্ধুর তটে তটে।
হে অজেয়, তব রণভূমি-'পরে
সুন্দর তার উৎসব করে,
দক্ষিণবায়ু মর্মর স্বরে
বাজায় কাড়া-নাকাড়া।

দোলপূর্ণিমা [২২ ফাল্গুন] ১৩৩৪
[শান্তিনিকেতন]

বরযাত্রা

পবন দিগন্তের দুয়ার নাড়ে
চকিত অরণ্যের সুপ্তি কাড়ে।
যেন কোন্ দুর্দম
বিপুল বিহঙ্গম
গগনে মুহুর্মুহু পক্ষ ঝাড়ে।

পথপাশে মল্লিকা দাঁড়ালো আসি,
বাতাসে সুগন্ধের বাজালো বাঁশি।
ধরার স্বয়ম্বরে
উদার আড়ম্বরে
আসে বর অম্বরে ছড়ায়ে হাসি।

অশোক রোমাঞ্চিত মঞ্জরিয়া
দিল তার সঞ্চয় অঞ্জলিয়া।
মধুকরগুঞ্জিত
কিশলয়পুঞ্জিত
উঠিল বনাঞ্চল চঞ্চলিয়া।

কিংশুককুঙ্কুমে বসিল সেজে,
ধরণীর কিঙ্কিণী উঠিল বেজে।
ইঙ্গিতে সংগীতে
নৃত্যের ভঙ্গীতে
নিখিল তরঙ্গিত উৎসবে যে।

দোলপূর্ণিমা [২২ ফাল্গুন] ১৩৩৪
[শান্তিনিকেতন]

মাধবী

বসন্তের জয়রবে
দিগন্ত কাঁপিল যবে
মাধবী করিল তার সজ্জা।
মুকুলের বন্ধ টুটে
বাহিরে আসিল ছুটে,
ছুটিল সকল তার লজ্জা।
অজানা পান্থের লাগি
নিশি নিশি ছিল জাগি
দিনে দিনে ভরেছিল অর্ঘ্য
কাননের একভিতে
নিভৃত পরানটিতে
রেখেছিল মাধুরীর স্বর্গ।
ফাল্গুন পবনরথে
যখন বনের পথে
জাগাল মর্মর-কলছন্দ,
মাধবী সহসা তার
সঁপি দিল উপহার,
রূপ তার, মধু তার, গন্ধ।

দোলপূর্ণিমা ১৩৩৪
[শান্তিনিকেতন]

বিজয়ী

বিবশ দিন, বিরস কাজ,
কে কোথা ছিনু দোঁহে,
সহসা প্রেম আসিলে আজ
কী মহা সমারোহে।
নীরবে রয় অলস মন,
আঁধারময় ভবনকোণ,

ভাঙিলে দ্বার কোন্ সে ক্ষণ
অপরাজিত ওহে।
সহসা প্রেম আসিলে আজ
বিপুল বিদ্রোহে।

কানন-'পর ছায়া বুলায়,
ঘনায় ঘনঘটা।
গঙ্গা যেন হেসে দুলায়
ধূর্জটির জটা।
যে যেথা রয় ছাড়িল পথ,
ছুটালে ঐ বিজয়রথ,
আঁখি তোমার তড়িৎবৎ
ঘন ঘুমের মোহে।
সহসা প্রেম আসিলে আজ
বেদনাদান বহে।

বৈশাখ ১৩৩৩ ?

প্রত্যাশা

প্রাঙ্গণে মোর শিরীষশাখায় ফাগুন মাসে
কী উচ্ছ্বাসে
ক্লান্তিবিহীন ফুল-ফোটানোর খেলা।
ক্ষান্তকূজন শান্ত বিজন সন্ধ্যাবেলা
প্রত্যহ সেই ফুল্ল শিরীষ প্রশ্ন শুধায় আমায় দেখি,
'এসেছে কি।'

আর বছরেই এমনি দিনেই ফাগুন মাসে
কী উল্লাসে
নাচের মাতন লাগল শিরীষ ডালে,
স্বর্গপুরের কোন্ নূপুরের তালে!

প্রত্যহ সেই চঞ্চল প্রাণ শুধিয়েছিল, 'শুনাও দেখি,
আসে নি কি।'

আবার কখন্ এমনি দিনেই ফাগুন মাসে
কী বিশ্বাসে
ডালগুলি তার রইবে শ্রবণ পেতে
অলখ জনের চরণশব্দে মেতে।
প্রত্যহ তার মর্মরস্বর বলবে আমায় দীর্ঘশ্বাসে,
'সে কি আসে।'

প্রশ্ন জানাই পুষ্পবিভোর ফাগুন মাসে
কী আশ্বাসে,
হায় গো আমার ভাগ্যরাতের তারা,
নিমেষগণন হয় না কি মোর সারা।
প্রত্যহ বয় প্রাঙ্গণময় বনের বাতাস এলোমেলো,
'সে কি এল।'

২৩ শ্রাবণ ১৩৩৫
চৌরঙ্গি [কলিকাতা]

অর্ঘ্য

সূর্যমুখীর বর্ণে বসন
লই রাঙায়ে
অরুণ আলোর ঝংকার মোর
লাগল গায়ে।
অঞ্চলে মোর কদমফুলের ভাষা
বক্ষে জড়ায় আসন্ন কোন্ আশা,
কৃষ্ণকলির হেমাঞ্জলির
চঞ্চলতা
কঞ্চুলিকার স্বর্ণলিখায়
মিলায় কথা।

আজ যেন পায় নয়ন আপন
নতুন জাগা।
আজ আসে দিন প্রথম দেখার
দোলন-লাগা।
এই ভুবনের একটি অসীম কোণ,
যুগলপ্রাণের গোপন পদ্মাসন,
সেথায় আমায় ডাক দিয়ে যায়
নাই জানা কে,
সাগরপারের পান্থপাখির
ডানার ডাকে।

চলব ডালায় আলোকমালায়
প্রদীপ জ্বেলে,
ঝিল্লিঝনন অশোকতলায়
চমক মেলে।
আমার প্রকাশ নতুন বচন ধ'রে
আপনাকে আজ নতুন রচন ক'রে,
ফাগুনবনের গুপ্ত ধনের
আভাস-ভরা,
রক্তদীপন প্রাণের আভায়
রঙিন-করা।

চক্ষে আমার জ্বলবে আদিম
অগ্নিশিখা,
প্রথম ধরায় সেই যে পরায়
আলোর টিকা।
নীরব হাসির সোনার বাঁশির ধ্বনি
করবে ঘোষণ প্রেমের উদ্বোধনী,

প্রাণদেবতার মন্দিরদ্বার
যাক রে খুলে,
অঙ্গ আমার অর্ঘ্যের থাল
অরূপ ফুলে।

২৩ শ্রাবণ ১৩৩৫
[কলিকাতা]

দ্বৈত

আমি যেন গোধূলিগগন
ধেয়ানে মগন,
স্তব্ধ হয়ে ধরা-পানে চাই ;
কোথা কিছু নাই,
শুধু শূন্য বিরাট প্রান্তরভূমি।
তারি প্রান্তে নিরালা পিয়ালতরু তুমি
বক্ষে মোর বাহু প্রসারিয়া।
স্তব্ধ হিয়া
শ্যামল স্পর্শনে আত্মহারা,
বিস্মরিল আপনার সূর্যচন্দ্রতারা।

তোমার মঞ্জরি
কভু ফোটে, কভু পড়ে ঝরি ;
তোমার পল্লবদল
কভু স্তব্ধ, কভু বা চঞ্চল।
একেলার খেলা তব
আমার একেলা বক্ষে নিত্যনব।
কিশলয়গুলি
কম্পমান করুণ অঙ্গুলি

চায় সন্ধ্যারক্তরাগ,
আলোর সোহাগ ;
চায় নক্ষত্রের কথা,—
চায় বুঝি মোর নিঃসীমতা।

২৩ শ্রাবণ ১৩৩৫
[কলিকাতা]

সন্ধান

আমার নয়ন তব নয়নের নিবিড় ছায়ায়
মনের কথার কুসুমকোরক খোঁজে।
সেথায় কখন্ অগম গোপন গহন মায়ায়
পথ হারাইল ও-যে।
আতুর দিঠিতে শুধায় সে নীরবেরে,—
নিভৃত বাণীর সন্ধান নাই যে রে ;
অজানার মাঝে অবুঝের মতো ফেরে
অশ্রুধারায় ম'জে।

আমার হৃদয়ে যে-কথা লুকানো, তার আভাষণ
ফেলে কভু ছায়া তোমার হৃদয়তলে ?
দুয়ারে এঁকেছি রক্ত রেখায় পদ্ম-আসন,
সে তোমারে কিছু বলে ?
তব কুঞ্জের পথ দিয়ে যেতে যেতে
বাতাসে বাতাসে ব্যথা দিই মোর পেতে,
বাঁশি কী আশায় ভাষা দেয় আকাশেতে
সে কি কেহ নাহি বোঝে।

শ্রাবণ ১৩৩৫ ?

উপহার

মণিমালা হাতে নিয়ে
দ্বারে গিয়ে
এসেছিনু ফিরে
নতশিরে।
ক্ষণতরে বুঝি
বাহিরে ফিরেছি খুঁজি
হায় রে বৃথাই
বাহিরে যা নাই।
ভীরু মন চেয়েছিল ভুলায়ে জিনিতে,
হীরা দিয়ে হৃদয় কিনিতে।

এই পণ মোর,
সমস্ত জীবন-ভোর
দিনে দিনে দিব তার হাতে তুলি
স্বর্গের দাক্ষিণ্য হতে আসিবে যে শ্রেষ্ঠ ক্ষণগুলি ;
কণ্ঠহারে
গেঁথে দিব তা'রে
যে দুর্লভ রাত্রি মম
বিকশিবে ইন্দ্রাণীর পারিজাতসম
পায়ে দিব তার
যে এক-মুহূর্ত আনে প্রাণের অনন্ত উপহার।

২৩ শ্রাবণ ১৩৩৫
[কলিকাতা]

শুভযোগ

যে-সন্ধ্যায় প্রসন্ন লগনে
পূর্ণচন্দ্রে হেরিল গগনে
উৎসুক ধরণী,

সর্বাঙ্গ বেষ্টিয়া তার তরঙ্গের ধন্য ধন্য ধ্বনি
মন্দ্রিয়া উঠিল কূলে কূলে ;
নদীর গদ্‌গদ বাণী অশ্রুবেগে উঠে ফুলে' ফুলে'
কোটালের বানে,
কী চেয়েছে কী বলেছে আপনি না জানে ;
সে-সন্ধ্যায় প্রসন্ন লগনে
তোমারে প্রথম দেখা দেখেছি জীবনে।

যে-বসন্তে উৎকণ্ঠিত দিনে
সাড়া এল চঞ্চল দক্ষিণে ;
পলাশের কুঁড়ি
একরাত্রে বর্ণবহ্নি জ্বালিল সমস্ত বন জুড়ি ;
শিমুল পাগল হয়ে মাতে,
অজস্র ঐশ্বর্যভার ভরে তার দরিদ্র শাখাতে,
পাত্র করি পুরা
আকাশে আকাশে ঢালে রক্তফেন সুরা।
উচ্ছ্বসিত সে-এক নিমেষে
যা-কিছু বলার ছিল বলেছি নিঃশেষে।

২৪ শ্রাবণ ১৩৩৫
চৌরঙ্গি [কলিকাতা]

মায়া

চিত্তকোণে ছন্দে তব
বাণীরূপে
সংগোপনে আসন লব
চুপে চুপে।

সেইখানেতেই আমার অভিসার,
　　যেথায় অন্ধকার
ঘনিয়ে আছে চেতন-বনের
　　ছায়াতলে,
যেথায় শুধু ক্ষীণ জোনাকির
　　আলো জ্বলে।

সেথায় নিয়ে যাব আমার
　　দীপশিখা,
গাঁথব আলো-আঁধার দিয়ে
　　মরীচিকা।
মাথা থেকে খোঁপার মালা খুলে
　　পরিয়ে দেব চুলে,—
গন্ধ দিবে সিন্ধুপারের
　　কুঞ্জবীথির,
আনবে ছবি কোন্ বিদেশের
　　কী বিস্মৃতির।

পরশ মম লাগবে তোমার
　　কেশে বেশে,
অঙ্গে তোমার রূপ নিয়ে গান
　　উঠবে ভেসে।
ভৈরবীতে উচ্ছল গান্ধার,
　　বসন্তবাহার,
পুরবী কি ভীমপলাশি
　　রক্তে দোলে—
রাগরাগিণী দুঃখে সুখে
　　যায়-যে গলে।

হাওয়ায় ছায়ায় আলোয় গানে
আমরা দোঁহে
আপন মনে রচব ভুবন
ভাবের মোহে।
রূপের রেখায় মিলবে রসের রেখা,
মায়ার চিত্রলেখা,—
বস্তু হতে সেই মায়া তো
সত্যতর,
তুমি আমায় আপনি র'চে
আপন কর।

২৪ শ্রাবণ ১৩৩৪
[কলিকাতা]

নির্ঝরিণী

ঝর্না, তোমার স্ফটিকজলের
স্বচ্ছ ধারা,
তাহারি মাঝারে দেখে আপনারে
সূর্যতারা।
তারি একধারে আমার ছায়ারে
আনি মাঝে মাঝে, দুলায়ো তাহারে,
তারি সাথে তুমি হাসিয়া মিলায়ো
কলধ্বনি,—
দিয়ো তা'রে বাণী যে-বাণী তোমার
চিরন্তনী।

আমার ছায়াতে তোমার হাসিতে
মিলিত ছবি,
তাই নিয়ে আজি পরানে আমার
মেতেছে কবি।

পদে পদে তব আলোর ঝলকে
ভাষা আনে প্রাণে পলকে পলকে,
মোর বাণীরূপ দেখিলাম আজি
নির্ঝরিণী।
তোমার প্রবাহে মনেরে জাগায়,
নিজেরে চিনি।

আষাঢ় ১৩৩৫
[বাঙ্গালোর]

শুকতারা

সুন্দরী তুমি শুকতারা
সুদূর শৈলশিখরান্তে,
শর্বরী যবে হবে সারা
দর্শন দিয়ো দিক্‌ভ্রান্তে।

ধরা যেথা অম্বরে মেশে
আমি আধো-জাগ্রত চন্দ্র,
আঁধারের বক্ষের 'পরে
আধেক আলোকরেখারন্ধ্র।

আমার আসন রাখে পেতে
নিদ্রাগহন মহাশূন্য,
তন্ত্রী বাজাই স্বপনেতে
তন্দ্রা ঈষৎ করি ক্ষুণ্ন।

মন্দ চরণে চলি পারে,
যাত্রা হয়েছে মোর সাঙ্গ।
সুর থেমে আসে বারে বারে,
ক্লান্তিতে আমি অবশাঙ্গ।

সুন্দরী ওগো শুকতারা,
　　রাত্রি না যেতে এসো তূর্ণ।
স্বপ্নে যে-বাণী হল হারা
　　জাগরণে করো তারে পূর্ণ।

নিশীথের তল হতে তুলি
　　লহো তারে প্রভাতের জন্য।
আঁধারে নিজেরে ছিল ভুলি,
　　আলোকে তাহারে করো ধন্য।

যেখানে সুপ্তি হল লীনা,
　　যেথা বিশ্বের মহামন্ত্র,
অর্পিনু সেথা মোর বীণা
　　আমি আধো-জাগ্রত চন্দ্র।

২৩ জুন ১৯২৮
Ballabrooie
বাঙ্গালোর

প্রকাশ

আচ্ছাদন হতে
ডেকে লহো মোরে তব চক্ষুর আলোতে।
অজ্ঞাত ছিলাম এতদিন
পরিচয়হীন,—
সেই অগোচরদুঃখভার
বহিয়া চলেছি পথে; শুধু আমি অংশ জনতার।
উদ্ধার করিয়া আনো,
আমারে সম্পূর্ণ করি জানো।
যেথা আমি একা
সেথায় নামুক তব দেখা।

সে-মহানির্জন
যে-গহনে অন্তর্যামী পাতেন আসন,
সেইখানে আনো আলো,
দেখো মোর সব মন্দ ভালো,
যাক লজ্জা ভয়,
আমার সমস্ত হ'ক তব দৃষ্টিময়।

ছায়া আমি সবা-কাছে, অস্ফুট আমি-যে,
তাই আমি নিজে
তাহাদের মাঝে
নিজেরে খুঁজিয়া পাই না-যে।
তারা মোর নাম জানে, নাহি জানে মান,
তারা মোর কর্ম জানে, নাহি জানে মর্মগত প্রাণ
সত্য যদি হই তোমা-কাছে
তবে মোর মূল্য বাঁচে,—
তোমার মাঝারে
বিধির স্বতন্ত্র সৃষ্টি জানিব আমারে।
প্রেম তব ঘোষিবে তখন
অসংখ্য যুগের আমি একান্ত সাধন।
তুমি মোরে করো আবিষ্কার,
পূর্ণ ফল দেহো মোরে আমার আজন্ম প্রতীক্ষার
বহিতেছি অজ্ঞাতির বন্ধন সদাই,
মুক্তি চাই
তোমার জানার মাঝে
সত্য তব যেথায় বিরাজে।

২৪ শ্রাবণ ১৩৩৫
[কলিকাতা]

বরণডালা

আজি এ নিরালা কুঞ্জে, আমার
অঙ্গ-মাঝে
বরণের ডালা সেজেছে আলোক-
মালার সাজে।
নব বসন্তে লতায় লতায়
পাতায় ফুলে
বাণীহিল্লোল উঠে প্রভাতের
স্বর্ণকূলে,
আমার দেহের বাণীতে সে-দোল
উঠিছে দুলে,—
এ বরণ-গান নাহি পেলে মান
মরিব লাজে,
ওহে প্রিয়তম, দেহে মনে মম
ছন্দ বাজে।

অর্ঘ্য তোমার আনি নি ভরিয়া
বাহির হতে,
ভেসে আসে পূজা পূর্ণ প্রাণের
আপন স্রোতে।
মোর তনুময় উছলে হৃদয়
বাঁধনহারা,
অধীরতা তারি মিলনে তোমারি
হ'ক না সারা।
ঘন যামিনীর আঁধারে যেমন
ঝলিছে তারা,

দেহ ঘেরি মম প্রাণের চমক
তেমনি রাজে।
সচকিত আলো নেচে ওঠে মোর
সকল কাজে।

২৫ শ্রাবণ ১৩৩৫

মুক্তি

ভোরের পাখি নবীন আঁখি দুটি
পুরানো মোর স্বপনডোর
ছিঁড়িল কুটিকুটি।
রুদ্ধ মন গগনে গেল খুলি,
বিজুলি হানি দৈববাণী
বক্ষে উঠে দুলি।
ঘাসের ছোঁওয়া তৃণশয়নছায়ে
মাটির যেন মর্মকথা বুলায়ে দিল গায়ে;
আমের বোল, ঝাউয়ের দোল,
ঢেউয়ের লুটোপুটি
মিলি সকলে কী কোলাহলে
বক্ষে এল জুটি।

ভোরের পাখি নবীন আঁখি দুটি
গুহাবিহারী ভাবনা যত
নিমেষে নিল লুটি।
কী ইঙ্গিতে আচম্বিতে
ডাকিল লীলাভরে
দুয়ারখোলা পুরানো খেলাঘরে,
যেখানে ব'সে সবার কাছাকাছি
অজানা ভাবে অবুঝ গান
একদা গাহিয়াছি।

প্রাণের মাঝে ছুটে-চলার
খেপামি এল ছুটি,
লাভের লোভ, ক্ষতির ক্ষোভ
সকলি গেল টুটি।

ভোরের পাখি নবীন আঁখি দুটি
শুকতারাকে যেমনি ডাকে
প্রাণে সে উঠে ফুটি।
অরুণরাঙা চেতনা জাগে চিতে—
ঝুমকোলতা জানায় কথা
রঙিন রাগিণীতে।
মনের 'পরে খেলায় বায়ুবেগে
কত-যে মায়া রঙের ছায়া
খেয়ালে-পাওয়া মেঘে;
বুলায় বুকে ম্যাগ্‌নোলিয়া
কৌতূহলী মুঠি,
অতি বিপুল ব্যাকুলতায়
নিখিলে জেগে উঠি।

২৭ শ্রাবণ ১৩৩৫

উদ্‌ঘাত

অজানা জীবন বাহিনু,
রহিনু আপন মনে,
গোপন করিতে চাহিনু—
ধরা দিনু দুনয়নে।
কী বলিতে পাছে কী বলি
তাই দূরে ছিনু কেবলি,
তুমি কেন এসে সহসা
দেখে গেলে আঁখিকোণে
কী আছে আমার মনে।

গভীর তিমিরগহনে
আছিনু নীরব বিরহে,
হাসির তড়িৎ-দহনে
লুকানো সে আর কি রহে।
দিন কেটেছিল বিজনে
ধেয়ানের ছবি সৃজনে,
আনমনে যেই গেয়েছি
শুনে গেছ সেইখনে
কী আছে আমার মনে।

প্রবেশিলে মোর নিভৃতে,
দেখে নিলে মোরে কী ভাবে,
যে-দীপ জ্বেলেছি নিশীথে
সে-দীপ কি তুমি নিভাবে।
ছিল ভরি মোর থালিকা,
ছিঁড়িব কি সেই মালিকা।
শরম দিবে কি তাহারে
অকথিত নিবেদনে
যা আছে আমার মনে।

২৭ শ্রাবণ ১৩৩৫

অসমাপ্ত

বোলো তারে, বোলো,
এতদিনে তারে দেখা হল।
তখন বর্ষণশেষে
ছুঁয়েছিল রৌদ্র এসে
উন্মীলিত গুল্‌মোরের থোলো

বনের মন্দির-মাঝে
তরুর তম্বুরা বাজে,
অনন্তের উঠে স্তবগান,
চক্ষে জল বহে যায়,
নম্র হল বন্দনায়
আমার বিস্মিত মনপ্রাণ।

দেবতার বর
কত জন্ম কত জন্মান্তর
অব্যক্ত ভাগ্যের রাতে
লিখেছে আকাশ-পাতে
এ-দেখার আশ্বাস-অক্ষর।
অস্তিত্বের পারে পারে
এ-দেখার বারতারে
বহিয়াছি রক্তের প্রবাহে।
দূর শূন্যে দৃষ্টি রাখি'
আমার উন্মনা আঁখি
এ-দেখার গূঢ় গান গাহে।

বোলো আজি তারে,—
'চিনিলাম তোমারে আমারে।
হে অতিথি, চুপে চুপে
বারম্বার ছায়ারূপে
এসেছ কম্পিত মোর দ্বারে।
কত রাত্রে চৈত্রমাসে,
প্রচ্ছন্ন পুষ্পের বাসে
কাছে-আসা নিশ্বাস তোমার
স্পন্দিত করেছে জানি
আমার গুণ্ঠনখানি,
কাঁদায়েছে সেতারের তার।'

বোলো তারে আজ,—
'অন্তরে পেয়েছি বড়ো লাজ।
কিছু হয় নাই বলা,
বেধে গিয়েছিল গলা,
ছিল না দিনের যোগ্য সাজ।
আমার বক্ষের কাছে
পূর্ণিমা লুকানো আছে,
সেদিন দেখেছ শুধু অমা।
দিনে দিনে অর্ঘ্য মম
পূর্ণ হবে, প্রিয়তম,
আজি মোর দৈন্য করো ক্ষমা।'

২৭ শ্রাবণ ১৩৩৫

নিবেদন

অজানা খনির নূতন মণির
গেঁথেছি হার,
ক্লান্তিবিহীনা নবীনা বীণায়
বেঁধেছি তার।
যেমন নূতন বনের দুকূল,
যেমন নূতন আমের মুকুল,
মাঘের অরুণে খোলে স্বর্গের
নূতন দ্বার—
তেমনি আমার নবীন রাগের
নবযৌবনে নব সোহাগের
রাগিণী রচিয়া উঠিল নাচিয়া
বীণার তার।

যে-বাণী আমার কখনো কারেও
হয় নি বলা
তাই দিয়ে গানে রচিব নূতন
নৃত্যকলা।
আজি অকারণ মুখর বাতাসে
যুগান্তরের সুর ভেসে আসে,
মর্মরস্বরে বনের ঘুচিল
মনের ভার,—
যেমনি ভাঙিল বাণীর বন্ধ
উচ্ছ্বসি উঠে নূতন ছন্দ,
সুরের সাহসে আপনি চকিত
বীণার তার।

২৭ শ্রাবণ ১৩৩৫

অচেনা

রে অচেনা, মোর মুষ্টি ছাড়াবি কী ক'রে
যতক্ষণ চিনি নাই তোরে?
কোন অন্ধক্ষণে
বিজড়িত তন্দ্রাজাগরণে
রাত্রি যবে সবে হয় ভোর
মুখ দেখিলাম তোর।
চক্ষু 'পরে চক্ষু রাখি শুধালেম, 'কোথা সংগোপনে
আছ আত্মবিস্মৃতির কোণে?'

তোর সাথে চেনা
সহজে হবে না,
কানে-কানে মৃদু কণ্ঠে নয়।
করে নেব জয়
সংশয়কুণ্ঠিত তোর বাণী;

দৃপ্ত বলে লব টানি
শঙ্কা হতে, লজ্জা হতে, দ্বিধাদ্বন্দ্ব হতে
নির্দয় আলোতে।
জাগিয়া উঠিবি অশ্রুধারে,
মুহূর্তে চিনিবি আপনারে ;
ছিন্ন হবে ডোর,
তোমার মুক্তিতে তবে মুক্তি হবে মোর।

হে অচেনা,
দিন যায়, সন্ধ্যা হয়, সময় র'বে না ;
মহা আকস্মিক
বাধাবন্ধ ছিন্ন করি দিক্,
তোমারে চেনার অগ্নি দীপ্তশিখা উঠুক উজ্জ্বলি,
দিব তাহে জীবন অঞ্জলি।

আষাঢ় ১৩৩৫
[বাঙ্গালোর]

অপরাজিত

ফিরাবে তুমি মুখ,
ভেবেছ মনে আমারে দিবে দুখ ?
আমি কি করি ভয়।
জীবন দিয়ে তোমারে প্রিয়ে, করিব আমি জ
বিঘ্ন-ভাঙা যৌবনের ভাষা,
অসীম তার আশা,
বিপুল তার বল,
তোমার আঁখি-বিজুলিঘাতে হবে না নিষ্ফল।

বিমুখ মেঘ ফিরিয়া যায় বৈশাখের দিনে,
অরণ্যেরে যেন সে নাহি চিনে,

ধরে না কুঁড়ি কানন জুড়ি, ফোটে না বটে ফুল,
মাটির তলে তৃষিত তরুমূল ;
ঝরিয়া পড়ে পাতা,
বনস্পতি তবুও তুলি' মাথা
নিঠুর তপে মন্ত্র জপে নীরব অনিমেষে
দহনজয়ী সন্ন্যাসীর বেশে।
দিনের পরে যায় রে দিন, রাতের পরে রাতি,
শ্রবণ রহে পাতি।
কঠিনতর যবে সে-পণ দারুণ উপবাসে
এমনকালে হঠাৎ কবে আসে
উদার অকৃপণ
আষাঢ় মাসে সজল শুভখন ;
পূর্বগিরি-আড়াল হতে বাড়ায় তার পাণি,
করিয়ো ক্ষমা, করিয়ো ক্ষমা, গুমরি উঠে বাণী,
নমিয়া পড়ে নিবিড় মেঘরাশি,
অশ্রুবারিবন্যা নামে ধরণী যায় ভাসি।

ফিরালে মোরে মুখ !
এ শুধু মোরে ভাগ্য করে ক্ষণিক কৌতুক।
তোমার প্রেমে আমার অধিকার
অতীত যুগ হতে সে জেনো লিখন বিধাতার।
অচল গিরিশিখর-'পরে সাগর করে দাবি,
ঝর্না পড়ে নাবি ;
সুদূর দিক্‌রেখার পানে চায়,
অকূল অজানায়
শঙ্কাভরে তরল স্বরে কহে,
নহে গো, নহে নহে ;
এড়ায়ে যাবে বলি
কত-না আঁকাবাঁকার পথে চলে সে ছলছলি ;

বিপুলতর হয় সে-ধারা, গভীরতর সুরে,
যতই আসে দূরে ;
উদারহাসি সাগর সহে অবুঝ অবহেলা,—
একদা শেষে পলাতকার খেলা
বক্ষে তার মিলায় কবে, মিলনে হয় সারা—
পূর্ণ হয় নিবেদনের ধারা।

২৮ শ্রাবণ ১৩৩৫

নির্ভয়

আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা
গড়িব না ধরণীতে,
মুগ্ধ ললিত অশ্রুগলিত গীতে।
পঞ্চশরের বেদনামাধুরী দিয়ে
বাসররাত্রি রচিব না মোরা প্রিয়ে ;
ভাগ্যের পায়ে দুর্বলপ্রাণে
ভিক্ষা না যেন যাচি।
কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয়
তুমি আছ, আমি আছি।

উড়াব ঊর্ধ্বে প্রেমের নিশান
দুর্গম পথ-মাঝে
দুর্দম বেগে, দুঃসহতম কাজে।
রুক্ষ দিনের দুঃখ পাই তো পাব,
চাই না শান্তি, সান্ত্বনা নাহি চাব।
পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি,
ছিন্ন পালের কাছি,
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব
তুমি আছ, আমি আছি।

দুজনের চোখে দেখেছি জগৎ,
দোঁহারে দেখেছি দোঁহে,—
মরুপথতাপ দুজনে নিয়েছি সহে।
ছুটি নি মোহন মরীচিকা-পিছে-পিছে,
ভুলাই নি মন সত্যেরে করি মিছে—
এই গৌরবে চলিব এ ভবে
যতদিন দোঁহে বাঁচি।
এ-বাণী প্রেয়সী, হোক মহীয়সী—
তুমি আছ, আমি আছি।

৩১ শ্রাবণ ১৩৩৫

পথের বাঁধন

পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি,
আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী।
রঙিন নিমেষ ধুলার দুলাল
পরানে ছড়ায় আবীর গুলাল,
ওড়না ওড়ায় বর্ষার মেঘে
দিগঙ্গনার নৃত্য,
হঠাৎ-আলোর ঝলকানি লেগে
ঝলমল করে চিত্ত।

নাই আমাদের কনকচাঁপার কুঞ্জ,
বনবীথিকায় কীর্ণ বকুলপুঞ্জ।
হঠাৎ কখন্ সন্ধ্যাবেলায়
নামহারা ফুল গন্ধ এলায়,
প্রভাতবেলায় হেলাভরে করে
অরুণকিরণে তুচ্ছ
উদ্ধত যত শাখার শিখরে
রডোডেনড্রন্ গুচ্ছ।

নাই আমাদের সঞ্চিত ধনরত্ন,
নাই রে ঘরের লালনললিত যত্ন।
পথপাশে পাখি পুচ্ছ নাচায়,
বন্ধন তারে করি না খাঁচায়,
ডানা-মেলে-দেওয়া মুক্তিপ্রিয়ের
কূজনে দুজনে তৃপ্ত।
আমরা চকিত অভাবনীয়ের
ক্বচিৎ কিরণে দীপ্ত।

[আষাঢ় ১৩৩৫
বাঙ্গালোর]

দূত

ছিনু আমি বিষাদে মগনা
অন্যমনা
তোমার বিচ্ছেদ-অন্ধকারে।
হেনকালে নির্জন কুটিরদ্বারে
অকস্মাৎ
কে করিল করাঘাত,
কহিল গম্ভীর কণ্ঠে, অতিথি এসেছি, দ্বার খোলো।

মনে হল
ঐ যেন তোমারি স্বর শুনি,
ঐ যেন দক্ষিণবায়ু দূরে ফেলি মদির ফাল্‌গুনী
দিগন্তে আসিল পূর্বদ্বারে,
পাঠাল নির্ঘোষ তার বজ্রধ্বনিমন্দ্রিত মল্লারে।
কেঁপেছিল বক্ষতল
বিলম্ব করি নি তবু অর্ধ পল।

মুহূর্তে মুছিনু অশ্রুবারি,
বিরহিণী নারী,

ছাড়িনু ধেয়ান তব তোমারি সন্ধানে,
ছুটে গেনু দ্বার-পানে।
শুধালেম, তুমি দূত কার।
সে কহিল, আমি তো সবার।
যে-ঘরে তোমার শয্যা একদিন পেতেছি আদরে
ডাকিলাম তারে সেই ঘরে।
আনিলাম অর্ঘ্যথালি,
দীপ দিনু জ্বালি।
দেখিলাম বাঁধা তারি ভালে
যে-মালা পরায়েছিনু তোমারেই বিদায়ের কালে।

২০ অগস্ট ১৯২৮
[কলিকাতা]

পরিচয়

তখন বর্ষণহীন অপরাহ্ণমেঘে
শঙ্কা ছিল জেগে ;
ক্ষণে ক্ষণে তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনায়
বায়ু হেঁকে যায় ;
শূন্যে যেন মেঘচ্ছিন্ন রৌদ্ররাগে পিঙ্গল জটায়
দুর্বাসা হানিছে ক্রোধ রক্তচক্ষু-কটাক্ষচ্ছটায়

সে-দুর্যোগে এনেছিনু তোমার বৈকালী,
কদম্বের ডালি।
বাদলের বিষণ্ণ ছায়াতে
গীতহারা প্রাতে
নৈরাশ্যজয়ী সে-ফুল রেখেছিল কাজল প্রহরে
রৌদ্রের স্বপনছবি রোমাঞ্চিত কেশরে কেশরে।

মন্থর মেঘেরে যবে দিগন্তে ধাওয়ায়
পুবন হাওয়ায়,
কাঁদে বন শ্রাবণের রাতে
প্লাবনের ঘাতে,
তখনো নির্ভীক নীপ গন্ধ দিল পাখির কুলায়ে,
বৃন্ত ছিল ক্লান্তিহীন, তখনো সে পড়ে নি ধুলায়।
সেই ফুলে দৃঢ় প্রত্যাশার
দিনু উপহার।

সজল সন্ধ্যায় তুমি এনেছিলে সখী,
একটি কেতকী।
তখনো হয় নি দীপ জ্বালা,
ছিলাম নিরালা।
সারিদেওয়া সুপারির আন্দোলিত সঘন সবুজে
জোনাকি ফিরিতেছিল অবিশ্রান্ত কারে খুঁজে খুঁজে

দাঁড়াইলে দুয়ারের বাহিরে আসিয়া,
গোপনে হাসিয়া।
শুধালেম আমি কৌতূহলী
'কী এনেছ' বলি'।
পাতায় পাতায় বাজে ক্ষণে ক্ষণে বারিবিন্দুপাত,
গন্ধঘন প্রদোষের অন্ধকারে বাড়াইনু হাত।

ঝংকারি উঠিল মোর অঙ্গ আচম্বিতে
কাঁটার সংগীতে
চমকিনু কী তীব্র হরষে
পরুষ পরশে।

সহজ-সাধন-লব্ধ নহে সে মুগ্ধের নিবেদন,
অন্তরে ঐশ্বর্যরাশি, আচ্ছাদনে কঠোর বেদন।
নিষেধে নিরুদ্ধ যে-সম্মান
তাই তব দান।

২০ অগস্ট ১৯২৮
চৌরঙ্গি [কলিকাতা]

দায়মোচন

চিরকাল রবে মোর প্রেমের কাঙাল,—
এ কথা বলিতে চাও বোলো।
এই ক্ষণটুকু হ'ক সেই চিরকাল ;
তার পরে যদি তুমি ভোলো
মনে করাব না আমি শপথ তোমার,
আসা যাওয়া দুদিকেই খোলা রবে দ্বার,
যাবার সময় হলে যেয়ো সহজেই,
আবার আসিতে হয় এসো।
সংশয় যদি রয় তাহে ক্ষতি নেই,
তবু ভালোবাসো যদি বেসো।

বন্ধু, তোমার পথ সম্মুখে জানি,
পশ্চাতে আমি আছি বাঁধা।
অশ্রুনয়নে বৃথা শিরে কর হানি
যাত্রায় নাহি দিব বাধা।
আমি তব জীবনের লক্ষ্য তো নহি,
ভুলিতে ভুলিতে যাবে হে চিরবিরহী ;
তোমার যা দান তাহা রহিবে নবীন
আমার স্মৃতির আঁখিজলে,
আমার যা দান সেও জেনো চিরদিন
রবে তব বিস্মৃতিতলে।

দূরে চলে যেতে যেতে দ্বিধা করি মনে
যদি কভু চেয়ে দেখ ফিরে
হয়তো দেখিবে আমি শূন্য শয়নে
নয়ন সিক্ত আঁখিনীরে।
মার্জনা করো যদি পাব তবে বল,
করুণা করিলে নাহি ঘোচে আঁখিজল,
সত্য যা দিয়েছিলে থাক্ মোর তাই,
দিবে লাজ তার বেশি দিলে।
দুঃখ বাঁচাতে যদি কোনোমতে চাই
দুঃখের মূল্য না মিলে।

দুর্বল ম্লান করে নিজ অধিকার
বরমাল্যের অপমানে।
যে পারে সহজে নিতে যোগ্য সে তার,
চেয়ে নিতে সে কভু না জানে
প্রেমেরে বাড়াতে গিয়ে মিশাব না ফাঁকি,
সীমারে মানিয়া তার মর্যাদা রাখি,
যা পেয়েছি সেই মোর অক্ষয় ধন,
যা পাই নি বড়ো সেই নয়।
চিত্ত ভরিয়া রবে ক্ষণিক মিলন
চিরবিচ্ছেদ করি জয়।

২৩ অগস্ট ১৯২৮

সবলা

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা?
নত করি' মাথা
পথপ্রান্তে কেন রব জাগি
ক্লান্তধৈর্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি
দৈবাগত দিনে।

শুধু শূন্যে চেয়ে রব ? কেন নিজে নাহি লব চিনে
সার্থকের পথ।
কেন না ছুটাব তেজে সন্ধানের রথ
দুর্ধর্ষ অশ্বেরে বাঁধি দৃঢ় বল্‌গাপাশে।
দুর্জয় আশ্বাসে
দুর্গমের দুর্গ হতে সাধনার ধন
কেন নাহি করি আহরণ
প্রাণ করি' পণ।

যাব না বাসরকক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী,—
আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী।
বীরহস্তে বরমাল্য লব একদিন
সে-লগ্ন কি একান্তে বিলীন
ক্ষীণদীপ্তি গোধূলিতে।
কভু তারে দিব না ভুলিতে
মোর দৃপ্ত কঠিনতা।
বিনম্র দীনতা
সম্মানের যোগ্য নহে তার,—
ফেলে দেবো আচ্ছাদন দুর্বল লজ্জার।

দেখা হবে ক্ষুব্ধ সিন্ধুতীরে ;
তরঙ্গগর্জনোচ্ছ্বাস মিলনের বিজয়ধ্বনিরে
দিগন্তের বক্ষে নিক্ষেপিবে।
মাথার গুণ্ঠন খুলি কব তারে, মর্ত্যে বা ত্রিদিবে
একমাত্র তুমিই আমার।
সমুদ্র-পাখির পক্ষে সেইক্ষণে উঠিবে হুংকার
পশ্চিম পবন হানি
সপ্তর্ষি-আলোকে যবে যাবে তারা পন্থা অনুমানি।

হে বিধাতা, আমারে রেখো না বাক্যহীনা,
রক্তে মোর জাগে রুদ্র বীণা।

উত্তরিয়া জীবনের সর্বোন্নত মুহূর্তের 'পরে
জীবনের সর্বোত্তম বাণী যেন ঝরে
কণ্ঠ হতে
নির্বারিত স্রোতে।
যাহা মোর অনির্বচনীয়
তারে যেন চিত্ত-মাঝে পায় মোর প্রিয়।
সময় ফুরায় যদি, তবে তার পরে
শান্ত হ'ক সে-নির্ঝর নৈঃশব্দ্যের নিস্তব্ধ সাগরে।

২৩ অগস্ট ১৯২৮

প্রতীক্ষা

তোমার প্রত্যাশা লয়ে আছি প্রিয়তমে,
চিত্ত মোর তোমারে প্রণমে।
অয়ি অনাগতা, অয়ি নিত্য প্রত্যাশিতা,
হে সৌভাগ্যদায়িনী দয়িতা।
সেবাকক্ষে করি না আহ্বান ;—
শুনাও তাহারি জয়গান
যে-বীর্য বাহিরে ব্যর্থ, যে-ঐশ্বর্য ফিরে অবাঞ্ছিত,
চাটুলুব্ধ জনতায় যে-তপস্যা নির্মম লাঞ্ছিত।

দীর্ঘ এ দুর্গম পথ মধ্যাহ্নতাপিত,
অনিদ্রায় রজনী যাপিত।
শুষ্কবাক্যবালুকার ঘূর্ণিপাক-ঝড়ে
পথিক ধুলায় শুয়ে পড়ে।
নাহি চাহি মধুর শুশ্রূষা,
হে কল্যাণী, তুমি নিষ্কলুষা,
তোমার প্রবল প্রেম প্রাণভরা সৃষ্টির নিশ্বাস,
উদ্দীপ্ত করুক চিত্তে ঊর্ধ্বশিখা বিপুল বিশ্বাস।

ধূসর প্রদোষে আজি অন্তপথ জুড়ে
নিশাচর মিথ্যা চলে উড়ে।
আলো-আঁধারের পাকে না মিলে কিনারা,
দীর্ঘ যে দেখায় হ্রস্ব যারা।
যাচে দেশ মোহের দীক্ষারে,
কাঁদে দিক বিধির ধিক্কারে,
ভাগ্যের ভিক্ষুক চাহে কুটিল সিদ্ধির আশীর্বাদ,
ধূলিতে-খুঁটিয়া-তোলা বহুজন-উচ্ছিষ্ট প্রসাদ।

কুৎসায় বিস্তারি দেয় পঙ্ক-ক্লিন্ন গ্লানি,
কলহেরে শৌর্য ব'লে জানি,
ভাবি, দুর্যোগের সিন্ধু তরিব হেলায়
বঞ্চনার ভঙ্গুর ভেলায়।
বাহিরে মুক্তিরে ব্যর্থ খুঁজি,
অন্তরে বন্ধন করি পুঁজি,
অশক্তি মজ্জায় রক্তে, শক্তি বলি জানি ছলনাকে,
মর্মগত খর্বতায় সর্বকালে খর্ব করি রাখে।

হে বাণীরূপিণী, বাণী জাগাও অভয়,
কুজ্ঝটিকা চির সত্য নয়।
চিত্তেরে তুলুক ঊর্ধ্বে মহত্ত্বের পানে
উদাত্ত তোমার আত্মদানে।
হে নারী, হে আত্মার সঙ্গিনী,
অবসাদ হতে লহো জিনি,—
স্পর্ধিত কুশ্রীতা নিত্য যতই করুক সিংহনাদ,
হে সতী সুন্দরী, আনো তাহার নিঃশব্দ প্রতিবাদ

১৭ অগস্ট ১৯২৮

লগ্ন

প্রথম মিলনদিন, সে কি হবে নিবিড় আষাঢ়ে,
যেদিন গৈরিক বস্ত্র ছাড়ে
আসন্নের আশ্বাসে সুন্দরা
বসুন্ধরা ?
প্রাঙ্গণের চারিধার ঢাকিয়া সজল আচ্ছাদনে
যেদিন সে বসে প্রসাধনে
ছায়ার আসন মেলি ;
পরি লয় নূতন সবুজরঙা চেলি,
চক্ষুপাতে লাগায় অঞ্জন,
বক্ষে করে কদম্বের কেশর রঞ্জন।
দিগন্তের অভিষেকে
বাতাস অরণ্যে ফিরি নিমন্ত্রণ যায় হেঁকে হেঁকে।
যেদিন প্রণয়ী বক্ষতলে
মিলনের পাত্রখানি ভরে অকারণ অশ্রুজলে,
কবির সংগীত বাজে গভীর বিরহে,—
নহে নহে, সেদিন তো নহে।

সে কি তবে ফাল্গুনের দিনে,
যেদিন বাতাস ফিরে গন্ধ চিনে চিনে
সবিস্ময়ে বনে বনে,
শুধায় সে মল্লিকারে কাঞ্চন-রঙ্গনে,
তুমি কবে এলে।
নাগকেশরের কুঞ্জ কেশর ধুলায় দেয় ফেলে
ঐশ্বর্যগৌরবে।
কলরবে
অজস্র মিশায় বিহঙ্গম
ফুলের বর্ণের রঙ্গে ধ্বনির সংগম ;

অরণ্যের শাখায় শাখায়
প্রজাপতিসংঘ আনে পাখায় পাখায়
চিত্রলিপি, কুসুমেরি বিচিত্র অক্ষরে ;
ধরণী যৌবনগর্বভরে
আকাশেরে নিমন্ত্রণ করে যবে
উদ্দাম উৎসবে ;
কবির বীণার তন্ত্র যে-বসন্তে ছিঁড়ে যেতে চাহে
প্রমত্ত উৎসাহে ।
আকাশে বাতাসে
বর্ণের গন্ধের উচ্চহাসে
ধৈর্য নাহি রহে,—
নহে নহে, সেদিন তো নহে ।

যেদিন আশ্বিনে শুভক্ষণে
আকাশের সমারোহ ধরণীতে পূর্ণ হয় ধনে ।
প্রাচুর্যপ্রশান্ত তট পেয়েছে সঙ্গিনী
তরঙ্গিণী—
তপস্বিনী সে-যে, তার গম্ভীর প্রবাহে—
সমুদ্রবন্দনা গান গাহে ।
মুছিয়াছে নীলাম্বর বাষ্পসিক্ত চোখ,
বন্ধমুক্ত নির্মল আলোক ।
বনলক্ষ্মী শুভব্রতা
শুভ্রের ধেয়ানে তার মেলিয়াছে অম্লান শুভ্রতা
আকাশে আকাশে
শেফালি মালতী কুন্দে কাশে ।
অপ্রগল্‌ভা ধরিত্রী-সে প্রণামে লুণ্ঠিত,
পূজারিনী নিরবগুণ্ঠিত,
আলোকের আশীর্বাদে শিশিরের স্নানে
দাহহীন শান্তি তার প্রাণে ।

দিগন্তের পথ বাহি
শূন্যে চাহি
রিক্তবিত্ত শুভ্র মেঘ সন্ন্যাসী উদাসী
গৌরীশঙ্করের তীর্থে চলিয়াছে ভাসি।
সেই স্নিগ্ধক্ষণে, সেই স্বচ্ছ সূর্যকরে,
পূর্ণতায় গম্ভীর অম্বরে
মুক্তির শান্তির মাঝখানে
তাহারে দেখিব যারে চিত্ত চাহে, চক্ষু নাহি জানে।

১৯ অগস্ট ১৯২৮

সাগরিকা

সাগরজলে সিনান করি সজল এলোচুলে
বসিয়াছিলে উপল-উপকূলে।
শিথিল পীতবাস
মাটির 'পরে কুটিলরেখা লুটিল চারি পাশ।
নিরাবরণ বক্ষে তব, নিরাভরণ দেহে
চিকন সোনা-লিখন উষা আঁকিয়া দিল স্নেহে।
মকরচূড় মুকুটখানি পরি ললাট-'পরে
ধনুকবাণ ধরি দখিন করে,
দাঁড়ানু রাজবেশী,—
কহিনু, "আমি এসেছি পরদেশী"।

চমকি ত্রাসে দাঁড়ালে উঠি শিলা-আসন ফেলে,
শুধালে, "কেন এলে"।
কহিনু আমি, "রেখো না ভয় মনে,
পূজার ফুল তুলিতে চাহি তোমার ফুলবনে"।
চলিলে সাথে, হাসিলে অনুকূল,
তুলিনু যূথী, তুলিনু জাতী, তুলিনু চাঁপাফুল।

দুজনে মিলি সাজায়ে ডালি বসিনু একাসনে,
নটরাজেরে পূজিনু একমনে।
কুহেলি গেল, আকাশে আলো দিল-যে পরকাশি
ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি।

সন্ধ্যাতারা উঠিল যবে গিরিশিখর-'পরে,
একেলা ছিলে ঘরে।
কটিতে ছিল নীল দুকূল, মালতীমালা মাথে,
কাঁকন দুটি ছিল দুখানি হাতে।
চলিতে পথে বাজায়ে দিনু বাঁশি,
"অতিথি আমি", কহিনু দ্বারে আসি।
তরাসভরে চকিতকরে প্রদীপখানি জ্বেলে
চাহিলে মুখে, কহিলে, "কেন এলে"।
কহিনু আমি, "রেখো না ভয় মনে,
তনু দেহটি সাজাব তব আমার আভরণে"।
চাহিলে হাসিমুখে,
আধোচাঁদের কনকমালা দোলানু তব বুকে
মকরচূড় মুকুটখানি কবরী তব ঘিরে
পরায়ে দিনু শিরে।
জ্বালায়ে বাতি মাতিল সখীদল,
তোমার দেহে রতনসাজ করিল ঝলমল।
মধুর হল বিধুর হল মাধবী নিশীথিনী,
আমার তালে তোমার নাচে মিলিল রিনিঝিনি।
পূর্ণ-চাঁদ হাসে আকাশ-কোলে,
আলোক-ছায়া শিব-শিবানী সাগরজলে দোলে।

ফুরাল দিন কখন্ নাহি জানি,
সন্ধ্যাবেলা ভাসিল জলে আবার তরীখানি।
সহসা বায়ু বহিল প্রতিকূলে,
প্রলয় এল সাগরতলে দারুণ ঢেউ তুলে।

লবণজলে ভরি
আঁধার রাতে ডুবাল মোর রতনভরা তরী।
আবার ভাঙা ভাগ্য নিয়ে দাঁড়ানু দ্বারে এসে
ভূষণহীন মলিন দীন বেশে।
দেখিনু আমি নটরাজের দেউলদ্বার খুলি
তেমনি করে রয়েছে ভরে ডালিতে ফুলগুলি।
হেরিনু রাতে, উতল উৎসবে
তরল কলরবে
আলোর নাচ নাচায় চাঁদ সাগরজলে যবে,
নীরব তব নম্র নত মুখে
আমারি আঁকা পত্রলেখা, আমারি মালা বুকে।
দেখিনু চুপে-চুপে
আমারি বাঁধা মৃদঙ্গের ছন্দ রূপে রূপে
অঙ্গে তব হিল্লোলিয়া দোলে
ললিতগীতকলিতকল্লোলে।

মিনতি মম শুন হে সুন্দরী,
আরেক বার সমুখে এসো প্রদীপখানি ধরি।
এবার মোর মকরচূড় মুকুট নাহি মাথে,
ধনুকবাণ নাহি আমার হাতে;
এবার আমি আনি নি ডালি দখিন সমীরণে
সাগরকূলে তোমার ফুলবনে।
এনেছি শুধু বীণা,
দেখো তো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পার কি না।

১ অক্টোবর ১৯২৭
মায়ার জাহাজ

বরণ

পুরাণে বলেছে
একদিন নিয়েছিল বেছে
স্বয়ম্বরসভাঙ্গনে দময়ন্তী সতী
নল-নরপতি
ছদ্মবেশী দেবতার মাঝে।
অর্ঘ্যহারা দেবতারা চলে গেল লাজে।
দেবমূর্তি চিনেছে সেদিন,
তারা যে ফেলে না ছায়া, তারা অমলিন।
সেদিন স্বর্গের ধৈর্য গেল টুটি,
ইন্দ্রলোক করিল ভ্রূকুটি।

তাই শুনে কত দিন একা বসে বসে
ভেবেছিনু বালিকাবয়সে,
আমি হব স্বয়ম্বরা বিশ্বসভাতলে,—
দেবতারি গলে
দিব মালা তপস্বিনী,
মানবের মাঝখানে একদিন লব তারে চিনি।
তারি লাগি সর্ব দেহে মনে
দিনে দিনে বরমাল্য গাঁথিব যতনে।

কঠিন সে পণ,
ভাবি নি কেমনে তারে করিব সাধন।
মানুষ-যে দেশে দেশে
কত ফেরে দেবতার ছদ্মবেশে;
ললাটে তিলক কারো লেখা,
দেখিতে দেখিতে ওঠে কালো হয়ে তার স্বর্ণরেখা।
কারো বা কটিতে বাঁধা শরশূন্য তূণ,
কেহ করে বজ্রধ্বনি, নাহি তাহে বজ্রের আগুন।

বাতায়নে বসে থাকি,
কতদিন কী দেখিয়া আশ্বাসে চমকি উঠে আঁখি;
চেয়ে চেয়ে দ্বিধা লাগে শেষে
বৃষ্টি হতে হতে দেখি শিলা পড়ে এসে।

একদিন রৌদ্রের বেলায়
মধ্যাহ্নের জনতার মুখর মেলায়
রাজপথ-পাশে
দাঁড়াইনু,—দেখিলাম যারা যায় আসে
তাহাদের কায়া
সম্মুখে ফেলিয়া চলে দীর্ঘতর ছায়া।
শুনিলাম স্পর্ধাতীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর
ছিন্ন করে দিতে চাহে দেবতার অখণ্ড অম্বর।
উজ্জ্বল সজ্জায়
দীন অঙ্গ সমাচ্ছন্ন ধনের লজ্জায়।
ছুটে চলে অশ্বরথ,
তার চেয়ে আড়ম্বরে সঙ্গে ওড়ে ধূলির পর্বত।

যখন সেদিন সেই উর্ধ্বশ্বাস লুব্ধ ঠেলাঠেলি
নানাশব্দে উঠিছে উদ্বেলি
তুমি দেখি পথপ্রান্তে একা হাস্যমুখে
নিঃশব্দ কৌতুকে
চেয়ে আছ,—হৃদয় আছিল জনস্রোতে,
মন ছিল দূরে সবা হতে।
তুমি যেন মহাকালসমুদ্রের তটে
নিত্যের নিশ্চল চিত্তপটে
দেখেছিলে চঞ্চলের চলমান ছবি,
শুনেছিলে ভৈরবের ধ্যান-মাঝে উমার ভৈরবী।
বহে গেল জনতার ঢেউ,—
কে-যে তুমি কোথা আছ দেখে নাই কেউ।

একা আমি দেখেছি তোমারে—
তুমিই ফেল নি ছায়া ছায়ার মাঝারে।
মালা হাতে গেনু ধেয়ে,
হাসিলে আমার পানে চেয়ে।
মোর স্বয়ম্বরে
সেদিন মর্ত্যের মুখ ভ্রূকুটিল অবজ্ঞার ভরে

২৬ অগস্ট ১৯২৮

পথবর্তী

দূর মন্দিরে সিন্ধুকিনারে
পথে চলিয়াছ তুমি।
আমি তরু মোর ছায়া দিয়ে তারে
মৃত্তিকা তার চুমি।
হে তীর্থগামী, তব সাধনার
অংশ কিছু-বা রহিল আমার,
পথপাশে আমি তব যাত্রার
রহিব সাক্ষীরূপে।
তোমার পূজায় মোর কিছু যায়
ফুলের গন্ধধূপে।

তব আহ্বানে বরণ করিয়া
নিয়েছি দুর্গমেরে।
ক্লান্তি কিছু-বা নিলাম হরিয়া
মোর অঞ্চল-ঘেরে।
যা ছিল কঠোর, যাহা নিষ্ঠুর
তার সাথে কিছু মিলাই মধুর,
যা ছিল অজানা, যাহা ছিল দূর
আমি তারি মাঝে থেকে

দিনু পথ-'পরে শ্যাম অক্ষরে
জানার চিহ্ন এঁকে।

মোর পরিচয়ে তোমার পথের
কিছু রহে পরিচয়।
তব রচনায় তব ভকতের
কিছু বাণী মিশে রয়।
তোমার মধ্যদিবসের তাপে
আমার স্নিগ্ধ কিশলয় কাঁপে,
মোর পল্লব সে-মন্ত্র জাপে
গভীর যা তব মনে,
মোর ফলভার মিলানু তোমার
সাধনফলের সনে।

বেলা চলে যাবে, একদা যখন
ফুরাবে যাত্রা তব,
শেষ হবে যবে মোর প্রয়োজন
হেথাই দাঁড়ায়ে রব।
এই পথখানি রবে মোর প্রিয়,
এই হবে মোর চিরবরণীয়,
তোমারি স্মরণে রব স্মরণীয়,
না মানিব পরাভব।
তব উদ্দেশে অর্পিব হেসে
যা-কিছু আমার সব

২৭ অগস্ট ১৯২৮

মুক্তরূপ

তোমারে আপন কোণে স্তব্ধ করি যবে
পূর্ণরূপে দেখি না তোমায়,
মোর রক্ততরঙ্গের মত্ত কলরবে
বাণী তব মিশে ভেসে যায়।

তোমার পাখারে আমি রুদ্ধ করি বুঝি,
সে-বন্ধনে তোমারেই পাই না তো খুঁজি,
তুমি তো ছায়ার নহ, প্রভাতবিলাসী,
আলোতেই তোমার প্রকাশ,
তোমার ডানার ছন্দে তব উচ্চ হাসি
যাক চলে ভেদিয়া আকাশ।

জানি, যদি লুব্ধ মনে কৃপণতা করি,
ঐশ্বর্যেও দৈন্য না ঘুচায়,
ব্যর্থ ভাণ্ডারের তরে রহিব প্রহরী,
বঞ্চনা করিব আপনায়।
আত্মা যেথা লুপ্ত থাকে সেথা উপচ্ছায়া
মুগ্ধ চেতনার 'পরে রচে তার মায়া,
তাই নিয়ে ভুলাব কি আমার জীবন।
গাঁথিব কি বুদ্‌বুদের হার।
তোমারে আড়াল ক'রে তোমার স্বপন
মিটাবে কি আকাঙ্ক্ষা আমার।

বিরাজে মানবশৌর্যে সূর্যের মহিমা,
মর্ত্যে সে তিমিরজয়ী প্রভু,
অজেয় আত্মার রশ্মি, তারে দিবে সীমা
প্রেমের সে ধর্ম নহে কভু।
যাও চলি রণক্ষেত্রে, লও শঙ্খ তুলি,
পশ্চাতে উড়ুক তব রথচক্রধূলি,
নির্দয় সংগ্রাম-অন্তে মৃত্যু যদি আসি
দেয় ভালে অমৃতের টিকা,
জানি যেন সে-তিলকে উঠিল প্রকাশি
আমারো জীবনজয়লিখা।

আমার প্রাণের শক্তি প্রাণে তব লহো,
মোর দুঃখযজ্ঞের শিখায়

জ্বালিবে মশাল তব, আতঙ্কদুঃসহ
রাত্রিরে দহি সে যেন যায়।
তোমারে করিনু দান শ্রদ্ধার পাথেয়,
যাত্রা তব ধন্য হ'ক, যাহা কিছু হেয়
ধূলিতলে হ'ক ধূলি, দ্বিধা যাক মরি,
চরিতার্থ হ'ক ব্যর্থতাও,
তোমার বিজয়মাল্য হতে ছিন্ন করি
আমারে একটি পুষ্প দাও।

২৯ অগস্ট ১৯২৮

স্পর্ধা

শ্লথপ্রাণ দুর্বলের স্পর্ধা আমি কভু সহিব না।
লোলুপ সে লালায়িত, প্রেমেরে সে করে বিড়ম্বনা
ক্লেদঘন চাটুবাক্যে, বাষ্পে বিজড়িত দৃষ্টি তার
কলুষকুণ্ঠিত অঙ্গে লিপ্ত করে গ্লানি লালসার,
আবেশে মন্থর কণ্ঠে গদ্‌গদ সে প্রার্থনা জানায়,
আলোকবঞ্চিত তার অন্তরের কানায় কানায়
দুষ্ট ফেন উঠে বুদ্‌বুদিয়া,— ফেটে যায়, দেয় খুলি
রুদ্ধ বিষবায়ু। গলিত মাংসের যেন ক্রিমিগুলি
কল্পনাবিকার তার, শিথিল চিন্তার তলে তলে
আকুলিতে থাকে কিলিবিলি।— যেন প্রাণপণ বলে
মন তারে করে কষাঘাত। জীর্ণমজ্জা কাপুরুষে
নারী যদি গ্রাহ্য করে, লজ্জিত দেবতা তারে দুষে
অসহ্য সে অপমানে। নারী সে-যে মহেন্দ্রের দান,
এসেছে ধরিত্রীতলে পুরুষেরে সঁপিতে সম্মান।

৩০ অগস্ট ১৯২৮
জোড়াসাঁকো

রাখিপূর্ণিমা

কাহারে পরাব রাখি যৌবনের রাখিপূর্ণিমায়,
হে মোর ভাগ্যের দেব। লগ্ন যেন বহে নাহি যায়।
মেঘে আজি আবিষ্ট অম্বর, ঘন বৃষ্টি-আচ্ছাদনে
অস্পষ্ট আলোর মন্ত্র আকাশ নিবিষ্ট হয়ে শোনে,
বুঝিতে পারে না ভালো। আমি ভাবিতেছি একা বসে
আমার বাঞ্ছিত কবে বাহিরিল প্রচ্ছন্ন প্রদোষে
চিহ্নহীন পথে। এসেছিল দ্বারের সম্মুখে মোর
ক্ষণতরে। তখনো রজনী মম হয় নাই ভোর,
হৃদয় অস্ফুট ছিল অর্ধ জাগরণে। ডাকে নি সে
নাম ধরে, দুয়ারে করে নি করাঘাত, গেছে মিশে
সমুদ্রতরঙ্গরবে তাহার অশ্বের হ্রেষাধ্বনি।
হে বীর অপরিচিত, শেষ হল আমার রজনী,
জানা তো হল না কোন্ দুঃসাধ্যের সাধন লাগিয়া
অস্ত্র তব উঠিল ঝঞ্চনি। আমি রহিনু জাগিয়া।

৩১ অগস্ট ১৯২৮

আহ্বান

কোথা আছ? ডাকি আমি। শোনো শোনো, আছে প্রয়োজন
একান্ত আমারে তব। আমি নহি তোমার বন্ধন;—
পথের সম্বল মোর প্রাণে। দুর্গমে চলেছ তুমি
নীরস নিষ্ঠুর পথে,— উপবাসহিংস্র সেই ভূমি
আতিথ্যবিহীন; উদ্ধত নিষেধদণ্ড রাত্রিদিন
উদ্যত করিয়া আছে ঊর্ধ্ব-পানে। আমি ক্লান্তিহীন
সেই সঙ্গ দিতে পারি, প্রাণবেগে বহন যে করে
শুশ্রূষার পূর্ণশক্তি আপনার নিঃশঙ্ক অন্তরে,—
যথা রুক্ষ রিক্তবৃক্ষ শৈলবক্ষ ভেদি অহরহ
দুর্দাম নির্ঝরে ঢালে দুর্নিবার সেবার আগ্রহ,

শুকায় না রসবিন্দু প্রখর নির্দয় সূর্যতেজে,
নীরস প্রস্তরমুষ্টিতলে দৃঢ়বলে রাখে সে-যে
অক্ষয় সম্পদরাশি। সহাস্য উজ্জ্বল গতি তার
দুর্যোগে অপরাজিত, অবিচল বীর্যের আধার।

১ সেপ্টেম্বর ১৯২৮

বাপী

একদা বিজনে যুগল তরুর মূলে
তৃষ্ণার জল তুমি দিয়েছিলে তুলে।
আর কোনোখানে ছায়া নাহি দেখি,
শুধালেম, কাছে বসিতে দিবে কি।
সেদিন তোমার ঘরে ফিরিবার বেলা
বহে গেল বুঝি, কাজে হয়ে গেল হেলা।

অদূরে হোথায় ভাঙা দেউলের ধারে
পূর্ব যুগের পূজাহীন দেবতারে
প্রভাত-অরুণ প্রতিদিন খোঁজে,
শূন্য বেদির অর্থ না বোঝে,
দিন শেষ হলে সন্ধ্যাতারার আলো
যে-পূজারী নাই তারে বলে, দীপ জ্বালো।

একদিন বুঝি দূরে কোন্ রাজধানী
রচনা করেছে দীর্ঘ এ পথখানি।
আজি তার নাম নাই ইতিহাসে,
জীর্ণ হয়েছে বালুকার গ্রাসে,
প্রান্তরশেষে শীর্ণ বনের কোলে
জনপদবধূ জল নিয়ে যায় চলে।

লুপ্তকালের শুষ্ক সাগরধারে
বহু বিস্মৃতি যেথা রয় স্তূপাকারে,
অতি পুরাতন কাহিনী যেথায়
রুদ্ধ কণ্ঠে শূন্যে তাকায়,
হারানো ভাষার নিশার স্বপ্নছায়ে
হেরিনু তোমায়, আসিনু ক্লান্ত পায়ে।

শুধু দুটি তরু মরুর প্রাণের কথা,
লুকানো কী রসে বাঁচে তার শ্যামলতা।
সেদিন তাহারি মর্মর সনে
কী ব্যথা মিশানু, জানে দুইজনে;
মাথার উপরে উড়ে গেল কোন্ পাখি
হতাশ পাখার হাহাকাররেখা আঁকি।

তপ্ত বালুরে ভর্ৎসিয়া মুহুমুহু
তাপিত বাতাস চিৎকারি উঠে হুহু;
ধূলির ঘূর্ণি, যেন বেঁকে বেঁকে
শাপ-লাগা প্রেত নাচে থেকে থেকে;
রূঢ় রুদ্র রিক্তের মাঝখানে
দুইটি প্রহর ভরেছিনু প্রাণে গানে।

দিন শেষ হল, চলে যেতে হল একা,
বলিনু তোমারে, আরবার হবে দেখা।
শুনে হেসেছিলে হাসিখানি ম্লান,
তরুণ হৃদয়ে যেন তুমি জান
অসীমের বুকে অনাদি বিষাদখানি
আছে সারাখন মুখে আবরণ টানি।

তার পরে কত দিন চলে গেল মিছে
একটি দিনেরে দলিয়া পায়ের নীচে।

বহু পরে যবে ফিরিলাম প্রিয়ে,
এ-পথে আসিতে দেখি চমকিয়ে
আছে সেই কূপ, আছে সে যুগলতরু।
তুমি নাই, আছে তৃষিত স্মৃতির মরু॥

এ কূপের তলে মোর যক্ষের ধন
একটি দিনের দুর্লভ সেইখন
চিরকাল ভরি' রহিল লুকানো,
ওগো অগোচরা জান নাহি জান ;
আর কোনো দিনে অন্য যুগের প্রিয়া
তারে আর কারে দিবে কি উদ্ধারিয়া।

১ সেপ্টেম্বর ১৯২৮

মহুয়া

বিরক্ত আমার মন কিংশুকের এত গর্ব দেখি'।
নাহি ঘুচিবে কি
অশোকের অতিখ্যাতি, বকুলের মুখর সম্মান।
ক্লান্ত কি হবে না কবিগান
মালতীর মল্লিকার
অভ্যর্থনা রচি' বারম্বার ?
রে মহুয়া, নামখানি গ্রাম্য তোর, লঘু ধ্বনি তার,
উচ্চশিরে তবু রাজকুলবনিতার
গৌরব রাখিস ঊর্ধ্বে ধরে।
আমি তো দেখেছি তোরে
বনস্পতিগোষ্ঠী-মাঝে অরণ্যসভায়
অকুণ্ঠিত মর্যাদায়
আছিস দাঁড়ায়ে ;
শাখা যত আকাশে বাড়ায়ে

শাল তাল সপ্তপর্ণ অশ্বত্থের সাথে
প্রথম প্রভাতে
সূর্য-অভিনন্দনের তুলেছিস গম্ভীর বন্দন।
অপ্রসন্ন আকাশের ভ্রূভঙ্গে যখন
অরণ্য উদ্বিগ্ন করি তোলে,
সেই কালবৈশাখীর ক্রুদ্ধ কলরোলে
শাখাব্যূহে ঘিরে
আশ্বাস করিস দান শঙ্কিত বিহঙ্গ অতিথিরে।
অনাবৃষ্টিক্লিষ্ট দিনে,
বিশীর্ণ বিপিনে,
বন্যবুভুক্ষুর দল ফেরে রিক্ত পথে,
দুর্ভিক্ষের ভিক্ষাঞ্জলি ভরে তারা তোর সদাব্রতে

বহুদীর্ঘ সাধনায় সুদৃঢ় উন্নত
তপস্বীর মতো
বিলাসের চাঞ্চল্যবিহীন,
সুগম্ভীর সেই তোরে দেখিয়াছি অন্যদিন
অন্তরে অধীরা
ফাল্গুনের ফুলদোলে কোথা হতে জোগাস মদিরা
পুষ্পপুটে ;
বনে বনে মৌমাছিরা চঞ্চলিয়া উঠে।
তোর সুরাপাত্র হতে বন্যনারী
সম্বল সংগ্রহ করে পূর্ণিমার নৃত্যমত্ততারি।
রে অটল, রে কঠিন,
কেমনে গোপনে রাত্রিদিন
তরল যৌবনবহ্নি মজ্জায় রাখিয়াছিলি ভরে।
কানে কানে কহি তোরে
বধূরে যেদিন পাব, ডাকিব মহুয়া নাম ধরে।

৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৮
[জোড়াসাঁকো]

দীনা

তোমারে সম্পূর্ণ জানি হেন মিথ্যা কখনো কহি নি,
প্রিয়তম, আমি বিরহিণী
পরিপূর্ণ মিলনের মাঝে।
মোর স্পর্শে বাজে
যে-তন্ত্রটি তোমার বীণায়,
তাহারি পঞ্চম স্বরে তোমারে কি নিঃশেষে চিনায়
তোমার বসন্ত রাগে,
নিদ্রাহীন রজনীর পরজে বেহাগে।
সে-তন্ত্র সোনার বটে,— বিভাসে ললিতে
যে কথা সে চেয়েছে বলিতে
তাইতে হয়েছে পূর্ণ এ আমার জীবন-অঞ্জলি।
তবু সত্য করে বলি,
ব্যথা লাগে বুকে
যখন সহসা আসি তোমার সম্মুখে
নিভৃত তোমার ঘরে
স্বপ্নভাঙা প্রথম প্রহরে,—
যখন জাগে নি পাখি, রক্তিম আকাশে
আসন্ন অরণ্যগাথা নব সূর্যোদয়-আশে
রয়েছে স্তম্ভিত,
পিঙ্গল আভায় দীপ্ত জটা বিলম্বিত
অরুণ সন্ন্যাসী
করজোড়ে আছে স্থির আলোকপ্রত্যাশী,—
তখন তোমার মুখ চেয়ে দেখিয়াছি ভয়ে ভয়ে,
জেনেছি হৃদয়ে
তুমিই অচেনা।
কোনো দিন ফুরাবে না
পরিচয়; তোমারে বুঝিব আমি করি না সে আশা,
কথায় যা বল নাই, আমি-যে জানি না তার ভাষা।

ভয় হয় পাছে
যে-সম্পদ চেয়েছিলে মোর কাছে
সে-যে মোর নাই, তাই শেষে পড়ে ধরা,
দেখ দূর হতে এসে জলাশয়ে জল নাই ভরা।
তখন নিয়ো না যেন অপরাধ মোর,
হয়ো না কঠোর,
তুমি যদি মুগ্ধ মনে ভুলে থাক, তবু
গভীর দীনতা মোর গোপন করি নি আমি কভু।
মোর দ্বারে যবে এলে অন্যমনা
সে কি মোর কিছু নিয়ে পুরাতে কামনা।
নহে নহে, হে রাজন, তোমার অনেক ধন আছে,
তাই তুমি আস মোর কাছে
দেবার আনন্দ তব পূর্ণ করিবার লাগি ;
যদি তাই পূর্ণ হয়, তবে আমি নহি তো অভাগী।

৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৮

সৃষ্টিরহস্য

সৃষ্টির রহস্য আমি তোমাতে করেছি অনুভব,
নিখিলের অস্তিত্বগৌরব।
তুমি আছ, তুমি এলে,
এ বিস্ময় মোর পানে আপনারে নিত্য আছে মেলে
অলৌকিক পদ্মের মতন।
অন্তহীন কাল আর অসীম গগন
নিদ্রাহীন আলো
কী অনাদি মন্ত্রে তারা অঙ্গ ধরি তোমাতে মিলাল।
যুগে যুগে কী অক্লান্ত সাধনায়,
অগ্নিময়ী বেদনায়,
নিমেষে হয়েছে ধন্য শক্তির মহিমা
পেয়ে আপনার সীমা

ওই মুখে, ওই চক্ষে, ওই হাসিটিতে।
সেই সৃষ্টিতপস্যার সার্থক আনন্দ মোর চিতে
স্পর্শ করে, যবে তব মুখে মেলি' আঁখি
সম্মুখে তোমার বসে থাকি।

২০ অগস্ট ১৯২৮

নাম্নী

শামলী

সে যেন গ্রামের নদী
বহে নিরবধি
মৃদুমন্দ কলকলে ;
তরঙ্গের ভঙ্গী নাই, আবর্তের ঘূর্ণি নাই জলে ;
নুয়ে-পড়া তটতরু ঘনচ্ছায়া-ঘেরে
ছোটো করে রাখে আকাশেরে।
জগৎ সামান্য তার, তারি ধূলি-'পরে
বনফুল ফোটে অগোচরে,
মধু তার নিজ মূল্য নাহি জানে,
মধুকর তারে না বাখানে।
গৃহকোণে ছোটো দীপ জ্বালায় নেবায়,
দিন কাটে সহজ সেবায়।
স্নান সাজ করি এলোচুলে
অপরাজিতার ফুলে
প্রভাতে নীরব নিবেদনে
স্তব করে একমনে।
মধ্যদিনে বাতায়নতলে
চেয়ে দেখে নিম্নে দিঘিজলে
শৈবালের ঘনস্তর,
পতঙ্গের খেলা তারি 'পর।

আবছায়া কল্পনায়
ভাষাহীন ভাবনায়
মন তার ভরে
মধ্যাহ্নের অব্যক্ত মর্মরে।
সায়াহ্নের শান্তিখানি নিয়ে ঘোমটায়
নদীপথে যায়
ঘট কাঁখে
বেণুবীথিকার বাঁকে বাঁকে
ধীর পায়ে চলি',—
নাম কি শামলী।

কাজলী

প্রচ্ছন্ন দাক্ষিণ্যভারে চিত্ত তার নত
স্তম্ভিত মেঘের মতো,
তৃষ্ণাহরা
আষাঢ়ের আত্মদান-প্রত্যাশায় ভরা।
সে যেন গো তমালের ছায়াখানি,
অবগুণ্ঠনের তলে পথ-চাওয়া আতিথ্যের বাণী।
যে-পথিক একদিন আসিবে দুয়ারে
ক্লিষ্ট ক্লান্তিভারে,
সেই অজানার লাগি গৃহকোণে আনতনয়ন
বুনিছে শয়ন।
সে যেন গো কাকচক্ষু স্বচ্ছ দিঘিজল
অচঞ্চল,
কানায় কানায় ভরা,
শীতল অতল-মাঝে প্রসন্ন কিরণ দেয় ধরা।
কালো চক্ষুপল্লবের কাছে
থমকিয়া আছে

স্তব্ধ ছায়া পাতি'
হাসির খেলার সাথী
সুগভীর স্নিগ্ধ অশ্রুবারি ;
যেন তাহা দেবতারি
করুণা-অঞ্জলি,—
নাম কি কাজলী।

হেঁয়ালী

যারে সে বেসেছে ভালো তারে সে কাঁদায়।
নূতন ধাঁধায়
ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া দেয় তারে,
কেবলি আলো-আঁধারে
সংশয় বাধায় ;
ছল-করা অভিমানে বৃথা সে সাধায়।
সে কি শরতের মায়া
উড়ো মেঘে নিয়ে আসে বৃষ্টিভরা ছায়া।
অনুকূল চাহনির তলে
কী বিদ্যুৎ ঝলে।
কেন দয়িতের মিনতিকে
অভাবিত উচ্চ হাস্যে উড়াইয়া দেয় দিকে দিকে।
তার পরে আপনার নির্দয় লীলায়
আপনি সে ব্যথা পায়,
ফিরে যে গিয়েছে তারে ফিরায়ে ডাকিতে কাঁদে প্রাণ ;
আপনার অভিমানে করে খানখান।
কেন তার চিত্তাকাশে সারা বেলা
পাগল হাওয়ার এই এলোমেলো খেলা।
আপনি সে পারে না বুঝিতে
যেদিকে চলিতে চায় কেন তার চলে বিপরীতে।
গভীর অন্তরে
যেন আপনার অগোচরে

আপনার সাথে তার কী আছে বিরোধ,
অন্যেরে আঘাত করে আত্মঘাতী ক্রোধ ;
মুহূর্তেই বিগলিত করুণায়
অপমানিতের পায়
প্রাণমন দেয় ঢালি,—
নাম কি হেঁয়ালী।

খেয়ালী

মধ্যাহ্নে বিজন বাতায়নে
সুদূর গগনে
কী দেখে সে ধানের খেতের পরপারে,—
নিরালা নদীর পথে দিগন্তে সবুজ অন্ধকারে
যেখানে কাঁঠাল জাম নারিকেল বেত
প্রসারিয়া চলেছে সংকেত
অজানা গ্রামের,
সুখ দুঃখ জন্ম মৃত্যু অখ্যাত নামের।
অপরাহ্নে ছাদে বসি',
এলোচুল বুকে পড়ে খসি,
গ্রন্থ নিয়ে হাতে
উদাস হয়েছে মন সে-যে কোন্ কবিকল্পনাতে।
সুদূরের বেদনায়
অতীতের অশ্রুবাষ্প হৃদয়ে ঘনায়।
বীরের কাহিনী
না-দেখা জনের লাগি তারে যেন করে বিরহিণী।
পূর্ণিমানিশীথে
স্রোতে-ভাসা একা তরী যবে সকরুণ সারিগীতে
ছায়াঘন তীরে তীরে সুপ্তিতে সুরের ছবি আঁকে,
উৎসুক আকাঙ্ক্ষা জেগে থাকে

নিষুপ্ত প্রহরে,
অহৈতুক বারিবিন্দু ঝরে
আঁখিকোণে ;
যুগান্তরপার হতে কোন্ পুরাণের কথা শোনে।
ইচ্ছা করে সেই রাতে
লিপিখানি লেখে ভূর্জপাতে
লেখনীতে ভরি লয়ে দুঃখে-গলা কাজলের কালি,—
নাম কি খেয়ালী।

কাকলী

কলছন্দে পূর্ণ তার প্রাণ,—
নিত্য বহমান
ভাষার কল্লোলে
জাগাইয়া তোলে
চারিধারে
প্রত্যহের জড়তারে ;
সংগীতে তরঙ্গ তুলি,
হাসিতে ফেনিল তার ছোটো দিনগুলি
আঁখি তার কথা কয়, বাহুভঙ্গী কত কথা বলে,
চরণ যখন চলে
কথা কয়ে যায়—
যে-কথাটি অরণ্যের পাতায় পাতায়,
যে-কথাটি ঢেউ তোলে
আশ্বিনে ধানের খেতে— প্রান্ত হতে প্রান্তে যায় চলে,
যে-কথাটি নিশীথতিমিরে
তারায় তারায় কাঁপে অধীর ঝিমিরে,
যে-কথাটি মহুয়ার বনে
মধুপগুঞ্জনে
সারাবেলা উঠিছে চঞ্চলি,—
নাম কি কাকলী।

পিয়ালী

চাহনি তাহার, সব কোলাহল হ'লে সারা
সন্ধ্যার তিমিরে ভাসা তারা।
মৌনখানি সুমধুর মিনতিরে
লতায়ে লতায়ে যেন মনের চৌদিকে দেয় ঘিরে,
নির্বাক চাহিয়া থাকে নাহি পায় ভেবে
কেমন করিয়া কী-যে দেবে।
দুয়ার-বাহিরে
আসে ধীরে,
ক্ষণেক নীরব থেকে চলে যায় ফিরে।
নাও যদি কয় কথা
মনে যেন ভরি দেয় সুস্নিগ্ধ মমতা।
পায়ের চলায়
কিছু যেন দান করে ধূলির তলায়।
তারে কিছু করিলে জিজ্ঞাসা,
কিছু বলে, কিছু তবু বাকি থাকে ভাষা।
নিঃশব্দে খুলিয়া দ্বার
অঞ্চলে আড়াল করি সে যেন কাহার
আনিয়াছে সৌভাগ্যের থালি,—
নাম কি পিয়ালী।

দিয়ালী

জনতার মাঝে
দেখিতে পাই নে তারে, থাকে তুচ্ছ সাজে।
ললাটে ঘোমটা টানি
দিবসে লুকায়ে রাখে নয়নের বাণী।
রজনীর অন্ধকার
তুলে দেয় আবরণ তার।

রাজরানীবেশে
অনায়াসগৌরবের সিংহাসনে বসে মৃদু হেসে।
বক্ষে হার ঝলমলে,
সীমন্তে অলকে জ্বলে
মাণিক্যের সীঁথি।
কী যেন বিস্মৃতি
সহসা ঘুচিয়া যায়, টুটে দীনতার ছদ্মসীমা,
মনে পড়ে আপন মহিমা।
ভক্তেরে সে দেয় পুরস্কার
বরমাল্য তার
আপন সহস্র দীপ জ্বালি,—
নাম কি দিয়ালী।

নাগরী

ব্যঙ্গসুনিপুণা,
শ্লেষবাণসন্ধানদারুণা।
অনুগ্রহবর্ষণের মাঝে
বিদ্রূপবিদ্যুৎঘাত অকস্মাৎ মর্মে এসে বাজে।
সে যেন তুফান
যাহারে চঞ্চল করে সে-তরীকে করে খানখান
অট্টহাস্য আঘাতিয়া এপাশে ওপাশে ;
প্রশ্রয়ের বীথিকায় ঘাসে ঘাসে
রেখেছে সে কণ্টক-অঙ্কুর বুনে বুনে ;
অদৃশ্য আগুনে
কুঞ্জ তার বেড়িয়াছে ;
যারা আসে কাছে
সব থেকে তারা দূরে রয় ;

মোহমন্ত্রে যে-হৃদয়
করে জয়
তারি 'পরে অবজ্ঞায় দারুণ নির্দয়।
আপন তপস্যা লয়ে যে-পুরুষ নিশ্চল সদাই,
যে উহারে ফিরে চাহে নাই,
জানি সেই উদাসীন
একদিন
জিনিয়াছে ওরে,
জ্বালাময়ী তারি পায়ে দীপ্ত দীপ দিল অর্ঘ্য ভরে।
বিদুষী নিয়েছে বিদ্যা শুধু চিত্তে নয়,
আপন রূপের সাথে ছন্দ তারে দিল অঙ্গময়
বুদ্ধি তার ললাটিকা,
চক্ষুর তারায় বুদ্ধি জ্বলে দীপশিখা;
বিদ্যা দিয়ে রচে নাই পণ্ডিতের স্থূল অহংকার।
বিদ্যারে করেছে অলংকার।
প্রসাধনসাধনে চতুরা,
জানে সে ঢালিতে সুরা
ভূষণভঙ্গীতে,
অলক্তের আরক্ত ইঙ্গিতে।
জাদুকরী বচনে চলনে;
গোপন সে নাহি করে আপন ছলনে;
অকপট মিথ্যারে সে নানা রসে করিয়া মধুর
নিন্দা তার করি দেয় দূর;
জ্যোৎস্নার মতন
গোপনেও নহে সে গোপন।
আঁধার-আলোরি কোলে রয়েছে জাগরি,—
নাম কি নাগরী।

সাগরী

বাহিরে সে দুরন্ত আবেগে
উচ্ছলিয়া উঠে জেগে,—
উচ্চহাস্যতরঙ্গ সে হানে
সূর্যচন্দ্র-পানে।
পাঠায় অস্থির চোখ—
আলোকের উত্তরে আলোক।
কভু অন্ধকারপুঞ্জে দেখা দেয় ঝঞ্ঝার ভ্রূকুটি,
ক্ষণে ক্ষণে
আন্দোলনে
প্রচণ্ড অধৈর্যবেগে তটের মর্যাদা ফেলে টুটি।
গভীর অন্তর তার নিস্তব্ধ গম্ভীর,
কোথা তল, কোথা তীর ;
অগাধ তপস্যা যেন রেখেছে সঞ্চিত করি,—
নাম কি সাগরী।

জয়ন্তী

যেন তার চক্ষু-মাঝে
উদ্যত বিরাজে
মহেশের তপোবনে নন্দীর তর্জনী।
ইন্দ্রের অশনি
মৌনে তার ঢাকা ;
প্রাণ তার অরুণের পাখা
মেলিল দিনের বক্ষে তীব্র অতৃপ্তিতে
দুঃসহ দীপ্তিতে।
সাধক দাঁড়ায় তার কাছে—
সহসা সংশয় লাগে যোগ্যতা কি আছে ;
দুঃসাধ্যসাধন-তরে
পথ খুঁজে মরে।

তুচ্ছতারে দাহে তার অবজ্ঞাদহন ;
এনেছে সে করিয়া বহন
ইন্দ্রাণীর গাঁথা মাল্য ; দিবে কণ্ঠে তার
কার্মুকে যে দিয়েছে টংকার,
কাপট্যেরে হানিয়াছে সত্যে যার ঋণী বসুমতী,—
নাম কি জয়তী।

ঝামরী

সে যেন খসিয়া-পড়া তারা,
মর্ত্যের প্রদীপে নিল মৃত্তিকার কারা।
নগরে জনতামরু,
সে যেন তাহারি মাঝে পথপ্রান্তে সঙ্গিহীন তরু,
তারে ঢেকে আছে নিতি
অরণ্যের সুগভীর স্মৃতি।
সে যেন অকালে-ফোটা কুবলয়,
শিশিরে কুণ্ঠিত হয়ে রয়।
মন পাখা মেলিবারে চায়
চারিদিকে ঠেকে যায়,
জানে না কিসের বাধা তার ;
অদৃষ্টের মায়াদুর্গদ্বার
কোন্ রাজপুত্র এসে
মন্ত্রবলে ভেঙে দেবে শেষে।
আকাশে আলোতে
নিমন্ত্রণ আসে যেন কোথা হতে,
পথ রুদ্ধ চারিধারে,
মুখ ফুটে বলিতে না পারে
অলক্ষ্য কী আচ্ছাদনে কেন সে আবৃতা।
সে যেন অশোকবনে সীতা,

চারিদিকে যারা আছে কেহ তার নহেক স্বকীয় ;
কে তারে পাঠাবে অঙ্গুরীয়
বিচ্ছেদের অতল সমুদ্রপারে ;
আঁখি তুলে তাই বারে বারে
চেয়ে দেখে নিরুত্তর নিঃশব্দ গগনে।

কোন্ দেব নিত্যনির্বাসনে
পাঠাল তাহারে।
স্বর্গের বীণার তারে
সংগীতে কি করেছিল ভুল।
মহেন্দ্রের-দেওয়া ফুল
নৃত্যকালে খসে গেলে অন্যমনে দলেছিল কভু ?
আজো তবু
মন্দারের গন্ধ যেন আছে তার বিষাদে জড়ানো,
অধরে রয়েছে তার ম্লান—
সন্ধ্যার গোলাপসম—
মাঝখানে-ভেঙে-যাওয়া অমরার গীতি অনুপম।
অদৃশ্য যে-অশ্রুধারা
আবিষ্ট করেছে তার চক্ষুতারা,
তাহা দিব্য বেদনার করুণানির্ঝরী,—
নাম কি ঝামরী।

মুরতি

যে-শক্তির নিত্যলীলা নানা বর্ণে আঁকা,
যে-গুণী প্রজাপতির পাখা
যুগ যুগ ধ্যান করি একদা কী খনে
রচিল অপূর্ব চিত্রে বিচিত্র লিখনে,
এই নারী
রচনা তাহারি।

এ শুধু কালের খেলা
এর দেহ কী আলস্যে বিধাতা একেলা
রচিলেন সন্ধ্যাকালে
আপনার অর্থহীন ক্ষণিক খেয়ালে—
যে-লগনে
কর্মহীন ক্লান্তক্ষণে
মেঘের মহিমামায়া মুহূর্তেই মুগ্ধ করি আঁখি
অন্ধরাত্রে বিনা ক্ষোভে যায় মুখ ঢাকি।
শরতে নদীর জলে যে-ভঙ্গিমা,
বৈশাখে দাড়িম্ববনে যে-রাগরঙ্গিমা
যৌবনের দাপে
অবজ্ঞাকটাক্ষ হানে মধ্যাহ্নের তাপে,
শ্রাবণের বন্যাতলে হারা
ভেসে-যাওয়া শৈবালের যে-নৃত্যের ধারা,
মাঘশেষে অশ্বত্থের কচি পাতাগুলি
যে-চাঞ্চল্যে উঠে দুলি,
হেমন্তের প্রভাতবাতাসে
শিশিরে যে-ঝিলিমিলি ঘাসে ঘাসে,
প্রথম আষাঢ়দিনে গুরু গুরু রবে
ময়ূরের পুচ্ছপুঞ্জ উল্লসিয়া উঠে যে-গৌরবে
তাই দিয়ে রচিত সুন্দরী ;—
লতা যেন নারী হয়ে দিল চক্ষু ভরি।

রঙিন বুদ্বুদ সে কি, ইন্দ্রধনু বুঝি,
অন্তর না পাই খুঁজি—
সকলি বাহির,
চিত্ত অগভীর।
কারো পথ চেয়ে নাহি থাকে,
কারে-না-পাওয়ার দুঃখ মনে নাহি রাখে

মুগ্ধ প্রাণ-উপহার
অনায়াসে নেয়, আর অনায়াসে ভোলে দায় তার।
ভুবনে যেখানে যত নয়নের আনন্দলহরী
তাই দেখা দিতে এল নারীমূর্তি ধরি।
সরস্বতী রচিলেন মন তার কোন্ অবসরে
রাগহীন বাণীহীন গুঞ্জনের স্বরে;
অমৃতে মাটিতে মেশা সৃজনের এ কোন্ সুরতি,—
নাম কি মুরতি।

মালিনী

হাসিমুখ নিয়ে যায় ঘরে ঘরে,
সখীদের অবকাশ মধু দিয়ে ভরে।
প্রসন্নতা তার অন্তহীন
রাত্রিদিন
গভীর কী উৎস হতে
উচ্ছলিছে আলোঝলা কথাবলা স্রোতে।
মর্ত্যের ম্লানতা তারে
পারে নি তো স্পর্শ করিবারে।
প্রভাতে সে দেখা দিলে মনে হয় যেন সূর্যমুখী
রক্তারুণ উল্লাসে কৌতুকী।
মধ্যাহ্নের স্থলপদ্ম অমলিন রাগে
প্রফুল্ল সে সূর্যের সোহাগে,
সায়াহ্নের জুঁই সে-যে,
গন্ধে যার প্রদোষের শূন্যতায় বাঁশি ওঠে বেজে।
মৈত্রীসুধাময় চোখে
মাধুরী মিশায়ে দেয় সন্ধ্যাদীপালোকে।
রজনীগন্ধা সে রাতে, দেয় পরকাশি
আনন্দহিল্লোল রাশি রাশি;
সঙ্গহীন আঁধারের নৈরাশ্যকালিনী,—
নাম কি মালিনী।

করুণী

তরুলতা
যে-ভাষায় কয় কথা
সে-ভাষা সে জানে,—
তৃণ তার পদক্ষেপ দয়া বলি মানে।
পুষ্পপল্লবের 'পরে তার আঁখি
অদৃশ্য প্রাণের হর্ষ দিয়ে যায় রাখি।
স্নেহ তার আকাশের আলোর মতন
কাননের অন্তরবেদন
দূর করিবার লাগি
নিত্য আছে জাগি।
শিশু হতে শিশুতর
গাছগুলি বোবা প্রাণে ভর-ভর ;
বাতাসে বৃষ্টিতে
চঞ্চলিয়া জাগে তারা অর্থহীন গীতে,
ধরণীর যে-গভীরে চিররসধারা
সেইখানে তারা
কাঙাল প্রসারি ধরে তৃষিত অঞ্জলি,
বিশ্বের করুণারাশি শাখায় শাখায় উঠে ফলি ;—
সে-তরুলতারি মতো স্নিগ্ধ প্রাণ তার ;
শ্যামল উদার
সেবা যত্ন সরল শান্তিতে
ঘনচ্ছায়া বিস্তারিয়া আছে চারিভিতে ;
তাহার মমতা
সকল প্রাণীর 'পরে বিছায়েছে স্নেহের সমতা ;
পশু পাখি তার আপনার ;
জীববৎসলার
স্নেহ ঝরে শিশু-'পরে, বনে যেন নত মেঘভার
ঢালে বারিধার।

তরুণ প্রাণের 'পরে করুণায় নিত্য সে তরুণী,—
নাম কি করুণী।

প্রতিমা

চতুর্দশী এল নেমে
পূর্ণিমার প্রান্তে এসে গেল থেমে।
অপূর্ণের ঈষৎ আভাসে
আপন বলিতে তারে মর্ত্যভূমি শঙ্কা নাহি বাসে।
এ ধরার নির্বাসনে
কুণ্ঠার গুণ্ঠন নাই, ভীরুতা নাইক তার মনে,
সংসারজনতা মাঝে
আপনাতে আপনি বিরাজে।
দুঃখে শোকে অবিচল, ধৈর্য তার প্রফুল্লতা-ভরা,
সকল উদ্বেগভারহরা।
রোগ যদি আসে রুখে
সকরুণ শান্ত হাসি লেগে থাকে গ্লানিহীন মুখে।
দুর্যোগ মেঘের মতো
নীচে দিয়ে বহে যায় কত
বারে বারে,
প্রভা তার মুছিতে না পারে।
তবু তার মহিমায় কিছু আছে বাকি,
সেইখানে রাখে ঢাকি
অশ্রুজল
বিষাদ-ইঙ্গিতে-ছোঁওয়া ঈষৎ বিহ্বল।
কণামাত্র সে-ক্ষীণতা
নাহি কহে কথা,
কেহ না দেখিতে পায়
নিত্য যারা ঘিরে আছে তায়।

অমরার অসীমতা মাটিতে নিয়েছে সীমা,—
নাম কি প্রতিমা।

নন্দিনী

প্রথম সৃষ্টির ছন্দখানি
অঙ্গে তার নক্ষত্রের নৃত্য দিল আনি।
বর্ষা-অন্তে ইন্দ্রধনু
মর্ত্যে নিল তনু।
দিগ্বধূর মায়াবী অঙ্গুলি
চঞ্চল চিন্তায় তার বুলায়েছে বর্ণ-আঁকা তুলি।
সরল তাহার হাসি, সুকুমার মুঠি
যেন শুভ্র কমলকলিকা;
আঁখিদুটি
যেন কালো আলোকের সচকিত শিখা।
অবসাদবন্ধভাঙা মুক্তির সে ছবি,
সে আনিয়া দেয় চিত্তে
কলনৃত্যে
দুস্তর-প্রস্তর-ঠেলা ফেনোচ্ছল আনন্দজাহ্নবী।
বীণার তন্ত্রের মতো গতি তার সংগীতস্পন্দিনী,—
নাম কি নন্দিনী।

২৮ শ্রাবণ ১৩৩৫

ঊষসী

ভোরের আগের যে-প্রহরে
স্তব্ধ অন্ধকার-'পরে
সুপ্তি-অন্তরাল হতে দূর সূর্যোদয়
বনময়

পাঠায় নূতন জাগরণী,
অতি মৃদু শিহরণী
বাতাসের গায়ে ;
পাখির কুলায়ে
অস্পষ্ট কাকলি ওঠে আধোজাগা স্বরে,
স্তম্ভিত আগ্রহভরে
অব্যক্ত বিরাট আশা ধ্যানে মগ্ন দিকে দিগন্তরে,—
ও কোন্ তরুণ প্রাণে করিয়াছে ভর,
অন্তর্গূঢ় সে-প্রহর
আত্ম-অগোচর।
চিত্ত তার আপনার গভীর অন্তরে
নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করে
পরিপূর্ণ সার্থকতা লাগি।
সুপ্তি-মাঝে প্রতীক্ষিয়া আছে জাগি
নির্মল নির্ভয়
কোন্ দিব্য অভ্যুদয়।
কোন্ সে পরমা মুক্তি, কোন্ সেই আপনার
দীপ্যমান মহা আবিষ্কার।
প্রভাতমহিমা ওর সম্বৃত রয়েছে নিশ্চেতনে,
তাহারি আভাস পাই মনে।
আমি ওই রথশব্দ শুনি,
সোনার বীণার তারে সংগীত আনিছে কোন্ গুণী।
জাগিবে হৃদয়,
ভুবন তাহার হবে বাণীময় ;
মানসকমল একমনা
নবোদিত তপনের করিবে প্রথম অভ্যর্থনা।
জাগিবে নূতন দিবা উজ্জ্বল উল্লাসে
বর্ণে গন্ধে গানে প্রাণে মহোৎসবে তার চারিপাশে।
নিরুদ্ধ চেতনা হতে হবে চ্যুত
লালসা-আবেশে জড়ীভূত
স্বপ্নের শৃঙ্খলপাশ।

বিলুপ্ত করিবে দূরে উন্মুক্ত বাতাস
দুর্বল দীপের গাঢ় বিষতপ্ত কলুষনিশ্বাস।
আলোকের জয়ধ্বনি উঠিবে উচ্ছ্বসি,—
নাম কি উষসী।

[শ্রাবণ ?-আশ্বিন ১৩৩৫]

ছায়ালোক

যেথায় তুমি গুণী জ্ঞানী, যেথায় তুমি মানী,
যেথায় তুমি তত্ত্ববিদের সেরা,
আমি সেথায় লুকিয়ে যেতে পথ পাব না জানি,
সেথায় তুমি লোকের ভিড়ে ঘেরা।
সেথায় তোমার বুদ্ধি সদাই জাগে,
চক্ষে তোমার আবেশ নাহি লাগে,
আমার ভীরু হৃদয় ছায়া মাগে,
তোমার সেথায় আলোক খরতর,
যখন সেথা চাহ আমার বাগে
সংকোচে প্রাণ কাঁপে থর থর।

মোহভাঙা দৃষ্টি তোমার যখন আঘাত হানে,
যায় নিখিলের রহস্যদ্বার টুটে,
এক নিমেষে অপরূপের রূপের মধ্যখানে
অস্ত্র যন্ত্র প্রকাশ পেয়ে উঠে।
বসুন্ধরার শ্যামল প্রাণের ঢাকা
রূঢ় পাথর গোপন ক'রে রাখা,
ভিতরে তার কতই আঁকাবাঁকা
কতকালের দাহন-ইতিহাসে,
ফাটলধরা কত-যে দাগ আঁকা
তোমার চোখে বাহির হয়ে আসে।

তেমনি করে যখন কভু আমার পানে চাবে
মর্মভেদী কৌতূহলের আঁখি,
বিধাতা যা লুকান লাজে দেখতে-যে তাই পাবে
মোর রচনায় যা আছে তাঁর বাকি।
আমার মাঝে তোমার অগোচরে
আদিম যুগের গোপন গভীর স্তরে
অপূর্ণতা রয়েছে অন্তরে,
সৃষ্টি আমার অসমাপ্ত আছে,
সামনে এলে মরি-যে সেই ডরে
ভাঙাচোরা চক্ষে পড়ে পাছে।

তোমার প্রাণে কোনোখানে নাই কি মায়ার ঠাঁই
মত্ততাহীন তত্ত্বপরপারে,
যেথায় তীক্ষ্ণ চোখের কোনো প্রশ্ন জেগে নাই
অসতর্ক মুক্ত হৃদয়দ্বারে ?
যেথায় তুমি দৃষ্টিকর্তা নহ,
সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি লয়ে রহ,
যেথা নানা বর্ণের সংগ্রহ,
যেথা নানা মূর্তিতে মন মাতে,
যেথা তোমার অতৃপ্ত আগ্রহ
আপনভোলা রসের রচনাতে।

সেথায় আমি যাব যখন চৈত্ররজনীতে
বনের বাণী হাওয়ায় নিরুদ্দেশা,
চাঁদের আলোয় ঘুম-হারানো পাখির কলগীতে
পথ-হারানো ফুলের রেণু মেশা।
দেখবে আমায় স্বপন-দেখা চোখে,
চমকে উঠে বলবে তুমি, 'ও কে,

কোন্ দেবতার ছিল মানসলোকে,
এল আমার গানের ডাকে ডাকা'।
সে-রূপ আমার দেখবে ছায়ালোকে
যে-রূপ তোমার পরান দিয়ে আঁকা।

৯ আশ্বিন ১৩৩৫

প্রচ্ছন্ন

বিদেশে ঐ সৌধশিখর-'পরে
ক্ষণকালের তরে
পথ হতে-যে দেখেছিলেম, ওগো আধেক-দেখা,
মনে হল তুমি অসীম একা
দাঁড়িয়েছিলে যেন আমার একটি বিজন খনে
আর কিছু নাই সেথায় ত্রিভুবনে।
সামনে তোমার মুক্ত আকাশ, অরণ্যতল নীচে,
ক্ষণে ক্ষণে ঝাউয়ের শাখা প্রলাপ মর্মরিছে।
মুখ দেখা না যায়,
পিঠের 'পরে বেণীটি লুটায়।
থামের পাশে হেলান-দেওয়া ঈষৎ দেখি আধখানি ঐ দেহ,
অসম্পূর্ণ কয়টি রেখায় কী যেন সন্দেহ।
বন্দিনী কি ভোগের কারাগারে,
ভাবনা তোমার উড়ে চলে দূর দিগন্তপারে?
সোনার বরন শস্যখেতে, কোন্-সে নদীতীরে
পূজারীদের চলার পথে, উচ্চচূড়া দেবতামন্দিরে
তোমার চিরপরিচিত প্রভাত-আলোখানি,
তারি স্মৃতি চক্ষে তোমার জল কি দিল আনি।

কিম্বা তুমি রাজেন্দ্রসোহাগী,
সেই বহুবল্লভের প্রেমে দ্বিধার দুঃখ হৃদয়ে রয় জাগি,

প্রশ্ন কি তাই শুধাও নক্ষত্রেরে
সপ্তঋষির কাছে তোমার প্রণামখানি সেরে।
হয়তো বৃথাই সাজ,
তৃপ্তিবিহীন চিত্ততলে তৃষ্ণা-অনল দহন করে আজো ;
তাই কি শূন্য আকাশ-পানে চাও,
উপেক্ষিত যৌবনেরি ধিক্কার জানাও ?

কিম্বা আছ চেয়ে
আসবে সে কোন্ দুঃসাহসী গোপন পন্থা বেয়ে,
বক্ষ তোমার দোলে,
রক্ত নাচে ত্রাসের উতরোলে।
স্তব্ধ আছে তরুশ্রেণী মরণছায়া-ঢাকা,
শূন্যে ওড়ে অদৃশ্য কোন্ পাখা।
আমি পথিক যাব-যে কোন্ দূরে ;
তুমি রাজার পুরে
মাঝে-মাঝে কাজের অবসরে
বাহির হয়ে আসবে হোথায় ঐ অলিন্দ-'পরে,
দেখবে চেয়ে অকারণে স্তব্ধ নেত্রপাতে
গোধূলিবেলাতে
বনের সবুজ তরঙ্গ পারায়ে
নদীর প্রান্তরেখায় যে-পথ গিয়েছে হারায়ে।
তোমার ইচ্ছা চলবে কল্পনাতে
সুদূর পথে আভাসরূপী সেই অজানার সাথে
পান্থ যে-জন নিত্য চলে যায়।
আমি পথিক হায়,
পিছন-পানে এই বিদেশের সুদূর সৌধশিরে
ইচ্ছা আমার পাঠাই ফিরে ফিরে
ছায়ায়-ঢাকা আধেক-দেখা তোমার বাতায়নে,
যে-মুখ তোমার লুকিয়ে ছিল সে-মুখ আঁকি মনে।

১০ আশ্বিন ১৩৩৫

দর্পণ

দর্পণ লইয়া তারে কী প্রশ্ন শুধাও একমনে
হে সুন্দরী, কী সংশয় জাগে তব উদ্বিগ্ন নয়নে।
নিজেরে দেখিতে চাও বাহিরে রাখিয়া আপনারে
যেন আর কারো চোখে ; আর কারো জীবনের দ্বারে
খুঁজিছ আপন স্থান। প্রেমের অর্ঘ্যের কোনো ত্রুটি
দেখ কি মুখের কোনোখানে। তাই তব আঁখিদুটি
নিজেরে কি করিছে ভর্ৎসনা। সাজায়ে লইয়া সর্বদেহে
স্বর্গের গর্বের ধন, তবে যেতে চাও তার গেহে ?
জান না কি হে রমণী, দর্পণে যা দেখিছ তা ছায়া,
পার না রচিতে কভু তাই দিয়ে চিরস্থায়ী মায়া।
তিলোত্তমা অনুপমা সুরেন্দ্রের প্রমোদপ্রাঙ্গণে
কঙ্কণঝংকারে আর নৃত্যলোল নূপুরনিক্কণে
নাচিয়া বাহিরে চলে যায়। লয়ে আত্মনিবেদন
গৌরবে জিনিলা শচী ইন্দ্রলোকে নন্দন-আসন।

১৫ আশ্বিন ১৩৩৫

ভাবিনী

ভাবিছ যে-ভাবনা একা-একা
দুয়ারে বসি চুপে চুপে,
সে যদি সম্মুখে দিত দেখা
মূর্তি ধরি কোনো রূপে—
হয়তো দেখিতাম শুকতারা
দিবস পার হয়ে দিশাহারা
এসেছে সন্ধ্যার কিনারাতে
সাঁঝের তারাদের দলে,
উদাস স্মৃতিভরা আঁখিপাতে
উষার হিমকণা জ্বলে।

হয়তো দেখিতাম বাদলে যে
শ্রাবণে এনেছিল বাণী
শরতে জলভার এল ত্যেজে
শুভ্র সেই মেঘখানি।
চলে সে সন্ন্যাসী দিশে দিশে
রবির আলোকের পিয়াসী সে,
আকাশ আপনারি লিপি লিখে
পড়িতে দিল যেন তারে,
সে তাই চেয়ে চেয়ে অনিমিখে
বুঝিতে বুঝি নাহি পারে।

হয়তো দেখিতাম রজনীতে
সে যেন সুরহারা বীণা
বিজন দীপহীন দেহলিতে
মৌন-মাঝে আছে লীনা।
একদা বেজেছিল যে-রাগিণী
তারে সে ফিরে যেন নিল চিনি
তারার কিরণের কম্পনে
নীরব আকাশের মাঝে,
সুদূর সুরসভা-অঙ্গনে
সুরের স্মৃতি যেথা বাজে।

১৫ আশ্বিন ১৩৩৫

একাকী

চন্দ্রমা আকাশতলে পরম একাকী,—
আপন নিঃশব্দ গানে আপনারি শূন্য দিল ঢাকি।
অয়ি একাকিনী,
অলিন্দে নিশীথরাত্রে শুনিছ সে জ্যোৎস্নার রাগিণী
চেয়ে শূন্যপানে,

যে-রাগিণী অসীমের উৎস হতে আনে
অনাদি বিরহরস, তাই দিয়ে ভরিয়া আঁধার
কোন্ বিশ্ববেদনার মহেশ্বরে দেয় উপহার।
তারি সাথে মিলায়েছ তব দৃষ্টিখানি,
চোখে অনির্বচনীয় বাণী,
মিলায়েছ যেন তব জন্মান্তর হতে নিয়ে আসা
দীর্ঘনিশ্বাসের ভাষা।
মিলায়েছ, সুগম্ভীর দুঃখের মাঝারে
যে-মুক্তি রয়েছে লীন বন্ধহীন শান্ত অন্ধকারে।
অরণ্যে অরণ্যে আজি সাগরে সাগরে,
জনশূন্য তুষারশিখরে
কোন্ মহাশ্বেতা, কোন্ তপস্বিনী বিছাল অঞ্চল,
স্তব্ধ অচঞ্চল,
অনন্তেরে সম্বোধিয়া কহিল সে ঊর্ধ্বে তুলি আঁখি,—
তুমিও একাকী।

১৮ আশ্বিন ১৩৩৫

আশীর্বাদ

জ্বলিল অরুণরশ্মি আজি ওই তরুণ প্রভাতে
হে নবীনা, নবরাগরক্তিম শোভাতে
সীমন্তে সিন্দুরবিন্দু তব
জ্যোতি আজি পেল অভিনব,
চেলাঞ্চলে উদ্ভাসিল অন্তরের দীপ্যমান প্রভা,
শরমের বৃন্তে তুমি আনন্দের বিকশিত জবা।

সাহানা রাগিণীরসে জড়িত আজি এ পুণ্যতিথি,
তোমার ভুবনে আসে পরম অতিথি।
আনো আনো মাঙ্গল্যের ভার,
দাও বধূ, খুলে দাও দ্বার,

তোমার অঙ্গনে হেরো সগৌরবে ওই রথ আসে,
সেই বার্তা আজি বুঝি উদ্‌ঘোষিল আকাশে বাতাসে।

নবীন জীবনে তব নববিশ্ব রচনার ভাষা
আজি বুঝি পূর্ণ হল লয়ে নব আশা।
সৃষ্টির সে আনন্দ-উৎসবে
তব শ্রেষ্ঠধন দিতে হবে,
সেই সৃষ্টিসাধনায় আপনি করিবে আবিষ্কার
তোমার আপনা-মাঝে লুকানো যে ঐশ্বর্যভাণ্ডার।

পথ কে দেখাল এই পথিকেরে তাহা আমি জানি,
ওই চক্ষুতারা তারে দ্বারে দিল আনি।
যে-সুর নিভৃতে ছিল প্রাণে
কেমনে তা শুনেছিল কানে,
তোমার হৃদয়কুঞ্জে যে-ফুল ছায়ায় ছিল ফুটে
তাহার অমৃতগন্ধ গিয়েছিল বন্ধ তার টুটে।

যদি পারিতাম আজি অলকার দ্বারীরে ভুলায়ে
হরিয়া অমূল্য মণি অলকেতে দিতাম দুলায়ে।
তবু মোর মন মোরে কহে
সে-দান তোমার যোগ্য নহে,
তোমার কমলবনে দিব আনি রবির প্রসাদ,
তোমার মিলনক্ষণে সঁপিব কবির আশীর্বাদ।

আশ্বিন ? ১৩৩৫

নববধূ

চলেছে উজান ঠেলি তরণী তোমার,
দিক্‌প্রান্তে নামে অন্ধকার।
কোন্ গ্রামে যাবে তুমি, কোন্ ঘাটে হে বধূবেশিনী,
ওগো বিদেশিনী।
উৎসবের বাঁশিখানি কেন-যে কে জানে
ভরেছে দিনান্তবেলা ম্লান মূলতানে,
তোমারে পরাল সাজ মিলি সখীদল
গোপনে মুছিয়া চক্ষুজল।

মৃদুস্রোত নদীখানি ক্ষীণ কলকলে
স্তিমিত বাতাসে যেন বলে—
'কত বধূ গিয়েছিল কতকাল এই স্রোত বাহি
তীরপানে চাহি।
ভাগ্যের বিধাতা কোনো কহেন নি কথা,
নিস্তব্ধ ছিলেন চেয়ে লজ্জাভয়ে নতা
তরুণী কন্যার পানে, তরী 'পরে ছিলেন গোপনে
তরণীর কাণ্ডারীর সনে।'

কোন্ টানে জানা হতে অজানায় চলে
আধো হাসি আধো অশ্রুজলে!
ঘর ছেড়ে দিয়ে তবে ঘরখানি পেতে হয় তারে
অচেনার ধারে।
ওপারের গ্রাম দেখো আছে ঐ চেয়ে,
বেলা ফুরাবার আগে চলো তরী বেয়ে,
ওই ঘাটে কত বধূ কত শত বর্ষ বর্ষ ধরি
ভিড়ায়েছে ভাগ্যভীরু তরী

জনে জনে রচি গেল কালের কাহিনী,
অনিত্যের নিত্যপ্রবাহিনী।
জীবনের ইতিবৃত্তে নামহীন কর্ম-উপহার
রেখে গেল তার।
আপনার প্রাণসূত্রে যুগ যুগান্তর
গেঁথে গেঁথে চলে গেল না রাখি স্বাক্ষর,
ব্যথা যদি পেয়ে থাকে না রহিল কোনো তার ক্ষত,
লভিল মৃত্যুর সদাব্রত।

তাই আজি গোধূলির নিস্তব্ধ আকাশ
পথে তব বিছাল আশ্বাস।
কহিল সে কানে কানে, প্রাণ দিয়ে ভরা যার বুক
সেই তার সুখ।
রয়েছে কঠোর দুঃখ রয়েছে বিচ্ছেদ,
তবু দিন পূর্ণ হবে, রহিবে না খেদ
যদি বলে যাও বধূ, 'আলো দিয়ে জ্বেলেছিনু আলো,
সব দিয়ে বেসেছিনু ভালো।'

১৯ আশ্বিন ১৩৩৫

পরিণয়

শুভখন আসে সহসা আলোক জ্বেলে,
মিলনের সুধা পরম ভাগ্যে মেলে।
একার ভিতরে একের দেখা না পাই,
দুজনার যোগে পরম একের ঠাঁই,
সে-একের মাঝে আপনারে খুঁজে পেলে।

আপনারে দান সেই তো চরম দান,
আকাশে আকাশে তারি লাগি আহ্বান।

ফুলবনে তাই রূপের তুফান লাগে,
নিশীথে তারায় আলোর ধেয়ান জাগে,
উদয়সূর্য গাহে জাগরণী গান।

নীরবে গোপনে মর্ত্যভুবন-'পরে
অমরাবতীর সুরসুরধুনী ঝরে।
যখনি হৃদয়ে পশিল তাহার ধারা
নিজেরে জানিলে সীমার বাঁধন হারা,
স্বর্গের দীপ জ্বলিল মাটির ঘরে।

আজি বসন্ত চিরবসন্ত হ'ক
চিরসুন্দরে মজুক তোমার চোখ।
প্রেমের শান্তি চিরশান্তির বাণী
জীবনের ব্রতে দিনে রাতে দিক আনি,
সংসারে তব নামুক অমৃতলোক।

আশ্বিন ? ১৩৩৫

মিলন

সৃষ্টির প্রাঙ্গণে দেখি বসন্তে অরণ্যে ফুলে ফুলে
দুটিরে মিলানো নিয়ে খেলা
রেণুলিপি বহি বায়ু প্রশ্ন করে মুকুলে মুকুলে
কবে হবে ফুটিবার বেলা।
তাই নিয়ে বর্ণচ্ছটা, চঞ্চলতা শাখায় শাখায়,
সুন্দরের ছন্দ বহে প্রজাপতি পাখায় পাখায়,
পাখির সংগীত সাথে বন হতে বনান্তরে ধায়
উচ্ছ্বসিত উৎসবের মেলা।

স্থষ্টির সে-রঙ্গ আজি দেখি মানবের লোকালয়ে
হুজনায় গ্রন্থির বাঁধন।
অপূর্ব জীবন তাহে জাগিবে বিচিত্র রূপ লয়ে
বিধাতার আপন সাধন।
ছেড়েছে সকল কাজ, রঙিন বসনে ওরা সেজে
চলেছে প্রান্তর বেয়ে, পথে পথে বাঁশি চলে বেজে,
পুরানো সংসার হতে জীর্ণতার সব চিহ্ন মেজে
রচিল নবীন আচ্ছাদন।

যাহা সবচেয়ে সত্য সবচেয়ে খেলা যেন তাই,
যেন সে ফাল্গুনকলোল্লাস।
যেন তাহা নিঃসংশয়, মর্তের ম্লানতা যেন নাই,
দেবতার যেন সে উচ্ছ্বাস।
সহজে মিশেছে তাই আত্মভোলা মানুষের সনে
আকাশের আলো আজি গোধূলির রক্তিম লগনে,
বিশ্বের রহস্যলীলা মানুষের উৎসবপ্রাঙ্গণে
লভিয়াছে আপন প্রকাশ।

বাজা তোরা বাজা বাঁশি, মৃদঙ্গ উঠুক তালে মেতে
দুরন্ত নাচের নেশা পাওয়া।
নদীপ্রান্তে তরুগুলি ঐ দেখ্ আছে কান পেতে,
ঐ সূর্য চাহে শেষ চাওয়া।
নিবি তোরা তীর্থবারি সে-অনাদি উৎসের প্রবাহে
অনন্তকালের বক্ষ নিমগ্ন করিতে যাহা চাহে
বর্ণে গন্ধে রূপে রসে, তরঙ্গিত সংগীত উৎসাহে
জাগায় প্রাণের মত্ত হাওয়া।

সহস্র দিনের মাঝে আজিকার এই দিনখানি
হয়েছে স্বতন্ত্র চিরন্তন।
তুচ্ছতার বেড়া হতে মুক্তি তারে কে দিয়েছে আনি
প্রত্যহের ছিঁড়েছে বন্ধন।
প্রাণদেবতার হাতে জয়টিকা পরেছে সে ভালে,
সূর্যতারকার সাথে স্থান সে পেয়েছে সমকালে,
সৃষ্টির প্রথম বাণী যে-প্রত্যাশা আকাশে জাগালে
তাই এল করিয়া বহন।

২০ আশ্বিন ১৩৩৫

বন্দিনী

তুমি বনের পুব পবনের সাথী,
বাদল মেঘের পথে তোমার ডানার মাতামাতি।
ওগো পাখি, বাঁধনহারা পাখি,
খাঁচার কোণে এই বিজনে আপন মনে থাকি।
হায় অজানা, জানি না সে
উধাও তুমি কোন্ আকাশে,
কোন্ তমালের কাননতলে মধ্যদিনের তাপে
বনচ্ছায়ার শিরায় শিরায় তোমারি সুর কাঁপে।

কোন্ রঙনে রঙিন তোমার পাখা ?
তোমার সোনার বরনখানি ভাবনাতে মোর আঁকা
ওগো পাখি, বাঁধনহারা পাখি,
মুক্তরূপের ধ্যানের ছায়ায় মগ্ন আমার আঁখি।
বন্দী মনের বদ্ধ ডানা,
চতুর্দিকে কঠোর মানা,
তোমার সাথে উড়ে চলার মিলন মাগি মনে,—
শূন্যে সদাই গান ফেরে তাই অসীম অন্বেষণে।

গান গাওয়া মোর সেই মিলনের খেলা,
তোমার গানের ছন্দে আমার স্বপন পাখা মেলা।
ওগো পাখি, বাঁধনহারা পাখি,
মনে মনে তোমায় পরাই গানের গাঁথন রাখি।
আজি আমার সুরের মাঝে
দূরের ডানার শব্দ বাজে,
মেঘের পথিক গানে আমার এল প্রাণের কূলে,
বিরহেরি আকাশতলে নিল আমায় তুলে।

গানের হাওয়ায় নিকট মিলায় দূরে—
দূর আসে সেই হাওয়ায় প্রাণের নিকট অন্তঃপুরে।
ওগো পাখি, বাঁধনহারা পাখি,
তোমার গানের মরীচিকায় শূন্য যে দাও ঢাকি।
বাঁধনে তাই জাদু লাগে,
বীণার তারে মুক্তি জাগে,
রাগিণীতে মুক্তি সে দেয়, ওগো আমার দূর,
তোমার দেওয়া না-শোনা গান বাঁধে যে তার সুর।

৫ কার্তিক ১৩৩৫

গুপ্তধন

আরো কিছুখন না-হয় বসিয়ো পাশে,
আরো যদি কিছু কথা থাকে তাই বলো।
শরৎ-আকাশ হেরো ম্লান হয়ে আসে,
বাষ্প-আভাসে দিগন্ত ছলোছলো।
জানি তুমি কিছু চেয়েছিলে দেখিবারে,
তাই তো প্রভাতে এসেছিলে মোর দ্বারে,

দিন না ফুরাতে দেখিতে পেলে কি তারে
হে পথিক বলো বলো,—
সে মোর অগম অন্তর-পারাবারে
রক্তকমল তরঙ্গে টলোমলো।

দ্বিধাভরে আজো প্রবেশ কর নি ঘরে,
বাহির-আঙনে করিলে সুরের খেলা,
জানি না কী নিয়ে যাবে-যে দেশান্তরে,
হে অতিথি, আজি শেষবিদায়ের বেলা।
প্রথম প্রভাতে সব কাজ তব ফেলে
যে-গভীর বাণী শুনিবারে কাছে এলে,
কোনোখানে কিছু ইশারা কি তার পেলে
হে পথিক, বলো বলো,—
সে-বাণী আপন গোপন প্রদীপ জ্বেলে
রক্ত-আগুনে প্রাণে মোর জ্বলোজ্বলো।

১৪ কার্তিক ১৩৩৫

প্রত্যাগত

দূরে গিয়েছিলে চলি ; বসন্তের আনন্দভাণ্ডার
তখনো হয় নি নিঃস্ব ; আমার বরণপুষ্পহার
তখনো অম্লান ছিল ললাটে তোমার। হে অধীর,
কোন্ অলিখিত লিপি দক্ষিণের উদ্‌ভ্রান্ত সমীর
এনেছিল চিত্তে তব। তুমি গেলে বাঁশি লয়ে হাতে,
ফিরে দেখ নাই চেয়ে আমি বসে আপন বীণাতে
বাঁধিতেছিলাম সুর গুঞ্জরিয়া বসন্তপঞ্চমে ;
আমার অঙ্গনতলে আলো আর ছায়ার সংগমে
কম্পমান আম্রতরু করেছিল চাঞ্চল্য বিস্তার
সৌরভবিহ্বল শুক্লরাতে। সেই কুঞ্জগৃহদ্বার

এতকাল মুক্ত ছিল। প্রতিদিন মোর দেহলিতে
আঁকিয়াছি আলিপনা। প্রতিসন্ধ্যা বরণডালিতে
গন্ধতৈলে জ্বালায়েছি দীপ। আজি কতকাল পরে
যাত্রা তব হল অবসান। হেথা ফিরিবার তরে
হেথা হতে গিয়েছিলে। হে পথিক, ছিল এ-লিখন—
আমারে আড়াল করে আমারে করিবে অন্বেষণ ;
সুদূরের পথ দিয়ে নিকটেরে লাভ করিবারে
আহ্বান লভিয়াছিলে সখা। আমার প্রাঙ্গণদ্বারে
যে-পথ করিলে শুরু সে-পথের এখানেই শেষ।
হে বন্ধু, কোরো না লজ্জা, মোর মনে নাই ক্ষোভলেশ,
নাই অভিমানতাপ। করিব না ভর্ৎসনা তোমায় ;
গভীর বিচ্ছেদ আজি ভরিয়াছি অসীম ক্ষমায়।
আমি আজি নবতর বধূ ; আজি শুভদৃষ্টি তব
বিরহগুণ্ঠনতলে দেখে যেন মোরে অভিনব
অপূর্ব আনন্দরূপে, আজি যেন সকল সন্ধান
প্রভাতে নক্ষত্রসম শুভ্রতায় লভে অবসান।
আজি বাজিবে না বাঁশি, জ্বলিবে না প্রদীপের মালা,
পরিব না রক্তাম্বর ; আজিকার উৎসব নিরালা
সর্ব-আভরণহীন। আকাশেতে প্রতিপদ-চাঁদ
কৃষ্ণপক্ষ পার হয়ে পূর্ণতার প্রথম প্রসাদ
লভিয়াছে। দিক্‌প্রান্তে তারি ওই ক্ষীণ নম্র কলা
নীরবে বলুক আজি আমাদের সব কথা-বলা।

২৭ পৌষ ১৩৩৫

পুরাতন

যে-গান গাহিয়াছিনু কবেকার দক্ষিণ বাতাসে
সে-গান আমার কাছে কেন আজ ফিরে ফিরে আসে
শরতের অবসানে। সেদিনের সাহানার সুর
আজি অসময়ে এসে অকারণে করিছে বিধুর
মধ্যাহ্নের আকাশেরে; দিগন্তের অরণ্যরেখায়
দূর অতীতের বাণী লিপ্ত আছে অস্পষ্ট লেখায়,
তাহারে ফুটাতে চাহে। পথভ্রান্ত করুণ গুঞ্জনে
মধু আহরিতে ফিরে, সেদিনের অকৃপণ বনে
যে-চামেলিবল্লী ছিল তারি শূন্য দানসত্র হতে।
ছায়াতে যা লীন হল তারে খোঁজে নিষ্ঠুর আলোতে।
শীতরিক্ত শাখা ছেড়ে পাখি গেছে সিন্ধুপারে চলি,
তারি কুলায়ের কাছে সে-কালের বিস্মৃত কাকলি
বৃথাই জাগাতে আসে। যে-তারকা অস্তে গেল দূরে
তাহারি স্পন্দন ও-যে ধরিয়া এনেছে নিজ সুরে।

পৌষ ? ১৩৩৫

ছায়া

আঁখি চাহে তব মুখ-পানে,
তোমারে জেনেও নাহি জানে।
কিসের নিবিড় ছায়া
নিয়েছে স্বপনকায়া
তোমার মর্মের মাঝখানে।

হাসি কাঁপে অধরের শেষে
দূরতর অশ্রুর আবেশে।

বসন্তকূজিত রাতে
তোমার বাণীর সাথে
অশ্রুত কাহার বাণী মেশে।

মনে তব গুপ্ত কোন্ নীড়ে
অব্যক্ত ভাবনা এসে ভিড়ে।
বসন্তপঞ্চম রাগে
বিচ্ছেদের ব্যথা লাগে
সুগভীর ভৈরবীর মীড়ে।

তোমার শ্রাবণপূর্ণিমাতে
বাদল রয়েছে সাথে সাথে।
হে করুণ ইন্দ্রধনু,
তোমার মানসী তনু
জন্ম নিল আলোতে ছায়াতে।

অদৃশ্যের বরণের ডালা,
প্রচ্ছন্ন প্রদীপ তাহে জ্বালা।
মিলন নিকুঞ্জতলে
দিয়েছ আমার গলে
বিরহের সূত্রে গাঁথা মালা।

তব দানে ওগো আনমনা,
দিয়ো মোরে তোমার বেদনা।
যে-বন কুয়াশাছাওয়া
ঝরা ফুল সেথা পাওয়া,
থাক্ তাহে শিশিরের কণা।

৫ ভাদ্র ১৩৩৬

বাসরঘর

তোমারে ছাড়িয়া যেতে হবে
রাত্রি যবে
উঠিবে উন্মনা হয়ে প্রভাতের রথচক্ররবে।
হায় রে বাসরঘর,
বিরাট বাহির সে যে বিচ্ছেদের দস্যু ভয়ংকর।
তবু সে যতই ভাঙেচোরে
মালাবদলের হার যত দেয় ছিন্ন ছিন্ন করে,
তুমি আছ ক্ষয়হীন
অনুদিন;
তোমার উৎসব
বিচ্ছিন্ন না হয় কভু, না হয় নীরব।
কে বলে তোমারে ছেড়ে গিয়েছে যুগল
শূন্য করি তব শয্যাতল।
যায় নাই, যায় নাই,
নব নব যাত্রীমাঝে ফিরে ফিরে আসিছে তারাই
তোমার আহ্বানে
উদার তোমার দ্বার-পানে।
হে বাসরঘর,
বিশ্বে প্রেম মৃত্যুহীন, তুমিও অমর।

[আষাঢ় ১৩৩৫
বাঙ্গালোর]

বিচ্ছেদ

রাত্রি যবে সাঙ্গ হল, দূরে চলিবারে
দাঁড়াইলে দ্বারে।
আমার কণ্ঠের যত গান
করিলাম দান।

তুমি হাসি
মোর হাতে দিলে তব বিরহের বাঁশি।
তার পরদিন হতে
বসন্তে শরতে
আকাশে বাতাসে উঠে খেদ,
কেঁদে কেঁদে ফিরে বিশ্বে বাঁশি আর গানের বিচ্ছেদ

আষাঢ় ১৩৩৫
বাঙ্গালোর

বিদায়

কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও।
তারি রথ নিত্যই উধাও
জাগাইছে অন্তরীক্ষে হৃদয়স্পন্দন,
চক্রে-পিষ্ট আঁধারের বক্ষ-ফাটা তারার ক্রন্দন

ওগো বন্ধু, সেই ধাবমান কাল
জড়ায়ে ধরিল মোরে ফেলি তার জাল,—
তুলে নিল দ্রুতরথে
দুঃসাহসী ভ্রমণের পথে
তোমা হতে বহুদূরে।
মনে হয় অজস্র মৃত্যুরে
পার হয়ে আসিলাম
আজি নবপ্রভাতের শিখরচূড়ায়,
রথের চঞ্চল বেগ হাওয়ায় উড়ায়
আমার পুরানো নাম।

ফিরিবার পথ নাহি ;
দূর হতে যদি দেখ চাহি
পারিবে না চিনিতে আমায়।
হে বন্ধু, বিদায়।

কোনোদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে,
বসন্তবাতাসে
অতীতের তীর হতে যে-রাত্রে বহিবে দীর্ঘশ্বাস,
ঝরা বকুলের কান্না ব্যথিবে আকাশ,
সেইক্ষণে খুঁজে দেখো, কিছু মোর পিছে রহিল সে
তোমার প্রাণের প্রান্তে ; বিস্মৃতপ্রদোষে
হয়তো দিবে সে জ্যোতি,
হয়তো ধরিবে কভু নামহারা স্বপ্নের মুরতি।
তবু সে তো স্বপ্ন নয়,
সব-চেয়ে সত্য মোর, সেই মৃত্যুঞ্জয়,
সে আমার প্রেম।
তারে আমি রাখিয়া এলেম
অপরিবর্তন অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশে
পরিবর্তনের স্রোতে আমি যাই ভেসে
কালের যাত্রায়।
হে বন্ধু, বিদায়।

তোমার হয় নি কোনো ক্ষতি
মর্ত্যের মৃত্তিকা মোর, তাই দিয়ে অমৃত-মুরতি
যদি সৃষ্টি করে থাক, তাহারি আরতি
হ'ক তব সন্ধ্যাবেলা।
পূজার সে-খেলা
ব্যাঘাত পাবে না মোর প্রত্যহের ম্লানস্পর্শ লেগে ;
তৃষার্ত আবেগবেগে
ভ্রষ্ট নাহি হবে তার কোনো ফুল নৈবেদ্যের থালে।

তোমার মানসভোজে সযত্নে সাজালে
যে ভাবরসের পাত্র বাণীর তৃষায়,
তার সাথে দিব না মিশায়ে
যা মোর ধূলির ধন, যা মোর চক্ষের জলে ভিজে
আজো তুমি নিজে
হয়তো বা করিবে রচন
মোর স্মৃতিটুকু দিয়ে স্বপ্নাবিষ্ট তোমার বচন।
ভার তার না রহিবে, না রহিবে দায়।
হে বন্ধু, বিদায়।

মোর লাগি করিয়ো না শোক,
আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক।
মোর পাত্র রিক্ত হয় নাই,
শূন্যেরে করিব পূর্ণ, এই ব্রত বহিব সদাই।
উৎকণ্ঠ আমার লাগি কেহ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে
সে-ই ধন্য করিবে আমাকে।
শুক্লপক্ষ হতে আনি
রজনীগন্ধার বৃন্তখানি
যে পারে সাজাতে
অর্ঘ্যথালা কৃষ্ণপক্ষ রাতে,
যে আমারে দেখিবারে পায়
অসীম ক্ষমায়
ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি,
এবার পূজায় তারি আপনারে দিতে চাই বলি।
তোমারে যা দিয়েছিনু, তার
পেয়েছ নিঃশেষ অধিকার।
হেথা মোর তিলে তিলে দান,
করুণ মুহূর্তগুলি গণ্ডূষ ভরিয়া করে পান
হৃদয়-অঞ্জলি হতে মম।

ওগো তুমি নিরুপম,
হে ঐশ্বর্যবান,
তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান ;
গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়।
হে বন্ধু, বিদায়।

২৫ জুন ১৯২৮
ব্যাঙ্গালোর। বাঙ্গালোর

প্রণতি

কত ধৈর্য ধরি
ছিলে কাছে দিবসশর্বরী।
তব পদ-অঙ্কনগুলিরে
কতবার দিয়ে গেছ মোর ভাগ্যপথের ধূলিরে।
আজ যবে
দূরে যেতে হবে
তোমারে করিয়া যাব দান
তব জয়গান।

কতবার ব্যর্থ আয়োজনে
এ জীবনে
হোমাগ্নি উঠে নি জ্বলি,
শূন্যে গেছে চলি
হতাশ্বাস ধূমের কুণ্ডলী।
কতবার ক্ষণিকের শিখা
আঁকিয়াছে ক্ষীণ টিকা
নিশ্চেতন নিশীথের ভালে।
লুপ্ত হয়ে গেছে তাহা চিহ্নহীন কালে।

এবার তোমার আগমন
হোমহুতাশন
জ্বেলেছে গৌরবে।
যজ্ঞ মোর ধন্য হবে।
আমার আহুতি দিনশেষে
করিলাম সমর্পণ তোমার উদ্দেশে।

লহো এ প্রণাম—
জীবনের পূর্ণ পরিণাম।
এ প্রণতি-'পরে
স্পর্শ রাখো স্নেহভরে।
তোমার ঐশ্বর্য-মাঝে
সিংহাসন যেথায় বিরাজে,
করিয়ো আহ্বান,
সেথা এ প্রণতি মোর পায় যেন স্থান

[আষাঢ় ১৩৩৫
বাঙ্গালোর]

নৈবেদ্য

তোমারে দিই নি সুখ, মুক্তির নৈবেদ্য গেনু রাখি
রজনীর শুভ্র অবসানে; কিছু আর নাহি বাকি,
নাইকো প্রার্থনা, নাই প্রতি মুহূর্তের দৈন্যরাশি,
নাই অভিমান, নাই দীনকান্না, নাই গর্বহাসি,
নাই পিছে ফিরে দেখা। শুধু সে মুক্তির ডালিখানি
ভরিয়া দিলাম আজি আমার মহৎ মৃত্যু আনি।

[আষাঢ় ১৩৩৫
বাঙ্গালোর]

অশ্রু

সুন্দর, তুমি চক্ষু ভরিয়া
এনেছ অশ্রুজল।
এনেছ তোমার বক্ষে ধরিয়া
দুঃসহ হোমানল।
দুঃখ যে তাই উজ্জ্বল হয়ে উঠে,
মুগ্ধ প্রাণের আবেশবন্ধ টুটে,
এ তাপে শ্বসিয়া উঠে বিকশিয়া
বিচ্ছেদশতদল।

[আষাঢ় ১৩৩৫
বাঙ্গালোর]

অন্তর্ধান

তব অন্তর্ধানপটে হেরি তব রূপ চিরন্তন।
অন্তরে অলক্ষ্যলোকে তোমার পরম-আগমন।
লভিলাম চিরস্পর্শমণি ;
তোমার শূন্যতা তুমি পরিপূর্ণ করেছ আপনি।

জীবন আঁধার হল, সেইক্ষণে পাইনু সন্ধান
সন্ধ্যার দেউলদীপ, অন্তরে রাখিয়া গেছ দান।
বিচ্ছেদেরি হোমবহ্নি হতে
পূজামূর্তি ধরে প্রেম, দেখা দেয় দুঃখের আলোতে

২৬ আষাঢ় ১৩৩৫
[শান্তিনিকেতন]

বিরহ

শঙ্কিত আলোক নিয়ে দিগন্তে উদিল শীর্ণ শশী,
অরণ্যে শিরীষশাখে অকস্মাৎ উঠিল উচ্ছ্বসি
বসন্তের হাওয়ার খেয়াল,
ব্যথায় নিবিড় হল শেষ বাক্য বলিবার কাল।

গোধূলির গীতিশূন্য স্তম্ভিত প্রহরখানি বেয়ে
শান্ত হল শেষ দেখা,— নির্নিমেষ রহিলাম চেয়ে।
ধীরে ধীরে বনান্তে মিলাল
প্রান্তরের প্রান্ততটে অস্তশেষ ক্ষীণ পাংশু আলো।

যে-দ্বার খুলিয়া গেলে রুদ্ধ সে হবে না কোনোমতে।
কান পাতি রবে তব ফিরিবার প্রত্যাশার পথে,—
তোমার অমূর্ত আসা-যাওয়া
যে-পথে চঞ্চল করে দিগ্‌বালার অঞ্চলের হাওয়া।

বসন্তে মাঘের অন্তে আম্রবনে মুকুলমত্ততা
মধুপগুঞ্জনে মিশি আনে কোন্‌ কানে-কানে কথা।
মোর নাম তব কণ্ঠে ডাকা
শান্ত আজি তাপক্লান্ত দিনান্তের মৌন দিয়ে ঢাকা।

সঙ্গহীন স্তব্ধতার সুগম্ভীর নিবিড় নিভৃতে
বাক্যহারা চিত্তে মোর এতদিনে পাইনু শুনিতে
তুমি কবে মর্মমাঝে পশি
আপন মহিমা হতে রেখে গেলে বাণী মহীয়সী।

২৬ আষাঢ় ১৩৩৫

[শান্তিনিকেতন]

বিদায়সম্বল

যাবার দিকের পথিকের 'পরে
ক্ষণিকার স্নেহখানি
শেষ উপহার করুণ অধরে
দিল কানে কানে আনি।
ভুলিব না কভু, রবে মনে মনে—
এই মিছে আশা দেয় খনে খনে,
ছলছল ছায়া নবীন নয়নে
বাধোবাধো মৃদু বাণী।

যাবার দিকের পথিক সে-কথা
ভরি লয় তার প্রাণে।
পিছনের এই শেষ আকুলতা
পাথেয় বলি সে জানে।
যখন আঁধারে ভরিবে সরণী,
ভুলে-ভরা ঘুমে নীরব ধরণী,
ভুলিব না কভু, এই ক্ষীণধ্বনি
তখনো বাজিবে কানে।

যাবার দিকের পথিক সে বোঝে—
যে যায় সে যায় চ'লে,
যারা থাকে তারা এ উহারে খোঁজে,
যে যায় তাহারে ভোলে।
তবুও নিজেরে ছলিতে ছলিতে
বাঁশি বাজে মনে চলিতে চলিতে
'ভুলিব না কভু' বিভাসে ললিতে
এই কথা বুকে দোলে।

১৯ অগস্ট ১৯২৭
সিঙাপুর

দিনান্তে

বাহিরে তুমি নিলে না মোরে, দিবস গেল বয়ে,
তাহাতে মোর যা হয় হ'ক ক্ষতি,
অন্তরে যা দিবার ছিল মিলিছে এক হয়ে,
চরণে তব গোপনে তার গতি।
লুকায়ে ছিল ছায়াতে ফুল, ভরিল তব ডালি,
গন্ধভরা বন্দনাতে দিয়েছি ধূপ জ্বালি,
প্রদীপ ছিল মলিনশিখা, ধোঁয়াতে ছিল কালি,
দীপ্ত হয়ে উঠিছে তার জ্যোতি।
বাহির হতে না যদি লও পূজার এই ডালি
চরণে তব গোপনে তার গতি।

না-হয় তুমি ওপারে থাকো, এপারে আমি থাকি
নীরব এই নীরস মরুতীরে,
অন্ধকারে সন্ধ্যাতারা নয়নে দেয় আঁকি
সুদূর তব উদার আঁখিটিরে।
ব্যথায় মম তোমারি ছায়া পড়িছে মোর প্রাণে,
বিরহ হানি তোমারি বাণী মিলিছে মোর গানে,
অলখ স্রোতে ভাবনা ধায় তোমার তটপানে
এপার হতে বহিয়া মোর নতি
যে-বীণা তব মন্দিরেতে বাজে নি তানে তানে
চরণে তব নীরবে তার গতি।

১ শ্রাবণ ১৩৩৪
আম্বোয়াজ জাহাজ

অবশেষ

বাহির পথে বিবাগী হিয়া
কিসের খোঁজে গেলি,
আয় রে ফিরে আয়।
পুরানো ঘরে দুয়ার দিয়া
ছেঁড়া আসন মেলি
বসিবি নিরালায়।
সারাটা বেলা সাগর-ধারে
কুড়ালি যত নুড়ি,
নানারঙের শামুক-ভারে
বোঝাই হল ঝুড়ি,
লবণ-পারাবারের পারে
প্রখর তাপে পুড়ি
মরিলি পিপাসায়;
ঢেউয়ের দোল তুলিল রোল
অকূলতল জুড়ি,
কহিল বাণী কী জানি কী ভাষায়।
আয় রে ফিরে আয়।

বিরাম হল আরামহীন
যদি রে তোর ঘরে,
না যদি রয় সাথী,
সন্ধ্যা যদি তন্দ্রালীন
মৌন অনাদরে,
না যদি জ্বালে বাতি;
তবু তো আছে আঁধার কোণে
ধ্যানের ধনগুলি,
একেলা বসি আপনমনে
মুছিবি তার ধূলি,

গাঁথিবি তারে রতনহারে
বুকেতে নিবি তুলি
মধুর বেদনায়।
কাননবীথি ফুলের রীতি
না-হয় গেছে ভুলি,
তারকা আছে গগন-কিনারায়।
আয় রে ফিরে আয়।

২৯ চৈত্র ১৩৩৪
[শান্তিনিকেতন]

শেষ মধু

বসন্তবায় সন্ন্যাসী হায়
চৈৎ-ফসলের শূন্য খেতে,
মৌমাছিদের ডাক দিয়ে যায়
বিদায় নিয়ে যেতে যেতে,—
আয় রে, ওরে মৌমাছি, আয়,
চৈত্র যে যায় পত্রঝরা,
গাছের তলায় আঁচল বিছায়
ক্লান্তি-অলস বসুন্ধরা।

সজনে ঝুলায় ফুলের বেণী,
আমের মুকুল সব ঝরে নি,
কুঞ্জবনের প্রান্ত-ধারে
আকন্দ রয় আসন পেতে।
আয় রে তোরা মৌমাছি, আয়,
আসবে কখন্ শুকনো খরা,
প্রেতের নাচন নাচবে তখন
রিক্ত নিশায় শীর্ণ জরা।

শুনি যেন কাননশাখায়
বেলাশেষের বাজায় বেণু;
মাখিয়ে নে আজ পাখায় পাখায়
স্মরণভরা গন্ধরেণু।
কাল যে-কুসুম পড়বে ঝরে
তাদের কাছে নিস গো ভরে
ওই বছরের শেষের মধু
এই বছরের মৌচাকেতে।
নূতন দিনের মৌমাছি, আয়,
নাই রে দেরি, করিস ত্বরা,
শেষের দানে ঐ রে সাজায়
বিদায়দিনের দানের ভরা।

চৈত্রমাসের হাওয়ায় কাঁপা
দোলনচাঁপার কুঁড়িখানি
প্রলয়দাহের রৌদ্রতাপে
বৈশাখে আজ ফুটবে জানি।
যা-কিছু তার আছে দেবার
শেষ করে সব নিবি এবার,
যাবার বেলায় যাক চলে যাক
বিলিয়ে দেবার নেশায় মেতে।
আয় রে, ওরে মৌমাছি, আয়,
আয় রে গোপনমধু-হরা,
চরম দেওয়া সঁপিতে চায়
ঐ মরণের স্বয়ম্বরা।

১২ চৈত্র ১৩৩৩
[শান্তিনিকেতন]

বনবাণী

ভূমিকা

আমার ঘরের আশেপাশে যে-সব আমার বোবা-বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌঁছল। তাদের ভাষা হচ্ছে জীবজগতের আদিভাষা, তার ইশারা গিয়ে পৌঁছয় প্রাণের প্রথমতম স্তরে; হাজার হাজার বৎসরের ভুলে-যাওয়া ইতিহাসকে নাড়া দেয়; মনের মধ্যে যে-সাড়া ওঠে সেও ওই গাছের ভাষায়,— তার কোনো স্পষ্ট মানে নেই, অথচ তার মধ্যে বহু যুগযুগান্তর গুনগুনিয়ে ওঠে।

ওই গাছগুলো বিশ্ববাউলের একতারা, ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে শুনি তাহলে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে। মুক্তি সেই বিরাট প্রাণসমুদ্রের কূলে, যে-সমুদ্রের উপরের তলায় সুন্দরের লীলা রঙে রঙে তরঙ্গিত, আর গভীরতলে 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্'। সেই সুন্দরের লীলায় লালসা নেই, আবেশ নেই, জড়তা নেই, কেবল পরমা শক্তির নিঃশেষ আনন্দের আন্দোলন। 'এতস্যৈবানন্দস্য মাত্রাণি' দেখি ফুলে ফলে পল্লবে; তাতেই মুক্তির স্বাদ পাই, বিশ্বব্যাপী প্রাণের সঙ্গে প্রাণের নির্মল অবাধ মিলনের বাণী শুনি।

বোষ্টমী একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, কবে আমাদের মিলন হবে গাছতলায়। তার মানে গাছের মধ্যে প্রাণের বিশুদ্ধ সুর, সেই সুরটি যদি প্রাণ পেতে নিতে পারি তাহলে আমাদের মিলনসংগীতে বদ্-সুর লাগে না। বুদ্ধদেব যে-বোধিদ্রুমের তলায় মুক্তিতত্ত্ব পেয়েছিলেন, তাঁর বাণীর সঙ্গে সঙ্গে সেই বোধিদ্রুমের বাণীও শুনি যেন— দুই-এ মিশে আছে। আরণ্যক ঋষি শুনতে পেয়েছিলেন গাছের বাণী, 'বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ'; শুনেছিলেন, 'যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্'।

তাঁরা গাছে গাছে চিরযুগের এই প্রশ্নটি পেয়েছিলেন, 'কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ'— প্রথম-প্রাণ তার বেগ নিয়ে কোথা থেকে এসেছে এই বিশ্বে। সেই প্রৈতি সেই বেগ থামতে চায় না, রূপের ঝরনা অহরহ ঝরতে লাগল, তার কত রেখা, কত ভঙ্গী কত ভাষা, কত বেদনা। সেই প্রথম প্রাণপ্রৈতির নবনবোন্মেষশালিনী সৃষ্টির চিরপ্রবাহকে নিজের মধ্যে গভীরভাবে বিশুদ্ধভাবে অনুভব করার মহামুক্তি আর কোথায় আছে।

এখানে ভোরে উঠে হোটেলের জানালার কাছে বসে কত দিন মনে করেছি শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে আমার সেই ঘরের দ্বারে প্রাণের আনন্দ-রূপ আমি দেখব আমার সেই লতার শাখায় শাখায়; প্রথম-প্রৈতির বন্ধবিহীন প্রকাশরূপ দেখব সেই নাগকেশরের ফুলে ফুলে। মুক্তির জন্যে প্রতিদিন যখন প্রাণ ব্যথিত ব্যাকুল হয়ে ওঠে, তখন সকলের চেয়ে মনে পড়ে আমার দরজার কাছের সেই গাছগুলিকে। তারা ধরণীর ধ্যানমন্ত্রের ধ্বনি। প্রতিদিন অরুণোদয়ে, প্রতি নিস্তব্ধরাত্রে তারার আলোয় তাদের ওঙ্কারের সঙ্গে আমার ধ্যানের সুর মেলাতে চাই। এখানে আমি রাত্রি প্রায় তিনটের সময়— তখন একে রাতের অন্ধকার, তাতে মেঘের আবরণ— অন্তরে অন্তরে একটা অসহ্য চঞ্চলতা অনুভব করি নিজের কাছ থেকেই উদ্দামবেগে পালিয়ে যাবার জন্যে। পালাব কোথায়। কোলাহল থেকে সংগীতে। এই আমার অন্তর্গূঢ় বেদনার দিনে শান্তিনিকেতনের চিঠি যখন পেলুম তখন মনে পড়ে গেল, সেই সংগীত তার সরল বিশুদ্ধ সুরে বাজছে আমার উত্তরায়ণের গাছগুলির মধ্যে,— তাদের কাছে চুপ করে বসতে পারলেই সেই সুরের নির্মল ঝরনা আমার অন্তরাত্মাকে প্রতিদিন স্নান করিয়ে দিতে পারবে। এই স্নানের দ্বারা ধৌত হয়ে স্নিগ্ধ হয়ে তবেই আনন্দলোকে প্রবেশের অধিকার আমরা পাই। পরমসুন্দরের মুক্তরূপে প্রকাশের মধ্যেই পরিত্রাণ,— আনন্দময় সুগভীর বৈরাগ্যই হচ্ছে সেই সুন্দরের চরম দান।

২৩ অক্টোবর ১৯২৬

[হোটেল ইম্‌পীরিয়ল]

ভিয়েনা

বনবাণী

বৃক্ষবন্দনা

অন্ধ ভূমিগর্ভ হতে শুনেছিলে সূর্যের আহ্বান
প্রাণের প্রথম জাগরণে, তুমি বৃক্ষ, আদিপ্রাণ,
ঊর্ধ্বশীর্ষে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা
ছন্দোহীন পাষাণের বক্ষ-'পরে ; আনিলে বেদনা
নিঃসাড় নিষ্ঠুর মরুস্থলে।

সেদিন অম্বর-মাঝে
শ্যামে নীলে মিশ্রমন্ত্রে স্বর্গলোকে জ্যোতিষ্কসমাজে
মর্ত্যের মাহাত্ম্যগান করিলে ঘোষণা। যে-জীবন
মরণতোরণদ্বার বারম্বার করি উত্তরণ
যাত্রা করে যুগে যুগে অনন্তকালের তীর্থপথে
নব নব পান্থশালে বিচিত্র নূতন দেহরথে,
তাহারি বিজয়ধ্বজা উড়াইলে নিঃশঙ্ক গৌরবে
অজ্ঞাতের সম্মুখে দাঁড়ায়ে। তোমার নিঃশব্দ রবে
প্রথম ভেঙেছে স্বপ্ন ধরিত্রীর, চমকি উল্লসি
নিজেরে পড়েছে তার মনে,— দেবকন্যা দুঃসাহসী
কবে যাত্রা করেছিল জ্যোতিঃস্বর্গ ছাড়ি দীনবেশে
পাংশুম্লান গৈরিকবসন-পরা, খণ্ড কালে দেশে
অমরার আনন্দেরে খণ্ড খণ্ড ভোগ করিবারে,
দুঃখের সংঘাতে তারে বিদীর্ণ করিয়া বারে বারে
নিবিড় করিয়া পেতে।

মৃত্তিকার হে বীর সন্তান,
সংগ্রাম ঘোষিলে তুমি মৃত্তিকারে দিতে মুক্তিদান
মরুর দারুণ দুর্গ হতে ; যুদ্ধ চলে ফিরে ফিরে ;
সন্তরি সমুদ্র-উর্মি দুর্গম দ্বীপের শূন্য তীরে
শ্যামলের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিলে অদম্য নিষ্ঠায়,
দুস্তর শৈলের বক্ষে প্রস্তরের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়
বিজয়-আখ্যানলিপি লিখি দিলে পল্লব-অক্ষরে
ধূলিরে করিয়া মুগ্ধ, চিহ্নহীন প্রান্তরে প্রান্তরে
ব্যাপিলে আপন পন্থা।

বাণীশূন্য ছিল একদিন
জলস্থল শূন্যতল, ঋতুর উৎসবমন্ত্রহীন,—
শাখায় রচিলে তব সংগীতের আদিম আশ্রয়,
যে-গানে চঞ্চল বায়ু নিজের লভিল পরিচয়,
সুরের বিচিত্র বর্ণে আপনার দৃশ্যহীন তনু
রঞ্জিত করিয়া নিল, অঙ্কিল গানের ইন্দ্রধনু
উত্তরীর প্রান্তে প্রান্তে। সুন্দরের প্রাণমূর্তিখানি
মৃত্তিকার মর্ত্যপটে দিলে তুমি প্রথম বাখানি
টানিয়া আপন প্রাণে রূপশক্তি সূর্যলোক হতে,
আলোকের গুপ্তধন বর্ণে বর্ণে বর্ণিলে আলোতে।
ইন্দ্রের অপ্সরী আসি মেঘে মেঘে হানিয়া কঙ্কণ
বাষ্পপাত্র চূর্ণ করি লীলানৃত্যে করেছে বর্ষণ
যৌবন-অমৃতরস, তুমি তাই নিলে ভরি ভরি
আপনার পত্রপুষ্পপুটে, অনন্তযৌবনা করি
সাজাইলে বসুন্ধরা।

হে নিস্তব্ধ, হে মহাগম্ভীর,
বীর্যেরে বাঁধিয়া ধৈর্যে শান্তিরূপ দেখালে শক্তির ;
তাই আসি তোমার আশ্রয়ে শান্তিদীক্ষা লভিবারে
শুনিতে মৌনের মহাবাণী ;— দুশ্চিন্তার গুরুভারে

নতশীর্ষ বিলুণ্ঠিতে শ্যামসৌম্যচ্ছায়াতলে তব,—
প্রাণের উদার রূপ, রসরূপ নিত্য নব নব,
বিশ্বজয়ী বীররূপ, ধরণীর বাণীরূপ তার
লভিতে আপন প্রাণে। ধ্যানবলে তোমার মাঝার
গেছি আমি, জেনেছি, সূর্যের বক্ষে জ্বলে বহ্নিরূপে
সৃষ্টিযজ্ঞে যেই হোম, তোমার সত্তায় চুপে চুপে
ধরে তাই শ্যাম স্নিগ্ধরূপ ; ওগো সূর্যরশ্মিপায়ী,
শত শত শতাব্দীর দিনধেনু দুহিয়া সদাই
যে-তেজে ভরিলে মজ্জা, মানবেরে তাই করি দান
করেছ জগৎজয়ী ; দিলে তারে পরম সম্মান ;
হয়েছে সে দেবতার প্রতিস্পর্ধী,— সে-অগ্নিচ্ছটায়
প্রদীপ্ত তাহার শক্তি বিশ্বতলে বিস্ময় ঘটায়
ভেদিয়া দুঃসাধ্য বিঘ্নবাধা। তব প্রাণে প্রাণবান,
তব স্নেহচ্ছায়ায় শীতল, তব তেজে তেজীয়ান,
সজ্জিত তোমার মাল্যে যে-মানব, তারি দূত হয়ে
ওগো মানবের বন্ধু, আজি এই কাব্য-অর্ঘ্য ল'য়ে
শ্যামের বাঁশির তানে মুগ্ধ কবি আমি
অর্পিলাম তোমায় প্রণামী।

৯ চৈত্র ১৩৩৩
[শান্তিনিকেতন]

জগদীশচন্দ্র

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু

প্রিয়করকমলে

বন্ধু

যেদিন ধরণী ছিল ব্যথাহীন বাণীহীন মরু,
প্রাণের আনন্দ নিয়ে, শঙ্কা নিয়ে, দুঃখ নিয়ে, তরু
দেখা দিল দারুণ নির্জনে। কত যুগ-যুগান্তরে
কান পেতে ছিল স্তব্ধ মানুষের পদশব্দ তরে
নিবিড় গহনতলে। যবে এল মানব অতিথি,
দিল তারে ফুল ফল, বিস্তারিয়া দিল ছায়াবীথি।
প্রাণের আদিমভাষা গূঢ় ছিল তাহার অন্তরে,
সম্পূর্ণ হয় নি ব্যক্ত আন্দোলনে ইঙ্গিতে মর্মরে।
তার দিনরজনীর জীবযাত্রা বিশ্বধরাতলে
চলেছিল নানা পথে শব্দহীন নিত্যকোলাহলে
সীমাহীন ভবিষ্যতে; আলোকের আঘাতে তনুতে
প্রতিদিন উঠিয়াছে চঞ্চলিত অণুতে অণুতে
স্পন্দবেগে নিঃশব্দ ঝংকারগীতি; নীরব স্তবনে
সূর্যের বন্দনাগান গাহিয়াছে প্রভাতপবনে।
প্রাণের প্রথমবাণী এইমতো জাগে চারিভিতে
তৃণে তৃণে বনে বনে, তবু তাহা রয়েছে নিভৃতে,—
কাছে থেকে শুনি নাই;— হে তপস্বী, তুমি একমনা
নিঃশব্দেরে বাক্য দিলে; অরণ্যের অন্তরবেদনা
শুনেছ একান্তে বসি; মূক জীবনের যে-ক্রন্দন
ধরণীর মাতৃবক্ষে নিরন্তর জাগাল স্পন্দন
অঙ্কুরে অঙ্কুরে উঠি, প্রসারিয়া শত ব্যগ্র শাখা,
পত্রে পত্রে চঞ্চলিয়া, শিকড়ে শিকড়ে আঁকাবাঁকা
জন্মমরণের দ্বন্দ্বে, তাহার রহস্য তব কাছে
বিচিত্র অক্ষররূপে সহসা প্রকাশ লভিয়াছে।

প্রাণের আগ্রহবার্তা নির্বাকের অন্তঃপুর হতে
অন্ধকার পার করি আনি দিলে দৃষ্টির আলোতে।
তোমার প্রতিভাদীপ্ত চিত্তমাঝে কহে আজি কথা
তরুর মর্মর সাথে মানব-মর্মের আত্মীয়তা;
প্রাচীন আদিমতম সম্বন্ধের দেয় পরিচয়।
হে সাধকশ্রেষ্ঠ, তব দুঃসাধ্য সাধন লভে জয়;—
সতর্ক দেবতা যেথা গুপ্তবাণী রেখেছেন ঢাকি
সেথা তুমি দীপ্তহস্তে অন্ধকারে পশিলে একাকী,
জাগ্রত করিলে তারে। দেবতা আপন পরাভবে
যেদিন প্রসন্ন হন, সেদিন উদার জয়রবে
ধ্বনিত অমরাবতী আনন্দে রচিয়া দেয় বেদি
বীর বিজয়ীর তরে, যশের পতাকা অভ্রভেদী
মর্ত্যের চূড়ায় উড়ে।

মনে আছে একদা যেদিন
আসন প্রচ্ছন্ন তব, অশ্রদ্ধার অন্ধকারে লীন,
ঈর্ষাকণ্টকিত পথে চলেছিলে ব্যথিত চরণে,
ক্ষুদ্র শত্রুতার সাথে প্রতিক্ষণে অকারণ রণে
হয়েছ পীড়িত শ্রান্ত। সে দুঃখই তোমার পাথেয়,
সে অগ্নি জ্বেলেছে যাত্রাদীপ, অবজ্ঞা দিয়েছে শ্রেয়,
পেয়েছ সম্বল তব আপনার গভীর অন্তরে।
তোমার খ্যাতির শঙ্খ আজি বাজে দিকে দিগন্তরে
সমুদ্রের এ-কূলে ও-কূলে; আপন দীপ্তিতে আজি
বন্ধু, তুমি দীপ্যমান; উচ্ছ্বসি উঠিছে বাজি
বিপুল কীর্তির মন্দ্র তোমার আপন কর্মমাঝে।
জ্যোতিষ্কসভার তলে যেথা তব আসন বিরাজে
সেথায় সহস্রদীপ জ্বলে আজি দীপালি-উৎসবে।
আমারো একটি দীপ তারি সাথে মিলাইনু যবে
চেয়ে দেখো তার পানে, এ দীপ বন্ধুর হাতে জ্বালা;
তোমার তপস্যাক্ষেত্র ছিল যবে নিভৃত নিরালা

বাধায় বেষ্টিত রুদ্ধ, সেদিন সংশয়সন্ধ্যাকালে
কবি-হাতে বরমাল্য সে-বন্ধু পরায়েছিল ভালে ;
অপেক্ষা করে নি সে তো জনতার সমর্থন তরে,
দুর্দিনে জ্বেলেছে দীপ রিক্ত তব অর্ঘ্যথালি-'পরে।
আজি সহস্রের সাথে ঘোষিল সে, 'ধন্য ধন্য তুমি,
ধন্য তব বন্ধুজন, ধন্য তব পুণ্য জন্মভূমি।'

১৪ অগ্রহায়ণ ১৩৩৫
শান্তিনিকেতন

দেবদারু

আমি তখন ছিলেম শিলঙ পাহাড়ে, রূপভাবক নন্দলাল ছিলেন কার্সিয়ঙে। তাঁর কাছ থেকে ছোটো একটি পত্রপট পাওয়া গেল, তাতে পাহাড়ের উপর দেওদার গাছের ছবি আঁকা। চেয়ে চেয়ে মনে হল, ওই একটি দেবদারুর মধ্যে যে-শ্যামল শক্তির প্রকাশ, সমস্ত পর্বতের চেয়ে তা বড়ো, ওই দেবদারুকে দেখা গেল হিমালয়ের তপস্যার সিদ্ধিরূপে। মহাকালের চরণপাতে হিমালয়ের প্রতিদিন ক্ষয় হচ্ছে, কিন্তু দেবদারুর মধ্যে যে-প্রাণ, নব নব তরুদেহের মধ্যে দিয়ে যুগে যুগে তা এগিয়ে চলবে। শিল্পীর পত্রপটের প্রত্যুত্তরে আমি এই কাব্যলিপি পাঠিয়ে দিলেম।

তপোমগ্ন হিমাদ্রির ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করি চুপে
বিপুল প্রাণের শিখা উচ্ছ্বসিল দেবদারুরূপে।
সূর্যের যে-জ্যোতির্মন্ত্র তপস্বীর নিত্য-উচ্চারণ
অন্তরের অন্ধকারে, পারিল না করিতে ধারণ
সেই দীপ্ত রুদ্রবাণী,— তপস্যার সৃষ্টিশক্তিবলে
সে-বাণী ধরিল শ্যামকায়া ; সবিতার সভাতলে
করিল সাবিত্রীগান ; স্পন্দমান ছন্দের মর্মরে
ধরিত্রীর সামগাথা বিস্তারিল অনন্ত অম্বরে।

ঋজু দীর্ঘ দেবদারু—গিরি এরে শ্রেষ্ঠ করে জ্ঞান
আপন মহিমা চেয়ে ; অন্তরে ছিল যে তার ধ্যান
বাহিরে তা সত্য হল ; ঊর্ধ্ব হতে পেয়েছিল ঋণ,
ঊর্ধ্বপানে অর্ঘ্যরূপে শোধ করি দিল একদিন।
আপন দানের পুণ্যে স্বর্গ তার রহিল না দূর,
সূর্যের সংগীতে মেশে মৃত্তিকার মুরলীর সুর।

২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪
শিলঙ

আম্রবন

সে-বৎসর শান্তিনিকেতন আম্রবীথিকায় বসন্ত-উৎসব হয়েছিল। কেউবা চিত্রে কেউবা কারুশিল্পে কেউবা কাব্যে আপন অর্ঘ্য এনেছিলেন। আমি ঋতুরাজকে নিবেদন করেছিলেম কয়েকটি কবিতা, তার মধ্যে নিম্নলিখিত একটি। সে-দিন উৎসবে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, এই আম্রবনের সঙ্গে আমার পরিচয় তাঁদের সকলের চেয়ে পুরাতন,— সেই আমার বালককালের আত্মীয়তা এই কবিতার মধ্যে আমার জীবনের পরাহ্নে প্রকাশ করে গেলেম। এই আম্রবনের যে-নিমন্ত্রণ বালকের চিরবিস্মিত হৃদয়ে এসে পৌঁচেছিল আজ মনে হয় সেই নিমন্ত্রণ যেন আবার আসছে মাটির মেঠো সুর নিয়ে, রৌদ্রতপ্ত ঘাসের গন্ধ নিয়ে, উত্তেজিত শালিখগুলির কাকলিবিক্ষুব্ধ অপরাহ্নের অবকাশ নিয়ে।

তব পথচ্ছায়া বাহি বাঁশরিতে যে বাজাল আজি
মর্মে তব অশ্রুত রাগিণী,
ওগো আম্রবন,
তারি স্পর্শে রহি রহি আমারো হৃদয় উঠে বাজি,—
চিনি তারে কিম্বা নাহি চিনি,
কে জানে কেমন।

অন্তরে অন্তরে তব যে-চঞ্চল রসের ব্যগ্রতা
আপন অন্তরে তাহা বুঝি,
ওগো আম্রবন।
তোমার প্রচ্ছন্ন মন আমারি মতন চাহে কথা—
মঞ্জরিতে মুখরিয়া আনন্দের ঘনগূঢ় ব্যথা ;
অজানারে খুঁজি'
আমারি মতন আন্দোলন।

সচকিয়া চিকনিয়া কাঁপে তব কিশলয়রাজি
সর্ব অঙ্গে নিমেষে নিমেষে,
ওগো আম্রবন।
আমিও তো আপনার বিকশিত কল্পনায় সাজি
অন্তর্লীন আনন্দ-আবেশে
অমনি নূতন।
প্রাণে মোর অমনি তো দোলা দেয় সন্ধ্যায় উষায়
অদৃশ্যের নিশ্বসিত ধ্বনি,
ওগো আম্রবন।
আমার যে পুষ্পশোভা সে কেবল বাণীর ভূষায়,
নূতন চেতনে চিত্ত আপনারে পরাইতে চায়
সুরের গাঁথনি—
গীতঝংকারের আবরণ।

যে অজস্র ভাষা তব উচ্ছ্বসিয়া উঠেছে কুসুমি
ভূতলের চিরন্তনী কথা,
ওগো আম্রবন,
তাই বহে নিয়ে যাও, আকাশের অন্তরঙ্গ তুমি,
ধরণীর বিরহবারতা
গভীর গোপন।
সে-ভাষা সহজে মিশে বাতাসের নিশ্বাসে নিশ্বাসে,

মৌমাছির গুঞ্জনে গুঞ্জনে,
ওগো আম্রবন।
আমার নিভৃত চিত্তে সে-ভাষা সহজে চলে আসে,
মিশে যায় সংগোপনে অন্তরের আভাসে আশ্বাসে
স্বপনে বেদনে,
ধ্যানে মোর করে সঞ্চরণ।

সুদূর জন্মের যেন ভুলে-যাওয়া প্রিয়কণ্ঠস্বর
গন্ধে তব রয়েছে সঞ্চিত,
ওগো আম্রবন।
যেন নাম ধ'রে কোন্ কানে-কানে গোপন মর্মর
তাই মোরে করে রোমাঞ্চিত
আজি ক্ষণে ক্ষণ।
আমার ভাবনা আজি প্রসারিত তব গন্ধ সনে
জনমমরণপরপার,
ওগো আম্রবন,
যেথায় অমরাপুরে সুন্দরের দেউলপ্রাঙ্গণে
জীবনের নিত্য-আশা সন্ন্যাসিনী, সন্ধ্যারতিক্ষণে
দীপ জ্বালি তার
পূর্ণেরে করিছে সমর্পণ।

বহুকাল চলিয়াছে বসন্তের রসের সঞ্চার
ওই তব মজ্জায় মজ্জায়,
ওগো আম্রবন।
বহুকাল যৌবনের মদোৎফুল্ল পল্লীললনার
আকুলিত অলক সজ্জায়
জোগালে ভূষণ।
শিকড়ের মুষ্টি দিয়া আঁকড়িয়া যে-বক্ষ পৃথ্বীর
প্রাণরস কর তুমি পান,
ওগো আম্রবন,

সেথা আমি গেঁথে আছি দুদিনের কুটির মৃত্তির ;-
তোমার উৎসবে আমি আজি গাব এক রজনীর
পথ-চলা গান,
কালি তার হবে সমাপন।

৫ ফাল্গুন ১৩৩৪
[শান্তিনিকেতন]

নীলমণিলতা

শান্তিনিকেতন উত্তরায়ণের একটি কোণের বাড়িতে আমার বাসা ছিল। এই বাসার অঙ্গনে আমার পরলোকগত বন্ধু পিয়র্সন একটি বিদেশী গাছের চারা রোপণ করেছিলেন। অনেককাল অপেক্ষার পরে নীলফুলের স্তবকে স্তবকে একদিন সে আপনার অজস্র পরিচয় অবারিত করলে। নীল রঙে আমার গভীর আনন্দ, তাই এই ফুলের বাণী আমার যাতায়াতের পথে প্রতিদিন আমাকে ডাক দিয়ে বারে বারে স্তব্ধ করেছে। আমার দিক থেকে কবিরও কিছু বলবার ইচ্ছে হত কিন্তু নাম না পেলে সম্ভাষণ করা চলে না। তাই লতাটির নাম দিয়েছি নীলমণিলতা। উপযুক্ত অনুষ্ঠানের দ্বারা সেই নামকরণটি পাকা করবার জন্যে এই কবিতা। নীলমণি ফুল যেখানে চোখের সামনে ফোটে সেখানে নামের দরকার হয় নি, কিন্তু একদা অবসানপ্রায় বসন্তের দিনে দূরে ছিলুম, সে-দিন রূপের স্মৃতি নামের দাবি করলে। ভক্ত ১০১ নামে দেবতাকে ডাকে সে শুধু বিরহের আকাশকে পরিপূর্ণ করবার জন্যে।

ফাল্গুনমাধুরী তার চরণের মঞ্জীরে মঞ্জীরে
নীলমণিমঞ্জরির গুঞ্জন বাজায়ে দিল কি রে।
আকাশ যে মৌনভার
বহিতে পারে না আর,
নীলিমাবন্যায় শূন্যে উচ্ছলে অনন্ত ব্যাকুলতা,
তারি ধারা পুষ্পপাত্রে ভরি নিল নীলমণিলতা

পৃথ্বীর গভীর মৌন দূর শৈলে ফেলে নীল ছায়া,
মধ্যাহ্নমরীচিকায় দিগন্তে খোঁজে সে স্বপ্নকায়া।
যে-মৌন নিজেরে চায়
সমুদ্রের নীলিমায়,
অন্তহীন সেই মৌন উচ্ছ্বসিল নীলগুচ্ছ ফুলে,
দুর্গম রহস্য তার উঠিল সহজ ছন্দে দুলে।

আসন্ন মিলনাশ্বাসে বধূর কম্পিত তনুখানি
নীলাম্বর-অঞ্চলের গুণ্ঠনে সঞ্চিত করে বাণী।
মর্মের নির্বাক কথা
পায় তার নিঃসীমতা
নিবিড় নির্মল নীলে; আনন্দের সেই নীল দ্যুতি
নীলমণিমঞ্জরির পুঞ্জে পুঞ্জে প্রকাশে আকুতি।

অজানা পান্থের মতো ডাক দিলে অতিথির ডাকে,
অপরূপ পুষ্পোচ্ছ্বাসে হে লতা, চিনালে আপনাকে।
বেল জুঁই শেফালিরে
জানি আমি ফিরে ফিরে,
কত ফাল্গুনের, কত শ্রাবণের, আশ্বিনের ভাষা
তারা তো এনেছে চিত্তে, রঙিন করেছে ভালোবাসা

চাঁপার কাঞ্চন-আভা সে-যে কার কণ্ঠস্বরে সাধা,
নাগকেশরের গন্ধ সে-যে কোন্ বেণীবন্ধে বাঁধা।
বাদলের চামেলি-যে
কালো আঁখিজলে ভিজে,
করবীর রাঙা রঙ কঙ্কণঝংকারসুরে মাখা,
কদম্বকেশরগুলি নিদ্রাহীন বেদনায় আঁকা।

তুমি সুদূরের দূতী, নূতন এসেছ নীলমণি,
স্বচ্ছ নীলাম্বরসম নির্মল তোমার কণ্ঠধ্বনি।
যেন ইতিহাসজালে
বাঁধা নহ দেশে কালে,
যেন তুমি দৈববাণী বিচিত্র বিশ্বের মাঝখানে,
পরিচয়হীন তব আবির্ভাব, কেন এ কে জানে

'কেন এ কে জানে'— এই মন্ত্র আজি মোর মনে জাগে ;
তাই তো ছন্দের মালা গাঁথি অকারণ অনুরাগে।
বসন্তের নানা ফুলে
গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলে,
আম্রবনে ছায়া কাঁপে মৌমাছির গুঞ্জরণগানে ;
মেলে অপরূপ ডানা প্রজাপতি; কেন এ কে জানে।

কেন এ কে জানে এত বর্ণগন্ধরসের উল্লাস,
প্রাণের মহিমাছবি রূপের গৌরবে পরকাশ।
যেদিন বিতানচ্ছায়ে
মধ্যাহ্নের মন্দবায়ে
ময়ূর আশ্রয় নিল, তোমারে তাহারে একখানে
দেখিলাম চেয়ে চেয়ে, কহিলাম, 'কেন এ কে জানে'

অভ্যাসের সীমা-টানা চৈতন্যের সংকীর্ণ সংকোচে
ঔদাস্যের ধুলা ওড়ে, আঁখির বিস্ময়রস ঘোচে।
মন জড়তায় ঠেকে,
নিখিলেরে জীর্ণ দেখে,
হেনকালে হে নবীন, তুমি এসে কী বলিলে কানে ;
বিশ্বপানে চাহিলাম, কহিলাম, 'কেন এ কে জানে'।

আমি আজ কোথা আছি, প্রবাসে অতিথিশালা মাঝে।
তব নীললাবণ্যের বংশীধ্বনি দূর শূন্যে বাজে।
আসে বৎসরের শেষ,
চৈত্র ধরে ম্লান বেশ,
হয়তো বা রিক্ত তুমি ফুল ফোটাবার অবসানে,
তবু, হে অপূর্ব রূপ, দেখা দিলে কেন যে কে জানে।

২৭ চৈত্র ১৩৩৩
ভরতপুর

কুরচি

অনেককাল পূর্বে শিলাইদহ থেকে কলকাতায় আসছিলেম। কুষ্টিয়া স্টেশনঘরের পিছনের দেয়ালঘেঁষা এক কুরচিগাছ চোখে পড়ল। সমস্ত গাছটি ফুলের ঐশ্বর্যে মহিমান্বিত। চারিদিকে হাটবাজার; একদিকে রেলের লাইন, অন্যদিকে গোরুর গাড়ির ভিড়, বাতাস ধুলোয় নিবিড়। এমন অজায়গায় পি. ডব্লু. ডি-র স্বরচিত প্রাচীরের গায়ে ঠেস দিয়ে এই একটি কুরচিগাছ তার সমস্ত শক্তিতে বসন্তের জয়ঘোষণা করছে— উপেক্ষিত বসন্তের প্রতি তার অভিবাদন সমস্ত হট্টগোলের উপরে যাতে ছাড়িয়ে ওঠে এই যেন তার প্রাণপণ চেষ্টা। কুরচির সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়।

ভ্রমর একদা ছিল পদ্মবনপ্রিয়
ছিল প্রীতি কুমুদিনী পানে।
সহসা বিদেশে আসি হায়, আজ কি ও
কুটজেও বহু বলি' মানে!

—সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকের অনুবাদ

কুরচি, তোমার লাগি পদ্মেরে ভুলেছে অন্যমনা
যে-ভ্রমর, শুনি নাকি তারে কবি করেছে ভর্ৎসনা।
আমি সেই ভ্রমরের দলে। তুমি আভিজাত্যহীনা,
নামের গৌরবহারা; শ্বেতভুজা ভারতীর বীণা

তোমারে করে নি অভ্যর্থনা অলংকারঝংকারিত
কাব্যের মন্দিরে। তবু সেথা তব স্থান অবারিত,
বিশ্বলক্ষ্মী করেছেন আমন্ত্রণ যে-প্রাঙ্গণতলে
প্রসাদচিহ্নিত তাঁর নিত্যকার অতিথির দলে।
আমি কবি লজ্জা পাই কবির অন্যায় অবিচারে
হে সুন্দরী। শাস্ত্রদৃষ্টি দিয়ে তারা দেখেছে তোমারে,
রসদৃষ্টি দিয়ে নহে; শুভদৃষ্টি কোনো সুলগনে
ঘটিতে পারে নি তাই, ঔদাস্যের মোহ-আবরণে
রহিলে কুণ্ঠিত হয়ে।

তোমারে দেখেছি সেই কবে
নগরে হাটের ধারে, জনতার নিত্যকলরবে,
ইঁটকাঠপাথরের শাসনের সংকীর্ণ আড়ালে,
প্রাচীরের বহিঃপ্রান্তে।— সূর্যপানে চাহিয়া দাঁড়ালে
সকরুণ অভিমানে;— সহসা পড়েছে যেন মনে
একদিন ছিলে যবে মহেন্দ্রের নন্দনকাননে
পারিজাতমঞ্জরির লীলার সঙ্গিনীরূপ ধরি
চিরবসন্তের স্বর্গে, ইন্দ্রাণীর সাজাতে কবরী;
অপ্সরীর নৃত্যলোল মণিবন্ধে কঙ্কণবন্ধনে
পেতে দোল তালে তালে; পূর্ণিমার অমল চন্দনে
মাখা হয়ে নিশ্বসিতে চন্দ্রমার বক্ষোহার-'পরে।
অদূরে কঙ্কররুক্ষ লৌহপথে কঠোর ঘর্ঘরে
চলেছে আগ্নেয়রথ, পণ্যভারে কম্পিত ধরায়
ঔদ্ধত্য বিস্তারি বেগে; কটাক্ষে কেহ না ফিরে চায়
অর্থমূল্যহীন তোমাপানে, হে তুমি দেবের প্রিয়া,
স্বর্গের দুলালী। যবে নাটমন্দিরের পথ দিয়া
বেসুর অসুর চলে, সেইক্ষণে তুমি একাকিনী
দক্ষিণবায়ুর ছন্দে বাজায়েছ সুগন্ধ-কিঙ্কিণী
বসন্তবন্দনানৃত্যে,— অবজ্ঞিয়া অন্ধ অবজ্ঞারে,

ঐশ্বর্যের ছদ্মবেশী ধূলির দুঃসহ অহংকারে
হানিয়া মধুর হাস্য ; শাখায় শাখায় উচ্ছ্বসিত
ক্লান্তিহীন সৌন্দর্যের আত্মহারা অজস্র অমৃত
করেছ নিঃশব্দ নিবেদন।

মোর মুগ্ধ চিত্তময়
সেইদিন অকস্মাৎ আমার প্রথম পরিচয়
তোমা-সাথে। অনাদৃত বসন্তেরে আবাহন গীতে
প্রণমিয়া উপেক্ষিতা, শুভক্ষণে কৃতজ্ঞ এ চিতে
পদার্পিলে অক্ষয় গৌরবে। সেইক্ষণে জানিলাম,
হে আত্মবিস্মৃত তুমি, ধরাতলে সত্য তব নাম
সকলেই ভুলে গেছে, সে-নাম প্রকাশ নাহি পায়
চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রন্থে পণ্ডিতের পুঁথির পাতায় ;
গ্রামের গাথার ছন্দে সে-নাম হয় নি আজো লেখা,
গানে পায় নাই সুর। সে-নাম কেবল জানে একা
আকাশের সূর্যদেব, তিনি তাঁর আলোকবীণায়
সে-নামে ঝংকার দেন, সেই সুর ধূলিরে চিনায়
অপূর্ব ঐশ্বর্য তার ; সে-সুরে গোপন বার্তা জানি'
সন্ধানী বসন্ত হাসে। স্বর্গ হতে চুরি করে আনি'
এ ধরা, বেদের মেয়ে, তোরে রাখে কুটির-কানাচে
কটুনামে লুকাইয়া, হঠাৎ পড়িস ধরা পাছে।
পণ্যের কর্কশধ্বনি এ নামে কদর্য আবরণ
রচিয়াছে ; তাই তোরে দেবী ভারতীর পদ্মবন
মানে নি স্বজাতি বলে, ছন্দ তোরে করে পরিহার,—
তা বলে হবে কি ক্ষুণ্ণ কিছুমাত্র তোর শুচিতার।
সূর্যের আলোর ভাষা আমি কবি কিছু কিছু চিনি,
কুর্চি, পড়েছ ধরা, তুমিই রবির আদরিণী।

১০ বৈশাখ ১৩৩৪
শান্তিনিকেতন

শাল

প্রায় ত্রিশ বছর হল শান্তিনিকেতনের শালবীথিকায় আমার সে-দিনকার এক কিশোর কবিবন্ধুকে পাশে নিয়ে অনেক দিন অনেক সায়াহ্নে পায়চারি করেছি। তাকে অন্তরের গভীর কথা বলা বড়ো সহজ ছিল। সেই আমাদের যত আলাপগুঞ্জরিত রাত্রি, আশ্রমবাসের ইতিহাসে আমার চিরন্তন স্মৃতিগুলির সঙ্গেই গ্রথিত হয়ে আছে। সে কবি আজ ইহলোকে নেই। পৃথিবীতে মানুষের প্রিয়সঙ্গের কত ধারা কত নিভৃত পথ দিয়ে চলেছে। এই স্তব্ধ তরুশ্রেণীর প্রাচীন ছায়ায় সেই ধারা তেমন করে আরো অনেক বয়ে গেছে, আরো অনেক বইবে। আমরা চলে যাব কিন্তু কালে কালে বারে বারে বন্ধুসংগমের জন্য এই ছায়াতল রয়ে গেল। যেমন অতীতের কথা ভাবছি— তেমনি ওই শালশ্রেণীর দিকে চেয়ে বহুদূর ভবিষ্যতের ছবিও মনে আসছে।

বাহিরে যখন ক্ষুব্ধ দক্ষিণের মদির পবন
অরণ্যে বিস্তারে অধীরতা ; যবে কিংশুকের বন
উচ্ছৃঙ্খল রক্তরাগে স্পর্ধায় উদ্যত ; দিশিদিশি
শিমুল ছড়ায় ফাগ ; কোকিলের গান অহর্নিশি
জানে না সংযম, যবে বকুল অজস্র সর্বনাশে
স্খলিত দলিত বনপথে, তখন তোমার পাশে
আসি আমি হে তপস্বী শাল, যেথায় মহিমারাশি
পুঞ্জিত করেছ অভ্রভেদী, যেথা রয়েছ বিকাশি
দিগন্তে গম্ভীর শান্তি। অন্তরের নিগূঢ় গভীরে
ফুল ফুটাবার ধ্যানে নিবিষ্ট রয়েছ ঊর্ধ্বশিরে ;
চৌদিকের চঞ্চলতা পশে না সেথায়। অন্ধকারে
নিঃশব্দ সৃষ্টির মন্ত্র নাড়ি বেয়ে শাখায় সঞ্চারে ;
সে অমৃত মন্ত্রতেজ নিলে ধরি সূর্যলোক হতে
নিভৃত মর্মের মাঝে ; স্নান করি আলোকের স্রোতে
শুনি নিলে নীল আকাশের শান্তিবাণী ; তার পরে
আত্মসমাহিত তুমি, স্তব্ধ তুমি,— বৎসরে বৎসরে
বিশ্বের প্রকাশযজ্ঞে বারম্বার করিতেছ দান
নিপুণ সুন্দর তব কমণ্ডলু হতে অফুরান

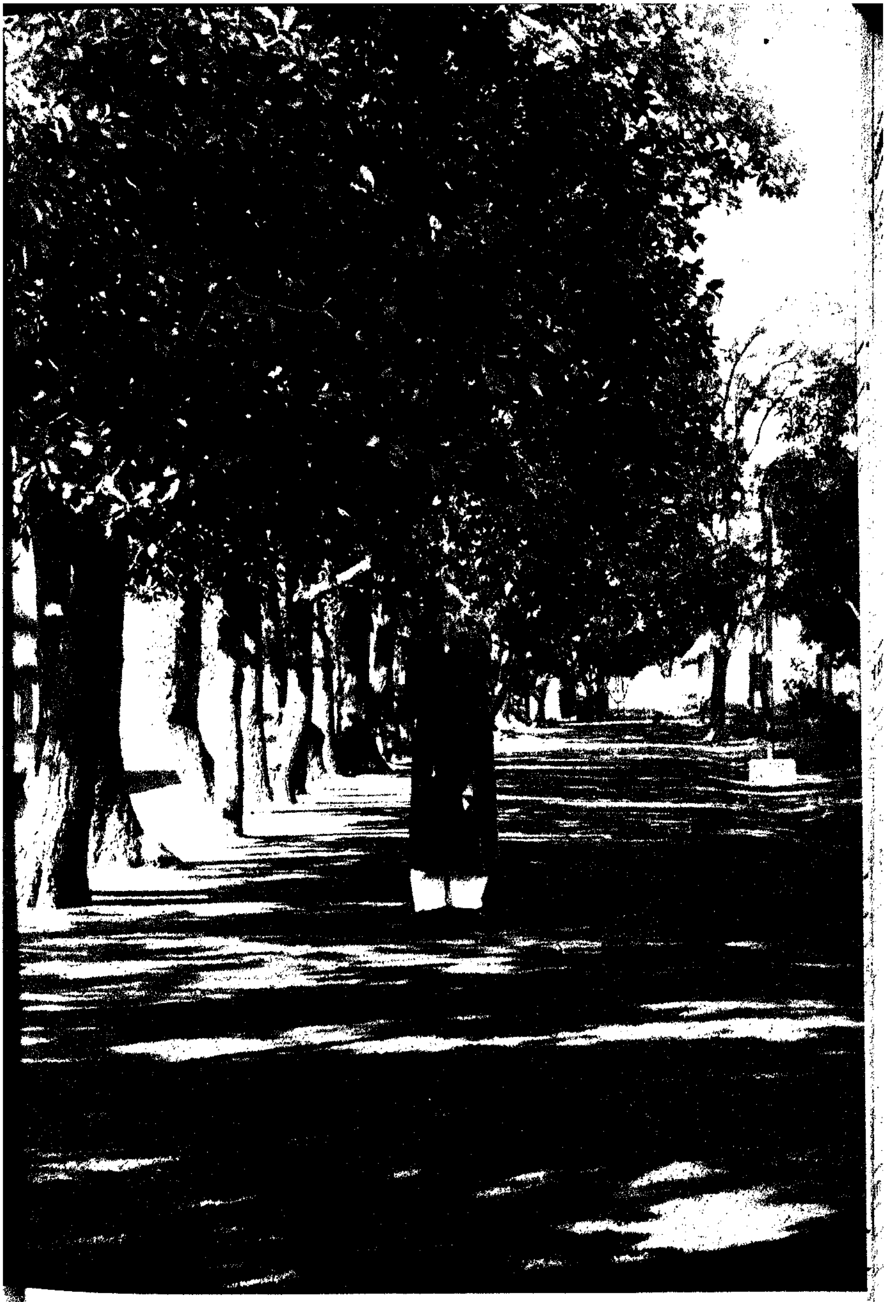

শান্তিনিকেতন শালবীথিকায় রবীন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগ্রহ হইতে

পুণ্যগন্ধী প্রাণধারা ; সে ধারা চলেছে ধীরে ধীরে
দিগন্তে শ্যামল উর্মি উচ্ছ্বাসিয়া, দূর শতাব্দীরে
শুনাতে মর্মর আশীর্বাণী। রাজার সাম্রাজ্য কতশত
কালের বন্যায় ভাসে, ফেটে যায় বুদ্‌বুদের মতো,
মানুষের ইতিবৃত্ত সুদুর্গম গৌরবের পথে
কিছুদূর যায়, আর বারম্বার ভগ্নচূর্ণ রথে
কীর্ণ করে ধূলি। তারি মাঝে উদার তোমার স্থিতি,
ওগো মহা শাল, তুমি সুবিশাল কালের অতিথি ;
আকাশেরে দাও সঙ্গ বর্ণরঙ্গে শাখার ভঙ্গিতে,
বাতাসেরে দাও মৈত্রী পল্লবের মর্মরসংগীতে,
মঞ্জরির গন্ধের গণ্ডূষে। যুগে যুগে কত কাল
পথিক এসেছে তব ছায়াতলে, বসেছে রাখাল,
শাখায় বেঁধেছে নীড় পাখি ; যায় তারা পথ বাহি
আসন্ন বিস্মৃতি পানে, উদাসীন তুমি আছ চাহি।
নিত্যের মালার সূত্রে অনিত্যের যত অক্ষগুটি
অ।স্তত্বের আবর্তনে দ্রুতবেগে চলে তারা ছুটি ;
মর্ত্যপ্রাণ তাহাদের ক্ষণেক পরশ করে যেই
পায় তারা রূপনাম, তার পরে আর তারা নেই,
নেমে যায় অসংখ্যের তলে। সেই চলে-যাওয়া দল
রেখে দিয়ে গেছে যেন ক্ষণিকের কলকোলাহল
দক্ষিণহাওয়ায় কাঁপা ওই তব পত্রের কল্লোলে,
শাখার দোলায়। ওই ধ্বনি স্মরণে জাগায়ে তোলে
কিশোর বন্ধুরে মোর। কতদিন এই পাতাঝরা
বীথিকায়, পুষ্পগন্ধে বসন্তের আগমনী-ভরা
সায়াহ্নে দুজনে মোরা ছায়াতে অঙ্কিত চন্দ্রালোকে
ফিরেছি গুঞ্জিত আলাপনে। তার সেই মুগ্ধ চোখে
বিশ্ব দেখা দিয়েছিল নন্দনমন্দার রঙে রাঙা ;
যৌবন-তুফান-লাগা সেদিনের কত নিদ্রাভাঙা
জ্যোৎস্নামুগ্ধ রজনীর সৌহার্দ্যের সুধারসধারা
তোমার ছায়ার মাঝে দেখা দিল, হয়ে গেল সারা।

গভীর আনন্দক্ষণ কতদিন তব মঞ্জরিতে
একান্ত মিশিয়াছিল একখানি অখণ্ড সংগীতে
আলোকে আলাপে হাস্যে, বনের চঞ্চল আন্দোলনে,
বাতাসের উদাস নিশ্বাসে।

প্রীতিমিলনের ক্ষণে
সেদিনের প্রিয় সে কোথায়, বর্ষে বর্ষে দোলা দিত
যাহার প্রাণের বেগ উৎসব করিয়া তরঙ্গিত।
তোমার বীথিকাতলে তার মুক্ত জীবনপ্রবাহ
আনন্দচঞ্চল গতি মিলায়েছে আপন উৎসাহ
পুষ্পিত উৎসাহে তব। হায়, আজি তব পত্রদোলে
সেদিনের স্পর্শ নাই। তাই এই বসন্তকল্লোলে,
পূর্ণিমার পূর্ণতায়, দেবতার অমৃতের দানে
মর্ত্যের বেদনা মেশে।

চাহি' আজ দূর পানে
স্বপ্নচ্ছবি চোখে ভাসে,— ভাবী কোন্ ফাল্গুনের রাতে
দোলপূর্ণিমায়, সাজাতে আসিছে কারা পদ্মপাতে
পলাশ বকুল চাঁপা, আলিম্পনলেখা এঁকে দিতে
তব ছায়াবেদিকায়, বসন্তের আবাহন গীতে
প্রসন্ন করিতে তব পুষ্পবরিষন। সে-উৎসবে
আজিকার এই দিন পথপ্রান্তে লুণ্ঠিত নীরবে।
কোলে তার পড়ে আছে এ-রাত্রির উৎসবের ডালা।
আজিকার অর্ঘ্যে আছে যতগুলি সুরে-গাঁথা মালা,
কিছু তার শুকায়েছে, কিছু তার আছে অমলিন;
দুয়েকটি তুলে নিল যাত্রীদল; সে-দিন এ-দিন
দোঁহে দোঁহা মুখ চেয়ে বদল করিয়া নিল মালা,—
নূতনে ও পুরাতনে পূর্ণ হল বসন্তের পালা।

৮ ফাল্গুন ১৩৩৪
[শান্তিনিকেতন]

মধুমঞ্জরি

এ লতার কোনো-একটা বিদেশী নাম নিশ্চয় আছে— জানি নে, জানার দরকারও নেই। আমাদের দেশের মন্দিরে এই লতার ফুলের ব্যবহার চলে না, কিন্তু মন্দিরের বাহিরের যে-দেবতা মুক্তস্বরূপে আছেন তাঁর প্রচুর প্রসন্নতা এর মধ্যে বিকশিত। কাব্যসরস্বতী কোনো মন্দিরের বন্দিনী দেবতা নন, তাঁর ব্যবহারে এই ফুলকে লাগাব ঠিক করেছি, তাই নতুন করে নাম দিতে হল। রূপে রসে এর মধ্যে বিদেশী কিছুই নেই, এদেশের হাওয়ায় মাটিতে এর একটুও বিতৃষ্ণা দেখা যায় না, তাই দিশী নামে একে আপন করে নিলেম।

প্রত্যাশী হয়ে ছিনু এতকাল ধরি,
বসন্তে আজ দুয়ারে, আ মরি মরি,
ফুলমাধুরীর অঞ্জলি দিল ভরি
মধুমঞ্জরিলতা।
কতদিন আমি দেখিতে এসেছি প্রাতে
কচি ডালগুলি ভরি নিয়ে কচি পাতে
আপন ভাষায় যেন আলোকের সাথে
কহিতে চেয়েছে কথা।

কতদিন আমি দেখেছি গোধূলিকালে
সোনালি ছায়ার পরশ লেগেছে ডালে,
সন্ধ্যাবায়ুর মৃদু-কাঁপনের তালে
কী যেন ছন্দ শোনে।
গহন নিশীথে ঝিল্লি যখন ডাকে,
দেখেছি চাহিয়া জড়িত ডালের ফাঁকে
কালপুরুষের ইঙ্গিত যেন কাকে
দূর দিগন্তকোণে।

শ্রাবণে সঘন ধারা ঝরে ঝরঝর
পাতায় পাতায় কেঁপে ওঠে থরথর,

মনে হয় ওর হিয়া যেন ভর-ভর
বিশ্বের বেদনাতে।
কতবার ওর মর্মে গিয়েছি চলি,
বুঝিতে পেরেছি কেন উঠে চঞ্চলি,
শরৎশিশিরে যখন সে ঝলমলি
শিহরায় পাতে পাতে।

ভুবনে ভুবনে যে-প্রাণ সীমানাহারা
গগনে গগনে সিঞ্চিল গ্রহতারা
পল্লবপুটে ধরি লয় তারি ধারা,
মজ্জায় লহে ভরি।
কী নিবিড় যোগ এই বাতাসের সনে,
যেন সে পরশ পায় জননীর স্তনে,
সে পুলকখানি কত-যে, সে মোর মনে
বুঝিব কেমন করি।

বাতাসে আকাশে আলোকের মাঝখানে—
ঋতুর হাতের মায়ামন্ত্রের টানে
কী-যে বাণী আছে প্রাণে প্রাণে ও-ই জানে,
মন তা জানিবে কিসে।
যে-ইন্দ্রজাল দ্যুলোকে ভূলোকে ছাওয়া,
বুকের ভিতর লাগে ওর তারি হাওয়া,—
বুঝিতে যে চাই কেমন সে ওর পাওয়া,
চেয়ে থাকি অনিমিষে।

ফুলের গুচ্ছে আজি ও উচ্ছ্বসিত,
নিখিলবাণীর রসের পরশামৃত
গোপনে গোপনে পেয়েছে অপরিমিত
ধরিতে না পারে তারে।

ছন্দে গন্ধে রূপ-আনন্দে ভরা,
ধরণীর ধন গগনের মন-হরা,
শ্যামলের বীণা বাজিল মধুস্বরা
ঝংকারে ঝংকারে।

আমার দুয়ারে এসেছিল নাম ভুলি
পাতা-ঝলমল অঙ্কুরখানি তুলি
মোর আঁখিপানে চেয়েছিল দুলি দুলি
করুণ প্রশ্নরতা।
তারপরে কবে দাঁড়াল যেদিন ভোরে
ফুলে ফুলে তার পরিচয়লিপি ধরে
নাম দিয়ে আমি নিলাম আপন করে
মধুমঞ্জরিলতা।

তারপরে যবে চলে যাব অবশেষে
সকল ঋতুর অতীত নীরব দেশে,
তখনো জাগাবে বসন্ত ফিরে এসে
ফুল-ফোটাবার ব্যথা।
বরষে বরষে সেদিনো তো বারে বারে
এমনি করিয়া শূন্য ঘরের দ্বারে
এই লতা মোর আনিবে কুসুমভারে
ফাগুনের আকুলতা।

তব পানে মোর ছিল যে প্রাণের প্রীতি
ওর কিশলয়ে রূপ নেবে সেই স্মৃতি,
মধুর গন্ধে আভাসিবে নিতি নিতি
সে মোর গোপন কথা।

অনেক কাহিনী যাবে যে সেদিন ভুলে,
স্মরণচিহ্ন কত যাবে উন্মূলে ;
মোর দেওয়া নাম লেখা থাক্‌ ওর ফুলে
মধুমঞ্জরিলতা।

[চৈত্র ১৩৩৬
শান্তিনিকেতন]

নারিকেল

সমুদ্রের ধারে জমিতেই নারিকেলের সহজ আবাস। আমাদের আশ্রমের মাঠ সেই সমুদ্রকূল থেকে বহুদূরে। এখানে অনেক যত্নে একটি নারিকেলকে পালন করে তোলা হয়েছে— সে নিঃসঙ্গ নিষ্ফল নিস্তেজ। তাকে দেখে মনে হয় সে যেন প্রাণপণে ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে দিগন্ত অতিক্রম করে কোনো-এক আকাঙ্ক্ষার ধনকে দেখবার চেষ্টা করছে। নির্বাসিত তরুর মজ্জার মধ্যে সেই আকাঙ্ক্ষা। এখানে আলোনা মাটিতে সমুদ্রের স্পর্শমাত্র নেই, গাছের শিকড় তার বাঞ্ছিত রস এখানে সন্ধান করছে, পাচ্ছে না ; সে উপবাসী, ধরণীর কাছে তার কান্নার সাড়া মিলছে না। আকাশে উদ্যত হয়ে উঠে তার যে-সন্ধানদৃষ্টিকে সে দিগন্তপারে পাঠাচ্ছে দিনান্তে সন্ধ্যাবেলায় সেই তার সন্ধানেরই সজীব মূর্তির মতো পাখি তার দোদুল্যমান শাখায় প্রতিদিন ফিরে ফিরে আসে।

আজ বসন্তে প্রথম কোকিল ডেকে উঠল। দক্ষিণ হাওয়ায় আজ কি সমুদ্রের বাণী এসে পৌঁছল, যে-বাণী সমুদ্রের কূলে কূলে বধির মাটির সুপ্তিকে নিয়তই অশান্ত তরঙ্গমন্ত্রে আন্দোলিত করে তুলছে। তাই কি আজ সেই দক্ষিণসমুদ্র থেকে তার তাণ্ডবনৃত্যের স্পর্শ এই গাছের শাখায় শাখায় চঞ্চল। সমুদ্রের রুদ্রডমরুর জাগরণী কি এরই পল্লবমর্মরে তার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি জাগিয়েছে। বিরহী তরু কি আজ আপন অন্তরে সেই সুদূরবন্ধুর বার্তা পেল, যে-বন্ধুর মহাগানে অভিনন্দিত হয়ে কোন্‌ অতীত যুগে একদিন কোনো প্রথম নারিকেল প্রাণযাত্রীরূপে জীবলোকে যাত্রা শুরু করেছিল ? সেই যুগারম্ভপ্রভাতের আদিম উৎসবে মহাপ্রাণের যে-স্পর্শপুলক জেগেছিল তাই আজ

ফিরে পেয়ে কি ওই গাছটির সংবৎসরের অবসাদ আজ বসন্তে ঘুচল। তার জীবনের জয়পতাকা আবার আজ কি ওই নব-উৎসাহে নীলাম্বরে আন্দোলিত। যেন একটা আচ্ছাদন উঠে গেল, তার মজ্জার মধ্যে প্রাণশক্তির যে-আশ্বাসবাণী প্রচ্ছন্ন হয়েছিল তাকেই আজ কি ফিরে পেলে, যে-বাণী বলছে— 'চলো প্রাণতীর্থে, জয় করো মৃত্যুকে।'

সমুদ্রের কূল হতে বহুদূরে শব্দহীন মাঠে
নিঃসঙ্গ প্রবাস তব নারিকেল,— দিনরাত্রি কাটে
যে-প্রচ্ছন্ন আকাঙ্ক্ষায় বুঝিতে পার না তাহা নিজে।
দিগন্তেরে অতিক্রমি দেখিতে চাহিছ তুমি কী-যে
দীর্ঘ করি দেহ তব, মজ্জায় রয়েছে তার স্মৃতি
গূঢ় হয়ে। মাটির গভীরে যে-রস খুঁজিছ নিতি
কী স্বাদ পাও না তাহে, অন্নে তার কী অভাব আছে,
তাই তো শিকড় উপবাসী কাঁদে ধরণীর কাছে।
আকাশে রয়েছ চেয়ে রাত্রিদিন কিসের প্রত্যাশে
বাক্যহারা! বারবার শূন্য হতে ফিরে ফিরে আসে
তোমারি সন্ধানরূপী সন্ধ্যাবেলাকার শ্রান্ত পাখি
লম্বিত শাখায় তব।
ঐ শুন উঠিয়াছে ডাকি
বসন্তের প্রথম কোকিল। সে বাণী কি এল প্রাণে
দক্ষিণপবন হতে যে-বাণী সমুদ্র শুধু জানে;
পৃথিবীর কূলে কূলে যে-বাণী গম্ভীর আন্দোলনে
বধির মাটির সুপ্তি কাঁপায়ে তুলিছে প্রতিক্ষণে
অশান্ততরঙ্গমন্দ্রে, দক্ষিণসাগর হতে একি
তাণ্ডবনৃত্যের স্পর্শ শাখার হিল্লোলে তব দেখি
মুহুর্মুহু চঞ্চলিত।
রুদ্রডমরুর জাগরণী
পল্লবমর্মরে তব পেয়েছে কি ক্ষীণ প্রতিধ্বনি।
কান পেতে ছিলে তুমি,— হে বিরহী, বসন্তে কি আজি
সুদূরবন্ধুর বার্তা অন্তরে উঠিল তব বাজি,—

যে-বন্ধুর মহাগানে একদিন সূর্যের আলোতে
রোমাঞ্চিয়া বাহিরিলে প্রাণযাত্রী, অন্ধকার হতে ?
আজি কি পেয়েছ ফিরে প্রাণের পরশহর্ষ সেই
যুগারম্ভপ্রভাতের আদি-উৎসবের।— নিমেষেই
অবসাদ দূরে গেল, জীবনের বিজয়পতাকা
আবার চঞ্চল হল নীলাম্বরে, খুলে গেল ঢাকা,
খুঁজে পেলে যে-আশ্বাস অন্তরে কহিছে রাত্রিদিন—
'প্রাণতীর্থে চলো, মৃত্যু করো জয়, শ্রান্তিক্লান্তিহীন।'

[১৬ ফাল্গুন ১৩৩৪
শান্তিনিকেতন]

চামেলি-বিতান

চামেলি-বিতানের নিচের ছায়ায় আমি বসতুম— ময়ূর এসে বসত উপরে, লতার আশ্রয়বেষ্টনী থেকে পুচ্ছ ঝুলিয়ে। জানি সে আমাকে কিছুমাত্র সম্মান করত না, কিন্তু সৌন্দর্যের যে-অর্ঘ্যভার সে বহন করে বেড়াত, তার অজ্ঞাতে আমি নিজেই সেটি প্রতিদিন গ্রহণ করেছি। এমন অসংকোচে সে যে দেখা দিয়ে যায় এতে আমি কৃতজ্ঞ ছিলুম, সে যে আমাকে ভয় করে নি এ আমার সৌভাগ্য। আরও তার কয়েকটি সঙ্গী সঙ্গিনী ছিল কিন্তু দূরের দুরাশায় ওদের কোথায় টেনে নিয়ে গেল, আমিও চলে এসেছি সেই চামেলির সুগন্ধি ছায়ার আশ্রয় থেকে অন্য জায়গায়। বাইরে থেকে এই পরিবর্তনগুলি বেশি কিছু নয়, তবু অন্তরের মধ্যে ভাঙাচোরার দাগ কিছু কিছু থেকে যায়। শুনেছিলুম আমাদের প্রদেশে কোনো-এক নদীগর্ভজাত দ্বীপ ময়ূরের আশ্রয়। ময়ূর হিন্দুর অবধ্য। মৃগয়াবিলাসী ইংরেজ এই দ্বীপের নিষেধকে উপেক্ষা করতে পারে নি অথচ গুলি করে ময়ূর মারবার প্রবল আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব

হওয়াতে পার্শ্ববর্তী দ্বীপে খাদ্যের প্রলোভন বিস্তার করে ভুলিয়ে নিয়ে এসে ময়ূর মারত। বাল্মীকির শাপকে এ-যুগের কবি পুনরায় প্রচার না করে থাকতে পারল না।

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বং
অগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।

ময়ূর কর নি মোরে ভয়,
সেই গর্ব, সেই মোর জয়।
বাহিরেতে আমলকী
করিতেছে ঝকমকি,
বটের উঠেছে কচি পাতা,
হোথায় দুয়ার থেকে
আমারে গিয়েছ দেখে,
খুলিয়া বসেছি মোটা খাতা।
লিখিতেছি নিজ মনে,—
হেরি' তাই আঁখিকোণে
অবজ্ঞায় ফিরে যাও চলি,
বোঝ না, লেখনী ধরি
কী যে এত খুঁটে মরি,
আমারে জেনেছ মূঢ় বলি।

সেই ভালো জান যদি তাই,
তাহে মোর কোন খেদ নাই।
তবু আমি খুশী আছি,
আস তুমি কাছাকাছি,
মোরে দেখে নাহি কর ত্রাস
যদিও মানব, তবু
আমারে কর না কভু
দানব বলিয়া অবিশ্বাস।

সুন্দরের দূত তুমি,
এ-ধূলির মর্ত্যভূমি,
স্বর্গের প্রসাদ হেথা আন,
তবুও বধি না তোরে,
বাঁধি না পিঞ্জরে ধরে,
এও কি আশ্চর্য নাহি মান

কাননের এই এক কোণা,—
হেথায় তোমার আনাগোনা।
চামেলিবিতানতল
মোর বসিবার স্থল,
দিন যবে অবসান হয়।
হেথা আস কী যে ভাবি',
মোর চেয়ে তোর দাবি
বেশি বই কম কিছু নয়।
জ্যোৎস্না ডালের ফাঁকে
হেথা আল্‌পনা আঁকে,
এ নিকুঞ্জ জানে আপনার।
কচি পাতা যে-বিশ্বাসে
দ্বিধাহীন হেথা আসে,
তোমার তেমনি অধিকার।

বর্ণহীন রিক্ত মোর সাজ,
তারি লাগি পাছে পাই লাজ,
বর্ণে বর্ণে আমি তাই
ছন্দ রচিবারে চাই,
সুরে সুরে গীতচিত্র করি।
আকাশেরে বাসি ভালো,
সকাল-সন্ধ্যার আলো
আমার প্রাণের বর্ণে ভরি।

ধরায় যেখানে তাই,
তোমার গৌরব-ঠাঁই
সেথায় আমারো ঠাঁই হয়।
সুন্দরের অনুরাগে
তাই মোর গর্ব লাগে,
মোরে তুমি কর নাই ভয়।

তোমার আমার তরে জানি
মধুরের এই রাজধানী।
তোর নাচ, মোর গীতি,
রূপ তোর, মোর প্রীতি,
তোর বর্ণ, আমার বর্ণনা,—
শোভনের নিমন্ত্রণে
চলি মোরা দুইজনে,
তাই তুই আমার আপনা।
সহজ রঙ্গের রঙ্গী
ওই যে গ্রীবার ভঙ্গী,
বিস্ময়ের নাহি পাই পার।
তুমি-যে শঙ্কা না পাও,
নিঃসংশয়ে আস যাও,
এই মোর নিত্য পুরস্কার।

নাশ করে যে-আগ্নেয় বাণ
মুহূর্তে অমূল্য তোর প্রাণ—
তার লাগি বসুন্ধরা
হয় নি সবুজে ভরা,
তার লাগি ফুল নাহি ধরে।
যে-বসন্তে প্রাণে প্রাণে
বেদনার সুধা আনে
সে-বসন্ত নহে তার তরে।

ছন্দ ভেঙে দেয় সে যে,
অকস্মাৎ উঠে বেজে
অর্থহীন চকিত চীৎকার,
ধূমাচ্ছন্ন অবিশ্বাস
বিশ্ববক্ষে হানে ত্রাস,
কুটিল সংশয় কদাকার।

সৃষ্টিছাড়া এই-যে উৎপাত
হানে দানবের পদাঘাত
পুণ্য পৃথিবীর শিরে,—
তার লজ্জা তুই কি রে
আনিতে পারিবি তোর মনে।
অকৃতজ্ঞ নিষ্ঠুরতা
সৌন্দর্যেরে দেয় ব্যথা
কেন যে তা বুঝিবি কেমনে।
কেন যে কদর্য ভাষা
বিধাতার ভালোবাসা
বিদ্রূপে করিছে ছারখার,
যে-হস্ত দানেরি তরে
তারি রক্তপাত করে,
সেই লজ্জা নিখিলজনার।

[বৈশাখ ১৩৩৪
শান্তিনিকেতন]

পরদেশী

পিয়র্সন্ কয়েক জোড়া সবুজরঙের বিদেশী পাখি আশ্রমে ছেড়ে দিয়েছিলেন। অনেক দিন তারা এখানে বাসা বেঁধে ছিল। আজকাল আর দেখতে পাই নে। আশা করি কোনো নালিশ নিয়ে তারা চলে যায় নি, কিম্বা এখানকার অন্য আশ্রমিক পশু-পাখির সঙ্গে বর্ণভেদ বা স্বরের পার্থক্য নিয়ে তাদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটে নি।

এনেছে কবে বিদেশী সখা
বিদেশী পাখি আমার বনে,
সকাল-সাঁঝে কুঞ্জমাঝে
উঠিছে ডাকি সহজ মনে।
অজানা এই সাগরপারে
হল না তার গানের ক্ষতি।
সবুজ তার ডানার আভা,
চপল তার নাচের গতি।
আমার দেশে যে-মেঘ এসে
নীপবনের মরমে মেশে
বিদেশী পাখি গীতালি দিয়ে
মিতালি করে তাহার সনে।

বটের ফলে আরতি তার,
রয়েছে লোভ নিমের তরে,
বনজামেরে চঞ্চু তার
অচেনা ব'লে দোষী না করে
শরতে যবে শিশির বায়ে
উচ্ছ্বসিত শিউলিবীথি,
বাণীরে তার করে না ম্লান
কুহেলিঘন পুরানো স্মৃতি।

শালের ফুল-ফোটার বেলা
মধুকাঙালী লোভীর মেলা,
চিরমধুর বঁধুর মতো
সে-ফুল তার হৃদয় হরে।

বেণুবনের আগের ডালে
চটুল ফিঙা যখন নাচে
পরদেশী এ পাখির সাথে
পরানে তার ভেদ কি আছে।
উষার ছোঁওয়া জাগায় ওরে
ছাতিমশাখে পাতার কোলে,
চোখের আগে যে-ছবি জাগে
মানে না তারে প্রবাস ব'লে।
আলোতে সোনা, আকাশে নীলা,
সেথা যে চিরজানারি লীলা,
মায়ের ভাষা শোনে সেখানে
শ্যামল ভাষা যেখানে গাছে।

৮ বৈশাখ ১৩৩৪
[শান্তিনিকেতন]

কুটিরবাসী

তরুবিলাসী আমাদের এক তরুণ বন্ধু এই আশ্রমের এক কোণে পথের ধারে একখানি গোলাকার কুটির রচনা করেছেন। সেটি আছে একটি পুরাতন তালগাছের চরণ বেষ্টন ক'রে। তাই তার নাম হয়েছে তালধ্বজ। এটি যেন মৌচাকের মতো, নিভৃতবাসের মধু দিয়ে ভরা। লোভনীয় বলেই মনে করি, সেই সঙ্গে এও মনে হয়

বাসস্থান সম্বন্ধে অধিকারভেদ আছে ; যেখানে আশ্রয় নেবার ইচ্ছা থাকে সেখানে হয়তো আশ্রয় নেবার যোগ্যতা থাকে না।

তোমার কুটিরের
সমুখবাটে
পল্লিরমণীরা
চলেছে হাটে।
উড়েছে রাঙা ধূলি,
উঠেছে হাসি,—
উদাসী বিবাগীর
চলার বাঁশি
আঁধারে আলোকেতে
সকালে সাঁঝে
পথের বাতাসের
বুকেতে বাজে।

যা-কিছু আসে যায়
মাটির 'পরে
পরশ লাগে তারি
তোমার ঘরে।
ঘাসের কাঁপা লাগে,
পাতার দোলা,
শরতে কাশবনে
তুফান তোলা,
প্রভাতে মধুপের
গুনগুনানি,
নিশীথে ঝিঁঝিঁরবে
জালবুনানি।
দেখেছি ভোরবেলা
ফিরিছ একা,

পথের ধারে পাও
　　কিসের দেখা।
সহজে সুখী তুমি
　　জানে তা কেবা,
ফুলের গাছে তব
　　স্নেহের সেবা;
এ কথা কারো মনে
　　রবে কি কালি,
মাটির 'পরে গেলে
　　হৃদয় ঢালি।

দিনের পরে দিন
　　যে-দান আনে
তোমার মন তারে
　　দেখিতে জানে।
নম্র তুমি, তাই
　　সরলচিতে
সবার কাছে কিছু
　　পেয়েছ নিতে,
উচ্চ-পানে সদা
　　মেলিয়া আঁখি
নিজেরে পলে পলে
　　দাও নি ফাঁকি।

চাও নি জিনে নিতে
　　হৃদয় কারো,
নিজের মন তাই
　　দিতে যে পার।
তোমার ঘরে আসে
　　পথিকজন,

চাহে না জ্ঞান তারা,
চাহে না ধন,
এটুকু বুঝে যায়
কেমনধারা
তোমারি আসনের
শরিক তারা।

তোমার কুটিরের
পুকুর পাড়ে
ফুলের চারাগুলি
যতনে বাড়ে।
তোমারো কথা নাই,
তারাও বোবা,
কোমল কিশলয়ে
সরল শোভা।
শ্রদ্ধা দাও, তবু
মুখ না খোলে,
সহজে বোঝা যায়
নীরব ব'লে।

তোমারি মতো তব
কুটিরখানি,
স্নিগ্ধ ছায়া তার
বলে না বাণী।
তাহার শিয়রেতে
তালের গাছে
বিরল পাতাকটি
আলোয় নাচে,
সমুখে খোলা মাঠ
করিছে ধূ ধূ,

দাঁড়ায়ে দূরে দূরে
খেজুর শুধু।

তোমার বাসাখানি
আঁটিয়া মুঠি
চাহে না আঁকড়িতে
কালের ঝুঁটি।
দেখি যে পথিকের
মতোই তাকে,
থাকা ও না-থাকার
সীমায় থাকে।
ফুলের মতো ও যে,
পাতার মতো,
যখন যাবে, রেখে
যাবে না ক্ষত।

নাইকো রেষারেষি
পথে ও ঘরে,
তাহারা মেশামেশি
সহজে করে।
কীর্তিজালে ঘেরা
আমি তো ভাবি,
তোমার ঘরে ছিল
আমারো দাবি;
হারায়ে ফেলেছি সে
ঘূর্ণিবায়ে,
অনেক কাজে আর
অনেক দায়ে।

[চৈত্র ১৩৩৩
শান্তিনিকেতন]

হাসির পাথেয়

তখন আমার অল্প বয়স। পিতা আমাকে সঙ্গে করে হিমালয়ে চলেছেন ড্যালহৌসি পাহাড়ে। সকালবেলায় ডাণ্ডি চ'ড়ে বেরতুম, অপরাহ্ণে ডাকবাংলায় বিশ্রাম হত। আজো মনে আছে এক জায়গায় পথের ধারে ডাণ্ডিওয়ালারা ডাণ্ডি নামিয়েছিল। সেখানে শ্যাওলায় শ্যামল পাথরগুলোর উপর দিয়ে গুহার ভিতর থেকে ঝরনা নেমে উপত্যকায় কলশব্দে ঝরে পড়ছে। সেই প্রথম দেখা ঝরনার রহস্য আমার মনকে প্রবল করে টেনেছিল। এদিকে ডানপাশে পাহাড়ের ঢালু গায়ে স্তরে স্তরে শস্যখেত হলদে ফুলে ছাওয়া, দেখে দেখে তৃপ্তির শেষ হয় না,— কেবলি ভাবি এইগুলো ভ্রমণের লক্ষ্য কেন না হবে, কেবল ক্ষণিক উপলক্ষ কেন হয়। সেই ঝরনা কোন্ নদীর সঙ্গে মিলে কোথায় গেছে জানি নে কিন্তু সেই মুহূর্তকালের প্রথম পরিচয়টুকু কখনো ভুলব না।

হিমালয় গিরিপথে চলেছিনু কবে বাল্যকালে
মনে পড়ে। ধূর্জটির তাণ্ডবের ডম্বরুর তালে
যেন গিরি-পিছে গিরি উঠিছে নামিছে বারেবারে
তমোঘন অরণ্যের তল হতে মেঘের মাঝারে
ধরার ইঙ্গিত যেথা স্তব্ধ রহে শূন্যে অবলীন,
তুষারনিরুদ্ধ বাণী, বর্ণহীন বর্ণনাবিহীন।
সেদিন বৈশাখমাস, খণ্ড খণ্ড শস্যক্ষেত্রস্তরে
রৌদ্রবর্ণ ফুল ;— মেঘের কোমল ছায়া তারি 'পরে
যেন স্নিগ্ধ আকাশের ক্ষণে ক্ষণে নীচে নেমে এসে
ধরণীর কানে কানে প্রশংসার বাক্য ভালোবেসে।

সেইদিন দেখেছিনু নিবিড় বিস্ময়মুগ্ধ চোখে
চঞ্চল নির্ঝরধারা গুহা হতে বাহিরি আলোকে

আপনাতে আপনি চকিত, যেন কবি বাল্মীকির
উচ্ছ্বসিত অনুষ্টুভ। স্বর্গে যেন সুরসুন্দরীর
প্রথম যৌবনোল্লাস, নূপুরের প্রথম ঝংকার,
আপনার পরিচয়ে নিঃসীম বিস্ময় আপনার,
আপনারি রহস্যের পিছে পিছে উৎসুক চরণে
অশ্রান্ত সন্ধান। সেই ছবিখানি রহিল স্মরণে
চিরদিন মনোমাঝে।

সেদিনের যাত্রাপথ হতে
আসিয়াছি বহুদূরে; আজি ক্লান্ত জীবনের স্রোতে
নেমেছে সন্ধ্যার নীরবতা। মনে উঠিতেছে ভাসি
শৈলশিখরের দূর নির্মল শুভ্রতা রাশি রাশি
বিগলিত হয়ে আসে দেবতার আনন্দের মতো
প্রত্যাশী ধরণী যেথা প্রণামে ললাট অবনত।
সেই নিরন্তর হাসি অবলীল গতিচ্ছন্দে বাজে
কঠিন বাধায় কীর্ণ শঙ্কায় সংকুল পথমাঝে
দুর্গমেরে করি অবহেলা। সে-হাসি দেখেছি বসি
শস্যভরা তটচ্ছায়ে কলস্বরে চলেছে উচ্ছ্বসি
পূর্ণবেগে। দেখেছি অম্লান তারে তীব্র রৌদ্রদাহে
শুষ্ক শীর্ণ দৈন্যদিনে বহি যায় অক্লান্ত প্রবাহে
সৈকতিনী, রক্তচক্ষু বৈশাখেরে নিঃশঙ্ক কৌতুকে
কটাক্ষিয়া— অফুরান হাস্যধারা মৃত্যুর সম্মুখে।

হে হিমাদ্রি, সুগম্ভীর, কঠিন তপস্যা তব গলি
ধরিত্রীরে করে দান যে-অমৃতবাণীর অঞ্জলি
এই সে হাসির মন্ত্র, গতিপথে নিঃশেষ পাথেয়,
নিঃসীম সাহসবেগ, উল্লসিত অশ্রান্ত অজেয়।

১ বৈশাখ ১৩৩৪
শান্তিনিকেতন

বৃক্ষরোপণ উৎসব

গান

১

মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে,
হে প্রবল প্রাণ।
ধূলিরে ধন্য করো করুণার পুণ্যে,
হে কোমল প্রাণ।
মৌনী মাটির মর্মের গান কবে
উঠিবে ধ্বনিয়া মর্মর তব রবে,
মাধুরী ভরিবে ফুলে ফলে পল্লবে,
হে মোহন প্রাণ।

পথিকবন্ধু, ছায়ার আসন পাতি'
এসো শ্যাম সুন্দর,
এসো বাতাসের অধীর খেলার সাথী,
মাতাও নীলাম্বর।
উষায় জাগাও শাখায় গানের আশা,
সন্ধ্যায় আনো বিরামগভীর ভাষা,
রচি দাও রাতে সুপ্তগীতের বাসা,
হে উদার প্রাণ।

২

আয় আমাদের অঙ্গনে,
অতিথি বালক তরুদল,
মানবের স্নেহসঙ্গ নে,
চল্‌, আমাদের ঘরে চল্‌।

শ্যামবঙ্কিম ভঙ্গীতে
চঞ্চল কলসংগীতে
দ্বারে নিয়ে আয় শাখায় শাখায়
প্রাণ-আনন্দ কোলাহল।

তোদের নবীন পল্লবে
নাচুক আলোক সবিতার,
দে পবনে বনবল্লভে
মর্মর গীত উপহার।
আজি শ্রাবণের বর্ষণে
আশীর্বাদের স্পর্শ নে,
পড়ুক মাথায় পাতায় পাতায়
অমরাবতীর ধারাজল।

ক্ষিতি

বক্ষের ধন হে ধরণী, ধরো
ফিরে নিয়ে তব বক্ষে।
শুভদিনে এরে দীক্ষিত করো
আমাদের চিরসখ্যে।
অন্তরে পাক কঠিন শক্তি,
কোমলতা ফুলে পত্রে,
পক্ষিসমাজে পাঠাক পত্রী
তোমার অন্নসত্রে।

অপ

হে মেঘ, ইন্দ্রের ভেরি বাজাও গম্ভীর মন্দ্রস্বনে
মেদুর অম্বরতলে। আনন্দিত প্রাণের স্পন্দনে
জাগুক এ শিশুবৃক্ষ। মহোৎসবে লহো এরে ডেকে।
বনের সৌভাগ্যদিনে ধরণীর বর্ষা অভিষেকে।

তেজ

স্বষ্টির প্রথম বাণী তুমি, হে আলোক ;
এ নব তরুতে তব শুভদৃষ্টি হ'ক ।
একদা প্রচুর পুষ্পে হবে সার্থকতা
উহার প্রচ্ছন্ন প্রাণে রাখো সেই কথা ।
স্নিগ্ধ পল্লবের তলে তব তেজ ভরি'
হ'ক তব জয়ধ্বনি শতবর্ষ ধরি ।

মরুৎ

হে পবন কর নাই গৌণ,
আষাঢ়ে বেজেছে তব বংশী ।
তাপিত নিকুঞ্জের মৌন
নিশ্বাসে দিলে তুমি ধ্বংসি ।
এ তরু খেলিবে তব সঙ্গে,
সংগীত দিয়ো এরে ভিক্ষা ।
দিয়ো তব ছন্দের রঙ্গে
পল্লবহিল্লোল শিক্ষা ।

ব্যোম

আকাশ, তোমার সহাস উদার দৃষ্টি
মাটির গভীরে জাগায় রূপের স্বষ্টি ।
তব আহ্বানে এই তো শ্যামলমূর্তি
আলোক-অমৃতে খুঁজিছে প্রাণের পূর্তি ।
দিয়েছ সাহস, তাই তব নীলবর্ণে
বর্ণ মিলায় আপন হরিৎপর্ণে ।
তরুতরুণেরে করুণায় করো ধন্য,
দেবতার স্নেহ পায় যেন এই বন্য ।

মাঙ্গলিক

প্রাণের পাথেয় তব পূর্ণ হ'ক হে শিশু চিরায়ু,
বিশ্বের প্রসাদস্পর্শে শক্তি দিক সুধাসিক্ত বায়ু।
হে বালকবৃক্ষ, তব উজ্জ্বল কোমল কিশলয়
আলোক করিয়া পান ভাণ্ডারেতে করুক সঞ্চয়
প্রচ্ছন্ন প্রশান্ত তেজ। লয়ে তব কল্যাণকামনা
শ্রাবণবর্ষণযজ্ঞে তোমারে করিনু অভ্যর্থনা।—
থাকো প্রতিবেশী হয়ে, আমাদের বন্ধু হয়ে থাকো।
মোদের প্রাঙ্গণে ফেলো ছায়া, পথের কঙ্কর ঢাকো
কুসুমবর্ষণে; আমাদের বৈতালিক বিহঙ্গমে
শাখায় আশ্রয় দিয়ো; বর্ষে বর্ষে পুষ্পিত উদ্যমে
অভিনন্দনের গন্ধ মিলাইয়ো বর্ষাগীতিকায়,
সন্ধ্যাবন্দনার গানে। মোদের নিকুঞ্জবীথিকায়
মঞ্জুল মর্মরে তব ধরিত্রীর অন্তঃপুর হতে
প্রাণমাতৃকার মন্ত্র উচ্ছ্বসিবে সূর্যের আলোতে।
শত বর্ষ হবে গত, রেখে যাব আমাদের প্রীতি
শ্যামল লাবণ্যে তব। সে যুগের নূতন অতিথি
বসিবে তোমার ছায়ে। সেদিন বর্ষণমহোৎসবে
আমাদের নিমন্ত্রণ পাঠাইয়ো তোমার সৌরভে
দিকে দিকে বিশ্বজনে। আজি এই আনন্দের দিন
তোমার পল্লবপুঞ্জে পুষ্পে তব হ'ক মৃত্যুহীন।
রবীন্দ্রের কণ্ঠ হতে এ সংগীত তোমার মঙ্গলে
মিলিল মেঘের মন্ত্রে, মিলিল কদম্বপরিমলে।

১৩ জুলাই ১৯২৮
[শান্তিনিকেতন]

পরিশেষ

আশীর্বাদ

শ্রীমান অতুলপ্রসাদ সেন
করকমলে—

বঙ্গের দিগন্ত ছেয়ে বাণীর বাদল
বহে যায় শতস্রোতে রসবন্যাবেগে ;
কভু বজ্রবহ্নি কভু স্নিগ্ধ অশ্রুজল
ধ্বনিছে সংগীতে ছন্দে তারি পুঞ্জমেঘে ;
বঙ্কিম শশাঙ্ককলা তারি মেঘজটা
চুম্বিয়া মঙ্গলমন্ত্রে রচে স্তরে স্তরে
সুন্দরের ইন্দ্রজাল ; কত রশ্মিচ্ছটা
প্রত্যূষে দিনের অন্তে রাখে তারি 'পরে
আলোকের স্পর্শমণি। আজি পূর্ববায়ে
বঙ্গের অম্বর হতে দিকে দিগন্তরে
সহর্ষ বর্ষণধারা গিয়েছে ছড়ায়ে
প্রাণের আনন্দবেগে পশ্চিমে উত্তরে ;
দিল বঙ্গবীণাপাণি অতুলপ্রসাদ,
তব জাগরণী গানে নিত্য আশীর্বাদ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরিশেষ

প্রণাম

অর্থ কিছু বুঝি নাই, কুড়ায়ে পেয়েছি কবে জানি
নানা বর্ণে চিত্র-করা বিচিত্রের নর্মবাঁশিখানি
যাত্রাপথে। সে-প্রত্যুষে প্রদোষের আলো অন্ধকার
প্রথম মিলনক্ষণে লভিল পুলক দোঁহাকার
রক্ত-অবগুণ্ঠনচ্ছায়ায়। মহামৌন-পারাবারে
প্রভাতের বাণীবন্যা চঞ্চলি মিলিল শতধারে
তুলিল হিল্লোলদোল। কত যাত্রী গেল কত পথে
দুর্লভ ধনের লাগি অভ্রভেদী দুর্গম পর্বতে
দুস্তর সাগর উত্তরিয়া। শুধু মোর রাত্রিদিন,
শুধু মোর আনমনে পথ-চলা হল অর্থহীন।
গভীরের স্পর্শ চেয়ে ফিরিয়াছি, তার বেশি কিছু
হয় নি সঞ্চয় করা, অধরার গেছি পিছু পিছু।
আমি শুধু বাঁশরিতে ভরিয়াছি প্রাণের নিশ্বাস,
বিচিত্রের সুরগুলি গ্রন্থিবারে করেছি প্রয়াস
আপনার বীণার তন্তুতে। ফুল ফোটাবার আগে
ফাল্গুনে তরুর মর্মে বেদনার যে-স্পন্দন জাগে
আমন্ত্রণ করেছিনু তারে মোর মুগ্ধ রাগিণীতে
উৎকণ্ঠাকম্পিত মূর্ছনায়। ছিন্ন পত্র মোর গীতে
ফেলে গেছে শেষ দীর্ঘশ্বাস। ধরণীর অন্তঃপুরে
রবিরশ্মি নামে যবে, তৃণে তৃণে অঙ্কুরে অঙ্কুরে
যে-নিঃশব্দ হুলুধ্বনি দূরে দূরে যায় বিস্তারিয়া
ধূসর যবনি-অন্তরালে, তারে দিনু উৎসারিয়া

এ বাঁশির রন্ধ্রে রন্ধ্রে ; যে-বিরাট গূঢ় অনুভবে
রজনীর অঙ্গুলিতে অক্ষমালা ফিরিছে নীরবে
আলোকবন্দনামন্ত্র জপে— আমার বাঁশিরে রাখি
আপন বক্ষের 'পরে, তারে আমি পেয়েছি একাকী
হৃদয়কম্পনে মম ; যে বন্দী গোপন গন্ধখানি
কিশোরকোরক মাঝে স্বপ্নস্বর্গে ফিরিছে সন্ধানি
পুজার নৈবেদ্যডালি, সংশয়িত তাহার বেদনা
সংগ্রহ করেছে গানে আমার বাঁশরি কলস্বনা।
চেতনাসিন্ধুর ক্ষুব্ধ তরঙ্গের মৃদঙ্গগর্জনে
নটরাজ করে নৃত্য, উন্মুখর অট্টহাস্যসনে
অতল অশ্রুর লীলা মিলে গিয়ে কলরলরোলে
উঠিতেছে রণি রণি, ছায়ারৌদ্র সে-দোলায় দোলে
অশ্রান্ত উল্লোলে। আমি তীরে বসি তারি রুদ্রতালে
গান বেঁধে লভিয়াছি আপন ছন্দের অন্তরালে
অনন্তের আনন্দবেদনা। নিখিলের অনুভূতি
সংগীতসাধনা মাঝে রচিয়াছে অসংখ্য আকৃতি।
এই গীতিপথপ্রান্তে হে মানব, তোমার মন্দিরে
দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দ্যের তীরে
আরতির সান্ধ্যক্ষণে ; একের চরণে রাখিলাম
বিচিত্রের নর্মবাঁশি,— এই মোর রহিল প্রণাম।

৬ এপ্রিল ১৯৩১
শান্তিনিকেতন

বিচিত্রা

ছিলাম যবে মায়ের কোলে,
বাঁশি বাজানো শিখাবে ব'লে
চোরাই করে এনেছ মোরে তুমি,
বিচিত্রা হে, বিচিত্রা,
যেখানে তব রঙের রঙ্গভূমি।
আকাশতলে এলায়ে কেশ
বাজালে বাঁশি চুপে,
সে মায়াসুরে স্বপ্নছবি
জাগিল কত রূপে;
লক্ষ্যহারা মিলিল তারা
রূপকথার বাটে,
পারায়ে গেল ধূলির সীমা
তেপান্তরী মাঠে।

নারিকেলের ডালের আগে
দুপুরবেলা কাঁপন লাগে,
ইশারা তারি লাগিত মোর প্রাণে,
বিচিত্রা, হে বিচিত্রা,
কী বলে তারা কে বলো তাহা জানে।
অর্থহারা সুরের দেশে
ফিরালে দিনে দিনে,
ঝলিত মনে অবাক বাণী,
শিশির যেন তৃণে।
প্রভাত-আলো উঠিত কেঁপে
পুলকে কাঁপা বুকে,
বারণহীন নাচিত হিয়া
কারণহীন সুখে।

জীবনধারা অকূলে ছোটে,
দুঃখে সুখে তুফান ওঠে,
আমারে নিয়ে দিয়েছ তাহে খেয়া,
বিচিত্রা হে, বিচিত্রা,
কালো গগনে ডেকেছে ঘন দেয়া।
প্রাণের সেই ঢেউয়ের তালে
বাজালে তুমি বীণ,
ব্যথায় মোর জাগায়ে নিয়ে
তারের রিনিরিন।
পালের 'পরে দিয়েছ বেগে
সুরের হাওয়া তুলে,
সহসা বেয়ে নিয়েছ তরী
অপূর্বেরি কূলে।

চৈত্রমাসে শুক্ল নিশা
জুঁহিবেলির গন্ধে মিশা;
জলের ধ্বনি তটের কোলে কোলে
বিচিত্রা হে, বিচিত্রা,
অনিদ্রারে আকুল করি তোলে।
যৌবনে সে উতল রাতে
করুণ কার চোখে
মোহিনী রাগে মিলাতে মিড়
চাঁদের ক্ষীণালোকে।
কাহার ভীরু হাসির 'পরে
মধুর দ্বিধা ভরি
শরমে-ছোঁওয়া নয়নজল
কাঁপাতে থরথরি।

হঠাৎ কভু জাগিয়া উঠি
ছিন্ন করি ফেলেছ টুটি

নিশীথিনীর মৌন যবনিকা,
বিচিত্রা হে, বিচিত্রা,
হেনেছ তারে বজ্রানলশিখা।
গভীর রবে হাঁকিয়া গেছ
'অলস থেকো না গো।'
নিবিড় রাতে দিয়েছ নাড়া,
বলেছ 'জাগো জাগো।'
বাসরঘরে নিবালে দীপ,
ঘুচালে ফুলহার,
ধূলি-আঁচল দুলায়ে ধরা
করিল হাহাকার।

বুকের শিরা ছিন্ন করে
ভীষণ পূজা করেছি তোরে,
কখনো পূজা শোভন শতদলে,—
বিচিত্রা হে, বিচিত্রা,
হাসিতে কভু, কখনো আঁখিজলে।
ফসল যত উঠেছে ফলি
বক্ষ বিভেদিয়া
কণাকণায় তোমারি পায়
দিয়েছি নিবেদিয়া।
তবুও কেন এনেছ ডালি
দিনের অবসানে ;
নিঃশেষিয়া নিবে কি ভরি
নিঃস্ব-করা দানে।

৭ বৈশাখ ১৩৩৪
[শান্তিনিকেতন]

জন্মদিন

রবিপ্রদক্ষিণপথে জন্মদিবসের আবর্তন
হয়ে আসে সমাপন।
আমার রুদ্রের
মালা রুদ্রাক্ষের
অন্তিম গ্রন্থিতে এসে ঠেকে
রৌদ্রদগ্ধ দিনগুলি গেঁথে একে একে।
হে তপস্বী, প্রসারিত করো তব পাণি
লহো মালাখানি।

উগ্র তব তপের আসন,
সেথায় তোমারে সম্ভাষণ
করেছিনু দিনে দিনে কঠিন স্তবনে
কখনো মধ্যাহ্নরৌদ্রে কখনো-বা ঝঞ্ঝার পবনে।
এবার তপস্যা হতে নেমে এসো তুমি—
দেখা দাও যেথা তব বনভূমি
ছায়াঘন, যেথা তব আকাশ অরুণ
আষাঢ়ের আভাসে করুণ।
অপরাহ্ণ যেথা তার ক্লান্ত অবকাশে
মেলে শূন্য আকাশে আকাশে
বিচিত্র বর্ণের মায়া ; যেথা সন্ধ্যাতারা
বাক্যহারা
বাণীবহ্নি জ্বালি'
নিভৃতে সাজায় ব'সে অনন্তের আরতির ডালি।
শ্যামল দাক্ষিণ্যে ভরা
সহজ আতিথ্যে বসুন্ধরা
যেথা স্নিগ্ধ শান্তিময় ;
যেথা তার অফুরান মাধুর্যসঞ্চয়
প্রাণে প্রাণে
বিচিত্র বিলাস আনে রূপে রসে গানে

বিশ্বের প্রাঙ্গণে আজি ছুটি হ'ক মোর,
ছিন্ন করে দাও কর্মডোর।
আমি আজ ফিরিব কুড়ায়ে
উচ্ছৃঙ্খল সমীরণ যে-কুসুম এনেছে উড়ায়ে
সহজে ধুলায়,
পাখির কুলায়
দিনে দিনে ভরি উঠে যে-সহজ গানে,
আলোকের ছোঁওয়া লেগে সবুজের তম্বুরার তানে।
এই বিশ্বসত্তার পরশ,
স্থলে জলে তলে তলে এই গূঢ় প্রাণের হরষ
তুলি লব অন্তরে অন্তরে,
সর্বদেহে, রক্তস্রোতে, চোখের দৃষ্টিতে, কণ্ঠস্বরে,
জাগরণে, ধেয়ানে, তন্দ্রায়,
বিরামসমুদ্রতটে জীবনের পরমসন্ধ্যায়।
এ জন্মের গোধূলির ধূসর প্রহরে
বিশ্বরস-সরোবরে
শেষবার ভরিব হৃদয় মন দেহ
দূর করি সব কর্ম, সব তর্ক, সকল সন্দেহ,
সব খ্যাতি, সকল দুরাশা,
বলে যাব, 'আমি যাই, রেখে যাই, মোর ভালোবাসা।'

২৩ বৈশাখ ১৩৩৮
[শান্তিনিকেতন]

পান্থ

শুধায়ো না মোরে তুমি মুক্তি কোথা, মুক্তি কারে কই,
আমি তো সাধক নই, আমি গুরু নই।
আমি কবি, আছি
ধরণীর অতি কাছাকাছি,
এ পারের খেয়ার ঘাটায়।
সম্মুখে প্রাণের নদী জোয়ার-ভাঁটায়
নিত্য বহে নিয়ে ছায়া আলো,
মন্দ ভালো,
ভেসে-যাওয়া কত কী যে, ভুলে-যাওয়া কত রাশি রাশি
লাভক্ষতি কান্নাহাসি,—
এক তীর গড়ি তোলে অন্য তীর ভাঙিয়া ভাঙিয়া;
সেই প্রবাহের 'পরে ঊষা ওঠে রাঙিয়া রাঙিয়া,
পড়ে চন্দ্রালোকরেখা জননীর অঙ্গুলির মতো;
কৃষ্ণরাতে তারা যত
জপ করে ধ্যানমন্ত্র; অস্তসূর্য রক্তিম উত্তরী
বুলাইয়া চলে যায়, সে-তরঙ্গে মাধবীমঞ্জরি
ভাসায় মাধুরীডালি,
পাখি তার গান দেয় ঢালি।
সে তরঙ্গনৃত্যছন্দে বিচিত্র ভঙ্গীতে
চিত্ত যবে নৃত্য করে আপন সংগীতে
এ বিশ্বপ্রবাহে,
সে-ছন্দে বন্ধন মোর, মুক্তি মোর তাহে।
রাখিতে চাহি না কিছু, আঁকড়িয়া চাহি না রহিতে,
ভাসিয়া চলিতে চাই সবার সহিতে
বিরহমিলনগ্রন্থি খুলিয়া খুলিয়া,
তরণীর পালখানি পলাতকা বাতাসে তুলিয়া।

হে মহাপথিক,
অবারিত তব দশদিক।

তোমার মন্দির নাই, নাই স্বর্গধাম,
নাইকো চরম পরিণাম ;
তীর্থ তব পদে পদে ;
চলিয়া তোমার সাথে মুক্তি পাই চলার সম্পদে,
চঞ্চলের নৃত্যে আর চঞ্চলের গানে,
চঞ্চলের সর্বভোলা দানে—
আঁধারে আলোকে,
সৃজনের পর্বে পর্বে, প্রলয়ের পলকে পলকে ।

২৪ বৈশাখ ১৩৩৮
[শান্তিনিকেতন]

অপূর্ণ

যে-ক্ষুধা চক্ষের মাঝে, যেই ক্ষুধা কানে,
স্পর্শের যে-ক্ষুধা ফিরে দিকে দিকে বিশ্বের আহ্বানে
উপকরণের ক্ষুধা কাঙাল প্রাণের,
ব্রত তার বস্তু সন্ধানের,
মনের যে-ক্ষুধা চাহে ভাষা,
সঙ্গের যে-ক্ষুধা নিত্য পথ চেয়ে করে কার আশা,
যে-ক্ষুধা উদ্দেশহীন অজানার লাগি
অন্তরে গোপনে রয় জাগি—
সবে তারা মিলি নিতি নিতি
নানা আকর্ষণবেগে গড়ি তোলে মানস-আকৃতি ।
কত সত্য, কত মিথ্যা, কত আশা, কত অভিলাষ,
কত-না সংশয় তর্ক, কত না বিশ্বাস,
আপন রচিত ভয়ে আপনারে পীড়ন কত-না,
কত রূপে কল্পিত সান্ত্বনা,—

মনগড়া দেবতারে নিয়ে কাটে বেলা,
পরদিনে ভেঙে করে ঢেলা,
অতীতের বোঝা হতে আবর্জনা কত
জটিল অভ্যাসে পরিণত,
বাতাসে বাতাসে ভাসা বাক্যহীন কত-না আদেশ
দেহহীন তর্জনীনির্দেশ,
হৃদয়ের গূঢ় অভিরুচি
কত স্বপ্নমূর্তি আঁকে দেয় পুনঃ মুছি,
কত প্রেম, কত ত্যাগ, অসম্ভব তরে
কত-না আকাশযাত্রা কল্পপক্ষভরে,
কত মহিমার পূজা, অযোগ্যের কত আরাধনা,
সার্থক সাধনা কত, কত ব্যর্থ আত্মবিড়ম্বনা,
কত জয় কত পরাভব—
ঐক্যবন্ধে বাঁধি এই সব
ভালো মন্দ সাদায় কালোয়
বস্তু ও ছায়ায় গড়া মূর্তি তুমি দাঁড়ালে আলোয়।

জন্মদিনে জন্মদিনে গাঁথনির কর্ম হবে শেষ,
সুখ দুঃখ ভয় লজ্জা ক্লেশ,
আরব্ধ ও অনারব্ধ সমাপ্ত ও অসমাপ্ত কাজ,
তৃপ্ত ইচ্ছা, ভগ্ন জীর্ণ সাজ
তুমি-রূপে পুঞ্জ হয়ে, শেষে
কয়দিন পূর্ণ করি কোথা গিয়ে মেশে।
যে-চৈতন্যধারা
সহসা উদ্ভূত হয়ে অকস্মাৎ হবে গতিহারা,
সে কিসের লাগি,—
নিদ্রায় আবিল কভু, কখনো-বা জাগি
বাস্তবে ও কল্পনায় আপনার রচি দিল সীমা,
গড়িল প্রতিমা।

অসংখ্য এ রচনায় উদ্ঘাটিছে মহা ইতিহাস,—
যুগান্তে ও যুগান্তরে এ কার বিলাস।

জন্মদিন মৃত্যুদিন, মাঝে তারি ভরি' প্রাণভূমি
কে গো তুমি।
কোথা আছে তোমার ঠিকানা,
কার কাছে তুমি আছ অন্তরঙ্গ সত্য করে জানা।
আছ আর নাই মিলে অসম্পূর্ণ তব সত্তাখানি
আপন গদ্গদ বাণী
পারে না করিতে ব্যক্ত, অশক্তির নিষ্ঠুর বিদ্রোহে
বাধা পায় প্রকাশ আগ্রহে,
মাঝখানে থেমে যায় মৃত্যুর শাসনে।
তোমার যে-সম্ভাষণে
জানাইতে চেয়েছিলে নিখিলেরে নিজ পরিচয়
হঠাৎ কি তাহার বিলয়,
কোথাও কি নাই তার শেষ সার্থকতা।
তবে কেন পঙ্গু সৃষ্টি, খণ্ডিত এ অস্তিত্বের ব্যথা।
অপূর্ণতা আপনার বেদনায়
পূর্ণের আশ্বাস যদি নাহি পায়,
তবে রাত্রিদিন হেন
আপনার সাথে তার এত দ্বন্দ্ব কেন।
ক্ষুদ্র বীজ মৃত্তিকার সাথে যুঝি
অঙ্কুরি উঠিতে চাহে আলোকের মাঝে মুক্তি খুঁজি।
সে-মুক্তি না যদি সত্য হয়
অন্ধ মূক দুঃখে তার হবে কি অনন্ত পরাজয়।

দার্জিলিং
অগ্রহায়ণ ? ১৩৩৮

আমি

আজ ভাবি মনে-মনে, তাহারে কি জানি
যাহার বলায় মোর বাণী,
যাহার চলায় মোর চলা,
আমার ছবিতে যার কলা,
যার সুর বেজে ওঠে মোর গানে গানে,
সুখে দুঃখে দিনে দিনে বিচিত্র যে আমার পরানে।
ভেবেছিনু আমাতে সে বাঁধা
এ প্রাণের যত হাসা কাঁদা
গণ্ডি দিয়ে মোর মাঝে
ঘিরেছে তাহারে মোর সকল খেলায় সব কাজে।
ভেবেছিনু সে আমারি আমি
আমার জনম বেয়ে আমার মরণে যাবে থামি।

তবে কেন পড়ে মনে, নিবিড় হরষে
প্রেয়সীর দরশে পরশে
বারে বারে
পেয়েছিনু তারে
অতল মাধুরীসিন্ধুতীরে
আমার অতীত সে-আমিরে।
জানি তাই, সে-আমি তো বন্দী নহে আমার সীমায়,
পুরাণে বীরের মহিমায়
আপনা হারায়ে
তারে পাই আপনাতে দেশকাল নিমেষে পারায়ে।
যে-আমি ছায়ার আবরণে
লুপ্ত হয়ে থাকে মোর কোণে
সাধকের ইতিহাসে তারি জ্যোতির্ময়
পাই পরিচয়।

যুগে যুগে কবির বাণীতে
সেই আমি আপনারে পেয়েছে জানিতে।

দিগন্তে বাদলবায়ুবেগে
নীল মেঘে
বর্ষা আসে নাবি।
বসে বসে ভাবি
এই আমি যুগে যুগান্তরে
কত মূর্তি ধরে,
কত নামে কত জন্ম কত মৃত্যু করে পারাপার
কত বারম্বার।
ভূত ভবিষ্যৎ লয়ে যে বিরাট অখণ্ড বিরাজে
সে মানব-মাঝে
নিভৃতে দেখিব আজি এ আমিরে,
সর্বত্রগামীরে।

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১

তুমি

সূর্য যখন উড়াল কেতন
অন্ধকারের প্রান্তে,
তুমি আমি তার রথের চাকার
ধ্বনি পেয়েছিনু জানতে
সেই ধ্বনি ধায় বকুলশাখায়
প্রভাতবায়ুর ব্যাকুল পাখায়,
সুপ্ত কুলায়ে জাগায়ে সে যায়
আকাশপথের পান্থে।

অরুণরথের সে-ধ্বনি পথের
মন্ত্র শুনায়ে দিলে
তাই পায়ে-পায় দোঁহার চলায়
ছন্দ গিয়েছে মিলে।

তিমিরভেদন আলোর বেদন
লাগিল বনের বক্ষে,
নবজাগরণ পরশরতন
আকাশে এল অলক্ষ্যে।
কিশলয়দল হল চঞ্চল,
শিশিরে শিহরি করে ঝলমল,
সুরলক্ষ্মীর স্বর্ণকমল
দুলে বিশ্বের চক্ষে।
রক্তরঙের উঠে কোলাহল
পলাশকুঞ্জময়,
তুমি আমি দোঁহে কণ্ঠ মিলায়ে
গাহিনু আলোর জয়।

সংগীতে ভরি এ প্রাণের তরী
অসীমে ভাসিল রঙ্গে,
চিনি নাহি চিনি চিরসঙ্গিনী
চলিলে আমার সঙ্গে।
চক্ষে তোমার উদিত রবির
বন্দনবাণী নীরব গভীর,
অস্তাচলের করুণ কবির
ছন্দ বসনভঙ্গে।
উষারুণ হতে রাঙা গোধূলির
দূরদিগন্তপানে
বিভাসের গান হল অবসান
বিধুর পুরবীতানে।

আমার নয়নে তব অঞ্জনে
ফুটেছে বিশ্বচিত্র,
তোমার মন্ত্রে এ বীণাতন্ত্রে
উদ্‌গাথা সুপবিত্র।
অতল তোমার চিত্তগহন,
মোর দিনগুলি সফেন নাচন,
তুমি সনাতনী আমিই নূতন,
অনিত্য আমি নিত্য।
মোর ফাল্গুন হারায় যখন
আশ্বিনে ফিরে লহ।
তব অপরূপে মোর নবরূপ
ভুলাইছ অহরহ।

আসিছে রাত্রি স্বপনধাত্রী,
বনবাণী হল শান্ত।
জলভরা ঘটে চলে নদীতটে
বধূর চরণ ক্লান্ত।
নিখিলে ঘনাল দিবসের শোক,
বাহির-আকাশে ঘুচিল আলোক,
উজ্জ্বল করি অন্তরলোক
হৃদয়ে এলে একান্ত।
লুকানো আলোয় তব কালো চোখ
সন্ধ্যাতারার দেশে
ইঙ্গিত তার গোপনে পাঠাল
জানি না কী উদ্দেশে।

দেখেছি তোমার আঁখি সুকুমার
নবজাগরিত বিশ্বে।
দেখিনু হিরণ হাসির কিরণ
প্রভাতোজ্জ্বল দৃশ্যে।

হয়ে আসে যবে যাত্রাবসান
বিমল আঁধারে ধুয়ে দিলে প্রাণ,
দেখিনু মেলেছ তোমার নয়ান
অসীম দূর ভবিষ্যে।
অজানা তারায় বাজে তব গান
হারায় গগনতলে।
বক্ষ আমার কাঁপে দুরু দুরু,
চক্ষু ভাসিল জলে।

প্রেমের দিয়ালি দিয়েছিল জ্বালি
তোমারি দীপের দীপ্তি
মোর সংগীতে তুমিই সঁপিতে
তোমার নীরব তৃপ্তি।
আমারে লুকায়ে তুমি দিতে আনি
আমার ভাষায় সুগভীর বাণী,
চিত্রলিখায় জানি আমি জানি
তব আলিপনলিপ্তি।
হৃৎশতদলে তুমি বীণাপাণি
সুরের আসন পাতি
দিনের প্রহর করেছ মুখর,
এখন এল যে রাতি।

চেনা মুখখানি আর নাহি জানি।
আঁধারে হতেছে গুপ্ত,
তব বাণীরূপ কেন আজি চুপ,
কোথায় সে হায় সুপ্ত।
অবগুণ্ঠিত তব চারিধার,
মহামৌনের নাহি পাই পার,
হাসিকান্নার ছন্দ তোমার
গহনে হল যে লুপ্ত।

শুধু ঝিল্লির ঘন ঝংকার
নীরবের বুকে বাজে।
কাছে আছ তবু গিয়েছ হারায়ে
দিশাহারা নিশামাঝে।

এ জীবনময় তব পরিচয়
এখানে কি হবে শূন্য।
তুমি যে-বীণায় বেঁধেছিলে তার
এখনি কি হবে ক্ষুণ্ণ।
যে-পথে আমার ছিলে তুমি সাথী
সে পথে তোমার নিবায়ো না বাতি,
আরতির দীপে আমার এ রাতি
এখনো করিয়ো পুণ্য।
আজো জ্বলে তব নয়নের ভাতি
আমার নয়নময়,
মরণসভায় তোমায় আমায়
গাব আলোকের জয়।

৭ নবেম্বর ১৯৩০
আল্‌গন্‌ কুয়িন্‌। ন্যুয়র্ক

আছি

বৈশাখেতে তপ্ত বাতাস মাতে
কুয়োর ধারে কলাগাছের দীর্ণ পাতে পাতে ;
গ্রামের পথে ক্ষণে ক্ষণে ধুলা উড়ায়,
ডাক দিয়ে যায় পথের ধারে কৃষ্ণচূড়ায় ;

আশুক্লান্ত বেলগুলি সব শীর্ণ হয়ে আসে,
ম্লান গন্ধ কুড়িয়ে তারি ছড়িয়ে বেড়ায় সুদীর্ঘ নিশ্বাসে ;
শুকনো টগর উড়িয়ে ফেলে,
চিকন কচি অশথ পাতায় যা খুশি তাই খেলে ;
বাঁশের গাছে কী নিয়ে তার কাড়াকাড়ি,
খেজুর গাছের শাখায় শাখায় নাড়ানাড়ি ;
বটের শাখে ঘনসবুজ ছায়ানিবিড় পাখির পাড়ায়
হুহু করে ধেয়ে এসে ঘুঘু দুটির নিদ্রা ছাড়ায় ;
রুক্ষ কঠিন রক্তমাটি ঢেউ খেলিয়ে মিলিয়ে গেছে দূরে
তার মাঝে ওর থেকে থেকে নাচন ঘুরে ঘুরে ;
খেপে উঠে হঠাৎ ছোটে তালের বনে উত্তরে দিক্‌সীমায়
অস্ফুট ঐ বাষ্পনীলিমায় ;
টেলিগ্রাফের তারে তারে
সুর সেধে নেয় পরিহাসের ঝংকারে ঝংকারে ;
এমনি করে বেলা বহে যায়,
এই হাওয়াতে চুপ করে রই একলা জানালায়।
ঐ যে ছাতিম গাছের মতোই আছি
সহজ প্রাণের আবেগ নিয়ে মাটির কাছাকাছি,
ওর যেমন এই পাতার কাঁপন, যেমন শ্যামলতা,
তেমনি জাগে ছন্দে আমার আজকে দিনের সামান্য এই কথা।
না থাক্ খ্যাতি, না থাক্ কীর্তিভার,
পুঞ্জীভূত অনেক বোঝা অনেক দুরাশার,—
আজ আমি যে বেঁচেছিলেম সবার মাঝে মিলে সবার প্রাণে
সেই বারতা রইল আমার গানে।

১৯ বৈশাখ ১৩৩৮
[শান্তিনিকেতন]

বালক

বালক বয়স ছিল যখন, ছাদের কোণের ঘরে
নিঝুম দুইপহরে
দ্বারের 'পরে হেলিয়ে মাথা
মেঝে মাদুর পাতা,
একা একা কাটত রোদের বেলা,—
না মেনেছি পড়ার শাসন, না করেছি খেলা।
দূর আকাশে ডেকে যেত চিল,
সিসুগাছের ডালপালা সব বাতাসে ঝিলমিল।
তপ্ত তৃষায় চঞ্চু করি ফাঁক
প্রাচীর-'পরে ক্ষণে ক্ষণে বসত এসে কাক।
চড়ুই পাখির আনাগোনা মুখর কলভাষা,
ঘরের মধ্যে কড়ির কোণে ছিল তাদের বাসা।
ফেরিওয়ালার ডাক শোনা যায় গলির ওপার থেকে—
দূরের ছাদে ঘুড়ি ওড়ায় সে কে।
কখন্ মাঝে-মাঝে
ঘড়িওয়ালা কোন্ বাড়িতে ঘণ্টাধ্বনি বাজে।
সামনে বিরাট অজানিত, সামনে দৃষ্টি-পেরিয়ে-যাওয়া দূর
বাজাত কোন্ ঘর-ভোলানো সুর।
কিসের পরিচয়ের লাগি
আকাশ-পাওয়া উদাসী মন সদাই ছিল জাগি।
অকারণের ভালোলাগা
অকারণের ব্যথায় মিলে গাঁথত স্বপন নাইক গোড়া আগা।
সাথীহীনের সাথী
মনে হত দেখতে পেতেম দিগন্তে নীল আসন ছিল পাতি।

সন্তরে আজ পা দিয়েছি আয়ুশেষের কূলে
অন্তরে আজ জানলা দিলেম খুলে।

তেমনি আবার বালকদিনের মতো
চোখ মেলে মোর সুদূর-পানে বিনা কাজে প্রহর হল গত।
প্রখর তাপের কাল,
ঝরঝরিয়ে কেঁপে ওঠে শিরীষগাছের ডাল;
কুয়োর ধারে তেঁতুলতলায় ঢুকে
পাড়ার কুকুর ঘুমিয়ে পড়ে ভিজে মাটির স্নিগ্ধ পরশসুখে;
গাড়ির গোরু ক্ষণকালের মুক্তি পেয়ে ক্লান্ত আছে শুয়ে
জামের ছায়ায় তৃণবিহীন ভুঁয়ে।
কাঁকর-পথের পারে
শুকনো পাতার দৈন্য জমে গন্ধরাজের সারে।
চেয়ে আছি দু-চোখ দিয়ে সব-কিছুরে ছুঁয়ে,
ভাবনা আমার সবার মাঝে থুয়ে।
বালক যেমন নগ্ন-আবরণ,
তেমনি আমার মন
ঐ কাননের সবুজ ছায়ায় এই আকাশের নীলে
বিনা বাধায় এক হয়ে যায় মিলে।
সকল জানার মাঝে
চিরকালের না-জানা কার শঙ্খধ্বনি বাজে।
এই ধরণীর সকল সীমায় সীমাহারার গোপন আনাগোনা
সেই আমারে করেছে আন্‌মনা।

২১ বৈশাখ ১৩৩৮
[শান্তিনিকেতন]

বর্ষশেষ

যাত্রা হয়ে আসে সারা,— আয়ুর পশ্চিমপথশেষে
ঘনায় মৃত্যুর ছায়া এসে।
অস্তসূর্য আপনার দাক্ষিণ্যের শেষ বন্ধ টুটি
ছড়ায় ঐশ্বর্য তার ভরি দুই মুঠি।

বর্ণসমারোহে দীপ্ত মরণের দিগন্তের সীমা,
জীবনের হেরিনু মহিমা।

এই শেষ কথা নিয়ে নিশ্বাস আমার যাবে থামি,—
কত ভালোবেসেছিনু আমি।
অনন্ত রহস্য তারি উচ্ছলি আপন চারিধার
জীবন মৃত্যুরে দিল করি একাকার;
বেদনার পাত্র মোর বারম্বার দিবসে নিশীথে
ভরি দিল অপূর্ব অমৃতে।

দুঃখের দুর্গম পথে তীর্থযাত্রা করেছি একাকী,
হানিয়াছে দারুণ বৈশাখী।
কত দিন সঙ্গীহীন, কত রাত্রি দীপালোকহারা,
তারি মাঝে অন্তরেতে পেয়েছি ইশারা।
নিন্দার কণ্টকমাল্যে বক্ষ বিঁধিয়াছে বারে বারে,
বরমাল্য জানিয়াছি তারে।

আলোকিত ভুবনের মুখপানে চেয়ে নির্নিমেষ
বিস্ময়ের পাই নাই শেষ।
যে-লক্ষ্মী আছেন নিত্য মাধুরীর পদ্ম-উপবনে,
পেয়েছি তাঁহার স্পর্শ সর্ব অঙ্গে-মনে।
যে-নিশ্বাস তরঙ্গিত নিখিলের অশ্রুতে হাসিতে,
তারে আমি ধরেছি বাঁশিতে।

যাঁহারা মানুষরূপে দৈববাণী অনির্বচনীয়
তাঁহাদের জেনেছি আত্মীয়।
কতবার পরাভব, কতবার কত লজ্জা ভয়,
তবু কণ্ঠে ধ্বনিয়াছে অসীমের জয়।
অসম্পূর্ণ সাধনায় ক্ষণে ক্ষণে ক্রন্দিত আত্মার
খুলে গেছে অবরুদ্ধ দ্বার।

লভিয়াছি জীবলোকে মানবজন্মের অধিকার,
ধন্য এই সৌভাগ্য আমার।
যেথা যে-অমৃতধারা উৎসারিল যুগে যুগান্তরে
জ্ঞানে কর্মে ভাবে, জানি সে আমারি তরে।
পূর্ণের যে-কোনো ছবি মোর প্রাণে উঠেছে উজ্জ্বলি
জানি তাহা সকলের বলি।

ধূলির আসনে বসি ভূমারে দেখেছি ধ্যানচোখে
আলোকের অতীত আলোকে।
অণু হতে অণীয়ান মহৎ হইতে মহীয়ান,
ইন্দ্রিয়ের পারে তার পেয়েছি সন্ধান।
ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি দেহের ভেদিয়া যবনিকা
অনির্বাণ দীপ্তিময়ী শিখা।

যেখানেই যে-তপস্বী করেছে দুষ্কর যজ্ঞযাগ,
আমি তার লভিয়াছি ভাগ।
মোহবন্ধমুক্ত যিনি আপনারে করেছেন জয়,
তাঁর মাঝে পেয়েছি আমার পরিচয়।
যেখানে নিঃশঙ্ক বীর মৃত্যুরে লঙ্ঘিল অনায়াসে,
স্থান মোর সেই ইতিহাসে।

শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠ যিনি, যতবার ভুলি কেন নাম,
তবু তাঁরে করেছি প্রণাম।
অন্তরে লেগেছে মোর স্তব্ধ আকাশের আশীর্বাদ ;
উষালোকে আনন্দের পেয়েছি প্রসাদ।
এ আশ্চর্য বিশ্বলোকে জীবনের বিচিত্র গৌরবে
মৃত্যু মোর পরিপূর্ণ হবে।

আজি এই বৎসরের বিদায়ের শেষ আয়োজন,
মৃত্যু, তুমি ঘুচাও গুণ্ঠন।
কত কী গিয়েছে ঝরে, জানি জানি কত স্নেহ প্রীতি
নিবায়ে গিয়েছে দীপ রাখে নাই স্মৃতি।
মৃত্যু, তব হাত পূর্ণ জীবনের মৃত্যুহীন ক্ষণে,
ওগো শেষ অশেষের ধনে।

৩০ চৈত্র ১৩৩৩
[শান্তিনিকেতন]

মুক্তি

১

আমারে সাহস দাও, দাও শক্তি, হে চিরসুন্দর,
দাও স্বচ্ছ তৃপ্তির আকাশ, দাও মুক্তি নিরন্তর
প্রত্যহের ধূলিলিপ্ত চরণপতনপীড়া হতে,
দিয়ো না দুলিতে মোরে তরঙ্গিত মুহূর্তের স্রোতে,
ক্ষোভের বিক্ষেপবেগে। শ্রাবণসন্ধ্যার পুষ্পবনে
গ্লানিহীন যে-সাহস সুকুমার যূথীর জীবনে—
নির্মম বর্ষণঘাতে শঙ্কাশূন্য প্রসন্ন মধুর,
মুহূর্তের প্রাণটিতে ভরি তোলে অনন্তের সুর,
সরল আনন্দহাস্যে ঝরি পড়ে তৃণশয্যা-'পরে,
পূর্ণতার মূর্তিখানি আপনার বিনম্র অন্তরে
সুগন্ধে রচিয়া তোলে; দাও সেই অক্ষুব্ধ সাহস,
সে আত্মবিস্মৃত শক্তি, অব্যাকুল, সহজে স্ববশ
আপনার সুন্দর সীমায়;— দ্বিধাশূন্য সরলতা
গাঁথুক শান্তির ছন্দে সব চিন্তা, মোর সব কথা।

১ জুলাই ১৯২৭

২

আপনার কাছ হতে বহুদূরে পালাবার লাগি
হে সুন্দর, হে অলক্ষ্য, তোমার প্রসাদ আমি মাগি,
তোমার আহ্বানবাণী। আজ তব বাজুক বাঁশরি,
চিত্তভরা শ্রাবণপ্লাবনরাগে,— যেন গো পাসরি
নিকটের তাপতপ্ত ঘূর্ণিবায়ে ক্ষুব্ধ কোলাহল,
ধূলির নিবিড় টান পদতলে। রয়েছি নিশ্চল
সারাদিন পথপার্শ্বে; বেলা হয়ে এল অবসান,
ঘন হয়ে আসে ছায়া, শ্রান্ত সূর্য করিছে সন্ধান
দিগন্তে অন্তিম শান্তি। দিবা যথা চলেছে নির্ভীক
চিহ্নহীন সঙ্গহীন অন্ধকার পথের পথিক
আপনার কাছ হতে অন্তহীন অজানার পানে
অসীমের সংগীতে উদাসী,— সেইমতো আত্মদানে
আমারে বাহির করো, শূন্যে শূন্যে পূর্ণ হ'ক সুর,
নিয়ে যাক পথে পথে হে অলক্ষ্য, হে মহাসুদূর।

২ জুলাই ১৯২৭

আহ্বান

আমার তরে পথের 'পরে কোথায় তুমি থাক
সে-কথা আমি শুধাই বারে বারে।
কোথায় জানি আসনখানি সাজিয়ে তুমি রাখ
আমার লাগি নিভৃতে একধারে।
বাতাস বেয়ে ইশারা পেয়ে গেছি মিলন-আশে
শিশিরধোয়া আলোতে-ছোঁয়া শিউলিছাওয়া ঘাসে,
খুঁজেছি দিশা বিলোল জল-কাকলিকলভাষে
অধীরধারা নদীর পারে পারে।

আকাশকোণে মেঘের রঙে মায়ার যেথা মেলা,
তটের তলে স্বচ্ছ জলে ছায়ার যেথা খেলা,
অশথশাখে কপোত ডাকে, সেথায় সারাবেলা
তোমার বাঁশি শুনেছি বারে বারে।

কেমনে বুঝি আমারে খুঁজি কোথায় তুমি ডাক,
বাজিয়া উঠে ভীষণ তব ভেরি।
শরম লাগে, মন না জাগে, ছুটিয়া চলি নাকো,
দ্বিধার ভরে দুয়ারে করি দেরি।
ডেকেছ তুমি মানুষ যেথা পীড়িত অপমানে,
আলোক যেথা নিবিয়া আসে শঙ্কাতুর প্রাণে,
আমারে চাহি ডঙ্কা তব বেজেছে সেইখানে
বন্দী যেথা কাঁদিছে কারাগারে।
পাষাণ ভিত টলিছে যেথা ক্ষিতির বুক ফাটি
ধুলায়-চাপা অনলশিখা কাঁপায়ে তোলে মাটি,
নিমেষ আসি বহুযুগের বাঁধন ফেলে কাটি,
সেথায় ভেরি বাজাও বারে বারে।

৪ শ্রাবণ ১৩৩৪
সিঙাপুর বন্দর

দুয়ার

হে দুয়ার, তুমি আছ মুক্ত অনুক্ষণ,
রুদ্ধ শুধু অন্ধের নয়ন।
অন্তরে কী আছে তাহা বোঝে না সে, তাই
প্রবেশিতে সংশয় সদাই।

হে দুয়ার, নিত্য জাগে রাত্রিদিনমান
সুগম্ভীর তোমার আহ্বান।
সূর্যের উদয়-মাঝে খোল আপনারে।
তারকায় খোল অন্ধকারে।

হে দুয়ার, বীজ হতে অঙ্কুরের দলে
খোল পথ, ফুল হতে ফলে।
যুগ হতে যুগান্তর কর অবারিত,
মৃত্যু হতে পরম অমৃত।

হে দুয়ার, জীবলোক তোরণে তোরণে
করে যাত্রা মরণে মরণে।
মুক্তিসাধনার পথে তোমার ইঙ্গিতে
'মাভৈঃ' বাজে নৈরাশ্যনিশীথে।

[১৩৩৪]

দীপিকা

প্রতি সন্ধ্যায় নব অধ্যায়,
জ্বাল তব নব দীপিকা।
প্রত্যুষপটে প্রতিদিন লেখ
আলোকের নব লিপিকা
অন্ধকারের সাথে দুর্বার
সংগ্রাম তব হয় বারবার,
দিনে দিনে হয় কত পরাজয়,
দিনে দিনে জয়সাধনা।
পথ ভুলে ভুলে পথ খুঁজে লও,
সেই উৎসাহে পথদুখ বও,

দেববিদ্রোহে বাঁধা পড় মোহে
তবে হয় দেবারাধনা।

খেলাঘর ভেঙে বাঁধ খেলাঘর,
খেল ভেঙে ভেঙে খেলেনা।
বাসা বেঁধে বেঁধে বাসা ভাঙে মন
কোথাও আসন মেলে না।
জানি পথশেষে আছে পারাবার,
প্রতিখনে সেথা মেশে বারিধার,
নিমেষে নিমেষে তবু নিঃশেষে
ছুটিছে পথিক তটিনী।
ছেড়ে দিয়ে দিয়ে এক ধ্রুব গান
ফিরে ফিরে আসে নব নব তান,
মরণে মরণে চকিত চরণে
ছুটে চলে প্রাণনটিনী।

২৫ ফাল্গুন [১৩৩৩]

লেখা

সব লেখা লুপ্ত হয়, বারম্বার লিখিবার তরে
নূতন কালের বর্ণে। জীর্ণ তোর অক্ষরে অক্ষরে
কেন পট রেখেছিস পূর্ণ করি। হয়েছে সময়
নবীনের তুলিকারে পথ ছেড়ে দিতে। হ'ক লয়
সমাপ্তির রেখাদুর্গ। নব লেখা আসি দর্পভরে
তার ভগ্নস্তূপরাশি বিকীর্ণ করিয়া দূরান্তরে
উন্মুক্ত করুক পথ, স্থাবরের সীমা করি জয়,
নবীনের রথযাত্রা লাগি। অজ্ঞাতের পরিচয়
অনভিজ্ঞ নিক জিনে। কালের মন্দিরে পূজাঘরে
যুগবিজয়ার দিনে পূজার্চনা সাঙ্গ হলে পরে

যায় প্রতিমার দিন। ধুলা তারে ডাক দিয়ে কয়,—
"ফিরে ফিরে মোর মাঝে ক্ষয়ে ক্ষয়ে হবি রে অক্ষয়,
তোর মাটি দিয়ে শিল্পী বিরচিবে নূতন প্রতিমা,
প্রকাশিবে অসীমের নব নব অন্তহীন সীমা।"

১১ চৈত্র ১৩৩৩

নূতন শ্রোতা

১

শেষ লেখাটার খাতা
পড়ে শোনাই পাতার পরে পাতা,
অমিয়নাথ স্তব্ধ হয়ে দোলায় মুগ্ধ মাথা।
উচ্ছ্বসি কয়, "তোমার অমর কাব্যখানি
নিত্যকালের ছন্দে লেখা সত্যভাষার বাণী।"

দড়িবাঁধা কাঠের গাড়িটারে
নন্দগোপাল ঘটর ঘটর টেনে বেড়ায় সভাঘরের দ্বারে।
আমি বলি, "থাম্ রে বাপু, থাম্,
দুষ্টুমি এর নাম,—
পড়ার সময় কেউ কি অমন বেড়ায় গাড়ি ঠেলে।
দেখ্ দেখি তোর অমিকাকা কেমন লক্ষ্মীছেলে।"

অনেক কষ্টে ভালোমানুষ-বেশে
বসল নন্দ অমিকাকার কোলের কাছে ঘেঁষে।
দুরন্ত সেই ছেলে
আমার মুখে ডাগর নয়ন মেলে

চুপ করে রয় মিনিট কয়েক, অমিরে কয় ঠেলে,
"শোনো অমিকাকা,
গাড়ির ভাঙা চাকা
সারিয়ে দেবে বলেছিলে, দাও এঁটে ইস্ক্রুপ।"
অমি বললে কানে-কানে, "চুপ চুপ চুপ।"
আবার খানিক শান্ত হয়ে শুনল বসে নন্দ
কবিবরের অমর ভাষার ছন্দ।

একটু পরে উস্‌খুসিয়ে গাড়ির থেকে দশবারোটা কড়ি
মেজের 'পরে করলে ছড়াছড়ি।
ঝম্‌ঝমিয়ে কড়িগুলো গুন্‌গুনিয়ে আউড়ে চলে ছড়া,—
এর পরে আর হয় না কাব্য পড়া।
তার ছড়া আর আমার ছড়ায় আর কতখন চলবে রেষারেষি,
হার মানতে হবেই শেষাশেষি।

অমি বললে, "দুষ্টু ছেলে।" নন্দ বললে, "তোমার সঙ্গে আড়ি,—
নিয়ে যাব গাড়ি,
দিন্‌দাদাকে ডাকব ছাতে ইস্টিশনের খেলায়,
গড়গড়িয়ে যাবে গাড়ি বদ্দিবাটির মেলায়।"
এই বলে সে ছল্‌ছলানি চোখে
গাড়ি নিয়ে দৌড়ে গেল কোন্‌ দিকে কোন্‌ ঝোঁকে।

আমি বললেম, যাও অমিয়, আজকে পড়া থাক্‌,
নন্দগোপাল এনেছে তার নতুনকালের ডাক।
আমার ছন্দে কান দিল না ও যে
কী মানে তার আমিই বুঝি আর যারা নাই বোঝে।
যে-কবির ও শুনবে পড়া সেও তো আজ খেলার গাড়ি ঠেলে,
ইস্টিশনের খেলাই সেও খেলে।
আমার মেলা ভাঙবে যখন দেব খেয়ায় পাড়ি,
তার মেলাতে পৌঁছবে তার গাড়ি,

আমার পড়ার মাঝে
তারি আসার ঘণ্টা যদি বাজে
সহজ মনে পারি যেন আসর ছেড়ে দিতে
নতুন কালের বাঁশিটিরে নতুন প্রাণের গীতে।
ভরেছিলেম এই ফাগুনের ডালা
তা নিয়ে কেউ নাই-বা গাঁথুক আর-ফাগুনের মালা।

১৯ অগস্ট ১৯২৭
প্লানসিউস জাহাজ

২

বছর বিশেক চলে গেল সাঙ্গ তখন ঠেলাগাড়ির খেলা ;
নন্দ বললে, "দাদামশায়, কী লিখেছ শোনাও তো এইবেলা !"
পড়তে গেলেম ভরসাতে বুক বেঁধে,
কণ্ঠ যে যায় বেধে ;
টেনে টেনে বাহির করি এ খাতা ওই খাতা,
উলটে মরি এ পাতা ওই পাতা।
ভয়ের চোখে যতই দেখি লেখা,
মনে হয় যে রস কিছু নেই, রেখার পরে রেখা।
গোপনে তার মুখের পানে চাহি,
বুদ্ধি সেথায় পাহারা দেয় একটু ক্ষমা নাহি।
নতুনকালের শানদেওয়া তার ললাটখানি খরখড়্গ-সম,
শীর্ণ যাহা, জীর্ণ যাহা তার প্রতি নির্মম।
তীক্ষ্ণ সজাগ আঁখি,
কটাক্ষে তার ধরা পড়ে কোথা যে কার ফাঁকি।
সংসারেতে গর্তগুহা যেখানে-যা সবখানে দেয় উঁকি,
অমিশ্র বাস্তবের সাথে নিত্য মুখোমুখি।

তীব্র তাহার হাস্য
বিশ্বকাজের মোহমুক্ত ভাষ্য।

একটু কেশে পড়া করলেম শুরু
যৌবনে যা শিখিয়েছিলেন অন্তর্যামী আমার কবিগুরু,—
প্রথম প্রেমের কথা,
আপ্‌নাকে সেই জানে না যেই গভীর ব্যাকুলতা,
সেই যে বিধুর তীব্রমধুর তরাসদোদুল বক্ষ দুরু দুরু,—
উড়ো পাখির ডানার মতো যুগল কালো ভুরু,
নীরব চোখের ভাষা,
এক নিমেষে উচ্ছলি দেয় চিরদিনের আশা,
তাহারি সেই দ্বিধার ঘায়ে ব্যথায় কম্পমান
দুটি-একটি গান।
এড়িয়ে-চলা জলধারার হাস্যমুখর কলকলোচ্ছ্বাস,
পুজায়-স্তব্ধ শরৎপ্রাতের প্রশান্ত নিশ্বাস,
বৈরাগিণী ধূসর সন্ধ্যা অস্তসাগরপারে,
তন্দ্রাবিহীন চিরন্তনের শান্তিবাণী নিশীথ-অন্ধকারে,—
ফাগুনরাতির স্পর্শমায়ায় অরণ্যতল পুষ্পরোমাঞ্চিত,
কোন্‌ অদৃশ্য সুচিরবাঞ্ছিত
বনবীথির ছায়াটিরে
কাঁপিয়ে দিয়ে বেড়ায় ফিরে ফিরে,
তারি চঞ্চলতা
মর্মরিয়া কইল যে-সব কথা,
তারি প্রতিধ্বনিভরা
দু-একটা চৌপদী আমার সসংকোচে পড়ে গেলেম ত্বরা।

পড়া আমার শেষ হল যেই, ক্ষণেক নীরব থেকে
নন্দগোপাল উৎসাহেতে বলল হঠাৎ ঝোঁকে,—

"দাদামশায়, শাবাশ।
তোমার কালের মনের গতি, পেলেম তারি ইতিহাসের আভাস।"
খাতা নিতে হাত বাড়াল, চাদরেতে দিলেম তাহা ঢাকা,
কইনু তারে, "দেখ্‌ তো ভায়া, কোথায় আছে তোর অমিয়কাকা।"

২৭ অক্টোবর [১৯২৭]
আবা-মারু জাহাজ। গঙ্গা

আশীর্বাদ

তরুণ আশীর্বাদপ্রার্থীর প্রতি প্রাচীন কবির নিবেদন
শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের উদ্দেশে—

নিম্নে সরোবর স্তব্ধ হিমাদ্রির উপত্যকাতলে।
ঊর্ধ্বে গিরিশৃঙ্গ হতে শ্রান্তিহীন সাধনার বলে
তরুণ নির্ঝর ধায় সিন্ধুসনে মিলনের লাগি
অরুণোদয়ের পথে। সে কহিল, "আশীর্বাদ মাগি
হে প্রাচীন সরোবর।" সরোবর কহিল হাসিয়া,
"আশিস তোমারি তরে নীলাম্বরে উঠে উদ্ভাসিয়া
প্রভাতসূর্যের করে; ধ্যানমগ্ন গিরিতপস্বীর
বিগলিত করুণার প্রবাহিত আশীর্বাদনীর
তোমারে দিতেছে প্রাণধারা। আমি বনচ্ছায়া হতে,
নির্জনে একান্তে বসি, দেখি নির্বারিত স্রোতে
সংগীত-উদ্বেল নৃত্যে প্রতিক্ষণে করিতেছ জয়
মসীকৃষ্ণ বিঘ্নপুঞ্জ, পথরোধী পাষাণসঞ্চয়,
গূঢ় জড় শত্রুদল। এই তব যাত্রার প্রবাহ
আপনার গতিবেগে আপনার জাগায় উৎসাহ।"

১৪ পৌষ ১৩৩৫

মোহানা

ইরাবতীর মোহানামুখে কেন আপনভোলা
সাগর তব বরন কেন ঘোলা।
কোথা সে তব বিমল নীল স্বচ্ছ চোখে চাওয়া,
রবির পানে গভীর গান গাওয়া ?
নদীর জলে ধরণী তার পাঠাল এ কী চিঠি,
কিসের ঘোরে আবিল হল দিঠি।
আকাশ-সাথে মিলায়ে রঙ আছিলে তুমি সাজি,
ধরার রঙে বিলাস কেন আজি।
রাতের তারা আলোকে আজ পরশ করে যবে
পায় না সাড়া তোমার অনুভবে ;
প্রভাত চাহে স্বচ্ছ জলে নিজেরে দেখিবারে,
বিফল করি ফিরায়ে দাও তারে।

নিয়েছ তুমি ইচ্ছা করি আপন পরাজয়,
মানিতে হার নাহি তোমার ভয়।
বরন তব ধূসর কর, বাঁধন নিয়ে খেল,
হেলায় হিয়া হারায়ে তুমি ফেল।
এ-লীলা তব প্রান্তে শুধু তটের সাথে মেশা,
একটুখানি মাটির লাগে নেশা।
বিপুল তব বক্ষ-'পরে অসীম নীলাকাশ,
কোথায় সেথা ধরার বাহুপাশ।
ধুলারে তুমি নিয়েছ মানি, তবুও অমলিন,
বাঁধন পরি স্বাধীন চিরদিন।
কালীরে রহে বক্ষে ধরি শুভ্র মহাকাল,
বাঁধে না তাঁরে আলো কলুষজাল।

৭ কার্তিক ১৩৩৪। কালীপূজা
[ইরাবতীসংগম। বঙ্গসাগর]

বক্সাদুর্গস্থ রাজবন্দীদের প্রতি

নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন।
পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা, সংগীত না মানিল বন্ধন।
ফোয়ারার রন্ধ্র হতে
উন্মুখর ঊর্ধ্বস্রোতে
বন্দীবারি উচ্চারিল আলোকের কী অভিনন্দন।

মৃত্তিকার ভিত্তি ভেদি অঙ্কুর আকাশে দিল আনি
স্বসমুত্থ শক্তিবলে গভীর মুক্তির মন্ত্রবাণী।
মহাক্ষণে রুদ্রাণীর
কী বর লভিল বীর,
মৃত্যু দিয়ে বিরচিল অমর্ত্য নরের রাজধানী।

'অমৃতের পুত্র মোরা'— কাহারা শুনাল বিশ্বময়।
আত্মবিসর্জন করি আত্মারে কে জানিল অক্ষয়।
ভৈরবের আনন্দেরে
দুঃখেতে জিনিল কে রে,
বন্দীর শৃঙ্খলচ্ছন্দে মুক্তের কে দিল পরিচয়।

১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮
দার্জিলিং

দুর্দিনে

দুর্যোগ আসি টানে যবে ফাঁসি
কর্মে জড়ায় গ্রন্থি,
মন্থর দিন পাথেয়বিহীন
দীর্ঘ পথের পন্থী;

নির্দয়তম নিন্দার হাস,
    নির্মমতম দৈব,
শূন্যে শূন্যে হতাশ বাতাস
    ফুকারে 'নৈব নৈব'—
হঠাৎ তখন কহে মোরে মন,
    'মিথ্যে, এ সব মিথ্যে,
প্রাণে যদি রয় গান অক্ষয়
    সুর যদি রয় চিত্তে।'

চৌদিক করে যুদ্ধঘোষণ,
    দুর্গম হয় পন্থা,
চিন্তায় করে রক্ত শোষণ
    প্রখর-নখরদন্তা,
নিরানন্দের ঘিরি রহে ঘের,
    নাই জীবনের সঙ্গী,
দৈন্য কুরূপ করে বিদ্রূপ
    ব্যঙ্গের মুখভঙ্গী—
মন বলে, 'নাই ভাবনা কিছুই
    মিথ্যে, এ সব মিথ্যে,
অন্তর-মাঝে চিরধনী তুই
    অন্তবিহীন বিত্তে।'

ভাষাহীন দিন কুয়াশাবিলীন—
    মলিন উষার স্বর্ণ,
কল্পনা যত বাদুড়ের মতো
    রাতে ওড়ে কালো বর্ণ;
আবর্জনার অচলপুঞ্জে
    যাত্রার পথ রুদ্ধ,
রিক্তকুসুম শুষ্ক কুঞ্জে
    বৈশাখ রহে ক্রুদ্ধ—

মন মোরে কয়, 'এ কিছুই নয়,
মিথ্যে, এ সব মিথ্যে,
আপনায় ভুলে গাও প্রাণ খুলে,
নাচো নিখিলের নৃত্যে।'

বদ্ধদুয়ার বিশ্ব বিরাজে,
নিবেছে ঘরের দীপ্তি,
চির-উপবাসী আপনার মাঝে
আপনি না পাই তৃপ্তি,
পদে পদে রয় সংশয় ভয়,
পদে পদে প্রেম ক্ষুণ্ণ,
বৃথা আহ্বান, বৃথা অনুনয়,
সবার আসন শূন্য—
মন বলি উঠে, 'ডুবে যা গভীরে,
মিথ্যে, এ সব মিথ্যে,
নিবিড় ধেয়ানে নিখিল লভি রে
আপনারি একাকিত্বে।'

২৩ অক্টোবর ১৯২৭
আবা-মারু। বঙ্গসাগর

প্রশ্ন

ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত, পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে,
তারা বলে গেল 'ক্ষমা করো সবে', বলে গেল 'ভালোবাসো—
অন্তর হতে বিদ্বেষবিষ নাশো'।
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির-দ্বারে
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে।

আমি-যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে,
আমি-যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি-যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।

কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সংগীতহারা,
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে,
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো।

পৌষ ১৩৩৮

ভিক্ষু

হায় রে ভিক্ষু, হায় রে,
নিঃস্বতা তোর মিথ্যা সে ঘোর,
নিঃশেষে দে বিদায় রে।
ভিক্ষাতে শুভলগ্নের ক্ষয়
কোন্ ভুলে তুই ভুলিলি,
ভাণ্ডার তোর পণ্ড-যে হয়,
অর্গল নাহি খুলিলি।
আপনারে নিয়ে আবরণ দিয়ে
এ কী কুৎসিত ছলনা ;
জীর্ণ এ চীর ছদ্মবেশীর,
নিজেরে সে কথা বল না।

হায় রে ভিক্ষু, হায় রে,
মিথ্যা মায়ার ছায়া ঘুচাবার
মন্ত্র কে নিবি আয় রে

কাঙাল যে জন পায় না সে ধন,
পায় সে কেবল ভিক্ষা।
চির-উপবাসী মিছা-সন্ন্যাসী
দিয়েছে তাহারে দীক্ষা।
তোর সাধনায় রত্নমানিক
পথে পথে যাস ছড়ায়ে,
ভিক্ষার ঝুলি, ধিক্ তারে ধিক্,
বহিস নে শিরে চড়ায়ে।
হায় রে ভিক্ষু, হায় রে,
নিঃস্বজনের দুঃস্বপনের
বন্ধ, ছিঁড়িস তায় রে।

অঞ্চলে রাতি ভিক্ষার কণা
সঞ্চয় করে তারাতে,
নিয়ে সে পারানি তবু পারিল না
তিমিরসিন্ধু পারাতে।
পূর্বগগন আপনার সোনা
ছড়াল যখন দ্যুলোকে,
পূর্ণের দানে পূর্ণ কামনা
প্রভাত পুরিল পুলকে।
হায় রে ভিক্ষু, হায় রে,
আপনা-মাঝারে গোপন রাজারে
মন যেন তোর পায় রে।

২৩ জুন ১৯২৮
বাঙ্গালোর

আশীর্বাদী

কল্যাণীয়া অমলিনার প্রথম বার্ষিক জন্মদিনে

তোমারে জননী ধরা
দিল রূপে রসে ভরা
প্রাণের প্রথম পাত্রখানি,
তাই নিয়ে তোলাপাড়া
ফেলাছড়া নাড়াচাড়া
অর্থ তার কিছুই না জানি।
কোন্ মহারঙ্গশালে
নৃত্য চলে তালে তালে,
ছন্দ তারি লাগে রক্তে তব।
অকারণ কলরোলে
তাই তব অঙ্গ দোলে,
ভঙ্গী তার নিত্য নব নব।
চিন্তা-আবরণহীন
নগ্নচিত্ত সারাদিন
লুটাইছে বিশ্বের প্রাঙ্গণে,
ভাষাহীন ইশারায়
ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যায়
যাহা-কিছু দেখে আর শোনে।
অস্ফুট ভাবনা যত
অশথপাতার মতো
কেবলি আলোয় ঝিলিমিলি।
কী হাসি বাতাসে ভেসে
তোমারে লাগিছে এসে,
হাসি বেজে ওঠে খিলিখিলি।
গ্রহ তারা শশী রবি
সমুখে ধরেছে ছবি
আপন বিপুল পরিচয়।

কচি কচি দুই হাতে
খেলিছ তাহারি সাথে,
নাই প্রশ্ন, নাই কোনো ভয়।
তুমি সর্ব দেহে মনে
ভরি লহ প্রতিক্ষণে
যে সহজ আনন্দের রস,
যাহা তুমি অনায়াসে
ছড়াইছ চারিপাশে
পুলকিত দরশ পরশ,
আমি কবি তারি লাগি
আপনার মনে জাগি,
বসে থাকি জানালার ধারে।
অমরার দূতীগুলি
অলক্ষ্য দুয়ার খুলি
আসে যায় আকাশের পারে।
দিগন্তে নীলিম ছায়া
রচে দূরান্তের মায়া,
বাজে সেথা কী অশ্রুত বেণু।
মধ্যদিন তন্দ্রাতুর
শুনিছে রৌদ্রের সুর,
মাঠে শুয়ে আছে ক্লান্ত ধেনু।
চোখের দেখাটি দিয়ে
দেহ মোর পায় কী এ,
মন মোর বোবা হয়ে থাকে।
সব আছে আমি আছি,
দুইয়ে মিলে কাছাকাছি
আমার সকল-কিছু ঢাকে।
যে-আশ্বাসে মর্ত্যভূমি
হে শিশু, জাগাও তুমি,
যে নির্মল যে সহজ প্রাণে,

কবির জীবনে তাই
যেন বাজাইয়া যাই
তারি বাণী মোর যত গানে।
ক্লান্তিহীন নব আশা
সেই তো শিশুর ভাষা,
সেই ভাষা প্রাণদেবতার,
জরার জড়ত্ব ত্যেজে
নব নব জন্মে সে যে
নব প্রাণ পায় বারম্বার।
নৈরাশ্যের কুহেলিকা
উষার আলোকটিকা
ক্ষণে ক্ষণে মুছে দিতে চায়,
বাধার পশ্চাতে কবি
দেখে চিরন্তন-রবি
সেই দেখা শিশুচক্ষে ভায়।
শিশুর সম্পদ বয়ে
এসেছ এ-লোকালয়ে,
সে-সম্পদ থাক্‌ অমলিনা।
যে-বিশ্বাস দ্বিধাহীন
তারি সুরে চিরদিন
বাজে যেন জীবনের বীণা।

৮ কার্তিক ১৩৩৮
দার্জিলিং

অবুঝ মন

অবুঝ শিশুর আবছায়া এই নয়নবাতায়নের ধারে
আপনাভোলা মনখানি তার অধীর হয়ে উঁকি মারে।
বিনাভাষার ভাবনা নিয়ে কেমন আঁকুবাঁকুর খেলা,—
হঠাৎ ধরা, হঠাৎ ছড়িয়ে ফেলা,

হঠাৎ অকারণ
কী উৎসাহে বাহু নেড়ে উদ্দাম গর্জন।
হঠাৎ দুলে দুলে ওঠে,
অর্থবিহীন কোন্ দিকে তার লক্ষ ছোটে।
বাহির-ভুবন হতে
আলোর লীলায় ধ্বনির স্রোতে
যে-বাণী তার আসে প্রাণে
তারি জবাব দিতে গিয়ে কী-যে জানায় কেই তা জানে

এই যে অবুঝ এই যে বোবা মন
প্রাণের 'পরে ঢেউ জাগিয়ে কৌতুকে যে অধীর অনুক্ষণ,
সর্ব দিকেই সর্বদা উন্মুখ,
আপনারি চাঞ্চল্য নিয়ে আপ্‌নি সমুৎসুক,—
নয় বিধাতার নবীন রচনা এ,
ইহার যাত্রা আদিম যুগের নায়ে।
বিশ্বকবির মানস-সরোবরে
প্রাতঃস্নানের পরে
প্রাণের সঙ্গে বাহির হল, তখন অন্ধকার,
নিয়ে এল ক্ষীণ আলোটি তার।
তারি প্রথম ভাষাবিহীন কূজনকাকলি যে
বনে বনে শাখায় পাতায় পুষ্পে ফলে বীজে
অঙ্কুরে অঙ্কুরে
উঠল জেগে ছন্দে সুরে সুরে।
সূর্য-পানে অবাক আঁখি মেলি
মুখরিত উচ্ছল তার কেলি।

নানারূপের খেলনা যে তার নানা বর্ণে আঁকে,
বারেক খোলে, বারেক তারে ঢাকে।

রোদবাদলে করুণ কান্না হাসি
সদাই ওঠে আভাসি উচ্ছ্বাসি।

ওই যে শিশুর অবুঝ ভোলা মন
তরীর কোণে বসে বসে দেখছি তারি আকুল আন্দোলন।
মাঝে-মাঝে সাগর-পানে তাকিয়ে দেখি যত
মনে ভাবি, ও যেন এই শিশু-আঁখির মতো,
আকাশ-পানে আবছায়া ওর চাওয়া
কোন্ স্বপনে-পাওয়া,
অন্তরে ওর যেন সে কোন্ অবুঝ ভোলা মন
এ-তীর হতে ও-তীর পানে দুলছে অনুক্ষণ।
কেমন কলভাষে
প্রলয়কাঁদন কাঁদে ও যে প্রবল হাসি হাসে
আপ্‌নিও তার অর্থ আছে ভুলে,—
ক্ষণে ক্ষণে শুধুই ফুলে ফুলে
অকারণে গর্জি উঠে শূন্যে শূন্যে মূঢ় বাহু তুলে।

বিরাট অবুঝ এই সে আদিম মন,
মানব-ইতিহাসের মাঝে আপ্‌নারে তার অধীর অন্বেষণ।
ঘর হতে ধায় আগুন-পানে, আগুন হতে পথে,
পথ হতে ধায় তেপান্তরের বিঘ্নবিষম অরণ্যে পর্বতে;
এই সে গড়ে, এই সে ভাঙে, এই সে কী আক্ষেপে
পায়ের তলায় ধরণীরে আঘাত করে ধুলায় আকাশ ব্যেপে;
হঠাৎ খেপে উঠে
রুদ্ধ পাষাণভিত্তি-'পরে বেড়ায় মাথা কুটে।
অনাসৃষ্টি সৃষ্টি আপনগড়া
তাই নিয়ে সে লড়াই করে, তাই নিয়ে তার কেবল ওঠাপড়া
হঠাৎ উঠে ঝেঁকে
যায় সে ছুটে কী রাঙা রঙ দেখে
অদৃশ্য কোন্ দূর দিগন্ত-পানে;

আবছায়া কোন্ সন্ধ্যা-আলোয় শিশুর মতো তাকায় অনুমানে,
তাহার ব্যাকুলতা
স্বপ্নে সত্যে মিশিয়ে রচে বিচিত্র রূপকথা।

২০ অক্টোবর ১৯২৭
আবা-মারু জাহাজ

পরিণয়

সুরমা ও সুরেন্দ্রনাথ কর -এর বিবাহ উপলক্ষে

ছিল চিত্রকল্পনায়, এতকাল ছিল গানে গানে,
সেই অপরূপ এল রূপ ধরি তোমাদের প্রাণে।
আনন্দের দিব্যমূর্তি সে-যে,
দীপ্ত বীরতেজে
উত্তরিয়া বিঘ্ন যত দূর করি ভীতি
তোমাদের প্রাঙ্গণেতে হাঁক দিল, 'এসেছি অতিথি'।

জ্বালো গো মঙ্গলদীপ করো অর্ঘ্য দান
তনু মনপ্রাণ।
ও যে সুরভবনের রমার কমলবনবাসী,
মর্ত্যে নেমে বাজাইল সাহানায় নন্দনের বাঁশি।
ধরার ধূলির 'পরে
মিশাইল কী আদরে
পারিজাতরেণু।
মানবগৃহের দৈন্যে অমরাবতীর কল্পধেনু
অলক্ষ্য অমৃতরস দান করে
অন্তরে অন্তরে।
এল প্রেম চিরন্তন, দিল দোঁহে আনি
রবিকরদীপ্ত আশীর্বাণী।

২৫ বৈশাখ ১৩৩৮
[শান্তিনিকেতন]

চিরন্তন

এই বিদেশের রাস্তা দিয়ে ধুলোয় আকাশ ঢেকে
গাড়ি আমার চলতেছিল হেঁকে।
হেনকালে নেবুর ডালে স্নিগ্ধ ছায়ায় উঠল কোকিল ডেকে
পথকোণের ঘন বনের থেকে।

এই পাখিটির স্বরে
চিরদিনের সুর যেন এই একটি দিনের 'পরে
বিন্দু বিন্দু ঝরে।
ছেলেবেলায় গঙ্গাতীরে আপন-মনে চেয়ে জলের পানে
শুনেছিলেম পল্লীতলে, এই কোকিলের গানে
অসীমকালের অনির্বচনীয়
প্রাণে আমার শুনিয়েছিল, "তুমি আমার প্রিয়।"

সেই ধ্বনিটি কানন ব্যেপে পল্লবে পল্লবে
জলের কলরবে
ওপার-পানে মিলিয়ে যেত সুদূর নীলাকাশে।
আজ এই পরবাসে
সেই ধ্বনিটি ক্ষুব্ধ পথের পাশে
গোপন শাখার ফুলগুলিরে দিল আপন বাণী।
বনচ্ছায়ার শীতল শান্তিখানি
প্রভাত-আলোর সঙ্গে করে নিবিড় কানাকানি
ওই বাণীটির বিমল সুরে গভীর রমণীয়,—
"তুমি আমার প্রিয়।"

এরি পাশেই নিত্য হানাহানি;
প্রতারণার ছুরি
পাঁজর কেটে করে চুরি

সরল বিশ্বাস ;
কুটিল হাসি ঘটিয়ে তোলে জটিল সর্বনাশ।
নিরাশ দুঃখে চেয়ে দেখি পৃথ্বীব্যাপী মানববিভীষিকা
জ্বালায় মানবলোকালয়ে প্রলয়বহ্নিশিখা,
লোভের জালে বিশ্বজগৎ ঘেরে,
ভেবে না পাই কে বাঁচাবে আপনহারা অন্ধ মানুষেরে।

হেনকালে স্নিগ্ধ ছায়ায় হঠাৎ কোকিল ডাকে
ফুল্ল অশোকশাখে ;
পরশ করে প্রাণে
যে-শান্তিটি সব-প্রথমে, যে-শান্তিটি সবার অবসানে,
যে-শান্তিতে জানায় আমায় অসীম কালের অনির্বচনীয়,—
"তুমি আমার প্রিয়।"

১৮ অক্টোবর ১৯২৭
পিনাঙ

কণ্টিকারি

শিলঙে এক গিরির খোপে পাথর আছে খসে,—
তারি উপর লুকিয়ে ব'সে
রোজ সকালে গেঁথেছিলেম ভোরের সুরে গানের মালা।
প্রথম সূর্যোদয়ের সঙ্গে ছিল আমার মুখোমুখির পালা।

ডানদিকেতে অফলা এক পিচের শাখা ভরে
ফুল ফোটে আর ফুল প'ড়ে যায় ঝরে।
কালো ডানায় হলদে আভাস কোন্ পাখি সেই অকারণের গানে
ক্লান্তি নাহি জানে,—

তেমনিতরো গোলাপলতা লতাবিতান ঢেকে
অজস্র তার ফুলের ভাষায় অন্ত না পায় উদ্দেশহীন ডেকে।
পাইনবনের প্রাচীন তরু তাকায় মেঘের মুখে,
ডালগুলি তার সবুজ ঝরনা ধরার পানে ঝুঁকে
মন্ত্রে যেন থমক-লেগে আছে।
দুটি দালিম গাছে
ঘনসবুজ পাতার কোলে কোলে
ঘনরাঙা ফুলের গুচ্ছ দোলে।

পায়ের কাছে একটি কণ্টিকারি—
অন্তরঙ্গ কাছের সঙ্গ তারি,
দূরের শূন্যে আপনাকে সে প্রচার নাহি করে।
মাটির কাছে নত হলে পরে
স্নিগ্ধ সাড়া দেয় সে ধীরে ধূলিশয়ন থেকে
নীলবরনের ফুলের বুকে একটুখানি সোনার বিন্দু এঁকে।

সেদিন যত রচেছিলাম গান
কণ্টিকারির দান
তাদের সুরে স্বীকার করা আছে।
আজকে যখন হৃদয় আমার ক্ষণিক শান্তি যাচে
দুঃখদিনের দুর্ভাবনার প্রচণ্ড পীড়নে,
হঠাৎ কেন জাগল আমার মনে,
সেই সকালের টুকরো একটুখানি—
মাটির কাছে কণ্টিকারির নীল-সোনালির বাণী।

৫ আষাঢ় ১৩৩৯

আরেক দিন

স্পষ্ট মনে জাগে,
তিরিশ বছর আগে
তখন আমার বয়স পঁচিশ— কিছুকালের তরে
এই দেশেতেই এসেছিলেম, এই বাগানের ঘরে।
সূর্য যখন নেমে যেত নীচে
দিনের শেষে ওই পাহাড়ে পাইনশাখার পিছে,
নীল শিখরের আগায় মেঘে মেঘে
আগুনবরন কিরণ রইত লেগে,
দীর্ঘ ছায়া বনে বনে এলিয়ে যেত পর্বতে পর্বতে ;—
সামনেতে ঐ কাঁকরঢালা পথে
দিনের পরে দিনে
ডাকপিয়নের পায়ের ধ্বনি নিত্য নিতেম চিনে।
মাসের পরে মাস গিয়েছে, তবু
একবারো তার হয় নি কামাই কভু।

আজো তেমনি সূর্য ডোবে সেইখানেতেই এসে
পাইনবনের শেষে,
সুদূর শৈলতলে
সন্ধ্যাছায়ার ছন্দ বাজে ঝরনাধারার জলে,
সেই সেকেলের মতোই তেমনিধারা
তারার পরে তারা
আলোর মন্ত্র চুপি চুপি শুনায় কানে পর্বতে পর্বতে ;
শুধু আমার কাঁকরঢালা পথে
বহুকালের চেনা
ডাকপিয়নের পায়ের ধ্বনি একদিনো বাজবে না।

আজকে তবু কী প্রত্যাশা জাগল আমার মনে,—
চলতে চলতে গেলেম অকারণে

ডাকঘরে সেই মাইলতিনেক দূরে।
দ্বিধা ভরে মিনিটকুড়িক এদিক ওদিক ঘুরে
ডাকবাবুদের কাছে
শুধাই এসে, “আমার নামে চিঠিপত্তর আছে ?”
জবাব পেলেম, “কই, কিছু তো নেই।”
শুনে তখন নতশিরে আপন-মনেতেই
অন্ধকারে ধীরে ধীরে
আসছি যখন শূন্য আমার ঘরের দিকে ফিরে,
শুনতে পেলেম পিছন দিকে
করুণ গলায় কে অজানা বললে হঠাৎ কোন্ পথিকে,—
“মাথা খেয়ো, কাল কোরো না দেরি।”
ইতিহাসের বাকিটুকু আঁধার দিল ঘেরি।
বক্ষে আমার বাজিয়ে দিল গভীর বেদনা সে
পঁচিশবছর বয়সকালের ভুবনখানির একটি দীর্ঘশ্বাসে,
যে-ভুবনে সন্ধ্যাতারা শিউরে যেত ওই পাহাড়ের দূরে
কাঁকরঢালা পথের ’পরে ডাকপিয়নের পদধ্বনির সুরে।

২৩ অগস্ট ১৯২৭
রন্ধিউস্ জাহাজ

তে হি নো দিবসাঃ

এই অজানা সাগরজলে বিকেলবেলার আলো
লাগল আমার ভালো।
কেউ দেখে কেউ নাই-বা দেখে, রাখবে না কেউ মনে,
এমনতরো ফেলাছড়ার হিসাব কি কেউ গোনে।

এই দেখে মোর ভরল বুকের কোণ ;
কোথা থেকে নামল রে সেই খেপা দিনের মন,
যেদিন অকারণ

হঠাৎ হাওয়ায় যৌবনেরি ঢেউ
ছল্‌ছলিয়ে উঠত প্রাণে জানত না তা কেউ।
লাগত আমায় আপন গানের নেশা
অনাগত ফাগুনদিনের বেদন দিয়ে মেশা।

সে গান যারা শুনত তারা আড়াল থেকে এসে
আড়ালেতে লুকিয়ে যেত হেসে।
হয়তো তাদের দেবার ছিল কিছু,
আভাসে কেউ জানায় নি তা নয়ন করে নিচু।
হয়তো তাদের সারাদিনের মাঝে
পড়ত বাধা একবেলাকার কাজে।
চমকলাগা নিমেষগুলি সেই
হয়তো বা কার মনে আছে, হয়তো মনে নেই।
জ্যোৎস্নারাতে একলা ছাদের 'পরে
উদার অনাদরে
কাটত প্রহর লক্ষ্যবিহীন প্রাণে,
মূল্যবিহীন গানে।

মোর জীবনে বিশ্বজনের অজানা সেই দিন,
বাজত তাহার বুকের মাঝে খামখেয়ালী বীন,—
যেমনতরো এই সাগরে নিত্য সোনায় নীলে
রূপহারানো রাধাশ্যামের দোলন দোঁহায় মিলে,
যেমনতরো ছুটির দিনে এমনি বিকেলবেলা
দেওয়া-নেওয়ার নাই কোনো দায়, শুধু হওয়ার খেলা,
অজানাতে ভাসিয়ে দেওয়া আলোছায়ার ভেলা।

২ অক্টোবর ১৯২৭
মারর জাহাজ

দীপশিল্পী

হে সুন্দরী, হে শিখা মহতী,
তোমার অরূপ জ্যোতি
রূপ লবে আমার জীবনে,
তারি লাগি একমনে
রচিলাম এই দীপখানি,
মূর্তিমতী এই মোর অভ্যর্থনাবাণী।

এসো এসো করো অধিষ্ঠান,
মোর দীর্ঘ জীবনেরে করো গো চরম বরদান।
হয় নাই যোগ্য তব,
কতবার ভাঙিয়াছি আবার গড়েছি অভিনব,—
মোর শক্তি আপনারে দিয়েছে ধিক্কার।
সময় নাহি যে আর,
নিদ্রাহারা প্রহর-যে একে একে হয় অপগত,
তাই আজ সমাপিনু ব্রত।
গ্রহণ করো এ মোর চিরজীবনের রচনারে
ক্ষণকাল স্পর্শ করো তারে।
তারপরে রেখে যাব এ জন্মের এক-সার্থকতা,
চিরন্তন সুখ মোর, এই মোর চিরন্তন ব্যথা।

ফাল্গুন ? ১৩৩৮

মানী

উচ্চপ্রাচীরে রুদ্ধ তোমার
ক্ষুদ্র ভুবনখানি,
হে মানী, হে অভিমানী।
মন্দিরবাসী দেবতার মতো

সম্মানশৃঙ্খলে
বন্দী রয়েছ পূজার আসনতলে।
সাধারণজন-পরশ এড়ায়ে
নিজেরে পৃথক করি
আছ দিনরাত গৌরবগুরু
কঠিন মূর্তি ধরি।
সবার যেখানে ঠাঁই
বিপুল তোমার মর্যাদা নিয়ে
সেথায় প্রবেশ নাই।
অনেক উপাধি তব,
মানুষ-উপাধি হারায়েছ শুধু
সে ক্ষতি কাহারে কব।

ভক্তেরা মন্দিরে
পুজারির কৃপা বহু-দামে কিনে
পুজা দিয়ে যায় ফিরে
ঝিল্লিমুখর বেণুবীথিকার ছায়ে
আপন নিভৃত গাঁয়ে।
তখন একাকী বৃথা বিচিত্র
পাষাণভিত্তি-মাঝে
দেবতার বুকে জান সে কী ব্যথা বাজে।
বেদির বাঁধন করি ধূলিসাৎ
অচলেরে দিয়ে নাড়া
মানুষের মাঝে সে-যে পেতে চায় ছাড়া।

হে রাজা, তোমার পুজাঘেরা মন
আপনারে নাহি জানে।
প্রাণহীন সম্মানে
উজ্জ্বল রঙে রঙকরা তুমি ঢেলা,—
তোমার জীবন সাজানো পুতুল

স্থূল মিথ্যার খেলা।
আপনি রয়েছ আড়ষ্ট হয়ে
আপনার অভিশাপে,
নিশ্চল তুমি নিজ গর্বের চাপে।
সহজ প্রাণের মান নিয়ে যারা
মুক্ত ভুবনে ফিরে
মরিবার আগে তাদের পরশ
লাগুক তোমার শিরে।

ফাল্গুন ? ১৩৩৮

রাজপুত্র

রূপকথা-স্বপ্নলোকবাসী
রাজপুত্র কোথা হতে আসি
শুভক্ষণে দেখা দেয় রূপে
চুপে-চুপে,
জানি বলে জেনেছিনু যারে
তারি মাঝে। আমার সংসারে,
বক্ষে মোর আগমনী পদধ্বনি বাজে
যেন বহুদূর হতে আসা।
তার ভাষা
প্রাণে দেয় আনি
সমুদ্রপারের কোন্ অভিনব যৌবনের বাণী।
সেদিন বুঝিতে পারে মন
ছিল সে-যে নিশ্চেতন
তুচ্ছতার অন্তরালে
এতকাল মায়ানিদ্রাজালে।
তার দৃষ্টিপাতে মোরে নূতন সৃষ্টির ছোঁওয়া লাগে,
চিত্ত জাগে।—

বলি তার পদযুগ চুমি,
"রাজপুত্র তুমি।"
এতদিন
আত্মপরিচয়হীন
জড়তার পাষাণপ্রাচীর দিয়ে ঘেরা
দুর্গ-মাঝে রেখেছিল প্রত্যহের প্রথার দৈত্যেরা।
কোন্ মন্ত্রগুণে
সে দুর্ভেদ বাধা যেন দাহিলে আগুনে,
বন্দিনীরে করিলে উদ্ধার,
করি নিলে আপনার,
নিয়ে গেলে মুক্তির আলোকে।
আজিকে তোমারে দেখি কী নূতন চোখে।
কুঁড়ি আজ উঠেছে কুসুমি,
বারবার মন বলে, "রাজপুত্র তুমি।"

২৮ ফাল্গুন ১৩৩৮

অগ্রদূত

হে পথিক, তুমি একা।
আপনার মনে জানি না কেমনে
অদেখার পেলে দেখা।
যে-পথে পড়ে নি পায়ের চিহ্ন
সে-পথে চলিলে রাতে,
আকাশে দেখেছ কোন্ সংকেত,
কারেও নিলে না সাথে।
তুঙ্গগিরির উঠিছ শিখরে
যেখানে ভোরের তারা
অসীম আলোকে করিছে আপন
আলোর যাত্রা সারা।

প্রথম যেদিন ফাল্গুনতাপে
নবনির্ঝর জাগে,
মহাসুদূরের অপরূপ রূপ
দেখিতে সে পায় আগে।
আছে আছে আছে, এই বাণী তার
এক নিমেষেই ফুটে,
অচেনা পথের আহ্বান শুনে
অজানার পানে ছুটে।
সেইমতো এক অকথিত ভাষা
ধ্বনিল তোমার মাঝে,
আছে আছে আছে, এ মহামন্ত্র
প্রতি নিশ্বাসে বাজে।

রোধিয়াছে পথ বন্ধুর করি
অচল শিলার স্তূপ।
নহে নহে নহে, এ নিষেধবাণী
পাষাণে ধরেছে রূপ।
জড়ের সে নীতি করে গর্জন
ভীরুজন মরে ভুলে,
জনহীন পথে সংশয়মোহ
রহে তর্জনী তুলে।
অলস মনের আপনারি ছায়া
শঙ্কিল কায়া ধরে,
অতি নিরাপদ বিনাশের তলে
বাঁচিতে চেয়ে সে মরে।

নবজীবনের সংকটপথে
হে তুমি অগ্রগামী,
তোমার যাত্রা সীমা মানিবে না
কোথাও যাবে না থামি।

শিখরে শিখরে কেতন তোমার
রেখে যাবে নব নব,
দুর্গম-মাঝে পথ করি দিবে,—
জীবনের ব্রত তব।
যত আগে যাবে দ্বিধা সন্দেহ
ঘুচে যাবে পাছে পাছে,
পায়ে পায়ে তব ধ্বনিয়া উঠিবে
মহাবাণী— 'আছে আছে'

১২ চৈত্র ১৩৩৮

প্রতীক্ষা

তোমার স্বপ্নের দ্বারে আমি আছি বসে
তোমার সুপ্তির প্রান্তে, নিভৃত প্রদোষে
প্রথম প্রভাততারা যবে বাতায়নে
দেখা দিল। চেয়ে আমি থাকি একমনে
তোমার মুখের 'পরে। স্তম্ভিত সমীরে
রাত্রির প্রহরশেষে সমুদ্রের তীরে
সন্ন্যাসী যেমন থাকে ধ্যানাবিষ্ট চোখে
চেয়ে পূর্বতট-পানে, প্রথম আলোকে
স্পর্শস্নান হবে তার, এই আশা ধরি
অনিদ্র আনন্দে কাটে দীর্ঘ বিভাবরী।
তব নবজাগরণী প্রথম যে-হাসি
কনকচাঁপার মতো উঠিবে বিকাশি
আধোখোলা অধরেতে, নয়নের কোণে,
চয়ন করিব তাই, এই আছে মনে।

২৫ ফাল্গুন ১৩৩৮

নির্বাক্

মনে তো ছিল তোমারে বলি কিছু
যে-কথা আমি বলি নি আর-কারে,
সেদিন বনে মাধবীশাখা নিচু
ফুলের ভারে ভারে।
বাঁশিতে লই মনের কথা তুলি
বিরহব্যথাবৃন্ত হতে ভাঙা,—
গোপন রাতে উঠেছে তারা দুলি
সুরের রঙে রাঙা।

শিরীষবন নতুনপাতা-ছাওয়া
মর্মরিয়া কহিল, 'গাহো গাহো।'
মধুমালতীগন্ধে-ভরা হাওয়া
দিয়েছে উৎসাহ।
পূর্ণিমাতে জোয়ারে উছলিয়া
নদীর জল ছলছলিয়া উঠে।
কামিনী ঝরে বাতাসে বিচলিয়া
ঘাসের 'পরে লুটে।

সে মধুরাতে আকাশে ধরাতলে
কোথাও কিছু ছিল না কৃপণতা।
চাঁদের আলো সবার হয়ে বলে
যত মনের কথা।
মনে হল যে, নীরবে কৃপা যাচে
যা-কিছু আছে তোমার চারিদিকে।
সাহস ধরি গেলেম তব কাছে
চাহিনু অনিমিখে।

সহসা মন উঠিল চমকিয়া
বাঁশিতে আর বাজিল না তো বাণী।
গহনছায়ে দাঁড়ানু থমকিয়া
হেরিনু মুখখানি।

সাগরশেষে দেখেছি একদিন
মিলিছে সেথা বহু নদীর ধারা—
ফেনিল জল দিক্‌সীমায় লীন
অপারে দিশাহারা।
তরণী মোর নানা স্রোতের টানে
অবোধসম কাঁপিছে থরথরি,
ভেবে না পাই কেমনে কোন্‌খানে
বাঁধিব মোর তরী।

তেমনি আজি তোমার মুখে চাহি
নয়ন যেন কূল না পায় খুঁজি,
অভাবনীয় ভাবেতে অবগাহি
তোমারে নাহি বুঝি।
মুখেতে তব শ্রান্ত এ কী আশা,
শান্তি এ কী, গোপন এ কী প্রীতি,
বাণীবিহীন এ কী ধ্যানের ভাষা,
এ কী সুদূর স্মৃতি।
নিবিড় হয়ে নামিল মোর মনে
স্তব্ধ তব নীরব গভীরতা—
রহিনু বসি লতাবিতান-কোণে,
কহি নি কোনো কথা।

মাঘ ১৩৩৮

প্রণাম

তোমার প্রণাম এ যে তারি আভরণ
যারে তুমি করেছ বরণ।
তুমি মূল্য দিলে তারে
দুর্লভ পূজার অলংকারে।
ভক্তিসমুজ্জ্বল চোখে
তাহারে হেরিলে তুমি যে-শুভ্র আলোকে
সে আলো করালো তারে স্নান ;
দীপ্যমান মহিমার দান
পরাইল ললাটের 'পর।
হ'ক সে দেবতা কিম্বা নর,
তোমারি হৃদয় হতে বিচ্ছুরিত রশ্মির ছটায়
দিব্য আবির্ভাবে তার প্রকাশ ঘটায়।
তার পরিচয়খানি
তোমাতেই লভিয়াছে জয়বাণী।
রচিয়া দিয়াছে তার সত্য স্বর্গপুরী
তোমারি এ প্রীতির মাধুরী
যে-অমৃত করে পান
ঢালে তাহা তোমারি এ উচ্ছ্বসিত প্রাণ।
তব শির নত
দিক্‌রেখায় অরুণের মতো,
তারি 'পরে দেবতার অভ্যুদয়
রূপ লভে সুপ্রসন্ন পুণ্য জ্যোতির্ময়।

১৭ চৈত্র ১৩৩৮

শূন্যঘর

গোধূলি-অন্ধকারে
পুরীর প্রান্তে অতিথি আসিনু দ্বারে।
ডাকিনু, 'আছ কি কেহ,
সাড়া দেহো, সাড়া দেহো।'
ঘরভরা এক নিরাকার শূন্যতা
না কহিল কোনো কথা।

বাহিরে বাগানে পুষ্পিত শাখা
গন্ধের আহ্বানে
সংকেত করে কাহারে তাহা কে জানে।
হতভাগা এক কোকিল ডাকিছে খালি,
জনশূন্যতা নিবিড় করিয়া
নীরবে দাঁড়ায়ে মালী।
সিঁড়িটা নির্বিকার
বলে, 'এস আর নাই যদি এস
সমান অর্থ তার।'

ঘরগুলো বলে ফিলজফারের গলায়,
'ডুব দিয়ে দেখো সত্তাসাগর-তলায়
বুঝিতে পারিবে, থাকা নাই থাকা
আসা আর দূরে যাওয়া
সবই এক কথা, খেয়ালের ফাঁকা হাওয়া।'
কেদারা এগিয়ে দিতে কারো নেই তাড়া,
প্রবীণ ভৃত্য ছুটি নিয়ে ঘরছাড়া।
মেয়াদ যখন ফুরোয় কপালে,
হায়রে তখন সেবা
কারেই বা করে কেবা।

মনেতে লাগিল বৈরাগ্যের ছোঁওয়া,
সকলি দেখিনু ধোঁওয়া।
ভাবিলাম এই ভাগ্যের তরী
বুঝি তার হাল নেই,
এলোমেলো স্রোতে আজ আছে কাল নেই।
নলিনীর দলে জলের বিন্দু
চপলম্ অতিশয়,
এই কথা জেনে সওয়ালেই ক্ষতি সয়।
অতএব— আরে অতএবখানা থাক্
আপাতত ফেরা যাক।

ব্যর্থ আশায় ভারাতুর সেই ক্ষণে
ফিরালেম রথ, ফিরিবার পথ
দূরতর হল মনে।
যাবার বেলায় শুষ্ক পথের
আকাশভরানো ধূলি
সহজে ছিলাম ভুলি।
ফিরিবার বেলা মুখেতে রুমাল,
ধোঁয়াটে চশমা চোখে,
মনে হল যত মাইক্রোব-দল
নাকে মুখে সব ঢোকে।
তাই বুঝিলাম, সহজ তো নয়
ফিলজফারের বুদ্ধি।
দরকার করে বহুৎ চিত্তশুদ্ধি।

মোটর চলিল জোরে,
একটু পরেই হাসিলাম হো হো করে।
সংশয়হীন আশার সামনে
হঠাৎ দরজা বন্ধ,
নেহাত এটার ঠাট্টার মতো ছন্দ।

বোকার মতন গম্ভীর মুখটারে
অট্টহাস্যে সহজ করিনু,
ফিরিনু আপন দ্বারে।

ঘরে কেহ আজ ছিল না যে, তাই
না-থাকার ফিলজাফি
মনটাকে ধরে চাপি।
থাকাটা আকস্মিক,
না-থাকাই সে তো দেশকাল ছেয়ে
চেয়ে আছে অনিমিখ।
সন্ধেবেলায় আলোটা নিবিয়ে
বসে বসে গৃহকোণে
না-থাকার এক বিরাট স্বরূপ
আঁকিতেছি মনে-মনে।
কালের প্রান্তে চাই,
ওই বাড়িটার আগাগোড়া কিছু নাই।
ফুলের বাগান, কোথা তার উদ্দেশ,
বসিবার সেই আরামকেদারা
পুরোপুরি নিঃশেষ।
মাসমাহিনার খাতাটারে নিয়ে পিছে
দুই দুই মালী একেবারে সব মিছে।
ক্রেসান্থেমাম্ কার্নেশনের
কেয়ারি সমেত তারা
নাই গহ্বরে হারা।

চেয়ে দেখি দূর-পানে
সেই ভাবীকালে যাহা আছে যেইখানে
উপস্থিতের ছোটো সীমানায়
সামান্য তাহা অতি—
হেথায় সেথায় বুদ্‌বুদ্‌সংহতি।

যাহা নাই তাই বিরাট বিপুল মহা।
অনাদি অতীত যুগের প্রবাহ-বহা
অসংখ্য ধন, কণামাত্রও তার
নাই নাই হায়, নাই সে কোথাও আর

'দূর করো ছাই' এই বলে শেষে
যেমনি জ্বালিনু আলো
ফিলজফিটার কুয়াশা কোথা মিলাল।
স্পষ্ট বুঝিনু যা-কিছু সমুখে আছে,
চক্ষের 'পরে যাহা বক্ষের কাছে
সেই তো অন্তহীন
প্রতিপল প্রতিদিন
যা আছে তাহারি মাঝে
যাহা নাই তাই গভীর গোপনে
সত্য হইয়া রাজে।
অতীতকালের যে ছিলেম আমি
আজিকার আমি সেই
প্রত্যেক নিমেষেই।
বাঁধিয়া রেখেছে এই মুহূর্তজাল
সমস্ত ভাবীকাল।

অতএব সেই কেদারাটা যেই
জানালায় লব টানি,
বসিব আরামে, সে-মুহূর্তেরে
চিরদিবসের জানি।
অতএব জেনো সন্ন্যাসী হব নাকো,
আরবার যদি ডাক
আবার সে ওই মাইক্রোব-ওড়া পথে
চলিব মোটর-রথে।
ঘরে যদি কেহ রয়

নাই ব'লে তারে ফিলজফারের
হবে নাকো সংশয়।
দুয়ার ঠেলিয়া চক্ষু মেলিয়া
দেখি যদি কোনো মিত্রম্
কবি তবে কবে, 'এই সংসার
অতীব বটে বিচিত্রম্।'

চৈত্র ? ১৩৩৮

দিনাবসান

বাঁশি যখন থামবে ঘরে,
নিববে দীপের শিখা,
এই জনমের লীলার 'পরে
পড়বে যবনিকা,
সেদিন যেন কবির তরে
ভিড় না জমে সভার ঘরে,
হয় না যেন উচ্চস্বরে
শোকের সমারোহ ;
সভাপতি থাকুন বাসায়,
কাটান বেলা তাসে পাশায়,
নাই বা হল নানা ভাষায়
আহা উহু ওহো।
নাই ঘনাল দল-বেদলের
কোলাহলের মোহ।

আমি জানি মনে-মনে,
সেঁউতি যূথী জবা
আনবে ডেকে ক্ষণে ক্ষণে
কবির স্মৃতিসভা।

বর্ষা-শরৎ-বসন্তেরি
প্রাঙ্গণেতে আমায় ঘেরি
যেথায় বীণা যেথায় ভেরি
বেজেছে উৎসবে,
সেথায় আমার আসন-'পরে
স্নিগ্ধশ্যামল সমাদরে
আলিপনায় স্তরে স্তরে
আঁকন আঁকা হবে।
আমার মৌন করবে পূর্ণ
পাখির কলরবে।

জানি আমি এই বারতা
রইবে অরণ্যেতে—
ওদের সুরে কবির কথা
দিয়েছিলেম গেঁথে।
ফাগুনহাওয়ায় শ্রাবণধারে
এই বারতাই বারে বারে
দিক্‌বালাদের দ্বারে দ্বারে
উঠবে হঠাৎ বাজি ;
কভু করুণ সন্ধ্যামেঘে,
কভু অরুণ আলোক লেগে,
এই বারতা উঠবে জেগে
রঙিন বেশে সাজি।
স্মরণসভার আসন আমার
সোনায় দেবে মাজি।

আমার স্মৃতি থাক্ না গাঁথা
আমার গীতি-মাঝে
যেখানে ওই ঝাউয়ের পাতা
মর্মরিয়া বাজে।

যেখানে ওই শিউলিতলে
ক্ষণহাসির শিশির জ্বলে,
ছায়া যেথায় ঘুমে ঢলে
কিরণকণামালী ;
যেথায় আমার কাজের বেলা
কাজের বেশে করে খেলা,
যেথায় কাজের অবহেলা
নিভৃতে দীপ জ্বালি'
নানা রঙের স্বপন দিয়ে
ভরে রূপের ডালি।

২৫ বৈশাখ ১৩৩৩
শান্তিনিকেতন

পথসঙ্গী

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

ছিলে-যে পথের সাথি,
দিবসে এনেছ পিপাসার জল
রাত্রে জ্বেলেছ বাতি।
আমার জীবনে সন্ধ্যা ঘনায়,
পথ হয় অবসান,
তোমার লাগিয়া রেখে যাই মোর
শুভকামনার দান।
সংসারপথ হ'ক বাধাহীন,
নিয়ে যাক কল্যাণে,
নব নব ঐশ্বর্য আসুক
জ্ঞানে কর্মে ও ধ্যানে।
মোর স্মৃতি যদি মনে রাখ কভু
এই বলে রেখো মনে—

ফুল ফুটায়েছি, ফল যদিও-বা
ধরে নাই এ জীবনে।

শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী

বাহিরে তোমার যা পেয়েছি সেবা
অন্তরে তাহা রাখি,
কর্মে তাহার শেষ নাহি হয়
প্রেমে তাহা থাকে বাকি।
আমার আলোর ক্লান্তি ঘুচাতে
দীপে তেল ভরি দিলে।
তোমার হৃদয় আমার হৃদয়ে
সে-আলোকে যায় মিলে।

৬ মে ১৯৩২
তেহেরান

অন্তর্হিতা

তুমি যে তারে দেখ নি চেয়ে
জানিত সে তা মনে,—
ব্যথার ছায়া পড়িত ছেয়ে
কালো চোখের কোণে।
জীবনশিখা নিবিল তার,
ডুবিল তারি সাথে
অবমানিত দুঃখভার
অবহেলার রাতে।
দীপাবলীর থালাতে নাই
তাহার স্নান হিয়া,
তারায় তারি আলোক তাই
উঠিল উজলিয়া।

স্বাগতবাণী ছিল সে মেলি
ভাষাবিহীন মুখে,
বহুজনের বাণীরে ঠেলি
বাজে কি তব বুকে।
নিকটে তব এসেছিল যে,
সে কথা বুঝাবারে
অসীম দূরে গিয়েছে ও-যে
শূন্যে খুঁজাবারে।
সেখানে গিয়ে করেছে চুপ,
ভিক্ষা গেল থামি,
তাই কি তার সত্যরূপ
হৃদয়ে এল নামি।

১ আষাঢ় ১৩৩৯
উদয়ন [শান্তিনিকেতন]

আশ্রমবালিকা

শ্রীমতী মমতা সেনের বিবাহ-উপলক্ষে

আশ্রমের হে বালিকা,
আশ্বিনের শেফালিকা
ফাল্গুনের শালের মঞ্জরি
শিশুকাল হতে তব
দেহে মনে নব নব
যে-মাধুর্য দিয়েছিল ভরি,
মাঘের বিদায়ক্ষণে
মুকুলিত আম্রবনে
বসন্তের যে-নবদূতিকা,
আষাঢ়ের রাশি রাশি
শুভ্র মালতীর হাসি,
শ্রাবণের যে-সিক্তযূথিকা,

ছিল ঘিরে রাত্রিদিন
তোমারে বিচ্ছেদহীন
প্রান্তরের যে-শান্তি উদার,
প্রত্যূষের জাগরণে
পেয়েছ বিস্মিত মনে
যে-আস্বাদ আলোকসুধার,
আষাঢ়ের পুঞ্জমেঘে
যখন উঠিত জেগে
আকাশের নিবিড় ক্রন্দন,
মর্মরিত গীতিকায়
সপ্তপর্ণবীথিকায়
দেখেছিলে যে-প্রাণস্পন্দন,
বৈশাখের দিনশেষে
গোধূলিতে রুদ্রবেশে
কালবৈশাখীর উন্মত্ততা—
সে-ঝড়ের কলোল্লাসে
বিদ্যুতের অট্টহাসে
শুনেছিলে যে-মুক্তিবারতা,
পউষের মহোৎসবে
অনাহত বীণারবে
লোকে লোকে আলোকের গান
তোমার হৃদয়দ্বারে
আনিয়াছে বারে বারে
নবজীবনের যে-আহ্বান,
নববরষের রবি
যে উজ্জ্বল পুণ্যছবি
এঁকেছিল নির্মল গগনে,
চিরনূতনের জয়
বেজেছিল শূন্যময়
বেজেছিল অন্তর-অঙ্গনে,

কত গান কত খেলা,
কত-না বন্ধুর মেলা,
প্রভাতে সন্ধ্যায় আরাধনা,
বিহঙ্গকূজন-সাথে
গাছের তলায় প্রাতে
তোমাদের দিনের সাধনা,
তারি স্মৃতি শুভক্ষণে
সমস্ত জীবনে মনে
পূর্ণ করি নিয়ে যাও চলে,
চিত্ত করি ভরপুর
নিত্য তারা দিক সুর
জনতার কঠোর কল্লোলে।
নবীন সংসারখানি
রচিতে হবে-যে জানি
মাধুরীতে মিশায়ে কল্যাণ,
প্রেম দিয়ে প্রাণ দিয়ে
কাজ দিয়ে গান দিয়ে
ধৈর্য দিয়ে, দিয়ে তব ধ্যান,—
সে তব রচনা-মাঝে
সব ভাবনায় কাজে
তারা যেন উঠে রূপ ধরি,
তারা যেন দেয় আনি
তোমার বাণীতে বাণী
তোমার প্রাণেতে প্রাণ ভরি।
সুখী হও, সুখী রহো
পূর্ণ করো অহরহ
শুভকর্মে জীবনের ডালা,
পুণ্যসূত্রে দিনগুলি
প্রতিদিন গেঁথে তুলি
রচি লহো নৈবেদ্যের মালা।

সমুদ্রের পার হতে
পূর্বপবনের স্রোতে
ছন্দের তরণীখানি ভ'রে
এ-প্রভাতে আজি তোরি
পূর্ণতার দিন স্মরি
আশীর্বাদ পাঠাইনু তোরে।

১৩ জ্যৈষ্ঠ [১৩৩৩]
রোহিতসাগর

বধূ

শ্রীমতী অমিতা সেনের পরিণয় উপলক্ষে

মানুষের ইতিহাসে ফেনোচ্ছল উদ্বেল উত্তম
গর্জি উঠে ; অতীত তিমিরগর্ভ হতে তুরঙ্গম
তরঙ্গ ছুটিছে শূন্যে ; উন্মেষিছে মহাভবিষ্যৎ।
বর্তমান কালতটে অগ্নিগর্ভ অপূর্ব পর্বত
সদ্যোজাত মহিমায় উজাড় উজ্জ্বল উত্তরীয়
নব সূর্যোদয়-পানে। যে-অদৃষ্ট, যে-অভাবনীয়
মানুষের ভাগ্যলিপি লিখিতেছে অজ্ঞাত অক্ষরে
দৃপ্ত বীরমূর্তি ধরি, দেখিয়াছি ; তার কণ্ঠস্বরে
শুনেছি দীপকরাগে সৃষ্টিবাণী মরণবিজয়ী
প্রাণমন্ত্রে।
এই ক্ষুব্ধ যুগান্তর-মাঝে বৎসে অয়ি,
তোমারে হেরিনু বধূবেশে, নির্ঝরিণী নৃত্যশীলা,
সহসা মিলিছ সরোবরে, চটুল চঞ্চল লীলা
গভীরে করিছ মগ্ন ; নির্ভয়ে নিখিল করি পণ
নবজীবনের সৃষ্টি-রহস্য করিছ উন্মোচন।
ইতিহাসবিধাতার ইন্দ্রজাল বিশ্বদুঃখসুখে

দেশে দেশে যে-বিস্ময় বিস্তারিছে বিরাট কৌতুকে
যুগে যুগে, নরনারীহৃদয়ের আকাশে আকাশে
এও সেই সৃষ্টিলীলা জ্যোতির্ময় বিশ্ব-ইতিহাসে।

৩ আষাঢ় ১৩৩৯
[শান্তিনিকেতন]

মিলন

শ্রীমতী ইন্দিরা মৈত্রের বিবাহ-উপলক্ষে

সেদিন উষার নববীণাঝংকারে
মেঘে মেঘে ঝরে সোনার সুরের কণা।
ধেয়ে চলেছিলে কৈশোরপরপারে
পাখিদুটি উন্মনা।
দখিন বাতাসে উধাও ওড়ার বেগে
অজানার মায়া রক্তে উঠিল জেগে
স্বপ্নের ছায়া ঢাকা।
সুরভবনের মিলনমন্ত্র লেগে
কবে দুজনের পাখায় ঠেকিল পাখা।

কেটেছিল দিন আকাশে হৃদয় পাতি
মেঘের রঙেতে রাঙায়ে দোঁহার ডানা।
আছিলে দুজনে অপারে ওড়ার সাথি,
কোথাও ছিল না মানা।
দূর হতে এই ধরণীর ছবিখানি
দোঁহার নয়নে অমৃত দিয়েছে আনি—
পুষ্পিত শ্যামলতা।
চারিদিক হতে বিরাটের মহাবাণী
শুনাল দোঁহারে ভাষার-অতীত কথা।

মেঘলোকে সেই নীরব সম্মিলনী
বেদনা আনিল কী অনির্বচনীয়।
দোঁহার চিত্তে উচ্ছ্বসি উঠে ধ্বনি—
'প্রিয়, ওগো মোর প্রিয়।'
পাখার মিলন অসীমে দিয়েছে পাড়ি,
সুরের মিলনে সীমারূপ এল তারি,
এলে নামি ধরা-পানে।
কুলায়ে বসিলে অকূল শূন্য ছাড়ি,
পরানে পরানে গান মিলাইলে গানে

১৭ কার্তিক ১৩৩৮
দার্জিলিং

স্পাই

শক্ত হল রোগ,
হপ্তা-পাঁচেক ছিল আমার ভোগ।
একটুকু যেই সুস্থ হলেম পরে
লোক ধরে না ঘরে,
ব্যামোর চেয়ে অনেক বেশি ঘটাল দুর্যোগ।
এল ভবেশ, এল পালিত, এল বন্ধু ঈশান,
এল পোলিটিশান,
এল গোকুল সংবাদপত্রের,
খবর রাখে সকল পাড়ার নাড়ীনক্ষত্রের।
কেউ-বা বলে 'বদল করো হাওয়া',
কেউ-বা বলে 'ভালো ক'রে করবে খাওয়াদাওয়া'।
কেউ-বা বলে, 'মহেন্দ্র ডাক্তার
এই ব্যামোতে তার মতো কেউ ওস্তাদ নেই আর

দেয়াল ঘেঁষে ওই যে সবার পাছে
সতীশ বসে আছে।
থাকে সে এই পাড়ায়,
চুলগুলো তার ঊর্ধ্বে তোলা পাঁচ আঙুলের নাড়ায়।
চোখে চশমা আঁটা,
এক কোণে তার ফেটে গেছে বাঁয়ের পরকলাটা।
গলার বোতাম খোলা,
প্রশান্ত তার চাউনি ভাবে-ভোলা।
সর্বদা তার হাতে থাকে বাঁধানো এক খাতা,
হঠাৎ খুলে পাতা
লুকিয়ে লুকিয়ে কী-যে লেখে, হয়তো বা সে কবি,
কিম্বা আঁকে ছবি।
নবীন আমায় শোনায় কানে-কানে,
ওই ছেলেটার গোপন খবর নিশ্চিত সেই জানে—
যাকে বলে 'স্পাই',
সন্দেহ তার নাই।
আমি বলি, হবেও বা, ভক্তিনম্র নিরীহ ওই মুখে
খাতার কোণে রিপোর্ট করার খোরাক নিচ্ছে টুকে।
ও মানুষটা সত্যি যদি তেমনি হেয় হয়,
ঘৃণা করব,— কেন করব ভয়।

এই বছরে বছরখানেক বেড়িয়ে নিলেম পাঞ্জাবে কাশ্মীরে।
এলেম যখন ফিরে ;
এল গণেশ, পলটু এল, এল নবীন পাল,
এল মাখনলাল।
হাতে একটা মোড়ক নিয়ে প্রণাম করলে পাঁচু,
মুখটা কাঁচুমাচু।
'মনিব কোথায়' শুধাই আমি তারে,
'সতীশ কোথায় হাঁ রে।'

নবীন বললে, 'খবর পান নি তবে—
দিন-পনেরো হবে
উপোস করে মারা গেল সোনার টুকরো ছেলে
নন্-ভায়োলেন্স্ প্রচার করে গেল যখন আলিপুরের জেলে।'
পাঁচু আমার হাতে দিল খাতা,
খুলে দেখি পাতার পরে পাতা—
দেশের কথা কী বলেছি তাই লিখেছে গভীর অনুরাগে,
পাঠিয়ে দিল জেলে যাবার আগে।
আজকে বসে বসে ভাবি, মুখের কথাগুলো
ঝরা পাতার মতোই তারা ধুলোয় হ'ত ধুলো।
সেইগুলোকে সত্য করে বাঁচিয়ে রাখবে কি এ
মৃত্যুসুধার নিত্যপরশ দিয়ে।

৩ আষাঢ় ১৩৩৯
শান্তিনিকেতন

ধাবমান

'যেয়ো না, যেয়ো না' বলি কারে ডাকে ব্যর্থ এ ক্রন্দন।
কোথা সে বন্ধন
অসীম যা করিবে সীমারে।
সংসার যাবারই বন্যা, তীব্রবেগে চলে পরপারে
এ পারের সব-কিছু রাশি রাশি নিঃশেষে ভাসায়ে,
কাঁদায়ে হাসায়ে
অস্থির সত্তার রূপ ফুটে আর টুটে;
'নয় নয়' এই বাণী ফেনাইয়া মুখরিয়া উঠে
মহাকাল সমুদ্রের 'পরে।
সেই স্বরে
রুদ্রের ডম্বরুধ্বনি বাজে
অসীম অম্বর-মাঝে—

'নয় নয় নয়'।
ওরে মন, ছাড়ো লোভ, ছাড়ো শোক, ছাড়ো ভয়।
সৃষ্টি নদী, ধারা তারি নিরন্ত প্রলয়।

যাবে সব যাবে চলে তবু ভালোবাসি,—
চমকে বিনাশ-মাঝে অস্তিত্বের হাসি
আনন্দের বেগে।
মরণের বীণাতারে উঠে জেগে
জীবনের গান;
নিরন্তর ধাবমান
চঞ্চল মাধুরী।
ক্ষণে ক্ষণে উঠে স্ফুরি
শাশ্বতের দীপশিখা
উজ্জ্বলিয়া মুহূর্তের মরীচিকা।
অতল কান্নার স্রোত মাতার করুণ স্নেহ বয়,
প্রিয়ের হৃদয়বিনিময়।
বিলোপের রঙ্গভূমে বীরের বিপুল বীর্যমদ
ধরণীর সৌন্দর্যসম্পদ।

অসীমের দান
ক্ষণিকের করপুটে, তার পরিমাণ
সময়ের মাপে নহে।
কাল ব্যাপি রহে নাই রহে
তবু সে মহান;
যতক্ষণ আছে তারে মূল্য দাও পণ করি প্রাণ।
ধায় যবে বিদায়ের রথ
জয়ধ্বনি করি তারে ছেড়ে দাও পথ
আপনারে ভুলি।
যতটুকু ধূলি

আছ তুমি করি অধিকার
তার মাঝে কী রহে না, তুচ্ছ সে বিচার।
বিরাটের মাঝে
এক রূপে নাই হয়ে অন্য রূপে তাহাই বিরাজে।
ছেড়ে এসো আপনার অন্ধকূপ,
মুক্তাকাশে দেখো চেয়ে প্রলয়ের আনন্দস্বরূপ।
ওরে শোকাতুর, শেষে
শোকের বুদ্‌বুদ্‌ তোর অশোক-সমুদ্রে যাবে ভেসে।

৬ আষাঢ় ১৩৩৯

ভীরু

তাকিয়ে দেখি পিছে
সেদিন ভালোবেসেছিলেম,
দিন না যেতেই হয়ে গেল মিছে।
বলার কথা পাই নি আমি খুঁজে,
আপনা হতে নেয় নি কেন বুঝে,
দেবার মতন এনেছিলেম কিছু,
ডালির থেকে পড়ে গেল নীচে।

ভরসা ছিল না যে,
তাই তো ভেবে দেখি নি হায়
কী ছিল তার হাসির দ্বিধা-মাঝে
গোপন বীণা সুরেই ছিল বাঁধা,
ঝংকার তায় দিয়েছিল আধা,
সংশয়ে আজ তলিয়ে গেল কোথা,
পাব কি তায় দুঃখসাগর সিঁচে।

হায় রে গরবিনী,
বারেক তব করুণ চাহনিতে
ভীরুতা মোর লও নি কেন জিনি।
যে-মণিটি ছিল বুকের হারে
ফেলে দিলে কোন্ খেদে হায় তারে,
ব্যর্থ রাতের অশ্রুফোঁটার মালা
আজ তোমার ওই বক্ষে ঝলকিছে।

৯ আষাঢ় ১৩৩৯

বিচার

বিচার করিয়ো না।
যেখানে তুমি রয়েছ, সে তো
জগতে এক কোণা।
যেটুকু তব দৃষ্টি যায়
সেটুকু কতখানি,
যেটুকু শোন তাহার সাথে
মিশাও নিজবাণী।
মন্দ-ভালো সাদা ও কালো
রাখিছ ভাগে ভাগে।
সীমানা মিছে আঁকিয়া তোল
আপন-রচা দাগে।

সুরের বাঁশি যদি তোমার
মনের মাঝে থাকে,
চলিতে পথে আপন-মনে
জাগায়ে দাও তাকে।

গানের মাঝে তর্ক নাই,
কাজের নাই তাড়া।
যাহার খুশি চলিয়া যাবে,
যে খুশি দিবে সাড়া।
হ'ক-না তারা কেহ-বা ভালো
কেহ-বা ভালো-নয়,
এক পথেরি পথিক তারা
লহো এ পরিচয়।

বিচার করিয়ো না।
হায় রে হায়, সময় যায়,
বৃথা এ আলোচনা।
ফুলের বনে বেড়ার কোণে
হেরো অপরাজিতা
আকাশ হতে এনেছে বাণী,
মাটির সে যে মিতা।
ওই তো ঘাসে আষাঢ়মাসে
সবুজে লাগে বান,—
সকল ধরা ভরিয়া দিল
সহজ তার দান।
আপনা ভুলি সহজ সুখে
ভরুক তব হিয়া,
পথিক, তব পথের ধন
পথেরে যাও দিয়া।

১০ আষাঢ় ১৩৩৯
উদয়ন [শান্তিনিকেতন]

পুরানো বই

আমি জানি
পুরাতন এই বইখানি।—
অপঠিত, তবু মোর ঘরে
আছে সমাদরে।
এর ছিন্ন পাতে পাতে তার
বাষ্পাকুল করুণার
স্পর্শ যেন রয়েছে বিলীন;
সে-যে আজ হল কতদিন।

সরল দুখানি আঁখি ঢলোঢলো,
বেদনার আভাসেই করে ছলোছলো;
কালোপাড় শাড়িখানি মাথার উপর দিয়ে ফেরা,
দুটি হাত কঙ্কণে ও সান্ত্বনায় ঘেরা।
জনহীন দ্বিপ্রহরে
এলোচুল মেলে দিয়ে বালিশের 'পরে,
এই বই তুলে নিয়ে বুকে
একমনে স্নিগ্ধমুখে
বিচ্ছেদকাহিনী যায় পড়ে।
জানালা বাহিরে শূন্যে ওড়ে
পায়রার ঝাঁক,
গলি হতে দিয়ে যায় ডাক
ফেরিওলা,
পাপোশের 'পরে ভোলা
ভক্ত সে কুকুর
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নে ছাড়ে আর্তস্বর।
সময়ের হয়ে যায় ভুল;
গলির ওপারে স্কুল,
সেথা হতে বাজে যবে
কাংস্যরবে

ছুটির ঘণ্টার ধ্বনি,
দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তখনি
তাড়াতাড়ি
ওঠে সে শয়ন ছাড়ি,
গৃহকার্যে চলে যায় সচকিতে
বইখানি রেখে কুলুঙ্গিতে।
অন্তঃপুর হতে অন্তঃপুরে
এই বই ফিরিয়াছে দূর হতে দূরে।
ঘরে ঘরে গ্রামে গ্রামে
খ্যাতি এর ব্যাপিয়াছে দক্ষিণে ও বামে।

তার পরে গেল সেই কাল,
ছিঁড়ে দিয়ে চলে গেল আপন সৃষ্টির মায়াজাল।
এ লজ্জিত বই
কোনো ঘরে স্থান এর কই।
নবীন পাঠক আজ বসি কেদারায়
ভেবে নাহি পায়
এ লেখাও কোন্ মন্ত্রে করেছিল জয়
সেদিনের অসংখ্য হৃদয়।

জানালা-বাহিরে নীচে ট্রাম যায় চলি।
প্রশস্ত হয়েছে গলি।
চলে গেছে ফেরিওলা, সে-পসরা তার
বিকায় না আর।
ডাক তার ক্লান্ত সুরে
দূর হতে মিলাইল দূরে।
বেলা চলে গেল কোন্ ক্ষণে,
বাজিল ছুটির ঘণ্টা ও-পাড়ার সুদূর প্রাঙ্গণে।

১১ আষাঢ় ১৩৩৯
কোণার্ক [শান্তিনিকেতন]

বিস্ময়

আবার জাগিনু আমি। রাত্রি হল ক্ষয়।
পাপড়ি মেলিল বিশ্ব। এই তো বিস্ময়
অন্তহীন।

ডুবে গেছে কত মহাদেশ,
নিবে গেছে কত তারা, হয়েছে নিঃশেষ
কত যুগ যুগান্তর। বিশ্বজয়ী বীর
নিজেরে বিলুপ্ত করি শুধু কাহিনীর
বাক্যপ্রান্তে আছে ছায়াপ্রায়। কত জাতি
কীর্তিস্তম্ভ রক্তপঙ্কে তুলেছিল গাঁথি
মিটাতে ধূলির মহাক্ষুধা। সে-বিরাট
ধ্বংসধারা-মাঝে আজি আমার ললাট
পেল অরুণের টিকা আরো একদিন
নিদ্রাশেষে, এই তো বিস্ময় অন্তহীন।

আজ আমি নিখিলের জ্যোতিষ্কসভাতে
রয়েছি দাঁড়ায়ে। আছি হিমাদ্রির সাথে
আছি সপ্তর্ষির সাথে, আছি যেথা সমুদ্রের
তরঙ্গে ভঙ্গিয়া উঠে উন্মত্ত রুদ্রের
অট্টহাস্যে নাট্যলীলা। এ বনস্পতির
বল্কলে স্বাক্ষর আছে বহু শতাব্দীর,
কত রাজমুকুটেরে দেখিল খসিতে।
তারি ছায়াতলে আমি পেয়েছি বসিতে
আরো একদিন—

জানি এ দিনের মাঝে
কালের অদৃশ্য চক্র শব্দহীন বাজে।

১২ আষাঢ় ১৩৩৯
কোণার্ক [শান্তিনিকেতন]

অগোচর

হাটের ভিড়ের দিকে চেয়ে দেখি,
হাজার হাজার মুখ হাজার হাজার ইতিহাস
ঢাকা দিয়ে আসে যায় দিনের আলোয়
রাতের আঁধারে।
সব কথা তার
কোনো কালে জানবে না কেউ,
নিজেও জানে না কোনো লোক।
মুখর আলাপ তার, উচ্চস্বরে কত আলোচনা,
তারি অন্তস্তলে
বিচিত্র বিপুল
স্মৃতিবিস্মৃতির সৃষ্টিরাশি।
সেখানে তো শব্দ নেই, আলো নেই,
বাইরের দৃষ্টি নেই,
প্রবেশের পথ নেই কারো।
সংখ্যাহীন মানুষের
এই যে প্রচ্ছন্ন বাণী, অশ্রুত কাহিনী
কোন্ আদিকাল হতে
অন্তঃশীল অগণ্য ধারায়
আঁধার মৃত্যুর মাঝে মেশে রাত্রিদিন,
কী হল তাদের,
কী এদের কাজ।

হে প্রিয়, তোমার যতটুকু
দেখেছি শুনেছি
জেনেছি, পেয়েছি স্পর্শ করি'—
তার বহুশতগুণ অদৃশ্য অশ্রুত
রহস্য কিসের জন্য বদ্ধ হয়ে আছে,
কার অপেক্ষায়।

সে নিরালা ভবনের
কুলুপ তোমার কাছে নেই।
কার কাছে আছে তবে।
কে মহা-অপরিচিত যার অগোচর সভাতলে
হে চেনা-অপরিচিত, তোমার আসন?
সেই কি সবার চেয়ে জানে
আমাদের অন্তরের অজানারে।
সবার চেয়ে কি বড়ো তার ভালোবাসা
যার শুভদৃষ্টি-কাছে
অব্যক্ত করেছে অবগুণ্ঠন মোচন।

১৪ আষাঢ় ১৩৩৯

সান্ত্বনা

যে বোবা দুঃখের ভার
ওরে দুঃখী, বহিতেছ, তার কোনো নেই প্রতিকার।
সহায় কোথাও নাই, ব্যর্থ প্রার্থনায়
চিত্তদৈন্য শুধু বেড়ে যায়।

ওরে বোবা মাটি,
বক্ষ তোর যায় না তো ফাটি
বহিয়া বিশ্বের বোঝা দুঃখবেদনার
বক্ষে আপনার
বহু যুগ ধরে।
বোবা গাছ ওরে,
সহজে বহিস শিরে বৈশাখের নির্দয় দাহন,—
তুই সর্বসহিষ্ণু বাহন
শ্রাবণের
বিশ্বব্যাপী প্লাবনের।

তাই মনে ভাবি
যাবে নাবি
সর্ব দুঃখ সন্তাপ নিঃশেষে
উদার মাটির বক্ষোদেশে,
গভীর শীতল
যার স্তব্ধ অন্ধকারতল
কালের মথিত বিষ নিরন্তর নিতেছে সংহরি।
সেই বিলুপ্তির 'পরে দিবাবিভাবরী
তুলিছে শ্যামল তৃণস্তর
নিঃশব্দ সুন্দর।
শতাব্দীর সব ক্ষতি সব মৃত্যুক্ষত
যেখানে একান্ত অপগত
সেইখানে বনস্পতি প্রশান্ত গম্ভীর
সূর্যোদয়-পানে তোলে শির,
পুষ্প তার পত্রপুটে
শোভা পায় ধরিত্রীর মহিমামুকুটে।

বোবা মাটি, বোবা তরুদল,
ধৈর্যহারা মানুষের বিশ্বের দুঃসহ কোলাহল
স্তব্ধতায় মিলাইছ প্রতি মুহূর্তেই,—
নির্বাক সান্ত্বনা সেই
তোমাদের শান্তরূপে দেখিলাম,
করিনু প্রণাম।
দেখিলাম সব ব্যথা প্রতিক্ষণে লইতেছে জিনি
সুন্দরের ভৈরবী রাগিণী
সর্ব অবসানে
শব্দহীন গানে।

১৫ আষাঢ় ১৩৩৯

ছোটো প্রাণ

ছিলাম নিদ্রাগত,
সহসা আর্তবিলাপে কাঁদিল
রজনী ঝঞ্ঝাহত।
জাগিয়া দেখিনু পাশে
কচি মুখখানি সুখনিদ্রায়
ঘুমায়ে ঘুমায়ে হাসে।
সংসার-'পরে এই বিশ্বাস
দৃঢ় বাঁধা স্নেহডোরে
বজ্র-আঘাতে ভাঙে তা কেমন ক'রে

সৈন্যবাহিনী বিজয়কাহিনী
লিখে ইতিহাস জুড়ে।
শক্তিদম্ভ জয়স্তম্ভ
তুলিছে আকাশ ফুঁড়ে।
সম্পদসমারোহ
গগনে গগনে ব্যাপিয়া চলেছে
স্বর্ণমরীচিমোহ।
সেথায় আঘাতসংঘাতবেগে
ভাঙাচোরা যত হ'ক
তার লাগি বৃথা শোক।

কিন্তু হেথায় কিছু তো চাহে নি এরা।
এদের বাসাটি ধরণীর কোণে
ছোটো-ইচ্ছায় ঘেরা।
যেমন সহজে পাখির কুলায়
মৃদুকণ্ঠের গীতে
নিভৃত ছায়ায় ভরা থাকে মাধুরীতে।

হে রুদ্র, কেন তারো 'পরে বাণ হান,
কেন তুমি নাহি জান
নির্ভয়ে ওরা তোমারে বেসেছে ভালো,
বিস্মিত চোখে তোমারি ভুবনে
দেখেছে তোমার আলো।

১৬ আষাঢ় ১৩৩৯

নিরাবৃত

যবনিকা-অন্তরালে মর্ত্য পৃথিবীতে
ঢাকাপড়া এই মন। আভাসে ইঙ্গিতে
প্রমাণে ও অনুমানে আলোতে আঁধারে
ভাঙা খণ্ড জুড়ে সে-যে দেখেছে আমারে
মিলায়ে তাহার সাথে নিজ অভিরুচি
আশা তৃষা। বারবার ফেলেছিল মুছি
রেখা তার ; মাঝে-মাঝে করিয়া সংস্কার
দেখেছে নূতন করে মোরে। কতবার
ঘটেছে সংশয়। এই যে সত্যে ও ভুলে
রচিত আমার মূর্তি, সংসারের কূলে
এ নিয়ে সে এতদিন কাটায়েছে বেলা।
এরে ভালোবেসেছিল, এরে নিয়ে খেলা
সাঙ্গ করে চলে গেছে।

বসে একা ঘরে
মনে-মনে ভাবিতেছি আজ,— লোকান্তরে
যদি তার দিব্য আঁখি মায়ামুক্ত হয়
অকস্মাৎ, পাবে যার নব পরিচয়
সে কি আমি। স্পষ্ট তারে জানুক যতই
তবু যে অস্পষ্ট ছিল তাহারি মতোই

এরে কি আপনি রচি বাসিবে সে ভালো।
হায় রে মানুষ এ যে। পরিপূর্ণ আলো
সে তো প্রলয়ের তরে, সৃষ্টির চাতুরী
ছায়াতে আলোতে নিত্য করে লুকোচুরি।
সে-মায়াতে বেঁধেছিনু মর্ত্যে মোরা দোঁহে
আমাদের খেলাঘর, অপূর্ণের মোহে
মুগ্ধ ছিনু, মর্ত্যপাত্রে পেয়েছি অমৃত।
পূর্ণতা নির্মম সে যে স্তব্ধ অনাবৃত।

১৭ আষাঢ় ১৩৩৯

দূর হতে ভেবেছিনু মনে
দুর্জয় নির্দয় তুমি, কাঁপে পৃথ্বী তোমার শাসনে।
তুমি বিভীষিকা,
দুঃখীর বিদীর্ণ বক্ষে জ্বলে তব লেলিহান শিখা।
দক্ষিণ হাতের শেল উঠেছে ঝড়ের মেঘ-পানে,
সেথা হতে বজ্র টেনে আনে।
ভয়ে ভয়ে এসেছিনু দুরুদুরু বুকে
তোমার সম্মুখে।
তোমার ভ্রূকুটিভঙ্গে তরঙ্গিল আসন্ন উৎপাত,—
নামিল আঘাত।
পাঁজর উঠিল কেঁপে,
বক্ষে হাত চেপে
শুধালেম, 'আরো কিছু আছে না কি,
আছে বাকি
শেষ বজ্রপাত?'
নামিল আঘাত।

এইমাত্র ? আর কিছু নয় ?
ভেঙে গেল ভয়।
যখন উদ্যত ছিল তোমার অশনি
তোমারে আমার চেয়ে বড়ো ব'লে নিয়েছিনু গনি।
তোমার আঘাত সাথে নেমে এলে তুমি
যেথা মোর আপনার ভূমি।
ছোটো হয়ে গেছ আজ।
আমার টুটিল সব লাজ।
যত বড়ো হও,
তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড়ো নও।
আমি মৃত্যু-চেয়ে বড়ো এই শেষ কথা ব'লে
যাব আমি চলে।

১৭ আষাঢ় ১৩৩৯

অবাধ

সরে যা, ছেড়ে দে পথ,
দুর্ভর সংশয়ে ভারী তোর মন পাথরের পারা।
হালকা প্রাণের ধারা
দিকে দিকে ওই ছুটে চলে
কলকোলাহলে
দুরন্ত আনন্দভরে।
ওরাই যে লঘু করে
অতীতের পুরাতন বোঝা।
ওরাই তো করে দেয় সোজা
সংসারের বক্র ভঙ্গী চঞ্চল সংঘাতে।
ওদের চরণপাতে
জটিল জালের গ্রন্থি যত
হয় অপগত।

মলিনতা দেয় মেজে,
শ্রান্তি দূর করে ওরা ক্লান্তিহীন তেজে।

ওরা সব মেঘের মতন
প্রভাতকিরণপায়ী,— সিন্ধুর তরঙ্গ অগণন,
ওরা যেন দিশাহারা হাওয়ার উৎসাহ,
মাটির হৃদয়জয়ী নিরন্তর তরুর প্রবাহ ;
প্রাচীন রজনীপ্রান্তে ওরা সবে প্রথম-আলোক।
ওরা শিশু, বালিকা বালক,
ওরা নারী তারুণ্যে উচ্ছল।
ওরা যে নির্ভীক বীরদল
যৌবনের দুঃসাহসে বিপদের দুর্গ হানে,
সম্পদেরে উদ্ধারিয়া আনে।
পায়ের শৃঙ্খল ওরা চলে ঝংকারিয়া
অন্তরে প্রবল মুক্তি নিয়া।
আগামী কালের লাগি নাই চিন্তা, নাই মনে ভয়,
আগামী কালেরে করে জয়।

চলেছে চলেছে ওরা চারিদিক হতে
আঁধারে আলোতে,
সম্মুখের পানে
অজ্ঞাতের টানে।
তুই সরে যা রে
ওরে ভীরু, ভারাতুর সংশয়ের ভারে

১৮ আষাঢ় ১৩৩৯

যাত্রী

যে-কাল হরিয়া লয় ধন
সেই কাল করিছে হরণ
সে ধনের ক্ষতি।
তাই বসুমতী
নিত্য আছে বসুন্ধরা।
একে একে পাখি যায়, গানের পসরা
কোথাও না হয় শূন্য,
আঘাতের অন্ত নেই, তবুও অক্ষুণ্ন
বিপুল সংসার।
দুঃখ শুধু তোমার, আমার,
নিমেষের বেড়াঘেরা এখানে ওখানে।
সে-বেড়া পারায়ে তাহা পৌঁছায় না নিখিলের পানে।
ওরে তুমি, ওরে আমি,
যেখানে তোদের যাত্রা একদিন যাবে থামি
সেখানে দেখিতে পাবি ধন আর ক্ষতি
তরঙ্গের ওঠা নামা, একই খেলা, একই তার গতি।
কান্না আর হাসি
এক বীণাতন্ত্রীতারে একই গানে উঠিছে উচ্ছ্বাসি,
একই শমে এসে
মহামৌনে মিলে যায় শেষে।
তোমার হৃদয়তাপ
তোমার বিলাপ
চাপা থাক্ আপনার ক্ষুদ্রতার তলে।
যেইখানে লোকযাত্রা চলে
সেখানে সবার সাথে নির্বিকার চলো একসারে,
দেখা দাও শান্তিসৌম্য আপনারে—
যে-শান্তি মৃত্যুর প্রান্তে বৈরাগ্যে নিভৃত,
আত্মসমাহিত ;

দিবসের যত
ধূলিচিহ্ন, যত কিছু ক্ষত
লুপ্ত হল যে শান্তির অন্তিম তিমিরে ;
সংসারের শেষ তীরে
সপ্তর্ষির ধ্যানপুণ্য রাতে
হারায় যে-শান্তিসিন্ধু আপনারি অন্ত আপনাতে ;
যে-শান্তি নিবিড় প্রেমে
স্তব্ধ আছে থেমে,
যে-প্রেম শরীরমন অতিক্রম করিয়া সুদূরে
একান্ত মধুরে
লভিয়াছে আপনার চরম বিস্মৃতি ।
সে পরম শান্তি-মাঝে হ'ক তব অচঞ্চল স্থিতি ।

১৮ আষাঢ় ১৩৩৯

মিলন

তোমারে দিব না দোষ । জানি মোর ভাগ্যের ভ্রূকুটি,
ক্ষুদ্র এই সংসারের যত ক্ষত, যত তার ত্রুটি,
যত ব্যথা আঘাত করিছে তব পরম সত্তারে
অহরহ । জানি যে তুমি তো নাই ছাড়ায়ে আমারে
নির্লিপ্ত সুদূর স্বর্গে । আমি মোর তোমাতে বিরাজে ;
দেওয়ানেওয়া নিরন্তর প্রবাহিত তুমি-আমি-মাঝে
দুর্গম বাধারে অতিক্রমি । আমার সকল ভার
রাত্রিদিন রয়েছে তোমারি 'পরে, আমার সংসার
সে শুধু আমারি নহে । তাই ভাবি এই ভার মোর
যেন লঘু করি নিজবলে, জটিল বন্ধনডোর

একে একে ছিন্ন করি যেন, মিলিয়া সহজ মিলে
দ্বন্দ্বহীন বন্ধহীন বিচরণ করি এ নিখিলে
না চেয়ে আপনা-পানে। অশান্তিরে করি দিলে দূর
তোমাতে আমাতে মিলি ধ্বনিয়া উঠিবে এক সুর।

১৯ আষাঢ় ১৩৩৯

আগন্তুক

এসেছি সুদূর কাল থেকে।
তোমাদের কালে
পৌঁছলেম যে-সময়ে
তখন আমার সঙ্গী নেই।
ঘাটে ঘাটে কে কোথায় নেবে গেছে।
ছোটো ছোটো চেনা সুখ যত,
প্রাণের উপকরণ,
দিনের রাতের মুষ্টিদান
এসেছি নিঃশেষ করে বহুদূর পারে।
এ জীবনে পা দিয়েছি প্রথম যে-কালে
সে কালের 'পরে অধিকার
দৃঢ় হয়েছিল দিনে দিনে
ভাবে ও ভাষায়,
কাজে ও ইঙ্গিতে,
প্রণয়ের প্রাত্যহিক দেনাপাওনায়।
হেসে খেলে কোনোমতে সকলের সঙ্গে বেঁচে থাকা,
লোকযাত্রারথে
কিছু কিছু গতিবেগ দেওয়া,
শুধু উপস্থিত থেকে প্রাণের আসরে

ভিড় জমা করা,
এই তো যথেষ্ট ছিল

আজ তোমাদের কালে
প্রবাসী অপরিচিত আমি।
আমাদের ভাষার ইশারা
নিয়েছে নূতন অর্থ তোমাদের মুখে।
ঋতুর বদল হয়ে গেছে,—
বাতাসের উলটো-পালটা ঘ'টে
প্রকৃতির হল বর্ণভেদ।
ছোটো ছোটো বৈষম্যের দল
দেয় ঠেলা,
করে হাসাহাসি।
রুচি আশা অভিলাষ
যা মিশিয়ে জীবনের স্বাদ,
তার হল রসবিপর্যয়।

আমাদের সেকালকে যে-সঙ্গ দিয়েছি
যতই সামান্য হ'ক মূল্য তার
তবু সেই সঙ্গসূত্রে গাঁথা হয়ে মানুষে মানুষে
রচেছিল যুগের স্বরূপ,—
আমার সে-সঙ্গ আজ
মেলে না যে তোমাদের প্রত্যহের মাপে।
কালের নৈবেদ্যে লাগে যে সকল আধুনিক ফুল
আমার বাগানে ফোটে না সে।
তোমাদের যে-বাসার কোণে থাকি
তার খাজনার কড়ি হাতে নেই।
তাই তো আমাকে দিতে হবে
বড়ো কিছু দান
দানের একান্ত দুঃসাহসে।

উপস্থিত কালের যা দাবি
মিটাবার জন্যে সে তো নয়,
তাই যদি সেই দান তোমাদের রুচিতে না লাগে,
তবে তার বিচার সে পরে হবে।
তবু যা সম্বল আছে তাই দিয়ে
একালের ঋণ শোধ ক'রে অবশেষে
ঋণী তারে রেখে যাই যেন।
যা আমার লাভক্ষতি হতে বড়ো,
যা আমার সুখদুঃখ হতে বেশি—
তাই যেন শেষ করে দিয়ে চলে যাই
স্তুতি নিন্দা হিসাবের অপেক্ষা না রেখে।

১১ জুলাই ১৯৩২

জরতী

হে জরতী,
অন্তরে আমার
দেখেছি তোমার ছবি।
অবসানরজনীতে দীপবর্তিকার
স্থিরশিখা আলোকের আভা
অধরে ললাটে— শুভ্র কেশে।
দিগন্তে প্রণামনত শান্ত-আলো প্রত্যূষের তারা
মুক্ত বাতায়ন থেকে
পড়েছে নিমেষহীন নয়নে তোমার।
সন্ধ্যাবেলা
মল্লিকার মালা ছিল গলে
গন্ধ তার ক্ষীণ হয়ে
বাতাসকে করুণ করেছে—

উৎসবশেষের যেন অবসন্ন অঙ্গুলির
বীণাগুঞ্জরণ।
শিশিরমন্থর বায়ু,
অশথের শাখা অকম্পিত।
অদূরে নদীর শীর্ণ স্বচ্ছ ধারা কলশব্দহীন,
বালুতটপ্রান্তে চলে ধীরে
শূন্যগৃহ-পানে
ক্লান্তগতি বিরহিণী বধূর মতন।

হে জরতী মহাশ্বেতা,
দেখেছি তোমাকে
জীবনের শারদ অম্বরে
বৃষ্টিরিক্ত শুচিশুভ্র লঘু স্বচ্ছ মেঘে।
নিম্নে শস্যে ভরা খেত দিকে দিকে,
নদী ভরা কূলে কূলে,
পূর্ণতার স্তব্ধতায় বসুন্ধরা স্নিগ্ধ সুগম্ভীর

হে জরতী, দেখেছি তোমাকে
সত্তার অন্তিম তটে,
যেখানে কালের কোলাহল
প্রতিক্ষণে ডুবিছে অতলে।
নিস্তরঙ্গ সেই সিন্ধুনীরে
তীর্থস্নান করি'
রাত্রির নিকষকৃষ্ণ শিলাবেদিমূলে
এলোচুলে করিছ প্রণাম
পরিপূর্ণ সমাপ্তিরে।
চঞ্চলের অন্তরালে অচঞ্চল যে শান্ত মহিমা
চিরন্তন,
চরম প্রসাদ তার

নামিল তোমার নম্র শিরে
মানসসরোবরের অগাধ সলিলে
অস্তগত তপনের সর্বশেষ আলোর মতন।

১৩ জুলাই ১৯৩২

প্রাণ

বহু লক্ষ বর্ষ ধরে জ্বলে তারা,
ধাবমান অন্ধকার কালস্রোতে
অগ্নির আবর্ত ঘুরে ওঠে।
সেই স্রোতে এ ধরণী মাটির বুদ্‌বুদ;
তারি মধ্যে এই প্রাণ
অণুতম কালে
কণাতম শিখা লয়ে
অসীমের করে সে আরতি।
সে না হলে বিরাটের নিখিলমন্দিরে
উঠত না শঙ্খধ্বনি,
মিলত না যাত্রী কোনোজন,
আলোকের সামমন্ত্র ভাষাহীন হয়ে
রইত নীরব।

১৪ জুলাই ১৯৩২

সাথী

তখন বয়স সাত।
মুখচোরা ছেলে,
একা একা আপনারি সঙ্গে হত কথা।
মেঝে বসে

ঘরের গরাদেখানা ধরে
বাইরের দিকে চেয়ে চেয়ে
বয়ে যেত বেলা।
দূরে থেকে মাঝে-মাঝে ঢঙ ঢঙ করে
বাজত ঘণ্টার ধ্বনি,
শোনা যেত রাস্তা থেকে সইসের হাঁক।
হাঁসগুলো কলরবে ছুটে এসে নামত পুকুরে।
ও-পাড়ার তেলকলে বাঁশি ডাক দিত।
গলির মোড়ের কাছে দত্তদের বাড়ি,
কাকাতুয়া মাঝে-মাঝে উঠত চীৎকার করে ডেকে
একটা বাতাবিলেবু, একটা অশথ,
একটা কয়েতবেল, একজোড়া নারকেলগাছ,
তারাই আমার ছিল সাথী।
আকাশে তাদের ছুটি অহরহ,
মনে-মনে সে ছুটি আমার।
আপনারি ছায়া নিয়ে
আপনার সঙ্গে যে-খেলাতে
তাদের কাটত দিন
সে আমারি খেলা।
তারা চিরশিশু
আমার সমবয়সী।
আষাঢ়ে বৃষ্টির ছাঁটে, বাদলহাওয়ায়,
দীর্ঘ দিন অকারণে
তারা যা করেছে কলরব
আমার বালকভাষা
হো হা শব্দ করে
করেছিল তারি অনুবাদ।

তারপরে একদিন যখন আমার
বয়স পঁচিশ হবে,

বিরহের ছায়াম্লান বৈকালেতে
ওই জানালায়
বিজনে কেটেছে বেলা।
অশথের কম্পমান পাতায় পাতায়
যৌবনের চঞ্চল প্রত্যাশা
পেয়েছে আপন সাড়া।
সকরুণ মুলতানে গুন্ গুন্ গেয়েছি যে-গান
রৌদ্রে-ঝিলিমিলি সেই নারকেলডালে
কেঁপেছিল তারি সুর।
বাতাবিফুলের গন্ধ ঘুমভাঙা সাথীহারা রাতে
এনেছে আমার প্রাণে
দূর শয্যাতল থেকে
সিক্ত আঁখি আর কার উৎকণ্ঠিত বেদনার বাণী।
সেদিন সে গাছগুলি
বিচ্ছেদে মিলনে ছিল যৌবনের বয়স্য আমার।

তারপরে অনেক বৎসর গেল
আরবার একা আমি।
সেদিনের সঙ্গী যারা
কখন্ চিরদিনের অন্তরালে তারা গেছে সরে।
আবার আরেকবার জানলাতে
বসে আছি আকাশে তাকিয়ে।
আজ দেখি সে অশ্বত্থ, সেই নারকেল
সনাতন তপস্বীর মতো।
আদিম প্রাণের
যে-বাণী প্রাচীনতম
তাই উচ্চারিত রাত্রিদিন
উচ্ছ্বসিত পল্লবে পল্লবে।
সকল পথের আরম্ভেতে
সকল পথের শেষে

পুরাতন যে নিঃশব্দ মহাশান্তি স্তব্ধ হয়ে আছে,
নিরাসক্ত নির্বিচল সেই শান্তি-সাধনার
মন্ত্র ওরা প্রতিক্ষণে দিয়েছে আমার কানে-কানে

১৬ জুলাই ১৯৩২

বোবার বাণী

আমার ঘরের সম্মুখেই
পাকে পাকে জড়িয়ে শিমুলগাছে
উঠেছে মালতীলতা।
আষাঢ়ের রসস্পর্শ
লেগেছে অন্তরে তার।
সবুজ তরঙ্গগুলি হয়েছে উচ্ছল
পল্লবের চিক্কণ হিল্লোলে।
বাদলের ফাঁকে ফাঁকে মেঘচ্যুত রৌদ্র এসে
ছোঁয়ায় সোনার-কাঠি অঙ্গে তার,
মজ্জায় কাঁপন লাগে,
শিকড়ে শিকড়ে বাজে আগমনী।
যেন কত-কী-যে কথা নীরবে উৎসুক হয়ে থাকে
শাখাপ্রশাখায়।
এই মৌনমুখরতা
সারারাত্রি অন্ধকারে
ফুলের বাণীতে হয় উচ্ছ্বসিত,
ভোরের বাতাসে উড়ে পড়ে।

আমি একা বসে বসে ভাবি
সকালের কচি আলো দিয়ে রাঙা
ভাঙা ভাঙা মেঘের সমুখে ;

বৃষ্টিধোওয়া মধ্যাহ্নের
গোরুচরা মাঠের উপরে আঁখি রেখে ;
নিবিড় বর্ষণে আর্ত
শ্রাবণের আর্দ্র অন্ধকার রাতে ;
নানা কথা ভিড় করে আসে
গহন মনের পথে,
বিবিধ রঙের সাজ,
বিবিধ ভঙ্গীতে আসাযাওয়া,—
অন্তরে আমার যেন
ছুটির দিনের কোলাহলে
কথাগুলো মেতেছে খেলায়।

তবুও যখন তুমি আমার আঙিনা দিয়ে যাও
ডেকে আনি, কথা পাই নে তো।
কখনো যদি বা ভুলে কাছে আস
বোবা হয়ে থাকি।
অবারিত সহজ আলাপে
সহজ হাসিতে
হল না তোমার অভ্যর্থনা।
অবশেষে ব্যর্থতার লজ্জায় হৃদয় ভরে দিয়ে
তুমি চলে যাও,
তখন নির্জন অন্ধকারে
ফুটে ওঠে ছন্দে-গাঁথা সুরে-ভরা বাণী—
পথে তারা উড়ে পড়ে,
যার খুশি সাজি ভরে নিয়ে চলে যায়।

৩ শ্রাবণ ১৩৩৯

আঘাত

সোঁদালের ডালের ডগায়
মাঝে মাঝে পোকাধরা পাতাগুলি
কুঁকড়ে গিয়েছে ;
বিলিতি নিমের
বাকলে লেগেছে উই ;
কুরচির গুঁড়িটাতে পড়েছে ছুরির ক্ষত,
কে নিয়েছে ছাল কেটে ;
চারা অশোকের
নিচেকার দুয়েকটা ডালে
শুকিয়ে পাতার আগা কালো হয়ে গেছে।
কত ক্ষত, কত ছোটো মলিন লাঞ্ছনা,
তারি মাঝে অরণ্যের অক্ষুণ্ণ মর্যাদা
শ্যামল সম্পদে
তুলেছে আকাশ-পানে পরিপূর্ণ পুজার অঞ্জলি
কদর্যের কদাঘাতে
দিয়ে যায় কালিমার মসীরেখা,
সে-সকলি অধঃসাৎ ক'রে
শান্ত প্রসন্নতা
ধরণীরে ধন্য করে পুর্ণের প্রকাশে।

ফুটিয়েছে ফুল সে যে,
ফলিয়েছে ফলভার,
বিছিয়েছে ছায়া-আস্তরণ,
পাখিরে দিয়েছে বাসা,
মৌমাছিরে জুগিয়েছে মধু,
বাজিয়েছে পল্লবমর্মর।
পেয়েছে সে প্রভাতের পুণ্য আলো,
শ্রাবণের অভিষেক,
বসন্তের বাতাসের আনন্দমিতালি,—

পেয়েছে সে ধরণীর প্রাণরস,
সুগভীর সুবিপুল আয়ু,.
পেয়েছে সে আকাশের নিত্য আশীর্বাদ।
পেয়েছে সে কীটের দংশন।

১৯ জুলাই ১৯৩২

শান্ত

বিদ্রূপবাণ উদ্যত করি
এসেছিল সংসার,
নাগাল পেল না তার।
আপনার মাঝে আছে সে অনেক দূরে।
শান্ত মনের স্তব্ধ গহনে
ধ্যানের বীণার সুরে
রেখেছে তাহারে ঘিরি।
হৃদয়ে তাহার উচ্চ উদয়গিরি।
সেথা অন্তরলোকে
সিন্ধুপারের প্রভাত-আলোক
জ্বলিছে তাহার চোখে।
সে আলোকে এই বিশ্বের রূপ
অপরূপ হয়ে জাগে।
তার দৃষ্টির আগে
বিরূপ বিকল খণ্ডিত যত-কিছু
বিদ্রোহ ছেড়ে বিরাটের পায়ে
করে এসে মাথা নিচু।

সিন্ধুতীরের শৈলতটের 'পরে
হিংসামুখর তরঙ্গদল
যতই আঘাত করে,

কঠোর বিরোধ রচি তুলে তত
অতলের মহালীলা,
ফেনিল নৃত্যে দামামা বাজায় শিলা
হে শান্ত, তুমি অশান্তিরেই
মহিমা করিছ দান,
গর্জন এসে তোমার মাঝারে
হল ভৈরব গান।
তোমার চোখের গভীর আলোকে
অপমান হল গত
সন্ধ্যামেঘের তিমিররন্ধ্রে
দীপ্ত রবির মতো।

১৪ চৈত্র ১৩৩৮

জলপাত্র

প্রভু, তুমি পূজনীয়। আমার কী জাত,
জান তাহা হে জীবননাথ।
তবুও সবার দ্বার ঠেলে
কেন এলে
কোন্ দুখে
আমার সম্মুখে।
ভরা ঘট লয়ে কাঁখে
মাঠের পথের বাঁকে বাঁকে
তীব্র দ্বিপ্রহরে
আসিতেছিলাম ধেয়ে আপনার ঘরে।
চাহিলে তৃষ্ণার বারি,
আমি হীন নারী

তোমারে করিব হেয়,
সে কি মোর শ্রেয়।
ঘটখানি নামাইয়া চরণে প্রণাম ক'রে
কহিলাম, "অপরাধী করিয়ো না মোরে।"
শুনিয়া আমার মুখে তুলিলে নয়ন বিশ্বজয়ী,
হাসিয়া কহিলে, "হে মৃন্ময়ী,
পুণ্য যথা মৃত্তিকার এই বসুন্ধরা
শ্যামল কান্তিতে ভরা,
সেইমতো তুমি
লক্ষ্মীর আসন, তাঁর কমলচরণ আছ চুমি।
সুন্দরের কোনো জাত নাই,
মুক্ত সে সদাই।
তাহারে অরুণরাঙা উষা
পরায় আপন ভূষা ;
তারাময়ী রাতি
দেয় তার বরমাল্য গাঁথি।
মোর কথা শোনো,
শতদল পঙ্কজের জাতি নেই কোনো।
যার মাঝে প্রকাশিল স্বর্গের নির্মল অভিরুচি
সেও কি অশুচি।
বিধাতা প্রসন্ন যেথা আপনার হাতের সৃষ্টিতে
নিত্য তার অভিষেক নিখিলের আশিসবৃষ্টিতে।"
জলভরা মেঘস্বরে এই কথা ব'লে
তুমি গেলে চলে।

তার পর হতে
এ ভঙ্গুর পাত্রখানি প্রতিদিন উষার আলোতে
নানা বর্ণে আঁকি,
নানা চিত্ররেখা দিয়ে মাটি তার ঢাকি।

হে মহান, নেমে এসে তুমি যারে করেছ গ্রহণ,
সৌন্দর্যের অর্ঘ্য তার তোমা-পানে করুক বহন।

২৪ জুলাই ১৯৩২

আতঙ্ক

বটের জটায় বাঁধা ছায়াতলে
গোধূলিবেলায়
বাগানের জীর্ণ পাঁচিলেতে
সাদাকালো দাগগুলো
দেখা দিত ভয়ংকর মূর্তি ধরে
ওইখানে দৈত্যপুরী,
অদৃশ্য কুঠরি থেকে তার
মনে-মনে শোনা যেত হাঁউমাউখাঁউ।
লাঠি হাতে কুঁজোপিঠ
খিলিখিলি হাসত ডাইনিবুড়ী।
কাশীরাম দাস
পয়ারে যা লিখেছিল হিড়িম্বার কথা
ইঁট-বের-করা সেই পাঁচিলের 'পরে
ছিল তারি প্রত্যক্ষ কাহিনী।
তারি সঙ্গে সেইখানে নাককাটা সূর্পণখা
কালো কালো দাগে
করেছিল কুটুম্বিতা।

সতেরো বৎসর পরে
গিয়েছি সে সাবেক বাড়িতে।
দাগ বেড়ে গেছে,
মুগ্ধ নতুনের তুলি পুরোনোকে দিয়েছে প্রশ্রয়।

ইটগুলো মাঝে-মাঝে খসে গিয়ে
পড়ে আছে রাশকরা।
গায়ে গায়ে লেগেছে অনন্তমূল,
কালমেঘ লতা,
বিছুটির ঝাড় ;
ভাঁটিগাছে হয়েছে জঙ্গল।
পুরোনো বটের পাশে
উঠেছে ভেরেণ্ডাগাছ মস্তবড়ো হয়ে।
বাইরেতে স্থর্পণখা-হিড়িম্বার চিহ্নগুলো আছে,
মনে তারা কোনোখানে নেই।

স্টেশনে গেলেম ফিরে একবার খুব হেসে নিয়ে।
জীবনের ভিত্তিটার গায়ে
পড়েছে বিস্তর কালো দাগ
মূঢ় অতীতের মসীলেখা ;
ভাঙা গাঁথুনিতে
ভীরু কল্পনার যত জটিল কুটিল চিহ্নগুলো।
মাঝে-মাঝে
যেদিন বিকেলবেলা
বাদলের ছায়া নামে
সারি সারি তালগাছে
দিঘির পাড়িতে,
দূরের আকাশে
স্নিগ্ধ সুগম্ভীর
মেঘের গর্জন ওঠে গুরুগুরু,
ঝিঁঝিঁ ডাকে বুনো খেজুরের ঝোপে,
তখন দেশের দিকে চেয়ে
বাঁকাচোরা আলোহীন পথে
ভেঙেপড়া দেউলের মূর্তি দেখি ;
দীর্ণ ছাদে, তার জীর্ণ ভিতে

নামহীন অবসাদ,—
অনির্দিষ্ট শঙ্কাগুলো নিদ্রাহীন পেঁচা,
নৈরাশ্যের অলীক অত্যুক্তি যত,
দুর্বলের স্বরচিত শত্রুর চেহারা।
ধিক্ রে ভাঙনলাগা মন,
চিন্তায় চিন্তায় তোর কত মিথ্যা আঁচড় কেটেছে
দুষ্টগ্রহ সেজে ভয়
কালোচিহ্নে মুখভঙ্গী করে।
কাঁটা-আগাছার মতো
অমঙ্গল নাম নিয়ে
আতঙ্কের জঙ্গল উঠেছে।
চারিদিকে সারি সারি জীর্ণ ভিতে
ভেঙেপড়া অতীতের বিরূপ বিকৃতি
কাপুরুষে করিছে বিদ্রূপ।

২৩ জুলাই ১৯৩২

আলেখ্য

তোরে আমি রচিয়াছি রেখায় রেখায়
লেখনীর নটনলেখায়।
নির্বাকের গুহা হতে আনিয়াছি
নিখিলের কাছাকাছি,
যে-সংসারে হতেছে বিচার
নিন্দাপ্রশংসার।
এই আস্পর্ধার তরে
আছে কি নালিশ তোর রচয়িতা আমার উপরে।
অব্যক্ত আছিলি যবে
বিশ্বের বিচিত্ররূপ চলেছিল নানা কলরবে

নানা ছন্দে লয়ে
স্বজনে প্রলয়ে।
অপেক্ষা করিয়া ছিলি শূন্যে শূন্যে, কবে কোন্ গুণী
নিঃশব্দ ক্রন্দন তোর শুনি'
সীমায় বাঁধিবে তোরে সাদায় কালোয়
আঁধারে আলোয়।
পথে আমি চলেছিনু। তোর আবেদন
করিল ভেদন
নাস্তিত্বের মহা-অন্তরাল,
পরশিল মোর ভাল
চুপে-চুপে
অর্ধস্ফুট স্বপ্নমূর্তিরূপে।
অমূর্ত সাগরতীরে রেখার আলেখ্যলোকে
আনিয়াছি তোকে।
ব্যথা কি কোথাও বাজে
মূর্তির মর্মের মাঝে।
সুষমার অন্যথায়
ছন্দ কি লজ্জিত হল অস্তিত্বের সত্য মর্যাদায়।
যদিও তাই-বা হয়
নাই ভয়,
প্রকাশের ভ্রম কোনো
চিরদিন রবে না কখনো।
রূপের মরণত্রুটি
আপনিই যাবে টুটি
আপনারি ভারে,
আরবার মুক্ত হবি দেহহীন অব্যক্তের পারে।

২৪ জুলাই ১৯৩২

সান্ত্বনা

সকালের আলো এই বাদলবাতাসে
মেঘে রুদ্ধ হয়ে আসে
ভাঙা কণ্ঠে কথার মতন।
মোর মন
এ অস্ফুট প্রভাতের মতো
কী কথা বলিতে চায়, থাকে বাক্যহত।
মানুষের জীবনের মজ্জায় মজ্জায়
যে-দুঃখ নিহিত আছে অপমানে শঙ্কায় লজ্জায়,
কোনো কালে যার অন্ত নাই,
আজি তাই
নির্যাতন করে মোরে। আপনার দুর্গমের মাঝে
সান্ত্বনার চির-উৎস কোথায় বিরাজে,
যে-উৎসের গূঢ় ধারা বিশ্বচিত্ত-অন্তঃস্তরে
উন্মুক্ত পথের তরে
নিত্য ফিরে যুঝে,
আমি তারে মরি খুঁজে।
আপন বাণীতে
কী পুণ্যে বা পারিব আনিতে
সেই সুগম্ভীর শান্তি, নৈরাশ্যের তীব্র বেদনারে
স্তব্ধ যা করিতে পারে।
হায় রে ব্যথিত,
নিখিল-আত্মার কেন্দ্রে বাজে অকথিত
আরোগ্যের মহামন্ত্র, যার গুণে
সৃজনের হোমের আগুনে
নিজেরে আহুতি দিয়া নিত্য সে নবীন হয়ে উঠে,-
প্রাণেরে ভরিয়া তুলে নিত্যই মৃত্যুর করপুটে।
সেই মন্ত্র শান্ত মৌনতলে
শুনা যায় আত্মহারা তপস্যার বলে।

মাঝে-মাঝে পরম বৈরাগী
সে-মন্ত্র চেয়েছে দিতে সর্বজন লাগি।
কে পারে তা করিতে বহন,
মুক্ত হয়ে কে পারে তা করিতে গ্রহণ।
গতিহীন আর্ত অক্ষমের তরে
কোন্ করুণার স্বর্গে মন মোর দয়া ভিক্ষা করে
ঊর্ধ্বে বাহু তুলি।
কে বন্ধু রয়েছ কোথা, দাও দাও খুলি
পাষাণকারার দ্বার—
যেথায় পুঞ্জিত হল নিষ্ঠুরের অত্যাচার,
বঞ্চনা লোভীর,
যেথায় গভীর
মর্মে উঠে বিষাইয়া সত্যের বিকার।
আমিত্ববিমুগ্ধ মন যে দুর্বহ ভার
আপনার আসক্তিতে জমায়েছে আপনার 'পরে,
নির্মম বর্জনশক্তি দাও তার অন্তরে অন্তরে।
আমার বাণীতে দাও সেই সুধা
যাহাতে মিটিতে পারে আত্মার গভীরতম ক্ষুধা।

হেনকালে সহসা আসিল কানে
কোন্ দূর তরুশাখে শ্রান্তিহীন গানে
অদৃশ্য কে পাখি
বারবার উঠিতেছে ডাকি।
কহিলাম তারে, 'ওগো, তোমার কণ্ঠেতে আছে আলো,
অবসাদ-আঁধার ঘুচাল।
তোমার সহজ এই প্রাণের প্রোল্লাস
সহজেই পেতেছে প্রকাশ।
আদিম আনন্দ যাহা এ বিশ্বের মাঝে,
যে-আনন্দ অস্তিত্বে বিরাজে,

যে পরম আনন্দলহরী
যত দুঃখ যত সুখ নিয়েছে আপনা-মাঝে হরি,
আমারে দেখালে পথ তুমি তারি পানে
এই তব অকারণ গানে।

২৭ জুলাই ১৯৩২

শ্রীবিজয়লক্ষ্মী

তোমায় আমায় মিল হয়েছে কোন্ যুগে এইখানে।
ভাষায় ভাষায় গাঁঠ পড়েছে, প্রাণের সঙ্গে প্রাণে।
ডাক পাঠালে আকাশপথে কোন্ সে পুবেন বায়ে
দূর সাগরের উপকূলে নারিকেলের ছায়ে।
গঙ্গাতীরের মন্দিরেতে সেদিন শঙ্খ বাজে,
তোমার বাণী এপার হতে মিলল তারি মাঝে।
বিষ্ণু আমায় কইল কানে, বললে দশভুজা,
"অজানা ওই সিন্ধুতীরে নেব আমার পুজা।"
মন্দাকিনীর কলধারা সেদিন ছলোছলো
পুব সাগরে হাত বাড়িয়ে বললে, "চলো, চলো।"
রামায়ণের কবি আমায় কইল আকাশ হতে,
"আমার বাণী পার করে দাও দূর সাগরের স্রোতে।"
তোমার ডাকে উতল হল বেদব্যাসের ভাষা—
বললে, "আমি ওই পারেতে বাঁধব নূতন বাসা।"
আমার দেশের হৃদয় সেদিন কইল আমার কানে,
"আমায় বয়ে যাও গো লয়ে সুদূর দেশের পানে।"

সেদিন প্রাতে সুনীল জলে ভাসল আমার তরী,—
শুভ্র পালে গর্ব জাগায় শুভ হাওয়ায় ভরি।
তোমার ঘাটে লাগল এসে, জাগল সেথায় সাড়া,
কূলে কূলে কাননলক্ষ্মী দিল আঁচল নাড়া।
প্রথম দেখা আবছায়াতে আঁধার তখন ধরা,
সেদিন সন্ধ্যা সপ্তঋষির আশীর্বাদে ভরা।
প্রাতে মোদের মিলনপথে উষা ছড়ায় সোনা,
সে-পথ বেয়ে লাগল দোঁহার প্রাণের আনাগোনা।

দুইজনেতে বাঁধনু বাসা পাথর দিয়ে গেঁথে,
দুইজনেতে বসনু সেথায় একটি আসন পেতে।

বিরহরাত ঘনিয়ে এল কোন্ বরষের থেকে,
কালের রথের ধুলা উড়ে দিল আসন ঢেকে।
বিস্মরণের ভাঁটা বেয়ে কবে এলেম ফিরে
ক্লান্তহাতে রিক্তমনে একা আপন তীরে।
বঙ্গসাগর বহুবরষ বলে নি মোর কানে
সে যে কভু সেই মিলনের গোপন কথা জানে।
জাহ্নবীও আমার কাছে গাইল না সেই গান
সুদূর পারের কোথায় যে তার আছে নাড়ীর টান।

এবার আবার ডাক শুনেছি, হৃদয় আমার নাচে,
হাজার বছর পার হয়ে আজ আসি তোমার কাছে।
মুখের পানে চেয়ে তোমার আবার পড়ে মনে
আরেক দিনের প্রথম দেখা তোমার শ্যামল বনে।
হয়েছিল রাখিবাঁধন সেদিন শুভ প্রাতে,
সেই রাখি যে আজো দেখি তোমার দখিন হাতে।
এই সে-পথে হয়েছিল মোদের যাওয়া-আসা
আজো সেথায় ছড়িয়ে আছে আমার ছিন্ন ভাষা।
সে চিহ্ন আজ বেয়ে বেয়ে এলেম শুভক্ষণে
সেই সেদিনের প্রদীপজ্বালা প্রাণের নিকেতনে।
আমি তোমায় চিনেছি আজ, তুমি আমায় চেনো,
নূতনপাওয়া পুরানোকে আপন ব'লে জেনো।

৪ ভাদ্র ১৩৩৪
[বাটাভিয়া] যবদ্বীপ

বোরোবুদুর

সেদিন প্রভাতে সূর্য এইমতো উঠেছে অম্বরে
অরণ্যের বন্দনমর্মরে ;
নীলিম বাষ্পের স্পর্শ লভি'
শৈলশ্রেণী দেখা দেয় যেন ধরণীর স্বপ্নচ্ছবি।

নারিকেল-বনপ্রান্তে নরপতি বসিল একাকী
ধ্যানমগ্ন-আঁখি।
উচ্চে উচ্ছ্বসিল প্রাণ অন্তহীন আকাঙ্ক্ষাতে,
কী সাহসে চাহিল পাঠাতে
আপন পূজার মন্ত্র যুগযুগান্তরে।
অপরূপ অমৃত অক্ষরে
লিখিল বিচিত্র লেখা ; সাধকের ভক্তির পিপাসা
রচিল আপন মহাভাষা—
সর্বকাল সর্বজন
আনন্দে পড়িতে পারে যে-ভাষার লিপির লিখন।

সে-লিপি ধরিল দ্বীপ আপন বক্ষের মাঝখানে,
সে লিপি তুলিল গিরি আকাশের পানে
সে-লিপির বাণী সনাতন
করেছে গ্রহণ
প্রথম-উদিত সূর্য শতাব্দীর প্রত্যহ প্রভাতে।
অদূরে নদীর কিনারাতে
আলবাঁধা মাঠে
কত যুগ ধরে চাষী ধান বোনে আর ধান কাটে ;—
আঁধারে আলোয়
প্রত্যহের প্রাণলীলা সাদায় কালোয়
ছায়ানাট্যে ক্ষণিকের নৃত্যচ্ছবি যায় লিখে লিখে,
লুপ্ত হয় নিমিখে নিমিখে।

কালের সে-লুকাচুরি, তারি মাঝে সংকল্প সে কার
প্রতিদিন করে মন্ত্রোচ্চার,
বলে অবিশ্রাম,—
'বুদ্ধের শরণ লইলাম।'
প্রাণ যার দুদিনের, নাম যার মিলাল নিঃশেষে
সংখ্যাতীত বিস্মৃতের দেশে,
পাষাণের ছন্দে ছন্দে বাঁধিয়া গেছে সে
আপনার অক্ষয় প্রণাম,—
'বুদ্ধের শরণ লইলাম।'

কত যাত্রী কতকাল ধরে
নম্রশিরে দাঁড়ায়েছে হেথা করজোড়ে।
পূজার গম্ভীর ভাষা খুঁজিতে এসেছে কত দিন,
তাদের আপনকণ্ঠ ক্ষীণ।
ইঙ্গিতপুঞ্জিত তুঙ্গ পাষাণের সংগীতের তানে
আকাশের পানে
উঠেছে তাদের নাম,
জেগেছে অনন্ত ধ্বনি,—'বুদ্ধের শরণ লইলাম।'

অর্থ আজ হারায়েছে সে-যুগের লিখা,
নেমেছে বিস্মৃতিকুহেলিকা।
অর্ঘ্যশূন্য কৌতূহলে দেখে যায় দলে দলে আসি
ভ্রমণবিলাসী,—
বোধশূন্য দৃষ্টি তার নিরর্থক দৃশ্য চলে গ্রাসি।
চিত্ত আজি শান্তিহীন লোভের বিকারে,
হৃদয় নীরস অহংকারে।
ক্ষিপ্রগতি বাসনার তাড়নায় তৃপ্তিহীন ত্বরা,
কম্পমান ধরা;
বেগ শুধু বেড়ে চলে ঊর্ধ্বশ্বাসে মৃগয়া-উদ্দেশে,
লক্ষ্য ছোটে পথে পথে, কোথাও পৌঁছে না পরিশেষে;

অন্তহারা সঞ্চয়ের আহুতি মাগিয়া
সর্বগ্রাসী ক্ষুধানল উঠেছে জাগিয়া ;
তাই আসিয়াছে দিন,
পীড়িত মানুষ মুক্তিহীন,
আবার তাহারে
আসিতে হবে যে তীর্থদ্বারে
শুনিবারে
পাষাণের মৌনতটে যে-বাণী রয়েছে চিরস্থির—
কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর
আকাশে উঠিছে অবিরাম
অমেয় প্রেমের মন্ত্র,—'বুদ্ধের শরণ লইলাম।'

২৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৭
বোরোবুদুর [যবদ্বীপ]

সিয়াম

প্রথম দর্শনে

ত্রিশরণ মহামন্ত্র যবে
বজ্রমন্দ্ররবে
আকাশে ধ্বনিতেছিল পশ্চিমে পুরবে,
মরুপারে, শৈলতটে, সমুদ্রের কূলে উপকূলে,
দেশে দেশে চিত্তদ্বার দিল যবে খুলে
আনন্দমুখর উদ্বোধন,—
উদ্দাম ভাবের ভার ধরিতে নারিল যবে মন,
বেগ তার ব্যাপ্ত হল চারিভিতে,
দুঃসাধ্য কীর্তিতে, কর্মে, চিত্রপটে মন্দিরে মূর্তিতে,
আত্মদানসাধনস্ফূর্তিতে
উচ্ছ্বসিত উদার উক্তিতে,—
স্বার্থঘন দীনতার বন্ধনমুক্তিতে,—

সে-মন্ত্র অমৃতবাণী হে সিয়াম, তব কানে
কবে এল কেহ নাহি জানে
অভাবিত অলক্ষিত আপনাবিস্মৃত শুভক্ষণে
দূরাগত পান্থসমীরণে।

সে-মন্ত্র তোমার প্রাণে লভি প্রাণ
বহুশাখাপ্রসারিত কল্যাণে করেছে ছায়াদান।
সে-মন্ত্রভারতী
দিল অস্খলিত গতি
কত শত শতাব্দীর সংসারযাত্রারে—
শুভ আকর্ষণে বাঁধি তারে
এক ধ্রুব কেন্দ্র-সাথে
চরম মুক্তির সাধনাতে ;—
সর্বজনগণে তব এক করি একাগ্র ভক্তিতে,
এক ধর্ম, এক সঙ্ঘ, এক মহাগুরুর শক্তিতে
সে-বাণীর সৃষ্টিক্রিয়া নাহি জানে শেষ,
নবযুগ-যাত্রাপথে দিবে নিত্য নূতন উদ্দেশ ;
সে-বাণীর ধ্যান
দীপ্যমান করি দিবে নব নব জ্ঞান
দীপ্তির ছটায় আপনার,
এক সূত্রে গাঁথি দিবে তোমার মানসরত্নহার।
হৃদয়ে হৃদয়ে মিল করি
বহু যুগ ধরি
রচিয়া তুলেছ তুমি সুমহৎ জীবনমন্দির,—
পদ্মাসন আছে স্থির,
ভগবান বুদ্ধ সেথা সমাসীন
চিরদিন—
মৌন যাঁর শান্তি অন্তহারা,
বাণী যাঁর সকরুণ সান্ত্বনার ধারা।

আমি সেথা হতে এনু যেথা ভগ্নস্তূপে
বুদ্ধের বচন রুদ্ধ দীর্ণকীর্ণ মূক শিলারূপে,—
ছিল যেথা সমাচ্ছন্ন করি
বহু যুগ ধরি
বিস্মৃতিকুয়াশা
ভক্তির বিজয়স্তম্ভে সমুৎকীর্ণ অর্চনার ভাষা।
সে-অর্চনা সেই বাণী
আপন সজীব মূর্তিখানি
রাখিয়াছে ধ্রুব করি শ্যামল সরস বক্ষে তব,—
আজি আমি তারে দেখি লব,—
ভারতের যে-মহিমা
ত্যাগ করি আসিয়াছে আপন অঙ্গনসীমা
অর্ঘ্য দিব তারে
ভারত-বাহিরে তব দ্বারে।
স্নিগ্ধ করি প্রাণ
তীর্থজলে করি যাব স্নান
তোমার জীবনধারাস্রোতে,
যে-নদী এসেছে বহি ভারতের পুণ্যযুগ হতে—
যে-যুগের গিরিশৃঙ্গ-'পর
একদা উদিয়াছিল প্রেমের মঙ্গলদিনকর।

11 October 1927
Phya Thai Palace Hotel
[Bangkok]

সিয়াম

বিদায়কালে

কোন্ সে সুদূর মৈত্রী আপন প্রচ্ছন্ন অভিজ্ঞানে
আমার গোপন ধ্যানে
চিহ্নিত করেছে তব নাম,
হে সিয়াম,
বহু পূর্বে যুগান্তরে মিলনের দিনে।
মুহূর্তে লয়েছি তাই চিনে
তোমারে আপন বলি,
তাই আজ ভরিয়াছি ক্ষণিকের পথিক-অঞ্জলি
পুরাতন প্রণয়ের স্মরণের দানে,
সপ্তাহ হয়েছে পূর্ণ শতাব্দীর শব্দহীন গানে।
চিরন্তন আত্মীয়জনারে
দেখিয়াছি বারে বারে
তোমার ভাষায়,
তোমার ভক্তিতে, তব মুক্তির আশায়,
সুন্দরের তপস্যাতে
যে-অর্ঘ্য রচিলে তব সুনিপুণ হাতে
তাহারি শোভন রূপে—
পূজার প্রদীপে তব, প্রজ্জ্বলিত ধূপে।

আজি বিদায়ের ক্ষণে
চাহিলাম স্নিগ্ধ তব উদার নয়নে,
দাঁড়ানু ক্ষণিক তব অঙ্গনের তলে,
পরাইনু গলে
বরমাল্য পূর্ণ অনুরাগে—
অম্লান কুসুম যার ফুটেছিল বহুযুগ আগে।

৩০ আশ্বিন ১৩৩৪

ইণ্টর্ন্যাশনাল রেলোয়ে [সিয়াম]

বুদ্ধদেবের প্রতি

সারনাথে মূলগন্ধকুটি বিহার প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে রচিত

ওই নামে একদিন ধন্য হল দেশে দেশান্তরে
তব জন্মভূমি।
সেই নাম আরবার এ দেশের নগরে প্রান্তরে
দান করো তুমি।
বোধিদ্রুমতলে তব সেদিনের মহাজাগরণ
আবার সার্থক হ'ক, মুক্ত হ'ক মোহ-আবরণ,
বিস্মৃতির রাত্রিশেষে এ ভারতে তোমারে স্মরণ
নবপ্রাতে উঠুক কুসুমি।

চিত্ত হেথা মৃতপ্রায়, অমিতাভ, তুমি অমিতায়ু,
আয়ু করো দান।
তোমার বোধনমন্ত্রে হেথাকার তন্দ্রালস বায়ু
হ'ক প্রাণবান।
খুলে যাক রুদ্ধদ্বার, চৌদিকে ঘোষুক শঙ্খধ্বনি
ভারত অঙ্গনতলে আজি তব নব আগমনী,
অমেয় প্রেমের বার্তা শতকণ্ঠে উঠুক নিঃস্বনি—
এনে দিক অজেয় আহ্বান।

24. 10. 31.
Darjeeling

পারস্যে জন্মদিনে

ইরান, তোমার যত বুলবুল
তোমার কাননে যত আছে ফুল
বিদেশী কবির জন্মদিনেরে মানি
শুনাল তাহারে অভিনন্দনবাণী।

ইরান, তোমার বীর সন্তান,
প্রণয়-অর্ঘ্য করিয়াছে দান
আজি এ বিদেশী কবির জন্মদিনে,
আপনার বলি নিয়েছে তাহারে চিনে।

ইরান, তোমার সম্মানমালে
নব গৌরব বহি নিজ ভালে
সার্থক হল কবির জন্মদিন।
চিরকাল তারি স্বীকার করিয়া ঋণ
তোমার ললাটে পরানু এ মোর শ্লোক,—
ইরানের জয় হ'ক।

২৫ বৈশাখ ১৩৩৯
[তেহেরান]

ধর্মমোহ

ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সে-জন মারে আর শুধু মরে।
নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর,
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।
শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো,
শাস্ত্রে মানে না, মানে মানুষের ভালো।

বিধর্ম বলি মারে পরধর্মেরে,
নিজ ধর্মের অপমান করি ফেরে,
পিতার নামেতে হানে তাঁর সন্তানে,
আচার লইয়া বিচার নাহিক জানে,
পূজাগৃহে তোলে রক্তমাখানো ধ্বজা,—
দেবতার নামে এ যে শয়তান ভজা।

অনেক যুগের লজ্জা ও লাঞ্ছনা,
বর্বরতার বিকারবিড়ম্বনা,
ধর্মের মাঝে আশ্রয় দিল যারা
আবর্জনায় রচে তারা নিজ কারা।—
প্রলয়ের ওই শুনি শৃঙ্গধ্বনি,
মহাকাল আসে লয়ে সম্মার্জনী।

যে দেবে মুক্তি তারে খুঁটিরূপে গাড়া,
যে মিলাবে তারে করিল ভেদের খাঁড়া,
যে আনিবে প্রেম অমৃত-উৎস হতে
তারি নামে ধরা ভাসায় বিষের স্রোতে,
তরী ফুটা করি পার হতে গিয়ে ডোবে,—
তবু এরা কারে অপবাদ দেয় ক্ষোভে।

হে ধর্মরাজ, ধর্মবিকার নাশি
ধর্মমূঢ়জনেরে বাঁচাও আসি।
যে-পূজার বেদি রক্তে গিয়েছে ভেসে
ভাঙো ভাঙো, আজি ভাঙো তারে নিঃশেষে,—
ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো,
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।

৩১ বৈশাখ ১৩৩৩
রেলপথ

সংযোজন

প্রাচী

জাগো হে প্রাচীন প্রাচী !
ঢেকেছে তোমারে নিবিড় তিমির
যুগযুগব্যাপী অমারজনীর ;
মিলেছে তোমার সুপ্তির তীর
লুপ্তির কাছাকাছি ।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী !

জীবনের যত বিচিত্র গান
ঝিল্লিমন্ত্রে হল অবসান ;
কবে আলোকের শুভ আহ্বান
নাড়ীতে উঠিবে নাচি ।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী !

সঁপিবে তোমারে নবীন বাণী কে ।
নবপ্রভাতের পরশমানিকে
সোনা করি দিবে ভুবনখানিকে,
তারি লাগি বসি' আছি ।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী !

জরার জড়িমা-আবরণ টুটে
নবীন রবির জ্যোতির মুকুটে
নব রূপ তব উঠুক-না ফুটে,
করপুটে এই যাচি।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী!

'খোলো খোলো দ্বার, ঘুচুক আঁধার',
নবযুগ আসি ডাকে বারবার—
দুঃখ-আঘাতে দীপ্তি তোমার
সহসা উঠুক বাঁচি।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী!

ভৈরবরাগে উঠিয়াছে তান,
ঈশানের বুঝি বাজিল বিষাণ,
নবীনের হাতে লহো তব দান
জ্বালাময় মালাগাছি
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী

[জ্যৈষ্ঠ ? ১৩৩০
শিলঙ]

আশীর্বাদ

শ্রীমতী লীলা দেবী কল্যাণীয়াসু

বিশ্ব-পানে বাহির হবে
আপন কারা টুটি—
এই সাধনায় কুঁড়ি ওঠে
কুসুম হয়ে ফুটি।
বীজ আপনার বাঁধন ছিঁড়ে
ফলেরে দেয় সাড়া।
সূর্যতারা আঁধার চিরে
জ্যোতিরে দেয় ছাড়া।
এই সাধনায় যোগযুক্ত
সাধু তাপসবর
মৃত্যু হতে করেন মুক্ত
অমৃতনির্ঝর।
এই সাধনায় বিশ্বকবির
আনন্দবীন বাজে,—
আপ্‌নারে দেয় উৎস্রাবিয়া
আপন সৃষ্টি-মাঝে।
সেই ফল পাও প্রেমের যোগে
পুণ্য মিলনব্রতে ;
আপ্‌নারে দাও ছুটি তুমি
আপন বন্ধ হতে।
আত্মভোলা দুইটি প্রাণে
মিলবে একাকার,
সেই মিলনে বিকাশ হবে
নূতন সংসার।

১১ আষাঢ় ১৩৩০

আশীর্বাদ

শ্রীমতী কল্পনা দেবীর প্রতি

সুন্দর ভক্তির ফুল অলক্ষ্যে নিভৃত তব মনে
যদি ফুটে থাকে মোর কাব্যের দক্ষিণ সমীরণে,
হে শোভনে, আজি এই নির্মল কোমল গন্ধ তার
দিয়েছ দক্ষিণা মোরে, কবির গভীর পুরস্কার।

লহো আশীর্বাদ বৎসে, আপন গোপন অন্তঃপুরে
ছন্দের নন্দনবন সৃষ্টি করো সুধাস্নিগ্ধ সুরে,—
বঙ্গের নন্দিনী তুমি, প্রিয়জনে করো আনন্দিত,
প্রেমের অমৃত তব ঢেলে দিক গানের অমৃত।

২২ ভাদ্র ১৩৩০
শান্তিনিকেতন

লক্ষ্যশূন্য

রথীরে কহিল গৃহী উৎকণ্ঠায় উর্ধ্বস্বরে ডাকি,—
"থামো থামো, কোথা তুমি রুদ্রবেগে রথ যাও হাঁকি,
সম্মুখে আমার গৃহ।" রথী কহে, "ওই মোর পথ,
ঘুরে গেলে দেরি হবে, বাধা ভেঙে সিধা যাবে রথ।"
গৃহী কহে, "নিদারুণ ত্বরা দেখে মোর ডর লাগে,
কোথা যেতে হবে বলো।" রথী কহে, "যেতে হবে আগে।"
"কোন্‌খানে" শুধাইল। রথী বলে, "কোনোখানে নহে,—
শুধু আগে।" "কোন্ তীর্থে, কোন্ সে মন্দিরে" গৃহী কহে।
"কোথাও না, শুধু আগে।" "কোন্ বন্ধু-সাথে হবে দেখা।"
"কারো সাথে নহে, যাব সব-আগে আমি মাত্র একা।"
ঘর্ঘরিত রথবেগে গৃহভিত্তি করি দিল গ্রাস ;
হাহাকারে, অভিশাপে, ধূলিজালে ক্ষুভিল বাতাস

সন্ধ্যার আকাশে। আঁধারের দীপ্ত সিংহদ্বার-বাগে
রক্তবর্ণ অস্তপথে ছোটে রথ লক্ষ্যশূন্য আগে।

৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫
ক্রাকোভিয়া জাহাজ

প্রবাসী

পরবাসী চলে এসো ঘরে
অনুকূল সমীরণভরে।
বারে বারে শুভদিন
ফিরে গেল অর্থহীন,
চেয়ে আছে সবে তোমা-তরে,
ফিরে এসো ঘরে।

আকাশে আকাশে আয়োজন,
বাতাসে বাতাসে আমন্ত্রণ।
বন ভরা ফুলে ফুলে,
এসো এসো, লহো তুলে,
উঠে ডাক মর্মরে মর্মরে।

ফসলে ঢাকিয়া যায় মাটি,
তুমি কি লবে না তাহা কাটি।
ওই দেখো কতবার
হল খেয়া পারাপার,
সারিগান উঠিল অম্বরে।

কোথা যাবে সে কি জানা নেই।
যেথা আছ ঘর সেথা নেই।

মন যে দিল না সাড়া,
তাই তুমি গৃহছাড়া,
পরবাসী বাহিরে অন্তরে।

আঙিনায় আঁকা আলিপনা,
আঁখি তব চেয়ে দেখিল না।
মিলনঘরের বাতি
জ্বলে অনিমেষভাতি
সারারাতি জানালার 'পরে

বাঁশি পড়ে আছে তরুমূলে,
আজ তুমি আছ তারে ভুলে।
কোনোখানে সুর নাই,
আপন ভুবনে তাই
কাছে থেকে আছ দূরান্তরে

এসো এসো মাটির উৎসবে,
দক্ষিণবায়ুর বেণুরবে।
পাখির প্রভাতীগানে,
এসো এসো পুণ্যস্নানে
আলোকের অমৃতনির্ঝরে।

ফিরে এসো তুমি উদাসীন,
ফিরে এসো তুমি দিশাহীন।
প্রিয়েরে বরিতে হবে,
বরমাল্য আনো তবে,
দক্ষিণা দক্ষিণ তব করে।

দুঃখ আছে অপেক্ষিয়া দ্বারে,
বীর তুমি বক্ষে লহো তারে।

পথের কণ্টক দলি
ক্ষতপদে এসো চলি
ঝটিকার মেঘমন্দ্রস্বরে।

বেদনার অর্ঘ্য দিয়ে, তবে
ঘর তব আপনার হবে।
তুফান তুলিবে কূলে,
কাঁটাও ভরিবে ফুলে,
উৎসধারা ঝরিবে প্রস্তরে।

[চৈত্র ১৩৩২]

বুদ্ধজন্মোৎসব

সংস্কৃত ছন্দের নিয়ম-অনুসারে পঠনীয়

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি,
নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব,
ঘোর কুটিল পন্থ তার,
লোভজটিল বন্ধ।
নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী,
কর ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন অমৃতবাণী,
বিকশিত কর প্রেমপদ্ম
চিরমধুনিষ্যন্দ।

শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য

এস দানবীর, দাও
ত্যাগকঠিন দীক্ষা,
মহাভিক্ষু, লও সবার
অহংকার ভিক্ষা।

লোক লোক ভুলুক শোক, খণ্ডন কর মোহ,
উজ্জ্বল কর জ্ঞানসূর্য-উদয়-সমারোহ,
প্রাণ লভুক সকল ভুবন,
নয়ন লভুক অন্ধ।

শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।

ক্রন্দনময় নিখিলহৃদয়
তাপদহনদীপ্ত।
বিষয়বিষ-বিকারজীর্ণ
খিন্ন অপরিতৃপ্ত।
দেশ দেশ পরিল তিলক রক্তকলুষগ্লানি,
তব মঙ্গলশঙ্খ আন, তব দক্ষিণ পাণি,
তব শুভ সংগীতরাগ,
তব সুন্দর ছন্দ।

শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।

১৩৩৩

প্রথম পাতায়

লিখতে যখন বল আমায়
তোমার খাতার প্রথম পাতে
তখন জানি, কাঁচা কলম
নাচবে আজো আমার হাতে,—
সেই কলমে আছে মিশে
ভাদ্রমাসের কাশের হাসি,

সেই কলমে সাঁঝের মেঘে
 লুকিয়ে বাজে ভোরের বাঁশি।
সেই কলমে শিশু দোয়েল
 শিস দিয়ে তার বেড়ায় উড়ি।
পারুলদিদির বাসায় দোলে
 কনকচাঁপার কচি কুঁড়ি।
খেলার পুতুল আজো আছে
 সেই কলমের খেলাঘরে ;
সেই কলমে পথ কেটে দেয়
 পথহারানো তেপান্তরে।
নতুন চিকন অশথপাতা
 সেই কলমে আপনি নাচে।
সেই কলমে মোর বয়সে
 তোমার বয়স বাঁধা আছে।

৮ বৈশাখ ১৩৩৪

নূতন

আমরা খেলা খেলেছিলেম,
 আমরাও গান গেয়েছি ;
আমরাও পাল মেলেছিলেম,
 আমরা তরী বেয়েছি।
হারায় নি তা হারায় নি,
বৈতরণী তা পারায় নি,
নবীন আঁখির চপল আলোয়
 সে কাল ফিরে পেয়েছি।

দূর রজনীর স্বপন লাগে
 আজ নূতনের হাসিতে।

দূর ফাগুনের বেদন জাগে
    আজ ফাগুনের বাঁশিতে।
হায় রে সেকাল, হায় রে
কখন্ চলে যায় রে
আজ একালের মরীচিকায়
    নতুন মায়ায় ভাসিতে।

যে-মহাকাল দিন ফুরালে
    আমার কুসুম ঝরাল,
সেই তোমারি তরুণ ভালে
    ফুলের মালা পরাল।
কইল শেষের কথা সে,
কাঁদিয়ে গেল হতাশে,
তোমার মাঝে নতুন সাজে
    শূন্য আবার ভরাল।

আনলে ডেকে পথিক মোরে
    তোমার প্রেমের আগুনে।
শুকনো ঝোরা দিল ভ'রে
    এক পসলায় শাগুনে।
সন্ধ্যামেঘের কোনাতে
রক্তরাগের সোনাতে
শেষ নিমেষের বোঝাই দিয়ে
    ভাসিয়ে দিলে ভাগুনে।

৩০ বৈশাখ ১৩৩৪
শিলঙ

শুকসারী

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর পাহাড়-আঁকা চিত্রপত্রিকার উত্তরে

শুক বলে, গিরিরাজের জগতে প্রাধান্য ;
সারী বলে, মেঘমালা, সেই বা কী সামান্য,—
গিরির মাথায় থাকে।
শুক বলে, গিরিরাজের দৃঢ় অচল শিলা ;
সারী বলে, মেঘমালার আদি-অন্তই লীলা,—
বাঁধবে কে-বা তাকে ?

শুক বলে, নদীর জলে গিরি ঢালেন প্রাণ ;
সারী বলে, তার পিছনে মেঘমালার দান,—
তাই তো নদী আছে।
শুক বলে, গিরীশ থাকেন গিরিতে দিনরাত্র ;
সারী বলে, অন্নপূর্ণা ভরেন ভিক্ষাপাত্র,—
সে তো মেঘের কাছে।

শুক বলে, হিমাদ্রি যে ভারত করে ধন্য ;
সারী বলে, মেঘমালা বিশ্বেরে দেয় স্তন্য,—
বাঁচে সকল জন।
শুক বলে, সমাধিতে স্তব্ধ গিরির দৃষ্টি,—
সারী বলে, মেঘমালার নিত্যনূতন সৃষ্টি ;
তাই সে চিরন্তন।

৩১ বৈশাখ ১৩৩৪
শিলঙ

সুসময়

বৈশাখী ঝড় যতই আঘাত হানে
সন্ধ্যাসোনার ভাণ্ডারদ্বার-পানে,
　　দস্যুর বেশে যতই করে সে দাবি
　　কুণ্ঠিত মেঘ হারায় সোনার চাবি,
গগন সঘন অবগুণ্ঠন টানে।

'খোলো খোলো মুখ' বনলক্ষ্মীরে ডাকে,
নিবিড় ধুলায় আপনি তাহারে ঢাকে।
　　'আলো দাও' হাঁকে, পায় না কাহারো সাড়া,
　　আঁধার বাড়ায়ে বেড়ায় লক্ষ্মীছাড়া,
পথ সে হারায় আপন ঘূর্ণিপাকে।

তারপরে যবে শিউলিফুলের বাসে
শরৎলক্ষ্মী শুভ্র আলোয় ভাসে,
　　নদীর ধারায় নাই মিছে মত্ততা,
　　কুন্দকলির স্নিগ্ধশীতল কথা,
মৃদু উচ্ছ্বাস মর্মরে ঘাসে ঘাসে,—

শিশির যখন বেণুর পাতার আগে
রবির প্রসাদ নীরব চাওয়ায় মাগে,
　　সবুজ খেতের নবীনধানের শিষে
　　ঢেউ খেলে যায় আলোকছায়ায় মিশে,
গগনসীমায় কাশের কাঁপন লাগে,—

হঠাৎ তখন সূর্যডোবার কালে
দীপ্তি লাগায় দিক্‌ললনার ভালে;
　　মেঘ ছেঁড়ে তার পর্দা আঁধার-কালো,
　　কোথায় সে পায় স্বর্গলোকের আলো,
চরম খনের পরম প্রদীপ জ্বালে।

১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

নূতন কাল

নন্দগোপাল বুক ফুলিয়ে এসে
বললে আমায় হেসে,—
"আমার সঙ্গে লড়াই ক'রে কখ্‌খনো কি পার,
বারে বারেই হার।"
আমি বললেম, "তাই বই কি! মিথ্যে তোমার বড়াই,
হ'ক দেখি তো লড়াই।"
"আচ্ছা তবে দেখাই তোমায়" এই ব'লে সে যেমনি টানলে হাত
দাদামশাই তখ্‌খনি চিৎপাত।
সবাইকে সে আনলে ডেকে, চেঁচিয়ে নন্দ করলে বাড়ি মাত।

বারে বারে শুধায় আমায়, "বলো তোমার হার হয়েছে না কি।"
আমি কইলেম, "বলতে হবে তা কি।
ধুলোর যখন নিলেম শরণ প্রমাণ তখন রইল কি আর বাকি।
এই কথা কি জান—
আমার কাছে নন্দগোপাল যখনি হার মান
আমারি সেই হার,
লজ্জা সে আমার।
ধুলোয় যেদিন পড়ব যেন এই জানি নিশ্চিত,
তোমারি শেষ জিত।"

২৩ অগস্ট [১৯২৭]
কুন্‌ফিউস জাহাজ

পরিণয়মঙ্গল

হৈমন্তী দেবী ও অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীর পরিণয়-উপলক্ষে

উত্তরে দুয়াররুদ্ধ হিমানীর কারাদুর্গতলে
প্রাণের উৎসবলক্ষ্মী বন্দী ছিল তন্দ্রার শৃঙ্খলে।
যে নীহারবিন্দু ফুল ছিঁড়ি তার স্বপ্নমন্ত্রপাশ
কঠিনের মরুবক্ষে মাধুরীর আনিল আশ্বাস,

হৈমন্তী নিঃশব্দে কবে গেঁথেছে তাহারি শুভ্রমালা
নিভৃত গোপন চিত্তে ; সেই অর্ঘ্যে পূর্ণ করি ডালা
লাবণ্যনৈবেদ্যখানি, দক্ষিণসমুদ্র-উপকূলে
এনেছে অরণ্যচ্ছায়ে, যেথায় অগণ্য ফুলে ফুলে
রবির সোহাগগর্ব বর্ণগন্ধমধুরসধারে
বৎসরের ঋতুপাত্র উচ্ছলিয়া দেয় বারে বারে।
বিস্ময়ে ভরিল মন, এ কী এ প্রেমের ইন্দ্রজাল,
কোথা করে অন্তর্ধান মুহূর্তে দুস্তর অন্তরাল—
দক্ষিণপবনসখা উৎকণ্ঠিত বসন্ত কেমনে
হৈমন্তীর কণ্ঠ হতে বরমাল্য নিল শুভক্ষণে।

১ পৌষ ১৩৩৪
শান্তিনিকেতন

জীবনমরণ

জীবনমরণের বাজায়ে খঞ্জনি
নাচিয়া ফাল্গুন গাহিছে।
অধীরা হল ধরা মাটির বন্দিনী
বাতাসে উড়ে যেতে চাহিছে।
আজিকে আলো ছায়া করিছে কোলাকুলি,
আজিকে এক দোলে দুজনে দোলাদুলি
শুকানো পাতা আর মুকুলে।
আজিকে শিরীষের মুখর উপবনে
জড়িত পাশাপাশি নূতনে পুরাতনে
চিকন শ্যামলের দুকূলে।

বিরহে টানে মিড় মিলন-বীণাতারে,
সুখের বুকে বাজে বেদনা

কপোত কাকলিতে করুণা সঙ্কারে,
কাননদেবী হল বিমনা।
আমারো প্রাণে বুঝি বহেছে ওই হাওয়া,
কিছু-বা কাছে আসা, কিছু-বা চলে যাওয়া,
কিছু-বা স্মরি কিছু পাসরি।
যে আছে যে-বা নাই আজিকে দোঁহে মিলি
আমার ভাবনাতে ভ্রমিছে নিরিবিলি
বাজায়ে ফাগুনের বাঁশরি।

[ফাল্গুন ১৩৩৪]

গৃহলক্ষ্মী

নবজাগরণ-লগনে গগনে বাজে কল্যাণশঙ্খ—
এসো তুমি উষা ওগো অকলুষা, আনো দিন নিঃশঙ্ক
দ্যুলোকভাসানো আলোকসুধায়
অভিষেক তুমি করো বসুধায়,
নবীন দৃষ্টি নয়নে তাহার এনে দাও অকলঙ্ক।

সম্মুখ-পানে নবযুগ আজি মেলুক উদার চিত্র।
অমৃতলোকের দ্বার খুলে দিন্ চিরজীবনের মিত্র।
বিশ্বের পথে আসিয়াছে ডাক,
যাত্রীরা সবে যাক ধেয়ে যাক,
দেহমন হতে হ'ক অপগত অবসাদ অপবিত্র।

মৌন যে ছিল বক্ষে তাহার বাজুক বীণার তন্ত্র,
নব বিশ্বাসে আশ্বাসহীন শুনুক বিজয়মন্ত্র।
এসো আনন্দ, দুঃখহরণ,
দুঃখেরে দাও করিতে বরণ,
মরণতোরণ পার হয়ে পাই অমর প্রাণের পন্থ।

কল্যাণী, তব অঙ্গনে আজি হবে মঙ্গলকর্ম,—
শুভসংগ্রামে যে যাবে তাহারে পরাও বীরের বর্ম।
বলো সবে ডাকি "ছাড়ো সংশয়",
বলো যাত্রীরে "হয়েছে সময়",
বলো "নাহি ভয়", বলো "জয় জয়, জয়ী যেন হয় ধর্ম"।

পশ্চাৎ-পানে ফিরায়ে ডেকো না, মনে জাগায়ো না দ্বন্দ্ব,
দুর্বল শোকে অশ্রুসলিলে নয়ন কোরো না অন্ধ।
সংকট-মাঝে ছুটিবার কালে
বাঁধিয়া রেখো না আবেশের জালে,
যে-চরণ বাধা লঙ্ঘিবে, তাহে জড়ায়ো না মোহবন্ধ।

? বৈশাখ ১৩৩৪

রঙিন

ভিড় করেছে রঙমশালীর দলে।
কেউ-বা জলে কেউ-বা তারা স্থলে।
অজানা দেশ, রাত্রিদিনে
পায়ের কাছের পথটি চিনে
দুঃসাহসে এগিয়ে তারা চলে।

কোন্ মহারাজ রথের 'পরে একা,
ভালো করে যায় না তাঁরে দেখা।
সূর্যতারা অন্ধকারে
ডাইনে বাঁয়ে উঁকি মারে,
আপন আলোয় দৃষ্টি তাদের ঠেকা।

আমার মশাল সামনে ধরি না যে,
তাই তো আলো চক্ষে নাহি বাজে।

অন্তরে মোর রঙের শিখা
চিত্তকে দেয় আপন টিকা,
রঙিনকে তাই দেখি মনের মাঝে।

পাখিরা রঙ ওড়ায় আকাশতলে,
মাছেরা রঙ খেলায় গভীর জলে ;
রঙ জেগেছে বনসভায়
গোলাপ চাঁপা রঙন জবায়,
মেঘেরা রঙ ফোটায় পলে পলে।

নীরব ডাকে রঙমহালের রাজা
হুকুম করেন, 'রঙের আসর সাজা।'—
অমনি ফাগুন কোথা হতে
ভেসে আসে হাওয়ার স্রোতে,
পুরানোকে রাঙিয়ে করে তাজা।

তাদের আসর বাহির-ভুবনেতে,
ফেরে সেথায় রঙের নেশায় মেতে।
আমার এ রঙ গোপন প্রাণে,
আমার এ রঙ গভীর গানে,
রঙের আসন ধেয়ানে দিই পেতে।

২৬ ভাদ্র ১৩৩৫

আশীর্বাদী

কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সংবর্ধনা উপলক্ষে

আমরা তো আজ পুরাতনের কোঠায়,
নবীন বটে ছিলেম কোনো কালে।
বসন্তে আজ কত নূতন বোঁটায়
ধরল কুঁড়ি বাণীবনের ডালে।

কত ফুলের যৌবন যায় চুকে
একবেলাকার মৌমাছিদের প্রেমে।
মধুর পালা রেণুকণার মুখে
ঝরা পাতায় ক্ষণিকে যায় থেমে।

ফাগুনফুলে ভরেছিলে সাজি,
শ্রাবণমাসে আনো ফলের ভিড়।
সেতারেতে ইমন উঠে বাজি
সুরবাহারে দিক কানাড়ার মিড়।

২ ভাদ্র ১৩৩৮

বসন্ত-উৎসব

এ-বৎসর দোলপূর্ণিমা ফাল্গুন পার হয়ে চৈত্রে পৌঁছল। আমের মুকুল নিঃশেষিত, আমবাগানে মৌমাছির ভিড় নেই, পলাশ-ফোটার পালা ফুরল, গাছের তলায় শুকনো শিমুল তার শেষমধু পিঁপড়েদের বিলিয়ে দিয়ে বিদায় নিয়েছে। কাঞ্চনশাখা প্রায় দেউলে, ঐশ্বর্যের অল্প কিছু বাকি। কেবল শালের বীথিকা ভরে উঠেছে মঞ্জরিতে। উৎসব-প্রভাতে আশ্রমকন্যারা ঋতুরাজের সিংহাসন প্রদক্ষিণ করলে এই পুষ্পিত শালের বনে, তার বল্কলে আবির মাখিয়ে দিলে, তার ছায়ায় রাখলে মাল্যপ্রদীপের অর্ঘ্য। চতুর্দশীর চাঁদ যখন অস্তদিগন্তে, প্রভাতের ললাটে যখন অরুণ-আবিরের তিলকরেখা ফুটে উঠল, তখন আমি এই ছন্দের নৈবেদ্য বসন্ত-উৎসবের বেদির জন্য রচনা করেছি।

আশ্রমসখা হে শাল, বনস্পতি,
লহো আমাদের নতি।
তুমি এসেছিলে মোদের সবার আগে
প্রাণের পতাকা রাঙায়ে হরিৎরাগে,
সংগ্রাম তব কত ঝঞ্ঝার সাথে,
কত দুর্দিনে কত দুর্যোগরাতে
জয়গৌরবে ঊর্ধ্বে তুলিলে শির
হে বীর, হে গম্ভীর।

তোমার প্রথম অতিথি বনের পাখি,
শাখায় শাখায় নিলে তাহাদের ডাকি,
স্নিগ্ধ আদরে গানেরে দিয়েছ বাসা,
মৌন তোমার পেয়েছে আপন ভাষা,
সুরে কিশলয়ে মিলন ঘটালে তুমি—
মুখরিত হল তোমার জন্মভূমি।

আমরা যেদিন আসন নিলেম আসি
কহিল স্বাগত তব পল্লবরাশি,
তার পর হতে পরিচয় নব নব
দিবসরাত্রি ছায়াবীথিতলে তব
মিলিল আসিয়া নানা দিগ্‌দেশ হতে
তরুণ জীবনস্রোতে।

বৈশাখতাপ শান্ত শীতল করো,
নববর্ষারে করি দাও ঘনতর,
শুভ্র শরতে জ্যোৎস্নার রেখাগুলি
ছায়ায় মিলায়ে সাজাও বনের ধূলি,
মধুলক্ষ্মীরে আনিয়াছে আহ্বানি
মঞ্জরিভরা সুন্দর তব বাণী।

নীরব বন্ধু, লহো আমাদের প্রীতি,
আজি বসন্তে লহো এ কবির গীতি,
কোকিলকাকলি শিশুদের কলরবে
মিলেছে আজি এ তব জয়-উৎসবে,
তোমার গন্ধে মোর আনন্দে আজি
এ পুণ্যদিনে অর্ঘ্য উঠিল সাজি

গম্ভীর তুমি, সুন্দর তুমি, উদার তোমার দান,
লহো আমাদের গান।

দোলপূর্ণিমা ১৩৩৮
শান্তিনিকেতন

আশীর্বাদ

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিনে

অভাগা যখন বেঁধেছিল তার বাসা
কোণে কোণে তারি পুঞ্জিত হল জীবনের ভাঙা আশা।
ঘরের মধ্যে বুকের কাঁদনগুলা
উড়িয়ে বেড়ায় ধুলা।
তুষিয়া রুষিয়া উঠে নিরুদ্ধ বায়ু,
শোষণ করিছে আয়ু।
যেখানে-সেখানে মলিনের লাগে ছোঁওয়া,
দীপ নিভে যায়, তীব্রগন্ধ ধোঁওয়া
রোধ করে নিশ্বাস,
কঠোর ভাগ্য হানে নিষ্ঠুর ভাষ।

ওরে দরিদ্র, চেয়ে দেখ্ তোর ভাঙা ভিত্তির ধারে,
অসীম আকাশ, কে তারে রোধিতে পারে।
সেথা নাই বন্ধন,
প্রভাত-আলোকে প্রতিদিন আসে তব অভিনন্দন।
সন্ধ্যার তারা তোমারি মুখেতে চাহে,
তোমারি মুক্তি গাহে।
তব সত্তার মহিমা ঘোষিছে সব সত্তার মাঝে,
হে মানব, তুমি কোথায় লুকাও লাজে।
যেখানে ক্ষুদ্র সেখানে পীড়িত তুমি,
কর্কশ হাসি হাসিছে যেথায় দৈন্যের মরুভূমি

তাহার বাহিরে তোমার উদার স্থান,
বিশ্ব তোমারে বক্ষ মেলিয়া করিতেছে আহ্বান।

১৮ আশ্বিন
শুক্ল পঞ্চমী ১৩৩১

আশীর্বাদ

শ্রীমান দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিবসে

প্রথম পঞ্চাশ বর্ষ রচি দিক প্রথম সোপান,
দ্বিতীয় পঞ্চাশ তাহে গৌরবে করুক অভ্যুত্থান।

২ পৌষ
১৩৩১

তোমার মুখর দিন হে দিনেন্দ্র, লইয়াছে তুলি
আপনার দিগ্ দিগন্তে রবির সংগীতরশ্মিগুলি
প্রহর করিয়া পূর্ণ। মেঘে মেঘে তারি লিপি লিখে
বিরহমিলনবাণী পাঠাইলে বহু দূর দিকে
উদার তোমার দান। রবিকর করি মর্মগত
বনস্পতি আপনার পত্রপুষ্পে করে পরিণত,
তাহারি নৈবেদ্য দিয়ে বসন্তের রচে আরাধনা
নিত্যোৎসব-সমারোহে। সেইমতো তোমার সাধনা।
রবির সম্পদ হ'ত নিরর্থক, তুমি যদি তারে
না লইতে আপনার করি, যদি না দিতে সবারে।
সুরে সুরে রূপ নিল তোমা-'পরে স্নেহ সুগভীর
রবির সংগীতগুলি আশীর্বাদ রহিল রবির।

২ পৌষ
১৩৩১

উত্তিষ্ঠত নিবোধত

কল্যাণীয়া শ্রীমতী রমা দেবী

আজি তব জন্মদিনে এই কথা করাব স্মরণ—
জয় করে নিতে হয় আপনার জীবন মরণ
আপন অক্লান্ত বলে দিনে দিনে ; যা পেয়েছ দান
তার মূল্য দিতে হবে, দিতে হবে তাহারে সম্মান
নিত্য তব নির্মল নিষ্ঠায়। নহে ভোগ, নহে খেলা
এ জীবন, নহে ইহা কালস্রোতে ভাসাইতে ভেলা
খেয়ালের পাল তুলে। আপনারে দীপ করি জ্বালো,
দুর্গম সংসারপথে অন্ধকারে দিতে হবে আলো,
সত্যলক্ষ্যে যেতে হবে অসত্যের বিঘ্ন করি দূর,
জীবনের বীণাতন্ত্রে বেসুরে আনিতে হবে সুর—
দুঃখেরে স্বীকার করি ; অনিত্যের যত আবর্জনা
পূজার প্রাঙ্গণ হতে নিরালস্যে করিবে মার্জনা
প্রতিক্ষণে সাবধানে, এই মন্ত্র বাজুক নিয়ত
চিন্তায় বচনে কর্মে তব— উত্তিষ্ঠত নিবোধত।

১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০
গ্লেন্ এডেন, দার্জিলিঙ

প্রার্থনা

কামনায় কামনায় দেশে দেশে যুগে যুগান্তরে
নিরন্তর নিদারুণ দ্বন্দ্ব যবে দেখি ঘরে ঘরে
প্রহরে প্রহরে ; দেখি অন্ধ মোহ দুরন্ত প্রয়াসে
বুভুক্ষার বহ্নি দিয়ে ভস্মীভূত করে অনায়াসে
নিঃসহায় দুর্ভাগার সকরুণ সকল প্রত্যাশা,
জীবনের সকল সম্বল ; দুঃখীর আশ্রয়বাসা

নিশ্চিন্তে ভাঙিয়া আনে দুর্দাম দুরাশাহোমানলে
আহুতি-ইন্ধন জোগাইতে ; নিঃসংকোচ গর্বে বলে,
আত্মতৃপ্তি ধর্ম হতে বড়ো ; দেখি আত্মম্ভরী প্রাণ
তুচ্ছ করিবারে পারে মানুষের গভীর সম্মান
গৌরবের মৃগতৃষ্ণিকায় ; সিদ্ধির স্পর্ধার তরে
দীনের সর্বস্ব সার্থকতা দলি দেয় ধূলি-'পরে
জয়যাত্রাপথে ;— দেখি' ধিক্কারে ভরিয়া উঠে মন,
আত্মজাতি-মাংসলুব্ধ মানুষের প্রাণনিকেতন
উন্মীলিছে নখে দন্তে হিংস্র বিভীষিকা ;— চিত্ত মম
নিষ্কৃতিসন্ধানে ফিরে পিঞ্জরিত বিহঙ্গমসম,
মুহূর্তে মুহূর্তে বাজে শৃঙ্খলবন্ধন-অপমান
সংসারের। হেনকালে জ্বলি উঠে বজ্রাগ্নি-সমান
চিত্তে তাঁর দিব্যমূর্তি, সেই বীর রাজার কুমার
বাসনারে বলি দিয়া বিসর্জিয়া সর্ব আপনার
বর্তমানকাল হতে নিষ্ক্রমিলা নিত্যকাল-মাঝে
অনন্ত তপস্যা বহি মানুষের উদ্ধারের কাজে
অহমিকা-বন্দীশালা হতে।— ভগবান বুদ্ধ তুমি,
নির্দয় এ লোকালয়, এ ক্ষেত্রেই তব জন্মভূমি।
ভরসা হারাল যারা, যাহাদের ভেঙেছে বিশ্বাস,
তোমারি করুণাবিত্তে ভরুক তাদের সর্বনাশ,—
আপনারে ভুলে তারা ভুলুক দুর্গতি।— আর যারা
ক্ষীণের নির্ভর ধ্বংস করে, রচে দুর্ভাগ্যের কারা
দুর্বলের মুক্তি রুধি', বোসো তাহাদেরি দুর্গদ্বারে
তপের আসন পাতি' ; প্রমাদবিহ্বল অহংকারে
পড়ুক সত্যের দৃষ্টি ; তাদের নিঃসীম অসম্মান
তব পুণ্য আলোকেতে লভুক নিঃশেষ অবসান।

২৯ জুলাই ১৯৩৩

অতুলপ্রসাদ সেন

বন্ধু, তুমি বন্ধুতার অজস্র অমৃতে
পূর্ণপাত্র এনেছিলে মর্ত্য ধরণীতে।
ছিল তব অবিরত
হৃদয়ের সদাব্রত,
বঞ্চিত কর নি কভু কারে
তোমার উদার মুক্ত দ্বারে।

মৈত্রী তব সমুচ্ছল ছিল গানে গানে
অমরাবতীর সেই সুধাঝরা দানে।
সুরে-ভরা সঙ্গ তব
বারে বারে নব নব
মাধুরীর আতিথ্য বিলাল,
রসতৈলে জ্বেলেছিল আলো।

দিন পরে গেছে দিন, মাস পরে মাস,
তোমা হতে দূরে ছিল আমার আবাস।
'হবে হবে, দেখা হবে'—
এ-কথা নীরব রবে
ধ্বনিত হয়েছে ক্ষণে ক্ষণে
অকথিত তব আমন্ত্রণে।

আমারো যাবার কাল এল শেষে আজি,
'হবে হবে, দেখা হবে' মনে ওঠে বাজি।
সেখানেও হাসিমুখে
বাহু মেলি লবে বুকে
নবজ্যোতির্দীপ্ত অনুরাগে,
সেই ছবি মনে-মনে জাগে।

এখানে গোপন চোর ধরার ধুলায়
করে সে বিষম চুরি যখন ভুলায়।
যদি ব্যথাহীন কাল
বিনাশের ফেলে জাল,
বিরহের স্মৃতি লয় হরি,
সব-চেয়ে সে-ক্ষতিরে ডরি।

তাই বলি, দীর্ঘ আয়ু দীর্ঘ অভিশাপ,
বিচ্ছেদের তাপ নাশে সেই বড়ো তাপ।
অনেক হারাতে হয়,
তারেও করিনে ভয়;
যতদিন ব্যথা রহে বাকি,
তার বেশি যেন নাহি থাকি।

১৯ ভাদ্র ১৩৪১
শান্তিনিকেতন

নাটক ও প্রহসন

বসন্ত

উৎসর্গ

শ্রীমান কবি নজ্‌রুল ইস্‌লাম
স্নেহভাজনেষু

১০ ফাল্গুন
১৩২৯

বসন্ত

রাজা। কবি!

কবি। কী মহারাজ।

রাজা। আমি মন্ত্রণাসভা থেকে পালিয়ে এসেছি।

কবি। সৎকার্য করেছেন। কিন্তু মহারাজের এমন সুমতি হল কেন।

রাজা। বৎসর শেষ হয়ে এল, রাজকোষ শূন্যপ্রায়। মন্ত্রণাসভায় বসলেই সচিবরা আসেন তাঁদের নিজ বিভাগের জন্যে টাকা দাবি করতে। কাজেই পলায়ন ছাড়া গতি নেই।

কবি। এতে উপকার হবে।

রাজা। কার উপকার হবে।

কবি। রাজ্যের।

রাজা। সে-কি কথা।

কবি। রাজা মাঝে-মাঝে সরে দাঁড়ালে প্রজারা রাজত্ব করবার অবকাশ পায়।

রাজা। তার অর্থ কী হল।

কবি। রাজার অর্থ যখন শূন্যে এসে ঠেকে প্রজা তখন নিজের অর্থ খুঁজে বের করে, তাতেই তার রক্ষা।

রাজা। কবি, তোমার কথাগুলো বাঁকা ঠেকছে। মন্ত্রণাসভা ছেড়ে এসেছি, আবার তোমার সঙ্গও ছাড়তে হবে নাকি।

কবি। না, তার দরকার হবে না। আপনি যখন পলাতক তখন তো আমাদেরই দলে এসে পড়েছেন।

রাজা। তোমার দলে?

কবি। হাঁ মহারাজ, আমি জন্মপলাতক।

গান

আমরা বাস্তুছাড়ার দল,
ভবের পদ্মপত্রে জল।
আমরা করছি টলমল।
মোদের আসাযাওয়া শূন্য হাওয়া
নাইকো ফলাফল।

রাজা। তুমি আমাকে দলে টানতে চাও? অতদূর এগোতে পারব না। আমাকে মন্ত্রীরা মিলে সভাছাড়া করেছে, তাই বলে কি কবির দলে ভিড়ে শেষে—

কবি। শুধু আমাকে দেখে ভয় পাবেন না, এ দলে আপনি রাজসঙ্গীও পাবেন।

রাজা। রাজসঙ্গী? কে বলো তো।

কবি। ঋতুরাজ।

রাজা। ঋতুরাজ? বসন্ত?

কবি। হাঁ মহারাজ। তিনি চিরপলাতক। আমারই মতো। পৃথ্বী তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে পৃথ্বীপতি করতে চেয়েছিল কিন্তু তিনি—

রাজা। বুঝেছি, বোধ করি রাজকোষের অবস্থা দেখে পালাতে ইচ্ছে করছেন।

কবি। পৃথিবীর রাজকোষ পূর্ণ করে দিয়ে তিনি পালান।

রাজা। কী দুঃখে।

কবি। দুঃখে নয়, আনন্দে।

রাজা। কবি, তোমার হেঁয়ালি রাখো; আমার অধ্যাপকের দল তোমার হেঁয়ালি শুনে রাগ করে, বলে ওগুলোর কোনো অর্থ নেই। আজ বসন্ত-উৎসবে কী পালা তৈরি করেছ সেইটে বলো।

কবি। আজ সেই পলাতকার পালা।

রাজা। বেশ বেশ। বুঝতে পারব তো?

কবি। বোঝাবার চেষ্টা করি নি।

রাজা। তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু না-বোঝাবার চেষ্টা কর নি তো?

কবি। না মহারাজ, এতে মূলেই অর্থ নেই, বোঝা না-বোঝার কোনো বালাই নেই, কেবল এতে সুর আছে।

রাজা। আচ্ছা বেশ, শুরু হ'ক। কিন্তু ওদিকে মন্ত্রণাসভার কাজ চলছে, আওয়াজ শুনে মন্ত্রীরা তো—

কবি। হাঁ মহারাজ, তাঁরাসুদ্ধ হয়তো পলাতকার দলে যোগ দিতে পারেন। তাতে দোষ কী হয়েছে। ফাল্গুন-যে পড়েছে।

রাজা। সর্বনাশ! এখানে এসে যদি আবার—

কবি। ভয় নেই। শূন্যকোষের কথাটা স্মরণ করিয়ে দেবার ভারই মন্ত্রীদের বটে, কিন্তু শূন্যকোষের কথা ভুলিয়ে দেবার ভারই তো কবির উপরে।

রাজা। তাহলে ভালো কথা। তাহলে আর দেরি নয়। ভোলবার অত্যন্ত দরকার হয়েছে। দলবল সব প্রস্তুত তো? আমাদের নাট্যাচার্য দিনপতি—

কবি। ওই তো তিনি ভারতীর কমলবনের মধুগন্ধে বিহ্বল হয়ে বসে আছেন।

রাজা। দেখে মনে হচ্ছে বটে শূন্য রাজকোষের কথায় ওঁর কিছুমাত্র খেয়াল নেই।

কবি। উনি আমাদের উৎসবের বন্ধু, দুর্ভিক্ষের দিনে ওঁকে না হলে চলে না। কারণ উনি ক্ষুধার কথা সুধা দিয়ে ভোলান।

রাজা। সাধু! আমার মন্ত্রীদের সঙ্গে ওঁর পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। বিশেষত আমার অর্থসচিবের সঙ্গে। তিনি অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে আছেন। তাঁর মনে যদি পুলক সঞ্চার করতে পারেন তাহলে—

কবি। ফস করে বেশি আশা দিয়ে ফেলবেন না— রাজকোষের অবস্থা যে রকম—

রাজা। হাঁ হাঁ, বটে বটে।—আচ্ছা, তবে তোমার পালা আরম্ভ হবে কী দিয়ে।

কবি। ঋতুরাজ আসবেন, প্রস্তুত হবার জন্যে আকাশে একটা ডাক পড়েছে।

রাজা। বলছে কী।

কবি। বলছে, সব দিয়ে ফেলতে হবে।

রাজা। নিজেকে একেবারে শূন্য ক'রে? সর্বনাশ!

কবি। না, নিজেকে পূর্ণ ক'রে। নইলে দেওয়া তো ফাঁকি দেওয়া।

রাজা। মানে কী হ'ল।

কবি। যে-দেওয়া সত্যি, সে দেওয়াতে ভরতি করে। বসন্ত-উৎসবে দানের দ্বারাই ধরণী ধনী হয়ে উঠবে।

রাজা। তাহলে ধরণীর সঙ্গে ধরণীপতির ওইখানে অমিল দেখতে পাচ্ছি। আমি তো দান করতে গিয়ে প্রায়ই বিপদে পড়ি— অর্থসচিবের মুখ অত্যন্ত গম্ভীর হতে থাকে।

কবি। যে-দান সত্য তার দ্বারা বাইরের ধন বিনাশ পায়, অন্তরের ধন বিকাশ পেতে থাকে।

রাজা। ও আবার কী। এটা উপদেশের মতো শোনাচ্ছে, কবি।

কবি। তাহলে আর দেরি নয়, গান শুরু হ'ক।

বসন্তের পরিচরগণ

সব দিবি কে, সব দিবি পায়,
আয় আয় আয়।
ডাক পড়েছে ওই শোনা যায়,
আয় আয় আয়।
আসবে-যে সে স্বর্ণরথে,
জাগবি কারা রিক্ত পথে
পৌষরজনী তাহার আশায়।
আয় আয় আয়।
ক্ষণেক কেবল তাহার খেলা,
হায় হায় হায়।
তার পরে তার যাবার বেলা,
হায় হায় হায়।
চলে গেলে জাগবি যবে
ধনরতন বোঝা হবে,
বহন করা হবে-যে দায়।
হায় হায় হায়।

রাজা। দাবি তো কম নয়।

কবি। দাবি বড়ো হলেই দান সহজ হয়; ছোটো হলেই কৃপণতা জাগায়

রাজা। তা এরা সব রাজী আছে?

কবি। ওদের মুখেই শুনে নিন।

বনভূমি

বাকি আমি রাখব না কিছুই।
তোমার চলার পথে পথে
ছেয়ে দেব ভুঁই।

ওগো মোহন, তোমার উত্তরীয়
গন্ধে আমার ভরে নিয়ো,
উজাড় করে দেব পায়ে
বকুল বেলা জুঁই।
দখিনসাগর পার হয়ে-যে
এলে পথিক তুমি।
আমার সকল দেব অতিথিরে
আমি বনভূমি।
আমার কুলায়ভরা রয়েছে গান,
সব তোমারেই করেছি দান,
দেবার কাঙাল করে আমায়
চরণ যখন ছুঁই।

আম্রকুঞ্জ

ফল ফলাবার আশা আমি মনেই রাখি নি রে।
আজ আমি তাই মুকুল ঝরাই দক্ষিণসমীরে।
বসন্তগান পাখিরা গায়,
বাতাসে তার সুর ঝরে যায়,
মুকুল ঝরার ব্যাকুল খেলা
আমারি সেই রাগিণী রে।
জানি নে ভাই, ভাবি নে তাই কী হবে মোর দশা
যখন আমার সারা হবে সকল ঝরা খসা।
এই কথা মোর শূন্য ডালে
বাজবে সেদিন তালে তালে,
'চরম দেওয়ায় সব দিয়েছি
মধুর মধুযামিনীরে।'

রাজা। ভাবখানা বুঝেছি কবি।

কবি। কী বুঝলেন।

রাজা। 'ফল ফলাব' বলে কোমর বেঁধে বসলে ফল ফলে না। মনের আনন্দে

'ফল চাই নে' বলতে পারলে, ফল আপনি ফলে ওঠে। আম্রকুঞ্জ মুকুল ঝরাতে ভরসা পায় বলেই তার ফল ধরে।

কবি। মহারাজ, এটা যেন উপদেশের মতো শোনাচ্ছে।

রাজা। ঠিক কথা। তাহলে গান ধরো।

করবী

যদি তারে নাই চিনি গো
সে কি আমায় নেবে চিনে
এই নব ফাল্গুনের দিনে।
(জানি নে জানি নে)
সে কি আমার কুঁড়ির কানে
ক'বে কথা গানে গানে,
পরান তাহার নেবে কিনে
এই নব ফাল্গুনের দিনে?
(জানি নে জানি নে)
সে কি আপন রঙে ফুল রাঙাবে।
সে কি মর্মে এসে ঘুম ভাঙাবে।
ঘোমটা আমার নতুন পাতার
হঠাৎ দোলা পাবে কি তার।
গোপন কথা নেবে জিনে
এই নব ফাল্গুনের দিনে?
(জানি নে জানি নে)

রাজা। ওদিকে ও কিসের গোলমাল শুনতে পাই।

কবি। দখিনহাওয়া-যে এল।

রাজা। তা হয়েছে কী।

কবি। বাইরের বেণুবন উতলা হয়ে উঠেছে, কিন্তু ঘরের কোণের দীপশিখাটি নববধূর মতো শঙ্কিত।

বেণুবন

দখিনহাওয়া, জাগো জাগো
জাগাও আমার সুপ্ত এ প্রাণ।
আমি বেণু, আমার শাখায়
নীরব-যে হায় কত-না গান।
(জাগো জাগো)

দীপশিখা

ধীরে ধীরে ধীরে বও
ওগো উতল হাওয়া।
নিশীথরাতের বাঁশি বাজে,
শান্ত হও গো, শান্ত হও

বেণুবন

পথের ধারে আমার কারা
ওগো পথিক বাঁধনহারা,
নৃত্য তোমার চিত্তে আমার
মুক্তিদোলা করে যে দান।

দীপশিখা

আমি প্রদীপশিখা তোমার লাগি
ভয়ে ভয়ে একা জাগি,
মনের কথা কানে-কানে
মৃদু মৃদু কও।

বেণুবন

গানের পাখা যখন খুলি
বাধাবেদন তখন ভুলি।

দীপশিখা

তোমার দূরের গাথা বনের বাণী
ঘরের কোণে দেয়-যে আনি।

বেণুবন

যখন আমার বুকের মাঝে
তোমার পথের বাঁশি বাজে,
বন্ধভাঙার ছন্দে আমার
মৌন কাঁদন হয় অবসান।
দখিনহাওয়া, জাগো জাগো,
জাগাও আমার সুপ্ত এ প্রাণ

দীপশিখা

আমার কিছু কথা আছে
ভোরের বেলার তারার কাছে,
সেই কথাটি তোমার কানে
চুপি চুপি লও।
ধীরে ধীরে বও
ওগো উতল হাওয়া।

ঋতুরাজের পরিচরবর্গ

সহসা ডালপালা তোর উতলা-যে!
(ও চাঁপা, ও করবী)
কারে তুই দেখতে পেলি
আকাশ-মাঝে
জানি না যে।
কোন্ সুরের মাতন হাওয়ায় এসে
বেড়ায় ভেসে,
(ও চাঁপা, ও করবী)

কার নাচনের নূপুর বাজে
জানি না যে।
তোরে ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগে।
কোন্ অজানার ধেয়ান যে তোর
মনে জাগে।
কোন্ রঙের মাতন উঠল দুলে
ফুলে ফুলে,
(ও চাঁপা, ও করবী)
কে সাজালে রঙিন সাজে
জানি না যে।

কবি। ঋতুরাজের দূতেরা ভাবছে কেউ খবর পায় নি— পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু পায়ের শব্দ যে হৃৎকম্পনের মধ্যে ধরা পড়ে।

মাধবী

সে কি ভাবে গোপন রবে
লুকিয়ে হৃদয় কাড়া।
তাহার আসা হাওয়ায় ঢাকা,
সে যে সৃষ্টিছাড়া।
হিয়ায় হিয়ায় জাগল বাণী,
পাতায় পাতায় কানাকানি,
'ওই এল যে', 'ওই এল যে'
পরান দিল সাড়া।
এই তো আমার আপনারি এই
ফুল ফোটানোর মাঝে
তারে দেখি নয়ন ভ'রে
নানা রঙের সাজে।
এই-যে পাখির গানে গানে
চরণধ্বনি বয়ে আনে,
বিশ্ববীণার তারে তারে
এই তো দিল নাড়া।

রাজা। কবি, ওই তো পূর্ণচন্দ্র উঠেছে দেখছি।

কবি। দখিনহাওয়ায় যেন কোন্ দেবতার স্বপ্ন ভেসে এল।

রাজা। শুধু দখিনহাওয়ায় ওকে ভাসালে চলবে না কবি, তোমার গানের সুরও চাই। জগতে কেবল যে দেবতাই আছেন তা তো নয়।

শালবীথিকা

ভাঙল হাসির বাঁধ।
অধীর হয়ে মাতল কেন
পূর্ণিমার ওই চাঁদ।
উতল হাওয়া ক্ষণে ক্ষণে
মুকুলছাওয়া বকুলবনে
দোল দিয়ে যায়, পাতায় পাতায়
ঘটায় পরমাদ।
ঘুমের আঁচল আকুল হল
কী উল্লাসের ভরে।
স্বপন যত ছড়িয়ে প'ল
দিকে দিগন্তরে।
আজ রাতের এই পাগলামিরে
বাঁধবে ব'লে কে ওই ফিরে,
শালবীথিকায় ছায়া গেঁথে
তাই পেতেছে ফাঁদ।

বকুল

ও আমার চাঁদের আলো,
আজ ফাগুনের সন্ধ্যাকালে
ধরা দিয়েছ যে আমার
পাতায় পাতায় ডালে ডালে।
যে-গান তোমার সুরের ধারায়
বন্যা জাগায় তারায় তারায়,

মোর আঙিনায় বাজল সে-সুর
আমার প্রাণের তালে তালে।
সব কুঁড়ি মোর ফুটে ওঠে
তোমার হাসির ইশারাতে।
দখিনহাওয়া দিশাহারা
আমার ফুলের গন্ধে মাতে।
শুভ্র, তুমি করলে বিলোল
আমার প্রাণে রঙের হিলোল,
মর্মরিত মর্ম আমার
জড়ায় তোমার হাসির জালে।

রাজা। সব তো বুঝলুম। আকাশ থেকে চাঁদ দেখছি পৃথিবীর হৃদয়কে দোলা লাগিয়েছে। কিন্তু ওঁকে পৃথিবীতে নামিয়ে এনে কষে দোলা না দিতে পারলে তো জবাব দেওয়া হয় না। তার কী করলে।

কবি। তার তো ব্যবস্থা হয়েছে মহারাজ। আমাদের নদীর ঢেউ আছে তো, সেদিকে চেয়ে দেখো না। চাঁদ টলোমলো।

নদী

কে দেবে চাঁদ তোমায় দোলা।
আপন আলোর স্বপন-মাঝে বিভোল ভোলা।
কেবল তোমার চোখের চাওয়ায়
দোলা দিলে হাওয়ায় হাওয়ায়,
বনে বনে দোল জাগাল
ওই চাহনি তুফানতোলা।
আজ মানসের সরোবরে
কোন্ মাধুরীর কমলকানন
দোলাও তুমি ঢেউয়ের 'পরে।
তোমার হাসির আভাস লেগে
বিশ্বদোলন দোলার বেগে
উঠল জেগে আমার গানের
কল্লোলিনী কলরোলা।

রাজা। এবার ওই কে আসে।

কবি। বলব না। চিনতে পারেন কিনা দেখতে চাই

দখিনহাওয়া

শুকনো পাতা কে যে ছড়ায় ওই দূরে
উদাসকরা কোন্ সুরে।
ঘরছাড়া ওই কে বৈরাগী
জানি না যে কাহার লাগি
ক্ষণে ক্ষণে শূন্য বনে যায় ঘুরে।
চিনি চিনি হেন ওরে হয় মনে,
ফিরে ফিরে যেন দেখা ওর সনে।
ছদ্মবেশে কেন খেল,
জীর্ণ এ বাস ফেলো ফেলো,
প্রকাশ করো চিরনূতন বন্ধুরে।

রাজা। ওহে কবি, তোমার এ পালাটা কী রকম করে তুলেছ। বরযাত্রীরই ভিড়, বর কোথায়। তোমার ঋতুরাজ কই।

কবি। ওই যে, এই খানিক আগে দেখলেন।

রাজা। ওই জীর্ণ বসন প'রে শুকনো পাতা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে? ওতে তো নবীনের রূপ দেখলুম না। ও তো মূর্তিমান পুরাতন।

কবি। তবে তো চিনতে পারেন নি, ঠকেছেন। আমাদের ঋতুরাজের যে গায়ের কাপড়খানা আছে, তার এক পিঠে নূতন, এক পিঠে পুরাতন। যখন উলটে পরেন তখন দেখি শুকনো পাতা, ঝরা ফুল; আবার যখন পালটে নেন তখন সকালবেলার মল্লিকা, সন্ধ্যাবেলার মালতী,— তখন ফাল্গুনের আম্রমঞ্জরি, চৈত্রের কনকচাঁপা। উনি একই মানুষ নূতনপুরাতনের মধ্যে লুকোচুরি করে বেড়াচ্ছেন।

রাজা। তাহলে নবীন মূর্তিটা একবার দেখিয়ে দাও। আর দেরি কেন।

কবি। ওই-যে এসেছেন। পথিকবেশে, নূতনপুরাতনের মাঝখানকার নিত্যযাতায়াতের পথে।

রাজা। তোমার পলাতকা বুঝি পথে-পথেই থাকেন?

কবি। হাঁ, উনি বাস্তুছাড়ার দলপতি, আমি ওঁরই গানের তলপি বয়ে বেড়াই।

গান

গানগুলি মোর শৈবালেরি দল—
ওরা বন্যাধারায় পথ যে হারায়
উদ্দাম চঞ্চল।
ওরা কেনই আসে যায় বা চ'লে,
অকারণের হাওয়ায় দোলে,
চিহ্ন কিছুই যায় না রেখে,
পায় না কোনো ফল।
ওদের সাধন তো নাই—
কিছু সাধন তো নাই;
ওদের বাঁধন তো নাই—
কোনো বাঁধন তো নাই।
উদাস ওরা উদাস করে
গৃহহারা পথের স্বরে,
ভুলে-যাওয়ার স্রোতের 'পরে
করে টলমল।

রাজা। আর দেরি নয়, কবি। ওই দেখো, মন্ত্রণাসভা থেকে অর্থসচিব এসেছে। রাজকোষের কথা পাড়বার পূর্বেই ঋতুরাজের আসর জমাও।

মাধবী মালতী ইত্যাদি

তোমার বাস কোথা-যে পথিক ওগো,
দেশে কি বিদেশে।
তুমি হৃদয়-পূর্ণ-করা, ওগো
তুমিই সর্বনেশে।

ঋতুরাজ

আমার বাস কোথা-যে জান নাকি,
শুধাতে হয় সে কথা কি,
ও মাধবী, ও মালতী।

মাধবী মালতী ইত্যাদি

হয়তো জানি, হয়তো জানি, হয়তো জানি নে,
মোদের বলে দেবে কে সে।
মনে করি আমার তুমি,
বুঝি নও আমার।
বলো বলো বলো পথিক,
বলো তুমি কার।

ঋতুরাজ

আমি তারি যে আমারে
যেমনি দেখে চিনতে পারে
ও মাধবী, ও মালতী।

মাধবী মালতী ইত্যাদি

হয়তো চিনি, হয়তো চিনি, হয়তো চিনি নে,
মোদের বলে দেবে কে সে।

বনপথ

আজ দখিনবাতাসে
নাম-না-জানা কোন্‌ বনফুল
ফুটল বনের ঘাসে।

ঋতুরাজ

ও মোর পথের সাথী, পথে পথে
গোপনে যায় আসে।

বনপথ

কৃষ্ণচূড়া চূড়ায় সাজে,
বকুল তোমার মালার মাঝে,

শিরীষ তোমার ভরবে সাজি—
ফুটেছে সেই আশে।

ঋতুরাজ

এ মোর পথের বাঁশির সুরে সুরে
লুকিয়ে কাঁদে হাসে।

বনপথ

ওরে দেখ বা নাই দেখ, ওরে
যাও বা না-যাও ভুলে।
ওরে নাই-বা দিলে দোলা, ওরে
নাই-বা নিলে তুলে।
সভায় তোমার ও কেহ নয়,
ওর সাথে নেই ঘরের প্রণয়,
যাওয়া-আসার আভাস নিয়ে
রয়েছে একপাশে।

ঋতুরাজ

ওগো ওর সাথে মোর প্রাণের কথা
নিশ্বাসে নিশ্বাসে।

রাজা। খুব জমেছে, কবি। সুরের দোলায় চাঁদকে দুলিয়েছ। ওই দেখো-না, আমার অর্থসচিবসুদ্ধ দুলছে।

কবি। এবার সময় হয়েছে।

রাজা। কিসের সময়।

কবি। ঋতুরাজের যাবার সময়।

রাজা। আমাদের অর্থসচিবকে চোখে পড়েছে নাকি।

কবি। বলেইছি তো, পূর্ণ থেকে রিক্ত, রিক্ত থেকে পূর্ণ, এরই মধ্যে ওঁর আনাগোনা। বাঁধন পরা, বাঁধন খোলা, এও যেমন এক খেলা, ওও তেমনি এক খেলা।

রাজা। আমি কিন্তু ওই পূর্ণ হওয়ার খেলাটাই পছন্দ করি।

কবি। যথার্থ পূর্ণ হয়ে উঠলে রিক্ত হওয়ার খেলায় ভয় থাকে না।

রাজা। বোধ হচ্ছে যেন এখনি উপদেশ দিতে শুরু করবে।

কবি। আচ্ছা তাহলে আবার গান শুরু হ'ক।

ঋতুরাজ

এখন আমার সময় হল,
যাবার দুয়ার খোলো খোলো।
হল দেখা, হল মেলা,
আলোছায়ায় হল খেলা,
স্বপন-যে সে ভোলো ভোলো।
আকাশ ভরে দূরের গানে,
অলখ দেশে হৃদয় টানে।
ওগো সুদূর, ওগো মধুর,
পথ বলে দাও পরানবঁধুর,
সব আবরণ তোলো তোলো।

মাধবী

বিদায় যখন চাইবে তুমি দক্ষিণসমীরে,
তোমায় ডাকব না তো ফিরে।
করব তোমায় কী সম্ভাষণ।
কোথায় তোমার পাতব আসন
পাতাঝরা কুসুমঝরা নিকুঞ্জকুটিরে।
তুমি আপ্‌নি যখন আস তখন
আপ্‌নি কর ঠাঁই,
আপ্‌নি কুসুম ফোটাও, মোরা
তাই দিয়ে সাজাই।
তুমি যখন যাও, চলে যাও,
সব আয়োজন হয়-যে উধাও,
গান ঘুচে যায়, রং মুছে যায়,
তাকাই অশ্রুনীরে।

ঋতুরাজ

এবেলা ডাক পড়েছে কোন্‌খানে
ফাগুনের ক্লান্ত ক্ষণের শেষ গানে।
সেখানে স্তব্ধ বীণার তারে তারে,
সুরের খেলা ডুবসাঁতারে,
সেখানে চোখ মেলে যার পাই নে দেখা
তাহারে মন জানে গো, মন জানে।
এবেলা মন যেতে চায় কোন্‌খানে
নিরালায় লুপ্ত পথের সন্ধানে।
সেখানে মিলনদিনের ভোলা হাসি
লুকিয়ে বাজায় করুণ বাঁশি,
সেখানে যে-কথাটি হয় না বলা
সে কথা রয় কানে গো, রয় কানে।

ঝুমকোলতা

না, যেয়ো না, যেয়ো নাকো।
মিলনপিয়াসী মোরা,
কথা রাখো, কথা রাখো।
আজো বকুল আপনহারা, হায় রে,
ফুল ফোটানো হয় নি সারা,
সাজি ভরে নি,
পথিক ওগো, থাকো থাকো।
চাঁদের চোখে জাগে নেশা,
তার আলো— গানে গন্ধে মেশা।
দেখো চেয়ে কোন্ বেদনায় হায় রে,
মল্লিকা ওই যায় চলে যায়
অভিমানিনী।
পথিক, তারে ডাকো ডাকো।

আকন্দ

এবার বিদায়বেলার সুর ধরো ধরো,
(ও চাঁপা, ও করবী)
তোমার শেষ ফুলে আজ সাজি ভরো।
যাবার পথে আকাশতলে
মেঘ রাঙা হল চোখের জলে,
ঝরে পাতা ঝর ঝর।
হেরো হেরো ওই রুদ্র রবি
স্বপ্ন ভাঙায় রক্তছবি।
খেয়াতরীর রাঙা পালে
আজ লাগল হাওয়া ঝড়ের তালে,
বেণুবনের ব্যাকুল শাখা থর থর।

ধুতুরা

আজ খেলাভাঙার খেলা খেলবি আয়।
সুখের বাসা ভেঙে ফেলবি আয়।
মিলনমালার আজ বাঁধন তো টুটবে,
ফাগুনদিনের আজ স্বপন তো ছুটবে,
উধাও মনের পাখা মেলবি আয়।
অস্তগিরির ওই শিখরচূড়ে
ঝড়ের মেঘের আজ ধ্বজা উড়ে।
কালবৈশাখীর হবে-যে নাচন,
সাথে নাচুক তোর মরণবাঁচন,
হাসিকাঁদন পায়ে ঠেলবি আয়।

জবা

ভয় করব না রে
বিদায়বেদনারে।

আপন সুধা দিয়ে
ভরে দেব তারে।
চোখের জলে সে-যে নবীন র'বে,
ধ্যানের মণিমালায় গাঁথা হবে,
পরব বুকের হারে।
নয়ন হতে তুমি আসবে প্রাণে,
মিলবে তোমার বাণী আমার গানে।
বিরহব্যথায় বিধুর দিনে
দুখের আলোয় তোমায় নেব চিনে,
এ মোর সাধনা রে।

সকলে

ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক,
বিচ্ছেদে তোর খণ্ডমিলন পূর্ণ হবে।
আয় রে সবে
প্রলয়গানের মহোৎসবে।
তাণ্ডবে ওই তপ্ত হাওয়ায় ঘূর্ণি লাগায়,
মত্ত ঈশান বাজায় বিষাণ শঙ্কা জাগায়,
ঝংকারিয়া উঠল আকাশ ঝঞ্ঝারবে।
আয় রে সবে
প্রলয়গানের মহোৎসবে।

রাজা। আমার মন্ত্রণাসভার দশা করলে কী। সব মন্ত্রী-যে এখানে এসে জুটেছে। ওই দেখো, আমার অর্থসচিবসুদ্ধ-যে নাচতে শুরু করে দিলে। বড়ো লঘু হয়ে পড়ছেন না?

কবি। ওঁর-যে থলি শূন্য হয়ে গেছে, তাই নাচে টেনেছে। বোঝা ভারি থাকলে গৌরবে নড়তে পারতেন না। আজ আমাদের অগৌরবের উৎসব।

রাজা। রাজগৌরব?

কবি। সেও টি঄কল না। তাই তো ঋতুরাজ আজ রাজবেশ খসিয়ে দিয়ে বৈরাগী হয়ে বেরিয়ে চলেছেন। এবার ধরণীতে তপস্যার দিন এসেছে, অর্থসচিবদের হাতে কাজ থাকবে না।

ভাঙনধরার ছিন্ন-করার রুদ্র নাটে
যখন সকল ছন্দ বিকল, বন্ধ কাটে,
মুক্তিপাগল বৈরাগীদের চিত্ততলে
প্রেমসাধনার হোমহুতাশন জ্বলবে তবে।
ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক,
সব আশাজাল যায় রে যখন উড়ে পুড়ে
আশার অতীত দাঁড়ায় তখন ভুবন জুড়ে,
স্তব্ধ বাণী নীরব স্বরে কথা কবে।
আয় রে সবে
প্রলয়গানের মহোৎসবে।

রক্তকরবী

নাট্যপরিচয়

এই নাটকটি সত্যমূলক। এর ঘটনাটি কোথাও ঘটেছে কিনা ঐতিহাসিকের 'পরে তার প্রমাণসংগ্রহের ভার দিলে পাঠকদের বঞ্চিত হতে হবে। এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে কবির জ্ঞানবিশ্বাস-মতে এটি সম্পূর্ণ সত্য।

ঘটনাস্থানটির প্রকৃত নামটি কী সে-সম্বন্ধে ভৌগোলিকদের মতভেদ থাকা সম্ভব। কিন্তু সকলেই জানেন এর ডাকনাম যক্ষপুরী। পণ্ডিতরা বলেন, পৌরাণিক যক্ষপুরীতে ধনদেবতা কুবেরের স্বর্ণসিংহাসন। কিন্তু এ-নাটকটি একেবারেই পৌরাণিক কালের নয়, একে রূপকও বলা যায় না। যে-জায়গাটার কথা হচ্ছে সেখানে মাটির নীচে যক্ষের ধন পোঁতা আছে। তাই সন্ধান পেয়ে পাতালে সুড়ঙ্গ-খোদাই চলছে, এইজন্যেই লোকে আদর ক'রে একে যক্ষপুরী নাম দিয়েছে। এই নাটকে এখানকার সুড়ঙ্গ-খোদাইকরদের সঙ্গে যথাকালে আমাদের পরিচয় হবে।

যক্ষপুরীর রাজার প্রকৃত নাম সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতের ঐক্য কেউ প্রত্যাশা করে না। এইটুকু জানি যে, এর একটি ডাকনাম আছে— মকররাজ। যথাসময়ে লোকমুখে এই নামকরণের কারণ বোঝা যাবে।

রাজমহলের বাহির-দেয়ালে একটি জালের জানলা আছে। সেই জালের আড়াল থেকে মকররাজ তাঁর ইচ্ছামতো পরিমাণে মানুষের সঙ্গে দেখাশোনা করে থাকেন। কেন তাঁর এমনতরো অদ্ভুত ব্যবহার তা নিয়ে নাটকের পাত্রগণ যেটুকু আলাপ আলোচনা করেছেন তার বেশি আমরা কিছু জানি নে।

এই রাজ্যের যাঁরা সর্দার তাঁরা যোগ্য লোক এবং যাকে বলে বহুদর্শী। রাজার তাঁরা অন্তরঙ্গ পার্ষদ। তাঁদের সতর্ক ব্যবস্থাগুণে খোদাইকরদের কাজের মধ্যে ফাঁক পড়তে পায় না এবং যক্ষপুরীর নিরন্তর উন্নতি হতে থাকে। এখানকার মোড়লরা একসময়ে খোদাইকর ছিল, নিজগুণে

তাদের পদবৃদ্ধি এবং উপাধিলাভ ঘটেছে। কর্মনিষ্ঠতায় তারা অনেক বিষয়ে সর্দারদের ছাড়িয়ে যায়। যক্ষপুরীর বিধিবিধানকে যদি কবির ভাষায় পূর্ণচন্দ্র বলা যায়, তবে তার কলঙ্কবিভাগের ভারটাই প্রধানত মোড়লদের 'পরে।

এছাড়া একজন গোঁসাইজি আছেন, তিনি নামগ্রহণ করেন ভগবানের কিন্তু অন্নগ্রহণ করেন সর্দারের। তাঁর দ্বারা যক্ষপুরীর অনেক উপকার ঘটে।

জেলেদের জালে দৈবাৎ মাঝে-মাঝে অখাদ্যজাতের জলচর জীব আটকা পড়ে। তাদের দ্বারা পেটভরা বা ট্যাঁকভরার কাজ তো হয়ই না, মাঝের থেকে তারা জাল ছিঁড়ে দিয়ে যায়। এই নাট্যের ঘটনাজালের মধ্যে নন্দিনী নামক একটি কন্যা তেমনিভাবে এসে পড়েছে। মকররাজ যে-বেড়ার আড়ালে থাকেন, সেইটেকে এই মেয়ে টিঁকতে দেয় না বুঝি।

নাটকের আরম্ভেই রাজার জালের জানলার বাহির-বারান্দায় এই কন্যাটির সঙ্গে দেখা হবে। জানলাটি যে কি-রকম তা সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করা অসম্ভব। যারা তার কারিগর তারাই তার কলাকৌশল বোঝে।

নাট্যঘটনার যতটুকু আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার সমস্তটাই এই রাজমহলের জালের জানলার বাহির-বারান্দায়। ভিতরে কী হচ্ছে, তার অতি অল্পই আমরা জানতে পাই।

রক্তকরবী

এই নাট্যব্যাপার যে-নগরকে আশ্রয় করিয়া আছে তাহার নাম যক্ষপুরী। এখানকার শ্রমিকদল মাটির তলা হইতে সোনা তুলিবার কাজে নিযুক্ত। এখানকার রাজা একটা অত্যন্ত জটিল আবরণের আড়ালে বাস করে। প্রাসাদের সেই জালের আবরণ এই নাটকের একটিমাত্র দৃশ্য। সেই আবরণের বহির্ভাগে সমস্ত ঘটনা

নন্দিনী ও কিশোর, সুড়ঙ্গ-খোদাইকর বালক

কিশোর। নন্দিনী, নন্দিনী, নন্দিনী!

নন্দিনী। আমাকে এত করে ডাকিস কেন, কিশোর। আমি কি শুনতে পাই নে।

কিশোর। শুনতে পাস জানি, কিন্তু আমার-যে ডাকতে ভালো লাগে। আর ফুল চাই তোমার? তাহলে আনতে যাই।

নন্দিনী। যা যা, এখনি কাজে ফিরে যা, দেরি করিস নে।

কিশোর। সমস্তদিন তো কেবল সোনার তাল খুঁড়ে আনি, তার মধ্যে একটু সময় চুরি করে তোর জন্যে ফুল খুঁজে আনতে পারলে বেঁচে যাই।

নন্দিনী। ওরে কিশোর, জানতে পারলে-যে ওরা শাস্তি দেবে।

কিশোর। তুমি-যে বলেছিলে, রক্তকরবী তোমার চাই-ই চাই। আমার আনন্দ এই যে, রক্তকরবী এখানে সহজে মেলে না। অনেক খুঁজেপেতে একজায়গায় জঞ্জালের পিছনে একটিমাত্র গাছ পেয়েছি।

নন্দিনী। আমাকে দেখিয়ে দে, আমি নিজে গিয়ে ফুল তুলে আনব।

কিশোর। অমন কথা বোলো না। নন্দিনী, নিষ্ঠুর হয়ো না। ওই গাছটি থাক্ আমার একটিমাত্র গোপন কথার মতো। বিশু তোমাকে গান শোনায়, সে তার নিজের গান। এখন থেকে তোমাকে আমি ফুল জোগাব, এ আমারই নিজের ফুল।

নন্দিনী। কিন্তু এখানকার জানোয়াররা তোকে শাস্তি দেয়, আমার-যে বুক ফেটে যায়।

কিশোর। সেই ব্যথায় আমার ফুল আরো বেশি করে আমারই হয়ে ফোটে। ওরা হয় আমার দুঃখের ধন।

নন্দিনী। কিন্তু তোদের এ দুঃখ আমি সইব কী করে।

কিশোর। কিসের দুঃখ। একদিন তোর জন্যে প্রাণ দেব নন্দিনী, এই কথা কতবার মনে-মনে ভাবি।

নন্দিনী। তুই তো আমাকে এত দিলি, তোকে আমি কী ফিরিয়ে দেব বল্‌ তো, কিশোর।

কিশোর। এই সত্যটি কর্‌ নন্দিনী, আমার হাত থেকেই রোজ সকালে ফুল নিবি।

নন্দিনী। আচ্ছা, তাই সই। কিন্তু তুই একটু সামলে চলিস।

কিশোর। না, আমি সামলে চলব না, চলব না। ওদের মারের মুখের উপর দিয়েই রোজ তোমাকে ফুল এনে দেব। [প্রস্থান

অধ্যাপকের প্রবেশ

অধ্যাপক। নন্দিনী! যেয়ো না, ফিরে চাও।

নন্দিনী। কী অধ্যাপক।

অধ্যাপক। ক্ষণে ক্ষণে অমন চমক লাগিয়ে দিয়ে চলে যাও কেন। যখন মনটাকে নাড়া দিয়েই যাও তখন না-হয় সাড়া দিয়েই বা গেলে। একটু দাঁড়াও, দুটো কথা বলি।

নন্দিনী। আমাকে তোমার কিসের দরকার।

অধ্যাপক। দরকারের কথা যদি বললে, ওই চেয়ে দেখো। আমাদের খোদাইকরের দল পৃথিবীর বুক চিরে দরকারের-বোঝা-মাথায় কীটের মতো সুড়ঙ্গর ভিতর থেকে উপরে উঠে আসছে। এই যক্ষপুরে আমাদের যা-কিছু ধন সব ওই ধুলোর নাড়ির ধন— সোনা। কিন্তু সুন্দরী, তুমি যে-সোনা সে তো ধুলোর নয়, সে-যে আলোর। দরকারের বাঁধনে তাকে কে বাঁধবে।

নন্দিনী। বারে বারে ওই একই কথা বল। আমাকে দেখে তোমার এত বিস্ময় কিসের অধ্যাপক।

অধ্যাপক। সকালে ফুলের বনে যে আলো আসে তাতে বিস্ময় নেই, কিন্তু পাকা দেয়ালের ফাটল দিয়ে যে আলো আসে সে আর-এক কথা। যক্ষপুরে তুমি সেই আচমকা আলো। তুমিই বা এখানকার কথা কী ভাবছ বলো দেখি।

নন্দিনী। অবাক হয়ে দেখছি, সমস্ত শহর মাটির তলাটার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে অন্ধকার হাতড়ে বেড়াচ্ছে। পাতালে সুড়ঙ্গ খুদে তোমরা যক্ষের ধন বের করে করে আনছ। সে যে অনেক যুগের মরা ধন, পৃথিবী তাকে কবর দিয়ে রেখেছিল।

অধ্যাপক। আমরা-যে সেই মরা ধনের শবসাধনা করি। তার প্রেতকে বশ করতে চাই। সোনার তালের তালবেতালকে বাঁধতে পারলে পৃথিবীকে পাব মুঠোর মধ্যে।

নন্দিনী। তার পরে আবার, তোমাদের রাজাকে এই একটা অদ্ভুত জালের দেয়ালের আড়ালে ঢাকা দিয়ে রেখেছ, সে-যে মানুষ পাছে সে-কথা ধরা পড়ে। তোমাদের ওই সুড়ঙ্গের অন্ধকার ডালাটা খুলে ফেলে তার মধ্যে আলো ঢেলে দিতে ইচ্ছে করে, তেমনি ইচ্ছে করে ওই বিশ্রী জালটাকে ছিঁড়ে ফেলে মানুষটাকে উদ্ধার করি।

অধ্যাপক। আমাদের মরা ধনের প্রেতের যেমন ভয়ংকর শক্তি, আমাদের মানুষ-ছাঁকা রাজারও তেমনি ভয়ংকর প্রতাপ।

নন্দিনী। এ-সব তোমাদের বানিয়ে-তোলা কথা।

অধ্যাপক। বানিয়ে-তোলাই তো। উলঙ্গের কোনো পরিচয় নেই, বানিয়ে-তোলা কাপড়েই কেউ-বা রাজা, কেউ-বা ভিখিরী। এসো আমার ঘরে। তোমাকে তত্ত্বকথা বুঝিয়ে দিতে বড়ো আনন্দ হয়।

নন্দিনী। তোমাদের খোদাইকর যেমন খনি খুদে খুদে মাটির মধ্যে তলিয়ে চলেছে, তুমিও তো তেমনি দিনরাত পুঁথির মধ্যে গর্ত খুঁড়েই চলেছ। আমাকে নিয়ে সময়ের বাজে খরচ করবে কেন।

অধ্যাপক। আমরা নিরেট নিরবকাশ-গর্তের পতঙ্গ, ঘন কাজের মধ্যে সেঁধিয়ে আছি; তুমি ফাঁকা সময়ের আকাশে সন্ধ্যাতারাটি, তোমাকে দেখে আমাদের ডানা চঞ্চল হয়ে ওঠে। এসো আমার ঘরে, তোমাকে নিয়ে একটু সময় নষ্ট করতে দাও।

নন্দিনী। না না, এখন না। আমি এসেছি তোমাদের রাজাকে তার ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখব।

অধ্যাপক। সে থাকে জালের আড়ালে, ঘরের মধ্যে ঢুকতে দেবে না।

নন্দিনী। আমি জালের বাধা মানি নে, আমি এসেছি ঘরের মধ্যে ঢুকতে।

অধ্যাপক। জান নন্দিনী, আমিও আছি একটা জালের পিছনে? মানুষের অনেকখানি বাদ দিয়ে পণ্ডিতটুকু জেগে আছে। আমাদের রাজা যেমন ভয়ংকর, আমিও তেমনি ভয়ংকর পণ্ডিত।

নন্দিনী। আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ তুমি। তোমাকে তো ভয়ংকর ঠেকে না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এরা আমাকে এখানে নিয়ে এল, রঞ্জনকে সঙ্গে আনলে না কেন।

অধ্যাপক। সব জিনিসকে টুকরো করে আনাই এদের পদ্ধতি। কিন্তু তাও বলি, এখানকার মরা ধনের মাঝখানে তোমার প্রাণের ধনকে কেন আনতে চাও।

নন্দিনী। আমার রঞ্জনকে এখানে আনলে এদের মরা পাঁজরের ভিতর প্রাণ নেচে উঠবে।

অধ্যাপক। একা নন্দিনীকে নিয়েই যক্ষপুরীর সর্দাররা হতবুদ্ধি হয়ে গেছে, রঞ্জনকে আনলে তাদের হবে কী।

নন্দিনী। ওরা জানে না ওরা কী অদ্ভুত। ওদের মাঝখানে বিধাতা যদি খুব একটা হাসি হেসে ওঠেন, তাহলেই ওদের চটকা ভেঙে যেতে পারে। রঞ্জন বিধাতার সেই হাসি।

অধ্যাপক। দেবতার হাসি সূর্যের আলো, তাতে বরফ গলে, কিন্তু পাথর টলে না। আমাদের সর্দারদের টলাতে গেলে গায়ের জোর চাই।

নন্দিনী। আমার রঞ্জনের জোর তোমাদের শঙ্খিনীনদীর মতো। ওই নদীর মতোই সে যেমন হাসতেও পারে তেমনি ভাঙতেও পারে। অধ্যাপক, তোমাকে আমার আজকের দিনের একটি গোপন খবর দিই। আজ রঞ্জনের সঙ্গে আমার দেখা হবে।

অধ্যাপক। জানলে কী করে।

নন্দিনী। হবে হবে, দেখা হবে। খবর এসেছে।

অধ্যাপক। সর্দারের চোখ এড়িয়ে কোন্ পথ দিয়ে খবর আসবে।

নন্দিনী। যে-পথে বসন্ত আসবার খবর আসে সেই পথ দিয়ে। তাতে লেগে আছে আকাশের রঙ, বাতাসের লীলা।

অধ্যাপক। তার মানে, আকাশের রঙে বাতাসের লীলায় উড়ো খবর এসেছে।

নন্দিনী। যখন রঞ্জন আসবে তখন দেখিয়ে দেব উড়ো খবর কেমন করে মাটিতে এসে পৌঁছল।

অধ্যাপক। রঞ্জনের কথা উঠলে নন্দিনীর মুখ আর থামতে চায় না। থাক্‌গে,

আমার তো আছে বস্তুতত্ত্ববিদ্যা, তার গহ্বরের মধ্যে ঢুকে পড়িগে, আর সাহস হচ্ছে না। (খানিকটা গিয়ে ফিরে এসে) নন্দিনী, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যক্ষপুরীকে তোমার ভয় করছে না ?

নন্দিনী। ভয় করবে কেন।

অধ্যাপক। গ্রহণের সূর্যকে জন্তুরা ভয় করে, পূর্ণ সূর্যকে ভয় করে না। যক্ষপুরী গ্রহণলাগা পুরী। সোনার গর্তের রাহুতে ওকে খাবলে খেয়েছে। ও নিজে আস্ত নয়, কাউকে আস্ত রাখতে চায় না। আমি তোমাকে বলছি, এখানে থেকো না। তুমি চলে গেলে ওই গর্তগুলো আমাদের সামনে আরো হাঁ করে উঠবে ; তবু বলছি, পালাও। যেখানকার লোকে দস্যুবৃত্তি ক'রে মা বসুন্ধরার আঁচলকে টুকরো টুকরো করে ছেঁড়ে না, সেইখানে রঞ্জনকে নিয়ে সুখে থাকোগে। (কিছুদূর গিয়ে ফিরে এসে) নন্দিনী, তোমার ডান হাতে ওই যে রক্তকরবীর কঙ্কণ, ওর থেকে একটি ফুল খসিয়ে দেবে ?

নন্দিনী। কেন, কী করবে তুমি।

অধ্যাপক। কতবার ভেবেছি, তুমি যে রক্তকরবীর আভরণ পর, তার একটা কিছু মানে আছে।

নন্দিনী। আমি তো জানি নে কী মানে।

অধ্যাপক। হয়তো তোমার ভাগ্যপুরুষ জানে। এই রক্ত-আভায় একটা ভয়-লাগানো রহস্য আছে, শুধু মাধুর্য নয়।

নন্দিনী। আমার মধ্যে ভয় ?

অধ্যাপক। সুন্দরের হাতে রক্তের তুলি দিয়েছে বিধাতা। জানি নে, রাঙা রঙে তুমি কী লিখন লিখতে এসেছ। মালতী ছিল, মল্লিকা ছিল, ছিল চামেলি ; সব বাদ দিয়ে এ-ফুল কেন বেছে নিলে। জান, মানুষ না জেনে অমনি করে নিজের ভাগ্য বেছে নেয় ?

নন্দিনী। রঞ্জন আমাকে কখনো কখনো আদর ক'রে বলে রক্তকরবী। জানি নে আমার কেমন মনে হয়, আমার রঞ্জনের ভালোবাসার রঙ রাঙা, সেই রঙ গলায় পরেছি, বুকে পরেছি, হাতে পরেছি।

অধ্যাপক। তা আমাকে ওর একটি ফুল দাও, শুধু ক্ষণকালের দান, ওর রঙের তত্ত্বটি বোঝবার চেষ্টা করি।

নন্দিনী। এই নাও। আজ রঞ্জন আসবে, সেই আনন্দে এই ফুলটি তোমাকে দিলুম। [অধ্যাপকের প্রস্থান

সুড়ঙ্গ-খোদাইকর গোকুলের প্রবেশ

গোকুল। একবার মুখ ফেরাও তো দেখি।— তোমাকে বুঝতেই পারলুম না। তুমি কে।

নন্দিনী। আমাকে যা দেখছ তা ছাড়া আমি কিছুই না। বোঝবার তোমার দরকার কী।

গোকুল। না বুঝলে ভালো ঠেকে না। এখানে তোমাকে রাজা কোন্ কাজের প্রয়োজনে এনেছে।

নন্দিনী। অকাজের প্রয়োজনে।

গোকুল। একটা কী মন্তর তোমার আছে। ফাঁদে ফেলেছ সবাইকে। সর্বনাশী তুমি। তোমার ওই সুন্দর মুখ দেখে যারা ভুলবে তারা মরবে। দেখি দেখি, সিঁথিতে তোমার ওই কী ঝুলছে।

নন্দিনী। রক্তকরবীর মঞ্জরি।

গোকুল। ওর মানে কী।

নন্দিনী। ওর কোনো মানেই নেই।

গোকুল। আমি কিচ্ছু তোমাকে বিশ্বাস করি নে। একটা কী ফন্দি করেছ। আজ দিন না যেতেই একটা-কিছু বিপদ ঘটাবে। তাই এত সাজ। ভয়ংকরী, ওরে ভয়ংকরী।

নন্দিনী। আমাকে দেখে তোমার এমন ভয়ংকর মনে হচ্ছে কেন।

গোকুল। দেখে মনে হচ্ছে, তুমি রাঙা আলোর মশাল। যাই, নির্বোধদের বুঝিয়ে বলিগে, 'সাবধান, সাবধান, সাবধান।' [প্রস্থান

নন্দিনী। (জালের দরজায় ঘা দিয়ে) শুনতে পাচ্ছ ?

নেপথ্যে। নন্দা, শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু বারে বারে ডেকো না, আমার সময় নেই, একটুও না।

নন্দিনী। আজ খুশিতে আমার মন ভরে আছে। সেই খুশি নিয়ে তোমার ঘরের মধ্যে যেতে চাই।

নেপথ্যে। না, ঘরের মধ্যে না, যা বলতে হয় বাইরে থেকে বলো।

নন্দিনী। কুঁদফুলের মালা গেঁথে পদ্মপাতায় ঢেকে এনেছি।

নেপথ্যে। নিজে পরো।

নন্দিনী। আমাকে মানায় না, আমার মালা রক্তকরবীর।

নেপথ্যে। আমি পর্বতের চূড়ার মতো, শূন্যতাই আমার শোভা।

নন্দিনী। সেই চূড়ার বুকেও ঝরনা ঝরে, তোমার গলাতেও মালা দুলবে। জাল খুলে দাও, ভিতরে যাব।

নেপথ্যে। আসতে দেব না, কী বলবে শীঘ্র বলো। সময় নেই।

নন্দিনী। দূর থেকে ওই গান শুনতে পাচ্ছ?

নেপথ্যে। কিসের গান।

নন্দিনী। পৌষের গান। ফসল পেকেছে, কাটতে হবে, তারি ডাক।

গান

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে— আয় রে চলে,
আয় আয় আয়।
ডালা-যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে,
মরি, হায় হায় হায়।

দেখছ না, পৌষের রোদ্দুর পাকা ধানের লাবণ্য আকাশে মেলে দিচ্ছে?

হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে
দিগ্‌বধূরা ধানের খেতে,
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে—
মরি, হায় হায় হায়।

তুমিও বেরিয়ে এসো রাজা, তোমাকে মাঠে নিয়ে যাই।

মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুশী হল,—
ঘরেতে আজ কে রবে গো। খোলো দুয়ার খোলো।

নেপথ্যে। আমি মাঠে যাব? কোন্ কাজে লাগব।

নন্দিনী। মাঠের কাজ তোমার যক্ষপুরীর কাজের চেয়ে অনেক সহজ।

নেপথ্যে। সহজ কাজটাই আমার কাছে শক্ত। সরোবর কি ফেনার-নূপুর-পরা ঝরনার মতো নাচতে পারে। যাও যাও, আর কথা কয়ো না, সময় নেই।

নন্দিনী। অদ্ভুত তোমার শক্তি। যেদিন আমাকে তোমার ভাণ্ডারে ঢুকতে দিয়েছিলে, তোমার সোনার তাল দেখে কিছু আশ্চর্য হই নি, কিন্তু যে বিপুল শক্তি দিয়ে অনায়াসে সেইগুলোকে নিয়ে চুড়ো করে সাজাচ্ছিলে, তাই দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম।

তবু বলি, সোনার পিণ্ড কি তোমার ওই হাতের আশ্চর্য ছন্দে সাড়া দেয়, যেমন সাড়া দিতে পারে ধানের খেত। আচ্ছা রাজা, বলো তো, পৃথিবীর এই মরা ধন দিনরাত নাড়াচাড়া করতে তোমার ভয় হয় না?

নেপথ্যে। কেন, ভয় কিসের।

নন্দিনী। পৃথিবী আপনার প্রাণের জিনিস আপনি খুশী হয়ে দেয়। কিন্তু যখন তার বুক চিরে মরা হাড়গুলোকে ঐশ্বর্য ব'লে ছিনিয়ে নিয়ে আস, তখন অন্ধকার থেকে একটা কানা রাক্ষসের অভিসম্পাত নিয়ে আস। দেখছ না, এখানে সবাই যেন কেমন রেগে আছে, কিম্বা সন্দেহ করছে, কিম্বা ভয় পাচ্ছে?

নেপথ্যে। অভিসম্পাত?

নন্দিনী। হাঁ, খুনোখুনি কাড়াকাড়ির অভিসম্পাত।

নেপথ্যে। শাপের কথা জানি নে। এ জানি যে আমরা শক্তি নিয়ে আসি। আমার শক্তিতে তুমি খুশী হও, নন্দিন?

নন্দিনী। ভারি খুশি লাগে। তাই তো বলছি আলোতে বেরিয়ে এসো, মাটির উপর পা দাও, পৃথিবী খুশী হয়ে উঠুক।

আলোর খুশি উঠল জেগে
ধানের শিষে শিশির লেগে,
ধরার খুশি ধরে না গো, ওই-যে উথলে,
মরি, হায় হায় হায়।

নেপথ্যে। নন্দিনী, তুমি কি জান, বিধাতা তোমাকেও রূপের মায়ার আড়ালে অপরূপ ক'রে রেখেছেন? তার মধ্যে থেকে ছিনিয়ে তোমাকে আমার মুঠোর ভিতর পেতে চাচ্ছি, কিছুতেই ধরতে পারছি নে। আমি তোমাকে উলটিয়ে পালটিয়ে দেখতে চাই, না পারি তো ভেঙেচুরে ফেলতে চাই।

নন্দিনী। ও কী বলছ তুমি।

নেপথ্যে। তোমার ওই রক্তকরবীর আভাটুকু ছেঁকে নিয়ে আমার চোখে অঞ্জন ক'রে পরতে পারি নে কেন। সামান্য পাপড়িক'টা আঁচল চাপা দিয়ে বাধা দিয়েছে। তেমনি বাধা তোমার মধ্যে— কোমল ব'লেই কঠিন। আচ্ছা নন্দিনী, আমাকে কী মনে কর, খুলে বলো তো।

নন্দিনী। সে আরেক দিন বলব। আজ তো তোমার সময় নেই, আজ যাই।

নেপথ্যে। না না, যেয়ো না, বলে যাও; আমাকে কী মনে কর বলো।

নন্দিনী। কতবার বলেছি, তোমাকে মনে করি আশ্চর্য। প্রকাণ্ড হাতে প্রচণ্ড জোর ফুলে ফুলে উঠেছে, ঝড়ের আগেকার মেঘের মতো— দেখে আমার মন নাচে।

নেপথ্যে। রঞ্জনকে দেখে তোমার মন-যে নাচে, সেও কি—

নন্দিনী। সে কথা থাক্‌, তোমার তো সময় নেই।

নেপথ্যে। আছে সময়, শুধু এই কথাটি বলে যাও।

নন্দিনী। সে-নাচের তাল আলাদা, তুমি বুঝবে না।

নেপথ্যে। বুঝব। বুঝতে চাই।

নন্দিনী। সব কথা ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারি নে, আমি যাই।

নেপথ্যে। যেয়ো না, বলো আমাকে তোমার ভালো লাগে কিনা।

নন্দিনী। হাঁ, ভালো লাগে।

নেপথ্যে। রঞ্জনের মতোই ?

নন্দিনী। ঘুরে-ফিরে একই কথা। এ-সব কথা তুমি বোঝ না।

নেপথ্যে। কিছু কিছু বুঝি। আমি জানি রঞ্জনের সঙ্গে আমার তফাতটা কী। আমার মধ্যে কেবল জোরই আছে, রঞ্জনের মধ্যে আছে জাদু।

নন্দিনী। জাদু বলছ কাকে।

নেপথ্যে। বুঝিয়ে বলব ? পৃথিবীর নিচের তলায় পিণ্ড পিণ্ড পাথর লোহা সোনা, সেইখানে রয়েছে জোরের মূর্তি। উপরের তলায় একটুখানি কাঁচা মাটিতে ঘাস উঠছে, ফুল ফুটছে— সেইখানে রয়েছে জাদুর খেলা। দুর্গমের থেকে হীরে আনি, মানিক আনি ; সহজের থেকে ওই প্রাণের জাদুটুকু কেড়ে আনতে পারি নে।

নন্দিনী। তোমার এত আছে, তবু কেবলই অমন লোভীর মতো কথা বল কেন।

নেপথ্যে। আমার যা আছে সব বোঝা হয়ে আছে। সোনাকে জমিয়ে তুলে তো পরশমণি হয় না,— শক্তি যতই বাড়াই যৌবনে পৌঁছল না। তাই পাহারা বসিয়ে তোমাকে বাঁধতে চাই ; রঞ্জনের মতো যৌবন থাকলে ছাড়া রেখেই তোমাকে বাঁধতে পারতুম। এমনি ক'রে বাঁধনের রশিতে গাঁট দিতে দিতেই সময় গেল। হায় রে, আর-সব বাঁধা পড়ে, কেবল আনন্দ বাঁধা পড়ে না।

নন্দিনী। তুমি তো নিজেকেই জালে বেঁধেছ, তার পরে কেন এমন ছটফট করছ বুঝতে পারি নে।

নেপথ্যে। বুঝতে পারবে না। আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি— তোমার মতো একটি

ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাঁড়িয়ে বলছি, আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত। তৃষ্ণার দাহে এই মরুটা কত উর্বরা ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে, তাতে মরুর পরিসরই বাড়ছে, ওই একটুখানি দুর্বল ঘাসের মধ্যে যে-প্রাণ আছে তাকে আপন করতে পারছে না।

নন্দিনী। তুমি-যে এত ক্লান্ত তোমাকে দেখে তো তা মনেই হয় না। আমি তো তোমার মস্ত জোরটাই দেখতে পাচ্ছি।

নেপথ্যে। নন্দিন, একদিন দূরদেশে আমারই মতো একটা ক্লান্ত পাহাড় দেখেছিলুম। বাইরে থেকে বুঝতেই পারি নি তার সমস্ত পাথর ভিতরে ভিতরে ব্যথিয়ে উঠেছে। একদিন গভীর রাতে ভীষণ শব্দ শুনলুম, যেন কোন্ দৈত্যের দুঃস্বপ্ন গুমরে গুমরে হঠাৎ ভেঙে গেল। সকালে দেখি পাহাড়টা ভূমিকম্পের টানে মাটির নিচে তলিয়ে গেছে। শক্তির ভার নিজের অগোচরে কেমন ক'রে নিজেকে পিষে ফেলে, সেই পাহাড়টাকে দেখে তাই বুঝেছিলুম। আর, তোমার মধ্যে একটা জিনিস দেখছি —সে এর উলটো।

নন্দিনী। আমার মধ্যে কী দেখছ।

নেপথ্যে। বিশ্বের বাঁশিতে নাচের যে-ছন্দ বাজে সেই ছন্দ।

নন্দিনী। বুঝতে পারলুম না।

নেপথ্যে। সেই ছন্দে বস্তুর বিপুল ভার হালকা হয়ে যায়। সেই ছন্দে গ্রহনক্ষত্রের দল ভিখারী নটবালকের মতো আকাশে আকাশে নেচে বেড়াচ্ছে। সেই নাচের ছন্দেই নন্দিনী, তুমি এমন সহজ হয়েছ, এমন সুন্দর। আমার তুলনায় তুমি কতটুকু, তবু তোমাকে ঈর্ষা করি।

নন্দিনী। তুমি নিজেকে সবার থেকে হরণ করে রেখে বঞ্চিত করেছ ; সহজ হয়ে ধরা দাও না কেন।

নেপথ্যে। নিজেকে গুপ্ত রেখে বিশ্বের বড়ো বড়ো মালখানার মোটা মোটা জিনিস চুরি করতে বসেছি। কিন্তু যে-দান বিধাতার হাতের মুঠির মধ্যে ঢাকা, সেখানে তোমার চাঁপার কলির মতো আঙুলটি যতটুকু পৌঁছয়, আমার সমস্ত দেহের জোর তার কাছ দিয়ে যায় না। বিধাতার সেই বন্ধ মুঠো আমাকে খুলতেই হবে।

নন্দিনী। তোমার এ-সব কথা আমি ভালো বুঝতে পরি নে, আমি যাই।

নেপথ্যে। আচ্ছা যেয়ো,— কিন্তু জানলার বাইরে এই হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি, তোমার হাতখানি একবার এর উপর রাখো।

নন্দিনী। না না, তোমার সবখানা বাদ দিয়ে হঠাৎ একখানা হাত বেরিয়ে এলে আমার ভয় করে।

নেপথ্যে। কেবল একখানা হাত দিয়ে ধরতে চাই বলেই সবাই আমার কাছ থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু সব দিয়ে যদি তোমাকে ধরতে চাই, ধরা দেবে কি, নন্দিন।

নন্দিনী। তুমি তো আমাকে ঘরে যেতে দিলে না, তবে কেন এ-সব বলছ।

নেপথ্যে। আমার অনবকাশের উজান ঠেলে তোমাকে ঘরে আনতে চাই নে। যেদিন পালের হাওয়ায় তুমি অনায়াসে আসবে সেই দিন আগমনীর লগ্ন লাগবে। সে-হাওয়া যদি ঝড়ের হাওয়া হয় সেও ভালো। এখনো সময় হয় নি।

নন্দিনী। আমি তোমাকে বলছি রাজা, সেই পালের হাওয়া আনবে রঞ্জন। সে যেখানে যায় ছুটি সঙ্গে নিয়ে আসে।

নেপথ্যে। তোমার রঞ্জন যে-ছুটি বয়ে নিয়ে বেড়ায় সেই ছুটিকে রক্তকরবীর মধু দিয়ে ভরে রাখে কে, আমি কি জানি নে। নন্দিন, তুমি তো আমাকে ফাঁকা ছুটির খবর দিলে, মধু কোথায় পাব।

নন্দিনী। আজ আমি তবে যাই।

নেপথ্যে। না, এই কথাটার জবাব দিয়ে যাও।

নন্দিনী। ছুটি কী ক'রে মধুতে ভরে, তার জবাব রঞ্জনকে চোখে দেখলেই পাবে। সে বড়ো সুন্দর।

নেপথ্যে। সুন্দরের জবাব সুন্দরই পায়। অসুন্দর যখন জবাব ছিনিয়ে নিতে চায়, বীণার তার বাজে না, ছিঁড়ে যায়। আর নয়, যাও তুমি চলে যাও— নইলে বিপদ ঘটবে।

নন্দিনী। যাচ্ছি, কিন্তু বলে গেলুম, আজ আমার রঞ্জন আসবে, আসবে, আসবে,— কিছুতে তাকে ঠেকাতে পারবে না। [প্রস্থান

ফাগুলাল খোদাইকর ও তার স্ত্রী চন্দ্রার প্রবেশ

ফাগুলাল। আমার মদ কোথায় লুকিয়েছ চন্দ্রা, বের করো।

চন্দ্রা। ওকি কথা। সকাল থেকেই মদ ?

ফাগুলাল। আজ ছুটির দিন। কাল ওদের মারণচণ্ডীর ব্রত গেছে। আজ ধ্বজাপূজা, সেই সঙ্গে অস্ত্রপূজা।

চন্দ্রা। বল-কি। ওরা কি ঠাকুরদেবতা মানে।

ফাগুলাল। দেখ নি ওদের মদের ভাঁড়ার, অস্ত্রশালা আর মন্দির একেবারে গায়ে গায়ে ?

চন্দ্রা। তা ছুটি পেয়েছ বলেই মদ ? গাঁয়ে থাকতে পার্বণের ছুটিতে তো—

ফাগুলাল। বনের মধ্যে পাখি ছুটি পেলে উড়তে পায়, খাঁচার মধ্যে তাকে ছুটি দিলে মাথা ঠুকে মরে। যক্ষপুরে কাজের চেয়ে ছুটি বিষম বালাই।

চন্দ্রা। কাজ ছেড়ে দাও-না, চলো-না ঘরে ফিরে।

ফাগুলাল। ঘরের রাস্তা বন্ধ, জান না বুঝি ?

চন্দ্রা। কেন বন্ধ।

ফাগুলাল। আমাদের ঘর নিয়ে ওদের কোনো মুনফা নেই।

চন্দ্রা। আমরা কি ওদের দরকারের গায়ে আঁট ক'রে লাগানো, যেন ধানের গায়ে তুঁষ ? ফালতো কিছুই নেই ?

ফাগুলাল। আমাদের বিশুপাগল বলে, আস্ত হয়ে থাকাটা কেবল পাঁঠার নিজের পক্ষেই দরকার ; যারা তাকে খায়, তার হাড়গোড় খুরলেজ বাদ দিয়েই খায়। এমন-কি, হাড়কাঠের সামনে তারা যে ভ্যাঁ করে ডাকে, সেটাকেও বাহুল্য বলে আপত্তি করে। ওই-যে বিশুপাগল গান গাইতে গাইতে আসছে।

চন্দ্রা। কিছুদিন থেকে হঠাৎ ওর গান খুলে গেছে।

ফাগুলাল। তাই তো দেখছি।

চন্দ্রা। ওকে নন্দিনীতে পেয়েছে, সে ওর প্রাণ টেনেছে, গানও টেনেছে।

ফাগুলাল। তাতে আর আশ্চর্যটা কী।

চন্দ্রা। না, আশ্চর্য কিছুই নেই। ওগো সাবধান থেকো, কোন্ দিন তোমারও গলা থেকে গান বের করবে— সেদিন পাড়ার লোকের কী দশা হবে। মায়াবিনী মায়া জানে। বিপদ ঘটাবে।

ফাগুলাল। বিশুর বিপদ আজ ঘটে নি, এখানে আসবার অনেক আগে থাকতেই ও নন্দিনীকে জানে।

চন্দ্রা। বিশুবেয়াই, শুনে যাও, শুনে যাও। যাও কোথায়। গান শোনাবার লোক এখানেও এক-আধজন মিলতে পারে, নিতান্ত লোকসান হবে না।

বিশুর প্রবেশ ও গান

মোর স্বপনতরীর কে তুই নেয়ে।
লাগল পালে নেশার হাওয়া,

পাগল পরান চলে গেয়ে।
আমায় ভুলিয়ে দিয়ে যা
তোর ভুলিয়ে দিয়ে না,
তোর সুদূর ঘাটে চল্ রে বেয়ে।

চন্দ্রা। তবে তো আশা নেই, আমরা-যে বড়ো কাছে।

বিশু। আমার ভাবনা তো সব মিছে,
আমার সব পড়ে থাক্ পিছে।
তোমার ঘোমটা খুলে দাও,
তোমার নয়ন তুলে চাও,
দাও হাসিতে মোর পরান ছেয়ে

চন্দ্রা। তোমার স্বপনতরীর নেয়েটি কে সে আমি জানি।

বিশু। বাইরে থেকে কেমন করে জানবে। আমার তরীর মাঝখান থেকে তাকে তো দেখ নি।

চন্দ্রা। তরী ডোবাবে একদিন বলে দিলুম, তোমার সেই সাধের নন্দিনী।

গোকুল খোদাইকরের প্রবেশ

গোকুল। দেখো বিশু, তোমার ওই নন্দিনীকে ভালো ঠেকছে না।

বিশু। কেন, কী করেছে।

গোকুল। কিছুই করে না, তাই তো খটকা লাগে। এখানকার রাজা খামকা ওকে আনালে কেন। ওর রকমসকম কিছুই বুঝি নে।

চন্দ্রা। বেয়াই, এ আমাদের দুঃখের জায়গা, ও-যে এখানে অষ্টপ্রহর কেবল সুন্দরিপনা করে বেড়ায়, এ আমরা দেখতে পারি নে।

গোকুল। আমরা বিশ্বাস করি সাদা মোটাগোছের চেহারা, বেশ ওজনে ভারী।

বিশু। যক্ষপুরীর হাওয়ায় সুন্দরের 'পরে অবজ্ঞা ঘটিয়ে দেয়, এইটেই সর্বনেশে। নরকেও সুন্দর আছে, কিন্তু সুন্দরকে কেউ সেখানে বুঝতেই পারে না, নরকবাসীর সব চেয়ে বড়ো সাজা তাই।

চন্দ্রা। আচ্ছা বেশ, আমরাই যেন মুর্খু, কিন্তু এখানকার সর্দার পর্যন্ত ওকে দুচক্ষে দেখতে পারে না, তা জান ?

বিশু। দেখো দেখো চন্দ্রা, সর্দারের দুচক্ষুর ছোঁয়াচ যেন তোমাকে না লাগে, তাহলে আমাদের দেখেও তোমার চক্ষু লাল হয়ে উঠবে।— আচ্ছা, তুই কী বলিস ফাগুলাল।

ফাগুলাল। সত্যি কথা বলি দাদা, নন্দিনীকে যখন দেখি, নিজের দিকে তাকিয়ে লজ্জা করে। ওর সামনে কথা কইতে পারি নে।

গোকুল। বিশুভাই, ওই মেয়েকে দেখে তোমার মন ভুলেছে সেইজন্যে দেখতে পাচ্ছ না ও কী অলক্ষণ নিয়ে এসেছে। বুঝতে বেশি দেরি হবে না, বলে রাখলুম।

ফাগুলাল। বিশুভাই, তোমার বেয়ান জানতে চায় আমরা মদ খাই কেন।

বিশু। স্বয়ং বিধির কৃপায় মদের বরাদ্দ জগতের চারদিকেই, এমন-কি, তোমাদের ওই চোখের কটাক্ষে। আমাদের এই বাহুতে আমরা কাজ জোগাই, তোমাদের বাহুর বন্ধনে তোমরা মদ জোগাও। জীবলোকে মজুরি করতে হয়, আবার মজুরি ভুলতেও হয়। মদ না হলে ভোলাবে কিসে।

চন্দ্রা। তাই বই কি। তোমাদের মতো জন্মমাতালের জন্যে বিধাতার দয়ার অন্ত নেই। মদের ভাণ্ড উপুড় করে দিয়েছেন।

বিশু। একদিকে ক্ষুধা মারছে চাবুক, তৃষ্ণা মারছে চাবুক; তারা জ্বালা ধরিয়েছে,— বলছে, কাজ করো। অন্য দিকে বনের সবুজ মেলেছে মায়া রোদের সোনা মেলেছে মায়া, ওরা নেশা ধরিয়েছে,— বলছে, ছুটি ছুটি।

চন্দ্রা। এইগুলোকে মদ বলে নাকি।

বিশু। প্রাণের মদ, নেশা ফিকে, কিন্তু দিনরাত লেগে আছে। প্রমাণ দেখো। এ রাজ্যে এলুম, পাতালে সিঁধকাটার কাজে লাগলুম, সহজ মদের বরাদ্দ বন্ধ হয়ে গেল। অন্তরাত্মা তাই তো হাটের মদ নিয়ে মাতামাতি করছে। সহজ নিশ্বাসে যখন বাধা পড়ে, তখনই মানুষ হাঁপিয়ে নিশ্বাস টানে।

গান

তোর প্রাণের রস তো শুকিয়ে গেল ওরে,
তবে মরণরসে নে পেয়ালা ভরে।
সে-যে চিতার আগুন গালিয়ে ঢালা,
সব জ্বলনের মেটায় জ্বালা,
সব শূন্যকে সে অট্ট হেসে দেয়-যে রঙিন করে।

চন্দ্রা। এসো-না বেয়াই, পালাই আমরা।

বিশু। সেই নীল চাঁদোয়ার নিচে, খোলা মদের আড্ডায়! রাস্তা বন্ধ। তাই তো এই কয়েদখানার চোরাই মদের ওপর এমন ভয়ংকর টান। আমাদের না আছে আকাশ, না আছে অবকাশ; তাই বারো ঘণ্টার সমস্ত হাসি গান সূর্যের আলো কড়া করে চুঁইয়ে নিয়েছি একচুমুকের তরল আগুনে। যেমন ঠাস দাসত্ব তেমনি নিবিড় ছুটি।

তোর সূর্য ছিল গহন মেঘের মাঝে,
তোর দিন মরেছে অকাজেরি কাজে,
তবে আসুক-না সেই তিমিররাতি,
লুপ্তিনেশার চরম সাথী,
তোর ক্লান্ত আঁখি দিক্‌ সে ঢাকি দিকভোলাবার ঘোরে।

চন্দ্রা। যাই বল বিশুবেয়াই, যক্ষপুরীতে এসে তোমরাই মজেছ। আমাদের মেয়েদের তো কিছু বদল হয় নি।

বিশু। হয় নি তো কী। তোমাদের ফুল গেছে শুকিয়ে, এখন 'সোনা সোনা' করে প্রাণটা খাবি খাচ্ছে।

চন্দ্রা। কখ্‌খনো না।

বিশু। আমি বলছি 'হাঁ'। ওই যে ফাগু হতভাগা বারো ঘণ্টার পরে আরো চার ঘণ্টা যোগ ক'রে খেটে মরে, তার কারণটা ফাগুও জানে না, তুমিও জান না। অন্তর্যামী জানেন। তোমার সোনার স্বপ্ন ভিতরে-ভিতরে ওকে চাবুক মারে, সে চাবুক সর্দারের চাবুকের চেয়েও কড়া।

চন্দ্রা। আচ্ছা বেশ, তা চলো-না কেন, এখান থেকে দেশে ফিরে যাই।

বিশু। সর্দার কেবল-যে ফেরবার পথ বন্ধ করেছে তা নয়, ইচ্ছেটা সুদ্ধ আটকেছে। আজ যদি-বা দেশে যাও টিঁকতে পারবে না, কালই সোনার নেশায় ছুটে ফিরে আসবে, আফিমখোর পাখি যেমন ছাড়া পেলেও খাঁচায় ফেরে।

ফাগুলাল। আচ্ছা ভাই বিশু, তুমি তো একদিন পুঁথি পড়ে পড়ে চোখ খোয়াতে বসেছিলে, তোমাকে আমাদের মতো মুর্খদের সঙ্গে কোদাল ধরালে কেন।

চন্দ্রা। এতদিন আছি, এই কথাটির জবাব বেয়াই-এর কাছ থেকে কিছুতেই আদায় করা গেল না।

ফাগুলাল। অথচ কথাটা সবাই জানে।

বিশু। কী বলো দেখি।

ফাগুলাল। আমাদের খবর নেবার জন্যে ওরা তোমাকে চর রেখেছিল।

বিশু। সবাই জানতিস যদি তো আমাকে জ্যান্ত রাখলি কেন।

ফাগুলাল। এও জানি এ কাজ তোমার দ্বারা হল না।

চন্দ্রা। এমন আরামের কাজেও টিঁকতে পারলে না, বেয়াই?

বিশু। আরামের কাজ? একটা সজীব দেহ, তার পিছনে পৃষ্ঠব্রণ হয়ে লেগে থাকা! বললুম, 'দেশে যাব, শরীর বড়ো খারাপ।' সর্দার বললেন, 'আহা, এত খারাপ শরীর নিয়ে দেশে যাবেই বা কেমন করে। তবু চেষ্টা দেখো।' চেষ্টা দেখলুম। শেষে দেখি যক্ষপুরীর কবলের মধ্যে ঢুকলে তার হাঁ বন্ধ হয়ে যায়, এখন তার জঠরের মধ্যে যাবার একটি পথ ছাড়া আর পথই নেই। আজ তার সেই আশাহীন আলোহীন জঠরের মধ্যে তলিয়ে গেছি। এখন তোতে-আমাতে তফাত এই যে, সর্দার তোকে যতটা অবজ্ঞা করে আমাকে তার চেয়েও বেশী। ছেঁড়া কলাপাতার চেয়ে ভাঙা ভাঁড়ের প্রতি মানুষের হেলা।

ফাগুলাল। দুঃখ কী, বিশুদাদা। আমরা তো তোমাকে মাথায় করে রেখেছি।

বিশু। প্রকাশ পেলেই মারা যাব। তোদের আদর পড়ে যেখানে সর্দারের দৃষ্টি পড়ে সেখানেই, সোনাব্যাঙ যতই মকমক্ শব্দে কোলাব্যাঙের অভ্যর্থনা করে, সেটা কানে গিয়ে পৌঁছয় বোড়াসাপের।

চন্দ্রা। কতদিনে তোমাদের কাজ ফুরবে?

বিশু। পাঁজিতে তো দিনের শেষ লেখে না। এক দিনের পর দু দিন, দু দিনের পর তিন দিন; সুড়ঙ্গ কেটেই চলেছি, এক হাতের পর দু হাত, দু হাতের পর তিন হাত। তাল তাল সোনা তুলে আনছি, এক তালের পর দু তাল, দু তালের পর তিন তাল। যক্ষপুরে অঙ্কের পর অঙ্ক সার বেঁধে চলেছে, কোনো অর্থে পৌঁছয় না। তাই ওদের কাছে আমরা মানুষ নই, কেবল সংখ্যা। ফাগুভাই, তুমি কোন্ সংখ্যা।

ফাগুলাল। পিঠের কাপড়ে দাগা আছে, আমি ৪৭ ফ।

বিশু। আমি ৬৯ ঙ। গাঁয়ে ছিলুম মানুষ, এখানে হয়েছি দশপঁচিশের ছক। বুকের উপর দিয়ে জুয়োখেলা চলছে।

চন্দ্রা। বেয়াই, ওদের সোনা তো অনেক জমল, আরো কি দরকার।

বিশু। দরকার বলে পদার্থের শেষ আছে। খাওয়ার দরকার আছে, পেট ভরিয়ে তার শেষ পাওয়া যায়; নেশার দরকার নেই, তার শেষও নেই। ওই সোনার তালগুলো-যে মদ, আমাদের যক্ষরাজের নিরেট মদ। বুঝতে পারলে না?

চন্দ্রা। না।

বিশু। মদের পেয়ালা নিয়ে ভুলে যাই ভাগ্যের গণ্ডির মধ্যে আমরা বাঁধা। মনে করি আমাদের অবাধ ছুটি। সোনার তাল হাতে নিয়ে এখানকার কর্তার সেই মোহ লাগে। সে ভাবে সর্বসাধারণের মাটির টান ওতে পৌঁছয় না, অসাধারণের আসমানে ও উড়ছে।

চন্দ্রা। নবান্নের সময় এল ব'লে, গ্রামে গ্রামে তার জোগাড় চলছে। পায়ে পড়ি, ঘরে চলো। একবার সর্দারকে গিয়ে আমরা যদি—

বিশু। স্ত্রীবুদ্ধিতে সর্দারকে এখনো চেন নি বুঝি?

চন্দ্রা। কেন, ওকে দেখে তো আমার বেশ—

বিশু। হাঁ, বেশ ঝক্‌ঝকে। মকরের দাঁত, খাঁজে খাঁজে বড়ো পরিপাটি করে কামড়ে ধরে। মকররাজ স্বয়ং ইচ্ছে করলেও আলগা করতে পারে না।

চন্দ্রা। ওই-যে সর্দার।

বিশু। তবেই হয়েছে। আমাদের কথা নিশ্চয়ই শুনেছে।

চন্দ্রা। কেন, এমন তো কিছু বলি নি যাতে—

বিশু। বেয়ান, কথা আমরা বলি, মানে-যে করে ওরা। কাজেই কোন্ কথার টিকে কোন্ চালে আগুন লাগায় কেউ জানে না।

সর্দারের প্রবেশ

চন্দ্রা। সর্দারদাদা!

সর্দার। কী নাতনী, খবর ভালো তো?

চন্দ্রা। একবার বাড়ি যেতে ছুটি দাও।

সর্দার। কেন। যে-বাসা দিয়েছি সে তো খাসা, বাড়ির চেয়ে অনেক ভালো। সরকারী খরচে চৌকিদার পর্যন্ত রাখা গেছে। কী হে ৬৯ ঙ, তোমাকে এদের মধ্যে দেখলে মনে হয় সারস এসেছেন বকের দলকে নাচ শেখাতে।

বিশু। সর্দারজি, তোমার ঠাট্টা শুনে আমোদ লাগছে না। নাচাবার মতো পায়ের জোর থাকলে এখান থেকে টেনে দৌড় মারতুম। তোমাদের এলাকায় নাচানো ব্যবসা কত সাংঘাতিক তার মোটা মোটা দৃষ্টান্ত দেখেছি, এমন হয়েছে সাদা চালে চলতেও পা কাঁপে।

সর্দার। নাতনী, একটা সুখবর আছে। এদের ভালোকথা শোনাবার জন্যে

কেনারাম গোঁসাইকে আনিয়ে রেখেছি। এদের কাছ থেকে প্রণামী আদায় করে খরচটা উঠে যাবে। গোঁসাইজির কাছ থেকে রোজ সন্ধেবেলায় এরা—

ফাগুলাল। না না, সে হবে না, সর্দারজি। এখন সন্ধেবেলায় মদ খেয়ে বড়ো-জোর মাতলামি করি, উপদেশ শোনাতে এলে নরহত্যা ঘটবে।

বিশু। চুপ চুপ, ফাগুলাল।

গোঁসাইয়ের প্রবেশ

সর্দার। এই-যে বলতে বলতেই উপস্থিত। প্রভু, প্রণাম। আমাদের এই কারিগরদের দুর্বল মন, মাঝে-মাঝে অশান্ত হয়ে ওঠে। এদের কানে একটু শান্তিমন্ত্র দেবেন— ভারি দরকার।

গোঁসাই। এই এদের কথা বলছ? আহা, এরা তো স্বয়ং কূর্ম-অবতার। বোঝার নিচে নিজেকে চাপা দিয়েছে বলেই সংসারটা টিঁকে আছে। ভাবলে শরীর পুলকিত হয়। বাবা ৪৭ ফ, একবার ঠাউরে দেখো, যে-মুখে নাম কীর্তন করি সেই মুখে অন্ন জোগাও তোমরা; শরীর পবিত্র হল যে-নামাবলিখানা গায়ে দিয়ে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সেখানা বানিয়েছ তোমরাই। একি কম কথা। আশীর্বাদ করি সর্বদাই অবিচলিত থাকো, তাহলেই ঠাকুরের দয়াও তোমাদের 'পরে অবিচলিত থাকবে। বাবা, একবার কণ্ঠ খুলে বলো 'হরি হরি'। তোমাদের সব বোঝা হালকা হয়ে যাক। হরিনাম আদাবন্তে চ মধ্যে চ।

চন্দ্রা। আহা, কী মধুর। বাবা, অনেকদিন এমন কথা শুনি নি। দাও দাও, আমাকে একটু পায়ের ধুলো দাও।

ফাগুলাল। এতক্ষণ অবিচলিত ছিলুম, কিন্তু আর তো পারি নে। সর্দার, এত বড়ো অপব্যয় কিসের জন্যে। প্রণামী আদায় করতে চাও রাজী আছি, কিন্তু ভণ্ডামি সইব না।

বিশু। ফাগুলাল খেপলে আর রক্ষে নেই, চুপ চুপ।

চন্দ্রা। ইহকাল পরকাল তুমি দু-ই খোয়াতে বসেছ? তোমার গতি হবে কী। এমন মতি তোমার আগে ছিল না, আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের উপরে ওই নন্দিনীর হাওয়া লেগেছে।

গোঁসাই। যাই বল সর্দার, কী সরলতা। পেটে-মুখে এক, এদের আমরা শেখাব কি এরাই আমাদের শিক্ষা দেবে। বুঝেছ?

সর্দার। বুঝেছি বই-কি। এও বুঝেছি উৎপাত বেধেছে কোথা থেকে। এদের

ভার আমাকেই নিতে হচ্ছে। প্রভুপাদ বরঞ্চ ওপাড়ায় নাম শুনিয়ে আসুন, সেখানে করাতীরা যেন একটু খিটখিট শুরু করছে।

গোঁসাই। কোন্ পাড়া বললে, সর্দারবাবা।

সর্দার। ওই-যে ট ঠ পাড়ায়। সেখানে ৭১ ট হচ্ছে মোড়ল। মূর্ধন্য-ণয়ের ৬৫ যেখানে থাকে তার বাঁয়ে ওই পাড়ার শেষ।

গোঁসাই। বাবা, দন্ত্য-ন পাড়া যদিও এখনো নড়্‌নড় করছে, মূর্ধন্য-ণরা ইদানীং অনেকটা মধুর রসে মজেছে। মন্ত্র নেবার মতো কান তৈরি হল ব'লে। তবু আরো ক'টা মাস পাড়ায় ফৌজ রাখা ভালো। কেননা, নাহংকারাৎ পরো রিপুঃ। ফৌজের চাপে অহংকারটার দমন হয়, তার পরে আমাদের পালা। তবে আসি।

চন্দ্রা। প্রভু, আশীর্বাদ করো, এই এদের যেন সুমতি হয়। অপরাধ নিয়ো না।

গোঁসাই। ভয় নেই মা-লক্ষ্মী, এরা সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। [প্রস্থান

সর্দার। ওহে ৬৯ ঙ, তোমাদের ওপাড়ার মেজাজটা যেন কেমন দেখছি!

বিশু। তা হতে পারে। গোঁসাইজি এদের কূর্ম-অবতার বললেন, কিন্তু শাস্ত্রমতে অবতারের বদল হয়। কূর্ম হঠাৎ বরাহ হয়ে ওঠে, বর্মের বদলে বেরিয়ে পড়ে দন্ত, ধৈর্যের বদলে গোঁ।

চন্দ্রা। বিশুবেয়াই, একটু থামো। সর্দারদাদা, আমার দরবারটা ভুলো না।

সর্দার। কিছুতেই না। শুনে রাখলুম, মনেও রাখব। [প্রস্থান

চন্দ্রা। আহা দেখলে? সর্দার লোকটি কী সরেস। সবার সঙ্গেই হেসে কথা।

বিশু। মকরের দাঁতের শুরুতে হাসি, অন্তিমে কামড়।

চন্দ্রা। কামড়টা এর মধ্যে কোথায়!

বিশু। জান না, ওরা ঠিক করেছে এবার থেকে এখানে কারিগরের সঙ্গে তাদের স্ত্রীরা আসতে পারবে না?

চন্দ্রা। কেন।

বিশু। সংখ্যারূপে ওদের হিসাবের খাতায় আমরা জায়গা পাই, কিন্তু সংখ্যার অঙ্কের সঙ্গে নারীর অঙ্ক গণিতশাস্ত্রের যোগে মেলে না।

চন্দ্রা। ওমা! ওদের নিজের ঘরে কি স্ত্রী নেই। তারা কী বলে।

বিশু। তারাও সোনার তালের মদে বেহুঁশ। নেশায় স্বামীদের ছাড়িয়ে যায়। আমরা তাদের চোখেই পড়ি নে।

চন্দ্রা। বিশুবেয়াই, তোমার ঘরে তো স্ত্রী ছিল, তার হল কী। অনেকদিন খবর পাই নি।

বিশু। যতদিন চরের উচ্চপদে ভরতি ছিলুম, সর্দারনীদের কোঠাবাড়িতে তার তাসখেলার ডাক পড়ত। যখন ফাগুলালদের দলে যোগ দিলুম, ওপাড়ায় তার নেমন্তন্ন বন্ধ হয়ে গেল। সেই ধিক্কারে আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে।

চন্দ্রা। ছি, এমন পাপও করে।

বিশু। এ পাপের শাস্তিতে আর-জন্মে সে সর্দারনী হয়ে জন্মাবে।

চন্দ্রা। বিশুবেয়াই, দেখো দেখো, ওই কারা ধুম করে চলেছে। সারে সারে ময়ূরপঙ্খি, হাতির হাওদায় ঝালর দেখেছ। ঝলমল করছে। কী চমৎকার ঘোড়-সওয়ার। বর্শার ডগায় যেন এক-এক টুকরো সূর্যের আলো বিঁধে নিয়ে চলেছে।

বিশু। ওই তো সর্দারনীরা ধ্বজাপুজার ভোজে যাত্রা করেছে।

চন্দ্রা। আহা, কী সাজের ধুম। কী চেহারা। আচ্ছা বেয়াই, যদি কাজ ছেড়ে না দিতে, তুমিও ওদের দলে অমনি ধুম করে বেরতে ? আর তোমার সেই স্ত্রী—

বিশু। হাঁ, আমাদেরো ওই দশা ঘটত।

চন্দ্রা। এখন আর ফেরবার পথ নেই ? একেবারে না ?

বিশু। আছে, নর্দমার ভিতর দিয়ে।

নেপথ্যে। পাগলভাই !

বিশু। কী পাগলী।

ফাগুলাল। ওই তোমার নন্দিনীর ডাক পড়ল। আজকের মতো বিশুদাদাকে আর পাওয়া যাবে না।

চন্দ্রা। তোমার বিশুদাদার আশা আর রেখো না। কোন্ সুখে ও তোমাকে ভুলিয়েছে বলো দেখি, বেয়াই।

বিশু। ভুলিয়েছে দুঃখে।

চন্দ্রা। বেয়াই অমন উলটিয়ে কথা কও কেন।

বিশু। তোরা বুঝবি নে। এমন দুঃখ আছে যাকে ভোলার মতো দুঃখ আর নেই।

ফাগুলাল। বিশুদাদা, পস্ট করে কথা বলো, নইলে রাগ ধরে।

বিশু। বলছি শোন্, কাছের পাওনাকে নিয়ে বাসনার যে-দুঃখ তাই পশুর, দূরের পাওনাকে নিয়ে আকাঙ্ক্ষার যে-দুঃখ তাই মানুষের। আমার সেই চিরদুঃখের দূরের আলোটি নন্দিনীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

চন্দ্রা। এ-সব কথা বুঝি নে বেয়াই, একটা কথা বুঝি যে, যে-মেয়েকে তোমরা যত কম বোঝ সেই তোমাদের তত বেশী টানে। আমরা সাদাসিধে, আমাদের দর

কম, তবু যা হ'ক তোমাদের সোজা পথে নিয়ে চলি। কিন্তু আজ বলে রাখলুম, ওই মেয়েটা ওর রক্তকরবীর মালার ফাঁসে তোমাকে সর্বনাশের পথে টেনে আনবে।

[চন্দ্রা ও ফাগুলালের প্রস্থান

নন্দিনীর প্রবেশ

নন্দিনী। পাগলভাই, দূরের রাস্তা দিয়ে আজ সকালে ওরা পৌষের গান গেয়ে মাঠে যাচ্ছিল, শুনেছিলে?

বিশু। আমার সকাল কি তোর সকালের মতো যে, গান শুনতে পাব। এ-যে ক্লান্ত রাত্তিরটারই ঝেঁটিয়ে-ফেলা উচ্ছিষ্ট।

নন্দিনী। আজ মনের খুশিতে ভাবলুম, এখানকার প্রাকারের উপর চড়ে ওদের গানে যোগ দেব। কোথাও পথ পেলুম না, তাই তোমার কাছে এসেছি।

বিশু। আমি তো প্রাকার নই।

নন্দিনী। তুমিই আমার প্রাকার। তোমার কাছে এসে উঁচুতে উঠে বাহিরকে দেখতে পাই।

বিশু। তোমার মুখে এ কথা শুনে আশ্চর্য লাগে।

নন্দিনী। কেন।

বিশু। যক্ষপুরীতে ঢুকে অবধি এতকাল মনে হত, জীবন হতে আমার আকাশখানা হারিয়ে ফেলেছি। মনে হত, এখানকার টুকরো মানুষদের সঙ্গে আমাকে এক ঢেঁকিতে কুটে একটা পিণ্ড পাকিয়ে তুলেছে। তার মধ্যে ফাঁক নেই। এমন-সময় তুমি এসে আমার মুখের দিকে এমন করে চাইলে, আমি বুঝতে পারলুম আমার মধ্যে এখনো আলো দেখা যাচ্ছে।

নন্দিনী। পাগলভাই, এই বন্ধ গড়ের ভিতরে কেবল তোমার-আমার মাঝ-খানটাতেই একখানা আকাশ বেঁচে আছে। বাকি আর-সব বোজা।

বিশু। সেই আকাশটা আছে বলেই তোমাকে গান শোনাতে পারি।

গান

তোমায় গান শোনাব তাইতো আমায় জাগিয়ে রাখ,
ওগো ঘুমভাঙানিয়া।
বুকে চমক দিয়ে তাই তো ডাক,
ওগো দুখজাগানিয়া।

এল আঁধার ঘিরে,
পাখি এল নীড়ে,
তরী এল তীরে,
শুধু আমার হিয়া বিরাম পায় নাকো,
ওগো দুখজাগানিয়া।

নন্দিনী। বিশুপাগল, তুমি আমাকে বলছ 'দুখজাগানিয়া'?

বিশু। তুমি আমার সমুদ্রের অগম পারের দূতী। যেদিন এলে যক্ষপুরীতে, আমার হৃদয়ে লোনা জলের হাওয়ায় এসে ধাক্কা দিলে।

আমার কাজের মাঝে মাঝে
কান্নাধারার দোলা তুমি থামতে দিলে না-যে।
আমায় পরশ ক'রে
প্রাণ সুধায় ভ'রে
তুমি যাও যে সরে,
বুঝি আমার ব্যথার আড়ালেতে দাঁড়িয়ে থাক,
ওগো দুখজাগানিয়া।

নন্দিনী। তোমাকে একটা কথা বলি, পাগল। যে-দুঃখটির গান তুমি গাও, আগে আমি তার খবর পাই নি।

বিশু। কেন, রঞ্জনের কাছে?

নন্দিনী। না, দুই হাতে দুই দাঁড় ধরে সে আমাকে তুফানের নদী পার করে দেয়; বুনো ঘোড়ার কেশর ধরে আমাকে বনের ভিতর দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে যায়; লাফ-দেওয়া বাঘের দুই ভুরুর মাঝখানে তীর মেরে সে আমার ভয়কে উড়িয়ে দিয়ে হা হা করে হাসে। আমাদের নাগাই নদীতে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে স্রোতটাকে যেমন সে তোলপাড় করে, আমাকে নিয়ে তেমনি সে তোলপাড় করতে থাকে। প্রাণ নিয়ে সর্বস্ব পণ করে সে হারজিতের খেলা খেলে। সেই খেলাতেই আমাকে জিতে নিয়েছে। একদিন তুমিও তো তার মধ্যে ছিলে, কিন্তু কী মনে করে বাজিখেলার ভিড় থেকে একলা বেরিয়ে গেলে। যাবার সময় কেমন করে আমার মুখের দিকে তাকালে বুঝতে পারলুম না— তার পরে কতকাল খোঁজ পাইনি। কোথায় তুমি গেলে বলো তো।

বিশু। **গান**

ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার দুখের পারাবারে,
হল কানায় কানায় কানাকানি এই পারে ওই পারে।
আমার তরী ছিল চেনার কূলে, বাঁধন তাহার গেল খুলে,
তারে হাওয়ায় হাওয়ায় নিয়ে গেল কোন্ অচেনার ধারে।

নন্দিনী। সেই অচেনার ধার থেকে এখানে যক্ষপুরীর সুড়ঙ্গ খোদার কাজে কে তোমাকে আবার টেনে আনলে।

বিশু। একজন মেয়ে। হঠাৎ তীর পেয়ে উড়ন্ত পাখি যেমন মাটিতে পড়ে যায়, সে আমাকে তেমনি করে এই ধুলোর মধ্যে এনে ফেলেছে; আমি নিজেকে ভুলে ছিলুম।

নন্দিনী। তোমাকে সে কেমন করে ছুঁতে পারলে।

বিশু। তৃষ্ণার জল যখন আশার অতীত হয়, মরীচিকা তখন সহজে ভোলায়। তার পরে দিকহারা নিজেকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। একদিন পশ্চিমের জানলা দিয়ে আমি দেখছিলুম মেঘের স্বর্ণপুরী, সে দেখছিল সর্দারের সোনার চূড়া। আমাকে কটাক্ষে বললে, 'ওইখানে আমাকে নিয়ে যাও, দেখি কত বড়ো তোমার সামর্থ্য।' আমি স্পর্ধা করে বললুম, 'যাব নিয়ে।' আনলুম তাকে সোনার চূড়ার নিচে। তখন আমার ঘোর ভাঙল।

নন্দিনী। আমি এসেছি এখান থেকে তোমাকে বের করে নিয়ে যাব। সোনার শিকল ভাঙব।

বিশু। তুমি যখন এখানকার রাজাকে পর্যন্ত টলিয়েছ, তখন তোমাকে ঠেকাবে কিসে। আচ্ছা, তোমার ওকে ভয় করে না?

নন্দিনী। এই জালের বাইরে থেকে ভয় করে। কিন্তু আমি-যে ভিতরে গিয়ে দেখেছি।

বিশু। কী রকম দেখলে।

নন্দিনী। দেখলুম মানুষ, কিন্তু প্রকাণ্ড। কপালখানা যেন সাতমহলা বাড়ির সিংহদ্বার। বাহুদুটো কোন্ দুর্গম দুর্গের লোহার অর্গল। মনে হল যেন রামায়ণ-মহাভারত থেকে নেমে এসেছে কেউ।

বিশু। ঘরে ঢুকে কী দেখলে।

নন্দিনী। ওর বাঁ হাতের উপর বাজপাখি বসে ছিল; তাকে দাঁড়ের উপর

বসিয়ে ও আমার মুখে চেয়ে রইল। তার পরে, যেমন বাজপাখির পাখার মধ্যে আঙুল চালাচ্ছিল তেমনি করে আমার হাত নিয়ে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। একটু পরে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, 'আমাকে ভয় করে না?' আমি বললুম, 'একটুও না।' তখন আমার খোলা চুলের মধ্যে দুই হাত ভরে দিয়ে কতক্ষণ চোখ বুজে বসে রইল।

বিশু। তোমার কেমন লাগল।

নন্দিনী। ভালো লাগল। কি-রকম বলব? ও যেন হাজার বছরের বটগাছ, আমি যেন ছোট্ট পাখি। ওর ডালের একটি ডগায় কখনো যদি একটু দোল খেয়ে যাই, নিশ্চয় ওর মজ্জার মধ্যে খুশি লাগে। ওই একলা প্রাণকে সেই খুশিটুকু দিতে ইচ্ছে করে।

বিশু। তার পরে ও কী বললে।

নন্দিনী। একসময় ঝোঁকে উঠে ওর বর্শাফলার মতো দৃষ্টি আমার মুখের উপর রেখে হঠাৎ বলে উঠল, 'আমি তোমাকে জানতে চাই।' আমার কেমন গা শিউরে উঠল। বললুম, 'জানবার কী আছে। আমি কি তোমার পুঁথি।' সে বললে, 'পুঁথিতে যা আছে সব জানি, তোমাকে জানি নে।' তার পরে কি-রকম ব্যগ্র হয়ে উঠে বললে, 'রঞ্জনের কথা আমাকে বলো। তাকে কি-রকম ভালোবাস।' আমি বললুম, 'জলের ভিতরকার হাল যেমন আকাশের উপরকার পালকে ভালোবাসে— পালে লাগে বাতাসের গান, আর হালে জাগে ঢেউয়ের নাচ।' মস্ত একটা লোভী ছেলের মতো একদৃষ্টে তাকিয়ে চুপ করে শুনলে। হঠাৎ চমকিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'ওর জন্যে প্রাণ দিতে পার?' আমি বললুম, 'এখ্খনি।' ও যেন রেগে গর্জন করে বললে, 'কখ্খনো না।' আমি বললুম, 'হাঁ পারি।' 'তাতে তোমার লাভ কী।' বললুম, 'জানি নে।' তখন ছটফট করে বলে উঠল, 'যাও, আমার ঘর থেকে যাও, যাও, কাজ নষ্ট করো না।' মানে বুঝতে পারলুম না।

বিশু। সব কথার পস্ট মানে ও জানতে চায়। যেটা ও বুঝতে পারে না, সেটাতে ওর মন ব্যাকুল করে দেয়, তাতেই ও রেগে ওঠে।

নন্দিনী। পাগলভাই, ওর উপর দয়া হয় না তোমার?

বিশু। যেদিন ওর 'পরে বিধাতার দয়া হবে, সেদিন ও মরবে।

নন্দিনী। না না, তুমি জান না, বেঁচে থাকবার জন্যে ও কি-রকম মরিয়া হয়ে আছে।

বিশু। ওর বাঁচা বলতে কী বোঝায়, সে তুমি আজই দেখতে পাবে; জানিনে সইতে পারবে কিনা।

নন্দিনী। ওই দেখো পাগলভাই, ওই ছায়া। নিশ্চয় সর্দার আমাদের কথা লুকিয়ে শুনেছে।

বিশু। এখানে তো চারদিকেই সর্দারের ছায়া, এড়িয়ে চলবার জো কী।— সর্দারকে কেমন লাগে ?

নন্দিনী। ওর মতো মরা জিনিস দেখিনি। যেন বেতবন থেকে কেটে আনা বেত। পাতা নেই, শিকড় নেই, মজ্জায় রস নেই, শুকিয়ে লিকলিক করছে।

বিশু। প্রাণকে শাসন করবার জন্যেই প্রাণ দিয়েছে দুর্ভাগা।

নন্দিনী। চুপ করো, শুনতে পাবে।

বিশু। চুপ করাটাকেও যে শুনতে পায়, তাতে আপদ আরো বাড়ে। যখন খোদাইকরদের সঙ্গে থাকি, তখন কথায়বার্তায় সর্দারকে সামলে চলি। তাই ওরা আমাকে অপদার্থ বলে অশ্রদ্ধা করেই বাঁচিয়ে রেখেছে। ওদের দণ্ডটা দিয়েও আমাকে ছোঁয় না। কিন্তু পাগলী, তোর সামনে মনটা স্পর্ধিত হয়ে ওঠে, সাবধান হতে ঘৃণা বোধ হয়।

নন্দিনী। না না, বিপদকে তুমি ডেকে এনো না। ওই-যে সর্দার এসে পড়েছে।

সর্দারের প্রবেশ

সর্দার। কিগো ৬৯ ঙ, সকলেরই সঙ্গে তোমার প্রণয়, বাছবিচার নেই ?

বিশু। এমন কি, তোমার সঙ্গেও শুরু হয়েছিল, বাছবিচার করতে গিয়েই বেধে গেল।

সর্দার। কী নিয়ে আলাপ চলছে।

বিশু। তোমাদের দুর্গ থেকে কী করে বেরিয়ে আসা যায় পরামর্শ করছি।

সর্দার। বল-কি, এত সাহস ? কবুল করতেও ভয় নেই ?

বিশু। সর্দার, মনে-মনে তো সব জানই। খাঁচার পাখি শলাগুলোকে ঠোকরায়, সে তো আদর করে নয়। এ কথা কবুল করলেই কী, না-করলেই কী।

সর্দার। আদর করে না, সে জানা আছে ; কিন্তু কবুল করতে ভয় করে না, সেটা এই কয়েক দিন থেকে জানান দিচ্ছে।

নন্দিনী। সর্দারজি, তুমি-যে বলেছিলে, আজ রঞ্জনকে এনে দেবে। কই কথা রাখলে না ?

সর্দার। আজই তাকে দেখতে পাবে।

নন্দিনী। সে আমি জানতুম। তবু আশা দিলে যখন, জয় হ'ক তোমার সর্দার, এই নাও কুন্দফুলের মালা।

বিশু। ছি ছি, মালাটা নষ্ট করলে। রঞ্জনের জন্যে রাখলে না কেন।

নন্দিনী। তার জন্যে মালা আছে।

সর্দার। আছে বই-কি, ওই বুঝি গলায় দুলছে ? জয়মালা এই কুন্দফুলের, এ-যে হাতের দান,—আর বরণমালা ওই রক্তকরবীর, এ হৃদয়ের দান। ভালো ভালো, হাতের দান হাতে-হাতেই চুকিয়ে দাও, নইলে শুকিয়ে যাবে ; হৃদয়ের দান, যত অপেক্ষা করবে তত তার দাম বাড়বে। [প্রস্থান

নন্দিনী। (জানলার কাছে) শুনতে পাচ্ছ ?

নেপথ্যে। কী বলতে চাও বলো।

নন্দিনী। একবার জানলার কাছে এসে দাঁড়াও।

নেপথ্যে। এই এসেছি।

নন্দিনী। ঘরের মধ্যে যেতে দাও, অনেক কথা বলবার আছে।

নেপথ্যে। বারবার কেন মিছে অনুরোধ করছ। এখনো সময় হয় নি। ও কে তোমার সঙ্গে। রঞ্জনের জুড়ি নাকি।

বিশু। না রাজা, আমি রঞ্জনের ওপিঠ, যে-পিঠে আলো পড়ে না— আমি অমাবস্যা।

নেপথ্যে। তোমাকে নন্দিনীর কিসের দরকার। নন্দিনী, এ লোকটা তোমার কে।

নন্দিনী। ও আমার সাথী, ও আমাকে গান শেখায়। ওই তো শিখিয়েছে—

গান

'ভালোবাসি ভালোবাসি'
এই সুরে কাছে দূরে জলে-স্থলে বাজায় বাঁশি।

নেপথ্যে। ওই তোমার সাথী ? ওকে এখনি যদি তোমার সঙ্গছাড়া করি তা-হলে কী হয়।

নন্দিনী। তোমার গলার সুর ও কি-রকম হয়ে উঠল। থামো তুমি। তোমার কেউ সঙ্গী নেই নাকি।

নেপথ্যে। আমার সঙ্গী ? মধ্যাহ্নসূর্যের কেউ সঙ্গী আছে ?

নন্দিনী। আচ্ছা, থাক্ ও-কথা। মা গো, তোমার হাতে ওটা কী।

নেপথ্যে। একটা মরা ব্যাঙ।

নন্দিনী। কী করবে ওকে নিয়ে।

নেপথ্যে। এই ব্যাঙ একদিন একটা পাথরের কোটরের মধ্যে ঢুকেছিল। তারি আড়ালে তিন হাজার বছর ছিল টিঁকে। এইভাবে কী করে টিঁকে থাকতে হয় তারি রহস্য ওর কাছ থেকে শিখছিলুম; কী করে বেঁচে থাকতে হয় তা ও জানে না। আজ আর ভালো লাগল না, পাথরের আড়াল ভেঙে ফেললুম, নিরন্তর টিঁকে-থাকার থেকে ওকে দিলুম মুক্তি। ভালো খবর নয়?

নন্দিনী। আমারো চারিদিক থেকে তোমার পাথরের দুর্গ আজ খুলে যাবে। আমি জানি, আজ রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হবে।

নেপথ্যে। তোমাদের দুজনকে তখন একসঙ্গে দেখতে চাই।

নন্দিনী। জালের আড়ালে তোমার চশমার ভিতর দিয়ে দেখতে পাবে না।

নেপথ্যে। ঘরের ভিতরে বসিয়ে দেখব।

নন্দিনী। তাতে কী হবে।

নেপথ্যে। আমি জানতে চাই।

নন্দিনী। তুমি যখন জানবার কথা বল, কেমন ভয় করে।

নেপথ্যে। কেন।

নন্দিনী। মনে হয়, যে-জিনিসটাকে মন দিয়ে জানা যায় না, প্রাণ দিয়ে বোঝা যায়, তার 'পরে তোমার দরদ নেই।

নেপথ্যে। তাকে বিশ্বাস করতে সাহস হয় না, পাছে ঠকি। যাও তুমি, সময় নষ্ট কোরো না।— না না, একটু রোসো। তোমার অলকের থেকে ওই যে রক্তকরবীর গুচ্ছ গালের কাছে নেমে পড়েছে, আমাকে দাও।

নন্দিনী। এ নিয়ে কী হবে।

নেপথ্যে। ওই ফুলের গুচ্ছ দেখি আর মনে হয়, ওই যেন আমারি রক্ত আলোর শনিগ্রহ ফুলের রূপ ধরে এসেছে। কখনো ইচ্ছে করছে, তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলি, আবার ভাবছি, নন্দিনী যদি কোনোদিন নিজের হাতে ওই মঞ্জরি আমার মাথায় পরিয়ে দেয়, তা হলে—

নন্দিনী। তা-হলে কী হবে।

নেপথ্যে। তা-হলে হয়তো আমি সহজে মরতে পারব।

নন্দিনী। একজন মানুষ রক্তকরবী ভালোবাসে, আমি তাকে মনে করে ওই ফুলে আমার কানের দুল করেছি।

নেপথ্যে। তা হলে বলে দিচ্ছি, ও আমারো শনিগ্রহ তারো শনিগ্রহ।

নন্দিনী। ছি ছি, ওকি কথা বলছ। আমি যাই।

নেপথ্যে। কোথায় যাবে।

নন্দিনী। তোমার দুর্গদুয়ারের কাছে বসে থাকব।

নেপথ্যে। কেন।

নন্দিনী। রঞ্জন যখন সেই পথ দিয়ে আসবে, দেখতে পাবে আমি তারি জন্যে অপেক্ষা করে আছি।

নেপথ্যে। রঞ্জনকে যদি দ'লে ধুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দিই, আর তাকে একটুও চেনা না যায়।

নন্দিনী। আজ তোমার কী হয়েছে। আমাকে মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছ কেন।

নেপথ্যে। মিছিমিছি ভয়? জান না, আমি ভয়ংকর?

নন্দিনী। হঠাৎ তোমার একি ভাব। লোকে তোমাকে ভয় করে, এইটেই দেখতে ভালোবাস? আমাদের গাঁয়ের শ্রীকণ্ঠ যাত্রায় রাক্ষস সাজে— সে যখন আসরে নামে তখন ছেলেরা আঁতকে উঠলে সে ভারি খুশী হয়। তোমারো-যে সেই দশা। আমার কী মনে হয় সত্যি বলব? রাগ করবে না?

নেপথ্যে। কী বলো দেখি।

নন্দিনী। ভয় দেখাবার ব্যবসা এখানকার মানুষের। তোমাকে তাই তারা জাল দিয়ে ঘিরে অদ্ভুত সাজিয়ে রেখেছে। এই জুজুর পুতুল সেজে থাকতে লজ্জা করে না?

নেপথ্যে। কী বলছ, নন্দিনী।

নন্দিনী। এতদিন যাদের ভয় দেখিয়ে এসেছ তারা ভয় পেতে একদিন লজ্জা করবে। আমার রঞ্জন এখানে যদি থাকত, তোমার মুখের উপর তুড়ি মেরে সে মরত তবু ভয় পেত না।

নেপথ্যে। তোমার স্পর্ধা তো কম নয়। এতদিন যা-কিছু ভেঙে চুরমার করেছি তারি রাশকরা পাহাড়ের চূড়ার উপরে তোমাকে দাঁড় করিয়ে দেখাতে ইচ্ছে করছে। তার পরে—

নন্দিনী। তার পরে কী।

নেপথ্যে। তার পরে আমার শেষ ভাঙাটা ভেঙে ফেলি। দাড়িমের দানা ফাটিয়ে দশ আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে যেমন তার রস বের করে, তেমনি তোমাকে আমার এই দুটো হাতে— যাও যাও, এখনি পালিয়ে যাও, এখনি।

নন্দিনী। এই রইলুম দাঁড়িয়ে! কী করতে পার করো। অমন বিশ্রী করে গর্জন করছ কেন।

নেপথ্যে। আমি যে কী অদ্ভুত নিষ্ঠুর, তার সমস্ত প্রমাণ তোমার কাছে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে। আমার ঘরের ভিতর থেকে কখনো আর্তনাদ শোন নি?

নন্দিনী। শুনেছি, সে কিসের আর্তনাদ।

নেপথ্যে। সৃষ্টিকর্তার চাতুরী আমি ভাঙি। বিশ্বের মর্মস্থানে যা লুকোনো আছে তা ছিনিয়ে নিতে চাই, সেই সব ছিন্ন প্রাণের কান্না। গাছের থেকে আগুন চুরি করতে হলে তাকে পোড়াতে হয়। নন্দিনী, তোমার ভিতরেও আছে আগুন, রাঙা আগুন। একদিন দাহন করে তাকে বের করব, তার আগে নিষ্কৃতি নেই।

নন্দিনী। কেন তুমি নিষ্ঠুর।

নেপথ্যে। আমি হয় পাব, নয় নষ্ট করব। যাকে পাই নে তাকে দয়া করতে পারি নে। তাকে ভেঙে ফেলাও খুব একরকম করে পাওয়া।

নন্দিনী। ওকি, অমন মুঠো পাকিয়ে হাত বের করছ কেন।

নেপথ্যে। আচ্ছা, হাত সরিয়ে নিচ্ছি, পালাও তুমি, পায়রা যেমন পালায় বাজপাখির ছায়া দেখে।

নন্দিনী। আচ্ছা যাই, আর তোমাকে রাগাব না।

নেপথ্যে। শোনো শোনো, ফিরে এস তুমি। নন্দিনী! নন্দিনী!

নন্দিনী। কী বলো।

নেপথ্যে। সামনে তোমার মুখে-চোখে প্রাণের লীলা, আর পিছনে তোমার কালো-চুলের ধারা মৃত্যুর নিস্তব্ধ ঝরনা। আমার এই হাতদুটো সেদিন তার মধ্যে ডুব দিয়ে মরবার আরাম পেয়েছিল। মরণের মাধুর্য আর-কখনো এমন করে ভাবি নি। সেই গুচ্ছগুচ্ছ কালোচুলের নিচে মুখ ঢেকে ঘুমোতে ভারি ইচ্ছে করছে। তুমি জান না, আমি কত শ্রান্ত।

নন্দিনী। তুমি কি কখনো ঘুমোও না।

নেপথ্যে। ঘুমোতে ভয় করে।

নন্দিনী। তোমাকে আমার গানটা শেষ করে শুনিয়ে দিই—

'ভালোবাসি ভালোবাসি'
এই সুরে কাছে দূরে জলে-স্থলে বাজায় বাঁশি।
আকাশে কার বুকের মাঝে
ব্যথা বাজে,
দিগন্তে কার কালো আঁখি আঁখির জলে যায় গো ভাসি।

নেপথ্যে। থাক্ থাক্ থামো তুমি, আর গেয়ো না।

নন্দিনী। সেই সুরে সাগরকূলে
বাঁধন খুলে
অতল রোদন উঠে দুলে
সেই সুরে বাজে মনে
অকারণে
ভুলে-যাওয়া গানের বাণী, ভোলা দিনের কাঁদনহাসি।

পাগলভাই, ওই-যে মরা ব্যাঙটা ফেলে রেখে দিয়ে কখন্ পালিয়েছে। গান শুনতে ও ভয় পায়।

বিশু। ওর বুকের মধ্যে যে বুড়ো ব্যাঙটা সকলকরম সুরের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে আছে, গান শুনলে তার মরতে ইচ্ছে করে। তাই ওর ভয় লাগে।— পাগলী, আজ তোর মুখে একটা দীপ্তি দেখছি, মনের মধ্যে কোন্ ভাবনার অরুণোদয় হয়েছে আমাকে বলবি নে ?

নন্দিনী। মনের মধ্যে খবর এসে পৌচেছে, আজ নিশ্চয় রঞ্জন আসবে।

বিশু। নিশ্চয় খবর এল কোন্ দিক থেকে।

নন্দিনী। তবে শোনো বলি। আমার জানলার সামনে ডালিমের ডালে রোজ নীলকণ্ঠপাখি এসে বসে। আমি সন্ধে হলেই ধ্রুবতারাকে প্রণাম করে বলি, ওর ডানার একটি পালক আমার ঘরে এসে যদি উড়ে পড়ে তো জানব, আমার রঞ্জন আসবে। আজ সকালে জেগে উঠেই দেখি উত্তুরে-হাওয়ায় পালক আমার বিছানায় এসে পড়ে আছে। এই দেখো আমার বুকের আঁচলে।

বিশু। তাই তো দেখছি, আর দেখছি কপালে আজ কুঙ্কুমের টিপ পরেছ।

নন্দিনী। দেখা হলে এই পালক আমি তার চুড়োয় পরিয়ে দেব।

বিশু। লোকে বলে নীলকণ্ঠের পাখায় জয়যাত্রার শুভচিহ্ন আছে।

নন্দিনী। রঞ্জনের জয়যাত্রা আমার হৃদয়ের মধ্যে দিয়ে।

বিশু। পাগলী, এখন আমি যাই আমার নিজের কাজে।

নন্দিনী। না, আজ তোমাকে কাজ করতে দেব না।

বিশু। কী করব বলো।

নন্দিনী। গান করো।

বিশু। কী গান করব।

নন্দিনী। পথচাওয়ার গান।

বিশু। গান

যুগে যুগে বুঝি আমায় চেয়েছিল সে।
সেই বুঝি মোর পথের ধারে রয়েছে বসে।
আজ কেন মোর পড়ে মনে, কখন্ তারে চোখের কোণে
দেখেছিলেম অফুট প্রদোষে,
সেই যেন মোর পথের ধারে রয়েছে বসে।
আজ ওই চাঁদের বরণ হবে আলোর সংগীতে,
রাতের মুখের আঁধারখানি খুলবে ইঙ্গিতে।
শুক্ল রাতে সেই আলোকে দেখা হবে, এক পলকে
সব আবরণ যাবে যে খসে।
সেই যেন মোর পথের ধারে রয়েছে বসে।

নন্দিনী। পাগল, যখন তুমি গান কর তখন কেবল আমার মনে হয়, অনেক তোমার পাওনা ছিল কিন্তু কিছু তোমাকে দিতে পারি নি।

বিশু। তোর সেই কিছু-না-দেওয়া আমি ললাটে পরে চলে যাব। অল্প-কিছু-দেওয়ার দামে আমার গান বিক্রি করব না।— এখন কোথায় যাবি।

নন্দিনী। পথের ধারে, যেখান দিয়ে রঞ্জন আসবে। সেইখানে বসে আবার তোমার গান শুনব। [উভয়ের প্রস্থান

সর্দার ও মোড়লের প্রবেশ

সর্দার। না, এপাড়ায় রঞ্জনকে কিছুতে আসতে দেওয়া চলবে না।

মোড়ল। ওকে দূরে রাখব বলেই বজ্রগড়ের সুড়ঙ্গে কাজ করাতে নিয়ে গিয়েছিলুম।

সর্দার। তা কি হল।

মোড়ল। কিছুতেই পারা গেল না। সে বললে, 'হুকুম মেনে কাজ করা আমার অভ্যেস নেই।'

সর্দার। অভ্যেস এখনি শুরু করাতে দোষ কী।

মোড়ল। সে-চেষ্টা করা গেল। বড়ো মোড়ল এল কোটালকে নিয়ে। মানুষটার ভয়ডর কিছুই নেই। গলায় একটু শাসনের সুর লেগেছে কি অমনি হো হো করে হেসে ওঠে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, 'গাম্ভীর্য নির্বোধের মুখোশ, আমি তাই খসাতে এসেছি।'

সর্দার। ওকে সুড়ঙ্গের মধ্যে দলে ভিড়িয়ে দিলে না কেন।

মোড়ল। দিয়েছিলুম, ভাবলুম চাপে পড়ে বশ মানবে। উলটো হল, খোদাই-করদের উপর থেকেও যেন চাপ নেমে গেল। তাদের মাতিয়ে তুললে, বললে, 'আজ আমাদের খোদাইনৃত্য হবে।'

সর্দার। খোদাইনৃত্য? তার মানে কী।

মোড়ল। রঞ্জন ধরলে গান, ওরা বললে, 'মাদল পাই কোথায়', ও বললে, 'মাদল না থাকে, কোদাল আছে।' তালে তালে কোদাল পড়তে লাগল; সোনার পিণ্ড নিয়ে সে কী লোফালুফি। বড়ো মোড়ল স্বয়ং এসে বললে, 'এ কেমন তোমার কাজের ধারা।' রঞ্জন বললে, 'কাজের রশি খুলে দিয়েছি, তাকে টেনে চালাতে হবে না, নেচে চলবে।'

সর্দার। লোকটা পাগল দেখছি।

মোড়ল। ঘোর পাগল। বললুম, 'কোদাল ধরো।' ও বলে, 'তার চেয়ে বেশী কাজ হবে যদি একটা সারেঙ্গি এনে দাও।'

সর্দার। তোমরা ওকে বজ্রগড়ে নিয়ে গিয়েছিলে, সেখান থেকে কুবেরগড়ে এল কী করে।

মোড়ল। কী জানি, প্রভু। শিকল দিয়ে তো ওকে কষে বাঁধা গেল। খানিক বাদে দেখি, কেমন করে পিছলে বেরিয়ে এসেছে— ওর গায়ে কিছু চেপে ধরে না। আর, ও কথায়-কথায় সাজ বদল ক'রে চেহারা বদল করে। আশ্চর্য ওর ক্ষমতা। কিছুদিন ও এখানে থাকলে খোদাইকরগুলো পর্যন্ত বাঁধন মানবে না।

সর্দার। ওকি। ওই-না রঞ্জন, রাস্তা দিয়ে চলেছে গান গেয়ে? একটা ভাঙা সারেঙ্গি জোগাড় করেছে। স্পর্ধা দেখো, একটু লুকোবারও চেষ্টা নেই।

মোড়ল। তাই তো। কখন্ গারদের ভিত কেটে বেরিয়ে এসেছে। ভেলকি জানে।

সর্দার। যাও, এই বেলা ধরোগে ওকে। এপাড়ায় নন্দিনীর সঙ্গে যেন কিছুতে মিলতে না পারে।

মোড়ল। দেখতে দেখতে ওর দল ভারী হয়ে উঠছে। কখন্ আমাদের সুদ্ধ নাচিয়ে তুলবে।

ছোটো সর্দারের প্রবেশ

সর্দার। কোথায় চলেছ।

ছোটো সর্দার। রঞ্জনকে বাঁধতে চলেছি।

সর্দার। তুমি কেন। মেজো সর্দার কোথায়।

ছোটো সর্দার। ওকে দেখে তাঁর এত মজা লেগেছে, তিনি ওর গায়ে হাত দিতেই চান না। বলেন, 'আমরা সর্দাররা কি-রকম অদ্ভুত হয়ে উঠেছি, সে ওর হাসি দেখলে বুঝতে পারি।'

সর্দার। শোনো, ওকে বাঁধতে হবে না, রাজার ঘরে পাঠিয়ে দাও।

ছোটো সর্দার। ও তো রাজার ডাক মানতেই চায় না।

সর্দার। ওকে বলোগে, রাজা ওর নন্দিনীকে সেবাদাসী করে রেখেছে।

ছোটো সর্দার। কিন্তু রাজা যদি—

সর্দার। কিছু ভাবতে হবে না। চলো, আমি নিজে যাচ্ছি। [সকলের প্রস্থান

অধ্যাপক ও পুরাণবাগীশের প্রবেশ

পুরাণবাগীশ। ভিতরে একি প্রলয়কাণ্ড হচ্ছে বলো তো। ভয়ংকর শব্দ-যে!

অধ্যাপক। রাজা বোধহয় নিজের উপর নিজে রেগেছে। তাই নিজের তৈরী একটা-কিছু চুরমার করে দিচ্ছে।

পুরাণবাগীশ। মনে হচ্ছে, বড়ো বড়ো থাম হুড়মুড় করে পড়ে যাচ্ছে।

অধ্যাপক। আমাদের ওই পাহাড়তলা জুড়ে একটা সরোবর ছিল, শঙ্খিনীনদীর জল এসে তাতে জমা হত। একদিন তাঁর বাঁ দিকের পাথরের স্তূপটা কাত হয়ে পড়ল, জমা জল পাগলের অট্টহাসির মতো খল্‌খল্ করে বেরিয়ে চলে গেল। কিছুদিন থেকে রাজাকে দেখে মনে হচ্ছে, ওর সঞ্চয়সরোবরের পাথরটাতে চাড় লেগেছে, তলাটা ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে এসেছে।

পুরাণবাগীশ। বস্তুবাগীশ, এ কোন্ জায়গায় আমাকে আনলে, আর কী করতেই বা আনলে।

অধ্যাপক। জগতে যা-কিছু জানবার আছে, সমস্তই জানার দ্বারা ও আত্মসাৎ করতে চায়। আমার বস্তুতত্ত্ববিদ্যা প্রায় উজাড় করে নিয়েছে, এখন থেকে থেকে

রেগে উঠে বলছে, 'তোমার বিদ্যে তো সিঁধকাঠি দিয়ে একটা দেয়াল ভেঙে তার পিছনে আরেকটা দেয়াল বের করেছে। কিন্তু প্রাণপুরুষের অন্দরমহল কোথায়।' ভাবলুম, এখন কিছুদিন ওকে পুরাণ-আলোচনায় ভুলিয়ে রাখা যাক— আমার থলে ঝাড়া হয়ে গেছে, এখন পুরাবৃত্তের গাঁঠকাটা চলুক। ওই দেখতে পাচ্ছ, কে যাচ্ছে ?

পুরাণবাগীশ। একটি মেয়ে ধানীরঙের-কাপড়-পরা।

অধ্যাপক। পৃথিবীর প্রাণভরা খুশিখানা নিজের সর্বাঙ্গে টেনে নিয়েছে, ওই আমাদের নন্দিনী। এই যক্ষপুরে সর্দার আছে, মোড়ল আছে, খোদাইকর আছে, আমার মতো পণ্ডিত আছে, কোতোয়াল আছে, জল্লাদ আছে, মুর্দফরাশ আছে, সব বেশ মিশ খেয়ে গেছে। কিন্তু ও একেবারে বেখাপ। চারদিকে হাটের চেঁচামেচি, ও হল সুরবাঁধা তম্বুরা। এক-একদিন ওর চলে-যাওয়ার হাওয়াতেই আমার বস্তুচর্চার জাল ছিঁড়ে যায়। ফাঁকের মধ্যে দিয়ে মনোযোগটা বুনোপাখির মতো হুশ ক'রে উড়ে পালায়।

পুরাণবাগীশ। বল-কি হে, তোমার পাকা হাড়ে এমন ঠোকাঠুকি বাধে নাকি।

অধ্যাপক। জানার টানের চেয়ে প্রাণের টান বেশী হলেই পাঠশালা-পালাবার ঝোঁক সামলানো যায় না।

পুরাণবাগীশ। এখন বলো তো, তোমাদের রাজার সঙ্গে দেখা হবে কোথায়।

অধ্যাপক। দেখার উপায় নেই, ওই জালটার আড়াল থেকে আলাপ হবে।

পুরাণবাগীশ। বল-কি হে। এই জালের আড়াল থেকে ?

অধ্যাপক। তা নয় তো কী। ঘোমটার আড়াল থেকে যেরকম রসালাপ হতে পারে সে ধরনের না, একেবারে ছাঁকা কথা। ওর গোয়ালের গোরু বোধহয় দুধ দিতে জানে না, একেবারেই মাখন দেয়।

পুরাণবাগীশ। বাজে কথা বাদ দিয়ে আসল কথা আদায় করাই তো পণ্ডিতের অভিপ্রায়।

অধ্যাপক। কিন্তু বিধাতার নয়। তিনি আসল জিনিস সৃষ্টি করেছেন বাজে জিনিসকে লালন করবার জন্যে। তিনি সম্মান দেন ফলের আঁঠিকে, ভালোবাসা দেন ফলের শাঁসকে।

পুরাণবাগীশ। আজকাল দেখছি তোমার বস্তুতত্ত্ব ধানীরঙের দিকে একটানা ছুটে চলেছে। কিন্তু অধ্যাপক, তোমাদের এই রাজাকে তুমি সহ্য কর কী করে।

অধ্যাপক। সত্যি কথা বলব ? আমি ওকে ভালোবাসি।

পুরাণবাগীশ। বল-কি হে।

অধ্যাপক। তুমি জান না, ও এত বড়ো যে, ওর দোষগুলোও ওকে নষ্ট করতে পারে না।

সর্দারের প্রবেশ

সর্দার। ওহে বস্তুবাগীশ, বেছে বেছে এই মানুষটিকে এনেছ বুঝি! ওঁর বিদ্যের বিবরণ শুনেই আমাদের রাজা খেপে উঠেছে।

অধ্যাপক। কি-রকম।

সর্দার। রাজা বলে, পুরাণ ব'লে কিছু নেই। বর্তমানকালটাই কেবল বেড়ে বেড়ে চলেছে।

পুরাণবাগীশ। পুরাণ যদি নেই তা-হলে কিছু আছে কী করে। পিছন যদি না থাকে তো সামনেটা কি থাকতে পারে।

সর্দার। রাজা বলেন, মহাকাল নবীনকে সম্মুখে প্রকাশ করে চলেছে, পণ্ডিত সেই কথাটাকে চাপা দিয়ে বলে, মহাকাল পুরাতনকে পিছনে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

অধ্যাপক। নন্দিনীর নিবিড় যৌবনের ছায়াবীথিকায় নবীনের মায়ামৃগীকে রাজা চকিতে চকিতে দেখতে পাচ্ছেন, ধরতে পারছেন না, রেগে উঠছেন আমার বস্তুতত্ত্বর উপর।

নন্দিনীর দ্রুত প্রবেশ

নন্দিনী। সর্দার, সর্দার, ওকি! ও কারা!

সর্দার। কিগো নন্দিনী, তোমার কুঁদফুলের মালা পরব যখন ঘোর রাত হবে। অন্ধকারে যখন আমার বারো-আনাই অস্পষ্ট হয়ে উঠবে, তখন হয়তো ফুলের মালায় আমাকেও মানাতে পারে।

নন্দিনী। চেয়ে দেখো, ও কী ভয়ানক দৃশ্য। প্রেতপুরীর দরজা খুলে গেছে নাকি। ওই কারা চলেছে প্রহরীদের সঙ্গে? ওই-যে বেরিয়ে আসছে রাজার মহলের খিড়কিদরজা দিয়ে?

সর্দার। ওদের আমরা বলি রাজার এঁটো।

নন্দিনী। মানে কী।

সর্দার। মানে একদিন তুমিও বুঝবে, আজ থাক্।

নন্দিনী। কিন্তু এ-সব কী চেহারা। ওরা কি মানুষ। ওদের মধ্যে মাংসমজ্জা মনপ্রাণ কিছু কি আছে।

সর্দার। হয়তো নেই।

নন্দিনী। কোনো দিন ছিল?

সর্দার। হয়তো ছিল।

নন্দিনী। এখন গেল কোথায়।

সর্দার। বস্তুবাগীশ, পার তো বুঝিয়ে দাও, আমি চললুম। [প্রস্থান

নন্দিনী। ওকি, ওই সব ছায়াদের মধ্যে যে চেনা মুখ দেখছি। ওই তো নিশ্চয় আমাদের অনুপ আর উপমন্যু। অধ্যাপক, ওরা আমাদের পাশের গাঁয়ের লোক। দুই ভাই মাথায় যেমন লম্বা, গায়ে তেমনি শক্ত, ওদের সবাই বলে তাল-তমাল। আষাঢ়চতুর্দশীতে আমাদের নদীতে বাচ খেলতে আসত। মরে যাই, ওদের এমন দশা কে করলে। ওই-যে দেখি শক্‌লু, তলোয়ারখেলায় সব্বার আগে পেত মালা। অন্‌—প, শক্‌লু—, এই দিকে চেয়ে দেখো, এই আমি, তোমাদের নন্দিন, ঈশানী-পাড়ার নন্দিন। মাথা তুলে দেখলে না, চিরদিনের মতো মাথা হেঁট হয়ে গেছে। ওকি, কঙ্কু যে! আহা, আহা, ওর মতো ছেলেকেও যেন আখের মতো চিবিয়ে ফেলে দিয়েছে। বড়ো লাজুক ছিল; যে-ঘাটে জল আনতে যেতুম, তারি কাছে ঢালু পাড়ির 'পরে বসে থাকত, ভাণ করত যেন তীর বানাবার জন্য শর ভাঙতে এসেছে। দুষ্টমি ক'রে ওকে কত দুঃখ দিয়েছি। ও কঙ্কু, ফিরে চা আমার দিকে। হায় রে, আমার ইশারাতে যার রক্ত নেচে উঠত, সে আমার ডাকে সাড়াই দিলে না। গেল গো, আমাদের গাঁয়ের সব আলো নিবে গেল। অধ্যাপক, লোহাটা ক্ষয়ে গেছে, কালো মরচেটাই বাকি! এমন কেন হল।

অধ্যাপক। নন্দিনী, যে-দিকটাতে ছাই, তোমার দৃষ্টি আজ সেই দিকটাতেই পড়েছে। একবার শিখার দিকে তাকাও, দেখবে তার জিহ্বা লকলক করছে।

নন্দিনী। তোমার কথা বুঝতে পারছি নে।

অধ্যাপক। রাজাকে তো দেখেছ? তার মূর্তি দেখে শুনছি নাকি তোমার মন মুগ্ধ হয়েছে?

নন্দিনী। হয়েছে বই-কি। সে-যে অদ্ভুত শক্তির চেহারা।

অধ্যাপক। সেই অদ্ভুতটি হল যার জমা, এই কিম্ভূতটি হল তার খরচ। ওই ছোটোগুলো হতে থাকে ছাই, আর ওই বড়োটা জ্বলতে থাকে শিখা। এই হচ্ছে বড়ো হবার তত্ত্ব।

নন্দিনী। ও তো রাক্ষসের তত্ত্ব।

অধ্যাপক। তত্ত্বর উপর রাগ করা মিছে। সে ভালোও নয়, মন্দও নয়। যেটা হয় সেটা হয়, তার বিরুদ্ধে যাও তো হওয়ারই বিরুদ্ধে যাবে।

নন্দিনী। এই যদি মানুষের হওয়ার রাস্তা হয়, তা-হলে চাই নে আমি হওয়া— আমি ওই ছায়াদের সঙ্গে চলে যাব, আমাকে রাস্তা দেখিয়ে দাও।

অধ্যাপক। রাস্তা দেখাবার দিন এলে এরাই দেখাবে, তার আগে রাস্তা ব'লে কোনো বালাই নেই। দেখো-না, পুরাণবাগীশ আস্তে আস্তে কখন্ সরে পড়েছেন, ভেবেছেন পালিয়ে বাঁচবেন। একটু এগোলেই বুঝবেন বেড়াজাল এখান থেকে শুরু করে বহু যোজন দূর পর্যন্ত খুঁটিতে খুঁটিতে বাঁধা। নন্দিনী, রাগ করছ তুমি। তোমার কপোলে রক্তকরবীর গুচ্ছ আজ প্রলয়গোধূলির মেঘের মতো দেখাচ্ছে।

নন্দিনী। (জানলা ঠেলে) শোনো, শোনো!

অধ্যাপক। কাকে ডাকছ তুমি।

নন্দিনী। জালের কুয়াশায় ঢাকা তোমাদের রাজাকে।

অধ্যাপক। ভিতরকার কপাট পড়ে গেছে, ডাক শুনতে পাবে না।

নন্দিনী। বিশুপাগল, পাগলভাই!

অধ্যাপক। তাকে ডাকছ কেন।

নন্দিনী। এখনো-যে সে ফিরল না। আমার ভয় করছে।

অধ্যাপক। একটু আগেই তোমার সঙ্গেই তো দেখেছি।

নন্দিনী। সর্দার বললে, রঞ্জনকে চিনিয়ে দেবার জন্যে তার ডাক পড়েছে। সঙ্গে যেতে চাইলুম, দিলে না।— ও কিসের আর্তনাদ।

অধ্যাপক। এ বোধ হচ্ছে সেই পালোয়ানের।

নন্দিনী। কে সে।

অধ্যাপক। সেই-যে জগদ্বিখ্যাত গজ্জু, যার ভাই ভজন স্পর্ধা করে রাজার সঙ্গে কুস্তি করতে এল, তার পরে তার লঙোটির একটা ছেঁড়া সুতো কোথাও দেখা গেল না। সেই রাগে গজ্জু এল তাল ঠুকে। ওকে গোড়াতেই বলেছিলুম, 'এ-রাজ্যে সুড়ঙ্গ খুদতে চাও তো এসো, মরতে-মরতেও কিছুদিন বেঁচে থাকবে। আর যদি পৌরুষ দেখাতে চাও তো একমুহূর্ত সইবে না। এ বড়ো কঠিন জায়গা।'

নন্দিনী। দিনরাত এই মানুষধরা ফাঁদের খবরদারি করে এরা একটুও কি ভালো থাকে।

অধ্যাপক। ভালোর কথাটা এর মধ্যে নেই, থাকার কথাটাই আছে। এদের সেই থাকাটা এত ভয়ংকর বেড়ে গেছে যে লাখো-লাখো মানুষের উপর চাপ না দিলে এদের ভার সামলাবে কে? জাল তাই বেড়েই চলেছে। ওদের যে থাকতেই হবে।

নন্দিনী। থাকতেই হবে? মানুষ হয়ে থাকবার জন্যে যদি মরতেই হয়, তাতেই বা দোষ কী।

অধ্যাপক। আবার সেই রাগ? সেই রক্তকরবীর ঝংকার? খুব মধুর, তবুও যা সত্য তা সত্য। থাকবার জন্যে মরতে হবে, এ কথা বলে সুখ পাও তো বলো। কিন্তু থাকবার জন্যে মারতে হবে, এ কথা যারা বলে তারাই থাকে। তোমরা বল এতে মনুষ্যত্বের ত্রুটি হয়, রাগের মাথায় ভুলে যাও এইটেই মনুষ্যত্ব। বাঘকে খেয়ে বাঘ বড়ো হয় না, কেবল মানুষই মানুষকে খেয়ে ফুলে ওঠে।

পালোয়ানের প্রবেশ

নন্দিনী। আহা, ওই দেখো, কি-রকম টলতে টলতে আসছে। পালোয়ান, এইখানে শুয়ে পড়ো। অধ্যাপক, দেখো-না কোথায় চোট লেগেছে।

অধ্যাপক। বাইরে থেকে চোটের দাগ দেখতেই পাবে না।

পালোয়ান। দয়াময় ভগবান, জীবনে যেন একবার জোর পাই, আর একদিনের জন্যেও।

অধ্যাপক। কেন হে।

পালোয়ান। কেবল ওই সর্দারটার ঘাড় মটকে দেবার জন্যে।

অধ্যাপক। সর্দার তোমার কী করেছে।

পালোয়ান। সমস্তই সেই তো ঘটিয়েছে। আমি তো লড়তে চাই নি। আজ বলে বেড়াচ্ছে, আমারি দোষ।

অধ্যাপক। কেন। ওর কী স্বার্থ।

পালোয়ান। সমস্ত পৃথিবীকে নিঃশক্তি করতে পারলে তবে ওরা নিশ্চিন্ত হয়। দয়াময় হরি, একদিন যেন ওর চোখদুটো উপড়ে ফেলতে পারি, যেন ওর জিভটা টেনে বের করি।

নন্দিনী। তোমার কি-রকম বোধ হচ্ছে, পালোয়ান।

পালোয়ান। বোধ হচ্ছে ভিতরটা ফাঁপা হয়ে গেছে। এরা কোথাকার দানব, জাদু জানে, শুধু জোর নয়, একেবারে ভরসা পর্যন্ত শুষে নেয়।— যদি কোনো উপায়ে একবার— হে কল্যাণময় হরি, আঃ যদি একবার— তোমার দয়া হলে কী না হতে পারে। সর্দারের বুকে যদি একবার দাঁত বসাতে পারি।

নন্দিনী। অধ্যাপক, ওকে ধরো তুমি, দুজনে মিলে আমাদের বাসায় নিয়ে যাই।

অধ্যাপক। সাহস করি নে, নন্দিনী। এখানকার নিয়মমতে তাতে অপরাধ হবে।

নন্দিনী। মানুষটাকে মরতে দিলে অপরাধ হবে না ?

অধ্যাপক। যে-অপরাধের শাস্তি দেবার কেউ নেই সেটা পাপ হতে পারে কিন্তু অপরাধ নয়। নন্দিনী, এ-সমস্ত থেকে তুমি একেবারে চলে এসো। শিকড়ের মুঠো মেলে গাছ মাটির নিচে হরণশোষণের কাজ করে, সেখানে তো ফুল ফোটায় না। ফুল ফোটে উপরের ডালে, আকাশের দিকে। ওগো রক্তকরবী, আমাদের মাটির তলাকার খবর নিতে এসো না, উপরের হাওয়ায় তোমার দোল দেখব বলে তাকিয়ে আছি।— ওই-যে সর্দার। আমি তবে সরি। তোমার সঙ্গে কথা কই এ ও সইতে পারে না।

নন্দিনী। আমার উপরে কেন এত রাগ।

অধ্যাপক। আন্দাজে বলতে পারি। তুমি ভিতরে-ভিতরে ওর মনের তারে টান লাগিয়েছ ; যতই সুর মিলছে না, বেসুর ততই কড়া হয়ে চেঁচিয়ে উঠছে।

[প্রস্থান

সর্দারের প্রবেশ

নন্দিনী। সর্দার !

সর্দার। নন্দিনী, তোমার সেই কুঁদফুলের মালাগাছটি আমার ঘরে দেখে গোঁসাইজির দুই চক্ষু— এই-যে স্বয়ং এসেছেন। প্রণাম ! প্রভু, সেই মালাটি নন্দিনী আমাকে দিয়েছিল !

গোঁসাইয়ের প্রবেশ

গোঁসাই। আহা, শুভ্র প্রাণের দান, ভগবানের শুভ্র কুন্দফুল। বিষয়ী লোকের হাতে পড়েও তার শুভ্রতা ম্লান হল না। এতেই তো পুণ্যের শক্তি আর পাপীর ত্রাণের আশা দেখতে পাই।

নন্দিনী। গোঁসাইজি, এই লোকটির একটা ব্যবস্থা করো। এর জীবনের আর কতটুকুই বা বাকি।

গোঁসাই। সবদিক ভেবে যে-পরিমাণ বাঁচা দরকার, আমাদের সর্দার নিশ্চয় ওকে ততটুকু বাঁচিয়ে রাখবে। কিন্তু বৎসে, এ-সব আলোচনা তোমাদের মুখে শ্রুতিকটু লাগে, আমরা পছন্দ করি নে।

নন্দিনী। এ-রাজ্যে বাঁচিয়ে রাখার বুঝি পরিমাণবিচার আছে ?

গোঁসাই। আছে বই-কি। পার্থিব জীবনটা যে সীমাবদ্ধ। তাই হিসাব বুঝে তার ভাগবাঁটোয়ারা করতে হয়। আমাদের শ্রেণীর লোকের 'পরে ভগবান দুঃসহ দায়িত্ব চাপিয়েছেন, সেটা বহন করতে গেলে আমাদের ভাগে প্রাণের সারাংশ অনেকটা

বেশী পরিমাণে পড়া চাই। ওদের খুব কম বাঁচলেও চলে, কেননা ওদের ভার-লাঘবের জন্যে আমরাই বাঁচি। একি ওদের পক্ষে কম বাঁচোয়া।

নন্দিনী। গোঁসাইজি, ভগবান তোমার উপরে এদের কোন্ উপকারের বিষম ভার চাপিয়েছেন।

গোঁসাই। যে-প্রাণ সীমাবদ্ধ নয়, তার অংশভাগ নিয়ে কারো সঙ্গে কারো ঝগড়ার দরকারই হয় না, আমরা গোঁসাইরা সেই প্রাণেরই রাস্তা দেখাতে এসেছি। এতেই যদি ওরা সন্তুষ্ট থাকে তবেই আমরা ওদের বন্ধু।

নন্দিনী। তবে কি এ-লোকটা ওর সীমাবদ্ধ প্রাণ নিয়ে এই-রকম আধমরা হয়েই পড়ে থাকবে।

গোঁসাই। পড়েই বা থাকবে কেন। কী বল সর্দার।

সর্দার। সে তো ঠিক। পড়ে থাকতে দেব কেন। এখন থেকে নিজের জোরে চলবার ওর দরকারই হবে না। আমাদেরই জোরে চালিয়ে নিয়ে বেড়াব। ওরে গজ্জু।

পালোয়ান। কী প্রভু।

গোঁসাই। হরি হরি, এরি মধ্যে গলা বেশ-একটু মিহি হয়ে এসেছে, মনে হচ্ছে, আমাদের নামকীর্তনের দলে টেনে নিতে পারব।

সর্দার। হ-ক্ষ পাড়ার মোড়লের ঘরে তোর বাসা হয়েছে, চলে যা সেখানে।

নন্দিনী। ওকি কথা। চলতে পারবে কেন।

সর্দার। দেখো নন্দিনী, মানুষ-চালানোই আমাদের ব্যবসা। আমরা জানি, মানুষ যেখানটাতে এসে মুখ থুবড়ে পড়ে, জোরে ঠেলা দিলে আরো খানিকটা যেতে পারে। যাও গজ্জু।

পালোয়ান। যে আদেশ।

নন্দিনী। পালোয়ান, আমিও যাচ্ছি মোড়লের ঘরে। সেখানে তো তোমাকে দেখবার কেউ নেই।

পালোয়ান। না না, থাক্, সর্দার রাগ করবে।

নন্দিনী। আমি সর্দারের রাগকে ভয় করি নে।

পালোয়ান। আমি ভয় করি, দোহাই তোমার, আমার বিপদ বাড়িয়ো না।

[প্রস্থান

নন্দিনী। সর্দার, যেয়ো না, বলে যাও আমার বিশুপাগলকে কোথায় নিয়ে গেছ।

সর্দার। আমি নিয়ে যাবার কে। বাতাস নিয়ে যায় মেঘকে, সেটাকে যদি দোষ মনে কর, খবর নাও বাতাসকে কে দিয়েছে ঠেলা।

নন্দিনী। এ কোন্ সর্বনেশে দেশ গো। তোমরাও মানুষ নও, আর যাদের চালাও তারাও মানুষ নয়? তোমরা হাওয়া, তারা মেঘ? গোঁসাই, তুমি নিশ্চয় জান, কোথায় আমার বিশুপাগল আছে।

গোঁসাই। আমি নিশ্চয় জানি, সে যেখানে থাক্ সবই ভালোর জন্যে।

নন্দিনী। কার ভালোর জন্যে।

গোঁসাই। সে তুমি বুঝবে না— আঃ, ছাড়ো, ছাড়ো, ওটা আমার জপমালা। ওই গেল ছিঁড়ে। ওহে সর্দার, এই যে মেয়েটিকে তোমরা—

সর্দার। কে জানে ও কেমন করে এখানকার নিয়মের একটা ফাঁকের মধ্যে বাসা পেয়েছে। স্বয়ং আমাদের রাজা—

গোঁসাই। ওহে, এইবার আমার নামাবলিটা-সুদ্ধ ছিঁড়বে। বিপদ করলে। আমি চললুম। [প্রস্থান

নন্দিনী। সর্দার, বলতেই হবে কোথায় নিয়ে গিয়েছ বিশুপাগলকে।

সর্দার। তাকে বিচারশালায় ডেকেছে— এর বেশি বলবার নেই। ছাড়ো আমাকে, আমার কাজ আছে।

নন্দিনী। আমি নারী বলে আমাকে ভয় কর না? বিদ্যুৎশিখার হাত দিয়ে ইন্দ্র তাঁর বজ্র পাঠিয়ে দেন। আমি সেই বজ্র বয়ে এনেছি, ভাঙবে তোমার সর্দারির সোনার চূড়া।

সর্দার। তবে সত্য কথাটা তোমাকে বলে যাই। বিশুর বিপদ ঘটিয়েছ তুমিই।

নন্দিনী। আমি!

সর্দার। হাঁ, তুমিই। এতদিন কীটের মতো নিঃশব্দে মাটির নিচে গর্ত করে সে চলেছিল, তাকে মরবার পাখা মেলতে শিখিয়েছ তুমিই, ওগো ইন্দ্রদেবের আগুন। অনেককে টানবে, তারপরে শেষ বোঝাপড়া হবে তোমাতে-আমাতে। বেশি দেরি নেই।

নন্দিনী। তাই হ'ক, কিন্তু একটা কথা বলে যাও, রঞ্জনকে আমার সঙ্গে দেখা করতে দেবে কি।

সর্দার। কিছুতে না।

নন্দিনী। কিছুতেই না! দেখব তোমার সাধ্য কিসের। তার সঙ্গে আমার মিলন হবেই, হবেই, আজই হবে। এই তোমাকে বলে দিলুম। [সর্দারের প্রস্থান

নন্দিনী। (জানলায় ঘা দিয়ে) শোনো শোনো, রাজা। কোথায় তোমার বিচার-শালা। তোমার জালের এই আড়াল ভাঙব আমি। ও কে ও! কিশোর যে! বল্ তো আমায়, জানিস কি কোথায় আমাদের বিশু।

কিশোরের প্রবেশ

কিশোর। হাঁ নন্দিনী, এখনি তার সঙ্গে দেখা হবে, মনটা ঠিক করে রাখো। জানি নে, প্রহরীদের কর্তা আমার মুখ দেখে কেন দয়া করলে। আমার অনুরোধে এই পথ দিয়ে বিশুকে নিয়ে যেতে রাজী হল।

নন্দিনী। প্রহরীদের কর্তা? তবে কি—

কিশোর। হাঁ, ওই-যে আসছে।

নন্দিনী। ওকি! তোমার হাতে হাতকড়ি! পাগলভাই, তোমাকে ওরা অমন করে কোথায় নিয়ে চলেছে।

বিশুকে নিয়ে প্রহরীর প্রবেশ

বিশু। ভয় নেই, কিছু ভয় করিস নে। পাগলী, এতদিন পরে আমার মুক্তি হল।

নন্দিনী। কী বলছ বুঝতে পারছি নে।

বিশু। যখন ভয়ে-ভয়ে পদে-পদে বিপদ সামলে চলতুম তখন ছাড়া ছিলুম। সেই ছাড়ার মতো বন্ধন আর নেই।

নন্দিনী। কি দোষ করেছ যে এরা তোমাকে বেঁধে নিয়ে চলেছে।

বিশু। এতদিন পরে আজ সত্যকথা বলেছিলুম।

নন্দিনী। তাতে দোষ কী হয়েছে।

বিশু। কিচ্ছু না।

নন্দিনী। তবে এমন করে বাঁধলে কেন।

বিশু। এতেই বা ক্ষতি কী হল। সত্যের মধ্যে মুক্তি পেয়েছি— এ-বন্ধন তারি সত্য সাক্ষী হয়ে রইল।

নন্দিনী। ওরা তোমাকে পশুর মতো রাস্তা দিয়ে বেঁধে নিয়ে চলেছে, ওদের নিজেরি লজ্জা করছে না? ছি ছি, ওরাও তো মানুষ।

বিশু। ভিতরে মস্ত একটা পশু রয়েছে-যে— মানুষের অপমানে ওদের মাথা হেঁট হয় না, ভিতরকার জানোয়ারটার লেজ ফুলতে থাকে, দুলতে থাকে।

নন্দিনী। আহা পাগলভাই, ওরা কি তোমাকে মেরেছে। এ কিসের চিহ্ন তোমার গায়ে।

বিশু। চাবুক মেরেছে, যে-চাবুক দিয়ে ওরা কুকুর মারে। যে-রশিতে এই

চাবুক তৈরী সেই রশির সুতো দিয়েই ওদের গোঁসাইয়ের জপমালা তৈরী। যখন ঠাকুরের নাম জপ করে তখন সে-কথা ওরা ভুলে যায়, কিন্তু ঠাকুর খবর রাখেন।

নন্দিনী। আমাকেও এমনি করে তোমার সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যাক, ভাই আমার। তোমার এই মার আমিও যদি কিছু না পাই তবে আজ থেকে মুখে অন্ন রুচবে না।

কিশোর। বিশু, আমি যদি চেষ্টা করি নিশ্চয় ওরা তোমার বদলে আমাকে নিতে পারে। সেই অনুমতি করো তুমি।

বিশু। এ-যে তোর পাগলের মতো কথা।

কিশোর। শাস্তিতে তো আমাকে বাজবে না, আমার বয়স অল্প, আমি খুশী হয়ে সইতে পারব।

নন্দিনী। আহা, না কিশোর, ও-কথা বলিস নে।

কিশোর। নন্দিনী, আমি আজ কামাই করেছি, ওরা তা টের পেয়েছে। আমার পিছনে ডালকুত্তা লাগিয়েছে। তারা যে অপমান করবে, এই শাস্তি তার থেকে আমাকে বাঁচাবে।

বিশু। না কিশোর, এখনো ধরা পড়লে চলবে না। একটা বিপদের কাজ করবার আছে। রঞ্জন এখানে এসেছে, যেমন করে পারিস তাকে বের করতে হবে। সহজ নয়।

কিশোর। নন্দিনী, তা-হলে বিদায় নিলুম। রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হলে তোমার কোন্ কথা তাকে জানাব।

নন্দিনী। কিছু না। তাকে এই রক্তকরবীর গুচ্ছ দিলেই আমার সব কথা জানানো হবে। [কিশোরের প্রস্থান

বিশু। এইবার রঞ্জনের সঙ্গে তোমার মিলন হ'ক।

নন্দিনী। মিলনে আমার আর সুখ হবে না। এ-কথা কোনোদিন ভুলতে পারব না যে, তোমাকে শূন্যহাতে বিদায় দিয়েছি। আর ওই-যে বালক কিশোর, ও আমার কাছ থেকে কী বা পেলে।

বিশু। মনে যে-আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছ, তাতে ওর অন্তরের ধন সব প্রকাশ পেয়েছে। আর কী চাই। মনে আছে, সেই নীলকণ্ঠের পালক রঞ্জনের চূড়ায় পরিয়ে দিতে হবে?

নন্দিনী। এই-যে রয়েছে আমার বুকের আঁচলে।

বিশু। পাগলী, শুনতে পাচ্ছিস ওই ফসলকাটার গান ?

নন্দিনী। শুনতে পাচ্ছি, প্রাণ কেঁদে উঠছে।

বিশু। মাঠের লীলা শেষ হল, খেতের মালিক পাকা ফসল ঘরে নিয়ে চলল। চলো প্রহরী, আর দেরি নয়—

গান

শেষ ফলনের ফসল এবার কেটে লও, বাঁধো আঁটি,
বাকি যা নয় গো নেবার মাটিতে হ'ক তা মাটি।

[সকলের প্রস্থান

চিকিৎসক ও সর্দারের প্রবেশ

চিকিৎসক। দেখলুম। রাজা নিজের 'পরে নিজে বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। এ-রোগ বাইরের নয়, মনের।

সর্দার। এর প্রতিকার কী।

চিকিৎসক। বড়ো-রকমের ধাক্কা। হয় অন্য রাজ্যের সঙ্গে, নয় নিজের প্রজাদের মধ্যে উৎপাত বাধিয়ে তোলা।

সর্দার। অর্থাৎ আর-কারো ক্ষতি করতে না দিলে, উনি নিজের ক্ষতি করবেন।

চিকিৎসক। ওরা বড়োলোক, বড়ো-শিশু, খেলা করে। একটা খেলায় যখন বিরক্ত হয়, তখন আরেকটা খেলা না জুগিয়ে দিলে নিজের খেলনা ভাঙে। কিন্তু প্রস্তুত থাকো সর্দার, আর বড়ো দেরি নেই।

সর্দার। লক্ষণ দেখে আমি আগেই সব প্রস্তুত রেখেছি। কিন্তু হায় হায়, কী দুঃখ। আমাদের স্বর্ণপুরী যে-রকম ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছিল, এমন কোনোদিন হয় নি, ঠিক এই সময়টাতেই— আচ্ছা যাও, ভেবে দেখছি। [চিকিৎসকের প্রস্থান

মোড়লের প্রবেশ

মোড়ল। সর্দারমহারাজ, ডেকেছেন ? আমি ঞ পাড়ার মোড়ল।

সর্দার। তুমিই তো তিনশো একুশ ?

মোড়ল। প্রভুর কী স্মরণশক্তি। আমার মতো অভাজনকেও ভোলেন না।

সর্দার। দেশ থেকে আমার স্ত্রী আসছে। তোমাদের পাড়ার কাছে ডাক বদল হবে, শীঘ্র এখানে পৌঁছিয়ে দেওয়া চাই।

মোড়ল। পাড়ায় গোরুর মড়ক, গাড়ি টানবার মতো বলদের অভাব। তা হ'ক, খোদাইকরদের লাগিয়ে দেওয়া যাবে।

সর্দার। কোথায় যেতে হবে জান তো? বাগানবাড়িতে, যেখানে সর্দারদের ভোজ।

মোড়ল। যাচ্ছি, কিন্তু একটা কথা বলে দিয়ে যাই। একটু কান দেবেন। ওই-যে ৬৯ ঙ, লোকে যাকে বিশুপাগল বলে, ওর পাগলামিটাকে শোধন করবার সময় এসেছে।

সর্দার। কেন। তোমাদের 'পরে উৎপাত করে নাকি।

মোড়ল। মুখের কথায় নয়, ভাবে-ভঙ্গীতে।

সর্দার। আর ভাবনা নেই। বুঝেছ?

মোড়ল। তাই নাকি। তা-হলে ভালো। আরেকটা কথা, ওই-যে ৪৭ ফ, ৬৯ ঙর সঙ্গে ওর কিছু বেশী মেশামেশি।

সর্দার। সেটা লক্ষ্য করেছি।

মোড়ল। প্রভুর লক্ষ্য ঠিকই আছে। তবু নানান দিকে দৃষ্টি রাখতে হয় নাকি— দুই-একটা ফসকিয়ে যেতেও পারে। এই দেখুন-না, আমাদের ৯৫— গ্রামসম্পর্কে আমার পিসশ্বশুর— পাঁজরের হাড়ক'খানা দিয়ে সর্দারমহারাজের ঝাড়ুবর্দারের খড়ম বানিয়ে দিতে প্রস্তুত, প্রভুভক্তি দেখে স্বয়ং তার সহধর্মিণী লজ্জায় মাথা হেঁট করে, অথচ আজ পর্যন্ত—

সর্দার। তার নাম বড়ো-খাতায় উঠেছে।

মোড়ল। যাক, সার্থক হল এতকালের সেবা। খবরটা তাকে সাবধানে শোনাতে হবে, তার আবার মৃগীরোগ আছে, কী জানি হঠাৎ –

সর্দার। আচ্ছা, সে হবে, তুমি যাও শিগ্‌গির।

মোড়ল। আর একজন মানুষের কথা বলবার আছে— সে যদিচ আমার আপন শালা, তার মা মরে গেলে আমার স্ত্রী তাকে নিজের হাতে মানুষ করেছে, তবুও যখন মনিবের নিমক—

সর্দার। তার কথা কাল হবে, তুমি দৌড়ে চলে যাও।

মোড়ল। মেজো সর্দারবাহাদুর ওই আসছেন। ওঁকে আমার হয়ে দুটো কথা বলবেন। আমার উপর ওঁর ভালো নজর নেই। আমার বিশ্বাস প্রভুদের মহলে ৬৯ ঙর যখন যাওয়া-আসা ছিল, তখনি সে আমার নামে—

সর্দার। না না, কোনোদিন তোমার নাম করতেও তাকে শুনি নি।

মোড়ল। সেই তো ওর চালাকি। যে-মানুষ নামজাদা তার নাম চাপা দিয়েই তো তাকে মারতে হয়। কৌশলে ইশারায় লাগালাগি করা তো ভালো নয়। ওই রোগটি আছে আমাদের তেত্রিশের। তার তো দেখি আর-কোনো কাজ নেই, যখন-তখন প্রভুদের খাসমহলে যাওয়া-আসা চলছেই। ভয় হয়, কার নামে কী বানিয়ে বসে। অথচ ওঁর নিজের ঘরের খবরটি যদি—

সর্দার। আজ আর সময় নেই, শিগ্‌গির যাও।

মোড়ল। তবে প্রণাম হই। (ফিরে এসে) একটি কথা, ওপাড়ার অষ্ট-আশি সেদিন মাত্র তিরিশ তনখায় কাজে ঢুকল, দুটো বছর না যেতেই উপরিপাওনা ধরে ওর আয় আজ কিছু না হবে তো মাসে হাজার-দেড়হাজার তো হবেই। প্রভুদের সাদা মন, দেবতার মতো ফাঁকা স্তবেই ভোলেন। সাষ্টাঙ্গে প্রণামের ঘটা দেখেই—

সর্দার। আচ্ছা আচ্ছা, সে-কথা কাল হবে।

মোড়ল। আমার তো দয়াধর্ম আছে, আমি তার রুটি মারার কথা বলি নে; কিন্তু তাকে খাতাঞ্চিখানায় রাখাটা ভালো হচ্ছে কিনা ভেবে দেখবেন। আমাদের বিষ্ণুদত্ত তার নাড়ীনক্ষত্র জানে। তাকে ডাকিয়ে নিয়ে—

সর্দার। আজই ডাকাব, তুমি যাও।

মোড়ল। প্রভু, আমার সেজো ছেলে লায়েক হয়ে উঠেছে। প্রণাম করতে এসেছিল, তিন দিন হাঁটাহাঁটি করে দর্শন না পেয়ে ফিরে গেছে। বড়োই মনের দুঃখে আছে। প্রভুর ভোগের জন্যে আমার বধূমাতা নিজের হাতে তৈরী ছাঁচিকুমড়োর—

সর্দার। আচ্ছা, পরশু আসতে বোলো, দেখা মিলবে। [মোড়লের প্রস্থান

মেজো সর্দারের প্রবেশ

মেজো সর্দার। নাচওয়ালী আর বাজনদারদের বাগানে রওনা করে দিয়ে এলুম।

সর্দার। আর, রঞ্জনের সেটা কত দূর—

মেজো সর্দার। এ-সব কাজ আমার দ্বারা হয় না। ছোটো সর্দার নিজে পছন্দ করে ভার নিয়েছে। এতক্ষণে তার—

সর্দার। রাজা কি—

মেজো সর্দার। রাজা নিশ্চয় বুঝতে পারেন নি। দশজনের সঙ্গে মিশিয়ে তাকে —কিন্তু রাজাকে এরকম ঠকানো আমি তো কর্তব্য মনে করি নে।

সর্দার। রাজার প্রতি কর্তব্যের অনুরোধেই রাজাকে ঠকাতে হয়, রাজাকে ঠেকাতেও হয়। সে দায় আমার। এবার কিন্তু ওই মেয়েটাকে অবিলম্বে—

মেজো সর্দার। না না, এ-সব কথা আমার সঙ্গে নয়। যে-মোড়লের উপর ভার দেওয়া হয়েছে সে যোগ্য লোক, সে কোনোরকম নোংরামিকেই ভয় করে না।

সর্দার। কেনারাম গোঁসাই কি জানে রঞ্জনের কথা।

মেজো সর্দার। আন্দাজে সবই জানে, পস্ট জানতে চায় না।

সর্দার। কেন।

মেজো সর্দার। পাছে 'জানি নে' এই কথা বলবার পথ বন্ধ হয়ে যায়।

সর্দার। হলই বা।

মেজো সর্দার। বুঝছ না? আমাদের তো শুধু একটা চেহারা, সর্দারের চেহারা। কিন্তু ওর-যে এক পিঠে গোঁসাই, আরেক পিঠে সর্দার। নামাবলিটা একটু ফেঁসে গেলেই সেটা ফাঁস হয়ে পড়ে। তাই সর্দারিধর্মটা নিজের অগোচরে পালন করতে হয়, তা-হলে নামজপের বেলায় খুব বেশী বাধে না।

সর্দার। নামজপটা না-হয় ছেড়েই দিত।

মেজো সর্দার। কিন্তু এদিকে যে ওর মনটা ধর্মভীরু, রক্তটা যাই হ'ক। তাই স্পষ্টভাবে নামজপ আর অস্পষ্টভাবে সর্দারি করতে পারলে ও সুস্থ থাকে। ও আছে বলেই আমাদের দেবতা আরামে আছে, তার কলঙ্ক ঢাকা পড়েছে, নইলে চেহারাটা ভালো দেখাত না।

সর্দার। মেজো সর্দার, তোমারো দেখেছি রক্তের সঙ্গে সর্দারির রক্তের মিল হয় নি।

মেজো সর্দার। রক্ত শুকিয়ে এলেই বালাই থাকবে না, এখনো সে-আশা আছে। কিন্তু আজো তোমার ওই তিনশো-একুশকে সইতে পারি নে। যাকে দূর থেকে চিমটে দিয়ে ছুঁতেও ঘেন্না করে, তাকে যখন সভার মাঝখানে সুহৃদ ব'লে বুকে জড়িয়ে ধরতে হয়, তখন কোনো তীর্থজলে স্নান করে নিজেকে শুচি বোধ হয় না।— ওই-যে নন্দিনী আসছে।

সর্দার। চলে এসো, মেজো সর্দার।

মেজো সর্দার। কেন। ভয় কিসের।

সর্দার। তোমাকে বিশ্বাস করি নে; আমি জানি, তোমার চোখে নন্দিনীর ঘোর লেগেছে।

মেজো সর্দার। কিন্তু তুমি জানো না যে, তোমার চোখেও কর্তব্যের রঙের

সঙ্গে রক্তকরবীর রঙ কিছু যেন মিশেছে, তাতেই রক্তিমা এতটা ভয়ংকর হয়ে উঠল।

সর্দার। তা হবে, মনের কথা মন নিজেও জানে না। তুমি চলে এসো আমার সঙ্গে। [উভয়ের প্রস্থান

নন্দিনীর প্রবেশ

নন্দিনী। দেখতে দেখতে সিঁদুরে মেঘে আজকের গোধূলি রাঙা হয়ে উঠল। ওই-কি আমাদের মিলনের রঙ। আমার সিঁথের সিঁদুর যেন সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে গেছে। (জানলায় ঘা দিয়ে) শোনো, শোনো, শোনো। দিনরাত এখানে পড়ে থাকব, যতক্ষণ না শোনো।

গোঁসাইয়ের প্রবেশ

গোঁসাই। ঠেলছ কাকে।

নন্দিনী। তোমাদের যে-অজগর আড়ালে থেকে মানুষ গেলে তাকে।

গোঁসাই। হরি হরি, ভগবান যখন ছোটোকে মারেন তখন তার ছোটোমুখে বড়োকথা দিয়েই মারেন। দেখো নন্দিনী, তুমি নিশ্চয় জেনো, আমি তোমার মঙ্গল চিন্তা করি।

নন্দিনী। তাতে আমার মঙ্গল হবে না।

গোঁসাই। এসো আমার ঠাকুরঘরে, তোমাকে নাম শোনাইগে।

নন্দিনী। শুধু নাম নিয়ে করব কী।

গোঁসাই। মনে শান্তি পাবে।

নন্দিনী। শান্তি যদি পাই তবে ধিক্ ধিক্ ধিক্ আমাকে। আমি এই দরজায় অপেক্ষা করে বসে থাকব।

গোঁসাই। দেবতার চেয়ে মানুষের 'পরে তোমার বিশ্বাস বেশী ?

নন্দিনী। তোমাদের ওই ধ্বজদণ্ডের দেবতা, সে কোনো দিনই নরম হবে না। কিন্তু জালের আড়ালের মানুষ চিরদিনই কি জালে বাঁধা থাকবে। যাও যাও, যাও। মানুষের প্রাণ ছিঁড়ে নিয়ে তাকে নাম দিয়ে ভোলাবার ব্যবসা তোমার।

[গোঁসাইয়ের প্রস্থান

ফাগুলাল ও চন্দ্রার প্রবেশ

ফাগুলাল। বিশু তোমার সঙ্গে এল, সে এখন কোথায়। সত্য করে বলো।

নন্দিনী। তাকে বন্দী করে নিয়ে গেছে।

চন্দ্রা। রাক্ষসী, তুই তাকে ধরিয়ে দিয়েছিস। তুই ওদের চর।

নন্দিনী। কোন্ মুখে এমন কথা বলতে পারলে।

চন্দ্রা। নইলে এখানে তোর কী কাজ। কেবল সবার মন ভুলিয়ে ভুলিয়ে ঘুরে বেড়াস।

ফাগুলাল। এখানে সবাই সবাইকে সন্দেহ করে, কিন্তু তবু তোমাকে আমি বিশ্বাস করে এসেছি। মনে-মনে তোমাকে— সে-কথা থাক্। কিন্তু আজ কেমনতরো ঠেকছে যে।

নন্দিনী। হবে, তা হবে। আমার সঙ্গে এসেই বিপদে পড়েছে। তোমাদের কাছে নিরাপদে থাকত, সে-কথা নিজেই বললে।

চন্দ্রা। তবে কেন আনলি ওকে ভুলিয়ে! সর্বনাশী!

নন্দিনী। ও-যে বললে, ও মুক্তি চায়।

চন্দ্রা। ভালো মুক্তি দিয়েছিস ওকে।

নন্দিনী। আমি তো ওর সব কথা বুঝতে পারি নে, চন্দ্রা। ও কেন আমাকে বললে, বিপদের তলায় তলিয়ে গিয়ে তবে মুক্তি। ফাগুলাল, নিরাপদের মার থেকে মুক্তি চায় যে-মানুষ, আমি তাকে বাঁচাব কী করে।

চন্দ্রা। ও-সব কথা বুঝি নে। ওকে ফিরিয়ে যদি না আনতে পারিস মরবি, মরবি। তোর ওই সুন্দরপানা মুখখানা দেখে আমি ভুলি নে।

ফাগুলাল। চন্দ্রা, মিছে বকাবকি করে কী হবে। কারিগরপাড়া থেকে দলবল জুটিয়ে আনি। বন্দীশালা চুরমার করে ভাঙব।

নন্দিনী। আমি যাব তোমাদের সঙ্গে।

ফাগুলাল। কী করতে যাবে।

নন্দিনী। ভাঙতে যাব।

চন্দ্রা। ওগো, অনেক ভাঙন ভেঙেছ মায়াবিনী! আর কাজ নেই।

গোকুলের প্রবেশ

গোকুল। সবার আগে ওই ডাইনীকে পুড়িয়ে মারতে হবে।

চন্দ্রা। মারবে? তাতে ওর শাস্তি হবে না। যে-রূপ নিয়ে ও সর্বনাশ করে, সেই রূপটা দাও ঘুচিয়ে। খুরপো দিয়ে যেমন করে ঘাস নিড়োয়, তেমনি করে ওর রূপ দাও নিড়িয়ে।

গোকুল। তা পারি। একবার এই হাতুড়ির নাচনটা—

ফাগুলাল। খবরদার! ওর গায়ে হাত দাও যদি তা-হলে—

নন্দিনী। ফাগুলাল, তুমি থামো। ও ভীরু, আমাকে ভয় করে তাই আমাকে মারতে চায়। আমি ওর মারকে ভয় করিনে। কী করতে পারে করুক কাপুরুষ।

গোকুল। ফাগুলাল, এখনো তোমার চৈতন্য হয় নি! সর্দারকেই তুমি শত্রু বলে জান! তা হ'ক যে-শত্রু সহজ শত্রু তাকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তোমাদের ওই মিষ্টিমুখী সুন্দরী—

নন্দিনী। সর্দারকে তোমার শ্রদ্ধা! পায়ের তলাটাকে পায়ের তলার কাদার শ্রদ্ধা যে-রকম। যে দাস সে কখনো শ্রদ্ধা করতে পারে?

ফাগুলাল। গোকুল, তোমার পৌরুষ দেখাবার সময় এসেছে। কিন্তু বালিকার কাছে নয়। চলো আমার সঙ্গে।

[ফাগুলাল চন্দ্রা ও গোকুলের প্রস্থান

একদল লোকের প্রবেশ

নন্দিনী। ওগো, কোথায় চলেছ তোমরা।

প্রথম। ধ্বজাপূজার নৈবেদ্য নিয়ে চলেছি।

নন্দিনী। রঞ্জনকে দেখেছ?

দ্বিতীয়। তাকে পাঁচদিন আগে একবার দেখেছিলুম, আর দেখি নি। ওই ওদের জিজ্ঞাসা করো, হয়তো বলতে পারবে।

নন্দিনী। ওরা কারা।

তৃতীয়। ওরা সর্দারের ভোজে মদ নিয়ে যাচ্ছে। [এই দলের প্রস্থান

অন্য দলের প্রবেশ

নন্দিনী। ওগো লালটুপিরা, রঞ্জনকে তোমরা দেখেছ?

প্রথম। সেদিন রাতে শম্ভুমোড়লের বাড়িতে দেখেছি।

নন্দিনী। এখন কোথায় আছে সে?

দ্বিতীয়। ওই-যে সর্দারনীদের ভোজে সাজ নিয়ে চলেছে, ওদের জিজ্ঞাসা করো, ওরা অনেক কথা শুনতে পায় যা আমাদের কানে পৌঁছয় না।

[এই দলের প্রস্থান

অন্য দলের প্রবেশ

নন্দিনী। ওগো, রঞ্জনকে এরা কোথায় রেখেছে তোমরা কি জান।

প্রথম। চুপ চুপ।

নন্দিনী। তোমরা নিশ্চয় জান, আমাকে বলতেই হবে।

দ্বিতীয়। আমাদের কান দিয়ে যা ঢোকে মুখ দিয়ে তা বেরোয় না, তাই টিঁকে আছি। ওই-যে অস্ত্রের ভার নিয়ে আসছে, ওদের জিজ্ঞাসা করো।

[এই দলের প্রস্থান

অন্য দলের প্রবেশ

নন্দিনী। ওগো, একটু থামো, বলে যাও রঞ্জন কোথায়।

প্রথম। শোনো বলি, লগ্ন হয়ে এসেছে। ধ্বজাপুজায় রাজাকে বেরোতেই হবে। তাঁকেই জিজ্ঞাসা করো। আমরা শুরুটা জানি, শেষটা জানি নে। [প্রস্থান

নন্দিনী। (জানলায় ঘা দিয়ে) সময় হয়েছে, দরজা খোলো।

নেপথ্যে। আবার এসেছ অসময়ে। এখনি যাও, যাও তুমি।

নন্দিনী। অপেক্ষা করবার সময় নেই, শুনতেই হবে আমার কথা!

নেপথ্যে। কী বলবার আছে বাইরে থেকে বলে চলে যাও।

নন্দিনী। বাইরে থেকে কথার সুর তোমার কানে পৌঁছয় না।

নেপথ্যে। আজ ধ্বজাপুজা, আমার মন বিক্ষিপ্ত কোরো না। পুজার ব্যাঘাত হবে। যাও, যাও! এখনি যাও।

নন্দিনী। আমার ভয় ঘুচে গেছে। অমন করে তাড়াতে পারবে না। মরি সেও ভালো, দরজা না খুলিয়ে নড়ব না।

নেপথ্যে। রঞ্জনকে চাও বুঝি? সর্দারকে বলে দিয়েছি, এখনি তাকে এনে দেবে। পুজোয় যাবার সময় দরজায় দাঁড়িয়ে থেকো না। বিপদ ঘটবে।

নন্দিনী। দেবতার সময়ের অভাব নেই, পুজোর জন্যে যুগযুগান্তর অপেক্ষা করতে পারেন। মানুষের দুঃখ মানুষের নাগাল চায় যে। তার সময় অল্প।

নেপথ্যে। আমি ক্লান্ত, ভারি ক্লান্ত। ধ্বজাপুজায় অবসাদ ঘুচিয়ে আসব। আমাকে দুর্বল কোরো না। এখন বাধা দিলে রথের চাকায় গুঁড়িয়ে যাবে।

নন্দিনী। বুকের উপর দিয়ে চাকা চলে যাক, নড়ব না।

নেপথ্যে। নন্দিনী, আমার কাছ থেকে তুমি প্রশ্রয় পেয়েছ, তাই ভয় কর না। আজ ভয় করতেই হবে।

নন্দিনী। আমি চাই, সবাইকে যেমন ভয় দেখিয়ে বেড়াও, আমাকেও তেমনি ভয় দেখাবে। তোমার প্রশ্রয়কে ঘৃণা করি।

নেপথ্যে। ঘৃণা কর? স্পর্ধা চূর্ণ করব। তোমাকে আমার পরিচয় দেবার সময় এসেছে।

নন্দিনী। পরিচয়ের অপেক্ষাতেই আছি, খোলো দ্বার। (দ্বার উদ্‌ঘাটন) ওকি! ওই কে প'ড়ে। রঞ্জনের মতো দেখছি যেন!

রাজা। কী বললে। রঞ্জন? কখনোই রঞ্জন নয়।

নন্দিনী। হাঁ গো, এই তো আমার রঞ্জন।

রাজা। ও কেন বললে না ওর নাম। কেন এমন স্পর্ধা করে এল।

নন্দিনী। জাগো রঞ্জন, আমি এসেছি তোমার সখী। রাজা, ও জাগে না কেন।

রাজা। ঠকিয়েছে। আমাকে ঠকিয়েছে এরা। সর্বনাশ! আমার নিজের যন্ত্র আমাকে মানছে না। ডাক্ তোরা, সর্দারকে ডেকে আন, বেঁধে নিয়ে আয় তাকে।

নন্দিনী। রাজা, রঞ্জনকে জাগিয়ে দাও, সবাই বলে তুমি জাদু জান, ওকে জাগিয়ে দাও।

রাজা। আমি যমের কাছে জাদু শিখেছি, জাগাতে পারি নে। জাগরণ ঘুচিয়ে দিতেই পারি।

নন্দিনী। তবে আমাকে ওই ঘুমেই ঘুম পাড়াও। আমি সইতে পারছি নে। কেন এমন সর্বনাশ করলে।

রাজা। আমি যৌবনকে মেরেছি— এতদিন ধরে আমি সমস্ত শক্তি নিয়ে কেবল যৌবনকে মেরেছি। মরা-যৌবনের অভিশাপ আমাকে লেগেছে।

নন্দিনী। ও কি আমার নাম বলে নি।

রাজা। এমন করে বলেছিল, সে আমি সইতে পারি নি। হঠাৎ আমার নাড়ীতে নাড়ীতে যেন আগুন জ্বলে উঠল।

নন্দিনী। (রঞ্জনের প্রতি) বীর আমার, নীলকণ্ঠপাখির পালক এই পরিয়ে দিলুম তোমার চূড়ায়। তোমার জয়যাত্রা আজ হতে শুরু হয়েছে। সেই যাত্রার বাহন আমি।— আহা, এই-যে ওর হাতে সেই আমার রক্তকরবীর মঞ্জরি। তবে তো কিশোর ওকে দেখেছিল। সে কোথায় গেল। রাজা, কোথায় সেই বালক।

রাজা। কোন্ বালক।

নন্দিনী। যে-বালক এই ফুলের মঞ্জরি রঞ্জনকে এনে দিয়েছিল।

রাজা। সে-যে অদ্ভুত ছেলে। বালিকার মতো তার কচি মুখ, কিন্তু উদ্ধত তার বাক্য। সে স্পর্ধা করে আমাকে আক্রমণ করতে এসেছিল।

নন্দিনী। তার পরে? কী হল তার। বলো কী হল। বলতেই হবে, চুপ করে থেকো না।

রাজা। বুদ্‌বুদের মতো সে লুপ্ত হয়ে গেছে।

নন্দিনী। রাজা, এইবার সময় হল।

রাজা। কিসের সময়।

নন্দিনী। আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার লড়াই।

রাজা। আমার সঙ্গে লড়াই করবে তুমি! তোমাকে-যে এই মুহূর্তেই মেরে ফেলতে পারি।

নন্দিনী। তার পর থেকে মুহূর্তে মুহূর্তে আমার সেই মরা তোমাকে মারবে। আমার অস্ত্র নেই, আমার অস্ত্র মৃত্যু।

রাজা। তা-হলে কাছে এসো। সাহস আছে আমাকে বিশ্বাস করতে? চলো আমার সঙ্গে। আজ আমাকে তোমার সাথী করো, নন্দিন।

নন্দিনী। কোথায় যাব?

রাজা। আমার বিরুদ্ধে লড়াই করতে, কিন্তু আমারি হাতে হাত রেখে। বুঝতে পারছ না? সেই লড়াই শুরু হয়েছে। এই আমার ধ্বজা, আমি ভেঙে ফেলি ওর দণ্ড, তুমি ছিঁড়ে ফেলো ওর কেতন। আমারি হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক, মারুক, সম্পূর্ণ মারুক তাতেই আমার মুক্তি।

দলের লোক। মহারাজ, এ কী কাণ্ড। এ কী উন্মত্ততা। ধ্বজা ভাঙলেন! আমাদের দেবতার ধ্বজা, যার অজেয় শল্যের এক দিক পৃথিবীকে অন্য দিক স্বর্গকে বিদ্ধ করেছে, সেই আমাদের মহাপবিত্র ধ্বজদণ্ড! পুজার দিনে কী মহাপাতক। চল্‌, সর্দারদের খবর দিইগে। [প্রস্থান

রাজা। এখনো অনেক ভাঙা বাকি, তুমিও তো আমার সঙ্গে যাবে নন্দিনী, প্রলয়পথে আমার দীপশিখা?

নন্দিনী। যাব আমি।

ফাগুলালের প্রবেশ

ফাগুলাল। বিশুকে ওরা কিছুতেই ছেড়ে দেবে না। এ কে। এই বুঝি রাজা? ডাকিনী, ওর সঙ্গে পরামর্শ চলছে! বিশ্বাসঘাতিনী!

রাজা। কী হয়েছে তোমাদের। কী করতে বেরিয়েছ।

ফাগুলাল। বন্দীশালার দরজা ভাঙতে, মরি তবু ফিরব না।

রাজা। ফিরবে কেন। ভাঙার পথে আমিও চলেছি। ওই তার প্রথম চিহ্ন। আমার ভাঙা ধ্বজা, আমার শেষ কীর্তি।

ফাগুলাল। নন্দিন, ভালো বুঝতে পারছি নে। আমরা সরল মানুষ, দয়া করো, আমাদের ঠকিয়ো না। তুমি-যে আমাদেরই ঘরের মেয়ে।

নন্দিনী। ফাগুভাই, তোমরা তো মৃত্যুকেই পণ করেছ, ঠকবার তো কিছুই বাকি রাখলে না।

ফাগুলাল। নন্দিন, তুমিও তবে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলো।

নন্দিনী। আমি তো সেইজন্যেই বেঁচে আছি। ফাগুলাল, আমি চেয়েছিলুম রঞ্জনকে তোমাদের সকলের মধ্যে আনতে। ওই দেখো, এসেছে আমার বীর, মৃত্যুকে তুচ্ছ ক'রে।

ফাগুলাল। সর্বনাশ! ওই কি রঞ্জন! নিঃশব্দ পড়ে আছে!

নন্দিনী। নিঃশব্দ নয়। মৃত্যুর মধ্যে তার অপরাজিত কণ্ঠস্বর আমি-যে এই শুনতে পাচ্ছি। রঞ্জন বেঁচে উঠবে— ও কখনো মরতে পারে না।

ফাগুলাল। হায় রে নন্দিনী, সুন্দরী আমার! এইজন্যই কি তুমি এতদিন অপেক্ষা করে ছিলে আমাদের এই অন্ধ নরকে।

নন্দিনী। ও আসবে বলে অপেক্ষা করে ছিলুম, ও তো এল। ও আবার আসার জন্যে প্রস্তুত হব, ও আবার আসবে।— চন্দ্রা কোথায়, ফাগুলাল।

ফাগুলাল। সে গেছে গোকুলকে নিয়ে সর্দারের কাছে কাঁদাকাটি করতে। সর্দারের 'পরে তাদের অগাধ বিশ্বাস।— কিন্তু মহারাজ, ভুল বোঝ নি তো? আমরা তোমারি বন্দীশালা ভাঙতে বেরিয়েছি।

রাজা। হাঁ, আমারি বন্দীশালা। তোমাতে আমাতে দুজনে মিলে কাজ করতে হবে। একলা তোমার কাজ নয়।

ফাগুলাল। সর্দাররা খবর পেলেই ঠেকাতে আসবে।

রাজা। তাদের সঙ্গে আমার লড়াই।

ফাগুলাল। সৈন্যেরা তো তোমাকে মানবে না।

রাজা। একলা লড়ব, সঙ্গে তোমরা আছ।

ফাগুলাল। জিততে পারবে?

রাজা। মরতে তো পারব। এতদিনে মরবার অর্থ দেখতে পেয়েছি— বেঁচেছি।

ফাগুলাল। রাজা, শুনতে পাচ্ছ গর্জন?

রাজা। ওই-যে দেখছি, সর্দার সৈন্য নিয়ে আসছে। এত শিগ্‌গির কী করে সম্ভব হল। আগে থাকতেই প্রস্তুত ছিল, কেবল আমিই জানতে পারি নি। ঠকিয়েছে আমাকে। আমারি শক্তি দিয়ে আমাকে বেঁধেছে।

ফাগুলাল। আমার দলবল তো এখনো এসে পৌঁছল না।

রাজা। সর্দার নিশ্চয় তাদের ঠেকিয়ে রেখেছে। আর তারা পৌঁছবে না।

নন্দিনী। মনে ছিল, বিশুপাগলকে তারা আমার কাছে এনে দেবে। সে কি আর হবে না।

রাজা। উপায় নেই। পথঘাট আটক করতে সর্দারের মতো কাউকে দেখি নি।

ফাগুলাল। তা হলে চলো নন্দিনী, তোমাকে নিরাপদ জায়গায় রেখে এসে তার পরে যা হয় হবে। সর্দার তোমাকে দেখলে রক্ষা থাকবে না।

নন্দিনী। একা আমাকেই নিরাপদের নির্বাসনে পাঠাবে? ফাগুলাল, তোমাদের চেয়ে সর্দার ভালো, সেই আমার জয়যাত্রার পথ খুলে দিলে। সর্দার, সর্দার!— দেখো, ওর বর্শার আগে আমার কুন্দফুলের মালা দুলিয়েছে। ওই মালাকে আমার বুকের রক্তে রক্তকরবীর রঙ করে দিয়ে যাব।— সর্দার! আমাকে দেখতে পেয়েছে। জয় রঞ্জনের জয়। [দ্রুত প্রস্থান

রাজা। নন্দিনী। [প্রস্থান

অধ্যাপকের প্রবেশ

ফাগুলাল। কোথায় ছুটেছ, অধ্যাপক।

অধ্যাপক। কে-যে বললে, রাজা এতদিন পরে চরম প্রাণের সন্ধান পেয়ে বেরিয়েছে— পুঁথিপত্র ফেলে সঙ্গ নিতে এলুম।

ফাগুলাল। রাজা তো ওই গেল মরতে, সে নন্দিনীর ডাক শুনেছে।

অধ্যাপক। তার জাল ছিঁড়েছে। নন্দিনী কোথায়।

ফাগুলাল। সে গেছে সবার আগে। তাকে আর নাগাল পাওয়া যাবে না।

অধ্যাপক। এইবারই পাওয়া যাবে। আর এড়িয়ে যেতে পারবে না, তাকে ধরব। [প্রস্থান

বিশুর প্রবেশ

বিশু। ফাগুলাল, নন্দিনী কোথায়।

ফাগুলাল। তুমি কী করে এলে।

বিশু। আমাদের কারিগররা বন্দীশালা ভেঙে ফেলেছে। তারা ওই চলেছে লড়তে। আমি নন্দিনীকে খুঁজতে এলুম। সে কোথায়।

ফাগুলাল। সে গেছে সকলের আগে এগিয়ে।

বিশু। কোথায়।

ফাগুলাল। শেষ মুক্তিতে।—বিশু, দেখতে পাচ্ছ ওখানে কে শুয়ে আছে?

বিশু। ও-যে রঞ্জন!

ফাগুলাল। ধুলায় দেখছ ওই রক্তের রেখা?

বিশু। বুঝেছি, ওই তাদের পরমমিলনের রক্তরাখি। এবার আমার সময় এল একলা মহাযাত্রার। হয়তো গান শুনতে চাইবে। আমার পাগলী! আয় রে ভাই, এবার লড়াইয়ে চল্।

ফাগুলাল। নন্দিনীর জয়।

বিশু। নন্দিনীর জয়।

ফাগুলাল। আর, ওই দেখো, ধুলায় লুটচ্ছে তার রক্তকরবীর কঙ্কণ। ডানহাত থেকে কখন্ খসে পড়েছে। তার হাতখানি আজ সে রিক্ত করে দিয়ে চলে গেল।

বিশু। তাকে বলেছিলুম, তার হাত থেকে কিছু নেব না। এই নিতে হল, তার শেষ দান।

[প্রস্থান

দূরে গান

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয় রে চলে,
আয় আয় আয়।
ধুলার আঁচল ভরেছে আজ পাকা ফসলে,
মরি হায় হায় হায়।

উপন্যাস ও গল্প

গল্পগুচ্ছ

গল্পগুচ্ছ

দেনাপাওনা

পাঁচ ছেলের পর যখন এক কন্যা জন্মিল তখন বাপমায়ে অনেক আদর করিয়া তাহার নাম রাখিলেন নিরুপমা। এ-গোষ্ঠীতে এমন শৌখিন নাম ইতিপূর্বে কখনো শোনা যায় নাই। প্রায় ঠাকুরদেবতার নামই প্রচলিত ছিল— গণেশ, কার্তিক, পার্বতী, তাহার উদাহরণ।

এখন নিরুপমার বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছে। তাহার পিতা রামসুন্দর মিত্র অনেক খোঁজ করেন কিন্তু পাত্র কিছুতেই মনের-মতন হয় না। অবশেষে মস্ত এক রায়বাহাদুরের ঘরের একমাত্র ছেলেকে সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছেন। উক্ত রায়বাহাদুরের পৈতৃক বিষয়-আশয় যদিও অনেক হ্রাস হইয়া আসিয়াছে কিন্তু বনেদি ঘর বটে।

বরপক্ষ হইতে দশ হাজার টাকা পণ এবং বহুল দানসামগ্রী চাহিয়া বসিল। রামসুন্দর কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন ; এমন পাত্র কোনো-মতে হাতছাড়া করা যায় না।

কিছুতেই টাকার জোগাড় আর হয় না। বাঁধা দিয়া, বিক্রয় করিয়া, অনেক চেষ্টাতেও হাজার ছয়-সাত বাকি রহিল। এদিকে বিবাহের দিন নিকট হইয়া আসিয়াছে।

অবশেষে বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। নিতান্ত অতিরিক্ত সুদে একজন বাকি টাকাটা ধার দিতে স্বীকার করিয়াছিল কিন্তু সময়কালে সে উপস্থিত হইল না। বিবাহসভায় একটা তুমুল গোলযোগ বাধিয়া গেল। রামসুন্দর আমাদের রায়-বাহাদুরের হাতে-পায়ে ধরিয়া বলিলেন, "শুভকার্য সম্পন্ন হইয়া যাক, আমি নিশ্চয়ই টাকাটা শোধ করিয়া দিব।" রায়বাহাদুর বলিলেন, "টাকা হাতে না পাইলে বর সভাস্থ করা যাইবে না।"

এই দুর্ঘটনায় অন্তঃপুরে একটা কান্না পড়িয়া গেল। এই গুরুতর বিপদের যে মূল

কারণ সে চেলি পরিয়া, গহনা পরিয়া, কপালে চন্দন লেপিয়া, চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ভাবী শ্বশুরকুলের প্রতি যে তাহার খুব একটা ভক্তি কিংবা অনুরাগ জন্মিতেছে, তাহা বলা যায় না।

ইতিমধ্যে একটা সুবিধা হইল। বর সহসা তাহার পিতৃদেবের অবাধ্য হইয়া উঠিল। সে বাপকে বলিয়া বসিল, "কেনাবেচা-দরদামের কথা আমি বুঝি না, বিবাহ করিতে আসিয়াছি বিবাহ করিয়া যাইব।"

বাপ যাহাকে দেখিল তাহাকেই বলিল, "দেখেছেন মহাশয়, আজকালকার ছেলেদের ব্যবহার।" দুই-একজন প্রবীণ লোক ছিল, তাহারা বলিল, "শাস্ত্রশিক্ষা নীতিশিক্ষা একেবারে নাই, কাজেই।"

বর্তমান শিক্ষার বিষময় ফল নিজের সন্তানের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়া রায়বাহাদুর হতোদ্যম হইয়া বসিয়া রহিলেন। বিবাহ একপ্রকার বিষণ্ণ নিরানন্দভাবে সম্পন্ন হইয়া গেল।

শ্বশুরবাড়ি যাইবার সময় নিরুপমাকে বুকে টানিয়া লইয়া বাপ আর চোখের জল রাখিতে পারিলেন না। নিরু জিজ্ঞাসা করিল, "তারা কি আর আমাকে আসতে দেবে না, বাবা।" রামসুন্দর বলিলেন, "কেন আসতে দেবে না, মা। আমি তোমাকে নিয়ে আসব।"

রামসুন্দর প্রায়ই মেয়েকে দেখিতে যান কিন্তু বেহাইবাড়িতে তাঁর কোনো প্রতিপত্তি নাই। চাকরগুলো পর্যন্ত তাঁহাকে নিচু নজরে দেখে। অন্তঃপুরের বাহিরে একটা স্বতন্ত্র ঘরে পাঁচ মিনিটের জন্য কোনোদিন-বা মেয়েকে দেখিতে পান, কোনোদিন-বা দেখিতে পান না।

কুটুম্বগৃহে এমন করিয়া অপমান তো সহা যায় না। রামসুন্দর স্থির করিলেন যেমন করিয়া হউক টাকাটা শোধ করিয়া দিতে হইবে।

কিন্তু যে-ঋণভার কাঁধে চাপিয়াছে, তাহারি ভার সামলানো দুঃসাধ্য। খরচপত্রের অত্যন্ত টানাটানি পড়িয়াছে; এবং পাওনাদারদের দৃষ্টিপথ এড়াইবার জন্য সর্বদাই নানারূপ হীন কৌশল অবলম্বন করিতে হইতেছে।

এদিকে শ্বশুরবাড়ি উঠিতে বসিতে মেয়েকে খোঁচা লাগাইতেছে। পিতৃগৃহের নিন্দা শুনিয়া ঘরে দ্বার দিয়া অশ্রুবিসর্জন তাহার নিত্যক্রিয়ার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে।

বিশেষত শাশুড়ীর আক্রোশ আর কিছুতেই মেটে না। যদি কেহ বলে, "আহা, কী শ্রী। বউয়ের মুখখানি দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়।" শাশুড়ী ঝংকার দিয়া উঠিয়া বলে, "শ্রী তো ভারি। যেমন ঘরের মেয়ে তেমনি শ্রী।"

এমন কি, বউয়ের খাওয়াপরারও যত্ন হয় না। যদি কোনো দয়াপরতন্ত্র প্রতিবেশিনী কোনো ত্রুটির উল্লেখ করে, শাশুড়ী বলে, "ওই ঢের হয়েছে।" অর্থাৎ বাপ যদি পুরা দাম দিত তো মেয়ে পুরা যত্ন পাইত। সকলেই এমন ভাব দেখায় যেন বধূর এখানে কোনো অধিকার নাই, ফাঁকি দিয়া প্রবেশ করিয়াছে।

বোধ হয় কন্যার এই-সকল অনাদর এবং অপমানের কথা বাপের কানে গিয়া থাকিবে। তাই রামসুন্দর অবশেষে বসতবাড়ি বিক্রয়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু ছেলেদের যে গৃহহীন করিতে বসিয়াছেন সে-কথা তাহাদের নিকট হইতে গোপনে রাখিলেন। স্থির করিয়াছিলেন, বাড়ি বিক্রয় করিয়া সেই বাড়িই ভাড়া লইয়া বাস করিবেন; এমন কৌশলে চলিবেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে এ-কথা ছেলেরা জানিতে পারিবে না।

কিন্তু ছেলেরা জানিতে পারিল। সকলে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। বিশেষত বড়ো তিনটি ছেলে বিবাহিত এবং তাহাদের কাহারো বা সন্তান আছে। তাহাদের আপত্তি অত্যন্ত গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল, বাড়িবিক্রয় স্থগিত হইল।

তখন রামসুন্দর নানাস্থান হইতে বিস্তর সুদে অল্প অল্প করিয়া টাকা ধার করিতে লাগিলেন। এমন হইল যে, সংসারের খরচ আর চলে না।

নিরু বাপের মুখ দেখিয়া সব বুঝিতে পারিল। বৃদ্ধের পক্বকেশে শুষ্কমুখে এবং সদাসংকুচিত ভাবে দৈন্য এবং দুশ্চিন্তা প্রকাশ হইয়া পড়িল। মেয়ের কাছে যখন বাপ অপরাধী তখন সে অপরাধের অনুতাপ কি আর গোপন রাখা যায়। রামসুন্দর যখন বেহাইবাড়ির অনুমতিক্রমে ক্ষণকালের জন্য কন্যার সাক্ষাতলাভ করিতেন, তখন বাপের বুক যে কেমন করিয়া ফাটে, তাহা তাঁহার হাসি দেখিলেই টের পাওয়া যাইত।

সেই ব্যথিত পিতৃহৃদয়কে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশে দিনকতক বাপের বাড়ি যাইবার জন্য নিরু নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছে। বাপের ম্লান মুখ দেখিয়া সে আর দূরে থাকিতে পারে না। একদিন রামসুন্দরকে কহিল, "বাবা, আমাকে একবার বাড়ি লইয়া যাও।" রামসুন্দর বলিলেন, "আচ্ছা।"

কিন্তু তাঁহার কোনো জোর নাই— নিজের কন্যার উপরে পিতার যে স্বাভাবিক অধিকার আছে, তাহা যেন পণের টাকার পরিবর্তে বন্ধক রাখিতে হইয়াছে। এমন কি কন্যার দর্শন, সেও অতি সসংকোচে ভিক্ষা চাহিতে হয় এবং সময়বিশেষে নিরাশ হইলে দ্বিতীয় কথাটি কহিবার মুখ থাকে না।

কিন্তু মেয়ে আপনি বাড়ি আসিতে চাহিলে বাপ তাকে না আনিয়া কেমন করিয়া থাকে। তাই, বেহাইয়ের নিকট সে-সম্বন্ধে দরখাস্ত পেশ করিবার পূর্বে রামসুন্দর কত

হীনতা, কত অপমান, কত ক্ষতি স্বীকার করিয়া যে তিনটি হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে-ইতিহাস গোপন থাকাই ভালো।

নোটক'খানি রুমালে জড়াইয়া চাদরে বাঁধিয়া রামসুন্দর বেহাইয়ের নিকট গিয়া বসিলেন। প্রথমে হাস্যমুখে পাড়ার খবর পাড়িলেন। হরেকৃষ্ণের বাড়িতে একটা মস্ত চুরি হইয়া গিয়াছে, তাহার আদ্যোপান্ত বিবরণ বলিলেন। নবীনমাধব ও রাধামাধব দুই ভাইয়ের তুলনা করিয়া বিদ্যাবুদ্ধি ও স্বভাব সম্বন্ধে রাধামাধবের সুখ্যাতি এবং নবীনমাধবের নিন্দা করিলেন ; শহরে একটা নূতন ব্যামো আসিয়াছে, সে-সম্বন্ধে অনেক আজগুবি আলোচনা করিলেন ; অবশেষে হুঁকাটি নামাইয়া রাখিয়া কথায় কথায় বলিলেন, "হাঁ হাঁ, বেহাই সেই টাকাটা বাকি আছে বটে। রোজই মনে করি, যাচ্ছি অমনি হাতে করে কিছু নিয়ে যাই কিন্তু সময়কালে মনে থাকে না। আর ভাই, বুড়ো হয়ে পড়েছি।" এমনি এক দীর্ঘ ভূমিকা করিয়া পঞ্জরের তিনখানি অস্থির মতো সেই তিনখানি নোট যেন অতি সহজে অতি অবহেলে বাহির করিলেন। সবেমাত্র তিন হাজার টাকার নোট দেখিয়া রায়বাহাদুর অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন।

বলিলেন, "থাক্ বেহাই, ওতে আমার কাজ নেই।" একটা প্রচলিত বাংলা প্রবাদের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, সামান্য কারণে হাতে দুর্গন্ধ করিতে তিনি চান না।

এই ঘটনার পরে মেয়েকে বাড়ি আনিবার প্রস্তাব কাহারো মুখে আসে না— কেবল রামসুন্দর ভাবিলেন, 'সে-সকল কুটুম্বিতার সংকোচ আমাকে আর শোভা পায় না।' মর্মাহতভাবে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে মৃদুস্বরে কথাটা পাড়িলেন। রায়বাহাদুর কোনো কারণমাত্র উল্লেখ না করিয়া বলিলেন, "সে এখন হচ্ছে না।" এই বলিয়া কর্মোপলক্ষে স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

রামসুন্দর মেয়ের কাছে মুখ না দেখাইয়া কম্পিতহস্তে কয়েকখানি নোট চাদরের প্রান্তে বাঁধিয়া বাড়ি ফিরিয়া গেলেন। মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতদিন না সমস্ত টাকা শোধ করিয়া দিয়া অসংকোচে কন্যার উপরে দাবি করিতে পারিবেন, ততদিন আর বেহাইবাড়ি যাইবেন না।

বহুদিন গেল। নিরুপমা লোকের উপর লোক পাঠায় কিন্তু বাপের দেখা পায় না। অবশেষে অভিমান করিয়া লোক পাঠানো বন্ধ করিল— তখন রামসুন্দরের মনে বড়ো আঘাত লাগিল, কিন্তু তবু গেলেন না।

আশ্বিন মাস আসিল। রামসুন্দর বলিলেন, 'এবার পুজার সময় মাকে ঘরে আনিবই, নহিলে আমি'— খুব একটা শক্ত রকম শপথ করিলেন।

পঞ্চমী কি ষষ্ঠীর দিনে আবার চাদরের প্রান্তে গুটিকতক নোট বাঁধিয়া রামসুন্দর

যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। পাঁচ বৎসরের এক নাতি আসিয়া বলিল, "দাদা, আমার জন্যে গাড়ি কিনতে যাচ্ছিস?" বহুদিন হইতে তাহার ঠেলাগাড়িতে চড়িয়া হাওয়া খাইবার শখ হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তাহা মিটিবার উপায় হইতেছে না। ছয় বৎসরের এক নাতিনী আসিয়া সরোদনে কহিল, পুজার নিমন্ত্রণে যাইবার মতো তাহার একখানিও ভালো কাপড় নাই।

রামসুন্দর তাহা জানিতেন, এবং সে-সম্বন্ধে তামাক খাইতে খাইতে বৃদ্ধ অনেক চিন্তা করিয়াছেন। রায়বাহাদুরের বাড়ি যখন পুজার নিমন্ত্রণ হইবে তখন তাঁহার বধূগণকে অতি যৎসামান্য অলংকারে অনুগ্রহপাত্র দরিদ্রের মতো যাইতে হইবে, এ-কথা স্মরণ করিয়া তিনি অনেক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার ললাটের বার্ধক্যরেখা গভীরতর অঙ্কিত হওয়া ছাড়া আর-কোনো ফল হয় নাই।

দৈন্যপীড়িত গৃহের ক্রন্দনধ্বনি কানে লইয়া বৃদ্ধ তাঁহার বেহাইবাড়িতে প্রবেশ করিলেন। আজ তাঁহার সে সংকোচভাব নাই; দ্বাররক্ষী এবং ভৃত্যদের মুখের প্রতি সে চকিত সলজ্জ দৃষ্টিপাত দূর হইয়া গিয়াছে, যেন আপনার গৃহে প্রবেশ করিলেন। শুনিলেন, রায়বাহাদুর ঘরে নাই, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে। মনের উচ্ছ্বাস সংবরণ করিতে না পারিয়া রামসুন্দর কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আনন্দে দুই চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। বাপও কাঁদে মেয়েও কাঁদে; দুইজনে কেহ আর কথা কহিতে পারে না। এমন করিয়া কিছুক্ষণ গেল। তারপরে রামসুন্দর কহিলেন, "এবার তোকে নিয়ে যাচ্ছি, মা। আর কোনো গোল নাই।"

এমন সময়ে রামসুন্দরের জ্যেষ্ঠপুত্র হরমোহন তার দুটি ছোটো ছেলে সঙ্গে লইয়া সহসা ঘরে প্রবেশ করিলেন। পিতাকে বলিলেন, "বাবা, আমাদের তবে এবার পথে ভাসালে?"

রামসুন্দর সহসা অগ্নিমূর্তি হইয়া বলিলেন, "তোদের জন্য কি আমি নরকগামী হব। আমাকে তোরা আমার সত্য পালন করতে দিবি নে?" রামসুন্দর বাড়ি বিক্রয় করিয়া বসিয়া আছেন; ছেলেরা কিছুতে না জানিতে পায়, তাহার অনেক ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু তবু তাহারা জানিয়াছে দেখিয়া তাহাদের প্রতি হঠাৎ অত্যন্ত রুষ্ট ও বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

তাঁহার নাতি তাঁহার দুই হাঁটু সবলে জড়াইয়া ধরিয়া মুখ তুলিয়া কহিল, "দাদা, আমাকে গাড়ি কিনে দিলে না?"

নতশির রামসুন্দরের কাছে বালক কোনো উত্তর না পাইয়া নিরুর কাছে গিয়া বলিল, "পিসিমা, আমাকে একখানা গাড়ি কিনে দেবে?"

নিরুপমা সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া কহিল, "বাবা, তুমি যদি আর এক পয়সা আমার শ্বশুরকে দাও, তা-হলে আর তোমার মেয়েকে দেখতে পাবে না, এই তোমার গা ছুঁয়ে বললুম।"

রামসুন্দর বলিলেন, "ছি মা, অমন কথা বলতে নেই। আর এ-টাকাটা যদি আমি না দিতে পারি, তা-হলে তোর বাপের অপমান। আর তোরো অপমান।"

নিরু কহিল, "টাকা যদি দাও তবেই অপমান। তোমার মেয়ের কি কোনো মর্যাদা নেই। আমি কি কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম। না বাবা, এ-টাকা দিয়ে তুমি আমাকে অপমান কোরো না। তা ছাড়া আমার স্বামী তো এ-টাকা চান না।"

রামসুন্দর কহিলেন, "তা-হলে তোমাকে যেতে দেবে না, মা।"

নিরুপমা কহিল, "না দেয় তো কী করবে বলো। তুমিও আর নিয়ে যেতে চেয়ো না।"

রামসুন্দর কম্পিত হস্তে নোটবাঁধা চাদরটি কাঁধে তুলিয়া আবার চোরের মতো সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া বাড়ি ফিরিয়া গেলেন।

কিন্তু রামসুন্দর এই-যে টাকা আনিয়াছিলেন এবং কন্যার নিষেধে সে টাকা না দিয়াই চলিয়া গিয়াছেন, সে-কথা গোপন রহিল না। কোনো স্বভাবকৌতূহলী দ্বারলগ্নকর্ণ দাসী নিরুর শাশুড়ীকে এই খবর দিল। শুনিয়া তাঁহার আর আক্রোশের সীমা রহিল না।

নিরুপমার পক্ষে তাহার শ্বশুরবাড়ি শরশয্যা হইয়া উঠিল। এদিকে তাহার স্বামী বিবাহের অল্পদিন পরেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া দেশান্তরে চলিয়া গিয়াছে; এবং পাছে সংসর্গদোষে হীনতা শিক্ষা হয়, এই ওজরে সম্প্রতি বাপের বাড়ির আত্মীয়দের সহিত নিরুর সাক্ষাৎকার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

এই সময়ে নিরুর একটা গুরুতর পীড়া হইল। কিন্তু সেজন্য তাহার শাশুড়ীকে সম্পূর্ণ দোষ দেওয়া যায় না। শরীরের প্রতি সে অত্যন্ত অবহেলা করিত। কার্তিক-মাসের হিমের সময় সমস্তরাত মাথার দরজা খোলা, শীতের সময় গায়ে কাপড় নাই। আহারের নিয়ম নাই। দাসীরা যখন মাঝে-মাঝে খাবার আনিতে ভুলিয়া যাইত, তখন যে তাহাদের একবার মুখ খুলিয়া স্মরণ করাইয়া দেওয়া, তাহাও সে করিত না। সে-যে পরের ঘরের দাসদাসী এবং কর্তাগৃহিণীদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া বাস করিতেছে, এই সংস্কার তাহার মনে বদ্ধমূল হইতেছিল। কিন্তু এরূপ ভাবটাও শাশুড়ীর সহ্য হইত না। যদি আহারের প্রতি বধূর কোনো অবহেলা দেখিতেন,

তবে শাশুড়ী বলিতেন, “নবাবের বাড়ির মেয়ে কিনা। গরিবের ঘরের অন্ন ওঁর মুখে রোচে না।” কখনো-বা বলিতেন, “দেখো-না, একবার ছিরি হচ্ছে দেখো-না, দিনে দিনে যেন পোড়াকাঠ হয়ে যাচ্ছে।”

রোগ যখন গুরুতর হইয়া উঠিল তখন শাশুড়ী বলিলেন, “ওঁর সমস্ত ন্যাকামি।” অবশেষে একদিন নিরু সবিনয়ে শাশুড়ীকে বলিল, “বাবাকে আর আমার ভাইদের একবার দেখব, মা।” শাশুড়ী বলিলেন, “কেবল বাপের বাড়ি যাইবার ছল।”

কেহ বলিলে বিশ্বাস করিবে না— যেদিন সন্ধ্যার সময় নিরুর শ্বাস উপস্থিত হইল, সেইদিন প্রথম ডাক্তার দেখিল, এবং সেইদিন ডাক্তারের দেখা শেষ হইল।

বাড়ির বড়োবউ মরিয়াছে, খুব ধুম করিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল। প্রতিমা-বিসর্জনের সমারোহ সম্বন্ধে জেলার মধ্যে রায়চৌধুরিদের যেমন লোকবিখ্যাত প্রতিপত্তি আছে, বড়োবউয়ের সৎকার সম্বন্ধে রায়বাহাদুরদের তেমনি একটা খ্যাতি রহিয়া গেল— এমন চন্দনকাষ্ঠের চিতা এ মুলুকে কেহ কখনো দেখে নাই। এমন ঘটা করিয়া শ্রাদ্ধও কেবল রায়বাহাদুরদের বাড়িতেই সম্ভব এবং শুনা যায়, ইহাতে তাঁহাদের কিঞ্চিৎ ঋণ হইয়াছিল।

রামসুন্দরকে সান্ত্বনা দিবার সময় তাহার মেয়ের যে কিরূপ মহাসমারোহে মৃত্যু হইয়াছে, সকলেই তাহার বহুল বর্ণনা করিল।

এদিকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চিঠি আসিল, “আমি এখানে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছি, অতএব অবিলম্বে আমার স্ত্রীকে এখানে পাঠাইবে।” রায়বাহাদুরের মহিষী লিখিলেন, “বাবা, তোমার জন্যে আর-একটি মেয়ের সম্বন্ধ করিয়াছি, অতএব অবিলম্বে ছুটি লইয়া এখানে আসিবে।”

এবারে বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়।

১২৯৮ ?

পোস্টমাস্টার

প্রথম কাজ আরম্ভ করিয়াই উলাপুর গ্রামে পোস্টমাস্টারকে আসিতে হয়। গ্রামটি অতি সামান্য। নিকটে একটি নীলকুঠি আছে, তাই কুঠির সাহেব অনেক জোগাড় করিয়া এই নূতন পোস্ট-আপিস স্থাপন করাইয়াছে।

আমাদের পোস্টমাস্টার কলিকাতার ছেলে। জলের মাছকে ডাঙায় তুলিলে যে-

রকম হয়, এই গণ্ডগ্রামের মধ্যে আসিয়া পোস্টমাস্টারেরও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে। একখানি অন্ধকার আটচালার মধ্যে তাঁহার আপিস; অদূরে একটি পানাপুকুর এবং তাহার চারিপাড়ে জঙ্গল। কুঠির গোমস্তা প্রভৃতি যে-সকল কর্মচারী আছে তাহাদের ফুরসত প্রায় নাই এবং তাহারা ভদ্রলোকের সহিত মিশিবার উপযুক্ত নহে।

বিশেষত কলিকাতার ছেলে ভালো করিয়া মিশিতে জানে না। অপরিচিত স্থানে গেলে, হয় উদ্ধত নয় অপ্রতিভ হইয়া থাকে। এই কারণে স্থানীয় লোকের সহিত তাঁহার মেলামেশা হইয়া উঠে না। অথচ হাতে কাজ অধিক নাই। কখনো-কখনো দুটো-একটা কবিতা লিখিতে চেষ্টা করেন। তাহাতে এমন ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সমস্তদিন তরুপল্লবের কম্পন এবং আকাশের মেঘ দেখিয়া জীবন বড়ো সুখে কাটিয়া যায়— কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, যদি আরব্য উপন্যাসের কোনো দৈত্য আসিয়া এক রাত্রের মধ্যে এই শাখাপল্লব-সমেত সমস্ত গাছগুলা কাটিয়া পাকা রাস্তা বানাইয়া দেয়, এবং সারি সারি অট্টালিকা আকাশের মেঘকে দৃষ্টিপথ হইতে রুদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে এই আধমরা ভদ্রসন্তানটি পুনশ্চ নবজীবন লাভ করিতে পারে।

পোস্টমাস্টারের বেতন অতি সামান্য। নিজে রাঁধিয়া খাইতে হয় এবং গ্রামের একটি পিতৃমাতৃহীন অনাথা বালিকা তাঁহার কাজকর্ম করিয়া দেয়, চারিটি-চারিটি খাইতে পায়। মেয়েটির নাম রতন। বয়স বারো-তেরো। বিবাহের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না।

সন্ধ্যার সময় যখন গ্রামের গোয়ালঘর হইতে ধূম কুণ্ডলায়িত হইয়া উঠিত, ঝোপে ঝোপে ঝিল্লি ডাকিত, দূরে গ্রামের নেশাখোর বাউলের দল খোলকরতাল বাজাইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান জুড়িয়া দিত— যখন অন্ধকার দাওয়ায় একলা বসিয়া গাছের কম্পন দেখিলে কবিহৃদয়েও ঈষৎ হৃৎকম্প উপস্থিত হইত, তখন ঘরের কোণে একটি ক্ষীণশিখা প্রদীপ জ্বালিয়া পোস্টমাস্টার ডাকিতেন 'রতন'। রতন দ্বারে বসিয়া এই ডাকের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিত কিন্তু এক ডাকে ঘরে আসিত না— বলিত, "কী গা বাবু, কেন ডাকছ।"

পোস্টমাস্টার। তুই কী করছিস।

রতন। এখনি চুলো ধরাতে যেতে হবে— হেঁশেলের—

পোস্টমাস্টার। তোর হেঁশেলের কাজ পরে হবে এখন— একবার তামাকটা সেজে দে তো।

অনতিবিলম্বে দুটি গাল ফুলাইয়া কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে রতনের প্রবেশ। হাত হইতে কলিকাটা লইয়া পোস্টমাস্টার ফস করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা রতন, তোর

মাকে মনে পড়ে ?" সে অনেক কথা ; কতক মনে পড়ে, কতক মনে পড়ে না। মায়ের চেয়ে বাপ তাহাকে বেশী ভালোবাসিত, বাপকে অল্প অল্প মনে আছে। পরিশ্রম করিয়া বাপ সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফিরিয়া আসিত, তাহারি মধ্যে দৈবাৎ দুটি-একটি সন্ধ্যা তাহার মনে পরিষ্কার ছবির মতো অঙ্কিত আছে। এই কথা হইতে হইতে ক্রমে রতন পোস্টমাস্টারের পায়ের কাছে মাটির উপর বসিয়া পড়িত। মনে পড়িত, তাহার একটি ছোটোভাই ছিল— বহু পূর্বেকার বর্ষার দিনে একদিন একটা ডোবার ধারে দুইজনে মিলিয়া গাছের ভাঙা ডালকে ছিপ করিয়া মিছামিছি মাছধরা খেলা করিয়াছিল— অনেক গুরুতর ঘটনার চেয়ে সেই কথাটাই তাহার মনে বেশী উদয় হইত। এইরূপ কথাপ্রসঙ্গে মাঝে-মাঝে বেশী রাত হইয়া যাইত, তখন আলস্যক্রমে পোস্টমাস্টারের আর রাঁধিতে ইচ্ছা করিত না। সকালের বাসী ব্যঞ্জন থাকিত এবং রতন তাড়াতাড়ি উনুন ধরাইয়া খানকয়েক রুটি সেঁকিয়া আনিত— তাহাতেই উভয়ের রাত্রের আহার চলিয়া যাইত।

এক-একদিন সন্ধ্যাবেলায় সেই বৃহৎ আটচালার কোণে আপিসের কাঠের চৌকির উপর বসিয়া পোস্টমাস্টারও নিজের ঘরের কথা পাড়িতেন— ছোটোভাই, মা এবং দিদির কথা, প্রবাসে একলা ঘরে বসিয়া যাহাদের জন্য হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিত তাহাদের কথা। যে-সকল কথা সর্বদাই মনে উদয় হয় অথচ নীলকুঠির গোমস্তাদের কাছে যাহা কোনোমতেই উত্থাপন করা যায় না, সেই কথা একটি অশিক্ষিতা ক্ষুদ্র বালিকাকে বলিয়া যাইতেন, কিছুমাত্র অসংগত মনে হইত না। অবশেষে এমন হইল, বালিকা কথোপকথনকালে তাঁহার ঘরের লোকদিগকে মা, দিদি, দাদা বলিয়া চিরপরিচিতের ন্যায় উল্লেখ করিত। এমন কি, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়পটে বালিকা তাঁহাদের কাল্পনিক মূর্তিও চিত্রিত করিয়া লইয়াছিল।

একদিন বর্ষাকালের মেঘমুক্ত দ্বিপ্রহরে ঈষৎ-তপ্ত সুকোমল বাতাস দিতেছিল, রৌদ্রে ভিজা ঘাস এবং গাছপালা হইতে একপ্রকার গন্ধ উত্থিত হইতেছিল, মনে হইতেছিল যেন ক্লান্ত ধরণীর উষ্ণ নিশ্বাস গায়ের উপরে আসিয়া লাগিতেছে, এবং কোথাকার এক নাছোড়বান্দা পাখি তাহার একটা একটানা সুরের নালিশ সমস্ত দুপুরবেলা প্রকৃতির দরবারে অত্যন্ত করুণস্বরে বারবার আবৃত্তি করিতেছিল। পোস্টমাস্টারের হাতে কাজ ছিল না— সেদিনকার বৃষ্টিধৌত মসৃণ চিক্কণ তরুপল্লবের হিল্লোল এবং পরাভূত বর্ষার ভগ্নাবশিষ্ট রৌদ্রশুভ্র স্তূপাকার মেঘস্তর বাস্তবিকই দেখিবার বিষয় ছিল ; পোস্টমাস্টার তাহা দেখিতেছিলেন এবং ভাবিতেছিলেন, এই সময়ে কাছে একটি-কেহ নিতান্ত আপনার লোক থাকিত— হৃদয়ের সহিত একান্তসংলগ্ন একটি

স্নেহপুত্তলি মানবমূর্তি। ক্রমে মনে হইতে লাগিল, সেই পাখি ওই কথাই বারবার বলিতেছে এবং এই জনহীন তরুচ্ছায়ানিমগ্ন মধ্যাহ্নের পল্লবমর্মরের অর্থও কতকটা ওইরূপ। কেহ বিশ্বাস করে না, এবং জানিতেও পায় না, কিন্তু ছোটো পল্লীর সামান্য বেতনের সাব-পোস্টমাস্টারের মনে গভীর নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে দীর্ঘ ছুটির দিনে এইরূপ একটা ভাবের উদয় হইয়া থাকে।

পোস্টমাস্টার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিলেন, 'রতন'। রতন তখন পেয়ারাতলায় পা ছড়াইয়া দিয়া কাঁচা পেয়ারা খাইতেছিল; প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া অবিলম্বে ছুটিয়া আসিল— হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "দাদাবাবু, ডাকছ?" পোস্টমাস্টার বলিলেন, "তোকে আমি একটু একটু করে পড়তে শেখাব।" বলিয়া সমস্ত দুপুরবেলা তাহাকে লইয়া 'স্বরে অ' 'স্বরে আ' করিলেন। এবং এইরূপে অল্পদিনেই যুক্ত-অক্ষর উত্তীর্ণ হইলেন।

শ্রাবণমাসে বর্ষণের আর অন্ত নাই। খাল বিল নালা জলে ভরিয়া উঠিল। অহর্নিশি ভেকের ডাক এবং বৃষ্টির শব্দ। গ্রামের রাস্তায় চলাচল প্রায় একপ্রকার বন্ধ— নৌকায় করিয়া হাটে যাইতে হয়।

একদিন প্রাতঃকাল হইতে খুব বাদলা করিয়াছে। পোস্টমাস্টারের ছাত্রীটি অনেকক্ষণ দ্বারের কাছে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল, কিন্তু অন্যদিনের মতো যথাসাধ্য নিয়মিত ডাক শুনিতে না পাইয়া আপনি খুঙ্গিপুঁথি লইয়া ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, পোস্টমাস্টার তাঁহার খাটিয়ার উপর শুইয়া আছেন— বিশ্রাম করিতেছেন মনে করিয়া অতি নিঃশব্দে পুনশ্চ ঘর হইতে বাহিরে যাইবার উপক্রম করিল। সহসা শুনিল 'রতন'। তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গিয়া বলিল, "দাদাবাবু, ঘুমচ্ছিলে?" পোস্টমাস্টার কাতরস্বরে বলিলেন, "শরীরটা ভালো বোধ হচ্ছে না— দেখ্ তো আমার কপালে হাত দিয়ে।"

এই নিতান্ত নিঃসঙ্গ প্রবাসে ঘনবর্ষায় রোগকাতর শরীরে একটুখানি সেবা পাইতে ইচ্ছা করে। তপ্ত ললাটের উপর শাঁখাপরা কোমল হস্তের স্পর্শ মনে পড়ে। এই ঘোর প্রবাসে রোগযন্ত্রণায় স্নেহময়ী নারীরূপে জননী ও দিদি পাশে বসিয়া আছেন, এই কথা মনে করিতে ইচ্ছা করে। এবং এস্থলে প্রবাসীর মনের অভিলাষ ব্যর্থ হইল না। বালিকা রতন আর বালিকা রহিল না। সেই মুহূর্তেই সে জননীর পদ অধিকার করিয়া বসিল, বৈদ্য ডাকিয়া আনিল, যথাসময়ে বটিকা খাওয়াইল, সারারাত্রি শিয়রে জাগিয়া রহিল, আপনি পথ্য রাঁধিয়া দিল, এবং শতবার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁগো দাদাবাবু, একটুখানি ভালো বোধ হচ্ছে কি।"

বহুদিন পরে পোস্টমাস্টার ক্ষীণ শরীরে রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন—মনে স্থির করিলেন, আর নয়, এখান হইতে কোনোমতে বদলি হইতে হইবে। স্থানীয় অস্বাস্থ্যের উল্লেখ করিয়া তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় কর্তৃপক্ষদের নিকট বদলি হইবার জন্য দরখাস্ত করিলেন।

রোগসেবা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া রতন দ্বারের বাহিরে আবার তাহার স্বস্থান অধিকার করিল। কিন্তু পূর্ববৎ আর তাহাকে ডাক পড়ে না। মাঝে-মাঝে উঁকি মারিয়া দেখে, পোস্টমাস্টার অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে চৌকিতে বসিয়া অথবা খাটিয়ায় শুইয়া আছেন। রতন যখন আহ্বান প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া আছে, তিনি তখন অধীরচিত্তে তাঁহার দরখাস্তের উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছেন। বালিকা দ্বারের বাহিরে বসিয়া সহস্রবার করিয়া তাহার পুরানো পড়া পড়িল। পাছে যেদিন সহসা ডাক পড়িবে সেদিন তাহার যুক্ত-অক্ষর সমস্ত গোলমাল হইয়া যায়, এই তাহার একটা আশঙ্কা ছিল। অবশেষে সপ্তাহখানেক পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় ডাক পড়িল। উদ্বেলিতহৃদয়ে রতন গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "দাদাবাবু, আমাকে ডাকছিলে?"

পোস্টমাস্টার বলিলেন, "রতন, কালই আমি যাচ্ছি।"

রতন। কোথায় যাচ্ছ দাদাবাবু।

পোস্টমাস্টার। বাড়ি যাচ্ছি।

রতন। আবার কবে আসবে।

পোস্টমাস্টার। আর আসব না।

রতন আর-কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিল না। পোস্টমাস্টার আপনিই তাহাকে বলিলেন, তিনি বদলির জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন, দরখাস্ত নামঞ্জুর হইয়াছে; তাই তিনি কাজে জবাব দিয়া বাড়ি যাইতেছেন। অনেকক্ষণ আর কেহ কোনো কথা কহিল না। মিটমিট করিয়া প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল এবং একস্থানে ঘরের জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া একটি মাটির সরার উপর টপটপ করিয়া বৃষ্টির জল পড়িতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে রতন আস্তে আস্তে উঠিয়া রান্নাঘরে রুটি গড়িতে গেল। অন্যদিনের মতো তেমন চটপট হইল না। বোধ করি মধ্যে-মধ্যে মাথায় অনেক ভাবনা উদয় হইয়াছিল। পোস্টমাস্টারের আহার সমাপ্ত হইলে পর বালিকা হঠাৎ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদাবাবু, আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে?"

পোস্টমাস্টার হাসিয়া কহিলেন, "সে কী করে হবে।" ব্যাপারটা যে কী কী কারণে অসম্ভব তাহা বালিকাকে বুঝানো আবশ্যক বোধ করিলেন না।

সমস্তরাত্রি স্বপ্নে এবং জাগরণে বালিকার কানে পোস্টমাস্টারের হাস্যধ্বনির কণ্ঠস্বর বাজিতে লাগিল, 'সে কী করে হবে'।

ভোরে উঠিয়া পোস্টমাস্টার দেখিলেন, তাঁহার স্নানের জল ঠিক আছে; কলিকাতার অভ্যাস অনুসারে তিনি তোলা জলে স্নান করিতেন। কখন্ তিনি যাত্রা করিবেন সে-কথা বালিকা কী কারণে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই; পাছে প্রাতঃকালে আবশ্যক হয় এইজন্য রতন তত রাত্রে নদী হইতে তাঁহার স্নানের জল তুলিয়া আনিয়াছিল। স্নান সমাপন হইলে রতনের ডাক পড়িল। রতন নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিল এবং আদেশপ্রতীক্ষায় একবার নীরবে প্রভুর মুখের দিকে চাহিল। প্রভু কহিলেন, "রতন, আমার জায়গায় যে-লোকটি আসবেন তাঁকে বলে দিয়ে যাব তিনি তোকে আমারি মতন যত্ন করবেন, আমি যাচ্ছি বলে তোকে কিছু ভাবতে হবে না।" এই কথাগুলি যে অত্যন্ত স্নেহগর্ভ এবং দয়ার্দ্র হৃদয় হইতে উত্থিত সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু নারীহৃদয় কে বুঝিবে। রতন অনেকদিন প্রভুর অনেক তিরস্কার নীরবে সহ্য করিয়াছে কিন্তু এই নরম কথা সহিতে পারিল না। একেবারে উচ্ছ্বসিতহৃদয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "না না, তোমার কাউকে কিছু বলতে হবে না, আমি থাকতে চাই নে।"

পোস্টমাস্টার রতনের এরূপ ব্যবহার কখনো দেখেন নাই, তাই অবাক হইয়া রহিলেন।

নূতন পোস্টমাস্টার আসিল। তাহাকে সমস্ত চার্জ বুঝাইয়া দিয়া পুরাতন পোস্টমাস্টার গমনোন্মুখ হইলেন যাইবার সময় রতনকে ডাকিয়া বলিলেন, "রতন, তোকে আমি কখনো কিছু দিতে পারি নি। আজ যাবার সময় তোকে কিছু দিয়ে গেলুম, এতে তোর দিনকয়েক চলবে।"

কিছু পথখরচা বাদে তাঁহার বেতনের যত টাকা পাইয়াছিলেন পকেট হইতে বাহির করিলেন। তখন রতন ধুলায় পড়িয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "দাদাবাবু, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে কিছু দিতে হবে না; তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার জন্যে কাউকে কিছু ভাবতে হবে না"— বলিয়া একদৌড়ে সেখান হইতে পলাইয়া গেল।

ভূতপূর্ব পোস্টমাস্টার নিশ্বাস ফেলিয়া, হাতে কার্পেটের ব্যাগ ঝুলাইয়া, কাঁধে ছাতা লইয়া, মুটের মাথায় নীল ও শ্বেত রেখায় চিত্রিত টিনের পেঁটরা তুলিয়া ধীরে ধীরে নৌকাভিমুখে চলিলেন।

যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণীর

উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো চারিদিকে ছলছল করিতে লাগিল, তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন— একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল, 'ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি'— কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়াছে— এবং নদী-প্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার।

কিন্তু রতনের মনে কোনো তত্ত্বের উদয় হইল না। সে সেই পোস্ট-আপিস গৃহের চারিদিকে কেবল অশ্রুজলে ভাসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বোধ করি তাহার মনে ক্ষীণ আশা জাগিতেছিল, দাদাবাবু যদি ফিরিয়া আসে— সেই বন্ধনে পড়িয়া কিছুতেই দূরে যাইতে পারিতেছিল না। হায় বুদ্ধিহীন মানবহৃদয়। ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচে না, যুক্তিশাস্ত্রের বিধান বহুবিলম্বে মাথায় প্রবেশ করে, প্রবল প্রমাণকেও অবিশ্বাস করিয়া মিথ্যা আশাকে দুই বাহুপাশে বাঁধিয়া বুকের ভিতরে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরা যায়, অবশেষে একদিন সমস্ত নাড়ী কাটিয়া হৃদয়ের রক্ত শুষিয়া সে পলায়ন করে, তখন চেতনা হয় এবং দ্বিতীয় ভ্রান্তিপাশে পড়িবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।

১২৯৮ ?

গিন্নি

ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের দুই-তিন শ্রেণী নিচে আমাদের পণ্ডিত ছিলেন শিবনাথ। তাঁহার গোঁফদাড়ি কামানো, চুল ছাঁটা এবং টিকিটি হ্রস্ব। তাঁহাকে দেখিলেই বালকদের অন্তরাত্মা শুকাইয়া যাইত।

প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায়, যাহাদের হুল আছে তাহাদের দাঁত নাই। আমাদের পণ্ডিতমহাশয়ের দুই একত্রে ছিল। এদিকে কিল চড় চাপড় চারাগাছের বাগানের উপর শিলাবৃষ্টির মতো অজস্র বর্ষিত হইত, ওদিকে তীব্র বাক্যজালায় প্রাণ বাহির হইয়া যাইত।

ইনি আক্ষেপ করিতেন, পুরাকালের মতো গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ এখন আর নাই;

ছাত্রেরা গুরুকে আর দেবতার মতো ভক্তি করে না ; এই বলিয়া আপনার উপেক্ষিত দেবমহিমা বালকদের মস্তকে সবেগে নিক্ষেপ করিতেন ; এবং মাঝে-মাঝে হুংকার দিয়া উঠিতেন, কিন্তু তাহার মধ্যে এত ইতর কথা মিশ্রিত থাকিত যে তাহাকে দেবতার বজ্রনাদের রূপান্তর বলিয়া কাহারো ভ্রম হইতে পারে না। বাপান্ত যদি বজ্রনাদ সাজিয়া তর্জনগর্জন করে, তাহার ক্ষুদ্র বাঙালীমূর্তি কি ধরা পড়ে না।

যাহা হউক, আমাদের স্কুলের এই তৃতীয়শ্রেণী দ্বিতীয়বিভাগের দেবতাটিকে ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ অথবা কার্তিক বলিয়া কাহারো ভ্রম হইত না ; কেবল একটি দেবতার সহিত তাঁহার সাদৃশ্য উপলব্ধি করা যাইত, তাঁহার নাম যম ; এবং এতদিন পরে স্বীকার করিতে দোষ নাই এবং ভয়ও নাই, আমরা মনে মনে কামনা করিতাম, উক্ত দেবালয়ে গমন করিতে তিনি যেন আর অধিক বিলম্ব না করেন।

কিন্তু এটা বেশ বুঝা গিয়াছিল, নরদেবতার মতো বালাই আর নাই। সুরলোক-বাসী দেবতাদের উপদ্রব নাই। গাছ হইতে একটা ফুল পাড়িয়া দিলে খুশী হন, না দিলে তাগাদা করিতে আসেন না। আমাদের নরদেবগণ চান অনেক বেশী, এবং আমাদের তিলমাত্র ত্রুটি হইলে চক্ষুদুটো রক্তবর্ণ করিয়া তাড়া করিয়া আসেন, তখন তাঁহাদিগকে কিছুতেই দেবতার মতো দেখিতে হয় না।

বালকদের পীড়ন করিবার জন্য আমাদের শিবনাথপণ্ডিতের একটি অস্ত্র ছিল, সেটি শুনিতে যৎসামান্য কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত নিদারুণ। তিনি ছেলেদের নূতন নামকরণ করিতেন। নাম জিনিসটা যদিচ শব্দ বই আর কিছুই নয় কিন্তু সাধারণত লোকে আপনার চেয়ে আপনার নামটা বেশী ভালোবাসে ; নিজের নাম রাষ্ট্র করিবার জন্য লোকে কী কষ্টই না স্বীকার করে, এমন কি, নামটিকে বাঁচাইবার জন্য লোকে আপনি মরিতে কুণ্ঠিত হয় না।

এমন নামপ্রিয় মানবের নাম বিকৃত করিয়া দিলে তাহার প্রাণের চেয়ে প্রিয়তর স্থানে আঘাত করা হয়। এমন কি, যাহার নাম ভূতনাথ তাহাকে নলিনীকান্ত বলিলে তাহার অসহ্য বোধ হয়।

ইহা হইতে এই তত্ত্ব পাওয়া যায়, মানুষ বস্তুর চেয়ে অবস্তুকে বেশী মূল্যবান জ্ঞান করে, সোনার চেয়ে বানি, প্রাণের চেয়ে মান এবং আপনার চেয়ে আপনার নামটাকে বড়ো মনে করে।

মানবস্বভাবের এই-সকল অন্তর্নিহিত নিগূঢ় নিয়মবশত পণ্ডিতমহাশয় যখন শশীশেখরকে ভেটকি নাম দিলেন তখন সে নিরতিশয় কাতর হইয়া পড়িল। বিশেষত উক্ত নামকরণে তাহার চেহারার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করা হইতেছে জানিয়া তাহার

মর্মযন্ত্রণা আরো দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল, অথচ একান্ত শান্তভাবে সমস্ত সহ্য করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইল।

আশুর নাম ছিল গিন্নি, কিন্তু তাহার সঙ্গে একটু ইতিহাস জড়িত আছে।

আশু ক্লাসের মধ্যে নিতান্ত বেচারা ভালোমানুষ ছিল। কাহাকেও কিছু বলিত না, বড়ো লাজুক; বোধহয় বয়সে সকলের চেয়ে ছোটো, সকল কথাতেই কেবল মৃদু মৃদু হাসিত; বেশ পড়া করিত; স্কুলের অনেক ছেলেই তাহার সঙ্গে ভাব করিবার জন্য উন্মুখ ছিল কিন্তু সে কোনো ছেলের সঙ্গে খেলা করিত না, এবং ছুটি হইবামাত্রই মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া বাড়ি চলিয়া যাইত।

পত্রপুটে গুটিকতক মিষ্টান্ন এবং ছোটো কাঁসার ঘটিতে জল লইয়া একটার সময় বাড়ি হইতে দাসী আসিত। আশু সেজন্য বড়ো অপ্রতিভ; দাসীটা কোনোমতে বাড়ি ফিরিলে সে যেন বাঁচে। সে-যে স্কুলের ছাত্রের অতিরিক্ত আর-কিছু, এটা সে স্কুলের ছেলেদের কাছে প্রকাশ করিতে যেন বড়ো অনিচ্ছুক। সে-যে বাড়ির কেহ, সে-যে বাপমায়ের ছেলে, ভাইবোনের ভাই, এটা যেন ভারি একটা গোপন কথা, এটা সঙ্গীদের কাছে কোনোমতে প্রকাশ না হয়, এই তাহার একান্ত চেষ্টা।

পড়াশুনা সম্বন্ধে তাহার আর-কোনো ত্রুটি ছিল না, কেবল এক-একদিন ক্লাসে আসিতে বিলম্ব হইত এবং শিবনাথপণ্ডিত তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে কোনো সদুত্তর দিতে পারিত না। সেজন্য মাঝে-মাঝে তাহার লাঞ্ছনার সীমা থাকিত না। পণ্ডিত তাহাকে হাঁটুর উপর হাত দিয়া পিঠ নীচু করিয়া দালানের সিঁড়ির কাছে দাঁড় করাইয়া রাখিতেন; চারিটা ক্লাসের ছেলে সেই লজ্জাকাতর হতভাগ্য বালককে এইরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইত।

একদিন গ্রহণের ছুটি ছিল। তাহার পরদিন স্কুলে আসিয়া চৌকিতে বসিয়া পণ্ডিতমহাশয় দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, একখানি শ্লেট ও মসীচিহ্নিত কাপড়ের থলির মধ্যে পড়িবার বইগুলি জড়াইয়া লইয়া অন্যদিনের চেয়ে সংকুচিতভাবে আশু ক্লাসে প্রবেশ করিতেছে।

শিবনাথপণ্ডিত শুষ্কহাস্য হাসিয়া কহিলেন, "এই-যে গিন্নি আসছে।"

তাহার পর পড়া শেষ হইলে ছুটির পূর্বে তিনি সকল ছাত্রদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শোন্ তোরা সব শোন্।"

পৃথিবীর সমস্ত মাধ্যাকর্ষণশক্তি সবলে বালককে নিচের দিকে টানিতে লাগিল; কিন্তু ক্ষুদ্র আশু সেই বেঞ্চির উপর হইতে একখানি কোঁচা ও দুইখানি পা ঝুলাইয়া ক্লাসের সকল বালকের লক্ষ্যস্থল হইয়া বসিয়া রহিল। এতদিনে আশুর অনেক বয়স

হইয়া থাকিবে এবং তাহার জীবনে অনেক গুরুতর সুখদুঃখলজ্জার দিন আসিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেইদিনকার বালকহৃদয়ের ইতিহাসের সহিত কোনোদিনের তুলনা হইতে পারে না।

কিন্তু ব্যাপারটা অতি ক্ষুদ্র এবং দুই কথায় শেষ হইয়া যায়।

আশুর একটি ছোটো বোন আছে ; তাহার সমবয়স্ক সঙ্গিনী কিংবা ভগিনী আর-কেহ নাই, সুতরাং আশুর সঙ্গেই তাহার যত খেলা।

একটি গেটওয়ালা লোহার রেলিঙের মধ্যে আশুদের বাড়ির গাড়িবারান্দা। সেদিন মেঘ করিয়া খুব বৃষ্টি হইতেছিল। জুতা হাতে করিয়া, ছাতা মাথায় দিয়া যে দুইচারিজন পথিক পথ দিয়া চলিতেছিল, তাহাদের কোনো দিকে চাহিবার অবসর ছিল না। সেই মেঘের অন্ধকারে, সেই বৃষ্টিপতনের শব্দে, সেই সমস্তদিন ছুটিতে, গাড়িবারান্দার সিঁড়িতে বসিয়া আশু তাহার বোনের সঙ্গে খেলা করিতেছিল।

সেদিন তাহাদের পুতুলের বিয়ে। তাহারি আয়োজন সম্বন্ধে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে ব্যস্ত হইয়া আশু তাহার ভগিনীকে উপদেশ দিতেছিল।

এখন তর্ক উঠিল, কাহাকে পুরোহিত করা যায়। বালিকা চট করিয়া ছুটিয়া একজনকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা, তুমি আমাদের পুরুতঠাকুর হবে ?"

আশু পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখে, শিবনাথপণ্ডিত ভিজা ছাতা মুড়িয়া অর্ধসিক্ত অবস্থায় তাহাদের গাড়িবারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন ; পথ দিয়া যাইতেছিলেন, বৃষ্টির উপদ্রব হইতে সেখানে আশ্রয় লইয়াছেন। বালিকা তাঁহাকে পুতুলের পৌরোহিত্যে নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিতেছে।

পণ্ডিতমশায়কে দেখিয়াই আশু তাহার খেলা এবং ভগিনী সমস্ত ফেলিয়া এক-দৌড়ে গৃহের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। তাহার ছুটির দিন সম্পূর্ণ মাটি হইয়া গেল।

পরদিন শিবনাথপণ্ডিত যখন শুষ্ক উপহাসের সহিত এই ঘটনাটি ভূমিকাস্বরূপে উল্লেখ করিয়া সাধারণসমক্ষে আশুর 'গিন্নি' নামকরণ করিলেন, তখন প্রথমে সে যেমন সকল কথাতেই মৃদুভাবে হাসিয়া থাকে তেমন করিয়া হাসিয়া চারিদিকের কৌতুকহাস্যে ঈষৎ যোগ দিতে চেষ্টা করিল ; এমনসময় একটা ঘণ্টা বাজিল, অন্য-সকল ক্লাস ভাঙিয়া গেল, এবং শালপাতায় দুটি মিষ্টান্ন ও ঝকঝকে কাঁসার ঘটিতে জল লইয়া দাসী আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইল।

তখন হাসিতে হাসিতে তাহার মুখকান টকটকে লাল হইয়া উঠিল, ব্যথিত কপালের শিরা ফুলিয়া উঠিল, এবং উচ্ছ্বসিত অশ্রুজল আর কিছুতেই বাধা মানিল না।

শিবনাথপণ্ডিত বিশ্রামগৃহে জলযোগ করিয়া নিশ্চিন্তমনে তামাক খাইতে লাগিলেন

—ছেলেরা পরমাহ্লাদে আশুকে ঘিরিয়া 'গিন্নি গিন্নি' করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সেই ছুটির দিনের ছোটোবোনের সহিত খেলা জীবনের একটি সর্বপ্রধান লজ্জাজনক ভ্রম বলিয়া আশুর কাছে বোধ হইতে লাগিল, পৃথিবীর লোক কোনোকালেও যে সেদিনের কথা ভুলিয়া যাইবে এ তাহার মনে বিশ্বাস হইল না।

১২৯৮ ?

রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা

যাহারা বলে গুরুচরণের মৃত্যুকালে তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের সংসারটি অন্তঃপুরে বসিয়া তাস খেলিতেছিলেন, তাহারা বিশ্বনিন্দুক, তাহারা তিলকে তাল করিয়া তোলে। আসলে গৃহিণী তখন এক পায়ের উপর বসিয়া দ্বিতীয় পায়ের হাঁটু চিবুক পর্যন্ত উত্থিত করিয়া কাঁচা তেঁতুল, কাঁচা লঙ্কা এবং চিংড়িমাছের ঝালচচ্চড়ি দিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পান্তাভাত খাইতেছিলেন। বাহির হইতে যখন ডাক পড়িল, তখন স্তূপাকৃতি চর্বিত ডাঁটা এবং নিঃশেষিত অন্নপাত্রটি ফেলিয়া গম্ভীর-মুখে কহিলেন, "দুটো পান্তাভাত-যে মুখে দেব, তারো সময় পাওয়া যায় না।"

এদিকে ডাক্তার যখন জবাব দিয়া গেল তখন গুরুচরণের ভাই রামকানাই রোগীর পার্শ্বে বসিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "দাদা, যদি তোমার উইল করিবার ইচ্ছা থাকে তো বলো।" গুরুচরণ ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "আমি বলি, তুমি লিখিয়া লও।" রামকানাই কাগজকলম লইয়া প্রস্তুত হইলেন। গুরুচরণ বলিয়া গেলেন, "আমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত বিষয়সম্পত্তি আমার ধর্মপত্নী শ্রীমতী বরদাসুন্দরীকে দান করিলাম।" রামকানাই লিখিলেন— কিন্তু লিখিতে তাঁহার কলম সরিতেছিল না। তাঁহার বড়ো আশা ছিল, তাঁহার একমাত্র পুত্র নবদ্বীপ অপুত্রক জ্যাঠামহাশয়ের সমস্ত বিষয়সম্পত্তির অধিকারী হইবে। যদিও দুই ভাইয়ে পৃথগন্ন ছিলেন, তথাপি এই আশায় নবদ্বীপের মা নবদ্বীপকে কিছুতেই চাকরি করিতে দেন নাই— এবং সকাল-সকাল বিবাহ দিয়াছিলেন, এবং শত্রুর মুখে ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া বিবাহ নিষ্ফল হয় নাই। কিন্তু তথাপি রামকানাই লিখিলেন এবং সই করিবার জন্য কলমটা দাদার হাতে দিলেন। গুরুচরণ নির্জীব হস্তে যাহা সই করিলেন, তাহা কতকগুলা কম্পিত বক্ররেখা কি তাঁহার নাম, বুঝা দুঃসাধ্য।

পান্তাভাত খাইয়া যখন স্ত্রী আসিলেন তখন গুরুচরণের বাক্‌রোধ হইয়াছে দেখিয়া

স্ত্রী কাঁদিতে লাগিলেন। যাহারা অনেক আশা করিয়া বিষয় হইতে বঞ্চিত হইয়াছে তাহারা বলিল 'মায়াকান্না'। কিন্তু সেটা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

উইলের বৃত্তান্ত শুনিয়া নবদ্বীপের মা ছুটিয়া আসিয়া বিষম গোল বাধাইয়া দিল— বলিল, "মরণকালে বুদ্ধিনাশ হয়। এমন সোনার-চাঁদ ভাইপো থাকিতে—"

রামকানাই যদিও স্ত্রীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন— এত অধিক যে তাহাকে ভাষান্তরে ভয় বলা যাইতে পারে— কিন্তু তিনি থাকিতে পারিলেন না, ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "মেজোবউ, তোমার তো বুদ্ধিনাশের সময় হয় নাই, তবে তোমার এমন ব্যবহার কেন। দাদা গেলেন, এখন আমি তো রহিয়া গেলাম, তোমার যা-কিছু বক্তব্য আছে, অবসরমতো আমাকে বলিয়ো, এখন ঠিক সময় নয়।"

নবদ্বীপ সংবাদ পাইয়া যখন আসিল তখন তাহার জ্যাঠামহাশয়ের কাল হইয়াছে। নবদ্বীপ মৃত ব্যক্তিকে শাসাইয়া কহিল, "দেখিব মুখাগ্নি কে করে— এবং শ্রাদ্ধশান্তি যদি করি তো আমার নাম নবদ্বীপ নয়।" গুরুচরণ লোকটা কিছুই মানিত না। সে ডফ সাহেবের ছাত্র ছিল। শাস্ত্রমতে যেটা সর্বাপেক্ষা অখাদ্য সেইটাতে তার বিশেষ পরিতৃপ্তি ছিল। লোকে যদি তাহাকে ক্রিশ্চান বলিত, সে জিভ কাটিয়া বলিত, "রাম, আমি যদি ক্রিশ্চান হই তো গোমাংস খাই।" জীবিত অবস্থায় যাহার এই দশা, সদ্যমৃত অবস্থায় সে-যে পিণ্ডনাশ-আশঙ্কায় কিছুমাত্র বিচলিত হইবে, এমন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু উপস্থিতমতো ইহা ছাড়া আর-কোনো প্রতিরোধের পথ ছিল না। নবদ্বীপ একটা সান্ত্বনা পাইল যে, লোকটা পরকালে গিয়া মরিয়া থাকিবে। যতদিন ইহলোকে থাকা যায় জ্যাঠামহাশয়ের বিষয় না পাইলেও কোনোক্রমে পেট চলিয়া যায়, কিন্তু জ্যাঠামহাশয় যে-লোকে গেলেন সেখানে ভিক্ষা করিয়া পিণ্ড মেলে না। বাঁচিয়া থাকিবার অনেক সুবিধা আছে।

রামকানাই বরদাসুন্দরীর নিকট গিয়া বলিলেন, "বউঠাকুরানী, দাদা তোমাকে সমস্ত বিষয় দিয়া গিয়াছেন। এই তাঁহার উইল। লোহার সিন্দুকে যত্নপূর্বক রাখিয়া দিয়ো।"

বিধবা তখন মুখে মুখে দীর্ঘপদ রচনা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতেছিলেন, দুইচারিজন দাসীও তাঁহার সহিত স্বর মিলাইয়া মধ্যে-মধ্যে দুইচারিটা নূতন শব্দ যোজনাপূর্বক শোকসংগীতে সমস্ত পল্লীর নিদ্রা দূর করিতেছিল। মাঝে হইতে এই কাগজখণ্ড আসিয়া একপ্রকার লয়ভঙ্গ হইয়া গেল এবং ভাবেরও পূর্বাপর যোগ রহিল না। ব্যাপারটা নিম্নলিখিত-মতো অসংলগ্ন আকার ধারণ করিল।—

"ওগো, আমার কী সর্বনাশ হল গো, কী সর্বনাশ হল। আচ্ছা, ঠাকুরপো,

লেখাটা কার। তোমার বুঝি? ওগো, তেমন যত্ন ক'রে আমাকে আর কে দেখবে, আমার দিকে কে মুখ তুলে চাইবে গো।— তোরা একটুকু থাম্‌, মেলা চেঁচাস নে, কথাটা শুনতে দে। ওগো, আমি কেন আগে গেলুম না গো— আমি কেন বেঁচে রইলুম।" রামকানাই মনে-মনে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সে আমাদের কপালের দোষ।"

বাড়ি ফিরিয়া গিয়া নবদ্বীপের মা রামকানাইকে লইয়া পড়িলেন। বোঝাই গাড়ি সমেত খাদের মধ্যে পড়িয়া হতভাগ্য বলদ গাড়োয়ানের সহস্র গুঁতা খাইয়াও অনেকক্ষণ যেমন নিরুপায় নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, রামকানাই তেমনি অনেক-ক্ষণ চুপ করিয়া সহ্য করিলেন,— অবশেষে কাতরস্বরে কহিলেন, "আমার অপরাধ কী। আমি তো দাদা নই।"

নবদ্বীপের মা ফোঁস করিয়া উঠিয়া বলিলেন, "না, তুমি বড়ো ভালো মানুষ, তুমি কিছু বোঝ না; দাদা বললেন 'লেখো', ভাই অমনি লিখে গেলেন। তোমরা সবাই সমান। তুমিও সময়কালে ওই কীর্তি করবে বলে বসে আছ। আমি মলেই কোন্‌ পোড়ারমুখী ডাইনীকে ঘরে আনবে— আর আমার সোনার-চাঁদ নবদ্বীপকে পাথারে ভাসাবে। কিন্তু সেজন্যে ভেবো না, আমি শিগগির মরছি নে।"

এইরূপে রামকানাইয়ের ভাবী অত্যাচারের আলোচনা করিয়া গৃহিণী উত্তরোত্তর অধিকতর অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতে লাগিলেন। রামকানাই নিশ্চয় জানিতেন, যদি এই-সকল উৎকট কাল্পনিক আশঙ্কা নিবারণ-উদ্দেশে ইহার তিলমাত্র প্রতিবাদ করেন, তবে হিতে বিপরীত হইবে। এই ভয়ে অপরাধীর মতো চুপ করিয়া রহিলেন, যেন কাজটা করিয়া ফেলিয়াছেন। যেন তিনি সোনার নবদ্বীপকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়া তাঁহার ভাবী দ্বিতীয়পক্ষকে সমস্ত লিখিয়া দিয়া মরিয়া বসিয়া আছেন, এখন অপরাধ স্বীকার না করিয়া কোনো গতি নাই।

ইতিমধ্যে নবদ্বীপ তাহার বুদ্ধিমান বন্ধুদের সহিত অনেক পরামর্শ করিয়া মাকে আসিয়া বলিল, "কোনো ভাবনা নাই। এ-বিষয় আমিই পাইব। কিছুদিনের মতো বাবাকে এখান হইতে স্থানান্তরিত করা চাই। তিনি থাকিলে সমস্ত ভণ্ডুল হইয়া যাইবে।" নবদ্বীপের বাবার বুদ্ধিসুদ্ধির প্রতি নবদ্বীপের মার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না; সুতরাং কথাটা তাঁরো যুক্তিযুক্ত মনে হইল। অবশেষে মার তাড়নায় এই নিতান্ত অনাবশ্যক নির্বোধ কর্মনাশা বাবা একটা যেমন-তেমন ছল করিয়া কিছু-দিনের মতো কাশীতে গিয়া আশ্রয় লইলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই বরদাসুন্দরী এবং নবদ্বীপচন্দ্র পরস্পরের নামে উইলজালের

অভিযোগ করিয়া আদালতে গিয়া উপস্থিত হইল। নবদ্বীপ তাহার নিজের নামে যে-উইলখানি বাহির করিয়াছে, তাহার নামসহি দেখিলে গুরুচরণের হস্তাক্ষর স্পষ্ট প্রমাণ হয়; উইলের দুই-একজন নিঃস্বার্থ সাক্ষীও পাওয়া গিয়াছে। বরদাসুন্দরীর পক্ষে নবদ্বীপের বাপ একমাত্র সাক্ষী এবং সহি কারো বুঝিবার সাধ্য নাই। তাঁহার গৃহপোষ্য একটি মামাতো ভাই ছিল, সে বলিল, "দিদি, তোমার ভাবনা নাই। আমি সাক্ষ্য দিব এবং আরো সাক্ষ্য জুটাইব।"

ব্যাপারটা যখন সম্পূর্ণ পাকিয়া উঠিল, তখন নবদ্বীপের মা নবদ্বীপের বাপকে কাশী হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অনুগত ভদ্রলোকটি ব্যাগ ও ছাতা হাতে যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এমন কি, কিঞ্চিৎ রসালাপ করিবারও চেষ্টা করিলেন, জোড়হস্তে সহাস্যে বলিলেন, "গোলাম হাজির, এখন মহারানীর কী অনুমতি হয়।"

গৃহিণী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "নেও নেও, আর রঙ্গ করতে হবে না। এতদিন ছুতো করে কাশীতে কাটিয়ে এলেন, একদিনের তরে তো মনে পড়ে নি। ইত্যাদি।

এইরূপে উভয় পক্ষে অনেকক্ষণ ধরিয়া পরস্পরের নামে আদরের অভিযোগ আনিতে লাগিলেন,— অবশেষে নালিশ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া জাতিতে গিয়া পৌঁছিল— নবদ্বীপের মা পুরুষের ভালোবাসার সহিত মুসলমানের মুরগি-বাৎসল্যের তুলনা করিলেন। নবদ্বীপের বাপ বলিলেন, 'রমণীর মুখে মধু, হৃদয়ে ক্ষুর',— যদিও এই মৌখিক মধুরতার পরিচয় নবদ্বীপের বাপ কবে পাইলেন, বলা শক্ত।

ইতিমধ্যে রামকানাই সহসা আদালত হইতে এক সাক্ষীর সপিনা পাইলেন। অবাক হইয়া যখন তাহার মর্মগ্রহণের চেষ্টা করিতেছেন, তখন নবদ্বীপের মা আসিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিলেন। বলিলেন, "হাড়জ্বালানী ডাকিনী কেবল-যে বাছা নবদ্বীপকে তাহার স্নেহশীল জ্যাঠার ন্যায্য উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চায় তাহা নহে, আবার সোনার ছেলেকে জেলে পাঠাইবার আয়োজন করিতেছে।"

অবশেষে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইয়া রামকানাইয়ের চক্ষু-স্থির হইয়া গেল। উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "তোরা একি সর্বনাশ করিয়াছিস।" গৃহিণী ক্রমে নিজমূর্তি ধারণ করিয়া বলিলেন, "কেন, এতে নবদ্বীপের দোষ হয়েছে কী। সে তার জ্যাঠার বিষয় নেবে না! অমনি এক কথায় ছেড়ে দেবে!"

কোথা হইতে এক চক্ষুখাদিকা, ভর্তার পরমায়ুহন্ত্রী, অষ্টকুষ্ঠীর পুত্রী উড়িয়া

আসিয়া জুড়িয়া বসিবে, ইহা কোন্ সৎকুলপ্রদীপ কনকচন্দ্র সন্তান সহ্য করিতে পারে। যদি-বা মরণকালে এবং ডাকিনীর মন্ত্রগুণে কোনো-এক মূঢ়মতি জ্যেষ্ঠতাতের বুদ্ধিভ্রম হইয়া থাকে, তবে সুবর্ণময় ভ্রাতুষ্পুত্র সে-ভ্রম নিজহস্তে সংশোধন করিয়া লইলে এমন কী অন্যায় কার্য হয়।

হতবুদ্ধি রামকানাই যখন দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রী পুত্র উভয়ে মিলিয়া কখনো-বা তর্জনগর্জন কখনো-বা অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন, তখন ললাটে করাঘাত করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন— আহার ত্যাগ করিলেন, জল পর্যন্ত স্পর্শ করিলেন না।

এইরূপে দুই দিন নীরবে অনাহারে কাটিয়া গেল, মকদ্দমার দিন উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে নবদ্বীপ বরদাসুন্দরীর মামাতো ভাইটিকে ভয় প্রলোভন দেখাইয়া এমনি বশ করিয়া লইয়াছে যে, সে অনায়াসে নবদ্বীপের পক্ষে সাক্ষ্য দিল। জয়শ্রী যখন বরদাসুন্দরীকে ত্যাগ করিয়া অন্য পক্ষে যাইবার আয়োজন করিতেছে, তখন রামকানাইকে ডাক পড়িল।

অনাহারে মৃতপ্রায় শুষ্কওষ্ঠ শুষ্করসনা বৃদ্ধ কম্পিত শীর্ণ অঙ্গুলি দিয়া সাক্ষ্য-মঞ্চের কাঠগড়া চাপিয়া ধরিলেন। চতুর ব্যারিস্টার অত্যন্ত কৌশলে কথা বাহির করিয়া লইবার জন্য জেরা করিতে আরম্ভ করিলেন,— বহুদূর হইতে আরম্ভ করিয়া সাবধানে অতি ধীর বক্রগতিতে প্রসঙ্গের নিকটবর্তী হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

তখন রামকানাই জজের দিকে ফিরিয়া জোড়হস্তে কহিলেন, "হুজুর, আমি বৃদ্ধ, অত্যন্ত দুর্বল। অধিক কথা কহিবার সামর্থ্য নাই। আমার যা বলিবার সংক্ষেপে বলিয়া লই। আমার দাদা স্বর্গীয় গুরুচরণ চক্রবর্তী মৃত্যুকালে সমস্ত বিষয়সম্পত্তি তাঁহার পত্নী শ্রীমতী বরদাসুন্দরীকে উইল করিয়া দিয়া যান। সে-উইল আমি নিজহস্তে লিখিয়াছি এবং দাদা নিজহস্তে স্বাক্ষর করিয়াছেন। আমার পুত্র নবদ্বীপচন্দ্র যে-উইল দাখিল করিয়াছেন তাহা মিথ্যা।" এই বলিয়া রামকানাই কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

চতুর ব্যারিস্টার সকৌতুকে পার্শ্ববর্তী অ্যাটর্নিকে বলিলেন, "বাই জোভ। লোক-টাকে কেমন ঠেসে ধরেছিলুম।"

মামাতো ভাই ছুটিয়া গিয়া দিদিকে বলিল, "বুড়ো সমস্ত মাটি করিয়াছিল,— আমার সাক্ষ্যে মকদ্দমা রক্ষা পায়।"

দিদি বলিলেন, "বটে? লোক কে চিনতে পারে। আমি বুড়োকে ভালো বলে জানতুম।"

কারাবরুদ্ধ নবদ্বীপের বুদ্ধিমান বন্ধুরা অনেক ভাবিয়া স্থির করিল, নিশ্চয়ই বৃদ্ধ ভয়ে এই কাজ করিয়া ফেলিয়াছে; সাক্ষীর বাক্সের মধ্যে উঠিয়া বুড়া বুদ্ধি ঠিক রাখিতে পারে নাই; এমনতরো আস্ত নির্বোধ সমস্ত শহর খুঁজিলে মিলে না।

গৃহে ফিরিয়া আসিয়া রামকানাইয়ের কঠিন বিকার-জ্বর উপস্থিত হইল। প্রলাপে পুত্রের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে এই নির্বোধ সর্বকর্মপণ্ডকারী নবদ্বীপের অনাবশ্যক বাপ পৃথিবী হইতে অপসৃত হইয়া গেল; আত্মীয়দের মধ্যে কেহ কেহ কহিল, "আর কিছুদিন পূর্বে গেলেই ভালো হইত"— কিন্তু তাহাদের নাম করিতে চাহি না।

১২৯৮ ?

ব্যবধান

সম্পর্ক মিলাইয়া দেখিতে গেলে বনমালী এবং হিমাংশুমালী উভয়ে মামাতো পিস-তুতো ভাই; সেও অনেক হিসাব করিয়া দেখিলে তবে মেলে। কিন্তু ইহাদের দুই পরিবার বহুকাল হইতে প্রতিবেশী, মাঝে কেবল একটা বাগানের ব্যবধান, এইজন্য ইহাদের সম্পর্ক নিতান্ত নিকট না হইলেও ঘনিষ্ঠতার অভাব নাই।

বনমালী হিমাংশুর চেয়ে অনেক বড়ো। হিমাংশুর যখন দন্ত এবং বাক্যস্ফূর্তি হয় নাই, তখন বনমালী তাহাকে কোলে করিয়া এই বাগানে সকালে সন্ধ্যায় হাওয়া খাওয়াইয়াছে, খেলা করিয়াছে, কান্না থামাইয়াছে, ঘুম পাড়াইয়াছে এবং শিশুর মনো-রঞ্জন করিবার জন্য পরিণতবুদ্ধি বয়স্ক লোকদিগকে সবেগে শিরশ্চালন, তারস্বরে প্রলাপভাষণ প্রভৃতি যে-সকল বয়সানুচিত চাপল্য এবং উৎকট উদ্যম প্রকাশ করিতে হয়, বনমালী তাহাও করিতে ত্রুটি করে নাই।

বনমালী লেখাপড়া বড়ো-একটা কিছু করে নাই। তাহার বাগানের শখ ছিল এবং এই দূরসম্পর্কের ছোটোভাইটি ছিল। ইহাকে খুব একটি দুর্লভ দুর্মূল্য লতার মতো বনমালী হৃদয়ের সমস্ত স্নেহসিঞ্চন করিয়া পালন করিতেছিল এবং সে যখন তাহার সমস্ত অন্তরবাহিরকে আচ্ছন্ন করিয়া লতাইয়া উঠিতে লাগিল, তখন বনমালী আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিল।

এমন সচরাচর দেখা যায় না কিন্তু এক-একটি স্বভাব আছে যে, একটি ছোটো খেয়াল কিংবা একটি ছোটো শিশু কিংবা একটি অকৃতজ্ঞ বন্ধুর নিকটে অতি সহজে আপনাকে

সম্পূর্ণ বিসর্জন করে ; এই বিপুল পৃথিবীতে একটিমাত্র ছোটো স্নেহের কারবারে জীবনের সমস্ত মূলধন সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, তারপরে হয়তো সামান্য উপস্বত্বে পরম সন্তোষে জীবন কাটাইয়া দেয় কিংবা সহসা একদিন প্রভাতে সমস্ত ঘরবাড়ি বিক্রয় করিয়া কাঙাল হইয়া পথে গিয়া দাঁড়ায়।

হিমাংশুর বয়স যখন আর-একটু বাড়িল, তখন বয়স এবং সম্পর্কের বিস্তর তারতম্য-সত্ত্বেও বনমালীর সহিত তাহার যেন একটি বন্ধুত্বের বন্ধন স্থাপিত হইল। উভয়ের মধ্যে যেন ছোটোবড়ো কিছু ছিল না।

এইরূপ হইবার একটু কারণও ছিল। হিমাংশু লেখাপড়া করিত এবং স্বভাবতই তাহার জ্ঞানস্পৃহা অত্যন্ত প্রবল ছিল। বই পাইলেই পড়িতে বসিত, তাহাতে অনেক বাজে বই পড়া হইয়াছিল বটে কিন্তু যেমন করিয়াই হউক চারিদিকেই তাহার মনের একটি পরিণতিসাধন হইয়াছিল। বনমালী বিশেষ একটু শ্রদ্ধার সহিত তাহার কথা শুনিত, তাহার পরামর্শ লইত, তাহার সহিত ছোটোবড়ো সকল কথার আলোচনা করিত, কোনো বিষয়েই তাহাকে বালক বলিয়া অগ্রাহ্য করিত না। হৃদয়ের সর্বপ্রথম স্নেহরস দিয়া যাহাকে মানুষ করা গিয়াছে, বয়সকালে যদি সে বুদ্ধি, জ্ঞান এবং উন্নত স্বভাবের জন্য শ্রদ্ধার অধিকারী হয়, তবে তাহার মতো এমন পরমপ্রিয়বস্তু পৃথিবীতে আর পাওয়া যায় না।

বাগানের শখও হিমাংশুর ছিল। কিন্তু এ-বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে প্রভেদ ছিল। বনমালীর ছিল হৃদয়ের শখ, হিমাংশুর ছিল বুদ্ধির শখ। পৃথিবীর এই কোমল গাছপালাগুলি, এই অচেতন জীবনরাশি, যাহারা যত্নের কোনো লালসা রাখে না অথচ যত্ন পাইলে ঘরের ছেলেগুলির মতো বাড়িয়া ওঠে, যাহারা মানুষের শিশুর চেয়েও শিশু, তাহাদিগকে সযত্নে মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য বনমালীর একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ছিল। কিন্তু হিমাংশুর গাছপালার প্রতি একটি কৌতূহলদৃষ্টি ছিল। অঙ্কুর গজাইয়া উঠে, কিশলয় দেখা দেয়, কুঁড়ি ধরে, ফুল ফুটিয়া উঠে, ইহাতে তাহার একান্ত মনোযোগ আকর্ষণ করিত।

গাছের বীজবপন, কলম করা, সার দেওয়া, চানকা তৈয়ারি প্রভৃতি সম্বন্ধে হিমাংশুর মাথায় বিবিধ পরামর্শের উদয় হইত এবং বনমালী অত্যন্ত আনন্দের সহিত তাহা গ্রহণ করিত। এই উদ্যানখণ্ডটুকু লইয়া আকৃতি প্রকৃতির যত প্রকার সংযোগ-বিয়োগ সম্ভব, তাহা উভয়ে মিলিয়া সাধন করিত।

দ্বারের সম্মুখে বাগানের উপরেই একটি বাঁধানো বেদির মতো ছিল। চারটে বাজিলেই একটি পাতলা জামা পরিয়া, একটি কোঁচানো চাদর কাঁধের উপর ফেলিয়া,

গুড়গুড়ি লইয়া, বনমালী সেইখানে ছায়ায় গিয়া বসিত। কোনো বন্ধুবান্ধব নাই, হাতে একখানি বই কিংবা খবরের কাগজ নাই। বসিয়া বসিয়া তামাক টানিত, এবং আড়চক্ষে উদাসীনভাবে কখনো-বা দক্ষিণে কখনো বামে দৃষ্টিপাত করিত। এমনি করিয়া সময় তাহার গুড়গুড়ির বাষ্পকুণ্ডলীর মতো ধীরে ধীরে অত্যন্ত লঘুভাবে উড়িয়া যাইত, ভাঙিয়া যাইত, মিলাইয়া যাইত, কোথাও কোনো চিহ্ন রাখিত না।

অবশেষে যখন হিমাংশু স্কুল হইতে ফিরিয়া, জল খাইয়া হাতমুখ ধুইয়া দেখা দিত, তখন তাড়াতাড়ি গুড়গুড়ির নল ফেলিয়া বনমালী উঠিয়া পড়িত। তখনি তাহার আগ্রহ দেখিয়া বুঝা যাইত, এতক্ষণ ধৈর্যসহকারে সে কাহার প্রত্যাশায় বসিয়া ছিল।

তাহার পরে দুইজনে বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে কথা। অন্ধকার হইয়া আসিলে দুইজনে বেঞ্চের উপর বসিত,— দক্ষিণের বাতাস গাছের পাতা মর্মরিত করিয়া বহিয়া যাইত; কোনোদিন-বা বাতাস বহিত না, গাছপালাগুলি ছবির মতো স্থির দাঁড়াইয়া রহিত, মাথার উপরে আকাশ ভরিয়া তারাগুলি জ্বলিতে থাকিত।

হিমাংশু কথা কহিত, বনমালী চুপ করিয়া শুনিত। যাহা বুঝিত না, তাহাও তাহার ভালো লাগিত; যে-সকল কথা আর-কাহারো নিকট হইতে অত্যন্ত বিরক্তি-জনক লাগিতে পারিত, সেই কথাই হিমাংশুর মুখে বড়ো কৌতুকের মনে হইত। এমন শ্রদ্ধাবান বয়স্ক শ্রোতা পাইয়া হিমাংশুর বক্তৃতাশক্তি স্মৃতিশক্তি কল্পনাশক্তির সবিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ হইত। সে কতক-বা পড়িয়া বলিত, কতক-বা ভাবিয়া বলিত, কতক-বা উপস্থিতমতো তাহার মাথায় জোগাইত এবং অনেক সময়ে কল্পনার সহায়তায় জ্ঞানের অভাব ঢাকা দিয়া লইত। অনেক ঠিক কথা বলিত, অনেক বেঠিক কথাও বলিত, কিন্তু বনমালী গম্ভীরভাবে শুনিত, মাঝে-মাঝে দুটো-একটা কথা বলিত, হিমাংশু তাহার প্রতিবাদ করিয়া যাহা বুঝাইত তাহাই বুঝিত, এবং তাহার পরদিন ছায়ায় বসিয়া গুড়গুড়ি টানিতে টানিতে সেই-সকল কথা অনেকক্ষণ ধরিয়া বিস্ময়ের সহিত চিন্তা করিত।

ইতিমধ্যে এক গোল বাধিল। বনমালীদের বাগান এবং হিমাংশুদের বাড়ির মাঝখানে জল যাইবার একটি নালা আছে। সেই নালার এক জায়গায় একটি পাতিলেবুর গাছ জন্মিয়াছে। সেই গাছে যখন ফল ধরে তখন বনমালীদের চাকর তাহা পাড়িতে চেষ্টা করে এবং হিমাংশুদের চাকর তাহা নিবারণ করে এবং উভয় পক্ষে যে-গালাগালি বর্ষিত হয়, তাহাতে যদি কিছুমাত্র বস্তু থাকিত তাহা হইলে সমস্ত নালা ভরাট হইয়া যাইত।

মাঝে হইতে বনমালীর বাপ হরচন্দ্র এবং হিমাংশুমালীর বাপ গোকুলচন্দ্রের মধ্যে

তাহাই লইয়া ঘোর বিবাদ বাধিয়া গেল। দুই পক্ষে নালার দখল লইয়া আদালতে হাজির।

উকিল-ব্যারিস্টারদের মধ্যে যতগুলি মহারথী ছিল, সকলেই অন্যতর পক্ষ অবলম্বন করিয়া সুদীর্ঘ বাক্‌যুদ্ধ আরম্ভ করিল। উভয় পক্ষের যে টাকাটা খরচ হইয়া গেল, ভাদ্রের প্লাবনেও উক্ত নালা দিয়া এত জল কখনো বহে নাই।

শেষকালে হরচন্দ্রের জিত হইল; প্রমাণ হইয়া গেল, নালা তাহারি এবং পাতিনেবুতে আর-কাহারো কোনো অধিকার নাই। আপিল হইল কিন্তু নালা এবং পাতিনেবু হরচন্দ্রেরই রহিল।

যতদিন মকদ্দমা চলিতেছিল, দুই ভাইয়ের বন্ধুত্বে কোনো ব্যাঘাত ঘটে নাই। এমন কি, পাছে বিবাদের ছায়া পরস্পরকে স্পর্শ করে, এই আশঙ্কায় কাতর হইয়া বনমালী দ্বিগুণ ঘনিষ্ঠভাবে হিমাংশুকে হৃদয়ের কাছে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিত, এবং হিমাংশুও লেশমাত্র বিমুখভাব প্রকাশ করিত না।

যেদিন আদালতে হরচন্দ্রের জিত হইল, সেদিন বাড়িতে বিশেষত অন্তঃপুরে পরম উল্লাস পড়িয়া গেল, কেবল বনমালীর চক্ষে ঘুম রহিল না। তাহার পরদিন অপরাহ্ণে সে এমন ম্লানমুখে সেই বাগানের বেদিতে গিয়া বসিল, যেন পৃথিবীতে আর-কাহারো কিছু হয় নাই, কেবল তাহারি একটা মস্ত হার হইয়া গেছে।

সেদিন সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, ছয়টা বাজিয়া গেল, কিন্তু হিমাংশু আসিল না। বনমালী একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হিমাংশুদের বাড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল। খোলা জানালার ভিতর দিয়া দেখিতে পাইল, আলনার উপরে হিমাংশুর স্কুলের ছাড়া-কাপড় ঝুলিতেছে; অনেকগুলি চিরপরিচিত লক্ষণ মিলাইয়া দেখিল— হিমাংশু বাড়িতে আছে। গুড়গুড়ির নল ফেলিয়া দিয়া বিষণ্নমুখে বেড়াইতে লাগিল এবং সহস্রবার সেই বাতায়নের দিকে চাহিল, কিন্তু হিমাংশু বাগানে আসিল না।

সন্ধ্যার আলো জ্বলিলে বনমালী ধীরে ধীরে হিমাংশুর বাড়িতে গেল।

গোকুলচন্দ্র দ্বারের কাছে বসিয়া তপ্ত দেহে হাওয়া লাগাইতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "কে ও।"

বনমালী চমকিয়া উঠিল। যেন সে চুরি করিতে আসিয়া ধরা পড়িয়াছে। কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "মামা, আমি।"

মামা বলিলেন, "কাহাকে খুঁজিতে আসিয়াছ। বাড়িতে কেহ নাই।"

বনমালী আবার বাগানে ফিরিয়া আসিয়া চুপ করিয়া বসিল।

যত রাত হইতে লাগিল, দেখিল হিমাংশুদের বাড়ির জানলাগুলি একে একে বন্ধ

হইয়া গেল ; দরজার ফাঁক দিয়া যে-দীপালোকরেখা দেখা যাইতেছিল, তাহাও ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি নিবিয়া গেল। অন্ধকার রাত্রে বনমালীর মনে হইল, হিমাংশুদের বাড়ির সমুদয় দ্বার তাহারি নিকট রুদ্ধ হইয়া গেল, সে কেবল বাহিরের অন্ধকারে একলা পড়িয়া রহিল।

আবার তাহার পরদিন বাগানে আসিয়া বসিল, মনে করিল, আজ হয়তো আসিতেও পারে। যে বহুকাল হইতে প্রতিদিন আসিত, সে-যে একদিনও আসিবে না, এ-কথা সে কিছুতেই মনে করিতে পারিল না। কখনো মনে করে নাই, এ বন্ধন কিছুতেই ছিঁড়িবে ; এমন নিশ্চিন্তমনে থাকিত যে, জীবনের সমস্ত সুখদুঃখ কখন্ সেই বন্ধনে ধরা দিয়াছে, তাহা সে জানিতেও পারে নাই। আজ সহসা জানিল সেই বন্ধন ছিঁড়িয়াছে, কিন্তু একমুহূর্তে-যে তাহার সর্বনাশ হইয়াছে তাহা সে কিছুতেই অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতে পারিল না।

প্রতিদিন যথাসময়ে বাগানে বসিত, যদি দৈবক্রমে আসে। কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য, যাহা নিয়মক্রমে প্রত্যহ ঘটিত, তাহা দৈবক্রমেও একদিন ঘটিল না।

রবিবারদিনে ভাবিল, পূর্বনিয়মমতো আজো হিমাংশু সকালে আমাদের এখানে খাইতে আসিবে। ঠিক-যে বিশ্বাস করিল তাহা নয় কিন্তু তবু আশা ছাড়িতে পারিল না। সকাল আসিল, সে আসিল না।

তখন বনমালী বলিল, 'তবে আহার করিয়া আসিবে।' আহার করিয়া আসিল না। বনমালী ভাবিল, 'আজ বোধ হয় আহার করিয়া ঘুমাইতেছে। ঘুম ভাঙিলেই আসিবে।' ঘুম কখন্ ভাঙিল জানি না, কিন্তু আসিল না।

আবার সেই সন্ধ্যা হইল, রাত্রি আসিল, হিমাংশুদের দ্বার একে একে রুদ্ধ হইল, আলোগুলি একে একে নিবিয়া গেল।

এমনি করিয়া সোমবার হইতে রবিবার পর্যন্ত সপ্তাহের সাতটা দিনই যখন দুরদৃষ্ট তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইল, আশাকে আশ্রয় দিবার জন্য যখন আর একটা দিনও বাকি রহিল না, তখন হিমাংশুদের রুদ্ধদ্বার অট্টালিকার দিকে তাহার অশ্রুপূর্ণ দুটি কাতর চক্ষু বড়ো-একটা মর্মভেদী অভিমানের নালিশ পাঠাইয়া দিল এবং জীবনের সমস্ত বেদনাকে একটিমাত্র আর্তস্বরের মধ্যে সংহত করিয়া বলিল, 'দয়াময়!'

১২৯৮ ?

তারাপ্রসন্নের কীর্তি

লেখকজাতির প্রকৃতি অনুসারে তারাপ্রসন্ন কিছু লাজুক এবং মুখচোরা ছিলেন। লোকের কাছে বাহির হইতে গেলে তাঁহার সর্বনাশ উপস্থিত হইত। ঘরে বসিয়া কলম চালাইয়া তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, পিঠ একটু কুঁজা, সংসারের অভিজ্ঞতা অতি অল্প। লৌকিকতার বাঁধি বোলসকল সহজে তাঁহার মুখে আসিত না, এইজন্য গৃহদুর্গের বাহিরে তিনি আপনাকে কিছুতেই নিরাপদ মনে করিতেন না।

লোকেও তাঁহাকে একটা উজবুক রকমের মনে করিত এবং লোকেরো দোষ দেওয়া যায় না। মনে করো, প্রথম পরিচয়ে একটি পরম ভদ্রলোক উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তারাপ্রসন্নকে বলিলেন, "মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয়ে যে কী পর্যন্ত আনন্দ লাভ করা গেল, তা একমুখে বলতে পারি নে"— তারাপ্রসন্ন নিরুত্তর হইয়া নিজের দক্ষিণ করতল বিশেষ মনোযোগপূর্বক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ সে নীরবতার অর্থ এইরূপ মনে হয়, 'তা, তোমার আনন্দ হয়েছে সেটা খুব সম্ভব বটে, কিন্তু আমার-যে আনন্দ হয়েছে, এমন মিথ্যা কথাটা কী করে মুখে উচ্চারণ করব তাই ভাবছি।'

মধ্যাহ্নভোজে নিমন্ত্রণ করিয়া লক্ষপতি গৃহস্বামী যখন সায়াহ্নের প্রাক্কালে পরিবেশন করিতে আরম্ভ করেন এবং মধ্যে-মধ্যে বিনীত কাকুতিসহকারে ভোজ্যসামগ্রীর অকিঞ্চিৎ-করত্ব সম্বন্ধে তারাপ্রসন্নকে সম্বোধনপূর্বক বলিতে থাকেন, "এ কিছুই না। অতি যৎসামান্য। দরিদ্রের খুদকুঁড়া, বিদুরের আয়োজন। মহাশয়কে কেবলি কষ্ট দেওয়া"— তারাপ্রসন্ন চুপ করিয়া থাকেন, যেন কথাটা এমনি প্রামাণিক যে তাহার আর উত্তর সম্ভবে না।

মধ্যে-মধ্যে এমনো হয়, কোনো সুশীল ব্যক্তি যখন তারাপ্রসন্নকে সংবাদ দেন যে, তাঁহার মতো অগাধ পাণ্ডিত্য বর্তমানকালে দুর্লভ এবং সরস্বতী নিজের পদ্মাসন পরিত্যাগপূর্বক তারাপ্রসন্নের কণ্ঠাগ্রে বাসস্থান গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তারাপ্রসন্ন তাহার তিলমাত্র প্রতিবাদ করেন না, যেন সত্য-সত্যই সরস্বতী তাঁহার কণ্ঠরোধ করিয়া বসিয়া আছেন। তারাপ্রসন্নের এইটে জানা উচিত যে, মুখের সামনে যাহারা প্রশংসা করে এবং পরের কাছে যাহারা আত্মনিন্দায় প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অন্যের নিকট হইতে প্রতিবাদ প্রত্যাশা করিয়াই অনেকটা অসংকোচে অত্যুক্তি করিয়া থাকে— অপর পক্ষ আগাগোড়া সমস্ত কথাটা যদি অম্লানবদনে গ্রহণ করে, তবে বক্তা আপনাকে প্রতারিত জ্ঞান করিয়া বিষম ক্ষুব্ধ হয়। এইরূপ স্থলে লোকে নিজের কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইলে দুঃখিত হয় না।

ঘরের লোকের কাছে তারাপ্রসন্নের ভাব অন্যরূপ ; এমন কি, তাঁহার নিজের স্ত্রী দাক্ষায়ণীও তাঁহার সহিত কথায় আঁটিয়া উঠিতে পারেন না। গৃহিণী কথায় কথায় বলেন, "নেও নেও, আমি হার মানলুম। আমার এখন অন্য কাজ আছে।" বাগ্‌যুদ্ধে স্ত্রীকে আত্মমুখে পরাজয় স্বীকার করাইতে পারে, এমন ক্ষমতা এবং এমন সৌভাগ্য কয়জন স্বামীর আছে।

তারাপ্রসন্নের দিন বেশ কাটিয়া যাইতেছে। দাক্ষায়ণীর দৃঢ় বিশ্বাস, বিদ্যাবুদ্ধি-ক্ষমতায় তাঁহার স্বামীর সমতুল্য কেহ নাই এবং সে-কথা তিনি প্রকাশ করিয়া বলিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না ; শুনিয়া তারাপ্রসন্ন বলিতেন, "তোমার একটি বই স্বামী নাই, তুলনা কাহার সহিত করিবে।" শুনিয়া দাক্ষায়ণী ভারি রাগ করিতেন।

দাক্ষায়ণীর কেবল একটা এই মনস্তাপ ছিল যে, তাঁহার স্বামীর অসাধারণ ক্ষমতা বাহিরে প্রকাশ হয় না,— স্বামীর সে-সম্বন্ধে কিছুমাত্র চেষ্টা নাই। তারাপ্রসন্ন যাহা লিখিতেন তাহা ছাপাইতেন না।

অনুরোধ করিয়া দাক্ষায়ণী মাঝে-মাঝে স্বামীর লেখা শুনিতেন, যতই না বুঝিতেন ততই আশ্চর্য হইয়া যাইতেন। তিনি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, কবিকঙ্কণ-চণ্ডী পড়িয়াছেন এবং কথকতাও শুনিয়াছেন। সে-সমস্তই জলের মতো বুঝা যায়, নিরক্ষর লোকেও অনায়াসে বুঝিতে পারে, কিন্তু তাঁহার স্বামীর মতো এমন সম্পূর্ণ দুর্বোধ হইবার আশ্চর্য ক্ষমতা তিনি ইতিপূর্বে দেখেন নাই।

তিনি মনে-মনে কল্পনা করিতেন, এই বই যখন ছাপানো হইবে এবং কেহ এক অক্ষর বুঝিতে পারিবে না, তখন দেশসুদ্ধ লোক বিস্ময়ে কিরূপ অভিভূত হইয়া যাইবে। সহস্রবার করিয়া স্বামীকে বলিতেন, "এ-সব লেখা ছাপাও।"

স্বামী বলিতেন, "বই ছাপানো সম্বন্ধে ভগবান মনু স্বয়ং বলে গেছেন, প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।"

তারাপ্রসন্নের চারিটি সন্তান, চারই কন্যা। দাক্ষায়ণী মনে করিতেন সেটা গর্ভধারিণীরই অক্ষমতা। এইজন্য তিনি আপনাকে প্রতিভাসম্পন্ন স্বামীর অত্যন্ত অযোগ্য স্ত্রী মনে করিতেন। যে-স্বামী কথায় কথায় এমন-সকল দুরূহ গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁহার স্ত্রীর গর্ভে কন্যা বই আর সন্তান হয় না, স্ত্রীর পক্ষে এমন অপটুতার পরিচয় আর কী দিব।

প্রথম কন্যাটি যখন পিতার বক্ষের কাছ পর্যন্ত বাড়িয়া উঠিল, তখন তারাপ্রসন্নের নিশ্চিন্তভাব ঘুচিয়া গেল। তখন তাঁহার স্মরণ হইল, একে একে চারিটি কন্যারই

বিবাহ দিতে হইবে, এবং সেজন্য বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। গৃহিণী অত্যন্ত নিশ্চিন্ত-মুখে বলিলেন, "তুমি যদি একবার একটুখানি মন দাও, তাহা হইলে ভাবনা কিছুই নাই।"

তারাপ্রসন্ন কিঞ্চিৎ ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "সত্য নাকি। আচ্ছা, বলো দেখি কী করিতে হইবে।"

দাক্ষায়ণী সংশয়শূন্য নিরুদ্বিগ্নভাবে বলিলেন, "কলিকাতায় চলো, তোমার বইগুলা ছাপাও, পাঁচজন লোকে তোমাকে জানুক,— তার পরে দেখো দেখি, টাকা আপনি আসে কিনা।"

স্ত্রীর আশ্বাসে তারাপ্রসন্নও ক্রমে আশ্বাস লাভ করিতে লাগিলেন এবং মনে প্রত্যয় হইল, তিনি ইস্তক-নাগাদ বসিয়া বসিয়া যত লিখিয়াছেন তাহাতে পাড়াসুদ্ধ লোকের কন্যাদায় মোচন হইয়া যায়।

এখন, কলিকাতায় যাইবার সময় ভারি গোল পড়িয়া গেল। দাক্ষায়ণী তাঁহার নিরুপায় নিঃসহায় সযত্নপালিত স্বামীটিকে কিছুতেই একলা ছাড়িয়া দিতে পারেন না। তাঁহাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া নিত্যনৈমিত্তিক কর্তব্য স্মরণ করাইয়া সংসারের বিবিধ উপদ্রব হইতে কে রক্ষা করিবে।

কিন্তু অনভিজ্ঞ স্বামীও অপরিচিত বিদেশে স্ত্রীকন্যা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে অত্যন্ত ভীত ও অসম্মত। অবশেষে দাক্ষায়ণী পাড়ার একটি চতুর লোককে স্বামীর নিত্য-অভ্যাস সম্বন্ধে সহস্র উপদেশ দিয়া আপনার পদে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এবং স্বামীকে অনেক মাথার দিব্য ও অনেক মাদুলিতাগায় আচ্ছন্ন করিয়া বিদেশে রওনা করিয়া দিলেন। এবং ঘরে আছাড় খাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া তারাপ্রসন্ন তাঁহার চতুর সঙ্গীর সাহায্যে 'বেদান্তপ্রভাকর' প্রকাশ করিলেন। দাক্ষায়ণীর গহনা বন্ধক রাখিয়া যে-টাকা'টি পাইয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই খরচ হইয়া গেল।

বিক্রয়ের জন্য বহির দোকানে এবং সমালোচনার জন্য দেশের ছোটো বড়ো সমস্ত সম্পাদকের নিকট 'বেদান্তপ্রভাকর' পাঠাইয়া দিলেন। ডাকযোগে গৃহিণীকেও একখানা বই রেজেস্টারি করিয়া পাঠাইলেন। আশঙ্কা ছিল, পাছে ডাকওয়ালারা পথের মধ্য হইতে চুরি করিয়া লয়।

গৃহিণী যেদিন ছাপার বইয়ের উপরের পৃষ্ঠায় ছাপার অক্ষরে তাঁহার স্বামীর নাম দেখিলেন, সেদিন পাড়ার সকল মেয়েকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন। যেখানে সকলে আসিয়া বসিবার কথা, সেইখানে বইটা ফেলিয়া রাখিলেন।

সকলে আসিয়া বসিলে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "ওমা, বইটা ওখানে কে ফেলে রেখেছে। অন্নদা, বইটা দাও-না ভাই, তুলে রাখি।" উহাদের মধ্যে অন্নদা পড়িতে জানে। বইটা কুলঙ্গির উপর তুলিয়া রাখিলেন।

মুহূর্তপরে একটা জিনিস পাড়িতে গিয়া ফেলিয়া দিলেন,— তারপরে নিজের বড়োমেয়েকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শশী, বাবার বই পড়তে ইচ্ছে হয়েছে বুঝি? তা নে-না মা, পড়্-না। তাতে লজ্জা কী।" বাবার বহির প্রতি শশীর কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না।

কিছুক্ষণ পরেই তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "ছি মা, বাবার বই অমন করে নষ্ট করতে নেই, তোমার কমলাদিদির হাতে দাও, উনি ওই আলমারির মাথায় তুলে রাখবেন।"

বহির যদি কিছুমাত্র চেতনা থাকিত, তাহা হইলে সেই একদিনের উৎপীড়নে বেদান্তের প্রাণান্তপরিচ্ছেদ হইত।

একে একে কাগজে সমালোচনা বাহির হইতে লাগিল। গৃহিণী যাহা ঠাহরাইয়াছিলেন, তাহা অনেকটা সত্য হইয়া দাঁড়াইল। গ্রন্থের এক অক্ষর বুঝিতে না পারিয়া দেশশুদ্ধ সমালোচক একেবারে বিহ্বল হইয়া উঠিল। সকলেই একবাক্যে কহিল, "এমন সারবান গ্রন্থ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই।"

যে-সকল সমালোচক রেনল্ড্‌সের লণ্ডনরহস্যের বাংলা অনুবাদ ছাড়া আর-কোনো বই স্পর্শ করিতে পারে না, তাহারা অত্যন্ত উৎসাহের সহিত লিখিল, "দেশের ঝুড়ি ঝুড়ি নাটকনবেলের পরিবর্তে যদি এমন দুই-একখানি গ্রন্থ মধ্যে-মধ্যে বাহির হয়, তবে বঙ্গসাহিত্য বাস্তবিকই পাঠ্য হয়।"

যে-ব্যক্তি পুরুষানুক্রমে বেদান্তের নাম কখনো শুনে নাই সেই কেবল লিখিল, "তারাপ্রসন্নবাবুর সহিত সকল স্থানে আমাদের মতের মিল হয় নাই,— স্থানাভাববশত এস্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম না। কিন্তু মোটের উপরে গ্রন্থকারের সহিত আমাদের মতের অনেক ঐক্যই লক্ষিত হয়।" কথাটা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে মোটের উপর গ্রন্থখানি পুড়াইয়া ফেলা উচিত ছিল।

দেশের যেখানে যত লাইব্রেরি ছিল এবং ছিল না, তাহার সম্পাদকগণ মুদ্রার পরিবর্তে মুদ্রাঙ্কিত পত্রে তারাপ্রসন্নের গ্রন্থ ভিক্ষা চাহিয়া পাঠাইলেন। অনেকেই লিখিল, 'আপনার এই চিন্তাশীল গ্রন্থে দেশের একটি মহৎ অভাব দূর হইয়াছে।' চিন্তাশীল গ্রন্থ কাহাকে বলে, তারাপ্রসন্ন ঠিক বুঝিতে পারিলেন না কিন্তু পুলকিতচিত্তে ঘর হইতে মাশুল দিয়া প্রত্যেক লাইব্রেরিতে 'বেদান্তপ্রভাকর' পাঠাইয়া দিলেন।

এইরূপ অজস্র স্তুতিবাক্যে তারাপ্রসন্ন যখন অতিমাত্র উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন, এমন সময়ে পত্র পাইলেন দাক্ষায়ণীর পঞ্চম সন্তানসম্ভাবনা অতি নিকটবর্তী হইয়াছে। তখন রক্ষকটিকে সঙ্গে করিয়া অর্থসংগ্রহের জন্য দোকানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

সকল দোকানদার একবাক্যে বলিল, একখানি বইও বিক্রয় হয় নাই। কেবল এক জায়গায় শুনিলেন, মফঃস্বর হইতে কে-একজন তাঁহার এক বই চাহিয়া পাঠাইয়াছিল এবং তাহাকে ভ্যালুপেবেলে পাঠানোও হইয়াছিল, কিন্তু বই ফেরত আসিয়াছে, কেহ গ্রহণ করে নাই। দোকানদারকে তাহার মাসুল দণ্ড দিতে হইয়াছে, সেইজন্য সে বিষম আক্রোশে গ্রন্থকারের সমস্ত বহি তখনি তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতে উদ্যত হইল।

গ্রন্থকার বাসায় ফিরিয়া আসিয়া অনেক ভাবিলেন কিন্তু কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার চিন্তাশীল গ্রন্থ সম্বন্ধে যতই চিন্তা করিলেন, ততই অধিকতর উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে লাগিলেন। অবশেষে যে-কয়েকটি টাকা অবশিষ্ট ছিল, তাহাই অবলম্বন করিয়া অবিলম্বে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তারাপ্রসন্ন গৃহিণীর নিকট আসিয়া অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত প্রফুল্লতা প্রকাশ করিলেন। দাক্ষায়ণী শুভ সংবাদের জন্য সহাস্যমুখে প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

তখন তারাপ্রসন্ন একখানি 'গৌড়বার্তাবহ'আনিয়া গৃহিণীর ক্রোড়ে ফেলিয়া দিলেন। পাঠ করিয়া তিনি মনে-মনে সম্পাদকের অক্ষয় ধনপুত্র কামনা করিলেন ; এবং তাঁহার লেখনীর মুখে মানসিক পুষ্পচন্দন-অর্ঘ্য উপহার দিলেন। পাঠ সমাপন করিয়া আবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন।

স্বামী তখন 'নবপ্রভাত' আনিয়া খুলিয়া দিলেন। পাঠ করিয়া আনন্দবিহ্বলা দাক্ষায়ণী আবার স্বামীর মুখের প্রতি প্রত্যাশাপূর্ণ স্নিগ্ধনেত্র উত্থাপিত করিলেন।

তখন তারাপ্রসন্ন একখণ্ড 'যুগান্তর' বাহির করিলেন। তাহার পর ? তাহার পর 'ভারতভাগ্যচক্র'। তাহার পর ? তাহার পর 'শুভজাগরণ' তাহার পর 'অরুণালোক', তাহার পর 'সংবাদতরঙ্গভঙ্গ'। তাহার পর— আশা, আগমনী, উচ্ছ্বাস, পুষ্পমঞ্জরী, সহচরী, সীতা-গেজেট, অহল্যালাইব্রেরি-প্রকাশিকা, ললিত সমাচার, কোটাল, বিশ্ববিচারক, লাবণ্যলতিকা। হাসিতে হাসিতে গৃহিণীর আনন্দাশ্রু পড়িতে লাগিল।

চোখ মুছিয়া আর-একবার স্বামীর কীর্তিরশ্মিসমুজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিলেন,—

স্বামী বলিলেন, "এখনো অনেক কাগজ বাকি আছে।"

দাক্ষায়ণী বলিলেন, "সে বিকালে দেখিব, এখন অন্য খবর কী বলো।"

তারাপ্রসন্ন বলিলেন, "এবার কলিকাতায় গিয়া শুনিয়া আসিলাম, লাটসাহেবের মেম একখানা বই বাহির করিয়াছে কিন্তু তাহাতে বেদান্তপ্রভাকরের কোনো উল্লেখ করে নাই।"

দাক্ষায়ণী বলিলেন, "আহা, ও-সব কথা নয়— আর কী আনলে বলো-না।"

তারাপ্রসন্ন বলিলেন, "কতকগুলো চিঠি আছে।"

তখন দাক্ষায়ণী স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, "টাকা কত আনলে।" তারাপ্রসন্ন বলিলেন, "বিধুভূষণের কাছে পাঁচ টাকা হাওলাত করে এনেছি।"

অবশেষে দাক্ষায়ণী যখন সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিলেন, তখন পৃথিবীর সাধুতা সম্বন্ধে তাঁহার সমস্ত বিশ্বাস বিপর্যস্ত হইয়া গেল। নিশ্চয় দোকানদারেরা তাঁহার স্বামীকে ঠকাইয়াছে এবং বাংলাদেশের সমস্ত ক্রেতা ষড়যন্ত্র করিয়া দোকানদারদের ঠকাইয়াছে।

অবশেষে সহসা মনে হইল, যাহাকে নিজের প্রতিনিধি করিয়া স্বামীর সহিত পাঠাইয়াছিলেন সেই বিধুভূষণ দোকানদারদের সহিত তলে তলে যোগ দিয়াছে— এবং যত বেলা যাইতে লাগিল ততই তিনি পরিষ্কার বুঝিতে পারিলেন, ওপাড়ার বিশ্বম্ভর চাটুজ্যে তাঁহার স্বামীর পরম শত্রু, নিশ্চয়ই এ-সমস্ত তাঁহারি চক্রান্তে ঘটিয়াছে। তাই বটে, যেদিন তাঁহার স্বামী কলিকাতায় যাত্রা করেন, তাহার দুই দিন পরেই বিশ্বম্ভরকে বটতলায় দাঁড়াইয়া কানাই পালের সহিত কথা কহিতে দেখা গিয়াছিল— কিন্তু বিশ্বম্ভর মাঝে-মাঝে প্রায়ই কানাই পালের সহিত কথাবার্তা কয় না কি, এইজন্য তখন কিছু মনে হয় নাই, এখন সমস্ত জলের মতো বুঝা যাইতেছে।

এদিকে দাক্ষায়ণীর সাংসারিক দুর্ভাবনা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। যখন অর্থসংগ্রহের এই একমাত্র সহজ উপায় নিষ্ফল হইল, তখন আপনার কন্যাপ্রসবের অপরাধ তাঁহাকে চতুর্গুণ দগ্ধ করিতে লাগিল। বিশ্বম্ভর, বিধুভূষণ অথবা বাংলাদেশের অধিবাসীদিগকে এই অপরাধের জন্য দায়িক করিতে পারিলেন না— সমস্তই একলা নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইতে হইল, কেবল যে-মেয়েরা জন্মিয়াছে এবং জন্মিবে তাহাদিগকেও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অংশ দিলেন। অহোরাত্র মুহূর্তের জন্য তাঁহার মনে আর শান্তি রহিল না।

আসন্নপ্রসবকালে দাক্ষায়ণীর শারীরিক অবস্থা এমন হইল যে, সকলের বিশেষ আশঙ্কার কারণ হইয়া দাঁড়াইল। নিরুপায় তারাপ্রসন্ন পাগলের মতো হইয়া বিশ্বম্ভরের কাছে গিয়া বলিল, "দাদা, আমার এই খানপঞ্চাশেক বই বাঁধা রাখিয়া যদি কিছু টাকা দাও তো আমি শহর হইতে ভালো দাই আনাই।"

বিশ্বম্ভর বলিল, "ভাই, সেজন্য ভাবনা নাই, টাকা যাহা লাগে আমি দিব,

তুমি বই লইয়া যাও।" এই বলিয়া কানাই পালের সহিত অনেক বলাকহা করিয়া কিঞ্চিৎ টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিল এবং বিধুভূষণ স্বয়ং গিয়া নিজে হইতে পাথেয় দিয়া কলিকাতা হইতে ধাত্রী আনিল।

দাক্ষায়ণী কী মনে করিয়া স্বামীকে ঘরে ডাকাইয়া আনিলেন এবং মাথার দিব্য দিয়া বলিলেন, "যখনি তোমার সেই বেদনার উপক্রম হইবে, স্বপ্নলব্ধ ঔষধটা খাইতে ভুলিয়ো না। আর, সেই সন্ন্যাসীর মাদুলিটা কখনোই খুলিয়া রাখিয়ো না।" আর এমন ছোটোখাটো সহস্র বিষয়ে স্বামীর দুটি হাতে ধরিয়া অঙ্গীকার করাইয়া লইলেন। আর বলিলেন, বিধুভূষণের উপর কিছুই বিশ্বাস নাই, সেই তাঁহার স্বামীর সর্বনাশ করিয়াছে। নতুবা ঔষধ মাদুলি এবং মাথার-দিব্য সমেত তাঁহার সমস্ত স্বামীটিকে তাহার হস্তে দিয়া যাইতেন।

তারপরে মহাদেবের মতো তাঁহার বিশ্বাসপ্রবণ ভোলানাথ স্বামীটিকে পৃথিবীর নির্মম কুটিলবুদ্ধি চক্রান্তকারীদের সম্বন্ধে বারবার সতর্ক করিয়া দিলেন। অবশেষে চুপি-চুপি বলিলেন, "দেখো, আমার যে-মেয়েটি হইবে, সে যদি বাঁচে তাহার নাম রাখিয়ো 'বেদান্তপ্রভা', তারপরে তাহাকে শুধু প্রভা বলিয়া ডাকিলেই চলিবে।"

এই বলিয়া স্বামীর পায়ের ধুলা মাথায় লইলেন। মনে-মনে কহিলেন, 'কেবল কন্যা জন্ম দিবার জন্যই স্বামীর ঘরে আসিয়াছিলাম। এবার বোধ হয় সে আপদ ঘুচিল।'

ধাত্রী যখন বলিল, "মা, একবার দেখো, মেয়েটি কী সুন্দর হয়েছে"— মা একবার চাহিয়া নেত্র নিমীলন করিলেন, মৃদুস্বরে বলিলেন 'বেদান্তপ্রভা'। তারপরে ইহসংসারে আর-একটি কথা বলিবারও অবসর পাইলেন না।

১২৯৮ ?

প্রবন্ধ

শান্তিনিকেতন

শান্তিনিকেতন

১১

রসের ধর্ম

আমাদের ধর্মসাধনার দুটো দিক আছে, একটা শক্তির দিক, একটা রসের দিক। পৃথিবী যেমন জলে স্থলে বিভক্ত, এও ঠিক তেমনি।

শক্তির দিক হচ্ছে বলিষ্ঠ বিশ্বাস। এ বিশ্বাস জ্ঞানের সামগ্রী নয়। ঈশ্বর আছেন, এইটুকু মাত্র বিশ্বাস করাকে বিশ্বাস বলি নে। আমি যার কথা বলছি, এই বিশ্বাস সমস্ত চিত্তের একটি অবস্থা; এ একটি অবিচলিত ভরসার ভাব। মন এতে ধ্রুব হয়ে অবস্থিতি করে— আপনাকে সে কোনো অবস্থায় নিরাশ্রয় নিঃসহায় মনে করে না।

এই বিশ্বাস জিনিসটি পৃথিবীর মতো দৃঢ়। এ একটি নিশ্চিত আধার। এর মধ্যে মস্ত একটি জোর আছে।

যার মধ্যে এই বিশ্বাসের বল নেই, অর্থাৎ যার চিত্তে এই ধ্রুব স্থিতিতত্ত্বটির অভাব আছে, সে ব্যক্তি সংসারে ক্ষণে ক্ষণে যা-কিছুকে হাতে পায়, তাকে অত্যন্ত প্রাণপণ চেষ্টায় আঁকড়ে ধরে। সে যেন অতল জলে পড়েছে— কোথাও সে পায়ের কাছে মাটি পায় না; এইজন্যে যে-সব জিনিস সংসারের জোয়ারে ভাঁটায় ভেসে আসে ভেসে চলে যায়, তাদেরি তাড়াতাড়ি দুই মুঠো দিয়ে চেপে ধরাকেই সে পরিত্রাণ বলে মনে করে। তার মধ্যে যা-কিছু হারায়, যা-কিছু তার মুঠো ছেড়ে চলে যায়, তার ক্ষতিকে এমনি সে একান্ত ক্ষতি বলে মনে করে যে, কোথাও সে সান্ত্বনা খুঁজে পায় না। কথায় কথায় কেবলি তার মনে হয়, সর্বনাশ হয়ে গেল। বাধাবিঘ্ন কেবলি তার মনে নৈরাশ্য ঘনীভূত করে তোলে। সেই-সমস্ত বিঘ্নকে পেরিয়ে সে কোথাও একটা চরম সফলতার নিঃসংশয় মূর্তি দেখতে পায় না। যে-লোক ডুবজলে সাঁতার দেয় যার কোথাও দাঁড়াবার উপায় নেই, সামান্য হাঁড়ি কলসি কলার ভেলা তার পরমধন— তার ভয় ভাবনা উদ্বেগের সীমা নেই। আর, যে-ব্যক্তির পায়ের নিচে সুদৃঢ় মাটি আছে, তারো হাঁড়িকলসির প্রয়োজন আছে, কিন্তু হাঁড়িকলসি তার জীবনের অবলম্বন নয়— এগুলো যদি কেউ কেড়ে নেয় তা-হলে তার যতই অভাব অসুবিধা হ'ক না, সে ডুবে মরবে না।

এইজন্যে দৃঢ়বিশ্বাসী লোকের কাজকর্মে জোর আছে, কিন্তু উদ্বেগ নেই। সে মনের মধ্যে নিশ্চয় অনুভব করে, তার একটা দাঁড়াবার জায়গা আছে, পৌঁছবার স্থান আছে। প্রত্যক্ষ ফল সে না দেখতে পেলেও সে মনে-মনে জানে, ফল থেকে সে বঞ্চিত হয় নি— বিরুদ্ধ ফল পেলেও সেই বিরুদ্ধতাকে সে একান্ত করে দেখে না, তার ভিতর থেকেও একটি সার্থকতার প্রত্যয় মনে থাকে। একটি অত্যন্ত বড়ো জায়গায় চিত্তের দৃঢ়নির্ভরতা, এই জায়গাটিকে ধ্রুবসত্য ব'লে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা, এই হচ্ছে সেই বিশ্বাস যে-মাটির উপরে আমাদের ধর্মসাধনা প্রতিষ্ঠিত।

এই বিশ্বাসটির মূলে একটি উপলব্ধি আছে। সেটি হচ্ছে এই যে, ঈশ্বর সত্য।

কথাটি শুনতে সহজ, এবং শোনাবামাত্রই অনেকে হয়তো বলে উঠবেন যে, ঈশ্বর সত্য, এ কথা তো আমরা অস্বীকার করি নে।

পদে পদেই অস্বীকার করি। ঈশ্বর সত্য নন, এইভাবেই প্রতিদিন আমরা সংসারের কাজ করে থাকি। ঈশ্বর সত্য, এই উপলব্ধিটির উপরে আমরা ভর দিতে পারি নে। আমাদের মন সেই পর্যন্ত পৌঁছে সেখানে গিয়ে স্থিতি করতে পারে না।

আমার যাই ঘটুক না কেন, যিনি চরমসত্য পরমসত্য তিনি আছেন এবং তাঁর মধ্যেই আমি আছি, এই ভরসাটুকু সকল অবস্থাতেই যার মনের মধ্যে লেগেই আছে, সে ব্যক্তি যেমনভাবে জীবনের কাজ করে, আমরা কি তেমনভাবে করে থাকি।— আছেন, আছেন, তিনি আছেন, তিনি আমার হয়েই আছেন— সকল দেশে সকল কালেই তিনি আছেন এবং তিনি আমারি আছেন— জীবনে যত উলটপালটই হ'ক, এই সত্যটি থেকে কেউ আমাকে কিছুমাত্র বঞ্চিত করতে পারবে না, এমন জোর এমন ভরসা যার আছে সেই হচ্ছে বিশ্বাসী; তিনি আছেন, এই সত্যের উপরে সে বিশ্রাম করে এবং তিনি আছেন, এই সত্যের উপরেই সে কাজ করে।

কিন্তু ঈশ্বর-যে কেবল সত্যরূপে সকলকে দৃঢ় করে ধারণ করে রেখেছেন, সকলকে আশ্রয় দিয়েছেন, এই কথাটিই সম্পূর্ণ কথা নয়।

এই জীবধাত্রী পৃথিবী খুব শক্ত বটে— এর ভিত্তি অনেক পাথরের স্তর দিয়ে গড়া। এই কঠিন দৃঢ়তা না থাকলে এর উপরে আমরা এমন নিঃসংশয়ে ভর দিতে পারতুম না। কিন্তু এই কাঠিন্যই যদি পৃথিবীর চরমরূপ হত, তা-হলে তো এ একটি প্রস্তরময় ভয়ংকর মরুভূমি হয়ে থাকত।

এর সমস্ত কাঠিন্যের উপরে একটি রসের বিকাশ আছে— সেইটেই এর চরম পরিণতি। সেটি কোমল, সেটি সুন্দর, সেটি বিচিত্র। সেইখানেই নৃত্য, সেইখানেই গান, সেইখানেই সাজসজ্জা। পৃথিবীর সার্থকরূপটি এইখানেই প্রকাশ পেয়েছে।

অর্থাৎ নিত্যস্থিতির উপরে একটি নিত্যগতির লীলা না থাকলে তার সম্পূর্ণতা নেই। পৃথিবীর ধাতুপাথরের অচল ভিত্তির সর্বোচ্চ তলায় এই গতির প্রবাহ চলেছে, প্রাণের প্রবাহ, যৌবনের প্রবাহ, সৌন্দর্যের প্রবাহ— তার চলাফেরা আসাযাওয়া মেলামেশার আর অন্ত নেই।

রস জিনিসটি সচল ;— সে কঠিন নয় ব'লে, নম্র ব'লে, সর্বত্র তার একটি সঞ্চার আছে ; এইজন্যেই সে বৈচিত্র্যের মধ্যে হিল্লোলিত হয়ে উঠে জগৎকে পুলকিত করে তুলছে— এইজন্যেই কেবলই সে আপনার অপূর্বতা প্রকাশ করছে, এইজন্যেই তার নবীনতার অন্ত নেই।

এই রসটি যেখানে শুকিয়ে যায় সেখানে আবার সেই নিশ্চল কঠিনতা বেরিয়ে পড়ে, সেখানে প্রাণের ও যৌবনের নমনীয়তা কমনীয়তা চলে যায়, জরা ও মৃত্যুর যে-আড়ষ্টতা তাই উৎকট হয়ে ওঠে।

আমাদের ধর্মসাধনার মধ্যেও এই রসময় গতিতত্ত্বটি না রাখলে তার সম্পূর্ণতা নেই, এমন কি, তার যেটি চরম সার্থকতা সেইটিই নষ্ট হয়।

অনেকসময় ধর্মসাধনায় দেখা যায়, কঠিনতাই প্রবল হয়ে ওঠে— তার অবিচলিত দৃঢ়তা নিষ্ঠুর শুষ্কভাবেই আপনাকে প্রকাশ করে। সে আপনার সীমার মধ্যে অত্যন্ত উদ্ধত হয়ে বসে থাকে ; সে অন্যকে আঘাত করে ; তার মধ্যে কোনোপ্রকার নড়াচড়া নেই, এইটে নিয়েই সে গৌরব বোধ করে ; নিজের স্থানটি ছেড়ে চলে না ব'লে কেবল সে একটা দিক দিয়েই সমস্ত জগৎকে দেখে, এবং যারা অন্য দিকে আছে, তারা কিছুই দেখছে না এবং সমস্তই ভুল দেখছে ব'লে কল্পনা করে। নিজের সঙ্গে অন্যের কোনোপ্রকার অনৈক্যকে এই কাঠিন্য ক্ষমা করতে জানে না ; সবাইকে নিজের অচল পাথরের চারিভিতের মধ্যে জোর ক'রে টেনে আনতে চায়। এই কাঠিন্য মাধুর্যকে দুর্বলতা এবং বৈচিত্র্যকে মায়ার ইন্দ্রজাল ব'লে অবজ্ঞা করে এবং সমস্তকে সবলে একাকার করে দেওয়াকেই সমন্বয় সাধন ব'লে মনে করে।

কিন্তু কাঠিন্য ধর্মসাধনার অন্তরালদেশে থাকে। তার কাজ ধারণ করা, প্রকাশ করা নয়। অস্থিপঞ্জর মানবদেহের চরম পরিচয় নয়— সরস কোমল মাংসের দ্বারাই তার প্রকাশ পরিপূর্ণ হয়। সে-যে পিণ্ডাকারে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে না, সে-যে আঘাত সহ্য করেও ভেঙে যায় না, সে-যে আপনার মর্মস্থানগুলিকে সকলপ্রকার উপদ্রব থেকে রক্ষা করে, তার ভিতরকার কারণ হচ্ছে তার অস্থিকঙ্কাল। কিন্তু আপনার এই কঠোর শক্তিকে সে আচ্ছন্ন করেই রাখে এবং প্রকাশ করে আপনার রসময় প্রাণময় ভাবময় গতিভঙ্গীময় কোমল অথচ সতেজ সৌন্দর্যকে।

ধর্মসাধনারও চরম পরিচয় যেখানে তার শ্রী প্রকাশ পায়। এই শ্রী জিনিসটি রসের জিনিস। তার মধ্যে অভাবনীয় বিচিত্রতা এবং অনির্বচনীয় মাধুর্য ও তার মধ্যে নিত্য-চলনশীল প্রাণের লীলা! শুষ্কতায় অনম্রতায় তার সৌন্দর্যকে লোপ করে, তার সচলতাকে রোধ করে, তার বেদনাবোধকে অসাড় করে দেয়। ধর্মসাধনার যেখানে উৎকর্ষ সেখানে গতির বাধাহীনতা, ভাবের বৈচিত্র্য এবং অক্ষুণ্ণ মাধুর্যের নিত্যবিকাশ।

নম্রতা নইলে এই জিনিসটিকে পাওয়া যায় না। কিন্তু নম্রতা মানে শিক্ষিত বিনয় নয়। অর্থাৎ কঠিন লোহাকে পুড়িয়ে-পিটিয়ে তাকে ইস্পাতরূপে যে খরধার নমনীয়তা দেওয়া যায়, এ সে জিনিস নয়। সরস সজীব তরুশাখার যে-নম্রতা— যে-নম্রতার মধ্যে ফুল ফুটে ওঠে, দক্ষিণের বাতাস নৃত্যের আন্দোলন বিস্তার করে, শ্রাবণের ধারা সংগীতে মুখরিত হয় এবং সূর্যের কিরণ ঝংকৃত সেতারের স্বরগুলির মতো উৎক্ষিপ্ত হতে থাকে; চারিদিকের বিশ্বের নানা ছন্দ যে-নম্রতার মধ্যে আপনার স্পন্দনকে বিচিত্র করে তোলে; যে-নম্রতা সহজভাবে সকলের সঙ্গে আপনার যোগ স্বীকার করে, সায় দেয়, সাড়া দেয়, আঘাতকে সংগীতে পরিণত করে, এবং স্বাতন্ত্র্যকে সৌন্দর্যের দ্বারা সকলের আপন করে তোলে।

এক কথায় বলতে গেলে এই নম্রতাটি রসের নম্রতা— শিক্ষার নম্রতা নয়। এই নম্রতা শুষ্ক সংযমের বোঝায় নত নয়, সরস প্রাচুর্যের দ্বারাই নত; প্রেমে ভক্তিতে আনন্দে পরিপূর্ণতায় নত।

কঠোরতা যেমন স্বভাবতই আপনাকে স্বতন্ত্র রাখে, রস তেমনি স্বভাবতই অন্যের দিকে যায়। আনন্দ সহজেই নিজেকে দান করে— আনন্দের ধর্মই হচ্ছে সে আপনাকে অন্যের মধ্যে প্রসারিত করতে চায়। কিন্তু উদ্ধত হয়ে থাকলে কিছুতেই অন্যের সঙ্গে মিল হয় না— অন্যকে চাইতে গেলেই নিজেকে নত করতে হয়— এমন কি, যে-রাজা যথার্থ রাজা, প্রজার কাছে তাকে নম্র হতেই হবে। রসের ঐশ্বর্যে যে-লোক ধনী, নম্রতাই তার প্রাচুর্যের লক্ষণ।

বিশ্বজগতের মধ্যে জগদীশ্বর কোন্‌খানে আমাদের কাছে নত। যেখানে তিনি সুন্দর; যেখানে রসোবৈ সঃ; সেখানে আনন্দকে ভাগ না করে তাঁর চলে না; সেখানে নিজের নিয়মের জোরের উপরে কড়া হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না; সেখানে সকলের মাঝখানে নেমে এসে সকলকে তাঁর ডাক দিতে হয়; সেই ডাকের মধ্যে কত করুণা, কত বেদনা, কত কোমলতা! স্নেহের আনন্দভারে দুর্বল ক্ষুদ্র শিশুর কাছে পিতামাতা যেমন নত হয়ে পড়েন, জগতের ঈশ্বর তেমনি করেই আমাদের দিকে নত হয়ে পড়েছেন। এইটেই হচ্ছে আমাদের কাছে সকলের চেয়ে বড়ো কথা;—

তাঁর নিয়ম অটল, তাঁর শক্তি অসীম, তাঁর ঐশ্বর্য অনন্ত, এ-সব কথা আমাদের কাছে ওর চেয়ে ছোটো ; তিনি নত হয়ে সুন্দর হয়ে ভাবে ভঙ্গীতে হাসিতে গানে রসে গন্ধে রূপে আমাদের সকলের কাছে আপনাকে দান করতে এসেছেন এবং আপনার মধ্যে আমাদের সকলকে নিতে এসেছেন, এইটেই হচ্ছে আমাদের পক্ষে চরম কথা— তাঁর সকলের চেয়ে পরম পরিচয় হচ্ছে এইখানেই।

জগতে ঈশ্বরের এই-যে দুইটি পরিচয়— একটি অটল নিয়মে, আর একটি সুনম্র সৌন্দর্যে, এর মধ্যে নিয়মটি আছে গুপ্ত আর সৌন্দর্যটি আছে তাঁকে ঢেকে। নিয়মটি এমন প্রচ্ছন্ন যে, সে-যে আছে তা আবিষ্কার করতে মানুষের অনেকদিন লেগেছিল কিন্তু সৌন্দর্য চিরদিন আপনাকে ধরা দিয়েছে। সৌন্দর্য মিলবে ব'লেই, ধরা দেবে ব'লেই সুন্দর। এই সৌন্দর্যের মধ্যেই, রসের মধ্যেই মিলনের তত্ত্বটি রয়েছে।

ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যখন কাঠিন্যই বড়ো হয়ে ওঠে তখন সে মানুষকে মেলায় না, মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে। এইজন্যে কৃচ্ছ্রসাধনকে যখন কোনো ধর্ম আপনার প্রধান অঙ্গ করে তোলে, যখন সে আচারবিচারকেই মুখ্য স্থান দেয়, তখন সে মানুষের মধ্যে ভেদ আনয়ন করে ; তখন তার নীরস কঠোরতা সকলের সঙ্গে তাকে মিলতে বাধা দেয়, সে আপনার নিয়মের মধ্যে নিজেকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র ক'রে আবদ্ধ ক'রে রাখে ; সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকে পাছে নিয়মের ক্রটিতে অপরাধ ঘটে— এইজন্যেই সবাইকে সরিয়ে সরিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলতে হয়। শুধু তাই নয়, নিয়মপালনের একটা অহংকার মানুষকে শক্ত করে তোলে, নিয়মপালনের একটা লোভ তাকে পেয়ে বসে এবং এই-সকল নিয়মকে ধ্রুব ধর্ম ব'লে জানা তার সংস্কার হয়ে যায় ব'লেই যেখানে এই নিয়মের অভাব দেখতে পায় সেখানে তার অত্যন্ত একটা অবজ্ঞা জন্মে।

য়িহুদি এইজন্যে আপনার ধর্মনিয়মের জালের মধ্যে আপনাকে আপাদমস্তক বন্দী করে রেখেছে ; ধর্মের ক্ষেত্রে সমস্ত মানুষকে আহ্বান করা এবং সমস্ত মানুষের সঙ্গে মেলা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

বর্তমান হিন্দুসমাজও ধর্মের দ্বারা নিজেকে পৃথিবীর সকল মানুষের সঙ্গেই পৃথক করে রেখেছে। নিজের মধ্যেও তার বিভাগের অন্ত নেই। বস্তুত নিজেকে সকলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করবার জন্যেই সে নিয়মের বেড়া নির্মাণ করেছিল। বৌদ্ধধর্ম ভারত-বর্ষীয়কে সকলের সঙ্গে অবাধে মিলিয়ে দিচ্ছিল, বর্তমান হিন্দুধর্মের সমস্ত নিয়মসংযম প্রধানত তারি প্রতিকারের প্রবল চেষ্টা। সেই চেষ্টাটি আজ পর্যন্ত রয়ে গেছে। সে কেবলি দূর করছে, কেবলি ভাগ করছে, নিজেকে কেবলি সংকীর্ণ বদ্ধ ক'রে আড়াল করে রাখবার উদ্যোগ করছে। হিন্দুর ধর্ম যেখানে, সেখানে বাহিরের লোকের পক্ষে

সমস্ত জানলাদরজা বন্ধ এবং ঘরের লোকের পক্ষে কেবলি বেড়া এবং প্রাচীর।

অন্য দেশে অন্য জাতির মধ্যে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্যে কোনো চেষ্টা নেই তা বলতে পারি নে। কারণ, স্বাতন্ত্র্যরক্ষার প্রয়োজন আছে, সে প্রয়োজনকে অস্বীকার করা কোনোমতেই চলে না। কিন্তু অন্যত্র এই স্বাতন্ত্র্যরক্ষার চেষ্টা রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক অর্থাৎ এই চেষ্টাটা সেখানে নিজের নীচের তলায় বাস করে।

মিলনের বৃত্তিটি স্বাতন্ত্র্যচেষ্টার উপরের জিনিস। ক্রীতদাস রাজাকে খুন ক'রে সিংহাসনে চড়ে বসলে যেমন হয়, স্বাতন্ত্র্যচেষ্টা তেমনি মিলনধর্মকে একেবারে অভিভূত করে দিয়ে তার উপরে যদি আপনার স্থান দখল ক'রে বসে, তা হলে সেইরকমের অন্যায় ঘটে। এইজন্যেই পারিবারিক বা সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় স্বার্থবুদ্ধি মানুষকে স্বাতন্ত্র্যের দিকে টেনে থাকলেও, ধর্মবুদ্ধি তার উপরে দাঁড়িয়ে তাকে বিশ্বের দিকে— বিশ্বমানবের দিকে নিয়ত আহ্বান করে।

আমাদের দেশে বর্তমানকালে সেইখানেই ছিদ্র হয়েছে এবং সেই ছিদ্রপথেই এ দেশের শনি প্রবেশ করেছে। যে-ধর্ম মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলায়, সেই ধর্মের দোহাই দিয়েই আমরা মানুষকে পৃথক করেছি। আমরা বলেছি মানুষের স্পর্শে, তার সঙ্গে একাসনে আহারে, তার আহরিত অন্নজল গ্রহণে, মানুষ ধর্মে পতিত হয়। বন্ধনকে ছেদন করাই যার কাজ, তাকে দিয়েই আমরা বন্ধনকে পাকা করে নিয়েছি— তা হলে আজ আমাদের উদ্ধার করবে কে।

আশ্চর্য ব্যাপার এই, উদ্ধার করবার ভার আজ আমরা তারি হাতে দিতে চেষ্টা করছি, যে-জিনিসটা ধর্মের চেয়ে নিচেকার। আমরা স্বাজাত্যবুদ্ধির উপর বরাত দিয়েছি, ভারতবর্ষের অন্তর্গত মানুষের সঙ্গে মানুষকে মিলিয়ে দেবার জন্যে। আমরা বলছি, তা না-হলে আমরা বড়ো হব না, বলিষ্ঠ হব না, আমাদের প্রয়োজনসিদ্ধি হবে না।

আমরা ধর্মকে এমন জায়গায় এনে ফেলেছি যে, আমাদের জাতীয় স্বার্থবুদ্ধি প্রয়োজনবুদ্ধিও তার চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে। এমন দশা হয়েছে যে, ধর্মে আমাদের উদ্ধার নেই, স্বাজাত্যের দ্বারা আমাদের উদ্ধার পেতে হবে! এমন হয়েছে যে, ধর্ম আমাদের পৃথক থাকতে বলছে, স্বাজাত্য আমাদের এক হবার জন্যে তাড়না করছে!

কিন্তু ধর্মবুদ্ধি যে-মিলনের ঘটক নয়, সে-মিলনের উপর আমি ভরসা রাখতে পারি নে। ধর্মমূলক মিলনতত্ত্বটিকে আমাদের দেশে যদি প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, তবেই স্বভাবতই আমরা মিলনের দিকে যাব, কেবলি গণ্ডি আঁকবার এবং বেড়া তোলবার প্রবৃত্তি থেকে আমরা নিষ্কৃতি পাব। ধর্মের সিংহদ্বার খোলা থাকলে তবেই ছোটো বড়ো সকল যজ্ঞের নিমন্ত্রণেই মানুষকে আমরা আহ্বান করতে পারব;— নতুবা কেবলমাত্র

প্রয়োজনের বা স্বাজাত্য-অভিমানের খিড়কির দরজাটুকু যদি খুলে রাখি, তবে ধর্মনিয়মের বাধা অতিক্রম করে সেই ফাঁকটুকুর মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের এত প্রভেদপার্থক্য, এত বিরোধবিচ্ছেদ গলতে পারবে না— মিলতে পারবে না।

ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে এইটি বরাবর দেখা গেছে, ধর্ম যখন আপনার রসের মূর্তি প্রকাশ করে তখনি সে বাঁধন ভাঙে এবং সকল মানুষকে এক করবার দিকে ধাবিত হয়। খ্রীষ্ট যে প্রেমভক্তিরসের বন্যাকে মুক্ত করে দিলেন, তা য়িহুদিধর্মের কঠিন শাস্ত্রবন্ধনের মধ্যে নিজেকে বদ্ধ রাখতে পারলে না এবং সেই ধর্ম আজ পর্যন্ত প্রবল জাতির স্বার্থের শৃঙ্খলকে শিথিল করবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করছে, আজ পর্যন্ত সমস্ত সংস্কার এবং অভিমানের বাধা ভেদ করে মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলাবার দিকে তার আকর্ষণশক্তি প্রয়োগ করছে।

বৌদ্ধধর্মের মূলে একটি কঠোর তত্ত্বকথা আছে কিন্তু সেই তত্ত্বকথায় মানুষকে এক করে নি; তার মৈত্রী তার করুণা এবং বুদ্ধদেবের বিশ্বব্যাপী হৃদয়প্রসারই মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ ঘুচিয়ে দিয়েছে। নানক বল, রামানন্দ বল, কবীর বল, চৈতন্য বল, সকলেই রসের আঘাতে বাঁধন ভেঙে দিয়ে সকল মানুষকে এক জায়গায় ডাক দিয়েছেন।

তাই বলছিলুম, ধর্ম যখন আচারকে নিয়মকে শাসনকে আশ্রয় ক'রে কঠিন হয়ে ওঠে, তখন সে মানুষকে বিভক্ত করে দেয়, পরস্পরের মধ্যে গতিবিধির পথকে অবরুদ্ধ করে। ধর্মে যখন রসের বর্ষা নেবে আসে তখন যে-সকল গহ্বর পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান রচনা করেছিল, তারা ভক্তির স্রোতে প্রেমের বন্যায় ভরে ওঠে এবং সেই পূর্ণতায় স্বাতন্ত্র্যের অচল সীমাগুলিই সচল হয়ে উঠে অগ্রসর হয়ে সকলকে মিলিয়ে দিতে চায়, বিপরীত পারকে এক করে দেয় এবং দুর্লঙ্ঘ্য দূরকে আনন্দবেগে নিকট করে আনে। মানুষ যখনি সত্যভাবে গভীরভাবে মিলেছে তখন কোনো-একটি বিপুল রসের আবির্ভাবেই মিলেছে, প্রয়োজনে মেলে নি, তত্ত্বজ্ঞানে মেলে নি, আচারের শুষ্ক শাসনে মেলে নি।

ধর্মের যখন চরম লক্ষ্যই হচ্ছে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনসাধন, তখন সাধককে এ-কথা মনে রাখতে হবে যে, কেবল বিধিবদ্ধ পূজার্চনা আচার অনুষ্ঠান শুচিতার দ্বারা তা হতেই পারে না। এমন কি, তাতে মনকে কঠোর করে ব্যাঘাত আনে এবং ধার্মিকতার অহংকার জাগ্রত হয়ে চিত্তকে সংকীর্ণ করে দেয়। হৃদয়ে রস থাকলে তবেই তাঁর সঙ্গে মিলন হয়, আর-কিছুতেই হয় না।

কিন্তু এই কথাটি মনে রাখতে হবে, ভক্তিরসের প্রেমরসের মধ্যে যে-দিকটি সম্ভোগের দিক, কেবল সেইটিকেই একান্ত করে তুললে দুর্বলতা এবং বিকার ঘটে। ওর মধ্যে একটি শক্তির দিক আছে, সেটি না থাকলে রসের দ্বারা মনুষ্যত্ব দুর্গতিপ্রাপ্ত হয়।

ভোগই প্রেমের একমাত্র লক্ষণ নয়। প্রেমের একটি প্রধান লক্ষণ হচ্ছে এই যে, প্রেম আনন্দে দুঃখকে স্বীকার করে নেয়। কেননা দুঃখের দ্বারা, ত্যাগের দ্বারাই তার পূর্ণ সার্থকতা। ভাবাবেশের মধ্যে নয়— সেবার মধ্যে, কর্মের মধ্যেই তার পূর্ণ পরিচয়। এই দুঃখের মধ্যে দিয়ে, কর্মের মধ্যে দিয়ে, তপস্যার মধ্যে দিয়ে যে-প্রেমের পরিপাক হয়েছে, সেই প্রেমই বিশুদ্ধ থাকে এবং সেই প্রেমই সর্বাঙ্গীণ হয়ে ওঠে।

এই দুঃখস্বীকারই প্রেমের মাথার মুকুট; এই তার গৌরব। ত্যাগের দ্বারাই সে আপনাকে লাভ করে; বেদনার দ্বারাই তার রসের মন্থন হয়; সাধ্বী সতীকে যেমন সংসারের কর্ম মলিন করে না, তাকে আরো দীপ্তিমতী করে তোলে, সংসারে মঙ্গলকর্ম যেমন তার সতীপ্রেমকে সার্থক করতে থাকে, তেমনি যে-সাধকের চিত্ত ভক্তিতে ভরে উঠেছে, কর্তব্যের শাসন তাঁর পক্ষে শৃঙ্খল নয়— সে তাঁর অলংকার; দুঃখে তাঁর জীবন নত হয় না, দুঃখেই তাঁর ভক্তি গৌরবান্বিত হয়ে ওঠে। এইজন্যে মানবসমাজে কর্মকাণ্ড যখন অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠে মনুষ্যত্বকে ভারাক্রান্ত করে তোলে, তখন একদল বিদ্রোহী জ্ঞানের সহায়তায় কর্মমাত্রেরই মূল উৎপাটন এবং দুঃখমাত্রকে একান্তভাবে নিরস্ত করে দেবার অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু যাঁরা ভক্তির দ্বারা পূর্ণতার স্বাদ পেয়েছেন, তাঁরা কিছুকেই অস্বীকার করবার প্রয়োজন বোধ করেন না— তাঁরা অনায়াসেই কর্মকে শিরোধার্য এবং দুঃখকে বরণ করে নেন। নইলে-যে তাঁদের ভক্তির মাহাত্ম্যই থাকে না, নইলে-যে ভক্তিকে অপমান করা হয়; ভক্তি বাইরের সমস্ত অভাব ও আঘাতের দ্বারাই আপনার ভিতরকার পূর্ণতাকে আপনার কাছে সপ্রমাণ করতে চায়— দুঃখে নম্রতা ও কর্মে আনন্দই তার ঐশ্বর্যের পরিচয়। কর্মে মানুষকে জড়িত করে এবং দুঃখ তাকে পীড়া দেয়, রসের আবির্ভাবে মানুষের এই সমস্যাটি একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়, তখন কর্ম এবং দুঃখের মধ্যেই মানুষ যথার্থভাবে আপনার মুক্তি উপলব্ধি করে। বসন্তের উত্তাপে পর্বতশিখরের বরফ যখন রসে বিগলিত হয়, তখন চলাতেই তার মুক্তি, নিশ্চলতাই তার বন্ধন; তখন অক্লান্ত আনন্দে দেশদেশান্তরকে উর্বর ক'রে সে চলতে থাকে; তখন নুড়িপাথরের দ্বারা সে যতই প্রতিহত হয় ততই তার সংগীত জাগ্রত এবং নৃত্য উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

একটা বরফের পিণ্ড এবং ঝরনার মধ্যে তফাত কোন্‌খানে। না, বরফের পিণ্ডের নিজের মধ্যে গতিতত্ত্ব নেই। তাকে বেঁধে টেনে নিয়ে গেলে তবেই সে চলে। সুতরাং চলাটাই তার বন্ধনের পরিচয়। এইজন্যে বাইরে থেকে তাকে ঠেলা দিয়ে চালনা করে নিয়ে গেলে প্রত্যেক আঘাতেই সে ভেঙে যায়, তার ক্ষয় হতে থাকে— এইজন্য চলা ও আঘাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে স্থির নিশ্চল হয়ে থাকাই তার পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থা।

কিন্তু ঝরনার যে-গতি সে তার নিজেরি গতি,— সেইজন্যে এই গতিতেই তার ব্যাপ্তি, মুক্তি, তার সৌন্দর্য। এইজন্য গতিপথে সে যত আঘাত পায় ততই তাকে বৈচিত্র্য দান করে। বাধায় তার ক্ষতি নেই, চলায় তার শ্রান্তি নেই।

মানুষের মধ্যেও যখন রসের আবির্ভাব না থাকে, তখনি সে জড়পিণ্ড। তখন ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় ভাবনাই তাকে ঠেলে ঠেলে কাজ করায়, সে-কাজে পদে পদেই তার ক্লান্তি। সেই নীরস অবস্থাতেই মানুষ অন্তরের নিশ্চলতা থেকে বাহিরেও কেবলি নিশ্চলতা বিস্তার করতে থাকে। তখনি তার যত খুঁটিনাটি, যত আচার বিচার, যত শাস্ত্র শাসন। তখনি মানুষের মন গতিহীন বলেই বাহিরেও সে আষ্টেপৃষ্ঠে বদ্ধ। তখনি তার ওঠাবসা খাওয়াপরা সকল দিকেই বাঁধাবাঁধি। তখনি সে সেই-সকল নিরর্থক কর্মকে স্বীকার করে যা তাকে সম্মুখের দিকে অগ্রসর করে না, যা তাকে অন্তহীন পুনরাবৃত্তির মধ্যে কেবলি একই জায়গায় ঘুরিয়ে মারে।

রসের আবির্ভাবে মানুষের জড়ত্ব ঘুচে যায়। সুতরাং তখন সচলতা তার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়; তখন অগ্রগামী গতিশক্তির আনন্দেই সে কর্ম করে, সর্বজয়ী প্রাণশক্তির আনন্দেই সে দুঃখকে স্বীকার করে।

বস্তুত মানুষের প্রধান সমস্যা এ নয় যে, কোন্ শক্তি দ্বারা সে দুঃখকে একেবারে নিবৃত্ত করতে পারে।

তার সমস্যা হচ্ছে এই যে, কোন্ শক্তি দ্বারা সে দুঃখকে সহজেই স্বীকার করে নিতে পারে। দুঃখকে নিবৃত্ত করবার পর যাঁরা দেখাতে চান, তাঁরা অহংকেই সমস্ত অনর্থের হেতু বলে একেবারে তাকে বিলুপ্ত করতে বলেন; দুঃখকে স্বীকার করবার শক্তি যাঁরা দিতে চান, তাঁরা অহংকে প্রেমের দ্বারা পরিপূর্ণ করে তাকে সার্থক করে তুলতে বলেন। অর্থাৎ গাড়ি থেকে ঘোড়াকে খুলে ফেলাই যে গাড়িকে খানায় পড়া থেকে রক্ষা করবার সুকৌশল তা নয়, ঘোড়ার উপরে সারথিকে স্থাপন করাই হচ্ছে গাড়িকে বিপদ থেকে বাঁচানো এবং তাকে গম্যস্থানের অভিমুখে চালানোর যথোচিত উপায়। এইজন্যে মানুষের ধর্মসাধনার মধ্যে যখন ভক্তির আবির্ভাব হয়, তখনি সংসারে যেখানে যা-কিছু সমস্ত বজায় থেকেও মানুষের সকল সমস্যার মীমাংসা হয়ে যায়— তখন কর্মের মধ্যে সে আনন্দ ও দুঃখের মধ্যে সে গৌরব অনুভব করে; তখন কর্মই তাকে মুক্তি দেয় এবং দুঃখ তার ক্ষতির কারণ হয় না।

গুহাহিত

উপনিষৎ তাঁকে বলেছেন— গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং— অর্থাৎ তিনি গুপ্ত, তিনি গভীর। তাঁকে শুধু বাইরে দেখা যায় না, তিনি লুকানো আছেন। বাইরে যা-কিছু প্রকাশিত, তাকে জানবার জন্যে আমাদের ইন্দ্রিয় আছে— তেমনি যা গূঢ়, যা গভীর, তাকে উপলব্ধি করবার জন্যেই আমাদের গভীরতর অন্তরিন্দ্রিয় আছে। তা যদি না থাকত তা হলে সেদিকে আমরা ভুলেও মুখ ফিরাতুম না ; গহনকে পাবার জন্যে আমাদের তৃষ্ণার লেশও থাকত না।

এই অগোচরের সঙ্গে যোগের জন্যে আমাদের বিশেষ অন্তরিন্দ্রিয় আছে ব'লেই মানুষ এই জগতে জন্মলাভ ক'রে কেবল বাইরের জিনিসে সন্তুষ্ট থাকে নি। তাই সে চারিদিকে খুঁজে খুঁজে মরছে, দেশবিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাকে কিছুতে থামতে দিচ্ছে না। কোথা থেকে সে এই খুঁজে-বের-করবার পরোয়ানা নিয়ে সংসারে এসে উপস্থিত হল ? যা-কিছু পাচ্ছি, তার মধ্যে আমরা সম্পূর্ণকে পাচ্ছি নে— যা পাচ্ছি নে, তার মধ্যেই আমাদের আসল পাবার সামগ্রীটি আছে, এই একটি সৃষ্টিছাড়া প্রত্যয় মানুষের মনে কেমন করে জন্মাল ?

পশুদের মনে তো এই তাড়নাটি নেই। উপরে যা আছে তারি মধ্যে তাদের চেষ্টা ঘুরে বেড়াচ্ছে— মুহূর্তকালের জন্যেও তারা এমন কথা মনে করতে পারে না যে যাকে দেখা যায় না তাকেও খুঁজতে হবে, যাকে পাওয়া যায় না তাকেও লাভ করতে হবে। তাদের ইন্দ্রিয় এই বাইরে এসে থেমে গিয়েছে, তাকে অতিক্রম করতে পারছে না ব'লে তাদের মনে কিছুমাত্র বেদনা নেই।

কিন্তু এই একটি অত্যন্ত আশ্চর্য ব্যাপার, মানুষ প্রকাশ্যের চেয়ে গোপনকে কিছুমাত্র কম করে চায় না— এমন কি, বেশি করেই চায়। তার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিরুদ্ধ সাক্ষ্য সত্ত্বেও মানুষ বলেছে, 'দেখতে পাচ্ছি নে কিন্তু আরো আছে, শোনা যাচ্ছে না কিন্তু আরো আছে।'

জগতে অনেক গুপ্ত সামগ্রী আছে যার আচ্ছাদন তুলে ফেললেই তা প্রত্যক্ষগম্য হয়ে ওঠে, এ কিন্তু সে-রকম নয়— এ আচ্ছন্ন ব'লে গুপ্ত নয়, এ গভীর ব'লেই গুপ্ত, সুতরাং একে যখন আমরা জানতে পারি তখনো এ গভীর থাকে।

গোরু উপরের থেকে ঘাস ছিঁড়ে খায়, শূকর দাঁত দিয়ে মাটি চিরে সেই ঘাসের মুথা উপড়ে খেয়ে থাকে, কিন্তু এখানে উপরের ঘাসের সঙ্গে নিচেকার মুথার প্রকৃতিগত

কোনো প্রভেদ নেই, দুটিই স্পর্শগম্য এবং দুটিতেই সমান-রকমেই পেট ভরে। কিন্তু মানুষ গোপনের মধ্যে যা খুঁজে বের করে, প্রকাশ্যের সঙ্গে তার যোগ আছে— সাদৃশ্য নেই। তা খনির ভিতরকার খনিজের মতো তুলে এনে ভাণ্ডার বোঝাই করবার জিনিস নয়। অথচ মানুষ তাকে রত্নের চয়ে বেশি মূল্যবান রত্ন বলেই জানে।

তার মানে আর-কিছুই নয়, মানুষের একটি অন্তরতর ইন্দ্রিয় আছে— তার ক্ষুধাও অন্তরতর, তার খাদ্যও অন্তরতর, তার তৃপ্তিও অন্তরতর।

এইজন্যই চিরকাল মানুষ চোখের দেখাকে ভেদ করবার জন্যে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। এইজন্য মানুষ, আকাশে তারা আছে, কেবল এইটুকুমাত্র দেখেই মাটির দিকে চোখ ফেরায় নি— এইজন্যে কোন্ সুদূর অতীতকালে ক্যাল্‌ডিয়ার মরু-প্রান্তরে মেষপালক মেষ চরাতে চরাতে নিশীথরাত্রের আকাশপৃষ্ঠায় জ্যোতিষ্করহস্য পাঠ করে নেবার জন্যে রাত্রের পরে রাত্রে অনিমেষ-নিদ্রাহীন-নেত্রে যাপন করেছে ;— তাদের যে-মেষরা চরছিল তার মধ্যে কেহই একবারও সেদিকে তাকাবার প্রয়োজনমাত্র অনুভব করে নি।

কিন্তু মানুষ যা দেখে তার গুহাহিত দিকটাও দেখতে চায়, নইলে সে কিছুতেই স্থির হতে পারে না।

এই অগোচরের রাজ্য অন্বেষণ করতে করতে মানুষ-যে কেবল সত্যকেই উদ্‌ঘাটন করেছে, তা বলতে পারি নে। কত ভ্রমের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে, তার সীমা নেই। গোচরের রাজ্যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেও সে প্রতিদিন এককে আর ব'লে দেখে, কত ভুলকেই তার কাটিয়ে উঠতে হয় তার সীমা নেই, কিন্তু তাই ব'লে প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রকে তো একেবারে মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। তেমনি অগোচরের দেশেও যেখানে আমরা গোপনকে খুঁজে বেড়াই, সেখানে আমরা অনেক ভ্রমকে-যে সত্য ব'লে গ্রহণ করেছি তাতে সন্দেহ নেই। একদিন বিশ্বব্যাপারের মূলে আমরা কত ভূতপ্রেত কত অদ্ভুত কাল্পনিক মূর্তিকে দাঁড় করিয়েছি তার ঠিকানা নেই, কিন্তু তাই নিয়ে মানুষের এই মনোবৃত্তিটিকে উপহাস করবার কোনো কারণ দেখি নে। গভীর জলে জাল ফেলে যদি পাঁক ও গুগলি ওঠে, তার থেকেই জালফেলাকে বিচার করা চলে না। মানুষ তেমনি অগোচরের তলায় যে জাল ফেলছে, তার থেকে এ পর্যন্ত পাঁক বিস্তর উঠেছে— কিন্তু তবুও তাকে অশ্রদ্ধা করতে পারি নে। সকল দেখার চেয়ে বেশি দেখা, সকল পাওয়ার চেয়ে বেশি পাওয়ার দিকে মানুষের এই চেষ্টাকে নিয়ত প্রেরণ করা, এইটেই একটি আশ্চর্য ব্যাপার ;— আফ্রিকার বন্যবর্বরতার মধ্যেও যখন এই চেষ্টার পরিচয়

পাই, তখন তাদের অদ্ভুত বিশ্বাস এবং বিকৃত কদাকার দেবমূর্তি দেখেও মানুষের এই অন্তর্নিহিত শক্তির একটি বিশেষ গৌরব অনুভব না করে থাকা যায় না।

মানুষের এই শক্তিটি সত্য— এবং এই শক্তিটি সত্যকেই গোপনতা থেকে উদ্ধার করবার এবং মানুষের চিত্তকে গভীরতার নিকেতনে নিয়ে যাবার জন্যে।

এই শক্তিটি মানুষের এত সত্য যে, একে জয়যুক্ত করবার জন্যে মানুষ দুর্গমতার কোনো বাধাকেই মানতে চায় না। এখানে সমুদ্রপর্বতের নিষেধ মানুষের কাছে ব্যর্থ হয়, এখানে ভয় তাকে ঠেকাতে পারে না বারংবার নিষ্ফলতা তার গতিরোধ করতে পারে না ;— এই শক্তির প্রেরণায় মানুষ তার সমস্ত ত্যাগ করে এবং অনায়াসে প্রাণ বিসর্জন করতে পারে।

মানুষ-যে দ্বিজ ; তার জন্মক্ষেত্র দুই জায়গায়। এক জায়গায় সে প্রকাশ্য, আর-এক জায়গায় সে গুহাহিত, সে গভীর। এই বাইরের মানুষটি বেঁচে থাকবার জন্যে চেষ্টা করছে, সেজন্যে তাকে চতুর্দিকে কত সংগ্রহ কত সংগ্রাম করতে হয় তেমনি আবার ভিতরকার মানুষটিও বেঁচে থাকবার জন্যে লড়াই ক'রে মরে। তার যা অন্নজল তা বাইরের জীবন রক্ষার জন্য একান্ত আবশ্যক নয়, কিন্তু তবু মানুষ এই খাদ্য সংগ্রহ করতে আপনার বাইরের জীবনকে বিসর্জন করেছে। এই ভিতরকার জীবনটিকে মানুষ অনাদর করে নি— এমন কি, তাকেই বেশি আদর করেছে এবং তাই যারা করেছে তারাই সভ্যতার উচ্চশিখরে অধিরোহণ করেছে। মানুষ বাইরের জীবনটাকেই যখন একান্ত বড়ো করে তোলে তখন সব দিক থেকেই তার সুর নেবে যেতে থাকে। দুর্গমের দিকে, গোপনের দিকে, গভীরতার দিকে, মানুষের চেষ্টাকে যখন টানে তখনি মানুষ বড়ো হয়ে ওঠে,— ভূমার দিকে অগ্রসর হয়,— তখনি মানুষের চিত্ত সর্বতোভাবে জাগ্রত হতে থাকে। যা সুগম, যা প্রত্যক্ষ, তাতে মানুষের সমস্ত চেতনাকে উদ্যম দিতে পারে না, এইজন্য কেবলমাত্র সেই দিকে আমাদের মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণতা লাভ করে না।

তা হলে দেখতে পাচ্ছি, মানুষের মধ্যেও একটি সত্তা আছে যেটি গুহাহিত ; সেই গভীর সত্তাটিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি গুহাহিত তাঁর সঙ্গেই কারবার করে— সেই তার আকাশ, তার বাতাস, তার আলোক ; সেইখানেই তার স্থিতি, তার গতি, সেই গুহালোকই তার লোক।

এইখান থেকে সে যা-কিছু পায় তাকে বৈষয়িক পাওয়ার সঙ্গে তুলনা করাই যায় না— তাকে মাপ ক'রে ওজন ক'রে দেখবার কোনো উপায়ই নেই— তাকে যদি কোনো স্থূলদৃষ্টি ব্যক্তি অস্বীকার করে বসে, যদি বলে, 'কী তুমি পেলে একবার দেখি'— তা হলে বিষম সংকটে পড়তে হয়। এমন কি, যা বৈজ্ঞানিক সত্য, প্রত্যক্ষ সত্যের ভিত্তিতেই

যার প্রতিষ্ঠা তার সম্বন্ধেও প্রত্যক্ষতার স্থূল আবদার চলে না। আমরা দেখাতে পারি, ভারি জিনিস হাত থেকে পড়ে যায় কিন্তু মহাকর্ষণকে দেখাতে পারি নে। অত্যন্ত মূঢ়ও যদি বলে, 'আমি সমুদ্র দেখব, আমি হিমালয় পর্বত দেখব', তবে তাকে এ-কথা বলতে হয় না যে, 'আগে তোমার চোখদুটোকে মস্ত-বড়ো করে তোলো তবে তোমাকে পর্বত সমুদ্র দেখিয়ে দিতে পারব'— কিন্তু সেই মূঢ়ই যখন ভূবিদ্যার কথা জিজ্ঞাসা করে তখন তাকে বলতেই হয়, 'একটু রোসো ; গোড়া থেকে শুরু করতে হবে ; আগে তোমার মনকে সংস্কারের আবরণ থেকে মুক্ত করো তবে এর মধ্যে তোমার অধিকার হবে। অর্থাৎ চোখ মেললেই চলবে না, কান খুললেই হবে না, তোমাকে গুহার মধ্যে প্রবেশ করতে হবে।' মূঢ় যদি বলে, 'না, আমি সাধনা করতে রাজী নই, আমাকে তুমি এ-সমস্তই চোখে-দেখা কানে-শোনার মতো সহজ করে দাও', তবে তাকে হয় মিথ্যা দিয়ে ভোলাতে হয়, নয় তার অনুরোধে কর্ণপাত করাও সময়ের বৃথা অপব্যয় বলে গণ্য করতে হয়।

তাই যদি হয় তবে উপনিষৎ যাঁকে গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং বলেছেন, যিনি গভীরতম, তাঁকে দেখাশোনার সামগ্রী করে বাইরে এনে ফেলবার অদ্ভুত আবদার আমাদের খাটতেই পারে না। এই আবদার মিটিয়ে দিতে পারেন এমন গুরুকে আমরা অনেক-সময় খুঁজে থাকি, কিন্তু যদি কোনো গুরু বলেন, 'আচ্ছা বেশ, তাঁকে খুব সহজে করে দিচ্ছি'— ব'লে সেই যিনি নিহিতং গুহায়াং তাঁকে আমাদের চোখের সমুখে যেমন-খুশি একরকম করে দাঁড় করিয়ে দেন, তা হলে বলতেই হবে, তিনি অসত্যের দ্বারা গোপনকে আরো গোপন করে দিলেন। এ-রকম স্থলে শিষ্যকে এই কথাটাই বলবার কথা যে, মানুষ যখন সেই গুহাহিতকে, সেই গভীরকে চায়, তখন তিনি গভীর ব'লেই তাঁকে চায়— সেই গভীর আনন্দ আর-কিছুতে মেটাতে পারে না ব'লেই তাঁকে চায়— চোখে-দেখা কানে-শোনার সামগ্রী জগতে যথেষ্ট আছে, তার জন্যে আমাদের বাইরের মানুষটা তো দিনরাত ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু আমাদের অন্তরতর গুহাহিত তপস্বী সে সমস্ত-কিছু চায় না ব'লেই একাগ্রমনে তাঁর দিকে চলেছে। তুমি যদি তাঁকে চাও তবে গুহার মধ্যে প্রবেশ করেই তাঁর সাধনা করো— এবং যখন তাঁকে পাবে, তোমার 'গুহাশয়' রূপেই তাঁকে পাবে ; অন্য রূপে যে তাঁকে চায় সে তাঁকেই চায় না ; সে কেবল বিষয়কেই অন্য একটা নাম দিয়ে চাচ্ছে। মানুষ সকল পাওয়ার চেয়ে যাঁকে চাচ্ছে, তিনি সহজ বলেই তাঁকে চাচ্ছে না— তিনি ভূমা বলেই তাঁকে চাচ্ছে। যিনি ভূমা, সর্বত্রই তিনি গুহাহিতং, কি সাহিত্যে কি ইতিহাসে, কি শিল্পে কি ধর্মে কি কর্মে।

এই যিনি সকলের চেয়ে বড়ো, সকলের চেয়ে গভীর, কেবলমাত্র তাঁকে চাওয়ার

মধ্যেই একটা সার্থকতা আছে। সেই ভূমাকে আকাঙ্ক্ষা করাই আত্মার মাহাত্ম্য— ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি, এই কথাটি-যে মানুষ বলতে পেরেছে, এতেই তার মনুষ্যত্ব। ছোটোতে তার সুখ নেই, সহজে তার সুখ নেই, এইজন্যেই সে গভীরকে চায়— তবু যদি তুমি বল, 'আমার হাতের তেলোর মধ্যে সহজকে এনে দাও', তবে তুমি আর-কিছুকে চাচ্ছ।

বস্তুত, যা সহজ, অর্থাৎ যাকে আমরা অনায়াসে দেখছি, অনায়াসে শুনছি, অনায়াসে বুঝছি, তার মতো কঠিন আবরণ আর নেই। যিনি গভীর তিনি এই অতিপ্রত্যক্ষ-গোচর সহজের দ্বারাই নিজেকে আবৃত করে রেখেছেন। বহুকালের বহু চেষ্টায় এই সহজদেখাশোনার আবরণ ভেদ করেই মানুষ বিজ্ঞানের সত্যকে, দর্শনের তত্ত্বকে দেখেছে, যা-কিছু পাওয়ার মতো পাওয়া তাকে লাভ করেছে।

শুধু তাই নয়, কর্মক্ষেত্রেও মানুষ বহু সাধনায় আপনার সহজ প্রবৃত্তিকে ভেদ ক'রে তবে কর্তব্যনীতিতে গিয়ে পৌঁচেছে। মানুষ আপনার সহজ ক্ষুধাতৃষ্ণাকেই বিনা বিচারে মেনে পশুর মতো সহজ জীবনকে স্বীকার করে নেয় নি ; এইজন্যেই শিশুকাল থেকে প্রবৃত্তির উপরে জয়লাভ করবার শিক্ষা নিয়ে তাকে দুঃসাধ্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে —বারংবার পরাস্ত হয়েও সে পরাভব স্বীকার করতে পারছে না। শুধু চরিত্রে এবং কর্মে নয়, হৃদয়ভাবের দিকেও মানুষ সহজকে অতিক্রম করবার পথে চলেছে ; ভালোবাসাকে মানুষ নিজের থেকে পরিবারে, পরিবার থেকে দেশে, দেশ থেকে সমস্ত মানবসমাজে প্রসারিত করবার চেষ্টা করছে। এই দুঃসাধ্য সাধনায় সে যতই অকৃতকার্য হ'ক, একে সে কোনোমতেই অশ্রদ্ধা করতে পারে না ; তাকে বলতেই হবে, 'যদিচ স্বার্থ আমার কাছে সুপ্রত্যক্ষ ও সহজ এবং পরার্থ গূঢ়নিহিত ও দুঃসাধ্য, তবু স্বার্থের চেয়ে পরার্থই সত্যতর এবং সেই দুঃসাধ্যসাধনার দ্বারাই মানুষের শক্তি সার্থক হয় সুতরাং সে গভীরতর আনন্দ পায়, অর্থাৎ এই কঠিন ব্রতই আমাদের গুহাহিত মানুষটির যথার্থ জীবন— কেননা, তার পক্ষে নাল্পে সুখমস্তি।'

জ্ঞানে ভাবে কর্মে মানুষের পক্ষে সর্বত্রই যদি এই কথাটি খাটে, জ্ঞানে ভাবে কর্মে সর্বত্রই যদি মানুষ সহজকে অতিক্রম ক'রে গভীরের দিকে যাত্রা করার দ্বারাই সমস্ত শ্রেয় লাভ করে থাকে, তবে কেবল কি পরমাত্মার সম্বন্ধেই মানুষ দীনভাবে সহজকে প্রার্থনা ক'রে আপনার মনুষ্যত্বকে ব্যর্থ করবে ? মানুষ যখন টাকা চায় তখন সে এ-কথা বলে না, 'টাকাকে ঢেলা করে দাও, আমার পক্ষে পাওয়া সহজ হবে।'— টাকা দুর্লভ বলেই প্রার্থনীয় ; টাকা ঢেলার মতো সুলভ হলেই মানুষ তাকে চাইবে না। তবে ঈশ্বরের সম্বন্ধেই কেন আমরা উলটা কথা বলতে যাব। কেন বলব, 'তাঁকে

আমরা সহজ করে অর্থাৎ সস্তা করে পেতে চাই।' কেন বলব, 'আমরা তাঁর সমস্ত অসীম মূল্য অপহরণ ক'রে তাঁকে হাতে হাতে চোখে চোখে ফিরিয়ে বেড়াব।'

না, কখনো তা আমরা চাই নে। তিনি আমাদের চিরজীবনের সাধনার ধন, সেই আমাদের আনন্দ। শেষ নেই, শেষ নেই, জীবন শেষ হয়ে আসে তবু শেষ নেই। শিশুকাল থেকে আজ পর্যন্ত কত নব নব জ্ঞানে ও রসে তাঁকে পেতে পেতে এসেছি, না জেনেও তাঁর আভাস পেয়েছি, জেনে তাঁর আস্বাদ পেয়েছি, এমনি করে সেই অনন্ত গোপনের মধ্যে নূতন নূতন বিস্ময়ের আঘাতে আমাদের চিত্তের পাপড়ি একটি একটি করে একটু একটু করে বিকশিত হয়ে উঠছে। হে গূঢ়, তুমি গূঢ়তম বলেই তোমার টান প্রতিদিন মানুষের জ্ঞানকে প্রেমকে কর্মকে গভীর হতে গভীরতরে আকর্ষণ করে নিয়ে যাচ্ছে। তোমার এই অনন্ত রহস্যময় গোপনতাই মানুষের সকলের চেয়ে প্রিয়; এই অতল গভীরতাই মানুষের বিষয়াসক্তি ভোলাচ্ছে, তার বন্ধন আলগা করে দিচ্ছে, তার জীবনমরণের তুচ্ছতা দূর করছে; তোমার এই পরম গোপনতা থেকেই তোমার বাঁশির মধুরতম গভীরতম স্বর আমাদের প্রাণের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে আসছে; মহত্ত্বের উচ্চতা, প্রেমের গাঢ়তা, সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ, সমস্ত তোমার ওই অনির্বচনীয় গভীরতার দিকে টেনে নিয়ে আমাদের সুধায় ডুবিয়ে দিচ্ছে। মানবচিত্তের এই আকাঙ্ক্ষার আবেগ, এই আনন্দের বেদনাকে তুমি এমনি করে চিরকাল জাগিয়ে রেখে চিরকাল তৃপ্ত করে চলেছ। হে গুহাহিত, তোমার গোপনতার শেষ নেই বলেই জগতের যত প্রেমিক যত সাধক যত মহাপুরুষ তোমার গভীর আহ্বানে আপনাকে এমন নিঃশেষে ত্যাগ করতে পেরেছিলেন; এমন মধুর করে তাঁরা দুঃখকে অলংকার করে পরেছেন, মৃত্যুকে মাথায় করে বরণ করেছেন। তোমার সেই সুধাময় অতলস্পর্শ গভীরতাকে যারা নিজের মূঢ়তার দ্বারা আচ্ছন্ন ও সীমাবদ্ধ করেছে, তারাই পৃথিবীতে দুর্গতির পঙ্ককুণ্ডে লুটচ্ছে— তারা বল তেজ সম্পদ সমস্ত হারিয়েছে— তাদের চেষ্টা ও চিন্তা কেবলি ছোটো ও জগতে তাদের সমস্ত অধিকার কেবলি সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। নিজেকে দুর্বল কল্পনা করে তোমাকে যারা সুলভ করতে চেয়েছে, তারা মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ গৌরবকে ধুলায় লুণ্ঠিত করে দিয়েছে।

হে গুহাহিত, আমার মধ্যে যে গোপন পুরুষ, যে নিভৃতবাসী তপস্বীটি রয়েছে, তুমি তারি চিরন্তন বন্ধু; প্রগাঢ় গভীরতার মধ্যেই তোমরা দুজনে পাশাপাশি গায়ে গায়ে সংলগ্ন হয়ে রয়েছ— সেই ছায়াগম্ভীর নিবিড় নিস্তব্ধতার মধ্যেই তোমরা দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া। তোমাদের সেই চিরকালের পরমাশ্চর্য গভীর সখ্যকে আমরা যেন আমাদের কোনো ক্ষুদ্রতার দ্বারা ছোটো করে না দেখি। তোমাদের ওই পরম

সত্যকে মানুষ দিনে দিনে যতই উপলব্ধি করছে, ততই তার কাব্য সংগীত ললিতকলা অনির্বচনীয় রসের আভাসে রহস্যময় হয়ে উঠছে, ততই তার জ্ঞান সংস্কারের দৃঢ় বন্ধনকে ছিন্ন করছে, তার কর্ম স্বার্থের দুর্লঙ্ঘ্য সীমা অতিক্রম করছে, তার জীবনের সকল ক্ষেত্রেই অনন্তের ব্যঞ্জনা প্রকাশ পেয়ে উঠছে।

তোমার সেই চিরন্তন পরম গোপনতার অভিমুখে আনন্দে যাত্রা করে চলব,— আমার সমস্ত যাত্রাসংগীত সেই নিগূঢ়তার নিবিড় সৌন্দর্যকেই যেন চিরদিন ঘোষণা করে,— পথের মাঝখানে কোনো কৃত্রিমকে, কোনো ছোটোকে, কোনো সহজকে নিয়ে যেন ভুলে না থাকে,— আমার আনন্দের আবেগধারা সমুদ্রে চিরকাল বহমান হবার সংকল্প ত্যাগ ক'রে যেন মরুবালুকার ছিদ্রপথে আপনাকে পথিমধ্যে পরিসমাপ্ত করে না দেয়।

২৩ চৈত্র ১৩১৬

দুর্লভ

ঈশ্বরের মধ্যে মনকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি নে, মন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, এই কথা অনেকের মুখে শোনা যায়।

'পারি নে' যখন বলি তার অর্থ এই, সহজে পারি নে; যেমন করে নিশ্বাস গ্রহণ করছি, কোনো সাধনার প্রয়োজন হচ্ছে না, ঈশ্বরকে তেমন করে আমাদের চেতনার মধ্যে গ্রহণ করতে পারি নে।

কিন্তু গোড়া থেকেই মানুষের পক্ষে কিছুই সহজ নয়; ইন্দ্রিয়বোধ থেকে আরম্ভ করে ধর্মবুদ্ধি পর্যন্ত সমস্তই মানুষকে এত সুদূর টেনে নিয়ে যেতে হয় যে মানুষ হয়ে ওঠা সকল দিকেই তার পক্ষে কঠিন সাধনার বিষয়। যেখানে সে বলবে 'আমি পারি নে' সেইখানেই তার মনুষ্যত্বের ভিত্তি ক্ষয় হয়ে যাবে, তার দুর্গতি আরম্ভ হবে; সমস্তই তাকে পারতেই হবে।

পশুশাবককে দাঁড়াতে এবং চলতে শিখতে হয় নি। মানুষকে অনেকদিন ধরে বারবার উঠে পড়ে তবে চলা অভ্যাস করতে হয়েছে; 'আমি পারি নে' বলে সে নিষ্কৃতি পায় নি। মাঝে-মাঝে এমন ঘটনা শোনা গেছে, পশুমাতা মানবশিশুকে হরণ করে বনে নিয়ে গিয়ে পালন করেছে। সেই-সব মানুষ জন্তুদের মতো হাতে পায়ে হাঁটে। বস্তুত তেমন করে হাঁটা সহজ। সেইজন্য শিশুদের পক্ষে হামাগুড়ি দেওয়া কঠিন নয়।

কিন্তু মানুষকে উপরের দিকে মাথা তুলে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে হবে। এই খাড়া

হয়ে দাঁড়ানো থেকেই মানুষের উন্নতির আরম্ভ। এই উপায়ে যখনি সে আপনার দুই হাতকে মুক্তিদান করতে পেরেছে তখনি পৃথিবীর উপরে সে কর্তৃত্বের অধিকার লাভ করেছে। কিন্তু শরীরটাকে সরল রেখায় খাড়া রেখে দুই পায়ের উপর চলা সহজ নয়। তবু জীবনযাত্রার আরম্ভেই এই কঠিন কাজকেই তার সহজ করে নিতে হয়েছে; যে মাধ্যাকর্ষণ তার সমস্ত শরীরের ভারকে নীচের দিকে টানছে, তার কাছে পরাভব স্বীকার না করবার শিক্ষাই তার প্রথম কঠিন শিক্ষা।

বহু চেষ্টায় এই সোজা হয়ে চলা যখন তার পক্ষে সহজ হয়ে দাঁড়াল, যখন সে আকাশের আলোকের মধ্যে অনায়াসে মাথা তুলতে পারল, তখন জ্যোতিষ্কবিরাজিত বৃহৎ বিশ্বজগতের সঙ্গে সে আপনার সম্বন্ধ উপলব্ধি করে আনন্দ ও গৌরব লাভ করলে।

এই যেমন জগতের মধ্যে চলা মানুষকে কষ্ট করে শিখতে হয়েছে, সমাজের মধ্যে চলাও তাকে বহু কষ্টে শিখতে হয়েছে। খাওয়া পরা, শোওয়া বসা, চলা বলা, এমন কিছুই নেই যা তাকে বিশেষ যত্নে অভ্যাস না করতে হয়েছে। কত রীতিনীতি নিয়ম-সংযম মানলে তবে চারদিকের মানুষের সঙ্গে তার আদানপ্রদান, তার প্রয়োজন ও আনন্দের সম্বন্ধ সম্পূর্ণ ও সহজ হতে পারে। যতদিন তা না হয় ততদিন তাকে পদে পদে দুঃখ ও অপমান স্বীকার করতে হয়— ততদিন তার যা দেবার ও তার যা নেবার উভয়ই বাধাগ্রস্ত হয়।

জ্ঞানরাজ্যে অধিকারলাভের চেষ্টাতেও মানুষকে অল্প ক্লেশ পেতে হয় না। যা চোখে দেখছি, কানে শুনছি, তাকেই আরামে স্বীকার করে গেলেই মানুষের চলে না। এইজন্যেই বিদ্যালয় বলে কত বড়ো একটা প্রকাণ্ড বোঝা মানুষের সমাজকে বহন করে বেড়াতে হয়— তার কত আয়োজন, কত ব্যবস্থা! জীবনের প্রথম কুঁড়িপঁচিশ বছর মানুষকে কেবল শিক্ষা সমাধা করতেই কাটিয়ে দিতে হয় এবং যাদের জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রবল, সমস্ত জীবনেও তাদের শিক্ষা শেষ হয় না।

এমনি সকল দিকেই দেখতে পাই, মানুষ মনুষ্যত্বলাভের সাধনায় তপস্যা করছে। আহারের জন্যে রৌদ্রবৃষ্টি মাথায় করে নিয়ে চাষ করাও তার তপস্যা, আর নক্ষত্রলোকের রহস্য ভেদ করবার জন্যে আকাশে দূরবীন তুলে জেগে থাকাও তার তপস্যা।

এমনি প্রাণের রাজ্যেই বল, জ্ঞানের রাজ্যেই বল, সামাজিকতার রাজ্যেই বল, সর্বত্রই আপনার পূর্ণ অধিকার লাভ করবার জন্যে মানুষকে প্রাণপণ করতে হয়েছে। যারা বলেছে 'পারি নে', তারাই নেবে গিয়েছে। যা সহজ না, তারি মধ্যে মানুষকে সহজ হতে হবে— সহজের প্রকাণ্ড মাধ্যাকর্ষণকে কাটিয়ে তাকে সর্বত্রই উপরে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে।

প্রথম থেকেই সহজের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে এই প্রবৃত্তি মানুষের পক্ষে এমনি স্বাভাবিক হয়ে গেছে যে, অনাবশ্যক দুঃসাধ্যসাধনও তাকে আনন্দ দেয়। আর-কোনো প্রাণীর মধ্যেই এই অদ্ভুত জিনিসটা নেই। যেটা সহজ, যেটা আরামের, তার ব্যতিক্রম দেখলে অন্য কোনো প্রাণী সুখ বোধ করতে পারে না। অন্য প্রাণীরা যে লড়াই করে, সে কেবল প্রয়োজনসাধনের জন্যে, আত্মরক্ষার জন্যে, অর্থাৎ দায়ে পড়ে; সে লড়াই গায়ে পড়ে দুঃসাধ্যসাধনের জন্যে নয়। কিন্তু মানুষই কেবলমাত্র কঠিন কাজকে সম্পন্ন করাতেই বিশেষ আনন্দ পায়।

এইজন্যেই যে-ব্যায়ামকৌশলে কোনো প্রয়োজনই নেই, সেটা দেখা মানুষের একটা আমোদের অঙ্গ। যখন শুনতে পাই বারংবার পরাস্ত হয়েও মানুষ উত্তরমেরুর তুষার মরুক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে আপনার জয়পতাকা পুঁতে এসেছে, তখন এই কার্যের লাভ সম্বন্ধে কোনো হিসাব না করেও আমাদের ভিতরকার তপস্বী মনুষ্যত্ব পুলক অনুভব করে। মানুষের প্রায় প্রত্যেক খেলার মধ্যেই শরীর বা মনের একটা-কিছু কষ্টের হেতু আছে— এমন একটা কিছু আছে যা সহজ নয় বলেই মানুষের পক্ষে সুখকর।

যখন কোনো ক্ষেত্রেই মানুষকে 'পারি নে' এ-কথাটা বলতে দেওয়া হয় নি, তখন ব্রহ্মের মধ্যে মানুষ সহজ হবে, সত্য হবে, এ সম্বন্ধেও 'পারি নে' বলা তার চলবে না। সকল শ্রেষ্ঠতাতেই চেষ্টা করে তাকে সফল হতে হয়েছে, আর যেটা সকলের চেয়ে পরম শ্রেষ্ঠতা সেইখানেই সে নিতান্ত সামান্য চেষ্টা করেই যদি ফল না পায়, তবেই এ-কথা বলা তার সাজবে না যে, 'আমার দ্বারা একেবারে সাধ্য নয়'।

যতই সহজ ও যতই আরামের হ'ক, তবু আমরা কেবল মাটির দিকেই মাথা করে পশুর মতো চলে বেড়াব না, মানুষের ভিতর এই একটি তাগিদ ছিল বলেই মানুষ যেমন বহু চেষ্টায় আকাশে মাথা তুলেছে— এবং সেই আকাশে মাথা তুলেছে ব'লে পৃথিবীর অধিকার থেকে সে বঞ্চিত হয় নি, বরঞ্চ পশুর থেকে তার অধিকার অনেক বৃহৎভাবে ব্যাপ্ত হয়েছে, তেমনই আমাদের মনের অন্তরতম দেশে আর-একটি গভীরতম উত্তেজনা আছে, আমরা কেবলই সংসারের দিকে মাথা রেখে সমস্ত জীবন ঘোর বিষয়ীর মতো ধুলা ঘ্রাণ করে করেই বেড়াতে পারব না— অনন্তের মধ্যে, অভয়ের মধ্যে, অশোকের মধ্যে মাথা তুলে আমরা সরল হয়ে উন্নত হয়ে সঞ্চরণ করব। যদি তাই করি, তবে সংসার থেকে আমরা ভ্রষ্ট হব না বরঞ্চ সংসারে আমাদের অধিকার বৃহৎ হবে, সত্য হবে, সার্থক হবে। তখন মুক্তভাবে আমরা সংসারে বিচরণ করতে পারব বলেই সংসারে আমাদের যথার্থ কর্তৃত্ব প্রশস্ত হবে।

জন্তু যেমন চার পায়ে চলে ব'লে হাতের ব্যবহার পায় না, তেমনি বিষয়ীলোক সংসারে চার পায়ে চলে ব'লে কেবল চলে মাত্র, সে ভালো করে কিছুই দিতে পারে না এবং নিতে পারে না। কিন্তু যাঁরা সাধনার জোরে ব্রহ্মের দিকে মাথা তুলে চলতে শিখেছেন, তাঁদের হাত পা উভয়ই মাটিতে বদ্ধ নয়— তাঁদের দুই হাত মুক্ত হয়েছে— তাঁদের নেবার শক্তি এবং দেবার শক্তি পূর্ণতালাভ করেছে— তাঁরা কেবলমাত্র চলেন তা নয়, তাঁরা কর্তা, তাঁরা সৃষ্টিকর্তা।

যে সৃষ্টিকর্তা সে আপনাকে সর্জন করে ; আপনাকে ত্যাগ করেই সে সৃষ্টি করে। এই ত্যাগের শক্তিই হচ্ছে সকলের চেয়ে বড়ো শক্তি। এই ত্যাগের শক্তির দ্বারাই মানুষ বড়ো হয়ে উঠেছে। যে-পরিমাণেই সে আপনাকে ত্যাগ করতে পেরেছে সেই পরিমাণেই সে লাভ করেছে। এই ত্যাগের শক্তিই সৃষ্টিশক্তি। এই সৃষ্টিশক্তিই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য। তিনি বন্ধনহীন বলেই আনন্দে আপনাকে নিত্যকাল ত্যাগ করেন। এই ত্যাগই তাঁর সৃষ্টি। আমাদের চিত্ত যে-পরিমাণে স্বার্থবর্জিত হয়ে মুক্ত আনন্দে তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়, সেই পরিমাণে সেও সৃষ্টি করে, সেই পরিমাণেই তার চিন্তা, তার কর্ম সৃষ্টি হয়ে ওঠে।

যাঁরা সংসার থেকে উচ্চ হয়ে উঠে ব্রহ্মের মধ্যে মাথা তুলে সঞ্চরণ করতে শিখেছেন, তাঁদের এই ত্যাগের শক্তিই মুক্তিলাভ করেছে। এই আসক্তিবন্ধনহীন আত্মত্যাগের অব্যাহত শক্তি দ্বারাই আধ্যাত্মিকলোকে তাঁরা শ্রেষ্ঠ অধিকার লাভ করেন। এই অধিকারের জোরে সর্বত্রই তাঁরা রাজা। এই অধিকারই মানুষের পরম অধিকার। এই অধিকারের মধ্যেই মানুষের চরম স্থিতি। এইখানে মানুষকে 'পারি নে' বললে চলবে না ;— চিরজীবন সাধনা করেও এই চরম গতি তাকে লাভ করতে হবে, নইলে সে যদি সমস্ত পৃথিবীরও সম্রাট হয় তবু তার মহতী বিনষ্টিঃ।

যে-ব্রহ্মের শক্তি আমার অন্তরে বাহিরে সর্বত্রই নিজেকে উৎসর্জন করছে, যিনি 'আত্মদা', আমি জলে-স্থলে-আকাশে সুখে-দুঃখে সর্বত্র সকল অবস্থায় তাঁর মধ্যেই আছি, এই চেতনাকে প্রতিদিনের চেষ্টায় সহজ করে তুলতে হবে। এই সাধনার ধ্যানই হচ্ছে গায়ত্রী। এই সাধনাই হচ্ছে তাঁর মধ্যে দাঁড়াতে এবং চলতে শেখা। অনেকবার টলতে হবে, বারবার পড়তে হবে, কিন্তু তাই বলে ভয় করলে হবে না 'তবে বুঝি পারব না'। পারবই, নিশ্চয়ই পারব। কেননা অন্তরের মধ্যে এই দিকেই মানুষের একটা প্রেরণা আছে,— এইজন্যে মানুষ দুঃসাধ্যতাকে ভয় করে না, তাকে বরণ করে নেয়,— এইজন্যেই মানুষ এতবড়ো একটা আশ্চর্য কথা ব'লে জগতের অন্য-সকল প্রাণীর চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে, ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি।

জন্মোৎসব

বক্তার জন্মদিনে বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের বালকদিগের নিকট কথিত

আজ আমার জন্মদিনে তোমরা উৎসব করে আমাকে আহ্বান করেছ,— এতে আমার অনেকদিনের স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলেছে।

জন্মদিনে বিশেষভাবে নিজের জীবনের প্রতি দৃষ্টি করবার কথা অনেকদিন আমার মনে জাগে নি। কত ২৫শে বৈশাখ চলে গিয়েছে, তারা অন্য তারিখের চেয়ে নিজেকে কিছুমাত্র বড়ো করে আমার কাছে প্রকাশ করে নি।

বস্তুত, নিজের জন্মদিন বৎসরের অন্য ৩৬৪ দিনের চেয়ে নিজের কাছে কিছুমাত্র বড়ো নয়। যদি অন্যের কাছে তার মূল্য থাকে তবেই তার মূল্য।

যেদিন আমরা এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলুম, সেদিন নূতন অতিথিকে নিয়ে যে উৎসব হয়েছিল, সে আমাদের নিজের উৎসব নয়। অজ্ঞাত গোপনতার মধ্য থেকে আমাদের সদ্য আবির্ভাবকে যাঁরা একটি পরমলাভ বলে মনে করেছিলেন, উৎসব তাঁদেরি। আনন্দলোক থেকে একটি আনন্দ-উপহার পেয়ে তাঁরা আত্মার আত্মীয়তার ক্ষেত্রকে বড়ো করে উপলব্ধি করেছিলেন, তাই তাঁদের উৎসব।

এই উপলব্ধি চিরকাল সকলের কাছে সমান নবীন থাকে না। অতিথি ক্রমে পুরাতন হয়ে আসে,— সংসারে তার আবির্ভাব-যে পরমরহস্যময় এবং সে-যে চিরদিন এখানে থাকবে না, সে-কথা ভুলে যেতে হয়। বৎসরের পর বৎসর সমভাবেই প্রায় চলে যেতে থাকে— মনে হয়, তার ক্ষতিও নেই বৃদ্ধিও নেই, সে আছে তো আছেই— তার মধ্যে অন্তরের প্রকাশ আর আমরা দেখতে পাই নে। তখন যদি আমরা উৎসব করি, সে বাঁধা প্রথার উৎসব— সে এক-রকম দায়ে পড়ে করা।

যতক্ষণ মানুষের মধ্যে নব নব সম্ভাবনার পথ খোলা থাকে, ততক্ষণ তাকে আমরা নূতন করেই দেখি; তার সম্বন্ধে ততক্ষণ আমাদের আশার অন্ত থাকে না, সে আমাদের ঔৎসুক্যকে সমান জাগিয়ে রেখে দেয়।

জীবনে একটা বয়স আসে যখন মানুষের সম্বন্ধে আর নূতন প্রত্যাশা করবার কিছুই থাকে না; তখন সে যেন আমাদের কাছে এক-রকম ফুরিয়ে আসে। সে-রকম অবস্থায় তাকে দিয়ে আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহার চলতে পারে কিন্তু উৎসব চলতে পারে না; কারণ, উৎসব জিনিসটাই হচ্ছে নবীনতার উপলব্ধি— তা আমাদের প্রতি-দিনের অতীত। উৎসব হচ্ছে জীবনের কবিত্ব, যেখানে রস সেইখানেই তার প্রকাশ।

আজ আমি উনপঞ্চাশ বৎসর সম্পূর্ণ করে পঞ্চাশে পড়েছি। কিন্তু আমার সেই দিনের কথা মনে পড়ছে যখন আমার জন্মদিন নবীনতার উজ্জ্বলতায় উৎসবের উপযুক্ত ছিল।

তখন আমার তরুণ বয়স। প্রভাত হতে না হতে প্রিয়জনেরা আমাকে কত আনন্দে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে 'আজ তোমার জন্মদিন'। আজ তোমরা যেমন ফুল তুলেছ, ঘর সাজিয়েছ, সেই-রকম আয়োজনই তখন হয়েছে। আত্মীয়দের সেই আনন্দ-উৎসাহের মধ্যে মনুষ্যজন্মের একটি বিশেষ মূল্য সেদিন অনুভব করতুম। যেদিকে সংসারে আমি অসংখ্য বহুর মধ্যে একজনমাত্র, সেদিক থেকে আমার দৃষ্টি ফিরে গিয়ে যেখানে আমি আমিই, যেখানে আমি বিশেষভাবে একমাত্র, সেখানেই আমার দৃষ্টি পড়ত— নিজের গৌরবে সেদিন প্রাতঃকালে হৃদয় বিকশিত হয়ে উঠত।

এমনি করে আত্মীয়দের স্নেহদৃষ্টির পথ বেয়ে নিজের জীবনের দিকে যখন তাকাতুম, তখন আমার জীবনের দূরবিস্তৃত ভবিষ্যৎ তার অনাবিষ্কৃত রহস্যলোক থেকে এমন একটি বাঁশি বাজাত যাতে আমার সমস্ত চিত্ত দুলে উঠত। বস্তুত, জীবন তখন আমার সামনেই— পিছনে তার অতি অল্পই। জীবনে যেটুকু গোচর ছিল, তার চেয়ে অগোচরই ছিল অনেক বেশি। আমার তরুণ বয়সের অল্প কয়েকটি অতীত বৎসরকে গানের ধুয়াটির মতো অবলম্বন করে সমস্ত অনাগত ভবিষ্যৎ তার উপরে অনির্বচনীয়ের তান লাগাতে থাকত।

পথ তখন নির্দিষ্ট হয় নি। নানা দিকে তার শাখাপ্রশাখা। কোন্ দিক দিয়ে কোথায় যাব এবং কোথায় গেলে কী পাব, তার অধিকাংশই কল্পনার মধ্যে ছিল। এইজন্য প্রতিবৎসর জন্মদিনে জীবনের সেই অনির্দেশ্য অসীম প্রত্যাশায় চিত্ত বিশেষভাবে জাগ্রত হয়ে উঠত।

ঝরনা যখন প্রথম জেগে ওঠে, নদী যখন প্রথম চলতে আরম্ভ করে, তখন নিজের সুবিধার পথ বের করতে তাকে নানা দিকে নানা গতিপরিবর্তন করতে হয়। অবশেষে বাধার দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে যখন তার পথ সুনির্দিষ্ট হয়, তখন নূতন পথের সন্ধান তার বন্ধ হয়ে যায়। তখন নিজের খনিত পথকে অতিক্রম করাই তার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

আমারো জীবনের ধারা যখন ঘাতপ্রতিঘাতের মাঝখান দিয়ে আপনার পথটি তৈরি করে নিলে, তখন বর্ষার বন্যার বেগও সেই পথেই স্ফীত হয়ে বইতে লাগল এবং গ্রীষ্মের রিক্ততাও সেই পথেই সংকুচিত হয়ে চলতে থাকল। তখন নিজের জীবনকে

বারম্বার আর নূতন করে আলোচনা করবার দরকার রইল না। এইজন্যে তখন থেকে জন্মদিন আর-কোনো নূতন আশার সুরে বাজতে থাকল না। সেইজন্যে জন্মদিনের সংগীতটি যখন নিজের ও অন্যের কাছে বন্ধ হয়ে এল, তখন আস্তে আস্তে উৎসবের প্রদীপটিও নিবে এল। আমার বা আর-কারো কাছে এর আর-কোনো প্রয়োজনই ছিল না।

এমনসময় আজ তোমরা যখন আমাকে এই জন্মোৎসবের সভা সাজিয়ে তার মধ্যে আহ্বান করলে, তখন প্রথমটা আমার মনের মধ্যে সংকোচ উপস্থিত হয়েছিল। আমার মনে হল, জন্ম তো আমার অর্ধ শতাব্দীর প্রান্তে কোথায় পড়ে রয়েছে, সে-যে কবেকার পুরানো কথা তার আর ঠিক নেই— মৃত্যুদিনের মূর্তি তার চেয়ে অনেক বেশি কাছে এসেছে— এই জীর্ণ জন্মদিনকে নিয়ে উৎসব করবার বয়স কি আমার।

এমনসময় একটি কথা আমার মনে উদয় হল, এবং সেই কথাটাই তোমাদের সামনে আমি বলতে ইচ্ছা করি।

পূর্বেই আভাস দিয়েছি, জন্মোৎসবের ভিতরকার সার্থকতাটা কিসে। জগতে আমরা অনেক জিনিসকে চোখের দেখা করে দেখি, কানের শোনা করে শুনি, ব্যবহারের পাওয়া করে পাই ; কিন্তু অতি অল্প জিনিসকেই আপন করে পাই। আপন করে পাওয়াতেই আমাদের আনন্দ— তাতেই আমরা আপনাকে বহুগুণ করে পাই। পৃথিবীতে অসংখ্য লোক ; তারা আমাদের চারিদিকেই আছে কিন্তু তাদের আমরা পাই নি, তারা আমাদের আপন নয়, তাই তাদের মধ্যে আমাদের আনন্দ নেই।

তাই বলছিলুম, আপন করে পাওয়াই হচ্ছে একমাত্র লাভ, তার জন্যেই মানুষের যত-কিছু সাধনা। শিশু ঘরে জন্মগ্রহণ করবামাত্রই তার মা বাপ এবং ঘরের লোক এক মুহূর্তেই আপনার লোককে পায়,— পরিচয়ের আরম্ভকাল থেকেই সে যেন চিরন্তন। অল্পকাল পূর্বেই সে একেবারে কেউ ছিল না— না-জানার অনাদি অন্ধকার থেকে বাহির হয়েই সে আপন-করে-জানার মধ্যে অতি অনায়াসেই প্রবেশ করলে ; এজন্যে পরস্পরের মধ্যে কোনো সাধনার, কোনো দেখাসাক্ষাৎ আনাগোনার কোনো প্রয়োজন হয় নি।

যেখানেই এই আপন করে পাওয়া আছে সেইখানেই উৎসব। ঘর সাজিয়ে বাঁশি বাজিয়ে সেই পাওয়াটিকে মানুষ সুন্দর করে তুলে প্রকাশ করতে চায়। বিবাহেও পরকে যখন চিরদিনের মতো আপন করে পাওয়া যায়, তখনো এই সাজসজ্জা, এই গীতবাদ্য। 'তুমি আমার আপন' এই কথাটি মানুষ প্রতিদিনের সুরে বলতে পারে না— এতে সৌন্দর্যের সুর ঢেলে দিতে হয়।

শিশুর প্রথম জন্মে যেদিন তার আত্মীয়েরা আনন্দধ্বনিতে বলেছিল 'তোমাকে আমরা পেয়েছি'— সেইদিনে ফিরে ফিরে বৎসরে বৎসরে তারা ওই একই কথা আওড়াতে চায় যে, 'তোমাকে আমরা পেয়েছি। তোমাকে পাওয়ায় আমাদের সৌভাগ্য, তোমাকে পাওয়ায় আমাদের আনন্দ, কেননা তুমি-যে আমাদের আপন, তোমাকে পাওয়াতে আমরা আপনাকে অধিক করে পেয়েছি।'

আজ আমার জন্মদিনে তোমরা যে-উৎসব করছ, তার মধ্যে যদি সেই কথাটি থাকে, তোমরা যদি আমাকে আপন করে পেয়ে থাক, আজ প্রভাতে সেই পাওয়ার আনন্দকেই যদি তোমাদের প্রকাশ করবার ইচ্ছা হয়ে থাকে, তা হলেই এই উৎসব সার্থক। তোমাদের জীবনের সঙ্গে আমার জীবন যদি বিশেষভাবে মিলে থাকে, আমাদের পরস্পরের মধ্যে যদি কোনো গভীরতর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে থাকে, তবেই যথার্থভাবে এই উৎসবের প্রয়োজন আছে, তার মূল্য আছে।

এই জীবনে মানুষের যে কেবল একবার জন্ম হয়, তা বলতে পারি নে। বীজকে মরে অঙ্কুর হতে হয়, অঙ্কুরকে মরে গাছ হতে হয়— তেমনি মানুষকে বারবার মরে নূতন জীবনে প্রবেশ করতে হয়।

একদিন আমি আমার পিতামাতার ঘরে জন্ম নিয়েছিলুম— কোন্ রহস্যধাম থেকে প্রকাশ পেয়েছিলুম, কে জানে। কিন্তু জীবনের পালা, প্রকাশের লীলা সেই ঘরের মধ্যেই সমাপ্ত হয়ে চুকে যায় নি।

সেখানকার সুখদুঃখ ও স্নেহপ্রেমের পরিবেষ্টন থেকে আজ জীবনের নূতন ক্ষেত্রে জন্মলাভ করেছি। বাপমায়ের ঘরে যখন জন্মেছিলুম তখন অকস্মাৎ কত নূতন লোক চিরদিনের মতো আমার আপনার হয়ে গিয়েছিল। আজ ঘরের বাইরে আর-একটি ঘরে আমার জীবন যে জন্মলাভ করেছে এখানেও একত্র কত লোকের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ বেঁধে গেছে। সেইজন্যেই আজকের এই আনন্দ।

আমার প্রথম বয়সে, সেই পূর্বজীবনের মধ্যে আজকের এই নবজন্মের সম্ভাবনা এতই সম্পূর্ণ গোপনে ছিল যে, তা কল্পনারও গোচর হতে পারত না। এই লোক আমার কাছে অজ্ঞাতলোক ছিল।

সেইজন্যে আমার এই পঞ্চাশ বৎসর বয়সেও আমাকে তোমরা নূতন করে পেয়েছ; আমার সঙ্গে তোমাদের সম্বন্ধের মধ্যে জরাজীর্ণতার লেশমাত্র লক্ষণ নেই। তাই আজ সকালে তোমাদের আনন্দ-উৎসবের মাঝখানে বসে আমার এই নবজন্মের নবীনতা অন্তরে বাহিরে উপলব্ধি করছি।

এই যেখানে তোমাদের সকলের সঙ্গে আমি আপন হয়ে বসেছি, এ আমার

সংসারলোক নয়, এ মঙ্গললোক। এখানে দৈহিক জন্মের সম্বন্ধ নয়, এখানে অহেতুক কল্যাণের সম্বন্ধ।

মানুষের মধ্যে দ্বিজত্ব আছে; মানুষ একবার জন্মায় গর্ভের মধ্যে, আবার জন্মায় মুক্ত পৃথিবীতে। তেমনি আর-একদিক দিয়ে মানুষের এক জন্ম আপনাকে নিয়ে, আর-এক জন্ম সকলকে নিয়ে।

পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়ে তবে মানুষের জন্মের সমাপ্তি, তেমনি স্বার্থের আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে মঙ্গলের মধ্যে উত্তীর্ণ হওয়া মনুষ্যত্বের সমাপ্তি। জঠরের মধ্যে ভ্রূণই হচ্ছে কেন্দ্রবর্তী, সমস্ত জঠর তাকেই ধারণ করে এবং পোষণ করে, কিন্তু পৃথিবীতে জন্মমাত্র তার সেই নিজের একমাত্র কেন্দ্রত্ব ঘুচে যায়— এখানে সে অনেকের অন্তর্বর্তী। স্বার্থলোকেও আমিই হচ্ছি কেন্দ্র, অন্য-সমস্ত তার পরিধি,— মঙ্গললোকে আমিই কেন্দ্র নই, আমি সমগ্রের অন্তর্বর্তী; সুতরাং এই সমগ্রের প্রাণেই সেই আমির প্রাণ, সমগ্রের ভালোমন্দেই তার ভালোমন্দ।

পৃথিবীতে আমাদের দৈহিক জীবন একেবারেই পাকা হয় না। যদিও মুক্ত আকাশে আমরা জন্মগ্রহণ করি বটে, তবু শক্তির অভাবে আমরা মুক্তভাবে সঞ্চরণ করতে পারি নে; মায়ের কোলেই, ঘরের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থাকি। তার পরে ক্রমশই পরিপুষ্টি ও সাধনা থেকে পৃথিবীলোকে আমাদের মুক্ত অধিকার বিস্তৃত হতে থাকে।

বাইরের দিক থেকে এ যেমন, অন্তরের দিক থেকেও আমাদের দ্বিতীয় জন্মের সেই-রকমের একটি ক্রমবিকাশ আছে। ঈশ্বর যখন স্বার্থের জীবন থেকে আমাদের মঙ্গলের জীবনে এনে উপস্থিত করেন, তখন আমরা একেবারেই পূর্ণ শক্তিতে সেই জীবনের অধিকার লাভ করতে পারি নে। ভ্রূণত্বের জড়তা আমরা একেবারেই কাটিয়ে উঠি নে। তখন আমরা চলতে চাই, কারণ চারিদিকে চলার ক্ষেত্র অবাধ-বিস্তৃত— কিন্তু চলতে পারি নে, কেননা আমাদের শক্তি অপরিণত। এই হচ্ছে দ্বন্দ্বের অবস্থা। শিশুর মতো চলতে গিয়ে বারবার পড়তে হয় এবং আঘাত পেতে হয়; যতটা চলি তার চেয়ে পড়ি অনেক বেশি। তবুও ওঠা ও পড়ার এই সুকঠোর বিরোধের মধ্য দিয়েই মঙ্গললোকে আমাদের মুক্তির অধিকার ক্রমশ প্রশস্ত হতে থাকে।

কিন্তু শিশু যখন মায়ের কোলে প্রায় অহোরাত্র শুয়ে-ঘুমিয়েই কাটাচ্ছে তখনো যেমন জানা যায়, সে এই চলা-ফেরা-জাগরণের পৃথিবীতেই জন্মগ্রহণ করেছে এবং তার সঙ্গে বয়স্কদের সাংসারিক সম্বন্ধ অনুভব করতে কোনো সংশয়মাত্র থাকে না, তেমনি যখন আমরা স্বার্থলোক থেকে মঙ্গললোকে প্রথম ভূমিষ্ঠ হই তখন পদে পদে আমাদের

জড়ত্ব ও অকৃতার্থতা সত্ত্বেও আমাদের জীবনের ক্ষেত্রপরিবর্তন হয়েছে, সে কথা এক-রকম করে বুঝতে পারা যায়। এমন কি, জড়তার সঙ্গে নবলব্ধ চেতনার বহুতরো বিরোধের দ্বারাই সেই খবরটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বস্তুত, স্বার্থের জঠরের মধ্যে মানুষ যখন শয়ান থাকে, তখন সে দ্বিধাহীন আরামের মধ্যেই কালযাপন করে। এর থেকে যখন প্রথম মুক্তিলাভ করে, তখন অনেক দুঃখ-স্বীকার করতে হয়, তখন নিজের সঙ্গে অনেক সংগ্রাম করতে হয়।

তখন ত্যাগ তার পক্ষে সহজ হয় না কিন্তু তবু তাকে ত্যাগ করতেই হয়, কারণ এ লোকের জীবনই হচ্ছে ত্যাগ। তখন তার সমস্ত চেষ্টার মধ্যে সম্পূর্ণ আনন্দ থাকে না, তবু তাকে চেষ্টা করতেই হয়। তখন তার মন যা বলে, তার আচরণ তার প্রতিবাদ করে; তার অন্তরাত্মা যে-ডালকে আশ্রয় করে, তার ইন্দ্রিয় তাকেই কুঠারাঘাত করতে থাকে; যে-শ্রেয়কে আশ্রয় ক'রে সে অহংকারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে, অহংকার গোপনে সেই শ্রেয়কেই আশ্রয় ক'রে গভীরতররূপে আপনাকে পোষণ করতে থাকে। এমনি ক'রে প্রথম অবস্থায় বিরোধ-অসামঞ্জস্যের বিষম দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে তার আর দুঃখের অন্ত থাকে না।

আমি আজ তোমাদের মধ্যে যেখানে এসেছি, এখানে আমার পূর্বজীবনের অনুবৃত্তি নেই। বস্তুত, সে জীবনকে ভেদ করেই এখানে আমাকে ভূমিষ্ঠ হতে হয়েছে। এই-জন্যেই আমার জীবনের উৎসব সেখানে বিলুপ্ত হয়ে এখানেই প্রকাশ পেয়েছে। দেশালাইয়ের কাঠির মুখে যে-আলো একটুখানি দেখা দিয়েছিল, সেই আলো আজ প্রদীপের বাতির মুখে ধ্রুবতর হয়ে জ্বলে উঠেছে।

কিন্তু এ-কথা তোমাদের কাছে নিঃসন্দেহই অগোচর নেই যে, এই নূতন জীবনকে আমি শিশুর মতো আশ্রয় করেছি মাত্র, বয়স্কের মতো একে আমি অধিকার করতে পারি নি। তবু আমার সমস্ত দ্বন্দ্ব এবং অপূর্ণতার বিচিত্র অসংগতির ভিতরেও আমি তোমাদের কাছে এসেছি, সেটা তোমরা উপলব্ধি করেছ— একটি মঙ্গললোকের সম্বন্ধে তোমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমি তোমাদের আপন হয়েছি, সেইটে তোমরা হৃদয়ে জেনেছ— এবং সেইজন্যেই আজ তোমরা আমাকে নিয়ে এই উৎসবের আয়োজন করেছ, এ-কথা যদি সত্য হয়, তবেই আমি আপনাকে ধন্য বলে মনে করব; তোমাদের সকলের আনন্দের মধ্যে আমার নূতন জীবনকে সার্থক বলে জানব।

এইসঙ্গে একটি কথা তোমাদের মনে করতে হবে, যে-লোকের সিংহদ্বারে তোমরা সকলে আত্মীয় বলে আমাকে আজ অভ্যর্থনা করতে এসেছ, এ লোকে তোমাদের জীবনও প্রতিষ্ঠালাভ করেছে, নইলে আমাকে তোমরা আপনার বলে জানতে পারতে

না। এই আশ্রমটি তোমাদের দ্বিজত্বের জন্মস্থান। ঝরনাগুলি যেমন পরস্পরের অপরিচিত নানা সুদূর শিখর থেকে নিঃসৃত হয়ে, একটি বৃহৎ ধারায় সম্মিলিত হয়ে নদী-জন্ম লাভ করে— তোমাদের ছোটো ছোটো জীবনের ধারাগুলি তেমনি কত দূরদূরান্তর গৃহ থেকে বেরিয়ে এসেছে— তারা এই আশ্রমের মধ্যে এসে বিচ্ছিন্নতা পরিহার ক'রে একটি সম্মিলিত প্রশস্ত মঙ্গলের গতি প্রাপ্ত হয়েছে। ঘরের মধ্যে তোমরা কেবল ঘরের ছেলেটি বলে আপনাদের জানতে— সেই জানার সংকীর্ণতা ছিন্ন করে এখানে তোমরা সকলের মধ্যে নিজেকে দেখতে পাচ্ছ— এমনি করে নিজের মহত্তর সত্তাকে এখানে উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছ, এই হচ্ছে তোমাদের নবজন্মের পরিচয়। এই নবজন্মে বংশগৌরব নেই, আত্মাভিমান নেই, রক্তসম্বন্ধের গণ্ডি নেই, আত্মপরের কোনো সংকীর্ণ ব্যবধান নেই ; এখানে তিনিই পিতা হয়ে, প্রভু হয়ে আছেন— য একঃ, যিনি এক,— অবর্ণঃ, যাঁর জাতি নেই,— বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি, যিনি অনেক বর্ণের অনেক নিগূঢ়নিহিত প্রয়োজনসকল বিধান করছেন,— বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ, বিশ্বের সমস্ত আরম্ভেও যিনি পরিণামেও যিনি,— স দেবঃ, সেই দেবতা। স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু। তিনি আমাদের সকলকে মঙ্গলবুদ্ধির দ্বারা সংযুক্ত করুন। এই মঙ্গললোকে স্বার্থবুদ্ধি নয়, বিষয়বুদ্ধি নয়, এখানে আমাদের পরস্পরের যে-যোগসম্বন্ধ সে কেবলমাত্র সেই একের বোধে অনুপ্রাণিত মঙ্গলবুদ্ধির দ্বারাই সম্ভব।

২৫ বৈশাখ ১৩১৭

শ্রাবণসন্ধ্যা

আজ শ্রাবণের অশ্রান্ত ধারাবর্ষণে জগতে আর-যত-কিছু কথা আছে, সমস্তকেই ডুবিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছে। মাঠের মধ্যে অন্ধকার আজ নিবিড়— এবং যে কখনো একটি কথা কইতে জানে না, সেই মূক আজ কথায় ভরে উঠেছে।

অন্ধকারকে ঠিকমতো তার উপযুক্ত ভাষায় যদি কেউ কথা কওয়াতে পারে, তবে সে এই শ্রাবণের ধারাপতনধ্বনি। অন্ধকারের নিঃশব্দতার উপরে এই ঝর্ ঝর্ কলশব্দ যেন পর্দার উপরে পর্দা টেনে দেয়, তাকে আরো গভীর করে ঘনিয়ে তোলে, বিশ্বজগতের নিদ্রাকে নিবিড় করে আনে। বৃষ্টিপতনের এই অবিরাম শব্দ, এ যেন শব্দের অন্ধকার।

আজ এই কর্মহীন সন্ধ্যাবেলাকার অন্ধকার তার সেই জপের মন্ত্রটিকে খুঁজে

পেয়েছে। বারবার তাকে ধ্বনিত করে তুলছে— শিশু তার নূতনশেখা কথাটিকে নিয়ে যেমন অকারণে অপ্রয়োজনে ফিরে ফিরে উচ্চারণ করতে থাকে সেই-রকম— তার শ্রান্তি নেই, শেষ নেই, তার আর বৈচিত্র্য নেই।

আজ বোবা সন্ধ্যাপ্রকৃতির এই-যে হঠাৎ কণ্ঠ খুলে গিয়েছে এবং আশ্চর্য হয়ে স্তব্ধ হয়ে সে যেন ক্রমাগত নিজের কথা নিজের কানেই শুনছে, আমাদের মনেও এর একটা সাড়া জেগে উঠেছে— সেও কিছু-একটা বলতে চাচ্ছে।— ওই-রকম খুব বড়ো করেই বলতে চায়, ওই-রকম জল স্থল আকাশ একেবারে ভরে দিয়েই বলতে চায়,— কিন্তু সে তো কথা দিয়ে হবার জো নেই, তাই সে একটা সুরকে খুঁজছে। জলের কল্লোলে, বনের মর্মরে, বসন্তের উচ্ছ্বাসে, শরতের আলোকে, বিশাল প্রকৃতির যা-কিছু কথা সে তো স্পষ্ট কথায় নয়— সে কেবল আভাসে ইঙ্গিতে, কেবল ছবিতে গানে। এইজন্যে প্রকৃতি যখন আলাপ করতে থাকে, তখন সে আমাদের মুখের কথাকে নিরস্ত করে দেয়, আমাদের প্রাণের ভিতরে অনির্বচনীয়ের আভাসে ভরা গানকেই জাগিয়ে তোলে।

কথা জিনিসটা মানুষেরই, আর গানটা প্রকৃতির। কথা সুস্পষ্ট এবং বিশেষ প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ, আর গান অস্পষ্ট এবং সীমাহীনের ব্যাকুলতায় উৎকণ্ঠিত। সেইজন্যে কথায় মানুষ মনুষ্যলোকের এবং গানে মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মেলে। এইজন্যে কথার সঙ্গে মানুষ যখন সুরকে জুড়ে দেয়, তখন সেই কথা আপনার অর্থকে আপনি ছাড়িয়ে গিয়ে ব্যাপ্ত হয়ে যায়— সেই সুরে মানুষের সুখদুঃখকে সমস্ত আকাশের জিনিস করে তোলে, তার বেদনা প্রভাতসন্ধ্যার দিগন্তে আপনার রঙ মিলিয়ে দেয়, জগতের বিরাট অব্যক্তের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি বৃহৎ অপরূপতা লাভ করে, মানুষের সংসারের প্রাত্যহিক সুপরিচিত সংকীর্ণতার সঙ্গে তার ঐকান্তিক ঐক্য আর থাকে না।

তাই নিজের প্রতিদিনের ভাষার সঙ্গে প্রকৃতির চিরদিনের ভাষাকে মিলিয়ে নেবার জন্যে মানুষের মন প্রথম থেকেই চেষ্টা করছে। প্রকৃতি হতে রঙ এবং রেখা নিয়ে নিজের চিন্তাকে মানুষ ছবি করে তুলছে, প্রকৃতি হতে সুর এবং ছন্দ নিয়ে নিজের ভাবকে মানুষ কাব্য করে তুলছে। এই উপায়ে চিন্তা অচিন্তনীয়ের দিকে ধাবিত হয়, ভাব অভাবনীয়ের মধ্যে এসে প্রবেশ করে। এই উপায়ে মানুষের মনের জিনিসগুলি বিশেষ প্রয়োজনের সংকোচ এবং নিত্যব্যবহারের মলিনতা ঘুচিয়ে দিয়ে চিরন্তনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এমন সরস নবীন এবং মহৎ মূর্তিতে দেখা দেয়।

আজ এই ঘনবর্ষার সন্ধ্যায় প্রকৃতির শ্রাবণ-অন্ধকারের ভাষা আমাদের ভাষার সঙ্গে মিলতে চাচ্ছে। অব্যক্ত আজ ব্যক্তের সঙ্গে লীলা করবে বলে আমাদের দ্বারে এসে

আঘাত করছে। আজ যুক্তি তর্ক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ খাটবে না। আজ গান ছাড়া আর কোনো কথা নেই।

তাই আমি বলছি, আমার কথা আজ থাক্। সংসারের কাজকর্মের সীমাকে, মনুষ্যলোকালয়ের বেড়াকে একটুখানি সরিয়ে দাও, আজ এই আকাশভরা শ্রাবণের ধারাবর্ষণকে অবারিত অন্তরের মধ্যে আহ্বান করে নেও।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্তরের সম্বন্ধটি বড়ো বিচিত্র। বাহিরে তার কর্মক্ষেত্রে প্রকৃতি এক-রকমের, আবার আমাদের অন্তরের মধ্যে তার আর-এক মূর্তি।

একটা দৃষ্টান্ত দেখো— গাছের ফুল। তাকে দেখতে যতই শৌখিন হ'ক, সে নিতান্তই কাজের দায়ে এসেছে। তার সাজসজ্জা সমস্তই আপিসের সাজ। যেমন করে হ'ক, তাকে ফল ফলাতেই হবে, নইলে তরুবংশ পৃথিবীতে টিঁকবে না, সমস্ত মরুভূমি হয়ে যাবে। এইজন্যেই তার রঙ, এইজন্যেই তার গন্ধ। মৌমাছির পদরেণুপাতে যেমনি তার পুষ্পজন্ম সফলতালাভের উপক্রম করে, অমনি সে আপনার রঙিন পাতা খসিয়ে ফেলে, আপনার মধুগন্ধ নির্মমভাবে বিসর্জন দেয়; তার শৌখিনতার সময়মাত্র নেই, সে অত্যন্ত ব্যস্ত। প্রকৃতির বাহিরবাড়িতে কাজের কথা ছাড়া আর অন্য কথা নেই। সেখানে কুঁড়ি ফুলের দিকে, ফুল ফলের দিকে, ফল বীজের দিকে, বীজ গাছের দিকে হন্‌হন্ করে ছুটে চলেছে,— যেখানে একটু বাধা পায় সেখানে আর মাপ নেই, সেখানে কোনো কৈফিয়ৎ কেউ গ্রাহ্য করে না, সেখানেই তার কপালে ছাপ পড়ে যায় 'নামঞ্জুর', তখনি বিনা বিলম্বে খসে ঝরে শুকিয়ে সরে পড়তে হয়। প্রকৃতির প্রকাণ্ড আপিসে অগণ্য বিভাগ, অসংখ্য কাজ। সুকুমার ওই ফুলটিকে যে দেখছ, অত্যন্ত বাবুর মতো গায়ে গন্ধ মেখে রঙিন পোশাক পরে এসেছে, সেও সেখানে রৌদ্রে জলে মজুরি করবার জন্যে এসেছে, তাকে তার প্রতি মুহূর্তের হিসাব দিতে হয়, বিনা কারণে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে যে একটু দোলা খাবে এমন এক পলকও তার সময় নেই।

কিন্তু এই ফুলটিই মানুষের অন্তরের মধ্যে যখন প্রবেশ করে, তখন তার কিছুমাত্র তাড়া নেই, তখন সে পরিপূর্ণ অবকাশ মূর্তিমান। এই একই জিনিস বাইরে প্রকৃতির মধ্যে কাজের অবতার, মানুষের অন্তরের মধ্যে শান্তি ও সৌন্দর্যের পূর্ণ প্রকাশ।

তখন বিজ্ঞান আমাদের বলে, 'তুমি ভুল বুঝছ— বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ফুলের একমাত্র উদ্দেশ্য কাজ করা; তার সঙ্গে সৌন্দর্যমাধুর্যের যে-অহেতুক সম্বন্ধ তুমি পাতিয়ে বসেছ, সে তোমার নিজের পাতানো।'

আমাদের হৃদয় উত্তর করে, 'কিছুমাত্র ভুল বুঝি নি। ওই ফুলটি কাজের পরিচয়পত্র নিয়ে প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করে, আর সৌন্দর্যের পরিচয়পত্র নিয়ে আমার দ্বারে এসে

আঘাত করে— একদিকে আসে বন্দীর মতো, আর-একদিকে আসে মুক্তস্বরূপে— এর একটা পরিচয়ই যে সত্য আর অন্যটা সত্য নয়, এ-কথা কেমন করে মানব। ওই ফুলটি গাছপালার মধ্যে অনবচ্ছিন্ন কার্যকারণসূত্রে ফুটে উঠেছে, এ-কথাটাও সত্য কিন্তু সে তো বাহিরের সত্য,— আর অন্তরের সত্য হচ্ছে, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।'

ফুল মধুকরকে বলে, 'তোমার ও আমার প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তোমাকে আহ্বান করে আনব বলে আম তোমার জন্যেই সেজেছি'— আবার মানুষের মনকে বলে, 'আনন্দের ক্ষেত্রে তোমাকে আহ্বান করে আনব বলে আমি তোমার জন্যেই সেজেছি।' মধুকর ফুলের কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস ক'রে কিছুমাত্র ঠকে নি, আর মানুষের মনও যখন বিশ্বাস ক'রে তাকে ধরা দেয় তখন দেখতে পায় ফুল তাকে মিথ্যা বলে নি।

ফুল-যে কেবল বনের মধ্যেই কাজ করছে তা নয়— মানুষের মনের মধ্যেও তার যেটুকু কাজ, তা সে বরাবর করে আসছে।

আমাদের কাছে তার কাজটা কী। প্রকৃতির দরজায় যে-ফুলকে যথাঋতুতে যথা-সময়ে মজুরের মতো হাজরি দিতে হয়, আমাদের হৃদয়ের দ্বারে সে রাজদূতের মতো উপস্থিত হয়ে থাকে।

সীতা যখন রাবণের ঘরে একা বসে কাঁদছিলেন তখন একদিন যে-দূত তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হয়েছিল, সে রামচন্দ্রের আংটি সঙ্গে করে এনেছিল; এই আংটি দেখেই সীতা তখনি বুঝতে পেরেছিলেন, এই দূতই তাঁর প্রিয়তমের কাছ থেকে এসেছে,— তখনি তিনি বুঝলেন, রামচন্দ্র তাঁকে ভোলেন নি, তাঁকে উদ্ধার করে নেবেন বলেই তাঁর কাছে এসেছেন।

ফুলও আমাদের কাছে সেই প্রিয়তমের দূত হয়ে আসে। সংসারের সোনার লঙ্কায় রাজভোগের মধ্যে আমরা নির্বাসিত হয়ে আছি, রাক্ষস আমাদের কেবলি বলছে, 'আমিই তোমার পতি, আমাকেই ভজনা করো।'

কিন্তু সংসারের পারের খবর নিয়ে আসে ওই ফুল। সে চুপিচুপি আমাদের কানে কানে এসে বলে, 'আমি এসেছি, আমাকে তিনি পাঠিয়েছেন। আমি সেই সুন্দরের দূত, আমি সেই আনন্দময়ের খবর নিয়ে এসেছি। এই বিচ্ছিন্নতার দ্বীপের সঙ্গে তাঁর সেতু বাঁধা হয়ে গেছে, তিনি তোমাকে একমুহূর্তের জন্যে ভোলেন নি, তিনি তোমাকে উদ্ধার করবেন। তিনি তোমাকে টেনে নিয়ে আপন করে নেবেন। মোহ তোমাকে এমন করে চিরদিন বেঁধে রাখতে পারবে না।'

যদি তখন আমরা জেগে থাকি তো তাকে বলি, 'তুমি যে তাঁর দূত তা আমরা

জানব কী করে।' সে বলে, 'এই দেখো আমি সেই সুন্দরের আংটি নিয়ে এসেছি। এর কেমন রঙ, এর কেমন শোভা।'

তাই তো বটে। এ-যে তাঁরি আংটি, মিলনের আংটি। আর-সমস্ত ভুলিয়ে তখনি সেই আনন্দময়ের আনন্দস্পর্শ আমাদের চিত্তকে ব্যাকুল করে তোলে। তখনি আমরা বুঝিতে পারি, এই সোনার লঙ্কাপুরীই আমার সব নয়— এর বাইরে আমার মুক্তি আছে— সেইখানে আমার প্রেমের সাফল্য, আমার জীবনের চরিতার্থতা।

প্রকৃতির মধ্যে মধুকরের কাছে যা কেবলমাত্র রঙ, কেবলমাত্র গন্ধ, কেবলমাত্র ক্ষুধানিবৃত্তির পথ চেনবার উপায়চিহ্ন, মানুষের হৃদয়ের কাছে তাই সৌন্দর্য, তাই বিনা-প্রয়োজনের আনন্দ। মানুষের মনের মধ্যে সে রঙিন কালিতে লেখা প্রেমের চিঠি নিয়ে আসে।

তাই বলছিলুম, বাইরে প্রকৃতি যতই ভয়ানক ব্যস্ত, যতই একান্ত কেজো হ'ক-না, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তার একটি বিনা কাজের যাতায়াত আছে। সেখানে তার কামারশালার আগুন আমাদের উৎসবের দীপমালা হয়ে দেখা দেয়, তার কারখানা-ঘরের কলশব্দ সংগীত হয়ে ধ্বনিত হয়। বাইরে প্রকৃতির কার্যকারণের লোহার শৃঙ্খল ঝম্ ঝম্ করে, অন্তরে তার আনন্দের অহেতুকতা সোনার তারে বীণাধ্বনি বাজিয়ে তোলে।

আমার কাছে এইটেই বড়ো আশ্চর্য ঠেকে— একই কালে প্রকৃতির এই দুই চেহারা, বন্ধনের এবং মুক্তির— একই রূপ-রস-শব্দ-গন্ধের মধ্যে এই দুই স্বর, প্রয়োজনের এবং আনন্দের— বাহিরের দিকে তার চঞ্চলতা, অন্তরের দিকে তার শান্তি— একই সময়ে একদিকে তার কর্ম, আর-একদিকে তার ছুটি ; বাইরের দিকে তার তট, অন্তরের দিকে তার সমুদ্র।

এই-যে এই মুহূর্তেই শ্রাবণের ধারাপতনে সন্ধ্যার আকাশ মুখরিত হয়ে উঠেছে, এ আমাদের কাছে তার সমস্ত কাজের কথা গোপন করে গেছে। প্রত্যেক ঘাসটির এবং গাছের প্রত্যেক পাতাটির অন্নপানের ব্যবস্থা করে দেবার জন্য সে যে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে আছে, এই অন্ধকারসভায় আমাদের কাছে এ-কথাটির কোনো আভাসমাত্র সে দিচ্ছে না। আমাদের অন্তরের সন্ধ্যাকাশেও এই শ্রাবণ অত্যন্ত ঘন হয়ে নেমেছে কিন্তু সেখানে তার আপিসের বেশ নেই, সেখানে কেবল গানের আসর জমাতে, কেবল লীলার আয়োজন করতে তার আগমন। সেখানে সে কবির দরবারে উপস্থিত। তাই ক্ষণে ক্ষণে মেঘমল্লারের সুরে কেবলি করুণ গান জেগে উঠছে—

তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী,
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহে, কৈসে গোঙায়বি
হরি বিনে দিনরাতিয়া।

প্রহরের পর প্রহর ধরে এই বার্তাই সে জানাচ্ছে, 'ওরে, তুই-যে বিরহিণী— তুই বেঁচে আছিস কী করে, তোর দিনরাত্রি কেমন করে কাটছে।'

সেই চিরদিনরাত্রির হরিকেই চাই, নইলে দিনরাত্রি অনাথ। সমস্ত আকাশকে কাঁদিয়ে তুলে এই কথাটা আজ আর নিঃশেষ হতে চাচ্ছে না।

আমরা যে তাঁরি বিরহে এমন করে কাটাচ্ছি, এ খবরটা আমাদের নিতান্তই জানা চাই। কেননা বিরহ মিলনেরই অঙ্গ। ধোঁয়া যেমন আগুন জ্বলার আরম্ভ, বিরহও তেমনি মিলনের আরম্ভ-উচ্ছ্বাস।

খবর আমাদের দেয় কে। ওই-যে তোমার বিজ্ঞান যাদের মনে করছে, তারা প্রকৃতির কারাগারের কয়েদী, তারা পায়ে শিকল দিয়ে একজনের সঙ্গে আর-একজন বাঁধা থেকে দিনরাত্রি কেবল বোবার মতো কাজ করে যাচ্ছে— তারাই। যেই তাদের শিকলের শব্দ আমাদের হৃদয়ের ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করে অমনি দেখতে পাই, এ-যে বিরহের বেদনাগান, এ-যে মিলনের আহ্বানসংগীত। যে-সব খবরকে কোনো ভাষা দিয়ে বলা যায় না, সে-সব খবরকে এরাই তো চুপি চুপি বলে যায়— এবং মানুষ কবি সেই-সব খবরকেই গানের মধ্যে কতকটা কথায়, কতকটা সুরে, বেঁধে গাইতে থাকে :

ভরা বাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর!

আজ কেবলি মনে হচ্ছে এই-যে বর্ষা, এ তো এক সন্ধ্যার বর্ষা নয়, এ যেন আমার সমস্ত জীবনের অবিরল শ্রাবণধারা। যতদূর চেয়ে দেখি, আমার সমস্ত জীবনের উপরে সঙ্গিহীন বিরহসন্ধ্যার নিবিড় অন্ধকার— তারি দিগ্‌দিগন্তরকে ঘিরে অশ্রান্ত শ্রাবণের বর্ষণে প্রহরের পর প্রহর কেটে যাচ্ছে; আমার সমস্ত আকাশ ঝর্‌ ঝর্‌ করে বলছে, 'কৈসে গোঙায়বি হরি বিনে দিনরাতিয়া।' কিন্তু তবু এই বেদনা, এই রোদন, এই বিরহ একেবারে শূন্য নয়;— এই অন্ধকারের, এই শ্রাবণের বুকের মধ্যে একটি নিবিড় রস অত্যন্ত গোপনে ভরা রয়েছে; একটি কোন্‌ বিকশিত বনের সজল গন্ধ আসছে, এমন একটি অনির্বচনীয় মাধুর্য— যা যখনি প্রাণকে ব্যথায় কাঁদিয়ে তুলছে, তখনি সেই বিদীর্ণ ব্যথার ভিতর থেকে অশ্রুসিক্ত আনন্দকে টেনে বের করে নিয়ে আসছে।

বিরহসন্ধ্যার অন্ধকারকে যদি শুধু এই বলে কাঁদতে হত যে, 'কেমন করে তোর দিনরাত্রি কাটবে', তা হলে সমস্ত রস শুকিয়ে যেত এবং আশার অঙ্কুর পর্যন্ত বাঁচত না ;— কিন্তু শুধু কেমন করে কাটবে নয় তো, কেমন করে কাটবে **হরি বিনে** দিনরাতিয়া— সেইজন্যে ঐ 'হরি বিনে' কথাটাকে ঘিরে ঘিরে এত অবিরল অজস্র বর্ষণ। চিরদিনরাত্রি যাকে নিয়ে কেটে যাবে, এমন একটি চিরজীবনের ধন কেউ আছে —তাকে না পেয়েছি নাই পেয়েছি, তবু সে আছে, সে আছে— বিরহের সমস্ত বক্ষ ভরে দিয়ে সে আছে— সেই **হরি বিনে** কৈসে গোঙায়বি দিনরাতিয়া। এই জীবন-ব্যাপী বিরহের যেখানে আরম্ভ সেখানে যিনি, যেখানে অবসান সেখানে যিনি, এবং তারি মাঝখানে গভীরভাবে প্রচ্ছন্ন থেকে যিনি করুণ সুরের বাঁশি বাজাচ্ছেন, সেই **হরি বিনে** কৈসে গোঙায়বি দিনরাতিয়া।

দ্বিধা

দুইকে নিয়ে মানুষের কারবার। সে প্রকৃতির, আবার সে প্রকৃতির উপরের। একদিকে সে কায়া দিয়ে বেষ্টিত, আর-একদিকে সে কায়ার চেয়ে অনেক বেশি।

মানুষকে একই সঙ্গে দুটি ক্ষেত্রে বিচরণ করতে হয়। সেই দুটির মধ্যে এমন বৈপরীত্য আছে যে, তারি সামঞ্জস্যসংঘটনের দুরূহ সাধনায় মানুষকে চিরজীবন নিযুক্ত থাকতে হয়। সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, ধর্মনীতির ভিতর দিয়ে মানুষের উন্নতির ইতিহাস হচ্ছে এই সামঞ্জস্যসাধনেরই ইতিহাস। যত-কিছু অনুষ্ঠানপ্রতিষ্ঠান শিক্ষা-দীক্ষা সাহিত্যশিল্প সমস্তই হচ্ছে মানুষের দ্বন্দ্বসমন্বয়চেষ্টার বিচিত্র ফল।

দ্বন্দ্বের মধ্যেই যত দুঃখ, এবং এই দুঃখই হচ্ছে উন্নতির মূলে। জন্তুদের ভাগ্যে পাক-স্থলীর সঙ্গে তার খাবার জিনিসের বিচ্ছেদ ঘটে গেছে— এই দুটোকে এক করবার জন্যে বহু দুঃখে তার বুদ্ধিকে শক্তিকে সর্বদাই জাগিয়ে রেখেছে ; গাছ নিজের খাবারের মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকে— ক্ষুধার সঙ্গে আহারের সামঞ্জস্যসাধনের জন্যে তাকে নিরন্তর দুঃখ পেতে হয় না। জন্তুদের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের বিচ্ছেদ ঘটে গেছে— এই বিচ্ছেদের সামঞ্জস্যসাধনের দুঃখ থেকে কত বীরত্ব ও কত সৌন্দর্যের সৃষ্টি হচ্ছে তার আর সীমা নেই ; উদ্ভিদরাজ্যে যেখানে স্ত্রীপুরুষের ভেদ নেই অথবা যেখানে তার মিলন-সাধনের জন্যে বাইরের উপায় কাজ করে, সেখানে কোনো দুঃখ নেই, সমস্ত সহজ।

মনুষ্যত্বের মূলে আর-একটি প্রকাণ্ড দ্বন্দ্ব আছে ; তাকে বলা যেতে পারে প্রকৃতি

এবং আত্মার দ্বন্দ্ব। স্বার্থের দিক এবং পরমার্থের দিক, বন্ধনের দিক এবং মুক্তির দিক, সীমার দিক এবং অনন্তের দিক— এই দুইকে মিলিয়ে চলতে হবে মানুষকে।

যতদিন ভালো করে মেলাতে না পারা যায় ততদিনকার যে চেষ্টার দুঃখ, উত্থান-পতনের দুঃখ, সে বড়ো বিষম দুঃখ। যে-ধর্মের মধ্যে মানুষের এই দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্য ঘটতে পারে, সেই ধর্মের পথ মানুষের পক্ষে কত কঠিন পথ। এই ক্ষুরধারশাণিত দুর্গম পথেই মানুষের যাত্রা ;— এ-কথা তার বলবার জো নেই যে, 'এই দুঃখ আমি এড়িয়ে চলব।' এই দুঃখকে যে স্বীকার না করে তাকে দুর্গতির মধ্যে নেমে যেতে হয় ;— সেই দুর্গতি যে কী নিদারুণ, পশুরা তা কল্পনাও করতে পারে না। কেননা, পশুদের মধ্যে এই দ্বন্দ্বের দুঃখ নেই— তারা কেবলমাত্র পশু। তারা কেবলমাত্র শরীর-ধারণ এবং বংশবৃদ্ধি করে চলবে, এতে তাদের কোনো ধিক্কার নেই। তাই তাদের পশুজন্ম একেবারে নিঃসংকোচ।

মানবজন্মের মধ্যে পদে পদে সংকোচ। শিশুকাল থেকেই মানুষকে কত লজ্জা, কত পরিতাপ, কত আবরণ-আড়ালের মধ্যে দিয়েই চলতে হয়— তার আহার বিহার তার নিজের মধ্যেই কত বাধাগ্রস্ত— নিতান্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকেও সম্পূর্ণ স্বীকার করা তার পক্ষে কত কঠিন, এমন কি, নিজের নিত্যসহচর শরীরকেও মানুষ লজ্জায় আচ্ছন্ন করে রাখে।

কারণ, মানুষ-যে পশু এবং মানুষ দুইই। একদিকে সে আপনার, আর-একদিকে সে বিশ্বের। একদিকে তার সুখ, আর-একদিকে তার মঙ্গল। সুখভোগের মধ্যে মানুষের সম্পূর্ণ অর্থ পাওয়া যায় না। গর্ভের মধ্যে ভ্রূণ আরামে থাকে এবং সেখানে তার কোনো অভাব থাকে না কিন্তু সেখানে তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য পাওয়া যায় না। সেখানে তার হাত পা চোখ কান মুখ সমস্তই নিরর্থক। যদি জানতে পারি যে এই ভ্রূণ একদিন ভূমিষ্ঠ হবে, তা হলেই বুঝতে পারি, এ-সমস্ত ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তার কেন আছে। এই-সকল আপাত-অনর্থক অঙ্গ হতেই অনুমান করা যায়, অন্ধকারবাসই এর চরম নয়, আলোকেই এর সমাপ্তি,— বন্ধন এর পক্ষে ক্ষণকালীন এবং মুক্তিই এর পরিণাম। তেমনি মনুষ্যত্বের মধ্যে এমন কতকগুলি লক্ষণ আছে কেবলমাত্র স্বার্থের মধ্যে, সুখভোগের মধ্যে যার পরিপূর্ণ অর্থই পাওয়া যায় না— উন্মুক্ত মঙ্গললোকেই যদি তার পরিণাম না হয়, তবে সেই সমস্ত স্বার্থবিরোধী প্রবৃত্তির কোনো অর্থই থাকে না। যে-সমস্ত প্রবৃত্তি মানুষকে নিজের দিক থেকে দুর্নিবারবেগে অন্যের দিকে নিয়ে যায়, সংগ্রহের দিক থেকে ত্যাগের দিকে নিয়ে যায়, এমন-কি, জীবনে আসক্তির দিক থেকে মৃত্যুকে বরণের দিকে নিয়ে যায়— যা মানুষকে বিনা প্রয়োজনে বৃহত্তর

জ্ঞান ও মহত্তর চেষ্টার দিকে অর্থাৎ ভূমার দিকে আকর্ষণ করে, যা মানুষকে বিনা কারণেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দুঃখকে স্বীকার করতে, সুখকে বিসর্জন করতে প্রবৃত্ত করে —তাতেই কেবল জানিয়ে দিতে থাকে, সুখে স্বার্থে মানুষের স্থিতি নেই— তার থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার জন্যে মানুষকে বন্ধনের পর বন্ধন ছেদন করতে হবে— মঙ্গলের সম্বন্ধে বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে মানুষকে মুক্তিলাভ করতে হবে।

এই স্বার্থের আবরণ থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়াই হচ্ছে স্বার্থ ও পরমার্থের সামঞ্জস্যসাধন। কারণ, স্বার্থের মধ্যে আবৃত থাকলেই তাকে সত্যরূপে পাওয়া যায় না। স্বার্থ থেকে যখন আমরা বহির্গত হই, তখনি আমরা পরিপূর্ণরূপে স্বার্থকে লাভ করি। তখনি আমরা আপনাকে পাই বলেই অন্য-সমস্তকেই পাই। গর্ভের শিশু নিজেকে জানে না বলেই তার মাকে জানে না— যখনি মাতার মধ্য হতে মুক্ত হয়ে সে নিজেকে জানে, তখনি সে মাকে জানে।

সেইজন্যে যতক্ষণ স্বার্থের নাড়ীর বন্ধন ছিন্ন করে মানুষ এই মঙ্গললোকের মধ্যে জন্মলাভ না করে, ততক্ষণ তার বেদনার অন্ত নেই। কারণ, যেখানে তার চরম স্থিতি নয়, যেখানে সে অসম্পূর্ণ, সেখানেই চিরদিন স্থিতির চেষ্টা করতে গেলেই তাকে কেবলি টানাটানির মধ্যে থাকতে হবে। সেখানে সে যা গড়ে তুলবে তা ভেঙে পড়বে, যা সংগ্রহ করবে তা হারাবে এবং যাকে সে সকলের চেয়ে লোভনীয় বলে কামনা করবে তাই তাকে আবদ্ধ করে ফেলবে।

তখন কেবল আঘাত, কেবল আঘাত। তখন পিতার কাছে আমাদের কামনা এই— মা মা হিংসীঃ— আমাকে আঘাত কোরো না, আমাকে আর আঘাত কোরো না। আমি এমন করে কেবলি দ্বিধার মধ্যে আর বাঁচি নে।

কিন্তু এ পিতারই হাতের আঘাত— এ মঙ্গললোকের আকর্ষণেরই বেদনা। নইলে পাপে দুঃখ থাকত না— পাপ বলেই কোনো পদার্থ থাকত না, মানুষ পশুদের মতো অপাপ হয়ে থাকত। কিন্তু, মানুষকে মানুষ হতে হবে বলেই এই দ্বন্দ্ব, এই বিদ্রোহ, বিরোধ, এই পাপ, এই পাপের বেদনা।

তাই-জন্যে মানুষ ছাড়া এ প্রার্থনা কেউ কোনোদিন করতে পারে না— বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব— হে দেব, হে পিতা, আমার সমস্ত পাপ দূর করে দাও। এ ক্ষুধামোচনের প্রার্থনা নয়, এ প্রয়োজনসাধনের প্রার্থনা নয়— মানুষের প্রার্থনা হচ্ছে, ‘আমাকে পাপ হতে মুক্ত করো। তা না করলে আমার দ্বিধা ঘুচবে না— পূর্ণতার মধ্যে আমি ভূমিষ্ঠ হতে পারছি নে— হে অপাপবিদ্ধ নির্মল পুরুষ, তুমিই যে আমার পিতা, এই বোধ আমার সম্পূর্ণ হতে পারছে না— তোমাকে সত্যভাবে নমস্কার করতে পারছি নে।’

যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব— যা ভালো তাই আমাদের দাও। মানুষের পক্ষে এ প্রার্থনা অত্যন্ত কঠিন প্রার্থনা। কেননা মানুষ যে দ্বন্দ্বের জীব— ভালো যে মানুষের পক্ষে সহজ নয়। তাই, যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব, এ আমাদের ত্যাগের প্রার্থনা, দুঃখের প্রার্থনা— নাড়ীছেদনের প্রার্থনা। পিতার কাছে এই কঠোর প্রার্থনা মানুষ ছাড়া আর-কেউ করতে পারে না।

পিতানোঽসি, পিতা নো বোধি, নমস্তেঽস্তু— যজুর্বেদের এই মন্ত্রটি নমস্কারের প্রার্থনা। তুমি আমাদের পিতা, তোমাকে আমাদের পিতা ব'লে যেন বুঝি এবং তোমাতে আমাদের নমস্কার যেন সত্য হয়।

অর্থাৎ আমার দিকেই সমস্ত টানবার যে একটা প্রবৃত্তি আছে, সেটাকে নিরস্ত করে দিয়ে তোমার দিকেই সমস্ত যেন নত করে সমর্পণ করে দিতে পারি। তা হলেই যে দ্বন্দ্বের অবসান হয়ে যায়— আমার যেখানে সার্থকতা সেইখানেই পৌঁছতে পারি। সেখানে যে পৌঁচেছি সে কেবল তোমাকে নমস্কারের দ্বারাই চেনা যায়;— সেখানে কোনো অহংকার টিঁকতেই পারে না— ধনী সেখানে দরিদ্রের সঙ্গে তোমার পায়ের কাছে এসে মেলে, তত্ত্বজ্ঞানী সেখানে মূঢ়ের সঙ্গেই তোমার পায়ের কাছে এসে নত হয়;— মানুষের দ্বন্দ্বের যেখানে অবসান সেখানে তোমাকে পরিপূর্ণ নমস্কার, অহংকারের একান্ত বিসর্জন।

এই নমস্কারটি কেমন নমস্কার?—

নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ,
নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ,
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

যিনি সুখকর তাঁকেও নমস্কার, যিনি মঙ্গলকর তাঁকেও নমস্কার; যিনি সুখের আকর তাঁকেও নমস্কার, যিনি মঙ্গলের আকর তাঁকেও নমস্কার; যিনি মঙ্গল তাঁকে নমস্কার, যিনি চরমমঙ্গল তাঁকে নমস্কার।

সংসারে পিতা ও মাতার ভেদ আছে কিন্তু বেদের মন্ত্রে যাঁকে পিতা ব'লে নমস্কার করছে, তাঁর মধ্যে পিতা ও মাতা দুইই এক হয়ে আছে। তাই তাঁকে কেবল পিতা বলেছে। সংস্কৃতসাহিত্যে দেখা গেছে, পিতরৌ বলতে পিতা ও মাতা উভয়কেই একত্রে বুঝিয়েছে।

মাতা পুত্রকে একান্ত করে দেখেন— তাঁর পুত্র তাঁর কাছে আর-সমস্তকে অতিক্রম করে থাকে। এইজন্যে তাকে দেখাশোনা, তাকে খাওয়ানো পরানো সাজানো নাচানো, তাকে সুখী করানোতেই মা মুখ্যভাবে নিযুক্ত থাকেন। গর্ভে সে যেমন

তাঁর নিজের মধ্যে একমাত্ররূপে পরিবেষ্টিত হয়ে ছিল, বাইরেও তিনি যেন তার জন্যে একটি বৃহত্তর গর্ভবাস তৈরি করে তুলে পুত্রের পুষ্টি ও তুষ্টির জন্যে সর্বপ্রকার আয়োজন করে থাকেন। মাতার এই একান্ত স্নেহে পুত্র স্বতন্ত্রভাবে নিজের একটি বিশেষ মূল্য যেন অনুভব করে।

কিন্তু পিতা পুত্রকে কেবলমাত্র তাঁর ঘরের ছেলে করে তাকে একটি সংকীর্ণ পরিধির কেন্দ্রস্থলে একমাত্র করে গড়ে তোলেন না। তাকে তিনি সকলের সামগ্রী, তাকে সমাজের মানুষ করে তোলবার জন্যেই চেষ্টা করেন। এইজন্যে তাকে সুখী করে তিনি স্থির থাকেন না, তাকে দুঃখ দিতে হয়। সে যদি একমাত্র হত, নিজেতেই নিজে সম্পূর্ণ হত, তা হলে সে যা চায় তাই তাকে দিলে ক্ষতি হত না; কিন্তু তাকে সকলের সঙ্গে মিলনের যোগ্য করতে হলে তাকে তার অনেক কামনার সামগ্রী থেকে বঞ্চিত করতে হয়— তাকে অনেক কাঁদাতে হয়। ছোটো হয়ে না থেকে বড়ো হয়ে ওঠবার যে-দুঃখ তা তাকে না দিলে চলে না। বড়ো হয়ে সকলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তবেই সে-যে সত্য হবে— তার সমস্ত শরীর ও মন, জ্ঞান, ভাব ও শক্তি সমগ্রভাবে সার্থক হবে এবং সেই সার্থকতাতেই সে যথার্থ মুক্তিলাভ করবে— এই কথা বুঝে কঠোর শিক্ষার ভিতর দিয়ে পুত্রকে মানুষ করে তোলাই পিতার কর্তব্য হয়ে ওঠে।

ঈশ্বরের মধ্যে এই মাতা পিতা এক হয়ে আছে। তাই দেখতে পাই, আমি সুখী হব বলে জগতে আয়োজনের অন্ত নেই। আকাশের নীলিমা এবং পৃথিবীর শ্যামলতায় আমাদের চোখ জুড়িয়ে যায়— যদি নাও যেত তবু এই জগতে আমাদের বাস অসম্ভব হত না। ফলে শস্যে আমাদের রসনার তৃপ্তি হয়— যদি নাও হত তবু প্রাণের দায়ে আমাদের পেট ভরাতেই হত। জীবনধারণে কেবল-যে আমাদের বা প্রকৃতির প্রয়োজন তা নয়, তাতে আমাদের আনন্দ; শরীরচালনা করতে আমাদের আনন্দ, চিন্তা করতে আমাদের আনন্দ, কাজ করতে আমাদের আনন্দ, প্রকাশ করতে আমাদের আনন্দ। আমাদের সমস্ত প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য এবং রসের যোগ আছে।

তাই দেখতে পাই, বিশ্বচেষ্টার বিচিত্র ব্যাপারের মধ্যে এ চেষ্টাও নিয়ত রয়েছে যে, জগৎ চলবে, জীবন চলবে এবং সেইসঙ্গে আমি পদে পদে খুশী হতে থাকব। নক্ষত্রলোকের যে-সমস্ত প্রয়োজন তা যতই প্রকাণ্ড প্রভূত ও আমার জীবনের পক্ষে যতই সুদূরবর্তী হ'ক-না কেন, তবুও নিশীথের আকাশে আমার কাছে মনোহর হয়ে ওঠাও তার একটা কাজ। সেইজন্য অতবড়ো অচিন্তনীয় বিরাট কাণ্ডও প্রয়োজন-বিহীন গৃহসজ্জার মতো হয়ে উঠে আমাদের ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ আকাশমণ্ডপটিকে চুমকির কাজে খচিত করে তুলেছে।

এমনি পদে পদে দেখতে পাচ্ছি, জগতের রাজা আমাকে খুশী করবার জন্য তাঁর বহুলক্ষ যোজনান্তরেরও অনুচরপরিচরদের হুকুম দিয়ে রেখেছেন ; তাদের সকল কাজের মধ্যে এটাও তারা ভুলতে পারে না। এ জগতে আমার মূল্য সামান্য নয়।

কিন্তু সুখের আয়োজনের মধ্যেই যখন নিঃশেষে প্রবেশ করতে চাই, তখন আবার কে আমাদের হাত চেপে ধরে, বলে যে, 'তোমাকে বদ্ধ হতে দেব না। এই-সমস্ত সুখের সামগ্রীর মধ্যে ত্যাগী হয়ে, মুক্ত হয়ে তোমাকে থাকতে হবে, তবেই এই আয়োজন সার্থক হবে। শিশু যেমন গর্ভ থেকে মুক্ত হয়ে তবেই যথার্থভাবে সম্পূর্ণভাবে সচেতনভাবে তার মাকে পায়, তেমনি এই-সমস্ত সুখের বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যখন মঙ্গললোকে মুক্তিলোকে ভূমিষ্ঠ হবে, তখনি সমস্তকে পরিপূর্ণরূপে পাবে। যখনি আসক্তির পথে যাবে তখনি সমগ্রকে হারাবার পথেই যাবে— বস্তুকে যখনি চোখের উপরে টেনে আনবে, তখনি তাকে আর দেখতে পাবে না, তখনি চোখ অন্ধ হয়ে যাবে।

আমাদের পিতা সুখের মধ্যে আমাদের বদ্ধ হতে দেন না, কেননা সমগ্রের সঙ্গে আমাকে যুক্ত হতে হবে— এবং সেই যোগের মধ্য দিয়েই তাঁর সঙ্গে আমার সত্য যোগ।

এই সমগ্রের সঙ্গে যাতে আমাদের যোগসাধন করে তাকেই বলে মঙ্গল। এই মঙ্গলবোধই মানুষকে কিছুতেই সুখের মধ্যে স্থির থাকতে দিচ্ছে না— এই মঙ্গলবোধই পাপের বেদনায় মানুষকে এই কান্না কাঁদাচ্ছে— মা মা হিংসীঃ, বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব, যদ্‌ভদ্রং তন্ন আসুব। সমস্ত খাওয়াপরার কান্না ছাড়িয়ে এই কান্না উঠেছে, 'আমাকে দ্বন্দ্বের মধ্যে রেখে আর আঘাত কোরো না, আমাকে পাপ থেকে মুক্ত করো ; আমাকে সম্পূর্ণ তোমার মধ্যে আনন্দে নত করে দাও।'

তাই মানুষ এই বলে নমস্কারের সাধনা করছে, নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ— সেই সুখকর যে তাঁকেও নমস্কার, আর সেই কল্যাণকর যে তাঁকেও নমস্কার-- একবার মাতারূপে তাঁকে নমস্কার, একবার পিতারূপে তাঁকে নমস্কার। মানবজীবনের দ্বন্দ্বের দোলার মধ্যে চড়ে যেদিকেই হেলি সেইদিকে তাঁকেই নমস্কার করতে শিখতে হবে। তাই বলি, নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ-- সুখের আকর যিনি তাঁকেও নমস্কার, মঙ্গলের আকর যিনি তাঁকেও নমস্কার— মাতা যিনি সীমার মধ্যে বেঁধে ধারণ করছেন, পালন করছেন, তাঁকেও নমস্কার, আর পিতা যিনি বন্ধন ছেদন করে অসীমের মধ্যে আমাদের পদে পদে অগ্রসর করছেন, তাঁকেও নমস্কার। অবশেষে দ্বিধা অবসান হয় যখন সব নমস্কার একে এসে মেলে— তখন নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ— তখন সুখে মঙ্গলে আর ভেদ

নেই, বিরোধ নেই— তখন শিব, শিব, শিব, তখন শিব এবং শিবতর— তখন পিতা এবং মাতা একই— তখন একমাত্র পিতা ;—এবং দ্বিধাবিহীন নিস্তব্ধ প্রশান্ত মানবজীবনের একটিমাত্র চরম নমস্কার—

নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতো ঊর্ধ্বগামী একাগ্র এই নমস্কার, অস্তুতরঙ্গ মহাসমুদ্রের মতো দশদিগন্তব্যাপী বিপুল এই নমস্কার—

নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

১২

পূর্ণ

আমাদের এই আশ্রমবাসী আমার একজন তরুণ বন্ধু এসে বললেন, 'আজ আমার জন্মদিন ; আজ আমি আঠারো পেরিয়ে উনিশ বছরে পড়েছি।'

তাঁর সেই যৌবনকালের আরম্ভ, আর আমার এই প্রৌঢ়বয়সের প্রান্ত— এই দুই সীমার মাঝখানকার কালটিকে কত দীর্ঘ বলেই মনে হয়। আমি আজ যেখানে দাঁড়িয়ে তাঁর এই উনিশ বছরকে দেখছি, গণনা ও পরিমাপ করতে গেলে সে কত দূরে। তাঁর এবং আমার বয়সের মাঝখানে কত আবাদ, কত ফসল ফলা, কত ফসল কাটা, কত ফসল নষ্ট হওয়া, কত সুভিক্ষ এবং কত দুর্ভিক্ষ প্রতীক্ষা করে রয়েছে তার ঠিকানা নেই।

যে-ছাত্র তার কলেজ-শিক্ষার প্রায় শেষ সীমায় এসে পৌঁচেছে, সে যখন শিশুশিক্ষা এবং ধারাপাত হাতে কোনো ছেলেকে পাঠশালায় যেতে দেখে, তখন তাকে মনে-মনে কৃপাপাত্রই বলে জ্ঞান করে। কেননা কলেজের ছাত্র এ-কথা নিশ্চয় জানে যে, ওই ছেলে শিক্ষার যে আরম্ভভাগে আছে সেখানে পূর্ণতার এতই অভাব যে, সেই শিশুশিক্ষা-ধারাপাতের মধ্যে সে রসের লেশমাত্র পায় না— অনেক দুঃখ ক্লেশ তাড়নার কাঁটাপথ ভেঙে তবে সে এমন জায়গায় এসে পৌঁছবে যেখানে তার জ্ঞান নিজের জ্ঞাতব্য বিষয়ের মধ্যে আপনাকে আপনি উপলব্ধি করতে করতে আনন্দিত হতে থাকবে।

কিন্তু মানুষের জীবন ব'লে যে-শিক্ষালয়টি আছে তার আশ্চর্য রহস্য এই যে, এখানকার পাঠশালার ছোটো ছেলেকেও এখানকার এম. এ. ক্লাসের প্রবীণ ছাত্র কৃপাপাত্র বলে মনে করতে পারে না।

তাই আমার পরিণত বয়সের সমস্ত অভিজ্ঞতা ও চিত্তবিস্তার সত্ত্বেও আমি আমার উনিশ বছরের বন্ধুটিকে তাঁর তারুণ্য নিয়ে অবজ্ঞা করতে পারি নে। বস্তুত তাঁর এই বয়সে যত অভাব ও অপরিণতি আছে, তারাই সব চেয়ে বড়ো হয়ে আমার চোখে পড়ছে না ; এই বয়সের মধ্যে যে একটি সম্পূর্ণতা ও সৌন্দর্য আছে, সেইটেই আমার কাছে আজ উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিচ্ছে।

মানুষের কাজের সঙ্গে ঈশ্বরের কাজের এইখানে একটি প্রভেদ আছে। মানুষের ভারাবাঁধা অসমাপ্ত ইমারত সমাপ্ত ইমারতের কাছে লজ্জিত হয়ে থাকে। কিন্তু ঈশ্বরের চারাগাছটি প্রবীণ বনস্পতির কাছেও দৈন্য প্রকাশ করে না। সেও সম্পূর্ণ,

সেও সুন্দর। সে যদি চারা অবস্থাতেই মারা যায়, তবু তার কোথাও অসমাপ্তি ধরা পড়ে না। ঈশ্বরের কাজে কেবল যে অন্তেই সম্পূর্ণতা তা নয়, তার সোপানে সোপানেই সম্পূর্ণতা।

একদিন তো শিশু ছিলুম, সেদিনের কথা তো ভুলি নি। তখন জীবনের আয়োজন অতি যৎসামান্য ছিল। তখন শরীরের শক্তি, বুদ্ধি ও কল্পনা যেমন অল্প ছিল, তেমনি জীবনের ক্ষেত্র এবং উপকরণও নিতান্ত সংকীর্ণ ছিল। ঘরের মধ্যে যে-অংশ অধিকার করেছিলুম তা ব্যাপক নয়, এবং ধুলার ঘর আর মাটির পুতুলই দিন কাটাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

অথচ আমার সেই বাল্যের জীবন আমার সেই বালক আমির কাছে একেবারে পরিপূর্ণ ছিল। সে-যে কোনো অংশেই অসমাপ্ত, তা আমার মনেই হতে পারত না। তার আশাভরসা হাসিকান্না লাভক্ষতি নিজের বাল্যগণ্ডির মধ্যেই পর্যাপ্ত হয়ে ছিল।

তখন যদি বড়োবয়সের কথা কল্পনা করতে যেতুম, তবে তাকে বৃহত্তর বাল্যজীবন বলেই মনে হত— অর্থাৎ রূপকথা খেলনা এবং লজঞ্জুসের পরিমাণকে বড়ো করে তোলা ছাড়া আর-কোনো বড়োকে স্বীকার করার কোনো প্রয়োজন বোধ করতুম না।

এ যেন ছবির তাসে ক খ শেখার মতো। কয়ে কাক, খয়ে খঞ্জন, গয়ে গাধা, ঘয়ে ঘোড়া। শুদ্ধমাত্র ক খ শেখার মতো অসম্পূর্ণ শেখা আর-কিছু হতেই পারে না। অক্ষরগুলোকে যোজনা করে যখন শব্দকে ও বাক্যকে পাওয়া যাবে, তখনি ক খ শেখার সার্থকতা হবে ; কিন্তু ইতিমধ্যে ক খ অক্ষর সেই কাকের ও খঞ্জনের ছবির মধ্যে সম্পূর্ণতা লাভ ক'রে শিশুর পক্ষে আনন্দকর হয়ে উঠে— সে ক খ অক্ষরের দৈন্য অনুভব করতেই পারে না।

তেমনি শিশুর জীবনে ঈশ্বর তাঁর জগতের পুঁথিতে যে-সমস্ত রঙচঙ-করা কখয়ের ছবির পাতা খুলে রাখেন, তাই বারবার উলটে-পালটে তার আর দিনরাত্রির জ্ঞান থাকে না। কোনো অর্থ, কোনো ব্যাখ্যা, কোনো বিজ্ঞান, কোনো তত্ত্বজ্ঞান তার দরকারই হয় না— সে ছবি দেখেই খুশী হয়ে থাকে ; মনে করে, এই ছবি দেখাই জীবনের চরম সার্থকতা।

তার পরে আঠারো বৎসর পেরিয়ে যেদিন উনিশে পা দিলুম, সেদিন খেলনা লজঞ্জুস ও রূপকথা একেবারে তুচ্ছ হয়ে গেল। সেদিন যে-ভাবরাজ্যের সিংহদ্বারের সমুখে এসে দাঁড়ালুম, সে একেবারে সোনার আভায় ঝল্‌মল্‌ করছে এবং ভিতর থেকে যে-একটি নহবতের আওয়াজ আসছে, তাতে প্রাণ উদাস করে দিচ্ছে। এতদিন ছিলুম বাইরে,

কিন্তু সাহিত্যের নিমন্ত্রণচিঠি পেয়ে মানুষের মানসলোকের রসভাণ্ডারে প্রবেশ করা গেল। মনে হল, এই যথেষ্ট, আর-কিছুরই প্রয়োজন নেই।

এমনি করে মধ্যযৌবনে যখন পৌঁছনো গেল তখন বাইরের দিকে আর-একটা দরজা খুলে গেল। তখন এই মানসলোকের বাহিরবাড়িতে ডাক পড়ল। মানুষ যেখানে বসে ভেবেছে, আলাপ করেছে, গান গেয়েছে, ছবি এঁকেছে সেখানে নয়— ভাব যেখানে কাজের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, সেই মস্ত খোলা জায়গায়। মানুষ যেখানে লড়াই করেছে, প্রাণ দিয়েছে, যেখানে অসাধ্যসাধনের জয়পতাকা হাতে অশ্বমেধের ঘোড়া নিয়ে নদী পর্বত সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে চলেছে সেইখানে। সেখানে সমাজ আহ্বান করছে, সেখানে দেশ হাত বাড়িয়ে আছে,— সেখানে উন্নতিতীর্থের দুর্গম শিখর মেঘের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে সুমহৎ ভবিষ্যতের দিকে তর্জনী তুলে রয়েছে। এই-বা কী বিরাট ক্ষেত্র! এই যেখানে যুগে যুগে সমস্ত মহাপুরুষ প্রাণ দিয়ে এসেছেন, এখানে প্রাণ আপনাকে নিঃশেষ করে দিতে পারলেই নিজেকে সার্থক বলে মনে করে।

কিন্তু এইখানে এসেই যে সমস্ত ফুরোয়, তা নয়। এর থেকেও বেরোবার দরজা আছে। সেই দরজা যখন খুলে যায় তখন দেখি আরো আছে, এবং তার মধ্যে শৈশব যৌবন বার্ধক্য সমস্তই অপূর্বভাবে সম্মিলিত। জীবন যখন ঝরনার মতো ঝরছিল তখন সে ঝরনারূপেই সুন্দর, যখন নদী হয়ে বেরোল তখন সে নদীরূপেই সার্থক, যখন তার সঙ্গে চারদিক থেকে নানা উপনদী ও জলধারা এসে মিলে তাকে শাখাপ্রশাখায় ব্যাপ্ত করে দিলে তখন মহানদরূপেই তার মহত্ত্ব— তার পরে সমুদ্রে এসে যখন সে সংগত হল তখন সেই সাগরসংগমেও তার মহিমা।

বাল্যজীবন যখন ইন্দ্রিয়বোধের বাইরের ক্ষেত্র ছিল তখনো সে সুন্দর, যৌবন যখন ভাববোধের মানসক্ষেত্রে গেল তখনো সে সুন্দর, প্রৌঢ় যখন বাহির ও অন্তরের সম্মিলনক্ষেত্রে গেল তখনো সে সুন্দর এবং বৃদ্ধ যখন বাহির ও অন্তরের অতীত ক্ষেত্রে গেল তখনো সে সুন্দর।

আমার তরুণ বন্ধুর জন্মদিনে এই কথাই আমি চিন্তা করছি। আমি দেখছি, তিনি একটি বয়ঃসন্ধিতে দাঁড়িয়েছেন— তাঁর সামনে একটি অভাবনীয় তাঁকে নব নব প্রত্যাশার পথে আহ্বান করছে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পঞ্চাশে পদার্পণ করে আমার সামনেও সেই অভাবনীয়কেই দেখছি। নূতন আর কিছুই নেই, শক্তির পাথেয় শেষ হয়ে গেছে, পথের সীমায় এসে ঠেকেছি, এ-কথা কোনোমতেই বলতে পারছি নে। আমি তো দেখছি, আমিও একটি বিপুল বয়ঃসন্ধিতে দাঁড়িয়েছি। বাল্যের জগৎ, যৌবনের জগৎ,

যা পার হয়ে এসেছি বলে মনে করেছিলুম, এখন দেখছি, তার শেষ হয় নি— তাকেই আবার আর-এক আলোকে আর-এক অর্থে আর-এক সুরে লাভ করতে হবে, মনের মধ্যে সেই একটি সংবাদ এসেছে।

এর মধ্যে অদ্ভুত ব্যাপারটা এই যে, যেখানে ছিলুম সেইখানেই আছি অথচ চলেওছি। শিশুকালের যে-পৃথিবী, যে-চন্দ্রসূর্যতারা, এখনো তাই— স্থানপরিবর্তন করতে হয় নি, অথচ সমস্তই বেড়ে উঠেছে। দাশুরায়ের পাঁচালি যে পড়বে তাকে যদি কোনোদিন কালিদাসের কাব্য পড়তে হয়, তবে তাকে স্বতন্ত্র পুঁথি খুলতে হয়। কিন্তু এ জগতে একই পুঁথি খোলা রয়েছে— সেই পুঁথিকে শিশু পড়ছে ছড়ার মতো, যুবা পড়ছে কাব্যের মতো এবং বৃদ্ধ তাতেই পড়ছে ভাগবত। কাউকে আর নড়ে বসতে হয় নি— কাউকে এমন কথা বলতে হয় নি যে, 'এ জগতে আমার চলবে না, আমি একে ছাড়িয়ে গেছি— আমার জন্যে নূতন জগতের দরকার।'

কিছুই দরকার হয় না এইজন্যে যে, যিনি এ পুঁথি পড়াচ্ছেন তিনি অনন্ত নূতন— তিনি আমাদের সঙ্গে-সঙ্গেই সমস্ত পাঠকে নূতন করে নিয়ে চলেছেন— মনে হচ্ছে না যে, কোনো পড়া সাঙ্গ হয়ে গেছে।

এইজন্যেই পড়ার প্রত্যেক অংশেই আমরা সম্পূর্ণতাকে দেখতে পাচ্ছি— মনে হচ্ছে, এই যথেষ্ট,— মনে হচ্ছে, আর দরকার নেই। ফুল যখন ফুটছে তখন সে এমনি করে ফুটছে যেন সেই চরম ; তার মধ্যে ফলের আকাঙ্ক্ষা দৈন্যরূপে যেন নেই। তার কারণ হচ্ছে, পরিণত ফলের মধ্যে যাঁর আনন্দ, অপরিণত ফুলের মধ্যেও তাঁর আনন্দের অভাব নেই।

শৈশবে যখন ধুলোবালি নিয়ে, যখন নুড়ি শামুক ঝিনুক ঢেলা নিয়ে খেলা করেছি, তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনাদিকালের ভগবান শিশুভগবান হয়ে আমাদের সঙ্গে খেলা করেছেন। তিনি যদি আমাদের সঙ্গে শিশু না হতেন এবং তাঁর সমস্ত জগৎকে শিশুর খেলাঘর করে না তুলতেন, তা হলে তুচ্ছ ধুলোমাটি আমাদের কাছে এমন আনন্দময় হয়ে উঠত না। তিনি আমাদের সঙ্গে থেকে আমাদের মতো হয়ে আমাদের আনন্দ দিয়ে এসেছেন, এইজন্যে শিশুর জীবনে সেই পরিপূর্ণস্বরূপের লীলাই এমন সুন্দর হয়ে দেখা দেয় ; কেউ তাকে ছোটো ব'লে, মূঢ় ব'লে, অক্ষম ব'লে অবজ্ঞা করতে পারে না— অনন্ত শিশু তার সখা হয়ে তাকে এমনি গৌরবান্বিত করে তুলেছেন যে, জগতের আদরের সিংহাসন সে অতি অনায়াসেই অধিকার করে বসেছে, কেউ তাকে বাধা দিতে সাহস করে না।

আবার সেইজন্যেই আমার উনিশ বৎসরের যুবাবন্ধুর তারুণ্যকে আমি অবজ্ঞা

করতে পারি নে। যিনি চিরযুবা তিনি তাকে যৌবনে মণ্ডিত জগতের মাঝখানে হাতে ধরে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। চিরকাল ধরে কত যুবাকেই যে তিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে এসেছেন, তার আর সীমা নেই। তাই যৌবনের মধ্যে চরমের আস্বাদ পেয়ে চিরদিন যুবারা যৌবনকে চরমরূপে পাবার আকাঙ্ক্ষা করেছে।

প্রবীণরা তাই দেখে হেসেছে। মনে করেছে যুবারা এই-সমস্ত নিয়ে ভুলে আছে কেমন করে। ত্যাগের মধ্যে রিক্ততার মধ্যে যে বাধাহীন পরিপূর্ণতা, সেই অমৃতের স্বাদ এরা পায় নি। তিনি চিরপুরাতন যিনি পরমানন্দে আপনাকে নিয়তই ত্যাগ করছেন, যিনি কিছুই চান না; তিনিই বৃদ্ধের বন্ধু হয়ে পূর্ণতার দ্বারস্বরূপ যে-ত্যাগ, অমৃতের দ্বারস্বরূপ যে-মৃত্যু, তারি অভিমুখে আপনি হাতে ধরে নিয়ে চলেছেন।

এমনি করে অনন্ত যদি পদে পদেই আমাদের কাছে না ধরা দিতেন, তবে অনন্তকে আমরা কোনো কালেই ধরতে পারতুম না। তবে তিনি আমাদের কাছে 'না' হয়েই থাকতেন। কিন্তু পদে পদে তিনিই আমাদের 'হাঁ'। বাল্যের মধ্যে যে হাঁ সে তিনিই, সেইখানেই বাল্যের সৌন্দর্য; যৌবনের মধ্যে যে হাঁ সেও তিনিই, সেইখানেই যৌবনের শক্তি সামর্থ্য; বার্ধক্যের মধ্যে যে হাঁ সেও তিনিই, সেইখানেই বার্ধক্যের চরিতার্থতা। খেলার মধ্যেও পূর্ণরূপে তিনি, সংগ্রহের মধ্যেও পূর্ণরূপে তিনি এবং ত্যাগের মধ্যেও পূর্ণরূপে তিনি।

এইজন্যেই পথও আমাদের কাছে এমন রমণীয়, এইজন্যে সংসারকে আমরা ত্যাগ করতে চাই নে। তিনি-যে পথে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন। পথের উপর আমাদের এই-যে ভালোবাসা, এ তাঁরি উপর ভালোবাসা। মরতে আমরা যে এত অনিচ্ছা করি, এর মধ্যে আমাদের মনের এই কথাটি আছে যে, 'হে প্রিয়, জীবনকে তুমি আমাদের কাছে প্রিয় করে রেখেছ।'— ভুলে যাই, যিনি প্রিয় করেছেন, মরণেও তিনিই আমাদের সঙ্গে চলেছেন।

আমাদের বলবার কথা এ নয় যে, এটা অপূর্ণ ওটা অপূর্ণ, অতএব এ সমস্তকে আমরা পরিত্যাগ করব। আমাদের বলবার কথা হচ্ছে এই যে, এরি মধ্যে যিনি পূর্ণ তাঁকে আমরা দেখব। ক্ষেত্রকে বড়ো করেই যে আমরা পূর্ণকে দেখি তা নয়, পূর্ণকে দেখলেই আমাদের ক্ষেত্র বড়ো হয়ে যায়। আমরা যেখানেই আছি, যে-অবস্থায় আছি, সকলের মধ্যেই যদি তাঁকে দেখবার অবকাশ না থাকত, তা হলে কেউ কোনো কালেই তাঁকে দেখবার আশা করতে পারতুম না। কারণ, আমরা যে যতদূরই অগ্রসর হই-না, অনন্ত যদি ধরা না দেন তবে কোনো কৌশলে কারো তাঁকে নাগাল পাবার সম্ভাবনা কিছুমাত্র থাকে না।

কিন্তু তিনি অনন্ত বলেই সর্বত্রই ধরা দিয়েই আছেন— এইজন্যে তাঁর আনন্দরূপের অমৃতরূপের প্রকাশ সকল দেশে, সকল কালে। তাঁর সেই প্রকাশ যদি আমাদের মানবজীবনের মধ্যে দেখে থাকি তবে মৃত্যুর পরেও তাঁকে নূতন করে দেখতে পাব, এই আশা আমাদের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মানবজীবনে সে সুযোগ যদি না ঘটে থাকে, অর্থাৎ যদি না জেনে থাকি যে, যা কিছু প্রকাশ পাচ্ছে সে তাঁরি আনন্দ, তবে মৃত্যুর পরে যে আরো-কিছু বিশেষ সুযোগ আছে, এ-কথা কল্পনা করবার কোনো হেতু দেখি নে।

অনন্ত চিরদিনই সকল দেশে সকল কালে সকল অবস্থাতেই নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশ করবেন, এই তাঁর আনন্দের লীলা। কিন্তু তাঁর যে অন্ত নেই, এ-কথা তিনি আমাদের কেমন করে জানান? নেতি নেতি করে জানান না, ইতি ইতি করেই জানান। অন্তহীন ইতি। সেই ইতিকে কোথাও সুস্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারলেই এ কথা জানতে পারি, সর্বত্রই ইতি— সর্বত্রই সেই এষঃ। জীবনেও সেই এষঃ, জীবনের পরেও সেই এষঃ।— কিন্তু তিনি নাকি অন্তহীন, সেইজন্যে তিনি কোথাও কোনোদিন পুরাতন নন,— চিরদিনই তাঁকে নূতন করেই জানব, নূতন করেই পাব, তাঁতে নূতন করেই আনন্দলাভ করতে থাকব। একেবারেই সমস্ত পাওয়াকে মিটিয়ে দিয়ে চিরকালের মতো একভাবেই যদি তাঁকে পেতুম, তা হলে অনন্তকে পাওয়া হত না। অন্য সমস্ত পাওয়াকে শেষ করে দিয়ে তবে তাঁকে পাব, এ কখনো হতেই পারে না। কিন্তু সমস্ত পাওয়ার মধ্যেই কেবল নব নবতর রূপে তাঁকেই পেতে থাকব, সেই অন্তহীন একক অন্তহীন বিচিত্রের মধ্যে চিরকাল ভোগ করে চলব, এই যদি না হয় তবে দেশকালের কোনো অর্থই নেই,— তবে বিশ্বরচনা উন্মত্ত প্রলাপ এবং আমাদের জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ মায়ামরীচিকামাত্র।

মাতৃশ্রাদ্ধ

আমি কোনো ইংরেজী বইয়ে পড়েছি যে, ঈশ্বরকে যে পিতা বলা হয়ে থাকে, সে একটা রূপকমাত্র। অর্থাৎ পৃথিবীতে পিতার সঙ্গে সন্তানের যে রক্ষণপালনের সম্বন্ধ, ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের সেই সম্বন্ধ আছে বলেই এই সাদৃশ্য অবলম্বনে তাঁকে পিতা বলা হয়।

কিন্তু এ-কথা আমরা মানি নে। আমরা তাঁকে রূপকের ভাষায় পিতা বলি নে। আমরা বলি, পিতামাতার মধ্যে তিনিই সত্য পিতা মাতা। তিনিই আমাদের অনন্ত

পিতামাতা, সেইজন্যেই মানুষ তার পৃথিবীর পিতামাতাকে চিরকাল পেয়ে আসছে। মানুষ যে পিতৃহীন হয়ে মাতৃহীন হয়ে পৃথিবীতে আসে না তার একমাত্র কারণ, বিশ্বের অনন্ত পিতামাতা চিরদিন মানুষের পিতামাতার মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করে আসছেন। পিতার মধ্যে পিতারূপে যে-সত্য সে তিনি, মাতার মধ্যে মাতারূপে যে-সত্য সে তিনি।

পিতামাতাকে যদি প্রাকৃতিক দিক থেকে দেখাই সত্য দেখা হত, অর্থাৎ আমাদের মর্ত্যজীবনের প্রাকৃতিক কারণমাত্র যদি তাঁরা হতেন, তা হলে এই পিতামাতা সম্ভাষণকে আমরা ভুলেও অনন্তের সঙ্গে জড়িত করতুম না। কিন্তু মানুষ পিতামাতার মধ্যে প্রাকৃতিক কারণের চেয়ে ঢের বড়ো জিনিসকে অনুভব করেছে— পিতামাতার মধ্যে এমন একটি পদার্থের পরিচয় পেয়েছে যা অন্তহীন, যা চিরন্তন, যা বিশেষ পিতামাতার সমস্ত ব্যক্তিগত সীমাকে ছাড়িয়ে গেছে; পিতামাতার মধ্যে এমন একটা-কিছু পেয়েছে যাতে দাঁড়িয়ে উঠে চন্দ্রসূর্যগ্রহতারাকে যিনি অনাদি-অনন্তকাল নিয়মিত করছেন, সেই পরম শক্তিকে সম্বোধন করে বলে উঠেছে, 'পিতা নোঽসি— তুমি আমাদের পিতা।' এ-কথা যে নিতান্তই হাস্যকর প্রলাপবাক্য এবং স্পর্ধার কথা হত যদি এ কেবলমাত্রই রূপক হত। কিন্তু মানুষ এক জায়গায় পিতামাতাকে বিশেষভাবে অনন্তের মধ্যে দেখেছে এবং অনন্তকে বিশেষভাবে পিতামাতার মধ্যে দেখেছে, সেইজন্যেই এমন দৃঢ়কণ্ঠে এতবড়ো অভিমানের সঙ্গে বলতে পেরেছে 'পিতা নোঽসি'।

মানুষ পিতামাতার মধ্য থেকে যে-অমৃতের ধারা লাভ করেছে সেইটেকে অনুসরণ করতে গিয়ে দেখেছে কোথাও তার সীমা নেই, দেখেছে যেখান থেকে সূর্যনক্ষত্র তাদের নিঃশেষহীন আলোক পাচ্ছে, জীবজন্তু যেখান থেকে অবসানহীন প্রাণের স্রোতে ভেসে চ'লে আজ পর্যন্ত কোনো শেষে গিয়ে পৌঁছল না, সেই জগতের অনাদি আদিপ্রস্রবণ হতেই ওই অমৃতধারা প্রবাহিত হয়ে আসছে; অনন্ত ওইখানে আমাদের কাছে যেমনি ধরা পড়ে গেছেন, অমনি আমরা সেই দিকেই মুখ তুলে বলে উঠেছি 'পিতা নোঽসি'— বলেছি, 'যাকেই পিতা বলে ডাকি-না কেন, তুমিই আমাদের পিতা।'

'তুমি যে আমাদেরি' অনন্তকে এমন কথা বলতে শিখলুম এইখান থেকেই। 'তোমার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য কারবার নিয়ে তুমি আছ, সে কথা ভাবতে গেলেও ভয়ে মরি— কিন্তু ধরা পড়ে গেছ এইখানেই— দেখেছি তোমাকে পিতার মধ্যে, দেখেছি তোমাকে মাতার মধ্যে— তাই তুমি যত বড়োই হও-না কেন, পৃথিবীর এই এক কোণে দাঁড়িয়ে বলেছি, তুমি আমাদের পিতা— পিতা নোঽসি। আমাদের তুমি আমাদের, আমার তুমি আমার।'

এমন করে যদি তাঁকে না পেতুম তবে তাঁকে খুঁজতে যেতুম কোন্ রাস্তায়? সে রাস্তার অন্ত পেতুম কবে এবং কোন্‌খানে? যত দূরেই যেতুম তিনি দূরেই থেকে যেতেন। কেবল তাঁকে অনির্বচনীয় বলতুম, অগম্য অপার বলতুম।

কিন্তু সেই অনির্বচনীয় অগম্য অপার তিনিই আমার পিতা, আমার মাতা, তিনিই আমার— মানুষকে এই একটি অদ্ভুত কথা তিনি বলিয়েছেন। অনধিগম্য, এক মুহূর্তে এত আশ্চর্য সহজ হয়েছেন।

একেবারে আমাদের মানবজন্মের প্রথম মুহূর্তেই। মার কোলে মানুষের জন্ম, এইটেই মানুষের মস্ত কথা এবং প্রথম কথা। জীবনের প্রথম মুহূর্তেই তার অধিকারের আর অন্ত নেই; তার জন্যে প্রাণ দিতে পারে এতবড়ো স্নেহ তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে, জগতে এত তার মূল্য। এ মূল্য তাকে উপার্জন করতে হয় নি, এ মূল্য সে একেবারেই পেয়েছে।

মাতাই শিশুকে জানিয়ে দিলে, বিশাল বিশ্বজগৎ তার আত্মীয়, নইলে মাতা তার আপন হত না। মাতাই তাকে জানিয়ে দিলে, নিখিলের ভিতর দিয়ে যে যোগের সূত্র তাকে বেঁধেছে, সেটি কেবল প্রাকৃতিক কার্যকারণের সূত্র নয়, সে একটি আত্মীয়তার সূত্র। সেই চিরন্তন আত্মীয়তা পিতামাতার মধ্যে রূপগ্রহণ ক'রে জীবনের আরম্ভেই শিশুকে এই জগতে প্রথম অভ্যর্থনা করে নিলে। একেবারেই যে অপরিচিত, এক নিমেষেই তাকে সুপরিচিত বলে গ্রহণ করলে— সে কে। এমনটা পারে কে। এ শক্তি আছে কার। সেই অনন্ত প্রেম, যিনি সকলকেই চেনেন, এবং সকলকেই চিনিয়ে দেন।

এইজন্যে প্রেম যখন চিনিয়ে দেন, তখন জানাশুনা চেনাপরিচয়ের দীর্ঘ ভূমিকার কোনো দরকার হয় না, তখন রূপগুণ শক্তিসামর্থ্যের আসবাব-আয়োজনও বাহুল্য হয়ে ওঠে, তখন জ্ঞানের মতো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওজন করে হিসেব করে চিনতে হয় না। চিরকাল তাঁর যে চেনাই রয়েছে সেইজন্যে তাঁর আলো যেখানে পড়ে সেখানে কেউ কাউকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না।

শিশু মা-বাপের কোলেই জগৎকে যখন প্রথম দেখলে, তখন কেউ তাকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে না— বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের থেকে একটি ধ্বনি এল, 'এসো, এসো।' সেই ধ্বনি মা-বাপের কণ্ঠের ভিতর দিয়ে এল কিন্তু সে কি মা-বাপেরই কথা। সেটি যাঁর কথা তাঁকেই মানুষ বলেছে 'পিতা নোঽসি'।

শিশু জন্মাল আনন্দের মধ্যে, কেবল কার্যকারণের মধ্যে নয়। তাকে নিয়ে মা-বাপের খুশি, মা-বাপকে নিয়ে তার খুশি। এই আনন্দের ভিতর দিয়ে জগতের সঙ্গে

তার সম্বন্ধ আরম্ভ হল। এই-যে আনন্দ, এ আনন্দ ছিল কোথায়, এ আনন্দ আসে কোথা থেকে। যে-পিতামাতার ভিতর দিয়ে শিশু একে পেয়েছে, সেই পিতামাতা একে পাবে কোথায়। এ কি তাদের নিজের সম্পত্তি। এই আনন্দ জীবনের প্রথম মুহূর্তেই যেখান থেকে এসে পৌঁছল, সেইখানে মানুষের চিত্ত গিয়ে যখন উত্তীর্ণ হয় তখনি এতবড়ো কথা সে অতি সহজেই বলে, 'পিতা নোঽসি— তুমিই আমার পিতা, আমার মাতা।'

আমাদের এই মন্দিরের একজন উপাসক আমাকে জানিয়েছেন, আজ তাঁর মাতার শ্রাদ্ধদিন। আমি তাঁকে বলছি, আজ তাঁর মাতাকে খুব বড়ো করে দেখবার দিন, বিশ্বমাতার সঙ্গে তাঁকে মিলিয়ে দেখবার দিন।

মা যখন ইন্দ্রিয়বোধের কাছে প্রত্যক্ষ ছিলেন, তখন তাঁকে এতবড়ো করে দেখবার অবকাশ ছিল না। তখন তিনি সংসারে আচ্ছন্ন হয়ে দেখা দিতেন। আজ তাঁর সমস্ত আবরণ ঘুচে গিয়েছে— যেখানে তিনি পরিপূর্ণ সত্য, সেইখানেই আজ তাঁকে দেখে নিতে হবে। যিনি জন্মদান করে নিজের মাতৃত্বের মধ্য দিয়ে বিশ্বমাতার পরিচয়সাধন করিয়েছেন, আজ তিনি মৃত্যুর পর্দা সরিয়ে দিয়ে সংসারের আচ্ছাদন ছিন্ন করে সেই বিশ্বজননীর মধ্যে নিজের মাতৃত্বের চিরন্তন মূর্তিটি সন্তানের চক্ষে প্রকাশ করে দিন।

শ্রাদ্ধদিনের ভিতরকার কথাটি— শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস।

আমাদের মধ্যে একটি মূঢ়তা আছে; আমরা চোখে-দেখা কানে-শোনাকেই সব চেয়ে বেশি বিশ্বাস করি। যা আমাদের ইন্দ্রিয়বোধের আড়ালে পড়ে যায়, মনে করি, সে বুঝি একেবারেই গেল। ইন্দ্রিয়ের বাইরে শ্রদ্ধাকে আমরা জাগিয়ে রাখতে পারি নে।

আমার চোখে-দেখা কানে-শোনা দিয়েই তো আমি জগৎকে সৃষ্টি করি নি যে, আমার দেখাশোনার বাইরে যা পড়বে তাই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। যাকে চোখে দেখছি, যাকে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে জানছি, সে যাঁর মধ্যে আছে, যখন তাকে চোখে দেখি নে, ইন্দ্রিয় দিয়ে জানি নে, তখনো তাঁরি মধ্যে আছে। আমার জানা আর তাঁর জানা তো ঠিক এক সীমায় সীমাবদ্ধ নয়। আমার যেখানে জানার শেষ সেখানে তিনি ফুরিয়ে যান নি। আমি যাকে দেখছি নে, তিনি তাকে দেখছেন— আর তাঁর সেই দেখায় নিমেষ পড়ছে না।

সেই অনিমেষ জাগ্রত পুরুষের দেখার মধ্যেই আজ মাকে দেখতে হবে। আজ এই শ্রদ্ধাটিকে হৃদয়ে জাগ্রত করে তুলতে হবে যে, মা আছেন, মা সত্যের মধ্যে

আছেন, শোকানলের আলোকেই এই শ্রদ্ধাকে উজ্জ্বল করে তুলতে হবে যে, যা আছেন, তিনি কখনোই হারাতে পারেন না। সত্যের মধ্যে যা চিরকাল ছিলেন বলেই তাঁকে একদিন পেয়েছি— নইলে একদিনো পেতুম না— এবং সত্যের মধ্যেই যা আছেন বলেই আজো তাঁর অবসান নেই।

সত্যের মধ্যেই, অমৃতের মধ্যেই সমস্ত আছে, এ-কথা আমরা পরমাত্মীয়ের মৃত্যুতেই যথার্থত উপলব্ধি করি। যাদের সঙ্গে আমাদের স্নেহপ্রেমের, আমাদের জীবনের গভীর যোগ নেই, তারা আছে কি নেই তাতে আমাদের কিছুই আসে যায় না— সুতরাং মৃত্যুতে তারা আমাদের কাছে একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। এইখানেই মৃত্যুকে আমরা বিনাশ বলেই জানি।

কিন্তু এ মৃত্যুর অর্থ কী ভেবে দেখো। যে-মানুষকে আনন্দের মধ্যে দেখি নি, তাকে অমৃতের মধ্যেই দেখি নি— আমার পক্ষে সে কেবলমাত্র চোখে-দেখা কানে-শোনার অনিত্য লোকেই এতদিন ছিল;— যেখানে তাকে সত্যরূপে বৃহৎরূপে অমররূপে দেখতে পেতুম, সেখানে সে আমাকে দেখা দেয় নি।

যেখানে আমার প্রেম সেইখানেই আমি নিত্যের স্বাদ পাই, অমৃতের পরিচয় পেয়ে থাকি। সেখানে মানুষের উপর থেকে তুচ্ছতার আবরণ চলে যায়, মানুষের মূল্যের সীমা থাকে না। সেই প্রেমের মধ্যে যে-মানুষকে দেখেছি, তাকেই আমি অমৃতের মধ্যে দেখেছি। সমস্ত সীমাকে অতিক্রম ক'রে তার মধ্যে অসীমকে দেখতে পাই এবং মৃত্যুতেও সে আমার কাছে মরে না।

যাকে আমরা ভালোবাসি মৃত্যুতে সে যে থাকবে না, এই কথাটা আমাদের সমস্ত চিত্ত অস্বীকার করে;— প্রেম যে তাকে নিত্য বলেই জানে, সুতরাং মৃত্যু যখন তার প্রতিবাদ করে, তখন সেই প্রতিবাদকে মেনে নেওয়া তার পক্ষে এতই কঠিন হয়ে ওঠে। যে-মানুষকে আমরা অমৃতলোকের মধ্যে দেখেছি, তাকে মৃত্যুর মধ্যে দেখব কেমন করে।

মনের ভিতরে তখন একটি কথা এই ওঠে— প্রেম কি কেবল আমারি। কোনো বিশ্বব্যাপী প্রেমের যোগে কি আমার প্রেম সত্য নয়। যে-শক্তিকে অবলম্বন করে আমি ভালোবাসছি, আনন্দ পাচ্ছি, সেই শক্তিই কি সমস্ত বিশ্বে সকলের প্রতিই আনন্দিত হয়ে আছেন না। আমার প্রেমের মধ্যে এমন যে একটি অমৃত আছে, যে-অমৃতে আমার প্রেমাস্পদ আমার কাছে এমন চিরন্তন সত্য— সেই অমৃত কি সেই অনন্ত প্রেমের মধ্যে নেই। তাঁর সেই অনন্ত প্রেমের সুধায় আমরা কি অমর হয়ে উঠি নি। যেখানে তাঁর আনন্দ সেইখানেই কি অমৃত নেই।

প্রিয়জনের মৃত্যুর পরে প্রেমের আলোকে আমরা এই অনন্ত অমৃতলোককে আবিষ্কার করে থাকি। সেই তো আমাদের শ্রদ্ধার দিন— সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা, অমৃতের প্রতি শ্রদ্ধা। শ্রাদ্ধের দিনে আমরা মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে অমৃতের প্রতি সেই শ্রদ্ধা নিবেদন করি; আমরা বলি, মাকে দেখছি নে কিন্তু মা আছেন। চোখে দেখে, হাতে ছুঁয়ে যখন বলি 'মা আছেন', তখন সে তো শ্রদ্ধা নয়— আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় যেখানে শূন্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে সেখানে যখন বলি 'মা আছেন', তখন তাকেই যথার্থ বলে শ্রদ্ধা। নিজে যতক্ষণ পাহারা দিচ্ছি ততক্ষণ যাকে বিশ্বাস করি, তাকে কি শ্রদ্ধা করি। গোচরে এবং অগোচরেও যার উপর আমার বিশ্বাস অটল, তারি উপর আমার শ্রদ্ধা। মৃত্যুর অন্ধকারময় অন্তরালেও যাকে আমার সমস্ত চিত্ত সত্য বলে উপলব্ধি করছে, তাকেই তো যথার্থ আমি সত্য বলে শ্রদ্ধা করি।

সেই শ্রদ্ধাই প্রকাশ করার দিন শ্রাদ্ধের দিন। মাতার জীবিতকালে যখন বলেছি, 'মা তুমি আছ'— তার চেয়ে ঢের পরিপূর্ণ করে বলা, আজকের বলা যে, 'মা তুমি আছ।' তার মধ্যে আর-একটি গভীরতর শ্রদ্ধার কথা আছে— 'পিতা নোঽসি। হে আমার অনন্ত পিতামাতা, তুমি আছ, তাই আমার মাকে কোনো দিন হারাবার জো নেই।'

যেদিন বিশ্বব্যাপী অমৃতের প্রতি এই শ্রদ্ধা সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠবার দিন, সেই-দিনকারই আনন্দমন্ত্র হচ্ছে—

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।
মধু নক্তম্ উতোষসঃ মধুমৎ পার্থিবং রজঃ
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা।
মধুমান্নো বনস্পতিঃ মধুমান্ অস্তু সূর্যঃ
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।

এই আনন্দমন্ত্রের দ্বারা পৃথিবীর ধূলি থেকে আকাশের সূর্য পর্যন্ত সমস্তকে অমৃতে অভিষিক্ত করে মধুময় করে দেখবার দিন এই শ্রাদ্ধের দিন। সত্যম্— তিনি সত্য, অতএব সমস্ত তাঁর মধ্যে সত্য, এই শ্রদ্ধা যেদিন পূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে, সেই দিনই আমরা বলতে পারি আনন্দম্— তিনি আনন্দ এবং তাঁর মধ্যেই সমস্ত আনন্দে পরিপূর্ণ।

শেষ

গানে সম আছে, ছন্দে যতি আছে এবং এই যে লেখা চলছে, এই লেখার অন্য-সকল অংশের চেয়ে দাঁড়ির প্রভুত্ব কিছুমাত্র কম নয়। এই দাঁড়িগুলোই লেখার হাল ধরে রয়েছে— একে একটানা নিরুদ্দেশের মধ্যে হু হু করে ভেসে যেতে দিচ্ছে না।

বস্তুত কবিতা যখন শেষ হয়ে যায়, তখন সেই শেষ হয়ে যাওয়াটাও কবিতার একটা বৃহৎ অঙ্গ। কেননা কোনো ভালো কবিতাই একেবারে শূন্যের মধ্যে শেষ হয় না— যেখানে শেষ হয় সেখানেও সে কথা বলে— এই নিঃশব্দে কথাগুলি বলবার অবকাশ তাকে দেওয়া চাই।

যেখানে কবিতা থেমে গেল সেখানেই যদি তার সমস্ত স্বর সমস্ত কথা একেবারেই ফুরিয়ে যায়, তা হলে সে নিজের দীনতার জন্যে লজ্জিত হয়। কোনো-একটা বিশেষ উপলক্ষে প্রাণপণে ধুমধাম করে যে-ব্যক্তি একেবারে দেউলে হয়ে যায়, সেই ধুমধামের দ্বারা তার ঐশ্বর্য প্রকাশ পায় না, তার দারিদ্র্যই সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

নদী যেখানে থামে সেখানে একটি সমুদ্র আছে বলেই থামে— তাই থেমে তার কোনো ক্ষতি নেই। বস্তুত এ কেবল এক দিক থেকে থামা, অন্য দিক থেকে থামা নয়।

মানুষের জীবনের মধ্যেও এই-রকম অনেক থামা আছে। কিন্তু প্রায় দেখা যায়, মানুষ থামতে লজ্জা বোধ করে। সেইজন্যেই আমরা ইংরেজের মুখে প্রায় শুনতে পাই যে, জিন্‌লাগাম-পরা অবস্থায় দৌড়তে দৌড়তে মুখ থুবড়ে মরাই গৌরবের মরণ। আমরাও এই কথাটা আজকাল ব্যবহার করতে অভ্যাস করছি।

কোনো-একটা জায়গায় পূর্ণতা আছে, এ-কথা মানুষ যখন অস্বীকার করে তখন চলাটাকেই মানুষ একমাত্র গৌরবের জিনিস ব'লে মনে করে। ভোগ বা দান যে জানে না, সঞ্চয়কেই সে একান্ত করে জানে।

কিন্তু ভোগের বা দানের মধ্যে সঞ্চয় যখন আপনাকে ক্ষয় করতে থাকে তখন এক আকারে সঞ্চয়ের অবসান হয় বটে, কিন্তু আর-এক আকারে তারি সার্থকতা হতে থাকে। যেখানে সঞ্চয়ের এই সার্থক অবসান নেই সেখানে লজ্জাজনক কৃপণতা।

জীবনকে যারা এই-রকম কৃপণের মতো দেখে, তারা কোথাও কোনোমতেই থামতে চায় না, তারা কেবলি বলে, 'চলো, চলো, চলো।' থামার দ্বারা তাদের চলা সম্পূর্ণ ও

গভীর হয়ে ওঠে না ; তারা চাবুক এবং লাগামকেই স্বীকার করে, বৃহৎ এবং সুন্দর শেষকে তারা মানে না।

তারা যৌবনকে যৌবন পেরিয়েও টানাটানি করে নিয়ে চলে ; সেই দুঃসাধ্য ব্যাপারে কাঠ খড় এবং চেষ্টার আর অবধি থাকে না— তা ছাড়া কত লজ্জা, কত ভাবনা, কত ভয়।

ফল যখন পাকে তখন শাখা ছেড়ে যাওয়াই তার গৌরব। কিন্তু শাখা ত্যাগ করাকে যদি দীনতা ব'লে মনে করে, তবে তার মতো কৃপাপাত্র আর কে আছে।

নিজের স্থানকে অধিকার করার সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটি মনের মধ্যে রাখতে হবে যে, এই অধিকারকে সম্পূর্ণ করে তুলে এ'কে ত্যাগ করে যাব ; এই অধিকারকে যেমন করে পারি শেষ পর্যন্ত টানাহেঁচড়া করে রক্ষা করতেই হবে— তাতেই আমার সম্মান, আমার কৃতিত্ব, এই শিক্ষাই যারা শিশুকাল থেকে শিখে এসেছে, অপঘাত যতক্ষণ তাদের পেয়াদার মতো এসে জোর করে টেনে নিয়ে না যায় ততক্ষণ তারা দুই হাতে আসন আঁকড়ে পড়ে থাকে।

আমাদের দেশে অবসানকে স্বীকার করে, এইজন্যে তার মধ্যে অগৌরব দেখতে পায় না। এইজন্যে ত্যাগ করা তার পক্ষে ভঙ্গ দেওয়া নয়।

কেননা সেই ত্যাগ বলতে তো রিক্ততা বোঝায় না। পাকা ফলের ডাল ছেড়ে মাটিতে পড়াকে তো ব্যর্থতা বলতে পারি নে। মাটিতে তার চেষ্টার আকার এবং ক্ষেত্র -পরিবর্তন হয়— সেখানে সে নিশ্চেষ্টতার মধ্যে পলায়ন করে না। সেখানে বৃহত্তর জন্মের উদ্যোগপর্ব, সেখানে অজ্ঞাতবাসের পালা। সেখানে বাহির হতে ভিতরে প্রবেশ।

আমাদের দেশে বলে, পঞ্চাশোর্ধ্বং বনং ব্রজেৎ।

কিন্তু সে বন তো আলস্যের বন নয়, সে-যে তপোবন। সেখানে মানুষের এতকালের সঞ্চয়ের চেষ্টা, দানের চেষ্টার ক্ষেত্রে প্রবেশ করে।

করার আদর্শ মানুষের একমাত্র আদর্শ নয়, হওয়ার আদর্শই খুব বড়ো জিনিস। ধানের গাছ যখন রৌদ্রবৃষ্টির সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে বাড়ছিল সে খুব সুন্দর, কিন্তু ফসল ফ'লে যখন তার মাঠের দিন শেষ হয়ে ঘরের দিন আরম্ভ হয় তখন সেও সুন্দর। সেই ফসলের মধ্যে ধানখেতের সমস্ত রৌদ্রবৃষ্টির ইতিহাস নিবিড়ভাবে নিস্তব্ধ হয়ে আছে ব'লে কি তার কোনো অগৌরব আছে ?

মানুষের জীবনকেও কেবল তার খেতের মধ্যেই দেখব, তার ফসলের মধ্যে দেখব না, এমন পণ করলে সে জীবনকে নষ্টই করা হয়। তাই বলছি, মানুষের জীবনে

এমন একটি সময় আসে যখন তার থামার সময়। মানুষের কাজের সময়ে আমরা মানুষের কাছ থেকে যে-জিনিসটা আদায় করি, তার থামার সময়েও আমরা যদি সেই জিনিসটাই দাবি করি, তা হলে কেবল যে অন্যায় করা হয় তা নয়, নিজেকে বঞ্চিত করাই হয়।

থামার সময় মানুষের কাছে আমরা যেটা দাবি করতে পারি, সেটা করার আদর্শ নয়— সেটা হওয়ার আদর্শ। যখন সমস্তই কেবল চলছে, কেবলই ভাঙাগড়া এবং ওঠাপড়া, তখন সেই হওয়ার আদর্শটিকে সম্পূর্ণভাবে স্থিরভাবে আমরা দেখতে পাই নে— যখন চলা শেষ হয় তখন হওয়াকে আমরা দেখতে পাই। মানুষের এই সমাপ্ত ভাবটি, এই স্থিররূপটি দেখারও প্রয়োজন আছে। খেতের চারা এবং গোলার ধান আমাদের দুইই চাই।

কেজো লোকেরা কাজকেই একমাত্র লাভ বলে মনে করে— এইজন্য মানুষের কাছ থেকে তার অন্তিমকাল পর্যন্ত কেবল কাজ আদায় করবারই চেষ্টা করে।

যে-সমাজে যে-রকম দাবি সেই দাবি অনুসারেই মানুষের মূল্য। যেখানে সমাজ যুদ্ধ দাবি করে সেখানে যোদ্ধারই মূল্য বেশি, সুতরাং সকলেই আর-সমস্ত চেষ্টাকে সংহরণ ক'রে যোদ্ধা হবার জন্যেই প্রাণপণে চেষ্টা করে।

যেখানে কাজের দাবি অতিমাত্র, সেখানে অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত কেজো ভাবেই আপনাকে প্রচার করার দিকে মানুষের একান্ত প্রয়াস। সেখানে মানুষের দাঁড়ি নেই বললেই হয়, সেখানে কেবলই অসমাপিকা ক্রিয়া। সেখানে মানুষ যে-জায়গায় থামে সে-জায়গায় কিছুই পায় না, কেবল লজ্জা পায়; সেখানে কাজ একটা মদের মতো, ফুরোলেই অবসাদ; সেখানে স্তব্ধতার মধ্যে মানুষের কোনো বৃহৎ ব্যঞ্জনা নেই; সেখানে মৃত্যুর রূপ অত্যন্তই শূন্য এবং বিভীষিকাময় এবং জীবন সেখানে নিরন্তর মথিত, ক্ষুব্ধ, পীড়িত ও শতসহস্র কলের কৃত্রিম তাড়নায় গতিপ্রাপ্ত।

সামঞ্জস্য

এই বিশ্বচরাচরে আমরা বিশ্বকবির যে-লীলা চারিদিকেই দেখতে পাচ্ছি সে হচ্ছে সামঞ্জস্যের লীলা। সুর, সে যত কঠিন সুরই হ'ক, কোথাও ভ্রষ্ট হচ্ছে না; তাল, সে যত দুরূহ তালই হ'ক, কোনো জায়গায় তার স্খলনমাত্র নেই। চারিদিকেই গতি এবং স্ফূর্তি, স্পন্দন এবং নর্তন, অথচ সর্বত্রই অপ্রমত্ততা। পৃথিবী প্রতি মুহূর্তে

প্রবলবেগে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে, সূর্য প্রতি মুহূর্তে প্রবলবেগে কোনো-এক অপরিজ্ঞাত লক্ষ্যের অভিমুখে ছুটে চলেছে, কিন্তু আমাদের মনে ভাবনামাত্র নেই— আমরা সকাল-বেলায় নির্ভয়ে জেগে উঠে দিবসের তুচ্ছতম কাজটুকুও সম্পন্ন করবার জন্যে মনোযোগ করি এবং রাত্রে এ-কথা নিশ্চয় জেনে শুতে যাই যে, দিবসের আয়োজনটি যেখানে যেমনভাবে আজ ছিল, সমস্ত রাত্রির অন্ধকার ও অচেতনতার পরেও ঠিক তাকে সেই জায়গাতেই তেমনি করেই কাল পাওয়া যাবে। কেননা সর্বত্র সামঞ্জস্য আছে; এই অতি-প্রকাণ্ড অপরিচিত জগৎকে আমরা এই বিশ্বাসেই প্রতি মুহূর্তে বিশ্বাস করি।

অথচ এই সামঞ্জস্য তো সহজ সামঞ্জস্য নয়— এ তো মেষে ছাগে সামঞ্জস্য নয়, এ যেন বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খাওয়ানো। এই জগৎক্ষেত্রে যে-সব শক্তির লীলা, তাদের যেমন প্রচণ্ডতা তেমনি তাদের বিরুদ্ধতা— কেউ-বা পিছনের দিকে টানে, কেউ-বা সামনের দিকে ঠেলে, কেউ-বা গুটিয়ে আনে কেউ-বা ছড়িয়ে ফেলে, কেউ-বা বজ্রমুষ্টিতে সমস্তকে তাল পাকিয়ে নিরেট করে ফেলবার জন্যে চাপ দিচ্ছে, কেউ-বা তার চক্রযন্ত্রের প্রবল আবর্তে সমস্তকে গুঁড়িয়ে দিয়ে দিগ্‌বিদিকে উড়িয়ে ফেলবার জন্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই-সমস্ত শক্তি অসংখ্যবেশে এবং অসংখ্যতালে ক্রমাগতই আকাশময় ছুটে চলেছে— তার বেগ, তার বল, তার লক্ষ্য, তার বিচিত্রতা আমাদের ধারণাশক্তির অতীত; কিন্তু এই-সমস্ত প্রবলতা, বিরুদ্ধতা, বিচিত্রতার উপরে অধিষ্ঠিত অবিচলিত অখণ্ড সামঞ্জস্য। আমরা যখন জগৎকে কেবল তার কোনো একটামাত্র দিক থেকে দেখি তখন গতি এবং আঘাত এবং বিনাশ দেখি, কিন্তু সমগ্রকে যখন দেখি তখন দেখতে পাই নিস্তব্ধ সামঞ্জস্য। এই সামঞ্জস্যই হচ্ছে তাঁর স্বরূপ যিনি শান্তংশিবমদ্বৈতম্। জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি শান্তম্, সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি শিবম্, আত্মার মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি অদ্বৈতম্।

আমাদের আত্মার যে-সত্যসাধনা তার লক্ষও এই দিকে, এই পরিপূর্ণতার দিকে— এই শান্ত শিব অদ্বৈতের দিকে, কখনোই প্রমত্ততার দিকে নয়। আমাদের যিনি ভগবান তিনি কখনোই প্রমত্ত নন; নিরবচ্ছিন্ন সৃষ্টিপরম্পরার ভিতর দিয়ে অনন্ত দেশ ও অনন্ত কাল এই কথারই কেবল সাক্ষ্য দিচ্ছে। এষ সেতুর্বিধরণো লোকানামসম্ভেদায়।

এই অপ্রমত্ত পরিপূর্ণ শান্তিকে লাভ করবার অভিপ্রায় একদিন এই ভারতবর্ষের সাধনার মধ্যে ছিল। উপনিষদে ভগবদ্‌গীতায় আমরা এর পরিচয় যথেষ্ট পেয়েছি।

মাঝখানে ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগের যখন আধিপত্য হল, তখন আমাদের সেই সনাতন পরিপূর্ণতার সাধনা নির্বাণের সাধনার আকার ধারণ করলে। স্বয়ং বুদ্ধের মনে এই নির্বাণ শব্দটির অর্থ যে কী ছিল, তা এখানে আলোচনা করে কোনো ফল নেই, কিন্তু

দুঃখের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যে শূন্যতার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করাই যে চরম সিদ্ধি, এই ধারণা বৌদ্ধযুগের পর হতে নানা আকারে ন্যূনাধিক পরিমাণে সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে গিয়েছে।

এমনি করে পূর্ণতার শান্তি একদিন শূন্যতার শান্তি আকারে ভারতবর্ষের সাধনা-ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিল। সমস্ত বাসনাকে নিরস্ত ক'রে সমস্ত প্রবৃত্তির মূলোচ্ছেদ করে দিয়ে তবেই পরম শ্রেয়কে লাভ করা যায়, এই মত যেদিন থেকে ভারতবর্ষে তার সহস্র মূল বিস্তার করে দাঁড়ালো, সেইদিন থেকে ভারতবর্ষের সাধনায় সামঞ্জস্যের স্থলে রিক্ততা এসে দাঁড়ালো,— সেইদিন থেকে প্রাচীন তাপসাশ্রমের স্থলে আধুনিক কালের সন্ন্যাসাশ্রম প্রবল হয়ে উঠল এবং উপনিষদের পূর্ণস্বরূপ ব্রহ্ম শঙ্করাচার্যের শূন্যস্বরূপ ব্রহ্মরূপে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদে পরিণত হলেন।

কেবলমাত্র কঠোর চিন্তার জোরে মানুষ নিজের বাসনা ও প্রবৃত্তিকে মুছে ফেলে জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডকে বাদ দিয়ে শরীরের প্রাণক্রিয়াকে অবরুদ্ধ ক'রে একটি গুণলেশহীন অবচ্ছিন্ন (abstract) সত্তার ধ্যানে নিযুক্ত থাকতেও পারে, কিন্তু দেহমনহৃদয়বিশিষ্ট সমগ্র মানুষের পক্ষে এ-রকম অবস্থায় অবস্থিতি করা অসম্ভব এবং সে তার পক্ষে কখনোই প্রার্থনীয় হতে পারে না। এই কারণেই তখনকার জ্ঞানীরা যাকে মানুষের চরম শ্রেয় বলে মনে করতেন, তাকে সকল মানুষের সাধ্য বলে গণ্যই করতেন না। এই কারণে এই শ্রেয়ের পথে তাঁরা বিশ্বসাধারণকে আহ্বান করতেই পারতেন না— বরঞ্চ অধিকাংশকেই অনধিকারী বলে ঠেকিয়ে রাখতেন এবং এই সাধারণ লোকেরা মূঢ়ভাবে যে-কোনো বিশ্বাস ও সংস্কারকে আশ্রয় করত, তাকে তাঁরা সকরুণ অবজ্ঞাভরে প্রশ্রয় দিতেন। যেখানে যেটা যেমনভাবে আছে ও চলছে তাই নিয়েই সাধারণ মানুষ সন্তুষ্ট থাকুক এই তাঁদের কথা ছিল— কারণ, সত্য মানুষের পক্ষে এতই সুদূর, এতই দুরধিগম্য এবং সত্যকে পেতে গেলে নিজের স্বভাবকে মানুষের এমনি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে দিতে হয়!

দেশের জ্ঞান এবং দেশের অজ্ঞানের মধ্যে, দেশের সাধনা এবং দেশের সংসারযাত্রার মধ্যে, এতবড়ো একটা বিচ্ছেদ কখনোই সুস্থভাবে স্থায়ী হতে পারে না। বিচ্ছেদ যেখানে একান্ত প্রবল, সেখানে বিপ্লব না এসে তার সমন্বয় হয় না— কি রাষ্ট্রতন্ত্রে, কি সমাজতন্ত্রে, কি ধর্মতন্ত্রে।

আমাদের দেশেও তাই হল। মানুষের সাধনাক্ষেত্র থেকে জ্ঞানী যে-হৃদয়পদার্থকে অত্যন্ত জোর করে একেবারে সম্পূর্ণ নির্বাসিত করে দিয়েছিল সেই হৃদয় অত্যন্ত জোরের সঙ্গেই অধিকার-অনধিকারের বেড়া চুরমার করে ভেঙে বন্যার বেগে দেখতে

দেখতে একেবারে চতুর্দিক প্লাবিত করে দিলে; অনেকদিন পরে সাধনার ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন খুব ভরপুর হয়ে উঠল।

এখন আবার সকলে একেবারে উলটো সুর এই ধরলে যে, হৃদয়বৃত্তির চরিতার্থতাই মানুষের সিদ্ধির চরম পরিচয়। হৃদয়বৃত্তির অত্যন্ত উত্তেজনার যে-সমস্ত দৈহিক ও মানসিক লক্ষণ আছে, সাধনায় সেইগুলির প্রকাশই মানুষের কাছে একান্ত শ্রদ্ধালাভ করতে লাগল।

এই অবস্থায় স্বভাবত মানুষ আপনার ভগবানকেও প্রমত্ত আকারে দেখতে লাগল। তাঁর আর-সমস্তকেই খর্ব করে কেবলমাত্র তাঁকে হৃদয়াবেগচাঞ্চল্যের মধ্যেই একান্ত করে উপলব্ধি করতে লাগল এবং সেই-রকম উপলব্ধি থেকে যে একটি নিরতিশয় ভাব-বিহ্বলতা জন্মায়, সেইটেকেই উপাসনার পরাকাষ্ঠা বলে গণ্য করে নিলে।

কিন্তু ভগবানকে এই-রকম করে দেখাও তাঁর সমগ্রতা থেকে তাঁকে অবচ্ছিন্ন করে দেখা। কারণ মানুষ কেবলমাত্র হৃদয়পুঞ্জ নয়, এবং নানাপ্রকার উপায়ে শরীরমনের সমস্ত শক্তিকে কেবলমাত্র হৃদয়াবেগের ধারায় প্রবাহিত করতে থাকলে কখনোই সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের যোগে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগসাধন হতে পারে না।

হৃদয়াবেগকেই চরমরূপে যখন প্রাধান্য দেওয়া হয়, তখনি মানুষ এমন কথা অনায়াসে বলতে পারে যে, ভক্তিপূর্বক মানুষ যাকেই পূজা করুক-না কেন, তাতেই তার সফলতা। অর্থাৎ, যেন পূজার বিষয়টি ভক্তিকে জাগিয়ে তোলবার একটা উপায়মাত্র; যার একটা উপায়ে ভক্তি না জন্মে, তাকে অন্য যা-হয় একটা উপায় জুগিয়ে দেওয়ায় যেন কোনো বাধা নেই। এই অবস্থায় উপলক্ষটা যাই হ'ক, ভক্তির প্রবলতা দেখলেই আমাদের মনে শ্রদ্ধার উদয় হয়— কারণ, প্রমত্ততাকেই আমরা সিদ্ধি বলে মনে করি।

এই-রকম হৃদয়াবেগের প্রমত্ততাকেই আমরা অসামান্য আধ্যাত্মিক শক্তির লক্ষণ বলে মনে করি, তার কারণ আছে। যেখানে সামঞ্জস্য নষ্ট হয়, সেখানে শক্তিপুঞ্জ একদিকে কাত হয়ে পড়ে বলেই তার প্রবলতা চোখে পড়ে। কিন্তু সে তো একদিক থেকে চুরি করে অন্যদিককে স্ফীত করা। যেদিক থেকে চুরি হয় সেদিক থেকে নালিশ ওঠে; তার শোধ দিতেই হয় এবং তার শাস্তি না পেয়ে নিষ্কৃতি হয় না। সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে কেবলমাত্র হৃদয়াবেগের মধ্যে প্রতিসংহরণের চর্চায় মানুষ কখনোই মনুষ্যত্বলাভ করে না এবং মনুষ্যত্বের যিনি চরম লক্ষ্য তাঁকেও লাভ করতে পারে না।

নিজের মনের ভক্তির চরিতার্থতাই যখন মানুষের প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠল, বস্তুত দেবতা যখন উপলক্ষ হয়ে উঠলেন এবং ভক্তিকে ভক্তি করাই যখন নেশার মতো ক্রমশই উগ্র হয়ে উঠতে লাগল, মানুষ যখন পূজা করবার আবেগটাকেই প্রার্থনা করলে, কাকে পূজা করতে হবে সেদিকে চিন্তামাত্র প্রয়োগ করলে না এবং এই কারণেই যখন তার

পুজার সামগ্রী দ্রুতবেগে যেখানে-সেখানে যেমন-তেমন ভাবে নানা আকার ও নানা নাম ধরে অজস্র অপরিমিত বেড়ে উঠল, এবং সেইগুলিকে অবলম্বন করে নানা সংস্কার নানা কাহিনী নানা আচারবিচার জড়িত বিজড়িত হয়ে উঠতে লাগল ;— জগদ্‌ব্যাপারের সর্বত্রই একটা জ্ঞানের ন্যায়ের নিয়মের অমোঘ ব্যবস্থা আছে এই ধারণা যখন চতুর্দিকে ধূলিসাৎ হতে চলল, তখন সেই অবস্থায় আমাদের দেশে সত্যের সঙ্গে রসের, জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির একান্ত বিচ্ছেদ ঘটে গেল।

একদা বৈদিক যুগে কর্মকাণ্ড যখন প্রবল হয়ে উঠেছিল, তখন নিরর্থক কর্মই মানুষকে চরমরূপে অধিকার করেছিল ; কেবল নানা জটিল নিয়মে বেদি সাজিয়ে, কেবল মন্ত্র প'ড়ে, কেবল আহুতি ও বলি দিয়ে মানুষ সিদ্ধিলাভ করতে পারে, এই ধারণাই একান্ত হয়ে উঠেছিল ; তখন মন্ত্র এবং অনুষ্ঠানই, দেবতা এবং মানুষের হৃদয়ের চেয়ে বড়ো হয়ে দাঁড়ালো। তার পরে জ্ঞানের সাধনার যখন প্রাদুর্ভাব হল, তখন মানুষের পক্ষে জ্ঞানই একমাত্র চরম হয়ে উঠল— কারণ, যাঁর সম্বন্ধে জ্ঞান তিনি নির্গুণ নিষ্ক্রিয়, সুতরাং তাঁর সঙ্গে আমাদের কোনোপ্রকার সম্বন্ধ হতেই পারে না ; এ অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান-নামক পদার্থটাতে জ্ঞানই সমস্ত, ব্রহ্ম কিছুই নয় বললেই হয়। একদিন নিরর্থক কর্মই চূড়ান্ত ছিল ; জ্ঞান ও হৃদবৃত্তিকে সে লক্ষ্যই করে নি, তার পরে যখন জ্ঞান বড়ো হয়ে উঠল তখন সে আপনার অধিকার থেকে হৃদয় ও কর্ম উভয়কে নির্বাসিত করে দিয়ে নিরতিশয় বিশুদ্ধ হয়ে থাকবার চেষ্টা করলে। তার পরে ভক্তি যখন মাথা তুলে দাঁড়ালো তখন সে জ্ঞানকে পায়ের তলায় চেপে ও কর্মকে রসের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে একমাত্র নিজেই মানুষের পরম স্থানটি সম্পূর্ণ জুড়ে বসল, দেবতাকেও সে আপনার চেয়ে ছোটো করে দিলে, এমন-কি, ভাবের আবেগকে মথিত করে তোলবার জন্যে বাহিরে কৃত্রিম উত্তেজনার বাহ্যিক উপকরণগুলিকেও আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ করে নিলে।

এইরূপ গুরুতর আত্মবিচ্ছেদের উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে মানুষ চিরদিন বাস করতে পারে না। এই অবস্থায় মানুষ কেবল কিছুকাল পর্যন্ত নিজের প্রকৃতির একাংশের তৃপ্তি-সাধনের নেশায় বিহ্বল হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তার সর্বাংশের ক্ষুধা একদিন না জেগে উঠে থাকতে পারে না।

সেই পূর্ণ মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ আকাঙ্ক্ষাকে বহন করে এ দেশে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হয়েছিল। ভারতবর্ষে তিনি-যে কোনো নূতন ধর্মের সৃষ্টি করেছিলেন তা নয় ; ভারতবর্ষে যেখানে ধর্মের মধ্যে পরিপূর্ণতার রূপ চিরদিনই ছিল, যেখানে বৃহৎ সামঞ্জস্য, যেখানে শান্তংশিবমদ্বৈতম্, সেইখানকার সিংহদ্বার তিনি সর্বসাধারণের কাছে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছিলেন।

সত্যের এই পরিপূর্ণতাকে, এই সামঞ্জস্যকে পাবার ক্ষুধা যে কি-রকম প্রবল, এবং তাকে আপনার মধ্যে কি-রকম করে গ্রহণ ও ব্যক্ত করতে হয়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনে সেইটেই প্রকাশ হয়েছে।

তাঁর স্নেহময়ী দিদিমার মৃত্যুশোকের আঘাতে মহর্ষির ধর্মজীবন প্রথম জাগ্রত হয়ে উঠেই যে-ক্ষুধার কান্না কেঁদেছে, তার মধ্যে একটি বিস্ময়কর বিশেষত্ব আছে।

শিশু যখন খেলবার জন্যে কাঁদে তখন হাতের কাছে যে-কোনো একটা খেলনা পাওয়া যায় তাই দিয়েই তাকে ভুলিয়ে রাখা সহজ, কিন্তু সে যখন মাতৃস্তন্যের জন্যে কাঁদে তখন তাকে আর-কিছু দিয়েই ভোলাবার উপায় নেই। যে-লোক নিজের বিশেষ একটা হৃদয়াবেগকে কোনো-একটা কিছুতে প্রয়োগ করবার ক্ষেত্রমাত্র চায়, তাকে থামিয়ে রাখবার জিনিস জগতে অনেক আছে— কিন্তু কেবলমাত্র ভাবসম্ভোগ যার লক্ষ্য নয়, যে সত্য চায়, সে তো ভুলতে চায় না, সে পেতে চায়। কাজেই, সত্য কোথায় পাওয়া যাবে এই সন্ধানে তাকে সাধনার পথে বেরোতেই হবে— তাতে বাধা আছে, দুঃখ আছে, তাতে বিলম্ব ঘটে, তাতে আত্মীয়েরা বিরোধী হয়, সমাজের কাছ থেকে আঘাত বর্ষিত হতে থাকে— কিন্তু উপায় নেই, তাকে সমস্তই স্বীকার করতে হয়।

এই-যে সত্যকে পাবার ইচ্ছা এ কেবল জিজ্ঞাসামাত্র নয়, কেবল জ্ঞানে পাবার ইচ্ছা নয়, এর মধ্যে হৃদয়ের দুঃসহ ব্যাকুলতা আছে— তাঁর ছিল সত্যকে কেবল জ্ঞানরূপে নয়, আনন্দরূপে পাবার বেদনা। এইখানে তাঁর প্রকৃতি স্বভাবতই একটি সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যকে চাচ্ছিল। আমাদের দেশে এক সময়ে বলেছিল ব্রহ্মসাধনার ক্ষেত্রে ভক্তির স্থান নেই এবং ভক্তিসাধনার ক্ষেত্রে ব্রহ্মের স্থান নেই, কিন্তু মহর্ষি ব্রহ্মকে চেয়েছিলেন জ্ঞানে এবং ভক্তিতে, অর্থাৎ সমস্ত প্রকৃতি দিয়ে সম্পূর্ণ করে তাঁকে চেয়েছিলেন— এইজন্যে ক্রমাগত নানা কষ্ট নানা চেষ্টা নানা গ্রহণবর্জনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে যতক্ষণ তাঁর চিত্ত তাঁর অমৃতময় ব্রহ্মে, তাঁর আনন্দের ব্রহ্মে গিয়ে না ঠেকেছিল ততক্ষণ একমুহূর্ত তিনি থামতে পারেন নি।

এই কারণে তাঁর জীবনে ব্রহ্মজ্ঞান একটি বিশেষত্ব লাভ করেছিল এই যে, সে জ্ঞানকে সর্বসাধারণের কাছে না ধরে তিনি ক্ষান্ত হন নি।

জ্ঞানীর ব্রহ্মজ্ঞান কেবল জ্ঞানীর গণ্ডির মধ্যেই বদ্ধ থাকে। সেইজন্যেই এ দেশের লোকে অনেক সময়েই বলে থাকে, ব্রহ্মজ্ঞানের আবার প্রচার কী।

কিন্তু ব্রহ্মকে যিনি হৃদয়ের দ্বারা উপলব্ধি করেছেন তিনি এ-কথা বুঝেছেন— ব্রহ্মকে

পাওয়া যায়, হৃদয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ পাওয়া যায়— শুধু জ্ঞানে জানা যায় তা নয়, রসে পাওয়া যায়, কেননা সমস্ত রসের সার তিনি— রসো বৈ সঃ। যিনি হৃদয় দিয়ে ব্রহ্মকে পেয়েছেন, তিনি উপনিষদের এই মহাবাক্যের অর্থ বুঝেছেন—

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

জ্ঞান যখন তাঁকে পেতে চায় এবং বাক্য প্রকাশ করতে চায় তখন বারবার ফিরে ফিরে আসে, কিন্তু আনন্দ দিয়ে যখন সেই আনন্দের যোগ হয় তখন সেই প্রত্যক্ষ যোগে সমস্ত ভয় সমস্ত সংশয় দূর হয়ে যায়।

আনন্দের মধ্যে সমস্ত বোধের পরিপূর্ণতা— মন ও হৃদয়ের, জ্ঞান ও ভক্তির অখণ্ড যোগ।

আনন্দ যখন জাগে তখন সকলকে সে আহ্বান করে; সে গণ্ডির মধ্যে আপনাকে নিয়ে আপনি রুদ্ধ হয়ে বসে থাকতে পারে না। সে এ-কথা কাউকে বলে না যে 'তুমি দুর্বল, তোমার সাধ্য নেই', কেননা আনন্দের কাছে কোনো কঠিনতাই কঠিন নয়— আনন্দ সেই আনন্দের ধনকে এতই একান্ত ক'রে এতই নিবিড় ক'রে দেখে যে, সে তাঁকে দুষ্প্রাপ্য ব'লে কোনো লোককেই বঞ্চিত করতে চায় না— পথ যত দীর্ঘ যত দুর্গম হ'ক-না, এই পরমলাভের কাছে সে কিছুই নয়।

এই কারণে পৃথিবীতে এ-পর্যন্ত যে-কোনো মহাত্মা আনন্দ দিয়ে তাঁকে লাভ করেছেন, তাঁরা অমৃতভাণ্ডারের দ্বার বিশ্বজনের কাছে খুলে দেবার জন্যেই দাঁড়িয়েছেন —আর যাঁরা কেবলমাত্র জ্ঞান বা কেবলমাত্র আচারের মধ্যে নিবিষ্ট, তাঁরাই পদে পদে ভেদবিভেদের দ্বারা মানুষের পরস্পর মিলনের উদার ক্ষেত্রকে একেবারে কণ্টকাকীর্ণ করে দেন। তাঁরা কেবল না-এর দিক থেকে সমস্ত দেখেন, হাঁ-এর দিক থেকে নয়— এইজন্যে তাঁদের ভরসা নেই, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা নেই এবং ব্রহ্মকেও তাঁরা নিরতিশয় শূন্যতার মধ্যে নির্বাসিত করে রেখে দেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চিত্তে যখন ধর্মের ব্যাকুলতা প্রবল হল তখন তিনি-যে অনন্ত নেতি নেতিকে নিয়ে পরিতৃপ্ত হতে পারেন নি সেটা আশ্চর্যের বিষয় নয়, কিন্তু তিনি-যে সেই ব্যাকুলতার বেগে সমাজের পরিবারের চিরসংস্কারগত অভ্যস্ত পথে তাঁর ব্যথিত হৃদয়কে সমর্পণ করে দিয়ে কোনোমতে তার কান্নাকে থামিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন নি এইটেই বিস্ময়ের বিষয়। তিনি কাকে চাচ্ছেন তা ভালো করে জানবার পূর্বেই তাঁকেই চেয়েছিলেন— জ্ঞান যাঁকে চিরকালই জানতে চায় এবং প্রেম যাঁকে চিরকালই পেতে থাকে।

এইজন্য জীবনের মধ্যে তিনি সেই ব্রহ্মকে গ্রহণ করলেন— পরিমিত পদার্থের মতো করে যাঁকে পাওয়া যায় না এবং শূন্যপদার্থের মতো যাঁকে না-পাওয়া যায় না— যাঁকে পেতে গেলে একদিকে জ্ঞানকে খর্ব করতে হয় না, অন্যদিকে প্রেমকে উপবাসী করে মারতে হয় না— যিনি বস্তুবিশেষের দ্বারা নির্দিষ্ট নন অথবা বস্তুশূন্যতার দ্বারা অনির্দিষ্ট নন— যাঁর সম্বন্ধে উপনিষদ্ বলেছেন যে, যে তাঁকে বলে আমি জানি সেও তাঁকে জানে না, যে বলে আমি জানি নে সেও তাঁকে জানে। এক কথায় যাঁর সাধনা হচ্ছে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের সাধনা।

যাঁরা মহর্ষির জীবনী পড়েছেন তাঁরা সকলেই দেখেছেন, ভগবৎপিপাসা যখন তাঁর প্রথম জাগ্রত হয়ে উঠেছিল তখন কি-রকম দুঃসহ বেদনার মধ্যে তাঁর হৃদয়কে তরঙ্গিত করে তুলেছিল। অথচ তিনি যখন ব্রহ্মানন্দের রসাস্বাদ করতে লাগলেন তখন তাঁকে উদ্দাম ভাবোন্মাদে আত্মবিস্মৃত করে দেয় নি। কারণ, তিনি যাঁকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তিনি শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্— তাঁর মধ্যে সমস্ত শক্তি, সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত প্রেম অতলস্পর্শ পরিপূর্ণতায় পর্যাপ্ত হয়ে আছে। তাঁর মধ্যে বিশ্বচরাচর শক্তিতে ও সৌন্দর্যে নিত্যকাল তরঙ্গিত হচ্ছে— সে তরঙ্গ সমুদ্রকে ছাড়িয়ে চলে যায় না, এবং সমুদ্র সেই তরঙ্গের দ্বারা আপনাকে উদ্‌বেল করে তোলে না। তাঁর মধ্যে অনন্ত শক্তি বলেই শক্তির সংযম এমন অটল, অনন্ত রস বলেই রসের গাম্ভীর্য এমন অপরিমেয়।

এই শক্তির সংযমে এই রসের গাম্ভীর্যে মহর্ষি চিরদিন আপনাকে ধারণ করে রেখেছিলেন, কারণ, ভূমার মধ্যেই আত্মাকে উপলব্ধি করবার সাধনা তাঁর ছিল। যাঁরা আধ্যাত্মিক অসংযমকেই আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় বলে মনে করেন তাঁরা এই অবিচলিত শান্তির অবস্থাকেই দারিদ্র্য বলে কল্পনা করেন, তাঁরা প্রমত্ততার মধ্যে বিপর্যস্ত হয়ে পড়াকেই ভক্তির চরম অবস্থা বলে জানেন। কিন্তু যাঁরা মহর্ষিকে কাছে থেকে দেখেছেন, বস্তুত যাঁরা কিছুমাত্র তাঁর পরিচয় পেয়েছেন, তাঁরা জানেন যে তাঁর প্রবল সংযম ও প্রশান্ত গাম্ভীর্য ভক্তিরসের দীনতাজনিত নয়। প্রাচীন ভারতের তপোবনের ঋষিরা যেমন তাঁর গুরু ছিলেন, তেমনি পারস্যের সৌন্দর্যকুঞ্জের বুলবুল হাফেজ তাঁর বন্ধু ছিলেন। তাঁর জীবনের আনন্দপ্রভাতে উপনিষদের শ্লোকগুলি ছিল প্রভাতের আলোক এবং হাফেজের কবিতাগুলি ছিল প্রভাতের গান। হাফেজের কবিতার মধ্যে যিনি আপনার রসোচ্ছ্বাসের সাড়া পেতেন, তিনি যে তাঁর জীবনেশ্বরকে কি-রকম নিবিড় রসবেদনাপূর্ণ মাধুর্যঘন প্রেমের সঙ্গে অন্তরে বাহিরে দেখেছিলেন, সে কথা অধিক করে বলাই বাহুল্য।

ঐকান্তিক জ্ঞানের সাধনা যেমন শুষ্ক বৈরাগ্য আনে, ঐকান্তিক রসের সাধনাও তেমনি ভাববিহ্বলতার বৈরাগ্য নিয়ে আসে। সে অবস্থায় কেবলই রসের নেশায় আবিষ্ট হয়ে থাকতে ইচ্ছা করে, আর-সমস্তের প্রতি একান্ত বিতৃষ্ণা জন্মে এবং কর্মের বন্ধনমাত্রকে অসহ্য বলে বোধ হয়। অর্থাৎ মনুষ্যত্বের কেবল একটিমাত্র দিক অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠাতে অন্য সমস্ত দিক একেবারে রিক্ত হয়ে যায়, তখন আমরা ভগবানের উপাসনাকে কেবলই একটিমাত্র অংশে অত্যুগ্র করে তুলি, এবং অন্য-সকল দিক থেকেই তাকে শূন্য করে রাখি।

ভগবৎলাভের জন্য একান্ত ব্যাকুলতা সত্ত্বেও এই-রকম সামঞ্জস্যচ্যুত বৈরাগ্য মহর্ষির চিত্তকে কোনোদিন অধিকার করে নি। তিনি সংসারকে ত্যাগ করেন নি, সংসারের সুরকে ভগবানের ভক্তিতে বেঁধে তুলেছিলেন। ঈশ্বরের দ্বারা সমস্তকেই আচ্ছন্ন করে দেখবে, উপনিষদের এই উপদেশবাক্য অনুসারে তিনি তাঁর সংসারের বিচিত্র সম্বন্ধ ও বিচিত্র কর্মকে ঈশ্বরের দ্বারাই পরিব্যাপ্ত করে দেখবার তপস্যা করেছিলেন। কেবল নিজের পরিবার নয়, জনসমাজের মধ্যেও ব্রহ্মকে উপলব্ধি করবার সমস্ত বিঘ্ন দূর করতে তিনি চিরজীবন চেষ্টা করেছেন। এইজন্য এই শান্তিনিকেতনের বিশাল প্রান্তরের মধ্যেই হ'ক আর হিমালয়ের নিভৃত গিরিশিখরেই হ'ক, নির্জন সাধনায় তাঁকে বেঁধে রাখতে পারে নি। তাঁর ব্রহ্ম একলার ব্রহ্ম নয়— তাঁর ব্রহ্ম শুধু জ্ঞানীর ব্রহ্ম নয়, শুধু ভক্তের ব্রহ্মও নয়, তাঁর ব্রহ্ম নিখিলের ব্রহ্ম; নির্জনে তাঁর ধ্যান, সজনে তাঁর সেবা; অন্তরে তাঁর স্মরণ, বাহিরে তাঁর অনুসরণ; জ্ঞানের দ্বারা তাঁর তত্ত্ব-উপলব্ধি, হৃদয়ের দ্বারা তাঁর প্রতি প্রেম, চরিত্রের দ্বারা তাঁর প্রতি নিষ্ঠা এবং কর্মের দ্বারা তাঁর প্রতি আত্মনিবেদন। এই যে পরিপূর্ণস্বরূপ ব্রহ্ম, সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ উৎকর্ষের দ্বারাই আমরা যাঁর সঙ্গে যুক্ত হতে পারি— তাঁর যথার্থ সাধনাই হচ্ছে তাঁর যোগে সকলের সঙ্গে যুক্ত হওয়া এবং সকলের যোগে তাঁরই সঙ্গে যুক্ত হওয়া— দেহ মন হৃদয়ের সমস্ত শক্তি দ্বারাই তাঁকে উপলব্ধি করা এবং তাঁর উপলব্ধির দ্বারা দেহমন-হৃদয়ের সমস্ত শক্তিকে বলশালী করা— অর্থাৎ পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের পথকে গ্রহণ করা। মহর্ষি তাঁর ব্যাকুলতার দ্বারা এই সম্পূর্ণতাকেই চেয়েছিলেন এবং তাঁর জীবনের দ্বারা একেই নির্দেশ করেছিলেন।

ব্রহ্মের উপাসনা কাকে বলে সে সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য-সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব— তাঁতে প্রীতি করা এবং তাঁর প্রিয়কার্য সাধন করাই তাঁর উপাসনা। এ-কথা মনে রাখতে হবে, আমাদের দেশে ইতিপূর্বে তাঁর প্রতি প্রীতি এবং তাঁর প্রিয়কার্য-সাধন, এই উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছিল। অন্তত

প্রিয়কার্য শব্দের অর্থকে আমরা অত্যন্ত সংকীর্ণ করে এনেছিলুম ; ব্যক্তিগত শুচিতা এবং কতকগুলি আচার পালনকেই আমরা ঈশ্বরের প্রিয়কার্য বলে স্থির করে রেখেছিলুম। কর্ম যেখানে দুঃসাধ্য, যেখানে কঠোর, কর্মে যেখানে যথার্থ বীর্যের প্রয়োজন, যেখানে বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে, যেখানে অমঙ্গলের কণ্টকতরুকে রক্তাক্ত হস্তে সমূলে উৎপাটন করতে হবে, যেখানে অপমান নিন্দা নির্যাতন স্বীকার ক'রে প্রাচীন অভ্যাসের স্থূল জড়ত্বকে কঠিন দুঃখে ভেদ ক'রে জনসমাজের মধ্যে কল্যাণের প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সেইদিকে আমরা দেবতার উপাসনাকে স্বীকার করি নি। দুর্বলতাবশতই এই পূর্ণ উপাসনায় আমাদের অনাস্থা ছিল এবং অনাস্থা ছিল বলেই আমাদের দুর্বলতা এ-পর্যন্ত কেবলই বেড়ে এসেছে। ভগবানের প্রতি প্রীতি ও তাঁর প্রিয়কার্যসাধনের মাঝখানে আমাদের চরিত্রের মজ্জাগত দুর্বলতা যে-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছিল সেই বিচ্ছেদ মিটিয়ে দেবার পথে একদিন মহর্ষি একলা দাঁড়িয়েছিলেন— তখন তাঁর মাথার উপরে বৈষয়িক বিপ্লবের প্রবল ঝড় বইতেছিল এবং চতুর্দিকে বিচ্ছিন্ন পরিবার ও বিরুদ্ধ সমাজের সর্বপ্রকার আঘাত এসে পড়ছিল, তারই মাঝখানে অবিচলিত শক্তিতে একাকী দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর বাক্যে ও ব্যবহারে এই মন্ত্র ঘোষণা করেছিলেন— তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ভারতবর্ষ তার দুর্গতিদুর্গের যে রুদ্ধ দ্বারে শতাব্দীর পর শতাব্দী যাপন করেছে— আপনার ধর্মকে সমাজকে, আপনার আচারব্যবহারকে কেবলমাত্র আপনার কৃত্রিম গণ্ডির মধ্যে বেষ্টিত করে বসে রয়েছে, সেই দ্বার বাইরের পৃথিবীর প্রবল আঘাতে আজ ভেঙে গেছে ; আজ আমরা সকলের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়েছি, সকলের সঙ্গে আজ আমাদের নানাপ্রকার ব্যবহারে আসতে হয়েছে। আজ আমাদের যেখানে চরিত্রের দীনতা, জ্ঞানের সংকীর্ণতা, হৃদয়ের সংকোচ, যেখানে যুক্তিহীন আচারের দ্বারা আমাদের শক্তিপ্রয়োগের পথ পদে পদে বাধাগ্রস্ত হয়ে উঠছে, যেখানেই লোকব্যবহারে ও দেবতার উপাসনায় মানুষের সঙ্গে মানুষের দুর্ভেদ্য ব্যবধানে আমাদের শতখণ্ড করে দিচ্ছে, সেইখানেই আমাদের আঘাতের পর আঘাত, লজ্জার পর লজ্জা পেতে হচ্ছে,— সেইখানেই অকৃতার্থতা বারম্বার আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে ধূলিসাৎ করে দিচ্ছে এবং সেইখানেই প্রবলবেগে চলনশীল মানবস্রোতের অভিঘাত সহ্য করতে না পেরে আমরা মূর্ছিত হয়ে পড়ে যাচ্ছি— এই-রকম সময়েই যে-সকল মহাপুরুষ আমাদের দেশে মঙ্গলের জয়ধ্বজা বহন করে আবির্ভূত হবেন তাঁদের ব্রতই হবে জীবনের সাধনার ও সিদ্ধির মধ্যে সত্যের সেই বৃহৎ সামঞ্জস্যকে সমুজ্জ্বল করে তোলা যাতে ক'রে এখানকার

জনসমাজের সেই সাংঘাতিক বিশ্লিষ্টতা দূর হবে— যে-বিশ্লিষ্টতা এ দেশে অন্তরের সঙ্গে বাহিরের, আচারের সঙ্গে ধর্মের, জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির, বিচারশক্তির সঙ্গে বিশ্বাসের, মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রবল বিচ্ছেদ ঘটিয়ে আমাদের মনুষ্যত্বকে শতজীর্ণ করে ফেলছে।

ধনীগৃহের প্রচুর বিলাসের আয়োজনের মধ্যে জন্মগ্রহণ ক'রে এবং আচারনিষ্ঠ সমাজের কুলক্রমাগত প্রথার মধ্যে পরিবেষ্টিত হয়ে মহর্ষি নিজের বিচ্ছেদকাতর আত্মার মধ্যে এই সামঞ্জস্য-অমৃতের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন ; নিজের জীবনে চিরদিন সমস্ত লাভক্ষতি সমস্ত সুখদুঃখের মধ্যে এই সামঞ্জস্যের সাধনাকে গ্রহণ করেছিলেন এবং বাহিরে সমস্ত বাধাবিরোধের মধ্যে 'শান্তংশিবমদ্বৈতম্' এই সামঞ্জস্যের মন্ত্রটি অকুণ্ঠিত কণ্ঠে প্রচার করেছিলেন। তাঁর জীবনের অবসান পর্যন্ত এই দেখা গেছে যে তাঁর চিত্ত কোনো বিষয়েই নিশ্চেষ্ট ছিল না— ঘরে বাইরে, শয়নে আসনে, আহারে ব্যবহারে, আচারে অনুষ্ঠানে, কিছুতেই তাঁর লেশমাত্র শৈথিল্য বা অমনোযোগ ছিল না। কি গৃহকর্মে কি বিষয়কর্মে, কি সামাজিক ব্যাপারে কি ধর্মানুষ্ঠানে, সুনিয়মিত ব্যবস্থার স্খলন তিনি কোনো কারণেই অল্পমাত্রও স্বীকার করতেন না ; সমস্ত ব্যাপারকেই তিনি ধ্যানের মধ্যে সমগ্রভাবে দেখতেন এবং একেবারে সর্বাঙ্গীণভাবে সম্পন্ন করতেন— তুচ্ছ থেকে বৃহৎ পর্যন্ত যা-কিছুর সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল তার কোনো অংশেই তিনি নিয়মের ব্যভিচার ও সৌন্দর্যের বিকৃতি সহ্য করতে পারতেন না। ভাষায় বা ভাবে বা ব্যবহারে কিছুমাত্র ওজন নষ্ট হলে তৎক্ষণাৎ তাঁকে আঘাত করত। তাঁর মধ্যে যে-দৃষ্টি, যে-ইচ্ছা, যে আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল তা ছোটোবড়ো এবং আন্তরিক বাহ্যিক কিছুকেই বাদ দিত না, সমস্তকেই ভাবের মধ্যে মিলিয়ে নিয়মের মধ্যে বেঁধে কাজের মধ্যে সম্পন্ন ক'রে তুলে তবে স্থির হতে পারত। তাঁর জীবনের অবসান-পর্যন্ত দেখা গেছে, তাঁর ব্রহ্মসাধনা প্রাকৃতিক ও মানবিক কোনো বিষয়কেই অবজ্ঞা করে নি— সর্বত্রই তাঁর ঔৎসুক্য অক্ষুণ্ণ ছিল। বাল্যকালে আমি যখন তাঁর সঙ্গে ড্যালহৌসি পর্বতে একবার গিয়েছিলুম তখন দেখেছিলুম একদিকে যেমন তিনি অন্ধকার রাত্রে শয্যাত্যাগ করে পার্বত্য গৃহের বারান্দায় একাকী উপাসনার আসনে বসতেন, ক্ষণে ক্ষণে উপনিষৎ ও ক্ষণে ক্ষণে হাফেজের গান গেয়ে উঠতেন, দিনের মধ্যে থেকে থেকে ধ্যানে নিমগ্ন হতেন, সন্ধ্যাকালে আমার বালককণ্ঠের ব্রহ্মসংগীত শ্রবণ করতেন— তেমনি আবার জ্ঞান-আলোচনার সহায়স্বরূপ তাঁর সঙ্গে প্রক্টরের তিনখানি জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধীয় বই, কান্টের দর্শন ও গিবনের 'রোমের ইতিহাস' ছিল— তা ছাড়া এদেশের ও ইংলণ্ডের সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র হতে তিনি জ্ঞানে ও কর্মে বিশ্বপৃথিবীতে মানুষের

যা-কিছু পরিণতি ঘটছে, সমস্তই মনে-মনে পর্যবেক্ষণ করতেন। তাঁর চিত্তের এই সর্বব্যাপী সামঞ্জস্যবোধ তাঁকে তাঁর সংসারযাত্রায় ও ধর্মকর্মে সর্বপ্রকার সীমালঙ্ঘন হতে নিয়ত রক্ষা করেছে ;— গুরুবাদ ও অবতারবাদের উচ্ছৃঙ্খলতা হতে তাঁকে নিবৃত্ত করেছে এবং এই সামঞ্জস্যবোধ চিরন্তন সঙ্গীরূপে তাঁকে একান্ত দ্বৈতবাদের মধ্যে পথভ্রষ্ট বা একান্ত অদ্বৈতবাদের কুহেলিকারাজ্যে নিরুদ্দেশ হতে দেয় নি। এই সীমালঙ্ঘনের আশঙ্কা তাঁর মনে সর্বদা কি-রকম জাগ্রত ছিল, তার একটি উদাহরণ দিয়ে আমি শেষ করব। তখন তিনি অসুস্থ শরীরে পার্ক্ স্ট্রীটে বাস করতেন— একদিন মধ্যাহ্নে আমাদের জোড়াসাঁকোর বাটি থেকে তিনি আমাকে পার্ক্ স্ট্রীটে ডাকিয়ে নিয়ে বললেন, "দেখো, আমার মৃত্যুর পরে আমার চিতাভস্ম নিয়ে শান্তিনিকেতনে সমাধি স্থাপনের একটি প্রস্তাব আমি শুনেছি ; কিন্তু তোমার কাছে আমি বিশেষ করে বলে যাচ্ছি, কদাচ সেখানে আমার সমাধিরচনা করতে দেবে না।"— আমি বেশ বুঝতে পারলুম, শান্তিনিকেতন আশ্রমের যে-ধ্যানমূর্তি তাঁর মনের মধ্যে বিরাজ করছিল, সেখানে তিনি যে শান্ত শিব অদ্বৈতের আবির্ভাবকে পরিপূর্ণ আনন্দরূপে দেখতে পাচ্ছিলেন, তার মধ্যে তাঁর নিজের সমাধিস্তম্ভের কল্পনা সমগ্রের পবিত্রতা ও সৌন্দর্যকে স্থূচিবিদ্ধ করছিল— সেখানে তাঁর নিজের কোনো স্মরণচিহ্ন আশ্রমদেবতার মর্যাদাকে কোনোদিন পাছে লেশমাত্র অতিক্রম করে, সেদিন মধ্যাহ্নে এই আশঙ্কা তাঁকে স্থির থাকতে দেয় নি।

এই সাধক যে অসীম শান্তিকে আশ্রয় ক'রে আপনার প্রশান্ত গভীরতার মধ্যে অস্তুতরঙ্গ সমুদ্রের ন্যায় জীবনান্তকাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেই শান্তি তুমি, হে শান্ত, হে শিব! ভক্তের জীবনের মধ্য হতে তোমার সেই শান্তস্বরূপ উজ্জ্বলভাবে আমাদের জীবনে আজ প্রতিফলিত হ'ক। তোমার সেই শান্তিই সমস্ত ভুবনের প্রতিষ্ঠা, সকল বলের আধার। অসংখ্য বহুধা শক্তি তোমার এই নিস্তব্ধ শান্তি হতে উচ্ছ্বসিত হয়ে অসীম আকাশে অনাদি অনন্ত কালে বিকীর্ণ পরিকীর্ণ হয়ে পড়ছে এবং এই অসংখ্যবহুধা শক্তি সীমাহীন দেশকালের মধ্য দিয়ে তোমার এই নিস্তব্ধ শান্তির মধ্যে এসে নিঃশব্দে প্রবেশ লাভ করছে। সকল শক্তি সকল কর্ম সকল প্রকাশের আধার তোমার এই প্রবল বিপুল শান্তি আমাদের এই নানা ক্ষুদ্রতায় চঞ্চল, বিরোধে বিচ্ছিন্ন, বিভীষিকায় ব্যাকুল দেশের উপরে নব নব ভক্তের বাণী ও সাধকের জীবনের ভিতর দিয়ে প্রত্যক্ষরূপে অবতীর্ণ হ'ক। কৃষক যেখানে অলস এবং দুর্বল, যেখানে সে পূর্ণ উদ্যমে তার ক্ষেত্র কর্ষণ করে না, সেইখানেই শস্যের পরিবর্তে আগাছায় দেখতে দেখতে চারিদিক ভরে যায়— সেইখানেই বেড়া ঠিক থাকে না, আল নষ্ট হয়ে যায়, সেইখানেই ঋণের বোঝা

ক্রমশই বেড়ে উঠে বিনাশের দিন দ্রুতবেগে এগিয়ে আসতে থাকে ;— আমাদের দেশেও তেমনি করে দুর্বলতার সমস্ত লক্ষণ ধর্মসাধনায় ও কর্মসাধনায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে— উচ্ছৃঙ্খল কাল্পনিকতা ও যুক্তিবিচারহীন আচারের দ্বারা আমাদের জ্ঞানের ও কর্মের ক্ষেত্র, আমাদের মঙ্গলের পথ, সর্বত্রই একান্ত বাধাগ্রস্ত হয়ে উঠেছে ; সকল-প্রকার অদ্ভুত অমূলক অসংগত বিশ্বাস অতি সহজেই আমাদের চিত্তকে জড়িয়ে জড়িয়ে ফেলছে ; নিজের দুর্বল বুদ্ধি ও দুর্বল চেষ্টায় আমরা নিজে যেমন ঘরে বাহিরে সকল-প্রকার অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে পদে পদেই নিয়মের স্খলন ও অব্যবস্থার বীভৎসতাকে জাগিয়ে তুলি তেমনি তোমার এই বিশাল বিশ্বব্যাপারেও আমরা সর্বত্রই নিয়মহীন অদ্ভুত যথেচ্ছাচারিতা কল্পনা করি— অসম্ভব বিভীষিকা সৃজন করি— সেইজন্যই কোনোপ্রকার অন্ধ সংস্কারে আমাদের কোথাও বাধা নেই— তোমার চরিতে ও অনুশাসনে আমরা উন্মত্ততম বুদ্ধিভ্রষ্টতার আরোপ করতে সংকোচমাত্র বোধ করি নে এবং আমাদের সর্বপ্রকার চিরপ্রচলিত আচারবিচারে মূঢ়তার এমন কোনো সীমা নেই যার থেকে কোনো যুক্তি-তর্কে কোনো শুভবুদ্ধি দ্বারা আমাদের নিবৃত্ত করতে পারে। সেইজন্যে আমরা দুর্গতির ভয়সংকুল সুদীর্ঘ অমাবস্যার রাত্রিতে দুঃখদারিদ্র্য-অপমানের ভিতর দিয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে কেবলই নিজের অন্ধতার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। হে শান্ত, হে মঙ্গল, আজ আমাদের পূর্বাকাশে তোমার অরুণরাগ দেখা দিয়েছে, আলোকবিকাশের পূর্বেই দুটি-একটি ক'রে ভক্তবিহঙ্গ জাগ্রত হয়ে সুনিশ্চিত পঞ্চমস্বরে আনন্দবার্তা ঘোষণা করছে, আজ আমরা দেশের নব উদ্‌বোধনের এই ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গল পরিণামের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসকে শিরোধার্য করে নিয়ে তোমার জ্যোতির্ময় কল্যাণসূর্যের অভ্যুদয়ের অভিমুখে নবীন প্রাণে নবীন আশায় তোমাকে আনন্দময় অভিবাদনে নমস্কার করি।

সন্ধ্যা। ৭ পৌষ ১৩১৭

জাগরণ

প্রতিদিন আমাদের যে-আশ্রমদেবতা আমাদের নানা কাজের আড়ালেই গোপনে থেকে যান, তাঁকে স্পষ্ট করে দেখা যায় না, তিনি আজ এই পুণ্যদিনের প্রথম ভোরের আলোতে উৎসবদেবতার উজ্জ্বল বেশ প'রে আমাদের সকলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন— জাগো, আজ আশ্রমবাসী সকলে জাগো।

যখন আমাদের চোখে-দেখার সঙ্গে বিশ্বের আলোকের যোগ হয়, যখন আমাদের কানে-শোনার সঙ্গে বিশ্বের গানের মিলন ঘটে, যখন আমাদের স্পর্শস্নায়ুর তন্তুতে তন্তুতে

বিশ্বের কত হাজাররকম আঘাতের ঢেউ আমাদের চেতনার উপরে ঢেউ খেলিয়ে উঠতে থাকে, তখনি আমাদের জাগা— আমাদের শক্তির সঙ্গে যখন বিশ্বের শক্তির যোগ দুই দিক থেকেই সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে তখনি জাগা।

অতিথি যেমন নিদ্রিত ঘরের দ্বারে ঘা মারে, সমস্ত জগৎ অহরহ তেমনি করে আমাদের জীবনের দ্বারে ঘা মারছে, বলছে 'জাগো'। প্রত্যেক শক্তির উপরে বিরাট শক্তির স্পর্শ আসছে, বলছে 'জাগো'। যেখানে সেই বড়োর আহ্বানে আমাদের ছোটোটি তখনি সাড়া দিচ্ছে সেইখানেই প্রাণ, সেইখানেই বল, সেইখানেই আনন্দ। আমাদের হাজার তারের বীণার প্রত্যেক তারেই ওস্তাদের আঙুল পড়ছে, প্রত্যেক তারটিকেই বলছে 'জাগো'। যে তারটি জাগছে সেই তারেই সুর, সেই তারেই সংগীত। যে-তার শিথিল, যে-তার জাগছে না, সেই তারে আনন্দ নেই, সেই তারটিকে সেরে-তোলা বেঁধে-তোলার অনেক দুঃখের ভিতর দিয়ে তবে সেই সংগীতের সার্থকতার মধ্যে গিয়ে পৌছতে হয়।

এই-রকম আঘাতের পর আঘাত লেগে আমরা যে কত শত জাগার মধ্যে দিয়ে জাগতে জাগতে এসেছি, তা কি আমরা জানি। প্রত্যেক জাগার সম্মুখে কত নব নব অপূর্ব আনন্দ উদ্ঘাটিত হয়েছে, তা কি আমাদের স্মরণ আছে। জড় থেকে চৈতন্য, চৈতন্য থেকে আনন্দের মাঝখানে স্তরে স্তরে কত ঘুমের পর্দা একটি একটি করে খুলে গিয়েছে, তা অতীত যুগযুগান্তরের পাতায় পাতায় লেখা রয়েছে— মহাকালের দপ্তরের সেই বই কে আজ খুলে পড়তে পারবে। অনন্তের মধ্যে আমাদের এই-যে জাগরণ, এই-যে নানাদিকের জাগরণ— গভীর থেকে গভীরে, উদার থেকে উদারে জাগরণ, এই জাগরণের পালা তো এখনো শেষ হয় নি। সেই চিরজাগ্রত পুরুষ যিনি কালে কালে আমাদের চিরদিন জাগিয়ে এসেছেন— তিনি তাঁর হাজারমহল বিশ্বভবনের মধ্যে আজ এই মনুষ্যত্বের সিংহদ্বারটা খুলে আমাদের ডাক দিয়েছেন— এই মনুষ্যত্বের মুক্ত দ্বারে অনন্তের সঙ্গে মিলনের জাগরণ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে— সেই জাগরণে এবার যার সম্পূর্ণ জাগা হল না, ঘুমের সকল আবরণগুলি খুলে যেতে-না-যেতে মানবজন্মের অবকাশ যার ফুরিয়ে গেল, স কৃপণঃ, সে কৃপাপাত্র।

মনুষ্যত্বের এই-যে জাগা, এও কি একটিমাত্র জাগরণ। গোড়াতেই তো আমাদের দেহশক্তির জাগা আছে— সেই জাগাটাই সম্পূর্ণ হওয়া কি কম কথা। আমাদের চোখকান আমাদের হাতপা তার সম্পূর্ণ শক্তিকে লাভ ক'রে সজাগভাবে শক্তির ক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়েছে, আমাদের মধ্যে এমন কয়জন আছে? তার পর মনের জাগা আছে, হৃদয়ের জাগা আছে, আত্মার জাগা আছে— বুদ্ধিতে জাগা, প্রেমেতে জাগা, ভূমানন্দে জাগা

আছে— এই বিচিত্র জাগায় মানুষকে ডাক পড়েছে— যেখানে সাড়া দিচ্ছে না সেইখানেই সে বঞ্চিত হচ্ছে— যেখানে সাড়া দিচ্ছে সেইখানেই ভূমার মধ্যে তার আত্ম-উপলব্ধি সম্পূর্ণ হচ্ছে, সেইখানেই তার চারিদিকে শ্রী সৌন্দর্য ঐশ্বর্য আনন্দ পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে। মানুষের ইতিহাসে কোন্ স্মরণাতীত কাল থেকে জাতির পর জাতির উত্থানপতনের বজ্রনির্ঘোষে মনুষ্যত্বের প্রত্যেক দ্বারে-বাতায়নে এই মহা-উদ্‌বোধনের আহ্বানবাণী ধ্বনিত হয়ে এসেছে— বলছে, 'ভূমার মধ্যে জাগ্রত হও, আপনাকে বড়ো করে জানো।' বলছে, 'নিজের কৃত্রিম আচারের, কাল্পনিক বিশ্বাসের, অন্ধ সংস্কারের তমিস্র-আবরণে নিজেকে সমাচ্ছন্ন করে রেখো না— উজ্জ্বল সত্যের উন্মুক্ত আলোকের মধ্যে জাগ্রত হও— আত্মানং বিদ্ধি।'

এই-যে জাগরণ, যে-জাগরণে আমরা আপনাকে সত্যের মধ্যে দেখি, জ্যোতির মধ্যে দেখি, অমৃতের মধ্যে দেখি— যে-জাগরণে আমরা প্রতিদিনের স্বরচিত তুচ্ছতার সংকোচ বিদীর্ণ ক'রে আপনাকে পূর্ণতার মধ্যে বিকশিত করে দেখি, সেই জাগরণেই আমাদের উৎসব। তাই আমাদের উৎসবদেবতা প্রতিদিনের নিদ্রা থেকে আজ এই উৎসবের দিনে আমাদের জাগিয়ে তোলবার জন্যে দ্বারে এসে তাঁর ভৈরবরাগিণীর প্রভাতী গান ধরেছেন— আজ আমাদের উৎসব সার্থক হ'ক।

আমরা প্রত্যেকেই একদিকে অত্যন্ত ছোটো আর-একদিকে অত্যন্ত বড়ো। যে-দিকটাতে আমি কেবলমাত্রই আমি— সকল কথাতেই ঘুরে ফিরে কেবলই আমি— কেবল আমার সুখ দুঃখ, আমার আরাম, আমার আয়োজন, আমার প্রয়োজন, আমার ইচ্ছা – যেদিকটাতে আমি সবাইকে বাদ দিয়ে আপনাকে একান্ত করে দেখতে চাই, সেদিকটাতে আমি তো একটি বিন্দুমাত্র, সেদিকটাতে আমার মতো ছোটো আর কে আছে। আর যেদিকে আমার সঙ্গে সমস্তের যোগ, আমাকে নিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিপূর্ণতা, যেদিকে সমস্ত জগৎ আমাকে প্রার্থনা করে, আমার সেবা করে, তার শতসহস্র তেজ ও আলোকের নাড়ীর সূত্রে আমার সঙ্গে বিচিত্র সম্বন্ধ স্থাপন করে,— আমার দিকে তাকিয়ে তার সমস্ত লোকলোকান্তর পরম আদরে এই কথা বলে যে, 'তুমি আমার যেমন এমনটি কোথাও আর-কেউ নেই, অনন্তের মধ্যে তুমিই কেবল তুমি', সেইখানে আমার চেয়ে বড়ো আর কে আছে। এই বড়োর দিকে যখন আমি জাগ্রত হই, সেই দিকে আমার যেমন শক্তি, যেমন প্রেম, যেমন আনন্দ, সেই দিকে আমার নিজের কাছে নিজের উপলব্ধি যেমন পরিপূর্ণ, এমন ছোটোর দিকে কখনোই নয়। সকল স্বার্থের সকল অহংকারের অতীত সেই আমার বড়ো-আমিকে সকলের-চেয়ে-বড়ো-আমির মধ্যে ধরে দেখবার দিনই হচ্ছে আমাদের বড়ো দিন।

জগতে আমাদের প্রত্যেকেরই একটি বিশেষ স্থান আছে। আমরা প্রত্যেকেই একটি বিশেষ আমি। সেই বিশেষত্ব একেবারে অটল অটুট; অনন্ত কালে অনন্ত বিশ্বে আমি যা আর-কেউ তা নয়।

তা হলে দেখা যাচ্ছে এই-যে আমিত্ব ব'লে একটি জিনিস, এর দ্বারাই জগতের অন্য সমস্ত-কিছু হতেই আমি স্বতন্ত্র। আমি জানছি যে আমি আছি, এই জানাটি যেখানে জাগছে সেখানে অস্তিত্বের সীমাহীন জনতার মধ্যে আমি একেবারে একমাত্র। আমিই হচ্ছি আমি, এই জানাটুকুর অতি তীক্ষ্ণ খড়্গের দ্বারা এই কণামাত্র আমি অবশিষ্ট ব্রহ্মাণ্ডকে নিজের থেকে একেবারে চিরবিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে, নিখিল-চরাচরকে আমি এবং আমি-না এই দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছে।

কিন্তু এই-যে ঘর ভাঙাবার মূল আমি, মিলিয়ে দেবার মূলও হচ্ছেন উনি। পৃথক না হলে মিলনও হয় না; তাই দেখতে পাচ্ছি সমস্ত জগৎ জুড়ে বিচ্ছেদের শক্তি আর মিলনের শক্তি, বিকর্ষণ এবং আকর্ষণ, প্রত্যেক অণুপরমাণুর মধ্যে কেবলই পরস্পর বোঝাপড়া করছে। আমার আমির মধ্যেও সেই বিশ্বব্যাপী প্রকাণ্ড দুই শক্তির খেলা;— তার এক শক্তি প্রবল হাত দিয়ে ঠেলে ফেলছে, আর-এক শক্তি প্রবল হাত দিয়ে টেনে নিচ্ছে। এমনি করে আমি এবং আমি-না'র মধ্যে কেবলই আনাগোনার জোয়ারভাঁটা চলেছে। এমনি করে আমি আমাকে জানছি বলেই তার প্রতিঘাতে সকলকে জানছি এবং সকলকে জানছি বলেই তার প্রতিঘাতে আমাকে জানছি। বিশ্ব-আমির সঙ্গে আমার আমির এই নিত্যকালের ঢেউ-খেলাখেলি।

এই এক আমিকে অবলম্বন করে বিচ্ছেদ ও মিলন উভয় তত্ত্বই আছে ব'লে আমি-টুকুর মধ্যে অনন্ত দ্বন্দ্ব। যেদিকে সে পৃথক সেইদিকে তার চিরদিনের দুঃখ, যেদিকে সে মিলিত সেইদিকে তার চিরকালের আনন্দ; যেদিকে সে পৃথক সেইদিকে তার স্বার্থ, সেইদিকে তার পাপ, যেদিকে সে মিলিত সেইদিকে তার ত্যাগ, সেদিকে তার পুণ্য; যেদিকে সে পৃথক সেইদিকেই তার কঠোর অহংকার, যেদিকে সে মিলিত সেইদিকেই তার সকল মাধুর্যের সার প্রেম। মানুষের এই আমির একদিকে ভেদ এবং আর-একদিকে অভেদ আছে বলেই মানুষের সকল প্রার্থনার সার প্রার্থনা হচ্ছে দ্বন্দ্বসমাধানের প্রার্থনা;— অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

সাধক কবি কবীর দুটিমাত্র ছত্রে আমি-রহস্যের এই তত্ত্বটি প্রকাশ করেছেন—

যব হম রহল রহা নহিঁ কোঈ,
হমরে মাহ রহল সব কোঈ।

অর্থাৎ, আমির মধ্যে কিছুই নেই কিন্তু আমার মধ্যে সমস্তই আছে। অর্থাৎ, এই আমি একদিকে সমস্ত হতে পৃথক হয়ে অন্যদিকে সমস্তকেই আমার করে নিচ্ছে।

এই আমার দ্বন্দ্বনিকেতন আমিকে আমার ভগবান নিজের মধ্যে লোপ করে ফেলতে চান না, একে নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে চান। এই আমি তাঁর প্রেমের সামগ্রী ; একে তিনি অসীম বিচ্ছেদের দ্বারা চিরকাল পর করে অসীম প্রেমের দ্বারা চিরকাল আপন করে নিচ্ছেন।

এমন কত কোটি কোটি অন্তহীন আমির মধ্যে সেই এক পরম-আমির অনন্ত আনন্দ নিরন্তর ধ্বনিত তরঙ্গিত হয়ে উঠছে। অথচ এই অন্তহীন আমি-মণ্ডলীর প্রত্যেক আমির মধ্যেই তাঁর এমন একটি বিশেষ রস বিশেষ প্রকাশ যা জগতে আর কোনোখানেই নেই। সেইজন্যে আমি যত ক্ষুদ্রই হই, আমার মতো তাঁর আর দ্বিতীয় কিছুই নেই ; আমি যদি হারাই তবে লোকলোকান্তরের সমস্ত হিসাব গরমিল হয়ে যাবে। সেইজন্যেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আমাকে নইলে নয়, সেইজন্যেই সমস্ত জগতের ভগবান বিশেষরূপেই আমার ভগবান, সেইজন্যেই আমি আছি এবং অনন্ত প্রেমের বাঁধনে চিরকালই থাকব।

আমির এই চরম গৌরবের কথাটি প্রতিদিন আমাদের মনে থাকে না। তাই প্রতিদিন আমরা ছোটো হয়ে, সংসারী হয়ে, সম্প্রদায়বদ্ধ হয়ে থাকি।

কিন্তু মানুষ আমির এই বড়ো দিকের কথাটি দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর ভুলে থেকে বাঁচবে কী করে। তাই প্রতিদিনের মধ্যে-মধ্যে এক-একটি বড়োদিনের দরকার হয়। আগাগোড়া সমস্তই দেয়াল গেঁথে গৃহস্থ বাঁচে না, তার মাঝে-মাঝে জানলা দরজা বসিয়ে সে বাহিরকে ঘরের ও ঘরকে বাহিরের করে রাখতে চায়। বড়োদিনগুলি হচ্ছে সেই প্রতিদিনের দেয়ালের মধ্যে বড়ো দরজা। আমাদের প্রতিদিনের সূত্রে এই বড়োদিনগুলি সূর্যকান্তমণির মতো গাঁথা হয়ে যাচ্ছে ; জীবনের মালায় এই দিনগুলি যত বেশি, যত খাঁটি, যত বড়ো, আমাদের জীবনের মূল্য তত বেশি, আমাদের জীবনে সংসারের শোভা তত বেড়ে ওঠে।

তাই বলছিলুম, আজ আমাদের উৎসবের প্রাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দিকে আশ্রমের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়ে গেছে ; আজ নিখিল মানবের সঙ্গে আমাদের যে-যোগ, সেই যোগটি ঘোষণা করবার রোশনচৌকি এই প্রান্তরের আকাশ পূর্ণ করে বাজছে, কেবলই বাজছে, ভোর থেকে বাজছে। আজ আমাদের এই আশ্রমের ক্ষেত্র সকলেরই আনন্দক্ষেত্র। কেন। কেননা, আমাদের প্রত্যেকের জীবনের সাধনায় সমস্ত মানুষের সাধনা চলছে। এখানকার তপস্যায় সমস্ত পৃথিবীর লোকের ভাগ আছে। আশ্রমের

সেই বড়ো কথাটিকে আজ আমাদের হৃদয়মনের মধ্যে আমাদের জীবনের সমস্ত সংকল্পের মধ্যে পরিপূর্ণ করে নেব।

সকলের সঙ্গে আমাদের এই যোগের সংগীতটি আজ কে বাজাবেন। সেই মহাযোগী, জগতের অসংখ্য বীণাতন্ত্রী যাঁর কোলের উপরে অনন্তকাল ধরে স্পন্দিত হচ্ছে। তিনিই একের সঙ্গে অন্যের, অন্তরের সঙ্গে বাহিরের, জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর, আলোর সঙ্গে অন্ধকারের, যুগের সঙ্গে যুগান্তরের, বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ঘটিয়ে মিলন ঘটিয়ে তুলছেন ; তাঁরই হাতের সেই বিচ্ছেদমিলনের ঝংকারে বৈচিত্র্যের শত শত তান কেবলই উৎসারিত হয়ে আকাশ পরিপূর্ণ করে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে ; একই ধুয়ো থেকে তানের পর তান ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে, এবং একই ধুয়োতে তানের পর তান এসে পরিসমাপ্ত হচ্ছে।

বীণার তারগুলো যখন বাজে না তখন তারা পাশাপাশি পড়ে থাকে, তবুও তাদের মিলন হয় না, তখনো তারা কেউ কাউকে আপন বলে জানে না। যেই বেজে ওঠে অমনি সুরে সুরে তানে তানে তাদের মিলিয়ে দেয়— তাদের সমস্ত ফাঁকগুলো রাগরাগিণীর মাধুর্যে ভরে ভরে ওঠে। তখন তারা স্বতন্ত্র তবু এক,— কেউ-বা লোহার কেউ-বা পিতলের, তবু এক,— কেউ-বা সরু সুরের কেউ-বা মোটা সুরের, তবু এক— তখন তারা কেউ কাউকে আর ছাড়তে পারে না। তাদের প্রত্যেকের ভিতরের সত্য বাণীটি যেই প্রকাশ হয়ে পড়ে অমনি সত্যের সঙ্গে সত্যের, প্রকাশের সঙ্গে প্রকাশের অন্তরতর মিলটি সৌন্দর্যের উচ্ছ্বাসে ধরা পড়ে যায়— দেখা যায় আপনার মধ্যে সুর যতই স্বতন্ত্র হ'ক, গানের মধ্যে তারা এক।

আমাদের জীবনের বীণাতে, সংসারের বীণাতে প্রতিদিন তার বাঁধা চলছে, সুর বাঁধা এগোচ্ছে। সেই বাঁধবার মুখে কত কঠিন আঘাত, কত তীব্র বেসুর। তখন চেষ্টার মূর্তি, কষ্টের মূর্তিটাই বারবার করে দেখা যায়। সেই বেসুরকে সমগ্রের সুরে মিলিয়ে তুলতে এত টান পড়ে যে, এক-একসময় মনে হয় যেন তার আর সইতে পারল না, গেল বুঝি ছিঁড়ে।

এমনি করে চেয়ে দেখতে দেখতে শেষকালে মনে হয়, তবে বুঝি সার্থকতা কোথাও নেই— কেবলই বুঝি এই টানাটানি বাঁধাবাঁধি, দিনের পর দিন কেবলই খেটে মরা, কেবলই ওঠা পড়া, কেবলই অহংযন্ত্রটার অচল খোঁটার মধ্যে বাঁধা থেকে মোচড় খাওয়া —কোনো অর্থ নেই, কোনো পরিণাম নেই— কেবলই দিনযাপন মাত্র।

কিন্তু যিনি আমাদের বাজিয়ে, তিনি কেবলই কি কঠিন হাতে নিয়মের খোঁটায় চড়িয়ে পাক দিয়ে দিয়ে আমাদের সুরই বাঁধছেন। তা তো নয়। সঙ্গে-সঙ্গে মুহূর্তে

মুহূর্তে ঝংকারও দিচ্ছেন। কেবলই নিয়ম? তা তো নয়। তার সঙ্গে-সঙ্গেই আনন্দ। প্রতিদিন খেতে হচ্ছে বটে পেটের দায়ের অত্যন্ত কঠোর নিয়মে, কিন্তু তার সঙ্গে-সঙ্গেই মধুর স্বাদটুকুর রাগিণী রসনায় রসিত হয়ে উঠছে। আত্মরক্ষার বিষম চেষ্টায় প্রত্যেক মুহূর্তেই বিশ্বজগতের শতসহস্র নিয়মকে প্রাণপণে মানতে হচ্ছে বটে, কিন্তু সেই মেনে চলবার চেষ্টাতেই আমাদের শক্তির মধ্যে আনন্দের ঢেউ খেলিয়ে উঠছে। দায়ও যেমন কঠোর, খুশিও তেমনি প্রবল।

সেই আমাদের ওস্তাদের হাতে বাজবার সুবিধেই হচ্ছে ওই। তিনি সব সুরের রাগিণীই জানেন। যে-ক'টি তার বাঁধা হচ্ছে, তাতে যে-ক'টি সুর বাজে, কেবলমাত্র সেই ক'টি নিয়েই তিনি রাগিণী ফলিয়ে তুলতে পারেন। পাপী হ'ক, মূঢ় হ'ক; স্বার্থপর হ'ক, বিষয়ী হ'ক, যে হ'ক-না, বিশ্বের আনন্দের একটা সুরও বাজে না এমন চিত্ত কোথায়। তা হলেই হল; সেই সুযোগটুকু পেলেই তিনি আর ছাড়েন না। আমাদের অসাড়তমেরও হৃদয়ে প্রবল ঝন্‌ঝনার মাঝখানে হঠাৎ এমন একটা-কিছু সুর বেজে ওঠে যার যোগে ক্ষণকালের জন্যে নিজের চারদিককে ছাড়িয়ে গিয়ে চিরন্তনের সঙ্গে মিলে যাই। এমন একটা-কোনো সুর, নিজের প্রয়োজনের সঙ্গে অহংকারের সঙ্গে যার মিল নেই— যার মিল আছে আকাশের নীলিমার সঙ্গে, প্রভাতের আলোর সঙ্গে; যার মিল আছে ত্যাগীর ত্যাগের সঙ্গে, বীরের অভয়ের সঙ্গে, সাধুর প্রসন্নতার সঙ্গে; সেই সুরটি যখন বাজে তখন মায়ের কোলের অতিক্ষুদ্র শিশুটিও আমাদের সকল স্বার্থের উপরে চেপে বসে; সেই সুরেই আমরা ভাইকে চিনি, বন্ধুকে টানি, দেশের কাজে প্রাণ দিই; সেই সুরে সত্য আমাদের দুঃসাধ্য সাধনের দুর্গম পথে অনায়াসে আহ্বান করে; সেই সুর যখন বেজে ওঠে তখন আমরা জন্মদরিদ্রের এই চিরাভ্যস্ত কথাটা মুহূর্তেই ভুলে যাই যে, আমরা ক্ষুধাতৃষ্ণার জীব, আমরা জন্মমরণের অধীন, আমরা স্তুতিনিন্দায় আন্দোলিত; সেই সুরের স্পন্দনে আমাদের সমস্ত ক্ষুদ্র সীমা স্পন্দিত হয়ে উঠে আপনাকে লুকিয়ে অসীমকেই প্রকাশ করতে থাকে। সে সুর যখন বাজে না তখন আমরা ধূলির ধূলি, আমরা প্রকৃতির অতিভীষণ প্রকাণ্ড যন্ত্রটার মধ্যে আবদ্ধ একটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র চাকা, কার্যকারণের শৃঙ্খলে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত। তখন বিশ্বজগতের কল্পনাতীত বৃহত্ত্বের কাছে আমাদের ক্ষুদ্র আয়তন লজ্জিত, বিশ্বশক্তির অপরিমেয় প্রবলতার কাছে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি কুণ্ঠিত। তখন আমরা মাথা হেঁট করে দুই হাত জোড় করে অহোরাত্র ভয়ে ভয়ে বাতাসকে আলোকে সূর্যকে চন্দ্রকে পর্বতকে নদীকে নিজের চেয়ে বড়ো ব'লে দেবতা ব'লে যখন-তখন যেখানে-সেখানে প্রণাম করে করে বেড়াই। তখন আমাদের সংকল্প সংকীর্ণ, আমাদের আশা ছোটো,

আকাঙ্ক্ষা ছোটো, বিশ্বাস ছোটো, আমাদের আরাধ্য দেবতাও ছোটো। তখন কেবল 'খাও— পরো— সুখে থাকো— হেসে খেলে দিন কাটাও' এইটেই আমাদের জীবনের মন্ত্র। কিন্তু সেই ভূমার সুর যখনি বৃহৎ আনন্দের রাগিণীতে আমাদের আত্মার মধ্যে মন্ত্রিত হয়ে ওঠে, তখনি কার্যকারণের শৃঙ্খলে বাঁধা থেকেও আমরা তার থেকে মুক্ত হই, তখন আমরা প্রকৃতির অধীন থেকেও অধীন নই, প্রকৃতির অংশ হয়েও তার চেয়ে বড়ো; তখন আমরা জগৎসৌন্দর্যের দর্শক, জগৎঐশ্বর্যের অধিকারী, জগৎপতির আনন্দভাণ্ডারের অংশী— তখন আমরা প্রকৃতির বিচারক, প্রকৃতির স্বামী।

আজ বাজুক ভূমানন্দের সেই মেঘমন্দ্র সুন্দর ভীষণ সংগীত যাতে আমরা নিজেকে নিজে অতিক্রম করে অমৃতলোকে জাগ্রত হই। আজ আপনার অধিকারকে বিশ্বক্ষেত্রে প্রশস্ত করে দেখি, শক্তিকে বিশ্বশক্তির সহযোগী করে দেখি, মর্তজীবনকে অনন্ত-জীবনের মধ্যে বিধৃতরূপে ধ্যান করি।

বাজে বাজে জীবনবীণা বাজে! কেবল আমার একলার বীণা নয়— লোকে লোকে জীবনবীণা বাজে। কত জীব, তার কত রূপ, তার কত ভাষা, তার কত সুর, কত দেশে, কত কালে —সব মিলে অনন্ত আকাশে বাজে বাজে জীবনবীণা বাজে। রূপ-রস-শব্দ-গন্ধের নিরন্তর আন্দোলনে, সুখদুঃখের জন্মমৃত্যুর আলোক-অন্ধকারের নিরবচ্ছিন্ন আঘাত-অভিঘাতে, বাজে বাজে জীবনবীণা বাজে। ধন্য আমার প্রাণ যে, সেই অনন্ত আনন্দসংগীতের মধ্যে আমারও সুরটুকু জড়িত হয়ে আছে; এই আমি-টুকুর তান সকল-আমির গানে সুরের পর সুর জুগিয়ে মিড়ের পর মিড় টেনে চলেছে। এই আমিটুকুর তান কত সূর্যের আলোয় বাজছে, কত লোকে লোকে জন্মমরণের পর্যায়ের মধ্য দিয়ে বিস্তীর্ণ হচ্ছে, কত নব নব নিবিড় বেদনার মধ্য দিয়ে অভাবনীয় রূপে বিচিত্র হয়ে উঠছে; সকল-আমির বিশ্বব্যাপী বিরাট্‌বীণায় এই আমি এবং আমার মতো এমন কত আমির তার আকাশে আকাশে ঝংকৃত হয়ে উঠছে। কী সুন্দর আমি! কী মহৎ আমি! কী সার্থক আমি!

আজ আমাদের সাম্বৎসরিক উৎসবের দিনে আমাদের সমস্ত মনপ্রাণকে বিশ্বলোকের মাঝখানে উন্মুখ করে তুলে ধ'রে এই কথাটি স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের আশ্রমের প্রতিদিনের সাধনার লক্ষ্যটি এই যে, বিশ্বের সকল স্পর্শে আমাদের জীবনের সকল তার বাজতে থাকবে অনন্তের আনন্দগানে। সংকোচ নেই; কোথাও সংকোচ নেই, কোথাও কিছুমাত্র সংকোচ নেই;— স্বার্থের সংকোচ, ক্ষুদ্র সংস্কারের সংকোচ, ঘৃণাবিদ্বেষের সংকোচ— কিছুমাত্র না। সমস্ত অত্যন্ত সহজ, অত্যন্ত পরিষ্কার, অত্যন্ত খোলা, সমস্তই আলোতে ঝল্‌মল্ করছে— তার উপর বিশ্বপতির

আঙুল যখন যেমনি এসে পড়ছে, অকুণ্ঠিত সুর তৎক্ষণাৎ ঠিকটি বেজে উঠছে। জড় পৃথিবীর জলস্থলের সঙ্গেও তার আনন্দ সাড়া দিচ্ছে, তরুলতার সঙ্গেও তার আনন্দ মর্মরিত হয়ে উঠছে, পশুপক্ষীর সঙ্গেও তার আনন্দের সুর মিলছে, মানুষের মধ্যেও তার আনন্দ কোনো জায়গায় প্রতিহত হচ্ছে না ; সকল জাতির মধ্যে, সকলের সেবার মধ্যে, সকল জ্ঞানে, সকল ধর্মে তার উদার আত্মবিস্মৃত আনন্দ সূর্যের সহস্র কিরণের মতো অনায়াসে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে। সর্বত্রই সে জাগ্রত, সে সচেতন, সে উন্মুক্ত ; প্রস্তুত তার দেহ মন, উন্মুক্ত তার দ্বার বাতায়ন, উচ্ছ্বসিত তার আহ্বানধ্বনি। সে সকলের, এবং সেই বিশ্বরাজপথ দিয়েই সে তাঁর যিনি সকলেরই।

হে অমৃত আনন্দময়, আমার এই ক্ষুদ্র আমিটুকুর মধ্যে তোমার অনন্ত অমৃত আনন্দরূপ দেখবার জন্যে অপেক্ষা করে আছি। কতকাল ধরে যে, তা আমি নিজেও জানি নে, কিন্তু অপেক্ষা করে আছি। যতদিন নিজেকে ক্ষুদ্র বলে জানছি, ছোটো চিন্তায় ছোটো বাসনায় মৃত্যুর বেষ্টনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছি, ততদিন তোমার অমৃতরূপ আমার মধ্যে প্রত্যক্ষ হচ্ছে না। ততদিন আমার দেহে দীপ্তি নেই, মনে নিষ্ঠা নেই, কর্মে ব্যবস্থা নেই, চরিত্রে শক্তি নেই, চারি দিকে শ্রী নেই ; ততদিন তোমার জগদ্‌ব্যাপী নিয়মের সঙ্গে, শৃঙ্খলার সঙ্গে, সৌন্দর্যের সঙ্গে আমার মিল হচ্ছে না। যতদিন আমার এই আমিটুকুর মধ্যে তোমার অনন্ত অমৃতরূপ আনন্দরূপ না উপলব্ধি করছি, ততদিন আমার ভয়ের অন্ত নেই, শোকের অবসান নেই,— ততদিন মৃত্যুকেই চরম ভয় বলে মনে করি, ক্ষতিকেই চরম বিপদ ব'লে গণ্য করি,— ততদিন সত্যের জন্যে সংগ্রাম করতে পারি নে, মঙ্গলের জন্যে প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হই,— ততদিন আত্মাকে ক্ষুদ্র মনে করি বলেই কৃপণের মতো আপনাকে কেবলই পায়ে পায়ে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলতে চাই ; শ্রম বাঁচিয়ে চলি, কষ্ট বাঁচিয়ে চলি, নিন্দা বাঁচিয়ে চলি, কিন্তু সত্য বাঁচিয়ে চলি নে, ধর্ম বাঁচিয়ে চলি নে, আত্মার সম্মান বাঁচিয়ে চলি নে। যতদিন আমার এই আমিটুকুর মধ্যে তোমার অনন্ত অমৃতরূপ আনন্দরূপ না দেখি ততদিন চারিদিকের অনিয়ম, অস্বাস্থ্য, অজ্ঞান, অপূর্ণতা, অসৌন্দর্য, অপমান আমার জড়চিত্তকে আঘাতমাত্র করে না— চতুর্দিকের প্রতি আমার সুগভীর আলস্যবিজড়িত অনাদর দূর হয় না, নিখিলের প্রতি আমার আত্মা পরিপূর্ণ শক্তিতে প্রসারিত হতে পারে না ; ততদিন পাপকে বিমুগ্ধ বিহ্বলভাবে অন্তরের মধ্যে দিনের পর দিন কেবল লালন করেই চলি এবং পাপকে উদাসীন দুর্বলভাবে বাহিরে দিনের পর দিন কেবল প্রশ্রয় দিতেই থাকি— কঠিন এবং প্রবল সংকল্প নিয়ে অকল্যাণের সঙ্গে সংগ্রাম করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে দাঁড়াতে পারি নে ;— কি অব্যবস্থাকে কি অন্যায়কে আঘাত করার জন্যে

প্রস্তুত হই নে, পাছে তার লেশমাত্র প্রতিঘাত নিজের উপরে এসে পড়ে। তোমার অনন্ত অমৃতরূপ আনন্দরূপ আমার এই আমিটুকুর মধ্যে বোধ করতে পারি নে বলেই ভীরুতার অধম ভীরুতা এবং দীনতার অধম দীনতার মধ্যে দিনে দিনে তলিয়ে যেতে থাকি, দেহে-মনে গৃহে-গ্রামে সমাজে-স্বদেশে সর্বত্রই নিদারুণ নৈষ্ফল্য মঙ্গলকে পুনঃ পুনঃ বাধা দিতে থাকে, এবং অতি বীভৎস অচল জড়ত্ব ব্যাধিরূপে দুর্ভিক্ষরূপে, অনাচার ও অন্ধ সংস্কাররূপে, শতসহস্র কাল্পনিক বিভীষিকারূপে, অকল্যাণ ও শ্রীহীনতাকে চারিদিকে স্তূপাকার করে তোলে।

হে ভূমা, আজকের এই উৎসবের দিন আমাদের জাগরণের দিন হ'ক— আজ তোমার এই আকাশে আলোকে বাতাসে উদ্‌বোধনের বিপুল বাণী উদ্গীত হতে থাক্, আমরা অতি দীর্ঘ দীনতার নিশাবসানে নেত্র উন্মীলন করে জ্যোতির্ময় লোকে নিজেকে অমৃতস্য পুত্রাঃ বলে অনুভব করি; আনন্দসংগীতের তালে তালে নির্ভয়ে যাত্রা করি সত্যের পথে, আলোকের পথে, অমৃতের পথে; আমাদের এই যাত্রার পথে আমাদের মুখে চক্ষে, আমাদের বাক্যে মনে, আমাদের সমস্ত কর্মচেষ্টায়, হে রুদ্র, তোমার প্রসন্নমুখের জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক। আমরা এখানে সকলে যাত্রীর দল— তোমার আশীর্বাদ লাভের জন্য দাঁড়িয়েছি; সম্মুখে আমাদের পথ, আকাশে নবীন সূর্যের আলোক, 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' আমাদের মন্ত্র; অন্তরে আমাদের আশার অন্ত নেই,— আমরা মানব না পরাভব, আমরা জানব না অবসাদ, আমরা করব না আত্মার অবমাননা, চলব দৃঢ়পদে অসংকুচিত চিত্তে— চলব সমস্ত সুখদুঃখের উপর দিয়ে, সমস্ত স্বার্থ এবং দৈন্য এবং জড়তাকে দলিত ক'রে— তোমার বিশ্বলোকে অনাহত তূরীতে জয়বাদ্য বাজতে থাকবে, চারিদিক থেকে আহ্বান আসতে থাকবে 'এসো, এসো, এসো'— আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে খুলে যাবে চির জীবনের সিংহদ্বার— কল্যাণ, কল্যাণ, কল্যাণ— অন্তরে বাহিরে কল্যাণ— আনন্দম্ আনন্দম্, পরিপূর্ণমানন্দম্।

গ্রন্থপরিচয়

[রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশের তারিখ ও গ্রন্থসংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য গ্রন্থপরিচয়ে সংকলিত হইল। এই খণ্ডে মুদ্রিত কোনো কোনো রচনা সম্বন্ধে কবির নিজের মন্তব্যও এই বিভাগে মুদ্রিত হইল। পূর্ণতর তথ্যসংগ্রহ সর্বশেষ খণ্ডে একটি পঞ্জীতে প্রকাশিত হইবে।]

মহুয়া

মহুয়া ১৩৩৬ সালের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হয়।

বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপির সাহায্যে মহুয়ার বর্তমান সংস্করণে অনেক কবিতার রচনাস্থান নির্দিষ্ট হইল, এবং রচনাতারিখ ও পাঠ পরিবর্তিত ও সংশোধিত হইল।

নির্ঝরিণী, শুকতারা, অচেনা, পথের বাঁধন, বাসরঘর, বিদায়, প্রণতি, নৈবেদ্য, অশ্রু, অন্তর্ধান— এই দশটি কবিতা শেষের কবিতা[১] উপন্যাসের জন্য লিখিত হইলেও 'ভাবানুষঙ্গবশত মহুয়াতেও মুদ্রিত হইয়াছে'। রচনাবলী-সংস্করণে মহুয়ার সেই রূপ অপরিবর্তিত রাখা হইল।

মহুয়ার প্রথম সংস্করণের পাঠপরিচয়ে পাদটীকায় জানানো হইয়াছে যে, 'বিচ্ছেদ' ও 'বিরহ' শেষের কবিতার জন্য লিখিত হইলেও ওই উপন্যাসে ব্যবহৃত হয় নাই।

পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত কয়েকটি কবিতার মূল বা স্বতন্ত্র পাঠ নিম্নে মুদ্রিত হইল :

৩ শুধায়ো না মোর গান
কারে করেছিনু দান
পথধুলা-'পরে আছে তারি তরে
যার কাছে পাবে মান।

২ যে সেই ধুলার ফুলে
হার গেঁথে লয় তুলে,—
হেলার সে-ধন হয়-যে ভূষণ
তাহারি মাথার চুলে।

১ দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্র-রচনাবলী দশম খণ্ড।

১ ফুল ছিঁড়ে লয় হাওয়া,
সে পাওয়া মিথ্যে পাওয়া—
আনমনে তার পুষ্পের ভার
ধুলায় ছড়িয়ে যাওয়া।

[১৯২৭]

উৎসর্গ-কবিতাটির পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত বর্জনচিহ্নিত প্রথম পাঠ ; পরে পার্শ্ববর্তী সংখ্যানুযায়ী শ্লোকগুলির ক্রম পরিবর্তিত হইয়াছিল।

উজ্জীবন

ভস্ম-অপমানশয্যা ছাড়ো, পুষ্পধনু,
রুদ্র অগ্নি হতে লহো জ্বলদর্চি তনু।
যাহা মরণীয় যাক ম'রে,
জাগো চিরস্মরণীয় ধ্যানমূর্তি ধ'রে।
যাহা স্থূল, যাহা ক্লান্ত তব,
অঙ্গ সাথে দগ্ধ হ'ক, হও নিত্যনব।
মৃত্যু হতে জাগো, পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু।

বন্ধু তব দৈত্যজয়ী দেব বজ্রপাণি,
পুষ্পচ্ছলে তাঁরি অগ্নি দাও তুমি আনি।
সেই দিব্য দীপ্যমান দাহ
অন্তরে করুক ক্ষুব্ধ দুঃখের প্রবাহ।
মিলনেরে করুক প্রখর,
বিচ্ছেদেরে ক'রে দিক দুঃসহ সুন্দর।
মৃত্যু হতে ওঠো, পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু।

সংকটবন্ধুর তব দীর্ঘ রাজপথ—
সে-দুর্গমে চলুক প্রেমের জয়রথ।

তিমিরতোরণ রজনীর
স্পন্দিবে আহ্বানে মোর নির্ঘোষগম্ভীর।
যাক দূরে দ্বিধা লজ্জা ত্রাস—
আয় বক্ষে সর্বনাশা প্রচণ্ড উল্লাস।
মৃত্যু হতে ওঠো, পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু।

তপতী নাটকের প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত (পৃ. ৫২-৫৪) অনেকাংশে-পৃথক পাঠ।

উজ্জীবন

উত্তীর্ণ হয়েছ তুমি ধূর্জটির ক্রোধবহ্নিশিখা
হে মন্মথ, মনসিজ, হে মনের মায়ামরীচিকা,—
তৃষ্ণামরুবিহারে বিলাস,—
পুরাও পুরাও অভিলাষ।

দহনে দ্বিগুণ দীপ্তি লভিল দাহনশক্তি তব,
পুরাতনে ভস্ম করি বাহির হয়েছ নিত্যনব—
দুঃখে তব দুর্জয় বিকাশ—
পুরাও পুরাও অভিলাষ।

পুষ্পের প্রচ্ছন্ন তলে ইন্দ্রের যে বজ্র কর চুরি
মিলন করুক তীব্র, বিরহের দুঃসহ মাধুরী
শান্তি মোর করুক বিনাশ—
পুরাও পুরাও অভিলাষ।

নিন্দাকণ্টকিত পথে জয়যাত্রা অতন্দ্র অধীর
আনন্দে সার্থক করো— দাও মোরে বিশ্ববিস্মৃতির
সর্বনাশা প্রচণ্ড উল্লাস—
পুরাও পুরাও অভিলাষ।

'তপতী'র পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত সম্পূর্ণ-স্বতন্ত্র পাঠ। অসম্পূর্ণ ?

বরণডালা

আজি এই মম সকল ব্যাকুল
অঙ্গ-মাঝে
ওহে নিরুপম, তোমার স্তবের
ছন্দ বাজে।

এই বসন্তে লতায় লতায়
পাতায় ফুলে
বাণীহিল্লোল মিলিছে তোমার
চরণমূলে।
আমার দেহের বাণীতে সে দোল
উঠিছে দুলে।
দিনু পূজা মম, নাহি যদি লও
মরিব লাজে।
ওহে নিরুপম, তোমার স্তবের
ছন্দ বাজে।

তরু হতে ফুল আনি নাই আমি
আনি নি ফল।
দেশ দেশ হতে আনি নি ভরিয়া
তীর্থজল।
আমার আপন তনুতে উছলে
অধরা ধারা,
অধীরতা তার তোমারি মাঝারে
হ'ক-না সারা।
ঘনযামিনীর আঁধারে যেমন
ঝলিছে তারা
দেহ ঘেরি মম প্রাণের চমক
তেমনি রাজে।

ওহে নিরুপম, তোমার স্তবের
ছন্দ বাজে।

বৈশাখ ১৩৩৩

সম্ভবতঃ ইহা পূর্বপাঠ। কবির 'বৈকালী' গ্রন্থে (৪২ পৃ.) প্রাপ্ত। নটীর পূজা নাটকের 'আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো' গানটির সহিত সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

বরণ

পুরাণে কাহিনী শুনিয়াছি
দময়ন্তী নিয়েছিল বাছি
মানবেরে, ছদ্মবেশী দেবতার মাঝে।
অর্ঘ্যহারা দেবতারা চলে গেল লাজে।
রাজকন্যা চিনেছে সেদিন
দেবমূর্তি, সে যে ছায়াহীন।

তাই শুনে একা বসে বসে
ভেবেছিনু বালিকাবয়সে—
আমি লব স্বয়ম্বরে বরি দেবতারে,
সর্বমানবের মাঝে চিনিব তাহারে ;
তারি লাগি মোর দেহে মনে
বরমাল্য গাঁথিব যতনে।

বুঝি নি, কঠিন মোর পণ
কেমনে যে করিব সাধন।
কত-না মানুষ ফেরে দেবতার বেশে
লয়ে পুজারির দল দেশ হতে দেশে।
হেথা হোথা দিনে দিনে তাই
দ্বিধা লয়ে ফিরেছি সদাই।

খরতর রৌদ্রের বেলায়
জনতার মুখর মেলায়

দাঁড়ালেম একদিন রাজপথ-পাশে,
চেয়ে চেয়ে দেখিলাম যারা যায় আসে।
দেখিলাম যতটুকু কায়া
তার চেয়ে দীর্ঘতর ছায়া।

স্পর্ধাতীক্ষ্ণ কত কণ্ঠস্বর
শুনিলাম ভেদিছে অম্বর।
দেখিনু দীনের মূর্তি উজ্জ্বল সজ্জায়,
ধনসমারোহে তারে ঢাকিল লজ্জায়;
যতই ছুটায় অশ্বরথ
সঙ্গে ওড়ে ধূলির পর্বত।

সেদিন সবার ঠেলাঠেলি
নানা শব্দে উঠিল উদ্বেলি।
তুমি পথপ্রান্তে একা ছিলে হাস্যমুখে
নিঃশব্দে দেখিতেছিলে নিস্তব্ধ কৌতুকে;
হৃদয় আছিল জনস্রোতে,
মন ছিল দূরে সবা হতে।

বহে গেল জনতার ঢেউ।
তোমা-পানে চাহে নাই কেউ।
কেবল একেলা আমি দেখেছি তোমারে,
তুমিই ফেল নি ছায়া ছায়ার মাঝারে।
মালা হাতে কাছে গেনু ধেয়ে,
হাসিলে আমার মুখে চেয়ে।

২৫ অগস্ট, ১৯২৮
চৌরঙ্গি

পাণ্ডুলিপিতে-প্রাপ্ত স্বতন্ত্র পাঠ।

মহুয়া

রে মহুয়া, নামখানি গ্রাম্য তোর, লঘু ধ্বনি তার,
প্রাণ তোর উচ্চশির রহে রাজকুলবনিতার
মর্যাদা বহিয়া। হেরিয়াছি তোরে শালবীথিকায়
বনস্পতিসভা-মাঝে, সজ্জা তোর প্রচুর ছায়ায়
লুণ্ঠিত তৃণের 'পরে; বিপুল পল্লবঘন স্তরে
আগন্তুক বিহঙ্গমে সংগীতগুণীর সমাদরে
ডেকে নিস উদার আশ্রয়ে। উঠে যবে হুহুংকার
ক্রুদ্ধ কালবৈশাখীর, গর্ব জাগে শাখাপ্রশাখার,
তর্জনে গর্জিয়া উঠে দৃপ্তবলে রাখে আশ্রিতেরে।
অনাবৃষ্টিশীর্ণ দিনে বনের প্রাঙ্গণ হতে ফেরে
বুভুক্ষু অতিথি যবে, বন্য নারী আসে তোর পথে,
দুর্ভিক্ষের ভিক্ষাঞ্জলি পূর্ণ করি দিস সদাব্রতে।
যে-বধূরে ভাবি মনে, কানে-কানে কহি আমি তোরে—
যদি তার দেখা পাই ডাকিব মহুয়া নাম ধ'রে।

২ সেপ্টেম্বর ১৯২৮

পাণ্ডুলিপিতে-প্রাপ্ত বর্জনচিহ্নাঙ্কিত প্রথম পাঠ।

বিরহ ও অন্তর্ধান

শঙ্কিত আলোক নিয়ে দিগন্তে উদিল শীর্ণ শশী,
অরণ্যে শিরীষশাখে অকস্মাৎ উঠিল উচ্ছ্বসি
বসন্তের হাওয়ার খেয়াল,—
ব্যথায় নিবিড় হল শেষ কথা কহিবার কাল।

গোধূলির গীতিশূন্য স্তম্ভিত প্রহরখানি বেয়ে
গেলে তুমি দূর পথে, নির্নিমেষ রহিলাম চেয়ে।
ধীরে ধীরে বনান্তে মিলালো
প্রান্তরের প্রান্ততটে অস্তশেষ ক্ষীণ পাংশু আলো।

তব অন্তর্ধানে তব হেরিলাম রূপ চিরন্তন,
অন্তরে অলক্ষ্যলোকে তোমার পরম আগমন।
লভিলাম চিরস্পর্শমণি ;
তোমার শূন্যতা তুমি পরিপূর্ণ করেছ আপনি।

যে-দ্বার খুলিয়া গেলে রুদ্ধ সে হবে না কোনোমতে,
কান পাতি রহে তব ফিরিবার প্রত্যাশার পথে—
তোমার অমূর্ত আসাযাওয়া
যে পথে চঞ্চল করে দিগ্‌বালার অঞ্চলের হাওয়া।

বসন্তে মাঘের অন্তে আম্রবনে মুকুলমত্ততা
মধুপগুঞ্জনে মিশি আনে কোন্ কানে-কানে কথা।
মোর নাম তব কণ্ঠে ডাকা
ক্ষান্ত আজি তাপক্লান্ত দিনান্তের মৌন দিয়ে ঢাকা।

বিরহের সঙ্গহীন স্তব্ধতার গভীর নিভৃতে
বাক্যহারা চিত্তে মোর এতদিনে পাইনু শুনিতে
তুমি কবে মর্ম-মাঝে পশি
দিলে অনির্বচনীয় ধ্যানমন্ত্রবাণী মহীয়সী।

অন্তরের অন্ধকারে এতদিনে পাইনু সন্ধান
সন্ধ্যার দেউলদীপ চিত্তে মোর তোমারি সে দান।
বিচ্ছেদের হোমবহ্নি হতে
পূজামূর্তি ধরি প্রেম দেখা দিল দুঃখের আলোতে।

২৬ আষাঢ় ১৩৩৫

'বিরহ' ও 'অন্তর্ধান' কবিতাদুটির পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত একীকৃত আকারের প্রাথমিক পাঠ।

'দায়মোচন' কবিতাটির প্রথম শ্লোকের পরে পাণ্ডুলিপিতে নিম্নোদ্ধৃত একটি সম্পূর্ণ নূতন শ্লোক আছে :

শ্রাবণের বর্ষণে যা দিয়েছে ঢালি,
দান সেই অল্প তো নয়।

ফাল্গুনে ধরণীর যৌবনডালি
ভরে সেই রসসঞ্চয়।
তার পরে আশ্বিনে মেঘ উদাসীন
শূন্য গগনতলে সম্বলহীন ;—
স্বচ্ছ প্রভাতে ধরা চাহে তার পানে,
বিদায়ঋতুরে নাহি ডরে।
আলোতে শিশিরে আর সৌরভে প্রাণে
গৌরবে বিচ্ছেদ ভরে।

'সাগরিকা' কবিতাটির মহুয়ায় প্রচলিত পাঠে নিম্নমুদ্রিত একটি সম্পূর্ণ স্তবক বর্জিত হইয়াছে। পাণ্ডুলিপি ও মাসিক পত্রে (প্রবাসী, ১৩৩৪ পৌষ) প্রাপ্ত এই স্তবকটির স্থান বর্তমান পাঠের চতুর্থ স্তবকের পরে :

পরের দিনে তরুণ উষা বেণুবনের আগে
জাগিল যবে নব অরুণরাগে,—
নীরবে আসি দাঁড়ানু তব আঙন-বাহিরেতে,
শুনিনু কান পেতে,
গভীর স্বরে জপিছ কোন্‌খানে
উদ্‌বোধনমন্ত্র যাহা নিয়েছ তব কানে,
একদা দোঁহে পড়েছি যেই মোহমোচন বাণী
মহাযোগীর চরণ স্মরি' যুগল করি' পাণি।

'বিদায়সম্বল' কবিতাটির প্রচলিত পাঠে বর্জিত শেষ শ্লোকটি পাণ্ডুলিপি ও বিচিত্রা (১৩৩৪ কার্তিক) হইতে নিম্নে সংকলিত হইল :

যাবার দিকের পথিক যখন
শেষ কাঁদা শেষ হাসা
মিটায়ে চলিছে, থাক্‌-না তখন
মিছে ওইটুকু আশা।
বিদায়ের আগে সজল আঁখিতে
উঠুক ঘনিয়া ক্ষণিকের গীতে
'ভুলিব না কভু' এই কথাটিতে
অন্তিম ভালোবাসা।

মহুয়ার কয়েকটি কবিতার পরিবর্তিত সংগীতরূপ প্রথম সংস্করণ গীতবিতানের তৃতীয় খণ্ডেই (শ্রাবণ ১৩৩৯) পাওয়া যায়।

কবিতা		গানের প্রথম পংক্তি	গী. বি. পৃষ্ঠা
বিজয়ী	-	বিরস দিন, বিরল কাজ	৮০৪
সন্ধান	-	আমার নয়ন তোমার নয়নতলে	৭৫৫
মুক্তি	-	চপল তব নবীন আঁখি দুটি	৭৯২
উদ্‌ঘাত	-	জানি তোমার অজানা নাহি গো	৭৯৪
নিবেদন	-	কাহার গলায় পরাবি গানের	৮৩৩
গুপ্তধন	-	আরো একটু বোসো তুমি	৮২৭
পুরাতন	-	অনেকদিনের আমার যে-গান	৭৬৬

প্রত্যাশা, সন্ধান, বরণডালা, নিবেদন, নির্ভয়, গুপ্তধন, অবশেষ—মহুয়ার এই সাতটি কবিতাতেও রবীন্দ্রনাথ সুর দিয়াছিলেন; দ্বিতীয় সংস্করণ গীতবিতানের দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

১৩৩৬ সালে গ্রন্থপ্রকাশের অব্যবহিত পূর্বে মহুয়া সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে-পত্র লিখিয়াছিলেন নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল :

লেখার বিষয়টা ছিল সংকল্প করা—প্রধানত প্রজাপতির উদ্দেশে—আর তাঁরই দালালি করেন যে-দেবতা তাঁকেও মনে রাখতে হয়েছিল। অতএব 'মহুয়া'র কবিতাকে ঠিক আমার হালের কবিতা বলে শ্রেণীবদ্ধ করা চলে না। ভেবে দেখতে গেলে এটা কোনো কালবিশেষের নয়, এটা আকস্মিক। আমার সত্যিকার আধুনিক কবিতার সঙ্গে যদি এদের এক পংক্তিতে বসাও তা হলে তাদের বর্ণভেদ অত্যন্ত পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে কিছু যেন অত্যুক্তি করা হল। ফরমাশ ব্যাপারটা মোটরগাড়ির স্টার্টারের মতো। চালনাটা শুরু করে দেয় কিন্তু তার পরে মোটরটা চলে আপন মোটরিক প্রকৃতির তাপে। প্রথম ধাক্কাটা একেবারেই ভুলে যায়। মহুয়ার কবিতাগুলিও লেখবার বেগে ফরমাশের ধাক্কা নিঃসন্দেহই সম্পূর্ণ ভুলেছে—কল্পনার আন্তরিক তড়িৎ-শক্তি আপন চিরন্তনী প্রেরণায় তাদের চালিয়ে নিয়ে গেছে। প্রথম হাতল ঘোরানো হতেও পারে বাইরের থেকে, কিন্তু সচলতা শুরু হবামাত্রই লেখবার আনন্দই সারথি হয়ে বসে। এইজন্য আমার বিশ্বাস, তোমরা এই লেখার মধ্যে নতুন কিছু পাবে, আকারে এবং প্রকারে। নতুন লেখার ঝোঁক যখন চিত্তের মধ্যে এসে

পড়ে তখন তারা পূর্বদলের পুরানো পরিত্যক্ত বাসায় আশ্রয় নিতে চায় না; নতুন বাসা না বাঁধতে পারলে তাদের মানায় না, কুলোয় না। ক্ষণিকার বাসা আর বলাকার বাসা এক নয়।

আমি নিজে মহুয়ার কবিতার মধ্যে দুটো দল দেখতে পাই। একটি হচ্ছে নিছক গীতিকাব্য, ছন্দ ও ভাষার ভঙ্গীতেই তার লীলা। তাতে প্রণয়ের প্রসাধনকলা মুখ্য। আর-একটিতে ভাবের আবেগ প্রধান স্থান নিয়েছে, তাতে প্রণয়ের সাধনবেগই প্রবল।

মহুয়ার 'মায়া' নামক কবিতায় প্রণয়ের এই দুই ধারার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। প্রেমের মধ্যে সৃষ্টিশক্তির ক্রিয়া প্রবল। প্রেম সাধারণ মানুষকে অসাধারণ ক'রে রচনা করে— নিজের ভিতরকার বর্ণে রসে রূপে। তার সঙ্গে যোগ দেয় বাইরের প্রকৃতি থেকে নানা গান গন্ধ, নানা আভাস। এমনি ক'রে অন্তর-বাহিরের মিলনে চিত্তের নিভৃত লোকে প্রেমের অপরূপ প্রসাধন নির্মিত হতে থাকে— সেখানে ভাবে ভঙ্গীতে সাজে সজ্জায় নূতন নূতন প্রকাশের জন্য ব্যাকুলতা, সেখানে অনির্বচনীয়ের নানা ছন্দ, নানা ব্যঞ্জনা। একদিকে এই প্রসাধনের বৈচিত্র্য, আর-একদিকে এই উপলব্ধির নিবিড়তা ও বিশেষত্ব। মহুয়ার কবিতা চিত্তের সেই মায়ালোকের কাব্য, তার কোনো অংশে ছন্দে ভাষায় ভঙ্গীতে এই প্রসাধনের আয়োজন, কোনো অংশে উপলব্ধির প্রকাশ।

এই দুয়ের মধ্যে নূতনের বাসন্তিক স্পর্শ নিশ্চয় আছে— নইলে লিখতে আমার উৎসাহ থাকত না। তুমি তো জানই কত অল্প সময়ের মধ্যে এগুলি সমাধা করেছি। তার কারণ প্রবর্তনার বেগ মনে সতেজ ছিল। তাই অন্যমনস্ক-ভাবে এই পত্রের পূর্বাংশে তোমাকে যা লিখেছি অপরাংশে তার প্রতিবাদ করতে হল। বলেছিলুম এ লেখাগুলি আকস্মিক। ভুলেছিলুম সব কবিতাই যখনি লেখা যায় তখনি আকস্মিক। সব কবিতা বললে হয়তো বেশি বলা হয়। এক-একটা সময়ে এক-একটা নতুন ঝোঁকের কবিতা। বারো মাসে পৃথিবীর ছয় ঋতু বাঁধা, তাদের পুনরাবর্তন ঘটে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, একবার আমার মন থেকে যে-ঋতু যায়, সে আর-এক অপরিচিত ঋতুর জন্যে জায়গা ক'রে বিদায় গ্রহণ করে। পূর্বকালের সঙ্গে কিছু মেলে না, এ হতেই পারে না, কিন্তু সে যেন শরতের সঙ্গে শীতের মিলনের মতো। মনের যে-ঋতুতে মহুয়া লেখা সে আকস্মিক ঋতুই, ফর্মাসের ধাক্কায় আকস্মিক নয়, স্বভাবতই আকস্মিক। এগুলি যখন লিখছিলুম অপূর্বকুমার[1] প্রায় রোজ এসে শুনে যেত, সে যে-উত্তেজনা প্রকাশ করত সেটা

১ শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ

অপূর্বতারই উত্তেজনা। রূপের দিকে বা ভাবের দিকে একটা-কিছু নতুন পাচ্ছে বলেই তার আগ্রহ— তখন সুধীন্দ্র দত্তও ছিল তার সঙ্গী। তার থেকে আমার বিশ্বাস আপনার এই সমর্থন পেত যে, মনের মধ্যে রচনার একটি বিশেষ ঋতুর সমাগম হয়েছে— তাকে পূরবীর ঋতু বা বলাকার ঋতু বললে চলবে না।

পূরবী ও মহুয়ার মাঝখানে আর-একদল কবিতা আছে— সেগুলি অন্য জাতের। তাদের মধ্যে নটরাজ ও ঋতুরঙ্গই প্রধান। নৃত্যাভিনয়ের উপলক্ষ নিয়ে এগুলি রচিত হয়েছিল কিন্তু এরাও স্বভাবতই উপলক্ষকে অতিক্রম করেছে। আর কোনো-খানেই শান্তিনিকেতনের মতো ঋতুর লীলারঙ্গ দেখি নি— তারই সঙ্গে মানবভাষায় উত্তর প্রত্যুত্তর কিছুকাল থেকে আমার চলছে। তার রীতিমত শুরু হয়েছে শারদোৎসবে— তার পরে ঋতুগীতির প্রবাহ বেয়ে এসে পড়েছিল ঋতুরঙ্গে। বিষয় এক তবু প্রভেদ যথেষ্ট। সেই প্রভেদ যদি না থাকত তা হলে লেখবার উৎসাহই থাকত না। মহুয়ার কবিতা যখন পড়বে তখন আমার স্বভাবের এই কথাটা মনে রেখো। এই বইয়ের প্রথমে ও সব-শেষে যে-গুটিকয়েক কবিতা আছে সেগুলি মহুয়া পর্যায়ের নয়। সেগুলি ঋতু-উৎসব পর্যায়ের। দোলপূর্ণিমায় আবৃত্তির জন্যেই এদের রচনা করা হয়েছিল। কিন্তু নববসন্তের আবির্ভাবই মহুয়া কবিতার উপযুক্ত ভূমিকা ব'লে নকিবের কাজে ওদের এই গ্রন্থে আহ্বান করা হয়েছে।

মহুয়া নামটা নিয়ে তোমার মনে একটা দ্বিধা হয়েছিল জানি। কাব্যের বা কাব্যসংকলন-গ্রন্থের নামটাকে ব্যাখ্যামূলক করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। নামের দ্বারা আগেভাগে কবিতার পরিচয়কে সম্পূর্ণ বেঁধে দেওয়াকে আমি অত্যাচার মনে করি। কবিতার অতিনির্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রায়ই দেওয়া চলে না। আমি ইচ্ছা করেই মহুয়া নামটি দিয়েছি, নাম পাছে ভাষ্যরূপে কর্তৃত্ব করে এই ভয়ে। অথচ কবিতাগুলির সঙ্গে মহুয়া নামের একটুখানি সংগতি আছে— মহুয়া বসন্তেরই অনুচর, আর ওর রসের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে উন্মাদনা। যাই হ'ক, অর্থের অত্যন্ত বেশি সুসংগতি নেই বলেই কাব্যগ্রন্থের পক্ষে এ নামটি উপযুক্ত বলে আমি বিশ্বাস করি।"

কবির স্বহস্তাঙ্কিত নামপত্র এবং উৎসর্গকবিতাটি প্রচলিত সংস্করণের মতো রচনাবলী-সংস্করণ মহুয়াতেও মুদ্রিত হইল।

বনবাণী

বনবাণী ১৩৩৮ সালের আশ্বিন মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। রচনাবলী-সংস্করণে গ্রন্থটির 'বনবাণী' এবং 'বৃক্ষরোপণ উৎসব' কেবল এই দুইটি কবিতা-অংশ

মুদ্রিত হইল। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপির সাহায্যে অনেক কবিতার রচনাকাল ও পাঠ সংশোধিত এবং রচনাস্থান নির্দিষ্ট হইল।

বনবাণীর ভূমিকাটি শ্রীতেজেশচন্দ্র সেনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রের[১] পরিমার্জিত রূপ। 'কুটিরবাসী' কবিতার ভূমিকায় ইনিই 'তরুবিলাসী তরুণবন্ধু' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

পাণ্ডুলিপিতে উক্ত কবিতাটির আরম্ভে নিম্নমুদ্রিত তিনটি অতিরিক্ত শ্লোক আছে :

বাসাটি বেঁধে আছ
মুক্তদ্বারে
বটের ছায়াটিতে
পথের ধারে।
সমুখ দিয়ে যাই ; মনেতে ভাবি
তোমার ঘরে ছিল আমারো দাবি,
হারায়ে ফেলেছি সে
ঘূর্ণিবায়ে
অনেক কাজে আর
অনেক দায়ে।

এখানে পথে-চলা
পথিক জনা
আপনি এসে বসে
অন্যমনা।
তাহার বসা সেও চলারই তালে,
তাহার আনাগোনা সহজ চালে,
আসন লঘু তার
অল্প বোঝা,
সোজা সে চলে আসে,
যায় সে সোজা।

আমি যে ফাঁদি ভিত
বিরাম ভুলি',

১ দ্রষ্টব্য : 'গাছপালার প্রতি ভালোবাসা'— প্রবাসী, ১৩৩৪ বৈশাখ।

চূড়ার 'পরে চূড়া
আকাশে তুলি।
আমি যে ভাবনার জটিল জালে
বাঁধিয়া নিতে চাই সুদূর কালে,
সে-জালে আপনারে
জড়াই ঠেসে,
পথের অধিকার
হারাই শেষে।

'শাল' কবিতার ভূমিকায় 'কিশোর কবিবন্ধু' বলিয়া যাঁহার উল্লেখ আছে, তিনি পরলোকগত কবি সতীশচন্দ্র রায় (১২৮৮-১৩১০)[১]।

বৃক্ষরোপণ-উৎসব শান্তিনিকেতনে প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ৩০ আষাঢ় ১৩৩৫ সালে (১৪ জুলাই ১৯২৮)। শ্রীপ্রতিমা ঠাকুরকে একটি পত্রে (৯ শ্রাবণ ১৩৩৫)[২] রবীন্দ্রনাথ প্রথমবারের উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন :

…এখানে হল বৃক্ষরোপণ, শ্রীনিকেতনে হল হলচালন।… তোমার টবের বকুলগাছটাকে নিয়ে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানটা হল। পৃথিবীতে কোন গাছের এমন সৌভাগ্য কল্পনা করতে পার না। সুন্দরী বালিকারা সুপরিচ্ছন্ন হয়ে শাঁখ বাজাতে বাজাতে গান গাইতে গাইতে গাছের সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞক্ষেত্রে এল— শাস্ত্রীমশায় সংস্কৃত শ্লোক আওড়ালেন— আমি একে একে ছটা কবিতা পড়লুম— মালা দিয়ে চন্দন দিয়ে ধূপধুনো জ্বালিয়ে তার অভ্যর্থনা হল।… তার পরে বর্ষামঙ্গল গান হল— আমি এই উপলক্ষ্যে ছোটো একটি গল্প[৩] লিখেছিলুম, সেটা পড়লুম। আমার বেশভূষা দেখলে নিশ্চয় খুশী হতে। একটা কালো রেশমের ধুতি, গায়ে লাল আঙিয়া, মাথায় কালো টুপি, কাঁধে জরিদেওয়া কালো পাড়ের কোঁচানো লম্বা চাদর।…

পরিশেষ

পরিশেষ ১৩৩৯ সালের ভাদ্র মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। খেলনার মুক্তি, পত্রলেখা, খ্যাতি, বাঁশি, উন্নতি, ভীরু —পরিশেষের এই ছয়টি কবিতা পুনশ্চ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া পরিশেষের বর্তমান সংস্করণে বর্জিত হইল। কবিতাগুলি রচনাবলী-সংস্করণে 'পুনশ্চ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

১ দ্রষ্টব্য : বিচিত্র প্রবন্ধ গ্রন্থে 'বন্ধুস্মৃতি'। ২ দ্রষ্টব্য : চিঠিপত্র, তৃতীয় খণ্ড, পত্র নং ২৮।

৩ বলাই : গল্পগুচ্ছ, তৃতীয় খণ্ড।

রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি হইতে অনেক কবিতার রচনাস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে, এবং তারিখ ও পাঠ সংশোধিত বা পরিবর্তিত হইয়াছে।

'বিচিত্রা' কবিতাটির একটি অপ্রকাশিত স্বতন্ত্র পাঠ নিম্নে মুদ্রিত হইল :

বিচিত্রা

চুরি করে নিয়ে গেলে মোর মন কোন্ শিশুকালে,
হে বিচিত্রা, বাঁধি মায়াজালে—
বস্তুর আড়ালে যেথা দিনরাত্রি সাজাইছ তুমি
তোমার রঙের রঙ্গভূমি।
আকাশে ছড়ায়ে কেশ বাঁশি বাজায়েছ চুপে চুপে,—
সেই সুরে মোর চক্ষে কত স্বপ্ন অপরূপ রূপে
করেছে বিচিত্র লীলা ধরণীর ধূলির সীমায়,
দিগন্তের দূর নীলিমায়।

নারিকেলপল্লবের আকম্পিত ইঙ্গিতমর্মরে
বৈশাখের খরসূর্যকরে
আকাশ নিশ্বসি উঠি মধ্যাহ্নের আতন্দ্র আলসে
ভরিয়াছে রহস্যের রসে।
তৃণাগ্রে শিশিরবিন্দু শরতের শুভ্রতার বাণী
বাতাস ঝলকি' দিত, মুক্তির আনন্দ দিত আনি,
কাঁপিত প্রভাত আলো বালকের পুলকিত বুকে
হে বিচিত্রা, চাহি তব মুখে।

চৈত্রে স্বচ্ছ পূর্ণিমায় যত্নে-গাঁথা মল্লিকার মালা
ভরে যবে রাত্রির নিরালা
মিলন-আশ্বাসগন্ধ, শ্রান্তিহীন পাপিয়ার গানে,
অনিদ্রা নিবিড় করি আনে,—
যৌবনের সেই রাত্রে, বিচিত্রা, কাহার কালো চোখে
মোহিনীর মিড়খানি মিলাইতে চাঁদের আলোকে,
মধুর সংশয়ে-ছোঁওয়া শরমের কুহেলিকা আনি
হাসির উপরে দিতে টানি।

লোকালয়ে ফিরায়েছ সুখদুঃখে নিজে হাত ধরি
পথে পথে দিবসশর্বরী।
প্রাণের বীণার তন্ত্রে মৃত্যুসুরে তুলেছ স্পন্দন,
বাঁধিয়াছ, ছিঁড়েছ বন্ধন।
মর্মের বেদনা মোর তোমার আপন রসধারে
পেয়েছে সুতীব্র বর্ণ, দিয়েছ গভীর অর্থ তারে,
মোর নৌকা খেয়া দিতে বারে বারে ঝঞ্ঝাবায়ু তুলে
নিয়ে গেছ অপূর্বের কূলে।

মনে হয় সম্ভবতঃ ইহাই প্রথম পাঠ।

কয়েকটি কবিতার পরিশেষ-গ্রন্থে-বর্জিত অনুচ্ছেদ পাণ্ডুলিপি বা সাময়িক পত্র হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

সহসা জ্যৈষ্ঠের শেষরাতে
গুরু গর্জনের সাথে
পূর্ববনান্তের শাখে মর্মরিয়া জাগে বায়ুবেগ,
ঘননীল মেঘ
দিগন্তের তটে আনে বর্ষণের নিবিড় আশ্বাস—
তৃষিত মাটির বক্ষে দৈন্যজীর্ণ ঘাস
উল্লাসে তখনি
করিয়া অশ্রুত জয়ধ্বনি
থরে থরে
ছোটো ছোটো অক্ষরে অক্ষরে
আকাশের স্তবগান ফুটাইয়া তুলে
তিনীল তিনাল ফুলে ফুলে।—
সে-পুলক নেব মোর সর্বদেহ ভরি'
রক্তের লহরী
উঠিবে উচ্ছলি।
বসন্তে কুঞ্জের গলি
সুগন্ধিচ্ছায়ায়,

'জন্মদিন' কবিতার পাণ্ডুলিপিতে বর্জনচিহ্নিত রচনাংশ—
বর্তমান রচনাবলীর ১৬৭ পৃষ্ঠার অষ্টম ও নবম পংক্তির মধ্যে।

কবি আমি কারো গুরু নই।
জানি না কী আছে হোথা কৈবল্যের পারে
বৈকুণ্ঠের ধারে।

'পান্থ' কবিতার প্রথম পংক্তির পরে পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত রচনাংশ।

তোমার প্রথম জন্মদিন
এনেছে মর্ত্যের ঘাটে যে-প্রাণ নবীন,
চিরন্তন মানবের মহাসত্তা-মাঝে
এল কোন্ কাজে ?
এক আমি-কেন্দ্র ঘিরে
ফিরে ফিরে
মুহূর্তের দল অগণন
সৃষ্টির নিগূঢ় শক্তি করিয়া বহন
দিনরাতি
কী গাঁথনি তুলিতেছে গাঁথি
আলোয় ছায়ায়,
বিচিত্র বেদনাঘাতে ঝংকৃত কায়ায়,
রূপে রসে বর্ণে নৃত্যে গন্ধে গানে বেষ্টিত মায়ায়।

'অপূর্ণ' কবিতার বর্জিত প্রথম অনুচ্ছেদ[১]।

শুধু প্রাণরক্ষা আর বংশরক্ষা কাজে
তোমার চিত্তের শক্তি সাঙ্গ হয় নাই আত্ম-মাঝে,
যা রহিল বাকি
ধূলি তারে ফাঁকি দিবে নাকি।
সে চিত্ত অসীম-পানে বাতায়ন দিয়েছিল খুলি,
প্রত্যহের আপনারে ভুলি'
নিত্যের নৈবেদ্যথালে
আপনার শ্রেষ্ঠ দান ভরি দিয়াছিল কালে কালে।

১ দ্রষ্টব্য : প্রবাসী, ১৩৩৮ পৌষ— 'জন্মদিন'।

অসীম প্রাণের বার্তা যবে এসেছিল কানে
মরপ্রাণ তুচ্ছ করেছিলে আত্মদানে,
অর্থ তার কোথাও কি হবে না সমাধা,
মৃত্যু তারে দিবে বাধা,
ধুলায় কি হবে ধূলি
মহাক্ষণগুলি।

জন্মদিন এই বাণী
দিক তব চিত্তে আনি,—
মর্ত্যের জরায়ু
আপনাতে বদ্ধ করি লুপ্ত করিবে না তব আয়ু,—
অসম্পূর্ণ ক্লিষ্ট প্রাণ—
এ গর্ভবন্ধনে তার হলে অবসান,—
আরবার নবজন্ম লবে
পূর্ণের উৎসবে।

'অপূর্ণ' কবিতার শেষদুটি বর্জিত অনুচ্ছেদ।

আঁধার তিথিতে তারকাবীথিতে তন্দ্রাজড়িত চন্দ্র।
যূথীকলিগুলি দিতেছে আকুলি হিমগদ্গদ গন্ধ।
ক্ষীণ জ্যোৎস্নায়, ঘন কুয়াশায়,
ঘুমে জাগরণে, কায়ায় মায়ায়,
তোমায় আমায় আলোয় ছায়ায়
যুগলে ঘটিল দ্বন্দ্ব।
জন্মমরণ-অতীত বেলায় স্মরণের পরপারে
তব ভাবনায় মোর চেতনায় এক হল একেবারে।

'তুমি' কবিতার বর্জিত প্রথম শ্লোক। দ্রষ্টব্য: প্রবাসী, ১৩৪৮ চৈত্র— 'প্রাণলক্ষ্মী'।

আমি বেসেছিলেম ভালো
সকল দেহে মনে
এই ধরণীর ছায়া আলো
আমার এ জীবনে।
সেই যে আমার ভালোবাসা
লয়ে আকুল অকূল আশা
ছড়িয়ে দিল আপন ভাষা
আকাশনীলিমাতে।
রইল গভীর সুখে দুখে,
রইল সে-যে কুঁড়ির বুকে
ফুল-ফোটানোর মুখে মুখে
ফাগুনচৈত্ররাতে।
রইল তারি রাখি বাঁধা
ভাবীকালের হাতে।

'দিনাবসান' কবিতার তৃতীয় অনুচ্ছেদের পরবর্তী বর্জিত অনুচ্ছেদ।
দ্রষ্টব্য প্রবাসী, ১৩৩৩ জ্যৈষ্ঠ— 'জন্মোৎসবের দিনে'।

পরিশেষের কয়েকটি কবিতা সাময়িক পত্রে গদ্যভূমিকা-সংবলিত আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে গদ্যাংশগুলি মুদ্রিত হইল।

অবুঝ মন

জাহাজ চলছে, সমুদ্রের জল কেবলই ছল্‌ছল্‌ করে, আর লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে। একটি ছোটো শিশু; আমরা আছি আপন আপন কোণে একটিমাত্র কেদারা নিয়ে, কিন্তু সে আছে সমস্ত ডেক জুড়ে। তার অবুঝ মনখানি অসংলগ্ন অহৈতুক আগ্রহে ফ্যাল্‌ফেলে চোখের ভিতর দিয়ে বিশ্বের পরিচয় নিচ্ছে। আমার অঙ্কবিহারী সেই আটদশমাসের শিশুটির খেলা দেখে আমার অনেকটা সময় কাটে।

এটা বুঝতে পারছি যে, ওরই ওই মনটি আদিমকালের বহু পুরাতন। আমার যে-মন ওকে দেখছে আর ভাবছে, সেই হল নূতন; অনেক চেষ্টায় অনেক শিক্ষায় ও সাধনায় এই বিচারবুদ্ধিমান মন গড়ে উঠছে, এখনো সে অসমাপ্ত। ওরই অবচেতন মনটির সঙ্গে মেলে গাছপালার মধ্যে যে নির্বোধ মন জলের দিকে তার শিকড় চালাচ্ছে, সূর্যের দিকে যার আকুতি, যা স্বপ্নচালিতের মতো আপন ফুলের ভিতর দিয়ে আপন

ফলের উদ্দেশ্য সাধন করে। আমার নতুন মন গাছপালার মধ্যে ওই পুরাতন সহজ মন দেখে গভীর শান্তি পায়, আনন্দিত হয়। শিশুর মধ্যেও সেই আদিম মনটি দেখতে তার এত ভালো লাগে। মেয়েদের প্রকৃতিতেও মনের এই আদিমতার প্রাধান্য, তাদের সহজ বোধ সহজ প্রবৃত্তি বিচারবুদ্ধির চেয়ে অনেক প্রবল। আমরা অনেক-দিন থেকে ওদের সরলা অবলা বলে আসছি, সে কথার মানেই ওই— যে-তর্কে দ্বিধা আনে ওদের স্বভাবে ভালো করে সেই তর্কবুদ্ধি দখল পায় নি। নতুন-বুদ্ধি-ওয়ালা পুরুষের মনের কাছে এই সহজ মনের সংস্পর্শ আরামের। নতুনবুদ্ধিওয়ালা মনটা ক্লান্ত করে, বিভ্রান্ত করে, সংশয়ে আন্দোলিত করে; এইজন্যে মানুষ অনেক-সময় মদ খায়, এই উদগ্রবুদ্ধিমান মনটাকে বিহ্বল করে দিয়ে সেই আপন আদিম অবোধ মনের মধ্যে ছুটি নিতে চায় যেখানে অরাজকতা।

শিশুর মধ্যে যাকে দেখছি, সেই আদিম মনটাকে আর-এক জায়গায় দেখছি যেখানে গণসংঘ। সেই গণেশের হাতির মুণ্ড, তার যূথবুদ্ধির মাথা, সে বশ মানতেও যেমন মেতে উঠতেও তেমনি। তার প্রকাণ্ড শক্তির সঙ্গে তার নীরব বশ্যতার মিল পাই নে, তেমনি তার অকস্মাৎ দুর্দামতারও হিসেব পাওয়া যায় না। সেই অবুঝ মনটার সংস্কারগুলো, তার সমস্ত অন্ধ প্রবর্তনা গণসম্প্রদায়কে ঠেলে নিয়ে চলে। তারাই হল বাহন। নতুন মনটা সারথিগিরি করতে চেষ্টা করে, কিন্তু ঘোড়া প্রায়ই চার পা তুলে ছোটে। নইলে য়ুরোপে সেদিন যে যুদ্ধকাণ্ড হয়ে গেল, তা হতে পারত না। আদিম মনটা যখন বুদ্ধিওয়ালা মনটাকে একেবারেই মানতে চায় না, তখন মানুষ যাকে সভ্যতা বলে তার ঘটে দুর্গতি। প্রাচীন গ্রীস তার অসামান্য বুদ্ধি সত্ত্বেও যদি মরে থাকে, তার কারণটা ছিল অবচেতন মনের মধ্যে, যেখানে তার গুহাচর প্রবৃত্তির, তার গর্তবাসী সংস্কারের বাসা। আজকের দিনে য়ুরোপ কোনোমতেই স্থায়ী শান্তির কোনো ব্যবস্থা করতে পারছে না, তার কারণ সংস্কারগুলো লাগাম দাঁতে চেপে ধ'রে ছুটতে চায়।

সভ্যতা এর উলটো কারণেও মরে। নতুন মন যখন সনাতন সহজ মনের শক্তিকে আপন জটিল কর্মজালে সম্পূর্ণ চাপা দিতে চায়, আপন রথের চাকার তলায় তাকে খণ্ড খণ্ড করে, তখন তার শক্তির আদিম আশ্রয় জীর্ণ হয়ে যায়। আকাশগামী চূড়াটা ধুলোর আশ্রয় ছাড়িয়ে উঠতে চায়; ক্ষতি নেই, কিন্তু যখন সামঞ্জস্যের সীমা অতিক্রম করে তখনি ফিরে তাকে সেই ধুলোয় এসে পড়তে হয়। আদিম অবুঝ মনের সঙ্গে নতুনবুদ্ধিমান মনের পদে পদে রফা-নিষ্পত্তি করে চলাই পাকাচালে চলা। এই তো গেল আমার চিন্তার কথা। কিন্তু শিশুর মুখের দিকে যখন তাকিয়ে দেখতুম তখন যে-আনন্দ বোধ করতুম সেটা চিন্তার আনন্দ নয়; তখন আমি বিশ্বব্যাপী আদিম

প্রাণের বৃহৎ রঙ্গলীলা শিশুর দুটি চোখের বুদ্ধিবিহীন চঞ্চল ঔৎসুক্যের মধ্যে দেখতে পেতুম। শিশুর মধ্যে সেই বিশ্বশিশুকে দেখার আনন্দেই এই কবিতাটি লিখেছি।

— বিচিত্রা, ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ

আরেক দিন

যখন বছর দুয়েক হল দক্ষিণ আমেরিকায় যাত্রা করেছিলুম তখন মনের মধ্যে কোনো ভার ছিল না। যাঁরা আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন তাঁরা আমাকে ভরসা দিয়েছিলেন যে, তাঁরা আমার কাছ থেকে বক্তৃতা চান না, আমাকেই চান। দেশের দিক থেকেও কোনো অনুরোধ নিয়ে আসি নি, কেবল জাহাজে ওঠবার আগে একটি বাঙালী মেয়ের চিঠি পেয়েছিলুম, সে ইচ্ছে জানিয়েছিল আমি যেন ডায়ারি লিখি। তার পরে ভেসে পড়লুম সমুদ্রে। মন অনেকদিন এমন মুক্তি পায় নি। সামনে পিছনে কর্তব্যের তাগিদ নেই, আশেপাশেও তথৈবচ। বহুকাল পূর্বে, তখন বয়স অল্প, ঘরে কিম্বা বাইরে খাতির করবার লোক নেই,— লেখা আরম্ভ করেছি কিন্তু সে লেখা দূরে পৌঁছয় নি। আমার কাছে দেশের লোকের বা বিদেশের লোকের কোনো প্রত্যাশা ছিল না। পাঠক জমতে আরম্ভ করে নি তা বলা যায় না, কিন্তু পাঠকমণ্ডলী-নামক প্রকাণ্ড একটি শনিগ্রহ আমার জীবনকে তার উপগ্রহদলে ভরতি করবার জন্যে টান মারে নি। তখন মাসিকপত্র দুটি-চারটি, তার মধ্যে যারা প্রবলকণ্ঠশালী তারা ছিল আমার নিয়ত প্রতিকূল। সাপ্তাহিক যে-কয়টি ছিল তারা কেউ আমার প্রতি প্রসন্ন ছিল না। তাই আমার দায়িত্ব ছিল প্রধানত আমার নিজের কাছেই। তখন না ছিলেম অখ্যাত, না ছিলেম বিখ্যাত, ছিলেম প্রত্যাখ্যাত। তখন বাংলাদেশের নির্জন নদীর চরে ছিল আমার যাওয়া-আসা। সম্পূর্ণ নিজের মনেই লিখে যেতুম, শোনবার লোক কেউ ছিল না তা নয়, ছিল দুটি-চারিটি। আমার মন ছিল পাখি; তার না ছিল খাঁচা, না ছিল পায়ে শিকল,— না ছিল তার 'পরে শৌখিনের দাবি, না ছিল তার জন্যে প্রশংসার বাঁধা খোরাক। তার পর চল্লিশ বছর হয়ে গেল। এবার চলল সমুদ্রযাত্রা সুদীর্ঘ; পরিচিত সঙ্গী কেবলমাত্র একজন, এল্‌ম্‌হর্‌স্ট্‌, বাংলাভাষায় তার কান ছিল না। ডাঙার কোলাহল বহুদূরে। তার উপর শরীর হল অসুস্থ, তাতে ক'রেও সংসারের দায়িত্ব আরো অনেক দূরে দিলে সরিয়ে। বহুবৎসর পরে তাই ছুটি পাওয়া গেল, অল্পবয়সের হালকা জীবনের ছুটি। অমনি কলম আপনি ছুটল কবিতার চেনা রাস্তায়। ক্যাবিনে বসেও কবিতা লেখা চলে, এইবারে তার প্রথম আবিষ্কার। ক্যাবিনের খাঁচা বাইরের খাঁচা, সেটা ভুলতে বেশিক্ষণ লাগে না যদি

মনের মধ্যে পর্দা উঠে যায়, যদি ছুটির আকাশ থেকে হুহু করে হাওয়া ছুটে আসে। সেদিন শুধু কাব্য লিখি নি, গদ্যও লিখেছি ; সেই কবিতা আর গদ্য ছিল ভাইবোন, সগোত্র।

এইবারে সেই ছুটি ঠিক মিলল না। মন ডানা নড়াতে গিয়ে দেখে ডানার উপরে কর্তব্যের ফরমাশ গট হয়ে চেপে ব'সে ; মনের আপন খেয়ালের জায়গা খুব সংকীর্ণ। দূর হ'কগে— বোঝাটাকে নিয়ে দেশদেশান্তরে আর বয়ে বেড়াতে পারি নে। কাল ডেকের উপর কেদারায় বসে মনে-মনে বললুম, বিশ্বের কাছে আমার দায়িত্ব আছে, অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে এই কথাটা ভুলব। তাই একটা ছোটো কালো খাতা নিয়ে ঝুঁকে পড়া গেল, গৌড়জনকে নিরবধি মধু খাওয়াব সংকল্প করে নয়, অদৃষ্টের কাছে আজো ছুটির পাওনা দাবি করতে পারি এইটি প্রমাণ করবার জন্যে।

তার পরে সন্ধে হয়ে এল। দূরে দেখা যায় তটরেখা, নীল পাহাড় ঝাপসা হয়ে এসেছে। হাওয়া উঠেছে, সমুদ্রে দিয়েছে ঢেউ। ডেকের উপর আলো জ্বলল। আবার একবার কলম হাতে খাতা খুললুম।

—বিচিত্রা, ১৩৩৪ মাঘ

তে হি নো দিবসাঃ

অপরাহ্ণে আর-একটা কবিতা লিখে বসেছি। কর্তব্য হাতে না থাকলে অকাজের প্রাদুর্ভাব কি-রকম প্রবল হয় তারই এটা প্রমাণ। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ্‌ যখন কর্তব্য সম্বন্ধে ওড্‌ লিখেছিলেন তখন তাঁকে যদি মুলোর চাষ করতে হত, তা-হলে অতবড়ো দুর্ঘটনা ঘটত না। পোড়ো বাড়িতেই ভূতে বাসা করে।

—বিচিত্রা, ১৩৩৪ ফাল্গুন

প্রসঙ্গতঃ ইহা উল্লেখযোগ্য যে, পরিশেষের ‘দুয়ার’ কবিতাটির শ্লোকচারিটি বিশ্বভারতী বিদ্যাভবনে চারিটি দ্বারের উদ্দেশে রচিত হইয়া দ্বারগুলির শীর্ষফলকে অঙ্কিত হইয়াছে।

সংযোজন

পরিশেষ প্রকাশের বৎসরে (১৩৩৯) ও তৎপূর্বে রচিত রবীন্দ্রনাথের যে-সকল কবিতা বনবাণী বা পরিশেষে সংকলিত হইতে পারিত অথচ কোনো কবিতাগ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই, তাহাদের কতকগুলি পঞ্চদশখণ্ড রচনাবলীর সংযোজন-বিভাগে মুদ্রিত হইয়াছে। পরিশেষ গ্রন্থের কবিতাগুলির ভাবানুষঙ্গ বিচারে অব্যবহিত পরবর্তী কালের কয়েকটি রচনাও এই অংশে সংকলিত হইয়াছে। একই কারণে

'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি' হইতে 'লক্ষ্যশূন্য' এবং 'জাভাযাত্রীর পত্র' হইতে 'নূতন কাল' কবিতাদুটিও মুদ্রিত হইল।

সাময়িক পত্র হইতে সংকলিত কবিতার তালিকা পত্রিকার নাম ও প্রকাশকাল সহ নিম্নে মুদ্রিত হইল :

প্রাচী	-	প্রাচী, ১৩৩০ আষাঢ়
আশীর্বাদ (পৃ. ২৯১)	-	প্রবাসী, ১৩৪৮ শ্রাবণ
আশীর্বাদ (পৃ. ২৯২)	-	বিচিত্রা, ১৩৩৫ শ্রাবণ
প্রবাসী[১]	-	প্রবাসী, ১৩৩৩ বৈশাখ
বুদ্ধজন্মোৎসব[২]	-	প্রবাসী, ১৩৩৪ বৈশাখ
প্রথম পাতায়[৩]	-	প্রবাসী, ১৩৩৪ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ১৫৭
নূতন	-	কল্লোল, ১৩৩৫ বৈশাখ
শুকসারী	-	উত্তরা, ১৩৩৮ আশ্বিন
সুসময়	-	বিচিত্রা, ১৩৩৫ আষাঢ়
পরিণয়মঙ্গল	-	বিচিত্রা, ১৩৩৪ চৈত্র
গৃহলক্ষ্মী	-	বঙ্গলক্ষ্মী, ১৩৩৪ বৈশাখ
রঙিন	-	বিচিত্রা, ১৩৩৮ বৈশাখ
আশীর্বাদী	-	উপাসনা, ১৩৩৮ আশ্বিন
বসন্ত-উৎসব	-	বিচিত্রা, ১৩৩৯ বৈশাখ
আশীর্বাদ (পৃ. ৩০৮)	-	প্রবাসী, ১৩৩৯ অগ্রহায়ণ
আশীর্বাদ (পৃ. ৩০৯)	-	বিচিত্রা, ১৩৩৯ মাঘ
উত্তিষ্ঠত নিবোধত	-	প্রবাসী, ১৩৪৮ মাঘ
প্রার্থনা	-	বিচিত্রা, ১৩৪০ ভাদ্র
অতুলপ্রসাদ সেন	-	উত্তরা, ১৩৪১ আশ্বিন

'জীবনমরণ' কবিতাটি পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত হইয়াছে ; ১৩৪৮, আশ্বিনের মেঘনা পত্রিকায় কবিতাটি 'বসন্ত' নামে প্রকাশিত হয়, সেখানে উহার তারিখ—দোলপূর্ণিমা ১৩৩৪। 'জীবনমরণ' ও 'সুসময়' কবিতাদুটির পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত পূর্ব পাঠ নিম্নে মুদ্রিত হইল :

জীবনমরণ

জীবনের মরণের বাজায়ে মন্দিরা
বসন্ত নাচিয়া চলে চরণ চঞ্চল।
মাটির বন্দিনী ধরা তাই তো অধীরা
সাথে চলে যেতে চায় ছিঁড়িয়া শৃঙ্খল।

১ প্রবাসী পত্রিকার পঁচিশবৎসর-পূর্তি উপলক্ষে আশীর্বাণী।

২ দ্রষ্টব্য : দ্বিতীয় সংস্করণ নটীর পূজা, পৃ. ৫৬।

৩ 'ছোটো একটি মেয়েকে লেখা' কয়েকটি পত্রের সহিত প্রকাশিত।

আজি হেরো করে কোলাকুলি
এক দোলে দোঁহে দোলাদুলি
জীর্ণ পাতা কিশলয় কচি,
আজি হেরো শিরীষের বনে
নূতনের সাথে পুরাতনে
উৎসবের ডালি দেয় রচি।

বিদায় টেনেছে মিড় মিলনের তারে,
আনন্দের সুরে লাগে মূর্ছিত মূর্ছনা।
যুগল কপোতকণ্ঠে করুণা সঞ্চারে
ছায়াতলে বনলক্ষ্মী উৎসুক উন্মনা।
মোর প্রাণে যাওয়া আর আসা
একসুরে খোঁজে দোঁহে ভাষা,
একতালে দোলে কান্নাহাসি।
যে আছে যে নাই দোঁহে মিলি
মোর ভাবনায় নিরিবিলি
বাজাইছে ফাল্গুনের বাঁশি।

৬ ফাল্গুন ১৩৩৪

সুসময়

'দাও লেখা দাও' দেয় কত জন তাড়া,
চারদিকে চাই, না পাই বাণীর সাড়া।
চায় যবে কেউ অমনি ধরাই পড়ে
নই তো সে-জন লেখন যে-জন গড়ে—
লক্ষ্মীছাড়ার মিথ্যে দুয়ার নাড়া।

চাবার মানুষ চায় না যখন কেহ
'তীখন কথার লিখন ভিক্ষা দেহো',
হাটের পথিক নাই যবে কেউ বাকি,
একলা শাখায় বউ-কথা-কও পাখি,
হরিণশিশুর নাই মনে সন্দেহ,—

ক্লান্ত সমীর শান্ত কোমল শ্বাসে
অস্ফুট সুর জাগায় যখন ঘাসে,—
তখন হঠাৎ আলগা দুয়ার খোলা,—
স্বপনমগন-নয়ন, আপন-ভোলা
লেখক যে-জন বাহির-ভুবনে আসে।

যখন-তখন লুকিয়ে তাহার আসা,
প্রদোষ-আলোয় পথহারা তার বাসা।
বক্ষে তাহার যে-পুষ্পহার দোলে
নাই জানা নাই কোথায় সে-ফুল তোলে,—
চক্ষে তাহার কোন্ ইশারার ভাষা।

বৈশাখী ঝড় যতই আঘাত হানে
সন্ধ্যাসোনার ভাণ্ডারদ্বার-পানে,
মেঘের উপর যতই দারুণ দাবি,
কুণ্ঠিত মেঘ হারায় সোনার চাবি,
গগন আপন অবগুণ্ঠন টানে।

তার পরে যেই শিউলিফুলের বাসে
শরৎলক্ষ্মী শুভ্র আলোয় ভাসে,
নদীর ধারায় নাই মিছে মত্ততা,
কুন্দকলির স্নিগ্ধ শীতল কথা,
আকাশ সে কোন্ স্বপন-আভায় হাসে,—

শিশির যখন বেণুর পাতার আগে
রবির প্রসাদ নীরব চাওয়ায় মাগে,
সবুজ খেতের নবীন ধানের শিষে
ঢেউ খেলে যায় আলোক ছায়ায় মিশে,
গগনসীমায় কাশের কাঁপন লাগে—

হঠাৎ তখন সূর্য-ডোবার কালে
দীপ্তি জাগায় দিক্‌ললনার ভালে।
　　মেঘ ছেঁড়ে তার পর্দা আঁধার কালো,
　　কোথায় সে পায় স্বর্গলোকের আলো,
পরম আশার চরম প্রদীপ জ্বালে।

১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

পূর্বোদ্ধৃত 'সুসময়' কবিতার প্রথম চারটি শ্লোকের পরিবর্তিত স্বতন্ত্ররূপ পাণ্ডুলিপির অন্যত্র স্বাধীন কবিতার আকারে পাওয়া গিয়াছে, নিম্নে মুদ্রিত হইল :

'লিখন দেহো, লিখন দেহো' ডাকে,
খুঁজে না পাই বাণী কোথায় থাকে।
　　চায় কেহ যেই তখন ধরা পড়ে
　　নই আমি সেই লেখা যে-জন গড়ে,
লেখনী মোর শরমে মুখ ঢাকে।

চাবার মানুষ নাইকো যখন কেহ,
বলে না কেউ 'লিখন দেহো দেহো',
　　তখন দেখি মনের দুয়ার খোলা,
　　স্বপন-লাগা নয়ন ভাবে ভোলা
লেখক আসে অভয় অসন্দেহ।

হঠাৎ তাহার গোপন যাওয়া আসা,—
কোন্ গভীরে অজানা তার বাসা।
　　বক্ষে তাহার যে-পুষ্পহার দোলে
　　কেউ জানে না কোথায় সে ফুল তোলে,
চক্ষে তাহার কোন্ ইশারার ভাষা।

'লক্ষ্যশূন্য' ও 'নূতনকাল' কবিতাদুটির সূচনাস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন, 'যাত্রী'[১] গ্রন্থ হইতে তাহা যথাক্রমে অংশতঃ উদ্ধৃত হইল। পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১ 'যাত্রী' গ্রন্থের অঙ্গীভূত 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি' ও 'জাভা-যাত্রীর পত্র'— রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে 'বিশ্বযাত্রী রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থমালায় স্বতন্ত্র দুইটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

লক্ষ্যশূন্য

সিদ্ধি, যাকে ইংরেজিতে বলে সাক্‌সেস, তার বাহন যত দৌড়ে চলে ততই ফল পায়। য়ুরোপের দেশে দেশে রাষ্ট্রনীতির যুদ্ধনীতির বাণিজ্যনীতির তুমুল ঘোড়দৌড় চলছে জলে স্থলে আকাশে। সেখানে বাহ্য প্রয়োজনের গরজ অত্যন্ত বেশি হয়ে উঠল, তাই মনুষ্যত্বের ডাক শুনে কেউ সবুর করতে পারছে না। বীভৎস সর্বভুক পেটুকতার উদ্যোগে পলিটিক্‌স্‌ নিয়ত ব্যস্ত। তার গাঁঠকাটা ব্যবসায়ের পরিধি পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে। পূর্বকালে যুদ্ধবিগ্রহের পদ্ধতিতে ধর্মবুদ্ধি যেখানে মাঝে-মাঝে বাধা খাড়া করে রেখেছিল, ডিপ্লমাসি সেখানে আজ লাফমারা **hurdle race** খেলে চলেছে। সবুর সয় না যে। বিষবায়ুবাণ যুদ্ধের অস্ত্ররূপে যখন এক পক্ষ ব্যবহার করলে তখন অন্য পক্ষ ধর্মবুদ্ধির দোহাই পাড়লে। আজ সকল পক্ষই বিষের সন্ধানে উঠে পড়ে লেগেছে। যুদ্ধকালে নিরস্ত্র পুরবাসীদের প্রতি আকাশ থেকে অগ্নিবাণবর্ষণ নিয়ে প্রথমে শোনা গেল ধর্মবুদ্ধির নিন্দাবাণী। আজ দেখি ধার্মিকেরা স্বয়ং সামান্য কারণে পল্লিবাসীদের প্রতি কথায়-কথায় পাপবজ্র সন্ধান করছে। গত যুদ্ধের সময় শত্রুর সম্বন্ধে নানা উপায়ে সজ্ঞানে সচেষ্টভাবে সত্যগোপন ও মিথ্যাপ্রচারের শয়তানী অস্ত্র ব্যবহার প্রকাণ্ডভাবে চলল। যুদ্ধ থেমেছে কিন্তু সেই শয়তানি আজও থামে নি। এমন-কি, অক্ষম ভারতবর্ষকেও প্রবলের প্রপাগাণ্ডা রেয়াত করে না। এই-সব নীতি হচ্ছে সবুর-না-করা নীতি— এরা হল পাপের দ্রুত চাল,— এরা প্রতি পদেই বাহিরে জিতছে বটে কিন্তু সে জিত অন্তরের মানুষকে হারিয়ে দিয়ে। মানুষ আজ নিজের মাথা থেকে জয়মাল্য খুলে নিয়ে কলের গলায় পরিয়ে দিলে। রসাতল থেকে দানব বলছে ‘বাহবা’।

—পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি। ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫

নূতন কাল

…আমরা যারা এখানে [বালীদ্বীপে] বাহির থেকে এসেছি, আমাদের একটা দুর্লভ সুবিধা ঘটেছে এই যে, আমরা অতীত কালকে বর্তমানভাবে দেখতে পাচ্ছি। সেই অতীত মহৎ, সেই অতীতের ছিল প্রতিভা, যাকে বলে নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি; তার প্রাণশক্তির বিপুল উদ্যম আপন শিল্পসৃষ্টির মধ্যে প্রচুরভাবে আপন পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু তবুও সে অতীত, তার উচিত ছিল বর্তমানের পিছনে পড়া, সামনে এসে দাঁড়িয়ে বর্তমানকে সে ঠেকিয়ে রাখল কেন। বর্তমান সেই অতীতের বাহনমাত্র হয়ে বলছে ‘আমি হার মানলুম’; সে দীনভাবে বলছে, ‘এই অতীতকে প্রকাশ করে রাখাই আমার কাজ, নিজেকে লুপ্ত করে দিয়ে।’ নিজের ’পরে বিশ্বাস করবার সাহস নেই। এই

হচ্ছে নিজের শক্তি সম্বন্ধে বৈরাগ্য, নিজের 'পরে দাবি যতদূর সম্ভব কমিয়ে দেওয়া। দাবি স্বীকার করায় দুঃখ আছে, বিপদ আছে, অতএব— বৈরাগ্যমেবাভয়ং, অর্থাৎ বৈনাশ্যমেবাভয়ং।

…এখানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় এত অসম্ভব-রকম ব্যয় হয় যে সুদীর্ঘকাল লাগে তার আয়োজনে— যম আপন কাজ সংক্ষেপে ও সস্তায় সারেন কিন্তু নিয়ম চলে অতি লম্বা ও দুর্মূল্য চালে। এখানে অতীতকালের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া চলেছে বহুকাল ধ'রে, বর্তমানকালকে আপন সর্বস্ব দিতে হচ্ছে তার ব্যয় বহন করবার জন্যে।

এখানে এসে বারবার আমার এই কথা মনে হয়েছে যে, অতীতকাল যত বড়ো কালই হ'ক নিজের সম্বন্ধে বর্তমান কালের একটা স্পর্ধা থাকা উচিত, মনে থাকা উচিত তার মধ্যে জয় করবার শক্তি আছে। এই ভাবটাকে আমি একটি ছোটো কবিতায় লিখেছি…

—জাভাযাত্রীর পত্র। ৩০ অগস্ট ১৯২৭

'উত্তিষ্ঠত নিবোধত' কবিতাটির ব্যাখ্যাস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ শ্রীমতী রমা দেবীকে নিম্ন-মুদ্রিত পত্রটি (১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০) লিখিয়াছিলেন :

যে-আশীর্বাদ তোমাকে পাঠালুম এখনি তার সম্পূর্ণ অর্থ বুঝতে পারবে না, তাতে ক্ষতি নেই, রইল তোমার কাছে। এর মধ্যে যে-কথাটি আছে সংক্ষেপে তার অর্থ এই, ঈশ্বরের কাছ থেকে দানরূপে পেয়েছি আমাদের এই জীবন, একে যদি হেলা করে নষ্ট না করি, নিজের চেষ্টায় একে যদি ভালো করতে পারি, সুন্দর করতে পারি, তা হলেই এই দান সার্থক হবে— নইলে এত বড়ো ঐশ্বর্য পেয়েও হারানো হবে। 'উত্তিষ্ঠত নিবোধত' এই মন্ত্রের অর্থ এই— 'ওঠো, জাগো'। জীবনকে সত্য করে তুলতে হলে সচেতন থেকে তার সাধনা করতে হয়।

'প্রবাসী' কবিতাটিকে ভাঙিয়া পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ স্বতন্ত্র দুটি গান রচনা করিয়াছিলেন ; প্রথম সংস্করণ গীতবিতানের তৃতীয় খণ্ডে 'পরবাসী চলে এসো ঘরে' (পৃ. ৭৯০) এবং 'এসো এসো প্রাণের উৎসবে' (পৃ. ৮৪৪) গানদুটি দ্রষ্টব্য।

'নূতন' কবিতাটিরও একটি পরিবর্তিত সংগীতরূপ প্রথম সংস্করণ গীতবিতানে (পৃ. ৮৪৪) পাওয়া যায়। গানটির প্রথম ছত্র— 'দূর রজনীর স্বপন লাগে'।

উল্লিখিত গানগুলি অধুনাপ্রচলিত গীতবিতানের বিভিন্ন অংশে পাওয়া যাইবে।

বসন্ত

বসন্ত ১৩২৯ সালের (১৯২৩) ফাল্গুন মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পরে উহা 'ঋতু-উৎসব' গ্রন্থে (১৩৩৩) সংকলিত হইয়াছে।

'গানগুলি মোর শৈবালেরি দল' গানটি ঋতু-উৎসবের পাঠে বর্জিত হইয়া থাকিলেও ১৩২৯ সালের পাঠ অনুযায়ী রচনাবলী-সংস্করণ বসন্ত গ্রন্থে যথাস্থানে মুদ্রিত হইল। বলাকার ১৫ সংখ্যক[১] কবিতার সহিত গানটি তুলনীয়।

রক্তকরবী

রক্তকরবী ১৩৩৩ সালে [১৯২৬ ডিসেম্বর] গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৩৩০ সালের গ্রীষ্মাবকাশে শিলঙ-বাসকালে রবীন্দ্রনাথ নাটকটি 'যক্ষপুরী' নামে প্রথম রচনা করেন। পাণ্ডুলিপি আকারেই পরে ইহার নাম দিয়াছিলেন 'নন্দিনী'। ১৩৩১ সালের আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে সংশোধিত বর্তমান আকারে নাটকটি 'রক্তকরবী' নামে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়াছিল। কালানুক্রম অনুসারে রচনাবলীতে রক্তকরবী বসন্তের পরেই মুদ্রিত হইল।

বর্তমান সংস্করণের 'নাট্যপরিচয়' অংশ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত রক্তকরবীর পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত হইয়াছে। প্রচলিত সংস্করণ রক্তকরবীর 'প্রস্তাবনা' ১৩৩১ সালে লিখিত কবির একটি 'অভিভাষণ'।[২] নিম্নে উহা মুদ্রিত হইল :

"আজ আপনাদের বারোয়ারি-সভায় আমার 'নন্দিনী'র পালা অভিনয়। প্রায় কখনো ডাক পড়ে না, এবারে কৌতূহল হয়েছে। ভয় হচ্ছে, পালা সাঙ্গ হলে ভিখ মিলবে না, কুত্তা লেলিয়ে দেবেন। তারা পালাটাকে ছিঁড়ে কুটিকুটি করবার চেষ্টা করবে। এক ভরসা, কোথাও দন্তস্ফুট করতে পারবে না।

আপনারা প্রবীণ। চশমা বাগিয়ে পালাটার ভিতর থেকে একটা গূঢ় অর্থ খুঁটিয়ে বের করবার চেষ্টা করবেন। আমার নিবেদন, যেটা গূঢ় তাকে প্রকাশ্য করলেই তার সার্থকতা চলে যায়। হৃৎপিণ্ডটা পাঁজরের আড়ালে থেকেই কাজ করে। তাকে

১ দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড পৃ ৩৪।

২ দ্রষ্টব্য : প্রবাসী, ১৩৩২ বৈশাখ— 'রক্তকরবী'।

বের ক'রে তার কার্যপ্রণালী তদারক করতে গেলে কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। দশমুণ্ড বিশহাতওয়ালা রাবণের স্বর্ণলঙ্কায় সামান্য একটা বন্য বানর লেজে ক'রে আগুন লাগায়, এই কাহিনীটি যদি কবিগুরু আজ আপনাদের এই সভায় উপস্থিত করতেন তা হলে তার গূঢ় অর্থ নিয়ে আপনাদের চণ্ডীমণ্ডপে একটা কলরব উঠত। সন্দেহ করতেন কোনো-একটা সুপ্রতিষ্ঠিত বিধিব্যবস্থাকে বুঝি বিদ্রূপ করা হচ্ছে। অথচ শত শত বছর ধরে স্বভাবসন্দিগ্ধ লোকেরাও রামায়ণের প্রকাশ্যে যে-রস আছে তাই ভোগ করে এলেন— গোপনে যে-অর্থ আছে তার ঝুঁটি ধরে টানাটানি করলেন না।

আমার পালায় একটি রাজা আছে। আধুনিক যুগে তার একটার বেশি মুণ্ড ও দুটোর বেশি হাত দিতে সাহস হল না। আদিকবির মতো ভরসা থাকলে দিতেম। বৈজ্ঞানিক শক্তিতে মানুষের হাত পা মুণ্ড অদৃশ্যভাবে বেড়ে গেছে। আমার পালার রাজা যে সেই শক্তিবাহুল্যের যোগেই গ্রহণ করেন, গ্রাস করেন, নাটকে এমন আভাস আছে। ত্রেতাযুগের বহুসংগ্রহী বহুগ্রাসী রাবণ বিদ্যুৎবজ্রধারী দেবতাদের আপন প্রাসাদদ্বারে শৃঙ্খলিত ক'রে তাদের দ্বারা কাজ আদায় করত। তার প্রতাপ চিরদিনই অক্ষুণ্ণ থাকতে পারত। কিন্তু তার দেবদ্রোহী সমৃদ্ধির মাঝখানে হঠাৎ একটি মানবকন্যা এসে দাঁড়ালেন, অমনি ধর্ম জেগে উঠলেন। মূঢ় নিরস্ত্র বানরকে দিয়ে তিনি রাক্ষসকে পরাস্ত করলেন। আমার নাটকে ঠিক এমনটি ঘটে নি কিন্তু এর মধ্যেও মানবকন্যার আবির্ভাব আছে। তা ছাড়া কলিযুগের রাক্ষসের সঙ্গে কলিযুগের বানরের যুদ্ধ ঘটবে, এমনও একটা সূচনা আছে।

আদিকবির সাতকাণ্ডে স্থানাভাব ছিল না, এই কারণে লঙ্কাপুরীতে তিনি রাবণ ও বিভীষণকে স্বতন্ত্র স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু আভাস দিয়েছিলেন যে তারা একই, তারা সহোদর ভাই। একই নীড়ে পাপ ও সেই পাপের মৃত্যুবাণ লালিত হয়েছে। আমার স্বল্পায়তন নাটকে রাবণের বর্তমান প্রতিনিধিটি এক দেহেই রাবণ ও বিভীষণ; সে আপনাকেই আপনি পরাস্ত করে।

বাল্মীকির রামায়ণকে ভক্ত পাঠকেরা সত্যমূলক ব'লে স্বীকার করেন। আমার পালাটিকে যাঁরা শ্রদ্ধা ক'রে শুনবেন তাঁরা জানবেন এটিও সত্যমূলক। ঐতিহাসিকের উপরে প্রমাণের ভার দিলে ঠকবেন। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, কবির জ্ঞান-বিশ্বাস-মতে এটি সত্য।

ঘটনাস্থানটির প্রকৃত নাম নিয়ে ভৌগোলিকদের কাছে মতের ঐক্য প্রত্যাশা করা মিছে। স্বর্ণলঙ্কা-যে সিংহলে তা নিয়েও আজ কত কথাই উঠেছে। বস্তুত পৃথিবীর নানা স্থানে নানা স্তরেই স্বর্ণলঙ্কার চিহ্ন পাওয়া যায়। কবিগুরু যে সেই

অনির্দিষ্ট অথচ সুপরিনির্দিষ্ট স্বর্ণলঙ্কার সংবাদ পেয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কারণ সে-স্বর্ণলঙ্কা যদি খনিজ সোনাতেই বিশেষ একটা স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকত, তা হলে লেজের আগুনে ভস্ম না হয়ে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

স্বর্ণলঙ্কার মতোই আমার পালার ঘটনাস্থলের একটি ডাকনাম আছে। তাকে কবি যক্ষপুরী ব'লে জানে। তার কারণ এ নয় যে সেখানে পৌরাণিক কুবেরের স্বর্ণসিংহাসন। যক্ষের ধন মাটির নীচে পোঁতা আছে। এখানকার রাজা পাতালে সুড়ঙ্গ খোদাই করে সে ধন-হরণে নিযুক্ত। তাই আদর করে এই পুরীকে সমঝদার লোকেরা যক্ষপুরী বলে। লক্ষ্মীপুরী কেন বলে না? কারণ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বৈকুণ্ঠে, যক্ষের ভাণ্ডার পাতালে।

রামায়ণের গল্পের ধারার সঙ্গে এর যে-একটা মিল দেখছি, তার কারণ এ নয় যে, রামায়ণ থেকে গল্পটি আহরণ করা। আসল কারণ, কবিগুরুই আমার গল্পটিকে ধ্যানযোগে আগে থাকতে হরণ করেছেন। যদি বল প্রমাণ কী, প্রমাণ এই যে, স্বর্ণলঙ্কা তাঁর কালে এমন উচ্চ চূড়া নিয়ে প্রকাশমান ছিল, কেউ তা মানবে না। এটা-যে বর্তমান কালেরই, হাজার জায়গায় তার হাজার প্রমাণ প্রত্যক্ষ হয়ে আছে।

ধ্যানের সিঁধ কেটে মহাকবি ভাবীকালের সামগ্রীতে কিরকম কৌশলে হস্তক্ষেপ করতেন তার আর-একটি প্রমাণ দেব।

কর্ষণজীবী এবং আকর্ষণজীবী এই দুই-জাতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা বিষম দ্বন্দ্ব আছে, এ সম্বন্ধে বন্ধুমহলে আমি প্রায়ই আলাপ করে থাকি। কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কলিযুগ কৃষিপল্লীকে কেবলই উজাড় করে দিচ্ছে। তা-ছাড়া শোষণজীবী সভ্যতার ক্ষুধাতৃষ্ণা দ্বেষহিংসা বিলাসবিভ্রম সুশিক্ষিত রাক্ষসেরই মতো। আমার মুখের এই বচনটি কবি তাঁর রূপকের ঝুলিতে লুকিয়ে আত্মসাৎ করেছেন, সেটা প্রণিধান করলেই বোঝা যায়। নবদূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের বক্ষসংলগ্ন সীতাকে স্বর্ণপুরীর অধীশ্বর দশানন হরণ করে নিয়েছিল সেটা কি সেকালের কথা, না একালের? সেটা কি ত্রেতাযুগের ঋষির কথা, না আমার মতো কলিযুগের কবির কথা? তখনো কি সোনার খনির মালেকরা নবদূর্বাদলবিলাসী কৃষকদের ঝুঁটি ধ'রে টান দিয়েছিল?

আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে। কৃষী-যে দানবীয় লোভের টানেই আত্মবিস্মৃত হচ্ছে, ত্রেতাযুগে তারই বৃত্তান্তটি গা-ঢাকা দিয়ে বলবার জন্যেই সোনার মায়ামৃগের বর্ণনা আছে। আজকের দিনের রাক্ষসের মায়ামৃগের লোভেই তো আজকের দিনের সীতা তার হাতে ধরা পড়ছে; নইলে গ্রামের পঞ্চবটচ্ছায়াশীতল

কুটির ছেড়ে চাষীরা টিটাগড়ের চটকলে মরতে আসবে কেন? বাল্মীকির পক্ষে এ-সমস্তই পরবর্তী কালের, অর্থাৎ পরস্ব।

বারোয়ারির প্রবীণমণ্ডলীর কাছে এ-কথা বলে ভালো করলেম না। সীতাচরিত প্রভৃতি পুণ্যকথাসম্বন্ধে তাঁরা আমাকে অশ্রদ্ধাবান বলেই সন্দেহ করেন। এটা আমার দোষ নয়, তাঁদেরও দোষ বলতে পারি নে, বিধাতা তাঁদের এই-রকমই বুদ্ধি দিয়েছেন। বোধ করি সেটা আমার সঙ্গে বারে বারে কৌতুক করবার জন্যেই। পুণ্যশ্লোক বাল্মীকির প্রতি কলঙ্ক আরোপ করলুম বলে পুনর্বার হয়তো তাঁরা আমাকে একঘরে করবার চেষ্টা করবেন। ভরসার কথা আমার দলের লোক আছেন, কৃত্তিবাস নামে আর-এক বাঙালী কবি।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে উঠল। আধুনিক সমস্যা বলে কোনো পদার্থ নেই, মানুষের সব গুরুতর সমস্যাই চিরকালের। রত্নাকরের গল্পটার মধ্যে তারই প্রমাণ পাই। রত্নাকর গোড়ায় ছিলেন দস্যু, তার পরে দস্যুবৃত্তি ছেড়ে ভক্ত হলেন রামের। অর্থাৎ ধর্ষণবিদ্যার প্রভাব এড়িয়ে কর্ষণবিদ্যায় যখন দীক্ষা নিলেন তখনি সুন্দরের আশীর্বাদে তাঁর বীণা বাজল। এই তত্ত্বটা তখনকার দিনেও লোকের মনে জেগেছে। এককালে যিনি দস্যু ছিলেন তিনিই যখন কবি হলেন, তখনি আরণ্যকদের হাতে স্বর্ণলঙ্কার পরাভবের বাণী তাঁর কণ্ঠে এমন জোরের সঙ্গে বেজেছিল।

হঠাৎ মনে হতে পারে রামায়ণটা রূপক কথা। বিশেষত যখন দেখি রাম রাবণ দুই নামের দুই বিপরীত অর্থ। রাম হল আরাম, শান্তি; রাবণ হল চীৎকার, অশান্তি। একটিতে নবাঙ্কুরের মাধুর্য, পল্লবের মর্মর, আর-একটিতে শানবাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে দৈত্যরথের বীভৎস শৃঙ্গধ্বনি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রামায়ণ রূপক নয়, আমার রক্তকরবীর পালাটিও রূপকনাট্য নয়। রামায়ণ মুখ্যত মানুষের সুখদুঃখ বিরহ-মিলন ভালোমন্দ নিয়ে বিরোধের কথা; মানবের মহিমা উজ্জ্বল করে ধরবার জন্যেই চিত্রপটে দানবের পটভূমিকা। এই বিরোধ এক দিকে ব্যক্তিগত মানুষের, আরেক দিকে শ্রেণীগত মানুষের; রাম ও রাবণ একদিকে দুই মানুষের ব্যক্তিগত রূপ, আরেক দিকে মানুষের দুই শ্রেণীগত রূপ। আমার নাটকও একই কালে ব্যক্তিগত মানুষের আর মানুষগত শ্রেণীর। শ্রোতারা যদি কবির পরামর্শ নিতে অবজ্ঞা না করেন তা হলে আমি বলি শ্রেণীর কথাটা ভুলে যান। এইটি মনে রাখুন, রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি 'নন্দিনী' ব'লে একটি মানবীর ছবি। চারিদিকের পীড়নের ভিতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ। ফোয়ারা যেমন সংকীর্ণতার পীড়নে হাসিতে অশ্রুতে কলধ্বনিতে ঊর্ধ্বে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, তেমনি। সেই ছবির দিকেই যদি সম্পূর্ণ ক'রে তাকিয়ে

দেখেন তা হলে হয়তো কিছু রস পেতে পারেন। নয়তো রক্তকরবীর পাপড়ির আড়ালে অর্থ খুঁজতে গিয়ে যদি অনর্থ ঘটে তা হলে তার দায় কবির নয়। নাটকের মধ্যেই কবি আভাস দিয়েছে যে, মাটি খুঁড়ে যে-পাতালে খনিজ ধন খোঁজা হয় নন্দিনী সেখানকার নয়,— মাটির উপরিতলে যেখানে প্রাণের যেখানে রূপের নৃত্য, যেখানে প্রেমের লীলা, নন্দিনী সেই সহজ সুখের, সেই সহজ সৌন্দর্যের।"

যাত্রী গ্রন্থে 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি' অংশে ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৪ তারিখে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গত রক্তকরবী সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিয়াছেন নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায়, তা হলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে। তখন মানুষ আপনার সৃষ্ট যন্ত্রের আঘাতে কেবলই পীড়া দেয়, পীড়িত হয়।

এই ভাবটা আমার রক্তকরবী নাটকের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। যক্ষপুরে পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে করে আনছে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য সেখান থেকে নির্বাসিত। সেখানে জটিলতার জালে আপনাকে আপনি জড়িত করে মানুষ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই সে ভুলেছে, সোনার চেয়ে আনন্দের দাম বেশি; ভুলেছে, প্রতাপের মধ্যে পূর্ণতা নেই, প্রেমের মধ্যেই পূর্ণতা। সেখানে মানুষকে দাস করে রাখবার প্রকাণ্ড আয়োজনে মানুষ নিজেকেই নিজে বন্দী করেছে।

এমন সময়ে সেখানে নারী এল, নন্দিনী এল; প্রাণের বেগ এসে পড়ল যন্ত্রের উপর, প্রেমের আবেগ আঘাত করতে লাগল লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধনজালকে। তখন সেই নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনায় কী করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল, এই নাটকে তাই বর্ণিত আছে।"

গল্পগুচ্ছ

গল্পগুচ্ছ মজুমদার এজেন্সি হইতে গ্রন্থাকারে দুই খণ্ডে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডের প্রকাশকাল ১ আশ্বিন ১৩০৭; দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে।

বর্তমান খণ্ড রচনাবলীতে প্রকাশিত 'গিন্নি' গল্পটি অন্যান্য কয়েকটি গল্পের সহিত প্রথম গল্পগুচ্ছে বাদ পড়ে, যদিও রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্পসংগ্রহ 'ছোট গল্প' (১৫ ফাল্গুন ১৩০০) বইটিতে উহা ইতিপূর্বেই মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৯০৮-১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে

পাঁচ ভাগে প্রকাশিত ইণ্ডিয়ান প্রেসের গল্পগুচ্ছেও উহা বর্জিত ছিল। বিশ্বভারতী সংস্করণ গল্পগুচ্ছের (শ্রাবণ ১৩৩৩) প্রথম খণ্ডে গল্পটি পুনরায় সন্নিবিষ্ট হয়।

১৩১৭ সালের ২৮ ভাদ্র তারিখে পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে একটি পত্রে[১] রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :

"সাধনা বাহির হইবার পূর্বেই হিতবাদী কাগজের জন্ম হয়।[২]... সেই পত্রে প্রতি সপ্তাহেই আমি ছোটো গল্প, সমালোচনা ও সাহিত্যপ্রবন্ধ লিখিতাম। আমার ছোটো গল্প লেখার সূত্রপাত ওইখানেই। ছয় সপ্তাহকাল লিখিয়াছিলাম।"

বর্তমান খণ্ড রচনাবলীতে মুদ্রিত গল্প-ছয়টি হিতবাদীতে সম্ভবতঃ প্রথম ছয় সপ্তাহে বাহির হয়।

পোস্টমাস্টার গল্পটি সম্পর্কে সাজাদপুর হইতে ২৯ জুন ১৮৯২ তারিখে লেখা একটি পত্র 'ছিন্নপত্র' হইতে অংশতঃ উদ্ধৃত হইল :

"কালকের চিঠিতে লিখেছিলুম আজ অপরাহ্ণ সাতটার সময় কবি কালিদাসের সঙ্গে একটা এন্‌গেজ্‌মেণ্ট্ করা যাবে। বাতিটি জ্বালিয়ে টেবিলের কাছে কেদারাটি টেনে বইখানি হাতে যখন বেশ প্রস্তুত হয়ে বসেছি হেনকালে কবি কালিদাসের পরিবর্তে এখানকার পোস্টমাস্টার এসে উপস্থিত। এই লোকটির সঙ্গে আমার একটু বিশেষ যোগ আছে। যখন আমাদের এই কুঠিবাড়ির একতলাতেই পোস্ট অপিস ছিল এবং আমি এঁকে প্রতিদিন দেখতে পেতুম তখনি আমি একদিন দুপুরবেলায় এই দোতলায় বসে সেই পোস্টমাস্টারের গল্পটি লিখেছিলুম এবং সে গল্পটি যখন হিতবাদীতে বেরোল, তখন আমাদের পোস্টমাস্টারবাবু তার উল্লেখ ক'রে বিস্তর লজ্জামিশ্রিত হাস্য বিস্তার করেছিলেন। যাই হ'ক, এই লোকটিকে আমার বেশ লাগে। বেশ নানা-রকম গল্প করে যান, আমি চুপ করে বসে শুনি। ওরই মধ্যে ওঁর আবার বেশ-একটু হাস্যরসও আছে।"

এই প্রসঙ্গে ছিন্নপত্রের সাজাদপুর হইতে লেখা ফেব্রুয়ারি ১৮৯১ তারিখের চিঠিটিও দ্রষ্টব্য।

১ দ্রষ্টব্য : প্রবাসী ১৩৪৮ কার্তিক।

২ ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের শেষ হইতে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় 'হিতবাদী'-নামক সাপ্তাহিক পত্রের প্রকাশ আরম্ভ হয়।

'গিন্নি' গল্পের শিবনাথ পণ্ডিতের সহিত 'জীবনস্মৃতি'তে বর্ণিত 'নর্মাল স্কুল'এর জনৈক শিক্ষকের নিম্নোদ্ধৃত চিত্রটি তুলনীয় :

"ক্রমশ নর্মাল স্কুলের স্মৃতিটা যেখানে ঝাপসা অবস্থা পার হইয়া স্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে সেখানে কোনো অংশেই তাহা লেশমাত্র মধুর নহে।··· শিক্ষকদের মধ্যে একজনের কথা আমার মনে আছে, তিনি এমন কুৎসিত ভাষা ব্যবহার করিতেন যে, তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধাবশত তাঁহার কোনো প্রশ্নেরই উত্তর করিতাম না। সম্বৎসর তাঁহার ক্লাসে আমি সকল ছাত্রের শেষে নীরবে বসিয়া থাকিতাম। যখন পড়া চলিত তখন সেই অবকাশে পৃথিবীর অনেক দুরূহ সমস্যার মীমাংসাচেষ্টা করিতাম। একটা সমস্যার কথা মনে আছে। অস্ত্রহীন হইয়াও শত্রুকে কী করিলে যুদ্ধে হারানো যাইতে পারে, সেটা আমার গভীর চিন্তার বিষয় ছিল। ওই ক্লাসের পড়াশুনার গুঞ্জনধ্বনির মধ্যে বসিয়া ওই কথাটা মনে-মনে আলোচনা করিতাম, তাহা আজও আমার মনে আছে।"

হিতবাদী পত্রিকার দুষ্প্রাপ্যতা-বশতঃ রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গল্পগুলির পাঠ প্রথম গল্পসংগ্রহ 'ছোট গল্প' ও গল্পগুচ্ছের পূর্বসংস্করণগুলির সাহায্যে সংশোধিত হইয়াছে।

শান্তিনিকেতন

শান্তিনিকেতন ১৯০৯ হইতে ১৯১৬ সালের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে ছোটো ছোটো পুস্তিকার আকারে সতেরো খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ১৩১৫ সালের অগ্রহায়ণ হইতে ১৩২১ সালের মাঘ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনের মন্দিরে ও অন্যত্র নানা অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ যে-সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই এই সতেরো খণ্ডে সংগৃহীত হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃত 'সংশোধিত ও নির্বাচিত' যে বিশ্বভারতীসংস্করণ শান্তিনিকেতন ১৩৪১-৪২ সালে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়, তাহাতে অন্যান্য খণ্ডের কয়েকটি উপদেশের সহিত একাদশ ও দ্বাদশ খণ্ডের 'দুর্লভ', 'মাতৃশ্রাদ্ধ', 'সামঞ্জস্য'—এই তিনটি সম্পূর্ণ ব্যাখ্যান এবং 'জাগরণ'-এর শেষার্ধ বর্জিত হইয়াছে।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে একাদশ [অক্টোবর ১৯১০] ও দ্বাদশ [জানুয়ারি ১৯১১] খণ্ড শান্তিনিকেতন প্রথম সংস্করণ অনুসারে যথাক্রমে মুদ্রিত হইল।

মহুয়ার প্রথম সংস্করণে 'সবলা' কবিতাটির চতুর্থ ছত্রটি বাদ পড়িয়াছিল। পরবর্তী কালে স্মৃতি হইতে সংশোধন করিবার সময় রবীন্দ্রনাথ শ্রীপুলিনবিহারী সেনকে ২৭ অক্টোবর ১৯৩৯ তারিখের একটি পত্রে সম্পূর্ণ এক নূতন পংক্তি লিখিয়া পাঠান :

মহুয়াতে 'সবলা' বলে যে কবিতাটি আছে, তাতে একটা লাইন ছুট হয়েছে—

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতঃ,
সংকোচের দৈন্যজাল কেন তুমি পাতো—

এই শেষের লাইনটা পড়ে গিয়েছে— এই লাইনটাকে উদ্ধার কোরো। পরের লাইনে আছে—

পথপ্রান্তে কেন র'ব জাগি—

পথপ্রান্তে শব্দের পর সেমিকোলন দেওয়া চলে কিনা ভেবে দেখো— তা হলে মানে হবে সংকোচের জালটা পাতা হচ্ছে চলবার পথে।

বর্ণানুক্রমিক সূচী

অগোচর ২৪৩
অগ্রদূত ২১৪
অচেনা ৩২
অজানা খনির নূতন মণির ৩১
অজানা জীবন বাহিনু ২৮
অতুলপ্রসাদ সেন ৩১২
অন্তর্ধান ১০৪
অন্তর্হিতা ২২৭
অন্ধ ভূমিগর্ভ হতে শুনেছিলে ১১৫
অপ্ ১৫২
অপরাজিত ৩৩
অপূর্ণ ১৬৯
অবশেষ ১০৮
অবাধ ২৪৯
অবুঝ মন ২০১
অবুঝ শিশুর আবছায়া এই ২০১
অভাগা যখন বেঁধেছিল তার বাসা ৩০৮
অর্ঘ্য ১৫
অর্থ কিছু বুঝি নাই, কুড়ায়ে পেয়েছি ১৬১
অশ্রু ১০৪
অসমাপ্ত ২৯
আকাশ, তোমার সহাস উদার দৃষ্টি ১৫৩
আঁখি চাহে তব মুখ-পানে ৯৬
আগন্তুক ২৫৩
আঘাত ২৬২
আচ্ছাদন হতে ২৪
আছি ১৭৭
আজ খেলাভাঙার খেলা খেলবি আয় ৩৩৮

আজ দখিনাবাতাসে ৩৩৪
আজ ভাবি মনে-মনে তাহারে কি জানি ১৭২
আজি এই মম সকল ব্যাকুল ৫২০
আজি এ নিরালা কুঞ্জে, আমার ২৬
আজি তব জন্মদিনে এই কথা করাব স্মরণ ৩১০
আতঙ্ক ২৬৬
আপনার কাছ হতে বহুদূরে ১৮৪
আবার জাগিনু আমি ২৪২
আমরা খেলা খেলেছিলেম ২৯৭
আমরা তো আজ পুরাতনের কোঠায় ৩০৫
আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা ৩৫
আমরা বাস্তুছাড়ার দল ৩২২
আমার ঘরের সম্মুখেই ২৬০
আমার তরে পথের 'পরে কোথায় তুমি থাক ১৮৪
আমার নয়ন তব নয়নের ১৮
আমারে সাহস দাও, দাও শক্তি ১৮৩
আমি ১৭২
আমি জানি পুরাতন এই বইখানি ২৪০
আমি যেন গোধূলিগগন ১৭
আম্রবন ১২১
আয় আমাদের অঙ্গনে ১৫১
আরেক দিন ২০৮
আরো কিছুখন না হয় বসিয়ো পাশে ৯৩
আলেখ্য ২৬৮
আশীর্বাদ ৮৬, ১৯২, ২৯১, ২৯২, ৩০৮, ৩০৯
আশীর্বাদ : পরিশেষ ৫৫৭
আশীর্বাদী ১৯৯, ৩০৫
আশ্রমবালিকা ২২৮
আশ্রমসখা হে শাল, বনস্পতি ৩০৬
আশ্রমের হে বালিকা ২২৮

আহ্বান	৫৬, ১৮৪
ইরান, তোমার যত বুলবুল	২৮৩
ইরাবতীর মোহানামুখে	১৯৩
উচ্চ প্রাচীরে রুদ্ধ তোমার	২১১
উজ্জীবন ...	৫, ৫১৮, ৫১৯
উত্তরে দুয়াররুদ্ধ হিমানীর কারাদুর্গতলে	৩০১
উত্তিষ্ঠত নিবোধত	৩১০
উত্তীর্ণ হয়েছ তুমি ধূর্জটির ক্রোধবহ্নিশিখা	৫১৯
উৎসর্গ : মহুয়া	৩
উদ্‌ঘাত	২৮
উপহার	১৯
উষসী	৭৮
এই অজানা সাগরজলে	২০৯
এই বিদেশের রাস্তা দিয়ে	২০৫
একদা বিজনে যুগল তরুর মূলে	৫৭
একাকী	৮৫
এখন আমার সময় হল	৩৩৬
এনেছে কবে বিদেশী সখা	১৪৩
এবার বিদায়বেলার সুর ধরো ধরো	৩৩৮
এবেলা ডাক পড়েছে কোন্‌খানে	৩৩৫
এসেছি সুদূর কাল থেকে	২৫৩
ও আমার চাঁদের আলো	৩৩০
ওই নামে একদিন ধন্য হল দেশেদেশান্তরে	২৮৩
ওগো বসন্ত, হে ভুবনজয়ী	১০
ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার	৩৬৭
ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক	৩৩৯-৩৪০
কণ্টিকারি	২০৬
কত ধৈর্য ধরি	১০২
করুণী	৭৬
কলছন্দে পূর্ণ তার প্রাণ	৬৭

কাকলী	৬৭
কাজলী	৬৪
কামনায় কামনায় দেশে দেশে যুগে যুগান্তরে	৩১০
কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও	৯৯
কাহারে পরাব রাখী	৫৬
কুটিরবাসী	১৪৪
কুরচি	১২৭
কুরচি, তোমার লাগি পদ্মেরে ভুলেছে অন্যমনা	১২৭
কে দেবে চাঁদ, তোমায় দোলা	৩৩১
কোথা আছ ? ডাকি আমি	৫৬
কোন্ সে সুদূর মৈত্রী	২৮২
ক্ষিতি	১৫২
খেয়ালি	৬৬
গানগুলি মোর শৈবালেরি দল	৩৩৩
গিন্নি	৪১৭
গুপ্তধন	৯৩
গুহাহিত	৪৫২
গৃহলক্ষ্মী	৩০৩
গোধূলি-অন্ধকারে পুরীর প্রান্তে	২২০
চতুর্দশী এল নেমে	৭৭
চন্দ্রমা আকাশতলে পরম একাকী	৮৫
চলেছে উজান ঠেলি তরণী তোমার	৮৮
চামেলি-বিতান	১৩৮
চাহনি তাহার, সব কোলাহল হ'লে সারা	৬৮
চিত্তকোণে ছন্দে তব	২০
চিরকাল রবে মোর প্রেমের কাঙাল	৪০
চিরন্তন	২০৫
চুরি করে নিয়ে গেলে মোর মন	৫৩১
ছায়া	৯৬
ছায়ালোক	৮০

ছিনু আমি বিষাদে মগনা ৩৭
ছিল চিত্রকল্পনায়, এতকাল ছিল গানে গানে ২০৪
ছিলাম নিদ্রাগত ২৪৬
ছিলাম যবে মায়ের কোলে ১৬৩
ছিলে-যে পথের সাথী ২২৬
ছোটো প্রাণ ২৪৬
জগদীশচন্দ্র ১১৮
জনতার মাঝে দেখিতে পাই নে তারে ৬৮
জন্মদিন ১৬৬
জন্মোৎসব ৪৬২
জয়তী ৭১
জরতী ২৫৫
জলপাত্র ২৬৪
জাগরণ ৫০৬
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী ২৮৯
জীবনমরণ ৩০২,৫৩৯
জীবনমরণের বাজায়ে খঞ্জনি ৩০২
জীবনের মরণের বাজায়ে মন্দিরা ৫৩৯
জ্বলিল অরুণরশ্মি ৮৬
ঝর্না, তোমার স্ফটিকজলের ২২
ঝামরী ৭২
তখন বয়স সাত ২৫৭
তখন বর্ষণহীন অপরাহ্নমেঘে ৩৮
তপোমগ্ন হিমাদ্রির ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করি চুপে ১২০
তব অন্তর্ধানপটে হেরি তব রূপ চিরন্তন ১০৪
তব পথচ্ছায়া বাহি বাঁশরিতে যে বাজাল আজি ১২১
তরুলতা যে-ভাষায় কয় কথা ৭৬
তাকিয়ে দেখি পিছে ২৩৭
তারাপ্রসন্নের কীর্তি ৪৩১
তুমি ১৭৩

তুমি বনের পুব পবনের সাথী	…	…	৯২
তুমি যে তারে দেখনি চেয়ে	…	…	২২৭
তেজ	…	…	১৫৩
তে হি নো দিবসাঃ	…	…	২০৯
তোমায় আমায় মিল হয়েছে কোন্ যুগে এইখানে	…	…	২৭৫
তোমায় গান শোনাব তাই তো আমায়	…	…	৩৬৫
তোমার কুটিরের সমুখবাটে	…	…	১৪৫
তোমার প্রণাম এ যে তারি আভরণ	…	…	২১৯
তোমার প্রত্যাশা লয়ে আছি প্রিয়তমে	…	…	৪৩
তোমার বাস কোথা-যে পথিক ওগো	…	…	৩৩৩
তোমার মুখর দিন হে দিনেন্দ্র	…	…	৩০৯
তোমার স্বপ্নের দ্বারে আমি আছি বসে	…	…	২১৬
তোমারে আপন কোণে	…	…	৫৩
তোমারে ছাড়িয়া যেতে হবে	…	…	৯৮
তোমারে জননী ধরা	…	…	১৯৯
তোমারে দিই নি সুখ	…	…	১০৩
তোমারে দিব না দোষ	…	…	২৫২
তোমারে সম্পূর্ণ জানি	…	…	৬১
তোর প্রাণের রস তো শুকিয়ে গেল ওরে	…	…	৩৫৮
তোরে আমি রচিয়াছি রেখায় রেখায়	…	…	২৬৮
ত্রিশরণ মহামন্ত্র যবে	…	…	২৭৯
দখিনহাওয়া, জাগো জাগো	…	…	৩২৭-৩২৮
দর্পণ	…	…	৮৪
দর্পণ লইয়া তারে কী প্রশ্ন শুধাও	…	…	৮৪
'দাও লেখা দাও' দেয় কতজন তাড়া	…	…	৫৪০
দায়মোচন	…	…	৪০
দিনান্তে	…	…	১০৭
দিনাবসান	…	…	২২৪
দিয়ালী	…	…	৬৮
দীনা	…	…	৬১

দীপশিল্পী	২১১
দীপিকা	১৮৬
দুয়ার	১৮৫
দুর্দিনে	১৯৪
দুর্যোগ আসি টানে যবে ফাঁসি	১৯৪
দুর্লভ	৪৫৮
দূত	৩৭
দূর মন্দিরে সিন্ধুকিনারে	৫২
দূর হতে ভেবেছিনু মনে	২৪৮
দূরে গিয়েছিলে চলি	৯৪
দেনাপাওনা	৪০৫
দেবদারু	১২০
দ্বিধা	৪৭৪
দ্বৈত	১৭
ধর্মমোহ	২৮৪
ধর্মের বেশে মোহ এসে যারে ধরে	২৮৪
ধাবমান	২৩৫
ধীরে ধীরে ধীরে বও	৩২৭-৩২৮
নন্দগোপাল বুক ফুলিয়ে এসে	৩০১
নন্দিনী	৭৮
নবজাগরণ-লগনে-গগনে	৩০৩
নববধূ	৮৮
নাগরী	৬৯
নাট্যপরিচয় : রক্তকরবী	৩৪৩
নাম্নী	৬৩-৮০
না, যেয়ো না, যেয়ো নাকো	৩৩৭
নারিকেল	১৩৬
নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার	৪১
নিবেদন	৩১
নিম্নে সরোবর স্তব্ধ হিমাদ্রির উপত্যকাতলে	১৯২

নিরাবৃত	...	...	২৪৭
নির্ঝরিণী	...	...	২২
নির্বাক্‌	...	...	২১৭
নির্ভয়	...	...	৩৫
নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন	...	...	১৯৪
নীলমণিলতা	...	...	১২৪
নূতন	...	...	২৯৭
নূতন কাল	...	...	৩০১
নূতন শ্রোতা	...	...	১৮৮
নৈবেদ্য	...	...	১০৩
পথবর্তী	...	...	৫২
পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি	...	...	৩৬
পথসঙ্গী	...	...	২২৬
পথের বাঁধন	...	...	৩৬
পবন দিগন্তের দুয়ার নাড়ে	...	...	১২
পরদেশী	...	...	১৪৩
পরবাসী চলে এসো ঘরে	...	...	২৯৩
পরিচয়	...	...	৩৮
পরিণয়	...	...	৮৯, ২০৪
পরিণয়মঙ্গল	...	...	৩০১
পান্থ	...	...	১৬৮
পারস্যে জন্মদিনে	...	...	২৮৩
পিয়ালী	...	...	৬৮
পুরাণে কাহিনী শুনিয়াছি	...	...	৫২১
পুরাণে বলেছে	...	...	৫০
পুরাতন	...	...	৯৬
পুরানো বই	...	...	২৪০
পূর্ণ	...	...	৪৮১
পোস্টমাস্টার	...	...	৪১১
পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে	...	...	৩৫১-৩৫২

প্রকাশ ২৪
প্রচ্ছন্ন দাক্ষিণ্যভারে ৬৪
প্রচ্ছন্না ৮২
প্রণতি ১০২
প্রণাম ১৬১, ২১৯
প্রতিমা ৭৭
প্রতি সন্ধ্যায় নব অধ্যায় ১৮৬
প্রতীক্ষা ৪৩, ২১৬
প্রত্যাগত ৯৪
প্রত্যাশা ১৪
প্রত্যাশী হয়ে ছিনু এতকাল ধরি ১৩৩
প্রথম পঞ্চাশ বর্ষ রচি দিক ৩০৯
প্রথম পাতায় ২৯৬
প্রথম মিলনদিন, সে কি হবে নিবিড় আষাঢ়ে ৪৫
প্রথম সৃষ্টির ছন্দখানি ৭৮
প্রবাসী ২৯৩
প্রভু, তুমি পূজনীয়। আমার কী জাত ২৬৪
প্রশ্ন ১৯৬
প্রাঙ্গণে মোর শিরীষশাখায় ১৪
প্রাচী ২৮৯
প্রাণ ২৫৭
প্রাণের পাথেয় তব পূর্ণ হ'ক ১৫৪
প্রার্থনা ৩১০
ফল ফলাবার আশা আমি ৩২৫
ফাল্গুনমাধুরী তার চরণের মঞ্জীরে মঞ্জীরে ১২৪
ফিরাবে তুমি মুখ ৩৩
বক্ষের ধন হে ধরণী, ধরো ১৫২
বক্সাদুর্গস্থ রাজবন্দীদের প্রতি ১৯৪
বঙ্গের দিগন্ত ছেয়ে বাণীর বাদল ১৫৭
বটের জটায় বাঁধা ছায়াতলে ২৬৬

বধূ	..	...	২৩১
বন্দিনী	...	...	৯২
বন্ধু, তুমি বন্ধুতার অজস্র অমৃতে	...	...	৩১০
বরণ	...	...	৫০, ৫২১
বরণডালা	...	...	২৬, ৫২০
বরযাত্রা	...	...	১২
বর্ষশেষ	...	...	১৮০
বসন্ত	...	...	১০
বসন্ত-উৎসব	...	...	৩০৬
বসন্তবায় সন্ন্যাসী হায়	...	...	১০৯
বসন্তের জয়রবে	...	...	১৩
বহুলক্ষ বর্ষ ধরে জ্বলে তারা	...	...	২৫৭
বাকি আমি রাখব না কিছুই	...	...	৩২৪
বাপী	...	...	৫৭
বালক	...	...	১৭৯
বালক বয়স ছিল যখন	...	...	১৭৯
বাঁশি যখন থামবে ঘরে	...	...	২২৪
বাসরঘর	...	...	৯৮
বাহির পথে বিবাগী হিয়া	...	...	১০৮
বাহিরে তুমি নিলে না মোরে	...	...	১০৭
বাহিরে তোমার যা পেয়েছি সেবা	...	...	২২৭
বাহিরে যখন ক্ষুব্ধ দক্ষিণের মদির পবন	...	...	১৩০
বাহিরে সে দুরন্ত আবেগে	...	...	৭১
বিচার	...	...	২৩৮
বিচার করিয়ো না	...	...	২৩৮
বিচিত্রা	...	...	১৩৩, ৫৩১
বিচ্ছেদ	...	...	৯৮
বিজয়ী	...	...	১৩
বিদায়	...	...	৯৯
বিদায় যখন চাইবে তুমি	...	...	৩৩৬

বিদায়সম্বল	...	...	১০৬
বিদেশে ঐ সৌধশিখর-'পরে	...	...	৮২
বিদ্রূপবাণ উদ্যত করি	...	...	২৬৩
বিবশ দিন, বিরস কাজ	...	...	১৩
বিরক্ত আমার মন	...	...	৫৯
বিরহ	...	...	১০৫
বিরহ ও অন্তর্ধান	...	...	৫২৩
বিশ্বপানে বাহির হবে	...	...	২৯১
বিস্ময়	...	...	২৪২
বুদ্ধজন্মোৎসব	...	...	২৯৫
বুদ্ধদেবের প্রতি	...	...	২৮৩
বৃক্ষবন্দনা	...	...	১১৫
বৃক্ষরোপণ উৎসব	...	...	১৫১-১৫৪
বৈশাখী ঝড় যতই আঘাত হানে	...	...	৩০০
বৈশাখেতে তপ্ত বাতাস মাতে	...	...	১৭৭
বোধন	...	...	৭
বোবার বাণী	...	...	২৬০
বোরোবুদুর	...	...	২৭৭
বোলো তারে, বোলো	...	...	২৯
ব্যঙ্গসুনিপুণা, শ্লেষবাণসন্ধানদারুণা	...	...	৬৯
ব্যবধান	...	...	৪২৬
ব্যোম	...	...	১৫৩
ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ	...	...	১৯৬
ভয় করব না রে বিদায়বেদনারে	...	...	৩৩৮
ভস্ম-অপমানশয্যা ছাড়ো, পুষ্পধনু	...	...	৫, ৫১৮
ভাঙল হাসির বাঁধ	..	...	৩৩০
ভাবিছ যে-ভাবনা একা-একা	...	...	৮৪
ভাবিনী	...	...	৮৪
'ভালোবাসি ভালোবাসি'	...	...	৩৭০-৩৭৪
ভিক্ষু	..	...	১২৭

ভিড় করেছে রঙমশালীর দলে	...	...	৩০৪
ভীরু	...	...	২৩৭
ভূমিকা : বনবাণী	...	...	১১৩
ভোরের আগে যে-প্রহরে	...	...	৭৮
ভোরের পাখি নবীন আঁখি দুটি	...	...	২৭
মণিমালা হাতে নিয়ে	...	...	১৯
মধুমঞ্জরী	...	...	১৩৩
মধ্যাহ্নে বিজন বাতায়নে	...	...	৬৬
মনে তো ছিল তোমারে বলি কিছু	...	...	২১৭
ময়ূর, কর নি মোরে ভয়	...	...	১৩৯
মরুৎ	...	...	১৫৩
মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে	...	...	১৫১
মহুয়া	...	...	৫৯, ৫২৩
মাঘের সূর্য উত্তরায়ণে পার হয়ে এল চলি	...	...	৭
মাঙ্গলিক	...	...	১৫৪
মাতৃশ্রাদ্ধ	...	...	৪৮৬
মাধবী	...	...	১৩
মানী	...	...	২১১
মানুষের ইতিহাসে ফেনোচ্ছল উদ্বেল উদ্যম	...	...	২৩১
মায়া	...	...	২০
মালিনী	...	...	৭৫
মিলন	...		৯০, ২৩২, ২৫২
মুক্তরূপ	...	...	৫৩
মুক্তি	...	...	২৭
মুক্তি—১, ২	...	..	১৮৩, ১৮৪
মুরতি	...	...	৭৩
মৃত্যুঞ্জয়	...	...	২৪৮
মোর স্বপনতরীর কে তুই নেয়ে	...	...	৩৫৬
মোহানা	...	...	১৯৩
যদি তারে নাই চিনি গো	...	...	৩২৬

যবনিকা-অন্তরালে মর্ত্য পৃথিবীতে	... ...	২৪৭
যাত্রা হয়ে আসে সারা	... ...	১৮০
যাত্রী	... ...	২৫১
যাবার দিকের পথিকের ’পরে	... ...	১০৬
যারে সে বেসেছে ভালো	... ...	৩৫
যুগে যুগে বুঝি আমায় চেয়েছিল সে	... ...	৩৭৫
যে-কাল হরিয়া লয় ধন	... ...	২৫১
যে-ক্ষুধা চক্ষের মাঝে	... ...	১৩৯
যে-গান গাহিয়াছিনু	... ...	৯৬
যেথায় তুমি গুণী জ্ঞানী	... ...	৮০
যেদিন ধরণী ছিল ব্যথাহীন মরু	... ...	১১৮
যেন তার চক্ষু-মাঝে	... ...	৭১
যে বোবা দুঃখের ভার	... ...	২৪৪
‘যেয়ো না, যেয়ো না’ বলি কারে ডাকে	... ...	২৩৫
যে-শক্তির নিত্যলীলা নানা বর্ণে আঁকা	... ...	৭৩
যে-সন্ধ্যায় প্রসন্ন লগনে	... ...	১৯
রঙিন	... ...	৩০৪
রথীরে কহিল গৃহী উৎকণ্ঠায়	... ...	২৯২
রবিপ্রদক্ষিণপথে জন্মদিবসের আবর্তন	... ...	১৬৬
রসের ধর্ম	... ...	৪৪৩
রাখিপূর্ণিমা	... ...	৫৬
রাজপুত্র	... ...	২১৩
রাত্রি যবে সাঙ্গ হল	... ...	৯৮
রামকানাইয়ের নিবুর্দ্ধিতা	... ...	৪২১
রূপকথা-স্বপ্নলোকবাসী	... ...	২১৩
রে অচেনা, মোর মুষ্টি ছাড়াবি কী ক’রে	... ...	৩২
রে মহুয়া, নামখানি গ্রাম্য তোর	... ...	৫২৩
লক্ষ্যশূন্য	... ...	২৯২
লয়	... ...	৪৫
লিখতে যখন বল আমায়	... ...	২৯৬

'লিখন দেহো, লিখন দেহো' ডাকে ৫৪২
লেখা ১৮৭
শক্ত হল রোগ ২৩৩
শঙ্কিত আলোক নিয়ে দিগন্তে উদিল শীর্ণ শশী ১০৫, ৫২৩
শান্ত ২৬৩
শামলী ৬৩
শাল ১৩০
শিলঙে এক গিরির খোপে ২০৬
শুকতারা ২৩
শুকনো পাতা কে যে ছড়ায় ওই দূরে ৩৩২
শুক বলে, গিরিরাজের জগতে প্রাধান্য ২৯৯
শুকসারী ২৯৯
শুধায়ো না, কবে কোন্ গান ৩
শুধায়ো না মোর গান ৫১৭
শুধায়ো না মোরে তুমি মুক্তি কোথা ১৬৮
শুভখন আসে সহসা আলোক জ্বেলে ৮৯
শুভযোগ ১৯
শূন্যঘর ২২০
শেষ ৪৯২
শেষ ফলনের ফসল এবার ৩৮৮
শেষ মধু ১০৯
শেষ-লেখাটার খাতা ১৮৮
শ্রাবণসন্ধ্যা ৪৬৮
শ্রীবিজয়লক্ষ্মী ২৭৫
শ্লথপ্রাণ দুর্বলের স্পর্ধা আমি ৫৫
সকালের আলো এই বাদলবাতাসে ২৭০
সন্ধান ১৮
সব দিবি কে, সব দিবি পায় ৩২৪
সবলা ৪১
সব লেখা লুপ্ত হয় ১৮৭

সমুদ্রের কূল হতে বহুদূরে শব্দহীন মাঠে	...	...	১৩৭
সরে যা, ছেড়ে দে পথ	...	...	২৪৯
সহসা ডালপালা তোর উতলা-যে	...	...	৩২৮
সাগরজলে সিনান করি সজল এলোচুলে	...	...	৪৭
সাগরিকা	...	...	৪৭
সাগরী	...	...	৭১
সাথী	...	...	২৫৭
সান্ত্বনা	...	...	২৪৪, ২৭০
সামঞ্জস্য	...	...	৪৯৪
সিয়াম : প্রথম দর্শনে	...	...	২৭৯
সিয়াম : বিদায়কালে	...	...	২৮২
সুন্দর, তুমি চক্ষু ভরিয়া	...	...	১০৪
সুন্দর ভক্তির ফুল অলক্ষ্যে নিভৃত	...	...	২৯২
সুন্দরী তুমি শুকতারা	...	...	২৩
সুসময়	...	...	৩০০, ৫৪০
সূর্যমুখীর বর্ণে বসন লই রাঙায়ে	...	...	১৫
সূর্য যখন উড়াল কেতন	...	...	১৭৩
সৃষ্টির প্রথম বাণী তুমি হে আলোক	...	...	১৫৩
সৃষ্টির প্রাঙ্গণে দেখি বসন্তে অরণ্যে ফুলে ফুলে	...	...	৯০
সৃষ্টির রহস্য আমি তোমাতে করেছি অনুভব	...	...	৬২
সৃষ্টিরহস্য	...	...	৬২
সে কি ভাবে গোপন র'বে	...	...	৩২৯
সেদিন উষার নববীণাঝংকারে	...	...	২৩২
সেদিন প্রভাতে সূর্য এইমতো উঠেছে অম্বরে	...	...	২৭৭
সে যেন খসিয়া-পড়া তারা	...	...	৭২
সে যেন গ্রামের নদী	...	...	৬৩
সোঁদালের ডালের ডগায়	...	...	২৬২
স্পর্ধা	...	...	৫৫
স্পষ্ট মনে জাগে	...	...	২০৮
স্পাই	...	...	২৩৩

হাটের ভিড়ের দিকে চেয়ে দেখি	...	...	২৪৩
হায় রে ভিক্ষু, হায় রে	...	...	১৯৭
হাস্যিমুখ নিয়ে যায় ঘরে ঘরে	...	...	৭৫
হাসির পাথেয়	...	...	১৪৯
হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী	...	...	২৯৫
হিমালয়-গিরিপথে চলেছিনু কবে বাল্যকালে	...	...	১৪৯
হে অরতী, অন্তরে আমার	...	...	২৫৫
হে দুয়ার, তুমি আছ মুক্ত অনুক্ষণ	...	...	১৮৫
হে পথিক, তুমি একা	...	...	২১৪
হে পবন, কর নাই গৌণ	...	...	১৫৩
হে মেঘ, ইন্দ্রের ভেরী বাজাও গম্ভীর	...	...	১৫২
হেঁয়ালী	...	...	৬৫
হে সুন্দরী, হে শিখা মহতী	...	...	২১১

রবীন্দ্র রচনাবলী

ষোড়শ খণ্ড

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

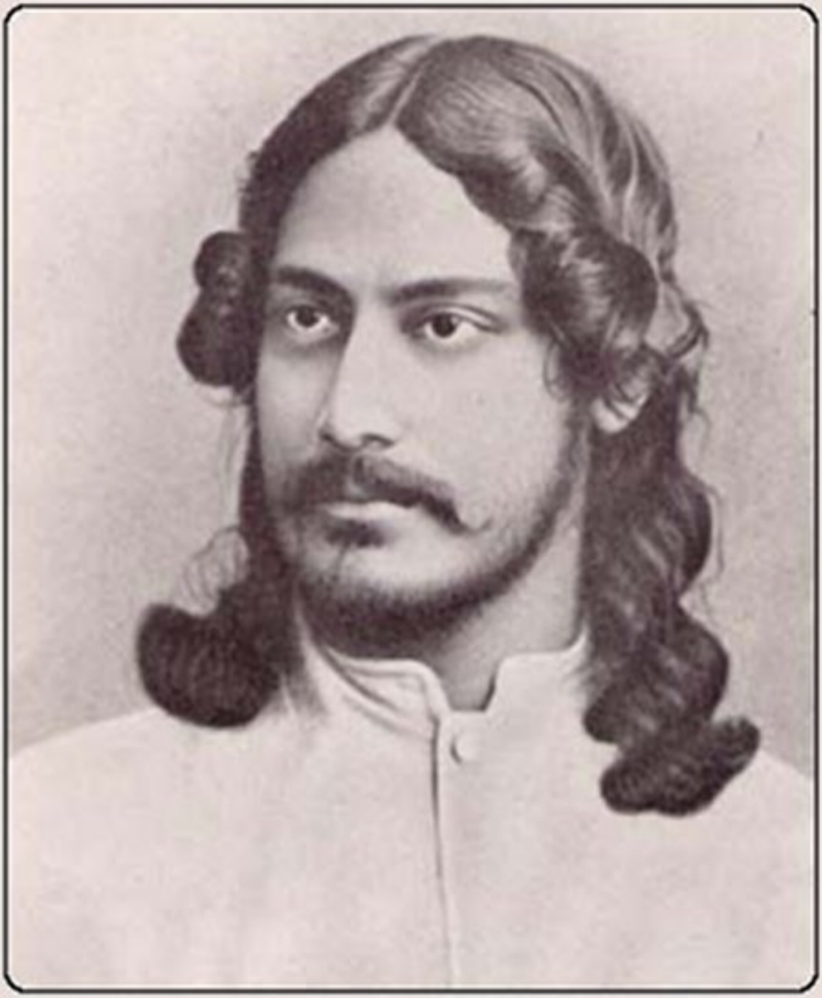

রবীন্দ্র-রচনাবলী

ষোড়শ খণ্ড

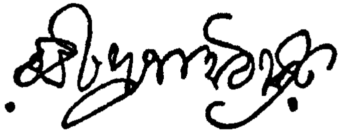

বিশ্বভারতী

২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট। কলিকাতা

প্রকাশ ২২ শ্রাবণ ১৩৫০
পুনর্মুদ্রণ মাঘ ১৩৬০

মূল্য ৮৲, ১১৲ ও ১২৲

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী। ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস। ৩০ কর্নওআলিস স্ট্রীট। কলিকাতা

সূচী

চিত্রসূচী ।৶০

কবিতা ও গান

পুনশ্চ ১

নাটক ও প্রহসন

চিরকুমার-সভা ১৪৭

উপন্যাস ও গল্প

গল্পগুচ্ছ ২৯৩

প্রবন্ধ

শান্তিনিকেতন ১৩ - ১৭ ৩৪১

গ্রন্থপরিচয় ৫০৯

বর্ণানুক্রমিক সূচী ৫১৯

চিত্রসূচী

রবীন্দ্রনাথ ॥ ১৯৩০ খৃস্টাব্দ

কবিতা ও গান

পুনশ্চ

ভূমিকা

গীতাঞ্জলির গানগুলি ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করেছিলেম। এই অনুবাদ কাব্যশ্রেণীতে গণ্য হয়েছে। সেই অবধি আমার মনে এই প্রশ্ন ছিল যে পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে ইংরেজিরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কি না। মনে আছে সত্যেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেম, তিনি স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু, চেষ্টা করেন নি। তখন আমি নিজেই পরীক্ষা করেছি, 'লিপিকা'র অল্প কয়েকটি লেখায় সেগুলি আছে। ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয় নি— বোধ করি ভীরুতাই তার কারণ।

তার পরে আমার অনুরোধক্রমে একবার অবনীন্দ্রনাথ এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। আমার মত এই যে, তাঁর লেখাগুলি কাব্যের সীমার মধ্যে এসেছিল, কেবল ভাষাবাহুল্যের জন্যে তাতে পরিমাণ রক্ষা হয় নি। আর-একবার আমি সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছি।

এই উপলক্ষ্যে একটা কথা বলবার আছে। গদ্যকাব্যে অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠনপ্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীনক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে। অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এই আমার বিশ্বাস এবং সেই দিকে লক্ষ রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলি লিখেছি। এর মধ্যে কয়েকটি কবিতা আছে তাতে মিল নেই, পদ্যছন্দ আছে, কিন্তু পদ্যের বিশেষ ভাষারীতি ত্যাগ করবার চেষ্টা করেছি। যেমন 'তরে' 'সনে' 'মোর' প্রভৃতি যে-সকল শব্দ গদ্যে ব্যবহার হয় না সেগুলিকে এই-সকল কবিতায় স্থান দিই নি।

২ আশ্বিন ১৩৩৯ — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উৎসর্গ

নীতু

পুনশ্চ

কোপাই

পদ্মা কোথায় চলেছে দূর আকাশের তলায়,
মনে মনে দেখি তাকে।
এক পারে বালুর চর,
নির্ভীক কেননা নিঃস্ব, নিরাসক্ত—
অন্য পারে বাঁশবন, আমবন,
পুরোনো বট, পোড়ো ভিটে,
অনেক দিনের গুঁড়ি-মোটা কাঁঠালগাছ—
পুকুরের ধারে সর্ষেখেত,
পথের ধারে বেতের জঙ্গল,
দেড়শো বছর আগেকার নীলকুঠির ভাঙা ভিত,
তার বাগানে দীর্ঘ ঝাউগাছে দিনরাত মর্মরধ্বনি।
ঐখানে রাজবংশীদের পাড়া,
ফাটল-ধরা খেতে ওদের ছাগল চরে,
হাটের কাছে টিনের ছাদওয়ালা গঞ্জ—
সমস্ত গ্রাম নির্মম নদীর ভয়ে কম্পান্বিত।
পুরাণে প্রসিদ্ধ এই নদীর নাম,
মন্দাকিনীর প্রবাহ ওর নাড়ীতে।
ও স্বতন্ত্র। লোকালয়ের পাশ দিয়ে চলে যায়—
তাদের সহ্য করে, স্বীকার করে না।
বিশুদ্ধ তার আভিজাতিক ছন্দে
এক দিকে নির্জন পর্বতের স্মৃতি, আর-এক দিকে নিঃসঙ্গ সমুদ্রের আহ্বান

একদিন ছিলেম ওরই চরের ঘাটে,
নিভৃতে, সবার হতে বহুদূরে।
ভোরের শুকতারাকে দেখে জেগেছি,
ঘুমিয়েছি রাতে সপ্তর্ষির দৃষ্টির সম্মুখে
নৌকার ছাদের উপর।
আমার একলা দিন-রাতের নানা ভাবনার ধারে ধারে
চলে গেছে ওর উদাসীন ধারা—
পথিক যেমন চলে যায়
গৃহস্থের সুখদুঃখের পাশ দিয়ে, অথচ দূর দিয়ে।

তার পরে যৌবনের শেষে এসেছি
তরুবিরল এই মাঠের প্রান্তে।
ছায়াবৃত সাঁওতাল-পাড়ার পুঞ্জিত সবুজ দেখা যায় অদূরে।

এখানে আমার প্রতিবেশিনী কোপাই নদী।
প্রাচীন গোত্রের গরিমা নেই তার।
অনার্য তার নামখানি
কত কালের সাঁওতাল নারীর হাস্যমুখর
কলভাষার সঙ্গে জড়িত।
গ্রামের সঙ্গে তার গলাগলি,
স্থলের সঙ্গে জলের নেই বিরোধ।
তার এ পারের সঙ্গে ও পারের কথা চলে সহজে।
শণের খেতে ফুল ধরেছে একেবারে তার গায়ে গায়ে,
জেগে উঠেছে কচি কচি ধানের চারা।
রাস্তা যেখানে থেমেছে তীরে এসে
সেখানে ও পথিককে দেয় পথ ছেড়ে
কলকল স্ফটিকস্বচ্ছ স্রোতের উপর দিয়ে।
অদূরে তালগাছ উঠেছে মাঠের মধ্যে,
তীরে আম জাম আমলকীর ঘেঁষাঘেঁষি।

ওর ভাষা গৃহস্থপাড়ার ভাষা—
তাকে সাধুভাষা বলে না।
জল স্থল বাঁধা পড়েছে ওর ছন্দে,
রেষারেষি নেই তরলে শ্যামলে।
ছিপ্‌ছিপে ওর দেহটি
বেঁকে বেঁকে চলে ছায়ায় আলোয়
হাততালি দিয়ে সহজ নাচে।
বর্ষায় ওর অঙ্গে অঙ্গে লাগে মাৎলামি
মহুয়া-মাতাল গাঁয়ের মেয়ের মতো—
ভাঙে না, ডোবায় না,
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আবর্তের ঘাঘরা
দুই তীরকে ঠেলা দিয়ে দিয়ে
উচ্চ হেসে ধেয়ে চলে।
শরতের শেষে স্বচ্ছ হয়ে আসে জল,
ক্ষীণ হয় তার ধারা,
তলার বালি চোখে পড়ে,
তখন শীর্ণ সমারোহের পাণ্ডুরতা
তাকে তো লজ্জা দিতে পারে না।
তার ধন নয় উদ্ধত, তার দৈন্য নয় মলিন ;
এ দুইয়েই তার শোভা—
যেমন নটী যখন অলংকারের ঝংকার দিয়ে নাচে,
আর যখন সে নীরবে বসে থাকে ক্লান্ত হয়ে,
চোখের চাহনিতে আলস্য,
একটুখানি হাসির আভাস ঠোঁটের কোণে।

কোপাই আজ কবির ছন্দকে আপন সাথি করে নিলে,
সেই ছন্দের আপোস হয়ে গেল ভাষার স্থলে জলে,
যেখানে ভাষার গান আর যেখানে ভাষার গৃহস্থালি।
তার ভাঙা তালে হেঁটে চলে যাবে ধনুক হাতে সাঁওতাল ছেলে ;
পার হয়ে যাবে গোরুর গাড়ি

আঁটি আঁটি খড় বোঝাই করে ;
হাটে যাবে কুমোর
বাঁকে করে হাঁড়ি নিয়ে ;
পিছন পিছন যাবে গাঁয়ের কুকুরটা ;
আর, মাসিক তিন টাকা মাইনের গুরু
ছেঁড়া ছাতি মাথায়।

১ ভাদ্র ১৩৩৯

নাটক

নাটক লিখেছি একটি।
বিষয়টা কী বলি।

অর্জুন গিয়েছেন স্বর্গে,
ইন্দ্রের অতিথি তিনি নন্দনবনে।
উর্বশী গেলেন মন্দারের মালা হাতে
তাঁকে বরণ করবেন ব'লে।
অর্জুন বললেন, দেবী, তুমি দেবলোকবাসিনী,
অতি সম্পূর্ণ তোমার মহিমা,
অনিন্দিত তোমার মাধুরী,
প্রণতি করি তোমাকে।
তোমার মালা দেবতার সেবার জন্যে।
উর্বশী বললেন, কোনো অভাব নেই দেবলোকের,
নেই তার পিপাসা।
সে জানেই না চাইতে,
তবে কেন আমি হলেম সুন্দর !
তার মধ্যে মন্দ নেই,
তবে ভালো হওয়া কার জন্যে !

আমার মালার মূল্য নেই তার গলায়।
মর্তকে প্রয়োজন আমার,
আমাকে প্রয়োজন মর্তের।
তাই এসেছি তোমার কাছে,
তোমার আকাঙ্ক্ষা দিয়ে করো আমাকে বরণ,
দেবলোকের দুর্লভ সেই আকাঙ্ক্ষা
মর্তের সেই অমৃত-অশ্রুর ধারা।

ভালো হয়েছে আমার লেখা।
'ভালো হয়েছে' কথাটা কেটে দেব কি চিঠি থেকে?
কেন, দোষ হয়েছে কী?
সত্য কথাই বেরিয়েছে কলমের মুখে।
আশ্চর্য হয়েছ আমার অবিনয়ে—
বলছ, ভালো যে হয়েইছে জানলে কী করে?
আমার উত্তর এই, নিশ্চিত নাই বা জানলেম।
এক কালের ভালোটা
হয়তো হবে না অন্য কালের ভালো।
তাই তো এক নিশ্বাসে বলতে পারি
'ভালো হয়েছে'।
চিরকালের সত্য নিয়ে কথা হত যদি
চুপ করে থাকতেম ভয়ে।
কত লিখেছি কতদিন,
মনে মনে বলেছি 'খুব ভালো'।
আজ পরম শত্রুর নামে
পারতেম যদি সেগুলো চালাতে
খুশি হতেম তবে।
এ লেখারও একদিন হয়তো হবে সেই দশা—
সেইজন্যেই, দোহাই তোমার,
অসংকোচে বলতে দাও আজকের মতো
'এ লেখা হয়েছে ভালো'।

এইখানটায় একটুখানি তন্দ্রা এল।
হঠাৎ-বর্ষণে চারি দিক থেকে ঘোলা জলের ধারা
যেমন নেমে আসে, সেইরকমটা।
তবু ঝেঁকে ঝেঁকে উঠে টলমল করে কলম চলছে,
যেমনটা হয় মদ খেয়ে নাচতে গেলে।
তবু শেষ করব এ চিঠি,
কুয়াশার ভিতর দিয়েও জাহাজ যেমন চলে,
কল বন্ধ করে না।

বিষয়টা হচ্ছে আমার নাটক।
বন্ধুদের ফর্মাশ, ভাষা হওয়া চাই অমিত্রাক্ষর।
আমি লিখেছি গদ্যে।
পদ্য হল সমুদ্র,
সাহিত্যের আদিযুগের সৃষ্টি।
তার বৈচিত্র্য ছন্দতরঙ্গে,
কলকল্লোলে।
গদ্য এল অনেক পরে।
বাঁধা ছন্দের বাইরে জমালো আসর।
সুশ্রী-কুশ্রী ভালোমন্দ তার আঙিনায় এল
ঠেলাঠেলি করে।
ছেঁড়া কাঁথা আর শাল-দোশালা
এল জড়িয়ে মিশিয়ে,
সুরে বেসুরে ঝনাঝন ঝংকার লাগিয়ে দিল।
গর্জনে ও গানে, তাণ্ডবে ও তরল তালে
আকাশে উঠে পড়ল গদ্যবাণীর মহাদেশ।
কখনো ছাড়লে অগ্নিনিশ্বাস,
কখনো ঝরালে জলপ্রপাত।
কোথাও তার সমতল, কোথাও অসমতল;
কোথাও দুর্গম অরণ্য, কোথাও মরুভূমি।

একে অধিকার যে করবে তার চাই রাজপ্রতাপ ;
পতন বাঁচিয়ে শিখতে হবে
এর নানারকম গতি অবগতি।
বাইরে থেকে এ ভাসিয়ে দেয় না স্রোতের বেগে,
অন্তরে জাগাতে হয় ছন্দ
গুরু লঘু নানা ভঙ্গিতে।
সেই গদ্যে লিখেছি আমার নাটক,
এতে চিরকালের স্তব্ধতা আছে
আর চলতি কালের চাঞ্চল্য।

৯ ভাদ্র ১৩৩৯

নূতন কাল

আমাদের কালে গোষ্ঠে যখন সাঙ্গ হল
সকালবেলার প্রথম দোহন,
ভোরবেলাকার ব্যাপারীরা
চুকিয়ে দিয়ে গেল প্রথম কেনা-বেচা,
তখন কাঁচা রৌদ্রে বেরিয়েছি রাস্তায়,
ঝুড়ি হাতে হেঁকেছি আমার কাঁচা ফল নিয়ে—
তাতে কিছু হয়তো ধরেছিল রঙ, পাক ধরে নি।
তার পর প্রহরে প্রহরে ফিরেছি পথে পথে ;
কত লোক কত বললে, কত নিলে, কত ফিরিয়ে দিলে,
ভোগ করলে দাম দিলে না সেও কত লোক—
সে কালের দিন হল সারা।

কাল আপন পায়ের চিহ্ন যায় মুছে মুছে,
স্মৃতির বোঝা আমরাই বা জমাই কেন,
এক দিনের দায় টানি কেন আর-এক দিনের 'পরে,
দেনা-পাওনা চুকিয়ে দিয়ে হাতে হাতে
ছুটি নিয়ে যাই না কেন সামনের দিকে চেয়ে !

সেদিনকার উদ্‌বৃত্ত নিয়ে নূতন কারবার জমবে না
তা নিলেম মেনে।
তাতে কী বা আসে যায়।
দিনের পর দিন পৃথিবীর বাসাভাড়া
দিতে হয় নগদ মিটিয়ে।
তার পর শেষ দিনে দখলের জোর জানিয়ে
তালা বন্ধ করবার ব্যর্থ প্রয়াস,
কেন সেই মূঢ়তা।

তাই প্রথম ঘণ্টা বাজল যেই
বেরিয়েছিলেম হিসেব চুকিয়ে দিয়ে।
দরজার কাছ পর্যন্ত এসে যখন ফিরে তাকাই,
তখন দেখি তুমি যে আছ
এ কালের আঙিনায় দাঁড়িয়ে।
তোমার সঙ্গীরা একদিন যখন হেঁকে বলবে
আর আমাকে নেই প্রয়োজন,
তখন ব্যথা লাগবে তোমারই মনে
এই আমার ছিল ভয়—
এই আমার ছিল আশা।
যাচাই করতে আস নি তুমি—
তুমি দিলে গ্রন্থি বেঁধে তোমার কালে আমার কালে হৃদয় দিয়ে।
দেখলেম ঐ বড়ো বড়ো চোখের দিকে তাকিয়ে,
করুণ প্রত্যাশা তো এখনো তার পাতায় আছে লেগে।

তাই ফিরে আসতে হল আর একবার।
দিনের শেষে নতুন পালা আবার করেছি শুরু
তোমারি মুখ চেয়ে,
ভালোবাসার দোহাই মেনে।
আমার বাণীকে দিলেম সাজ পরিয়ে
তোমাদের বাণীর অলংকারে—

তাকে রেখে দিয়ে গেলেম পথের ধারে পান্থশালায়.
পথিক বন্ধু, তোমারি কথা মনে ক'রে।
যেন সময় হলে একদিন বলতে পার
মিটল তোমাদেরও প্রয়োজন,
লাগল তোমাদেরও মনে।
দশ জনের খ্যাতির দিকে হাত বাড়াবার দিন নেই আমার।
কিন্তু তুমি আমাকে বিশ্বাস করেছিলে প্রাণের টানে—
সেই বিশ্বাসকে কিছু পাথেয় দিয়ে যাব
এই ইচ্ছা।

যেন গর্ব করে বলতে পার
আমি তোমাদেরও বটে,
এই বেদনা মনে নিয়ে নেমেছি এই কালে—
এমন সময় পিছন ফিরে দেখি তুমি নেই।
তুমি গেলে সেইখানেই
যেখানে আমার পুরোনো কাল অবগুণ্ঠিত মুখে চলে গেল,
যেখানে পুরাতনের গান রয়েছে চিরন্তন হয়ে।
আর, একলা আমি আজও এই নতুনের ভিড়ে বেড়াই ধাক্কা খেয়ে,
যেখানে আজ আছে কাল নেই।

২ ভাদ্র ১৩৩৯

খোয়াই

পশ্চিমে বাগান বন চষা-খেত
মিলে গেছে দূর বনান্তে বেগনি বাষ্পরেখায়;
মাঝে আম জাম তাল তেঁতুলে ঢাকা
সাঁওতালপাড়া;
পাশ দিয়ে ছায়াহীন দীর্ঘ পথ গেছে বেঁকে
রাঙা পাড় যেন সবুজ শাড়ির প্রান্তে কুটিল রেখায়।
হঠাৎ উঠেছে এক-একটা যূথভ্রষ্ট তালগাছ,
দিশাহারা অনির্দিষ্টকে যেন দিক দেখাবার ব্যাকুলতা।

পৃথিবীর একটানা সবুজ উত্তরীয়,
তারি এক ধারে ছেদ পড়েছে উত্তর দিকে,
মাটি গেছে ক'য়ে,
দেখা দিয়েছে
উর্মিল লাল কাঁকরের নিস্তব্ধ তোলপাড়—
মাঝে মাঝে মরচে-ধরা কালো মাটি
মহিষাসুরের মুণ্ড যেন।
পৃথিবী আপনার একটি কোণের প্রাঙ্গণে
বর্ষাধারার আঘাতে বানিয়েছে
ছোটো ছোটো অখ্যাত খেলার পাহাড়,
বয়ে চলেছে তার তলায় তলায় নামহীন খেলার নদী।

শরৎকালে পশ্চিম-আকাশে
সূর্যাস্তের ক্ষণিক সমারোহে
রঙের সঙ্গে রঙের ঠেলাঠেলি—
তখন পৃথিবীর এই ধূসর ছেলেমানুষির উপরে
দেখেছি সেই মহিমা
যা একদিন পড়েছে আমার চোখে
দুর্লভ দিনাবসানে
রোহিত সমুদ্রের তীরে তীরে
জনশূন্য তরুহীন পর্বতের রক্তবর্ণ শিখরশ্রেণীতে,
রুষ্টরুদ্রের প্রলয়ভ্রূকুঞ্চনের মতো।

এই পথে ধেয়ে এসেছে কালবৈশাখীর ঝড়
গেরুয়া পতাকা উড়িয়ে
ঘোড়সওয়ার বর্গি সৈন্যের মতো—
কাঁপিয়ে দিয়েছে শাল-সেগুনকে,
নুইয়ে দিয়েছে ঝাউয়ের মাথা,
হায়-হায় রব তুলেছে বাঁশের বনে,
কলাবাগানে করেছে দুঃশাসনের দৌরাত্ম্য।

ক্রন্দিত আকাশের নীচে ঐ ধূসর বন্ধুর
কাঁকরের স্তূপগুলো দেখে মনে হয়েছে
লাল সমুদ্রে তুফান উঠল,
ছিটকে পড়ছে তার শীকরবিন্দু।

এসেছিলেম বালককালে।
ওখানে গুহাগহ্বরে
ঝির্ ঝির্ ঝর্নার ধারায়
রচনা করেছি মন-গড়া রহস্যকথা,
খেলেছি নুড়ি সাজিয়ে
নির্জন দুপুর বেলায় আপন-মনে একলা।

তার পরে অনেক দিন হল,
পাথরের উপর নির্ঝরের মতো
আমার উপর দিয়ে
বয়ে গেল অনেক বৎসর।
রচনা করতে বসেছি একটা কাজের রূপ
ঐ আকাশের তলায় ভাঙামাটির ধারে,
ছেলেবেলায় যেমন রচনা করেছি
নুড়ির দুর্গ।
এই শালবন, এই একলা-মেজাজের তালগাছ,
ঐ সবুজ মাঠের সঙ্গে রাঙামাটির মিতালি,
এর পানে অনেক দিন যাদের সঙ্গে দৃষ্টি মিলিয়েছি,
যারা মন মিলিয়েছিল
এখানকার বাদল-দিনে আর আমার বাদল-গানে,
তারা কেউ আছে কেউ গেল চলে।

আমারও যখন শেষ হবে দিনের কাজ,
নিশীথরাত্রের তারা ডাক দেবে
আকাশের ও পার থেকে—

তার পরে ?

তার পরে রইবে উত্তর দিকে

ঐ বুক-ফাটা ধরণীর রক্তিমা,

দক্ষিণ দিকে চাষের খেত,

পুব দিকের মাঠে চরবে গোরু।

রাঙামাটির রাস্তা বেয়ে

গ্রামের লোক যাবে হাট করতে।

পশ্চিমের আকাশপ্রান্তে

আঁকা থাকবে একটি নীলাঞ্জনরেখা

৩০ শ্রাবণ ১৩৩৯

পত্র

তোমাকে পাঠালুম আমার লেখা

এক-বই-ভরা কবিতা।

তারা সবাই ঘেঁষাঘেঁষি দেখা দিল

একই সঙ্গে এক খাঁচায়।

কাজেই আর সমস্ত পাবে,

কেবল পাবে না তাদের মাঝখানের ফাঁকগুলোকে।

যে অবকাশের নীল আকাশের আসরে

একদিন নামল এসে কবিতা

সেইটেই পড়ে রইল পিছনে।

নিশীথ রাত্রের তারাগুলি ছিঁড়ে নিয়ে

যদি হার গাঁথা যায় ঠেসে,

বিশ্ব-বেনের দোকানে

হয়তো সেটা বিকোয় মোটা দামে;

তবু রসিকেরা বুঝতে পারে, যেন কমতি হল কিসের।

যেটা কম পড়ল সেটা ফাঁকা আকাশ,

তৌল করা যায় না তাকে,

কিন্তু সেটা দরদ দিয়ে ভরা।

মনে করো একটি গান উঠল জেগে
নীরব সময়ের বুকের মাঝখানে
একটি মাত্র নীলকান্তমণি—
তাকে কি দেখতে হবে
গয়নার বাক্সের মধ্যে।
বিক্রমাদিত্যের সভায়
কবিতা শুনিয়েছেন কবি দিনে দিনে।
ছাপাখানার দৈত্য তখন
কবিতার সময়াকাশকে
দেয় নি লেপে কালী মাখিয়ে।
হাইড্রলিক জাঁতায় -পেষা কাব্যপিণ্ড
তলিয়ে যেত না গলায় এক-এক গ্রাসে,
উপভোগটা পুরো অবসরে উঠত রসিয়ে।

হায় রে, কানে শোনার কবিতাকে
পরানো হল চোখে দেখার শিকল,
কবিতার নির্বাসন হল লাইব্রেরি-লোকে;
নিত্যকালের আদরের ধন
পাব্লিশরের হাটে হল নাকাল।
উপায় নেই,
জটলা-পাকানোর যুগ এটা।
কবিতাকে পাঠকের অভিসারে যেতে হয়
পটল-ডাঙার অম্নিবাসে চড়ে।

মন বলছে নিশ্বাস ফেলে—
আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে।
তুমি যদি হতে বিক্রমাদিত্য
আর আমি যদি হতেম— কী হবে ব'লে।
জন্মেছি ছাপার কালিদাস হয়ে।
তোমরা আধুনিক মালবিকা

কিনে পড় কবিতা
আরাম-কেদারায় ব'সে।
চোখ বুজে কান পেতে শোন না;
শোনা হলে
কবিকে পরিয়ে দাও না বেলফুলের মালা,
দোকানে পাঁচ সিকে দিয়েই খালাস

১০ ভাদ্র ১৩৩৯

পুকুর-ধারে

দোতলার জানলা থেকে চোখে পড়ে
পুকুরের একটি কোণা।
ভাদ্রমাসে কানায় কানায় জল।
জলে গাছের গভীর ছায়া টল্‌টল্‌ করছে
সবুজ রেশমের আভায়।
তীরে তীরে কলমি শাক আর হেলঞ্চ।
ঢালু পাড়িতে সুপারি গাছ ক'টা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।
এ ধারের ডাঙায় করবী, সাদা রঙন, একটি শিউলি;
দুটি অযত্নের রজনীগন্ধায় ফুল ধরেছে গরিবের মতো।
বাঁখারি-বাঁধা মেহেদির বেড়া,
তার ও পারে কলা পেয়ারা নারকেলের বাগান;
আরো দূরে গাছপালার মধ্যে একটা কোঠাবাড়ির ছাদ,
উপর থেকে শাড়ি ঝুলছে।
মাথায় ভিজে চাদর জড়ানো গা-খোলা মোটা মানুষটি
ছিপ ফেলে বসে আছে বাঁধা ঘাটের পৈঠাতে,
ঘণ্টার পর ঘণ্টা যায় কেটে।

বেলা পড়ে এল।
বৃষ্টি-ধোওয়া আকাশ,
বিকেলের প্রৌঢ় আলোয় বৈরাগ্যের ম্লানতা।

ধীরে ধীরে হাওয়া দিয়েছে,
টলমল করছে পুকুরের জল,
ঝিল্‌মিল্‌ করছে বাতাবি লেবুর পাতা।

চেয়ে দেখি আর মনে হয়
এ যেন আর কোনো-একটা দিনের আবছায়া ;
আধুনিকের বেড়ার ফাঁক দিয়ে
দূর কালের কার একটি ছবি নিয়ে এল মনে।
স্পর্শ তার করুণ, স্নিগ্ধ তার কণ্ঠ,
মুগ্ধ সরল তার কালো চোখের দৃষ্টি।
তার সাদা শাড়ির রাঙা চওড়া পাড়
দুটি পা ঘিরে ঢেকে পড়েছে ;
সে আঙিনাতে আসন বিছিয়ে দেয়,
সে আঁচল দিয়ে ধুলো দেয় মুছিয়ে ;
সে আম-কাঁঠালের ছায়ায় ছায়ায় জল তুলে আনে,
তখন দোয়েল ডাকে শজনের ডালে,
ফিঙে লেজ দুলিয়ে বেড়ায় খেজুরের ঝোপে।
যখন তার কাছে বিদায় নিয়ে চলে আসি
সে ভালো করে কিছুই বলতে পারে না ;
কপাট অল্প একটু ফাঁক করে পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে,
চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।

২৫ শ্রাবণ ১৩৩৯

অপরাধী

তুমি বল তিনু প্রশ্রয় পায় আমার কাছে—
তাই রাগ কর তুমি।
ওকে ভালোবাসি,
তাই ওকে দুষ্টু ব'লে দেখি,
দোষী ব'লে দেখি নে—

রাগও করি ওর 'পরে
ভালোও লাগে ওকে,
এ কথাটা মিছে নয় হয়তো।

এক একজন মানুষ অমন থাকে
সে লোক নেহাত মন্দ নয়,
সেইজন্যেই সহজে তার মন্দটাই পড়ে ধরা।
সে হতভাগা রঙে মন্দ, কিন্তু মন্দ নয় রসে ;
তার দোষ স্তূপে বেশি,
ভারে বেশি নয়—
তাই দেখতে যতটা লাগে,
গায়ে লাগে না তত।
মনটা ওর হাল্কা ছিপ্‌ছিপে নৌকো,
হুহু করে চলে যায় ভেসে ;
ভালোই বল আর মন্দই বল
জমতে দেয় না বেশি ক্ষণ—
এ পারের বোঝা ও পারে চালান করে দেয়
দেখতে দেখতে ;
ওকে কিছুই চাপ দেয় না,
তেমনি ও দেয় না চাপ।

স্বভাব ওর আসর-জমানো,
কথা কয় বিস্তর,
তাই বিস্তর মিছে বলতে হয়—
নইলে ফাঁক পড়ে কথার ঠাস-বুনোনিতে।
মিছেটা নয় ওর মনে,
সে ওর ভাষায়।
ওর ব্যাকরণটা যার জানা
তার বুঝতে হয় না দেরি।
ওকে তুমি বল নিন্দুক— তা সত্য।

সত্যকে বাড়িয়ে তুলে বাঁকিয়ে দিয়ে ও নিন্দে বানায়-
যার নিন্দে করে তার মন্দ হবে ব'লে নয়,
যারা নিন্দে শোনে তাদের ভালো লাগবে ব'লে।
তারা আছে সমস্ত সংসার জুড়ে।
তারা নিন্দের নীহারিকা,
ও হল নিন্দের তারা.
ওর জ্যোতি তাদেরই কাছ থেকে পাওয়া।
আসল কথা ওর বুদ্ধি আছে, নেই বিবেচনা।
তাই ওর অপরাধ নিয়ে হাসি চলে।
যারা ভালোমন্দ বিবেচনা করে সূক্ষ্ম তৌলের মাপে
তাদের দেখে হাসি যায় বন্ধ হয়ে ;
তাদের সঙ্গটা ওজনে হয় ভারী,
সয় না বেশিক্ষণ ;
দৈবে তাদের ত্রুটি যদি হয় অসাবধানে
হাঁপ ছেড়ে বাঁচে লোকে।

বুঝিয়ে বলি কাকে বলে অবিবেচনা—
মাখন লক্ষ্মীছাড়াটা সংস্কৃতর ক্লাসে
চৌকিতে লাগিয়ে রেখেছিল ভুসো ;
ছাপ লেগেছিল পণ্ডিতমশায়ের জামার পিঠে ;
সে হেসেছিল, সবাই হেসেছিল
পণ্ডিতমশায় ছাড়া।
হেড্‌মাস্টার দিলেন ছেলেটাকে একেবারে তাড়িয়ে ;
তিনি অত্যন্ত গম্ভীর, তিনি অত্যন্ত বিবেচক।
তাঁর ভাব-গতিক দেখে হাসি বন্ধ হয়ে যায়।

তিনু অপকার করে কিছু না ভেবে,
উপকার করে অনায়াসে,
কোনোটাই মনে রাখে না।
ও ধার নেয়, খেয়াল নেই শোধ করবার ;

যারা ধার নেয় ওর কাছে
পাওনার তলব নেই তাদের দরজায়।
মোটের উপর ওরই লোকসান হয় বেশি।

তোমাকে আমি বলি, ওকে গাল দিয়ো যা খুশি,
আবার হেসো মনে মনে—
নইলে ভুল হবে।
আমি ওকে দেখি কাছের থেকে, মানুষ ব'লে,
ভালো মন্দ পেরিয়ে।
তুমি দেখ দূরে ব'সে, বিশেষণের কাঠগড়ায় ওকে খাড়া রেখে;
আমি ওকে লাঞ্ছনা দিই তোমার চেয়ে বেশি—
ক্ষমা করি তোমার চেয়ে বড়ো ক'রে।
সাজা দিই, নির্বাসন দিই নে।
ও আমার কাছেই রয়ে গেল,
রাগ কোরো না তাই নিয়ে।

৭ ভাদ্র ১৩৩৯

ফাঁক

আমার বয়সে
মনকে বলবার সময় এল,
কাজ নিয়ে কোরো না বাড়াবাড়ি,
ধীরে সুস্থে চলো,
যথোচিত পরিমাণে ভুলতে করো শুরু
যাতে ফাঁক পড়ে সময়ের মাঝে মাঝে।
বয়স যখন অল্প ছিল
কর্তব্যের বেড়ায় ফাঁক ছিল যেখানে সেখানে।
তখন যেমন-খুশির ব্রজধামে
ছিল বালগোপালের লীলা।
মথুরার পালা এল মাঝে,
কর্তব্যের রাজাসনে।

আজ আমার মন ফিরেছে
সেই কাজ-ভোলার অসাবধানে।
কী কী আছে দিনের দাবি
পাছে সেটা যাই এড়িয়ে
বন্ধু তার ফর্দ রেখে যায় টেবিলে।
ফর্দটাও দেখতে ভুলি,
টেবিলে এসেও বসা হয় না—
এম্‌নিতরো ঢিলে অবস্থা।
গরম পড়েছে ফর্দে এটা না ধরলেও
মনে আনতে বাধে না।
পাখা কোথায়,
কোথায় দার্জিলিঙের টাইম-টেবিলটা.
এমনতরো হাঁপিয়ে ওঠবার ইশারা ছিল
থার্মোমিটারে।
তবু ছিলেম স্থির হয়ে।

বেলা দুপুর
আকাশ ঝাঁ ঝাঁ করছে,
ধূ ধূ করছে মাঠ,
তপ্ত বালু উড়ে যায় হুহু করে—
খেয়াল হয় না।
বনমালী ভাবে দরজা বন্ধ করাটা
ভদ্রঘরের কায়দা—
দিই তাকে এক ধমক।
পশ্চিমের সাশির ভিতর দিয়ে
রোদ ছড়িয়ে পড়ে পায়ের কাছে।
বেলা যখন চারটে
বেহারা এসে খবর নেয়, চিটিঠি ?
হাত উলটিয়ে বলি, নাঃ।

ক্ষণকালের জন্য খটকা লাগে
চিঠি লেখা উচিত ছিল—
ক্ষণকালটা যায় পেরিয়ে,
ডাকের সময় যায় তার পিছন পিছন।
এ দিকে বাগানে পথের ধারে
টগর গন্ধরাজের পুঁজি ফুরোয় না,
এরা ঘাটে-জটলা-করা বউদের মতো,
পরস্পর হাসাহাসি ঠেলাঠেলিতে
মাতিয়ে তুলেছে কুঞ্জ আমার।
কোকিল ডেকে ডেকে সারা—
ইচ্ছে করে তাকে বুঝিয়ে বলি,
অত একান্ত জেদ কোরো না
বনান্তরের উদাসীনকে মনে রাখবার জন্যে।
মাঝে মাঝে ভুলো, মাঝে মাঝে ফাঁক বিছিয়ে রেখো জীবনে;
মনে রাখার মানহানি কোরো না
তাকে দুঃসহ ক'রে।
মনে আনবার অনেক দিন ক্ষণ আমারো আছে,
অনেক কথা, অনেক দুঃখ।
তার ফাঁকের ভিতর দিয়েই
নতুন বসন্তের হাওয়া আসে
রজনীগন্ধার গন্ধে বিষণ্ণ হয়ে;
তারি ফাঁকের মধ্যে দিয়ে
কাঁঠালতলার ঘন ছায়া
তপ্ত মাঠের ধারে
দূরের বাঁশি বাজায়
অশ্রুত মূলতানে।
তারি ফাঁকে ফাঁকে দেখি,
ছেলেটা স্কুল পালিয়ে খেলা করছে
হাঁসের বাচ্ছা বুকে চেপে ধ'রে
পুকুরের ধারে

ঘাটের উপর একলা ব'সে
সমস্ত বিকেল বেলাটা।
তারি ফাঁকের ভিতর দিয়ে দেখতে পাই
লিখছে চিঠি নূতন বধূ,
ফেলছে ছিঁড়ে, লিখছে আবার।
একটুখানি হাসি দেখা দেয় আমার মুখে,
আবার একটুখানি নিশ্বাসও পড়ে।

১১ ভাদ্র ১৩৩৯

বাসা

ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।
আমার পোষা হরিণে বাছুরে যেমন ভাব
তেমনি ভাব শালবনে আর মহুয়ায়।
ওদের পাতা ঝরছে গাছের তলায়,
উড়ে পড়ছে আমার জানলাতে।
তালগাছটা খাড়া দাঁড়িয়ে পুবের দিকে,
সকালবেলাকার বাঁকা রোদ্দুর
তারি চোরাই ছায়া ফেলে আমার দেয়ালে।
নদীর ধারে ধারে পায়ে-চলা পথ
রাঙা মাটির উপর দিয়ে,
কুড়চির ফুল ঝরে তার ধুলোয়;
বাতাবি-লেবু-ফুলের গন্ধ
ঘনিয়ে ধরে বাতাসকে;
জারুল পলাশ মাদারে চলেছে রেষারেষি;
শজনে ফুলের ঝুরি দুলছে হাওয়ায়;
চামেলি লতিয়ে গেছে বেড়ার গায়ে গায়ে,
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।

নদীতে নেমেছে ছোটো একটি ঘাট
লাল পাথরে বাঁধানো।
তারি এক পাশে অনেক কালের চাঁপাগাছ,
মোটা তার গুঁড়ি।
নদীর উপরে বেঁধেছি একটি সাঁকো,
তার দুই পাশে কাঁচের টবে
জুঁই বেল রজনীগন্ধা শ্বেতকরবী।
গভীর জল মাঝে মাঝে,
নীচে দেখা যায় নুড়িগুলি।
সেইখানে ভাসে রাজহংস
আর ঢালুতটে চরে বেড়ায়
আমার পাটল রঙের গাই গোরুটি
আর মিশোল রঙের বাছুর,
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।

ঘরের মেঝেতে ফিকে নীল রঙের জাজিম পাতা
খয়েরি-রঙের-ফুল-কাটা।
দেয়াল বসন্তী রঙের,
তাতে ঘন কালো রেখার পাড়।
একটুখানি বারান্দা পুবের দিকে,
সেইখানে বসি সূর্যোদয়ের আগেই।
একটি মানুষ পেয়েছি
তার গলায় সুর ওঠে ঝলক দিয়ে,
নটীর কঙ্কণে আলোর মতো।
পাশের কুটিরে সে থাকে,
তার চালে উঠেছে ঝুমকোলতা।
আপন মনে সে গায় যখন
তখনি পাই শুনতে—
গাইতে বলি নে তাকে।

স্বামীটি তার লোক ভালো—
আমার লেখা ভালোবাসে,
ঠাট্টা করলে যথাস্থানে যথোচিত হাসতে জানে,
খুব সাধারণ কথা সহজেই পারে কইতে,
আবার হঠাৎ কোনো-একদিন আলাপ করে
—লোকে যাকে চোখ টিপে বলে কবিত্ব—
রাত্রি এগারোটার সময় শালবনে
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।

বাড়ির পিছন দিকটাতে
শাক-সবজির খেত।
বিঘে-দুয়েক জমিতে হয় ধান।
আর আছে আম-কাঁঠালের বাগিচা
আস্‌শেওড়ার-বেড়া-দেওয়া।
সকালবেলায় আমার প্রতিবেশিনী
গুন্‌ গুন্‌ গাইতে গাইতে মাখন তোলে দই থেকে,
তার স্বামী যায় দেখতে খেতের কাজ
লাল টাট্টু ঘোড়ায় চ'ড়ে।
নদীর ও পারে রাস্তা,
রাস্তা ছাড়িয়ে ঘন বন—
সে দিক থেকে শোনা যায় সাঁওতালের বাঁশি
আর শীতকালে সেখানে বেদেরা করে বাসা,
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।

এই পর্যন্ত।
এ বাসা আমার হয় নি বাঁধা, হবেও না।
ময়ূরাক্ষী নদী দেখিও নি কোনো দিন।
ওর নামটা শুনি নে কান দিয়ে,
নামটা দেখি চোখের উপরে—

মনে হয় যেন ঘননীল মায়ার অঞ্জন
লাগে চোখের পাতায়।
আর মনে হয়,
আমার মন বসবে না আর কোথাও,
সব কিছু থেকে ছুটি নিয়ে
চলে যেতে চায় উদাস প্রাণ
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।

৩ ভাদ্র ১৩৩৯

দেখা

মোটা মোটা কালো মেঘ
ক্লান্ত পালোয়ানের দল যেন,
সমস্ত রাত বর্ষণের পর
আকাশের এক পাশে এসে জমল
ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে।
বাগানের দক্ষিণ সীমায় সেগুন গাছে
মঞ্জরীর ঢেউগুলোতে হঠাৎ পড়ল আলো,
চমকে উঠল বনের ছায়া।
শ্রাবণ মাসের রৌদ্র দেখা দিয়েছে
অনাহূত অতিথি,
হাসির কোলাহল উঠল
গাছে গাছে ডালে-পালায়।
রোদ-পোহানো ভাবনাগুলো
ভেসে ভেসে বেড়ালো মনের দূর গগনে।
বেলা গেল অকাজে।

বিকেলে হঠাৎ এল গুরু গুরু ধ্বনি,
কার যেন সংকেত।

এক মুহূর্তে মেঘের দল
বুক ফুলিয়ে হু হু করে ছুটে আসে
তাদের কোণ ছেড়ে।
বাঁধের জল হয়ে গেল কালো,
বটের তলায় নামল থম্‌থমে অন্ধকার।
দূর বনের পাতায় পাতায়
বেজে ওঠে ধারাপতনের ভূমিকা।
দেখতে দেখতে ঘনবৃষ্টিতে পাণ্ডুর হয়ে আসে
সমস্ত আকাশ,
মাঠ ভেসে যায় জলে।
বুড়ো বুড়ো গাছগুলো আলুথালু মাতামাতি করে
ছেলেমানুষের মতো ;
ধৈর্য থাকে না তালের পাতায়, বাঁশের ডালে।
একটু পরেই পালা হল শেষ—
আকাশ নিকিয়ে গেল কে।
কৃষ্ণপক্ষের কৃশ চাঁদ যেন রোগশয্যা ছেড়ে
ক্লান্ত হাসি নিয়ে অঙ্গনে বাহির হয়ে এল।

মন বলে, এই আমার যত দেখার টুকরো
চাই নে হারাতে।
আমার সত্তর বছরের খেয়ায়
কত চল্‌তি মুহূর্ত উঠে বসেছিল,
তারা পার হয়ে গেছে অদৃশ্যে।
তার মধ্যে দুটি-একটি কুঁড়েমির দিনকে
পিছনে রেখে যাব
ছন্দে গাঁথা কুঁড়েমির কারুকাজে,
তারা জানিয়ে দেবে আশ্চর্য কথাটি
একদিন আমি দেখেছিলেম এই সব-কিছু।

৪ ভাদ্র ১৩৩৯

সুন্দর

প্লাটিনমের আঙটির মাঝখানে যেন হীরে।
আকাশের সীমা ঘিরে মেঘ,
মাঝখানের ফাঁক দিয়ে রোদ্দুর আসছে মাঠের উপর।
হুহু করে বইছে হাওয়া,
পেঁপে গাছগুলোর যেন আতঙ্ক লেগেছে,
উত্তরের মাঠে নিমগাছে বেধেছে বিদ্রোহ,
তালগাছগুলোর মাথায় বিস্তর বকুনি।
বেলা এখন আড়াইটা।
ভিজে বনের ঝল্‌মলে মধ্যাহ্ন
উত্তর দক্ষিণের জানলা দিয়ে এসে
জুড়ে বসেছে আমার সমস্ত মন।
জানি নে কেন মনে হয়
এই দিন দূর কালের আর কোনো-একটা দিনের মতো।
এ-রকম দিন মানে না কোনো দায়কে,
এর কাছে কিছুই নেই জরুরি,
বর্তমানের নোঙর-ছেঁড়া ভেসে-যাওয়া এই দিন।
একে দেখছি যে অতীতের মরীচিকা বলে
সে অতীত কি ছিল কোনো কালে কোনোখানে,
সে কি চিরযুগেরই অতীত নয়।
প্রেয়সীকে মনে হয় সে আমার জন্মান্তরের জানা —
যে কালে স্বর্গ, যে কালে সত্যযুগ,
যে কাল সকল কালেরই ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে।
তেমনি এই-যে সোনায় পান্নায় ছায়ায় আলোয় গাঁথা
অবকাশের নেশায় মন্থর আষাঢ়ের দিন
বিহ্বল হয়ে আছে মাঠের উপর ওড়না ছড়িয়ে দিয়ে,
এর মাধুরীকেও মনে হয় আছে তবু নেই,
এ আকাশবীণায় গৌড়সারঙের আলাপ,
সে আলাপ আসছে সর্বকালের নেপথ্য থেকে।

৭ ভাদ্র ১৩৩৯

শেষ দান

ছেলেদের খেলার প্রাঙ্গণ।
শুকনো ধুলো, একটি ঘাস উঠতে পায় না।
এক ধারে আছে কাঞ্চন গাছ,
আপন রঙের মিল পায় না সে কোথাও।
দেখে মনে পড়ে আমাদের কালো রিট্রিভার কুকুরটা,
সে বাঁধা থাকে কোঠাবাড়ির বারান্দায়।
দূরে রান্নাঘরের চার ধারে উঞ্ছবৃত্তির উৎসাহে
ঘুরে বেড়ায় দিশি কুকুরগুলো।
ঝগড়া করে, মার খায়, আর্তনাদ করে,
তবু আছে সুখে নিজেদের স্বভাবে।
আমাদের টেডি থেকে থেকে দাঁড়িয়ে ওঠে চঞ্চল হয়ে,
সমস্ত গা তার কাঁপতে থাকে,
ব্যগ্র চোখে চেয়ে দেখে দক্ষিণের দিকে,
ছুটে যেতে চায় ওদের মাঝখানে—
ঘেউ ঘেউ ডাকতে থাকে ব্যর্থ আগ্রহে।

তেমনি কাঞ্চন গাছ আছে একা দাঁড়িয়ে,
আপন শ্যামল পৃথিবীতে নয়,
মানুষের-পায়ে-দলা গরিব ধুলোর 'পরে।
চেয়ে থাকে দূরের দিকে
ঘাসের পটের উপর যেখানে বনের ছবি আঁকা।

সেবার বসন্ত এল।
কে জানবে, হাওয়ার থেকে
ওর মজ্জায় কেমন করে কী বেদনা আসে।
অদূরে শালবন আকাশে মাথা তুলে
মঞ্জরী-ভরা সংকেত জানালে
দক্ষিণসাগরতীরের নবীন আগন্তুককে।

সেই উচ্ছ্বসিত সবুজ কোলাহলের মধ্যে
কোন্ চরম দিনের অদৃশ্য দূত দিল ওর দ্বারে নাড়া,
কানে কানে গেল খবর দিয়ে এই—
একদিন নামে শেষ আলো,
নেচে যায় কচি পাতার শেষ ছেলেখেলার আসরে

দেরি করলে না।
তার হাসিমুখের বেদনা
ফুটে উঠল ভারে ভারে
ফিকে-বেগনি ফুলে।
পাতা গেল না দেখা—
যতই ঝরে ততই ফোটে,
হাতে রাখল না কিছুই।
তার সব দান এক বসন্তে দিল উজাড় ক'রে।
তার পরে বিদায় নিল
এই ধূসর ধূলির উদাসীনতার কাছে।

৫ ভাদ্র ১৩৩৯

কোমল গান্ধার

নাম রেখেছি কোমল গান্ধার,
মনে মনে।
যদি তার কানে যেত অবাক হয়ে থাকত বসে,
বলত হেসে 'মানে কী'।
মানে কিছুই যায় না বোঝা সেই মানেটাই খাঁটি।
কাজ আছে কর্ম আছে সংসারে,
ভালো মন্দ অনেক রকম আছে—
তাই নিয়ে তার মোটামুটি সবার সঙ্গে চেনাশোনা

পাশের থেকে আমি দেখি বসে বসে
কেমন একটি সুর দিয়েছে চার দিকে।
আপনাকে ও আপনি জানে না।
যেখানে ওর অন্তর্যামীর আসন পাতা,
সেইখানে তাঁর পায়ের কাছে
রয়েছে কোন্ ব্যথা-ধূপের পাত্রখানি।
সেখান থেকে ধোঁয়ার আভাস চোখের উপর পড়ে,
চাঁদের উপর মেঘের মতো—
হাসিকে দেয় একটুখানি ঢেকে।
গলার সুরে কী করুণা লাগে ঝাপসা হয়ে।
ওর জীবনের তানপুরা যে ওই সুরেতেই বাঁধা,
সেই কথাটি ও জানে না!
চলায় বসায় সব কাজেতেই ভৈরবী দেয় তান—
কেন যে তার পাই নে কিনারা।
তাই তো আমি নাম দিয়েছি কোমল-গান্ধার—
যায় না বোঝা যখন চক্ষু তোলে
বুকের মধ্যে অমন ক'রে
কেন লাগায় চোখের জলের মিড়।

১৩ ভাদ্র ১৩৩৯

আজ এই বাদলার দিন,
এ মেঘদূতের দিন নয়।
এ দিন অচলতায় বাঁধা।
মেঘ চলছে না, চলছে না হাওয়া,
টিপিটিপি বৃষ্টি
ঘোমটার মতো পড়ে আছে
দিনের মুখের উপর।

সময়ে যেন স্রোত নেই,
চার দিকে অবারিত আকাশ,
অচঞ্চল অবসর।

যেদিন মেঘদূত লিখেছেন কবি,
সেদিন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে নীল পাহাড়ের গায়ে।
দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছুটেছে মেঘ,
পুবে হাওয়া বয়েছে শ্যামজম্বুবনান্তকে দুলিয়ে দিয়ে।
যক্ষনারী বলে উঠেছে,
মাগো, পাহাড়সুদ্ধ নিল বুঝি উড়িয়ে।
মেঘদূত উড়ে চলে যাওয়ার বিরহ,
দুঃখের ভার পড়ল না তার 'পরে—
সেই বিরহে ব্যথার উপর মুক্তি হয়েছে জয়ী।

সেদিনকার পৃথিবী জেগে উঠেছিল
উচ্ছল ঝরনায়, উদ্‌বেল নদীস্রোতে
মুখরিত বনহিল্লোলে,
তার সঙ্গে দুলে দুলে উঠেছে
মন্দাক্রান্তা ছন্দে বিরহীর বাণী।
একদা যখন মিলনে ছিল না বাধা
তখন ব্যবধান ছিল সমস্ত বিশ্বে,
বিচিত্র পৃথিবীর বেষ্টনী পড়ে থাকত
নিভৃত বাসরকক্ষের বাইরে।
যেদিন এল বিচ্ছেদ
সেদিন বাঁধন-ছাড়া দুঃখ বেরোল
নদী গিরি অরণ্যের উপর দিয়ে।
কোণের কান্না মিলিয়ে গেল পথের উল্লাসে।
অবশেষে ব্যথার রূপ দেখা গেল
যে কৈলাসে যাত্রা হল শেষ।

সেখানে অচল ঐশ্বর্যের মাঝখানে
প্রতীক্ষার নিশ্চল বেদনা।

অপূর্ণ যখন চলেছে পূর্ণের দিকে
তার বিচ্ছেদের যাত্রাপথে
আনন্দের নব নব পর্যায়।
পরিপূর্ণ অপেক্ষা করছে স্থির হয়ে ;
নিত্যপুষ্প, নিত্যচন্দ্রালোক,
নিত্যই সে একা— সেই তো একান্ত বিরহী।
যে অভিসারিকা তারই জয়,
আনন্দে সে চলেছে কাঁটা মাড়িয়ে।

ভুল বলা হল বুঝি।
সেও তো নেই স্থির হয়ে যে পরিপূর্ণ,
সে যে বাজায় বাঁশি, প্রতীক্ষার বাঁশি—
সুর তার এগিয়ে চলে অন্ধকার পথে।
বাঞ্ছিতের আহ্বান আর অভিসারিকার চলা
পদে পদে মিলছে একই তালে।
তাই নদী চলেছে যাত্রার ছন্দে,
সমুদ্র দুলেছে আহ্বানের সুরে।

৭ ভাদ্র ১৩৩৯

স্মৃতি

পশ্চিমে শহর।
তারি দূর কিনারায় নির্জনে
দিনের তাপ আগলে আছে একটা অনাদৃত বাড়ি,
চারি দিকে চাল পড়েছে ঝুঁকে।
ঘরগুলোর মধ্যে চিরকালের ছায়া উপুড় হয়ে পড়ে,
আর চিরবন্দী পুরাতনের একটা গন্ধ।
মেঝের উপর হলদে জাজিম,
ধারে ধারে ছাপ-দেওয়া বন্দুক-ধারী বাঘ-মারা শিকারির মূর্তি

উত্তর দিকে শিশুগাছের তলা দিয়ে
চলেছে সাদা মাটির রাস্তা, উড়ছে ধুলো
খররৌদ্রের গায়ে হাল্কা উড়নির মতো।
সামনের চরে গম অড়র ফুটি তরমুজের খেত,
দূরে ঝক্‌মক্ করছে গঙ্গা,
তার মাঝে মাঝে গুণ-টানা নৌকো
কালীর আঁচড়ে আঁকা ছবি যেন।
বারান্দায় রুপোর-কাঁকন-পরা ভজিয়া
গম ভাঙছে জাঁতায়,
গান গাইছে একঘেয়ে সুরে,
গির্‌ধারী দারোয়ান অনেক খন ধরে তার পাশে বসে আছে
জানি না কিসের ওজরে।
বুড়ো নিমগাছের তলায় ইঁদারা,
গোরু দিয়ে জল টেনে তোলে মালী,
তার কাকুধ্বনিতে মধ্যাহ্ন সকরুণ,
তার জলধারায় চঞ্চল ভুট্টার খেত।
গরম হাওয়ায় ঝাপসা গন্ধ আসছে আমের বোলের,
খবর আসছে মহানিমের মঞ্জরীতে মৌমাছির বসেছে মেলা।

অপরাহ্ণে শহর থেকে আসে একটি পরবাসী মেয়ে,
তাপে কৃশ পাণ্ডুবর্ণ বিষণ্ণ তার মুখ,
মৃদুস্বরে পড়িয়ে যায় বিদেশী কবির কবিতা।
নীল রঙের জীর্ণ চিকের ছায়া-মিশানো অস্পষ্ট আলোয়
ভিজে খস্‌খসের গন্ধের মধ্যে
প্রবেশ করে সাগরপারের মানবহৃদয়ের ব্যথা।
আমার প্রথমযৌবন খুঁজে বেড়ায় বিদেশী ভাষার মধ্যে আপন ভাষা
প্রজাপতি যেমন ঘুরে বেড়ায়
বিলিতি মৌসুমি ফুলের কেয়ারিতে
নানা বর্ণের ভিড়ে।

৭ ভাদ্র ১৩৩৯

ছেলেটা

ছেলেটার বয়স হবে বছর দশেক—
পরের ঘরে মানুষ।
যেমন আগাছা বেড়ে ওঠে ভাঙা বেড়ার ধারে—
মালীর যত্ন নেই,
আছে আলোক-বাতাস বৃষ্টি
পোকামাকড় ধুলোবালি,
কখনো ছাগলে দেয় মুড়িয়ে
কখনো মাড়িয়ে দেয় গোরুতে—
তবু মরতে চায় না, শক্ত হয়ে ওঠে,
ডাঁটা হয় মোটা,
পাতা হয় চিকন সবুজ।

ছেলেটা কুল পাড়তে গিয়ে গাছের থেকে পড়ে,
হাড় ভাঙে,
বুনো বিষফল খেয়ে ওর ভির্মি লাগে,
রথ দেখতে গিয়ে কোথায় যেতে কোথায় যায়,
কিছুতেই কিছু হয় না—
আধমরা হয়েও বেঁচে ওঠে,
হারিয়ে গিয়ে ফিরে আসে
কাদা মেখে কাপড় ছিঁড়ে—
মার খায় দমাদম,
গাল খায় অজস্র—
ছাড়া পেলেই আবার দেয় দৌড়।

মরা নদীর বাঁকে দাম জমেছে বিস্তর,
বক দাঁড়িয়ে থাকে ধারে,
দাঁড়কাক বসেছে বৈঁচিগাছের ডালে,
আকাশে উড়ে বেড়ায় শঙ্খচিল,

বড়ো বড়ো বাঁশ পুঁতে জাল পেতেছে জেলে,
বাঁশের ডগায় বসে আছে মাছরাঙা,
পাতিহাঁস ডুবে ডুবে গুগলি তোলে।
বেলা দুপুর।
লোভ হয় জলের ঝিলিমিলি দেখে—
তলায় পাতা ছড়িয়ে শেওলাগুলো দুলতে থাকে,
মাছগুলো খেলা করে।
আরো তলায় আছে নাকি নাগকন্যা?
সোনার কাঁকই দিয়ে আঁচড়ায় লম্বা চুল,
আঁকাবাঁকা ছায়া তার জলের ঢেউয়ে।
ছেলেটার খেয়াল গেল ঐখানে ডুব দিতে—
ঐ সবুজ স্বচ্ছ জল,
সাপের চিকন দেহের মতো।
'কী আছে দেখিই-না' সব তাতে এই তার লোভ
দিল ডুব, দামে গেল জড়িয়ে—
চেঁচিয়ে উঠে, খাবি খেয়ে, তলিয়ে গেল কোথায়।
ডাঙায় রাখাল চরাচ্ছিল গোরু,
জেলেদের ডিঙি নিয়ে টানাটানি করে তুললে তাকে—
তখন সে নিঃসাড়।
তার পরে অনেক দিন ধরে মনে পড়েছে
চোখে কী করে সর্ষেফুল দেখে,
আঁধার হয়ে আসে,
যে মাকে কচি বেলায় হারিয়েছে
তার ছবি জাগে মনে,
জ্ঞান যায় মিলিয়ে।
ভারী মজা,
কী করে মরে সেই মস্ত কথাটা।
সাথিকে লোভ দেখিয়ে বলে,
'একবার দেখ্-না ডুবে, কোমরে দড়ি বেঁধে,
আবার তুলব টেনে।'

ভারী ইচ্ছা করে জানতে ওর কেমন লাগে।
সাথি রাজি হয় না ;
ও রেগে বলে, 'ভীতু, ভীতু, ভীতু কোথাকার।'

বক্সিদের ফলের বাগান, সেখানে লুকিয়ে যায় জন্তুর মতো।
মার খেয়েছে বিস্তর, জাম খেয়েছে আরো অনেক বেশি।
বাড়ির লোকে বলে, 'লজ্জা করে না বাঁদর ?'
কেন লজ্জা।
বক্সিদের খোঁড়া ছেলে তো ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে ফল পাড়ে,
ঝুড়ি ভরে নিয়ে যায়,
গাছের ডাল যায় ভেঙে,
ফল যায় দ'লে—
লজ্জা করে না ?

একদিন পাকড়াশিদের মেজো ছেলে একটা কাঁচ-পরানো চোঙ নিয়ে
ওকে বললে, 'দেখ্-না ভিতর বাগে।'
দেখল নানা রঙ সাজানো,
নাড়া দিলেই নতুন হয়ে ওঠে।
বললে, 'দে-না ভাই, আমাকে।
তোকে দেব আমার ঘষা ঝিনুক,
কাঁচা আম ছাড়াবি মজা ক'রে—
আর দেব আমের কষির বাঁশি।'

দিল না ওকে।
কাজেই চুরি করে আনতে হল।
ওর লোভ নেই—
ও কিছু রাখতে চায় না, শুধু দেখতে চায়
কী আছে ভিতরে।
খোদন দাদা কানে মোচড় দিতে দিতে বললে,
'চুরি করলি কেন।'

লক্ষ্মীছাড়াটা জবাব করলে,
'ও কেন দিল না।'
যেন চুরির আসল দায় পাকড়াশিদের ছেলের।

ভয় নেই ঘৃণা নেই ওর দেহটাতে।
কোলাব্যাঙ তুলে ধরে খপ ক'রে,
বাগানে আছে খোঁটা পোঁতার এক গর্ত,
তার মধ্যে সেটা পোষে—
পোকামাকড় দেয় খেতে।
গুবরে পোকা কাগজের বাক্সোয় এনে রাখে,
খেতে দেয় গোবরের গুটি—
কেউ ফেলে দিতে গেলে অনর্থ বাধে।
ইস্কুলে যায় পকেটে নিয়ে কাঠবিড়ালি।
একদিন একটা হেলে সাপ রাখলে মাস্টারের ডেস্কে—
ভাবলে, 'দেখিই-না কী করে মাস্টারমশায়।'
ডেক্‌সো খুলেই ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠে দিলেন দৌড়—
দেখবার মতো দৌড়টা।

একটা কুকুর ছিল ওর পোষা,
কুলীনজাতের নয়,
একেবারে বঙ্গজ।
চেহারা প্রায় মনিবেরই মতো,
ব্যবহারটাও।
অন্ন জুটত না সব সময়ে,
গতি ছিল না চুরি ছাড়া—
সেই অপকর্মের মুখে তার চতুর্থ পা হয়েছিল খোঁড়া।
আর, সেই সঙ্গেই কোন্ কার্যকারণের যোগে
শাসনকর্তাদের শসাখেতের বেড়া গিয়েছিল ভেঙে।
মনিবের বিছানা ছাড়া কুকুরটার ঘুম হত না রাতে,
তাকে নইলে মনিবেরও সেই দশা।

একদিন প্রতিবেশীর বাড়া ভাতে মুখ দিতে গিয়ে
তার দেহান্তর ঘটল।
মরণান্তিক দুঃখেও কোনো দিন জল বেরোয় নি যে ছেলের চোখে
দু দিন সে লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদে কেঁদে বেড়ালো,
মুখে অন্নজল রুচল না,
বক্সিদের বাগানে পেকেছে করম্‌চা—
চুরি করতে উৎসাহ হল না।
সেই প্রতিবেশীদের ভাগ্নে ছিল সাত বছরের,
তার মাথার উপর চাপিয়ে দিয়ে এল এক ভাঙা হাঁড়ি।
হাঁড়ি-চাপা তার কান্না শোনালো যেন ঘানিকলের বাঁশি।

গেরস্তঘরে ঢুকলেই সবাই তাকে 'দূর দূর' করে,
কেবল তাকে ডেকে এনে দুধ খাওয়ায় সিধু গয়লানী।
তার ছেলেটি মরে গেছে সাত বছর হল,
বয়সে ওর সঙ্গে তিন দিনের তফাত।
ওরই মতো কালোকোলো,
নাকটা ওইরকম চ্যাপ্টা।
ছেলেটার নতুন নতুন দৌরাত্ম্য এই গয়লানী মাসীর 'পরে।
তার বাঁধা গোরুর দড়ি দেয় কেটে,
তার ভাঁড় রাখে লুকিয়ে,
খয়েরের রঙ লাগিয়ে দেয় তার কাপড়ে।
'দেখি-না কী হয়' তারই বিবিধ-রকম পরীক্ষা।
তার উপদ্রবে গয়লানীর স্নেহ ওঠে ঢেউ খেলিয়ে।
তার হয়ে কেউ শাসন করতে এলে
সে পক্ষ নেয় ঐ ছেলেটারই।

অম্বিকে মাস্টার আমার কাছে দুঃখ ক'রে গেল,
'শিশুপাঠে আপনার লেখা কবিতাগুলো
পড়তে ওর মন লাগে না কিছুতেই,
এমন নিরেট বুদ্ধি।

পাতাগুলো দুষ্টুমি ক'রে কেটে রেখে দেয়,
বলে ইঁদুরে কেটেছে।
এতবড়ো বাঁদর।'
আমি বললুম, 'সে ত্রুটি আমারই,
থাকত ওর নিজের জগতের কবি
তা হলে গুবরে পোকা এত স্পষ্ট হত তার ছন্দে
ও ছাড়তে পারত না।
কোনো দিন ব্যাঙের খাঁটি কথাটি কি পেরেছি লিখতে,
আর সেই নেড়ি কুকুরের ট্রাজেডি।'

২৮ শ্রাবণ ১৩৩৯

সুশ্রী নয় এমন লোকের অভাব নেই জগতে—
এ মানুষটি তার চেয়েও বেশি, এ অদ্ভুত।
খাপছাড়া টাক সামনের মাথায়,
ফুর্‌ফুরে চুল কোথাও সাদা কোথাও কালো।
ছোটো ছোটো দুই চোখে নেই রোঁওয়া,
ভ্রূ কুঁচকিয়ে কী দেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে,
তার দেখাটা যেন চোখের উঞ্ছবৃত্তি।
যেমন উঁচু তেমনি চওড়া নাকটা,
সমস্ত মুখের সে বারো-আনি অংশীদার।
কপালটা মস্ত—
তার উত্তর দিগন্তে নেই চুল, দক্ষিণ দিগন্তে নেই ভুরু
দাড়ি-গোঁফ-কামানো মুখে
অনাবৃত হয়েছে বিধাতার শিল্পরচনার অবহেলা।

কোথায় অলক্ষ্যে পড়ে আছে আল্‌পিন টেবিলের কোণে,
তুলে নিয়ে সে বিঁধিয়ে রাখে জামায়—

তাই দেখে মুখ ফিরিয়ে মুচকে হাসে জাহাজের মেয়েরা ;
পার্সেল-বাঁধা টুকরো ফিতেটা সংগ্রহ করে মেঝের থেকে,
গুটিয়ে গুটিয়ে তাতে লাগায় গ্রন্থি ;
ফেলে-দেওয়া খবরের কাগজ ভাঁজ করে রাখে টেবিলে।
আহারে অত্যন্ত সাবধান—
পকেটে থাকে হজমি গুঁড়ো
খেতে বসেই সেটা খায় জলে মিশিয়ে,
খাওয়ার শেষে খায় হজমি বড়ি।

স্বল্পভাষী, কথা যায় বেধে—
যা বলে মনে হয় বোকার মতো।
ওর সঙ্গে যখন কেউ পলিটিক্‌স্ বলে
ও থাকে চুপচাপ, কিছু বুঝল কি না বোঝা যায় না।

চলেছি একসঙ্গে সাত দিন এক জাহাজে।
অকারণে সকলে বিরক্ত ওর 'পরে,
ওকে ব্যঙ্গ করে আঁকে ছবি,
হাসে তাই নিয়ে পরস্পর।
ওর নামে অত্যুক্তি বেড়ে চলেছে কেবলই,
ওকে দিনে দিনে মুখে মুখে রচনা করে তুলছে সবাই।
বিধির রচনায় ফাঁক থাকে,
থাকে কোথাও কোথাও অস্ফুটতা।
এরা ভরিয়ে তোলে এদের রচনা দৈনিক রাবিশ দিয়ে,
খাঁটি সত্যের মতো চেহারা হয়,
নিজেরা বিশ্বাস করে।
সবাই ঠিক করে রেখেছে ও দালাল,
কেউ বা বলে রবারের কুঠির মেজো ম্যানেজার ;
বাজি রাখা চলছে আন্দাজ নিয়ে।

সবাই ওকে পাশ কাটিয়ে চলে,
সেটা ওর সয়ে গেছে আগে থাকতেই।

চুরোট খাওয়ার ঘরে জুয়ো খেলে যাত্রীরা,
ও তাদের এড়িয়ে চলে যায়,
তারা ওকে গাল দেয় মনে মনে—
বলে কৃপণ, বলে ছোটোলোক।

ও মেশে চাটগাঁয়ের খালাসিদের সঙ্গে।
তারা কয় তাদের ভাষায়,
ও বলে কী ভাষা কে জানে—
বোধ করি ওলন্দাজি।
সকালে রবারের নল নিয়ে তারা ডেক ধোয়,
ও তাদের মধ্যে গিয়ে লাফালাফি করে,
তারা হাসে।
ওদের মধ্যে ছিল এক অল্প বয়সের ছেলে—
শামলা রঙ, কালো চোখ, ঝাঁকড়া চুল,
ছিপ্‌ছিপে গড়ন—
ও তাকে এনে দেয় আপেল কমলালেবু,
তাকে দেখায় ছবির বই।
যাত্রীরা রাগ করে য়ুরোপের অসম্মানে।

জাহাজ এল শিঙাপুরে।
খালাসিদের ডেকে ও তাদের দিল সিগারেট,
আর দশটা করে টাকার নোট
ছেলেটাকে দিলে একটা সোনা-বাঁধানো ছড়ি।
কাপ্তেনের কাছে বিদায় নিয়ে
তড়্‌বড়্‌ করে নেমে গেল ঘাটে।

তখন তার আসল নাম হয়ে গেল জানাজানি ;
যারা চুরোট ফোঁকার ঘরে তাস খেলত
'হায় হায়' করে উঠল তাদের মন।

১ ভাদ্র ১৩৩৯

বিশ্বশোক

দুঃখের দিনে লেখনীকে বলি—
লজ্জা দিয়ো না।
সকলের নয় যে আঘাত
ধোরো না সবার চোখে।
ঢেকো না মুখ অন্ধকারে,
রেখো না দ্বারে আগল দিয়ে।
জ্বালো সকল রঙের উজ্জ্বল বাতি,
কৃপণ হোয়ো না।

অতি বৃহৎ বিশ্ব,
অম্লান তার মহিমা,
অক্ষুব্ধ তার প্রকৃতি।
মাথা তুলেছে দুর্দর্শ সূর্যলোকে,
অবিচলিত অকরুণ দৃষ্টি তার অনিমেষ,
অকম্পিত বক্ষ প্রসারিত
গিরি নদী প্রান্তরে।
আমার সে নয়,
সে অসংখ্যের।
বাজে তার ভেরী সকল দিকে,
জ্বলে অনিভৃত আলো,
দোলে পতাকা মহাকাশে।
তার সমুখে লজ্জা দিয়ো না—
আমার ক্ষতি আমার ব্যথা
তার সমুখে কণার কণা।

এই ব্যথাকে আমার বলে ভুলব যখনি
তখনি সে প্রকাশ পাবে বিশ্বরূপে।

দেখতে পাব বেদনার বন্যা নামে কালের বুকে
শাখাপ্রশাখায় ;
ধায় হৃদয়ের মহানদী
সব মানুষের জীবনস্রোতে ঘরে ঘরে।
অশ্রুধারার ব্রহ্মপুত্র
উঠছে ফুলে ফুলে
তরঙ্গে তরঙ্গে ;
সংসারের কূলে কূলে
চলে তার বিপুল ভাঙাগড়া
দেশে দেশান্তরে।
চিরকালের সেই বিরহতাপ,
চিরকালের সেই মানুষের শোক,
নামল হঠাৎ আমার বুকে ;
এক প্লাবনে থর্‌থরিয়ে কাঁপিয়ে দিল
পাঁজরগুলো—
সব ধরণীর কান্নার গর্জনে
মিলে গিয়ে চলে গেল অনন্তে,
কী উদ্দেশে কে তা জানে।

আজকে আমি ডেকে বলি লেখনীকে,
লজ্জা দিয়ো না।
কূল ছাপিয়ে উঠুক তোমার দান।
দাক্ষিণ্যে তোমার
ঢাকা পড়ুক অন্তরালে
আমার আপন ব্যথা।
ক্রন্দন তার হাজার তানে মিলিয়ে দিয়ো
বিশাল বিশ্বসুরে।

১১ ভাদ্র ১৩৩৯

শেষ চিঠি

মনে হচ্ছে শূন্য বাড়িটা অপ্রসন্ন,
অপরাধ হয়েছে আমার
তাই আছে মুখ ফিরিয়ে।
ঘরে ঘরে বেড়াই ঘুরে,
আমার জায়গা নেই—
হাঁপিয়ে বেরিয়ে চলে আসি।
এ বাড়ি ভাড়া দিয়ে চলে যাব দেরাদুনে।

অমলির ঘরে ঢুকতে পারি নি বহুদিন
মোচড় যেন দিত বুকে।
ভাড়াটে আসবে, ঘর দিতেই হবে সাফ ক'রে,
তাই খুললেম ঘরের তালা।
একজোড়া আগ্রার জুতো,
চুল বাঁধবার চিরুনি, তেল, এসেন্সের শিশি,
শেলফে তার পড়বার বই,
ছোটো হার্মোনিয়ম।
একটা অ্যালবাম,
ছবি কেটে কেটে জুড়েছে তার পাতায়।
আলনায় তোয়ালে, জামা, খদ্দরের শাড়ি।
ছোটো কাঁচের আলমারিতে নানা রকমের পুতুল,
শিশি, খালি পাউডারের কৌটো।

চুপ করে বসে রইলেম চৌকিতে
টেবিলের সামনে।
লাল চামড়ার বাক্স,
ইস্কুলে নিয়ে যেত সঙ্গে।
তার থেকে খাতাটি নিলেম তুলে,
আঁক কষবার খাতা।

ভিতর থেকে পড়ল একটি আখোলা চিঠি,
আমারি ঠিকানা লেখা
অমলির কাঁচা হাতের অক্ষরে।

শুনেছি ডুবে মরবার সময়
অতীত কালের সব ছবি
এক মুহূর্তে দেখা দেয় নিবিড় হয়ে—
চিঠিখানি হাতে নিয়ে তেমনি পড়ল মনে
অনেক কথা এক নিমেষে।

অমলার মা যখন গেলেন মারা
তখন ওর বয়স ছিল সাত বছর।
কেমন একটা ভয় লাগল মনে,
ও বুঝি বাঁচবে না বেশি দিন।
কেননা বড়ো করুণ ছিল ওর মুখ,
যেন অকালবিচ্ছেদের ছায়া
ভাবীকাল থেকে উল্টে এসে পড়েছিল
ওর বড়ো বড়ো কালো চোখের উপরে।
সাহস হ'ত না ওকে সঙ্গছাড়া করি।
কাজ করছি আপিসে বসে,
হঠাৎ হ'ত মনে
যদি কোনো আপদ ঘটে থাকে।

বাঁকিপুর থেকে মাসি এল ছুটিতে—
বললে, 'মেয়েটার পড়াশুনো হল মাটি।
মূর্খ মেয়ের বোঝা বইবে কে
আজকালকার দিনে।'
লজ্জা পেলেম কথা শুনে তার,
বললেম 'কালই দেব ভর্তি করে বেথুনে'

ইস্কুলে তো গেল,
কিন্তু ছুটির দিন বেড়ে যায় পড়ার দিনের চেয়ে।
কতদিন স্কুলের বাস্ অমনি যেত ফিরে।
সে চক্রান্তে বাপেরও ছিল যোগ।

ফিরে বছর মাসি এল ছুটিতে;
বললে, 'এমন করে চলবে না।
নিজে ওকে যাব নিয়ে,
বোর্ডিঙে দেব বেনারসের স্কুলে,
ওকে বাঁচানো চাই বাপের স্নেহ থেকে।'
মাসির সঙ্গে গেল চলে।
অশ্রুহীন অভিমান
নিয়ে গেল বুক ভরে
যেতে দিলেম বলে।

বেরিয়ে পড়লেম বদ্রিনাথের তীর্থযাত্রায়
নিজের কাছ থেকে পালাবার ঝোঁকে।
চার মাস খবর নেই।
মনে হল গ্রন্থি হয়েছে আলগা
গুরুর কৃপায়।
মেয়েকে মনে মনে সঁপে দিলেম দেবতার হাতে,
বুকের থেকে নেমে গেল বোঝা।

চার মাস পরে এলেম ফিরে।
ছুটেছিলেম অমলিকে দেখতে কাশীতে—
পথের মধ্যে পেলেম চিঠি—
কী আর বলব,
দেবতাই তাকে নিয়েছে।

যাক সে-সব কথা।
অমলার ঘরে বসে সেই আখোলা চিঠি খুলে দেখি,
তাতে লেখা—
'তোমাকে দেখতে বড্‌ডো ইচ্ছে করছে'।
আর কিছুই নেই।

৩১ শ্রাবণ ১৩৩৯

বালক

হিরণমাসির প্রধান প্রয়োজন রান্নাঘরে।
দুটি ঘড়া জল আনতে হয় দিঘি থেকে—
তার দিঘিটা ঐ দুই ঘড়ারই মাপে
রান্নাঘরের পিছনে বাঁধা দরকারের বাঁধনে।

এ দিকে তার মা-মরা বোনপো,
গায়ে যে রাখে না কাপড়,
মনে যে রাখে না সদুপদেশ,
প্রয়োজন যার নেই কোনো কিছুতেই,
সমস্ত দিঘির মালেক সেই লক্ষ্মীছাড়াটা।
যখন খুশি ঝাঁপ দিয়ে পড়ে জলে,
মুখে জল নিয়ে আকাশে ছিটোতে ছিটোতে সাঁতার কাটে,
ছিনিমিনি খেলে ঘাটে দাঁড়িয়ে,
কঞ্চি নিয়ে করে মাছ-ধরা খেলা,
ডাঙায় গাছে উঠে পাড়ে জামরুল—
খায় যত ছড়ায় তার বেশি।

দশ-আনির টাক-পড়া মোটা জমিদার,
লোকে বলে দিঘির স্বত্ব তারই—
বেলা দশটায় সে চাপড়ে চাপড়ে তেল মাখে বুকে পিঠে,
ঝপ্‌ করে দুটো ডুব দিয়ে নেয়,

বাঁশবনের তলা দিয়ে দুর্গা নাম করতে করতে চলে ঘরে—
সময় নেই, জরুরি মকর্দমা।
দিঘিটা আছে তার দলিলে, নেই তার জগতে।
আর ছেলেটার দরকার নেই কিছুতেই,
তাই সমস্ত বন-বাদাড় খাল-বিল তারই—
নদীর ধার, পোড়ো জমি, ডুবো নৌকো, ভাঙা মন্দির,
তেঁতুল গাছের সবার উঁচু ডালটা।
জামবাগানের তলায় চরে ধোবাদের গাধা,
ছেলেটা তার পিঠে চড়ে—
ছড়ি হাতে জমায় ঘোড়্‌দৌড়।
ধোবাদের, গাধাটা আছে কাজের গরজে—
ছেলেটার নেই কোনো দরকার,
তাই জন্তুটা তার চার পা নিয়ে সমস্তটা তারই
যাই বলুন-না জজসাহেব।
বাপ মা চায় পড়ে শুনে হবে সে সদর-আলা;
সর্দার পোড়ো ওকে টেনে নামায় গাধার থেকে,
হেঁচড়ে আনে বাঁশবন দিয়ে,
হাজির করে পাঠশালায়।
মাঠে ঘাটে হাটে বাটে জলে স্থলে তার স্বরাজ—
হঠাৎ দেহটাকে ঘিরলে চার দেয়ালে,
মনটাকে আঠা দিয়ে এঁটে দিলে
পুঁথির পাতার গায়ে।

আমিও ছিলেম একদিন ছেলেমানুষ।
আমার জন্যেও বিধাতা রেখেছিলেন গড়ে
অকর্মণ্যের অপ্রয়োজনের জল স্থল আকাশ।
তবু ছেলেদের সেই মস্ত বড়ো জগতে
মেলল না আমার জায়গা।
আমার বাসা অনেক কালের পুরোনো বাড়ির

কোণের ঘরে—
বাইরে যাওয়া মানা।
সেখানে চাকর পান সাজে, দেয়ালে মোছে হাত,
গুন গুন ক'রে গায় মধুকানের গান;
শান-বাঁধানো মেজে, খড়্‌খড়ে-দেওয়া জানলা।
নীচে ঘাট-বাঁধানো পুকুর, পাঁচিল ঘেঁষে নারকেল গাছ।
জটাধারী বুড়ো বট মোটা মোটা শিকড়ে
আঁকড়ে ধরেছে পুব ধারটা।
সকাল থেকে নাইতে আসে পাড়ার লোকে,
বিকেলের পড়ন্ত রোদে ঝিকিমিকি জলে
ভেসে বেড়ায় পাতিহাঁসগুলো,
পাখা সাফ করে ঠোঁট দিয়ে মেজে।
প্রহরের পর কাটে প্রহর।
আকাশে ওড়ে চিল,
থালা বাজিয়ে যায় পুরোনো কাপড়ওয়ালা,
বাঁধানো নালা দিয়ে গঙ্গার জল এসে পড়ে পুকুরে।

পৃথিবীতে ছেলেরা যে খোলা জগতের যুবরাজ
আমি সেখানে জন্মেছি গরিব হয়ে।
শুধু কেবল
আমার খেলা ছিল মনের ক্ষুধায়, চোখের দেখায়,
পুকুরের জলে, বটের শিকড়-জড়ানো ছায়ায়,
নারকেলের দোদুল ডালে, দূর বাড়ির রোদ-পোহানো ছাদে।
অশোকবনে এসেছিল হনুমান,
সেদিন সীতা পেয়েছিলেন নবদূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের খবর।
আমার হনুমান আসত বছরে বছরে আষাঢ় মাসে
আকাশ কালো করে
সজল নবনীল মেঘে।
আনত তার মেদুর কণ্ঠে দূরের বার্তা,
যে দূরের অধিকার থেকে আমি নির্বাসিত।

ইমারত-ঘেরা ক্লিষ্ট যে আকাশটুকু
তাকিয়ে থাকত একদৃষ্টে আমার মুখে,
বাদলের দিনে গুরুগুরু ক'রে তার বুক উঠত দুলে।
বট গাছের মাথা পেরিয়ে কেশর ফুলিয়ে দলে দলে
মেঘ জুটত ডানাওয়ালা কালো সিংহের মতো।
নারকেল-ডালের সবুজ হত নিবিড়,
পুকুরের জল উঠত শিউরে শিউরে।
যে চাঞ্চল্য শিশুর জীবনে রুদ্ধ ছিল
সেই চাঞ্চল্য বাতাসে বাতাসে, বনে বনে।
পুব দিকের ও পার থেকে বিরাট এক ছেলেমানুষ ছাড়া পেয়েছে আকাশে,
আমার সঙ্গে সে সাথি পাতালে।

বৃষ্টি পড়ে ঝমাঝম। একে একে
পুকুরের পৈঠা যায় জলে ডুবে।
আরো বৃষ্টি, আরো বৃষ্টি, আরো বৃষ্টি।
রাত্তির হয়ে আসে, শুতে যাই বিছানায়,
খোলা জানলা দিয়ে গন্ধ পাই ভিজে জঙ্গলের।
উঠোনে একহাঁটু জল,
ছাদের নালার মুখ থেকে জলে পড়ছে জল মোটা ধারায়।
ভোরবেলায় ছুটেছি দক্ষিণের জানলায়,
পুকুর গেছে ভেসে;
জল বেরিয়ে চলেছে কল্‌কল্‌ করে বাগানের উপর দিয়ে,
জলের উপর বেলগাছগুলোর ঝাঁকড়া মাথা জেগে থাকে।
পাড়ার লোকে হৈ হৈ করে এসেছে
গামছা দিয়ে ধুতির কোঁচা দিয়ে মাছ ধরতে।
কাল পর্যন্ত পুকুরটা ছিল আমারি মতো বাঁধা,
এ বেলা ও বেলা তার উপরে পড়ত গাছের ছায়া,
উড়ো মেঘ জলে বুলিয়ে যেত ক্ষণিকের ছায়াতুলি,
বটের ডালের ভিতর দিয়ে যেন সোনার পিচকারিতে
ছিটকে পড়ত তার উপরে আলো—

পুকুরটা চেয়ে থাকত আকাশে ছল্‌ছলে দৃষ্টিতে।
আজ তার ছুটি, কোথায় সে চলল খ্যাপা
গেরুয়া-পরা বাউল যেন।

পুকুরের কোণে নৌকোটি
দাদারা চড়ে বসল ভাসিয়ে দিয়ে,
গেল পুকুর থেকে গলির মধ্যে,
গলির থেকে সদর রাস্তায়—
তার পরে কোথায় জানি নে। বসে বসে ভাবি।
বেলা বাড়ে।
দিনান্তের ছায়া মেশে মেঘের ছায়ায়,
তার সঙ্গে মেশে পুকুরের জলে বটের ছায়ার কালিমা।
সন্ধে হয়ে এল।
বাতি জ্বলল ঝাপসা আলোয় রাস্তার ধারে ধারে,
ঘরে জ্বলেছে কাঁচের সেজে মিট্‌মিটে শিখা,
ঘোর অন্ধকারে একটু একটু দেখা যায়
দুলছে নারকেলের ডাল,
ভূতের ইশারা যেন।
গলির পারে বড়ো বাড়িতে সব দরজা বন্ধ,
আলো মিট্‌ মিট্‌ করে দুই-একটা জানলা দিয়ে
চেয়ে-থাকা ঘুমন্ত চোখের মতো।
তার পরে কখন আসে ঘুম।
রাত দুটোর সময় স্বরূপ সর্দার নিষুত রাতে
বারান্দায় বারান্দায় হাঁক দিয়ে যায় চলে।

বাদলের দিনগুলো বছরে বছরে তোলপাড় করেছে আমার মন;
আজ তারা বছরে বছরে নাড়া দেয় আমার গানের সুরকে।
শালের পাতায় পাতায় কোলাহল,
তালের ডালে ডালে করতালি,
বাঁশের দোলাদুলি বনে বনে—

ছাতিম গাছের থেকে মালতীলতা
ঝরিয়ে দেয় ফুল।
আর সেদিনকার আমারি মতো অনেক ছেলে আছে ঘরে ঘরে,
লাঠাইয়ের সুতোয় মাখাচ্ছে আঠা,
তাদের মনের কথা তারাই জানে।

২ ভাদ্র ১৩৩৯

ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি

বাবা এসে শুধালেন,
'কী করছিস সুনি।
কাপড় কেন তুলিস বাক্সে, যাবি কোথায় ?'

সুনৃতার ঘর তিনতলায়।
দক্ষিণ দিকে দুই জানলা,
সামনে পালঙ্ক,
বিছানা লক্ষ্ণৌ-ছিটে ঢাকা।
অন্য দেয়ালে লেখবার টেবিল,
তার কোণে মায়ের ফোটোগ্রাফ—
তিনি গেছেন মারা।
বাবার ছবি দেয়ালে,
ফ্রেমে জড়ানো ফুলের মালা।
মেঝেতে-লাল শতরঞ্চে
শাড়ি শেমিজ ব্লাউজ
মোজা রুমাল ছড়াছড়ি।
কুকুরটা কাছ ঘেঁষে লেজ নাড়ছে,
ঠেলা দিচ্ছে কোলে থাবা তুলে—
ভেবে পাচ্ছে না কিসের আয়োজন,
ভয় হচ্ছে পাছে ওকে ফেলে রেখে আবার যায় কোথাও

ছোটো বোন শমিতা বসে আছে হাঁটু উঁচু করে,
বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে।
চুল বাঁধা হয় নি,
চোখ দুটি রাঙা কান্নার অবসানে।

চুপ করে রইল সুনৃতা,
মুখ নিচু করে সে কাপড় গোছায়—
হাত কাঁপে।
বাবা আবার বললেন,
'সুনি, কোথাও যাবি নাকি।'
সুনৃতা শক্ত করে বললে, 'তুমি তো বলেইছ,
এ বাড়িতে হতে পারবে না আমার বিয়ে,
আমি যাব অমুদের বাসায়।'
শমিতা বললে, 'ছি ছি, দিদি, কী বলছ।'
বাবা বললেন, 'ওরা যে মানে না আমাদের মত।'
'তবু ওদের মতই যে আমাকে মানতে হবে চিরদিন—'
এই বলে সুনি সেফটিপিন ভরে রাখলে লেফাফায়।
দৃঢ় ওর কণ্ঠস্বর, কঠিন ওর মুখের ভাব,
সংকল্প অবিচলিত।
বাবা বললেন, 'অনিলের বাপ জাত মানে,
সে কি রাজি হবে।'
সগর্বে বলে উঠল সুনৃতা,
'চেন না তুমি অনিলবাবুকে,
তাঁর জোর আছে পৌরুষের, তাঁর মত তাঁর নিজের।'
দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বাবা চলে গেলেন ঘর থেকে,
শমিতা উঠে তাঁকে জড়িয়ে ধরলে—
বেরিয়ে গেল তাঁর সঙ্গে।

বাজল দুপুরের ঘণ্টা।
সকাল থেকে খাওয়া নেই সুনৃতার।

শমিতা একবার এসেছিল ডাকতে—
ও বললে, খাবে বন্ধুর বাড়ি গিয়ে।
মা-মরা মেয়ে, বাপের আদুরে,
মিনতি করতে আসছিলেন তিনি ;
শমিতা পথ আগলিয়ে বললে,
'কক্‌খনো যেতে পারবে না বাবা,
ও না খায় তো নেই খেল।'

জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে
দেখলে সুনৃতা রাস্তার দিকে,
এসেছে অমুদের গাড়ি।
তাড়াতাড়ি চুলটা আঁচড়িয়ে
ব্রোচটা লাগাচ্ছে যখন কাঁধে,
শমি এসে বললে, 'এই নাও তাদের চিঠি।'
ব'লে ফেলে দিলে ছুঁড়ে ওর কোলে।
সুনৃতা পড়লে চিঠিখানা,
মুখ হয়ে গেল ফ্যাকাশে,
বসে পড়ল তোরঙ্গের উপর।
চিঠিতে আছে—
'বাবার মত করতে পারব নিশ্চিত ছিল মনে,
হল না কিছুতেই,
কাজেই—'

বাজল একটা।
সুনি চুপ করে ব'সে, চোখে জল নেই।
রামচরিত বললে এসে,
'মোটর দাঁড়িয়ে অনেক ক্ষণ।'
সুনি বললে, 'যেতে বলে দে।'
কুকুরটা কাছে এসে বসে রইল চুপ করে।

বাবা বুঝলেন,
প্রশ্ন করলেন না,
বললেন ওর মাথায় হাত বুলিয়ে,
'চল্ সুনি, হোসেঙ্গাবাদে তোর মামার ওখানে।'

কাল বিয়ের দিন।
অনিল জিদ করেছিল হবে না বিয়ে।
মা ব্যথিত হয়ে বলেছিল, 'থাক্-না।'
বাপ বললে, 'পাগল নাকি।'
ইলেক্‌ট্রিক বাতির মালা খাটানো হচ্ছে বাড়িতে,
সমস্ত দিন বাজছে সানাই।
হুহু করে উঠছে অনিলের মনটা।

তখন সন্ধ্যা সাতটা।
সুনিদের বউবাজারের বাড়ির এক তলায়
ডাবাহুঁকো বাঁ হাতে ধরে তামাক খাচ্ছে
কৈলেস সরকার,
আর তালপাতার পাখায় বাতাস চলছে ডান হাতে;
বেহারাকে ডেকেছে পা টিপে দেবে।
কালীমাখা ময়লা জাজিমে কাগজপত্র রাশ করা;
জ্বলছে একটা কেরোসিন লণ্ঠন।
হঠাৎ অনিল এসে উপস্থিত।
কৈলেস শশব্যস্ত উঠে দাঁড়ালো
শিথিল কাছাকোঁচা সামলিয়ে।
অনিল বললে
'পার্বণীটা ভুলেছিলেম গোলেমালে,
তাই এসেছি দিতে।'
তার পরে বাধো-বাধো গলায় বললে,
'অমনি দেখে যাব তোমাদের সুনিদিদির ঘরটা।'

গেল ঘরে।
খাটের উপর রইল বসে মাথায় হাত দিয়ে।
কিসের একটা অস্পষ্ট গন্ধ,
মূর্ছিতের নিশ্বাসের মতো।
সে গন্ধ চুলের না শুকনো ফুলের
না শূন্য ঘরে সঞ্চিত বিজড়িত স্মৃতির—
বিছানায়, চৌকিতে, পর্দায়।
সিগারেট ধরিয়ে টানল কিছুক্ষণ,
ছুঁড়ে ফেলে দিল জানলার বাইরে।
টেবিলের নীচে থেকে ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িটা
নিল কোলে তুলে।
ধক্ করে উঠল বুকের মধ্যে ;
দেখলে ঝুড়ি-ভরা রাশি রাশি ছেঁড়া চিঠি,
ফিকে নীল রঙের কাগজে
অনিলেরই হাতে লেখা।
তার সঙ্গে টুকরো টুকরো ছেঁড়া একটা ফোটোগ্রাফ।
আর ছিল বছর চার আগেকার
দুটি ফুল, লাল ফিতেয় বাঁধা
মেডেন-হেয়ার পাতার সঙ্গে
শুকনো প্যান্‌সি আর ভায়োলেট।

২৮ শ্রাবণ ১৩৩৯

কীটের সংসার

এক দিকে কামিনীর ডালে
মাকড়সা শিশিরের ঝালর দুলিয়েছে,
আর-এক দিকে বাগানে রাস্তার ধারে
লাল-মাটির-কণা-ছড়ানো
পিঁপড়ের বাসা

যাই আসি, তারি মাঝখান দিয়ে
সকালে বিকালে।
আনমনে দেখি শিউলিগাছে কুঁড়ি ধরেছে,
টগর গেছে ফুলে ছেয়ে।
বিশ্বের মাঝে মানুষের সংসারটুকু
দেখতে ছোটো, তবু ছোটো তো নয়।
তেমনি ঐ কীটের সংসার।
ভালো করে চোখে পড়ে না,
তবু সমস্ত সৃষ্টির কেন্দ্রে আছে ওরা।
কত যুগ থেকে অনেক ভাবনা ওদের,
অনেক সমস্যা, অনেক প্রয়োজন—
অনেক দীর্ঘ ইতিহাস।
দিনের পর দিন, রাতের পর রাত
চলেছে প্রাণশক্তির দুর্বার আগ্রহ।
মাঝখান দিয়ে যাই আসি,
শব্দ শুনি নে ওদের চিরপ্রবাহিত
চৈতন্যধারার—
ওদের ক্ষুধাপিপাসা-জন্মমৃত্যুর।
গুন গুন সুরে আধখানা গানের
জোড় মেলাতে খুঁজে বেড়াই
বাকি আধখানা পদ,
এই অকারণ অদ্ভুত খোঁজের কোনো অর্থ নেই
ঐ মাকড়সার বিশ্বচরাচরে,
ঐ পিঁপড়ে-সমাজে।
ওদের নীরব নিখিলে এখনি উঠছে কি
স্পর্শে স্পর্শে সুর, ঘ্রাণে ঘ্রাণে সংগীত,
মুখে মুখে অশ্রুত আলাপ,
চলায় চলায় অব্যক্ত বেদনা

আমি মানুষ—
মনে জানি সমস্ত জগতে আমার প্রবেশ,
গ্রহনক্ষত্রে ধূমকেতুতে
আমার বাধা যায় খুলে খুলে।
কিন্তু ঐ মাকড়সার জগৎ বন্ধ রইল চিরকাল
আমার কাছে,
ঐ পিঁপড়ের অন্তরের যবনিকা
পড়ে রইল চিরদিন আমার সামনে
আমার সুখে দুঃখে ক্ষুব্ধ
সংসারের ধারেই।
ওদের ক্ষুদ্র অসীমের বাইরের পথে
আমি যাই সকালে বিকালে—
দেখি, শিউলিগাছে কুঁড়ি ধরছে,
টগর গেছে ফুলে চেয়ে।

২৪ ভাদ্র ১৩৩৯

ক্যামেলিয়া

নাম তার কমলা,
দেখেছি তার খাতার উপরে লেখা।
সে চলেছিল ট্রামে, তার ভাইকে নিয়ে কলেজের রাস্তায়
আমি ছিলেম পিছনের বেঞ্চিতে।
মুখের এক পাশের নিটোল রেখাটি দেখা যায়,
আর ঘাড়ের উপর কোমল চুলগুলি খোঁপার নীচে।
কোলে তার ছিল বই আর খাতা।
যেখানে আমার নামবার সেখানে নামা হল না।

এখন থেকে সময়ের হিসাব করে বেরোই—
সে হিসাব আমার কাজের সঙ্গে ঠিকটি মেলে না,

প্রায় ঠিক মেলে ওদের বেরোবার সময়ের সঙ্গে,
প্রায়ই হয় দেখা।
মনে মনে ভাবি, আর-কোনো সম্বন্ধ না থাক্
ও তো আমার সহযাত্রিণী।
নির্মল বুদ্ধির চেহারা
ঝক্‌ঝক্ করছে যেন।
সুকুমার কপাল থেকে চুল উপরে তোলা,
উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি নিঃসংকোচ।
মনে ভাবি একটা-কোনো সংকট দেখা দেয় না কেন,
উদ্ধার করে জন্ম সার্থক করি—
রাস্তার মধ্যে একটা কোনো উৎপাত,
কোনো-একজন গুণ্ডার স্পর্ধা।
এমন তো আজকাল ঘটেই থাকে।
কিন্তু আমার ভাগ্যটা যেন ঘোলা জলের ডোবা,
বড়ো রকম ইতিহাস ধরে না তার মধ্যে,
নিরীহ দিনগুলো ব্যাঙের মতো একঘেয়ে ডাকে-
না সেখানে হাঙর-কুমিরের নিমন্ত্রণ না রাজহাঁসের।

একদিন ছিল ঠেলাঠেলি ভিড়।
কমলার পাশে বসেছে একজন আধা-ইংরেজ।
ইচ্ছে করছিল, অকারণে টুপিটা উড়িয়ে দিই তার মাথা থেকে,
ঘাড়ে ধরে তাকে রাস্তায় দিই নামিয়ে।
কোনো ছুতো পাই নে, হাত নিশ্‌পিশ্‌ করে।
এমন সময়ে সে এক মোটা চুরোট ধরিয়ে
টানতে করলে শুরু।
কাছে এসে বললুম, 'ফেলো চুরোট।'
যেন পেলেই না শুনতে,
ধোঁওয়া ওড়াতে লাগল বেশ ঘোরালো করে।
মুখ থেকে টেনে ফেলে দিলেম চুরোট রাস্তায়।

হাতে মুঠো পাকিয়ে একবার তাকালো কট্‌মট্‌ ক'রে—
আর কিছু বললে না, এক লাফে নেমে গেল।
বোধ হয় আমাকে চেনে।
আমার নাম আছে ফুটবল খেলায়,
বেশ একটু চওড়া গোছের নাম।
লাল হয়ে উঠল মেয়েটির মুখ,
বই খুলে মাথা নিচু করে ভান করলে পড়বার।
হাত কাঁপতে লাগল,
কটাক্ষেও তাকালে না বীরপুরুষের দিকে।
আপিসের বাবুরা বললে, 'বেশ করেছেন মশায়।'
একটু পরেই মেয়েটি নেমে পড়ল অজায়গায়,
একটা ট্যাক্সি নিয়ে গেল চলে।

পরদিন তাকে দেখলুম না,
তার পরদিনও না,
তৃতীয় দিনে দেখি
একটা ঠেলাগাড়িতে চলেছে কলেজে।
বুঝলুম, ভুল করেছি গোঁয়ারের মতো।
ও মেয়ে নিজের দায় নিজেই পারে নিতে,
আমাকে কোনো দরকারই ছিল না।
আবার বললুম মনে মনে,
ভাগ্যটা ঘোলা জলের ডোবা—
বীরত্বের স্মৃতি মনের মধ্যে কেবলই আজ আওয়াজ করছে
কোলাব্যাঙের ঠাট্টার মতো।
ঠিক করলুম, ভুল শোধরাতে হবে।

খবর পেয়েছি গরমের ছুটিতে ওরা যায় দার্জিলিঙে।
সেবার আমারও হাওয়া বদলাবার জরুরি দরকার।
ওদের ছোট্ট বাসা, নাম দিয়েছে মতিয়া—
রাস্তা থেকে একটু নেমে এক কোণে

গাছের আড়ালে,
সামনে বরফের পাহাড়।
শোনা গেল আসবে না এবার।
ফিরব মনে করছি এমন সময়ে আমার এক ভক্তের সঙ্গে দেখা,
মোহনলাল—
রোগা মানুষটি, লম্বা, চোখে চশমা,
দুর্বল পাকযন্ত্র দার্জিলিঙের হাওয়ায় একটু উৎসাহ পায়।
সে বললে, 'তনুকা আমার বোন,
কিছুতে ছাড়বে না তোমার সঙ্গে দেখা না করে।'
মেয়েটি ছায়ার মতো,
দেহ যতটুকু না হলে নয় ততটুকু—
যতটা পড়াশোনায় ঝোঁক, আহারে ততটা নয়।
ফুটবলের সর্দারের 'পরে তাই এত অদ্ভুত ভক্তি—
মনে করলে, আলাপ করতে এসেছি সে আমার দুর্লভ দয়া।
হায় রে ভাগ্যের খেলা!

যেদিন নেমে আসব তার দু দিন আগে তনুকা বললে,
'একটি জিনিস দেব আপনাকে, যাতে মনে থাকবে আমাদের কথা—
একটি ফুলের গাছ।'
এ এক উৎপাত। চুপ করে রইলেম।
তনুকা বললে, 'দামি দুর্লভ গাছ,
এ দেশের মাটিতে অনেক যত্নে বাঁচে।'
জিগেস করলেম, 'নামটা কী?'
সে বললে 'ক্যামেলিয়া'।
চমক লাগল—
আর-একটা নাম ঝলক দিয়ে উঠল মনের অন্ধকারে।
হেসে বললেম, 'ক্যামেলিয়া,
সহজে বুঝি এর মন মেলে না।'
তনুকা কী বুঝলে জানি নে, হঠাৎ লজ্জা পেলে,
খুশিও হল।

চললেম টবসুদ্ধ গাছ নিয়ে।
দেখা গেল, পার্শ্ববর্তিনী হিসাবে সহযাত্রিণীটি সহজ নয়।
একটা দো-কামরা গাড়িতে
টবটাকে লুকোলেম নাবার ঘরে।
থাক্ এই ভ্রমণবৃত্তান্ত,
বাদ দেওয়া যাক আরো মাস কয়েকের তুচ্ছতা।

পুজোর ছুটিতে প্রহসনের যবনিকা উঠল
সাঁওতাল পরগনায়।
জায়গাটা ছোটো। নাম বলতে চাই নে—
বায়ুবদলের বায়ু-গ্রস্তদল এ জায়গার খবর জানে না।
কমলার মামা ছিলেন রেলের এঞ্জিনিয়র।
এইখানে বাসা বেঁধেছেন
শালবনের ছায়ায়, কাঠবিড়ালিদের পাড়ায়।
সেখানে নীল পাহাড় দেখা যায় দিগন্তে,
অদূরে জলধারা চলেছে বালির মধ্যে দিয়ে,
পলাশবনে তসরের গুটি ধরেছে,
মহিষ চরছে হর্তকি গাছের তলায়—
উলঙ্গ সাঁওতালের ছেলে পিঠের উপরে।
বাসাবাড়ি কোথাও নেই,
তাই তাঁবু পাতলেম নদীর ধারে।
সঙ্গী ছিল না কেউ,
কেবল ছিল টবে সেই ক্যামেলিয়া।

কমলা এসেছে মাকে নিয়ে।
রোদ ওঠবার আগে
হিমে-ছোঁওয়া স্নিগ্ধ হাওয়ায়
শাল-বাগানের ভিতর দিয়ে বেড়াতে যায় ছাতি হাতে।
মেঠো ফুলগুলো পায়ে এসে মাথা কোটে,
কিন্তু সে কি চেয়ে দেখে।

অল্পজল নদী পায়ে হেঁটে
পেরিয়ে যায় ও পারে,
সেখানে সিসুগাছের তলায় বই পড়ে।
আর আমাকে সে যে চিনেছে
তা জানলেম আমাকে লক্ষ্য করে না বলেই।

একদিন দেখি, নদীর ধারে বালির উপর চড়িভাতি করছে এরা।
ইচ্ছে হল গিয়ে বলি, আমাকে দরকার কি নেই কিছুতেই।
আমি পারি জল তুলে আনতে নদী থেকে—
পারি বন থেকে কাঠ আনতে কেটে,
আর, তা ছাড়া কাছাকাছি জঙ্গলের মধ্যে
একটা ভদ্রগোছের ভালুকও কি মেলে না।

দেখলেম দলের মধ্যে একজন যুবক—
শর্ট্-পরা, গায়ে রেশমের বিলিতি জামা,
কমলার পাশে পা ছড়িয়ে
হাভানা চুরোট খাচ্ছে।
আর, কমলা অন্যমনে টুকরো টুকরো করছে
একটা শ্বেতজবার পাপড়ি,
পাশে পড়ে আছে
বিলিতি মাসিক পত্র।

মুহূর্তে বুঝলেম এই সাঁওতাল পরগনার নির্জন কোণে
আমি অসহ্য অতিরিক্ত, ধরবে না কোথাও।
তখনি চলে যেতেম, কিন্তু বাকি আছে একটি কাজ।
আর দিন-কয়েকেই ক্যামেলিয়া ফুটবে,
পাঠিয়ে দিয়ে তবে ছুটি।
সমস্ত দিন বন্দুক ঘাড়ে শিকারে ফিরি বনে জঙ্গলে,
সন্ধ্যার আগে ফিরে এসে টবে দিই জল
আর দেখি কুঁড়ি এগোল কত দূর।

সময় হয়েছে আজ।
যে আনে আমার রান্নার কাঠ
ডেকেছি সেই সাঁওতাল মেয়েটিকে।
তার হাত দিয়ে পাঠাব
শালপাতার পাত্রে।
তাঁবুর মধ্যে বসে তখন পড়ছি ডিটেকটিভ গল্প।
বাইরে থেকে মিষ্টিস্বরে আওয়াজ এল, 'বাবু, ডেকেছিস কেনে।'
বেরিয়ে এসে দেখি ক্যামেলিয়া
সাঁওতাল মেয়ের কানে,
কালো গালের উপর আলো করেছে।
সে আবার জিগেস করলে, 'ডেকেছিস কেনে।'
আমি বললেম, 'এই জন্যেই।'
তার পরে ফিরে এলেম কলকাতায়।

২৭ শ্রাবণ ১৩৩৯

শালিখ

শালিখটার কী হল তাই ভাবি।
একলা কেন থাকে দলছাড়া।
প্রথম দিন দেখেছিলেম শিমুল গাছের তলায়,
আমার বাগানে,
মনে হল একটু যেন খুঁড়িয়ে চলে।
তার পরে ঐ রোজ সকালে দেখি—
সঙ্গীহারা, বেড়ায় পোকা শিকার ক'রে।
উঠে আসে আমার বারান্দায়—
নেচে নেচে করে সে পায়চারি,
আমার 'পরে একটুকু নেই ভয়।
কেন এমন দশা।

সমাজের কোন্ শাসনে নির্বাসনের পালা,
দলের কোন্ অবিচারে
জাগল অভিমান।
কিছু দূরেই শালিখগুলো
করছে বকাবকি,
ঘাসে ঘাসে তাদের লাফালাফি,
উড়ে বেড়ায় শিরীষ গাছের ডালে ডালে—
ওর দেখি তো খেয়াল কিছুই নেই।
জীবনে ওর কোন্‌খানে যে গাঁঠ পড়েছে
সেই কথাটাই ভাবি।
সকালবেলার রোদে যেন সহজ মনে
আহার খুঁটে খুঁটে
ঝরে-পড়া পাতার উপর
লাফিয়ে বেড়ায় সারাবেলা।
কারো উপর নালিশ আছে
মনে হয় না একটুও তা।
বৈরাগ্যের গর্ব তো নেই ওর চলনে,
কিম্বা দুটো আগুন-জ্বলা চোখ।

কিন্তু ওকে দেখি নি তো সন্ধেবেলায়—
একলা যখন যায় বাসাতে ডালের কোণে
ঝিল্লি যখন ঝিঁ ঝিঁ করে অন্ধকারে,
হাওয়ায় আসে বাঁশের পাতার ঝরঝরানি।
গাছের ফাঁকে তাকিয়ে থাকে
ঘুমভাঙানো
সঙ্গীবিহীন সন্ধ্যাতারা।

২১ ভাদ্র ১৩৩৯

সাধারণ মেয়ে

আমি অন্তঃপুরের মেয়ে,
চিনবে না আমাকে।
তোমার শেষ গল্পের বইটি পড়েছি, শরৎবাবু,
'বাসি ফুলের মালা'।
তোমার নায়িকা এলোকেশীর মরণ-দশা ধরেছিল
পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে।
পঁচিশ বছর বয়সের সঙ্গে ছিল তার রেষারেষি,
দেখলেম তুমি মহদাশয় বটে—
জিতিয়ে দিলে তাকে।

নিজের কথা বলি।
বয়স আমার অল্প।
একজনের মন ছুঁয়েছিল
আমার এই কাঁচা বয়সের মায়া।
তাই জেনে পুলক লাগত আমার দেহে—
ভুলে গিয়েছিলেম, অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে আমি।
আমার মতো এমন আছে হাজার হাজার মেয়ে,
অল্পবয়সের মন্ত্র তাদের যৌবনে।

তোমাকে দোহাই দিই,
একটি সাধারণ মেয়ের গল্প লেখো তুমি।
বড়ো দুঃখ তার।
তারো স্বভাবের গভীরে
অসাধারণ যদি কিছু তলিয়ে থাকে কোথাও
কেমন করে প্রমাণ করবে সে,
এমন কজন মেলে যারা তা ধরতে পারে।

কাঁচা বয়সের জাদু লাগে ওদের চোখে,
মন যায় না সত্যের খোঁজে,
আমরা বিকিয়ে যাই মরীচিকার দামে।

কথাটা কেন উঠল তা বলি।
মনে করো তার নাম নরেশ।
সে বলেছিল কেউ তার চোখে পড়ে নি আমার মতো।
এতবড়ো কথাটা বিশ্বাস করব যে সাহস হয় না,
না করব যে এমন জোর কই।

একদিন সে গেল বিলেতে।
চিঠিপত্র পাই কখনো বা।
মনে মনে ভাবি, রাম রাম! এত মেয়েও আছে সে দেশে,
এত তাদের ঠেলাঠেলি ভিড়!
আর তারা কি সবাই অসামান্য—
এত বুদ্ধি, এত উজ্জ্বলতা।
আর তারা সবাই কি আবিষ্কার করেছে এক নরেশ সেনকে
স্বদেশে যার পরিচয় চাপা ছিল দশের মধ্যে।

গেল মেলের চিঠিতে লিখেছে
লিজির সঙ্গে গিয়েছিল সমুদ্রে নাইতে।
বাঙালি কবির কবিতা ক' লাইন দিয়েছে তুলে,
সেই যেখানে উর্বশী উঠছে সমুদ্র থেকে।
তার পরে বালির 'পরে বসল পাশাপাশি—
সামনে দুলছে নীল সমুদ্রের ঢেউ,
আকাশে ছড়ানো নির্মল সূর্যালোক।
লিজি তাকে খুব আস্তে আস্তে বললে,
'এই সেদিন তুমি এসেছ, দুদিন পরে যাবে চলে;
ঝিনুকের দুটি খোলা,
মাঝখানটুকু ভরা থাক্‌

একটি নিরেট অশ্রুবিন্দু দিয়ে—
দুর্লভ, মূল্যহীন।'
কথা বলবার কী অসামান্য ভঙ্গি।
সেই সঙ্গে নরেশ লিখেছে,
'কথাগুলি যদি বানানো হয় দোষ কী,
কিন্তু চমৎকার—
হীরে-বসানো সোনার ফুল কি সত্য, তবুও কি সত্য নয়।'
বুঝতেই পারছ,
একটা তুলনার সংকেত ওর চিঠিতে অদৃশ্য কাঁটার মতো
আমার বুকের কাছে বিঁধিয়ে দিয়ে জানায়—
আমি অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে।
মূল্যবানকে পুরো মূল্য চুকিয়ে দিই
এমন ধন নেই আমার হাতে।
ওগো, নাহয় তাই হল,
নাহয় ঋণীই রইলেম চিরজীবন।

পায়ে পড়ি তোমার, একটা গল্প লেখো তুমি শরৎবাবু,
নিতান্তই সাধারণ মেয়ের গল্প—
যে দুর্ভাগিনীকে দূরের থেকে পাল্লা দিতে হয়
অন্তত পাঁচ-সাতজন অসামান্যার সঙ্গে—
অর্থাৎ, সপ্তরথিনীর মার।
বুঝে নিয়েছি আমার কপাল ভেঙেছে,
হার হয়েছে আমার।
কিন্তু তুমি যার কথা লিখবে
তাকে জিতিয়ে দিয়ো আমার হয়ে,
পড়তে পড়তে বুক যেন ওঠে ফুলে
ফুলচন্দন পড়ুক তোমার কলমের মুখে।

তাকে নাম দিয়ো মালতী।
ঐ নামটা আমার।

ধরা পড়বার ভয় নেই।
এমন অনেক মালতী আছে বাংলাদেশে,
তারা সবাই সামান্য মেয়ে।
তারা ফরাসি জর্মান জানে না,
কাঁদতে জানে।

কী করে জিতিয়ে দেবে।
উচ্চ তোমার মন, তোমার লেখনী মহীয়সী।
তুমি হয়তো ওকে নিয়ে যাবে ত্যাগের পথে,
দুঃখের চরমে, শকুন্তলার মতো।
দয়া কোরো আমাকে।
নেমে এসো আমার সমতলে।
বিছানায় শুয়ে শুয়ে রাত্রির অন্ধকারে
দেবতার কাছে যে অসম্ভব বর মাগি—
সে বর আমি পাব না,
কিন্তু পায় যেন তোমার নায়িকা।
রাখো-না কেন নরেশকে সাত বছর লণ্ডনে,
বারে বারে ফেল করুক তার পরীক্ষায়,
আদরে থাক্ আপন উপাসিকামণ্ডলীতে।
ইতিমধ্যে মালতী পাস করুক এম. এ.
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে,
গণিতে হোক প্রথম তোমার কলমের এক আঁচড়ে।
কিন্তু ঐখানেই যদি থাম
তোমার সাহিত্যসম্রাট নামে পড়বে কলঙ্ক।
আমার দশা যাই হোক
খাটো কোরো না তোমার কল্পনা।
তুমি তো কৃপণ নও বিধাতার মতো।
মেয়েটাকে দাও পাঠিয়ে য়ুরোপে।
সেখানে যারা জ্ঞানী, যারা বিদ্বান, যারা বীর,
যারা কবি, যারা শিল্পী, যারা রাজা

দল বেঁধে আসুক ওর চার দিকে।
জ্যোতির্বিদের মতো আবিষ্কার করুক ওকে—
শুধু বিদুষী ব'লে নয়, নারী ব'লে।
ওর মধ্যে যে বিশ্ববিজয়ী জাদু আছে
ধরা পড়ুক তার রহস্য, মূঢ়ের দেশে নয়—
যে দেশে আছে সমজদার, আছে দরদি,
আছে ইংরেজ জর্মান ফরাসি।
মালতীর সম্মানের জন্য সভা ডাকা হোক-না,
বড়ো বড়ো নামজাদার সভা।
মনে করা যাক সেখানে বর্ষণ হচ্ছে মুষলধারে চাটুবাক্য,
মাঝখান দিয়ে সে চলেছে অবহেলায়—
ঢেউয়ের উপর দিয়ে যেন পালের নৌকো।
ওর চোখ দেখে ওরা করছে কানাকানি,
সবাই বলছে ভারতবর্ষের সজল মেঘ আর উজ্জ্বল রৌদ্র
মিলেছে ওর মোহিনী দৃষ্টিতে।
(এইখানে জনান্তিকে বলে রাখি,
সৃষ্টিকর্তার প্রসাদ সত্যই আছে আমার চোখে
বলতে হল নিজের মুখেই,
এখনো কোনো য়ুরোপীয় রসজ্ঞের
সাক্ষাৎ ঘটে নি কপালে।)
নরেশ এসে দাঁড়াক সেই কোণে,
আর তার সেই অসামান্য মেয়ের দল।

আর তার পরে ?
তার পরে আমার নটেশাকটি মুড়োল,
স্বপ্ন আমার ফুরোল।
হায় রে সামান্য মেয়ে!
হায় রে বিধাতার শক্তির অপব্যয়!

২৯ শ্রাবণ ১৩৩৯

একজন লোক

আধবুড়ো হিন্দুস্থানি,
রোগা লম্বা মানুষ—
পাকা গোঁফ, দাড়ি-কামানো মুখ
শুকিয়ে-আসা ফলের মতো।
ছিটের মেরজাই গায়ে, মালকোঁচা ধুতি,
বাঁ কাঁধে ছাতি, ডান হাতে খাটো লাঠি,
পায়ে নাগরা— চলেছে শহরের দিকে।
ভাদ্রমাসের সকাল বেলা,
পাৎলা মেঘের ঝাপসা রোদ্দুর ;
কাল গিয়েছে কম্বল-চাপা হাঁপিয়ে-ওঠা রাত,
আজ সকালে কুয়াশা-ভিজে হাওয়া
দোমনা ক'রে বইছে আমলকীর কচি ডালে।

পথিকটিকে দেখা গেল
আমার বিশ্বের শেষরেখাতে
যেখানে বস্তুহারা ছায়াছবির চলাচল।
ওকে শুধু জানলুম, একজন লোক।
ওর নাম নেই, সংজ্ঞা নেই, বেদনা নেই,
কিছুতে নেই কোনো দরকার—
কেবল হাটে-চলার পথে
ভাদ্রমাসের সকালবেলায়
একজন লোক।

সেও আমায় গেছে দেখে
তার জগতের পোড়ো জমির শেষ সীমানায়,
যেখানকার নীল কুয়াশার মাঝে
কারো সঙ্গে সম্বন্ধ নেই কারো,
যেখানে আমি— একজন লোক

তার ঘরে তার বাছুর আছে,
ময়না আছে খাঁচায় ;
স্ত্রী আছে তার, জাঁতায় আটা ভাঙে,
পিতলের মোটা কাঁকন হাতে ;
আছে তার ধোবা প্রতিবেশী,
আছে মুদি দোকানদার
দেনা আছে কাবুলিদের কাছে ;
কোনোখানেই নেই
আমি— একজন লোক।

১৭ ভাদ্র ১৩৩৯

খেলনার মুক্তি

এক আছে মণিদিদি,
আর আছে তার ঘরে জাপানি পুতুল
নাম হানাসান।
পরেছে জাপানি পেশোয়াজ
ফিকে সবুজের 'পরে ফুলকাটা সোনালি রঙের।
বিলেতের হাট থেকে এল তার বর ;
সেকালের রাজপুত্র কোমরেতে তলোয়ার বাঁধা,
মাথার টুপিতে উঁচু পাখির পালখ—
কাল হবে অধিবাস, পশু´ হবে বিয়ে।

সন্ধে হল।
পালঙ্কেতে শুয়ে হানাসান।
জ্বলে ইলেক্‌ট্রিক বাতি।
কোথা থেকে এল এক কালো চামচিকে,
উড়ে উড়ে ফেরে ঘুরে ঘুরে,
সঙ্গে তার ঘোরে ছায়া।

হানাসান ডেকে বলে,
'চামচিকে, লক্ষ্মী ভাই, আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাও
মেঘেদের দেশে।
জন্মেছি খেলনা হয়ে—
যেখানে খেলার স্বর্গ
সেইখানে হয় যেন গতি
ছুটির খেলায়।'

মণিদিদি এসে দেখে পালঙ্কে তো নেই হানাসান।
কোথা গেল! কোথা গেল!
বটগাছে আঙিনার পারে
বাসা ক'রে আছে ব্যাঙ্গমা;
সে বলে, 'আমি তো জানি,
চামচিকে ভায়া
তাকে নিয়ে উড়ে চলে গেছে।'
মণি বলে, 'হেই দাদা, হেই ব্যাঙ্গমা,
আমাকেও নিয়ে চলো,
ফিরিয়ে আনি গে।'

ব্যাঙ্গমা মেলে দিল পাখা,
মণিদিদি উড়ে চলে সারা রাত্রি ধ'রে।
ভোর হল, এল চিত্রকূটগিরি—
সেইখানে মেঘেদের পাড়া।
মণি ডাকে, 'হানাসান! কোথা হানাসান!
খেলা যে আমার প'ড়ে আছে।'

নীল মেঘ বলে এসে,
'মানুষ কি খেলা জানে?
খেলা দিয়ে শুধু বাঁধে যাকে নিয়ে খেলে।'

মণি বলে, 'তোমাদের খেলা কিরকম।'
কালো মেঘ ভেসে এল
হেসে চিকিমিকি,
ডেকে গুরুগুরু
বলে, 'ঐ চেয়ে দেখো, হানাসান হল নানাখানা—
ওর ছুটি নানা রঙে
নানা চেহারায়,
নানা দিকে
বাতাসে বাতাসে
আলোতে আলোতে।'

মণি বলে, 'ব্যাঙ্গমা দাদা,
এ দিকে বিয়ে যে ঠিক—
বর এসে কী বলবে শেষে।'
ব্যাঙ্গমা হেসে বলে,
'আছে চামচিকে ভায়া,
বরকেও নিয়ে দেবে পাড়ি।
বিয়ের খেলাটা সেও
মিলে যাবে সূর্যাস্তের শূন্যে এসে
গোধূলির মেঘে।'

মণি কেঁদে বলে, 'তবে,
শুধু কি রইবে বাকি কান্নার খেলা।'
ব্যাঙ্গমা বলে, 'মণিদিদি,
রাত হয়ে যাবে শেষ,
কাল সকালের ফোটা বৃষ্টি-ধোওয়া মালতীর ফুলে
সে খেলাও চিনবে না কেউ।'

১৩ আষাঢ় ১৩৩৯

পত্রলেখা

দিলে তুমি সোনা-মোড়া ফাউন্টেন পেন,
— কত মতো লেখার আসবাব।
ছোটো ডেস্‌কোখানি
আখরোট কাঠ দিয়ে গড়া।
ছাপ-মারা চিঠির কাগজ
নানা বহরের।
রুপোর কাগজ-কাটা, এনামেল-করা।
কাঁচি ছুরি গালা লাল-ফিতে।
কাঁচের কাগজ-চাপা,
লাল নীল সবুজ পেন্সিল।
বলে গিয়েছিলে তুমি চিঠি লেখা চাই
একদিন পরে পরে।

লিখতে বসেছি চিঠি,
সকালেই স্নান হয়ে গেছে।

লিখি যে কী কথা নিয়ে কিছুতেই ভেবে পাই নে তো।
একটি খবর আছে শুধু—
তুমি চলে গেছ।
সে খবর তোমারো তো জানা।
তবু মনে হয়,
ভালো করে তুমি সে জান না।
তাই ভাবি এ কথাটি জানাই তোমাকে—
তুমি চলে গেছ।
যতবার লেখা শুরু করি
ততবার ধরা পড়ে এ খবর সহজ তো নয়।
আমি নই কবি—

ভাষার ভিতরে আমি কণ্ঠস্বর পারি নে তো দিতে ;
না থাকে চোখের চাওয়া।
যত লিখি তত ছিঁড়ে ফেলি।

দশটা তো বেজে গেল।
তোমার ভাইপো বকু যাবে ইস্‌কুলে,
যাই তাকে খাইয়ে আসিগে।
শেষবার এই লিখে যাই—
তুমি চলে গেছ।
বাকি আর যতকিছু
হিজিবিজি আঁকাজোকা ব্লটিঙের 'পরে।

১৪ আষাঢ় ১৩৩৯

খ্যাতি

ভাই নিশি,
তখন উনিশ আমি, তুমি হবে বুঝি
পঁচিশের কাছাকাছি।
তোমার দুখানা বই ছাপা হয়ে গেছে—
'ক্ষান্তপিসি', তার পরে 'পঞ্চুর মৌতাত'।
তা ছাড়া মাসিকপত্র কালচক্রে ক্রমে বের হল
'রক্তের আঁচড়'।
হুলুস্থুল পড়ে গেল দেশে।
কলেজের সাহিত্যসভায়
সেদিন বলেছিলেম বঙ্কিমের চেয়ে তুমি বড়ো,
তাই নিয়ে মাথা-ফাটাফাটি।
আমাকে খ্যাপাত দাদা নিশি-পাওয়া ব'লে।
কলেজের পালা-শেষে
করেছি ডেপুটিগিরি,
ইস্তফা দিয়েছি কাজে স্বদেশীর দিনে।

তার পর থেকে, যা আমার
সৌভাগ্য অভাবনীয় তাই ঘটে গেল—
বন্ধুরূপে পেলেম তোমাকে।
কাছে পেয়ে কোনোদিন
তোমাকে করি নি খাটো—
ছোটো বড়ো নানা ত্রুটি সেও আমি হেসে ভালোবেসে
তোমার মহত্ত্বে সবই মিলিয়ে নিয়েছি।
এ ধৈর্য, এ পূর্ণদৃষ্টি, এও যে তোমারি কাছে শেখা।
দোষে ভরা অসামান্য প্রাণ,
সে চরিত্র-রচনায় সব চেয়ে ওস্তাদি তোমার
সে তো আমি জানি।

তার পরে কতবার অনুরোধ করেছ কেবলই,
বলেছিলে, 'লেখো, লেখো, গল্প লেখো।
লেখকের মঞ্চে ছিল পিঠ-উঁচু তোমারি চৌকিটা।
আত্ম-অবিশ্বাসে শুধু আটকে পড়েছ
পড়ুয়ার নীচের বেঞ্চিতে।'
শেষকালে বহু ইতস্তত ক'রে
লেখা করলেম শুরু।

বিষয়টা ঘটেছিল আমারি আমলে
পান্‌তিঘাটায়।
আসামি পোলিটিকাল,
সাতমাস পলাতকা।
মাকে দেখে যাবে বলে একদিন রাত্রে এসেছিল
প্রাণ হাতে ক'রে।
খুড়ো গেল পুলিশে খবর দিতে।
কিছুদিন নিল সে আশ্রয়
জেলেনীর ঘরে।

যখন পড়ল ধরা সত্য সাক্ষ্য দিল খুড়ো,
মিথ্যে সাক্ষ্য দিয়েছে জেলেনী।
জেলেনীকে দিতে হল জেলে,
খুড়ো হল সাব্‌রেজিস্ট্রার।

গল্পখানা পড়ে
বিস্তর বাহবা দিয়েছিলে।
খাতাখানা নিজে নিয়ে
শম্ভু সাণ্ডেলের ঘরে
বলে এলে, কালচক্রে অবিলম্বে বের হওয়া চাই।
বের হল মাসে মাসে—
শুক্‌নো কাশে আগুনের মতো
ছড়িয়ে পড়ল খ্যাতি নিমেষে নিমেষে।
বাঁশরি'তে লিখে দিল,
কোথা লাগে আশুবাবু এ নবীন লেখকের কাছে
শুনে হেসেছিলে তুমি।
পাঞ্চজন্যে লিখেছিল রতিকান্ত ঘোষ.
এত দিনে বাঙলা ভাষায়
সত্য লেখা পাওয়া গেল
ইত্যাদি ইত্যাদি।
এবার হাস নি তুমি।
তার পর থেকে
তোমার আমার মাঝখানে
খ্যাতির কাঁটার বেড়া ক্রমে ঘন হল।

এখন আমার কথা শোনো।
আমার এ খ্যাতি
আধুনিক মত্ততার ইঞ্চিদুই পলিমাটি-'পরে
হঠাৎ-গজিয়ে-ওঠা।

স্টুপিড জানে না—
মূল এর বেশি দূর নয় ;
ফল এর কোনোখানে নেই,
কেবলই পাতার ঘটা।
তোমার যে পঞ্চু সে তো বাঙলার ডন্‌কুইক্সোট,
তার যা মৌতাত
সে যে জন্মখ্যাপাদের মগজে মগজে
দেশে দেশে দেখা দেয় চিরকাল।
আমার এ কুঞ্জলাল ডুবড়ির মতো
জলে আর নেবে—
বোকাদের চোখে লাগে ধাঁধা।
আমি জানি তুমি কতখানি বড়ো।
এ ফাঁকা খ্যাতির চোরা মেকি পয়সায়
বিকাব কি বন্ধুত্ব তোমার।
কাগজের মোড়কটা খুলে দেখো,
আমার লেখার দগ্ধশেষ।
আজ বাদে কাল হ'ত ধুলো,
আজ হোক ছাই।

২৪ আষাঢ় ১৩৩৯

বাঁশি

কিনু গোয়ালার গলি।
দোতলা বাড়ির
লোহার-গরাদে-দেওয়া একতলা ঘর
পথের ধারেই।
লোনা-ধরা দেওয়ালেতে মাঝে মাঝে ধসে গেছে বালি,
মাঝে মাঝে স্যাঁতা-পড়া দাগ।

মার্কিন থানের মার্কা একখানা ছবি
সিদ্ধিদাতা গণেশের
দরজার 'পরে আঁটা।
আমি ছাড়া ঘরে থাকে আরেকটা জীব
এক ভাড়াতেই,
সেটা টিকটিকি।
তফাত আমার সঙ্গে এই শুধু,
নেই তার অন্নের অভাব।

বেতন পঁচিশ টাকা,
সদাগরি আপিসের কনিষ্ঠ কেরানি।
খেতে পাই দত্তদের বাড়ি
ছেলেকে পড়িয়ে।
শেয়ালদা ইস্টিশনে যাই,
সন্ধেটা কাটিয়ে আসি,
আলো জ্বালাবার দায় বাঁচে।
এঞ্জিনের ধস্ ধস্,
বাঁশির আওয়াজ,
যাত্রীর ব্যস্ততা,
কুলি-হাঁকাহাঁকি।
সাড়ে দশ বেজে যায়,
তার পরে ঘরে এসে নিরালা নিঃঝুম অন্ধকার।

ধলেশ্বরীনদীতীরে পিসিদের গ্রাম।
তাঁর দেওরের মেয়ে,
অভাগার সাথে তার বিবাহের ছিল ঠিকঠাক।
লগ্ন শুভ, নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল—
সেই লগ্নে এসেছি পালিয়ে।
মেয়েটা তো রক্ষে পেলে,
আমি তথৈবচ।

ঘরেতে এল না সে তো, মনে তার নিত্য আসাযাওয়া—
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।

বর্ষা ঘন ঘোর।
ট্রামের খরচা বাড়ে,
মাঝে মাঝে মাইনেও কাটা যায়।
গলিটার কোণে কোণে
জমে ওঠে পচে ওঠে
আমের খোসা ও আঁঠি, কাঁঠালের ভূতি,
মাছের কান্‌কা,
মরা বেড়ালের ছানা,
ছাইপাঁশ আরো কত কী যে!
ছাতার অবস্থাখানা জরিমানা-দেওয়া
মাইনের মতো,
বহু ছিদ্র তার।
আপিসের সাজ
গোপীকান্ত গোঁসাইয়ের মনটা যেমন,
সর্বদাই রসসিক্ত থাকে।
বাদলের কালো ছায়া
স্যাঁৎসেঁতে ঘরটাতে ঢুকে
কলে-পড়া জন্তুর মতন
মূর্ছায় অসাড়।
দিন-রাত মনে হয়, কোন্ আধমরা
জগতের সঙ্গে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে আছি।

গলির মোড়েই থাকে কান্তবাবু,
যত্নে-পাট-করা লম্বা চুল,
বড়ো বড়ো চোখ,
শৌখিন মেজাজ

কর্নেট বাজানো তার শখ।
মাঝে মাঝে সুর জেগে ওঠে
এ গলির বীভৎস বাতাসে—
কখনো গভীর রাতে,
ভোরবেলা আধো অন্ধকারে,
কখনো বৈকালে
ঝিকিমিকি আলোয় ছায়ায়।
হঠাৎ সন্ধ্যায়
সিন্ধু-বারোয়াঁয় লাগে তান,
সমস্ত আকাশে বাজে
অনাদি কালের বিরহবেদনা।
তখনি মুহূর্তে ধরা পড়ে
এ গলিটা ঘোর মিছে,
দুর্বিষহ, মাতালের প্রলাপের মতো।
হঠাৎ খবর পাই মনে
আকবর বাদশার সঙ্গে
হরিপদ কেরানির কোনো ভেদ নেই।
বাঁশির করুণ ডাক বেয়ে
ছেঁড়া ছাতা রাজছত্র মিলে চলে গেছে
এক বৈকুণ্ঠের দিকে।
এ গান যেখানে সত্য
অনন্ত গোধূলিলগ্নে
সেইখানে
বহি চলে ধলেশ্বরী;
তীরে তমালের ঘন ছায়া;
আঙিনাতে
যে আছে অপেক্ষা ক'রে তার
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।

২৫ আষাঢ় ১৩৩৯

উন্নতি

উপরে যাবার সিঁড়ি,
তারি নীচে দক্ষিণের বারান্দায়
নীলমণি মাস্টারের কাছে
সকালে পড়তে হত ইংলিশ রীডার
ভাঙা পাঁচিলের কাছে ছিল মস্ত তেঁতুলের গাছ।
ফল পাকবার বেলা
ডালে ডালে ঝপাঝপ বাঁদরের হ'ত লাফালাফি।
ইংরেজি বানান ছেড়ে দুই চক্ষু ছুটে যেত
লেজ-দোলা বাঁদরের দিকে।
সেই উপলক্ষে—
আমার বুদ্ধির সঙ্গে রাঙামুখো বাঁদরের
নির্ভেদ নির্ণয় করে
মাস্টার দিতেন কানমলা।

ছুটি হলে পরে
শুরু হত আমার মাস্টারি
উদ্ভিদ-মহলে।
ফলসা চালতা ছিল, ছিল সার-বাঁধা
সুপুরির গাছ।
অনাহূত জন্মেছিল কী করে কুলের এক চারা
বাড়ির গা ঘেঁষে;
সেটাই আমার ছাত্র ছিল।
ছড়ি দিয়ে মারতেম তাকে।
বলতেম 'দেখ্ দেখি বোকা,
উঁচু ফলসার গাছে ফল ধরে গেল,
কোথাকার বেঁটে কুল উন্নতির উৎসাহই নেই।'

শুনেছি বাবার মুখে যত উপদেশ
তার মধ্যে বার বার 'উন্নতি' কথাটা শোনা যেত।
ভাঙা বোতলের ঝুড়ি বেচে
শেষকালে কে হয়েছে লক্ষপতি ধনী
সেই গল্প শুনে শুনে
উন্নতি যে কাকে বলে দেখেছি সুস্পষ্ট তার ছবি।
বড়ো হওয়া চাই—
অর্থাৎ, নিতান্ত পক্ষে হতে হবে বাজিদপুরের
ভজু মল্লিকের জুড়ি।
ফলসার ফলে ভরা গাছ
বাগান-মহলে সেই ভজু মহাজন।
চারাটাকে রোজ বোঝাতেম,
ওরই মতো বড়ো হতে হবে।
কাঠি দিয়ে মাপি তাকে এবেলা ওবেলা—
আমারি কেবল রাগ বাড়ে,
আর কিছু বাড়ে না তো।
সেই কাঠি দিয়ে তাকে মারি শেষে সপাসপ্ জোরে—
একটু ফলে নি তাতে ফল।
কান-মলা যত দিই
পাতাগুলো ম'লে ম'লে
ততই উন্নতি তার কমে।

এ দিকে ছিলেন বাবা ইন্‌কম্-ট্যাক্সো-কালেক্টার,
বদলি হলেন
বর্ধমান ডিভিজনে।
উচ্চ ইংরেজির স্কুলে পড়া শুরু করে
উচ্চতার পূর্ণ পরিণতি
কোলকাতা গিয়ে।
বাবার মৃত্যুর পরে সেক্রেটারিয়েটে
উন্নতির ভিত্তি ফাঁদা গেল।

বন্ধুকষ্টে বহু ঋণ করে
বোনের দিয়েছি বিয়ে।
নিজের বিবাহ প্রায় টার্মিনসে এল
আগামী ফাল্গুন মাসে নবমী তিথিতে।
নববসন্তের হাওয়া ভিতরে বাইরে
বইতে আরম্ভ হল যেই
এমন সময়ে, রিডাক্‌শান্‌।
পোকা-খাওয়া কাঁচা ফল
বাইরেতে দিব্যি টুপ্‌টুপে,
ঝুপ্‌ করে খসে পড়ে
বাতাসের এক দমকায়,
আমার সে দশা।
বসন্তের আয়োজনে যে একটু ত্রুটি হল
সে কেবল আমারই কপালে।
আপিসের লক্ষ্মী ফিরালেন মুখ,
ঘরের লক্ষ্মীও
স্বর্ণকমলের খোঁজে অন্যত্র হলেন নিরুদ্দেশ।
সার্টিফিকেটের তাড়া হাতে,
শুক্‌নো মুখ,
চোখ গেছে বসে,
তুবড়ে গিয়েছে পেট,
জুতোটার তলা ছেঁড়া,
দেহের বর্ণের সঙ্গে চাদরের
ঘুচে গেছে বর্ণভেদ—
ঘুরে মরি বড়োলোকদের দ্বারে।
এমন সময় চিঠি এল,
ভজু মহাজন
দেনায় দিয়েছে ক্রোক ভিটেবাড়িখানা।

বাড়ি গিয়ে উপরের ঘরে
জানলা খুলতে সেটা ডালে ঠেকে গেল।

রাগ হল মনে—
ঠেলাঠেলি করে দেখি,
আরে আরে ছাত্র যে আমার!
শেষকালে বড়োই তো হল,
উন্নতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিলে
ভজু মল্লিকেরই মতো আমার দুয়ারে দিয়ে হানা।

২৬ আষাঢ় ১৩৩৯

ভীরু

ম্যাট্রিকুলেশনে পড়ে
ব্যঙ্গসূচচতুর
বটেকৃষ্ট, ভীরু ছেলেদের বিভীষিকা।
একদিন কী কারণে
সুনীতকে দিয়েছিল উপাধি 'পরমহংস' ব'লে।
ক্রমে সেটা হল 'পাতিহাঁস'।
শেষকালে হল 'হাঁসখালি'—
কোনো তার অর্থ নেই, সেই তার খোঁচা।

আঘাতকে ডেকে আনে
যে নিরীহ আঘাতকে করে ভয়।
নিষ্ঠুরের দল বাড়ে,
ছোঁয়াচ লাগায় অট্টহাসে।
ব্যঙ্গরসিকের যত অংশ-অবতার
নিষ্কাম বিদ্রূপসূচি বিঁধে
অহৈতুক বিদ্বেষেতে সুনীতকে করে জরজর

একদিন মুক্তি পেল সে বেচারা,
বেরোল ইস্কুল থেকে।

তার পরে গেল বহুদিন—
তবু যেন নাড়ীতে জড়িয়ে ছিল
সেদিনের সশঙ্ক সংকোচ।
জীবনে অন্যায় যত, হাস্যবক্র যত নির্দয়তা,
তারি কেন্দ্রস্থলে
বটেকৃষ্ট রেখে গেছে কালো স্থূল বিগ্রহ আপন।

সে কথা জানত বটু,
সুনীতের এই অন্ধ ভয়টাকে
মাঝে মাঝে নাড়া দিয়ে পেত সুখ
হিংস্র ক্ষমতার অহংকারে ;
ডেকে যেত সেই পুরাতন নামে,
হেসে যেত খলখল হাসি।

বি এল. পরীক্ষা দিয়ে
সুনীত ধরেছে ওকালতি,
ওকালতি ধরল না তাকে।
কাজের অভাব ছিল, সময়ের অভাব ছিল না—
গান গেয়ে সেতার বাজিয়ে
ছুটি ভরে যেত।
নিয়ামৎ ওস্তাদের কাছে
হ'ত তার সুরের সাধনা।

ছোটো বোন সুধা,
ডায়োসিসনের বি-এ,
গণিতে সে এম-এ দিবে এই তার পণ।
দেহ তার ছিপ্‌ছিপে,
চলা তার চটুল চকিত,
চশমার নীচে
চোখে তার ঝলমল কৌতুকের ছটা—

দেহমন
কূলে কূলে ভরা তার হাসিতে খুশিতে
তারি এক ভক্ত সখী নাম উমারানী—
শান্ত কণ্ঠস্বর,
চোখে স্নিগ্ধ কালো ছায়া,
দুটি দুটি সরু চুড়ি সুকুমার দুটি তার হাতে।
পাঠ্য ছিল ফিলজফি,
সে কথা জানাতে তার বিষম সংকোচ।

দাদার গোপন কথাখানা
সুধার ছিল না অগোচর।
চেপে রেখেছিল হাসি,
পাছে হাসি তীব্র হয়ে বাজে তার মনে।
রবিবার
চা খেতে বন্ধুকে ডেকেছিল।
সেদিন বিষম বৃষ্টি,
রাস্তা গলি ভেসে যায় জলে,
একা জানালার পাশে সুনীত সেতারে
আলাপ করেছে শুরু সুরট-মল্লার।
মন জানে
উমা আছে পাশের ঘরেই।
সেই-যে নিবিড় জানাটুকু
বুকের স্পন্দনে মিলে সেতারের তারে তারে কাঁপে।

হঠাৎ দাদার ঘরে ঢুকে
সেতারটা কেড়ে নিয়ে বলে সুধা,
'উমার বিশেষ অনুরোধ
গান শোনাতেই হবে,
নইলে সে ছাড়ে না কিছুতে।'

লজ্জায় সখীর মুখ রাঙা,
এ মিথ্যা কথার
কী করে যে প্রতিবাদ করা যায়
ভেবে সে পেল না।

সন্ধ্যার আগেই
অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে;
থেকে থেকে বাদল বাতাসে
দরজাটা ব্যস্ত হয়ে ওঠে,
বৃষ্টির ঝাপ্‌টা লাগে কাঁচের সাশিতে;
বারান্দার টব থেকে মৃদুগন্ধ দেয় জুঁই ফুল;
হাঁটুজল জমেছে রাস্তায়,
তারি 'পর দিয়ে
মাঝে মাঝে ছলো ছলো শব্দে চলে গাড়ি।
দীপালোকহীন ঘরে
সেতারের ঝংকারের সাথে
সুনীত ধরেছে গান
নটমল্লারের সুরে—
আওয়ে পিয়রওয়া,
রিমিঝিমি বরখন লাগে!
সুরের সুরেন্দ্রলোকে মন গেছে চলে,
নিখিলের সব ভাষা মিলে গেছে অখণ্ড সংগীতে
অন্তহীন কালসরোবরে
মাধুরীর শতদল—
তার 'পরে যে রয়েছে একা বসে
চেনা যেন তবু সে অচেনা।

সন্ধ্যা হল।
বৃষ্টি থেমে গেছে;
জ্বলেছে পথের বাতি।

পাশের বাড়িতে
কোন্ ছেলে দুলে দুলে
চেঁচিয়ে ধরেছে তার পরীক্ষার পড়া।

এমন সময় সিঁড়ি থেকে
অট্টহাস্যে এল হাঁক,
'কোথা ওরে, কোথা গেল হাঁসখালি!'
মাংসলপৃথুলদেহ বটেকৃষ্ট স্ফীতরক্তচোখ
ঘরে এসে দেখে,
সুনীত দাঁড়িয়ে দ্বারে নিঃসংকোচ স্তব্ধ ঘৃণা নিয়ে
স্থূল বিদ্রূপের ঊর্ধ্বে
ইন্দ্রের উদ্যত বজ্র যেন।
জোর করে হেসে উঠে
কী কথা বলতে গেল বটু,
সুনীত হাঁকল 'চুপ'—
অকস্মাৎ বিদলিত ভেকের ডাকের মতো
হাসি গেল থেমে।

৫ শ্রাবণ ১৩৩৯

তীর্থযাত্রী

টি. এস. এলিয়ট'এর The Journey of the Magi -নামক কবিতার অনুবাদ

কন্‌কনে ঠাণ্ডায় আমাদের যাত্রা—
ভ্রমণটা বিষম দীর্ঘ, সময়টা সব চেয়ে খারাপ,
রাস্তা ঘোরালো, ধারালো বাতাসের চোট,
একেবারে দুর্জয় শীত।
ঘাড়ে ক্ষত, পায়ে ব্যথা, মেজাজ-চড়া উটগুলো
শুয়ে শুয়ে পড়ে গলা বরফে।

মাঝে মাঝে মন যায় বিগড়ে
যখন মনে পড়ে পাহাড়তলিতে বসন্তমঞ্জিল, তার চাতাল,
আর শর্বতের পেয়ালা হাতে রেশমি সাজে যুবতীর দল।
এ দিকে উটওয়ালারা গাল পাড়ে, গন্‌গন্‌ করে রাগে,
ছুটে পালায় মদ আর মেয়ের খোঁজে।
মশাল যায় নিভে, মাথা রাখবার জায়গা জোটে না।
নগরে যাই, সেখানে বৈরিতা; নগরীতে সন্দেহ।
গ্রামগুলো নোংরা, তারা চড়া দাম হাঁকে।
কঠিন মুশকিল।
শেষে ঠাওরালেম চলব সারারাত,
মাঝে মাঝে নেব ঝিমিয়ে
আর কানে কানে কেউ বা গান গাবে—
এ সমস্তই পাগলামি।

ভোরের দিকে এলেম যেখানে মিঠে শীত সেই পাহাড়ের খদে;
সেখানে বরফ-সীমার নীচেটা ভিজে-ভিজে, ঘন গাছ-গাছালির গন্ধ।
নদী চলেছে ছুটে, জলযন্ত্রের চাকা আঁধারকে মারছে চাপড়।
দিগন্তের গায়ে তিনটে গাছ দাঁড়িয়ে,
বুড়ো সাদা ঘোড়াটা মাঠ বেয়ে দৌড় দিয়েছে।
পৌঁছলেম শরাবখানায়, তার কপাটের মাথায় আঙুরলতা।
দুজন মানুষ খোলা দরোজার কাছে পাশা খেলছে টাকার লোভে,
পা দিয়ে ঠেলছে শূন্য মদের কুপো।
কোনো খবরই মিলল না সেখানে,
চললেম আরো আগে।
যেতে যেতে সন্ধে হল;
সময়ে পেরিয়ে যায় যায়, তখন খুঁজে পেলেম জায়গাটা—
বলা যেতে পারে ব্যাপারটা তৃপ্তিজনক।

মনে পড়ে এ-সব ঘটেছে অনেক কাল আগে,
আবার ঘটে যেন এই ইচ্ছে, কিন্তু লিখে রাখো—

এই লিখে রাখো— এত দূরে যে আমাদের টেনে নিয়েছিল
সে কি জন্মের সন্ধানে না মৃত্যুর।
জন্ম একটা হয়েছিল বটে—
প্রমাণ পেয়েছি, সন্দেহ নেই।
এর আগে তো জন্মও দেখেছি, মৃত্যুও—
মনে ভাবতেম তারা এক নয়।
কিন্তু এই-যে জন্ম এ বড়ো কঠোর—
দারুণ এর যাতনা, মৃত্যুর মতো, আমাদের মৃত্যুর মতোই।
এলেম ফিরে আপন আপন দেশে, এই আমাদের রাজত্বগুলোয়।
আর কিন্তু স্বস্তি নেই সেই পুরানো বিধিবিধানে
যার মধ্যে আছে সব অনাত্মীয় আপন দেবদেবী আঁকড়ে ধ'রে।
আর-একবার মরতে পারলে আমি বাঁচি।

[১৩৩৯]

চিররূপের বাণী

প্রাঙ্গণে নামল অকালসন্ধ্যার ছায়া
সূর্যগ্রহণের কলিমার মতো।
উঠল ধ্বনি : খোলো দ্বার!
প্রাণপুরুষ ছিল ঘরের মধ্যে,
সে কেঁপে উঠল চমক খেয়ে।
দরজা ধরল চেপে,
আগলের উপর আগল লাগল।
কম্পিতকণ্ঠে বললে, কে তুমি।
মেঘমন্দ্র-ধ্বনি এল : আমি মাটি-রাজত্বের দূত,
সময় হয়েছে, এসেছি মাটির দেনা আদায় করতে।
ঝন্‌ঝন্‌ বেজে উঠল দ্বারের শিকল,
থরথর কাঁপল প্রাচীর,
হায়-হায় করে ঘরের হাওয়া।

নিশাচরের ডানার ঝাপট আকাশে আকাশে
নিশীথিনীর হৃৎকম্পনের মতো।
ধক্‌ধক্ ধক্‌ধক্ আঘাতে
খান্‌খান্ হল দ্বারের আগল, কপাট পড়ল ভেঙে।

কম্পমান কণ্ঠে প্রাণ বললে, হে মাটি, হে নিষ্ঠুর, কী চাও তুমি?
দূত বললে, আমি চাই দেহ।
দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে প্রাণ; বললে,
এতকাল আমার লীলা এই দেহে,
এর অণুতে অণুতে আমার নৃত্য,
নাড়ীতে নাড়ীতে ঝংকার,
মুহূর্তেই কি উৎসব দেবে ভেঙে—
দীর্ণ হয়ে যাবে বাঁশি,
চূর্ণ হয়ে যাবে মৃদঙ্গ,
ডুবে যাবে এর দিনগুলি
অতল রাত্রির অন্ধকারে?
দূত বললে, ঋণে বোঝাই তোমার এই দেহ,
শোধ করবার দিন এল—
মাটির ভাণ্ডারে ফিরবে তোমার দেহের মাটি।
প্রাণ বললে, মাটির ঋণ শোধ করে নিতে চাও, নাও—
কিন্তু তার চেয়ে বেশি চাও কেন?
দূত বিদ্রূপ করে বললে, এই তো তোমার নিঃস্ব দেহ,
কৃশ ক্লান্ত কৃষ্ণচতুর্দশীর চাঁদ—
এর মধ্যে বাহুল্য আছে কোথায়?
প্রাণ বললে, মাটিই তোমার, রূপ তো তোমার নয়।
অট্টহাস্যে হেসে উঠল দূত; বললে,
যদি পার দেহ থেকে রূপ নাও ছাড়িয়ে।
প্রাণ বললে, পারবই, এই পণ আমার।

প্রাণের মিতা মন। সে গেল আলোক-উৎসের তীর্থে।

বললে জোড়হাত করে :
হে মহাজ্যোতি, হে চিরপ্রকাশ, হে রূপের কল্পনির্ঝর,
স্থূল মাটির কাছে ঘটিয়ো না তোমার সত্যের অপলাপ
তোমার সৃষ্টির অপমান।
তোমার রূপকে লুপ্ত করে সে কোন্ অধিকারে।
আমাকে কাঁদায় কার অভিশাপে।
মন বসল তপস্যায়।
কেটে গেল হাজার বছর, লক্ষ বছর— প্রাণের কান্না থামে না।
পথে পথে বাটপাড়ি,
রূপ চুরি যায় নিমেষে নিমেষে।
সমস্ত জীবলোক থেকে প্রার্থনা ওঠে দিনরাত :
হে রূপকার, হে রূপরসিক,
যে দান করেছ নিজহাতে জড় দানব তাকে কেড়ে নিয়ে যায় যে।
ফিরিয়ে আনো তোমার আপন ধন।

যুগের পর যুগ গেল, নেমে এল আকাশবাণী :
মাটির জিনিস ফিরে যায় মাটিতে,
ধ্যানের রূপ রয়ে যায় আমার ধ্যানে।
বর দিলেম, হারা রূপ ধরা দেবে,
কায়ামুক্ত ছায়া আসবে আলোর বাহু ধরে
তোমার দৃষ্টির উৎসবে।
রূপ এল ফিরে দেহহীন ছবিতে, উঠল শঙ্খধ্বনি।
ছুটে এল চারি দিক থেকে রূপের প্রেমিক।

আবার দিন যায়, বৎসর যায়। প্রাণের কান্না থামে না।
আরো কী চাই।
প্রাণ জোড়হাত করে বলে,
মাটির দূত আসে, নির্মম হাতে কণ্ঠযন্ত্রে কুলুপ লাগায়—
বলে 'কণ্ঠনালী আমার'।

শুনে আমি বলি, মাটির বাঁশিখানি তোমার বটে,
কিন্তু বাণী তো তোমার নয়।
উপেক্ষা করে সে হাসে।
শোনো আমার ক্রন্দন, হে বিশ্ববাণী,
জয়ী হবে কি জড়মাটির অহংকার—
সেই অন্ধ সেই মূক তোমার বাণীর উপর কি চাপা দেবে চিরমূকত্ব,
যে বাণী অমৃতের বাহন তার বুকের উপর স্থাপন করবে জড়ের জয়স্তম্ভ?

শোনা গেল আকাশ থেকে :
ভয় নেই।
বায়ুসমুদ্রে ঘুরে ঘুরে চলে অশ্রুতবাণীর চক্রলহরী,
কিছুই হারায় না।
আশীর্বাদ এই আমার, সার্থক হবে মনের সাধনা ;
জীর্ণকণ্ঠ মিশবে মাটিতে, চিরজীবী কণ্ঠস্বর বহন করবে বাণী।

মাটির দানব মাটির রথে যাকে হরণ করে চলেছিল
মনের রথ সেই নিরুদ্দেশ বাণীকে আনলে ফিরিয়ে কণ্ঠহীন গানে।
জয়ধ্বনি উঠল মর্তলোকে।
দেহমুক্ত রূপের সঙ্গে যুগলমিলন হল দেহমুক্ত বাণীর
প্রাণতরঙ্গিণীর তীরে, দেহনিকেতনের প্রাঙ্গণে।

[১৩৩৯]

শুচি

রামানন্দ পেলেন গুরুর পদ—
সারাদিন তাঁর কাটে জপে তপে,
সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুরকে ভোজ্য করেন নিবেদন,
তার পরে ভাঙে তাঁর উপবাস
যখন অন্তরে পান ঠাকুরের প্রসাদ।

সেদিন মন্দিরে উৎসব—
রাজা এলেন, রানী এলেন,
এলেন পণ্ডিতেরা দূর দূর থেকে,
এলেন নানাচিহ্নধারী নানা সম্প্রদায়ের ভক্তদল।
সন্ধ্যাবেলায় স্নান শেষ করে
রামানন্দ নৈবেদ্য দিলেন ঠাকুরের পায়ে—
প্রসাদ নামল না তাঁর অন্তরে,
আহার হল না সেদিন।

এমনি যখন দুই সন্ধ্যা গেল কেটে,
হৃদয় রইল শুষ্ক হয়ে,
গুরু বললেন মাটিতে ঠেকিয়ে মাথা,
'ঠাকুর, কী অপরাধ করেছি।'
ঠাকুর বললেন, 'আমার বাস কি কেবল বৈকুণ্ঠে।
সেদিন আমার মন্দিরে যারা প্রবেশ পায় নি
আমার স্পর্শ যে তাদের সর্বাঙ্গে,
আমারই পাদোদক নিয়ে
প্রাণপ্রবাহিণী বইছে তাদের শিরায়।
তাদের অপমান আমাকে বেজেছে;
আজ তোমার হাতের নৈবেদ্য অশুচি।'

'লোকস্থিতি রক্ষা করতে হবে যে প্রভু'
ব'লে গুরু চেয়ে রইলেন ঠাকুরের মুখের দিকে।
ঠাকুরের চক্ষু দীপ্ত হয়ে উঠল; বললেন,
'যে লোকসৃষ্টি স্বয়ং আমার,
যার প্রাঙ্গণে সকল মানুষের নিমন্ত্রণ,
তার মধ্যে তোমার লোকস্থিতির বেড়া তুলে
আমার অধিকারে সীমা দিতে চাও
এতবড়ো স্পর্ধা!'

রামানন্দ বললেন, 'প্রভাতেই যাব এই সীমা ছেড়ে,
দেব আমার অহংকার দূর করে তোমার বিশ্বলোকে।'

তখন রাত্রি তিন প্রহর,
আকাশের তারাগুলি যেন ধ্যানমগ্ন।
গুরুর নিদ্রা গেল ভেঙে ; শুনতে পেলেন,
'সময় হয়েছে, ওঠো, প্রতিজ্ঞা পালন করো।'
রামানন্দ হাতজোড় করে বললেন, 'এখনো রাত্রি গভীর,
পথ অন্ধকার, পাখিরা নীরব।
প্রভাতের অপেক্ষায় আছি।'
ঠাকুর বললেন, 'প্রভাত কি রাত্রির অবসানে।
যখনি চিত্ত জেগেছে, শুনেছ বাণী,
তখনি এসেছে প্রভাত।
যাও তোমার ব্রতপালনে।'

রামানন্দ বাহির হলেন পথে একাকী,
মাথার উপরে জাগে ধ্রুবতারা।
পার হয়ে গেলেন নগর, পার হয়ে গেলেন গ্রাম।
নদীতীরে শ্মশান, চণ্ডাল শবদাহে ব্যাপৃত।
রামানন্দ দুই হাত বাড়িয়ে তাকে নিলেন বক্ষে।
সে ভীত হয়ে বললে, 'প্রভু, আমি চণ্ডাল, নাভা আমার নাম,
হেয় আমার বৃত্তি,
অপরাধী করবেন না আমাকে।'
গুরু বললেন, 'অন্তরে আমি মৃত, অচেতন আমি,
তাই তোমাকে দেখতে পাই নি এতকাল,
তাই তোমাকেই আমার প্রয়োজন—
নইলে হবে না মৃতের সংকার।'

চললেন গুরু আগিয়ে।
ভোরের পাখি উঠল ডেকে,

অরুণ-আলোয় শুকতারা গেল মিলিয়ে।
কবীর বসেছেন তাঁর প্রাঙ্গণে,
কাপড় বুনছেন আর গান গাইছেন গুন্ গুন্ স্বরে।
রামানন্দ বসলেন পাশে,
কণ্ঠ তাঁর ধরলেন জড়িয়ে।
কবীর ব্যস্ত হয়ে বললেন,
'প্রভু, জাতিতে আমি মুসলমান,
আমি জোলা, নীচ আমার বৃত্তি।'
রামানন্দ বললেন, 'এতদিন তোমার সঙ্গ পাই নি বন্ধু,
তাই অন্তরে আমি নগ্ন,
চিত্ত আমার ধুলায় মলিন,
আজ আমি পরব শুচিবস্ত্র তোমার হাতে—
আমার লজ্জা যাবে দূর হয়ে।'

শিষ্যেরা খুঁজতে খুঁজতে এল সেখানে,
ধিক্কার দিয়ে বললে, 'এ কী করলেন প্রভু!'
রামানন্দ বললেন, 'আমার ঠাকুরকে এতদিন যেখানে হারিয়েছিলুম
আজ তাঁকে সেখানে পেয়েছি খুঁজে।'
সূর্য উঠল আকাশে
আলো এসে পড়ল গুরুর আনন্দিত মুখে।

[অগ্রহায়ণ ১৩৩৯]

রঙরেজিনী

শঙ্করলাল দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত।
শাণিত তাঁর বুদ্ধি
শ্যেনপাখির চঞ্চুর মতো,
বিপক্ষের যুক্তির উপর পড়ে বিদ্যুদ্‌বেগে—
তার পক্ষ দেয় ছিন্ন করে,
ফেলে তাকে ধুলোয়।

রাজবাড়িতে নৈয়ায়িক এসেছে দ্রাবিড় থেকে।
বিচারে যার জয় হবে সে পাবে রাজার জয়পত্রী।
আহ্বান স্বীকার করেছেন শঙ্কর,
এমন সময় চোখে পড়ল পাগড়ি তাঁর মলিন।
গেলেন রঙরেজির ঘরে।

কুসুমফুলের খেত, মেহেদিবেড়ায় ঘেরা।
প্রান্তে থাকে জসীম রঙরেজি।
মেয়ে তার আমিনা, বয়স তার সতেরো।
সে গান গায় আর রঙ বাঁটে,
রঙের সঙ্গে রঙ মেলায়।
বেণীতে তার লাল সুতোর ঝালর,
চোলি তার বাদামি রঙের,
শাড়ি তার আশমানি।
বাপ কাপড় রাঙায়,
রঙের বাটি জুগিয়ে দেয় আমিনা।

শঙ্কর বললেন, জসীম,
পাগড়ি রাঙিয়ে দাও জাফরানি রঙে,
রাজসভায় ডাক পড়েছে।

কুল্ কুল্ করে জল আসে নালা বেয়ে কুসুমফুলের খেতে ;
আমিনা পাগড়ি ধুতে গেল নালার ধারে তুঁত গাছের ছায়ায় বসে
ফাগুনের রৌদ্র ঝলক দেয় জলে,
ঘুঘু ডাকে দূরের আমবাগানে।
ধোওয়ার কাজ হল, প্রহর গেল কেটে।
পাগড়ি যখন বিছিয়ে দিল ঘাসের 'পরে
রঙরেজিনী দেখল তারি কোণে
লেখা আছে একটি শ্লোকের একটি চরণ—
'তোমার শ্রীপদ মোর ললাটে বিরাজে'।

বসে বসে ভাবল অনেক ক্ষণ,
ঘুঘু ডাকতে লাগল আমের ডালে।
রঙিন সুতো ঘরের থেকে এনে
আরেক চরণ লিখে দিল—
'পরশ পাই নে তাই হৃদয়ের মাঝে'।

দুদিন গেল কেটে।
শঙ্কর এল রঙরেজির ঘরে।
শুধালো, পাগড়িতে কার হাতের লেখা?
জসীমের ভয় লাগল মনে।
সেলাম করে বললে, 'পণ্ডিতজি,
অবুঝ আমার মেয়ে,
মাপ করো ছেলেমানুষি।
চলে যাও রাজসভায়—
সেখানে এ লেখা কেউ দেখবে না, কেউ বুঝবে না।'
শঙ্কর আমিনার দিকে চেয়ে বললে,
'রংরেজিনী,
অহংকারের-পাকে-ঘেরা ললাট থেকে নামিয়ে এনেছ
শ্রীচরণের স্পর্শখানি হৃদয়তলে
তোমার হাতের রাঙা রেখার পথে।
রাজবাড়ির পথ আমার হারিয়ে গেল,
আর পাব না খুঁজে।'

২৫ অগ্রহায়ণ ১৩৩৯

মুক্তি

বাজিরাও পেশোয়ার অভিষেক হবে
কাল সকালে

কীর্তনী এসেছে গ্রামের থেকে,
মন্দিরে ছিল না তার স্থান।
সে বসেছে অঙ্গনের এক কোণে
পিপুল গাছের তলায়।
একতারা বাজায় আর কেবল সে ফিরে ফিরে বলে,
'ঠাকুর, তোমায় কে বসালো
কঠিন সোনার সিংহাসনে।'
রাত তখন দুই প্রহর,
শুক্লপক্ষের চাঁদ গেছে অস্তে।
দূরে রাজবাড়ির তোরণে
বাজছে শাঁখ শিঙে জগঝম্প,
জ্বলছে প্রদীপের মালা।

কীর্তনী গাইছে,
'তমালকুঞ্জে বনের পথে
শ্যামল ঘাসের কান্না এলেম শুনে,
ধুলোয় তারা ছিল যে কান পেতে,
পায়ের চিহ্ন বুকে পড়বে আঁকা
এই ছিল প্রত্যাশা।'

আরতি হয়ে গেছে সারা—
মন্দিরের দ্বার তখন বন্ধ,
ভিড়ের লোক গেছে রাজবাড়িতে।
কীর্তনী আপন মনে গাইছে,

‘প্রাণের ঠাকুর,
এরা কি পাথর গেঁথে তোমায় রাখবে বেঁধে।
তুমি যে স্বর্গ ছেড়ে নামলে ধুলোয়
তোমার পরশ আমার পরশ
মিলবে ব’লে।’

সেই পিপুল-তলার অন্ধকারে
একা একা গাইছিল কীর্তনী,
আর শুনছিল আরেকজনা গোপনে—
বাজিরাও পেশোয়া।
শুনছিল সে—
‘তুমি আমায় ডাক দিয়েছ আগল-দেওয়া ঘরের থেকে,
আমায় নিয়ে পথের পথিক হবে।
ঘুচবে তোমার নির্বাসনের ব্যথা,
ছাড়া পাবে হৃদয়-মাঝে।
থাক্ গে ওরা পাথরখানা নিয়ে
পাথরের বন্দীশালায়
অহংকারের-কাঁটার-বেড়া-ঘেরা।’

রাত্রি প্রভাত হল।
শুকতারা অরুণ-আলোয় উদাসী।
তোরণদ্বারে বাজল বাঁশি বিভাসে ললিতে।
অভিষেকের স্নান হবে,
পুরোহিত এল তীর্থবারি নিয়ে।

রাজবাড়ির ঠাকুরঘর শূন্য।
জ্বলছে দীপশিখা,
পূজার উপচার পড়ে আছে—
বাজিরাও পেশোয়া গেছে চলে
পথের পথিক হয়ে।

১৪ মাঘ ১৩৩৯

প্রেমের সোনা

রবিদাস চামার ঝাঁট দেয় ধুলো।
সজন রাজপথ বিজন তার কাছে,
পথিকেরা চলে তার স্পর্শ বাঁচিয়ে
গুরু রামানন্দ প্রাতঃস্নান সেরে
চলেছেন দেবালয়ের পথে,
দূর থেকে রবিদাস প্রণাম করল তাঁকে,
ধুলায় ঠেকালো মাথা।
রামানন্দ শুধালেন, 'বন্ধু, কে তুমি।'
উত্তর পেলেন, 'আমি শুক্‌নো ধুলো—
প্রভু, তুমি আকাশের মেঘ,
ঝরে যদি তোমার প্রেমের ধারা
গান গেয়ে উঠবে বোবা ধুলো
রঙবেরঙের ফুলে।'
রামানন্দ নিলেন তাকে বুকে,
দিলেন তাকে প্রেম।
রবিদাসের প্রাণের কুঞ্জবনে
লাগল যেন গীতবসন্তের হাওয়া

চিতোরের রানী, ঝালি তাঁর নাম।
গান পৌঁছল কানে,
তাঁর মন করে দিল উদাস!
ঘরের কাজে মাঝে মাঝে
দু চোখ দিয়ে জল পড়ে ঝ'রে।
মান গেল তাঁর কোথায় ভেসে।
রবিদাস চামারের কাছে
হরিপ্রেমের দীক্ষা নিলেন রাজরানী

স্মৃতিশিরোমণি
রাজকুলের বৃদ্ধ পুরোহিত,
বললে, 'ধিক্ মহারানী, ধিক্।
জাতিতে অন্ত্যজ রবিদাস,
ফেরে পথে পথে, ঝাঁট দেয় ধুলো,
তাকে তুমি প্রণাম করলে গুরু ব'লে—
ব্রাহ্মণের হেঁট হল মাথা
এ রাজ্যে তোমার।'

রানী বললেন, 'ঠাকুর, শোনো তবে,
আচারের হাজার গ্রন্থি
দিনরাত্রি বাঁধ কেবল শক্ত করে—
প্রেমের সোনা কখন পড়ল খসে
জানতে পার নি তা।
আমার ধুলোমাখা গুরু
ধুলোর থেকে কুড়িয়ে পেয়েছে।
অর্থহারা বাঁধনগুলোর গর্বে, ঠাকুর,
থাকো তুমি কঠিন হয়ে।
আমি সোনার কাঙালিনী
ধুলোর সে দান নিলেম মাথায় করে।

[মাঘ ১৩৩৯]

স্নান সমাপন

গুরু রামানন্দ স্তব্ধ দাঁড়িয়ে
গঙ্গার জলে পূর্বমুখে।
তখন জলে লেগেছে সোনার কাঠির ছোঁওয়া,
ভোরের হাওয়ায় স্রোত উঠছে ছল্‌ছল্‌ করে

রামানন্দ তাকিয়ে আছেন
জবাকুসুমসঙ্কাশ সূর্যোদয়ের দিকে।
মনে মনে বলছেন,
'হে দেব, তোমার যে কল্যাণতম রূপ
সে তো আমার অন্তরে প্রকাশ পেল না।
ঘোচাও তোমার আবরণ।'

সূর্য উঠল শালবনের মাথার উপর।
জেলেরা নৌকায় পাল দিলে তুলে,
বকের পাঁতি উড়ে চলেছে সোনার আকাশ বেয়ে
ও পারে জলার দিকে।
এখনো স্নান হল না সারা।
শিষ্য শুধালো, 'বিলম্ব কেন প্রভু,
পূজার সময় যায় বয়ে।'
রামানন্দ উত্তর করলেন,
'শুচি হয় নি তনু,
গঙ্গা রইলেন আমার হৃদয় থেকে দূরে।'
শিষ্য বসে ভাবে, এ কেমন কথা।

সর্ষেখেতে রৌদ্র ছড়িয়ে গেল।
মালিনী খুলেছে ফুলের পসরা পথের ধারে,
গোয়ালিনী যায় দুধের কলস মাথায় নিয়ে।
গুরুর কী হল মনে,
উঠলেন জল ছেড়ে।
চললেন বনঝাউ ভেঙে
গাঙশালিকের কোলাহলের মধ্য দিয়ে।
শিষ্য শুধালো, 'কোথায় যাও প্রভু,
ও দিকে তো নেই ভদ্রপাড়া।'
গুরু বললেন, 'চলেছি স্নানসমাপনের পথে।'

বালুচরের প্রান্তে গ্রাম।
গলির মধ্যে প্রবেশ করলেন গুরু।
সেখানে তেঁতুল গাছের ঘন ছায়া,
শাখায় শাখায় বানরদলের লাফালাফি।
গলি পৌঁছয় ভাজন মুচির ঘরে।
পশুর চামড়ার গন্ধ আসছে দূর থেকে।
আকাশে চিল উড়ছে পাক দিয়ে,
রোগা কুকুর হাড় চিবোচ্ছে পথের পাশে।
শিষ্য বললেন, 'রাম! রাম!'
ভ্রূকুটি করে দাঁড়িয়ে রইল গ্রামের বাইরে।

ভাজন লুটিয়ে পড়ে গুরুকে প্রণাম করলে
সাবধানে।
গুরু তাকে বুকে নিলেন তুলে।
ভাজন ব্যস্ত হয়ে উঠল,
'কী করলেন প্রভু,
অধমের ঘরে মলিনের গ্লানি লাগল পুণ্যদেহে।'
রামানন্দ বললেন,
'স্নানে গেলেম তোমার পাড়া দূরে রেখে,
তাই যিনি সবাইকে দেন ধৌত করে
তাঁর সঙ্গে মনের মিল হল না।
এতক্ষণে তোমার দেহে আমার দেহে
বইল সে বিশ্বপাবনধারা।
ভগবান সূর্যকে আজ প্রণাম করতে গিয়ে প্রণাম বেধে গেল।
বললেম, হে দেব, তোমার মধ্যে যে জ্যোতি আমার মধ্যেও তিনি,
তবু আজ দেখা হল না কেন।
এতক্ষণে মিলল তাঁর দর্শন
তোমার ললাটে আর আমার ললাটে—
মন্দিরে আর হবে না যেতে।'

১৫ ফাল্গুন ১৩৩৯

প্রথম পূজা

ত্রিলোকেশ্বরের মন্দির।
লোকে বলে স্বয়ং বিশ্বকর্মা তার ভিত-পত্তন করেছিলেন
কোন্ মান্ধাতার আমলে,
স্বয়ং হনুমান এনেছিলেন তার পাথর বহন করে।
ইতিহাসের পণ্ডিত বলেন, এ মন্দির কিরাত জাতের গড়া,
এ দেবতা কিরাতের।
একদা যখন ক্ষত্রিয় রাজা জয় করলেন দেশ
দেউলের আঙিনা পূজারিদের রক্তে গেল ভেসে,
দেবতা রক্ষা পেলেন নতুন নামে নতুন পূজাবিধির আড়ালে—
হাজার বৎসরের প্রাচীন ভক্তিধারার স্রোত গেল ফিরে।
কিরাত আজ অস্পৃশ্য, এ মন্দিরে তার প্রবেশপথ লুপ্ত।

কিরাত থাকে সমজের বাইরে,
নদীর পূর্বপারে তার পাড়া।
সে ভক্ত, আজ তার মন্দির নেই, তার গান আছে।
নিপুণ তার হাত, অভ্রান্ত তার দৃষ্টি।
সে জানে কী ক'রে পাথরের উপর পাথর বাঁধে,
কী করে পিতলের উপর রুপোর ফুল তোলা যায়—
কৃষ্ণশিলায় মূর্তি গড়বার ছন্দটা কী।
রাজশাসন তার নয় অস্ত্র তার নিয়েছে কেড়ে,
বেশে বাসে ব্যবহারে সম্মানের চিহ্ন হতে সে বর্জিত,
বঞ্চিত সে পুঁথির বিদ্যায়।
ত্রিলোকেশ্বর মন্দিরের স্বর্ণচূড়া পশ্চিম দিগন্তে যায় দেখা,
চিনতে পারে নিজেদেরই মনের আকল্প,
বহু দূরের থেকে প্রণাম করে।

কার্তিক পূর্ণিমা, পূজার উৎসব।

মঞ্চের উপরে বাজছে বাঁশি মৃদঙ্গ করতাল,
মাঠ জুড়ে কানাতের পর কানাত,
মাঝে মাঝে উঠেছে ধ্বজা।
পথের দুই ধারে ব্যাপারীদের পসরা—
তামার পাত্র, রুপোর অলংকার, দেবমূর্তির পট, রেশমের কাপড়;
ছেলেদের খেলার জন্যে কাঠের ডমরু, মাটির পুতুল, পাতার বাঁশি;
অর্ঘ্যের উপকরণ, ফল মালা ধূপ বাতি, ঘড়া ঘড়া তীর্থবারি।
বাজিকর তারস্বরে প্রলাপবাক্যে দেখাচ্ছে বাজি,
কথক পড়ছে রামায়ণকথা।
উজ্জ্বলবেশে সশস্ত্র প্রহরী ঘুরে বেড়ায় ঘোড়ায় চড়ে;
রাজ-অমাত্য হাতির উপর হাওদায়,
সম্মুখে বেজে চলেছে শিঙা।
কিংখাবে ঢাকা পাল্কিতে ধনীঘরের গৃহিণী,
আগে পিছে কিংকরের দল।
সন্ন্যাসীর ভিড় পঞ্চবটের তলায়,
নগ্ন, জটাধারী, ছাইমাখা;
মেয়েরা পায়ের কাছে ভোগ রেখে যায়—
ফল, দুধ, মিষ্টান্ন, ঘি, আতপ তণ্ডুল।

থেকে থেকে আকাশে উঠছে চীৎকারধ্বনি,
জয় ত্রিলোকেশ্বরের জয়।
কাল আসবে শুভলগ্নে রাজার প্রথম পূজা,
স্বয়ং আসবেন মহারাজা রাজহস্তীতে চড়ে।
তাঁর আগমন-পথের দুই ধারে
সারি সারি কলার গাছে ফুলের মালা,
মঙ্গলঘটে আম্রপল্লব।
আর ক্ষণে ক্ষণে পথের ধুলায় সেচন করছে গন্ধবারি।

শুক্লত্রয়োদশীর রাত।
মন্দিরে প্রথম প্রহরের শঙ্খ ঘণ্টা ভেরী পটহ থেমেছে।

আজ চাঁদের উপরে একটা ঘোলা আবরণ,
জ্যোৎস্না আজ ঝাপসা—
যেন মূর্ছার ঘোর লাগল।
বাতাস রুদ্ধ—
ধোঁয়া জমে আছে আকাশে,
গাছপালাগুলো যেন শঙ্কায় আড়ষ্ট।
কুকুর অকারণে আর্তনাদ করছে,
ঘোড়াগুলো কান খাড়া করে উঠছে ডেকে
কোন্ অলক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে।
হঠাৎ গম্ভীর ভীষণ শব্দ শোনা গেল মাটির নীচে—
পাতালে দানবেরা যেন রণদামামা বাজিয়ে দিলে—
গুরু-গুরু গুরু-গুরু।
মন্দিরে শঙ্খ ঘণ্টা বাজতে লাগল প্রবল শব্দে।
হাতি বাঁধা ছিল,
তারা বন্ধন ছিঁড়ে গর্জন করতে করতে
ছুটল চার দিকে
যেন ঘূর্ণি-ঝড়ের মেঘ।
তুফান উঠল মাটিতে—
ছুটল উট মহিষ গরু ছাগল ভেড়া
ঊর্ধ্বশ্বাসে, পালে পালে।
হাজার হাজার দিশাহারা লোক
আর্তস্বরে ছুটে বেড়ায়—
চোখে তাদের ধাঁধা লাগে,
আত্মপরের ভেদ হারিয়ে কে কাকে দেয় দ'লে।
মাটি ফেটে ফেটে ওঠে ধোঁয়া, ওঠে গরম জল—
ভীম-সরোবরের দিঘি বালির নীচে গেল শুষে।
মন্দিরের চূড়ায় বাঁধা বড়ো ঘণ্টা দুলতে দুলতে
বাজতে লাগল ঢং ঢং।
আচম্কা ধ্বনি থামল একটা ভেঙে-পড়ার শব্দে।

পৃথিবী যখন স্তব্ধ হল
পূর্ণপ্রায় চাঁদ তখন হেলেছে পশ্চিমের দিকে।
আকাশে উঠছে জ্বলে-ওঠা কানাতগুলোর ধোঁয়ার কুণ্ডলী,
জ্যোৎস্নাকে যেন অজগর সাপে জড়িয়েছে।

পরদিন আত্মীয়দের বিলাপে দিগ্‌বিদিক যখন শোকার্ত
তখন রাজসৈনিকদল মন্দির ঘিরে দাঁড়ালো,
পাছে অশুচিতার কারণ ঘটে।
রাজমন্ত্রী এল, দৈবজ্ঞ এল, স্মার্ত পণ্ডিত এল।
দেখলে বাহিরের প্রাচীর ধূলিসাৎ।
দেবতার বেদির উপরের ছাদ পড়েছে ভেঙে।
পণ্ডিত বললে সংস্কার করা চাই আগামী পূর্ণিমার পূর্বেই,
নইলে দেবতা পরিহার করবেন তাঁর মূর্তিকে।
রাজা বললেন, 'সংস্কার করো।'
মন্ত্রী বললেন, 'ওই কিরাতরা ছাড়া কে করবে পাথরের কাজ।
ওদের দৃষ্টিকলুষ থেকে দেবতাকে রক্ষা করব কী উপায়ে,
কী হবে মন্দিরসংস্কারে যদি মলিন হয় দেবতার অঙ্গমহিমা।'
কিরাত-দলপতি মাধবকে রাজা আনলেন ডেকে।
বৃদ্ধ মাধব, শুক্লকেশের উপর নির্মল সাদা চাদর জড়ানো—
পরিধানে পীতধড়া, তাম্রবর্ণ দেহ কটি পর্যন্ত অনাবৃত,
দুই চক্ষু সকরুণ নম্রতায় পূর্ণ।
সাবধানে রাজার পায়ের কাছে রাখলে একমুঠো কুন্দফুল,
প্রণাম করলে স্পর্শ বাঁচিয়ে।
রাজা বললেন, 'তোমরা না হলে দেবালয়-সংস্কার হয় না।'
'আমাদের 'পরে দেবতার ঐ কৃপা'
এই ব'লে দেবতার উদ্দেশে মাধব প্রণাম জানালে।
নৃপতি নৃসিংহরায় বললেন, 'চোখ বেঁধে কাজ করা চাই,
দেবমূর্তির উপর দৃষ্টি না পড়ে। পারবে?'
মাধব বললে, 'অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে কাজ করিয়ে নেবেন অন্তর্যামী।
যতক্ষণ কাজ চলবে, চোখ খুলব না।'

বাহিরের কাজ করে কিরাতের দল,
মন্দিরের ভিতরে কাজ করে মাধব,
তার দুই চক্ষু পাকে পাকে কালো কাপড়ে বাঁধা।
দিনরাত সে মন্দিরের বাহিরে যায় না—
ধ্যান করে, গান গায়, আর তার আঙুল চলতে থাকে।
মন্ত্রী এসে বলে, 'ত্বরা করো, ত্বরা করো—
তিথির পরে তিথি যায়, কবে লগ্ন হবে উত্তীর্ণ।'
মাধব জোড়হাতে বলে, 'যাঁর কাজ তাঁরই নিজের আছে ত্বরা,
আমি তো উপলক্ষ্য।'

অমাবস্যা পার হয়ে শুক্লপক্ষ এল আবার।
অন্ধ মাধব আঙুলের স্পর্শ দিয়ে পাথরের সঙ্গে কথা কয়,
পাথর তার সাড়া দিতে থাকে।
কাছে দাঁড়িয়ে থাকে প্রহরী
পাছে মাধব চোখের বাঁধন খোলে।
পণ্ডিত এসে বললে, 'একাদশীর রাত্রে প্রথম পূজার শুভক্ষণ।
কাজ কি শেষ হবে তার পূর্বে।'
মাধব প্রণাম করে বললে, 'আমি কে যে উত্তর দেব।
কৃপা যখন হবে সংবাদ পাঠাব যথাসময়ে,
তার আগে এলে ব্যাঘাত হবে, বিলম্ব ঘটবে।'

ষষ্ঠী গেল, সপ্তমী পেরোল—
মন্দিরের দ্বার দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়ে
মাধবের শুক্লকেশে।
সূর্য অস্ত গেল। পাণ্ডুর আকাশে একাদশীর চাঁদ।
মাধব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে,
'যাও প্রহরী, সংবাদ দিয়ে এসো গে
মাধবের কাজ শেষ হল আজ।
লগ্ন যেন বয়ে না যায়।'

প্রহরী গেল।
মাধব খুলে ফেললে চোখের বন্ধন।
মুক্ত দ্বার দিয়ে পড়েছে একাদশী-চাঁদের পূর্ণ আলো
দেবমূর্তির উপরে।
মাধব হাঁটু গেড়ে বসল দুই হাত জোড় করে
একদৃষ্টে চেয়ে রইল দেবতার মুখে,
দুই চোখে বইল জলের ধারা।
আজ হাজার বছরের ক্ষুধিত দেখা দেবতার সঙ্গে ভক্তের।

রাজা প্রবেশ করলেন মন্দিরে।
তখন মাধবের মাথা নত বেদীমূলে।
রাজার তলোয়ারে মুহূর্তে ছিন্ন হল সেই মাথা।
দেবতার পায়ে এই প্রথম পূজা, এই শেষ প্রণাম।

শান্তিনিকেতন
২৮ শ্রাবণ ১৩৩৯

অস্থানে

একই লতাবিতান বেয়ে চামেলি আর মধুমঞ্জরী
দশটি বছর কাটিয়েছে গায়ে গায়ে,
রোজ সকালে সূর্য-আলোর ভোজে
পাতাগুলি মেলে বলেছে
'এই তো এসেছি'।
অধিকারের দ্বন্দ্ব ছিল ডালে ডালে দুই শরিকে,
তবু তাদের প্রাণের আনন্দে
রেষারেষির দাগ পড়ে নি কিছু।

কখন যে কোন্ কুলগ্নে ঐ
সংশয়হীন অবোধ চামেলি

কোমল সবুজ ডাল মেলে দিল
বিজ্‌লিবাতির লোহার তারে তারে,
বুঝতে পারে নি যে ওরা জাত আলাদা।
শ্রাবণ মাসের অবসানে আকাশকোণে
সাদা মেঘের গুচ্ছগুলি
নেমে নেমে পড়েছিল শালের বনে,
সেই সময়ে সোনায় রাঙা স্বচ্ছ সকালে
চামেলি মেতেছিল অজস্র ফুলের গৌরবে।
কোথাও কিছু বিরোধ ছিল না,
মৌমাছিদের আনাগোনায়
উঠত কেঁপে শিউলিতলার ছায়া।
ঘুঘুর ডাকে দুই প্রহরে
বেলা হত আলস্যে শিথিল।

সেই ভরা শরতের দিনে সূর্য-ডোবার সময়
মেঘে মেঘে লাগল যখন নানা রঙের খেয়াল,
সেই বেলাতে কখন এল
বিজ্‌লিবাতির অনুচরের দল।
চোখ রাঙালো চামেলিটার স্পর্ধা দেখে—
শুষ্ক শূন্য আধুনিকের রূঢ় প্রয়োজনের 'পরে
নিত্যকালের লীলামধুর নিষ্প্রয়োজন অনধিকার
হাত বাড়ালো কেন।
তীক্ষ্ণ কুটিল আঁক্‌শি দিয়ে
টেনে টেনে ছিনিয়ে ছিঁড়ে নিল
কচি কচি ডালগুলি সব ফুলে-ভরা।
এত দিনে বুঝল হঠাৎ অবোধ চামেলিটা
মৃত্যু-আঘাত বক্ষে নিয়ে,
বিজ্‌লিবাতির তারগুলো ঐ জাত আলাদা।

২৩ ভাদ্র ১৩৩৯

ঘরছাড়া

এল সে জর্মনির থেকে
এই অচেনার মাঝখানে,
ঝড়ের মুখে নৌকো নোঙর-ছেঁড়া
ঠেকল এসে দেশান্তরে।
পকেটে নেই টাকা,
উদ্‌বেগ নেই মনে,
দিন চলে যায় দিনের কাজে
অল্পস্বল্প নিয়ে।
যেমন-তেমন থাকে
অন্য দেশের সহজ চালে।
নেই ন্যূনতা, গুমর কিছুই নেই—
মাথা-উঁচু
দ্রুত পায়ের চাল।
একটুও নেই অকিঞ্চনের অবসাদ।
দিনের প্রতি মুহূর্তকে
জয় করে সে আপন জোরে,
পথের মধ্যে ফেলে দিয়ে যায় সে চলে,
চায় না পিছন ফিরে—
রাখে না তার এক কণাও বাকি।
খেলাধুলা হাসিগল্প যা হয় যেখানে
তারি মধ্যে জায়গা সে নেয়
সহজ মানুষ।
কোথাও কিছু ঠেকে না তার
একটুকুও অনভ্যাসের বাধা।
একলা বটে তবুও তো
একলা সে নয়।
প্রবাসে তার দিনগুলো সব
হুহু করে কাটিয়ে দিচ্ছে হাল্কা মনে।

ওকে দেখে অবাক হয়ে থাকি,
সব মানুষের মধ্যে মানুষ
অভয় অসংকোচ—
তার বাড়া ওর নেই তো পরিচয়

দেশের মানুষ এসেছে তার আরেক জনা।
ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে
যা-খুশি তাই ছবি এঁকে এঁকে
যেখানে তার খুশি।
সে ছবি কেউ দেখে কিম্বা না'ই দেখে
ভালো বলে না'ই বলে—
খেয়াল কিছুই নেই।
দুইজনেতে পাশাপাশি
কাঁকর-ঢালা পথ দিয়ে ঐ
যাচ্ছে চলে
দুই টুকরো শরৎকালের মেঘ।
নয় ওরা তো শিকড়-বাঁধা গাছের মতো,
ওরা মানুষ—
ছুটি ওদের সকল দেশে সকল কালে
কর্ম ওদের সবখানে,
নিবাস ওদের সব মানুষের মাঝে।
মন যে ওদের স্রোতের মতো
সব কিছুরেই ভাসিয়ে চলে—
কোনোখানেই আটকা পড়ে না সে।
সব মানুষের ভিতর দিয়ে
আনাগোনার বড়ো রাস্তা তৈরি হবে,
এরাই আছে সেই রাস্তার কাজে
এই যত-সব ঘরছাড়াদের দল

১৭ ভাদ্র ১৩৩৯

ছুটির আয়োজন

কাছে এল পুজোর ছুটি।
রোদ্দুরে লেগেছে চাঁপাফুলের রঙ।
হাওয়া উঠছে শিশিরে শিরশিরিয়ে,
শিউলির গন্ধ এসে লাগে
যেন কার ঠাণ্ডা হাতের কোমল সেবা।
আকাশের কোণে কোণে
সাদা মেঘের আলস্য,
দেখে মন লাগে না কাজে।

মাস্টারমশায় পড়িয়ে চলেন
পাথুরে কয়লার আদিম কথা,
ছেলেটা বেঞ্চিতে পা দোলায়,
ছবি দেখে আপন মনে—
কমলদিঘির ফাটল-ধরা ঘাট
আর ভঞ্জদের পাঁচিল-ঘেঁষা
আতাগাছের ফলে-ভরা ডাল।
আর দেখে সে মনে মনে তিসির খেতে
গোয়ালপাড়ার ভিতর দিয়ে
রাস্তা গেছে এঁকেবেঁকে হাটের পাশে
নদীর ধারে।

কলেজের ইকনমিক্স্‌-ক্লাসে
খাতায় ফর্দ নিচ্ছে টুকে
চশমা-চোখে মেডেল-পাওয়া ছাত্র—
হালের লেখা কোন্‌ উপন্যাস কিনতে হবে,
ধারে মিলবে কোন্‌ দোকানে
'মনে-রেখো' পাড়ের শাড়ি,
সোনায় জড়ানো শাঁখা,

দিল্লির-কাজ-করা লাল মখমলের চটি
আর চাই রেশমে-বাঁধাই-করা
অ্যান্টিক কাগজে ছাপা কবিতার বই,
এখনো তার নাম মনে পড়ছে না।

ভবানীপুরের তেতালা বাড়িতে
আলাপ চলছে সরু মোটা গলায়—
এবার আবু পাহাড় না মাহুরা
না ড্যাল্‌হৌসি কিম্বা পুরী
না সেই চিরকেলে চেনা লোকের দার্জিলিঙ।

আর দেখছি সামনে দিয়ে
স্টেশনে যাবার রাঙা রাস্তায়
শহরের-দাদন-দেওয়া দড়িবাঁধা ছাগল-ছানা
পাঁচটা ছটা ক'রে।
তাদের নিষ্ফল কান্নার স্বর ছড়িয়ে পড়ে
কাশের-ঝালর-দোলা শরতের শান্ত আকাশে।
কেমন ক'রে বুঝেছে তারা
এল তাদের পূজার ছুটির দিন।

১৭ ভাদ্র ১৩৩৯

মৃত্যু

মরণের ছবি মনে আনি।
ভেবে দেখি শেষ দিন ঠেকেছে শেষের শীর্ণক্ষণে।
আছে ব'লে যত কিছু
রয়েছে দেশে কালে—
যত বস্তু, যত জীব, যত ইচ্ছা, যত চেষ্টা,
যত আশানৈরাশ্যের ঘাতপ্রতিঘাত
দেশে দেশে ঘরে ঘরে চিত্তে চিত্তে,

যত গ্রহনক্ষত্রের
দূর হতে দূরতর ঘূর্ণ্যমান স্তরে স্তরে
অগণিত অজ্ঞাত শক্তির
আলোড়ন আবর্তন
মহাকালসমুদ্রের কূলহীন বক্ষতলে,
সমস্তই আমার এ চৈতন্যের
শেষ সূক্ষ্ম আকম্পিত রেখার এ ধারে।
এক পা তখনো আছে সে প্রান্তসীমায়,
অন্য পা আমার
বাড়িয়েছি রেখার ও ধারে,
সেখানে অপেক্ষা করে অলক্ষিত ভবিষ্যৎ
লয়ে দিনরজনীর অন্তহীন অক্ষমালা
আলো-অন্ধকারে-গাঁথা।
অসীমের অসংখ্য যা-কিছু
সত্তায় সত্তায় গাঁথা
প্রসারিত অতীতে ও অনাগতে।
নিবিড় সে সমস্তের মাঝে
অকস্মাৎ আমি নেই।
এ কি সত্য হতে পারে।
উদ্ধত এ নাস্তিত্ব যে পাবে স্থান
এমন কি অণুমাত্র ছিদ্র আছে কোনোখানে।
সে ছিদ্র কি এতদিনে
ডুবাতো না নিখিলতরণী
মৃত্যু যদি শূন্য হত,
যদি হত মহাসমগ্রের
রূঢ় প্রতিবাদ।

২৬ ভাদ্র ১৩৩৯

মানবপুত্র

মৃত্যুর পাত্রে খৃস্ট যেদিন মৃত্যুহীন প্রাণ উৎসর্গ করলেন
রবাহূত অনাহূতের জন্যে
তার পরে কেটে গেছে বহু শত বৎসর।
আজ তিনি একবার নেমে এলেন নিত্যধাম থেকে মর্তধামে।
চেয়ে দেখলেন,
সেকালেও মানুষ ক্ষতবিক্ষত হত যে-সমস্ত পাপের মারে—
যে উদ্ধত শেল ও শল্য, যে চতুর ছোরা ও ছুরি,
যে ক্রূর কুটিল তলোয়ারের আঘাতে—
বিদ্যুদ্‌বেগে আজ তাদের ফলায় শান দেওয়া হচ্ছে
হিস্‌হিস্‌ শব্দে স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে
বড়ো বড়ো মসীধূমকেতন কারখানাঘরে।

কিন্তু দারুণতম যে মৃত্যুবাণ নূতন তৈরি হল,
ঝক্‌ঝক্‌ করে উঠল নরঘাতকের হাতে,
পূজারি তাতে লাগিয়েছে তাঁরই নামের ছাপ
তীক্ষ্ণ নখে আঁচড় দিয়ে।
খৃস্ট বুকে হাত চেপে ধরলেন;
বুঝলেন শেষ হয় নি তাঁর নিরবচ্ছিন্ন মৃত্যুর মুহূর্ত,
নূতন শূল তৈরি হচ্ছে বিজ্ঞানশালায়—
বিঁধছে তাঁর গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে।
সেদিন তাঁকে মেরেছিল যারা
ধর্মমন্দিরের ছায়ায় দাঁড়িয়ে,
তারাই আজ নূতন জন্ম নিল দলে দলে,
তারাই আজ ধর্মমন্দিরের বেদির সামনে থেকে
পূজামন্ত্রের সুরে ডাকছে ঘাতক সৈন্যকে—
বলছে 'মারো মারো'।
মানবপুত্র যন্ত্রণায় বলে উঠলেন ঊর্ধ্বে চেয়ে,
'হে ঈশ্বর, হে মানুষের ঈশ্বর,
কেন আমাকে ত্যাগ করলে।'

[শ্রাবণ ১৩৩৯]

শিশুতীর্থ

রাত কত হল?
উত্তর মেলে না।
কেননা, অন্ধ কাল যুগ-যুগান্তরের গোলকধাঁধায় ঘোরে, পথ অজানা,
পথের শেষ কোথায় খেয়াল নেই।
পাহাড়তলিতে অন্ধকার মৃত রাক্ষসের চক্ষুকোটরের মতো;
স্তূপে স্তূপে মেঘ আকাশের বুক চেপে ধরেছে;
পুঞ্জ পুঞ্জ কালিমা গুহায় গর্তে সংলগ্ন,
মনে হয় নিশীথরাত্রের ছিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ;
দিগন্তে একটা আগ্নেয় উগ্রতা
ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে আর নেভে—
ও কি কোনো অজানা দুষ্টগ্রহের চোখ-রাঙানি।
ও কি কোনো অনাদি ক্ষুধার লেলিহ লোল জিহ্বা।
বিক্ষিপ্ত বস্তুগুলো যেন বিকারের প্রলাপ,
অসম্পূর্ণ জীবলীলার ধূলিবিলীন উচ্ছিষ্ট;
তারা অমিতাচারী দৃপ্ত প্রতাপের ভগ্ন তোরণ,
লুপ্ত নদীর বিস্মৃতিবিলগ্ন জীর্ণ সেতু,
দেবতাহীন দেউলের সর্পবিবরছিদ্রিত বেদি,
অসমাপ্ত দীর্ণ সোপানপংক্তি শূন্যতায় অবসিত।
অকস্মাৎ উচ্চণ্ড কলরব আকাশে আবর্তিত আলোড়িত হতে থাকে—
ও কি বন্দী বন্যাবারির গুহাবিদারণের রলরোল।
ও কি ঘূর্ণ্যতাণ্ডবী উন্মাদ সাধকের রুদ্রমন্ত্র-উচ্চারণ।
ও কি দাবাগ্নিবেষ্টিত মহারণ্যের আত্মঘাতী প্রলয়নিনাদ।
এই ভীষণ কোলাহলের তলে তলে একটা অস্ফুট ধ্বনিধারা বিসর্পিত—
যেন অগ্নিগিরিনিঃসৃত গদগদকলমুখর পঙ্কস্রোত;
তাতে একত্রে মিলেছে পরশ্রীকাতরের কানাকানি, কুৎসিত জনশ্রুতি,
অবজ্ঞার কর্কশহাস্য।
সেখানে মানুষগুলো সব ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মতো
ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে—

মশালের আলোয় ছায়ায় তাদের মুখে
বিভীষিকার উল্কি পরানো।
কোনো এক সময়ে অকারণ সন্দেহে কোনো-এক পাগল
তার প্রতিবেশীকে হঠাৎ মারে ;
দেখতে দেখতে নির্বিচার বিবাদ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে দিকে দিকে।
কোনো নারী আর্তস্বরে বিলাপ করে ;
বলে, হায়, হায়, আমাদের দিশাহারা সন্তান উচ্ছন্ন গেল।
কোনো কামিনী যৌবনমদবিলসিত নগ্ন দেহে অট্টহাস্য করে ;
বলে, কিছুতে কিছু আসে যায় না।

২

ঊর্ধ্বে গিরিচূড়ায় বসে আছে ভক্ত, তুষারশুভ্র নীরবতার মধ্যে ;
আকাশে তার নিদ্রাহীন চক্ষু খোঁজে আলোকের ইঙ্গিত।
মেঘ যখন ঘনীভূত, নিশাচর পাখি চীৎকারশব্দে যখন উড়ে যায়,
সে বলে, ভয় নেই ভাই, মানবকে মহান্ বলে জেনো।
ওরা শোনে না, বলে পশুশক্তিই আদ্যাশক্তি, বলে পশুই শাশ্বত ;
বলে সাধুতা তলে তলে আত্মপ্রবঞ্চক।
যখন ওরা আঘাত পায় বিলাপ ক'রে বলে, ভাই, তুমি কোথায়।
উত্তরে শুনতে পায়, আমি তোমার পাশেই।
অন্ধকারে দেখতে পায় না, তর্ক করে— এ বাণী ভয়ার্তের মায়াসৃষ্টি,
আত্মসান্ত্বনার বিড়ম্বনা।
বলে, মানুষ চিরদিন কেবল সংগ্রাম করবে
মরীচিকার অধিকার নিয়ে
হিংসাকণ্টকিত অন্তহীন মরুভূমির মধ্যে।

৩

মেঘ সরে গেল।
শুকতারা দেখা দিল পূর্বদিগন্তে,
পৃথিবীর বক্ষ থেকে উঠল আরামের দীর্ঘনিশ্বাস,
পল্লবমর্মর বনপথে-পথে হিল্লোলিত,
পাখি ডাক দিল শাখায়-শাখায়।

ভক্ত বললে, সময় এসেছে।
কিসের সময় ?
যাত্রার।
ওরা বসে ভাবলে।
অর্থ বুঝলে না, আপন আপন মনের মতো অর্থ বানিয়ে নিলে।
ভোরের স্পর্শ নামল মাটির গভীরে,
বিশ্বসত্তার শিকড়ে শিকড়ে কেঁপে উঠল প্রাণের চাঞ্চল্য।
কে জানে কোথা হতে একটি অতি সূক্ষ্মস্বর
সবার কানে কানে বললে,
চলো সার্থকতার তীর্থে।
এই বাণী জনতার কণ্ঠে কণ্ঠে
একটি মহৎ প্রেরণায় বেগবান হয়ে উঠল।
পুরুষেরা উপরের দিকে চোখ তুললে,
জোড় হাত মাথায় ঠেকালে মেয়েরা।
শিশুরা করতালি দিয়ে হেসে উঠল।
প্রভাতের প্রথম আলো ভক্তের মাথায় সোনার রঙের চন্দন পরালে ;
সবাই বলে উঠল, ভাই, আমরা তোমার বন্দনা করি।

৪

যাত্রীরা চারি দিক থেকে বেরিয়ে পড়ল—
সমুদ্র পেরিয়ে, পর্বত ডিঙিয়ে, পথহীন প্রান্তর উত্তীর্ণ হয়ে—
এল নীলনদীর দেশ থেকে, গঙ্গার তীর থেকে,
তিব্বতের হিমমজ্জিত অধিত্যকা থেকে,
প্রাকাররক্ষিত নগরের সিংহদ্বার দিয়ে,
লতাজালজটিল অরণ্যে পথ কেটে।
কেউ আসে পায়ে হেঁটে, কেউ উটে, কেউ ঘোড়ায়, কেউ হাতিতে,
কেউ রথে চীনাংশুকের পতাকা উড়িয়ে।
নানা ধর্মের পূজারি চলল ধূপ জ্বালিয়ে, মন্ত্র প'ড়ে।
রাজা চলল, অনুচরদের বর্শাফলক রৌদ্রে দীপ্যমান,
ভেরী বাজে গুরু গুরু মেঘমন্দ্রে।

ভিক্ষু আসে ছিন্ন কন্থা প'রে,
আর রাজ-অমাত্যের দল স্বর্ণলাঞ্ছনখচিত উজ্জ্বল বেশে।
জ্ঞানগরিমা ও বয়সের ভারে মন্থর অধ্যাপককে ঠেলে দিয়ে চলে
চটুলগতি বিদ্যার্থী যুবক।
মেয়েরা চলেছে কলহাস্যে, কত মাতা, কুমারী, কত বধূ;
থালায় তাদের শ্বেতচন্দন, ঝারিতে গন্ধসলিল।
বেশ্যাও চলেছে সেই সঙ্গে; তীক্ষ্ণ তাদের কণ্ঠস্বর,
অতিপ্রকট তাদের প্রসাধন।
চলেছে পঙ্গু, খঞ্জ, অন্ধ, আতুর,
আর সাধুবেশী ধর্মব্যবসায়ী—
দেবতাকে হাটে হাটে বিক্রয় করা যাদের জীবিকা।
সার্থকতা!
স্পষ্ট ক'রে কিছু বলে না— কেবল নিজের লোভকে
মহৎ নাম ও বৃহৎ মূল্য দিয়ে ওই শব্দটার ব্যাখ্যা করে,
আর শান্তিশঙ্কাহীন চৌর্যবৃত্তির অনন্ত সুযোগ ও আপন মলিন
ক্লিন্ন দেহমাংসের অক্লান্ত লোলুপতা দিয়ে কল্পস্বর্গ রচনা করে।

৫

দয়াহীন দুর্গম পথ উপলখণ্ডে আকীর্ণ।
ভক্ত চলেছে, তার পশ্চাতে বলিষ্ঠ এবং শীর্ণ,
তরুণ এবং জরাজর্জর, পৃথিবী শাসন করে যারা
আর যারা অর্ধাশনের মূল্যে মাটি চাষ করে।
কেউ বা ক্লান্ত বিক্ষতচরণ, কারো মনে ক্রোধ, কারো মনে সন্দেহ
তারা প্রতি পদক্ষেপ গণনা করে আর শুধায়, কত পথ বাকি।
তার উত্তরে ভক্ত শুধু গান গায়।
শুনে তাদের ভ্রূ কুটিল হয়, কিন্তু ফিরতে পারে না,
চলমান জনপিণ্ডের বেগ এবং অনতিব্যক্ত আশার তাড়না
তাদের ঠেলে নিয়ে যায়।
ঘুম তাদের কমে এল, বিশ্রাম তারা সংক্ষিপ্ত করলে,
পরস্পরকে ছাড়িয়ে চলবার প্রতিযোগিতায় তারা ব্যগ্র,

ভয়— পাছে বিলম্ব ক'রে বঞ্চিত হয়।
দিনের পর দিন গেল।
দিগন্তের পর দিগন্ত আসে,
অজ্ঞাতের আমন্ত্রণ অদৃশ্য সংকেতে ইঙ্গিত করে।
ওদের মুখের ভাব ক্রমেই কঠিন
আর ওদের গঞ্জনা উগ্রতর হতে থাকে।

৬

রাত হয়েছে।
পথিকেরা বটতলায় আসন বিছিয়ে বসল।
একটা দমকা হাওয়ায় প্রদীপ গেল নিবে, অন্ধকার নিবিড়—
যেন নিদ্রা ঘনিয়ে উঠল মূর্ছায়।
জনতার মধ্য থেকে কে-একজন হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে
অধিনেতার দিকে আঙুল তুলে বললে,
মিথ্যাবাদী, আমাদের প্রবঞ্চনা করেছ।
ভর্ৎসনা এক কণ্ঠ থেকে আরেক কণ্ঠে উদগ্র হতে থাকল।
তীব্র হল মেয়েদের বিদ্বেষ, প্রবল হল পুরুষদের তর্জন।
অবশেষে একজন সাহসিক উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ তাকে মারলে প্রচণ্ড বেগে।
অন্ধকারে তার মুখ দেখা গেল না।
একজনের পর একজন উঠল, আঘাতের পর আঘাত করলে,
তার প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।
রাত্রি নিস্তব্ধ।
ঝর্নার কলশব্দ দূর থেকে ক্ষীণ হয়ে আসছে।
বাতাসে যূথীর মৃদুগন্ধ।

৭

যাত্রীদের মন শঙ্কায় অভিভূত।
মেয়েরা কাঁদছে, পুরুষেরা উত্ত্যক্ত হয় ভর্ৎসনা করছে, চুপ করো
কুকুর ডেকে ওঠে, চাবুক খেয়ে আর্ত কাকুতিতে তার ডাক থেমে যায়।
রাত্রি পোহাতে চায় না।
অপরাধের অভিযোগ নিয়ে মেয়ে পুরুষে তর্ক তীব্র হতে থাকে

সবাই চীৎকার করে, গর্জন করে,
শেষে যখন খাপ থেকে ছুরি বেরোতে চায় এমন সময় অন্ধকার ক্ষীণ হল—
প্রভাতের আলো গিরিশৃঙ্গ ছাপিয়ে আকাশ ভরে দিলে।
হঠাৎ সকলে স্তব্ধ;
সূর্যরশ্মির তর্জনী এসে স্পর্শ করল
রক্তাক্ত মৃত মানুষের শান্ত ললাট।
মেয়েরা ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল, পুরুষেরা মুখ ঢাকল দুই হাতে।
কেউ বা অলক্ষিতে পালিয়ে যেতে চায়, পারে না;
অপরাধের শৃঙ্খলে আপন বলির কাছে তারা বাঁধা।
পরস্পরকে তারা শুধায়, কে আমাদের পথ দেখাবে।
পূর্বদেশের বৃদ্ধ বললে,
আমরা যাকে মেরেছি সেই দেখাবে।
সবাই নিরুত্তর ও নতশির।
বৃদ্ধ আবার বললে, সংশয়ে তাকে আমরা অস্বীকার করেছি,
ক্রোধে তাকে আমরা হনন করেছি,
প্রেমে এখন আমরা তাকে গ্রহণ করব,
কেননা, মৃত্যুর দ্বারা সে আমাদের সকলের জীবনের মধ্যে সঞ্জীবিত,
সেই মহামৃত্যুঞ্জয়।
সকলে দাঁড়িয়ে উঠল, কণ্ঠ মিলিয়ে গান করলে,
জয় মৃত্যুঞ্জয়ের জয়।

৮

তরুণের দল ডাক দিল, চলো যাত্রা করি প্রেমের তীর্থে, শক্তির তীর্থে;
হাজার কণ্ঠের ধ্বনিনির্ঝরে ঘোষিত হল—
আমরা ইহলোক জয় করব এবং লোকান্তর।
উদ্দেশ্য সকলের কাছে স্পষ্ট নয়, কেবল আগ্রহে সকলে এক;
মৃত্যুবিপদকে তুচ্ছ করেছে সকলের সম্মিলিত সঞ্চলমান ইচ্ছার বেগ।
তারা আর পথ শুধায় না, তাদের মনে নেই সংশয়,
চরণে নেই ক্লান্তি।
মৃত অধিনেতার আত্মা তাদের অন্তরে বাহিরে—

সে যে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং জীবনের সীমাকে করেছে অতিক্রম।
তারা সেই ক্ষেত্র দিয়ে চলেছে যেখানে বীজ বোনা হল,
সেই ভাণ্ডারের পাশ দিয়ে যেখানে শস্য হয়েছে সঞ্চিত,
সেই অনুর্বর ভূমির উপর দিয়ে
যেখানে কঙ্কালসার দেহ বসে আছে প্রাণের কাঙাল;
তারা চলেছে প্রজাবহুল নগরের পথ দিয়ে,
চলেছে জনশূন্যতার মধ্যে দিয়ে
যেখানে বোবা অতীত তার ভাঙা কীর্তি কোলে নিয়ে নিস্তব্ধ;
চলেছে লক্ষ্মীছাড়াদের জীর্ণ বসতি বেয়ে
আশ্রয় যেখানে আশ্রিতকে বিদ্রূপ করে।
রৌদ্রদগ্ধ বৈশাখের দীর্ঘ প্রহর কাটল পথে পথে।
সন্ধ্যাবেলায় আলোক যখন ম্লান তখন তারা কালজ্ঞকে শুধায়,
ওই কি দেখা যায় আমাদের চরম আশার তোরণচূড়া।
সে বলে, না, ও যে সন্ধ্যাভ্রশিখরে অস্তগামী সূর্যের বিলীয়মান আভা।
তরুণ বলে, থেমো না বন্ধু, অন্ধতমিস্র রাত্রির মধ্য দিয়ে
আমাদের পৌঁছতে হবে মৃত্যুহীন জ্যোতির্লোকে।
অন্ধকারে তারা চলে।
পথ যেন নিজের অর্থ নিজে জানে,
পায়ের তলার ধূলিও যেন নীরব স্পর্শে দিক চিনিয়ে দেয়।
স্বর্গপথযাত্রী নক্ষত্রের দল মূক সংগীতে বলে, সাথি, অগ্রসর হও।
অধিনেতার আকাশবাণী কানে আসে, আর বিলম্ব নেই।

৯

প্রত্যূষের প্রথম আভা
অরণ্যের শিশিরবর্ষী পল্লবে পল্লবে ঝলমল করে উঠল।
নক্ষত্রসংকেতবিদ্ জ্যোতিষী বললে, বন্ধু, আমরা এসেছি।
পথের দুই ধারে দিক্‌প্রান্ত অবধি
পরিণত শস্যশীর্ষ স্নিগ্ধ বায়ুহিল্লোলে দোলায়মান—
আকাশের স্বর্ণলিপির উত্তরে ধরণীর আনন্দবাণী।
গিরিপদবর্তী গ্রাম থেকে নদীতলবর্তী গ্রাম পর্যন্ত
প্রতিদিনের লোকযাত্রা শান্ত গতিতে প্রবহমান—

কুমোরের চাকা ঘুরছে গুঞ্জনস্বরে,
কাঠুরিয়া হাটে আনছে কাঠের ভার,
রাখাল ধেনু নিয়ে চলেছে মাঠে,
বধূরা নদী থেকে ঘট ভ'রে যায় ছায়াপথ দিয়ে।
কিন্তু কোথায় রাজার দুর্গ, সোনার খনি,
মারণ-উচাটন-মন্ত্রের পুরাতন পুঁথি?
জ্যোতিষী বললে, নক্ষত্রের ইঙ্গিতে ভুল হতে পারে না,
তাদের সংকেত এইখানেই এসে থেমেছে।
এই বলে ভক্তিনম্রশিরে পথপ্রান্তে একটি উৎসের কাছে গিয়ে সে দাঁড়ালো।
সেই উৎস থেকে জলস্রোত উঠছে যেন তরল আলোক,
প্রভাত যেন হাসি-অশ্রুর গলিত মিলিত গীতধারায় সমুচ্ছল।
নিকটে তালীকুঞ্জতলে একটি পর্ণকুটির
অনির্বচনীয় স্তব্ধতায় পরিবেষ্টিত।
দ্বারে অপরিচিত সিন্ধুতীরের কবি গান গেয়ে বলছে,
মাতা, দ্বার খোলো।

১০

প্রভাতের একটি রবিরশ্মি রুদ্ধদ্বারের নিম্নপ্রান্তে তির্যক হয়ে পড়েছে।
সম্মিলিত জনসংঘ আপন নাড়ীতে নাড়ীতে যেন শুনতে পেলে
সৃষ্টির সেই প্রথম পরমবাণী, মাতা, দ্বার খোলো।
দ্বার খুলে গেল।
মা বসে আছেন তৃণশয্যায়, কোলে তাঁর শিশু,
উষার কোলে যেন শুকতারা।
দ্বারপ্রান্তে প্রতীক্ষাপরায়ণ সূর্যরশ্মি শিশুর মাথায় এসে পড়ল।
কবি দিলে আপন বীণার তারে ঝংকার, গান উঠল আকাশে:
জয় হোক মানুষের, ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের।
সকলে জানু পেতে বসল, রাজা এবং ভিক্ষু, সাধু এবং পাপী, জ্ঞানী এবং মূঢ়;
উচ্চস্বরে ঘোষণা করলে: জয় হোক মানুষের,
ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের।

[শ্রাবণ ১৩৩৮]

শাপমোচন

গন্ধর্ব সৌরসেন সুরলোকের সংগীতসভায়
কলানায়কদের অগ্রণী।
সেদিন তার প্রেয়সী মধুশ্রী গেছে সুমেরুশিখরে
সূর্যপ্রদক্ষিণে।
সৌরসেনের মন ছিল উদাসী।
অনবধানে তার মৃদঙ্গের তাল গেল কেটে,
উর্বশীর নাচে শমে পড়ল বাধা,
ইন্দ্রাণীর কপোল উঠল রাঙা হয়ে।
স্খলিতছন্দ সুরসভার অভিশাপে
গন্ধর্বের দেহশ্রী বিকৃত হয়ে গেল,
অরুণেশ্বর নাম নিয়ে তার জন্ম হল
গান্ধাররাজগৃহে।
মধুশ্রী ইন্দ্রাণীর পাদপীঠে মাথা রেখে পড়ে রইল;
বললে, 'বিচ্ছেদ ঘটিয়ো না,
একই লোকে আমাদের গতি হোক,
একই দুঃখভোগে, একই অবমাননায়।'
শচী সকরুণ দৃষ্টিতে ইন্দ্রের পানে তাকালেন।
ইন্দ্র বললেন, 'তথাস্তু, যাও মর্তে—
সেখানে দুঃখ পাবে, দুঃখ দেবে।
সেই দুঃখে ছন্দঃপাতন-অপরাধের ক্ষয়।'
মধুশ্রী জন্ম নিল মদ্ররাজকুলে, নাম নিল কমলিকা।

একদিন গান্ধারপতির চোখে পড়ল মদ্ররাজকন্যার ছবি।
সেই ছবি তার দিনের চিন্তা তার রাত্রের স্বপ্নের 'পরে
আপন ভূমিকা রচনা করলে।
গান্ধারের দূত এল মদ্ররাজধানীতে।
বিবাহপ্রস্তাব শুনে রাজা বললে,
'আমার কন্যার দুর্লভ ভাগ্য।'

ফাল্গুন মাসের পুণ্যতিথিতে শুভলগ্ন।
রাজহস্তীর পৃষ্ঠে রত্নাসনে মদ্ররাজসভায়
এসেছে মহারাজ অরুণেশ্বরের অঙ্কবিহারিণী বীণা।
স্তব্ধসংগীতে সেই রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে কন্যার বিবাহ।
যথাকালে রাজবধূ এল পতিগৃহে।

নির্বাণদীপ অন্ধকার ঘরেই প্রতি রাত্রে স্বামীর কাছে বধূসমাগম।
কমলিকা বলে, 'প্রভু, তোমাকে দেখবার জন্যে
আমার দিন আমার রাত্রি উৎসুক। আমাকে দেখা দাও।'
রাজা বলে, 'আমার গানেই তুমি আমাকে দেখো।'
অন্ধকারে বীণা বাজে।
অন্ধকারে গান্ধর্বীকলার নৃত্যে বধূকে বর প্রদক্ষিণ করে।
সেই নৃত্যকলা নির্বাসনের সঙ্গিনী হয়ে এসেছে
তার মর্তদেহে।
নৃত্যের বেদনা রানীর বক্ষে এসে দুলে দুলে ওঠে,
নিশীথরাত্রে সমুদ্রে জোয়ার এলে
তার ঢেউ যেমন লাগে তটভূমিতে—
অশ্রুতে প্লাবিত করে দেয়।

একদিন রাত্রির তৃতীয় প্রহরের শেষে
যখন শুকতারা পূর্বগগনে,
কমলিকা তার সুগন্ধি এলো চুলে রাজার দুই পা ঢেকে দিলে;
বললে, 'আদেশ করো আজ উষার প্রথম আলোকে
তোমাকে প্রথম দেখব।'
রাজা বললে, 'প্রিয়ে, না-দেখার নিবিড় মিলনকে
নষ্ট কোরো না এই মিনতি।'
মহিষী বললে, 'প্রিয়প্রসাদ থেকে
আমার দুই চক্ষু কি চিরদিন বঞ্চিত থাকবে
অন্ধতার চেয়েও এ যে বড়ো অভিশাপ।'
অভিমানে মহিষী মুখ ফেরালে।

রাজা বললে, 'কাল চৈত্রসংক্রান্তি।
নাগকেশরের বনে নিভৃতে সখাদের সঙ্গে আমার নৃত্যের দিন।
প্রাসাদশিখর থেকে চেয়ে দেখো।'
মহিষীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল ;
বললে, 'চিনব কী করে।'
রাজা বললে, 'যেমন খুশি কল্পনা করে নিয়ো,
সেই কল্পনাই হবে সত্য।'

চৈত্রসংক্রান্তির রাত্রে আবার মিলন।
মহিষী বললে, 'দেখলাম নাচ। যেন মঞ্জরিত শালতরুশ্রেণীতে
বসন্তবাতাসের মত্ততা।
সকলেই সুন্দর,
যেন ওরা চন্দ্রলোকের শুক্লপক্ষের মানুষ।
কেবল একজন কুশ্রী কেন রসভঙ্গ করলে, ও যেন রাহুর অনুচর।
ওখানে কী গুণে সে পেল প্রবেশের অধিকার।'
রাজা স্তব্ধ হয়ে রইল।
কিছু পরে বললে, 'ওই কুশ্রীর পরম বেদনাতেই তো সুন্দরের আহ্বান।
কালো মেঘের লজ্জাকে সান্ত্বনা দিতেই সূর্যরশ্মি তার ললাটে পরায় ইন্দ্রধনু,
মরুনীরস কালো মর্তের অভিশাপের উপর স্বর্গের করুণা যখন রূপ ধরে
তখনই তো শ্যামলসুন্দরের আবির্ভাব।
প্রিয়তমে, সেই করুণাই কি তোমার হৃদয়কে কাল মধুর করে নি।'
'না মহারাজ, না' ব'লে মহিষী দুই হাতে মুখ ঢাকলে।
রাজার কণ্ঠের সুরে অশ্রুর ছোঁওয়া লাগল ;
বললে, 'যাকে দয়া করলে হৃদয় তোমার ভরে উঠত
তাকে ঘৃণা ক'রে মনকে কেন পাথর করলে।'
'রসবিকৃতির পীড়া সইতে পারি নে'
এই ব'লে মহিষী আসন থেকে উঠে পড়ল।
রাজা তার হাত ধরলে ;
বললে, 'একদিন সইতে পারবে আপনারই আন্তরিক রসের দাক্ষিণ্যে—
কুশ্রীর আত্মত্যাগে সুন্দরের সার্থকতা।'

ভ্রূ কুটিল করে মহিষী বললে,
'অসুন্দরের জন্যে তোমার এই অনুকম্পার অর্থ বুঝি নে।
ঐ শোনো, উষার প্রথম কোকিলের ডাক,
অন্ধকারের মধ্যে তার আলোকের অনুভূতি।
আজ সূর্যোদয়মুহূর্তে তোমারও প্রকাশ হবে
আমার দিনের মধ্যে, এই আশায় রইলাম।'
রাজা বললে, 'তাই হোক, ভীরুতা যাক কেটে।'
দেখা হল।
ট'লে উঠল যুগলের সংসার।
'কী অন্যায়— কী নিষ্ঠুর বঞ্চনা'
বলতে বলতে কমলিকা ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে গেল।

গেল বহুদূরে
বনের মধ্যে মৃগয়ার জন্যে যে নির্জন রাজগৃহ আছে সেইখানে।
কুয়াশায় শুকতারার মতো লজ্জায় সে আচ্ছন্ন।
রাত্রি যখন দুই প্রহর তখন আধ-ঘুমে সে শুনতে পায়
এক বীণাধ্বনির আর্তরাগিণী।
স্বপ্নে বহুদূরের আভাস আসে,
মনে হয় এই সুর চিরদিনের চেনা।
রাতের পরে রাত গেল।
অন্ধকারে তরুতলে যে মানুষ ছায়ার মতো নাচে
তাকে চোখে দেখে না, তাকে হৃদয়ে দেখা যায়—
যেমন দেখা যায় জনশূন্য দেওদার বনের দোলায়িত শাখায়
দক্ষিণসমুদ্রের হাওয়ার হাহাকার-মূর্তি।

এ কী হল রাজমহিষীর।
কোন্ হতাশের বিরহ তার বিরহকে জাগিয়ে তোলে!
মাটির প্রদীপ-শিখায় সোনার প্রদীপ জ্বলে উঠল বুঝি।
রাতজাগা পাখি নিস্তব্ধ নীড়ের পাশ দিয়ে হুহু করে উড়ে যায়,
তার পাখার শব্দে ঘুমন্ত পাখির পাখা উৎসুক হয়ে ওঠে যে।

বীণায় বাজতে থাকে কেদারা বেহাগ, বাজে কালাংড়া।
আকাশে আকাশে তারাগুলি যেন তামসী তপস্বিনীর নীরব জপমন্ত্র।
রাজমহিষী বিছানার 'পরে উঠে বসে।
স্রস্ত তার বেণী, ত্রস্ত তার বক্ষ।
বীণার গুঞ্জরণ আকাশে মেলে দেয় এক অন্তহীন অভিসারের পথ।
রাগিণী-বিছানো সেই শূন্যপথে বেরিয়ে পড়ে তার মন।
কার দিকে। দেখার আগে যাকে চিনেছিল তারই দিকে।

একদিন নিম ফুলের গন্ধ অন্ধকার ঘরে অনির্বচনীয়ের আমন্ত্রণ নিয়ে এসেছে।
মহিষী বিছানা ছেড়ে বাতায়নের কাছে এসে দাঁড়ালো।
নীচে সেই ছায়ামূর্তির নৃত্য, বিরহের সেই উর্মি-দোলা।
মহিষীর সমস্ত দেহ কম্পিত।
ঝিল্লিঝংকৃত রাত, কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ দিগন্তে।
অস্পষ্ট আলোয় অরণ্য স্বপ্নে কথা কইছে।
সেই বোবা বনের ভাষাহীন বাণী লাগল রাজমহিষীর অঙ্গে অঙ্গে।
কখন নাচ আরম্ভ হল সে জানে না।
এ নাচ কোন্ জন্মান্তরের, কোন্ লোকান্তরের।

গেল আরো দুই রাত।
অভিসারের পথ একান্তই শেষ হয়ে আসছে এই জানলারই কাছে।
সেদিন বীণায় পরজের বিহ্বল মিড়।
কমলিকা আপন মনে নীরবে বলছে,
'ওগো কাতর, ওগো হতাশ, আর ডেকো না।
আমার আর দেরি নেই।'
কিন্তু যাবে কার কাছে।
চোখে না দেখেছিল যাকে তারই কাছে তো?
কেমন করে হবে।
দেখা-মানুষ আজ না-দেখা মানুষকে ছিনিয়ে নিয়ে
পাঠিয়ে দিলে সাত-সমুদ্র-পারে রূপকথার দেশে।
সেখানকার পথ কোন্ দিকে।

আরো এক রাত যায়।
কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ ডুবেছে অমাবস্যার তলায়।
আঁধারের ডাক কী গভীর।
পথ-না-জানা যত-সব গুহা-গহ্বর মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন
এই ডাক সেখানে গিয়ে প্রতিধ্বনি জাগায়।
সেই অস্ফুট আকাশবাণীর সঙ্গে মিলে ঐ যে বাজে বীণায় কানাড়া।
রাজমহিষী উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আজ আমি যাব।
আমার চোখকে আমি আর ভয় করি নে।'
পথের শুকনো পাতা পায়ে পায়ে বাজিয়ে দিয়ে
সে গেল পুরাতন অশথ গাছের তলায়।
বীণা থামল।
মহিষী থমকে দাঁড়ালো।
রাজা বললে, 'ভয় কোরো না প্রিয়ে, ভয় কোরো না।'
তার গলার স্বর জলে-ভরা মেঘের দূর গুরু-গুরু ধ্বনির মতো।
'আমার কিছু ভয় নেই, তোমারই জয় হল।'
এই বলে মহিষী আঁচলের আড়াল থেকে প্রদীপ বের করলে,
ধীরে ধীরে তুললে রাজার মুখের কাছে।
কণ্ঠ দিয়ে কথা বেরোতে চায় না, পলক পড়ে না চোখে।
বলে উঠল, 'প্রভু আমার, প্রিয় আমার,
এ কী সুন্দর রূপ তোমার।'

পৌষ ১৩৩৮

ছুটি

দাও-না ছুটি,
কেমন করে বুঝিয়ে বলি
কোন্‌খানে।
যেখানে ঐ শিরীষ-বনের গন্ধপথে
মৌমাছিদের কাঁপছে ডানা সারাবেলা।
যেখানেতে মেঘ-ভাসা ঐ সুদূরতা,
জলের প্রলাপ যেখানে প্রাণ উদাস করে

সন্ধ্যাতারা ওঠার মুখে,
যেখানে সব প্রশ্ন গেছে থেমে—
শূন্য ঘরে অতীত স্মৃতি গুন্‌গুনিয়ে
ঘুম ভাঙিয়ে রাখে না আর
বাদলরাতে।
যেখানে এই মন
গোরুচরা মাঠের মধ্যে স্তব্ধ বটের মতো
গাঁয়ে-চলা পথের পাশে।
কেউ বা এসে প্রহর-খানেক
বসে তলায়,
পা ছড়িয়ে কেউ বা বাজায় বাঁশি,
নববধূর পাল্কিখানা নামিয়ে রাখে
ক্লান্ত দুই পহরে;
কৃষ্ণ-একাদশীর রাতে
ছায়ার সঙ্গে ঝিল্লিরবে জড়িয়ে পড়ে
চাঁদের শীর্ণ আলো।
যাওয়া-আসার স্রোত বহে যায়
দিনে রাতে—
ধরে-রাখার নাই কোনো আগ্রহ,
দূরে-রাখার নাই তো অভিমান।
রাতের তারা স্বপ্নপ্রদীপখানি
ভোরের আলোয় ভাসিয়ে দিয়ে
যায় চলে, তার দেয় না ঠিকানা।

২১ ভাদ্র. ১৩৩৯

গানের বাসা

তোমরা দুটি পাখি,
মিলন-বেলায় গান কেন আজ
মুখে মুখে নীরব হল।

আতশবাজির বক্ষ থেকে
চতুর্দিকে স্ফুলিঙ্গ সব ছিটকে পড়ে—
তেমনি তোমাদের
বিরহতাপ ছড়িয়ে গিয়েছিল
সারারাত্রি সুরে সুরে বনের থেকে বনে।
গানের মূর্তি নিয়ে তারা পড়ল না তো ধরা—
বাতাস তাদের মিলিয়ে দিল
দিগন্তরের অরণ্যচ্ছায়ায়।

আমরা মানুষ, ভালোবাসার জন্যে বাসা বাঁধি,
চিরকালের ভিত গড়ি তার গানের সুরে ;
খুঁজে আনি জরাবিহীন বাণী
সে মন্দিরের গাঁথন দিতে।
বিশ্বজনের সবার জন্যে সে গান থাকে
সব প্রেমিকের প্রাণের আসন মেলে দিয়ে।
বিপুল হয়ে উঠেছে সে
দেশে দেশে কালে কালে।
মাটির মধ্যখানে থেকে
মাটিকে সে অনেক দূরে ছাড়িয়ে তোলে মাথা
কল্পস্বর্গলোকে।

সহজ ছন্দে যায় আনন্দে জীবন তোমাদের
উধাও পাখার নাচের তালে।
দুরু দুরু কোমল বুকের প্রেমের বাসা
আপনি আছে বাঁধা
পাখির ভুবনে।
প্রাণের রসে শ্যামল মধুর,
মুখরিত গুঞ্জনে মর্মরে,
ঝলকিত চিকন পাতার দোলনে কম্পনে,
পুলকিত ফুলের উল্লাসে,

নব নব ঋতুর মায়া-তুলি
সাজায় তারে নবীন রঙে—
মনে-রাখা ভুলে-যাওয়া
যেন দুটি প্রজাপতির মতো
সেই নিভৃতে অনায়াসে হাল্কা পাখায়
আলোছায়ার সঙ্গে বেড়ায় খেলে।

আমরা কেবল বানিয়ে তুলি
আপন ব্যথার রঙে রসে
ধূলির থেকে পালিয়ে যাবার সৃষ্টিছাড়া ঠাঁই,
বেড়া দিয়ে আগলে রাখি
ভালোবাসার জন্যে দূরের বাসা—
সেই আমাদের গান।

৩১ ভাদ্র ১৩৩৯

পয়লা আশ্বিন

হিমের শিহর লেগেছে আজ মৃদু হাওয়ায়
আশ্বিনের এই প্রথম দিনে।
ভোরবেলাকার চাঁদের আলো
মিলিয়ে আসে শ্বেতকরবীর রঙে।
শিউলিফুলের নিশ্বাস বয়
ভিজে ঘাসের 'পরে,
তপস্বিনী উষার পরা পুজোর চেলির
গন্ধ যেন
আশ্বিনের এই প্রথম দিনে।

পুব আকাশে শুভ্র আলোর শঙ্খ বাজে—

বুকের মধ্যে শব্দ যে তার
রক্তে লাগায় দোলা।
কত যুগের কত দেশের বিশ্ববিজয়ী
মৃত্যুপথে ছুটেছিল
অমর প্রাণের অসাধ্য সন্ধানে।
তাদেরই সেই বিজয়শঙ্খ
রেখে গেছে অরব ধ্বনি
শিশির-ধোওয়া রোদে।
বাজল রে আজ বাজল রে তার
ঘর-ছাড়ানো ডাক
আশ্বিনের এই প্রথম দিনে।

ধনের বোঝা, খ্যাতির বোঝা, দুর্ভাবনার বোঝা
ধুলোয় ফেলে দিয়ে
নিরুদ্‌বেগে চলেছিল জটিল সংকটে।
ললাট তাদের লক্ষ্য ক'রে
পঙ্কপিণ্ড হেনেছিল
দুর্জনেরা মলিন হাতে ;
নেমেছিল উল্কা আকাশ থেকে,
পায়ের তলায় নীরস নিঠুর পথ
তুলেছিল গুপ্ত ক্ষুদ্র কুটিল কাঁটা।
পায় নি আরাম, পায় নি বিরাম,
চায় নি পিছন ফিরে ;
তাদেরই সেই শুভ্রকেতনগুলি
ঐ উড়েছে শরৎপ্রাতের মেঘে
আশ্বিনের এই প্রথম দিনে।

ভয় কোরো না, লোভ কোরো না, ক্ষোভ কোরো না,
জাগো আমার মন—
গান জাগিয়ে চলো সমুখ-পথে

যেখানে ঐ কাশের চামর দোলে
নবসূর্যোদয়ের দিকে ;
নৈরাশ্যের নশ্বর হতে
রক্ত-ঝরা আপনাকে আজ ছিন্ন করে আনো,
আশার মোহ-শিকড়গুলো উপড়ে দিয়ে যাও—
লালসাকে দলো পায়ের তলায়।
মৃত্যুতোরণ যখন হবে পার
পরাজয়ের গ্লানিভরে মাথা তোমার না হয় যেন নত।
ইতিহাসের আত্মজয়ী বিশ্ববিজয়ী
তাদের মাভৈঃ বাণী বাজে নীরব নির্ঘোষণে
নির্মল এই শরৎ-রৌদ্রালোকে
আশ্বিনের এই প্রথম দিনে।

১ আশ্বিন ১৩৩৯

নাটক ও প্রহসন

নাটকের পাত্রপাত্রীগণ

চন্দ্রমাধববাবু	কলিকাতার কোনো কলেজের অধ্যাপক চিরকুমার-সভার সভাপতি
শ্রীশ, বিপিন, পূর্ণ	চিরকুমার-সভার সভ্যগণ
অক্ষয়কুমার	জগত্তারিণীর বড়ো জামাতা
রসিকদাদা	জগত্তারিণীর দূরসম্পর্কীয় খুড়া
বনমালী	ঘটক
গুরুদাস	ওস্তাদ
দারুকেশ্বর, মৃত্যুঞ্জয়	কুলীন যুবকদ্বয়
জগত্তারিণী	বিধবা হিন্দু মহিলা
পুরবালা	জগত্তারিণীর জ্যেষ্ঠা কন্যা, অক্ষয়কুমারের স্ত্রী
শৈলবালা	জগত্তারিণীর বিধবা কন্যা
নৃপবালা, নীরবালা	জগত্তারিণীর দুই অবিবাহিতা কন্যা
নির্মলা	চন্দ্রমাধববাবুর অবিবাহিতা ভাগিনেয়ী

চিরকুমার-সভা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অক্ষয়ের বৈঠকখানা

অক্ষয় ও পুরবালা

পুরবালা। তোমার নিজের বোন হলে দেখতুম কেমন চুপ করে বসে থাকতে। এত দিনে এক-একটির তিনটি চারটি করে পাত্র জুটিয়ে আনতে। ওরা আমার বোন কিনা—

অক্ষয়। মানবচরিত্রের কিছুই তোমার কাছে লুকোনো নেই। নিজের বোনে এবং স্ত্রীর বোনে যে কত প্রভেদ তা এই কাঁচা বয়সেই বুঝে নিয়েছ। তা ভাই, শ্বশুরের কোনো কন্যাটিকেই পরের হাতে সমর্পণ করতে কিছুতেই মন সরে না— এ বিষয়ে আমার ঔদার্যের অভাব আছে তা স্বীকার করতে হবে।

পুরবালা। দেখো, তোমার সঙ্গে আমার একটা বন্দোবস্ত করতে হচ্ছে।

অক্ষয়। একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তো মন্ত্র পড়ে বিবাহের দিনেই হয়ে গেছে, আবার আর একটা!

পুরবালা। ওগো, এটা তত ভয়ানক নয়। এটা হয়তো তেমন অসহ্য না হতেও পারে।

অক্ষয়। সখী, তবে খুলে বলো।

গান

কী জানি কী ভেবেছ মনে
খুলে বলো ললনে।
কী কথা হায় ভেসে যায় ঐ
ছলছল নয়নে।

পুরবালা। ওস্তাদজি, থামো। আমার প্রস্তাব এই-যে দিনের মধ্যে একটা সময় ঠিক করো যখন তোমার ঠাট্টা বন্ধ থাকবে, যখন তোমার সঙ্গে দুটো-একটা কাজের কথা হতে পারবে।

অক্ষয়। গরিবের ছেলে, স্ত্রীকে কথা বলতে দিতে ভরসা হয় না, পাছে খপ করে বাজুবন্দ চেয়ে বসে।

গান

পাছে চেয়ে বসে আমার মন
আমি তাই ভয়ে ভয়ে থাকি।
পাছে চোখে চোখে পড়ে বাঁধা
আমি তাই তো তুলি নে আঁখি।

পুরবালা। তবে যাও।

অক্ষয়। না না, রাগারাগি না। আচ্ছা, যা বল তাই শুনব। খাতায় নাম লিখিয়ে তোমার ঠাট্টানিবারণী সভার সভ্য হব। তোমার সামনে কোনো রকমের বেয়াদবি করব না। তা, কী কথা হচ্ছিল। শ্যালীদের বিবাহ। উত্তম প্রস্তাব।

পুরবালা। দেখো, এখন বাবা নেই। মা তোমারই মুখ চেয়ে আছেন। তোমারই কথা শুনে এখনও তিনি বেশি বয়স পর্যন্ত মেয়েদের লেখাপড়া শেখাচ্ছেন। এখন যদি সৎপাত্র না জুটিয়ে দিতে পার তা হলে কী অন্যায় হবে ভেবে দেখো দেখি।

অক্ষয়। আমি তো তোমাকে বলেইছি তোমরা কোনো ভাব্‌না কোরো না। আমার শ্যালীপতিরা গোকুলে বাড়ছেন।

পুরবালা। গোকুলটি কোথায়।

অক্ষয়। যেখান থেকে এই হতভাগ্যকে তোমার গোষ্ঠে ভর্তি করেছ। আমাদের সেই চিরকুমার-সভা।

পুরবালা। প্রজাপতির সঙ্গে তাদের যে লড়াই।

অক্ষয়। দেবতার সঙ্গে লড়াই করে পারবে কেন। তাঁকে কেবল চটিয়ে দেয় মাত্র। সেইজন্যে ভগবান প্রজাপতির বিশেষ ঝোঁক ওই সভাটার উপরেই। সরা-চাপা হাঁড়ির মধ্যে মাংস যেমন গুমে গুমে সিদ্ধ হতে থাকে প্রতিজ্ঞার মধ্যে চাপা থেকে সভ্যগুলিও একেবারে হাড়ের কাছ পর্যন্ত নরম হয়ে উঠেছেন, দিব্যি বিবাহযোগ্য হয়ে এসেছেন— এখন পাতে দিলেই হয়। আমিও তো এক কালে ওই সভার সভাপতি ছিলুম।

পুরবালা। তোমার কী রকম দশাটা হয়েছিল।

অক্ষয়। সে আর কী বলব। প্রতিজ্ঞা ছিল স্ত্রী শব্দ পর্যন্ত মুখে উচ্চারণ করব

না, কিন্তু শেষকালে এমনি হল যে মনে হ'ত শ্রীকৃষ্ণের ষোলো-শো গোপিনী যদি বা সম্প্রতি দুষ্প্রাপ্য হন অন্তত মহাকালীর চৌষট্টি হাজার যোগিনীর সন্ধান পেলেও একবার পেট ভরে প্রেমালাপটা করে নিই— ঠিক সেই সময়টাতেই তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল আর-কি।

পুরবালা। চৌষট্টি হাজারের শখ মিটল?

অক্ষয়। সে আর তোমার মুখের সামনে বলব না। জাঁক হবে। তবে ইশারায় বলতে পারি, মা কালী দয়া করেছেন বটে।

পুরবালা। তবে আমিও বলি, বাবা ভোলানাথের নন্দীভৃঙ্গীর অভাব ছিল না, আমাকে বুঝি তিনি দয়া করেছিলেন।

অক্ষয়। তা হতে পারে, সেইজন্যেই কার্তিকটি পেয়েছ।

পুরবালা। আবার ঠাট্টা শুরু হল?

অক্ষয়। কার্তিকের কথাটা বুঝি ঠাট্টা? গা ছুঁয়ে বলছি, ওটা আমার অন্তরের বিশ্বাস।

শৈলবালার প্রবেশ

শৈলবালা। মুখুজ্জেমশায়, এইবার তোমার ছোটো দুটি শ্যালীকে রক্ষা করো।

অক্ষয়। যদি অরক্ষণীয়া হয়ে থাকেন তো আমি আছি। ব্যাপারটা কী।

শৈলবালা। মার কাছে তাড়া খেয়ে রসিকদাদা কোথা থেকে একজোড়া কুলীনের ছেলে এনে হাজির করেছেন, মা স্থির করেছেন তাদের সঙ্গেই তাঁর দুই মেয়ের বিবাহ দেবেন।

অক্ষয়। ওরে বাস রে। একেবারে বিয়ের এপিডেমিক। প্লেগের মতো। এক বাড়িতে একসঙ্গে দুই কন্যেকে আক্রমণ। ভয় হয় পাছে আমাকেও ধরে।

গান

বড়ো থাকি কাছাকাছি,
তাই ভয়ে ভয়ে আছি।
নয়ন বচন কোথায় কখন বাজিলে বাঁচি না-বাঁচি।

শৈলবালা। এই কি তোমার গান গাবার সময় হল।

অক্ষয়। কী করব ভাই। রোশনচৌকি বাজাতে শিখি নি, তা হলে ধরতুম। বল কী। শুভকর্ম! দুই শ্যালীর উদ্‌বাহবন্ধন! কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কেন।

শৈলবালা। বৈশাখ মাসের পর আসছে বছরে অকাল পড়বে, আর বিয়ের দিন নেই।

পুরবালা। তোরা আগে থাকতে ভাবিস কেন শৈল, পাত্র আগে দেখা যাক তো।

জগত্তারিণীর প্রবেশ

জগত্তারিণী। বাবা অক্ষয়।

অক্ষয়। কী মা।

জগত্তারিণী। তোমার কথা শুনে আর তো মেয়েদের রাখতে পারি নে।

শৈলবালা। মেয়েদের রাখতে পার না ব'লেই কি মেয়েদের ফেলে দেবে মা।

জগত্তারিণী। ওই তো। তোদের কথা শুনলে গায়ে জ্বর আসে। বাবা অক্ষয়, শৈল বিধবা মেয়ে, ওকে এত পড়িয়ে, পাস করিয়ে, কী হবে বলো দেখি। ওর এত বিদ্যের দরকার কী।

অক্ষয়। মা, শাস্ত্রে লিখেছে, মেয়েমানুষের একটা না একটা কিছু উৎপাত থাকা চাই— হয় স্বামী, নয় বিদ্যে, নয় হিস্টিরিয়া। দেখো-না, লক্ষ্মীর আছেন বিষ্ণু, তাঁর আর বিদ্যের দরকার হয় নি, তাই স্বামীটিকে এবং পেঁচাটিকে নিয়েই আছেন; আর সরস্বতীর স্বামী নেই, কাজেই তাঁকে বিদ্যে নিয়ে থাকতে হয়।

জগত্তারিণী। তা, যা বল বাবা, আসছে বৈশাখে মেয়েদের বিয়ে দেবই।

পুরবালা। হাঁ মা, আমারও সেই মত। মেয়েমানুষের সকাল সকাল বিয়ে হওয়াই ভালো।

অক্ষয়। (জনান্তিকে) তা তো বটেই। বিশেষত যখন একাধিক স্বামী শাস্ত্রে নিষেধ তখন সকাল সকাল বিয়ে করে সময়ে পুষিয়ে নেওয়া চাই।

পুরবালা। আঃ কী বকছ। মা শুনতে পাবেন।

জগত্তারিণী। রসিককাকা আজ পাত্র দেখাতে আসবেন। তা, চল্ মা পুরি, তাদের জলখাবার ঠিক করে রাখিগে। [জগত্তারিণীর ও পুরবালার প্রস্থান

শৈলবালা। আর তো দেরি করা যায় না মুখুজ্জেমশায়। এইবার তোমার সেই চিরকুমার-সভার বিপিনবাবু শ্রীশবাবুকে বিশেষ একটু তাড়া না দিলে চলছে না। আহা, ছেলে দুটি চমৎকার। আমাদের নেপো আর নীরর সঙ্গে দিব্যি মানায়। তুমি তো চৈত্রমাস যেতে না-যেতে আপিস ঘাড়ে করে সিমলে যাবে, এবারে মাকে ঠেকিয়ে রাখা শক্ত হবে।

অক্ষয়। কিন্তু, তাই ব'লে সভাটিকে হঠাৎ অসময়ে তাড়া লাগালে যে চমকে যাবে। ডিমের খোলা ভেঙে ফেললেই কিছু পাখি বেরোয় না। যথোচিত তা দিতে হবে, তাতে সময় লাগে।

শৈলবালা। বেশ তো, তা দেবার ভার আমি নেব মুখুজ্জেমশায়।

অক্ষয়। আর-একটু খোলসা করে বলতে হচ্ছে।

শৈলবালা। ওই তো দশ নম্বরে ওদের সভা? আমাদের ছাদের উপর দিয়ে দেখন-হাসির বাড়ি পেরিয়ে ওখানে ঠিক যাওয়া যাবে। আমি পুরুষবেশে ওদের সভার সভ্য হব, তার পরে সভা কতদিন টেঁকে আমি দেখে নেব।

অক্ষয়। তা হলে জন্মটা বদলে নিয়ে আর-একবার সভ্য হব। একবার তোমার দিদির হাতে নাকাল হয়েছি, এবার তোমার হাতে। কুমার হবার সুখটাই ওই— কটাক্ষবাণগুলোকে লক্ষ্যভেদ করবার সুযোগ দেওয়া যায়।

শৈলবালা। ছি মুখুজ্জেমশায়, তুমি সেকেলে হয়ে যাচ্ছ। ওই-সব নয়নবাণ-টানগুলোর এখন কি আর চলন আছে। যুদ্ধবিদ্যার যে এখন অনেক বদল হয়ে গেছে।

নৃপবালা ও নীরবালার প্রবেশ

নৃপ শান্ত স্নিগ্ধ, নীর তাহার বিপরীত— কৌতুকে এবং চাঞ্চল্যে সে সর্বদাই আন্দোলিত

নীরবালা। (শৈলকে জড়াইয়া ধরিয়া) মেজদিদিভাই, আজ কারা আসবে বল্ তো।

নৃপবালা। মুখুজ্জেমশায়, আজ কি তোমার বন্ধুদের নিমন্ত্রণ আছে। জলখাবারের আয়োজন হচ্ছে কেন।

অক্ষয়। ওই তো! বই পড়ে পড়ে চোখ কানা করলে— পৃথিবীর আকর্ষণে উল্কাপাত কী করে ঘটে সে সমস্ত লাখ-দুলাখ ক্রোশের খবর রাখ, আর আজ ১৮ নম্বর মধুমিস্ত্রির গলিতে কার আকর্ষণে কে এসে পড়ছে সেটা অনুমান করতেও পারলে না?

নীরবালা। বুঝেছি ভাই মেজদিদি। তোর বর আসছে ভাই, তাই সকালবেলা আমার বাঁ চোখ নাচছিল।

নৃপবালা। তোর বাঁ চোখ নাচলে আমার বর আসবে কেন।

নীরবালা। তা ভাই, আমার বাঁ চোখটা নাহয় তোর বরের জন্যে নেচে নিলে, তাতে আমি দুঃখিত নই। কিন্তু মুখুজ্জেমশায়, জলখাবর তো দুটি লোকের জন্যে দেখলুম, মেজদিদি কি স্বয়ম্বরা হবে নাকি।

অক্ষয়। আমাদের ছোড়দিদিও বঞ্চিত হবেন না।

নীরবালা। আহা মুখুজ্জেমশায়, কী সুসংবাদ শোনালে। তোমাকে কী বকশিশ দেব। এই নাও আমার গলার হার, আমার দু হাতের বালা।

শৈলবালা। আঃ ছি, হাত খালি করিস নে।

নীরবালা। আজ আমাদের বরের অনারে পড়ার ছুটি দিতে হবে মুখুজ্জেমশায়।

নৃপবালা। আঃ, কী বর বর করছিস। দেখো তো ভাই মেজদিদি।

অক্ষয়। ওকে ওই জন্যেই তো বর্বরা নাম দিয়েছি। অয়ি বর্বরে, ভগবান তোমাদের কটি সহোদরাকে এই একটি অক্ষয় বর দিয়ে রেখেছেন, তবু তৃপ্তি নেই ?

নীরবালা। সেইজন্যেই তো লোভ বেড়ে গেছে।

নৃপ তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল

(চলিতে চলিতে) এলে খবর দিয়ো মুখুজ্জেমশায়, ফাঁকি দিয়ো না। দেখছ তো সেজদিদি কিরকম চঞ্চল হয়ে উঠেছে।—

গান

না ব'লে যায় পাছে সে
আঁখি মোর ঘুম না জানে।

অক্ষয়। ভয় নেই, ভয় নেই। একটা যায় তো আর-একটা আসবে। যে বিধাতা আগুন সৃষ্টি করেছেন পতঙ্গও তিনিই জুটিয়ে দেবেন। এখন গানটা চলুক।

নীরবালা।— কাছে তার রই, তবুও
ব্যথা যে রয় পরানে।

অক্ষয়। নীরু, এটা তো আগন্তুকদের লক্ষ্য করে তৈরি হয় নি। কাছের মানুষটি কে বলো তো।

নীরবালা।— যে পথিক পথের ভুলে
এল মোর প্রাণের কূলে
পাছে তার ভুল ভেঙে যায়
চলে যায় কোন্ উজানে,
আঁখি মোর ঘুম না জানে।

অক্ষয়। এ তো আমার সঙ্গে মিলছে। কিন্তু ভাই, জেনেশুনেই পথ ভুলেছি, সুতরাং সে ভুল ভাঙবার রাস্তা রাখি নি।

নীরবালা।— এল যেই এল আমার আগল টুটে,
খোলা দ্বার দিয়ে আবার যাবে ছুটে।
খেয়ালের হাওয়া লেগে
যে খেপা ওঠে জেগে
সে কি আর সেই অবেলায়
মিনতির বাধা মানে।
আঁখি মোর ঘুম না জানে।

অক্ষয়।— গান

না, না গো, না
কোরো না ভাবনা—
যদি বা নিশি যায় যাব না, যাব না।
যখনি চলে যাই
আসিব বলে যাই,
আলো-ছায়ার পথে করি আনাগোনা।
দোলাতে দোলে মন মিলনে বিরহে।
বারে বারেই জানি তুমি তো চির হে।
ক্ষণিক আড়ালে
বারেক দাঁড়ালে
মরি ভয়ে ভয়ে পাব কি পাব না।

নীরবালা। বড়ো নিশ্চিন্ত হলুম। তা হলে ঘুমোতে পারি।

অক্ষয়। নির্ভয়ে। [নৃপবালা ও নীরবালার প্রস্থান

শৈলবালা। মুখুজ্জেমশায়, আমি ঠাট্টা করছি নে— আমি চিরকুমার-সভার সভ্য হব। কিন্তু আমার সঙ্গে পরিচিত একজন কাউকে চাই তো। তোমার বুঝি আর সভ্য হবার জো নেই ?

অক্ষয়। না, আমি পাপ করেছি। তোমার দিদি আমার তপস্যা ভঙ্গ করে আমাকে স্বর্গ হতে বঞ্চিত করেছেন।

শৈলবালা। তা হলে রসিকদাদাকে ধরতে হচ্ছে। তিনি তো কোনো সভার সভ্য না হয়েও চিরকুমার-ব্রত রক্ষা করেছেন।

অক্ষয়। সভ্য হলেই এই বুড়োবয়সে ব্রতটি খোয়াবেন। ইলিশমাছ অমনি দিব্যি থাকে, ধরলেই মারা যায় ; প্রতিজ্ঞাও ঠিক তাই, তাকে বাঁধলেই তার সর্বনাশ।

রসিকের প্রবেশ

রসিকদাদার সম্মুখের মাথায় টাক, গোঁফ পাকা, গৌরবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি

অক্ষয়। ওরে পাষণ্ড, ভণ্ড, অকালকুষ্মাণ্ড।

রসিক। কেন হে মত্তমন্থর কুঞ্জকুঞ্জর পুঞ্জঅঞ্জনবর্ণ।

অক্ষয়। তুমি আমার শ্যালী-পুষ্পবনে দাবানল আনতে চাও ?

শৈলবালা। রসিকদাদা, তোমারই বা তাতে কী লাভ।

রসিক। ভাই, সইতে পারলুম না, কী করি। বছরে বছরেই তোর বোনদের বয়স বাড়ছে, বড়োমা আমারই দোষ দেন কেন। বলেন, দুবেলা বসে বসে কেবল খাচ্ছ, মেয়েদের জন্যে দুটো বর দেখে দিতে পার না। আচ্ছা ভাই, আমি না খেতে রাজি আছি, তা হলেই বর জুটবে না তোর বোনদের বয়স কমতে থাকবে? এ দিকে যে-দুটির বর জুটছে না তাঁরা তো দিব্যি খাচ্ছেন-দাচ্ছেন। শৈলভাই, কুমারসম্ভবে পড়েছিস, মনে আছে তো?—

> স্বয়ং বিশীর্ণদ্রুমপর্ণবৃত্তিতা
> পরা হি কাষ্ঠা তপসস্তয়া পুনঃ।
> তদপ্যপাকীর্ণমতঃ প্রিয়ংবদাং
> বদন্ত্যপর্ণেতি চ তাং পুরাবিদঃ।

তা ভাই, দুর্গা নিজের বর খুঁজতে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে তপস্যা করেছিলেন; কিন্তু নাৎনীদের বর জুটছে না বলে আমি বুড়োমানুষ খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেব, বড়োমার এ কী বিচার। আহা শৈল, ওটা মনে আছে তো? তদপ্যপাকীর্ণমতঃ প্রিয়ংবদাং—

শৈলবালা। মনে আছে দাদা, কিন্তু কালিদাস এখন ভালো লাগছে না।

রসিক। তা হলে তো অত্যন্ত দুঃসময় বলতে হবে।

শৈলবালা। তাই তোমার সঙ্গে পরামর্শ আছে।

রসিক। তা, রাজি আছি ভাই। যেরকম পরামর্শ চাও তাই দেব। যদি হাঁ বলাতে চাও হাঁ বলব, না বলাতে চাও না বলব। আমার এই গুণটি আছে। আমি সকলের মতের সঙ্গে মত দিয়ে যাই ব'লেই সবাই আমাকে প্রায় নিজের মতোই বুদ্ধিমান ভাবে।

অক্ষয়। তুমি অনেক কৌশলে তোমার পসার বাঁচিয়ে রেখেছ, তার মধ্যে তোমার এই টাক একটি।

রসিক। আর একটি হচ্ছে 'যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে'— তা, আমি বাইরের লোকের কাছে বেশি কথা কই নে।

শৈলবালা। সেইটে বুঝি আমাদের কাছে পুষিয়ে নাও?

রসিক। তোদের কাছে যে ধরা পড়েছি।

শৈলবালা। ধরা যদি পড়ে থাক তো চলো, যা বলি তাই করতে হবে।

রসিক। ভয় নেই দিদি। এমন দুটি কুলীনের ছেলে জোগাড় করেছি কন্যাদায়ের দুঃখের চেয়েও যারা হাজারগুণ অসহ্য। তাদের দেখলে বড়োমা তাঁর মেয়েদের জন্য এ বাড়িতে চিরকুমারী-সভা স্থাপন করবেন। যাই, তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন। [প্রস্থান

শৈলবালা। মুখুজ্জেমশায়।

অক্ষয়। আজ্ঞা করো।

শৈলবালা। কুলীনের ছেলে দুটোকে কোনো ফিকিরে তাড়াতে হবে।

অক্ষয়। তা তো হবেই।—

গান

দেখব কে তোর কাছে আসে—
তুই রবি একেশ্বরী, একলা আমি রইব পাশে।

শৈলবালা। (হাসিয়া) একেশ্বরী?

অক্ষয়। নাহয় তোমরা চার ঈশ্বরীই হলে, শাস্ত্রে আছে : অধিকন্তু ন দোষায়।

শৈলবালা। আর, তুমিই একলা থাকবে? ওখানে বুঝি অধিকন্তু খাটে না?

অক্ষয়। ওখানে শাস্ত্রের আর-একটা পবিত্র বচন আছে : সর্বমত্যন্তগর্হিতং।

শৈলবালা। কিন্তু মুখুজ্জেমশায়, ও পবিত্র বচনটা তো বরাবর খাটবে না। আরও সঙ্গী জুটবে।

অক্ষয়। তোমাদের এই একটি শালার জায়গায় দশশালা বন্দোবস্ত হবে? তখন আবার নূতন কার্যবিধি দেখা যাবে। ততদিন কুলীনের ছেলেটেলেগুলোকে ঘেঁষতে দিচ্ছি নে।

চাকরের প্রবেশ

চাকর। দুটি বাবু এসেছে। [প্রস্থান

শৈলবালা। ওই বুঝি তারা এল। দিদি আর মা ভাঁড়ারে ব্যস্ত আছেন, তাঁদের অবকাশ হবার পূর্বেই ওদের কোনো মতে বিদায় করে দিয়ো।

অক্ষয়। কী বকশিশ মিলবে।

শৈলবালা। আমরা তোমার সব শালীরা মিলে তোমাকে 'শালীবাহন রাজা' খেতাব দেব।

অক্ষয়। শালীবাহন দি সেকেণ্ড্?

শৈলবালা। সেকেণ্ড্ হতে যাবে কেন। সে শালীবাহনের নাম ইতিহাস থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তুমি হবে শালীবাহন দি গ্রেট।

অক্ষয়। বল কী। আমার রাজ্যকাল থেকে জগতে নূতন সাল প্রচলিত হবে?

গান

তুমি আমায় করবে মস্ত লোক—
দেবে লিখে রাজার টিকে প্রসন্ন ঐ চোখ।

[শৈলবালার প্রস্থান

মৃত্যুঞ্জয় ও দারুকেশ্বরের প্রবেশ

একটি বিসদৃশ লম্বা, রোগা, বুটজুতা-পরা, ধুতি প্রায় হাঁটুর কাছে উঠিয়াছে, চোখের নীচে কালী-পড়া, ম্যালেরিয়া রোগীর চেহারা, বয়স বাইশ হইতে বত্রিশ পর্যন্ত যেটা খুশি হইতে পারে। আর-একটি বেঁটে পাটো, অত্যন্ত দাড়ি-গোঁফ-সংকুল, নাকটি বটিকাকার, কপালটি ঢিবি, কালোকোলো, গোলগাল

অক্ষয়। (অত্যন্ত সৌহার্দ্য-সহকারে উঠিয়া প্রবলবেগে শেক্‌হ্যাণ্ড করিয়া) আসুন মিস্টার ন্যাথানিয়াল, আসুন মিস্টার জেরেমায়া, বসুন বসুন। ওরে বরফ-জল নিয়ে আয় রে, তামাক দে—

মৃত্যুঞ্জয়। (সহসা বিজাতীয় সম্ভাষণে সংকুচিত হইয়া মৃদুস্বরে) আজ্ঞে আমার নাম মৃত্যুঞ্জয় গাঙ্গুলি।

দারুকেশ্বর। আমার নাম শ্রীদারুকেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

অক্ষয়। ছি মশায়। ও নামগুলো এখনও ব্যবহার করেন বুঝি? আপনাদের ক্রিশ্চান নাম? (আগন্তুকদিগকে হতবুদ্ধি নিরুত্তর দেখিয়া) এখনও বুঝি নামকরণ হয় নি? তা, তাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না, ঢের সময় আছে।

অক্ষয়ের গুড়গুড়ির নল মৃত্যুঞ্জয়ের হাতে প্রদান। সে লোকটা ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া

বিলক্ষণ! আমার সামনে আবার লজ্জা। সাত বছর বয়স থেকে লুকিয়ে তামাক খেয়ে পেকে উঠেছি। ধোঁয়া লেগে লেগে বুদ্ধিতে ঝুল পড়ে গেল। লজ্জা যদি করতে হয় তা হলে আমার তো আর ভদ্রসমাজে মুখ দেখাবার জো থাকে না।

তখন সাহস পাইয়া দারুকেশ্বর মৃত্যুঞ্জয়ের হাত হইতে ফস করিয়া নল কাড়িয়া লইয়া ফড়্‌ ফড়্‌ শব্দে টানিতে আরম্ভ করিল। অক্ষয় পকেট হইতে কড়া বর্মার চুরোট বাহির করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ের হাতে দিলেন। যদিচ তাহার চুরোট অভ্যাস ছিল না, তবু সে সদ্যস্থাপিত ইয়ার্কির খাতিরে প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া মৃদুমন্দ টান দিতে লাগিল এবং কোনো গতিকে কাশি চাপিয়া রাখিল

অক্ষয়। এখন কাজের কথাটা শুরু করা যাক। কী বলেন।

মৃত্যুঞ্জয় চুপ করিয়া রহিল

দারুকেশ্বর। তা নয় তো কী। শুভস্য শীঘ্রং।

অক্ষয়। (গম্ভীর হইয়া) মুর্গি না মটন?

মৃত্যুঞ্জয় অবাক হইয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল

দারুকেশ্বর কিছু না বুঝিয়া অপরিমিত হাসিতে আরম্ভ করিল

আরে মশায়, নাম শুনেই হাসি। তা হলে তো গন্ধে অজ্ঞান এবং পাতে পড়লে মারাই

যাবেন। তা, যেটা হয় মনস্থির করে বলুন— মুর্গি হবে না মটন হবে।

তখন দুজনে বুঝিল আহারের কথা হইতেছে। ভীরু মৃত্যুঞ্জয় নিরুত্তর হইয়া ভাবিতে লাগিল
দারুকেশ্বর লালায়িত রসনায় একবার চারি দিকে চাহিয়া দেখিল

ভয় কিসের মশায়। নাচতে বসে ঘোমটা?

দারুকেশ্বর। (দুই হাতে দুই পা চাপড়াইয়া, হাসিয়া) তা, মুর্গিই ভালো, কট্‌লেট, কী বলেন।

মৃত্যুঞ্জয়। (সাহস পাইয়া) মটনটাই বা মন্দ কী ভাই। চপ!

অক্ষয়। ভয় কী দাদা, দু'ই হবে। দোমনা করে খেয়ে সুখ হয় না। (চাকরকে ডাকিয়া) ওরে, মোড়ের মাথায় যে হোটেল আছে সেখান থেকে কলিমদ্দি খানসামাকে ডেকে আন্‌ দেখি। (বুড়ো আঙুল দিয়া মৃত্যুঞ্জয়ের গা টিপিয়া মৃদুস্বরে) বিয়ার না শেরি?

মৃত্যুঞ্জয় লজ্জিত হইয়া মুখ বাঁকাইল

দারুকেশ্বর। হুইস্কির বন্দোবস্ত নেই বুঝি?

অক্ষয় (পিঠ চাপড়াইয়া) নেই তো কী। বেঁচে আছি কী করে।

গান

অভয় দাও তো বলি আমার wish কী—
একটি ছটাক সোডার জলে পাকি তিন পোয়া হুইস্কি।

ক্ষীণপ্রকৃতি মৃত্যুঞ্জয়ও প্রাণপণে হাস্য করা কর্তব্য বোধ করিল
এবং দারুকেশ্বর ফস করিয়া একটা বই টানিয়া লইয়া টপাটপ বাজাইতে আরম্ভ করিল

দারুকেশ্বর। দাদা, ওটা শেষ করে ফেলো।

গান

অভয় দাও তো বলি আমার wish কী—

অক্ষয়। (মৃত্যুঞ্জয়কে ঠেলা দিয়া) ধরো না হে, তুমিও ধরো।

সলজ্জ মৃত্যুঞ্জয় নিজের প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য মৃদুস্বরে যোগ দিল
অক্ষয় ডেস্ক চাপড়াইয়া বাজাইতে লাগিলেন— এক জায়গায় হঠাৎ থামিয়া, গম্ভীর হইয়া

হাঁ, হাঁ, আসল কথাটা জিজ্ঞাসা করা হয় নি। এ দিকে তো সব ঠিক, এখন আপনারা কী হলে রাজি হন।

দারুকেশ্বর। আমাদের বিলেতে পাঠাতে হবে।

অক্ষয়। সে তো হবেই। তার না কাটলে কি শ্যাম্পেনের ছিপি খোলে। দেশে আপনাদের মতো লোকের বিদ্যেবুদ্ধি চাপা থাকে, বাঁধন কাটলেই একেবারে নাকে মুখে চোখে উছলে উঠবে।

দারুকেশ্বর। (অত্যন্ত খুশি হইয়া অক্ষয়ের হাত চাপিয়া ধরিয়া) দাদা, এইটে তোমাকে করে দিতেই হচ্ছে। বুঝলে ?

অক্ষয়। সে কিছুই শক্ত নয়। কিন্তু ব্যাপ্টাইজ্‌ আজই তো হবেন ?

দারুকেশ্বর। (হাসিতে হাসিতে) সেটা কিরকম।

অক্ষয়। (কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের ভাবে) কেন, কথাই তো আছে, রেভারেণ্ড্‌ বিশ্বাস আজ রাত্রেই আসছেন। ব্যাপটিজ্‌ম্‌ না হলে তো ক্রিশ্চান মতে বিবাহ হতে পারে না।

মৃত্যুঞ্জয়। (অত্যন্ত ভীত হইয়া) ক্রিশ্চান মতে কী মশায়।

অক্ষয়। আপনি যে আকাশ থেকে পড়লেন। সে হচ্ছে না— ব্যাপ্টাইজ্‌ যেমন করে হোক, আজ রাত্রেই সারতে হচ্ছে। কিছুতেই ছাড়ব না।

মৃত্যুঞ্জয়। আপনারা ক্রিশ্চান নাকি।

অক্ষয়। মশায়, ন্যাকামি রাখুন। যেন কিছুই জানেন না।

মৃত্যুঞ্জয়। (অত্যন্ত ভীতভাবে) মশায়, আমরা হিঁদু, ব্রাহ্মণের ছেলে, জাত খোয়াতে পারব না।

অক্ষয়। (হঠাৎ অত্যন্ত উদ্ধতস্বরে) জাত কিসের মশায়। এ দিকে কলিমদ্দির হাতে মুর্গি খাবেন, বিলেত যাবেন, আবার জাত ?

মৃত্যুঞ্জয়। (ব্যস্তসমস্ত হইয়া) চুপ, চুপ, চুপ করুন। কে কোথা থেকে শুনতে পাবে।

দারুকেশ্বর। ব্যস্ত হবেন না মশায়, একটু পরামর্শ করে দেখি।

(মৃত্যুঞ্জয়কে একটু অন্তরালে ডাকিয়া লইয়া) বিলেত থেকে ফিরে সেই তো একবার প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে— তখন ডবল প্রায়শ্চিত্ত করে একেবারে ধর্মে ওঠা যাবে। এ সুযোগটা ছাড়লে আর বিলেত যাওয়াটা ঘটে উঠবে না। দেখলি তো কোনো শ্বশুরই রাজি হল না। আর ভাই, ক্রিশ্চানের হুঁকোয় তামাকই যখন খেলুম তখন ক্রিশ্চান হতে আর বাকি কী রইল।

(অক্ষয়ের কাছে আসিয়া) বিলেত যাওয়াটা তো নিশ্চয় পাকা ? তা হলে ক্রিশ্চান হতে রাজি আছি।

মৃত্যুঞ্জয়। কিন্তু আজ রাতটা থাক্‌।

দারুকেশ্বর। হতে হয় তো চট্‌পট্‌ সেরে ফেলে পাড়ি দেওয়াই ভালো; গোড়াতেই বলেছি, শুভস্য শীঘ্রং।

ইতিমধ্যে অন্তরালে রমণীগণের সমাগম

দুই-থালা ফল মিষ্টান্ন লুচি ও বরফ-জল লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ

দারুকেশ্বর। কই মশায়, অভাগার অদৃষ্টে মুর্গি বেটা উড়েই গেল না কি। কট্‌লেট্‌ কোথায়।

অক্ষয়। (মৃদুস্বরে) আজকের মতো এইটেই চলুক।

দারুকেশ্বর। সে কি হয় মশায়। আশা দিয়ে নৈরাশ? শ্বশুরবাড়ি এসে মটন চপ খেতে পাব না? আর, এ-যে বরফ-জল মশায়, আমার আবার সর্দির ধাত, সাদা জল সহ্য হয় না। (গান জুড়িয়া) অভয় দাও তো বলি আমার wish কী—

অক্ষয়। (মৃত্যুঞ্জয়কে টিপিয়া) ধরো-না হে, তুমিও ধরো-না— চুপচাপ কেন। (গানের উচ্ছ্বাস থামিলে আহার-পাত্র দেখাইয়া) নিতান্তই কি এটা চলবে না।

দারুকেশ্বর। (ব্যস্ত হইয়া) না মশায়, ও-সব রোগীর পথ্যি চলবে না। মুর্গি না খেয়েই তো ভারতবর্ষ গেল।

অক্ষয়। (কানের কাছে আসিয়া)—

গান

কত কাল রবে বলো ভারত রে
শুধু ডাল ভাত জল পথ্য করে।

দারুকেশ্বর উৎসাহসহকারে গানটা ধরিল এবং মৃত্যুঞ্জয়ও অক্ষয়ের গোপন ঠেলা খাইয়া সলজ্জভাবে মৃদু মৃদু যোগ দিতে লাগিল

অক্ষয়। (আবার কানে কানে ধরাইয়া দিয়া)—

দেশে অন্নজলের হল ঘোর অনটন,
ধরো হুইস্কি সোডা আর মুর্গি-মটন।

দারুকেশ্বর মাতিয়া উঠিয়া উর্ধ্বস্বরে ওই পদটা ধরিল এবং অক্ষয়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের প্রবল উৎসাহে মৃত্যুঞ্জয়ও কোনো মতে সঙ্গে সঙ্গে যোগ দিয়া গেল

অক্ষয়। (মৃদুস্বরে)—

যাও ঠাকুর চৈতন চুটকি নিয়া,
এসো দাড়ি নাড়ি কলিমদ্দি মিঞা।

যতই উৎসাহ-সহকারে গান চলিল, দ্বারের পার্শ্ব হইতে উস্‌খুস্‌ শব্দ শোনা যাইতে লাগিল এবং অক্ষয় নিরীহ ভালোমানুষটির মতো মাঝে মাঝে সেই দিকে কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন

এমন সময় ময়লা ঝাড়ন হাতে কলিমদ্দি আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল

দারুকেশ্বর। (কলিমদ্দিকে) এই-যে চাচা। আজ রান্নাটা কী হয়েছে বলো দেখি। অক্ষয়বাবু, কারি না কট্‌লেট্‌।

অক্ষয়। (অন্তরালের দিকে কটাক্ষ করিয়া) সে আপনারা যা ভালো বোঝেন।

দারুকেশ্বর। আমার তো মত, ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ ব'লে সব-কটাকেই আদর করে নিই।

অক্ষয়। তা তো বটেই, ওরা সকলেই পূজ্য।

কলিমদ্দি সেলাম করিয়া চলিয়া গেল

অক্ষয়। (কিঞ্চিৎ গলা চড়াইয়া) মশায়রা কি তা হলে আজ রাত্রেই ক্রিশ্চান হতে চান।

দারুকেশ্বর। আমার তো কথাই আছে, শুভস্য শীঘ্রং। আজই ক্রিশ্চান হব, এখনই ক্রিশ্চান হব, ক্রিশ্চান হয়ে তবে অন্য কথা। মশায়, আর ওই পুঁইশাক কলাইয়ের ডাল খেয়ে প্রাণ বাঁচে না। আসুন আপনার পাদরি ডেকে।

উচ্চস্বরে গান

যাও ঠাকুর চৈতন চুট্‌কি নিয়া,
এসো দাড়ি নাড়ি কলিমদ্দি মিঞা।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। (অক্ষয়ের কানে কানে) মাঠাকরুন একবার ডাকছেন।

অক্ষয় উঠিয়া দ্বারের অন্তরালে গেলে

জগত্তারিণী। এ কী। কাণ্ডটা কী।

অক্ষয়। (গম্ভীরমুখে) মা সে-সব পরে হবে, এখন ওরা হুইস্কি চাচ্ছে, কী করি। তোমার পায়ে মালিশ করবার জন্যে সেই-যে ব্রাণ্ডি এসেছিল, তার কি কিছু বাকি আছে।

জগত্তারিণী। (হতবুদ্ধি হইয়া) বল কী বাছা। ব্রাণ্ডি খেতে দেবে?

অক্ষয়। কী করব মা, শুনেইছ তো, ওর মধ্যে একটি ছেলে আছে যার জল খেলেই সর্দি হয়, মদ না খেলে আর-একটির মুখে কথাই বের হয় না।

জগত্তারিণী। ক্রিশ্চান হবার কথা কী বলছে ওরা।

অক্ষয়। ওরা বলছে হিঁদু হয়ে খাওয়া-দাওয়ার বড়ো অসুবিধে, পুঁইশাক কলায়ের ডাল খেলে ওদের অসুখ করে।

জগত্তারিণী। (অবাক হইয়া) তাই বলে কি ওদের আজ রাতেই মুর্গি খাইয়ে ক্রিশ্চান করবে নাকি।

অক্ষয়। তা, মা, ওরা যদি রাগ করে চলে যায় তা হলে দুটি পাত্র এখনই হাতছাড়া

হবে। তাই ওরা যা বলছে তাই শুনতে হচ্ছে। (পুরবালার প্রতি) আমাকে-সুদ্ধ মদ ধরাবে দেখছি।

পুরবালা। বিদায় করো, বিদায় করো, এখনই বিদায় করো।

জগত্তারিণী। (ব্যস্ত হইয়া) বাবা, এখানে মুর্গি খাওয়া-টাওয়া হবে না, তুমি ওদের বিদায় করে দাও। আমার ঘাট হয়েছিল আমি রসিককাকাকে পাত্র সন্ধান করতে দিয়েছিলুম। তাঁর দ্বারা যদি কোনো কাজ পাওয়া যায়। [রমণীগণের প্রস্থান

অক্ষয় ঘরে আসিয়া দেখেন, মৃত্যুঞ্জয় পলায়নের উপক্রম করিতেছে
এবং দারুকেশ্বর হাত ধরিয়া তাহাকে টানাটানি করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে
অক্ষয়ের অবর্তমানে মৃত্যুঞ্জয় অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে

মৃত্যুঞ্জয়। (অক্ষয়কে রাগের স্বরে) না মশায়, আমি ক্রিশ্চান হতে পারব না। আমার বিয়ে করে কাজ নেই।

অক্ষয়। তা মশায়, আপনাকে কে পায়ে ধরাধরি করছে।

দারুকেশ্বর। আমি রাজি আছি মশায়।

অক্ষয়। রাজি থাকেন তো গির্জেয় যান মশায়। আমার সাত পুরুষে ক্রিশ্চান করা ব্যাবসা নয়।

দারুকেশ্বর। ওই-যে কোন্ বিশ্বাসের কথা বললেন—

অক্ষয়। তিনি টেরিটির বাজারে থাকেন, তাঁর ঠিকানা লিখে দিচ্ছি।

দারুকেশ্বর। আর বিবাহটা ?

অক্ষয়। সেটা এ বংশে নয়।

দারুকেশ্বর। তা হলে এতক্ষণ পরিহাস করছিলেন মশায় ? খাওয়াটাও কি—

অক্ষয়। সেটাও এ ঘরে নয়।

দারুকেশ্বর। অন্তত হোটেলে ?

অক্ষয়। সে কথা ভালো।

টাকার ব্যাগ হইতে গুটিকয়েক টাকা বাহির করিয়া দুটিকে বিদায় করিয়া দিলেন
নৃপর হাত ধরিয়া টানিয়া নীরবালা বসন্তকালের দমকা হাওয়ার মতো ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল

নীরবালা। মুখুজ্জেমশায়, দিদি তো দুটির কোনোটিকেই বাদ দিতে চান না।

নৃপবালা। (নীরর কপোলে গুটি দুই-তিন অঙ্গুলির আঘাত করিয়া) ফের মিথ্যে কথা বলছিস !

অক্ষয়। ব্যস্ত হোস নে ভাই, সত্যমিথ্যের প্রভেদ আমি একটু-একটু বুঝতে পারি।

নীরবালা। আচ্ছা মুখুজ্জেমশায়, এ দুটি কি রসিকদাদার রসিকতা না আমাদের সেজদিদিরই ফাঁড়া?

অক্ষয়। বন্দুকের সকল গুলিই কি লক্ষ্যে গিয়ে লাগে। প্রজাপতি টার্গেট প্র্যাক্‌টিস করছিলেন, এ দুটো ফসকে গেল। প্রথম প্রথম এমন গোটাকতক হয়েই থাকে। এই হতভাগ্য ধরা পড়বার পূর্বে তোমার দিদির ছিপে অনেক জলচর ঠোকর দিয়ে গিয়েছিল, বঁড়শি বিঁধল কেবল আমারই কপালে। [কপালে চপেটাঘাত

নৃপবালা। এখন থেকে রোজই প্রজাপতির প্র্যাক্‌টিস চলবে নাকি মুখুজ্জেমশায়। তা হলে তো আর বাঁচা যায় না।

নীরবালা। কেন ভাই, দুঃখ করিস। রোজই কি ফসকাবে। একটা না একটা এসে ঠিক-মতন পৌঁছবে।

রসিকের প্রবেশ

নীরবালা। রসিকদাদা, এবার থেকে আমরাও তোমার জন্যে পাত্রী জোটাচ্ছি।

রসিক। সে তো সুখের বিষয়।

নীরবালা। হাঁ। সুখ দেখিয়ে দেব। তুমি থাক হোগলার ঘরে, আর পরের দালানে আগুন লাগাতে চাও? আমাদের হাতে টিকে নেই? আমাদের সঙ্গে যদি লাগ তা হলে তোমার দু-দুটো বিয়ে দিয়ে দেব; মাথায় যে-কটি চুল আছে সামলাতে পারবে না।

রসিক। দেখ্‌ দিদি, দুটো আস্ত জন্তু এনেছিলুম বলেই তো রক্ষে পেলি, যদি মধ্যম রকমের হত তা হলেই তো বিপদ ঘটত। যাকে জন্তু বলে চেনা যায় না সেই জন্তুই ভয়ানক।

অক্ষয়। সে কথা ঠিক। মনে মনে আমার ভয় ছিল, কিন্তু একটু পিঠে হাত বুলোবামাত্রই চট্‌পট্‌ শব্দে লেজ নড়ে উঠল। কিন্তু, মা বলছেন কী।

রসিক। সে যা বলছেন সে আর পাঁচজনকে ডেকে ডেকে শোনাবার মতো নয়। সে আমি অন্তরের মধ্যেই রেখে দিলুম। যা হোক, শেষে এই স্থির হয়েছে, তিনি কাশীতে তাঁর বোনপোর কাছে যাবেন, সেখানে পাত্রেরও সন্ধান পেয়েছেন, তীর্থদর্শনও হবে।

নীরবালা। বল কী রসিকদাদা। তা হলে এখানে আমাদের রোজ রোজ নতুন নতুন নমুনো দেখা বন্ধ?

নৃপবালা। তোর এখনও শখ আছে নাকি।

নীরবালা। এ কি শখের কথা হচ্ছে। এ হচ্ছে শিক্ষা। রোজ রোজ অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দেখতে দেখতে জিনিসটা সহজ হয়ে আসবে ; যেটিকে বিয়ে করবি সেই প্রাণীটিকে বুঝতে কষ্ট হবে না।

নৃপবালা। তোমার প্রাণীকে তুমি বুঝে নিয়ো, আমার জন্যে তোমার ভাবতে হবে না।

নীরবালা। সেই কথাই ভালো— তুইও নিজের জন্যে ভাবিস, আমিও নিজের জন্যে ভাবব, কিন্তু রসিকদাদাকে আমাদের জন্যে ভাবতে দেওয়া হবে না।

[নৃপ ও নীরর প্রস্থান

শৈলবালার প্রবেশ

শৈলবালা। রসিকদাদা, তোমার সঙ্গে আমার পরামর্শ আছে।

অক্ষয়। অ্যাঁ, শৈল, এই বুঝি ! আজ রসিকদা হলেন রাজমন্ত্রী ! আমাকে ফাঁকি !

শৈলবালা। (হাসিয়া) তোমার সঙ্গে আমার কি পরামর্শের সম্পর্ক মুখুজ্জেমশায়। পরামর্শ যে বুড়ো না হলে হয় না।

অক্ষয়। তবে রাজমন্ত্রীপদের জন্যে আমার দরবার উঠিয়ে নিলুম।

গান

আমি কেবল ফুল জোগাব
তোমার দুটি রাঙা হাতে,
বুদ্ধি আমার খেলে নাকো
পাহারা বা মন্ত্রণাতে।

শৈলবালা। রসিকদাদা, আমরা যে চিরকুমার-সভার সভ্য হব— তুমি আমার বাহন হবে।

রসিক। ভগবান হরি নারীছদ্মবেশে পুরুষকে ভুলিয়েছিলেন, তুই শৈল যদি পুরুষ-ছদ্মবেশে পুরুষকে ভোলাতে পারিস তা হলে হরিভক্তি উড়িয়ে দিয়ে তোর পুজোতেই শেষ বয়সটা কাটাব। কিন্তু, মা যদি টের পান ?

শৈলবালা। তিন কন্যাকে কেবলমাত্র স্মরণ করেই মা মনে মনে এত অস্থির হয়ে ওঠেন যে, তিনি আমাদের আর খবর রাখতে পারেন না। তাঁর জন্যে ভেবো না।

রসিক। কিন্তু, সভায় কিরকম করে সভ্যতা করতে হয় সে আমি কিছুই জানি নে।

শৈলবালা। আচ্ছা, সে আমি চালিয়ে নেব। আবেদনপত্রের সঙ্গে প্রবেশিকার দশটা টাকা পাঠিয়ে দিয়ে বসে আছি। রসিকদা, তোমার তো মার সঙ্গে কাশী গেলে চলবে না।

অক্ষয়। মার সঙ্গে কাশী যাবার জন্যে আমি লোক ঠিক করে দেব এখন, সেজন্যে ভাবনা নেই।

শৈলবালা। মুখুজ্জেমশায়, তুমি তাদের কী বানর বানিয়েই ছেড়ে দিলে— শেষ কালে বেচারাদের জন্যে আমার মায়া করছিল।

অক্ষয়। বানর কেউ বানাতে পারে না শৈল, ওটা পরমা প্রকৃতি নিজেই বানিয়ে রাখেন। ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ থাকা চাই। যেমন কবি হওয়া আর-কি। লেজই বল কবিত্বই বল ভিতরে না থাকলে জোর করে টেনে বের করবার জো নেই।

পুরবালার প্রবেশ

পুরবালা। (কেরোসিন ল্যাম্প্‌টা লইয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া) বেহারা কিরকম আলো দিয়ে গেছে, মিট্‌মিট্‌ করছে। ওকে ব'লে ব'লে পারা গেল না।

অক্ষয়। সে বেটা জানে কিনা অন্ধকারেই আমাকে বেশি মানায়।

পুরবালা। আলোতে মানায় না? বিনয় হচ্ছে নাকি। এটা তো নতুন দেখছি।

অক্ষয়। আমি বলছিলুম, বেহারা বেটা চাঁদ বলে আমাকে সন্দেহ করেছে।

পুরবালা। ওঃ, তাই ভালো। তা, ওর মাইনে বাড়িয়ে দাও।— কিন্তু রসিকদাদা, আজ কী কাণ্ডটাই করলে।

রসিক। ভাই, বর ঢের পাওয়া যায়, কিন্তু সবাই বিবাহযোগ্য হয় না, সেইটের একটা সামান্য উদাহরণ দিয়ে গেলুম।

পুরবালা। সে উদাহরণ না দেখিয়ে দুটো-একটা বিবাহযোগ্য বরের উদাহরণ দেখালেই তো ভাল হত।

শৈলবালা। সে ভার আমি নিয়েছি দিদি।

পুরবালা। তা আমি বুঝেছি। তুমি আর তোমার মুখুজ্জেমশায় মিলে ক দিন ধরে যেরকম পরামর্শ চলছে একটা কী কাণ্ড হবেই।

অক্ষয়। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড তো আজ হয়ে গেল।

রসিক। লঙ্কাকাণ্ডের আয়োজনও হচ্ছে, চিরকুমার-সভার স্বর্ণলঙ্কায় আগুন লাগাতে চলেছি।

পুরবালা। শৈল তার মধ্যে কে।

রসিক। হনুমান তো নয়ই।

অক্ষয়। উনিই হচ্ছেন স্বয়ং আগুন।

রসিক। এক ব্যক্তি ওঁকে লেজে করে নিয়ে যাবেন।

পুরবালা। আমি কিছু বুঝতে পারছি নে। শৈল, তুই চিরকুমার-সভায় যাবি নাকি।

শৈলবালা। আমি যে সভ্য হব।

পুরবালা। কী বলিস তার ঠিক নেই। মেয়েমানুষ আবার সভ্য হবে কী।

শৈলবালা। আজকাল মেয়েরাও যে সভ্য হয়ে উঠেছে। তাই আমি শাড়ি ছেড়ে চাপকান ধরব ঠিক করেছি।

পুরবালা। বুঝেছি, ছদ্মবেশে সভ্য হতে যাচ্ছিস বুঝি। চুলটা তো কেটেইছিস, ওইটেই বাকি ছিল। তোমাদের যা খুশি করো, আমি এর মধ্যে নেই।

অক্ষয়। না না, তুমি এ দলে ভিড়ো না। আর যার খুশি পুরুষ হোক, আমার অদৃষ্টে তুমি চিরদিন মেয়েই থেকো— নইলে ব্রীচ অফ কন্‌ট্রাক্ট— সে বড়ো ভয়ানক মকদ্দমা—

গান

চির-পুরানো চাঁদ,
চিরদিবস এমনি থেকো আমার এই সাধ।
পুরানো হাসি পুরানো সুধা মিটায় মম পুরানো ক্ষুধা,
নূতন কোনো চকোর যেন পায় না পরসাদ।

[পুরবালার প্রস্থান

শৈলবালাকে আশ্বাস দিয়া

ভয় নেই! রাগটা হয়ে গেলেই মনটা পরিষ্কার হবে— একটু অনুতাপও হবে— সেইটেই সুযোগের সময়।

রসিক।— কোপো যত্র ভ্রুকুটিরচনা নিগ্রহো যত্র মৌনং
যত্রান্যোন্যস্মিতমনুনয়ো যত্র দৃষ্টিঃ প্রসাদঃ।

শৈলবালা। রসিকদাদা, তুমি তো দিব্যি শ্লোক আউড়ে চলেছ— কোপ জিনিসটা কী, তা মুখুজ্জেমশায় টের পাবেন।

রসিক। আরে ভাই, বদল করতে রাজি আছি। মুখুজ্জেমশায় যদি শ্লোক আওড়াতেন আর আমার উপরেই যদি কোপ পড়ত তা হলে এই পোড়া কপালকে সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখতুম।

শৈলবালা। মুখুজ্জেমশায়।

অক্ষয়। (অত্যন্ত ত্রস্তভাবে) আবার মুখুজ্জেমশায়! এই বালখিল্য মুনিদের ধ্যানভঙ্গ ব্যাপারের মধ্যে আমি নেই।

শৈলবালা। ধ্যানভঙ্গ আমরা করব। কেবল মুনিকুমারগুলিকে এই বাড়িতে আনা চাই।

অক্ষয়। সভাসুদ্ধ এইখানে উৎপাটিত করে আনতে হবে? যত দুঃসাধ্য কাজ সব এই একটিমাত্র মুখুজ্জেমশায়কে দিয়ে?

শৈলবালা। (হাসিয়া) মহাবীর হবার ওই তো মুশকিল। যখন গন্ধমাদনের প্রয়োজন হয়েছিল তখন নল নীল অঙ্গদকে তো কেউ পোঁছেও নি।

অক্ষয়। ওরে পোড়ার-মুখী, ত্রেতাযুগের পোড়ার-মুখোকে ছাড়া আর কোনো উপমাও তোর মনে উদয় হল না? এত প্রেম!

শৈলবালা। হাঁ গো, এত প্রেম!

অক্ষয়।— গান

পোড়া মনে শুধু পোড়া মুখখানি জাগে রে।
এত আছে লোক, তবু পোড়া চোখে
আর কেহ নাহি লাগে রে।

অক্ষয়। আচ্ছা, তাই হবে। পঙ্গপাল ক'টাকে শিখার কাছে তাড়িয়ে নিয়ে আসব। তা হলে চট করে আমাকে একটা পান এনে দাও। তোমার স্বহস্তের রচনা।

শৈলবালা। কেন, দিদির হস্তের—

অক্ষয়। আরে, দিদির হস্ত তো জোগাড় করেইছি, নইলে পাণিগ্রহণ কী জন্যে। এখন অন্য পদ্মহস্তগুলির প্রতি দৃষ্টি দেবার অবকাশ পাওয়া গেছে।

শৈলবালা। আচ্ছা গো মশায়। পদ্মহস্ত তোমার পানে এমনি চুন মাখিয়ে দেবে যে, পোড়ার-মুখ আবার পুড়বে।

অক্ষয়।— গান

যারে মরণদশায় ধরে
সে যে শতবার করে মরে।
পোড়া পতঙ্গ যত পোড়ে তত
আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

শৈলবালা। মুখুজ্জেমশায়, ও কাগজের গোলাটা কিসের।

অক্ষয়। তোমাদের সেই সভ্য হবার আবেদনপত্র এবং প্রবেশিকার দশ টাকার নোট পকেটে ছিল, ধোবা বেটা কেচে এমনি পরিষ্কার করে দিয়েছে একটা অক্ষরও দেখতে পাচ্ছি নে। ও বেটা বোধ হয় স্ত্রীস্বাধীনতার ঘোরতর বিরোধী, তাই তোমার ওই পত্রটা একেবারে আগাগোড়া সংশোধন করে দিয়েছে।

শৈলবালা। এই বুঝি!

অক্ষয়। চারটিতে মিলে স্মরণশক্তি জুড়ে বসে আছ, আর কিছু কি মনে রাখতে দিলে?—

গান

সকলি ভুলেছে ভোলা মন,
ভোলে নি ভোলে নি শুধু ঐ চন্দ্রানন।

[শৈল ও রসিকের প্রস্থান

পুরবালার প্রবেশ

অক্ষয়। স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র তীর্থ। মান কি না।

পুরবালা। আমি কি পণ্ডিতমশায়ের কাছে শাস্ত্রের বিধান নিতে এসেছি। আমি মার সঙ্গে আজ কাশী চলেছি এই খবরটি দিয়ে গেলুম।

অক্ষয়। খবরটি সুখবর নয়— শোনবামাত্র তোমাকে শাল-দোশালা বকশিশ দিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে না।

পুরবালা। ইস, হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে? না? সহ্য করতে পারছ না?

অক্ষয়। আমি কেবল উপস্থিত বিচ্ছেদটার কথা ভাবছি নে। এখন তুমি দু দিন না রইলে, আরও কজন রয়েছেন, এক রকম করে এই হতভাগ্যের চলে যাবে। কিন্তু এর পরে কী হবে। দেখো, ধর্মে-কর্মে স্বামীকে এগিয়ে যেয়ো না; স্বর্গে তুমি যখন ডবল প্রমোশন পেতে থাকবে আমি তখন পিছিয়ে থাকব— তোমাকে বিষ্ণুদূতে রথে চড়িয়ে নিয়ে যাবে, আর আমাকে যমদূতে কানে ধরে হাঁটিয়ে দৌড় করাবে।

গান

স্বর্গে তোমায় নিয়ে যাবে উড়িয়ে,
পিছে পিছে আমি চলব খুঁড়িয়ে,
ইচ্ছা হবে টিকির ডগা ধরে
বিষ্ণুদূতের মাথাটা দিই গুঁড়িয়ে।

পুরবালা। আচ্ছা আচ্ছা, থামো।

অক্ষয়। আমি থামব, কেবল তুমিই চলবে? ঊনবিংশ শতাব্দীর এই বন্দোবস্ত? নিতান্তই চললে?

পুরবালা। চললুম।

অক্ষয়। আমাকে কার হাতে সমর্পণ করে গেলে।

পুরবালা। রসিকদাদার হাতে।

অক্ষয়। মেয়েমানুষ, হস্তান্তর করবার আইন কিছুই জান না। সেইজন্তেই তো বিরহাবস্থায় উপযুক্ত হাত নিজেই খুঁজে নিয়ে আত্মসমর্পণ করতে হয়।

পুরবালা। তোমাকে তো বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হবে না।

অক্ষয়। তা হবে না।—

গান

কার হাতে যে ধরা দেব প্রাণ
তাই ভাবতে বেলা অবসান।
ডান দিকেতে তাকাই যখন বাঁয়ের লাগি কাঁদে রে মন ;
বাঁয়ের লাগি ফিরলে তখন দক্ষিণেতে পড়ে টান।

আচ্ছা, আমার যেন সান্ত্বনার গুটি দুই-তিন সদুপায় আছে, কিন্তু তুমি—

বিরহযামিনী কেমনে যাপিবে,
বিচ্ছেদতাপে যখন তাপিবে
এপাশ ওপাশ বিছানা মাপিবে,
মকরকেতনে কেবলি শাপিবে—

পুরবালা। রক্ষে করো, ও মিলটা ওইখানেই শেষ করো!

অক্ষয়। দুঃখের সময় আমি থামতে পারি নে, কাব্য আপনি বেরোতে থাকে। মিল ভালো না বাস অমিত্রাক্ষর আছে. তুমি যখন বিদেশে থাকবে আমি 'আর্তনাদ বদ কাব্য' বলে একটা কাব্য লিখব। সখী, তার আরম্ভটা শোনো—

(সাড়ম্বরে) বাষ্পীয় শকটে চড়ি নারীচূড়ামণি
পুরবালা চলি যবে গেলা কাশীধামে
বিকালে, কহ হে দেবী অমৃতভাষিণী
কোন্ বরাঙ্গনে বরি বরমাল্যদানে
যাপিলা বিচ্ছেদমাস শ্যালীত্রয়ীশালী
শ্রীঅক্ষয়!

পুরবালা। (সগর্বে) আমার মাথা খাও, ঠাট্টা নয়, তুমি একটা সত্যিকার কাব্য লেখো না।

অক্ষয়। মাথা খাওয়ার কথা যদি বললে, আমি নিজের মাথাটি খেয়ে অবধি বুঝেছি ওটা সুখাদ্যের মধ্যে গণ্য নয়। আর ওই কাব্য লেখা, ও কার্যটাও সুসাধ্য

বলে জ্ঞান করি নে। বুদ্ধিতে আমার এক জায়গায় ফুটো আছে, কাব্য জমতে পারে না— ফস্ ফস্ করে বেরিয়ে পড়ে।

তুমি জান আমার গাছে ফল কেন না ফলে—
যেমনি ফুলটি ফুটে ওঠে আনি চরণতলে।

কিন্তু, আমার প্রশ্নের তো কোনো উত্তর পেলুম না? কৌতূহলে মরে যাচ্ছি। কাশীতে যে চলেছ, উৎসাহটা কিসের জন্যে। আপাতত সেই বিষ্ণুদূতটাকে মনে মনে ক্ষমা করলুম, কিন্তু ভগবান ভূতনাথ ভবানীপতির অনুচরগুলোর উপর ভারী সন্দেহ হচ্ছে। শুনেছি নন্দী ও ভৃঙ্গী অনেক বিষয়ে আমাকেও জেতে, ফিরে এসে হয়তো এই ভৃত্যটিকে পছন্দ না হতেও পারে।

পুরবালা। আমি কাশী যাব না।

অক্ষয়। সে কী কথা। ভূতভাবনের যে ভৃত্যগুলি একবার মরে ভূত হয়েছে তারা যে দ্বিতীয়বার মরবে।

রসিকের প্রবেশ

পুরবালা। আজ যে রসিকদার মুখ ভারী প্রফুল্ল দেখাচ্ছে।

রসিক। ভাই, তোর রসিকদার মুখের ওই রোগটা কিছুতেই ঘুচল না। কথা নেই বার্তা নেই প্রফুল্ল হয়েই আছে— বিবাহিত লোকেরা দেখে মনে মনে রাগ করে।

পুরবালা। শুনলে তো বিবাহিত লোক? এর একটা উপযুক্ত জবাব দিয়ে যাও।

অক্ষয়। আমাদের প্রফুল্লতার খবর ও বৃদ্ধ কোথা থেকে জানবে? সে এত রহস্যময় যে তা উদ্ভেদ করতে আজ পর্যন্ত কেউ পারলে না, সে এত গভীর যে আমরাই হাৎড়ে খুঁজে পাই নে— হঠাৎ সন্দেহ হয় আছে কি না।

পুরবালা। এই বুঝি! [রাগ করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম

অক্ষয়। (তাহাকে ফিরাইয়া) দোহাই তোমার, এই লোকটির সামনে রাগারাগি কোরো না— তা হলে ওর আস্পর্ধা আরও বেড়ে যাবে। দেখো দাম্পত্যতত্ত্বানভিজ্ঞ বৃদ্ধ, আমরা যখন রাগ করি তখন স্বভাবত আমাদের কণ্ঠস্বর প্রবল হয়ে ওঠে, সেইটেই তোমাদের কর্ণগোচর হয়; আর অনুরাগে যখন আমাদের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, কানের কাছে মুখ আনতে গিয়ে মুখ বারম্বার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়তে থাকে— তখন তো খবর পাও না।

পুরবালা। আঃ, চুপ করো।

অক্ষয়। যখন গয়নার ফর্দ হয় তখন বাড়ির সরকার থেকে সেক্‌রা পর্যন্ত সেটা কারও অবিদিত থাকে না, কিন্তু বসন্তনিশীথে যখন প্রেয়সী—

পুরবালা। আঃ, থামো।

অক্ষয়। বসন্তনিশীথে প্রেয়সী—

পুরবালা। আঃ, কী বকছ তার ঠিক নেই।

অক্ষয়। বসন্তনিশীথে যখন প্রেয়সী গর্জন করে বলেন 'আমি কালই বাপের বাড়ি চলে যাব, আমার একদণ্ড এখানে থাকতে ইচ্ছে নেই— আমার হাড় কালী হল— আমার—

পুরবালা। হাঁগো মশায়, কবে তোমার প্রেয়সী বাপের বাড়ি যাব ব'লে বসন্তনিশীথে গর্জন করেছে।

অক্ষয়। ইতিহাসের পরীক্ষা? কেবল ঘটনা রচনা করে নিষ্কৃতি নেই? আবার সন তারিখ -সুদ্ধ মুখে মুখে বানিয়ে দিতে হবে? আমি কি এতবড়ো প্রতিভাশালী।

রসিক। (পুরবালার প্রতি) বুঝেছ ভাই, সোজা করে ও তোমার কথা বলতে পারে না— ওর এত ক্ষমতাই নেই— তাই উল্টে বলে; আদরে না কুলোলে গাল দিয়ে আদর করতে হয়।

পুরবালা। আচ্ছা মল্লিনাথজি, তোমার আর ব্যাখ্যা করতে হবে না। মা যে শেষকালে তোমাকেই কাশী নিয়ে যাবেন স্থির করেছেন।

রসিক। তা, বেশ তো, এতে আর ভয়ের কথাটা কী। তীর্থে যাবার তো বয়সই হয়েছে। এখন তোমাদের লোলকটাক্ষে এ বৃদ্ধের কিছুই করতে পারবে না— এখন চিত্ত চন্দ্রচূড়ের চরণে—

মুগ্ধস্নিগ্ধবিদগ্ধলুব্ধমধুরৈর্লোলৈঃ কটাক্ষৈরলং
চেতঃ সম্প্রতি চন্দ্রচূড়চরণধ্যানামৃতে বর্ততে।

পুরবালা। সে তো খুব ভালো কথা, তোমার উপরে আর কটাক্ষের অপব্যয় করতে চাই নে, এখন চন্দ্রচূড়চরণে চলো— তা হলে মাকে ডাকি।

রসিক। (করজোড়ে) বড়দিদিভাই, তোমার মা আমাকে সংশোধনের বিস্তর চেষ্টা করেছেন, কিন্তু একটু অসময়ে সংস্কারকার্য আরম্ভ করেছেন— এখন তাঁর শাসনে কোনো ফল হবে না। বরঞ্চ এখনও নষ্ট হবার বয়স আছে, সে বয়সটা বিধাতার কৃপায় বরাবরই থাকে, লোল কটাক্ষটা শেষকাল পর্যন্ত খাটে, কিন্তু উদ্ধারের বয়স আর নেই। তিনি এখন কাশী যাচ্ছেন, কিছুদিন এই বৃদ্ধ শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতিসাধনের দুরাশা পরিত্যাগ করে শান্তিতে থাকুন— কেন তোরা তাঁকে কষ্ট দিবি।

জগত্তারিণীর প্রবেশ

জগত্তারিণী। বাবা, তা হলে আসি।

অক্ষয়। চললে নাকি মা? রসিকদাদা যে এতক্ষণ দুঃখ করছিলেন যে তুমি—

রসিক। (ব্যাকুলভাবে) দাদার সকল কথাতেই ঠাট্টা। মা, আমার কোনো দুঃখ নেই, আমি কেন দুঃখ করতে যাব।

অক্ষয়। বলছিলে না যে 'বড়োমা একলাই কাশী যাচ্ছেন, আমাকে সঙ্গে নিলেন না'?

রসিক। হাঁ, সে তো ঠিক কথা। মনে তো লাগতেই পারে, তবে কিনা মা যদি নিতান্তই—

জগত্তারিণী। না বাপু, বিদেশে তোমার রসিকদাদাকে সামলাবে কে। ওঁকে নিয়ে পথ চলতে পারব না।

পুরবালা। কেন মা, রসিকদাদাকে নিয়ে গেলে উনি তোমাকে দেখতে-শুনতে পারতেন।

জগত্তারিণী। রক্ষে করো, আমাকে আর দেখে-শুনে কাজ নেই। তোমার রসিক দাদার বুদ্ধির পরিচয় ঢের পেয়েছি।

রসিক। (টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে) তা, মা, যেটুকু বুদ্ধি আছে তার পরিচয় সর্বদাই দিচ্ছি, ও তো চেপে রাখবার জো নেই— ধরা পড়তেই হবে। ভাঙা চাকাটাই সব চেয়ে খড়্‌খড়্‌ করে, তিনি যে ভাঙা সেটা পাড়াসুদ্ধ খবর পায়। সেইজন্যেই বড়োমা, চুপচাপ করে থাকতেই চাই, কিন্তু তুমি যে আবার চালাতেও ছাড় না।

জগত্তারিণী। আমি তা হলে হারানের বাড়ি চললুম, একেবারে তাদের সঙ্গে গাড়িতে উঠব; এর পরে আর যাত্রার সময় নেই। পুরো, তোরা তো দিন ক্ষণ মানিস নে, ঠিক সময়ে ইস্টেশনে যাস।

পুরবালা। মা, আমি কাশী যাব না।

হঠাৎ তাহার অসম্মতিতে বিপন্ন হইয়া জগত্তারিণী তাঁহার জামাতার মুখের দিকে চাহিলেন

অক্ষয়। (শাশুড়ির মনের ভাব বুঝিয়া) সে কি হয়। তুমি মার সঙ্গে না গেলে ওঁর অসুবিধে হবে। আচ্ছা মা, তুমি এগোও, আমি ওকে ঠিক সময়ে স্টেশনে নিয়ে যাব।

জগত্তারিণী নিশ্চিন্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন। রসিকদাদা টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বিদায়কালীন বিমর্ষতা মুখে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন

পুরুষবেশধারী শৈলের প্রবেশ

অক্ষয়। কে মশায়। আপনি কে?

শৈলবালা। আজ্ঞে মশায়, আপনার সহধর্মিণীর সঙ্গে আমার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। (অক্ষয়ের সঙ্গে শেক-হ্যাণ্ড্) মুখুজ্জেমশায়, চিনতে তো পারলে না ?

পুরবালা। অবাক করলি। লজ্জা করছে না ?

শৈলবালা। দিদি, লজ্জা যে স্ত্রীলোকের ভূষণ— পুরুষের বেশ ধরতে গেলেই সেটা পরিত্যাগ করতে হয়। তেমনি আবার মুখুজ্জেমশায় যদি মেয়ে সাজেন উনি লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবেন না। রসিকদাদা, চুপ করে রইল যে ?

রসিক। আহা, শৈল যেন কিশোর কন্দর্প। যেন সাক্ষাৎ কুমার, ভবানীর কোল থেকে উঠে এল। ওকে বরাবর শৈল বলে দেখে আসছি, চোখের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল; ও সুন্দরী কি মাঝারি কি চলনসই সে কথা কখনো মনেও ওঠে নি—আজ ঐ বেশটি বদল করেছে বলেই তো ওর রূপখানি ধরা দিলে। পুরোদিদি, লজ্জার কথা কী বলছিস, আমার ইচ্ছে করছে ওকে টেনে নিয়ে ওর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করি।

অক্ষয়। (স্নেহাভিষিক্ত গাম্ভীর্যের সহিত ছদ্মবেশিনীকে ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া) সত্যি বলছি শৈল, তুমি যদি আমার শ্যালী না হয়ে আমার ছোটো ভাই হতে তা হলেও আমি আপত্তি করতুম না।

শৈলবালা। (ঈষৎ বিচলিত হইয়া) আমিও না মুখুজ্জেমশায়।

পুরবালা। (শৈলকে বুকের কাছে টানিয়া) এই বেশে তুই কুমার-সভার সভ্য হতে যাচ্ছিস ?

শৈলবালা। অন্য বেশে হতে গেলে যে ব্যাকরণের দোষ হয় দিদি। কী বল রসিকদাদা।

রসিক। তা তো বটেই, ব্যাকরণ বাঁচিয়ে তো চলতেই হবে। ভগবান পাণিনি বোপদেব এঁরা কী জন্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ভাই, শ্রীমতী শৈলবালার উত্তর চাপকান প্রত্যয় করলেই কি ব্যাকরণ রক্ষে হয়।

অক্ষয়। নতুন মুগ্ধবোধে তাই লেখে। আমি লিখেপ'ড়ে দিতে পারি, চিরকুমার-সভার মুগ্ধদের কাছে শৈল যেমন প্রত্যয় করাবে তাঁরা তেমনি প্রত্যয় যাবেন। কুমারদের ধাতু আমি জানি কিনা।

পুরবালা। (একটুখানি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) তোর মুখুজ্জেমশায়কে আর এই বুড়ো সমবয়সীটিকে নিয়ে তোর খেলা তুই আরম্ভ কর্— আমি মার সঙ্গে কাশী চললুম।

পুরবালা জিনিসপত্র গুছাইতে গেল, এমন সময় নৃপবালা ও নীরবালা ঘরে প্রবেশ করিয়াই পলায়নোদ্যত হইল

নীর দরজার আড়াল হইতে আর-একবার ভালো করিয়া তাকাইয়া মেজদিদি বলিয়া ছুটিয়া আসিল

নীরবালা। মেজদিদি, তোমাকে ভাই জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু ওই চাপকানে বাধছে। মনে হচ্ছে তুমি যেন কোন্ রূপকথার রাজপুত্র, তেপান্তর মাঠ পেরিয়ে আমাদের উদ্ধার করতে এসেছ।

নীরর সমুচ্চ কণ্ঠস্বরে আশ্বস্ত হইয়া নৃপও ঘরে প্রবেশ করিয়া মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিল

নীরবালা। (তাহাকে টানিয়া লইয়া) অমন করে লোভীর মতো তাকিয়ে আছিস কেন। যা মনে করছিস তা নয়, ও তোর দুষ্মন্ত নয়— ও আমাদের মেজদিদি।

রসিক।— ইয়মধিকমনোজ্ঞা চাপকানেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্।

অক্ষয়। মূঢ়ে, তোরা কেবল চাপকানটা দেখেই মুগ্ধ। গিল্‌টির এত আদর? এ দিকে যে খাঁটি সোনা দাঁড়িয়ে হাহাকার করছে।

নীরবালা। আজকাল খাঁটি সোনার দর যে বড়ো বেশি, আমাদের এই গিল্‌টিই ভালো। কী বল ভাই মেজদিদি।

শৈলর কৃত্রিম গোঁফটা একটু পাকাইয়া দিল

রসিক। (নিজেকে দেখাইয়া) এই খাঁটি সোনাটি খুব সস্তায় যাচ্ছে ভাই, এখনও কোনো ট্যাঁকশালে গিয়ে কোনো মহারানীর ছাপটি পর্যন্ত পড়ে নি।

নীরবালা। আচ্ছা বেশ, সেজদিদিকে দান করলুম। (রসিকদাদার হাত ধরিয়া নৃপর হাতে সমর্পণ করিল) রাজি আছিস তো ভাই?

নৃপবালা। তা আমি রাজি আছি।

রসিকদাদাকে একটা চৌকিতে বসাইয়া সে তাঁহার মাথার পাকা চুল তুলিয়া দিতে লাগিল
নীর শৈলর কৃত্রিম গোঁফে তা দিয়া পাকাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল

শৈলবালা। আঃ, কী করছিস, আমার গোঁফ পড়ে যাবে।

রসিক। কাজ কী, এ দিকে আয়-না ভাই, এ গোঁফ কিছুতেই পড়বে না।

নীরবালা। আবার! ফের! সেজদিদির হাতে সঁপে দিলুম কী করতে। আচ্ছা রসিকদাদা, তোমার মাথার দুটো-একটা চুল কাঁচা আছে, কিন্তু গোঁফ আগাগোড়া পাকালে কী করে।

রসিক। কারও কারও মাথা পাকবার আগে মুখটা পাকে।

অক্ষয়। তা হলে আমি একবার চিরকুমার-সভার মাথায় হাত বুলিয়ে আসি।

নীরবালা।— গান

জয়যাত্রায় যাও গো, ওঠো ওঠো জয়রথে তব।
মোরা জয়মালা গেঁথে আশা চেয়ে বসে রব।

আঁচল বিছায়ে রাখি পথধুলা দিব ঢাকি—
ফিরে এলে হে বিজয়ী, হৃদয়ে বরিয়া লব।

অক্ষয়। রথ প্রস্তুত, এখন কী আনব বলো।

নীরবালা।—

আঁকিয়ো হাসির রেখা সজল আঁখির কোণে—
নববসন্তশোভা এনো এ শূন্যবনে।
সোনার প্রদীপে জ্বালো আঁধার ঘরের আলো,
পরাও রাতের ভালে চাঁদের তিলক নব।

অক্ষয়। আর সব ভালো, কেবল তোমার ফর্দের মধ্যে সোনার প্রদীপটাই আক্কারা ঠেকছে। চেষ্টার ত্রুটি হবে না।

নীরবালা। দিদিদের সভাটা কোন্ ঘরে বসবে মুখুজ্জেমশায়।

অক্ষয়। আমার বসবার ঘরে।

নীরবালা। তা হলে সে ঘরটা একটু সাজিয়ে-গুজিয়ে দিইগে।

অক্ষয়। যতদিন আমি সে ঘরটা ব্যবহার করছি একদিনও সাজাতে ইচ্ছে হয় নি বুঝি?

নীরবালা। তোমার জন্যে ঝড়ু বেহারা আছে, তবু বুঝি আশ মিটল না?

পুরবালার প্রবেশ

পুরবালা। কী হচ্ছে তোমাদের।

নীরবালা। মুখুজ্জেমশায়ের কাছে পড়া বলে নিতে এসেছি দিদি। তা, উনি বলছেন ওঁর বাইরের ঘরটা ভালো করে ঝেড়ে সাজিয়ে না দিলে উনি পড়াবেন না। তাই সেজদিদিতে আমাতে ওঁর ঘর সাজাতে যাচ্ছি। আয় ভাই।

নৃপবালা। তোর ইচ্ছে হয়েছে তুই ঘর সাজাতে যা-না— আমি যাব না।

নীরবালা। বাঃ, আমি একা খেটে মরব, আর তুমি-সুদ্ধ তার ফল পাবে সে হবে না।

নৃপকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া নীর চলিয়া গেল

পুরবালা। সব গুছিয়ে নিয়েছি। এখনও ট্রেন যাবার দেরি আছে বোধ হয়।

অক্ষয়। যদি মিস করতে চাও তা হলে ঢের দেরি আছে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চন্দ্রবাবুর বাড়ি। চিরকুমার-সভার ঘর

শ্রীশ ও বিপিন

শ্রীশ। তা, যাই বল, অক্ষয়বাবু যখন আমাদের সভায় ছিলেন তখন আমাদের চিরকুমার-সভা জমেছিল ভালো। আমাদের সভাপতি চন্দ্রবাবু কিছু কড়া।

বিপিন। তিনি থাকতে রস কিছু বেশি জমে উঠেছিল— চিরকৌমার্যব্রতের পক্ষে রসাধিক্যটা ভালো নয়, আমার তো এই মত।

শ্রীশ। আমার মত ঠিক উল্টো। আমাদের ব্রত কঠিন ব'লেই রসের দরকার বেশি। রুক্ষ মাটিতে ফসল ফলাতে গেলে কি জলসিঞ্চনের প্রয়োজন হয় না। চির-জীবন বিবাহ করব না এই প্রতিজ্ঞাই যথেষ্ট, তাই ব'লেই কি সব দিক থেকেই শুকিয়ে মরতে হবে।

বিপিন। যাই বল, হঠাৎ কুমার-সভা ছেড়ে দিয়ে বিবাহ করে অক্ষয়বাবু আমাদের সভাটাকে যেন আল্‌গা করে দিয়ে গেছেন। ভিতরে ভিতরে আমাদের সকলেরই প্রতিজ্ঞার জোর কমে গেছে।

শ্রীশ। কিছুমাত্র না। আমার নিজের কথা বলতে পারি, আমার প্রতিজ্ঞার বল আরও বেড়েছে। যে ব্রত সকলে অনায়াসেই রক্ষা করতে পারে তার উপরে শ্রদ্ধা থাকে না।

বিপিন। একটা সুখবর দিই শোনো।

শ্রীশ। তোমার বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছে নাকি।

বিপিন। হয়েছে বৈকি— তোমার দৌহিত্রীর সঙ্গে। ঠাট্টা রাখো, পূর্ণ কাল কুমার-সভার সভ্য হয়েছে।

শ্রীশ। পূর্ণ! বল কী। তা হলে তো শিলা জলে ভাসল।

বিপিন। শিলা আপনি ভাসে না হে। তাকে আর-কিছুতে অকূলে ভাসিয়েছে।

শ্রীশ। ওহে বিপিন, পূর্ণ যে খামকা চিরকুমার-সভার সভ্য হল তার তো কোনো

কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এ সভায় কৈশিকাকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ, চুম্বকাকর্ষণ প্রভৃতি কোনো আকর্ষণের বালাই নেই।

বিপিন। কে বললে নেই। পর্দার আড়ালে আছে।

শ্রীশ। আর-একটু খোলসা করে বলো। তোমার বুদ্ধির দৌড়টা কিরকম শুনি।

বিপিন। পূর্ণ এ সভার সভ্য হবার পর থেকে আমি লক্ষ্য করে দেখেছি যে তার দুটি চক্ষু সর্বদা ওই দরজার দিকের পর্দাটার রহস্যভেদ করবার জন্যই নিবিষ্ট। কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখি পর্দার নীচের ফাঁক দিয়ে দুখানি চরণ দেখা যাচ্ছে। দেখেই বোঝা গেল, সেই চরণের দিকে যার মন বিচরণ করে কুমার-ব্রত রক্ষা করতে গিয়ে সে বিব্রত হবে।

শ্রীশ। সেই চরণযুগলের চরম তত্ত্বটা ধরতে পারলে? যাকে একটু করে জানলে মন উতলা হয় অনেক সময় তাকে সম্পূর্ণ জানলে মন শান্তি পায়। চরণ দুটি কার শুনি।

বিপিন। তবে ইতিহাসটা বলি শোনো। জানই তো, পূর্ণ সন্ধ্যাবেলায় চন্দ্রবাবুর কাছে পড়ার নোট নিতে যায়। সেদিন আমি আর পূর্ণ একসঙ্গেই একটু সকাল সকাল চন্দ্রবাবুর বাসায় এসেছিলেম। তিনি একটা মিটিং থেকে সবে এসেছেন। বেহারা কেরোসিন জ্বেলে দিয়ে গেছে, পূর্ণ বইয়ের পাত ওল্টাচ্ছে, এমন সময়— কী আর বলব ভাই, সে যেন বঙ্কিমবাবুর কোন্ এক অলিখিত নভেলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল এক কন্যে, পিঠে দুলছে বেণী—

শ্রীশ। বল কী, বল কী বিপিন।

বিপিন। শোনোই-না। এক হাতে থালায় করে চন্দ্রবাবুর জন্যে জলখাবার, আর-এক হাতে জলের গ্লাস নিয়ে হঠাৎ ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত। আমাদের দেখেই তো কুণ্ঠিত, সচকিত, লজ্জায় মুখ রক্তিমবর্ণ। হাত জোড়া, মাথায় কাপড় দেবার জো নেই। তাড়াতাড়ি টেবিলের উপর খাবার রেখেই ছুট। পূর্ণর মুখ দেখেই বোঝা গেল, তার মনটা দোদুল্যমান বেণীর পিছন পিছন ছুটেছে। ব্রাহ্ম বটে, কিন্তু তেত্রিশ কোটির সঙ্গে লজ্জাকে বিসর্জন দেয় নি এবং সত্য বলছি শ্রীকেও রক্ষা করেছে।

শ্রীশ। বল কী বিপিন, দেখতে ভালো বুঝি।

বিপিন। দিব্যি দেখতে। হঠাৎ যেন বিদ্যুতের মতো এসে পড়ে পড়াশুনোয় বজ্রাঘাত করে গেল।

শ্রীশ। আহা, কই, আমি তো একদিনও দেখি নি। মেয়েটি কে হে।

বিপিন। আমাদের সভাপতির ভাগ্নি, নাম নির্মলা।

শ্রীশ। ভাগ্নি? সর্বনাশ! এইখানেই থাকেন?

বিপিন। সন্দেহমাত্র নেই। সভাপতিমশায় নিজে নীরোগ, কিন্তু রোগের ছোঁয়াচ নিয়ে ফেরেন।

শ্রীশ। কিন্তু ভাগ্নেজামাই ব'লে বালাই নেই বুঝি?

বিপিন। সে বালাইটি অপরিণীত আকারে চিরকুমার-সভায় ঢুকে পড়েছে। পূর্ণ পরিণত আকারে যখন বেরিয়ে পড়বে তখন প্রজাপতি কুমার-সভার গুটি বিদীর্ণ করে দেবেন।

শ্রীশ। তিনি তবে কুমারী?

বিপিন। কুমারী বৈকি। কুমার-সভার মহামারী। এই ঘটনার ঠিক পরেই পূর্ণ হঠাৎ আমাদের কুমার-সভায় নাম লিখিয়েছে।

শ্রীশ। পূজারি সেজে ঠাকুর চুরি করবার মৎলব। আমাকেও তো ব্যাপারটা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

বিপিন। নারীতত্ত্বের গবেষণা স্বাস্থ্যকর না হতে পারে।

শ্রীশ। তোমার স্বাস্থ্যের যদি ব্যাঘাত না হয়ে থাকে তা হলে আমারও—

বিপিন। আরম্ভেতে রোগের প্রবেশ ধরা পড়ে না। কিন্তু, কুমারের মার যখন ভিতর থেকে ফুটে উঠবে তখন অশ্বিনীকুমারেরও সাধ্য নেই রক্ষা করে। গোড়ায় সাবধান হওয়া ভালো।

একটি প্রৌঢ় ব্যক্তির প্রবেশ

বিপিন। কী মশায়, আপনি কে।

প্রৌঢ় ব্যক্তি। আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীবনমালী ভট্টাচার্য, ঠাকুরের নাম ৺রামকমল ন্যায়চঞ্চু, নিবাস—

শ্রীশ। আর অধিক আমাদের ঔৎসুক্য নেই। এখন কী কাজে এসেছেন সেইটে—

বনমালী। কাজ কিছুই নয়। আপনারা ভদ্রলোক, আপনাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়—

শ্রীশ। কাজ আপনার না থাকে আমাদের আছে। এখন, অন্য কোনো ভদ্রলোকের সঙ্গে যদি আলাপ-পরিচয় করতে যান তা হলে আমাদের একটু—

বনমালী। তবে কাজের কথাটা সেরে নিই।

শ্রীশ। সেই ভালো।

বনমালী। কুমারটুলির নীলমাধব চৌধুরি-মশায়ের দুটি পরমাসুন্দরী কন্যা আছে— তাঁদের বিবাহযোগ্য বয়স হয়েছে—

শ্রীশ। হয়েছে তো হয়েছে, আমাদের সঙ্গে তার সম্বন্ধটা কী।

বনমালী। সম্বন্ধ তো আপনারা একটু মনোযোগ করলেই হতে পারে। সে আর শক্ত কী। আমি সমস্তই ঠিক করে দেব।

বিপিন। আপনার এত দয়া অপাত্রে অপব্যয় করছেন।

বনমালী। অপাত্র! বিলক্ষণ! আপনাদের মতো সৎপাত্র পাব কোথায়। আপনাদের বিনয়গুণে আরও মুগ্ধ হলেম।

শ্রীশ। এই মুগ্ধভাব যদি রাখতে চান তা হলে এইবেলা সরে পড়ুন। বিনয়গুণে অধিক টান সয় না।

বনমালী। কন্যার বাপ যথেষ্ট টাকা দিতে রাজি আছেন।

শ্রীশ। শহরে ভিক্ষুকের তো অভাব নেই। ওহে বিপিন, তোমার আমোদ বোধ হচ্ছে, কিন্তু এ-রকম সদালাপ আমার ভালো লাগে না।

বিপিন। পালাই কোথায়। ভগবান এঁকেও যে লম্বা একজোড়া পা দিয়েছেন।

শ্রীশ। যদি পিছু ধরেন তা হলে ভগবানের সেই দান মানুষের হাতে প'ড়ে খোয়াতে হবে।

বনমালী। আমিই যাই। [প্রস্থান

চন্দ্রমাধববাবুর প্রবেশ

চন্দ্রবাবু। পূর্ণ।

শ্রীশ। আজ্ঞে, আমি শ্রীশ।

চন্দ্রবাবু। আমাদের এই সভার সভ্যসংখ্যা অল্প হওয়াতে কারও হতাশ্বাস হবার কোনো কারণ নেই—

শ্রীশ। হতাশ্বাস? সেই তো আমাদের সভার গৌরব। এ সভার মহৎ আদর্শ এবং কঠিন বিধান কি সর্বসাধারণের উপযুক্ত। আমাদের সভা অল্প লোকের সভা।

চন্দ্রবাবু। (কার্যবিবরণের খাতাটা চোখের কাছে তুলিয়া) কিন্তু আমাদের আদর্শ উন্নত এবং বিধান কঠিন বলেই আমাদের বিনয় রক্ষা করা কর্তব্য; সর্বদাই মনে রাখা উচিত আমরা আমাদের সংকল্পসাধনের যোগ্য না হতেও পারি। ভেবে দেখো পূর্বে আমাদের মধ্যে এমন অনেক সভ্য ছিলেন যাঁরা হয়তো আমাদের চেয়ে সর্বাংশে মহত্তর ছিলেন, কিন্তু তাঁরাও নিজের সুখ এবং সংসারের প্রবল আকর্ষণে একে একে লক্ষ্যভ্রষ্ট

হয়েছেন। আমাদের কয় জনের পথেও যে প্রলোভন কোথায় অপেক্ষা করছে তা কেউ বলতে পারে না। সেইজন্য আমরা দম্ভ পরিত্যাগ করব এবং কোনো রকম শপথেও বদ্ধ হতে চাই নে। আমাদের মত এই যে, কোনো কালে মহৎ চেষ্টাকে মনে স্থান না দেওয়ার চেয়ে চেষ্টা করে অকৃতকার্য হওয়া ভালো।

পাশের ঘরে ঈষৎ-মুক্ত দরজার অন্তরালে একটি শ্রোত্রী এই কথায় যে একটুখানি বিচলিত হইয়া উঠিল, তাহার অঞ্চলবদ্ধ চাবির গোছায় দুই-একটা চাবি যে একটু ঠুন শব্দ করিল তাহা পূর্ণ ছাড়া আর কেহ লক্ষ্য করিতে পারিল না

চন্দ্রবাবু। আমাদের সভাকে অনেকেই পরিহাস করেন ; অনেকেই বলেন তোমরা দেশের কাজ করবার জন্য কৌমার্যব্রত গ্রহণ করছ, কিন্তু সকলেই যদি এই মহৎ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয় তা হলে পঞ্চাশ বৎসর পরে দেশে এমন মানুষ কে থাকবে যার জন্যে কোনো কাজ করা কারও দরকার হবে। আমি প্রায়ই নম্র নিরুত্তরে এই-সকল পরিহাস বহন করি ; কিন্তু এর কি কোনো উত্তর নেই ?

তিনি তাঁহার তিনটিমাত্র সভ্যের দিকে চাহিলেন

পূর্ণ। (নেপথ্যবাসিনীকে স্মরণ করিয়া সোৎসাহে) আছে বৈকি। সকল দেশেই একদল মানুষ আছে যারা সংসারী হবার জন্যে জন্মগ্রহণ করে নি, তাদের সংখ্যা অল্প। সেই কটিকে আকর্ষণ করে এক উদ্দেশ্য-বন্ধনে বাঁধবার জন্যে আমাদের এই সভা— সমস্ত জগতের লোককে কৌমার্যব্রতে দীক্ষিত করবার জন্যে নয়। আমাদের এই জাল অনেক লোককে ধরবে এবং অধিকাংশকেই পরিত্যাগ করবে, অবশেষে দীর্ঘকাল পরীক্ষার পর দুটি-চারটি লোক থেকে যাবে। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, তোমরাই কি সেই দুটি-চারটি লোক তবে স্পর্ধাপূর্বক কে নিশ্চয়রূপে বলতে পারে। হাঁ, আমরা জালে আকৃষ্ট হয়েছি এই পর্যন্ত, কিন্তু পরীক্ষায় শেষ পর্যন্ত টিঁকতে পারব কি না তা অন্তর্যামীই জানেন। কিন্তু আমরা টিঁকতে পারি বা না পারি, আমরা একে একে স্খলিত হই বা না হই, তাই বলে আমাদের এই সভাকে পরিহাস করবার অধিকার কারও নেই। কেবল যদি আমাদের সভাপতিমশায় একলামাত্র থাকেন, তবে আমাদের এই পরিত্যক্ত সভাক্ষেত্র সেই এক তপস্বীর তপঃপ্রভাবে পবিত্র উজ্জ্বল হয়ে থাকবে এবং তাঁর চির-জীবনের তপস্যার ফল দেশের পক্ষে কখনোই ব্যর্থ হবে না।

কুণ্ঠিত সভাপতি কার্যবিবরণের খাতাখানি পুনর্বার তাঁহার চোখের অত্যন্ত কাছে ধরিয়া অন্যমনস্কভাবে কী দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু পূর্ণর এই বক্তৃতা যথাস্থানে যথাবেগে গিয়া পৌঁছিল। চন্দ্রমাধববাবুর একাকী তপস্যার কথায় নির্মলার চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল এবং বিচলিত বালিকার চাবির গোছার ঝনক শব্দ উৎকর্ণ পূর্ণকে পুরস্কৃত করিল

বিপিন। আমরা এ সভার যোগ্য কি অযোগ্য কালেই তার পরিচয় হবে, কিন্তু কাজ করাও যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয় তবে সেটা কোনো-এক সময়ে শুরু করা উচিত। আমার প্রশ্ন এই, কী করতে হবে।

চন্দ্রবাবু। (উৎসাহিত হইয়া) এই প্রশ্নের জন্য আমরা এতদিন অপেক্ষা করে ছিলাম, কী করতে হবে। এই প্রশ্ন যেন আমাদের প্রত্যেককে দংশন করে অধীর করে তোলে, কী করতে হবে। বন্ধুগণ, কাজই একমাত্র ঐক্যের বন্ধন। এক সঙ্গে যারা কাজ করে তারাই এক। এই সভায় আমরা যতক্ষণ সকলে মিলে একটা কাজে নিযুক্ত না হব ততক্ষণ আমরা যথার্থ এক হতে পারব না। অতএব বিপিনবাবু আজ এই-যে প্রশ্ন করছেন 'কী করতে হবে', এই প্রশ্নকে নিবতে দেওয়া হবে না। সভ্যমহাশয়গণ, আপনারা উত্তর করুন কী করতে হবে।

শ্রীশ। (অস্থির হইয়া) আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন 'কী করতে হবে' আমি বলি আমাদের সকলকে সন্ন্যাসী হয়ে ভারতবর্ষের দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে দেশহিতব্রত নিয়ে বেড়াতে হবে, আমাদের দলকে পুষ্ট করে তুলতে হবে, আমাদের সভাটিকে সূক্ষ্ম সূত্র স্বরূপ করে সমস্ত ভারতবর্ষকে গেঁথে ফেলতে হবে।

বিপিন। (হাসিয়া) সে ঢের সময় আছে, যা কালই শুরু করা যেতে পারে এমন একটা-কিছু কাজ বলো। 'মারি তো গণ্ডার লুঠি তো ভাণ্ডার' যদি পণ ক'রে বস তবে গণ্ডারও বাঁচবে, ভাণ্ডারও বাঁচবে, তুমিও যেমন আরামে আছ তেমনি আরামে থাকবে। আমি প্রস্তাব করি, আমরা প্রত্যেকে দুটি করে বিদেশী ছাত্র পালন করব, তাদের পড়াশুনো এবং শরীরমনের সমস্ত চর্চার ভার আমাদের উপর থাকবে।

শ্রীশ। এই তোমার কাজ ! এর জন্যই আমরা সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেছি ? শেষকালে ছেলে মানুষ করতে হবে ! তা হলে নিজের ছেলে কী অপরাধ করেছে।

বিপিন। (বিরক্ত হইয়া) তা যদি বল তা হলে সন্ন্যাসীর তো কর্মই নেই ; কর্মের মধ্যে ভিক্ষে আর ভ্রমণ আর ভণ্ডামি।

শ্রীশ। (রাগিয়া) আমি দেখছি আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন এ সভার মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি যাঁদের শ্রদ্ধামাত্র নেই, তাঁরা যত শীঘ্র এ সভা পরিত্যাগ করে সন্তান-পালনে প্রবৃত্ত হন ততই আমাদের মঙ্গল।

বিপিন। (আরক্তবর্ণ হইয়া) নিজের সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই নে, কিন্তু এ সভায় এমন কেউ কেউ আছেন যাঁরা সন্ন্যাসগ্রহণের কঠোরতা এবং সন্তানপালনের ত্যাগ-স্বীকার দুয়েরই অযোগ্য, তাঁদের—

চন্দ্রবাবু। (চোখের কাছ হইতে কার্যবিবরণের খাতা নামাইয়া) উত্থাপিত

প্রস্তাব সম্বন্ধে পূর্ণবাবুর অভিপ্রায় জানতে পারলে আমার মন্তব্য প্রকাশ করবার অবসর পাই।

পূর্ণ। অদ্য বিশেষরূপে সভার ঐক্য-বিধানের জন্য একটা কাজ অবলম্বন করবার প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু কাজের প্রস্তাবে ঐক্যের লক্ষণ কিরকম পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে সে আর কাউকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার দরকার নেই। ইতিমধ্যে আমি যদি আবার একটা তৃতীয় মত প্রকাশ করে বসি তা হলে বিরোধানলে তৃতীয় আহুতি দান করা হবে— অতএব আমার প্রস্তাব এই যে, সভাপতিমশায় আমাদের কাজ নির্দেশ করে দেবেন এবং আমরা তাই শিরোধার্য করে নিয়ে বিনা বিচারে পালন করে যাব, কার্যসাধন এবং ঐক্যসাধনের এই একমাত্র উপায় আছে।

পাশের ঘরে এক ব্যক্তি আবার একবার নড়িয়া-চড়িয়া বসিল
এবং তাহার চাবি ঝন্ করিয়া উঠিল

চন্দ্রবাবু। আমাদের প্রথম কর্তব্য ভারতবর্ষের দারিদ্র্যমোচন, এবং তার আশু উপায় বাণিজ্য। আমরা কয়জনে বড়ো বাণিজ্য চালাতে পারি নে, কিন্তু তার সূত্রপাত করতে পারি। মনে করো আমরা সকলেই যদি দিয়াশলাই সম্বন্ধে পরীক্ষা আরম্ভ করি। এমন যদি একটা কাঠি বের করতে পারি যা সহজে জ্বলে, শীঘ্র নেবে না এবং দেশের সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, তা হলে দেশে সস্তা দেশালাই-নির্মাণের কোনো বাধা থাকে না। আমি বলছি শুধু ও জিনিসটা প্রস্তুত করার প্রণালী জানলেই তো হবে না। আমাদের দেশে যত রকম কাঠ মেলে তার মধ্যে কোন্ কাঠটা সব চেয়ে দাহ্য তার সন্ধান করা চাই।

বিপিন। দাহনতত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্ণবাবুর কিছু অভিজ্ঞতা আছে বলে মনে হয়।

চন্দ্রবাবু। তাই না কি। কী পূর্ণ, তুমি কি দাহ্য পদার্থের পরীক্ষা করেছ নাকি।

পূর্ণ। আমার মনে হয় খ্যাংরা কাঠি জিনিসটা সস্তাও বটে অথচ—

বিপিন। হাঁ, অথচ ওটা সহজেই জ্বালা ধরিয়ে দেয়, কিন্তু কুমার-সভায় তার পরীক্ষা সহজ নয়।

চন্দ্রবাবু। কী বলছেন বিপিনবাবু। কথাটা শুনতে পেলুম না।

বিপিন। আমি বলছিলুম, আমাদের দেশে দাহ্য পদার্থ যথেষ্ট আছে, যাতে দাহন করে এমন জিনিসেরও অভাব নেই; কিন্তু পরীক্ষাটা খুব বিবেচনাপূর্বক করা চাই।

চন্দ্রবাবু। ঠিক কথা বলেছেন। অনেক কাঠ আছে, যেমন শীঘ্র জ্বলে ওঠে তেমনি শীঘ্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

বিপিন। আছে বৈকি।

চন্দ্রবাবু। শীঘ্র জ্বলবে, অল্প অল্প করে জ্বলবে, অনেক ক্ষণ ধরে শেষ পর্যন্ত জ্বলবে, এমন জিনিসটি চাই। খুঁজলে পাওয়া যাবে না কি?

শ্রীশ। খুব পাওয়া যাবে, হয়তো দেখবেন হাতের কাছেই আছে।

পূর্ণ। পাকাটি এবং খ্যাংরা কাঠি দিয়ে শীঘ্রই পরীক্ষা করে দেখব।

শ্রীশ মুখ ফিরাইয়া হাসিল

অক্ষয়ের প্রবেশ

অক্ষয়। মশায়, প্রবেশ করতে পারি?

ক্ষীণদৃষ্টি চন্দ্রমাধববাবু হঠাৎ চিনিতে না পারিয়া
ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন

অক্ষয়। মশায়, ভয় পাবেন না এবং অমন ভ্রূকুটি করে আমাকেও ভয় দেখাবেন না। আমি অভূতপূর্ব নই, এমনকি, আমি আপনাদেরই ভূতপূর্ব— আমার নাম—

চন্দ্রবাবু। আর নাম বলতে হবে না। আসুন, আসুন অক্ষয়বাবু—

তিন তরুণ সভ্য অক্ষয়কে নমস্কার করিল
বিপিন ও শ্রীশ দুই বন্ধু সদ্যোবিবাদের বিমর্ষতায় গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল

পূর্ণ। মশায়, অভূতপূর্বের চেয়ে ভূতপূর্বকেই বেশি ভয় হয়।

অক্ষয়। পূর্ণবাবু বুদ্ধিমানের মতো কথাই বলেছেন। সংসারে ভূতের ভয়টাই প্রচলিত। নিজে যে ব্যক্তি ভূত অন্য লোকের জীবনসম্ভোগটা তার কাছে বাঞ্ছনীয় হতে পারেই না, এই মনে করে মানুষ ভূতকে ভয়ংকর কল্পনা করে। অতএব সভাপতিমশায়, চিরকুমার-সভার ভূতটিকে সভা থেকে ঝাড়াবেন না পূর্বসম্পর্কের মমতা-বশত একখানি চৌকি দেবেন— এই বেলা বলুন।

চন্দ্রবাবু। চৌকি দেওয়াই স্থির।

একখানি চেয়ার অগ্রসর করিয়া দিলেন

অক্ষয়। সর্বসম্মতিক্রমে আসন গ্রহণ করলুম। আপনারা আমাকে নিতান্ত ভদ্রতা করে বসতে বললেন বলেই যে আমি অভদ্রতা করে বসেই থাকব আমাকে এমন অসভ্য মনে করবেন না। বিশেষত পান তামাক এবং পত্নী আপনাদের সভার নিয়মবিরুদ্ধ, অথচ ওই তিনটে বদ্ অভ্যাসই আমাকে একেবারে মাটি করেছে, সুতরাং চটপট কাজের কথা সেরেই বাড়িমুখো হতে হবে।

চন্দ্রবাবু। (হাসিয়া) আপনি যখন সভ্য নন তখন আপনার সম্বন্ধে সভার নিয়ম

নাই খাটালেম ; পান-তামাকের বন্দোবস্ত বোধ হয় করে দিতে পারব, কিন্তু আপনার তৃতীয় নেশাই—

অক্ষয়। সেটি এখানে বহন করে আনবার চেষ্টা করবেন না, আমার সে নেশাটি প্রকাশ্য নয়।

চন্দ্রবাবু পান-তামাকের জন্য সনাতন চাকরকে ডাকিবার উপক্রম করিলেন
পূর্ণ 'আমি ডাকিয়া দিতেছি' বলিয়া উঠিল—
পাশের ঘরে চাবি এবং চুড়ি এবং সহসা পলায়নের শব্দ একসঙ্গে শোনা গেল

অক্ষয়। যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ। যতক্ষণ আমি এখানে আছি ততক্ষণ আমি আপনাদের চিরকুমার, কোনো প্রভেদ নেই। এখন আমার প্রস্তাবটা শুনুন।

চন্দ্রবাবু টেবিলের উপর কার্যবিবরণের খাতাটির প্রতি অত্যন্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়া মন দিয়া শুনিতে লাগিলেন

অক্ষয়। আমার কোনো মফস্বলের ধনী বন্ধু তাঁর একটি সন্তানকে আপনাদের কুমার-সভার সভ্য করতে ইচ্ছা করেছেন।

চন্দ্রবাবু। (বিস্মিত হইয়া) বাপ ছেলেটির বিবাহ দিতে চান না!

অক্ষয়। সে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন— বিবাহ সে কোনোক্রমেই করবে না আমি তার জামিন রইলুম। তার দূর সম্পর্কের এক দাদা-সুদ্ধ সভ্য হবেন। তাঁর সম্বন্ধেও আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। কারণ যদিচ তিনি আপনাদের মতো সুকুমার নন, কিন্তু আপনাদের সকলের চেয়ে বেশি কুমার, তাঁর বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে— সুতরাং তাঁর সন্দেহের বয়সটা আর নেই, সৌভাগ্যক্রমে সেটা আপনাদের সকলেরই আছে।

চন্দ্রবাবু। সভ্যপদপ্রার্থীদের নাম ধাম বিবরণ—

অক্ষয়। অবশ্যই তাঁদের নাম ধাম বিবরণ একটা আছেই, সভাকে তার থেকে বঞ্চিত করতে পারা যাবে না— সভ্য যখন পাবেন তখন নাম ধাম বিবরণ -সুদ্ধই পাবেন। কিন্তু আপনাদের এই এক তলার স্যাঁৎসেঁতে ঘরটি স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয়; আপনাদের এই চিরকুমার-ক'টির চিরত্ব যাতে হ্রাস না হয় সে দিকে একটু দৃষ্টি রাখবেন।

চন্দ্র। (কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া খাতাটি নাকের কাছে তুলিয়া লইয়া) অক্ষয়বাবু, আপনি জানেন তো আমাদের আয়—

অক্ষয়। আয়ের কথাটা আর প্রকাশ করবেন না, আমি জানি ও আলোচনাটা চিত্তপ্রফুল্লকর নয়। ভালো ঘরের বন্দোবস্ত করে রাখা হয়েছে, সেজন্যে আপনাদের ধনাধ্যক্ষকে স্মরণ করতে হবে না। চলুন-না, আজই সমস্ত দেখিয়ে শুনিয়ে আনি।

বিমর্ষ বিপিন-শ্রীশের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সভাপতিও প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়া চুলের মধ্য দিয়া বারবার আঙুল বুলাইতে বুলাইতে চুলগুলাকে অত্যন্ত অপরিষ্কার করিয়া তুলিলেন। কেবল পূর্ণ অত্যন্ত দমিয়া গেল

পূর্ণ। সভার স্থান-পরিবর্তনটা কিছু নয়।

অক্ষয়। কেন, এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি করলেই কি আপনাদের চিরকৌমার্যের প্রদীপ হাওয়ায় নিবে যাবে।

পূর্ণ। এ ঘরটি তো আমাদের মন্দ বোধ হয় না।

অক্ষয়। মন্দ নয়। কিন্তু এর চেয়ে ভালো ঘর শহরে দুষ্প্রাপ্য হবে না।

পূর্ণ। আমার তো মনে হয় বিলাসিতার দিকে মন না দিয়ে খানিকটা কষ্টসহিষ্ণুতা অভ্যাস করা ভালো।

শ্রীশ। সেটা সভার অধিবেশনে না করে সভার বাইরে করা যাবে।

বিপিন। একটা কাজে প্রবৃত্ত হলেই এত ক্লেশ সহ্য করবার অবসর পাওয়া যায় যে, অকারণে বলক্ষয় করা মূঢ়তা।

অক্ষয়। বন্ধুগণ, আমার পরামর্শ শোনো, সভাঘরের অন্ধকার দিয়ে চিরকৌমার্য-ব্রতের অন্ধকার আর বাড়িয়ো না। আলোক এবং বাতাস স্ত্রীজাতীয় নয়, অতএব সভার মধ্যে ও দুটোকে প্রবেশ করতে বাধা দিয়ো না। আরও বিবেচনা করে দেখো, এ স্থানটি অত্যন্ত সরস, তোমাদের ব্রতটি তদুপযুক্ত নয়। বাতিকের চর্চা করছ করো, কিন্তু বাতের চর্চা তোমাদের প্রতিজ্ঞার মধ্যে নয়। কী বল শ্রীশবাবু। বিপিনবাবুর কী মত।

শ্রীশ ও বিপিন। ঠিক কথা। ঘরটা একবার দেখেই আসা যাক-না।

পূর্ণ বিমর্ষ হইয়া নিরুত্তর রহিল। পাশের ঘরেও চাবি একবার ঠুন করিল
কিন্তু অত্যন্ত অপ্রসন্ন সুরে

অক্ষয়। চন্দ্রবাবু, এখনই আসুন-না, দেখিয়ে আনি।

চন্দ্রবাবু। চলুন। [চন্দ্রবাবু ও অক্ষয়ের প্রস্থান

বিপিন। দেখো পূর্ণবাবু, সত্যি কথা বলছি তোমাকে, চিরকুমার-সভার ফ্রন্টিয়ার পলিসিতে আমরা পর্দা জিনিসটার অনুমোদন করি নে। ওইখান থেকেই শত্রুপ্রবেশের পথ।

পূর্ণ। মানে কী হল।

বিপিন। পর্দার মতো উড়ুক্ষু জিনিস, অল্প একটু হাওয়াতে চঞ্চল হয়ে ওঠে, কুমার-সভার সে যোগ্য নয়।

শ্রীশ। এখানকার সীমানা-রক্ষার জন্য পাকা ইঁটের দেওয়ালের মতো অচল পদার্থ চাই। ওই পর্দাটা ভালো ঠেকছে না।

পূর্ণ। তোমাদের কথাগুলো কিছু রহস্যময় শোনাচ্ছে।

বিপিন। সে কথা ঠিক। রহস্য পদার্থটাই সর্বনেশে। চিরকুমারদের সকলের চেয়ে যে বড়ো শত্রু পর্দা-বেষ্টনীর মধ্যেই তার বাস।

শ্রীশ। আমাদের ব্রত হচ্ছে পর্দাটাকে আক্রমণ করা, তাকে ছিন্ন করে ফেলা। পর্দার ছায়ায় ছায়ায় ফেরে যে মায়ামৃগী আলো ফেললেই মরীচিকার মতো সে মিলিয়ে যাবে।

পূর্ণ। শ্রীশবাবু, মরীচিকা মেলাতে পারে, কিন্তু তৃষ্ণা তো মেলায় না।

শ্রীশ। কেন মেলাবে। ওটা থাকা চাই। তৃষ্ণা না থাকলে আমাদের ছোটাবে কিসে। কেবল জানা দরকার কোন্ পথে ছুটলে ফল পাওয়া যাবে।

নেপথ্যে গান। ওগো, তোরা কে যাবি পারে।

বিপিন। একটু আস্তে। গান শুনতে পাচ্ছ না? খাসা গান বটে।

পূর্ণ। ওই গানটাও কি পর্দা নয়। ওর আড়ালে যে রহস্য গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে পথে বিপথে ছোটাবার ক্ষমতা তারও আছে।

বিপিন। থাক্ ভাই। তত্ত্বকথাটা এখন থাক্। একটু শুনতে দাও। খুব কাছের বাড়ি থেকেই গানটা আসছে, শুনেছি অক্ষয়বাবুর বাসা ওইখানেই।

শ্রীশ। গানের কথাটা বেশ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

নেপথ্যে গান

ওগো, তোরা কে যাবি পারে।
আমি তরী নিয়ে বসে আছি নদী-কিনারে।
ও পারেতে উপবনে কত খেলা কত জনে,
এ পারেতে ধু ধু মরু বারি বিনা রে।
এইবেলা বেলা আছে, আয় কে যাবি।
মিছে কেন কাটে কাল কত কী ভাবি।
সূর্য পাটে যাবে নেমে, সুবাতাস যাবে থেমে,
খেয়া বন্ধ হয়ে যাবে সন্ধ্যা-আঁধারে।

শ্রীশ। গানটা বোধ হচ্ছে যেন কুমার-সভাকেই ভয় দেখাবার গান। খেয়া বন্ধ হয়ে গেলেই তো মুশকিল।

বিপিন। ওই শুনলে না বললে— 'এ পারেতে ধূ ধূ মরু বারি বিনা যে' ?

পূর্ণ। তা হলে আর দেরি কেন। পারে যাবার জোগাড় করো।

শ্রীশ। গলাটা শুনে বোধ হচ্ছে পারে নিয়ে যাবে না, অতলে তলিয়ে দেবে।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

শ্রীশের বাসা

শ্রীশ তাহার বাসার দক্ষিণের বারান্দায় একখানা বড়ো হাতাওআলা কেদারার দুই হাতার উপর দুই পা তুলিয়া দিয়া শুক্লসন্ধ্যায় চুপচাপ বসিয়া সিগারেট ফুঁকিতেছিল। পাশে টিপায়ের উপর রেকাবিতে একটি গ্লাসে বরফ-দেওয়া লেমনেড ও স্তূপাকার কুন্দফুলের মালা

বিপিনের প্রবেশ

বিপিন। কী গো সন্ন্যাসীঠাকুর।

শ্রীশ। (উঠিয়া বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া) এখনও বুঝি ঝগড়া ভুলতে পার নি ? আচ্ছা ভাই শিশুপালক, তুমি কি সত্যি মনে কর আমি সন্ন্যাসী হতে পারি নে।

বিপিন। কেন পারবে না। কিন্তু অনেকগুলি তল্পিদার চেলা সঙ্গে থাকা চাই।

শ্রীশ। তার তাৎপর্য এই যে, কেউ বা আমার বেলফুলের মালা গেঁথে দেবে, কেউ বা বাজার থেকে লেমনেড ও বরফ ভিক্ষে করে আনবে, এই তো ? তাতে ক্ষতিটা কী। যে সন্ন্যাসধর্মে বেলফুলের প্রতি বৈরাগ্য এবং ঠাণ্ডা লেমনেডের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মায় সেটা কি খুব উঁচু দরের সন্ন্যাস।

বিপিন। সাধারণ ভাষায় তো সন্ন্যাসধর্ম বলতে সেই রকমটাই বোঝায়।

শ্রীশ। ওই শোনো, তুমি কি মনে কর ভাষায় একটা কথার একটা বৈ অর্থ নেই। একজনের কাছে সন্ন্যাসী কথাটার যে অর্থ আর-একজনের কাছেও যদি ঠিক সেই অর্থই হয়, তা হলে মন ব'লে একটা স্বাধীন পদার্থ আছে কী করতে।

বিপিন। তোমার মন সন্ন্যাসী কথাটার কী অর্থ করছেন আমার মন সেইটি শোনবার জন্ম উৎসুক হয়েছেন।

শ্রীশ। আমার সন্ন্যাসীর সাজ এইরকম— গলায় ফুলের মালা, গায়ে চন্দন, কানে কুণ্ডল, মুখে হাস্ত। আমার সন্ন্যাসীর কাজ মানুষের চিত্ত-আকর্ষণ। সুন্দর চেহারা, মিষ্টি গলা, বক্তৃতায় অধিকার, এ-সমস্ত না থাকলে সন্ন্যাসী হয়ে উপযুক্ত ফল পাওয়া

যায় না। রুচি বুদ্ধি কার্যক্ষমতা ও প্রফুল্লতা, সকল বিষয়েই আমার সন্ন্যাসীসম্প্রদায়কে গৃহস্থের আদর্শ হতে হবে।

বিপিন। অর্থাৎ, একদল কার্তিককে ময়ূরের উপর চড়ে রাস্তায় বেরোতে হবে।

শ্রীশ। ময়ূর না পাওয়া যায় ট্রাম আছে, পদব্রজেও নারাজ নই। কুমার-সভা মানেই তো কার্তিকের সভা। কিন্তু কার্তিক কি কেবল সুপুরুষ ছিলেন। তিনিই ছিলেন স্বর্গের সেনাপতি।

বিপিন। লড়াইয়ের জন্যে তাঁর দুটিমাত্র হাত, কিন্তু বক্তৃতা করবার জন্যে তাঁর তিন-জোড়া মুখ।

শ্রীশ। এর থেকে প্রমাণ হয় আমাদের আর্য পিতামহরা বাহুবল অপেক্ষা বাক্য-বলকে তিনগুণ বেশি বলেই জানতেন। আমিও পালোয়ানিকে বীরত্বের আদর্শ বলে মানি নে।

বিপিন। ওটা বুঝি আমার উপর হল ?

শ্রীশ। ওই দেখো। মানুষকে অহংকারে কী রকম মাটি করে। তুমি ঠিক করে রেখেছ, পালোয়ান বললেই তোমাকে বলা হল। তুমি কলিযুগের ভীমসেন। আচ্ছা, এসো, যুদ্ধং দেহি। একবার বীরত্বের পরীক্ষা হয়ে যাক।

এই বলিয়া দুই বন্ধু ক্ষণকালের জন্য লীলাচ্ছলে হাত-কাড়াকাড়ি করিতে লাগিল
বিপিন হঠাৎ 'এইবার ভীমসেনের পতন' বলিয়া ধপ করিয়া শ্রীশের কেদারাটা অধিকার করিয়া তাহার উপরে দুই পা তুলিয়া দিল এবং 'উঃ অসহ্য তৃষ্ণা' বলিয়া লেমনেডের গ্লাসটি এক নিশ্বাসে খালি করিল তখন শ্রীশ তাড়াতাড়ি কুন্দফুলের মালাটি সংগ্রহ করিয়া 'কিন্তু বিজয়মাল্যটি আমার' বলিয়া সেটা মাথায় জড়াইল এবং বেতের মোড়াটার উপরে বসিয়া পড়িল

শ্রীশ। আচ্ছা ভাই, সত্যি বলো, একদল শিক্ষিত লোক যদি এই রকম সংসার পরিত্যাগ ক'রে পরিপাটি সজ্জায়, প্রফুল্ল প্রসন্ন মুখে, গানে এবং বক্তৃতায় ভারতবর্ষের চতুর্দিকে শিক্ষা বিস্তার করে বেড়ায় তাতে উপকার হয় কি না।

বিপিন। আইডিয়াটা ভালো বটে।

শ্রীশ। অর্থাৎ, শুনতে সুন্দর, কিন্তু করতে অসাধ্য। আমি বলছি অসাধ্য নয় এবং আমি দৃষ্টান্ত দ্বারা তার প্রমাণ করব। ভারতবর্ষে সন্ন্যাসধর্ম বলে একটা প্রকাণ্ড শক্তি আছে; তার ছাই ঝেড়ে, তার ঝুলিটা কেড়ে নিয়ে, তার জটা মুড়িয়ে, তাকে সৌন্দর্যে এবং কর্মনিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত করাই চিরকুমার-সভার একমাত্র উদ্দেশ্য। ছেলে পড়ানো এবং দেশলাইয়ের কাঠি তৈরি করবার জন্যে আমাদের মতো লোক চিরজীবনের ব্রত অবলম্বন করে নি। বলো বিপিন, তুমি আমার প্রস্তাবে রাজি আছ কি না।

বিপিন। তোমার সন্ন্যাসীর যেরকম চেহারা গলা এবং আসবাবের প্রয়োজন আমার তো তার কিছুই নেই। তবে তল্পিদার হয়ে পিছনে যেতে রাজি আছি। কানে যদি সোনার কুণ্ডল, অন্তত চোখে যদি সোনার চশমাটা প'রে যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াও তা হলে-একটা প্রহরীর দরকার, সে কাজটা আমার দ্বারা কতকটা চলতে পারবে।

শ্রীশ। আবার ঠাট্টা।

বিপিন। না ভাই, ঠাট্টা নয়। আমি সত্যিই বলছি, তোমার প্রস্তাবটাকে যদি সম্ভবপর করে তুলতে পার তা হলে খুব ভালোই হয়। তবে এরকম একটা সম্প্রদায়ে সকলেরই কাজ সমান হতে পারে না, যার যেমন স্বাভাবিক ক্ষমতা সেই অনুসারে যোগ দিতে পারে।

শ্রীশ। সে তো ঠিক কথা। কেবল একটি বিষয়ে আমাদের খুব দৃঢ় হতে হবে, স্ত্রীজাতির কোনো সংস্রব রাখব না।

বিপিন। মাল্যচন্দন অঙ্গদকুণ্ডল সবই রাখতে চাও, কেবল ওই একটা বিষয়ে এত বেশি দৃঢ়তা কেন?

শ্রীশ। ওইগুলো রাখছি ব'লেই দৃঢ়তা। যেজন্যে চৈতন্য তাঁর অনুচরদের স্ত্রীলোকের সঙ্গ থেকে কঠিন শাসনে দূরে রেখেছিলেন। তাঁর ধর্ম অনুরাগ এবং সৌন্দর্যের ধর্ম, সেজন্যেই তার পক্ষে প্রলোভনের ফাঁদ অনেক ছিল।

বিপিন। তা হলে ভয়টুকুও আছে।

শ্রীশ। আমার নিজের জন্যে লেশমাত্র নেই। আমি আমার মনকে পৃথিবীর বিচিত্র সৌন্দর্যে ব্যাপ্ত করে রেখে দিই, কোনো একটা ফাঁদে আমাকে ধরে কার সাধ্য? কিন্তু তোমরা যে দিনরাত্রি ফুটবল টেনিস ক্রিকেট নিয়ে থাক, তোমরা একবার পড়লে ব্যাট্‌বল গুলিডাণ্ডা সবসুদ্ধ ঘাড়-মোড় ভেঙে পড়বে।

বিপিন। আচ্ছা ভাই, সময় উপস্থিত হলে দেখা যাবে।

শ্রীশ। ও কথা ভালো নয়। সময় উপস্থিত হবে না, সময় উপস্থিত হতে দেব না সময় তো রথে চড়ে আসেন না, আমরা তাঁকে ঘাড়ে করে নিয়ে আসি; কিন্তু তুমি যে সময়টার কথা বলছ তাকে বাহন-অভাবে ফিরতেই হবে।

পূর্ণবাবুর প্রবেশ

উভয়ে। এসো পূর্ণবাবু।

বিপিন তাহাকে কেদারাটা ছাড়িয়া দিয়া একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিল

পূর্ণ। তোমাদের এই বারান্দায় জ্যোৎস্নাটি তো মন্দ রচনা কর নি, মাঝে মাঝে থামের ছায়া ফেলে ফেলে সাজিয়েছ ভালো।

শ্রীশ। ছাদের উপর জ্যোৎস্না রচনা করা প্রভৃতি কতকগুলি অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা জন্মাবার পূর্ব হতেই আমার আছে। কিন্তু দেখো পূর্ণবাবু, ওই দেশালাই করা-টরা ওগুলো আমার ভালো আসে না।

পূর্ণ। (ফুলের মালার দিকে চাহিয়া) সন্ন্যাসধর্মেই কি তোমার অসামান্য দখল আছে নাকি।

শ্রীশ। সেই কথাই তো হচ্ছিল। সন্ন্যাসধর্ম তুমি কাকে বল শুনি।

পূর্ণ। যে ধর্মে দর্জি ধোবা নাপিতের কোনো সহায়তা নিতে হয় না, তাঁতিকে একেবারেই অগ্রাহ্য করতে হয় পিয়ার্স্ সোপের বিজ্ঞাপনের দিকে দৃক্‌পাত করতে হয় না—

শ্রীশ। আরে ছিঃ, সে সন্ন্যাসধর্ম তো বুড়ো হয়ে মরে গেছে। এখন নবীন সন্ন্যাসী ব'লে একটা সম্প্রদায় গড়তে হবে—

পূর্ণ। বিদ্যাসুন্দরের যাত্রায় যে নবীন সন্ন্যাসী আছেন তিনি মন্দ দৃষ্টান্ত নন, কিন্তু তিনি তো চিরকুমার-সভার বিধানমতে চলেন নি।

শ্রীশ। যদি চলতেন তা হলে তিনিই ঠিক দৃষ্টান্ত হতে পারতেন। সাজে সজ্জায় বাক্যে আচরণে সুন্দর এবং সুনিপুণ হতে হবে—

পূর্ণ। কেবল রাজকন্যার দিক থেকে দৃষ্টি নামাতে হবে। এই তো? বিনি সুতার মালা গাঁথতে হবে, কিন্তু সে মালা পরাতে হবে কার গলায় হে।

শ্রীশ। স্বদেশের। কথাটা কিছু উচ্চ শ্রেণীর হয়ে পড়ল, কী করব বলো, মালিনী মাসি এবং রাজকুমারী একেবারেই নিষিদ্ধ— কিন্তু ঠাট্টা নয় পূর্ণবাবু—

পূর্ণ। ঠাট্টার মতো মোটেই শোনাচ্ছে না— ভয়ানক কড়া কথা, একেবারে খট্‌খটে শুকনো।

শ্রীশ। আমাদের চিরকুমার-সভা থেকে এমন একটি সন্ন্যাসীসম্প্রদায় গঠন করতে হবে যারা রুচি শিক্ষা ও কর্মে সকল গৃহস্থের আদর্শ হবে। যারা সংগীত প্রভৃতি কলাবিদ্যায় অদ্বিতীয় হবে, আবার লাঠি তলোয়ার -খেলা, ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক লক্ষ্য করায় পারদর্শী হবে—

পূর্ণ। অর্থাৎ, মনোহরণ এবং প্রাণহরণ দুই কর্মেই মজবুত হবে। পুরুষ দেবী-চৌধুরানীর দল আর-কি।

শ্রীশ। বঙ্কিমবাবু আমার আইডিয়াটা পূর্বে হতেই চুরি করে রেখেছেন, কিন্তু ওটাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের নিজের করে নিতে হবে।

পূর্ণ। সভাপতিমশায় কী বলেন।

শ্রীশ। তাঁকে ক দিন ধরে বুঝিয়ে বুঝিয়ে আমার দলে টেনে নিয়েছি। কিন্তু, তিনি তাঁর দেশালাইয়ের কাঠি ছাড়েন নি। তিনি বলেন, সন্ন্যাসীরা কৃষিতত্ত্ব বস্তুতত্ত্ব প্রভৃতি শিখে গ্রামে গ্রামে চাষাদের শিখিয়ে বেড়াবে, এক টাকা ক'রে শেয়ার নিয়ে একটা ব্যাঙ্ক্ খুলে বড়ো বড়ো পল্লীতে নূতন নিয়মে এক-একটা দোকান বসিয়ে আসবে— ভারতবর্ষের চারি দিকে বাণিজ্যের জাল বিস্তার করে দেবে। তিনি খুব মেতে উঠেছেন।

পূর্ণ। বিপিনবাবুর কী মত।

বিপিন। যদিচ আমি নিজেকে শ্রীশের নবীন সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের আদর্শ পুরুষ ব'লে জ্ঞান করি নে, কিন্তু দল যদি গড়ে ওঠে তো আমিও সন্ন্যাসী সাজতে রাজি আছি।

পূর্ণ। কিন্তু সাজতে খরচ আছে মশায়। কেবল কৌপীন নয় তো, অঙ্গদ কুণ্ডল আভরণ কুন্তলীন দেলখোশ—

শ্রীশ। পূর্ণবাবু, ঠাট্টাই কর আর যাই কর চিরকুমার-সভা সন্ন্যাসীসভা হবেই। আমরা এক দিকে কঠোর আত্মত্যাগ করব, অন্য দিকে মনুষ্যত্বের কোনো উপকরণ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করব না। আমরা কঠিন শৌর্য এবং ললিত সৌন্দর্য উভয়কেই সমান আদরে বরণ করব, সেই দুরূহ সাধনায় ভারতবর্ষে নবযুগের আবির্ভাব হবে—

পূর্ণ। বুঝেছি শ্রীশবাবু— কিন্তু নারী কি মনুষ্যত্বের একটা সর্বপ্রধান উপকরণের মধ্যে গণ্য নয়। এবং তাঁকে উপেক্ষা করলে ললিত সৌন্দর্যের প্রতি কি সমাদর রক্ষা হবে। তার কী উপায় করলে।

শ্রীশ। নারীর একটা দোষ. নরজাতিকে তিনি লতার মতো বেষ্টন করে ধরেন। যদি তাঁর দ্বারা বিজড়িত হবার আশঙ্কা না থাকত, যদি তাঁকে রক্ষা করেও স্বাধীনতা রক্ষা করা যেত, তা হলে কোনো কথা ছিল না। কাজে যখন জীবন উৎসর্গ করতে হবে তখন কাজের সমস্ত বাধা দূর করতে চাই— পাণিগ্রহণ করে ফেললে নিজের পাণিকেও বদ্ধ করে ফেলতে হবে, সে হলে চলবে না পূর্ণবাবু।

পূর্ণ। ব্যস্ত হোয়ো না ভাই, আমি আমার শুভবিবাহে তোমাদের নিমন্ত্রণ করতে আসি নি। কিন্তু ভেবে দেখো দেখি. মনুষ্যজন্ম আর পাব কি না সন্দেহ, অথচ হৃদয়কে চিরজীবন যে পিপাসার জল থেকে বঞ্চিত করতে যাচ্ছি তার পূরণস্বরূপ আর কোথাও আর কিছু জুটবে কি। মুসলমানের স্বর্গে হুরী আছে, হিন্দুর স্বর্গেও অপ্সরার অভাব নেই, চিরকুমার-সভার স্বর্গে সভাপতি এবং সভ্যমহাশয়দের চেয়ে মনোরম আর-কিছু পাওয়া যাবে কি।

শ্রীশ। পূর্ণবাবু বল কী। তুমি যে—

পূর্ণ। ভয় নেই ভাই, এখনও মরিয়া হয়ে উঠি নি। তোমার এই ছাদ-ভরা জ্যোৎস্না আর ওই ফুলের গন্ধ কি কৌমার্যব্রত-রক্ষার সহায়তা করবার জন্যে সৃষ্টি হয়েছে। মনের মধ্যে মাঝে মাঝে যে বাষ্প জমে আমি সেটাকে উচ্ছ্বসিত করে দেওয়াই ভালো বোধ করি; চেপে রেখে নিজেকে ভোলাতে গেলে কোন্‌দিন চিরকুমারব্রতের লোহার বয়লারখানা ফেটে যাবে। যাই হোক্‌, যদি সন্ন্যাসী হওয়াই স্থির কর তো আমিও যোগ দেব— কিন্তু আপাতত সভাটাকে তো রক্ষা করতে হবে।

শ্রীশ। কেন? কী হয়েছে?

পূর্ণ। অক্ষয়বাবু আমাদের সভাকে যে স্থানান্তর করবার ব্যবস্থা করছেন, এটা আমার ভালো ঠেকছে না।

শ্রীশ। সন্দেহ জিনিসটা নাস্তিকতার ছায়া। মন্দ হবে, ভেঙে যাবে, নষ্ট হবে, এ-সব ভাব আমি কোনো অবস্থাতেই মনে স্থান দিই নে। ভালোই হবে, যা হচ্ছে বেশ হচ্ছে, চিরকুমার-সভার উদার বিস্তীর্ণ ভবিষ্যৎ আমি চোখের সম্মুখে দেখতে পাচ্ছি— অক্ষয়বাবু সভাকে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে তার কী অনিষ্ট করতে পারেন। কেবল গলির এক নম্বর থেকে আর-এক নম্বরে নয়, আমাদের যে পথে-পথে দেশে-দেশে সঞ্চরণ করে বেড়াতে হবে। সন্দেহ শঙ্কা উদ্‌বেগ এগুলো মন থেকে দূর করে দাও পূর্ণবাবু— বিশ্বাস এবং আনন্দ না হলে বড়ো কাজ হয় না।

বিপিন। দিনকতক দেখাই যাক-না। যদি কোনো অসুবিধার কারণ ঘটে তা হলে স্বস্থানে ফিরে আসা যাবে— আমাদের সেই অন্ধকার বিবরটি ফস্‌ করে কেউ কেড়ে নিচ্ছে না।

অকস্মাৎ চন্দ্রমাধববাবুর সবেগে প্রবেশ। তিনজনের সসম্ভ্রমে উত্থান

চন্দ্রবাবু। দেখো, আমি সেই কথাটা ভাবছিলুম—

শ্রীশ। বসুন।

চন্দ্রবাবু। না না, বসব না, আমি এখনই যাচ্ছি। আমি বলছিলুম, সন্ন্যাসব্রতের জন্যে আমাদের এখন থেকে প্রস্তুত হতে হবে। হঠাৎ একটা অপঘাত ঘটলে, কিম্বা সাধারণ জ্বরজ্বালায়, কিরকম চিকিৎসা সে আমাদের শিক্ষা করতে হবে— ডাক্তার রামরতনবাবু ফি রবিবারে আমাদের দু ঘণ্টা করে বক্তৃতা দেবেন বন্দোবস্ত করে এসেছি।

শ্রীশ। কিন্তু, তাতে অনেক বিলম্ব হবে না?

চন্দ্রবাবু। বিলম্ব তো হবেই, কাজটি তো সহজ নয়। কেবল তাই নয়— আমাদের কিছু কিছু আইন অধ্যয়নও দরকার। অবিচার অত্যাচার থেকে রক্ষা করা এবং কার কতদূর অধিকার সেটা চাষাভুষোদের বুঝিয়ে দেওয়া আমাদের কাজ।

শ্রীশ। চন্দ্রবাবু, বসুন—

চন্দ্রবাবু। না শ্রীশবাবু, বসতে পারছি নে; আমার একটু কাজ আছে। আর-একটি আমাদের করতে হচ্ছে— গোরুর গাড়ি, ঢেঁকি, তাঁত প্রভৃতি আমাদের দেশী অত্যাবশ্যক জিনিসগুলিকে একটু-আধটু সংশোধন করে যাতে কোনো অংশে তাদের সস্তা বা মজবুত বা বেশি উপযোগী করে তুলতে পারি সে চেষ্টা আমাদের করতে হবে। এবার গ্রীষ্মের অবকাশে কেদারবাবুদের কারখানায় গিয়ে প্রত্যহ আমাদের কতকগুলি পরীক্ষা করা চাই।

শ্রীশ। চন্দ্রবাবু, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন—

চৌকি অগ্রসর-করণ

চন্দ্রবাবু। না না, আমি এখনই যাচ্ছি। দেখো, আমার মত এই যে, এই-সমস্ত গ্রামের ব্যবহার্য সামান্য জিনিসগুলির যদি আমরা কোনো উন্নতি করতে পারি তা হলে তাতে করে চাষাদের মনের মধ্যে যেরকম আন্দোলন হবে বড়ো বড়ো সংস্কারকার্যেও তেমন হবে না। তাদের সেই চিরকালের ঢেঁকি-ঘানির কিছু পরিবর্তন করতে পারলে তবে তাদের সমস্ত মন সজাগ হয়ে উঠবে, পৃথিবী যে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই এ তারা বুঝতে পারবে—

শ্রীশ। চন্দ্রবাবু, বসবেন না কি।

চন্দ্রবাবু। থাক্-না। একবার ভেবে দেখো, আমরা যে এতকাল ধরে শিক্ষা পেয়ে আসছি, উচিত ছিল আমাদের ঢেঁকি কুলো থেকে তার পরিচয় আরম্ভ হওয়া। বড়ো বড়ো কল-কারখানা তো দূরের কথা, ঘরের মধ্যেই আমাদের সজাগ দৃষ্টি পড়ল না। আমাদের হাতের কাছে যা আছে আমরা না তার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলুম, না তার সম্বন্ধে চিন্তা করলুম। যা ছিল তা তেমনিই রয়ে গেছে। মানুষ অগ্রসর হচ্ছে অথচ তার জিনিসপত্র পিছিয়ে থাকছে, এ কখনো হতেই পারে না। আমরা পড়েই আছি— ইংরেজ আমাদের কাঁধে করে বহন করছে, তাকে এগোনো বলে না। ছোটোখাটো সামান্য গ্রাম্য জীবনযাত্রা পল্লীগ্রামের পঙ্কিল পথের মধ্যে বদ্ধ হয়ে অচল হয়ে আছে, আমাদের সন্ন্যাসীসম্প্রদায়কে সেই গোরুর গাড়ির চাকা ঠেলতে হবে— কলের গাড়ির চালক হবার দুরাশা এখন থাক্।— ক'টা বাজল শ্রীশবাবু।

শ্রীশ। সাড়ে আটটা বেজে গেছে।

চন্দ্রবাবু। তা হলে আমি যাই। কিন্তু এই কথা রইল, আমাদের এখন অন্য-সমস্ত আলোচনা ছেড়ে নিয়মিত শিক্ষাকার্যে প্রবৃত্ত হতে হবে এবং—

পূর্ণ। আপনি যদি একটু বসেন চন্দ্রবাবু, তা হলে আমার দুই-একটা কথা বলবার আছে—

চন্দ্রবাবু। না, আজ আর সময় নেই—

পূর্ণ। বেশি কিছু নয়, আমি বলছিলুম আমাদের সভা—

চন্দ্রবাবু। সে কথা কাল হবে পূর্ণবাবু।

পূর্ণ। কিন্তু কালই তো সভা বসছে—

চন্দ্রবাবু। আচ্ছা, তা হলে পরশু। আমার সময় নেই—

পূর্ণ। দেখুন, অক্ষয়বাবু যে—

চন্দ্রবাবু। পূর্ণবাবু, আমাকে মাপ করতে হবে, আজ দেরি হয়ে গেছে।— কিন্তু দেখো, আমার একটা কথা মনে হচ্ছিল যে, চিরকুমার-সভা যদি ক্রমে বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ে তা হলে আমাদের সকল সভ্যই কিছু সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যেতে পারবেন না, অতএব ওর মধ্যে দুটি বিভাগ রাখা দরকার হবে -

পূর্ণ। স্থাবর এবং জঙ্গম।

চন্দ্রবাবু। তা সে যে নামই দাও। তা ছাড়া অক্ষয়বাবু সেদিন একটি কথা যা বললেন সেও আমার মন্দ লাগল না। তিনি বলেন, চিরকুমার-সভার সংস্রবে আর একটি সভা রাখা উচিত যাতে বিবাহিত এবং বিবাহ-সংকল্পিত লোকদের নেওয়া যেতে পারে। গৃহী লোকদেরও তো দেশের প্রতি কর্তব্য আছে। সকলেরই সাধ্যমতো কোনো না কোনো হিতকর কাজে নিযুক্ত থাকতে হবে— এইটে হচ্ছে সাধারণ ব্রত। আমাদের এক দল কুমারব্রত ধারণ করে দেশে দেশে বিচরণ করবেন, একদল কুমারব্রত ধারণ করে এক জায়গায় স্থায়ী হয়ে বসে কাজ করবেন, আর-এক দল গৃহী নিজ নিজ রুচি ও সাধ্য -অনুসারে একটা কোনো প্রয়োজনীয় কাজ অবলম্বন করে দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করবেন। যাঁরা পর্যটক-সম্প্রদায়ভুক্ত হবেন তাঁদের ম্যাপ-প্রস্তুত, জরিপ, ভূতত্ত্ববিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, প্রাণীতত্ত্ব প্রভৃতি শিখতে হবে; তাঁরা যে দেশে যাবেন সেখানকার সমস্ত তথ্য তন্ন তন্ন করে সংগ্রহ করবেন— তা হলেই ভারতবর্ষীয়ের দ্বারা ভারতবর্ষের যথার্থ বিবরণ লিপিবদ্ধ হবার ভিত্তি স্থাপিত হতে পারবে, হণ্টার সাহেবের উপরেই নির্ভর করে কাটাতে হবে না—

পূর্ণ। চন্দ্রবাবু, যদি বসেন তা হলে একটা কথা—

চন্দ্রবাবু। না, আমি বলছিলুম, যেখানে যেখানে যাব সেখানকার ঐতিহাসিক জনশ্রুতি এবং পুরাতন পুঁথি সংগ্রহ করা আমাদের কাজ হবে; শিলালিপি তাম্রশাসন এগুলোও সন্ধান করতে হবে— অতএব প্রাচীন-লিপি-পরিচয়টাও আমাদের কিছুদিন অভ্যাস করা আবশ্যক।

পূর্ণ। সে-সব তো পরের কথা, আপাতত—

চন্দ্রবাবু। না না, আমি বলছি নে সকলকেই সব বিদ্যা শিখতে হবে, তা হলে কোনো কালে শেষ হবে না। অভিরুচি-অনুসারে ওর মধ্যে আমরা কেউ বা একটা কেউ বা দুটো-তিনটে শিক্ষা করব—

শ্রীশ। কিন্তু, তা হলেও—

চন্দ্রবাবু। ধরো, পাঁচ বছর। পাঁচ বছরে আমরা প্রস্তুত হয়ে বেরোতে পারব। যারা চিরজীবনের ব্রত গ্রহণ করবে, পাঁচ বছর তাদের পক্ষে কিছুই নয়। তা ছাড়া এই পাঁচ বছরেই আমাদের পরীক্ষা হয়ে যাবে; যাঁরা টিঁকে থাকতে পারবেন তাঁদের সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ থাকবে না।

পূর্ণ। কিন্তু দেখুন, আমাদের সভাটা যে স্থানান্তর করা হচ্ছে—

চন্দ্রবাবু। না পূর্ণবাবু, আজ আর কিছুতেই না, আমার অত্যন্ত জরুরি কাজ আছে। পূর্ণবাবু, আমার কথাগুলো ভালো করে চিন্তা করে দেখো। আপাতত মনে হতে পারে অসাধ্য, কিন্তু তা নয়। দুঃসাধ্য বটে— তা, ভালো কাজ মাত্রই দুঃসাধ্য। আমরা যদি পাঁচটি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক পাই তা হলে আমরা যা কাজ করব তা চিরকালের জন্য ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করে দেবে।

শ্রীশ। কিন্তু, আপনি যে বলছিলেন গোরুর গাড়ির চাকা প্রভৃতি ছোটো ছোটো জিনিস—

চন্দ্রবাবু। ঠিক কথা, আমি তাকেও ছোটো মনে করে উপেক্ষা করি নে এবং বড়ো কাজকেও অসাধ্য জ্ঞান করে ভয় করি নে—

পূর্ণ। কিন্তু, সভার অধিবেশন সম্বন্ধেও—

চন্দ্রবাবু। সে-সব কথা কাল হবে পূর্ণবাবু। আজ তবে চললুম। [প্রস্থান

বিপিন। ভাই শ্রীশ, চুপচাপ যে। এক মাতালের মাৎলামি দেখে অন্য মাতালের নেশা ছুটে যায়। চন্দ্রবাবুর উৎসাহে তোমাকে সুদ্ধ দমিয়ে দিয়েছে।

শ্রীশ। না হে, অনেক ভাববার কথা আছে। উৎসাহ কি সব সময়ে কেবল বকাবকি করে। কখনো বা একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে থাকে, সেইটেই হল সাংঘাতিক অবস্থা।

বিপিন। পূর্ণবাবু, হঠাৎ পালাচ্ছ যে ?

পূর্ণ। সভাপতিমশায়কে রাস্তায় ধরতে যাচ্ছি, পথে যেতে যেতে যদি দৈবাৎ আমার দুটো-একটা কথায় কর্ণপাত করেন।

বিপিন। ঠিক উল্টো হবে। তাঁর যে-ক'টা কথা বাকি আছে সেইগুলো তোমাকে শোনাতে শোনাতে কোথায় যাবার আছে সে কথা ভুলেই যাবেন।

বনমালীর প্রবেশ

বনমালী। ভালো আছেন শ্রীশবাবু? বিপিনবাবু ভালো তো? এই-যে পূর্ণবাবুও আছেন দেখছি। তা, বেশ হয়েছে। আমি অনেক ব'লে ক'য়ে সেই কুমারটুলির পাত্রী দুটিকে ঠেকিয়ে রেখেছি।

শ্রীশ। কিন্তু আমাদের আর ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন না। আমরা একটা গুরুতর কিছু করে ফেলব।

পূর্ণ। আপনারা বসুন শ্রীশবাবু। আমার একটা কাজ আছে।

বিপিন। তার চেয়ে আপনি বসুন পূর্ণবাবু। আপনার কাজটা আমরা দুজনে মিলে সেরে দিয়ে আসছি।

পূর্ণ। তার চেয়ে তিন জনে মিলে সারাই তো ভালো।

বনমালী। আপনারা ব্যস্ত হচ্ছেন দেখছি। আচ্ছা, তা আর-এক সময় আসব।

তৃতীয় দৃশ্য

চন্দ্রবাবুর বাড়ি

চন্দ্রমাধববাবু, নির্মলা

চন্দ্রবাবু। নির্মল।

নির্মলা। কী মামা।

চন্দ্রবাবু। নির্মল, আমার গলার বোতামটা খুঁজে পাচ্ছি নে।

নির্মলা। বোধ হয় ওইখানেই কোথাও আছে।

চন্দ্রবাবু। (নিশ্চিন্তভাবে) একবার খুঁজে দেখো তো ফেনি।

নির্মলা। তুমি কোথায় কী ফেল আমি কি খুঁজে বের করতে পারি!

চন্দ্রবাবু। (মনে একটুখানি সন্দেহের সঞ্চার হওয়ায়, স্নিগ্ধকণ্ঠে) তুমিই তো পার নির্মল। আমার সমস্ত ত্রুটি সম্বন্ধে এত ধৈর্য আর কার আছে?

নির্মলার রুদ্ধ অভিমান চন্দ্রবাবুর স্নেহস্বরে অকস্মাৎ অশ্রুজলে বিগলিত হইবার উপক্রম করিল— নিঃশব্দে সম্বরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া চন্দ্রমাধববাবু নির্মলার কাছে আসিলেন। নির্মলার মুখখানি দুই আঙুল দিয়া তুলিয়া ধরিয়া ক্ষণকাল দেখিলেন

(মৃদুহাস্যে) নির্মল আকাশে একটুখানি মালিন্য দেখছি যেন। কী হয়েছে বলো দেখি।

নির্মলা। (ক্ষুব্ধস্বরে) এতদিন পরে আমাকে তোমাদের চিরকুমার-সভা থেকে বিদায় দিচ্ছ কেন। আমি কী করেছি।

চন্দ্রবাবু। (আশ্চর্য হইয়া) চিরকুমার-সভা থেকে তোমাকে বিদায় ? তোমার সঙ্গে সে সভার যোগ কী।

নির্মলা। দরজার আড়ালে থাকলে বুঝি যোগ থাকে না ? অন্তত সেই যতটুকু যোগ তাই বা কেন যাবে।

চন্দ্রবাবু। নির্মল, তুমি তো এ সভার কাজ করবে না, যারা কাজ করবে তাদের সুবিধার প্রতি লক্ষ রেখেই—

নির্মলা। আমি কেন কাজ করব না। তোমার ভাগ্নে না হয়ে ভাগ্নী হয়ে জন্মেছি বলেই কি তোমাদের হিতকার্যে যোগ দিতে পারব না। তবে আমাকে এতদিন শিক্ষা দিলে কেন। নিজের হাতে আমার সমস্ত মন প্রাণ জাগিয়ে দিয়ে শেষকালে কাজের পথ রোধ করে দাও কী বলে।

চন্দ্রবাবু। নির্মল, এক সময়ে তো বিবাহ করে তোমাকে সংসারের কাজে প্রবৃত্ত হতে হবে, চিরকুমার-সভার কাজ—

নির্মলা। বিবাহ আমি করব না।

চন্দ্রবাবু। তবে কী করবে বলো।

নির্মলা। দেশের কাজে তোমার সাহায্য করব।

চন্দ্রবাবু। আমরা তো সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়েছি।

নির্মলা। ভারতবর্ষে কি কেউ কখনো সন্ন্যাসিনী হয় নি।

চন্দ্রমাধববাবু নিরুত্তর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন

মামা, যদি কোনো মেয়ে তোমাদের ব্রত-গ্রহণের জন্যে অন্তরের সঙ্গে প্রস্তুত হয় তবে প্রকাশ্যভাবে তোমাদের সভার মধ্যে কেন তাকে গ্রহণ করবে না। আমি তোমাদের কৌমার্যসভার কেন সভ্য না হব।

চন্দ্রবাবু। (দ্বিধাকুণ্ঠিতভাবে) অন্য যাঁরা সভ্য আছেন—

নির্মলা। যাঁরা সভ্য আছেন, যাঁরা ভারতবর্ষের হিতব্রত নেবেন, যাঁরা সন্ন্যাসী হতে যাচ্ছেন, তাঁরা কি একজন ব্রতধারিণী স্ত্রীলোককে অসংকোচে নিজের দলে গ্রহণ করতে পারবেন না। তা যদি হয় তা হলে তাঁরা গৃহী হয়ে ঘরে রুদ্ধ থাকুন, তাঁদের দ্বারা কোনো কাজ হবে না।

চন্দ্রমাধববাবু চুলগুলোর মধ্যে ঘন ঘন পাঁচ আঙুল চালাইয়া অত্যন্ত উস্কোখুস্কো করিয়া তুলিলেন
এমন সময় হঠাৎ তাঁহার আস্তিনের ভিতর হইতে হারানো বোতামটা মাটিতে পড়িয়া গেল
নির্মলা হাসিতে হাসিতে কুড়াইয়া লইয়া চন্দ্রমাধববাবুর কামিজের গলায় লাগাইয়া
দিল— চন্দ্রমাধববাবু তাহার কোনো খবর লইলেন না— চুলের মধ্যে
অঙ্গুলিচালনা করিতে করিতে মস্তিষ্ককুলায়ের চিন্তাগুলিকে বিব্রত
করিতে লাগিলেন। নির্মলার প্রস্থান

পূর্ণবাবুর প্রবেশ

পূর্ণ। চন্দ্রবাবু, সে কথাটা কি ভেবে দেখলেন। আমাদের সভাটিকে স্থানান্তর করা আমার বিবেচনায় ভালো হচ্ছে না।

চন্দ্রবাবু। আজ আর-একটি কথা উঠেছে, সেটা পূর্ণবাবু তোমার সঙ্গে ভালো করে আলোচনা করতে ইচ্ছা করি। আমার একটি ভাগ্নী আছেন বোধ হয় জান ?

পূর্ণ। (নিরীহভাবে) আপনার ভাগ্নী ?

চন্দ্রবাবু। হাঁ, তাঁর নাম নির্মলা। আমাদের চিরকুমার-সভার সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের খুব যোগ আছে।

পূর্ণ। (বিস্মিতভাবে) বলেন কী।

চন্দ্রবাবু। আমার বিশ্বাস, তার অনুরাগ এবং উৎসাহ আমাদের কারও চেয়ে কম নয়।

পূর্ণ। (উত্তেজিতভাবে) এ কথা শুনলে আমাদের উৎসাহ বেড়ে ওঠে। স্ত্রীলোক হয়ে তিনি—

চন্দ্রবাবু। আমিও সেই কথা ভাবছি, স্ত্রীলোকের সরল উৎসাহ পুরুষের উৎসাহে যেন নূতন প্রাণ সঞ্চার করতে পারে— আমি নিজেই সেটা আজ অনুভব করছি।

পূর্ণ। (আবেগপূর্ণভাবে) আমিও সেটা বেশ অনুমান করতে পারি।

চন্দ্রবাবু। পূর্ণবাবু, তোমারও কি ওই মত।

পূর্ণ। কী মত বলছেন ?

চন্দ্রবাবু। অর্থাৎ, যথার্থ অনুরাগী স্ত্রীলোক আমাদের কঠিন কর্তব্যের বাধা না হয়ে যথার্থ সহায় হতে পারেন।

পূর্ণ। (নেপথ্যের প্রতি লক্ষ করিয়া উচ্চকণ্ঠে) সে বিষয়ে আমার লেশমাত্র সন্দেহ নেই। স্ত্রীজাতির অনুরাগ পুরুষের অনুরাগের একমাত্র সজীব নির্ভর, তাঁদের উৎসাহে আমাদের উদ্দীপনা। পুরুষের উৎসাহকে নবজাত শিশুটির মতো মানুষ করে তুলতে পারে কেবল স্ত্রীলোকের উৎসাহ।

শ্রীশ ও বিপিনের প্রবেশ

শ্রীশ। তা তো পারে পূর্ণবাবু, কিন্তু, সেই উৎসাহের অভাবেই কি আজ সভায় যেতে বিলম্ব হচ্ছে।

চন্দ্রবাবু। না না, দেরি হবার কারণ, আমার গলার বোতামটা কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি নে।

শ্রীশ। গলায় তো একটা বোতাম লাগানো রয়েছে দেখতে পাচ্ছি, আরও কি প্রয়োজন আছে। যদি বা থাকে, আর ছিদ্র পাবেন কোথা।

চন্দ্রবাবু। (গলায় হাত দিয়া) তাই তো!— আমরা সকলেই তো উপস্থিত আছি এখন সেই কথাটার আলোচনা হয়ে যাওয়া ভালো, কী বল পূর্ণবাবু।

পূর্ণ। সে বেশ কথা, কিন্তু এ দিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে না?

চন্দ্রবাবু। না, এখনও সময় আছে। শ্রীশবাবু, তোমরা একটু বোসো-না, কথাটা একটু স্থির হয়ে ভেবে দেখবার যোগ্য। আমার একটি ভাগ্নী আছেন, তাঁর নাম নির্মলা—

পূর্ণ হঠাৎ কাশিয়া লাল হইয়া উঠিল

আমাদের কুমারসভার সমস্ত উদ্দেশ্যের সঙ্গে তাঁর একান্ত মনের মিল।

শ্রীশ এবং বিপিন অবিচলিত নিরুৎসুকভাবে শুনিয়া যাইতে লাগিল

এ কথা আমি নিশ্চয় বলতে পারি, তাঁর উৎসাহ আমাদের কারও চেয়ে কম নয়।

শ্রীশ ও বিপিনের কাছ হইতে কিছুমাত্র সাড়া না পাইয়া
চন্দ্রবাবুও মনে মনে একটু উত্তেজিত হইতেছিলেন

এ কথা আমি ভালোরূপ বিবেচনা করে দেখে স্থির করেছি, স্ত্রীলোকের উৎসাহ পুরুষের সমস্ত বৃহৎ কার্যের মহৎ অবলম্বন। কী বল পূর্ণবাবু?

পূর্ণ। (নিস্তেজভাবে) তা তো বটেই।

চন্দ্রবাবু। (হঠাৎ সবেগে) নির্মলা যদি কুমার-সভার সভ্য হবার জন্য প্রার্থী থাকে, তা হলে তাকে আমরা সভ্য না করব কেন।

পূর্ণ। বলেন কী চন্দ্রবাবু।

শ্রীশ। আমরা কখনো কল্পনা করি নি যে, কোনো স্ত্রীলোক আমাদের সভার সভ্য হতে ইচ্ছা প্রকাশ করবেন, সুতরাং এ সম্বন্ধে আমাদের কোনো নিয়ম নেই—

বিপিন। নিষেধও নেই।

শ্রীশ। স্পষ্ট নিষেধ না থাকতে পারে কিন্তু আমাদের সভার যে-সকল উদ্দেশ্য তা স্ত্রীলোকের দ্বারা সাধিত হবার নয়।

বিপিন। আমাদের সভার উদ্দেশ্য সংকীর্ণ নয়, এবং বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধন করতে গেলে বিচিত্র শ্রেণীর ও বিচিত্র শক্তির লোকের বিচিত্র চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া চাই। স্বদেশের হিতসাধন একজন স্ত্রীলোক যেরকম পারবেন তুমি সেরকম পারবে না, এবং তুমি যেরকম পারবে একজন স্ত্রীলোক সেরকম পারবেন না— অতএব সভার উদ্দেশ্যকে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণভাবে সাধন করতে গেলে তোমারও যেমন দরকার স্ত্রীসভ্যেরও তেমনি দরকার।

শ্রীশ। যারা কাজ করতে চায় না তারাই উদ্দেশ্যকে ফলাও করে তোলে। যথার্থ কাজ করতে গেলেই লক্ষ্যকে সীমাবদ্ধ করতে হয়। আমাদের সভার উদ্দেশ্যকে যত বৃহৎ মনে করে তুমি বেশ নিশ্চিন্ত আছ আমি তত বৃহৎ মনে করি নে।

বিপিন। আমাদের সভার কার্যক্ষেত্র অন্তত এতটা বৃহৎ যে তোমাকে গ্রহণ করেছে বলে আমাকে পরিত্যাগ করতে হয় নি এবং আমাকে গ্রহণ করেছে বলে তোমাকে পরিত্যাগ করতে হয় নি। তোমার আমার উভয়েরই যদি এখানে স্থান হয়ে থাকে, আমাদের দুজনেরই যদি এখানে উপযোগিতা ও আবশ্যকতা থাকে, তা হলে আরও একজন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের এখানে স্থান হওয়া এমন কী কঠিন।

শ্রীশ। উদারতা অতি উত্তম জিনিস, সে আমি নীতিশাস্ত্রে পড়েছি। আমি তোমার সেই উদারতাকে নষ্ট করতে চাই নে, বিভক্ত করতে চাই মাত্র। স্ত্রীলোকেরা যে কাজ করতে পারেন তার জন্যে তাঁরা স্বতন্ত্র সভা করুন, আমরা তার সভ্য হবার প্রার্থী হব না, এবং আমাদের সভাও আমাদেরই থাক্। নইলে আমরা পরস্পরের কাজের বাধা হব মাত্র। মাথাটা চিন্তা করে মরুক, উদরটা পরিপাক করতে থাক্— পাকযন্ত্রটি মাথার মধ্যে এবং মস্তিষ্কটি পেটের মধ্যে প্রবেশচেষ্টা না করলেই বস্।

বিপিন। কিন্তু তাই বলে মাথাটা ছিন্ন করে এক জায়গায় এবং পাকযন্ত্রটাকে আর এক জায়গায় রাখলেও কাজের সুবিধা হয় না।

শ্রীশ। (অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া) উপমা তো আর যুক্তি নয় যে সেটাকে খণ্ডন করলেই আমার কথাটাকে খণ্ডন করা হল উপমা কেবল খানিক দূর পর্যন্ত খাটে—

বিপিন। অর্থাৎ, যতটুকু কেবল তোমার যুক্তির পক্ষে খাটে।

পূর্ণ। (অত্যন্ত বিমনা হইয়া) বিপিনবাবু, আমার মত এই যে, আমাদের এই-সকল কাজে মেয়েরা অগ্রসর হয়ে এলে তাতে তাঁদের মাধুর্য নষ্ট হয়।

চন্দ্রবাবু। (একখানা বই চক্ষের অত্যন্ত কাছে ধরিয়া) মহৎ কার্যে যে মাধুর্য নষ্ট হয় সে মাধুর্য সযত্নে রক্ষা করবার যোগ্য নয়।

শ্রীশ। না চন্দ্রবাবু, আমি ও-সব সৌন্দর্য-মাধুর্যের কথা আনছিই নে। সৈন্যদের

মতো এক চালে আমাদের চলতে হবে, অনভ্যাস বা স্বাভাবিক দুর্বলতা -বশত যাঁদের পিছিয়ে পড়বার সম্ভাবনা আছে তাঁদের নিয়ে ভারগ্রস্ত হলে আমাদের সমস্তই ব্যর্থ হবে।

এমন সময় নির্মলা অকুণ্ঠিত মর্যাদার সহিত গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল হঠাৎ সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। অশ্রুপূর্ণ ক্ষোভে তাহার কণ্ঠস্বর আর্দ্র

নির্মলা। আপনাদের কী উদ্দেশ্য এবং আপনারা দেশের কাজে কত দূর পর্যন্ত যেতে প্রস্তুত আছেন তা আমি কিছুই জানি নে, কিন্তু আমি আমার মামাকে জানি— তিনি যে পথে যাত্রা করে চলেছেন আপনারা কেন আমাকে সে পথে তাঁর অনুসরণ করতে বাধা দিচ্ছেন।

শ্রীশ নিরুত্তর, পূর্ণ কুণ্ঠিত-অনুতপ্ত, বিপিন প্রশান্ত-গম্ভীর, চন্দ্রবাবু সুগম্ভীর চিন্তামগ্ন

নির্মলা। (পূর্ণ এবং শ্রীশের প্রতি অশ্রুজলস্নাত কটাক্ষপাত করিয়া) আমি যদি কাজ করতে চাই, যিনি আমার আশৈশবের গুরু মৃত্যু পর্যন্ত যদি সকল শুভচেষ্টায় তাঁর অনুবর্তিনী হতে ইচ্ছা করি, আপনারা কেবল তর্ক করে আমার অযোগ্যতা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন কেন। আপনারা আমাকে কী জানেন।

শ্রীশ স্তব্ধ। পূর্ণ ঘর্মাক্ত

নির্মলা। আমি আপনাদের কুমারসভা বা অন্য কোনো সভা জানি নে, কিন্তু যাঁর শিক্ষায় আমি মানুষ হয়েছি তিনি যখন কুমারসভাকে অবলম্বন করেই তাঁর জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য-সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তখন এই কুমারসভা থেকে আপনারা আমাকে দূরে রাখতে পারবেন না। (চন্দ্রবাবুর দিকে ফিরিয়া) তুমি যদি বল আমি তোমার কাজের যোগ্য নই তা হলে আমি বিদায় হব, কিন্তু এঁরা আমাকে কী জানেন। এঁরা কেন আমাকে তোমার অনুষ্ঠান থেকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্যে সকলে মিলে তর্ক করছেন।

শ্রীশ। (বিনীত মৃদুস্বরে) মাপ করবেন, আমি আপনার সম্বন্ধে কোনো তর্ক করি নি, আমি সাধারণত স্ত্রীজাতি সম্বন্ধেই বলছিলুম।

নির্মলা। আমি স্ত্রীজাতি পুরুষজাতির প্রভেদ নিয়ে কোনো বিচার করতে চাই নে— আমি নিজের অন্তঃকরণ জানি এবং যাঁর উন্নত দৃষ্টান্তকে আশ্রয় করে রয়েছি তাঁর অন্তঃকরণ জানি, কাজে প্রবৃত্ত হতে এর বেশি আমার আর কিছু জানবার দরকার নেই।

চন্দ্রবাবু নিজের দক্ষিণ করতল চোখের অত্যন্ত কাছে লইয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন
পূর্ণ খুব চমৎকার করিয়া একটা কিছু বলিবার ইচ্ছা করিল—
কিন্তু তাহার মুখ দিয়া কোনো কথাই বাহির হইল না

পূর্ণ। (মনে মনে অনেক আবৃত্তি করিয়া) দেবী, এই পঙ্কিল পৃথিবীর কাজে কেন আপনার পবিত্র দুইখানি হস্ত প্রয়োগ করতে চাচ্ছেন।

কথাটা মনে যেমন লাগিতেছিল মুখে তেমন শোনাইল না, পূর্ণ বলিয়াই বুঝিতে পারিল কথাটা গদ্যের মধ্যে পদ্যের মতো কিছু যেন বাড়াবাড়ি হইয়া পড়িল—
লজ্জায় তাহার কান লাল হইয়া উঠিল

বিপিন। (স্বাভাবিক সুগম্ভীর শান্ত স্বরে) পৃথিবী যত বেশি পঙ্কিল পৃথিবীর সংশোধনকার্য তত বেশি পবিত্র।

শ্রীশ। সভার অধিবেশনে স্ত্রীসভ্য লওয়া সম্বন্ধে নিয়ম-মতো প্রস্তাব উত্থাপন করে যা স্থির হয় আপনাকে জানাব।

নির্মলা এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল

চন্দ্র। (হঠাৎ) ফেনি, আমার সেই গলার বোতামটা?

নির্মলা। (সলজ্জ হাসিয়া মৃদুকণ্ঠে) গলাতেই আছে।

চন্দ্র। (গলায় হাত দিয়া) হাঁ হাঁ, আছে বটে।

তিন ছাত্রের দিকে চাহিয়া হাসিলেন

চতুর্থ দৃশ্য

অক্ষয়ের বাসা

নৃপবালা ও নীরবালা

নৃপবালা। আজকাল তুই মাঝে মাঝে কেন অমন গম্ভীর হচ্ছিস বল তো নীরু।

নীরবালা। আমাদের বাড়ির যত কিছু গাম্ভীর্য সব বুঝি তোর একলার? আমার খুশি আমি গম্ভীর হব।

নৃপবালা। তুই কী ভাবছিস আমি বেশ জানি।

নীরবালা। তোর অত আন্দাজ করবার দরকার কী ভাই। এখন তোর নিজের ভাব্‌না ভাববার সময় হয়েছে।

নৃপবালা। (নীরর গলা জড়াইয়া) তুই ভাবছিস, মাগো মা, আমরা কী জঞ্জাল— আমাদের বিদায় করে দিতেও এত ভাবনা এত ঝঞ্ঝাট।

নীরবালা। তা, আমরা তো ভাই, ফেলে দেবার জিনিস নয় যে অমনি ছেড়ে দিলেই হল। আমাদের জন্যে যে এতটা হাঙ্গামা হচ্ছে সে তো গৌরবের কথা। কুমারসম্ভবে তো পড়েছিস গৌরীর বিয়ের জন্য একটি আস্ত দেবতা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। যদি কোনো কবির কানে ওঠে তা হলে আমাদের বিবাহের একটা বর্ণনা বেরিয়ে যাবে।

নৃপবালা। না ভাই, আমার ভারী লজ্জা করছে।

নীরবালা। আর, আমার বুঝি লজ্জা করছে না? আমি বুঝি বেহায়া? কিন্তু কী করবি বল্। ইস্কুলে যেদিন প্রাইজ নিতে গিয়েছিলুম লজ্জা করেছিল, আবার তার পর-বছরেও প্রাইজ নেবার জন্যে রাত জেগে পড়া মুখস্থ করেছিলেম। লজ্জাও করে, প্রাইজও ছাড়ি নে, আমার এই স্বভাব।

নৃপবালা। আচ্ছা নীরু, এবারে যে প্রাইজটার কথা চলছে সেটার জন্যে তুই কি খুব ব্যস্ত হয়েছিস।

নীরবালা। কোন্‌টা বল্ দেখি। চিরকুমার সভার দুটো সভ্য।

নৃপবালা। যেই হোক-না কেন, তুই তো বুঝতে পারছিস।

নীরবালা। তা ভাই, সত্যি কথা বলব? (নৃপর গলা জড়াইয়া কানে কানে) শুনেছি কুমারসভার দুটি সভ্যের মধ্যে খুব ভাব, আমরা যদি দুজনে দুই বন্ধুর হাতে পড়ি তা হলে বিয়ে হয়েও আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে না— নইলে আমরা কে কোথায় চলে যাব তার ঠিক নেই। তাই তো সেই যুগল দেবতার জন্যে এত পুজোর আয়োজন করছি ভাই। জোড়হস্তে মনে মনে বলছি, হে কুমারসভার অশ্বিনীকুমারযুগল, আমাদের দুটি বোনকে এক বোঁটার দুই ফুলের মতো তোমরা একসঙ্গে গ্রহণ করো।

বিরহসম্ভাবনার উল্লেখমাত্রে দুই ভগিনী পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিল
এবং নৃপ কোনোমতে চোখের জল সামলাইতে পারিল না

নৃপবালা। আচ্ছা নীরু, মেজদিদিকে কেমন করে ছেড়ে যাবি বল্ দেখি। আমরা দুজনে গেলে ওঁর আর কে থাকবে।

নীরবালা। সে কথা অনেক ভেবেছি। থাকতে যদি দেন তা হলে কি ছেড়ে যাই। ভাই, ওঁর তো স্বামী নেই, আমাদেরও নাহয় স্বামী না রইল। মেজদিদির চেয়ে বেশি সুখে আমাদের দরকার কী।

পুরুষবেশধারিণী শৈলবালার প্রবেশ

নীরবালা। (টেবিলের উপরিস্থিত থালা হইতে একটি ফুলের মালা তুলিয়া লইয়া

শৈলবালার গলায় পরাইয়া) আমরা দুই স্বয়ম্বরা তোমাকে আমাদের পতিরূপে বরণ করলুম।

শৈলবালাকে প্রণাম করিল

শৈলবালা। ও আবার কী।

নীরবালা। ভয় নেই ভাই, আমরা দুই সতিনে তোমাকে নিয়ে ঝগড়া করব না। যদি করি সেজদিদি আমার সঙ্গে পারবে না— আমি একলাই মিটিয়ে নিতে পারব, তোমাকে কষ্ট পেতে হবে না। না, সত্যি বলছি মেজদিদি, তোমার কাছে আমরা যেমন আদরে আছি এমন আদর কি আর কোথাও পাব। কেন তবে আমাদের পরের গলায় দিতে চাস।

নৃপর দুই চক্ষু বাহিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল

শৈলবালা। (তাহার চোখ মুছিয়া দিয়া) ও কী ও নৃপ, ছি। তোদের কিসে সুখ তা কি তোরা জানিস। আমাকে নিয়ে যদি তোদের জীবন সার্থক হত তা হলে কি আমি আর-কারও হাতে তোদের দিতে পারতুম।

রসিকের প্রবেশ

রসিক। ভাই, আমার মতো অসভ্যটাকে তোরা সভ্য করলি— আজ তো সভা এখানে বসবে, কিরকম করে চলব শিখিয়ে দে।

নীরবালা। ফের পুরোনো ঠাট্টা? তোমার ওই সভ্য-অসভ্যর কথাটা এই পরশু থেকে বলছ।

রসিক। যাকে জন্ম দেওয়া যায় তার প্রতি মমতা হয় না? ঠাট্টা একবার মুখ থেকে বের হলেই কি রাজপুতের কন্যার মতো তাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে হবে। হয়েছে কী, যতদিন চিরকুমার-সভা টিঁকে থাকবে এই ঠাট্টা তোদের দু বেলা শুনতে হবে।

নীরবালা। তবে ওটাকে তো একটু সকাল সকাল সেরে ফেলতে হচ্ছে। মেজদিদি ভাই, আর দয়ামায়া নয়— রসিকদাদার রসিকতাকে পুরোনো হতে দেব না, চিরকুমার-সভার চিরত্ব আমরা অচিরে ঘুচিয়ে দেব। তবেই তো আমাদের বিশ্ববিজয়িনী নারী নাম সার্থক হবে। কিরকম করে আক্রমণ করতে হবে একটা কিছু প্ল্যান ঠাউরেছিস?

শৈলবালা। কিছুই না। ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে যখন যে রকম মাথায় আসে।

নীরবালা। আমাকে যখন দরকার হবে রণভেরী ধ্বনিত করলেই আমি হাজির হব। 'আমি কি ডরাই সখী কুমারসভারে। নাহি কি বল এ ভুজমৃণালে?'

অক্ষয়ের প্রবেশ

অক্ষয়। অত্যকার সভায় বিদুষীমণ্ডলীকে একটি ঐতিহাসিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করি।

শৈলবালা। প্রস্তুত আছি।

অক্ষয়। বলো দেখি যে দুটি ডালে দাঁড়িয়েছিলেন সেই দুটি ডাল কাটতে চেয়েছিলেন কে।

নৃপবালা। আমি জানি মুখুজ্জেমশায়, কালিদাস।

অক্ষয়। না, আরও একজন বড়োলোক। শ্রীঅক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়।

নীরবালা। ডাল দুটি কে।

অক্ষয়। (বামে নীরকে টানিয়া) এই একটি (দক্ষিণে নৃপকে টানিয়া আনিয়া) এই আর-একটি।

নীরবালা। আর, কুড়ুল বুঝি আজ আসছে ?

অক্ষয়। আসছে কেন, এসেছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। ওই-যে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

দৌড় দৌড়। শৈল পালাইবার সময় রসিকদাদাকে টানিয়া লইয়া গেল
চুড়িবালার ঝংকার এবং ত্রস্ত পদপল্লবকয়েকটির দ্রুতপতনশব্দ সম্পূর্ণ না মিলাইতেই

শ্রীশ ও বিপিনের প্রবেশ

অক্ষয়। পূর্ণবাবু এলেন না যে ?

শ্রীশ। চন্দ্রবাবুর বাসায় তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ তাঁর শরীরটা খারাপ হয়েছে বলে আজ আর আসতে পারলেন না।

অক্ষয়। (পথের দিকে চাহিয়া) একটু বসুন, আমি চন্দ্রবাবুর অপেক্ষায় দ্বারের কাছে গিয়ে দাঁড়াই। তিনি অন্ধ মানুষ, কোথায় যেতে কোথায় গিয়ে পড়বেন তার ঠিক নেই। কাছাকাছি এমন স্থানও আছে যেখানে কুমারসভার অধিবেশন কোনোমতেই প্রার্থনীয় নয়।

[অক্ষয়ের প্রস্থান

অক্ষয় চলিয়া গেলে ঘরটি শ্রীশ ভালো করিয়া দেখিয়া লইল। ঘরে দুটি দীপ জ্বলিতেছে
সেই দুটিকে বেষ্টন করিয়া ফিরোজ রঙের রেশমের অবগুণ্ঠন। সেই আবরণ ভেদ করিয়া ঘরের আলোটি
মৃদু এবং রঙিন হইয়া উঠিয়াছে। টেবিলের মাঝখানে ফুলদানিতে ফুল সাজানো

বিপিন। (ঈষৎ হাসিয়া) যা বল ভাই, এ ঘরটি চিরকুমার-সভার উপযুক্ত নয়।

শ্রীশ। (চকিত হইয়া) কেন নয়।

বিপিন। ঘরের সজ্জাগুলি তোমার নবীন সন্ন্যাসীদের পক্ষেও যেন বেশি বোধ হচ্ছে।

শ্রীশ। আমার সন্ন্যাসধর্মের পক্ষে বেশি কিছু হতে পারে না।

বিপিন। কেবল নারী ছাড়া।

শ্রীশ। হাঁ, ওই একটিমাত্র।

অন্য দিনের মতো কথাটায় তেমন জোর পৌঁছিল না

বিপিন। দেয়ালের ছবি এবং অন্যান্য পাঁচ রকমে এ ঘরটিতে সেই নারীজাতির অনেকগুলি পরিচয় পাওয়া যায় যেন।

শ্রীশ। সংসারে নারীজাতির পরিচয় তো সর্বত্রই আছে।

বিপিন। তা তো বটেই। কবিদের কথা যদি বিশ্বাস করা যায় তা হলে চাঁদে ফুলে লতায় পাতায় কোনোখানেই নারীজাতির পরিচয় থেকে হতভাগ্য পুরুষ-মানুষের নিষ্কৃতি পাবার জো নেই।

শ্রীশ। (হাসিয়া) কেবল ভেবেছিলুম, চন্দ্রবাবুর বাসার সেই এক তলার ঘরটিতে রমণীর কোনো সংস্রব ছিল না। আজ সে ভ্রমটা হঠাৎ ভেঙে গেল। নাঃ, ওরা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে।

বিপিন। বেচারা চিরকুমার ক'টির জন্যে একটা কোনো ফাঁক রাখে নি। সভা করবার জায়গা পাওয়াই দায়।

শ্রীশ। এই দেখো-না।

কোণের একটা টিপাই হইতে গোটাদুয়েক চুলের কাঁটা তুলিয়া দেখাইল

বিপিন। (কাঁটা দুটি লইয়া পর্যবেক্ষণ করিয়া) ওহে ভাই, এ স্থানটা তো কুমারদের পক্ষে নিষ্কণ্টক নয়।

শ্রীশ। ফুলও আছে, কাঁটাও আছে।

বিপিন। সেইটেই তো বিপদ। কেবল কাঁটা থাকলে এড়িয়ে চলা যায়।

শ্রীশ অপর কোণের ছোটো বইয়ের শেলফ হইতে বইগুলি তুলিয়া দেখিতে লাগিল— কতকগুলি নভেল কতকগুলি ইংরাজি কাব্যসংগ্রহ। প্যাল্‌গ্রেভের গীতিকাব্যের স্বর্ণভাণ্ডার খুলিয়া দেখিল মার্জিনে মেয়েলি অক্ষরে নোট লেখা— তখন গোড়ায় পাতাটা উল্টাইয়া দেখিল দেখিয়া একটু নাড়িয়া-চাড়িয়া বিপিনের সম্মুখে ধরিল

বিপিন। নৃপবালা! আমার বিশ্বাস নামটি পুরুষ মানুষের নয়। কী বোধ কর।

শ্রীশ। আমারও সেই বিশ্বাস। এ নামটিও অন্যজাতীয় বলে ঠেকছে হে।

আর-একটা বই দেখাইল

বিপিন। নীরবালা! এ নামটি কাব্যগ্রন্থে চলে কিন্তু কুমারসভায়—

শ্রীশ। কুমারসভাতেও এই নামধারিণীরা যদি চলে আসেন তা হলে দ্বাররোধ করতে পারি এত বড়ো বলবান তো আমাদের মধ্যে কাউকে দেখি নে।

বিপিন। পূর্ণ তো একটি আঘাতেই আহত হয়ে পড়ল, রক্ষা পায় কি না সন্দেহ।

শ্রীশ। কিরকম।

বিপিন। লক্ষ্য করে দেখ নি বুঝি?

শ্রীশ। না না, ও তোমার অনুমান।

বিপিন। হৃদয়টা তো অনুমানেরই জিনিস— না যায় দেখা, না যায় ধরা।

শ্রীশ। পূর্ণর অসুখটাও তা হলে বৈদ্যশাস্ত্রের অন্তর্গত নয়?

বিপিন। না, এ-সকল ব্যাধি সম্বন্ধে মেডিকাল কলেজে কোনো লেক্‌চার চলে না।

শ্রীশ। এ বাড়ির দরজায় ঢুকতেই রসিক চক্রবর্তী বলে যে বৃদ্ধ যুবকটির সঙ্গে দেখা হল তাঁকে চিরকুমার-সভার দ্বারীর উপযুক্ত বলে বোধ হল না।

বিপিন। মনে হল শিবের তপোবন আগলাবার জন্য স্বয়ং পঞ্চশর নন্দীর ছদ্মবেশে এসেছেন, লোকটাকে বিশ্বাসযোগ্য ঠেকছে না।

চন্দ্রের প্রবেশ

চন্দ্রবাবু। আজকের তর্কবিতর্কের উত্তেজনায় পূর্ণবাবুর হঠাৎ শরীর খারাপ হল দেখে, আমি তাঁকে তাঁর বাড়ি পৌঁছে দেওয়া উচিত বোধ করলুম।

বিপিন। পূর্ণবাবুর যেরকম দুর্বল অবস্থা দেখছি পূর্ব হতেই তাঁর বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

চন্দ্রবাবু। পূর্ণবাবুকে তো বিশেষ অসাবধান বলে বোধ হয় না।

অক্ষয় ও রসিকের প্রবেশ

অক্ষয়। মাপ করবেন। এই নবীন সভ্যটিকে আপনাদের হাতে সমর্পণ করে দিয়েই আমি চলে যাচ্ছি।

রসিক। (হাসিয়া) আমার নবীনতা বাইরে থেকে বিশেষ প্রত্যক্ষগোচর নয়—

অক্ষয়। অত্যন্ত বিনয়বশত সেটা বাহ্য প্রাচীনতা দিয়ে ঢেকে রেখেছেন— ক্রমশ পরিচয় পাবেন। ইনিই হচ্ছেন সার্থকনামা শ্রীরসিক চক্রবর্তী।

রসিক। পিতা আমার রসবোধ সম্বন্ধে পরিচয় পাবার পূর্বেই রসিক নাম রেখেছিলেন, এখন পিতৃসত্যপালনের জন্য আমাকে রসিকতার চেষ্টা করতে হয়, তার পরে 'যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ'। [অক্ষয়ের প্রস্থান

পুরুষবেশী শৈলের প্রবেশ

শৈল আসিয়া সকলকে নমস্কার করিল। ক্ষীণদৃষ্টি চন্দ্রমাধববাবু আপনাভাবে তাহাকে দেখিলেন—
বিপিন ও শ্রীশ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল
শৈলের পশ্চাতে দুইজন ভৃত্য কয়েকটি ভোজনপাত্র হাতে করিয়া উপস্থিত হইল
শৈল ছোটো ছোটো রুপার থালাগুলি লইয়া সাদা পাথরের টেবিলের উপর সাজাইতে লাগিল

রসিক। ইনি আপনাদের সভার আর একটি নবীন সভ্য। এঁর নবীনতা সম্বন্ধে কোনো তর্ক নেই। ঠিক আমার বিপরীত। ইনি বুদ্ধির প্রবীণতা বাহ্য নবীনতা দিয়ে গোপন করে রেখেছেন। আপনারা কিছু বিস্মিত হয়েছেন দেখছি— হবার কথা। এঁকে দেখে মনে হয় বালক, কিন্তু আমি আপনাদের কাছে জামিন রইলুম— ইনি বালক নন।

চন্দ্রবাবু। এঁর নাম ?

রসিক। শ্রীঅবলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীশ। অবলাকান্ত ?

রসিক। নামটি আমাদের সভায় চলতি হবার মতো নয় স্বীকার করি। নামটির প্রতি আমারও বিশেষ মমত্ব নেই— যদি পরিবর্তন করে বিক্রমসিংহ বা ভীমসেন বা অন্য কোনো উপযুক্ত নাম রাখেন তাতে উনি আপত্তি করবেন না। যদিচ শাস্ত্রে আছে বটে 'স্বনামা পুরুষো ধন্য'— কিন্তু উনি অবলাকান্ত নামটির দ্বারাই জগতে পৌরুষ অর্জন করতে ব্যাকুল নন।

শ্রীশ। বলেন কী মশায়। নাম তো আর গায়ের বস্ত্র নয় যে, বদল করলেই হল।

রসিক। ওটা আপনাদের একেলে সংস্কার শ্রীশবাবু, নামটাকে প্রাচীনেরা পোশাকের মধ্যেই গণ্য করতেন। দেখুন-না কেন, অর্জুনের পিতৃদত্ত নাম কী ঠিক করে বলা শক্ত — পার্থ, ধনঞ্জয়, সব্যসাচী, লোকের যখন যা মুখে আসত তাই বলেই ডাকত। দেখুন, নামটাকে আপনারা বেশি সত্য মনে করবেন না; ওঁকে যদি ভুলে আপনি অবলাকান্ত না'ও বলেন উনি লাইবেলের মকদ্দমা আনবেন না।

শ্রীশ। (হাসিয়া) আপনি যখন এতটা অভয় দিচ্ছেন তখন অত্যন্ত নিশ্চিন্ত

হলুম— কিন্তু ওঁর ক্ষমাগুণের পরিচয় নেবার দরকার হবে না, নাম ভুল করব না মশায়।

রসিক। আপনি না করতে পারেন, কিন্তু আমি করি মশায়। উনি আমার সম্পর্কে নাতি হন; সেই জন্যে ওঁর সম্বন্ধে আমার রসনা কিছু শিথিল, যদি কখনো এক বলতে আর বলি সেটা মাপ করবেন।

শ্রীশ। অবলাকান্তবাবু, আপনি এ-সমস্ত কী আয়োজন করেছেন। আমাদের সভার কার্যাবলীর মধ্যে মিষ্টান্নটা ছিল না।

রসিক। (উঠিয়া) সেই ত্রুটি যিনি সংশোধন করেছেন তাঁকে সভার হয়ে ধন্যবাদ দিই।

শৈল। (থালা সাজাইতে সাজাইতে) শ্রীশবাবু, আহারটাও কি আপনাদের নিয়ম-বিরুদ্ধ।

শ্রীশ। (বিপুলায়তন বিপিনকে টানিয়া আনিয়া) এই সভ্যটির আকৃতি নিরীক্ষণ করে দেখলেই ও সম্বন্ধে কোনো সংশয় থাকবে না।

বিপিন। নিয়মের কথা যদি বলেন অবলাকান্তবাবু, সংসারের শ্রেষ্ঠ জিনিস-মাত্রই নিজের নিয়ম নিজেই সৃষ্টি করে; ক্ষমতাশালী লেখক নিজের নিয়মে চলে, শ্রেষ্ঠ কাব্য সমালোচকের নিয়ম মানে না। যে মিষ্টান্নগুলি সংগ্রহ করেছেন এ সম্বন্ধেও কোনো সভার নিয়ম খাটতে পারে না; এর একমাত্র নিয়ম, বসে যাওয়া এবং নিঃশেষ করা। ইনি যতক্ষণ আছেন ততক্ষণ জগতের অন্য সমস্ত নিয়মকে দ্বারের কাছে অপেক্ষা করতে হবে।

শ্রীশ। তোমার হল কী বিপিন। তোমাকে খেতে দেখেছি বটে, কিন্তু এক নিশ্বাসে এত কথা কইতে শুনি নি তো।

বিপিন। রসনা উত্তেজিত হয়েছে, এখন সরস বাক্য বলা আমার পক্ষে অত্যন্ত সহজ হয়েছে। যিনি আমার জীবনবৃত্তান্ত লিখবেন, হায়, এ সময়ে তিনি কোথায়?

রসিক। (টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে) আমার দ্বারা সে কাজটা প্রত্যাশা করবেন না, আমি এত দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে পারব না।

নূতন ঘরের বিলাসসজ্জার মধ্যে আসিয়া চন্দ্রমাধববাবুর মনটা বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার উৎসাহস্রোত যথাপথে প্রবাহিত হইতেছিল না। তিনি ক্ষণে ক্ষণে কার্যবিবরণের খাতা ক্ষণে ক্ষণে নিজের করকোষ্ঠী অকারণে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিলেন

শৈলবালা। (চন্দ্রবাবুর সম্মুখে গিয়া) সভার কার্যের যদি কিছু ব্যাঘাত করে থাকি তো মাপ করবেন চন্দ্রবাবু, কিছু জলযোগ—

চন্দ্রবাবু। এ-সমস্ত সামাজিকতায় সভার কার্যের ব্যাঘাত করে, তাতে সন্দেহ নেই।

রসিক। আচ্ছা, পরীক্ষা করে দেখুন, মিষ্টান্নে যদি সভার কার্য রোধ হয় তা হলে—

বিপিন। (মৃদুস্বরে) তা হলে ভবিষ্যতে নাহয় সভাটা বন্ধ রেখে মিষ্টান্নটা চালালেই হবে।

শ্রীশ। আসুন রসিকবাবু। আপনি উঠছেন না যে?

রসিক। রোজ রোজ যেচে এবং মাঝে মাঝে কেড়ে খেয়ে থাকি, আজ চিরকুমার-সভার সভ্যরূপে আপনাদের সংসর্গগৌরবে কিঞ্চিৎ উপরোধের প্রত্যাশায় ছিলুম, কিন্তু—

শৈলবালা। 'কিন্তু' আবার কী রসিকদাদা। তুমি যে রবিবার করে থাক, আজ তুমি কিছু খাবে নাকি।

রসিক। দেখছেন মশায়! নিয়ম আর-কারও বেলায় নয়,কেবল রসিকদাদার বেলায়। নাঃ, 'বলং বলং বাহুবলম্'। উপরোধ-অনুরোধের অপেক্ষা করা নয়।

বিপিন। (চারটিমাত্র ভোজনপাত্র দেখিয়া) আপনি আমাদের সঙ্গে বসবেন না?

শৈলবালা। না, আমি পরিবেষণ করব।

শ্রীশ। সে কি হয়।

শৈলবালা। আমাকে পরিবেষণ করতে দিন, খাওয়ার চেয়ে তাতে আমি ঢের বেশি খুশি হব।

শ্রীশ। রসিকবাবু, এটা কি ঠিক হচ্ছে।

রসিক। ভিন্নরুচির্হি লোকঃ। উনি পরিবেষণ করতে ভালোবাসেন, আমরা আহার করতে ভালোবাসি, এরকম রুচিভেদে বোধ হয় পরস্পরের কিছু সুবিধা আছে।

সকলের আহার

শৈলবালা। চন্দ্রবাবু, ওটা মিষ্টি, ওটা আগে খাবেন না, এই দিকে তরকারি আছে। জলের গ্লাস খুঁজছেন? এই-যে গ্লাস।

চন্দ্রবাবুর পাতে আম ছিল তিনি সেটাকে ভালোরূপ আয়ত্ত করিতে পারিতেছিলেন না— অনুতপ্ত শৈল তাড়াতাড়ি তাহা কাটিয়া সহজসাধ্য করিয়া দিল। যে সময়ে যেটি আবশ্যক আস্তে আস্তে হাতের কাছে জোগাইয়া দিয়া তাঁহার ভোজনব্যাপারটি নির্বিঘ্ন করিতে লাগিল

চন্দ্রবাবু। শ্রীশবাবু, স্ত্রীসভ্য নেওয়া সম্বন্ধে আপনি কিছু বিবেচনা করেছেন?

শ্রীশ। ভেবে দেখতে গেলে ওতে আপত্তির কারণ বিশেষ নেই, কেবল সমাজের আপত্তির কথাটা আমি ভাবি।

বিপিন। সমাজকে অনেক সময় শিশুর মতো গণ্য করা উচিত। শিশুর সমস্ত আপত্তি মেনে চললে শিশুর উন্নতি হয় না, সমাজ সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা খাটে।

শ্রীশ। আমার বোধ হয় আমাদের দেশে যে এত সভাসমিতির আয়োজন অনুষ্ঠান অকালে ব্যর্থ হয় তার প্রধান কারণ, সে-সকল কার্যে স্ত্রীলোকদের যোগ নেই। রসিক-বাবু কী বলেন।

রসিক। অবস্থাগতিকে যদিও স্ত্রীজাতির সঙ্গে আমার বিশেষ সম্বন্ধ নেই তবু এটুকু জেনেছি— স্ত্রীজাতি হয় যোগ দেন নয় বাধা দেন, হয় সৃষ্টি নয় প্রলয়। অতএব ওঁদের দলে টেনে অন্য সুবিধা যদি বা না'ও হয় তবু বাধার হাত এড়ানো যায়। বিবেচনা করে দেখুন, চিরকুমার-সভার মধ্যে যদি স্ত্রীজাতিকে আপনারা গ্রহণ করতেন তা হলে গোপনে এই সভাটিকে নষ্ট করবার জন্যে ওঁদের উৎসাহ থাকত না, কিন্তু বর্তমান অবস্থায়—

শৈলবালা। কুমারসভার উপর স্ত্রীজাতির আক্রোশের খবর রসিকদাদা কোথায় পেলে।

রসিক। বিপদের খবর না পেলে কি আর সাবধান করতে নেই। একচক্ষু হরিণ যে দিকে কানা ছিল সেই দিক থেকেই তো তীর খেয়েছিল— কুমারসভা যদি স্ত্রীজাতির প্রতিই কানা হন তা হলে সেই দিক থেকেই হঠাৎ ঘা খাবেন।

শ্রীশ। (বিপিনের প্রতি মৃদুস্বরে) একচক্ষু হরিণ তো আজ একটা তীর খেয়েছেন, একটি সভ্য ধূলিশায়ী।

চন্দ্রবাবু। কেবল পুরুষ নিয়ে যারা সমাজের ভালো করতে চায় তারা এক পায়ে চলতে চায়। সেইজন্যই খানিক দূর গিয়েই তাদের বসে পড়তে হয়। সমস্ত মহৎ চেষ্টা থেকে মেয়েদের দূরে রেখেছি বলেই আমাদের দেশের কাজে প্রাণসঞ্চার হচ্ছে না। আমাদের হৃদয়, আমাদের কাজ, আমাদের আশা বাইরে ও অন্তঃপুরে খণ্ডিত সেইজন্যে আমরা বাইরে গিয়ে বক্তৃতা দিই, ঘরে এসে ভুলি। দেখো অবলাকান্তবাবু, এখনও তোমার বয়স অল্প আছে, এই কথাটি ভালো করে মনে করে রেখো— স্ত্রীজাতিকে অব-হেলা কোরো না। স্ত্রীজাতিকে যদি আমরা নিচু করে রাখি তা হলে তাঁরাও আমাদের নীচের দিকেই আকর্ষণ করেন ; তা হলে তাঁদের ভারে আমাদের উন্নতির পথে চলা অসাধ্য হয়, দু পা চলেই আবার ঘরের কোণে এসেই আবদ্ধ হয়ে পড়ি। তাঁদের যদি আমরা উচ্চে রাখি তা হলে ঘরের মধ্যে এসে নিজের আদর্শকে খর্ব করতে লজ্জাবোধ হয়। আমাদের দেশে বাইরে লজ্জা আছে, কিন্তু ঘরের মধ্যে সেই লজ্জাটি নেই, সেইজন্যেই আমাদের সমস্ত উন্নতি কেবল বাহ্যাড়ম্বরে পরিণত হয়।

শৈলবালা। আশীর্বাদ করুন আপনার উপদেশ যেন ব্যর্থ না হয়, নিজেকে যেন আপনার আদর্শের উপযুক্ত করতে পারি।

চন্দ্রবাবু। আমার ভাগ্নী নির্মলাকে কুমারসভার সভ্যশ্রেণীতে ভুক্ত করতে আপনাদের কোনো আপত্তি নেই ?

রসিক। আর-কোনো আপত্তি নেই, কেবল একটু ব্যাকরণের আপত্তি। কুমার-সভায় কেউ যদি কুমারীবেশে আসেন তা হলে বোপদেবের অভিশাপ।

শৈলবালা। বোপদেবের অভিশাপ এ কালে খাটে না।

রসিক। আচ্ছা, অন্তত লোহারামকে তো বাঁচিয়ে চলতে হবে? আমি তো বোধ করি, স্ত্রীসভ্যরা যদি পুরুষসভ্যদের অজ্ঞাতসারে বেশ ও নাম পরিবর্তন করে আসেন তা হলে সহজে নিষ্পত্তি হয়।

শ্রীশ। তা হলে একটা কৌতুক এই হয় যে, কে স্ত্রী কে পুরুষ নিজেদের এই সন্দেহটা থেকে যায়—

বিপিন। আমি বোধ হয় সন্দেহ থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারি।

রসিক। আমাকেও বোধ হয় আমার নাৎনী বলে কারও হঠাৎ আশঙ্কা না হতে পারে।

শ্রীশ। কিন্তু অবলাকান্তবাবু সম্বন্ধে একটা সন্দেহ থেকে যায়।

শৈল অদূরবর্তী টিপাই হইতে মিষ্টান্নের থালা আনিতে প্রস্থান করিল

চন্দ্রবাবু। দেখুন রসিকবাবু, ভাষাতত্ত্বে দেখা যায়, ব্যবহার করতে করতে একটা শব্দের মূল অর্থ লোপ পেয়ে বিপরীত অর্থ ঘটে থাকে। স্ত্রীসভ্য গ্রহণ করলে চিরকুমার-সভার অর্থের যদি পরিবর্তন ঘটে তাতে ক্ষতি কী।

রসিক। কিছু না। আমি পরিবর্তনের বিরোধী নই— তা নামপরিবর্তন বা বেশ-পরিবর্তন যাই হোক-না কেন, যখন যা ঘটে আমি বিনা বিরোধে গ্রহণ করি বলেই আমার প্রাণটা নবীন আছে।

মিষ্টান্ন শেষ হইল এবং স্ত্রীসভ্য লওয়া সম্বন্ধে কাহারও আপত্তি হইল না

রসিক। আশা করি সভার কাজের কোনো ব্যাঘাত হয় নি।

শ্রীশ। কিছু না— অন্যদিন কেবল মুখেরই কাজ চলত, আজ দক্ষিণ হস্তও যোগ দিয়েছে।

বিপিন। তাতে আভ্যন্তরিক তৃপ্তিটা কিছু বেশি হয়েছে। আজ তা হলে এইখানেই সভা ভঙ্গ করা হোক, কারণ এর পরে আর কোনো আলোচনা চলবে না। এ দিকে দেরিও হয়ে গেছে। [সকলের প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অক্ষয়ের বাসা

অক্ষয়, নীর ও নৃপ

নীরর গান

যেতে দাও গেল যারা।
তুমি যেয়ো না, যেয়ো না—
আমার, বাদলের গান হয় নি সারা।
কুটিরে কুটিরে বন্ধ দ্বার,
নিভৃত রজনী অন্ধকার,
বনের অঞ্চল কাঁপে চঞ্চল—
অধীর সমীর তন্দ্রাহারা।

অক্ষয়। হল কী বলো দেখি। আমার যে ঘরটি এতকাল কেবল ঝড়ু বেহারার ঝাড়নের তাড়নে নির্মল ছিল, সেই ঘরের হাওয়া দুবেলা তোমাদের দুই বোনের অঞ্চল-বীজনে চঞ্চল হয়ে উঠছে যে।

নীরবালা। দিদি নেই, তুমি একলা পড়ে আছ ব'লে দয়া ক'রে মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যাই, তার উপরে আবার জবাবদিহি?

অক্ষয়। দয়াময়ী চোর, শূন্য হৃদয়টা চুরি করবার জন্যে শূন্য ঘরে উঁকিঝুঁকি? মৎলব কি বুঝি নে?

গান

ওগো দয়াময়ী চোর! এত দয়া মনে তোর!
বড়ো দয়া করে কণ্ঠে আমার জড়াও মায়ার ডোর!
বড়ো দয়া করে চুরি করে লও শূন্য হৃদয় মোর।

নীরবালা। আমাদের এমন বোকা চোর পাও নি। এখন হৃদয় আছে কোথায় যে চুরি করতে আসব।

অক্ষয়। ঠিক করে বলো দেখি হতভাগা হৃদয়টা গেছে কত দূরে।

নৃপবালা। আমি জানি মুখুজ্জেমশায়। বলব? ৪৭৫ মাইল।

নীরবালা। সেজদিদি অবাক করলি। তুই কি মুখুজ্জেমশায়ের হৃদয়ের পিছনে পিছনে মাইল গুনতে গুনতে ছুটেছিলি নাকি।

নৃপবালা। না ভাই, দিদি কাশী যাবার সময় টাইম্‌টেবিলে মাইলটা দেখেছিলুম।

অক্ষয়।— গান

চলেছে ছুটিয়া পলাতকা হিয়া,
বেগে বহে শিরা ধমনী।
হায় হায় হায় ধরিবারে তায়
পিছে পিছে ধায় রমণী।
বায়ুবেগভরে উড়ে অঞ্চল,
লটপট বেণী দুলে চঞ্চল—
এ কী রে রঙ্গ, আকুল-অঙ্গ
ছুটে কুরঙ্গগমনী।

নীরবালা। কবিবর, সাধু সাধু। কিন্তু, তোমার রচনায় কোনো কোনো আধুনিক কবির ছায়া দেখতে পাই যেন।

অক্ষয়। তার কারণ, আমিও অত্যন্ত আধুনিক। তোরা কি ভাবিস তোদের মুখুজ্জেমশায় কৃত্তিবাস ওঝার যমজ ভাই। ভূগোলের মাইল গুনে দিচ্ছিস, আর ইতিহাসের তারিখ ভুল? তা হলে আর বিদুষী শ্যালী থেকে ফল হল কী। এতবড়ো আধুনিকটাকে তোদের প্রাচীন বলে ভ্রম হয়?

নীরবালা। মুখুজ্জেমশায়, শিব যখন বিবাহসভায় গিয়েছিলেন তখন তাঁর শ্যালীরাও ওই রকম ভুল করেছিলেন, কিন্তু উমার চোখে তো অন্য রকম ঠেকেছিল। তোমার ভাব্‌না কিসের, দিদি তোমাকে আধুনিক বলেই জানেন।

অক্ষয়। মূঢ়ে, শিবের যদি শ্যালী থাকত তা হলে কি তাঁর ধ্যানভঙ্গ করবার জন্যে অনঙ্গদেবের দরকার হত। আমার সঙ্গে তাঁর তুলনা?

নৃপবালা। আচ্ছা মুখুজ্জেমশায়, এতক্ষণ তুমি এখানে বসে বসে কী করছিলে

অক্ষয়। তোদের গয়লাবাড়ির দুধের হিসেব লিখছিলুম।

নীরবালা। (ডেস্কের উপর হইতে অসমাপ্ত চিঠি তুলিয়া লইয়া) এই তোমার গয়লাবাড়ির হিসেব? হিসেবের মধ্যে ক্ষীর-নবনীর অংশটাই বেশি।

অক্ষয়। (ব্যস্তসমস্ত) না না, ওটা নিয়ে গোল করিস নে, আহা, দিয়ে যা—

নৃপবালা। নীরুভাই, জ্বালাস নে, চিঠিখানা ওঁকে ফিরিয়ে দে— ওখানে শ্যালীর

উপদ্রব সয় না। কিন্তু মুখুজ্জেমশায়, তুমি দিদিকে চিঠিতে কী বলে সম্বোধন কর বলো-না।

অক্ষয়। রোজ নূতন সম্বোধন করে থাকি—

নৃপবালা। আজ কী করেছ বলো দেখি।

অক্ষয়। শুনবে? তবে সখী, শোনো। চঞ্চলচকিতচিত্তচকোরচৌর চঞ্চুচুম্বিতচারু-চন্দ্রিকরুচিরুচির চিরচন্দ্রমা।

নীরবালা। চমৎকার চাটুচাতুর্য।

অক্ষয়। এর মধ্যে চৌর্যবৃত্তি নেই, চর্বিতচর্বণশূন্য।

নৃপবালা। (সবিস্ময়ে) আচ্ছা মুখুজ্জেমশায়, রোজ রোজ তুমি এই রকম লম্বা লম্বা সম্বোধন রচনা কর? তাই বুঝি দিদিকে চিঠি লিখতে এত দেরি হয়?

অক্ষয়। ওইজন্যেই তো নৃপর কাছে আমার মিথ্যে কথা চলে না। ভগবান যে আমাকে সত্য সত্য বানিয়ে বলবার এমন অসাধারণ ক্ষমতা দিয়েছেন সেটা দেখছি খাটাতে দিলে না। ভগ্নীপতির কথা বেদবাক্য ব'লে বিশ্বাস করতে কোন্ মনুসংহিতায় লিখেছে বলো দেখি।

নীরবালা। রাগ কোরো না, শান্ত হও মুখুজ্জেমশায়, শান্ত হও। সেজদিদির কথা ছেড়ে দাও, কিন্তু ভেবে দেখো আমি তোমার আধখানা কথা সিকি পয়সাও বিশ্বাস করি নে, এতেও তুমি সান্ত্বনা পাও না?

নৃপবালা। আচ্ছা মুখুজ্জেমশায়, সত্যি করে বলো, দিদির নামে তুমি কখনো কবিতা রচনা করেছ?

অক্ষয়। এবার তিনি যখন অত্যন্ত রাগ করেছিলেন তখন তাঁর স্তব রচনা করে গান করেছিলুম—

নৃপবালা। তার পরে?

অক্ষয়। তার পরে দেখলুম, তাতে উল্টো ফল হল, বাতাস পেয়ে যেমন আগুন বেড়ে ওঠে তেমনি হল— সেই অবধি স্তবরচনা ছেড়েই দিয়েছি।

নৃপবালা। ছেড়ে দিয়ে কেবল গয়লাবাড়ির হিসেব লিখছ? কী স্তব লিখেছিলে মুখুজ্জেমশায়, আমাদের শোনাও-না।

অক্ষয়। সাহস হয় না, শেষকালে আমার উপরওয়ালার কাছে রিপোর্ট্ করবি।

নৃপবালা। না, আমরা দিদিকে বলে দেব না।

অক্ষয়। তবে অবধান করো।

গান

মনোমন্দিরসুন্দরী।
স্খলদঞ্চলা চলচঞ্চলা
অয়ি মঞ্জুলা মঞ্জরী।
রোষারুণরাগরঞ্জিতা
গোপনহাস্য -কুটিল-আস্য-
কপটকলহগঞ্জিতা।
সংকোচনত-অঙ্গিনী।
চকিতচপল- নবকুরঙ্গ-
যৌবনবনরঙ্গিণী।
অয়ি খলছলগুণ্ঠিতা।
লুব্ধ-পবন -ক্ষুব্ধ লোভন
মল্লিকা অবলুণ্ঠিতা।
চুম্বনধনবঞ্চিনী।
রুদ্ধ-কোরক- সঞ্চিত-মধু-
কঠিনকনককঞ্জিনী।

কিন্তু আর নয়। এবারে মশায়রা বিদায় হোন।

নীরবালা। কেন, এত অপমান কেন। দিদির কাছে তাড়া খেয়ে আমাদের উপরে বুঝি তার ঝাল ঝাড়তে হবে?

অক্ষয়। এরা দেখছি পবিত্র জেনানা আর রাখতে দিলে না। আরে দুর্বৃত্তে, এখনই লোক আসবে।

নৃপবালা। তার চেয়ে বলো-না দিদির চিঠিখানা শেষ করতে হবে।

নীরবালা। তা, আমরা থাকলেমই বা, তুমি চিঠি লেখো-না, আমরা কি তোমার কলমের মুখ থেকে কথা কেড়ে নেব না কি।

অক্ষয়। তোমরা কাছাকাছি থাকলে মনটা এইখানেই মারা যায়, দূরে যিনি আছেন সে পর্যন্ত আর পৌঁছয় না। না, ঠাট্টা নয়, পালাও। এখনই লোক আসবে— ওই একটি বৈ দরজা খোলা নেই, তখন পালাবার পথ পাবে না।

নৃপবালা। এই সন্ধেবেলায় কে তোমার কাছে আসবে।

অক্ষয়। যাদের ধ্যান কর তারা নয় গো, তারা নয়।

নীরবালা। যার ধ্যান করা যায় সে সকল সময় আসে না তুমি আজকাল সেটা

বেশ বুঝতে পারছ, কী বল মুখুজ্জেমশায়। দেবতার ধ্যান কর আর উপদেবতার উপদ্রব হয়।—

গান

ও আমার ধ্যানেরই ধন,
তোমায় হৃদয়ে দোলায় যে হাসি রোদন।
আসে বসন্ত, ফোটে বকুল,
কুঞ্জে পূর্ণিমা-চাঁদ হেসে আকুল—
তারা তোমায় খুঁজে না পায়,
প্রাণের মাঝে আছ গোপন স্বপন।

অক্ষয়। সংগ্রহ হল কোথা থেকে।

নীরবালা। তোমারই শ্রীমুখ থেকে।

অক্ষয়। অবশেষে বিরহের দিনে আমারই শ্রীবক্ষে হানতে এসেছিস। আচ্ছা, তা হলে দয়া করিস নে, একেবারে শেষ করে দে।

নীরবালা।— আঁখিরে ফাঁকি দাও একি ধারা—
অশ্রুজলে তারে কর সারা।
গন্ধ আসে, কেন দেখি নে মালা।
পায়ের ধ্বনি শুনি, পথ নিরালা।
বেলা যে যায়, ফুল যে শুকায়—
অনাথ হয়ে আছে আমার ভুবন।

নেপথ্যে। অবলাকান্তবাবু আছেন ?

সহসা শ্রীশের প্রবেশ

'মাপ করবেন' বলিয়া পলায়নোদ্যম। নৃপ ও নীরর সবেগে প্রস্থান

অক্ষয়। এসো এসো শ্রীশবাবু।

শ্রীশ। (সলজ্জভাবে) মাপ করবেন।

অক্ষয়। রাজি আছি, কিন্তু অপরাধটা কী আগে বলো।

শ্রীশ। খবর না দিয়েই—

অক্ষয়। তোমার অভ্যর্থনার জন্য ম্যুনিসিপালিটির কাছ থেকে যখন বাজেট স্যাংশন করে নিতে হয় না তখন নাহয় খবর না দিয়েই এলে শ্রীশবাবু।

শ্রীশ। আপনি যদি বলেন এখানে আমার অসময়ে অনধিকার প্রবেশ হয় নি, তা হলেই হল।

অক্ষয়। তাই বললেম। তুমি যখনই আসবে তখনই সুসময়, এবং যেখানে পদার্পণ করবে সেইখানেই তোমার অধিকার। শ্রীশবাবু স্বয়ং বিধাতা সর্বত্র তোমাকে পাস্‌পোর্ট দিয়ে রেখেছেন। একটু বোসো, অবলাকান্তবাবুকে খবর পাঠিয়ে দিই। (স্বগত) না পলায়ন করলে চিঠি শেষ করতে পারব না। [প্রস্থান

শ্রীশ। চক্ষের সম্মুখ দিয়ে এক জোড়া মায়াস্বর্ণমৃগী ছুটে পালালো। ওরে নিরস্ত্র ব্যাধ, তোর ছোটবার ক্ষমতা নেই। নিকষের উপর সোনার রেখার মতো চকিত চোখের চাহনি দৃষ্টিপথের উপরে যেন আঁকা রয়ে গেল।

রসিকের প্রবেশ

শ্রীশ। সন্ধেবেলায় এসে আপনাদের তো বিরক্ত করি নি রসিকবাবু ?

রসিক। ভিক্ষুকক্ষে বিনিক্ষিপ্তঃ কিমিক্ষুর্নীরসো ভবেৎ ? শ্রীশবাবু, আপনাকে দেখে বিরক্ত হব আমি কি এতবড়ো হতভাগ্য।

শ্রীশ। অবলাকান্তবাবু বাড়ি আছেন তো ?

রসিক। আছেন বৈকি। এলেন ব'লে।

শ্রীশ। না না, যদি কাজে থাকেন তা হলে তাঁকে ব্যস্ত করে কাজ নেই— আমি কুঁড়ে লোক, বেকার মানুষের সন্ধানে ঘুরে বেড়াই।

রসিক। সংসারে সেরা লোকেরাই কুঁড়ে, এবং বেকার লোকেরাই ধন্য। উভয়ের সম্মিলন হলেই মণিকাঞ্চনযোগ। এই কুঁড়ে-বেকারের মিলনের জন্যেই তো সন্ধে-বেলাটার সৃষ্টি হয়েছে। যোগীদের জন্যে সকালবেলা, রোগীদের জন্যে রাত্রি, কাজের লোকের জন্যে দশটা-চারটে। আর সন্ধেবেলাটা, সত্যি কথা বলছি, চিরকুমার-সভার অধিবেশনের জন্যে চতুর্মুখ সৃজন করেন নি। কী বলেন শ্রীশবাবু।

শ্রীশ। সে কথা মানতে হবে বৈকি। সন্ধ্যা চিরকুমার-সভার অনেক পূর্বেই সৃজন হয়েছে, সে আমাদের সভাপতি চন্দ্রবাবুর নিয়ম মানে না—

রসিক। সে যে চন্দ্রের নিয়ম মানে তার নিয়মই আলাদা। আপনার কাছে খুলে বলি, হাসবেন না শ্রীশবাবু, আমার এক তলার ঘরে কায়ক্লেশে একটি জানলা দিয়ে অল্প একটু জ্যোৎস্না আসে ; শুক্লসন্ধ্যায় সেই জ্যোৎস্নার শুভ্র রেখাটি যখন আমার বক্ষের উপর এসে পড়ে তখন মনে হয় কে আমার কাছে কী খবর পাঠালে গো। শুভ্র একটি হংসদূত কোন্ বিরহিণীর হয়ে এই চিরবিরহীর কানে কানে বলছে—

অলিন্দে কালিন্দীকমলসুরভৌ কুঞ্জবসতের্-
বসন্তীং বাসন্তীনবপরিমলোদ্গারচিকুরাং।

স্বহৃৎসঙ্গে লীনাং মদমুকুলিতাক্ষীং পুনরিমাং
কদাহং সেবিষ্যে কিসলয়কলাপব্যজনিনীম্ ॥

শ্রীশ। বেশ বেশ রসিকবাবু, চমৎকার। কিন্তু, ওর মানেটা বলে দিতে হবে। ছন্দের ভিতর দিয়ে ওর রসের গন্ধটা পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু অনুস্বার-বিসর্গ দিয়ে একেবারে এঁটে বন্ধ করে রেখেছে।

রসিক। বাংলায় একটা তর্জমাও করেছি; পাছে সম্পাদকরা খবর পেয়ে হুড়াহুড়ি লাগিয়ে দেয়, তাই লুকিয়ে রেখেছি— শুনবেন শ্রীশবাবু?—

কুঞ্জকুটিরের স্নিগ্ধ অলিন্দের 'পর
কালিন্দীকমলগন্ধ ছুটিবে সুন্দর—
লীনা রবে মদিরাক্ষী তব অঙ্কতলে,
বহিবে বাসন্তীবাস ব্যাকুল কুন্তলে।
তাঁহারে করিব সেবা, কবে হবে হায়,
কিশলয়পাখাখানি দোলাইব গায়?

শ্রীশ। বা, বা, রসিকবাবু, আপনার মধ্যে এত আছে তা তো জানতুম না।

রসিক। কী করে জানবেন বলুন। কাব্যলক্ষ্মী যে তাঁর পদ্মবন থেকে মাঝে মাঝে এই টাকের উপরে খোলা হাওয়া খেতে আসেন এ কেউ সন্দেহ করে না। (হাত বুলাইয়া) কিন্তু, এমন ফাঁকা জায়গা আর নেই।

শ্রীশ। আহাহা রসিকবাবু, যমুনাতীরে সেই স্নিগ্ধ-অলিন্দ-ওয়ালা কুঞ্জকুটিরটি আমার ভারী মনে লেগে গেছে। যদি পায়োনিয়রে বিজ্ঞাপন দেখি সেটা দেনার দায়ে নিলেমে বিক্রি হচ্ছে তা হলে কিনে ফেলি।

রসিক। বলেন কী শ্রীশবাবু। শুধু অলিন্দ নিয়ে করবেন কী। সেই মদমুকুলিতাক্ষীর কথাটা ভেবে দেখবেন। সে নিলেমে পাওয়া শক্ত।

শ্রীশ। কার রুমাল এখানে পড়ে রয়েছে!

রসিক। দেখি দেখি। তাই তো। দুর্লভ জিনিস আপনার হাতে ঠেকে দেখছি। বাঃ, দিব্য গন্ধ। শ্লোকের লাইনটা বদলাতে হবে মশায়, ছন্দ ভঙ্গ হয় হোক গে— বাসন্তীনবপরিমলোদ্গাররুমালাং। শ্রীশবাবু, এ রুমালটাতে তো আমাদের কুমারসভার পতাকা নির্মাণ চলবে না। দেখেছেন কোণে একটি ছোট্ট 'ন' অক্ষর লেখা রয়েছে?

শ্রীশ। কী নাম হতে পারে বলুন দেখি। নলিনী? না, বড্ড চলিত নাম। নীলাম্বুজা? ভয়ংকর মোটা। নীহারিকা? বড়ো বাড়াবাড়ি। বলুন-না রসিকবাবু, আপনার কী মনে হয়।

রসিক। নাম মনে হয় না মশায়, আমার ভাব মনে আসে, অভিধানে যত 'ন' আছে সমস্ত মাথার মধ্যে রাশীকৃত হয়ে উঠতে চাচ্ছে, 'ন'য়ের মালা গেঁথে একটি নীলোৎপল-নয়নার গলায় পরিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে— নির্মলনবনীনিন্দিতনবীন— বলুন-না শ্রীশবাবু, শেষ করে দিন-না—

শ্রীশ। নবমল্লিকা।

রসিক। বেশ বেশ— নির্মলনবনীনিন্দিতনবীননবমল্লিকা। গীতগোবিন্দ মাটি হল। আরও অনেকগুলো ভালো ভালো 'ন' মাথার মধ্যে হাহাকার করে বেড়াচ্ছে, মিলিয়ে দিতে পারছি নে— নিভৃত নিকুঞ্জনিলয়, নিপুণনূপুরনিক্কণ, নিবিড়নীরদনির্মুক্ত— অক্ষয়দাদা থাকলে ভাবতে হত না। মাস্টারমশায়কে দেখবামাত্র ছেলেগুলো যেমন বেঞ্চে নিজ নিজ স্থানে সার বেঁধে বসে তেমনি অক্ষয়দাদার সাড়া পাবামাত্র কথাগুলো দৌড়ে এসে জুড়ে দাঁড়ায়।— শ্রীশবাবু, বুড়ো মানুষকে বঞ্চনা করে রুমালখানা চুপি চুপি পকেটে পুরবেন না—

শ্রীশ। আবিষ্কারকর্তার অধিকার সকলের উপর—

রসিক। আমার ওই রুমালখানিতে একটু প্রয়োজন আছে শ্রীশবাবু। আপনাকে তো বলেছি আমার নির্জন ঘরের একটিমাত্র জানলা দিয়ে একটুমাত্র চাঁদের আলো আসে, আমার একটি কবিতা মনে পড়ে—

বীথীষু বীথীষু বিলাসিনীনাং
মুখানি সংবীক্ষ্য শুচিস্মিতানি
জালেষু জালেষু করং প্রসার্য
লাবণ্যভিক্ষামটতীব চন্দ্রঃ।

কুঞ্জ- পথে পথে চাঁদ উঁকি দেয় আসি,
দেখে বিলাসিনীদের মুখভরা হাসি।
কর প্রসারণ করি ফিরে সে জাগিয়া
বাতায়নে বাতায়নে লাবণ্য মাগিয়া।

হতভাগা ভিক্ষুক আমার বাতায়নটায় যখন আসে তখন তাকে কী দিয়ে ভোলাই বলুন তো। কাব্যশাস্ত্রের রসালো জায়গা যা-কিছু মনে আসে সমস্ত আউড়ে যাই, কিন্তু কথায় চিঁড়ে ভেজে না। সেই দুর্ভিক্ষের সময় ওই রুমালখানি বড়ো কাজে লাগবে। ওতে অনেকটা লাবণ্যের সংস্রব আছে।

শ্রীশ। সে লাবণ্য দৈবাৎ কখনো দেখেছেন রসিকবাবু?

রসিক। দেখেছি বৈকি, নইলে কি ওই রুমালখানার জন্যে এত লড়াই করি। আর ওই-যে 'ন' অক্ষরের কথাগুলো আমার মাথার মধ্যে এখনও এক ঝাঁক ভ্রমরের মতো গুঞ্জন করে বেড়াচ্ছে তাদের সামনে কি একটি কমলবনবিহারিণী মানসীমূর্তি নেই।

শ্রীশ। রসিকবাবু, আপনার ওই মগজটি একটি মৌচাক-বিশেষ, ওর ফুকোরে ফুকোরে কবিত্বের মধু। আমাকে সুদ্ধ মাতাল করে দেবেন দেখছি। [দীর্ঘনিশ্বাসপতন

পুরুষবেশী শৈলবালার প্রবেশ

শৈলবালা। আমার আসতে অনেক দেরি হয়ে গেল, মাপ করবেন শ্রীশবাবু।

শ্রীশ। আমি এই সন্ধেবেলায় উৎপাত করতে এলুম, আমাকেও মাপ করবেন অবলাকান্তবাবু।

শৈলবালা। রোজ সন্ধেবেলায় যদি এই রকম উৎপাত করেন তা হলে মাপ করব, নইলে নয়।

শ্রীশ। আচ্ছা রাজি, কিন্তু এর পরে যখন অনুতাপ উপস্থিত হবে তখন প্রতিজ্ঞা স্মরণ করবেন।

শৈলবালা। আমার জন্যে ভাববেন না, কিন্তু আপনার যদি অনুতাপ উপস্থিত হয় তা হলে আপনাকে নিষ্কৃতি দেব।

শ্রীশ। সেই ভরসায় যদি থাকেন তা হলে অনন্তকাল অপেক্ষা করতে হবে।

শৈলবালা। রসিকদাদা, তুমি শ্রীশবাবুর পকেটের দিকে হাত বাড়াচ্ছ কেন। বুড়ো বয়সে গাঁটকাটা ব্যাবসা ধরবে নাকি।

রসিক। না ভাই, সে ব্যাবসা তোদের বয়সেই শোভা পায়। একখানা রুমাল নিয়ে শ্রীশবাবুতে আমাতে তক্‌রার চলছে, তোকে তার মীমাংসা করে দিতে হবে।

শৈলবালা। কিরকম।

রসিক। প্রেমের বাজারে বড়ো মহাজনি করবার মূলধন আমার নেই। আমি খুচরো মালের কারবারী— রুমালটা, চুলের দড়িটা, ছেঁড়া কাগজে দু-চারটে হাতের অক্ষর, এই-সমস্ত কুড়িয়ে-বাড়িয়েই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। শ্রীশবাবুর যেরকম মূলধন আছে তাতে উনি বাজার-সুদ্ধ পাইকেরি দরে কিনে নিতে পারেন— রুমাল কেন, সমস্ত নীলাঞ্চলে অর্ধেক ভাগ বসাতে পারেন। আমরা যেখানে চুলের দড়ি গলায় জড়িয়ে মরতে ইচ্ছে করি উনি যে সেখানে আগুল্‌ফবিলম্বিত চিকুররাশির সুগন্ধ ঘনান্ধকারের মধ্যে সম্পূর্ণ অস্ত যেতে পারেন। উনি উঞ্ছবৃত্তি করতে আসেন কেন।

শ্রীশ। অবলাকান্তবাবু, আপনি তো নিরপেক্ষ ব্যক্তি, রুমালখানা এখন আপনার

হাতেই থাক্, উভয় পক্ষের বক্তৃতা শেষ হয়ে গেলে বিচারে যার প্রাপ্য হয় তাকেই দেবেন।

শৈলবালা। (রুমালখানি পকেটে পুরিয়া) আমাকে আপনি নিরপেক্ষ লোক মনে করছেন বুঝি? এই কোণে যেমন একটি 'ন' অক্ষর লাল সুতোয় সেলাই করা আছে আমার হৃদয়ের একটি কোণে খুঁজলে দেখতে পাবেন ওই অক্ষরটি রক্তের বর্ণে লেখা। এ রুমাল আমি আপনাদের কাউকেই দেব না।

শ্রীশ। রসিকবাবু, এ কী রকম জবর্দস্তি। আর, 'ন' অক্ষরটিও তো বড়ো ভয়ানক অক্ষর।

রসিক। শুনেছি বিলিতি শাস্ত্রে ন্যায়ধর্মও অন্ধ, ভালোবাসাও অন্ধ। এখন দুই অন্ধে লড়াই হোক, যার বল বেশি তারই জিত হবে।

শৈলবালা। শ্রীশবাবু, যার রুমাল আপনি তো তাকে দেখেন নি, তবে কেন কেবলমাত্র কল্পনার উপর নির্ভর করে ঝগড়া করছেন।

শ্রীশ। দেখি নি কে বললে।

শৈলবালা। দেখেছেন? কাকে দেখলেন। 'ন' তো দুটি আছে—

শ্রীশ। দুটিই দেখেছি— তা, এ রুমাল দুজনের যাঁরই হোক, দাবি আমি পরিত্যাগ করতে পারব না।

রসিক। শ্রীশবাবু, বৃদ্ধের পরামর্শ শুনুন, হৃদয়গগনে দুই চন্দ্রের আয়োজন করবেন না: একশ্চন্দ্রস্তমোহন্তি।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। (শ্রীশের প্রতি) চন্দ্রবাবুর চিঠি নিয়ে একটি লোক আপনার বাড়ি খুঁজে শেষকালে এখানে এসেছে।

শ্রীশ। (চিঠি পড়িয়া) একটু অপেক্ষা করবেন? চন্দ্রবাবুর বাড়ি কাছেই— আমি একবার চট করে দেখা করে আসব।

শৈলবালা। পালাবেন না তো?

শ্রীশ। না, আমার রুমাল বন্ধক রইল, ওখানা খালাস না করে যাচ্ছি নে। [প্রস্থান

রসিক। ভাই শৈল, কুমারসভার সভ্যগুলিকে যেরকম ভয়ংকর কুমার ঠাউরেছিলুম তার কিছুই নয়। এদের তপস্যা ভঙ্গ করতে মেনকা রম্ভা মদন বসন্ত কারও দরকার হয় না, এই বুড়ো রসিকই পারে।

শৈলবালা। তাই তো দেখছি।

রসিক। আসল কথাটা কী জান? যিনি দার্জিলিঙে থাকেন তিনি ম্যালেরিয়ার দেশে পা বাড়াবামাত্রই রোগে চেপে ধরে। এঁরা এতকাল চন্দ্রবাবুর বাসায় বড্ড নীরোগ জায়গায় ছিলেন, এই বাড়িটি যে রোগের বীজে ভরা এখানকার রুমালে বইয়ে চৌকিতে টেবিলে যেখানে স্পর্শ করছেন সেইখান থেকেই একেবারে নাকে মুখে রোগ ঢুকছে— আহা, শ্রীশবাবুটি গেল।

শৈলবালা। রসিকদাদা, তোমার বুঝি রোগের বীজ অভ্যেস হয়ে গেছে।

রসিক। আমার কথা ছেড়ে দাও। আমার পিলে যকৃৎ যা-কিছু হবার তা হয়ে গেছে।

নীরবালার প্রবেশ

নীরবালা। দিদি, আমরা পাশের ঘরেই ছিলুম।

রসিক। জেলেরা জাল টানাটানি করে মরছে, আর চিল বসে আছে ছোঁ মারবার জন্যে।

নীরবালা। সেজদিদির রুমালখানা নিয়ে শ্রীশবাবু কী কাণ্ডটাই করলে। সেজদিদি তো লজ্জায় লাল হয়ে পালিয়ে গেছে। আমি এমনি বোকা ভুলেও কিছু ফেলে যাই নি। বারোখানা রুমাল এনেছি, ভাবছি এবার ঘরের মধ্যে রুমালের হরির লুঠ দিয়ে যাব।

শৈলবালা। তোর হাতে ও কিসের খাতা নীর।

নীরবালা। যে গানগুলো আমার পছন্দ হয় ওতে লিখে রাখি দিদি।

রসিক। ছোড়্‌দিদি, আজকাল তোর কিরকম পারমার্থিক গান পছন্দ হচ্ছে তার এক-আধটা নমুনা দেখতে পারি কি।

নীরবালা।— দিন গেল রে, ডাক দিয়ে নে পারের খেয়া—
চুকিয়ে হিসেব মিটিয়ে দে তোর দেয়া-নেয়া।

রসিক। দিদি ভারী ব্যস্ত যে। পার করবার নেয়ে ডেকে দিচ্ছি ভাই। যা দেবে যা নেবে সেটা মোকাবিলায় ঠিক করে নিয়ো।

নীরবালা।— গান

জ্বলে নি আলো অন্ধকারে,
দাও না সাড়া কি তাই বারে বারে।
তোমার বাঁশি আমার বাজে বুকে
কঠিন দুখে, গভীর সুখে—
যে জানে না পথ কাঁদাও তারে।

চেয়ে রই রাতের আকাশ-পানে,
মন যে কী চায় তা মনই জানে!
আশা জাগে কেন অকারণে
আমার মনে ক্ষণে ক্ষণে—
ব্যথার টানে তোমায় আনবে দ্বারে।

নেপথ্যে। অবলাকান্তবাবু আছেন?

বিপিন ঘরে প্রবিষ্ট ও সচকিত হইয়া দণ্ডায়মান

নীরবালা মুহূর্ত হতবুদ্ধি হইয়া দ্রুতবেগে বহিষ্ক্রান্ত

শৈলবালা। আসুন বিপিনবাবু।

বিপিন। ঠিক করে বলুন, আসব কি। আমি আসার দরুন আপনাদের কোনোরকম লোকসান নেই?

রসিক। ঘর থেকে কিছু লোকসান না করলে লাভ হয় না বিপিনবাবু, ব্যাবসার এই রকম নিয়ম। যা গেল তা আবার দুনো হয়ে ফিরে আসতে পারে, কী বল অবলাকান্ত।

শৈলবালা। রসিকদাদার রসিকতা আজকাল একটু শক্ত হয়ে আসছে।

রসিক। গুড় জমে যেরকম শক্ত হয়ে আসে। কিন্তু, বিপিনবাবু কী ভাবছেন বলুন দেখি।

বিপিন। ভাবছি কী ছুতো করে বিদায় নিলে আমাকে বিদায় দিতে আপনাদের ভদ্রতায় বাধবে না।

শৈলবালা। বন্ধুত্বে যদি বাধে?

বিপিন। তা হলে ছুতো খোঁজবার কোনো দরকারই হয় না।

শৈলবালা। তবে সেই খোঁজটা পরিত্যাগ করুন, ভালো হয়ে বসুন।

রসিক। মুখখানা প্রসন্ন করুন বিপিনবাবু। আমাদের প্রতি ঈর্ষা করবেন না। আমি তো বৃদ্ধ, যুবকের ঈর্ষার যোগ্যই নই। আর, আমাদের সুকুমারমূর্তি অবলাকান্তবাবুকে কোনো স্ত্রীলোক পুরুষ বলে জ্ঞানই করে না। আপনাকে দেখে যদি কোনো সুন্দরী কিশোরী ত্রস্তহরিণীর মতো পলায়ন করে থাকেন তা হলে মনকে এই বলে সান্ত্বনা দেবেন যে, তিনি আপনাকে পুরুষ বলেই মস্ত খাতিরটা করেছেন। হায় রে হতভাগ্য রসিক, তোকে দেখে কোনো তরুণী লজ্জাতে পলায়নও করে না।

বিপিন। রসিকবাবু আপনাকেও যে দলে টানছেন অবলাকান্তবাবু। এ কিরকম হল।

শৈলবালা। কী জানি বিপিনবাবু, আমার এই অবলাকান্ত নামটাই মিথ্যে—কোনো অবলা তো এ পর্যন্ত আমাকে কান্ত বলে বরণ করে নি।

বিপিন। হতাশ হবেন না, এখনও সময় আছে।

শৈলবালা। সে আশা এবং সে সময় যদি থাকত তা হলে চিরকুমার-সভায় নাম লেখাতে যেতুম না।

বিপিন। (স্বগত) এঁর মনের মধ্যে একটা কী বেদনা রয়েছে, নইলে এত অল্প বয়সে এই কাঁচামুখে এমন স্নিগ্ধ কোমল করুণ ভাব থাকত না। এটা কিসের খাতা। গান লেখা দেখছি। 'নীরবালা দেবী'। (পাঠ)

শৈলবালা। কী পড়ছেন বিপিনবাবু।

বিপিন। কোনো একটি অপরিচিতার কাছে অপরাধ করছি, হয়তো তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবার সুযোগ পাব না এবং হয়তো তাঁর কাছে শাস্তি পাবারও সৌভাগ্য হবে না, কিন্তু এই গানগুলি মানিক এবং হাতের অক্ষরগুলি মুক্তো। যদি লোভে পড়ে চুরি করি তবে দণ্ডদাতা বিধাতা ক্ষমা করবেন।

শৈলবালা। বিধাতা মাপ করতে পারেন, কিন্তু আমি করব না। ও খাতাটির 'পরে আমার লোভ আছে বিপিনবাবু।

রসিক। আর, আমি বুঝি লোভ মোহ সমস্ত জয় করে বসে আছি? আহা, হাতের অক্ষরের মতো জিনিস আর আছে? মনের ভাব মূর্তি ধ'রে আঙুলের আগা দিয়ে বেরিয়ে আসে— অক্ষরগুলির উপর চোখ বুলিয়ে গেলে হৃদয়টি যেন চোখে এসে লাগে। অবলাকান্ত, এ খাতাখানি ছেড়ো না ভাই। তোমাদের চঞ্চলা নীরবালা দেবী কৌতুকের ঝরনার মতো দিনরাত ঝরে পড়ছে, তাকে তো ধরে রাখতে পার না, এই খাতাখানির পত্রপুটে তারই একটি গণ্ডূষ ভরে উঠেছে— এ জিনিসের দাম আছে। বিপিনবাবু, আপনি তো নীরবালাকে জানেন না, আপনি এ খাতাখানা নিয়ে কী করবেন।

বিপিন। আপনারা তো স্বয়ং তাঁকেই জানেন, খাতাখানিতে আপনাদের প্রয়োজন কী। এই খাতা থেকে আমি যেটুকু পরিচয় প্রত্যাশা করি তার প্রতি আপনারা দৃষ্টি দেন কেন।

শ্রীশের প্রবেশ

শ্রীশ। মনে পড়েছে মশায়। সেদিন এখানে একটা বইয়েতে নাম দেখেছিলেম, নৃপবালা, নীরবালা— এ কী, বিপিন যে! তুমি এখানে হঠাৎ?

বিপিন। তোমার সম্বন্ধেও ঠিক ওই প্রশ্নটা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

শ্রীশ। আমি এসেছিলুম আমার সেই সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের কথাটা অবলাকান্তবাবুর সঙ্গে আলোচনা করতে। ওঁর যেরকম চেহারা, কণ্ঠস্বর, মুখের ভাব, উনি ঠিক আমার সন্ন্যাসীর আদর্শ হতে পারেন। উনি যদি ওঁর ওই চন্দ্রকলার মতো কপালটিতে চন্দন দিয়ে, গলায় মালা প'রে, হাতে একটি বীণা নিয়ে, সকালবেলায় একটি পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করেন তা হলে কোন্ গৃহস্থের হৃদয় না গলাতে পারেন।

রসিক। বুঝতে পারছি নে মশায়, হৃদয় গলাবার কি খুব জরুরি দরকার হয়েছে।

শ্রীশ। চিরকুমার-সভা হৃদয় গলাবার সভা।

রসিক। বলেন কী। তবে আমার দ্বারা কী কাজ পাবেন।

শ্রীশ। আপনার মধ্যে যেরূপ উত্তাপ আছে আপনি উত্তরমেরুতে গেলে সেখানকার বরফ গলিয়ে বন্যা করে দিয়ে আসতে পারেন।— বিপিন, উঠছ নাকি।

বিপিন। যাই, আমাকে রাত্রে একটু পড়তে হবে।

রসিক। (জনান্তিকে) অবলাকান্ত জিজ্ঞাসা করছেন, পড়া হয়ে গেলে বইখানা কি ফেরত পাওয়া যাবে।

বিপিন। (জনান্তিকে) পড়া হয়ে গেলে সে আলোচনা পরে হবে, আজ থাক্।

শৈলবালা। (মৃদুস্বরে) শ্রীশবাবু ইতস্তত করছেন কেন, আপনার কিছু হারিয়েছে নাকি।

শ্রীশ। (মৃদুস্বরে) আজ থাক্, আর একদিন খুঁজে দেখব।

[শ্রীশ ও বিপিনের প্রস্থান

নীরবালা। (দ্রুত প্রবেশ করিয়া) এ কী রকমের ডাকাতি দিদি। আমার গানের খাতাখানা নিয়ে গেল! আমার ভয়ানক রাগ হচ্ছে।

রসিক। রাগ শব্দে নানা অর্থ অভিধানে কয়।

নীরবালা। আচ্ছা পণ্ডিতমশায়, তোমার অভিধান জাহির করতে হবে না— আমার খাতা ফিরিয়ে আনো।

রসিক। পুলিসে খবর দে ভাই, চোর ধরা আমার ব্যাবসা নয়।

নীরবালা। কেন দিদি, তুমি আমার খাতা নিয়ে যেতে দিলে।

শৈলবালা। এমন অমূল্য ধন তুই ফেলে রেখে যাস কেন।

নীরবালা। আমি বুঝি ইচ্ছে করে ফেলে রেখে গেছি।

রসিক। লোকে সেইরকম সন্দেহ করছে।

নীরবালা। না রসিকদাদা, তোমার ও ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না।

রসিক। তা হলে ভয়ানক খারাপ অবস্থা। [নীরবালার সক্রোধে প্রস্থান

সলজ্জ নৃপবালার প্রবেশ

রসিক। কী নৃপ, হারাধন খুঁজে বেড়াচ্ছিস?

নৃপবালা। না, আমার কিছু হারায় নি।

রসিক। সে তো অতি সুখের সংবাদ। শৈলদিদি, তা হলে আর কেন, রুমালখানার মালিক যখন পাওয়া যাচ্ছে না তখন যে লোক কুড়িয়ে পেয়েছে তাকেই ফিরিয়ে দিস। (শৈলর হাত হইতে রুমাল লইয়া) এ জিনিসটা কার ভাই।

নৃপবালা। ও আমার নয়। [পলায়নোদ্যত

রসিক। (নৃপকে ধরিয়া) যে জিনিসটা খোওয়া গেছে নৃপ তার উপরে কোনো দাবিও রাখতে চায় না।

নৃপবালা। রসিকদাদা, ছাড়ো, আমার কাজ আছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গোলদিঘির পথ

শ্রীশ ও বিপিন

শ্রীশ। ওহে বিপিন, আজ মাঘের শেষে প্রথম বসন্তের বাতাস দিয়েছে, জ্যোৎস্নাও দিব্যি, আজ যদি এখনই ঘুমোতে কিম্বা পড়া মুখস্থ করতে যাওয়া যায় তা হলে দেবতারা ধিক্‌কার দেবেন।

বিপিন। তাঁদের ধিক্‌কার খুব সহজে সহ্য হয়, কিন্তু ব্যামোর ধাক্কা কিম্বা—

শ্রীশ। দেখো, ওইজন্যে তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়। আমি বেশ জানি দক্ষিনে হাওয়ায় তোমারও প্রাণটা চঞ্চল হয়, কিন্তু পাছে কেউ তোমাকে কবিত্বের অপবাদ দেয় ব'লে মলয়-সমীরণটাকে একেবারেই আমল দিতে চাও না। এতে তোমার বাহাদুরিটা কী জিজ্ঞাসা করি। আমি তোমার কাছে আজ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি, আমার ফুল ভালো লাগে, জ্যোৎস্না ভালো লাগে—

বিপিন। এবং—

শ্রীশ। এবং যা-কিছু ভালো লাগবার মতো জিনিস সবই ভালো লাগে।

বিপিন। বিধাতা তো তোমাকে ভারী আশ্চর্য রকম ছাঁচে গড়েছেন দেখছি।

শ্রীশ। তোমার ছাঁচ আরও আশ্চর্য। তোমার লাগে ভালো, কিন্তু বল অন্যরকম— আমার সেই শোবার ঘরের ঘড়িটার মতো— সে চলে ঠিক, বাজে ভুল।

বিপিন। কিন্তু শ্রীশ, তোমার যদি সব মনোরম জিনিসই মনোহর লাগতে লাগল তা হলে তো আসন্ন বিপদ।

শ্রীশ। আমি তো কিছুই বিপদ বোধ করি নে।

বিপিন। সেই লক্ষণটাই তো সব চেয়ে খারাপ। রোগের যখন বেদনাবোধ চলে যায় তখন আর চিকিৎসার রাস্তা থাকে না। আমি ভাই, স্পষ্টই কবুল করছি, স্ত্রীজাতির একটা আকর্ষণ আছে— চিরকুমার-সভা যদি সেই আকর্ষণ এড়াতে চান তা হলে তাঁকে খুব তফাত দিয়ে যেতে হবে।

শ্রীশ। ভুল, ভুল, ভয়ানক ভুল। তুমি তফাতে থাকলে কী হবে, তাঁরা তো তফাতে থাকেন না। সংসাররক্ষার জন্যে বিধাতাকে এত নারী সৃষ্টি করতে হয়েছে যে তাঁদের এড়িয়ে চলা অসম্ভব। অতএব কৌমার্য যদি রক্ষা করতে চাও তা হলে নারীজাতিকে অল্পে অল্পে সইয়ে নিতে হবে। ওই-যে স্ত্রীসভ্য নেবার নিয়ম হয়েছে, এতদিন পরে কুমারসভা চিরস্থায়ী হবার উপায় অবলম্বন করেছে। কিন্তু, কেবল একটিমাত্র মহিলা হলে চলবে না বিপিন, অনেকগুলি স্ত্রীসভ্য চাই। বদ্ধ ঘরের একটি জানলা খুলে ঠাণ্ডা লাগালে সর্দি ধরে, খোলা হাওয়ায় থাকলে সে বিপদ নেই।

বিপিন। আমি তোমার ওই খোলা-হাওয়া বদ্ধ-হাওয়া বুঝি নে ভাই। যার সর্দির ধাত তাকে সর্দি থেকে রক্ষা করতে দেবতা মনুষ্য কেউ পারে না।

শ্রীশ। তোমার ধাত কী বলছে হে।

বিপিন। সে কথা খোলসা করে বললেই বুঝতে পারবে তোমার ধাতের সঙ্গে তার চমৎকার মিল আছে। নাড়িটা যে সব সময়ে ঠিক চিরকুমারের নাড়ির মতো চলে তা জাঁক করে বলতে পারব না।

শ্রীশ। ওইটে তোমার আর-একটা ভুল। চিরকুমারের নাড়ির উপরে উনপঞ্চাশ পবনের নৃত্য হতে দাও— কোনো ভয় নেই, বাঁধাবাঁধি চাপাচাপি কোরো না। আমাদের মতো ব্রত যাদের তারা কি হৃদয়টিকে তুলো দিয়ে মুড়ে রাখতে পারে। তাকে অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়ার মতো ছেড়ে দাও, যে তাকে বাঁধবে তার সঙ্গে লড়াই করো।

বিপিন। ও কে হে। পূর্ণ দেখছি। ও বেচারার এ গলি থেকে আর বেরোবার জো নেই। ওই বীরপুরুষের অশ্বমেধের ঘোড়াটি বেজায় খোঁড়াচ্ছে। ওকে একবার ডাক দেব?

শ্রীশ। ডাকো। ও কিন্তু আমাদেরই দুজনকে অন্বেষণ করে গলিতে গলিতে ঘুরছে বলে বোধ হচ্ছে না।

বিপিন। পূর্ণবাবু, খবর কী।

পূর্ণর প্রবেশ

পূর্ণ। অত্যন্ত পুরোনো। কাল-পরশু যে খবর চলছিল আজও তাই চলছে।

শ্রীশ। কাল-পরশু শীতের হাওয়া বচ্ছিল, আজ বসন্তের হাওয়া দিয়েছে— এতে দুটো-একটা নতুন খবরের আশা করা যেতে পারে।

পূর্ণ। দক্ষিণের হাওয়ায় যে-সব খবরের সৃষ্টি হয় কুমারসভার খবরের কাগজে তার স্থান নেই। তপোবনে একদিন অকালে বসন্তের হাওয়া দিয়েছিল, তাই নিয়ে কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্য রচনা হয়েছে— আমাদের কপালগুণে বসন্তের হাওয়ায় কুমার-অসম্ভব কাব্য হয়ে দাঁড়ায়।

বিপিন। হয় তো হোক-না পূর্ণবাবু— সে কাব্যে যে দেবতা দগ্ধ হয়েছিলেন এ কাব্যে তাঁকে পুনর্জীবন দেওয়া যাক।

পূর্ণ। এ কাব্যে চিরকুমার-সভা দগ্ধ হোক। যে দেবতা জ্বলেছিলেন তিনি জ্বালান। না, আমি ঠাট্টা করছি নে শ্রীশবাবু, আমাদের চিরকুমার-সভাটি একটি আস্ত জতুগৃহ-বিশেষ। আগুন লাগলে রক্ষে নেই। তার চেয়ে বিবাহিত সভা স্থাপন করো, স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে নিরাপদ থাকবে। যে ইঁট পাঁজায় পুড়েছে তা দিয়ে ঘর তৈরি করলে আর পোড়বার ভয় থাকে না হে।

শ্রীশ। যে-সে লোক বিবাহ ক'রে বিবাহ জিনিসটা মাটি হয়ে গেছে পূর্ণবাবু। সেই জন্যেই তো কুমারসভা। আমার যতদিন প্রাণ আছে ততদিন এ সভায় প্রজাপতির প্রবেশ নিষেধ।

বিপিন। পঞ্চশর?

শ্রীশ। আসুন তিনি। একবার তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেলে, বাস্, আর ভয় নেই।

পূর্ণ। দেখো শ্রীশবাবু—

শ্রীশ। দেখব আর কী। তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। এক চোট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলব, কবিতা আওড়াব, কনকবলয়ভ্রংসরিক্তপ্রকোষ্ঠ হয়ে যাব, তবে রীতিমতো সন্ন্যাসী হতে পারব। আমাদের কবি লিখেছেন—

নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া,
তোমার অনল দিয়া।
কবে যাবে তুমি সমুখের পথে
দীপ্ত শিখাটি বাহি
আছি তাই পথ চাহি।

পুড়িবে বলিয়া রয়েছে আশায়
আমার নীরব হিয়া
আপন আঁধার নিয়া।
নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া।

পূর্ণ। ওহে শ্রীশবাবু, তোমার কবিটি তো মন্দ লেখে নি—

নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া।

ঘরটি সাজানো রয়েছে— থালায় মালা, পালঙ্কে পুষ্পশয্যা, কেবল জীবনপ্রদীপটি জ্বলছে না, সন্ধ্যা ক্রমে রাত্রি হতে চলল। বাঃ, দিব্যি লিখেছে। কোন্ বইটাতে আছে বলো দেখি।

শ্রীশ। বইটার নাম 'আবাহন'।

পূর্ণ। নামটাও বেছে বেছে দিয়েছে ভালো। (আপন মনে)—

নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া। (দীর্ঘনিশ্বাস)

তোমরা কি বাড়ির দিকে চলেছ।

শ্রীশ। বাড়ি কোন্ দিকে ভুলে গেছি ভাই।

পূর্ণ। আজ পথ ভোলবার মতোই রাতটা হয়েছে বটে। কী বল বিপিনবাবু।

শ্রীশ। বিপিনবাবু এ-সকল বিষয়ে কোনো কথাই কন না, পাছে ওঁর ভিতরকার কবিত্ব ধরা পড়ে। কৃপণ যে জিনিসটার বেশি আদর করে সেইটেকেই মাটির নীচে পুঁতে রাখে।

বিপিন। অস্থানে বাজে খরচ করতে চাই নে ভাই, স্থান খুঁজে বেড়াচ্ছি। মরতে হলে একেবারে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে মরাই ভালো।

পূর্ণ। এ তো উত্তম কথা, শাস্ত্রসংগত কথা। বিপিনবাবু একেবারে অন্তিম কালের জন্যে কবিত্ব সঞ্চয় করে রাখছেন, যখন অন্যে বাক্য কবেন কিন্তু উনি রবেন নিরুত্তর। আশীর্বাদ করি অন্যের সেই বাক্যগুলি যেন মধুমাখা হয়—

শ্রীশ। এবং তার সঙ্গে যেন কিঞ্চিৎ ঝালের সম্পর্কও থাকে—

বিপিন। এবং বাক্যবর্ষণ করেই যেন মুখের সমস্ত কর্তব্য নিঃশেষ না হয়—

পূর্ণ। বাক্যের বিরামস্থলগুলি যেন বাক্যের চেয়ে মধুমত্তর হয়ে ওঠে—

শ্রীশ। সেদিন নিদ্রা যেন না আসে—

পূর্ণ। রাত্রি যেন না যায়—

বিপিন। চন্দ্র যেন পূর্ণচন্দ্র হয়—

পূর্ণ। বিপিন যেন বসন্তের ফুলে প্রফুল্ল হয়ে ওঠে—

শ্রীশ। এবং হতভাগ্য শ্রীশ যেন কুঞ্জদ্বারের কাছে এসে উঁকিঝুঁকি না মারে।

পূর্ণ। দূর হোক গে শ্রীশবাবু, তোমার সেই 'আবাহন' থেকে আর-একটা কিছু কবিতা আওড়াও। চমৎকার লিখেছে হে—

নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া।

আহা! একটি জীবনপ্রদীপের শিখাটুকু আর-একটি জীবনপ্রদীপের মুখের কাছে কেবল একটু ঠেকিয়ে গেলেই হয়, বাস্, আর কিছুই নয়— দুটি কোমল অঙ্গুলি দিয়ে দীপখানি একটু হেলিয়ে একটু ছুঁইয়ে যাওয়া, তার পরেই চকিতের মধ্যে সমস্ত আলোকিত। (আপন মনে)— নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া।

শ্রীশ। পূর্ণবাবু, যাও কোথায়।

পূর্ণ। চন্দ্রবাবুর বাসায় একখানা বই ফেলে এসেছি, সেইটে খুঁজতে যাচ্ছি।

বিপিন। খুঁজলে পাবে তো? চন্দ্রবাবুর বাসা বড়ো এলোমেলো জায়গা— সেখানে যা হারায় সে আর পাওয়া যায় না। [পূর্ণের প্রস্থান

শ্রীশ। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) পূর্ণ বেশ আছে ভাই বিপিন।

বিপিন। ভিতরকার বাষ্পের চাপে ওর মাথাটা সোডাওআটারের ছিপির মতো একেবারে টপ্ করে উড়ে না যায়।

শ্রীশ। যায় তো যাক-না। কোনোমতে লোহার তার এঁটে মাথাটাকে ঠিক জায়গায় ধরে রাখাই কি জীবনের চরম পুরুষার্থ। মাঝে মাঝে মাথার বেঠিক না হলে রাত দিন মুটের বোঝার মতো মাথাটাকে বয়ে বেড়াচ্ছি কেন। দাও ভাই, তার কেটে, একবার উড়ুক। সেদিন তোমাকে শোনাচ্ছিলুম—

ওরে সাবধানী পথিক, বারেক
পথ ভুলে মর্ ফিরে।
খোলা আঁখি দুটো অন্ধ করে দে
আকুল আঁখির নীরে।
সে ভোলা পথের প্রান্তে রয়েছে
হারানো হিয়ার কুঞ্জ—

ঝরে পড়ে আছে কাঁটাতরু-তলে
রক্তকুসুমপুঞ্জ,
সেথা দুই বেলা ভাঙা-গড়া খেলা
অকূলসিন্ধুতীরে।
ওরে সাবধানী পথিক, বারেক
পথ ভুলে মর্‌ ফিরে।

বিপিন। আজকাল তুমি খুব কবিতা পড়তে আরম্ভ করেছ, শীঘ্রই একটা মুশকিলে পড়বে দেখছি।

শ্রীশ। যে লোক ইচ্ছে করে মুশকিলের রাস্তা খুঁজে বেড়াচ্ছে তার জন্যে কেউ ভেবো না। মুশকিলকে এড়িয়ে চলতে গিয়ে হঠাৎ মুশকিলের মধ্যে পা ফেললেই বিপদ। আসুন আসুন রসিকবাবু, রাত্রে পথে বেরিয়েছেন যে!

রসিকের প্রবেশ

রসিক। আমার রাতই বা কী, আর দিনই বা কী—

বরমসৌ দিবসো ন পুনর্নিশা
ননু নিশৈব বরং ন পুনর্দিনম্‌।
উভয়মেতদুপৈত্বথবা ক্ষয়ং
প্রিয়জনেন ন যত্র সমাগমঃ।

শ্রীশ। অস্যার্থঃ?

রসিক। অস্যার্থ হচ্ছে—

আসে তো আসুক রাতি, আসুক বা দিবা,
যায় যদি যাক নিরবধি।
তাহাদের যাতায়াতে আসে যায় কিবা
প্রিয় মোর নাহি আসে যদি।

অনেকগুলো দিন রাত এ-পর্যন্ত এসেছে এবং গেছে, কিন্তু তিনি আজ পর্যন্ত এসে পৌঁছলেন না— তাই, দিনই বলুন আর রাতই বলুন, ও দুটোর 'পরে আমার আর কিছু-মাত্র শ্রদ্ধা নেই।

শ্রীশ। আচ্ছা রসিকবাবু, প্রিয়জন এখনই যদি হঠাৎ এসে পড়েন।

রসিক। তা হলে আমার দিকে তাকাবেন না, তোমাদের দুজনের মধ্যে একজনের ভাগেই পড়বেন।

শ্রীশ। তা হলে তদ্দণ্ডেই তিনি অরসিক বলে প্রমাণ হয়ে যাবেন।

রসিক। এবং পরদণ্ডেই পরমানন্দে কালযাপন করতে থাকবেন। তা, আমি ঈর্ষা করতে চাই নে শ্রীশবাবু। আমার ভাগ্যে যিনি আসতে বহু বিলম্ব করলেন আমি তাঁকে তোমাদের উদ্দেশেই উৎসর্গ করলুম। দেবী, তোমার বরমাল্য গেঁথে আনো। আজ বসন্তের শুক্লরজনী, আজ অভিসারে এসো।—

মন্দং নিধেহি চরণৌ পরিধেহি নীলং
বাসঃ পিধেহি বলয়াবলিমঞ্চলেন।
মা জল্প সাহসিনি শারদচন্দ্রকান্ত-
দন্তাংশবস্তব তমাংসি সমাপয়ন্তি।

ধীরে ধীরে চলো তন্বী, পরো নীলাম্বর,
অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখো কঙ্কণ মুখর।
কথাটি কোয়ো না, তব দন্ত-অংশু-রুচি
পথের তিমিররাশি পাছে ফেলে মুছি।

শ্রীশ। রসিকবাবু, আপনার ঝুলি যে একেবারে ভরা। এমন কত তর্জমা করে রেখেছেন।

রসিক। বিস্তর। লক্ষ্মী তো এলেন না, কেবল বাণীকে নিয়েই দিন যাপন করছি।

শ্রীশ। ওহে বিপিন, অভিসার-ব্যাপারটা কল্পনা করতে বেশ লাগে।

বিপিন। ওটা পুনর্বার চালাবার জন্যে চিরকুমার-সভায় একটা প্রস্তাব এনে দেখো-না।

শ্রীশ। কতকগুলো জিনিস আছে যার আইডিয়াটা এত সুন্দর যে সংসারে সেটা চালাতে সাহস হয় না। যে রাস্তায় অভিসার হতে পারে, যেখানে কামিনীদের হার থেকে মুক্তো ছিঁড়ে ছড়িয়ে পড়ে, সে রাস্তা কি তোমার পটলডাঙা স্ট্রীট। সে রাস্তা জগতে কোথাও নেই। বিরহিণীর হৃদয় নীলাম্বরী পরে মনোরাজ্যের পথে ওই রকম করে বেরিয়ে থাকে— বক্ষের উপর থেকে মুক্তো ছিঁড়ে পড়ে, চেয়েও দেখে না— সত্যিকার মুক্তো হলে কুড়িয়ে নিত। কী বলেন রসিকবাবু।

রসিক। সে কথা মানতেই হয়— অভিসারটা মনে মনেই ভালো, গাড়িঘোড়ার রাস্তায় অত্যন্ত বেমানান। আশীর্বাদ করি শ্রীশবাবু, এই রকম বসন্তের জ্যোৎস্নারাত্রে কোনো-একটি জানলা থেকে কোনো-এক রমণীর ব্যাকুল হৃদয় তোমার বাসার দিকে যেন অভিসারে যাত্রা করে।

শ্রীশ। তা করবে রসিকবাবু, আপনার আশীর্বাদ ফলবে। আজকের হাওয়াতে

সেই খবরটা আমি মনে মনে পাচ্ছি। বিশে ডাকাত যেমন খবর দিয়ে ডাকাতি করত আমার অজানা অভিসারিকা তেমনি পূর্বে হতেই আমাকে অভিসারের খবর পাঠিয়েছে।

বিপিন। তোমার সেই ছাতের বারান্দাটা সাজিয়ে প্রস্তুত হয়ে থেকো।

শ্রীশ। তা, আমার সেই দক্ষিণের বারান্দায় একটি চৌকিতে আমি বসি, আর-একটি চৌকি সাজানো থাকে।

বিপিন। সেটাতে আমি এসে বসি।

শ্রীশ। মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ, অভাবপক্ষে তোমাকে নিয়ে চলে।

বিপিন। মধুময়ী যখন আসবেন তখন হতভাগার ভাগ্যে লগুড়ং দদ্যাৎ।

রসিক। (জনান্তিকে) শ্রীশবাবু, আপনার সেই দক্ষিণের ছাতটিকে চিহ্নিত করে রাখবার জন্যে যে পতাকা ওড়ানো আবশ্যক সেটা যে ফেলে এলেন।

শ্রীশ। রুমালটা কি এখন চেষ্টা করলে পাওয়া যেতে পারবে ?

রসিক। চেষ্টা করতে দোষ কী।

শ্রীশ। বিপিন, তুমি ভাই রসিকবাবুর সঙ্গে একটু কথাবার্তা কও, আমি চট্‌ করে আসছি। [প্রস্থান

বিপিন। আচ্ছা রসিকবাবু, রাগ করবেন না—

রসিক। যদি বা করি আপনার ভয় করবার কোনো কারণ নেই, আমি ভারী দুর্বল।

বিপিন। দু-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব, আপনি বিরক্ত হবেন না।

রসিক। আমার বয়স সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন নয় তো ?

বিপিন। না।

রসিক। তবে জিজ্ঞাসা করুন, ঠিক উত্তর পাবেন।

বিপিন। সেদিন যে মহিলাটিকে দেখলুম, তিনি—

রসিক। তিনি আলোচনার যোগ্য, আপনি সংকোচ করবেন না বিপিনবাবু— তাঁর সম্বন্ধে যদি আপনি মাঝে মাঝে চিন্তা ও চর্চা করে থাকেন তবে তাতে আপনার অসাধারণত্ব প্রমাণ হয় না, আমরাও ঠিক ওই কাজ করে থাকি।

বিপিন। অবলাকান্তবাবু বুঝি—

রসিক। তাঁর কথা বলবেন না, তাঁর মুখে অন্য কথা নেই।

বিপিন। তিনি কি—

রসিক। হাঁ, তাই বটে। তবে হয়েছে কী, তিনি নৃপবালা নীরবালা দুজনের কাকে যে বেশি ভালোবাসেন স্থির করে উঠতে পারেন না— তিনি দুজনের মধ্যে সর্বদাই দোলায়মান।

বিপিন। কিন্তু, তাঁদের কেউ কি ওঁর প্রতি—

রসিক। না, এমন ভাব নয় যে ওঁকে বিবাহ করতে পারেন। সে হলে তো কোনো গোলই ছিল না।

বিপিন। তাই বুঝি অবলাকান্তবাবু কিছু—

রসিক। কিছু যেন চিন্তান্বিত।

বিপিন। শ্রীমতী নীরবালা বুঝি গান ভালোবাসেন ?

রসিক। বাসেন বটে, আপনার পকেটের মধ্যেই তো তার সাক্ষী আছে।

বিপিন। (পকেট হইতে গানের খাতা বাহির করিয়া) এখানা নিয়ে আসা আমার অত্যন্ত অভদ্রতা হয়েছে—

রসিক। সে অভদ্রতা আপনি না করলে আমরা কেউ-না-কেউ করতেম।

বিপিন। আপনারা করলে তিনি মার্জনা করতেন, কিন্তু আমি— বাস্তবিক অন্যায় হয়েছে, কিন্তু এখন ফিরিয়ে দিলেও তো—

রসিক। মূল অন্যায়টা অন্যায়ই থেকে যায়।

বিপিন। অতএব—

রসিক। যাঁহাতক বাহান্ন তাঁহাতক তিপ্পান্ন। হরণে যে দোষটুকু হয়েছে রক্ষণে নাহয় তাতে আর-একটু যোগ হল।

বিপিন। খাতাটা সম্বন্ধে তিনি কি আপনাদের কাছে কিছু বলেছেন।

রসিক। বলেছেন অল্পই, কিন্তু না বলেছেন অনেকটা।

বিপিন। কিরকম।

রসিক। লজ্জায় অনেকখানি লাল হয়ে উঠলেন।

বিপিন। ছি ছি, সে লজ্জা আমারই।

রসিক। আপনার লজ্জা তিনি ভাগ করে নিলেন, যেমন অরুণের লজ্জায় উষা রক্তিম।

বিপিন। আমাকে আর পাগল করবেন না রসিকবাবু।

রসিক। দলে টানছি মশায়।

বিপিন। (খাতা পুনর্বার পকেটে পুরিয়া) ইংরেজিতে বলে, দোষ করা মানবের ধর্ম, ক্ষমা করা দেবতার।

রসিক। আপনি তা হলে মানবধর্ম-পালনটাই সাব্যস্ত করলেন।

বিপিন। দেবীর ধর্মে যা বলে তিনি তাই করবেন।

শ্রীশের প্রবেশ

শ্রীশ। অবলাকান্তবাবুর সঙ্গে দেখা হল না।

বিপিন। তুমি রাতারাতিই তাঁকে সন্ন্যাসী করতে চাও নাকি।

শ্রীশ। যা হোক, অক্ষয়বাবুর কাছে বিদায় নিয়ে এলুম।

বিপিন। বটে বটে, তাঁকে বলে আসতে ভুলে গিয়েছিলেম— একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসি গে।

রসিক। (জনান্তিকে) পুনর্বার কিছু সংগ্রহের চেষ্টায় আছেন বুঝি ? মানবধর্মটা ক্রমেই আপনাকে চেপে ধরছে। [বিপিনের প্রস্থান

শ্রীশ। রসিকবাবু, আপনার কাছে আমার একটা পরামর্শ আছে।

রসিক। পরামর্শ দেবার উপযুক্ত বয়স হয়েছে, বুদ্ধি না হতেও পারে।

শ্রীশ। আপনাদের ওখানে সেদিন যে দুটি মহিলাকে দেখেছিলেম তাঁদের দুজনকেই আমার সুন্দরী বলে বোধ হল।

রসিক। আপনার বোধশক্তির দোষ দেওয়া যায় না। সকলেই তো ওই এক কথাই বলে।

শ্রীশ। তাঁদের সম্বন্ধে যদি মাঝে মাঝে আপনার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করি তা হলে কি—

রসিক। তা হলে আমি খুশি হব, আপনারও সেটা ভালো লাগতে পারে, এবং তাঁদেরও বিশেষ ক্ষতি হবে না।

শ্রীশ। কিছুমাত্র না। ঝিল্লি যদি নক্ষত্র সম্বন্ধে জল্পনা করে—

রসিক। তাতে নক্ষত্রের নিদ্রার ব্যাঘাত হয় না।

শ্রীশ। ঝিল্লিরই অনিদ্রারোগ জন্মাতে পারে। কিন্তু তাতে আমার আপত্তি নেই।

রসিক। আজ তো তাই বোধ হচ্ছে।

শ্রীশ। যাঁর রুমাল কুড়িয়ে পেয়েছিলুম তাঁর নামটি বলতে হবে।

রসিক। তাঁর নাম নৃপবালা।

শ্রীশ। তিনি কোন্‌টি।

রসিক। আপনিই আন্দাজ করে বলুন দেখি।

শ্রীশ। যাঁর সেই লাল রঙের রেশমের শাড়ি পরা ছিল ?

রসিক। বলে যান।

শ্রীশ। যিনি লজ্জায় পালাতে চাচ্ছিলেন, অথচ পালাতেও লজ্জা বোধ করছিলেন— তাই মুহূর্তকালের জন্য হঠাৎ ত্রস্ত হরিণীর মতো থমকে দাঁড়িয়েছিলেন, সামনের দুই-এক

গুচ্ছ চুল প্রায় চোখের উপরে এসে পড়েছিল — চাবির-গোচ্ছা-বাঁধা চ্যুত অঞ্চলটি বাঁ হাতে তুলে ধরে যখন দ্রুতবেগে চলে গেলেন তখন তাঁর পিঠ-ভরা কালো চুল আমার দৃষ্টিপথের উপর দিয়ে একটি কালো জ্যোতিষ্কের মতো ছুটে নৃত্য করে চলে গেল।

রসিক। এ তো নৃপবালাই বটে। পা দুখানি লজ্জিত, হাত দুখানি কুণ্ঠিত, চোখ দুটি ত্রস্ত, চুলগুলি কুঞ্চিত, দুঃখের বিষয় হৃদয়টি দেখতে পান নি— সে যেন ফুলের ভিতরকার লুকোনো মধুটুকুর মতো মধুর, শিশিরটুকুর মতো করুণ।

শ্রীশ। রসিকবাবু, আপনার মধ্যে এত যে কবিত্বরস সঞ্চিত হয়ে রয়েছে তার উৎস কোথায় এবার টের পেয়েছি।

রসিক। ধরা পড়েছি শ্রীশবাবু—

কবীন্দ্রাণাং চেতঃ কমলবনমালাতপরুচিং
ভজন্তে যে সন্তঃ কতিচিদরুণামেব ভবতীং।
বিরিঞ্চিপ্রেয়স্যাস্তরুণতরশৃঙ্গারলহরীং
গভীরাভির্বাগ্‌ভির্বিদধতি সভারঞ্জনময়ীং।

কবীন্দ্রদের চিত্তকমলবনমালার কিরণলেখা যে তুমি, তোমাকে যারা লেশমাত্র ভজনা করে তারাই গভীর বাক্য দ্বারা সরস্বতীর সভারঞ্জনময়ী তরুণলীলালহরী প্রকাশ করতে পারে। আমি সেই কবিচিত্তকমলবনের কিরণলেখাটির পরিচয় পেয়েছি।

শ্রীশ। আমিও অল্প দিন হল একটু পরিচয় পেয়েছি, তার পর থেকে কবিত্ব আমার পক্ষে সহজ হয়ে এসেছে।

অক্ষয়ের প্রবেশ

অক্ষয়। (স্বগত) নাঃ, দুটি নবযুবকে মিলে আমাকে আর ঘরে তিষ্ঠতে দিলে না দেখছি। একটি তো গিয়ে চোরের মতো আমার ঘরের মধ্যে হাৎড়ে বেড়াচ্ছিলেন— ধরা পড়ে ভালোরকম জবাবদিহি করতে পারলে না, শেষকালে আমাকে নিয়ে পড়ল। তার খানিক বাদেই দেখি দ্বিতীয় ব্যক্তিটি গিয়ে ঘরের বইগুলি নিয়ে উল্টেপাল্টে নিরীক্ষণ করছে। তফাত থেকে দেখেই পালিয়ে এসেছি। বেশ মনের মতো করে চিঠিখানি যে লিখব এরা তা আর দিলে না।— আহা, চমৎকার জ্যোৎস্না হয়েছে।

শ্রীশ। এই-যে অক্ষয়বাবু।

অক্ষয়। ওই রে। একটা ডাকাত ঘরের মধ্যে, আর একটা ডাকাত পথের ধারে। হা প্রিয়ে, তোমার ধ্যান থেকে যারা আমার মনকে বিক্ষিপ্ত করছে তারা মেনকা উর্বশী রম্ভা হলে আমার কোনো খেদ ছিল না— মনের মতো ধ্যানভঙ্গও অক্ষয়ের অদৃষ্টে নেই, কলিকালে ইন্দ্রদেবের বয়স বেশি হয়ে বেরসিক হয়ে উঠেছে।

বিপিনের প্রবেশ

বিপিন। এই-যে অক্ষয়বাবু, আপনাকেই খুঁজছিলুম।

অক্ষয়। হায় হতভাগ্য, এমন রাত্রি কি আমাকে খোঁজ করে বেড়াবার জন্যই হয়েছিল।— In such a night as this,

When the sweet wind did gently kiss the trees
And they did make no noise, in such a night
Troilus methinks mounted the Trojan walls
And sighed his soul toward the Grecian tents,
Where Cressid lay that night

শ্রীশ। in such a night আপনি কী করতে বেরিয়েছেন অক্ষয়বাবু।

রসিক।— অপসরতি ন চক্ষুষো মৃগাক্ষী
রজনিরিয়ং চ ন যাতি নৈতি নিদ্রা।

চক্ষু-'পরে মৃগাক্ষীর চিত্রখানি ভাসে—
রজনীও নাহি যায়, নিদ্রাও না আসে।

অক্ষয়বাবুর অবস্থা আমি জানি মশায়।

অক্ষয়। তুমি কে হে।

রসিক। আমি রসিকচন্দ্র— দুই দিকে দুই যুবককে আশ্রয় করে যৌবনসাগরে ভাসমান।

অক্ষয়। এ বয়সে যৌবন সহ্য হবে না রসিকদাদা।

রসিক। যৌবনটা কোন্ বয়সে যে সহ্য হয় তা তো জানি নে, ওটা অসহ্য ব্যাপার। শ্রীশবাবু, আপনার কিরকম বোধ হচ্ছে।

শ্রীশ। এখনও সম্পূর্ণ বোধ করতে পারি নি।

রসিক। আমার মতো পরিণত বয়সের জন্যে অপেক্ষা করছেন বুঝি ?— অক্ষয়দা, আজ তোমাকে বড়ো অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে।

অক্ষয়। তুমি তো অন্যমনস্ক দেখবেই, মনটা ঠিক তোমার দিকে নেই।— বিপিনবাবু, তুমি আমাকে খুঁজছিলে বললে বটে, কিন্তু খুব যে জরুরি দরকার আছে ব'লে বোধ হচ্ছে না, অতএব আমি এখন বিদায় হই— একটু বিশেষ কাজ আছে। [প্রস্থান

রসিক। বিরহী চিঠি লিখতে চলল।

শ্রীশ। অক্ষয়বাবু আছেন বেশ। রসিকবাবু, ওঁর স্ত্রীই বুঝি বড়ো বোন তাঁর নাম?

রসিক। পুরবালা।

বিপিন। (নিকটে আসিয়া) কী নাম বললেন।

রসিক। পুরবালা।

বিপিন। তিনিই বুঝি সব চেয়ে বড়ো?

রসিক। হাঁ।

বিপিন। সব-ছোটোটির নাম?

রসিক। নীরবালা।

শ্রীশ। আর নৃপবালা কোন্‌টি।

রসিক। তিনি নীরবালার বড়ো।

শ্রীশ। তা হলে নৃপবালাই হলেন মেজো।

বিপিন। আর নীরবালা ছোটো।

শ্রীশ। পুরবালার ছোটো নৃপবালা।

বিপিন। তাঁর ছোটো হচ্ছেন নীরবালা।

রসিক। (স্বগত) এরা তো নাম জপ করতে শুরু করলে। আমার মুশকিল। আর তো হিম সহ্য হবে না, পালাবার উপায় করা যাক।

বনমালীর প্রবেশ

বনমালী। এই-যে আপনারা এখানে। আমি আপনাদের বাড়ি গিয়েছিলুম।

শ্রীশ। এইবার আপনি এখানে থাকুন, আমরা বাড়ি যাই।

বনমালী। আপনারা সর্বদাই ব্যস্ত দেখতে পাই।

বিপিন। তা, আপনাকে দেখলে একটু বিশেষ ব্যস্ত হয়েই পড়ি।

বনমালী। পাঁচ মিনিট যদি দাঁড়ান—

শ্রীশ। রসিকবাবু, একটু ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে না?

রসিক। আপনাদের এত ক্ষণে বোধ হল, আমার অনেক ক্ষণ থেকেই বোধ হচ্ছে।

বনমালী। চলুন-না, ঘরেই চলুন-না।

শ্রীশ। মশায়, এত রাত্রে যদি আমার ঘরে ঢোকেন তা হলে কিন্তু—

বনমালী। যে আজ্ঞে, আপনারা কিছু ব্যস্ত আছেন দেখছি, তা হলে আর-এক সময় হবে।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অক্ষয়ের বাসা

রসিক ও শৈলবালা

রসিক। ভাই শৈল।

শৈলবালা। কী রসিকদাদা।

রসিক। একি আমার কাজ। মহাদেবের তপোভঙ্গের জন্যে স্বয়ং কন্দর্পদেব ছিলেন আর আমি বৃদ্ধ—

শৈলবালা। তুমি তো বৃদ্ধ, তেমনি যুবক দুটিও তো যুগল মহাদেব নন।

রসিক। তা নন, সে আমি বেশ ঠাওর করেই দেখেছি। সেইজন্যেই তো নির্ভয়ে এসেছিলুম। কিন্তু, তাদের সঙ্গে রাস্তার মধ্যে হিমে দাঁড়িয়ে অর্ধেক রাত পর্যন্ত রসালাপ করবার মতো উত্তাপ আমার শরীরে তো নেই।

শৈলবালা। তাঁদের সংসর্গে উত্তাপ সঞ্চয় করে নেবে।

রসিক। সজীব গাছ যে সূর্যের তাপে প্রফুল্ল হয়ে ওঠে মরা কাঠ তাতেই ফেটে যায়, যৌবনের উত্তাপ বুড়ো মানুষের পক্ষে ঠিক উপযোগী বোধ হয় না।

শৈলবালা। কই, তোমাকে দেখে ফেটে যাবে বলে তো বোধ হচ্ছে না।

রসিক। হৃদয়টা দেখলে বুঝতে পারতিস ভাই।

শৈলবালা। কী বল রসিকদা। তোমারই তো এখন সব চেয়ে নিরাপদ বয়েস। যৌবনের দাহে তোমার কী করবে।

রসিক। শুষ্কেন্ধনে বহ্নিরুপৈতি বৃদ্ধিম্। যৌবনের দাহ বৃদ্ধকে পেলেই হুহুংশব্দে জ্বলে ওঠে— সেইজন্যেই তো 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা' বিপত্তির কারণ। কী আর বলব ভাই।

নীরবালার প্রবেশ

রসিক। আগচ্ছ বরদে দেবি। কিন্তু, বর তুমি আমাকে দেবে কি না জানি নে, আমি তোমাকে একটি বর দেবার জন্যে প্রাণপাত করে মরছি। শিব তো কিছুই করছেন না, তবু তোমাদের পুজো পাচ্ছেন; আর এই-যে বুড়ো খেটে মরছে এ কি কিছুই পাবে না।

নীরবালা। শিব পান ফুল, তুমি পাবে তার ফল— তোমাকেই বরমাল্য দেব রসিক-দাদা।

রসিক। মাটির দেবতাকে নৈবেদ্য দেবার সুবিধা এই যে, সেটি সম্পূর্ণ ফিরে পাওয়া যায়— আমাকেও নির্ভয়ে বরমাল্য দিতে পারিস, যখনই দরকার হবে তখনই ফিরে পাবি। তার চেয়ে ভাই, আমাকে একটা গলাবন্ধ বুনে দিস, বরমাল্যের চেয়ে সেটা বুড়ো মানুষের কাজে লাগবে।

নীরবালা। তা দেব— একজোড়া পশমের জুতো বুনে রেখেছি সেও শ্রীচরণেষু হবে।

রসিক। আহা, কৃতজ্ঞতা একেই বলে। কিন্তু নীরু, আমার পক্ষে গলাবন্ধই যথেষ্ট— আপাদমস্তক নাই হল, সেজন্যে উপযুক্ত লোক পাওয়া যাবে, জুতোটা তাঁরই জন্যে রেখে দে।

নীরবালা। আচ্ছা, তোমার বক্তৃতাও তুমি রেখে দাও।

রসিক। দেখেছিস ভাই শৈল, আজকাল নীরুরও লজ্জা দেখা দিয়েছে— লক্ষণ খারাপ।

শৈলবালা। নীরু, তুই করছিস কী। আবার এ ঘরে এসেছিস? আজ যে এখানে আমাদের সভা বসবে— এখনই কে এসে পড়বে, বিপদে পড়বি।

রসিক। সেই বিপদের স্বাদ ও একবার পেয়েছে, এখন বারবার বিপদে পড়বার জন্যে ছট্‌ফট্‌ করে বেড়াচ্ছে।

নীরবালা। দেখো রসিকদাদা, তুমি যদি আমাকে বিরক্ত কর তা হলে গলাবন্ধ পাবে না বলছি। দেখো দেখি দিদি, তুমিও যদি রসিকদার কথায় ওই রকম করে হাস, তা হলে ওঁর আস্পর্ধা আরও বেড়ে যাবে।

রসিক। দেখেছিস ভাই শৈল, নীরু আজকাল ঠাট্টাও সইতে পারছে না, মন এত দুর্বল হয়ে পড়েছে।—নীরুদিদি, কোনো কোনো সময় কোকিলের ডাক শ্রুতিকটু বলে ঠেকে এইরকম শাস্ত্রে আছে। তোর রসিকদাদার ঠাট্টাকেও কি তোর আজকাল কুহুতান বলে ভ্রম হতে লাগল।

নীরবালা। সেইজন্যেই তো তোমার গলায় গলাবন্ধ জড়িয়ে দিতে চাচ্ছি— তানটা যদি একটু কমে।

শৈলবালা। নীরু, আর ঝগড়া করিস নে— আয়, এখনই সবাই এসে পড়বে।

[নীর ও শৈলের প্রস্থান

পূর্ণর প্রবেশ

রসিক। আসুন পূর্ণবাবু।

পূর্ণ। এখনও আর কেউ আসেন নি ?

রসিক। আপনি বুঝি কেবল এই বৃদ্ধটিকে দেখে হতাশ হয়ে পড়েছেন ? আরও সকলে আসবেন পূর্ণবাবু।

পূর্ণ। হতাশ কেন হব রসিকবাবু।

রসিক। তা কেমন করে বলব বলুন। কিন্তু ঘরে যেই ঢুকলেন আপনার দুটি চক্ষু দেখে বোধ হল তারা যাকে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে সে ব্যক্তি আমি নই।

পূর্ণ। চক্ষুতত্ত্বে আপনার এত দূর অধিকার হল কী করে।

রসিক। আমার পানে কেউ কোনোদিন তাকায় নি পূর্ণবাবু, তাই এই প্রাচীন বয়স পর্যন্ত পরের চক্ষু পর্যবেক্ষণের যথেষ্ট অবসর পেয়েছি। আপনাদের মতো শুভাদৃষ্ট হলে দৃষ্টিতত্ত্ব লাভ না করে অনেক দৃষ্টিলাভ করতে পারতুম। কিন্তু, যাই বলুন পূর্ণবাবু, চোখ দুটির মতো এমন আশ্চর্য সৃষ্টি আর-কিছু হয় নি— শরীরের মধ্যে মন যদি কোথাও প্রত্যক্ষ বাস করে সে ওই চোখের উপরে।

পূর্ণ। (সোৎসাহে) ঠিক বলেছেন রসিকবাবু। ক্ষুদ্র শরীরের মধ্যে যদি কোথাও অনন্ত আকাশ কিম্বা অনন্ত সমুদ্রের তুলনা থাকে সে ওই দুটি চোখে।

রসিক।— নিঃসীমশোভাসৌভাগ্যং নতাঙ্গ্যা নয়নদ্বয়ং
অন্যোঽন্যালোকনানন্দবিরহাদিব চঞ্চলং। —বুঝেছেন পূর্ণবাবু ?

পূর্ণ। না, কিন্তু বোঝবার ইচ্ছা আছে।

রসিক।— আনতাঙ্গী বালিকার শোভাসৌভাগ্যের সার
নয়নযুগল
না দেখিয়ে পরস্পরে তাই কি বিরহভরে
হয়েছে চঞ্চল।

পূর্ণ। না রসিকবাবু, ও ঠিক হল না। ও কেবল বাক্‌চাতুরী। দুটো চোখ পরস্পরকে দেখতে চায় না।

রসিক। অন্য দুটো চোখকে দেখতে চায় তো ? সেই রকম অর্থ করেই নিন-না। শেষ দুটো ছত্র বদলে দেওয়া যাক—

প্রিয়চক্ষু-দেখাদেখি যে আনন্দ তাই সে কি
খুঁজিছে চঞ্চল।

পূর্ণ। চমৎকার হয়েছে রসিকবাবু।—

প্রিয়চক্ষু-দেখাদেখি যে আনন্দ তাই সে কি
খুঁজিছে চঞ্চল।

অথচ সে বেচারা বন্দী— খাঁচার পাখির মতো কেবল এ পাশে ও পাশে ছট্‌ফট্‌ করে— প্রিয়চক্ষু যেখানে সেখানে পাখা মেলে উড়ে যেতে পারে না।

রসিক। আবার দেখাদেখির ব্যাপারখানাও যে কিরকম নিদারুণ তাও শাস্ত্রে লিখছে— হত্বা লোচনবিশিখৈর্গত্বা কতিচিৎ পদানি পদ্মাক্ষী
জীবতি যুবা ন বা কিং ভূয়ো ভূয়ো বিলোকয়তি।

বিঁধিয়া দিয়া আঁখিবাণে
যায় সে চলি গৃহপানে,
জনমে অনুশোচনা—
বাঁচিল কি না দেখিবারে
চায় সে ফিরে বারে বারে
কমলবরলোচনা।

পূর্ণ। রসিকবাবু, বারে বারে ফিরে চায় কেবল কাব্যে।

রসিক। তার কারণ, কাব্যে ফিরে চাবার কোনো অসুবিধে নেই। সংসারটা যদি ওই রকম ছন্দে তৈরি হত তা হলে এখানেও ফিরে ফিরে চাইত পূর্ণবাবু এখানে মন ফিরে চায়, চক্ষু ফেরে না।

পূর্ণ। (সনিশ্বাসে) বড়ো বিশ্রী জায়গা রসিকবাবু।— কিন্তু, ওটা আপনি বেশ বলেছেন— প্রিয়চক্ষু-দেখাদেখি যে আনন্দ তাই সে কি
খুঁজিছে চঞ্চল।

রসিক। আহা পূর্ণবাবু, নয়নের কথা যদি উঠল, ও আর শেষ করতে ইচ্ছা করে না—
লোচনে হরিণগর্বমোচনে
মা বিদূষয় নতাঙ্গি কজ্জলৈঃ।
সায়কঃ সপদি জীবহারকঃ
কিং পুনর্হি গরলেন লেপিতঃ।

হরিণগর্বমোচন লোচনে
কাজল দিয়ো না, সরলে।
এমনি তো বাণ নাশ করে প্রাণ
কী কাজ লেপিয়া গরলে।

পূর্ণ। থামুন রসিকবাবু। ওই বুঝি কারা আসছেন।

চন্দ্রবাবু ও নির্মলার প্রবেশ

চন্দ্র। এই-যে অক্ষয়বাবু।

রসিক। আমার সঙ্গে অক্ষয়বাবুর সাদৃশ্য আছে শুনলে তিনি এবং তাঁর আত্মীয়গণ বিমর্ষ হবেন। আমি রসিক।

চন্দ্র। মাপ করবেন রসিকবাবু, হঠাৎ ভ্রম হয়েছিল।

রসিক। মাপ করবার কী কারণ ঘটেছে মশায়। আমাকে অক্ষয়বাবু ভ্রম করে কিছুমাত্র অসম্মান করেন নি। মাপ তাঁর কাছে চাইবেন।— পূর্ণবাবুতে আমাতে এতক্ষণ বিজ্ঞানচর্চা করছিলুম চন্দ্রবাবু।

চন্দ্র। আমাদের কুমারসভায় আমরা মাসে একদিন করে বিজ্ঞান-আলোচনার জন্যে স্থির করব মনে করছিলুম। আজ কী বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছিল পূর্ণবাবু।

পূর্ণ। না, সে কিছুই না চন্দ্রবাবু।

রসিক। চোখের দৃষ্টি সম্বন্ধে দু-চার কথা বলাবলি করা যাচ্ছিল।

চন্দ্র। দৃষ্টির রহস্য ভারী শক্ত রসিকবাবু।

রসিক। শক্ত বৈকি। পূর্ণবাবুরও সেই মত।

চন্দ্র। সমস্ত জিনিসের ছায়াই আমাদের দৃষ্টিপটে উল্টো হয়ে পড়ে, সেইটেকে যে কেমন করে আমরা সোজাভাবে দেখি সে সম্বন্ধে কোনো মতই আমার সন্তোষজনক বলে বোধ হয় না।

রসিক। সন্তোষজনক হবে কেমন করে। সোজা দেখা, বাঁকা দেখা, এই-সমস্ত নিয়ে মানুষের মাথা ঘুরে যায়। বিষয়টা বড়ো সংকটময়।

চন্দ্র। নির্মলার সঙ্গে রসিকবাবুর পরিচয় হয় নি। ইনিই আমাদের কুমারসভার প্রথম স্ত্রীসভ্য।

রসিক। (নমস্কার করিয়া) ইনি আমাদের সভার সভালক্ষ্মী। আপনাদের কল্যাণে আমাদের সভায় বুদ্ধিবিদ্যার অভাব ছিল না, ইনি আমাদের শ্রী দান করতে এসেছেন।

চন্দ্র। কেবল শ্রী নয়, শক্তি।

রসিক। একই কথা চন্দ্রবাবু। শক্তি যখন শ্রীরূপে আবির্ভূতা হন তখনই তাঁর শক্তির সীমা থাকে না। কী বলেন পূর্ণবাবু।

পুরুষবেশী শৈলবালার প্রবেশ

শৈলবালা। মাপ করবেন চন্দ্রবাবু, আমার কি আসতে দেরি হয়েছে।

চন্দ্র। (ঘড়ি দেখিয়া) না, এখনও সময় হয় নি। অবলাকান্তবাবু, আমার ভাগ্নী নির্মলা আজ আমাদের সভার সভ্য হয়েছেন।

শৈলবালা। (নির্মলার নিকট বসিয়া) দেখুন, পুরুষেরা স্বার্থপর, মেয়েদের কেবল নিজেদের সেবার জন্যেই বিশেষ করে বদ্ধ করে রাখতে চায়। চন্দ্রবাবু যে আপনাকে আমাদের সভার হিতের জন্যে দান করেছেন তাতে তাঁর মহত্ত্ব প্রকাশ পায়।

নির্মলা। আমার মামার কাছে দেশের কাজ এবং নিজের কাজ একই। আমি যদি আপনাদের সভার কোনো উপকার করতে পারি তাতে তাঁরই সেবা হবে।

শৈলবালা। আপনি যে সৌভাগ্যক্রমে চন্দ্রবাবুকে ভালো করে জানবার যোগ্যতা লাভ করেছেন এতে আপনি ধন্য।

নির্মলা। আমি ওঁকে জানব না তো কে জানবে।

শৈলবালা। আত্মীয় সব সময় আত্মীয়কে জানে না। আত্মীয়তায় ছোটোকে বড়ো করে তোলে বটে, তেমনি বড়োকেও ছোটো করে আনে। চন্দ্রবাবুকে যে আপনি যথার্থ-ভাবে জেনেছেন তাতে আপনার ক্ষমতা প্রকাশ পায়।

নির্মলা। কিন্তু, আমার মামাকে যথার্থভাবে জানা খুব সহজ, ওঁর মধ্যে এমন একটি স্বচ্ছতা আছে!

শৈলবালা। দেখুন, সেইজন্যেই তো ওঁকে ঠিকমতো জানা শক্ত। দুর্যোধন স্ফটিকের দেয়ালকে দেয়াল বলে দেখতেই পান নি। সরল স্বচ্ছতার মহত্ত্ব কি সকলে বুঝতে পারে। তাকে অবহেলা করে। আড়ম্বরেই লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

নির্মলা। আপনি ঠিক কথা বলেছেন। বাইরের লোকে আমার মামাকে কেউ চেনেই না। বাইরের লোকের মধ্যে এত দিন পরে আপনার কাছে মামার কথা শুনে আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে সে কী বলব।

শৈলবালা। আপনার ভক্তিও আমাকে ঠিক সেইরকম আনন্দ দিচ্ছে।

চন্দ্র। (উভয়ের নিকটে আসিয়া) অবলাকান্তবাবু, তোমাকে যে বইটি দিয়েছিলেম সেটা পড়েছ ?

শৈলবালা। পড়েছি এবং তার থেকে সমস্ত নোট করে আপনার ব্যবহারের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছি।

চন্দ্র। আমার ভারী উপকার হবে, আমি বড়ো খুশি হলুম অবলাকান্তবাবু। পূর্ণ নিজে আমার কাছে ওই বইটি চেয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু, ওঁর শরীর ভালো ছিল না বলে কিছুই করে উঠতে পারেন নি। খাতাটি তোমার কাছে আছে ?

শৈলবালা। এনে দিচ্ছি। [প্রস্থান

রসিক। পূর্ণবাবু, আপনাকে কেমন ম্লান দেখছি, অসুখ করেছে কি।

পূর্ণ। না, কিছুই না। রসিকবাবু, যিনি গেলেন এঁরই নাম অবলাকান্ত ?

রসিক। হাঁ।

পূর্ণ। আমার কাছে ওঁর ব্যবহারটা তেমন ভালো ঠেকছে না।

রসিক। অল্পবয়স কিনা সেইজন্যে—

পূর্ণ। মহিলাদের সঙ্গে কিরকম আচরণ করা উচিত সে শিক্ষা ওঁর বিশেষ দরকার।

রসিক। আমিও সেটা লক্ষ্য করে দেখেছি। মেয়েদের সঙ্গে উনি ঠিক পুরুষোচিত ব্যবহার করতে জানেন না— কেমন যেন গায়ে-পড়া ভাব। ওটা হয়তো অল্প বয়সের ধর্ম।

পূর্ণ। আমাদেরও তো বয়স খুব প্রাচীন হয় নি, কিন্তু আমরা তো—

রসিক। তা তো দেখছি, আপনি খুব দূরে দূরেই থাকেন— কিন্তু উনি হয়তো সেটাকে ঠিক ভদ্রতা বলেই গ্রহণ করেন না। ওঁর হয়তো ভ্রম হচ্ছে আপনি ওঁকে অগ্রাহ্য করেন।

পূর্ণ। বলেন কী রসিকবাবু। কী করব বলুন তো। আমি তো ভেবেই পাই নে, কী কথা বলবার জন্যে আমি ওঁর কাছে অগ্রসর হতে পারি।

রসিক। ভাবতে গেলে ভেবে পাবেন না। না ভেবে অগ্রসর হবেন, তার পরে কথা আপনি বেরিয়ে যাবে।

পূর্ণ। না রসিকবাবু, আমার একটা কথাও বেরোয় না। কী বলব আপনিই বলুন-না।

রসিক। এমন কোনো কথাই বলবেন না যাতে জগতে যুগান্তর উপস্থিত হবে। গিয়ে বলুন, আজকাল হঠাৎ কিরকম গরম পড়েছে।

পূর্ণ। তিনি যদি বলেন 'হাঁ গরম পড়েছে' তার পরে কী বলব।

বিপিন ও শ্রীশের প্রবেশ

শ্রীশ। (চন্দ্রবাবুকে ও নির্মলাকে নমস্কার করিয়া, নির্মলার প্রতি) আপনাদের উৎসাহ ঘড়ির চেয়ে এগিয়ে চলছে। এই দেখুন, এখনও সাড়ে ছটা বাজে নি।

নির্মলা। আজ আপনাদের সভায় আমার প্রথম দিন, সেইজন্যে সভা বসবার পূর্বেই এসেছি— প্রথম সভ্য হবার সংকোচ ভাঙতে একটু সময় দরকার।

বিপিন। কিন্তু, আপনার কাছে নিবেদন এই যে, আমাদের কিছুমাত্র সংকোচ করে চলবেন না। আজ থেকে আপনি আমাদের ভার নিলেন ; লক্ষ্মীছাড়া পুরুষ সভ্যগুলিকে অনুগ্রহ করে দেখবেন শুনবেন এবং হুকুম করে চালাবেন।

রসিক। যান পূর্ণবাবু, আপনিও একটা কথা বলুন গে।

পূর্ণ। কী বলব।

নির্মলা। চালাবার ক্ষমতা আমার নেই।

শ্রীশ। আপনি কি আমাদের এতই অচল বলে মনে করেন।

বিপিন। লোহার চেয়ে অচল আর কী আছে। কিন্তু, আগুন তো লোহাকে চালাচ্ছে— আমাদের মতো ভারী জিনিসগুলোকে চলনসই করে তুলতে আপনাদের মতো দীপ্তির দরকার।

রসিক। শুনছেন তো পূর্ণবাবু?

পূর্ণ। আমি কী বলব বলুন-না।

রসিক। বলুন, লোহাকে চালাতে চাইলেও আগুন চাই, গলাতে চাইলেও আগুন চাই।

বিপিন। কী পূর্ণবাবু, রসিকবাবুর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে?

পূর্ণ। হাঁ।

বিপিন। আপনার শরীর আজ ভালো আছে তো?

পূর্ণ। হাঁ।

বিপিন। অনেক ক্ষণ এসেছেন নাকি।

পূর্ণ। না।

বিপিন। দেখেছেন এবারে শীতটা ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতো সজোরে দৌড়ে মাঘের মাঝামাঝি একেবারে খপ করে থেমে গেল।

পূর্ণ। হাঁ।

শ্রীশ। এই-যে পূর্ণবাবু, গেল বারে আপনার শরীর খারাপ ছিল, এবারে বেশ ভালো বোধ হচ্ছে তো?

পূর্ণ। হাঁ।

শ্রীশ। এতদিন কুমারসভার যে কী একটা মহৎ অভাব ছিল আজ ঘরের মধ্যে ঢুকেই তা বুঝতে পেরেছি, সোনার মুকুটের মাঝখানটিতে কেবল একটি হীরে বসাবার অপেক্ষা ছিল— আজ সেইটি বসানো হয়েছে। কী বলেন পূর্ণবাবু।

পূর্ণ। আপনাদের মতো এমন রচনাশক্তি আমার নেই— আমি এত বানিয়ে বানিয়ে কথা বাঁটতে পারি নে, বিশেষত মহিলাদের সম্বন্ধে।

শ্রীশ। আপনার অক্ষমতার কথা শুনে দুঃখিত হলেম পূর্ণবাবু, আশা করি ক্রমে উন্নতি লাভ করতে পারবেন।

বিপিন। (রসিককে জনান্তিকে টানিয়া) দুই বীরপুরুষে যুদ্ধ চলুক, এখন আসুন রসিকবাবু, আপনার সঙ্গে দুই-একটা কথা আছে। দেখুন, সেই খাতা সম্বন্ধে আর কোনো কথা উঠেছিল ?

রসিক। অপরাধ করা মানবের ধর্ম আর ক্ষমা করা দেবীর— সে কথাটা আমি প্রসঙ্গক্রমে তুলেছিলেম—

বিপিন। তাতে কী বললেন।

রসিক। কিছু না ব'লে বিদ্যুতের মতো চলে গেলেন।

বিপিন। চলে গেলেন !

রসিক। কিন্তু, সে বিদ্যুতে বজ্র ছিল না।

বিপিন। গর্জন ?

রসিক। তা'ও ছিল না।

বিপিন। তবে ?

রসিক। এক প্রান্তে কিম্বা অন্য প্রান্তে একটু হয়তো বর্ষণের আভাস ছিল।

বিপিন। সেটুকুর অর্থ ?

রসিক। কী জানি মশায়। অর্থও থাকতে পারে, অনর্থও থাকতে পারে।

বিপিন। রসিকবাবু, আপনি কী বলেন আমি কিছু বুঝতে পারি নে।

রসিক। কী করে বুঝবেন— ভারী শক্ত কথা।

শ্রীশ। (নিকটে আসিয়া) কী কথা শক্ত মশায়।

রসিক। এই বৃষ্টি-বজ্র-বিদ্যুতের কথা।

শ্রীশ। ওহে বিপিন, তার চেয়ে শক্ত কথা যদি শুনতে চাও তা হলে পূর্ণর কাছে যাও।

বিপিন। শক্ত কথা সম্বন্ধে আমার খুব বেশি শখ নেই ভাই।

শ্রীশ। যুদ্ধ করার চেয়ে সন্ধি করার বিদ্যেটা ঢের বেশি দুরূহ— সেটা তোমার আসে। দোহাই তোমার, পূর্ণকে একটু ঠাণ্ডা করে এসো গে। আমি বরঞ্চ ততক্ষণ রসিকবাবুর সঙ্গে বৃষ্টি-বজ্র-বিদ্যুতের আলোচনা করে নিই। [বিপিনের প্রস্থান

রসিকবাবু, ওই-যে সেদিন আপনি যাঁর নাম নৃপবালা বললেন তিনি—তিনি—তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত করে কিছু বলুন। সেদিন চকিতের মধ্যে তাঁর মুখে এমন একটি স্নিগ্ধভাব দেখেছি, তাঁর সম্বন্ধে কৌতূহল কিছুতেই থামাতে পারছি নে।

রসিক। বিস্তারিত করে বললে কৌতূহল আরও বেড়ে যাবে। এরকম কৌতূহল 'হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে'। আমি তো তাঁকে এতকাল ধরে জেনে আসছি,

কিন্তু সেই কোমল হৃদয়ের স্নিগ্ধ মধুর ভাবটি আমার কাছে ‘ক্ষণে ক্ষণে তন্নবতা-মুপৈতি’।

শ্রীশ। আচ্ছা, তিনি— আমি সেই নৃপবালার কথা জিজ্ঞাসা করছি—

রসিক। সে আমি বেশ বুঝতেই পারছি।

শ্রীশ। তা, তিনি— কী আর প্রশ্ন করব। তাঁর সম্বন্ধে যা হয় কিছু বলুন-না— কাল কী বললেন, আজ সকালে কী করলেন, যত সামান্য হোক আপনি বলুন— আমি শুনি

রসিক। (শ্রীশের হাত ধরিয়া) বড়ো খুশি হলুম শ্রীশবাবু, আপনি যথার্থ ভাবুক বটেন— আপনি তাঁকে কেবল চকিতের মধ্যে দেখে এটুকু কী করে ধরতে পারলেন যে তাঁর সম্বন্ধে তুচ্ছ কিছুই নেই। তিনি যদি বলেন ‘রসিকদা ওই কেরোসিনের বাতিটা একটুখানি উস্‌কে দাও’ তো আমার মনে হয় যেন একটা নতুন কথা শুনলেম আদি-কবির প্রথম অনুষ্টুপ ছন্দের মতো। কী বলব শ্রীশবাবু, আপনি শুনলে হয়তো হাসবেন, সেদিন ঘরে ঢুকে দেখি নৃপবালা ছুঁচের মুখে সুতো পরাচ্ছেন, কোলের উপর বালিশের ওয়াড় পড়ে রয়েছে— আমার মনে হল এক আশ্চর্য দৃশ্য। কতবার কত দর্জির দোকানের সামনে দিয়ে গেছি, কখনো মুখ তুলে দেখি নি, কিন্তু—

শ্রীশ। আচ্ছা রসিকবাবু, তিনি নিজের হাতে ঘরের সমস্ত কাজ করেন ?

শৈলবালার প্রবেশ

শৈলবালা। রসিকদার সঙ্গে কী পরামর্শ করছেন।

রসিক। কিছুই না, নিতান্ত সামান্য কথা নিয়ে আমাদের আলোচনা চলছে, যত দূর তুচ্ছ হতে পারে।

চন্দ্র। সভা অধিবেশনের সময় হয়েছে আর বিলম্ব করা উচিত হয় না। পূর্ণবাবু, কৃষিবিদ্যালয় সম্বন্ধে আজ তুমি যে প্রস্তাব উত্থাপন করবে বলেছিলে সেটা আরম্ভ করো।

পূর্ণ। (দণ্ডায়মান হইয়া ঘড়ির চেন নাড়িতে নাড়িতে) আজ— আজ— (কাশি)

রসিক। (পার্শ্বে বসিয়া মৃদুস্বরে) আজ এই সভা—

পূর্ণ। আজ এই সভা—

রসিক। যে নূতন সৌন্দর্য এবং গৌরব লাভ করিয়াছে—

পূর্ণ। যে নূতন সৌন্দর্য এবং গৌরব লাভ করিয়াছে—

রসিক। প্রথমে তাহারই জন্য অভিনন্দন প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

পূর্ণ। প্রথমে তাহারই জন্য অভিনন্দন প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

রসিক। (মৃদুস্বরে) বলে যান পূর্ণবাবু।

পূর্ণ। তাহারই জন্য অভিনন্দন প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

রসিক। ভয় কী পূর্ণবাবু, বলে যান।

পূর্ণ। যে নূতন সৌন্দর্য এবং গৌরব (কাশি)— যে নূতন সৌন্দর্য (পুনরায় কাশি) অভিনন্দন—

রসিক। (উঠিয়া) সভাপতিমশায়, আমার একটা নিবেদন আছে। আজ পূর্ণবাবু সকল সভ্যের পূর্বেই সভায় উপস্থিত হয়েছেন। উনি অত্যন্ত অসুস্থ, তথাপি উৎসাহ সম্বরণ করতে পারেন নি। আজ আমাদের সভায় প্রথম অরুণোদয়, তাই দেখবার জন্যে পাখি প্রত্যূষেই নীড় পরিত্যাগ করে বেরিয়েছে। কিন্তু দেহ রুগ্‌ণ, তাই পূর্ণহৃদয়ের আবেগ কণ্ঠে ব্যক্ত করবার শক্তি নেই, অতএব ওঁকে আজ আমাদের নিষ্কৃতি দান করতে হবে। এবং আজ নবপ্রভাতের যে অরুণচ্ছটার স্তবগান করতে উনি উঠেছিলেন তাঁর কাছেও এই অবরুদ্ধকণ্ঠ ভক্তের হয়ে আমি মার্জনা প্রার্থনা করি। পূর্ণবাবু, আজ বরঞ্চ আমাদের সভার কার্য বন্ধ থাকে সেও ভালো, তথাপি বর্তমান অবস্থায় আজ আপনাকে কোনো প্রস্তাব উত্থাপন করতে দিতে পারি নে। সভাপতিমশায় ক্ষমা করবেন এবং আমাদের সভাকে যিনি আপন প্রভা দ্বারা অদ্য সার্থকতা দান করতে এসেছেন ক্ষমা করা তাঁদের স্বজাতিসুলভ করুণ হৃদয়ের সহজ ধর্ম।

চন্দ্রবাবু। আমি জানি কিছুকাল থেকে পূর্ণবাবু ভালো নেই, এ অবস্থায় আমরা ওঁকে ক্লেশ দিতে পারি না। বিশেষত অবলাকান্তবাবু ঘরে বসে বসেই আমাদের সভার কাজ অনেক দূর অগ্রসর করে দিয়েছেন। এ-পর্যন্ত ভারতবর্ষীয় কৃষি সম্বন্ধে গবর্মেণ্ট্‌ থেকে যতগুলি রিপোর্ট্‌ বাহির হয়েছে সবগুলি আমি ওঁর কাছে দিয়েছিলেম, তার থেকে উনি জমিতে সার দেওয়া সম্বন্ধীয় অংশটুকু সংক্ষেপে সংকলন করে রেখেছেন— সেইটি অবলম্বন করে উনি সর্বসাধারণের সুবোধ্য বাংলা ভাষায় একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করতেও প্রস্তুত হয়েছেন। ইনি যেরূপ উৎসাহ ও দক্ষতার সঙ্গে সভার কার্যে যোগদান করেছেন সেজন্য ওঁকে প্রচুর ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। বিপিনবাবু য়ুরোপীয় ছাত্রাগার-সকলের নিয়ম ও কার্যপ্রণালী -সংকলনের ভার নিয়েছিলেন। এবং শ্রীশবাবু স্বেচ্ছাকৃত দানের দ্বারা লণ্ডন নগরে কত বিচিত্র লোকহিতকর অনুষ্ঠান প্রবর্তিত হয়েছে তার তালিকা সংগ্রহ ও তৎসম্বন্ধে একটিপ্রবন্ধ-রচনায় প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন— বোধ হয় এখনও তা সমাধা করতে পারেন নি। আমি একটি পরীক্ষায় প্রবৃত্ত আছি— সকলেই জানেন আমাদের দেশের গোরুর গাড়ি এমন ভাবে নির্মিত যে তার পিছনে ভার পড়লেই

উঠে পড়ে এবং গোরুর গলায় ফাঁস লেগে যায়, আবার কোনো কারণে গোরু যদি পড়ে যায় তবে বোঝাই-সুদ্ধ গাড়ি তার ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়ে— এরই প্রতিকার করবার জন্যে আমি উপায়-উদ্ভাবনে ব্যস্ত আছি, কৃতকার্য হব বলে আশা করি। আমরা মুখে গোজাতি সম্বন্ধে দয়া প্রকাশ করি, অথচ প্রত্যহ সেই গোরুর সহস্র অনাবশ্যক কষ্ট নিতান্ত উদাসীনভাবে নিরীক্ষণ করে থাকি— আমার কাছে এইরূপ মিথ্যা ও শূন্য ভাবুকতা অপেক্ষা লজ্জাকর ব্যাপার জগতে আর কিছুই নেই। আমাদের সভা থেকে যদি এর কোনো প্রতিকার করতে পারি তবে আমাদের সভা ধন্য হবে। আমি রাত্রে গাড়োয়ান-পল্লীতে গিয়ে গোরুর অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেছি; গোরুর প্রতি অনর্থক অত্যাচার যে স্বার্থ ও ধর্ম উভয়ের বিরোধী হিন্দু গাড়োয়ানদের তা বোঝানো নিতান্ত কঠিন বলে বোধ হয় না। এ সম্বন্ধে আমি গাড়োয়ানদের মধ্যে একটা পঞ্চায়েত করবার চেষ্টায় আছি। শ্রীমতী নির্মলা আকস্মিক অপঘাতের আশু চিকিৎসা এবং রোগিচর্যা সম্বন্ধে রামরতন ডাক্তার-মহাশয়ের কাছ থেকে নিয়মিত উপদেশ লাভ করছেন— ভদ্রলোকদের মধ্যে সেই শিক্ষা ব্যাপ্ত করবার জন্যে তিনি দুই-একটি অন্তঃপুরে গিয়ে শিক্ষাদানে নিযুক্ত হয়েছেন। এইরূপে প্রত্যেক সভ্যের স্বতন্ত্র ও বিশেষ চেষ্টায় আমাদের এই ক্ষুদ্র কুমারসভা সাধারণের অজ্ঞাতসারে ক্রমশই বিচিত্র সফলতা লাভ করতে থাকবে এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

শ্রীশ। ওহে বিপিন, আমার কাজ তো আমি আরম্ভও করি নি।

বিপিন। আমারও ঠিক সেই অবস্থা।

শ্রীশ। কিন্তু, করতে হবে।

বিপিন। আমাকেও করতে হবে।

শ্রীশ। কিছুদিন অন্য সমস্ত আলোচনা ত্যাগ না করলে চলছে না।

বিপিন। আমিও তাই ভাবছি।

শ্রীশ। কিন্তু, অবলাকান্তবাবুকে ধন্য বলতে হবে— উনি যে কখন আপনার কাজটি করে যাচ্ছেন কিছু বোঝবার জো নেই।

বিপিন। তাই তো বড়ো আশ্চর্য। অথচ মনে হয় যেন ওঁর অন্যমনস্ক হবার বিশেষ কারণ আছে।

শ্রীশ। যাই, ওঁর সঙ্গে একবার আলোচনা করে আসি গে। [শৈলর নিকট গমন

পূর্ণ। রসিকবাবু, আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ জানাব।

রসিক। কিছু বলবেন না, আমি এমনি বুঝে নেব। কিন্তু, সকলে আমার মতো নয় পূর্ণবাবু— আন্দাজে বুঝবে না, বলা-কওয়ার দরকার।

পূর্ণ। আপনি আমার অন্তরের কথা বুঝে নিয়েছেন রসিকবাবু— আপনাকে পেয়ে আমি বেঁচে গেছি। আমার যা কথা তা মুখে উচ্চারণ করতেও সংকোচ বোধ হয়। আপনি আমাকে পরামর্শ দিন কী করতে হবে।

রসিক। প্রথমে আপনি ওঁর কাছে গিয়ে যা হয় একটা কিছু কথা আরম্ভ করে দিন-না।

পূর্ণ। ওই দেখুন-না, অবলাকান্তবাবু আবার ওঁর কাছে গিয়ে বসেছেন—

রসিক। তা হোক-না,তিনি তো ওঁকে চারি দিকে ঘিরে দাঁড়ান নি। অবলাকান্তকে তো ব্যূহের মতো ভেদ করে যেতে হবে না। আপনিও এক পাশে গিয়ে দাঁড়ান-না।

পূর্ণ। আচ্ছা, আমি দেখি।

শৈলবালা। (নির্মলার প্রতি) আমাকে এত করে বলবেন না— আপনি আমার চেয়ে ঢের বেশি কাজ করছেন।— কিন্তু, বেচারা পূর্ণবাবুর জন্যে আমার বড়ো দুঃখ হয়। আপনি আসবেন বলেই উনি আজ বিশেষ উৎসাহ করে এসেছিলেন, অথচ সেটা ব্যক্ত করতে না পেরে উনি বোধ হয় অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন। আপনি যদি ওঁকে—

নির্মলা। আপনাদের অন্যান্য সভ্যদের থেকে আমাকে একটু বিশেষভাবে পৃথক করে দেখছেন বলে আমি বড়ো সংকোচ বোধ করছি - আমাকে সভ্য বলে আপনাদের মধ্যে গণ্য করবেন, মহিলা বলে স্বতন্ত্র করবেন না।

শৈলবালা। আপনি যে মহিলা হয়ে জন্মেছেন সে সুবিধাটুকু আমাদের সভা ছাড়তে পারেন না। আপনি আমাদের সঙ্গে এক হয়ে গেলে যত কাজ হবে, আমাদের থেকে স্বতন্ত্র হলে তার চেয়ে বেশি কাজ হবে। যে লোক গুণের দ্বারা নৌকোকে অগ্রসর করে দেবে তাকে নৌকো থেকে কতকটা দূরে থাকতে হয়। চন্দ্রবাবু আমাদের নৌকোর হাল ধরে আছেন, তিনিও আমাদের থেকে কিছু দূরে এবং উচ্চে আছেন। আপনাকে গুণের দ্বারা আকর্ষণ করতে হবে, সুতরাং আপনাকে পৃথক থাকতে হবে। আমরা সব দাঁড়ির দলে বসে গেছি।

নির্মলা। আপনাকেও কর্মে এবং ভাবে এঁদের সকলের থেকে পৃথক বোধ হয়। একদিন মাত্র দেখেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছে, এ সভার মধ্যে আপনি আমার প্রধান সহায় হবেন।

শৈলবালা। সে তো আমার সৌভাগ্য। এই-যে আসুন পূর্ণবাবু। আমরা আপনার কথাই বলছিলেম। বসুন।

শ্রীশ। অবলাকান্তবাবু, আসুন, আপনার সঙ্গে অনেক কথা বলবার আছে। (জনান্তিকে লইয়া) আজ সভার পুরাতন সভ্য তিনটিকে আপনারা দুজনে লজ্জা দিয়েছেন। তা, ঠিক হয়েছে— পুরাতনের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করবার জন্যেই নূতনের প্রয়োজন।

শৈলবালা। আবার নূতন চালা কাঠে আগুন জ্বালাবার জন্যে পুরাতন ধরা কাঠের দরকার।

শ্রীশ। আচ্ছা, সে বিচার পরে হবে। কিন্তু, আমার সেই রুমালটি? সেটি হরণ করে আমার পরকাল খুইয়েছি, আবার রুমালটিও খোওয়াতে পারি নে। (পকেট হইতে বাহির করিয়া) এই আমি এক ডজন রেশমের রুমাল এনেছি, এই বদল করে নিতে হবে। এ যে তার উচিত মূল্য তা বলতে পারি নে— তার উপযুক্ত মূল্য দিতে গেলে চীন জাপান উজাড় করে দিতে হয়।

শৈলবালা। মশায়, এ ছলনাটুকু বোঝবার মতো বুদ্ধি বিধাতা আমাকে দিয়েছেন। এ উপহার আমার জন্যে আসেও নি, যাঁর রুমাল হরণ করেছেন আমাকে উপলক্ষ্য করে এগুলি—

শ্রীশ। অবলাকান্তবাবু, ভগবান বুদ্ধি আপনাকে যথেষ্ট দিয়েছেন দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু দয়ার ভাগটা কিছু যেন কম বোধ হচ্ছে— হতভাগ্যকে রুমালটি ফিরিয়ে দিলেই সেই কলঙ্কটুকু একেবারে দূর হয়।

শৈলবালা। আচ্ছা, আমি দয়ার পরিচয় দিচ্ছি, কিন্তু আপনি সভার জন্য যে প্রবন্ধ লিখতে প্রতিশ্রুত সেটা লিখে দেওয়া চাই।

শ্রীশ। নিশ্চয় দেব— রুমালটা ফিরে দিলেই কাজে মন দিতে পারব, তখন অন্য সন্ধান ছেড়ে কেবল সত্যানুসন্ধান করতে থাকব।

ঘরের অন্যত্র

বিপিন। বুঝেছেন রসিকবাবু, আমি তাঁর গানের নির্বাচনচাতুরী দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছি। গান যে তৈরি করেছে তার কবিত্ব থাকতে পারে, কিন্তু এই গানের নির্বাচনে যে কবিত্ব প্রকাশ পেয়েছে তার মধ্যে ভারী একটি সৌকুমার্য আছে।

রসিক। ঠিক বলেছেন, নির্বাচনের ক্ষমতাই ক্ষমতা। লতায় ফুল তো আপনি ফোটে, কিন্তু যে লোক মালা গাঁথে নৈপুণ্য এবং সুরুচি তো তারই।

বিপিন। আপনার ও গানটা মনে আছে?—

তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়
কোন্ পাথারে কোন্ পাষাণের ঘায়।

নবীন তরী নতুন চলে,
দিই নি পাড়ি অগাধ জলে,
বাহি তারে খেলার ছলে কিনার-কিনারায়।
তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়।
ভেসেছিল স্রোতের ভরে,
একা ছিলেম কর্ণ ধ'রে—
লেগেছিল পালের 'পরে মধুর মৃদু বায়।
সুখে ছিলেম আপন মনে,
মেঘ ছিল না গগনকোণে—
লাগবে তরী কুসুমবনে ছিলেম সে আশায়।
তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়।

রসিক। যাক ডুবে, কী বলেন বিপিনবাবু।

বিপিন। যাক গে, কিন্তু কোথায় ডুবল তার একটু ঠিকানা রাখা চাই। আচ্ছা রসিকবাবু, এ গানটা কেন তিনি খাতায় লিখে রাখলেন।

রসিক। স্ত্রীহৃদয়ের রহস্য বিধাতা বোঝেন না এই রকম একটা প্রবাদ আছে, রসিকবাবু তো তুচ্ছ।

শ্রীশ। (নিকটে আসিয়া) বিপিন, তুমি চন্দ্রবাবুর কাছে একবার যাও। বাস্তবিক, আমাদের কর্তব্যে আমরা ঢিল দিয়েছি— ওঁর সঙ্গে একটু আলোচনা করলে উনি খুশি হবেন।

বিপিন। আচ্ছা। [প্রস্থান

শ্রীশ। হাঁ, আপনি সেই-যে সেলাইয়ের কথা বলছিলেন— উনি বুঝি নিজের হাতে সমস্ত গৃহকর্ম করেন ?

রসিক। সমস্তই।

শ্রীশ। আপনি বুঝি সেদিন গিয়ে দেখলেন তাঁর কোলে বালিশের ওয়াড়গুলো পড়ে রয়েছে আর তিনি—

রসিক। মাথা নিচু করে ছুঁচে সুতো পরাচ্ছিলেন।

শ্রীশ। ছুঁচে সুতো পরাচ্ছিলেন। তখন স্নান করে এসেছেন বুঝি ?

রসিক। বেলা তখন তিনটে হবে।

শ্রীশ। বেলা তিনটে। তিনি বুঝি তাঁর খাটের উপর বসে—

রসিক। না, খাটে নয়, বারান্দার উপর মাদুর বিছিয়ে—

শ্রীশ। বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে বসে ছুঁচে সুতো পরাচ্ছিলেন—

রসিক। হাঁ, ছুঁচে সুতো পরাচ্ছিলেন। (স্বগত) আর তো পারা যায় না।

শ্রীশ। আমি যেন ছবির মতো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি— পা দুটি ছড়ানো, মাথা নিচু, খোলা চুল মুখের উপর এসে পড়েছে, বিকেল বেলার আলো -

বিপিন। (নিকটে আসিয়া) চন্দ্রবাবু তোমার সঙ্গে তোমার সেই প্রবন্ধটা সম্বন্ধে কথা কইতে চান। [শ্রীশের প্রস্থান

রসিক। (স্বগত) আর কত বকব।

অন্য প্রান্তে

নির্মলা। (পূর্ণের প্রতি) আপনার শরীর আজ বুঝি তেমন ভালো নেই।

পূর্ণ। না, বেশ আছে— হাঁ, একটু ইয়ে হয়েছে বটে, বিশেষ কিছু নয়— তবু একটু ইয়ে বৈকি— তেমন বেশ (কাশি)— আপনার শরীর বেশ ভালো আছে ?

নির্মলা। হাঁ।

পূর্ণ। আপনি— জিজ্ঞাসা করছিলুম যে আপনি— আপনি— আপনার ইয়ে কিরকম বোধ হয়— ওই-যে— মিল্‌টনের আরিয়োপ্যাজিটিকা— ওটা কিনা আমাদের এম-এ কোর্সে আছে, ওটা আপনার বেশ ইয়ে বোধ হয় না ?

নির্মলা। আমি ওটা পড়ি নি।

পূর্ণ। পড়েন নি ? (নিস্তব্ধ) ইয়ে হয়েছে— আপনি— এবারে কিরকম গরম পড়ছে— আমি একবার রসিকবাবু— রসিকবাবুর সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে। [নির্মলার নিকট হইতে প্রস্থান

ঘরের অন্যত্র

বিপিন। রসিকবাবু, আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়, ও গানটা তিনি বিশেষ কিছু মনে করে লিখেছেন।

রসিক। হতেও পারে। আপনি আমাকে সুদ্ধ ধোঁকা লাগিয়ে দিলেন যে। পূর্বে ওটা ভাবি নি।

বিপিন।—

তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়
কোন্ পাথারে কোন্ পাষাণের ঘায়।

—আচ্ছা রসিকবাবু, এখানে তরী বলতে ঠিক কী বোঝাচ্ছে।

রসিক। হৃদয় বোঝাচ্ছে তার আর সন্দেহ নেই। তবে ওই পাথারটা কোথায় আর পাষাণটা কে সেইটেই ভাববার বিষয়।

পূর্ণ। (নিকটে আসিয়া) বিপিনবাবু, মাপ করবেন— রসিকবাবুর সঙ্গে আমার একটি কথা আছে— যদি—

বিপিন। বেশ, বলুন, আমি যাচ্ছি। [রসিকের নিকট হইতে প্রস্থান

পূর্ণ। আমার মতো নির্বোধ জগতে নেই রসিকবাবু।

রসিক। আপনার চেয়ে ঢের নির্বোধ আছে যারা নিজেকে বুদ্ধিমান বলে জানে— যথা আমি।

পূর্ণ। একটু নিরালা পাই যদি আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে, সভা ভেঙে গেলে আজ রাত্রে একটু অবসর করতে পারেন ?

রসিক। বেশ কথা।

পূর্ণ। আজ দিব্য জ্যোৎস্না আছে, গোলদিঘির ধারে— কী বলেন।

রসিক। (স্বগত) কী সর্বনাশ।

শ্রীশ। (নিকটে আসিয়া) ওঃ, পূর্ণবাবু কথা কচ্ছেন বুঝি ? আচ্ছা, এখন থাক্। রাত্রে আপনার অবসর হবে রসিকবাবু ?

রসিক। তা হতে পারে।

শ্রীশ। তা হলে কালকের মতো— কী বলেন। কাল দেখলেন তো ঘরের চেয়ে পথে জমে ভালো।

রসিক। জমে বৈকি। (স্বগত) সর্দি জমে, কাশি জমে, গলার স্বর দইয়ের মতো জমে যায়। [শ্রীশের প্রস্থান

পূর্ণ। আচ্ছা রসিকবাবু, আপনি হলে কী বলে কথা আরম্ভ করতেন।

রসিক। হয়তো বলতুম— সেদিন বেলুন উড়েছিল, আপনাদের বাড়ির ছাত থেকে দেখতে পেয়েছিলেন কি।

পূর্ণ। তিনি যদি বলতেন, হাঁ—

রসিক। আমি বলতুম, মনকে ওড়বার অধিকার দিয়েছেন বলেই ঈশ্বর মানুষের শরীরে পাখা দেন নি, শরীরকে বদ্ধ রেখে বিধাতা মনের আগ্রহ কেবল বাড়িয়ে দিয়েছেন—

পূর্ণ। বুঝেছি রসিকবাবু— চমৎকার— এর থেকে অনেক কথার সৃষ্টি হতে পারে।

বিপিন। (নিকটে আসিয়া) পূর্ণবাবুর সঙ্গে কথা হচ্ছে ? থাক্ তবে, আমাদের সেই যে একটা কথা ছিল সেটা আজ রাত্রে হবে, কী বলেন।

রসিক। সেই ভালো।

বিপিন। জ্যোৎস্নায় রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে দিব্যি আরামে— কী বলেন।

রসিক। খুব আরাম। (স্বগত) কিন্তু বেয়ারামটা তার পরে।

অন্যত্র

শৈলবালা। (নির্মলার প্রতি) তা বেশ, আপনি যদি ইচ্ছা করেন আমিও ওই বিষয়টার আলোচনা করে দেখব। ডাক্তারি আমি অল্প অল্প চর্চা করেছি— বেশি নয়— কিন্তু আমি যোগদান করলে আপনার যদি উৎসাহ হয় আমি প্রস্তুত আছি।

পূর্ণ। (নিকটে আসিয়া) সেদিন বেলুন উড়েছিল, আপনি কি ছাদের উপর থেকে দেখতে পেয়েছিলেন।

নির্মলা। বেলুন ?

পূর্ণ। হাঁ, ওই বেলুন (সকলে নিরুত্তর)— রসিকবাবু বলছিলেন আপনি বোধ হয় দেখে থাকবেন, আমাকে মাপ করবেন— আপনাদের আলোচনায় আমি ভঙ্গ দিলুম— আমি অত্যন্ত হতভাগ্য।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অক্ষয়ের বাসা

অক্ষয় ও পুরবালা

অক্ষয়। দেবী, যদি অভয় দাও তো একটি প্রশ্ন আছে।

পুরবালা। কী শুনি।

অক্ষয়। শ্রীঅঙ্গে কৃশতার তো কোনো লক্ষণ দেখছি নে!

পুরবালা। শ্রীঅঙ্গ তো কৃশ হবার জন্যে পশ্চিমে বেড়াতে যায় নি।

অক্ষয়। তবে কি বিরহবেদনা বলে জিনিসটা মহাকবি কালিদাসের সঙ্গে সহমরণে মরেছে।

পুরবালা। তার প্রমাণ তুমি। তোমারও তো স্বাস্থ্যের বিশেষ ব্যাঘাত হয় নি দেখছি।

অক্ষয়। হতে দিল কই। তোমার তিন ভগ্নী মিলে অহরহ আমার কৃশতা নিবারণ করে রেখেছিল— বিরহ যে কাকে বলে সেটা আর কোনোমতেই বুঝতে দিলে না।—

গান

বিরহে মরিব ব'লে ছিল মনে পণ—
কে তোরা বাহুতে বাঁধি করিলি বারণ।
ভেবেছিনু অশ্রুজলে ডুবিব অকূল-তলে
কাহার সোনার তরী করিল তারণ।

—প্রিয়ে, কাশীধামে বুঝিপঞ্চশর ত্রিলোচনের ভয়ে এগোতে পারেন না।

পুরবালা। তা হতে পারে, কিন্তু কলকাতায় তো তাঁর যাতায়াত আছে।

অক্ষয়। তা আছে— কোম্পানির শাসন তিনি মানেন না, আমি তার প্রমাণ পেয়েছি।

নৃপবালা ও নীরবালার প্রবেশ

নীরবালা। দিদি।

অক্ষয়। এখন দিদি বৈ আর কথা নেই, অকৃতজ্ঞ! দিদি যখন বিচ্ছেদদহনে উত্তরোত্তর তপ্তকাঞ্চনের মতো শ্রী ধারণ করছিলেন তখন তোমাদের ক'টিকে সুশীতল করে রেখেছিল কে।

নীরবালা। শুনছ দিদি। এমন মিথ্যে কথা! তুমি যতদিন ছিলে না আমাদের একবার ডেকেও জিজ্ঞাসা করেন নি, কেবল চিঠি লিখেছেন আর টেবিলের উপর দুই পা তুলে দিয়ে বই হাতে করে পড়েছেন। তুমি এসেছ, এখন আমাদের নিয়ে গান হবে, ঠাট্টা হবে, দেখাবেন যেন—

নৃপবালা। দিদি, তুমিও তো ভাই, এতদিন আমাদের একখানিও চিঠি লেখ নি।

পুরবালা। আমার কি সময় ছিল ভাই। মাকে নিয়ে দিন রাত ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল।

অক্ষয়। যদি বলতে 'তোদের ভগ্নীপতির ধ্যানে নিমগ্ন ছিলুম' তা হলে কি লোকে নিন্দে করত।

নীরবালা। তা হলে ভগ্নীপতির আস্পর্ধা আরও বেড়ে যেত। মুখুজ্জেমশায়, তুমি তোমার বাইরের ঘরে যাও-না। দিদি এতদিন পরে এসেছেন, আমরা কি ওঁকে নিয়ে একটু গল্প করতে পাব না।

অক্ষয়। নৃশংসে, বিরহদাবদগ্ধ তোর দিদিকে আবার বিরহে জ্বালাতে চাস? তোদের ভগ্নীপতিরূপ ঘনকৃষ্ণ মেঘ মিলনরূপ মুষলধারাবর্ষণ-দ্বারা প্রিয়ার চিত্তরূপ লতানিকুঞ্জে আনন্দরূপ কিসলয়োদ্‌গম ক'রে প্রেমরূপ বর্ষায় কটাক্ষরূপ বিদ্যুৎ—

নীরবালা। এবং বকুনিরূপ ভেকের কলরব—

শৈলবালার প্রবেশ

অক্ষয়। এসো এসো— উত্তমাধমমধ্যমা এই তিন শ্যালী না হলে আমার—

নীরবালা। উত্তমমধ্যম হয় না।

শৈলবালা। (নৃপ ও নীরর প্রতি) তোরা ভাই, একটু যা তো, আমাদের কথা আছে।

অক্ষয়। কথাটা কী বুঝতে পারছিস তো নীরু? হরিনাম-কথা নয়।

নীরবালা। আচ্ছা, তোমার আর বকতে হবে না। [নৃপ ও নীরর প্রস্থান

শৈলবালা। দিদি, নৃপ-নীরর জন্যে মা দুটি পাত্র তা হলে স্থির করেছেন?

পুরবালা। হাঁ, কথা এক রকম ঠিক হয়ে গেছে। শুনেছি ছেলে দুটি মন্দ নয়— তারা মেয়ে দেখে পছন্দ করলেই পাকাপাকি হয়ে যাবে।

শৈলবালা। যদি পছন্দ না করে?

পুরবালা। তা হলে তাদের অদৃষ্ট মন্দ।

অক্ষয়। এবং আমার শ্যালী দুটির অদৃষ্ট ভালো।

শৈলবালা। নৃপ নীরু যদি পছন্দ না করে?

অক্ষয়। তা হলে ওদের রুচির প্রশংসা করব।

পুরবালা। পছন্দ আবার না করবে কী? তোদের সব বাড়াবাড়ি, স্বয়ম্বরার দিন গেছে। মেয়েদের পছন্দ করবার দরকার হয় না স্বামী হলেই তাকে ভালোবাসতে পারে।

অক্ষয়। নইলে তোমার বর্তমান ভগ্নীপতির কী দুর্দশাই হত শৈল!

জগত্তারিণীর প্রবেশ

জগত্তারিণী। বাবা অক্ষয়, ছেলে দুটিকে তা হলে তো খবর দিতে হয়। তারা তো আমাদের বাড়ির ঠিকানা জানে না।

অক্ষয়। বেশ তো মা, রসিকদাদাকে পাঠিয়ে দেওয়া যাক।

জগত্তারিণী। পোড়া কপাল। তোমার রসিকদাদার যেরকম বুদ্ধি। তিনি কাকে আনতে কাকে আনবেন ঠিক নেই।

পুরবালা। তা মা, তুমি কিছু ভেবো না। ছেলে দুটিকে আনবার ব্যবস্থা করে দেব।

জগত্তারিণী। মা পুরী, তুই একটু মনোযোগ না করলে হবে না। আজকালকার ছেলে, তাদের সঙ্গে কিরকম ব্যাভার করতে হয় না-হয় আমি কিছুই বুঝি নে।

অক্ষয়। (জনান্তিকে) পুরীর হাতযশ আছে। পুরী তাঁর মার জন্যে যে জামাইটি জুটিয়েছেন, পসার খুব বেড়ে গেছে। আজকালকার ছেলে কী করে বশ করতে হয় সে বিদ্যে—

পুরবালা। (জনান্তিকে) মশায় বুঝি আজকালকার ছেলে।

জগত্তারিণী। মা, তোমরা পরামর্শ করো। কায়েৎদিদি এসে বসে আছেন, আমি তাঁকে বিদায় করে আসি।

শৈলবালা। মা, তুমি একটু বিবেচনা করে দেখো, ছেলে দুটিকে এখনও তোমরা কেউ দেখ নি, হঠাৎ—

জগত্তারিণী। বিবেচনা করতে করতে আমার জন্ম শেষ হয়ে এল, আর বিবেচনা করতে পারি নে—

অক্ষয়। বিবেচনা সময়-মতো এর পর করলেই হবে, এখন কাজটা আগে হয়ে যাক।

জগত্তারিণী। বলো তো বাবা, শৈলকে বুঝিয়ে বলো তো। [প্রস্থান

পুরবালা। মিথ্যে তুই ভাবছিস শৈল— মা যখন মনস্থির করেছেন ওঁকে আর কেউ টলাতে পারবে না। প্রজাপতির নির্বন্ধ আমি মানি ভাই। যার সঙ্গে যার হবার, হাজার বিবেচনা করে মলেও সে হবেই।

অক্ষয়। সে তো ঠিক কথা— নইলে যার সঙ্গে যার হয়ে থাকে তার সঙ্গে না হয়ে আর একজনের সঙ্গে হ'ত।

পুরবালা। কী যে তর্ক কর তোমার অর্ধেক কথা বোঝাই যায় না।

অক্ষয়। তার কারণ আমি নির্বোধ।

পুরবালা। যাও, এখন স্নান করতে যাও, মাথা ঠাণ্ডা করে এসো গে। [প্রস্থান

রসিকের প্রবেশ

শৈলবালা। রসিকদাদা, শুনেছ তো সব ? মুশকিলে পড়া গেছে।

রসিক। মুশকিল কিসের। কুমারসভারও কৌমার্য রয়ে গেল, নৃপ-নীরুও পার পেলে, সব দিক রক্ষা হল।

শৈলবালা। কোনো দিক রক্ষা হয় নি।

রসিক। অন্তত এই বুড়োর দিকটা রক্ষা হয়েছে— দুটো অর্বাচীনের সঙ্গে মিশে আমাকে রাত্রে রাস্তায় দাঁড়িয়ে শ্লোক আওড়াতে হবে না।

শৈলবালা। মুখুজ্জেমশায়, তুমি না হলে রসিকদাদাকে কেউ শাসন করতে পারে না —উনি আমাদের কথা মানেন না।

অক্ষয়। যে বয়সে তোমাদের কথা বেদবাক্য বলে মানতেন সে বয়স পেরিয়েছে কিনা। তাই লোকটা বিদ্রোহ করতে সাহস করছে। আচ্ছা, আমি ঠিক করে দিচ্ছি। চলো তো রসিকদা, আমার বাইরের ঘরটাতে বসে তামাক নিয়ে পড়া যাক।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিপিনের বাসা

বিপিন ও গুরুদাস

তানপুরা হস্তে বিপিন অত্যন্ত বেসুরো গলায় সা রে গা মা সাধিতেছেন

বিপিন। ভাই গুরুদাস, তুমি তো ওস্তাদ মানুষ, আমার এই উপকারটি তোমার করে দিতেই হবে। এই খাতার সব গানগুলিই তোমাকে সুর বসিয়ে দিতে হবে। যেটা গাইলে ওটা খাসা হয়েছে। যদি কষ্ট না হয় তো আর একবার— আগে ওই গানের কথা দেখেই মজে গিয়েছিলুম, এখন দেখি কথাটি মানস-সরোবরের পদ্ম, আর তার উপরে গানটি বসেছে যেন বীণাপাণি স্বয়ং। ভাই আর-একবার—

গুরুদাস।— গান

তোমায় চেয়ে আছি বসে পথের ধারে সুন্দর হে।
জমল ধুলা প্রাণের বীণার তারে তারে সুন্দর হে।
নাই যে কুসুম, মালা গাঁথব কিসে। কান্নারই গান বীণায় এনেছি সে,
দূর হতে তাই শুনতে পাবে অন্ধকারে সুন্দর হে।
দিনের পরে দিন কেটে যায় সুন্দর হে।
মরে হৃদয় কোন্ পিপাসায় সুন্দর হে।
শূন্য ঘাটে আমি কী যে করি, রঙিন পালে কবে আসবে তরী—
পাড়ি দেব কবে সুধারসের পারাবারে সুন্দর হে।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। একটি বাবু এসেছেন।

বিপিন। বাবু? কিরকম বাবু রে।

ভৃত্য। বুড়ো লোকটি।

বিপিন। মাথায় টাক আছে?

ভৃত্য। আছে।

বিপিন। (তানপুরা রাখিয়া) নিয়ে আয়, এখনই নিয়ে আয়। ওরে ওরে, তামাক দিয়ে যা। বেহারাটা কোথায় গেল, পাখা টানতে বলে দে। আর দেখ্, চট করে গোটা-কতক মিঠে পানের দোনা কিনে আন্ তো রে। দেরি করিস নে, আর আধ সের বরফ নিয়ে আসিস— বুঝেছিস? [ভৃত্যের প্রস্থান

(পদশব্দ শুনিয়া) রসিকবাবু, আসুন।

বনমালীর প্রবেশ

বিপিন। রসিকবাবু— এ যে সেই বনমালী!

বৃদ্ধ। আজ্ঞে হাঁ, আমার নাম শ্রীবনমালী ভট্টাচার্য।

বিপিন। সে পরিচয় অনাবশ্যক। আমি একটু বিশেষ কাজে আছি।

বনমালী। মেয়েদুটিকে আর রাখা যায় না— পাত্রও অনেক আসছে—

বিপিন। শুনে খুশি হলেম— দিয়ে ফেলুন, দিয়ে ফেলুন—

বনমালী। কিন্তু আপনাদেরই ঠিক উপযুক্ত হত—

বিপিন। দেখুন বনমালীবাবু, এখনও আপনি আমার সম্পূর্ণ পরিচয় পান নি— যদি একবার পান তা হলে আমার উপযুক্ততা সম্বন্ধে আপনার ভয়ানক সন্দেহ হবে।

বনমালী। তা হলে আমি উঠি, আপনি ব্যস্ত আছেন, আর-এক সময় আসব।

বিপিন। (তানপুরা তুলিয়া লইয়া) সারেগা রেগামা গামাপা—

শ্রীশের প্রবেশ

শ্রীশ। কী হে বিপিন, একি। কুস্তি ছেড়ে দিয়ে গান ধরেছ? গুরুদাস যে?

বিপিন। ওস্তাদজি, আজ ছুটি। কী করব বলো, গান না শিখলে তো আর তোমার সন্ন্যাসীদলে আমল পাওয়া যাবে না। গুরুদাসকে গুরু মেনেছি। ওর কাছে নবীন-সন্ন্যাস-ব্রতের দীক্ষা নিচ্ছি।

শ্রীশ। সে কিরকম।

বিপিন। রস ভরে উঠলে তবেই তো ত্যাগ সহজ হয়। মেঘ যখন জলে ভারী হয় তখনই জল বর্ষণ করে।

শ্রীশ। রাখো তোমার নতুন ফিলসফি, কুমারসভার সেই লেখাটায় হাত দিতে পেরেছ?

বিপিন। না ভাই, সেটাতে এখনও হাত দিতে পারি নি। তোমার লেখাটি হয়ে গেছে নাকি।

শ্রীশ। না, আমিও হাত দিই নি। (কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) না ভাই, ভারী অন্যায় হচ্ছে। ক্রমেই আমরা আমাদের সংকল্প থেকে যেন দূরে চলে যাচ্ছি।

বিপিন। অনেক সংকল্প ব্যাঙাচির লেজের মতো, পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে আপনি অন্তর্ধান করে। কিন্তু যদি লেজটুকুই থেকে যেত, আর ব্যাঙটা যেত শুকিয়ে, সে কি-রকম হত। এক সময়ে একটা সংকল্প করেছিলেম বলেই যে সেই সংকল্পের খাতিরে নিজেকে শুকিয়ে মারতে হবে আমি তো তার মানে বুঝি নে।

শ্রীশ। আমি বুঝি। অনেক সংকল্প আছে যার কাছে নিজেকে শুকিয়ে মারাও শ্রেয়। অফলা গাছের মতো আমাদের ডালে পালায় প্রতিদিন যেন অতিরিক্ত-পরিমাণ রস-সঞ্চার হচ্ছে এবং সফলতার আশা প্রতিদিন যেন দূর হয়ে যাচ্ছে। আমি ভুল করেছিলুম ভাই বিপিন— সব বড়ো কাজেই তপস্যা চাই, নিজেকে নানা ভোগ থেকে বঞ্চিত না করলে, নানা দিক থেকে প্রত্যাহার করে না আনতে পারলে, চিত্তকে কোনো মহৎ কাজে সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত করা যায় না। এবার থেকে রসচর্চা একেবারে পরিত্যাগ করে কঠিন কাজে হাত দেব, এইরকম প্রতিজ্ঞা করেছি।

বিপিন। তোমার কথা মানি। কিন্তু, সব তৃণেই তো ধান ফলে না— শুকোতে গেলে কেবল নাহক শুকিয়ে মরাই হবে, ফস ফলবে না। কিছুদিন থেকে আমার মনে হচ্ছে আমরা যে সংকল্প গ্রহণ করেছি সে সংকল্প আমাদের দ্বারা সফল হবে না— অতএব আমাদের স্বভাবসাধ্য অন্য কোনোরকম পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়।

শ্রীশ। এ কোনো কাজের কথা নয়। বিপিন তোমার তম্বুরা ফেলো—

বিপিন। আচ্ছা, ফেললুম, তাতে পৃথিবীর কোনো ক্ষতি হবে না।

শ্রীশ। চন্দ্রবাবুর বাসায় আমাদের সভা তুলে নিয়ে যাওয়া যাক—

বিপিন। উত্তম কথা।

শ্রীশ। আমরা দুজনে মিলে রসিকবাবুকে একটু সংযত করে রাখব।

বিপিন। তিনি একলা আমাদের দুজনকে অসংযত করে না তোলেন।

গুরুদাস। সংযমচর্চা যদি আরম্ভ করেন তা হলে আমাকে আর দরকার নেই।

বিপিন। দরকার আরও বেশি। রৌদ্র যত প্রখর হবে, জলের প্রয়োজন ততই বাড়বে। এই দুঃসময়ে তুমি আমাকে ত্যাগ কোরো না— সকাল-সন্ধ্যায় যেন দর্শন পাই। সেই গানটা যদি এর মধ্যে তৈরি হয়ে যায় তো আজ সন্ধেবেলায়— কী বল?

গুরুদাস। আচ্ছা, তাই হবে। [প্রস্থান

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। একটি বুড়ো বাবু এসেছেন।

বিপিন। বুড়ো বাবু? জ্বালালে দেখছি। বনমালী আবার এসেছে।

শ্রীশ। বনমালী ? সে যে এই খানিক ক্ষণ হল আমার কাছেও এসেছিল।

বিপিন। ওরে, বুড়োকে বিদায় করে দে।

শ্রীশ। তুমি বিদায় করলে আবার আমার ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়বে। তার চেয়ে ডেকে আসুক, আমরা দুজনে মিলে বিদায় করে দিই। (ভৃত্যের প্রতি) বুড়োকে নিয়ে আয়। [ভৃত্যের প্রস্থান

রসিকের প্রবেশ

বিপিন। একি। এ তো বনমালী নয়, এ যে রসিকবাবু।

রসিক। আজ্ঞে হাঁ— আপনাদের আশ্চর্য চেনবার শক্তি— আমি বনমালী নই। 'ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী—'

শ্রীশ। না রসিকবাবু, ও-সব নয়, রসালাপ আমরা বন্ধ করে দিয়েছি।

রসিক। আঃ, বাঁচিয়েছেন।

শ্রীশ। অন্য সকল-প্রকার আলোচনা পরিত্যাগ করে এখন থেকে আমরা একান্তমনে কুমারসভার কাজে লাগব।

রসিক। আমারও সেই ইচ্ছে।

শ্রীশ। বনমালী ব'লে একজন বুড়ো, কুমোরটুলির নীলমাধব চৌধুরির দুই কন্যার সঙ্গে আমাদের বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, আমরা তাকে সংক্ষেপে বিদায় করে দিয়েছি— এ-সকল প্রসঙ্গও আমাদের কাছে অসংগত বোধ হয়।

রসিক। আমার কাছেও ঠিক তাই। বনমালী যদি দুই বা ততোধিক কন্যার বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হতেন তবে বোধ হয় তাঁকে নিষ্ফল হয়ে ফিরতে হত।

বিপিন। রসিকবাবু, কিছু জলযোগ করে যেতে হবে।

রসিক। না মশায়, আজ থাক্। আপনাদের সঙ্গে দুটো-একটা বিশেষ কথা ছিল, কিন্তু কঠিন প্রতিজ্ঞার কথা শুনে সাহস হচ্ছে না।

বিপিন। (সাগ্রহে) না না, তাই ব'লে কথা থাকলে বলবেন না কেন।

শ্রীশ। আমাদের যতটা ঠাওরাচ্ছেন ততটা ভয়ংকর নই। কথাটা কি বিশেষ করে আমার সঙ্গে।

বিপিন। না, সেদিন যে রসিকবাবু বলছিলেন আমারই সঙ্গে ওঁর দুটো-একটা আলোচনার বিষয় আছে।

রসিক। কাজ নেই, থাক্।

শ্রীশ। বলেন তো আজ রাত্রে গোলদিঘির ধারে—

রসিক। না শ্রীশবাবু, মাপ করবেন।

শ্রীশ। বিপিন ভাই, তুমি একটু ও ঘরে যাও-না, বোধ হয় তোমার সাক্ষাতে রসিক-বাবু—

রসিক। না না, দরকার কী—

বিপিন। তার চেয়ে রসিকবাবু, তেতালার ঘরে চলুন— শ্রীশ এখানে একটু অপেক্ষা করবেন এখন।

রসিক। না, আপনারা দুজনেই বসুন, আমি উঠি।

বিপিন। সে কি হয়। কিছু খেয়ে যেতে হবে।

শ্রীশ। না, আপনাকে কিছুতেই ছাড়ছি নে। সে হবে না।

রসিক। তবে কথাটা বলি। নৃপবালা নীরবালার কথা তো পূর্বেই আপনারা শুনেছেন—

শ্রীশ। শুনেছি বৈকি— তা নৃপবালার সম্বন্ধে যদি কিছু—

বিপিন। নীরবালার কোনো বিশেষ সংবাদ—

রসিক। তাঁদের দুজনের সম্বন্ধেই বিশেষ চিন্তার কারণ হয়ে পড়েছে।

উভয়ে। অসুখ নয় তো?

রসিক। তার চেয়ে বেশি। তাঁদের বিবাহের সম্বন্ধ —

শ্রীশ। বলেন কী রসিকবাবু। বিবাহের তো কোনো কথা শোনা যায় নি—

রসিক। কিচ্ছু না— হঠাৎ মা কাশী থেকে এসে দুটো অকালকুষ্মাণ্ডের সঙ্গে মেয়ে-দুটির বিবাহ স্থির করেছেন—

বিপিন। এ তো কিছুতেই হতে পারে না রসিকবাবু।

রসিক। মশায়, পৃথিবীতে যেটা অপ্রিয় সেইটেরই সম্ভাবনা বেশি। ফুলগাছের চেয়ে আগাছাই বেশি সম্ভবপর।

বিপিন। কিন্তু মশায়, আগাছা উৎপাটন করতে হবে—

শ্রীশ। ফুলগাছ রোপণ করতে হবে—

রসিক। তা তো বটেই, কিন্তু করে কে মশায়।

শ্রীশ। আমরা করব। কী বল বিপিন।

বিপিন। নিশ্চয়ই।

রসিক। কিন্তু, কী করবেন।

বিপিন। যদি বলেন তো সেই ছেলে-দুটোকে পথের মধ্যে—

রসিক। বুঝেছি, সেটা মনে করলেও শরীর পুলকিত হয়। কিন্তু, বিধাতার বরে অপাত্র জিনিসটা অমর— দুটো গেলে আবার দশটা আসবে।

বিপিন। এদের দুটোকে যদি ছলে বলে কিছুদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারি তা হলে ভাববার সময় পাওয়া যাবে।

রসিক। ভাববার সময় সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। এই শুক্রবারে তারা মেয়ে দেখতে আসবে।

বিপিন। এই শুক্রবারে?

শ্রীশ। সে তো পরশু।

রসিক। আজ্ঞে, পরশুই তো বটে। শুক্রবারকে তো পথের মধ্যে ঠেকিয়ে রাখা যায় না।

শ্রীশ। আচ্ছা, আমার একটা প্ল্যান মাথায় এসেছে।

রসিক। কিরকম শুনি।

শ্রীশ। সেই ছেলেদুটোকে বাড়ির কেউ চেনে?

রসিক। কেউ না।

শ্রীশ। তারা বাড়ি চেনে?

রসিক। তাও না।

শ্রীশ। তা হলে বিপিন যদি সেদিন তাদের কোনো রকম করে আটকে রাখতে পারে তো আমি তাদের নাম নিয়ে নৃপবালাকে—

বিপিন। জানই তো ভাই, আমার কোনো রকম কৌশল মাথায় আসে না। তুমি ইচ্ছে করলে কৌশলে ছেলেদুটোকে ভুলিয়ে রাখতে পারবে— আমি বরঞ্চ নিজেকে তাদের নামে চালিয়ে দিয়ে নীরবালাকে—

রসিক। কিন্তু মশায়, এ স্থলে তো গৌরবে বহুবচন খাটবে না। দুটি ছেলে আসবার কথা আছে, আপনাদের একজনকে দুজন বলে চালানো আমার পক্ষে কঠিন হবে—

শ্রীশ। ও, তা বটে।

বিপিন। হাঁ, সে কথা ভুলেছিলেম।

শ্রীশ। তা হলে তো আমাদের দুজনকেই যেতে হয়। কিন্তু—

রসিক। সে দুটোকে ভুল রাস্তায় চালান করে দিতে আমিই পারব। কিন্তু, আপনারা—

বিপিন। আমাদের জন্যে ভাববেন না রসিকবাবু।

শ্রীশ। আমরা সব-তাতেই প্রস্তুত আছি।

রসিক। আপনারা মহৎ লোক, এরকম ত্যাগস্বীকার—

শ্রীশ। বিলক্ষণ! এর মধ্যে ত্যাগস্বীকার কিছুই নেই।

বিপিন। এ তো আনন্দের কথা।

রসিক। না না, তবু তো মনে আশঙ্কা হতে পারে যে, কী জানি নিজের ফাঁদে যদি নিজেই পড়তে হয়।

শ্রীশ। কিছু না মশায়, কোনো আশঙ্কায় ডরাই নে।

বিপিন। আমাদের যাই ঘটুক তাতেই আমরা সুখী হব।

রসিক। এ তো আপনাদের মহত্ত্বের কথা, কিন্তু আমার কর্তব্য আপনাদের রক্ষা করা। তা, আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি— এই শুক্রবারের দিনটা আপনারা কোনো-মতে উদ্ধার করে দিন, তার পরে কখনো আপনাদের আর বিরক্ত করব না।

শ্রীশ। আমাদের বিরক্ত করবেন না এই কথা শুনে দুঃখিত হলেম রসিকবাবু।

রসিক। আচ্ছা, করব।

বিপিন। আমরা কি নিজের স্বাধীনতার জন্যেই কেবল ব্যস্ত। আমাদের এতই স্বার্থপর মনে করেন?

রসিক। মাপ করবেন— আমার ভুল ধারণা ছিল।

শ্রীশ। আপনি যাই বলুন, ফস্ করে ভালো পাত্র পাওয়া বড়ো শক্ত।

রসিক। সেইজন্যেই তো এত দিন অপেক্ষা করে শেষে এই বিপদ। বিবাহের প্রসঙ্গমাত্রই আপনাদের কাছে অপ্রিয়, তবু দেখুন আপনাদের সুদ্ধ—

বিপিন। সেজন্যে কিছু সংকোচ করবেন না—

শ্রীশ। আপনি যে আর-কারও কাছে না গিয়ে আমাদের কাছে এসেছেন, সেজন্যে অন্তরের সঙ্গে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

রসিক। আমি আর আপনাদের ধন্যবাদ দেব না। সেই কন্যা দুটির চিরজীবনের ধন্যবাদ আপনাদের পুরস্কৃত করবে।

বিপিন। ওরে, পাখাটা টান্।

শ্রীশ। রসিকবাবুর জন্যে জলখাবার আনাবে বলেছিলে—

বিপিন। সে এল বলে। ততক্ষণ এক গ্লাস বরফ-দেওয়া জল খান—

শ্রীশ। জল কেন, লেমনেড আনিয়ে দাও-না। (পকেট হইতে টিনের বাক্স বাহির করিয়া) এই নিন রসিকবাবু, পান খান।

বিপিন। ও দিকে হাওয়া পাচ্ছেন? এই তাকিয়াটি নিন-না।

শ্রীশ। আচ্ছা রসিকবাবু, নৃপবালা বুঝি খুব বিষণ্ন হয়ে পড়েছেন—

বিপিন। নীরবালাও অবশ্য খুব—

রসিক। সে আর বলতে।

শ্রীশ। নৃপবালা বুঝি কান্নাকাটি করছেন ?

বিপিন। আচ্ছা, নীরবালা তাঁর মাকে কেন একটু ভালো করে বুঝিয়ে বলেন না—

রসিক। (স্বগত) ওই রে, শুরু হল। আমার লেমনেডে কাজ নেই। (প্রকাশ্যে) মাপ করবেন, আমায় কিন্তু এখনই উঠতে হচ্ছে।

শ্রীশ। বলেন কী।

বিপিন। সে কি হয়।

রসিক। সেই ছেলেদুটোকে ভুল ঠিকানা দিয়ে আসতে হবে, নইলে—

শ্রীশ। বুঝেছি, তা হলে এখনই যান।

বিপিন। তা হলে আর দেরি করবেন না।

তৃতীয় দৃশ্য

চন্দ্রবাবুর বাড়ি

নির্মলা বাতায়নতলে আসীন। চন্দ্রবাবুর প্রবেশ

চন্দ্রবাবু। (স্বগত) বেচারা নির্মলা বড়ো কঠিন ব্রত গ্রহণ করেছে। আমি দেখছি ক দিন ধরে ও চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে রয়েছে। স্ত্রীলোক, মনের উপর এতটা ভার কি সহ্য করতে পারবে। (প্রকাশ্যে) নির্মল।

নির্মলা। (চমকিয়া) কী মামা।

চন্দ্রবাবু। সেই লেখাটা নিয়ে বুঝি ভাবছ ? আমার বোধ হয় অধিক না ভেবে মনকে দুই-একদিন বিশ্রাম দিলে লেখার পক্ষে সুবিধা হতে পারে।

নির্মলা। (লজ্জিত হইয়া) আমি ঠিক ভাবছিলুম না মামা। আমার এতক্ষণ সেই লেখায় হাত দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এই ক দিন থেকে গরম পড়ে দক্ষিনে হাওয়া দিতে আরম্ভ করেছে, কিছুতেই যেন মন বসাতে পারছি নে— ভারী অন্যায় হচ্ছে, আজ আমি যেমন করে হোক—

চন্দ্রবাবু। না না, জোর করে চেষ্টা কোরো না। আমার বোধ হয় নির্মল, বাড়িতে কেউ সঙ্গিনী নেই, নিতান্ত একলা কাজ করতে তোমার শ্রান্তি বোধ হয়। কাজে দুই-একজনের সঙ্গ এবং সহায়তা না হলে—

নির্মলা। অবলাকান্তবাবু আমাকে কতকটা সাহায্য করবেন বলেছেন— আমি তাঁকে রোগীশুশ্রূষা সম্বন্ধে সেই ইংরাজি বইটা দিয়েছি, তিনি একটা অধ্যায় আজ লিখে পাঠাবেন বলেছেন। বোধ হয় এখনই পাওয়া যাবে, তাই আমি অপেক্ষা করে বসে আছি।

চন্দ্রবাবু। ওই ছেলেটি বড়ো ভালো—

নির্মলা। খুব ভালো— চমৎকার—

চন্দ্রবাবু। এমন অধ্যবসায়, এমন কার্যতৎপরতা—

নির্মলা। আর, এমন সুন্দর নম্রস্বভাব—

চন্দ্রবাবু। ভালো প্রস্তাবমাত্রেই তাঁর উৎসাহ দেখে আমি আশ্চর্য হয়েছি।

নির্মলা। তা ছাড়া, তাঁকে দেখবামাত্র তাঁর মনের মাধুর্য মুখে এবং চেহারায় কেমন স্পষ্ট বোঝা যায়।

চন্দ্রবাবু। এত অল্প কালের মধ্যেই যে কারও প্রতি এত গভীর স্নেহ জন্মাতে পারে তা আমি কখনো মনে করি নি। আমার ইচ্ছা করে, ওই ছেলেটিকে নিজের কাছে রেখে ওর সকলপ্রকার লেখাপড়ায় এবং কাজে সহায়তা করি।

নির্মলা। তা হলে আমারও ভারী উপকার হয়, অনেক কাজ করতে পারি। আচ্ছা, এরকম প্রস্তাব করে একবার দেখোই-না।— ওই-যে বেহারা আসছে। বোধ হয় তিনি লেখাটা পাঠিয়ে দিয়েছেন। রামদীন, চিঠি আছে? এই দিকে নিয়ে আয়।

বেহারার প্রবেশ

ও চন্দ্রবাবুর হাতে চিঠি-প্রদান

মামা, সেই প্রবন্ধটা নিশ্চয় তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, ওটা আমাকে দাও।

চন্দ্রবাবু। না ফেনি, এটা আমার চিঠি।

নির্মলা। তোমার চিঠি! অবলাকান্তবাবু বুঝি তোমাকেই লিখেছেন? কী লিখেছেন।

চন্দ্রবাবু। না, এটা পূর্ণর লেখা।

নির্মলা। পূর্ণবাবুর লেখা? ওঃ—

চন্দ্রবাবু। পূর্ণ লিখছেন— 'গুরুদেব, আপনার চরিত্র মহৎ, মনের বল অসামান্য; আপনার মতো বলিষ্ঠপ্রকৃতি লোকেই মানুষের দুর্বলতা ক্ষমার চক্ষে দেখিতে পারেন ইহাই মনে করিয়া অদ্য এই চিঠিখানি আপনাকে লিখিতে সাহসী হইতেছি।'

নির্মলা। হয়েছে কী। বোধ হয় পূর্ণবাবু চিরকুমার-সভা ছেড়ে দেবেন, তাই এত ভূমিকা করছেন। লক্ষ্য করে দেখেছ বোধ হয়, পূর্ণবাবু আজকাল কুমারসভার কোনো কাজই করে উঠতে পারেন না।

চন্দ্রবাবু। 'দেব, আপনি যে আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন তাহা অত্যুচ্চ, যে উদ্দেশ্য আমাদের মস্তকে স্থাপন করিয়াছেন তাহা গুরুভার— সে আদর্শ এবং সেই উদ্দেশ্যের প্রতি এক মুহূর্তের জন্য ভক্তির অভাব হয় নাই, কিন্তু মাঝে মাঝে শক্তির দৈন্য অনুভব করিয়া থাকি তাহা চরণসমীপে সবিনয়ে স্বীকার করিতেছি।'

নির্মলা। আমার বোধ হয়, সকল বড়ো কাজেই মানুষ মাঝে মাঝে আপনার অক্ষমতা অনুভব করে হতাশ হয়ে পড়ে, শ্রান্ত মন এক-একবার বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু সে কি বরাবর থাকে।

চন্দ্রবাবু। 'সভা হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া যখন কার্যে হাত দিতে যাই তখন সহসা নিজেকে একক মনে হয়, উৎসাহ যেন আশ্রয়হীন লতার মতো লুণ্ঠিত হইয়া পড়িতে চাহে।' —নির্মল, আমরা তো ঠিক এই কথাই বলছিলেম।

নির্মলা। পূর্ণবাবু যা লিখেছেন সেটা সত্য— মানুষের সঙ্গ না হলে কেবলমাত্র সংকল্প নিয়ে উৎসাহ জাগিয়ে রাখা শক্ত।

চন্দ্রবাবু। 'আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করিবেন, কিন্তু অনেক চিন্তা করিয়া এ কথা স্থির বুঝিয়াছি, কুমারব্রত সাধারণ লোকের জন্য নহে— তাহাতে বল দান করে না, বল হরণ করে। স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের দক্ষিণ হস্ত— তাহারা মিলিত থাকিলে তবেই সম্পূর্ণরূপে সংসারের সকল কাজের উপযোগী হইতে পারে।'

তোমার কী মনে হয় নির্মল। (নির্মলা নিরুত্তর) অক্ষয়বাবুও এই কথা নিয়ে সেদিন আমার সঙ্গে তর্ক করছিলেন— তাঁর অনেক কথার উত্তর দিতে পারি নি।

নির্মলা। তা, হতে পারে। বোধ হয় কথাটার মধ্যে অনেকটা সত্য আছে।

চন্দ্রবাবু। 'গৃহস্থসন্তানকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত না করিয়া গৃহাশ্রমকে উন্নত আদর্শে গঠিত করাই আমার মতে শ্রেষ্ঠ কর্তব্য।'

নির্মলা। এ কথাটা কিন্তু পূর্ণবাবু বেশ বলেছেন।

চন্দ্রবাবু। আমিও কিছুদিন থেকে মনে করছিলেম কুমারব্রত গ্রহণের নিয়ম উঠিয়ে দেব।

নির্মলা। আমারও বোধ হয় উঠিয়ে দিলে মন্দ হয় না। কী বল মামা। অন্য কেউ কি আপত্তি করবেন। অবলাকান্তবাবু, শ্রীশবাবু—

চন্দ্রবাবু। আপত্তির কোনো কারণ নেই।

নির্মলা। তবু একবার অবলাকান্তবাবুদের মত নিয়ে দেখা উচিত।

চন্দ্রবাবু। মত তো নিতেই হবে।

(পত্রপাঠ) 'এ পর্যন্ত যাহা লিখিলাম সহজে লিখিয়াছি, এখন যাহা বলিতে চাহি তাহা লিখিতে কলম সরিতেছে না।'

নির্মলা। মামা, পূর্ণবাবু হয়তো কোনো গোপনীয় কথা লিখছেন, তুমি চেঁচিয়ে পড়ছ কেন।

চন্দ্রবাবু। ঠিক বলেছ ফেনি। (আপন মনে পাঠ) কী আশ্চর্য, আমি কি সকল বিষয়েই অন্ধ। এতদিন তো আমি কিছুই বুঝতে পারি নি। নির্মল, পূর্ণবাবুর কোনো ব্যবহার কি কখনো তোমার কাছে—

নির্মলা। হাঁ, পূর্ণবাবুর ব্যবহার আমার কাছে মাঝে মাঝে অত্যন্ত নির্বোধের মতো ঠেকেছিল।

চন্দ্রবাবু। অথচ পূর্ণবাবু খুব বুদ্ধিমান। তা হলে তোমাকে খুলে বলি— পূর্ণবাবু বিবাহের প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন—

নির্মলা। তুমি তো তাঁর অভিভাবক নও, তোমার কাছে প্রস্তাব—

চন্দ্রবাবু। আমি যে তোমার অভিভাবক, এই পড়ে দেখো—

নির্মলা। (পত্র পড়িয়া রক্তিমমুখে) এ হতেই পারে না।

চন্দ্রবাবু। আমি তাঁকে কী বলব।

নির্মলা। বোলো, কোনোমতে হতেই পারে না।

চন্দ্রবাবু। কেন নির্মল, তুমি তো বলছিলে কুমারব্রত-পালনের নিয়ম সভা হতে উঠিয়ে দিতে তোমার আপত্তি নেই।

নির্মলা। তাই বলেই কি যে প্রস্তাব করবে তাকেই—

চন্দ্রবাবু। পূর্ণবাবু তো যে-সে নয়, অমন ভালো ছেলে—

নির্মলা। মামা, তুমি এ-সব বিষয়ে কিছুই বোঝ না, তোমাকে বোঝাতে পারবও না— আমার কাজ আছে। [প্রস্থানোদ্যম

মামা, তোমার পকেটে ওটা কী উঁচু হয়ে আছে।

চন্দ্রবাবু। (চমকিয়া উঠিয়া) হাঁ হাঁ, ভুলে গিয়েছিলেম, বেহারা আজ সকালে তোমার নামে লেখা একটা কাগজ আমাকে দিয়ে গেছে—

নির্মলা। (তাড়াতাড়ি কাগজ লইয়া) দেখো দেখি মামা, কী অন্যায়, অবলাকান্তবাবুর লেখাটা সকালেই এসেছে, আমাকে দাও নি! আমি ভাবছিলেম তিনি হয়তো ভুলেই গেছেন। ভারী অন্যায়।

চন্দ্রবাবু। অন্যায় হয়েছে বটে। কিন্তু, এর চেয়ে ঢের বেশি অন্যায় ভুল আমি প্রতি দিনই করে থাকি ফেনি— তুমিই তো আমাকে প্রত্যেক বার মাপ করে প্রশ্রয় দিয়েছ।

নির্মলা। না, ঠিক অন্যায় নয়— আমিই অবলাকান্তবাবুর প্রতি মনে মনে অন্যায় করছিলেম, ভাবছিলেম— এই-যে, রসিকবাবু আসছেন। আসুন রসিকবাবু, মামা এই-খানেই আছেন।

রসিকের প্রবেশ

চন্দ্রবাবু। এই-যে, রসিকবাবু এসেছেন ভালোই হয়েছে।

রসিক। আমার আসাতেই যদি ভালো হয় চন্দ্রবাবু, তা হলে আপনাদের পক্ষে ভালো অত্যন্ত সুলভ। যখনই বলবেন তখনই আসব, না বললেও আসতে রাজি আছি।

চন্দ্রবাবু। আমরা মনে করছি আমাদের সভা থেকে চিরকুমারব্রতের নিয়মটা উঠিয়ে দেব— আপনি কী পরামর্শ দেন।

রসিক। আমি খুব নিঃস্বার্থভাবেই পরামর্শ দিতে পারব, কারণ, এ ব্রত রাখুন বা উঠিয়ে দিন আমার পক্ষে দু'ই সমান। আমার পরামর্শ এই যে, উঠিয়ে দিন, নইলে সে কোন্ দিন আপনিই উঠে যাবে। আমাদের পাড়ার রামহরি মাতাল রাস্তার মাঝখানে এসে সকলকে ডেকে বলেছিল, বাবাসকল, আমি স্থির করেছি এইখানটাতেই আমি পড়ব। স্থির না করলেও সে পড়ত, অতএব স্থির করাটাই তার পক্ষে ভালো হয়েছিল।

চন্দ্রবাবু। ঠিক বলেছেন রসিকবাবু, যে জিনিস বলপূর্বক আসবেই তাকে বলপ্রকাশ করতে না দিয়ে আসতে দেওয়াই ভালো। আসছে রবিবারের পূর্বেই এই প্রস্তাবটা সকলের কাছে একবার তুলতে চাই।

রসিক। আচ্ছা, শুক্রবারের সন্ধ্যাবেলায় আপনারা আমাদের ওখানে যাবেন, আমি সকলকে সংবাদ দিয়ে আনাব।

চন্দ্রবাবু। রসিকবাবু, আপনার যদি সময় থাকে তা হলে আমাদের দেশে গোজাতির উন্নতি সম্বন্ধে একটা প্রস্তাব আপনাকে—

রসিক। বিষয়টা শুনে খুব ঔৎসুক্য জন্মাচ্ছে, কিন্তু সময় খুব যে বেশি—

নির্মলা। না রসিকবাবু, আপনি ও ঘরে চলুন, আপনার সঙ্গে অনেক কথা কবার আছে। মামা, তোমার লেখাটা শেষ করো, আমরা থাকলে ব্যাঘাত হবে।

রসিক। তা হলে চলুন।

নির্মলা। (চলিতে চলিতে) অবলাকান্তবাবু আমাকে তাঁর সেই লেখাটা পাঠিয়ে দিয়েছেন— আমার অনুরোধ যে তিনি মনে করে রেখেছিলেন সেজন্যে আপনি তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন।

রসিক। ধন্যবাদ না পেলেও আপনার অনুরোধ রক্ষা করেই তিনি কৃতার্থ।

চতুর্থ দৃশ্য

অক্ষয়ের বাসা

জগত্তারিণী, পুরবালা ও অক্ষয়

জগত্তারিণী। বাবা অক্ষয়, দেখো তো, মেয়েদের নিয়ে আমি কী করি। নেপো বসে বসে কাঁদছে; নীর রেগে অস্থির, সে বলে সে কোনোমতেই বেরোবে না। ভদ্রলোকের ছেলেরা আজ এখনই আসবে, তাদের এখন কী বলে ফেরাব। তুমিই বাপু, ওদের শিখিয়ে পড়িয়ে বিবি করে তুলেছ, এখন তুমিই ওদের সামলাও। [প্রস্থান

পুরবালা। সত্যি, আমি ওদের রকম দেখে অবাক হয়ে গেছি, ওরা কি মনে করেছে ওরা—

অক্ষয়। বোধ হয় আমাকে ছাড়া আর-কাউকে ওরা পছন্দ করছে না; তোমারই সহোদরা কিনা, রুচিটা তোমারই মতো।

পুরবালা। ঠাট্টা রাখো, এখন ঠাট্টার সময় নয়। তুমি ওদের একটু বুঝিয়ে বলবে কি-না বলো। তুমি না বললে ওরা শুনবে না।

অক্ষয়। এত অনুগত! একেই বলে ভগ্নীপতিব্রতা শ্যালী। আচ্ছা, আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দাও— দেখি। [পুরবালার প্রস্থান

নৃপবালা ও নীরবালার প্রবেশ

নীরবালা। না, মুখুজ্জেমশায়, সে কোনোমতেই হবে না।

নৃপবালা। মুখুজ্জেমশায়, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাদের যার-তার সামনে ও-রকম করে বের কোরো না।

অক্ষয়। ফাঁসির হুকুম হলে একজন বলেছিল আমাকে বেশি উঁচুতে চড়িয়ো না, আমার মাথা ঘোরা ব্যামো আছে। তোদের যে তাই হল। বিয়ে করতে যাচ্ছিস, এখন দেখা দিতে লজ্জা করলে চলবে কেন।

নীরবালা। কে বললে আমরা বিয়ে করতে যাচ্ছি।

অক্ষয়। অহো, শরীরে পুলক সঞ্চার হচ্ছে। কিন্তু হৃদয় দুর্বল এবং দৈব বলবান, যদি দৈবাৎ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে হয়—

নীরবালা। না, ভঙ্গ হবে না।

অক্ষয়। হবে না তো? তবে নির্ভয়ে এসো; যুবক-দুটোকে দেখা দিয়ে আধপোড়া করে ছেড়ে দাও— হতভাগারা বাসায় ফিরে গিয়ে মরে থাকুক।

নীরবালা। অকারণে প্রাণিহত্যা করবার জন্যে আমাদের এত উৎসাহ নেই।

অক্ষয়। জীবের প্রতি কী দয়া! কিন্তু, সামান্য ব্যাপার নিয়ে গৃহবিচ্ছেদ করবার দরকার কী। তোদের মা দিদি যখন ধরে পড়েছেন এবং ভদ্রলোক দুটি যখন গাড়িভাড়া করে আসছে তখন একবার মিনিট-পাঁচেকের মতো দেখা দিস, তার পরে আমি আছি— তোদের অনিচ্ছায় কোনোমতেই বিবাহ দিতে দেব না।

নীরবালা। কোনোমতেই না?

অক্ষয়। কোনোমতেই না।

পুরবালার প্রবেশ

পুরবালা। আয়, তোদের সাজিয়ে দিই গে।

নীরবালা। আমরা সাজব না।

পুরবালা। ভদ্রলোকদের সামনে এইরকম বেশেই বেরোবি! লজ্জা করবে না!

নীরবালা। লজ্জা করবে বৈকি দিদি, কিন্তু সেজে বেরোতে আরও বেশি লজ্জা করবে।

অক্ষয়। উমা তপস্বিনীবেশে মহাদেবের মনোহরণ করেছিলেন, শকুন্তলা যখন দুষ্মন্তের হৃদয় জয় করেছিল তখন তার গায়ে একখানি বাকল ছিল— কালিদাস বলেন, সেও কিছু আঁট হয়ে পড়েছিল— তোমার বোনেরা সেই-সব পড়ে সেয়ানা হয়ে উঠেছে, সাজতে চায় না।

পুরবালা। সে-সব হল সত্যযুগের কথা। কলিকালের দুষ্মন্ত মহারাজারা সাজ-সজ্জাতেই ভোলেন।

অক্ষয়। যথা—

পুরবালা। যথা তুমি। যেদিন তুমি দেখতে এলে, মা বুঝি আমাকে সাজিয়ে দেন নি?

অক্ষয়। আমি মনে মনে ভাবলেম, সাজেও যখন একে সেজেছে তখন সৌন্দর্যে না জানি কত শোভা হবে।

পুরবালা। আচ্ছা, তুমি থামো। নীরু, আয়।

নীরবালা। না ভাই দিদি—

পুরবালা। আচ্ছা, সাজ নাই করলি, চুল তো বাঁধতে হবে?

অক্ষয়।— গান

অলকে কুসুম না দিয়ো,
শুধু শিথিল কবরী বাঁধিয়ো।

কাজলবিহীন সজল নয়নে
হৃদয়দুয়ারে ঘা দিয়ো।
আকুল আঁচলে পথিকচরণে
মরণের ফাঁদ ফাঁদিয়ো।
না করিয়া বাদ মনে যাহা সাধ
নিদয়া নীরবে সাধিয়ো।

পুরবালা। তুমি আবার গান ধরলে! আমি কখন কী করি বলো দেখি। তাদের আসবার সময় হল— এখনো আমার খাবার তৈরি করা বাকি আছে।

[নৃপবালা ও নীরবালাকে লইয়া প্রস্থান

রসিকের প্রবেশ

অক্ষয়। পিতামহ ভীষ্ম, যুদ্ধের সমস্তই প্রস্তুত?

রসিক। সমস্তই। বীরপুরুষ দুটিও সমাগত।

অক্ষয়। এখন কেবল দিব্যাস্ত্র-দুটি সাজতে গেছেন। তুমি তা হলে সেনাপতির ভার গ্রহণ করো, আমি একটু অন্তরালে থাকতে ইচ্ছা করি।

রসিক। আমিও প্রথমটা একটু আড়াল হই। [রসিক ও অক্ষয়ের প্রস্থান

শ্রীশ ও বিপিনের প্রবেশ

শ্রীশ। বিপিন, তুমি তো আজকাল সংগীতবিদ্যার উপর চীৎকারশব্দে ডাকাতি আরম্ভ করেছ— কিছু আদায় করতে পারলে?

বিপিন। কিছু না। সংগীতবিদ্যার দ্বারে সপ্তস্বর অনবরত পাহারা দিচ্ছে, সেখানে কি আমার ঢোকবার জো আছে। কিন্তু এ প্রশ্ন কেন তোমার মনে উদয় হল।

শ্রীশ। আজকাল মাঝে মাঝে কবিতায় সুর বসাতে ইচ্ছে করে। সেদিন বইয়ে পড়ছিলুম—

কেন সারা দিন ধীরে ধীরে
বালু নিয়ে শুধু খেল তীরে।
চলে যায় বেলা, রেখে মিছে খেলা
ঝাঁপ দিয়ে পড়ো কালো নীরে।
অকূল ছানিয়ে যা পাস তা নিয়ে
হেসে কেঁদে চলো ঘরে ফিরে।

—মনে হচ্ছিল এর সুরটা যেন জানি, কিন্তু গাবার জো নেই।

বিপিন। জিনিসটা মন্দ নয় হে— তোমার কবি লেখে ভালো। ওহে, ওর পরে আর কিছু নেই ? যদি শুরু করলে তবে শেষ করো।

শ্রীশ।—

নাহি জানি মনে কী বাসিয়া
পথে বসে আছে কে আসিয়া।
যে ফুলের বাসে অলস বাতাসে
হৃদয় দিতেছে উদাসিয়া
যেতে হয় যদি চলো নিরবধি
সেই ফুলবন তলাশিয়া।

বিপিন। বাঃ, বেশ ! কিন্তু শ্রীশ, শেল্‌ফের কাছে তুমি কী খুঁজে বেড়াচ্ছ।

শ্রীশ। সেই-যে সেদিন যে বইটাতে নাম লেখা দেখেছিলাম সেইটে—

বিপিন। না ভাই, আজ ও-সব নয়।

শ্রীশ। কী-সব নয়।

বিপিন। তাঁদের কথা নিয়ে কোনো রকম—

শ্রীশ। কী আশ্চর্য বিপিন। তাঁদের কথা নিয়ে আমি কি এমন কোনো আলোচনা করতে পারি যাতে—

বিপিন। রাগ কোরো না ভাই— আমি নিজের সম্বন্ধেই বলছি, এই ঘরেই আমি অনেক সময় রসিকবাবুর সঙ্গে তাঁদের বিষয়ে যে ভাবে আলাপ করেছি, আজ সে ভাবে কোনো কথা উচ্চারণ করতেও সংকোচ বোধ হচ্ছে— বুঝছ না—

শ্রীশ। কেন বুঝব না। আমি কেবল একখানি বই খুলে দেখবার ইচ্ছে করেছিলুম মাত্র— একটি কথাও উচ্চারণ করতুম না—

বিপিন। না, আজ তাও না। আজ তাঁরা আমাদের সম্মুখে বেরোবেন, আজ আমরা যেন তার যোগ্য থাকতে পারি।

শ্রীশ। বিপিন, তোমার সঙ্গে—

বিপিন। না ভাই, আমার সঙ্গে তর্ক কোরো না, আমি হারলুম— কিন্তু বইটা রাখো।

রসিকের প্রবেশ

রসিক। এই-যে, আপনারা এসে একলা বসে আছেন— কিছু মনে করবেন না—

শ্রীশ। কিছু না। এই ঘরটি আমাদের সাদর সম্ভাষণ করে নিয়েছিল।

রসিক। আপনাদের কত কষ্টই দেওয়া গেল।

শ্রীশ। কষ্ট আর দিতে পারলেন কই। একটা কষ্টের মতো কষ্ট স্বীকার করবার সুযোগ পেলে কৃতার্থ হতুম।

রসিক। যা হোক, অল্পক্ষণের মধ্যে চুকে যাবে এই এক সুবিধে। তার পরেই আপনারা স্বাধীন। ভেবে দেখুন দেখি, যদি এটা সত্যকার ব্যাপার হত তা হলেই 'পরিণামে বন্ধনভয়ম্'। বিবাহ জিনিসটা মিষ্টান্ন দিয়েই শুরু হয়, কিন্তু সকল সময় মধুরেণ সমাপ্ত হয় না। আচ্ছা, আজ আপনারা দুঃখিতভাবে এরকম চুপচাপ করে বসে আছেন কেন বলুন দেখি। আমি বলছি, আপনাদের কোনো ভয় নেই। আপনারা বনের বিহঙ্গ, দুটিখানি সন্দেশ খেয়েই আবার বনে উড়ে যাবেন— কেউ আপনাদের বাঁধবে না। নাত্র ব্যাধশরাঃ পতন্তি পরিতো নৈবাত্র দাবানলঃ। দাবানলের পরিবর্তে ডাবের জল পাবেন।

শ্রীশ। আমাদের সে দুঃখ নয় রসিকবাবু, আমরা ভাবছি — আমাদের দ্বারা কতটুকু উপকারই বা হচ্ছে। ভবিষ্যতের সমস্ত আশঙ্কা তো দূর করতে পারছি নে।

রসিক। বিলক্ষণ! যা করছেন তাতে আপনারা দুটি অবলাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করছেন— অথচ নিজেরা কোনোপ্রকার পাশেই বদ্ধ হচ্ছেন না।

জগত্তারিণী। (নেপথ্যে মৃদুস্বরে) আঃ, নেপো কী ছেলেমানুষি করছিস। শিগ্‌গির চোখের জল মুছে ঘরের মধ্যে যা, লক্ষ্মী মা আমার— কেঁদে চোখ লাল করলে কী রকম ছিরি হবে ভেবে দেখ্ দেখি।—নীরো, যা না। তোদের সঙ্গে আর পারি নে বাপু। ভদ্রলোকদের কতক্ষণ বসিয়ে রাখবি। কী মনে করবেন।

শ্রীশ। ওই শুনছেন রসিকবাবু? এ অসহ্য। এর চেয়ে রাজপুতদের কন্যাহত্যা ভালো।

বিপিন। রসিকবাবু, এঁদের এই সংকট থেকে সম্পূর্ণ রক্ষা করবার জন্যে আপনি আমাদের যা বলবেন আমরা তাতেই প্রস্তুত আছি।

রসিক। কিছু না, আপনাদের আর অধিক কষ্ট দেব না। কেবল আজকের দিনটা উত্তীর্ণ করে দিয়ে যান, তার পরে আপনাদের আর-কিছুই ভাবতে হবে না।

শ্রীশ। ভাবতে হবে না? কী বলেন রসিকবাবু। আমরা কি পাষাণ। আজ থেকেই আমরা বিশেষরূপে এঁদের জন্যে ভাববার অধিকার পাব।

বিপিন। এমন ঘটনার পর আমরা যদি এঁদের সম্বন্ধে উদাসীন হই তবে আমরা কাপুরুষ।

শ্রীশ। এখন থেকে এঁদের জন্যে ভাবা আমাদের পক্ষে গর্বের বিষয়— গৌরবের বিষয়।

রসিক। তা বেশ, ভাববেন, কিন্তু বোধ হয় ভাবা ছাড়া আর কোনো কষ্ট করতে হবে না।

শ্রীশ। আচ্ছা রসিকবাবু, আমাদের কষ্ট স্বীকার করতে দিতে আপনার এত আপত্তি হচ্ছে কেন।

বিপিন। এঁদের জন্যে যদিই আমাদের কোনো কষ্ট করতে হয় সেটা যে আমরা সম্মান বলে জ্ঞান করব।

শ্রীশ। দু দিন ধরে, রসিকবাবু, বেশি কষ্ট পেতে হবে না ব'লে আপনি ক্রমাগতই আমাদের আশ্বাস দিচ্ছেন— এতে আমরা বাস্তবিক দুঃখিত হয়েছি।

রসিক। আমাকে মাপ করবেন— আমি আর কখনো এমন অবিবেচনার কাজ করব না। আপনারা কষ্ট স্বীকার করবেন।

শ্রীশ। আপনি কি এখনও আমাদের চিনলেন না।

রসিক। চিনেছি বৈকি, সেজন্যে আপনারা কিছুমাত্র চিন্তিত হবেন না।

কুণ্ঠিত নৃপবালা ও নীরবালার প্রবেশ

শ্রীশ। (নমস্কার করিয়া) রসিকবাবু, আপনি এঁদের বলুন আমাদের যেন মার্জনা করেন।

বিপিন। আমরা যদি ভ্রমেও ওঁদের লজ্জা বা ভয়ের কারণ হই তবে তার চেয়ে দুঃখের বিষয় আমাদের পক্ষে আর কিছুই হতে পারে না, সেজন্যে যদি ক্ষমা না করেন তবে—

রসিক। বিলক্ষণ! ক্ষমা চেয়ে অপরাধিনীদের অপরাধ আরও বাড়াবেন না। এঁদের অল্প বয়স, মান্য অতিথিদের কিরকম সম্ভাষণ করা উচিত তা যদি এঁরা হঠাৎ ভুলে গিয়ে নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকেন তা হলে আপনাদের প্রতি অসদ্ভাব কল্পনা করে এঁদের আরও লজ্জিত করবেন না। নৃপদিদি, নীরদিদি, কী বল ভাই। যদিও এখনও তোমাদের চোখের পাতা শুকোয় নি তবু এঁদের প্রতি তোমাদের মন যে বিমুখ নয় সে কথা কি জানাতে পারি।

নৃপ ও নিরু লজ্জিত নিরুত্তর

না, একটু আড়ালে জিজ্ঞাসা করা দরকার। (জনান্তিকে) ভদ্রলোকদের এখন কী বলি বলো তো ভাই। বলব কি, তোমরা যত শীঘ্র পার বিদায় হও।

নীরবালা। (মৃদুস্বরে) রসিকদাদা, কী বক তার ঠিক নেই, আমরা কি তাই বলেছি— আমরা কি জানতুম এঁরা এসেছেন।

রসিক। (শ্রীশ ও বিপিনের প্রতি) এঁরা বলছেন—

সখা, কী মোর করমে লেখি—
তাপন বলিয়া তপনে ডরিনু,
চাঁদের কিরণ দেখি।

—এর উপরে আপনাদের আর কিছু বলবার আছে ?

নীরবালা। (জনান্তিকে) আঃ রসিকদাদা, কী বলছ তার ঠিক নেই। ও কথা আমরা কখন বললুম।

রসিক। (শ্রীশ ও বিপিনের প্রতি) এঁদের মনের ভাবটা আমি সম্পূর্ণ ব্যক্ত করতে পারি নি বলে এঁরা আমাকে ভৎর্সনা করছেন। এঁরা বলতে চান চাঁদের কিরণ বললেও যথেষ্ট বলা হয় না— তার চেয়ে আরও যদি—

নীরবালা। (জনান্তিকে) তুমি অমন কর যদি তা হলে আমরা চলে যাব।

রসিক। সখি, ন যুক্তম্ অকৃতসৎকারম্ অতিথিবিশেষম্ উজ্‌ঝিত্বা স্বচ্ছন্দতো গমনম্। (শ্রীশ ও বিপিনের প্রতি) এঁরা বলছেন এঁদের যথার্থ মনের ভাবটি যদি আপনাদের কাছে ব্যক্ত করে বলি, তা হলে এঁরা লজ্জায় এ ঘর থেকে চলে যাবেন।

[নীরবালা ও নৃপবালার প্রস্থানোদ্যম

শ্রীশ। রসিকবাবুর অপরাধে আপনারা নির্দোষদের সাজা দেবেন কেন। আমরা তো কোনোপ্রকার প্রগল্‌ভতা করি নি।

নৃপবালা ও নীরবালার 'ন যযৌ ন তস্থৌ' ভাব

বিপিন। (নীরকে লক্ষ্য করিয়া) পূর্বকৃত কোনো অপরাধ যদি থাকে তো ক্ষমা-প্রার্থনার অবকাশ কি দেবেন না।

রসিক। (জনান্তিকে) এই ক্ষমাটুকুর জন্যে বেচারা অনেক দিন থেকে সুযোগ প্রত্যাশা করছে।

নীরবালা। (জনান্তিকে) অপরাধ কী হয়েছে যে ক্ষমা করতে যাব।

রসিক। (বিপিনের প্রতি) ইনি বলছেন আপনার অপরাধ এমন মনোহর যে তাকে ইনি অপরাধ বলে লক্ষ্যই করেন নি। কিন্তু, আমি যদি সেই খাতাটি হরণ করতে সাহসী হতেম তবে সেটা অপরাধ হত— আইনের বিশেষ ধারায় এই রকম লিখছে।

বিপিন। ঈর্ষা করবেন না রসিকবাবু। আপনারা সর্বদাই অপরাধ করবার সুযোগ পান এবং সেজন্যে দণ্ডভোগ করে কৃতার্থ হন। আমি দৈবক্রমে একটা অপরাধ

করবার সুযোগ পেয়েছিলুম, কিন্তু এতই অধম যে দণ্ডনীয় বলেও গণ্য হলেম না, ক্ষমা পাবার যোগ্যতাও লাভ করলেম না।

রসিক। বিপিনবাবু, একেবারে হতাশ হবেন না। শাস্তি অনেক সময় বিলম্বে আসে, কিন্তু নিশ্চিত আসে। ফস্‌ করে মুক্তি না পেতেও পারেন।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। জলখাবার তৈরি। [নৃপবালা ও নীরবালার প্রস্থান

শ্রীশ। আমরা কি দুর্ভিক্ষের দেশ থেকে আসছি রসিকবাবু। জলখাবারের জন্যে এত তাড়া কেন।

রসিক। মধুরেণ সমাপয়েৎ।

শ্রীশ। (নিশ্বাস ফেলিয়া) কিন্তু সমাপনটা তো মধুর নয়। (জনান্তিকে বিপিনের প্রতি) কিন্তু বিপিন, এঁদের তো প্রতারণা করে যেতে পারব না।

বিপিন। (জনান্তিকে) তা যদি করি তবে আমরা পাষণ্ড।

শ্রীশ। (জনান্তিকে) এখন আমাদের কর্তব্য কী।

বিপিন। (জনান্তিকে) সে কি আর জিজ্ঞাসা করতে হবে।

রসিক। আপনারা দেখছি ভয় পেয়ে গেছেন। কোনো আশঙ্কা নেই, শেষকালে যেমন করেই হোক আমি আপনাদের উদ্ধার করবই।

শ্রীশ ও বিপিন আহারে প্রবৃত্ত হইল

ঘরের অন্য দিকে অক্ষয় ও জগত্তারিণীর প্রবেশ

জগত্তারিণী। দেখলে তো বাবা, কেমন ছেলে দুটি ?

অক্ষয়। মা, তোমার পছন্দ ভালো, এ কথা তো আমি অস্বীকার করতে পারি নে।

জগত্তারিণী। মেয়েদের রকম দেখলে তো বাবা ? এখন কান্নাকাটি কোথায় গেছে তার ঠিক নেই।

অক্ষয়। ওই তো ওদের দোষ। কিন্তু মা, তোমাকে নিজে গিয়ে আশীর্বাদ ক'রে ছেলেদুটিকে দেখতে হচ্ছে।

জগত্তারিণী। সে কি ভালো হবে অক্ষয়। ওরা কি পছন্দ জানিয়েছে।

অক্ষয়। খুব জানিয়েছে। এখন তুমি নিজে এসে আশীর্বাদ করে গেলেই চট্‌পট্‌ স্থির হয়ে যায়।

জগত্তারিণী। তা বেশ, তোমরা যদি বল, তা যাব, আমি ওদের মার বয়সী— আমার লজ্জা কিসের।

পুরবালার প্রবেশ

জগত্তারিণী। কী আর বলব পুরো, এমন সোনার চাঁদ ছেলে।

পুরবালা। তা জানতুম। নীর-নৃপর অদৃষ্টে কি খারাপ ছেলে হতে পারে।

অক্ষয়। তাদের বড়দিদির অদৃষ্টের আঁচ লেগেছে আর-কি।

পুরবালা। আচ্ছা, থামো। যাও দেখি, তাদের সঙ্গে একটু আলাপ করো গে ; কিন্তু শৈল গেল কোথায়।

অক্ষয়। সে খুশি হয়ে দরজা বন্ধ করে পুজোয় বসেছে।

শ্রীশ ও বিপিনের নিকট আসিয়া

ব্যাপারটা কী। রসিকদা, আজকাল তো খুব খাওয়াচ্ছ দেখছি। প্রত্যহ যাকে দু বেলা দেখছ তাকে হঠাৎ ভুলে গেলে ?

রসিক। এঁদের নূতন আদর, পাতে যা পড়ছে তাতেই খুশি হচ্ছেন। তোমার আদর পুরোনো হয়ে এল, তোমাকে নতুন করে খুশি করি এমন সাধ্য নেই ভাই।

অক্ষয়। কিন্তু শুনেছিলেম, আজকের সমস্ত মিষ্টান্ন এবং এ পরিবারের সমস্ত অনাস্বাদিত মধু উজাড় করে নেবার জন্যে দুটি অখ্যাতনামা যুবকের অভ্যুদয় হবে— এঁরা তাঁদেরই অংশে ভাগ বসাচ্ছেন নাকি। ওহে রসিকদা, ভুল কর নি তো ?

রসিক। ভুলের জন্যেই তো আমি বিখ্যাত। বড়োমা জানেন তাঁর বুড়ো রসিক-কাকা যাতে হাত দেবেন তাতেই গলদ হবে।

অক্ষয়। বল কী রসিকদাদা। করেছ কী। সে দুটি ছেলেকে কোথায় পাঠালে ?

রসিক। ভ্রমক্রমে তাঁদের ভুল ঠিকানা দিয়েছি।

অক্ষয়। সে বেচারাদের কী গতি হবে।

রসিক। বিশেষ অনিষ্ট হবে না। তাঁরা কুমারটুলিতে নীলমাধব চৌধুরির বাড়িতে এতক্ষণে জলযোগ সমাধা করেছেন। বনমালী ভট্টাচার্য তাঁদের তত্ত্বাবধানের ভার নিয়েছেন।

অক্ষয়। তা যেন বুঝলুম, মিষ্টান্ন সকলেরই পাতে পড়ল, কিন্তু তোমারই জলযোগটি কিছু কটু রকম হবে। এইবেলা ভ্রম সংশোধন করে নাও। শ্রীশবাবু, বিপিনবাবু, কিছু মনে কোরো না— এর মধ্যে একটু পারিবারিক রহস্য আছে।

শ্রীশ। সরলপ্রকৃতি রসিকবাবু সে রহস্য আমাদের নিকট ভেদ করেই দিয়েছেন। আমাদের ফাঁকি দিয়ে আনেন নি।

বিপিন। মিষ্টান্নের থালায় আমরা অনধিকার আক্রমণ করি নি, শেষ পর্যন্ত তার প্রমাণ দিতে প্রস্তুত আছি।

অক্ষয়। বল কী বিপিনবাবু। তা হলে চিরকুমার-সভাকে চিরজন্মের মতো কাঁদিয়ে

এসেছ ? জেনেশুনে, ইচ্ছাপূর্বক ?

রসিক। না না, তুমি ভুল করছ অক্ষয়।

অক্ষয়। আবার ভুল ? আজ কি সকলেরই ভুল করবার দিন হল নাকি।—

গান

ভুলে ভুলে আজ ভুলময়।
ভুলের লতায় বাতাসের ভুলে
ফুলে ফুলে হোক ফুলময়।
আনন্দ-ঢেউ ভুলের সাগরে উছলিয়া হোক কূলময়।

রসিক। এ কী, বড়োমা আসছেন যে !

অক্ষয়। আসবারই তো কথা। উনি তো কুমারটুলির ঠিকানায় যাবেন না।

জগত্তারিণীর প্রবেশ

শ্রীশ ও বিপিনের ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম

দুইজনকে দুই মোহর দিয়া জগত্তারিণীর আশীর্বাদ। জনান্তিকে অক্ষয়ের সহিত জগত্তারিণীর আলাপ

অক্ষয়। মা বলছেন, তোমাদের আজ ভালো করে খাওয়া হল না, সমস্তই পাতে পড়ে রইল।

শ্রীশ। আমরা দুবার চেয়ে নিয়ে খেয়েছি।

বিপিন। যেটা পাতে পড়ে আছে ওটা তৃতীয় কিস্তি।

শ্রীশ। ওটা না পড়ে থাকলে আমাদেরই পড়ে থাকতে হত।

জগত্তারিণী। (জনান্তিকে) তা হলে তোমরা ওঁদের বসিয়ে কথাবার্তা কও বাছা, আমি আসি। [প্রস্থান

রসিক। না, এ ভারী অন্যায় হল।

অক্ষয়। অন্যায়টা কী হল।

রসিক। আমি ওঁদের বার বার করে বলে এসেছি যে, ওঁরা কেবল আজ আহারটি করেই ছুটি পাবেন, কোনোরকম বধবন্ধনের আশঙ্কা নেই। কিন্তু—

শ্রীশ। ওর মধ্যে কিন্তুটা কোথায় রসিকবাবু। আপনি অত চিন্তিত হচ্ছেন কেন।

রসিক। বলেন কী শ্রীশবাবু, আপনাদের আমি কথা দিয়েছি যখন—

বিপিন। তা বেশ তো, এমনিই কী মহাবিপদে ফেলেছেন।

শ্রীশ। মা আমাদের যে আশীর্বাদ করে গেলেন আমরা যেন তার যোগ্য হই।

রসিক। না না, শ্রীশবাবু, সে কোনো কাজের কথা নয়। আপনারা যে দায়ে পড়ে ভদ্রতার খাতিরে—

বিপিন। রসিকবাবু, আমাদের প্রতি অবিচার করবেন না— দায়ে পড়ে—

রসিক। দায় নয় তো কী মশায়। সে কিছুতেই হবে না। আমি বরঞ্চ সেই ছেলেদুটোকে বনমালীর হাত ছাড়িয়ে কুমারটুলি থেকে এখনও ফিরিয়ে আনব, তবু—

শ্রীশ। আপনার কাছে কী অপরাধ করেছি রসিকবাবু।

রসিক। না না, এ তো অপরাধের কথা হচ্ছে না। আপনারা ভদ্রলোক, কৌমার্যব্রত অবলম্বন করেছেন— আমার অনুরোধে পড়ে পরের উপকার করতে এসে শেষকালে—

বিপিন। শেষকালে নিজের উপকার করে ফেলব এটুকু আপনি সহ্য করতে পারবেন না— এমনি হিতৈষী বন্ধু!

শ্রীশ। আমরা যেটাকে সৌভাগ্য বলে স্বীকার করছি। আপনি তার থেকে আমাদের বঞ্চিত করতে চেষ্টা করছেন কেন।

রসিক। শেষকালে আমাকে দোষ দেবেন না।

বিপিন। নিশ্চয় দেব, যদি না আপনি স্থির হয়ে শুভকর্মে সহায়তা করেন।

রসিক। আমি এখনও সাবধান করছি—

গতং তদ্‌গাম্ভীর্যং তটমপি চিতং জালিকশতৈঃ
সখে হংসোত্তিষ্ঠ ত্বরিতমমুতো গচ্ছ সরসঃ।

সে গাম্ভীর্য গেল কোথা, নদীতট হেরো হোথা
জালিকেরা জালে ফেলে ঘিরে—
সখে হংস, ওঠো ওঠো, সময় থাকিতে ছোটো
হেথা হতে মানসের তীরে।

শ্রীশ। কিছুতেই না। তা, আপনার সংস্কৃত শ্লোক ছুঁড়ে মারলেও সখা হংসরা কিছুতেই এখান থেকে নড়ছেন না।

রসিক। স্থান খারাপ বটে, নড়বার জো নেই। আমি তো অচল হয়ে বসে আছি— হায় হায়—

অয়ি কুরঙ্গ তপোবনবিভ্রমাৎ
উপগতাসি কিরাতপুরীমিমাম্।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। চন্দ্রবাবু এসেছেন।

অক্ষয়। এইখানেই ডেকে নিয়ে আয়। [ভৃত্যের প্রস্থান

রসিক। একেবারে দারোগার হাতে চোর-দুটিকে সমর্পণ করে দেওয়া হোক।

চন্দ্রবাবুর প্রবেশ

চন্দ্রবাবু। এই-যে, আপনারা এসেছেন। পূর্ণবাবুকেও দেখছি।

অক্ষয়। আজ্ঞে না, আমি পূর্ণ নই, তবু অক্ষয় বটে।

চন্দ্রবাবু। অক্ষয়বাবু। তা, বেশ হয়েছে, আপনাকেও দরকার ছিল।

অক্ষয়। আমার মতো অদরকারি লোককে যে দরকারে লাগাবেন তাতেই লাগতে পারি— বলুন কী করতে হবে।

চন্দ্রবাবু। আমি ভেবে দেখেছি, আমাদের সভা থেকে কুমারব্রতের নিয়ম না ওঠালে সভাকে অত্যন্ত সংকীর্ণ করে রাখা হচ্ছে। শ্রীশবাবু বিপিনবাবুকে এই কথাটা একটু ভালো করে বোঝাতে হবে।

অক্ষয়। ভারী কঠিন কাজ, আমার দ্বারা হবে কিনা সন্দেহ।

চন্দ্রবাবু। একবার একটা মতকে ভালো ব'লে গ্রহণ করেছি ব'লেই সেটাকে পরিত্যাগ করবার ক্ষমতা দূর করা উচিত নয়। মতের চেয়ে বিবেচনাশক্তি বড়ো। শ্রীশবাবু, বিপিনবাবু—

শ্রীশ। আমাদের অধিক বলা বাহুল্য—

চন্দ্রবাবু। কেন বাহুল্য। আপনারা যুক্তিতেও কর্ণপাত করবেন না?

বিপিন। আমরা আপনারই মতে—

চন্দ্রবাবু। আমার মত এক সময় ভ্রান্ত ছিল সে কথা স্বীকার করছি, আপনারা এখনও সেই মতেই—

রসিক। এই-যে পূর্ণবাবু আসছেন। আসুন আসুন।

পূর্ণর প্রবেশ

চন্দ্রবাবু। পূর্ণবাবু, তোমার প্রস্তাবমতে আমাদের সভা থেকে কুমারব্রত তুলে দেবার জন্যেই আজ আমরা এখানে মিলিত হয়েছি। কিন্তু, শ্রীশবাবু এবং বিপিনবাবু অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, এখন ওঁদের বোঝাতে পারলেই—

রসিক। ওঁদের বোঝাতে আমি ত্রুটি করি নি চন্দ্রবাবু—

চন্দ্রবাবু। আপনার মতো বাগ্মী যদি ফল না পেয়ে থাকেন তা হলে—

রসিক। ফল যা পেয়েছি 'তা ফলেন পরিচীয়তে'।

চন্দ্রবাবু। কী বলছেন ভালো বুঝতে পারছি নে।

অক্ষয়। ওহে রসিকদা, চন্দ্রবাবুকে খুব স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। আমি দুটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখনই এনে উপস্থিত করছি।

শ্রীশ। পূর্ণবাবু, ভালো আছেন তো?

পূর্ণ। হাঁ।

বিপিন। আপনাকে একটু শুকনো দেখাচ্ছে।

পূর্ণ। না, কিছু না।

শ্রীশ। আপনাদের পরীক্ষার আর তো দেরি নেই।

পূর্ণ। না।

নৃপবালা ও নীরবালাকে লইয়া অক্ষয়ের প্রবেশ

অক্ষয়। (নৃপবালা ও নীরবালার প্রতি) ইনি চন্দ্রবাবু, ইনি তোমাদের গুরুজন, এঁকে প্রণাম করো। (নৃপ ও নীরর প্রণাম) চন্দ্রবাবু, নূতন নিয়মে আপনাদের সভায় এই দুটি সভ্য বাড়ল।

চন্দ্রবাবু। বড়ো খুশি হলেম। এঁরা কে।

অক্ষয়। আমার সঙ্গে এঁদের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। এঁরা আমার দুটি শ্যালী। শ্রীশবাবু এবং বিপিনবাবুর সঙ্গে এঁদের সম্বন্ধ শুভলগ্নে আরও ঘনিষ্ঠতর হবে। এঁদের প্রাত দৃষ্টি করলেই বুঝবেন, রসিকবাবু এই যুবক-দুটির যে মতের পরিবর্তন করিয়েছেন সে কেবলমাত্র বাগ্মিতার দ্বারা নয়।

চন্দ্রবাবু। বড়ো আনন্দের কথা।

পূর্ণবাবু। শ্রীশবাবু, বড়ো খুশী হলুম। বিপিনবাবু, আপনাদের বড়ো সৌভাগ্য। আশা করি অবলাকান্তবাবুও বঞ্চিত হন নি, তাঁরও একটি—

নির্মলার প্রবেশ

চন্দ্রবাবু। নির্মলা, শুনে খুশি হবে, শ্রীশবাবু এবং বিপিনবাবুর সঙ্গে এঁদের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেছে। তা হলে কুমারব্রত উঠিয়ে দেওয়া সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করাই বাহুল্য।

নির্মলা। কিন্তু অবলাকান্তবাবুর মত তো নেওয়া হয় নি— তাঁকে এখানে দেখছি নে—

চন্দ্রবাবু। ঠিক কথা, আমি সেটা ভুলেই গিয়েছিলুম— তিনি আজ এখনও এলেন না কেন।

রসিক। কিছু চিন্তা করবেন না, তাঁর পরিবর্তন দেখলে আপনারা আরও আশ্চর্য হবেন।

অক্ষয়। চন্দ্রবাবু, এবারে আমাকেও দলে নেবেন। সভাটি যেরকম লোভনীয় হয়ে উঠল এখন আমাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন না।

চন্দ্রবাবু। আপনাকে পাওয়া আমাদের সৌভাগ্য।

অক্ষয়। আমার সঙ্গে সঙ্গে আর-একটি সভ্যও পাবেন। আজকের সভায় তাঁকে কিছুতেই উপস্থিত করতে পারলেম না। এখন তিনি নিজেকে সুলভ করবেন না— বাসরঘরে ভূতপূর্ব কুমারসভাটিকে সাধ্যমতো পিণ্ডদান করে তার পরে যদি দেখা দেন। এইবার অবশিষ্ট সভ্যটি এলেই আমাদের চিরকুমার-সভা সম্পূর্ণ সমাপ্ত হয়।

শৈলবালার প্রবেশ

শৈলবালা। (চন্দ্রবাবুকে প্রণাম করিয়া) আমাকে ক্ষমা করবেন।

শ্রীশ। এ কী, অবলাকান্তবাবু—

অক্ষয়। আপনারা মত-পরিবর্তন করেছেন, ইনি বেশ-পরিবর্তন করেছেন মাত্র।

রসিক। শৈলজা ভবানী এতদিন কিরাতবেশ ধারণ করে ছিলেন, আজ ইনি আবার তপস্বিনীবেশ গ্রহণ করলেন।

চন্দ্রবাবু। নির্মলা, আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে।

নির্মলা। অন্যায়! ভারী অন্যায়! অবলাকান্তবাবু—

অক্ষয়। নির্মলা দেবী ঠিক বলেছেন— অন্যায়। কিন্তু, সে বিধাতার অন্যায়। এঁর অবলাকান্ত হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু ভগবান এঁকে বিধবা শৈলবালা করে কী মঙ্গল সাধন করছেন সে রহস্য আমাদের অগোচর।

শৈলবালা। (নির্মলার প্রতি) আমি অন্যায় করেছি, সে অন্যায়ের প্রতিকার আমার দ্বারা কী হবে? আশা করি কালে সমস্ত সংশোধন হয়ে যাবে।

পূর্ণ। (নির্মলার নিকটে আসিয়া) এই অবকাশে আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, চন্দ্রবাবুর পত্রে আমি যে স্পর্ধা প্রকাশ করেছিলুম সে আমার পক্ষে অন্যায় হয়েছিল— আমার মতো অযোগ্য—

চন্দ্রবাবু। কিছু অন্যায় হয় নি পূর্ণবাবু, আপনার যোগ্যতা যদি নির্মলা না বুঝতে পারেন তো সে নির্মলারই বিবেচনার অভাব। [নির্মলার নতমুখে নিরুত্তরে প্রস্থান

রসিক। (পূর্ণের প্রতি জনান্তিকে) ভয় নেই পূর্ণবাবু, আপনার দরখাস্ত মঞ্জুর— প্রজাপাতর আদালতে ডিক্রী পেয়েছেন— কাল প্রত্যুষেই জারি করতে বেরোবেন।

শ্রীশ। (শৈলবালার প্রতি) বড়ো ফাঁকি দিয়েছেন।

বিপিন। সম্বন্ধের পূর্বেই পরিহাসটা করে নিয়েছেন।

শৈলবালা। পরে তাই বলে নিষ্কৃতি পাবেন না।

বিপিন। নিষ্কৃতি চাই নে।

রসিক। এইবারে নাটক শেষ হল। এইখানে ভরতবাক্য উচ্চারণ করে দেওয়া যাক—

সর্বস্তরতু দুর্গাণি সর্বো ভদ্রাণি পশ্যতু।
সর্বঃ কামানবাপ্নোতু সর্বঃ সর্বত্র নন্দতু॥

উপন্যাস ও গল্প

গল্পগুচ্ছ

গল্পগুচ্ছ

খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাইচরণ যখন বাবুদের বাড়ি প্রথম চাকরি করিতে আসে তখন তাহার বয়স বারো। যশোহর জিলায় বাড়ি, লম্বা চুল, বড়ো বড়ো চোখ, শ্যামচিক্কণ ছিপ্‌ছিপে বালক। জাতিতে কায়স্থ। তাহার প্রভুরাও কায়স্থ। বাবুদের এক-বৎসর-বয়স্ক একটি শিশুর রক্ষণ ও পালন-কার্যে সহায়তা করা তাহার প্রধান কর্তব্য ছিল।

সেই শিশুটি কালক্রমে রাইচরণের কক্ষ ছাড়িয়া স্কুলে, স্কুল ছাড়িয়া কলেজে, অবশেষে কলেজ ছাড়িয়া মুন্‌সেফিতে প্রবেশ করিয়াছে। রাইচরণ এখনো তাঁহার ভৃত্য।

তাহার আর-একটি মনিব বাড়িয়াছে। মাঠাকুরানী ঘরে আসিয়াছেন; সুতরাং অনুকূলবাবুর উপর রাইচরণের পূর্বে যতটা অধিকার ছিল তাহার অধিকাংশই নূতন কর্ত্রীর হস্তগত হইয়াছে।

কিন্তু কর্ত্রী যেমন রাইচরণের পূর্বাধিকার কতকটা হ্রাস করিয়া লইয়াছেন তেমনি একটি নূতন অধিকার দিয়া অনেকটা পূরণ করিয়া দিয়াছেন। অনুকূলের একটি পুত্রসন্তান অল্পদিন হইল জন্মলাভ করিয়াছে, এবং রাইচরণ কেবল নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে।

তাহাকে এমনি উৎসাহের সহিত দোলাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এমনি নিপুণতার সহিত তাহাকে দুই হাতে ধরিয়া আকাশে উৎক্ষিপ্ত করে, তাহার মুখের কাছে আসিয়া এমনি সশব্দে শিরশ্চালন করিতে থাকে, উত্তরের কোনো প্রত্যাশা না করিয়া এমন-সকল সম্পূর্ণ অর্থহীন অসংগত প্রশ্ন সুর করিয়া শিশুর প্রতি প্রয়োগ করিতে

থাকে যে, এই ক্ষুদ্র আনুকৌলবটি রাইচরণকে দেখিলে একেবারে পুলকিত হইয়া উঠে।

অবেশেষে ছেলেটি যখন হামাগুড়ি দিয়া অতি সাবধানে চৌকাঠ পার হইত এবং কেহ ধরিতে আসিলে খিল্ খিল্ হাস্যকলরব তুলিয়া দ্রুতবেগে নিরাপদ স্থানে লুকাইতে চেষ্টা করিত, তখন রাইচরণ তাহার অসাধারণ চাতুর্য ও বিচারশক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া যাইত। মার কাছে গিয়া সগর্ব সবিস্ময়ে বলিত, 'মা, তোমার ছেলে বড়ো হলে জজ হবে, পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করবে।'

পৃথিবীতে আর-কোনো মানবসন্তান যে এই বয়সে চৌকাঠ-লঙ্ঘন প্রভৃতি অসম্ভব চাতুর্যের পরিচয় দিতে পারে তাহা রাইচরণের ধ্যানের অগম্য, কেবল ভবিষ্যৎ জজেদের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নহে।

অবশেষে শিশু যখন টল্‌মল্ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল সে এক আশ্চর্য ব্যাপার— এবং যখন মাকে মা, পিসিকে পিচি, এবং রাইচরণকে চন্ন বলিয়া সম্ভাষণ করিল, তখন রাইচরণ সেই প্রত্যয়াতীত সংবাদ যাহার-তাহার কাছে ঘোষণা করিতে লাগিল।

সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে 'মাকে মা বলে, পিসিকে পিসি বলে, কিন্তু আমাকে বলে চন্ন'। বাস্তবিক, শিশুটির মাথায় এ বুদ্ধি কী করিয়া জোগাইল বলা শক্ত। নিশ্চয়ই কোনো বয়স্ক লোক কখনোই এরূপ অলোকসামান্যতার পরিচয় দিত না, এবং দিলেও তাহার জজের পদপ্রাপ্তি-সম্ভাবনা সম্বন্ধে সাধারণের সন্দেহ উপস্থিত হইত।

কিছুদিন বাদে মুখে দড়ি দিয়া রাইচরণকে ঘোড়া সাজিতে হইল। এবং মল্ল সাজিয়া তাহাকে শিশুর সহিত কুস্তি করিতে হইত— আবার পরাভূত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া না গেলে বিষম বিপ্লব বাধিত।

এই সময়ে অনুকূল পদ্মাতীরবর্তী এক জিলায় বদলি হইলেন। অনুকূল তাঁহার শিশুর জন্য কলিকাতা হইতে এক ঠেলাগাড়ি লইয়া গেলেন। সাটিনের জামা এবং মাথায় একটা জরির টুপি, হাতে সোনার বালা এবং পায়ে দুইগাছি মল পরাইয়া রাইচরণ নবকুমারকে দুইবেলা গাড়ি করিয়া হাওয়া খাওয়াইতে লইয়া যাইত।

বর্ষাকাল আসিল। ক্ষুধিত পদ্মা উদ্যান গ্রাম শস্যক্ষেত্র এক-এক গ্রাসে মুখে পুরিতে লাগিল। বালুকাচরের কাশবন এবং বনঝাউ জলে ডুবিয়া গেল। পাড় ভাঙার অবিশ্রাম ঝুপ্‌ঝাপ্ শব্দ এবং জলের গর্জনে দশ দিক মুখরিত হইয়া উঠিল, এবং দ্রুত বেগে ধাবমান ফেনরাশি নদীর তীব্র গতিকে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া তুলিল।

অপরাহ্ণে মেঘ করিয়াছিল, কিন্তু বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা ছিল না। রাইচরণের খামখেয়ালী ক্ষুদ্র প্রভু কিছুতেই ঘরে থাকিতে চাহিল না। গাড়ির উপর চড়িয়া

বসিল। রাইচরণ ধীরে ধীরে গাড়ি ঠেলিয়া ধান্যক্ষেত্রের প্রান্তে নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। নদীতে একটিও নৌকা নাই, মাঠে একটিও লোক নাই— মেঘের ছিদ্র দিয়া দেখা গেল, পরপারে জনহীন বালুকাতীরে শব্দহীন দীপ্ত সমারোহের সহিত সূর্যাস্তের আয়োজন হইতেছে। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে শিশু সহসা এক দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, 'চন্ন, ফু।'

অনতিদূরে সজল পঙ্কিল ভূমির উপর একটি বৃহৎ কদম্ববৃক্ষের উচ্চশাখায় গুটিকতক কদম্বফুল ফুটিয়াছিল, সেই দিকে শিশুর লুব্ধ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। দুই-চারি দিন হইল রাইচরণ কাঠি দিয়া বিদ্ধ করিয়া তাহাকে কদম্বফুলের গাড়ি বানাইয়া দিয়াছিল, তাহাতে দড়ি বাঁধিয়া টানিতে এত আনন্দ বোধ হইয়াছিল যে সেদিন রাইচরণকে আর লাগাম পরিতে হয় নাই; ঘোড়া হইতে সে একেবারেই সহিসের পদে উন্নীত হইয়াছিল।

কাদা ভাঙিয়া ফুল তুলিতে যাইতে চন্নর প্রবৃত্তি হইল না— তাড়াতাড়ি বিপরীত দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, 'দেখো দেখো ও—ই দেখো পাখি— ওই উড়ে—এ গেল। আয় রে পাখি আয় আয়।' এইরূপ অবিশ্রান্ত বিচিত্র কলরব করিতে করিতে সবেগে গাড়ি ঠেলিতে লাগিল।

কিন্তু যে ছেলের ভবিষ্যতে জজ হইবার কোনো সম্ভাবনা আছে তাহাকে এরূপ সামান্য উপায়ে ভুলাইবার প্রত্যাশা করা বৃথা— বিশেষত চারি দিকে দৃষ্টি-আকর্ষণের উপযোগী কিছুই ছিল না এবং কাল্পনিক পাখি লইয়া অধিক ক্ষণ কাজ চলে না।

রাইচরণ বলিল, 'তবে তুমি গাড়িতে বসে থাকো, আমি চট করে ফুল তুলে আনছি। খবরদার, জলের ধারে যেয়ো না।' বলিয়া হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া কদম্ববৃক্ষের অভিমুখে চলিল।

কিন্তু, ওই-যে জলের ধারে যাইতে নিষেধ করিয়া গেল, তাহাতে শিশুর মন কদম্বফুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সেই মুহূর্তেই জলের দিকে ধাবিত হইল। দেখিল, জল খল্‌খল্ ছল্‌ছল্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; যেন দুষ্টামি করিয়া কোন্-এক বৃহৎ রাইচরণের হাত এড়াইয়া এক লক্ষ শিশুপ্রবাহ সহাস্য কলস্বরে নিষিদ্ধ স্থানাভিমুখে দ্রুত বেগে পলায়ন করিতেছে।

তাহাদের সেই অসাধু দৃষ্টান্তে মানবশিশুর চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। গাড়ি হইতে আস্তে আস্তে নামিয়া জলের ধারে গেল, একটা দীর্ঘ তৃণ কুড়াইয়া লইয়া তাহাকে ছিপ কল্পনা করিয়া ঝুঁকিয়া মাছ ধরিতে লাগিল— দুরন্ত জলরাশি অস্ফুট কলভাষায় শিশুকে বার বার আপনাদের খেলাঘরে আহ্বান করিল।

একবার ঝপ্‌ করিয়া একটা শব্দ হইল, কিন্তু বর্ষার পদ্মাতীরে এমন শব্দ কত শোনা যায়। রাইচরণ আঁচল ভরিয়া কদম্বফুল তুলিল। গাছ হইতে নামিয়া সহাস্যমুখে গাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল, কেহ নাই। চারি দিকে চাহিয়া দেখিল কোথাও কাহারও কোনো চিহ্ন নাই।

মুহূর্তে রাইচরণের শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। সমস্ত জগৎসংসার মলিন বিবর্ণ ধোঁওয়ার মতো হইয়া আসিল। ভাঙা বুকের মধ্য হইতে একবার প্রাণপণ চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল, 'বাবু খোকাবাবু— লক্ষ্মী দাদাবাবু আমার।'

কিন্তু চন্ন বলিয়া কেহ উত্তর দিল না, দুষ্টামি করিয়া কোনো শিশুর কণ্ঠ হাসিয়া উঠিল না; কেবল পদ্মা পূর্ববৎ ছল্‌ছল্‌ খল্‌খল্‌ করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল, যেন সে কিছুই জানে না এবং পৃথিবীর এই-সকল সামান্য ঘটনায় মনোযোগ দিতে তাহার যেন এক মুহূর্ত সময় নাই।

সন্ধ্যা হইয়া আসিলে উৎকণ্ঠিত জননী চারি দিকে লোক পাঠাইয়া দিলেন। লণ্ঠন হাতে নদীতীরে লোক আসিয়া দেখিল, রাইচরণ নিশীথের ঝোড়ো বাতাসের মতো সমস্ত ক্ষেত্রময় 'বাবু' 'খোকাবাবু' 'আমার' বলিয়া ভগ্নকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছে। অবশেষে ঘরে ফিরিয়া রাইচরণ দড়াম করিয়া মাঠাকরুনের পায়ের কাছে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। তাহাকে যত জিজ্ঞাসা করে সে কাঁদিয়া বলে, 'জানি নে মা।'

যদিও সকলেই মনে মনে বুঝিল পদ্মারই এই কাজ, তথাপি গ্রামের প্রান্তে যে এক দল বেদের সমাগম হইয়াছে তাহাদের প্রতিও সন্দেহ দূর হইল না। এবং মাঠাকুরানীর মনে এমন সন্দেহ উপস্থিত হইল যে রাইচরণই বা চুরি করিয়াছে; এমন-কি তাহাকে ডাকিয়া অত্যন্ত অনুনয়পূর্বক বলিলেন, 'তুই আমার বাছাকে ফিরিয়ে এনে দে— তুই যত টাকা চাস তোকে দেব।' শুনিয়া রাইচরণ কেবল কপালে করাঘাত করিল। গৃহিণী তাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

অনুকূলবাবু তাঁহার স্ত্রীর মন হইতে রাইচরণের প্রতি এই অন্যায় সন্দেহ দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন রাইচরণ এমন জঘন্য কাজ কী উদ্দেশ্যে করিতে পারে। গৃহিণী বলিলেন, 'কেন। তাহার গায়ে সোনার গহনা ছিল।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাইচরণ দেশে ফিরিয়া গেল। এতকাল তাহার সন্তানাদি হয় নাই, হইবার বিশেষ আশাও ছিল না। কিন্তু দৈবক্রমে, বৎসর না যাইতেই, তাহার স্ত্রী অধিক বয়সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়া লোকলীলা সম্বরণ করিল।

এই নবজাত শিশুটির প্রতি রাইচরণের অত্যন্ত বিদ্বেষ জন্মিল। মনে করিল, এ যেন ছল করিয়া খোকাবাবুর স্থান অধিকার করিতে আসিয়াছে। মনে করিল, প্রভুর একমাত্র ছেলেটি জলে ভাসাইয়া নিজে পুত্রসুখ উপভোগ করা যেন একটি মহাপাতক। রাইচরণের বিধবা ভগ্নী যদি না থাকিত তবে এ শিশুটি পৃথিবীর বায়ু বেশিদিন ভোগ করিতে পাইত না।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ছেলেটিও কিছুদিন বাদে চৌকাঠ পার হইতে আরম্ভ করিল এবং সর্বপ্রকার নিষেধ লঙ্ঘন করিতে সকৌতুক চতুরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। এমন-কি, ইহার কণ্ঠস্বর হাস্যক্রন্দনধ্বনি অনেকটা সেই শিশুরই মতো। এক-একদিন যখন ইহার কান্না শুনিত রাইচরণের বুকটা সহসা ধড়াস্ করিয়া উঠিত, মনে হইত দাদাবাবু রাইচরণকে হারাইয়া কোথায় কাঁদিতেছে।

ফেল্‌না— রাইচরণের ভগ্নী ইহার নাম রাখিয়াছিল ফেল্‌না— যথাসময়ে পিসিকে পিসি বলিয়া ডাকিল। সেই পরিচিত ডাক শুনিয়া একদিন হঠাৎ রাইচরণের মনে হইল, 'তবে তো খোকাবাবু আমার মায়া ছাড়িতে পারে নাই, সে তো আমার ঘরে আসিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।'

এই বিশ্বাসের অনুকূলে কতকগুলি অকাট্য যুক্তি ছিল। প্রথমত, সে যাইবার অনতি-বিলম্বেই ইহার জন্ম। দ্বিতীয়ত, এতকাল পরে সহসা যে তাহার স্ত্রীর গর্ভে সন্তান জন্মে এ কখনোই স্ত্রীর নিজগুণে হইতে পারে না। তৃতীয়ত, এও হামাগুড়ি দেয়, টল্‌মল্ করিয়া চলে এবং পিসিকে পিসি বলে। যে-সকল লক্ষণ থাকিলে ভবিষ্যতে জজ হইবার কথা তাহার অনেকগুলি ইহাতে বর্তিয়াছে।

তখন মাঠাকরুনের সেই দারুণ সন্দেহের কথা হঠাৎ মনে পড়িল— আশ্চর্য হইয়া মনে মনে কহিল, 'আহা, মায়ের মন জানিতে পারিয়াছিল তাহার ছেলেকে কে চুরি করিয়াছে।' তখন, এতদিন শিশুকে যে অযত্ন করিয়াছে সেজন্য বড়ো অনুতাপ উপস্থিত হইল। শিশুর কাছে আবার ধরা দিল।

এখন হইতে ফেল্‌নাকে রাইচরণ এমন করিয়া মানুষ করিতে লাগিল যেন সে বড়ো ঘরের ছেলে। সাটিনের জামা কিনিয়া দিল। জরির টুপি আনিল। মৃত স্ত্রীর গহনা

গলাইয়া চুড়ি এবং বালা তৈয়ারি হইল। পাড়ার কোনো ছেলের সহিত তাহাকে খেলিতে দিত না; রাত্রিদিন নিজেই তাহার একমাত্র খেলার সঙ্গী হইল। পাড়ার ছেলেরা সুযোগ পাইলে তাহাকে নবাবপুত্র বলিয়া উপহাস করিত এবং দেশের লোক রাইচরণের এইরূপ উন্মত্তবৎ আচরণে আশ্চর্য হইয়া গেল।

ফেল্‌নার যখন বিদ্যাভ্যাসের বয়স হইল তখন রাইচরণ নিজের জোৎজমা সমস্ত বিক্রয় করিয়া ছেলেটিকে কলিকাতায় লইয়া গেল। সেখানে বহুকষ্টে একটি চাকরি যোগাড় করিয়া ফেল্‌নাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইল। নিজে যেমন তেমন করিয়া থাকিয়া ছেলেকে ভালো খাওয়া, ভালো পরা, ভালো শিক্ষা দিতে ত্রুটি করিত না। মনে মনে বলিত, 'বৎস, ভালোবাসিয়া আমার ঘরে আসিয়াছ বলিয়া যে তোমার কোনো অযত্ন হইবে, তা হইবে না।'

এমনি করিয়া বারো বৎসর কাটিয়া গেল। ছেলে পড়ে শুনে ভালো এবং দেখিতে শুনিতেও বেশ, হৃষ্টপুষ্ট, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ— কেশবেশবিন্যাসের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি, মেজাজ কিছু সুখী এবং শৌখিন। বাপকে ঠিক বাপের মতো মনে করিতে পারিত না। কারণ, রাইচরণ স্নেহে বাপ এবং সেবায় ভৃত্য ছিল, এবং তাহার আর একটি দোষ ছিল সে যে ফেল্‌নার বাপ এ কথা সকলের কাছেই গোপন রাখিয়াছিল। যে ছাত্রনিবাসে ফেল্‌না বাস করিত সেখানকার ছাত্রগণ বাঙাল রাইচরণকে লইয়া সর্বদা কৌতুক করিত এবং পিতার অসাক্ষাতে ফেল্‌নাও যে সেই কৌতুকালাপে যোগ দিত না তাহা বলিতে পারি না। অথচ নিরীহ বৎসলস্বভাব রাইচরণকে সকল ছাত্রই বড়ো ভালোবাসিত, এবং ফেল্‌নাও ভালোবাসিত, কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি ঠিক বাপের মতো নহে— তাহাতে কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ মিশ্রিত ছিল।

রাইচরণ বৃদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। তাহার প্রভু কাজকর্মে সর্বদাই দোষ ধরে। বাস্তবিক তাহার শরীরও শিথিল হইয়া আসিয়াছে, কাজেও তেমন মন দিতে পারে না, কেবলই ভুলিয়া যায়— কিন্তু, যে ব্যক্তি পুরা বেতন দেয় বার্ধক্যের ওজর সে মানিতে চাহে না। এ দিকে রাইচরণ বিষয় বিক্রয় করিয়া যে নগদ টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল তাহাও নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। ফেল্‌না আজকাল বসনভূষণের অভাব লইয়া সর্বদা খুঁৎখুঁৎ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

একদিন রাইচরণ হঠাৎ কর্মে জবাব দিল এবং ফেল্‌নাকে কিছু টাকা দিয়া বলিল, 'আবশ্যক পড়িয়াছে, আমি কিছু দিনের মতো দেশে যাইতেছি।' এই বলিয়া বারাসতে গিয়া উপস্থিত হইল। অনুকূলবাবু তখন সেখানে মুন্সেফ ছিলেন।

অনুকূলের আর দ্বিতীয় সন্তান হয় নাই, গৃহিণী এখনো সেই পুত্রশোক বক্ষের মধ্যে লালন করিতেছিলেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় বাবু কাছারি হইতে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন এবং কর্ত্রী একটি সন্ন্যাসীর নিকট হইতে সন্তানকামনায় বহু মূল্যে একটি শিকড় ও আশীর্বাদ কিনিতেছেন, এমন সময়ে প্রাঙ্গণে শব্দ উঠিল 'জয় হোক মা'।

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে রে।'

রাইচরণ আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, 'আমি রাইচরণ।'

বৃদ্ধকে দেখিয়া অনুকূলের হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিল। তাহার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সহস্র প্রশ্ন এবং আবার তাহাকে কর্মে নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিলেন।

রাইচরণ ম্লান হাস্য করিয়া কহিল, 'মাঠাকরুনকে একবার প্রণাম করিতে চাই।'

অনুকূল তাহাকে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। মাঠাকরুন রাইচরণকে তেমন প্রসন্নভাবে সমাদর করিলেন না; রাইচরণ তৎপ্রতি লক্ষ না করিয়া জোড়হস্তে কহিল, 'প্রভু, মা, আমিই তোমাদের ছেলেকে চুরি করিয়া লইয়াছিলাম। পদ্মাও নয়, আর কেহও নয়, কৃতঘ্ন অধম এই আমি—'

অনুকূল বলিয়া উঠিলেন, 'বলিস কী রে। কোথায় সে।'

'আজ্ঞা, আমার কাছেই আছে, আমি পরশ্ব আনিয়া দিব।'

সেদিন রবিবার, কাছারি নাই। প্রাতঃকাল হইতে স্ত্রীপুরুষ দুইজনে উন্মুখভাবে পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন। দশটার সময় ফেল্‌নাকে সঙ্গে লইয়া রাইচরণ আসিয়া উপস্থিত হইল।

অনুকূলের স্ত্রী কোনো প্রশ্ন কোনো বিচার না করিয়া, তাহাকে কোলে বসাইয়া, তাহাকে স্পর্শ করিয়া, তাহার আঘ্রাণ লইয়া, অতৃপ্তনয়নে তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, কাঁদিয়া হাসিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বাস্তবিক, ছেলেটি দেখিতে বেশ— বেশভূষা আকার প্রকারে দারিদ্র্যের কোনো লক্ষণ নাই। মুখে অত্যন্ত প্রিয়দর্শন বিনীত সলজ্জ ভাব। দেখিয়া অনুকূলের হৃদয়েও সহসা স্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

তথাপি তিনি অবিচলিত ভাব ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোনো প্রমাণ আছে?'

রাইচরণ কহিল, 'এমন কাজের প্রমাণ কী করিয়া, থাকিবে। আমি যে তোমার ছেলে চুরি করিয়াছিলাম সে কেবল ভগবান জানেন, পৃথিবীতে আর কেহ জানে না।'

অনুকূল ভাবিয়া স্থির করিলেন যে, ছেলেটিকে পাইবামাত্র তাঁহার স্ত্রী যেরূপ আগ্রহের সহিত তাহাকে আগলাইয়া ধরিয়াছেন এখন প্রমাণসংগ্রহের চেষ্টা করা সুযুক্তি নহে; যেমনই হউক, বিশ্বাস করাই ভালো। তা ছাড়া, রাইচরণ এমন ছেলেই বা কোথায় পাইবে। এবং বৃদ্ধ ভৃত্য তাঁহাকে অকারণে প্রতারণাই বা কেন করিবে।

ছেলেটির সহিতও কথোপকথন করিয়া জানিলেন যে সে শিশুকাল হইতে রাইচরণের সহিত আছে এবং রাইচরণকে সে পিতা বলিয়া জানিত, কিন্তু রাইচরণ কখনো তাহার প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার করে নাই, অনেকটা ভৃত্যের ভাব ছিল।

অনুকূল মন হইতে সন্দেহ দূর করিয়া বলিলেন, 'কিন্তু রাইচরণ, তুই আর আমাদের ছায়া মাড়াইতে পাইবি না।'

রাইচরণ করজোড়ে গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল, 'প্রভু, বৃদ্ধবয়সে কোথায় যাইব।'

কর্ত্রী বলিলেন, 'আহা থাক্‌। আমার বাছার কল্যাণ হউক। ওকে আমি মাপ করিলাম।'

ন্যায়পরায়ণ অনুকূল কহিলেন, 'যে কাজ করিয়াছে উহাকে মাপ করা যায় না।'

রাইচরণ অনুকূলের পা জড়াইয়া কহিল, 'আমি করি নাই, ঈশ্বর করিয়াছেন।'

নিজের পাপ ঈশ্বরের স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা দেখিয়া অনুকূল আরও বিরক্ত হইয়া কহিলেন, 'যে এমন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিয়াছে তাহাকে আর বিশ্বাস করা কর্তব্য নয়।'

রাইচরণ প্রভুর পা ছাড়িয়া কহিল, 'সে আমি নয় প্রভু।'

'তবে কে।'

'আমার অদৃষ্ট।'

কিন্তু, এরূপ কৈফিয়তে কোনো শিক্ষিত লোকের সন্তোষ হইতে পারে না।

রাইচরণ বলিল, 'পৃথিবীতে আমার আর-কেহ নাই।'

ফেল্‌না যখন দেখিল সে মুন্সেফের সন্তান, রাইচরণ তাহাকে এত দিন চুরি করিয়া নিজের ছেলে বলিয়া অপমানিত করিয়াছে, তখন তাহার মনে মনে কিছু রাগ হইল। কিন্তু, তথাপি উদারভাবে পিতাকে বলিল, 'বাবা, উহাকে মাপ করো। বাড়িতে থাকিতে না দাও, উহার মাসিক কিছু টাকা বরাদ্দ করিয়া দাও।'

ইহার পর রাইচরণ কোনো কথা না বলিয়া একবার পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিল, সকলকে প্রণাম করিল ; তাহার পর দ্বারের বাহির হইয়া পৃথিবীর অগণ্য লোকের মধ্যে মিশিয়া গেল। মাসান্তে অনুকূল যখন তাহার দেশের ঠিকানায় কিঞ্চিৎ বৃত্তি পাঠাইলেন তখন সে টাকা ফিরিয়া আসিল। সেখানে কোনো লোক নাই।

অগ্রহায়ণ ১২৯৮

সম্পত্তি-সমর্পণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বৃন্দাবন কুণ্ড মহা ক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়া তাহার বাপকে কহিল, 'আমি এখনই চলিলাম।'

বাপ যজ্ঞনাথ কুণ্ড কহিলেন, 'বেটা অকৃতজ্ঞ, ছেলেবেলা হইতে তোকে খাওয়াইতে পরাইতে যে ব্যয় হইয়াছে তাহা পরিশোধ করিবার নাম নাই, আবার তেজ দেখো-না।'

যজ্ঞনাথের ঘরে যেরূপ অশনবসনের প্রথা তাহাতে খুব যে বেশি ব্যয় হইয়াছে তাহা নহে। প্রাচীন কালের ঋষিরা আহার এবং পরিচ্ছদ সম্বন্ধে অসম্ভব অল্প খরচে জীবন নির্বাহ করিতেন ; যজ্ঞনাথের ব্যবহারে প্রকাশ পাইত বেশভূষা-আহারবিহারে তাঁহারও সেইরূপ অত্যুচ্চ আদর্শ ছিল। সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই ; সে কতকটা আধুনিক সমাজের দোষে এবং কতকটা শরীররক্ষা সম্বন্ধে প্রকৃতির কতকগুলি অন্যায় নিয়মের অনুরোধে।

ছেলে যতদিন অবিবাহিত ছিল সহিয়াছিল, কিন্তু বিবাহের পর হইতে খাওয়া পরা সম্বন্ধে বাপের অত্যন্ত বিশুদ্ধ আদর্শের সহিত ছেলের আদর্শের অনৈক্য হইতে লাগিল। দেখা গেল ছেলের আদর্শ ক্রমশই আধ্যাত্মিকের চেয়ে বেশি আধিভৌতিকের দিকে যাইতেছে। শীতগ্রীষ্ম-ক্ষুধাতৃষ্ণা-কাতর পার্থিব সমাজের অনুকরণে কাপড়ের বহর এবং আহারের পরিমাণ উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছে।

এ সম্বন্ধে পিতাপুত্রে প্রায় বচসা হইতে লাগিল। অবশেষে বৃন্দাবনের স্ত্রীর গুরুতর পীড়া-কালে কবিরাজ বহুব্যয়সাধ্য এক ঔষধের ব্যবস্থা করাতে যজ্ঞনাথ তাহাতেই কবিরাজের অনভিজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন।

বৃন্দাবন প্রথমে হাতে পায়ে ধরিল, তার পরে রাগারাগি করিল, কিন্তু কোনো ফল হইল না। পত্নীর মৃত্যু হইলে বাপকে স্ত্রীহত্যাকারী বলিয়া গালি দিল।

বাপ বলিলেন, 'কেন, ঔষধ খাইয়া কেহ মরে না? দামী ঔষধ খাইলেই যদি বাঁচিত তবে রাজা-বাদশারা মরে কোন্ দুঃখে। যেমন করিয়া তোর মা মরিয়াছে, তোর দিদিমা মরিয়াছে, তোর স্ত্রী তাহার চেয়ে কি বেশি ধুম করিয়া মরিবে।'

বাস্তবিক যদি শোকে অন্ধ না হইয়া বৃন্দাবন স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিত তাহা হইলে এ কথায় অনেকটা সান্ত্বনা পাইত। তাহার মা দিদিমা কেহই মরিবার সময় ঔষধ খান নাই। এ বাড়ির এইরূপ সনাতন প্রথা। কিন্তু আধুনিক লোকেরা প্রাচীন নিয়মে মরিতেও চায় না। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন এ দেশে ইংরেজের নূতন সমাগম হইয়াছে, কিন্তু সে সময়েও তখনকার সেকালের লোক তখনকার একালের লোকের ব্যবহার দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া অধিক করিয়া তামাক টানিত।

যাহা হউক, তখনকার নব্য বৃন্দাবন তখনকার প্রাচীন যজ্ঞনাথের সহিত বিবাদ করিয়া কহিল, 'আমি চলিলাম।'

বাপ তাহাকে তৎক্ষণাৎ যাইতে অনুমতি করিয়া সর্বসমক্ষে কহিলেন, বৃন্দাবনকে যদি তিনি কখনো এক পয়সা দেন তবে তাহা গোরক্তপাতের সহিত গণ্য হইবে। বৃন্দাবনও সর্বসমক্ষে যজ্ঞনাথের ধন-গ্রহণ মাতৃরক্তপাতের তুল্য পাতক বলিয়া স্বীকার করিল। ইহার পর পিতাপুত্রে ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল।

বহুকাল শান্তির পরে এইরূপ একটি ছোটোখাটো বিপ্লবে গ্রামের লোক বেশ একটু প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। বিশেষত, যজ্ঞনাথের ছেলে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হওয়ার পর সকলেই নিজ নিজ শক্তি অনুসারে যজ্ঞনাথের দুঃসহ পুত্রবিচ্ছেদদুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সকলেই বলিল, সামান্য একটা বউয়ের জন্য বাপের সহিত বিবাদ করা কেবল এ কালেই সম্ভব।

বিশেষত তাহারা খুব একটা যুক্তি দেখাইল; বলিল, একটা বউ গেলে অনতিবিলম্বে আর-একটা বউ সংগ্রহ করা যায়, কিন্তু বাপ গেলে দ্বিতীয় বাপ মাথা খুঁড়িলেও পাওয়া যায় না। যুক্তি খুব পাকা সন্দেহ নাই; কিন্তু আমার বিশ্বাস, বৃন্দাবনের মতো ছেলে এ যুক্তি শুনিলে অনুতপ্ত না হইয়া বরং কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইত।

বৃন্দাবনের বিদায়কালে তাহার পিতা যে অধিক মনঃকষ্ট পাইয়াছিলেন তাহা বোধ হয় না। বৃন্দাবন যাওয়াতে এক তো ব্যয়সংক্ষেপ হইল, তাহার উপরে যজ্ঞনাথের একটা মহা ভয় দূর হইল, বৃন্দাবন কখন তাহাকে বিষ খাওয়াইয়া মারে এই আশঙ্কা তাঁহার সর্বদাই ছিল— যে অত্যল্প আহার ছিল তাহার সহিত বিষের কল্পনা সর্বদা লিপ্ত

হইয়া থাকিত। বধূর মৃত্যুর পর এ আশঙ্কা কিঞ্চিৎ কমিয়াছিল এবং পুত্রের বিদায়ের পর অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ হইল।

কেবল একটি বেদনা মনে বাজিয়াছিল। যজ্ঞনাথের চারি বৎসর -বয়স্ক নাতি গোকুলচন্দ্রকে বৃন্দাবন সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। গোকুলের খাওয়া-পরার খরচ অপেক্ষাকৃত কম, সুতারং তাহার প্রতি যজ্ঞনাথের স্নেহ অনেকটা নিষ্কণ্টক ছিল। তথাপি বৃন্দাবন যখন তাহাকে নিতান্তই লইয়া গেল তখন অকৃত্রিম শোকের মধ্যেও যজ্ঞনাথের মনে মুহূর্তের জন্য একটা জমাখরচের হিসাব উদয় হইয়াছিল ; উভয়ে চলিয়া গেলে মাসে কতটা খরচ কমে এবং বৎসরে কতটা দাঁড়ায়, এবং যে টাকাটা সাশ্রয় হয় তাহা কত টাকার সুদ।

কিন্তু তবু শূন্য গৃহে গোকুলচন্দ্রের উপদ্রব না থাকাতে গৃহে বাস করা কঠিন হইয়া উঠিল। আজকাল যজ্ঞনাথের এমনি মুশকিল হইয়াছে, পূজার সময়ে কেহ ব্যাঘাত করে না, খাওয়ার সময় কেহ কাড়িয়া খায় না, হিসাব লিখিবার সময় দোয়াত লইয়া পালায় এমন উপযুক্ত লোক কেহ নাই। নিরুপদ্রবে স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল।

মনে হইল যেন মৃত্যুর পরেই লোকে এইরূপ উৎপাতহীন শূন্যতা লাভ করে ; বিশেষত বিছানার কাঁথায় তাঁহার নাতির কৃত ছিদ্র এবং বসিবার মাদুরে উক্ত শিল্পী-অঙ্কিত মসীচিহ্ন দেখিয়া তাঁহার হৃদয় আরও অশান্ত হইয়া উঠিত। সেই অমিতাচারী বালকটি দুই বৎসরের মধ্যেই পরিবার ধুতি সম্পূর্ণ অব্যবহার্য করিয়া তুলিয়াছিল বলিয়া পিতামহের নিকট বিস্তর তিরস্কার সহ্য করিয়াছিল ; এক্ষণে তাহার শয়নগৃহে সেই শত-গ্রন্থিবিশিষ্ট মলিন পরিত্যক্ত চীরখণ্ড দেখিয়া তাঁহার চক্ষু ছল্‌ছল্‌ করিয়া আসিল ; সেটি পলিতা-প্রস্তুত-করণ কিম্বা অন্য কোনো গার্হস্থ্য ব্যবহারে না লাগাইয়া যত্নপূর্বক সিন্দুকে তুলিয়া রাখিলেন এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যদি গোকুল ফিরিয়া আসে এবং এমন-কি বৎসরে একখানি করিয়া ধুতিও নষ্ট করে তথাপি তাহাকে তিরস্কার করিবেন না।

কিন্তু গোকুল ফিরিল না এবং যজ্ঞনাথের বয়স যেন পূর্বাপেক্ষা অনেক শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠিল এবং শূন্য গৃহ প্রতিদিন শূন্যতর হইতে লাগিল।

যজ্ঞনাথ আর ঘরে স্থির থাকিতে পারেন না। এমন-কি, মধ্যাহ্নে যখন সকল সম্ভ্রান্ত লোকই আহারান্তে নিদ্রাসুখ লাভ করে যজ্ঞনাথ হুঁকা-হস্তে পাড়ায় পাড়ায় ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। তাঁহার এই নীরব মধ্যাহ্নভ্রমণের সময় পথের ছেলেরা খেলা পরিত্যাগপূর্বক নিরাপদ স্থানে পলায়ন করিয়া তাঁহার মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে স্থানীয় কবি-রচিত বিবিধ-

ছন্দোবদ্ধ রচনা শ্রুতিগম্য উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিত। পাছে আহারের ব্যাঘাত ঘটে বলিয়া তাঁহার পিতৃদত্ত নাম উচ্চারণ করিতে কেহ সাহস করিত না, এইজন্য সকলেই স্বেচ্ছামতে তাঁহার নূতন নামকরণ করিত। বুড়োরা তাঁহাকে 'যজ্ঞনাশ' বলিতেন, কিন্তু ছেলেরা কেন যে তাঁহাকে 'চামচিকে' বলিয়া ডাকিত তাহার স্পষ্ট কারণ পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একদিন এইরূপে আম্রতরুচ্ছায়াশীতল গ্রামের পথে যজ্ঞনাথ মধ্যাহ্নে বেড়াইতে-ছিলেন; দেখিলেন একজন অপরিচিত বালক গ্রামের ছেলেদের সর্দার হইয়া উঠিয়া একটা সম্পূর্ণ নূতন উপদ্রবের পন্থা নির্দেশ করিতেছে। অন্যান্য বালকেরা তাহার চরিত্রের বল এবং কল্পনার নূতনত্বে অভিভূত হইয়া কায়মনে তাহার বশ মানিয়াছে।

অন্য বালকেরা বৃদ্ধকে দেখিয়া যেরূপ খেলায় ভঙ্গ দিত এ তাহা না করিয়া চট্ করিয়া আসিয়া যজ্ঞনাথের গায়ের কাছে চাদর ঝাড়া দিল এবং একটা বন্ধনমুক্ত গিরগিটি চাদর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া তাঁহার গা বাহিয়া অরণ্যাভিমুখে পলায়ন করিল— আকস্মিক ত্রাসে বৃদ্ধের সর্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। ছেলেদের মধ্যে ভারী একটা আনন্দের কলরব পড়িয়া গেল। আর কিছু দূর যাইতে না যাইতে যজ্ঞনাথের স্কন্ধ হইতে হঠাৎ তাঁহার গামছা অদৃশ্য হইয়া অপরিচিত বালকটির মাথায় পাগড়ির আকার ধারণ করিল।

এই অজ্ঞাত মানবকের নিকট হইতে এইপ্রকার নূতন প্রণালীর শিষ্টাচার প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞনাথ ভারী সন্তুষ্ট হইলেন। কোনো বালকের নিকট হইতে এরূপ অসংকোচ আত্মীয়তা তিনি বহুদিন পান নাই। বিস্তর ডাকাডাকি করিয়া এবং নানামতো আশ্বাস দিয়া যজ্ঞনাথ তাহাকে কতকটা আয়ত্ত করিয়া লইলেন।

জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার নাম কী।'

সে বলিল, 'নিতাই পাল।'

'বাড়ি কোথায়।'

'বলিব না।'

'বাপের নাম কী।'

'বলিব না।'

'কেন বলিবে না।'

'আমি বাড়ি ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছি।'

'কেন।'

'আমার বাপ আমাকে পাঠশালায় দিতে চায়।'

এরূপ ছেলেকে পাঠশালায় দেওয়া যে একটা নিষ্ফল অপব্যয় এবং বাপের বিষয়বুদ্ধি-হীনতার পরিচয় তাহা তৎক্ষণাৎ যজ্ঞনাথের মনে উদয় হইল।

যজ্ঞনাথ বলিলেন, 'আমার বাড়িতে আসিয়া থাকিবে?'

বালকটি কোনো আপত্তি না করিয়া এমনই নিঃসংকোচে সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিল যেন সে একটা পথপ্রান্তবর্তী তরুতল।

কেবল তাহাই নয়, খাওয়া পরা সম্বন্ধে এমনই অম্লানবদনে নিজের অভিপ্রায়মতো আদেশ প্রচার করিতে লাগিল যেন পূর্বাহ্ণেই তাহার পূরা দাম চুকাইয়া দিয়াছে। এবং ইহা লইয়া মাঝে মাঝে গৃহস্বামীর সহিত রীতিমতো ঝগড়া করিত। নিজের ছেলেকে পরাস্ত করা সহজ, কিন্তু পরের ছেলের কাছে যজ্ঞনাথকে হার মানিতে হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যজ্ঞনাথের ঘরে নিতাই পালের এই অভাবনীয় সমাদর দেখিয়া গ্রামের লোক আশ্চর্য হইয়া গেল। বুঝিল, বৃদ্ধ আর বেশি দিন বাঁচিবে না এবং কোথাকার এই বিদেশী ছেলেটাকেই সমস্ত বিষয় দিয়া যাইবে।

বালকের উপর সকলেরই পরম ঈর্ষা উপস্থিত হইল এবং সকলেই তাহার অনিষ্ট করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইল। কিন্তু বৃদ্ধ তাহাকে বুকের পাঁজরের মতো ঢাকিয়া বেড়াইত।

ছেলেটা মাঝে মাঝে চলিয়া যাইবে বলিয়া শাসাইত। যজ্ঞনাথ তাহাকে প্রলোভন দেখাইতেন, 'ভাই, তোকে আমি আমার সমস্ত বিষয়-আশয় দিয়া যাইব।' বালকের বয়স অল্প, কিন্তু এই আশ্বাসের মর্যাদা সে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিত।

তখন গ্রামের লোকেরা বালকের বাপের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা সকলেই বলিল, 'আহা বাপ-মা'র মনে না জানি কত কষ্টই হইতেছে। ছেলেটাও তো পাপিষ্ঠ কম নয়!'

বলিয়া ছেলেটার উদ্দেশে অকথ্য-উচ্চারণে গালি প্রয়োগ করিত। তাহার এতই বেশি ঝাঁজ যে, ন্যায়বুদ্ধির উত্তেজনা অপেক্ষা তাহাতে স্বার্থের গাত্রদাহ বেশি অনুভূত হইত।

বৃদ্ধ একদিন এক পথিকের কাছে শুনিতে পাইল, দামোদর পাল বলিয়া এক ব্যক্তি

তাহার নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে, অবশেষে এই গ্রামের অভিমুখেই আসিতেছে।

নিতাই এই সংবাদ শুনিয়া অস্থির হইয়া উঠিল; ভাবী বিষয়-আশয় সমস্ত ত্যাগ করিয়া পলায়নোদ্যত হইল।

যজ্ঞনাথ নিতাইকে বারম্বার আশ্বাস দিয়া কহিলেন, 'তোমাকে আমি এমন স্থানে লুকাইয়া রাখিব যে কেহই খুঁজিয়া পাইবে না। গ্রামের লোকেরাও না।'

বালকের ভারী কৌতূহল হইল; কহিল, 'কোথায় দেখাইয়া দাও-না।'

যজ্ঞনাথ কহিলেন, 'এখন দেখাইতে গেলে প্রকাশ হইয়া পড়িবে। রাত্রে দেখাইব।'

নিতাই এই নূতন রহস্য-আবিষ্কারের আশ্বাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বাপ অকৃতকার্য হইয়া চলিয়া গেলেই বালকদের সঙ্গে বাজি রাখিয়া একটা লুকোচুরি খেলিতে হইবে এইরূপ মনে মনে সংকল্প করিল। কেহ খুঁজিয়া পাইবে না। ভারী মজা। বাপ আসিয়া সমস্ত দেশ খুঁজিয়া কোথাও তাহার সন্ধান পাইবে না, সেও খুব কৌতুক।

মধ্যাহ্নে যজ্ঞনাথ বালককে গৃহে রুদ্ধ করিয়া কোথায় বাহির হইয়া গেলেন। ফিরিয়া আসিলে নিতাই তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া করিয়া অস্থির করিয়া তুলিল।

সন্ধ্যা হইতে না হইতে বলিল, 'চলো।'

যজ্ঞনাথ বলিলেন, 'এখনো রাত্রি হয় নাই।'

নিতাই আবার কহিল, 'রাত্রি হইয়াছে দাদা, চলো।'

যজ্ঞনাথ কহিলেন, 'এখনো পাড়ার লোক ঘুমায় নাই।'

নিতাই মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়াই কহিল, 'এখন ঘুমাইয়াছে, চলো।'

রাত্রি বাড়িতে লাগিল। নিদ্রাতুর নিতাই বহুকষ্টে নিদ্রাসম্বরণের প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে আরম্ভ করিল। রাত্রি দুই প্রহর হইলে যজ্ঞনাথ নিতাইয়ের হাত ধরিয়া নিদ্রিত গ্রামের অন্ধকার পথে বাহির হইলেন। আর-কোনো শব্দ নাই, কেবল থাকিয়া থাকিয়া কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল এবং সেই শব্দে নিকটে এবং দূরে যতগুলা কুকুর ছিল সকলে তারস্বরে যোগ দিল। মাঝে মাঝে নিশাচর পক্ষী পদশব্দে ত্রস্ত হইয়া ঝট্‌পট্‌ করিয়া বনের মধ্য দিয়া উড়িয়া গেল। নিতাই ভয়ে যজ্ঞনাথের হাত দৃঢ় করিয়া ধরিল।

অনেক মাঠ ভাঙিয়া অবশেষে এক জঙ্গলের মধ্যে এক দেবতাহীন ভাঙা মন্দিরে উভয়ে গিয়া উপস্থিত হইল। নিতাই কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণস্বরে কহিল, 'এইখানে?'

যেরূপ মনে করিয়াছিল সেরূপ কিছুই নয়। ইহার মধ্যে তেমন রহস্য নাই। পিতৃগৃহত্যাগের পর এমন পোড়ো মন্দিরে তাহাকে মাঝে মাঝে রাত্রিযাপন করিতে

হইয়াছে। স্থানটা যদিও লুকোচুরি খেলার পক্ষে মন্দ নয়, কিন্তু তবু এখান হইতে সন্ধান করিয়া বাহির করা নিতান্ত অসম্ভব নহে।

যজ্ঞনাথ মন্দিরের মধ্য হইতে একখণ্ড পাথর উঠাইয়া ফেলিলেন। বালক দেখিল, নিম্নে একটা ঘরের মতো এবং সেখানে প্রদীপ জ্বলিতেছে। দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময় এবং কৌতুহল হইল, সেই সঙ্গে ভয়ও করিতে লাগিল। একটি মই বাহিয়া যজ্ঞনাথ নামিয়া গেলেন, তাঁহার পশ্চাতে নিতাইও ভয়ে ভয়ে নামিল।

নীচে গিয়া দেখিল চারি দিকে পিতলের কলস। মধ্যে একটি আসন এবং তাহার সম্মুখে সিঁদুর, চন্দন, ফুলের মালা, পূজার উপকরণ। বালক কৌতুহল-নিবৃত্তি করিতে গিয়া দেখিল, ঘড়ায় কেবল টাকা এবং মোহর।

যজ্ঞনাথ কহিলেন, 'নিতাই, আমি বলিয়াছিলাম আমার সমস্ত টাকা তোমাকে দিব। আমার অধিক কিছু নাই, সবে এই ক'টি মাত্র ঘড়া আমার সম্বল। আজ আমি ইহার সমস্তই তোমার হাতে দিব।'

বালক লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, 'সমস্তই! ইহার একটি টাকাও তুমি লইবে না?'

'যদি লই তবে আমার হাতে যেন কুষ্ঠ হয়। কিন্তু একটা কথা আছে। যদি কখনো আমার নিরুদ্দেশ নাতি গোকুলচন্দ্র কিম্বা তাহার ছেলে কিম্বা তাহার পৌত্র কিম্বা তাহার প্রপৌত্র কিম্বা তাহার বংশের কেহ আসে তবে তাহার কিম্বা তাহাদের হাতে এই-সমস্ত টাকা গনিয়া দিতে হইবে।'

বালক মনে করিল, যজ্ঞনাথ পাগল হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিল, 'আচ্ছা।'

যজ্ঞনাথ কহিলেন, 'তবে এই আসনে বইস।'

'কেন।'

'তোমার পূজা হইবে।'

'কেন।'

'এইরূপ নিয়ম।'

বালক আসনে বসিল। যজ্ঞনাথ তাহার কপালে চন্দন দিলেন, সিঁদুরের টিপ দিয়া দিলেন, গলায় মালা দিলেন; সম্মুখে বসিয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন।

দেবতা হইয়া বসিয়া মন্ত্র শুনিতে নিতাইয়ের ভয় করিতে লাগিল; ডাকিল, 'দাদা।'

যজ্ঞনাথ কোনো উত্তর না করিয়া মন্ত্র পড়িয়া গেলেন।

অবশেষে এক-একটি ঘড়া বহু কষ্টে টানিয়া বালকের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া উৎসর্গ করিলেন এবং প্রত্যেকবার বলাইয়া লইলেন, 'যুধিষ্ঠির কুণ্ডের পুত্র গদাধর কুণ্ড তস্য পুত্র

প্রাণকৃষ্ণ কুণ্ড তস্য পুত্র পরমানন্দ কুণ্ড তস্য পুত্র যজ্ঞনাথ কুণ্ড তস্য পুত্র বৃন্দাবন কুণ্ড তস্য পুত্র গোকুলচন্দ্র কুণ্ডুকে কিম্বা তাহার পুত্র অথবা পৌত্র অথবা প্রপৌত্রকে কিম্বা তাহার বংশের ন্যায্য উত্তরাধিকারীকে এই-সমস্ত টাকা গনিয়া দিব।'

এইরূপ বার বার আবৃত্তি করিতে করিতে ছেলেটা হতবুদ্ধির মতো হইয়া আসিল। তাহার জিহ্বা ক্রমে জড়াইয়া আসিল। যখন অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইয়া গেল তখন দীপের ধূম ও উভয়ের নিশ্বাসবায়ুতে সেই ক্ষুদ্র গহ্বর বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। বালকের তালু শুষ্ক হইয়া গেল, হাত-পা জ্বালা করিতে লাগিল, শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল।

প্রদীপ ম্লান হইয়া হঠাৎ নিবিয়া গেল। অন্ধকারে বালক অনুভব করিল যজ্ঞনাথ মই বাহিয়া উপরে উঠিতেছে।

ব্যাকুল হইয়া কহিল, 'দাদা, কোথায় যাও।'

যজ্ঞনাথ কহিলেন, 'আমি চলিলাম। তুই এখানে থাক্— তোকে আর কেহই খুঁজিয়া পাইবে না। কিন্তু মনে রাখিস, যজ্ঞনাথের পৌত্র বৃন্দাবনের পুত্র গোকুলচন্দ্র।'

বলিয়া উপরে উঠিয়াই মই তুলিয়া লইলেন। বালক রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠ হইতে বহুকষ্টে বলিল, 'দাদা, আমি বাবার কাছে যাব।'

যজ্ঞনাথ ছিদ্রমুখে পাথর চাপা দিলেন এবং কান পাতিয়া শুনিলেন নিতাই আর একবার রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল, 'বাবা।'

তার পরে একটা পতনের শব্দ হইল, তার পরে আর কোনো শব্দ হইল না।

যজ্ঞনাথ এইরূপে যক্ষের হস্তে ধন সমর্পণ করিয়া সেই প্রস্তরখণ্ডের উপর মাটি চাপা দিতে লাগিলেন। তাহার উপরে ভাঙা মন্দিরের ইঁট বালি স্তূপাকার করিলেন। তাহার উপর ঘাসের চাপ্‌ড়া বসাইলেন, বনের গুল্ম রোপণ করিলেন। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল কিন্তু কিছুতেই সে স্থান হইতে নড়িতে পারিলেন না। থাকিয়া থাকিয়া কেবলই মাটিতে কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন। মনে হইতে লাগিল, যেন অনেক দূর হইতে, পৃথিবীর অতলস্পর্শ হইতে একটা ক্রন্দনধ্বনি উঠিতেছে। মনে হইল যেন রাত্রির আকাশ সেই একমাত্র শব্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, পৃথিবীর সমস্ত নিদ্রিত লোক যেন সেই শব্দে শয্যার উপরে জাগিয়া উঠিয়া কান পাতিয়া বসিয়া আছে।

বৃদ্ধ অস্থির হইয়া কেবলই মাটির উপরে মাটি চাপাইতেছে। যেন এমনি করিয়া কোনোমতে পৃথিবীর মুখ চাপা দিতে চাহে। ওই কে ডাকে 'বাবা'।

বৃদ্ধ মাটিতে আঘাত করিয়া বলে, 'চুপ কর্। সবাই শুনিতে পাইবে।'

আবার কে ডাকে 'বাবা'।

দেখিল রৌদ্র উঠিয়াছে। ভয়ে মন্দির ছাড়িয়া মাঠে বাহির হইয়া পড়িল।

সেখানেও কে ডাকিল, 'বাবা।' যজ্ঞনাথ সচকিত হইয়া পিছন ফিরিয়া দেখিলেন, বৃন্দাবন।

বৃন্দাবন কহিল, 'বাবা, সন্ধান পাইলাম আমার ছেলে তোমার ঘরে লুকাইয়া আছে, তাহাকে দাও।'

বৃদ্ধ চোখ মুখ বিকৃত করিয়া বৃন্দাবনের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, 'তোর ছেলে!'

বৃন্দাবন কহিল, 'হাঁ গোকুল— এখন তাহার নাম নিতাই পাল, আমার নাম দামোদর। কাছাকাছি সর্বত্রই তোমার খ্যাতি আছে, সেইজন্য আমরা লজ্জায় নাম পরিবর্তন করিয়াছি, নহিলে কেহ আমাদের নাম উচ্চারণ করিত না।'

বৃদ্ধ দশ অঙ্গুলি দ্বারা আকাশ হাৎড়াইতে হাৎড়াইতে যেন বাতাস আঁকড়িয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

চেতনা লাভ করিয়া যজ্ঞনাথ বৃন্দাবনকে মন্দিরে টানিয়া লইয়া গেল। কহিল, 'কান্না শুনিতে পাইতেছ?'

বৃন্দাবন কহিল, 'না।'

'কান পাতিয়া শোনো দেখি বাবা বলিয়া কেহ ডাকিতেছে?'

বৃন্দাবন কহিল, 'না।'

বৃদ্ধ তখন যেন ভারী নিশ্চিন্ত হইল।

তাহার পর হইতে বৃদ্ধ সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়ায়, 'কান্না শুনিতে পাইতেছ?' পাগলামির কথা শুনিয়া সকলেই হাসে।

অবশেষে বৎসর চারেক পরে বৃদ্ধের মৃত্যুর দিন উপস্থিত হইল। যখন চোখের উপর হইতে জগতের আলো নিবিয়া আসিল এবং শ্বাস রুদ্ধপ্রায় হইল তখন বিকারের বেগে সহসা উঠিয়া বসিল; একবার দুই হস্তে চারি দিক হাৎড়াইয়া মুমূর্ষু কহিল, 'নিতাই, আমার মইটা কে উঠিয়ে নিলে।'

সেই বায়ুহীন আলোকহীন মহাগহ্বর হইতে উঠিবার মই খুঁজিয়া না পাইয়া আবার সে ধুপ্‌ করিয়া বিছানায় পড়িয়া গেল। সংসারের লুকোচুরি খেলায় যেখানে কাহাকেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না সেইখানে অন্তর্হিত হইল।

পৌষ ১২৯৮

দালিয়া

ভূমিকা

পরাজিত শা সুজা ঔরঙ্গজীবের ভয়ে পলায়ন করিয়া আরাকান-রাজের আতিথ্য গ্রহণ করেন। সঙ্গে তিন সুন্দরী কন্যা ছিল। আরাকান-রাজের ইচ্ছা হয়, রাজপুত্রদের সহিত তাহাদের বিবাহ দেন। সেই প্রস্তাবে শা সুজা নিতান্ত অসন্তোষ প্রকাশ করাতে, একদিন রাজার আদেশে তাঁহাকে ছলক্রমে নৌকাযোগে নদীমধ্যে লইয়া নৌকা ডুবাইয়া দিবার চেষ্টা করা হয়। সেই বিপদের সময় কনিষ্ঠা বালিকা আমিনাকে পিতা স্বয়ং নদীমধ্যে নিক্ষেপ করেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা আত্মহত্যা করিয়া মরে। এবং সুজার একটি বিশ্বাসী কর্মচারী রহমত আলি জুলিখাকে লইয়া সাঁতার দিয়া পালায়, এবং সুজা যুদ্ধ করিতে করিতে মরেন।

আমিনা খরস্রোতে প্রবাহিত হইয়া দৈবক্রমে অনতিবিলম্বে এক ধীবরের জালে উদ্‌ধৃত হয় এবং তাহারই গৃহে পালিত হইয়া বড়ো হইয়া উঠে।

ইতিমধ্যে বৃদ্ধ রাজার মৃত্যু হইয়াছে এবং যুবরাজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

একদিন সকালে বৃদ্ধ ধীবর আসিয়া আমিনাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিল, 'তিন্নি।' ধীবর আরাকান ভাষায় আমিনার নূতন নামকরণ করিয়াছিল— 'তিন্নি, আজ সকালে তোর হইল কী। কাজকর্মে যে একেবারে হাত লাগাস নাই। আমার নতুন জালে আঠা দেওয়া হয় নাই, আমার নৌকো—'

আমিনা ধীবরের কাছে আসিয়া আদর করিয়া কহিল, 'বুঢ়া, আজ আমার দিদি আসিয়াছেন, তাই আজ ছুটি।'

'তোর আবার দিদি কে রে তিন্নি।'

জুলিখা কোথা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, 'আমি।'

বৃদ্ধ অবাক হইয়া গেল। তার পর জুলিখার অনেক কাছে আসিয়া ভালো করিয়া তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল।

খপ করিয়া জিজ্ঞাসা কারল, 'তুই কাজ-কাম কিছু জানিস?'

আমিনা কহিল 'বুঢ়া, দিদির হইয়া আমি কাজ করিয়া দিব। দিদি কাজ করিতে পারিবে না।'

বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তুই থাকিবি কোথায়।'

জুলিখা বলিল, 'আমিনার কাছে।'

বৃদ্ধ ভাবিল, এও তো বিষম বিপদ। জিজ্ঞাসা করিল, 'খাইবি কী।'

জুলিখা বলিল 'তাহার উপায় আছে'— বলিয়া অবজ্ঞাভরে ধীবরের সম্মুখে একটা স্বর্ণমুদ্রা ফেলিয়া দিল।

আমিনা সেটা কুড়াইয়া ধীবরের হাতে তুলিয়া দিয়া চুপিচুপি কহিল, 'বুঢ়া, আর-কোনো কথা কহিস না। তুই কাজে যা, বেলা হইয়াছে।'

জুলিখা ছদ্মবেশে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে আমিনার সন্ধান পাইয়া কী করিয়া ধীবরের কুটিরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে সে-সমস্ত কথা বলিতে গেলে দ্বিতীয় আর-একটি কাহিনী হইয়া পড়ে। তাহার রক্ষাকর্তা রহমত শেখ ছদ্মনামে আরাকান রাজসভায় কাজ করিতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছোটো নদীটি বহিয়া যাইতেছিল এবং প্রথম গ্রীষ্মের শীতল প্রভাতবায়ুতে কৈলু গাছের রক্তবর্ণ পুষ্পমঞ্জরী হইতে ফুল ঝরিয়া পড়িতেছিল।

গাছের তলায় বসিয়া জুলিখা আমিনাকে কহিল, 'ঈশ্বর যে আমাদের দুই ভগ্নীকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন সে কেবল পিতার হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য। নহিলে আর তো কোনো কারণ খুঁজিয়া পাই না।'

আমিনা নদীর পরপারে সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী, সর্বাপেক্ষা ছায়াময়, বনশ্রেণীর দিকে দৃষ্টি মেলিয়া ধীরে ধীরে কহিল,'দিদি, আর ও-সব কথা বলিস নে ভাই। আমার এই পৃথিবীটা এক রকম বেশ লাগিতেছে। মরিতে চায় তো পুরুষগুলো কাটাকাটি করিয়া মরুক গে, আমার এখানে কোনো দুঃখ নাই।'

জুলিখা বলিল, 'ছি ছি আমিনা, তুই কি শাহজাদার ঘরের মেয়ে। কোথায় দিল্লির সিংহাসন আর কোথায় আরাকানের ধীবরের কুটির।'

আমিনা হাসিয়া কহিল, 'দিদি, দিল্লির সিংহাসনের চেয়ে আমার বুঢ়ার এই কুটির এবং এই কৈলু গাছের ছায়া যদি কোনো বালিকার বেশি ভালো লাগে তাহাতে দিল্লির সিংহাসন এক বিন্দু অশ্রুপাত করিবে না।'

জুলিখা কতকটা আনমনে কতকটা আমিনাকে কহিল, 'তা, তোকে দোষ দেওয়া যায় না, তুই তখন নিতান্ত ছোটো ছিলি।— কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ্, পিতা তোকে সব চেয়ে বেশি ভালবাসিতেন বলিয়া তোকেই স্বহস্তে জলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। সেই

পিতৃদত্ত মৃত্যুর চেয়ে এই জীবনকে বেশি প্রিয় জ্ঞান করিস না। তবে যদি প্রতিশোধ তুলিতে পারিস তবেই জীবনের অর্থ থাকে।'

আমিনা চুপ করিয়া দূরে চাহিয়া রহিল। কিন্তু বেশ বুঝা গেল, সকল কথা সত্ত্বেও বাহিরের এই বাতাস এবং গাছের ছায়া এবং আপনার নবযৌবন এবং কী-একটা সুখস্মৃতি তাহাকে নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

কিছুক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'দিদি, তুমি একটু অপেক্ষা করো ভাই। আমার ঘরের কাজ বাকি আছে। আমি না রাঁধিয়া দিলে বুঢ়া খাইতে পাইবে না।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জুলিখা আমিনার অবস্থা চিন্তা করিয়া ভারী বিমর্ষ হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এমন সময় হঠাৎ ধুপ্‌ করিয়া একটা লম্ফের শব্দ হইল এবং পশ্চাৎ হইতে কে একজন জুলিখার চোখ টিপিয়া ধরিল।

জুলিখা ত্রস্ত হইয়া কহিল, 'কেও।'

স্বর শুনিয়া যুবক চোখ ছাড়িয়া দিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; জুলিখার মুখের দিকে চাহিয়া অম্লানবদনে কহিল, 'তুমি তো তিন্নি নও।' যেন জুলিখা বরাবর আপনাকে 'তিন্নি' বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিতেছিল, কেবল যুবকের অসামান্য তীক্ষ্ণবুদ্ধির কাছে সমস্ত চাতুরী প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

জুলিখা বসন সম্বরণ করিয়া দৃপ্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই চক্ষে অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিল। জিজ্ঞাসা করিল, 'কে তুমি।'

যুবক কহিল, 'তুমি আমাকে চেন না। তিন্নি জানে। তিন্নি কোথায়।'

তিন্নি গোলযোগ শুনিয়া বাহির হইয়া আসিল। জুলিখার রোষ এবং যুবকের হতবুদ্ধি বিস্মিতমুখ দেখিয়া আমিনা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

কহিল, 'দিদি, ওর কথা তুমি কিছু মনে করিয়ো না। ও কি মানুষ, ও একটা বনের মৃগ। যদি কিছু বেয়াদপি করিয়া থাকে আমি উহাকে শাসন করিয়া দিব।— দালিয়া, তুমি কী করিয়াছিলে।'

যুবক তৎক্ষণাৎ কহিল, 'চোখ টিপিয়া ধরিয়াছিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম তিন্নি। কিন্তু ও তো তিন্নি নয়।'

তিন্নি সহসা দুঃসহ ক্রোধ প্রকাশ করিয়া উঠিয়া কহিল, 'ফের! ছোটো মুখে বড়ো কথা। কবে তুমি তিন্নির চোখ টিপিয়াছ। তোমার তো সাহস কম নয়।'

যুবক কহিল, 'চোখ টিপিতে তো খুব বেশি সাহসের দরকার করে না ; বিশেষত পূর্বের অভ্যাস থাকিলে। কিন্তু সত্য বলিতেছি তিন্নি, আজ একটু ভয় পাইয়া গিয়াছিলাম।'

বলিয়া গোপনে জুলিখার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া আমিনার মুখের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল।

আমিনা কহিল, 'না, তুমি অতি বর্বর, শাহজাদীর সম্মুখে দাঁড়াইবার যোগ্য নও! তোমাকে সহবত শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। দেখো, এমনি করিয়া সেলাম করো।'

বলিয়া আমিনা তাহার যৌবনমঞ্জরিত তনুলতা অতি মধুর ভঙ্গীতে নত করিয়া জুলিখাকে সেলাম করিল। যুবক বহুকষ্টে তাহার নিতান্ত অসম্পূর্ণ অনুকরণ করিল।

বলিল, 'এমনি করিয়া তিন পা পিছু হঠিয়া আইস।' যুবক পিছু হঠিয়া আসিল।

'আবার সেলাম করো।' আবার সেলাম করিল।

এমনি করিয়া পিছু হঠাইয়া, সেলাম করাইয়া, আমিনা যুবককে কুটিরের দ্বারের কাছে লইয়া গেল

কহিল, 'ঘরে প্রবেশ করো।' যুবক ঘরে প্রবেশ করিল।

আমিনা বাহির হইতে ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া কহিল, 'একটু ঘরের কাজ করো। আগুনটা জ্বালাইয়া রাখো।' বলিয়া দিদির পাশে আসিয়া বসিল।

কহিল, 'দিদি, রাগ করিস নে ভাই, এখানকার মানুষগুলো এই রকমের। হাড় জ্বালাতন হইয়া গেছে।'

কিন্তু আমিনার মুখে কিম্বা ব্যবহারে তাহার লক্ষণ কিছুই প্রকাশ পায় না। বরং অনেক বিষয়ে এখানকার মানুষের প্রতি তাহার কিছু অন্যায় পক্ষপাত দেখা যায়।

জুলিখা যথাসাধ্য রাগ প্রকাশ করিয়া কহিল, 'বাস্তবিক আমিনা, তোর ব্যবহারে আমি আশ্চর্য হইয়া গেছি। একজন বাহিরের যুবক আসিয়া তোকে স্পর্শ করিতে পারে এত বড়ো তাহার সাহস।'

আমিনা দিদির সহিত যোগ দিয়া কহিল, 'দেখ্ দেখি বোন। যদি কোনো বাদশাহ কিম্বা নবাবের ছেলে এমন ব্যবহার করিত, তবে তাহাকে অপমান করিয়া দূর করিয়া দিতাম।'

জুলিখার ভিতরের হাসি আর বাধা মানিল না ; হাসিয়া উঠিয়া কহিল, 'সত্য করিয়া বল্ দেখি আমিনা, তুই যে বলিতেছিলি পৃথিবীটা তোর বড়ো ভালো লাগিতেছে, সে কি ওই বর্বর যুবকটার জন্য।'

আমিনা কহিল, 'তা, সত্য কথা বলি দিদি, ও আমার অনেক উপকার করে।

ফুলটা ফলটা পাড়িয়া দেয়, শিকার করিয়া আনে, একটা-কিছু কাজ করিতে ডাকিলে ছুটিয়া আসে। অনেকবার মনে করি উহাকে শাসন করিব। কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা। যদি খুব চোখ রাঙাইয়া বলি, দালিয়া, তোমার প্রতি আমি ভারী অসন্তুষ্ট হইয়াছি— দালিয়া মুখের দিকে চাহিয়া পরম কৌতুকে নিঃশব্দে হাসিতে থাকে। এদের দেশে পরিহাস বোধ করি এই রকম ; দু-ঘা মারিলে ভারী খুশি হইয়া উঠে, তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। ওই দেখো-না, ঘরে পুরিয়া রাখিয়াছি— বড়ো আনন্দে আছে, দ্বার খুলিলেই দেখিতে পাইব মুখ চক্ষু লাল করিয়া মনের সুখে আগুনে ফুঁ দিতেছে। ইহাকে লইয়া কী করি বল্ তো বোন। আমি তো আর পারিয়া উঠি না।'

জুলিখা কহিল, 'আমি চেষ্টা দেখিতে পারি।'

আমিনা হাসিয়া মিনতি করিয়া বলিল, 'তোর দুটি পায়ে পড়ি বোন। ওকে আর তুই কিছু বলিস না।'

এমন করিয়া বলিল, যেন ওই যুবকটি আমিনার একটি বড়ো সাধের পোষা হরিণ, এখনো তাহার বন্য স্বভাব দূর হয় নাই— পাছে অন্য কোনো মানুষ দেখিলে ভয় পাইয়া নিরুদ্দেশ হয় এমন আশঙ্কা আছে।

এমন সময় ধীবর আসিয়া কহিল, 'আজ দালিয়া আসে নাই তিন্নি ?'

'আসিয়াছে।'

'কোথায় গেল।'

'সে বড়ো উপদ্রব করিতেছিল, তাই তাহাকে ওই ঘরে পুরিয়া রাখিয়াছি।'

বৃদ্ধ কিছু চিন্তান্বিত হইয়া কহিল, 'যদি বিরক্ত করে সহিয়া থাকিস। অল্প বয়সে অমন সকলেই দুরন্ত হইয়া থাকে। বেশি শাসন করিস না। দালিয়া কাল এক থলু দিয়া আমার কাছে তিনটি মাছ লইয়াছিল।' (থলু অর্থে স্বর্ণমুদ্রা)

আমিনা কহিল, 'ভাবনা নাই বুঢ়া, আজ আমি তাহার কাছে দুই থলু আদায় করিয়া দিব, একটিও মাছ দিতে হইবে না।'

বৃদ্ধ তাহার পালিত কন্যার এত অল্প বয়সে এমন চাতুরী এবং বিষয়বুদ্ধি দেখিয়া পরম প্রীত হইয়া তাহার মাথায় সস্নেহ হাত বুলাইয়া চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আশ্চর্য এই, দালিয়ার আসা যাওয়া সম্বন্ধে জুলিখার ক্রমে আর আপত্তি রহিল না। ভাবিয়া দেখিলে, ইহাতে আশ্চর্য নাই। কারণ, নদীর যেমন এক দিকে স্রোত এবং আর-এক দিকে কূল, রমণীর সেইরূপ হৃদয়াবেগ এবং লোকলজ্জা। কিন্তু, সভ্যসমাজের বাহিরে আরাকানের প্রান্তে এখানে লোক কোথায়।

এখানে কেবল ঋতুপর্যায়ে তরু মুঞ্জরিত হইতেছে; এবং সম্মুখের নীলা নদী বর্ষায় স্ফীত, শরতে স্বচ্ছ এবং গ্রীষ্মে ক্ষীণ হইতেছে; পাখির উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বরে সমালোচনার লেশমাত্র নাই; এবং দক্ষিণবায়ু মাঝে মাঝে পরপারের গ্রাম হইতে মানবচক্রের গুঞ্জনধ্বনি বহিয়া আনে, কিন্তু কানাকানি আনে না।

পতিত অট্টালিকার উপরে ক্রমে যেমন অরণ্য জন্মে এখানে কিছু দিন থাকিলে সেইরূপ প্রকৃতির গোপন আক্রমণে লৌকিকতার মানবনির্মিত দৃঢ় ভিত্তি ক্রমে অলক্ষিতভাবে ভাঙিয়া যায় এবং চতুর্দিকে প্রাকৃতিক জগতের সহিত সমস্ত একাকার হইয়া আসে। দুটি সমযোগ্য নরনারীর মিলনদৃশ্য দেখিতে রমণীর যেমন সুন্দর লাগে এমন আর-কিছু নয়। এত রহস্য, এত সুখ, এত অতলস্পর্শ কৌতূহলের বিষয় তাহার পক্ষে আর-কিছুই হইতে পারে না। অতএব এই বর্বরকুটিরের মধ্যে নির্জন দারিদ্র্যের ছায়ায় যখন জুলিখার কুলগর্ব এবং লোকমর্যাদার ভাব আপনিই শিথিল হইয়া আসিল তখন পুষ্পিত কৈলুতরুচ্ছায়ে আমিনা এবং দালিয়ার মিলনের এই এক মনোহর খেলা দেখিতে তাহার বড়ো আনন্দ হইত।

বোধ করি তাহারও তরুণ হৃদয়ের একটা অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিত এবং তাহাকে সুখে দুঃখে চঞ্চল করিয়া তুলিত। অবশেষে এমন হইল, কোনোদিন যুবকের আসিতে বিলম্ব হইলে আমিনা যেমন উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিত জুলিখাও তেমনি আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিত এবং উভয়ে একত্র হইলে, চিত্রকর নিজের সদ্য-সমাপ্ত ছবি ঈষৎ দূর হইতে যেমন করিয়া দেখে তেমনি করিয়া সস্নেহে সহাস্যে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত। কোনো কোনো দিন মৌখিক ঝগড়াও করিত, ছল করিয়া ভর্ৎসনা করিত, আমিনাকে গৃহে রুদ্ধ করিয়া যুবকের মিলনাবেগ প্রতিহত করিত।

সম্রাট এবং আরণ্যের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে। উভয়ে স্বাধীন, উভয়েই স্বরাজ্যের একাধিপতি, উভয়কেই কাহারো নিয়ম মানিয়া চলিতে হয় না। উভয়ের মধ্যেই প্রকৃতির একটা স্বাভাবিক বৃহত্ত্ব এবং সরলতা আছে। যাহারা মাঝারি, যাহারা দিনরাত্রি লোকশাস্ত্রের অক্ষর মিলাইয়া জীবন যাপন করে, তাহারাই কিছু স্বতন্ত্র গোছের হয়। তাহারাই বড়োর কাছে দাস, ছোটোর কাছে প্রভু এবং অস্থানে নিতান্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়ায়। বর্বর দালিয়া প্রকৃতি-সম্রাজ্ঞীর উচ্ছৃঙ্খল ছেলে, শাহজাদীর কাছে কোনো সংকোচ ছিল না, এবং শাহজাদীরাও তাহাকে সমকক্ষ লোক বলিয়া চিনিতে পারিত। সহাস্য, সরল, কৌতুকপ্রিয়, সকল অবস্থাতেই নির্ভীক, অসংকুচিত তাহার চরিত্রে দারিদ্র্যের কোনো লক্ষণই ছিল না।

কিন্তু এই-সকল খেলার মধ্যে এক-একবার জুলিখার হৃদয়টা হায়-হায় করিয়া উঠিত ; ভাবিত, সম্রাটপুত্রীর জীবনের এই কি পরিণাম !

একদিন প্রাতে দালিয়া আসিবামাত্র জুলিখা তাহার হাত চাপিয়া কহিল, 'দালিয়া, এখানকার রাজাকে দেখাইয়া দিতে পার ?'

'পারি। কেন বলো দেখি।'

'আমার একটা ছোরা আছে, তাহার বুকের মধ্যে বসাইতে চাহি।'

প্রথমে দালিয়া কিছু আশ্চর্য হইয়া গেল। তাহার পরে জুলিখার হিংসাপ্রখর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার সমস্ত মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল ; যেন এতবড়ো মজার কথা সে ইতিপূর্বে কখনো শোনে নাই।— যদি পরিহাস বল তো এই বটে, রাজপুত্রীর উপযুক্ত। কোনো কথা নাই, বার্তা নাই, প্রথম আলাপেই একখানি ছোরার আধখানা একটা জীবন্ত রাজার বক্ষের মধ্যে চালনা করিয়া দিলে এইরূপ অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ব্যবহারে রাজাটা হঠাৎ কিরূপ অবাক হইয়া যায়, সেই চিত্র ক্রমাগত তাহার মনে উদিত হইয়া তাহার নিঃশব্দ কৌতুকহাসি থাকিয়া থাকিয়া উচ্চহাস্যে পরিণত হইতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তাহার পরদিনই রহমত শেখ জুলিখাকে গোপনে পত্র লিখিল যে, 'আরাকানের নূতন রাজা ধীবরের কুটিরে দুই ভগ্নীর সন্ধান পাইয়াছেন এবং গোপনে আমিনাকে দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছেন— তাহাকে বিবাহার্থে অবিলম্বে প্রাসাদে আনিবার আয়োজন করিতেছেন। প্রতিহিংসার এমন সুন্দর অবসর আর পাওয়া যাইবে না।'

তখন জুলিখা দৃঢ়ভাবে আমিনার হাত ধরিয়া কহিল, 'ঈশ্বরের ইচ্ছা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। আমিনা, এইবার তোর জীবনের কর্তব্য পালন করিবার সময় আসিয়াছে— এখন আর খেলা ভালো দেখায় না।'

দালিয়া উপস্থিত ছিল, আমিনা তাহার মুখের দিকে চাহিল ; দেখিল সে সকৌতুকে হাসিতেছে।

আমিনা তাহার হাসি দেখিয়া মর্মাহত হইয়া কহিল, 'জান দালিয়া ?—আমি রাজবধূ হইতে যাইতেছি।'

দালিয়া হাসিয়া বলিল, 'সে তো বেশি ক্ষণের জন্য নয়।'

আমিনা পীড়িত বিস্মিত চিত্তে মনে মনে ভাবিল, 'বাস্তবিকই এ বনের মৃগ, এর সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার করা আমারই পাগলামি।'

আমিনা দালিয়াকে আর একটু সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য কহিল, 'রাজাকে মারিয়া আর কি আমি ফিরিব।'

দালিয়া কথাটা সংগত জ্ঞান করিয়া কহিল, 'ফেরা কঠিন বটে।'

আমিনার সমস্ত অন্তরাত্মা একেবারে ম্লান হইয়া গেল।

জুলিখার দিকে ফিরিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'দিদি, আমি প্রস্তুত আছি।'

এবং দালিয়ার দিকে ফিরিয়া বিদ্ধ অন্তরে পরিহাসের ভান করিয়া কহিল, 'রানী হইয়াই আমি প্রথমে তোমাকে রাজার বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্রে যোগ দেওয়া অপরাধে শাস্তি দিব। তার পরে আর যাহা করিতে হয় করিব।'

শুনিয়া দালিয়া বিশেষ কৌতুক বোধ করিল, যেন প্রস্তাবটা কার্যে পরিণত হইলে তাহার মধ্যে অনেকটা আমোদের বিষয় আছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অশ্বারোহী পদাতিক নিশান হস্তী বাদ্য এবং আলোকে ধীবরের ঘর-দুয়ার ভাঙিয়া পড়িবার জো হইল। রাজপ্রাসাদ হইতে স্বর্ণমণ্ডিত দুই শিবিকা আসিয়াছে।

আমিনা জুলিখার হাত হইতে ছুরিখানি লইল। তাহার হস্তিদন্তনির্মিত কারুকার্য অনেক ক্ষণ ধরিয়া দেখিল। তাহার পর বসন উদ্‌ঘাটন করিয়া নিজের বক্ষের উপর একবার ধার পরীক্ষা করিয়া দেখিল। জীবনমুকুলের বৃন্তের কাছে ছুরিটি একবার স্পর্শ করিল, আবার সেটি খাপের মধ্যে পুরিয়া বসনের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল।

একান্ত ইচ্ছা ছিল, এই মরণযাত্রার পূর্বে একবার দালিয়ার সহিত দেখা হয়, কিন্তু কাল হইতে সে নিরুদ্দেশ। দালিয়া সেই-যে হাসিতেছিল তাহার ভিতরে কি অভিমানের জ্বালা প্রচ্ছন্ন ছিল।

শিবিকায় উঠিবার পূর্বে আমিনা তাহার বাল্যকালের আশ্রয়টি অশ্রুজলের ভিতর হইতে একবার দেখিল— তাহার সেই ঘরের গাছ, তাহার সেই ঘরের নদী। ধীবরের হাত ধরিয়া বাষ্পরুদ্ধ কম্পিত স্বরে কহিল, 'বুঢ়া, তবে চলিলাম। তিন্নি গেলে তোর ঘরকন্না কে দেখিবে।'

বুঢ়া একেবারে বালকের মতো কাঁদিয়া উঠিল।

আমিনা কহিল 'বুঢ়া, যদি দালিয়া আর এখানে আসে তাহাকে এই আঙটি দিয়ো। বলিয়ো, তিন্নি যাইবার সময় দিয়া গেছে।'

এই বলিয়াই দ্রুত শিবিকায় উঠিয়া পড়িল। মহাসমারোহে শিবিকা চলিয়া গেল। আমিনার কুটির, নদীতীর, কৈলুতরুতল অন্ধকার, নিস্তব্ধ, জনশূন্য হইয়া গেল।

যথাকালে শিবিকাদ্বয় তোরণদ্বার অতিক্রম করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। দুই ভগ্নী শিবিকা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল।

আমিনার মুখে হাসি নাই, চোখেও অশ্রুচিহ্ন নাই। জুলিখার মুখ বিবর্ণ। কর্তব্য যখন দূরে ছিল ততক্ষণ তাহার উৎসাহের তীব্রতা ছিল— এখন সে কম্পিতহৃদয়ে ব্যাকুল স্নেহে আমিনাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। মনে মনে কহিল, 'নব প্রেমের বৃন্ত হইতে ছিন্ন করিয়া এই ফুটন্ত ফুলটিকে কোন্ রক্তস্রোতে ভাসাইতে যাইতেছি।'

কিন্তু তখন আর ভাবিবার সময় নাই। পরিচারিকাদের দ্বারা নীত হইয়া শত সহস্র প্রদীপের অনিমেষ তীব্র দৃষ্টির মধ্য দিয়া দুই ভগিনী স্বপ্নাহতের মতো চলিতে লাগিল, অবশেষে বাসরঘরের দ্বারের কাছে মুহূর্তের জন্য থামিয়া আমিনা জুলিখাকে কহিল, 'দিদি।'

জুলিখা আমিনাকে গাঢ় আলিঙ্গনে বাঁধিয়া চুম্বন করিল।

উভয়ে ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিল।

রাজবেশ পরিয়া ঘরের মাঝখানে মছলন্দ-শয্যার উপর রাজা বসিয়া আছে। আমিনা সসংকোচে দ্বারের অনতিদূরে দাঁড়াইয়া রহিল।

জুলিখা অগ্রসর হইয়া রাজার নিকটবর্তী হইয়া দেখিল, রাজা নিঃশব্দে সকৌতুকে হাসিতেছেন।

জুলিখা বলিয়া উঠিল 'দালিয়া!'— আমিনা মূর্ছিত হইয়া পড়িল।

দালিয়া উঠিয়া তাহাকে আহত পাখিটির মতো কোলে করিয়া তুলিয়া শয্যায় লইয়া গেল। আমিনা সচেতন হইয়া বুকের মধ্য হইতে ছুরিটি বাহির করিয়া দিদির মুখের দিকে চাহিল, দিদি দালিয়ার মুখের দিকে চাহিল, দালিয়া চুপ করিয়া হাস্যমুখে উভয়ের প্রতি চাহিয়া রহিল— ছুরিও তাহার খাপের মধ্য হইতে একটুখানি মুখ বাহির করিয়া এই রঙ্গ দেখিয়া ঝিক্‌মিক্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

মাঘ ১২৯৮

কঙ্কাল

আমরা তিন বাল্যসঙ্গী যে ঘরে শয়ন করিতাম তাহার পাশের ঘরের দেয়ালে একটি আস্ত নরকঙ্কাল ঝুলানো থাকিত। রাত্রে বাতাসে তাহার হাড়গুলা খট্‌খট্‌ শব্দ করিয়া নড়িত। দিনের বেলায় আমাদিগকে সেই হাড় নাড়িতে হইত। আমরা তখন পণ্ডিত-মহাশয়ের নিকট মেঘনাদবধ এবং ক্যাম্বেল স্কুলের এক ছাত্রের কাছে অস্থিবিদ্যা পড়িতাম। আমাদের অভিভাবকের ইচ্ছা ছিল আমাদিগকে সহসা সর্ববিদ্যায় পারদর্শী করিয়া তুলিবেন। তাঁহার অভিপ্রায় কতদূর সফল হইয়াছে যাঁহারা আমাদিগকে জানেন তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করা বাহুল্য এবং যাঁহারা জানেন না তাঁহাদের নিকট গোপন করাই শ্রেয়।

তাহার পর বহুকাল অতীত হইয়াছে। ইতিমধ্যে সেই ঘর হইতে কঙ্কাল এবং আমাদের মাথা হইতে অস্থিবিদ্যা কোথায় স্থানান্তরিত হইয়াছে অন্বেষণ করিয়া জানা যায় না।

অল্পদিন হইল একদিন রাত্রে কোনো কারণে অন্যত্র স্থানাভাব হওয়াতে আমাকে সেই ঘরে শয়ন করিতে হয়।— অনভ্যাসবশত ঘুম হইতেছে না। এপাশ ওপাশ করিতে করিতে গির্জার ঘড়িতে বড়ো বড়ো ঘণ্টাগুলো প্রায় সব কটা বাজিয়া গেল। এমন সময়ে ঘরের কোণে যে তেলের সেজ জ্বলিতেছিল সেটা প্রায় মিনিট-পাঁচেক ধরিয়া খাবি খাইতে খাইতে একেবারে নিবিয়া গেল। ইতিপূর্বেই আমাদের বাড়িতে দুই-একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। তাই এই আলো নেবা হইতে সহজেই মৃত্যুর কথা মনে উদয় হইল। মনে হইল এই-যে রাত্রি দুই প্রহরে একটি দীপশিখা চিরান্ধকারে মিলাইয়া গেল, প্রকৃতির কাছে ইহাও যেমন আর মানুষের ছোটো ছোটো প্রাণশিখা কখনো দিনে কখনো রাত্রে হঠাৎ নিবিয়া বিস্মৃত হইয়া যায়, তাহাও তেমনি।

ক্রমে সেই কঙ্কালের কথা মনে পড়িল। তাহার জীবিতকালের বিষয় কল্পনা করিতে করিতে সহসা মনে হইল, একটি চেতন পদার্থ অন্ধকারে ঘরের দেয়াল হাৎড়াইয়া আমার মশারির চারি দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহার ঘন ঘন নিশ্বাসের শব্দ শুনা যাইতেছে। সে যেন কী খুঁজিতেছে, পাইতেছে না এবং দ্রুততর বেগে ঘরময় প্রদক্ষিণ করিতেছে। নিশ্চয় বুঝিতে পারিলাম, সমস্তই আমার নিদ্রাহীন উষ্ণ মস্তিষ্কের কল্পনা এবং আমারই মাথার মধ্যে বোঁ বোঁ করিয়া যে রক্ত ছুটিতেছে তাহাই দ্রুত পদশব্দের মতো শুনাইতেছে। কিন্তু, তবু গা ছম্‌ছম্‌ করিতে লাগিল। জোর করিয়া এই অকারণ ভয় ভাঙিবার জন্য বলিয়া উঠিলাম, 'কেও।' পদশব্দ আমার মশারির কাছে

আসিয়া থামিয়া গেল এবং একটা উত্তর শুনিতে পাইলাম, 'আমি। আমার সেই কঙ্কালটা কোথায় গেছে তাই খুঁজিতে আসিয়াছি।'

আমি ভাবিলাম, নিজের কাল্পনিক সৃষ্টির কাছে ভয় দেখানো কিছু নয়— পাশবালিশটা সবলে আঁকড়িয়া ধরিয়া চিরপরিচিতের মতো অতি সহজ সুরে বলিলাম, 'এই দুপর রাত্রে বেশ কাজটি বাহির করিয়াছ। তা, সে কঙ্কালে এখন আর তোমার আবশ্যক?'

অন্ধকারে মশারির অত্যন্ত নিকট হইতে উত্তর আসিল, 'বল কী। আমার বুকের হাড় যে তাহারই মধ্যে ছিল। আমার ছাব্বিশ বৎসরের যৌবন যে তাহার চারি দিকে বিকশিত হইয়াছিল— একবার দেখিতে ইচ্ছা করে না?"

আমি তৎক্ষণাৎ বলিলাম, 'হাঁ, কথাটা সংগত বটে। তা, তুমি সন্ধান করো গে যাও। আমি একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করি।'

সে বলিল, 'তুমি একলা আছ বুঝি? তবে একটু বসি। একটু গল্প করা যাক। পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমিও মানুষের কাছে বসিয়া মানুষের সঙ্গে গল্প করিতাম। এই পঁয়ত্রিশটা বৎসর আমি কেবল শ্মশানের বাতাসে হুহু শব্দ করিয়া বেড়াইয়াছি। আজ তোমার কাছে বসিয়া আর-একবার মানুষের মতো করিয়া গল্প করি।'

অনুভব করিলাম, আমার মশারির কাছে কে বসিল। নিরুপায় দেখিয়া আমি বেশ একটু উৎসাহের সহিত বলিলাম, 'সেই ভালো। যাহাতে মন বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠে এমন একটা-কিছু গল্প বলো।'

সে বলিল, 'সব চেয়ে মজার কথা যদি শুনিতে চাও তো আমার জীবনের কথা বলি।'

গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দুটা বাজিল।—

'যখন মানুষ ছিলাম এবং ছোটো ছিলাম তখন এক ব্যক্তিকে যমের মতো ভয় করিতাম। তিনি আমার স্বামী। মাছকে বঁড়শি দিয়া ধরিলে তাহার যেমন মনে হয় আমারও সেইরূপ মনে হইত। অর্থাৎ, কোন্-এক সম্পূর্ণ অপরিচিত জীব যেন বঁড়শিতে গাঁথিয়া আমাকে আমার স্নিগ্ধগভীর জন্মজলাশয় হইতে টান মারিয়া ছিনিয়া লইয়া যাইতেছে— কিছুতে তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ নাই। বিবাহের দুই মাস পরেই আমার স্বামীর মৃত্যু হইল এবং আমার আত্মীয়স্বজনেরা আমার হইয়া অনেক বিলাপ-পরিতাপ করিলেন। আমার শ্বশুর অনেকগুলি লক্ষণ মিলাইয়া দেখিয়া শাশুড়িকে কহিলেন, শাস্ত্রে যাহাকে বলে বিষকন্যা এ মেয়েটি তাই। সে কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে।— শুনিতেছ? কেমন লাগিতেছে।'

আমি বলিলাম, 'বেশ। গল্পের আরম্ভটি বেশ মজার।'

'তবে শোনো। আনন্দে বাপের বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। ক্রমে বয়স বাড়িতে লাগিল। লোকে আমার কাছে লুকাইতে চেষ্টা করিত, কিন্তু আমি নিজে বেশ জানিতাম আমার মতো রূপসী এমন যেখানে-সেখানে পাওয়া যায় না। তোমার কী মনে হয়।'

'খুব সম্ভব। কিন্তু আমি তোমাকে কখনো দেখি নাই।'

'দেখ নাই? কেন। আমার সেই কঙ্কাল। হি হি হি হি।— আমি ঠাট্টা করিতেছি। তোমার কাছে কী করিয়া প্রমাণ করিব যে, সেই দুটো শূন্য চক্ষুকোটরের মধ্যে বড়ো বড়ো টানা দুটি কালো চোখ ছিল এবং রাঙা ঠোঁটের উপরে যে মৃদু হাসিটুকু মাখানো ছিল এখনকার অনাবৃতদন্তসার বিকট হাস্যের সঙ্গে তার কোনো তুলনাই হয় না— এবং সেই কয়খানা দীর্ঘ শুষ্ক অস্থিখণ্ডের উপর এত লালিত্য, এত লাবণ্য, যৌবনের এত কঠিন-কোমল নিটোল পরিপূর্ণতা প্রতিদিন প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতেছিল তোমাকে তাহা বলিতে গেলে হাসি পায় এবং রাগও ধরে। আমার সেই শরীর হইতে যে অস্থিবিদ্যা শেখা যাইতে পারে তাহা তখনকার বড়ো বড়ো ডাক্তারেরাও বিশ্বাস করিত না। আমি জানি, একজন ডাক্তার তাঁহার কোনো বিশেষ বন্ধুর কাছে আমাকে কনক-চাঁপা বলিয়াছিলেন। তাহার অর্থ এই, পৃথিবীর আর-সকল মনুষ্যই অস্থিবিদ্যা এবং শরীরতত্ত্বের দৃষ্টান্তস্থল ছিল, কেবল আমি সৌন্দর্যরূপী ফুলের মতো ছিলাম। কনক-চাঁপার মধ্যে কি একটা কঙ্কাল আছে?

'আমি যখন চলিতাম তখন আপনি বুঝিতে পারিতাম যে, একখণ্ড হীরা নড়াইলে তাহার চারি দিক হইতে যেমন আলো ঝক্‌মক্ করিয়া উঠে, আমার দেহের প্রত্যেক গতিতে তেমনি সৌন্দর্যের ভঙ্গি নানা স্বাভাবিক হিল্লোলে চারি দিকে ভাঙিয়া পড়িত। আমি মাঝে মাঝে অনেক ক্ষণ ধরিয়া নিজের হাত দুখানি নিজে দেখিতাম— পৃথিবীর সমস্ত উদ্ধত পৌরুষের মুখে রাশ লাগাইয়া মধুরভাবে বাগাইয়া ধরিতে পারে এমন দুইখানি হাত। সুভদ্রা যখন অর্জুনকে লইয়া দৃপ্ত ভঙ্গিতে আপনার বিজয়রথ বিস্মিত তিন লোকের মধ্য দিয়া চালাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন তাঁহার বোধ করি এইরূপ দুখানি অস্থূল সুডোল বাহু, আরক্ত করতল এবং লাবণ্যশিখার মতো অঙ্গুলি ছিল।

'কিন্তু আমার সেই নির্লজ্জ নিরাবরণ নিরাভরণ চিরবৃদ্ধ কঙ্কাল তোমার কাছে আমার নামে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে। আমি তখন নিরুপায় নিরুত্তর ছিলাম। এই জন্য পৃথিবীর সব চেয়ে তোমার উপর আমার বেশি রাগ। ইচ্ছা করে, আমার সেই ষোলো বৎসরের

জীবন্ত, যৌবনতাপে উত্তপ্ত, আরক্তিম রূপখানি একবার তোমার চোখের সামনে দাঁড় করাই, বহুকালের মতো তোমার দুই চক্ষের নিদ্রা ছুটাইয়া দিই, তোমার অস্থিবিদ্যাকে অস্থির করিয়া দেশছাড়া করি।'

আমি বলিলাম, 'তোমার গা যদি থাকিত তো গা ছুঁইয়া বলিতাম, সে বিদ্যার লেশমাত্র আমার মাথায় নাই। আর তোমার সেই ভুবনমোহন পূর্ণযৌবনের রূপ রজনীর অন্ধকারপটের উপরে জাজ্জ্বল্যমান হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর অধিক বলিতে হইবে না।'

'আমার কেহ সঙ্গিনী ছিল না। দাদা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, বিবাহ করিবেন না। অন্তঃপুরে আমি একা। বাগানের গাছতলায় আমি একা বসিয়া ভাবিতাম, সমস্ত পৃথিবী আমাকেই ভালোবাসিতেছে, সমস্ত তারা আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে, বাতাস ছল করিয়া বার বার দীর্ঘনিশ্বাসে পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছে এবং যে তৃণাসনে পা দুটি মেলিয়া বসিয়া আছি তাহার যদি চেতনা থাকিত তবে সে পুনর্বার অচেতন হইয়া যাইত। পৃথিবীর সমস্ত যুবাপুরুষ ওই তৃণপুঞ্জরূপে দল বাঁধিয়া নিস্তব্ধে আমার চরণবর্তী হইয়া দাঁড়াইয়াছে এইরূপ আমি কল্পনা করিতাম; হৃদয়ে অকারণে কেমন বেদনা অনুভব হইত।

'দাদার বন্ধু শশিশেখর যখন মেডিকাল কালেজ হইতে পাস হইয়া আসিলেন তখন তিনিই আমাদের বাড়ির ডাক্তার হইলেন। আমি তাঁহাকে পূর্বে আড়াল হইতে অনেক-বার দেখিয়াছি। দাদা অত্যন্ত অদ্ভুত লোক ছিলেন— পৃথিবীটাকে যেন ভালো করিয়া চোখ মেলিয়া দেখিতেন না। সংসারটা যেন তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট ফাঁকা নয়— এই জন্য সরিয়া সরিয়া একেবারে প্রান্তে গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন।

'তাঁহার বন্ধুর মধ্যে এক শশিশেখর। এই জন্য বাহিরের যুবকদের মধ্যে আমি এই শশিশেখরকেই সর্বদা দেখিতাম। এবং যখন আমি সন্ধ্যাকালে পুষ্পতরুতলে সম্রাজ্ঞীর আসন গ্রহণ করিতাম তখন পৃথিবীর সমস্ত পুরুষজাতি শশিশেখরের মূর্তি ধরিয়া আমার চরণাগত হইত।— শুনিতেছ? কী মনে হইতেছে?'

আমি সনিশ্বাসে বলিলাম, 'মনে হইতেছে, শশিশেখর হইয়া জন্মিলে বেশ হইত।'

'আগে সবটা শোনো। একদিন বাদলার দিনে আমার জ্বর হইয়াছে। ডাক্তার দেখিতে আসিয়াছেন। সেই প্রথম দেখা।

'আমি জানলার দিকে মুখ করিয়া ছিলাম, সন্ধ্যার লাল আভাটা পড়িয়া রুগ্‌ণ মুখের বিবর্ণতা যাহাতে দূর হয়। ডাক্তার যখন ঘরে ঢুকিয়াই আমার মুখের দিকে একবার চাহিলেন তখন আমি মনে মনে ডাক্তার হইয়া কল্পনায় নিজের মুখের দিকে চাহিলাম।

সেই সন্ধ্যালোকে কোমল বালিশের উপরে একটি ঈষৎক্লিষ্ট কুসুমপেলব মুখ ; অসংযমিত চূর্ণকুন্তল ললাটের উপর আসিয়া পড়িয়াছে এবং লজ্জায় আনমিত বড়ো বড়ো চোখের পল্লব কপোলের উপর ছায়া বিস্তার করিয়াছে।

'ডাক্তার নম্র মৃদুস্বরে দাদাকে বলিলেন, একবার হাতটা দেখিতে হইবে।

'আমি গাত্রাবরণের ভিতর হইতে ক্লান্ত সুগোল হাতখানি বাহির করিয়া দিলাম। একবার হাতের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, যদি নীলবর্ণ কাঁচের চুড়ি পরিতে পারিতাম তো আরো বেশ মানাইত। রোগীর হাত লইয়া নাড়ী দেখিতে ডাক্তারের এমন ইতস্তত ইতিপূর্বে কখনো দেখি নাই। অত্যন্ত অসংলগ্নভাবে কম্পিত অঙ্গুলিতে নাড়ী দেখিলেন। তিনি আমার জ্বরের উত্তাপ বুঝিলেন, আমিও তাঁহার অন্তরের নাড়ী কিরূপ চলিতেছে কতকটা আভাস পাইলাম। বিশ্বাস হইতেছে না?'

আমি বলিলাম, 'অবিশ্বাসের কোনো কারণ দেখিতেছি না— মানুষের নাড়ী সকল অবস্থায় সমান চলে না।'

'কালক্রমে আরো দুই-চারিবার রোগ ও আরোগ্য হইবার পরে দেখিলাম আমার সেই সন্ধ্যাকালের মানস সভায় পৃথিবীর কোটি কোটি পুরুষ-সংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস হইয়া ক্রমে একটিতে আসিয়া ঠেকিল, আমার পৃথিবী প্রায় জনশূন্য হইয়া আসিল। জগতে কেবল একটি ডাক্তার এবং একটি রোগী অবশিষ্ট রাহল।

'আমি গোপনে সন্ধ্যাবেলায় একটি বাসন্তী রঙের কাপড় পরিতাম, ভালো করিয়া খোঁপা বাঁধিয়া মাথায় একগাছি বেলফুলের মালা জড়াইতাম, একটি আয়না হাতে লইয়া বাগানে গিয়া বসিতাম।

'কেন। আপনাকে দেখিয়া কি আর পরিতৃপ্তি হয় না। বাস্তবিকই হয় না। কেননা, আমি তো আপনি আপনাকে দেখিতাম না। আমি তখন একলা বসিয়া দুইজন হইতাম। আমি তখন ডাক্তার হইয়া আপনাকে দেখিতাম, মুগ্ধ হইতাম এবং ভালোবাসিতাম এবং আদর করিতাম, অথচ প্রাণের ভিতরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস সন্ধ্যাবাতাসের মতো হু হু করিয়া উঠিত।

'সেই হইতে আমি আর একলা ছিলাম না ; যখন চলিতাম নত নেত্রে চাহিয়া দেখিতাম পায়ের অঙ্গুলিগুলি পৃথিবীর উপরে কেমন করিয়া পড়িতেছে এবং ভাবিতাম এই পদক্ষেপ আমাদের নূতন-পরীক্ষোত্তীর্ণ ডাক্তারের কেমন লাগে ; মধ্যাহ্নে জানলার বাহিরে ঝাঁ ঝাঁ করিত, কোথাও সাড়াশব্দ নাই, মাঝে মাঝে এক-একটা চিল অতিদূর আকাশে শব্দ করিয়া উড়িয়া যাইত ; এবং আমাদের উদ্যানপ্রাচীরের বাহিরে খেলেনাওয়ালা সুর ধরিয়া 'চাই খেলেনা চাই' 'চুড়ি চাই' করিয়া ডাকিয়া যাইত, আমি একখানি

ধব্‌ধবে চাদর পাতিয়া নিজের হাতে বিছানা করিয়া শয়ন করিতাম ; একখানি অনাবৃত বাহু কোমল বিছানার উপরে যেন অনাদরে মেলিয়া দিয়া ভাবিতাম, এই হাতখানি এমনি ভঙ্গিতে কে যেন দেখিতে পাইল, কে যেন দুইখানি হাত দিয়া তুলিয়া লইল, কে যেন ইহার আরক্ত করতলের উপর একটি চুম্বন রাখিয়া দিয়া আবার ধীরে ধীরে ফিরিয়া যাইতেছে।— মনে করো এইখানেই গল্পটা যদি শেষ হয় তাহা হইলে কেমন হয়।'

আমি বলিলাম, 'মন্দ হয় না। একটু অসম্পূর্ণ থাকে বটে, কিন্তু সেইটুকু আপন মনে পূরণ করিয়া লইতে বাকি রাতটুকু বেশ কাটিয়া যায়।'

'কিন্তু তাহা হইলে গল্পটা যে বড়ো গম্ভীর হইয়া পড়ে। ইহার উপহাসটুকু থাকে কোথায়। ইহার ভিতরকার কঙ্কালটা তাহার সমস্ত দাঁত ক'টি মেলিয়া দেখা দেয় কই।

'তার পরে শোনো। একটুখানি পসার হইতেই আমাদের বাড়ির এক তলায় ডাক্তার তাঁহার ডাক্তারখানা খুলিলেন। তখন আমি তাঁহাকে মাঝে মাঝে হাসিতে হাসিতে ঔষধের কথা, বিষের কথা, কী করিলে মানুষ সহজে মরে, এই-সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতাম। ডাক্তারির কথায় ডাক্তারের মুখ খুলিয়া যাইত। শুনিয়া শুনিয়া মৃত্যু যেন পরিচিত ঘরের লোকের মতো হইয়া গেল। ভালোবাসা এবং মরণ কেবল এই দুটোকেই পৃথিবীময় দেখিলাম।

'আমার গল্প প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে— আর বড়ো বাকি নাই।'

আমি মৃদুস্বরে বলিলাম, 'রাত্রিও প্রায় শেষ হইয়া আসিল।'

'কিছুদিন হইতে দেখিলাম ডাক্তারবাবু বড়ো অন্যমনস্ক এবং আমার কাছে যেন ভারী অপ্রতিভ। একদিন দেখিলাম তিনি কিছু বেশিরকম সাজসজ্জা করিয়া দাদার কাছে তাঁহার জুড়ি ধার লইলেন, রাত্রে কোথায় যাইবেন।

'আমি আর থাকিতে পারিলাম না। দাদার কাছে গিয়া নানা কথার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, হাঁ দাদা, ডাক্তারবাবু আজ জুড়ি লইয়া কোথায় যাইতেছেন।

'সংক্ষেপে দাদা বলিলেন, মরিতে।

'আমি বলিলাম, না, সত্য করিয়া বলো-না।

'তিনি পূর্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ খোলসা করিয়া বলিলেন, বিবাহ করিতে।

'আমি বলিলাম সত্য নাকি।— বলিয়া অনেক হাসিতে লাগিলাম।

'অল্পে অল্পে শুনিলাম এই বিবাহে ডাক্তার বারো হাজার টাকা পাইবেন।

'কিন্তু আমার কাছে এ সংবাদ গোপন করিয়া আমাকে অপমান করিবার তাৎপর্য কী। আমি কি তাঁহার পায়ে ধরিয়া বলিয়াছিলাম যে, এমন কাজ করিলে আমি বুক

ফাটিয়া মরিব। পুরুষদের বিশ্বাস করিবার জো নাই। পৃথিবীতে আমি একটিমাত্র পুরুষ দেখিয়াছি এবং এক মুহূর্তে সমস্ত জ্ঞান লাভ করিয়াছি।

'ডাক্তার রোগী দেখিয়া সন্ধ্যার পূর্বে ঘরে আসিলে আমি প্রচুর পরিমাণে হাসিতে হাসিতে বলিলাম, কী ডাক্তার মহাশয়। আজ নাকি আপনার বিবাহ ?

'আমার প্রফুল্লতা দেখিয়া ডাক্তার যে কেবল অপ্রতিভ হইলেন তাহা নহে, ভারী বিমর্ষ হইয়া গেলেন।

'জিজ্ঞাসা করিলাম, বাজনা-বাদ্য কিছু নাই যে ?

'শুনিয়া তিনি ঈষৎ একটু নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, বিবাহ ব্যাপারটা কি এতই আনন্দের।

'শুনিয়া আমি হাসিয়া অস্থির হইয়া গেলাম। এমন কথাও তো কখনো শুনি নাই। আমি বলিলাম, সে হইবে না, বাজনা চাই, আলো চাই।

'দাদাকে এমনি ব্যস্ত করিয়া তুলিলাম যে দাদা তখনই রীতিমতো উৎসবের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

'আমি কেবলই গল্প করিতে লাগিলাম, বধূ ঘরে আসিলে কী হইবে, কী করিব। জিজ্ঞাসা করিলাম— আচ্ছা ডাক্তার মহাশয়, তখনো কি আপনি রোগীর নাড়ী টিপিয়া বেড়াইবেন। হি হি! হি হি! যদিও মানুষের, বিশেষত পুরুষের, মনটা দৃষ্টিগোচর নয়, তবু আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি কথাগুলি ডাক্তারের বুকে শেলের মতো বাজিতেছিল।

'অনেক রাত্রে লগ্ন। সন্ধ্যাবেলায় ডাক্তার ছাতের উপর বসিয়া দাদার সহিত দুই-এক পাত্র মদ খাইতেছিলেন। দুইজনেরই এই অভ্যাসটুকু ছিল। ক্রমে আকাশে চাঁদ উঠিল।

'আমি হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিলাম, ডাক্তারমশায় ভুলিয়া গেলেন নাকি। যাত্রার যে সময় হইয়াছে।

'এইখানে একটা সামান্য কথা বলা আবশ্যক। ইতিমধ্যে আমি গোপনে ডাক্তার-খানায় গিয়া খানিকটা গুঁড়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম এবং সেই গুঁড়ার কিয়দংশ সুবিধামতো অলক্ষিতে ডাক্তারের গ্লাসে মিশাইয়া দিয়াছিলাম।

'কোন্ গুঁড়া খাইলে মানুষ মরে ডাক্তারের কাছে শিখিয়াছিলাম।

'ডাক্তার এক চুমুকে গ্লাসটি শেষ করিয়া কিঞ্চিৎ আর্দ্র গদ্‌গদ কণ্ঠে আমার মুখের দিকে মর্মান্তিক দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, তবে চলিলাম।

'বাঁশি বাজিতে লাগিল, আমি একটি বারাণসী শাড়ি পরিলাম, যতগুলি গহনা

সিন্দুকে তোলা ছিল সবগুলি বাহির করিয়া পরিলাম— সিঁথিতে বড়ো করিয়া সিঁদুর দিলাম। আমার সেই বকুলতলায় বিছানা পাতিলাম।

'বড়ো সুন্দর রাত্রি। ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না। সুপ্ত জগতের ক্লান্তি হরণ করিয়া দক্ষিনে বাতাস বহিতেছে। জুঁই আর বেল ফুলের গন্ধে সমস্ত বাগান আমোদ করিয়াছে।

'বাঁশির শব্দ যখন ক্রমে দূরে চলিয়া গেল, জ্যোৎস্না যখন অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল, এই তরুপল্লব এবং আকাশ এবং আজন্মকালের ঘর-দুয়ার লইয়া পৃথিবী যখন আমার চারি দিক হইতে মায়ার মতো মিলাইয়া যাইতে লাগিল তখন আমি নেত্র নিমীলন করিয়া হাসিলাম।

'ইচ্ছা ছিল যখন লোকে আসিয়া আমাকে দেখিবে তখন এই হাসিটুকু যেন রঙিন নেশার মতো আমার ঠোঁটের কাছে লাগিয়া থাকে। ইচ্ছা ছিল যখন আমার অনন্তরাত্রির বাসরঘরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিব তখন এই হাসিটুকু এখান হইতেই মুখে করিয়া লইয়া যাইব। কোথায় বাসরঘর। আমার সে বিবাহের বেশ কোথায়। নিজের ভিতর হইতে একটা খট্‌খট্‌ শব্দে জাগিয়া দেখিলাম, আমাকে লইয়া তিনটি বালক অস্থিবিদ্যা শিখিতেছে। বুকের যেখানে সুখদুঃখ ধুক্‌ধুক্‌ করিত এবং যৌবনের পাপড়ি প্রতিদিন একটি একটি করিয়া প্রস্ফুটিত হইত সেইখানে বেত্র নির্দেশ করিয়া কোন্‌ অস্থির কী নাম মাস্টার শিখাইতেছে। আর সেই-যে অন্তিম হাসিটুকু ওষ্ঠের কাছে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলাম তাহার কোনো চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছিলে কি।—

'গল্পটা কেমন লাগিল।'

আমি বলিলাম, 'গল্পটি বেশ প্রফুল্লকর।'

এমন সময় প্রথম কাক ডাকিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এখনো আছ কি।'

কোনো উত্তর পাইলাম না।

ঘরের মধ্যে ভোরের আলো প্রবেশ করিল।

ফাল্গুন ১২৯৮

মুক্তির উপায়

১

ফকিরচাঁদ বাল্যকাল হইতেই গম্ভীরপ্রকৃতি। বৃদ্ধসমাজে তাহাকে কখনোই বেমানান দেখাইত না। ঠাণ্ডা জল, হিম, এবং হাস্যপরিহাস তাহার একেবারে সহ্য হইত না। একে গম্ভীর, তাহাতে বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময়েই মুখমণ্ডলের চারি দিকে কালো পশমের গলাবন্ধ জড়াইয়া থাকাতে তাহাকে ভয়ংকর উঁচু দরের লোক বলিয়া বোধ হইত। ইহার উপরে, অতি অল্প বয়সেই তাহার ওষ্ঠাধর এবং গণ্ডস্থল প্রচুর গোঁফ-দাড়িতে আচ্ছন্ন হওয়াতে সমস্ত মুখের মধ্যে হাস্যবিকাশের স্থান আর তিলমাত্র অবশিষ্ট রহিল না।

স্ত্রী হৈমবতীর বয়স অল্প এবং তাহার মন পার্থিব বিষয়ে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট। সে বঙ্কিমবাবুর নভেল পড়িতে চায় এবং স্বামীকে ঠিক দেবতার ভাবে পূজা করিয়া তাহার তৃপ্তি হয় না। সে একটুখানি হাসিখুশি ভালোবাসে, এবং বিকচোন্মুখ পুষ্প যেমন বায়ুর আন্দোলন এবং প্রভাতের আলোকের জন্য ব্যাকুল হয় সেও তেমনি এই নবযৌবনের সময় স্বামীর নিকট হইতে আদর এবং হাস্যামোদ যথাপরিমাণে প্রত্যাশা করিয়া থাকে। কিন্তু, স্বামী তাহাকে অবসর পাইলেই ভাগবত পড়ায়, সন্ধ্যাবেলায় ভগবদ্‌গীতা শুনায়, এবং তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির উদ্দেশে মাঝে মাঝে শারীরিক শাসন করিতেও ত্রুটি করে না। যেদিন হৈমবতীর বালিশের নীচে হইতে কৃষ্ণকান্তের উইল বাহির হয় সেদিন উক্ত লঘুপ্রকৃতি যুবতীকে সমস্ত রাত্রি অশ্রুপাত করাইয়া তবে ফকির ক্ষান্ত হয়। একে নভেল-পাঠ, তাহাতে আবার পতিদেবকে প্রতারণা। যাহা হউক, অবিশ্রান্ত আদেশ অনুদেশ উপদেশ ধর্মনীতি এবং দণ্ডনীতির দ্বারা অবশেষে হৈমবতীর মুখের হাসি, মনের সুখ এবং যৌবনের আবেগ একেবারে নিষ্কর্ষণ করিয়া ফেলিতে স্বামীদেবতা সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইয়াছিলেন।

কিন্তু, অনাসক্ত লোকের পক্ষে সংসারে বিস্তর বিঘ্ন। পরে পরে ফকিরের এক ছেলে এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারবন্ধন বাড়িয়া গেল। পিতার তাড়নায় এতবড়ো গম্ভীর-প্রকৃতি ফকিরকেও আপিসে আপিসে কর্মের উমেদারিতে বাহির হইতে হইল, কিন্তু কর্ম জুটিবার কোনো সম্ভাবনা দেখা গেল না।

তখন সে মনে করিল, 'বুদ্ধদেবের মতো আমি সংসার ত্যাগ করিব।' এই ভাবিয়া একদিন গভীর রাত্রে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

২

মধ্যে আর-একটি ইতিহাস বলা আবশ্যক।

নবগ্রামবাসী ষষ্ঠীচরণের এক ছেলে। নাম মাখনলাল। বিবাহের অনতিবিলম্বে সন্তানাদি না হওয়াতে পিতার অনুরোধে এবং নূতনত্বের প্রলোভনে আর-একটি বিবাহ করেন। এই বিবাহের পর হইতে যথাক্রমে তাঁহার উভয় স্ত্রীর গর্ভে সাতটি কন্যা এবং একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল।

মাখন লোকটা নিতান্ত শৌখিন এবং চপলপ্রকৃতি, কোনোপ্রকার গুরুতর কর্তব্যের দ্বারা আবদ্ধ হইতে নিতান্ত নারাজ। একে তো ছেলেপুলের ভার, তাহার পরে যখন দুই কর্ণধার দুই কর্ণে ঝিঁকা মারিতে লাগিল, তখন নিতান্ত অসহ্য হইয়া সেও একদিন গভীর রাত্রে ডুব মারিল।

বহুকাল তাহার আর সাক্ষাৎ নাই। কখনো কখনো শুনা যায়, এক বিবাহে কিরূপ সুখ তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য সে কাশীতে গিয়া গোপনে আর-একটি বিবাহ করিয়াছে; শুনা যায়, হতভাগ্য কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিয়াছে। কেবল দেশের কাছাকাছি আসিবার জন্য মাঝে মাঝে তাহার মন উতলা হয়, ধরা পড়িবার ভয়ে আসিতে পারে না।

৩

কিছু-দিন ঘুরিতে ঘুরিতে উদাসীন ফকিরচাঁদ নবগ্রামে আসিয়া উপস্থিত। পথপার্শ্ব-বর্তী এক বটবৃক্ষ-তলে বসিয়া নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, 'আহা, বৈরাগ্যমেবাভয়ং। দারাপুত্র ধনজন কেউ কারো নয়। কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ।' বলিয়া এক গান জুড়িয়া দিল—

শোন্ রে শোন্, অবোধ মন,
শোন্ সাধুর উক্তি— কিসে মুক্তি
সেই সুযুক্তি কর্ গ্রহণ।
ভবের শুক্তি ভেঙে মুক্তি-মুক্তা কর্ অন্বেষণ।
ওরে ও ভোলা মন, ভোলা মন রে।

সহসা গান বন্ধ হইয়া গেল— 'ও কে ও। বাবা দেখছি! সন্ধান পেয়েছেন বুঝি! তবেই তো সর্বনাশ। আবার তো সংসারের অন্ধকূপে টেনে নিয়ে যাবেন। পালাতে হল।'

৪

ফকির তাড়াতাড়ি নিকটবর্তী এক গৃহে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধ গৃহস্বামী চুপচাপ বসিয়া তামাক টানিতেছিল। ফকিরকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কে হে তুমি।'

ফকির। বাবা, আমি সন্ন্যাসী।

বৃদ্ধ। সন্ন্যাসী! দেখি দেখি বাবা, আলোতে এসো দেখি।

এই বলিয়া আলোতে টানিয়া লইয়া ফকিরের মুখের 'পরে ঝুঁকিয়া বুড়ামানুষ বহুকষ্টে যেমন করিয়া পুঁথি পড়ে তেমনি করিয়া ফকিরের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বিড় বিড় করিয়া বকিতে লাগিল— 'এই তো আমার সেই মাখনলাল দেখছি। সেই নাক, সেই চোখ, কেবল কপালটা বদলেছে, আর সেই চাঁদমুখ গোঁফে দাড়িতে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।'

বলিয়া বৃদ্ধ সস্নেহে ফকিরের শ্মশ্রুল মুখে দুই-একবার হাত বুলাইয়া লইল এবং প্রকাশ্যে কহিল, 'বাবা মাখন।'

বলা বাহুল্য বৃদ্ধের নাম ষষ্ঠীচরণ।

ফকির। (সবিস্ময়ে) মাখন! আমার নাম তো মাখন নয়। পূর্বে আমার নাম যাই থাক্‌, এখন আমার নাম চিদানন্দস্বামী। ইচ্ছা হয় তো পরমানন্দও বলতে পারো।

ষষ্ঠী। বাবা, তা এখন আপনাকে চিঁড়েই বল্‌ আর পরমান্নই বল্‌, তুই যে আমার মাখন, বাবা, সে তো আমি ভুলতে পারব না।— বাবা, তুই কোন্‌ দুঃখে সংসার ছেড়ে গেলি। তোর কিসের অভাব। দুই স্ত্রী— বড়োটিকে না ভালোবাসিস, ছোটোটি আছে। ছেলেপিলের দুঃখও সেই। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে সাতটি কন্যে, একটি ছেলে। আর আমি, বুড়ো বাপ, ক দিনই বা বাঁচব— তোর সংসার তোরই থাকবে।

ফকির একেবারে আঁৎকিয়া উঠিয়া কহিল, কী সর্বনাশ। শুনলেও যে ভয় হয়।

এতক্ষণে প্রকৃত ব্যাপারটা বোধগম্য হইল। ভাবিল, 'মন্দ কী, দিন-দুই বৃদ্ধের পুত্রভাবেই এখানে লুকাইয়া থাকা যাক, তাহার পরে সন্ধানে অকৃতকার্য হইয়া বাপ চলিয়া গেলেই এখান হইতে পলায়ন করিব।'

ফকিরকে নিরুত্তর দেখিয়া বৃদ্ধের মনে আর সংশয় রহিল না। কেষ্টা চাকরকে ডাকিয়া বলিল, 'ওরে ও কেষ্টা, তুই সকলকে খবর দিয়ে আয় গে, আমার মাখন ফিরে এসেছে।'

৫

দেখিতে দেখিতে লোকে লোকারণ্য। পাড়ার লোকে অধিকাংশই বলিল, সেই বটে। কেহ বা সন্দেহ প্রকাশ করিল। কিন্তু, বিশ্বাস করিবার জন্যই লোকে এত ব্যগ্র যে সন্দিগ্ধ লোকদের উপরে সকলে হাড়ে চটিয়া গেল। যেন তাহারা ইচ্ছাপূর্বক কেবল রসভঙ্গ করিতে আসিয়াছে; যেন তাহারা পাড়ার চৌদ্দ অক্ষরের পয়ারকে সতেরো অক্ষর করিয়া বসিয়া আছে, কোনোমতে তাহাদিগকে সংক্ষেপ করিতে পারিলেই তবে পাড়াসুদ্ধ লোক আরাম পায়— তাহারা ভূতও বিশ্বাস করে না, ওঝাও বিশ্বাস করে না, আশ্চর্য গল্প শুনিয়া যখন সকলের তাক লাগিয়া গিয়াছে তখন তাহারা প্রশ্ন উত্থাপন করে। একপ্রকার নাস্তিক বলিলেই হয়। কিন্তু, ভূত অবিশ্বাস করিলে ততটা ক্ষতি নাই, তাই বলিয়া বুড়া বাপের হারা ছেলেকে অবিশ্বাস করা যে নিতান্ত হৃদয়হীনতার কাজ। যাহা হউক, সকলের নিকট হইতে তাড়না খাইয়া সংশয়ীর দল থামিয়া গেল।

ফকিরের অতিভীষণ অটল গাম্ভীর্যের প্রতি ভ্রূপক্ষেপমাত্র না করিয়া পাড়ার লোকেরা তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া বলিতে লাগিল, 'আরে আরে, আমাদের সেই মাখন আজ ঋষি হয়েছেন, তপিস্বী হয়েছেন, চিরটা কাল ইয়ার্কি দিয়ে কাটালে, আজ হঠাৎ মহামুনি জামদগ্নি হয়ে বসেছেন।'

কথাটা উন্নতচেতা ফকিরের অত্যন্ত খারাপ লাগিল, কিন্তু নিরুপায়ে সহ্য করিতে হইল। একজন গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ওরে মাখন, তুই কুচ্‌কুচে কালো ছিলি, রঙটা এমন ফর্শা করলি কী করে।'

ফকির উত্তর দিল, 'যোগ অভ্যাস ক'রে।'

সকলেই বলিল, 'যোগের কী আশ্চর্য প্রভাব।'

একজন উত্তর করিল, 'আশ্চর্য আর কী। শাস্ত্রে আছে, ভীম যখন হনুমানের লেজ ধরে তুলতে গেলেন, কিছুতেই তুলতে পারলেন না। সে কী ক'রে হল। সে তো যোগবলে।'

এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইল।

হেনকালে ষষ্ঠীচরণ আসিয়া ফকিরকে বলিল, 'বাবা, একবার বাড়ির ভিতরে যেতে হচ্ছে।'

এ সম্ভাবনাটা ফকিরের মাথায় উদয় হয় নাই— হঠাৎ বজ্রাঘাতের মতো মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল। অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া, পাড়ার লোকের বিস্তর অন্যায় পরিহাস

পরিপাক করিয়া অবশেষে বলিল, 'বাবা, আমি সন্ন্যাসী হয়েছি, আমি অন্তঃপুরে ঢুকতে পারব না।'

ষষ্ঠীচরণ পাড়ার লোকদের সম্বোধন করিয়া বলিল, 'তা হলে আপনাদের একবার গা তুলতে হচ্ছে। বউমাদের এইখানেই নিয়ে আসি। তাঁরা বড়ো ব্যাকুল হয়ে আছেন।'

সকলে উঠিয়া গেল। ফকির ভাবিল, এইবেলা এখান হইতে এক দৌড় মারি। কিন্তু, রাস্তায় বাহির হইলেই পাড়ার লোক কুক্কুরের মতো তাহার পশ্চাতে ছুটিবে ইহাই কল্পনা করিয়া তাহাকে নিস্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিতে হইল।

যেমনি মাখনলালের দুই স্ত্রী প্রবেশ করিল ফকির অমনি নতশিরে তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া কহিল, 'মা, আমি তোমাদের সন্তান।'

অমনি ফকিরের নাকের সম্মুখে একটা বালা-পরা হাত খড়্‌গের মতো খেলিয়া গেল এবং একটি কাংস্যবিনিন্দিত কণ্ঠে বাজিয়া উঠিল, 'ওরে ও পোড়াকপালে মিন্সে, তুই মা বললি কাকে!'

অমনি আর-একটি কণ্ঠ আরো দুই সুর উচ্চে পাড়া কাঁপাইয়া ঝংকার দিয়া উঠিল, 'চোখের মাথা খেয়ে বসেছিস! তোর মরণ হয় না!'

নিজের স্ত্রীর নিকট হইতে এরূপ চলিত বাংলা শোনা অভ্যাস ছিল না; সুতরাং একান্ত কাতর হইয়া ফকির জোড়হস্তে কহিল, 'আপনারা ভুল বুঝছেন। আমি এই আলোতে দাঁড়াচ্ছি, আমাকে একটু ঠাউরে দেখুন।'

প্রথমা ও দ্বিতীয়া পরে পরে কহিল, 'ঢের দেখেছি। দেখে দেখে চোখ ক্ষয়ে গেছে। তুমি কচি খোকা নও, আজ নতুন জন্মাও নি। তোমার দুধের দাঁত অনেক দিন ভেঙেছে। তোমার কি বয়সের গাছ-পাথর আছে। তোমায় যম ভুলেছে বলে কি আমরা ভুলব।'

এরূপ এক-তরফা দাম্পত্য আলাপ কতক্ষণ চলিত বলা যায় না— কারণ, ফকির একেবারে বাক্‌শক্তিরহিত হইয়া নতশিরে দাঁড়াইয়া ছিল। এমন সময় অত্যন্ত কোলাহল শুনিয়া এবং পথে লোক জমিতে দেখিয়া ষষ্ঠীচরণ প্রবেশ করিল। বলিল, 'এতদিন আমার ঘর নিস্তব্ধ ছিল, একেবারে টুঁশব্দ ছিল না। আজ মনে হচ্ছে বটে, আমার মাখন ফিরে এসেছে।'

ফকির করজোড়ে কহিল, 'মশায়, আপনার পুত্রবধূদের হাত থেকে আমাকে রক্ষে করুন।'

ষষ্ঠী। বাবা, অনেক দিন পরে এসেছ, তাই প্রথমটা একটু অসহ্য বোধ হচ্ছে। তা, মা,

তোমরা এখন যাও। বাবা মাখন তো এখন এখানেই রইলেন, ওঁকে আর কিছুতেই যেতে দিচ্ছি নে।

ললনাদ্বয় বিদায় হইলে ফকির ষষ্ঠীচরণকে বলিল, 'মশায়, আপনার পুত্র কেন যে সংসার ত্যাগ করে গেছেন তা আমি সম্পূর্ণ অনুভব করতে পারছি। মশায়, আমার প্রণাম জানবেন, আমি চললেম।'

বৃদ্ধ এম্‌নি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন উত্থাপন করিল যে, পাড়ার লোক মনে করিল মাখন তাহার বাপকে মারিয়াছে। তাহারা হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিল। সকলে আসিয়া ফকিরকে জানাইয়া দিল, এমন ভণ্ডতপস্বীগিরি এখানে খাটিবে না। ভালোমানুষের ছেলের মতো কাল কাটাইতে হইবে। একজন বলিল, 'ইনি তো পরমহংস নন, পরম বক।'

গাম্ভীর্য গোঁফদাড়ি এবং গলাবন্ধের জোরে ফকিরকে এমন-সকল কুৎসিত কথা কখনো শুনিতে হয় নাই। যাহা হউক, লোকটা পাছে আবার পালায় পাড়ার লোকেরা অত্যন্ত সতর্ক রহিল। স্বয়ং জমিদার ষষ্ঠীচরণের পক্ষ অবলম্বন করিলেন।

৬

ফকির দেখিল এম্‌নি কড়া পাহারা যে, মৃত্যু না হইলে ইহারা ঘরের বাহির করিবে না। একাকী ঘরে বসিয়া গান গাহিতে লাগিল—

শোন্ সাধুর উক্তি, কিসে মুক্তি
সেই সুযুক্তি কর্ গ্রহণ।

বলা বাহুল্য গানটার আধ্যাত্মিক অর্থ অনেকটা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে।

এমন করিয়াও কোনোমতে দিন কাটিত। কিন্তু, মাখনের আগমনসংবাদ পাইয়া দুই স্ত্রীর সম্পর্কের এক ঝাঁক শ্যালা ও শ্যালী আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহারা আসিয়াই প্রথমত ফকিরের গোঁফ দাড়ি ধরিয়া টানিতে লাগিল; তাহারা বলিল, এ তো সত্যকার গোঁফ দাড়ি নয়, ছদ্মবেশ করিবার জন্য আঠা দিয়া জুড়িয়া আসিয়াছে।

নাসিকার নিম্নবর্তী গুম্ফ ধরিয়া টানাটানি করিলে ফকিরের ন্যায় অত্যন্ত মহৎ লোকেরও মাহাত্ম্য রক্ষা করা দুষ্কর হইয়া উঠে। ইহা ছাড়া কানের উপর উপদ্রবও ছিল— প্রথমত মলিয়া, দ্বিতীয়ত এমন-সকল ভাষা প্রয়োগ করিয়া যাহাতে কান না মলিলেও কান লাল হইয়া উঠে।

ইহার পর ফকিরকে তাহারা এমন-সকল গান ফর্মায়েশ করিতে লাগিল, আধুনিক

বড়ো বড়ো নূতন পণ্ডিতেরা যাহার কোনোরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে হার মানেন। আবার নিদ্রাকালে তাহারা ফকিরের স্বল্পাবশিষ্ট গণ্ডস্থলে চুনকালি মাখাইয়া দিল; আহারকালে কেশুরের পরিবর্তে কচু, ডাবের জলের পরিবর্তে হুঁকার জল, দুধের পরিবর্তে পিঠালি-গোলার আয়োজন করিল; পিঁড়ার নীচে সুপারি রাখিয়া তাহাকে আছাড় খাওয়াইল; লেজ বানাইল এবং সহস্র প্রচলিত উপায়ে ফকিরের অভ্রভেদী গাম্ভীর্য ভূমিসাৎ করিয়া দিল।

ফকির রাগিয়া ফুলিয়া-ফাঁপিয়া ঝাঁকিয়া-হাঁকিয়া কিছুতেই উপদ্রবকারীদের মনে ভীতির সঞ্চার করিতে পারিল না। কেবল সর্বসাধারণের নিকট অধিকতর হাস্যাস্পদ হইতে লাগিল। ইহার উপরে আবার অন্তরাল হইতে একটি মিষ্ট কণ্ঠের উচ্চহাস্য মাঝে মাঝে কর্ণগোচর হইত; সেটা যেন পরিচিত বলিয়া ঠেকিত এবং মন দ্বিগুণ অধৈর্য হইয়া উঠিত।

পরিচিত কণ্ঠ পাঠকের অপরিচিত নহে। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ষষ্ঠীচরণ কোনো-এক সম্পর্কে হৈমবতীর মামা। বিবাহের পর শাশুড়ির দ্বারা নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পিতৃমাতৃহীনা হৈমবতী মাঝে মাঝে কোনো-না-কোনো কুটুম্ববাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করিত। অনেক দিন পরে সে মামার বাড়ি আসিয়া নেপথ্য হইতে এক পরমকৌতুকাবহ অভিনয় নিরীক্ষণ করিতেছে। তৎকালে হৈমবতীর স্বাভাবিক রঙ্গপ্রিয়তার সঙ্গে প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তির উদ্রেক হইয়াছিল কি না চরিত্রতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা স্থির করিবেন, আমরা বলিতে অক্ষম।

ঠাট্টার সম্পর্কীয় লোকেরা মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিত, কিন্তু স্নেহের সম্পর্কীয় লোকদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন। সাত মেয়ে এবং এক ছেলে তাঁহাকে এক দণ্ড ছাড়ে না। বাপের স্নেহ অধিকার করিবার জন্য তাহাদের মা তাহাদিগকে অনুক্ষণ নিযুক্ত রাখিয়াছিল। দুই মাতার মধ্যে আবার রেষারেষি ছিল, উভয়েরই চেষ্টা যাহাতে নিজের সন্তানই অধিক আদর পায়। উভয়েই নিজ নিজ সন্তানদিগকে সর্বদাই উত্তেজিত করিতে লাগিল— দুই দলে মিলিয়া পিতার গলা জড়াইয়া ধরা, কোলে বসা, মুখচুম্বন করা প্রভৃতি প্রবল স্নেহব্যক্তিকার্যে পরস্পরকে জিতিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

বলা বাহুল্য, ফকির লোকটা অত্যন্ত নির্লিপ্তস্বভাব, নহিলে নিজের সন্তানদের অকাতরে ফেলিয়া আসিতে পারিত না। শিশুরা ভক্তি করিতে জানে না, তাহারা সাধুত্বের নিকট অভিভূত হইতে শিখে নাই, এইজন্য ফকির শিশুজাতির প্রতি তিল-মাত্র অনুরক্ত ছিলেন না— তাহাদিগকে তিনি কীট-পতঙ্গের ন্যায় দেহ হইতে দূরে

রাখিতে ইচ্ছা করিতেন। সম্প্রতি তিনি অহরহ শিশু-পঙ্গপালে আচ্ছন্ন হইয়া বর্জইস অক্ষরের ছোটো বড়ো নোটের দ্বারা আদ্যোপান্ত সমাকীর্ণ ঐতিহাসিক প্রবন্ধের ন্যায় শোভমান হইলেন। তাহাদের মধ্যে বয়সের বিস্তর তারতম্য ছিল এবং তাহারা সকলেই কিছু তাঁহার সহিত বয়ঃপ্রাপ্ত সভ্যজনোচিত ব্যবহার করিত না; শুদ্ধশুচি ফকিরের চক্ষে অনেক সময় অশ্রুর সঞ্চার হইত এবং তাহা আনন্দাশ্রু নহে।

পরের ছেলেরা যখন নানা সুরে তাঁহাকে 'বাবা বাবা' করিয়া ডাকিয়া আদর করিত তখন তাঁহার সাংঘাতিক পাশব শক্তি প্রয়োগ করিবার একান্ত ইচ্ছা হইত, কিন্তু ভয়ে পারিতেন না। মুখ চক্ষু বিকৃত করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন।

অবশেষে ফকির মহা চেঁচামেচি করিয়া বলিতে লাগিল, 'আমি যাবই, দেখি আমাকে কে আটক করিতে পারে।'

তখন গ্রামের লোক এক উকিল আনিয়া উপস্থিত করিল। উকিল আসিয়া কহিল, 'জানেন আপনার দুই স্ত্রী?'

ফকির। আজ্ঞে, এখানে এসে প্রথম জানলুম।

উকিল। আর, আপনার সাত মেয়ে, এক ছেলে, তার মধ্যে দুটি মেয়ে বিবাহযোগ্যা।

ফকির। আজ্ঞে, আপনি আমার চেয়ে ঢের বেশি জানেন দেখতে পাচ্ছি।

উকিল। আপনার এই বৃহৎ পরিবারের ভরণপোষণের ভার আপনি যদি না নেন তবে আপনার অনাথিনী দুই স্ত্রী আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করবেন, পূর্বে হতে বলে রাখলুম।

ফকির সব চেয়ে আদালতকে ভয় করিত। তাহার জানা ছিল, উকিলেরা জেরা করিবার সময় মহাপুরুষদিগের মানমর্যাদা-গাম্ভীর্যকে খাতির করে না— প্রকাশ্যে অপমান করে এবং খবরের কাগজে তাহার রিপোর্ট্ বাহির হয়। ফকির অশ্রুসিক্তলোচনে উকিলকে বিস্তারিত আত্মপরিচয় দিতে চেষ্টা করিল; উকিল তাহার চাতুরীর, তাহার উপস্থিতবুদ্ধির, তাহার মিথ্যা-গল্প-রচনার অসাধারণ ক্ষমতার ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতে লাগিল। শুনিয়া ফকিরের আপন হস্তপদ দংশন করিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল।

ষষ্ঠীচরণ ফকিরকে পুনশ্চ পলায়নোদ্যত দেখিয়া শোকে অধীর হইয়া পড়িল। পাড়ার লোকে তাহাকে চারি দিকে ঘিরিয়া অজস্র গালি দিল এবং উকিল তাহাকে এমন শাসাইল যে তাহার মুখে আর কথা রহিল না।

ইহার উপর যখন আটজন বালক বালিকা গাঢ় স্নেহে তাহাকে চারি দিকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া তাহার শ্বাসরোধ করিবার উপক্রম করিল, তখন অন্তরালস্থিত হৈমবতী হাসিবে কি কাঁদিবে ভাবিয়া পাইল না।

ফকির অন্য উপায় না দেখিয়া ইতিমধ্যে নিজের পিতাকে একখানা চিঠি লিখিয়া সমস্ত অবস্থা নিবেদন করিয়াছিল। সেই পত্র পাইয়া ফকিরের পিতা হরিচরণবাবু আসিয়া উপস্থিত। পাড়ার লোক, জমিদার এবং উকিল কিছুতেই দখল ছাড়ে না।

এ লোকটি যে ফকির নহে, মাখন, তাহারা তাহার সহস্র অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগ করিল— এমন-কি, যে ধাত্রী মাখনকে মানুষ করিয়াছিল সেই বুড়িকে আনিয়া হাজির করিল। সে কম্পিত হস্তে ফকিরের চিবুক তুলিয়া ধরিয়া মুখ নিরীক্ষণ করিয়া তাহার দাড়ির উপরে দরবিগলিত ধারায় অশ্রুপাত করিতে লাগিল।

যখন দেখিল, তাহাতেও ফকির রাশ মানে না, তখন ঘোমটা টানিয়া দুই স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইল। পাড়ার লোকেরা শশব্যস্ত হইয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল। কেবল দুই বাপ, ফকির এবং শিশুরা ঘরে রহিল।

দুই স্ত্রী হাত নাড়িয়া নাড়িয়া ফকিরকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কোন্ চুলোয়, যমের কোন্ দুয়োরে যাবার ইচ্ছে হয়েছে।'

ফকির তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলিতে পারিল না, সুতরাং নিরুত্তর হইয়া রহিল। কিন্তু, ভাবে যেরূপ প্রকাশ পাইল তাহাতে যমের কোনো বিশেষ দ্বারের প্রতি তাহার যে বিশেষ পক্ষপাত আছে এরূপ বোধ হইল না; আপাতত যে-কোনো একটা দ্বার পাইলেই সে বাঁচে, কেবল একবার বাহির হইতে পারিলেই হয়।

তখন আর-একটি রমণীমূর্তি গৃহে প্রবেশ করিয়া ফকিরকে প্রণাম করিল। ফকির প্রথমে অবাক, তাহার পরে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া বলিল, 'এ যে হৈমবতী!'

নিজের অথবা পরের স্ত্রীকে দেখিয়া এত প্রেম তাহার চক্ষে ইতিপূর্বে কখনো প্রকাশ পায় নাই। মনে হইল, মূর্তিমতী মুক্তি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।

আর-একটি লোক মুখের উপর শাল মুড়ি দিয়া অন্তরাল হইতে দেখিতেছিল। তাহার নাম মাখনলাল। একটি অপরিচিত নিরীহ ব্যক্তিকে নিজপদে অভিষিক্ত দেখিয়া সে এতক্ষণ পরম সুখানুভব করিতেছিল; অবশেষে হৈমবতীকে উপস্থিত দেখিয়া বুঝিতে পারিল উক্ত নিরপরাধ ব্যক্তি তাহার নিজের ভগ্নীপতি; তখন দয়াপরতন্ত্র হইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, 'না, আপনার লোককে এমন বিপদে ফেলা মহাপাতক।'

দুই স্ত্রীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিল, 'এ আমারই দড়ি, আমারই কলসী।'

মাখনলালের এই অসাধারণ মহত্ত্ব ও বীরত্বে পাড়ার লোক আশ্চর্য হইয়া গেল।

চৈত্র ১২৯৮

প্রবন্ধ

শান্তিনিকেতন

শান্তিনিকেতন

১৩

কর্মযোগ

জগতে আনন্দযজ্ঞে তাঁর যে নিমন্ত্রণ আমরা আমাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই পেয়েছি তাকে আমাদের কেউ কেউ স্বীকার করতে চাচ্ছে না। তারা বিজ্ঞানশাস্ত্র আলোচনা করে দেখেছে। তারা বিশ্বের সমস্ত রহস্য উদ্‌ঘাটন করে এমন একটা জায়গায় গিয়ে ঠেকেছে যেখানে সমস্তই কেবল নিয়ম। তারা বলছে ফাঁকি ধরা পড়ে গেছে— দেখছি যা-কিছু সব নিয়মেই চলেছে, এর মধ্যে আনন্দ কোথায়? তারা আমাদের উৎসবের আনন্দরব শুনে দূরে বসে মনে মনে হাসছে।

সূর্য চন্দ্র এমনি ঠিক নিয়মে উঠছে, অস্ত যাচ্ছে, যে, মনে হচ্ছে তারা যেন ভয়ে চলছে, পাছে এক পল-বিপলেরও ত্রুটি ঘটে। বাতাসকে বাইরে থেকে যতই স্বাধীন বলে মনে হয়, যারা ভিতরকার খবর রাখে তারা জানে, ওর মধ্যেও পাগলামি কিছুই নেই— সমস্তই নিয়মে বাঁধা। এমন-কি, পৃথিবীতে সব চেয়ে খামখেয়ালি বলে যাকে মনে হয় সেই মৃত্যু, যার আনাগোনার কোনো খবর পাই নে বলে যাকে হঠাৎ ঘরের দরজার সামনে দেখে আমরা চমকে উঠি, তাকেও জোড় হাতে নিয়ম পালন করে চলতে হয়— একটুও পদস্খলন হবার জো নেই।

মনে কোরো না এই গূঢ় খবরটা কেবল বৈজ্ঞানিকের কাছেই ধরা পড়েছে। তপোবনের ঋষি বলেছেন: ভীষাস্মাদ্‌বাতঃ পবতে। তাঁর ভয়ে, তাঁর নিয়মের অমোঘ শাসনে বাতাস বইছে; বাতাসও মুক্ত নয়। ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ। তাঁর নিয়মের অমোঘ শাসনে কেবল যে অগ্নি চন্দ্র সূর্য চলছে তা নয়, স্বয়ং মৃত্যু, যে কেবল বন্ধন কাটবার জন্যেই আছে, যার নিজের কোনো বন্ধন আছে ব'লে মনেও হয় না, সেও অমোঘ নিয়মকে একান্ত ভয়ে পালন করে চলছে।

তবে তো দেখছি ভয়েই সমস্ত চলছে, কোথাও একটু ফাঁক নেই। তবে আর আনন্দের কথাটা কেন? যেখানে কারখানাঘরে আগাগোড়া কল চলছে সেখানে কোনো পাগল আনন্দের দরবার করতে যায় না।

বাঁশিতে তবু তো আজ আনন্দের সুর উঠেছে, এ কথা তো কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। মানুষকে তো মানুষ এমন করে ডাকে, বলে, চল্ ভাই, আনন্দ করবি চল্। এই নিয়মের রাজ্যে এমন কথাটা তার মুখ দিয়ে বের হয় কেন।

সে দেখতে পাচ্ছে, নিয়মের কঠিন দণ্ড একেবারে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে; কিন্তু তাকে জড়িয়ে জড়িয়ে তাকে আচ্ছন্ন ক'রে যে লতাটি উঠেছে তাতে কি আমরা কোনো ফুল ফুটতে দেখি নি? দেখি নি কি কোথাও শ্রী এবং শান্তি, সৌন্দর্য এবং ঐশ্বর্য? দেখছি নে কি প্রাণের লীলা, গতির নৃত্য, বৈচিত্র্যের অজস্রতা?

বিশ্বের নিয়ম সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকেই চরম রূপে প্রচার করছে না— একটি অনির্বচনীয়ের পরিচয় তাকে চারি দিকে আচ্ছন্ন করে প্রকাশ পাচ্ছে। সেই জন্যেই যে উপনিষৎ একবার বলেছেন 'অমোঘ শাসনের ভয়ে যা-কিছু সমস্ত চলেছে' তিনিই আবার বলেছেন: আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দ থেকেই এই যা-কিছু সমস্ত জন্মাচ্ছে। যিনি আনন্দস্বরূপ, মুক্ত, তিনিই নিয়মের বন্ধনের মধ্য দিয়ে দেশকালে আপনাকে প্রকাশ করছেন।

কবির মুক্ত আনন্দ আপনাকে প্রকাশ করবার বেলায় ছন্দের বাঁধন মানে। কিন্তু, যে লোকের নিজের মনের মধ্যে ভাবের উদ্‌বোধন হয় নি সে বলে, এর মধ্যে আগাগোড়া কেবল ছন্দের ব্যায়ামই দেখছি। সে নিয়ম দেখে, নৈপুণ্য দেখে, কেননা সেইটেই চোখে দেখা যায়; কিন্তু যাকে অন্তর দিয়ে দেখা যায় সেই রসকে সে বোঝে না, সে বলে রস কিছুই নেই। সে মাথা নেড়ে বলছে, সমস্তই যন্ত্র, কেবল বৈজ্ঞানিক নিয়ম।

কিন্তু, ওই-যে কার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ এমন নিতান্ত সহজ সুরে বলে উঠেছে: রসো বৈ সঃ। কবির কাব্যে তিনি যে অনন্ত রস দেখতে পাচ্ছেন। জগতের নিয়ম তো তার কাছে আপনার বন্ধনের রূপ দেখাচ্ছে না। তিনি যে একেবারে নিয়মের চরমকে দেখে আনন্দে বলে উঠেছেন: আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। জগতে তিনি ভয়কে দেখছেন না, আনন্দকেই দেখছেন। সেই জন্যেই বলছেন: আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন। ব্রহ্মের আনন্দকে যিনি সর্বত্র জানতে পেরেছেন তিনি আর কিছুতেই ভয় পান না। এমনি করে জগতে আনন্দকে দেখে প্রত্যক্ষ ভয়কে যিনি একেবারেই অস্বীকার করেছেন তিনিই বলেছেন: মহদ্ ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতৎ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি। এই মহদ্ ভয়কে, এই উদ্যত বজ্রকে যাঁরা জানেন তাঁদের আর মৃত্যুভয় থাকে না।

যারা জেনেছে, ভয়ের মধ্য দিয়েই অভয়, নিয়মের মধ্য দিয়েই আনন্দ আপনাকে

প্রকাশ করেন, তারাই নিয়মকে পার হয়ে চলে গেছে। নিয়মের বন্ধন তাদের পক্ষে নেই যে তা নয়, কিন্তু সে যে আনন্দেরই বন্ধন, সে যে প্রেমিকের পক্ষে প্রিয়তমের ভুজবন্ধনের মতো। তাতে দুঃখ নেই, কোনো দুঃখ নেই। সকল বন্ধনই সে যে খুশি হয়ে গ্রহণ করে, কোনোটাকেই এড়াতে চায় না। কেননা, সমস্ত বন্ধনের মধ্যেই সে যে আনন্দের নিবিড় স্পর্শ উপলব্ধি করতে থাকে। বস্তুত যেখানে নিয়ম নেই, যেখানে উচ্ছৃঙ্খল উন্মত্ততা, সেইখানেই তাকে বাঁধে, তাকে মারে— সেইখানেই অসীমের সঙ্গে বিচ্ছেদ, পাপের যন্ত্রণা। প্রবৃত্তির আকর্ষণে সত্যের সুদৃঢ় নিয়মবন্ধন থেকে যখন সে স্খলিত হয়ে পড়ে তখনই সে মাতার আলিঙ্গনভ্রষ্ট শিশুর মতো কেঁদে উঠে বলে : মা মা হিংসীঃ। আমাকে আঘাত কোরো না। সে বলে, বাঁধো, আমাকে বাঁধো, তোমার নিয়মে আমাকে বাঁধো, অন্তরে বাঁধো, বাহিরে বাঁধো— আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে, আবৃত করে বেঁধে রাখো ; কোথাও কিছু ফাঁক রেখো না, শক্ত করে ধরো ; তোমারই নিয়মের বাহুপাশে বাঁধা পড়ে তোমার আনন্দের সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকি। আমাকে পাপের মৃত্যুবন্ধন থেকে টেনে নিয়ে তুমি দৃঢ় করে রক্ষা করো।

নিয়মকে আনন্দের বিপরীত জ্ঞান করে কেউ কেউ যেমন মাৎলামিকেই আনন্দ বলে ভুল করে তেমনি আমাদের দেশে এমন লোক প্রায় দেখা যায় যাঁরা কর্মকে মুক্তির বিপরীত বলে কল্পনা করেন। তাঁরা মনে করেন কর্ম পদার্থটা স্থূল, ওটা আত্মার পক্ষে বন্ধন।

কিন্তু, এই কথা মনে রাখতে হবে, নিয়মেই যেমন আনন্দের প্রকাশ কর্মেই তেমনি আত্মার মুক্তি। আপনার ভিতরেই আপনার প্রকাশ হতে পারে না বলেই আনন্দ বাহিরের নিয়মকে ইচ্ছা করে, তেমনি আপনার ভিতরেই আপনার মুক্তি হতে পারে না বলেই আত্মা মুক্তির জন্যে বাহিরের কর্মকে চায়। মানুষের আত্মা কর্মেই আপনার ভিতর থেকে আপনাকে মুক্ত করছে ; তাই যদি না হত তা হলে কখনোই সে ইচ্ছা করে কর্ম করত না।

মানুষ যতই কর্ম করছে ততই সে আপনার ভিতরকার অদৃশ্যকে দৃশ্য করে তুলছে, ততই সে আপনার সুদূরবর্তী অনাগতকে এগিয়ে নিয়ে আসছে। এই উপায়ে মানুষ আপনাকে কেবলই স্পষ্ট করে তুলছে— মানুষ আপনার নানা কর্মের মধ্যে, রাষ্ট্রের মধ্যে, সমাজের মধ্যে, আপনাকেই নানা দিক থেকে দেখতে পাচ্ছে।

এই দেখতে পাওয়াই মুক্তি। অন্ধকার মুক্তি নয়, অস্পষ্টতা মুক্তি নয়। অস্পষ্টতার মতো ভয়ংকর বন্ধন নেই। অস্পষ্টতাকে ভেদ করে উঠবার জন্যেই বীজের মধ্যে অঙ্কুরের চেষ্টা, কুঁড়ির মধ্যে ফুলের প্রয়াস। অস্পষ্টতার আবরণকে ভেদ করে সুপরিস্ফুট হবার জন্যেই আমাদের চিত্তের ভিতরকার ভাবরাশি বাইরে আকার-

গ্রহণের উপলক্ষ্য খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমাদের আত্মাও অনির্দিষ্টতার কুহেলিকা থেকে আপনাকে মুক্ত করে বাইরে আনবার জন্যেই কেবলই কর্ম সৃষ্টি করছে। যে কর্মে তার কোনো প্রয়োজনই নেই, যা তার জীবনযাত্রার পক্ষে আবশ্যক নয়, তাকেও কেবলই সে তৈরি করে তুলছে। কেননা, সে মুক্তি চায়। সে আপনার অন্তরাচ্ছাদন থেকে মুক্তি চায়, সে আপনার অরূপের আবরণ থেকে মুক্তি চায়। সে আপনাকে দেখতে চায়, পেতে চায়। ঝোপঝাড় কেটে সে যখন বাগান তৈরি করে তখন কুরূপতার মধ্য থেকে সে যে সৌন্দর্যকে মুক্ত করে তোলে সে তার নিজেরই ভিতরকার সৌন্দর্য— বাইরে তাকে মুক্তি দিতে না পারলে অন্তরেও সে মুক্তি পায় না। সমাজের যথেচ্ছাচারের মধ্যে সুনিয়ম স্থাপন করে অকল্যাণের বাধার ভিতর থেকে যে কল্যাণকে সে মুক্তি দান করে সে তারই নিজের ভিতরকার কল্যাণ— বাইরে তাকে মুক্তি দিতে না পারলে অন্তরেও সে মুক্তিলাভ করে না। এমনি করে মানুষ নিজের শক্তিকে, সৌন্দর্যকে, মঙ্গলকে, নিজের আত্মাকে, নানাবিধ কর্মের ভিতরে কেবলই বন্ধনমুক্ত করে দিচ্ছে। যতই তাই করছে ততই আপনাকে মহৎ করে দেখতে পাচ্ছে; ততই তার আত্মপরিচয় বিস্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

উপনিষৎ বলেছেন : কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ। কর্ম করতে করতেই শত বৎসর বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করবে। যাঁরা আত্মার আনন্দকে প্রচুররূপে উপলব্ধি করেছেন এ হচ্ছে তাঁদেরই বাণী। যাঁরা আত্মাকে পরিপূর্ণ করে জেনেছেন তাঁরা কোনোদিন দুর্বল মুহ্যমানভাবে বলেন না— জীবন দুঃখময় এবং কর্ম কেবলই বন্ধন। দুর্বল ফুল যেমন বোঁটাকে আল্‌গা করে ধরে এবং ফল ফলবার পূর্বেই খসে যায় তাঁরা তেমন নন। জীবনকে তাঁরা খুব শক্ত করে ধরেন এবং বলেন, আমি ফল না ফলিয়ে কিছুতেই ছাড়ছি নে। তাঁরা সংসারের মধ্যে কর্মের মধ্যে আনন্দে আপনাকে প্রবলভাবে প্রকাশ করবার জন্যে ইচ্ছা করেন। দুঃখ তাপ তাঁদের অবসন্ন করে না, নিজের হৃদয়ের ভারে তাঁরা ধূলিশায়ী হয়ে পড়েন না। সুখ দুঃখ সমস্তের মধ্য দিয়েই তাঁরা আত্মার মাহাত্ম্যকে উত্তরোত্তর উদ্‌ঘাটিত করে আপনাকে দেখেন এবং আপনাকে দেখিয়ে বিজয়ী বীরের মতো সংসারের ভিতর দিয়ে মাথা তুলে চলে যান। বিশ্বজগতে যে শক্তির আনন্দ নিরন্তর ভাঙাগড়ার মধ্যে লীলা করছে— তারই নৃত্যের ছন্দ তাঁদের জীবনের লীলার সঙ্গে তালে তালে মিলে যেতে থাকে; তাঁদের জীবনের আনন্দের সঙ্গে সূর্যালোকের আনন্দ, মুক্ত সমীরণের আনন্দ, সুর মিলিয়ে দিয়ে অন্তর-বাহিরকে সুধাময় করে তোলে। তাঁরাই বলেন : কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ। কাজ করতে করতেই শত বৎসর বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করবে।

মানুষের মধ্যে এই-যে জীবনের আনন্দ, এই-যে কর্মের আনন্দ আছে, এ অত্যন্ত সত্য। এ কথা বলতে পারব না এ আমাদের মোহ, এ কথা বলতে পারব না যে একে ত্যাগ না করলে আমরা ধর্মসাধনার পথে প্রবেশ করতে পারব না। ধর্মসাধনার সঙ্গে মানুষের কর্মজগতের বিচ্ছেদ ঘটানো কখনোই মঙ্গল নয়। বিশ্বমানবের নিরন্তর কর্মচেষ্টাকে তার ইতিহাসের বিরাট ক্ষেত্রে একবার সত্যদৃষ্টিতে দেখো। যদি তা দেখ তা হলে কর্মকে কি কেবল দুঃখের রূপেই দেখা সম্ভব হবে। তা হলে আমরা দেখতে পাব কর্মের দুঃখকে মানুষ বহন করছে এ কথা তেমন সত্য নয় যেমন সত্য কর্মই মানুষের বহু দুঃখ বহন করছে, বহু ভার লাঘব করছে। কর্মের স্রোত প্রতিদিন আমাদের অনেক বিপদ ঠেলে ফেলছে, অনেক বিকৃতি ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ কথা সত্য নয় যে মানুষ দায়ে পড়ে কর্ম করছে— তার এক দিকে দায় আছে, আর-এক দিকে সুখও আছে; কর্ম এক দিকে অভাবের তাড়নায়, আর-এক দিকে স্বভাবের পরিতৃপ্তিতে। এই জন্যেই মানুষ যতই সভ্যতার বিকাশ করছে ততই আপনার নূতন নূতন দায় কেবল বাড়িয়েই চলেছে, ততই নূতন নূতন কর্মকে সে ইচ্ছা করেই সৃষ্টি করছে। প্রকৃতি জোর করে আমাদের কতকগুলো কাজ করিয়ে সচেতন করে রেখেছে, নানা ক্ষুধাতৃষ্ণার তাড়নায় আমাদের যথেষ্ট খাটিয়ে মারছে। কিন্তু, আমাদের মনুষ্যত্বের তাতেও কুলিয়ে উঠল না। পশুপক্ষীর সঙ্গে সমান হয়ে প্রকৃতির ক্ষেত্রে তাকে যে কাজ করতে হচ্ছে তাতেই সে চুপ করে থাকতে পারলে না; কাজের ভিতর দিয়ে ইচ্ছা করেই সে সবাইকে ছাড়িয়ে যেতে চায়। মানুষের মতো কাজ কোনো জীবকে করতে হয় না। আপনার সমাজের একটি অতি বৃহৎ কাজের ক্ষেত্র তাকে নিজে তৈরি করতে হয়েছে। এখানে কত কাল থেকে সে কত ভাঙছে গড়ছে, কত নিয়ম বাঁধছে কত নিয়ম ছিন্ন করে দিচ্ছে, কত পাথর কাটছে কত পাথর গাঁথছে, কত ভাবছে কত খুঁজছে কত কাঁদছে। এই ক্ষেত্রেই তার সকলের চেয়ে বড়ো বড়ো লড়াই লড়া হয়ে গেছে। এইখানেই সে নব নব জীবন লাভ করেছে। এইখানেই তার মৃত্যু পরম গৌরবময়। এইখানে সে দুঃখকে এড়াতে চায় নি, নূতন নূতন দুঃখকে স্বীকার করেছে। এইখানেই মানুষ সেই মহৎতত্ত্বটি আবিষ্কার করেছে যে, উপস্থিত যা তার চারি দিকেই আছে সেই পিঞ্জরটার মধ্যেই মানুষ সম্পূর্ণ নয়, মানুষ আপনার বর্তমানের চেয়ে অনেক বড়ো— এই জন্যে কোনো-একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে তার আরাম হতে পারে, কিন্তু তার চরিতার্থতা তাতে একেবারে বিনষ্ট হয়। সেই মহতী বিনষ্টিকে মানুষ সহ্য করতে পারে না। এইজন্যই, তার বর্তমানকে ভেদ করে বড়ো হবার জন্যই, এখনও সে যা হয়ে ওঠে নি তাই হতে পারবার জন্যেই, মানুষকে কেবলই বারবার

দুঃখ পেতে হচ্ছে। সেই দুঃখের মধ্যেই মানুষের গৌরব। এই কথা মনে রেখে, মানুষ আপনার কর্মক্ষেত্রকে সংকুচিত করে নি, কেবলই তাকে প্রসারিত করেই চলেছে। অনেক সময় এত দূর পর্যন্ত গিয়ে পড়েছে যে কর্মের সার্থকতাকে বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছে, কর্মের-স্রোতে-বাহিত আবর্জনার দ্বারা প্রতিহত হয়ে মানবচিত্ত এক-একটা কেন্দ্রের চার দিকে ভয়ংকর আবর্ত রচনা করছে— স্বার্থের আবর্ত, সাম্রাজ্যের আবর্ত, ক্ষমতাভিমানের আবর্ত। কিন্তু, তবু যতক্ষণ গতিবেগ আছে ততক্ষণ ভয় নেই ; সংকীর্ণতার বাধা সেই গতির মুখে ক্রমশই কেটে যায়, কাজের বেগই কাজের ভুলকে সংশোধন করে। কারণ, চিত্ত অচল জড়তার মধ্যে নিদ্রিত হয়ে পড়লেই তার শত্রু প্রবল হয়ে ওঠে, বিনাশের সঙ্গে আর সে লড়াই করে উঠতে পারে না। বেঁচে থেকে কর্ম করতে হবে, কর্ম করে বেঁচে থাকতে হবে, এই অনুশাসন আমরা শুনেছি। কর্ম করা এবং বাঁচা, এই দুয়ের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য যোগ আছে।

প্রাণের লক্ষণই হচ্ছে এই যে, আপনার ভিতরটাতেই তার আপনার সীমা নেই, তাকে বাইরে আসতেই হবে। তার সত্য— অন্তর এবং বাহিরের যোগে। দেহকে বেঁচে থাকতে হয় বলেই বাইরের আলো, বাইরের বাতাস, বাইরের অন্নজলের সঙ্গে তাকে নানা যোগ রাখতে হয়। শুধু প্রাণশক্তিকে নেবার জন্যে নয়, তাকে দান করবার জন্যেও বাইরেকে দরকার। এই দেখো-না কেন, শরীরকে তো নিজের ভিতরের কাজ যথেষ্টই করতে হয় ; এক নিমেষও তার হৃৎপিণ্ড থেমে থাকে না, তার মস্তিষ্ক তার পাকযন্ত্রের কাজের অন্ত নেই ; তবু দেহটা নিজের ভিতরকার এই অসংখ্য প্রাণের কাজ করেও স্থির থাকতে পারে না— তার প্রাণই তাকে বাইরের নানা কাজে এবং নানা খেলায় ছুটিয়ে বেড়ায়। কেবলমাত্র ভিতরের রক্তচলাচলেই তার তুষ্টি নেই, নানা প্রকারে বাইরের চলাচলে তার আনন্দ সম্পূর্ণ হয়।

আমাদের চিত্তেরও সেই দশা। কেবলমাত্র আপনার ভিতরের কল্পনা ভাবনা নিয়ে তার চলে না। বাইরের বিষয়কে সর্বদাই তার চাই— কেবল নিজের চেতনাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে নয়, নিজেকে প্রয়োগ করবার জন্যে, দেবার জন্যে এবং নেবার জন্যে।

আসল কথা, যিনি সত্যস্বরূপ সেই ব্রহ্মকে ভাগ করতে গেলেই আমরা বাঁচি নে। তাঁকে অন্তরেও যেমন আশ্রয় করতে হবে বাইরেও তেমনি আশ্রয় করতে হবে। তাঁকে যে দিকে ত্যাগ করব সেই দিকে নিজেকেই বঞ্চিত করব। মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ। ব্রহ্ম আমাকে ত্যাগ করেন নি, আমি যেন ব্রহ্মকে ত্যাগ না করি। তিনি আমাকে বাহিরে ধরে রেখেছেন। তিনি আমাকে অন্তরেও জাগিয়ে রেখেছেন।

আমরা যদি এমন কথা বলি যে, তাঁকে কেবল অন্তরের ধ্যানে পাব, বাইরের কর্ম থেকে তাঁকে বাদ দেব— কেবল হৃদয়ের প্রেমের দ্বারা তাঁকে ভোগ করব, বাইরের সেবার দ্বারা তাঁর পূজা করব না— কিম্বা একেবারে এর উল্টো কথাটাই বলি, এবং এই ব'লে জীবনের সাধনাকে যদি কেবল এক দিকেই ভারগ্রস্ত করে তুলি তা হলে প্রমত্ত হয়ে আমাদের পতন ঘটবে।

আমরা পশ্চিম মহাদেশে দেখছি সেখানে মানুষের চিত্ত প্রধানত বাহিরেই আপনাকে বিকীর্ণ করতে বসেছে। শক্তির ক্ষেত্রই তার ক্ষেত্র। ব্যাপ্তির রাজ্যেই সে একান্ত ঝুঁকে পড়েছে, মানুষের অন্তরের মধ্যে যেখানে সমাপ্তির রাজ্য সে জায়গাটাকে সে পরিত্যাগ করবার চেষ্টায় আছে, তাকে সে ভালো করে বিশ্বাসই করে না। এত দূর পর্যন্ত গেছে যে সমাপ্তির পূর্ণতাকে সে কোনো জায়গাতেই দেখতে পায় না। যেমন বিজ্ঞান বলছে বিশ্বজগৎ কেবলই পরিণতির অন্তহীন পথে চলেছে, তেমনি য়ুরোপ আজকাল বলতে আরম্ভ করেছে— জগতের ঈশ্বরও ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠছেন। তিনি যে নিজে হয়ে আছেন এ তারা মানতে চায় না, তিনি নিজেকে করে তুলছেন এই তাদের কথা।

ব্রহ্মের এক দিকে ব্যাপ্তি, আর-এক দিকে সমাপ্তি ; এক দিকে পরিণতি, আর-এক দিকে পরিপূর্ণতা ; এক দিকে ভাব, আর-এক দিকে প্রকাশ— দুই একসঙ্গে গান এবং গান-গাওয়ার মতো অবিচ্ছিন্ন মিলিয়ে আছে এটা তারা দেখতে পাচ্ছে না। এ যেন গায়কের অন্তঃকরণকে স্বীকার না করে বলা যে 'গান কোনো জায়গাতেই নেই— কেবলমাত্র গেয়ে যাওয়াই আছে'। কেননা, আমরা যে গেয়ে যাওয়াটাকেই দেখছি, কোনো সময়েই তো সম্পূর্ণ গানটাকে একসঙ্গে দেখছি নে— কিন্তু, তাই বলে কি এটা জানি নে যে সম্পূর্ণ গান চিত্তের মধ্যে আছে ?

এমনি করে কেবলমাত্র ক'রে-যাওয়া চলে-যাওয়ার দিকটাতেই চিত্তকে ঝুঁকে পড়তে দেওয়াতে পাশ্চাত্য জগতে আমরা একটা শক্তির উন্মত্ততা দেখতে পাই। তারা সমস্তকেই জোর করে কেড়ে নেবে, আঁকড়ে ধরবে, এই পণ করে বসে আছে। তারা কেবলই করবে, কোথাও এসে থামবে না, এই তাদের জিদ। জীবনের কোনো জায়গাতেই তারা মৃত্যুর সহজ স্থানটিকে স্বীকার করে না। সমাপ্তিকে তারা সুন্দর বলে দেখতে জানে না।

আমাদের দেশে ঠিক এর উল্টো দিকে বিপদ। আমরা চিত্তের ভিতরের দিকটাতেই ঝুঁকে পড়েছি। শক্তির দিককে, ব্যাপ্তির দিককে, আমরা গাল দিয়ে পরিত্যাগ করতে চাই। ব্রহ্মকে ধ্যানের মধ্যে কেবল পরিসমাপ্তির দিক দিয়েই

দেখব, তাঁকে বিশ্বব্যাপারে নিত্য পরিণতির দিক দিয়ে দেখব' না, এই আমাদের পণ। এইজন্য আমাদের দেশে সাধকদের মধ্যে আধ্যাত্মিক উন্মত্ততার দুর্গতি প্রায়ই দেখতে পাই। আমাদের বিশ্বাস কোনো নিয়মকে মানে না, আমাদের কল্পনার কিছুতেই বাধা নেই, আমাদের আচারকে কোনোপ্রকার যুক্তির কাছে কিছুমাত্র জবাবদিহি করতে হয় না। আমাদের জ্ঞান বিশ্বপদার্থ থেকে ব্রহ্মকে অবচ্ছিন্ন করে দেখবার ব্যর্থ প্রয়াস করতে করতে শুকিয়ে পাথর হয়ে যায়, আমাদের হৃদয় কেবলমাত্র আপনার হৃদয়াবেগের মধ্যেই ভগবানকে অবরুদ্ধ করে ভোগ করবার চেষ্টায় রসোন্মত্ততায় মূর্ছিত হয়ে পড়তে থাকে। শক্তির ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞান বিশ্বনিয়মের সঙ্গে কোনো কারবার রাখতে চায় না, স্থাণু হয়ে বসে আপনাকে আপনিই নিরীক্ষণ করতে চায়; আমাদের হৃদয়াবেগ বিশ্বসেবার মধ্যে ভগবৎপ্রেমকে আকার দান করতে চায় না, কেবল অশ্রুজলে আপনার অঙ্গনে ধুলোয় লুটোপুটি করতে ইচ্ছা করে। এতে যে আমাদের মনুষ্যত্বের কত দূর বিকৃতি ও দুর্বলতা ঘটে তা ওজন করে দেখবার কোনো উপায়ও আমাদের ত্রিসীমানায় রাখি নি। আমাদের যে দাঁড়িপাল্লা অন্তর-বাহিরের সমস্ত সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলেছে তাই দিয়েই আমরা আমাদের ধর্মকর্ম ইতিহাস-পুরাণ সমাজ-সভ্যতা সমস্তকে ওজন করে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকি, আর-কোনো প্রকার ওজনের সঙ্গে মিলিয়ে নিখুঁতভাবে সত্য নির্ণয় করবার কোনো দরকারই দেখি নে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা অন্তর-বাহিরের যোগে অপ্রমত্ত। সত্যের এক দিকে নিয়ম, এক দিকে আনন্দ। তার এক দিকে ধ্বনিত হচ্ছে: ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি। আর-এক দিকে ধ্বনিত হচ্ছে: আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। এক দিকে বন্ধনকে না মানলে অন্য দিকে মুক্তিকে পাবার জো নেই। ব্রহ্ম এক দিকে আপনার সত্যের দ্বারা বদ্ধ, আর-এক দিকে আপনার আনন্দের দ্বারা মুক্ত। আমরাও সত্যের বন্ধনকে যখন সম্পূর্ণ স্বীকার করি তখনই মুক্তির আনন্দকে সম্পূর্ণ লাভ করি।

সে কেমনতরো? যেমন সেতারে তার বাঁধা। সেতারের তার যখন একেবারে ঠিক সত্য করে বাঁধা হয়, সেই বন্ধনে স্বরতত্ত্বের নিয়মের যখন লেশমাত্র স্খলন না হয়, তখন সেই তারে গান বাজে এবং সেই গানের সুরের মধ্যেই সেতারের তার আপনাকে আপনি ছাড়িয়ে যায়, সে মুক্তি লাভ করতে থাকে। এক দিকে সে নিয়মের মধ্যে অবিচলিতভাবে বাঁধা পড়েছে বলেই অন্য দিকে সে সংগীতের মধ্যে উদারভাবে উন্মুক্ত হতে পেরেছে। যতক্ষণ এই তার ঠিক সত্য হয়ে বাঁধা হয় নি ততক্ষণ সে কেবলমাত্রই বন্ধন, বন্ধন ছাড়া আর-কিছুই নয়। কিন্তু, তাই বলে এই তার খুলে ফেলাকেই মুক্তি বলে না। সাধনার কঠিন নিয়মে ক্রমশই তাকে সত্যে বেঁধে তুলতে

পারলেই সে বদ্ধ থেকেও এবং বদ্ধ থাকাতেই পরিপূর্ণ সার্থকতার মধ্যে মুক্তিলাভ করে।

আমাদের জীবনের বীণাতেও কর্মের সরু মোটা তারগুলি ততক্ষণ কেবলমাত্র বন্ধন যতক্ষণ তাদের সত্যের নিয়মে ধ্রুব করে না বেঁধে তুলতে পারি। কিন্তু, তাই বলে এই তারগুলিকে খুলে ফেলে দিয়ে শূন্যতার মধ্যে, ব্যর্থতার মধ্যে, নিষ্ক্রিয়তা-লাভকে মুক্তিলাভ বলে না।

তাই বলছিলুম কর্মকে ত্যাগ করা নয়, কিন্তু আমাদের প্রতিদিনের কর্মকেই চির-দিনের সুরে ক্রমশ বেঁধে তোলবার সাধনাই হচ্ছে সত্যের সাধনা, ধর্মের সাধনা। এই সাধনারই মন্ত্র হচ্ছে: যদ্‌যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ। যে যে কর্ম করবে সমস্তই ব্রহ্মকে সমর্পণ করবে। অর্থাৎ, সমস্ত কর্মের দ্বারা আত্মা আপনাকে ব্রহ্মে নিবেদন করতে থাকবে। অনন্তের কাছে নিত্য এই নিবেদন করাই আত্মার গান, এই হচ্ছে আত্মার মুক্তি। তখন কী আনন্দ যখন সকল কর্মই ব্রহ্মের সঙ্গে যোগের পথ, কর্ম যখন আমাদের নিজের প্রবৃত্তির কাছেই ফিরে ফিরে না আসে, কর্মে যখন আমাদের আত্মসমর্পণ প্রতিদিন একান্ত হয়ে ওঠে— সেই পূর্ণতা, সেই মুক্তি, সেই স্বর্গ— তখন সংসারই তো আনন্দনিকেতন।

কর্মের মধ্যে মানুষের এই-যে বিরাট আত্মপ্রকাশ, অনন্তের কাছে তার এই-যে নিরন্তর আত্মনিবেদন, ঘরের কোণে বসে একে কে অবজ্ঞা করতে চায়! সমস্ত মানুষে মিলে রৌদ্রে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে কালে কালে মানবমাহাত্ম্যের যে অভ্রভেদী মন্দির রচনা করছে কে মনে করে সেই সুমহৎ সৃষ্টিব্যাপার থেকে সুদূরে পালিয়ে গিয়ে নিভৃতে বসে আপনার মনে কোনো-একটা ভাবরসসম্ভোগই মানুষের সঙ্গে ভগবানের মিলন, এবং সেই সাধনাই ধর্মের চরম সাধনা! ওরে উদাসীন, ওরে আপনার মাদকতায় বিভোর বিহ্বল সন্ন্যাসী, এখনই শুনতে কি পাচ্ছ না ইতিহাসের সুদূরপ্রসারিত ক্ষেত্রে মনুষ্যত্বের প্রশস্ত রাজপথে মানবাত্মা চলেছে, চলেছে মেঘমন্দ্রগর্জনে আপনার কর্মের বিজয়রথে, চলেছে বিশ্বের মধ্যে আপনার অধিকারকে বিস্তীর্ণ করতে। তার সেই আকাশে আন্দোলিত জয়পতাকার সম্মুখে পর্বতের প্রস্তররাশি বিদীর্ণ হয়ে গিয়ে পথ ছেড়ে দিচ্ছে; বন-জঙ্গলের ঘনছায়াচ্ছন্ন জটিল চক্রান্ত সূর্যালোকের আঘাতে কুহেলিকার মতো তার সম্মুখে দেখতে দেখতে কোথায় অন্তর্ধান করছে; অসুখ অস্বাস্থ্য অব্যবস্থা পদে পদে পিছিয়ে গিয়ে প্রতিদিন তাকে স্থান ছেড়ে দিচ্ছে; অজ্ঞতার বাধাকে সে পরাভূত করছে, অন্ধতার অন্ধকারকে সে বিদীর্ণ করে ফেলছে। তার চারি দিকে দেখতে দেখতে শ্রীসম্পদ কাব্যকলা জ্ঞানধর্মের আনন্দলোক উদ্‌ঘাটিত হয়ে যাচ্ছে।

বিপুল ইতিহাসের দুর্গম দুরত্যয় পথে মানবাত্মার এই-যে বিজয়রথ অহোরাত্র পৃথিবীকে কম্পান্বিত করে চলেছে তুমি কি অসাড় হয়ে চোখ বুজে বলতে চাও তার কেউ সারথি নেই? তাকে কেউ কোনো মহৎ সার্থকতার দিকে চালনা করে নিয়ে যাচ্ছে না? এইখানেই, এই মহৎ সুখদুঃখ বিপৎসম্পদের পথেই কি রথীর সঙ্গে সারথির যথার্থ মিলন ঘটছে না? রথ চলেছে, শ্রাবণের অমারাত্রির দুর্যোগও সেই সারথির অনিমেষ নেত্রকে আচ্ছন্ন করতে পারছে না, মধ্যাহ্নসূর্যের প্রখর আলোকেও তাঁর ধ্রুবদৃষ্টি প্রতিহত হচ্ছে না; আলোকে অন্ধকারে চলেছে রথ, আলোকে অন্ধকারে মিলন রথীর সঙ্গে সেই সারথির— চলতে চলতে মিলন, পথের মধ্যে মিলন, উঠবার সময় মিলন, নামবার সময় মিলন, রথীর সঙ্গে সারথির। ওরে, কে সেই নিত্য মিলনকে অগ্রাহ্য করতে চায়! তিনি যেখানে চালাতে চান কে সেখানে চলতে চায় না! কে বলতে চায় আমি মানুষের ইতিহাসের ক্ষেত্র থেকে সুদূরে পালিয়ে গিয়ে নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে, নিশ্চেষ্টতার মধ্যে একলা পড়ে থেকে তাঁর সঙ্গে মিলব। কে বলতে চায় এই-সমস্তই মিথ্যা— এই বৃহৎ সংসার, এই নিত্যবিকাশমান মানুষের সভ্যতা, অন্তর-বাহিরের সমস্ত বাধাকে ভেদ করে আপনার সকল প্রকার শক্তিকে জয়যুক্ত করবার জন্যে মানুষের এই চিরদিনের চেষ্টা, এই পরমদুঃখের এবং পরমসুখের সাধনা। যে লোক এ-সমস্তকেই মিথ্যা বলে কত বড়ো মিথ্যা তার চিত্তকে আক্রমণ করেছে! এত বড়ো বৃহৎ সংসারকে এত বড়ো ফাঁকি বলে যে মনে করে সে কি সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে সত্যই বিশ্বাস করে! যে মনে করে পালিয়ে গিয়ে তাঁকে পাওয়া যায় সে কবে তাঁকে পাবে, কোথায় তাঁকে পাবে, পালিয়ে কত দূরে সে যাবে, পালাতে পালাতে একেবারে শূন্যতার মধ্যে গিয়ে পৌঁছবে এমন সাধ্য তার আছে কি! তা নয়— ভীরু যে, পালাতে যে চায়, সে কোথাও তাঁকে পায় না। সাহস করে বলতে হবে এই-যে তাঁকে পাচ্ছি, এই-যে এখনই, এই-যে এখানেই। বারবার বলতে হবে আমার প্রত্যেক কর্মের মধ্যে আমি যেমন আপনাকে পাচ্ছি তেমনি আমার আপনার মধ্যে যিনি আপনি তাঁকে পাচ্ছি। কর্মের মধ্যে আমার যা-কিছু বাধা, যা-কিছু বেসুর, যা-কিছু জড়তা, যা-কিছু অব্যবস্থা, সমস্তকেই আমার শক্তির দ্বারা সাধনার দ্বারা দূর করে দিয়ে এই কথাটি অসংকোচে বলবার অধিকারটি আমাদের লাভ করতে হবে যে, কর্মে আমার আনন্দ, সেই আনন্দেই আমার আনন্দময় বিরাজ করছেন।

উপনিষদে 'ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ' ব্রহ্মবিৎদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাকে বলেছেন? আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ। পরমাত্মায় যাঁর আনন্দ, পরমাত্মায় যাঁর ক্রীড়া এবং যিনি ক্রিয়াবান্ তিনিই ব্রহ্মবিৎদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আনন্দ আছে অথচ

সেই আনন্দের ক্রীড়া নেই, এ কখনো হতেই পারে না— সেই ক্রীড়া নিষ্ক্রিয় নয়— সেই ক্রীড়াই হচ্ছে কর্ম। ব্রহ্মে যাঁর আনন্দ তিনি কর্ম না হলে বাঁচবেন কী করে? কারণ, তাঁকে এমন কর্ম করতেই হবে যে কর্মে সেই ব্রহ্মের আনন্দ আকার ধারণ করে বাহিরে প্রকাশমান হয়ে ওঠে। এইজন্য যিনি ব্রহ্মবিৎ, অর্থাৎ জ্ঞানে যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি আত্মরতিঃ, পরমাত্মাতেই তাঁর আনন্দ, এবং তিনি আত্মক্রীড়ঃ, তাঁর সকল কাজই হচ্ছে পরমাত্মার মধ্যে— তাঁর খেলা, তাঁর স্নান-আহার, তাঁর জীবিকা-অর্জন, তাঁর পরহিতসাধন, সমস্তই হচ্ছে পরমাত্মার মধ্যে তাঁর বিহার। তিনি ক্রিয়াবান্, ব্রহ্মের যে আনন্দ তিনি ভোগ করেন তাকে কর্মে প্রকাশ না করে তিনি থাকতে পারেন না। কবির আনন্দ কাব্যে, শিল্পীর আনন্দ শিল্পে, বীরের আনন্দ শক্তির প্রতিষ্ঠায়, জ্ঞানীর আনন্দ তত্ত্বাবিষ্কারে যেমন আপনাকে কেবলই কর্ম আকারে প্রকাশ করতে যাচ্ছে ব্রহ্মবিদের আনন্দ তেমনি জীবনে ছোটো বড়ো সকল কাজেই সত্যের দ্বারা, সৌন্দর্যের দ্বারা, শৃঙ্খলার দ্বারা, মঙ্গলের দ্বারা, অসীমকেই প্রকাশ করতে চেষ্টা করে।

ব্রহ্মও তো আপনার আনন্দকে তেমনি করেই প্রকাশ করছেন; তিনি 'বহুধাশক্তি-যোগাৎ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি'। তিনি আপনার বহুধা শক্তির যোগে নানা জাতির নানা অন্তর্নিহিত প্রয়োজন সাধন করছেন। সেই অন্তর্নিহিত প্রয়োজন তো তিনি নিজেই, তাই তিনি আপনাকে নানা শক্তির ধারায় কেবলই নানা আকারে দান করছেন। কাজ করছেন, তিনি কাজ করছেন— নইলে আপনাকে তিনি দিতে পারবেন কী করে। তাঁর আনন্দ আপনাকে কেবলই উৎসর্গ করছে, সেই তো তাঁর সৃষ্টি।

আমাদেরও সার্থকতা ওইখানে, ওইখানেই ব্রহ্মের সঙ্গে মিল আছে। বহুধাশক্তি-যোগে আমাদেরও আপনাকে কেবলই দান করতে হবে। বেদে তাঁকে 'আত্মদা বলদা' বলেছে; তিনি যে কেবল আপনাকে দিচ্ছেন তা নয়, তিনি আমাদের সেই বল দিচ্ছেন যাতে করে আমরাও তাঁর মতো আপনাকে দিতে পারি। সেইজন্যে, বহুধা শক্তির যোগে যিনি আমাদের প্রয়োজন মেটাচ্ছেন ঋষি তাঁরই কাছে প্রার্থনা করছেন : স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু। তিনি যেন আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো প্রয়োজনটা মেটান, আমাদের সঙ্গে শুভবুদ্ধির যোগ সাধন করেন। অর্থাৎ শুধু এ হলে চলবে না যে, তাঁর শক্তিযোগে তিনি কেবল আপনি কর্ম করে আমাদের অভাব মোচন করবেন; আমাদের শুভবুদ্ধি দিন, তা হলে আমরাও তাঁর সঙ্গে মিলে কাজ করতে দাঁড়াব, তা হলেই তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগ সম্পূর্ণ হবে। শুভবুদ্ধি হচ্ছে সেই

বুদ্ধি যাতে সকলের স্বার্থকে আমারই নিহিতার্থ বলে জানি, সেই বুদ্ধি যাতে সকলের কর্মে আপন বহুধা শক্তি প্রয়োগ করাতেই আমার আনন্দ। এই শুভবুদ্ধিতে যখন আমরা কাজ করি তখন আমাদের কর্ম নিয়মবদ্ধ কর্ম, কিন্তু যন্ত্রচালিতের কর্ম নয়— আত্মার তৃপ্তিকর কর্ম, কিন্তু অভাবতাড়িতের কর্ম নয়— তখন আমাদের কর্ম দশের অন্ধ অনুকরণ নয়, লোকাচারের ভীরু অনুবর্তন নয়। তখন, যেমন আমরা দেখছি 'বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ', বিশ্বের সমস্ত কর্ম তাঁতেই আরম্ভ হচ্ছে এবং তাঁতেই এসে সমাপ্ত হচ্ছে, তেমনি দেখতে পাব আমার সমস্ত কর্মের আরম্ভে তিনি এবং পরিণামেও তিনি— তাই আমার সকল কর্মই শান্তিময়, কল্যাণময়, আনন্দময়।

উপনিষৎ বলেন তাঁর 'স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ'। তাঁর জ্ঞান শক্তি এবং কর্ম স্বাভাবিক। তাঁর পরমা শক্তি আপন স্বভাবেই কাজ করছে। আনন্দই তাঁর কাজ, কাজই তাঁর আনন্দ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য ক্রিয়াই তাঁর আনন্দের গতি।

কিন্তু সেই স্বাভাবিকতা আমাদের জন্মায় নি বলেই কাজের সঙ্গে আনন্দকে আমরা ভাগ করে ফেলেছি। কাজের দিন আমাদের আনন্দের দিন নয়, আনন্দ করতে যেদিন চাই সেদিন আমাদের ছুটি নিতে হয়। কেননা হতভাগ্য আমরা, কাজের ভিতরেই আমরা ছুটি পাই নে। প্রবাহিত হওয়ার মধ্যেই নদী ছুটি পায়, শিখারূপে জ্বলে ওঠার মধ্যেই আগুন ছুটি পায়, বাতাসে বিস্তীর্ণ হওয়ার মধ্যেই ফুলের গন্ধ ছুটি পায়— আপনার সমস্ত কর্মের মধ্যেই আমরা তেমন করে ছুটি পাই নে। কর্মের মধ্য দিয়ে আপনাকে ছেড়ে দিই নে ব'লে, দান করি নে ব'লে কর্ম আমাদের চেপে রাখে। কিন্তু, হে আত্মদা, বিশ্বের কর্মে তোমার আনন্দমূর্তি প্রত্যক্ষ করে কর্মের ভিতর দিয়ে আমাদের আত্মা আগুনের মতো তোমার দিকেই জ্বলে উঠুক, নদীর মতো তোমার অভিমুখেই প্রবাহিত হোক, ফুলের গন্ধের মতো তোমার মধ্যেই বিস্তীর্ণ হতে থাক্‌। জীবনকে তার সমস্ত সুখ-দুঃখ, সমস্ত ক্ষয়-পূরণ, সমস্ত উত্থান-পতনের মধ্য দিয়েও পরিপূর্ণ করে ভালোবাসতে পারি এমন বীর্য তুমি আমাদের মধ্যে দাও। তোমার এই বিশ্বকে পূর্ণশক্তিতে দেখি, পূর্ণশক্তিতে শুনি, পূর্ণশক্তিতে এখানে কাজ করি। জীবনে সুখ নেই ব'লে, হে জীবিতেশ্বর, তোমাকে অপবাদ দেব না। যে জীবন তুমি আমাকে দিয়েছ এই জীবনে পরিপূর্ণ করে আমি বাঁচব, বীরের মতো একে আমি গ্রহণ করব এবং দান করব, এই তোমার কাছে প্রার্থনা। দুর্বল চিত্তের সেই কল্পনাকে একেবারে দূর করে দিই যে কল্পনা সমস্ত কর্ম থেকে বিযুক্ত একটা আধারহীন আকারহীন বাস্তবতাহীন পদার্থকে ব্রহ্মানন্দ বলে মনে করে। কর্মক্ষেত্রে মধ্যাহ্নসূর্যালোকে তোমার আনন্দরূপকে প্রকাশমান দেখে হাটে ঘাটে মাঠে বাজারে সর্বত্র যেন তোমার

জয়ধ্বনি করতে পারি। মাঠের মধ্যে কঠোর পরিশ্রমে কঠিন মাটি ভেঙে যেখানে চাষা চাষ করছে সেইখানেই তোমার আনন্দ শ্যামল শস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে; যেখানেই জলাজঙ্গল গর্তগাড়িকে সরিয়ে ফেলে মানুষ আপনার বাসভূমিকে পরিচ্ছন্ন করে তুলছে সেইখানেই পারিপাট্যের মধ্যে তোমার আনন্দ প্রকাশিত হয়ে পড়ছে; যেখানে স্বদেশের অভাব দূর করবার জন্যে মানুষ অশ্রান্ত কর্মের মধ্যে আপনাকে অজস্র দান করছে সেইখানেই শ্রীসম্পদে তোমার আনন্দ বিস্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। যেখানে মানুষের জীবনের আনন্দ চিত্তের আনন্দ কেবলই কর্মের রূপ ধারণ করতে চেষ্টা করছে সেখানে সে মহৎ, সেখানে সে প্রভু, সেখানে সে দুঃখকষ্টের ভয়ে দুর্বল ক্রন্দনের সুরে নিজের অস্তিত্বকে কেবলই অভিশাপ দিচ্ছে না। যেখানেই জীবনে মানুষের আনন্দ নেই, কর্মে মানুষের অনাস্থা, সেইখানেই তোমার সৃষ্টিতত্ত্ব যেন বাধা পেয়ে প্রতিহত হয়ে যাচ্ছে, সেইখানেই নিখিলের প্রবেশদ্বার সংকীর্ণ। সেইখানেই যত সংকোচ, যত অন্ধ সংস্কার, যত অমূলক বিভীষিকা, যত আধিব্যাধি এবং পরস্পরবিচ্ছিন্নতা।

হে বিশ্বকর্মন্, আজ আমরা তোমার সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে এই কথাটি জানাতে এসেছি, আমার এই সংসার আনন্দের, আমার এই জীবন আনন্দের। বেশ করেছ আমাকে ক্ষুধাতৃষ্ণার আঘাতে জাগিয়ে রেখেছ তোমার এই জগতে, তোমার এই বহুধা শক্তির অসীম লীলাক্ষেত্রে। বেশ করেছ তুমি আমাকে দুঃখ দিয়ে সম্মান দিয়েছ, বিশ্বসংসারে অসংখ্য জীবের চিত্তে দুঃখতাপের দাহে যে অগ্নিময়ী পরমা সৃষ্টি চলছে বেশ করেছ আমাকে তার সঙ্গে যুক্ত করে গৌরবান্বিত করেছ। সেই সঙ্গে প্রার্থনা করতে এসেছি, আজ তোমার বিশ্বশক্তির প্রবল বেগ বসন্তের উদ্দাম দক্ষিণ বাতাসের মতো ছুটে চলে আসুক, মানবের বিশাল ইতিহাসের মহাক্ষেত্রের উপর দিয়ে ধেয়ে আসুক— নিয়ে আসুক তার নানা ফুলের গন্ধকে, নানা বনের মর্মরধ্বনিকে বহন করে, আমাদের দেশের এই শব্দহীন প্রাণহীন শুষ্কপ্রায় চিত্ত-অরণ্যের সমস্ত শাখাপল্লবকে দুলিয়ে কাঁপিয়ে মুখরিত করে দিক— আমাদের অন্তরের নিদ্রোত্থিত শক্তি ফুলে ফলে কিশলয়ে অপর্যাপ্তরূপে সার্থক হবার জন্যে কেঁদে উঠুক। দেখতে দেখতে শতসহস্র কর্মচেষ্টার মধ্যে আমাদের দেশের ব্রহ্মোপাসনা আকার ধারণ করে তোমার অসীমতার অভিমুখে বাহু তুলে আপনাকে একবার দিগবিদিকে ঘোষণা করুক। মোহের আবরণকে উদ্‌ঘাটন করো, উদাসীনতার নিদ্রাকে অপসারিত করে দাও— এখনই এই মুহূর্তে অনন্ত দেশে কালে ধাবমান ঘূর্ণমান চিরচাঞ্চল্যের মধ্যে তোমার নিত্যবিলসিত আনন্দরূপকে দেখে নিই; তার পরে সমস্ত জীবন দিয়ে তোমাকে প্রণাম

করে সংসারে মানবাত্মার সৃষ্টিক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করি, যেখানে নানা দিক থেকে নানা অভাবের প্রার্থনা, দুঃখের ক্রন্দন, মিলনের আকাঙ্ক্ষা এবং সৌন্দর্যের নিমন্ত্রণ আমাকে আহ্বান করছে— যেখানে আমার নানাভিমুখী শক্তির একমাত্র সার্থকতা সুদীর্ঘ কাল ধরে প্রতীক্ষা করে বসে আছে এবং যেখানে বিশ্বমানবের মহাযজ্ঞে আনন্দের হোমহুতাশনে আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখ লাভক্ষতিকে পুণ্য আহুতির মতো সমর্পণ করে দেবার জন্যে আমার অন্তরের মধ্যে কোন্ তপস্বিনী মহানিষ্ক্রমণের দ্বার খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ফাল্গুন ১৩১৭

আত্মবোধ

কয়েক দিন হল পল্লীগ্রামে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের দুইজন বাউলের সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলুম, তোমাদের ধর্মের বিশেষত্বটি কী আমাকে বলতে পার? একজন বললে, 'বলা বড়ো কঠিন, ঠিক বলা যায় না।' আর-একজন বললে, 'বলা যায় বৈকি— কথাটা সহজ। আমরা বলি এই যে, গুরুর উপদেশে গোড়ায় আপনাকে জানতে হয়। যখন আপনাকে জানি তখন সেই আপনার মধ্যে তাঁকে পাওয়া যায়।' আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'তোমাদের এই ধর্মের কথা পৃথিবীর লোককে সবাইকে শোনাও না কেন।' সে বললে, 'যার পিপাসা হবে সে গঙ্গার কাছে আপনি আসবে।' আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'তাই কি দেখতে পাচ্ছ। কেউ কি আসছে।' সে লোকটি অত্যন্ত প্রশান্ত হাসি হেসে বললে, 'সবাই আসবে। সবাইকে আসতে হবে।'

আমি এই কথা ভাবলুম, বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের শাস্ত্রশিক্ষাহীন এই বাউল, এ তো মিথ্যা বলে নি। আসছে, সমস্ত মানুষই আসছে। কেউ তো স্থির হয়ে নেই। আপনার পরিপূর্ণতার অভিমুখেই তো সবাইকে চলতে হচ্ছে, আর যাবে কোথায়। আমরা প্রসন্নমনে হাসতে পারি— পৃথিবী জুড়ে সবাই যাত্রা করেছে। আমরা কি মনে করছি সবাই কেবল নিজের উদর-পূরণের অন্ন খুঁজছে, নিজের প্রাত্যহিক প্রয়োজনের চারি দিকেই প্রতিদিন প্রদক্ষিণ করে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে? না, তা নয়। এই মুহূর্তেই পৃথিবীর সমস্ত মানুষ অন্নের জন্যে, বস্ত্রের জন্যে, নিজের ছোটো বড়ো কত শত দৈনিক আবশ্যকের জন্যে ছুটে বেড়াচ্ছে— কিন্তু, কেবল তার সেই আহ্নিক গতিতে নিজেকে প্রদক্ষিণ করা নয়, সেই সঙ্গে সঙ্গেই সে জেনে এবং না জেনে একটি

প্রকাণ্ড কক্ষে মহাকাশে আর-একটি কেন্দ্রের চার দিকে যাত্রা করে চলেছে— যে কেন্দ্রের সঙ্গে সে জ্যোতির্ময় নাড়ির আকর্ষণে বিধৃত হয়ে রয়েছে, যেখান থেকে সে আলোক পাচ্ছে, প্রাণ পাচ্ছে, যার সঙ্গে একটি অদৃশ্য অথচ অবিচ্ছেদ্য সূত্রে তার চিরদিনের মহাযোগ রয়েছে।

মানুষ অন্নবস্ত্রের চেয়ে গভীর প্রয়োজনের জন্যে পথে বেরিয়ে পড়েছে। কী সেই প্রয়োজন? তপোবনে ভারতবর্ষের ঋষি তার উত্তর দিয়েছেন। এবং বাংলাদেশের পল্লীগ্রামে বাউলও তার উত্তর দিচ্ছে। মানুষ আপনাকে পাবার জন্যে বেরিয়েছে; আপনাকে না পেলে, তার আপনার চেয়ে যিনি বড়ো আপন তাঁকে পাবার জো নেই। তাই এই আপনাকেই বিশুদ্ধ ক'রে, প্রবল ক'রে, পরিপূর্ণ ক'রে পাবার জন্যে মানুষ কত তপস্যা করছে। শিশুকাল থেকেই সে আপনার প্রবৃত্তিকে শিক্ষিত ও সংযত করছে, এক-একটি বড়ো বড়ো লক্ষ্যের চার দিকে সে আপনার ছোটো ছোটো সমস্ত বাসনাকে নিয়মিত করবার চেষ্টা করছে, এমন-সকল আচার-অনুষ্ঠানের সে সৃষ্টি করছে যাতে তাকে অহরহ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, দৈনিক জীবনযাত্রার মধ্যে তার সমাপ্তি নেই, সমাজব্যবহারের মধ্যেও তার অবসান নেই। সে এমন একটি বৃহৎ আপনাকে চাচ্ছে যে আপনি তার বর্তমানকে, তার চার দিককে, তার প্রবৃত্তি ও বাসনাকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে গেছে।

আমাদের বৈরাগী বাংলাদেশের একটি ছোটো নদীর ধারে এক সামান্য কুটিরে বসে এই আপ্‌নি'র খোঁজ করছে এবং নিশ্চিন্ত হাস্যে বলছে, সবাইকেই আসতে হবে এই আপ্‌নির খোঁজ করতে। কেননা, এ তো কোনো বিশেষ মতের বিশেষ সম্প্রদায়ের ডাক নয়; সমস্ত মানবের মধ্যে যে চিরন্তন সত্য আছে এ যে তারই ডাক। কলরবের তো অন্ত নেই— কত কল-কারখানা, কত যুদ্ধবিগ্রহ, কত বাণিজ্য-ব্যবসায়ের কোলাহল আকাশকে মথিত করছে; কিন্তু, মানুষের ভিতর থেকে সেই সত্যের ডাককে কিছুতেই আচ্ছন্ন করতে পারছে না। মানুষের সমস্ত ক্ষুধাতৃষ্ণা সমস্ত অর্জন-বর্জনের মাঝখানে সে রয়েছে। কত ভাষায় সে কথা কইছে, কত কালে কত দেশে কত রূপে কত ভাবে সমস্ত আশুপ্রয়োজনের উপর সে জাগ্রত হয়ে আছে। কত তর্ক তাকে আঘাত করছে, কত সংশয় তাকে অস্বীকার করছে, কত বিকৃতি তাকে আক্রমণ করছে, কিন্তু সে বেঁচেই আছে। সে কেবলই বলছে, তোমার আপ্‌নিকে পাও: আত্মানং বিদ্ধি।

এই আপ্‌নিকে মানুষ সহজে আপন করে তুলতে পারছে না, সেইজন্যে মানুষ সূত্রচ্ছিন্ন মালার মতো কেবলই খসে যাচ্ছে, ধুলোয় ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু, যে বিশ্ব-

জগতে সে নিশ্চিন্ত হয়ে বাস করছে সেই জগৎ তো মুহুর্মুহু এমন করে খসে পড়ছে না, ছড়িয়ে পড়ছে না।

অথচ এই জগৎটি তো সহজ জিনিস নয়। এর মধ্যে যে-সকল বিরাট শক্তি কাজ করছে তাদের নিতান্ত নিরীহ বলা যায় না। আমাদের এতটুকু একটুখানি রাসায়নিক পরীক্ষাশালায় যখন সামান্য একটা টেবিলের উপর দু-চার কণা গ্যাসকে অল্প একটু বন্ধনমুক্ত করে দিয়ে তাদের লীলা দেখতে যাই তখন শঙ্কিত হয়ে থাকতে হয়, তাদের গলাগলি জড়াজড়ি ঠেলাঠেলি মারামারি যে কী অদ্ভুত এবং কী প্রচণ্ড তা দেখে বিস্মিত হই। বিশ্ব জুড়ে আবিষ্কৃত এবং অনাবিষ্কৃত এমন কত শত বাষ্প-পদার্থ তাদের কত বিচিত্র প্রকৃতি নিয়ে কী কাণ্ড বাধিয়ে বেড়াচ্ছে তা আমরা কল্পনা করতেও পারি নে। তার উপরে জগতের মূল শক্তিগুলিও পরস্পরের বিরুদ্ধ। আকর্ষণের উল্টো শক্তি বিকর্ষণ, কেন্দ্রানুগের উল্টো শক্তি কেন্দ্রাতিগ। এই-সমস্ত বিরুদ্ধতা ও বৈচিত্র্যের প্রকাণ্ড লীলাভূমি এই-যে জগৎ এখানকার আলোতে আমরা অনায়াসে চোখ মেলেছি, এখানকার বাতাসে অনায়াসে নিশ্বাস নিচ্ছি, এর জলে স্থলে অনায়াসে সঞ্চরণ করছি। যেমন আমাদের শরীরের ভিতরটাতে কত রকমের কত কী কাজ চলছে তার ঠিকানা নেই, কিন্তু আমরা সমস্তটাকে জড়িয়ে একটি অখণ্ড স্বাস্থ্যের মধ্যে এক করে জানছি— দেহটাকে হৃৎপিণ্ড মস্তিষ্ক পাকযন্ত্র প্রভৃতির জোড়া-তাড়া ব্যাপার বলে জানছি নে।

জগতের রহস্যাগারের মধ্যে শক্তির ঘাত প্রতিঘাত যেমনি জটিল ও ভয়ংকর হোক-না কেন, আমাদের কাছে তা নিতান্তই সহজ হয়ে দেখা দিয়েছে। অথচ জগৎটা আসলে যে কী তা যখন সন্ধান করে বুঝে দেখবার চেষ্টা করি তখন কোথাও আর তল পাওয়া যায় না। সকলেই জানেন বস্তুতত্ত্ব সম্বন্ধে এক সময় বিজ্ঞান ঠিক করে রেখেছিল যে পরমাণুর পিছনে আর যাবার জো নেই— সেই-সকল সূক্ষ্মতম মূল-বস্তুর যোগ-বিয়োগেই জগৎ তৈরি হচ্ছে। কিন্তু, বিজ্ঞানের সেই মূল-বস্তুর দুর্গও আজ আর টেকে না। আদিকারণের মহাসমুদ্রের দিকে বিজ্ঞান যতই এক-এক পা এগোচ্ছে ততই বস্তুত্বের কূলকিনারা কোন্ দিগন্তরালে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে; সমস্ত বৈচিত্র্য সমস্ত আকার-আয়তন একটা বিরাট শক্তির মধ্যে একেবারে সীমা হারিয়ে আমাদের ধারণার সম্পূর্ণ অতীত হয়ে উঠছে।

কিন্তু, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যা এক দিকে আমাদের ধারণার একেবারেই অতীত তাই আর-এক দিকে নিতান্ত সহজেই আমাদের ধারণাগম্য হয়ে আমাদের কাছে ধরা দিয়েছে। সেই হচ্ছে আমাদের এই জগৎ। এই জগতে শক্তিকে শক্তিরূপে

বিজ্ঞানের সাহায্যে আমাদের জানতে হচ্ছে না; আমরা তাকে অত্যন্ত প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি— জলস্থল, তরুলতা, পশুপক্ষী। জল মানে বাষ্পবিশেষের যোগবিয়োগ বা শক্তি-বিশেষের ক্রিয়ামাত্র নয়— জল মানে আমারই একটি আপন সামগ্রী, সে আমার চোখের জিনিস, স্পর্শের জিনিস; সে আমার স্নানের জিনিস, পানের জিনিস; সে বিবিধ প্রকারেই আমার আপন। বিশ্বজগৎ বলতেও তাই। স্বরূপত তার একটি বালুকণাও যে কী তা আমরা ধারণা করতে পারি নে, কিন্তু সম্বন্ধত সে বিচিত্রভাবে বিশেষভাবে আমার আপন।

যাকে ধরা যায় না সে আপনিই আমার আপন হয়ে ধরা দিয়েছে। এতই আপন হয়ে ধরা দিয়েছে যে দুর্বল উলঙ্গ শিশু এই অচিন্ত্য শক্তিকে নিশ্চিন্তমনে আপনার ধুলোখেলার ঘরের মতো ব্যবহার করছে, কোথাও কিছু বাধছে না।

জড়জগতে যেমন মানুষেও তেমনি। প্রাণশক্তি যে কী তা কেমন করে বলব। পর্দার উপর পর্দা যতই তুলব ততই অচিন্ত্য অনন্ত অনির্বচনীয়ে গিয়ে পড়ব। সেই প্রাণ এক দিকে যত বড়ো প্রকাণ্ড রহস্যই হোক-না কেন, আর-এক দিকে তাকে আমরা কী সহজেই বহন করছি— সে আমার আপন প্রাণ। পৃথিবীর সমস্ত লোকালয়কে ব্যাপ্ত করে প্রাণের ধারা এই মুহূর্তে অগণ্য জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, নূতন নূতন শাখাপ্রশাখায় ক্রমাগতই দুর্ভেদ্য নির্জনতাকে সজন করে তুলছে— এই প্রাণের প্রবাহের উপর লক্ষ লক্ষ মানুষের দেহের তরঙ্গ কতকাল ধরে অহোরাত্র অন্ধকার থেকে সূর্যা-লোকে উঠছে এবং সূর্যালোক থেকে অন্ধকার নেবে পড়ছে। এ কী তেজ, কী বেগ, কী নিশ্বাস মানুষের মধ্যে আপনাকে উচ্ছ্বসিত, আন্দোলিত, নব নব বৈচিত্র্যে বিস্তীর্ণ করে দিচ্ছে! যেখানে অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে তার রহস্য চিরকাল প্রচ্ছন্ন হয়ে রক্ষিত সেখানে আমাদের প্রবেশ নেই; আবার যেখানে দেশকালের মধ্যে তার প্রকাশ নিরন্তর গর্জিত উন্মথিত হয়ে উঠছে সেখানেও সে কেবল লেশমাত্র আমাদের গোচরে আছে, সমস্তটাকে এক সঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি নে। কিন্তু, এখানেই সে আছে, এখনই সে আছে, আমার হয়ে আছে। তার সমস্ত অতীতকে আকর্ষণ করে তার সমস্ত ভবিষ্যৎকে বহন করে সে আছে। সেই অদৃশ্য অথচ দৃশ্য, সেই এক অথচ বহু, সেই বদ্ধ অথচ মুক্ত, সেই বিরাট মানবপ্রাণ— তার পৃথিবীজোড়া ক্ষুধাতৃষ্ণা, নিশ্বাস-প্রশ্বাস, শীতগ্রীষ্ম, হৃৎপিণ্ডের উত্থানপতন, শিরা-উপশিরায় রক্তস্রোতের জোয়ার-ভাঁটা নিয়ে দেশে দেশান্তরে বংশে বংশান্তরে বিরাজ করছে। এই অনির্বচনীয় প্রাণশক্তি তার অপরিসীম রহস্য নিয়েও সদ্যোজাত শিশুর মধ্যে আপন হয়ে ধরা দিতে কুণ্ঠিত হয় নি।

তাই বলছিলুম, অসংখ্য বিরুদ্ধতা ও বৈচিত্র্যের মধ্যে মহাশক্তির যে অনির্বচনীয়

ক্রিয়া চলছে তাই আমাদের কাছে জগৎরূপে প্রাণরূপে নিতান্ত সহজ হয়ে আপন হয়ে ধরা দিয়েছে; তাই আমরা কেবল যে তাদের ব্যবহার করছি তা নয়, তাদের ভালো-বাসছি, তাদের কোনো মতেই ছাড়তে চাই নে। তারা আমার এতই আপন যে তাদের যদি বাদ দিতে যাই তবে আমার আমিত্ব একেবারে বস্তুশূন্য হয়ে পড়ে।

জগৎ সম্বন্ধে তো এই রকম সমস্ত সহজ, কিন্তু যেখানে মানুষ আপনি সেখানে সে এমন সহজে সামঞ্জস্য ঘটিয়ে তুলতে পারছে না। মানুষ আপনাকে এমন অখণ্ডভাবে সমগ্র ক'রে আপন ক'রে লাভ করছে না। যাকে মাঝখানে নিয়ে সবাই মানুষের এত আপন তাকেই আপন করে তোলা মানুষের পক্ষে কী কঠিন হয়েছে!

অন্তরে বাহিরে মানুষ নানাখানা নিয়ে একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত; তারই মাঝখানে সে আপনাকে ধরতে পারছে না, চারি দিকে সে কেবল টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ছে। কিন্তু, আপনাকেই তার সব চেয়ে দরকার; তার যত কিছু দুঃখ তার গোড়াতেই এই আপনাকে না-পাওয়া। যতক্ষণ এই আপনাকে পরিপূর্ণ করে না পাওয়া যায় ততক্ষণ কেবলই মনে হয় এটা পাই নি, ওটা পাই নি; ততক্ষণ যা-কিছু পাই তাতে তৃপ্তি হয় না। কেননা, যতক্ষণ আমরা আপনাকে না পাই ততক্ষণ নিত্যভাবে আমরা কোনো জিনিসকেই পাই নে; এমন কোনো আধার থাকে না যার মধ্যে কোনো-কিছুকে স্থিরভাবে ধরে রাখতে পারি। ততক্ষণ আমরা বলি সবই মায়া— সবই ছায়ার মতো চলে যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু, আত্মাকে যখনই পাই, নিজের মধ্যে ধ্রুব এককে যখনই নিশ্চিত করে ধরতে পারি, তখনই সেই কেন্দ্রকে অবলম্বন করে চারি দিকের সমস্ত বিধৃত হয়ে আনন্দময় হয়ে ওঠে। আপনাকে যখন পাই নি তখন যা-কিছু অসত্য ছিল আপনাকে পাবামাত্রই সেই-সমস্তই সত্য হয়ে ওঠে। আমার বাসনার কাছে প্রবৃত্তির কাছে যারা মরীচিকার মতো ধরা দিচ্ছে অথচ দিচ্ছে না, কেবলই এড়িয়ে এড়িয়ে চলে যাচ্ছে, তারাই আমার আত্মাকে সত্যভাবে বেষ্টন করে আত্মারই আপন হয়ে ওঠে। এইজন্যে যে লোক আত্মাকে পেয়েছে জলে স্থলে আকাশে তার আনন্দ, সকল অবস্থার মধ্যেই তার আনন্দ; কেননা, সে আপনার অমর সত্যের মধ্যে সমস্তকেই অমর সত্যরূপে পেয়েছে। সে কিছুকেই ছায়া বলে না, মায়া বলে না, কারণ তার কাছে জগতের সমস্ত পদার্থেরই সত্য ধরা দিয়েছে। সে নিজে সত্য হয়েছে, এইজন্য তার কাছে কোনো সত্যই বিশ্লিষ্ট বিচ্ছিন্ন স্খলিত নয়। এমনি করে আপনাকে পাওয়ার মধ্যে সমস্তকে পাওয়া, আপনার সত্যের দ্বারা সকল সত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি সমগ্র হয়ে ওঠা, নিজেকে কেবল কতকগুলো বাসনা এবং কতকগুলো অনুভূতির স্তূপরূপে না জানা, নিজেকে কেবল বিচ্ছিন্ন কতকগুলো

বিষয়ের মধ্যে খুঁজে খুঁজে না বেড়ানো এই হচ্ছে আত্মবোধের আত্মোপলব্ধির লক্ষণ।

পৃথিবী একদিন বাষ্প ছিল, তখন তার পরমাণুগুলো আপনার তাপের বেগে বিশ্লিষ্ট হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। তখন পৃথিবী আপনার আকার পায় নি, প্রাণ পায় নি, তখন পৃথিবী কিছুকেই জন্ম দিতে পারত না, কিছুকেই ধরে রাখতে পারত না— তখন তার সৌন্দর্য ছিল না, সার্থকতা ছিল না, কেবল ছিল তাপ আর বেগ। যখন সে সংহত হয়ে এক হল তখনই জগতের গ্রহনক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে সেও একটি বিশেষ স্থান লাভ করে বিশ্বের মণিমালায় নূতন একটি মরকত মানিক গেঁথে দিলে। আমাদের চিত্তও সেইরকম প্রবৃত্তির তাপে ও বেগে চারি দিকে কেবল যখন ছড়িয়ে পড়ে তখন যথার্থভাবে কিছুই পাই নে, কিছুই দিই নে; যখনই সমস্তকে সংহত সংযত করে এক করে আত্মাকে পাই, যখনই আমি সত্য যে কী তা জানি, তখনই আমার সমস্ত বিচ্ছিন্ন জানা একটি প্রজ্ঞায় ঘনীভূত হয়, সমস্ত বিচ্ছিন্ন বাসনা একটি প্রেমে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে এবং জীবনের ছোটো বড়ো সমস্তই নিবিড় আনন্দে সুন্দর হয়ে প্রকাশ পায়। তখন আমার সকল চিন্তা ও সকল কর্মের মধ্যেই একটি আত্মানন্দের অবিচ্ছিন্ন যোগ থাকে। তখনই আমি আধ্যাত্মিক ধ্রুবলোকে আপনার সত্যপ্রতিষ্ঠা উপলব্ধি করে সম্পূর্ণ নির্ভয় হই। তখন আমার সেই ভ্রম ঘুচে যায় যে আমি সংসারের অনিশ্চয়তার মধ্যে, মৃত্যুর আবর্তের মধ্যে ভ্রাম্যমান। তখন আত্মা অতি সহজেই জানে যে সে পরমাত্মার মধ্যে চিরসত্যে বিধৃত হয়ে আছে।

এই আমার সকলের চেয়ে সত্য আপনাটিকে নিজের ইচ্ছার জোরে আমাকে পেতে হবে— অসংখ্যের ভিড় ঠেলে টানাটানি কাটিয়ে এই আমার অত্যন্ত সহজ সমগ্রতাকে সহজ করে নিতে হবে। আমার ভিতরকার এই অখণ্ড সামঞ্জস্যটি কেবল জগতের নিয়মের দ্বারা ঘটবে না, আমার ইচ্ছার দ্বারা ঘটে উঠবে।

এইজন্যে মানুষের সামঞ্জস্য বিশ্বজগতের সামঞ্জস্যের মতো সহজ নয়। মানুষের চেতনা আছে, বেদনা আছে ব'লেই নিজের ভিতরকার সমস্ত বিরুদ্ধতাকে সে একেবারে গোড়া থেকেই অনুভব করে; বেদনার পীড়ায় সেইগুলোই তার কাছে অত্যন্ত বড়ো হয়ে ওঠে; নিজের ভিতরকার এই-সমস্ত বিরুদ্ধতার দুঃখ তার পক্ষে এত একান্ত যে এতেই তার চিত্ত প্রতিহত হয়— কোনো একটি বৃহৎ সত্যের মধ্যে তার এই-সকল বিরুদ্ধতার বৃহৎ সমাধান আছে, সমস্ত দুঃখবেদনার একটি আনন্দপরিণাম আছে, এটা সে সহজে দেখতে পায় না। আমরা একেবারে গোড়া থেকেই দেখতে পাচ্ছি যাতে আমার সুখ তাতেই আমার মঙ্গল নয়, যাকে আমি মঙ্গল বলে জানছি চার দিক

থেকে তার বাধা পাচ্ছি। আমার শরীর যা দাবি করে আমার মনের দাবি সকল সময় তার সঙ্গে মেলে না, আমি একলা যা দাবি করি আমার সমাজের দাবির সঙ্গে তার বিরোধ ঘটে, আমার বর্তমানের দাবি আমার ভবিষ্যতের দাবিকে অস্বীকার করতে চায়। অন্তরে বাহিরে এই-সমস্ত দুঃসহ বাধাবিরোধ ছিন্নবিচ্ছিন্নতা নিয়ে মানুষকে চলতে হচ্ছে। অন্তরে বাহিরে এই ঘোরতর অসামঞ্জস্যের দ্বারা আক্রান্ত হওয়াতেই মানুষ আপনার অন্তরতম ঐক্যশক্তিকে প্রাণপণে প্রার্থনা করছে। যাতে তার এই-সমস্ত বিক্ষিপ্ততাকে মিলিয়ে এক করে দেবে, সহজ করে দেবে, তার প্রতি সে আপনার বিশ্বাসকে ও লক্ষ্যকে কেবলই স্থির রাখবার চেষ্টা করছে। মানুষ আপনার অন্তর-বাহিরের এই প্রভূত বিক্ষিপ্ততার মধ্যে বৃহৎ ঐক্যসাধনের চেষ্টা প্রতিদিনই করছে। সেই চেষ্টাই তার জ্ঞান বিজ্ঞান সমাজ সাহিত্য রাষ্ট্রনীতি। সেই চেষ্টাই তার ধর্মকর্ম পূজা-অর্চনা। সেই চেষ্টাই কেবল মানুষকে তার নিজের স্বভাব নিজের সত্য জানিয়ে দিচ্ছে। সেই চেষ্টা খানিকটা সফল হচ্ছে খানিকটা নিষ্ফল হচ্ছে, বার বার ভাঙছে বারবার গড়ছে— কিন্তু বারম্বার এই-সমস্ত ভাঙাগড়ার মধ্যে মানুষ আপনার এই স্বাভাবিক ঐক্যচেষ্টার দ্বারাতেই আপনার ভিতরকার সেই এককে ক্রমশ সুস্পষ্ট করে দেখছে এবং সেই সঙ্গে বিশ্বব্যাপারেও সেই মহৎ এক তার কাছে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। সেই এক যতই স্পষ্ট হচ্ছে ততই মানুষ স্বভাবতই জ্ঞানে প্রেমে ও কর্মে ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্নতা পরিহার করে ভূমাকে আশ্রয় করছে।

তাই বলছিলুম, ঘুরে ফিরে মানুষ যা-কিছু করছে— কখনো বা ভুল করে কখনো বা ভুল ভেঙে— সমস্তর মূলে আছে এই আত্মবোধের সাধনা। সে যাকেই চাক-না সত্য করে চাচ্ছে এই আপনাকে, জেনে চাচ্ছে, না জেনে চাচ্ছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্তকে বিরাট ভাবে একটি জায়গায় মিলিয়ে জড়িয়ে নিয়ে মানুষ আত্মার একটি অখণ্ড উপলব্ধিকে পেতে চাচ্ছে। সে এক রকম করে বুঝতে পারছে কোনোখানেই বিরোধ সত্য নয়, বিচ্ছিন্নতা সত্য নয়, নিরন্তর অবিরোধের মধ্যে মিলে উঠে একটি বিশ্বসংগীতকে প্রকাশ করবার জন্যেই বিরোধের সার্থকতা— সেই সংগীতেই পরিপূর্ণ আনন্দ। নিজের ইতিহাসে মানুষ সেই তানটাকেই কেবল সাধছে, সুরের যতই স্খলন হোক তবু কিছুতেই নিরস্ত হচ্ছে না। উপনিষদের বাণীর দ্বারা সে কেবলই বলছে : তমেবৈকং জানীথ আত্মানম্। সেই এককে জানো, সেই আত্মাকে। অমৃতস্যৈষ সেতুঃ। ইহাই অমৃতের সেতু।

আপনার মধ্যে এই এককে পেয়ে মানুষ যখন ধীর হয়, যখন তার প্রবৃত্তি শান্ত

হয়, সংযত হয়, তখন তার বুঝতে বাকি থাকে না এই তার এক কাকে খুঁজছে। তার প্রবৃত্তি খুঁজে মরে নানা বিষয়কে— কেননা, নানা বিষয়কে নিয়েই সে বাঁচে, নানা বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়াই তার সার্থকতা। কিন্তু, যেটি হচ্ছে মানুষের এক, মানুষের আপ্‌নি, সে স্বভাবতই একটি অসীম এককে, একটি অসীম আপ্‌নিকে খুঁজছে— আপনার ঐক্যের মধ্যে অসীম ঐক্যকে অনুভব করলে তবেই তার সুখের স্পৃহা শান্তি লাভ করে। তাই উপনিষৎ বলেন— 'একং রূপং বহুধা যঃ করোতি' যিনি একরূপকে বিশ্বজগতে বহুধা করে প্রকাশ করেছেন, 'তম্ আত্মস্থং যে অনুপশ্যন্তি ধীরাঃ' তাঁকে যে ধীরেরা আত্মস্থ করে দেখেন, অর্থাৎ যাঁরা তাঁকে আপনার একের মধ্যে এক করে দেখেন, 'তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্' তাঁদেরই সুখ নিত্য, আর-কারও না।

আত্মার সঙ্গে এই পরমাত্মাকে দেখা এ অত্যন্ত একটি সহজ দৃষ্টি, এ একেবারেই যুক্তিতর্কের দৃষ্টি নয়। এ হচ্ছে 'দিবীব চক্ষুরাততং'। চক্ষু যেমন একেবারে সহজেই আকাশে বিস্তীর্ণ পদার্থকে দেখতে পায় এ সেই রকম দেখা। আমাদের চক্ষুর স্বভাবই হচ্ছে সে কোনো জিনিসকে ভেঙে ভেঙে দেখে না, একেবারে সমগ্র করে দেখে। সে স্পেক্‌ট্রস্কোপ যন্ত্র দিয়ে দেখার মতো করে দেখে না, সে আপনার মধ্যে সমস্তকে বেঁধে নিয়ে আপন করে দেখতে জানে। আমাদের আত্মবোধের দৃষ্টি যখন খুলে যায় তখন সেও তেমনি অত্যন্ত সহজেই আপনাকে এক ক'রে এবং পরম একের সঙ্গে আনন্দে সম্মিলিত করে দেখতে পায়। সেই রকম করে সমগ্র করে দেখাই তার সহজ ধর্ম। তিনি যে পরম আত্মা, আমাদের পরম আপ্‌নি। সেই পরম আপ্‌নিকে যদি আপন করেই না জানা যায়, তা হলে আর যেমন করেই জানা যাক্ তাঁকে জানাই হল না। জ্ঞানে জানাকে আপন করে জানা বলে না, ঠিক উল্টো— জ্ঞান সহজেই তফাৎ করে জানে, আপন করে জানবার শক্তি তার হাতে নেই।

উপনিষৎ বলছেন— 'এষ দেবো বিশ্বকর্মা' এই দেবতা বিশ্বকর্মা, বিশ্বের অসংখ্য কর্মে আপনাকে অসংখ্য আকারে ব্যক্ত করছেন, কিন্তু তিনিই 'মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ' মহান্ আপন-রূপে পরম এক-রূপে সর্বদাই মানুষের হৃদয়ের মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছেন। 'হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো য এতৎ' সেই হৃদয়ের যে জ্ঞান, যে জ্ঞান একেবারে সংশয়রহিত অব্যবহিত জ্ঞান, সেই জ্ঞানে যাঁরা এঁকে পেয়ে থাকেন 'অমৃতাস্তে ভবন্তি', তাঁরাই অমৃত হন।

আমাদের চোখ যেমন একেবারে দেখে আমাদের হৃদয় তেমনি স্বভাবত একেবারে অনুভব করে— মধুরকে তার মিষ্ট লাগে, রুদ্রকে তার ভীষণ বোধ হয়, সেই বোধের

জন্যে তাকে কিছুই চিন্তা করতে হয় না। সেই আমাদের হৃদয় যখন তার স্বাভাবিক সংশয়রহিত বোধশক্তির দ্বারাই পরম এককে বিশ্বের মধ্যে এবং আপনার মধ্যে প্রত্যক্ষ অনুভব করে তখন মানুষ চিরকালের জন্যে বেঁচে যায়। জোড়া দিয়ে দিয়ে অনন্ত কালেও আমরা এককে পেতে পারি নে, হৃদয়ের সহজ বোধে এক মুহূর্তেই তাঁকে একান্ত আপন করে পাওয়া যায়। তাই উপনিষৎ বলেছেন তিনি আমাদের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট, তাই একেবারেই রসরূপে আনন্দরূপে তাঁকে অব্যবহিত করে পাই, আর-কিছুতে পাবার জো নেই—

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

বাক্যমন যাঁকে না পেয়ে ফিরে আসে সেই ব্রহ্মের আনন্দকে হৃদয় যখন বোধ করে তখন আর কিছুতেই ভয় থাকে না।

এই সহজ বোধটি হচ্ছে প্রকাশ— এ জানা নয়, সংগ্রহ করা নয়, জোড়া দেওয়া নয়, আলো যেমন একেবারে প্রকাশ হয় এ তেমনি প্রকাশ। প্রভাত যখন হয়েছে তখন আলোর খোঁজে হাটে বাজারে ছুটতে হবে না, জ্ঞানীর দ্বারে ঘা মারতে হবে না— যা-কিছু বাধা আছে সেইগুলো কেবল মোচন করতে হবে— দরজা খুলে দিতে হবে, তা হলেই আলো একেবারে অখণ্ড হয়ে প্রকাশ পাবে।

সেই জন্যেই এই প্রার্থনাই মানুষের গভীরতম প্রার্থনা : আবিরাবীর্ম এধি। হে আবিঃ, হে প্রকাশ, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও। মানুষের যা দুঃখ সে অপ্রকাশের দুঃখ— যিনি প্রকাশস্বরূপ তিনি এখনও তার মধ্যে ব্যক্ত হচ্ছেন না ; তার হৃদয়ের উপর অনেকগুলো আবরণ রয়ে গেছে ; এখনও তার মধ্যে বাধা-বিরোধের সীমা নেই ; এখনও সে আপনার প্রকৃতির নানা অংশের মধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারছে না ; এখনও তার এক ভাগ অন্য ভাগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে, তার স্বার্থের সঙ্গে পরমার্থের মিল হচ্ছে না, এই উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে যিনি আবিঃ তাঁর আবির্ভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠছে না ; ভয় দুঃখ শোক অবসাদ অকৃতার্থতা এসে পড়ছে— যা গিয়েছে তার জন্যে বেদনা যা আসবে তার জন্য ভাবনা চিত্তকে মথিত করছে, আপনার অন্তর বাহির সমস্তকে নিয়ে জীবন প্রসন্ন হয়ে উঠছে না। এই জন্যেই মানুষের প্রার্থনা : রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্। হে রুদ্র, তোমার প্রসন্ন মুখের দ্বারা আমাকে নিয়ত রক্ষা করো। যেখানে সেই আবিঃ'র আবির্ভাব সম্পূর্ণ নয় সেখানে প্রসন্নতা নেই ; যে দেশে সেই আবিঃ'র আবির্ভাব বাধাগ্রস্ত সেই দেশ থেকে প্রসন্নতা চলে গেছে ; যে গৃহে তাঁর আবির্ভাব প্রতিহত সেখানে ধনধান্য

থাকলেও শ্রী নেই; যে চিত্তে তাঁর প্রকাশ সমাচ্ছন্ন সে চিত্ত দীপ্তিহীন, প্রতিষ্ঠাহীন, সে কেবল স্রোতের শৈবালের মতো ভেসে বেড়াচ্ছে। এই জন্যে যে-কোনো প্রার্থনা নিয়েই মানুষ ঘুরে বেড়াক-না কেন তার আসল প্রার্থনাটি হচ্ছে: আবিরাবীর্ম এধি। হে প্রকাশ, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ সম্পূর্ণ হোক। এই জন্যে মানুষের সকল কান্নার মধ্যে বড়ো কান্না পাপের কান্না। সে যে আপনার সমস্তটাকে নিয়ে সেই পরম একের সুরে মেলাতে পারছে না, সেই অমিলের বেসুর সেই পাপ তাকে আঘাত করছে। মানুষের নানা ভাগ নানা দিকে যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে, তার একটা অংশ যখন তার অন্য সকল অংশকে ছাড়িয়ে গিয়ে উৎপাতের আকার ধারণ করছে, তখন সে নিজেকে সেই পরম একের শাসনে বিধৃত দেখতে পাচ্ছে না, তখন সেই বিচ্ছিন্নতার বেদনায় কেঁদে উঠে সে বলছে: মা মা হিংসীঃ। আমাকে আর আঘাত কোরো না, আঘাত কোরো না। বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব। আমার সমস্ত পাপ দূর করো, তোমার সঙ্গে আমার সমগ্রকে মিলিয়ে দাও, তা হলেই আমার আপনার মধ্যে আমার মিল হবে, সকলের মধ্যে আমার মিল হবে, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ পরিপূর্ণ হবে, জীবনের মধ্যে সমস্ত রুদ্রতা প্রসন্নতায় দীপ্যমান হয়ে উঠবে।

মানুষের নানা জাতি আজ নানা অবস্থার মধ্যে আছে, তাদের জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ এক রকমের নয়। তাদের ইতিহাস বিচিত্র, তাদের সভ্যতা ভিন্ন রকমের। কিন্তু, যে জাতি যেরকম পরিণতিই পাক-না কেন, সকলেই কোনো-না-কোনো আকারে আপনার চেয়ে বড়ো আপনাকে চাচ্ছে। এমন একটি বড়ো যা তার সমস্তকে আপনার মধ্যে অধিকার করে সমস্তকে বাঁধবে, জীবনকে অর্থদান করবে। যা সে পেয়েছে, যা তার প্রতিদিনের, যা নিয়ে তাকে ঘরকন্না করতে হচ্ছে, যা তার কেনা-বেচার সামগ্রী তা নিয়ে তো তাকে থাকতেই হয়। সেই সঙ্গে, যা তার সমস্তের অতীত, যা তার দেখাশোনা খাওয়াপরার চেয়ে বেশি, যা নিজেকে অতিক্রম করবার দিকে তাকে টানে, যা তাকে দুঃসাধ্যের দিকে আহ্বান করে, যা তাকে ত্যাগ করতে বলে, যা তার পূজা গ্রহণ করে, মানুষ তাকেই আপনার মধ্যে উপলব্ধি করতে চাচ্ছে। তাকেই আপনার সমস্ত সুখ-দুঃখের চেয়ে বড়ো বলে স্বীকার করছে। কেননা, মানুষ জানছে মনুষ্যত্বের প্রকাশ সেই দিকেই; তার প্রতিদিনের খাওয়া-পরা আরাম-বিরামের দিকে নয়। সেই দিকেই চেয়ে মানুষ দু হাত তুলে বলছে: আবিরাবীর্ম এধি। হে প্রকাশ, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও। সেই দিকে চেয়েই মানুষ বুঝতে পারছে যে, তার মনুষ্যত্ব তার প্রতিদিনের তুচ্ছতার মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, তার প্রবৃত্তির আকর্ষণে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে, তাকে মুক্ত করতে হবে; তাকে যুক্ত করতে হবে। সেই দিকে চেয়েই মানুষ

এক দিকে আপনার দীনতা আর-এক দিকে আপনার সুমহৎ অধিকারকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছে এবং সেই দিকে চেয়েই মানুষের কণ্ঠ চিরদিন নানা ভাষায় ধ্বনিত হয়ে উঠছে : আবিরাবীর্ম এধি। হে প্রকাশ, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও। প্রকাশ চায়, মানুষ প্রকাশ চায়; ভূমাকে আপনার মধ্যে দেখতে চায়; তার পরম আপনাকে আপনার মধ্যে পেতে চায়। এই প্রকাশ তার আহার-বিহারের চেয়ে বেশি, তার প্রাণের চেয়ে বেশি। এই প্রকাশই তার প্রাণের প্রাণ, তার মনের মন। এই প্রকাশই তার সমস্ত অস্তিত্বের পরমার্থ।

মানুষের জীবনে এই ভূমার উপলব্ধিকে পূর্ণতর করবার জন্যেই পৃথিবীতে মহাপুরুষদের আবির্ভাব। মানুষের মধ্যে ভূমার প্রকাশ যে কী সেটা তাঁরাই প্রকাশ করতে আসেন। এই প্রকাশ সর্বাঙ্গীণ রূপে কোনো ভক্তের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে এমন কথা বলতে পারি নে। কিন্তু, মানুষের মধ্যে এই প্রকাশকে উত্তরোত্তর পরিপূর্ণ করে তোলাই তাঁদের কাজ। অসীমের মধ্যে সকল দিক দিয়ে মানুষের আত্মোপলব্ধিকে তাঁরা অখণ্ড করে তোলবার পথ কেবলই সুগম করে দিচ্ছেন, সমস্ত গানটাকে তার সমস্ত তালে লয়ে জাগাতে না পারলেও তাঁরা মূল সুরটিকে কেবলই বিশুদ্ধ করে তুলছেন— সেই সুরটি তাঁরা ধরিয়ে দিচ্ছেন।

যিনি ভক্ত তিনি অসীমকে মানুষের মধ্যে ধরে মানুষের আপন সামগ্রী করে তোলেন। আমরা আকাশে সমুদ্রে পর্বতে জ্যোতিষ্কলোকে, বিশ্বব্যাপী অমোঘ নিয়মতন্ত্রের মধ্যে, অসীমকে দেখি; কিন্তু সেখানে আমরা অসীমকে আমার সমস্ত দিয়ে দেখতে পাই নে। মানুষের মধ্যে যখন অসীমের প্রকাশ দেখি তখন আমরা অসীমকে আমার সকল দিক দিয়েই দেখি এবং যে দেখা সকলের চেয়ে অন্তরতম সেই দেখা দিয়ে দেখি। সেই দেখা হচ্ছে ইচ্ছার মধ্যে ইচ্ছাকে দেখতে পাওয়া। জগতের নিয়মের মধ্যে আমরা শক্তিকে দেখতে পাই; কিন্তু ইচ্ছাশক্তিকে দেখতে গেলে ইচ্ছার মধ্যে ছাড়া আর কোথায় দেখব? ভক্তের ইচ্ছা যখন ভগবানের ইচ্ছাকে জ্ঞানে প্রেমে কর্মে প্রকাশ করতে থাকে তখন যে অপরূপ পদার্থ দেখি জগতে সে আর কোথায় দেখতে পাব? অগ্নি জল বায়ু সূর্য তারা যত উজ্জ্বল যত প্রবল যত বৃহৎ হোক এই প্রকাশকে সে তো দেখাতে পারে না। তারা শক্তিকে দেখায়, কিন্তু শক্তিকে দেখানোর মধ্যে একটা বন্ধন একটা পরাভব আছে। তারা নিয়মকে রেখামাত্র লঙ্ঘন করতে পারে না। তারা যা তাদের তাই হওয়া ছাড়া আর উপায় নেই, কেননা তাদের লেশমাত্র ইচ্ছা নেই। এমনতরো জড়যন্ত্রের মধ্যে ইচ্ছার আনন্দ পূর্ণভাবে প্রকাশ হতে পারে না।

মানুষের মধ্যে ঈশ্বর এই ইচ্ছার জায়গাটাতে আপনার সর্বশক্তিমত্তাকে সংহরণ করেছেন— এইখানে তাঁর থেকে তাকে কিছু পরিমাণ স্বতন্ত্র করে দিয়েছেন; সেই স্বাতন্ত্র্যে তিনি তাঁর শক্তি প্রয়োগ করেন না। কেননা, সেই স্বাধীনতার ক্ষেত্রটুকুতে দাসের সঙ্গে প্রভুর সম্বন্ধ নয়, সেখানে প্রিয়ের সঙ্গে প্রিয়ের মিলন। সেইখানেই সকলের চেয়ে বড়ো প্রকাশ— ইচ্ছার প্রকাশ, প্রেমের প্রকাশ। সেখানে আমরা তাঁকে মানতেও পারি, না মানতেও পারি; সেখানে আমরা তাঁকে আঘাত দিতে পারি। সেখানে আমরা ইচ্ছাপূর্বক তাঁর ইচ্ছাকে গ্রহণ করব, প্রীতির দ্বারা তাঁর প্রেমকে স্বীকার করব— সেই একটি মস্ত অপেক্ষা একটি মস্ত ফাঁক রয়ে গেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কেবলমাত্র এই ফাঁকটুকুতেই সর্বশক্তিমানের সিংহাসন পড়ে নি। কেননা, এইখানে প্রেমের আসন পাতা হবে।

এই যেখানে ফাঁক রয়ে গেছে এইখানেই যত অসত্য অন্যায় পাপ মলিনতার অবকাশ ঘটেছে; কেননা, এইখান থেকেই তিনি ইচ্ছা করেই একটু সরে গিয়েছেন। এইখানে মানুষ এতদূর পর্যন্ত বীভৎস হয়ে উঠতে পারে যে আমরা সংশয়ে পীড়িত হয়ে বলে উঠি জগদীশ্বর যদি থাকতেন তবে এমনটি ঘটতে পারত না; বস্তুত সে জায়গায় জগদীশ্বর আচ্ছন্নই আছেন, সে জায়গা তিনি মানুষেকেই ছেড়ে দিয়েছেন। সেখান থেকে তাঁর নিয়ম একেবারে চলে গেছে তা নয়; কিন্তু মা যেমন শিশুকে স্বাধীনভাবে চলতে শেখাবার সময় তার কাছে থাকেন অথচ তাকে ধরে থাকেন না, তাকে খানিকটা পরিমাণে পড়ে যেতে এবং আঘাত পেতে অবকাশ দেন, এও সেই রকম। মানুষের ইচ্ছার ক্ষেত্রটুকুতে তিনি আছেন, অথচ নেই। এইজন্য সেই জায়গাটাতে আমরা এত আঘাত করছি, আঘাত পাচ্ছি, ধুলায় আমাদের সর্বাঙ্গ মলিন হয়ে উঠছে, সেখানে আমাদের দ্বিধাদ্বন্দ্বের আর অন্ত নেই, সেইখানেই আমাদের যত পাপ। সেইখান থেকেই মানুষের এই প্রার্থনা ধ্বনিত হয়ে উঠছে: আবিরাবীর্ম এধি। হে প্রকাশ, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক। বৈদিক ঋষির ভাষার এই প্রার্থনাটাই এই বাংলাদেশে পথ চলতে চলতে শোনা যায় এমন গানে যে গান সাহিত্যে স্থান পায় নি, এমন লোকের কণ্ঠে যার কোনো অক্ষরবোধ হয় নি। সেই বাংলাদেশের নিতান্ত সরলচিত্তের সরল সুরের সারি গান: মাঝি, তোর বইঠা নে রে, আমি আর বাইতে পারলাম না! তোমার হাল তুমি ধরো, এই তোমার জায়গায় তুমি এসো, আমার ইচ্ছা নিয়ে আমি আর পেরে উঠলুম না। আমার মধ্যে যে বিচ্ছেদটুকু আছে সেখানে তুমি আমাকে একলা বসিয়ে রেখো না। হে প্রকাশ, সেখানে তোমার প্রকাশ পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক

এত বাধা বিরোধ, এত অসত্য, এত জড়তা, এত পাপ কাটিয়ে উঠে তবে ভক্তের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়। জড়জগতে তাঁর প্রকাশের যে বাধা নেই তা নয়; কারণ, বাধা না হলে প্রকাশ হতেই পারে না। জড়জগতে তাঁর নিয়মই তাঁর শক্তিকে বাধা দিয়ে তাকে প্রকাশ করে তুলছে; এই নিয়মকে তিনি স্বীকার করেছেন। আমাদের চিত্তজগতে যেখানে তাঁর প্রেমের মিলনকে তিনি প্রকাশ করবেন সেখানে সেই প্রকাশের বাধাকে তিনি স্বীকার করেছেন, সে হচ্ছে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা। এই বাধার ভিতর দিয়ে যখন প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়— যখন ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা, প্রেমের সঙ্গে প্রেম, আনন্দের সঙ্গে আনন্দ মিলে যায়, তখন ভক্তের মধ্যে ভগবানের এমন একটি আবির্ভাব হয় যা আর কোথাও হতে পারে না।

এইজন্যই আমাদের দেশে ভক্তের গৌরব এমন করে কীর্তন করেছে যা অন্য দেশে উচ্চারণ করতে লোকে সংকোচ বোধ করে। যিনি আনন্দময়, আপনাকে যিনি প্রকাশ করেন, সেই প্রকাশে যাঁর আনন্দ, তিনি তাঁর সেই আনন্দকে বিশুদ্ধ আনন্দরূপে প্রকাশ করেন ভক্তের জীবনে। এই প্রকাশের জন্যে তাঁকে ভক্তের ইচ্ছার অপেক্ষা করতে হয়; এখানে জোর খাটে না। রাজার পেয়াদা প্রেমের রাজ্যে পা বাড়াতে পারে না। প্রেম ছাড়া প্রেমের গতি নেই। এইজন্যে ভক্ত যে দিন আপনার অহংকারকে বিসর্জন দেয়, ইচ্ছা করে আপনার ইচ্ছাকে তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে মিলিয়ে দেয়, সেই দিন মানুষের মধ্যে তাঁর আনন্দের প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়। সেই প্রকাশ তিনি চাচ্ছেন। সেইজন্যই মানুষের হৃদয়ের দ্বারে নিত্য নিত্যই তাঁর সৌন্দর্যের লিপি এসে পৌঁচচ্ছে, তাঁর রসের আঘাত কত রকম করে আমাদের চিত্তে এসে পড়ছে— এবং ঘুম থেকে আমাদের সমস্ত প্রকৃতিকে জাগিয়ে তোলবার জন্যে বিপদ মৃত্যু দুঃখ শোক ক্ষণে ক্ষণে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। সেই প্রকাশ তিনি চাচ্ছেন, সেইজন্যেই আমাদের চিত্তও সকল বিস্মৃতি সকল অসাড়তার মধ্যেও গভীরতর ভাবে সেই প্রকাশকে চাচ্ছে। বলছে: আবিরাবীর্ম এধি।

আমাদের দেশের ভক্তিশাস্ত্রের এই স্পর্ধার কথা, অর্থাৎ অনন্তের ইচ্ছা আমাদের ইচ্ছার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে এই কথা, আজকাল অন্য দেশের অন্য ভাষাতেও আভাস দিচ্ছে। সেদিন একজন ইংরেজ ভক্ত কবির কবিতায় এই কথাই দেখলুম। তিনি ভগবানকে ডেকে বলছেন—

Thou hast need of thy meanest creature;
  thou hast need of what once was thine:
The thirst that consumes my spirit
  is the thirst of thy heart for mine.

তিনি বলছেন, তোমার দীনতম জীবটিকেও তোমার প্রয়োজন আছে; সে যে একদিন তোমাতেই ছিল, আবার তুমি তাকে তোমারই করে নিতে চাও; আমার চিত্তকে যে তৃষায় দগ্ধ করছে সে যে তোমারই তৃষা, আমার জন্যে তোমার হৃদয়ের তৃষা।

পশ্চিম হিন্দুস্থানের পুরাকালের এক সাধক কবি, তাঁর নাম জ্ঞানদাস বঘেলি— তিনিও ঠিক এই কথাই বলেছেন। আমার এক বন্ধু তার বাংলা অনুবাদ করেছেন—

অসীম ক্ষুধায় অসীম তৃষায়
বহ প্রভু অসীম ভাষায়,
তাই দীননাথ, আমি ক্ষুধিত, আমি তৃষিত,
তাই তো আমি দীন।

আমার জন্যে তাঁরই যে তৃষা তা'ই তাঁর জন্যে আমার তৃষার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে। তাঁর অসীম তৃষাকে তিনি অসীম ভাষায় প্রকাশ করছেন। সেই ভাষাই তো উষার আলোকে, নিশীথের নক্ষত্রে, বসন্তের সৌরভে, শরতের স্বর্ণকিরণে। জগতে এই ভাষার তো আর কোনোই কাজ নেই, সে তো কেবলই হৃদয়ের প্রতি হৃদয়মহাসমুদ্রের ডাক। সে কবি বলরাম দাসের ভাষায় বলছে: তোমায় হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির! তুমি আমার হৃদয়ের ভিতরেই ছিলে, কিন্তু বিচ্ছেদ হয়েছে; সেই বিচ্ছেদ মিটিয়ে আবার ফিরে এসো, সমস্ত দুঃখের পথটা মাড়িয়ে আবার আমাতে ফিরে এসো, হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের মিলন সম্পূর্ণ হোক।— এই একটি বিরহবেদনা অনন্তের মধ্যে রয়েছে, সেই জন্যেই আমার মধ্যেও আছে।

I have come from thee, why I know not;
but thou art, O God! what thou art;
And the round of eternal being is
the pulse of thy beating heart.

আমি তোমার মধ্য থেকে এসেছি কেন যে তা জানি নে, কিন্তু হে ঈশ্বর, তুমি যেমন তেমনিই আছ; এই-যে একবার তোমা থেকে বেরিয়ে আবার যুগযুগান্তের মধ্য দিয়ে তোমাতেই ফিরে আসা এই হচ্ছে তোমার অসীম হৃদয়ের এক-একটি হৃৎস্পন্দন।

অনন্তের মধ্যে এই-যে বিরহবেদনা সমস্ত বিশ্বকাব্যকে রচনা করে তুলছে, কবি জ্ঞানদাস তাঁর ভগবানকে বলছেন, এই বেদনা তোমাতে আমাতে ভাগ করে ভোগ

করব ; এ বেদনা যেমন তোমার তেমনি আমার। তাই কবি বলছেন, আমি যে দুঃখ পাচ্ছি তাতে তুমি লজ্জা কোরো না প্রভু।—

প্রেমের পত্নী তোমার আমি,
আমার কাছে লাজ কী স্বামী!
তোমার সকল ব্যথার ব্যথী আমায়
করো নিশিদিন।
নিদ্রা নাহি চক্ষে তব,
আমিই কেন ঘুমিয়ে রব!
বিশ্ব তোমার বিরাট গেহ,
আমিও বিশ্বে লীন।

ভোগের সুখ তো আমি চাই নে— যারা দাসী তাদের সেই সুখের বেতন দিয়ো। আমি যে তোমার পত্নী ; আমি তোমার বিশ্বের সমস্ত দুঃখের ভার তোমার সঙ্গে বহন করব। সেই দুঃখের ভিতর দিয়েই সেই দুঃখকে উত্তীর্ণ হব। আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ অখণ্ড মিলনে সম্পূর্ণ হবে। সেই জন্যেই, আমি বলছি নে আমাকে সুখ দাও, আমি বলছি : আবিরাবীর্ম এধি। হে প্রকাশ, আমার মধ্যে তুমি প্রকাশিত হও।

আমি তোমার ধর্মপত্নী,
ভোগের দাসী নহি।
আমার কাছে লাজ কি স্বামী,
নিষ্কপটে কহি—
আমায় প্রভু, দেখাইয়ো না
সুখের প্রলোভন,
তোমার সাথে দুঃখ বহি
সেই তো পরম ধন।
ভোগের দাসী তোমার নহি,
তাই তো ভুলাও নাকো,
মিথ্যা সুখে মিথ্যা মানে
দূরে ফেলাও নাকো।
পতিব্রতা সতী আমি,
তাই তো তোমার ঘরে

হে ভিখারি, সব দারিদ্র্য
আমার সেবা করে।
সুখের ভৃত্য নই তব, তাই
পাই না সুখের দান—
আমি তোমার প্রেমের পত্নী
এই তো আমার মান।

মানুষ যখন প্রকাশের সম্পূর্ণতাকে চাবার জন্যে সচেতন হয়ে জাগ্রত হয়ে ওঠে তখন সে সুখকে সুখই বলে না। তখন সে বলে : যো বৈ ভূমা তৎ সুখং। যা ভূমা তাই সুখ। আপনার মধ্যে যখন সে ভূমাকে চায় তখন আর আরামকে চাইলে চলবে না, স্বার্থকে চাইলে চলবে না, তখন আর কোণে লুকোবার জো নেই, তখন কেবল আপনার হৃদয়োচ্ছ্বাস নিয়ে আপনার আঙিনায় কেঁদে লুটিয়ে বেড়াবার দিন আর থাকে না। তখন নিজের চোখের জল মুছে ফেলে বিশ্বের দুঃখের ভার কাঁধে তুলে নেবার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। তখন কর্মের আর অন্ত নেই, ত্যাগের আর সীমা নেই। তখন ভক্ত বিশ্ববোধের মধ্যে,বিশ্বপ্রেমের মধ্যে, বিশ্বসেবার মধ্যে আপনাকে ভূমার প্রকাশে প্রকাশিত করতে থাকে।

ভক্তের জীবনের মধ্যে যখন সেই প্রকাশকে আমরা দেখি তখন কী দেখি? দেখি, সে তর্কবিতর্ক নয়, সে তত্ত্বজ্ঞানের টীকাভাষ্য বাদপ্রতিবাদ নয়, সে বিজ্ঞান নয়, দর্শন নয়— সে একটি একের সম্পূর্ণতা, অখণ্ডতার পরিব্যক্তি। যেমন জগৎকে প্রত্যক্ষ অনুভব করবার জন্যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাশালায় যাবার দরকার হয় না, সেও তেমনি। ভক্তের সমস্ত জীবনটিকে এক করে মিলিয়ে নিয়ে অসীম সেখানে একেবারে সহজরূপে দেখা দেন। তখন ভক্তের জীবনের সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে আর বিরুদ্ধতা দেখতে পাই নে। তার আগাগোড়াইসেই একের মধ্যে সুন্দর হয়ে, মহৎ হয়ে, শক্তিশালী হয়ে মেলে। জ্ঞান মেলে, ভক্তি মেলে, কর্ম মেলে। বাহির মেলে, অন্তর মেলে। কেবল যে সুখ মেলে তা নয়, দুঃখও মেলে। কেবল যে জীবন মেলে তা নয়, মৃত্যুও মেলে। কেবল যে বন্ধু মেলে তা নয়, শত্রুও মেলে। সমস্তই আনন্দে মিলে যায়, রাগিণীতে মিলে ওঠে। তখন জীবনের সমস্ত সুখদুঃখ বিপদ্‌সম্পদের পরিপূর্ণ সার্থকতা সুডোল হয়ে, নিটোল অবিচ্ছিন্ন হয়ে প্রকাশমান হয়। সেই প্রকাশেরই অনির্বচনীয় রূপ হচ্ছে প্রেমের রূপ। সেই প্রেমের রূপে সুখ এবং দুঃখ দুই'ই সুন্দর, ত্যাগ এবং ভোগ দুই'ই পবিত্র, ক্ষতি এবং লাভ দুই'ই সার্থক; এই প্রেমে সমস্ত বিরোধের আঘাত, বীণার তারে অঙ্গুলির আঘাতের মতো, মধুর সুরে বাজতে

থাকে। এই প্রেমের মৃদুতাও যেমন সুকুমার বীরত্বও তেমনি সুকঠিন। এই প্রেম দূরকে এবং নিকটকে, আত্মীয়কে এবং পরকে, জীবনসমুদ্রের এ পারকে এবং ও পারকে প্রবল মাধুর্যে এক করে দিয়ে, দিগ্‌দিগন্তরের ব্যবধানকে আপন বিপুল সুন্দর হাস্যের ছটায় পরাহত করে দিয়ে, উষার মতো উদিত হয়। অসীম তখন মানুষের নিতান্ত আপনার সামগ্রী হয়ে দেখা দেন পিতা হয়ে, বন্ধু হয়ে, স্বামী হয়ে, তার সুখদুঃখের ভাগী হয়ে, তার মনের মানুষ হয়ে। তখন অসীমে সসীমে যে প্রভেদ সেই প্রভেদ কেবলই অমৃতে ভরে ভরে উঠতে থাকে, সেই ফাঁকটুকুর ভিতর দিয়ে মিলনের পারিজাত আপনার পাপড়ি একটির পর একটি করে বিকশিত করতে থাকে। তখন জগতের সকল প্রকাশ, সকল আকাশের সকল তারা, সকল ঋতুর সকল ফুল, সেই প্রকাশের উৎসবে বাঁশি বাজাবার জন্যে ছুটে আসে। তখন হে রুদ্র, হে চিরদিনের পরম দুঃখ, হে চিরজীবনের বিচ্ছেদবেদনা, তোমার এ কী মূর্তি! এ কী দক্ষিণং মুখম্! তখন, তুমি নিত্য পরিত্রাণ করছ, সসীমতার নিত্য দুঃখ হতে নিত্য বিচ্ছেদ হতে তুমি নিত্যই পরিত্রাণ করে চলেছ— এই গূঢ় কথা আর গোপন থাকে না। তখন ভক্তের উদ্‌ঘাটিত হৃদয়ের ভিতর দিয়ে মানবলোকে তোমার সিংহদ্বার খুলে যায়। ছুটে আসে সমস্ত বালক বৃদ্ধ; যারা মূঢ় তারাও বাধা পায় না, যারা পতিত তারাও নিমন্ত্রণ পায়। লোকাচারের কৃত্রিম শাস্ত্রবিধি টলমল করতে থাকে এবং শ্রেণীভেদের নিষ্ঠুর পাষাণপ্রাচীর করুণায় বিগলিত হয়ে পড়ে। তোমার বিশ্বজগৎ আকাশে এই কথাটা বলে বেড়াচ্ছে যে 'আমি তোমার'। এই কথা বলে সে নতশিরে তোমার নিয়ম পালন করে চলছে। মানুষ তার চেয়ে ঢের বড়ো কথা বলবার জন্য অনন্ত আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। সে বলতে চায় 'তুমি আমার'। কেবল তোমার মধ্যে আমার স্থান তা নয়, আমার মধ্যেও তোমার স্থান। তুমি আমার প্রেমিক, আমি তোমার প্রেমিক। আমার ইচ্ছায় আমি তোমার ইচ্ছাকে স্থান দেব, আমার আনন্দে আমি তোমার আনন্দকে গ্রহণ করব— এই জন্যেই আমার এত দুঃখ, এত বেদনা, এত আয়োজন। এ দুঃখ তোমার জগতে আর-কারও নেই। নিজের অন্তর-বাহিরের সঙ্গে দিনরাত্রি লড়াই করতে করতে এ কথা আর-কেউ বলছে না 'আবিরাবীর্ম এধি'। তোমার বিচ্ছেদ-বেদনা বহন করে জগতে আর-কেউ এমন করে কাঁদছে না যে 'মা মা হিংসীঃ'। তোমার পশুপক্ষীরা বলছে, আমার ক্ষুধা দূর করো, আমার শীত দূর করো, আমার তাপ দূর করো। আমরাই বলছি: বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব। আমার সমস্ত পাপ দূর করো। কেন বলছি। নইলে, হে প্রকাশ, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ হয় না। সেই মিলন না হওয়ার যে দুঃখ সে দুঃখ কেবল আমার নয়, সে দুঃখ অনন্তের

মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। এইজন্যে, মানুষ যে দিকেই ঘুরুক, যাই করুক, তার সকল চেষ্টার মধ্যেই সে চিরদিন এই সাধনার মন্ত্রটি বহন করে নিয়ে চলেছে: আবিরাবীর্ম এধি। এ তার কিছুতেই ভোলবার নয়। আরাম-ঐশ্বর্যের পুষ্পশয্যার মধ্যে শুয়েও সে ভুলতে পারে না। দুঃখযন্ত্রণার অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পড়েও সে ভুলতে পারে না। প্রকাশ, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও, তুমি আমার হও, আমার সমস্তকে অধিকার করে তুমি আমার হও, আমার সমস্ত সুখদুঃখের উপরে দাঁড়িয়ে তুমি আমার হও, আমার সমস্ত পাপকে তোমার পায়ের তলায় ফেলে দিয়ে তুমি আমার হও। সমস্ত অসংখ্য লোকলোকান্তর যুগযুগান্তরের উপরে নিস্তব্ধ বিরাজমান যে পরম এক তুমি, সেই মহা এক তুমি, আমার মধ্যে আমার হও। সেই এক তুমি 'পিতা নোঽসি'— আমার পিতা। সেই এক তুমি 'পিতা নো বোধি'— আমার বোধের মধ্যে আমার পিতা হও, আমার প্রবৃত্তির মধ্যে প্রভু হও, আমার প্রেমের মধ্যে প্রিয়তম হও। এই প্রার্থনা জানাবার যে গৌরব মানুষ আপনার অন্তরাত্মার মধ্যে বহন করেছে, এই প্রার্থনা সফল করবার যে গৌরব আপন ভক্তপরম্পরার মধ্য দিয়ে কত কাল হতে লাভ করে এসেছে, মানুষের সেই শ্রেষ্ঠতম গভীরতম চিরন্তন গৌরবের উৎসব আজ এই সন্ধ্যাবেলায়, এই লোকালয়ের প্রান্তে, অন্ধকার পৃথিবীর নানা জন্মমৃত্যু হাসিকান্না কাজকর্ম বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মধ্যে এই ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণটিতে। মানুষের সেই গৌরবের আনন্দধ্বনিকে আলোকে সংগীতে পুষ্পমালায় স্তবগানে উদ্‌ঘোষিত করবার এই উৎসব। বিশ্বের মধ্যে তুমি একমেবাদ্বিতীয়ম্, মানুষের ইতিহাসে তুমি একমেবাদ্বিতীয়ম্, আমার হৃদয়ের সত্যতম প্রেমে তুমি একমেবাদ্বিতীয়ম্— এই কথা জানতে এবং জানাতে আমরা এখানে এসেছি। তর্কের দ্বারা নয়, যুক্তির দ্বারা নয়। আনন্দের দ্বারা, শিশু যেমন সহজবোধে তার পিতামাতাকে জানে এবং জানায় সেই রকম পরিপূর্ণ প্রত্যয়ের দ্বারা। হে উৎসবের অধিদেবতা, আমাদের প্রত্যেকের কাছে এই উৎসবকে সফল করো, এই উৎসবের মধ্যে, হে আবিঃ, তুমি আবির্ভূত হও। আমাদের সকলের সম্মিলিত চিত্তাকাশে তোমার দক্ষিণমুখ প্রকাশিত হোক। প্রতিদিন আপনাকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র জেনে যে দুঃখ পেয়েছি সেই বোধ হতে, সেই দুঃখ হতে, এখনই আমাদের পরিত্রাণ করো। সমস্ত লোভ-ক্ষোভের ঊর্ধ্বে ভূমার মধ্যে আত্মাকে উপলব্ধি করে বিশ্বমানবের বিরাট সাধনমন্দিরে আজ এখনই তোমাকে নত হয়ে নমস্কার করি। নমস্তেঽস্তু। তোমাতে আমাদের নমস্কার সত্য হোক, নমস্কার সত্য হোক।

ফাল্গুন ১৩১৭

ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা

একটি গান যখনই ধরা যায় তখনই তার রূপ প্রকাশ হয় না; তার একটা অংশ সম্পূর্ণ হয়ে যখন সমে ফিরে আসে তখন সমস্তটার রাগিণী কী এবং তার অন্তরাটা কোন্ দিকে গতি নেবে সে কথা চিন্তা করবার সময় আসে।

আমাদের দেশের ইতিহাসে ব্রাহ্মসমাজেরও ভূমিকা একটা শমে এসে দাঁড়িয়েছে; তার আরম্ভের দিকের কাজ একটা সমাপ্তির মধ্যে পৌঁচেছে। যে-সমস্ত প্রাণহীন অভ্যস্ত লোকাচারের জড় আবরণের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে হিন্দুসমাজ আপনার চিরন্তন সত্য সম্বন্ধে চেতনা হারিয়ে বসেছিল ব্রাহ্মসমাজ তার সেই আবরণকে ছিন্ন করবার জন্যে তাকে আঘাত করতে প্রস্তুত হয়েছিল।

ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে এই-যে আঘাত দেবার কাজ এ একটা শমে এসে উত্তীর্ণ হয়েছে। হিন্দুসমাজ নিজের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে; হিন্দুসমাজ নানা দিক দিয়ে নিজের ভিতরকার নিত্যতম এবং মহত্তম সত্যকে উপলব্ধি করবার জন্যে চেষ্টা করতে প্রবৃত্ত হয়েছে।

এই চেষ্টা একেবারে সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না, এই চেষ্টা নানা ঘাতপ্রতিঘাত ও সত্যমিথ্যার ভিতর দিয়ে ঘুরে নানা শাখা-প্রশাখার পথ খুঁজতে খুঁজতে আপন সার্থকতার দিকে অগ্রসর হবে। এই চেষ্টার অনেক রূপ দেখা যাচ্ছে যার মধ্যে সত্যের মূর্তি বিশুদ্ধভাবে প্রকাশ পাচ্ছে না; কিন্তু তবু যেটি প্রধান কাজ সেটি সম্পন্ন হয়েছে, হিন্দুসমাজের চিত্ত জেগে উঠেছে।

এই চিত্ত যখন জেগেছে তখন হিন্দুসমাজ আর তো অন্ধভাবে কালের স্রোতে ভেসে যেতে পারে না; তাকে এখন থেকে দিক্‌নির্ণয় করে চলতেই হবে, নিজের হালটা কোথায় তা তাকে খুঁজে নিতেই হবে। ভুল অনেক করবে, কিন্তু ভুল করবার শক্তি যার হয়েছে ভুল সংশোধন করবারও শক্তি তার জেগেছে।

তাই বলছিলুম, ব্রাহ্মসমাজের আরম্ভের কাজটা শমে এসে সমাপ্ত হয়েছে। সে নিদ্রিত সমাজকে জাগিয়েছে। কিন্তু, এইখানেই কি ব্রাহ্মসমাজের কাজ ফুরিয়েছে? যে পথিকরা পান্থশালায় ঘুমিয়ে পড়েছিল তাদের দ্বারে আঘাত করেই কি সে চলে যাবে। কিম্বা জাগরণের পরেও কি সেই দ্বারে আঘাত করার বিরক্তিকর অভ্যাস সে পরিত্যাগ করতে পারবে না। এবার কি পথে চলবার কাজে তাকে অগ্রসর হতে হবে না।

নিরুদ্ধ উৎসের বাধা দূর করবার জন্যে যতক্ষণ পর্যন্ত মাটি খোঁড়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত সে কাজটা বিশেষভাবে আমারই। সেই খনন-করা কূপটাকে আমার বলে অভিমান করতে পারি। কিন্তু, যখন খুঁড়তে খুঁড়তে উৎস বেরিয়ে পড়ে তখন কোদাল ফেলে দিয়ে সেই গর্ত ছেড়ে বাইরে উঠে পড়তে হয়। তখন যে ঝর্নাটা দেখা দেয় সে যে বিশ্বের জিনিস; তার উপরে আমারই সিলমোহরের ছাপ দিয়ে তাকে আর সংকীর্ণ অধিকারের মধ্যে ধরে রেখে দিতে পারি না। তখন সেই উৎস নিজের পথ নিজে প্রস্তুত করে নিয়ে বাইরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে— তখন আমরাই তার অনুসরণ করতে প্রবৃত্ত হই।

আমাদের সাম্প্রদায়িক ইতিহাসেরও এই দুই রকম দুই অধ্যায় আছে। যতদিন বাধা দূর করবার পালা ততদিন আমাদের চেষ্টা, আমাদের কৃতিত্ব; ততদিন আমাদের কাজ চারি দিক থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন, এমন-কি চারি দিকের বিরুদ্ধ; ততদিন সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতা অত্যন্ত তীব্র।

অবশেষে গভীর থেকে গভীরতরে যেতে যেতে এমন একটি জায়গায় গিয়ে পৌঁছনো যায় যেখানে বিশ্বের মর্মগত চিরন্তন সত্য-উৎস আর প্রচ্ছন্ন থাকে না। সে জিনিস সকলেরই জিনিস; সে যখন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে তখন খন্তা কোদাল ফেলে দিয়ে, আঘাতের কাজ বন্ধ রেখে, নিজেকে তারই অনুবর্তী করে বিশ্বের ক্ষেত্রে সকলের সঙ্গে মিলনের পথে বেরিয়ে পড়তে হয়। সম্প্রদায় তখন কূপের কাজ ছেড়ে বাইরের কাজে আপনি ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তখন তার লক্ষপরিবর্তন হয়, তখন তার বোধশক্তি নিখিলের বৃহৎ প্রতিষ্ঠাকে আশ্রয় করে— পদে পদে আপনাকেই তীব্রভাবে অনুভব করে না।

ব্রাহ্মসমাজ কি আজ আপনার সেই সার্থকতার সম্মুখে এসে পৌঁছে নিজের এত-দিনকার সমস্ত ভাঙাগড়ার চেষ্টাকে সাম্প্রদায়িকতার বাইরে মুক্তক্ষেত্রের মধ্যে দেখবার অবকাশ পায় নি?

অবশ্য, ব্রাহ্মসমাজ ব্যক্তিগত দিক থেকে আমাদের একটা আশ্রয় দিয়েছে, সেটা অবহেলা করবার নয়। পূর্বে আমাদের ভক্তিবৃত্তি জ্ঞানবৃত্তি বহুদিনব্যাপী দুর্গতিপ্রাপ্ত দেশের নানা খণ্ডতা ও বিকৃতির মধ্যে যথার্থ পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারছিল না। পৃথিবী যখন তার বৃহৎ ইতিহাস ও বিজ্ঞান নিয়ে আমাদের দেশবদ্ধ সংস্কারের বেড়া ভেঙে আমাদের সম্মুখে এসে আবির্ভূত হল তখন হঠাৎ বিশ্বপৃথিবীব্যাপী আদর্শের সঙ্গে আমাদের বিশ্বাস ও আচারকে মিলিয়ে দেখবার একটা সময় এসে পড়ল। সেই সংকটের সময়ে অনেকেই নিজের দেশের প্রতি এবং প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের প্রতি

সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাহীন হয়ে পড়েছিল। সেই বিপদের দিন থেকে আজ পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ আমাদের বুদ্ধিকে ও ভক্তিকে আশ্রয় দিয়েছে, আমাদের ভেসে যেতে দেয় নি।

সাম্প্রদায়িক দিক থেকেও দেখা যেতে পারে, ব্রাহ্মসমাজ আঘাতের দ্বারা ও দৃষ্টান্তের দ্বারা সমাজের বহুতর কুরীতি ও কুসংস্কার দূর করেছে এবং বিশেষভাবে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের শিক্ষা ও অবস্থার পরিবর্তন -সাধন করে তাদের মনুষ্যত্বের অধিকারকে প্রশস্ত করে দিয়েছে।

কিন্তু ব্রাহ্মসমাজকে আশ্রয় করে আমরা উপাসনা করে আনন্দ পাচ্ছি এবং সামাজিক কর্তব্যসাধন করে উপকার পাচ্ছি, এইটুকুমাত্র স্বীকার করেই থামতে পারি নে। ব্রাহ্মসমাজের উপলব্ধিকে এর চেয়ে অনেক বড়ো করে পেতে হবে।

এ কথা সত্য নয় যে ব্রাহ্মসমাজ কেবলমাত্র আধুনিক কালের হিন্দুসমাজকে সংস্কার করবার একটা চেষ্টা, অথবা ঈশ্বরোপাসকের মনে জ্ঞান ও ভক্তির একটা সমন্বয় -সাধনের বর্তমানকালীন প্রয়াস। ব্রাহ্মসমাজ চিরন্তন ভারতবর্ষের একটি আধুনিক আত্মপ্রকাশ।

ইতিহাসে দেখা গিয়েছে ভারতবর্ষ বারম্বার নব নব ধর্মমতের প্রবল আঘাত সহ্য করেছে। কিন্তু, চন্দনতরু যেমন আঘাত পেলে আপনার গন্ধকেই আরও অধিক করে প্রকাশ করে তেমনি ভারতবর্ষও যখনই প্রবল আঘাত পেয়েছে তখনই আপনার সকলের চেয়ে সত্যসাধনাকেই ব্রহ্মসাধনাকেই নূতন করে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তা যদি না করত তা হলে সে আত্মরক্ষা করতেই পারত না।

মুসলমানধর্ম প্রবল ধর্ম, এবং তা নিশ্চেষ্ট ধর্ম নয়। এই ধর্ম যেখানে গেছে সেখানেই আপনার বিরুদ্ধ ধর্মকে আঘাত করে ভূমিসাৎ করে তবে ক্ষান্ত হয়েছে। ভারতবর্ষের উপরেও এই প্রচণ্ড আঘাত এসে পড়েছিল এবং বহু শতাব্দী ধরে এই আঘাত নিরন্তর কাজ করেছে।

এই আঘাতবেগ যখন অত্যন্ত প্রবল তখনকার ধর্ম-ইতিহাস আমরা দেখতে পাই নে। কারণ, সে ইতিহাস সংকলিত ও লিপিবদ্ধ হয় নি। কিন্তু, সেই মুসলমান-অভ্যাগমের যুগে ভারতবর্ষে যে-সকল সাধক জাগ্রত হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের বাণী আলোচনা করে দেখলে স্পষ্ট দেখা যায় ভারতবর্ষ আপন অন্তরতম সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়ে এই মুসলমানধর্মের আঘাতবেগকে সহজেই গ্রহণ করতে পেরেছিল।

সত্যের আঘাত কেবল সত্যই গ্রহণ করতে পারে। এইজন্য প্রবল আঘাতের মুখে প্রত্যেক জাতি হয় আপনার শ্রেষ্ঠ সত্যকে সমুজ্জ্বল করে প্রকাশ করে, নয় আপনার মিথ্যা সম্বলকে উড়িয়ে দিয়ে দেউলে হয়ে যায়। ভারতবর্ষেরও যখন আত্ম-

রক্ষার দিন উপস্থিত হয়েছিল তখন সাধকের পর সাধক এসে ভারতবর্ষের চিরসত্যকে প্রকাশ করে ধরেছিলেন। সেই যুগের নানক রবিদাস কবীর দাদূ প্রভৃতি সাধুদের জীবন ও রচনা যাঁরা আলোচনা করছেন তাঁরা সেই সময়কার ধর্ম-ইতিহাসের যবনিকা অপসারিত করে যখন দেখাবেন তখন দেখতে পাব ভারতবর্ষ তখন আত্মসম্পদ সম্বন্ধে কিরকম সবলে সচেতন হয়ে উঠেছিল।

ভারতবর্ষ তখন দেখিয়েছিল, মুসলমানধর্মের যেটি সত্য সেটি ভারতবর্ষের সত্যের বিরোধী নয়। দেখিয়েছিল, ভারতবর্ষের মর্মস্থলে সত্যের এমন একটি বিপুল সাধনা সঞ্চিত হয়ে আছে যা সকল সত্যকে আত্মীয় বলে গ্রহণ করতে পারে। এইজন্যেই সত্যের আঘাত তার বাইরে এসে যতই ঠেকুক তার মর্মে গিয়ে কখনো বাজে না, তাকে বিনাশ করে না।

আজ আবার পাশ্চাত্যজগতের সত্য আপনার জয়ঘোষণা করে ভারতবর্ষের দুর্গ-দ্বারে আঘাত করেছে। এই আঘাত কি আত্মীয়ের আঘাত হবে না শত্রুর আঘাত হবে। প্রথম যেদিন সে শৃঙ্গধ্বনি করে এসেছিল সেদিন তো মনে করেছিলুম সে বুঝি মৃত্যুবাণ হানবে। আমাদের মধ্যে যারা ভীরু তারা মনে করেছিল ভারতবর্ষের সত্যসম্বল নেই, অতএব এইবার তাকে তার জীর্ণ আশ্রয় পরিত্যাগ করতে হল বুঝি।

কিন্তু, তা হয় নি। পৃথিবীর নব আগন্তুকের সাড়া পেয়ে ভারতবর্ষের নবীন সাধকেরা নির্ভয়ে তার বহু দিনের অবরুদ্ধ দুর্গের দ্বার খুলে দিলেন। ভারতবর্ষের সাধন-ভাণ্ডারে এবার পাশ্চাত্য অতিথিকে সমাদরে আহ্বান করা হয়েছে— ভয় নেই, কোনো অভাব নেই— এইবার যে ভোজ হবে সেই আনন্দভোজে পূর্ব পশ্চিম এক পংক্তিতে বসে যাবে।

ভারতবর্ষের সেই চিরন্তন সাধনার দ্বার-উদ্‌ঘাটনই ব্রাহ্মসমাজের ঐতিহাসিক তাৎপর্য। অনেক দিন দ্বার রুদ্ধ ছিল, তালায় মর্চে পড়েছিল, চাবি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এইজন্যে গোড়ায় খোলবার সময় কঠিন ধাক্কা দিতে হয়েছে, সেটাকে যেন বিরোধের মতো বোধ হয়েছিল।

কিন্তু, বিরোধ নয়। বর্তমানকালের সংঘর্ষে ব্রাহ্মসমাজে ভারতবর্ষ আপনার সত্যরূপ প্রকাশের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। চিরকালের ভারতবর্ষকে ব্রাহ্মসমাজ নবীন-কালের বিশ্বপৃথিবীর সভায় আহ্বান করেছে। বিশ্বপৃথিবীর পক্ষে এখনও এই ভারতবর্ষকে প্রয়োজন আছে। বিশ্বমানবের উত্তরোত্তর উদ্ভিদ্যমান সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে বর্তমান যুগে ভারতবর্ষের সাধনাই সকল সমস্যার সকল জটিলতার যথার্থ সমাধান

করে দেবে এই একটা আশা ও আকাঙ্ক্ষা বিশ্বমানবের বিচিত্রকণ্ঠে আজ ফুটে উঠছে।

ব্রাহ্মসমাজকে, তার সাম্প্রদায়িকতার আবরণ ঘুচিয়ে দিয়ে, মানব-ইতিহাসের এই বিরাট ক্ষেত্রে বৃহৎ করে উপলব্ধি করবার দিন আজ উপস্থিত হয়েছে।

আমরা ব্রহ্মকে স্বীকার করেছি এই কথাটি যদি সত্য হয় তবে আমরা ভারতবর্ষকে স্বীকার করেছি এবং ভারতবর্ষের সাধনক্ষেত্রে সমুদয় পৃথিবীর সত্যসাধনাকে গ্রহণ করবার মহাযজ্ঞ আমরা আরম্ভ করেছি।

ব্রহ্মের উপলব্ধি বলতে যে কী বোঝায় উপনিষদের একটি মন্ত্রে তার আভাস আছে—

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্‌সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি নিখিল ভুবনে প্রবেশ করে আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে বার বার নমস্কার করি।

ঈশ্বর সর্বব্যাপী এই মোটা কথাটা বলে নিষ্কৃতি পাওয়া নয়। এটি কেবল জ্ঞানের কথামাত্র নয়; এ একটি পরিপূর্ণ বোধের কথা। অগ্নি জল তরুলতাকে আমরা ব্যবহারের সামগ্রী বলেই জানি, এইজন্য আমাদের চিত্ত তাদের নিতান্ত আংশিক ভাবেই গ্রহণ করে; আমাদের চৈতন্য সেখানে পরমচৈতন্যকে অনুভব করে না। উপনিষদের উল্লিখিত মন্ত্রে আমাদের সমস্ত চেতনাকে সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যের মধ্যে আহ্বান করছে। জড়ে জীবে নিখিলভুবনে ব্রহ্মকে এই-যে উপলব্ধি করা এ কেবলমাত্র জ্ঞানের উপলব্ধি নয়, এ ভক্তির উপলব্ধি। ব্রহ্মকে সর্বত্র জানা নয়— সর্বত্র নমস্কার করা, বোধের সঙ্গে সঙ্গে নমস্কারকে বিশ্বভুবনে প্রসারিত করে দেওয়া। ভূমাকে যেখানে আমরা বোধ করি সেই বোধের রসই হচ্ছে ভক্তি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথাও এই রসের বিচ্ছেদ না রাখা, সমস্তকে ভক্তির দ্বারা চৈতন্যের মধ্যে উপলব্ধি করা, জীবনের এমন পরিপূর্ণতা জগদ্‌বাসের এমন সার্থকতা আর কী হতে পারে!

কালের বহুতর আবর্জনার মধ্যে এই ব্রহ্মসাধনা একদিন আমাদের দেশে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। সে জিনিস তো একেবারে হারিয়ে যাবার নয়। তাকে আমাদের খুঁজে পেতেই হবে। কেননা, এই ব্রহ্মসাধনা থেকে বাদ দিয়ে দেখলে মনুষ্যত্বের কোনো-একটা চরম তাৎপর্য থাকে না, সে একটা পুনঃপুন-আবর্তমান অন্তহীন ঘূর্ণার মতো প্রতিভাত হয়।

ভারতবর্ষ যে সত্যসম্পদ পেয়েছিল মাঝে তাকে হারাতে হয়েছে। কারণ, পুনর্বার তাকে বৃহত্তর করে পূর্ণতর করে পাবার প্রয়োজন আছে। হারাবার কারণের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা অপূর্ণতা ছিল; সেইটিকে শোধন করে নেবার জন্যেই তাকে হারাতে হয়েছে। একবার তার কাছে থেকে দূরে না গেলে তাকে বিশুদ্ধ ক'রে সত্য ক'রে দেখবার অবকাশ পাওয়া যায় না।

হারিয়েছিলুম কেন। আমাদের সাধনার মধ্যে একটা অসামঞ্জস্য ঘটেছিল। আমাদের সাধনার মধ্যে অন্তর ও বাহির, আত্মার দিক ও বিষয়ের দিক, সমান ওজন রেখে চলতে পারে নি। আমরা ব্রহ্মসাধনায় যখন জ্ঞানের দিকে ঝোঁক দিয়েছিলুম তখন জ্ঞানকেই একান্ত করে তুলেছিলুম; তখন জ্ঞান যেন জ্ঞানের সমস্ত বিষয়কে পর্যন্ত একেবারে পরিহার করে কেবল আপনার মধ্যেই আপনাকে পর্যাপ্ত করে তুলতে চেয়েছিল। আমাদের সাধনা যখন ভক্তির পথ অবলম্বন করেছিল ভক্তি তখন বিচিত্র কর্মে ও সেবায় আপনাকে প্রবাহিত করে না দিয়ে নিজের মধ্যেই নিজে ক্রমাগত উচ্ছ্বসিত হয়ে একটা ফেনিল ভাবোন্মত্ততার আবর্ত সৃষ্টি করেছে।

যে জিনিস জড় নয় সে কেবলমাত্র আপনাকে নিয়ে টিকতে পারে না, আপনার বাইরে তাকে আপনার খাদ্য খুঁজতে হয়। জীব যখন খাদ্যাভাবে নিজের চর্বি ও শারীর উপকরণকে নিজে ভিতরে ভিতরে খেতে থাকে তখন সে কিছুদিন বেঁচে থাকে, কিন্তু ক্রমশই নীরস ও নির্জীব হয়ে মারা পড়ে।

আমাদের জ্ঞানবৃত্তি হৃদয়বৃত্তিও কেবল আপনাকে আপনি খেয়ে বাঁচতে পারে না— আপনাকে পোষণ করবার জন্যে, রক্ষা করবার জন্যে, আপনার বাইরে তাকে যেতেই হবে। কিন্তু, ভারতবর্ষে একদিন জ্ঞান অত্যন্ত বিশুদ্ধ অবস্থা পাবার প্রলোভনে সমস্তকে বর্জন করে নিজের কেন্দ্রের মধ্যে নিজের পরিধিকে বিলুপ্ত করবার চেষ্টা করেছিল এবং হৃদয় আপনার হৃদয়বৃত্তিতে নিজের মধ্যেই নিজের লক্ষ্য স্থাপন করে আপনাকে ব্যর্থ করে তুলেছিল।

পৃথিবীর পশ্চিম প্রদেশ তখন এর উল্টো দিকে চলছিল। সে বিষয়রাজ্যের বৈচিত্র্যের মধ্যে অহরহ ঘুরে ঘুরে বহুতর তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলিকে স্তূপাকার করে তুলছিল— তার কোনো অন্ত ছিল না, কোনো ঐক্য ছিল না। তার ছিল কেবল সংগ্রহের লোভেই সংগ্রহ, কাজের উত্তেজনাতেই কাজ, ভোগের মত্ততাতেই ভোগ।

কিন্তু এই বিষয়ের বৈচিত্র্য-রাজ্যে য়ুরোপ গভীরতম চরম ঐক্যটি পায় নি বটে, তবু তার সর্বব্যাপী একটি বাহ্য শৃঙ্খলা সে দেখেছিল। সে দেখেছে সমস্তই অমোঘ নিয়মের শৃঙ্খলে পরস্পর অবিচ্ছিন্ন বাঁধা। কোথায় বাঁধা, কার হাতে বাঁধা— এই-

সমস্ত বন্ধন কোন্‌খানে একটি মুক্তিতে একটি আনন্দে পর্যবসিত য়ুরোপ তা দেখে নি।

এমন সময়েই রামমোহন রায় আমাদের দেশের প্রাচীন ব্রহ্মসাধনাকে নবীন যুগে উদ্‌ঘাটিত করে দিলেন। ব্রহ্মকে তিনি নিজের জীবনের মধ্যে গ্রহণ করে জীবনের সমস্ত শক্তিকে বৃহৎ করে বিশ্বব্যাপী করে প্রকাশ করে দিলেন। তাঁর সকল চিন্তা সকল চেষ্টা, মানুষের প্রতি তাঁর প্রেম, দেশের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, কল্যাণের প্রতি তাঁর লক্ষ, সমস্তই ব্রহ্মসাধনাকে আশ্রয় করে উদার ঐক্য লাভ করেছিল। ব্রহ্মকে তিনি জীবন থেকে এবং ব্রহ্মাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবলমাত্র ধ্যানের বস্তু জ্ঞানের বস্তু করে নিভৃতে নির্বাসিত করে রাখেন নি। ব্রহ্মকে তিনি বিশ্ব-ইতিহাসে বিশ্বধর্মে বিশ্বকর্মে সর্বত্রই সত্য করে দেখবার সাধনা নিজের জীবনে এমন করে প্রকাশ করলেন যে সেই তাঁর সাধনার দ্বারা আমাদের দেশে সকল বিষয়েই তিনি নূতন যুগের প্রবর্তন করে দিলেন।

রামমোহন রায়ের মুখ দিয়ে ভারতবর্ষ আপন সত্যবাণী ঘোষণা করেছে। বিদেশের গুরু যখন এই ভারতবর্ষকে দীক্ষা দেবার জন্য উপস্থিত হয়েছিল এই বাণী তখনই উচ্চারিত হয়েছে।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঘরে বাহিরে তখন এই ব্রহ্মসাধনার কথা চাপা ছিল। আমাদের দেশে তখন ব্রহ্মকে পরমজ্ঞানীর অতি দূর গহন জ্ঞানদুর্গের মধ্যে কারারুদ্ধ করে রেখেছিল; চারি দিকে রাজত্ব করছিল আচার বিচার বাহ্য-অনুষ্ঠান এবং ভক্তিরসমাদকতার বিচিত্র আয়োজন। সেদিন রামমোহন রায় যখন ব্রহ্মসাধনকে পুঁথির অন্ধকার-সমাধি থেকে মুক্ত করে জীবনের ক্ষেত্রে এনে দাঁড় করালেন তখন দেশের লোক সবাই ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠল: এ আমাদের আপন জিনিস নয়, এ আমাদের বাপ-পিতামহের সামগ্রী নয়। বলে উঠল, এ খৃস্টানি, একে ঘরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। শক্তি যখন বিলুপ্ত হয়, জীবন যখন সংকীর্ণ হয়ে আসে, জ্ঞান যখন গ্রাম্যগণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে কাল্পনিকতাকে নিয়ে যথেচ্ছবিশ্বাসের অন্ধকার ঘরে স্বপ্ন দেখে আপনাকে বিফল করতে চায়, তখনই ব্রহ্ম সকলের চেয়ে সুদূর, এমন-কি সকলের চেয়ে বিরুদ্ধ হয়ে প্রতিভাত হন। এ দিকে য়ুরোপে মানবশক্তি তখন প্রবলভাবে জাগ্রত হয়ে বৃহৎভাবে আপনাকে প্রকাশ করছে। কিন্তু, সে তখন আপনাকেই প্রকাশ করতে চাচ্ছে— আপনার চেয়ে বড়োকে নয়, সকলের চেয়ে শ্রেয়কে নয়। তার জ্ঞানের ক্ষেত্র বিশ্বব্যাপী, তার কর্মের ক্ষেত্র পৃথিবী-জোড়া, এবং সেই উপলক্ষ্যে মানুষের সঙ্গে তার

সম্বন্ধ সুদূরবিস্তৃত। কিন্তু, তার ধ্বজপতাকায় লেখা ছিল 'আমি'। তার মন্ত্র ছিল 'জোর যার মুলুক তার'। সে যে অস্ত্রপাণি রক্তবসনা শক্তিদেবতাকে জগতে প্রচার করতে চলেছিল তার বাহন ছিল পণ্যসম্ভার, অন্তহীন উপকরণরাশি।

কিন্তু, এই বৃহৎ ব্যাপারকে কিসে ঐক্যদান করতে পারে। এই বিরাট যজ্ঞের যজ্ঞপতি কে। কেউ বা বলে স্বাজাত্য, কেউ বা বলে রাষ্ট্রব্যবস্থা, কেউ বা বলে অধিকাংশের সুখসাধন, কেউ বা বলে মানবদেবতা। কিন্তু, কিছুতেই বিরোধ মেটে না, কিছুতেই ঐক্যদান করতে পারে না। প্রতিকূলতা- পরস্পরের প্রতি ভ্রূকুটি করে পরস্পরকে শান্ত রাখতে চেষ্টা করে এবং যাকে গ্রহণ করতে দলবদ্ধ স্বার্থের কোনো-খানে বাধে তাকে একেবারে ধ্বংস করবার জন্যে সে উদ্যত হয়ে ওঠে। কেবল বিপ্লবের পর বিপ্লব আসছে, কেবল পরীক্ষার পর পরীক্ষা চলছে। কিন্তু, এ কথা একদিন জানতেই হবে, বাহিরে যেখানে বৃহৎ অনুষ্ঠান অন্তরে সেখানে ব্রহ্মকে উপলব্ধি না করলে কিছুতেই কিছুর সমন্বয় হতে পারবে না। প্রয়োজনবোধকে যত বড়ো নাম দেও, স্বার্থসিদ্ধিকে যত বড়ো সিংহাসনে বসাও, নিয়মকে যত পাকা করে তোল এবং শক্তিকে যত প্রবল করে দাঁড় করাও, সত্যপ্রতিষ্ঠা কিছুতেই নেই— শেষ পর্যন্ত কিছুই টিকতে এবং টেকাতে পারবে না। যা প্রবল অথচ প্রশান্ত, ব্যাপক অথচ গভীর, আত্মসমাহিত অথচ বিশ্বানুপ্রবিষ্ট, সেই আধ্যাত্মিক জীবনসূত্রের দ্বারা না বেঁধে তুলতে পারলে অন্য কোনো কৃত্রিম জোড়াতাড়ার দ্বারা জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞান, কর্মের সঙ্গে কর্ম, জাতির সঙ্গে জাতি যথার্থভাবে সম্মিলিত হতে পারবে না। সেই সম্মিলন যদি না ঘটে তবে আয়োজন যতই বিপুল হবে তার সংঘাতবেদনা ততই দুঃসহ হয়ে উঠতে থাকবে।

যে সাধনা সকলকে গ্রহণ করতে ও সকলকে মিলিয়ে তুলতে পারে, যার দ্বারা জীবন একটি সর্বগ্রাহী সমগ্রের মধ্যে সর্বতোভাবে সত্য হয়ে উঠতে পারে, সেই ব্রহ্মসাধনার পরিপূর্ণ মূর্তিকে ভারতবর্ষ বিশ্বজগতের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করবে এই হচ্ছে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস। ভারতবর্ষে এই ইতিহাসের আরম্ভ হয়েছে কোন্ সুদূর দুর্গম গুহার মধ্যে। এই ইতিহাসের ধারা কখনো দুই কূল ভাসিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, কখনো বালুকাস্তরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে, কিন্তু কখনোই শুষ্ক হয় নি। আজ আমরা ভারতবর্ষের মর্মোচ্ছ্বসিত সেই অমৃতধারাকে, বিধাতার সেই চিরপ্রবাহিত মঙ্গল-ইচ্ছার স্রোতস্বিনীকে আমাদের ঘরের সম্মুখে দেখতে পেয়েছি— কিন্তু, তাই ব'লে যেন তাকে আমরা ছোটো করে আমাদের সাম্প্রদায়িক গৃহস্থালির সামগ্রী করে না জানি। যেন বুঝতে পারি নিষ্কলঙ্কতুষারস্রুত এই পুণ্যস্রোত কোন্ গঙ্গোত্রীর নিভৃত

কন্দর থেকে বিগলিত হয়ে পড়ছে এবং ভবিষ্যতের দিক্‌প্রান্তে কোন্ মহাসমুদ্র তাকে অভ্যর্থনা করে জলদমন্দ্রে মঙ্গলবাণী উচ্চারণ করছে। ভস্মরাশির মধ্যে যে প্রাণ নিশ্চেতন হয়ে আছে সেই প্রাণকে সঞ্জীবিত করবার এই ধারা। অতীতের সঙ্গে অনাগতকে অবিচ্ছিন্ন কল্যাণের সূত্রে এক করে দেবার এই ধারা। এবং বিশ্বজগতে জ্ঞান ও ভক্তির দুই তীরকে সুগভীর সুপবিত্র জীবনযোগে সম্মিলিত করে দিয়ে কর্মের ক্ষেত্রকে বিচিত্র শস্যপর্যায়ে পরিপূর্ণরূপে সফল করে তোলবার জন্যেই ভারতের অমৃত-কলমন্দ্র-কল্লোলিত এই উদার স্রোতস্বতী।

বৈশাখ ১৩১৮

১৪

সুন্দর

পশ্চিম আকাশের পারে তখনও সূর্যাস্তের ধূসর আভা ছিল; আমাদের আশ্রমে শালবনের মাথার উপরে সন্ধ্যাবেলাকার নিস্তব্ধ শান্তি সমস্ত বাতাসকে গভীর করে তুলছিল। আমার হৃদয় একটি বৃহৎ সৌন্দর্যের আবির্ভাবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। আমার কাছে বর্তমান মুহূর্ত তার সীমা হারিয়ে ফেলেছিল; আজকেকার এই সন্ধ্যা কত যুগের সুদূর অতীতকালের সন্ধ্যার মধ্যে প্রসারিত হয়ে গিয়েছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে যেদিন ঋষিদের আশ্রম সত্য ছিল, যেদিন প্রত্যহ সূর্যের উদয় এ দেশে তপোবনের পর তপোবনে পাখির কাকলি এবং সামগানকে জাগিয়ে তুলত, এবং দিনের অবসানে পাটলবর্ণ নিঃশব্দ গোধূলি কত নদীর তীরে কত শৈলপদমূলে শ্রান্ত হোমধেনু-গুলিকে তপোবনের গোষ্ঠগৃহে ফিরিয়ে আনত, ভারতবর্ষের সেই সরল জীবন এবং গভীর সাধনার দিন আজকের শান্ত সন্ধ্যার আকাশে অত্যন্ত সত্যরূপে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল।

আমার এই কথা মনে হচ্ছিল, আর্যাবর্তের দিগন্তপ্রসারিত সমতল ভূমিতে সূর্যোদয়ে ও সূর্যাস্তে যে আশ্চর্য সৌন্দর্যের মহিমা প্রতিদিন প্রকাশিত হয় আমাদের আর্যপিতামহেরা তাকে এক দিনও এক বেলাও উপেক্ষা করেন নি। প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যাকে তাঁরা অচেতনে বিদায় দিতে পারেন নি। প্রত্যেক যোগী এবং প্রত্যেক গৃহী তাকে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু, কেবল ভোগীর মতো নয়, ভাবুকের মতো নয়। সৌন্দর্যকে তাঁরা পূজার মন্দিরে অভ্যর্থনা করে নিয়েছেন। সৌন্দর্যের মধ্যে যে আনন্দ প্রকাশ পায় তাকে তাঁরা ভক্তির চক্ষে দেখেছেন; সমস্ত চাঞ্চল্য দমন করে মনকে স্থির শান্ত করে উষা ও সন্ধ্যাকে তাঁরা অনন্তের ধ্যানের সঙ্গে মিলিত করে নিয়েছেন। আমার মনে হল, নদীসংগমে সমুদ্রতীরে পর্বতশিখরে যেখানে তাঁরা প্রকৃতির সুন্দর প্রকাশকে বিশেষ করে দেখেছেন সেইখানে তাঁরা আপনার ভোগের উদ্যান রচনা করেন নি; সেখানে তাঁরা এমন একটি তীর্থস্থান স্থাপন করেছেন, এমন কোনো-একটি চিহ্ন রেখে দিয়েছেন, যাতে স্বভাবতই সেই সুন্দরের মধ্যে ভূমার সঙ্গে মানুষের মিলন হতে পারে।

এই সুন্দরের মহান রূপকে সহজ দৃষ্টিতে যেন প্রত্যক্ষ করতে পারি, এই প্রার্থনাটি আমার মনের মধ্যে সেই সন্ধ্যার আকাশে জেগে উঠছিল। জগতের মধ্যে সুন্দরকে

আপনার ভোগবৃত্তির দ্বারা অসত্য ও ছোটো না ক'রে, ভক্তিবৃত্তির দ্বারা সত্য ও মহৎ করে যেন জানতে পারি। অর্থাৎ, কেবলই তাকে নিজের করে নেবার ব্যর্থ বাসনা ত্যাগ করে আপনাকেই তার কাছে দান করবার ইচ্ছা যেন আমার মনে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

তখন আমার এই কথাটি মনে হল, সত্যকে সুন্দর ও সুন্দরকে মহান বলে জানবার অনুভূতি সহজ নয়। আমরা অনেক জিনিসকে বাদ দিয়ে, অনেক অপ্রিয়কে দূরে রেখে, অনেক বিরোধকে চোখের আড়াল করে দিয়ে নিজের মনোমত একটা গণ্ডির মধ্যে সৌন্দর্যকে অত্যন্ত শৌখিন-রকম করে দেখতে চাই। তখন বিশ্বলক্ষ্মীকে আমাদের সেবাদাসী করতে চেষ্টা করি; সেই অপমানের দ্বারা আমরা তাঁকে হারাই এবং আমাদের কল্যাণকে সুদ্ধ হারিয়ে ফেলি।

মানবপ্রকৃতিকে বাদ দিয়ে দেখলে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে জটিলতা নেই; এইজন্যে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সুন্দরকে দেখা ও ভূমাকে দেখা সহজ। ছোটো করে দেখতে গেলে তার মধ্যে যে-সমস্ত বিরোধ ও বিকৃতি চোখে পড়ে সেগুলিকে বড়োর মধ্যে মিলিয়ে দিয়ে একটি বৃহৎ সামঞ্জস্যকে দেখতে পাওয়া আমাদের মধ্যে তেমন কঠিন নয়।

কিন্তু, মানুষের সম্বন্ধে এটি আমরা পেরে উঠি নে। মানুষ আমাদের এত অত্যন্ত কাছে যে তার সমস্ত ছোটোকে আমরা বড়ো করে এবং স্বতন্ত্র করে দেখি। যা তার ক্ষণিক ও তুচ্ছ তাও আমাদের বেদনার মধ্যে অত্যন্ত গুরুতর হয়ে দেখা দেয়; কাজেই লোভে ক্ষোভে ভয়ে ভাবনায় আমরা সমগ্রকে গ্রহণ করতে পারি নে, আমরা একাংশের মধ্যে দোলায়িত হতে থাকি। এই জন্যে এই বিশাল সন্ধ্যাকাশের মধ্যে যেমন সহজে সুন্দরকে দেখতে পাচ্ছি মানবসংসারে তেমন সহজে দেখতে পাই নে।

আজ এই সন্ধ্যাবেলায় বিশ্বজগতের মূর্তিকে যে এমন সুন্দর করে দেখছি এর জন্যে আমাদের কোনো সাধনা নেই। যাঁর এই বিশ্ব তিনি নিজের হাতে এই সমগ্রকে সুন্দর করে আমাদের চোখের সামনে ধরেছেন। সমস্তটাকে বিশ্লেষণ করে যদি এর ভিতরে প্রবেশ করতে যাই তা হলে এর মধ্যে যে কত বিচিত্র ব্যাপার দেখতে পাব তার আর অন্ত নেই। এখনই অনন্ত আকাশ জুড়ে তারায় তারায় যে আগ্নেয় বাষ্পের ভীষণ ঝড় বইছে তার একটি সামান্য অংশও যদি আমরা সম্মুখে প্রত্যক্ষ করতে পারতুম তা হলে ভয়ে আমরা স্তম্ভিত মূর্ছিত হয়ে যেতুম। টুকরো টুকরো করে যদি দেখ তা হলে এর মধ্যে কত ঘাতসংঘাত কত বিরোধ ও বিকৃতি তার কি সংখ্যা আছে। এই-যে আমাদের চোখের সামনেই ওই গাছটি এই তারাখচিত আকাশের গায়ে সমগ্রভাবে সুন্দর হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, একে যদি আংশিকভাবে দেখতে যাই

তা হলে দেখতে পাব এর মধ্যে কত গ্রন্থি, কত বাঁকাচোরা, এর ত্বকের উপরে কত বলি পড়েছে, এর কত অংশ মরে শুকিয়ে কীটের আবাস হয়ে পচে যাচ্ছে। আজ এই সন্ধ্যার আকাশে দাঁড়িয়ে জগতের যতখানি দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে অসম্পূর্ণতা এবং বিকারের কিছু অভাব নেই ; কিন্তু তার কিছুই বাদ না দিয়ে, সমস্তকে স্বীকার করে নিয়ে, যা-কিছু তুচ্ছ যা-কিছু ব্যর্থ যা-কিছু বিরূপ সবই অবিচ্ছেদে আত্মসাৎ করে এই বিশ্ব অকুণ্ঠিতভাবে আপনার সৌন্দর্য প্রকাশ করছে। সমস্তই যে সুন্দর, সৌন্দর্য যে কাটা-ছাঁটা বেড়া-দেওয়া গণ্ডী-কাটা জিনিস নয়, বিশ্ববিধাতা তাই আজ এই নিস্তব্ধ আকাশের মধ্যে অতি অনায়াসে দেখিয়ে দিচ্ছেন।

তিনি দেখিয়ে দিচ্ছেন, এত বড়ো বিশ্ব যে এত সহজে সুন্দর হয়ে আছে তার কারণ এর অণুতে পরমাণুতে একটা প্রকাণ্ড শক্তি কাজ করছে। সেই-যে শক্তিকে দেখতে পাই সে অতি ভীষণ। সে কাটছে ভাঙছে টানছে জুড়ছে ; সে তাণ্ডবনৃত্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক রেণুকে নিত্যনিয়ত কম্পান্বিত করে রেখেছে ; তার প্রতি পদক্ষেপের সংঘাতে ক্রন্দসী রোদন করে উঠছে। ভয়াদিন্দ্রশ্চবায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি। যাকে কাছে এসে ভাগ করে দেখলে এমন ভয়ংকর তারই অখণ্ড সত্যরূপ কী পরমশান্তিময় সুন্দর। সেই ভীষণ যদি সর্বত্র কাজ না করত তা হলে এই রমণীয় সৌন্দর্য থাকত না। অবিশ্রাম অমোঘ শক্তির চেষ্টার উপরেই এই সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠিত। সেই চেষ্টা কেবলই বিচ্ছিন্নতার মধ্য থেকে ব্যবস্থা, বৈষম্যের মধ্য থেকে সুষমাকে প্রবল বলে উদ্ভিন্ন করে তুলছে সেই চেষ্টাকে যখন কেবল তার গতির দিক থেকে দেখি তখন তাকে ভয়ংকর দেখি, তখনই তার মধ্যে বিরোধ ও বিকৃতি। কিন্তু, তার সঙ্গে সঙ্গেই তার স্থিতির রূপটিও রয়েছে, সেইখানেই শান্তি ও সৌন্দর্য। জগতে এই মুহূর্তেই যেমন আকাশ-জোড়া ভাঙাচোরার ঘর্ঘরধ্বনি এবং মৃত্যুবেদনার আর্তস্বর রয়েছে তেমনি তার সঙ্গে সঙ্গেই তার সমস্তকে নিয়ে পরিপূর্ণ সংগীত অবিরাম ধ্বনিত হচ্ছে ; সেই কথাটি আজ সন্ধ্যাকাশে বিশ্বকবি নিজে পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছেন। তাঁর ভয়ংকর শক্তি যে অগ্নিময় তারার মালা গেঁথে তুলছে সেই মালা তাঁর কণ্ঠে মণিমালা হয়ে শোভা পাচ্ছে, এখনই এ আমরা কত সহজে কী অনায়াসেই দেখতে পাচ্ছি— আমাদের মনে ভয় নেই, ভাবনা নেই, মন আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

মানবসংসারেও তেমনি একটি ভীষণ শক্তির তেজ নিত্যনিয়ত কাজ করছে। আমরা তার ভিতরে আছি বলেই তার বাষ্পরাশির ভয়ংকর ঘাতসংঘাত সর্বদাই বড়ো করে প্রত্যক্ষ করছি। আধিব্যাধি দুর্ভিক্ষদারিদ্র্য হানাহানি-কাটাকাটির মন্থন কেবলই চারি দিকে চলছে। সেই ভীষণ যদি এর মধ্যে রুদ্ররূপে না থাকত তা হলে সমস্ত

শিথিল হয়ে বিশ্লিষ্ট হয়ে একটা আকার-আয়তন-হীন কদর্যতায় পরিণত হত। সংসারের মাঝখানে সেই ভীষণের রুদ্রলীলা চলছে বলেই তার দুঃসহ দীপ্ততেজে অভাব থেকে পূর্ণতা, অসাম্য থেকে সামঞ্জস্য, বর্বরতা থেকে সভ্যতা অনিবার্যবেগে উদ্গত হয়ে উঠছে; তারই ভয়ংকর পেষণ-ঘর্ষণে রাজ্যসাম্রাজ্য শিল্পসাহিত্য ধর্মকর্ম উত্তরোত্তর নব নব উৎকর্ষ লাভ করে জেগে উঠছে। এই সংসারের মাঝখানে মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং; কিন্তু এই মহদ্ভয়কে যাঁরা সত্য করে দেখেন তাঁরা আর ভয়কে দেখেন না, তাঁরা মহাসৌন্দর্যকেই দেখেন। তাঁরা অমৃতকেই দেখেন যা এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

অনেকে এমনভাবে বলেন, যেন প্রকৃতির আদর্শ মানুষের পক্ষে জড়ত্বের আদর্শ; যেন যা আছে তাই নিয়েই প্রকৃতি; প্রকৃতির মধ্যে উপরে ওঠবার কোনো বেগ নেই; সেইজন্যেই মানবপ্রকৃতিকে বিশ্বপ্রকৃতি থেকে পৃথক্ করে দেখবার চেষ্টা হয়। কিন্তু, আমরা তো প্রকৃতির মধ্যে একটা তপস্যা দেখতে পাচ্ছি; সে তো জড়যন্ত্রের মতো একই বাঁধা নিয়মের খোঁটাকে অনন্তকাল অন্ধভাবে প্রদক্ষিণ করছে না। এ পর্যন্ত তাকে তো তার পথের কোনো জায়গায় থেমে থাকতে দেখি নি। সে তার আকারহীন বিপুল বাষ্পসংঘাত থেকে চলতে চলতে আজ মানুষে এসে পৌচেছে, এবং এখানেই যে তার চলা শেষ হয়ে গেল এমন মনে করবার কোনো হেতু নেই। ইতিমধ্যে তার অবিরাম চেষ্টা কত গড়েছে এবং কত ভেঙে ফেলেছে, কত ঝড় কত প্লাবন কত ভূমিকম্প কত অগ্নি-উচ্ছ্বাসের বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে তার বিকাশ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। আতপ্ত পঙ্কের ভিতর দিয়ে একদিন কত মহারণ্যকে সে তখনকার ঘনমেঘাবৃত আকাশের দিকে জাগিয়ে তুলেছিল, আজ কেবল কয়লার খনির ভাণ্ডারে তাদের অস্পষ্ট ইতিহাস কালো অক্ষরে লিখিত রয়েছে। যখন তার পৃথিবীতে জলস্থলের সীমা ভালো করে নির্ণীত হয় নি তখন কত বৃহৎ সরীসৃপ কত অদ্ভুত পাখি কত আশ্চর্য জন্তু কোন্‌ নেপথ্যগৃহ থেকে এই সৃষ্টিরঙ্গভূমিতে এসে তাদের জীবলীলা সমাধা করেছে, আজ তারা অর্ধরাত্রির একটা অদ্ভুত স্বপ্নের মতো কোথায় মিলিয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃতির সেই উৎকর্ষের দিকে অভিব্যক্ত হবার অবিশ্রাম কঠোর চেষ্টা, সে থেমে তো যায় নি। থেমে যদি যেত তা হলে এখনই যা-কিছু সমস্তই বিশ্লিষ্ট হয়ে একটা আদি-অন্তহীন বিশৃঙ্খলতায় স্তূপাকার হয়ে উঠত। প্রকৃতির মধ্যে একটি অনিদ্র অভিপ্রায় কেবলই তাকে তার ভাবী উৎকর্ষের দিকে কঠিন বলে আকর্ষণ করে চলেছে ব'লেই তার বর্তমান এমন একটি অব্যর্থ শৃঙ্খলার মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করতে পারছে। কেবলই তাকে সামঞ্জস্যের বন্ধন ছিন্ন ক'রে ক'রেই এগোতে হচ্ছে, কেবলই তাকে গর্ভাবরণ বিদীর্ণ করে নব নব জন্মে প্রবৃত্ত হতে হচ্ছে। এইজন্যেই এত দুঃখ, এত মৃত্যু। কিন্তু,

সামঞ্জস্যেরই একটি সুমহৎ নিত্য আদর্শ তাকে ছোটো ছোটো সামঞ্জস্যের বেষ্টনের মধ্যে কিছুতেই স্থির হয়ে থাকতে দিচ্ছে না, কেবলই ছিন্ন করে করে কেড়ে নিয়ে চলেছে। বিশ্বপ্রকৃতির বৃহৎ প্রকাশের মধ্যে এই দুটিকেই আমরা একসঙ্গে অবিচ্ছিন্ন দেখতে পাই। তার চেষ্টার মধ্যে যে দুঃখ, অথচ তার সেই চেষ্টার আদিতে ও অন্তে যে আনন্দ, দুই একত্র হয়ে প্রকৃতিতে দেখা দেয়। এইজন্যে প্রকৃতির মধ্যে যে শক্তি অনবরত অতিভীষণ ভাঙাগড়ায় প্রবৃত্ত তাকে এই মুহূর্তেই স্থির শান্ত নিস্তব্ধ দেখতে পাচ্ছি। এই সসীমের তপস্যার সঙ্গে অসীমের সিদ্ধিকে অবিচ্ছেদে মিলিয়ে দেখাই হচ্ছে সুন্দরকে দেখা— এর একটিকে বাদ দিতে গেলেই অন্যটি অর্থহীন সুতরাং শ্রীহীন হয়ে পড়ে।

মানবসংসারে কেন যে সব সময়ে আমরা এই দুটিকে এক করে মিলিয়ে দেখতে পারি নে তার কারণ পূর্বেই বলেছি। সংসারের সমস্ত বেদনা আমাদের অত্যন্ত কাছে এসে বাজে; যেখানে সামঞ্জস্য বিদীর্ণ হচ্ছে সেইখানেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে, কিন্তু সেই-সমস্তকেই অনায়াসে আত্মসাৎ করে নিয়ে যেখানে অনন্ত সামঞ্জস্য বিরাজ করছে সেখানে সহজে আমাদের দৃষ্টি যায় না। এমনি করে আমরা সত্যকে অপূর্ণ করে দেখছি বলেই আমরা সত্যকে সুন্দর করে দেখছি নে; সেইজন্যেই আবিঃ আমাদের কাছে আবির্‌ভূত হচ্ছেন না, সেইজন্য রুদ্রের দক্ষিণ মুখ আমরা দেখতে পাচ্ছি নে।

কিন্তু, মানবসংসারের মধ্যেই সেই ভীষণকে সুন্দর করে দেখতে চাও? তা হলে নিজের স্বার্থপর ছয়-রিপু-চালিত ক্ষুদ্র জীবন থেকে দূরে এসো। মানবচরিতকে যেখানে বড়ো করে দেখতে পাওয়া যায় সেই মহাপুরুষদের সামনে এসে দাঁড়াও। ওই দেখো শাক্যরাজবংশের তপস্বী। তাঁর পুণ্যচরিত আজ কত ভক্তের কণ্ঠে কত কবির গাথায় উচ্চারিত হচ্ছে; তাঁর চরিত ধ্যান করে কত দীনচেতা ব্যক্তিরও মন আজ মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। কী তার দীপ্তি, কী তার সৌন্দর্য, কী তার পবিত্রতা। কিন্তু, সেই জীবনের প্রত্যেক দিনকে একবার স্মরণ করে দেখো। কী দুঃসহ। কত দুঃখের দারুণ দাহে ওই সোনার প্রতিমা তৈরি হয়ে উঠেছে। সেই দুঃখগুলিকে স্বতন্ত্র করে যদি পুঞ্জীভূত করে দেখানো যেত তা হলে সেই নিষ্ঠুর দৃশ্যে মানুষের মন একেবারে বিমুখ হয়ে যেত। কিন্তু, সমস্ত দুঃখের সঙ্গে সঙ্গেই তার আদিতে ও অন্তে যে ভূমানন্দ আছে তাকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বলেই এই চরিত এত সুন্দর, মানুষ একে এত আদরে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করছে।

ভগবান ঈশাকে দেখো। সেই একই কথা। কত আঘাত, কত বেদনা। সমস্তকে

নিয়ে তিনি কত সুন্দর। শুধু তাই নয়; তাঁর চারি দিকে মানুষের সমস্ত নিষ্ঠুরতা সংকীর্ণতা ও পাপ সেও তাঁর চরিতমূর্তির উপকরণ— পঙ্ককে পঙ্কজ যেমন সার্থক করে তেমনি মানবজীবনের সমস্ত অমঙ্গলকে তিনি আপনার আবির্ভাবের দ্বারা সার্থক করে দেখিয়েছেন।

ভীষণ শক্তির প্রচণ্ড লীলাকে আজ আমরা যেমন এই সন্ধ্যাকাশে শান্ত সুন্দর করে দেখতে পাচ্ছি, মহাপুরুষদের জীবনেও মহদ্‌দুঃখের ভীষণ লীলাকে সেই রকম বৃহৎ করে সুন্দর করে দেখতে পাই। কেননা, সেখানে আমরা দুঃখকে পরিপূর্ণ সত্যের মধ্যে দেখি, এইজন্য তাকে দুঃখরূপে দেখি নে, আনন্দরূপেই দেখি।

আমাদেরও জীবনের চরম সাধনা এই যে, রুদ্রের যে দক্ষিণ মুখ তাই আমরা দেখব; ভীষণকে সুন্দর বলে জানব; মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং যিনি তাঁকে ভয়ে নয়, আনন্দে অমৃত বলে গ্রহণ করব। প্রিয় অপ্রিয় সুখ দুঃখ সম্পদ বিপদ সমস্তকেই আমরা বীর্যের সঙ্গে গ্রহণ করব এবং সমস্তকেই আমরা ভূমার মধ্যে অখণ্ড ক'রে এক ক'রে সুন্দর করে দেখব। যিনি ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং তিনিই পরমসুন্দর এই কথা নিশ্চয় মনের মধ্যে উপলব্ধি করে এই সুখদুঃখবন্ধুর ভাঙাগড়ার সংসারে সেই রুদ্রের আনন্দ-লীলার নিত্যসহচর হবার জন্য প্রত্যহ প্রস্তুত হতে থাকব। নতুবা, ভোগেও জীবনের সার্থকতা নয়, বৈরাগ্যেও নয়। নইলে সমস্ত দুঃখ-কঠোরতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে আমরা সৌন্দর্যকে যখন আমাদের দুর্বল আরামের উপযোগী করে ভোগসুখের বেড়া দিয়ে বেষ্টন করব তখন সেই সৌন্দর্য ভূমাকে আঘাত করতে থাকবে, আপনার চারি দিকের সঙ্গে তার সহজ স্বাভাবিক যোগ নষ্ট হয়ে যাবে— তখন সেই সৌন্দর্য দেখতে দেখতে বিকৃত হয়ে কেবল উগ্রগন্ধ মাদকতার সৃষ্টি করবে, আমাদের শুভ বুদ্ধিকে স্খলিত করে তাকে ভূমিসাৎ করে দেবে। সেই সৌন্দর্য ভোগবিলাসের বেষ্টনে আমাদের সকল থেকে বিচ্ছিন্ন করে কলুষিত করবে, সকলের সঙ্গে সরল সামঞ্জস্যে যুক্ত করে আমাদের কল্যাণ করবে না। তাই বলছিলুম, সুন্দরকে জানার জন্যে কঠোর সাধনা ও সংযমের দরকার, প্রবৃত্তির মোহ যাকে সুন্দর বলে জানায় সে তো মরীচিকা। সত্যকে যখন আমরা সুন্দর করে জানি তখনই সুন্দরকে সত্য করে জানতে পারি। সত্যকে সুন্দর করে সেই জানে যার দৃষ্টি নির্মল, যার হৃদয় পবিত্র, বিশ্বের মধ্যে সর্বত্রই আনন্দকে প্রত্যক্ষ করতে তার আর কোথাও বাধা থাকে না। ১৫ চৈত্র ১৩১৭

আষাঢ় ১৩১৮

বর্ষশেষ

আজকের বর্ষশেষের দিবাবসানের এই-যে উপাসনা, এই উপাসনায় তোমরা কি সম্পূর্ণমনে যোগ দিতে পারবে? তোমাদের মধ্যে অনেকেই আছ বালক, তোমরা জীবনের আরম্ভমুখেই রয়েছ। শেষ বলতে যে কী বোঝায় তা তোমরা ঠিক উপলব্ধি করতে পারবে না; বৎসরের পর বৎসর এসে তোমাদের পূর্ণ করছে, আর আমাদের জীবনে প্রত্যেক বৎসর নূতন করে ক্ষয় করবার কাজই করছে। তোমরা এই-যে জীবনের ক্ষেত্রে বাস করছ এর জন্য তোমাদের এখনো খাজনা দেবার সময় আসে নি— তোমরা কেবল নিচ্ছ এবং খাচ্ছ। আর, আমরা যে এতকাল জীবনটাকে ভোগ করে আসছি তারই পুরো খাজনাটা চুকিয়ে যাবার বয়স আমাদের হয়েছে। বৎসরে বৎসরে কিছু কিছু করে খাজনা আমরা শোধ করছি; ঘরে যা সঞ্চয় করে বসে ছিলুম, মনে করেছিলুম কোনো কালে এ আর খরচ করতে হবে না, সেই সঞ্চয়ে টান পড়েছে। আজ কিছু যাচ্ছে, কাল কিছু যাচ্ছে; অবশেষে একদিন এই পার্থিব জীবনের পুরা তহবিল নিকাশ করে দিয়ে খাতাপত্র বন্ধ করে বিদায় নিতে হবে।

তোমরা পূর্বাচলের যাত্রী, সূর্যোদয়ের দিকেই তোমাদের মুখ; সেই দিকে যিনি তোমাদের অভ্যুদয়ের পথে আহ্বান করছেন তাঁকে তোমরা পূর্বমুখ করেই প্রণাম করো। আমরা পশ্চিম-অস্তাচলের দিকে জোড়হাত করে উপাসনা করি; সেই দিক থেকে আমাদের আহ্বান আসছে, সেই আহ্বানও সুন্দর সুগম্ভীর এবং শান্তিময় আনন্দরসে পরিপূর্ণ।

অথচ এই পূর্বপশ্চিমের মধ্যে ব্যবধান কোনোখানেই নেই। আজ যেখানে বর্ষশেষ কালই সেখানে বর্ষারম্ভ; একই পাতার এ পৃষ্ঠায় সমাপ্তি, ও পৃষ্ঠায় সমারম্ভ— কেউ কাউকে পরিত্যাগ করে থাকতে পারে না। পূর্ব এবং পশ্চিম একটি অখণ্ড মণ্ডলের মধ্যে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে, তাদের মধ্যে ভেদ নেই বিবাদ নেই— এক দিকে যিনি শিশুর আর-এক দিকে তিনিই বৃদ্ধের। এক দিকে তাঁর বিচিত্র রূপের দিকে তিনি আমাদের আশীর্বাদ করে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, আর-এক ।দকে তাঁর একস্বরূপের দিকে আমাদের আশীর্বাদ করে আকর্ষণ করে নিচ্ছেন।

আজ পূ্ণিমার রাত্রিতে বৎসরের শেষদিন সমাপ্ত হয়েছে। কোনো শেষই যে শূন্যতার মধ্যে শেষ হয় না, ছন্দের যতির মধ্যেও ছন্দের সৌন্দর্য যে পূর্ণ হয়ে প্রকাশ পায়, বিরাম যে কেবল কর্মের অভাবমাত্র নয়, কর্ম বিরামের মধ্যেই আপনার মধুর

এবং গভীর সার্থকতাকে দেখতে পায়, এই কথাটি আজ এই চৈত্রপূর্ণিমার জ্যোৎস্নাকাশে যেন মূর্তিমান হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি জগতে যা-কিছু চলে যায়, ক্ষয় হয়ে যায়, তার দ্বারাও সেই অক্ষয় পূর্ণতাই প্রকাশ পাচ্ছেন।

নিজের জীবনের দিকে তাকাতে গেলে এই কথাটাই মনে হয়। কিছু পূর্বেই আমি বলেছি, তোমাদের বয়সে তোমরা যেমন প্রতিদিন কেবল নূতন-নূতনকে পাচ্ছ আমাদের বয়সে আমরা তেমনি কেবল দিতেই আছি, আমাদের কেবল যাচ্ছেই। এ কথাটা যদি সম্পূর্ণ সত্য হত তা হলে কী জন্যে আজ উপাসনা করতে এসেছি, কোন্ ভয়ংকর শূন্যতাকে আজ প্রণাম করতে বসেছি? তা হলে বিষাদে আমাদের মুখ দিয়ে কথা বেরুত না, আতঙ্কে আমরা মরে যেতুম।

কিন্তু স্পষ্টই যে দেখতে পাচ্ছি, জীবনের সমস্ত যাওয়া কেবলই একটি পাওয়াতে এসে ঠেকছে; সমস্তই যেখানে ফুরিয়ে যাচ্ছে সেখানে দেখছি একটি অফুরন্ত আবির্ভাব।

এইটিই বড়ো একটি আশ্চর্য পাওয়া। অহরহ নূতন নূতন পাওয়ার মধ্যে যে পাওয়া তাতে পরিপূর্ণ পাওয়ার রূপটি দেখা যায় না। তাতে প্রত্যেক পাওয়ার মধ্যেই 'পাই নি পাই নি' কান্নাটা থেকে যায়— অন্তরের সে কান্নাটা সকল সময়ে শুনতে পাই নে, কেননা আশা তখন আমাদের টেনে ছুটিয়ে নিয়ে যায়, কোনো একটা জায়গায় ক্ষণকাল থেমে এই না-পাওয়ার কান্নাটাকে কান পেতে শুনতে দেয় না।

কিন্তু, একটু একটু করে রিক্ত হতে হতে অন্তরাত্মা যে পাওয়ার মধ্যে এসে পৌঁছে সেটি কী গভীর পাওয়া, কী বিশুদ্ধ পাওয়া! সেই পাওয়ার যথার্থ স্বাদ পাবা-মাত্র মৃত্যু-ভয় চলে যায়। তাতে এ ভয়টা আর থাকে না যে যা-কিছু যাচ্ছে তাতে আত্মার কেবল ক্ষতিই হচ্ছে। সমস্ত ক্ষতির শেষে যে অক্ষয়কে দেখতে পাওয়া যায় তাঁকে পাওয়াই আমাদের পাওয়া।

নদী আপন গতিপথে দুই কূলে দিনরাত্রি নূতন নূতন ক্ষেত্রকে পেতে পেতে চলে; সমুদ্রে যখন সে এসে পৌঁছয় তখন আর নূতন-নূতনকে পায় না, তখন তার দেবার পালা। তখন আপনাকে সে নিঃশেষ করে কেবল দিতেই থাকে। কিন্তু, আপনার সমস্তকে দিতে দিতে সে যে অন্তহীন পাওয়াকে পায় সেইটিই তো পরিপূর্ণ পাওয়া। তখন সে দেখে আপনাকে অহরহ রিক্ত করে দিয়েও কিছুতেই তার লোকসান আর হয় না। বস্তুত কেবলই আপনাকে ক্ষয় করে দেওয়াই অক্ষয়কে সত্যরূপে জানবার প্রধান উপায়। যখন আপনার নানা জিনিস থাকে তখন আমরা

মনে করি সেই থাকাতেই সমস্ত কিছু আছে, সে-সব ঘুচলেই একেবারে সব শূন্যময় হয়ে যাবে। সেইজন্যে আপনার দিকটা একেবারে উজাড় করে দিয়ে যখন তাঁকে পূর্ণ দেখা যায় তখন সেই দেখাই অভয় দেখা, সেই দেখাই সত্য দেখা।

এইজন্যেই সংসারে ক্ষয় আছে, মৃত্যু আছে। যদি না থাকত তবে অক্ষয়কে অমৃতকে কোন্ অবকাশ দিয়ে আমরা দেখতে পেতুম। তা হলে আমরা কেবল বস্তুর পর বস্তু, বিষয়েরই পর বিষয়কেই একান্ত করে দেখতুম; সত্যকে দেখতুম না। কিন্তু বিষয় কেবলই মেঘের মতো সরে যাচ্ছে, কুয়াশার মতো মিলিয়ে যাচ্ছে ব'লেই যিনি সরে যাচ্ছেন না, মিলিয়ে যাচ্ছেন না, তাঁকে আমরা দেখতে পাচ্ছি।

তাই আমি বলছি, আজ বর্ষশেষের এই রাত্রিতে তোমার বন্ধ ঘরের জানলা থেকে জগতের সেই যাওয়ার পথটার দিকেই মুখ বাড়িয়ে একবার তাকিয়ে দেখো। কিছুই থাকছে না, সবই চলেছে, এইটিই লক্ষ্য করো। মন শান্ত করে হৃদয় শুদ্ধ করে এই দিকে দেখতে দেখতেই দেখবে, এই-সমস্ত যাওয়া সার্থক হচ্ছে এমন একটি 'থাকা' স্থির হয়ে আছে। দেখতে পাবে—

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।

সেই এক যিনি, তিনি অন্তরীক্ষে বৃক্ষের মতো স্তব্ধ হয়ে আছেন।

জীবন যতই এগোচ্ছে ততই দেখতে পাচ্ছি, সেখানেও সেই এক যিনি তিনি সমস্ত যাওয়া-আসার মধ্যে স্তব্ধ হয়ে আছেন। নিমেষে নিমেষে যা সরে গেছে, ঝরে গেছে, যা দিতে হয়েছে, তার হিসাব রাখতে কে পারে। তা অনেক, তা অসংখ্য। কিন্তু এই-সমস্ত গিয়ে, সমস্ত দিয়ে, যাঁকে পাচ্ছি তিনি এক। 'গেছে গেছে' এ কথাটা যতই কেঁদে বলি-না কেন, তিনি আছেন, তিনি আছেন— এই কথাটাই সকল কান্না ছাপিয়ে জেগে উঠছে। সব গেছে এই শোক যেখানে জাগছে সেখানে ভালো করে তাকাও, তিনি আছেন এই অচল আনন্দ সেখানে বিরাজমান।

যেখানে যা-কিছু সমস্ত শেষ হয়ে যাচ্ছে সেই গভীর নিঃশেষতার মধ্যে আজ বর্ষশেষের দিনে মুখ তুলে তাকাও, দেখো: বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ। চিত্তকে নিস্তব্ধ করো, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গতি নিস্তব্ধ হয়ে যাবে, আকাশের চন্দ্রতারা স্থির হয়ে দাঁড়াবে, অণুপরমাণুর অবিরাম নৃত্য একেবারে থেমে যাবে। দেখবে বিশ্বজোড়া ক্ষয়মৃত্যু এক জায়গায় সমাপ্ত হয়ে গেছে। কলশব্দ নেই, চাঞ্চল্য নেই, সেখানে জন্ম-মরণ এই নিঃশব্দ সংগীতে বিলীন হয়ে রয়েছে 'বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ'।

আজ আমি আমার জীবনের দেওয়া এবং পাওয়ার মাঝখানের আসনটিতে বসে তাঁর উপাসনা করতে এসেছি। এই জায়গাটিতে তিনি যে আজ আমাকে বসতে

দিয়েছেন এজন্যে আমি আমার মানবজীবনকে ধন্য মনে করছি। তাঁর যে বাহু গ্রহণ করে এবং তাঁর যে বাহু দান করে এই দুই বাহুর মাঝখানটিতে তাঁর যে বক্ষ যে কোল সেই বক্ষে সেই কোলে আমি আমার জীবনকে অনুভব করছি। এক দিকে অনেককে হারিয়েও আর-এক দিকে এককে পাওয়া যায় এই কথাটি জানবার সুযোগ তিনি ঘটিয়েছেন। জীবনে যা চেয়েছি এবং পাই নি, যা পেয়েছি এবং চাই নি, যা দিয়ে আবার নিয়েছেন, সমস্তকেই আজ জীবনের দিবাবসানের পরম মাধুর্যের মধ্যে যখন দেখতে পাচ্ছি তখন তাদের দুঃখবেদনার রূপ কোথায় চলে গেল! আমার সমস্ত হারানো আজ আনন্দে ভরে উঠছে; কেননা, আমি যে দেখতে পাচ্ছি তিনি রয়েছেন, তাঁকে ছাড়িয়ে কিছুই হয় নি— আমার যা-কিছু গেছে তাতে তাঁকে কিছুই কমিয়ে দিতে পারে নি, সমস্তই আপনাকে সরিয়ে তাঁকেই দেখাচ্ছে। সংসার আমার কিছুই নেয় নি, মৃত্যু আমার কিছুই নেয় নি, মহাশূন্য আমার কিছুই নেয় নি— একটি অণু না, একটি পরমাণু না। সমস্তকে নিয়ে তখন যিনি ছিলেন সমস্ত গিয়ে এখনও তিনিই আছেন, এমন আনন্দ আর কিছু নেই, এমন অভয় আর কী হতে পারে।

আজ আমার মন তাঁকে বলছে, বারে বারে খেলা শেষ হয়, কিন্তু, হে আমার জীবন-খেলার সাথি, তোমার তো শেষ হয় না। ধুলার ঘর ধুলায় মেশে, মাটির খেলনা একে একে সমস্ত ভেঙে যায়; কিন্তু যে তুমি আমাকে এই খেলা খেলিয়েছ, যে তুমি এই খেলা আমার কাছে প্রিয় করে তুলেছ, সেই তুমি খেলার আরম্ভেও যেমন ছিলে খেলার শেষেও তেমনি আছ। যখন খেলায় খুব করে মেতেছিলুম তখন খেলাই আমার কাছে খেলার সঙ্গীর চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছিল, তখন তোমাকে তেমন করে দেখা হয় নি। আজ যখন একটা খেলা শেষ হয়ে এল তখন তোমাকে ধরেছি, তোমাকে চিনেছি। তখন আমি তোমাকে বলতে পেরেছি, খেলা আমার হারিয়ে যায় নি, সমস্তই তোমার মধ্যে মিশেছে। দেখতে পাচ্ছি, ঘর অন্ধকার করে দিয়ে আবার তুমি গোপনে নূতন আয়োজন করছ, সেই আয়োজন অন্ধকারের মধ্যেও আমি অন্তরে অনুভব করছি।

এবারকার এ খেলার ঘরটাকে তা হলে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দাও। ভাঙাচোরা আবর্জনার আঘাতে পদে পদে ধুলোর উপরে পড়তে হয়— এবার সে-সমস্ত নিঃশেষে চুকিয়ে দাও, কিছুই আর বাকি রেখো না। এই-সমস্ত ভাঙা খেলনার জোড়াতাড়া খেলা এ আর আমি পেরে উঠি নে। সব তুমি লও লও, সব কুড়িয়ে লও। যত বিঘ্ন দূর করো, যত ভগ্ন সরিয়ে দাও, যা-কিছু ক্ষয় হবার দিকে যাচ্ছে সব লয় করে দাও: হে পরিপূর্ণ আনন্দ, পরিপূর্ণ নূতনের জন্যে আমাকে প্রস্তুত করো। ১৩১৭

জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

নববর্ষ

আজ নববর্ষের প্রাতঃসূর্য এখনো দিক্‌প্রান্তে মাথা ঠেকিয়ে বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম করে নি— এই ব্রাহ্মমুহূর্তে আমরা আশ্রমবাসীরা আমাদের নূতন বৎসরের প্রথম প্রণামটিকে আমাদের অনন্তকালের প্রভুকে নিবেদন করবার জন্যে এখানে এসেছি। এই প্রণামটি সত্য প্রণাম হোক।

এই-যে নববর্ষ আজ জগতের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে, এ কি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করতে পেরেছে? আমাদের জীবনে কি আজ নববর্ষ আরম্ভ হল?

এই-যে বৈশাখের প্রথম প্রত্যূষটি আজ আকাশপ্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালো কোথাও দরজাটি খোলবারও কোনো শব্দ পাওয়া গেল না, আকাশ-ভরা অন্ধকার একেবারে নিঃশব্দে অপসারিত হয়ে গেল, কুঁড়ি যেমন করে ফোটে আলোক তেমনি করে বিকশিত হয়ে উঠল— তার জন্যে কোথাও কিছুমাত্র বেদনা বাজল না। নববৎসরের উষালোক কি এমন স্বভাবত এমন নিঃশব্দে আমাদের অন্তরে প্রকাশিত হয়?

নিত্যলোকের সিংহদ্বার বিশ্বপ্রকৃতির দিকে চিরকাল খোলাই রয়েছে; সেখান থেকে নিত্যনূতনের অমৃতধারা অবাধে সর্বত্র প্রবাহিত হচ্ছে। এইজন্যে কোটি কোটি বৎসরেও প্রকৃতি জরাজীর্ণ হয়ে যায় নি; আকাশের এই বিপুল নীলিমার মধ্যে কোথাও লেশমাত্র চিহ্ন পড়তে পায় নি। এইজন্যেই বসন্ত যেদিন সমস্ত বনস্থলীর মাথার উপরে দক্ষিনে বাতাসে নবীনতার আশিসমন্ত্র পড়ে দেয় সেদিন দেখতে দেখতে তখনই অনায়াসে শুকনো পাতা খসে গিয়ে কোথা থেকে নবীন কিশলয় পুলকিত হয়ে ওঠে, ফুলে ফলে পল্লবে বনশ্রীর শ্যামাঞ্চল একেবারে ভরে যায়— এই-যে পুরাতনের আবরণের ভিতর থেকে নূতনের মুক্তিলাভ এ কত অনায়াসেই সম্পন্ন হয়। কোথাও কোনো সংগ্রাম করতে হয় না।

কিন্তু, মানুষ তো পুরাতন আবরণের মধ্যে থেকে এত সহজে এমন হাসিমুখে নূতনতার মধ্যে বেরিয়ে আসতে পারে না। বাধাকে ছিন্ন করতে হয়, বিদীর্ণ করতে হয়— বিপ্লবের ঝড় বয়ে যায়। তার অন্ধকার রাত্রি এমন সহজে প্রভাত হয় না; তার সেই অন্ধকার বজ্রাহত দৈত্যের মতো আর্তস্বরে ক্রন্দন করে ওঠে, এবং তার সেই প্রভাতের আলোক দেবতার খরধার খড়্গের মতো দিকে দিগন্তে চকিত হতে থাকে।

মানুষ যদিচ এই সৃষ্টির বেশিদিনের সন্তান নয় তবু জগতের মধ্যে সে সকলের

চেয়ে যেন প্রাচীন। কেননা সে যে আপনার মনটি দিয়ে বেষ্টিত ; যে বিশাল বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে চিরযৌবনের রস অবাধে সর্বত্র সঞ্চারিত হচ্ছে তার সঙ্গে সে একেবারে একাত্ম মিলে থাকতে পারছে না। সে আপনার শতসহস্র সংস্কারের দ্বারা অভ্যাসের দ্বারা নিজের মধ্যে আবদ্ধ। জগতের মাঝখানে তার নিজের একটি বিশেষ জগৎ আছে ; সেই তার জগৎ আপনার রুচিবিশ্বাস-মতামতের দ্বারা সীমাবদ্ধ। এই সীমাটার মধ্যে আটকা পড়ে মানুষ দেখতে দেখতে অত্যন্ত পুরাতন হয়ে পড়ে। শতসহস্র বৎসরের মহারণ্যও অনায়াসে শ্যামল হয়ে থাকে, যুগযুগান্তরের প্রাচীন হিমালয়ের ললাটে তুষাররত্নমুকুট সহজেই অম্লান হয়ে বিরাজ করে, কিন্তু মানুষের রাজপ্রাসাদ দেখতে দেখতে জীর্ণ হয়ে যায় এবং তার লজ্জিত ভগ্নাবশেষ একদিন প্রকৃতির অঞ্চলের মধ্যেই আপনাকে প্রচ্ছন্ন করে ফেলতে চেষ্টা করে। মানুষের আপন জগৎটিও মানুষের সেই রাজপ্রাসাদের মতো। চারি দিকের জগৎ নূতন থাকে, আর মানুষের জগৎ তার মধ্যে পুরাতন হয়ে পড়তে থাকে। তার কারণ, বৃহৎ জগতের মধ্যে সে আপনার একটি ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি করে তুলছে। এই স্বাতন্ত্র্য ক্রমে ক্রমে আপন ঔদ্ধত্যের বেগে চারি দিকের বিরাট প্রকৃতির থেকে অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন হতে থাকলেই ক্রমশ বিকৃতিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এমনি করে মানুষই এই চিরনবীন বিশ্বজগতের মধ্যে জরাজীর্ণ হয়ে বাস করে। যে পৃথিবীর ক্রোড়ে মানুষের জন্ম সেই পৃথিবীর চেয়ে মানুষ প্রাচীন— সে আপনাকে আপনি ঘিরে রাখে বলেই বৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এই বেষ্টনের মধ্যে তার বহুকালের আবর্জনা সঞ্চিত হতে থাকে, প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে সেগুলি বৃহতের মধ্যে ক্ষয় হয়ে মিলিয়ে যায় না— অবশেষে সেই স্তূপের ভিতর থেকে নবীন আলোকে বাহির হয়ে আসা মানুষের পক্ষে প্রাণান্তিক ব্যাপার হয়ে পড়ে। অসীম জগতে চারি দিকে সমস্তই সহজ, কেবল সেই মানুষই সহজ নয়। তাকে যে অন্ধকার বিদীর্ণ করতে হয় সে তার স্বরচিত সযত্নপালিত অন্ধকার। সেইজন্যে এই অন্ধকারকে যখন বিধাতা একদিন আঘাত করেন সে আঘাত আমাদের মর্মস্থানে গিয়ে পড়ে ; তখন তাঁকে দুই হাত জোড় করে বলি, প্রভু, তুমি আমাকেই মারছ। বলি, আমার এই পরম স্নেহের জঞ্জালকে তুমি রক্ষা করো। কিম্বা বিদ্রোহের রক্তপতাকা উড়িয়ে বলি, তোমার আঘাত আমি তোমাকে ফিরিয়ে দেব, এ আমি গ্রহণ করব না।

মানুষ সৃষ্টির শেষ সন্তান বলেই মানুষ সৃষ্টির মধ্যে সকলের চেয়ে প্রাচীন। সৃষ্টির যুগযুগান্তরের ইতিহাসের বিপুল ধারা আজ মানুষের মধ্যে এসে মিলেছে। মানুষ নিজের মনুষ্যত্বের মধ্যে জড়ের ইতিহাস, উদ্ভিদের ইতিহাস, পশুর ইতিহাস সমস্তই একত্র বহন করছে। প্রকৃতির কত লক্ষকোটি বৎসরের ধারাবাহিক সংস্কারের

ভার তাকে আজ আশ্রয় করেছে। এই-সমস্তকে যতক্ষণ সে একটি উদার ঐক্যের মধ্যে সুসংগত সুসংহত করে না তুলছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার মনুষ্যত্বের উপকরণগুলিই তার মনুষ্যত্বের বাধা, ততক্ষণ তার যুদ্ধ-অস্ত্রের বাহুল্যই তার যুদ্ধজয়ের প্রধান অন্তরায়। একটি মহৎ অভিপ্রায়ের দ্বারা যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার বৃহৎ আয়োজনকে সার্থকতার দিকে গেঁথে না তুলছে ততক্ষণ তারা এলোমেলো চার দিকে ছড়িয়ে পড়ে অহরহ জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে এবং সুষমার পরিবর্তে কুশ্রীতার জঞ্জালে চারি দিককে অবরুদ্ধ করে দিচ্ছে।

সেইজন্যে বিশ্বজগতে যে নববর্ষ চিরপ্রবহমাণ নদীর মতো অবিশ্রাম চলেছে, এক দিনের জন্যও যে নববর্ষের নবীনত্ব ব্যাঘাত পায় না এবং সেইজন্যই প্রকৃতির মধ্যে নববর্ষের দিন বলে কোনো একটা বিশেষ দিন নেই, সেই নববর্ষকে মানুষ সহজে গ্রহণ করতে পারে না; তাকে চিন্তা করে গ্রহণ করতে হয়; বিশ্বের চিরনবীনতাকে একটি বিশেষ দিনে বিশেষ করে চিহ্নিত করে তবে তাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে হয়। তাই মানুষের পক্ষে নববর্ষকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করা একটা কঠিন সাধনা, এ তার পক্ষে স্বাভাবিক ঘটনা নয়।

সেইজন্যে আমি বলছি, এই প্রত্যূষে আমাদের আশ্রমের বনের মধ্যে যে-একটি সুস্নিগ্ধ শান্তি প্রসারিত হয়েছে, এই যে অরুণালোকের সহজ নির্মলতা, এই-যে পাখির কাকলির স্বাভাবিক মাধুর্য, এতে যেন আমাদের ভুলিয়ে না দেয়; যেন না মনে করি এই আমাদের নববর্ষ; যেন মনে না করি একে আমরা এমনি সুন্দর করে লাভ করলুম। আমাদের নববর্ষ এমন সহজ নয়, এমন কোমল নয়, শান্তিতে পরিপূর্ণ এমন শীতল মধুর নয়। মনে যেন না করি, এই আলোকের নির্মলতা আমারই নির্মলতা, এই আকাশের শান্তি আমারই শান্তি; মনে যেন না করি স্তব পাঠ ক'রে, নামগান ক'রে, কিছুক্ষণের জন্যে একটা ভাবের আনন্দ লাভ ক'রে, আমরা যথার্থরূপে নববর্ষকে আমাদের জীবনের মধ্যে আবাহন করতে পেরেছি।

জগতের মধ্যে এই মুহূর্তে যিনি নবপ্রভাতকে প্রেরণ করেছেন তিনি আজ নববর্ষকে আমাদের দ্বারে প্রেরণ করলেন, এই কথাটিকে সত্যরূপে মনের মধ্যে চিন্তা করো। একবার ধ্যান করে দেখো, আমাদের সেই নববর্ষের কী ভীষণ রূপ। তার অনিমেষ নেত্রের দৃষ্টির মধ্যে আগুন জ্বলছে। প্রভাতের এই শান্ত নিঃশব্দ সমীরণ সেই ভীষণের কঠোর আশীর্বাদকে অনুচ্চারিত বজ্রবাণীর মতো বহন করে এনেছে।

মানুষের নববর্ষ আরামের নববর্ষ নয়, সে এমন শান্তির নববর্ষ নয়, পাখির গান

তার গান নয়, অরুণের আলো তার আলো নয়। তার নববর্ষ সংগ্রাম ক'রে আপন অধিকার লাভ করে; আবরণের পর আবরণকে ছিন্ন বিদীর্ণ করে তবে তার অভ্যুদয় ঘটে।

বিশ্ববিধাতা সূর্যকে অগ্নিশিখার মুকুট পরিয়ে যেমন সৌরজগতের অধিরাজ করে দিয়েছেন, তেমনি মানুষকে যে তেজের মুকুট তিনি পরিয়েছেন দুঃসহ তার দাহ। সেই পরম দুঃখের দ্বারাই তিনি মানুষকে রাজগৌরব দিয়েছেন; তিনি তাকে সহজ জীবন দেন নি। সেইজন্যেই সাধন করে তবে মানুষকে মানুষ হতে হয়; তরুলতা সহজেই তরুলতা, পশুপক্ষী সহজেই পশুপক্ষী, কিন্তু মানুষ প্রাণপণ চেষ্টায় তবে মানুষ।

তাই বলছি আজ যদি তিনি আমাদের জীবনের মধ্যে নববর্ষ পাঠিয়ে থাকেন তবে আমাদের সমস্ত শক্তিকে জাগ্রত করে তুলে তাকে গ্রহণ করতে হবে। সে তো সহজ দান নয়, আজ যদি প্রণাম করে তাঁর সে দান গ্রহণ করি তবে মাথা তুলতে গিয়ে যেন কেঁদে না বলে উঠি 'তোমার এ ভার বহন করতে পারি নে প্রভু, মনুষ্যত্বের অতি-বিপুল দায় আমার পক্ষে দুর্ভর'।

প্রত্যেক মানুষের উপরে তিনি সমস্ত মানুষের সাধনা স্থাপিত করেছেন, তাই তো মানুষের ব্রত এত কঠোর ব্রত। নিজের প্রয়োজনটুকুর মধ্যে কোনোমতেই তার নিষ্কৃতি নেই। বিশ্বমানবের জ্ঞানের সাধনা প্রেমের সাধনা কর্মের সাধনা মানুষকে গ্রহণ করতে হয়েছে। সমস্ত মানুষ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আপনাকে চরিতার্থ করবে বলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এইজন্যেই তার উপরে এত দাবি। এইজন্যে নিজেকে তার পদে পদে এত খর্ব করে চলতে হয়; এত তার ত্যাগ, এত তার দুঃখ, এত তার আত্মসম্বরণ।

মানুষ যখনই মানুষের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে তখনই বিধাতা তাকে বলেছেন, তুমি বীর। তখনই তিনি তার ললাটে জয়তিলক এঁকে দিয়েছেন। পশুর মতো আর তো সেই ললাটকে সে মাটির কাছে অবনত করে সঞ্চরণ করতে পারবে না; তাকে বক্ষ প্রসারিত করে আকাশে মাথা তুলে চলতে হবে। তিনি মানুষকে আহ্বান করেছেন, হে বীর, জাগ্রত হও। একটি দরজার পর আর-একটি দরজা ভাঙো, একটি প্রাচীরের পর আর-একটি পাষাণপ্রাচীর বিদীর্ণ করো। তুমি মুক্ত হও, আপনার মধ্যে তুমি বদ্ধ থেকো না। ভূমার মধ্যে তোমার প্রকাশ হোক।

এই-যে যুদ্ধে তিনি আমাদের আহ্বান করেছেন তার অস্ত্র তিনি দিয়েছেন। সে তাঁর ব্রহ্মাস্ত্র; সে শক্তি আমাদের আত্মার মধ্যে রয়েছে। আমরা যখন দুর্বলকণ্ঠে

বলি 'আমার বল নেই' সেইটেই আমাদের মোহ। দুর্জয় বল আমার মধ্যে আছে। তিনি নিরস্ত্র সৈনিককে সংগ্রামক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিয়ে পরিহাস করবার জন্যে তার পরাভবের প্রতীক্ষা করে নেই। আমার অন্তরের অস্ত্রশালায় তাঁর শানিত অস্ত্র সব ঝক্ ঝক্ করে জ্বলছে। সে-সব অস্ত্র যতক্ষণ নিজের মধ্যে রেখেছি ততক্ষণ কথায় কথায় ঘুরে ফিরে নিজেই তার উপরে গিয়ে পড়ছি, ততক্ষণ তারা অহরহ আমাকেই ক্ষতবিক্ষত করছে। এ-সমস্ত তো সঞ্চয় করে রাখবার জন্য নয়। আয়ুধকে ধরতে হবে দক্ষিণহস্তের দৃঢ় মুষ্টিতে; পথ কেটে বাধা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে বাহির হতে হবে। এসো, এসো, দলে দলে বাহির হয়ে পড়ো— নববর্ষের প্রাতঃকালে পূর্বগগনে আজ জয়ভেরি বেজে উঠছে। সমস্ত অবসাদ কেটে যাক, সমস্ত দ্বিধা সমস্ত আত্ম-অবিশ্বাস পায়ের তলায় ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে যাক— জয় হোক তোমার, জয় হোক তোমার প্রভুর।

না না, এ শান্তির নববর্ষ নয়। সম্বৎসরের ছিন্নভিন্ন বর্ম খুলে ফেলে দিয়ে আজ আবার নূতন বর্ম পরবার জন্যে এসেছি। আবার ছুটতে হবে। সামনে মহৎ কাজ রয়েছে, মনুষ্যত্বলাভের দুঃসাধ্য সাধনা। সেই কথা স্মরণ করে আনন্দিত হও। মানুষের জয়লক্ষ্মী তোমারই জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে, এই কথা জেনে নিরলস উৎসাহে দুঃখব্রতকে আজ বীরের মতো গ্রহণ করো।

প্রভু, আজ তোমাকে কোনো জয়বার্তা জানাতে পারলুম না। কিন্তু, যুদ্ধ চলছে, এ যুদ্ধে ভঙ্গ দেব না। তুমি যখন সত্য, তোমার আদেশ যখন সত্য, তখন কোনো পরাভবকেই আমার চরম পরাভব বলে গণ্য করতে পারব না। আমি জয় করতেই এসেছি; তা যদি না আসতুম তবে তোমার সিংহাসনের সম্মুখে এক মুহূর্ত আমি দাঁড়াতে পারতুম না। তোমার পৃথিবী আমাকে ধারণ করেছে, তোমার সূর্য আমাকে জ্যোতি দিয়েছে, তোমার সমীরণ আমার মধ্যে প্রাণের সংগীত বাজিয়ে তুলেছে, তোমার মহামনুষ্যলোকে আমি অক্ষয় সম্পদের অধিকার লাভ করে জন্মগ্রহণ করেছি; তোমার এত দানকে এত আয়োজনকে আমার জীবনের ব্যর্থতার দ্বারা কখনোই উপহসিত করব না। আজ প্রভাতে আমি তোমার কাছে আরাম চাইতে শান্তি চাইতে দাঁড়াই নি। আজ আমি আমার গৌরব বিস্মৃত হব না। মানুষের যজ্ঞ-আয়োজনকে ফেলে রেখে দিয়ে প্রকৃতির স্নিগ্ধ বিশ্রামের মধ্যে লুকোবার চেষ্টা করব না। যতবার আমরা সেই চেষ্টা করি ততবার তুমি ফিরে ফিরে পাঠিয়ে দাও, আমাদের কাজ কেবল বাড়িয়েই দাও, তোমার আদেশ আরো তীব্র আরো কঠোর হয়ে ওঠে। কেননা, মানুষ আপনার মনুষ্যত্বের ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে থাকবে তার

এ লজ্জা তুমি স্বীকার করতে পার না। দুঃখ দিয়ে ফেরাও— পাঠাও তোমার মৃত্যু-দূতকে, ক্ষতিদূতকে। জীবনটাকে নিয়ে যতই এলোমেলো করে ব্যবহার করেছি ততই তাতে সহস্র দুঃসাধ্য গ্রন্থি পড়ে গেছে— সে তো সহজে মোচন করা যাবে না, তাকে ছিন্ন করতে হবে। সেই বেদনা থেকে আলস্যে বা ভয়ে আমাকে লেশমাত্র নিরস্ত হতে দিয়ো না। কতবার নববর্ষ এসেছে, কত নববর্ষের দিনে তোমার কাছে মঙ্গল প্রার্থনা করেছি। কিন্তু, কত মিথ্যা আর বলব। বারে বারে কত মিথ্যা সংকল্প আর উচ্চারণ করব। বাক্যের ব্যর্থ অলংকারকে আর কত রাশীকৃত করে জমিয়ে তুলব। জীবন যদি সত্য হয়ে না থাকে তবে ব্যর্থ জীবনের বেদনা সত্য হয়ে উঠুক— সেই বেদনার বহ্নিশিখায় তুমি আমাকে পবিত্র করো। হে রুদ্র, বৈশাখের প্রথম দিনে আজ আমি তোমাকেই প্রণাম করি— তোমার প্রলয়লীলা আমার জীবনবীণার সমস্ত আলস্যসুপ্ত তারগুলোকে কঠিনবলে আঘাত করুক, তা হলেই আমার মধ্যে তোমার সৃষ্টিলীলার নব আনন্দসংগীত বিশুদ্ধ হয়ে বেজে উঠবে। তা হলেই তোমার প্রসন্নতাকে অবারিত দেখতে পাব, তা হলেই আমি রক্ষা পাব। রুদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্। ১ বৈশাখ ১৩১৮

জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

বৈশাখী ঝড়ের সন্ধ্যা

কর্ম করতে করতে কর্মসূত্রে এক-এক জায়গায় গ্রন্থি পড়ে; তখন তাই নিয়ে কাজ অনেক বেড়ে যায়। সেইটে ছিঁড়তে, খুলতে, সেরে নিতে, চার দিকে কত রকমের টানাটানি করতে হয়— তাতে মন উত্ত্যক্ত হয়ে ওঠে।

এখানকার কাজে ইতিমধ্যে সেই রকমের একটা গ্রন্থি পড়েছিল; তাই নিয়ে নানা দিকে একটা নাড়াচাড়া টানাছেঁড়া উপস্থিত হয়েছিল। তাই ভেবেছিলুম আজ মন্দিরে বসেও সেই জোড়াতাড়ার কাজ কতকটা বুঝি করতে হবে; এ সম্বন্ধে কিছু বলতে হবে, কিছু উপদেশ দিতে হবে। মনের মধ্যে এই নিয়ে কিছু চিন্তা কিছু চেষ্টার আঘাত ছিল। কী করলে জট ছাড়ানো হবে, জঞ্জাল দূর হবে, হিতবাক্য তোমরা অবহিতভাবে শুনতে পারবে, সেই কথা আমার মনকে ভিতরে ভিতরে তাড়না দিচ্ছিল।

এমন সময় দেখতে দেখতে উত্তর-পশ্চিমে ঘনঘোর মেঘ করে এসে সূর্যাস্তের রক্ত

আভাকে বিলুপ্ত করে দিলে। মাঠের পরপারে দেখা গেল যুদ্ধক্ষেত্রের অশ্বারোহী দূতের মতো ধুলায় ধ্বজা উড়িয়ে বাতাস উন্মত্তভাবে ছুটে আসছে।

আমাদের আশ্রমের শালতরুর শ্রেণী এবং তালবনের শিখরের উপর একটা কোলাহল জেগে উঠল, তার পরে দেখতে দেখতে আমবাগানের সমস্ত ডালে ডালে আন্দোলন পড়ে গেল, পাতায় পাতায় মাতামাতির কলমর্মরে আকাশ ভরে গেল— ঘনধারায় বৃষ্টি নেমে এল।

তার পর থেকে এই চকিত বিদ্যুতের সঙ্গে থেকে থেকে মেঘের গর্জন, বাতাসের বেগ এবং অবিরল বর্ষণ চলেছে। মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে নিবিড় হয়ে এসেছে। আজ যে-সব কথা বলবার প্রয়োজন আছে মনে করে এসেছিলুম সে-সব কথা কোথায় যে চলে গিয়েছে তার ঠিকানা নেই।

দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির খরতাপে চারি দিকের মাঠ শুষ্ক হয়ে দগ্ধ হয়ে গিয়েছিল, জল আমাদের ইঁদারার তলায় এসে ঠেকেছিল, আশ্রমের ধেনুদল ব্যাকুল হয়ে উঠছিল। স্নান ও পানের জলের কিরকম ব্যবস্থা করা হবে সেজন্যে আমরা নানা ভাবনা ভাবছিলুম; মনে হচ্ছিল যেন এই কঠোর শুষ্কতার দিনের আর কোনোমতেই অবসান হবে না।

এমন সময় এক সন্ধ্যার মধ্যেই নীল স্নিগ্ধ মেঘ আকাশ ছেয়ে ছড়িয়ে পড়ল; দেখতে দেখতে জলে একেবারে চারি দিক ভেসে গেল। ক্রমে ক্রমে নয়, ক্ষণে ক্ষণে নয়, চিন্তা করে নয়, চেষ্টা করে নয়— পূর্ণতার আবির্ভাব একেবারে অবারিত দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে অনায়াসে সমস্ত অধিকার করে নিলে।

গ্রীষ্মসন্ধ্যার এই অপর্যাপ্ত বর্ষণ, এই নিবিড় সুন্দর স্নিগ্ধতা, আমারও মন থেকে সমস্ত প্রয়াস সমস্ত ভাবনাকে একেবারে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। পরিপূর্ণতা যে আমারই ক্ষুদ্র চেষ্টার উপর নির্ভর করে দীনভাবে বসে নেই, আমার সমস্ত অন্তঃকরণ যেন এই কথাটা এক মুহূর্তে অনুভব করলে। পরিপূর্ণতাকে শনৈঃ শনৈঃ ক'রে, একটুর সঙ্গে আর-একটুকে জুড়ে গেঁথে, কোনো কালে পাবার জো নেই। সে মৌচাকের মধু ভরা নয়, সে বসন্তের এক নিশ্বাসে বনে বনে লক্ষকোটি ফুলের নিগূঢ় মর্মকোষে মধু সঞ্চারিত করে দেওয়া। অত্যন্ত শুষ্কতা অত্যন্ত অভাবের মাঝখানেও পূর্ণস্বরূপের শক্তি আমাদের অগোচরে আপনিই কাজ করছে— যখন তাঁর সময় হয় তখন নৈরাশ্যের অপার মরুভূমিকেও সরসতায় অভিষিক্ত করে অকস্মাৎ সে কী আশ্চর্যরূপে দেখা দেয়। বহুদিনের মৃতপত্র তখন এক মুহূর্তে ঝেঁটিয়ে ফেলে, বহুকালের শুষ্ক ধূলিকে এক মুহূর্তে শ্যামল করে তোলে — তার আয়োজন যে কোথায় কেমন করে হচ্ছিল তা আমাদের দেখতেও দেয় না।

এই পরিপূর্ণতার প্রকাশ যে কেমন— সে যে কী বাধাহীন, কী প্রচুর, কী মধুর, কী গম্ভীর— সে আজ এই বৈশাখের দিবাবসানে সহসা দেখতে পেয়ে আমাদের সমস্ত মন আনন্দে গান গেয়ে উঠেছে। আজ অন্তরে বাহিরে এই পরিপূর্ণতারই সে অভ্যর্থনা করছে।

সেইজন্যে, আজ তোমাদের যে কিছু উপদেশের কথা বলব আমার সে মন নেই, কিছু বলবার যে দরকার আছে সেও আমার মন বলছে না ; কেবল ইচ্ছা করছে বিশ্ব-জগতের মধ্যে যে-একটি পরম গম্ভীর অন্তহীন আশা জেগে রয়েছে, কোনো দুঃখ-বিপত্তি-অভাবে যাকে পরাস্ত করতে পারছে না, গানের সুরে তার কাছে আমাদের আনন্দ আজ নিবেদন করে দিই। বলি, আমাদের ভয় নেই, আমাদের ভয় নেই— তোমার পরিপূর্ণ পাত্র নিয়ে যখন দেখা দেবে সে পাত্র উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়তে থাকবে, যে দীনতা কোনোদিন পূরণ হতে পারে এমন কেউ মনে করতেও পারে না সেও পূরণ হয়ে যাবে। নামবে তোমার বর্ষণ, একেবারে ঝর ঝর করে ঝরতে থাকবে তোমার প্রসাদধারা ; গহ্বর যত গভীর তা ভরবে তেমনি গভীর করে।

আজ আর কিছু নয়, আজ মনকে সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ করে পেতে দিই তাঁর কাছে। আজ অন্তরের অন্তরতম গভীরতার মধ্যে অনুভব করি সেখানটি ধীরে ধীরে ভরে উঠছে। বারিধারা ঝরছে ঝরছে— সমস্ত ধুয়ে যাচ্ছে, স্নিগ্ধ হয়ে যাচ্ছে ; সমস্ত নবীন হয়ে উঠছে, শ্যামল হয়ে উঠছে। বাইরে কেউ দেখতে পাচ্ছে না, বাইরে সমস্ত মেঘাবৃত, সমস্ত নিবিড় অন্ধকার, তারই মধ্যে নেমে আসছে তাঁর নিঃশব্দচরণ দূত-গুলি, ভরে ভরে নিয়ে আসছে তাঁরই সুধাপাত্র।

আজ যদি এই মন্দিরের মধ্যে বসে সমস্ত মনটিকে প্রসারিত করে দিই, এই জন-শূন্য মাঠের মাঝখানে, এই অন্ধকারে-ঘেরা আশ্রমের তরুশাখাগুলির মধ্যে, তবে প্রত্যেক ধূলিকণাটির মধ্যে কী গূঢ় গভীর পুলক অনুভব করব! সেই পুলকোচ্ছ্বাসের গন্ধে আকাশ ভরে গিয়েছে ; প্রত্যেক তৃণ প্রত্যেক পাতাটি আজ উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে— তাদের সংখ্যা গণনা করতে কে পারে! পৃথিবীর এই একটি পরিব্যাপ্ত আনন্দ নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যাকাশের মধ্যে আজ নিঃশব্দে রাশীকৃত হয়ে উঠেছে। চারি দিকের এই মূক অব্যক্ত প্রাণের খুশির সঙ্গে মানুষ তুমিও খুশি হও! এই সহসা-অভাবনীয়কে বুক ভরে পাবার যে খুশি, এই এক মুহূর্তে সমস্ত অভাবের দীনতাকে একেবারে ভাসিয়ে দেবার যে খুশি, সেই খুশির সঙ্গে মানুষ তোমার সমস্ত মন প্রাণ শরীর আজ খুশি হয়ে উঠুক। আজকের এই গগনব্যাপী ঘোর ঘনঘটাকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করি। বহুদিনের কর্মক্ষোভ হতে উত্থিত ধূলির আবরণ ধুয়ে আজ ভেসে

যাক— পবিত্র হই, স্নিগ্ধ হই। এসো এসো, তুমি এসো— আমার দিক্‌দিগন্ত পূর্ণ করে তুমি এসো! হে গোপন, তুমি এসো! প্রান্তরের এই নির্জন অন্ধকারের মধ্য দিয়ে, আকাশের এই নিবিড় বৃষ্টিধারার মধ্য দিয়ে তুমি এসো! সমস্ত গাছের পাতা সমস্ত তৃণদলের সঙ্গে আজ পুলকিত হয়ে উঠি। হে নীরব, তুমি এসো, আজ বিনা সাধনের ধন হয়ে ধরা দাও— তোমার নিঃশব্দ চরণের স্পর্শলাভের জন্য আজ আমার সমস্ত হৃদয়কে তোমার সমস্ত আকাশের মধ্যে মেলে দিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসি। ৬ বৈশাখ ১৩১৮

শ্রাবণ ১৩১৮

সত্যবোধ

আজকের এই প্রান্তরের উপর জ্যোৎস্নার আলোক দেখে আমার অনেক দিনের আরও কয়েকটি জ্যোৎস্নারাত্রির কথা মনে পড়ছে।

তখন আমি পদ্মানদীতে বাস করতুম। পদ্মার চরে নৌকা বাঁধা থাকত। শুক্লপক্ষের রাত্রিতে কতদিন আমি একলা সেই চরে বেড়িয়েছি। কোথাও ঘাস নেই, গাছ নেই, চাঁদের আলোর সঙ্গে বালুচরের প্রান্ত মিশিয়ে গেছে— সেই পরিব্যাপ্ত শুভ্রতার মধ্যে একটিমাত্র যে ছায়া সে কেবল আমার।

সেই আমার নির্জন সন্ধ্যায় আমার একজন সঙ্গী জুটল। তিনি আমাদের একজন কর্মচারী। তিনি আমার পাশে চলতে চলতে অনেক সময়েই দিনের কাজের আলোচনায় প্রবৃত্ত হতেন। সে সমস্তই দেনাপাওনার কথা, জমিদারির কথা, আমাদের প্রয়োজনের কথা।

সেই আমার কানের কাছে সেই একটিমাত্র মানুষের একটুখানি কণ্ঠের ধ্বনি এতবড়ো নক্ষত্রলোকের অখণ্ড নিস্তব্ধতাকে এক মুহূর্তে ভেঙে দিত এবং এতবড়ো একটি নিভৃত শুভ্রতার উপরেও যেন ঘোমটা পড়ে যেত, তাকে আর যেন আমি স্পষ্ট করে দেখতেই পেতুম না।

তার পরে তিনি চলে গেলে হঠাৎ দেখতে পেতুম আমি এতক্ষণ অত্যন্ত ছোটো হয়ে গিয়েছিলুম, সেইজন্যে চার দিকের বড়োকে আমি আর সত্য বলে জানতে পারছিলুম না; এতবড়ো শান্তিময় সৌন্দর্যময় আকাশ-ভরা প্রত্যক্ষ বর্তমানও আমার কাছে একেবারে কিছুই-না হয়ে গিয়েছিল।

এই নিয়ে কতদিন মনের মধ্যে আমি বিস্ময় অনুভব করেছি। এই কথা মনে

ভেবেছি, যতক্ষণ কেবল আমারই সংক্রান্ত কথা হচ্ছিল, আমারই বিষয়কর্ম, আমারই আয়োজন প্রয়োজন— আমার মনের মধ্যে আমিই যখন একমাত্র প্রধান ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলুম— বস্তুত তখনই আমার বিশ্বের মধ্যে আমিই সকলের চেয়ে ছোটো হয়ে গিয়েছিলুম। ততক্ষণ চাঁদ আমার কাছ থেকে তার জ্যোৎস্না ফিরিয়ে নিয়েছিল। নদীর কলধ্বনি আমাকে একেবারে নগণ্য করে দিয়ে পাশে থেকেও আমাকে অস্পৃশ্যের মতো পরিহার করে চলে গিয়েছিল। এই দিগন্তব্যাপী শুভ্র আকাশের মধ্যে তখন আমি আর ছিলুম না, আমি নির্বাসিত হয়ে গিয়েছিলুম।

শুধু তাই নয়, তখন আমার মনের মধ্যে যে ভাব, যে ভাবনা, চারি দিকের বিশ্ব-জগতের সঙ্গে তার যেন কোনো সত্য যোগ নেই। নিখিলের মাঝখানে তাকে ধরে দেখলে দেখতে পাওয়া যায় সে একটা অদ্ভুত মিথ্যা। জমিজমা হিসাব-কিতাব মামলা-মকদ্দমা এ-সমস্ত শূন্যগর্ভ বুদ্‌বুদ বিশ্বসাগরের মধ্যে কোনো চিহ্নমাত্র না রেখে মুহূর্তে মুহূর্তে কত শতসহস্র বিদীর্ণ হয়ে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

তা হোক, তবু সমুদ্রের মধ্যে বুদ্‌বুদেরও স্থান আছে। সমুদ্রের সমগ্র সত্যটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে ওই বুদ্‌বুদেরও যেটুকু সত্য সেটুকুকে একেবারে অস্বীকার করবার দরকারই হয় না। কিন্তু, আমরা যখন এই বুদ্‌বুদের মধ্যে বেষ্টিত হয়ে সমুদ্রের দিকে আমাদের দৃষ্টি একেবারে হারাই তখনই আমাদের বিপদ ঘটে।

আমরা বড়োর মধ্যে আছি এই কথাটি যখন আমাদের মনের মধ্যে স্পষ্ট থাকে তখন ছোটোকে স্বীকার করে নিলে আমাদের কোনো ক্ষতি হয় না। বড়ো জগতে আমাদের বাস, বড়ো সত্যে আমাদের চির আশ্রয়, এই কথাটি যাতে ভুলিয়ে দেয় তাতেই আমাদের সর্বনাশ করে।

বাইরে থেকে দেখতে গেলে বড়োতে আমাদের প্রয়োজন অতি অল্প। ছোটো-খাটোর মধ্যে সহজেই আমাদের চলে যায়। কিন্তু যাতে তার কেবলমাত্র চলে যায় মানুষকে তার মধ্যে তো মানুষ থাকতে দেয় নি। মানুষকে সকল দিকেই মানুষ তার থেকে বাইরে টেনে আনছে।

এই-যে তোমরা মানবশিশু, পৃথিবীতে তোমরা সকলের চেয়ে ছোটো; আজ তোমাদের আমরা এই মন্দিরে এনেছি, জগতে সকলের চেয়ে যিনি বড়ো তাঁকে প্রণাম করতে। বাহির থেকে দেখলে কারও হাসি পেতে পারে, মনে হতে পারে এর কী দরকার।

কিন্তু, মনকে একবার জিজ্ঞাসা কোরো, এতবড়ো আকাশ, এতবড়ো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই বা আমাদের জন্মাবার কী দরকার ছিল। আমাদের চার দিকে যথোপযুক্ত

স্থানটুকু রেখে তার চার দিকে বেড়া তুলে দিলে কোনো অসুবিধা হত না; বরঞ্চ অনেক বিষয়ে হয়তো সুবিধা হত, অনেক কাজ হয়তো সহজ হতে পারত।

কিন্তু, ছোটোর পক্ষেও বড়োর একটি গভীরতম অন্তরতম দরকার আছে। সে এক দিকে অত্যন্ত ছোটো হয়েও আর-এক দিকে অত্যন্ত বড়োকে এক মুহূর্তের জন্যেও হারায় নি এই সত্যের মধ্যেই সে বেঁচে আছে। তার চার দিকে সমস্তই তাকে কেবল বড়োর কথাই বলছে। আকাশ কেবলই বলছে 'বড়ো', আলোক কেবলই বলছে 'বড়ো', বাতাস কেবলই বলছে 'বড়ো'। দিবসের পৃথিবী তাকে বলছে 'বড়ো', রাত্রের নক্ষত্রমণ্ডলী তাকে বলছে 'বড়ো'। গ্রহনক্ষত্র থেকে আরম্ভ করে নদী সমুদ্র প্রান্তর সকলেই তার কানের কাছে অহোরাত্র এই এক মন্ত্রই জপ করছে— 'বড়ো'। ছোটো মানুষটি বড়োর মধ্যেই দৃষ্টি মেলেছে, সে বড়োর মধ্যেই নিশ্বাস নিচ্ছে, সে বড়োর মধ্যেই সঞ্চরণ করছে।

এইজন্যে মানুষ ছোটো হয়েও কিছুতেই ছোটোতে সন্তুষ্ট হতে পারছে না। এমন-কি, ছোটোর মধ্যে যে সুখ আছে তাকে ফেলে দিয়ে বড়োর মধ্যে যে দুঃখ আছে তাকেও মানুষ ইচ্ছাপূর্বক প্রার্থনা করে। মানুষের জ্ঞান সূর্য চন্দ্র তারার মধ্যেও তত্ত্ব সন্ধান করে বেড়ায়; তার শক্তি কেবলমাত্র ঘরের মধ্যে আপনাকে আরামে আটকে রাখতে পারে না। এই বড়োর দিকেই মানুষের পথ, সেই দিকেই তার গতি, সেই দিকেই তার শক্তি, সেই দিকেই তার সত্য— এই সহজ কথাটি কখন সে ভুলতে থাকে? যখন সে আপন হাতের-গড়া বেড়া দিয়ে আপনার চার দিক ঘিরে তুলতে থাকে। তখন এই জগৎ থেকে যে বড়োর মন্ত্রটি দিনরাত্রি উঠছে সেটি তার মনের মধ্যে প্রবেশ করবার পথ খুঁজে পায় না। আমরা ছোটো হয়েও বড়ো, এই মস্ত কথাটি তখন দিনে দিনে ভুলে যেতে থাকি। এবং আমাদের সেই এক বড়ো দেবতার আসনটি ছোটো ছোটো শতসহস্র অপদেবতা এসে অধিকার করে বসে।

বড়োর মধ্যেই আমাদের বাস এই সত্যটি স্মরণ করবার জন্যেই আমাদের ধ্যানের মন্ত্রে আছে: ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। এই কথাটা একেবারে ভুলে গিয়ে যখন আমরা নিশ্চয় করে মনে করে বসি ঘরের মধ্যেই আমাদের বাস, ধনের মধ্যেই আমাদের বাস, তখনই হৃদয়ের মধ্যে যত রাজ্যের উৎপাত জেগে ওঠে— যত কাম ক্রোধ লোভ মোহ। বদ্ধ জলে বদ্ধ বাতাসে যেমন কেবলই বিষ জমে, তেমনি যখনই মনে করি আমাদের সংসারক্ষেত্র আমাদের কর্মক্ষেত্রই আমাদের সত্য আশ্রয় তখনই বিরোধ বিদ্বেষ সংশয় অবিশ্বাস পদে পদে জেগে উঠতে থাকে; তখনই আপনাকে ভুলতে পারি নে এবং অন্যকে কেবলই আঘাত করি।

যেমন আপনার সংসারের মধ্যেই সমস্ত জগৎকে না দেখে জগতের মধ্যেই আপনার সংসারকে দেখলে তবে সত্য দেখা হয়, সেই সত্যকে আশ্রয় করে থাকলে নিজের প্রবৃত্তির বিকৃতি সহজে ঘটতে পারে না, তেমনি প্রত্যেক মানুষকেও আমাদের সত্য করে দেখা চাই।

আমরা মানুষকে সত্য করে কখন দেখি নে? কখন তাকে ছোটো করে দেখি? যখন আমার দিক থেকে তাকে দেখি, তার দিক থেকে তাকে দেখি নে। আমার পক্ষে সে কতখানি এইটে দিয়েই আমরা মানুষকে ওজন করি। আমার পক্ষে তার কী প্রয়োজন, আমি তার কাছ থেকে কতটা আশা করতে পারি, আমার সঙ্গে তার ব্যাবহারিক সম্বন্ধ কতখানি, এই বিচারের দ্বারাই মানুষকে সীমাবদ্ধ করে জানি। যেমন আমরা পৃথিবীতে অধিকাংশ সময়ে এই ভাবেই বাস করি যে, কেবল আমার বিষয়-সম্পত্তিকে আমার ঘরবাড়িকে ধারণ করবার জন্যই বিশ্বজগৎটা রয়েছে, তার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কোনো মূল্য নেই। তেমনি আমরা মনে করি, আমার প্রয়োজন এবং আমার ভালো-লাগা মন্দ-লাগার সম্বন্ধকে বহন করবার জন্যেই মানুষ আছে— আমাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়েও সে যে কতখানি তা আমরা দেখি নে।

জগৎকে অহরহ ছোটো করে দেখলে যেমন নিজেকেই ছোটো করে ফেলা হয়, তেমনি মানুষকে কেবলই নিজের ব্যাবহারিক সম্বন্ধে ছোটো করে দেখলে নিজেকেই আমরা ছোটো করি। তাতে আমাদের শক্তি ছোটো হয়ে যায়, আমাদের প্রীতি ছোটো হয়ে যায়। জগতে যাঁরা মহাত্মা লোক তাঁরা মানুষকে মানুষ বলে দেখেছেন, নিজের সংস্কার বা নিজের প্রয়োজনের দ্বারা তাকে টুকরো করে দেখেন নি। এতে করে তাঁদের নিজেদের মনুষ্যত্বের মহত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। মানুষকে তাঁরা দেখেছেন বলেই নিজেকে তাঁরা মানুষের জন্যে দান করতে পেরেছেন।

নিজের দিক থেকেই যখন আমরা অন্যকে দেখি তখন আমরা অতি অনায়াসেই অন্যকে নষ্ট করতে পারি। এমন গল্প শোনা গেছে, ডাকাত মানুষকে খুন করে ফেলে শেষকালে তার চাদরের গ্রন্থি থেকে এক পয়সা মাত্র পেয়েছে। নিজের প্রয়োজনের দিক থেকে দেখে মানুষের প্রাণকে সে এক পয়সার চেয়েও ছোটো করে ফেলেছে। নিজের ভোগপ্রবৃত্তি যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন মানুষকে আমরা ভোগের উপায় বলে দেখি, তাকে আমরা মানুষ বলে সম্মান করি নে— আমার লুব্ধ বাসনা দ্বারা অনায়াসেই আমরা মানুষকে খর্ব করতে পারি। বস্তুত মানুষের প্রতি অত্যাচার অবিচার ঈর্ষা ক্রোধ বিদ্বেষ এ-সমস্তেরই মূল কারণ হচ্ছে মানুষকে আমরা আমার দিক থেকে দেখার

দরুন তার মূল্য কমিয়ে দিই এবং তার প্রতি ক্ষুদ্র ব্যবহার করা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

এর ফল হয় এই যে, এতে করে আমাদের নিজেদেরই মূল্য কমে যায়। অন্যকে নামিয়ে দিলেই আমরা নেমে যাই। কেননা, মানুষের যথার্থ আশ্রয় মানুষ, আমরা বড়ো হয়ে পরস্পরকে বড়ো করি। যেখানে শূদ্রকে ব্রাহ্মণ নামিয়েছে সেখানে ব্রাহ্মণকেও নীচে নামতে হয়েছে, তার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। শূদ্র যদি বড়ো হত সে স্বতই ব্রাহ্মণকে বড়ো করে রাখত। রাজা যদি নিজের প্রয়োজন বা সুবিধা বুঝে প্রজাকে খর্ব করে রাখে তবে নিজেকে সে খর্ব করেই। কারণ, কোনো মানুষই বিচ্ছিন্ন নয়; প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেক মানুষকে মূল্য দান করে। যেখানে মানুষ ভৃত্যকে ভৃত্যমাত্র মনে না ক'রে মানুষ বলে জ্ঞান করে সেখানে সে মনুষ্যত্বকে সম্মান দেয় ব'লেই যথার্থরূপে নিজেকেই সম্মানিত করে।

কিন্তু, আমাদের তামসিকতাবশত জগতেও যেমন আমরা সত্য করে বাস করি নে মানুষকেও তেমনি আমরা সত্য করে দেখতে পারি নে। সেইজন্যে জগৎকে কেবলই আমার সম্পত্তি করে তুলব এই কথাই আমার অহোরাত্রের ধ্যান হয় এবং সেইজন্যই অধিকাংশ জগৎই আমার কাছে থেকেও না-থাকার মতো হয়ে যায়, মানুষকেও তাই আমরা আমাদের নিজের সংস্কার স্বভাব ও প্রয়োজনের গণ্ডিটুকুর মধ্যেই দেখি; সেইজন্যে মানুষের যে দিকটা নিত্য সত্য, যে দিকটা মহৎ, সে দিকটা আমাদের চোখেই পড়ে না। সেইজন্যে ব্যবসায়ীর মতো আমরা কেবলমাত্র তার মজুরির দাম দিই, আত্মীয়ের মতো তার মনুষ্যত্বের কোনো দাম দিই নে। এইজন্যে যদিচ আমরা বড়োর মধ্যেই আছি তবু আমরা বড়োকে গ্রহণ করি নে, যদিচ সত্যই আমাদের আশ্রয় তবু সে আশ্রয় থেকে নিজেদের বঞ্চিত করি।

এইরকম অবস্থায় মানুষকে আমরা অতি অনায়াসেই আঘাত করি, অপমান করি। মানুষকে এরকম উপেক্ষা করে অবজ্ঞা করে আমাদের যে কোনো প্রয়োজন-সিদ্ধি হয় তা নয়, এমন-কি অনেক সময় হয়তো প্রয়োজনের ব্যাঘাত ঘটে— কিন্তু, এ একটা বিকৃতি। বৃহৎ সত্য হতে বিচ্ছিন্ন হলে স্বভাবতই যে বিকৃতি দেখা দেয় এ সেই বিকৃতি। মানুষের মধ্যে এবং বিশ্বজগতের মধ্যে আমরা আমাদের পরিবেষ্টনকে সংকীর্ণ করে নিয়েছি বলেই আমাদের প্রবৃত্তিগুলো দূষিত হয়ে উঠতে থাকে; সেই দূষিত প্রবৃত্তিই মারীরূপে আমাদের নিজেকে এবং অন্যকে মারতে থাকে।

এই আশ্রমে আমাদের যে সাধনা সে হচ্ছে এই বিশ্বে এবং মানুষের মধ্যে সংকীর্ণতা থেকে মুক্তিলাভের সাধনা। সত্যকে আমরা সম্পূর্ণরূপে বোধ করতে চাই। এ সাধনা

সহজ নয়; কিন্তু কঠিন হলেও তবু সত্যের সাধনাই করতে হবে। এ আশ্রম আমাদের সাধনার ক্ষেত্র; সে কথা ভুলে গিয়ে যখনই একে আমরা কেবলমাত্র কর্মক্ষেত্র বলে মনে করি তখনই আমাদের আত্মার বোধশক্তি বিকৃত হতে থাকে, তখনই আমাদের আমিটাই বলবান হয়ে ওঠে। তখনই আমরা পরস্পরকে আঘাত করি, অবিচার করি। তখন আমাদের উক্তি অত্যুক্তি হয়, আমাদের আচার অত্যাচার হয়ে পড়ে।

কর্ম করতে করতে কর্মের সংকীর্ণতা আমাদের ঘিরে ফেলে; কিন্তু দিনের মধ্যে অন্তত একবার মনকে তার বাইরে নিয়ে গিয়ে উদার সত্যকে আমাদের প্রাত্যহিক কর্মপ্রয়োজনের অতীত ক্ষেত্রে দেখে নিতে হবে। সপ্তাহের মধ্যে অন্তত একদিন এমন-ভাবে যাপন করতে হবে যাতে বোঝা যায় যে আমরা সত্যকে মানি। আমাদের সত্য করে বাঁচতে হবে; সমস্ত মিথ্যার জাল, সমস্ত কৃত্রিমতার জঞ্জাল সরিয়ে ফেলতেই হবে— জগতে যিনি সকলের বড়ো তিনিই আমার জীবনের ঈশ্বর এ কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে। আমরা যে তাঁর মধ্যে বেঁচে আছি এ কথা কি জীবনে একদিনও অনুভব করে যেতে পারব না? এই নানা সংস্কারে আঁকা, নানা প্রয়োজনে আঁটা, আমির পর্দাটাকে মাঝে মাঝে সরিয়ে ফেলতে পারলেই তখনই চার দিকে দেখতে পাব জগৎ কী আশ্চর্য অপরূপ! মানুষ কী বিপুল রহস্যময়! তখন মনে হবে এই-সমস্ত পশুপক্ষী গাছপালাকে এই যেন আমি প্রথম সমস্ত মন দিয়ে দেখতে পাচ্ছি; আগে এরা আমার কাছে দেখা দেয় নি। সেইদিনই এই জ্যোৎস্নারাত্রি তার সমস্ত হৃদয় উদ্‌ঘাটন করে দেবে; এই আকাশে এই বাতাসে একটি চিরন্তন বাণী ধ্বনিত হয়ে উঠবে। সেইদিন আমাদের মানবসংসারের মধ্যে জগৎ-সৃষ্টির চরম অভিপ্রায়টিকে সুগভীরভাবে দেখতে পাব; এবং অতি সহজেই দূর হয়ে যাবে সমস্ত দাহ, সমস্ত বিক্ষোভ, এই অহমিকাবেষ্টিত ক্ষুদ্র জীবনের সমস্ত দুঃসহ বিকৃতি। ১৩১৯

ভাদ্র ১৩১৯

সত্য হওয়া

বিশ্বচরাচরকে যিনি সত্য করে বিরাজ করছেন তাঁকেই একেবারে সহজে জানব এই আকাঙ্ক্ষাটি মানুষের আত্মার মধ্যে গোচরে ও অগোচরে কাজ করছে এই কথাটি নিয়ে সেদিন আলোচনা করা গিয়েছিল।

কিন্তু, এই প্রশ্ন মনে উদয় হয়, যিনি সকলের চেয়ে সত্য, যাঁর মধ্যে আমরা আছি, তাঁকে নিতান্ত সহজেই কেন না বুঝি— তাঁকে জানবার জন্যে নিয়ত এত সাধনা এত ডাকাডাকি কেন ?

যার মধ্যে আছি তার মধ্যেই সহজ হয়ে ওঠবার জন্যে যে কঠিন চেষ্টার প্রয়োজন হয় তার একটি দৃষ্টান্ত আমাদের সকলেরই জানা আছে ; এখানে তারই উল্লেখ করব। মাতার গর্ভে ভ্রূণ অচেতন হয়ে থাকে। মাতার দেহ থেকে সে রস গ্রহণ করে, তাতে তাকে কোনো কষ্ট করতে হয় না। মায়ের স্বাস্থ্যেই তার স্বাস্থ্য, মায়ের পোষণেই তার পোষণ, মায়ের প্রাণেই তার প্রাণ।

যখন সে ভূমিষ্ঠ হয় তখন সে নিশ্চেষ্টতা থেকে একেবারে সচেষ্টতার ক্ষেত্রে এসে পড়ে। এখানে আলোক অজস্র, আকাশ উন্মুক্ত, এখানে সে কোনো আবরণের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। কিন্তু, তবু এই মুক্ত আকাশ প্রশস্ত পৃথিবীতে বাস করেও এই মুক্তির মধ্যে সঞ্চরণের সহজ অধিকার সে একেবারেই পায় না। অনেক দিন পর্যন্ত সে চলতে পারে না, বলতে পারে না। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে তার হৃদয়ে মনে যে শক্তি আছে, যে-সমস্ত শক্তির দ্বারা সে এই পৃথিবীর মধ্যে সহজ হয়ে উঠবে, তাকে অক্লান্ত চালনা করে অনেক দিনে তবে সে মানুষ হয়ে ওঠে।

ভূমিষ্ঠ শিশু গর্ভবাস থেকে মুক্তি পেয়েছে বটে, তবু অনেক দিন পর্যন্ত গর্ভের সংস্কার তার ঘোচে না। সে চোখ বুজে নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে, নিদ্রিত অবস্থাতেই তার অধিকাংশ সময় কাটে।

কিন্তু, জড়ত্বের এই-সমস্ত লক্ষণ দেখেও তবু আমরা জানি সে চেতনার ক্ষেত্রে বাস করছে, জানি তার এই নিশ্চেষ্ট নিশ্চলতা চিরকাল সত্য নয়। এখনও যদিচ সে চোখ বুজে কাটায়, তবু সে যে আলোকের ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করেছে এ কথা সত্য এবং এই সত্যটি ক্রমশই তার দৃষ্টিশক্তিকে পূর্ণতররূপে অধিকার করতে থাকবে।

তৎপূর্বে তার চেষ্টা অল্প নয়। বারবার সে পড়ে পড়ে যাচ্ছে, বারবার সে ব্যর্থ হচ্ছে। কিন্তু তার এই কষ্ট দেখে, এই অক্ষমতা দেখে আমরা কখনোই বলি নে যে,

তবে ওর আর কাজ নেই— ও থাক্ মায়ের কোলেই দিনরাত পড়ে থাক্। আমরা তাকে ধরে ধরে বারম্বার চলার চেষ্টাতেই প্রবৃত্ত করি। কেননা, আমরা নিশ্চয় জানি, এই মানবশিশু যেখানে জন্মেছে সেইখানে সঞ্চরণের শক্তিটা যদিও চোখে দেখতে পাচ্ছি নে তবু সেইটেই ওর পক্ষে সত্য, অক্ষমতাই যদিচ চোখে দেখতে পাচ্ছি তবু সেইটেই সত্য নয়। এই নিশ্চিত বিশ্বাসে ভর করে শিশুকে আমরা অভ্যাসে প্রবৃত্ত রাখি বলেই অবশেষে একদিন তার পক্ষে চলা বলা এমনি সহজ হয়ে যায় যে, তার জন্যে এক মুহূর্ত চেষ্টা করতে হয় না।

মানুষের মধ্যে আত্মা মুক্তির ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করেছে। পশুর চিত্ত বিশ্বপ্রকৃতির গর্ভে আবৃত। সে প্রাকৃতিক সংস্কারের আবরণে আচ্ছন্ন হয়ে অনায়াসে কাজ করে যাচ্ছে। সমস্ত প্রকৃতির চেষ্টা তার মধ্যে চেষ্টারূপে কাজ করছে। ভ্রূণের মতো সে কেবল নিচ্ছে, কেবল বাড়ছে, আপনার প্রাণকে সে কেবল পোষণ করছে। এমনি করে বিশ্বের মধ্যে মিলিত হয়ে সে চলছে বলে ভ্রূণের মতো আপনাকে সে আপনি জানে না।

মানুষের আত্মা প্রকৃতির এই গর্ভ থেকে অধ্যাত্মলোকে জন্মেছে। সে প্রকৃতির সঙ্গে জড়িত হয়ে প্রকৃতির ভিতর থেকে কেবল অন্ধভাবে প্রবৃত্তির তাড়নায় সঞ্চয় করতে থাকবে, এ আর হতেই পারে না। এখন সে কর্তা— এখন সে সৃষ্টি করবে, আপনাকে দান করবে।

মানুষের আত্মা মুক্তিক্ষেত্রে জন্মেছে যদিচ এই কথাটাই সত্য, তবু একেবারেই এর সম্পূর্ণ প্রমাণ আমরা পাচ্ছি নে। প্রকৃতির গর্ভবাসের মধ্যে বদ্ধ অবস্থার যে সংস্কার তা সে এই মুক্তলোকের মধ্যে এসেও একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারছে না। আত্মশক্তির সাধনার দ্বারাই সচেষ্টভাবে সে যে আপনাকে এবং জগৎকে অধিকার করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছে, এ কথা এখনও তাকে দেখে স্পষ্ট অনুভব করা যায় না। এখনও সে যেন প্রবৃত্তির নাড়ির দ্বারা প্রকৃতি থেকে রস শোষণ করে কেবল জড়ভাবে আপনাকে পুষ্ট করতে থাকবে এমনি তার ভাব; আপনার মধ্যে তার আপনার যে একটি সত্য আশ্রয় আছে এখনও তার উপরে নির্ভর দৃঢ় হয় নি, এইজন্যে প্রকৃতিকেই সে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে আছে; এইজন্যেই শিশুর মতোই সে সব জিনিসকে মুঠোয় নিতে এবং মুখে পুরতে চায়— জানে না জ্ঞানের দ্বারা সকল জিনিসকে নির্লিপ্তভাবে অথচ পূর্ণতরভাবে গ্রহণ করবার দিন তার এসেছে। এখনও সে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতে পারছে না যে, শক্তিকে মুক্ত করে দেওয়ার দ্বারাই সে আপনাকে পাবে, আপনাকে ত্যাগ করার দ্বারা দান করার দ্বারাই সে আপনাকে

পূর্ণভাবে সপ্রমাণ করবে; সত্যের মধ্যেই তার যথার্থ স্থিতি, সংসার ও বিষয়ের গর্তের মধ্যে নয়, সেই সত্যের মধ্যে তার ক্ষয় নেই, তার ভয় নেই— আপনাকে নিঃসংকোচে শেষ পর্যন্ত উৎসর্গ করে দিয়ে এই অমর সত্যকে প্রকাশ করবার পরম সুযোগ হচ্ছে মানবজন্ম এ কথাটাকে এখনও সে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করতে পারছে না।

মানুষের মধ্যে এই দুর্বল দ্বিধা দেখেই একদল দীনচিত্ত লোক মানুষের মাহাত্ম্যকে অবিশ্বাস করে— মানুষের আত্মাকে তারা দেখতে পায় না; তারা ক্ষুধাতৃষ্ণানিদ্রাতুর অহংটাকেই চরম বলে জানে, অন্যটাকে কল্পনা বলে স্থির করে।

কিন্তু, শিশু যদিচ মায়ের কোলে ঘুমিয়ে রয়েছে এবং অচেতনপ্রায় ভাবে তার স্তনপান করছে, অর্থাৎ যদিচ তার ভাব দেখে মন হয় সে একান্তভাবে পরাশ্রিত, তবু যেমন সে কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়, বস্তুত সে স্বাধীন কর্তৃত্বের ক্ষেত্রেই জন্মলাভ করেছে— তেমনি মানুষের আত্মা সম্বন্ধেও আমরা আপাতত যত বিরুদ্ধ প্রমাণই পাই নে কেন তবু এই কথাই নিশ্চিত সত্য যে, বিষয়রাজ্যের সে দীন প্রজা নয়, পরমাত্মার মধ্যেই তার সত্য প্রতিষ্ঠা। সে অন্য যে-কোনো জিনিসকেই মুখে প্রার্থনা করুক, অন্য যে-কোনো জিনিসের জন্যই শোক করুক, তার সকল প্রার্থনার অভ্যন্তরেই পরমাত্মার মধ্যে একান্ত সহজ হবার প্রার্থনাই সত্য এবং তাঁর মধ্যে প্রবুদ্ধ না হবার শোকই তার একমাত্র গভীরতম ও সত্যতম শোক।

শিশুকে সংসারে যে আমরা এত বেশি অক্ষম বলে দেখি তার কারণই হচ্ছে সে একান্ত অক্ষম নয়। তার মধ্যে যে সত্য ক্ষমতা ভবিষ্যৎকে আশ্রয় করে আছে তারই সঙ্গে তুলনা করেই তার বর্তমান অক্ষমতাকে এমন বড়ো দেখতে হয়। এই অক্ষমতাই যদি নিত্য সত্য হত তা হলে এ সম্বন্ধে আমাদের কোনো চিন্তারই উদয় হত না।

সূর্যগ্রহণের ছায়া যেমন সূর্যের চেয়ে সত্য নয়, তেমনি স্বার্থবদ্ধ মানবাত্মার দুর্বলতা মানবাত্মার চেয়ে বড়ো সত্য নয়। মানুষ অহংকে নিয়ে যতই নাড়াচাড়া করুক, তাই নিয়ে জগতে যত ভয়ানক আন্দোলন আলোড়ন যত উত্থান পতনই হোক-না কেন তবু সেটাই চরম সত্য কদাচ নয়। মানুষের আত্মাই তার সত্য বস্তু বলেই তার অহমের চাঞ্চল্য এত বেশি প্রবল করে আমাদের আঘাত করে। এই তার অন্তরতম সত্যের মধ্যে সম্পূর্ণ সত্য হয়ে ওঠার সাধনাই হচ্ছে মনুষ্যত্বের চরম সাধনা। এই সত্যের মধ্যে সত্য হতে গেলে বদ্ধভাবে জড়ভাবে হওয়া যায় না; বাধা কাটিয়ে তাকে লাভ না করলে লাভ করাই যায় না। সেইজন্য মানুষের আত্মা যে মুক্তিক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করেছে সেই ক্ষেত্রের সত্য অধিকার সে নিশ্চেষ্টভাবে পেতেই পারে না। এইজন্যেই তার এত বাধা, এবং তার এই-সকল বাধার দ্বারাই প্রমাণ হয় অসত্যপাশ হতে মুক্ত হওয়াই তার সত্য পরিণাম।

শিশু যখন চলতে গিয়ে পড়ছে তখন যেমন তাকে বারম্বার পতনসত্ত্বেও চলার অভ্যাস করতে দেওয়া হয়, কারণ সকলেই জানে পড়াটাই তার চরম নয়, সেইরকম প্রত্যহ সত্যলোকে ব্রহ্মলোকে চলার অভ্যাস মানুষকে করতেই হবে। কোনো আলস্য কোনো ক্লেশে নিরস্ত হলে চলবে না।

প্রত্যহ তাঁর কাছে যাওয়া, তাঁকে চিন্তা করা, স্মরণ করা, এইটেই হচ্ছে পন্থা। সংসারে যতই বাঁধা থাকি-না কেন তবু সমস্ত খণ্ডতা সমস্ত অনিত্যের মধ্যে সেই অনন্ত সত্যকে স্বীকার করার দ্বারা মানুষ আপনার আত্মাকে সম্মান করে। বিষয়ের দাসত্ব যতই করি তবু সেইটেই পরম সত্য নয়, প্রতিদিন এই কথা মানুষকে কোনো-এক সময় স্বীকার করতেই হবে। সত্য জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম এই কথাই সত্য, এবং এই সত্যেই আমি সত্য; ধনজনমানের দ্বারা আমি সত্য নই। আমি সত্যলোকে জ্ঞানলোকে বাস করি, আমি ব্রহ্মলোকে প্রাতষ্ঠিত। আমার প্রতিদিনের ব্যবহারে আমি এ কথার সম্পূর্ণ সমর্থন এখনও করতে পারছি নে; তবু মানুষকে এক দিকে আকাশে মাথা তুলে এবং এক দিকে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে বলতে হবে যে, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম এই কথাই সত্য। এই সত্য, এই সত্য, এই সত্য— প্রতিদিন বলতে হবে; বিমুখ মনকেও বলাতে হবে; ক্ষীণ কণ্ঠকেও উচ্চারণ করাতে হবে। নিয়ত বলতে বলতে আমরা যে সত্যলোকে বাস করছি এই বোধটি ক্রমশই আমাদের কাছে সহজ হয়ে আসবে। তখন অর্ধচেতন অবস্থায় দিন কাটবে না, তখন বারবার ধুলোর উপর পড়ে পড়ে যাব না, তখন আলোর দিকে আকাশের দিকে মাথা তুলে চলতে শিখব; তখন বাইরের সমস্ত বস্তুকেই আমার আত্মার চেয়ে বড়ো করে জানব না, এবং প্রবৃত্তির প্রবল উত্তেজনাকেই প্রকৃত আত্ম-পরিচয় বলে মনে করব না।

ব্রহ্মকে সহজ করে জানবার শক্তিই আমাদের সত্যকার শক্তি; সেই শক্তি আমাদের আছে; জানতে পারছি নে বলে সে শক্তিকে কখনোই অস্বীকার করব না। বারবার তাঁকে ডাকতে হবে, বারবার তাঁকে বলতে হবে, এই তুমি, এই তুমি, এই তুমি। এই তুমি আমার সম্মুখেই, এই তুমি আমার অন্তরেই। এই তুমি আমার প্রতি মুহূর্তে, এই তুমি আমার অনন্ত কালে। বলতে বলতে তাঁর নামে আমার সমস্ত শরীর বাজতে থাকবে, আমার মন বাজতে থাকবে, আমার বাহির বাজতে থাকবে, আমার সংসার বাজতে থাকবে। আমার চিত্ত বলবে সত্যং, আমার বিশ্বচরাচর বলবে সত্যং। ক্রমে আমার প্রতি দিনের প্রত্যেক কর্ম বলতে থাকবে সত্যং। বেহালা যন্ত্র যতই পুরাতন হয় ততই তার মূল্য বেশি হয় তার কারণ, অনেক দিন থেকে সুর বাজতে বাজতে বেহালার কাষ্ঠফলকের পরমাণুগুলি সুরের ছন্দে ছন্দে সুবিন্যস্ত হয়ে ওঠে,

*

তখন সুরকে আর সে বাধা দেয় না। সেইরকম আমরা প্রতিদিন তাঁকে যতই ডাকতে থাকি ততই আমাদের শরীর মনের সমস্ত অণু পরমাণু তাঁর সত্য নামে এমন সত্য হয়ে উঠতে থাকে যে বাজতে আর দেরি হয় না, কোথাও কিছুমাত্র আর বাধা দেয় না।

এই সত্যনাম মানুষের সমস্ত শরীরে মনে, মানুষের সমস্ত সংসারে, সমস্ত কর্মে, একতান আশ্চর্য স্বরসম্মিলনে বিচিত্র হয়ে বেজে উঠবে বলে বিশ্বমহাসভার সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী একাগ্রভাবে অপেক্ষা করে রয়েছে। সমস্ত গ্রহনক্ষত্র, সমস্ত উদ্ভিদ্ পশু পক্ষী মানুষের লোকালয়ের দিকে কান পেতে রয়েছে। আমরা মানুষ হয়ে জন্মে মানুষের চিত্ত দিয়ে তাঁর অমৃতরস আস্বাদন করে মানুষের কণ্ঠে তাঁকে সমস্ত আকাশে ঘোষণা করে দেব এরই জন্যে বিশ্বপ্রকৃতি যুগ যুগান্তর ধরে তার সভা রচনা করছে। বিশ্বের সমস্ত অণু পরমাণু এই সুরের স্পন্দনে পুলকিত হবার জন্যে অপেক্ষা করছে। এখনই তোমরা জেগে ওঠো, এখনই তোমরা তাঁকে ডাকো— এই বনের গাছপালার মধ্যে তার মাধুর্য শিউরে উঠতে থাকবে, এই তোমাদের সামনেকার পৃথিবীর মাটির মধ্যে আনন্দ সঞ্চারিত হতে থাকবে।

মানুষের আত্মা মুক্তিলোকে আনন্দলোকে জন্মগ্রহণ করবে বলে বিশ্বের সূতিকা-গৃহে অনেক দিন ধরে চন্দ্র সূর্য তারার মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালানো রয়েছে। যেমনি নবজাত মুক্ত আত্মার প্রাণচেষ্টার ক্রন্দনধ্বনি সমস্ত ক্রন্দসীকে পরিপূর্ণ করে উচ্ছ্বসিত হবে অমনি লোকে লোকান্তরে আনন্দশঙ্খ বেজে উঠবে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সেই প্রত্যাশাকে পূরণ করবার জন্যই মানুষ। নিজের উদরপূরণ এবং স্বার্থসাধনের জন্য নয়। এই কথা প্রত্যহ মনে রেখে নিখিল জগতের সাধনাকে আমরা আপনার সাধনা করে নেব। আমরা সত্যকে প্রত্যক্ষ দেখব, জানব, সত্যে সঞ্চরণ করব এবং অসংকোচে ঘোষণা করব: তুমিই সত্য। ১৩১৯

পৌষ ১৩১৯

সত্যকে দেখা

এই জগতে কেবল আমরা যা চোখে দেখছি কানে শুনছি তাতেই আমাদের চরম তৃপ্তি হচ্ছে না। আমরা কাকে দেখতে চাচ্ছি একেবারে সমস্ত মন সমস্ত হৃদয় মেলে দিয়ে? আমাদের মনে হচ্ছে যেন আমাদের সমগ্র প্রকৃতি দিয়ে, আমাদের যা-কিছু আছে তার সমস্তকে দিয়ে, যেন আমরা কাকে দেখতে পাব। আমাদের সেই সমস্তটিকে এখনও

মেলা হয় নি— আমাদের চক্ষু মন হৃদয় সমস্তকে একটি উন্মীলিত শতদলের মতো একেবারে এক করে খুলে দেওয়া হয় নি। সেইজন্যে হাজার হাজার বস্তুকে খণ্ড খণ্ড করে একটার পর আর-একটাকে দেখে চলেছি, কিন্তু যাকে নিয়ে এই সমস্ত বস্তুই বাস্তব সেই অখণ্ড সত্যকে আমরা প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি নে।

কিন্তু, জগতে কেবল আমরা বস্তুকে দেখব না, সত্যকে দেখব, এই একটি নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক মানুষের অন্তরের মধ্যে গভীর করে জাগছে। এই যেমন মাটি জল আলো আমরা চোখ মেলে সহজে দেখছি তেমনি এই সমস্ত দেখার মধ্যে এমনি সহজেই সত্যকে দেখব, এই ইচ্ছা আমাদের সকল ইচ্ছার মূলে নিত্য নিয়ত রয়েছে।

শাবক পাখির যখন চোখ ফোটে নি, যখন আলো যে কী সে জানেও না, তখন তার প্রাণের মূলে সেই আলো দেখবার বাসনা নিহিত হয়ে কাজ করছে। যতক্ষণ সে আলো দেখে নি ততক্ষণ সে জগৎকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে একটু একটু করে জানছে; সমস্তকে এক মুহূর্তে এক আলোতে একযোগে জানা যে কাকে বলে তা সে বোঝেও না, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেই বিশ্বের জ্যোতিতেই যে তার চোখের জ্যোতির সার্থকতা এই তত্ত্বটি তার অন্ধতার অন্ধকারে তার মুদ্রিত চোখের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

তেমনি আমার মধ্যে যে এক সত্য আছে যাকে অবলম্বন করে আমার জীবনের সমস্ত ঘটনা পরস্পর গ্রথিত হয়ে একটি অর্থ লাভ করে, সেই আমার মধ্যেকার সত্য বিশ্বের সত্যকে আপনার চরম সত্য বলে সর্বত্র অতি সহজে উপলব্ধি করবে, এই আকাঙ্ক্ষাটি তার মধ্যে অহরহ গূঢ়ভাবে রয়েছে। এই আকাঙ্ক্ষাটির গভীর ক্রিয়া-ফলে আমাদের আত্মার মুদ্রিত চোখ একদিন ফুটবে; সেদিন আমরা যে দিকে চাব কেবল খণ্ড বস্তুকে দেখব না, অখণ্ড সত্যকে দেখব।

যিনি সকলের চেয়ে সত্য তাঁকেই সকলের চেয়ে সহজে দেখা এই হচ্ছে আমাদের সকল দেখার চরম সাধনা। সেই দেখাটি খুলবে, সেই চোখটি ফুটবে, এইজন্যেই তো রোজ আমরা দুবেলা তাঁর নাম করছি, তাঁকে প্রণাম করছি। তাঁকে ডাকতে ডাকতে, তাঁর দিকে মুখ তুলতে তুলতে, ভিতরের সেই শক্তি ক্রমে জাগ্রত হবে, বাধা কেটে যেতে থাকবে, আত্মার চোখ খুলে যাবে। যেমনি খুলে যাবে অমনি আর তর্ক নয়, যুক্তি নয়, কিছু নয়— অমনি সহজে দেখা, অমনি আমার মনের আনন্দের সঙ্গে সেই আকাশ-ভরা আনন্দের একেবারে গায়ে গায়ে ঠেকা, অমনি আমার সমস্ত শরীরে তাঁর স্পর্শ, সমস্ত মনে তাঁর অনুভূতি। অমনি তখনই অতি সহজে উপলব্ধি যে, তাঁরই আনন্দে আলোক আমার চোখের তারায় আলো হয়ে

নাচছে, তাঁরই আনন্দে বাতাস আমার দেহের মধ্যে প্রাণ হয়ে বয়ে যাচ্ছে। অমনি জানতে পারা যায় যে, এই পৃথিবীর মাটি আমাকে ধরে আছে এ কথাটি সত্য নয়, তিনিই আমাকে ধরে আছেন; এই সংসার আমার আশ্রয় এ কথাটি সত্য নয়, তিনিই আমার আশ্রয়। তখন এ কথা বুঝতে কিছু বিলম্ব হবে না যে আলোক আছে বলে দেখছি তা নয়, তিনিই আমার অন্তরে ও বাইরে সত্য হয়ে আছেন বলেই সমস্ত জিনিসের সঙ্গে আমার দেখার যোগ হচ্ছে, তাঁর শক্তিতেই তাঁকে দেখছি; তাঁরই ধী দিয়ে তাঁকে ধ্যান করছি; তাঁরই সুরে আমার কণ্ঠ তাঁরই নাম করছে; তাঁরই আনন্দে আমি তাঁর স্মরণে আনন্দ পাচ্ছি।

তাই আমি তোমাদের বলছি, তোমরা জান বা না জান তোমাদের গভীর আত্মার পরম চাওয়ার ধন হচ্ছেন তিনি। আমাদের এই আমি সেই পরম আমির মুখোমুখি হয়ে না বসতে পারলে কখনোই তার প্রেম চরিতার্থ হবে না। আর-সমস্তকে সে ধরছে ছাড়ছে হারাচ্ছে; তাই সে এমন একটি আমিকে আপনার প্রত্যক্ষ বোধে চাচ্ছে যার মধ্যে সে চিরন্তনরূপে সম্পূর্ণরূপে আছে; অন্য জিনিসের মতো যাকে ধরতে হয় না, ছুঁতে হয় না, রাখতে হয় না। আমাদের এই ভিতরকার একলা আমি সেই-যে তার পরম সাথিকে সাক্ষাৎ করে জানতে চায় তার কান্না কি শুনতে পাচ্ছ না। তাকে আর তুমি পদে পদে ব্যর্থ কোরো না, তার কান্না থামাও। তোমার আপনকে তুমি আপনি সার্থক করবার জন্যে এসো এসো, প্রতিদিন সাধনায় বোসো। সকালে ঘুম ভেঙেই প্রথম কথা যেন মনে পড়ে তিনি আছেন, আমি তাঁর মধ্যে আছি। যদি অর্ধরাত্রে জেগে ওঠ তবে একবার চোখ চেয়ে দেখে মনকে এই কথাটি বলিয়ে নিয়ো যে, তিনি তাঁর সমস্ত লোকলোকান্তরকে নিয়ে অন্ধকারকে পরিপূর্ণ করে নিস্তব্ধ হয়ে আছেন, আমি তাঁর মধ্যেই আছি। মধ্যাহ্নে কাজ যখন অত্যন্ত উগ্র হয়ে উঠে তোমাকে প্রবল বেগে আকর্ষণ করে নিয়ে চলেছে তখন মুহূর্তকালের জন্যে আপনাকে থামিয়ে এই কথাটি বোলো, তুমি আছ, আমি তোমার মধ্যে আছি। এমনি করেই সকল সময়ে সকল দেখার মধ্যে সত্যকে দেখা সহজ হয়ে যাবে। প্রতিদিন উপাসনায় যখন তাঁর কাছে বসবে মনকে বিমুখ হতে দিয়ো না। তিনি আছেন, তাঁরই সামনে এসে বসেছি, এই সহজ কথাটি যেন এক মুহূর্তেই মন সহজ করে বলতে পারে; যেন এক নিমেষেই একেবারেই তোমার মাথা তাঁর পায়ের কাছে এসে ঠেকে। প্রথম কিছুদিন মন চঞ্চল হতে পারে; কিন্তু প্রতিদিন বসতে বসতে ক্রমেই বসা সত্য হয়ে উঠবে, ক্রমেই তাঁর কাছে পৌঁছতে আর দেরি হবে না। ১৩১৯

মাঘ ১৩১৯

শুচি

প্রসঙ্গক্রমে আজ দ্বিপ্রহরে আমার একটি পবিত্র বাল্যস্মৃতি মনের মধ্যে জাগ্রত হয়ে উঠেছে। বালক বয়সে যখন একটি খৃস্টান বিদ্যালয়ে আমি অধ্যয়ন করেছিলুম তখন একটি অধ্যাপককে দেখেছিলুম যাঁর সঙ্গে আমার সেই অল্পকালের সংসর্গ আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে গেছে।

শুনেছিলুম তিনি স্পেনদেশের একটি সম্ভ্রান্ত ধনীবংশীয় লোক, ভোগৈশ্বর্য সমস্ত পরিত্যাগ করে ধর্মসাধনায় জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁর পাণ্ডিত্যও অসাধারণ, কিন্তু তিনি তাঁর মণ্ডলীর আদেশক্রমে এই দূর প্রবাসে এক বিদ্যালয়ে নিতান্ত নিম্ন-শ্রেণীতে অধ্যাপনার কাজ করছেন।

আমাদের ক্লাসে অল্প সময়েরই জন্য তাঁকে দেখতুম। ইংরেজি উচ্চারণ তাঁর পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল, সেজন্যে ক্লাসের ছেলেরা তাঁর পড়ানোতে শ্রদ্ধাপূর্বক মন দিত না; বোধ করি সে তিনি বুঝতে পারতেন, কিন্তু তবু সেই পরম পণ্ডিত অবজ্ঞাপরায়ণ ছাত্রদের নিয়ে অবিচলিত শান্তির সঙ্গে প্রতিদিন তাঁর কর্তব্য সম্পন্ন করে যেতেন।

কিন্তু, নিশ্চয়ই তাঁর সেই শান্তি কর্তব্যপরায়ণতার কঠোর শান্তি নয়। তাঁর সেই শান্ত মুখশ্রীর মধ্যে আমি গভীর একটি মাধুর্য দেখতে পেতুম। যদিচ আমি তখন নিতান্তই বালক ছিলুম, এবং এই অধ্যাপকের সঙ্গে নিকট-পরিচয়ের কোনো সুযোগই আমার ছিল না, তবু এই সৌম্যমূর্তি মৃদুভাষী তাপসের প্রতি আমার ভক্তি অত্যন্ত প্রগাঢ় ছিল।

আমাদের এই অধ্যাপকটি সুশ্রী পুরুষ ছিলেন না, কিন্তু তাঁকে দেখলে বা তাঁকে স্মরণ করলে আমার মন আকৃষ্ট হত। আমি তাঁর মধ্যে কী দেখতে পেতুম সেই কথাটি আজ আমি আলোচনা করে দেখছিলুম।

তাঁর যে সৌন্দর্য সে একটি নম্রতা এবং শুচিতার সৌন্দর্য। আমি যেন তাঁর মুখের মধ্যে, তাঁর ধীর গতির মধ্যে, তাঁর শুচিশুভ্র চিত্তকে দেখতে পেতুম।

এ দেশে আমরা শুচিতার একটি মূর্তি প্রায়ই দেখতে পাই, সে অত্যন্ত সংকীর্ণ। সে যেন নিজের চতুর্দিককে কেবলই নিজের সংস্রব থেকে ধুলোর মতো ঝেড়ে ফেলতে থাকে। তার শুচিতা কৃপণের ধনের মতো কঠিন সতর্কতার সঙ্গে অন্যকে পরিহার করে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। এইরকম কঠোর আত্মপরায়ণ শুচিতা বিশ্বকে কাছে টানে না, তাকে দূরে ঠেকিয়ে রাখে।

কিন্তু, যথার্থ শুচিতার ছবি আমি আমার সেই অধ্যাপকের মধ্যে দেখেছিলুম। সেই শুচিতার প্রকৃতি কী, তার আশ্রয় কী ?

আমরা শুচিতার বাহ্য লক্ষণ এই একটি দেখেছি, আহারে বিহারে পরিমিত ভাব রক্ষা করা। ভোগের প্রাচুর্য শুচিতার আদর্শকে যেন আঘাত করে। কেন করে। যা আমার ভালো লাগে তাকে প্রচুর পরিমাণে সঞ্চয় করা এবং ভোগ করার মধ্যে অপবিত্রতা কেন থাকবে। বিলাসের মধ্যে স্বভাবত দূষণীয় কী আছে। যে-সকল জিনিস আমাদের দৃষ্টি-শ্রুতি-স্পর্শবোধকে পরিতৃপ্ত করে তারা তো সুন্দর, তাদের তো নিন্দা করবার কিছু নেই। তবে নিন্দাটা কোন্‌খানে ?

বস্তুত নিন্দাটা আমারই মধ্যে। যখন আমি সর্বপ্রযত্নে আমাকেই ভরণ করতে থাকি তখনই সেটা অশুচিকর হয়ে ওঠে। এই আমার দিকটার মধ্যে একটা অসত্য আছে যেজন্য এই দিকটা অপবিত্র। অন্নকে যদি গায়ে মাখি তবে সেটা অপবিত্র— কিন্তু, যদি খাই তাতে অশুচিতা নেই— কারণ, গায়ে মাখাটা অন্নের সত্য ব্যবহার নয়।

আমার দিকটা যখন একান্ত হয় তখন সে অসত্য হয় এইজন্যই সে অপবিত্র হয়ে ওঠে, কেননা কেবলমাত্র আমার মধ্যে আমি সত্য নই। সেইজন্য যখন কেবল আমার দিকেই আমি সমস্ত মনটাকে দিই তখন আত্মা অসতী হয়ে ওঠে, সে আপনার শুচিতা হারায়। আত্মা পতিব্রতা স্ত্রীর মতো; তার সমস্ত দেহ মন প্রাণ আপনার স্বামীকে নিয়েই সত্য হয়। তার স্বামীই তার প্রিয় আত্মা, তার সত্য আত্মা, তার পরম আত্মা। তার সেই স্বামিসম্বন্ধেই উপনিষদ বলেছেন এষাস্য পরমা গতিঃ, এষাস্য পরমা সম্পৎ, এষোঽস্য পরমোলোকঃ, এষোঽস্য পরমআনন্দঃ। ইনিই তার পরম গতি, ইনিই তার পরম সম্পদ, ইনিই তার পরম আশ্রয়, ইনিই তার পরম আনন্দ।

কিন্তু যখন আমি সমস্ত ভোগকে আমার দিকেই টানতে থাকি, যখন অহোরাত্রি সমস্ত জীবন আমি এমন করে চলতে থাকি যেন আমার স্বামী নেই, আমার স্বামীর সংসারকে কেবলই বঞ্চনা করে নিজের অংশকেই সকলের চেয়ে বড়ো করতে চাই, তখনই আমার জীবন আগাগোড়া কলঙ্কে লিপ্ত হতে থাকে, তখন আমি অসতী। তখন আমি সত্যের ধন হরণ করে অসত্যের পূরণ করবার চেষ্টা করি। সে চেষ্টা চিরকালের মতো সফল হতেই পারে না; যা-কিছু কেবল আমার দিকেই টানব তা নষ্ট হবেই, তার বৃহৎ সফলতা স্থায়ী সফলতা হতেই পারে না; তার জন্যে ভয় ভাবনা এবং শোকের অন্ত নেই। অসত্যের দ্বারা সত্যকে আঁকড়ে রাখা কোনোমতেই চলে না। ভোগের ফুলের মাঝখানে একটি কীট আছে, সেই কীট আমি এই অসত্য আমি; সে ফুলে ফল ধরে না। ভোগের তরণীর মাঝখানে একটি ছিদ্র আছে, সে ছিদ্র আমি এই অসত্য

আমি ; এ তরণী অতৃপ্তিদুঃখের সমুদ্র কখনোই পার হতে পারে না, পথের মধ্যেই সে ডুবিয়ে দেয়।

সেইজন্যে শুচিতার সাধনা যাঁরা করেন ভোগের আকাঙ্ক্ষাকে তাঁরা প্রশ্রয় দেন না। কেননা, এই স্বামিবিমুখ আমির উপকরণ যতই জোগাতে থাকি ততই সে উন্মত্ত হয়ে উঠতে থাকে, ততই তার অতৃপ্তিই তীক্ষ্ণ অঙ্কুশাঘাত করে তাকে প্রলয়ের পথে দৌড় করাতে থাকে। এইজন্যে পৃথিবীর সর্বত্রই উচ্চসাধনার একটা প্রধান অঙ্গ ভোগকে খর্ব করা, সুখের ইচ্ছাকে পরিমিত করা। অর্থাৎ, এমন করে চলা যাতে নিজের দিকেই সমস্ত বোঝা বাড়তে বাড়তে সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে সেই দিকটাতেই কাত হয়ে না পড়ি।

কিন্তু, আমি যাঁর কথা বলছি তিনি ধনমান ত্যাগ করে বৈরাগ্য অবলম্বন করেছেন বলেই যে আমার কাছে এমন মনোহর হয়ে উঠেছিলেন তা নয়। তাঁর মুখ দেখেই বোঝা যেত যেখানে তিনি সত্য সেইখানেই তাঁর মনটি প্রতিষ্ঠিত। তাঁর প্রভুর সঙ্গে মিলনের দ্বারা সর্বদা তিনি সম্পূর্ণ হয়ে আছেন। একটি অলক্ষ্য উপাসনার দ্বারা ভিতরে ভিতরে সর্বদাই তাঁকে স্নান করিয়ে দিচ্ছে ; পরমপবিত্রস্বরূপ স্বামীকে তিনি তাঁর আত্মার মধ্যে বরণ করে নিয়েছেন, এইজন্য সুনির্মল শান্তিময় শুচিতায় তাঁর সমস্ত জীবন দীপ্যমান হয়ে উঠেছে। সত্য তাঁকে পবিত্র করে তুলেছে, বাইরের কোনো নিয়ম নয়।

আমরা যখন কেবল নিজেরটি নিয়ে থাকি তখন আমরা আমাদের বড়ো আত্মাটির প্রতি বিমুখ হই ; তাতে কেবলই আমাদের সত্যহানি হতে থাকে বলেই তার দ্বারা আমাদের বিকৃতি ঘটে। তাই স্বার্থের জীবন ভোগের জীবন কেবলই মলিনতা দিয়ে আমাদের লিপ্ত করতে থাকে ; এই গ্লানি থেকে ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন, তিনি আমাদের বাঁচান। আমার নিজের সেবা আমার পক্ষে বড়ো লজ্জা, আমার স্বামীর সেবাতেই আমার গৌরব। আমার নিজের সুখের দিকেই যখন আমি নেমে পড়ি তখন আমার বড়ো আমিকে একেবারেই অস্বীকার করি বলেই ভয়ানক ছোটো হয়ে যেতে থাকি ; সেই ছোটো আপনাকে ভরতে গিয়েই আপনাকে যথার্থ ভাবে হারাতে থাকি। মানুষ যে ছোটো নয়, মানুষ যে সেই বড়োর যোগে বড়ো। সেই তার বড়োর আনন্দেই সে আনন্দিত হোক ; সেই তার বড়োর সম্বন্ধেই সে জগতের সকলকে আপনার করে নিক। সেই তার বড়ো আপনাকে হারিয়ে সে বাঁচবে কেমন করে? আর-কিছুতেই বাঁচতে পারবে না, ধন মান খ্যাতি কিছুতেই না। সত্য না হলে বাঁচব কী করে। আমি কি আপনাকে দিয়ে আপনাকে পূর্ণ করে তুলতে পারি। হে

আমার পরম সত্য, আমি আমার অন্তরে বাহিরে কেবল নিজেকেই আশ্রয় করতে চাচ্ছি বলে কেবল অসত্যের মধ্যে অশুচি হয়ে ডুবছি— আমার মধ্যে হে মহান্, হে পবিত্র, তোমার প্রকাশ হোক, তা হলেই আমি চিরদিনের মতো রক্ষা পাব। হে প্রভু, পাহি মাং নিত্যং, পাহি মাং নিত্যম্। ১৩১৯

আশ্বিন ১৩১৯

বিশেষত্ব ও বিশ্ব

আমার একটি পরম স্নেহাস্পদ ছাত্র আমাকে বলছিলেন: কাল সন্ধ্যাবেলা যখন আমরা ঝড়বৃষ্টিতে মাঠে বেড়াচ্ছিলুম তখন আমার মনে কেবল এই একটা চিন্তা উঠ-ছিল যে, প্রকৃতির মধ্যে এই-যে এতবড়ো একটা আন্দোলন চলছে আমাকে এ যেন দৃক্‌পাতও করছে না, আমি যে একটা ব্যক্তি ও তার কোনো একটা খবরও রাখছে না।

আমি তাঁকে বললুম: সেইজন্যেই তো বিশ্বপ্রকৃতির উপরে পৃথিবীসুদ্ধ লোক এমন দৃঢ় করে নির্ভর করতে পারে। যে বিচারক কোনো বিশেষ লোকের উপর বিশেষ করে তাকায় না, তারই বিচারের উপর সর্বসাধারণে আস্থা রাখে।

এ উত্তরে আমার ছাত্রটি সন্তুষ্ট হলেন না। তাঁর মনের ভাব এই যে, বিচারকের সঙ্গে তো আমাদের প্রেমের সম্বন্ধ নয়, কাজের সম্বন্ধ। আমার মধ্যে যখন একটি বিশেষত্ব আছে, আমি যখন ব্যক্তিবিশেষ, তখন স্বভাবতই সেই বিশেষত্ব একটি বিশেষ সম্বন্ধকে প্রার্থনা করে। যখন সেই বিশেষ সম্বন্ধকে পায় না তখন সে দুঃখ বোধ করে; প্রকৃতির মধ্যে আমাদের সেই দুঃখ আছে। সে আমাকে বিশেষ ব্যক্তি বলে বিশেষ ভাবে মানে না। তার কাছে আমরা সকলেই সমান।

আমি তাঁকে এই কথাটি বোঝাবার চেষ্টা করছিলুম যে, মানুষের বিশেষত্ব তো একটি ঐকান্তিক পদার্থ নয়। মানুষের সত্তার সে একটা প্রান্তমাত্র। মানুষের এক প্রান্তে তার বিশ্ব, অন্য প্রান্তে তার বিশেষত্ব। এই দুই নিয়ে তবে তার সম্পূর্ণতা, তার আনন্দ। যদি আপনার সৃষ্টিছাড়া নিজত্বের মধ্যে মানুষের যথার্থ আনন্দ থাকত তা হলে নিজেরই একটি স্বতন্ত্র জগতের মধ্যে সে বাস করতে পারত, সেখানে তার নিজের সুবিধা অনু-সারে সূর্য উঠত কিম্বা উঠত না। সেখানে তার যখন যেমন ইচ্ছা হত তখন তেমনি ঘটত; কোনো বাধা হত না, সুতরাং কোনো দুঃখ থাকত না। সেখানে তার কাউকে

জানবার দরকার হত না, কেননা সেখানে তার ইচ্ছামতোই সমস্ত ঘটছে। এই মুহূর্তেই তার প্রয়োজন-অনুসারে যেটা পাখি, পরমুহূর্তেই সেটা তার প্রয়োজনমতো তার মাথার পাগড়ি হতে পারে। কারণ, পাখি যদি চিরদিনই পাখি হয়, যদি তার পক্ষিত্বের কোনো নড়চড় হওয়া অসম্ভব হয়, তবে কোনো-না-কোনো অবস্থায় আমাদের বিশেষ ইচ্ছাকে সে বাধা দেবেই ; সব সময়েই আমার বিশেষ ইচ্ছার পক্ষে পাখির দরকার হতেই পারে না। আমার মনে আছে একদিন বর্ষার সময় আমার মাস্তুলতোলা বোট নিয়ে গোরাই সেতুর নীচে দিয়ে যাচ্ছিলুম ; মাস্তুল সেতুর গায়ে ঠেকে গেল। এ দিকে বর্ষানদীর প্রবল স্রোতে নৌকাকে বেগে ঠেলছে ; মাস্তুল মড়্‌মড়্‌ করে ভাঙবার উপক্রম করছে। লোহার সেতু যদি সেই সময় লোহার অটল ধর্ম ত্যাগ করে, যদি এক ফুট মাত্র উপরে ওঠে, কিম্বা মাস্তুল যদি কেবল এক সেকেণ্ড মাত্র তার কাঠের ধর্মের ব্যত্যয় করে একটুমাত্র মাথা নিচু করে, কিম্বা নদী যদি বলে 'ক্ষণকালের জন্যে আমার নদীত্বকে একটু খাটো করে দিই, এই বেচারার নৌকোখানা নিরাপদে বেরিয়ে চলে যাক' তা হলেই আমার অনেক দুঃখ নিবারণ হয়। কিন্তু তা হবার জো নেই— লোহা সে লোহাই, কাঠ সে কাঠই, জলও সে জল! এইজন্যে লোহা-কাঠ-জলকে আমার জানা চাই এবং তারা ব্যক্তিবিশেষের প্রয়োজন অনুসারে আপনার ধর্মের কোনো ব্যতিক্রম করে না ব'লেই প্রত্যেক ব্যক্তি তাকে জানতে পারে। নিজের যথেচ্ছাঘটিত জগতের মধ্যে সমস্ত বাধা ও চেষ্টাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে বাস করি নে বলেই বিজ্ঞান দর্শন শিল্পকলা ধর্মকর্ম যা-কিছু মানুষের সাধনের ধন সমস্ত সম্ভবপর হয়েছে।

একটা কথা ভেবে দেখো, আমাদের বিশেষ ব্যক্তিত্বের প্রধান সম্বল যে ইচ্ছা, সে ইচ্ছা কাকে চাচ্ছে? যদি আমাদের নিজের মনের মধ্যেই তার তৃপ্তি থাকত তা হলে মনের মধ্যে যা খুশি তাই বানিয়ে বানিয়ে তাকে স্থির করে রাখতে পারতুম। কিন্তু, ইচ্ছা তা চায় না। সে আপনার বাইরের সমস্ত কিছুকে চায়। তা হলে আপনার বাইরে একটা সত্য পদার্থ কিছু থাকা চাই। যদি কিছু থাকে তবে তার একটা সত্য নিয়ম থাকা দরকার, নইলে তাকে থাকাই বলে না। যদি সেই নিয়ম থাকে তবে নিশ্চয়ই আমার ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছাকে সে সব সময়ে খাতির করে চলতেই পারে না।

অতএব, দেখা যাচ্ছে যে বিশ্বকে নিয়ে আমার বিশেষত্ব আনন্দিত সেই বিশ্বের কাছে তাকে বাধা পেতেই হবে, আঘাত পেতেই হবে। নইলে সে বিশ্ব সত্য বিশ্ব হ'ত না, সত্য বিশ্ব না হলে তাকে আনন্দও দিত না। ইচ্ছা যদি আপনার নিয়মেই আপনি বাঁচত, সত্যের সঙ্গে সর্বদা যদি তার যোগ ঘটবার দরকার না হ'ত, তা হলে

ইচ্ছা বলে পদার্থের কোনো অর্থ ই থাকত না ; তা হলে ইচ্ছাই হ'ত না। সত্যকে চায় বলেই আমাদের ইচ্ছা। এমন-কি, আমাদের ইচ্ছা যখন অসম্ভবকে চায় তখনও তাকে সত্যরূপে পেতে চায়, অসম্ভব কল্পনার মধ্যে পেয়ে তার সুখ নেই।

তা হলে দেখতে পাচ্ছি, আমাদের বিশেষত্বের পক্ষে এমন একটি বিশ্বনিয়মের প্রয়োজন যে নিয়ম সত্য, অর্থাৎ যে নিয়ম আমার বিশেষত্বের উপর নির্ভর করে না।

বস্তুত আমি আমাকেই সার্থক করবার জন্যেই বিশ্বকে চাই। এই বিশ্ব যদি আমারই ইচ্ছাধীন একটা মায়া-পদার্থ হয় তা হলে আমাকেই ব্যর্থ করে। আমারই জ্ঞান সার্থক বিশ্বজ্ঞানে, আমারই শক্তি সার্থক বিশ্বশক্তিতে, আমারই প্রেম সার্থক বিশ্বপ্রেমে। তাই যখন দেখছি তখন এ কথা কেমন করে বলব 'বিশ্ব যদি বিশ্বরূপে সত্য না হত, সে যদি আমারই বিশেষ ইচ্ছানুগত হয়ে স্বপ্নের মতো হত তা হলে ভালো হত'? তা হলে সে যে আমারই পক্ষে অনর্থকর হত।

এইজন্যে আমরা দেখতে পাই, আমির মধ্যে যার আনন্দ প্রচুর সেই তার আমিকে বিশেষত্বের দিক থেকে বিশ্বের দিকে নিয়ে যায়। আপনার শক্তিতে যার আনন্দ সে কাজকে সংকীর্ণ করতে পারে না, সে বিশ্বের মধ্যে কাজ করতে চায়। তা করতে গেলেই বিশ্বের নিয়মকে তার মানতে হয়। বস্তুত এমন অবস্থায় বিশ্বের নিয়মকে মানার যে দুঃখ সেই দুঃখ সম্পূর্ণ স্বীকার করাতেই তার আনন্দ। সে কখনোই দুর্বলভাবে কান্নার সুরে বলতে পারে না 'বিশ্ব কেন আপনার নিয়মে আপনি এমনি স্থির হয়ে আছে, সে কেন আমার অনুগত হচ্ছে না'। বিশ্ব আপনার নিয়মে আপনি স্থির হয়ে আছে বলেই মানুষ বিশ্বক্ষেত্রে কাজ করতে পারছে। কবি যখন নিজের ভাবের আনন্দে ভোর হয়ে ওঠেন তখন তিনি সেই আনন্দকে বিশ্বের আনন্দ করতে চান। তা করতে গেলেই আর নিজের খেয়ালমতো চলতে পারেন না। তখন তাঁকে এমন ভাষা আশ্রয় করতে হয় যা সকলের ভাষা, যা তাঁর খেয়াল-মতো একেবারে উলটোপালটা হয়ে চলে না। তাঁকে এমন ছন্দ মানতেই হয় যে ছন্দে সকলের শ্রবণ পরিতৃপ্ত হয়, তিনি বলতে পারেন না 'আমার খুশি আমি ছন্দকে যেমন-তেমন করে চালাব'। ভাগ্যে এমন ভাষা আছে যা সকলের ভাষা, ভাগ্যে ছন্দের এমন নিয়ম আছে যাতে সকলের কানে মিষ্ট লাগে, সেইজন্যেই কবির বিশেষ আনন্দ আপনাকে বিশ্বের আনন্দ করে তুলতে পারে। এই বিশ্বের ভাষা বিশ্বের নিয়মকে মানতে গেলে দুঃখ আছে, কেননা সে তোমাকে খাতির করে চলে না ; কিন্তু এই দুঃখকে কবি আনন্দে স্বীকার করে। সৌন্দর্যের যে নিয়ম বিশ্বনিয়ম তাকে সে নিজের রচনার মধ্যে কোথাও লেশমাত্র ক্ষুণ্ণ করতে চায় না ; একটুও শৈথিল্য তার পক্ষে অসহ্য। কবি যতই বড়ো

হবে, অর্থাৎ তার বিশেষত্ব যতই মহৎ হবে, ততই বিশ্বনিয়মের সমস্ত শাসন সে স্বীকার করবে ; কারণ, এই বিশ্বকে স্বীকার করার দ্বারাই তার বিশেষত্ব সার্থক হয়ে ওঠে।

মানুষের মহত্ত্বই হচ্ছে এইখানে ; সে আপনার বিশেষত্বকে বিশ্বের সামগ্রী করে তুলতে পারে, এবং তাতেই তার সকলের চেয়ে বড়ো আনন্দ। মানুষের আমির সঙ্গে বিশ্বের সঙ্গে মেলবার পথ বড়ো রকম করে আছে বলেই মানুষের দুঃখ এবং তাতেই মানুষের আনন্দ। বিশ্বের সঙ্গে পশুর যোগ নিজের খাওয়া-শোওয়ার সম্বন্ধে ; এই প্রয়োজনের তাড়নাতেই পশুকে আপনার বাইরে যেতে হয়, এই দুঃখের ভিতর দিয়েই সে সুখ লাভ করে। মানুষের সঙ্গে পশুর একটা মস্ত প্রভেদ হচ্ছে এই, মানুষ যেমন বিশ্বের কাছ থেকে নানা রকম করে নেয় তেমনি মানুষ আপনাকে বিশ্বের কাছে নানা রকম করে দেয়। তার সৌন্দর্যবোধ তার কল্যাণচেষ্টা কেবলই সৃষ্টি করতে চায় ; তা না করতে পেলেই সে পঙ্গু হয়ে খর্ব হয়ে যায়। নিতে গেলেও তার নেবার ক্ষেত্র বিশ্ব, দিতে গেলেও তার দেবার ক্ষেত্র বিশ্ব। এ কথা যখন সত্য তখন তুমি যদি বল 'বিশ্বপ্রকৃতি আমার ব্যক্তিগত বিশেষত্বকে মেনে চলে না বলে আমার দুঃখবোধ হচ্ছে' তখন তোমাকে বুঝে দেখতে হবে— মেনে চলে না বলেই তোমার আনন্দ। বিশেষকে মানে না বলেই সে বিশ্ব এবং সে বিশ্ব বলেই বিশেষের তাতে প্রতিষ্ঠা। দুঃখের একান্ত অভাব যদি ঘটত, অর্থাৎ যদি কোথাও কোনো নিয়ম না থাকত, বাধা না থাকত, কেবল আমার ইচ্ছাই থাকত, তা হলে আমার ইচ্ছাও থাকত না ; সে অবস্থায় কিছু থাকা না-থাকা একেবারে সমান। অতএব, তুমি যখন মাঠে বেড়াচ্ছিলে তখন ঝড়বৃষ্টি যে তোমাকে কিছুমাত্র মানে নি এ কথাকে যদি বড়ো করে দেখি তা হলে এর মধ্যে কোনে ক্ষোভের কারণ দেখি নে। তা হলে এইটেই দেখতে পাই : ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ ভয়াদিন্দ্রশ্চবায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ। তাঁরই অটল নিয়মে অগ্নি ও সূর্য তাপ দিচ্ছে, এবং মেঘ বায়ু ও মৃত্যু ধাবিত হচ্ছে। তারা সহস্রের ইচ্ছার দ্বারা তাড়িত নয়, একের শাসনে চালিত। এইজন্যেই তারা সত্য, তারা সুন্দর ; এইজন্যেই তাদের মধ্যেই আমার মঙ্গল ; এইজন্যেই তাদের সঙ্গে আমার যোগ সম্ভব ; এইজন্যেই তাদের কাছ থেকে আমি পাই এবং তাদের মধ্যে আমি আপনাকে দিতে পারি। ১৩১৯

অগ্রহায়ণ ১৩১৯

১৫

পিতার বোধ

যা প্রাণের জিনিস তাকে প্রথার জিনিস করে তোলার যে কত বড়ো লোকসান সে কথা তো প্রতিদিন মনে পড়ে না। কিন্তু, আপনার ক্ষুধাতৃষ্ণাকে তো ফাঁকি দিয়ে সারি নে। অন্নজলকে তো সত্যকারই অন্নজলের মতো ব্যবহার করে থাকি। কেবল আমার ভিতরকার এই-যে মানুষটি ধনে যাকে ধনী করে না, খ্যাতি প্রতিপত্তি যার ললাটে কোনো চিহ্ন দিতে পারে না, সংসারের ছায়ারৌদ্রপাতে যার ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নির্ভর করে না, সেই আমার অন্তরতম চিরকালের মানুষটিকে দিনের পর দিন বস্তু না দিয়ে কেবল নাম দিয়ে বঞ্চনা করি ; তাকে আমার মন না দিয়ে কেবল মন্ত্র দিয়েই কাজ চালাতে থাকি। সে যা চায় তা নাকি সকলের চেয়ে বড়ো ; এইজন্যে সকলের চেয়ে শূন্য দিয়ে তাকে থামিয়ে রেখে অন্য সমস্ত প্রয়োজন সারবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে বেড়াই।

আমাদের এই বাইরের মানুষের এই সংসারের মানুষের সঙ্গে সেই আমাদের অন্তরের মানুষের একটা মস্ত তফাত হচ্ছে এই যে, এই বাইরের লোকটাকে আমরা আদর করে বা অবজ্ঞা করে উপহারই দিই আর ভিক্ষাই দিই-না কেন সে সেটা পায়, আর সত্যকার ইচ্ছার সঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে যা না দিই সে আমার সেই অন্তরের মানুষটির কাছে গিয়েও পৌঁছে না।

সেইজন্যে দানের সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলে 'শ্রদ্ধয়া দেয়ম্', শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করবে। কেননা, মানুষের বাহিরে ভিতরে দুই বিভাগ আছে, একটা বিভাগে অর্থ এসে পড়ে, আর-একটা বিভাগে শ্রদ্ধা গিয়ে পৌঁছয়। এইজন্য শ্রদ্ধা যদি না দিই, শুধু টাকাই দিই, তা হলে মানুষের অন্তরাত্মাকে কিছুই দেওয়া হয় না, এমন-কি, তাকে অপমানই করা হয়। তেমন দান কখনোই সম্পূর্ণ দান নয় ; সুতরাং সে দান সংসারের দান হতে পারে, কিন্তু সে দান ধর্মের দান হতেই পারে না। দান যে আমরা কেবল পরকেই দিয়ে থাকি তা তো নয়।

বস্তুত, প্রতি মুহূর্তেই আমরা নিজেকে নিজের কাছে দান করছি ; সেই দানের দ্বারাই আমাদের প্রকাশ। সকলেই জানেন, প্রতি মুহূর্তেই আমরা আপনার মধ্যে আপনাকে দাহ করছি ; সেই দাহ করাটাই আমাদের প্রাণক্রিয়া। এমনি করে

আপনার কাছে আপনাকে সেই আহুতি-দান যখনই বন্ধ হয়ে যাবে তখনই প্রাণের আগুন আর জ্বলবে না, জীবনের প্রকাশ শেষ হয়ে যাবে। এইরকম মননক্রিয়াতেও নানাপ্রকার ক্ষয়ের মধ্যে দিয়েই চিন্তাকে জাগাতে হয়। এইজন্যে নিজের প্রকাশকে জাগ্রত রাখতে আমরা অহরহ আপনার মধ্যে আপনার একটি যজ্ঞ করে আপনাকে যত পারছি ততই দান করছি। সেই দানের সম্পূর্ণতার উপরেই আমাদের প্রকাশের সম্পূর্ণতা।

বাতি আপনাকে আপনি যে পরিমাণ দান করবে সেই পরিমাণে তার আলোক উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। যে পরিমাণে নিজের প্রতি তার দানের উপকরণ বিশুদ্ধ হবে সেই পরিমাণে তার শিখা ধূমশূন্য হতে থাকবে। নিজের প্রকাশযজ্ঞে আমাদের যে নিরন্তর দান সে সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই খাটে।

সে দান তো আমাদের চলছেই ; কিন্তু কী দান করছি এবং সেটা পৌঁচচ্ছে কোন্‌খানে সে তো আমাদের দেখতে হবে। সারাদিন খেটেখুটে বাইরের জিনিস কুড়িয়েবাড়িয়ে যা কিছু পাচ্ছি সে আমরা কার হাতে এনে জমা করছি ? সে তো সমস্তই দেখছি বাইরেই এসে জমছে। টাকাকড়ি ঘরবাড়ি সে তো এই বাইরের মানুষের।

কিন্তু, নিজেকে এই-যে আমরা দান করছি, এই-যে আমার চেষ্টা, এই-যে আমার সমস্তই, এ কি পূর্ণ দান হচ্ছে। শ্রদ্ধার দান হচ্ছে ? ধর্মের দান হচ্ছে ? এতে করে আমরা বাড়াচ্ছি, কিন্তু বড়ো হতে পারছি কি। এতে করে আমরা সুখ পাচ্ছি, কিন্তু আনন্দ পাচ্ছি নে ; এতে করে তো আমাদের প্রকাশ পরিপূর্ণ হতে পারছে না। মানুষ বললে যতখানি বোঝায় ততখানি তো ব্যক্ত হয়ে উঠছে না।

কেন এমন হচ্ছে। কেননা, এই দানে মস্ত একটা অশ্রদ্ধা আছে। এই দানের দ্বারা আমরা নিজেকে প্রতিদিন অশ্রদ্ধা করে চলেছি। আমরা নিজের কাছে যে অর্ঘ্য বহন করে আনছি তার দ্বারাই আমরা স্বীকার করছি যে, আমার মধ্যে বরণীয় কিছুই নেই। আমাদের যে আত্মপূজা সে একেবারেই দেবতার পূজা নয়, সে অপদেবতার পূজা, সে অত্যন্ত অবজ্ঞার পূজা। আমাদের যা অপবিত্র তাই দিয়েও আমরা নৈবেদ্যকে ভরিয়ে তুলছি।

নিজেকে যে লোক কেবলই ধনমান জোগাচ্ছে সে লোক নিজের সত্যকে কেবলই অবিশ্বাস করছে ; সে আপনার অন্তরের মানুষকে কেবলই অপমান করছে ; তাকে সে কিছুই দিচ্ছে না, কিছু দেবার যোগ্যই মনে করছে না। এমনি করে সে নিজেকে কেবল অর্থই দিচ্ছে, কিন্তু শ্রদ্ধা দিচ্ছে না— এবং 'শ্রদ্ধয়া দেয়ম্‌' এই উপদেশবাণীটিকে সকলের চেয়ে ব্যর্থ করছে নিজের বেলাতেই।

কিন্তু সত্যকে আমরা হাজার অস্বীকার করলেও সত্যকে তো আমরা বিনাশ করতে পারি নে। আমাদের অন্তরের সত্য মানুষটিকে আমরা যে চিরদিনই কেবল অভুক্ত রেখে দিচ্ছি, তার দুর্গতি তো কোনো আরামে কোনো আড়ম্বরে চাপা পড়ে না। আমরা যার সেবা করি সে তো আমাদের বাঁচায় না, আমরা যার ভোগের সামগ্রী জুগিয়ে চলি সে তো আমাদের এমন একটি কড়িও ফিরিয়ে দেয় না যাকে আমাদের চিরানন্দপথের সম্বল বলে বুকের কাছে যত্ন করে জমিয়ে রেখে দিতে পারি। আরামের পর্দা ছিন্ন করে ফেলে দুঃখের দিন তো বিনা আহ্বানে আমাদের সুসজ্জিত ঘরের মাঝখানে হঠাৎ এসে দাঁড়ায়, তখন তো বুকের রক্ত দিয়েও তার দাবি নিঃশেষে চুকিয়ে মিটিয়ে দিতে পারি নে; আর অকস্মাৎ বজ্রের মতো মৃত্যু এসে আমাদের সংসারের মর্মস্থানের মাঝখানটায় যখন মস্ত একটা ফাঁক রেখে দিয়ে যায় তখন রাশি রাশি ধনজনমান দিয়ে ফাঁক তো কিছুতে ভরিয়ে তুলতে পারি নে। যখন এক দিকে ভার চাপতে চাপতে জীবনের সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে যায়, যখন প্রবৃত্তির সঙ্গে প্রবৃত্তির ঠেকাঠেকি হতে থাকে, অবশেষে ভিতরে ভিতরে পাপের উত্তাপ বাড়তে বাড়তে একদিন যখন বিনাশের দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে, তখন লোকজন সৈন্যসামন্ত কাকে ডাকব যে তার উপরে এক ঘড়াও জল ঢেলে দিতে পারে। মূঢ়, কাকে প্রবল করে তুমি বলী হলে, কাকে ধনদান করে তুমি ধনী হতে পারলে, কাকে প্রতিদিন রক্ষা করে করে তুমি চিরদিনের মতো বেঁচে গেলে?

আমাদের অন্তরের সত্য মানুষটি কোন্ আশ্রয়ের জন্যে পথ চেয়ে আছে? আমরা এতদিন ধরে তাকে কোন্ ভরসা দিয়ে এলুম? বাহিরের বৈঠকখানায় আমরা ঝাড়লন্ঠন খাটিয়ে দিলুম, কিন্তু অন্তরের ঘরের কোণটিতে আমরা সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালালুম না। রাত্রি গভীর হল, অন্ধকার নিবিড় হয়ে এল, সেই তার একলা ঘরের নিবিড় অন্ধকারের মাঝখানে ধুলায় বসে সে যখন কেঁদে উঠল আমরা তখন প্রহরে প্রহরে কী বলে তাকে আশ্বাস দিলুম।

তার সেই মর্মভেদী রোদনে আমাদের নিশীথরাত্রির প্রমোদসভায় যখন ক্ষণে ক্ষণে আমাদের বড়োই ব্যাঘাত করতে লাগল, আমাদের মত্ততার মাঝখানে তার সেই গভীর ক্রন্দন আমাদের নেশাকে যখন ক্ষণে ক্ষণে ছুটিয়ে দেবার উপক্রম করলে, তখন আমরা তাকে কোনোমতে থামিয়ে রাখবার জন্যে তার দরজার বাহিরে দাঁড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে তাকে বলে এসেছি: ভয় নেই তোমার, আমি আছি। মনে করেছি, এই বুঝি তার সকলের চেয়ে বড়ো অভয়মন্ত্র যে 'আমি আছি'। নিজের সমস্ত ধনসম্পদ মানমর্যাদাকে একটা মমতার সূত্রে জপমালার মতো গেঁথে ফেলে তার হাতে

দিয়ে বলেছি : এইটেকেই তুমি দিনরাত্রি বারবার করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কেবলই একমনে জপ করতে থাকো 'আমি আমি আমি'। আমি সত্য, আমি বড়ো, আমি প্রিয়।

তাই নিয়ে সে জপছে বটে : আমি আমি আমি। কিন্তু, তার চোখ দিয়ে জল পড়া আর কিছুতেই থামছে না। তার ভিতরকার এ কোন্ একটা মহাবিষাদ অশ্রুবিন্দুর গুটি ফিরিয়ে ফিরিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই জপে যাচ্ছে : না না না, নয় নয় নয়। কোন্ তাপসিনীর করুণবীণায় এমন উদাস-করা ভৈরবীর সুরে সমস্ত আকাশকে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে তুলছে : ব্যর্থ হল, ব্যর্থ হল রে, সকালবেলাকার আলোক ব্যর্থ হল, রাত্রি-বেলাকার স্তব্ধতা ব্যর্থ হল; মায়াকে খুঁজলুম, ছায়াকে পেলুম, কোথাও কিছুই ধরা দিল না।

ওরে মত্ত, কোন্ মাভৈঃ বাণীটির জন্যে আমার এই অন্তরের একলা মানুষ এমন উৎকণ্ঠিত হয়ে কান পেতে রয়েছে? সে হচ্ছে চিরদিনের সেই সত্য বাণী : পিতা নোঽসি, পিতা তুমিই আছ।

তুমি আছ, পিতা, তুমি আছ, আমাদের পিতা তুমি আছ : এই বাণীতেই সমস্ত শূন্য ভরে গেল, সমস্ত ভার সরে গেল, কোনো ভয় আর কোথাও রইল না।

আর ওটা কী ভয়ানক মিথ্যা, ওই-যে 'আমি আছি'! কই আছ, তুমি আছ কোথায়! তুমি ভবসমুদ্রের কোন্ ফেনাগুলাকে আশ্রয় করে বলছ 'আমি আছি'। যে বুদ্‌বুদটি যখনই ফেটে যাচ্ছে তাতে তখনই তোমারই ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। সংসারে দীর্ঘনিশ্বাসের যে লেশমাত্র তপ্ত হাওয়াটুকু তোমার গায়ে এসে লাগছে তাতে একেবারে তোমার সত্তাকেই গিয়ে ঘা দিচ্ছে। তুমি আছ কিসের উপরে। তুমি কে। অথচ আমার অন্তরের মানুষ যখন বলছে 'চাই' তখন তুমি অহংকার করে তাকে গিয়ে বলছ : আমি আছি, তুমি আমাকেই চাও, তুমি আমাকে নিয়েই খুশি থাকো। এ তোমার কেমন দান। তোমার প্রকাণ্ড বোঝা বইবে কে। এ যে বিষম ভার। এ যে কেবলই বস্তুর পরে বস্তু, কেবলই ক্ষুধার পরে ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষের পরে দুর্ভিক্ষ। এ তো তোমাকে আশ্রয় করা নয়, এ যে তোমাকে বহন করা। তুমি যে পঙ্গু, তোমার যে পা নেই, তুমি যে কেবলই অন্যের উপরেই ভর দিয়ে সংসারে চলে বেড়াও। তোমার এ বোঝা যেখানকার সেইখানেই পড়ে পড়ে ধুলোর সঙ্গে ধুলো হয়ে যেতে থাক্! যে মানুষটি যাত্রী, যে পথের পথিক, অনন্তের অভিমুখে যার ডাক আছে, সে তোমার এই ভার টেনে টেনে বেড়াবে কেন। এই-সমস্ত বোঝার উপর দিনরাত্রি বুক দিয়ে চেপে পড়ে থাকবে সে

সময় তার কোথায়। এইজন্যে সে তাঁকেই চায় যাঁর উপরে সে ভর দিতে পারবে, যাঁর ভার তাকে বইতে হবে না। তুমি কি সেই নির্ভর নাকি। তবে কী ভরসা দেবার জন্যে তুমি তার কানের কাছে এসে মন্ত্র জপছ 'আমি আছি'!

পিতা নোঽসি: পিতা, তুমি আছ, তুমি আছ— এই আমার অন্তরের একমাত্র মন্ত্র। তুমি আছ এই দিয়েই আমার জীবনের এবং জগতের সমস্ত কিছু পূর্ণ। 'সত্যং' এই বলে ঋষিরা তোমাকে একমনে জপ করেছেন, সে কথাটির মানে হচ্ছে এই যে: পিতা নোঽসি, পিতা তুমি আছ। যা সত্য তা শুধুমাত্র সত্য নয়, তাই আমার পিতা।

কিন্তু, তুমি আছ এই বোধটিকে তো সমস্ত প্রাণমন দিয়ে পেতে হবে। তুমি আছ, এ তো শুধু একটা মন্ত্র নয়। তুমি আছ, এটা তো শুধু কেবল একটা জেনে রাখবার কথা নয়। তুমি আছ, এই বোধটিকে যদি আমি পূর্ণ করে না যেতে পারি তবে কিসের জন্যে এ জগতে এসেছিলুম, কেনই বা কিছুদিনের জন্য নানা জিনিস আঁকড়ে ধরে ধরে ভেসে বেড়ালুম— শেষকালে কেনই বা এই অসংলগ্ন নিরর্থকতার মধ্যে হঠাৎ দিন ফুরিয়ে গেল।

শক্ত হয়েছে এই যে, আমি আছি এই বোধটিকেই আমি দিবারাত্রি সকল রকম করেই অভ্যাস করে ফেলেছি। জীবনের সকল চেষ্টাতেই কেবল এই আমিকেই নানা রকম করে স্বীকার করে এসেছি, প্রতিদিনের সমস্ত খাজনা তারই হাতে শেষ কড়াটি পর্যন্ত জমা করে দিয়েছি। আমি-বোধটা একেবারে অস্থিমজ্জায় জড়িয়ে গেছে, সে যদি বড়ো দুঃখ দেয় তবু তাকে অন্যমনস্ক হয়েও চেপে ধরি, তাকে ভুলতে ইচ্ছা করলেও ভুলতে পারি নে।

সেইজন্যেই আমাদের প্রতিদিনের প্রার্থনা এই যে, পিতা নো বোধি: তুমি যে পিতা, তুমি যে আছ, এই সত্যের বোধে আমার সমস্ত জীবনকে পূর্ণ করে দাও। পিতা নো বোধি: পিতার বোধ দিয়ে আমার সমস্তকে সমস্তটা ভরে তোলো, কিছুই আর বাকি না থাক্; আমার প্রত্যেক নিশ্বাস প্রশ্বাস পিতার বোধ নিয়ে আমার সর্বশরীরে প্রাণের আনন্দ তরঙ্গিত করে তুলুক, আমার সর্বাঙ্গের স্পর্শচেতনা পিতার বোধে পুলকিত হয়ে উঠুক, পিতার বোধের আলোক আমার দুই চক্ষুকে অভিষিক্ত করে দিক। পিতা নো বোধি: আমার জীবনের সমস্ত সুখকে পিতার বোধে বিনম্র করে দিক, আমার জীবনের সমস্ত দুঃখকে পিতার বোধ করুণাবর্ষণে সফল করে তুলুক। আমার ব্যথা, আমার লজ্জা, আমার দৈন্য, সকলের সঙ্গে আমার সমস্ত বিরোধ, পিতার বোধের অসীমতার মধ্যে একেবারে ভাসিয়ে দিই। এই বোধ প্রতিদিন প্রসারিত হতে থাক্;

নিকট হতে দূরে, দূর হতে দূরান্তরে, আত্মীয় হতে পরে, মিত্র হতে শত্রুতে, সম্পদ হতে বিপদে, জীবন হতে মৃত্যুতে প্রসারিত হতে থাক্— প্রিয় হতে অপ্রিয়ে, লাভ হতে ত্যাগে, আমার ইচ্ছা হতে তোমার ইচ্ছায়।

প্রতিদিন মন্ত্র পড়ে গিয়েছি 'পিতা নো বোধি', কিন্তু একবারও মনেও আনি নি কত বড়ো চাওয়া চাচ্ছি; মনেও আনি নি এই প্রার্থনাকে যদি সত্য করে তুলতে চাই তবে জীবনের সাধনাকে কত বড়ো সাধনা করতে হবে। কত ত্যাগ, কত ক্ষমা, কত পাপের ক্ষালন, কত সংস্কারের আবরণ-মোচন, কত হৃদয়ের গ্রন্থি-ছেদন! জীবনকে সত্য করতে না পারলে সেই অনন্ত সত্যের বোধকে পাব কেমন করে। নিজের নিষ্ঠুর স্বার্থকে ত্যাগ করতে না পারলে সেই অনন্ত করুণার বোধকে গ্রহণ করব কেমন করে। সত্যে মঙ্গলে দয়ায় সৌন্দর্যে আনন্দে নির্মলতায় ভরে রয়েছে, সমস্ত ঘন হয়ে ভরে রয়েছে— সেই তো আমার পিতা, সর্বত্র আমার পিতা। পিতা নোঽসি, পিতা নোঽসি— এই মন্ত্রের অক্ষরই সমস্ত আকাশে, এই মন্ত্রের ধ্বনিই জ্যোতির্ময় স্বর-সপ্তকের বিশ্বসংগীত। পিতা তুমি আছ, এই মন্ত্রই কত অসংখ্য রূপ ধরে লোকলোকান্তরে সমস্ত জীবকে কোলে করে নিয়ে সুখদুঃখের অবিরাম বৈচিত্র্যে সৃষ্টিকে প্রাণপরিপূর্ণ করে রয়েছে। অসীম চেতনজগতের মধ্যে নিয়ত উদ্‌বেলিত তোমার যে পিতার আনন্দ, যে আনন্দে তুমি আপনাকেই আপন সন্তানের মধ্যে নিরীক্ষণ করে লীলা করছ, যে আনন্দে তুমি তোমার সন্তানের মধ্যে ছোটো হয়ে নত হয়ে আসছ এবং তোমার সন্তানকে তোমার মধ্যে বড়ো করে তুলে নিচ্ছ, সেই তোমার অপরিসীম পিতার আনন্দকেই সকলের চেয়ে সত্য ক'রে, আপনার সকলের চেয়ে পরম সম্পদ করে বোধ করতে চাচ্ছে আমার অন্তরাত্মা— তবু সেই জায়গায় আমি কেবলই তার কাছে এনে দিচ্ছি আমার অহংকে। সেই অহংকে কিছুতেই আমি তাড়াতে পারছি নে, তার কাছে আমার নিজের জোর আর কিছুতেই খাটে না, অনেক দিন হল তার হাতেই আমার সমস্ত কেল্লা আমি ছেড়ে দিয়ে বসে আছি। আমার সমস্ত অস্ত্র সেই নিয়েছে, আমার সমস্ত ধনের সেই অধিকারী। সেইজন্যেই তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা, পিতা নো বোধি। পিতা, এই বোধ তুমিই আমার মনে জাগাও। এই বোধটিকে একেবারে বাধাহীন করে লাভ করি যে আমার অস্তিত্ব এ কেবলমাত্রই সন্তানের অস্তিত্ব, আমি তো আর কারও নই, আর কিছুই নই, তোমার সন্তান এই আমার একটিমাত্র সত্য; এই সন্তানের অস্তিত্বকে ঘিরে ঘিরে অন্তরে বাহিরে যা-কিছু আছে, এ সমস্তই পিতার আনন্দ ছাড়া আর কিছুই নয়— এই জল-স্থল-আকাশ, এই জন্মমৃত্যুর জীবনকাব্য, এই সুখদুঃখের সংসারলীলা, এ

সমস্তই সন্তানের জীবনকে আলিঙ্গন করে ধরছে। এইবার কেবল আমার দিকের দরকার আমার সমস্ত প্রাণটা পিতা বলে সাড়া দিয়ে উঠুক। উপরের ডাকের সঙ্গে নীচের ডাকটি মিলে যাক, আমার দিক থেকে কেবল এইটেই বাকি আছে। তোমার দিক থেকে একেবারে জগৎ ভরে উঠল; তুমি আপনাকে দিয়ে আর শেষ করতে পারলে না— পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ একেবারে ছাপিয়ে পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু, তোমার এই এতবড়ো আকাশ-ভরা আত্মদান আমরা দেখতেই পাচ্ছি নে,গ্রহণ করতেই পারছি নে কিসের জন্যে। ওই এতটুকু একটুখানি আমির জন্যে। সে যে সমস্ত অনন্তের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বলছে 'আমি'! একবার একটুখানি থাম্! একবার আমার জীবনের সব চেয়ে সত্য বলাটা বলতে দে, একবার সন্তানজন্মের চরম ডাকটা ডাকতে দে: পিতা নোঽসি! পিতা পিতা পিতা, তুমি তুমি তুমি, কেবল এই কথাটা— অন্ধকারে আলোতে নির্ভয়ে গলা খুলে কেবল: আছ, আছ, আছ। 'আমি' তার সমস্ত বোঝাসুদ্ধ একেবারে তলিয়ে যাক সেই অতলস্পর্শ সত্যে যেখানে তুমি তোমার সন্তানকে আপনার পরিপূর্ণ আনন্দে আবৃত করে জানছ; তেমনি করে সন্তানকেও জানতে দাও তার পিতাকে। তোমার জানা এবং তার জানার মাঝখানকার বাধাটা একেবারে ঘুচে যাক; তুমি যেমন করে আপনাকে দান করেছ তেমনি করে আমাকে গ্রহণ করো।

নমস্তেঽস্তু, তোমাকে যেন নমস্কার করতে পারি। এই আমার পিতার বোধ যখন জাগে তখন নমস্কারের মধুর রসে সমস্ত জীবন একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। সর্বত্র যখন পিতাকে পাই তখন সর্বত্র হৃদয় আনন্দে অবনত হয়ে পড়ে। তখন শুনতে পাই জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের গভীরতম মর্মকুহর হতে একটিমাত্র ধ্বনি অনন্তের মধ্যে নিশ্বসিত হয়ে উঠছে: নমোনমঃ। লোকে লোকান্তরে: নমোনমঃ। সুমধুর সুগম্ভীর নমোনমঃ। তখন দেখতে পাই নমস্কারে নমস্কারে নক্ষত্রের সঙ্গে নক্ষত্র একটিমাত্র জায়গায় তাদের জ্যোতির্ময় ললাটকে মিলিত করেছে। সমস্ত বিশ্বের এই আশ্চর্য সুন্দর সামঞ্জস্য— যে সামঞ্জস্য কোথাও কিছুমাত্র ঔদ্ধত্যের দ্বারা সৃষ্টির বিচিত্র ছন্দকে একটুও আঘাত করছে না, আপনার অণুতে পরমাণুতে অনন্তের আনন্দকে সম্পূর্ণ মেনে নিচ্ছে। এই তো সেই নমস্কারের সংগীত, ঊর্ধ্বে অধোতে দিকে দিগন্তরে: নমোনমঃ। এই সমস্ত বিশ্বের নমস্কারের সঙ্গে আমার চিত্ত যখন তার নমস্কারটিকেও এক করে দেয়, সে যখন আর পৃথক থাকতে পারে না, তখন সে চিরকালের মতো ধন্য হয়; তখনই সে বুঝতে পারে, আমি বেঁচে গেলুম, আমি রক্ষা পেলুম। তখনই জগতের সমস্তের মধ্যেই সে আপনার পিতাকে পেলে; কোনো জায়গায় তার আর কোনো ভয় রইল না।

পিতা, নমস্তেঽস্তু। তোমাকে যেন নমস্কার করতে পারি। এই পারাই চরম পারা— এই পারাতেই জীবনের সকল পারা শেষ হয়ে যায়। যেন নমস্কার করতে পারি। সমস্ত যাত্রার অবসানে নদী যেমন আপনাকে দিয়ে সমুদ্রকে এসে নমস্কার করে, সেই নমস্কারটিতেই তার সমস্ত পথযাত্রা একেবারে নিঃশেষে সার্থক, হে পিতা, তেমনি করে একটি পরিপূর্ণ নমস্কারে তোমার মধ্যে আপনাকে যেন শেষ করে দিতে পারি। এই-যে আমার-বাহিরের মানুষটা, এই আমার সংসারের মানুষটা, জন্ম ও মৃত্যুর মাঝখানকার অতি ক্ষুদ্র এই মানুষটা, এ কেবল মাথাটাকে সকলের চেয়ে উঁচুতে তুলে বুক ফুলিয়ে বেড়াতে চায়। সকলের চেয়ে আমি তফাত থাকব, সকলের চেয়ে আমি বড়ো হব, এতেই তার সকলের চেয়ে সুখ। তার একমাত্র কারণ এই, আপনার মধ্যে তার আপনার স্থিতি নেই। বাইরের বিষয়ের উপরেই তার স্থিতি। যত জিনিস বাড়ে ততই সে বাড়ে; নিজের মধ্যে সে শূন্য; সেখানে তার কোনো সম্পদ নেই এইজন্য বাইরে ধন যত জমে ততই সে ধনী হয়। জিনিসপত্র নিয়েই যাকে বড়ো হতে হয় সে তো সকলের সঙ্গে মিলতে পারে না। জিনিসপত্র তো জ্ঞান নয়, প্রেম নয়; সকলকে দান করার দ্বারাই তো সে আরও বাড়ে না, ভাগ করার দ্বারাই তো সে আরও ঘনীভূত হয়ে উঠে না। তার থেকে যা যায় তা যায়, সে তো আরও দ্বিগুণ হয়ে ফিরে আসে না। তার যা আমার তা আমার, যা অন্যের তা অন্যেরই— এইজন্যে যে মানুষটা উপকরণ নিয়েই বড়ো হয় সকলের থেকে তফাত হয়েই সে বড়ো হয়। আপনার সম্পদকে সকলের সঙ্গে মেলাতে গেলেই তার ক্ষতি হতে থাকে। এইজন্যে যতই সে বড়ো হয় ততই তার আমিটাই উঁচু হয়ে উঠতে থাকে, ততই চারি দিকের সঙ্গে তার যোগ বিচ্ছিন্ন হতে থাকে এবং তার সমস্ত সুখই অহংকারের রূপ ধারণ করে অন্য সকলকে অবনত করতে চায়। এমনি করে বিশ্বের সঙ্গে বিরোধের দ্বারাই সে যে দুঃসহ তাপের সৃষ্টি করে সেইটেকেই সে আপনার প্রতাপ বলে গণ্য করে।

কিন্তু, আমার অন্তরের নিত্য মানুষটি তো দিনরাত্রি মাথা উঁচু করে বেড়াতে চায় নি, সে নমস্কার করতেই চেয়েছিল। তার সমস্ত আনন্দ নমস্কারের দ্বারা বিশ্বজগতে প্রবাহিত হয়ে যেতে চেয়েছে, নমস্কারের দ্বারা তার আত্মসমর্পণ পরিপূর্ণ হতে চায়। নমস্কারের দ্বারা সে আপনাকে সেই জায়গাতেই প্রসারিত করে যেখানে তুমি তোমার পা রেখেছ, যেখানে তোমার চরণাশ্রয় করে জগতের ছোটো বড়ো সকলেই এক জায়গায় এসে মিলেছে, যেখানে দরিদ্রকে ধনী দ্বারের বাইরে দাঁড় করাতে পারে না, শূদ্রকে ব্রাহ্মণ দূরে সরিয়ে রেখে দিতে পারে না। সেই তো সকলের চেয়ে নীচের জায়গা, সেই তো সকলের চেয়ে প্রশস্ত জায়গা, সেই তোমার অনন্তপ্রসারিত পাদপীঠ।

আমার অন্তরাত্মা পরিপূর্ণ নমস্কারের দ্বারা সেই সর্বজনভোগ্য মহাপুণ্যস্থানের অধিকারটি পেতে ব্যাকুল হয়ে আছে। যে স্থানটি নিয়ে রাজা তার কাছ থেকে খাজনা দাবি করবে না, পাশের মানুষ তার সঙ্গে লাঠালাঠি করতে আসবে না, সত্য নমস্কারটি যে স্থানের একমাত্র সত্য দলিল— সেই সম্পত্তিই আমার অন্তরাত্মার পৈতৃক সম্পত্তি।

জল যখন তাপের দ্বারা হালকা হয়ে যায় তখনই সে বাষ্প হয়ে উপরে চড়তে থাকে। তখনই সে পৃথিবীর সমস্ত জলরাশির সঙ্গে আপনার সম্বন্ধকে পৃথক করে ফেলে। তখনই সে ব্যর্থ হয়ে স্ফীত হয়ে উড়ে বেড়ায়, তখনই সে আলোককে আবৃত করে। কিন্তু, তৎসত্ত্বেও সকলেই জানে, জলের যথার্থ স্বধর্মই হচ্ছে সে আপনার সমতলতাকেই চায়। সেই সমতলতাকে চাওয়ার মধ্যেই তার নমস্কারের প্রার্থনা, সেই নমস্কারের দ্বারাই সে রসধারায় সকল দিকে প্রবাহিত হয়, পৃথিবীর মাটিকে সফলতায় অভিষিক্ত করে দেয়— তার সেই প্রণত সাষ্টাঙ্গ নমস্কারই সমস্ত পৃথিবীর কল্যাণ। যে লঘুবাষ্প-রাশি পৃথক হয়ে উঁচুতে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, নিচেকার সঙ্গে আপনার কোনো আত্মীয়তা স্বীকার করতেই চায় না, তার .গায়ে শুভক্ষণে যেই একটু রসের হাওয়া লাগে, যেই সে আপনার যথার্থ গৌরবে ভরে ওঠে, অমনি সে আপনাকে আর ধারণ করে রাখতে পারে না; নমস্কারে বিগলিত হয়ে সেই সর্বজনের নিম্নক্ষেত্রে, সেই সকলের মাঝখানে এসে লুটিয়ে পড়তে থাকে। তখনই জলের সঙ্গে জল মিশে যায়, তখনই মিলনের স্রোত চার দিকে ছুটে বইতে থাকে, বর্ষণের সংগীতে দশ দিক মুখরিত হয়ে ওঠে, প্রত্যেক জলবিন্দু তখনই আপনাকে সত্যরূপে লাভ করে, আপনার ধর্মে আপনি পূর্ণ হয়ে ওঠে।

তেমনি আমার অন্তরের মানুষটি অন্তরে অন্তরে আপনাকে বর্ষণ করতে, আপনাকে সমর্পণ করতে চাচ্ছে। এই তার যথার্থ ধর্ম। সে অহংকারের বাধা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দিয়ে নমস্কারের গৌরবকেই চাচ্ছে; পরিপূর্ণ প্রণতির দ্বারা নিখিলের সমস্তের সঙ্গে আপনার সুবৃহৎ সমতলতা লাভের জন্য চিরদিন সে উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে। আপনার সেই অন্তরতম স্বধর্মটিকে যে পর্যন্ত সে না পাচ্ছে সেই পর্যন্তই তার যত-কিছু দুঃখ, যত-কিছু অপমান। এইজন্যেই সে প্রতিদিন জোড়হাত করে বলছে, নমস্তেঽস্তু— তোমাকে যেন নমস্কার করতে পারি।

তোমাকে নমস্কার করা, এ কথাটি সহজ কথা নয়। এ তো কেবল অভ্যস্তভাবে মাথা নিচু করা নয়। পিতা নোঽসি, তুমি আমাদের সকলেরই পিতা, এই কথাটিকে তো সহজে বলতে পারলুম না। যখন ভেবে দেখি এই কথাটি বলবার পথ প্রতিদিনই

সকল ব্যবহারেই কেমন করে অবরুদ্ধ করে ফেলছি তখন মনে ভয় হয়, মনে করি সন্তানের নমস্কার বুঝি এ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আর সম্পূর্ণ হতে পারল না; মানুষের জীবনে যে রস সকল রসের সার সেই পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের মধুরতম রসটি হৃদয়ের মধ্যে বুঝি কণামাত্রও জায়গা পেল না। কেমন করেই বা পাবে। শুষ্ক যে সে আপনার শুষ্কতা নিয়েই গর্ব করে, ক্ষুদ্র যে সে যে আপনার ক্ষুদ্রতা নিয়েই উদ্ধত হয়ে ওঠে। স্বাতন্ত্র্যের সংকীর্ণতাকে ত্যাগ করতে গেলে সে যে কেবলই মনে করে আমি আমার আত্মাকে খর্ব করলুম। সে যে নমস্কার করতে চাচ্ছেই না। তার এমনই দুর্দশা যে উপাসনার সময় যখন সে তোমার কাছে আসে তখনও সে আপনার অহংটাকেই এগিয়ে নিয়ে আসে। সংসারক্ষেত্রে যেখানে সমস্তই আত্মপর ও উচ্চ-নীচের দ্বারাই আমরা সীমাচিহ্নিত করে রেখেছি সেখানে সর্বলোকপিতা যে তুমি তোমাকে নমস্কার করবার তো জায়গাই পাই নে, তোমাকে সত্যকার নমস্কার করতে গেলে সকল দিকেই নানা দেয়ালেই মাথা ঠেকে যায়, কিন্তু তোমার এই পূজার ক্ষেত্রে যেখানে কেবল ক্ষণকালের জন্যেই আমরা পরিচিত-অপরিচিত পণ্ডিত-মূর্খ ধনী-দরিদ্র তোমারই নামে একত্র সমবেত হই সেখানেও যে মুহূর্তেই আমরা মুখে উচ্চারণ করছি 'পিতা নোহসি', তুমি আমাদের সকলের পিতা, তুমিই আছ, তুমিই সত্য— সেই মুহূর্তেই আমরা মনে মনে লোকের জাতি বিচার করছি, বিদ্যা বিচার করছি, সম্প্রদায় বিচার করছি। যখনই বলছি নমস্তেঽস্তু তখনই নমস্কারকে অন্তরে কলুষিত করছি, সকলের পিতা বলে যে অসংকুচিত নমস্কার তোমাকেই দিতে এসেছি তার অধিকাংশই তোমার কাছ থেকে হরণ করে নিয়ে আমার সমাজটারই পায়ের কাছে স্থাপন করছি। সংসারে আমার অহং নিজের জোরে স্পষ্ট করেই প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে বেড়ায়। সেখানে তার নিজের পূর্ণ অধিকার সম্বন্ধে নিজের কোনো সংশয় বা লজ্জা নেই। এখানে তোমার পূজার ক্ষেত্রে তার অনধিকারের বাধাকে এড়াবার জন্যে সে নিজেকে প্রচ্ছন্ন করে আসে; কিন্তু এখানে তার সকলের চেয়ে ভয়ংকর স্পর্ধা এই যে, ছদ্মবেশে তোমারই সে অংশী হতে চায়, তোমার নামের সঙ্গে সে নিজের নামকে জড়িত করে এবং তোমার পূজার মধ্যেও সে নিজের অপবিত্র হস্তকে প্রসারিত করতে কুণ্ঠিত হয় না।

এমনি করে কি চিরদিনই আমরা তোমার নমস্কারকেও সাম্প্রদায়িক সামাজিক প্রথার মধ্যে এবং ব্যক্তিগত অভ্যাসের মধ্যেই ঠেলে রেখে দেব। কিন্তু কেন। তার প্রয়োজন কী আছে। তোমাকে নমস্কার তো আমার টাকা নয়, কড়ি নয়, ঘর নয়, বাড়ি নয়। তোমাকে নমস্কার করে আমার বাইরের মানুষটি তো তার থলির মধ্যে

কিছুই ভরতে পারে না। রাজাকে নমস্কার করলে তার লাভ আছে, সমাজকে নমস্কার করলে তার সুবিধা আছে, প্রবলকে নমস্কার করলে তার সাংসারিক অনেক আপদ এড়ায়; কিন্তু সে যদি দলের দিকে, সমাজের দিকে, অনিমেষ নেত্র মেলেই থাকে তবে তোমাকে নমস্কার করার কথা উচ্চারণ করবারই বা তার লেশমাত্র প্রয়োজন কী আছে।

প্রয়োজন যে একমাত্র তারই যে আমার ভিতরের মানুষ— সে যে নিত্য মানুষ, সে তো সংসারের মানুষ নয়, সে তো সমাজের কাছ থেকে ছোটো বড়ো কোনো উপাধি গ্রহণ করে সেই চিহ্নে আপনাকে চিহ্নিত করে না। তার চরম প্রয়োজন সকলের সঙ্গে আপনাকে এক করে জানা; তা হলেই সে আপনাকে সত্য জানতে পারে; সেই সত্য জানা থেকে বঞ্চিত হলেই সে মুহ্যমান হয়ে অপবিত্র হয়ে জগতে বাস করে। আপনাকে সত্যরূপে জানবার জন্যেই, সমাজসংস্কারের সংকীর্ণ জালের মধ্যে নিজেকে নিত্যকাল জড়িত করে রাখবার দীনতা হতে উদ্ধার পাবার জন্যেই সে ডাকছে তার পিতাকে, সে ডাকছে নিখিল মানুষের পিতাকে; সেই তার পিতার বোধের মধ্যেই তার আপনার বোধ সত্য হবে, তার বিশ্বের সম্বন্ধ সম্পূর্ণ হবে। এ ডাক সমাজের ডাক নয়, সম্প্রদায়ের ডাক নয়, এ ডাক অন্তরাত্মার ডাক। এ ডাক কুলশীলের ডাক নয়, মানসম্ভ্রমের ডাক নয়, এ ডাক সন্তানের ডাক। এই একটিমাত্র ডাকেই সকল সন্তানের কণ্ঠ এক সুরে মেলে, এই 'পিতা নোঽসি'। তাই এ ডাকের সঙ্গে কোনো অহংকার কোনো সংস্কারকে মেলাতে গেলেই এই পরম সংগীতকে এক মুহূর্তেই বেসুরো করা হবে; তাতে আত্মা পীড়িত হবে এবং হে পরমাত্মন্, তাতে তোমাকেই বেদনা দেওয়া হবে যে তুমি সকল সন্তানের ব্যথার ব্যথী।

তাই তোমার কাছে অন্তরের এই অন্তরতম প্রার্থনা, যেন নত হই, নত হই। সেই নতি দীনতার নতি নয়, সে যে পরম পরিপূর্ণতার প্রণতি। তোমার কাছে সেই একান্ত নমস্কার আত্মসমর্পণের পরমৈশ্বর্য। আমাদের সেই নমস্কার সত্য হোক, সত্য হোক; অহং শান্ত হোক, অহংকার ক্ষয় হোক, ভেদবুদ্ধি দূর হোক, পিতার বোধ পূর্ণ হোক এবং বিশ্বভুবনে সন্তানের প্রণামের সঙ্গে পিতার বিগলিত আনন্দধারা সম্মিলিত হোক। নমস্তেঽস্তু।—

সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক তোমার এ সংসারে
　　একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে।
ঘনশ্রাবণমেঘের মতো রসের ভারে নম্র নত
সমস্ত মন থাক্ পড়ে থাক্ তব ভবনদ্বারে
　　একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে।

নানা সুরের আকুল ধারা মিলিয়ে দিয়ে আত্মহারা
সমস্ত গান সমাপ্ত হোক নীরব পারাবারে
একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে।
হংস যেমন মানসযাত্রী তেমনি সারা দিবসরাত্রি
সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক মরণপরপারে
একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে।

১১ মাঘ ১৩১৮

ফাল্গুন ১৩২০

সৃষ্টির অধিকার

দিন তো যাবেই; এমনি করেই তো দিনের পর দিন গিয়েছে। কিন্তু, সব মানুষেরই ভিতরে এই একটি বেদনা রয়েছে যে যেটা হবার সেটা হয় নি। দিন তো যাবে, কিন্তু মানুষ কেবলই বলেছে: হবে, আমার যা হবার তা আমাকে হতেই হবে, এখনও তার কিছুই হয় নি। তাই যদি না হয়ে থাকে তবে মানুষ আর কিসের মানুষ, পশুর সঙ্গে তার পার্থক্য কোথায়! পশু তার প্রাত্যহিক জীবনে তার যে-সমস্ত প্রবৃত্তি রয়েছে তাদের চরিতার্থতা সাধন করে যাচ্ছে, তার মধ্যে তো কোনো বেদনা নেই। এখনও যা হয়ে ওঠবার তা হয় নি, এ কথা তো তার কথা নয়। কিন্তু মানুষের জীবনের সমস্ত কর্মের ভিতরে ভিতরে এই বেদনাটি রয়েছে— হয় নি, যা হবার তা হয় নি। কী হয় নি। আমি যা হব বলে পৃথিবীতে এলুম তাই যে হলুম না, সেই হবার সংকল্প যে জোর করে নিতে পারলুম না। আমার পথ আমি নেব, আমার যা হবার আমি তাই হব, এই কথাটি জোর করে বলতে পারলুম না বলেই এই বেদনা জেগে উঠছে যে হয় নি, হয় নি, দিন আমার বৃথাই বয়ে যাচ্ছে। গাছকে পশুপক্ষীকে তো এ সংকল্প করতে হয় না, মানুষকেই এই কথা বলতে হয়েছে যে আমি হব। যতক্ষণ পর্যন্ত এ সংকল্পকে সে দৃঢ়ভাবে ধরতে পারছে না, এই কথা সে জোর করে বলতে পারছে না, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ পশুপক্ষী-তরুলতার সঙ্গে সমান। কিন্তু, ভগবান তাকে তাদের সঙ্গে সমান হতে দেবেন না; তিনি চান যে তাঁর বিশ্বের মধ্যে কেবল মানুষই আপনাকে গড়ে তুলবে, আপনার ভিতরকার মনুষ্যত্বটিকে অবাধে প্রকাশ করবে। সেইজন্যে তিনি মানুষের শিশুকে সকলের চেয়ে অসহায় করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, তাকে উলঙ্গ ক'রে দুর্বল ক'রে পাঠিয়েছেন। আর-সকলেরই জীবনরক্ষার জন্যে যে-সকল উপকরণের দরকার তা তিনি দিয়েছেন; বাঘকে

তীক্ষ্ণ নখদন্ত দিয়ে সাজিয়ে পাঠিয়েছেন। কিন্তু, এ কী তাঁর আশ্চর্য লীলা যে মানুষের শিশুকে তিনি সকলের চেয়ে দুর্বল অক্ষম ও অসহায় করে দিয়েছেন ; কারণ, এরই ভিতর থেকে তিনি তাঁর পরমা শক্তিকে দেখাবেন। যেখানে তাঁর শক্তি সকলের চেয়ে বেশি থেকেও সকলের চেয়ে প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে সেইখানেই তো তাঁর আনন্দের লীলা। এই দুর্বল মনুষ্যশরীরের ভিতর দিয়ে যে একটি পরমা শক্তি প্রকাশিত হবে এই তাঁর আহ্বান।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর-সব তৈরি, চন্দ্রসূর্য তরুলতা সমস্তই তৈরি ; কেবল মানুষকেই তিনি অসম্পূর্ণ করে পাঠিয়েছেন। সকলের চেয়ে অসহায় করে মায়ের কোলে যাকে পাঠালেন সেই যে সকলের চেয়ে শক্তিশালী ও সম্পূর্ণ হবার অধিকারী, এই লীলাই তো তিনি দেখাবেন। কিন্তু, আমরা কী তাঁর এই ইচ্ছাকে ব্যর্থ করব। তিনি বাইরে আমাদের যে দুর্বলতার বেশ পরিয়ে পাঠিয়েছেন তারই মধ্যে আমরা আবৃত থাকব, এ হলে আর কী হল। এ পৃথিবীতে তো কোথাও দুর্বলতা নেই। এই পৃথিবীর ভূমি কী নিশ্চল অটল, সূর্যচন্দ্র গ্রহনক্ষত্র আপন আপন কক্ষপথে কী স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত ! এখানে একটি অণুপরমাণুরও নড়চড় হবার জো নেই ; সমস্তই তাঁর অটল শাসনে তাঁর স্থির নিয়মে বিধৃত হয়ে নিজ নিজ কাজ করে যাচ্ছে। কেবল মানুষকেই তিনি অসম্পূর্ণ করে রেখেছেন। তিনি ময়ূরকে নানা বিচিত্র রঙে রঙিয়ে দিয়েছেন ; মানুষকে দেন নি, তার ভিতরে রঙের একটি বাটি দিয়ে বলেছেন, তোমাকে তোমার নিজের রঙে সাজতে হবে। তিনি বলেছেন, তোমার মধ্যে সবই দিলুম, কিন্তু তোমাকে সেই-সব উপকরণ দিয়ে নিজেকে কঠিন করে সুন্দর করে আশ্চর্য করে তৈরি করে তুলতে হবে, আমি তোমাকে তৈরি করে দেব না। আমরা তা না করে যদি যেমন জন্মাই তেমনিই মরি, তবে তাঁর এই লীলা কি ব্যর্থ হবে না।

কী নিয়ে আমাদের দিনের পর দিন যাচ্ছে। প্রতিদিনের আবর্তনে কী জন্যে যে ঘুরে মরছি তার কোনো ঠিকানাই নেই। আজ যা হচ্ছে কালও তাই হচ্ছে, এক দিনের পর কেবল আর-এক দিনের পুনরাবৃত্তি চলছে ; ঘানিতে জোতা হয়ে আছি, ঘুরে বেড়াচ্ছি একই জায়গায়। এর মধ্যে এমন কোনো নতুন আঘাত পাচ্ছি না যাতে মনে পড়ে আমি মানুষ। এই সাংসারিক জীবনযাত্রার প্রাত্যহিক অভ্যস্ত কর্মে আমরা কী পাচ্ছি। আমরা কী জড়ো করছি। এই-সব জীর্ণ বোঝার মধ্যে একদিন কি এমনি ভাবেই জীবন পরিসমাপ্ত হবে। অভ্যাস, অভ্যাস— তারই জড় স্তূপের নীচে তলিয়ে যাচ্ছি ; তারই উপরে যে আমাদের একদিন ঠেলে উঠতে হবে সেই কথাটিই ভুলে যাচ্ছি। মলিনতার উপর কেবলই মলিনতা জমা হচ্ছে ; অভ্যাসকে

কেবলই বেড়ে যেতে দেওয়া হচ্ছে, এমনি করে নিজের কৃত্রিমতার বেড়ার মধ্যে সংকীর্ণ জায়গায় আমরা আবদ্ধ হয়ে রয়েছি, বিশ্বভুবনের আশ্চর্য লীলাকে দেখতে পাচ্ছি না। দেখবার বেলা দেখি উপকরণ, আসবাব, বাঁধা নিয়মে জীবনযন্ত্রের চাকা চালানো। তাঁর আলো আর ভিতরে আসতে পথ পায় না; ওই-সব জিনিস-গুলো আড়াল হয়ে দাঁড়ায়। তিনি আমাদের কাছে আসবেন বলে বলে দিয়েছেন, তুমি তোমার আসনখানি তৈরি করে দাও, আমি সেই আসনে বসব, তোমার ঘরে গিয়ে বসব। অথচ আমরা যা-কিছু আয়োজন করছি সে-সব নিজের জন্যে, তাঁকে বাদ দিয়ে বসেছি। জগৎ জুড়ে শ্যামল পৃথিবীর সকল সৌন্দর্যের মধ্যে তিনি আপনাকে বিকীর্ণ করে রয়েছেন, কেবল একটুখানি কালো জায়গা, আমাদের হৃদয়ের সেই কালো-কলঙ্কে-মলিন ধূলিতে-আচ্ছন্ন সেই একটুমাত্র কালো জায়গাতে তাঁর স্থান হয় নি, সেইখানে তাঁকে আসতে নিষেধ করে দিয়েছি। সেই জায়গাটুকু আমার, সেখানে আমার টাকা রাখব, আসবাব জমাব, ছেলের জন্য বাড়ির ভিত কাটব। সেখানে তাঁকে বলি, তোমাকে ওখানে যেতে দিতে পারব না, তোমাকে ওখান থেকে নির্বাসিত করে দিলুম। তাই এই এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখছি যে, যে মানুষ সকলের চেয়ে বড়ো, যার মধ্যে ভূমার প্রকাশ, সেই মানুষেরই কি সকলের চেয়ে অকৃতার্থ হবার শক্তি হল। আমাদের যে সেই শক্তি তিনিই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আর-সব জায়গায় আমি রয়েছি, কিন্তু তোমার ঘরে নিমন্ত্রণ না করলে আমি যাব না। তিনি বলেছেন, তোমরা কি আমাকে ডাকবে না। তোমরা যা ভোগ করছ আমাকে তার একটু অংশ দেবে না? যারা কেড়ে নেবার লোক তারা কেড়ে নেয়, তারা অনাদর সইতে পারে না। আর যিনি দ্বারের বাইরে প্রতীক্ষা করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাঁকেই বলেছি, তোমাকে দিতে পারব না। দিনের পর দিন কি এই কথা বলে আমরা সব ব্যর্থ করি নি। একদিন আমাদের এ সংকল্প নিতেই হবে, বলতে হবে, আমার ধন জন মান, আমার সমস্ত খ্যাতি-প্রতিপত্তি জীবনযৌবন তোমারই জন্যে। প্রতিদিন যদি বা ভুলে থাকি আজ একদিন অন্তত বলি, তোমারই জন্য আমার এই জীবন হে স্বামী! তোমাকে না দিয়ে কি আমি আমাকে ব্যর্থ করলেম না তোমাকেই ব্যর্থ করলেম? তুমি যে বলেছিলে আমরা অমৃতস্য পুত্রাঃ, আমরা অমৃতের পুত্র। তুমি যে বলেছিলে, তুমি বড়ো, তোমার জীবন সংসারের সুখের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে থাকবে না। সেই পিতৃসত্য যে আমাদের পালন করতেই হবে, তাকে ব্যর্থ করলে যে তোমার সত্যকেই ব্যর্থ করা হবে।

সেইজন্যে, সেই সত্যকে স্বীকার করবে বলে এক-একটা দিনকে মানুষ পৃথক করে রাখে। সে বলে, রোজ তো ঘানি টেনেছি, আর পারি নে; একটা দিন অন্তত বুঝি যে আনন্দলোকে অমৃতলোকেই আমি জন্মগ্রহণ করেছি, কারাগারের মধ্যে নয়। সেই দিন উৎসবের দিন, সেই দিন মানুষের আপনার সত্যকে জানবার দিন। সেই দিনকে প্রতিদিনকার দিন করতে হবে। প্রতিদিন নিজেকে কত অসত্য করে দেখেছি, কত অসত্য করে জেনেছি; একদিন আপনাকে অনন্তের মধ্যে দেখে নিতে হবে। বিশ্বের বিধাতা হয়েও তুমি আমার পিতা, পিতা নোঽসি, এতবড়ো কথা একদিন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জানাতেই হবে। আজ ধনমান খ্যাতিপ্রতিপত্তির কাছে প্রণাম নয়, প্রতিদিন সেইখানে মাথা লুটিয়েছি এবং সেই ধূলিজঞ্জালের নীচে কোন্ তলায় তলিয়ে গিয়েছি। আজ সমস্ত জঞ্জাল দূর করে দিয়ে যিনি আমার দরজায় যুগ যুগ ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাঁকে ডাকব: পিতা নোঽসি। তুমি আমার পিতা। যেদিন তাঁকে ডাকব, তাঁকে ঘরে নিয়ে আসব, সেদিন সব ধনমান সার্থক হবে, সেদিন কোনো অভাবই আর অভাব থাকবে না।

মানুষ একদিন ভেবেছিল সে স্বর্গে যাবে, সেই চিন্তায় সে তীর্থে তীর্থে ঘুরেছে, সে ব্রাহ্মণের পদধূলি নিয়েছে, সে কত ব্রত অনুষ্ঠান করেছে; কী করলে সে স্বর্গলোকের অধিকারী হতে পারে এই কথাই তার মনে জেগেছে। কিন্তু, স্বর্গ তো কোথাও নেই। তিনি তো স্বর্গ কোথাও রাখেন নি। তিনি মানুষকে বলেছেন, তোমাকে স্বর্গ তৈরি করতে হবে। এই সংসারকেই তোমায় স্বর্গ করতে হবে। সংসারে তাঁকে আনলেই যে সংসার স্বর্গ হয়। এতদিন মানুষ এ কোন্ শূন্যতার ধ্যান করেছে। সে সংসারকে ত্যাগ করে কেবলই দূরে দূরে গিয়ে নিষ্ফল আচারবিচারের মধ্যে এ কোন্ স্বর্গকে চেয়েছে। তার ঘর-ভরা শিশু তার মা-বাপ ভাই-বন্ধু, আত্মীয়-প্রতিবেশী— এদের সকলকে নিয়ে নিজের সমস্ত জীবনখানি দিয়ে যে তাকে স্বর্গ তৈরি করতে হবে। কিন্তু সে সৃষ্টি কি একলা হবে। না, তিনি বলেছেন, তোমাতে আমাতে মিলে স্বর্গ করব, আর-সব আমি একলা করেছি, কিন্তু তোমার জন্যেই আমার স্বর্গসৃষ্টি অসমাপ্ত রয়ে গেছে। তোমার ভক্তি তোমার আত্মনিবেদনের অপেক্ষায় এতবড়ো একটা চরমসৃষ্টি হতে পারে নি। সর্বশক্তিমান এই জায়গায় তাঁর শক্তিকে খর্ব করেছেন, এক জায়গায় তিনি হার মেনেছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁর সকলের চেয়ে দুর্বল সন্তান তার সব উপকরণ হাতে করে নিয়ে আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত স্বর্গরচনাই অসম্পূর্ণ রইল। এইজন্যে

যে তিনি যুগ যুগান্ত ধরে অপেক্ষা করছেন। তিনি কি এই পৃথিবীর জন্যেই কত কাল ধরে অপেক্ষা করেন নি। আজ যে এই পৃথিবী এমন সুন্দরী এমন শস্যশ্যামলা হয়েছে, কত বাষ্পদহনের ভিতর দিয়ে ক্রমশ শীতল হয়ে তরল হয়ে তার পরে ক্রমে ক্রমে এই পৃথিবী কঠিন হয়ে উঠেছে। তখন তার বক্ষে এমন আশ্চর্য শ্যামলতা দেখা দিয়েছে। পৃথিবী যুগ যুগ ধরে তৈরি হয়েছে, কিন্তু স্বর্গ এখনও বাকি। বাষ্প-আকারে যখন পৃথিবী ছিল তখন তো এমন সৌন্দর্য ফোটে নি। আজ নীলাকাশের নীচে পৃথিবীর কী অপরূপ সৌন্দর্য দেখা দিয়েছে। ঠিক তেমনি স্বর্গলোক বাষ্প-আকারে আমাদের হৃদয়ের ভিতরে ভিতরে রয়েছে, তা আজও দানা বেঁধে ওঠে নি। তাঁর সেই রচনাকার্যে তিনি আমাদের সঙ্গে বসে গিয়েছেন; কিন্তু আমরা কেবল খাব, পরব, সঞ্চয় করব, এই বলে বলে সমস্ত ভুলে বসে রইলুম। তবু এ ভুল তো ভাঙবে; মরবার আগে একদিন তো বলতে হবে, এই পৃথিবীতে এই জীবনে আমি স্বর্গের একটুখানি আভাস রেখে গেলেম। কিছু মঙ্গল রেখে গেলেম। অনেক অপরাধ স্তূপাকার হয়েছে, অনেক সময় ব্যর্থ করেছি, তবু ক্ষণে ক্ষণে একটু সৌন্দর্য ফুটেছিল। জগৎসংসারকে কি একেবারেই বঞ্চিত করে গেলেম, অভাবকে তো কিছু পূরণ করেছি, কিছু অজ্ঞান দূর করেছি। এই কথাটি তো বলে যেতে হবে। এ দিন যাবে। এই আলো চোখের উপর মিলিয়ে যাবে। সংসার তার দরজা বন্ধ করে দেবে, তার বাইরে পড়ে থাকব। তার আগে কি বলে যেতে পারব না 'কিছু দিতে পেরেছি'।

আমাদের সৃষ্টি করবার ভার যে স্বয়ং তিনি দিয়েছেন। তিনি যে নিজে সুন্দর হয়ে জগৎকে সুন্দর করে সাজিয়েছেন, এ নিয়ে তো মানুষ খুশি হয়ে চুপ করে থাকতে পারল না। সে বললে, আমি ওই সৃষ্টিতে আরও কিছু সৃষ্টি করব। শিল্পী কী করে। সে কেন শিল্প রচনা করে। বিধাতা বলেছেন, আমি এই-যে উৎসবের লন্ঠন সব আকাশে ঝুলিয়ে দিয়েছি, তুমি কি আল্পনা আঁকবে না। আমার রোশনচৌকি তো বাজছেই, তোমার তম্বুরা, কি একতারাই না হয়, তুমি বাজাবে না? সে বললে, হাঁ, বাজাব বৈকি। গায়কের গানে আর বিশ্বের প্রাণে যেমনি মিলল অমনি ঠিক গানটি হল। আমি গান সৃষ্টি করব বলে সেই গান তিনি শোনবার জন্যে আপনি এসেছেন। তিনি খুশি হয়েছেন; মানুষের মধ্যে তিনি যে আনন্দ দিয়েছেন, প্রেম দিয়েছেন, তা যে মিলল তাঁর সব আনন্দের সঙ্গে— এই দেখে তিনি খুশি। শিল্পী আমাদের মানুষের সভায় কি তার শিল্প দেখাতে এসেছে। সে যে তাঁরই সভায় তার শিল্প দেখাচ্ছে, তার গান শোনাচ্ছে।

তিনি বললেন, বাঃ, এ যে দেখছি আমার সুর শিখেছে, তাতে আবার আধো আধো বাণী জুড়ে দিয়েছে— সেই বাণীর আধখানা ফোটে আধখানা ফোটে না। তাঁর সুরে সেই আধফোটা সুর মিলিয়েছি শুনে তিনি বললেন, খুশি হয়েছি। এই-যে তাঁর মুখের খুশি— না দেখতে পেলে সে শিল্পী নয়, সে কবি নয়, সে গায়ক নয়। যে মানুষের সভায় দাঁড়িয়ে মানুষ কবে জয়মাল্য দেবে এই অপেক্ষায় বসে আছে সে কিছুই নয়। কিন্তু, শিল্পী কেবলমাত্র রেখার সৌন্দর্য নিল, কবি সুর নিল, রস নিল। এরা কেউই সব নিতে পারল না। সব নিতে পারা যায় একমাত্র সমস্ত জীবন দিয়ে। তাঁরই জিনিস তাঁর সঙ্গে মিলে নিতে হবে।

জীবনকে তাঁর অমৃতরসে কানায় কানায় পূর্ণ করে যেদিন নিবেদন করতে পারব সেদিন জীবন ধন্য হবে। তার চেয়ে বড়ো নিবেদন আর কী আছে। আমরা তো তা পারি না। তাঁর নৈবেদ্য থেকে সমস্ত চুরি করি; কৃপণতা করে বলি, নিজের জন্য সবই নেব কিন্তু তাঁকে দেবার বেলা উদ্‌বৃত্তমাত্র দিয়ে নিশ্চিন্ত হব। তাঁকে সমস্ত নিবেদন করে দিতে পারলে সব দরকার ভরে যায়, সব অভাব পূর্ণ হয়ে যায়। তাই বলছি, আজ সেই জীবনের পরিপূর্ণ নিবেদনের দিন। আজ বলবার দিন, তুমি আমাকে তোমার আসনের পাশে বসিয়েছিলে, কিন্তু আমি ভুলেছিলুম, আমি সব জুড়ে নিজেই বসেছিলুম— তোমার সঙ্গে বসব এ গৌরব ভুলে গেলুম— তোমাতে আমাতে মিলে বসবার যে অপরূপ সার্থকতা এ জীবনে কি তা হবে না। আজ এই কথা বলব, আমার আসন শূন্য রয়ে গেছে। তুমি এসো, তুমি এসো, তুমি এসে একে পূর্ণ করো। তুমি না এলে আমার এই গৌরবে কাজ কী, আমার ধুলোর মধ্যে ভিক্ষুকের মতো পড়ে থাকা যে ভালো। হায় হায়, ধুলোবালি নিয়ে বাস্তবিকই এই-যে খেলা করছি এই কি আমার সৃষ্টি। এই সৃষ্টির কাজের জন্যেই কি আমার জীবনের এত আয়োজন হয়েছিল। মাঝে মাঝে কি পরম দুঃখে পরম আঘাতে এগুলো ভেঙে যায় নি। খেলাঘর একটু নাড়া দিলেই পড়ে যায়। কিন্তু, তোমাতে আমাতে মিলে যে সৃষ্টি তা কি একটু ফুঁয়ে এমনি করে পড়ে যেতে পারে। খেলাঘর কত যত্ন করেই গড়ে তুলি; যেদিন আঘাত দিয়ে ভেঙে দেন সেদিন দেখিয়ে দেন যে তাঁকে বাদ দিয়ে একলা সৃষ্টি করবার কোনো সাধ্য আমাদের নেই। সেদিন কেঁদে উঠে আবার ভুলি, আবার ছিদ্র ঢাকবার চেষ্টা করি— এমনি করে সব ব্যর্থ হয়ে যায়।

সব কৃত্রিমতা দূর করে দিয়ে আজ একদিনের জন্য দরজা খুলে ডাকি— হে আমার চিরদিনের অধীশ্বর, তোমাকে একদিনের জন্যেই ডাকলুম। এই জীবনে

শেষ নয়, এই পৃথিবীতেও শেষ নয়, আমি যে তোমার দর্শনার্থে তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছি। ঘুরেই চলেছি, দেখা মেলে নি। আজ সব রুদ্ধতার মধ্যে একটু ফাঁক করে দিলেম, দেখা দিয়ো। অপরাধ তুমি যদি ক্ষমা না কর, পরমানন্দের কণা একটিও যদি না দাও, তবু এ কথা বলতে পারব না 'ওগো আমি পারলুম না'। আমি ক্লান্ত, অক্ষম, দুর্বল, আমি জবাব দিলুম, আমার সব পড়ে রইল— এ কথা বলব না। তোমার জন্য দুঃখ পেলেম এই কথা জানাবার সুখ যে তুমিই দেবে। দুঃখ আমার নিজের জন্য পেলে খেদের অবসান থাকে না। হে বন্ধু, তোমার জন্য বড়ো দুঃখ পেয়েছি এ কথা বলবার অধিকার দাও। সমস্ত সংসারের দীর্ঘপথ দুঃখের বোঝা বয়ে এসেছি, আজ দিলুম তোমার পায়ে ফেলে। তুমি যে আনন্দ, তুমি যে অমৃত, এই কথাটি আজ স্মরণ করব। সেই স্মরণ করবার দিনই এই মহোৎসবের দিন।

অসতো মা সদ্গময়। অসত্যে জড়িয়ে আছি, তোমার সঙ্গে মিললে তবে সত্য হব। তোমার সঙ্গে সত্যে মিলন হবে, জ্ঞানের জ্যোতিতে মিলন হবে। মৃত্যুর পথ মাড়িয়ে অমৃতলোকে মিলন হবে। বিশ্বজগৎকে তোমার প্রকাশ যেমন প্রকাশিত করছে তেমনি আমার জীবনকে করবে। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ। ১১ মাঘ ১৩২০

ছোটো ও বড়ো

এগারোই মাঘ সায়ংকালে লেখক কর্তৃক পঠিত উপদেশ

এই সংসারের মাঝখানে থেকে সংসারের সমস্ত তাৎপর্য খুঁজে পাই আর নাই পাই, প্রতিদিনের তুচ্ছতার মধ্যে মানুষ ক্ষণকালের খেলা যেমন করেই খেলুক, মানুষ আপনাকে সৃষ্টির মাঝখানে একটা খাপছাড়া ব্যাপার বলে মনে করতে পারে না। মানুষের বুদ্ধি ভালোবাসা আশা আকাঙ্ক্ষা সমস্তের মধ্যেই মানুষের উপস্থিত প্রয়োজনের অতিরিক্ত এমন একটা প্রভূত বেগ আছে যে মানুষ নিজের জীবনের হিসাব করবার সময়, যা তার হাতে আছে তার চেয়ে অনেক বেশি জমা করে নেয়। মানুষ আপনার প্রতিদিনের হাত-খরচের খুচরো তহবিলকেই নিজের মূলধন বলে

গণ্য করে না। মানুষের সকল কিছুতেই যে-একটি চিরজীবনের উত্তম প্রকাশ পায় সে যে একটা অদ্ভুত বিড়ম্বনা, মরীচিকার মতো সে যে কেবল জলকে দেখায় অথচ তৃষ্ণাকে বহন করে, এ কথা সমস্ত মনের সঙ্গে সে বিশ্বাস করতে পারে না।

ভোগী ভোগের মধুপাত্রের মধ্যে আপনার দুই ডানা জড়িয়ে ফেলে বসে আছে, বুদ্ধি-অভিমানী জোনাক-পোকার মতো আপন পুচ্ছের আলোক-সীমার বাইরে আর সমস্তকেই অস্বীকার করছে, অলসচিত্ত উদাসীন তার নিমীলিত চক্ষুপল্লবের দ্বারা আপনার মধ্যে একটি চিররাত্রি রচনা করে পড়ে আছে, তবু সমস্ত মত্ততা অহংকার এবং জড়ত্বের ভিতর দিয়ে মানুষ নানা দেশে নানা ভাষায় নানা আকারে প্রকাশ করবার চেষ্টা করছে যে 'আমার সত্য প্রতিষ্ঠা আছে এবং সে প্রতিষ্ঠা এইটুকুর মধ্যে নয়'।

সেইজন্যে আমরা যাঁকে দেখলুম না, যাঁকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ করলুম না, যাঁকে সংসারবুদ্ধিটুকুর বেড়া দিয়ে ঘের দিয়ে রাখলুম না, তাঁর দিকে মুখ তুলে যাঁরা বললেন তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ, এই তিনি পুত্র হতে প্রিয়, বিত্ত হতেও প্রিয়, অন্য সব-কিছু হতেও প্রিয়— তাঁদের সেই বাণীকে আমাদের জীবনের ব্যবহারে সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে না পেরেও আজ পর্যন্ত অগ্রাহ্য করতে পারলুম না। এইজন্যে যখন আমরা তাঁর ভক্তকে দেখলুম তিনি কোন্ অন্ত-হীনের প্রেমে জীবনের প্রতি মুহূর্তকে মধুময় করে বিকশিত করছেন, যখন তাঁর সেবককে দেখলুম তিনি বিশ্বের কল্যাণে প্রাণকে তুচ্ছ এবং দুঃখ-অপমানকে গলার হার করে তুলছেন, তখন তাঁদের প্রণাম করে আমরা বললুম এইবার মানুষকে দেখা গেল।

সমস্ত বৈষয়িকতা, সমস্ত দ্বেষবিদ্বেষ ভাগবিভাগের মাঝখানে এইটি ঘটছে; কিছুতেই এটিকে আর চাপা দিতে পারলে না। মানুষের মধ্যে এই-যে অনন্তের বিশ্বাস, এই-যে অমৃতের আশ্বাসটি বীজের মতো রয়েছে, বারম্বার দলিত বিদলিত হয়েও সে মরল না। এ যদি শুধু তর্কের সামগ্রী হত তবে তর্কের আঘাতে আঘাতে চূর্ণ হয়ে যেত; কিন্তু এ যে মর্মের জিনিস, মানুষের সমস্ত প্রাণের কেন্দ্রস্থল থেকে এ যে অনির্বচনীয়রূপে আপনাকে প্রকাশ করে।

তাই তো ইতিহাসে দেখা গেছে মানুষের চিত্তক্ষেত্রে এক-একবার শত বৎসরের অনাবৃষ্টি ঘটেছে, অবিশ্বাসের কঠিনতায় তার অনন্তের চেতনাকে আবৃত করে দিয়েছে, ভক্তির রসসঞ্চয় শুকিয়ে গেছে, যেখানে পূজার সংগীত বেজে উঠত সেখানে উপ-হাসের অট্টহাস্য জেগে উঠছে। শত বৎসরের পরে আবার বৃষ্টি নেমেছে, মানুষ বিস্মিত হয়ে দেখেছে সেই মৃত্যুহীন বীজ আবার নূতন তেজে অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে।

মাঝে মাঝে যে শুষ্কতার ঋতু আসে তারও প্রয়োজন আছে, কেননা বিশ্বাসের প্রচুর রস পেয়ে যখন বিস্তর আগাছা কাঁটাগাছ জন্মায়, যখন তারা আমাদের ফসলের সমস্ত জায়গাটি ঘন করে জুড়ে ব'সে আমাদের চলবার পথটি রোধ করে দেয়, যখন তারা কেবল আমাদের বাতাসকে বিষাক্ত করে কিন্তু আমাদের কোনো খাদ্য জোগায় না, তখন খররৌদ্রের দিনই শুভদিন; তখন অবিশ্বাসের তাপে যা মরবার তা শুকিয়ে মরে যায়, কিন্তু যার প্রাণ আমাদের প্রাণের মধ্যে সে মরবে তখনই যখন আমরা মরব। যতদিন আমরা আছি ততদিন আমাদের আত্মার খাদ্য আমাদের সংগ্রহ করতেই হবে; মানুষ আত্মহত্যা করবে না।

এই-যে মানুষের মধ্যে একটি অমৃতলোক আছে যেখানে তার চিরদিনের সমস্ত সংগীত বেজে উঠছে, আজ আমাদের উৎসব সেইখানকার। এই উৎসবের দিনটি কি আমাদের প্রতিদিন হতে স্বতন্ত্র। এই-যে অতিথি আজ গলায় মালা পরে মাথায় মুকুট নিয়ে এসেছে, এ কি আমাদের প্রতিদিনের আত্মীয় নয়।

আমাদের প্রতিদিনেরই পর্দার আড়ালে আমাদের উৎসবের দিনটি বাস করছে। আমাদের দৈনিক জীবনের মধ্যে অন্তঃসলিলা হয়ে একটি চিরজীবনের ধারা বয়ে চলেছে; সে আমাদের প্রতিদিনকে অন্তরে অন্তরে রসদান করতে করতে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। সে ভিতর থেকে আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে উদার করছে, সমস্ত ত্যাগকে সুন্দর করছে, সমস্ত প্রেমকে সার্থক করছে। আমাদের সেই প্রতিদিনের অন্তরের রসস্বরূপকে আজ আমরা প্রত্যক্ষরূপে বরণ করব বলেই এই উৎসব; এ আমাদের জীবনের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন নয়। সম্বৎসরকাল গাছ আপনার পাতার ভার নিয়েই তো আছে। বসন্তের হাওয়ায় একদিন তার ফুল ফুটে ওঠে; সেইদিন তার ফলের খবরটি প্রকাশ হয়ে পড়ে। সেইদিন বোঝা যায় এতদিনকার পাতা ধরা এবং পাতা ঝরার ভিতরে এই সফলতার প্রবাহটি বরাবর চলে আসছিল, সেই-জন্যেই ফুলের উৎসব দেখা দিল, গাছের অমরতার পরিচয় সুন্দর বেশে প্রচুর ঐশ্বর্যে আপনাকে প্রকাশ করল।

আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সেই পরমোৎসবের ফুল কি আজ ধরেছে, তার গন্ধ কি আমরা অন্তরের মধ্যে আজ পেয়েছি। আজ কি অন্য সব ভাবনার আড়াল থেকে এই কথাটি আমাদের কাছে স্পষ্ট করে দেখা দিল যে জীবনটা কেবল প্রাত্যহিক প্রয়োজনের কর্মজাল বুনে বুনে চলা নয়, তার গভীরতার ভিতর থেকে একটি পরম সৌন্দর্য পরমকল্যাণ পূজার অঞ্জলির মতো উর্ধ্বমুখ হয়ে উঠছে?

না, সে কথা তো আমরা সকলে মানি নে। আমাদের জীবনের মর্মনিহিত সেই

সত্যকে সুন্দরকে দেখবার দিন এখনও হয়তো আসে নি। আপনাকে একেবারে ভুলিয়ে দেয়, সমস্ত স্বার্থকে পরমার্থের মধ্যে মিলিয়ে তোলে, এমন বৃহৎ আনন্দের হিল্লোল অন্তরের মধ্যে জাগে নি। কিন্তু তবুও তিন শো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে অন্তত একটি দিনকেও আমরা পৃথক করে রাখি, আমাদের সমস্ত অন্যমনস্কতার মাঝখানেই আমাদের পূজার প্রদীপটি জ্বালি, আসনটি পাতি, সকলকে ডাকি, যে যেমন ভাবে আসে আসুক, যে যেমন ভাবে ফিরে যায় ফিরে যাক।

কেননা, এ তো আমাদের কারও একলার সামগ্রী নয়; আজ আমাদের কণ্ঠ হতে যে স্তবসংগীত উঠবে সে তো কারও একলা কণ্ঠের বাণী নয়; জীবনের পথে সম্মুখের দিকে যাত্রা করতে করতে মানুষ নানা ভাষায় যাঁর নাম ডেকেছে, যে নাম তার সংসারের সমস্ত কলরবের উপরে উঠেছে আমরা সেই সকল মানুষের কণ্ঠের চিরদিনের নামটি উচ্চারণ করতে আজ এখানে একত্র হয়েছি— কোনো পুরস্কার পাবার আশায় নয়, কেবল এই কথাটি বলবার জন্যে যে তাঁকে আমরা আপনার ভাষায় ডাকতে শিখেছি। মানুষের এই একটি আশ্চর্য সৌভাগ্য। আমরা পশুরই মতো আহার-বিহারে রত, আপন আপন ভাগ নিয়ে আমাদের টানাটানি, তবু তারই মধ্যেই 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্', আমরা সেই মহান্ পুরুষকে জেনেছি— সমস্ত মানুষের হয়ে এই কথাটি স্বীকার করবার জন্যেই উৎসবের আয়োজন।

অথচ আমরা যে সুখসম্পদের কোলে বসে আরামে আছি, তাই আনন্দ করছি, তা নয়। দ্বারে মৃত্যু এসেছে, ঘরে দারিদ্র্য; বাইরে বিপদ, অন্তরে বেদনা; মানুষের চিত্ত সেই ঘন অন্ধকারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলেছে: বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। আমি সেই মহান্ পুরুষকে জেনেছি যিনি অন্ধকারের পরপার হতে জ্যোতির্ময়রূপে প্রকাশ পাচ্ছেন। মনুষ্যত্বের তপস্যা সহজ তপস্যা হয় নি, সাধনার দুর্গম পথ দিয়ে রক্তমাখা পায়ে মানুষকে চলতে হয়েছে, তবু মানুষ আঘাতকে দুঃখকে আনন্দ বলে গ্রহণ করেছে; মৃত্যুকে অমৃত বলে বরণ করেছে; ভয়ের মধ্যে অভয়কে ঘোষণা করেছে— এবং 'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং', হে রুদ্র, তোমার যে প্রসন্নমুখ সেই মুখ মানুষ দেখতে পেয়েছে। সে দেখা তো সহজ নয়; সমস্ত অভাবকে পরিপূর্ণ করে দেখা, সমস্ত সীমাকে অতিক্রম করে দেখা। মানুষ সেই দেখা দেখেছে বলেই তো তার সকল কান্নার অশ্রুজলের উপরে তার গৌরবের পদ্মটি ভেসে উঠেছে; তার দুঃখের হাটের মাঝখানে তার এই আনন্দসম্মিলন।

কিন্তু, বিমুখ চিত্তও আছে, এবং বিরুদ্ধ বাক্যও শোনা যায়। এমন কোন্ মহৎ

সম্পদ মানুষের কাছে এসেছে যার সম্মুখে বাধা তার পরিহাসকুটিল মুখ নিয়ে এসে দাঁড়ায় নি। তাই এমন কথা শুনি, অনন্তকে নিয়ে তো আমরা উৎসব করতে পারি নে, অনন্ত যে আমাদের কাছে তত্ত্বকথা মাত্র। বিশ্বের মধ্যে তাঁকে ব্যাপ্ত করে দেখব— কিন্তু, লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মধ্যে যে বিশ্ব নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, যে বিশ্বের নাড়ীতে নাড়ীতে আলোকধারার আবর্তন হয়ে কত শত শত বৎসর কেটে যায়, সে বিশ্ব আমার কাছে আছে কোথায়। তাই তো সেই অনন্ত পুরুষকে নিজের হাত দিয়ে নিজের মতো করে ছোটো করে নিই, নইলে তাঁকে নিয়ে আমাদের উৎসব করা চলে না।

এমনি করে তর্কের কথা এসে পড়ে। যখন উপভোগ করি নে, যখন সমস্ত প্রাণকে জাগিয়ে দিয়ে উপলব্ধি করি নে, তখনই কলহ করি। ফুলকে যদি প্রদীপের আলোয় ফুটতে হত তা হলেই তাকে প্রদীপ খুঁজে বেড়াতে হত; কিন্তু যে সূর্যের আলো আকাশময় ছড়িয়ে যায় ফুল যে সেই আলোয় ফোটে, এইজন্যে তার কাজ কেবল আকাশে আপনাকে মেলে ধরা। আপন ভিতরকার প্রাণের বিকাশবেগেই সে আপনার পাপড়ির অঞ্জলিটিকে আলোর দিকে পেতে দেয়, তর্ক করে পণ্ডিতের সঙ্গে পরামর্শ করে এ কাজ করতে গেলে দিন বয়ে যেত। হৃদয়কে একান্ত করে অনন্তের দিকে পেতে ধরা মানুষের মধ্যেও দেখেছি, সেইখানেই তো ওই বাণী উঠেছে: বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। আমি সেই মহান্ পুরুষকে দেখেছি যিনি অন্ধকারের পরপার হতে জ্যোতির্ময়রূপে প্রকাশ পাচ্ছেন। এ তো তর্কযুক্তির কথা হল না; চোখ যেমন করে আপনার পাতা মেলে দেখে এ যে তেমনি করে জীবন মেলে দেখা।

সত্য হতে অবচ্ছিন্ন করে যেখানে তত্ত্বকথাকে বাক্যের মধ্যে বাঁধা হয় সেখানে তা নিয়ে কথা-কাটাকাটি করা সাজে, কিন্তু দ্রষ্টা যেখানে অনন্ত পুরুষকে সমস্ত সত্যেরই মাঝখানে দেখে বলেন 'এষঃ', এই-যে তিনি, সেখানে তো কোনো কথা বলা চলে না। 'সীমা' শব্দটার সঙ্গে একটা 'না' লাগিয়ে দিয়ে আমরা 'অসীম' শব্দটাকে রচনা করে সেই শব্দটাকে শূন্যাকার করে বৃথা ভাবতে চেষ্টা করি। কিন্তু অসীম তো 'না' নন, তিনি যে নিবিড় নিরবচ্ছিন্ন 'হাঁ'। তাই তো তাঁকে ওঁ বলে ধ্যান করা হয়। ওঁ যে হাঁ, ওঁ যে যা-কিছু আছে সমস্তকে নিয়ে অখণ্ড পরিপূর্ণতা। আমাদের মধ্যে প্রাণ জিনিসটি যেমন— কথা দিয়ে যদি তাকে ব্যাখ্যা করতে যাই তবে দেখি প্রতি মুহূর্তেই তার ধ্বংস হচ্ছে, সে যেন মৃত্যুর মালা; কিন্তু তর্ক না করে আপনার ভিতরকার সহজবোধ দিয়ে যদি দেখি তবে দেখতে পাই আমাদের প্রাণ তার প্রতি মুহূর্তের মৃত্যুকে অতিক্রম করে রয়েছে; মৃত্যুর 'না' দিয়ে তার পরিচয় হয় না, মৃত্যুর মধ্যে সেই প্রাণই হচ্ছে 'হাঁ'।

সীমার মধ্যে অসীম হচ্ছেন তেমনি ওঁ। তর্ক না করে উপলব্ধি করে দেখলেই দেখা যায় সমস্ত চলে যাচ্ছে, সমস্ত স্খলিত হচ্ছে বটে, কিন্তু একটি অখণ্ডতার বোধ আপনিই থেকে যাচ্ছে। সেই অখণ্ডতার বোধের মধ্যেই আমরা সমস্ত পরিবর্তন সমস্ত গতায়াতসত্ত্বেও বন্ধুকে বন্ধু বলে জানছি; নিরন্তর সমস্ত চলে-যাওয়াকে পেরিয়ে থেকে-যাওয়াটাই আমাদের বোধের মধ্যে বিরাজ করছে। বন্ধুকে বাইরের বোধের মধ্যে আমরা খণ্ড খণ্ড করে দেখছি; কখনো আজ কখনো পাঁচদিন পরে, কখনো এক ঘটনায় কখনো অন্য ঘটনায়। তাঁর সম্বন্ধে আমার বাইরের বোধটাকে জড়ো করে দেখলে তার পরিমাণ অতি অল্পই হয়, অথচ অন্তরের মধ্যে তার সম্বন্ধে যে একটি নিরবচ্ছিন্ন বোধের উদয় হয়েছে তার পরিমাণের আর অন্ত নেই, সে আমার সমস্ত প্রত্যক্ষ জানার কূল ছাপিয়ে কোথায় চলে গেছে। যে কাল গত সে কালও তাকে ধরে রাখে নি, যে কাল সমাগত সে কালও তাকে ঠেকিয়ে রাখে নি, এমন-কি, মৃত্যুও তাকে আবদ্ধ করে নি। বরঞ্চ আমার বন্ধুকে ক্ষণে ক্ষণে ঘটনায় ঘটনায় যে ফাঁক ফাঁক করে দেখেছি সেই সীমাবচ্ছিন্ন দেখাগুলিকে সুনির্দিষ্টভাবে মনে আনতে চাইলে মন হার মানে— কিন্তু, সমস্ত খণ্ড জানার সীমাকে সকল দিকে পেরিয়ে গিয়ে আমার বন্ধুর যে একটি পরম অনুভূতি অসীমের মধ্যে নিরন্তরভাবে উপলব্ধ হয়েছে সেইটেই সহজ; কেবল সহজ নয়, সেইটেই আনন্দময়। আমাদের প্রিয়জনের সমস্ত অনিত্যতার সীমা পূরণ করে তুলেছে এমন একটি চিরন্তনকে যেমন অনায়াসে যেমন আনন্দে আমরা দেখি তেমনি করেই যাঁরা আপনার সহজ বিপুল বোধের দ্বারা সংসারের সমস্ত চলার ভিতরকার অসীম থাকাটিকে একান্ত অনুভব করেছেন তাঁরাই বলেছেন: এষাস্য পরমা গতিঃ, এষাস্য পরমা সম্পৎ, এষোঽস্য পরমোলোকঃ, এষোঽস্য পরমআনন্দঃ। এ তো জ্ঞানীর তত্ত্বকথা নয়, এ যে আনন্দের নিবিড় উপলব্ধি। এষঃ, এই-যে ইনি, এই-যে অত্যন্ত নিকটের ইনি, ইনিই জীবের পরমা গতি, পরম ধন, পরম আশ্রয়, পরম আনন্দ। তিনি এক দিকে যেমন গতি আর-এক দিকে তেমনি আশ্রয়, এক দিকে যেমন সাধনার ধন আর-এক দিকে তেমনি সিদ্ধির আনন্দ।

কিন্তু, আমাদের লৌকিক বন্ধুকে আমরা অসীমতার মধ্যে উপলব্ধি করছি বটে, তবু সীমার মধ্যেই তার প্রকাশ; নইলে তার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধই থাকত না। অতএব, অসীম ব্রহ্মকে আমাদের নিজের উপকরণ দিয়ে নিজের কল্পনা দিয়ে আগে নিজের মতো গড়ে নিতে হবে, তার পরে তাঁর সঙ্গে আমাদের ব্যবহার চলতে পারে— এমন কথা বলা হয়ে থাকে।

কিন্তু, আমার বন্ধুকে যেমন আমার নিজের হাতে গড়তে হয় নি এবং যদি গড়তে

হত তা হলে কখনো তার সঙ্গে আমার সত্য বন্ধুত্ব হত না— বন্ধুর বাহিরের প্রকাশটি আমার চেষ্টা আমার কল্পনার নিরপেক্ষ— তেমনি অনন্তস্বরূপের প্রকাশও তো আমার সংগ্রহ-করা উপকরণের অপেক্ষা করে নি; তিনি অনন্ত বলেই আপনার স্বাভাবিক শক্তিতেই আপনাকে প্রকাশ করছেন। যখনই তিনি আমাদের মানুষ করে সৃষ্টি করেছেন তখনই তিনি আপনাকে আমাদের অন্তরে বাহিরে মানুষের ধন করে ধরা দিয়েছেন, তাঁকে রচনা করবার বরাত তিনি আমাদের উপরে দেন নি। প্রভাতের অরুণ-আভা তো আমারই, বনের শ্যামল শোভা তো আমারই— ফুল যে ফুটেছে সে কার কাছে ফুটেছে। ধরণীর বীণাযন্ত্রে যে নানা সুরের সংগীত উঠেছে সে সংগীত কার জন্যে। আর, এই তো রয়েছে মায়ের কোলের শিশু, বন্ধুর-দক্ষিণ-হস্ত-ধরা বন্ধু, এই তো ঘরে বাহিরে যাদের ভালোবেসেছি সেই আমার প্রিয়জন; এদের মধ্যে যে অনির্বচনীয় আনন্দ প্রসারিত হচ্ছে এই আনন্দ যে আমার আনন্দময়ের নিজের হাতের পাতা আসন। এই আকাশের নীল চাঁদোয়ার নীচে, এই জননী পৃথিবীর বিচিত্র আল্‌পনা-আঁকা বরণবেদিটির উপরে আমার সমস্ত আপন লোকের মাঝখানে সেই সত্যং জ্ঞান-মনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপে অমৃতরূপে বিরাজ করছেন।

এই সমস্ত থেকে, এই তাঁর আপনার আত্মদান থেকে, অবচ্ছিন্ন করে নিয়ে কোন্‌ কল্পনা দিয়ে গড়ে কোন্‌ দেয়ালের মধ্যে তাঁকে স্বতন্ত্র করে ধরে রেখে দেব। সেই কি হবে আমাদের কাছে সত্য, আর যিনি অন্তর বাহির ভরে দিয়ে নিত্য নবীন শোভায় চিরসুন্দর হয়ে বসে রয়েছেন তিনিই হবেন তত্ত্বকথা? তাঁরই এই আপন আনন্দ-নিকেতনের প্রাঙ্গণে আমরা তাঁকে ঘিরে বসে অহোরাত্র খেলা করলুম, তবু এইখানে এই সমস্তর মাঝখানে আমাদের হৃদয় যদি জাগল না, আমরা তাঁকে যদি ভালোবাসতে না পারলুম, তবে জগৎজোড়া এই আয়োজনের দরকার কী ছিল। তবে কেন এই আকাশের নীলিমা, অমারাত্রির অবগুণ্ঠনের উপরে কেন এই-সমস্ত তারার চুমকি বসানো, তবে কেন বসন্তের উত্তরীয় উড়ে এসে ফুলের গন্ধে দক্ষিনে হাওয়াকে উতলা করে তোলে। তবে তো বলতে হয় সৃষ্টি বৃথা হয়েছে, অনন্ত যেখানে নিজে দেখা দিচ্ছেন সেখানে তাঁর সঙ্গে মিলন হবার কোনো উপায় নেই। বলতে হয় যেখানে তাঁর সদাব্রত সেখানে আমাদের উপবাস ঘোচে না; মা যে অন্ন স্বহস্তে প্রস্তুত করে নিয়ে বসে আছেন সন্তানের তাতে তৃপ্তি নেই, আর ধুলোবালি নিয়ে খেলার অন্ন যা সে নিজে রচনা করেছে তাইতে তার পেট ভরবে।

না, এ কেবল সেই-সকল দুর্বল উদাসীনদের কথা যারা পথে চলবে না এবং দূরে বসে বসে বলবে পথে চলাই যায় না। একটি ছেলে নিতান্ত একটি সহজ কবিতা

আবৃত্তি করে পড়ছিল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি যে কবিতাটি পড়লে তাতে কী বলেছে, তার থেকে তুমি কী বুঝলে। সে বললে, সে কথা তো আমাদের মাস্টারমশায় বলে দেয় নি। ক্লাসে পড়া মুখস্থ করে তার একটা ধারণা হয়ে গেছে যে কবিতা থেকে নিজের মন দিয়ে বোঝবার কিছুই নেই। মাস্টারমশায় তাকে ব্যাকরণ অভিধান সমস্ত বুঝিয়েছে, কেবল এই কথাটি বোঝায় নি যে, রসকে নিজের হৃদয় দিয়েই বুঝতে হয়, মাস্টারের বোঝা দিয়ে বুঝতে হয় না। সে মনে করেছে বুঝতে পারার মানে একটা কথার জায়গায় আর-একটা কথা বসানো, 'সুশীতল' শব্দের জায়গায় 'সুস্নিগ্ধ' শব্দ প্রয়োগ করা। এপর্যন্ত মাস্টার তাকে ভরসা দেয় নি, তার মনের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অপহরণ করেছে। যেখানে বোঝা তার পক্ষে নিতান্ত সহজ সেখানেও বুঝতে পারে বলে তার ধারণাই হয় নি। এইজন্যে ভয়ে ভয়ে সে আপনার স্বাভাবিক শক্তিকে খাটায় না। সেও বলে আমি বুঝি নে, আমরাও বলি সে বোঝে না। এলাহাবাদ শহরে যেখানে গঙ্গা যমুনা দুই নদী একত্র মিলিত হয়েছে সেখানে ভূগোলের ক্লাসে যখন একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল 'নদী জিনিসটা কী— তুমি কখনো কি দেখেছ' সে বললে, না। ভূগোলের নদী জিনিসটার সংজ্ঞা সে অনেক মার খেয়ে শিখেছে; এ কথা মনে করতে তার সাহসই হয় নি যে, যে নদী দুইবেলা সে চক্ষে দেখেছে, যার মধ্যে সে আনন্দে স্নান করেছে, সেই নদীই তার ভূগোলবিবরণের নদী, তার বহু দুঃখের এক্‌জামিন-পাসের নদী।

তেমনি করেই আমাদের ক্ষুদ্র পাঠশালার মাস্টারমশায়রা কোনোমতেই এ কথা আমাদের জানতে দেয় না যে, অনন্তকে একান্তভাবে আপনার মধ্যে এবং সমস্তের মধ্যে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করা যায়। এইজন্যে অনন্তস্বরূপ যেখানে আমাদের ঘর ভরে পৃথিবী জুড়ে আপনি দেখা দিলেন সেখানে আমরা বলে বসলুম, বুঝতে পারি নে, দেখতে পেলুম না। ওরে, বোঝবার আছে কী? এই-যে এষঃ, এই-যে এই। এই-যে চোখ জুড়িয়ে গেল, প্রাণ ভরে গেল, এই-যে বর্ণে গন্ধে গীতে নিরন্তর আমাদের ইন্দ্রিয়বীণায় তাঁর হাত পড়ছে, এই-যে স্নেহে প্রেমে সখ্যে আমাদের হৃদয়ে কত রঙ ধরে উঠেছে, কত মধু ভরে উঠছে; এই-যে দুঃখরূপ ধরে অন্ধকারের পথ দিয়ে পরম কল্যাণ আমাদের জীবনের সিংহদ্বারে এসে আঘাত করছেন, আমাদের সমস্ত প্রাণ কেঁপে উঠছে, বেদনায় পাষাণ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে; আর ওই-যে তাঁর বহু অশ্বের রথ, মানুষের ইতিহাসের রথ, কত অন্ধকারময় নিস্তব্ধ রাত্রি এবং কত কোলাহলময় দিনের ভিতর দিয়ে বন্ধুর পন্থায় যাত্রা করেছে, তাঁর বিদ্যুৎশিখাময়ী কশা মাঝে মাঝে আকাশে ঝল্‌কে ঝল্‌কে উঠছে— এই তো এষঃ, এই তো এই। সেই এইকে সমস্ত

জীবন মন দিয়ে আপন করে জানি, প্রত্যহ প্রতি দিনের ঘটনার মধ্যে স্বীকার করি এবং উৎসবের দিনে বিশ্বের বাণীকে বিজয়কণ্ঠে নিয়ে তাঁকে ঘোষণা করি— সেই সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, সেই শান্তং শিবমদ্বৈতং, সেই কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ, সেই-যে এক অনেকের প্রয়োজন গভীরভাবে পূর্ণ করছেন, সেই-যে অন্তহীন জগতের আদি-অন্তে পরিব্যাপ্ত সেই-যে মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ যাঁর সঙ্গে শুভযোগে আমাদের বুদ্ধি শুভবুদ্ধি হয়ে ওঠে।

নিখিলের মাঝখানে যেখানে মানুষ তাঁকে মানুষের সম্বন্ধে ডাকতে পারে— পিতা মাতা বন্ধু— সেখান থেকে সমস্ত চিত্তকে প্রত্যাখ্যান করে যখন আমরা অনন্তকে ছোটো করে আপন হাতে আপনার মতো ক'রে গড়েছি তখন কী যে করেছি তা কি ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট করে একবার দেখব না। যখন আমরা বলেছি 'আমাদের পরমধনকে সহজ করবার জন্যে ছোটো করব' তখনই আমাদের পরমার্থকে নষ্ট করেছি। তখন টুকরো কেবলই হাজার টুকরো হবার দিকে গেছে, কোথাও সে আর থামতে চায় নি; কল্পনা কোনো বাধা না পেয়ে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে; কৃত্রিম বিভীষিকায় সংসারকে কণ্টকিত করে তুলেছে; বীভৎস প্রথা ও নিষ্ঠুর আচার সহজেই ধর্মসাধনা ও সমাজব্যবস্থার মধ্যে আপনার স্থান করে নিয়েছে। আমাদের বুদ্ধি অন্তঃপুর-চারিণী ভীরু রমণীর মতো স্বাধীন বিচারের প্রশস্ত রাজপথে বেরোতে কেবলই ভয় পেয়েছে। এই কথাটি আমাদের বুঝতে হবে যে অসীমের অভিমুখে আমাদের চলবার পন্থাটি মুক্ত না রাখলে নয়। থামার সীমাই হচ্ছে আমাদের মৃত্যু; আরোর পরে আরোই হচ্ছে আমাদের প্রাণ— সেই আমাদের ভূমার দিকটি জড়তার দিক নয়, সহজের দিক নয়, সে দিক অন্ধ অনুসরণের দিক নয়, সেই দিক নিয়তসাধনার দিক। সেই মুক্তির দিককে মানুষ যদি আপন কল্পনার বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলে, আপনার দুর্বলতাকেই লালন করে ও শক্তিকে অবমানিত করে, তবে তার বিনাশের দিন উপস্থিত হয়।

এমনি করে মানুষ যখন সহজ করবার জন্যে আপনার পূজাকে ছোটো করতে গিয়ে পূজনীয়কে একপ্রকার বাদ দিয়ে বসে তখন পুনশ্চ সে এই দুর্গতি থেকে আপনাকে বাঁচাবার ব্যগ্রতায় অনেক সময় আর-এক বিপদে গিয়ে পড়ে— আপন পূজনীয়কে এতই দূরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রাখে সেখানে আমাদের পূজা পৌঁছতে পারে না, অথবা পৌঁছতে গিয়ে তার সমস্ত রস শুকিয়ে যায়। এ কথা তখন মানুষ ভুলে যায় যে অসীমকে কেবলমাত্র ছোটো করলেও যেমন তাঁকে মিথ্যা করা হয় তেমনি তাঁকে কেবল-মাত্র বড়ো করলেও তাঁকে মিথ্যা করা হয়; তাঁকে শুধু ছোটো করে আমাদের বিকৃতি, তাঁকে শুধু বড়ো করে আমাদের শুষ্কতা।

অনন্তং ব্রহ্ম, অনন্ত বলেই ছোটো হয়েও বড়ো এবং বড়ো হয়েও ছোটো। তিনি অনন্ত বলেই সমস্তকে ছাড়িয়ে আছেন এবং অনন্ত বলেই সমস্তকে নিয়ে আছেন। এইজন্যে মানুষ যেখানে মানুষ সেখানে তো তিনি মানুষকে ত্যাগ করে নেই। তিনি পিতামাতার হৃদয়ের পাত্র দিয়ে আপনিই আমাদের স্নেহ দিয়েছেন, তিনি মানুষের প্রীতির আকর্ষণ দিয়ে আপনি আমাদের হৃদয়ের গ্রন্থি মোচন করেছেন; এই পৃথিবীর আকাশেই তাঁর যে বীণা বাজে তারই সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের তার এক সুরে বাঁধা; মানুষের মধ্য দিয়েই তিনি আমাদের সমস্ত সেবা গ্রহণ করছেন, আমাদের কথা শুনছেন এবং শোনাচ্ছেন; এইখানেই সেই পুণ্যলোক সেই স্বর্গলোক যেখানে জ্ঞানে প্রেমে কর্মে সর্বতোভাবে তাঁর সঙ্গে আমাদের মিলন ঘটতে পারে। অতএব মানুষ যদি অনন্তকে সমস্ত মানবসম্বন্ধ হতে বিচ্যুত করে জানাই সত্য মনে করে তবে সে শূন্যতাকেই সত্য মনে করবে। আমরা মানুষ হয়ে জন্মেছি যখনই এ কথা সত্য হয়েছে তখনই এ কথাও সত্য— অনন্তের সঙ্গে আমাদের সমস্ত ব্যবহার এই মানুষের ক্ষেত্রেই, মানুষের বুদ্ধি, মানুষের প্রেম, মানুষের শক্তি নিয়েই। এইজন্যে ভূমার আরাধনায় মানুষকে দুটি দিক বাঁচিয়ে চলতে হয়। এক দিকে নিজের মধ্যেই সেই ভূমার আরাধনা হওয়া চাই, আর-এক দিকে অন্য আকারে সে যেন নিজেরই আরাধনা না হয়; এক দিকে নিজের শক্তি নিজের হৃদয়বৃত্তিগুলি দিয়েই তাঁর সেবা হবে, আর-এক দিকে নিজেরই রিপুগুলিকে ধর্মের রসে সিক্ত করে সেবা করবার উপায় করা যেন না হয়।

অনন্তের মধ্যে দূরের দিক এবং নিকটের দিক দুইই আছে; মানুষ সেই দূর ও নিকটের সামঞ্জস্যকে যে পরিমাণে নষ্ট করেছে সেই পরিমাণে ধর্ম যে কেবল তার পক্ষে অসম্পূর্ণ হয়েছে তা নয়, তা অকল্যাণ হয়েছে। এইজন্যেই মানুষ ধর্মের দোহাই দিয়ে সংসারে যত দারুণ বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে এমন সংসারবুদ্ধির দোহাই দিয়ে নয়। আজ পর্যন্ত ধর্মের নামে কত নরবলি হয়েছে এবং কত নরবলি হচ্ছে তার আর সীমাসংখ্যা নেই; সে বলি কেবলমাত্র মানুষের প্রাণের বলি নয়— বুদ্ধির বলি, দয়ার বলি, প্রেমের বলি। আজ পর্যন্ত কত দেবমন্দিরে মানুষ আপনার সত্যকে ত্যাগ করেছে, আপনার মঙ্গলকে ত্যাগ করেছে এবং কুৎসিতকে বরণ করেছে। মানুষ ধর্মের নাম করেই নিজেদের কৃত্রিম গণ্ডির বাইরের মানুষকে ঘৃণা করবার নিত্য অধিকার দাবি করেছে। মানুষ যখন হিংসাকে, আপনার প্রকৃতির রক্তপায়ী কুকুরটাকে, একেবারে সম্পূর্ণ শিকল কেটে ছেড়ে দিয়েছে তখন নির্লজ্জভাবে ধর্মকে আপন সহায় বলে আহ্বান করেছে। মানুষ যখন বড়ো বড়ো দস্যুবৃত্তি করে পৃথিবীকে সন্ত্রস্ত করেছে

তখন আপনার দেবতাকে পূজার লোভ দেখিয়ে দলপতির পদে নিয়োগ করেছে বলে কল্পনা করেছে। কৃপণ যেমন করে আপনার টাকার থলি লুকিয়ে রাখে তেমনি করে আজও আমরা আমাদের ভগবানকে আপনার সম্প্রদায়ের লোহার সিন্দুকে তালা বন্ধ করে রেখেছি বলে আরাম বোধ করি এবং মনে করি যারা আমাদের দলের নামটুকু ধারণ না করেছে তারা ঈশ্বরের ত্যাজ্যপুত্ররূপে কল্যাণের অধিকার হতে বঞ্চিত। মানুষ ধর্মের দোহাই দিয়েই এই কথা বলেছে এই সংসার বিধাতার প্রবঞ্চনা, মানবজন্মটাই পাপ, আমরা ভারবাহী বলদের মতো হয় কোনো পূর্বপিতামহের নয় নিজের জন্মজন্মান্তরের পাপের বোঝা বহে নিয়ে অন্তহীন পথে চলেছি। ধর্মের নামেই অকারণ ভয়ে মানুষ পীড়িত হয়েছে এবং অদ্ভুত মূঢ়তায় আপনাকে ইচ্ছাপূর্বক অন্ধ করে রেখেছে।

কিন্তু, তবু এই-সমস্ত বিকৃতি ও ব্যর্থতার ভিতর দিয়েও ধর্মের সত্যরূপ নিত্যরূপ ব্যক্ত হয়ে উঠছে। বিদ্রোহী মানুষ সমূলে তাকে ছেদন করবার চেষ্টা করে কেবল তার বাধাগুলিকেই ছেদন করছে। অবশেষে এই কথা মানুষের উপলব্ধি করবার সময় এসেছে যে, অসীমের আরাধনা মনুষ্যত্বের কোনো অঙ্গের উচ্ছেদ-সাধন নয়, মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ পরিণতি। অনন্তকে একই কালে এক দিকে আনন্দের দ্বারা অন্য দিকে তপস্যার দ্বারা উপলব্ধি করতে হবে; কেবলই রসে মজে থাকতে হবে না— জ্ঞানে বুঝতে হবে, কর্মে পেতে হবে, তাঁকে আমার মধ্যে যেমন আনতে হবে তেমনি আমার শক্তিকে তাঁর মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। সেই অনন্তস্বরূপের সম্বন্ধে মানুষ এক দিকে বলেছে আনন্দ হতেই তিনি যা-কিছু সমস্ত সৃষ্টি করছেন, আবার আর-এক দিকে বলেছে : স তপোঽতপ্যত, তিনি তপস্যাদ্বারা যা-কিছু সমস্ত সৃষ্টি করেছেন। এই দুইই একই কালে সত্য। তিনি আনন্দ হতে সৃষ্টিকে উৎসারিত করছেন, তিনি তপস্যাদ্বারা সৃষ্টিকে কালের ক্ষেত্রে প্রসারিত করে নিয়ে চলেছেন। একই কালে তাঁকে তাঁর সেই আনন্দ এবং তাঁর সেই প্রকাশের দিক থেকে গ্রহণ না করলে আমরা চাঁদ ধরছি কল্পনা করে কেবল আকাশ ধরবার চেষ্টা করব।

বহুকাল পূর্বে একবার বৈরাগীর মুখে গান শুনেছিলুম : আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে! সে আরও গেয়েছিল : আমার মনের মানুষ যেখানে, আমি কোন্ সন্ধানে যাই সেখানে! তার এই গানের কথাগুলি আজ পর্যন্ত আমার মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যখন শুনেছি তখন এই গানটিকে মনের মধ্যে কোনো স্পষ্ট ভাষায় ব্যাখ্যা করেছি তা নয়, কিম্বা এ কথা আমার জানবার প্রয়োজন বোধ হয় নি যে যারা গাচ্ছে তারা সাম্প্রদায়িক ভাবে এর ঠিক কী অর্থ বোঝে। কেননা,

অনেক সময়ে দেখা যায় মানুষ সত্যভাবে যে কথাটা বলে মিথ্যাভাবে সে কথাটা বোঝে। কিন্তু, এ কথা ঠিক যে এই গানের মধ্যে মানুষের একটি গভীর অন্তরের কথা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। মানুষের মনের মানুষ তিনিই তো, নইলে মানুষ কার জোরে মানুষ হয়ে উঠছে। ইহুদিদের পুরাণে বলেছে, ঈশ্বর মানুষকে আপনার প্রতিরূপ করে গড়েছেন। স্থূল বাহ্য ভাবে এ কথার মানে যেমনই হোক, গভীর ভাবে এ কথা সত্য বৈকি।·তিনি ।ভতরে থেকে আপনাকে দিয়েই তো মানুষকে তৈরি করে তুলছেন। সেইজন্যে মানুষ আপনার সব-কিছুর মধ্যে আপনার চেয়ে বড়ো একটি কাকে অনুভব করছে। সেইজন্যেই ওই বাউলের দলই বলেছে: খাঁচার মধ্যে অচিন পাখি কমনে আসে যায়! আমার সমস্ত সীমার মধ্যে সীমার অতীত সেই অচেনাকে ক্ষণে ক্ষণে জানতে পারছি, সেই অসীমকেই আমার করতে পারবার জন্যে প্রাণের ব্যাকুলতা।—

আাম কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে!

অসীমের মধ্যে যে-একটি ছন্দ দূর ও নিকট-রূপে আন্দোলিত, যা বিরাট হৃৎস্পন্দনের মতো চৈতন্যধারাকে বিশ্বের সর্বত্র প্রেরণ ও সর্বত্র হতে অসীমের অভিমুখে আকর্ষণ করছে, এই গানের মধ্যে সেই ছন্দের দোলাটুকু রয়ে গেছে।

অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম অন্য জগতের অন্য জীবের সঙ্গে আপনাকে কী সম্বন্ধে বেঁধেছেন তা জানবার কোনো উপায় আমাদের নেই, কিন্তু এইটুকু মনের ভিতরে জেনেছি যে মানুষের তিনি মনের মানুষ; তিনিই মানুষকে পাগল করে পথে বের করে দিলেন, তাকে স্থির হয়ে ঘুমিয়ে থাকতে দিলেন না। কিন্তু, সেই মনের মানুষ তো আমার এই সামান্য মানুষটি নয়; তাঁকে তো কাপড় পরিয়ে, আহার করিয়ে, শয্যায় শুইয়ে, ভোগের সামগ্রী দিয়ে ভুলিয়ে রাখবার নয়। তিনি আমার মনের মানুষ বটে, কিন্তু তবু দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলতে হচ্ছে: আমার মনের মানুষ কে রে! আমি কোথায় পাব তারে! সে যে কে তা তো আপনাকে কোনো সহজ অভ্যাসের মধ্যে স্থূল রকম করে ভুলিয়ে রাখলে জানতে পারব না। তাকে জ্ঞানের সাধনায় জানতে হবে; সে জানা কেবলই জানা, সে জানা কোনোখানে এসে বদ্ধ হবে মা। কোথায় পাব তারে। কোনো বিশেষ নির্দিষ্ট স্থানে কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্যে তো পাওয়া যাবে না; স্বার্থবন্ধন মোচন করতে করতে মঙ্গলকে সাধন করতে করতেই তাকে পাওয়া, আপনাকে নিয়ত দানের দ্বারাই তাকে নিয়ত পাওয়া।

মানুষ এমনি করেই তো আপনার মনের মানুষের সন্ধান করছে। এমনি করেই তো তার সমস্ত দুঃসাধ্য সাধনার ভিতর দিয়েই যুগে যুগে সেই মনের মানুষ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে। যতই তাকে পাচ্ছে ততই বলছে 'আমি কোথায় পাব তারে'। সেই মনের মানুষকে নিয়ে মানুষের মিলন বিচ্ছেদ একাধারেই; তাঁকে পাওয়ার মধ্যেই তাঁকে না-পাওয়া। সেই পাওয়া না-পাওয়ার নিত্য টানেই মানুষের নব নব ঐশ্বর্যলাভ, জ্ঞানের অধিকারের ব্যাপ্তি, কর্মক্ষেত্রের প্রসার— এক কথায়, পূর্ণতার মধ্যে অবিরত আপনাকে নব নব রূপে উপলব্ধি। অসীমের সঙ্গে মিলনের মাঝখানেই এই-যে একটি চিরবিরহ আছে এ বিরহ তো কেবল রসের বিরহ নয়, কেবল ভাবের দ্বারাই তো এর পূর্ণতা হতে পারে না, জ্ঞানে কর্মেও এই বিরহ মানুষকে ডাক দিয়েছে— ত্যাগের পথ দিয়ে মানুষ অভিসারে চলেছে। জ্ঞানের দিকে, শক্তির দিকে, প্রেমের দিকে, যে দিকেই মানুষ বলেছে 'আমি চিরকালের মতো পৌঁচেছি' 'আমি পেয়ে বসে আছি', এই বলে যেখানেই সে তার উপলব্ধিকে নিশ্চলতার বন্ধন দিয়ে বাঁধতে চেয়েছে, সেইখানেই সে কেবল বন্ধনকেই পেয়েছে, সম্পদকে হারিয়েছে, সে সোনা ফেলে আঁচলে গ্রন্থি দিয়েছে। এই-যে তার চিরকালের গান: আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে! এই প্রশ্ন যে তার চিরদিনের প্রশ্ন: মনের মানুষ যেখানে বলো কোন্ সন্ধানে যাই সেখানে! কেননা, সন্ধান এবং পেতে থাকা এক সঙ্গে; যখনই সন্ধানের অবসান তখনই উপলব্ধির বিকৃতি ও বিনাশ।

এই মনের মানুষের কথা বেদমন্ত্রে আর-এক রকম করে বলা হয়েছে। তাঁকে বলেছে 'পিতা নোঽসি', তুমি আমাদের পিতা হয়ে আছ। পিতা যে মানুষের সম্বন্ধ; কোনো অনন্ত তত্ত্বকে তো পিতা বলা যায় না। অসীমকে যখন পিতা বলে ডাকা হল তখন তাঁকে আপন ঘরের ডাকে ডাকা হল। এতে কি কোনো অপরাধ হল। এতে কি সত্যকে কোথাও খাটো করা হল। কিছুমাত্র না। কেননা, আমার ঘর ছেড়ে তিনি তো শূন্যতার মধ্যে লুকিয়ে নেই। আমার ঘরটিকে তিনি যে সকল রকম করেই ভরেছেন। মাকে যখন মা বলেছি তখন পরম মাতাকে ডাকবার ভাষাই যে অভ্যাস করেছি; মানুষের সকল সম্বন্ধের ভিতর দিয়েই যে তাঁর সঙ্গে আনাগোনার দরজা একটি একটি করে খোলা হয়েছে; মানুষের সকল সম্বন্ধের ভিতর দিয়েই যে আমরা এক-এক ভাবে অসীমের স্পর্শ নিয়েছি। আমার সেই ঘর-ভরা অসীমকে, আমার সেই জীবন-ভরা অসীমকে, আমার ঘরের ডাক দিয়েই ডাকতে হবে— আমার জীবনের ডাক দিয়েই ডাকতে হবে। সেইটেই আমার চরম ডাক, সেইজন্যেই আমার ঘর। সেই-জন্যেই আমি মানুষ হয়ে জন্মেছি; সেইজন্যেই আমার জীবনের যত-কিছু জানা, যত-

কিছু পাওয়া। তাই তো মানুষ এমন সাহসে সেই অনন্ত জগতের বিধাতাকে ডেকেছে 'পিতা নোঽসি', তুমি আমারই পিতা, তুমি আমারই ঘরের। এ ডাক সত্য ডাক; কিন্তু, এই ডাকই মানুষ একেবারে মিথ্যা করে তোলে যখন এই ছোটো অনন্তের সঙ্গে সঙ্গেই বড়ো অনন্তকে ডাক না দেয়। তখন তাঁকে আমরা মা ব'লে পিতা ব'লে কেবলমাত্র আবদার করি, আর সাধনা করবার কিছু থাকে না; যেটুকু সাধনা সেও কৃত্রিম সাধনা হয়। তখন তাঁকে পিতা বলে আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করতে চাই, মকদ্দমায় ফল লাভ করতে চাই, অন্যায় করে তার শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাই। কিন্তু, এ তো কেবলমাত্র নিজের সাধনাকে সহজ করবার জন্য, ফাঁকি দিয়ে আপন দুর্বলতাকে লালন করবার জন্যে, তাঁকে পিতা বলা নয়। সেইজন্যেই বলা হয়েছে: পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি। তুমি যে পিতা এই বোধকে আমার উদ্‌বোধিত করতে থাকো। এ বোধ তো সহজ বোধ নয়, ঘরের কোণে এ বোধকে বেঁধে রেখে তো চুপ করে পড়ে থাকবার নয়। আমাদের বোধের বন্ধন মোচন করতে করতে এই পিতার বোধটিকে ঘর থেকে ঘরে, দেশ থেকে দেশে, সমস্ত মানুষের মধ্যে নিত্য প্রসারিত করে দিতে হবে। আমাদের জ্ঞান প্রেম কর্মকে বিস্তীর্ণ করে দিয়ে ডাকতে হবে 'পিতা'— সে ডাক সমস্ত অন্যায়ের উপরে বেজে উঠবে, সে ডাক মঙ্গলের দুর্গম পথে বিপদের মুখে আমাদের আহ্বান করে ধ্বনিত হবে। পিতা নো বোধি! নমস্তেঽস্তু! পিতার বোধকে উদ্‌বোধিত করো— যেন আমাদের নমস্কারকে সত্য করতে পারি, যেন আমাদের প্রতিদিনের পূজায়, আমাদের ব্যবসায়ে, সমাজের কাজে, আমাদের পিতার বোধ জাগ্রত হয়ে পিতাকে নমস্কার সত্য হয়ে ওঠে। মানুষের যে পরম নমস্কারটি তার যাত্রাপথের দুই ধারে তার নানা কল্যাণকীর্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলেছে, সেই সমগ্র মানবের সমস্ত কালের চিরসাধনার নরস্কারটিকে আজ আমাদের উৎসবদেবতার চরণে নিবেদন করতে এসেছি। সে নমস্কার পরমানন্দের নমস্কার, সে নমস্কার পরম দুঃখের নমস্কার। নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ, নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ। তুমি সুখরূপে আনন্দকর, তোমাকে নমস্কার! তুমি দুঃখরূপে কল্যাণকর, তোমাকে নমস্কার! তুমি কল্যাণ, তোমাকে নমস্কার! তুমি নব নবতর কল্যাণ, তোমাকে নমস্কার। ১১ মাঘ ১৩২০

ফাল্গুন ১৩২০

১৬

সৌন্দর্যের সকরুণতা

প্রভাতের পূর্বগগনে আলোকের প্রথম বিকাশ যেমন মধুর, মানুষের জীবনের প্রথম প্রত্যুষের অরুণরেখা যেদিন জেগে ওঠে সেদিন শিশুর কণ্ঠে তার সংগীত তেমনি মধুর, তেমনি নির্মল। সমস্ত মানুষের জীবনের আরম্ভে এই মধুর সুরের উদ্‌বোধন লোকালয়ে ঘরে ঘরে দেখতে পাই। জীবনের সেই নির্মল সৌন্দর্যের ভূমিকাটি কেমন সুন্দর! জগৎসংসারে তাই যত মলিনতা থাক্, জরার দ্বারা মানুষ যেমনই আচ্ছন্ন হোক-না কেন, ঘরে ঘরে মনুষ্যত্ব নতুন হয়ে জন্মগ্রহণ করছে। আজ শিশুদের কণ্ঠে জীবনের সেই উদ্‌বোধনসংগীতের প্রথম কলকাকলি শুনতে পাচ্ছি— এ উদ্‌বোধন কে প্রেরণ করলেন। যিনি জীবনের অধীশ্বর তিনিই ঘরে ঘরে এই জাগরণের গীত পাঠিয়েছেন। আজ চিত্ত সেই গানে জাগ্রত হোক।

কিন্তু, এই উৎসবের সংগীতের মধ্যে একটি করুণ সুর, একটি কান্না রয়েছে; সকালের প্রভাতী রাগিণীর সেই কান্না বুকের মধ্যে শিরা নিংড়ে নিংড়ে বাজছে। আনন্দের সুরের মধ্যে করুণার কোমল নিখাদ বাজছে। সে কিসের করুণা। পিতা ডাক দিয়েছেন, কিন্তু সকলের সময় হয়ে ওঠে নি। জাগে নি সবাই। অনন্ত শূন্যে প্রভাত-আলোকের ভৈরবী সুর করুণা বিস্তার করে যুগ হতে যুগে ধ্বনিত হচ্ছে, তিনি উৎসব-ক্ষেত্রে ডেকেছেন। অনাদিকালের সেই আহ্বান ধ্বনিত হচ্ছে; কিন্তু, তাঁর ছেলে-মেয়েদের ঘুম ভাঙে নি। তারা কেউ বা উদাসীন, কারও বা কাজ আছে, কেউ বা উপহাস করছে, কাউকে বা অভ্যাসের আবরণ কঠিন করে ঘিরে আছে। তারা সংসারের কোলাহল শুনেছে, স্বার্থের আহ্বান শুনেছে, প্রতিদিনের প্রয়োজনের ডাক শুনেছে, কিন্তু আকাশের আলোকের ভিতরে আনন্দময়ের আনন্দভবনে উৎসবের আমন্ত্রণের আহ্বান শুনতে পায় নি।

প্রেমিকের ডাক প্রেমাস্পদের কাছে আসছে, মাঝখানে কত ব্যবধান! কত অবিশ্বাস, কত কলুষ, কত মোহ, কত বাধা! উৎসবের নহবত প্রভাতে প্রভাতে বাজছে, তারায় তারায় অন্ধকারের হৃদয় ভেদ করে বাজছে— সেই উৎসবালোকে ফুল ফুটছে, পাখি গান করছে, শ্যামল তৃণের আস্তরণ পাতা হয়েছে, তাঁর মালীরা ফুলের মালা গেঁথে ঝুলিয়ে রেখেছে। কিন্তু, এতই ব্যবধান, সেখানকার সংগীতকে এখানে

আমাদের কাছে পৌঁছতে দিচ্ছে না। সেইজন্যই তিনি যে সৌন্দর্যের সংগীত বাজাচ্ছেন তার মধ্যে অমন কান্না রয়েছে। পৌঁছল না, সবাই এসে জুটল না, আনন্দসভা শূন্য পড়ে রইল। জগতের সৌন্দর্যের বুকের মধ্যে এই কান্না বাজছে। ফুল ফুটতে ফুটতে ঝরতে ঝরতে কত কান্নাই কাঁদল। সে বললে, যে প্রেমলিপি আমি আনলুম সে লিপিখানি কেউ পড়ল না।

নদীর কলস্রোতে নির্জন পর্বতশিখর থেকে যে সংগীতকে বহন করে সমুদ্রের দিকে চলেছে সেই সুরে কান্না রয়েছে: আমি যে নির্জন থেকে নির্জনের দিকে চলেছি সেই নির্জনের সুর গ্রামে গ্রামে লোকালয়ে ঘোষণা করেছি, কারও সময় হল না সে আহ্বান শুনবার। আকাশের সমস্ত তারা এমন ডাক ডাকল, কাননের সমস্ত ফুল এমন ডাক ডাকল— দরজা রুদ্ধ— কেউ শুনল না। এমন সুন্দর জগতে জন্মালুম, এমন সুন্দর আলোকে চোখ মেললুম, সেখানে কি কেবল কাজ! কাজ! কেবল প্রবৃত্তির কোলাহল! কেবল এই কলহ মাৎসর্য বিরোধ! সেখানে এরাই কি সকলের চেয়ে প্রধান! এই সুরেই কি সূর্য চন্দ্র সুর মেলাচ্ছে! এই সুরেই কি সুর ধরিয়েছিলেন যেদিন জননী শিশুকে প্রথম মুখচুম্বন করলেন! এত বড়ো আকাশ, তার এমন নির্মল নীলিমা! একে মানব না? পৃথিবীর এমন আশ্চর্য প্রাণবান গীতিকাব্য, একে মানব না! সেই-জন্যই জগতের সৌন্দর্যের মধ্যে এমন একটি চিরবিরহের করুণা। প্রেমিকের সঙ্গে প্রেমাস্পদের বিচ্ছেদ হয়েছে, মাঝখানে স্বার্থের মরুভূমি। সেই মরুভূমি পার হয়ে ডাক আসছে 'এসো এসো'— সেই ডাকের কান্নায় আকাশ ভরে গেল, আলোক ফেটে পড়ল।

কিন্তু, যিনি উৎসবের দেবতা তিনি অপেক্ষা করতে জানেন। এই মরুভূমির ভিতর দিয়ে তিনিই পার করছেন, পথহারাদের ক্রমে ক্রমে পথে টেনে আনছেন। দুঃখের অশ্রুতে তাঁর মিলনের শতদল বিকশিত হচ্ছে। তিনি জানেন যে বধির সেও শুনবে, চিরযুগের রুদ্ধদ্বার একদিন খুলবে, পাষাণ একদিন গলবে। এই বাধা-বিরোধের ভিতর থেকে তিনি টেনে নেবেন।

মানুষের জাগরণ সহজ নয় বলেই তার মূল্য যে বেশি। এই জাগরণের জন্য যুগ যুগ যে অপেক্ষা করতে হয়। যেদিন জাগবে মানুষ সেদিন পাখির গানের চেয়ে তার গানের মূল্য অনেক বেশি হবে, ফুলের সৌন্দর্যের চেয়ে তার সৌন্দর্য অনেক বেশি হবে। মানুষ আজ বিদ্রোহ করছে; কিন্তু ঝড়ের মেঘ যেমন শ্রাবণের ধারায় বিগলিত হয়ে তার বজ্রবিদ্যুৎকে নিঃশেষ করে মাটিতে লুটিয়ে গড়িয়ে পড়ে যায়, তেমনি বিদ্রোহী মানুষ যেদিন ঝোড়ো মেঘের মতো কেঁদে ঝরে পড়বে সেদিন মরুভূমিতে বিকশিত হবে ফুল—

তার মূল্য যে অনেক বেশি। সেইজন্য যুগ যুগ রাত্রিদিন তিনি জেগে রইলেন, অপেক্ষা করে রইলেন, পাপীর পাপের মলিনতা ধৌত হয়ে কবে তার হৃদয় ফুলের মতো নির্মল হয়ে ফুটে উঠবে। বৎসরে বৎসরে উৎসব ব্যর্থ হয়; দিনের পর দিন আলোকদূত ফিরে ফিরে যায়; অন্ধকার নিশীথিনীর তারকারা রাত্রির পর রাত্রি একই আহ্বানের পুনরাবৃত্তি করতে থাকে, ক্ষান্ত হয় না, ক্লান্তি আসে না— কারণ, এই আশা যে জেগে রয়েছে যে যেদিন মানুষ ডাক শুনবে সেদিন সমস্ত সার্থক হবে।

আজ উৎসবের প্রাঙ্গণে আমরা এসেছি; এ দিন সকলের উৎসবের দিন কি না তা জানি না। সম্বৎসর তিনি ফুল ফুটিয়েছেন, প্রতিদিনই আমাদের ডেকেছেন। আজ কি আমরা নিজের হাতের তৈরি এই উৎসবক্ষেত্রে তাঁর সেই প্রতি নিমেষের সাড়া দিচ্ছি। হে উৎসবের দেবতা, তোমার উৎসবের ক্ষেত্র ব্যর্থ হবে না। তুমি সাজিয়েছ, আমরা এসেছি। আমরা বললুম 'পিতা নোঽসি'; তুমি পিতা এই কথা স্বীকার করলুম। বললুম নমস্তেঽস্তু, নমস্কার সত্য হোক। নমস্কার তো সত্য হয় নি। সংসারের মধ্যে নমস্কার সত্য হয় নি। তোমাকে বঞ্চনা করেছি। ক্ষমতার পায়ে,ধনের পায়ে নমস্কার করেছি। হে আমার উৎসবদেবতা, আজ একটুখানি নমস্কার বাঁচিয়ে এনেছি— আজ আসবার সময় ধনমানের কাছ থেকে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে একটু নমস্কার আনতে পেরেছি— সে না হতে পারে প্রতিদিনের নমস্কার, না হতে পারে সমস্ত জীবনের নমস্কার, কিন্তু এই ক্ষণকালের নমস্কার তুমি নাও, সমস্ত জীবনের অসাড়তা অচৈতন্য দূর হোক, তুমি নিজের হাতে জাগাও—

তুমি আপনি জাগাও মোরে তব সুধাপরশে।

১১ মাঘ ১৩২১

অমৃতের পুত্র

অমৃত-উৎসের ধারে মানুষকে একবার করে আসতে হবে এবং আপনাকে নতুন করে নিতে হবে। জীবনের তত্ত্বই হচ্ছে মরণের ভিতর দিয়ে নতুনকে কেবলই প্রকাশ করা। সংসারের মধ্যে জরা সব জীর্ণ করছে, যা-কিছু নতুন তার উপর সে তার তপ্ত হাতের কালিমা বোলাচ্ছে, তাই দেখতে দেখতে নির্মল ললাটে বলির রেখা পড়ে— সকল কর্মে ক্লান্তি ও অবসাদ কেবলই জমে ওঠে। এই জরার আক্রমণে আমরা

প্রতিদিন পুরাতন হয়ে যাচ্ছি। সেইজন্য মানুষ নানা উপলক্ষ্য করে একটি জিনিসকে কেবলই প্রকাশ করতে চায়। সে জিনিসটি তার চিরযৌবন। জরাদৈত্য যে তার সব রক্ত শোষণ করেছে সে এ কথা মানতে চায় না। সে জানে যে তার অন্তরের চিরনবীন চিরযৌবনের ভাণ্ডারে অমৃত পরিপূর্ণ। সেই কথাটি ঘোষণা করবার জন্যই মানুষের উৎসব।

মানুষ দেখতে পেয়েছে যে সংসারের সঞ্চয় প্রতিদিন ক্ষয় হয়ে যায়। যতই ভয় ভাবনা করি, যতই আগলে আগলে রাখি, কাল সমস্তই নষ্ট করবে— নবীন সৌন্দর্য কোথাও রাখবে না। সংসার যে বৃদ্ধকে তৈরি করছে ; সে আরম্ভ করে নবীন শিশুকে নিয়ে, তার পরে একদিন বৃদ্ধ করে তাকে ছেড়ে দেয়। প্রভাতের শুভ্র নির্মলতা নিয়ে সে আরম্ভ করে, তার পরে তার উপর কালের প্রলেপ দিতে দিতে তাকে নিশীথ রাত্রের কালিমায় হারিয়ে ফেলে।

অথচ এই জরার হাত থেকে মানুষকে তো রক্ষা পেতে হবে। কেমন করে পাবে, কোথায় পাবে। যেখানে চিরপ্রাণ সেইখানে পাবে। সে প্রাণের লীলার ধারা তো একসূত্রের ধারা নয়। দেখো-না কেন, রাত্রির পরে দিন নতুন নতুন পুষ্পে পুষ্পিত হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। দিনান্তে নিশীথের তারা নতুন করেই আপনার দীপ জ্বালাচ্ছে। মৃত্যুর সূত্রে প্রাণের মালাকর অমনি করে জীবনের ফুলকে নবীন করে গেঁথে তুলছেন। কিন্তু, সংসার একটানা মৃত্যুকে ধরে রেখেছে, সে সব জিনিসকে কেবলই ক্ষয় করতে করতে সেই অতল গহ্বরে নিয়ে গিয়ে ফেলে। কিন্তু, এই একটানা মৃত্যুর ধারা যদি চরম সত্য হত তবে তো কিছুই নতুন হয়ে উঠত না, তবে তো এত দিনে পৃথিবী পচে উঠত, তবে জরার মূর্তিই সব জায়গায় প্রকাশ পেত। সেইজন্য মানুষ উৎসবের দিনে বলে, আমি এই মৃত্যুর ধারাকে মানব না, আমি অমৃতকে চাই। এ কথাও মানুষ বলেছে, অমৃতকে আমি দেখেছি, আমি পেয়েছি, সমস্তই বেঁচে আছে অমৃতে।

মৃত্যুর সাক্ষ্য চারি দিকে, অথচ মানুষ বলে উঠেছে : ওগো শোনো, তোমরা অমৃতের পুত্র, তোমরা মৃত্যুর পুত্র নও।—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং।

আমি তাঁকে জেনেছি এই বার্তা যাঁরা বলেছেন তাঁরা সে কথা বলবার আরম্ভে সম্বোধনেই আমাদের কী আশ্বাস দিয়ে বলেছেন 'তোমরা দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্র— তোমরা সংসারবাসী মৃত্যুর পুত্র নও'! জগতের মৃত্যুর বাঁশির ভিতর দিয়ে এই অমৃতের সংগীত

যে প্রচারিত হচ্ছে এ সংগীত তো পশুরা শুনতে পায় না। তারা খেয়েদেয়ে ধুলোয় কাদায় লুটিয়ে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে। অমৃতের সংগীত যে তোমরাই শোনবার অধিকারী। কেন। তোমরা যে মৃত্যুর অধীন নও, তোমরা মৃত্যুর একটানা পথেই চলছ না—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।

তোমরা যে ধামে রয়েছ, যে লোকে বাস করছ, সে কোন্ লোক। তোমরা কি এই পৃথিবীর ধুলোমাটিতেই রয়েছ যেখানে সমস্ত জীর্ণ হয়ে ঝরে ঝরে পড়ছে। না, তোমরা দিব্যলোকে বাস করছ, অমৃতলোকে বাস করছ। এই কথা মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে মানুষ বলছে, সমস্ত সাক্ষ্যকে অস্বীকার করে মানুষ বলছে। এ কথা সে মরতে মরতে বলছে। এই মাটির উপর মাটির জীবের সঙ্গে বাস করে বলছে : তোমরা এই মাটিতে বাস করছ না, তোমরা দিব্যধামে বাস করছ।

সেই দিব্যধামের আলো কোথা থেকে আসে। তমসঃ পরস্তাৎ। তমসার পরপার থেকে আসে। এই মৃত্যুর অন্ধকার সত্য নয়, সত্য সেই জ্যোতি যা যুগে যুগে মোহের অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে আসছে। যুগে যুগে মানুষ অজ্ঞানের ভিতর থেকে জ্ঞানকে পাচ্ছে, যুগে যুগে মানুষ পাপকে মলিনতাকে বিদীর্ণ করে পুণ্যকে আহরণ করছে। বিরোধের ভিতর দিয়ে সত্যকে পাচ্ছে, এ ছাড়া সত্যকে পাবার আর-কোনো উপায় মানুষের নেই। যারা মনে করছে এই জ্যোতিই অসত্য, এই দিব্যধামের কথা কল্পনা মাত্র, তাদের কথা যদি সত্য হত তবে মাটিতে মানুষ একদিন যেমন জন্মেছিল ঠিক তেমনিই থাকত, তার আর কোনো বিকাশ হত না। মানুষের মধ্যে অমৃত রয়েছে বলেই না মৃত্যুকে ভেদ করে সেই অমৃতের প্রকাশ হচ্ছে। ফোয়ারা যেমন তার ছোটো একটুখানি ছিদ্রকে ভেদ করে ঊর্ধ্বে আপনার ধারাকে উৎক্ষিপ্ত করে তেমনি এই মৃত্যুর সংকীর্ণ ছিদ্রের ভিতর দিয়ে অমৃতের উৎস উঠছে। যাঁরা এটা দেখতে পেয়েছেন তাঁরা ডাক দিয়ে বলেছেন : ভয় কোরো না, অন্ধকার সত্য নয়, মৃত্যু সত্য নয়, তোমাদের অমৃতের অধিকার। মৃত্যুর কাছে দাসখত লিখে দিয়ো না ; যদি প্রবৃত্তির হাতে আত্মসমর্পণ কর তবে এই অমৃতত্বের অধিকারকে যে অপমানিত করবে। কীট যেমন করে ফুলকে খায় তেমনি করে প্রবৃত্তি যে একে খেতে থাকবে। তিনি নিজে বলেছেন : তোরা অমৃতের পুত্র, আমার মতন তোরা। আর আমরা সে কথা প্রতিদিন মিথ্যা করব ?

ভেবে দেখো, মানুষকে কি অমৃতের পুত্র করে তোলা সহজ। মানুষের বিকাশে

যত বাধা ফুলের বিকাশে তত বাধা নেই। সে যে খোলা আকাশে থাকে; সমস্ত আলোকের ধারা বাতাসের ধারা নিয়ত সেই আকাশ ধুয়ে দিচ্ছে— সে বাতাসে তো দূষিত বাষ্প জমা হয়ে তাকে বিষাক্ত করছে না, মুহূর্তে মুহূর্তে আকাশ-ভরা প্রাণ সেই বিষকে ক্ষালন করে দিচ্ছে, তাকে কোথাও জমতে দিচ্ছে না। মানুষের মুশকিল হয়েছে, সে আপনার সংস্কার দিয়ে আপনার চারি দিকে একটা আবরণ উঠিয়েছে; কত যুগের কত আবর্জনাকে সে জমিয়ে জমিয়ে তুলেছে। সে বলে, আকাশের আলোকে আমি বিশ্বাস করব না, আমার ঘরের মাটির দীপকে আমি বিশ্বাস করব; আলোক নতুন, কিন্তু আমার ওই দীপ সনাতন। তার শয়নগৃহে বিষাক্ত বাতাস জমা হয়ে রয়েছে; সেইটেতেই সে পড়ে থাকতে চায়, কেননা, সে যে হল তার সঞ্চিত বাতাস, সে নতুন বাতাস নয়। ঈশ্বরের আলো ঈশ্বরের বাতাস কেবলই যে নতুনকে আনে সেই নতুনকে সে বিশ্বাস করছে না। ঘরের কোণের অন্ধকারটা পুরাতন, তাকেই সে পূজা করে।

এইজন্য ঈশ্বরকে ইতিহাসের বেড়া যুগে যুগে ভাঙতে হয়। তাঁর আলোককে তাঁর আকাশকে যা নিষেধ করে দাঁড়ায় তারই উপরে একদিন তাঁর বজ্র এসে পড়ে, সেইখানে একদিন তাঁর ঝড় বয়। তবে মুক্তি। স্তূপাকার সংস্কার যা জমা হয়ে উঠে সমস্ত চলবার পথকে আটকে বসে আছে সেইখানে রক্তস্রোত বয়ে যায়। তবে মুক্তি। স্বার্থের সঞ্চয় যখন অভ্রভেদী হয়ে ওঠে তখন কামানের গোলা দিয়ে তাকে ভাঙতে হয়। তবে মুক্তি। তখন কান্নায় আকাশ ছেয়ে যায়, কিন্তু সেই কান্নার ধারা নইলে উত্তাপ দূর হবে কেমন করে।

চিরদিন এমনি করে সত্যের সঙ্গে লড়াই করে এসেছে মানুষ। মানুষের নিজের হাতের গড়া জিনিসের উপর মানুষের বড়ো মোহ; সেইজন্য মানুষ নিজের হাতেই নিজে মার খায়। মানুষ নিজের হাতে নিজেকে মারবার গদা তৈরি করে। সেইজন্য আজ সেই নিজের হাতের গড়া গদার আঘাতে রাজ্য-সাম্রাজ্যের সমস্ত সীমা চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। মানুষের স্বার্থবুদ্ধি আজ বলছে, ধর্মবুদ্ধির কোনো কথা আমি শুনতে চাই না, আমি গায়ের জোরে সব কেড়েকুড়ে নেব। সংসারের পোষ্যপুত্র যারা তারা সংসারের ধর্ম গ্রহণ করে; সে ধর্ম, যে সবল সে দুর্বলের উপর প্রভুত্ব করবে। কিন্তু, মানুষ যে সংসারের পুত্র নয়, সে যে অমৃতের পুত্র; সেইজন্য তাকে নিজের গদা দিয়ে স্বার্থের ধর্ম, যা তার পরধর্ম, তাকে ধূলিসাৎ করতে হবে। এ সংগ্রাম মানুষকে করতেই হবে। যা জমিয়েছে তাকে চিরকালই আঁকড়ে ধরে রাখবে এ কেমন মমতা। যেমন দেহের প্রতি আমাদের মমতা। আমরা কি হাজার চেষ্টা করলেও দেহকে রাখতে

পারি। যতই কেঁদে মরি-না কেন, যতই বলি-না কেন যে তার সঙ্গে অনেক দিন ধরে আমার সম্বন্ধ— তাকে রাখতে পারব না, কারণ তাকে রক্ষা মানেই মৃত্যুকে ধরে রাখা। আমাদের যে দেহকে ত্যাগ করে মৃত্যুকেই মারতে হয়। তেমনি বাপ-পিতামহ থেকে যা চলে আসছে, যা জমে রয়েছে, তাকে চিরকাল ধরে রাখবার ইচ্ছাও মৃত্যুকে ধরে রাখবার ইচ্ছামাত্র। দেহকে রাখতে পারলুম না, পুরাতনকেও রাখতে পারব না।

ইতিহাসবিধাতা তাই বললেন নতুন হতে হবে। কামানের গর্জনে আজ সেই বাণীই শুনতে পাচ্ছি, নতুন হতে হবে। জাতীয়তার আদর্শকে নিয়ে য়ুরোপ এতকাল ধরে তার প্রতাপকে অভ্রভেদী করে তুলেছে। ছোটো জাহাজ ছিল, তার পর বড়ো জাহাজ, তার পর বড়ো জাহাজ থেকে আরও বড়ো জাহাজ। কামান ছোটো ছিল, তা থেকে আরও বড়ো কামান গড়ে তুলে য়ুরোপ তার মারণ-অস্ত্র সব এতকাল বসে শানিয়েছে। জলে স্থলে এই-সব ব্যাপার করে তুলে তার তৃপ্তি হল না; আকাশে পর্যন্ত মারবার যন্ত্র তাকে তৈরি করতে হল। নিজের প্রতাপকে এমনি করে অভ্রভেদী করে সে দুর্বলকে টিপে তার রক্ত পান করবে, এমন কথা কি সে বলতে পারে। মানুষ মানুষকে খেয়ে বাঁচবে, এই হবে? ইতিহাসবিধাতা তাই হতে দেবেন? না। তিনি কামানের গর্জনের ধ্বনির ভিতর দিয়ে বলেছেন, নতুন হতে হবে। য়ুরোপে নতুন হবার সেই ডাক উঠেছে।

সেই আহ্বান আমাদের মধ্যে নেই? আমরাই জরাজীর্ণ হয়ে থাকব? ইতিহাস-বিধাতা কি আমাদেরই আশা ত্যাগ করেছেন। দুর্গতির পর দুর্গতি, দুঃখের পর দুঃখ দিয়ে তিনি আমাদের দেশকে বলছেন: না হয় নি, তোমাদেরও হয় নি, নতুনকে লাভ অমৃতকে লাভ হয় নি। তুমি যে আবর্জনাস্তূপ জমিয়েছ তা তোমাকে আশ্রয় দিতে পারে নি। আমি অনন্ত প্রাণ, আমায় বিশ্বাস করো। বীর পুত্র, দুঃসাহসিক পুত্র সব, বেরিয়ে পড়ো।— এই বাণী কি আসে নি। এ কথা তিনি শোনান নি?—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।

শোনো, তোমরা অমৃতের পুত্র, তোমরা দিব্যধামবাসী। তোমাদের এই অন্ধকারের মধ্যে সেই পরপার থেকে আলোক আসছে। সেইখান থেকে যে আলোক আসছে তাতে জাগ্রত হও; বসে বসে চকমকি ঠুকলে দিনকে সৃষ্টি করতে পারবে না। সেই আলোকে যে নব নব দিন অমৃতের বার্তা নিয়ে আসছে। নব নব লীলায় সব নূতন

নূতন হয়ে উঠছে। দুঃখের ভিতর দিয়ে আনন্দ আসছে, রক্তস্রোতের উপর জীবনের শ্বেত শতদল ভেসে উঠছে।

সেই অমৃতের মধ্যে ডুব দাও, তবেই হে বৃদ্ধ, কাননে যে ফুল এইমাত্র ফুটেছে তুমি তার সমবয়সী হবে; আজ ভোরে পূর্বাশার কোলে যে তরুণ সূর্যের জন্ম হয়েছে, হে প্রবীণ, তোমার বয়স তার সঙ্গে মিলবে। বেরিয়ে এসো সেই আনন্দলোকে, সেই মুক্তির ক্ষেত্রে। ভেঙে ফেলো বাধাবিপত্তিকে, নিত্যনূতনের অমৃতলোকে বেরিয়ে এসো। সেই অমৃতসাগরের তীরে এসে অকূলের হাওয়া নিই, সত্যকে দেখি। সত্যকে নিরমুক্ত আলোকের মধ্যে দেখি। সেই সত্য যা নিশীথের সমস্ত তারকার প্রদীপমালা সাজিয়ে আরতি করছে, সেই সত্য যা সূর্যের উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত সাক্ষীর মতো সমস্ত দেখছে। নব নব নবীনতার সেই জ্ঞানময় সত্য যার মধ্যে প্রাণের বিরাম নেই, জড়তার লেশ নেই, যার মধ্যে সমস্ত চৈতন্য পরিপূর্ণ।

ওরে সংকীর্ণ ঘরের অধিবাসী, ঘরের দরজা ভেঙেচুরে ফেলে দাও। আমরা উৎসবের দেবতাকে দর্শন করে মনুষ্যত্বের জয়তিলক এঁকে নেব, আমরা নূতন বর্ম পরিধান করব। আমাদের সংগ্রাম মৃত্যুর সঙ্গে। নিন্দা-অবমাননাকে তুচ্ছ করে অসত্যের সঙ্গে অন্যায়ের সঙ্গে সেই যুদ্ধ করবার অধিকার তিনি দিয়েছেন। এই অভয় বাণী আমরা পেয়েছি—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে দিব্যানি ধামানি তস্থুঃ।

এই কথা বলবার দিন আজ এই ভারতবর্ষেরই এসেছে। আজ প্রতাপে মদোন্মত্ত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে মানুষ বিদ্রোহের ধ্বজা তুলেছে— আমরা যত ছোটো হই সেই বল সংগ্রহ করব যাতে তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলতে পারি, না, এ নয়, তোমরা দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্র, তোমরা মৃত্যুর পুত্র নও।

যে ধনমান পায় নি সেই জোরের সঙ্গে বলতে পারে: আমি সত্যকে পেয়েছি; আমার ঐশ্বর্য নেই, গৌরব নেই, আমার দারিদ্র্য-অবমাননার সীমা নেই, কিন্তু আমার এমন অধিকার রয়েছে যার থেকে আমায় কেউ বঞ্চিত করতে পারে না। আমাদের আর-কিছু নেই বলেই এ কথা আমাদের মুখে যেমন শোনাবে এমন আর কারও মুখে নয়। পৃথিবীর মধ্যে লাঞ্ছিত আমরা, আমরা বলব আমরা অমৃতের পুত্র— এবং আমরাই বলছি যে তোমরাও অমৃতের পুত্র। আজ উৎসবের দিনে এই সুরটি আমাদের কানে নিয়ে যেতে হবে। আমাদের দেশের অপমান দারিদ্র্য অত্যন্ত স্বচ্ছ, সেইজন্যই সত্য আমাদের কাছে প্রকাশ পেতে বাধা পাবে না, সে একেবারে নগ্ন হয়ে দেখা দেবে। পাথরের হর্ম্য

গড়ে তুলে আমরাও আকাশের আলোককে নিরুদ্ধ করব না, আমাদের নিরাশ্রয় দীনের কণ্ঠে বড়ো মধুর স্বরে বাজবে—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে দিব্যানি ধামানি তস্থুঃ।

১০ মাঘ ১৩২১, প্রাতঃকাল

যাত্রীর উৎসব

এই প্রাঙ্গণের বাইরে বিশ্বের যে মন্দিরে সন্ধ্যাকাশের তারা জ্বলে উঠেছে, যেখানে অনন্ত আকাশের প্রাঙ্গণে সন্ধ্যার শান্তি পরিব্যাপ্ত, সেই মন্দিরের দ্বারে গিয়ে প্রণাম করতে তো মন কোনো বাধা পায় না। বিশ্বভুবনে ফুলের যে রঙ সহজে পুষ্পকাননে প্রকাশ পেয়েছে, নক্ষত্রলোকে যে আলো সহজে জ্বলেছে, এখানে তো সে রঙ লাগা সহজ হয় নি, এখানে সম্মিলিত চিত্তের আলো তো সহজে জ্বলে নি। এই মুহূর্তে সন্ধ্যাকালের গন্ধগহন কুসুমের সভায়, নিবিড় তারারাজির দীপালোকিত প্রাঙ্গণে, বিশ্বের নমস্কার কী সৌন্দর্যে কী একান্ত নম্রতায় নত হয়ে রয়েছে! কিন্তু, যেখানে দশজন মানুষ এসেছে সেখানে বাধার অন্ত নেই; সেখানে চিত্তবিক্ষেপ কত ঢেউ তুলেছে— কত সংশয়, কত বিরোধ, কত পরিহাস, কত অস্বীকার, কত ঔদ্ধত্য! সেখানে লোক কত কথাই বলে: এ কোন্ দলের লোক, কোন্ সমাজের, এর কী ভাষা! এ কী ভাবে, এর চরিত্রে কোথায় কী দরিদ্রতা আছে, তাই নিয়ে এত তর্ক! এত প্রশ্ন এত বিরুদ্ধতার মাঝখানে কেমন করে নিয়ে যাব সেই প্রদীপখানি একটু বাতাস যার সয় না, সেই ফুলের অর্ঘ্য কেমন করে পৌঁছে দেব একটু স্পর্শেই যা ম্লান হয়। সেই শক্তি তো আমার নেই যার দ্বারা সমস্ত বিরুদ্ধতা নিরস্ত হবে, সব বিক্ষোভের তরঙ্গ শান্ত হবে। জনতার মাঝখানে যেখানে তাঁর উৎসব সেখানে আমি ভয় পাই, এত বিরুদ্ধতাকে ঠেলে চলতে আমি কুণ্ঠিত।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাজরাজেশ্বর যেখানে তাঁর সিংহাসনে আসীন সেখানে তাঁর চরণে উপবেশন করতে আমি ভয় করি নি। সেখানে গিয়ে বলতে পারি, হে রাজন্, তোমার সিংহাসনের এক পাশে আমায় স্থান দাও। তুমি তো কেবল বিশ্বের রাজা নও, আমার সঙ্গে যে তোমার অনন্ত কালের সম্বন্ধ। এ কথা বলতে কণ্ঠ কম্পিত হয় না, হৃদয় দ্বিধান্বিত হয় না। কিন্তু, ভিড়ের মধ্যে তোমাকে আমার বলে স্বীকার করতে কণ্ঠ যদি কম্পিত হয় তবে মাপ কোরো হে হৃদয়েশ্বর। ভিড়ের মধ্যে যখন ডাক দাও তখন

কোন্ ভাষায় সাড়া দেব। তোমার চরণে হৃদয়ের যে ভাষা সে তো নীরব ভাষা, যে স্তবগান তোমার সে তো অশ্রুত গান। সে যে হৃদয়বীণার তন্ত্রে তন্ত্রে গুঞ্জিত হয়ে ওঠে, সেই বীণা যে তোমার বুকের কাছে তুমি ধরে রেখেছ। যতই ক্ষীণ সুরে সে বাজুক সে তোমার বুকের কাছেই বাজে। কিন্তু, তোমার আমার মাঝখানে যেখানে জনতার ব্যবধান, নীরবে হোক সরবে হোক অন্তরে অন্তরে যেখানে কোলাহল তরঙ্গিত, সেই ব্যবধান ভেদ করে আমার এই ক্ষীণ কণ্ঠের সংগীত যে জাগবে, আমার পূজার দীপালোক যে অনির্বাণ হয়ে থাকবে— এ বড়ো কঠিন, বড়ো কঠিন।

মানুষ গোড়াতেই যে প্রশ্ন করে, কে হে, তুমি কোন্ দলের। এ যে উৎসব— এ তো কোনো এক দল নয়, এ যে শতদল। এ কাদের উৎসব আমি কেমন করে তার নাম দেব। এক-একজন করে কত লোকের নাম বলব। হৃদয়ের ভক্তির প্রদীপ জ্বালিয়ে সমস্ত কোলাহল পার হয়ে স্তব্ধ শান্ত হয়ে যাঁরা এসেছেন আমি তো তাঁদের নাম জানি না। যাঁরা যুগে যুগে এই উৎসবের দীপ জ্বালিয়ে গেছেন এবং যাঁরা অনাগত যুগে এই দীপ জ্বালাবেন তাঁদের কত নাম করব আর কেমন করেই বা করব। আমি এই জানি, যে সম্প্রদায় আপনার বাইরে আসতে চায় না সে নিজের ছাপ মেরে তবে আত্মীয়তা করতে চায়। তাঁর দক্ষিণ মুখের যে অম্লান জ্যোতি অনন্ত আকাশে প্রকাশমান, যে জ্যোতি মনুষ্যত্বের ইতিহাসের প্রবাহে ভাসমান, সম্প্রদায় সেই জ্যোতিকেই নিজের প্রাচীরের মধ্যে অবরুদ্ধ করতে চায়।

উৎসব তো ভক্তির, উৎসব তো ভক্তেরই। সে তো মতের নয়, প্রথার নয়, অনুষ্ঠানের নয়। এ চিরদিনের উৎসব, এ লোকলোকান্তরের উৎসব। সেই অনন্ত-কালের নিত্য-উৎসবের আলো থেকে যে একটুখানি স্ফুলিঙ্গ এখানে এসে পড়ছে যদি কেউ হৃদয়ের দীপমুখে সেটুকু গ্রহণ করে তবেই সে শিখা জ্বলবে, তবেই উৎসব হবে। যদি তা না হয়, যদি কেবল দস্তুর রক্ষা করা হয়, এ যদি কেবল পঞ্জিকার জিনিস হয়, তবে সমস্ত অন্ধকার ; এখানে একটি দীপও তবে জ্বলে নি। সেইজন্য বলছি এ দলের উৎসব নয়, এ হৃদয়ের ভিতরকার ভক্তির উৎসব। আমরা লোক ডেকে আলো জ্বালাতে পারি, কিন্তু লোক ডেকে তো সুধারসের উৎসকে উৎসারিত করতে পারি না। যদি আজ কোনো জায়গায় ভক্তের কোনো একটি আসন পাতা হয়ে থাকে, এ সভার প্রান্তে যদি ভক্তের হৃদয় জেগে থাকে, তবেই সার্থক হয়েছে এই প্রদীপ জ্বালা, সার্থক হয়েছে এই সংগীতের ধ্বনি, এই-সমস্ত উৎসবের আয়োজন।

এই উৎসব যাত্রীর উৎসব। আমরা বিশ্বযাত্রী, পথের ধারের কোনো পান্থশালাতে আমরা বদ্ধ নই। কোনো বাঁধা মতামতের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে দাঁড়িয়ে থেকে উৎসব

হয় না— চলার পথে উৎসব, চলতে চলতে উৎসব। এ উৎসব কবে আরম্ভ হয়েছে। যেদিন এই পৃথিবীতে মায়ের কোলে জন্মগ্রহণ করেছি সেই দিন থেকে এই আনন্দ-উৎসবের আমন্ত্রণ পৌঁচেছে; সেই আহ্বানে সেই দিন থেকে পথে বেরিয়েছি। সেই যাত্রীর সঙ্গে সেই দিন থেকে তুমি যে সহযাত্রী, তাই তো যাত্রীর উৎসব জমেছে। মনে হয়েছিল যে পথে চলেছি সে সংসারের পথ— তার মাঝে সংসার, তার শেষে সংসার; তার লক্ষ্য ধনমান, তার অবসান মৃত্যুতে। কিন্তু না, পথ তো কোথাও ঠেকে না, সমস্তকেই যে ছাড়িয়ে যায়। তুমি সহযাত্রী তার দক্ষিণ-হাত ধরে কত সংকটের মধ্য দিয়ে, সংশয়ের মধ্য দিয়ে, সংগ্রামের ভিতর দিয়ে, তাকে পাশে নিয়ে চলেইছ; কোনো-কিছুতে এসে থামতে দাও নি। সে বিদ্রূপ করেছে, বিরুদ্ধতা করেছে, কিন্তু তুমি তার দক্ষিণ হাত ছাড় নি। তুমি সঙ্গে সঙ্গে চলেছ; তুমি তাকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছ সেই অনন্ত মনুষ্যত্বের বিরাট রাজপথে, সেখানে সমস্ত যাত্রীর দল চিরজীবনের তীর্থে চলেছে। ইতিহাসের সেই প্রশস্ত রাজপথে কী আনন্দকোলাহল, কী জয়ধ্বনি! সেই তো উৎসবের আনন্দধ্বনি! তুমি বদ্ধ কর নি, তুমি বদ্ধ হতে দেবে না, তুমি কোনো মতের মধ্যে প্রথার মধ্যে মানুষকে নজরবন্দী করে রাখবে না। তুমি বলেছ, মাভৈঃ, যাত্রীর দল বেরিয়ে পড়ো। কেন ভয় নেই। কিসে নির্ভয়। তুমি যে সঙ্গে সঙ্গে চলছ। তাই তো যে চলছে সে কেবলই তোমাকে পাচ্ছে। যে চলছে না সে আপনাকেই পাচ্ছে, আপনার সম্প্রদায়কেই পাচ্ছে।

অনন্তকাল যিনি আকাশে পথ দেখিয়ে চলেছেন তিনি কবে চলবে ব'লে কারও জন্যে অপেক্ষা করবেন না। যে বসে রয়েছে সে কি দেখতে পাচ্ছে না তার বন্ধন। সে কি জানে না যে এই বন্ধন না খুলে ফেললে সে মুক্ত হবে না, সে সত্যকে পাবে না। সত্যকে বেঁধেছি, সত্যকে সম্প্রদায়ের কারাগারে বন্দী করেছি এমন কথা কে বলে! অনন্ত সত্যকে বন্দী করবে? তুমি যত বড়ো মুগ্ধ হও-না কেন, তোমার মোহ-অন্ধকারের জাল বুনিয়ে বুনিয়ে অনন্ত সত্যকে ঘিরে ফেলবে এত বড়ো স্পর্ধার কথা কোন্ সম্প্রদায় উচ্চারণ করতে পারে!

সত্যকে হাজার হাজার বৎসর ধরে বেঁধে অচল করে রেখে দিয়েছি, এই বলে আমরা গৌরব করে থাকি। সত্যকে পথ চলতে বাধা দিয়েছি— তাকে বলেছি, তোমার আসন এইটুকুর মধ্যে, এর বাহিরে নয়, তুমি গণ্ডি ডিঙিয়ো না, তুমি সমুদ্র পেরিয়ো না। সত্যের অভিভাবক আমি, আমি তাকে মিথ্যার বেড়ার মধ্যে খাড়া দাঁড় করিয়ে রাখব— মুগ্ধদের জন্য সত্যের সঙ্গে মিথ্যাকে যে পরিমাণে মেশানো দরকার সেই মেশানোর ভার আমার উপর— এমন সব স্পর্ধাবাক্য আমরা এতদিন

বসে এসেছি। ইতিহাসবিধাতা সেই স্পর্ধা চূর্ণ করবেন না? মানুষ অন্ধ জড়প্রথার কারাপ্রাচীর যেখানে অভ্রভেদী করে তুলবে এবং সত্যের জ্যোতিকে প্রতিহত করবে সেখানে তাঁর বজ্র পড়বে না? তিনি এ কেমন করে সহ্য করবেন। তিনি কি বলতে পারেন যে তিনি বন্দী। তিনি এ কথা বললে সংসারকে কে বাঁচাবে। তিনি বলেছেন : সত্য মুক্ত, আমি মুক্ত, সত্যের পথিক তোমরা মুক্ত। এই উদ্‌বোধনের মন্ত্র মুক্তির মন্ত্র এখনই নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে ; অনন্তকাল জাগ্রত থেকে তারা সেই জ্যোতির্ময় মন্ত্র উচ্চারণ করছে। জপ করছে এই মন্ত্র সেই চিরজাগ্রত তপস্বীরা : জাগ্রত হও, জাগ্রত হও ; প্রাচীর দিয়ে বাঁধিয়ে সত্যকে বন্দী করে রাখবার চেষ্টা কোরো না। সত্য তা হলে নিদারুণ হয়ে উঠবে ; যে লোহার শৃঙ্খল তার হাতকে বাঁধবে সেই শৃঙ্খল দিয়ে তোমার মস্তকে সে করাঘাত করবে।

রুদ্ধ সত্যের সেই করাঘাত কি ভারতবর্ষের ললাটে এসে পড়ে নি। সত্যকে ফাঁসি পরাতে চেয়েছে যে দেশ সে দেশ কি সত্যের আঘাতে মূর্ছিত হয় নি। অপমানে মাথা হেঁট হয় নি? সইবে না বন্ধন ; বড়ো দুঃখে ভাঙবে, বড়ো অপমানে ভাঙবে। সেই উদ্‌বোধনের প্রলয়মন্ত্র পৃথিবীতে জেগেছে, সেই ভাঙবার মন্ত্র জেগেছে। বসে থাকবার নয়, কোণের মধ্যে তামসিকতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে থাকবার নয় — চলবার, ভাঙবার ডাক আজ এসেছে। আজকের সেই উৎসব, সেই সত্যের মধ্যে উদ্‌বোধিত হবার উৎসব।

আমরা সেই মুক্তির মন্ত্র পেয়েছি। কালের স্রোতে ডুবল না 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম', অন্তহীন সত্য, অন্তহীন ব্রহ্মের মন্ত্র। কবে ভারতবর্ষের তপোবনে কোন্ সুদূর প্রাচীন কালে এই মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল— অন্ত নেই তার অন্ত নেই। অন্তহীন যাত্রাপথে সত্যকে পেতে হবে, জ্ঞানকে পেতে হবে। সমস্ত সম্প্রদায়ের বাইরে দাঁড়িয়ে মুক্ত নীলাকাশের তলে একদিন আমাদের পিতামহ এই মুক্তির মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন। সেই-যে মুক্তির আনন্দঘোষণার উৎসব সে কি এই ঘরের কোণে বসে আমরা কজনে সম্পন্ন করব, এই কলকাতা শহরের এক প্রান্তে। ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত এই মুক্তির উৎসবের আনন্দধ্বনি বেজে উঠবে না? এই মুক্তির বাণীকে আমাদের পিতামহ কোথা থেকে পেয়েছিলেন। এই অনন্ত আকাশের জ্যোতির ভিতর থেকে একে তিনি পেয়েছেন, বিশ্বের মর্মকুহর থেকে এই মুক্তিমন্ত্রের ধ্বনি শুনতে পেয়েছেন। এই-যে মুক্তির মন্ত্র আগুনের ভাষায় আকাশে গীত হচ্ছে, সেই আগুনকে তাঁরা এই ক'টি সহজ বাণীর মধ্যে প্রস্ফুটিত করেছেন। সেই বাণী আমরা ভুলব? আর বলব সত্য পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে ইতিহাসের

জীর্ণ দেয়ালে ভাঙা-ঘড়ির কাঁটার মতো চিরদিনের জন্য থেমে গেছে ? গৌরব করে বলব 'আমাদেরই দেশে সচল সত্য অচল পাথর হয়ে গেছে— বুকের উপরে সেই জগদ্দল পাথরের ভার আমরা বইছি' ? না, কখনোই না। উদ্‌বোধনের মন্ত্র আজ জগৎ জুড়ে বাজছে: যাত্রী, বেরিয়ে এসো, বেরিয়ে এসো। ভেঙে ফেলো তোমার নিজের হাতের রচিত কারাগার। সেই যাত্রীদের সঙ্গে চলো যারা চন্দ্র-সূর্য-তারার সঙ্গে এক তালে পা ফেলে ফেলে চলছে। ১১ মাঘ ১৩২১, সন্ধ্যার উদ্‌বোধন

মাধুর্যের পরিচয়

আমাদের মন্ত্রে আছে : পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি। তুমি আমাদের পিতা, তুমি পিতা আমাদের এই বোধ দাও। এই পিতার বোধ আমাদের অন্তঃকরণে সজাগ নেই বলে আমাদের যেমনই ক্ষতি হোক, পিতার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের দিক দিয়ে তাঁর কাজ সমানই চলেছে। আমাদের বোধের অসম্পূর্ণতাতে তাঁর কোনো ব্যাঘাত হয় নি। তিনি তাঁর সমস্ত সন্তানের মধ্যে চৈতন্য ও প্রাণ প্রেরণ করেছেন, তাঁর পিতৃত্ব মানবসমাজে কাজ করেই চলেছে।

কিন্তু, এক জায়গায় তিনি সুপ্ত হয়ে আছেন; তিনি যেখানে আমাদের প্রিয়তম সেখানে তিনি জাগেন নি। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার প্রেম উদ্‌বোধিত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আত্মার গভীর অন্ধকার নির্জনতার মধ্যে সেই প্রিয়তম সুপ্ত হয়ে আছেন। সংসারের সকল রসের ভিতরে যে তাঁর রস, সকল মাধুর্য সকল প্রীতির মূলে যে তাঁর প্রীতি— এ কথা আমি জানলুম না। আমার প্রেম জাগল না। অথচ তিনি যে সত্যই প্রিয়তম এ কথা সত্য। এ বললে স্বতোবিরুদ্ধতা দোষ ঘটে ? কারণ, তিনি যদি প্রিয়তম তবে তাঁকে ভালোবাসি না কেন। কিন্তু, তা বললে কী হবে, তিনি আমার প্রিয়তম না হলে এত বেদনা আমি পাব কেন। কত মানুষের ভিতরে জীবনের তৃপ্তির সন্ধান করা গেল, ধনমানের পিছনে পিছনে মরীচিকার সন্ধানে ফেরা গেল; মন ভরল না, সে কেঁদে বলল, 'জীবন ব্যর্থ হল— এমন একটি এককে পেলুম না যার কাছে সমস্ত প্রীতিকে নিঃশেষে নিবেদন করে দিতে পারি, দ্বিধা-সংশয়ের হাত থেকে একেবারে নিষ্কৃতি পেতে পারি।' ক্ষণে ক্ষণে এ মানুষকে ও মানুষকে আশ্রয় করলুম; কিন্তু, জীবনের সেই-সব প্রেমের বিচ্ছিন্ন মুহূর্তগুলিকে ভরে তুলবে কেমন করে। কোন্ মাধুর্যের প্লাবনে ছেদগুলো সব ভরে যাবে। এমন একের কাছে আপনাকে নিবেদন করি নি বলেই এত বেদনা পাচ্ছি।

তিনি যে আমার প্রিয়তম এই কথাটা জানলুম না বলেই এত দুঃখ আমার। তিনি সত্যই প্রিয়তম বলেই যা পাচ্ছি তারই মধ্যে দুঃখ রয়ে যাচ্ছে ; তাতে প্রেম চরিতার্থ হচ্ছে কই। আমরা সব সন্ধানের মধ্যে একেকেই খুঁজছি, এমন কিছুকে খুঁজছি যা সব বিচ্ছিন্নতাকে জোড়া দেবে। জ্ঞান কি জোড়া দিতে পারে। জ্ঞান একটা বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুকে একবার মিলিয়ে দেখে, একবার বিশ্লেষ করে দেখে। বিরোধটাকে মেটাতে পারে প্রেম, বৈচিত্র্যের সামঞ্জস্য ঘটাতে পারে প্রেম। বৈচিত্র্যের এই মরুভূমির মধ্যে আমাদের তৃষ্ণা কেবলই বেড়ে উঠতে থাকে ; জ্ঞান সেই বৈচিত্র্যের অন্তহীন সূত্রকে টেনে নিয়ে ঘুরিয়ে মারবে— সে তৃষ্ণা মেটাবে কেমন করে। সেই প্রেম না জাগা পর্যন্ত কী ঘোরাটাই ঘুরতে হয়! একবার ভাবি ধনী হই, ধনে বিচ্ছিন্নতা ভরে দেবে, সোনায় রুপোয় সব পূর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু, সোনায় রুপোয় সে ফাঁক কি ভরতে পারে। খ্যাতি-প্রতিপত্তি, মানুষের উপরে প্রভাববিস্তার, কিছু দিয়েই সেই ফাঁক ভরে না। প্রেমে সব ফাঁক ভরে যায়, সব বৈচিত্র্য মিলে যায়। মানুষ যে তার সমস্ত চেষ্টার ভিতর দিয়ে কেবলই সেই প্রেমকে খুঁজে বেড়াচ্ছে— সত্যই যে তার প্রিয়তম। সত্য যদি প্রিয়তম না হবেন তবে তাঁর বিরহে মানুষ কি এমন করে লুটিয়ে পড়ত। যাকে সত্য বলে আঁকড়ে ধরতে যায় সে যখন শূন্য হয়ে যায় তখন মানুষের সেই বেদনার মতো বেদনা আর কী আছে। মানুষ তাই একান্তমনে এই কামনাই করছে : আমার সকল প্রেমের মধ্যে সেই একের প্রেমরস বর্ষিত হোক,আমার সব রন্ধ্র পূর্ণ হয়ে যাক। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে পাত্রের মতো করে তাঁর প্রেমের অমৃতে পূর্ণ করে মানুষ পান করতে চায়। অন্তরাত্মার এই কামনা, এই সাধনা, এই ক্রন্দন। কিন্তু অহমের কোলাহলে এ কান্না তার নিজের কানেই পৌঁচচ্ছে না। প্রতিবারেই সে মনে করছে, বড্ড ঠকেছি, আর ঠকা নয়, এবার যা চাচ্ছি তাতেই আমার সব অভাব ভরে যাবে। হায় রে, সে অভাব কি আর-কিছুতে ভরে! এমন মোহান্ধ কেউ নেই যার আত্মা পরম বিরহে এই বলে কাঁদছে না 'প্রিয়তম জাগলেন না'। ফুলের মালা টাঙানো হয়েছে, বাতি জ্বালানো হয়েছে, সব আয়োজন পূর্ণ, শুধু তাঁকে ডাকলুম না— তাঁকে জাগালুম না।

যেখানে তিনি পিতামাতা সেখানে তিনি অন্নপান দিচ্ছেন, প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখছেন। মায়ের ভাণ্ডার তো খোলা রয়েছে ; ধরণীর ভোজে মা পরিবেশন করছেন, পর্যাপ্ত পরিমাণে সব দিচ্ছেন। সেখানে কোনো বাধা নেই। কিন্তু, যখন জগতের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করি এত সৌন্দর্য কেন, এত ফুল ফুটল কেন, আকাশে এত তারার প্রদীপ জ্বলল কেন, জীবনে মাঝে মাঝে বসন্তের দক্ষিনে হাওয়া যৌবনের মর্মরধ্বনি

জাগিয়ে তোলে কেন, তখন বুঝি যে প্রিয়তম জাগলেন না— তাঁরই জাগার অপেক্ষায় যে এত আয়োজন।

তাই আমি আমার অন্তরাত্মাকে যা-কিছু এনে দিচ্ছি সে সব পরিহার করছে। সে বলছে, এ নয়, এ নয়, এ নয়— আমি আমার প্রিয়তমকে চাই। আমি তাঁকে না পেয়েই তো পাপে লুটোচ্ছি, আমি ক্ষুধাতৃষ্ণার এই দাহ সহ্য করছি, আমি চারি দিকে আমার অশান্ত প্রবৃত্তি নিয়ে দস্যুবৃত্তি করে বেড়াচ্ছি। যাঁকে পেলে সব মিলবে তাঁকে পাওয়া হয় নি বলেই এত আঘাত দিচ্ছি। যদি তাঁকে পেতুম বলতুম, 'আমার হয়ে গেছে। আমার দিনের পর দিন, জীবনের পর জীবন ভরে গেল।'

সমস্ত সৌন্দর্যের মাঝখানে যেদিন সেই সুন্দরকে দেখলুম, সমস্ত মাধুর্যের ভিতরে যেদিন সেই মধুরকে পেলুম, সেদিন আমার মাধুর্যের পরিচয় দেব কিসে। মাধুর্যে বিগলিত হয়ে কি পরিচয় দেব। না। মাধুর্যের পরিচয় মাধুর্যে নয়, মাধুর্যের পরিচয় বীর্যে। সেদিন মৃত্যুকে স্বীকার করে পরিচয় দেব। বলব, প্রিয়তম হে, মরব তোমার জন্য। আমার আর শোক নেই, ক্ষুদ্রতা নেই, ক্ষতি নেই। প্রাণের মায়া আর আমার রইল না— বলো-না তুমি, প্রাণকে তোমার কোন্ কাজে দিতে হবে। তোমাকে পেলে ধুলোয় লুটিয়ে কেঁদে বেড়াব তা নয়, কেবল মধুর রসের গান করব তা নয় গো। যেদিন বলতে পারব 'যিনি মধুর পরম মধুর, যিনি সুন্দর পরম সুন্দর, তিনি আমার প্রিয়তম, তিনি আমায় স্পর্শ করেছেন' সেদিন আনন্দে দুর্গম পথে সমস্ত কণ্টককে পায়ে দলে চলে যাব। সেদিন জানব যে কর্মে কোনো ক্লান্তি থাকবে না, ত্যাগে কোথাও কৃপণতা থাকবে না। কোনো বাধাকে বাধা বলে মানব না। মৃত্যু সেদিন সামনে দাঁড়ালে তাকে বিদ্রূপ করে চলে যাব। সেদিন বুঝব তাঁর সঙ্গে আমার মিলন হয়েছে। মানুষকে সেই মিলন পেতেই হবে। দেখতে হবে দুঃখকে মৃত্যুকে সে ভয় করে না। স্পর্ধা করে বীরত্ব করলে সে বীরত্ব টেঁকে না— জগৎ-ভরা আনন্দ যেদিন অন্তরে সুধাস্রোতে বয়ে যাবে সেদিন মানুষের সমস্ত মনুষ্যত্ব সরল হবে, তার কর্ম সহজ হবে, তার ত্যাগ সহজ হবে। সেদিন মানুষ বীর। সেদিন ইচ্ছা করে সে বিপদকে বরণ করবে।

প্রিয়তম যে জাগবেন সে খবর পাব কেমন করে। গান যে বেজে উঠবে। কী গান বাজবে। সে তো সহজ গান নয়, সে যে রুদ্রবীণার গান। সেই গান শুনে মানুষ বলে উঠবে, সৌন্দর্যে অভিভূত হব বলে এ পৃথিবীতে জন্মাই নি, সৌন্দর্যের সুধারসে পেয়ালা ভরে তাকে নিঃশেষে পান করে মৃত্যুকে উপেক্ষা করে চলে যাব। মাধুর্যের প্রকাশ কেবল ললিতকলায় নয়। এই সৌন্দর্যসুধার মধ্যে বীর্যের আগুন রয়েছে; মানুষ যেদিন এই সৌন্দর্যসুধা পান করবে সেদিন দুঃখের মাথার উপরে সে দাঁড়াবে, আগুনে

ঝাঁপ দিয়ে পড়বে। মানুষ বিষয়বিষরসের মত্ততায় বিহ্বল হয়ে সেই আনন্দরসকে পান করল না। সেই আনন্দের মধ্যে বীর্যের অগ্নি রয়েছে, সেই অগ্নিতেই সমস্ত গ্রহচন্দ্রলোক দীপ্যমান হয়ে উঠেছে— সেই বীর্যের অগ্নি মানুষের মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তুলল না। অথচ মানুষের অন্তরাত্মা জানে যে জগতের সুধাপাত্র পরিপূর্ণ আছে বলেই মৃত্যু এখানে কেবলই মরছে এবং জীবনের ধারাকে প্রবাহিত করছে - প্রাণের কোথাও বিরাম নেই। অন্তরাত্মা জানে যে সেই সুধার ধারা জীবন থেকে জীবনান্তরে, লোক থেকে লোকান্তরে ধয়েই চলেছে। কত যোগী, কত প্রেমী, কত মহাপুরুষ সেই সুধার ধারায় সমস্ত জীবনকে ডুবিয়ে অমৃতত্বের সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে ডাক দিয়ে বলেছেন: তোমরা অমৃতের পুত্র, মৃত্যুর পুত্র নও।

কিন্তু, সে কথায় মানুষের বিশ্বাস হয় না। সে যে বিষয়ের দাসত্ব করছে সেইটেই তার কাছে বাস্তব, আর এ-সব কথা তার কাছে শূন্য ভাবুকতামাত্র। সে তাই এ-সব কথাকে বিদ্রূপ করে, আঘাত করে, অবিশ্বাস করে। যাঁরা অমৃতের বাণী এনেছেন মানুষ তাই তাঁদের মেরেছে। তাঁরা যেমন মানুষের হাতে মার খেয়েছেন এমন আর কেউ নয়, অথচ তাঁরা তো মলেন না। তাঁদের প্রাণই শত সহস্র বৎসর ধরে সজীব হয়ে রইল। কারণ, তাঁরাই যে মার খেতে পারেন; তাঁরা যে অমৃতের সন্ধান পেয়েছেন। মৃত্যুর দ্বারা তাঁরা অমৃতের প্রমাণ করেন। মানুষের দরজায় এসে দাঁড়ালে মানুষ তাঁদের আতিথ্য দেয় নি, আতিথ্য দেবে না; মানুষ তাঁদের শত্রু বলে জেনেছে। কারণ, আমরা আমাদের যত-কিছু মত বিশ্বাস সমস্ত পাথরে বাঁধিয়ে রেখে দিয়েছি, ওই-সব পাগলকে ঘরে ঢোকালে সে-সমস্ত যে বিপর্যস্ত হয়ে যাবে এই মানুষের মস্ত ভয়। মৃত্যুকে কৌটার মধ্যে পুরে লোহার সিন্দুকে লুকিয়ে রেখে দিয়েছি, ওরা ঘরে এলে কি আর রক্ষা আছে! লোহার সিন্দুক ভেঙে যে মৃত্যুকে এরা বার করবে।

সেই মৃত্যুকেই তাঁরা মারতে আসেন। তাঁরা মরে প্রমাণ করেন আছে সুধা সমস্ত বিশ্বকে পূর্ণ করে। নিঃশেষে পরম আনন্দে সেই সুধার পাত্র থেকে তাঁরা পান করেন। তাঁরা প্রিয়তমকে জেনেছেন, প্রিয়তম তাঁদের জীবনে জেগেছেন।

আমাদের গানে তাই আমরা ডাকছি: প্রিয়তম হে, জাগো, জাগো, জাগো। কেন না, প্রিয়তম হে, তুমি জাগ নি বলেই মনুষ্যত্ব বিকাশ হল না, পৌরুষ পরাহত হয়ে রইল। তোমার কণ্ঠের বিজয়মাল্য দাও পরিয়ে তুমি আমাদের কণ্ঠে, জয়ী করো সংগ্রামে। সংসারের যুদ্ধে পরাভূত হতে দিয়ো না। বাঁচাও, তোমার অমৃতপাত্র আমার মুখে এনে দাও। অপমানের মধ্যে পরাভবের মধ্যে তোমাকে ডাকছি: জাগো, জাগো, জাগো। জাগরণের আলোকে সমস্ত দেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠুক। ১১ মাঘ ১৩২১, সন্ধ্যার উপদেশ

একটি মন্ত্র

মানুষের পক্ষে সব চেয়ে ভয়ংকর হচ্ছে অসংখ্য। এই অসংখ্যের সঙ্গে একলা মানুষ পেরে উঠবে কেন। সে কত জায়গায় হাতজোড় করে দাঁড়াবে। সে কত পুজার অর্ঘ্য কত বলির পশু সংগ্রহ করে মরবে। তাই মানুষ অসংখ্যের ভয়ে ব্যাকুল হয়ে কত ওঝা ডেকেছে কত জাদুমন্ত্র পড়েছে তার ঠিক নেই।

একদিন সাধক দেখতে পেলেন, যা-কিছু টুকরো টুকরো হয়ে দেখা দিচ্ছে তাদের সমস্তকে অধিকার করে এবং সমস্তকে পেরিয়ে আছে সত্যং। অর্থাৎ, যা-কিছু দেখছি তাকে সম্ভব করে আছে একটি না-দেখা পদার্থ।

কেন, তাকে দেখি নে কেন। কেননা, সে যে কিছুর সঙ্গে স্বতন্ত্র হয়ে দেখা দেবার নয়। সমস্ত স্বতন্ত্রকে আপনার মধ্যে ধারণ করে সে যে এক হয়ে আছে। সে যদি হত 'একটি' তা হলে তাকে নানা বস্তুর এক প্রান্তে কোনো একটা জায়গায় দেখতে পেতুম। কিন্তু সে যে হল 'এক', তাই তাকে অনেকের অংশ করে বিশেষ করে দেখবার জো রইল না।

এত বড়ো আবিষ্কার মানুষ আর কোনো দিন করে নি। এটি কোনো বিশেষ সামগ্রীর আবিষ্কার নয়, এ হল মন্ত্রের আবিষ্কার। মন্ত্রের আবিষ্কারটি কী। বিজ্ঞানে যেমন অভিব্যক্তিবাদ— তাতে বলছে জগতে কোনো জিনিস একেবারেই সম্পূর্ণ হয়ে শুরু হয় নি, সমস্তই ক্রমে ক্রমে ফুটে উঠছে। এই বৈজ্ঞানিক মন্ত্রটিকে মানুষ যতই সাধন ও মনন করছে ততই তার বিশ্ব-উপলব্ধি নানা দিকে বেড়ে চলেছে।

মানুষের অনেক কথা আছে যাকে জানবামাত্রই তার জানার প্রয়োজনটি ফুরিয়ে যায়, তার পরে সে আর মনকে কোনো খোরাক দেয় না। রাত পোহালে সকাল হয় এ কথা বার বার চিন্তা করে কোনো লাভ নেই। কিন্তু, যেগুলি মানুষের অমৃতবাণী সেইগুলিই হল তার মন্ত্র। যতই সেগুলি ব্যবহার করা যায় ততই তাদের প্রয়োজন আরও বেড়ে চলে। মানুষের সেইরকম একটি অমৃতমন্ত্র কোনো-এক শুভক্ষণে উচ্চারিত হয়েছিল : সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

কিন্তু, মানুষ সত্যকে কোথায় বা অনুভব করলে। কোথাও কিছুই তো স্থির হয়ে নেই, দেখতে দেখতে এক আর হয়ে উঠছে। আজ আছে বীজ, কাল হল অঙ্কুর, অঙ্কুর থেকে হল গাছ, গাছ থেকে অরণ্য। আবার সেই সমস্ত অরণ্য স্লেটের উপর ছেলের হাতে আঁকা হিজিবিজির মতো কতবার মাটির উপর থেকে মুছে মুছে

যাচ্ছে। পাহাড়-পর্বতকে আমরা বলি ধ্রুব; কিন্তু সেও যেন রঙ্গমঞ্চের পট, এক-এক অঙ্কের পর তাকে কোন্ নেপথ্যের মানুষ কোথায় যে গুটিয়ে তোলে দেখা যায় না। চন্দ্র সূর্য তারাও যেন আলোকের বুদ্‌বুদের মতো অন্ধকারসমুদ্রের উপর ফুটে ফুটে ওঠে, আবার মিলিয়ে মিলিয়ে যায়। এইজন্যেই তো সমস্তকে বলি সংসার, আর সংসারকে বলি স্বপ্ন, বলি মায়া। সত্য তবে কোন্‌খানে।

সত্যের তো প্রকাশ এমনি করেই, এই চিরচঞ্চলতায়। নৃত্যের কোনো একটি ভঙ্গিও স্থির হয়ে থাকে না, কেবলই তা নানাখানা হয়ে উঠছে। তবু যে দেখছে সে আনন্দিত হয়ে বলছে 'আমি নাচ দেখছি'। নাচের সমস্ত অনিত্য ভঙ্গিই তালে মানে বাঁধা একটি নিরবচ্ছিন্ন সত্যকে প্রকাশ করছে। আমরা নাচের নানা ভঙ্গিকেই মুখ্য করে দেখছি নে; আমরা দেখছি তার সেই সত্যটিকে, তাই খুশি হয়ে উঠছি। যে ভাঙা গাড়িটা রাস্তার ধারে অচল হয়ে পড়ে আছে সে আপনার জড়ত্বের গুণেই পড়ে থাকে; কিন্তু যে গাড়ি চলছে তার সারথি, তার বাহন, তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তার চলবার পথ, সমস্তেরই পরস্পরের মধ্যে একটি নিয়তপ্রবৃত্ত সামঞ্জস্য থাকা চাই, তবেই সে চলে। অর্থাৎ, তার দেশকালগত সমস্ত অংশপ্রত্যংশকে অধিকার ক'রে, তাদের যুক্ত ক'রে, তাদের অতিক্রম করে যদি সত্য না থাকে তবে সে গাড়ি চলে না।

যে ব্যক্তি বিশ্বসংসারে এই কেবলই বদল হওয়ার দিকেই নজর রেখেছে সেই মানুষই হয় বলছে 'সমস্তই স্বপ্ন' নয় বলছে 'সমস্তই বিনাশের প্রতিরূপ— অতি ভীষণ'। সে হয় বিশ্বকে ত্যাগ করবার জন্যে ব্যগ্র হয়েছে নয় ভীষণ বিশ্বের-দেবতাকে দারুণ উপচারে খুশি করবার আয়োজন করছে। কিন্তু, যে লোক সমস্ত তরঙ্গের ভিতরকার ধারাটি, সমস্ত ভঙ্গির ভিতরকার নাচটি, সমস্ত সুরের ভিতরকার সংগীতটি দেখতে শুনতে পাচ্ছে সেই তো আনন্দের সঙ্গে বলে উঠছে সত্যং। সেই জানে, বৃহৎ ব্যাবসা যখন চলে তখনই বুঝি সেটা সত্য, মিথ্যা হলেই সে দেউলে হয়ে অচল হয়। মহাজনের মূলধনের যদি সত্য পরিচয় পেতে হয় তবে যখন তা খাটে তখনই তা সম্ভব। সংসারের সমস্ত-কিছু চলছে বলেই সমস্ত মিথ্যা, এটা হল একেবারেই উল্‌টো কথা। আসল কথা সত্য বলেই সমস্ত চলছে। তাই আমরা চারি দিকেই দেখছি সত্তা আপনাকে স্থির রাখতে পারছে না, সে আপনার কূল ছাপিয়ে দিয়ে অসীম বিকাশের পথে এগিয়ে চলেছে।

এই সত্য পদার্থটি, যা সমস্তকে গ্রহণ করে অথচ সমস্তকে পেরিয়ে চলে, তাকে মানুষ বুঝতে পারলে কেমন করে। এ তো তর্ক করে বোঝবার জো ছিল না; এ আমরা নিজের প্রাণের মধ্যেই যে একেবারে নিঃসংশয় করে দেখেছি। সত্যের রহস্য সব চেয়ে স্পষ্ট করে ধরা পড়ে গেছে তরুলতায় পশুপাখিতে। সত্য যে প্রাণস্বরূপ তা এই

পৃথিবীর রোমাঞ্চরূপী ঘাসের পত্রে পত্রে লেখা হয়ে বেরিয়েছে। নিখিলের মধ্যে যদি একটি বিরাট প্রাণ না থাকত তবে এই জগৎজোড়া লুকোচুরি খেলায় সে তো একটি ঘাসের মধ্যেও ধরা পড়ত না।

এই ঘাসটুকুর মধ্যে আমরা কী দেখছি। যেমন গানের মধ্যে আমরা তান দেখে থাকি। বৃহৎ অঙ্গের ধ্রুপদ গান চলছে; চৌতালের বিলম্বিত লয়ে তার ধীর মন্দ গতি; যে ওস্তাদের মনে সমগ্র গানের রূপটি বিরাজ করছে মাঝে মাঝে সে লীলাচ্ছলে এক-একটি ছোটো ছোটো তানে সেই সমগ্রের রূপটিকে ক্ষণেকের মধ্যে দেখিয়ে দেয়। মাটির তলে জলের ধারা রহস্যে ঢাকা আছে, ছিদ্রটি পেলে সে উৎস হয়ে ছুটে বেরিয়ে আপনাকে অল্পের মধ্যে দেখিয়ে দেয়। তেমনি উদ্ভিদে পশুপাখিতে প্রাণের যে চঞ্চল লীলা ফোয়ারার মতো ছুটে ছুটে বেরোয় সে হচ্ছে অল্পপরিসরে নিখিল সত্যের প্রাণময় রূপের পরিচয়।

এই প্রাণের তত্ত্বটি কী তা যদি কেউ আমাদের জিজ্ঞাসা করে তবে কোনো সংজ্ঞার দ্বারা তাকে আটেঘাটে বেঁধে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিতে পারি এমন সাধ্য আমাদের নেই। পৃথিবীতে তাকেই বোঝানো সব চেয়ে শক্ত যাকে আমরা সব চেয়ে সহজে বুঝেছি। প্রাণকে বুঝতে আমাদের বুদ্ধির দরকার হয় নি, সেইজন্যে তাকে বোঝাতে গেলে বিপদে পড়তে হয়। আমাদের প্রাণের মধ্যে আমরা দুটি বিরোধকে অনায়াসে মিলিয়ে দেখতে পাই। এক দিকে দেখি আমাদের প্রাণ নিয়ত চঞ্চল; আর-এক দিকে দেখি সমস্ত চাঞ্চল্যকে ছাপিয়ে, অতীতকে পেরিয়ে, বর্তমানকে অতিক্রম করে প্রাণ বিস্তীর্ণ হয়ে বর্তে আছে। বস্তুত সেই বর্তে থাকার দিকেই দৃষ্টি রেখে আমরা বলি আমরা বেঁচে আছি। এই একই কালে বর্তে না থাকা এবং বর্তে থাকা, এই নিত্য চাঞ্চল্য এবং নিত্য স্থিতির মধ্যে ন্যায়শাস্ত্রের যদি কোনো বিরোধ থাকে তবে তা ন্যায়শাস্ত্রেই আছে— আমাদের প্রাণের মধ্যে নেই।

যখন আমরা বেঁচে থাকতে চাই তখন আমরা এইটেই তো চাই। আমরা আমাদের স্থিতিকে চাঞ্চল্যের মধ্যে মুক্তি দান করে এগিয়ে চলতে চাই। যদি আমাদের কেউ অহল্যার মতো পাথর করে স্থির করে রাখে তবে বুঝি যে সেটা আমাদের অভিশাপ। আবার যদি আমাদের প্রাণের মুহূর্তগুলিকে কেউ চকমকি-ঠোকা স্ফুলিঙ্গের মতো বর্ষণ করতে থাকে তা হলে সে প্রাণকে আমরা একখানা করে পাই নে বলে তাকে পাওয়াই হয় না।

এমনি করে প্রাণময় সত্যের এমন একটি পরিচয় নিজের মধ্যে অনায়াসে পেয়েছি যা অনির্বচনীয় অথচ সুনিশ্চিত, যা আপনাকে আপনি কেবল ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে চলেছে,

যা অসীমকে সীমায় আকারবদ্ধ করতে করতে এবং সীমাকে অসীমের মধ্যে মুক্তি দিতে দিতে প্রবাহিত হচ্ছে। এর থেকেই নিখিল সত্যকে আমরা নিখিলের প্রাণরূপে জানতে পারছি। বুঝতে পারছি এই সত্য সকলের মধ্যে থেকেই সকলকে অতিক্রম করে আছে বলে বিশ্বসংসার কেবলই চলার দ্বারাই সত্য হয়ে উঠছে। এইজন্য জগতে স্থিরত্বই হচ্ছে বিনাশ, কেননা স্থিরত্বই হচ্ছে সীমায় ঠেকে যাওয়া। এইজন্যেই বলা হয়েছে: যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং। এই যা-কিছু সমস্তই প্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পিত হচ্ছে।

তবে কি সমস্তই প্রাণ। আর, অপ্রাণ কোথাও নেই? অপ্রাণ আছে, কেননা দ্বন্দ্ব ছাড়া সৃষ্টি হয় না। কিন্তু, সেই অপ্রাণের দ্বারা সৃষ্টির পরিচয় নয়। প্রাণটাই হল মুখ্য, অপ্রাণটা গৌণ।

আমরা চলবার সময় যখন পা ফেলি তখন প্রত্যেক পা ফেলা একটা বাধায় ঠেকে। কিন্তু চলার পরিচয় সেই বাধায় ঠেকে যাওয়ার দ্বারা নয়, বাধা পেরিয়ে যাওয়ার দ্বারা। নিখিল সত্যেরও এক দিকে বাধা, আর-এক দিকে বাধামোচন। সেই বাধামোচনের দিকেই তার পরিচয়; সেই দিকেই সে প্রাণস্বরূপ; সেই দিকেই সে সমস্তকে মেলাচ্ছে এবং চালাচ্ছে।

যেদিন এই কথাটি আমরা ঠিকমতো উপলব্ধি করতে পেরেছি সেদিন আমাদের ভয়ের দিন নয়, ভিক্ষার দিন নয়; সেদিন কোনো উচ্ছৃঙ্খল দেবতাকে অদ্ভুত উপায়ে বশ করবার দিন নয়। সেদিন বিশ্বের সত্যকে আমারও সত্য বলে আনন্দিত হবার দিন।

সেদিন পূজারও দিন বটে। কিন্তু, সত্যের পূজা তো কথার পূজা নয়। কথায় ভুলিয়ে সত্যের কাছে তো বর পাবার জো নেই। সত্য প্রাণময়, তাই প্রাণের মধ্যেই সত্যের পূজা। আমরা প্রত্যক্ষ দেখেছি মানুষ সত্যের বর পাচ্ছে, তার দৈন্য দূর হচ্ছে, তার তেজ বেড়ে উঠছে। কোথায় দেখেছি। যেখানে মানুষের চিত্ত অচল নয়, যেখানে তার নব নব উদ্‌যোগ, যেখানে সামনের দিকে মানুষের গতি, যেখানে অতীতের খোঁটায় সে আপনাকে আপাদমস্তক বেঁধেছেঁদে স্থির হয়ে বসে নেই, যেখানে আপনার এগোবার পথকে সকল দিকে মুক্ত রাখবার জন্যে মানুষ সর্বদাই সচেতন। জ্বালানি কাঠ যখন পূর্ণতেজে জ্বলে না তখন সে ধোঁয়ায় কিম্বা ছাইয়ে ঢাকা পড়ে। তেমনি দেখা গেছে, যে জাতি আপনার প্রাণকে চলতে না দিয়ে কেবলই বাঁধতে চেয়েছে তার সত্য সকল দিক থেকেই ম্লান হয়ে এসে তাকে নির্জীব করে; কেননা সত্যের ধর্ম জড়ধর্ম নয়, প্রাণধর্ম— চলার দ্বারাই তার প্রকাশ।

নিজের ভিতরকার বেগবান প্রাণের আনন্দে মানুষ যখন অক্লান্ত সন্ধানের পথে সত্যের পূজা বহন করে তখনই বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে তারও সৃষ্টি চারি দিকে বিচিত্র হয়ে ওঠে ; তখন তার রথ পর্বত লঙ্ঘন করে, তার তরণী সমুদ্র পার হয়ে যায়, তখন কোথাও তার আর নিষেধ থাকে না। তখন সে নূতন নূতন সংকটের মধ্যে ঘা পেতে থাকে বটে, কিন্তু নুড়ির ঘা খেয়ে ঝর্নার কলগান যেমন আরও জেগে ওঠে তেমনি ব্যাঘাতের দ্বারাই বেগবান প্রাণের মুখে নূতন নূতন ভাষার সৃষ্টি হয়। আর, যারা মনে করে স্থির হয়ে থাকাই সত্যের সেবা, চলাই সনাতন সত্যের বিরুদ্ধে অপরাধ, তাদের অচলতার তলায় ব্যাধি দারিদ্র্য অপমান অব্যবস্থা কেবলই জমে ওঠে, নিজের সমাজ তাদের কাছে নিষেধের কাঁটাখেত, দূরের লোকালয় তাদের কাছে দুর্গম। নিজের দুর্গতির জন্যে তারা পরকে অপরাধী করতে চায়, এ কথা ভুলে যায় যে যে-সব দড়িদড়া দিয়ে তারা সত্যকে বন্দী করতে চেয়েছিল সেইগুলো দিয়ে তারা আপনাকে বেঁধে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে আছে।

যদি জানতে চাই মানুষের বুদ্ধিশক্তিটা কী তবে কোন্‌খানে তার সন্ধান করব। যেখানে মানুষের গণনাশক্তি চিরদিন ধরে পাঁচের বেশি আর এগোতে পারলে না সেইখানে? যদি জানতে চাই মানুষের ধর্ম কী তবে কোথায় যাব। যেখানে সে ভূতপ্রেতের পূজা করে, কাষ্ঠলোষ্ট্রের কাছে নরবলি দেয় সেইখানে? না, সেখানে নয়। কেননা, সেখানে মানুষ বাঁধা পড়ে আছে। সেখানে তার বিশ্বাসে তার আচরণে সম্মুখীন গতি নেই। চলার দ্বারাই মানুষ আপনাকে জানতে থাকে, কেননা চলাই সত্যের ধর্ম। যেখানে মানুষ চলার মুখে, সেইখানেই আমরা মানুষকে স্পষ্ট করে দেখতে পাই— কেননা মানুষ সেখানে আপনাকে বড়ো করে দেখায়— যেখানে আজও সে পৌঁছোয় নি সেখানটিকেও সে আপনার গতিবেগের দ্বারা নির্দেশ করে দেয়। তার ভিতরকার সত্য তাকে চলার দ্বারাই জানাচ্ছে যে, সে যা তার চেয়ে সে অনেক বেশি।

তবেই দেখতে পাচ্ছি সত্যের সঙ্গে সঙ্গে একটি জানা লেগে আছে। আমাদের যে বিকাশ সে কেবল হওয়ার বিকাশ নয়, সে জানার বিকাশ। হতে থাকার দ্বারা চলতে থাকার দ্বারাই আপনাকে আমরা জানতে থাকি।

সত্যের সঙ্গে সঙ্গেই এই জ্ঞান লেগে রয়েছে, সেইজন্যেই মন্ত্রে আছে : সত্যং জ্ঞানং। অর্থাৎ, সত্য যার বাহিরের বিকাশ জ্ঞান তার অন্তরের প্রকাশ। যে সত্য কেবলই হয়ে উঠছে মাত্র অথচ সেই হয়ে-ওঠা আপনাকেও জানছে না, কাউকে কিছু জানাচ্ছেও না, তাকে আছে বলাই যায় না। আমার মধ্যে জ্ঞানের আলোটি যেমনি জ্বলে অমনি

যা-কিছু আছে সমস্ত আমার মধ্যে সার্থক হয়। এই সার্থকতাটি বৃহৎভাবে বিশ্বের মধ্যে নেই, অথচ খণ্ডভাবে আমার মধ্যে আছে, এমন কথা মনে করতে পারে নি বলেই মানুষ বলেছে : সত্যং জ্ঞানং। সত্য সর্বত্র, জ্ঞানও সর্বত্র। সত্য কেবলই জ্ঞানকে ফল দান করছে, জ্ঞান কেবলই সত্যকে সার্থক করছে— এর আর অবধি নেই। এ যদি না হয় তবে অন্ধ সৃষ্টির কোনো অর্থই নেই।

উপনিষদে ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলেছে তাঁর 'স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ'। অর্থাৎ, তাঁর জ্ঞান বল ও ক্রিয়া স্বাভাবিক। তাঁর বল আর ক্রিয়া এই তো হল যা-কিছু ; এই তো হল জগৎ। চার দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি বল কাজ করছে ; স্বাভাবিক এই কাজ। অর্থাৎ, আপনার জোরেই আপনার এই কাজ চলছে ; এই স্বাভাবিক বল ও ক্রিয়া যে কী জিনিস তা আমরা আমাদের প্রাণের মধ্যে স্পষ্ট করে বুঝতে পারি। এই বল ও ক্রিয়া হল বাহিরের সত্য। তারই সঙ্গে সঙ্গে একটি অন্তরের প্রকাশ আছে, সেইটি হল জ্ঞান। আমরা বুদ্ধিতে বোঝবার চেষ্টায় দুটিকে স্বতন্ত্র করে দেখছি, কিন্তু বিরাটের মধ্যে এ একেবারে এক হয়ে আছে। সর্বত্র জ্ঞানের চালনাতেই বল ও ক্রিয়া চলছে এবং বল ও ক্রিয়ার প্রকাশেই জ্ঞান আপনাকে উপলব্ধি করছে। 'স্বাভাবিকী জ্ঞান-বলক্রিয়া চ' মানুষ এমন কথা বলতেই পারত না, যদি সে নিজের মধ্যে স্বাভাবিক জ্ঞান ও প্রাণ এবং উভয়ের যোগ একান্ত অনুভব না করত। এইজন্যই গায়ত্রীমন্ত্রে এক দিকে বাহিরের ভূর্ভুবঃ স্বঃ এবং অন্য দিকে অন্তরের ধী উভয়কেই একই পরমশক্তির প্রকাশরূপে ধ্যান করবার উপদেশ আছে।

যেমন প্রদীপের মুখের ছোটো শিখাটি বিশ্বব্যাপী উত্তাপেরই অঙ্গ তেমনি আমার প্রাণ বিশ্বের প্রাণের অঙ্গ, তেমনি আমার জানাও বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়।

মানুষ পৃথিবীর এক কোণে বসে যুক্তির দাঁড়িপাল্লায় সূর্যকে ওজন করছে এবং বলছে, আমার জ্ঞানের জোরেই বিশ্বের রহস্য প্রকাশ হচ্ছে। কিন্তু, এ জ্ঞান যদি তারই জ্ঞান হত তবে এটা জ্ঞানই হত না ; বিরাট জ্ঞানের যোগেই সে যা-কিছু জানতে পারছে। মানুষ অহংকার করে বলে 'আমার শক্তিতেই আমি কলের গাড়ি চালিয়ে দূরত্বের বাধা কাটাচ্ছি' ; কিন্তু তার এই শক্তি যদি বিশ্বশক্তির সঙ্গে না মিলত তা হলে সে এক পাও চলতে পারত না।

সেইজন্যে যেদিন মানুষ বললে সত্যং সেইদিনই একই প্রাণময় শক্তিকে আপনার মধ্যে এবং আপনার বাহিরে সর্বত্র দেখতে পেলে। যেদিন বললে জ্ঞানং সেইদিন সে বুঝলে যে সে যা-কিছু জানছে এবং যা-কিছু ক্রমে জানবে সমস্তই একটি বৃহৎ জানার মধ্যে জাগ্রত রয়েছে। এইজন্যই আজ তার এই বিপুল ভরসা জন্মেছে যে তার শক্তির

এবং জ্ঞানের ক্ষেত্র কেবলই বেড়ে চলবে, কোথাও সে থেমে যাবে না। এখন সে আপনারই মধ্যে অসীমের পথ পেয়েছে, এখন তাকে আর যাগযজ্ঞ জাদুমন্ত্র পৌরোহিত্যের শরণ নিতে হবে না। এখন তার প্রার্থনা এই—

অসতো মা সদ্‌গময়

তমসো মা জ্যোতির্গময়।

অসত্যের জড়তা থেকে চিরবিকাশমান সত্যের মধ্যে আমাকে নিয়ত চালনা করো, অন্ধকার হতে আমার জ্ঞানের আলোক উন্মীলিত হতে থাক্।

আমাদের মন্ত্রের শেষ বাক্যটি হচ্ছে : অনন্তং ব্রহ্ম। মানুষ আপনার সত্যের অনুভবে সত্যকে সর্বত্র দেখছে, আপনার জ্ঞানের আলোকে জ্ঞানকে সর্বত্র জানছে, তেমনি আপনার আনন্দের মধ্যে মানুষ অনন্তের যে পরিচয় পেয়েছে তারই থেকে বলছে 'অনন্তং ব্রহ্ম'।

কোথায় সেই পরিচয়। আমাদের মধ্যে অনন্ত সেখানেই যেখানে আমরা আপনাকে দান করে আনন্দ পাই। দানের দ্বারা যেখানে আমাদের কেবলমাত্র ক্ষতি সেইখানেই আমাদের দারিদ্র্য, আমাদের সীমা, সেখানে আমরা কৃপণ। কিন্তু, দানই যেখানে আমাদের লাভ, ত্যাগই যেখানে আমাদের পুরস্কার, সেখানেই আমরা আমাদের ঐশ্বর্যকে জানি, আমাদের অনন্তকে পাই। যখন আমাদের সীমারূপী অহংকেই আমরা চরম বলে জানি তখন কিছুই আমরা ছাড়তে চাই নে, সমস্ত উপকরণকে তখন দু হাতে আঁকড়ে ধরি— মনে করি বস্তুপুঞ্জের যোগেই আমরা সত্য হব, বড়ো হব। আর, যখনই কোনো বৃহৎ প্রেম বৃহৎ ভাবের আনন্দ আমাদের মধ্যে জেগে ওঠে তখনই আমাদের কৃপণতা কোথায় চলে যায়! তখন আমরা রিক্ত হয়ে পূর্ণ হয়ে উঠি, মৃত্যুর দ্বারা অমৃতের আস্বাদ পাই। এইজন্য মানুষের প্রধান ঐশ্বর্যের পরিচয় বৈরাগ্যে, আসক্তিতে নয়, আমাদের সমস্ত নিত্যকীর্তি বৈরাগ্যের ভিত্তিতে স্থাপিত। তাই মানুষ বলেছে : ভূমৈব সুখং, ভূমাই আমার সুখ ; ভূমাত্বের বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ, ভূমাকেই আমার জানতে হবে ; নাল্পে সুখমস্তি, অল্পে আমার সুখ নেই।

এই ভূমাকে মা যখন সন্তানের মধ্যে দেখে তখন তার আর আত্মসুখের লালসা থাকে না। এই ভূমাকে মানুষ যখন স্বদেশের মধ্যে দেখে তখন তার আর আত্মপ্রাণের মমতা থাকে না। যে সমাজনীতিতে মানুষকে অবজ্ঞা করা ধর্ম বলে শেখায় সে সমাজের ভিতর থেকে মানুষ আপনার অনন্তকে পায় না ; এইজন্যই সে সমাজে কেবল শাসনের পীড়া আছে, কিন্তু ত্যাগের আনন্দ নেই। মানুষকে আমরা মানুষ বলেই জানি নে যখন তাকে আমরা ছোটো করে জানি। মানুষ সম্বন্ধে যেখানে আমাদের জ্ঞান কৃত্রিম সংস্কারের

ধূলিজালে আবৃত সেইখানেই মানুষের মধ্যে ভূমা আমাদের কাছে আচ্ছন্ন। সেখানে কৃপণ মানুষ আপনাকে ক্ষুদ্র বলতে, অক্ষম বলতে, লজ্জা বোধ করে না। 'সত্যকে মতে মানি, কাজে করতে পারি নে' এ কথা স্বীকার করতে সেখানে সংকোচ ঘটে না। সেখানে মঙ্গল-অনুষ্ঠানও বাহ্য-আচার-গত হয়ে ওঠে। কিন্তু, মানুষের মধ্যে ভূমা যে আছে, এই জন্যই ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ, ভূমাকে না জানলে সত্য জানা হয় না। সমাজের মধ্যে যখন সেই জানা সকল দিকে জেগে উঠবে তখন মানুষ 'আনন্দরূপমমৃতং' আপনার আনন্দরূপকে অমৃতরূপকে সর্বত্র সৃষ্টি করতে থাকবে। প্রদীপের শিখার মতো আত্ম-দানেই মানুষের আত্ম-উপলব্ধি। এই কথাটি আপনার মধ্যে নানা আকারে প্রত্যক্ষ করে মানুষ অনন্তস্বরূপকে বলেছে 'আত্মদা', তিনি আপনাকে দান করছেন, সেই দানেই তাঁর পরিচয়।

এইবার আমাদের সমস্ত মন্ত্রটি একবার দেখে নিই : সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

অনন্ত ব্রহ্মের সীমারূপটি হচ্ছে সত্য। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সত্যনিয়মের সীমার মধ্য দিয়েই অনন্ত আপনাকে উৎসর্গ করছেন। প্রশ্ন এই যে, সত্য যখন সীমায় বদ্ধ তখন অসীমকে প্রকাশ করে কেমন করে। তার উত্তর এই যে, সত্যের সীমা আছে, কিন্তু সত্য সীমার দ্বারা বদ্ধ নয়। এইজন্যই সত্য গতিমান্। সত্য আপনার গতির দ্বারা কেবলই আপনার সীমাকে পেরিয়ে পেরিয়ে চলতে থাকে, কোনো সীমায় এসে একেবারে ঠেকে যায় না। সত্যের এই নিরন্তর প্রকাশের মধ্যে আত্মদান করে অনন্ত আপনাকেই জানছেন, এই জন্যই মন্ত্রের একপ্রান্তে সত্যং আর-এক প্রান্তে অনন্তং ব্রহ্ম— তারই মাঝখানে জ্ঞানং।

এই কথাটিকে বাক্যে বলতে গেলেই স্বতোবিরোধ এসে পড়ে। কিন্তু, সে বিরোধ কেবল বাক্যেরই। আমরা যাকে ভাষায় বলি সীমা সেই সীমা ঐকান্তিকরূপে কোথাও নেই, তাই সীমা কেবলই অসীমে মিলিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমরা যাকে ভাষায় বলি অসীম সেই অসীমও ঐকান্তিক ভাবে কোথাও নেই, তাই অসীম কেবলই সীমায় রূপগ্রহণ করে প্রকাশিত হচ্ছেন। সত্যও অসীমকে বর্জন করে সীমায় নিশ্চল হয়ে নেই, অসীমও সত্যকে বর্জন করে শূন্য হয়ে বিরাজ করছেন না। এইজন্য ব্রহ্ম সীমা এবং সীমা-হীনতা দুইয়েরই অতীত, তাঁর মধ্যে রূপ এবং অপরূপ দুইই সংগত হয়েছে।

তাঁকে বলা হয়েছে 'বলদা', তাঁর বল তাঁর শক্তি বিশ্বসত্যরূপে প্রকাশিত হচ্ছে; আবার আত্মদা, সেই সত্যের সঙ্গে সেই শক্তির সঙ্গে তাঁর আপনার বিচ্ছেদ ঘটে নি— সেই শক্তির যোগেই তিনি আপনাকে দিচ্ছেন। এমনি করেই সসীম অসীমের, অরূপ সরূপের, অপরূপ মিলন ঘটে গেছে। সত্যং এবং অনন্তং অনির্বচনীয়রূপে পরস্পরের যোগে একই কালে প্রকাশমান হচ্ছে। তাই অসীমের আনন্দ সসীমের অভিমুখে,

সসীমের আনন্দ অসীমের অভিমুখে। তাই ভক্ত ও ভগবানের আনন্দমিলনের মধ্যে আমরা সসীম ও অসীমের এই বিশ্বব্যাপী প্রেমলীলার চিররহস্যটিকে ছোটোর মধ্যে দেখতে পাই। এই রহস্যটি রবিচন্দ্রতারার পর্দার আড়ালে নিত্যকাল চলেছে; এই রহস্যটিকে বুকের ভিতরে নিয়ে বিশ্বচরাচর রসবৈচিত্র্যে বিচিত্র হয়ে উঠেছে। সত্যের সঙ্গে অনন্তের এই নিত্যযোগ লোকস্থিতির শান্তিতে, সমাজস্থিতির মঙ্গলে ও জীবাত্মা-পরমাত্মার একাত্ম মিলনে শান্তং শিবমদ্বৈতম্ রূপে প্রকাশমান হয়ে উঠছে। এই শান্তি জড়ত্বের নিশ্চল শান্তি নয়, সমস্ত চাঞ্চল্যের মর্ম-নিহিত শান্তি; এই মঙ্গল দ্বন্দ্ববিহীন নির্জীব মঙ্গল নয়, সমস্ত দ্বন্দ্বমন্থনের আলোড়ন-জাত মঙ্গল; এই অদ্বৈত একাকারত্বের অদ্বৈত নয়, সমস্ত বিরোধবিচ্ছেদের সমাধান-কারী অদ্বৈত। কেননা, তিনি 'বলদা আত্মদা'; সত্যের ক্ষেত্রে শক্তির মধ্য দিয়েই তিনি কেবলই আপনাকে দান করছেন।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম— এই মন্ত্রটি তো কেবলমাত্র ধ্যানের বিষয় নয়, এটিকে প্রতিদিনের সাধনায় জীবনের মধ্যে গ্রহণ করতে হবে।

সেই সাধনাটি কী। আমাদের জীবনে সত্যের সঙ্গে অনন্তের যে বাধা ঘটিয়ে বসেছি, যে বাধা-বশত আমাদের জ্ঞানের বিকার ঘটছে, সেইটে দূর করে দিতে থাকা।

এই বাধা ঘটিয়েছে আমাদের অহং। এই অহং আপনার রাগদ্বেষের লাগাম এবং চাবুক নিয়ে আমাদের জীবনটাকে নিজের সুখদুঃখের সংকীর্ণ পথেই চালাতে চায়। তখন আমাদের কর্মের মধ্যে শান্তকে পাই নে, আমাদের সম্বন্ধের মধ্যে শিবের অভাব ঘটে এবং আত্মার মধ্যে অদ্বৈতের আনন্দ থাকে না। কেননা, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম; অনন্তের সঙ্গে যোগে তবেই সত্য জ্ঞানময় হয়ে ওঠে। তবেই আমাদের জ্ঞানবলক্রিয়া স্বাভাবিক হয়। যাদের জীবন বেগে চলছে, অথচ কেবলমাত্র আপনাকেই কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করছে, তাদের সেই চলা সেই বলক্রিয়া কলুর বলদের চলার মতো; তা স্বাভাবিক নয়, তা জ্ঞানময় নয়।

আবার, যারা জীবনের সত্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে অনন্তকে কর্মহীন সন্ন্যাসের মধ্যে উপলব্ধি করতে কিম্বা ভাবরসের মাদকতায় উপভোগ করতে চায় তাদেরও এই ধ্যানের কিম্বা রসের সাধনা বন্ধ্যা। তাদের চেষ্টা হয় শূন্যকেই দোহন করতে থাকে নয় নিজের কল্পনাকেই সফলতা বলে মনে করে। যাদের জীবন সত্যের চিরবিকাশ-পথে চলছে না, কেবল শূন্যতাকে বা রসভোগবিহ্বল নিজের মনটাকেই বারে বারে প্রদক্ষিণ করছে, তাদের সেই অন্ধ সাধনা হয় জড়ত্ব নয় প্রমত্ততা।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম এই মন্ত্রটিকে যদি গ্রহণ করি তবে আমাদের মনকে প্রবৃত্তির চাঞ্চল্য ও অহংকারের ঔদ্ধত্য থেকে নিরমুক্ত করবার জন্যে একান্ত চেষ্টা করতে হবে—

তা না হলে আমাদের কর্মের কলুষ এবং জ্ঞানের বিকার কিছুতেই ঘুচবে না। আমাদের যে অহং আজ মাথা উঁচু করে আমাদের সত্য এবং অনন্তের মধ্যে ব্যবধান জাগিয়ে অজ্ঞানের ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে সে যখন প্রেমে বিনম্র হয়ে তার মাথা নত করতে পারবে তখন আমাদের জীবনে সেই অহংই হবে সসীম ও অসীমের মিলনের সেতু; তখন আমাদের জীবনে তারই সেই নম্রতার উপরে প্রতিষ্ঠিত হবে সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যখন সুখদুঃখের চাঞ্চল্য আমাদের অভিভূত করবে তখন এই শান্তিমন্ত্র স্মরণ করতে হবে: সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যখন মান অপমান তরঙ্গদোলায় আমাদের ক্ষুব্ধ করতে থাকে তখন এই মঙ্গলমন্ত্র স্মরণ করতে হবে: সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যখন কল্যাণের আহ্বানে দুর্গম পথে প্রবৃত্ত হবার সময় আসবে তখন এই অভয়মন্ত্র স্মরণ করতে হবে: সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যখন বাধা প্রবল হয়ে উঠে সেই পথ রুদ্ধ করে দাঁড়াবে তখন এই শক্তিমন্ত্র স্মরণ করতে হবে: সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যখন মৃত্যু এসে প্রিয়বিচ্ছেদের ছায়ায় আমাদের জীবনযাত্রার পথকে অন্ধকারময় করে তুলবে তখন এই অমৃতমন্ত্র স্মরণ করতে হবে: সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আমাদের জীবনগত সত্যের সঙ্গে আনন্দময় ব্রহ্মের যোগ পূর্ণ হতে থাক্; তা হলেই আমাদের জ্ঞান নির্মল হয়ে আমাদের সমস্ত ক্ষোভ হতে, মত্ততা হতে, অবসাদ হতে রক্ষা করবে। নদী যখন চলতে থাকে তখন তার চলার সঙ্গে সঙ্গেই যেমন একটি কলসংগীত বাজে আমাদের জীবন তেমনি প্রতি ক্ষণেই মুক্তির পথে সত্য হয়ে চলুক; যাতে তার চলার সঙ্গে সঙ্গেই এই অমৃত-বাণীটি সংগীতের মতো বাজতে থাকে: সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যিনি বিশ্বরূপে আপনাকে দান করছেন তাঁকে প্রতিদানরূপে আত্মনিবেদন করব, সেই নিত্য মালা-বদলের আনন্দ-মন্ত্রটি হোক: সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আর আমাদের জীবনের প্রার্থনা হোক—

অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতংগময়।

জড়তা হতে আমাদের সত্যে নিয়ে যাও, মূঢ়তা হতে আমাদের জ্ঞানে নিয়ে যাও, মৃত্যুর খণ্ডতা হতে আমাদের অমৃতে নিয়ে যাও।

অবিরাম হোক সেই তোমার নিয়ে যাওয়া, সেই আমাদের চিরজীবনের গতি। কেননা, তুমি আবিঃ, প্রকাশই তোমার স্বভাব; বিনাশের মধ্যে তোমার আনন্দ আপনাকে বিলুপ্ত করে না, বিকাশের মধ্যে দিয়ে তোমার আনন্দ আপনাকে বিস্তার করে। তোমার সেই পরমানন্দের বিকাশ আমাদের জীবনে জ্ঞানে প্রেমে কর্মে, আমাদের গৃহে সমাজে দেশে, বাধামুক্ত হয়ে প্রসারিত হোক, জয় হোক তোমার!

১৫ মাঘ ১৩২০। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে পঠিত

চৈত্র ১৩২০

১৭

উদ্‌বোধন

আজ আমাদের আশ্রমের এই বিশেষ দিনে আমাদের চিত্ত জাগ্রত হোক। সংসারের মধ্যে আমাদের যে উৎসবের দিন আসে সে দিন অন্য দিন থেকে স্বতন্ত্র, প্রতিদিনের সঙ্গে তার সুর মেলে না। কিন্তু, আমাদের এই উৎসবের দিনের সঙ্গে প্রতিদিনের যোগ আছে, এ যেন মোতির হারের মাঝখানে হীরার দোলক। যোগ আছে, আবার বিশেষত্বও আছে। কেননা, ওই বিশেষত্বের জন্যে মানুষের একটু আকাঙ্ক্ষা আছে। মানুষ এক-একদিন প্রতিদিনের জীবন থেকে একটু সরে এসে তার আনন্দের আস্বাদ পেতে চায়। যেজন্যে আমরা ঘরের অন্নকে একটু দূরে নিয়ে খাবার জন্যে বনভোজনে যাই। প্রত্যহের সামগ্রীকেই তার অভ্যাস থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটু নূতন করে পেতে চাই। তাই আজ আমরা আমাদের আশ্রমের অন্নকে একটু সরে এসে একটু বিশেষ করে ভোগ করবার জন্যে আয়োজন করেছি।

কিন্তু, বনভোজনের আয়োজনে যখন খাদ্যসামগ্রী দূরে এবং একটু বড়ো করে বয়ে নিয়ে যেতে হয় তখন আমাদের ভাঁড়ারের হিসাবটা মুহূর্তের মধ্যে চোখে পড়ে যায়। যদি প্রতিদিন অপব্যয় হয়ে থাকে তা হলে সেদিন দেখব টানাটানি পড়ে গেছে।

আজ আমাদের অমৃত-অন্নের বনভোজনের আয়োজনে হয়তো অভাব দেখতে পাব। যদি পাই, তবে সেই অন্তরের অভাবকে বাইরের কী দিয়েই বা ঢাকা দেব। যারা শহরে থাকে তাদের সাজসরঞ্জামের অভাব নেই, তাই দিয়েই তারা তাদের উৎসবের মানরক্ষা করতে পারে। আমাদের এখানে সে-সমস্ত উদ্‌যোগের পথ বন্ধ। কিন্তু, ভয় নেই। প্রতিদিনই আমাদের আশ্রমের উৎসবের বায়না দেওয়া গেছে। এখানকার শালবনে পাখির বাসায়, এখানকার প্রান্তরের আকাশে বাতাসের খেলার প্রাঙ্গণে, প্রতিদিনই আমাদের উৎসবের সুর কিছু-না-কিছু জমেছে। কিন্তু প্রতিদিনের অন্যমনস্কতায় সেই রোশনচৌকি ভালো করে প্রাণে পৌঁছয় নি। আজ আমাদের অভ্যাসের জড়তাকে ঠেলে দিয়ে একবার মন দিতে পারলেই হয়, আর-কিছু বাইরে থেকে সংগ্রহ করতে হবে না। চিত্তকে শান্ত করে বসি, অঞ্জলি করে হাত পাতি, তা হলে মধুবনের মধুফল আপনিই হাতে এসে পড়বে। যে আয়োজন চারি দিকে আপনিই হয়ে আছে তাকেই ভোগ করাই যে আমাদের উৎসব। প্রতিদিন ডাকি নি বলেই যাঁকে দেখি নি আজ মনের সঙ্গে ডাক দিলেই যে তাঁকে দেখতে পাব। বাইরের উত্তেজনায়

ধাক্কা দিয়ে মনকে চেতিয়ে তোলা, তাতে আমাদের দরকার নেই। কেননা, তাতে লাভ নেই, বরঞ্চ শক্তির ক্ষয় হয়। গাছের ভিতরের রসে যখন বসন্তের নাড়া পায় তখনই ফুল ফোটে; সেই ফুলই সত্য। বাইরের উত্তেজনায় যে ক্ষণিক মোহ আনে সে কেবল মরীচিকা; তাতে যেন না ভুলি। আমাদের ভিতরকার শক্তিকে উদ্‌বোধিত করি। ক্ষণকালের জন্যেও যদি তার সাড়া পাই তখন তার সার্থকতা চিরদিনের। যদি মুহূর্তের জন্যও আমরা সত্য হতে পারি তবে সে সত্য কোনোদিন মরবে না; সেই অমৃতবীজ চিরকালের মতো আমাদের চিরজীবনের ক্ষেত্রে বোনা হয়ে যাবে। যে পুণ্য হোমাগ্নি বিশ্বের যজ্ঞশালায় চিরদিন জ্বলছে তাতে যদি ঠিকমতো করে একবার আমাদের চিত্ত-প্রদীপের মুখটুকু ঠেকিয়ে দিতে পারি তা হলে সেই মুহূর্তেই আমাদের শিখাটুকু ধরে উঠতে পারে।

সত্যের মধ্যে আজ আমাদের জাগরণ সম্পূর্ণ হোক, এই প্রভাতের আলোক আজ আমাদের আবরণ না হোক, আজ চিরজ্যোতি প্রকাশিত হোন, ধরণীর শ্যামল যবনিকা আজ যেন কিছু গোপন না করে— আজ চিরসুন্দর দেখা দিন। শিশু যেমন মাকে সম্পূর্ণরূপে আলিঙ্গন করে তেমনি করেই আজ সেই পরম চৈতন্যের সঙ্গে আমাদের চৈতন্যের মিলন হোক। যেমন কবির কাব্য পাঠ করবার সময় তাঁর ছন্দ ও ভাষার ভিতর দিয়ে কবির আনন্দের মধ্যে গিয়ে আমাদের চিত্ত উপনীত হয় তেমনি করে আজ এই শিশিরস্নানে স্নিগ্ধ নির্মল বিশ্বশোভার অন্তরে সেই বিশ্বের আনন্দকে যেন সমস্ত হৃদয় মন দিয়ে প্রত্যক্ষ অনুভব করি। ৭ পৌষ ১৩২০

মাঘ ১৩২০

মুক্তির দীক্ষা

আমাদের আশ্রমের উৎসবের ভিতরকার তত্ত্বটি কী তাই আজ আমাদের বিশেষ করে জানবার দিন। যে মহাত্মা এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আজ তাঁরই দীক্ষা-দিনের সাম্বৎসরিক। আজকের এই উৎসবটি তাঁর জন্মদিনের বা মৃত্যুদিনের উৎসব নয়, তাঁর দীক্ষাদিনের উৎসব। তাঁর এই দীক্ষার কথাই এই আশ্রমের ভিতরকার কথা।

সকলেই জানেন যে এক সময়ে যখন তিনি যৌবনবয়সে বিলাসের মধ্যে ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত পালিত হয়েছিলেন তখন হঠাৎ তাঁর পিতামহীর মৃত্যু হওয়াতে তাঁর অন্তরে অত্যন্ত বেদনা উপস্থিত হল। সেই বেদনার আঘাতে চারি দিক থেকে আবরণ উন্মোচিত হয়ে গেল। যে সত্যের জন্যে তাঁর হৃদয় লালায়িত হল তাকে তিনি কোথায় পাবেন, তাকে কেমন করে পাবেন, এই ভেবে তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ তার চারি দিকে যে-সকল অভ্যাস রয়েছে, যে-সব প্রথা চিরকাল চলে আসছে, তারই মধ্যে বেশ আরামে থাকে— যতক্ষণ পর্যন্ত ভিতরে যে সত্য রয়েছে তা তার অন্তরে জাগ্রত না হয়— ততক্ষণ তার এই বেদনাবোধ থাকে না। যেমন, যখন আমরা ঘুমিয়ে থাকি তখন ছোটো খাঁচায় ঘুমোলেও কষ্ট হয় না, কিন্তু জেগে উঠলে আর সেই খাঁচার মধ্যে থাকতে পারি না। তখন সংকীর্ণ জায়গাতে আর আমাদের কুলোয় না। ধনমান যখন আমাদের বেষ্টন করে থাকে তখন তো আমাদের কোনো অভাব বোধ হয় না। আমরা সংসারে বেশ আরামে আছি এই মনে করেই নিশ্চিন্ত থাকি। শুধু ধনমান কেন, পুরুষানুক্রমে যে-সব বিধিব্যবস্থা আচারবিচার চলে আসছে তার মধ্যেও নিবিষ্ট থাকলে মনে হয়— এ বেশ, আর নতুন করে কোনো চিন্তা বা চেষ্টা করবার দরকার নেই। কিন্তু, একবার যথার্থ সত্যের পিপাসা জাগ্রত হলে দেখতে পাই যে সংসারই মানুষের শেষ জায়গা নয়। আমরা যে ধুলোয় জন্মে ধুলোয় মিশব তা নয়। জীবন-মৃত্যুর চেয়ে অনেক বড়ো আমাদের আত্মা। সেই আত্মা উদ্‌বোধিত হলে বলে ওঠে : কী হবে আমার এই চিরকালের অভ্যাস নিয়ে, আচার নিয়ে! এ তো আমার নয়। এতে আরাম আছে, এতে কোনো ভাবনাচিন্তা নেই, এতেই সংসার চলে যাচ্ছে, তা জানি। কিন্তু, এ আমার নয়!— সংসারের পনেরো-আনা লোক যেমন ধনমানে বেষ্টিত হয়ে সন্তুষ্ট হয়ে আছে তেমনি যে-সমস্ত আচারবিচার চলে আসছে তারও মধ্যে তারা আরামে রয়েছে। কিন্তু, একবার যদি কোনো আঘাতে এই আবরণ ছিন্ন হয়ে যায় অমনি মনে হয়, এ কী কারাগার! এ আবরণ তো আশ্রয় নয়।

এক-একজন লোক সংসারে আসেন যাঁদের কোনো আবরণে আবদ্ধ করতে পারে না। তাঁদের জীবনেই বড়ো বড়ো আঘাত এসে পৌঁছোয় আবরণ ভাঙবার জন্যে, এবং তাঁরা সংসারে যাকে অভ্যস্ত আরাম বলে লোকে অবলম্বন করে নিশ্চিন্ত থাকে তাকে কারাগার বলেই নির্দেশ করেন। আজ যাঁর কথা বলছি তাঁর জীবনে সেই ঘটনা ঘটেছিল। তাঁর পরিবারে ধনমানের অভাব ছিল না, চিরাগত প্রথা সেখানে আচরিত হত। কিন্তু, এক মুহূর্তেই মৃত্যুর আঘাতে তিনি যেমনি জাগলেন অমনি বুঝলেন যে এর মধ্যে শান্তি নেই। তিনি বললেন : আমার পিতাকে আমি জানতে চাই — দশজনের মতো করে তাঁকে জানতে চাই না, তাঁকে জানতে পারি না। সত্যকে তিনি জীবনে প্রত্যক্ষভাবে জানতে চেয়েছিলেন; দশজনের মুখের কথায় শাস্ত্রবাক্যে আচারে-বিচারে তাঁকে জানবার চেষ্টাকে তিনি পরিহার করেছিলেন। সেই যে তাঁর উদ্‌বোধন, সে প্রত্যক্ষ সত্যের মধ্যে উদ্‌বোধন; সেই প্রথমযৌবনের প্রারম্ভে যে তাঁর দীক্ষা-গ্রহণ সে মুক্তির দীক্ষা-গ্রহণ। যেদিন পক্ষীশাবকের পাখা

ওঠে সেইদিনই পক্ষীমাতা তাকে উড়তে শেখায়। তেমনি তারই দীক্ষার দরকার যার মুক্তির দরকার। চারি দিকের জড় সংস্কারের আবরণ থেকে তিনি মুক্তি চেয়েছিলেন।

তাঁর কাছে সেই মুক্তির দীক্ষা নেব বলেই আমরা আশ্রমে এসেছি। ঈশ্বরের সঙ্গে যে আমাদের স্বাধীন মুক্ত যোগ সেইটে আমরা এখানে উপলব্ধি করব ; যে-সব কাল্পনিক কৃত্রিম ব্যবধান তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগ হতে দিচ্ছে না তার থেকে আমরা মুক্তি লাভ করব। যেটা কারাগার তার পিঞ্জরের প্রত্যেক শলাকাটি যদি সোনার শলাকা হয় তবু সে কারাগার, তার মধ্যে মুক্তি নেই। এখানে আমাদের সকল কৃত্রিম বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে হবে। এখানে মুক্তির সেই দীক্ষা নেবার জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। সেই দীক্ষাটিই যে তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন।

তাই আমি বলছি যে, এ আশ্রম— এখানে কোনো দল নেই, সম্প্রদায় নেই। মানস-সরোবরে যেমন পদ্ম বিকশিত হয় তেমনি এই প্রান্তরের আকাশে এই আশ্রমটি জেগে উঠেছে ; একে কোনো সম্প্রদায়ের বলতে পারবে না। সত্যকে লাভ করবার দ্বারা আমরা তো কোনো নামকে পাই না। কতবার কত মহাপুরুষ এসেছেন— তাঁরা মানুষকে এই সব কৃত্রিম সংস্কারের বন্ধন থেকেই মুক্তি দিতে চেয়েছেন। কিন্তু, আমরা সে কথা ভুলে গিয়ে সে'ই বন্ধনে জড়াই, সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করি। যে সত্যের আঘাতে কারাগারের প্রাচীর ভাঙি তাই দিয়ে তাকে নতুন নাম দিয়ে পুনরায় প্রাচীর গড়ি এবং সেই নামের পুজো শুরু করে দিই। বলি, আমার বিশেষ সম্প্রদায়-ভুক্ত সমাজ-ভুক্ত যে-সকল মানুষ তারাই আমার ধর্মবন্ধু, তারাই আমার আপন। না, এখানে এ আশ্রমে আমাদের এ কথা বলবার কথা নয়। এখানে এই পাখিরাই আমাদের ধর্মবন্ধু, যে সাঁওতাল বালকেরা আমাদের শুভবুদ্ধিকে নিয়ত জাগ্রত করছে তারাই আমাদের ধর্মবন্ধু। আমাদের এই আশ্রম থেকে কেউ নাম নিয়ে যাবে না। স্বাস্থ্যলাভ করলে, বিদ্যালাভ করলে, মানুষের নাম যেমন বদলায় না তেমনি ধর্মকে লাভ করলে নাম বদলাবার দরকার নেই। এখানে আমরা যে ধর্মের দীক্ষা পাব সে দীক্ষা মানুষের সমস্ত মনুষ্যত্বের দীক্ষা।

বাইরের ক্ষেত্রে মহর্ষি আমাদের সবাইকে কোন্ বড় জিনিস দিয়ে গিয়েছেন। কোনো সম্প্রদায় নয়, এই আশ্রম। এখানে আমরা নামের পুজো থেকে, দলের পুজো থেকে, আপনাদের রক্ষা করে সকলেই আশ্রয় পাব— এইজন্যেই তো আশ্রম। যে-কোনো দেশ থেকে যে-কোনো সমাজ থেকে যেই আসুক-না কেন, তাঁর পুণ্যজীবনের জ্যোতিতে পরিবৃত হয়ে আমরা সকলকেই এই মুক্তির ক্ষেত্রে আহ্বান করব। দেশ-দেশান্তর দূর-দূরান্তর থেকে যে কোনো ধর্মবিশ্বাসকে অবলম্বন করে যিনিই এখানে আশ্রয় চাইবেন, আমরা যেন কাউকে গ্রহণ করতে কোনো সংস্কারের বাধা বোধ না

করি। কোনো সম্প্রদায়ের লিপিবদ্ধ বিশ্বাসের দ্বারা আমাদের মন যেন সংকুচিত না হয়।

যে মুক্তির বাণী তিনি তাঁর জীবন দিয়ে প্রচার করে গিয়েছিলেন তাকেই আমরা গ্রহণ করব; সেই তাঁর দীক্ষামন্ত্রটি: ঈশাবাস্যমিদং সর্বং। ঈশ্বরের মধ্যে সমস্তকে দেখো। সেই মন্ত্রে তাঁর মন উতলা হয়েছিল। সর্বত্র সকল অবস্থায় আমরা যেন দেখতে পাই তিনি সত্য, জগতের বিচিত্র ব্যাপারের মধ্যে তিনি সত্যকেই প্রকাশ করছেন। কোনো সম্প্রদায় বলতে পারবে না যে সে সত্যকে শেষ করে পেয়েছে। কালে কালে সত্যের নব নব প্রকাশ। এখানে দিনে দিনে আমাদের জীবন সেই সত্যের মধ্যে নূতন নূতন বিকাশ লাভ করবে, এই আমাদের আশা। আমরা এই মুক্তির সরোবরে স্নান করে আনন্দিত হই, সমস্ত সম্প্রদায়ের বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে আনন্দিত হই। ৭ পৌষ ১৩২০

মাঘ ১৩২০

প্রতীক্ষা

কতদিন নিভৃতে এখানে তাঁর নাম শুনেছি। আজ এই জনকোলাহলে তাঁরই নাম ধ্বনিত হচ্ছে, অস্ফুট কলোচ্ছ্বাসে এই নিঃশব্দ নিস্তব্ধ সন্ধ্যাকাশকে মুখরিত করে তুলছে। এই কোলাহলের ধ্বনি তাঁকে চারি দিকে বেষ্টন করে উঠেছে। আজ অন্তরে অন্তরে জাগ্রত হয়ে অন্তর্যামীকে বিরলে স্মরণ করবার দিন নয়; সংসারতরণীর কর্ণধার হয়ে যিনি সবাইকে নিয়ে চলেছেন আজ তাঁকে দেখবার দিন। অন্যদিন আকাশের গ্রহ-তারাকে বল্‌গার দ্বারা সংযত করে বিচিত্র বিশ্বরথকে একাকী সেই সারথি নিয়ে গেছেন —রথচক্রের শব্দ ওঠে নি, রাত্রির বিরামের কিছুমাত্র ব্যাঘাত করে নি। আজ নিদ্রা দূর হয়েছে, পাখিরা কুলায়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। এই কোলাহলে যিনি 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্‌' তিনি স্থিরপ্রতিষ্ঠ হয়ে রয়েছেন। কোলাহলের মর্মে যেখানে নিস্তব্ধ তাঁর আসন আজ আমরা সেইখানেই তাঁকে প্রণাম করবার জন্য চিত্তকে উদ্‌বোধিত করি।

আমাদের উৎসবদেবতা কোলাহল নিরস্ত করেন নি, তিনি মানা করেন নি। তাঁর পূজা তিনি সব-শেষে ঠেলে রেখেছেন। যখন রাজা আসেন তখন কত আয়োজন করে আসেন, কত সৈন্যসামন্ত নিয়ে ধ্বজা উড়িয়ে আসেন, যাতে লোকে তাঁকে না মেনে থাকতে না পারে। কিন্তু, যিনি রাজার রাজা তাঁর কোনো আয়োজন নেই। তাঁকে

যে ভুলে থাকে সে থাকুক ; তাঁর কোনো তাগিদই নেই। যার মনে পড়ে, যখন মনে পড়ে, সেই তাঁর পূজা করুক— এইটুকু মাত্র তাঁর পাওনা। কেননা, তাঁর কাছে কোনো ভয় নেই। বিশ্বের আর-সব নিয়ম ভয়ে ভয়ে মানতে হয়। আগুনে হাত দিতে ভয় পাই, কেননা জানি যে হাত পুড়বেই। কিন্তু, কেবল তাঁর সঙ্গে ব্যবহারে কোনো ভয় নেই। তিনি বলেছেন, আমাকে ভয় না করলেও তোমার কোনো ক্ষতি নেই। এই-যে আজ এত লোকসমাগম হয়েছে, কে তার চিত্তকে স্থির করেছে। তিনি কি দেখছেন না আমাদের চিত্ত কত বিক্ষিপ্ত। কিন্তু, তাঁর শাসন নেই। যাঁদের পদমর্যাদা আছে, রাজ-পুরুষদের কাছে সম্মান আছে, এমন লোক আজ এখানে এসেছেন। যাঁরা জ্ঞানের অভিমানে মত্ত হয়ে তাঁকে বিশ্বাস করেন না এমন লোক এখানে উপস্থিত আছেন। কিন্তু, তাঁর বসুন্ধরার ধৈর্য তাঁদের ধারণ করে রয়েছে, আকাশের জ্যোতির এক কণাও তাঁদের জন্য কমে নি— সব ঠিক সমান রয়েছে। তাঁর এই ইচ্ছা যে তিনি আমাদের কাছ থেকে জোর করে কিছু নেবেন না। তাঁর প্রহরীদের কত ঘুষ দিচ্ছি, তারা কত শাসন করছে, কিন্তু বিশ্বমন্দিরের সেই দেবতা একটি কথাও বলেন না। মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে আসছে, আর আমাদের মনে ভয় জেগে উঠছে যে পরকালে গিয়ে বুঝি এখানকার কাজের হিসাব দিতে হবে। না, সে ভয় একেবারেই সত্য নয়। তিনি যে কোনোদিন আমাদের শাস্তি দেবেন তা নয়। তিনি এমনি করে অপেক্ষা করে থাকবেন। তিনি কুঁড়ির দিকে চোখ মেলে থাকবেন কবে সেই কুঁড়ি ফুটবে। যতক্ষণ কুঁড়ি না ফুটছে ততক্ষণ তাঁর পূজার অর্ঘ্য ভরছে না তারই জন্য তিনি যুগ যুগান্তর ধরে অপেক্ষা করে রয়েছেন। এমনি নির্ভয়ে যে মানুষ তাঁকে দেখতে না পেয়ে গোল করছে, এতেও তিনি ধৈর্য ধরে বসে আছেন। এতে তাঁর কোনোই ক্ষতি নেই।

কিন্তু, এতে কার ক্ষতি হচ্ছে। ক্ষতি হচ্ছে মানবাত্মার। আমরা জানি না আমাদের অন্তরে এক উপবাসী পুরুষ সমস্ত পদমর্যাদার মধ্যে ক্ষুধিত হয়ে রয়েছে। বিষয়ী লোকের, জ্ঞানাভিমানী লোকের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না, কিন্তু ক্ষতি হচ্ছে তার। কবে শুভদিন হবে, কবে মোহরাত্রির অবসান হবে, কবে আনন্দে বিহঙ্গেরা গান ধরবে, কবে অর্ঘ্য ভরে উঠবে। এই-যে বিশাল বসুন্ধরায় আমরা জন্মলাভ করেছি, সমস্ত চৈতন্য নিয়ে, জ্ঞান নিয়ে, কবে এই জন্মলাভকে সার্থক করে যেতে পারব! সেই সার্থকতার জন্যই যে তৃষিত হয়ে অন্তরাত্মা বসে আছে। কিন্তু, ভয় নেই, কোথাও কোনো ভয় নেই। কারণ, যদি ভয়ের কারণ থাকত তবে তিনি উদ্‌বোধিত করতেন। তিনি বলছেন : আমি তো জোর করে চাই নে, যে ভুলে আছে তার ভুল একদিন ভাঙবে। ইচ্ছা করে তাঁর কাছে আসতে হবে, এইজন্যে তিনি তাকিয়ে আছেন। তাঁর ইচ্ছার

সঙ্গে ইচ্ছাকে মেলাতে হবে। আমাদের অনেক দিনের সঞ্চিত ক্ষুধা নিয়ে একদিন তাঁকে গিয়ে বলব : আমার হল না, আমার হৃদয় ভরল না। যেদিন সত্য করে চাইব সেদিন জননী কোলে তুলে নেবেন।

কিন্তু, এ ভুল তবে রয়েছে কেন। আমাদের এই ভুলের মধ্যেই যে তাঁর উপাসনা হচ্ছে। এরই মধ্যে যিনি সাধক তিনি তাঁর সাধনা নিয়ে রয়েছেন। যাঁদের উপরে তাঁর ডাক গিয়ে পৌঁচেছে সেই-সকল ভক্ত তাঁর অঙ্গনের কোণে বসে তাঁকে ধ্যান করছেন, তাঁকে ছাড়া তাঁদের সুখ নেই। এ যদি সত্য না হ'ত তা হলে কি পৃথিবীতে তাঁর নাম থাকত। তা হলে অন্য কথাই সকলের মনের মধ্যে জাগত, তারই কোলাহলে সমস্ত সংসার উত্ত্যক্ত হয়ে উঠত। ভক্তের হৃদয়ের আনন্দজ্যোতির সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের নিয়ত যোগ হচ্ছেই। এই জনপ্রবাহের ধ্বনির মাঝখানে, এই-সমস্ত ক্ষণস্থায়ী কল্লোলের মধ্য থেকে, মানবাত্মার অমর বাণী জাগ্রত হয়ে উঠছে। মানুষের চিরদিনের সাধনার প্রবাহকে সেই বাণী প্রবাহিত করে দিচ্ছে; অতল পঙ্কের মধ্য থেকে পদ্ম বিকশিত হয়ে উঠছে; কোথা থেকে হঠাৎ বসন্তসমীরণ আসে, যখন এসে হৃদয়ের মধ্যে বয় তখন আমাদের অন্তরে পূজার পুষ্প ফুটব-ফুটব করে ওঠে। তাই দেখছি যে যদিচ এত অবহেলা, এত দ্বেষবিদ্বেষ, চারি দিকে এত উন্মত্ততা, তথাপি মানবাত্মা জাগ্রত আছে। কারণ, মানবের ধর্মই তাঁকে চিন্তা করা। মানবের ধর্ম যে তার চৈতন্যকে কেবল সংসারে বিলুপ্ত করে দেবে তা নয়। সে যে কেবলই জেগে জেগে উঠছে। যারা নিদ্রিত ছিল তারা হঠাৎ জেগে দেখছে যে এই অনন্ত আকাশে তাঁর আরতির দীপ জ্বলেছে, সমস্ত বিশ্ব তাঁর বন্দনাগান করছে। এতেও কি মানুষের দুটি হাত জোড় হবে না। তোমার না হতে পারে, কিন্তু সমস্ত মানবের অন্তরের মধ্যে তপস্বীদের কণ্ঠে স্তবগান উঠছে। অনন্তদেবের প্রাঙ্গণে সেই স্তবগান ধ্বনিত হচ্ছে, শোনো একবার শোনো; সমস্ত মানবের ভিতরে, মানবের নিভৃত কন্দরে, যেখানে ভক্ত বসে রয়েছেন সেইখানে তাঁর কী বন্দনাধ্বনি উঠছে শোনো। এই অর্থহীন নিখিল মানবের কলোচ্ছ্বাসের মধ্যে সেই একটি চিরন্তন বাণী কালে কালে যুগে যুগে জাগ্রত। তাকে বহন করবার জন্য বরপুত্রগণ আগে আগে চলেছেন, পথ দেখিয়ে দেখিয়ে চলেছেন। সে আজ নয়। আমরা অনন্ত পথের পথিক, আমরা যে কত যুগ ধরে চলেছি! যাঁরা গাচ্ছেন তাঁদের গান আমাদের কানে পৌঁচচ্ছে। তাই যদি না পৌঁছয় তবে কী নিয়ে আমরা থাকব। দিনের পর দিন কি এমনি করেই চলে যাবে। এই কাড়াকাড়ি মারামারি উঞ্ছবৃত্তির মধ্যে কি জীবন কাটবে। এইজন্যেই কি জন্মেছিলুম। জীবনের পথে কি এইজন্যেই আমাদের চলতে বলা

হয়েছে। এই-যে সংসারে জন্মেছি, চলেছি, এখানে কত প্রেম কত আনন্দ যে ছড়িয়ে রয়েছে তা কি আমরা দেখছি না। কেবলই কি দেখব পদমর্যাদা, টাকাকড়ি, বিষয়-বিভব, আর-কিছুই নয়। যিনি সকল মানবের বিধাতা একবার তাঁর কাছে দাঁড়াবার কি ক্ষণমাত্র অবকাশ হবে না। পৃথিবীর এই মহাতীর্থে সেই জনগণের অধিনায়ককে কি প্রণাম নিবেদন করে যাব না।

কিন্তু, ভয় নেই, ভয় নেই। তাঁর তো শাসন নেই। তাই একবার হৃদয়ের সমস্ত প্রীতিকে জাগ্রত করি। একবার সব নিয়ে আমাদের জীবনের একটি পরম প্রণাম রেখে দিয়ে যাব। জানি, অন্যমনস্ক হয়ে আছি, তবু বলা যায় না— শুভক্ষণ যে কখন আসে তা বলা যায় না। তাই তো এখানে আসি। কী জানি যদি মন ফিরে যায়। তিনি যে ডাক ডাকছেন, তাঁর প্রেমের ডাক, যদি শুভক্ষণ আসে— যদি শুনতে পাই। সমস্ত কোলাহলের মাঝখানে তাই কান খাড়া করে রয়েছি। এই মুহূর্তেই হয়তো তাঁর ডাক আসতে পারে। এই মুহূর্তেই আমার জীবনপ্রদীপের যে শিখাটি জ্বলে নি সেই শিখাটি জ্বলে উঠতে পারে। আমাদের সত্য প্রার্থনা, যা চিরদিন অন্তরের এক প্রান্তে অপেক্ষা করে রয়েছে, সেই প্রার্থনা আজ জাগুক। অসতো মা সদ্‌গময়। সত্যকে চাই। সমস্ত মিথ্যাজাল ছিন্ন করে দাও। এই প্রার্থনা জগতে যত মানব জন্মগ্রহণ করেছে সকলের চিরকালের প্রার্থনা। এই প্রার্থনাই মানুষের সমাজ গড়েছে, সাম্রাজ্য রচনা করেছে, শিল্পসাহিত্যের সৃষ্টি করেছে। আজ এই প্রার্থনা আমাদের জীবনে ধ্বনিত হয়ে উঠুক। ৭ পৌষ ১৩২০, রাত্রি

মাঘ ১৩২০

অগ্রসর হওয়ার আহ্বান

স্টপ্‌ফোর্ড্‌ ব্রুকের সঙ্গে যখন আমার আলাপ হয়েছিল তখন তিনি আমাকে বললেন যে, কোনো-একটা বিশেষ সাম্প্রদায়িক দলের কথা বা বিশেষ দেশের বা কালের প্রচলিত রূপক ধর্মমত বা বিশ্বাসের সঙ্গে আমার কবিতা জড়িত নয় বলে আমার কবিতা পড়ে তাঁদের আনন্দ ও উপকার হয়েছে। তার কারণ, খৃস্টধর্ম যে কাঠামোর ভিতর দিয়ে এসে যে রূপটি পেয়েছে তার সঙ্গে বর্তমান জ্ঞানবিজ্ঞানের অনেক জায়গাতেই অনৈক্য হচ্ছে। তাতে করে পুরোনো ধর্মবিশ্বাস একেবারে গোড়া ঘেঁষে উন্মূলিত করে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিদিন যা বিশ্বাস করি বলে মানুষকে স্বীকার করতে হয় তা স্বীকার করা সে দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের পক্ষে অসম্ভব। অনেকের পক্ষে চর্চে যাওয়া অসাধ্য

হয়েছে। ধর্ম মানুষের জীবনের বাইরে পড়ে রয়েছে; লোকের মনকে তা আর আশ্রয় দিতে পারছে না। সেইজন্য ফরাসীস্ বিদ্রোহ থেকে আরম্ভ করে দেখা গিয়েছে যে, ধর্মকে আঘাত দেবার উদ্যম সেখানকার বুদ্ধিমান লোকদের পেয়ে বসেছে। অথচ ধর্মকে আঘাতমাত্র দিয়ে মানুষ আশ্রয় পাবে কেমন করে! তাতে কিছুদিনের মতো মানুষ প্রবৃত্ত থাকতে পারে, কিন্তু তাতে ধর্ম সম্বন্ধে মানুষের অন্তরে যে স্বাভাবিক পিপাসা রয়েছে তার কোনোই তৃপ্তি হয় না।

এখনকার কালে সেই পিপাসার দাবি জেগে উঠেছে। তার নানা লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। নাস্তিকতা নিয়ে যেদিন জ্ঞানী লোকেরা দম্ভ করতেন সেদিন চলে গিয়েছে। ধর্মকে আবৃত করে অন্ধ সংস্কারগুলা যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন সেগুলিকে ঝেঁটিয়ে ফেলার একটা দরকার হয়; নাস্তিকতা ও সংশয়বাদের সেই কারণে প্রয়োজন হয়। যেমন ধরো, আমাদের দেশে চার্বাক প্রভৃতির সময়ে একটা আন্দোলন জেগেছিল। কিন্তু, এখন লড়াই করবার প্রবৃত্তিই যে মানুষের নেই। এখন অন্ধ সংস্কারগুলি প্রায়ই পরাভূত হয়ে গিয়েছে। কাজেই লড়াই নিয়ে আর মানুষের মন ব্যাপৃত থাকতে পারছে না। বিশ্বাসের যে একটা মূল চাই, সংসারে যা-কিছু ঘটছে তাকে বিচ্ছিন্নভাবে নিলে চলে না— এ প্রয়োজনবোধ মানুষের ভিতরে জেগেছে। ইউরোপের লোকেরা ধর্ম-বিশ্বাসের একটা প্রত্যক্ষগম্য প্রমাণের অনুসন্ধান করছে; যেমন ভূতের বিশ্বাস, টেলিপ্যাথি প্রভৃতি কতগুলো অতীন্দ্রিয় রাজ্যের ব্যাপার নিয়ে তারা উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। তাতে ও দেশের লোকেরা মনে করছে যে ওই-সব প্রমাণ সংগৃহীত হলে ধর্মবিশ্বাস তার ভিত্তি পাবে। ওই-সব ভুতুড়ে কাণ্ডের মধ্যে ধর্মের সত্যকে তারা খুঁজছে। এ নিয়ে আমার সঙ্গে অনেকের কথাবার্তা হয়েছে। আমি এই কথাই বলেছি যে, বিশ্বব্যাপারে তোমরা যদি বিশ্বাসের মূল না পাও তবে অন্য-কিছুতে এমনই কী ভিত্তি পাবে। নূতন জিনিস কিছু পেলেই মনকে তা আলোড়িত করে। একজন ইংরেজ কবি একদিন আমাকে বললেন যে তাঁর ধর্মবিশ্বাস অত্যন্ত শিথিল হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু রেডিয়মের আবিষ্কারে তাঁর বিশ্বাসকে ফিরিয়েছে। তার মানে, ওরা বাইরের দিক থেকে ধর্ম-বিশ্বাসের ভিত্তিকে পাকা করবার চেষ্টা করে। সেইজন্য ওরা যদি কখনো দেখে যে মানুষের ভক্তির গভীরতার মধ্যেই একটা প্রমাণ রয়েছে, যেমন চোখ দিয়ে বাহ্য ব্যাপারকে দেখছি বলে তার প্রমাণ পাচ্ছি তেমনি একটা অধ্যাত্মদৃষ্টির দ্বারা আধ্যাত্মিক সত্যকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা যায়— তা হলে ওরা একটা ভরসা পায়। প্রফেসর জেম্স্ প্রভৃতি দেখিয়েছেন যে মিষ্টিক বলে যারা গণ্য তাঁরা তাঁদের ধর্মবিশ্বাসকে কেমন করে প্রকাশ করেছেন। তাঁদের সব জীবনের সাক্ষ্য থেকে তিনি দেখিয়েছেন যে, তাঁরা সবাই

একই কথা বলেছেন ; তাঁদের সকলেরই অভিজ্ঞতা একই পথ দিয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন দেশে নানা অবস্থার নানা লোক একই বাণী নানা কালে ব্যক্ত করেছেন। এ বড়ো আশ্চর্য।

এই প্রসঙ্গের উপলক্ষে স্টপ্‌ফোর্ড্‌ ব্রুক বলেছিলেন যে, ধর্মকে এমন স্থানে দাঁড় করানো দরকার যেখান থেকে সকল দেশের সকল লোকই তাকে আপনার বলে গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ, কোনো-একটা বিশেষ স্থানিক বা সাময়িক ধর্মবিশ্বাস বিশেষ দেশের লোকের কাছেই আদর পেতে পারে, কিন্তু সর্বদেশের সর্বকালের লোককে আকর্ষণ করতে পারে না। আমাদের ধর্মের কোনো 'ডগ্‌মা' নেই শুনে তিনি ভারি খুশি হলেন। বললেন, তোমরা খুব বেঁচে গেছ। ডগ্‌মার কোনো অংশ না টিঁকলে সমস্ত ধর্মবিশ্বাসকে পরিহার করবার চেষ্টা দেখতে পাওয়া যায়। সে বড়ো বিপদ। আমাদের উপনিষদের বাণীতে কোনো বিশেষ দেশকালের ছাপ নেই ; তার মধ্যে এমন কিছুই নেই যাতে কোনো দেশের কোনো লোকের কোথাও বাধতে পারে। তাই সেই উপনিষদের প্রেরণায় আমাদের যা-কিছু কাব্য বা ধর্মচিন্তা হয়েছে সেগুলো পশ্চিমদেশের লোকের ভালো লাগবার প্রধান কারণই হচ্ছে, তার মধ্যে বিশেষ দেশের কোনো সংকীর্ণ বিশেষত্বের ছাপ নেই।

পূর্বে যাতায়াতের তেমন সুযোগ ছিল না বলে মানুষ নিজ নিজ জাতিগত ইতিহাসকে একান্ত করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছিল। সেইজন্য খৃস্টান অত্যন্ত খৃস্টান হয়েছে, হিন্দু অত্যন্ত হিন্দু হয়েছে। এক-এক জাতি নিজের ধর্মকে আয়্‌রন্‌চেষ্টে সিলমোহর দিয়ে রেখেছে। কিন্তু, মানুষ মানুষের কাছে আজ যতই আসছে ততই সার্বভৌমিক ধর্মবোধের প্রয়োজন মানুষ বেশি করে অনুভব করছে। জ্ঞান যেমন সকলের জিনিস হচ্ছে সাহিত্যও তেমনি সকলের উপভোগ্য হবার উপক্রম করছে। সবরকম সাহিত্যরস সবাই নিজের বলে ভোগ করবে এইটি হয়ে উঠছে। এবং সকলের চেয়ে যেটি পরম ধন, ধর্ম, সেখানেও যে-সব সংস্কার তাকে ঘিরে রেখেছে, ধর্মের মধ্যে প্রবেশের সিংহদ্বারকে রোধ করে রেখেছে, বিশেষ পরিচয়পত্র না দেখাতে পারলে কাউকে সেখানে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না, সেই-সব সংস্কার দূর করবার আয়োজন হচ্ছে। পশ্চিমদেশে যাঁরা মনীষী তাঁরা নিজের ধর্মসংস্কারের সংকীর্ণতায় পীড়া পাচ্ছেন এবং ইচ্ছা করছেন যে, ধর্মের পথ উদার এবং প্রশস্ত হয়ে যাক। সেই যাঁরা পীড়া পাচ্ছেন এবং সংস্কার কাটিয়ে ধর্মকে তার বিশুদ্ধ মূর্তিতে দেখবার চেষ্টা করছেন তাঁদের মধ্যে স্টপ্‌ফোর্ড্‌ ব্রুকও একজন। খৃস্টধর্ম যেখানে সংকীর্ণ সেখানে ব্রুক তাকে মানেন নি। তাঁর 'অন্‌ওঅর্ড্‌ ক্রাইস্ট' -নামক নূতন বইটির প্রথম উপদেশটি পাঠ করলেই সেটা বোঝা যাবে। আজকের ৭ই পৌষের উৎসবের সঙ্গে সেই উপদেশের যোগ আছে।

তিনি Revelationএর চতুর্থ অধ্যায় থেকে এই শ্লোকটি তাঁর উপদেশের বিষয় করে নিয়েছেন—

After this I looked, and, behold, a door was opened in heaven ; and the first voice I heard was as it were a trumpet talking with me ; which said, come up hither and I will show thee things that shall be hereafter.

তাঁর উপদেশের ভিতরকার কথা হচ্ছে এই : বরাবর এই কথা আছে 'তুমি এসো আরও কিছু দেখাবার আছে' ; এই বাণী বরাবর মানুষ শুনে আসছে। আমাদের কোনো জায়গায় ঈশ্বর বদ্ধ থাকতে দেবেন না। জ্ঞানে ভাবে কর্মে সমাজে সকল দিকে স্বর্গ থেকে, উপর থেকে, ডাক আসছে : তোমরা চলে এসো, তোমরা বসে থাকতে পারবে না। ইহলোকের মধ্যেই সেই hereafter, সেই পরে যা হবে, তার ডাক মানুষ শুনেছে বলেই তার সমাজে উন্নতি হচ্ছে, তার জ্ঞান প্রসার লাভ করছে। পশু এ ডাক শোনে না, তাকে কেউ বলে না যে 'তুমি যা দেখছ যা পাচ্ছ তাই শুধু নয়— আরও অনেক বাকি আছে'। মানুষেরই এই একটি বিশেষ গৌরবের জিনিস যে মানুষকে ঈশ্বর স্থির নিশ্চল হয়ে বসে থাকতে দিলেন না। যেখানে তার বদ্ধতা, তার সংকীর্ণতা, সেখানে ক্রমাগতই আহ্বান আসছে : আরও কিছু আছে, আরও আছে। যা হয়েছে তা হয়েছে এ বলে যদি দাঁড়াই, যদি সেই 'আরও আছে'র ডাককে অমান্য করি; তা হলে মানুষের ধর্মের পতন। যদি তাকে জ্ঞানে অমান্য করি তা হলে মানুষের মূঢ়তায় পতন। যদি সমাজে অমান্য করি তা হলে জড়তায় পতন। কালে কালে মহাপুরুষেরা কী দেখান। তাঁরা দেখান যে, তোমরা যাকে ধর্ম বলে ধরে রয়েছ ধর্ম তার মধ্যে পর্যাপ্ত নন। মানুষকে মহাপুরুষেরা মুক্তির পথ দেখিয়ে দেন ; তাঁরা বলেন, চলতে হবে। কিন্তু, মানুষ তাঁদেরই আশ্রয় করে খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে যায়, আর চলতে চায় না। মহাপুরুষেরা যে পর্যন্ত গিয়েছেন তারও বেশি তাঁদের অনুপন্থীরা যাবেন, এই তো তাঁদের ইচ্ছা। কিন্তু, তারা তাঁদের বাক্য গলায় বেঁধে আত্মহত্যা সাধন করে। মহাপুরুষদের পথ হচ্ছে পথ, কেবল-মাত্র পথ। তাঁরা সেই পথে চলেছিলেন এইটেই সত্য। সুতরাং পথে বসলে গম্য-স্থানকে পাব না, পথে চললেই পাব। উপরের থেকে সেই চলবার ডাকটিই আসছে। সেই বাণীই বলছে : তুমি বসে থেকে কিছু পাবে না ; চলো, আরও চলো ; আরও আছে, আরও আছে। মানুষের ধর্ম চলছে তা আমরা দেখতে পাচ্ছি। ধর্ম আমাদের কোনো সীমাবদ্ধ জিনিসের পরিচয় দিচ্ছে না, ধর্ম অসীমের পরিচয় দিচ্ছে। পাখি যেমন আকাশে ওড়ে এবং উড়তে উড়তে আকাশের শেষ পায় না তেমনি আমরা অনন্তের

মধ্যে যে অবাধ গতি রয়েছে তাতেই চলতে থাকব। পাখি পিঞ্জরের মধ্যে ছট্‌ফট্‌ করে তার কারণ এ নয় যে, সে তার প্রয়োজন সেখানে পাচ্ছে না, কিন্তু তার প্রয়োজনের চেয়ে বেশিকেই পাচ্ছে না। মানুষেরও তাই চাই। প্রয়োজনের চেয়ে বেশিতেই মানুষের আনন্দ। মানুষের ধর্ম হচ্ছে অনন্তে বিহার, অনন্তের আনন্দকে পাওয়া। মানুষ যেখানে ধর্মকে বিশেষ দেশকালে আবদ্ধ করেছে সেখানে যে ধর্ম তাকে মুক্তি দেবে সেই ধর্মই তার বন্ধন হয়েছে। য়ুরোপে ধর্ম যেখানে তাকে বেঁধেছে সেইখানেই মুক্তির জন্য য়ুরোপ ক্রন্দন করছে। onward cry মানুষের cry।

আজকে যাঁর দীক্ষার সাম্বৎসরিকে আমরা এসেছি তিনি onward cry শুনতে পেয়েছিলেন। যে সময়ে আমাদের দেশে ধর্মকে সমাজকে চারি দিক থেকে নানা আচার ও প্রথার বন্ধনে বেঁধেছিল, তাকে সংকীর্ণ করে রুদ্ধ করে রেখেছিল, সেই সময়ে তিনি এই আহ্বান শুনে জেগে উঠলেন। চারি দিকের এই রুদ্ধতা, এই বেড়াগুলো, তাঁকে অত্যন্ত বেদনা দিয়েছিল। তিনি যখন আকাশে উড়তে চেয়েছিলেন তখন পিঞ্জরের প্রত্যেকটি শলাকা তাঁকে আঘাত করেছিল। তিনি জীবনকে প্রতিদিন অগ্রসর করবেন, প্রতিদিন অনন্তের আস্বাদ আপনার ভিতর থেকে পাবেন, তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা সেদিনকার সমাজে বড়োই দুর্লভ ছিল। সকলেই নিজ নিজ প্রচলিত অভ্যাসে তৃপ্ত ছিল। এই সাতই পৌষের দিন তিনি তাঁর দীক্ষার আহ্বান শুনেছিলেন, সে আহ্বান এই মন্ত্রটি : ঈশাবাস্যমিদং সর্বং। দেখো, তাঁর মধ্যে সব দেখো। এই আহ্বান, এই দীক্ষামন্ত্রই তো এই আশ্রমের মধ্যে রয়েছে। উপনিষদের এই মন্ত্র, এ কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের নয়, এ কোনো বিশেষ সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করে না। এ বাণী দেশে দেশান্তরে নির্ঝরধারার মতো যুগে যুগে প্রবাহিত হয়ে চলতে থাকবে : দেখো, তাঁর মধ্যে সব দেখো।

সেইজন্য আজ আমাদের বিশেষভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে যে, মহর্ষির জীবনের শ্রেষ্ঠ বিকাশ সমাজে হয় নি, তা এই আশ্রমে হয়েছিল। বিশেষ সমাজের সঙ্গে তিনি দীর্ঘকাল সংযুক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু সেইখানেই তাঁর চিরজীবনের সাধনা তার বিশেষ সার্থকতা লাভ করে নি; এই আশ্রমের মধ্যেই তার সার্থকতা সম্পূর্ণ হয়েছিল। 'আরো'র দিকে চলো : সেই ডাক তিনি শুনে বেরিয়েছিলেন, সেই মন্ত্রে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই ডাকটি সেই মন্ত্রটি তিনি আমাদের মধ্যে রেখে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন : এসো, এসো আরও পাবে। অনন্তস্বরূপের ভাণ্ডার যদি উন্মুক্ত হয় তবে তার আর সীমা কোথায়! তাই আমাদের দেখতে হবে যে, আমরা যেন সেই পথে তাঁর অনুসরণ করি যে পথ দিয়ে তিনি চলে গিয়েছেন। জ্ঞানে প্রেমে ধর্মে সকল দিকে যেন মুক্তির পথেই ক্রমাগত অগ্রসর হতে থাকি। এ কথা ভুলবার নয় যে, এ আশ্রম

সম্প্রদায়ের স্থান নয়, এখানে সমস্ত বিশ্বের আমরা পরিচয় পাব। এখানে সকল জাতির সকল দেশের লোক সমাগত হবে। তাঁর এই দীক্ষার মন্ত্রকে, সমস্তকে ঈশ্বরের মধ্যে দেখার মন্ত্রকে, আমরা কোথাও সংকোচ করব না। আমাদের অগ্রসরের পথ যেন কোনোমতেই বন্ধ না হয়। ৭ পৌষ ১৩২০

মাঘ ১৩২০

মা মা হিংসীঃ

মানুষের সকল প্রার্থনার মধ্যে এই-যে একটি প্রার্থনা দেশে দেশে কালে কালে চলে এসেছে 'মা মা হিংসীঃ : আমাকে বিনাশ কোরো না, আমাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করো'— এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। যে শারীরিক মৃত্যু তার নিশ্চিত ঘটবে তার থেকে রক্ষা পাবার জন্য মানুষ প্রার্থনা করতে পারে না, কারণ এমন অনর্থক প্রার্থনা করে তার কোনো লাভ নেই। সে জানে মৃত্যুর চেয়ে সুনিশ্চিত সত্য আর নেই, দৈহিক জীবনের বিনাশ একদিন না একদিন ঘটবেই। এ বিষয়ে তার মনে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু, সে যখন বলেছে 'আমাকে বিনাশ কোরো না' তখন সে যে কী বলতে চেয়েছে তা তার অন্তরের দিকে চেয়ে দেখলেই বেশ বোঝা যায়। এমন যদি হত যে তার শরীর চিরকাল বাঁচত, তা হলেও সেই বিনাশ থেকে তাকে কেউ রক্ষা করতে পারত না। কারণ, সে যে প্রতি মুহূর্তের বিনাশ। সে যে কত রকমের মৃত্যু একটার পর একটা আমাদের জীবনের উপরে আসছে। ক্ষুদ্র কালে বদ্ধ হয়ে বাইরের সুখদুঃখের আঘাতে ক্রমাগত খণ্ডিত বিক্ষিপ্ত হয়ে যে জীবন আমরা বহন করছি এতে যে প্রতিদিনই আমরা মরছি। যে গণ্ডি দিয়ে আমরা জীবনকে ঘিরে রাখতে চেষ্টা করি তারই মধ্যে জীবন কত মরা মরছে, কত প্রেম কত বন্ধুত্ব মরছে, কত ইচ্ছা কত আশা মরছে— এই ক্রমাগত মৃত্যুর আঘাতে সমস্ত জীবন ব্যথিত হয়ে উঠেছে।

জীবনের মধ্যে এই মৃত্যুর ব্যথা যে আমাদের ভোগ করতে হয় তার কারণ হচ্ছে, আমরা দুই জায়গায় আছি। আমরা তাঁর মধ্যেও আছি, সংসারের মধ্যেও আছি। আমাদের এক দিকে অনন্ত, অন্য দিকে সান্ত। সেইজন্য মানুষ এই কথাই ভাবছে, কী করলে এই দুই দিককেই সে সত্য করতে পারে। আমাদের এই সংসারের পিতা, যিনি এই পার্থিব জীবনের সূত্রপাত করে দিয়েছেন, তাঁকে শুধু পিতা বলে আমাদের অন্তরের তৃপ্তি নেই। কারণ আমরা যে জানি যে, এই শারীরিক জীবন একদিন ফুরিয়ে যাবে।

আমরা তাই সেই আর-একজন পিতাকে ডাকছি যিনি কেবলমাত্র পার্থিব জীবনের নয়, কিন্তু চিরজীবনের পিতা। তাঁর কাছে গেলে মৃত্যুর মধ্যে বাস করেও আমরা অমৃতলোকে প্রবেশ করতে পারি, এই আশ্বাস কেমন করে যেন আমরা আমাদের ভিতর থেকেই পেয়েছি। এইজন্যই পথ চলতে চলতে মানুষ ক্ষণে ক্ষণে উপরের দিকে তাকায়। এইজন্যই সংসারের সুখভোগের মধ্যে থাকতে থাকতে তার অন্তরের মধ্যে বেদনা জেগে ওঠে এবং তখন ইচ্ছাপূর্বক সে পরম দুঃখকে বহন করবার জন্য প্রস্তুত হয়। কেন। কারণ, সে বুঝতে পারে মানুষের মধ্যে কতবড়ো সত্য রয়েছে, কতবড়ো চেতনা রয়েছে, কতবড়ো শক্তি রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে মরছে ততক্ষণ পর্যন্ত দুঃখের পর দুঃখ, আঘাতের পর আঘাত, তার উপর আসবেই আসবে— কে তাকে রক্ষা করবে। কিন্তু, যেমনি সে তার সমস্ত দুঃখ-আঘাতের মধ্যে সেই অমৃতলোকের আশ্বাস পায় অমনি তার এই প্রার্থনা আর-সকল প্রার্থনাকে ছাড়িয়ে ওঠে : মা মা হিংসীঃ। আমাকে বাঁচাও বাঁচাও প্রতিদিনের হাত থেকে, ছোটোর হাতের মার থেকে আমাকে বাঁচাও। আমি বড়ো আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে, স্বার্থের হাত থেকে, অহমিকার হাত থেকে নিয়ে যাও। তোমার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের মধ্যে আমার জীবন যেতে চাচ্ছে। আপনাকে খণ্ড খণ্ড করে প্রতিদিন আপনার অহমিকার মধ্যে ঘুরে ঘুরে আমার কোনো আনন্দ নেই। মা মা হিংসীঃ। আমাকে বিনাশ থেকে বাঁচাও।

যে প্রেমের মধ্যে সমস্ত জগতে মানুষ আপনার সত্য স্থানটিকে পায়, সমস্ত মানুষের সঙ্গে তার সত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সেই পরম প্রেমটিকে না পেলে মানুষকে কে বেদনা ও আঘাত থেকে রক্ষা করতে পারে। তখন তার উপর আঘাত নানা দিক থেকে ক্রমাগতই আসবে, পাপের দহন তাকে দগ্ধ করে মারবে। এইজন্যই সংসারের ডাকের উপর আর-একটি ডাক জেগে আছে : তোমার ভিতর দিয়ে সমস্ত সংসারের সঙ্গে যে আমার নিত্য সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধে আমায় বাঁধো, তা হলেই মৃত্যুর ভিতর থেকে আমি অমৃতে উত্তীর্ণ হতে পারব।

পিতা নো বোধি। পিতা, তুমি বোধ দাও। তোমাকে স্মরণ করে মনকে আমরা নম্র করি। প্রতিদিনের ক্ষুদ্রতা আমাদের ঔদ্ধত্যে নিয়ে যায়, তোমার চরণতলে আপনাকে একবার সম্পূর্ণ ভুলি। এই ক্ষুদ্র আমার সীমায় আমি বড়ো হয়ে উঠছি এবং পদে পদে অন্যকে আঘাত করছি ; আমাকে পরাভূত করো তোমার প্রেমে। এই মৃত্যুর মধ্যে আমাকে রেখো না, হে পরম লোকের পিতা, প্রেমেতে ভক্তিতে অবনত হয়ে তোমাকে নমস্কার করি এবং সেই নমস্কারের দ্বারা রক্ষা পাই। তা না হলে দুঃখ পেতেই হবে, বাসনার অভিঘাত সহ্য করতেই হবে, অহংকারের পীড়ন প্রতিদিন

জীবনকে ভারগ্রস্ত করে তুলবেই তুলবে। যতদিন পর্যন্ত ক্ষুদ্রতার সীমার মধ্যে বদ্ধ হয়ে আছি ততদিন পাপ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠে বিকটমূর্তি ধারণ করে চতুর্দিককে বিভীষিকাময় করে তুলবেই তুলবে।

সমস্ত য়ুরোপে আজ এক মহাযুদ্ধের ঝড় উঠেছে। কতদিন ধরে গোপনে গোপনে এই ঝড়ের আয়োজন চলছিল! অনেক দিন থেকে আপনার মধ্যে আপনাকে যে মানুষ কঠিন করে বদ্ধ করেছে, আপনার জাতীয় অহমিকাকে প্রচণ্ড করে তুলেছে, তার সেই অবরুদ্ধতা আপনাকেই আপনি একদিন বিদীর্ণ করবেই করবে। এক-এক জাতি নিজ নিজ গৌরবে উদ্ধত হয়ে সকলের চেয়ে বলীয়ান হয়ে ওঠবার জন্য চেষ্টা করেছে। বর্মে চর্মে অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অন্যের চেয়ে নিজে বেশি শক্তিশালী হবার জন্য তারা ক্রমাগতই তলোয়ারে শান দিয়েছে। peace conference, শান্তিস্থাপনের উদ্‌যোগ চলেছে; সেখানে কেবলই নানা উপায় উদ্ভাবন করে নানা কৌশলে এই মারকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু, কোনো রাজনৈতিক কৌশলে কি এর প্রতিরোধ হতে পারে। এ যে সমস্ত মানুষের পাপ পুঞ্জীভূত আকার ধারণ করেছে; সেই পাপই যে মারবে এবং মেরে আপনার পরিচয় দেবে। সে মার থেকে রক্ষা পেতে গেলে বলতেই হবে: মা মা হিংসীঃ। পিতা, তোমার বোধ না দিলে এ মার থেকে আমাদের কেউ রক্ষা করতে পারবে না। কখনো এটা সত্য হতে পারে না যে, মানুষ কেবলমাত্র আপনার ভিতরেই আপনার সার্থকতাকে পাবে। তুমি আমাদের পিতা, তুমি সকলের পিতা, এই কথা বলতেই হবে। এই কথা বলার উপরেই মানুষের পরিত্রাণ। মানুষের পাপের আগুন এই পিতার বোধের দ্বারা নিববে; নইলে সে কখনোই নিববে না, দাবানলের মতো সে ক্রমশ ব্যাপ্ত হতে হতে সমস্ত ছারখার করে দেবে। কোনো রাজমন্ত্রী কূটকৌশলজাল বিস্তার করে যে সে আগুন নেবাতে পারবে তা নয়; মার খেতে হবে, মানুষকে মার খেতেই হবে।

মানুষের এই-যে প্রচণ্ড শক্তি এ বিধাতার দান। তিনি মানুষকে ব্রহ্মাস্ত্র দিয়েছেন এবং দিয়ে বলে দিয়েছেন, যদি তুমি একে কল্যাণের পক্ষে ব্যবহার কর তবেই ভালো, আর যদি পাপের পক্ষে ব্যবহার কর তবে এ ব্রহ্মাস্ত্র তোমার নিজের বুকেই বাজবে। আজ মানুষ মানুষকে পীড়ন করবার জন্য নিজের এই অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্রকে ব্যবহার করেছে; তাই সে ব্রহ্মাস্ত্র আজ তারই বুকে বেজেছে। মানুষের বক্ষ বিদীর্ণ করে আজ রক্তের ধারা পৃথিবীতে প্রবাহিত হয়ে চলবে— আজ কে মানুষকে বাঁচাবে! এই পাপ এই হিংসা মানুষকে আজ কী প্রচণ্ড মার মারবে— তাকে এর মার থেকে কে বাঁচাবে!

আমরা আজ এই পাপের মূর্তি যে কী প্রকাণ্ড তা কি দেখব না। এই পাপ যে সমস্ত মানুষের মধ্যে রয়েছে এবং আজ তাই এক জায়গায় পুঞ্জীভূত হয়ে বিরাট আকার নিয়ে দেখা দিয়েছে, এ কথা কি আমরা বুঝব না। আমরা এ দেশে প্রতিদিন পরস্পরকে আঘাত করছি, মানুষকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করছি, স্বার্থকে একান্ত করে তুলছি। এ পাপ কতদিন ধরে জমছে, কত যুগ ধরে জমছে। প্রতিদিনই কি আমরা তারই মার খাচ্ছি নে। বহু শতাব্দী থেকে আমরা কি কেবলই মরছি নে। সেইজন্যই তো এই প্রার্থনা : মা মা হিংসীঃ। বাঁচাও বাঁচাও, এই বিনাশের হাত থেকে বাঁচাও। এই সমস্ত দুঃখশোকের উপরে যে অশোক লোক রয়েছে, অনন্ত-অন্তের সম্মিলনে যে অমৃতলোক সৃষ্ট হয়েছে, সেইখানে নিয়ে যাও। সেইখানে মরণের উপরে জয়ী হয়ে আমরা বাঁচব ; ত্যাগের দ্বারা, দুঃখের দ্বারা বাঁচব। সেইখানে আমাদের মুক্তি দাও।

আজ অপ্রেমঝঞ্ঝার মধ্যে, রক্তস্রোতের মধ্যে, এই বাণী সমস্ত মানুষের ক্রন্দনধ্বনির মধ্যে জেগে উঠেছে। এই বাণী হাহাকার করতে করতে আকাশকে বিদীর্ণ করে বয়ে চলেছে। সমস্ত মানবজাতিকে বাঁচাও। আমাকে বাঁচাও। এই বাণী যুদ্ধের গর্জনের মধ্যে মুখরিত হয়ে আকাশকে বিদীর্ণ করে দিয়েছে।

স্বার্থের বন্ধনে জর্জর হয়ে, রিপুর আঘাতে আহত হয়ে, এই-যে আমরা প্রত্যেকে পাশের লোককে আঘাত করছি ও আঘাত পাচ্ছি— সেই প্রত্যেক আমির ক্রন্দনধ্বনি একটা ভয়ানক বিশ্বযজ্ঞের মধ্যে সকল মানুষের প্রার্থনারূপে রক্তস্রোতে গর্জিত হয়ে উঠেছে : মা মা হিংসীঃ। মরছে মানুষ, বাঁচাও তাকে। কে বাঁচাবে। পিতা নোঽসি। তুমি যে আমাদের সকলের পিতা, তুমি বাঁচাও। তোমার বোধের দ্বারা বাঁচাও। তোমাকে সকল মানুষ মিলে যেদিন নমস্কার করব সেই দিন নমস্কার সত্য হবে। নইলে ভূলুণ্ঠিত হয়ে মৃত্যুর মধ্যে যে নমস্কার করতে হয় সেই মৃত্যু থেকে বাঁচাও। দেশদেশান্তরে তোমার যত যত সন্তান আছে, হে পিতা, তুমি প্রেমে ভক্তিতে কল্যাণে সকলকে একত্র করো তোমার চরণতলে। নমস্কার সর্বত্র ব্যাপ্ত হোক। দেশ থেকে দেশান্তরে জাতি থেকে জাতিতে ব্যাপ্ত হোক। বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব। বিশ্বপাপের যে মূর্তি আজ রক্তবর্ণে দেখা দিয়েছে সেই বিশ্বপাপকে দূর করো। মা মা হিংসীঃ। বিনাশ থেকে রক্ষা করো। ২০ শ্রাবণ ১৩২১

আশ্বিন-কার্তিক ১৩২১

পাপের মার্জনা

আমাদের প্রার্থনা সকল সময়ে সত্য হয় না, অনেক সময়ে মুখের কথা হয়; কারণ, চারি দিকে অসত্যের দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকি বলে আমাদের বাণীতে সত্যের তেজ পৌঁছোয় না। কিন্তু, ইতিহাসের মধ্যে, জীবনের মধ্যে, এমন এক-একটি দিন আসে যখন সমস্ত মিথ্যা এক মুহূর্তে দগ্ধ হয়ে গিয়ে এমনি একটি আলোক জেগে ওঠে যার সামনে সত্যকে অস্বীকার করবার উপায় থাকে না। তখনই এই কথাটি বারবার জাগ্রত হয়: বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব। হে দেব, হে পিতা, বিশ্বপাপ মার্জনা করো।

আমরা তাঁর কাছে এ প্রার্থনা করতে পারি না 'আমাদের পাপ ক্ষমা করো'; কারণ, তিনি ক্ষমা করেন না, তিনি সহ্য করেন না। তাঁর কাছে এই প্রার্থনাই সত্য প্রার্থনা: তুমি মার্জনা করো। যেখানে যত কিছু পাপ আছে, অকল্যাণ আছে, বারম্বার রক্তস্রোতের দ্বারা, অগ্নিবৃষ্টির দ্বারা, সেখানে তিনি মার্জনা করেন। যে প্রার্থনা ক্ষমা চায় সে দুর্বলের ভীরুর প্রার্থনা, সে প্রার্থনা তাঁর দ্বারে গিয়ে পৌঁছোবে না।

আজ এই-যে যুদ্ধের আগুন জ্বলেছে এর ভিতরে সমস্ত মানুষের প্রার্থনাই কেঁদে উঠেছে: বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব। বিশ্বপাপ মার্জনা করো। আজ যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়েছে সে যেন ব্যর্থ না হয়। রক্তের বন্যায় যেন পুঞ্জীভূত পাপ ভাসিয়ে নিয়ে যায়। যখনই পৃথিবীর পাপ স্তূপাকার হয়ে উঠে তখনই তো তাঁর মার্জনার দিন আসে। আজ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যে দহনযজ্ঞ হচ্ছে তার রুদ্র আলোকে এই প্রার্থনা সত্য হোক: বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব। আমাদের প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে আজ এই প্রার্থনা সত্য হয়ে উঠুক।

আমরা প্রতিদিন সংবাদপত্রে টেলিগ্রাফে যে একটু-আধটু খবর পাই তার পশ্চাতে কী অসহ্য সব দুঃখ রয়েছে আমরা কি তা চিন্তা করে দেখি। যে হানাহানি হচ্ছে তার সমস্ত বেদনা কোন্‌খানে গিয়ে লাগছে। ভেবে দেখো কত পিতামাতা তাদের একমাত্র ধনকে হারাচ্ছে, কত স্ত্রী স্বামীকে হারাচ্ছে, কত ভাই ভাইকে হারাচ্ছে। এই-জন্যই তো পাপের আঘাত এত নিষ্ঠুর; কারণ, যেখানে বেদনাবোধ সব চেয়ে বেশি, যেখানে প্রীতি সব চেয়ে গভীর, পাপের আঘাত সেইখানেই যে গিয়ে বাজে। যার হৃদয় কঠিন সে তো বেদনা অনুভব করে না। কারণ, সে যদি বেদনা পেত তবে পাপ এমন নিদারুণ হতেই পারত না। যার হৃদয় কোমল, যার প্রেম গভীর, তাকেই সমস্ত

বেদনা বইতে হবে। এইজন্য যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের রক্তপাত কঠিন নয়, রাজনৈতিকদের দুশ্চিন্তা কঠিন নয়; কিন্তু ঘরের কোণে যে রমণী অশ্রুবিসর্জন করছে তারই আঘাত সব চেয়ে কঠিন।

সেইজন্য এক-একসময় মন এই কথা জিজ্ঞাসা করে: যেখানে পাপ সেখানে কেন শাস্তি হয় না। সমস্ত বিশ্বে কেন পাপের বেদনা কম্পিত হয়ে ওঠে। কিন্তু এই কথা জেনো যে, মানুষের মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ নেই, সমস্ত মানুষ যে এক। সেইজন্য পিতার পাপ পুত্রকে বহন করতে হয়, বন্ধুর পাপের জন্য বন্ধুকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, প্রবলের উৎপীড়ন দুর্বলকে সহ্য করতে হয়। মানুষের সমাজে একজনের পাপের ফলভোগ সকলকেই ভাগ করে নিতে হয়; কারণ, অতীতে ভবিষ্যতে দূরে দূরান্তে হৃদয়ে হৃদয়ে মানুষ যে পরস্পরে গাঁথা হয়ে আছে।

মানুষের এই ঐক্যবোধের মধ্যে যে গৌরব আছে তাকে ভুললে চলবে না। এইজন্যই আমাদের সকলকে দুঃখভোগ করবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। তা না হলে প্রায়শ্চিত্ত হয় না; সমস্ত মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সকলকেই করতে হবে। যে হৃদয় প্রীতিতে কোমল দুঃখের আগুন তাকেই আগে দগ্ধ করবে। তার চক্ষে নিদ্রা থাকবে না। সে চেয়ে দেখবে দুর্যোগের রাত্রে দূর দিগন্তে মশাল জ্বলে উঠছে, বেদনায় মেদিনী কম্পিত করে রুদ্র আসছেন; সেই বেদনার আঘাতে তার হৃদয়ের সমস্ত নাড়ী ছিন্ন হয়ে যাবে। যার চিত্ততন্ত্রীতে আঘাত করলে সব চেয়ে বেশি বাজে পৃথিবীর সমস্ত বেদনা তাকেই সব চেয়ে বেশি করে বাজবে।

তাই বলছি যে, সমস্ত মানুষের সুখদুঃখকে এক করে যে-একটি পরম বেদনা পরম প্রেম আছেন তিনি যদি শূন্য কথার কথা মাত্র হতেন তবে বেদনার এই গতি কখনোই এমন বেগবান হতে পারত না। ধনী-দরিদ্র জ্ঞানী-অজ্ঞানী সকলকে নিয়ে সেই এক পরম প্রেম চিরজাগ্রত আছেন বলেই এক জায়গার বেদনা সকল জায়গায় কেঁপে উঠছে। এই কথাটি আজ বিশেষভাবে অনুভব করো।

তাই এ কথা আজ বলবার কথা নয় যে 'অন্যের কর্মের ফল আমি কেন ভোগ করব'। 'হাঁ, আমিই ভোগ করব, আমি নিজে একাকী ভোগ করব' এই কথা বলে প্রস্তুত হও। নিজের জীবনকে শুচি করো, তপস্যা করো, দুঃখকে গ্রহণ করো। তোমাকে যে নিজের পাপের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ করতে হবে, নিজের রক্তপাত করতে হবে, দুঃখে দগ্ধ হয়ে হয়তো মরতে হবে। কারণ, তোমার নিজের জীবনকে যদি পরিপূর্ণরূপে উৎসর্গ না কর তবে পৃথিবীর জীবনের ধারা নির্মল থাকবে কেমন করে, প্রাণবান হয়ে উঠবে কেমন করে। ওরে তপস্বী, তপস্যায় প্রবৃত্ত হতে হবে: সমস্ত জীবনকে আহুতি দিতে হবে, তবেই

'যদ্‌ভদ্রং তৎ' যা ভদ্র তাই আসবে। ওরে তপস্বী, দুঃসহ দুর্ভর দুঃখভারে তোমার হৃদয় একেবারে নত হয়ে যাক, তাঁর চরণে গিয়ে পৌঁছোক! নমস্তেঽস্তু। বলো, পিতা, তুমি যে আছ সে কথা এমনি আঘাতের মধ্য দিয়ে প্রচার করো। তোমার প্রেম নিষ্ঠুর, সেই নিষ্ঠুর প্রেম তোমার জাগ্রত হয়ে সব অপরাধ লন করুক। পিতা নো বোধি। আজই তো সেই উদ্‌বোধনের দিন। আজ পৃথিবীর প্রলয়দাহের রুদ্র আলোকে, পিতা, তুমি দাঁড়িয়ে আছ। প্রলয়হাহাকারের ঊর্ধ্বে স্তূপাকার পাপকে দগ্ধ করে সেই দহনদীপ্তিতে তুমি প্রকাশ পাচ্ছ, তুমি জেগে রয়েছ। তুমি আজ ঘুমোতে দেবে না; তুমি আঘাত করছ প্রত্যেকের জীবনে কঠিন আঘাত। যেখানে প্রেম আছে জাগুক, যেখানে কল্যাণের বোধ আছে জাগুক; সকলে আজ তোমার বোধে উদ্‌বোধিত হয়ে উঠুক। এই এক প্রচণ্ড আঘাতের দ্বারা তুমি সকল আঘাতকে নিরস্ত করো। সমস্ত বিশ্বের পাপ হৃদয়ে হৃদয়ে ঘরে ঘরে দেশে দেশে পুঞ্জীভূত; তুমি আজ সেই পাপ মার্জনা করো। দুঃখের দ্বারা মার্জনা করো, রক্তস্রোতের দ্বারা মার্জনা করো, অগ্নিবৃষ্টির দ্বারা মার্জনা করো।

এই প্রার্থনা, সমস্ত মানবচিত্তের এই প্রার্থনা, আজ আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে জাগ্রত হোক: বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব। বিশ্বপাপ মার্জনা করো। এই প্রার্থনাকে সত্য করতে হবে; শুচি হতে হবে, সমস্ত হৃদয়কে মার্জনা করতে হবে। আজ সেই তপস্যার আসনে পূজার আসনে উপবিষ্ট হও। যে পিতা সমস্ত মানবসন্তানের দুঃখ গ্রহণ করছেন, যাঁর বেদনার অন্ত নেই, প্রেমের অন্ত নেই, যাঁর প্রেমের বেদনা উদ্‌বেল হয়ে উঠেছে, তাঁর সম্মুখে উপবিষ্ট হয়ে সেই তাঁর প্রেমের বেদনাকে আমরা সকলে মিলে গ্রহণ করি। ৯ ভাদ্র ১৩২১

আশ্বিন-কার্তিক ১৩২১

সৃষ্টির ক্রিয়া

অবকাশের পর আবার আমরা শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেছি। আর-একবার আমাদের চিন্তা করবার সময় হয়েছে। এখানকার সত্য আহ্বানকে অন্তরের মধ্যে সুস্পষ্ট করে উপলব্ধি করবার জন্য এবং মনের মধ্যে যেখানে গ্রন্থি রয়েছে, দীনতা রয়েছে, তাকে মোচন করবার জন্য আবার আমাদের ভালো করে প্রস্তুত হতে হবে।

এই শান্তিনিকেতনে যেখানে আমরা সকলে আশ্রয় লাভ করেছি এবং সম্মিলিত হয়েছি, এখানে এই সম্মিলনের ব্যাপারকে কোনো-একটা আকস্মিক ঘটনা বলে মনে

করতে পারি নে। বিশ্বের মধ্যে আমাদের জীবনের অন্যান্য যে-সকল সম্ভাবনা ছিল তাদের এড়িয়ে এই এখানে যে আমরা আশ্রয় পেয়েছি এর মধ্যে একটা গভীর অভিপ্রায় রয়েছে। এখানে একটি সৃষ্টি হচ্ছে; এখানে যারা এসেছে তারা কিছু দিচ্ছে, কিছু নিয়ে যাচ্ছে, এমনি করে ক্রমশ এখানে একটি জীবনের সঞ্চার হচ্ছে। এর মধ্যে নানা ভাঙা-গড়ার কাণ্ড চলেছে; কেউ বা এখানে স্থায়ী, কেউ অস্থায়ী। সুতরাং এই আশ্রমকে বাহির থেকে দেখলে মনে হওয়া কিছু আশ্চর্য নয় যে, এ ভাঙাগড়া বুঝি দৈবক্রমে ঘটছে। একটা ঘর তৈরি হবার সময় কত চুন সুর্কি মাল মসলার অপব্যয় হয়, চার দিকে এলোমেলো হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে সেগুলো পড়ে থাকে। কিন্তু, সমস্ত ঘরটি যখন তৈরি হয়ে ওঠে তখন আদ্যোপান্ত হিসাব পাওয়া যায়। তখন কী অপব্যয় হয়েছিল তাকে কেউ গণনার মধ্যেই আনে না। তেমনি এই আশ্রমের প্রত্যেক মানুষের জীবনের ইতিহাসের হিসাব নিলে দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে কেউ বা কিছু পাচ্ছে, কেউ বা কিছুই পায় নি। সে হিসাবে এখানকার সমগ্র সৃষ্টির চেহারা দেখা যায় না। এই-যে এখানে চারি দিক থেকে প্রাণের প্রবাহ আসছে, এ ব্যাপারটাকে আমাদের খুব সত্য ক'রে, খুব বড়ো করে অন্তরের মধ্যে দেখবার শক্তি লাভ করতে হবে। এ একটা বিশ্বের ব্যাপার। কত দিক থেকে প্রাণের ধারা এখানে আসছে এবং কত দিকে দিগন্তরে এখান থেকে পুনরায় বয়ে চলবে —একে আকস্মিক ঘটনা মনে করবার কোনো কারণ নেই।

বিশ্বের কোনো ব্যাপারকেই যে আমরা দেখতে পাই নে তার কারণ, আমরা সমস্ত মন দিয়ে দেখি নে। চোখ দিয়ে দেখতে পাই নে, কারণ এ তো চোখ দিয়ে দেখবার জিনিস নয়। একে যে চরিত্র দিয়ে দেখতে হয়। স্বভাব দিয়ে দেখতে হয়। স্বভাবের ভিতর দিয়ে দেখতে হয় বলেই স্বভাবকে বিশুদ্ধ করা দরকার হয়। আমরা এই আশ্রমে যতই উপদেশ দিই এবং যতই উপদেশ পাই-না কেন, এই আশ্রমের ভিতরে যে অমৃত-উৎসটি উঠছে তাকে দেখবার, তার কাছে যাবার শক্তি যে আমাদের সকলের রয়েছে তা নয়। সেই দেখতে পাই না বলেই উপদেশে কিছু হয় না, কথারচনা ব্যর্থ হয়। সেই আনন্দ-স্বরূপকে দেখলেই আনন্দ যে ভরে উঠবে। সেই আনন্দে যে সমস্ত ত্যাগ সহজ হয়ে যাবে, বিরোধ দূর হবে, সব নির্মল হবে, সকল বাধা কেটে যাবে। আনন্দের লক্ষণ দেখলেই চেনা যায়। যখন দেখি যে আমাদের ভিতরে দুশ্চিন্তা ও দুশ্চেষ্টা থামছে না, অন্যায় ক্ষুদ্রতা মিথ্যা কত কী আমাদের ঘিরে রয়েছে, তখন বুঝতে পারছি যে সেই আনন্দকে দেখবার শক্তি আমাদের হয় নি। তার লক্ষণ আমাদের মধ্যে ফুটছে না।

আপনাকে এবং জগৎকে সত্য করে জানবার ও দেখবার জন্যই মানুষ এই জগতে এসেছে। মানুষও যে-সমস্ত অনুষ্ঠান রচনা করেছে, তার বিদ্যালয়, তার রাজ্যসাম্রাজ্য,

নীতিধর্ম, সমস্তেরই মূল কথা এই যে, মানুষ যে যথার্থ কী সেটা মানুষকে প্রকাশ করতে হচ্ছে। মানুষের অনুষ্ঠানে মানুষই বিরাট রূপ ধরে প্রকাশ পাচ্ছে। সেইজন্য সমস্ত অনুষ্ঠানের ভিতরকার আদর্শ হচ্ছে মানুষকে মুক্তি দেওয়া। মানুষ নিজেকে যে ছোটো বলে জানছে মানুষের ধর্ম কর্ম তারই প্রতিবাদ করে তাকে বলছে: তুমি ছোটো নও, তুমি আপনার মধ্যে আপনি বদ্ধ নও, তুমি সমস্ত জগতের, তুমি বড়ো, বড়ো, বড়ো।

কিন্তু, মানুষের এই বড়ো বড়ো অনুষ্ঠানের মধ্যে মানুষের ভিতরে যে শয়তান রয়েছে সে প্রবেশ করছে। মানুষের ধর্ম তাকে ভূমার সঙ্গে বড়োর সঙ্গে যোগযুক্ত করবে, সকলকে এক করবে, এই তো তার উদ্দেশ্য। কিন্তু, সেই ধর্মের মধ্যে শয়তান প্রবেশ করে মানুষের ঐক্যকে খণ্ড খণ্ড করে দিচ্ছে; কত অন্যায়, কত অসত্য, কত সংকীর্ণতা সৃষ্টি করছে। মানুষের জাতীয়তা, ইংরেজিতে যাকে nationality বলে, ক্রমশ উদ্‌ভিন্ন হয়ে উঠেছে এইজন্য যে তার মধ্যে মানুষের সাধনা মিলিত হয়ে মানুষের এক বৃহৎরূপকে ব্যক্ত করবে, ক্ষুদ্র স্বার্থ থেকে প্রত্যেক মানুষকে মুক্ত করে বৃহৎমঙ্গলের মধ্যে সকলকে সম্মিলিত করবে। কিন্তু, সেই তপস্যা ভঙ্গ করবার জন্যে শয়তান সেই জাতীয়তাকেই অবলম্বন করে কত বিরোধ কত আঘাত কত ক্ষুদ্রতাকে দিন দিন তার মধ্যে জাগিয়ে তুলছে। মানুষের তপস্যা এক দিকে, অন্য দিকে তপস্যা ভঙ্গ করবার আয়োজন— এ দুইই পাশাপাশি রয়েছে।

শান্তিনিকেতন-আশ্রমেও সেই তপস্যা রয়েছে; ধর্ম যে কত বড়ো, বিশ্ব যে কত সত্য, মানুষ যে কত বড়ো, এই আশ্রম সে কথা নিয়তই স্মরণ করিয়ে দেবে। এইখানে আমরা মানুষের সমস্ত ভেদ জাতিভেদ ভুলব। আমাদের দেশে চারি দিকে ধর্মের নামে যে অধর্ম চলছে, মানুষকে কত ক্ষুদ্র ক'রে সংকীর্ণ ক'রে তার মানবধর্মকে নষ্ট করবার আয়োজন চলছে, আমরা এই আশ্রমেই সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হব। এত বড়ো আমাদের কাজ। কিন্তু, আমরা একে কেউ বা স্কুলের মতো করে দেখছি। কেউ বা আপনার আপনার ছোটোখাটো চিন্তার মধ্যে বদ্ধ হয়ে রয়েছি। একে আমরা উপলব্ধি করছি নে বলে গোলমাল করতে করতে চলেছি। আপনার সত্য পরিচয় পাচ্ছি নে, এরও যথার্থ পরিচয় পাচ্ছি নে। এই আশ্রমের চারি দিকে যে একটি অনন্তত্ব রয়েছে তাকেই নষ্ট করছি। কেবলই আবর্জনা ফেলছি, আমাদের ছোটো ছোটো প্রকৃতির দুর্বলতা কত আবর্জনাকে কেবলই বর্ষণ করছে। এমনি করে এখানকার স্থান সংকীর্ণ হয়ে উঠছে। প্রত্যেকের রাগদ্বেষ-মোহমলিনতার দ্বারা এখানকার বাতাস কলুষিত হচ্ছে, আকাশ অবরুদ্ধ হচ্ছে।

আমি অধিক কথা বলতে চাই না। বাক্যের দ্বারা ক্ষণিক উত্তেজনা ও উৎসাহ

সঞ্চার করার উপর আমার কোনো বিশ্বাস নেই। আমি জানি প্রত্যেকের জীবন নিজের ভিতর থেকে নিজের শক্তিকে উপলব্ধি করতে না পারলে বক্তৃতা বা উপদেশে কোনো ফললাভ হয় না। প্রতি দিনের সাধনায় শক্তিকে জাগ্রত করে তবে আমরা মুক্তি পাব। আমি বৃথা এ আক্ষেপও রাখতে চাই না যে কিছু হচ্ছে না। শান্তভাবে গম্ভীরভাবে স্তব্ধ হয়ে আমাদের আপনার ভিতরে দেখতে হবে যে 'শান্তং শিবং অদ্বৈতং' রয়েছেন ; তিনি সত্য, তিনি আমার ভিতরে সত্য, তিনি জগতে সত্য। দেখি কোন্‌খানে বাধছে, কোন্‌খানে জগতের মধ্যে যিনি 'শান্তং শিবং অদ্বৈতং' তাঁর শান্তিতে আমি ব্যাঘাত করছি। এ প্রত্যেককে আলাদা করে নিজের ভিতরে দেখতে হবে। কারণ, প্রত্যেকের জীবনের সমস্যা স্বতন্ত্র। কার কোন্‌খানে দীনতা ও কৃপণতা তা তো আমরা জানি না। এই মন্দিরে আমাদের যেমন সম্মিলিত উপাসনা হচ্ছে তেমনি আমাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র সাধনা এইখানেই জেগে উঠুক। একবার আমাদের চিত্তকে চিন্তাকে গভীর করে অন্তরের মধ্যে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। আমরা একবার দেখবার চেষ্টা করি এই আশ্রমের মধ্যে যে সত্যসাধনা রয়েছে সেটি কী। আর-একবার মনকে দিয়ে বলিয়ে নিই : পিতা নোঽসি। পিতা নো বোধি। এ যে কত বড়ো বোধ। সেই বোধের দ্বারা আমাদের দৃষ্টির কলুষ, আমাদের বুদ্ধির জড়তা, আমাদের চৈতন্যের সংকীর্ণতা দূর হয়ে যাক। এ তো কোনো উপদেশের দ্বারা হবার জো নেই। যেমন করে ছোটো অঙ্গার থেকে বৃহৎ অগ্নি জ্বলে উঠতে পারে তেমনি করে এই ছোটো কথাটি থেকে বোধের অগ্নি জ্বলে উঠুক ; দগ্ধ হোক সকল মলিনতা ও সংকীর্ণতা। যদি সমস্ত ইচ্ছাকে জাগ্রত করে আমরা এই সত্যকে গ্রহণ করি তবেই এই বোধ উদ্‌বোধিত হবে, যদি না করি তবে হবে না। মিথ্যার মধ্যে জড়িয়ে আছি, যদি বলি তাই নিয়েই কাটবে, কাটাও, কেউ কোনো বাধা দেবে না। সংসারে কেউ তার থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। কোনো উপদেশ কোনো উত্তেজনায় ফল হবে না।

মানুষের কণ্ঠে নয়, এই স্তবমন্ত্রের বাণী বিশ্বের কণ্ঠে জেগে উঠুক। এই বাণী জগতে শক্তি প্রয়োগ করুক, বাতাসে শক্তি প্রয়োগ করুক, আলোকে শক্তি প্রয়োগ করুক। বাধা বিস্তর, আবরণ সুকঠিন জানি। কিন্তু এও জানি যে, মানুষের শক্তির সীমা নেই। দেশে কালে মানুষ অনন্ত, তার সেই অনন্ত মহত্ত্বকে কোনো আবরণ প্রচ্ছন্ন করে রাখতে পারে না। আমি সত্য, আমি সত্য, এই কথা জানবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যোগ হোক। জাতীয়তার আবরণ, বিশেষ ধর্মের গণ্ডি, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা, এ-সমস্ত থেকে মুক্তিলাভ করি। সেই

মুক্তির জন্যই যে এই স্থানটি তৈরি হয়েছে আজ সেই কথা স্মরণ করি। আজ স্থির হয়ে ভাবি যে, প্রতিদিনের জীবনে কোন্‌খানে ব্যাঘাত রয়েছে। অভ্যস্ত বলেই তো সেই ব্যাঘাতকে দেখতে পাই নে। সমস্ত জীবনের সঙ্গে সে একাত্ম হয়ে গিয়েছে। যেমন বাতাসে এত ধুলো রয়েছে, অথচ দরজার ভিতর দিয়ে সূর্যরশ্মি এলে তবেই সেটা দেখা যায়, তেমনি অন্তরে যে কী দীনতা রয়েছে তা এমনি দেখা যায় না— শান্তিনিকেতনের সাধনার জ্যোতির ভিতর দিয়ে তাকে দেখে তার থেকে মুক্তিলাভের ব্রতকে গ্রহণ করি। বোধ আবির্ভূত হোক। বোধ পরিপূর্ণ হোক। কার্তিক ১৩২১

দীক্ষার দিন

আশ্রমকে যেদিন সত্য করে দেখতে হবে সেদিন আনন্দের সংগীত বেজে উঠবে, ফুলের মালা দুলবে, সূর্যের কিরণ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে। কারণ, আনন্দের মধ্য দিয়েই সত্যকে দেখা সম্ভব হয়, আর-কোনো উপায়ে নয়। আমাদের একান্ত আসক্তি দিয়ে সব জিনিসকে বাইরের দিক থেকে আঁকড়ে থাকি; সেইজন্যই সেই আসক্তি থেকে ছাড়িয়ে ভিতরকার আনন্দরূপকে দেখবার এক-এক দিন আসে।

আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি কোন্‌ দিনটিকে আশ্রমের এই সত্যরূপকে দেখবার উৎসবের দিন করেছেন? সে তাঁর দীক্ষার দিন। দীক্ষা সেই দিন যেদিন মানুষ আপনার মধ্যে যেটি বড়ো, আপনার মধ্যে যে অমর জীবন, তাকে স্বীকার করে। সংসারের ক্ষেত্রে মানুষ যে জন্মায় তাতে তার কোনো চেষ্টা নেই; সেখানকার আয়োজন তার আসবার অনেক পূর্বে থেকেই প্রস্তুত হয়ে আছে। কিন্তু, মানুষ আপনাকে আপনি অতিক্রম করে যেদিন একেবারে সূর্যের আলোর কাছে, নিখিল আকাশের কাছে, পুণ্য সমীরণের কাছে, বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দক্ষিণ হস্তের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে— যেদিন এই কথা বলে যে আমি অনন্তকালের অমৃতজীবনের মানুষ, আমারই মধ্যে সেই বৃহৎ সেই বিরাট সেই ভূমার প্রকাশ— সেদিন সমস্ত মানুষের উৎসবের দিন। সেইরকম একটি দীক্ষার দিন যেদিন মহর্ষি বিশ্বের মধ্যে অনন্তকে প্রণাম করেছেন, যেদিন আপনার মধ্যে অমৃতজীবনকে অনুভব করে তাকে অর্ঘ্যরূপে তাঁর কাছে নিবেদন করে দিয়েছেন, সেই দিনটি যে বাস্তবিকই উৎসবের দিন এই কথা অনুভব করে তিনি তাকে আমাদের জন্যে দান করে গিয়েছেন। মহর্ষির সেই দীক্ষাকে আশ্রয় করেই এখানে আমরা আছি। এই

আশ্রম তাঁর সেই দীক্ষাদিনটিরই বাইরের রূপ। কারণ, এখানে কর্মে দীক্ষা, শিক্ষায় দীক্ষা, শিক্ষকতায় দীক্ষা— সেই অমরজীবনের দীক্ষা। সেই পরমদীক্ষার মন্ত্রটি এই আশ্রমের মধ্যে রয়ে গেছে। প্রতিদিন সে কথা যদি ভুলে গিয়ে থাকি অন্তত আজ উৎসবের আনন্দালোকে আশ্রমের সেই অমৃতরূপকে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করবার জন্য প্রস্তুত হও। আজ উদ্‌বোধিত হও, সত্যকে দেখো। আজ বাতাসের মধ্যে সেই দীক্ষার মন্ত্র শ্রবণ করো—

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্‌ধনম্‌।

যে পরম ইচ্ছায় সমস্ত জগৎ বিধৃত ও চালিত, যে পরম ইচ্ছায় সূর্য চন্দ্র তারা নিয়মিত এবং আকাশের অনন্ত আরতিদীপের কোনোদিন নির্বাণ নেই, সেই পরম ইচ্ছার দ্বারা সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে আচ্ছন্ন তা উপলব্ধি করো। সব স্পন্দিত তাঁর ইচ্ছার কম্পনে, তাঁর আনন্দের বিদ্যুতে। সেই আনন্দকে দেখো। তিনি ত্যাগ করছেন তাই ভোগ করছি। তিনি ত্যাগ করছেন তাই জীবনের উৎস দশ দিকে প্রবাহিত হচ্ছে; আনন্দের নদী শাখায় প্রশাখায় বয়ে যাচ্ছে; ঘরে ঘরে স্বামীস্ত্রীর পবিত্র প্রীতিতে, পিতামাতার গভীর স্নেহে, মাধুর্যধারার অবসান নেই। অজস্র ধারায় সেই জীবন, সেই আনন্দ, সেই প্রেম প্রবাহিত; ভোগ করো, আনন্দে ভোগ করো। আকাশের নীলিমায়, কাননের শ্যামলিমায়, জ্ঞানে প্রেমে আনন্দে ভোগ করো, পরিপূর্ণরূপে ভোগ করো। মা গৃধঃ। মনের ভিতরে কোনো কলুষ কোনো লোভ না আসুক, পাপের লোভের সকল বন্ধন মুক্ত হোক। এই তাঁর দীক্ষার মন্ত্র।

এই মন্ত্র আশ্রমকে সৃষ্টি করেছে, এই মন্ত্র এই আশ্রমকে রক্ষা করেছে। এই আশ্রমের আকাশে, পুণ্য সমীরণে, নির্মল আলোকে, উদার প্রান্তরে, এই আমাদের সম্মিলিত জীবনের মধ্যে এই মন্ত্রকে দেখবার, শ্রবণ করবার, গ্রহণ করবার জন্য অদ্য এই উৎসব। চিত্ত জাগ্রত হোক, আশ্রমদেবতা প্রত্যক্ষ হোন, তিনি তাঁর মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করুন। এই ফুলের মতো সুকুমার তরুণজীবনগুলির উপর তাঁর স্নেহাশীর্বাদ পড়ুক; বিকশিত হোক এরা পুণ্যে প্রেমে পবিত্রতায়; স্মরণ করুক এই শুভদিন, গ্রহণ করুক এই মন্ত্র, এই চিরজীবনের পাথেয়। এদের সম্মুখে সমস্ত জীবনের পথ রয়েছে, অমৃত আশীর্বাদ এরা গ্রহণ করে যাত্রা করুক; চিরজীবনের দীক্ষাকে লাভ করে এরা অগ্রসর হয়ে যাক। পথের সমস্ত বাধা বিপত্তি সংকটকে অতিক্রম করে যাবার জন্যে এই দীক্ষার মন্ত্র তাদের সহায় হোক। উদ্‌বোধিত হও, জীবনকে উদ্‌বোধিত করো। ৭ পৌষ ১৩২১

আরো

আরো চাই, আরো চাই— এই গান উৎসবের গান। আমরা সেই ভাণ্ডারে এসেছি যেখানে আরো পাব। পৃথিবী ধনে ধান্যে পরিপূর্ণ, মানুষের ঘর স্নেহে প্রেমে পরিপূর্ণ। লক্ষ্মীর কোলে মানুষ জন্মেছে। সেখানে আমাদের প্রয়োজন মিটিয়ে দিন কেটে যাচ্ছে। এক-একদিন তার বাইরে এসে 'আরো'র ভাণ্ডারের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে মানুষের উৎসব।

একদিন মানুষ পৃথিবীতে দেবতাকে বড়ো ভয় করেছিল। কে যে প্রসন্ন হলে জীবন সুখে স্বচ্ছন্দে কাটে, কে যে অপ্রসন্ন হলে দুর্যোগ উপস্থিত হয়, তা মানুষ কোনোমতেই সেদিন ভেবে পায় নি। যে শক্তির সঙ্গে আত্মার যোগ নেই তাকে প্রসন্ন রাখবার জন্য বলির পশু নিয়ে তখন ভয়াতুর মানুষ একত্র মিলেছে। তখনকার সেই ভয়ের পূজা তো উৎসব নয়। ডাকাতের হাতে পড়লে যেমন ভীরু বলে ওঠে 'আমার যা আছে সব দিচ্ছি কিন্তু আমায় প্রাণে মেরো না' তেমনি পৃথিবীর মধ্যে অদৃশ্য শক্তিকে খুশি রাখবার জন্য সেদিন মানুষ বলেছিল : আমি তোমাকে সব দেব, তুমি আমায় সংকটে ফেলো না। কিন্তু, সে তো আনন্দের দান নয়। আনন্দের দেবতাকে উপলব্ধি করলে আর ভয় নেই। কারণ, এই আনন্দের দেবতাই যে 'আরো', এই তো সকলকে ছাড়িয়ে যায়। যা-কিছু পেয়েছি বুঝেছি তার চেয়ে তিনি আরো ; যা পাই নি, হারিয়েছি, তার চেয়েও তিনি আরো। তিনি ধনের চেয়ে আরো, মানের চেয়ে আরো, আরামের চেয়ে আরো। তাই তো সেই আরো'র পূজায়, আরো'র উৎসবে মানুষ আনন্দে বলেছে : আমার ধন নাও, প্রাণ নাও, সম্মান নাও। অন্তরে এবং বাহিরে মানুষের এই-যে আরো'কে জানা এ বড়ো আরামের জানা নয়। যেদিন মানুষ জেনেছে যে সে পশু নয়, তার দেবতা পাশব নয়, সে বড়ো, তার দেবতা বড়ো, সেদিন সে যে পরম দুঃখকে স্বীকার করে নিয়েছে। সেদিন মানুষ যে বিজয়ী, মানুষ যে বীর, তাই সেই বিজয়লাভের জয়োৎসব সেদিন হবে না ? পাখি যেমন অন্ধকারের প্রান্তে জ্যোতির স্পর্শমাত্রে অকারণ আনন্দে গেয়ে ওঠে তেমনি যেদিন পরম জ্যোতি তাকে স্পর্শ করেন সেদিন মানুষও গেয়ে ওঠে। সেদিন সে বলে : আমি অমৃতের পুত্র। সে বলে : বেদাহমেতং, আমি পেয়েছি। সেই পাওয়ার জোরে নিজের মধ্যে সেই অমৃতকে অনুভব করে ভয়কে সে আর ভয় করে না, মৃত্যুকে গ্রাহ্য করে না, বিপদের সামনে দাঁড়িয়ে সে বলে : আমার পথ সামনে, আমি পিছু হটব না, আমার পরাজয় নেই— রুদ্র তোমার প্রসন্নতা অন্তহীন।

একবার ভেবে দেখো দেখি, এই মুহূর্তে যখন এখানে আমরা আনন্দোৎসব করছি তখন সমুদ্রের পারে মানুষের সঙ্গে মানুষের কী নিদারুণ যুদ্ধ চলেছে! সেখানে আজ এই প্রভাতের আলোক কী দেখছে, কী প্রলয়ের বিভীষিকা! সেখানে এই বিভীষিকার উপরে দাঁড়িয়ে মানুষ তার মনুষ্যত্বকে প্রচার করছে। সেখানে ইতিহাসের ডাক এসেছে, সেই ডাক শুনে সবাই বেরিয়ে পড়েছে। কে ভুল করেছে, কে ভুল করে নি, এ যুদ্ধে কোন্ পক্ষ কী পরিমাণ দায়ী, সে কথা দূরের কথা। কিন্তু, ইতিহাসের ডাক পড়েছে; সে ডাক জার্মান শুনেছে, ইংরাজ শুনেছে, ফরাসি শুনেছে, বেলজিয়ান শুনেছে, অস্ট্রিয়ান শুনেছে, রাশিয়ান শুনেছে। ইতিহাসের ভিতর দিয়ে ইতিহাসের দেবতা তাঁর পূজা গ্রহণ করবেন; এ যুদ্ধের মধ্যে তাঁর সেই উৎসব। কোনো জাতি তার জাতীয় স্বার্থকে পুঞ্জীভূত করে তার জাতীয়তাকে সংকীর্ণ করে তুলবে তা হবে না, ইতিহাসবিধাতার এই আদেশ। মানুষ সেই জাতীয় স্বার্থদানবের পায়ে এত দিন ধরে নরবলির উদ্‌যোগ করেছে, আজ তাই সেই অপদেবতার মন্দির ভাঙবার হুকুম হয়েছে। ইতিহাসবিধাতা বলেছেন, এ জাতীয় স্বার্থদানবের মন্দিরের প্রাচীর তোমাদের সবাইকে চূর্ণ করে ধুলোয় লুটিয়ে দিতে হবে, এ নরবলি আর চলবে না। যেমনি এই হুকুম পৌঁচেছে অমনি কামানের গোলা দুই পক্ষ থেকে সেই প্রাচীরের উপর এসে পড়েছে। বীরের দল ইতিহাসবিধাতার পূজায় তাদের রক্তপদ্মের অর্ঘ্য নিয়ে চলেছে। যারা আরামে ছিল তারা আরামকে ধিক্‌কার দিয়ে বলে উঠেছে, প্রাণকে আঁকড়ে থাকব না, প্রাণের চেয়ে মানুষের মধ্যে আরো আরো বেশি আছে। কামানের গর্জনে মনুষ্যত্বের জয়সংগীত বেজে উঠেছে। মা কেঁদে উঠেছে, স্ত্রীপুত্র অনাথ হয়ে বক্ষে করাঘাত করছে। সেই কান্নার উপরে দাঁড়িয়ে সেখানে উৎসব হচ্ছে; বাণিজ্য ব্যবসায় চলছিল, ঘরে টাকা বোঝাই হচ্ছিল, রাজ্যসাম্রাজ্য জুড়ে প্রতাপ ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছিল— ডাক পড়ল বেরিয়ে আসতে হবে। মহেশ্বর যখন তাঁর পিণাকে রুদ্র নিশ্বাস ভরেছেন তখন মাকে কেঁদে বলতে হয়েছে 'যাও'। স্ত্রীকে কেঁদে নিজের হাতে স্বামীকে বর্ম পরিয়ে দিতে হয়েছে। সমুদ্রপারে আজ মরণযজ্ঞে সেই প্রাণের মহোৎসব।

সেই উৎসবের ধ্বনি আমাদের উৎসবের মধ্যে কি আজ এসে পৌঁছোয় নি। ভীত মানুষ, আরামের জন্য লালায়িত মানুষ, যে প্রতিদিন তুচ্ছ স্বার্থটুকু নিয়ে কাড়াকাড়ি মারামারি করে মরেছে, কে তার কানে এই মন্ত্র দিলে 'সব ফেলে দাও— বেরিয়ে এসো'! যাঁর হাতে আরো'র ভাণ্ডার তিনিই বললেন, যাও মৃত্যুকে অবহেলা করে বেরোও দেখি! বিরাট বীর মানুষের সেই পরিচয়, যে মানুষ আরো'র অমৃত-পানে উন্মত্ত হয়েছে সেই মানুষের পরিচয়, আজ কি আমরা পাব না। আমরা কি এ দেশে অজ্ঞানদেবতা

উপদেবতার মন্দির তৈরি করে ষোড়শোপচারে তার পূজা করি নি। তার কাছে মানুষের বুদ্ধিকে শক্তিকে বলি দিই নি? যে অজ্ঞানমোহে মানুষ মানুষকে ঘৃণা করে দূরে পরিহার করে সেই মোহের মন্দির, সেই মূঢ়তার মন্দির কি আমাদের ভাঙতে হবে না। আমাদের সামনে সেই লড়াই নেই? আমাদের মার খেতে হবে আত্মীয়স্বজনের। আমরা দুঃখকে স্বীকার করব, আমরা অপমান নিন্দা বিদ্রূপের আঘাত পাব, তাতে আমরা ভয় করব না।

আমাদের শান্তিনিকেতনে ইতিহাসবিধাতা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, কোন্ অমৃতমন্ত্রে সেই শক্তিকে আমরা পাব। ঈশাবাস্যমিদং সর্বং। ভয় নেই; সমস্তই পরিপূর্ণতার দ্বারা আবৃত। মৃত্যুর উপরে সেই অমৃত। ঈশের দ্বারা আচ্ছন্ন করে দেখো —সর্বত্র সেই আনন্দলোক উদ্‌ঘাটিত হবে, ভয় চলে যাবে। দূর করো সব জালজঞ্জাল, বেরিয়ে এসো।

ভোগসুখ মোহকলুষ আমাদের পায়ে পায়ে জড়িয়ে ধরেছে, নির্ভয়ে সব ফেলে দিয়ে বীরত্বের অভিষেকস্নানে শুচি হয়ে বেরিয়ে এসো। আজ জগৎ জুড়ে যে ক্রন্দন বেজেছে তার মধ্যে ভয়ের সুর নেই; তার ভিতর দিয়ে ইতিহাস তৈরি হচ্ছে, তারই মধ্যে ইতিহাসবিধাতার আনন্দ। সে ক্রন্দন তাঁর মধ্যে শান্ত। সেই শান্তং শিবং অদ্বৈতমের মধ্যে মৃত্যু মরেছে। তিনি নিজের হাতে মানুষের ললাটে জয়তিলক পরিয়েছেন। তিনি বিচ্ছেদবিরোধের মাঝখানে দাঁড়িয়েছেন। যাত্রীরা যেখানে যাত্রা করেছে, মৃত্যুর ঝংকার যেখানে প্রতিধ্বনিত, সেইখানে দেখো সেই শান্তং শিবং অদ্বৈতং। আজ সেই রুদ্রের দক্ষিণ হস্তের আশীর্বাদ গ্রহণ করো। রুদ্রের প্রসন্ন হাসি তখনই দেখা যায় যখন তিনি দেখতে পান যে তাঁর বীর সন্তানেরা দুঃখকে অগ্রাহ্য করেছে। তখনই তাঁর সেই প্রসন্ন মুখের হাস্যচ্ছটা বিকীর্ণ হয়ে সত্যজ্যোতিতে অভিষিক্ত করে দেয়। রুদ্রের সেই প্রসন্নতা আজ উৎসবের দিনে আমাদের জীবনের উপরে বিকীর্ণ হোক। ৭ পৌষ প্রাতে, ১৩২১

মাঘ ১৩২১

আবির্ভাব

তুমি যে এসেছ মোর ভবনে
রব উঠেছে ভুবনে।

আশ্চর্য কথা এই যে আমরা এই গানে বলছি যে, তুমি আমার ভবনে অতিথি হয়ে এসেছ। এই একটি কথা বলবার অধিকার তিনি আমাদের দিয়েছেন। যিনি বিশ্বভুবনের সব জায়গা জুড়ে বসে আছেন, তাঁকেই আমরা বলছি, তুমি আমার ভবনে

অতিথি। কারণ, আমার ভবনে তাঁকে ডাকবার এবং না ডাকবার অধিকার তিনিই আমাকে দিয়েছেন। তাই সেই সর্বব্যাপী ঈশ্বরকে ইচ্ছা করলে ভবনের দ্বারে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারি।

জীবনে কত অল্প দিন আমরা সেই বন্ধুকে ঘরে ডেকে আনি। তাঁকে আমার ভবনে ডাকব এমন দিন তো আসে না। তিনি এই ঘরের প্রান্তেই মুখ আবৃত করে বসে থাকেন; অপেক্ষা করেন, দেখি আমায় ডাক দেয় কি না! তিনি আমার ঘরের সামান্য আসবাবটি পর্যন্ত প্রকাশ করছেন, তিনি সর্বঘরে সর্ববিষয়ের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছেন, অথচ তিনিই ঘরে নেই। প্রত্যেক নিশ্বাসের ওঠানামায় তাঁর শক্তি কাজ করছে, চক্ষের প্রত্যেক পলক তাঁর ইচ্ছায় পড়ছে, রক্তের প্রত্যেক কণা নিরন্তর ধাবিত হচ্ছে, অথচ আমাদের এতবড়ো আস্পর্ধা তিনি দিলেন যে, আমরা না ডাকলে তিনি ঘরে প্রবেশ করবেন না।

সেইজন্যে যেদিন তিনি আসেন সমস্ত হৃদয় খুলে দিয়ে সেদিন প্রেমের ডাকে তাঁকে ডাকি, সেদিন বিশ্বভুবনে রব ওঠে: তিনি এসেছেন। সূর্যের তরুণ আলোকে সেই বাণী প্রকাশ হয়, নক্ষত্র হতে নক্ষত্রে সেই বার্তা ধাবিত হয়, বিকশিত পুষ্পের পাপড়িতে পাপড়িতে লেখা থাকে: তিনি এসেছেন। তিনি অপেক্ষা করে ছিলেন আলোকের পর্দার ও পারে, জীবনের সুখদুঃখের ও দিকে; ডাক যেই পড়ল অমনি যিনি অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সূর্যচন্দ্রতারার জ্যোতির্ময় সিংহাসনে বসে ছিলেন তিনি একটি কীটের গহ্বরের মতো ক্ষুদ্র ঘরে স্থান পেলেন। অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাঁর স্থান ছিল, স্থান ছিল না এই ছোটো ঘরটিতে। এই ঘরটি ধনজনমানে ভর্তি ছিল, তাই তাঁর জন্য এখানে জায়গা হয় নি। কিন্তু, যেদিন এলেন সেদিন তড়িৎবেগে সমস্ত বিশ্বে এই বার্তা গোপনে গোপনে প্রচারিত হয়ে গেল: তিনি এসেছেন। ফুলের সৌন্দর্যে, আকাশের নীলিমায় এই বার্তা ব্যাপ্ত হয়ে গেল।

পুত্র কখনো কখনো পিতার জন্মোৎসব করে থাকে, সংসারে এমন ঘটনা ঘটে। সেদিন পুত্র মনে ভাবে যে তার পিতা একদিন শিশু হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেদিন যেন তার ঘরে সে নূতন করে তার পিতার জন্মব্যাপারকে অনুভব করে। পিতাকে সে যেন নিজের পুত্রের মতো লাভ করে। এ যেমন আশ্চর্য তেমনি আশ্চর্য বিশ্বপিতা যেদিন জন্মগ্রহণ করেন আমাদের ঘরে। যিনি অনন্ত ভুবনের পিতা তিনি একদিন আমার অন্তরের ভিতরে চৈতন্যের মধ্যে জন্মলাভ করবেন; তিনি আসবেন। পিতা নোঽসি। পিতা তুমি পিতা হয়ে আছ, আমার জীবনকে তোমার মহাজীবনে আলিঙ্গন করে আছ, যুগ হতে যুগে লোক হতে লোকান্তরে আমায় বহন করে এনেছ। পিতা নো

বোধি। কিন্তু, আমার বোধের মধ্যে তো তোমার আবির্ভাব হয় নি। সেই বোধের অপেক্ষায়, আমার উদ্‌বোধনের অপেক্ষায় যে তাঁকে থাকতে হয়। যেদিন আমার বোধের মধ্যে পিতারূপে তাঁর আবির্ভাব হবে সেদিন পৃথিবীতে শঙ্খধ্বনি বেজে উঠবে। ভক্তের চৈতন্যে সেদিন যে তাঁর নবজন্মলাভ।

সংসারের সুখে দুঃখে যখন তরঙ্গায়িত হচ্ছি চৈতন্যের মধ্যে তখন আমরা পিতৃহারা। জীবধাত্রী বসুন্ধরা পিতার সিংহাসন বহন করছে; প্রাণের ভাণ্ডার, অন্নের ভাণ্ডার সেখানে পরিপূর্ণ। কিন্তু, অন্তরে যে দুর্ভিক্ষ, সেখানে যে পিতা নেই। সে বড়ো দৈন্য, সে পরম দারিদ্র্য। যিনি রয়েছেন সর্বত্রই, তাঁকে আমি পাই না। পাই না, কারণ ভক্তি নেই। যুক্তি খুঁজে পাওয়া সহজ, কিন্তু ভক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। আনন্দ সহজ না হলে পাওয়া যায় না। উপনিষদে বলে, মন বাক্য তাঁকে না পেয়ে ফিরে ফিরে আসে, কিন্তু তাঁর আনন্দ যে পেয়েছে তার আর ভয় নেই। তাঁকে দেখা উৎসবের মধ্যে দেখা; জ্ঞানে নয়, তর্কের মধ্যে নয়। আনন্দের ভিতর দিয়ে ছাড়া কিছুই পাবার উপায় নেই।

এই-যে উৎসবের আলোক জ্বলছে একে কি তর্ক করে কোনোমতেই পাওয়া যেত। চোখের মধ্যে আলো পাবার আনন্দ আছে, তাই তো চোখ আলো পায়; চোখ যে আলোর জন্য লালায়িত। এক সময়ে জীবের তো চক্ষু ছিল না; চক্ষু কেমন করে ক্রমে জীবের অভিব্যক্তিতে ফুটল? জীবের মধ্যে আলোককে পাবার তৃষ্ণা ছিল, দেহীর দেহের পর্দার আড়ালে বিরহীর মতো সেই তৃষ্ণা জেগে ছিল; তার সেই দীর্ঘ বিরহের তপস্যা সহসা একদিন চক্ষুবাতায়নের ভিতরে সার্থক হল। আলোকের আনন্দদূত তার চোখের বাতায়নে এল। আলোককে পাবার আনন্দের জন্য তপস্যা ছিল; সেই তপস্যা অন্ধ জীবের অন্ধকার দেহের মধ্যে চক্ষুকে বিকশিত করে স্বর্গের আলোকের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছে। সেই একই সাধনা অন্ধ চৈতন্যের মধ্যে রয়েছে; আত্মা কাঁদছে সেখানে। যতদিন পর্যন্ত অন্ধ জীব চক্ষু পায় নি সে জানত না তার ভিতরে আলোকবিরহী কাঁদছিল; সে না জানলেও সেই কান্না ছিল বলেই চোখ খুলেছে। অন্তরের মধ্যে চৈতন্যগুহায় অন্ধকারে পরমজ্যোতির জন্য মানুষের তপস্যা চলেছে। এ কথা কখনোই সত্য নয় যে কোনো মানুষের আত্মা ধনজনের জন্য লালায়িত। মগ্নচৈতন্যের অন্ধকারময় রুদ্ধ বাতায়নে বিরহী আত্মা কাঁদছে; সেই কান্না সমস্ত কোলাহলের আবরণ ভেদ করে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত উঠেছে। আনন্দ যেদিন আসবে সেদিন চোখ মেলে দেখব সেই জ্যোতির্ময়কে। সেদিন তিনি আমার ভবনে আসবেন এবং বিশ্বভুবনে তার সাড়া পড়ে যাবে। ৭ পৌষ ১৩২১

মাঘ ১৩২১

অন্তরতর শান্তি

তুমি যে চেয়ে আছ আকাশ ভরে,
নিশিদিন অনিমেষে দেখছ মোরে !

তিনি যে চেয়ে রয়েছেন আমার মুখের দিকে, আমার অন্তরের মাঝখানে, এ কি উপলব্ধি করব এইখানে। এ-সব কথা কি এই কোলাহলে বলবার কথা। তারার আলোকে, স্নিগ্ধ অন্ধকারে, ভক্তের অন্তরের নিস্তব্ধলোকে, যখন অনন্ত আকাশ থেকে একটি অনিমেষ নেত্রের দৃষ্টি পড়ে তখন সেই নিঃশব্দ বিরলতার মধ্যেই এই পরম আনন্দের গভীর বাণী জেগে উঠতে পারে— এই কথাই মনে হয়। কিন্তু তা নয়, সেই বিরলতার মধ্যেই যে সাধকের উৎসব সম্পূর্ণ হয় তা কখনোই সত্য নয়। মানুষের এই কোলাহলময় হাটে যেখানে কেনাবেচার বিচিত্র লীলা চলেছে, এরই মধ্যে, এই মুখর কোলাহলের মধ্যেই, তাঁর পূজার গীত উঠছে— এর থেকে দূরে সরে গিয়ে কখনোই তাঁর উৎসব নয়। আকাশের তারায় তারায় যে সংগীত উঠছে যুগ যুগান্তর ধরে সে সংগীতের কেবলই পুনরাবৃত্তি চলছে। সেখানে কোনো কোলাহল নেই, ভিড় নেই, ঠেলাঠেলি নেই; নক্ষত্রলোকে যেন বিশ্বরূপ বাউল তার একতারার একটি সুর ফিরে ফিরে বাজাচ্ছে। কিন্তু মানুষের জগতে যে গান উঠছে সে কি একটি-তারের সংগীত। কত যুদ্ধবিগ্রহ বিরোধ-সংগ্রামের কত বিচিত্র তার সেখানে ঝংকৃত হচ্ছে, তার বৈচিত্র্যের সীমা নেই। কিন্তু এই-সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে, বিরোধের মধ্যে, শান্তির সুর বাজছে। মানুষের চারি দিকে ষড়্‌রিপুর হানাহানি, তাণ্ডবলীলা চলেছে; কিন্তু এত বেসুর এসে কই এই একটি সুরকে তো লুপ্ত করতে পারলে না! সকল বিরোধ, সকল বিপ্লব, সকল যুদ্ধবিগ্রহের ভিতর দিয়ে এই সুর বেজে উঠল : শান্তং শিবং অদ্বৈতং।

মানুষের ইতিহাসে এই-যে উৎসব চলছে তারই কি একটি প্রতিরূপ আজকের এই মেলার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না। এখানে কেউ বাজার করছে, কেউ খেলা করছে, কেউ যাত্রা শুনছে, কিন্তু নিষেধ তো করা হয় নি, বলা হয় নি 'এখানে উপাসনা হচ্ছে— তোমরা সাধু হয়ে চুপ করে বসে থাকো'। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে মানুষের জগতে যে-একটা প্রচণ্ড কোলাহল চলছে শান্তিনিকেতনের নিভৃত শান্তিকে তা আবিল করুক। মানুষই কোলাহল করে, আর তো কেউ করে না। কিন্তু মানুষের কোলাহল আজ পর্যন্ত কি মানুষের সংগীতকে থামাতে পারল। ঈশ্বর যে খনির ভিতর থেকে রত্নকে উদ্ধার করতে চান, তিনি যে বিরোধের এই কোলাহলের মধ্য থেকেই তাঁর পূজাকে

উদ্ধার করবেন। কারণ, এই কোলাহলের জীব মানুষ যখন শান্তিকে পায় তখন সেই গভীরতম শান্তির তুলনা কোথায়। সে শান্তি জনহীন সমুদ্রে নেই, মরুভূমির স্তব্ধতায় নেই, পর্বতের দুর্গম শিখরে নেই। আত্মার মধ্যে সেই গভীর শান্তি। চারি দিকের কোলাহল তাকে আক্রমণ করতে গিয়ে পরাস্ত হয়; কোলাহলের ভিতরে নিবিড়রূপে সুরক্ষিত সেই শান্তি। হাট বসে গিয়েছে, বেচা-কেনার রব উঠেছে; তারই মধ্যে প্রত্যেক মানুষ তার আপনার আত্মার ভিতরে একটি যোগাসনকে বহন করছে। হে যোগী, জাগো। তোমার যোগাসন প্রস্তুত, তোমার আসন তুমি গ্রহণ করো; এই কোলাহলে, ষড়্‌রিপুর ক্ষোভ-বিক্ষোভ-বিরোধের মাঝখানে অক্ষতশান্তি, সেইখানে বোসো। সেখানে তোমার উৎসবপ্রদীপ জ্বালো, কোনো অশান্ত বাতাস তাকে নেবাতে পারবে না। তুমি কোলাহল দেখে ভীত হোয়ো না; ফলের গর্ভে শস্য যেমন তিক্ত আবরণের ভিতরে থেকে রক্ষা পায়; সেইরূপ কোলাহলের দ্বারাই বেষ্টিত হয়ে চিরকাল মানুষের শান্তি রক্ষা পেয়ে এসেছে। মানুষ তার বৈষয়িকতার বুকের উপর তার ইষ্টদেবতাকে সর্বত্রই তো প্রতিষ্ঠিত করেছে। যেখানে তার আসক্তি জীবনের সব সূত্রগুলিকে জড়িয়ে রেখেছে তারই মাঝখানে তার মন্দিরের চূড়া দেব-লোকের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

আমাদের চিত্ত আজ অনুকূল হয় নি, ক্ষতি নেই। যাক যার মন যেখানে খুশি যাক, কোনো নিষেধ নেই। তবু এই অসীম স্বাধীনতার ভিতরে মানুষের পূজার ক্ষেত্র সাবধানে রক্ষিত হয়ে এসেছে। সেই কথাটি আজ উপলব্ধি করবার জন্য কোলাহলের মধ্যে এসেছি। যার ভক্তি আছে, যার ভক্তি নেই, বিষয়ী ব্যবসায়ী পাপী, সকলেরই মধ্যে তাঁর পূজা হচ্ছে। এইখানেই এই মেলার মধ্যেই তাঁর পূজা হয়েছে, এই কোলাহলের মধ্যেই তাঁর স্তব উঠেছে। এইখানেই সেই শান্তং শিবং অদ্বৈতমের পদধ্বনি শুনছি; এই হাটের রাস্তায় তাঁর পদচিহ্ন পড়েছে। মানুষের এই আনাগোনার হাটেই তাঁর আনাগোনা; তিনি এইখানেই দেখা দিচ্ছেন। ৭ পৌষ রাত্রি, ১৩২১

মাঘ ১৩২১

—

গ্রন্থপরিচয়

রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশের তারিখ ও গ্রন্থ-সংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য গ্রন্থপরিচয়ে সংকলিত হইল। এই খণ্ডে মুদ্রিত কোনো কোনো রচনা সম্বন্ধে কবির নিজের মন্তব্যও উদ্‌ধৃত হইল।

পুনশ্চ

পুনশ্চ ১৩৩৯ সালের আশ্বিন মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৩৪০ সালের ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে, পরিশেষ গ্রন্থ হইতে খেলনার মুক্তি, পত্রলেখা, খ্যাতি, বাঁশি, উন্নতি, ভীরু এবং নূতন-লিখিত তীর্থযাত্রী, চিররূপের বাণী, শুচি, রঙরেজিনী, মুক্তি, প্রেমের সোনা ও স্নানসমাপন এই তেরোটি কবিতা সংযোজিত হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলীর এই খণ্ডে উক্ত দ্বিতীয় সংস্করণই পুনর্মুদ্রিত হইল।

শ্রীযুক্ত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ পুনশ্চ কাব্যের রচনারীতি সম্বন্ধে যে আলোচনা করেন নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল—

গানের আলাপের সঙ্গে পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থের গদ্যিকারীতির যে তুলনা করেছ সেটা মন্দ হয় নি। কেননা, আলাপের মধ্যে তালটা বাঁধনছাড়া হয়েও আত্মবিস্মৃত হয় না। অর্থাৎ, বাইরে থাকে না মৃদঙ্গের বোল, কিন্তু নিজের অঙ্গের মধ্যেই থাকে চলবার একটা ওজন।

কিন্তু সংগীতের সঙ্গে কাব্যের একটা জায়গায় মিল নেই। সংগীতের সমস্তটাই অনির্বচনীয়। কাব্যে বচনীয়তা আছে সে কথা বলা বাহুল্য। অনির্বচনীয়তা সেইটেকেই বেষ্টন করে হিল্লোলিত হতে থাকে, পৃথিবীর চার দিকে বায়ুমণ্ডলের মতো। এ-পর্যন্ত বচনের সঙ্গে অনির্বচনের, বিষয়ের সঙ্গে রসের গাঁঠ বেঁধে দিয়েছে ছন্দ। পরস্পরকে বলিয়ে নিয়েছে 'যদেতৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব'। বাক্ এবং অবাক্ বাঁধা পড়েছে ছন্দের মাল্যবন্ধনে। এই বাক্ এবং অবাকের একান্ত মিলনেই কাব্য। বিবাহিত জীবনে যেমন কাব্যেও তেমনি মাঝে মাঝে বিরোধ বাধে, উভয়ের মাঝখানে ফাঁক পড়ে যায়, ছন্দও তখন জোড় মেলাতে পারে না। সেটাকেই বলি আক্ষেপের বিষয়। বাসরঘরে এক শয্যায় দুই পক্ষ দুই দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকার মতোই সেটা শোচনীয়। তার চেয়ে আরো শোচনীয় যখন 'এক

কষ্টে না খেয়ে বাপের বাড়ি যান'। যথাপরিমিত খাদ্যবস্তুর প্রয়োজন আছে এ কথা অজীর্ণরোগীকেও স্বীকার করতে হয়। কোনো কোনো কাব্যে বাগ্‌দেবী স্থূলখাদ্যাভাবে ছায়ার মতো হয়ে পড়েন। সেটাকে আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ বলে উল্লাস না করে আধিভৌতিকতার অভাব বলে বিমর্ষ হওয়াই উচিত।

পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থে আধিভৌতককে সমাদর করে ভোজে বসানো হয়েছে। যেন জামাইষষ্ঠী। এ মানুষটা পুরুষ। একে সোনার ঘড়ির চেন পরালেও অলংকৃত করা হয় না। তা হোক, পাশেই আছেন কাঁকন-পরা অর্ধাবগুণ্ঠিতা মাধুরী, তিনি তাঁর শিল্পসমৃদ্ধ ব্যজনিকার আন্দোলনে এই ভোজের মধ্যে অমরাবতীর মৃদুমন্দ হাওয়ার আভাস এনে দিচ্ছেন। নিজের রচনা নিয়ে অহংকার করছি মনে করে আমাকে হঠাৎ সদুপদেশ দিতে বোসো না। আমি যে কীর্তিটা করেছি তার মূল্য নিয়ে কথা হচ্ছে না; তার যেটি আদর্শ এই চিঠিতে তারই আলোচনা চলছে। বক্ষ্যমান কাব্যে গদ্যটি মাংসপেশল পুরুষ বলেই কিছু প্রাধান্য যদি নিয়ে থাকে তবু তার কলাবতী বধূ দরজার আধখোলা অবকাশ দিয়ে উঁকি মারছে, তার সেই ছায়াবৃত কটাক্ষ-সহযোগে সমস্ত দৃশ্যটি রসিকদের উপভোগ্য হবে বলেই ভরসা করেছিলুম। এর মধ্যে ছন্দ নেই বললে অত্যুক্তি হবে, ছন্দ আছে বললেও সেটাকে বলব স্পর্ধা। তবে কী বললে ঠিক হবে ব্যাখ্যা করি। ব্যাখ্যা করব কাব্যরস দিয়েই।

বিবাহসভায় চন্দনচর্চিত বর-ক'নে টোপর মাথায় আল্পনা-আঁকা পিঁড়ির উপর বসেছে। পুরুত পড়ে চলেছে মন্ত্র, ও দিকে আকাশ থেকে আসছে শাহানা রাগিণীতে শানাইয়ের সংগীত। এমন অবস্থায় উভয়ের যে বিবাহ চলেছে সেটা নিঃসন্দিগ্ধ সুস্পষ্ট। নিশ্চিত-ছন্দ-ওয়ালা কাব্যে সেই শানাই-বাজনা সেই মন্ত্র-পড়া লেগেই আছে। তার সঙ্গে আছে লাল চেলি, বেনারসির জোড়, ফুলের মালা, ঝাড়-লন্ঠনের রোশনাই। সাধারণত যাকে কাব্য বলি সেটা হচ্ছে বচন-অনির্বচনের সদ্যোমিলনের পরিভূষিত উৎসব। অনুষ্ঠানে যা যা দরকার সযত্নে তা সংগ্রহ করা হয়েছে। কিন্তু, তার পরে? অনুষ্ঠান তো বারো মাস চলবে না। তাই বলেই তো নীরবিত শাহানা সংগীতের সঙ্গে সঙ্গেই বরবধূর মহাশূন্যে অন্তর্ধান কেউ প্রত্যাশা করে না। বিবাহ-অনুষ্ঠানটা সমাপ্ত হল, কিন্তু বিবাহটা তো রইল, যদি না কোনো মানসিক বা সামাজিক উপনিপাত ঘটে। এখন থেকে শাহানা রাগিণীটা অশ্রুত বাজবে। এমন-কি মাঝে মাঝে তার সঙ্গে বেসুরো নিখাদে অত্যন্তশ্রুত কড়া সুরও না মেশা অস্বাভাবিক, সুতরাং একেবারে না মেশা প্রার্থনীয় নয়। চেলি বেনারসিটা তোলা রইল, আবার কোনো অনুষ্ঠানের দিনে কাজে লাগবে। সপ্তপদীর বা

চতুর্দশপদীর পদক্ষেপটা প্রতিদিন মানায় না। তাই বলেই প্রাত্যহিক পদক্ষেপটা অস্থানে পড়ে বিপদজনক হবেই এমন আশঙ্কা করি নে। এমন-কি বাম দিক থেকে ঝুমুঝুমু মলের আওয়াজ গোলমালের মধ্যেও কানে আসে। তবু মোটের উপর বেশভূষাটা হল আটপৌরে। অনুষ্ঠানের বাঁধা রীতি থেকে ছাড়া পেয়ে একটা সুবিধে হল এই যে, উভয়ের মিলনের মধ্যে দিয়ে সংসারযাত্রার বৈচিত্র্য সহজ রূপ নিয়ে স্থূল সূক্ষ্ম নানা ভাবে দেখা দিতে লাগল। যুগলমিলন নেই, অথচ সংসারযাত্রা আছে, এমনও ঘটে। কিন্তু, সেটা লক্ষ্মীছাড়া। যেন খবুরে-কাগজি সাহিত্য। কিন্তু, যে সংসারটা প্রতিদিনের অথচ সেই প্রতিদিনকেই লক্ষ্মীশ্রী চিরদিনের করে তুলছে, যাকে চিরন্তনের পরিচয় দেবার জন্যে বিশেষ বৈঠকখানায় অলংকৃত আয়োজন করতে হয় না, তাকে কাব্যশ্রেণীতেই গণ্য করি। অথচ চেহারায় সে গদ্যের মতো হতেও পারে। তার মধ্যে বেসুর আছে, প্রতিবাদ আছে, নানাপ্রকার বিমিশ্রতা আছে, সেইজন্যেই চারিত্রশক্তি আছে। যেমন কর্ণের চারিত্রশক্তি যুধিষ্ঠিরের চেয়ে অনেক বড়ো। অথচ একরকম শিশুমতি আছে যারা ধর্মরাজের কাহিনী শুনে অশ্রুবিগলিত হয়। রামচন্দ্র নামটার উল্লেখ করলুম না, সে কেবল লোকভয়ে। কিন্তু, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আদিকবি বাল্মীকি রামচন্দ্রকে ভূমিকাপত্তন-স্বরূপে খাড়া করেছিলেন তার অসবর্ণতায় লক্ষ্মণের চরিত্রকে উজ্জ্বল করে আঁকবার জন্যেই, এমন-কি, হনুমানের চরিত্রকেও বাদ্ দেওয়া চলবে না। কিন্তু, সেই একঘেয়ে ভূমিকাটা অত্যন্ত বেশি রঙফলানো চওড়া বলেই লোকে ওইটের দিকে তাকিয়ে হায়-হায় করে। ভবভূতি তা করেন নি। তিনি রামচন্দ্রের চরিত্রকে অশ্রদ্ধেয় করবার জন্যেই কবিজনোচিত কৌশলে উত্তররামচরিত রচনা করেছিলেন। তিনি সীতাকে দাঁড় করিয়েছেন রামভদ্রের প্রতি প্রবল গঞ্জনারূপে।

ওই দেখো, কী কথা বলতে কী কথা এসে পড়ল। আমার বক্তব্য ছিল এই, কাব্যকে বেড়াভাঙা গদ্যের ক্ষেত্রে স্ত্রীস্বাধীনতা দেওয়া যায় যদি তা হলে সাহিত্যসংসারের আলংকারিক অংশটা হাল্কা হয়ে তার বৈচিত্র্যের দিক, তার চরিত্রের দিক, অনেকটা খোলা যায়গা পায়; কাব্য জোরে পা ফেলে চলতে পারে। সেটা সযত্নে নেচে চলার চেয়ে সব সময়ে যে নিন্দনীয় তা নয়। নাচের আসরের বাইরে আছে এই উঁচুনিচু বিচিত্র বৃহৎ জগৎ, রূঢ় অথচ মনোহর; সেখানে জোরে চলাটাই মানায় ভালো, কখনো ঘাসের উপর, কখনো কাঁকরের উপর দিয়ে।

রোসো। নাচের কথাটা যখন উঠল ওটাকে সেরে নেওয়া যাক। নাচের জন্য বিশেষ সময় বিশেষ কায়দা চাই। চারি দিক বেষ্টন করে আলোটা মালাটা দিয়ে

তার চালচিত্র খাড়া না করলে মানানসই হয় না। কিন্তু, এমন মেয়ে দেখা যায় যার সহজ চলনের মধ্যেই বিনা ছন্দের ছন্দ আছে। কবিরা সেই অনায়াসের চলন দেখেই নানা উপমা খুঁজে বেড়ায়। সে মেয়ের চলনটাই কাব্য, তাতে নাচের তাল নাই বা লাগল; তার সঙ্গে মৃদঙ্গের বোল দিতে গেলে বিপত্তি ঘটবে। তখন মৃদঙ্গকে দোষ দেব না তার চলনকে? সেই চলন নদীর ঘাট থেকে আরম্ভ করে রান্নাঘর বাসরঘর পর্যন্ত। তার জন্যে মাল-মসলা বাছাই করে বিশেষ ঠাট বানাতে হয় না। গদ্যকাব্যেরও এই দশা। সে নাচে না, সে চলে। সে সহজে চলে ব'লেই তার গতি সর্বত্র। সেই গতিভঙ্গী আবাঁধা। ভিড়ের ছোঁওয়া বাঁচিয়ে পোশাকি-শাড়ির-প্রান্ত-তুলে-ধরা আধ-ঘোমটা-টানা সাবধান চাল তার নয়।

এই গেল আমার পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থের কৈফিয়ত। আরো-একটা পুনশ্চ-নাচের আসরে নাট্যাচার্য হয়ে বসব না এমন পণ করি নি। কেবলমাত্র কাব্যের অধিকারকে বাড়াব মনে করেই একটা দিকের বেড়ায় গেট বসিয়েছি। এবারকার মতো আমার কাজ ওই পর্যন্ত। সময় তো বেশি নেই। এর পরে আবার কোন্ খেয়াল আসবে বলতে পারি নে। যাঁরা দৈবদুর্যোগে মনে করবেন গদ্যে কাব্যরচনা সহজ তাঁরা এই খোলা দরজাটার কাছে ভিড় করবেন সন্দেহ নেই। তা নিয়ে ফৌজদারি বাধলে আমাকে স্বদলের লোক বলে স্বপক্ষে সাক্ষী মেনে বসবেন। সেই দুর্দিনের পূর্বেই নিরুদ্দেশ হওয়া ভালো। এর পরে মদ্‌রচিত আরো একখানা কাব্যগ্রন্থ বেরবে, তার নাম বিচিত্রিতা। সেটা দেখে ভদ্রলোকে এই মনে করে আশ্বস্ত হবে যে আমি পুনশ্চ প্রকৃতিস্থ হয়েছি।…

খড়দহ, দেওয়ালি, ১৩৩৯

—পরিচয়। বৈশাখ ১৩৪০

'বাসা' (১৯ অগস্ট ১৯৩২) কবিতা রচনার দুই বৎসর পূর্বে কবি বর্লিন হইতে শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে একখানি চিঠি লেখেন। এই চিঠিখানি উক্ত কবিতার প্রাথমিক খসড়া বলা যাইতে পারে—

এখানকার ন্যাশন্যাল গ্যালারিতে আমার পাঁচখানা ছবি নিয়েছে, শুনেছ। তার মানে, তারা পৌঁচেছে ছবির অমরাবতীতে। ওরা দামের জন্যে ভাবছিল; টাকা নেই, কী করবে। আমি লিখে দিয়েছি যে, আমি জর্মানিকে দান করলুম, দাম চাই নে। ভারি খুশি হয়েছে। আরো অনেক জায়গা থেকে এক্‌জিবিশনের জন্যে আবেদন আসছে। একটা এসেছে স্পেন থেকে, তারা চায় নবেম্বরে। ভিয়েনা চায় ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি যে পোটো সেই নামটাই ছড়িয়ে পড়ছে কবি নামকে ছাপিয়ে। থেকে-থেকে মনে আসছে তোমার সেই স্টুডিয়োর কথাটা। ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে,

শালবনের ছায়ায়, খোলা জানলার কাছে। বাইরে একটা তালগাছ খাড়া দাঁড়িয়ে; তারই পাতাগুলোর কম্পমান ছায়া সঙ্গে নিয়ে রোদ্দুর এসে পড়েছে আমার দেয়ালের উপর; জামের ডালে বসে ঘুঘু ডাকছে সমস্ত দুপুরবেলা; নদীর ধার দিয়ে একটা ছায়াবীথি চলে গেছে; কুড়চি ফুলে ছেয়ে গেছে গাছ; বাতাবি নেবুর ফুলের গন্ধে বাতাস ঘন হয়ে উঠেছে; জারুল পলাশ মাদারে চলেছে প্রতিযোগিতা; সজনে ফুলের ঝুরি দুলছে হাওয়ায়; অশথগাছের পাতাগুলো ঝিল্‌মিল্ ঝিল্‌মিল্ করছে— আমার জানলার কাছ পর্যন্ত উঠেছে চামেলি লতা। নদীতে নেবেছে একটি ছোটো ঘাট, লাল পাথরে বাঁধানো, তারই এক পাশে একটি চাঁপার গাছ। একটির বেশি ঘর নেই। শোবার খাট দেয়ালের গহ্বরের মধ্যে ঠেলে দেওয়া যায়। ঘরে একটিমাত্র আছে আরাম-কেদারা; মেঝেতে ঘন লাল রঙের জাজিম পাতা; দেয়াল বসন্তী রঙের, তাতে ঘোর কালো রেখার পাড় আঁকা। ঘরের পুব দিকে একটুখানি বারান্দা; সূর্যোদয়ের আগেই সেইখানে চুপ করে গিয়ে বসব, আর খাবার সময় হলে নীলমনি সেইখানে খাবার এনে দেবে। একজন কেউ থাকবে যার গলা খুব মিষ্টি, যে আপন-মনে গান গাইতে ভালোবাসে। পাশের কুটিরে তার বাসা; যখন খুশি সে গান করবে, আমার ঘরের থেকে শুনতে পাব। তার স্বামী ভালোমানুষ এবং বুদ্ধিমান; আমার চিঠিপত্র লিখে দেয়, অবকাশকালে সাহিত্য-আলোচনা করে, এবং ঠাট্টা করলে ঠাট্টা বুঝতে পারে এবং যথোচিত হাসে। নদীর উপরে দুটি সাঁকো থাকবে, নাম দিতে পারব জোড়াসাঁকো; সেই সাঁকোর দুই প্রান্ত বেয়ে জুই বেল রজনীগন্ধা রক্তকরবী। নদীর মাঝে-মাঝে গভীর জল, সেইখানে ভাসছে রাজহাঁস; আর ঢালু নদীতটে চ'রে বেড়াচ্ছে আমার পাটল রঙের গাইগোরু তার বাছুর নিয়ে। শাক-সব্জির খেত আছে, বিঘে-দুইয়েক জমিতে ধানও কিছু হয়। খাওয়াদাওয়া নিরামিষ, ঘরে তোলা মাখন দই ছানা ক্ষীর; কুকারে যা রাঁধা যেতে পারে তাই যথেষ্ট, রান্নাঘর নেই। থাক্ এই পর্যন্ত। বাইরের দিকে চেয়ে মনে পড়ছে আছি বর্লিনে বড়োলোক সেজে, বড়ো কথা বলতে হবে; বড়ো খ্যাতির বোঝা বয়ে চলতে হবে দিনের পর দিন; জগৎ-জোড়া সব সমস্যা রয়েছে তর্জনী তুলে, তার জবাব চাই। ও দিকে ভারতসাগরের তীরে অপেক্ষা করে আছে বিশ্বভারতী; তার অনেক দাবি, অনেক দায়; ভিক্ষা করতে হবে দেশে দেশান্তরে। অতএব থাক্ আমার স্টুডিয়ো। কতদিনই বা বাঁচব! ইতিমধ্যে কর্তব্য করতে করতে ঘোরা যাক রেলে চ'ড়ে, মোটরে চ'ড়ে, জাহাজে চ'ড়ে, ব্যোমযানে চ'ড়ে, সভ্যভব্য হয়ে। অতএব আর সময় নেই। ইতি ১৮ অগস্ট ১৯৩০

—পত্রসংখ্যা ৩৬। চিঠিপত্র ৩

'বিশ্বশোক' কবিতাটি কবির দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুশোকে লিখিত বলিয়া অনুমিত। 'চিররূপের বাণী' রূপবাণী প্রেক্ষাগৃহের দ্বারোদ্‌ঘাটন উপলক্ষ্যে লিখিত। 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্যরূপে অভিনীত হইয়া থাকে; 'শিশুতীর্থ'ও কবির আবৃত্তি-সহযোগে নৃত্যে রূপায়িত হইয়াছে।

চিরকুমার-সভা

চিরকুমার-সভা উপন্যাস আকারে ভারতী পত্রে (১৩০৭ বৈশাখ - ১৩০৮ জ্যৈষ্ঠ) ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। পরে ইহা ১৩১১ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীর (হিতবাদীর উপহার) 'রঙ্গচিত্র' বিভাগের অন্তর্গত হয়, এবং 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' নাম লইয়া ১৩১৪ সালে স্বতন্ত্র পুস্তকরূপে (গদ্যগ্রন্থাবলী ৮) প্রকাশিত হয়। 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' রবীন্দ্র-রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডে 'উপন্যাস ও গল্প' বিভাগে প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থখানির কোনো কোনো অংশ পরিবর্তন করিয়া এবং কিছু নূতন-লিখিত অংশ যোগ করিয়া রবীন্দ্রনাথ ১৩৩১ সালের চৈত্র মাসে বা ১৩৩২ সালের বৈশাখ মাসে একখানি নাটক রচনা করেন; অনেকগুলি নূতন গানও ইহাতে যোগ করেন। নাটকটি 'চিরকুমার-সভা' নামে ১৩৩২ সালের চৈত্র মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ইহাই বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত হইল। 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাসটি আর প্রচলিত না থাকায়, 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' হইতে বর্ণনাংশও অনেকখানি এই নাটকে সংকলিত হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলীতে 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া, রচনাবলী-সংস্করণে চিরকুমার-সভা হইতে উক্ত বর্ণনাংশ বর্জিত হইয়াছে; শুধু যে-সকল অংশ অভিনয়-নির্দেশক সেগুলি রক্ষিত হইল।

চিরকুমার-সভা সম্বন্ধে প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি পত্রাংশ নিম্নে সংকলিত হইল—

আমি নানাপ্রকার ছুতোয় নানাপ্রকার কুঁড়েমি করে অবশেষে কাল বৈকালে চিরকুমার-সভায় হস্তক্ষেপ করেছি। আজ বৈকালে সমাধা করার আশা করছি। অবশ্য চিরসমাধা নয়— কেবল আশ্বিনের কিস্তি।... ২৮শে শ্রাবণ [১৩০৭]

—প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি। পৃ ২৮৮

চন্দ্রমাধববাবুর চরিত্রে অনেক মিশল আছে, তার মধ্যে কতক মেজদাদা কতক রাজনারান বাবু এবং কতক আমার কল্পনা আছে। নির্মলাও তথৈবচ, এর মধ্যে সরলার অংশ অনেকটা আছে বটে। কিন্তু, কোনো রিয়াল মানুষ প্রত্যহ আমাদের

কাছে যেরকম প্রতীয়মান সেরকম ভাবে কাব্যে স্থান পাবার যোগ্য নয়। কারণ, রিয়াল মানুষকে যথার্থ ও সম্পূর্ণরূপে জানবার শক্তি আমাদের না থাকাতে আমরা তাকে প্রতিদিন খণ্ডিত বিক্ষিপ্ত এবং অনেক সময় পূর্বাপরবিরোধী -ভাবে না দেখে উপায় পাই নে; কাজেই তাকে নিয়ে কাব্যে কাজ চলে না। সুতরাং, কাব্যে যদিচ কোনো কোনো রিয়াল লোকের আভাসমাত্র থাকে তবু তাকে সম্পূর্ণ করতে অন্তর বাহির নানা দিক থেকে নানা উপকরণ আহরণ করতে হয়। চন্দ্রমাধবে মেজদাদার শিশুবৎ স্বচ্ছ সারল্যের ছায়া আছে এবং নির্মলায় সরলার কল্পনাপ্রবণ উদ্দীপ্ত কর্মোৎসাহ আছে, কিন্তু উভয় চরিত্রেই অনেক জিনিস আছে যা তাঁদের কারোই নয়। [আশ্বিন ১৩০৭]

— বিশ্বভারতী পত্রিকা। বৈশাখ ১৩৫০

কাল চিরকুমার-সভা শেষ করিয়া ফেলিয়া হাড়ে বাতাস লাগাইতেছি… ১১ চৈত্র ১৩০৭।

— প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি। পৃ ২৯১

চিরকুমার-সভার শেষ দিকটায় একেবারে full steam লাগানো গিয়েছিল।… যেমন করে হোক শেষ করে দিয়ে অঋণী হবার জন্যে মনটা নিতান্তই ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। তার পরে যখন তোমার কাছে শুনলুম শেষ দিকটা ক্রমেই ঢিলে হয়ে আসছে, তখন কলমের পশ্চাতে খুব একটা কড়া চাবুক লাগিয়ে এক দমে শেষ করে দেওয়া গেছে। সকল সময়ে কি মেজাজ ঠিক থাকে। চৈত্রের কুমার-সভা সম্বন্ধে তুমি যা লিখেছ সেটা ঠিক। তোমার পরামর্শ-মতে ভবিষ্যতে ওটা পরিবর্তন করে দেবার চেষ্টা করব। বৈশাখে কুমার-সভার উপসংহারটা পড়ে তোমাদের কিরকম লাগে জানবার খুব কৌতূহল আছে। যথেষ্ট আশঙ্কাও আছে। নিতান্ত অনিচ্ছা এবং নিরুদ্যমের মধ্যে কেবলমাত্র প্রতিজ্ঞার জোরে ওটা শেষ করেছি; মনের সে অবস্থায় কখনো রসনিঃসারণ হয় না। যেখানে থামা উচিত এবং যেরকম ভাবে থামা উচিত তা হয়েছে কিনা নিজে বুঝতে পারছি নে। একবার সমস্ত জিনিসটা একসঙ্গে ধরে দেখতে পারলে তবে ওর পরিমাণ-সামঞ্জস্য বিচার করা যায়। সেইজন্যে বৈশাখের ভারতীর অপেক্ষায় আছি। যখন বই বেরোবে তখন অনেকটা বদল হয়ে বেরোবে। [? চৈত্র, ১৩০৭]

— প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি। পৃ ২৮৯

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রবীন্দ্রনাথকে চিরকুমার-সভা ইংরেজি করার বিষয় লিখিলে, রবীন্দ্রনাথ তদুত্তরে তাঁহাকে লেখেন—

আমার মনে হয় চিরকুমার-সভার ইংরেজি করা অসম্ভব। তার ব্যঙ্গ, তার শ্লেষ, তার সামাজিক ভূমিকা অত্যন্ত বেশি বাঙালি। বাংলাদেশে শ্যালী-ভগ্নীপতির সম্বন্ধ অনন্ত-

সাধারণ, এমন-কি, ভারতের অন্যত্রও নেই। অন্য প্রদেশের পাঠক এই ব্যাপারকে আপত্তিজনক বলে মনে করতে পারে।… হয়তো এ সম্বন্ধে একটু ভূমিকা করে দিলে জিনিসটা কৌতুকাবহ হতেও পারে। আমাদের দেশের একজন সাহিত্য-অধ্যাপক প্রমাণ করে দিয়েছেন আমার লেখায় যথার্থ হাস্যরস নেই, দৃষ্টান্তস্থলে চিরকুমার-সভারও উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে গীতিকাব্যলেখকদের কলম হাসতে ও হাসাতে পারে না। অতএব, সাবধান হবেন। ইতি ১০ অক্টোবর ১৯৩৫

—প্রবাসী। ভাদ্র ১৩৪৮

গল্পগুচ্ছ

রচনাবলীর এই খণ্ডে সংকলিত পাঁচটি গল্প ১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ—চৈত্র এই পাঁচ মাসে সাধনা মাসিকপত্রে প্রথম প্রকাশলাভ করে। বর্তমান গ্রন্থে প্রত্যেক রচনার শেষে সাধনায় প্রকাশের কাল মুদ্রিত হইয়াছে।

খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, সম্পত্তি-সমর্পণ ও কঙ্কাল 'বিচিত্র গল্প' প্রথম ভাগে (১৩০১) এবং দালিয়া ও মুক্তির উপায় 'বিচিত্র গল্প' দ্বিতীয় ভাগে (১৩০১) সংকলিত হয়; গ্রন্থমধ্যে সেই উহাদের প্রথম প্রচার।

'মুক্তির উপায়' গল্প অবলম্বনে লিখিত ওই নামের নাটক 'অলকা' (আশ্বিন ১৩৪৫) মাসিক পত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল, অধুনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

শান্তিনিকেতন

বর্তমান খণ্ডে শান্তিনিকেতন গ্রন্থের ১৩শ-১৭শ খণ্ড মুদ্রণের ফলে এই রচনাপর্যায় সমাপ্ত হইল। রচনাগুলির অধিকাংশই শান্তিনিকেতন-আশ্রমের উপাসনামন্দিরে উক্ত হইয়াছিল; কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভাষণের তারিখও মুদ্রিত আছে। রচনাগুলির সাময়িক পত্রে প্রকাশের কাল সব সময়ে পাওয়া যায় না; যে-সকল ক্ষেত্রে পাওয়া গিয়াছে (প্রবাসী, ভারতী অথবা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় পাওয়া যায়) উহা রচনাশেষে স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদরূপে সংকলিত হইল।

শান্তিনিকেতন ত্রয়োদশ খণ্ডে প্রকাশিত 'আত্মবোধ' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র দে'কে একটি চিঠিতে লিখিয়াছেন—

আত্মবোধ প্রবন্ধটা এখানে আমার সম্মুখে নাই, এইজন্য আপনারা যে বিশেষ অংশটির কথা উত্থাপন করিয়াছেন তাহার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করিতে পারিলাম না। আত্মবোধের শেষভাগে আমি এই কথা বলিয়াছি যে, ব্রহ্মের প্রকাশ সর্বত্রই পরিপূর্ণ—

কেবল মানবের ইচ্ছার মধ্যে তিনি আপনাকে সম্পূর্ণ করেন নাই, কারণ তাহা হইলে ইচ্ছার ধর্মই লোপ হইত। 'হাঁ' ও 'না' দুই না থাকিলে ইচ্ছা থাকিতেই পারে না। যেখানে 'না' বলিবার সম্ভাবনামাত্র নাই, একেবারেই 'হাঁ', সেখানে অন্ধ শাসন ; সেখানে প্রেম নাই, ইচ্ছা নাই। যেমন জড় প্রকৃতি— সেখানে যাহা না ঘটিলে নয় তাহাই ঘটিতেছে ; অতএব সেখানে ঈশ্বরের নিয়ম প্রকাশ পাইতেছে, প্রেম প্রকাশ পাইতেছে না। প্রেম প্রেমকে চায়, ইচ্ছা ইচ্ছাকে চায়। আমাদের ইচ্ছার মধ্যে 'না'কে বিপর্যস্ত করিয়া দিয়া যখন তিনি 'হাঁ'কে জয় করেন তখনই আমাদের ইচ্ছার মধ্যে তাঁহার ইচ্ছা প্রকাশ পায়। আমরা নিজে ইচ্ছা করিয়া যখন তাঁহার ইচ্ছাকে স্বীকার করি তখনই ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার মিলন হয়। সুতরাং ইহার জন্য তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হয়। একসময় আমাদের যে প্রেম তাঁহাকে চায় নাই, কেবল বিষয়ের রাজ্যে ঘুরিয়াছিল, সেই প্রেম যখন তাঁহাকে চায় তখন তাঁহার চাওয়ার সঙ্গে আমার চাওয়ার মিলন হয় ; তখনই আমার প্রেম তাঁহার প্রেমকে উপলব্ধি করে এবং চতুর্দিকে প্রকাশ করে। অতএব মানবাত্মার ইচ্ছার মধ্যে পরমাত্মার ইচ্ছার পূর্ণ প্রকাশ জগতে আর কোথাও দেখিতে পাই না, কেবল ভক্তের জীবনে দেখি। এ পর্যন্ত মানব-ইতিহাসে জ্ঞানে প্রেমে ও কর্মে পরিপূর্ণমাত্রায় পরমাত্মার ইচ্ছার সঙ্গে জীবাত্মার ইচ্ছার একান্ত যোগ দেখা যায় নাই ; কোথাও বা জ্ঞান প্রবল, কর্ম প্রবল নহে— কোথাও বা অন্যরূপ। কিন্তু, এই আদর্শ যে অসম্ভব তাহা নহে। বিশ্বমানবের চিত্তে এই ইচ্ছাই গূঢ়ভাবে নিয়ত কাজ করিতেছে— সে তাঁহাকে আপনার সকল দিয়া উপলব্ধি করিবে ইহাই তাহার সাধনা। মানুষ আপনার বুদ্ধি প্রীতি ও শক্তি এই তিন পাত্র পূর্ণ করিয়া ভরিয়া তাঁহার অমৃত পান করিবে, এই পরম ইচ্ছাটি জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ের মধ্যেই আছে ; ক্রমশ এই ইচ্ছা পূর্ণ হইয়া উঠাই প্রেমের লীলা, এই লীলা কখনোই শেষ হইয়া যাইতে পারে না কিন্তু, তাই বলিয়া এমন কথা বলা যায় না যে এই লীলা কোনো কালে আরম্ভ হইতেও পারে না, অনন্তকাল উহা দূরেই থাকিয়া যাইবে। বাধা-ব্যবধানের ভিতর দিয়া দুই মহাপ্রেমিকের মধ্যে ইচ্ছার লীলা চলিতেছে ; তাহারই মহা আনন্দের রূপ আমরা ভক্তের জীবনের মধ্যে দেখিতে পাই। ইতি ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮, শিলাইদা, নদিয়া

শুদ্ধপাঠ-নির্দেশ

পৃ ১২ নিম্ন হইতে ছত্র ৪ অগ্নিনিশ্বাস স্থলে অগ্নিনিশ্বাস

পৃ ২৭৫ ছত্র ১১ নিঃত্রার্থ স্থলে নিঃস্বার্থ

পৃ ৪০২ নিম্ন হইতে ছত্র ১১ তাতহৈ স্থলে তাতেই

বর্ণানুক্রমিক সূচী

অগ্রসর হওয়ার আহ্বান	...	...	৪৮৫
অন্তরতর শান্তি	...	...	৫০৭
অপরাধী	...	...	২১
অভয় দাও তো বলি আমার	...	...	১৬১
অমৃতের পুত্র	...	...	৪৫৪
অলকে কুসুম না দিয়ো	...	...	২৭৭
অস্থানে	...	...	১১৭
আঁখিরে ফাঁকি দাও একি ধারা	...	..	২২০
আজ এই বাদলার দিন	...	...	৩৫
আত্মবোধ	...	...	৩৫৬
আনতাঙ্গী বালিকার	..	...	২৪৫
আবির্ভাব	...	...	৫০৪
আমাদের কালে গোষ্ঠে যখন	...	...	১৩
আমার বয়সে মনকে বলবার	...	...	২৪
আমি অন্তঃপুরের মেয়ে	..	...	৭১
আমি কেবল ফুল জোগাব	...	...	১৬৭
আরো	...	...	৫০২
আসে তো আসুক রাতি	...	...	২৩৫
উদ্‌বোধন	...	...	৪৭৮
উন্নতি	...	...	৮৮
উপরে যাবার সিঁড়ি	...	...	৮৮
এক আছে মণিদিদি	...	...	৭৭
একই লতাবিতান বেয়ে	...	...	১১৭
একজন লোক	...	...	৭৬
একটি মন্ত্র	...	...	৪৬৮
এক দিকে কামিনীর ডালে	...	...	৬১
এল সে জর্মনির থেকে	...	...	১১৯
ও আমার ধ্যানেরই ধন	...	...	২২০
ওগো, তোরা কে যাবি পারে	...	...	১৮৯

ওগো দয়াময়ী চোর	...	...	২১৬
ওরে সাবধানী পথিক, বারেক	...	...	২৩৪
কঙ্কাল	...	...	৩২১
কতকাল রবে বলো ভারত রে	...	...	১৬৩
কন্‌কনে ঠাণ্ডায় আমাদের যাত্রা	...	...	৯৫
কর্মযোগ	...	...	৩৪৩
কাছে এল পুজোর ছুটি	...	...	১২১
কার হাতে যে ধরা দেব প্রাণ	...	...	১৭২
কিনু গোয়ালার গলি	...	...	৮৪
কী জানি কী ভেবেছ মনে	...	...	১৫১
কীটের সংসার	...	...	৬১
কুঞ্জকুটিরের স্নিগ্ধ অলিন্দের 'পর	...	...	২২২
কুঞ্জ-পথে-পথে চাঁদ	...	...	২২৩
কেন সারা দিন ধীরে ধীরে	...	...	২৭৮
কোপাই	...	...	৭
কোমল গান্ধার	...	...	৩৪
ক্যামেলিয়া	...	...	৬৩
খেলনার মুক্তি	...	...	৭৭
খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন	...	...	২৯৫
খোয়াই	...	...	১৫
খ্যাতি	...	...	৮১
গন্ধর্ব সৌরসেন সুরলোকের সংগীতসভায়	...	...	১৩৩
গানের বাসা	...	...	১৩৯
গুরু রামানন্দ স্তব্ধ দাঁড়িয়ে	...	...	১০৯
ঘরছাড়া	...	...	১১৯
চক্ষু -'পরে মৃগাক্ষীর	...	...	২৪১
চলেছে ছুটিয়া পলাতকা হিয়া	...	...	২১৭
চির-পুরানো চাঁদ	...	...	১৬৯
চিররূপের বাণী	...	...	৯৭
ছুটি	...	...	১৩৮

ছুটির আয়োজন	...	...	১২১
ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি	...	...	৫৭
ছেলেটা	...	...	৩৯
ছেলেটার বয়স হবে	...	...	৩৯
ছেলেদের খেলার প্রাঙ্গণ	...	...	৩৩
ছোটো ও বড়ো	...	...	৪৩৮
জয়যাত্রায় যাও গো	...	...	১৭৭
জ্বলে নি আলো অন্ধকারে	...	...	২২৬
তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়	...	...	২৫৬
তীর্থযাত্রী	...	...	৯৫
তুমি আমায় করবে মস্তলোক	...	...	১৫৯
তুমি বল তিন্নু প্রশ্রয় পায়	...	...	২১
তোমরা দুটি পাখি	...	...	১৩৯
তোমাকে পাঠালুম আমার লেখা	...	...	১৮
তোমায় চেয়ে বসে আছি	...	...	২৬৪
ত্রিলোকেশ্বরের মন্দির	..	...	১১২
দাও-না ছুটি	...	...	১৩৮
দালিয়া	...	...	৩১২
দিলে তুমি সোনা-মোড়া ফাউন্টেন পেন	...	...	৮০
দীক্ষার দিন	...	...	৫০০
দুঃখের দিনে লেখনীকে বলি	...	...	৪৭
দেখা	...	...	৩০
দোতলার জানলা থেকে	...	...	২০
ধীরে ধীরে চলো তম্বী	...	...	২৩৬
নববর্ষ	...	...	৩৯৩
নাটক	...	...	১০
নাটক লিখেছি একটি	...	...	১০
না, না গো, না	...	...	১৫৭
না ব'লে যায় পাছে সে	...	...	১৫৬
নাম তার কমলা	..	...	৬৩

নাম রেখেছি কোমলগান্ধার	...	...	৩৪
নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ	...	...	২৩২
নূতন কাল	...	...	১৩
পত্র	..	...	১৮
পত্রলেখা	...	...	৮০
পদ্মা কোথায় চলেছে দূর	...	...	৭
পয়লা আশ্বিন	...	...	১৪১
পশ্চিমে বাগান বন চষা-খেত	...	...	১৫
পশ্চিমে শহর	...	...	৩৭
পাছে চেয়ে বসে আমার মন	...	...	১৫২
পাপের মার্জনা	...	...	৪৯৪
পিতার বোধ	...	...	৪২১
পুকুর-ধারে	...	...	২০
পোড়া মনে শুধু পোড়া মুখখানি	...	...	১৭০
প্রতীক্ষা	...	...	৪৮২
প্রথম পূজা	...	...	১১২
প্রাঙ্গণে নামল অকাল সন্ধ্যার ছায়া	...	...	৯৭
প্রেমের সোনা	...	...	১০৮
প্লাটিনমের আঙটির মাঝখানে	...	...	৩২
ফাঁক	...	...	২৪
বড়ো থাকি কাছাকাছি	...	...	১৫৩
বর্ষশেষ	...	...	৩৮৯
বাজিরাও পেশোয়ার	...	...	১০৬
বাবা এসে শুধালেন	...	...	৫৭
বালক	...	...	৫২
বাঁশি	...	...	৮৪
বাসা	...	...	২৭
বিচ্ছেদ	...	..	৩৫
বিঁধিয়া দিয়া আঁখিবাণে	...	...	২৪৬
বিরহে মরিব বলে	...	...	২৬১

বিশেষত্ব ও বিশ্ব	...	...	৪১১
বিশ্বশোক	...	...	৪৭
বৈশাখী ঝড়ের সন্ধ্যা	...	...	৩৯৮
ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা	...	...	৩৭৪
ভাই নিশি	...	...	৮১
ভুলে ভুলে আজ ভুলময়	...	...	২৮৫
ভীরু	...	...	৯১
মনে হচ্ছে শূন্য বাড়িটা	...	...	৪৯
মনোমন্দিরসুন্দরী	...	...	২১৯
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে	...	...	২৭
মরণের ছবি মনে আনি	...	...	১২২
মাধুর্যের পরিচয়	...	...	৪৬৪
মানবপুত্র	...	...	১২৪
মা মা হিংসীঃ	...	...	৪৯০
মুক্তি	...	...	১০৬
মুক্তির উপায়	...	...	৩২৯
মুক্তির দীক্ষা	...	...	৪৭৯
মৃত্যু	...	...	১২২
মৃত্যুর পাত্রে খৃস্ট যেদিন	...	..	১২৪
মোটা মোটা কালো মেঘ	...	...	৩০
ম্যাট্রিকুলেশনে পড়ে	...	...	৯১
যাত্রীর উৎসব	...	...	৪৬০
যারে মরণদশায় ধরে	...	...	১৭০
যেতে দাও গেল যারা	...	..	২১৬
রবিদাস চামার ঝাঁট দেয় ধুলো	...	...	১০৮
রঙরেজিনী	...	...	১০৩
রাত কত হল	...	...	১২৫
রামানন্দ পেলেন গুরুর পদ	...	...	১০০
শঙ্করলাল দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত	...	...	১০৩
শাপমোচন	...	...	১৩৩

শালিখ	...	...	৬৯
শালিখটার কী হল	...	...	৬৯
শিশুতীর্থ	...	...	১২৫
শুচি	...	...	১০০
শুচি	...	...	৪১৪
শেষ চিঠি	...	...	৪৯
শেষ দান	...	...	৩৩
সত্যকে দেখা	...	...	৪১১
সত্যবোধ	...	...	৪০১
সত্য হওয়া	...	...	৪০৭
সম্পত্তি-সমর্পণ	...	...	৬০৩
সহযাত্রী	...	...	৪৪
সাধারণ মেয়ে	...	...	৭১
সুন্দর	...	...	৩৮৩
সুন্দর	...	...	৬২
সুশ্রী নয় এমন লোকের	...	...	৪৪
সৃষ্টির ক্রিয়া	...	...	৪৯৬
সৃষ্টির অধিকার	...	...	৪৩২
সৌন্দর্যের সকরুণতা	...	...	৪৫৪
স্নান-সমাপন	...	...	১০৯
স্মৃতি	...	...	৬৭
স্বর্গে তোমায় নিয়ে যাবে উড়িয়ে	...	...	১৭১
হরিণগর্বমোচন লোচনে	...	...	২৪৬
হিমের শিহর লেগেছে আজ	...	...	১৪১
হিরণমাসির প্রধান প্রয়োজন	...	...	৫২

রবীন্দ্র রচনাবলী

সপ্তদশ খণ্ড

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র-রচনাবলী

সপ্তদশ খণ্ড

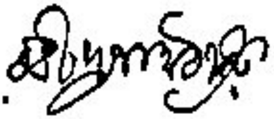

প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪০৭
পুনর্মুদ্রণ পৌষ ১৪১০

© বিশ্বভারতী

ISBN-81-7522-288-3 (V.17)
ISBN-81-7522-289-1 (Set)

প্রকাশক অধ্যাপক সুধেন্দু মণ্ডল
বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড। কলকাতা ১৭

মুদ্রক প্রিন্টিং সেন্টার
১ ছিদাম মুদি লেন। কলকাতা ৬

প্রকাশকের নিবেদন

রবীন্দ্র-রচনাবলীর অষ্টাবিংশ খণ্ডের (বর্তমান সুলভ ষোড়শ খণ্ড) নিবেদন-এ বলা হইয়াছিল : 'পূর্বপ্রকাশিত রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত কোনো কোনো গ্রন্থের উদ্‌বৃত্ত রচনা এবং কিছু অগ্রন্থিত রচনা বর্তমান খণ্ডে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করা হইল। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত বিবিধ রচনা সংগ্রহের কাজ চলিতেছে এবং তাহা খণ্ডশ প্রকাশের আয়োজনও হইতেছে।'

অগ্রন্থিত রচনাগুলি প্রকাশ করিবার সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী উনত্রিংশ এবং ত্রিংশ খণ্ড (বর্তমান সপ্তদশ খণ্ড) সংকলিত হইল। এই খণ্ডে উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত বা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের অগ্রন্থিত রচনাসমূহ পাওয়া যাইবে। বর্তমান খণ্ডে ওই দুই খণ্ডের প্রবন্ধগুলিকে বিষয় অনুযায়ী বিন্যস্ত করা হইয়াছে; এবং পরিশিষ্ট অংশের রচনাগুলিও যুক্ত হইল।

সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশের বিবরণ এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য গ্রন্থপরিচয় অংশে সংকলিত হইয়াছে।

১৪০৪

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী [১৬

প্রকাশকের নিবেদন [৫

কবিতা

অভিলাষ ৩
হোক ভারতের জয় ৮
হিন্দুমেলায় উপহার ১১
প্রকৃতির খেদ (দ্বিতীয় পাঠ) ১৪
প্রকৃতির খেদ (প্রথম পাঠ) ১৭
'জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ' ২৪
প্রলাপ ১ ২৫
প্রলাপ ২ ৩০
প্রলাপ ৩ ৩২
দিল্লি দরবার ৩৫
ভারতী ৩৬
হিমালয় ৩৭
আগমনী ৩৯
আকুল আহ্বান ৪২
অবসাদ ৪৪
মেঘ্‌লা শ্রাবণের বাদ্‌লা রাতি ৪৫
শারদা ৪৬

মালতী পুঁথি -ধৃত

হা বিধাতা ছেলেবেলা হতেই এমন ৪৭
এসো আজি সখা ৪৯
পার কি বলিতে কেহ ৫১
ছেলেবেলাকার আহা, ঘুমঘোরে দেখেছিনু ৫১
আমার এ মনোজ্বালা ৫২
উপহার-গীতি ৫৩
পাষাণ-হৃদয়ে কেন সঁপিনু হৃদয় ৫৪
ভেবেছি কাহারো সাথে ৫৪
হা রে বিধি কী দারুণ অদৃষ্ট আমার ৫৫
ও কথা বোলো না সখি ৫৫
কী হবে বলো গো সখি ৫৫
এ হতভাগারে ভালো কে বাসিতে চায় ৫৬
জানি সখা অভাগীরে ভালো তুমি বাস না ৫৬

সংযোজন

সন্ধ্যাসংগীত

সন্ধ্যা ৫৯
কেন গান গাই ৬১
কেন গান শুনাই ৬৩
বিষ ও সুধা ৬৪

প্রভাতসংগীত

স্নেহ উপহার ৭৫
শরতে প্রকৃতি ৭৬

ছবি ও গান

বিরহ ৭৮

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

সখি রে— পিরীত বুঝবে কে? ৭৯
হম সখি দারিদ নারী! ৮০

কড়ি ও কোমল

শরতের শুকতারা ৮১
পত্র (মাগো আমার লক্ষ্মী) ৮৩
পত্র (বসে বসে লিখলেম চিঠি) ৮৫
জন্মতিথির উপহার ৮৬
চিঠি (চিঠি লিখব কথা ছিল) ৮৭
পত্র (দামু বোস আর চামু বোসে) ৯১

অনুবাদ-কবিতা

ম্যাক্‌বেথ্‌ ৯৭
বিচ্ছেদ ১০০
বিদায়-চুম্বন ১০০
কষ্টের জীবন ১০১
জীবন উৎসর্গ ১০১
ললিত-নলিনী ১০২
বিদায় ১০৪
সংগীত ১০৪
গভীর গভীরতম হৃদয়প্রদেশে ১০৫
যাও তবে প্রিয়তম সুদূর সেথায় ১০৬
আবার আবার কেন রে আমার ১০৭
বৃদ্ধ কবি ১০৯
জাগি রহে চাঁদ ১১০
পাতায় পাতায় দুলিছে শিশির ১১০
বলো গো বালা, আমারি তুমি ১১১

গিয়াছে সে দিন, যে দিন হৃদয় ১১২
রূপসী আমার, প্রেয়সী আমার ১১৩
সুশীলা আমার, জানালার 'পরে ১১৪
কোরো না ছলনা, কোরো না ছলনা ১১৪
চপলারে আমি অনেক ভাবিয়া ১১৫
প্রেমতত্ত্ব ১১৬
নলিনী ১১৬
দিন রাত্রি নাহি মানি ১১৭
দামিনীর আঁখি কিবা ১১৮
অদৃষ্টের হাতে লেখা ১২০
ভুজ-পাশ-বদ্ধ অ্যান্টনি ১২০
সুখী প্রাণ ১২২
জীবন মরণ ১২২
স্বপ্ন দেখেছিনু প্রেমাগ্নিজ্বালার ১২৩
আঁখি পানে যবে আঁখি তুলি ১২৪
প্রথমে আশাহত হয়েছিনু ১২৪
নীল বায়লেট নয়ন দুটি করিতেছে ঢলঢল ১২৪
গানগুলি মোর বিষে ঢালা ১২৪
তুমি একটি ফুলের মতো মণি ১২৫
রানী, তোর ঠোঁট দুটি মিঠি ১২৫
বারেক ভালোবেসে যে জন মজে ১২৫
বিশ্বামিত্র, বিচিত্র এই লীলা! ১২৬
ভালোবাসে যারে তার চিতাভস্ম-পানে ১২৬

প্রবন্ধ

সাহিত্য

ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী ১২৯
মেঘনাদবধ কাব্য ১৩১
স্যাক্সন জাতি ও অ্যাংলো স্যাক্সন সাহিত্য ১৬৪
বিয়াত্রিচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য ১৭৪
পিত্রার্কা ও লরা ১৮৫
গেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ ১৯২
নর্ম্যান জাতি ও অ্যাংলো-নর্ম্যান সাহিত্য [প্রথম প্রস্তাব] ১৯৮
[নর্ম্যান জাতি ও অ্যাংলো-নর্ম্যান সাহিত্য] দ্বিতীয় প্রস্তাব ২০৪
চ্যাটার্টন— বালক-কবি ২১৪
বাঙালি কবি নয় ২১৯
বাঙালি কবি নয় কেন ২২৭

'দেশজ প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি'/ (প্রত্যুত্তর)	২৪১
কাব্য : স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট	২৪৪
সাহিত্যের উদ্দেশ্য	২৪৭
সাহিত্য ও সভ্যতা	২৪৯
আলস্য ও সাহিত্য	২৫২
কবিতার উপাদান রহস্য (Mystery)	২৫৬
সৌন্দর্য	২৫৬
Dialogue/Literature	২৫৭
সাহিত্য	২৫৯
বাংলায় লেখা	২৬০
অপরিচিত ভাষা ও অপরিচিত সংগীত	২৬১
সৌন্দর্য সম্বন্ধে গুটিকতক ভাব	২৬২
বাংলা সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা [শেষাংশ]	২৬৪
[কাব্য]	২৬৫
একটি পত্র	২৬৭
বাংলা লেখক	২৬৯
'সাহিত্য'-পাঠকদের প্রতি	২৭২
রবীন্দ্রবাবুর পত্র	২৭২
স্যাহিত্যের গৌরব	২৭৪
মেয়েলি ব্রত	২৭৮
সাহিত্যের সৌন্দর্য	২৭৯
সংগীত	
সংগীত ও ভাব	২৮৫
সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা/হর্বার্ট স্পেন্সরের মত	২৯০
শিল্প	
[মন্দিরপথবর্তিনী]	২৯৭
মন্দিরাভিমুখে	৩০০
ধর্ম/দর্শন	
সাকার ও নিরাকার উপাসনা	৩০৭
নববর্ষ উপলক্ষে গাজিপুরে ব্রহ্মোপাসনা/উদ্‌বোধন	৩১৩
ধর্ম ও ধর্মনীতির অভিব্যক্তি (Evolution)	৩১৫
চন্দ্রনাথবাবুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব	৩১৫
নব্য লয়তত্ত্ব	৩১৮
[সুখ না দুঃখ] উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে বক্তব্য	৩২১
বেদান্তের বিদেশীয় ব্যাখ্যা	৩২২
রামমোহন রায়	৩৩০

শিক্ষা

ছাত্রদের নীতিশিক্ষা ৩৪১
ছাত্রবৃত্তির পাঠ্যপুস্তক ৩৪৪
মুসলমান ছাত্রের বাংলা শিক্ষা ৩৫০

সমাজ

বাঙালির আশা ও নৈরাশ্য ৩৫৫
ইংরাজদিগের আদব-কায়দা ৩৫৯
নিন্দা-তত্ত্ব ৩৬২
পারিবারিক দাসত্ব ৩৬৯
জুতা-ব্যবস্থা/(১৮৯০ খৃস্টাব্দে লিখিত) ৩৭৬
চীনে মরণের ব্যবসায় ৩৭৯
নিমন্ত্রণ-সভা ৩৮৪
চেঁচিয়ে বলা ৩৮৮
জিহ্বা আস্ফালন ৩৯২
জিজ্ঞাসা ও উত্তর ৩৯৬
সমাজ সংস্কার ও কুসংস্কার ৩৯৮
ন্যাশনল ফন্ড ৪০২
টৌন্‌হলের তামাশা ৪০৭
অকাল কুষ্মাণ্ড ৪০৯
হাতে কলমে ৪২০
একটি পুরাতন কথা ৪২৮
কৈফিয়ত ৪৩৫
[দুর্ভিক্ষ] ৪৪১
লাঠির উপর লাঠি ৪৪২
সত্য ৪৪৫
আপনি বড়ো ৪৫২
হিন্দুদিগের জাতীয় চরিত্র ও স্বাধীনতা ৪৫৫
স্ত্রী ও পুরুষের প্রেমে বিশেষত্ব ৪৫৮
আমাদের সভ্যতায় বাহ্যিক ও মানসিকের অসামঞ্জস্য ৪৬১
সমাজে স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের প্রভাব ৪৬২
আমাদের প্রাচীন কাব্যে ও সমাজে স্ত্রী-পুরুষ প্রেমের অভাব ৪৬৪
Chivalry ৪৬৫
নব্যবঙ্গের আন্দোলন ৪৬৬

ইতিহাস

ঝান্‌সীর রানী ৪৭৩
কাজের লোক কে ৪৭৭
গুটিকত গল্প ৪৮০

আকবর শাহের উদারতা ৪৮৩
ন্যায় ধর্ম ৪৮৩
বীর গুরু ৪৮৪
শিখ-স্বাধীনতা ৪৮৮
গ্রন্থসমালোচনা : ভারতবর্ষের ইতিহাস, মুর্শিদাবাদ কাহিনী ৪৯০, ৪৯১
ঐতিহাসিক চিত্র/সূচনা ৪৯২

বিজ্ঞান

সামুদ্রিক জীব/প্রথম প্রস্তাব/কীটাণু ৪৯৭
দেবতায় মনুষ্যত্ব আরোপ ৫০২
বৈজ্ঞানিক সংবাদ ৫০৮
বৈজ্ঞানিক সংবাদ : গতি নির্ণয়ের ইন্দ্রিয়, ইচ্ছামৃত্যু, মাকড়সা-
সমাজে স্ত্রীজাতির গৌরব, উটপক্ষীর লাথি ৫১১-৫১২
বৈজ্ঞানিক সংবাদ : জীবনের শক্তি, ভূতের গল্পের প্রামাণিকতা,
মানব শরীর ৫১৩-৫১৪
রোগশত্রু ও দেহরক্ষক সৈন্য ৫১৫
উদয়াস্তের চন্দ্রসূর্য, অভ্যাসজনিত পরিবর্তন,
ওলাউঠার বিস্তার, ঈথর ৫১৭-৫২১
ভূগর্ভস্থ জল ও বায়ুপ্রবাহ ৫২২

বিবিধ

সাত্ত্বনা ৫২৯
নিঃস্বার্থ প্রেম ৫৩০
যথার্থ দোসর ৫৩৪
গোলাম-চোর ৫৪০
চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় ৫৪২
দরোয়ান ৫৪৫
জীবন ও বর্ণমালা ৫৪৮
রেল গাড়ি ৫৫০
লেখা কুমারী ও ছাপা সুন্দরী ৫৫৩
গোঁফ এবং ডিম ৫৫৫
সত্যং শিবং সুন্দরম্ ৫৫৯
ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী ৫৫৯
পুষ্পাঞ্জলি ৫৬৩
বিবিধ প্রসঙ্গ ১ ৫৬৯
বিবিধ প্রসঙ্গ ২ ৫৭৪
বর্ষার চিঠি ৫৭৭
বরফ পড়া ৫৭৯
শিউলিফুলের গাছ ৫৮২

বানরের শ্রেষ্ঠত্ব ৫৮৪
কার্যাধ্যক্ষের নিবেদন ৫৮৫
সৌন্দর্য ও বল ৫৮৫
আবশ্যকের মধ্যে অধীনতার ভাব ৫৮৬
শরৎকাল ৫৮৬
ছেলেবেলাকার শরৎকাল ৫৮৮
ইন্দুর-রহস্য ৫৮৮
কাজ ও খেলা ৫৮৯
[ঘানির বলদ] ৫৯১
[জীবনের বুদ্‌বুদ] ৫৯১
বাগান ৫৯১
ঠাকুরঘর ৫৯২
নিষ্ফল চেষ্টা ৫৯৩
সফলতার দৃষ্টান্ত ৫৯৪
[লেখক-জন্ম] ৫৯৬
সম্পাদকের বিদায় গ্রহণ ৫৯৬

গ্রন্থসমালোচনা

রাবণ-বধ দৃশ্য কাব্য, অভিমন্যু-বধ দৃশ্য কাব্য, অভিমন্যু সম্ভব কাব্য
The Indian Homoeopathic Review ৬০১-৬০৩
আনন্দ রহো, সীতার বনবাস দৃশ্যকাব্য, লক্ষ্মণ-বর্জন দৃশ্যকাব্য,
মুক্তি ও সাধন সম্বন্ধে হিন্দু-শাস্ত্রের উপদেশ, কুসুম-কানন,
সরলা, প্রায়শ্চিত্ত, আদর, উর্মিলা-কাব্য, নির্ঝরিণী (গীতিকাব্য),
রাজ-উদাসীন ৬০৩-৬০৬
জন স্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত, ইতালির ইতিবৃত্ত-সঙ্কলিত
ম্যাটসিনির জীবনবৃত্ত, হৃদয়োচ্ছ্বাস, স্যামুয়েল হানিমানের জীবনবৃত্ত,
যেমন রোগ তেমনি রোজা, গার্হস্থ্য চিকিৎসাবিদ্যা, শার্ঙ্গধর, বাবরের
পরাক্রম, স্বপন-সংগীত, উদ্বাহরণ বা অপূর্ব মিলন, মেঘেতে বিজলী
বা হরিশচন্দ্র ৬০৬-৬০৯
বনবালা, হরবিলাপ, কমলে কামিনী বা ফুলেশ্বরী, কল্পনা-কুসুম,
কবিতাবলী, কুসুমারিন্দম ৬০৯
সমালোচক কাব্য, তৃণপুঞ্জ, শান্তি-কুসুম, সুরসভা, কৈলাস-কুসুম,
মণি মন্দির, পার্থ প্রসাদন, প্রমীলার পরী, ষড়ঋতু বর্ণন কাব্য ৬১০-৬১১
সিন্ধু দূত, রামধনু, ঝংকার, উচ্ছ্বাস ৬১১-৬১৩
সংগীত সংগ্রহ। (বাউলের গাথা), স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক
আপত্তি খণ্ডন, ভাষাশিক্ষা ৬১৩-৬১৫
লালা গোলকচাঁদ, দেহাত্মিক-তত্ত্ব ৬১৫
সংগ্রহ, লীলা, রায়মহাশয়, প্রবাসের পত্র, অপরিচিতের পত্র,
প্রকৃতির শিক্ষা, দ্বারকানাথ মিত্রের জীবনী ৬১৫-৬১৮

অশোকচরিত, পঞ্চামৃত	৬১৮
কঙ্কাবতী : ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	৬১৮-৬২০
ভক্তচরিতামৃত, রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবনচরিত, চরিত রত্নাবলী, অর্থই অনর্থ, ঠগী কাহিনী	৬২০-৬২১
উপনিষদঃ	৬২১-৬২৩
হাসি ও খেলা, সাধন সপ্তকম্, নীতিশতক	৬২৩-৬২৫
দেওয়ান গোবিন্দরাম, মনোরমা,	৬২৫-৬২৬
নূরজাহান, শুভপরিণয়ে	৬২৬-৬২৭
রঘুবংশ, ফুলের তোড়া, নীহার-বিন্দু	৬২৭-৬২৮
নির্ঝরিণী	৬২৮
বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম	৬২৮-৬২৯
কবি বিদ্যাপতি, প্রসঙ্গমালা, মনোহর পাঠ, ন্যায় দর্শন, কাতন্ত্রব্যাকরণম্	৬২৯-৬৩১
সাহিত্য চিন্তা, বামা সুন্দরী বা আদর্শনারী, শুশ্রূষা, বাসনা, পুষ্পাঞ্জলি	৬৩১-৬৩৩
চিন্তালহরী, ভূমিকম্প	৬৩৩-৬৩৪
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	৬৩৪
সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা	
ভারতী, নব্যভারত, সাহিত্য	৬৩৭-৬৪০
নব্যভারত, সাহিত্য	৬৪০-৬৪২
নব্যভারত, সাহিত্য, সাহিত্য ও বিজ্ঞান	৬৪৩-৬৪৪
সাহিত্য	৬৪৪-৬৪৭
নব্যভারত, সাহিত্য	৬৪৭-৬৪৯
নব্যভারত, সাহিত্য	৬৪৯-৬৫১
নব্যভারত, সাহিত্য	৬৫১-৬৫৩
সাহিত্য	৬৫৩-৬৫৪
নব্যভারত, সাহিত্য	৬৫৪-৬৫৬
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা	৬৫৬-৬৫৭
প্রদীপ, উৎসাহ	৬৫৭-৬৫৮
নব্যভারত, প্রদীপ, উৎসাহ, নির্মাল্য	৬৫৮-৬৬১
নব্যভারত, সাহিত্য, পূর্ণিমা, প্রদীপ, অঞ্জলি	৬৬১-৬৬৫
সাহিত্য, প্রদীপ, অঞ্জলি	৬৬৫-৬৬৬
সাহিত্য, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, প্রদীপ, উৎসাহ, অঞ্জলি	৬৬৬-৬৬৮
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, প্রদীপ	৬৬৮-৬৭০
সাময়িক সারসংগ্রহ	
মণিপুরের বর্ণনা, আমেরিকার সমাজচিত্র, পৌরাণিক মহাপ্লাবন, মুসলমান মহিলা, প্রাচ্য সভ্যতার প্রাচীনত্ব	৬৭৩-৬৭৬

ক্ষিপ্ত রমণীসম্প্রদায়, সীমান্ত প্রদেশ ও আশ্রিতরাজ্য,
ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ ৬৭৬-৬৭৯
স্ত্রী-মজুর, প্রাচীন-পুঁথি উদ্ধার, ক্যাথলিক সোশ্যালিজ্‌ম্ ৬৭৯-৬৮২
আমেরিকানের রক্তপিপাসা ৬৮২
উন্নতি, সুখ দুঃখ ৬৮৪-৬৮৫
সোশ্যালিজ্‌ম ৬৮৬
প্রাচীন শূন্যবাদ ৬৮৮
পরিবারাশ্রম ৬৮৯
মানুষসৃষ্টি, জিব্রল্টার বর্জন ৬৯১-৬৯৩
পলিটিক্স, কন্‌গ্রেসে বিদ্রোহ, ভারত কৌন্সিলের স্বাধীনতা,
পুলিস রেগুলেশন বিল, ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি, ধর্মপ্রচার ৬৯৪-৭০৩
ইন্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটি, উদ্দেশ্য সংক্ষেপ ও কর্তব্যবিচার,
হিন্দু ও মুসলমান, কন্‌গ্রেসে বিদ্রোহ, রাষ্ট্রীয় ব্যাপার ৭০৩-৭০৮
ফেরোজ শা মেটা, বেয়াদব, কথামালার একটি গল্প ৭০৮-৭১১
চাবুক-পরিপাক, জাতীয় আদর্শ, অপূর্ব দেশহিতৈষিতা, কুকুরের
প্রতি মুগুর ৭১১-৭১৩
ইংলন্ডে ও ভারতবর্ষে সমকালীন সিভিল সর্বিস পরীক্ষা, মতের
আশ্চর্য ঐক্য, ইংরাজি ভাষা শিক্ষা, জাতীয় সাহিত্য ৭১৩-৭১৬
ভ্রম স্বীকার, চিত্রল-অধিকার, ইংরাজের লোকপ্রিয়তা, ইংরাজের
স্বদোষ-বাৎসল্য, ইংরাজের লোকলজ্জা, প্রাচী ও প্রতীচী ৭১৬-৭১৯
নূতন সংস্করণ, জাতিভেদ, বিবাহে পণগ্রহণ, ইংরাজের কাপুরুষতা ৭১৯-৭২২

পরিশিষ্ট

সারস্বত সমাজ ১ ৭২৫
সারস্বত সমাজ ২ ৭২৬
বিশেষ বিজ্ঞাপন/ ত্রৈমাসিক সাধনা ৭২৭
প্রাদেশিক সভার উদ্‌বোধন ৭২৮
শারদ জ্যোৎস্নায় ভগ্নহৃদয়ের গীতোচ্ছ্বাস ৭৩২
গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি ৭৩৫
বঙ্গে সমাজ-বিপ্লব ৭৩৬
বিজন চিন্তা : কল্পনা ৭৩৮
কবিতা-পুস্তক ৭৪০
আবদারের আইন ৭৪৬
সংযোজন ৭৫৮
গ্রন্থপরিচয় ৭৬৩
বর্ণানুক্রমিক সূচী ৮২১

চিত্রসূচী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর -অঙ্কিত : ১৮৮৩	প্রবেশক
পাণ্ডুলিপিচিত্র "অবসাদ"। মালতী পুঁথি	৪৪
"জীবণ মরণ"। ভিক্টোর হুগোর কবিতার অনুবাদ	১২২
পুষ্পাঞ্জলি " তোমার ফুলবাগানে যখন চারি দিকেই ফুল ফুটিতেছে..."	৫৬৮

কবিতা

অভিলাষ

১

জনমনোমুগ্ধকর উচ্চ অভিলাষ!
তোমার বন্ধুর পথ অনন্ত অপার।
অতিক্রম করা যায় যত পান্থশালা,
তত যেন অগ্রসর হতে ইচ্ছা হয়।

২

তোমার বাঁশরি স্বরে বিমোহিত মন—
মানবেরা, ওই স্বর লক্ষ্য করি হায়,
যত অগ্রসর হয় ততই যেমন
কোথায় বাজিছে তাহা বুঝিতে না পারে।

৩

চলিল মানব দেখো বিমোহিত হয়ে,
পর্বতের অত্যুন্নত শিখর লঙ্ঘিয়া,
তুচ্ছ করি সাগরের তরঙ্গ ভীষণ,
মরুর পথের ক্লেশ সহি অনায়াসে।

৪

হিমক্ষেত্র, জনশূন্য কানন, প্রান্তর,
চলিল সকল বাধা করি অতিক্রম।
কোথায় যে লক্ষ্যস্থান খুঁজিয়া না পায়,
বুঝিতে না পারে কোথা বাজিছে বাঁশরি।

৫

ওই দেখো ছুটিয়াছে আর-এক দল,
লোকারণ্য পথমাঝে সুখ্যাতি কিনিতে;
রণক্ষেত্রে মৃত্যুর বিকট মূর্তি মাঝে,
শমনের দ্বার সম কামানের মুখে।

৬

ওই দেখো পুস্তকের প্রাচীর মাঝারে
দিন রাত্রি আর স্বাস্থ্য করিতেছে ব্যয়।
পহুঁছিতে তোমার ও দ্বারের সম্মুখে
লেখনীরে করিয়াছে সোপান সমান।

৭

কোথায় তোমার অন্ত রে দুরভিলাষ
'স্বর্ণঅট্টালিকা মাঝে?' তা নয় তা নয়।
'সুবর্ণখনির মাঝে অন্ত কি তোমার?'
তা নয়, যমের দ্বারে অন্ত আছে তব।

৮

তোমার পথের মাঝে, দুষ্ট অভিলাষ,
ছুটিয়াছে মানবেরা সন্তোষ লভিতে।
নাহি জানে তারা ইহা নাহি জানে তারা,
তোমার পথের মাঝে সন্তোষ থাকে না!

৯

নাহি জানে তারা হায় নাহি জানে তারা
দরিদ্র কুটির মাঝে বিরাজে সন্তোষ।
নিরজন তপোবনে বিরাজে সন্তোষ।
পবিত্র ধর্মের দ্বারে সন্তোষ আসন।

১০

নাহি জানে তারা ইহা নাহি জানে তারা
তোমার কুটিল আর বন্ধুর পথেতে
সন্তোষ নাহিকো পারে পাতিতে আসন।
নাহি পশে সূর্যকর আঁধার নরকে।

১১

তোমার পথেতে ধায় সুখের আশয়ে
নির্বোধ মানবগণ সুখের আশয়ে;
নাহি জানে তারা ইহা নাহি জানে তারা
কটাক্ষও নাহি করে সুখ তোমা পানে।

১২

সন্দেহ ভাবনা চিন্তা আশঙ্কা ও পাপ
এরাই তোমার পথে ছড়ানো কেবল
এরা কি হইতে পারে সুখের আসন
এ-সব জঞ্জালে সুখ তিষ্ঠিতে কি পারে।

১৩

নাহি জানে তারা ইহা নাহি জানে তারা
নির্বোধ মানবগণ নাহি জানে ইহা
পবিত্র ধর্মের দ্বারে চিরস্থায়ী সুখ
পাতিয়াছে আপনার পবিত্র আসন।

১৪

ওই দেখো ছুটিয়াছে মানবের দল
তোমার পথের মাঝে দুষ্ট অভিলাষ
হত্যা অনুতাপ শোক বহিয়া মাথায়
ছুটেছে তোমার পথে সন্দিগ্ধ হৃদয়ে।

১৫

প্রতারণা প্রবঞ্চনা অত্যাচারচয়
পথের সম্বল করি চলে দ্রুতপদে
তোমার মোহন জালে পড়িবার তরে।
ব্যাধের বাঁশিতে যথা মৃগ পড়ে ফাঁদে।

১৬

দেখো দেখো বোধহীন মানবের দল
তোমার ও মোহময়ী বাঁশরির স্বরে
এবং তোমার সঙ্গী আশা উত্তেজনে
পাপের সাগরে ডুবে মুক্তার আশয়ে।

১৭

রৌদ্রের প্রখর তাপে দরিদ্র কৃষক
ঘর্মসিক্ত কলেবরে করিছে কর্ষণ
দেখিতেছে চারি ধারে আনন্দিত মনে
সমস্ত বর্ষের তার শ্রমের যে ফল।

১৮

দূরাকাঙ্ক্ষা হায় তব প্রলোভনে পড়ি
কর্ষিতে কর্ষিতে সেই দরিদ্র কৃষক
তোমার পথের শোভা মনোময় পটে
চিত্রিতে লাগিল হায় বিমুগ্ধ হৃদয়ে।

১৯

ওই দেখো আঁকিয়াছে হৃদয়ে তাহার
শোভাময় মনোহর অট্টালিকারাজি
হীরক মাণিক্য পূর্ণ ধনের ভাণ্ডার
নানা শিল্পে পরিপূর্ণ শোভন আপণ।

২০

মনোহর কুঞ্জবন সুখের আগার
শিল্প-পারিপাট্যযুক্ত প্রমোদভবন
গঙ্গা সমীরণ স্নিগ্ধ পল্লীর কানন
প্রজাপূর্ণ লোভনীয় বৃহৎ প্রদেশ।

২১

ভাবিল মুহূর্ত-তরে ভাবিল কৃষক
সকলই এসেছে যেন তারি অধিকারে
তারি ওই বাড়ি ঘর তারি ও ভাণ্ডার
তারি অধিকারে ওই শোভন প্রদেশ।

২২

মুহূর্তেক পরে তার মুহূর্তেক পরে
লীন হল চিত্রচয় চিত্তপট হতে
ভাবিল চমকি উঠি ভাবিল তখন
'আছে কি এমন সুখ আমার কপালে?'

২৩

'আমাদের হায় যত দুরাকাঙ্ক্ষাচয়
মানসে উদয় হয় মুহূর্তের তরে
কার্যে তাহা পরিণত না হতে না হতে
হৃদয়ের ছবি হায় হৃদয়ে মিশায়।'

২৪

ওই দেখো ছুটিয়াছে তোমার ও পথে
রক্তমাখা হাতে এক মানবের দল
সিংহাসন রাজদণ্ড ঐশ্বর্য মুকুট
প্রভুত্ব রাজত্ব আর গৌরবের তরে।

২৫

ওই দেখো গুপ্তহত্যা করিয়া বহন
চলিতেছে অঙ্গুলির 'পরে ভর দিয়া
চুপি চুপি ধীরে ধীরে অলক্ষিত ভাবে
তলবার হাতে করি চলিয়াছে দেখো।

২৬

হত্যা করিতেছে দেখো নিদ্রিত মানবে
সুখের আশয়ে বৃথা সুখের আশয়ে
ওই দেখো ওই দেখো রক্তমাখা হাতে
ধরিয়াছে রাজদণ্ড সিংহাসনে বসি।

২৭

কিন্তু হায় সুখলেশ পাবে কি কখন?
সুখ কি তাহারে করিবেক আলিঙ্গন?
সুখ কি তাহার হৃদে পাতিবে আসন?
সুখ কভু তারে কি গো কটাক্ষ করিবে?

২৮

নরহত্যা করিয়াছে যে সুখের তরে
যে সুখের তরে পাপে ধর্ম ভাবিয়াছে
বৃষ্টি বজ্র সহ্য করি যে সুখের তরে
ছুটিয়াছে আপনার অভীষ্ট সাধনে?

২৯

কখনোই নয় তাহা কখনোই নয়
পাপের কী ফল কভু সুখ হতে পারে
পাপের কী শাস্তি হয় আনন্দ ও সুখ
কখনোই নয় তাহা কখনোই নয়।

৩০

প্রজ্বলিত অনুতাপ হুতাশন কাছে
বিমল সুখের হায় স্নিগ্ধ সমীরণ
হুতাশনসম তপ্ত হয়ে উঠে যেন
তখন কি সুখ কভু ভালো লাগে আর।

৩১

নরহত্যা করিয়াছে যে সুখের তরে
যে সুখের তরে পাপে ধর্ম ভাবিয়াছে
ছুটেছে না মানি বাধা অভীষ্ট সাধনে
মনস্তাপে পরিণত হয়ে উঠে শেষে।

৩২

হৃদয়ের উচ্চাসনে বসি অভিলাষ
মানবদিগকে লয়ে ক্রীড়া কর তুমি
কাহারে বা তুলে দাও সিদ্ধির সোপানে
কারে ফেল নৈরাশ্যের নিষ্ঠুর কবলে।

৩৩

কৈকেয়ী হৃদয়ে চাপি দুষ্ট অভিলাষ!
চতুর্দশ বর্ষ রামে দিলে বনবাস,
কাড়িয়া লইলে দশরথের জীবন,
কাঁদালে সীতায় হায় অশোক-কাননে।

৩৪

রাবণের সুখময় সংসারের মাঝে
শান্তির কলস এক ছিল সুরক্ষিত
ভাঙিল হঠাৎ তাহা ভাঙিল হঠাৎ
তুমিই তাহার হও প্রধান কারণ।

৩৫

দুর্যোধন-চিত্ত হায় অধিকার করি
অবশেষে তাহারেই করিলে বিনাশ
পাণ্ডুপুত্রগণে তুমি দিলে বনবাস
পাণ্ডবদিগের হৃদে ক্রোধ জ্বালি দিলে।

৩৬

নিহত করিলে তুমি ভীষ্ম আদি বীরে
কুরুক্ষেত্র রক্তময় করে দিলে তুমি
কাঁপাইলে ভারতের সমস্ত প্রদেশ
পাণ্ডবে ফিরায়ে দিলে শূন্য সিংহাসন।

৩৭

বলি না হে অভিলাষ তোমার ও পথ
পাপেতেই পরিপূর্ণ পাপেই নির্মিত
তোমার কতকগুলি আছয়ে সোপান
কেহ কেহ উপকারী কেহ অপকারী।

৩৮

উচ্চ অভিলাষ! তুমি যদি নাহি কভু
বিস্তারিতে নিজ পথ পৃথিবীমণ্ডলে
তাহা হলে উন্নতি কি আপনার জ্যোতি
বিস্তার করিত এই ধরাতল-মাঝে?

৩৯

সকলেই যদি নিজ নিজ অবস্থায়
সন্তুষ্ট থাকিত নিজ বিদ্যা বুদ্ধিতেই
তাহা হলে উন্নতি কি আপনার জ্যোতি
বিস্তার করিত এই ধরাতল-মাঝে?

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
অগ্রহায়ণ ১৭৯৬ শক
নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৮৭৪

হোক ভারতের জয়!

এসো এসো ভ্রাতৃগণ! সরল অন্তরে
সরল প্রীতির ভরে
সবে মিলি পরস্পরে
আলিঙ্গন করি আজ বহুদিন পরে।

এসেছে জাতীয় মেলা ভারতভূষণ,
ভারত সমাজে তবে
হৃদয় খুলিয়া সবে
এসো এসো এসো করি প্রিয়সম্ভাষণ।
দূর করো আত্মভেদ বিপদ-অঙ্কুর,
দূর করো মলিনতা
বিলাসিতা অলসতা,
হীনতা ক্ষীণতা দোষ করো সবে দূর।
ভীরুতা বঙ্গীয়জন-কলঙ্ক-প্রধান—
সে-কলঙ্ক দূর করো,
সাহসিক তেজ ধরো,
স্বকার্যকুশল হও হয়ে একতান।
হল না কিছুই করা যা করিতে এলে—
এই দেখো হিন্দুমেলা,
তবে কেন কর হেলা?
কী হবে কী হবে আর তুচ্ছ খেলা খেলে?
সাগরের স্রোতসম যাইছে সময়।
তুচ্ছ কাজে কেন রও,
স্বদেশহিতৈষী হও—
স্বদেশের জনগণে দাও রে অভয়।
নাহি আর জননীর পূর্বসুতগণ—
হরিশ্চন্দ্র যুধিষ্ঠির
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ বীর,
অনন্তজলধিতলে হয়েছে মগন।
নাহি সেই রাম আদি সম্রাট প্রাচীন,
বিক্রম-আদিত্যরাজ,
কালিদাস কবিরাজ,
পরাশর পারাশর পণ্ডিত প্রবীণ।
সকলেই জল বায়ু তেজ মৃত্তিকায়
মিশাইয়া নিজদেহ
অনন্ত ব্রহ্মের গেহ
পশেছে কীর্তিরে শুধু রাখিয়ে ধরায়।
আদরে সে প্রিয় সখী আচ্ছাদি গগনে
সে লোকবিশ্রুত নাম
সে বিশ্ববিজয়ী ধাম
নির্ঘোষে ঘুষিছে সদা অখিল ভুবনে।
যবনের রাজ্যকালে কীর্তির আধার
চিতোর-নগর নাম
অতুলবীরত্বধাম,
কেমন ছিল রে মনে ভাবো একবার।

এইরূপ কত শত নগর প্রাচীন
সুকীর্তি-তপন-করে
ভারত উজ্জ্বল ক'রে
অনন্ত কালের গর্ভে হয়েছে বিলীন।
নাহি সেই ভারতের একতা-বিভব,
পাষাণ বাঁধিয়া গলে
সকলের পদতলে
লুটাইছে আর্যগণ হইয়া নীরব।
গেল, হায়, সব সুখ অভাগী মাতার—
ছিল যত মনোআশা
নিল কাল সর্বনাশা,
প্রসন্ন বদন হল বিষণ্ণ তাঁহার।
কী আর হইবে মাতা খুলিয়া বদন।
দীপ্তভানু অস্ত গেল,
এবে কালরাত্রি এল,
বসনে আবরি মুখ কাঁদো সর্বক্ষণ।
বিশাল অপার সিন্ধু, গভীর নিস্বনে
যেখানে যেখানে যাও
কাঁদিতে কাঁদিতে গাও—
ডুবিল ভারতরবি অনন্ত জীবনে।
সুবিখ্যাত গৌড় যেই বঙ্গের রতন—
তার কীর্তিপ্রতিভায়
খ্যাতাপন্ন এ ধরায়
হয়েছিল একদিন বঙ্গবাসিগণ।
গেল সে বঙ্গের জ্যোতিঃ কিছুকাল পরে—
কোনো চিহ্ন নাহি তার,
পরিয়া হীনতাহার,
ডুবিয়াছে এবে বঙ্গ কলঙ্কসাগরে।
হিন্দুজনভ্রাতৃগণ! করি হে বিনয়—
একতা উৎসাহ ধরো,
জাতীয় উন্নতি করো,
ঘুষুক ভুবনে সবে ভারতের জয়।
জগদীশ! তুমি, নাথ, নিত্য-নিরাময়
করো কৃপা বিতরণ,
অধিবাসিজনগণ,
করুক উন্নতি— হোক্ ভারতের জয়!

বান্ধব
মাঘ ১২৮১

হিন্দুমেলায় উপহার

১

হিমাদ্রি শিখরে শিলাসন-'পরি,
গান ব্যাসঋষি বীণা হাতে করি—
কাঁপায়ে পর্বত শিখর কানন,
কাঁপায়ে নীহারশীতল বায়।

২

স্তব্ধ শিখর স্তব্ধ তরুলতা,
স্তব্ধ মহীরুহ নড়েনাকো পাতা।
বিহগ নিচয় নিস্তব্ধ অচল;
নীরবে নির্ঝর বহিয়া যায়।

৩

পূরণিমা রাত— চাঁদের কিরণ—
রজতধারায় শিখর, কানন,
সাগর-উরমি, হরিত-প্রান্তর,
প্লাবিত করিয়া গড়ায়ে যায়।

৪

ঝংকারিয়া বীণা কবিবর গায়,
'কেন রে ভারত কেন তুই, হায়,
আবার হাসিস্! হাসিবার দিন
আছে কি এখনো এ ঘোর দুঃখে।

৫

দেখিতাম যবে যমুনার তীরে,
পূর্ণিমা নিশীথে নিদাঘ সমীরে,
বিশ্রামের তরে রাজা যুধিষ্ঠির,
কাটাতেন সুখে নিদাঘ-নিশি।

৬

তখন ও-হাসি লেগেছিল ভালো,
তখন ও-বেশ লেগেছিল ভালো,
শ্মশান লাগিত স্বরগ সমান,
মরু উরবরা ক্ষেতের মতো।

৭

তখন পূর্ণিমা বিতরিত সুখ,
মধুর উষার হাস্য দিত সুখ,
প্রকৃতির শোভা সুখ বিতরিত
পাখির কূজন লাগিত ভালো।

৮

এখন তা নয়, এখন তা নয়,
এখন গেছে সে সুখের সময়।
বিষাদ আঁধার ঘেরেছে এখন,
হাসি খুশি আর লাগে না ভালো।

৯

অমার আঁধার আসুক এখন,
মরু হয়ে যাক ভারত-কানন,
চন্দ্র সূর্য হোক মেঘে নিমগন
প্রকৃতি-শৃঙ্খলা ছিঁড়িয়া যাক।

১০

যাক ভাগীরথী অগ্নিকুণ্ড হয়ে,
প্রলয়ে উপাড়ি পাড়ি হিমালয়ে,
ডুবাক ভারতে সাগরের জলে,
ভাঙিয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক।

১১

চাই না দেখিতে ভারতেরে আর,
চাই না দেখিতে ভারতেরে আর,
সুখ-জন্মভূমি চির বাসস্থান,
ভাঙিয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক।

১২

দেখেছি সে-দিন যবে পৃথ্বীরাজ,
সমরে সাধিয়া ক্ষত্রিয়ের কাজ,
সমরে সাধিয়া পুরুষের কাজ,
আশ্রয় নিলেন কৃতান্ত-কোলে।

১৩

দেখেছি সে-দিন দুর্গাবতী যবে,
বীরপত্নীসম মরিল আহবে
বীরবালাদের চিতার আগুন,
দেখেছি বিস্ময়ে পুলকে শোকে।

১৪

তাদের স্মরিলে বিদরে হৃদয়,
স্তব্ধ করি দেয় অন্তরে বিস্ময়;
যদিও তাদের চিতাভস্মরাশি,
মাটির সহিত মিশায়ে গেছে!

১৫

আবার সে-দিন(ও) দেখিয়াছি আমি,
স্বাধীন যখন এ-ভারতভূমি
কী সুখের দিন! কী সুখের দিন!
আর কি সে-দিন আসিবে ফিরে?

১৬

রাজা যুধিষ্ঠির (দেখেছি নয়নে)
স্বাধীন নৃপতি আর্য-সিংহাসনে,
কবিতার শ্লোকে বীণার তারেতে,
সে-সব কেবল রয়েছে গাঁথা!

১৭

শুনেছি আবার, শুনেছি আবার,
রাম রঘুপতি লয়ে রাজ্যভার,
শাসিতেন হায় এ-ভারতভূমি,
আর কি সে-দিন আসিবে ফিরে!

১৮

ভারত-কঙ্কাল আর কি এখন,
পাইবে হায় রে নূতন জীবন;
ভারতের ভস্মে আগুন জ্বলিয়া,
আর কি কখনো দিবে রে জ্যোতি।

১৯

তা যদি না হয় তবে আর কেন,
হাসিবি ভারত! হাসিবি রে পুনঃ,
সে-দিনের কথা জাগি স্মৃতিপটে,
ভাসে না নয়ন বিষাদজলে?

২০

অমার আঁধার আসুক এখন,
মরু হয়ে যাক ভারত-কানন,
চন্দ্র সূর্য হোক মেঘে নিমগন,
প্রকৃতি-শৃঙ্খলা ছিঁড়িয়া যাক।

২১

যাক ভাগীরথী অগ্নিকুণ্ড হয়ে,
প্রলয়ে উপাড়ি পাড়ি হিমালয়ে,
ডুবাক ভারতে সাগরের জলে,
ভাঙিয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক।

২২

মুছে যাক মোর স্মৃতির অক্ষর,
শূন্যে হোক লয় এ শূন্য অন্তর,
ডুবুক আমার অমর জীবন,
অনন্ত গভীর কালের জলে।'

অমৃতবাজার পত্রিকা
২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫

প্রকৃতির খেদ

[দ্বিতীয় পাঠ]

বিস্তারিয়া ঊর্মিমালা, সুকুমারী শৈলবালা
অমল সলিলা গঙ্গা অই বহি যায় রে।
প্রদীপ্ত তুষাররাশি, শুভ্র বিভা পরকাশি
ঘুমাইছে স্তব্ধভাবে গোমুখীর শিখরে।
ফুটিয়াছে কমলিনী অরুণের কিরণে।
নির্ঝরের এক ধারে, দুলিছে তরঙ্গ-ভরে
ঢুলে ঢুলে পড়ে জলে প্রভাত পবনে।
হেলিয়া নলিনী-দলে প্রকৃতি কৌতুকে দোলে
গঙ্গার প্রবাহ ধায় ধুইয়া চরণ।
ধীরে ধীরে বায়ু আসি দুলায়ে অলকরাশি
কবরী কুসুমগন্ধ করিছে হরণ।
বিজনে খুলিয়া প্রাণ, সপ্তমে চড়ায়ে তান,
শোভনা প্রকৃতিদেবী গা'ন ধীরে ধীরে।
নলিনী-নয়নদ্বয়, প্রশান্ত বিষাদময়
মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস বহিল গভীরে।—
'অভাগী ভারত হায় জানিতাম যদি—
বিধবা হইবি শেষে, তা হলে কি এত ক্লেশে
তোর তরে অলংকার করি নিরমাণ।
তা হলে কি হিমালয়, গর্বে-ভরা হিমালয়,
দাঁড়াইয়া তোর পাশে, পৃথিবীরে উপহাসে,
তুষারমুকুট শিরে করি পরিধান।
তা হলে কি শতদলে তোর সরোবরজলে
হাসিত অমন শোভা করিয়া বিকাশ,
কাননে কুসুমরাশি, বিকাশি মধুর হাসি,
প্রদান করিত কি লো অমন সুবাস।
তা হলে ভারত তোরে, সৃজিতাম মরু করে
তরুলতা-জন-শূন্য প্রান্তর ভীষণ।
প্রজ্বলন্ত দিবাকর বর্ষিত জ্বলন্ত কর
মরীচিকা পান্থগণে করিত ছলনা।'

থামিল প্রকৃতি করি অশ্রু বরিষন
গলিল তুষারমালা, তরুণী সরসী-বালা
ফেলিল নীহারবিন্দু নির্ঝরিণীজলে।
কাঁপিল পাদপদল, উথলে গঙ্গার জল
তরুস্কন্ধ ছাড়ি লতা লুটায় ভূতলে।
ঈষৎ আঁধাররাশি, গোমুখী শিখর গ্রাসি
আটক করিল নব অরুণের কর।
মেঘরাশি উপজিয়া, আঁধারে প্রশ্রয় দিয়া,
ঢাকিয়া ফেলিল ক্রমে পর্বতশিখর।
আবার গাইল ধীরে প্রকৃতিসুন্দরী।—
'কাঁদ্ কাঁদ্ আরো কাঁদ্ অভাগী ভারত।
হায় দুখনিশা তোর, হল না হল না ভোর,
হাসিবার দিন তোর হল না আগত।
লজ্জাহীনা! কেন আর! ফেলে দে-না অলংকার
প্রশান্ত গভীর অই সাগরের তলে।
পূতধারা মন্দাকিনী ছাড়িয়া মরতভূমি
আবদ্ধ হউক পুন ব্রহ্ম-কমণ্ডলে।
উচ্চশির হিমালয়, প্রলয়ে পাউক লয়,
চিরকাল দেখেছে যে ভারতের গতি।
কাঁদ্ তুই তার পরে, অসহ্য বিষাদভরে
অতীত কালের চিত্র দেখাউক স্মৃতি।
দেখ্ আর্য-সিংহাসনে, স্বাধীন নৃপতিগণে
স্মৃতির আলেখ্যপটে রয়েছে চিত্রিত।
দেখ্ দেখি তপোবনে, ঋষিরা স্বাধীন মনে,
কেমন ঈশ্বর ধ্যানে রয়েছে ব্যাপৃত।
কেমন স্বাধীন মনে, গাইছে বিহঙ্গগণে,
স্বাধীন শোভায় শোভে কুসুম নিকর।
সূর্য উঠি প্রাতঃকালে, তাড়ায় আঁধারজালে
কেমন স্বাধীনভাবে বিস্তারিয়া কর।
তখন কি মনে পড়ে, ভারতী মানস-সরে
কেমন মধুর স্বরে বীণা ঝংকারিত।
শুনিয়া ভারত পাখি, গাইত শাখায় থাকি,
আকাশ পাতাল পৃথ্বী করিয়া মোহিত।
সে-সব স্মরণ করে কাঁদ্ লো আবার!
আয় রে প্রলয় ঝড়, গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ কর্,
ধূর্জটি! সংহার-শিঙ্গা বাজাও তোমার।
প্রভঞ্জন ভীমবল, খুলে দেও বায়ুদল,
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাক ভারতের বেশ।
ভারত-সাগর রুষি, উগরো বালুকারাশি,
মরুভূমি হয়ে থাক্ সমস্ত প্রদেশ।'
বলিতে নারিল আর প্রকৃতিসুন্দরী,

ধ্বনিয়া আকাশ ভূমি, গরজিল প্রতিধ্বনি,
কাঁপিয়া উঠিল বেগে ক্ষুব্ধ হিমগিরি।
জাহ্নবী উন্মত্তপারা, নির্ঝর চঞ্চল ধারা,
বহিল প্রচণ্ড বেগে ভেদিয়া প্রস্তর।
প্রবল তরঙ্গভরে, পদ্ম কাঁপে থরে থরে,
টলিল প্রকৃতি-সতী আসন-উপর।
সুচঞ্চল সমীরণে, উড়াইল মেঘগণে,
সুতীব্র রবির ছটা হল বিকীরিত।
আবার প্রকৃতি-সতী আরম্ভিল গীত।—
'দেখিয়াছি তোর আমি সেই এক বেশ।
অজ্ঞাত আছিলি যবে মানব নয়নে।
নিবিড় অরণ্য ছিল এ বিস্তৃত দেশ।
বিজন ছায়ায় নিদ্রা যেত পশুগণে।
কুমারী অবস্থা তোর সে কি পড়ে মনে?
সম্পদ বিপদ সুখ, হরষ বিষাদ দুখ
কিছুই না জানিতিস সে কি পড়ে মনে?
সে-এক সুখের দিন হয়ে গেছে শেষ—
যখন মানবগণ, করে নাই নিরীক্ষণ,
তোর সেই সুদুর্গম অরণ্য প্রদেশ।
না বিতরি গন্ধ হায়, মানবের নাসিকায়
বিজনে অরণ্যফুল যাইত শুকায়ে—
তপনকিরণ-তপ্ত, মধ্যাহ্নের বায়ে।
সে-এক সুখের দিন হয়ে গেছে শেষ।
সেইরূপ রহিলি না কেন চিরকাল।
না দেখি মনুষ্যমুখ, না জানিয়া দুঃখ সুখ,
না করিয়া অনুভব মান অপমান।
অজ্ঞান শিশুর মতো, আনন্দে দিবস যেত,
সংসারের গোলমালে থাকিয়া অজ্ঞান।
তা হলে তো ঘটিত না এ-সব জঞ্জাল।
সেইরূপ রহিলি না কেন চিরকাল।
সৌভাগ্যে হানিয়া বাজ, তা হলে তো তোরে আজ
অনাথা ভিখারীবেশে কাঁদিতে হত না।
পদাঘাতে উপহাসে, তা হলে তো কারাবাসে
সহিতে হত না শেষে এ ঘোর যাতনা।
অরণ্যেতে নিরিবিলি, সে যে তুই ভালো ছিলি,
কী কুক্ষণে করিলি রে সুখের কামনা।
দেখি মরীচিকা হায়, আনন্দে বিহ্বলপ্রায়
না জানি নৈরাশ্য শেষে করিবে তাড়না।
আর্যরা আইল শেষে, তোর এ বিজন দেশে,
নগরেতে পরিণত হল তোর বন।

হরষে প্রফুল্ল মুখে হাসিলি সরলা সুখে,
আশার দর্পণে মুখ দেখিলি আপন।
ঋষিগণ সমস্বরে অই সামগান করে
চমকি উঠিছে আহা হিমালয় গিরি।
ওদিকে ধনুর ধ্বনি, কাঁপায় অরণ্যভূমি
নিদ্রাগত মৃগগণে চমকিত করি।
সরস্বতী নদীকূলে, কবিরা হৃদয় খুলে
গাইছে হরষে আহা সুমধুর গীত।
বীণাপাণি কুতূহলে, মানসের শতদলে,
গাহেন সরসী-বারি করি উথলিত।
সেই-এক অভিনব, মধুর সৌন্দর্য তব,
আজিও অঙ্কিত তাহা রয়েছে মানসে।
আঁধার সাগরতলে একটি রতন জ্বলে
একটি নক্ষত্র শোভে মেঘান্ধ আকাশে।
সুবিস্তৃত অন্ধকূপে, একটি প্রদীপ-রূপে
জ্বলিতিস তুই আহা, নাহি পড়ে মনে?
কে নিভালে সেই ভাতি ভারতে আঁধার রাতি
হাতড়ি বেড়ায় আজি সেই হিন্দুগণে?
এই অমানিশা তোর, আর কি হবে না ভোর
কাঁদিবি কি চিরকাল ঘোর অন্ধকূপে।
অনন্তকালের মতো, সুখসূর্য অস্তগত
ভাগ্য কি অনন্তকাল রবে এই রূপে।
তোর ভাগ্যচক্র শেষে থামিল কি হেতা এসে,
বিধাতার নিয়মের করি ব্যভিচার।
আয় রে প্রলয় ঝড়, গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ কর,
ধূর্জটি! সংহার-শিঙ্গা বাজাও তোমার।
প্রভঞ্জন ভীমবল, খুলে দেও বায়ুদল,
ছিন্নভিন্ন করে দিক ভারতের বেশ।
ভারতসাগর রুষি, উগরো বালুকারাশি
মরুভূমি হয়ে যাক সমস্ত প্রদেশ।'

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
৭৯৭ আষাঢ় শক। জুন-জুলাই ১৮৭৫

প্রকৃতির খেদ

[প্রথম পাঠ]

১

বিস্তারিয়া ঊর্মিমালা,
বিধির মানস-বালা,
মানস-সরসী ওই নাচিছে হরষে।

প্রদীপ্ত তুষাররাশি,
শুভ্র বিভা পরকাশি,
ঘুমাইছে স্তব্ধভাবে হিমাদ্রি উরসে।

২

অদূরেতে দেখা যায়,
উজ্জ্বল রজত কায়,
গোমুখী হইতে গঙ্গা ওই বহে যায়।
ঢালিয়া পবিত্র ধারা,
ভূমি করি উরবরা,
চঞ্চল চরণে সতী সিন্ধুপানে ধায়।

৩

ফুটেছে কনকপদ্ম অরুণ কিরণে॥
অমল সরসী-'পরে,
কমল, তরঙ্গভরে,
ঢুলে ঢুলে পড়ে জলে প্রভাত পবনে।

৪

হেলিয়া নলিনীদলে,
প্রকৃতি কৌতুকে দোলে,
সরসী-লহরী ধায় ধুইয়া চরণ।
ধীরে ধীরে বায়ু আসি,
দুলায়ে অলকরাশি,
কবরী-কুসুম-গন্ধ করিছে হরণ।

৫

বিজনে খুলিয়া প্রাণ,
নিখাদে চড়ায়ে তান,
শোভনা প্রকৃতিদেবী গান ধীরে ধীরে।
নলিন নয়নদ্বয়,
প্রশান্ত বিষাদময়
ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস বহিল গভীরে।

৬

'অভাগী ভারত! হায়, জানিতাম যদি,
বিধবা হইবি শেষে,
তা হলে কি এত ক্লেশে,
তোর তরে অলংকার করি নিরমাণ?
তা হলে কি পূতধারা মন্দাকিনী নদী
তোর উপত্যকা-'পরে হত বহমান?

তা হলে কি হিমালয়,
গর্ব্বে ভরা হিমালয়
দাঁড়াইয়া তোর পাশে
পৃথিবীরে উপহাসে,
তুষারমুকুট শিরে করি পরিধান।

৭

তা হলে কি শতদলে,
তোর সরোবরজলে,
হাসিত অমন শোভা করিয়া বিকাশ?
কাননে কুসুমরাশি,
বিকাশি মধুর হাসি,
প্রদান করিত কি লো অমন সুবাস?

৮

তা হলে ভারত! তোরে,
সৃজিতাম মরু করে,
তরুলতা-জন-শূন্য প্রান্তর ভীষণ;
প্রজ্বলন্ত দিবাকর,
বর্ষিত জ্বলন্ত কর,
মরীচিকা পান্থদের করিত ছলন!'
থামিল প্রকৃতি করি অশ্রু বরিষন।

৯

গলিল তুষারমালা,
তরুণী সরসী বালা,
ফেনিল নীহার-নীর সরসীর জলে।
কাঁপিল পাদপদল;
উথলে গঙ্গার জল,
তরুস্কন্ধ ছাড়ি লতা লুটিল ভূতলে।

১০

ঈষৎ আঁধাররাশি,
গোমুখী শিখর গ্রাসি,
আটক করিয়া দিল অরুণের কর।
মেঘরাশি উপজিয়া,
আঁধারে প্রশ্রয় দিয়া,
ঢাকিয়া ফেলিল ক্রমে পর্বতশিখর।

১১

আবার ধরিয়া ধীরে সুমধুর তান।
প্রকৃতি বিষাদে দুঃখে আরম্ভিল গান।

'কাঁদ্‌! কাঁদ্‌! আরো কাঁদ্‌ অভাগী ভারত
হায়! দুঃখ-নিশা তোর,
হল না হল না ভোর,
হাসিবার দিন তোর হল না আগত?

১২

লজ্জাহীনা! কেন আর,
ফেলে দে-না অলংকার,
প্রশান্ত গভীর ওই সাগরের তলে?
পূতধারা মন্দাকিনী,
ছাড়িয়া মরতভূমি
আবদ্ধ হউক পুনঃ ব্রহ্ম-কমণ্ডলে।

১৩

উচ্চশির হিমালয়,
প্রলয়ে পাউক লয়,
চিরকাল দেখেছে যে ভারতের গতি।
কাঁদ্‌ তুই তার পরে,
অসহ্য বিষাদভরে,
অতীত কালের চিত্র দেখাউক স্মৃতি।

১৪

দেখ্‌, আর্য সিংহাসনে,
স্বাধীন নৃপতিগণে,
স্মৃতির আলেখ্যপটে রহেছে চিত্রিত।
দেখ্‌ দেখি তপোবনে,
ঋষিরা স্বাধীন মনে,
কেমন ঈশ্বরধ্যানে রহেছে ব্যাপৃত।

১৫

কেমন স্বাধীন মনে,
গাহিছে বিহঙ্গগণে,
স্বাধীন শোভায় শোভে প্রসূননিকর।
সূর্য উঠি প্রাতঃকালে,
তাড়ায় আঁধারজালে,
কেমন স্বাধীনভাবে বিস্তারিয়া কর।

১৬

তখন কি মনে পড়ে—
ভারতী-মানস-সরে,
কেমন মধুর স্বরে বীণা ঝংকারিত।
শুনিয়ে ভারত-পাখি

গাহিত শাখায় থাকি
আকাশ পাতাল পৃথ্বী করিয়া মোহিত?

১৭

সে-সব স্মরণ করে, কাঁদ লো আবার।
'আয় রে প্রলয় ঝড়
গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ কর
ধূর্জটি! সংহার-শিঙ্গা বাজাও তোমার!
স্বর্গমর্ত্য রসাতল হোক একাকার।

১৮

প্রভঞ্জন ভীম-বল!
খুলে দাও, বায়ুদল!
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাক ভারতের বেশ।
ভারতসাগর রুষি
উগরো বালুকারাশি
মরুভূমি হয়ে যাক সমস্ত প্রদেশ।

১৯

বলিতে নারিল আর প্রকৃতি-সুন্দরী।
ধ্বনিয়া আকাশভূমি,
গরজিল প্রতিধ্বনি,
কাঁপিয়া উঠিল বেগে ক্ষুব্ধ হিমগিরি।

২০

জাহ্নবী উন্মত্তপারা,
নির্ঝর চঞ্চল ধারা,
বহিল প্রচণ্ডবেগে ভেদিয়া প্রস্তর।
মানস সরস-'পরে,
পদ্ম কাঁপে থরে থরে
দুলিল প্রকৃতি সতী আসন-উপর।

২১

সুচঞ্চল সমীরণে,
উড়াইল মেঘগণে,
সুতীব্র রবির ছটা হল বিকীরিত
আবার প্রকৃতি সতী আরম্ভিল গীত।

২২

'দেখিয়াছি তোর আমি সেই এক বেশ,
অজ্ঞাত আছিল যবে মানবনয়নে।
নিবিড় অরণ্য ছিল এ বিস্তৃত দেশ,

বিজন ছায়ায় নিদ্রা যেত পশুগণে,
কুমারী অবস্থা তোর সে কি পড়ে মনে?
সম্পদ বিপদ সুখ,
হরষ বিষাদ দুখ,
কিছুই না জানিতিস্ সে কি পড়ে মনে?
সে-এক সুখের দিন হয়ে গেছে শেষ,
যখন মানবগণ,
করে নাই নিরীক্ষণ,
তোর সেই সুদুর্গম অরণ্যপ্রদেশ।
না বিতরি গন্ধ হায়,
মানবের নাসিকায়
বিজনে অরণ্যফুল, যাইত শুকায়ে
তপনকিরণ-তপ্ত মধ্যাহ্নের বায়ে।
সে-এক সুখের দিন হয়ে গেছে শেষ।

২৩

সেইরূপ রহিল না কেন চিরকাল!
না দেখি মনুষ্যমুখ
না জানিয়া দুঃখসুখ
না করিয়া অনুভব মান অপমান।
অজ্ঞান শিশুর মতো
আনন্দে দিবস যেত,
সংসারের গোলমালে থাকিয়া অজ্ঞান।

তা হলে তো ঘটিত না এ-সব জঞ্জাল!
সেইরূপ রহিলি না কেন চিরকাল?
সৌভাগ্যে হানিল বাজ,
তা হলে তো তোরে আজ
অনাথা ভিখারীবেশে কাঁদিতে হত না?
পদাঘাতে উপহাসে,
তা হলে তো কারাবাসে
সহিতে হত না শেষে এ ঘোর যাতনা।

২৪

অরণ্যেতে নিরিবিলি,
সে যে তুই ভালো ছিলি,
কী কুক্ষণে করিলি রে সুখের কামনা।
দেখি মরীচিকা হায়!
আনন্দে বিহ্বলপ্রায়!
না জানি নৈরাশ্য শেষে করিবে তাড়না।

২৫

আইল হিন্দুরা শেষে,
তোর এ বিজন দেশে,
নগরেতে পরিণত হল তোর বন।
হরিষে প্রফুল্লমুখে,
হাসিলি সরলা! সুখে,
আশার দর্পণে মুখ দেখিলি আপন।

২৬

ঋষিগণ সমস্বরে
অই সামগান করে
চমকি উঠিছে আহা! হিমালয় গিরি।
ওদিকে ধনুর ধ্বনি,
কাঁপায় অরণ্যভূমি
নিদ্রাগত মৃগগণে চমকিত করি।
সরস্বতী-নদীকূলে,
কবিরা হৃদয় খুলে
গাইছে হরষে আহা সুমধুর গীত।
বীণাপাণি কুতূহলে,
মানসের শতদলে
গাহেন সরসী বারি করি উথলিত।

২৭

সেই এক অভিনব
মধুর সৌন্দর্য তব,
আজিও অঙ্কিত তাহা রয়েছে মানসে।
আঁধার সাগরতলে
একটি রতন জ্বলে
একটি নক্ষত্র শোভে মেঘান্ধ আকাশে।
সুবিস্তৃত অন্ধকূপে,
একটি প্রদীপ-রূপে
জ্বলিতিস তুই আহা,
নাহি পড়ে মনে?
কে নিভালে সেই ভাতি ভারতে আঁধার রাতি
হাতড়ি বেড়ায় আজি সেই হিন্দুগণে।
সেই অমানিশা তোর,
আর কি হবে না ভোর
কাঁদিবি কি চিরকাল ঘোর অন্ধকূপে।
অনন্ত কালের মতো,
সুখসূর্য অস্তগত,
ভাগ্য কি অনন্ত কাল রবে এই রূপে।

তোর ভাগ্যচক্র শেষে,
থামিল কি হেথা এসে,
বিধাতার নিয়মের করি ব্যভিচার
আয় রে প্রলয় ঝড়,
গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ কর
ধূর্জটি! সংহার-শিঙ্গা বাজাও তোমার।
প্রভঞ্জন ভীমবল,
খুলে দেও বায়ুদল,
ছিন্ন ভিন্ন করে দিক ভারতের বেশ।
ভারতসাগর রুষি,
উগরো বালুকারাশি
মরুভূমি হয়ে যাক সমস্ত প্রদেশ।'

প্রতিবিম্ব
বৈশাখ ১২৮২

'জ্বল জ্বল চিতা! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ'

জ্বল্ জ্বল্ চিতা! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
পরান সঁপিবে বিধবা-বালা।
জ্বলুক্ জ্বলুক্ চিতার আগুন,
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা॥
শোন্ রে যবন!— শোন্ রে তোরা,
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে,
সাক্ষী র'লেন দেবতা তার
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে॥
ওই যে সবাই পশিল চিতায়,
একে একে একে অনলশিখায়,
আমরাও আয় আছি যে কজন,
পৃথিবীর কাছে বিদায় লই।
সতীত্ব রাখিব করি প্রাণপণ,
চিতানলে আজ সঁপিব জীবন—
ওই যবনের শোন্ কোলাহল,
আয় লো চিতায় আয় লো সই!
জ্বল্ জ্বল্ চিতা! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
অনলে আহুতি দিব এ প্রাণ।
জ্বলুক্ জ্বলুক্ চিতার আগুন,
পশিব চিতায় রাখিতে মান।
দেখ্ রে যবন! দেখ্ রে তোরা!
[illegible]

জ্বলন্ত অনলে হইব ছাই,
তবু না হইব তোদের দাসী॥
আয় আয় বোন! আয় সখি আয়!
জ্বলন্ত অনলে সঁপিবারে কায়,
সতীত্ব লুকাতে জ্বলন্ত চিতায়,
জ্বলন্ত চিতায় সঁপিতে প্রাণ।
দেখ্‌ রে জগৎ, মেলিয়ে নয়ন,
দেখ্‌ রে চন্দ্রমা দেখ্‌ রে গগন!
স্বর্গ হতে সব দেখ্‌ দেবগণ,
জলদ-অক্ষরে রাখ্‌ গো লিখে।
স্পর্ধিত যবন, তোরাও দেখ্‌ রে,
সতীত্ব-রতন, করিতে রক্ষণ,
রাজপুত সতী আজিকে কেমন,
সঁপিছে পরান অনল-শিখে॥

[নভেম্বর ১৮৭৫]

প্রলাপ ১

১

গিরির উরসে নবীন নির্ঝর,
ছুটে ছুটে অই হতেছে সারা।
তলে তলে তলে নেচে নেচে চলে,
পাগল তটিনী পাগলপারা।

২

হৃদি প্রাণ খুলে ফুলে ফুলে ফুলে,
মলয় কত কী করিছে গান।
হেতা হোতা ছুটি ফুল-বাস লুটি,
হেসে হেসে হেসে আকুল প্রাণ।

৩

কামিনী পাপড়ি ছিঁড়ি ছিঁড়ি ছিঁড়ি,
উড়িয়ে উড়িয়ে ছিঁড়িয়ে ফেলে।
চুপি চুপি গিয়ে ঠেলে ঠেলে দিয়ে,
জাগায়ে তুলিছে তটিনীজলে।

৪

ফিরে ফিরে ফিরে ধীরে ধীরে ধীরে,
হরষে মাতিয়া, খুলিয়া বুক।
নলিনীর কোলে পড়ে ঢ'লে ঢ'লে,
নলিনী সলিলে লুকায় মুখ।

৫

হাসিয়া হাসিয়া কুসুমে আসিয়া,
ঠেলিয়া উড়ায় মধুপ দলে।
গুন্‌ গুন্‌ গুন্‌ রাগিয়া আগুন,
অভিশাপ দিয়া কত কী বলে।

৬

তপন কিরণ— সোনার ছটায়,
লুটায় খেলায় নদীর কোলে।
ভাসি ভাসি ভাসি স্বর্ণ ফুলরাশি
হাসি হাসি হাসি সলিলে দোলে।

৭

প্রজাপতিগুলি পাখা দুটি তুলি
উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায় দলে।
প্রসারিয়া ডানা করিতেছে মানা
কিরণে পশিতে কুসুমদলে।

৮

মাতিয়াছে গানে সুললিত তানে
পাপিয়া ছড়ায় সুধার ধার।
দিকে দিকে ছুটে বন জাগি উঠে
কোকিল উতর দিতেছে তার।

৯

তুই কে লো বালা। বন করি আলা,
পাপিয়ার সাথে মিশায়ে তান।
হৃদয়ে হৃদয়ে লহরী তুলিয়া,
অমৃত ললিত করিস গান।

১০

স্বর্গ ছায় গানে বিমানে বিমানে
ছুটিয়া বেড়ায় মধুর তান।
মধুর নিশায় ছাইয়া পরান,
হৃদয় ছাপিয়া উঠেছে গান।

১১

নীরব প্রকৃতি নীরব ধরা।
নীরবে তটিনী বহিয়া যায়।
তরুণী ছড়ায় অমৃতধারা,
ভূধর, কানন, জগত ছায়।

১২

মাতাল করিয়া হৃদয় প্রাণ,
মাতাল করিয়া পাতাল ধরা।
হৃদয়ের তল অমৃতে ডুবায়ে,
ছড়ায় তরুণী অমৃতধারা।

১৩

কে লো তুই বালা! বন করি আলা,
ঘুমাইছে বীণা কোলের 'পরে।
জ্যোতির্ময়ী ছায়া স্বরগীয় মায়া,
ঢল ঢল ঢল প্রমোদ-ভরে।

১৪

বিভোর নয়নে বিভোর পরানে—
চারি দিক্ পানে চাহিস্ হেসে!
হাসি উঠে দিক্! ডাকি উঠে পিক্!
নদী ঢলে পড়ে পুলিন দেশে!!

১৫

চারি দিক্ চেয়ে কে লো তুই মেয়ে,
হাসি রাশি রাশি ছড়িয়ে দিস্?
আঁধার ছুটিয়া জোছনা ফুটিয়া
কিরণে উজলি উঠিছে দিশ্!

১৬

কমলে কমলে এ ফুলে ও ফুলে,
ছুটিয়া খেলিয়া বেড়াস্ বালা!
ছুটে ছুটে ছুটে খেলায় যেমন
মেঘে মেঘে মেঘে দামিনী-মালা।

১৭

নয়নে করুণা অধরে হাসি,
উছলি উছলি পড়িছে ছাপি।
মাথায় গলায় কুসুমরাশি
বাম করতলে কপোল চাপি।

১৮

এতকাল তোরে দেখিনু সেবিনু—
হৃদয়-আসনে দেবতা বলি।
নয়নে নয়নে, পরানে পরানে,
হৃদয়ে হৃদয়ে রাখিনু তুলি।

১৯

তবুও তবুও পূরিল না আশ,
তবুও হৃদয় রহেছে খালি।
তোরে প্রাণ মন করিয়া অর্পণ
ভিখারি হইয়া যাইব চলি।

২০

আয় কল্পনা মিলিয়া দুজনা,
ভূধরে কাননে বেড়াব ছুটি।
সরসী হইতে তুলিয়া কমল
লতিকা হইতে কুসুম লুটি।

২১

দেখিব উষার পুরব গগনে,
মেঘের কোলেতে সোনার ছটা।
তুষার-দর্পণে দেখিছে আনন
সাঁজের লোহিত জলদ-ঘটা।

২২

কনক-সোপানে উঠিছে তপন
ধীরে ধীরে ধীরে উদয়াচলে।
ছড়িয়ে ছড়িয়ে সোনার বরন,
তুষারে শিশিরে নদীর জলে।

২৩

শিলার আসনে দেখিব বসিয়ে,
প্রদোষে যখন দেবের বালা
পাহাড়ে লুকায়ে সোনার গোলা
আঁখি মেলি মেলি করিবে খেলা।

২৪

ঝর ঝর ঝর নদী যায় চলে,
ঝুরু ঝুরু ঝুরু বহিছে বায়।
চপল নিঝর ঠেলিয়া পাথর
ছুটিয়া— নাচিয়া— বহিয়া যায়।

২৫

বসিব দুজনে— গাইব দুজনে,
হৃদয় খুলিয়া, হৃদয়ব্যথা;
তটিনী শুনিবে, ভূধর শুনিবে
জগত শুনিবে সে-সব কথা।

২৬

যেথায় যাইবি তুই কলপনা,
আমিও সেথায় যাইব চলি।
শ্মশানে, শ্মশানে— মরু বালুকায়,
মরীচিকা যথা বেড়ায় ছলি।

২৭

আয় কলপনা আয় লো দুজনা,
আকাশে আকাশে বেড়াই ছুটি।
বাতাসে বাতাসে আকাশে আকাশে
নবীন সুনীল নীরদে উঠি।

২৮

বাজাইব বীণা আকাশ ভরিয়া,
প্রমোদের গান হরষে গাহি,
যাইব দুজনে উড়িয়া উড়িয়া,
অবাক জগত রহিবে চাহি!

২৯

জলধররাশি উঠিবে কাঁপিয়া,
নব নীলিমায় আকাশ ছেয়ে।
যাইব দুজনে উড়িয়া উড়িয়া,
দেবতারা সব রহিবে চেয়ে।

৩০

সুর-সুরধুনী আলোকময়ী,
উজলি কনক বালুকারাশি।
আলোকে আলোকে লহরী তুলিয়া,
বহিয়া বহিয়া যাইছে হাসি।

৩১

প্রদোষ তারায় বসিয়া বসিয়া,
দেখিব তাহার লহরীলীলা।
সোনার বালুকা করি রাশ রাশ,
সুর-বালিকারা করিবে খেলা।

৩২

আকাশ হইতে দেখিব পৃথিবী।
অসীম গগনে কোথায় পড়ে।
কোথায় একটি বালুকার রেণু
বাতাসে আকাশে আকাশে ঘোরে।

৩৩

কোথায় ভূধর কোথায় শিখর
অসীম সাগর কোথায় পড়ে।
কোথায় একটি বালুকার রেণু,
বাতাসে আকাশে আকাশে ঘোরে।

৩৪

আয় কল্পনা আয় লো দুজনা,
এক সাথে সাথে বেড়াব মাতি।
পৃথিবী ফিরিয়া জগত ফিরিয়া,
হরষে পুলকে দিবস রাতি।

জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব
অগ্রহায়ণ ১২৮২

প্রলাপ ২

ঢাল্! ঢাল্ চাঁদ! আরো আরো ঢাল্!
সুনীল আকাশে রজতধারা!
হৃদয় আজিকে উঠেছে মাতিয়া
পরান হয়েছে পাগলপারা!
গাইব রে আজ হৃদয় খুলিয়া
জাগিয়া উঠিবে নীরব রাতি!
দেখাব জগতে হৃদয় খুলিয়া
পরান আজিকে উঠেছে মাতি!
হাসুক পৃথিবী, হাসুক জগৎ,
হাসুক হাসুক চাঁদিমা তারা!
হৃদয় খুলিয়া করিব রে গান
হৃদয় হয়েছে পাগলপারা!
আধ ফুটো-ফুটো গোলাপ-কলিকা
ঘাড়খানি আহা করিয়া হেঁট
মলয় পবনে লাজুক বালিকা
সউরভ রাশি দিতেছে ভেট।
আয় লো প্রমদা! আয় লো হেথায়
মানস আকাশে চাঁদের ধারা!
গোলাপ তুলিয়া পর্ লো মাথায়
সাঁঝের গগনে ফুটিবে তারা।
হেসে ঢল্ ঢল্ পূর্ণ শতদল
ছড়িয়ে ছড়িয়ে সুরভিরাশি

নয়নে নয়নে, অধরে অধরে
জ্যোছনা উছলি পড়িছে হাসি!
চুল হতে ফুল খুলিয়ে খুলিয়ে
ঝরিয়ে ঝরিয়ে পড়িছে ভূমে!
খসিয়া খসিয়া পড়িছে আঁচল
কোলের উপর কমল থুয়ে!
আয় লো তরুণী! আয় লো হেথায়!
সেতার ওই যে লুটায় ভূমে
বাজা লো ললনে! বাজা একবার
হৃদয় ভরিয়ে মধুর ঘুমে!
নাচিয়া নাচিয়া ছুটিবে আঙুল!
নাচিয়া নাচিয়া ছুটিবে তান!
অবাক্ হইয়া মুখপানে তোর
চাহিয়া রহিব বিভল প্রাণ!
গলার উপরে সঁপি হাতখানি
বুকের উপরে রাখিয়া মুখ
আদরে অস্ফুটে কত কী যে কথা
কহিবি পরানে ঢালিয়া সুখ!
ওই রে আমার সুকুমার ফুল
বাতাসে বাতাসে পড়িছে দুলে
হৃদয়েতে তোরে রাখিব লুকায়ে
নয়নে নয়নে রাখিব তুলে।
আকাশ হইতে খুঁজিবে তপন
তারকা খুঁজিবে আকাশ ছেয়ে!
খুঁজিয়া বেড়াবে দিক্‌বধূগণ
কোথায় লুকাল মোহিনী মেয়ে?
আয় লো ললনে! আয় লো আবার
সেতারে জাগায়ে দে-না লো বালা!
দুলায়ে দুলায়ে ঘাড়টি নামায়ে
কপোলেতে চুল করিবে খেলা।
কী-যে ও মুরতি শিশুর মতন!
আধ ফুটো-ফুটো ফুলের কলি!
নীরব নয়নে কী-যে কথা কয়
এ জনমে আর যাব না ভুলি!
কী-যে ঘুমঘোরে ছায় প্রাণমন
লাজে ভরা ওই মধুর হাসি!
পাগলিনী বালা গলাটি কেমন
ধরিস্ জড়িয়ে ছুটিয়ে আসি!
ভুলেছি পৃথিবী ভুলেছি জগৎ
ভুলেছি, সকল বিষয় মানে!

হেসেছে পৃথিবী— হেসেছে জগৎ
কটাক্ষ করিলি কাহারো পানে!
আয়! আয় বালা! তোরে সাথে লয়ে
পৃথিবী ছাড়িয়া যাই লো চলে!
চাঁদের কিরণে আকাশে আকাশে
খেলায়ে বেড়াব মেঘের কোলে!
চল্ যাই মোরা আরেক জগতে
দুজনে কেবল বেড়াব মাতি
কাননে কাননে, খেলাব দুজনে
বনদেবীকোলে যাপিব রাতি!
যেখানে কাননে শুকায় না ফুল!
সুরভি-পূরিত কুসুমকলি!
মধুর প্রেমেরে দোষে না যেথায়
সেথায় দুজনে যাইব চলি!

জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব
ফাল্গুন ১২৮২

প্রলাপ ৩

আয় লো প্রমদা! নিঠুর ললনে
বার বার বল্ কী আর বলি!
মরমের তলে লেগেছে আঘাত
হৃদয় পরান উঠেছে জ্বলি!
আর বলিব না এই শেষবার
এই শেষবার বলিয়া লই
মরমের তলে জ্বলেছে আগুন
হৃদয় ভাঙিয়া গিয়াছে সই!
পাষাণে গঠিত সুকুমার ফুল!
হুতাশনময়ী দামিনী বালা!
অবারিত করি মরমের তল
কহিব তোরে লো মরম জ্বালা!
কতবার তোরে কহেছি ললনে!
দেখায়েছি খুলে হৃদয় প্রাণ!
মরমের ব্যথা, হৃদয়ের কথা,
সে-সব কথায় দিস্ নি কান!
কতবার সখি বিজনে বিজনে
শুনায়েছি তোরে প্রেমের গান,
প্রেমের আলাপ— প্রেমের প্রলাপ
সে-সব প্রলাপে দিস্ নি কান!

কতবার সখি! নয়নের জল
করেছি বর্ষণ চরণতলে!
প্রতিশোধ তুই দিস্ নিকো তার
শুধু এক ফোঁটা নয়নজলে!
শুধা ওলো বালা! নিশার আঁধারে
শুধা ওলো সখি! আমার রেতে
আঁখিজল কত করেছে গোপন
মর্ত্ত্য পৃথিবীর নয়ন হতে!
শুধা ওলো বালা নিশার বাতাসে
লুটিতে আসিয়া ফুলের বাস
হৃদয়ে বহন করেছে কিনা সে—
নিরাশ প্রেমীর মরম শ্বাস!
সাক্ষী আছ ওগো তারকা চন্দ্রমা!
কেঁদেছি যখন মরম শোকে—
হেসেছে পৃথিবী, হেসেছে জগৎ
কটাক্ষ করিয়া হেসেছে লোকে!
সহেছি সে-সব তোর তরে সখি!
মরমে মরমে জ্বলন্ত জ্বালা!
তুচ্ছ করিবারে পৃথিবী জগতে
তোমারি তরে লো শিখেছি বালা!
মানুষের হাসি তীব্র বিষমাখা
হৃদয় শোণিত করেছে ক্ষয়।
তোমারি তরে লো সহেছি সে-সব
ঘৃণা উপহাস করেছি জয়!
কিনিতে হৃদয় দিয়েছি হৃদয়
নিরাশ হইয়া এসেছি ফিরে;
অশ্রু মাগিবারে দিয়া অশ্রুজল
উপেক্ষিত হয়ে এয়েছি ফিরে।
কিছুই চাহি নি পৃথিবীর কাছে—
প্রেম চেয়েছিলু ব্যাকুল মনে।
সে বাসনা যবে হল না পূরণ
চলিয়া যাইব বিজন বনে!
তোর কাছে বালা এই শেষবার
ফেলিল সলিল ব্যাকুল হিয়া;
ভিখারি হইয়া যাইব লো চলে
প্রেমের আশায় বিদায় দিয়া।
সেদিন যখন ধন, যশ, মান,
অরির চরণে দিলাম ঢালি
সেইদিন আমি ভেবেছিলু মনে
উদাস হইয়া যাইব চলি।

তখনো হায় রে একটি বাঁধনে
আবদ্ধ আছিল পরান দেহ।
সে দৃঢ় বাঁধন ভেবেছিনু মনে
পারিবে না আহা ছিঁড়িতে কেহ!
আজ ছিঁড়িয়াছে, আজ ভাঙিয়াছে,
আজ সে স্বপন গিয়াছে চলি।
প্রেম ব্রত আজ করি উদ্‌যাপন
ভিখারি হইয়া যাইব চলি!
পাষাণের পটে ও মুরতিখানি
আঁকিয়া হৃদয়ে রেখেছি তুলি
গরবিনি! তোর ওই মুখখানি
এ জনমে আর যাব না ভুলি!
মুছিতে নারিব এ জনমে আর
নয়ন হইতে নয়নবারি
যতকাল ওই ছবিখানি তোর
হৃদয়ে রহিবে হৃদয় ভরি।
কী করিব বালা মরণের জলে
ওই ছবিখানি মুছিতে হবে!
পৃথিবীর লীলা ফুরাইবে আজ,
আজিকে ছাড়িয়া যাইব ভবে!
এ ভাঙা হৃদয় কত সবে আর!
জীর্ণ প্রাণ কত সহিবে জ্বালা!
মরণের জল ঢালিয়া অনলে
হৃদয় পরান জুড়াল বালা!
তোরে সখি এত বাসিতাম ভালো
খুলিয়া দেছিনু হৃদয়তল
সে-সব ভাবিয়া ফেলিবি না বালা
শুধু এক ফোঁটা নয়ন জল?
আকাশ হইতে দেখি যদি বালা
নিঠুর ললনে! আমার তরে
এক ফোঁটা আহা নয়নের জল
ফেলিস্‌ কখনো বিষাদভরে!
সেই নেত্রজলে— এক বিন্দু জলে
নিভায়ে ফেলিব হৃদয় জ্বালা!
প্রদোষে বসিয়া প্রদোষ তারায়
প্রেম গান সুখে করিব বালা!

জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব
বৈশাখ ১২৮৩

দিল্লি দরবার

দেখিছ না অয়ি ভারত-সাগর, অয়ি গো হিমাদ্রি দেখিছ চেয়ে,
প্রলয়-কালের নিবিড় আঁধার, ভারতের ভাল ফেলেছে ছেয়ে।
অনন্ত সমুদ্র তোমারই বুকে, সমুচ্চ হিমাদ্রি তোমারি সম্মুখে,
নিবিড় আঁধারে, এ ঘোর দুর্দিনে, ভারত কাঁপিছে হরষ-রবে!
শুনিতেছি নাকি শত কোটি দাস, মুছি অশ্রুজল, নিবারিয়া শ্বাস,
সোনার শৃঙ্খল পরিতে গলায় হরষে মাতিয়া উঠেছে সবে?
শুধাই তোমারে হিমালয়-গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন?
তুমি শুনিয়াছ হে গিরি-অমর, অর্জুনের ঘোর কোদণ্ডের স্বর,
তুমি দেখিয়াছ সুবর্ণ আসনে, যুধিষ্ঠির-রাজা ভারত শাসনে,
তুমি শুনিয়াছ সরস্বতী-কূলে, আর্য-কবি গায় মন প্রাণ খুলে,
তোমারে শুধাই হিমালয়-গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন?
তুমি শুনিতেছ ওগো হিমালয়, ভারত গাইছে ব্রিটিশের জয়,
বিষণ্ণ নয়নে দেখিতেছ তুমি— কোথাকার এক শূন্য মরুভূমি—
সেথা হতে আসি ভারত-আসন লয়েছে কাড়িয়া, করিছে শাসন,
তোমারে শুধাই হিমালয়-গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন?
তবে এই-সব দাসের দাসেরা, কিসের হরষে গাইছে গান?
পৃথিবী কাঁপায়ে অযুত উচ্ছ্বাসে কিসের তরে গো উঠায় তান?
কিসের তরে গো ভারতের আজি, সহস্র হৃদয় উঠেছে বাজি?
যত দিন বিষ করিয়াছে পান, কিছুতে জাগে নি এ মহাশ্মশান,
বন্ধন শৃঙ্খলে করিতে সম্মান
ভারত জাগিয়া উঠেছে আজি?
কুমারিকা হতে হিমালয়-গিরি
এক তারে কভু ছিল না গাঁথা,
আজিকে একটি চরণ-আঘাতে, সমস্ত ভারত তুলেছে মাথা!
এসেছিল যবে মহম্মদ ঘোরি, স্বর্গ রসাতল জয়নাদে ভরি
রোপিতে ভারতে বিজয়ধ্বজা,
তখনো একত্রে ভারত জাগে নি, তখনো একত্রে ভারত মেলে নি,
আজ জাগিয়াছে, আজ মিলিয়াছে—
বন্ধনশৃঙ্খলে করিতে পূজা!
ব্রিটিশ-রাজের মহিমা গাহিয়া
ভূপগণ ওই আসিছে ধাইয়া
রতনে রতনে মুকুট ছাইয়া ব্রিটিশ-চরণে লোটাতে শির—
ওই আসিতেছে জয়পুররাজ, ওই যোধপুর আসিতেছে আজ
ছাড়ি অভিমান তেয়াগিয়া লাজ, আসিছে ছুটিয়া অযুত বীর!
হা রে হতভাগ্য ভারতভূমি,
কণ্ঠে এই ঘোর কলঙ্কের হার
পরিবারে আজি করি অলংকার
গৌরবে মাতিয়া উঠেছে সবে?

তাই কাঁপিতেছে তোর বক্ষ আজি
ব্রিটিশ-রাজের বিজয়রবে?
ব্রিটিশ-বিজয় করিয়া ঘোষণা, যে গায় গাক্ আমরা গাব না
আমরা গাব না হরষ গান,
এসো গো আমরা যে ক'জন আছি, আমরা ধরিব আরেক তান।

১৮৭৭

ভারতী

শুধাই অয়ি গো ভারতী তোমায়
তোমার ও বীণা নীরব কেন?
কবির বিজন মরমে লুকায়ে
নীরবে কেন গো কাঁদিছ হেন?
অযতনে, আহা, সাধের বীণাটি
ঘুমায়ে রয়েছে কোলের কাছে,
অযতনে, আহা, এলোথেলো চুল
এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে আছে।
কেন গো আজিকে এ-ভাব তোমার
কমলবাসিনী ভারতী রানী—
মলিন মলিন বসন ভূষণ
মলিন বদনে নাহিকো বাণী।
তবে কি জননি অমৃতভাষিণি
তোমার ও বীণা নীরব হবে?
ভারতের এই গগন ভরিয়া
ও বীণা আর না বাজিবে তবে?
দেখো তবে মাতা দেখো গো চাহিয়া
তোমার ভারত শ্মশান-পারা,
ঘুমায়ে দেখিছে সুখের স্বপন
নরনারী সব চেতনহারা।
যাহা-কিছু ছিল সকলি গিয়াছে,
সে-দিনের আর কিছুই নাই,
বিশাল ভারত গভীর নীরব,
গভীর আঁধার যে-দিকে চাই।
তোমারো কি বীণা ভারতী জননি,
তোমারো কি বীণা নীরব হবে?
ভারতের এই গগন ভরিয়া
ও-বীণা আর না বাজিবে তবে?
না না গো, ভারতী, নিবেদি চরণে
কোলে তুলে লও মোহিনী বীণা।

বিলাপের ধ্বনি উঠাও জননি,
　　দেখিব ভারত জাগিবে কি না।
অযুত অযুত ভারতনিবাসী
　　কাঁদিয়া উঠিবে দারুণ শোকে,
সে রোদনধ্বনি পৃথিবী ভরিয়া
　　উঠিবে, জননি, দেবতালোকে।
তা যদি না হয় তা হলে, ভারতি,
　　তুলিয়া লও গো বিজয়ভেরী,
বাজাও জলদগভীর গরজে
　　অসীম আকাশ ধ্বনিত করি।
গাও গো হুতাশ-পূরিত গান,
　　জ্বলিয়া উঠুক অযুত প্রাণ,
উথলি উঠুক ভারত-জলধি—
　　কাঁপিয়া উঠুক অচলা ধরা।
দেখিব তখন প্রতিভাহীনা
　　এ ভারতভূমি জাগিবে কি না,
ঢাকিয়া বয়ান আছে যে শয়ান
　　শরমে হইয়া মরমে-মরা!
এই ভারতের আসনে বসিয়া
　　তুমিই ভারতী গেয়েছ গান,
ছেয়েছে ধরার আঁধার গগন
　　তোমারি বীণার মোহন তান।
আজও তুমি, মাতা, বীণাটি লইয়া
　　মরম বিঁধিয়া গাও গো গান—
হীনবল সেও হইবে সবল,
　　মৃতদেহ সেও পাইবে প্রাণ।

ভারতী
শ্রাবণ ১২৮৪

হিমালয়

যেখানে জ্বলিছে সূর্য, 　　উঠিছে সহস্র তারা,
　　প্রজ্বলিত ধূমকেতু বেড়াইছে ছুটিয়া।
অসংখ্য জগৎযন্ত্র, 　　ঘুরিছে নিয়মচক্রে
　　অসংখ্য উজ্জ্বল গ্রহ রহিয়াছে ফুটিয়া।
গম্ভীর অচল তুমি, 　　দাঁড়ায়ে দিগন্ত ব্যাপি,
　　সেই আকাশের মাঝে শুভ্র শির তুলিয়া।
নির্ঝর ছুটিছে বক্ষে, 　　জলদ ভ্রমিছে শৃঙ্গে,
　　চরণে লুটিছে নদী শিলারাশি ঠেলিয়া।
তোমার বিশাল ক্রোড়ে 　　লভিতে বিশ্রাম-সুখ
　　ক্ষুদ্র নর আমি এই আসিয়াছি ছুটিয়া।

পৃথিবীর কোলাহল, পারি না সহিতে আর,
পৃথিবীর সুখ দুখ গেছে সব মিটিয়া।
সারাদিন, সারারাত, সমুচ্চ শিখরে বসি,
চন্দ্র-সূর্য-গ্রহময় শূন্যপানে চাহিয়া।
জীবনের সন্ধ্যাকাল কাটাইব ধীরে ধীরে,
নিরালয় মরমের গানগুলি গাহিয়া।
গভীর নীরব গিরি, জোছনা ঢালিবে চন্দ্র,
দূরশৈলমালাগুলি চিত্রসম শোভিবে।
ধীরে ধরে ঝুরু ঝুরু, কাঁপিবেক গাছপালা
একে একে ছোটো ছোটো তারাগুলি নিভিবে।
তখন বিজনে বসি, নীরবে নয়ন মুদি,
স্মৃতির বিষণ্ণ ছবি আঁকিব এ মানসে।
শুনিব সুদূর শৈলে, একতানে নির্ঝরিণী,
ঝর ঝর ঝর ঝর মৃদুধ্বনি বরষে।
ক্রমে ক্রমে আসিবেক জীবনের শেষ দিন,
তুষার শয্যার 'পরে রহিব গো শুইয়া।
মর মর মর মর দুলিবে গাছের পাতা
মাথার উপরে হুহু— বায়ু যাবে বহিয়া।
চোখের সামনে ক্রমে, নিভিবে রবির আলো
বনগিরি নির্ঝরিণী অন্ধকারে মিশিবে।
তটিনীর মৃদুধ্বনি, নিঝরের ঝর ঝর
ক্রমে মৃদুতর হয়ে কানে গিয়া পশিবে।
এতকাল যার বুকে, কাটিয়া গিয়াছে দিন,
দেখিতে সে ধরাতল শেষ বার চাহিব।
সারাদিন কেঁদে কেঁদে— ক্লান্ত শিশুটির মতো
অনন্তের কোলে গিয়া ঘুমাইয়া পড়িব।
সে ঘুম ভাঙিবে যবে, নূতন জীবন ল'য়ে,
নূতন প্রেমের রাজ্যে পুন আঁখি মেলিব।
যত কিছু পৃথিবীর দুখ, জ্বালা, কোলাহল,
ডুবায়ে বিস্মৃতি-জলে মুছে সব ফেলিব।
ওই যে অসংখ্য তারা, ব্যাপিয়া অনন্ত শূন্য
নীরবে পৃথিবী-পানে রহিয়াছে চাহিয়া।
ওই জগতের মাঝে, দাঁড়াইব এক দিন,
হৃদয় বিস্ময়-গান উঠিবেক গাহিয়া।
রবি শশি গ্রহ তারা, ধূমকেতু শত শত
আঁধার আকাশ ঘেরি নিঃশবদে ছুটিছে।
বিস্ময়ে শুনিব ধীরে, মহাস্তব্ধ প্রকৃতির
অভ্যন্তর হতে এক গীতধ্বনি উঠিছে।
গভীর আনন্দ-ভরে, বিস্ফারিত হবে মন
হৃদয়ের ক্ষুদ্র ভাব যাবে সব ছিঁড়িয়া।

তখন অনন্ত কাল, অনন্ত জগত-মাঝে
ভুঞ্জিব অনন্ত প্রেম মনঃপ্রাণ ভরিয়া।

ভারতী
ভাদ্র ১২৮৪

আগমনী

সুধীরে নিশার আঁধার ভেদিয়া
ফুটিল প্রভাততারা।
হেথা হোথা হতে পাখিরা গাহিল
ঢালিয়া সুধার ধারা।
মৃদুল প্রভাতসমীর পরশে
কমল নয়ন খুলিল হরষে,
হিমালয় শিরে অমল আভায়
শোভিল ধবল তুষারজটা।
খুলি গেল ধীরে পুরবদ্বার,
ঝরিল কনককিরণধার,
শিখরে শিখরে জ্বলিয়া উঠিল,
রবির বিমল কিরণছটা।
গিরিগ্রাম আজি কিসের তরে,
উঠেছে নাচিয়া হরষভরে,
অচল গিরিও হয়েছে যেমন
অধীর পাগল-পারা।
তটিনী চলেছে নাচিয়া ছুটিয়া,
কলরব উঠে আকাশে ফুটিয়া,
ঝর ঝর ঝর করিয়া ধ্বনি
ঝরিছে নিঝরধারা।
তুলিয়া কুসুম গাঁথিয়া মালা,
চলিয়াছে গিরিবাসিনী বালা,
অধর ভরিয়া সুখের হাসিতে
মাতিয়া সুখের গানে।
মুখে একটিও নাহিকো বাণী
শবদচকিতা মেনকারানী
তৃষিত নয়নে আকুল হৃদয়ে,
চাহিয়া পথের পানে।
আজ মেনকার আদরিণী উমা
আসিবে বরষ-পরে।
তাইতে আজিকে হরষের ধ্বনি
উঠিয়াছে ঘরে ঘরে।
অধীর হৃদয়ে রানী আসে যায়,

কভু বা প্রাসাদশিখরে দাঁড়ায়,
কভু বসে ওঠে, বাহিরেতে ছোটে
এখনো উমা মা এল না কেন?
হাসি হাসি মুখে পুরবাসীগণে
অধীরে হাসিয়া ভূধরভবনে,
'কই উমা কই' বলে 'উমা কই',
তিলেক বেয়াজ সহে না যেন!
বরষের পরে আসিবেন উমা
রানীর নয়নতারা,
ছেলেবেলাকার সহচরী যত
হরষে পাগল-পারা।
ভাবিছে সকলে আজিকে উমায়
দেখিবে নয়ন ভ'রে,
আজিকে আবার সাজাব তাহায়
বালিকা উমাটি ক'রে।
তেমনি মৃণালবলয়-যুগলে,
তেমনি চিকন-চিকন বাকলে,
তেমনি করিয়া পরাব গলায়
বনফুল তুলি গাঁথিয়া মালা।
তেমনি করিয়া পরায়ে কেশ
তেমনি করিয়া এলায়ে কেশ,
জননীর কাছে বলিব গিয়ে
'এই নে মা তোর তাপসী বালা'।
লাজ-হাসি-মাখা মেয়ের মুখ
হেরি উথলিবে মায়ের সুখ,
হরষে জননী নয়নের জলে
চুমিবে উমার সে মুখখানি।
হরষে ভূধর অধীর-পারা
হরষে ছুটিবে তটিনীধারা,
হরষে নিঝর উঠিবে উছসি,
উঠিবে উছসি মেনকারানী।
কোথা তবে তোরা পুরবাসী মেয়ে
যেথা যে আছিস আয় তোরা ধেয়ে
বনে বনে বনে ফিরিবি বালা,
তুলিবি কুসুম, গাঁথিবি মালা,
পরাবি উমার বিনোদ-গলে।
তারকা-খচিত গগন-মাঝে
শারদ চাঁদিমা যেমন সাজে
তেমনি শারদা অবনী শশী
শোভিবে কেমন অবনীতলে।

ওই বুঝি উমা, ওই বুঝি আসে,
	দেখো চেয়ে গিরিরানী!
আলুলিত কেশ, এলোথেলো বেশ,
	হাসি-হাসি মুখখানি।
বালিকারা সব আসিল ছুটিয়া
	দাঁড়াল উমারে ঘিরি।
শিথিল চিকুরে অমল মালিকা
	পরাইয়া দিল ধীরি।
হাসিয়া হাসিয়া কহিল সবাই
	উমার চিবুক ধ'রে,
'বলি গো স্বজনী, বিদেশে বিজনে
	আছিলি কেমন করে?
আমরা তো সখি সারাটি বরষ
	রহিয়াছি পথ চেয়ে—
কবে আসিবেক আমাদের সেই
	মেনকারানীর মেয়ে!
এই নে, স্বজনী, ফুলের ভূষণ
	এই নে, মৃণাল-বালা,
হাসিমুখখানি কেমন সাজিবে
	পরিলে কুসুম-মালা।'
কেহ বা কহিল, 'এবার স্বজনি,
	দিব না তোমায় ছেড়ে
ভিখারি ভবের সরবস ধন
	আমরা লইব কেড়ে।
বলো তো, স্বজনী, এ কেমন-ধারা
	এয়েছ বরষ-পরে,
কেমনে নিদয়া রহিবে কেবল
	তিনটি দিনের তরে।'
কেহ বা কহিল, 'বলো দেখি, সখী,
	মনে পড়ে ছেলেবেলা?
সকলে মিলিয়া এ গিরিভবনে
	কত-না করেছি খেলা!
সেই মনে পড়ে যেদিন স্বজনী
	গেলে তপোবন-মাঝে—
নয়নের জলে আমরা সকলে
	সাজানু তাপসী-সাজে।
কোমল শরীরে বাকল পরিয়া
	এলায়ে নিবিড় কেশ,
লভিবারে পতি মনের মতন
	কত-না সহিলে ক্লেশ।

ছেলেবেলাকার সখীদের সব
 এখনো তো মনে আছে,
ভয় হয় বড়ো পতির সোহাগে
 ভুলিস তাদের পাছে।'
কত কী কহিয়া হরষে বিষাদে
 চলিল আলয়-মুখে,
কাঁদিয়া বালিকা পড়িল ঝাঁপায়ে
 আকুল মায়ের বুকে।
হাসিয়া কাঁদিয়া কহিল রানী,
 চুমিয়া উমার অধরখানি,
'আয় মা জননি আয় মা কোলে,
 আজ বরষের পরে।
দুখিনী মাতার নয়নের জল
তুই যদি, মা গো, না মুছাবি বল্
তবে উমা আর, কে আছে আমার
 এ শূন্য আঁধার ঘরে?
সারাটি বরষ যে দুখে গিয়াছে
 কী হবে শুনে সে ব্যথা,
বল্ দেখি, উমা, পতির ঘরের
 সকল কুশল-কথা।'
এত বলি রানী হরষে আদরে
 উমারে কোলেতে লয়ে,
হরষের ধারা বরষি নয়নে
 পশিল গিরি-আলয়ে।
আজিকে গিরির প্রাসাদে কুটিরে
 উঠিল হরষ-ধ্বনি,
কত দিন পরে মেনকা-মহিষী
 পেয়েছে নয়নমণি।

ভারতী
আশ্বিন ১২৮৪

আকুল আহ্বান

অভিমান ক'রে কোথায় গেলি,
 আয় মা ফিরে, আয় মা ফিরে আয়।
দিন রাত কেঁদে কেঁদে ডাকি
 আয় মা ফিরে, আয় মা ফিরে আয়।
সন্ধে হল, গৃহ অন্ধকার,
 মা গো, হেথায় প্রদীপ জ্বলে না।
একে একে সবাই ঘরে এল,
 আমায় যে মা, 'মা' কেউ বলে না।

সময় হল বেঁধে দেব চুল,
পরিয়ে দেব রাঙা কাপড়খানি।
সাঁজের তারা সাঁজের গগনে—
কোথায় গেল, রানী আমার রানী!

ও মা, রাত হল, আঁধার করে আসে,
ঘরে ঘরে প্রদীপ নিবে যায়।
আমার ঘরে ঘুম নেইকো শুধু—
শূন্য শেজ শূন্যপানে চায়।
কোথায় দুটি নয়ন ঘুমে ভরা,
সেই নেতিয়ে-পড়া ঘুমিয়ে-পড়া মেয়ে।
শ্রান্ত দেহ ঢুলে ঢুলে পড়ে,
তবু মায়ের তরে আছে বুঝি চেয়ে।

আঁধার রাতে চলে গেলি তুই,
আঁধার রাতে চুপি চুপি আয়।
কেউ তো তোরে দেখতে পাবে না,
তারা শুধু তারার পানে চায়।
পথে কোথাও জনপ্রাণী নেই,
ঘরে ঘরে সবাই ঘুমিয়ে আছে।
মা তোর শুধু একলা দ্বারে বসে,
চুপি চুপি আয় মা, মায়ের কাছে।
আমি তোরে নুকিয়ে রেখে দেব,
রেখে দেব বুকের মধ্যে করে—
থাক্, মা, সে তার পাষাণ হৃদি নিয়ে
অনাদর যে করেছে তোরে।
মলিন মুখে গেলি তাদের কাছে—
তবু তারা নিলে না মা কোলে?
বড়ো বড়ো আঁখি দুখানি
রইলি তাদের মুখের পানে তুলে?
এ জগৎ কঠিন— কঠিন—
কঠিন, শুধু মায়ের প্রাণ ছাড়া।
সেইখানে তুই আয় মা ফিরে আয়—
এত ডাকি দিবি নে কি সাড়া?

হে ধরণী, জীবের জননী,
শুনেছি যে মা তোমায় বলে।
তবে কেন তোর কোলে সবে
কেঁদে আসে কেঁদে যায় চলে।
তবে কেন তোর কোলে এসে
সন্তানের মেটে না পিপাসা।

কেন চায়— কেন কাঁদে সবে,
কেন কেঁদে পায় না ভালোবাসা।
কেন হেথা পাষাণ পরান
কেন সবে নীরস নিষ্ঠুর!
কেঁদে কেঁদে দুয়ারে যে আসে
কেন তারে করে দেয় দূর!
কেঁদে যে-জন ফিরে চলে যায়,
তার তরে কাঁদিস নে কেহ—
এই কি মা জননীর প্রাণ!
এই কি মা জননীর স্নেহ!

ফুলের দিনে সে যে চলে গেল,
ফুল ফোটা সে দেখে গেল না।
ফুলে ফুলে ভরে গেল বন,
একটি সে তো পরতে পেল না।
ফুল ফোটে, ফুল ঝরে যায়—
ফুল নিয়ে আর সবাই পরে।
ফিরে এসে সে যদি দাঁড়ায়,
একটিও রবে না তার তরে!
তার তরে মা কেবল আছে,
আছে শুধু জননীর স্নেহ,
আছে শুধু মা'র অশ্রুজল—
কিছু নাই, নাই আর কেহ।
খেলত যারা তারা খেলতে গেছে,
হাসত যারা তারা আজও হাসে,
তার তরে কেহ ব'সে নেই,
মা শুধু রয়েছে তারি আশে!

হায়, বিধি, এ কি ব্যর্থ হবে!
ব্যর্থ হবে মা'র ভালোবাসা!
কত জনের কত আশা পুরে,
ব্যর্থ হবে মার প্রাণের আশা।

বালক
আশ্বিন-কার্তিক ১২৯২

অবসাদ

দয়াময়ি, বাণি, বীণাপাণি,
জাগাও— জাগাও, দেবি, উঠাও আমারে দীন হীন।
ঢালো এ হৃদয়মাঝে জ্বলন্ত অনলময় বল।
দিনে দিনে অবসাদে হইতেছি অবশ মলিন;

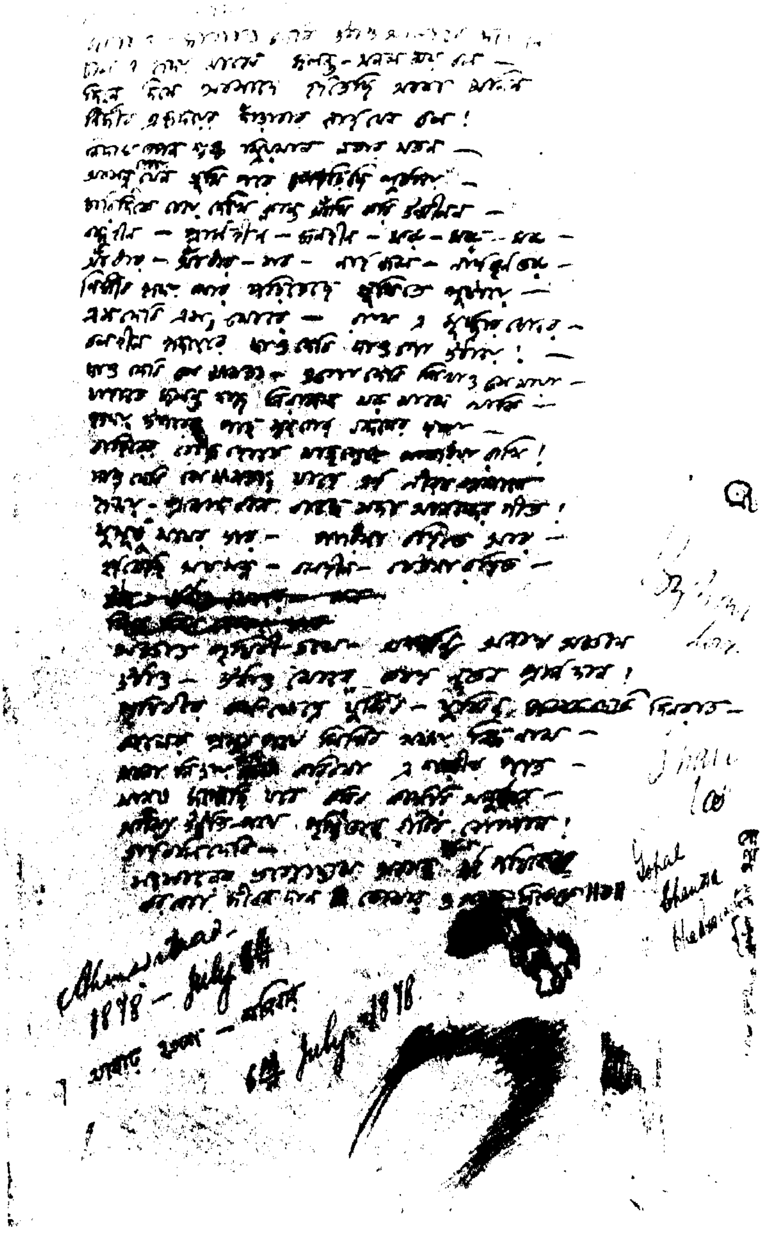

'অবসাদ' কবিতার পাণ্ডুলিপিচিত্র

মালতীপুঁথি

নির্জীব এ হৃদয়ের দাঁড়াবার নাই যেন বল।
নিদাঘ-তপন-শুষ্ক ম্রিয়মাণ লতার মতন
ক্রমে অবসন্ন হয়ে পড়িতেছি ভূমিতে লুটায়ে,
চারিদিকে চেয়ে দেখি শ্রান্ত আঁখি করি উন্মীলন—
বন্ধুহীন-প্রাণহীন-জনহীন মরু মরু মরু—
আঁধার— আঁধার সব— নাই জল নাই তৃণ তরু,
নির্জীব হৃদয় মোর ভূমিতলে পড়িছে লুটায়ে;
এসো দেবি, এসো, মোরে
রাখো এ মূর্চ্ছার ঘোরে;
বলহীন হৃদয়েরে দাও দেবি, দাও গো উঠায়ে।
দাও দেবি সে ক্ষমতা, ওগো দেবি, শিখাও সে মায়া—
যাহাতে জ্বলন্ত, দগ্ধ, নিরানন্দ মরুমাঝে থাকি
হৃদয় উপরে পড়ে স্বরগের নন্দনের ছায়া—
শুনি সুহৃদের স্বর থাকিলেও বিজনে একাকী।
দাও দেবি সে ক্ষমতা, যাহে এই নীরব শ্মশানে,
হৃদয়-প্রমোদ-বনে বাজে সদা আনন্দের গীত।
মুমূর্ষু মনের ভার—
পারি না বহিতে আর—
হইতেছি অবসন্ন— বলহীন— চেতনা-রহিত—
অজ্ঞাত পৃথিবীতলে— অকর্মণ্য-অনাথ-অজ্ঞান—
উঠাও— উঠাও মোরে— করহ নূতন প্রাণ দান।
পৃথিবীর কর্মক্ষেত্রে যুঝিব— যুঝিব দিবারাত—
কালের প্রস্তরপটে লিখিব অক্ষয় নিজ নাম।
অবশ নিদ্রায় পড়ি করিব না এ শরীর পাত,
মানুষ জন্মেছি যবে করিব কর্মের অনুষ্ঠান।
দুর্গম উন্নতিপথে পৃথ্বীতরে গঠিব সোপান,
তাই বলি দেবি—
সংসারের ভগ্নোদ্যম, অবসন্ন, দুর্বল পথিকে
করো গো জীবন দান তোমার ও অমৃত-নিষেকে।

বালক
চৈত্র ১২৯২
রচনা : আমেদাবাদ
৬ জুলাই ১৮৭৮

মেঘ্‌লা শ্রাবণের বাদ্‌লা রাতি

মেঘ্‌লা শ্রাবণের বাদ্‌লা রাতি,
বাহিরে ঝড় বাতাস,
জান্‌লা রুধি ঘরে জ্বালায়ে বাতি
বন্ধু মিলি খেলে তাস।

বন্ধু পাঁচ জনে বসিয়া গৃহকোণে
চিত্ত বড়োই উদাস,
কর্ম হাতে নাই, কভু বা উঠে হাই
কভু বা করে হা-হুতাশ।
বিরস ম্লান-মুখো, মেজাজ বড়ো রুখো,
শেষে বা বাধে হাতাহাতি!
আকাশ ঢাকা মেঘে, বাতাস রেগেমেগে
বাহিরে করে মাতামাতি।

অবন বলে ভাই তর্কে কাজ নাই
প্রমারা হোক এক বাজি—
সমর মুদি চোখ বলিল তাই হোক
সত্য কহে আছি রাজি।
বজ্র দিক জুড়ি করিছে হুড়োমুড়ি
হরিশ ভয়ে হত-বুলি,
গগন এক ধারে কিছু না বলি কারে
পলকে ছবি নিল তুলি।

শারদা

ওই শুনি শূন্যপথে রথচক্রধ্বনি,
ও নহে শারদমেঘে লঘু গরজন।
কাহার আসার আশে নীরবে অবনী
আকুল শিশিরজলে ভাসায় নয়ন।
কার কণ্ঠহার হ'তে সোনার ছটায়
চারি দিকে ঝলমল শারদ-কিরণ!
প্রফুল্ল মালতী বনে প্রভাতে লুটায়
কাহার অমল শুভ্র অঞ্চল-বসন!
কাহার মঞ্জুল হাসি, সুগন্ধ নিশ্বাস
নিকুঞ্জে ফুটায়ে তুলে শেফালি কামিনী।
ওকি রাজহংসরব, ওই কলভাষ?
নহে গো, বাজিছে অঙ্গে কঙ্কণ কিঙ্কিনী।
ছাড়িয়া অনন্তধাম সৌন্দর্য-কৈলাস,
আসিছেন এ বঙ্গের আনন্দ-রূপিণী।

মালতী পুঁথি

হা বিধাতা— ছেলেবেলা হতেই এমন

প্রথম সর্গ

হা বিধাতা— ছেলেবেলা হতেই এমন
দুর্বল হৃদয় লয়ে লভেছি জনম,
আশ্রয় না পেলে কিছু, হৃদয় আমার
অবসন্ন হয়ে পড়ে লতিকার মতো।
স্নেহ-আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ না হইলে
কাঁদে ভূমিতলে পড়ে হয়ে ম্রিয়মাণ।
তবে হে ঈশ্বর! তুমি কেন গো আমারে।
ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে করিলে নিক্ষেপ;
যেখানে সবারি হৃদি যন্ত্রের মতন;
স্নেহ প্রেম হৃদয়ের বৃত্তি সমুদয়
কঠোর নিয়মে যেথা হয় নিয়মিত।
কেন আমি হলেম না কৃষক-বালক,
ভায়ে ভায়ে মিলে মিলে করিতাম খেলা,
গ্রামপ্রান্তে প্রান্তরের পর্ণের কুটিরে
পিতামাতা ভাইবোন সকলে মিলিয়া
স্বাভাবিক হৃদয়ের সরল উচ্ছ্বাসে,
মুক্ত ওই প্রান্তরের বায়ুর মতন
হৃদয়ের স্বাধীনতা করিতাম ভোগ।
শ্রান্ত হলে খেলা-সুখে সন্ধ্যার সময়ে
কুটিরে ফিরিয়া আসি ভালোবাসি যারে
তার স্নেহময় কোলে রাখিতাম মাথা,
তা হইলে দ্বেষ ঘৃণা মিথ্যা অপবাদ
মুহূর্তে মুহূর্তে আর হত না সহিতে।
হৃদয়বিহীন প্রাসাদের আড়ম্বর
গর্বিত এ নগরের ঘোর কোলাহল
কৃত্রিম এ ভদ্রতার কঠোর নিয়ম
ভদ্রতার কাষ্ঠ হাসি, নহে মোর তরে।
দরিদ্র গ্রামের সেই ভাঙাচোরা পথ,
গৃহস্থের ছোটোখাটো নিভৃত কুটির
যেখানে কোথা বা আছে, তৃণ রাশি রাশি,
কোথা বা গাছের তলে বাঁধা আছে গাভী
অযত্নে চিবায় কভু গাছের পল্লব
কভু বা দেখিছে চাহি বাৎসল্য-নয়নে
ক্রীড়াশীল কুটিরের শিশুদের দিকে।
কুটিরের বধূগণ উঠিয়া প্রভাতে
আপনার আপনার কাজে আছে রত।

সে ক্ষুদ্র কুটির আর ভাঙাচোরা পথ,
দিগন্তের পদতলে বিশাল প্রান্তর
... যৌবনময় হৃদয়ে যাহার
... তৃণফুল শুকায় নিভৃতে
ছবি দেখে কল্পনার স্বপ্নের মতন
তা হইলে মধুময় কবিতার মতো
কেমন আরামে যেত জীবন কাটিয়া।

এমন হৃদয়হীন উপেক্ষার মাঝে
একজন ছিল মোর প্রেমের প্রতিমা,
অমিয়া, সে বালিকারে কত ভালোবাসি।
দিগন্তের দূর প্রান্তে ঘুমন্ত চন্দ্রমা,
ধবল জলদ জালে, আধো আধো ঢাকা—
বালিকা তেমনি আহা মধুর কোমল।
সেই বালা দয়া করি হৃদয় আমার
রেখেছিল জুড়াইয়া স্নেহের ছায়ায়।
অনন্ত-প্রণয়ময়ী রমণী তোমরা
পৃথিবীর মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।
তোমাদের স্নেহধারা যদি না বর্ষিত
হৃদয় হইত তবে মরুভূমিসম
স্নেহ দয়া প্রেম ভক্তি যাইত শুকায়ে।
তোমরাই পৃথিবীর সংগীত, কবিতা,
স্বর্গ, সে তো তোমাদের হৃদয়ে বিরাজে
সে হৃদয়ে স্নেহছায়ে দিলে গো আশ্রয়
পাষাণ-হৃদয় সেও যায় গো গলিয়া!
কেহই আশ্রয় যবে ছিল না অমিয়া!
জননী, ভগ্নীর মতো বেসেছিলে ভালো
সে কি আর এ জনমে পারিব ভুলিতে?
বিষণ্ণ কাতর এক বালকের 'পরে
সে যে কী স্নেহের ধারা করেছ বর্ষণ
চিরকাল হৃদয়ে তা রহিবে মুদ্রিত।
ওই স্নেহময় কোলে রাখি শ্রান্ত মাথা
কাতর হইয়া কত করেছি রোদন
কত-না ব্যথিত হয়ে আদরে যতনে
অঞ্চলে সে অশ্রুজল দিয়াছ মুছায়ে।
কবিতা লিখিলে ছুটে ওই কোলে গিয়া
ওই গলা ধরে তাহা শুনাতাম কত
বাল্যহৃদয়ের মোর যত ছিল কথা
তোমার কাছেতে কিছু করি নি গোপন।
ওই স্নেহময় কোল ছিল স্বর্গ মোর

সেইখানে একবার মুখ লুকাইলে
সব শ্রান্তি সব জ্বালা যেত দূর হয়ে।
শ্রান্ত শিশুটির মতো ওই কোলে যবে
নীরবে নিষ্পন্দ হয়ে রহিতাম শুয়ে
অনন্ত স্নেহেতে পূর্ণ আনত নয়নে
কেমন মুখের পানে চাহিয়া রহিতে
তখন কী হর্ষে হৃদি যাইত ফাটিয়া!
কতবার করিয়াছি কত অভিমান,
আদরেতে উচ্ছ্বসিয়া কেঁদেছি কতই।

এসো আজি সখা

এসো আজি সখা বিজন পুলিনে
বলিব মনের কথা;
মরমের তলে যা-কিছু রয়েছে
লুকানো মরম-ব্যথা।
সুচারু রজনী, মেঘের আঁচল
চাপিয়া অধরে হাসিছে শশি,
বিমল জোছনা সলিলে মজিয়া
আঁধার মুছিয়া ফেলেছে নিশি,
কুসুম কাননে বিনত আননে
মুচকিয়া হাসে গোলাপবালা,
বিষাদে মলিনা, শরমে নিলীনা,
সলিলে দুলিছে কমলিনী বধূ
ম্লানরূপে করি সরসী আলা!
আজি, খুলিয়া ফেলিব প্রাণ
আজি, গাইব কত কী গান,
আজি, নীরব নিশীথে, চাঁদের হাসিতে
মিশাব অফুট তান!
দুই হৃদয়ের যত আছে গান
এক সাথে আজি গাইব,
দুই হৃদয়ের যত আছে কথা
দুইজনে আজি কহিব;
কতদিন সখা, এমন নিশীথে
এমন পুলিনে বসি,
মানসের গীত গাহিয়া গাহিয়া
কাটাতে পাই নি নিশি।
স্বপনের মতো সেই ছেলেবেলা
সেইদিন সখা মনে কি হয়?
হৃদয় ছিল গো কবিতা মাখানো
প্রকৃতি আছিল কবিতাময়,

কী সুখে কাটিত পূরণিমা রাত
এই নদীতীরে আসি,
[কু]সুমের মালা গাঁথিয়া গাঁথিয়া
গনিয়া তারকারাশি।
যমুনা সুমুখে যাইত বহিয়া
সে যে কী সুখের গাইত গান,
ঘুম ঘুম আঁখি আসিত মুদিয়া
বিভল হইয়া যাইত প্রাণ!
[কত] যে সুখের কল্পনা আহা
আঁকিতাম মনে মনে
[সা]রাটি জীবন কাটাইব যেন

...

তখন কি সখা জানিতাম মনে
পৃথিবী কবির নহে
কল্পনা যার যতই প্রবল
ততই সে দুখ সহে!

এমন পৃথিবী, শোভার আকর
পাখি হেথা করে গান
কাননে কাননে কুসুম ফুটিয়া
পরিমল করে দান।

আকাশে হেথায় উঠে গো তারকা
উঠে সুধাকর, রবি,
বরন বরন জলদ দেখিছে
নদীজলে মুখছবি,
এমন পৃথিবী এও কারাগার
কবির মনের কাছে!
যে দিকে নয়ন ফিরাইতে যায়
সীমায় আটক আছে!
তাই [যে] গো সখা মনে মনে আমি
গড়েছি একটি বন,
সারাদিন সেথা ফুটে আছে ফুল,
গাইছে বিহগগণ।
আপনার ভাবে হইয়া পাগল
রাতদিন সুখে আছি গো সেথা
বিজন কাননে পাখির মতন
বিজনে গাইয়া মনের ব্যথা!
কতদিন পরে পেয়েছি তোমারে,
ভুলেছি মরমজ্বালা;

দুজনে মিলিয়া সুখের কাননে
গাঁথিব কুসুমমালা!
দুজনে মিলিয়া পূরণিমা রাতে
গাইব সুখের গান
যমুনা পুলিনে করিব দুজনে
সুখ নিশা অবসান,
আমার এ মন সঁপিয়া তোমারে
লইব তোমার মন
হৃদয়ের খেলা খেলিয়া খেলিয়া
কাটাইব সারাক্ষণ!
এইরূপে সখা কবিতার কোলে
পোহায়ে যাইবে প্রাণ
সুখের স্বপন দেখিয়া দেখিয়া
গাহিয়া সুখের গান।

পার কি বলিতে কেহ

পার কি বলিতে কেহ কী হল এ বুকে
যখনি শুনি গো ধীর সংগীতের ধ্বনি
যখনি দেখি গো ধীর প্রশান্ত রজনী
কত কী যে কথা আর কত কী যে ভাব
উচ্ছ্বসিয়া উথলিয়া আলোড়িয়া উঠে!
দূরাগত রাখালের বাঁশরির মতো
আধভোলা কালিকার স্বপ্নের মতন—
কী যে কথা কী যে ভাব ধরি ধরি করি
তবুও কেমন ধারা পারি না ধরিতে!
কী করি পাই না খুঁজি পাই না ভাবিয়া,
ইচ্ছা করে ভেঙেচুরে প্রাণের ভিতর
যা-কিছু যুঝিছে হৃদে খুলে ফেলি তাহা।

ছেলেবেলাকার আহা, ঘুমঘোরে দেখেছিনু

ছেলেবেলাকার আহা, ঘুমঘোরে দেখেছিনু
মূরতি দেবতাসম অপরূপ স্বজনি,
ভেবেছিনু মনে মনে, প্রণয়ের চন্দ্রলোকে
খেলিব দুজনে মিলি দিবস ও রজনী,
আজ সখি একেবারে, ভেঙেছে সে ঘুমঘোর
ভেঙেছে সাধের ভুল মাখানো যা মরমে,
দেবতা ভাবিনু যারে, তার কলঙ্কের কথা
শুনিয়া মলিন মুখ ঢাকিয়াছি শরমে।

তাই ভাবিয়াছি সখি, এই হৃদয়ের পটে
এঁকেছি যে ছবিখানি অতিশয় যতনে,
অশ্রুজলে অশ্রুজলে, মুছিয়া ফেলিব তাহা,
আর না আনিব মনে, এই পোড়া জনমে।—
কিন্তু হা— বৃথা এ আশা, মরমের মরমে যা।
আঁকিয়াছি সযতনে শোণিতের আখরে,
এ জনমে তাহা আর, মুছিবে না, মুছিবে না,
আমরণ রবে তাহা হৃদয়ের ভিতরে!
আমরণ কেঁদে কেঁদে, কাটিয়া যাইবে দিন,
নীরব আগুনে মন পুড়ে হবে ছাই লো!
মনের এ কথাগুলি গোপনে লুকায়ে রেখে
কতদিন বেঁচে রব ভাবিতেছি তাই লো!

আমার এ মনোজ্বালা

আমার এ মনোজ্বালা কে বুঝিবে সরলে
কেন যে এমন করে, ম্রিয়মাণ হয়ে থাকি
কেন যে নীরবে হেন বসে থাকি বিরলে।
এ যাতনা কেহ যদি বুঝিতে পারিত দেবি,
তবে কি সে আর কভু পারিত গো হাসিতে?
হৃদয় আছয়ে যার সঁপিতে পারে সে প্রাণ
এ জ্বলন্ত যন্ত্রণার এক তিল নাশিতে!
হে সখী হে সখাগণ, আমার মর্মের জ্বালা
কেহই তোমরা যদি না পার গো বুঝিতে,
কী আগুন জ্বলে তার নিভৃত গভীর তলে
কী ঘোর ঝটিকা সনে হয় তারে যুঝিতে।
তবে গো তোমরা মোরে শুধায়ো না শুধায়ো না
কেন যে এমন করে রহিয়াছি বসিয়া
বিরলে আমারে হেথা, একলা থাকিতে দাও,
[আমা]র মনের কথা বুঝিবে কী করিয়া?
[ম্রিয়]মাণ মুখে, এই শূন্যপ্রায় নেত্রে
[ক]লঙ্ক সঁপি গো আমি তোমাদের হরষে;
পূর্ণিমা যামিনী যথা মলিন হইয়া যায়
ক্ষুদ্র এক অন্ধকার জলদের পরশে।
কিন্তু কী করিব বলো, কী চাও কী দিব আমি
তোমাদের আমোদ গো এক তিল বাড়াতে
হৃদয়ে এমন জ্বালা, কী করে হাসিব বলো
কিছুতে বিষণ্ণভাব পারি না যে তাড়াতে।
বিরক্ত হোয়ো না সখি, অমন বিরক্ত নেত্রে
আমার মুখের পানে রহিয়ো না চাহিয়া,
কী আঘাত লাগে প্রাণে, দেখি ও বিরক্ত মুখ

কেমনে সখি গো তাহা বুঝাইব কহিয়া?
ব্যথায় পাইয়া ব্যথা, যদি গো শুধাতে কথা
অশ্রুজলে মিশাইতে যদি অশ্রুজল
আদরে স্নেহের স্বরে, একটি কহিতে কথা,
অনেক নিভিত তবু এ হৃদি-অনল
জানিতাম ওগো সখি, কাঁদিলে মমতা পাব,
কাঁদিলে বিরক্ত হবে এ কী নিদারুণ?
চরণে ধরি গো সখি, একটু করিয়ো দয়া
নহিলে নিভিবে কিসে বুকের আগুন!

...

উপহার-গীতি

ছেলেবেলা হতে বালা, যত গাঁথিয়াছি মালা
যত বনফুল আমি তুলেছি যতনে
ছুটিয়া তোমারি কোলে, ধরিয়া তোমারি গলে
পরায়ে দিয়াছি সখি তোমারি চরণে।
আজো গাঁথিয়াছি মালা, তুলিয়া বনের ফুল
তোমারি চরণে সখি দিব গো পরায়ে—
না-হয় ঘৃণার ভরে, দলিয়ো চরণতলে
হৃদয় যেমন করে দলেছ দুপায়ে।
পৃথিবীর নিন্দাযশে, কটাক্ষ করি না বালা
তুমি যদি সোহাগেতে করহ গ্রহণ
আমার সর্বস্বধন, কবিতার মালাগুলি
পৃথিবীর তরে আমি করি নি গ্রন্থন।
আমি যে-সকল গান গাই গো মনের সুখে
সপ্তসুরে পূর্ণ করি এ শূন্য আকাশ
পৃথিবীর আর কেহ, শুনুক বা না শুনুক
তুমি যেন শুন বালা, এই অভিলাষ!
তোমার লাগিবে ভালো, তুমি গো বলিবে ভালো,
গলাবে তোমারি মন এ সংগীত 'ধ্বনি
আমার মর্মের কথা, তুমিই বুঝিবে সখি
আর কেহ না বুঝুক খেদ নাহি গণি
একদিন মনে পড়ে, যাহা তাহা গাইতাম
সকলি তোমার সখি লাগিত গো ভালো
নীরবে শুনিতে তুমি, সমুখে বহিত নদী
মাথায় ঢালিত চাঁদ পূর্ণিমার আলো।
সুখের স্বপনসম, সেদিন গেল গো চলি
অভাগা অদৃষ্টে হায় এ জন্মের তরে
আমার মনের গান মর্মের রোদনধ্বনি
স্পর্শও করে না আজ তোমার অন্তরে।

তবুও— তবুও সখি তোমারেই শুনাইব
তোমারেই দিব সখি যা আছে আমার।
দিনু যা মনের সাথে, তুলিয়া লও তা হাতে
ভগ্ন হৃদয়ের এই প্রীতি-উপহার।

বাড়িতে ১লা কার্তিক মঙ্গলবার

পাষাণ-হৃদয়ে কেন সঁপিনু হৃদয়

পাষাণ-হৃদয়ে কেন সঁপিনু হৃদয়?
মর্মভেদী যন্ত্রণায়, ফিরেও যে নাহি চায়
বুক ফেটে গেলেও যে কথা নাহি কয়
প্রাণ দিয়ে সাধিলেও, পায়ে ধরে কাঁদিলেও
এক তিল এক বিন্দু দয়া নাহি হয়
হেরিলে গো অশ্রুরাশি, বরষে ঘৃণার হাসি,
বিরক্তির তিরস্কার তীব্র বিষময়।
এত যদি ছিল মনে, তবে বলো কী কারণে
একদিন তুলেছিল স্বর্গের আলয়
একদিন স্নেহভরে, মাথা রাখি কোল-'পরে
কেন নিয়েছিল হরে পরান হৃদয়
ভগ্নবুকে কেন আর, বজ্র হানে বার বার
মনখানা নিয়ে যেন করে ছেলেখেলা—
গিয়াছে যা ভেঙেচুরে, আর কেন তার পরে
মিছামিছি বিঁধে আহা বাণ বিষময়!

ভেবেছি কাহারো সাথে

ভেবেছি কাহারো সাথে মিশিব না আর
কারো কাছে বর্ষিব না অশ্রুবারিধার।
মানুষ পরের দুখে, করে শুধু উপহাস
জেনেছি, দেখেছি তাহা শত শত বার
যাহাদের মুখ আহা একটু মলিন হলে
যন্ত্রণায় ফেটে যায় হৃদয় আমার
তারাই— তারাই যদি এত গো নিষ্ঠুর হল
তবে আমি হতভাগ্য কী করিব আর!
সত্য তুমি হও সাক্ষী, ধর্ম তুমি জেনো ইহা
ঈশ্বর! তুমিই শুন প্রতিজ্ঞা আমার।
যার তরে কেঁদে মরি, সেই যদি উপহাসে
তবে মানুষের সাথে মিশিব না আর।

হা রে বিধি কী দারুণ অদৃষ্ট আমার

হারে বিধি কী দারুণ অদৃষ্ট আমার
যারে যত ভালোবাসি, যার তরে কাঁদে প্রাণ
হৃদয়ে আঘাত দেয় সেই বারে বার—
যারে আমি বন্ধু বলি, করিয়াছি আলিঙ্গন
সেই এ হৃদয় করিয়াছে চুরমার
যারেই বেসেছি ভালো, সেই চিরকাল-তরে
পৃথিবীর কাছে দুঃখ পেয়েছে অপার।
হান বিধি হান বজ্র, আমার এ ভগ্নহৃদে
তিলেক বাঁচিতে নাই বাসনা আমার
প্রস্তরে গঠিত এই, হৃদয়বিহীন ধরা
হেথা কত কাল বলো বেঁচে রব আর।

ও কথা বোলো না সখি

ও কথা বোলো না সখি— প্রাণে লাগে ব্যথা—
আমি ভালোবাসি নাকো এ কিরূপ কথা।
কী জানি কী মোর দশা কহিব কেমনে
প্রকাশ করিতে নারি রয়েছে যা মনে—
পৃথিবী আমারে সখি চিনিল না তাই—
পৃথিবী না চিনে মোরে তাহে ক্ষতি নাই—
তুমিও কি বুঝিলে না এ মর্মকাহিনী
তুমিও কি চিনিলে না আমারে স্বজনি?

কী হবে বলো গো সখি

কী হবে বলো গো সখি ভালোবাসি অভাগারে
যদি ভালোবেসে থাক ভুলে যাও একেবারে—
একদিন এ হৃদয়— আছিল কুসুমময়
চরাচর পূর্ণ ছিল সুখের অমৃতধারে
সেদিন গিয়েছে সখি আর কিছু নাই
ভেঙে পুড়ে সব যেন হয়ে গেছে ছাই
হৃদয়-কবরে শুধু মৃত ঘটনার
...[র]য়েছে পড়ে স্মৃতি নাম যার।

এ হতভাগারে ভালো কে বাসিতে চায়

এ হতভাগারে ভালো কে বাসিতে চায়?
সুখ-আশা থাকে যদি বেসো না আমায়!
এ জীবন, অভাগার— নয়ন সলিলধার
বলো সখি কে সহিতে পারিবে তা হায়!
এ ভগ্ন প্রাণের অতি বিষাদের গান
বলো সখি কে শুনিতে পারে সারা প্রাণ
গেছি ভুলে ভালোবাসা— ছাড়িয়াছি সুখ-আশা
ভালোবেসে কাজ নাই স্বজনি আমায়!

জানি সখা অভাগীরে ভালো তুমি বাস না

জানি সখা অভাগীরে ভালো তুমি বাস না
ছেড়েছি ছেড়েছি নাথ তব প্রেম-কামনা—
এক ভিক্ষা মাগি হায়— নিরাশ কোরো না তায়
শেষ ভিক্ষা শেষ আশা— অন্তিম বাসনা—
এ জন্মের তরে সখা— আর তো হবে না দেখা
তুমি সুখে থেকো নাথ কী কহিব আর
একবার বোসো হেথা ভালো করে কও কথা
যে নামে ডাকিতে সখা ডাকো একবার—
ওকি সখা কেঁদোনাকো— দুখিনীর কথা রাখো
আমি গেলে বলো নাথ— কী ক্ষতি তাহার?
যাই সখা যাই তবে— ছাড়ি তোমাদের সবে—
সময় আসিছে কাছে বিদায় বিদায়—

রচনাকাল : ১৮৭৪-১৮৮২ খৃস্টাব্দ

সংযোজন

সন্ধ্যা

ব্যথা বড়ো বাজিয়াছে প্রাণে,
সন্ধ্যা তুই ধীরে ধীরে আয়!
কাছে আয়—আরো কাছে আয়—
সঙ্গীহারা হৃদয় আমার
তোর বুকে লুকাইতে চায়।
আমার ব্যথার তুই ব্যথী,
তুই মোর একমাত্র সাথী,
সন্ধ্যা তুই আমার আলয়,
তোরে আমি বড়ো ভালোবাসি—
সারাদিন ঘুরে ঘুরে ঘুরে
তোর কোলে ঘুমাইতে আসি,
তোর কাছে ফেলি রে নিশ্বাস,
তোর কাছে কহি মনোকথা,
তোর কাছে করি প্রসারিত
প্রাণের নিভৃত নীরবতা।
তোর গান শুনিতে শুনিতে
তোর তারা গুনিতে গুনিতে,
নয়ন মুদিয়া আসে মোর,
হৃদয় হইয়া আসে ভোর—
স্বপন-গোধূলিময় প্রাণ
হারায় প্রাণের মাঝে তোর!
একটি কথাও নাই মুখে,
চেয়ে শুধু রোস মুখপানে
অনিমেষ আনত নয়ানে।
ধীরে শুধু ফেলিস নিশ্বাস,
ধীরে শুধু কানে কানে গাস
ঘুম-পাড়াবার মৃদু গান,
কোমল কমল কর দিয়ে
ঢেকে শুধু দিস দুনয়ান,
ভুলে যাই সকল যাতনা
জুড়াইয়া আসে মোর প্রাণ!
তাই তোরে ডাকি একবার
সঙ্গীহারা হৃদয় আমার,
তোর বুকে লুকাইয়া মাথা
তোর কোলে ঘুমাইতে চায়,
সন্ধ্যা তুই ধীরে ধীরে আয়।

আঁধার আঁচল দিয়ে তোর
আমার দুখেরে ঢেকে রাখ,
বল তারে ঘুমাইতে বল
কপালেতে হাতখানি রাখ,
জগতেরে ক'রে দে আড়াল,
কোলাহল করিয়া দে দূর—
দুখেরে কোলেতে করে নিয়ে
র'চে দে নিভৃত অন্তঃপুর।
তা হলে সে কাঁদিবে বসিয়া,
কল্পনার খেলেনা গড়িবে,
খেলিয়া আপন মনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া, শেষে
আপনি সে ঘুমায়ে পড়িবে।

আয় সন্ধ্যা ধীরে ধীরে আয়,
হাতে লয়ে স্বপনের ডালা
গুন্ গুন্ মন্ত্র পড়ি পড়ি
গাঁথিয়া দে স্বপনের মালা,
জড়ায়ে দে আমার মাথায়,
স্নেহ-হস্ত বুলায়ে দে গায়!
স্রোতস্বিনী ঘুমঘোরে, গাবে কুলু কুলু করে
ঘুমেতে জড়িত আধো গান,
ঝিল্লিরা ধরিবে একতান,
দিনশ্রমে শ্রান্ত বায়ু গৃহমুখে যেতে যেতে
গান গাবে অতি মৃদু স্বরে,
পদশব্দ শুনি তার তন্দ্রা ভাঙি লতা পাতা
ভর্ৎসনা করিবে মরমরে।
ভাঙা ভাঙা গানগুলি মিলিয়া হৃদয়-মাঝে
মিশে যাবে স্বপনের সাথে,
নানাবিধ রূপ ধরি ভ্রমিয়া বেড়াবে তারা,
হৃদয়ের গুহাতে গুহাতে।

আয় সন্ধ্যা ধীরে ধীরে আয়,
আন তোর স্বর্ণ মেঘজাল,
পশ্চিমের সুবর্ণ প্রাঙ্গণে
খেলিবি মেঘের ইন্দ্রজাল।
ওই তোর ভাঙা মেঘগুলি,
হৃদয়ের খেলেনা আমার,
ওইগুলি কোলে করে নিয়ে
সাধ যায় খেলি অনিবার।
ওই তোর জলদের 'পর
বাঁধি আমি কত শত ঘর!
সাধ যায় হোথায় লুটাই,

অস্তগামী রবির মতন,
লুটায়ে লুটায়ে পড়ি শেষে
সাগরের ওই প্রান্তদেশে
তরল কনক নিকেতন!
ছোটো ছোটো ওই তারাগুলি,
ডাকে মোরে আঁখি-পাতা খুলি।
স্নেহময় আঁখিগুলি যেন
আছে শুধু মোর পথ চেয়ে,
সন্ধ্যার আঁধারে বসি বসি
কহে যেন গান গেয়ে গেয়ে,
'কবে তুমি আসিবে হেথায়
অন্ধকার নিভৃত-নিলয়ে,
জগতের অতি প্রান্তদেশে
প্রদীপটি রেখেছি জ্বালায়ে!
বিজনেতে রয়েছি বসিয়া
কবে তুমি আসিবে হেথায়!'
সন্ধ্যা হলে মোর মুখ চেয়ে
তারাগুলি এই গান গায়!
আয় সন্ধ্যা ধীরে ধীরে আয়,
জগতের নয়ন ঢেকে দে—
আঁধার আঁচল পেতে দিয়ে
কোলেতে মাথাটি রেখে দে!

প্রকাশকাল : ১২৮৯

কেন গান গাই

গুরুভার মন লয়ে কত বা বেড়াবি ব'য়ে?
এমন কি কেহ তোর নাই,
যাহার হৃদয়-'পরে মিলিবে মুহূর্ত তরে
হৃদয়টি রাখিবার ঠাঁই?
'কেহ না, কেহ না!'

সংসারে যে দিকে ফিরে চাই
এমন কি কেহ তোর নাই—
তোর দিন শেষ হলে, স্মৃতিখানি লয়ে কোলে,
শোয়াইয়া বিষাদের কোমল শয়নে,
বিমল শিশির-মাখা প্রেম-ফুলে দিয়ে ঢাকা
চেয়ে রবে আনত নয়নে?
হৃদয়েতে রেখে দিবে তুলে,
প্রতিদিন ঢেকে দিবে ফুলে,

মনোমাঝে প্রবেশিয়ে বিন্দু বিন্দু অশ্রু দিয়ে
বৃন্ত-ছিন্ন প্রেম-ফুলগুলি
রাখিবেক জিয়াইয়া তুলি?
এমনকি কি কেহ তোর নাই?
'কেহ না, কেহ না।'

প্রাণ তুই খুলে দিলি ভালোবাসা বিলাইলি
কেহ তাহা তুলে না লইল,
ভূমিতলে পড়িয়া রহিল;
ভালোবাসা কেন দিলি তবে
কেহ যদি কুড়ায়ে না লবে?
কেন সখা কেন?
'জানি না, জানি না।'

বিজনে বনের মাঝে ফুল এক আছে ফুটে
শুধাইতে গেনু তার কাছে,
'ফুল, তুই এ আঁধারে পরিমল দিস কারে,
এ কাননে কে বা তোর আছে!
যখন পড়িবি তুই ঝরে,
শুকাইয়া দলগুলি ধূলিতে হইবে ধূলি,
মনে কি করিবে কেহ তোরে!
তবে কেন পরিমল ঢেলে দিস অবিরল
ছোটো মনখানি ভ'রে ভ'রে?
কেন, ফুল, কেন?
সেও বলে, 'জানি না, জানি না।'

সখা, তুমি গান গাও কেন?
কেহ যদি শুনিতে না চায়?
ওই দেখো পথমাঝে যে যাহার নিজ কাজে
আপনার মনে চলে যায়।
কেহ যদি শুনিতে না চায়
কেন তবে, কেন গাও গান,
আকাশে ঢালিয়া দাও প্রাণ?
গান তব ফুরাইবে যবে,
রাগিণী কারো কি মনে রবে?
বাতাসেতে স্বরধার খেলিয়াছে অনিবার,
বাতাসে সমাধি তার হবে।
কাহারো মনেও নাহি রবে,
কেন সখা গান গাও তবে?
কেন, সখা, কেন?
'জানি না, জানি না।'

বিজন তরুর শাখে একাকি পাখিটি ডাকে,
শুধাইতে গেনু তার কাছে,
'পাখি তুই এ আঁধারে গান শুনাইবি কারে?
এ কাননে কে বা তোর আছে!
যখনি ফুরাবে তোর প্রাণ,
যখনি থামিবে তোর গান,
বন ছিল যেমন নীরবে,
তেমনি নীরব পুন হবে।
যেমনি থামিবে গীত, অমনি সে সচকিত
প্রতিধ্বনি আকাশে মিলাবে,
তোর গান তোরি সাথে যাবে!
আকাশে ঢালিয়া দিয়া প্রাণ,
তবে, পাখি, কেন গাস গান?
কেন, পাখি, কেন?
সেও বলে, 'জানি না, জানি না!'

প্রকাশকাল : ১২৮৯

কেন গান শুনাই

এসো সখি, এসো মোর কাছে,
কথা এক শুধাবার আছে!
চেয়ে তব মুখপানে ব'সে এই ঠাঁই—
প্রতিদিন যত গান তোমারে শুনাই,
বুঝিতে কি পার সখি কেন যে তা গাই?
শুধু কি তা পশে কানে? কথাগুলি তার
কোথা হতে উঠিতেছে ভাবো একবার?
বুঝ না কি হৃদয়ের
কোন্‌খানে শেল ফুটে
তবে প্রতি কথাগুলি
আর্তনাদ করি উঠে!
যখন নয়নে উঠে বিন্দু অশ্রুজল,
তখন কি তাই তুই দেখিস কেবল?
দেখ না কি কী সমুদ্র হৃদয়েতে উথলিছে,
শুধু কণামাত্র তার আঁখিপ্রান্তে বিগলিছে!
যখন একটি শুধু উঠে রে নিশ্বাস,
তখন কি তাই শুধু শুনিবারে পাস?
শুনিস না কী ঝটিকা হৃদয়ে বেড়ায় ছুটে
একটি উচ্ছ্বাস শুধু বাহিরেতে ফুটে।
যে কথাটি বলি আমি শোনো শুধু তাই?
শোনো না কি যত কথা বলা হইল না?
যত কথা বলিবারে চাই?

আমি কি শুনাই গান
ভালো মন্দ করিতে বিচার?
যবে এ নয়ন হতে বহে অশ্রুধার—
শুধু কি রে দেখিবি তখন
সে অশ্রু উজ্জ্বল কি না হীরার মতন?
আমার এ গান তোরে যখন শুনাই
নিন্দা বা প্রশংসা আমি কিছু নাহি চাই—
যে হৃদি দিয়েছি তোরে
তাই তোরে দেখাবারে চাই,
তারি ভাষা বুঝাবারে চাই,
তারি ব্যথা জানাবারে চাই,
আর কিবা চাই?
সেই হৃদি দেখিলি যখন,
তারি ভাষা বুঝিলি যখন,
তারি ব্যথা জানিলি যখন
তখন একটি বিন্দু অশ্রুবারি চাই!
(আর কিবা চাই!)

আয় সখি কাছে মোর আয়,
কথা এক শুধাব তোমায়—
এত গান শুনালেম এত অনুরাগে
কথা তার বুকে কি লো লাগে?
একটি নিশ্বাস কি লো জাগে?
কথা শুধু শুনিয়া কি যাস?
ভালো মন্দ বুঝিস কেবল?
প্রাণের ভিতর হতে
উঠে না একটি অশ্রুজল?

প্রকাশকাল : ১২৮৮

বিষ ও সুধা

অস্ত গেল দিনমণি। সন্ধ্যা আসি ধীরে
দিবসের অন্ধকার সমাধির 'পরে
তারকার ফুলরাশি দিল ছড়াইয়া।
সাবধানে অতি ধীরে নায়ক যেমন
ঘুমন্ত প্রিয়ার মুখ করয়ে চুম্বন,
দিন-পরিশ্রমে ক্লান্ত পৃথিবীর দেহ
অতি ধীরে পরশিল সায়াহ্নের বায়ু।
দুরন্ত তরঙ্গগুলি যমুনার কোলে
সারাদিন খেলা করি পড়েছে ঘুমায়ে।

ভগ্ন দেবালয়খানি যমুনার ধারে,
শিকড়ে শিকড়ে তার ছায়ি জীর্ণ দেহ
বট অশথের গাছ জড়াজড়ি করি
আঁধারিয়া রাখিয়াছে ভগন হৃদয়,
দুয়েকটি বায়ূচ্ছ্বাস পথ ভুলি গিয়া
আঁধার আলয়ে তার হয়েছে আটক,
অধীর হইয়া তারা হেথায় হোথায়
হু হু করি বেড়াইছে পথ খুঁজি খুঁজি।
শুন সন্ধ্যে! আবার এসেছি আমি হেথা,
নীরব আঁধারে তব বসিয়া বসিয়া
তটিনীর কলধ্বনি শুনিতে এয়েছি।
হে তটিনী, ও কি গান গাইতেছ তুমি!
দিন নাই, রাত্রি নাই, এক তানে শুধু
এক সুরে এক গান গাইছ সতত—
এত মৃদুস্বরে ধীরে, যেন ভয় করি
সন্ধ্যার প্রশান্ত স্বপ্ন ভেঙে যায় পাছে!
এ নীরব সন্ধ্যাকালে তব মৃদু গান
একতান ধ্বনি তব শুনে মনে হয়
এ হৃদি-গানেরি যেন শুনি প্রতিধ্বনি!
মনে হয় যেন তুমি আমারি মতন
কী এক প্রাণে ধন ফেলেছ হারায়ে।
এসো স্মৃতি, এসো তুমি এ ভগ্ন হৃদয়ে—
সায়াহ্ন-রবির মৃদু শেষ রশ্মিরেখা
যেমন পড়েছে ওই অন্ধকার মেঘে
তেমনি ঢালো এ হৃদে অতীত-স্বপন!
কাঁদিতে হয়েছে সাধ বিরলে বসিয়া,
কাঁদি একবার, দাও সে ক্ষমতা মোরে!
যাহা কিছু মনে পড়ে ছেলেবেলাকার
সমস্ত মালতীময়— মালতী কেবল
শৈশবকালের মোর স্মৃতির প্রতিমা।
দুই ভাই বোনে মোরা আছিনু কেমন!
আমি ছিনু ধীর শান্ত গম্ভীর-প্রকৃতি,
মালতী প্রফুল্ল অতি সদা হাসি হাসি।
ছিল না সে উচ্ছ্বসিনী নির্ঝরিণী সম
শৈশব-তরঙ্গবেগে চঞ্চলা সুন্দরী,
ছিল না সে লজ্জাবতী লতাটির মতো
শরম-সৌন্দর্যভরে ম্রিয়মাণ-পারা।
আছিল সে প্রভাতের ফুলের মতন,
প্রশান্ত হরষে সদা মাখানো মুখানি;
সে হাসি গাহিত শুধু উষার সংগীত—
সকলি নবীন আর সকলি বিমল।

মালতীর শান্ত সেই হাসিটির সাথে
হৃদয়ে জাগিত যেন প্রভাত পবন,
নূতন জীবন যেন সঞ্চরিত মনে।
ছেলেবেলাকার যত কবিতা আমার
সে হাসির কিরণেতে উঠেছিল ফুটি।
মালতী ছুঁইত মোর হৃদয়ের তার,
তাইতে শৈশব-গান উঠিত বাজিয়া।
এমনি আসিত সন্ধ্যা; শ্রান্ত জগতেরে
স্নেহময় কোলে তার ঘুম পাড়াইতে।
সুবর্ণ-সলিলসিক্ত সায়াহ্ন-অম্বরে
গোধূলির অন্ধকার নিঃশব্দ চরণে
ছোটো ছোটো তারাগুলি দিত ফুটাইয়া,
নন্দনবনের যেন চাঁপা ফুল দিয়ে
ফুলশয্যা সাজাইত সুরবালাদের।
মালতীরে লয়ে পাশে আসিতাম হেথা;
সন্ধ্যার সংগীতস্বরে মিলাইয়া স্বর
মৃদুস্বরে শুনাতেম শৈশব-কবিতা।
হর্ষময় গর্বে তার আঁখি উজলিত—
অবাক ভক্তির ভাবে ধরি মোর হাত
একদৃষ্টে মুখপানে রহিত চাহিয়া।
তার সে হরষ হেরি আমারো হৃদয়ে
কেমন মধুর গর্ব উঠিত উথলি!
ক্ষুদ্র এক কুটির আছিল আমাদের,
নিস্তব্ধ-মধ্যাহ্নে আর নীরব সন্ধ্যায়
দূর হতে তটিনীর কলস্বর আসি
শান্ত কুটিরের প্রাণে প্রবেশিয়া ধীরে
করিত সে কুটিরের স্বপন রচনা।
দুই জনে ছিনু মোরা কল্পনার শিশু—
বনে ভ্রমিতাম যবে, সুদূর নির্ঝরে
বনশ্রীর পদধ্বনি পেতাম শুনিতে।
যাহা কিছু দেখিতাম সকলেরি মাঝে
জীবন্ত প্রতিমা যেন পেতেম দেখিতে।
কত জোছনার রাত্রে মিলি দুই জনে
ভ্রমিতাম যমুনার পুলিনে পুলিনে,
মনে হত এ রজনী পোহাতে চাবে না,
সহসা কোকিল-রব শুনিয়া উষায়,
সহসা যখনি শ্যামা গাহিয়া উঠিত,
চমকিয়া উঠিতাম, কহিতাম মোরা,
'এ কী হল। এরি মধ্যে পোহাল রজনী!'
দেখিতাম পূর্ব দিকে উঠেছে ফুটিয়া
শুকতারা, রজনীর বিদায়ের পথে,

প্রভাতের বায়ু ধীরে উঠিছে জাগিয়া,
আসিছে মলিন হয়ে আঁধারের মুখ।
তখন আলয়ে দোঁহে আসিতাম ফিরি,
আসিতে আসিতে পথে শুনিতাম মোরা
গাইছে বিজনকুঞ্জে বউ-কথা-কও।
ক্রমশ বালককাল হল অবসান,
নীরদের প্রেমদৃষ্টে পড়িল মালতী,
নীরদের সাথে তার হইল বিবাহ।
মাঝে মাঝে যাইতাম তাদের আলয়ে;
দেখিতাম মালতীর শান্ত সে হাসিতে
কুটিরেতে রাখিয়াছে প্রভাত ফুটায়ে!

সঙ্গীহারা হয়ে আমি ভ্রমিতাম একা,
নিরাশ্রয় এ-হৃদয় অশান্ত হইয়া
কাঁদিয়া উঠিত যেন অধীর উচ্ছ্বাসে।
কোথাও পেত না যেন আরাম বিশ্রাম।
অন্যমনে আছি যবে, হৃদয় আমার
সহসা স্বপন ভাঙি উঠিত চমকি।
সহসা পেত না ভেবে, পেত না খুঁজিয়া
আগে কী ছিল রে যেন এখন তা নাই।
প্রকৃতির কি যেন কী গিয়াছে হারায়ে
মনে তাহা পড়িছে না। ছেলেবেলা হতে
প্রকৃতির যেই ছন্দ এসেছি শুনিয়া
সেই ছন্দোভঙ্গ যেন হয়েছে তাহার,
সেই ছন্দে কী কথার পড়েছে অভাব—
কানেতে সহসা তাই উঠিত বাজিয়া,
হৃদয় সহসা তাই উঠিত চমকি।
জানি না কিসের তরে, কী মনের দুখে
দুয়েকটি দীর্ঘশ্বাস উঠিত উচ্ছ্বসি।
শিখর হতে শিখরে, বন হতে বনে,
অন্যমনে একেলাই বেড়াতাম ভ্রমি—
সহসা চেতন পেয়ে উঠিয়া চমকি
সবিস্ময়ে ভাবিতাম, কেন ভ্রমিতেছি,
কেন ভ্রমিতেছি তাহা পেতেম না ভাবি!

একদিন নবীন বসন্ত-সমীরণে
বউ-কথা-কও যবে খুলেছে হৃদয়,
বিষাদে সুখেতে মাখা প্রশান্ত কী ভাব
প্রাণের ভিতরে যবে রয়েছে ঘুমায়ে,
দেখিনু বালিকা এক, নির্ঝরের ধারে
বনফুল তুলিতেছে আঁচল ভরিয়া।

দুপাশে কুন্তলজাল পড়েছে এলায়ে,
মুখেতে পড়েছে তার উষার কিরণ।
কাছেতে গেলাম তার, কাঁটা বাছি ফেলি
কানন-গোলাপ তারে দিলাম তুলিয়া।
প্রতিদিন সেইখানে আসিত দামিনী
তুলিয়া দিতাম ফুল, শুনাতেম গান,
কহিতাম বালিকারে কত কী কাহিনী,
শুনি সে হাসিত কভু, শুনিত না কভু,
আমি ফুল তুলে দিলে ফেলিত ছিঁড়িয়া।
ভর্ৎসনার অভিনয়ে কহিত কত কী।
কভু বা ভ্রূকুটি করি রহিত বসিয়া,
হাসিতে হাসিতে কভু যাইত পলায়ে,
অলীক শরমে কভু হইত অধীর।
কিন্তু তার ভ্রূকুটিতে, শরমে, সংকোচে,
লুকানো প্রেমেরি কথা করিত প্রকাশ!
এইরূপে প্রতি উষা যাইত কাটিয়া।
একদিন সে-বালিকা না আসিত যদি
হৃদয় কেমন যেন হইত বিকল—
প্রভাত কেমন যেন যেত না কাটিয়া—
দিন যেত অতি ধীরে নিরাশ-চরণে!
বর্ষচক্র আর বার আসিল ফিরিয়া,
নূতন বসন্তে পুনঃ হাসিল ধরণী,
প্রভাতে অলসভাবে, বসি তরুতলে,
দামিনীরে শুধালেম কথায় কথায়
'দামিনী, তুমি কি মোরে ভালোবাস বালা?'
অলীক-শরম-রোষে ভ্রূকুটি করিয়া
ছুটে সে পলায়ে গেল দূর বনান্তরে—
জানি না কী ভাবি পুনঃ ছুটিয়া আসিয়া
'ভালোবাসি— ভালোবাসি—' কহিয়া অমনি
শরমে-মাখানো মুখ লুকালো এ বুকে।
এইরূপে দিন যেত স্বপ্ন খেলা খেলি।
কত ক্ষুদ্র অভিমানে কাঁদিত বালিকা,
কত ক্ষুদ্র কথা লয়ে হাসিত হরষে—
কিন্তু জানিতাম কি রে এই ভালোবাসা
দুদিনের ছেলেখেলা, আর কিছু নয়?
কে জানিত প্রভাতের নবীন কিরণে
এমন শতেক ফুল উঠে রে ফুটিয়া
প্রভাতের বায়ু সনে খেলা সাঙ্গ হলে
আপনি শুকায়ে শেষে ঝরে পড়ে যায়—
ওই ফুলে থুয়েছিনু হৃদয়ের আশা,
ওই কুসুমের সাথে খসে পড়ে গেল।

আর কিছুকাল পরে এই দামিনীরে
যে কথা বলিয়াছিনু আজো মনে আছে।
'দামিনী, মনে কি পড়ে সে দিনের কথা?
বলো দেখি কত দিন ওই মুখখানি
দেখি নি তোমার? তাই দেখিতে এয়েছি!
জোছনার রাত্রে যবে বসেছি কাননে,
দুয়েকটি তারা কভু পড়িছে খসিয়া,
হৃতবুদ্ধি দুয়েকটি পথহারা মেঘ
অনন্ত আকাশ-রাজ্যে ভ্রমিছে কেবল,
সে নিস্তব্ধ রজনীতে হৃদয়ে যেমন
একে একে সব কথা উঠে গো জাগিয়া,
তেমনি দেখিনু যেই ওই মুখখানি
স্মৃতি-জাগরণকারী রাগিণীর মতো
ওই মুখখানি তব দেখিনু যেমনি
একে একে পুরাতন সব স্মৃতিগুলি
জীবন্ত হইয়া যেন জাগিল হৃদয়ে।
মনে আছে সেই সখি আর-এক দিন
এমনি গম্ভীর সন্ধ্যা, এই নদীতীর,
এইখানে এই হাত ধরিয়া তোমার
কাতরে কহেছি আমি নয়নের জলে,
'বিদায় দাও গো এবে চলিনু বিদেশে,
দেখো সখি এত দিন বাসিয়াছ ভালো,
দুদিন না দেখে যেন যেয়ো না ভুলিয়া!
সংসারের কর্ম হতে অবসর লয়ে
আবার ফিরিয়া যবে আসিব দামিনী,
নব-অতিথির মতো ভেবো না আমারে
সম্ভ্রমের অভিনয় কোরো না বালিকা!'
কিছুই উত্তর তার দিলে না তখন,
শুধু মুখপানে চেয়ে কাতর নয়নে
ভর্ৎসনার অশ্রুজল করিলে বর্ষণ।
যেন এই নিদারুণ সন্দেহের মোর
অশ্রুজল ছাড়া আর নাইকো উত্তর।
আবার কহিনু আমি ওই মুখ চেয়ে,
'কে জানে মনের মধ্যে কী হয়েছে মোর
আশঙ্কা হতেছে যেন হৃদয়ে আমার
ওই স্নেহ-সুধামাখা মুখখানি তোর
এ জনমে আর বুঝি পাব না দেখিতে।'
নীরব গম্ভীর সেই সন্ধ্যার আঁধারে
সমস্ত জগৎ যেন দিল প্রতিধ্বনি
'এ জনমে আর বুঝি পাব না দেখিতে।'
গম্ভীর নিশীথে যথা আধো ঘুমঘোরে

সুদূর শ্মশান হতে মরণের রব
শুনিলে হৃদয় উঠে কাঁপিয়া কেমন,
তেমনি বিজন সেই তটিনীর তীরে
একাকী আঁধারে যেন শুনিনু কী কথা,
সমস্ত হৃদয় যেন উঠিল শিহরি।
আর বার কহিলাম, 'বিদায়—ভুলো না।'
তখন কি জানিতাম এই নদীতীরে
এই সন্ধ্যাকালে আর তোমারি সমুখে
এমনি মনের দুখে হইবে কাঁদিতে?
তখনো আমার এই বাল্যজীবনের
প্রভাত-নীরদ হতে নব-রক্তরাগ
যায় নি মিলায়ে সখি, তখনো হৃদয়
মরীচিকা দেখিতেছিল দূর শূন্যপটে।
নামিনু সংসারক্ষেত্রে যুঝিনু একাকী,
যাহা কিছু চাহিলাম পাইনু সকলি।
তখন ভাবিনু যাই প্রেমের ছায়ায়
এতদিনকার শ্রান্তি যাবে দূর হয়ে।
সন্ধ্যাকালে মরুভূমে পথিক যেমন
নিরখিয়া দেখে যবে সম্মুখে পশ্চাতে
সুদূরে দেখিতে পায় প্রান্ত দিগন্তের
সুবর্ণ জলদজালে মণ্ডিত কেমন,
সে-দিকে তারকাগুলি চুম্বিছে প্রান্তর,
সায়াহ্নবালার সেথা পূর্ণতম শোভা,
কিন্তু পদতলে তার অসীম বালুকা
সারাদিন জ্বলি জ্বলি তপন-কিরণে
ফেলিছে সায়াহ্নকালে জ্বলন্ত নিশ্বাস।
তেমনি এ সংসারের পথিক যাহারা
ভবিষ্যৎ অতীতের দিগন্তের পানে
চাহি দেখে স্বর্গ সেথা হাসিছে কেবল
পদতলে বর্তমান মরুভূমি সম।
স্মৃতি আর আশা ছাড়া সত্যকার সুখ
মানুষের ভাগ্যে সখি ঘটে নাকো বুঝি!
বিদেশ হইতে যবে আইসে ফিরিয়া
অতি হতভাগা যেও সেও ভাবে মনে
যারে যারে ভালোবাসে সকলেই বুঝি
রহিয়াছে তার তরে আকুল-হৃদয়ে!
তেমনি কতই সখি করেছিনু আশা,
মনে মনে ভেবেছিনু কত-না হরষে
দামিনী আমার বুঝি তৃষিতনয়নে
পথপানে চেয়ে আছে আমারি আশায়।
আমি গিয়ে কব তারে হরষে কাঁদিয়া,

'মুছ অশ্রুজল সখি, বহু দিন পরে
এসেছে বিদেশ হতে ললিত তোমার'।
অমনি দামিনী বুঝি আহ্লাদে উথলি
নীরব অশ্রুর জলে কবে কত কথা।
ফিরিয়া আসিনু যবে—এ কী হল জ্বালা!
কিছুতে নয়নজল নারি সামালিতে।
ফেরো ফেরো চাহিয়ো না এ আঁখির পানে,
প্রাণে বাজে অশ্রুজল দেখাতে তোমায়!
জেনো গো রমণি, জেনো, এত দিন পরে
কাঁদিয়া প্রণয় ভিক্ষা করিতে আসি নি,
এ অশ্রু দুঃখের অশ্রু— এ নহে ভিক্ষার!
কখনো কখনো সখি অন্য মনে যবে
সুবিজন বাতায়নে রয়েছ বসিয়া
সম্মুখে যেতেছে দেখা বিজন প্রান্তর
হেথা হোথা দুয়েকটি বিচ্ছিন্ন কুটির,
হু হু করি বহিতেছে যমুনার বায়ু—
তখন কি সে-দিনের দুয়েকটি কথা
সহসা মনের মধ্যে উঠে না জাগিয়া?
কখন যে জাগি উঠে পার না জানিতে!
দূরতম রাখালের বাঁশিস্বর সম
কভু কভু দুয়েকটি ভাঙা-ভাঙা সুর
অতি মৃদু পশিতেছে শ্রবণবিবরে;
আধো জেগে আধো ঘুমে স্বপ্ন আধো-ভোলা—
তেমনি কি সে-দিনের দুয়েকটি কথা
সহসা মনের মধ্যে উঠে না জাগিয়া?
স্মৃতির নির্ঝর হতে অলক্ষ্যে গোপনে,
পথহারা দুয়েকটি অশ্রুবারিধারা
সহসা পড়ে না ঝরি নেত্রপ্রান্ত হতে,
পড়িছে কি না পড়িছে পার না জানিতে!
একাকী বিজনে কভু অন্যমনে যবে
বসে থাকি, কত কী যে আইসে ভাবনা,
সহসা মুহূর্ত-পরে লভিয়া চেতন
কী কথা ভাবিতেছিনু নাহি পড়ে মনে
অথচ মনের মধ্যে বিষণ্ণ কী ভাব
কেমন আঁধার করি রহে যেন চাপি,
হৃদয়ের সেই ভাবে কখনো কি সখি
সে-দিনের কোনো ছায়া পড়ে না স্মরণে?
ছেলেবেলাকার কোনো বন্ধুর মরণ
স্মরিলে যেমন লাগে হৃদয়ে আঘাত,
তেমনি কি সখি কভু মনে নাহি হয়
সে-সকল দিন কেন গেল গো চলিয়া

যে দিন এ-জন্মে আর আসিবে না ফিরি!
পুরাতন বন্ধু তারা, কত কাল আহা
খেলা করিয়াছি মোরা তাহাদের সাথে,
কত সুখে হাসিয়াছি দুঃখে কাঁদিয়াছি,
সে-সকল সুখ দুঃখ হাসি কান্না লয়ে
মিশাইয়া গেল তারা আঁধার অতীতে!

চলিনু দামিনী পুনঃ চলিনু বিদেশে—
ভাবিলাম একবার দেখিব মুখানি,
একবার শুনাইব মরমের ব্যথা,
তাই আসিয়াছি সখি, এ জনমে আর
আসিব না দিতে তব শান্তিতে ব্যাঘাত,
এ জন্মের তরে সখি কহো একবার
একটি স্নেহের বাণী অভাগার 'পরে,
ভ্রমিয়া বেড়াব যবে সুদূর বিদেশে
সে-কথার প্রতিধ্বনি বাজিবে হৃদয়ে!'

থামো স্মৃতি—থামো তুমি, থামো এইখানে,
সম্মুখে তোমার ও কি দৃশ্য মর্মভেদী?
মালতী আমার সেই প্রাণের ভগিনী,
শৈশবকালের মোর খেলাবার সাথী
যৌবনকালের মোর আশ্রয়ের ছায়া,
প্রতি দুঃখ প্রতি সুখ প্রতি মনোভাব
যার কাছে না বলিলে বুক যেত ফেটে,
সেই সে মালতী মোর হয়েছে বিধবা!
আপনার দুঃখে মগ্ন স্বার্থপর আমি
ভালো করে পারিনু না করিতে সান্ত্বনা!
নিজের চোখের জলে অন্ধ এ নয়নে
পরের চোখের জল পেনু না দেখিতে!
ছেলেবেলাকার সেই পুরানো কুটিরে
হাসিতে হাসিতে এল মালতী আমার,
সে-হাসির চেয়ে ভালো তীব্র অশ্রুজল!
কে জানিত সে-হাসির অন্তরে অন্তরে
কালরাত্রি অন্ধকার রয়েছে লুকায়ে!
একদিনো বলে নি সে কোনো দুঃখ-কথা,
একদিনো কাঁদে নি সে সমুখে আমার!
জানি জানি মালতী সে স্বর্গের দেবতা!
নিজের প্রাণের বহ্নি করিয়া গোপন,
পরের চোখের জল দিত সে মুছায়ে।

ছেলেবেলাকার সেই হাসিটি তাহার
সমস্ত আনন তার রাখিত উজলি,
কত-না করিত যত্ন করিত সান্ত্বনা।
হাসিতে হাসিতে কত করিত আদর!
কিন্তু হা, শ্মশানে যথা চাঁদের জোছনা
শ্মশানের ভীষণতা বাড়ায় দ্বিগুণ—
মালতীর সেই হাসি দেখিয়া তেমনি
নিজের এ হৃদয়ের ভগ্ন-অবশেষ
দ্বিগুণ পড়িত যেন নয়নে আমার!
তাহার আদর পেয়ে ভুলিনু যাতনা,
কিন্তু হায়, দেখি নাই, বিজন-শয্যায়
কত দিন কাঁদিয়াছে মালতী গোপনে!
সে যখন দেখিত, তাহার বাল্যসখা
দিনে দিনে অবসাদে হইছে মলিন,
দিনে দিনে মন তার যেতেছে ভাঙিয়া,
তখন আকুলা বালা রাত্রে একাকিনী
কাঁদিয়া দেবতা কাছে করেছে প্রার্থনা—
বালিকার অশ্রুময় সে প্রার্থনাগুলি
আর কেহ শুনে নাই অন্তর্যামী ছাড়া!
দেখি নাই কত রাত্রি একাকিনী গিয়া
যমুনার তীরে বসি কাঁদিত বিরলে!
একাকিনী কেঁদে কেঁদে হইত প্রভাত,
এলোথেলো কেশপাশে পড়িত শিশির,
চাহিয়া রহিত উষা ম্লান মুখপানে!
বিষময়, বহ্নিময়, বজ্রময় প্রেম,
এ স্নেহের কাছে তুই ঢাক মুখ ঢাক।
তুই মরণের কীট, জীবনের রাহু,
সৌন্দর্য-কুসুম-বনে তুই দাবানল,
হৃদয়ের রোগ তুই, প্রাণের মাঝারে
সতত রাখিস তুই পিপাসা পুষিয়া,
ভুজঙ্গ বাহুর পাকে মর্ম জড়াইয়া
কেবলি ফেলিস তুই বিষাক্ত নিশ্বাস,
আগ্নেয় নিশ্বাসে তোর জ্বলিয়া জ্বলিয়া
হৃদয়ে ফুটিতে থাকে তপ্ত রক্তস্রোত।
জরজর কলেবর, আবেশে অসাড়,
শিথিল শিরার গ্রন্থি, অচেতন প্রাণ,
স্খলিত জড়িত বাণী, অবশ নয়ন,
আশা ও নিরাশা-পাকে ঘুরিছে হৃদয়,
ঘুরিছে চোখের 'পরে জগতসংসার!
এই প্রেম, এই বিষ, বজ্র-হুতাশন
কবে রে পৃথিবী হতে যাবে দূর হয়ে!

আয় স্নেহ, আয় তোর স্নিগ্ধসুধা ঢালি
এ জ্বলন্ত বহ্নিরাশি দে রে নিবাইয়া।
অগ্নিময় বৃশ্চিকের আলিঙ্গন হতে,
সুধাসিক্ত কোলে তোর তুলে নে তুলে নে।
প্রেম-ধূমকেতু ওই উঠেছে আকাশে,
ঝলসি দিতেছে, হায়, যৌবনের আঁখি,
কোথা তুমি ধ্রুবতারা ওঠো একবার,
ঢালো এ জ্বলন্ত নেত্রে স্নিগ্ধ মৃদু জ্যোতি।
তুমি সুধা, তুমি ছায়া, তুমি জ্যোৎস্নাধারা,
তুমি স্রোতস্বিনী, তুমি উষার বাতাস,
তুমি হাসি, তুমি আশা, মৃদু অশ্রুজল,
এসো তুমি এ প্রেমেরে দাও নিভাইয়া।
একটি মালতী যার আছে এ সংসারে
সহস্র দামিনী তার ধূলিমুষ্টি নয়!

ক্রমশ হৃদয় মোর এল শান্ত হয়ে
যন্ত্রণা বিষাদে আসি হল পরিণত।
নিস্তরঙ্গ সরসীর প্রশান্ত হৃদয়ে
নিশীথের শান্ত বায়ু ভ্রমে গো যখন,
এত শান্ত এত মৃদু পদক্ষেপ তার
একটি চরণচিহ্ন পড়ে না সরসে,
তেমনি প্রশান্ত হৃদে প্রশান্ত বিষাদ
ফেলিতে লাগিল ধীরে মৃদুল নিশ্বাস।
নিরখিয়া নিদারুণ ঝটিকার মাঝে
হাসিময় শান্ত সেই মালতী কুসুমে
ক্রমশ হৃদয় মোর এল শান্ত হয়ে।
কিন্তু হায় কে জানিত সেই হাসিময়
সুকুমার ফুলটির মর্মের মাঝারে
মরণের কীট পশি করিতেছে ক্ষয়!
হইল প্রফুল্লতর মুখখানি তার,
হইল প্রশান্ততর হাসিটি তাহার,
দিবা যবে যায় যায়, হাসিময় মেঘে
দূর আঁধারের মুখ করয়ে উজ্জ্বল—
এ হাসি তেমনি হাসি কে জানিত তাহা!
একদা পূর্ণিমারাত্রে নিস্তব্ধ গভীর
মুখপানে চেয়ে বালা, হাত ধরি মোর
কহিল মৃদুলস্বরে—'যাই তবে ভাই!'
কোথা গেলি—কোথা গেলি মালতী আমার
অভাগা ভ্রাতারে তোর রাখিয়া হেথায়!
দুঃখের কণ্টকময় সংসারের পথে
মালতী, কে লয়ে যাবে হাত ধরি মোর?

সংসারের ধ্রুবতারা ডুবিল আমার।
তেমন পূর্ণিমা রাত্রি দেখি নি কখনো,
পৃথিবী ঘুমাইতেছে শান্ত জোছনায়;
কহিনু পাগল হয়ে— 'রাক্ষসী পৃথিবী
এত রূপ তোরে কভু সাজে না সাজে না!'

মালতী শুকায়ে গেল, সুবাস তাহার
এখনো রয়েছে কিন্তু ভরিয়া কুটির।
তাহার মনের ছায়া এখনো যেন রে
সে কুটিরে শান্তিরসে রেখেছে ডুবায়ে!
সে শান্ত প্রতিমা মম মনের মন্দির
রেখেছে পবিত্র করি রেখেছে উজ্জ্বলি!

প্রকাশকাল : ১২৮৯

প্রভাতসংগীত

স্নেহ উপহার

শ্রীমতী ইন্দিরা প্রাণাধিকাসু।

বাব্‌লা।

আয় রে বাছা কোলে বসে চা' মোর মুখ-পানে,
হাসিখুশি প্রাণখানি তোর প্রভাত ডেকে আনে।
আমায় দেখে আসিস ছুটে, আমায় বাসিস ভালো,
কোথা হতে পড়লি প্রাণে তুই রে উষার আলো!

দেখ্ রে প্রাণে স্নেহের মতো সাদা সাদা জুঁই ফুটেছে।
দেখ্ রে, আমার গানের সাথে ফুলের গন্ধ জড়িয়ে গেছে।
গেথেছি রে গানের মালা, ভোরের বেলা বনে এসে
মনে বড়ো সাধ হয়েছে পরাব তোর এলোকেশে!
গানের সাথে ফুলের সাথে মুখখানি মানাবে ভালো,
আয় রে তবে আয় রে মেয়ে দেখ্ রে চেয়ে রাত পোহালো!
কচিমুখটি ঘিরে দেব ললিতরাগিণী দিয়ে,
বাপের কাছে মায়ের কাছে দেখিয়ে আসবি ছুটে গিয়ে!

চাঁদনি রাতে বেড়াই ছাতে মুখখানি তোর মনে পড়ে,
তোর কথাটাই কিলিবিলি মনের মধ্যে নড়েচড়ে!
হাসি হাসি মুখখানি তোর ভেসে ভেসে বেড়ায় কাছে,
হাসি যেন এগিয়ে এল, মুখটি যেন পিছিয়ে আছে!
কচি প্রাণের আনন্দ তোর ভাঙা বুকে দে ছড়িয়ে,
ছোটো দুটি হাত দিয়ে তোর গলাটি মোর ধর জড়িয়ে!

বিজন প্রাণের দ্বারে বসে করবি রে তুই ছেলেখেলা,
চুপ করে তাই বসে বসে দেখব আমি সন্ধেবেলা।
কোথায় আছিস, সাড়া দে রে, বুকের কাছে আয় রে তবে,
তোর মুখেতে গানগুলি মোর কেমন শোনায় শুনতে হবে!

আমি যেন দাঁড়িয়ে আছি একটা বাবলা গাছের মতো
বড়ো বড়ো কাঁটার ভয়ে তফাত থাকে লতা যত।
সকাল হলে মনের সুখে ডালে ডালে ডাকে পাখি,
আমার কাঁটা-ডালে কেউ ডাকে না চুপ করে তাই দাঁড়িয়ে থাকি!
নেই বা লতা এল কাছে, নেই বা পাখি বসল শাখে,
যদি আমার বুকের কাছে বাবলা ফুলটি ফুটে থাকে!
বাতাসেতে দুলে দুলে ছড়িয়ে দেয় রে মিষ্টি হাসি,
কাঁটা-জন্ম ভুলে গিয়ে তাই দেখে হরষে ভাসি!
দূর কর ছাই, ঝোঁকের মাথায় বলে ফেললেম কত কী যে?
কথাগুলো ঠেকছে যেন চোখের জলে ভিজে ভিজে!

রবি কাকা।

প্রকাশকাল : ১২৯০

শরতে প্রকৃতি

কই গো প্রকৃতি রানী, দেখি দেখি মুখখানি,
কেন গো বিষাদছায়া রয়েছে অধর ছুঁয়ে
মুখানি মলিন কেন গো?
এই যে মুহূর্ত আগে হাসিতে ছিলে গো দেখি
পলক না পালটিতে সহসা নেহারি এ কি—
মরমে বিলীন যেন গো!
কেন তনুখানি ঢাকা শুভ্র কুহেলিকা বাসে
মৃদু বিষাদের ভারে সুধীরে মুদিয়া আসে
নয়ন-নলিন হেন গো?

ওই দেখো চেয়ে দেখো— একবার চেয়ে দেখো—
চাঁদের অধর দুটি হাসিতে ভাসিয়া যায়!
নিশীথের প্রাণে গিয়া সে হাসি মিশিয়া যায়।
সে হাসির কোলে বসি কানন-গোলাপগুলি
আধো আধো কথা কহে সোহাগেতে দুলি দুলি!
সে হাসির পায়ে পড়ি নদীর লহরীগণ
যার যত কথা আছে বলিতে আকুল মন।
সে-হাসির শিশুদুটি লতিকামণ্ডপে গিয়া
আঁধারে ভাবিয়া সারা বাহিরিবে কোথা দিয়া।
সে-হাসি অলসে ঢলি দিগন্তে পড়িয়া নুয়ে,
মেঘের অধরপ্রান্ত একটু রয়েছে ছুঁয়ে।

বলো তুমি কেন তবে
এমন মলিন রবে?
বিষাদ-স্বপন দেখে হাসির কোলেতে শুয়ে।

ঘোমটাটি খোলো খোলো
মুখখানি তোলো তোলো
চাঁদের মুখের পানে চাও একবার!
বলো দেখি কারে হেরি এত হাসি তার!
নিলাজ বসন্ত যবে কুসুমে কুসুমময়
মাতিয়া নিজের রূপে হাসিয়া আকুল হয়,
মলয় মরমে মরি,
ফিরে হাহাকার করি—
বনের হৃদয় হতে সৌরভ-উচ্ছ্বাস বয়।
তারে হেরি হয় না সে এমন হরষে ভোর;
কী চোখে দেখেছে চাঁদ ওই মুখখানি তোর!
তুই তবু কেন কেন
দারুণ বিরাগে যেন
চাস নে চাঁদের হাসি চাঁদের আদর!
নাই তোর ফুলবাস,
নাইক প্রেমের হাস,
পাপিয়া আড়ালে বসি শুনায় না প্রেমগান!
কী দুখেতে উদাসিনী
যৌবনেতে সন্ন্যাসিনী!
কাহার ধেয়ানে মগ্ন শুভ্র বস্ত্র পরিধান?

এক-কালে ছিল তোর কুসুমিত মধুমাস—
হৃদয়ে ফুটিত তোর অজস্র ফুলের রাশ;
যৌবন-উচ্ছ্বাসে ভোর
প্রাণের সুরভি তোর
পথিক সমীরে সব দিলি তুই বিলাইয়া!
শেষে গ্রীষ্মতাপে জ্বলি
শুকাইল ফুল-কলি,
সর্বস্ব যাহারে দিলি সেও গেল পলাইয়া!
চেতনা পাইয়া শেষে হইয়া সর্বস্ব-হারা
সারাটি বরষা তুই কাঁদিয়া হইলি সারা!
এত দিন পরে বুঝি শুকাইল অশ্রুধারা!
আজ বুঝি মনে মনে করিলি দারুণ পণ
যোগিনী হইবি তুই পাষাণে বাঁধিবি মন।
বসন্তের ছেলেখেলা ভালো নাহি লাগে আর—
চপল চঞ্চল হাসি ফুলময় অলংকার!
এখন যে হাসি হাসো আজি বিরাগের দিন,
শুভ্র শান্ত সুবিমল বাসনা-লালসাহীন।

এত যে করিলি পণ
তবুও তো ক্ষণে ক্ষণ
সে দিনের স্মৃতিছায়া হৃদয়ে বেড়ায় ভাসি।
প্রশান্ত মুখের 'পরে
কুহেলিকা ছায়া পড়ে—
ভাবনার মেঘ উঠে সহসা আলোক নাশি—
মুহূর্তে কিসের লাগি
আবার উঠিস জাগি
আবার অধরে ফুটে সেই সে পুরানো হাসি।

ঘুমায়ে পড়িস যবে বিহ্বল রজনীশেষে,
অতি মৃদু পা টিপিয়া উষা আসে হেসে হেসে,
অতিশয় সাবধানে দুইটি আঙুল দিয়া
কুয়াশা-ঘোমটা তোর দেয় ধীরে সরাইয়া।
অমনি তরুণ রবি পাশে আসি মৃদুগতি
মুদিত নয়ন তোর চুমে ধীরে ধীরে অতি।
শিহরিয়া কাঁপি উঠি
মেলিস নয়ন দুটি,
রাঙা হয়ে ওঠে তোর কপোল-কুসুমদল
শরমে আকুল ঝরে শিশির-নয়নজল।

সুদূর আলয় হতে তাড়াতাড়ি খেলা ভুলি
মাঝে মাঝে ছুটে আসে দুদণ্ডের মেঘগুলি।
চমকি দাঁড়ায়ে থাকে, ওই মুখপানে চায়,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষে কাঁদিয়া মরিয়া যায়।
কিসের বিরাগ এত, কী তপে আছিস ভোর।
এত করে সেধে সেধে
এত করে কেঁদে কেঁদে
যোগিনী, কিছুতে তবু ভাঙিবে না পণ তোর?
যোগিনী, কিছুতে কি রে ফিরিবে না মন তোর?

ভারতী
আশ্বিন ১২৮৭

ছবি ও গান

বিরহ

ধীরে ধীরে প্রভাত হল, আঁধার মিলায়ে গেল
উষা হাসে কনকবরণী,
বকুল গাছের তলে কুসুম রাশির পরে
বসিয়া পড়িল সে রমণী,

আঁখি দিয়ে ঝরঝরে অশ্রুবারি ঝ'রে পড়ে
ভেঙে যেতে চায় যেন বুক,
রাঙা রাঙা অধর দুটি কেঁপে কেঁপে ওঠে কতো,
করতলে সকরুণ মুখ।
অরুণ আঁখির 'পরে, অরুণের আভা পড়ে,
কেশপাশে অরুণ লুকায়,
দুই হাতে মুখ ঢাকে কার নাম ধরে ডাকে
কেন তার সাড়া নাহি পায়।
বহিছে প্রভাত-বায় আঁচল লুটিয়ে যায়,
মাথায় ঝরিয়ে পড়ে ফুল,
ডালপালা দোলে ধীরে কাননে সরসীতীরে
ফুটে ওঠে মল্লিকা মুকুল।
পা দুখানি ছড়াইয়া পুরবের পানে চেয়ে
ললিতে প্রাণের গান গায়
গাহিতে গাহিতে গান, সব যেন অবসান
যেন সব-কিছু ভুলে যায়।
প্রাণ যেন গানে মিশে, অনন্ত আকাশ-মাঝে
উদাসী হইয়ে চ'লে যায়,
ব'সে ব'সে শুধু গান গায়।

কাল : ১২৯০

সিংহ ঠাকুরের পদাবলী

১

সখিরে— পিরীত বুঝবে কে?
আঁধার হৃদয়ক দুঃখ কাহিনী
বোলব, শুনবে কে?
রাধিকার অতি অন্তর বেদন
কে বুঝবে অয়ি সজনী
কে বুঝবে সখি রোয়ত রাধা
কোন দুখে দিন রজনী?
কলঙ্ক রটায়ব জনি সখি রটাও
কলঙ্ক নাহিক মানি,
সকল তয়াগব লভিতে শ্যামক
একঠো আদর বাণী।
মিনতি করিলো সখি শত শত বার, তু
শ্যামক না দিহ গারি,
শীল মান কুল, অপনি সজনি হম
চরণে দেয়নু ডারি।

সখিলো—
বৃন্দাবনকো দুরজন মানুখ
পিরীত নাহিক জানে,
বৃথাই নিন্দা কাহ রটায়ত
হমার শ্যামক নামে?
কলঙ্কিনী হম রাধা, সখিলো
ঘৃণা করহ জনি মনমে
ন আসিও তব্ কবহুঁ সজনিলো
হমার আঁধা ভবনমে।
কহে ভানু অব— বুঝবে না সখি
কোহি মরমকো বাত,
বিরলে শ্যামক কহিও বেদন
বৃক্ষে রাখয়ি মাথ।

ভারতী
ফাল্গুন ১২৮৪

২

হম সখি দারিদ নারী!
জনম অবধি হম পীরিতি করনু
মোচনু লোচন-বারি।
রূপ নাহি মম, কছুই নাহি গুণ
দুখিনী আহির জাতি,
নাহি জানি কছু বিলাস-ভঙ্গিম
যৌবন গরবে মাতি।
অবলা রমণী, ক্ষুদ্র হৃদয় ভরি
পীরিত করনে জানি;
এক নিমিখ পল, নিরখি শ্যাম জনি
সোই বহুত করি মানি।
কুঞ্জ পথে যব নিরখি সজনি হম,
শ্যামক চরণক চীনা,
শত শত বেরি ধূলি চুম্বি সখি,
রতন পাই জনু দীনা।
নিঠুর বিধাতা, এ দুখ-জনমে
মাঙব কি তুয়া পাশ!
জনম অভাগী, উপেখিতা হম,
বহুত নাহি করি আশ,—
দূর থাকি হম রূপ হেরইব,
দূরে শুনইব বাঁশি।
দূর দূর রহি সুখে নিরীখিব
শ্যামক মোহন হাসি।
শ্যাম-প্রেয়সি রাধা! সখিলো!
থাক' সুখে চিরদিন!

তুয়া সুখে হম রোয়ব না সখি
অভাগিনী গুণ হীন।
অপন দুখে সখি, হম রোয়ব লো
নিভৃতে মুছইব বারি।
কোহি ন জানব, কোন বিষাদে
তন-মন দহে হমারি।
ভানু সিংহ ভনয়ে, শুন কালা
দুখিনী অবলা বালা—
উপেখার অতি তিখিনী বাণে
না দিহ না দিহ জ্বালা।

ভারতী
মাঘ ১২৮৪

কড়ি ও কোমল

শরতের শুকতারা

একাদশী রজনী
পোহায় ধীরে ধীরে—
রাঙা মেঘ দাঁড়ায়
উষারে ঘিরে ঘিরে।
ক্ষীণ চাঁদ নভের
আড়ালে যেতে চায়,
মাঝখানে দাঁড়ায়ে
কিনারা নাহি পায়।
বড়ো ম্লান হয়েছে
চাঁদের মুখখানি,
আপনাতে আপনি
মিশাবে অনুমানি।
হেরো দেখো কে ওই
এসেছে তার কাছে,
শুকতারা চাঁদের
মুখেতে চেয়ে আছে।
মরি মরি কে তুমি
একটুখানি প্রাণ,
কী না জানি এনেছ
করিতে ওরে দান।
চেয়ে দেখো আকাশে
আর তো কেহ নাই,
তারা যত গিয়েছে
যে যার নিজ ঠাঁই।

সাথীহারা চন্দ্রমা
হেরিছে চারি ধার,
শূন্য আহা নিশির
বাসর-ঘর তার!
শরতের প্রভাতে
বিমল মুখ নিয়ে
তুমি শুধু রয়েছ
শিয়রে দাঁড়াইয়ে।
ও হয়তো দেখিতে
পেলে না মুখ তোর!
ও হয়তো তারার
খেলার গান গায়,
ও হয়তো বিরাগে
উদাসী হতে চায়!
ও কেবল নিশির
হাসির অবশেষ!
ও কেবল অতীত
সুখের স্মৃতিলেশ!
দ্রুতপদে তাহারা
কোথায় চলে গেছে—
সাথে যেতে পারে নি
পিছনে পড়ে আছে!
কত দিন উঠেছ
নিশির শেষাশেষি,
দেখিয়াছ চাঁদেতে
তারাতে মেশামেশি!
দুই দণ্ড চাহিয়া
আবার চলে যেতে,
মুখখানি লুকাতে
উষার আঁচলেতে।
পুরবের একান্তে
একটু দিয়ে দেখা,
কী ভাবিয়া তখনি
ফিরিতে একা একা।
আজ তুমি দেখেছ
চাঁদের কেহ নাই,
স্নেহময়ি, আপনি
এসেছ তুমি তাই!
দেহখানি মিলায়
মিলায় বুঝি তার!

হাসিটুকু রহে না
রহে না বুঝি আর!
দুই দণ্ড পরে তো
রবে না কিছু হায়!
কোথা তুমি, কোথায়
চাঁদের ক্ষীণকায়!
কোলাহল তুলিয়া
গরবে আসে দিন,
দুটি ছোটো প্রাণের
লিখন হবে লীন।
সুখশ্রমে মলিন
চাঁদের একসনে
নবপ্রেম মিলাবে
কাহার রবে মনে!

ভারতী
অগ্রহায়ণ ১২৯১

পত্র

শ্রীমতী ইন্দিরা প্রাণাধিকাসু

স্টীমার। খুলনা

মাগো আমার লক্ষ্মী,
মনিষ্যি না পক্ষী!
এই ছিলেম তরীতে,
কোথায় এনু ত্বরিতে!
কাল ছিলেম খুলনায়,
তাতে তো আর ভুল নাই,
কলকাতায় এসেছি সদ্য,
বসে বসে লিখছি পদ্য।

তোদের ফেলে সারাটা দিন
আছি অমনি এক রকম,
খোপে বসে পায়রা যেন
করছি কেবল বক্‌বকম।
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
মেঘ করেছে আকাশে,
উষার রাঙা মুখখানি গো
কেমন যেন ফ্যাকাশে!
বাড়িতে যে কেউ কোথা নেই
দুয়োরগুলো ভেজানো,

ঘরে ঘরে খুঁজে বেড়াই
ঘরে আছে কে যেন।
পক্ষীটি সেই ঝুপসি হয়ে
ঝিমচ্ছে রে খাঁচাতে,
ভুলে গেছে নেচে নেচে
পুচ্ছটি তার নাচাতে।
ঘরের কোণে আপন মনে
শূন্য পড়ে বিছেনা,
কাহার তরে কেঁদে মরে
সে কথাটা মিছে না।
বইগুলো সব ছড়িয়ে প'ড়ে
নাম লেখা তায় কার গো।
এমনি তারা রবে কি রে
খুলবে না কেউ আর গো।
এটা আছে সেটা আছে
অভাব কিছু নেই তো,
স্মরণ করে দেয় রে যারে
থাকে নাকো সেই তো।
বাগানে ওই দুটো গাছে
ফুল ফুটেছে রাশি রাশি,
ফুলের গন্ধে মনে পড়ে
ফুল কে আমায় দিত মেলা,
বিছেনায় কার মুখটি দেখে
সকাল হত সকালবেলা।
জল থেকে তুই আসবি কবে
মাটির লক্ষ্মী মাটিতে
ঠাকুরবাবুর ছয় নম্বর
জোড়াসাঁকোর বাটীতে।

ইস্টিম ওই রে ফুরিয়ে এল
নোঙর তবে ফেলি অদ্য।
অবিদিত নেই তো তোমায়
রবিকাকা কুঁড়ের হদ্দ।
আজকে নাকি মেঘ করেছে
ঠেকছে কেমন কাঁকা-কাঁকা,
তাই খানিকটা কোঁসকোঁসিয়ে
বিদায় হল—
রবিকাকা।

কলিকাতা
প্রকাশকাল : ১২৯৩

পত্র

শ্রীমতী ইন্দিরা প্রাণাধিকাসু

স্টীমার। খুলনা

বসে বসে লিখলেম চিঠি
পুরিয়ে দিলাম চারটি পিঠই,
পেলেম না তার জবাবই
এমনি তোমার নবাবী!

দুটো ছত্র লিখবি পত্র
একলা তোমার 'রব্-কা' যে!
পোড়ারমুখী তাও হবে না
আলিস্যি তোর সব কাজে!
ঝগড়াটে নয় স্বভাব আমার
নইলে দেখতে কারখানা,
গলার চোটে আকাশ ফেটে
হয়ে যেত চারখানা,
বাছা আমার দেখতে পেতে
এই কলমের ধারখানা!

তোমার মতো এমনি মা তো
দেখি নি এ বঙ্গে গো,
মায়া দয়া যা-কিছু সে
যদিন থাকে সঙ্গে গো!
চোখের আড়াল প্রাণের আড়াল
কেমনতরো ঢঙ এ গো!
তোমার প্রাণ যে পাষাণ-সম
জানি সেটা long ago!

সংসারে যে সবি মায়া
সেটা নেহাত গল্প না!
বাইরেতে এক ভিতরে এক
এ যেন কার খল-পনা!
সত্যি বলে যেটা দেখি
সেটা আমার কল্পনা!
ভেবে একবার দেখো বাছা
ফিলজফি অল্প না!

মস্ত একটা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ
কে রেখেছে সাজিয়ে
যা করি তা কেবল 'থোড়া
জমির বাস্তে কাজিয়ে!'

বৃষ্টি পড়ে চিঠি না পাই,
মনটা নিয়ে ততই হাঁপাই,
শূন্যে চেয়ে ততই ভাবি
সকলি ভোজ-বাজি এ!
ফিলজফি মনের মধ্যে
ততই ওঠে গাঁজিয়ে!

দূর হোক গে, এত কথা
কেনই বলি তোমাকে!
ভরা নায়ে পা দিয়েছ,
আছ তুমি দেমাকে!

...

তোমার সঙ্গে আর কথা না,
তুমি এখন লোকটা মস্ত,
কাজ কি বাপু, এইখেনেতেই
রবীন্দ্রনাথ হলেন অস্ত।

জন্মতিথির উপহার

একটি কাঠের বাক্স
শ্রীমতী ইন্দিরা প্রাণাধিকাসু

স্নেহ-উপহার এনেছি রে দিতে
লিখেও এনেছি দু-তিন ছত্তর।
দিতে কত কী যে সাধ যায় তোরে
দেবার মতো নেই জিনিস-পত্তর!
টাকাকড়িগুলো ট্যাকশালে আছে
ব্যাঙ্কে আছে সব জমা,
ট্যাঁকে আছে খালি গোটা দুত্তিন,
এবার করো বাছা ক্ষমা!
হীরে জহরাৎ যত ছিল মোর
পোঁতা ছিল সব মাটিতে,
জহরী যে যেত সন্ধান পেয়ে
নে গেছে যে যার বাটীতে!
দুনিয়া শহর জমিদারি মোর,
পাঁচ ভূতে করে কাড়াকাড়ি,
হাতের কাছেতে যা-কিছু পেলুম,
নিয়ে এনু তাই তাড়াতাড়ি!
স্নেহ যদি কাছে রেখে যাওয়া যেত
চোখে যদি দেখা যেত রে,

বাজারে-জিনিস কিনে নিয়ে এসে
বল্‌ দেখি দিত কে তোরে!
জিনিসটা অতি যৎসামান্য
রাখিস ঘরের কোণে,
বাক্সখানি ভরে স্নেহ দিনু তোরে
এইটে থাকে যেন মনে!
বড়োসড়ো হবি ফাঁকি দিয়ে যাবি,
কোন্‌খেনে রবি লুকিয়ে,
কাকা-ফাকা সব ধুয়ে-মুছে ফেলে
দিবি একেবারে চুকিয়ে।
তখন যদি রে এই কাঠখানা
মনে একটুকু তোলে ঢেউ—
একবার যদি মনে পড়ে তোর
'বুজি' বলে বুঝি ছিল কেউ!
এই-যে সংসারে আছি মোরা সবে
এ বড়ো বিষম দেশটা!
ফাঁকিফুঁকি দিয়ে দূরে চলে যেতে
ভুলে যেতে সবার চেষ্টা!
ভয়ে ভয়ে তাই সবারে সবাই
কত কী যে এনে দিচ্ছে,
এটা-ওটা দিয়ে স্মরণ জাগিয়ে
বেঁধে রাখিবার ইচ্ছে!
মনে রাখতে যে মেলাই কাঠ-খড় চাই,
ভুলে যাবার ভারি সুবিধে,
ভালোবাস যারে কাছে রাখ তারে
যাহা পাস তারে খুবি দে!
বুঝে কাজ নেই এত শত কথা,
ফিলজফি হোক ছাই!
বেঁচে থাকো তুমি সুখে থাকো বাছা
বালাই নিয়ে মরে যাই!

প্রকাশকাল : ১২৯৩

চিঠি

শ্রীমতী ইন্দিরা প্রাণাধিকাসু

স্টীমার 'রাজহংস'। গঙ্গা

চিঠি লিখব কথা ছিল,
দেখছি সেটা ভারি শক্ত।
তেমন যদি খবর থাকে
লিখতে পারি তক্ত তক্ত।

খবর বয়ে বেড়ায় ঘুরে
খবরওয়ালা ঝাঁকা-মুটে।
আমি বাপু ভাবের ভক্ত
বেড়াই নাকো খবর খুঁটে।
এত ধুলো, এত খবর
কলকাতাটার গলিতে!
নাকে ঢোকে খবর ঢোকে
দু-চার কদম চলিতে।
এত খবর সয় না আমার
মরি আমি হাঁপোষে।
ঘরে এসেই খবরগুলো
মুছে ফেলি পাপোষে।
আমাকে তো জানই বাছা!
আমি একজন খেয়ালি।
কথাগুলো যা বলি, তার
অধিকাংশই হেঁয়ালি।
আমার যত খবর আসে
ভোরের বেলা পুব দিয়ে।
পেটের কথা তুলি আমি
পেটের মধ্যে ডুব দিয়ে।
আকাশ ঘিরে জাল ফেলে
তারা ধরাই ব্যাবসা।
থাক্ গে তোমার পাটের হাটে
মথুর কুণ্ডু শিবু সা।
কল্পতরুর তলায় থাকি
নই গো আমি খবুরে।
হাঁ করিয়ে চেয়ে আছি
মেওয়া ফলে সবুরে।
তবে যদি নেহাত কর
খবর নিয়ে টানাটানি।
আমি বাপু একটি কেবল
দুষ্টু মেয়ের খবর জানি।
দুষ্টুমি তার শোন যদি
অবাক হবে সত্যি।
এত বড়ো বড়ো কথা তার
মুখখানি একরত্তি।
মনে মনে জানেন তিনি
ভারি মস্ত লোকটা।
লোকের সঙ্গে না-হক কেবল
ঝগড়া করবার ঝোঁকটা।

আমার সঙ্গেই যত বিবাদ
কথায় কথায় আড়ি।
এর নাম কি ভদ্র ব্যাভার!
বড্ড বাড়াবাড়ি।
মনে করেছি তার সঙ্গে
কথাবার্তা বন্ধ করি।
প্রতিজ্ঞা থাকে না পাছে
সেইটে ভারি সন্দ করি।
সে না হলে সকাল বেলায়
চামেলি কি ফুটবে!
সে নইলে কি সন্ধে বেলায়
সন্ধেতারা উঠবে।
সে না হলে দিনটা ফাঁকি
আগাগোড়াই মস্করা।
পোড়ারমুখী জানে সেটা
তাই এত তার আস্কারা।
চুড়ি-পরা হাত দুখানি
কতই জানে ফন্দি।
কোনোমতে তার সাথে তাই
করে আছি সন্ধি।

নাম যদি তার জিগেস কর
নামটি বলা হবে না।
কী জানি সে শোনে যদি
প্রাণটি আমার রবে না।
নামের খবর কে রাখে তার
ডাকি তারে যা খুশি।
দুষ্টু বলো, দস্যি বলো,
পোড়ারমুখী, রাক্কুসী।
বাপ মায়ে যে নাম দিয়েছে
বাপ মায়েরি থাক্ সে।
ছিষ্টি খুঁজে মিষ্টি নামটি
তুলে রাখুন বাক্সে!
এক জনেতে নাম রাখবে
অন্নপ্রাশনে।
বিশ্বসুদ্ধ সে নাম নেবে
বিষম শাসন এ!
নিজের মনের মতো সবাই
করুক নামকরণ।
বাবা ডাকুন 'চন্দ্রকুমার'
খুড়ো 'রামচরণ'।

ধার-করা নাম নেব আমি
হবে না তো সিটি।
জানই আমার সকল কাজে
Originality।
ঘরের মেয়ে তার কি সাজে
সংস্কৃত নাম।
এতে কেবল বেড়ে ওঠে
অভিধানের দাম।
আমি বাপু ডেকে বসি
যেটা মুখে আসে,
যারে ডাকি সেই তা বোঝে
আর সকলে হাসে!
দুষ্টু মেয়ের দুষ্টুমি— তায়
কোথায় দেব দাঁড়ি!
অকূল পাথার দেখে শেষে
কলমের হাল ছাড়ি!
শোনো বাছা, সত্যি কথা
বলি তোমার কাছে—
ত্রিজগতে তেমন মেয়ে
একটি কেবল আছে।
বর্ণিমেটা কারো সঙ্গে
মিলে পাছে যায়—
তুমুল ব্যাপার উঠবে বেধে
হবে বিষম দায়!
হপ্তাখানেক বকাবকি
ঝগড়াঝাঁটির পালা,
একটু চিঠি লিখে, শেষে
প্রাণটা ঝালাফালা।
আমি বাপু ভালোমানুষ
মুখে নেইকো রা।
ঘরের কোণে বসে বসে
গোঁফে দিচ্ছি তা।
আমি যত গোলে পড়ি
শুনি নানান বাক্যি।
খোঁড়ার পা যে খানায় পড়ে
আমিই তাহার সাক্ষী।
আমি কারো নাম করি নি
তবু ভয়ে মরি।
তুই পাছে নিস গায়ে পেতে
সেইটো বড়ো ডরি।

কথা একটা উঠলে মনে
ভারি তোরা জ্বালাস।
আমি বাপু আগে থাকতে
বলে হলুম খালাস!

বালক
ফাল্গুন ১২৯২

পত্র

শ্রীমান্ দামু বসু এবং চামু বসু
সম্পাদক সমীপেষু।
দামু বোস আর চামু বোসে
কাগজ বেনিয়েছে
বিদ্যেখানা বড্ড ফেনিয়েছে!
(আমার দামু আমার চামু!)
কোথায় গেল বাবা তোমার
মা জননী কই!
সাত-রাজার-ধন মানিক ছেলের
মুখে ফুটছে খই!
(আমার দামু আমার চামু!)
দামু ছিল একরত্তি
চামু তথৈবচ,
কোথা থেকে এল শিখে
এতই খচমচ!
(আমার দামু আমার চামু!)
দামু বলেন 'দাদা আমার'
চামু বলেন 'ভাই',
আমাদের দোঁহাকার মতো
ত্রিভুবনে নাই!
(আমার দামু আমার চামু!)
গায়ে পড়ে গাল পাড়ছে
বাজার সরগরম,
মেছুনি-সংহিতায় ব্যাখ্যা
হিঁদুর ধরম!
(দামু আমার চামু!)
দামুচন্দ্র অতি হিঁদু
আরো হিঁদু চামু
সঙ্গে সঙ্গে গজায় হিঁদু
রামু বামু শামু
(দামু আমার চামু!)

রব উঠেছে ভারতভূমে
হিঁদু মেলা ভার,
দামু চামু দেখা দিয়েছেন
ভয় নেইকো আর।
(ওরে দামু, ওরে চামু!)
নাই বটে গোতম অত্রি
যে যার গেছে সরে,
হিঁদু দামু চামু এলেন
কাগজ হাতে করে।
(আহা দামু আহা চামু!)
লিখছে দোঁহে হিঁদুশাস্ত্র
এডিটোরিয়াল,
দামু বলছে মিথ্যে কথা
চামু দিচ্ছে গাল।
(হায় দামু হায় চামু!)
এমন হিঁদু মিলবে না রে
সকল হিঁদুর সেরা,
বোস বংশ আর্যবংশ
সেই বংশের এঁরা!
(বোস দামু বোস চামু!)
কলির শেষে প্রজাপতি
তুলেছিলেন হাই,
সুড়সুড়িয়ে বেরিয়ে এলেন
আর্য দুটি ভাই ;
(আর্য দামু চামু!)
দম্ভ দিয়ে খুঁড়ে তুলছে
হিঁদু শাস্ত্রের-মূল,
মেলাই কচুর আমদানিতে
বাজার হুলুস্থুল।
(দামু চামু অবতার!)
মনু বলেন 'ম'নু আমি'
বেদের হল ভেদ,
দামু চামু শাস্ত্র ছাড়ে,
রইল মনে খেদ!
(ওরে দামু ওরে চামু!)
মেড়ার মতো লড়াই করে
লেজের দিকটা মোটা,
দাপে কাঁপে থরথর
হিঁদুয়ানির খোঁটা!
(আমার হিঁদু দামু চামু!)

দামু চামু কেঁদে আকুল
কোথায় হিঁদুয়ানি!
ট্যাকে আছে গোঁজ' যেথায়
সিকি দুয়ানি।
(থলের মধ্যে হিঁদুয়ানি!)
দামু চামু ফুলে উঠল
হিঁদুয়ানি বেচে,
হামাগুড়ি ছেড়ে এখন
বেড়ায় নেচে নেচে!
(ষেটের বাছা দামু চামু!)
আদর পেয়ে নাদুস নুদুস
আহার করছে কসে,
তরিবৎটা শিখলে নাকো
বাপের শিক্ষাদোষে!
(ওরে দামু চামু!)
এসো বাপু কানটি নিয়ে,
শিখবে সদাচার,
কানের যদি অভাব থাকে
তবেই নাচার!
(হায় দামু হায় চামু!)
পড়াশুনো করো, ছাড়ো
শাস্ত্র আষাঢ়ে,
মেজে ঘষে তোল্ রে বাপু
স্বভাব চাষাড়ে।
(ও দামু ও চামু!)
ভদ্রলোকের মান রেখে চল্
ভদ্র বলবে তোকে,
মুখ ছুটোলে কুলশীলটা
জেনে ফেলবে লোকে!
(হায় দামু হায় চামু!)
পয়সা চাও তো পয়সা দেব
থাকো সাধুপথে,
তাবচ্চ শোভতে কেউ কেউ
যাবৎ ন ভাষতে!
(হে দামু হে চামু!)

সঞ্জীবনী
১ চৈত্র ১২৯২

অনুবাদ-কবিতা

ম্যাক্‌বেথ্‌

(ডাকিনী। ম্যাক্‌বেথ্‌)

দৃশ্য : বিজন প্রান্তর। বজ্র বিদ্যুৎ। তিনজন ডাকিনী।

১ম ডা — ঝড় বাদলে আবার কখন
মিল্‌ব মোরা তিনটি জনে।
২য় ডা — ঝগড়া ঝাঁটি থামবে যখন,
হার জিত সব মিট্‌বে রণে।
৩য় ডা — সাঁঝের আগেই হবে সে ত;
১ম ডা — মিল্‌ব কোথায় বোলে দে ত।
২য় ডা — কাঁটা খোঁচা মাঠের মাঝ।
৩য় ডা — ম্যাকেথ সেথা আস্‌চে আজ।
১ম ডা — কটা বেড়াল। যাচ্ছি ওরে!
২য় ডা — ঐ বুঝি ব্যাং ডাক্‌চে মোরে!
৩য় ডা — চল্‌ তবে চল্‌ ত্বরা কোরে!
সকলে — মোদের কাছে ভালই মন্দ,
মন্দ যাহা ভাল যে তাই,
অন্ধকারে কোয়াশাতে
ঘুরে ঘুরে ঘুরে বেড়াই!

প্রস্থান।

দৃশ্য : এক প্রান্তর। বজ্র। তিনজন ডাকিনী।

১ম ডা — এতক্ষণ বোন কোথায় ছিলি?
২য় ডা — মারতে ছিলুম শুয়োরগুলি।
৩য় ডা — তুই ছিলি বোন, কোথায় গিয়ে?
১ম ডা — দেখ্‌, একটা মাঝির মেয়ে
গোটাকতক বাদাম নিয়ে
খাচ্ছিল সে কচ্‌মচিয়ে
কচ্‌মচিয়ে
কচ্‌মচিয়ে—
চাইলুম তার কাছে গিয়ে,
পোড়ারমুখী বোল্লে রেগে
'ডাইনি মাগী যা' তুই ভেগে।'
আলাপোয় তার স্বামী গেছে,
আমি যাব পাছে পাছে।
বেঁড়ে একটা ইঁদুর হোয়ে
চালুনীতে যাব বোয়ে—
যা বোলেছি কোর্‌ব আমি
কোর্‌ব আমি—

নইক আমি এমন মেয়ে!
২য় ডা — আমি দেব বাতাস একটি।
১ম ডা — তুমি ভাই বেশ লোকটি!
৩য় ডা — একটি পাবি আমার কাছে।
১ম ডা — বাকি সব আমারি আছে।

* * *

খড়ের মত একেবারে
শুকিয়ে আমি ফেল্‌ব তারে।
কিবা দিনে কিবা রাতে
ঘুম রবে না চোকের পাতে।
মিশ্‌বে না কেউ তাহার সাথে।
একাশি বার সাত দিন
শুকিয়ে শুকিয়ে হবে ক্ষীণ।
জাহাজ যদি না যায় মারা
ঝড়ের মুখে সবে সারা।
বল্‌ দেখি বোন্‌, এইটে কি!
২য় ডা — কই, কই, কই, দেখি, দেখি।
১ম ডা — একটা মাঝির বুড় আঙুল
রোয়েচে লো বোন, আমার কাছে,
বাড়িমুখো জাহাজ তাহার
পথের মধ্যে মারা গেছে।
৩য় ডা — ঐ শোন্‌ শোন্‌ বাজ্‌ল ভেরী
আসে ম্যাকেথ, নাইক দেরী!

দৃশ্য : গুহা। মধ্যে ফুটন্ত কটাহ। বজ্র। তিনজন ডাকিনী

১ম ডা — কালো বেড়াল তিনবার
করেছিল চীৎকার।
২য় ডা — তিনবার আর একবার
সজারুটা ডেকেছিল।
৩য় ডা — হার্পি বলে আকাশ তলে
'সময় হোল' 'সময় হোল!'
১ম ডা — আয় রে কড়া ঘিরে ঘিরে
বেড়াই মোরা ফিরে ফিরে।
বিষমাখা ওই নাড়ি ভুঁড়ি
কড়ার মধ্যে ফেল্‌ রে ছুঁড়ি।
ব্যাং একটা ঠাণ্ডা ভুঁয়ে
একত্রিশ দিন ছিল শুয়ে,
হোয়েছে সে বিষে পোরা
কড়ার মধ্যে ফেল্‌ব মোরা।
সকলে — দ্বিগুণ দ্বিগুণ দ্বিগুণ খেটে

কাজ সাধি আয় সবাই জুটে।
দ্বিগুণ দ্বিগুণ জ্বল্‌রে আগুন
ওঠরে কড়া দ্বিগুণ ফুটে।
২য় ডা — জলার সাপের মাংস নিয়ে
সিদ্ধ কর কড়ায় দিয়ে।
গিগিটি-চোক ব্যাঙের পা,
টিকটিকি-ঠ্যাং পেঁচার ছা।
কুত্তোর জিব, বাদুড় রোঁয়া,
সাপের জিব আর শুওর শোঁয়া।
শক্ত ওষুধ কোরতে হবে
টগ্‌বগিয়ে ফোটাই তবে।
সকলে — দ্বিগুণ দ্বিগুণ দ্বিগুণ খেটে
কাজ সাধি আয় সবাই জুটে।
দ্বিগুণ দ্বিগুণ জ্বলরে আগুন
ওঠ্‌রে কড়া দ্বিগুণ ফুটে।
৩য় ডা — মকরের আঁশ, বাঘের দাঁত,
ডাইনি-মড়া, হাঙ্গর ব্যাঁৎ,
ইষের শিকড় তুলেছি রাতে,
নেড়ের পিলে মেশাই তাতে,
পাঁঠার পিত্তি, শেওড়া ডাল
গেরণ-কালে কেটেছি কাল,
তাতারের ঠোঁট, তুর্কি নাক,
তাহার সাথে মিশিয়ে রাখ।
আন্‌গে রে সেই ভ্রূণ-মরা,
খানায় ফেলে খুন-করা,
তারি একটি আঙুল নিয়ে
সিদ্ধ কর কড়ায় দিয়ে।
বাঘের নাড়ি ফেলে তাতে
ঘন কর আগুন-তাতে।
সকলে — দ্বিগুণ দ্বিগুণ দ্বিগুণ খেটে
কাজ সাধি আয় সবাই জুটে।
দ্বিগুণ দ্বিগুণ জ্বল্‌রে আগুন
ওঠরে কড়া দ্বিগুণ ফুটে।
২য় ডা — বাঁদর ছানার রক্তে তবে
ওষুধ ঠাণ্ডা কোরতে হবে—
তবেই ওষুধ শক্ত হবে।

ভারতী
আশ্বিন ১২৮৭

বিচ্ছেদ

প্রতিকূল বায়ুভরে, উর্মিময় সিন্ধু-'পরে
তরীখানি যেতেছিল ধীরি,
কম্পমান কেতু তার, চেয়েছিল কতবার
সে দ্বীপের পানে ফিরি ফিরি।
যারে আহা ভালোবাসি, তারে যবে ছেড়ে আসি
যত যাই দূর দেশে চলি,
সেইদিক পানে হায়, হৃদয় ফিরিয়া চায়
যেখানে এসেছি তারে ফেলি।
বিদেশেতে দেখি যদি, উপত্যকা, দ্বীপ, নদী,
অতিশয় মনোহর ঠাঁই,
সুরভি কুসুমে যার, শোভিত সকল ধার
শুধু হৃদয়ের ধন নাই,
বড়ো সাধ হয় প্রাণে, থাকিতাম এইখানে,
হেথা যদি কাটিত জীবন,
রয়েছে যে দূরবাসে, সে যদি থাকিত পাশে
কী যে সুখ হইত তখন।
পূর্বদিক সন্ধ্যাকালে, গ্রাসে অন্ধকার জালে
ভীত পান্থ চায় ফিরে ফিরে,
দেখিতে সে শেষজ্যোতি, সূক্ষ্মতর হয়ে অতি
এখনো যা জ্বলিতেছে ধীরে,
তেমনি সুখের কাল, গ্রাসে গো আঁধার-জাল
অদৃষ্টের সায়াহ্নে যখন,
ফিরে চাই বারে বারে, শেষবার দেখিবারে
সুখের সে মুমূর্ষু কিরণ।

Thomas Moore

Moore's Irish Melodies

বিদায়-চুম্বন

একটি চুম্বন দাও প্রমদা আমার
জনমের মতো দেখা হবে না কো আর।
মর্মভেদী অশ্রু দিয়ে, পূজিব তোমারে প্রিয়ে
দুখের নিশ্বাস আমি দিব উপহার।
সে তো তবু আছে ভালো, একটু আশার আলো
জ্বলিতেছে অদৃষ্টের আকাশে যাহার।
কিন্তু মোর আশা নাই, যে দিকে ফিরিয়া চাই
সেই দিকে নিরাশার দারুণ আঁধার।

ভালো যে বেসেছি তারে দোষ কী আমার?
উপায় কী আছে বলো উপায় কী তার?
দেখামাত্র সেই জনে, ভালোবাসা আসে মনে
ভালো বাসিলেই ভুলা নাহি যায় আর।
নাহি বাসিতাম যদি এত ভালো তারে
অন্ধ হয়ে প্রেমে তার মজিতাম না রে
যদি নাহি দেখিতাম, বিচ্ছেদ না জানিতাম
তা হলে হৃদয় ভেঙে যেত না আমার!
আমারে বিদায় দাও যাই গো সুন্দরী,
যাই তবে হৃদয়ের প্রিয় অধীশ্বরী,
থাকো তুমি থাকো সুখে, বিমল শান্তির বুকে
সুখ, প্রেম, যশ, আশা থাকুক তোমার
একটি চুম্বন দাও প্রমদা আমার।

Robert Burns

কষ্টের জীবন

মানুষ কাঁদিয়া হাসে,
পুনরায় কাঁদে গো হাসিয়া।
পাদপ শুকায়ে গেলে,
তবুও সে না হয় পতিত,
তরণী ভাঙিয়া গেলে
তবু ধীরে যায় সে ভাসিয়া,
ছাদ যদি পড়ে যায়,
দাঁড়াইয়া রহে তবু ভিত।
বন্দী চলে যায় বটে,
তবুও তো রহে কারাগার,
মেঘে ঢাকিলেও সূর্য
কোনোমতে দিন অস্ত হয়,
তেমনি হৃদয় যদি
ভেঙেচুরে হয় চুরমার,
কোনোক্রমে বেঁচে থাকে
তবুও সে ভগন হৃদয়।
ভগন দর্পণ যথা,
ক্রমশ যতই ভগ্ন হয়,
ততই সে শত শত,
প্রতিবিম্ব করয়ে ধারণ,
তেমনি হৃদয় হতে,
কিছুই গো যাইবার নয়।
হোক না শীতল স্তব্ধ,
শত খণ্ডে ভগ্ন চূর্ণ মন,

হউক-না রক্তহীন,
হীনতেজ তবুও তাহারে,
বিনিদ্র জ্বলন্ত জ্বালা,
ক্রমাগত করিবে দাহন,
শুকায়ে শুকায়ে যাবে,
অন্তর বিষম শোকভারে,
অথচ বাহিরে তার,
চিহ্নমাত্র না পাবে দর্শন।

George Gordon Byron

জীবন উৎসর্গ

এসো এসো এই বুকে নিবাসে তোমার,
যূথভ্রষ্ট বাণবিদ্ধ হরিণী আমার,
এইখানে বিরাজিছে সেই চির হাসি,
আঁধারিতে পারিবে না তাহা মেঘরাশি।
এই হস্ত এ হৃদয় চিরকাল মতো
তোমার, তোমারি কাজে রহিবে গো রত!
কিসের সে চিরস্থায়ী ভালোবাসা তবে,
গৌরবে কলঙ্কে যাহা সমান না রবে?
জানি না, জানিতে আমি চাহি না, চাহি না,
ও হৃদয়ে এক তিল দোষ আছে কিনা,
ভালোবাসি তোমারেই এই শুধু জানি,
তাই হলে হল, আর কিছু নাহি মানি।
দেবতা সুখের দিনে বলেছ আমায়,
বিপদে দেবতা সম রক্ষিব তোমায়,
অগ্নিময় পথ দিয়া যাব তব সাথে,
রক্ষিব, মরিব কিংবা তোমারি পশ্চাতে।

Thomas Moore

Moore's Irish Melodies

ললিত-নলিনী

(কৃষকের প্রেমালাপ।)

ললিত

হা নলিনী গেছে আহা কী সুখের দিন,
দোঁহে যবে এক সাথে, বেড়াতেম হাতে হাতে
নবীন হৃদয় চুরি করিলি নলিন।
হা নলিনী কত সুখে গেছে সেই দিন।

নলিনী
কত ভালোবাসি সেই বনেরে ললিত,
প্রথমে বলিনু যেথা, মনের লুকানো কথা,
স্বর্গ-সাক্ষী করি যেথা হয়ে হরষিত
বলিলে, আমারি তুমি হইবে ললিত।
ললিত
বসন্ত-বিহগ যথা সুললিত ভাষী,
যত শুনি তত তার, ভালো লাগে গীতধার,
যত দিন যায় তত তোরে ভালোবাসি,
যত দিন যায় তব বাড়ে রূপরাশি।
নলিনী
কোমল গোলাপকলি থাকে যথা গাছে,
দিন দিন ফুটে যত, পরিমল বাড়ে তত,
এ হৃদয় ভলোবাসা আলো করি আছে
সঁপেছি সে ভালোবাসা তোমারি গো কাছে।
ললিত
মৃদুতর রবিকর সুনীল আকাশ
হেরিলে শস্যের আশে, হৃদয় হরষে ভাসে
তার চেয়ে এ হৃদয়ে বাড়ে গো উল্লাস
হেরিলে নলিনী তোর মৃদু মধু হাস।
নলিনী
মধু আগমন বার্তা করিতে কূজিত
কোকিল যখন ডাকে, হৃদয় নাচিতে থাকে
কিন্তু তার চেয়ে হৃদি হয় উথলিত,
মিলিলে তোমার সাথে প্রাণের ললিত।
ললিত
কুসুমের মধুময় অধর যখন
ভ্রমর প্রণয়ভরে, হরষে চুম্বন করে
সে কি এত সুখ পায় আমার মতন
যবে ও অধরখানি করি গো চুম্বন?
নলিনী
শিশিরাক্ত পত্রকোলে মল্লিকা হসিত,
বিজন সন্ধ্যার ছায়ে, ফুটে সে মলয়বায়ে,
সে অমন নহে মিষ্ট নহে সুবাসিত
তোমার চুম্বন আহা যেমন ললিত।
ললিত
ঘুরুক অদৃষ্টচক্র সুখ দুখ দিয়া
কভু দিক্ রসাতলে, কভু বা স্বরগে তুলে
রহিবে একটি চিন্তা হৃদয়ে জাগিয়া
সে চিন্তা তোমারি তরে জানি ওগো প্রিয়া।

নলিনী

ধন রত্ন কনকের নাহি ধার ধারি
পদতলে বিলাসীর, নত করিব না শির
প্রণয়ধনের আমি দরিদ্র ভিখারি,
সে প্রণয়, ললিত গো তোমারি তোমারি।

Robert Burns

বিদায়

যাও তবে প্রিয়তম সুদূর প্রবাসে
নব বন্ধু নব হর্ষ নব সুখ আশে।
সুন্দরী রমণী কত, দেখিবে গো শত শত
ফেলে গেলে যারে তারে পড়িবে কি মনে?
তব প্রেম প্রিয়তম, অদৃষ্টে নাইকো মম
সে-সব দুরাশা সখা করি না স্বপনে
কাতর হৃদয় শুধু এই ভিক্ষা চায়
ভুলো না আমায় সখা ভুলো না আমায়।
স্মরিলে এ অভাগীর যাতনার কথা,
যদিও হৃদয়ে লাগে তিলমাত্র ব্যথা,
মরমের আশা এই, থাক্ রুদ্ধ মরমেই
কাজ নাই দুখিনীরে মনে করে আর।
কিন্তু দুঃখ যদি সখা, কখনো গো দেয় দেখা
মরমে জনমে যদি যাতনার ভার,
ও হৃদয় সান্ত্বনার বন্ধু যদি চায়
ভুলো না আমায় সখা ভুলো না আমায়।

Mrs. Amelia Opie

সংগীত

কেমন সুন্দর আহা ঘুমায়ে রয়েছে
চাঁদের জোছনা এই সমুদ্রবেলায়।
এসো প্রিয়ে এইখানে বসি কিছুকাল;
গীতস্বর মৃদু মৃদু পশুক শ্রবণে।
সুকুমার নিস্তব্ধতা আর নিশীথিনী—
সাজে ভালো মর্ম-ছোঁয়া সুধা-সংগীতেরে।
বইস জেসিকা, দেখো, গগন-প্রাঙ্গণ
জলৎ কাঞ্চন-পাতে খচিত কেমন।
এমন একটি নাই তারকামণ্ডল
দিব্য গীত যে না গায় প্রতি পদক্ষেপে।

অমর আত্মাতে হয় এমনি সংগীত।
কিন্তু ধূলিময় এই মর্ত্য-আবরণ
যতদিন রাখে তারে আচ্ছন্ন করিয়া
ততদিন সে সংগীত পাই না শুনিতে।

William Shakespeare

ভারতী
মাঘ ১২৮৪

গভীর গভীরতম হৃদয়প্রদেশে

১

গভীর গভীরতম হৃদয়প্রদেশে,
নিভৃত নিরালা ঠাঁই, লেশমাত্র আলো নাই,
লুকানো এ প্রেমসাধ গোপনে নিবসে,
শুদ্ধ যবে ভালোবাসা নয়নে তোমার,
ঈষৎ প্রদীপ্ত হয়, উচ্ছ্বসয়ে এ-হৃদয়,
ভয়ে ভয়ে জড়সড় তখনি আবার।

২

শূন্য এই মরমের সমাধি-গহ্বরে,
জ্বলিছে এ প্রেমশিখা চিরকাল-তরে,
কেহ না দেখিতে পায়, থেকেও না থাকা প্রায়,
নিভিবারও নাম নাই নিরাশার ঘোরে।

৩

যা হবার হইয়াছে— কিন্তু প্রাণনাথ!
নিতান্ত হইবে যবে এ শরীরপাত,
আমার সমাধি-স্থানে কোরো নাথ কোরো মনে,
রয়েছে এ কে দুঃখিনী হয়ে ধরাসাৎ।

৪

যতই যাতনা আছে দলুক আমায়,
সহজে সহিতে নাথ সব পারা যায়,
কিন্তু হে তুমি-যে মোরে, ভুলে যাবে একেবারে
সে কথা করিতে মনে হৃদি ফেটে যায়।

৫

রেখো তবে এই মাত্র কথাটি আমার,
এই কথা শেষ কথা, কথা নাহি আর,
(এ দেহ হইলে পাত, যদি তুমি প্রাণনাথ,

প্রকাশো আমার তরে তিলমাত্র শোক,
ধর্মত হবে না দোষী দোষিবে না লোক—
কাতরে বিনয়ে তাই, এই মাত্র ভিক্ষা চাই,
কখনো চাহি নে আরো কোনো ভিক্ষা আর)
যবে আমি যাব ম'রে, চির এ দুঃখিনী তরে,
বিন্দুমাত্র অশ্রুজল ফেলো একবার—
আজন্ম এত যে ভালোবেসেছি তোমায়,
সে প্রেমের প্রতিদান একমাত্র প্রতিদান,
তা বই কিছুই আর দিয়ো না আমায়।

George Gordon Byron

যাও তবে প্রিয়তম সুদূর সেথায়

১

যাও তবে প্রিয়তম সুদূর সেথায়,
লভিবে সুযশ কীর্তি গৌরব যেথায়,
কিন্তু গো একটি কথা, কহিতেও লাগে ব্যথা,
উঠিবে যশের যবে সমুচ্চ সীমায়,
তখন স্মরিয়ো নাথ স্মরিয়ো আমায়—
সুখ্যাতি অমৃত রবে, উৎফুল্ল হইবে যবে,
তখন স্মরিয়ো নাথ স্মরিয়ো আমায়।

২

কত যে মমতা-মাখা, আলিঙ্গন পাবে সখা,
পাবে প্রিয় বান্ধবের প্রণয় যতন,
এ হতে গভীরতর, কতই উল্লাসকর,
কতই আমোদে দিন করিবে যাপন,
কিন্তু গো অভাগী আজি এই ভিক্ষা চায়,
যখন বান্ধব-সাথ, আমোদে মাতিবে নাথ,
তখন অভাগী বলে স্মরিয়ো আমায়।

৩

সুচারু সায়াহ্নে যবে ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
তোমার সে মনোহরা, সুদীপ্ত সাঁজের তারা,
সেখানে সখা গো তুমি পাইবে দেখিতে—
মনে কি পড়িবে নাথ, এক দিন আমা সাথ,
বনভ্রমি ফিরে যবে আসিতে ভবনে—
ওই সেই সন্ধ্যাতারা, দুজনে দেখেছি মোরা,
আরো যেন জ্বল জ্বল জ্বলিত গগনে।

৪

নিদাঘের শেষাশেষি, মলিনা গোলাপরাশি,
নিরখি বা কত সুখী হইতে অন্তরে,
দেখি কি স্মরিবে তায়, যেই অভাগিনী হায়
গাঁথিত যতনে তার মালা তোমা তরে।
যে-হস্ত গ্রথিত বলে তোমার নয়নে
হত তা সৌন্দর্য-মাখা, ক্রমেতে শিখিলে সখা
গোলাপে বাসিতে ভালো যাহারি কারণে—
তখন সে দুঃখিনীকে কোরো নাথ মনে।

৫

বিষণ্ণ হেমন্তে যবে, বৃক্ষের পল্লব সবে
শুকায়ে পড়িবে খসে খসে চারি ধারে,
তখন স্মরিয়ো নাথ স্মরিয়ো আমারে।
নিদারুণ শীত কালে, সুখদ আগুন জ্বেলে,
নিশীথে বসিবে যবে অনলের ধারে,
তখন স্মরিয়ো নাথ স্মরিয়ো আমারে।
সেই সে কল্পনাময়ী সুখের নিশায়,
বিমল সংগীত তান, তোমার হৃদয় প্রাণ।
নীরবে সুধীরে ধীরে যদি গো জাগায়—
আলোড়ি হৃদয়-তল, এক বিন্দু অশ্রুজল,
যদি আঁখি হতে পড়ে সে তান শুনিলে,
তখন করিয়ো মনে, এক দিন তোমা সনে,
যে যে গান গাহিয়াছি হৃদি প্রাণ খুলে,
তখন স্মরিয়ো হায় অভাগিনী বলে।

Thomas Moore

Moore's Irish Melodies

আবার আবার কেন রে আমার

আবার আবার কেন রে আমার
সেই ছেলেবেলা আসে না ফিরে,
হরষে কেমন আবার তা হলে,
সাঁতারিয়ে ভাসি সাগরের জলে,
খেলিয়ে বেড়াই শিখরী শিরে!
স্বাধীন হৃদয়ে ভালো নাহি লাগে,
ঘোরঘটাময় সমাজধারা,
না, না, আমি রে যাব সেই স্থানে,
ভীষণ ভূধর বিরাজে যেখানে,
তরঙ্গ মাতিছে পাগল পারা!
অয়ি লক্ষ্মী, তুমি লহো লহো ফিরে,

ধন ধান্য তুমি যা দেছ মোরে,
জাঁকালো উপাধি নাহি আমি চাই,
ক্রীতদাসে মম কোনো সুখ নাই,
সেবকের দল যাক-না সোরে!
তুলে দাও মোরে সেই শৈল-'পরে,
গরজি ওঠে যা সাগর-নাদে,
অন্য সাধ নাই, এই মাত্র চাই,
ভ্রমিব সেথায় স্বাধীন হৃদে।
অধিক বয়স হয় নে তো মম,
এখনি বুঝিতে পেরেছি হায়,
এ ধরা নহে তো আমার কারণে,
আর মম সুখ নাহি এ জীবনে,
কবে রে এড়াব এ দেহ দায়।
একদা স্বপনে হেরেছিনু আমি,
সুবিমল এক সুখের স্থান,
কেন রে আমার সে ঘুম ভাঙিল
কেন রে আমার নয়ন মেলিল,
দেখিতে নীরস এ ধরা খান!
এক কালে আমি বেসেছিনু ভালো,
ভালোবাসা-ধন কোথায় এবে,
বাল্যসখা সব কোথায় এখন—
হায় কী বিষাদে ডুবেছে এ মন,
আশারও আলোক গিয়েছে নিবে!
আমোদ-আসরে আমোদ-সাথীরা,
মাতায় ক্ষণেক আমোদ রসে,
কিন্তু এ হৃদয়, আমোদের নয়,
বিরলে কাঁদি যে একেলা বসে।
উঃ কী কঠোর, বিষম কঠোর,
সেই সকলের আমোদ-রব,
শত্রু কিম্বা সখা নহে যারা মনে,
অথচ পদ বা বিভব কারণে,
আমোদ-আসরে মিশেছে সব।
দাও ফিরে মোরে সেই সখাগুলি,
বয়সে হৃদয়ে সমান যারা,
এখনি যে আমি ত্যেজিব তা হলে,
গভীর নিশীথ-আমোদীর দলে,
হৃদয়ের ধার কি ধারে তারা।
সর্বস্ব রতন, প্রিয়তমা ওরে,
তোরেও শুধাই একটি কথা,
বল দেখি কিসে আর মম সুখ,
হেরিয়েও যবে তোর হাসি-মুখ,

কমে না হৃদয়ে একটি ব্যথা।
যাক তবে সব, দুঃখ নাহি তায়,
শোকের সমাজ নাহিকো চাই,
গভীর বিজনে মনের বিরাগে,
স্বাধীন হৃদয়ে ভালো যাহা লাগে,
সুখে উপভোগ করিব তাই!
মানব-মণ্ডলী ছেড়ে যাব যাব,
বিরাগে কেবল, ঘৃণাতে নয়,
অন্ধকারময় নিবিড় কাননে,
থাকিব তবুও নিশ্চিন্ত মনে,
আমারও হৃদয় আঁধারময়!
কেন রে কেন রে হল না আমার,
কপোতের মতো বায়ুর পাখা,
তা হলে ত্যেজিয়ে মানব-সমাজ,
গগনের ছাদ ভেদ করি আজ,
থাকিতাম সুখে জলদে ঢাকা!

George Gordon Byron

ভারতী
আষাঢ় ১২৮৫

বৃদ্ধ কবি

মন হতে প্রেম যেতেছে শুকায়ে
জীবন হতেছে শেষ,
শিথিল কপোল মলিন নয়ন
তুষার-ধবল কেশ!
পাশেতে আমার নীরবে পড়িয়া
অযতনে বীণাখানি,
বাজাবার বল নাইকো এ হাতে
জড়িমা জড়িত বাণী!
গীতিময়ী মোর সহচরী বীণা!
হইল বিদায় নিতে;
আর কি পারিবি ঢালিবারে তুই
অমৃত আমার চিতে?
তবু একবার আর-একবার
ত্যজিবার আগে প্রাণ,
মরিতে মরিতে গাহিয়া লইব
সাধের সে-সব গান!
দুলিবে আমার সমাধি-উপরে
তরুগণ শাখা তুলি,

বনদেবতারা গাইবে তখন
মরণের গানগুলি!

ভারতী
কার্তিক ১২৮৬

জাগি রহে চাঁদ

বেহাগ

জাগি রহে চাঁদ আকাশে যখন
সারাটি রজনী!
শ্রান্ত জগত ঘুমে অচেতন
সারাটি রজনী!
অতি ধীরে ধীরে হৃদে কী লাগিয়া
মধুময় ভাব উঠে গো জাগিয়া
সারাটি রজনী!
ঘুমায়ে তোমারি দেখি গো স্বপন
সারাটি রজনী!
জাগিয়া তোমারি দেখি গো বদন
সারাটি রজনী!
ত্যজিবে যখন দেহ ধূলিময়
তখন কি সখি তোমার হৃদয়।
আমার ঘুমের শয়ন-'পরে
ভ্রমিয়া বেড়াবে প্রণয়-ভরে।
সারাটি রজনী!

পাতায় পাতায় দুলিছে শিশির

পূরবী

পাতায় পাতায় দুলিছে শিশির
গাহিছে বিহগগণ,
ফুলবন হতে সুরভি হরিয়া
বহিতেছে সমীরণ
সাঁঝের আকাশ মাঝারে এখনো
মৃদুল কিরণ জ্বলে।
নলিনীর সাথে বসিয়া তখন
কত-না হরষে কাটাইনু ক্ষণ,
কে জানিত তবে বালিকা নিদয়
রেখেছিল ঢাকি কপট-হৃদয়
সরল হাসির তলে!

এই তো সেথায় ভ্রমি, গো, যেথায়
থাকিত সে মোর কাছে,
প্রকৃতি জানে না পরিবরতন
সকলি তেমনি আছে!
তেমনি গোলাপ ম্লান-হাসি-ময়
জ্বলিছে শিশির-ভরে,
যে হাসি-কিরণে আছিল প্রকৃতি
দ্বিগুণ দ্বিগুণ মধুর আকৃতি,
সে হাসি নাইকো আর!

Irish Song

বলো গো বালা, আমারি তুমি

পিলু

বলো গো বালা, আমারি তুমি
হইবে চিরকাল!
অনিয়া দিব চরণতলে
যা-কিছু আছে সাগরজলে
পৃথিবী-'পরে আকাশতলে
অমূল মণি জাল!
শুনি আশার মোহন-রব
যা-কিছু ভালো লাগিবে তব
আনিয়া দিব, হও গো, যদি
আমারি চিরকাল!
যেথায় মোরা বেড়াব দুটি,
কুসুমগুলি উঠিবে ফুটি,
নদীর জলে শুনিতে পাব
দেবতাদের বাণী।
তারকাগুলি দেখাবে যেন
প্রেমিকদেরি জগতহেন,
মধুর এক স্বপন সম
দেখাবে ধরাখানি!
আকাশ-ভেদী শিখর হতে
পতনশীল নিঝর-স্রোতে
নাহিয়া যথা কানন-ভূমি
হরিত-বাসে সাজে,
চির-প্রবাহী সুখের ধারে
দোঁহার হৃদি হাসিবে হারে—
যেই সুখের মূল লুকানো
কলপনার মাঝে!

প্রেম দেবের কুহক জালে
হৃদয়ে যার অমৃত ঢালে,
সেই সে জনে করেন প্রেম
কত না সুখ-দান।
ভবন তাঁর স্বরগ-'পরে,
যেথায় তাঁর চরণ পড়ে
ধরার মাঝে স্বরগ শোভা
ধরে, গো, সেইখান।

Thomas Moore

Moore's Irish Melodies

গিয়াছে সে দিন, যে দিন হৃদয়

গিয়াছে সে দিন, যে দিন হৃদয়
রূপের মোহনে আছিল মাতি,
প্রাণের স্বপন আছিল যখন
প্রেম প্রেম শুধু দিবস রাতি!
শান্ত আশা এ হৃদয়ে আমার
এখন ফুটিতে পারে,
সুবিমলতর দিবস আমার
এখন উঠিতে পারে।
বালক কালের প্রেমের স্বপন—
মধুর যেমন উজল যেমন
তেমন কিছুই আসিবে না,
তেমন কিছুই আসিবে না।
সে দেবীপ্রতিমা নারিব ভুলিতে
প্রথম প্রণয় আঁকিল যাহা,
স্মৃতি-মরু মোর উজল করিয়া
এখনো হৃদয়ে বিরাজে তাহা।
সে প্রতিমা সেই পরিমল সম
পলকে যা লয় পায়,
প্রভাতকালের স্বপন যেমন
পলকে মিশায়ে যায়।
অলস প্রবাহ জীবনে আমার
সে কিরণ কভু ভাসিবে না আর
সে কিরণ কভু ভাসিবে না,
সে কিরণ কভু ভাসিবে না।

Thomas Moore

Moore's Irish Melodies

রূপসী আমার, প্রেয়সী আমার

রূপসী আমার, প্রেয়সী আমার,
যাইবি কি তুই যাইবি কি তুই,
রূপসী আমার যাইবি কি তুই,
ভ্রমিবারে গিরি-কাননে?
পাদপের ছায়া মাথার 'পরে,
পাখিরা গাইছে মধুর স্বরে
অথবা উড়িছে পাখা বিছায়ে
হরষে সে গিরি-কাননে।
রূপসী আমার প্রেয়সী আমার
যাইবি কি তুই যাইবি কি তুই,
রূপসী আমার, যাইবি কি তুই
ভ্রমিবারে গিরি-কাননে?
শিখর উঠেছে আকাশ-'পরি,
ফেনময় স্রোত পড়িছে মরি,
সুরভি-কুঞ্জ ছায়া বিছায়ে
শোভিছে সে গিরি-কাননে!
রূপসী আমার, প্রেয়সী আমার,
যাইবি কি তুই যাইবি কি তুই,
রূপসী আমার, যাইবি কি তুই।
ভ্রমিবারে গিরি-কাননে!
ধবল শিখর কুসুমে ভরা
সরসে ঝরিছে নির্ঝর-ধারা
উছসে উঠিয়া সলিল-কণা
শীতলিছে গিরি-কাননে!
রূপসী আমার, প্রেয়সী আমার,
যাইবি কি তুই যাইবি কি তুই,
রূপসী আমার, যাইবি কি তুই
ভ্রমিবারে গিরি-কাননে।
সুখ দুখ যাহা দিলেন, বিধি,
কিছুই মানিতে চায় না হৃদি,
তোমারে ও প্রেমে লইয়া পাশে
ভ্রমি যদি গিরি-কাননে।

Robert Burns

সুশীলা আমার, জানালার 'পরে

সুশীলা আমার, জানালার 'পরে
দাঁড়াও একটিবার!
একবার আমি দেখিয়া লইব
মধুর হাসি তোমার।
কত দুখ-জ্বালা সহি অকাতরে
ভ্রমি, গো, দূর প্রবাসে
যদি লভি মোর হৃদয়-রতন—
সুশীলারে মোর পাশে!
কালিকে যখন নাচ গান কত
হতেছিল সভা-'পরে,
কিছুই শুনি নি, আছিনু মগন
তোমারি ভাবনা-ভরে
আছিল কত-না বালিকা, রমণী,
রূপসী প্রমোদ-হিয়া,
বিষাদে কহিনু 'তোমরা তো নহ
সুশীলা, আমার প্রিয়া।'
সুশীলে, কেমনে ভাঙ তার মন
হরষে মরিতে পারে যেই জন
তোমারি তোমারি তরে।
সুশীলে, কেমনে ভাঙ হিয়া তার
কিছু যে করে নি, এক দোষ যার
ভালোবাসে শুধু তোরে।
প্রণয়ে প্রণয় না যদি মিশাও
দয়া কোরো মোর প্রতি,
সুশীলার মন নহে তো কখনো
নিরদয় এক রতি।

Robert Burns

কোরো না ছলনা, কোরো না ছলনা

'কোরো না ছলনা কোরো না ছলনা
যেয়ো না ফেলিয়া মোরে!
এতই যাতনা দুখিনী আমারে
দিতেছ কেমন করে?
গাঁথিয়া রেখেছি পরাতে মালিকা
তোমার গলার-'পরে,
কোরো না, ছলনা কোরো না ছলনা,

যেয়ো না ফেলিয়া মোরে।
এতই যাতনা দুখিনী-বালারে
দিতেছ কেমন করে?
যে শপথ তুমি বলেছ আমারে
মনে করে দেখো তবে,
মনে করো সেই কুঞ্জ যেথায়
কহিলে আমারি হবে।
কোরো না ছলনা— কোরো না ছলনা
যেয়ো না ফেলিয়া মোরে,
এতই যাতনা দুখিনী-বালারে
দিতেছ কেমন করে?'
এত বলি এক কাঁদিছে ললনা
ভাসিছে লোচন-লোরে
'কোরো না ছলনা— কোরো না ছলনা
যেয়ো না ফেলিয়া মোরে।
এতই যাতনা দুখিনী-বালারে
দিতেছ কেমন করে?'

William Chappel

চপলারে আমি অনেক ভাবিয়া

চপলারে আমি অনেক ভাবিয়া
দূরেতে রাখিয়া এলেম তারে,
রূপ-ফাঁদ হতে পালাইতে তার,
প্রণয়ে ডুবাতে মদিরা-ধারে।
এত দূরে এসে বুঝিনু এখন
এখনো ঘুচে নি প্রণয়-ঘোর,
মাথায় যদিও চড়েছে মদিরা
প্রণয় রয়েছে হৃদয়ে মোর?
যুবতীর শেষে লইনু শরণ
মাগিনু সহায় তার,
অনেক ভাবি সে কহিল তখন
'চপলা নারীর সার।'
আমি কহিলাম 'সে কথা তোমার
কহিতে হবে না মোরে—
দোষ যদি কিছু বলিবারে পারো
শুনি প্রণিধান করে।'
যুবতি কহিল 'তাও কভু হয়?
যদি বলি দোষ আছে—
নামের আমার কুযশ হইবে

কহিনু তোমার কাছে।'
এখন তো আর নাই কোনো আশা
হইয়াছি অসহায়—
চপলা আমার মরমে মরমে
বাণ বিঁধিতেছে, হায়!
দলে মিশি তার ইন্দ্রিয় আমার
বিরোধী হয়েছে মোর,
যুবতী আমার— বলিছে আমারে
রূপের অধীন ঘোর!

Lord Cantalupe

প্রেমতত্ত্ব

নিঝর মিশিছে তটিনীর সাথে
তটিনী মিশিছে সাগর-'পরে,
পবনের সাথে মিশিছে পবন
চির-সুমধুর প্রণয়-ভরে!
জগতে কেহই নাইকো একেলা,
সকলি বিধির নিয়ম-গুণে,
একের সহিত মিশিছে অপরে
আমি বা কেননা তোমার সনে?
দেখো, গিরি ওই চুমিছে আকাশে,
ঢেউ-'পরে ঢেউ পড়িছে ঢলি,
সে কুলবালারে কে বা না দোষিবে,
ভাইটিরে যদি যায় সে ভুলি!
রবি-কর দেখো চুমিছে ধরণী,
শশি-কর চুমে সাগর জল,
তুমি যদি মোরে না চুম', ললনা,
এ-সব চুম্বনে কী তবে ফল?

P. B. Shelley

নলিনী

লীলাময়ী নলিনী,
চপলিনী নলিনী,
শুধালে আদর করে
ভালো সে কি বাসে মোরে,
কচি দুটি হাত দিয়ে
ধরে গলা জড়াইয়ে,

হেসে হেসে একেবারে
ঢলে পড়ে পাগলিনী।
ভালো বাসে কি না, তবু
বলিতে চাহে না কভু
　　　　নিরদয়া নলিনী।
যবে হৃদি তার কাছে,
প্রেমের নিশ্বাস যাচে
চায় সে এমন করে
বিপাকে ফেলিতে মোরে,
　　　　হাসে কত, কথা তবু কয় না।
এমন নির্দোষ ধূর্ত
চতুর সরল,
ঘোমটা তুলিয়া চায়
চাহনি চপল
　　　　উজ্জ্বল অসিত-তারা-নয়না!
অমনি চকিত এক হাসির ছটায়
ললিত কপোলে তার গোলাপ ফুটায়,
　　　　তখনি পলায় আর রয় না!

Alfred Tennyson

ভারতী
কার্তিক ১২৮৬

দিন রাত্রি নাহি মানি

দিন রাত্রি নাহি মানি, আয় তোরা আয় রে,
চির সুখ-রসে রত আমরা হেথায় রে।
বসন্তে মলয় বায় একটি মিলায়ে যায়,
আরেকটি আসে পুনঃ মধুময় তেমনি,
　　　　প্রেমের স্বপন হায়
　　　　একটি যেমনি যায়
আরেকটি সুস্বপন জাগি উঠে অমনি।
নন্দন কানন যদি এ মরতে চাই রে
　　　　তবে তা ইহাই রে!
　　　　তবে তা ইহাই রে।

প্রেমের নিশ্বাস হেথা ফেলিতেছি বালিকা,
সুরভি নিশ্বাস যথা ফেলে ফুল-কলিকা,
　　　　তাহাদের আঁখিজল
　　　　এমন সে সুবিমল

এমন সে সমুজ্জ্বল মুকুতার পারা রে,
তাদের চুম্বন হাসি
দিবে কত সুধারাশি
যাদের মধুর এত নয়নের ধারা রে।
নন্দনকানন যদি এ মরতে চাই রে
তবে তা ইহাই রে।
তবে তা ইহাই রে।
থাকুক ও-সব সুখ চাই না, গো চাই না,
যে সুখ-ভিখারী আমি তাহা যে গো পাই না।
দুই হৃদি এক ঠাঁই
প্রণয়ে মিলিতে চাই
সুখে দুখে যে প্রেমের নাহি হবে শেষ রে।
প্রেমে উদাসীন হৃদি
শত যুগ যাপে যদি,
তার চেয়ে কত ভালো এ সুখ নিমেষ রে।
নন্দনকানন যদি এ মরতে চাই রে
তবে তা ইহাই রে
তবে তা ইহাই রে।

Thomas Moore

দামিনীর আঁখি কিবা

দামিনীর আঁখি কিবা
ধরে জ্বল' জ্বল' বিভা
কার তরে জ্বলিতেছে কেবা তাহা জানিবে?
চারি দিকে খর ধার
বাণ ছুটিতেছে তার
কার-'পরে লক্ষ্য তার কেবা অনুমানিবে?
তার চেয়ে নলিনীর আঁখিপানে চাহিতে
কত ভালো লাগে তাহা কে পারিবে কহিতে?
সদা তার আঁখি দুটি
নিচু পাতে আছে ফুটি,
সে আঁখি দেখে নি কেহ উঁচু পানে তুলিতে!
যদি বা সে ভুলে কভু চায় কারো আননে,
সহসা লাগিয়া জ্যোতি
সে-জন বিস্ময়ে অতি
চমকিয়া উঠে যেন স্বরগের কিরণে!
ও আমার নলিনী লো, লাজমাখা নলিনী,
অনেকেরি আঁখি-'পরে
সৌন্দর্য বিরাজ করে,

তোর আঁখি-'পরে প্রেম নলিনী লো নলিনী!
দামিনীর দেহে রয়
বসন কনকময়
সে বসন অপসরী সৃজিয়াছে যতনে,
যে গঠন যেই স্থান
প্রকৃতি করেছে দান
সে-সকল ফেলিয়াছে ঢাকিয়া সে বসনে।
নলিনী বসন পানে দেখ দেখি চাহিয়া
তার চেয়ে কত ভালো কে পারিবে কহিয়া?
শিথিল অঞ্চল তার
ওই দেখো চারি ধার
স্বাধীন বায়ুর মতো উড়িতেছে বিমানে,
যেথা যে গঠন আছে
পূর্ণ ভাবে বিকাশিছে
যেখানে যা উঁচু নিচু প্রকৃতির বিধানে!
ও আমার নলিনী লো, সুকোমলা নলিনী
মধুর রূপের ভাস
তাই প্রকৃতির বাস,
সেই বাস তোর দেহে নলিনী লো নলিনী!
দামিনীর মুখ-আগে
সদা রসিকতা জাগে,
চারি ধারে জ্বলিতেছে খরধার বাণ সে,
কিন্তু কে বলিতে পারে
শুধু সে কি ধাঁধিবারে,
নহে তা কি খর ধারে বিঁধিবারি মানসে?
কিন্তু নলিনীর মনে
মাথা রাখি সঙ্গোপনে
ঘুমায়ে রয়েছে কিবা প্রণয়ের দেবতা।
সুকোমল সে শয্যার
অতি যা কঠিন ধার
দলিত গোলাপ তাও আর কিছু নহে তা!
ও আমার নলিনী লো, বিনয়িনী নলিনী
রসিকতা তীব্র অতি
নাই তার এত জ্যোতি
তোমার নয়নে যত নলিনী লো নলিনী।

Thomas Moore

ভারতী
আষাঢ় ১২৮৮

অদৃষ্টের হাতে লেখা

অদৃষ্টের হাতে লেখা সূক্ষ্ম এক রেখা,
সেই পথ বয়ে সবে হয় অগ্রসর।
কত শত ভাগ্যহীন ঘুরে মরে সারাদিন
প্রেম পাইবার আগে মৃত্যু দেয় দেখা,
এত দূরে আছে তার প্রাণের দোসর।

কখন বা তার চেয়ে ভাগ্য নিরদয়,
প্রণয়ী মিলিল যদি— অতি অসময়!
'হৃদয়টি?' 'দিয়াছি তা।' কাঁদিয়া সে কহে,
'হাতখানি প্রিয়তম?' 'নহে, নহে, নহে!'

Matthew Arnold

ভুজ-পাশ-বদ্ধ অ্যান্টনি

এই তো আমরা দোঁহে বসে আছি কাছে কাছে!
একটি ভুজঙ্গ-ভুজে আমারে জড়ায়ে আছে;
আরেকটি শ্যাম-বাহু, শতেক মুকুতা ঝুলে,
সোনার মদিরা পাত্র আকাশে রয়েছে তুলে।
অলকের মেঘ মাঝে জ্বলিতেছে মুখখানি,
রূপের মদিরা পিয়া
আবেশে অবশ হিয়া,
পড়েছে মাতাল হয়ে, কখন্ কিছু না জানি।
রাখিয়া বক্ষের পরে অবশ চিবুক মোর,
হাসিতেছি তার পানে, হৃদয়ে আঁধার ঘোর।
বাতায়ন-যবনিকা, বাতাস, সরায়ে ধীরে
বীজন করিছে আসি এ মোর তাপিত শিরে।
সম্মুখেতে দেখা যায়
পীতবর্ণ বালুকায়
অস্তগামী রবিকর অদূর 'নীলের' তীরে।
চেয়ে আছি, দেখিতেছি, নদীর সুদূর পারে,
(কী জানি কিসের দুখ।)
পশ্চিম দিকের মুখ
বিষণ্ণ হইয়া আসে সন্ধ্যার আঁধার ভারে।
প্রদোষ তারার মুখে হাসি আসি উঁকি মারে।
রোমীয় স্বপন এক জাগিছে সম্মুখে মোর,
ঘুরিছে মাথার মাঝে, মাথায় লেগেছে ঘোর।
রোমীয় সমর-অস্ত্র ঝঞ্ঝনিয়া উঠে বাজি,

বিস্ফারিত নাসা চাহে রণ-ধূম পিতে আজি।
কিন্তু হায়! অমনি সে মুখ্ পানে হেসে চায়,
কী জানি কী হয় মতি,
হীন প্রমোদের প্রতি।
বীরের ভ্রূকুটিগুলি তখনি মিলায়ে যায়।
গরবিত, শূন্য হিয়া, জর্জর আবেশ-বাণে,
যে প্রমোদে ঘৃণা করি হেসে চাই তারি পানে।

অনাহূত হর্ষ এক জাগ্রতে স্বপনে আসি,
শৌর্যের সমাধি-পরে ঢালে রবি-কর রাশি!
কতবার ঘৃণি তারে! রমণী সে অবহেলে
পৌরুষ নিতেছে কাড়ি বিলাসের জালে ফেলে!
কিন্তু সে অধর হতে
অমনি অজস্র স্রোতে
ঝরে পড়ে মৃদু হাসি, চুম্বন অমৃত-মাখা
আমারে করিয়া তুলে, ভাঙাঘর ফুলে ঢাকা।
বীরত্বের মুখ খানি একবার মনে আনি,
তার পরে ওই মুখে ফিরাই নয়ন মম,
ওই মুখ! একখানি উজ্জ্বল কলঙ্ক সম!
ওই তার শ্যাম বাহু আমারে ধরেছে হায়!
অঙ্গুলির মৃদু স্পর্শে বল মোর চলে যায়!
মুখ ফিরাইয়া লই— রমণী যেমনি ধীরি
মৃদু কণ্ঠে মৃদু কহে, অমনি আবার ফিরি।
রোমের আঁধার মেঘ দেখে যেই মুখ-'পরে,
অমনি দু বাহু দিয়ে কণ্ঠ জড়াইয়া ধরে,
বরষে নয়নবারি আমার বুকের মাঝ,
চুমিয়া সে অশ্রুবারি শুকানো বীজের কাজ।
তার পরে ত্যজি মোরে চরণ পড়িছে টলে,
থর থর কেঁপে বলে— 'যাও, যাও, যাও চলে!'
ঢুলু ঢুলু আঁখিপাতা পুরে অশ্রু-মুকুতায়,
শ্যামল সৌন্দর্য তার হিম-শ্বেত হয়ে যায়!
জীবনের লক্ষ্য, আশা, ইচ্ছা, হারাইয়া ফেলি,
চেয়ে থাকি তার পানে কাতর নয়ন মেলি।
আবার ফিরাই মুখ, কটাক্ষেতে চেয়ে রই,
কলঙ্কে প্রমোদে মাতি তাহারে টানিয়া লই!
আরেকটি বার রোম, হইব সন্তান তোর
একটি বাসনা এই বন্দী এ হৃদয়ে মোর।
গৌরবে সম্মানে মরি এই এক আছে আশ,
চাহি না করিতে ব্যয় চুম্বনে অন্তিম শ্বাস!
বুঝি হায় সে আশাও পুরিবে না কোনো কালে
রোমীয় মৃত্যুও বুঝি ঘটিবে না এ কপালে!

রোমীয় সমাধি চাই
তাও বুঝি ভাগ্যে নাই,
ওই বুকে মরে যাব, বুঝি মরণের কালে।

Robert Buchanan

ভারতী
আশ্বিন-কার্তিক ১২৮৮

সুখী প্রাণ

জান না তো নির্ঝরিণী, আসিয়াছ কোথা হতে,
কোথায় যে করিছ প্রয়াণ,
মাতিয়া চলেছ তবু আপন আনন্দে পূর্ণ,
আনন্দ করিছ সবে দান।
বিজন-অরণ্য-ভূমি দেখিছে তোমার খেলা
জুড়াইছে তাহার নয়ান।
মেষ-শাবকের মতো তরুদের ছায়ে ছায়ে
রচিয়াছ খেলিবার স্থান।
গভীর ভাবনা কিছু আসে না তোমার কাছে,
দিনরাত্রি গাও শুধু গান।
বুঝি নরনারী মাঝে এমনি বিমল হিয়া
আছে কেহ তোমারি সমান।
চাহে না চাহে না তারা ধরণীর আড়ম্বর,
সন্তোষে কাটাতে চায় প্রাণ,
নিজের আনন্দ হতে আনন্দ বিতরে তারা
গায় তারা বিশ্বের কল্যাণ।

Robert Buchanan

'আলোচনা' পত্রিকা
ভাদ্র ১২৯১

জীবন মরণ

ওরা যায়, এরা করে বাস;
অন্ধকার উত্তর বাতাস
বহিয়া কত-না হা-হুতাশ
ধূলি আর মানুষের প্রাণ
উড়াইয়া করিছে প্রয়াণ।
আঁধারেতে রয়েছি বসিয়া;
একই বায়ু যেতেছে শ্বসিয়া

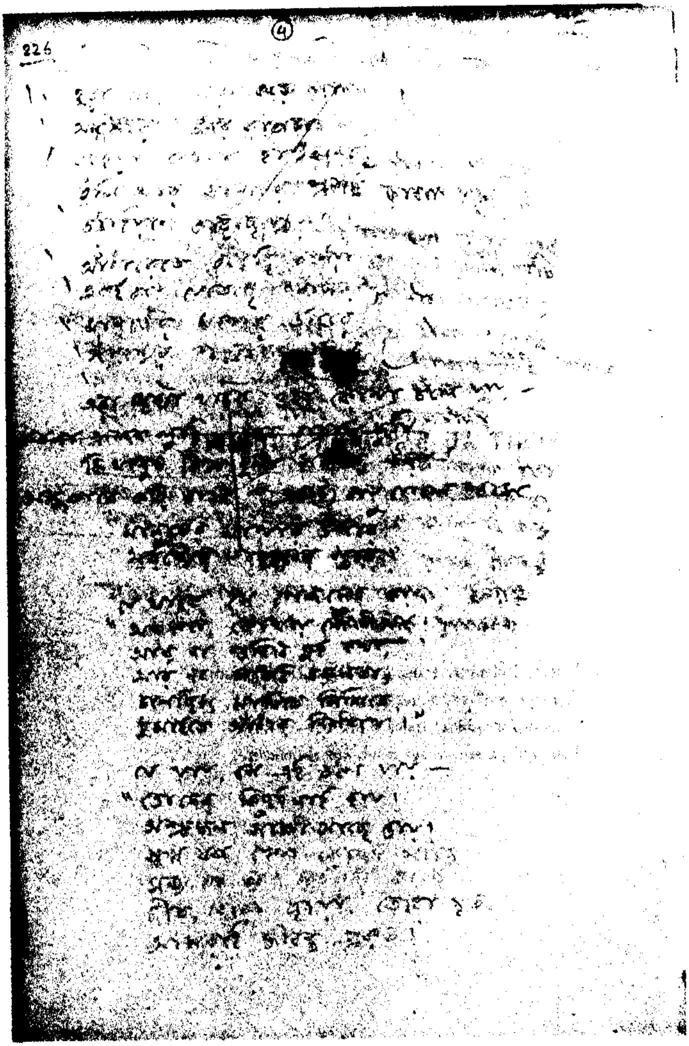

"জীবন মরণ"

ভিক্টর হ্যুগোর কবিতার অনুবাদ

রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপিচিত্র

মানুষের মাথার উপরে,
অরণ্যের পল্লবের স্তরে।

যে থাকে সে গেলদের কয়,
'অভাগা, কোথায় গেলি লয়।
আর না শুনিবি তুই কথা,
আর হেরিবি তরুলতা,
চলেছিস মাটিতে মিশিতে,
ঘুমাইতে আঁধার নিশীথে।'

যে যায় সে এই বলে যায়,
'তোদের কিছুই নাই হায়,
অশ্রুজল সাক্ষী আছে তায়।
সুখ যশ হেথা কোথা আছে
সত্য যা তা মৃতদেরি কাছে।
জীব, তোরা ছায়া, তোরা মৃত,
আমরাই জীবন্ত প্রকৃত।'

Victor Hugo

'আলোচনা' পত্রিকা
কার্তিক ১২৯১

স্বপ্ন দেখেছিনু প্রেমাগ্নিজ্বালার

স্বপ্ন দেখেছিনু প্রেমাগ্নিজ্বালার
সুন্দর চুলের, সুগন্ধি মালার,
তিক্ত বচনের, মিষ্ট অধরের,
বিমুগ্ধ গানের, বিষণ্ণ স্বরের।
সে-সব মিলায়ে গেছে বহুদিন,
সে স্বপ্নপ্রতিমা কোথায় বিলীন।
শুধু সে অনন্ত জ্বলন্ত হুতাশ
ছন্দে বদ্ধ হয়ে করিতেছে বাস।

তুমিও গো যাও, হে অনাথ গান,
সে স্বপ্নছবিরে করগে সন্ধান।
দিলাম পাঠায়ে, করিতে মেলানী,
ছায়া-প্রতিমারে বায়ুময়ী বাণী।

Heinrich Heine

আঁখি পানে যবে আঁখি তুলি

আঁখি পানে যবে আঁখি তুলি
দুখ জ্বালা সব যাই ভুলি।
অধরে অধর পরশিয়া
প্রাণমন উঠে হরষিয়া।
মাথা রাখি যবে ওই বুকে
ডুবে যাই আমি মহা সুখে।
যবে বল তুমি, 'ভালবাসি',
শুনে শুধু আঁখিজলে ভাসি।

Heinrich Heine

প্রথমে আশাহত হয়েছিনু

প্রথমে আশাহত হয়েছিনু
ভেবেছিনু সবে না এ বেদনা;
তবু তো কোনোমতে সয়েছিনু,
কী করে যে সে কথা শুধায়ো না।

Heinrich Heine

নীল বায়লেট নয়ন দুটি করিতেছে ঢলঢল

নীল বায়লেট নয়ন দুটি করিতেছে ঢলঢল
রাঙা গোলাপ গাল দুখানি, সুধায় মাখা সুকোমল।
শুভ্র বিমল করকমল ফুটে আছে চিরদিন!
হৃদয়টুকু শুষ্ক শুধু পাষাণসম সুকঠিন।

Heinrich Heine

গানগুলি মোর বিষে ঢালা

গানগুলি মোর বিষে ঢালা
কী হবে আর তাহা বই?
ফুটন্ত এ প্রাণের মাঝে
বিষ ঢেলেছে বিষময়ী!

গানগুলি মোর বিষে ঢালা,
কী হবে আর তাহা বই?

বুকের মধ্যে সর্প আছে,
তুমিও সেথা আছ অয়ি।

Heinrich Heine

তুমি একটি ফুলের মতো মণি

তুমি একটি ফুলের মতো মণি
এম্‌নি মিষ্টি, এম্‌নি সুন্দর।
মুখের পানে তাকাই যখনি
ব্যথায় কেন কাঁদায় অন্তর।

শিরে তোমার হস্ত দুটি রাখি
পড়ি এই আশীষ মন্তর,
বিধি তোরে রাখুন চিরকাল
এমনি মিষ্টি, এম্‌নি সুন্দর।

Heinrich Heine

রানী, তোর ঠোঁট দুটি মিঠি

রানী, তোর ঠোঁট দুটি মিঠি
রানী, তোর মধুমাখা দিঠি
রানী, তুই মণি তুই ধন,
তোর কথা ভাবি সারাক্ষণ।
দীর্ঘ সন্ধ্যা কাটে কী করিয়া?
সাধ যায় তোর কাছে গিয়া
চুপিচাপি বসি এক ভিতে
ছোটোছোটো সেই ঘরটিতে।
ছোটো হাতখানি হাতে করে
অধরেতে রেখে দিই ধরে।
ভিজাই ফেলিয়া আঁখিজল
ছোট সে কোমল করতল।

Heinrich Heine

বারেক ভালোবেসে যে জন মজে

বারেক ভালোবেসে যে জন মজে
দেবতাসম সেই ধন্য,
দ্বিতীয়বার পুন প্রেমে যে পড়ে
মূর্খের অগ্রগণ্য।

আমিও সে দলের মূর্খরাজ
দুবার প্রেমপাশে পড়ি;

তপন শশী তারা হাসিয়া মরে,
আমিও হাসি— আর মরি।

Heinrich Heine

বিশ্বামিত্র, বিচিত্র এ লীলা!

বিশ্বামিত্র, বিচিত্র এ লীলা!
দিবেরাত্রি আহার নিদ্রে ছেড়ে,
তপিস্যে আর লড়াই করে শেষে
বশিষ্ঠের গাইটি নিলে কেড়ে।

বিশ্বামিত্র তোমার মতো গোরু
দুটি এমন দেখি নি বিশ্বে!
নইলে একটি গাভী পাবার তরে
এত যুদ্ধু এত তপিস্যে!

Heinrich Heine

সাধনা
বৈশাখ ১২৯৯

ভালোবাসে যারে তার চিতাভস্ম-পানে

ভালোবাসে যারে তার চিতাভস্ম-পানে
প্রেমিক যেমন চায় কাতর নয়ানে
তেমনি যে তোমা-পানে নাহি চায় গ্রীস্
তাহার হৃদয় মন পাষাণ কুলিশ
ইংরাজেরা ভাঙিয়াছে প্রাচীর তোমার
দেবতাপ্রতিমা লয়ে গেছে [সিন্ধুপার]
এ দেখে কার না হবে হবে ...

[ধূম]কেতু সম তারা কী কুক্ষণে হায়
[ছা]ড়িয়া সে ক্ষুদ্র দ্বীপ আইল হেথায়
[অ]সহায় বক্ষ তব রক্তময় করি
দেবতা প্রতিমাগুলি লয়ে গেল হরি।

George Gordon Byron

মালতী পুঁথি

প্রবন্ধ

সাহিত্য

ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী

মনুষ্যহৃদয়ের স্বভাব এই যে, যখনই সে সুখ দুঃখ শোক প্রভৃতির দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন সে ভাব বাহ্যে প্রকাশ না করিলে সে সুস্থ হয় না। যখন কোনো সঙ্গী পাই, তখন তাহার নিকট মনোভাব ব্যক্ত করি, নহিলে সেই ভাব সংগীতাদির দ্বারা প্রকাশ করি। এইরূপে গীতিকাব্যের উৎপত্তি। আর কোনো মহাবীর শত্রুহস্ত বা কোনো অপকার হইতে দেশকে মুক্ত করিলে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতাসূচক যে গীতি রচিত ও গীত হয় তাহা হইতেই মহাকাব্যের জন্ম। সুতরাং মহাকাব্য যেমন পরের হৃদয় চিত্র করিতে উৎপন্ন হয়, তেমনি গীতিকাব্য নিজের হৃদয় চিত্র করিতে উৎপন্ন হয়। মহাকাব্য আমরা পরের জন্য রচনা করি এবং গীতিকাব্য আমরা নিজের জন্য রচনা করি। যখন প্রেম করুণা ভক্তি প্রভৃতি বৃত্তি-সকল হৃদয়ের গূঢ় উৎস হইতে উৎসারিত হয় তখন আমরা হৃদয়ের ভার লাঘব করিয়া তাহা গীতিকাব্যরূপ স্রোতে ঢালিয়া দিই এবং আমাদের হৃদয়ের পবিত্র প্রস্রবণজাত সেই স্রোত হয়তো শত শত মনোভূমি উর্বরা করিয়া পৃথিবীতে চিরকাল বর্তমান থাকিবে। ইহা মরুভূমির দগ্ধ বালুকাও আর্দ্র করিতে পারে, ইহা শৈলক্ষেত্রের শিলারাশিও উর্বরা করিতে পারে। কিংবা যখন অগ্নিশৈলের ন্যায় আমাদের হৃদয় ফাটিয়া অগ্নিরাশি উদ্‌গীরিত হইতে থাকে, তখন সেই অগ্নি আর্দ্র কাষ্ঠও জ্বালাইয়া দেয়, সুতরাং গীতিকাব্যের ক্ষমতা বড়ো অল্প নহে। ঋষিদিগের ভক্তির উৎস হইতে যে-সকল গীত উত্থিত হইয়াছিল তাহাতে হিন্দুধর্ম গঠিত হইয়াছে, এবং এমন দৃঢ়রূপে গঠিত হইয়াছে যে, বিদেশীয়রা সহস্র বৎসরের অত্যাচারেও তাহা ভগ্ন করিতে পারে নাই। এই গীতিকাব্যই যুদ্ধের সময় সৈনিকদের উন্মত্ত করিয়া তুলে, বিরহের সময় বিরহীর মনোভাব লাঘব করে, মিলনের সময় প্রেমিকের সুখে আহুতি প্রদান করে, দেবপূজার সময় সাধকের ভক্তির উৎস উন্মুক্ত করিয়া দেয়। এই গীতিকাব্যই ফরাসি বিদ্রোহের উত্তেজনা করিয়াছে, এই গীতিকাব্যই চৈতন্যের ধর্ম বঙ্গদেশে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে, এবং এই গীতিকাব্যই বাঙালির নির্জীব হৃদয়ে আজকাল অল্প অল্প জীবন সঞ্চার করিয়াছে। মহাকাব্য সংগ্রহ করিতে হয়, গঠিত করিতে হয়; গীতিকাব্যের উপকরণ-সকল গঠিত আছে, প্রকাশ করিলেই হইল। নিজের মনোভাব প্রকাশ করা বড়ো সামান্য ক্ষমতা নহে। শেক্সপিয়র পরের হৃদয় চিত্র করিয়া দৃশ্যকাব্যে অসাধারণ হইয়াছেন, কিন্তু নিজের হৃদয়চিত্রে অক্ষম হইয়া গীতিকাব্যে উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। তেমনি বাইরন নিজ হৃদয়চিত্রে অসাধারণ; কিন্তু পরের হৃদয়চিত্রে অক্ষম। গীতিকাব্য অকৃত্রিম, কেননা তাহা আমাদের নিজের হৃদয়কাননের পুষ্প; আর মহাকাব্য শিল্প, কেননা তাহা পর-হৃদয়ের অনুকরণ মাত্র। এই নিমিত্ত আমরা বাল্মীকি, ব্যাস, হোমর, ভার্জিল প্রভৃতি প্রাচীন কালের কবিদিগের ন্যায় মহাকাব্য লিখিতে পারিব না; কেননা সেই প্রাচীনকালে লোকে সভ্যতার আচ্ছাদনে হৃদয় গোপন করিতে জানিত না, সুতরাং কবি হৃদয় প্রত্যক্ষ করিয়া সেই অনাবৃত হৃদয়-সকল সহজেই চিত্র করিতে পারিতেন। গীতিকাব্য যেমন প্রাচীনকালের তেমনি এখনকার, বরং সভ্যতার সঙ্গে তাহা উন্নতি লাভ করিবে, কেননা সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে যেমন হৃদয় উন্নত হইবে, তেমনি হৃদয়ের চিত্রও উন্নতি লাভ করিবে। নিজের হৃদয় চিত্র করিতে গীতিকাব্যের উৎপত্তি বটে; কিন্তু কেবলমাত্র নিজের হৃদয় চিত্র করা গীতিকাব্যের কার্য নহে; এখন নিজের ও পরের উভয়ের মনোচিত্রের নিমিত্ত গীতিকাব্য ব্যাপৃত আছে, নহিলে গীতিকাব্যের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকিত না। ইংরাজিতে যাহাকে Lyric Poetry

কহে, আমরা তাহাকে খণ্ডকাব্য কহি। মেঘদূত খণ্ডকাব্য, ঋতুসংহারও খণ্ডকাব্য এবং Lalla Rookh-ও Lyric Poetry, Irish Melodies-ও Lyric Poetry, কিন্তু আমরা গীতিকাব্য অর্থে মেঘদূতকে মনে করি নাই, ঋতুসংহারকে গীতিকাব্য কহিতেছি। আমাদের মতে Lalla Rookh গীতিকাব্য নয়, Irish Melodies গীতিকাব্য। ইংরাজিতে যাহাদিগকে Odes, Sonnets প্রভৃতি কহে তাহাদিগের সমষ্টিকেই আমরা গীতিকাব্য বলিতেছি। বাংলাদেশে মহাকাব্য অতি অল্প কেন? তাহার অনেক কারণ আছে। বাংলা ভাষার সৃষ্টি অবধি প্রায় বঙ্গদেশ বিদেশীয়দিগের অধীনে থাকিয়া নির্জীব হইয়া আছে, আবার বাংলার জলবায়ুর গুণে বাঙালিরা স্বভাবত নির্জীব, স্বপ্নময়, নিস্তেজ, শান্ত; মহাকাব্যের নায়কদিগের হৃদয় চিত্র করিবার আদর্শ হৃদয় পাইবে কোথা? অনেক দিন হইতে বঙ্গদেশ সুখে শান্তিতে নিদ্রিত; যুদ্ধবিগ্রহ স্বাধীনতার ভাব বাঙালির হৃদয়ে নাই; সুতরাং এই কোমল হৃদয়ে প্রেমের বৃক্ষ আষ্টেপৃষ্ঠে মূল বিস্তার করিয়াছে। এই নিমিত্ত জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের লেখনী হইতে প্রেমের অশ্রু নিঃসৃত হইয়া বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়াছে এবং এই নিমিত্তই প্রেমপ্রধান বৈষ্ণব ধর্ম বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছে ও আধিপত্য লাভ করিয়াছে। আজকাল ইংরাজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালিরা স্বাধীনতা, অধীনতা, তেজস্বিতা, স্বদেশ-হিতৈষিতা প্রভৃতি অনেকগুলি কথার মর্মার্থ গ্রহণ করিয়াছেন এবং আজকাল মহাকাব্যের এত বাহুল্য হইয়াছে যে, যিনিই এখন কবি হইতে চান তিনিই একখানি গীতিকাব্য লিখিয়াই একখানি করিয়া মহাকাব্য বাহির করেন, কিন্তু তাঁহারা মহাকাব্যে উন্নতিলাভ করিতে পারিতেছেন না ও পারিবেন না। যদি বিদ্যাপতি-জয়দেবের সময় তাঁহাদের মনের এখনকার ন্যায় অবস্থা থাকিত তবে তাঁহারা হয়তো উৎকৃষ্ট মহাকাব্য লিখিতে পারিতেন। এখনকার মহাকাব্যের কবিরা রুদ্ধহৃদয়ে লোকদের হৃদয়ে উঁকি মারিতে গিয়া নিরাশ হইয়াছেন ও অবশেষে মিল্টন খুলিয়া ও কখনো কখনো রামায়ণ ও মহাভারত লইয়া অনুকরণের অনুকরণ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত মেঘনাদবধে, বৃত্রসংহারে ওই-সকল কবিদিগের পদছায়া স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু বাংলার গীতিকাব্য আজকাল যে ক্রন্দন তুলিয়াছে তাহা বাংলার হৃদয় হইতে উত্থিত হইতেছে। ভারতবর্ষের দুরবস্থায় বাঙালিদের হৃদয় কাঁদিতেছে, সেই নিমিত্তই বাঙালিরা আপনার হৃদয় হইতে অশ্রুধারা লইয়া গীতিকাব্যে ঢালিয়া দিতেছে। 'মিলে সবে ভারতসন্তান' ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয় সংগীত, স্বদেশের নিমিত্ত বাঙালির প্রথম অশ্রুজল। সেই অবধি আরম্ভ হইয়া আজি কালি বাংলা গীতিকাব্যের যে অংশে নেত্রপাত করি সেইখানেই ভারত। কোথাও বা দেশের নির্জীব রোদন, কোথাও বা উৎসাহের জ্বলন্ত অনল। 'মিলে সবে ভারতসন্তানে'র কবি যে ভারতের জয়গান করিতে অনুমতি দিয়াছেন, আজি কালি বালক পর্যন্ত, স্ত্রীলোক পর্যন্ত সেই জয়গান করিতেছে, বরং এখন এমন অতিরিক্ত হইয়া উঠিয়াছে যে তাহা সমূহ হাস্যজনক। সকল বিষয়েরই অতিরিক্ত হাস্যজনক, এবং এই অতিরিক্ততাই প্রহসনের মূল ভিত্তি। ভারতমাতা, যবন, উঠ, জাগো, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি শুনিয়া শুনিয়া আমাদের হৃদয় এত অসাড় হইয়া পড়িয়াছে যে ও-সকল কথা আর আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে না। ক্রমে যতই বালকগণ 'ভারত ভারত' চিৎকার বাড়াইবেন ততই আমাদের হাস্য সংবরণ করা দুঃসাধ্য হইবে। এই নিমিত্ত যাঁহারা ভারতবাসীদের দেশহিতৈষিতায় উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত আর্যসংগীত লেখেন, তাঁহাদের ক্ষান্ত হইতে উপদেশ দিই, তাঁহাদের প্রয়াস দেশহিতৈষিতার প্রস্রবণ হইতে উঠিতেছে বটে কিন্তু তাঁহাদের সোপান হাস্যজনক। তাঁহারা বুঝেন না ঘুমন্ত মনুষ্যের কর্ণে ক্রমাগত একই রূপ শব্দ প্রবেশ করিলে ক্রমে তাহা এমন অভ্যস্ত হইয়া যায় যে তাহাতে আর তাহার ঘুমের ব্যাঘাত হয় না। তাঁহারা বুঝেন না যেমন ক্রন্দন করিলে ক্রমে শোক নষ্ট হইয়া যায় তেমনি সকল বিষয়েই। এই নিমিত্তই শেক্সপিয়র কহিয়াছেন 'Words to the heat of deed too cold breath give'. তোমার হৃদয় যখন উৎসাহে জ্বলিয়া উঠিবে তখন তুমি তাহা দমন করিবে নহিলে প্রকাশ করিলেই নিভিয়া যাইবে এবং যত দমন করিবে ততই জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিবে।

ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসরসরোজিনী, দুঃখসঙ্গিনী এই তিনখানি গীতিকাব্য আমরা সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাদিগের মধ্যে ভুবনমোহিনীপ্রতিভা ও অবসরসরোজিনীর মধ্যে অনেকগুলি আর্যসংগীত আছে কেননা ইহাদিগের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক, অপরটি বালক। ইহা প্রায় প্রত্যক্ষ যে দুর্বলদিগের যেমন শারীরিক বল অল্প তেমনি মানসিক তেজ অধিক; ঈশ্বর একটির অভাব অন্যটির দ্বারা পূর্ণ করেন। ভুবনমোহিনীপ্রতিভা ও অবসরসরোজিনী পড়িলে দেখিবে, ইঁহাদিগের মধ্যে একজনের প্রয়াস আছে, অধ্যবসায় আছে, শ্রমশীলতা আছে। একজন আপনার হৃদয়ের খনির মধ্যে যে রত্ন যে ধাতু পাইয়াছেন তাহাই পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াছেন, সে রত্নে ধূলিকর্দম মিশ্রিত আছে কিনা, তাহা সুমার্জিত মসৃণ করিতে হইবে কিনা তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। আর-একজন আপনার বিদ্যার ভাণ্ডারে যাহা-কিছু কুড়াইয়া পাইয়াছেন, তাহাই একটু মার্জিত করিয়া বা কোনো কোনো স্থলে তাহার সৌন্দর্য নষ্ট করিয়া পাঠককে আপনার বলিয়া দিতেছেন। একজন নিজের জন্য কবিতা লিখিয়াছেন, আর-একজন পাঠকদিগের জন্য কবিতা লিখিয়াছেন। ভুবনমোহিনী নিজের মন তৃপ্তির জন্য কবিতা লিখিয়াছেন, আর রাজকৃষ্ণবাবু যশপ্রাপ্তির জন্য কবিতা লিখিয়াছেন, নহিলে তিনি বিদেশীয় কবিতার ভাব সংগ্রহ করিয়া নিজের বলিয়া দিতেন না। ভুবনমোহিনী পৃথিবীর লোক, তাঁর কবিতার নিন্দা করিলেও গ্রাহ্য করিবেন না, কেননা তিনি পৃথিবীর লোকের নিমিত্ত কবিতা লেখেন নাই। আর রাজকৃষ্ণবাবু তাঁহার কবিতার নিন্দা শুনিলে মর্মান্তিক ক্ষুব্ধ হইবেন, কেননা যশেচ্ছাই তাঁহাকে কবি করিয়া তুলিয়াছে। একজন অশিক্ষিতা রমণীর প্রতিভায় ও একজন শিক্ষিত যুবকের প্রয়াসে এই প্রভেদ। কবিরা যেখানেই প্রায় পরের অনুকরণ করিতে যান সেইখানেই নষ্ট করেন ও যেখানে নিজের ভাব লেখেন সেইখানেই ভালো হয়, কেননা তাঁহাদের নিজের ভাবস্রোতের মধ্যে পরের ভাব ভালো করিয়া মিশে না। আর কুকবিরা প্রায় যেখানে পরের অনুকরণ বা অনুবাদ করেন সেইখানেই ভালো হয় ও নিজের ভাব জুড়িতে গেলেই নষ্ট করেন, কেননা হয় পরের মনোভাব-স্রোতের মধ্যে তাঁহাদের নিজের ভাব মিশে না কিংবা তাঁহার আশ্রয় উচ্চতর কবির কবিত্বের নিকট তাঁহার নিজের ভাব 'হংসমধ্যে বক যথা' হইয়া পড়ে! এই নিমিত্ত অবসরসরোজিনীর 'মধুমক্ষিকা-দংশন' ও 'প্রবাহি চলিয়া যাও অয়ি লো তটিনী' ইত্যাদি কবিতাগুলি মন্দ নাও লাগিতে পারে!

জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব
কার্তিক ১২৮৩

মেঘনাদবধ কাব্য

বঙ্গীয় পাঠকসমাজে যে-কোনো গ্রন্থকার অধিক প্রিয় হইয়া পড়েন, তাঁহার গ্রন্থ নিরপেক্ষভাবে সমালোচনা করিতে কিঞ্চিৎ সাহসের প্রয়োজন হয়। তাঁহার পুস্তক হইতে এক বিন্দু দোষ বাহির করিলেই, তাহা ন্যায্য হউক বা অন্যায্যই হউক, পাঠকেরা অমনি ফণা ধরিয়া উঠেন। ভীরু সমালোচকরা ইঁহাদের ভয়ে অনেক সময়ে আপনার মনের ভাব প্রকাশ করিতে সাহস করেন না। সাধারণ লোকদিগের প্রিয় মতের পোষকতা করিয়া লোকরঞ্জন করিতে আমাদের বড়ো একটা বাসনা নাই। আমাদের নিজের যাহা মত তাহা প্রকাশ্যভাবে বলিতে আমরা কিছুমাত্র সংকুচিত হইব না বা যদি কেহ আমাদের মতের দোষ দেখাইয়া দেন তবে তাহা প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিতে আমরা কিছুমাত্র লজ্জিত হইব না। এখনকার পাঠকদের স্বভাব এই যে, তাঁহারা ঘটনাক্রমে এক-একজন লেখকের অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়েন, এরূপ অবস্থায় তাঁহারা সে লেখকের রচনায় কোনো দোষ দেখিতে পান না, অথবা কেহ যদি তাহার কোনো দোষ দেখাইয়া দেয় সে দোষ বোধগম্য ও যুক্তিযুক্ত হইলেও তাঁহারা সেগুলিকে গুণ বলিয়া বুঝাইতে ও বুঝিতে

প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকেন। আবার এমন অনেক ভীরু-স্বভাব পাঠক আছেন, যাঁহারা খ্যাতনামা লেখকের রচনা পাঠকালে কোনো দোষ দেখিলে তাহাকে দোষ বলিয়া মনে করিতে ভয় পান, তাঁহারা মনে করেন এগুলি গুণই হইবে, আমি ইহার গভীর অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না।

আমাদের পাঠকসমাজের রুচি ইংরাজি-শিক্ষার ফলে একাংশে যেমন উন্নত হইয়াছে অপরাংশে তেমনি বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ভ্রমর, কোকিল, বসন্ত লইয়া বিরহ বর্ণনা করিতে বসা তাঁহাদের ভালো না লাগুক, কবিতার অন্যসকল দোষ ইংরাজি গিল্‌টিতে আবৃত করিয়া তাঁহাদের চক্ষে ধরো তাঁহারা অন্ধ হইয়া যাইবেন। ইঁহারা ভাববিহীন মিষ্ট ছত্রের মিলনসমষ্টি বা শব্দাড়ম্বরের ঘনঘটাচ্ছন্ন শ্লোককে মুখে কবিতা বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জিত হন কিন্তু কার্যে তাহার বিপরীতাচরণ করেন। শব্দের মিষ্টতা অথবা আড়ম্বর তাঁহাদের মনকে এমন আকৃষ্ট করে যে ভাবের দোষ তাঁহাদের চক্ষে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। কুশ্রী ব্যক্তিকে মণি-মাণিক্যজড়িত সুদৃশ্য পরিচ্ছদে আবৃত করিলে আমাদের চক্ষু পরিচ্ছদের দিকেই আকৃষ্ট হয়, ওই পরিচ্ছদ সেই কুশ্রী ব্যক্তির কদর্যতা কিয়ৎ পরিমাণে প্রচ্ছন্ন করিতেও পারে কিন্তু তাহা বলিয়া তাহাকে সৌন্দর্য অর্পণ করিতে পারে না।

আমরা এবারে যে মেঘনাদবধের একটি রীতিমতো সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা পাঠ করিয়া অনেক পাঠক বিরক্ত হইয়া কহিবেন যে অত সূক্ষ্ম সমালোচনা করিয়া পুস্তকের দোষগুণ ধরা অনাবশ্যক, মোটের উপর পুস্তক ভালো লাগিলেই হইল। আমরা বলি এমন অনেক চিত্রকর আছেন, যাঁহারা বর্ণপ্রাচুর্যে তাঁহাদের চিত্র পূর্ণ করেন, সে চিত্র দূর হইতে সহসা নয়ন আকর্ষণ করিলেও প্রকৃত শিল্পরসজ্ঞ ব্যক্তি সে চিত্রকরেরও প্রশংসা করেন না, সে চিত্রেরও প্রশংসা করেন না, তাঁহারা বিশেষ বিশেষ করিয়া দেখেন যে, চিত্রে ভাব কেমন সংরক্ষিত হইয়াছে, এবং ভাবসুদ্ধ চিত্র দেখিলেই তাঁহারা তৃপ্ত হন। কাব্য সম্বন্ধেও ওইরূপ বলিতে পারা যায়। আমরা অধিক ভূমিকা করিতে অতিশয় অনিচ্ছুক, এখন যে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গিয়াছে তাহারই অবতারণা করা যাক।

লক্ষ্মণ, ইন্দ্রজিৎ, রাবণ, সীতা, প্রমীলা, ইন্দ্র, দুর্গা, মায়াদেবী, লক্ষ্মী ইঁহারাই মেঘনাদবধের প্রধান চরিত্র। ইহার মধ্যে কতকগুলি চরিত্র সুচিত্রিত হয় নাই, এবং কতকগুলি আমাদের মনের মতো হয় নাই। প্রথম, পুস্তক আরম্ভ করিতেই রাবণকে পাই। প্রথমে আমরা ভাবিলাম, কী একটি ভীষণ চিত্রই পাইব, গগনস্পর্শী বিশাল দশানন গম্ভীর, ভীষণ, অন্ধকারময় মূর্তিতে উচ্চ প্রকাণ্ড সভামণ্ডপে আসীন, কিন্তু তাহা নহে, তাহা খুঁজিয়া পাই না। পাঠক প্রথমে একটি স্ফটিকময় রত্নরাজিসমাকুল সভায় প্রবেশ করো; সেখানে বসন্তের বাতাস বহিতেছে, কুসুমের গন্ধ আসিতেছে, চন্দ্রাননা চারুলোচনা কিংকরী চামর ঢুলাইতেছে, মদনের প্রতিরূপ ছত্রধর ছত্র ধরিয়া আছে, যাহা এক ভীষণের মধ্যে আছে দৌবারিক, কিন্তু দৌবারিককে মনে করিতে গিয়া শিবের রুদ্রভাব কমাইতে হয়। কবি পাণ্ডবশিবির-দ্বারে শূলপাণি রুদ্রেশ্বরের সহিত দ্বারবানের তুলনা দিয়াছেন। পুষ্করিণীর সহিত সমুদ্রের তুলনা দিলে সমুদ্রকেই ছোটো বলিয়া মনে হয়। কেহ বলিবেন যে, রামায়ণের রাবণ রত্নরাজিসমাকুলিত সভাতেই থাকিত, সুতরাং মেঘনাদবধে অন্যরূপ কী করিয়া বর্ণিত হইবে? আমরা বলি রত্নরাজিসংকুল সভায় কি গাম্ভীর্য অর্পণ করা যায় না? বাল্মীকি রাবণের সভা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন, 'রাবণের সভা তরঙ্গসংকুল, নক্রকুম্ভীর ভীষণ সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর।'[1] বাংলার একটি ক্ষুদ্র কাব্যের সহিত বাল্মীকির বিশাল কাব্যের তুলনা করিতে যাওয়াও যা, আর মহাদেবের সহিত একটা দ্বারবানের তুলনা করাও তা, কিন্তু কী করা যায়, কোনো কোনো পাঠকের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া না দেখাইলে তাঁহারা বুঝিবেন না।

---

১. হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য -কর্তৃক অনুবাদিত রামায়ণ। সুন্দর কাণ্ড।

ভূতলে অতুল সভা— ফটিকে গঠিত;
তাহে শোভে রত্নরাজি, মানসসরসে
সরস কমলকুল বিকশিত যথা।
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত স্তম্ভ সারি সারি
ধরে উচ্চ স্বর্ণ ছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি,
বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে
ধরারে। ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা,
পদ্মরাগ, মরকত, হীরা, যথা ঝোলে
খচিত মুকুলে ফুলে পল্লবের মালা
ব্রতালয়ে। ইত্যাদি

ইহা কি রাবণের সভা? ইহা তো নাট্যশালার বর্ণনা!

কতকগুলি পাঠকের আবার পাত্রাপাত্র জ্ঞান নাই, তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিবেন রাবণের সভা মহান করিতেই হইবে তাহার অর্থ কী? না-হয় সুন্দরই হইল, ইঁহাদের কথার উত্তর দিতে আমাদের অবকাশ নাই এবং ইচ্ছাও নাই। এককথায় বলিয়া রাখি যে, কবি ব্রজাঙ্গনায় যথাসাধ্য কাকলি, বাঁশরি, স্বরলহরী, গোকুল, বিপিন প্রভৃতি ব্যবহার করিতে পারিতেন, কিন্তু মহাকাব্য রচনায়, বিশেষ রাবণের সভা-বর্ণনায় মিষ্টভাবের পরিবর্তে তাঁহার নিকট হইতে আমরা উচ্চ, প্রকাণ্ড, গম্ভীর ভাব প্রার্থনা করি। এই সভার বর্ণনা পাঠ করিয়া দেখি রাবণ কাঁদিতেছেন, রাবণের রোদনে পুস্তকের প্রারম্ভভাগ যে নষ্ট হইয়া গেল, তাহা আর সুরুচি পাঠকদের বুঝাইয়া দিতে হইবে না। ভালো, এ দোষ পরিহার করিয়া দেখা যাউক, রাবণ কী ভয়ানক শোকেই কাঁদিতেছেন ও সে রোদনই বা কী অসাধারণ; কিন্তু তাহার কিছুই নয়, বীরবাহুর শোকে রাবণ কাঁদিতেছেন। অনেকে কহিবেন, ইহা অপেক্ষা আর শোক কী আছে। কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন, বীরবাহুর পূর্বে রাবণের কত পুত্র হত হইয়াছে, সকল ক্লেশের ন্যায় শোকও অভ্যস্ত হইয়া যায়, এখন দেখা যাউক রাবণের রোদন কী প্রকার। প্রকাণ্ড দশানন, কাঁদিতেছেন কিরূপে—

এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি,
বাক্যহীন পুত্রশোকে! ঝর ঝর ঝরে,
অবিরল অশ্রুধারা— তিতিয়া বসনে
ইত্যাদি

রানী মন্দোদরীকে কাঁদাইতে গেলে ইহা অপেক্ষা অধিক বাক্যব্যয় করিতে হইত না। ইহা পড়িলেই আমাদের মনে হয় গালে হাত দিয়া একটি বিধবা স্ত্রীলোক কাঁদিতেছেন। একজন সাধারণ নায়ক এরূপ কাঁদিতে বসিলে আমাদের গা জ্বলিয়া যায়, তাহাতে ইনি মহাকাব্যের নায়ক, যে-সে নায়ক নয়, যিনি বাহুবলে স্বর্গপুরী কাঁপাইয়াছিলেন, এবং যাঁহার এতদূর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল যে, তাঁহার চক্ষের উপরে একটি একটি করিয়া পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা নিহত হইল, ঐশ্বর্যশালী জনপূর্ণ কনকলঙ্কা ক্রমে ক্রমে শ্মশানভূমি হইয়া গেল, অবশেষে যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন তথাপি রামের নিকট নত হন নাই, তাঁহাকে এইরূপ বালিকাটির ন্যায় কাঁদাইতে বসানো অতি ক্ষুদ্র কবির উপযুক্ত। ভাবুক মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, মন্দোদরীই বিলাপ করিতে হইলে বলিতেন যে—

হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীরচূড়ামণি!
কী পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে?
কী পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই? হায় রে কেমনে
সহি এ যাতনা আমি? কে আর রাখিবে

এ বিপুল কুল-মান এ কালসমরে?

ইত্যাদি

রাবণের ক্রন্দন দেখিয়া 'সচিবশ্রেষ্ঠ বুধঃ সারণ' সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন,

এ ভবমণ্ডল

মায়াময়, বৃথা এর সুখ দুঃখ যত।

রাবণ কহিলেন, 'কিন্তু জেনে শুনে তবু কাঁদে এ-পরাণ অবোধ'। ইহার পর দূত যে বীরবাহুর যুদ্ধের বর্ণনা করিলেন তাহা মন্দ নহে, তাহাতে কবি কথাগুলি বেশ বাছিয়া বসাইয়াছেন। তাহার পরে দূত বীরবাহুর মৃত্যু স্মরণ করিয়া কাঁদিল— 'কাঁদে যথা বিলাপী স্মরিয়া পূর্ব দুঃখ'— এ কথাটি অতিশয় অযথা হইয়াছে। অমনি সভাসুদ্ধ কাঁদিল, রাবণ কাঁদিল, আমার মনে হইল আমি একরাশি স্ত্রীলোকের মধ্যে বসিয়া পড়িলাম।

অশ্রুময় আঁখি পুনঃ কহিলা রাবণ,
মন্দোদরী মনোহর,

একে তো অশ্রুময় আঁখি রাবণ, তাহাতে আবার 'মন্দোদরী মনোহর', আমরা বাল্মীকির রাবণকে হারাইয়া ফেলিলাম। বড়ো বড়ো কবিরা এক-একটি বিশেষণে তাঁহাদের বর্ণনীয় বিষয়ের স্বপক্ষে এক-এক আকাশ ভাব আনিয়া দেন। রোদনের সময় রাবণের 'মন্দোদরী মনোহর' বিশেষণ দিবার প্রয়োজন কী? যখন কবি রাবণের সৌন্দর্য বুঝাইবার জন্য কোনো বর্ণনা করিবেন তখন 'মন্দোদরী মনোহর' রাবণের বিশেষণ অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। তৎপরে দূত তেজের সহিত বীরবাহুর মৃত্যু বর্ণনা করিলেন, তখন রাবণের বীরত্ব ফিরিয়া আসিল, কেননা ডমরুধ্বনি না শুনিলে ফণী কখনো উত্তেজিত হয় না। তাহার পরে শ্মশানে বীরবাহুর মৃতকায় দেখিয়া—

মহাশোকে শোকাকুল কহিলা রাবণ।
যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ কুমার
প্রিয়তম, বীরকুলসাধ এ শয়নে
সদা! রিপুদল বলে দলিয়া সমরে
জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে ভীরু সে মূঢ় শত ধিক্‌ তারে।

এতদূর পড়িয়া আশা হয় যে এবার বুঝি রাবণের উপযুক্ত রোদনই হইবে কিন্তু তাহার পরেই আছে—

তবু বৎস যে হৃদয় মুগধ—
কোমল সে ফুলসম। এ বজ্র আঘাতে
কত যে কার সে, তা জানেন সে জন
অন্তর্যামী যিনি; আমি কহিতে অক্ষম।
হে বিধি, এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী।
পরের যাতনা কিন্তু দেখি কি হে তুমি
হও সুখী? পিতা সদা পুত্র দুঃখে দুঃখী;
তুমি হে জগতপিতা, এ কী রীতি তব?
হা পুত্র! হা বীরবাহু! বীরেন্দ্র কেশরী
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে?

সুরুচি পাঠকেরা কখনোই বলিবেন না যে, ইহা রাবণের উপযুক্ত রোদন হইয়াছে।

এইরূপে আক্ষেপিয়া রাক্ষস ঈশ্বর
রাবণ, ফিরায়ে আঁখি দেখিলেন দূরে
সাগর

ভাবিলাম মহাকবি সাগরের কী একটি মহান গম্ভীর চিত্রই করিবেন, অন্য কোনো কবি এ সুবিধা ছাড়িতেন না। সমুদ্রের গম্ভীর চিত্র দূরে থাক্, কবি কহিলেন—

বহিছে জলস্রোত কলরবে
স্রোতঃপথে জল যথা বরিষার কালে

যাঁহাদের কবি আখ্যা দিতে পারি তাঁহাদের মধ্যে কেহই এরূপ নীচ বর্ণনা করিতে পারেন না, তাঁহাদের মধ্যে কেহই বিশাল সমুদ্রের ভাব এত ক্ষুদ্র করিয়া ভাবিতে পারেন না। এই স্থলে পাঠকগণের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য রামায়ণ হইতে একটি উৎকৃষ্ট সমুদ্র বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।[১]

"বিস্তীর্ণ মহাসমুদ্র প্রচণ্ড বায়ুবেগে নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলিত হইতেছে। উহার কোথাও উদ্দেশ নাই, চতুর্দিক অবাধে প্রসারিত হইয়া আছে। উহা ঘোর জলজন্তুগণে পূর্ণ; প্রদোষকালে অনবরত ফেন বিকাশপূর্বক যেন হাস্য করিতেছে এবং তরঙ্গভঙ্গি প্রদর্শনপূর্বক যেন নৃত্য করিতেছে। তৎকালে চন্দ্র উদিত হওয়াতে মহাসমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস বর্ধিত হইয়াছে এবং প্রতিবিম্বিত চন্দ্র উহার বক্ষে ক্রীড়া করিতেছে। সমুদ্র পাতালের ন্যায় ঘোর গভীরদর্শন; উহার ইতস্ততঃ তিমি তিমিঙ্গিল প্রভৃতি জলজন্তুসকল প্রচণ্ডবেগে সঞ্চরণ করিতেছে। স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড শৈল; উহা অতলস্পর্শ; ভীম অজগরগণ গর্ভে লীন রহিয়াছে। উহাদের দেহ জ্যোতির্ময়, সাগরবক্ষে যেন অগ্নিচূর্ণ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। সমুদ্রের জলরাশি নিরবচ্ছিন্ন উঠিতেছে ও পড়িতেছে। সমুদ্র আকাশতুল্য এবং আকাশ সমুদ্রতুল্য; উভয়ের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই; আকাশে তারকাবলী এবং সমুদ্রে মুক্তাস্তবক; আকাশে ঘনরাজি এবং সমুদ্রে তরঙ্গজাল; আকাশে সমুদ্র ও সমুদ্রে আকাশ মিশিয়াছে। প্রবল তরঙ্গের পরস্পর সংঘর্ষ নিবন্ধন মহাকাশে মহাভেরীর ন্যায় অনবরত ভীম রব শ্রুত হইতেছে। সমুদ্র যেন অতিমাত্র ক্রুদ্ধ; উহা রোষভরে যেন উঠিবার চেষ্টা করিতেছে এবং উহার ভীম গম্ভীর রব বায়ুতে মিশ্রিত হইতেছে।"

রাবণ সমুদ্রকে সম্বোধন করিয়া যাহা কহিলেন তাহা সুন্দর লাগিল। রাবণ পুনরায় সভায় আসিয়া,

শোকে মগ্ন বসিলা নীরবে
মহামতি, পাত্র, মিত্র, সভাসদ্ আদি
বসিলা চৌদিকে, আহা নীরব বিষাদে!

হেনকালে রোদনের 'মৃদু নিনাদ' ও কিঙ্কিণীর 'ঘোর রোল' তুলিয়া চিত্রাঙ্গদা আইলেন, কবি তখন একটি ঝড় বাধাইলেন, এই ঝড়ের রূপকটি অতিশয় হাস্যজনক।

সুরসুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল; মুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন
নিশ্বাস প্রলয় বায়ু; অশ্রুবারিধারা
আসার, জীমূত-মন্দ্র হাহাকার রব।

এই ঝড় উপস্থিত হইতেই অমনি নেত্রনীরসিক্তা কিংকরী দূরে চামর ফেলিয়া দিল এবং ছত্রধর ছত্র ফেলিয়া দিয়া কাঁদিতে বসিল, আর পাত্র-মিত্র সভাসদ আদি অধীর হইয়া 'ঘোর কোলাহলে' কাঁদিতে লাগিল। রাবণের সভায় এত কান্না তো আর সহ্য হয় না, পাত্র-মিত্র সভাসদ আদিকে এক-একটি খেলেনা দিয়া থামাইতে ইচ্ছা করে। একটু শোকে কিংকরী চামর ছুঁড়িয়া ফেলিল, একটু শোকে ছত্রধর ছত্র ফেলিয়া কাঁদিতে বসিল। একে তো ইহাতে রাজসভার এক অপূর্ব ভাব মনে আসে, দ্বিতীয়ত ক্রোধেই চামর আদি দূরে ফেলিয়া দিবার সম্ভাবনা, শোকে বরং হস্ত হইতে অজ্ঞাতে খসিয়া পড়িতে পারে। মহিষী রাবণকে যাহা কহিলেন তাহা ভালো লাগিল,

১ হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য -কর্তৃক অনুবাদিত রামায়ণ। যুদ্ধকাণ্ড, চতুর্থ সর্গ।

রাবণ কহিলেন,

বরজে সজারু পশি বারুইর যথা
ছিন্নভিন্ন করে তারে, দশরথাত্মজ
মজাইছে লঙ্কা মোর।

এই উদাহরণটি অতিশয় সংকীর্ণ হইয়াছে; যদি সাহিত্যদর্পণকার জীবিত থাকিতেন তবে দোষ-পরিচ্ছেদে যেখানে সূর্যের সহিত কুপিত কপি কপোলের তুলনা উদ্‌ধৃত করিয়াছেন সেইখানে এইটি প্রযুক্ত হইতে পারিত। দূতের ডমরুধ্বনিতে, চিত্রাঙ্গদার শোকার্ত ভর্ৎসনায় রাবণ শোকে অভিমানে 'ত্যজি সুকনকাসন উঠিল গর্জিয়া'। সুকনকাসন, সুসিন্দুর, সুসমীরণ, সুআরাধনা, সুকবচ, সুউচ্চ, সুমনোহর কথাগুলি কাব্যের স্থানে স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে, এগুলি তেমন ভালো শুনায় না। ইহার পরে রাবণ সৈন্যদের সজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন, রণসজ্জার বর্ণনা তেমন কিছু চিত্রিতবৎ হয় নাই, নহিলে উদ্‌ধৃত করিতাম।

যাহা হউক, প্রথম সর্গের এতখানি পড়িয়া যদি আমাদের রাবণের চরিত্র বুঝিতে হয় তো কী বুঝিব? রাবণকে কি মন্দোদরী বলিয়া আমাদের ভ্রম হইবে না? কোথায় রাবণ বীরবাহুর মৃত্যু শুনিয়া পদাহত সিংহের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিবেন, না সভাসুদ্ধ কাঁদাইয়া কাঁদিতে বসিলেন! কোথায় পুত্রশোক তাঁহার কৃপাণের শান-প্রস্তর হইবে, কোথায় প্রতিহিংসা তাঁহার শোকের ঔষধি হইবে, না তিনি স্ত্রীলোকের শোকাগ্নি নির্বাণের উপায় অশ্রুজলের আশ্রয় লইয়াছেন। কোথায় যখন দূত বীরবাহুর মৃত্যু স্মরণ করিয়া কাঁদিবে তখন তিনি বলিবেন যে, আমার বীরবাহুর মৃত্যু হয় নাই তো তিনি অমর হইয়াছেন, না সারণ তাঁহাকে বুঝাইবে যে, 'এ ভব মণ্ডল মায়াময়' আর তিনি উত্তর দিবেন, 'তাহা জানি তবু জেনে শুনে কাঁদে এ পরাণ অবোধ!' যখন রাবণ বীরবাহুর মৃতকায় দেখিয়া বলিতেছেন 'যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ কুমার, বীরকুলসাধ এ শয়নে সদা' তখন মনে করিলাম, বুঝি এতক্ষণে মন্দোদরীর পরিবর্তে রাবণকে পাইলাম, কিন্তু তাহা নয়, আবার রাবণ কাঁদিয়া উঠিলেন। রাবণের সহিত যদি বৃত্রসংহারের বৃত্রের তুলনা করা যায় তবে স্বীকার করিতে হয় যে, রাবণের অপেক্ষা বৃত্রের মহান ভাব আছে। বৃত্র সভায় প্রবেশ করিবামাত্র কবি তাহার চিত্র আমাদের সম্মুখে ধরিলেন, তাহা দেখিয়াই বৃত্রকে প্রকাণ্ড দৈত্য বলিয়া চিনিতে পারিলাম।

নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভাস
পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ।
নিশান্তে গগনপথে ভানুর ছটায়
বৃত্রাসুর প্রবেশিল তেমতি সভায়।
ভ্রূকুটি করিয়া দর্পে ইন্দ্রাসন-'পরে
বসিল, কাঁপিল গৃহ দৈত্যপদভরে।

মেঘনাদবধের প্রথম সর্গের উপসংহার ভাগে যখন ইন্দ্রজিৎ রাবণের নিকট যুদ্ধে যাইবার প্রার্থনা করিলেন, তখন রাবণ কহিলেন, 'এ কাল সমরে নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা বারংবার'। কিন্তু বৃত্রপুত্র রুদ্রপীড় যখন পিতার নিকট সেনাপতি হইবার প্রার্থনা করিলেন তখন বৃত্র কহিলেন,

রুদ্রপীড়! তব চিত্তে যত অভিলাষ,
পূর্ণ কর যশোরশ্মি বাঁধিয়া কিরীটে;
বাসনা আমার নাই করিতে হরণ
তোমার সে যশঃপ্রভা পুত্র যশোধর।
ত্রিলোকে হয়েছ ধন্য, আরও ধন্য হও
দৈত্যকুল উজ্জ্বলিয়া, দানবতিলক!
তবে যে বৃত্রের চিত্তে সমরের সাধ

অদ্যাপি প্রজ্বল এত, হেতু সে তাহার
যশোলিপ্সা নহে, পুত্র, অন্য সে লালসা,
নারি ব্যক্ত করিবারে বাক্যে বিন্যাসিয়া।
অনন্ত তরঙ্গময় সাগর গর্জন,
বেলাগর্ভে দাঁড়াইলে, যথা সুখকর;
গভীর শর্বরীযোগে গাঢ় ঘনঘটা
বিদ্যুতে বিদীর্ণ হয়, দেখিলে যে সুখ;
কিংবা সে গঙ্গোত্রীপার্শ্বে একাকী দাঁড়ায়ে
নিরখি যখন অম্বুরাশি ঘোর-নাদে
পড়িছে পর্বতশৃঙ্গ স্রোতে বিলুণ্ঠিয়া,
ধরাধর ধরাতল করিয়া কম্পিত!
তখন অন্তরে যথা, শরীর পুলকি,
দুর্জয় উৎসাহে হয় সুখ বিমিশ্রিত;
সমরতরঙ্গে পশি, খেলি যদি সদা,
সেই সুখ চিত্তে মম হয় রে উত্থিত।

ইহার মধ্যে ভয়ভাবনা কিছুই নাই, বীরোচিত তেজ। মেঘনাদবধ কাব্যে অনেকগুলি 'প্রভঞ্জন' 'কলম্বকুল' প্রভৃতি দীর্ঘপ্রস্থ কথায় সজ্জিত ছত্রসমূহ পাঠ করিয়া তোমার মন ভারগ্রস্ত হইয়া যাইবে, কিন্তু এমন ভাবপ্রধান বীরোচিত বাক্য অল্পই খুঁজিয়া পাইবে। অনেক পাঠকের স্বভাব আছে যে তাঁহারা চরিত্রে চিত্রে কী অভাব কী হীনতা আছে তাহা দেখিবেন না, কথার আড়ম্বরে তাঁহারা ভাসিয়া যান, কবিতার হৃদয় দেখেন না, কবিতার শরীর দেখেন। তাঁহারা রাবণের ক্রন্দন অশ্রু আকর্ষণ করিলেই তৃপ্ত হন, কিন্তু রাবণের ক্রন্দন করা উচিত কি না তাহা দেখিতে চান না, এইজন্যই বঙ্গ-দেশময় মেঘনাদবধের এত সুখ্যাতি। আমরা দেখিতেছি কোনো কোনো পাঠক ভাবিয়া ভাবিয়া মাথা ঘুরাইবেন যে, সমালোচক রাবণকে কেন তাহার কাঁদিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চাহেন? একজন চিত্রকর একটি কালীর মূর্তি অঙ্কিত করিয়াছিল, আমি সেই মূর্তিটি দেখিয়াছিলাম; পাঠকেরা জানেন পুরাণে কালীর কীরূপ ভীষণ চিত্রই অঙ্কিত আছে, অমাবস্যার অন্ধকার নিশীথে যাঁহার পূজা হয়, আলুলিত কুন্তলে বিকট হাস্যে যিনি শ্মশানভূমিতে নৃত্য করেন, নরমুণ্ডমালা যাঁহার ভূষণ, ডাকিনী যোগিনীগণ যাঁহার সঙ্গিনী, এমন কালীর চিত্র আঁকিয়া চিত্রকর তাঁহাকে আপাদমস্তক স্বর্ণালংকারে বিভূষিত করিয়াছে, অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি এই চিত্রটির বড়োই প্রশংসা করিয়াছিলেন, যাঁহারা সংহারশক্তিরূপিণী কালিকার স্বর্ণভূষণে কোনো দোষ দেখিতে পান না তাঁহারা রাবণের ক্রন্দনে কী দোষ আছে ভাবিয়া পাইবেন না, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, তাঁহাদের জন্য এই সমালোচনা লিখিত হইতেছে না। মূল কথা এই, বঙ্গদেশে এখন এমনই সৃষ্টিছাড়া শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত হইয়াছে যে তাহাতে শিক্ষিতেরা বিজ্ঞান-দর্শনের কতকগুলি বুলি এবং ইতিহাসের সাল-ঘটনা ও রাজাদিগের নামাবলী মুখস্থ করিতে পারিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের রুচিরও উন্নতি করিতে পারেন নাই বা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতেও শিখেন নাই। বাল্মীকির রামায়ণে শোকের সময় রাবণের কীরূপ অবস্থা বর্ণিত আছে, এ স্থলে তাহা অনুবাদ করিয়া পাঠকদের গোচরার্থে লিখিলাম, ইহাতে পাঠকেরা দেখিবেন বাল্মীকির রাবণ হইতে মেঘনাদবধের রাবণের কত বিভিন্নতা।

অনন্তর হনুমান-কর্তৃক অক্ষ নিহত হইলে রাক্ষসাধিপতি মনঃসমাধানপূর্বক শোক সংবরণ করিয়া ইন্দ্রজিৎকে রণে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন।[১] মনঃসমাধানপূর্বক শোক সংবরণ করার

১. সুন্দরকাণ্ড, ৪৩ অধ্যায়। ২. যুদ্ধকাণ্ড, ২৯ অধ্যায়। ৩. যুদ্ধকাণ্ড, ৩১ অধ্যায়।

মধ্যে রাবণের যে মহান ভাব প্রকাশিত হইতেছে, তাহা যদি ইংরাজি-পুথি-সর্বস্ব-পাঠকেরা দেশীয় কবি বাল্মীকি লিখিয়াছেন বলিয়া বুঝিতে না পারেন, এইজন্য ইংরাজি কবি মিলটন হইতে তাহার আংশিক সাদৃশ্য উদ্‌ধৃত করিয়া দিতেছি,

Thrice he essay'd and thrice, in spite of scorn,
Tears, such as angels weep, burst forth :—

ধূম্রাক্ষ নিহত হইয়াছেন শুনিয়া রাবণ ক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া কৃতাঞ্জলিবদ্ধ সৈন্যাধ্যক্ষকে কহিলেন, অকম্পনকে সেনাপতি করিয়া শীঘ্র যুদ্ধবিশারদ ঘোরদর্শন দুর্ধর্ষ রাক্ষসগণ যুদ্ধার্থে নির্গত হউক।[১]

অতঃপর ক্রুদ্ধ রাবণ অকম্পন হত হইয়াছেন শুনিয়া কিঞ্চিৎ দীনভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাক্ষসপতি মুহূর্তকাল মন্ত্রীদিগের সহিত চিন্তা করিয়া ক্রোধে উষ্ণ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে গৃহ হইতে নির্গত হইলেন।[৫]

অতিকায় নিহত হইলে তাহাদের বচন শুনিয়া শোকবিহ্বল, বন্ধুনাশবিচেতন, আকুল রাবণ কিছুই উত্তর দিলেন না। সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠকে শোকাভিপ্লুত দেখিয়া কেহই কিছু কহিলেন না; সকলেই চিন্তামগ্ন হইয়া রহিলেন।

নিকুম্ভ ও কুম্ভ হত হইয়াছেন শুনিয়া রাবণ ক্রোধে প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় হইলেন।[১]

স্ববল ক্ষয় এবং বিরূপাক্ষবধ শ্রবণে রাক্ষসেশ্বর রাবণ দ্বিগুণ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন।[২]

এই-সকল বর্ণনায় শোকের অপেক্ষা ক্রোধের ভাব অধিক ব্যক্ত হইয়াছে।

ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে যাইবার নিমিত্ত পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলে রাবণ কহিলেন,

কুম্ভকর্ণ বলি
ভাই মম, তায় আমি জাগানু অকালে
ভয়ে; হায় দেহ তার, দেখো সিন্ধুতীরে
ভূপতিত, গিরিশৃঙ্গ কিংবা তরু যথা
বজ্রাঘাতে

বজ্রাঘাতে ভূপতিত গিরিশৃঙ্গসম, এই উদাহরণটি তো বেশ হইল, কিন্তু আবার 'কিংবা তরু' দিয়া কমাইবার কী প্রয়োজন ছিল, যেন কবি গিরিশৃঙ্গেও প্রকাণ্ডভাব বুঝাইতে না পারিয়া 'কিংবা তরু' দিয়া আরও উচ্চ করিয়াছেন।

তবে যদি একান্ত সমরে
ইচ্ছা তব, বৎস, আগে পূজ ইষ্টদেবে

প্রভৃতি বলিয়া রাবণ ইন্দ্রজিৎকে সেনাপতিপদে বরণ করিলেন, তখন বন্দীদের একটি গানের পর প্রথম সর্গ শেষ হইল।

সপ্তম সর্গে বর্ণিত আছে, মহাদেব রাবণকে ইন্দ্রজিতের নিধনবার্তা জানাইতে ও রুদ্রতেজে পূর্ণ করিতে বীরভদ্রকে রাবণসমীপে প্রেরণ করিলেন।

চলিলা আকাশপথে বীরভদ্র বলী
ভীমাকৃতি; ব্যোমচর নামিলা চৌদিকে
সভয়ে, সৌন্দর্যতেজে হীনতেজা রবি,
সুধাংশু নিরংশু যথা সে রবির তেজে।
ভয়ংকরী শূল ছায়া পড়িল ভূতলে।
গম্ভীর নিনাদে নাদি অম্বুরাশিপতি
পূজিলা ভৈরব দূতে। উত্তরিলা রথী
রক্ষঃপুরে; পদচাপে থর থর থরি

---

১. যুদ্ধকাণ্ড, ৫৭ অধ্যায়। ২. যুদ্ধকাণ্ড, ৭৭ অধ্যায়।

কাঁপিল কনকলঙ্কা, বৃক্ষশাখা যথা
পক্ষীন্দ্র গরুড় বৃক্ষে পড়ে উড়ি যবে।

মেঘনাদবধ কাব্যে মহান ভাবোত্তেজক যে তিন-চারিটি মাত্র বর্ণনা আছে তন্মধ্যে ইহাও একটি। রাবণের সভায় গিয়া এই 'সন্দেশবহ' ইন্দ্রজিতের নিধনবার্তা নিবেদন করিল, অমনি রাবণ মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন; রুদ্রতেজে বীরভদ্রবলী রাবণের মূর্ছাভঙ্গ করিলেন। পরে বীরভদ্র যুদ্ধের বিবরণ বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করিয়া কহিলেন,

প্রফুল্ল হায় কিংশুক যেমনি
ভূপতিত, বনমাঝে, প্রভঞ্জনবলে
মন্দিরে দেখিনু শূরে।

বায়ুবলচ্ছিন্ন কিংশুক ফুলটির মতো মৃত মহাবীর মেঘনাদ পড়িয়া আছেন, ইহা তো সমুচিত তুলনা হইল না। একটি মৃত বালিকার দেহ দেখিয়া তুমি ওইরূপ বলিতে পারিতে! নহিলে দূতের বাক্য মর্মস্পৃক্ হইয়াছে। পরে দূত উপরি-উক্ত কথাগুলি বলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। এইবার রাবণ গর্জিয়া উঠিলেন—

এ কনক-পুরে,
ধনুর্ধর আছে যত সাজো শীঘ্র করি
চতুরঙ্গে! রণরঙ্গে ভুলিব এ জ্বালা
এ বিষম জ্বালা যদি পারিবে ভুলিতে!

পাঠকেরা বলিবেন এইবার তো হইয়াছে; এইবার তো রাবণ প্রতিহিংসাকে শোকের ঔষধি করিয়াছেন কিন্তু পাঠক হয়তো দেখেন নাই 'তেজস্বী আজি মহারুদ্র তেজে' রাবণ স্বভাবত তো এত তেজস্বী নন, তিনি মহারুদ্রতেজ পাইয়াছেন, সেইজন্য আজ উন্মত্ত। কবি বীরবাহুর শোকে রাবণকে স্ত্রীলোকের ন্যায় কাঁদাইয়াছেন, সুতরাং ভাবিলেন যে রাবণের যেরূপ স্বভাব, তিনি তাঁহার প্রিয়তম পুত্র ইন্দ্রজিতের নিধনবার্তা শুনিলে বাঁচিবেন কীরূপে? এই নিমিত্তই রুদ্রতেজাদির কল্পনা করেন। ইহাতেও রাবণ যে স্ত্রীলোক সেই স্ত্রীলোকই রহিলেন। এই নিমিত্ত ইহার পর রাবণ যে যে স্থলে তেজস্বিতা দেখাইয়াছেন তাহা তাঁহার স্বভাবগুণে নহে তাহা দেব-তেজের গুণে।

মেঘনাদবধ কাব্যে কবি যে ইচ্ছাপূর্বক রাক্ষসপতি রাবণকে ক্ষুদ্রতম মনুষ্য করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা নয়। রাবণকে তিনি মহান চরিত্রের আদর্শ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাকে স্ত্রীপ্রকৃতির প্রতিমা করিয়া তুলিয়াছেন; তিনি তাহাকে কঠোর হিমাদ্রিসদৃশ করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু 'কোমল সে ফুলসম' করিয়া গড়িয়াছেন। ইহা আমরা অনুমান করিয়া বলিতেছি না, মাইকেল আমাদের কোনো সম্ভ্রান্ত বন্ধুকে যে পত্র লিখেন তাহার নিম্নলিখিত অনুবাদটি পাঠ করিয়া দেখুন।

'এখানকার লোকেরা অসন্তোষের সহিত বলিয়া থাকে যে, মেঘনাদবধ কাব্যে কবির মনের টান রাক্ষসদিগের প্রতি! বাস্তবিক তাহাই বটে। আমি রাম এবং তাঁহার দলবলগুলাকে ঘৃণা করি, রাবণের ভাব মনে করিলে আমার কল্পনা প্রজ্বলিত ও উন্নত হইয়া উঠে। রাবণ লোকটা খুব জমকালো ছিল।'

মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণের চরিত্র যেরূপ চিত্রিত হইয়াছে তাহাই যদি কবির কল্পনার চরম উন্নতি হইয়া থাকে তবে তিনি কাব্যের প্রারম্ভভাগে 'মধুকরী কল্পনা দেবীর' যে এত করিয়া আরাধনা করিয়াছিলেন তাহার ফল কী হইল? এইখানে আমরা রাবণকে অবসর দিলাম।

ভারতী
শ্রাবণ ১২৮৪

আমরা গতবারে যখন রাবণের চরিত্র সমালোচনা করিয়াছিলাম, তখন মনে করিলাম যে, রাবণের ক্রন্দন করা যে অস্বাভাবিক, ইহা বুঝাইতে বড়ো একটা অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না; কিন্তু এখন দেখিলাম বড়ো গোল বাধিয়াছে; কেহ কেহ বলিতেছেন 'রাবণ পুত্রশোকে কাঁদিয়াছে, তবেই তো তাহার বড়ো অপরাধ!' পুত্রশোকে বীরের কীরূপ অবস্থা হয়, তাঁহারা আপনা-আপনাকেই তাহার আদর্শস্বরূপ করিয়াছেন। ইঁহাদের একটু ভালো করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক বোধ করিতেছি। পাঠকদের কেহ বা ইচ্ছা করিয়া বুঝিবেন না, তাঁহাদের সঙ্গে যোঝাযুঝি করা আমাদের কর্ম নহে, তবে যাঁহারা সত্য অপ্রিয় হইলেও গ্রহণের জন্য উন্মুখ আছেন তাঁহারা আর-একটু চিন্তা করিয়া দেখুন।

সেনাপতি সিউয়ার্ডের পুত্র যুদ্ধে হত হইলে রস্‌ আসিয়া তাঁহাকে নিধন সংবাদ দিলেন। সিউয়ার্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সম্মুখভাগেই তো তিনি আহত হইয়াছিলেন?'

রস্‌।— হাঁ, সম্মুখেই আহত হইয়াছিলেন।

সিউয়ার্ড।— তবে আর কি! আমার যতগুলি কেশ আছে ততগুলি যদি পুত্র থাকিত, তবে তাহাদের জন্য ইহা অপেক্ষা উত্তম মৃত্যু প্রার্থনা করিতাম না।

ম্যাল্‌কম্‌।— তাঁহার জন্য আরও অধিক শোক করা উচিত।

সিউয়ার্ড।— না, তাঁহার জন্য আর অধিক শোক উপযুক্ত নহে। শুনিতেছি তিনি বীরের মতো মরিয়াছেন, ভালোই, তিনি তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন, ঈশ্বর তাঁহার ভালো করুন।

—ম্যাক্‌বেথ

আমরা দেখিতেছি, মাইকেলের হস্তে যদি লেখনী থাকিত তবে এই স্থলে তিনি বলিতেন যে,

হা পুত্র, হা সিউয়ার্ড, বীরচূড়ামণি
কী পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে!

অ্যাডিসন তাঁহার নাটকে পুত্রশোকে কেটোকে তো ক্ষুদ্র মনুষ্যের ন্যায় রোদন করান নাই!

স্পার্টার বীর-মাতারা পুত্রকে যুদ্ধে বিদায় দিবার সময় বলিতেন না, যে,

এ কাল সমরে,
নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে
তোমা বারংবার!

তাঁহারা বলিতেন, 'হয় জয় নয় মৃত্যু তোমাকে আলিঙ্গন করুক!'

রাণা লক্ষ্মণসিংহ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, দ্বাদশ রাজপুত্র যুদ্ধে মরিলে জয়লাভ হইবে; তিনি তাঁহার দ্বাদশ পুত্রকেই যুদ্ধে মরিতে আদেশ করিয়াছিলেন। তিনি তো তখন রুদ্যমান পারিষদগণের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া সভার মধ্যে

ঝর ঝর ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা তিতিয়া বসনে,

কাঁদিতে বসেন নাই।

রাজস্থানের বীরদিগের সহিত, স্পার্টার বীর-মাতাদের সহিত তুলনা করিলে কল্পনা-চিত্রিত রাবণকে তো স্ত্রীলোকের অধম বলিয়া মনে হয়!

কেহ কেহ বলেন, 'অন্য কবি যাহা লিখিয়াছেন তাহাই যে মাইকেলকে লিখিতে হইবে এমন কি কিছু লেখাপড়া আছে?' আমরা তাহার উত্তর দিতে চাহি না, কেবল এই কথা বলিতে চাহি যে সকল বিষয়েই তো একটি উচ্চ আদর্শ আছে, কবির চিত্র সেই আদর্শের কত নিকটে পৌঁছিয়াছে এই দেখিয়াই তো আমাদের কাব্য আলোচনা করিতে হইবে। স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক এই দুইটি কথা লইয়া কতকগুলি পাঠক অতিশয় গণ্ডগোল করিতেছেন। তাঁহারা বলেন যাহা স্বাভাবিক তাহাই সুন্দর, তাহাই কবিতা; পুত্রশোকে রাবণকে না কাঁদাইলে অস্বাভাবিক হইত, সুতরাং কবিতার হানি হইত। দুঃখের বিষয়, তাঁহারা জানেন না যে, একজনের পক্ষে যাহা

স্বাভাবিক, আর-একজনের পক্ষে তাহাই অস্বাভাবিক। যদি ম্যাক্‌বেথের ডাকিনীরা কাহারও কষ্ট দেখিয়া মমতা প্রকাশ করিত তবে তাহাই অস্বাভাবিক হইত, যদিও সাধারণ মনুষ্যদের পক্ষে তাহা স্বাভাবিক। আমি তো বলিতেছি না যে, বীর কষ্ট পাইবেন না, দুঃখ পাইবেন না; সাধারণ লোক যতখানি দুঃখ-কষ্ট পায় বীর তেমনই পাইবেন অথবা তদপেক্ষা অধিক পাইতেও পারেন, কিন্তু তাঁহার এতখানি মনের বল থাকা আবশ্যক যে, পুরুষের মতো, বীরের মতো তাহা সহ্য করিতে পারেন; শরীরের বল লইয়াই তো বীরত্ব নহে। যে ঝড়ে বৃক্ষ ভাঙিয়া ফেলে সেই ঝড়ই হিমালয়ের শৃঙ্গে আঘাত করে, অথচ তাহা তিলমাত্র বিচলিত করিতে পারে না। কেহ কেহ বলেন 'ওইপ্রকার মত পূর্বেকার স্টোয়িকদিগেরই সাজিত, এখন উনবিংশ শতাব্দীতে ও কথা শোভা পায় না; স্টোয়িক দার্শনিক যে, অগ্নিতে হাত রাখিয়া স্থিরভাবে দহনজ্বালা সহ্য করিয়াছেন সে তাঁহাদের সময়েরই উপযুক্ত।' শিক্ষিত লোকেরা এরূপ অর্থহীন কথা যে কী করিয়া বলিতে পারেন তাহা আমরা অনেক ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিলাম না। তাঁহারা কি বলিতে চাহেন যে, অগ্নিতে হাত রাখিয়া ক্রন্দন করাই বীরপুরুষের উপযুক্ত! তাঁহাদের যদি এরূপ মত হয় যে, উনবিংশ শতাব্দীতে এরূপ বীরত্বের প্রয়োজন নাই, তবে তাঁহাদের সহিত তর্ক করা এ প্রস্তাবে অপ্রাসঙ্গিক, কেবল তাঁহাদিগকে একটি সংবাদ দিতে ইচ্ছা করি যে, বাল্মীকির রামায়ণ পড়িয়া ও অন্যান্য নানাবিধ প্রমাণ পাইয়া আমরা তো এইরূপ ঠিক করিয়াছি যে রাবণ উনবিংশ শতাব্দীর লোক নহেন! স্টোয়িকদের ন্যায় সমস্ত মনোবৃত্তিকে নষ্ট করিয়া ফেলা যে বীরত্ব নয় তা কে অস্বীকার করিবে? যেমন বিশেষ বিশেষ রাগ-রাগিণীর বিশেষ বিশেষ বিসম্বাদী সুর আছে, সেই সেই সুর-সংযোগে সেই সেই রাগিণী নষ্ট হয় সেইরূপ এক-একটি স্বভাবের কতকগুলি বিরোধী গুণ আছে, সেই-সকল গুণ বিশেষ বিশেষ চরিত্র নষ্ট করে। বীরের পক্ষে শোকে আকুল হইয়া কাঁদিয়া গড়াগড়ি দেওয়াও সেইপ্রকার বিরোধী গুণ। যাক— এ-সকল কথা লইয়া অধিক আন্দোলন সময় নষ্ট করা মাত্র। এখন লক্ষ্মীর চরিত্র সমালোচনা করা যাউক।*

প্রথম সর্গের মধ্যভাগে লক্ষ্মী দেবীর অবতারণা করা হইয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মেঘনাদবধে কতকগুলি চরিত্র সুচিত্রিত হয় নাই এবং কতকগুলি আমাদের মনের মতো হয় নাই। রাবণের চরিত্র যেমন আমাদের মনের মতো হয় নাই তেমনি লক্ষ্মীর চরিত্র সুচিত্রিত হয় নাই। লক্ষ্মীর চরিত্রচিত্রের দোষ এই যে, তাঁহার চরিত্র কীরূপ আমরা বলিতে পারি না। আমরা যেমন বলিতে পারি যে, মেঘনাদবধের রাবণ স্ত্রীলোকের ন্যায় কোমল-হৃদয়, অসাধারণ পুত্রবৎসল, তেমন কি লক্ষ্মীকে কিছু বিশেষণ দিতে পারি? সে বিষয় সমালোচনা করিয়াই দেখা যাউক।

মুরলা আসিয়া লক্ষ্মীকে যুদ্ধের বার্তা জিজ্ঞাসা করিলে, লক্ষ্মী কহিলেন,

—হায় লো স্বজনি!
দিন দিন হীন-বীর্য রাবণ দুর্মতি
যাদঃপতি রোধঃ যথা চলোর্মি আঘাতে!

শেষ ছত্রটিতে ভাবের অনুযায়ী কথা বসিয়াছে, ঠিক বোধ হইতেছে যেন তরঙ্গ বার বার আসিয়া তটভাগে আঘাত করিতেছে। মুরলা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইন্দ্রজিৎ কোথায়?' লক্ষ্মীর তখন মনে পড়িল যে, ইন্দ্রজিৎ প্রমোদ উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছেন, এবং মুরলাকে বিদায় করিয়া ইন্দ্রজিতের ধাত্রীবেশ ধরিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। সেখানে ইন্দ্রজিৎকে ভ্রাতার মৃত্যু সংবাদ দিয়া যুদ্ধে

* আমরা পূর্ব সংখ্যায় দেখাইয়াছি যে মৃত মেঘনাদের সহিত বায়ুবলচ্ছিন্ন কিংশুক ফুলের তুলনা অনুচিত হইয়াছে। কিন্তু ভাষাকে একটু মোচড়াইয়া 'কিংশুক' শব্দে কিংশুক বৃক্ষ অর্থ করিলে সে দোষ কাটিয়া যাইতে পারে। কিন্তু বাংলা ভাষায় কিংশুক বলিতে বৃক্ষ না বুঝাইয়া পুষ্পই বুঝায়, যেমন আম বলিলে ফলই বুঝায়, গোলাপ বলিলে গোলাপ ফুলই বুঝায়, ইত্যাদি।

উত্তেজিত করিয়া দিলেন। এতদূর পড়িয়া আমরা দেবীকে ভক্তবৎসলা বলিতে পারি। কিন্তু আবার পরক্ষণেই ইন্দ্রের নিকট গিয়া বলিতেছেন,

—বহুকালাবধি
আছি আমি সুরনিধি স্বর্ণ লঙ্কাধামে,
বহুবিধ রত্ন-দানে বহু যত্ন করি,
পূজে মোরে রক্ষোরাজ। হায় এত দিনে
বাম তার প্রতি বিধি! নিজ কর্ম-দোষে
মজিছে সবংশে পাপী; তবুও তাহারে
না পারি ছাড়িতে, দেব! বন্দী যে, দেবেন্দ্র,
কারাগার দ্বার নাহি খুলিলে কি কভু
পারে সে বাহির হতে? যতদিন বাঁচে
রাবণ, থাকিব আমি বাঁধা তার ঘরে।

আর-এক স্থলে— না হইলে নির্মূল সমূলে
রক্ষঃপতি, ভবতল রসাতলে যাবে!

অর্থাৎ তুমি কারাগারের দ্বার খুলিবার উপায় দেখো, রাবণকে বিনাশ করো, তাহা হইলেই আমি আস্তে আস্তে বাহির হইয়া আসিব। রাবণ পূজা করে বলিয়া মেঘনাদবধের লক্ষ্মীর তাহার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ জন্মিয়াছে, এ নিমিত্ত সহজে তাহাকে ছাড়িয়া আসিতে পারেন না, ভাবিয়া ভাবিয়া একটি সহজ উপায় ঠাওরাইলেন, অর্থাৎ রাবণ সবংশে নিহত হইলেই তিনি মুক্তিলাভ করিবেন। আমাদের সহজ বুদ্ধিতে এইরূপ বোধ হয় যে, রাবণ যদি লক্ষ্মীর স্বভাবটা ভালো করিয়া বুঝিতেন ও ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিতেন যে লক্ষ্মী অবশেষে এইরূপ নিমকহারামি করিবেন, তবে নিতান্ত নির্বোধ না হইলে কখনোই তাঁহাকে

বহুকালাবধি
বহুবিধ রত্নদানে বহু যত্ন করি

পূজা করিতেন না।

লক্ষ্মী ইন্দ্রকে কহিতেছেন,

মেঘনাদ নামে পুত্র, হে বৃত্রবিজয়ী,
রাবণের, বিলক্ষণ জান তুমি তারে।

ইহার মধ্যে যে একটু তীব্র উপহাস আছে; দেবী হইয়া লক্ষ্মী ইন্দ্রকে যে এরূপ সম্বোধন করেন, ইহা আমাদের কানে ভালো শুনায় না। ওই ছত্র দুটি পড়িলেই আমরা লক্ষ্মীর যে মৃদুহাস্য বিষমাখা একটি মর্মভেদী কটাক্ষ দেখিতে পাই, তাহাতে দেবভাবের মাহাত্ম্য অনেকটা হ্রাস হইয়া যায়। লক্ষ্মী ওইরূপ আর-এক স্থলে ইন্দ্রের কৈলাসে যাইবার সময় তাঁহাকে কহিয়াছিলেন,

বড়ো ভালো বিরূপাক্ষ বাসেন লক্ষ্মীরে।
কহিয়ো বৈকুণ্ঠপুরী বহুদিন ছাড়ি
আছয়ে সে লঙ্কাপুরে! কত যে বিরলে
ভাবয়ে সে অবিরল, একবার তিনি,
কী দোষ দেখিয়া, তারে না ভাবেন মনে?
কোন্ পিতা দুহিতারে পতিগৃহ হতে
রাখে দূরে— জিজ্ঞাসিয়ো, বিজ্ঞ জটাধরে।

এখানে 'বিজ্ঞ জটাধর' কথাটি পিতার প্রতি কন্যার প্রয়োগ অসহনীয়। ইহার পর ষষ্ঠ সর্গে আর-এক স্থলে লক্ষ্মীকে আনা হইয়াছে। এখানে মায়া আসিয়া লক্ষ্মীকে তেজ সংবরণ করিতে বলিলেন। লক্ষ্মী কহিলেন,

কার সাধ্য, বিশ্বধ্যেয়া অবহেলে তব
আজ্ঞা? কিন্তু প্রাণ মন কাঁদে গো স্মরিলে
এ-সকল কথা! হায় কত যে আদরে
পূজে মোর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, রানী মন্দোদরী,
কী আর কহিব তার?

ইহাতে লক্ষ্মীকে অত্যন্ত ভক্তবৎসলা বলিয়া মনে হয়, তবে যেন মায়ার আজ্ঞায় ভক্তগৃহ ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছেন। আবার সপ্তম সর্গে তিনিই রাবণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন। লক্ষ্মী যে কীরূপ দেবতা তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না এবং কখনো যে তাঁহাকে পূজা করিতে আমাদের সাহস হইবে, তাহারও কোনো সম্ভাবনা দেখিলাম না। মেঘনাদবধে দেবতা ও সাধারণ মনুষ্যের মধ্যে কিছুমাত্র বিভিন্নতা রক্ষিত হয় নাই। ইন্দ্রাদির চরিত্র সমালোচনা-কালে পাঠকেরা তাহার প্রমাণ পাইবেন।

ভারতী
ভাদ্র ১২৮৪

গত সংখ্যার সমালোচনা পড়িয়া কেহ কেহ কহিতেছেন, পুরাণে লক্ষ্মী চপলা বলিয়াই বর্ণিত আছেন। কবি যদি পুরাণেরই অনুসরণ করিয়া থাকেন তাহাতে হানি কী হইয়াছে? তাঁহাদের সহিত একবাক্য হইয়া আমরাও স্বীকার করি যে, লক্ষ্মী পুরাণে চপলারূপেই বর্ণিত হইয়াছেন; কিন্তু চপলা অর্থে কী বুঝায়? আজ আছেন, কাল নাই। পুরাণ লক্ষ্মীকে চপলা অর্থে পুরা এরূপ মনে করেন নাই, যে আমারই পূজা গ্রহণ করিবেন অথচ আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবেন। এ লুকোচুরি, কেবল দেবতা নহে মানব চরিত্রের পক্ষেও কতখানি অসম্মানজনক তাহা কি পাঠকেরা বুঝিতে পারিতেছেন না? কপটতা ও চপলতা দুইটি কথার মধ্যে যে অর্থগত প্রভেদ আছে ইহা বোধ হয় আমাদের নূতন করিয়া বুঝাইতে হইবে না। মেঘনাদবধের লক্ষ্মীর চরিত্র-মধ্যে দুইটি দোষ আছে, প্রথম কপটতা, দ্বিতীয় পরস্পরবিরোধী ভাব। গুপ্তভাবে রাবণের শত্রুতাসাধন করাতে কপটতা এবং কখনো ভক্তবৎসলা দেখানো ও কখনো তাহার বিপরীতাচারণ করাতে পরস্পরবিরোধী ভাব প্রকাশ পাইতেছে। পাঠকেরা কেহ যদি লক্ষ্মীর পূর্বোক্তরূপ হীনচরিত্র পুরাণ হইতে বাহির করিতে পারেন তবে আমরা আমাদের ভ্রম স্বীকার করিব। কিন্তু যদিও বা পুরাণে ওইরূপ থাকে তথাপি কি রুচিবান কবির নিকট হইতে তাহা অপেক্ষা পরিমার্জিত চিত্র আশা করি না?

প্রথম সর্গে যখন ইন্দিরা ইন্দ্রজিৎকে তাঁহার ভ্রাতার নিধন সংবাদ শুনাইলেন তখন

ছিঁড়িলা কুসুমদাম রোষে মহাবলী
মেঘনাদ, ফেলাইলা কনক বলয়
দূরে, পদতলে পড়ি শোভিলা কুণ্ডল
যথা অশোকের ফুল অশোকের তলে
আভাময়! ‘ধিক্ মোরে’ কহিলা গম্ভীরে
কুমার, ‘হা ধিক্ মোরে!’ বৈরিদল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি বামাদল মাঝে?
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ
আমি ইন্দ্রজিৎ; আন রথ ত্বরা করি;
ঘুচাব এ অপবাদ বধি রিপুদলে।

ইন্দ্রজিতের তেজস্বিতা উত্তম বর্ণিত হইয়াছে। রাবণ যখন ইন্দ্রজিৎকে রণে পাঠাইতে কাতর হইতেছেন তখন

উত্তরিলা বীরদর্পে অসুরারি রিপু;
কি ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি,
রাজেন্দ্র? থাকিতে দাস, যদি যাও রণে
তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে।
হাসিবে মেঘ বাহন, রুষিবেন দেব অগ্নি।

ইহাতেও ইন্দ্রজিতের তেজ প্রকাশিত হইতেছে, এইরূপে কবি ইন্দ্রজিতের বর্ণনা যেরূপ আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা ভালো লাগিল।

সাজিলা রথীন্দ্রর্ষভ বীর আভরণে,
* * *
মেঘবর্ণ রথ, চক্র বিজলীর ছটা;
ধ্বজ ইন্দ্র চাপরূপী; তুরঙ্গম বেগে
আশুগতি।

পূর্বে কবি রোদনের সহিত ঝড়ের যেরূপ অদ্ভুত তুলনা ঘটাইয়াছিলেন এখানে সেইরূপ রথের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত মেঘবিদ্যুৎ ইন্দ্রধনু বায়ুর তুলনা করিয়াছেন, কাব্যের মধ্যে এরূপ তুলনার অভাব নাই কিন্তু একটিও আমাদের ভালো লাগে না। বর্ণনীয় বিষয়কে অধিকতর পরিস্ফুট করাই তো তুলনার উদ্দেশ্য কিন্তু এই মেঘ বিজলী ইন্দ্রচাপে আমাদের রথের যে কী বিশেষ ভাবোদয় হইল বলিতে পারি না। মেঘনাদবধের অধিকাংশ রচনাই কৌশলময়, কিন্তু কবিতা যতই সরল হয় ততই উৎকৃষ্ট। রামায়ণ হোমার প্রভৃতি মহাকাব্যের অন্যান্য গুণের সহিত সমালোচকেরা তাহাদিগের সরলতারও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

মানস সকাশে শোভে কৈলাশ-শিখরী
আভাময়, তার শিরে ভবের ভবন,
শিখি-পুচ্ছ চূড়া যেন মাধবের শিরে!
সুশ্যামাঙ্গ শৃঙ্গধর, স্বর্ণফুল শ্রেণী
শোভে তাহে, আহা মরি পীতধরা যেন!
নির্ঝর-ঝরিত বারিরাশি স্থানে স্থানে—
বিশদ চন্দনে যেন চর্চিত সে বপুঃ!

যে কৈলাস-শিখরী চূড়ায় বসিয়া মহাদেব ধ্যান করিতেছেন কোথায় তাহা উচ্চ হইতেও উচ্চ হইবে, কোথায় তাহার বর্ণনা শুনিলে আমাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবে, নেত্র বিস্ফারিত হইবে, না 'শিখি-পুচ্ছ চূড়া যথা মাধবের শিরে।' মাইকেল ভালো এক মাধব শিখিয়াছেন, এক শিখিপুচ্ছ, পীতধরা, বংশীধ্বনি আর রাধাকৃষ্ণ কাব্যময় ছড়াইয়াছেন। কৈলাস-শিখরের ইহা অপেক্ষা আর নীচ বর্ণনা হইতে পারে না। কোনো কবি ইহা অপেক্ষা কৈলাস-শিখরের নীচ বর্ণনা করিতে পারেন না।

শরদিন্দু পুত্র, বধূ শারদ কৌমুদী;
তারা কিরীটিনী নিশি সদৃশী আপনি
রাক্ষস-কুল-ঈশ্বরী! অশ্রুবারিধারা
শিশির, কপোল পর্ণে পড়িয়া শোভিল।

এই-সকল টানিয়া বুনিয়া বর্ণনা আমাদের কর্ণে অসম-ভূমি-পথে বাধা-প্রাপ্ত রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দের ন্যায় কর্কশ লাগে।

গজরাজ তেজঃ ভুজে; অশ্বগতি পদে;
স্বর্ণরথ শিরঃ চূড়া; অঞ্চল পতাকা
রত্নময়; ভেরী, তূরী, দুন্দুভি, দামামা
আদি বাক্য সিংহনাদ! শেল, শক্তি, জাটি,
তোমর, ভোমর, শূল, মুষল, মুদগর,
পট্টিশ, নারাচ, কৌন্ত— শোভে দন্তরূপে!
জনমিলা নয়নাগ্নি সাঁজোয়ার তেজে।

পাঠকেরা বলুন দেখি এরূপ বর্ণনা সময়ে সময়ে হাস্যজনক হইয়া পড়ে কি না!

যখন মেঘনাদ রথে উঠিতেছেন তখন প্রমীলা আসিয়া কাঁদিয়া কহিলেন,

কোথায় প্রাণ সখে,
রাখি এ দাসীরে, কহো, চলিলা আপনি?
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে
এ অভাগী? হায়, নাথ, গহন কাননে,
ব্রততী বাঁধিলে সাধে করি-পদ, যদি
তার রঙ্গরসে মনঃ না দিয়া মাতঙ্গ
যায় চলি, তবু তারে রাখে পদাশ্রমে
যূথনাথ। তবে কেন তুমি, গুণনিধি
ত্যজ কিঙ্করীরে আজি?

হৃদয় হইতে যে ভাব সহজে উৎসারিত উৎস-ধারার ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে তাহার মধ্যে কৃত্রিমতা বাক্য-কৌশল প্রভৃতি থাকে না। প্রমীলার এই 'রঙ্গরসের' কথার মধ্যে গুণপনা আছে, বাক্যচাতুরীও আছে বটে, কিন্তু হৃদয়ের উচ্ছ্বাস নাই।

ইহার সহিত একটি স্বভাব-কবি-রচিত সহজ হৃদয়ভাবের কবিতার তুলনা করিয়া দেখো, যখন অক্রূর কৃষ্ণকে রথে লইতেছেন, তখন রাধা বলিতেছেন,

রাধারে চরণে ত্যজিলে রাধানাথ,
কী দোষ রাধার পাইলে?
শ্যাম, ভেবে দেখো মনে, তোমারি কারণে
ব্রজাঙ্গনাগণে উদাসী।
নহি অন্য ভাব, শুন হে মাধব
তোমারি প্রেমের প্রয়াসী।
ঘোরতর নিশি, যথা বাজে বাঁশি,
তথা আসি গোপী সকলে,
দিয়ে বিসর্জন কুল শীলে।
এতেই হলাম দোষী, তাই তোমায় জিজ্ঞাসি
এই দোষে কি হে ত্যজিলে?
শ্যাম, যাও মধুপুরী, নিষেধ না করি
থাকো হরি যথা সুখ পাও।
একবার, সহাস্য বদনে বঙ্কিম নয়নে
ব্রজগোপীর পানে ফিরে চাও।
জনমের মতো, শ্রীচরণ দুটি,
হেরি হে নয়নে শ্রীহরি,
আর হেরিব আশা না করি।

হৃদয়ের ধন তুমি গোপিকার
হৃদে বজ্র হানি চলিলে?
—হরু ঠাকুর

ইহার মধ্যে বাক্‌চাতুরী নাই, কৃত্রিমতা নাই, ভাবিয়া চিন্তিয়া গড়িয়া পিটিয়া ঘর হইতে রাধা উপমা ভাবিয়া আইসেন নাই, সরল হৃদয়ের কথা নয়নের অশ্রুজলের ন্যায় এমন সহজে বাহির হইতেছে যে; কৃষ্ণকে তাহার অর্থ বুঝিতে কষ্ট পাইতে হয় নাই, আর মাতঙ্গ, ব্রততী, পদাশ্রম, রঙ্গরস প্রভৃতি কথা ও উপমার জড়ামড়িতে প্রমীলা হয়তো ক্ষণেকের জন্য ইন্দ্রজিৎকে ভাবাইয়া তুলিয়াছিলেন।

ইন্দ্রজিতের উত্তর সেইরূপ কৃত্রিমতাময়, কৌশলময়, ঠিক যেন প্রমীলা খুব এক কথা বলিয়া লইয়াছেন, তাহার তো একটা উপযুক্ত উত্তর দিতে হইবে, এইজন্য কহিতেছেন,

ইন্দ্রজিতে জিতি তুমি, সতি,
বেঁধেছ যে দৃঢ় বাঁধে, কে পারে খুলিতে
সে বাঁধে ইত্যাদি

সমস্ত মেঘনাদবধ কাব্যে হৃদয়ের উচ্ছ্বাসময় কথা অতি অল্পই আছে, প্রায় সকলগুলিই কৌশলময়। তৃতীয় সর্গে যখন প্রমীলা রামচন্দ্রের ফটক ভেদ করিয়া ইন্দ্রজিতের নিকট আইলেন তখন ইন্দ্রজিৎ কহিলেন,

রক্তবীজে বধি তুমি এবে বিধুমুখী,
আইলা কৈলাস ধামে ইত্যাদি

প্রমীলা কহিলেন,

ও পদ-প্রাসাদে, নাথ, ভববিজয়িনী
দাসী, কিন্তু মনমথে না পারি জিনিতে।
অবহেলি, শরানলে, বিরহ অনলে
(দুরূহ) ডরাই সদা; ইত্যাদি

যেন স্ত্রী-পুরুষে ছড়া-কাটাকাটি চলিতেছে। পঞ্চম সর্গের শেষভাগে পুনরায় ইন্দ্রজিতের অবতারণা করা হইয়াছে।

কুসুমশয়নে যথা সুবর্ণ মন্দিরে,
বিরাজে রাজেন্দ্র বলী ইন্দ্রজিৎ, তথা
পশিল কূজন ধ্বনি সে সুখ সদনে।
জাগিলা বীর কুঞ্জর কুঞ্জবন গীতে।
প্রমীলার করপদ্ম করপদ্মে ধরি
রথীন্দ্র, মধুর স্বরে, হায় রে, যেমতি
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
প্রেমের রহস্য কথা, কহিলা (আদরে
চুম্বি নিমীলিত আঁখি) ডাকিছে কূজনে,
হৈমবতী উষা তুমি, রূপসি, তোমারে
পাখিকুল! মিল প্রিয়ে, কমললোচন।
উঠ, চিরানন্দ মোর, সূর্যকান্ত মণি-
সম এ পরান কান্তা, তুমি রবিচ্ছবি;—
তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন।
ভাগ্যবৃক্ষে ফলোত্তম তুমি হে জগতে
আমার! নয়নতারা! মহার্ঘরতন।

উঠি দেখো শশিমুখি, কেমনে ফুটিছে,
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জুকুঞ্জবনে
কুসুম। ইত্যাদি।

এই দৃশ্যে মেঘনাদের কোমলতা সুন্দর বর্ণিত হইয়াছে। প্রমীলার নিকট হইতে ইন্দ্রজিতের বিদায়টি সুন্দর হইয়াছে, তাহার মধ্যে বাক্‌চাতুরী কিছুমাত্র নাই। কিন্তু আবার একটি 'যথা' আসিয়াছে—

যথা যবে কুসুমেষু ইন্দ্রের আদেশে
রতিরে ছাড়িয়া শূর, চলিলা কুক্ষণে
ভাঙিতে শিবের ধ্যান; হায় রে, তেমতি
চলিলা কন্দর্পরূপী ইন্দ্রজিৎ বলী,
ছাড়িয়া রতি-প্রতিমা প্রমীলা সতীরে।
কুলগ্নে করিলা যাত্রা মদন; কুলগ্নে
করি যাত্রা গেলা চলি মেঘনাদ বলী—
বিলাপিলা যথা রতি প্রমীলা যুবতী। ইত্যাদি

বলপূর্বক ইন্দ্রজিৎকে মদন ও প্রমীলাকে রতি করিতেই হইবে। রতির ন্যায় প্রমীলাকে ছাড়িয়া মদনের ন্যায় ইন্দ্রজিৎ চলিলেন, মদন কুলগ্নে যাত্রা করিয়াছিলেন, ইন্দ্রজিৎও তাহাই করিলেন। তখন মদন ও ইন্দ্রজিৎ একই মিলিয়া গেল, আর রতিও কাঁদিয়াছিলেন, রতিরূপিণী প্রমীলাও কাঁদিলেন, তবে তো রতি আর প্রমীলার কিছুমাত্র ভিন্নতা রহিল না।

আবার আর-একটি কৃত্রিমতাময় রোদন আসিয়াছে, যখন ইন্দ্রজিৎ গজেন্দ্রগমনে যুদ্ধে যাইতেছেন তখন প্রমীলা তাঁহাকে দেখিতেছেন আর কহিতেছেন—

জানি আমি কেন তুই গহন কাননে
ভ্রমিস্ রে গজরাজ! দেখিয়া ও গতি—
কী লজ্জায় আর তুই মুখ দেখাইবি,
অভিমানী? সরু মাজা তোর রে কে বলে,
রাক্ষস-কুল-হর্য্যক্ষে হেরে যার আঁখি,
কেশরি? তুইও তেঁই সদা বনবাসী।
নাশিস্ বারণে তুই, এ বীর-কেশরী
ভীম প্রহরণে রণে বিমুখে বাসরে, ইত্যাদি

এই কি হৃদয়ের ভাষা? হৃদয়ের অশ্রুজল? হেমবাবু কহিয়াছেন 'বিদ্যাসুন্দর এবং অন্নদামঙ্গল ভারতচন্দ্র-রচিত সর্বোৎকৃষ্ট কাব্য, কিন্তু যাহাতে অন্তর্দাহ হয়, হৃৎকম্প হয়, তাদৃশ ভাব তাহাতে কই?' সত্য, ভারতচন্দ্রের ভাষা কৌশলময়, ভাবময় নহে, কিন্তু 'জানি আমি কেন তুই' ইত্যাদি পড়িয়া আমরা ভারতচন্দ্রকে মাইকেলের নিমিত্ত সিংহাসনচ্যুত করিতে পারি না। তাহার পরে প্রমীলা যে ভগবতীর কাছে প্রার্থনা করিয়াছেন তাহা সুন্দর হইয়াছে। ইন্দ্রজিতের মৃত্যুবর্ণনা, লক্ষ্মণের চরিত্র-সমালোচনাস্থলে আলোচিত হইবে।

মেঘনাদবধ কাব্যের মধ্যে এই ইন্দ্রজিতের চরিত্রই সর্বাপেক্ষা সুচিত্রিত হইয়াছে। তাহাতে একাধারে কোমলতা বীরত্ব উভয় মিশ্রিত হইয়াছে।

ইন্দ্রজিতের যুদ্ধযাত্রার সময় আমরা প্রথমে প্রমীলার দেখা পাই, কিন্তু তখন আমরা তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই, তৃতীয় সর্গে আমরা প্রমীলার সহিত বিশেষরূপে পরিচিত হই। প্রমীলা পতিবিরহে রোদন করিতেছেন।

উতরিলা নিশাদেবী প্রমোদ উদ্যানে।
শিহরি প্রমীলা সতী, মৃদু কলস্বরে,

বাসন্তী নামেতে সখি বসন্ত সৌরভা,
তার গলা ধরি কাঁদি কহিতে লাগিলা;
'ওই দেখো আইল লো তিমির যামিনী,
কাল ভুজঙ্গিনীরূপে দংশিতে আমারে,
বাসন্তি! কোথায় সখি, রক্ষঃ কুলপতি,
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ, এ বিপত্তি কালে?' ইত্যাদি।

পূর্বে কি বলি নাই মেঘনাদবধে হৃদয়ের কবিতা নাই, ইহার বর্ণনা সুন্দর হইতে পারে, ইহার দুই-একটি ভাব নূতন হইতে পারে, কিন্তু কবিতার মধ্যে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস অতি অল্প। আমরা অনেক সময়ে অনেক প্রকার ভাব অনুভব করি, কিন্তু তাহার ক্রমানুযায়ী শৃঙ্খলা খুঁজিয়া পাই না, অনুভব করি অথচ কেন হইল কী হইল কিছুই ভাবিয়া পাই না, কবির অণুবীক্ষণী কল্পনা তাহা আবিষ্কার করিয়া আমাদের দেখাইয়া দেয়। হৃদয়ের প্রত্যেক তরঙ্গ প্রতি-তরঙ্গ যাঁহার কল্পনার নেত্র এড়াইতে পারে না তাঁহাকেই কবি বলি। তাঁহার রচিত হৃদয়ের গীতি আমাদের হৃদয়ে চিরপরিচিত সঙ্গীর ন্যায় প্রবেশ করে। প্রমীলার বিরহ উচ্ছ্বাস আমাদের হৃদয়ের দুয়ারে তেমন আঘাত করে না তো, কালভুজঙ্গিনী-স্বরূপ তিমিরযামিনীর কাল, চন্দ্রমার অগ্নি-কিরণও মলয়ের বিষজ্বালাময় কবিতার সহিত অস্তমিত হইয়াছে।

প্রমীলা বাসন্তীকে কহিলেন—

চলো, সখি, লঙ্কাপুরে যাই মোরা সবে।

বাসন্তী কহিল—

কেমনে পশিবে
লঙ্কাপুরে আজি তুমি? অলঙ্ঘ্য সাগর-
সম রাঘবীয় চমূ বেড়িছে তাহায়?
রুষিলা দানববালা প্রমীলা রূপসী!
কী কহিলি, বাসন্তি? পর্বতগৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?
দানবনন্দিনী আমি, রক্ষঃ কুলবধূ,
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী—
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?
পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজবলে,
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি?

এখানটি অতি সুন্দর হইয়াছে, তেজস্বিনী প্রমীলা আমাদের চক্ষে অনলের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছেন।

তৎপরে প্রমীলার যুদ্ধযাত্রার উপকরণ সজ্জিত হইল। মেঘনাদবধের যুদ্ধসজ্জা বর্ণনা, সকলগুলিই প্রায় একই প্রকার। বর্ণনাগুলিতে বাক্যের ঘনঘটা আছে, কিন্তু 'বিদ্যুচ্ছটাকৃতি বিশ্বোজ্জ্বল' ভাবচ্ছটা কই? সকলগুলিতেই 'মন্দুরায় হ্রেষে অশ্ব' 'নাদে গজ বারী মাঝে' 'কাঞ্চন কঞ্চুক বিভা' ভিন্ন আর কিছুই নাই।

চড়িল ঘোড়া একশত চেড়ি

...

...হ্রেষিল অশ্ব মগন হরষে
দানব দলনী পদ্ম পদযুগ ধরি
বক্ষে, বিরূপাক্ষ সুখে নাদেন যেমতি!

শেষ দুই পঙ্‌ক্তিটি আমাদের বড়ো ভালো লাগিল না; এক তো কালিকার পদযুগ বক্ষে ধরিয়া বিরূপাক্ষ নাদেন এ কথা কোনো শাস্ত্রে পড়ি নাই। দ্বিতীয়ত, কালিকার পদযুগ বক্ষে ধরিয়া মহাদেব চিৎকার করিতে থাকেন এ ভাবটি অতিশয় হাস্যজনক। তৃতীয়ত 'নাদেন' শব্দটি আমাদের কানে ভালো লাগে না। প্রমীলা সখীবৃন্দকে সম্ভাষণ করিয়া বলিতেছেন—

লঙ্কাপুরে, শুন লো দানবী
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ বন্দীসম এবে।
কেন যে দাসীরে ভুলি বিলম্বেন তথা
প্রাণনাথ, কিছু আমি না পারি বুঝিতে?
যাইব তাঁহার পাশে, পশিব নগরে
বিকট কটক কাটি, জিনি ভুজবলে
রঘুশ্রেষ্ঠে;— এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা, মম,
নতুবা মরিব রণে— যা থাকে কপালে!
দানব-কুল-সম্ভবা আমরা, দানবী;—
দানব কুলের বিধি বধিতে সমরে,
দ্বিষৎশোণিত-নদে নতুবা ডুবিতে!
অধরে ধরিলা মধু গরল লোচনে
আমরা, নাহি কি বল এ ভুজ-মৃণালে?
চলো সবে রাঘবের হেরি বীর-পনা।
দেখিবে যে রূপ দেখি শূর্পণখা পিসি
মাতিল মদন মদে পঞ্চবটী বনে; ইত্যাদি

প্রমীলা লঙ্কায় যাউন-না কেন, বিকট কটক কাটিয়া রঘুশ্রেষ্ঠকে পরাজিত করুন-না কেন, তাহাতে তো আমাদের কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু শূর্পণখা পিসির মদনদেবের কথা, নয়নের গরল, অধরের মধু লইয়া সখীদের সহিত ইয়ারকি দেওয়াটা কেন? যখন কবি বলিয়াছেন—

কী কহিলে বাসন্তি? পর্বতগৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?

যখন কবি বলিয়াছেন— 'রোষে লাজ ভয় ত্যজি, সাজে তেজস্বিনী প্রমীলা।' তখন আমরা যে প্রমীলার জ্বলন্ত অনলের ন্যায় তেজোময় গর্বিত উগ্র মূর্তি দেখিয়াছিলাম, এই হাস্য-পরিহাসের স্রোতে তাহা আমাদের মন হইতে অপসৃত হইয়া যায়। প্রমীলা এই যে চোক ঠারিয়া মুচকি হাসিয়া ঢল ঢল ভাবে রসিকতা করিতেছেন, আমাদের চক্ষে ইহা কোনোমতে ভালো লাগে না!

একেবারে শত শঙ্খ ধরি
ধ্বনিলা, টঙ্কারি রোযে শত ভীম ধনু
স্ত্রীবৃন্দ, কাঁপিল লঙ্কা আতঙ্কে, কাঁপিল
মাতঙ্গে নিষাদী, রথে রথী তুরঙ্গমে
সাদীবর; সিংহাসনে রাজা; অবরোধে
কুলবধূ; বিহঙ্গম কাঁপিল কুলায়ে;
পর্বত গহ্বরে সিংহ; বনহস্তী বনে;
ডুবিল অতল জলে জলচর যত।

সুন্দর হইয়াছে। পশ্চিম দুয়ারে যাইতেই হনু গর্জিয়া উঠিল। অমনি 'নৃমুণ্ড মালিনী সখি (উগ্রচণ্ডাধনী)' রোষে হুংকারিয়া সীতানাথকে সংবাদ দিতে কহিলেন। হনুমান অগ্রসর হইয়া সভয়ে প্রমীলাকে দেখিল, এবং মনে মনে কহিল—

অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, উতরিনু যবে
লঙ্কাপুরে, ভয়ংকরী হেরিনু ভীমারে,
প্রচণ্ডা খর্পর খণ্ডা হাতে মুণ্ডমালী।
দানব নন্দিনী যত মন্দোদরী আদি
রাবণের প্রণয়িনী, দেখিনু তা সবে।
রক্ষঃ-কুল-বালা-দলে, রক্ষঃকুল-বধূ
(শশিকলা সমরূপে) ঘোর নিশাকালে,
দেখিনু সকলে একা ফিরি ঘরে ঘরে।
দেখিনু অশোক বনে (হায় শোকাকুলা)
রঘুকুল কমলেরে,— কিন্তু নাহি হেরি
এ হেন রূপ-মাধুরী কভু এ ভুবনে।

ভয়ংকরী ভীমা প্রচণ্ড খর্পর খণ্ডা হাতে মুণ্ডমালী এবং রক্ষঃকুলবালাদল শশিকলাসমরূপে, অশোক বনে শোকাকুল রঘুকুলকমল, পাশাপাশি বসিতে পারে না। কবির যদি প্রমীলাকে ভয়ংকরী করিবার অভিপ্রায় ছিল, তবে শশিকলাসম রূপবতী রক্ষঃকুলবালা এবং রঘুকুলকমলকে ত্যাগ করিলেই ভালো হইত। কিংবা যদি তাঁহাকে রূপমাধুরী-সম্পন্না করিবার ইচ্ছা ছিল তবে খর্পর খণ্ডা হস্তে মুণ্ডমালীকে পরিত্যাগ করাই উচিত ছিল।

প্রমীলা রামের নিকট নৃমুণ্ডমালিনী-আকৃতি নৃমুণ্ডমালিনীকে দূতী স্বরূপে প্রেরণ করিলেন,

চমকিলা বীরবৃন্দ হেরিয়া বামারে,
চমকে গৃহস্থ যথা ঘোর নিশাকালে
হেরি অগ্নিশিখা ঘরে! হাসিলা ভামিনী
মনে মনে। এক দৃষ্টে চাহে বীর যত
দড়ে রড়ে জড় সবে হয়ে স্থানে স্থানে।
বাজিল নূপুর পায়ে কাঞ্চি কটিদেশে।
ভীমাকার শূল করে, চলে নিতম্বিনী
জরজরি সর্ব জনে কটাক্ষের শরে
তীক্ষ্ণতর।

আমরা ভয়ে জড়সড় হইব, না কটাক্ষে জর-জর হইব এই এক সমস্যায় পড়িলাম।

নব মাতঙ্গিনী গতি চলিলা রঙ্গিণী,
আলো করি দশদিশ, কৌমুদী যেমতি,
কুমুদিনী সখী, ঝরেন বিমল সলিলে,
কিংবা উষা অংশুময়ী গিরিশৃঙ্গ মাঝে।

নৃমুণ্ডমালিনী আকৃতি উগ্রচণ্ডাধনীও বিমল কৌমুদী ও অংশুময়ী উষা হইয়া দাঁড়াইল! এবং এই অংশুময়ী উষা ও বিমল কৌমুদীকেই দেখিয়া প্রফুল্ল না হইয়া রামের বীর সকল দড়ে রড়ে জড়োসড়ো হইয়া গিয়াছিল।

হেন কালে হনু সহ উত্তরিলা দূতী
শিবিরে। প্রণমি বামা কৃতাঞ্জলি পুটে,
(ছত্রিশ রাগিণী যেন মিলি এক তানে)
কহিলা—

উগ্রচণ্ডাধনী কথা কহিলে ছত্রিশ রাগিণী বাজে, মন্দ নহে!

উত্তরিলা ভীমা-রূপী; বীর শ্রেষ্ঠ তুমি,

রক্ষোবধূ মাগে রণ, দেহো রণ তারে,
বীরেন্দ্র। রমণী শত মোরা যাহে চাহ,
যুঝিবে সে একাকিনী। ধনুর্বাণ ধরো,
ইচ্ছা যদি, নরবর, নহে চর্ম অসি,
কিংবা গদা, মল্লযুদ্ধে সদা মোরা রত।

এখানে মল্লযুদ্ধের প্রস্তাবটা আমাদের ভালো লাগিল না। রাম যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করিলে প্রমীলা লঙ্কায় গিয়া ইন্দ্রজিতের সহিত মিলিত হইলেন ও তৃতীয় সর্গ শেষ হইল। এখন আর-একটি কথা আসিতেছে, মহাকাব্যে যে-সকল উপাখ্যান লিখিত হইবে, মূল আখ্যানের ন্যায় তাহার প্রাধান্য দেওয়া উচিত নহে এবং উপাখ্যানগুলি মূল আখ্যানের সহিত অসংলগ্ন না হয়। একটি সমগ্র সর্গ লইয়া প্রমীলার প্রমোদ উদ্যান হইতে নগর প্রবেশ করার বর্ণনা লিখিত হইয়াছে তাহার অর্থ কী? এই উপাখ্যানের সহিত মূল আখ্যানের কোনো সম্পর্ক নাই, অথচ একখানা শরতের মেঘের মতো যে অমনি ভাসিয়া গেল তাহার তাৎপর্য কী? এক সর্গ ব্যাপিয়া এমন আড়ম্বর করা হইয়াছে যে আমাদের মনে হইয়াছিল যে প্রমীলা না জানি কী একটা কারখানা বাধাইবেন, অনেক হাঙ্গাম হইল।

কাঁপিল লঙ্কা আতঙ্কে, কাঁপিল
মাতঙ্গে নিষাদী, রথে রথী, তুরঙ্গমে
সাদীবর; সিংহাসনে রাজা; অবরোধে
কুলবধূ; বিহঙ্গম কাঁপিল কুলায়ে
পর্বত গহ্বরে সিংহ; বনহস্তী বনে;

নৃমুণ্ডমালিনী সখী (উগ্রচণ্ডাধনী) আইলেন, বীর সকল দড়ে রড়ে জড় হইয়া গেল। কোদণ্ড টংকার, ঘোড়া দড়বড়ি, অসির ঝনঝনি, ক্ষিতি টলমলি ইত্যাদি অনেক গোলযোগের পর হইল কী? না প্রমীলা প্রমোদ উদ্যান হইতে নগরে প্রবেশ করিলেন, একটা সমগ্র সর্গ ফুরাইয়া গেল, সে রাত্রে আবার ভয়ে রামের ঘুম হইল না। আচ্ছা, পাঠক বলুন দেখি আমাদের স্বভাবত মনে হয় কিনা, যে, ইন্দ্রজিতের সহিত সাক্ষাৎ ব্যতীতও আরও কিছু প্রধান ঘটনা ঘটিবে। ইন্দ্রজিৎবধ নামক ঘটনার সহিত উপরি-উক্ত উপাখ্যানের কোনো সম্পর্ক নাই, অথচ মধ্য হইতে একটা বিষম গণ্ডগোল বাধিয়া গেল।

ভারতী
আশ্বিন ১২৮৪

লক্ষ্মী ইন্দ্রকে আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন।

কহিলেন স্বরীশ্বর, 'এ ঘোর বিপদে
বিশ্বনাথ বিনা, মাতঃ কে আর রাখিবে
রাঘবে? দুর্বার রণে রাবণ-নন্দন।
পন্নগ-অশনে নাগ নাহি ডরে যত,
ততোধিক ডরি তারে আমি।'

ইন্দ্র ইন্দ্রজিতের নিকট শতবার পরাজিত হইতে পারেন, কিন্তু তথাপি

পন্নগ-অশনে নাগ নাহি ডরে যত,
ততোধিক ডরি তারে আমি।

এ কথা তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইতে পারে না। ইন্দ্রজিৎকে বাড়াইবার জন্য ইন্দ্রকে নত করা

অন্যায় হইয়াছে; প্রতি-নায়ককে নত করিলেই যে নায়ককে উন্নত করা হয়, তাহা নহে; হিমালয়কে ভূমি অপেক্ষা উচ্চ বলিলে হিমালয়ের উচ্চত্ব প্রতিভাত হয় না, সকল পর্বত হইতে হিমালয়কে উচ্চ বলিলেই তাহাকে যথার্থ উন্নত বলিয়া বোধ হয়। একবার, দুইবার, তিনবার পরাজিত হইলে কাহার মন দমিয়া যায়? পৃথিবী বীরের। সহস্রবার অকৃতকার্য হইলেও কাহার উদ্যম টলে না? স্বর্গের দেবতার। ইন্দ্র ইন্দ্রজিতের অপেক্ষা দুর্বল হইতে পারেন, কিন্তু ভীরু কেন হইবেন? চিত্রের প্রারম্ভ ভাগেই কবি যে ইন্দ্রকে কাপুরুষ করিয়া আঁকিয়াছেন, তাহা বড়ো সুকবি-সংগত হয় নাই।

ইন্দ্র শচীর সহিত কৈলাস-শিখরে দুর্গার নিকটে গমন করিলেন এবং রাঘবকে রক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। এক বিষয়ে আমরা ইন্দ্রের প্রতি বড়ো অসন্তুষ্ট হইলাম, পাঠকের মনে আছে যে, ইন্দ্রের কৈলাসে আসিবার সময় লক্ষ্মী প্রায় মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে,

বড়ো ভালো বিরূপাক্ষ বাসেন লক্ষ্মীরে।
কহিয়ো, বৈকুণ্ঠপুরী বহুদিন ছাড়ি
আছয়ে সে লঙ্কাপুরে! কত যে বিরলে
ভাবয়ে সে অবিরল; একবার তিনি,
কী দোষ দেখিয়া তারে না ভাবেন মনে?
কোন্ পিতা দুহিতারে পতিগৃহ হতে
রাখে দূরে জিজ্ঞাসিয়ো বিজ্ঞ জটাধরে!

পাছে শিবের সহিত দেখা না হয় ও তিনি শিবের বিজ্ঞত্বের উপর যে ভয়ানক কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন তাহা অনর্থক নষ্ট হয়, এই নিমিত্ত তিনি বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন যে—

ত্র্যম্বকে না পাও যদি, অম্বিকার পদে
কহিয়ো এ-সব কথা।

লক্ষ্মীর এমন সাধের অনুরোধটি ইন্দ্র পালন করেন নাই।

মহাদেবের পরামর্শ মতে ইন্দ্র মায়াদেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন।

সৌর-খরতর-করজাল-সংকলিত—
আভাময় স্বর্ণাসনে বসি কুহকিনী
শক্তীশ্বরী।

আমাদের মতে মায়াদেবীর আসন সৌর-খরতর-করজাল-সংকলিত না হইয়া যদি অস্ফুট অন্ধকার-কুজ্ঝটিকা-মণ্ডিত জলদময় হইত, তবে ভালো হইত। মায়াদেবীর নিকট হইতে দেব-অস্ত্র লইয়া ইন্দ্র রাম-সমীপে প্রেরণ করিলেন।

পঞ্চম সর্গে ইন্দ্রজিতের ভাবনায় ইন্দ্রের ঘুম নাই;

—কুসুম শয্যা ত্যজি, মৌন-ভাবে
বসেন ত্রিদিব-পতি রত্ন-সিংহাসনে;—
সুবর্ণ মন্দিরে সুপ্ত আর দেব যত।

দেবতাদিগের ঘুমটা না থাকিলেই ভালো হইত, যদি বা ঘুম রহিল, তবে ইন্দ্রজিতের ভয়ে ইন্দ্রের রাতটা না জাগিলেই ভালো হইত।

শচী ইন্দ্রের ভয় ভাঙিবার জন্য নানাবিধ প্রবোধ দিতে লাগিলেন,

'পাইয়াছ অস্ত্র কান্ত', কহিলা পৌলমী
অনন্ত যৌবনা, 'যাহে বধিলা তারকে
মহাসুর তারকারি; তব ভাগ্য বলে
তব পক্ষ বিরূপাক্ষ; আপনি পার্বতী,
দাসীর সাধনে সাধ্বী কহিলা, সুসিদ্ধ

হবে মনোরথ কালি; মায়া দেবীশ্বরী
বধের বিধান কহি দিবেন আপনি;—
তবে এ ভাবনা নাথ কহো কী কারণে?'

কিন্তু ইন্দ্র কিছুতেই প্রবোধ মানিবার নহেন, দেব-অস্ত্র পাইয়াছেন তাহা সত্য, শিব তাঁহার পক্ষ তাহাও সত্য, কিন্তু তথাপি ইন্দ্রের বিশ্বাস হইতেছে না—

সত্য যা কহিলে,
দেবেন্দ্রাণি, প্রেরিয়াছি অস্ত্র লঙ্কাপুরে,
কিন্তু কী কৌশলে মায়া রক্ষিবে লক্ষ্মণে
রক্ষোযুদ্ধে, বিশালাক্ষি, না পারে বুঝিতে।
জানি আমি মহাবলী সুমিত্রা নন্দন;
কিন্তু দন্তী কবে, দেবি, আঁটে মৃগরাজে?
দম্ভোলী নির্ঘোষ আমি শুনি, সুবদনে;
মেঘের ঘর্ঘর ঘোর; দেখি ইরম্মদে,
বিমানে আমার সদা ঝলে সৌদামিনী;
তবু থর-থরি হিয়া কাঁপে, দেবি, যবে
নাদে রুষি মেঘনাদ,

পাঠক দেখিলেন তো, ইন্দ্র কোনোমতে শচীর সান্ত্বনা মানিলেন না।

বিষাদে নিশ্বাসি
নীরবিলা সুরনাথ; নিশ্বাসি বিষাদে
(পতিখেদে সতী প্রাণ কাঁদেরে সতত।)
বসিলা ত্রিদিব-দেবী দেবেন্দ্রের পাশে।

আহা, অসহায় শিশুর প্রতি আমাদের যেরূপ মমতা জন্মে, ভয় ও বিষাদে আকুল ইন্দ্র বেচারীর উপর আমাদের সেইরূপ জন্মিতেছে।

উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, চিত্রলেখা প্রভৃতি অপ্সরারা বিষণ্ণ ইন্দ্রকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

সরসে যেমতি
সুধাকর কররাশি বেড়ে নিশাকালে
নীরবে মুদিত পদ্মে।

বিষণ্ণ-সৌন্দর্যের তুলনা এখানে সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু মাইকেল যেখানেই 'কিংবা' আনেন, সেখানেই আমাদের বড়ো ভয় হয়,

কিংবা দীপাবলী—
অম্বিকার পীঠতলে শারদ পার্বণে
হর্ষে মগ্ন বঙ্গ যবে পাইয়া মায়েরে
চির বাঞ্ছা।

পূর্বকার তুলনাটির সহিত ইহা সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়াছে, দীপাবলী, শারদপার্বণ, সমুদয়গুলিই উল্লাস-সূচক।

এমন সময়ে মায়াদেবী আসিয়া কহিলেন,

যাই, আদিতেয়,
লঙ্কাপুরে, মনোরথ তোমার পুরিব;
রক্ষঃকুলচূড়ামণি চূর্ণিব কৌশলে।

এতক্ষণে ইন্দ্র সান্ত্বনা পাইলেন, নিদ্রাতুরা শচী ও অপ্সরীরাও বাঁচিল, নহিলে হয়তো বেচারীদের সমস্ত রাত্রি জাগিতে হইত।

ইন্দ্রজিৎ হত হইয়াছেন। লক্ষ্মী ইন্দ্রালয়ে উপস্থিত হইবামাত্র ইন্দ্র আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া কহিতেছেন,

দেহো পদধূলি,
জননি; নিঃশঙ্ক দাস তোমার প্রসাদে—
গত জীব রণে আজি দুরন্ত রাবণি!
ভুঞ্জিব স্বর্গের সুখ নিরাপদ এবে।

বড়ো বাড়াবাড়ি হইয়াছে; ইন্দ্রের ভীরুতা কিছু অতিরিক্ত হইয়াছে। এইবার সকলে কহিবেন যে, পুরাণে ইন্দ্রকে বড়ো সাহসী করে নাই, এক-একটি দৈত্য আসে, আর ইন্দ্র পাতালে পলায়ন করেন ও একবার ব্রহ্মা একবার মহাদেবকে সাধাসাধি করিয়া বেড়ান। তবে মাইকেলের কী অপরাধ? কিন্তু এ আপত্তি কোনো কার্যেরই নহে। মেঘনাদবধের যদি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পুরাণের কথা যথাযথরূপে রক্ষিত হইত, তবে তাঁহাদের কথা আমরা স্বীকার করিতাম। কত স্থানে তিনি অকারণে পুরাণ লঙ্ঘন করিয়াছেন, রাবণের মাতুল কালনেমীকে তিনি ইন্দ্রজিতের শ্বশুর করিলেন, প্রমীলার দ্বারা রামের নিকট তিনি মল্লযুদ্ধের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, বীর চূড়ামণি রাবণকে কাপুরুষ বানাইলেন; আর যেখানে পুরাণকে মার্জিত করিবার সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন ছিল, সেখানেই পুরাণের অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহাকে মার্জনা করিতে পারি না। ইন্দ্রের পর দুর্গার অবতারণা করা হইয়াছে।

ইন্দ্রজিতের বধোপায় অবধারিত করিবার জন্য ইন্দ্র দুর্গার নিকট উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্রের অনুরোধে পার্বতী শিবের নিকট গমনোদ্যত হইলেন। রতিকে আহ্বান করিতেই রতি উপস্থিত হইলেন, এবং রতির পরামর্শে মোহিনী মূর্তি ধরিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

দুর্গা মদনকে আহ্বান করিলেন ও কহিলেন,

চলো মোর সাথে,
হে মন্মথ, যাব আমি যথা যোগিপতি
যোগে মগ্ন এবে, বাছা; চলো ত্বরা করি।

'বাছা' কহিলেন—

কেমনে মন্দির হতে, নগেন্দ্রনন্দিনি,
বাহিরিবা, কহো দাসে, এ মোহিনী বেশে,
মুহূর্তে মাতিবে, মাতঃ, জগত হেরিলে,
ও রূপ মাধুরী সত্য কহিনু তোমারে।
হিতে বিপরীত, দেবী, সত্বরে ঘটিবে।
সুরাসুর-বৃন্দ যবে মথি জলনাথে,
লভিলা অমৃত, দুষ্ট দিতিসুত যত
বিবাদিল দেব সহ সুধা-মধু হেতু।
মোহিনী মুরতি ধরি আইলা শ্রীপতি।
ছদ্মবেশী হৃষিকেশে ত্রিভুবন হেরি।
হারাইলা জ্ঞান সবে এ দাসের শরে!
অধর-অমৃত-আশে ভুলিলা অমৃত
দেব দৈত্য; নাগদল নম্রশিরঃ লাজে,
হেরি পৃষ্ঠদেশে বেণী, মন্দর আপনি
অচল হইল হেরি উচ্চ কুচ যুগে!
স্মরিলে সে কথা, সতি, হাসি আসে মুখে,
মলম্বা অম্বরে তাম্র এত শোভা যদি

ধরে, দেবি, ভাবি দেখো বিশুদ্ধ কাঞ্চন
কান্তি কত মনোহর!

'বাছা'র সহিত 'মাতা'র কী চমৎকার মিষ্টালাপ হইতেছে দেখিয়াছেন? মলম্বা অম্বরের (গিলটি) উদাহরণ দিয়া, মদন কথাটি আরও কেমন রসময় করিয়া তুলিয়াছে দেখিয়াছেন? মহাদেবের নিকট পার্বতী গমন করিলেন,

মোহিত মোহিনী রূপে; কহিলা হরষে
পশুপতি, 'কেন হেথা একাকিনী দেখি,
এ বিজন স্থলে তোমা, গণেন্দ্র জননি?
কোথায় মৃগেন্দ্র তব কিঙ্কর, শঙ্করি?
কোথায় বিজয়া, জয়া?' হাসি উত্তরিলা
সুচারু হাসিনী উমা; 'এ দাসীরে ভুলি,
হে যোগীন্দ্র বহু দিন আছ এ বিরলে
তেঁই আসিয়াছি নাথ, দরশন আশে
পা দুখানি। যে রমণী পতিপরায়ণা,
সহচরী সহ সে কি যায় পতিপাশে?'

পতিপরায়ণা নারীর সহচরীর সহিত পতিসমীপে যাইতে যে নিষেধ আছে, এমন কথা আমরা কোনো ধর্মশাস্ত্রে পড়ি নাই। পুনশ্চ মহাদেবের নিকট দাসীভাবে আত্মনিবেদন করা পার্বতীর পৌরাণিক চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। উচ্চ দেব-ভাবের সহিত দম্পতির একাত্মভাবে যেরূপ সংলগ্ন হয়, উচ্চ-নীচ ভাব সেরূপ নহে।

রাবণের সহিত যখন কার্তিকেয়ের যুদ্ধ হইতেছে, তখন দুর্গা কাতর হইয়া সখী বিজয়াকে কহিতেছেন—

যা লো সৌদামিনী গতি,
নিবার কুমারে, সই। বিদরিছে হিয়া
আমার, লো সহচরী, হেরি রক্তধারা
বাছার কোমল দেহে। ইত্যাদি।

অসুরমর্দিনী শক্তিরূপিণী ভগবতীকে 'বাছার কোমল দেহে রক্তধারা' দেখিয়া এরূপ অধীর করা বড়ো সুকল্পনা নহে; পৃথিবীতে এমন নারী আছেন, যাঁহারা পুত্রকে যুদ্ধ হইতে নিরত করিবার জন্য সহচরী প্রেরণ করেন না; তবে মহাদেবী, পার্বতীকে এত ক্ষুদ্র করা কতদূর অসংগত হইয়াছে, সুরুচি পাঠকদের তাহা বুঝিবার জন্য অধিক আড়ম্বর করিতে হইবে না।

ভারতী
কার্তিক ১২৮৪

বাল্মীকি রামের চরিত্র-বর্ণনাকালে বলিয়াছেন, 'যম ও ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহার বল, বৃহস্পতির ন্যায় তাঁহার বুদ্ধি, পর্বতের ন্যায় তাঁহার ধৈর্য।*... ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হলেও তিনি ক্ষুব্ধ হন না। যখন কৈকয়ী রামকে বনে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন, তখন 'মহানুভব রাম কৈকেয়ীর এইরূপ কঠোর বাক্য শুনিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত ও শোকাবিষ্ট হইলেন না।... চন্দ্রের যেমন হ্রাস, সেইরূপ রাজ্যনাশ তাঁহার স্বাভাবিক শোভাকে কিছুমাত্র মলিন করিতে পারিল না! জীবন্মুক্ত যেমন সুখে দুঃখে একই ভাবে থাকেন, তিনি তদ্রূপই রহিলেন; ফলতঃ ঐ সময়ে তাঁহার চিত্ত-বিকার কাহারই অণুমাত্র লক্ষিত হইল না।... ঐ সময় দেবী কৌশল্যার অন্তঃপুরে অভিষেক-

* উদ্‌ধৃতিগুলি হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য -কৃত রামায়ণ হইতে।

মহোৎসব-প্রসঙ্গে নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ হইতেছিল। রাম তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াও এই বিপদে ধৈর্যাবলম্বন করিয়া রহিলেন। জ্যোৎস্নাপূর্ণ শারদীয় শশধর যেমন আপনার নৈসর্গিক শোভা ত্যাগ করেন না; সেইরূপ তিনিও চিরপরিচিত হর্ষ পরিত্যাগ করিলেন না।' সাধারণ্যে রামের প্রজারঞ্জন, এবং বীরত্বের ন্যায় তাঁহার অটল ধৈর্যও প্রসিদ্ধ আছে। বাল্মীকি রামকে মনুষ্যচরিত্রের পূর্ণতা অর্পণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; তিনি তাঁহাকে কোমলতা ও বীরত্ব, দয়া ও ন্যায়, সহৃদয়তা ও ধৈর্য প্রভৃতি সকল প্রকার গুণের সামঞ্জস্য-স্থল করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা উপরি-উক্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া মেঘনাদবধ কাব্যের রাম চরিত্র সমালোচনা করিব, অথবা যদি মাইকেল রাম-চরিত-চিত্রের আদিকবির অনুসরণ না করিয়া থাকেন, তবে তাহা কতদূর সংগত হইয়াছে আলোচনা করিয়া দেখিব।

যখন প্রমীলার দূতী নৃমুণ্ডমালিনী রামের নিকট অসি, গদা বা মল্লযুদ্ধের প্রস্তাব করিতে গেলেন, তখন রঘুপতি উত্তর দেন যে,

—শুন সুকেশিনী,
বিবাদ না করি আমি কভু অকারণে।
অরি মম রক্ষঃপতি, তোমরা সকলে
কুলবালা, কুলবধূ; কোন্ অপরাধে
বৈরিভাব আচরিব তোমাদের সাথে? ইত্যাদি।

তখন মনে করিলাম যে, রাম ভালোই করিয়াছেন, তিনি বীর, বীরের মর্যাদা বুঝেন; অবলা স্ত্রীলোকদের সহিত অনর্থক বিবাদ করিতেও তাঁহার ইচ্ছা নাই। তখন তো জানিতাম না যে, রাম ভয়ে যুদ্ধ করিতে সাহস করেন নাই।

দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে
রক্ষোবর! যুদ্ধসাধ ত্যজিনু তখনি।
মূঢ় যে ঘাঁটায় হেন বাঘিনীরে।

এ রাম যে কী বলিয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন সেই এক সমস্যা!

প্রমীলা তো লঙ্কায় চলিয়া যাউন, কিন্তু রামের যে ভয় হইয়াছে তাহা আর কহিবার নয়। তিনি বিভীষণকে ডাকিয়া কহিতেছেন—

এবে কী করিব, কহো, রক্ষ-কুলমণি?
সিংহ সহ সিংহী আসি মিলিল বিপিনে,
কে রাখে এ মৃগ পালে?

রামের কাঁদো কাঁদো স্বর যেন আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছি। লক্ষ্মণ, দাদাকে একটু প্রবোধ দিলেন; রাম বিভীষণকে কহিলেন—

কৃপা করি, রক্ষোবর, লক্ষ্মণেরে লয়ে,
দুয়ারে দুয়ারে সখে, দেখো সেনাগণে।
কোথায় কে জাগে আজি? মহাক্লান্ত সবে
বীরবাহু সহ রণে। ...
...এ পশ্চিম দ্বারে
আপনি জাগিব আমি ধনুর্বাণ হাতে!

লক্ষ্মণ ষষ্ঠ সর্গে রামকে কহিলেন—

মারি রাবণিরে, দেব দেহো আজ্ঞা দাসে!

রঘুনাথ উত্তর করিলেন—

হায় রে কেমনে—
যে কৃতান্ত দূতে দূরে হেরি, ঊর্ধ্বশ্বাসে

ভয়াকুল জীবকুল ধায় বায়ুবেগে
প্রাণ লয়ে; দেব-নর ভস্ম যার বিষে;
কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্প বিবরে,
প্রাণাধিক? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।

ইত্যাদি

লক্ষ্মণ বুঝাইলেন যে, দেবতারা যখন আমাদের প্রতি সদয়, তখন কিসের ভয়। বিভীষণ কহিলেন যে, লঙ্কার রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে স্বপ্নে কহিয়াছিলেন যে, তিনি শীঘ্রই প্রস্থান করিবেন, অতএব ভয় করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। কিন্তু রাম কাঁদিয়া উঠিলেন—

উত্তরিলা সীতানাথ সজল নয়নে;
'স্মরিলে পূর্বের কথা রক্ষকুলোত্তম
আকুল পরান কাঁদে। কেমনে ফেলিব
এ ভ্রাতৃ-রতনে আমি এ অতল জলে?'

ইত্যাদি

কিছুতেই কিছু হইল না, রামের ভয় কিছুতেই ঘুচিল না, অবশেষে আকাশবাণী হইল।

উচিত কি তব, কহো হে বৈদেহীপতি,
সংশয়িতে দেববাক্য, দেবকুলপ্রিয়
তুমি?

অবশেষে আকাশে চাহিয়া দেখিলেন যে অজগরের সহিত একটা ময়ূর যুদ্ধ করিতেছে, কিন্তু যুদ্ধে অজগর জয়ী ও ময়ূর নিহত হইল। এতক্ষণে রাম শান্ত হইলেন ও লক্ষ্মণকে যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত করিয়া দিলেন। লক্ষ্মণ যুদ্ধে যাইবার সময় রাম একবার দেবতার কাছে প্রার্থনা করিলেন, একবার বিভীষণকে কাতরভাবে কহিলেন,

সাবধানে যাও মিত্র। অমূল রতনে
রামের, ভিখারী রাম অর্পিছে তোমারে,
রথীবর!

বিভীষণ কহিলেন, কোনো ভয় নাই। ইন্দ্রজিৎ-শোকে অধীর হইয়া যখন রাবণ সৈন্য-সজ্জায় আদেশ দিলেন, তখন রাক্ষসসৈন্য-কোলাহল শুনিয়া রাম আপনার সৈন্যাধ্যক্ষগণকে ডাকাইয়া আনিলেন ও তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

'পুত্রশোকে আজি
বিকল রাক্ষসপতি সাজিছে সত্বরে;

...

রাখো গো রাঘবে আজি এ ঘোর বিপদে।
স্ববন্ধু-বান্ধব-হীন বনবাসী আমি
ভাগ্য-দোষে; তোমরা হে রামের ভরসা
বিক্রম, প্রতাপ, রণে।...
কুল, মান, প্রাণ মোর রাখো হে উদ্ধারি
রঘুবন্ধু, রঘুবধূ বদ্ধা কারাগারে
রক্ষ-ছলে। স্নেহ-পণে কিনিয়াছ রামে
তোমরা বাঁধো হে আজি কৃতজ্ঞতাপাশে
রঘুবংশে, দাক্ষিণাত্য দাক্ষিণ্য প্রকাশি!'
নীরবিলা রঘুনাথ সজল নয়নে।

এরূপ দুগ্ধপোষ্য বালকের ন্যায় কথায় কথায় সজল নয়নে বিষম ভীরুস্বভাব রাম বনের

বানরগুলাকে লইয়া এতকাল লঙ্কায় তিষ্ঠিয়া আছে কীরূপে তাহাই ভাবিতেছি।

লক্ষ্মণের মৃত্যু হইলে রাম বিলাপ করিতে লাগিলেন, সে বিলাপ সম্বন্ধে আমরা অধিক কিছু বলিতে চাহি না, কেবল ইলিয়াড হইতে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর বন্ধু পেট্রক্লসের মৃত্যুতে একিলিস যে বিলাপ করিয়াছিলেন তাহা উদ্‌ধৃত করিয়া দিলাম, পাঠকেরা বুঝিয়া লইবেন যে কীরূপ বিলাপ বীরের উপযুক্ত। একিলিস তাঁহার দেবীমাতা থেটিস্‌কে কহিতেছেন,

He, deeply groaning—"To this cureless grief.
Not even the Thunderer's favour brings relief.
Patroclus— Ah!— Say, goddess, can I boast
A pleasure now? revenge itself is lost;
Patroclus, loved of all my martial train,
Beyond mankind, beyond myself, is slain!
'Tis not in fate the alternate now to give;
Patroclus dead Achilles hates to live.
Let me revenge it on proud Hector's heart,
Let his last spirit smoke upon my dart;
On these conditions will I breathe; till then,
I blush to walk among the race of men."
A flood of tears at this the goddess shed :
"Ah then, I see thee dying, see thee dead!
When Hector falls, thou diest."—"Let Hector die,
And let me fall! (Achilles made reply)
Far lies Patroclus from his native plain!
He fell, and, falling, wish'd my aid in vain.
Ah then, since from this miserable day
I cast all hope of my return away;
Since unrevenged, a hundred ghosts demand
The fate of Hector from Achilles' hand;
Since here, for brutal courage far renown'd,
I live an idle burden to the ground,
(Others in council famed for nobler skill,-
More useful to preserve, than I to kill)
Let me— But oh! ye gracious powers above!
Wrath and revenge from men and gods remove;
Far, far too dear to every mortal breast,
Sweet to the soul, as honey to the taste :
Gathering like vapours of a noxious kind
Form fiery blood, and darkening all the mind.
Me Agamemnon urged to deadly hate;
'Tis past— I quell it; I resign to fate.
Yes— I will meet the murderer of my friend;
Or (if the gods ordain it) meet my end.

The stroke of fate the bravest cannot shun :
The great Alcides, Jore's unequal'd son,
To Juno's hate, at length resign'd his breath.
And sunk the victim of all-conquering death.
So shall Achilles fall! Stretch'd pale and dead,
No more the Grecian hope, or Trojan dread!
Let me, this instant, rush into the fields,
And reap what glory life's short harvest yields.
Shall I not force some widow'd dame to tear
With frantic hands her long dishevel'd hair ?
Shall I not force her breast to heave with sighs,
And the soft tears to trickle from her eyes ?
Yes, I shall give the fair those mournful charms—
In vain you hold me— Hence! my arms, my arms!—
Soon shall the sanguine torrent spread so wide,
That all shall know, Achilles swells the tide."

রাম লক্ষ্মণের ঔষধ আনিবার জন্য যমপুরীতে গমন করিলেন। সেখানে বালীর সহিত দেখা হইল, বালী কহিলেন—

—কী হেতু হেথা সশরীরে আজি
রঘুকুলচূড়ামণি? অন্যায় সমরে
সংহারিলে মোরে তুমি তুষিতে সুগ্রীবে;
কিন্তু দূর করো ভয়, এ কৃতান্ত পুরে
নাহি জানি ক্রোধ মোরা, জিতেন্দ্রিয় সবে।

পরে দশরথের নিকটে গেলেন;

হেরি দূরে পুত্রবরে রাজর্ষি, প্রসারি
বাহুযুগ, (বক্ষঃস্থল আর্দ্র অশ্রুজলে)

বালী যেমন দেহের সহিত ক্রোধ প্রভৃতি রিপু পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে সুখভোগ করিতেছেন, তেমনি দশরথ যদি পৃথিবীর অশ্রুজল পৃথিবীতেই রাখিয়া আসিতেন তো ভালো হইত। শরীর না থাকিলে অশ্রুজল থাকা অসম্ভব, আমরা তাহা কল্পনাও করিতে পারি না। এমন-কি, ইহার কিছু পরে রাম যখন দশরথের পদধূলি লইতে গেলেন, তখন তাঁহার পা-ই খুঁজিয়া পান নাই। এমন অশরীরী আত্মার বক্ষঃস্থল কীরূপে যে অশ্রুজলে আর্দ্র হইয়াছিল তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। যাহা হউক রামের আর অধিক কিছুই নাই। রামের সম্বন্ধে আর-একটি কথা বলিবার আছে। রাম যে কথায় কথায় 'ভিখারী রাম' 'ভিখারী রাম' করিয়াছেন, সেগুলি আমাদের ভালো লাগে না; এইরূপে নিজের প্রতি পরের দয়া উদ্রেক করিবার চেষ্টা, অতিশয় হীনতা প্রকাশ করা মাত্র। একজন দরিদ্র বলিতে পারে 'আমি ভিক্ষুক আমাকে সাহায্য করো।' একজন নিস্তেজ দুর্বল বলিতে পারে, 'আমি দুর্বল, আমাকে রক্ষা করো।' কিন্তু তেজস্বী বীর সেরূপ বলিতে পারেন না; তাহাতে আবার রাম ভিখারীও নহেন, তিনি নির্বাসিত বনবাসী মাত্র।

"ভিখারী রাঘব, দূতি, বিদিত জগতে।"
"অমূল রতনে
রামের, ভিখারী রাম অর্পিছে তোমারে।"
"বাঁচাও করুণাময়, ভিখারী রাঘবে।" ইত্যাদি।

যাহা হউক, রামায়ণের নায়ক মহাবীর রাম, মেঘনাদবধ কাব্যের কবি তাঁহার এ-কী দুর্দশা করিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রে তিলমাত্র উন্নত-ভাব অর্পিত হয় নাই, এরূপ পরমুখাপেক্ষী ভীরু কোনোকালে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় নাই। বাল্যকাল হইতে রামের প্রতি আমাদের এরূপ মমতা আছে যে, প্রিয়ব্যক্তির মিথ্যা অপবাদ শুনিলে যেরূপ কষ্ট হয়, মেঘনাদবধ কাব্যে রামের কাহিনী পড়িলে সেইরূপ কষ্ট হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, রামের চরিত্রে বীরত্ব ও কোমলত্ব সমানরূপে মিশ্রিত আছে। পৌরুষ এবং স্ত্রীত্ব উভয় একাধারে মিশ্রিত হইলে তবে পূর্ণ মনুষ্য সৃজিত হয়, বাল্মীকি রামকে সেইরূপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মেঘনাদবধে রামের কোমলতা অংশটুকু অপর্যাপ্তরূপে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু পাঠক, এমন একটি কথাও কি পাইয়াছেন, যাহাতে তাঁহাকে বীর বলিয়া মনে হয়? প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কেবল বিভীষণের সহিত পরামর্শ করিয়াছেন, কেবল লক্ষ্মণের জন্য রোদন করিয়াছেন। ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধে প্রেরণ করিবার সময় সংস্কৃত রামায়ণে রাম লক্ষ্মণকে কহিতেছেন—

বৎস, সেই ভয়াবহ দুরাত্মার (ইন্দ্রজিতের) সমস্ত মায়া অবগত আছি। সেই রাক্ষসাধম দিব্য অস্ত্রধারী, এবং সংগ্রামে ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণকেও বিসংজ্ঞ করিতে পারে। সে রথে আরোহণপূর্বক অন্তরীক্ষে বিচরণ করে, এবং মেঘাচ্ছন্ন সূর্যের ন্যায় তাহার গতি কেহ জ্ঞাত হইতে পারে না। হে সত্যপরাক্রম অরিন্দম, বাণ দ্বারা সেই মহাবীর রাক্ষসকে বধ করো।

হে বৎস, সংগ্রামে দুর্মদ যে বীর বজ্রহস্তকেও পরাজিত করিয়াছে, হনুমান, জাম্বুবান ও ঋক্ষসৈন্য দ্বারা পরিবৃত হইয়া যাও— তাহাকে বিনাশ করো। বিভীষণ তাহার অধিষ্ঠিত স্থানের সমস্ত অবগত আছেন, তিনিও তোমার অনুগমন করিবেন।

মূল রামায়ণে লক্ষ্মণের শক্তিশেল যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অনুবাদিত করিয়া নিম্নে উদ্‌ধৃত করা গেল—

ভুজগরাজের জিহ্বার ন্যায় প্রদীপ্ত শক্তি রাবণ দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়া মহাবেগে লক্ষ্মণের বক্ষে নিপতিত হইল। লক্ষ্মণ এই দূরপ্রবিষ্ট শক্তি দ্বারা ভিন্নহৃদয় হইয়া ভূতলে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। সন্নিহিত রাম তাঁহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ভ্রাতৃস্নেহে বিষণ্ণ হইলেন ও মুহূর্তকাল সাশ্রুনেত্রে চিন্তা করিয়া ক্রোধে যুগান্তবহ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। 'এখন বিষাদের সময় নয়' বলিয়া রাম রাবণ-বধার্থ পুনর্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ওই মহাবীর অনবরত শরবর্ষণপূর্বক রাবণকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন। শর-জালে আকাশ পূর্ণ হইল এবং রাবণ মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

অনন্তর রাম দেখিলেন, লক্ষ্মণ শক্তিবিদ্ধ হইয়া শোণিত-লিপ্ত-দেহে সসর্প-পর্বতের ন্যায় রণস্থলে পতিত আছেন। সুগ্রীব, অঙ্গদ ও হনুমান প্রভৃতি মহাবীরগণ লক্ষ্মণের বক্ষঃস্থল হইতে বহু যত্নেও রাবণ-নিক্ষিপ্ত-শক্তি আকর্ষণ করিতে পারিলেন না। পরে রাম ক্রুদ্ধ হইয়া দুই হস্তে ওই ভয়াবহ শক্তি গ্রহণ ও উৎপাটন করিলেন, শক্তি উৎপাটন-কালে রাবণ তাঁহার প্রতি অনবরত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু মহাবীর রাম তাহা লক্ষ না করিয়া লক্ষ্মণকে উত্থাপনপূর্বক হনুমান ও সুগ্রীবকে কহিলেন, দেখো, তোমরা লক্ষ্মণকে পরিবেষ্টনপূর্বক এই স্থানে থাকো এবং ইহাকে অপ্রমাদে রক্ষা করো। ইহা চিরপ্রার্থিত পরাক্রম প্রকাশের অবসর। ওই সেই পাপাত্মা রাবণ, বর্ষার মেঘের ন্যায় গর্জনকরত আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। হে সৈন্যগণ, আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করো, আজ জগৎ অরাবণ বা অরাম হইবে। তোমরা কিছুতে ভীত হইয়ো না। আমি সত্যই কহিতেছি এই দুরাত্মাকে নিহত করিয়া রাজ্যনাশ, বনবাস, দণ্ডকারণ্যে পর্যটন ও জানকীবিয়োগ এই-সমস্ত ঘোরতর দুঃখ ও নরক-তুল্য-ক্লেশ নিশ্চয় বিস্মৃত হইব। আমি যাহার জন্য এই কপিসৈন্য আহরণ করিয়াছি, যাহার জন্য সুগ্রীবকে রাজা করিয়াছি, যাহার জন্য সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিলাম, সেই পাপ আজ আমার দৃষ্টিপথে উপস্থিত, তাহাকে আজ আমি সংহার

করিব। এই পামর আজ দৃষ্টিবিষ ভীষণ সর্পের দৃষ্টিতে পড়িয়াছে, কিছুতেই ইহার নিস্তার নাই। সৈন্যগণ, এক্ষণে তোমরা শৈলশিখরে উপবিষ্ট হইয়া আমাদের এই তুমুল সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করো। আমি আজ এমন ভীষণ কার্য করিব যে, অদ্যকার যুদ্ধে গন্ধর্বেরা, কিন্নরেরা, দেবরাজ ইন্দ্র, চরাচর সমস্ত লোক, স্বর্গের সমস্ত দেবতারা রামের রামত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া যতকাল পৃথিবী রহিবে ততকাল তাহা ঘোষণা করিতে থাকিবে।

এই বলিয়া মহাবীর রাম মেঘ হইতে জলধারার ন্যায় শরাসন হইতে অনবরত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। উভয়পক্ষের নিক্ষিপ্ত শর গতিপথে সংঘর্ষপ্রাপ্ত হওয়াতে একটি তুমুলশব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল।

এই তো রামায়ণ হইতে লক্ষ্মণের পতনদৃষ্টে রামের অবস্থা বর্ণনা উদ্‌ধৃত করা গেল। এক্ষণে রামায়ণের অনুকরণ করিলে ভালো হইত কিনা, আমরা তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি না, পাঠকেরা তাহা বিচার করিবেন।

ভারতী
পৌষ ১২৮৪

রামের নিকট বিদায় লইয়া লক্ষ্মণ এবার যুদ্ধ করিতে যাইতেছেন, মায়ার প্রসাদে অদৃশ্য হইয়া লক্ষ্মণ লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিয়া—

হেরিলা সভয়ে বলী সর্বভুক্‌রূপী
বিরূপাক্ষ মহারক্ষঃ, প্রক্ষ্বেড়নধারী। ইত্যাদি।

কবি কাব্যের স্থানে স্থানে অযত্ন সহকারে, নিশ্চিন্তভাবে দুই-একটি কথা ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার ফল বড়ো ভালো হয় নাই। 'সভয়ে' কথাটি এখানে না ব্যবহার করিয়াও তিনি সমস্ত বর্ণনাটি সর্বাঙ্গসুন্দররূপে শেষ করিতে পারিতেন।

প্রবল পবন-বলে বলীন্দ্র পাবনি
হনু, অগ্রসরি শূর, দেখিলা সভয়ে
বীরাঙ্গনা মাঝে রঙ্গে প্রমীলা দানবী।

হনুমানের প্রমীলাকে দেখিয়া এত ভয় কেন হইল তাহা জানেন? হনুমান রাবণের প্রণয়িনীদের দেখিয়াছেন, 'রক্ষঃকুলবধূ ও রক্ষঃকুলবালাদের' দেখিয়াছেন, শোকাকুলা রঘুকুলকমলকে দেখিয়াছেন, 'কিন্তু এহেন রূপ-মাধুরী কভু এ ভুবনে' দেখেন নাই বলিয়াই এত সভয়! '—কুম্ভকর্ণ বলী ভাই মম, তায় আমি জাগানু অকালে ভয়ে।' যাহা হউক এরূপ সভয়ে, সত্রাসে, সজল নয়নে প্রভৃতি অনেক কথা কাব্যের অনেক স্থানে অযথারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এরূপ দুটি-একটি ক্ষুদ্র কথার ব্যবহার লইয়া এতটা আড়ম্বর করিতেছি কেন? তাহার অনেক কারণ আছে। তূলিকার একটি সামান্য স্পর্শ মাত্রেই চিত্রের অনেকটা এদিক-ওদিক হইয়া যায়। কবি লিখিবার সময় লক্ষ্মণের চিত্রটি সমগ্রভাবে মনের মধ্যে অঙ্কিত করিয়া লইতে পারেন নাই; নহিলে যে লক্ষ্মণ দর্শন-ভীষণ 'মূর্তি' মহাদেবকে দেখিয়া অস্ত্র উদ্যত করিয়াছিলেন, তিনি প্রক্ষ্বেড়নধারী বিরূপাক্ষ রাক্ষসের প্রতি সভয়ে দৃষ্টিপাত করিলেন কেন? 'সভয়ে' এই কথাটির ব্যবহারে আমরা লক্ষ্মণের ভয়গ্রস্ত মুখশ্রী স্পষ্ট দেখিতেছি, ইহাতে 'রঘুজ-অজ-অঙ্গজ' দশরথ-তনয় সৌমিত্রির প্রতি যে আমাদের ভক্তি বাড়িতেছে তাহা নহে।

ইহার পরে লক্ষ্মণের সহিত ইন্দ্রজিতের যে যুদ্ধবর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাতে যে লক্ষ্মণের নীচতা, কাপুরুষতা, অক্ষত্রোচিত ব্যবহার স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে— তাহা কে অস্বীকার করিবেন? কবি তাহা ভ্রমক্রমে করেন নাই, ইচ্ছাপূর্বক করিয়াছেন, তিনি একস্থলে ইন্দ্রজিতের মুখ দিয়াই কহিয়াছেন,

ক্ষুদ্রমতি নর, শূর, লক্ষ্মণ; নহিলে
অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে?
কহো মহারথি, একি মহারথী প্রথা?
নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে
এ কথা!

যদি ইচ্ছাপূর্বক করিয়া থাকেন, তবে কেন করিলেন? এ মহাকাব্যে কি মহান চরিত্র যথেষ্ট আছে? রাবণকে কি স্ত্রীলোক করা হয় নাই? ইন্দ্রকে কি ভীরু মনুষ্যরূপে চিত্রিত করা হয় নাই? এ কাব্যের রাম কি একটি কৃপাপাত্র বালক নহেন? তবে এ মহাকাব্যে এমন কে মহান চরিত্র আছেন, যাঁহার কাহিনী শুনিতে শুনিতে আমাদের হৃদয় স্তম্ভিত হয়, শরীর কণ্টকিত হয়, মন বিস্ফারিত হইয়া যায়। ইহাতে শয়তানের ন্যায় ভীষণ দুর্দম্য মন, ভীষ্মের ন্যায় উদার বীরত্ব, রামায়ণের লক্ষ্মণের ন্যায় উগ্র জ্বলন্ত মূর্তি, যুধিষ্ঠিরের ন্যায় মহান শান্তভাব, চিত্রিত হয় নাই। ইহাতে রাবণ প্রথম হইতেই পুত্রশোকে কাঁদিতেছেন, ইন্দ্র ইন্দ্রজিতের ভয়ে কাঁপিতেছেন, রাম বিভীষণের নিকট গিয়া ত্রাহি ত্রাহি করিতেছেন, ইহা দেখিয়া যে কাহার হৃদয় মহান ভাবে বিস্ফারিত হইয়া যায়, জানি না।

যখন ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণকে কহিলেন,

নিরস্ত্র যে অরি,
নহে রথীকুল প্রথা আঘাতিতে তারে।
এ বিধি, হে বীরবর, অবিদিত নহে,
ক্ষত্র তুমি, তব কাছে;— কী আর কহিব?

তখন

জলদপ্রতিমস্বনে কহিলা সৌমিত্রি,
'আনায় মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু
ছাড়ে রে কিরাত তারে? বধিব এখনি,
অবোধ তেমনি তোরে! জন্ম রক্ষঃকুলে
তোর, ক্ষত্রধর্ম, পাপি, কী হেতু পালিব,
তোর সঙ্গে? মারি অরি, পারি যে কৌশলে!'

এ কথা বলিবার জন্য জলদপ্রতিমস্বনের কোনো আবশ্যক ছিল না।

রামায়ণের লক্ষ্মণ একটি উদ্ধত উগ্র-যুবক, অন্যায় তাঁহার কোনোমতে সহ্য হয় না, তরবারির উপরে সর্বদাই তাঁহার হস্ত পড়িয়া আছে, মনে যাহা অন্যায় বুঝিবেন মুহূর্তে তাহার প্রতিবিধান করিতে প্রস্তুত আছেন, তাহার আর বিবেচনা করিবেন না, অগ্রপশ্চাৎ করিবেন না, তাহার ফল ভালো হইবে কি মন্দ হইবে তাহা জ্ঞান নাই, অন্যায় হইলে আর রক্ষা নাই। অল্পবয়স্ক বীরের উদ্ধত চঞ্চল হৃদয় রামায়ণে সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। যখন দশরথ রামকে বনে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন ও রামও তাহাতে সম্মত হইলেন, তখন লক্ষ্মণ যাহা কহিতেছেন তাহার কিয়দংশ উদ্‌ধৃত করিয়া দিলাম, ইহাতে পাঠকেরা কিয়ৎপরিমাণে রামায়ণে বর্ণিত লক্ষ্মণচরিত্র বুঝিতে পারিবেন।[১]

'রাম এইরূপ কহিলে মহাবীর লক্ষ্মণ সহসা দুঃখ ও হর্ষের মধ্যগত হইয়া অবনতমুখে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন এবং ললাটপট্টে ভ্রূকুটি বন্ধনপূর্বক বিলমধ্যস্থ ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রোধভরে ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার বদনমণ্ডল নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল এবং কুপিত সিংহের মুখের ন্যায় অতি ভীষণ বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর হস্তী যেমন

১. হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য -কৃত রামায়ণ হইতে উদ্‌ধৃত।

আপনার শুণ্ড বিক্ষেপ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তিনি হস্তাগ্র বিক্ষিপ্ত এবং নানাপ্রকার গ্রীবাভঙ্গি করিয়া বক্রভাবে কটাক্ষ নিক্ষেপপূর্বক কহিতে লাগিলেন, আর্য! ধর্মদোষ পরিহার এবং স্বদৃষ্টান্তে লোকদিগকে মর্যাদায় স্থাপন এই দুই কারণে বনগমনে আপনার যে আবেগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক।... আপনি অনায়াসেই দৈবকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, তবে কি নিমিত্ত একান্ত শোচনীয় অকিঞ্চিৎকর দৈবের প্রশংসা করিতেছেন?... বীর! এই জঘন্য ব্যাপার আমার কিছুতেই সহ্য হইতেছে না! এক্ষণে আমি মনের দুঃখে যাহা কিছু কহিতেছি, আপনি ক্ষমা করিবেন। আরও আপনি যে ধর্মের মর্ম অনুধাবন করিয়া মুগ্ধ হইতেছেন, যাহার প্রভাবে আপনার মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়াছে আমি সেই ধর্মকেই দ্বেষ করি। আপনি কর্মক্ষম, তবে কি কারণে সেই স্ত্রৈণ রাজার ঘৃণিত অধর্মপূর্ণ বাক্যের বশীভূত হইবেন? এই যে রাজ্যাভিষেকের বিঘ্ন উপস্থিত হইল, বরদান ছলই ইহার কারণ; কিন্তু আপনি যে তাহা স্বীকার করিতেছেন না, ইহাই আমার দুঃখ; ফলতঃ আপনার এই ধর্মবুদ্ধি নিতান্তই নিন্দনীয় সন্দেহ নাই।... তাঁহারা আপনার রাজ্যাভিষেকে বিঘ্নাচরণ করিলেন, আপনিও তাহা দৈবকৃত বিবেচনা করিতেছেন, অনুরোধ করি, এখনই এইরূপ দুর্বুদ্ধি পরিত্যাগ করুন, এই প্রকার দৈব কিছুতেই আমার প্রীতিকর হইতেছে না। যে ব্যক্তি নিস্তেজ, নির্বীর্য, সেইই দৈবের অনুসরণ করে, কিন্তু যাঁহারা বীর, লোকে যাঁহাদিগের বল-বিক্রমের শ্লাঘা করিয়া থাকে, তাঁহারা কদাচই দৈবের মুখাপেক্ষা করেন না। যিনি স্বীয় পৌরুষপ্রভাবে দৈবকে নিরস্ত করিতে সমর্থ হন, দৈববলে তাঁহার স্বার্থহানি হইলেও অবসন্ন হন না। আর্য! আজ লোকে দৈববল এবং পুরুষের পৌরুষ উভয়ই প্রত্যক্ষ করিবে। অদ্য দৈব ও পুরুষকার উভয়েরই বলাবল পরীক্ষা হইবে। যাহারা আপনার রাজ্যাভিষেক দৈবপ্রভাবে প্রতিহত দেখিয়াছে, আজ তাহারাই আমার পৌরুষের হস্তে তাহাকে পরাস্ত দেখিবে। আজ আমি উচ্ছৃঙ্খল দুর্দান্ত মদস্রাবী মত্ত কুঞ্জরের ন্যায় দৈবকে স্বীয় পরাক্রমে প্রতিনিবৃত্ত করিব। পিতা দশরথের কথা দূরে থাকুক, সমস্ত লোকপাল, অধিক কি ত্রিজগতের সমস্ত লোকও আপনার রাজ্যাভিষেকে ব্যাঘাত দিতে পারিবে না। যাহারা পরস্পর একবাক্য হইয়া আপনার অরণ্যবাস সিদ্ধান্ত করিয়াছে, আজ তাহাদিগকেই চতুর্দশ বৎসরের নিমিত্ত নির্বাসিত হইতে হইবে। আপনার অনিষ্ট সাধন করিয়া ভরতকে রাজ্য দিবার নিমিত্ত রাজা ও কৈকেয়ীর যে আশা উপস্থিত হইয়াছে, আজ আমি তাহাই দগ্ধ করিব। যে আমার বিরোধী, আমার দুর্বিষহ পৌরুষ যেমন তাহার দুঃখের কারণ হইবে, তদ্রূপ দৈববল কদাচই সুখের নিমিত্ত হইবেক না।

...প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমিই আপনকার রাজ্য রক্ষা করিব, নতুবা চরমে যেন আমার বীরলোক লাভ না হয়। তীরভূমি যেমন মহাসাগরকে রক্ষা করিতেছে, তদ্রূপ আমি আপনার রাজ্য রক্ষা করিব। এক্ষণে আপনি স্বয়ংই যত্নবান হইয়া মাঙ্গলিক দ্রব্যে অভিষিক্ত হউন। ভূপালগণ যদি কোনো প্রকার বিরোধাচরণ করেন, আমি একাকীই তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইব। আর্য! আমার যে এই ভুজদণ্ড দেখিতেছেন, ইহা কি শরীরের সৌন্দর্য সম্পাদনার্থ? যে কোদণ্ড দেখিতেছেন, ইহা কি কেবল শোভার্থ? এই খড়্গ কি কাষ্ঠবন্ধন, এই শরে কি কাষ্ঠভার অবতরণ করা হয়?— মনেও করিবেন না; এই চারিটি পদার্থ শত্রুবিনাশার্থই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক্ষণে বজ্রধারী ইন্দ্রই কেন আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হউন-না, বিদ্যুতের ন্যায় ভাস্বর তীক্ষ্মধার অসি দ্বারা তাঁহাকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব। হস্তীর শুণ্ড অশ্বের উরুদেশ এবং পদাতিক মস্তক আমার খড়্গে চূর্ণ হইয়া সমরাঙ্গন একান্ত গহন ও দুরবগাহ করিয়া তুলিবে। অদ্য বিপক্ষেরা আমার অসিধারায় ছিন্নমস্তক হইয়া শোণিতলিপ্ত দেহে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় বিদ্যুদ্দামশোভিত মেঘের ন্যায় রণক্ষেত্রে নিপতিত হইবে।... যে হস্ত চন্দন লেপন, অঙ্গদ ধারণ, ধন দান ও সুহৃদ্‌বর্গের প্রতিপালনের সম্যক উপযুক্ত, অদ্য সেই হস্ত আপনার অভিষেক-বিঘাতকদিগের নিবারণ বিষয়ে স্বীয় অনুরূপ কার্য সাধন করিবে। এক্ষণে আজ্ঞা করুন আপনার কোন্ শত্রুকে ধন প্রাণ ও সুহৃদ্‌গণ হইতে বিযুক্ত করিতে হইবে। আমি আপনার

চিরকিঙ্কর, আদেশ করুন, যেরূপে এই বসুমতী আপনার হস্তগত হয়, আমি তাহারই অনুষ্ঠান করিব।'

মূল রামায়ণে ইন্দ্রজিতের সহিত লক্ষ্মণের যেরূপ যুদ্ধবর্ণনা আছে তাহার কিয়দংশ আমরা পাঠকদিগের গোচরার্থে এইখানে অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

'তুমি এই স্থানে বয়স কাটাইয়াছ, তুমি আমার পিতার সাক্ষাৎ ভ্রাতা, সুতরাং পিতৃব্য হইয়া কীরূপে আমার অনিষ্ট করিতেছ? জ্ঞাতিত্ব ভ্রাতৃত্ব, জাতি ও সৌহার্দ্যও তোমার নিকট কিছুই নয়। তুমি ধর্মকেও উপেক্ষা করিতেছ। নির্বোধ! তুমি যখন স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছ তখন তুমি শোচনীয় এবং সাধুগণের নিন্দনীয়। আত্মীয়স্বজনের সহবাস ও অপর নীচ ব্যক্তির আশ্রয় এই দুইটির যে কত অন্তর তুমি বুদ্ধিশৈথিল্যে তাহা বুঝিতেছ না। পর যদি গুণবান হয় এবং স্বজন যদি নির্গুণও হয় তবুও নির্গুণ স্বজন শ্রেষ্ঠ, পর যে সে পরই। স্বজনের প্রতি তোমার যেরূপ নির্দয়তা, ইহাতে তুমি জনসমাজে প্রতিষ্ঠা ও সুখ কদাচই পাইবে না। আমার পিতা গৌরব বা প্রণয়বশতই হউক তোমাকে যেমন কঠোর ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন তেমনই তো আবার সান্ত্বনাও করিয়াছেন। গুরু লোক প্রীতিভরে অপ্রিয় কথা বলেন বটে কিন্তু অবিচারিত মনে আবার তো সমাদরও করিয়া থাকেন। দেখো, যে ব্যক্তি সুশীল মিত্রের বিনাশার্থ শত্রুর বৃদ্ধি কামনা করে ধান্যগুচ্ছের সন্নিহিত শ্যামাকের ন্যায় তাহাকে পরিত্যাগ করা উচিত।'

ইন্দ্রজিৎ বিভীষণকে এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া ক্রোধভরে লক্ষ্মণকে কটূক্তি করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর লক্ষ্মণ রোষাবিষ্ট হইয়া নির্ভয়ে কহিলেন, রে দুষ্ট! কথা মাত্রে কখনো কার্যের পারগামী হওয়া যায় না, যিনি কার্যত তাহা প্রদর্শন করিতে পারেন তিনিই বুদ্ধিমান। তুই নির্বোধ, কোন্ দুষ্কর কার্যে কতকগুলি নিরর্থক বাক্য ব্যয় করিয়া আপনাকে কৃতকার্য জ্ঞান করিতেছিস। তুই অন্তরালে থাকিয়া রণস্থলে আমাদিগকে ছলনা করিয়াছিস। কিন্তু দেখ, এই পথটি তস্করের, বীরের নয়। এক্ষণে আত্মশ্লাঘা করিয়া কী হইবে, যদি তুই সম্মুখযুদ্ধে তিষ্ঠিতে পারিস, তবেই আমরা তোর বলবীর্যের পরিচয় পাইব। আমি তোরে কঠোর কথা কহিব না, তিরস্কার কি আত্মশ্লাঘাও করিব না অথচ বধ করিব। দেখ, আমার কেমন বল বিক্রম। অগ্নি নীরবে সমস্ত দগ্ধ করিয়া থাকেন এবং সূর্য নীরবে উত্তাপ প্রদান করিয়া থাকেন। এই বলিয়া মহাবীর লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

ভারতী
ফাল্গুন ১২৮৪

স্যাক্‌সন জাতি ও অ্যাংলো স্যাক্‌সন সাহিত্য

এই প্রবন্ধে স্যাক্‌সন জাতির আচার ও ব্যবহার, ভাষা ও সাহিত্য বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যে ভিত্তির উপর আধুনিক ইংরাজি মহা-সাহিত্য স্থাপিত আছে সেই অ্যাংলো স্যাক্‌সন ভাষা ও সাহিত্য পরীক্ষা করিয়া দেখিতে এবং যে ভিত্তির উপর সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বরস্বরূপ ইংরাজ জাতি আদৌ স্থাপিত, সেই স্যাক্‌সনদের রীতিনীতি সমালোচনা করিয়া দেখিতে আজ আমরা প্রবৃত্ত হইলাম। কিডমন, বিউল্ফ্মাস, টেন প্রভৃতির সার সংগ্রহ করিয়া আজ আমরা পাঠকদিগকে উপহার দিতেছি।

রোমানেরা ব্রিটনে রাজ্য স্থাপন করিলে পর এক দল শেল্‌ট (celt) তাহাদের বশ্যতা স্বীকার না করিয়া ওয়েল্‌স ও হাইল্যান্ডের পার্বত্য প্রদেশে আশ্রয় লইল। যাহারা রোমকদের অধীন হইল তাহাদের মধ্যে রোমক সভ্যতা ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হইতে লাগিল। রোমকদের অধিকৃত দেশে

প্রশস্ত রাজপথ নির্মিত হইল, দৃঢ় প্রাচীরে নগরসমূহ বেষ্টিত হইল— বাণিজ্য ও কৃষির যথেষ্ট উন্নতি হইল— নর্দাম্বর্লন্ডের লৌহ, সমার্সেটের শীষক, কর্নওয়ালের টিন-খনি আবিষ্কৃত হইল। কিন্তু বাহিরে সভ্যতার চাকচিক্য যেমন বাড়িতে লাগিল, ভিতরে ভিতরে ব্রিটনের শোণিত ক্ষয় হইয়া আসিতে লাগিল। রোমকেরা তাহাদের সকল বিষয়ের স্বাধীনতা অপহরণ করিল— তাহাদিগকে বিদ্যা শিখাইল— উন্নততর ধর্মে দীক্ষিত করিল— সভ্যতা ও অসভ্যতার প্রভেদ দেখাইয়া দিল— কিন্তু কী করিয়া স্বদেশ শাসন করিতে হয় তাহা শিখাইল না। সুশাসনে থাকাতে জেতৃজাতির উপর তাহারা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিল— কখনো যে বিপদে পড়িতে হইবে সে কথা ভুলিয়া গেল, সুতরাং আত্মরক্ষণের ভাব অন্তর্হিত ও পরপ্রত্যাশার ভাব তাহাদের চরিত্রে বদ্ধমূল হইল। এইরূপ অস্বাস্থ্যকর সভ্যতা সে জাতির সর্বনাশ করিল। রোমকদের কর-ভারে নিপীড়িত হইয়াও তাহাদের একটি কথা বলিবার জো ছিল না। এক দল জমিদারের দল উত্থিত হইল— ও সেইসঙ্গে কৃষক দলের অধঃপতন হইল— কৃষকেরা জমিদারদের দাস হইয়া কাল যাপন করিতে লাগিল। এইরূপে রোমকদিগের অধিকৃত ব্রিটনেরা ভিতরে ভিতরে অসার হইয়া আসিল। রোমক-পুঁথি পড়িতে ও রোমক-ভাষায় কথা কহিতে শিখিয়াই তাহারা মনে করিল ভারি সভ্য হইয়া উঠিয়াছি ও স্বাধীন শেল্ট ও পিক্টদিগকে অসভ্য বলিয়া মনে মনে মহা ঘৃণা করিতে লাগিল। প্রায় চারি শতাব্দী ইহাদের এইরূপ মোহময় সুখ-নিদ্রায় নিদ্রিত রাখিয়া সহসা একদিন রোমকেরা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিল। গথেরা ইটালি আক্রমণ করিয়াছে, সুতরাং রোমকেরা নিজদেশ রক্ষা করিতে ব্রিটন ছাড়িয়া স্বদেশে চলিয়া গেল, আর ফিরিল না। অসভ্যতর শেল্ট, পিক্ট, স্কট প্রভৃতি সামুদ্রিক দস্যুগণ চারি দিক হইতে ঝাঁকিয়া পড়িল— তখন সেই অসহায় সভ্য জাতিগণ কাঁপিতে কাঁপিতে জর্মনি হইতে অর্থ দিয়া সৈন্য ভাড়া করিয়া আনিল। হেঞ্জেস্ট ও হর্সা তাহাদের সাহায্য করিতে সৈন্য লইয়া এবস্‌ফ্লিটে জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইল।

ইহারাই অ্যাঙ্গল্‌স্ (Angles)। ব্রিটনেরা এবং রোমকেরা ইহাদিগকে স্যাক্‌সন বলিত। ইহাদের ভাষার নাম Seo Englisce Spræc অর্থাৎ English Speech। হলান্ড হইতে ডেনমার্ক পর্যন্ত ওই যে সমুদ্র-সীমা দেখিতেছ, মেঘময়, কুজ্‌ঝটিকাচ্ছন্ন আর্দ্রভূমি বিস্তৃত রহিয়াছে— বহু শতাব্দী পূর্বে উহা নিবিড় অরণ্যে আবৃত ছিল, সেই আরণ্য ভূভাগ অ্যাঙ্গল্‌স্‌দের বাসস্থান ছিল। এমন কদর্য স্থান আর নাই। বৃষ্টি ঝটিকা মেঘে সেই দেশের মস্তকের উপর কী যেন অভিশাপের অন্ধকার বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। দিবারাত্রি উন্মত্ত জলধি তীরভূমি আক্রমণ করিতেছে— এই ক্ষুভিত সমুদ্রের মুখে কোনো জাহাজের সহজে নিস্তার নাই। এই সমুদ্রতীরে, তুষার কুজ্‌ঝটিকাচ্ছন্ন-ঝঞ্ঝাঝটিকা-ক্ষুব্ধ অন্ধকার অরণ্যে ও জলায় শোণিত-পিপাসু সামুদ্রিক দস্যুদল বাস করিত। এই মনুষ্যশিকারীরা জীবনকে তৃণ জ্ঞান করিত। সেই সময়কার রোমক কবি কহিয়াছেন, 'তাহারা আমাদের শত্রু; সমুদয় শত্রু অপেক্ষা হিংস্র, এবং যেমন হিংস্র তেমনি ধূর্ত। সমুদ্র তাহাদের যুদ্ধ-শিক্ষালয়, ঝটিকা তাহাদের বন্ধু; এই সমুদ্র-ব্যাঘ্রেরা পৃথিবী লুণ্ঠন করিবার জন্যই আছে।' তাহারা আপনারাই গাহিত, 'ঝটিকা-বেগ আমাদের দাঁড়ের সহায়তা করে— আকাশের নিশ্বাসস্বরূপ বজ্রের গর্জন আমাদের হানি করিতে পারে না— ঝঞ্ঝা আমাদের ভৃত্য— আমরা যেখানে যাইতে ইচ্ছা করি সে আমাদের সেইখানেই বহন করিয়া লইয়া যায়।' স্ত্রীলোক এবং দাসদের উপর ভূমি কর্ষণ ও পশুপালনের ভার দিয়া ইহারা সমুদ্র ভ্রমণ, যুদ্ধ ও দেশলুণ্ঠন করিতে যাইত। রক্তপাত করাই তাহারা মুক্ত স্বাধীন জাতির কার্য বলিয়া জানিত— স্বাধীনতা ও মুক্ত ভাবের ইহাই তাহাদের আদর্শ ছিল। নরহত্যা ও রক্তপাত তাহাদের ব্যবসায়, ব্যবসায় কেন, তাই তাহাদের আমোদ ছিল। Ragnar Lodbrog নামক গাথক গাহিতেছে—'অসি দিয়া আমরা তাহাদিগকে কাটিয়া ফেলিলাম;— আমার সুন্দরী পত্নীকে যখন প্রথম আমার পার্শ্বে শয্যায় বসাইলাম তখন আমার যেরূপ আমোদ হইয়াছিল, সেই সময়েও কি আমার তেমনি আমোদ হয় নাই?' যখন এজিল (Egil) ডেনমার্কবাসী জার্লের কন্যার পার্শ্বে উপবেশন করিল, তখন সেই

কন্যা তাঁহাকে 'তিনি কখনো নেকড়িয়া বাঘদিগকে গরম গরম মনুষ্য মাংস খাইতে দেন নাই ও সমস্ত শরৎকালের মধ্যে মৃতদেহের উপর কাক উড়িতে দেখেন নাই' বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়া দূরে ঠেলিয়া দিল। তখন এজিল এই বলিয়া তাহাকে শান্ত করে 'আমি রক্তাক্ত অসি হস্তে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছি, নর-দেহ-লোলুপ কাকেরা আমার অনুসরণ করিয়াছে। দারুণ যুদ্ধ করিয়াছি এবং মনুষ্য আলয়ের উপর দিয়া অগ্নি চলিয়া গিয়াছে। যাহারা দ্বার রক্ষা করিতে নিযুক্ত ছিল, তাহাদিগকে রক্তের উপর ঘুম পাড়াইয়াছি।' তখনকার কুমারীদের সহিত এইরূপ কথোপকথন চলিত। ইহাদের গ্রামবাসীদের সম্বন্ধে ট্যাসিটস্ বলেন যে ইহারা সকলেই পৃথক পৃথক আপনার আপনার লইয়াই থাকে। এমন বিজনতা ও স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় জাতি আর নাই। প্রত্যেক গ্রামবাসী যেমন আপনার ভূমিটুকু লইয়া স্বতন্ত্র থাকে তেমনি আবার প্রত্যেক গ্রাম অন্য গ্রামের সহিত স্বতন্ত্র থাকিতে চায়। প্রত্যেক গ্রাম চারি ধারে অরণ্য বা পোড়োভূমির দ্বারা ঘেরা থাকে— সে ভূমি কোনো বিশেষ ব্যক্তির অধিকারভুক্ত নহে— সেইখানে দোষী ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড হইত— এবং সেইখানে সকল-প্রকার উপদেবতার আবাস বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল। যখন কোনো নূতন ব্যক্তি সেই অরণ্য বা পোড়োভূমির মধ্যে আসিত তখন তাহাকে শৃঙ্গ বাজাইয়া আসিতে হইত। নিঃশব্দে আসিলে শত্রুজ্ঞান করিয়া যার ইচ্ছা সেই বধ করিতে পারিত। ইহাদের সকলেরই প্রায় একটু একটু ভূমি থাকিত, এবং যাহাদের এইরূপ ভূমি থাকিত তাহাদের নাম কার্ল (churl) (মনুষ্য) ছিল। তাহাদিগকে Freenecked man (মুক্তস্কন্ধ মনুষ্য) কহিত— অর্থাৎ তাহাদের কোনো প্রভুর নিকট স্কন্ধ নত করিতে হইত না। তাহাদের আর-এক নাম ছিল 'শস্ত্রধারী' অর্থাৎ তাহাদেরই অস্ত্রবহন করিবার অধিকার ছিল। প্রথমে ইহাদের মধ্যে বিচারপ্রণালী ছিল না— প্রত্যেক মনুষ্য আপনার আপনার প্রতিহিংসা সাধন করিত। ক্রমে ন্যায় ও বিচার প্রচলিত হইল। তখনকার অপরিস্ফুট দণ্ডনীতি বলেন— চোখের বদলে চোখ, প্রাণের বদলে প্রাণ দাও, কিংবা তার উপযুক্ত মূল্য দাও। যাহার যে অঙ্গ তুমি নষ্ট করিবে, তোমার নিজের সেই অঙ্গ দান করিতে হইবে, কিংবা তাহার উপযুক্ত মূল্য দিতে হইবে। এ মূল্য যে দোষী ব্যক্তিই দিবে তাহা নহে, দোষী ব্যক্তির পরিবার আহত ব্যক্তির পরিবারকে দিবে। প্রত্যেক কুটুম্ব তাঁহার অন্য কুটুম্বের রক্ষক, একজনের জন্য সকলে দায়ী, ও একজনের উপর আর কেহ অন্যায়াচরণ করিলে সকলে তাহার প্রতিবিধান করিবেন। ইহাদের মধ্যে বিশেষ পুরোহিত কেহ ছিল না— প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার আপনার পুরোহিত।

নিপীড়িত ব্রিটিশ জাতীয়েরা এই অ্যাঙ্গল্স্ সৈন্যদিগকে অর্থ দিয়া ভাড়া করিয়া আনিল। কিন্তু দেখিতে দেখিতে ঝাঁকে ঝাঁকে অ্যাঙ্গল্স্রা ব্রিটনে আসিয়া পড়িল। ব্রিটিশদিগের এত টাকা ও খাদ্য দিবার সামর্থ্য ছিল না, সুতরাং অবশেষে তাহাদেরই সহিত যুদ্ধ বাধিয়া গেল। দারুণ হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইল— ধনীগণ সমুদ্রপাড়ে পলায়ন করিল। দরিদ্র অধিবাসীরা পার্বত্য প্রদেশে লুকাইয়া রহিল, কিন্তু আহারাভাবে সেখানে অধিক দিন থাকিতে না পারিয়া বাহির হইয়া পড়িত, অমনি নিষ্ঠুর স্যাক্সনদের তরবারি-ধারে নিপতিত হইত। দরিদ্র কৃষকেরা গির্জায় গিয়া আশ্রয় লইত— কিন্তু গির্জার উপরেই স্যাক্সনদের সর্বাপেক্ষা অধিক ক্রোধ ছিল। গির্জায় আগুন ধরাইয়া দিয়া আচার্যদিগকে বধ করিয়া একাকার করিত, কৃষক বেচারীরা আগুন হইতে পলাইয়া আসিয়া স্যাক্সনদের তরবারিতে নিহত হইত। ফ্র্যাঙ্ক জাতিরা গল্ অধিকার করিলে ও লম্বর্ডিগণ ইটালি অধিকার করিলে জেতারাই সভ্যতর জিত জাতিদের মধ্যে লোপ পাইয়া যায়, কিন্তু ইংলণ্ডে ঠিক তাহার বিপরীত হয়— স্যাক্সনেরা একেবারে ব্রিটন জাতিকে ধ্বংস করিয়া ফেলে। দুই শতাব্দী ক্রমাগত যুদ্ধ ও ক্রমাগত হত্যা করিয়া স্যাক্সনেরা ব্রিটনের আদিম অধিবাসীদের বিলোপ করিয়া দেয়। তখন ইংলন্ড তাহাদেরই দেশ হইল। অল্পস্বল্প দুই-একটি ব্রিটন যাহারা অবশিষ্ট ছিল তাহারা কেহ কেহ স্যাক্সন প্রভুর দাস হইয়া রহিল, কেহ কেহ বা ওয়েলস্ ও হাইলন্ডের দুর্গম প্রদেশে পলাইয়া গেল। এখনো শেল্টিক ভাষা-প্রসূত একপ্রকার ভাষা ওয়েলসে

চলিত আছে।[১] ইংরাজি ভাষায় শেল্‌টিক উপাদান খুব অল্পই পাইবে। নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কেবল কেল্‌টিক বা শেল্‌টিক কথা ইংরাজি ভাষায় প্রচলিত ছিল।

রোমকেরা যখন ইংলন্ড বিজয় করিয়াছিলেন তখন অধিকৃত জাতিদিগের রাজভাষা লাটিন ছিল। কিন্তু অ্যাংলো স্যাক্‌সন ভাষায় তখনো লাটিনের কোনো চিহ্ন পড়ে নাই। ইংলন্ডের কতকগুলি দেশের নাম কেবল রোমীয় ধাতু হইতে উৎপন্ন হয়। তাহা ব্যতীত দু-একটি অন্য কথাও রোমীয় ধাতু হইতে প্রসূত হইয়াছিল, যেমন Cheese পনির কথা লাটিন Casens হইতে উৎপন্ন। স্যাক্‌সন munt (পর্বত) কথা বোধ হয় লাটিন mons হইতে গৃহীত হইয়াছে। পর্বত হইতে নৈসর্গিক পদার্থের নামও যে অন্য ভাষা হইতে গৃহীত হইবে, ইহা কতকটা অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু জর্মান সমুদ্রের তীরে বা তাহার নিকটে একটিও পর্বত নাই, সুতরাং সে দেশবাসীরা যে পর্বতের নাম না জানিবে তাহাতে আশ্চর্য নাই।

জর্মান জাতিরা যখন স্পেন গল্‌ ও ইতালি জয় করিয়াছিল তখনো সে দেশের ধর্ম, সামাজিক আচার-ব্যবহার ও শাসনপ্রণালীর পরিবর্তন হয় নাই। কিন্তু জর্মান জাতিরা ব্রিটন দ্বীপ যেরূপ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিল এমন আর কোনো দেশ পারে নাই। রোমীয় সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের উপর সম্পূর্ণরূপে জর্মান সমাজ নির্মিত হইল। ব্রিটিশ আচার-ব্যবহার, ইতালির সভ্যতা, সমস্ত ধ্বংস হইয়া গেল, এবং এই সমতলীকৃত ভূমির উপর আর-একপ্রকার নূতনতর ও উন্নততর সভ্যতার বীজ রোপিত হইল।

যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে স্যাক্‌সনদের রাজার প্রয়োজন হইল। পূর্বে তাহাদের রাজা ছিল না। যখন কোথাও যুদ্ধ করিতে যাইত তখন একজনকে প্রধান বলিয়া লইয়া যাইত মাত্র। কিন্তু একটা দেশ অধিকার করিয়া রাখিতে হইলে ও ক্রমাগত তদ্দেশবাসীদের সহিত যুদ্ধবিগ্রহ বাধিলে রাজা নহিলে চলে না। হেঞ্জেস্টের উত্তরাধিকারীরা কেল্‌টের রাজা হইল। এই-সকল যুদ্ধে স্যাক্‌সন জাতিদের মধ্যে দাস-সংখ্যা বাড়িয়া উঠিল। যুদ্ধে বন্দী হইলে উচ্চ শ্রেণীস্থদিগকে দাস হইতে হইত, এবং মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইবার জন্যও দাসত্ব অনেকে আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিত। ঋণ শুধিতে না পারিয়া অনেককে উত্তমর্ণের দাস হইতে বাধ্য হইতে হইত। বিচারে অপরাধী ব্যক্তির পরিবারেরা জরিমানা দিতে না পারিলে সে দোষী ব্যক্তিকে দাসত্ব ভোগ করিতে হইত। এইরূপে স্যাক্‌সনদের মধ্যে একটা দাসজাতি উত্থিত হইল। দাসের পুত্র দাস হইত ইহা হইতেই এই ইংরাজি প্রবাদ উৎপন্ন হয় যে, আমার গোরুর বাছুর আমারই সম্পত্তি। দাস পলাইয়া গেলে পর ধরিতে পারিলে তাহাকে চাবুক মারিয়া খুন করিত বা স্ত্রীলোক হইলে তাহাকে দগ্ধ করিয়া মারিত। যখন ব্রিটনদের সহিত যুদ্ধ কতকটা ক্ষান্ত হইল, তখন তাহাদের আপনাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিল। নর্দাম্বরলন্ডের রাজা ইয়ল্‌ফ্রিথ্‌ অন্যান্য অনেক ইংলিশ রাজ্য জয় করিলেন। কেবল কেন্টের রাজা ইথল্‌বার্ট তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ইয়ল্‌ফ্রিথের অকস্মাৎ মৃত্যুতে এই দুই রাজ্যের মধ্যে তেমন বিবাদ বাধিতে পারে নাই। এই সময়ে খৃস্টান ধর্ম ধীরে ধীরে ইংলন্ডে প্রবেশ করিল। প্যারিসের খৃস্টান রাজকন্যা বাক্‌টার সহিত ইথল্‌বার্টের বিবাহ হইল। রাজ্ঞীর সহিত একজন খৃস্টান পুরোহিত কেন্টের রাজধানীতে আসিল। এই বিবাহ-বার্তা শ্রবণে সাহস পাইয়া পোপ গ্রেগরি সেন্ট অগস্টিনকে ইংলন্ডে খৃস্টান ধর্ম প্রচার করিতে পাঠাইয়া দিলেন। কেন্টের অধিপতি তাহাদের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিলেন ও কহিলেন 'তোমাদের কথাগুলি বেশ, কিন্তু নূতন ও

---

১. যে জাতিরা অ্যাংলো স্যাক্‌সন দলভুক্ত নয়, অথচ অ্যাংলো স্যাক্‌সনদের দেশের সীমায় বাস করিত, তাহাদিগকে স্যাক্‌সনেরা Wealhas বলিত, ইহা হইতে Wales নামের উৎপত্তি। এই কারণবশত ইটালির জর্মান নাম Welschland। ওই কারণেই আরও অনেক দেশকে জর্মনেরা Welsh, walloon, wallachia নামে অভিহিত করিয়া থাকে।

সন্দেহজনক।' তিনি নিজে স্বধর্ম পরিত্যাগ করিতে চাহিলেন না, কিন্তু খৃস্টানদিগকে আশ্রয় দিতে স্বীকার করিলেন। প্রচলিত ধর্মের সহিত অনেক যুঝাযুঝির পর খৃস্টান ধর্ম ইংলন্ডে স্থান পাইল।

ইংলন্ড-বিজেতাদের যে সকলেরই এক ভাষা ও এক জাতি ছিল তাহা নহে। এই খৃস্টান ধর্ম প্রবেশ করিয়া তাহাদের ভাষা ও জাতি অনেকটা এক করিয়া দিল। এই ভাষার ঐক্য সাহিত্যের অল্প উন্নতির কারণ নহে। খৃস্টধর্ম প্রবেশ করিবার পূর্বে অক্ষরে লিখা প্রচলিত ছিল না। খৃস্টধর্ম প্রবেশ করিলে পর স্যাক্সনেরা নব উদ্যমে উদ্দীপ্ত হইল ও তাহাদের হৃদয়ের উৎস উন্মুক্ত হইয়া সংগীত-স্রোতে অ্যাংলো স্যাক্সন সাহিত্য পূর্ণ করিল। খৃস্টধর্ম প্রচার হওয়াতে স্যাক্সনদের মধ্যে রোমীয় সাহিত্য চর্চার আরম্ভ হইল ও বাইবেলের কবিতার উচ্চ আদর্শ স্যাক্সনেরা প্রাপ্ত হইল। যুদ্ধোন্মাদে মত্ত থাকিয়া যে জাতি বিদ্যার দিকে মনোযোগ করিতে পারে নাই, খৃস্টীয় ধর্মের সহিত শান্তি ও ঐক্যে অভিষিক্ত হইয়া সম্মুখে যে ইতালীয় বিদ্যার খনি পাইল তাহাতেই তাহারা মনের সমুদয় উদ্যম নিয়োগ করিল। খৃস্টধর্ম প্রচারের সহায়তা করিবার জন্য তাহারা অ্যাংলো স্যাক্সন ভাষায় বাইবেল ও অন্যান্য লাটিন ধর্মপুস্তক অনুবাদ করিতে লাগিল। ইহাতে যে ভাষার ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হইবে তাহাতে আশ্চর্য কী? অ্যাংলো স্যাক্সন ভাষায় লিখিত অধিক প্রাচীন পুস্তক পাওয়া যায় না। অ্যালফ্রেডের সময়েই প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত ভাষা Bec ledene (Book language) অর্থাৎ লিখিত ভাষা হইল। প্রাচীনতর পুস্তক যাহা-কিছু পাওয়া যায়, তাহা খৃস্টান ধর্মপ্রচারের পরে অক্ষরে লিখিত হইয়াছে। প্রাচীনতম অ্যাংলো স্যাক্সন কাব্যের মধ্যে Lay of Beowulf প্রধান। ইহা কোন্ সময়ে যে রচিত হইয়াছিল তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। অনেকে অনুমান করেন খৃস্টান ধর্ম প্রচলিত হইবার পূর্বে ইহা রচিত হইয়া থাকিবে। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবিতা অ্যাংলো স্যাক্সন ভাষায় পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু ইহার ধরন, ভাব অন্যান্য অ্যাংলো স্যাক্সন কবিতার সহিত এত বিভিন্ন যে, এই গীতি সাধারণ স্যাক্সন প্রতিভা হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনে হয় না। স্কান্দিনেবীয় পৌরাণিক কবিতার সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে। গল্পটির সারমর্ম এই, ডহাম গ্রেন্ডেল বলিয়া এক রাক্ষস ছিল, সে নিকটস্থ জলার মধ্য হইতে বাহির হইয়া রাত্রে গুপ্তভাবে তথাকার রাজবাটির মধ্যে প্রবেশ করিত ও গৃহস্থিত ঘুমন্ত যোদ্ধাদের বিনষ্ট করিত; কেহ কেহ বলেন এই রাক্ষস জলার অস্বাস্থ্যজনক বাষ্পের রূপক মাত্র। বোউল্‌ফ নৃপতি তথায় গিয়া সেই রাক্ষসকে আহত ও নিহত করেন। তিনি ফেনগ্রীব (Foamy necked) জাহাজে চড়িয়া কিরূপে বিদেশীয় রাজসভায় আইলেন এবং তাঁহার অন্যান্য কীর্তি ইহাতে স্কান্দিনেবীয় সাগার ধরনে লিখিত। বোউল্‌ফ এক মহাবীর পুরুষ। 'তিনি উন্মুক্ত অসি দৃঢ় হস্তে ধরিয়া ঘোরতর তরঙ্গে ও শীতলতম ঝঞ্ঝায় সমুদ্র পর্যটন করিয়াছেন, ও তাঁহার চারি দিকে শীতের তীব্রতা সমুদ্রের ঊর্মির সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন।' কিন্তু তিনি তাহাদিগের কুঠারবিদ্ধ করিলেন। নয় জন সিন্ধুদৈত্য (NICOR) বিনাশ করিলেন। বৃদ্ধ রাজা হ্রথগার (Hrothgar)-কে গ্রেন্ডেল (Grendel) দৈত্যহস্ত হইতে নিস্তার করিবার জন্য অস্ত্রাদি কিছু না লইয়াই আসিলেন। আপনার শক্তির উপর নির্ভর করিয়া তিনি প্রাসাদে শুইয়া আছেন—'নিশীথের অন্ধকার উত্থিত হইল, ওই গ্রেন্ডেল আসিতেছে, সকলে দ্বার খুলিয়া ফেলিল'—একজন ঘুমন্ত যোদ্ধাকে ধরিল, 'তাহার অজ্ঞাতসারে তাহাকে ছিঁড়িয়া ফেলিল, তাহাকে দংশন করিল, তাহার শিরা হইতে রক্তপান করিল, ও তাহাকে ক্রমাগত ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইয়া ফেলিল।' এমন সময়ে বোউল্‌ফ উঠিলেন, দৈত্যকে আক্রমণ করিলেন। 'প্রাসাদ কম্পিত হইল ... উভয়েই উন্মত্ত। গৃহ ধ্বনিত হইল, আশ্চর্য এই যে, যে মদ্যশালা এই সংগ্রামশ্বাপদদিগকে বহন করিয়া ছিল, সে সুন্দর প্রাসাদ ভাঙিয়া পড়ে নাই। শব্দ উত্থিত হইল, তাহা নূতন প্রকারের। যখন নর্থ ডেনমার্কবাসীরা আপনাদের গৃহভিত্তির মধ্যে থাকিয়া শুনিল যে সেই ঈশ্বর-দ্বেষী আপন ভীষণ পরাজয়-সংগীত গাহিতেছে, আঘাত-যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতেছে, তখন একপ্রকার ভয়ে

তাহারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। ...সেই ঘৃণ্য হতভাগ্যের মৃত্যু-আঘাত পাইতে এখনো বাকি আছে— অবশেষে সে স্কন্ধে ভীষণ আঘাত পাইল— তাহার মাংসপেশীসমূহ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল— অস্থির সন্ধিমূল বিভিন্ন হইল। সমরে বোউল্‌ফের জয় হইল।' বিচ্ছিন্ন হস্ত-পদ গ্রেন্ডেল হ্রদে গিয়া লুকাইল। 'সেই হ্রদের তরঙ্গ তাহার রক্তে ফুটিতে লাগিল। হ্রদের জল তাহার শোণিতের সহিত মিশিয়া উষ্ণ হইয়া উঠিল। রক্ত-বিবর্ণ জলে শোণিতের বুদ্‌বুদ উঠিতে লাগিল।' সেইখানেই তাহার মৃত্যু হইল। কিন্তু গ্রেন্ডেলের মাতা, তাহার পুত্রের মতো যাহার 'অতি শীতল সলিলের ভীষণ স্থানে বাস নির্দিষ্ট ছিল' সে একদিন রাত্রে আসিয়া আর-একজন যোদ্ধাকে বিনাশ করিল। বোউল্‌ফ্ পুনরায় তাহাকে বধ করিতে চলিলেন। একটি পর্বতের নিকট এক ভীষণ গহ্বর ছিল— সে গহ্বর নেকড়িয়া ব্যাঘ্রদের আবাস স্থান। পর্বতের অন্ধকারে ভূমির নিম্ন দিয়া এক নদী বহিয়া যাইতেছে। বৃক্ষসমূহ শিকড় দিয়া সেই নদী আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। রাত্রে সেখানে গেলে দেখা যায় সে স্রোতের উপর আগুন জ্বলিতেছে। সে অরণ্যে কেহ নেকড়িয়া ব্যাঘ্র দ্বারা আক্রান্ত হইলে বরং তীরে দাঁড়াইয়া মরিয়া যাইবে তবুও সে স্রোতে লুকাইতে সাহস পাইবে না। অদ্ভুতাকৃতি পিশাচ (Dragon) ও সর্পসমূহ সেই স্রোতে ভাসিতেছে। বোউল্‌ফ সেই তরঙ্গে ডুব দিলেন; বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সেই রাক্ষসীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। সে তাঁহাকে মুষ্টিতে বদ্ধ করিয়া তাহার আবাস স্থানে লইয়া গেল। সেখানে এক বিবর্ণ আলোক জ্বলিতেছিল। সেই আলোকে সম্মুখাসম্মুখি দাঁড়াইয়া বীর সেই পাতালের বাঘিনী মহাশক্তি নাগিনীকে দেখিলেন। অবশেষে তাহাকে বধ করিলেন। তাঁহার মৃত্যু-ঘটনা নিম্নলিখিতরূপে কথিত আছে : পঞ্চাশ বৎসর তিনি রাজত্ব করিলে পর এক ড্র্যাগন (Dragon) আসিয়া 'অগ্নি-তরঙ্গে' মনুষ্য ও গৃহ নষ্ট করিতে লাগিল। বোউল্‌ফ এক লৌহ-চর্ম নির্মাণ করিলেন। এবং তাহাই পরিধান করিয়া একাকী যুদ্ধ করিতে গেলেন। 'নৃপতির এমন উদ্ধত গর্ব ছিল যে, সেই পক্ষবান রাক্ষসের সহিত যুদ্ধে অধিক সঙ্গী ও সৈন্য লইয়া যাইতে চাহিলেন না।' কিন্তু তথাপি কেমন বিষণ্ণ হইয়া অনিচ্ছার সহিত গেলেন, কেননা এইবার তাঁহার অদৃষ্টে মৃত্যু আছে। সেই রাক্ষস অগ্নি উদ্‌গার করিতে লাগিল। তাহার শরীরে অস্ত্র বিদ্ধ হইল না। রাজা সেই অগ্নির মধ্যে পতিত হইয়া অতিশয় যন্ত্রণা পাইতে লাগিলেন। উইগ্‌লাফ ব্যতীত তাঁহার অন্য সমস্ত সহচর বনে পলায়ন করিল। উইগ্‌লাফ অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিল, এবং তাহাদের উভয়ের খড়্গাঘাতে সেই ড্র্যাগন বিচ্ছিন্ন-শরীর ও বিনষ্ট হইল। কিন্তু রাজার ক্ষতস্থান ফুলিয়া উঠিল ও জ্বলিতে লাগিল, 'তিনি দেখিলেন তাঁহার বক্ষের মধ্যে বিষ ফুটিতেছে।' তিনি মৃত্যুকালে বলিলেন, 'পঞ্চাশ বৎসর আমি এই-সকল প্রজাদিগকে পালন করিয়াছি। এমন কোনো রাজা ছিল না যে আমাকে ভয় দেখাইতে বা আমার নিকট সৈন্য পাঠাইতে সাহস করিত। আমার যাহা-কিছু ছিল তাহা ভালোরূপ রক্ষা করিয়াছি, কোনো বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই, অন্যায় শপথ করি নাই। যদিও আমি মৃত্যু-আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছি, এই-সকল কারণে তথাপি আমার আনন্দ হইতেছে। প্রিয় উইগ্‌লাফ! এখনি যাও, ওই শ্বেত-প্রস্তর-শালা (দৈত্যের আবাস) অনুসন্ধান করিয়া দেখো, গুপ্তধন পাইবে। আমার জীবন দিয়া ধনরাশি ক্রয় করিয়াছি, উহা আমার প্রজাদের অভাবের সময় কাজে লাগিবে। আমার মৃত্যুর পূর্বে আমার প্রজাদের জন্য এই যে ধন পাইয়াছি ইহার নিমিত্ত দেবতার নিকট ঋণী রহিলাম।' এই কাব্যের কবিতা যতই অসম্পূর্ণ হউক, ইহার নায়ক যে অতি মহান তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইঁহার চরিত্রে প্রতিপদে পৌরুষ প্রকাশ পাইতেছে। পরের উপকারের জন্য নিজের প্রাণ দিতে ইনি কখনো সংকুচিত হন নাই। সেই সময়কার সমাজের অসভ্য অবস্থায় এরূপ চরিত্র যে চিত্রিত হইতে পারিবে ইহা একপ্রকার অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়।

অ্যাংলো স্যাক্‌সন কবিতা হৃদয়ের কথা মাত্র, আর কিছুই নহে। ইহাতে চিন্তার কোনো সংস্রব নাই। ইহার কবিতা কতকগুলি ভাঙা ভাঙা কথার সমষ্টিমাত্র— ছন্দও তেমনি ভাঙা ভাঙা, ঠিক যেন হৃদয়ের পূর্ণ উচ্ছ্বাসের সময় সকল কথা ভালো করিয়া বাহির হইতেছে না। 'সৈন্যদল

যাইতেছে, পাখিরা গাইতেছে, ঝিল্লিরব হইতেছে, যুদ্ধাস্ত্রের শব্দ উঠিতেছে— বর্মের উপর বর্শাঘাতের ধ্বনি হইতেছে। ওই উজ্জ্বল চন্দ্র আকাশের তলে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ভয়ানক দৃশ্যসকল দৃষ্টিগোচর হইল।... প্রাঙ্গণে যুদ্ধ-কোলাহল উত্থিত হইল। তাহারা কাষ্ঠের ঢাল হস্তে ধারণ করিল। তাহারা মস্তকের অস্থিভেদ করিয়া অস্ত্র বিদ্ধ করিল। দুর্গের ছাদ প্রতিধ্বনিত হইল।... অন্ধকারবর্ণ অশুভদর্শন কাকেরা চারি দিকে উইলোপত্রের ন্যায় উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল।'

অ্যাংলো স্যাক্সন কবিতায় প্রেমের কথা নাই বলিলেও হয়; কিন্তু বন্ধুত্ব ও প্রভুপ্রীতির সুন্দর বর্ণনা আছে। 'বৃদ্ধ রাজা তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ অনুচরকে আলিঙ্গন করিলেন— দুই হস্তে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন, বৃদ্ধ অধিপতির কপোল বাহিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইল, সে বীর তাঁহার এত প্রিয় ছিল। তাঁহার হৃদয় হইতে যে অশ্রুধারা উত্থিত হইল তাহা নিবারণ করিলেন না! হৃদয়ে মর্মের গভীর তন্ত্রীতে তাঁহার প্রিয় বীরের জন্য গোপনে নিশ্বাস ফেলিলেন।'

কোনো দেশান্তরিত ব্যক্তি তাহার প্রভুকে স্বপ্নে দেখিতেছে— যেন তাঁহাকে আলিঙ্গন, চুম্বন করিতেছে, যেন তাঁহার ক্রোড়ে মাথা রাখিতেছে। অবশেষে যখন জাগিয়া উঠিল, যখন দেখিল সে একাকী, যখন দেখিল সম্মুখে জনশূন্য প্রদেশ বিস্তীর্ণ, সামুদ্রিক পক্ষীরা পক্ষবিস্তার করিয়া তরঙ্গে ডুব দিতেছে, বরফ পড়িতেছে, তুষার জমিতেছে, শিলাবৃষ্টি হইতেছে, তখন সে কহিয়া উঠিল—

'কতদিন আনন্দের সহিত আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, মৃত্যু ভিন্ন আর কিছুতেই আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না, অবশেষে তাহা মিথ্যা হইল, যেন আমাদের মধ্যে কখনো বন্ধুত্ব ছিল না। কষ্ট দিবার জন্য মানুষেরা আমাকে এই অরণ্যে এক ওক্ বৃক্ষের তলে এই গহ্বরে বাস করিতে দিয়াছে। এই মৃত্তিকার নিবাস অতি শীতল, আমি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। গহ্বরসকল অন্ধকার, পর্বতসকল উচ্চ, কণ্টকময় শাখা-প্রশাখার নগর, এ কী নিরানন্দ আলয়!... আমার বন্ধুরা এখন ভূগর্ভে— যাহাদের ভালোবাসিতাম, এখন কবর তাহাদিগকে ধারণ করিতেছে। কবর তাহাদের রক্ষা করিতেছে— আর আমি একাকী ভ্রমিয়া বেড়াইতেছি। এই ওক্ বৃক্ষতলে এই গহ্বরে এই দীর্ঘ গ্রীষ্মকালে আমাকে বসিয়া থাকিতে হইবে।'

অ্যাংলো স্যাক্সন কবিতার ছন্দ বড়ো অদ্ভুত। ইহার মিল নাই বা অন্য কোনো নিয়ম নাই, কেবল প্রত্যেক দ্বিতীয় ছত্রে দুই-তিনটি এমন কথা থাকিবে যাহার প্রথম অক্ষর এক, যেমন—

Ne wæs her tha giet, nym the heolstirsceado
Wiht geworden ; ac thes wida grund
Stood deop and dim, drihtne fremde.
Idel and unnyt.

অ্যাংলো স্যাক্সন খৃস্টান কবিদিগের মধ্যে প্রধান ও প্রথম, কিডমন (Cædmon)। অনেক বয়স পর্যন্ত কিডমন কবিতা রচনা করিতে পারিতেন না। একদিন এক নিমন্ত্রণ সভায় সকলে বীণা লইয়া পর্যায়ক্রমে গান গাইতেছিল, কিডমন যেই দেখিলেন, তাঁহার কাছে বীণা আসিতেছে, অমনি আস্তে আস্তে সভা হইতে উঠিলেন এবং বাড়ি প্রস্থান করিলেন। একদিন রাত্রে এক অশ্বশালায় চৌকি দিতে দিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, স্বপ্ন দেখিলেন একজন কে যেন আসিয়া তাঁহাকে কহিতেছে, 'কিডমন, আমাকে একটা গান শুনাও!' কিডমন কহিলেন, 'আমি যে গাইতে পারি না।' সে কহিল, 'তাহা হউক, তুমি গাহিতে পারিবে।' কিডমন কহিলেন, 'কী গান গাইব।' সে কহিল, 'সৃষ্টির আরম্ভ বিষয়ে।' ঘুম ভাঙিয়া গেলে কিডমন আবেস্ হিলডার নিকট গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন; আবেস্ মনে করিলেন কিডমন দেবপ্রসাদ পাইয়াছেন, তিনি কিডমনকে তাঁহার দেবালয়ের সন্ন্যাসী-দলভুক্ত করিয়া লইলেন। কৃত্তিবাস যেমন কথকতা শুনিয়া রামায়ণ লিখিতেন, তেমনি একজন কিডমনকে বাইবেল অনুবাদ করিয়া শুনাইত আর তিনি তাহা ছন্দে

পরিণত করিতেন। আমাদের দেশের কবিদের সহিত, কিডমনের স্বপ্ন-আদেশের বিষয় কেমন মিলিয়া গিয়াছে।

সৃষ্টির বিষয়ে কিডমন এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন--

গুহা-অন্ধকার ছাড়া ছিল না কিছুই!
এ মহা অতলস্পর্শ আঁধার গভীর—
আছিল দাঁড়ায়ে শুধু শূন্য নিষ্ফল।
উন্নত ঈশ্বর তবে দেখিলা চাহিয়া
এই নিরানন্দস্থান! দেখিলা হেথায়
অন্ধকার, বিষণ্ণ ও শূন্য মেঘরাশি
রহিয়াছে চিরস্থির-নিশীথিনী ল'য়ে।
উত্থিত হইল সৃষ্টি ঈশ্বর-আজ্ঞায়।
মহান ক্ষমতাবলে অনন্ত ঈশ্বর
প্রথমে স্বর্গ ও পৃথ্বী করিলা সৃজন।
নির্মিলা আকাশ; আর এ বিস্তৃত ভূমি
সর্বশক্তিমান প্রভু করিলা স্থাপন।
পৃথিবী তরুণ তৃণে ছিল না হরিত,
সমুদ্র চিরান্ধকারে আছিল আবৃত,
পথ ছিল সুদূর-বিস্তৃত, অন্ধকার!
আদেশিলা মহাদেব জ্যোতিরে আসিতে
এ মহা আঁধার স্থানে। মুহূর্তে অমনি—
ইচ্ছা পূর্ণ হল তাঁর। পবিত্র আলোক
এই মরুময় স্থানে পাইল প্রকাশ।

কিডমন ইজিপ্টের ফ্যারাওর (Pharaoh) যুদ্ধে মৃত্যুবর্ণনা করিতেছেন—

ভয়ে তাহাদের হৃদি হইল আকুল!
মৃত্যু হেরি সমুদ্র করিল আর্তনাদ,
পর্বত-শিখর রক্তে হইল রঞ্জিত,
সিন্ধু রক্তময় ফেন করিল উদ্‌গার,
উঠিল মৃত্যু-আঁধার, গর্জিল তরঙ্গ,
পলা'ল ইজিপ্টবাসী ভয়ে কম্পান্বিত!

. . .

সমুদ্র তরঙ্গরাশি মেঘের মতন
ধাইয়া তাদের পানে, পড়িল ঝাঁপিয়া;
গৃহে আর কাহারেও হল না ফিরিতে
যেথা যায় সেখানেই উন্মত্ত জলধি—
বিনষ্ট হইয়া গেল তাহাদের বল,
উঠিল ঝটিকা ঘোর আকাশ ব্যাপিয়া,
করিল সে শত্রুদল দারুণ চীৎকার!
মৃত্যুর নিদানে বায়ু হল ঘনীভূত!

পাঠকেরা যদি মিলটনের শয়তানের সহিত কিডমনের শয়তানের তুলনা করিয়া দেখেন তবে অনেক সাদৃশ্য পাইবেন।

কেন বা সেবিব তাঁরে প্রসাদের তরে?
কেন তাঁর কাছে হব দাসত্বে বিনত?
তাঁর মতো আমিও বিধাতা হতে পারি।
তবে শুন— শুন সবে বীর-সঙ্গীগণ
তোমরা সকলে মোর করো সহায়তা,
তা হলে এ যুদ্ধে মোরা লভিব বিজয়।
সুবিখ্যাত, সুদৃঢ়-প্রকৃতি বীরগণ
আমারেই রাজা ব'লে করেছে গ্রহণ।
সুযুক্তি দিবার যোগ্য ইহারাই সবে,
যুঝিব ঈশ্বর সাথে ইহাদের লয়ে!

. . .

ইহাদেরি রাজা হয়ে শাসিব এ দেশ,
তবে কী কারণে হব তাঁহারি অধীন?
কখনো— কখনো তাঁর হইব না দাস।

আর-এক স্থলে— উচ্চ স্বর্গধামে মোরে করিলেন দান—
ঈশ্বর যে সুখ-ভূমি, সে স্থানের সাথে
এ সংকীর্ণ আবাসের কী ঘোর প্রভেদ।
যদি কিছুক্ষণ তরে পাই গো ক্ষমতা—
এক শীত ঋতু তরে হই মুক্ত যদি
তাহা হলে সঙ্গীগণ ল'য়ে— কিন্তু হায়—
চারি দিকে রহিয়াছে লৌহের বাঁধন!
এই ঘোর নরকের দৃঢ়মুষ্টি মাঝে
কী দারুণরূপে আমি হয়েছি আবদ্ধ!
ঊর্ধ্বে, নিম্নে জ্বলিতেছে বিশাল অনল—
এমন জঘন্য দৃশ্য দেখি নি কখনো!

বীরের নৈরাশ্য সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। অবশেষে শয়তান স্থির করিলেন যদি ঈশ্বর-সৃষ্ট মনুষ্যের কোনো অপকার করিতে পারেন তাহা হইলে তিনি 'এই শৃঙ্খলের মধ্যে থাকিয়াও সুখে ঘুমাইবেন'।

ইতিমধ্যে ডেনিসরা একবার ইংলন্ড আক্রমণ করিয়াছিল; কিন্তু অ্যালফ্রেড তাহাদিগকে দমন করেন। নবম শতাব্দীতে অ্যালফ্রেডের রাজত্বকালে অ্যাংলো স্যাক্সন ভাষা ও সাহিত্য চরম উন্নত সীমায় পৌঁছিয়াছিল। অ্যালফ্রেডের এই একমাত্র বাসনা ছিল যে, যাহাতে 'মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার সৎকার্যের স্মরণচিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারেন'। সে বিষয়ে তিনি কৃতকার্য হইয়াছিলেন। তিনি একজন বলবান যোদ্ধা ছিলেন, ও তখনকার ইংলন্ডের অন্যান্য রাজ্য অতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়াছিল, ইচ্ছা করিলে হয়তো তিনি সমস্ত ইংলন্ড বশে আনিতে পারিতেন। কিন্তু সেদিকে তাঁহার অভিলাষ ধাবিত হয় নাই, শান্তিস্থাপনা, সুশাসন ও নিজ প্রজাদের মধ্যে সুশিক্ষা প্রচার করাই তাঁহার একমাত্র ব্রত ছিল। অ্যালফেডের যে অসাধারণ প্রতিভা বা উদ্‌ভাবনী শক্তি ছিল তাহা নহে, তাঁহার সৎ ইচ্ছা ও মহান অধ্যবসায় ছিল। তিনি তাঁহার উচ্চ আশা ও স্বার্থ পরিতৃপ্ত করিতে কিছুমাত্র মন দেন নাই, প্রজাদের মঙ্গলই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। তিনি দুঃখ করিয়া বলেন যে, এমন একদিন ছিল যখন বিদেশ হইতে লোকে ইংলন্ডে বিদ্যা শিখিতে আসিত, কিন্তু এখন বিদ্যা শিখিতে গেলে বিদেশীদের নিকট শিখিতে হয়। এই অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য তিনি দেশীয় ভাষায় নানা পুস্তক অনুবাদ করিতে লাগিলেন। অ্যালফ্রেড যদিও অনেক লাটিন

পুস্তক অনুবাদ করিয়াছিলেন তথাপি তাঁর লাটিন অতি অল্পই জানা ছিল; অতি প্রশংসনীয় সরলতার সহিত ইহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন : 'যদি আমার চেয়ে কেহ অধিক লাটিন জান, তবে আমায় কেহ দোষ দিয়ো না, কারণ প্রত্যেক মনুষ্য তাহার যে পর্যন্ত ক্ষমতা আছে, সেই অনুসারেই কথা কহিবে ও কাজ করিবে।' তাঁহার অনুবাদের মধ্যে স্থানে স্থানে লাটিনের অজ্ঞতা স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। অ্যালফ্রেডই অ্যাংলো স্যাক্সন ভাষায় গদ্যের প্রথম সৃষ্টিকর্তা। তখনকার অজ্ঞলোকদের বুঝাইবার জন্য তাঁহার অনুবাদ যথাসাধ্য সহজ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এক ছত্র ভাঙিতে গিয়া তাঁহাকে দশ ছত্র লিখিতে হইয়াছিল। ইঁহার সময় হইতেই ইংলন্ডের Chronicle অর্থাৎ ঐতিহাসিক বিবরণ লিখিত হয়। কিন্তু সে অতি শুষ্ক ও নীরস। তাহা ইতিহাসের কোনো উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে নাই। তাহাতে তখনকার ব্যক্তিদিগের অবস্থার বিষয় কিছুই বর্ণিত হয় নাই, কেবল অমুক বৎসরে দুর্ভিক্ষ হইল, অমুক বৎসরে অমুক নগরে আগুন লাগিল, অমুক বৎসরে একটা ধূমকেতু উঠিল, ইত্যাদি কতকগুলি ঘটনার বিবরণ মাত্র লিখিত আছে।

আবার ডেনিসরা ইংলন্ড আক্রমণ করে; এবার ইংলন্ড তাহাদের হস্তগত হইল। ডেনিসদের সহিত স্যাক্সনদের ভাষা ও আচার-ব্যবহারের বিশেষ কিছুই প্রভেদ ছিল না। কান্যুট প্রজাদের কীরূপ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। যাহা হউক, অ্যাংলো স্যাক্সন রাজত্বের শেষভাগে অ্যাংলো স্যাক্সন সাহিত্যের যথেষ্ট অবনতি হইয়া আসিয়াছিল। ধর্মাচার্যগণ অলস বিলাসী অজ্ঞ, সাধারণ লোকেরা নীতিভ্রষ্ট ও ধূর্ত হইয়া আসিতেছিল। এই সময় ইংলন্ডে নর্মান সভ্যতা-স্রোত প্রবেশ করিয়া দেশের ও ভাষার যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিল। যাহা হউক, ডেনিসরাজ্য শীঘ্রই বিলুপ্ত হইল।

খৃস্টীয় ধর্ম প্রবেশ করিলে পর ইংরাজি ভাষায় অনেক রোমীয় কথা প্রবেশ করে। কিন্তু নর্মান অধিকারের সময়েই অধিকাংশ লাটিন-ধাতুজাত কথা ইংরাজি ভাষায় প্রচলিত হয়। অনেক ডেনিস কথা ইংরাজিতে পাওয়া যায়।

যখন স্যাক্সনেরা তাহাদের আদিম দেশে ছিল তখন তাহাদের স্বভাব কীরূপ ছিল তাহা বর্ণনা করিয়াছি। যখন ইংলন্ডে আসিয়া তাহারা একটা স্থায়ী বাসস্থান পাইল, তখন তাহাদের বিলাসের দিকে দৃষ্টি পড়িল। কিন্তু সে কীরূপ বিলাস? মুসলমানেরা ভারতবর্ষে আসিয়া যেরূপ বিলাসে মগ্ন হইয়াছিল, ইহা সে বিলাস নহে। যে বিলাসের সহিত সুকুমার বিদ্যার সংস্রব আছে, ইহা সে বিলাস নহে। অ্যাংলো স্যাক্সনদের শিল্প দেখো, নাই বলিলেও হয়; তাহাদের কবিতা দেখো, কেবল রক্তময়। কবিতার যে অংশের সহিত শিল্পের যোগ আছে— ছন্দ, তাহা স্যাক্সন ভাষায় অতি বিশৃঙ্খল। লাটিন সাহিত্যের আদর্শ পাইয়াও তাহাদের কবিতার ও ছন্দের বিশেষ কিছুই উন্নতি হয় নাই। স্যাক্সনদের হৃদয়ে সুন্দর-ভাবের আদর্শ ছিল না বলিয়াই মনে হয়— তাহাদের বিলাস আর কী হইতে পারে? আহার ও পান। সমস্ত দিনরাত্রি পানভোজনেই মত্ত থাকিত। এড্‌গারের সময় ধর্মমন্দিরে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত নাচ গান পান ভোজন চলিত। পৃথিবীর প্রথম যুগের অসহায় অবস্থার সহিত যুদ্ধ করিয়া একটু অবসর পাইলেই, আর্যেরা (আর্যেরা বলিলে যদি অতি বিস্তৃত অর্থ বুঝায় তবে হিন্দুরা) স্বভাবতই জ্ঞান উপার্জনের দিকে মনোযোগ দিতেন, কিন্তু স্যাক্সনেরা তাহাদের অবসরকাল অতিবাহিত করিবার জন্য অদ্ভুত উপায় বাহির করিয়াছিল; সে উপায়টি— দিনরাত্রি অজ্ঞান হইয়া থাকা। তাহারা উত্তেজনা চায়, তাহারা ঋষিদের মতো অমন বিজনে বসিয়া ভাবিতে পারে না— অসভ্য সংগীত উচ্চৈঃস্বরে গাইয়া, যুদ্ধের নৃশংস আমোদে উন্মত্ত থাকিয়া তাহারা দিন যাপন করিতে চায়। রক্তপাত ও লুটপাট ছাড়া আর কথা ছিল না। দাস ব্যবসায় যদিও আইনে বারণ ছিল, কিন্তু সে বারণে কোনো কাজ হয় নাই— নর্মান রাজত্ব সময়ে দাস ব্যবসায় উঠিয়া যায়। গর্ভবতী দাসীদিগের মূল্য অনেক বলিয়া তাহারা স্ত্রী দাসীদিগের প্রতি জঘন্য আচরণ করিত। তবুও খৃস্টধর্ম ইহাদের অনেকটা নরম করিয়া

আনিয়াছিল। স্যাক্‌সনদের বুদ্ধি তখন তীব্র নহে। তাহাদের মধ্যে প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি অতি অল্পই জন্মিয়াছে। তাহাদের কবিতার উপাখ্যানসমূহের ভালোরূপ ধারাবাহিক যোগ নাই, তাহাদের কবিদের ঔপন্যাসিক ক্ষমতা তেমন ছিল না। স্যাক্‌সনদের মধ্যে বিদ্যা-প্রচার করিবার জন্য অনেকবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু সে বিষয়ে কেহই কৃতকার্য হয় নাই। স্যাক্‌সন ধর্মাচার্যদের মধ্যে যে বিদ্যাচর্চার আরম্ভ হয় তাহা কয়েক শতাব্দী মাত্র থাকে, তাহার পরেই আবার সমস্ত অন্তর্হিত হইয়া যায়। নর্মানরা আসিয়া স্যাক্‌সন খৃস্ট-পুরোহিতদিগের অজ্ঞতা দেখিয়া অতিশয় বিরক্ত হয়। অ্যাংলো স্যাক্‌সন সাহিত্য অতি সামান্য। অ্যালফ্রেডের গদ্যগ্রন্থ ও বোউল্‌ফ এবং অন্যান্য দুই-একটি কবিতা লইয়াই তাহাদের সাহিত্যের যথা-সর্বস্ব।

স্বাধীনতা-প্রিয়তা ও বীরত্ব স্যাক্‌সন জাতীয়দিগের প্রধান গুণ। তাহাদের সমস্ত স্বভাব পৌরুষেই গঠিত। সকলেই আপনার আপনার প্রভু। রাজার সহিত প্রজার তেমন প্রভেদ ছিল না— স্যাক্‌সন রাজ্যের শেষাশেষি সেই প্রভেদ জন্মে। জর্মনিতে ভীরুদিগকে পঙ্কে পুঁতিয়া বিনষ্ট করিত। স্যাক্‌সনেরা যাহাকে প্রধান বলিয়া মানে তাহার জন্য সকলই করিতে পারে। যে তাহার প্রধানকে না লইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্তন করে, তাহার বড়ো অখ্যাতি। যে প্রধানের গৃহে তাহারা মদ্যপান করিয়াছে, যাহার নিকট হইতে বিশ্বাসের চিহ্ন তরবারি ও বর্ম পাইয়াছে তাহার জন্য প্রাণদান করিতে তাহারা কাতর নহে— এ ভাব তাহাদের কবিতার যেখানে-সেখানে প্রকাশ পাইয়াছে। স্যাক্‌সন জাতিদের কল্পনা ও সৌন্দর্য-প্রীতি ছিল না, তাহাদের চরিত্রে কার্যকরী বুদ্ধি ও পৌরুষ অতিমাত্র ছিল।

ভারতী
শ্রাবণ ১২৮৫

বিয়াত্রিচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য

ইতালিয়ার এই স্বপ্নময় কবির জীবন গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় হইতে শেষ পর্যন্ত বিয়াত্রিচে (Beatrice)। বিয়াত্রিচেই তাঁহার সমুদয় কাব্যের নায়িকা, বিয়াত্রিচেই তাঁহার জীবন-কাব্যের নায়িকা। বিয়াত্রিচেকে বাদ দিয়া তাঁহার কাব্য পাঠ করা বৃথা, বিয়াত্রিচেকে বাদ দিলে তাঁহার জীবন-কাহিনী শূন্য হইয়া পড়ে। তাঁহার জীবনের দেবতা বিয়াত্রিচে, তাঁহার সমুদয় কাব্য বিয়াত্রিচের স্তোত্র। বিয়াত্রিচের প্রতি প্রেমই তাঁহার প্রথম কবিতার উৎস উৎসারিত করিয়া দেয়। তাঁহার প্রথম গীতিকাব্য 'ভিটা নুওভা'র (Vita Nuova) প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বিয়াত্রিচেরই আরাধনা, ইহার কিয়দ্দুর লিখিয়াই তাঁহার বিরক্তি বোধ হইল— তাঁহার মনঃপূত হইল না; পাঠকের চক্ষে বিয়াত্রিচেকে দূর-স্বর্গের অলৌকিক দেবতার ন্যায় চিত্রিত করিয়াও তিনি পরিতৃপ্ত হইলেন না। এই কাব্যের শেষ ভাগে তিনি লিখিতেছেন—

'এই পর্যন্ত লিখিয়াই আমি এক অতিশয় আশ্চর্য স্বপ্ন দেখিলাম— সেই স্বপ্নে যাহা দেখিলাম তাহাতে এই স্থির করিলাম যে, আমি সেই প্রিয় দেবীর বিষয় যাহা লিখিতেছি তাহা তাঁহার যোগ্য নহে— যে পর্যন্ত ইহা অপেক্ষা যোগ্যতর কবিতা না লিখিতে পারিব সে পর্যন্ত আর লিখিব না। ইহা নিশ্চয়ই যে, তিনি (বিয়াত্রিচে) জানিতেছেন, আমি তাঁহার বিষয়ে যোগ্যতর কবিতা লিখিবার ক্ষমতা প্রাপ্তির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি। সমুদয় জীবের প্রাণদাতা ঈশ্বর-প্রসাদে আর কিছুদিন যদি বাঁচিয়া থাকি, তবে তাঁহার বিষয়ে এমন লিখিব, যাহা এ পর্যন্ত কোনো মহিলার সম্বন্ধে কেহ কখনো লেখে নাই।' এই স্থির করিয়াই তিনি তাঁহার মহাকাব্য 'ডিভাইনা কামেডিয়া' (*Divina Commedia*) লিখেন ও বিয়াত্রিচে সম্বন্ধে এমন কথা বলেন, যাহা কোনো মহিলা সম্বন্ধে কেহ কখনো বলে নাই।

দান্তে তাঁহার নয় বৎসর বয়স হইতেই বিয়াত্রিচেকে ভালোবাসিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু তাঁহার প্রেম সাধারণ ভালোবাসা নামে অভিহিত হইতে পারে না। বিয়াত্রিচের সহিত তাঁহার প্রেমের আদান-প্রদান হয় নাই, নেত্রে নেত্রে নীরব প্রেমের উত্তর-প্রত্যুত্তর হয় নাই। অতিদূর সাক্ষাৎ— দূর আলাপ ভিন্ন বিয়াত্রিচের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও আলাপ হয় নাই। অতি দূরস্থ দেবীর ন্যায় তিনি দূর হইতে সসম্ভ্রমে বিয়াত্রিচেকে দেখিতেন, অতি দূর হইতে তাঁহার গ্রীবানমিত নমস্কারে আপনাকে দেবানুগৃহীত মনে করিতেন। যে সভায় বিয়াত্রিচে আছেন, সে সভায় গেলে তিনি কেমন অভিভূত হইয়া পড়িতেন, তিনি কথা কহিতে পারিতেন না, তাঁহার শরীর কাঁপিতে থাকিত! বিয়াত্রিচেকে তিনি তাঁহার প্রেমের কাহিনী বলেন নাই, বলিতে সাহস করেন নাই, বা বলিবার আবশ্যক বোধ করেন নাই। তিনি আপনার প্রেমের স্বপ্নেই আপনি মগ্ন থাকিতেন, তাঁহার প্রেম জাগ্রত রাখিবার জন্য বিয়াত্রিচের প্রতিদান আবশ্যক ছিল না। তাঁহার কাব্য পড়িলে বিয়াত্রিচেকে মানুষ হইতে উচ্চ-পদবী-গত মনে হয়, তাঁহার নিকট হইতে অনুগ্রহ ভিন্ন প্রেম-প্রত্যাশা করিবার ইচ্ছা মনে এক মুহূর্তও স্থান পায় না। যদিও 'ভিটা নুওভা' কাব্যের নায়িকাই বিয়াত্রিচে, কিন্তু পাঠকেরা বিয়াত্রিচের মুখ হইতে একটি কথাও শুনিতে পান নাই, বিয়াত্রিচে সর্বদাই তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে রহিয়াছেন। রূপক প্রভৃতির দ্বারা বিয়াত্রিচেকে দান্তে এমন একটি মেঘময় অস্ফুট আবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন যে, পাঠকের চক্ষে সেই অস্ফুট মূর্তি অতি পবিত্র বলিয়া প্রতিভাত হয়। দান্তে তাঁহার প্রেমার্দ্র হৃদয়ে মনে করিতেন, 'যে ব্যক্তিই বিয়াত্রিচের নিকট আসিত তাহারই হৃদয়ে এমন গভীর ভক্তির উদ্রেক হইত যে, তাহার মুখের দিকে নেত্র তুলিতে তাহার সাহস হইত না।' দান্তে বলেন, 'যখন মনুষ্যেরা তাঁহার দিকে চাহিত তখনি তাহারা কেবল একটি মাধুর্য ও মহত্ত্ব অনুভব করিত।' দান্তে ভক্তির চক্ষে দেখিতেন, সমস্ত পৃথিবী বিয়াত্রিচের পূজা করিতেছে, দেবতারা তাঁহাকে আপনাদের মধ্যে আনিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। দান্তের 'ডিভাইনা কামেডিয়া'র নরকের দ্বার-রক্ষকেরা বিয়াত্রিচের নাম শুনিয়াই অমনি সসম্ভ্রমে দ্বার খুলিয়া দিতেছে— দেবতারা বিয়াত্রিচের নাম শুনিয়া অমনি স্বর্গযাত্রীদ্বয়কে সহর্ষে আহ্বান করিতেছেন। বিয়াত্রিচের মৃত্যুর পর দান্তে অশ্রুপূর্ণ নয়নে দেখিলেন, যেন সমস্ত নগরীই রোদন করিতেছে। বিয়াত্রিচের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ বর্ণনাই 'ভিটা নুওভা'র আরম্ভ—

'যখন আমার জীবনের আরম্ভ হইতে নয় বার মাত্র সূর্য তাঁহার কক্ষ প্রদক্ষিণ করিয়াছে, এমন সময়ে আমার হৃদয়ের মহান মহিলা আমার চক্ষের সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন।... তখন তাঁহার জীবনের আরম্ভ মাত্র এবং আমার বয়স নবম বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। তাঁহার শরীরে সুন্দর লোহিত বর্ণের পরিচ্ছদ, একটি কটিবন্ধ ও বাল্যবয়সের উপযুক্ত কতকগুলি অলংকার। সত্য বলিতেছি তাঁহাকে দেখিয়া সেই মুহূর্তেই আমার হৃদয়ের অতি নিভৃত নিলয়স্থিত মর্ম পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল, এবং তাহার প্রভাব আমার শরীরের শিরায় শিরায় প্রকাশিত হইল। সে (মর্ম) কাঁপিতে কাঁপিতে এই কথাগুলি বলিল ওই দেখো, আমা অপেক্ষা সবলতর দেবতা আমার উপর আধিপত্য করিতে আসিয়াছেন;... সেই সময় হইতে প্রেম আমার হৃদয়-রাজ্যের অধিপতি হইল।... দেবতাদিগের মধ্যে কনিষ্ঠ দেবতাটিকে (বিয়াত্রিচেকে) দেখিবার জন্য প্রেমের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া বাল্যকালে কতবার তাহার অন্বেষণে ফিরিয়াছি। সে এমন প্রশংসনীয়; তাহার ব্যবহার এমন মহৎ যে কবি হোমারের উক্তি তাহার প্রতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে— অর্থাৎ 'তাহাকে দেখিয়া মনে হয় সে দেবতাদের মধ্যে জন্মলাভ করিয়াছে, মানুষের মধ্যে নহে'। বিয়াত্রিচের পিতা একটি ভোজ দেন, সেই ভোজে দান্তের পিতা তাঁহার পুত্রকে সঙ্গে লইয়া যান; সেই সভাতেই দান্তের সহিত বিয়াত্রিচের উক্ত প্রথম সাক্ষাৎ হয়। দ্বিতীয় সাক্ষাৎ এইরূপে বর্ণিত হয় : 'উপরি-উক্ত মহান মহিলার সহিত সাক্ষাতের পর নয় বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, এমন সময়ে নিষ্কলঙ্ক-শুভ্র-বসনা, সখীদ্বয়-পরিবেষ্টিতা সেই বিস্ময়জনক মহিলা আর-একবার আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তিনি রাজপথ দিয়া যাইবার সময় আমি যেখানে সসম্ভ্রমে স্তম্ভিত হইয়া

দাঁড়াইয়া ছিলাম, সেই দিকে নেত্র ফিরাইলেন, এবং তাঁহার সেই অনির্বচনীয় নম্রতার সহিত এমন শ্রীপূর্ণ নমস্কার করিলেন যে, আমি সেই মুহূর্তেই সৌন্দর্যের সর্বাঙ্গ যেন দেখিতে পাইলাম।... এইবার প্রথম তাঁহার কথা শুনিতে পাইলাম, শুনিয়া এমন আহ্লাদ হইল যে, সুরামত্তের ন্যায় আমার সঙ্গীদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ছুটিয়া আসিলাম। আমার নির্জন গৃহে আসিয়া সেই অতিশয় ভদ্রমহিলার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রা আসিল ও এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখিলাম। সেই স্বপ্নের বিষয় সেই-সময়কার প্রধান প্রধান কবিদের জানাইব স্থির করিলাম। যাঁহারা যাঁহারা প্রেমের অধীন আছেন তাঁহাদের বন্দনা করিয়া ও তাঁহাদের এই স্বপ্নের প্রকৃত অর্থ-ব্যাখ্যা করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া এই স্বপ্নের বিষয়ে একটি কবিতা লিখিব স্থির করিলাম। সেই কবিতাটি (Sonnet) এই—

প্রেম-বন্দী হৃদি যাঁরা, সুকোমল মন,
যাঁরা পড়িবেন এই সংগীত আমার,
তাঁরা মোর অনুনয় করুন শ্রবণ,
বুঝায়ে দিউন্ মোরে অর্থ কী ইহার?
যে কালে উজ্জ্বল তারা উজলে আকাশ,
নিশার চতুর্থ ভাগ হয়ে গেছে শেষ,
প্রেম মোর নেত্রে আসি হলেন প্রকাশ,
স্মরিলে এখনো কাঁপে হৃদয় প্রদেশ!
দেখে মনে হল যেন প্রফুল্ল আনন;
মোর হৃদ্‌পিণ্ড রহে করতলে তাঁর;
বাহু-'পরে শান্ত ভাবে করিয়া শয়ন
ঘুমাইয়া রয়েছেন মহিলা আমার—
অবশেষে জাগি উঠি, প্রেমের আদেশে
সভয়ে জ্বলন্ত-হৃদি করিলা আহার!
তার পরে চলি গেলা প্রেম অন্য দেশে
কাঁদিতে কাঁদিতে অতি বিষণ্ণ-আকার!

এই স্বপ্নের পর হইতে সেই অতি শ্রীমতী মহিলার চিন্তাতেই ব্যাপৃত ছিলাম। ক্রমে ক্রমে আমার স্বাস্থ্য এমন নষ্ট হইয়া আসিল যে, আমার আকার দেখিয়া বন্ধুরা অতিশয় চিন্তিত হইলেন; আবার যে গূঢ় কথা সকল-কথা অপেক্ষা আমি লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি, কেহ কেহ অসদভিপ্রায়ে তাহাই জানিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া যুক্তি ও প্রেমের পরামর্শে উত্তর দিলাম যে, প্রেমের দ্বারাই আমার এই অবস্থা হইয়াছে। আমার আকারে প্রেমের চিহ্ন এমন স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছিল যে, সে গোপন করা বৃথা। কিন্তু যখন তাহারা জিজ্ঞাসা করিল— 'কাহার প্রেমে বিচলিত হইয়াছ?' আমি তাহাদের দিকে চাহিলাম, হাসিলাম, আর উত্তর দিলাম না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, বিয়াত্রিচে দান্তেকে অভিবাদন করিলে দান্তে কী আনন্দ অনুভব করিতেন! কিন্তু একবার দান্তের নামে এক অতি মিথ্যা নিন্দা উঠে, সেই নিন্দা 'সেই অতি কোমলা, পাপের বিনাশয়িতা, পুণ্যের রাজ্ঞী-স্বরূপার' কানে গেল। দান্তে কহিতেছেন, 'এবার যখন তিনি আমার সম্মুখ দিয়া গেলেন তখন আমার সুখের একমাত্র কারণ সেই সুন্দর নমস্কার হইতে বঞ্চিত করিলেন। যেখানে যখন তাঁহাকে দেখিয়াছি তাঁহার সেই অমূল্য নমস্কারের আশায় আমি পৃথিবীর শত্রুতা ভুলিয়াছি, আমার হৃদয়ে এমন একটি উদারতা জন্মিত যে, পৃথিবীতে যে আমার যাহা-কিছু দোষ করিয়াছে সমুদায় মার্জনা করিতাম।' এ নমস্কার হইতে, তাঁহার সেই প্রেমের একমাত্র পুরস্কার হইতে যখন তিনি বঞ্চিত হইলেন, তখন তিনি অত্যন্ত যন্ত্রণা পাইলেন,

জনকোলাহল ভেদ করিয়া যেখানে একটি নির্জন স্থান পাইলেন সেইখানেই তীব্রতম অশ্রুজলে রোদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রথম উচ্ছ্বাস-বেগ নিবৃত্ত হইলে তাঁহার নির্জন গৃহে গিয়া 'কাতর শিশুর' ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

একবার কোনো বন্ধুর বিবাহ-সভায় তিনি আহূত হন। তাঁহার বন্ধুকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নব বধূর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিবেন স্থির করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল, তিনি দেখিলেন তাঁহার অতি নিকটেই বিয়াত্রিচে। তিনি এমন একপ্রকার অভিভূত হইয়া পড়িলেন যে, মহিলারা তাঁহার আকার দেখিয়া বিয়াত্রিচের সহিত চুপে চুপে কথা কহিতে লাগিলেন ও তাঁহাকে উপহাস করিতে আরম্ভ করিলেন! তিনি তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, নিজ গৃহে আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন— 'যদি এই মহিলা (বিয়াত্রিচে) আমার অবস্থা জানিতেন, তবে আমার আকার দেখিয়া কখনো তিনি এরূপ উপহাস করিতেন না, বরং তাঁহার দয়া হইত!'

দান্তে তাঁহার সেই অভিলষিত নমস্কার আর এ পর্যন্ত পান নাই। একবার কতকগুলি মহিলা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'যাঁহাকে তুমি ভালোবাস, তাঁহার দর্শন মাত্রেই তুমি যদি অমন অভিভূত হইয়া পড়, তবে তোমার ভালোবাসিবার ফল কী?' তিনি উত্তর দিলেন, 'তাঁহার একটি নমস্কার পাওয়াই এ পর্যন্ত আমার ভালোবাসিবার একমাত্র লক্ষ্য ও ফল ছিল, তাঁহার নমস্কারই আমার ইচ্ছার একমাত্র গম্যস্থান ছিল— কিন্তু তিনি যখন তাহা না দিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছেন তখন তাহাই হউক— প্রেম আমাকে এমন আর-একটি সুখে নিবিষ্ট করিয়াছেন, যাহা কোনো কালেই শেষ হইবে না।' তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সে কোন্ সুখ?' দান্তে কহিলেন, 'আমার মহিলার প্রশংসা গান।' তাঁহার মহিলার প্রশংসার গান নিম্নে অনুবাদিত হইল—

রমণি! তোমরা বুঝ প্রেমের ব্যাপার—
মহিলার কথা মোর করহ শ্রবণ—
ব'লে ফুরায় না কভু প্রশংসা তাঁহার—
মন খুলে ব'লে তবু জুড়াইবে মন!
পৃথিবীতে যত কিছু আছে গো মহান—
তাহা হতে মহত্তর চরিত তাঁহার
হেন দীপিয়াছে প্রেমে এ মোর পরান,
চির বল অর্পিয়াছে বচনে আমার!
সাধ যায় করি তাঁর হেন যশোগান
সমস্ত পুরুষে তাঁর পদতলে আনি—
কিন্তু থাক্— গাব নাকো সে সমুচ্চ তান
গাহিতে ক্ষমতা যদি না থাকে কী জানি!
আমার এ ভালোবাসা অতি সুকোমল,
গাব তাই অতিশয় সুকোমল তানে—
সুকোমল হৃদি ওগো মহিলা সকল!
যে গান লাগিবে ভালো তোমাদের কানে!
স্বর্গের দেবতা এক কহিলা ঈশ্বরে—
'দেখো প্রভু, দেখো চেয়ে এই পৃথ্বীতলে—
মানব হইতে এক হেন জ্যোতি ক্ষরে,
নিম্ন দেশ পৃথিবীরে সে জ্যোতি উজলে!
স্বর্গের অভাব প্রভু নাই কিছু আর,
শুধু ওই জ্যোতি, ওই বিমল কিরণ।

তাই দেব অনুনয় শুন গো আমার,
দেবতার মাঝে তারে করো আনয়ন।'
আমাদের প্রতি দয়া হইল বিধির—
কহিলেন, 'ধৈর্য ধরো, আসুক সময়—
পৃথিবীতে এক জন আছে গো অধীর
কখন হারায় তারে সদা তার ভয়।'

...

প্রেম কহে তার পানে করি নিরীক্ষণ

...

ঈশ্বর নূতন সৃষ্টি করিলা সৃজন!
মুকুতার মতো পাণ্ডু বরন তাহার—
প্রকৃতির পূর্ণতম-শিল্প সেই জন,
কহি তারে পূর্ণতম আদর্শ শোভার!
সুন্দর নয়নে তার সদাই জাগ্রত
এমন প্রেমের জ্যোতি, এমন উজ্জ্বল
যে জ্যোতি দর্শক আঁখি করায় মুদিত—
সে জ্যোতি ঢালয়ে হৃদে আলোক বিমল।
হাসিতে চিত্রিত যেন প্রেমের আকার—
এক দৃষ্টে কে তাকাবে সে হাসি তাহার?
তোমারে কহি, হে গান, সন্তান প্রেমের,
তুমি তো যাইবে বহু মহিলার কাছে,
বিলম্ব কোরো না কভু, বলো তাঁহাদের—
'দেবীগণ, মোর শুধু এক কাজ আছে—
তাঁহার চরণে যাওয়া, যাঁর মহা যশে
ভাণ্ডার আমার এই পূর্ণ রহিয়াছে।'
যদিবা বিলম্ব তব হয় দৈববশে,
দেখো যেন রহিয়ো না তাহাদের কাছে—
অসাধু যাদের জ্ঞান, মন ভালো নয়—
কেবল রমণী আর প্রেমিকের কানে
খুলিয়ো হে গীত তুমি তোমার হৃদয়!
মহিলা আমার বসি আছেন সেখানে [যেখানে,]
সেখানে তোমারে তাঁরা যাবেন লইয়া—
তাঁরে মোর কথা তুমি দিয়ো বুঝাইয়া!

একবার দান্তে অত্যন্ত পীড়িত হন, পীড়ার সময় সহসা কেমন তাঁহার মনে হইল, বিয়াত্রিচের মৃত্যু হইবে। কল্পনা তাঁহাকে পাগলের মতো করিয়া তুলিল, কল্পনায় তিনি দেখিতে লাগিলেন, কেহ তাঁহাকে কহিতেছে, 'তোমার মৃত্যু হইবে।' কেহ বা কহিতেছে, 'তুমি মরিয়াছ।' তিনি দেখিলেন যেন সূর্য অন্ধকার, তারকারা রোদন করিতেছে, ভয়ানক ভূমিকম্প হইতেছে, তাঁহার চারি দিকে পাখিরা মরিতেছে ও পড়িতেছে— এই বিপ্লবের মধ্যে কে যেন তাঁহাকে কহিল, 'জান না তোমার অনুপম মহিলা পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছেন?' তিনি যেন বিয়াত্রিচের মৃত্যুকালীন

প্রশান্ত মুখ দেখিতে পাইলেন। সেই অজ্ঞান অবস্থায় এমন কাতর স্বরে মৃত্যুকে আহ্বান করিলেন যে, শয্যাপার্শ্বস্থ শুশ্রূষাকারিণী রমণী ভয়ে কাঁদিতে লাগিলেন। অবশেষে জাগ্রত হইয়া ইহা স্বপ্ন জানিতে পারিয়া সুস্থির হইলেন।

একদিন তিনি মনে করিলেন, এ পর্যন্ত তিনি তাঁহার মহিলার বিষয় যাহা-কিছু লিখিয়াছেন, সমুদয় অপূর্ণ হইয়াছে। ক্ষুদ্র গীতির মধ্যে ভাব প্রকাশ করিয়া পরিতৃপ্ত না হইয়া তিনি একটি বৃহৎ কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলেন—

কত কাল আছি আমি প্রেমের শাসনে,
এমন গিয়াছে স'য়ে অধীনতা তাঁর,
প্রথমে যা দুখ ব'লে করেছিনু মনে
এখন তা ধরিয়াছে সুখের আকার!
যদিও গো বলহীন হয়েছে পরান,
গেছে চলি তেজ যাহা ছিল এই চিতে,
তবু হেন সুখ প্রেম করেন গো দান
মৃত্যুমূল্য দিয়ে চাই সে সুখ কিনিতে!
প্রেমের প্রসাদে মোর হেন শক্তি আছে,
প্রত্যেক নিশ্বাস ধরি প্রার্থনা আকার—
অনুগ্রহ-ভিক্ষা চায় মহিলার কাছে—
অতি দীনভাবে অতি নম্রভাবে আর!
তাঁরে দেখিলেই আসে সে ভাব আমার।

এই কয় ছত্র লিখিয়াই সহসা গান থামিয়া গেল— সহসা ইহার নিম্নে লাটিন ভাষায় এই কথাগুলি লিখিত হইল 'যে নগরী লোকে পূর্ণ ছিল সে আজ কী নির্জন হইয়াছে! সমস্ত জাতির মধ্যে যে জাতি মহত্তম ছিল সে জাতি আজ কী বিধবার আকার ধারণ করিয়াছে!' বিয়াত্রিচের মৃত্যু হইয়াছে— এই সংবাদ শুনিয়াই সহসা যেন তাঁহার সংগীত থামিয়া গেল। এমন একটি মহান ঘটনা শুনিলেন যেন তাহা আর চলিত ভাষায় লিখা যায় না, গ্রাম্য ভাষায় লিখিলে তাহা যেন অতি লঘু হইয়া পড়ে। এই নিদারুণ দুঃখে তাঁহার আর কী সান্ত্বনা হইতে পারে? তিনি বিয়াত্রিচের মৃত্যু ও জন্মতিথি মিলাইয়া তখনকার জ্যোতিষ গণনার অনুসারে স্থির করিলেন— বিয়াত্রিচের মৃত্যুর সহিত নিশ্চয়ই খৃস্টীয় ত্রিমূর্তির (Holy Trinity) কোনো-না-কোনো যোগ আছে।— এই কল্পনাতেই তাঁহার কত সুখ হইল! তিনি নগরের প্রধান প্রধান লোকদিগকে পত্র লিখিলেন, তাহাতে বিয়াত্রিচের মৃত্যুতে নগরের কী দুর্দশা হইয়াছে তাহাই ব্যাখ্যা করিলেন— তাঁহার বিশ্বাস হইল, যেন বিয়াত্রিচের মৃত্যুতে সমস্ত নগরী অভাব অনুভব করিতেছে, অথবা যদি না করে, তবে প্রকৃতপক্ষে তাহাদের যে অভাব হইয়াছে, এ বিষয়ে তাহাদের চেতনা জন্মাইয়া দেওয়া তাঁহার কর্তব্য কর্ম।

ক্রমে ক্রমে দুঃখের অন্ধকার তাঁহার হৃদয়ে গাঢ়তর হইতে লাগিল— যখন অশ্রুজল শুকাইয়া গেল তখন স্থির করিলেন অশ্রুময় অক্ষরে তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিবেন। এই ভাবিয়া, যাহারা তাঁহার দুঃখ বুঝিতে পারিবে, তাঁহার দুঃখে যাহারা সহজে মমতা করিতে পারিবে, সেই রমণীদের সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—

এ নয়ন কাঁদিয়া কাঁদিয়া যন্ত্রণায়,
জীর্ণ হয়ে পড়িয়াছে গেছে শুকাইয়া—
নিভাতে এ জ্বালা যদি থাকে গো উপায়

(যেন জ্বালা অতি ধীরে যেতেছে লইয়া
ক্রমশ এ দেহ মোর কবরের পানে,)
তবে তাহা মৃত্যু, কিংবা প্রকাশি এ ব্যথা।
যখন মহিলা মোর আছিলা এখানে
আর কারে বলি নাই এ মর্মের কথা,
হে রমণি তোমাদের কোমল হৃদয়ে
মরমের কথা মোর ঢেলেছি কেবল।
যখন গেছেন তিনি স্বরগ আলয়ে—
রাখিয়া আমার তরে শোক-অশ্রুজল—
তখন যা-কিছু মোর বলিবার আছে
হে রমণি বলিব গো তোমাদেরি কাছে।

তিনি তাহাদিগকে কহিলেন— বিয়াত্রিচে উচ্চতম স্বর্গে গিয়াছেন, সেখানে যাইতে তাঁহার কিছুমাত্র কষ্ট পাইতে হয় নাই! ঈশ্বর তাঁহাকে আপনি ডাকিয়া লইলেন— ঈশ্বর দেখিলেন— এই যন্ত্রণাময় পৃথিবী এমন সুন্দর প্রাণীর বাসযোগ্য নহে। সংগীতটি এই বলিয়া সমাপ্ত করিলেন—

যাও তুমি, হে করুণ সংগীত আমার,
যাও সেথা যেইখানে রমণীরা আছে,
আগে তুমি যেতে সেথা বহি সুখভার,
কত সুখ পেতে, রহি তাহাদের কাছে!
এখনো তাদেরি কাছে করো গো প্রয়াণ,
বিষণ্ণ ও শূন্য তুমি শোকের সন্তান!

এইরূপে প্রথম বৎসর কাটিয়া গেলে পর একবার একটি স্থান দেখিয়া সহসা তাঁহার পূর্ব-স্মৃতি জাগ্রত হইয়া উঠিল। সেইখানে দাঁড়াইয়া তিনি অতি বিষণ্ণ বদনে পুরাতন কথা ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই বিষাদ আর কেহ দেখিতে পাইতেছে কিনা, তাহাই দেখিবার জন্য চারি দিকে নেত্রপাত করিলেন। সহসা দেখিতে পাইলেন— একটি বাতায়ন হইতে অতি সুন্দরী এক যুবতী তাঁহাকে এমন মমতার সহিত নিরীক্ষণ করিতেছেন যে, দয়া যেন তাঁহার নেত্রে স্পষ্ট প্রতিভাত হইয়াছে। এই মমতা পাইয়া দান্তের হৃদয় গলিয়া গেল, অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। এই মমতা পাইয়া কেবল কৃতজ্ঞতা নহে, ঈষৎ প্রেমের ছায়াও তাঁহার তরুণ হৃদয়ে পতিত হইল! সেদিন চলিয়া গেলেন— কিন্তু আবার তাহাকে দেখিতে কেমন বাসনা হইল, আর-একদিন সেইখানে গেলেন— আবার তাহাকে দেখিতে পাইলেন— দেখিলেন তাঁহার বিয়াত্রিচের ন্যায় তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ। পাণ্ডুবর্ণকে দান্তে 'প্রেমের বর্ণ' নাম দিয়াছেন। দান্তে কহিলেন, 'আমার চক্ষু তাহাকে দেখিলে কেমন আনন্দ অনুভব করে।' পরক্ষণেই আবার চক্ষুকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, 'চক্ষু! তোর অশ্রুজল দেখিয়া কত লোকে অশ্রু ফেলিয়াছে, তুই আজ কি ভুলিয়া গেলি যে মহিলার (বিয়াত্রিচের) জন্য তুই রোদন করিতেছিস, সেই মহিলার কথা স্মরণ করিয়াই ওই রমণী তোর দিকে চাহিতেছেন?' কিন্তু ওই তিরস্কার বৃথা! আপনাকে ভর্ৎসনা করিলেন কিন্তু শোধন করিতে পারিলেন না। যেদিকে মন ধাবিত হয়, তাহার অনুকূলে কখনো যুক্তির অভাব হয় না।— অবশেষে স্থির করিলেন— প্রেম তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্যই উক্ত মহিলাকে তাঁহার চক্ষের সম্মুখে স্থাপিত করিয়াছেন— অতএব তাঁহার হৃদয়ের অভাব এই মমতাময়ী মহিলাই পূর্ণ করিবেন। এইরূপে নূতন-প্রেম যখন তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময়ে কল্পনার স্বপ্নে একদিন যেন প্রত্যক্ষ সেই লোহিত-বসনা বিয়াত্রিচেকে দেখিতে পাইলেন— ভস্মাচ্ছন্ন পুরাতন প্রেমের বহ্নি আবার জ্বলিয়া উঠিল ও নূতন প্রেম অঙ্কুরেই শুকাইল!

'ভিটা নুওভা' কাব্যে বিদেশীয় পথিকদিগকে সম্বোধন করিয়া নিম্নলিখিত গীতিটি লিখিত আছে—

ধীরে যাইতেছে চলি, ওগো যাত্রীদল
যেন কোন্ দূর বস্তু করি কল্পনা—
মোদের দহিছে যেই বিষাদ অনল
তোমাদের পরশে নি যেন সে যাতনা!
তোমাদের নিজদেশ এতই কি দূরে?
এ শোকার্ত নগরীর যাও মধ্য দিয়া
বোধ হয় তবু যেন জান না, এ পুরে
কী মহান শোকানল দহিতেছে হিয়া!
তবু যদি একবার দাঁড়াও হেথায়,
কিছুক্ষণ মোর কথা শোনো মন দিয়া—
তা হলে বিদায়কালে বিষম ব্যথায়
যাবে চলি উচ্চ স্বরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া!
তিল মাত্র যার কথা করিলে বর্ণন,
তিল মাত্র যার কথা করিলে শ্রবণ,
মানুষ কাঁদিতে থাকে ব্যথিত অন্তর,
সেই বিয়াত্রিচে-হারা অভাগা নগর!

'ভিটা নুওভা' কাব্যে ইহার পরে আর-একটি মাত্র গীতি আছে। তাহাতে কবি কহিতেছেন, তাঁহার মন স্বর্গে গিয়াছিল, সেখানে দেখিলেন বিয়াত্রিচেকে দেবতারা পূজা করিতেছেন। সে বিয়াত্রিচেকে দেখিয়া কবি এমন বিস্মিত হইয়া গেলেন যে, ভাবিলেন, তাঁহাকে বর্ণনা করিতে গেলে এমন গভীর কথার প্রয়োজন হয় যে, সে কথার অর্থ তিনি নিজেই বুঝিতে পারেন না। তাহার পরেই বিয়াত্রিচে সম্বন্ধে যোগ্যতর কবিতা লিখিবেন স্থির করিয়া 'ভিটা নুওভা' কাব্য শেষ করিলেন।

বিয়াত্রিচে সম্বন্ধে যোগ্যতর কাব্য 'ডিভাইনা কমিডিয়া' (*Divina Commedia*)। 'ভিটা নুওভা' লেখা শেষ হইলে তাহার অনেক দিন পরে তাহা লিখিত হয়। এই কাব্য সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্বে দান্তের কবিতার বহির্ভূক্ত জীবনের বিষয়ে দুই-এক কথা বলিয়া লই।

দান্তের প্রকৃত নাম দুরান্তে আলিঘিয়ারি (Durante Alighieri)। তাঁহার সময়ে দুই দল ছিল। গুয়েলফ ও ঘিবেলীন (Guelf and Ghibelline) শ্বেত ও কৃষ্ণ, অর্থাৎ কুলীন ও সাধারণ অধিবাসী; ইহাদের উভয় দলের মধ্যে প্রায়ই বিপ্লব চলিত, একদল ক্ষমতাশালী হইলে অপর দল নিপীড়িত হইত। দান্তে Guelf অর্থাৎ কুলীন দলভুক্ত ছিলেন। তাঁহার সময়ে গুয়েলফ দলই ক্ষমতাশালী ছিল। 'ভিটা নুওভা' কাব্যে দান্তের প্রেমের কাহিনী পড়িলে মনে হয় না, দান্তে বাহিরের কোনো বিষয়ে লিপ্ত ছিলেন— মনে হয় তাঁহার চক্ষে সমুদয় জগতের সমষ্টি বিয়াত্রিচে, এ সংসারে আর কিছু নাই কেবল বিয়াত্রিচে, এ সংসারে আর কিছু করিবার নাই— কেবল বিয়াত্রিচের আরাধনা! যখন তিনি বিয়াত্রিচের প্রতি-হাস্যে প্রতি-উপেক্ষায় শিশুর ন্যায় রোদন করিতেছিলেন, প্রতি ক্ষুদ্র নমস্কারে দরিদ্রের রত্ন পাইতেছিলেন, তখন তিনি রাজ্য-শাসন সম্বন্ধেও দারুণ লিপ্ত ছিলেন। ক্যাম্প্যাল্‌ডিনো (Campaldino) সমরে তিনি স্বয়ং যুদ্ধ করিয়াছেন, ক্যাপ্রোনার যুদ্ধে তিনি উপস্থিত ছিলেন। গুয়েলফ দলের মধ্যে যখন আত্মবিবাদ উপস্থিত হয় তখন তিনি বিশেষ উদ্যমের সহিত তাহাদের মধ্যে একদলের সহায়তা করিতেছিলেন। বিয়াত্রিচের মৃত্যুর পর শাসনকার্য ভিন্ন তাঁহার অন্য কোনো কার্য ছিল না। রাজকার্যে নগরীর মধ্যে তিনি একজন বিখ্যাত লোক হইয়া উঠিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি রাজ্যের প্রধান শাসকদলভুক্ত হইলেন।

কিন্তু এই পদে তিনি দুই মাস কাল মাত্র ছিলেন। ইতিমধ্যে রাজ্যে তাঁহার এত শত্রু হইয়াছিল যে শীঘ্রই তাঁহাকে তাঁহার জন্মভূমি ফ্লোরেন্স নগরী হইতে জন্মের মতো নির্বাসিত হইতে হইল। এই নগরে প্রবেশাধিকার পাইবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। অবশেষে যখন তাঁহার কবিত্বের খ্যাতি চারি দিকে ব্যাপ্ত হইল— তখন ফ্লোরেন্সবাসীরা তাঁহাকে অনুতপ্ত বেশে দোষ স্বীকার করিতে করিতে নগরে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না। চিরজন্ম নির্বাসনে পরপ্রত্যাশী হইয়া তাঁহাকে কালযাপন করিতে হইয়াছিল। এইরূপে যখন বিয়াত্রিচেকে লইয়া হৃদয়ে তাঁহার ঝটিকা চলিতেছিল, তখন বাহিরের রাজ-বিপ্লব ঝটিকায় তিনি যে উদাসীন ছিলেন তাহা নহে। অনেক দিন রাজ্য সম্বন্ধে মগ্ন থাকিয়া বিয়াত্রিচের উদ্দেশে যোগ্যতর কবিতা লিখিতে পারেন নাই। কিন্তু কোনো বিশেষ সময়ে সহসা তাঁহার খ্যাতি মান যশের দুরাশা ছুটিয়া গেল ও মহাকাব্য এইরূপে আরম্ভ করিলেন—

জীবনের মধ্যপথে দেখিনু সহসা,
ভ্রমিতেছি ঘোর বনে পথ হারাইয়া—
সে যে কী ভীষণ অতি দারুণ গহন—
স্মৃতি তার ভয়ে মোরে করে অভিভূত!
সে ভয়ের চেয়ে মৃত্যু নহে ভয়ানক!

জীবনের মধ্য পথে, অর্থাৎ যখন তিনি তাঁহার পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে পৌঁছিয়াছেন— তিনি এই কাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন। ভীষণ অরণ্য আর কিছুই নহে— সে তাঁহার রাজ্য-শাসন-কার্য, খ্যাতি-প্রতিপত্তির নিমিত্ত সংগ্রাম। অর্ধ অজ্ঞানের মতো হইয়া যখন তিনি এই বনে ভ্রমণ করিতেছেন এমন সময়ে একটি চিতাবাঘ দেখিতে পাইলেন এবং এইরূপ পর্যায়ক্রমে একটি সিংহ ও ক্ষুধাতুরা এক নেকড়িয়া ব্যাঘ্রী দেখিতে পাইলেন। এ সমস্তই রূপক মাত্র, চিতাব্যাঘ্র সুখতৃষা, সিংহ দুরাশা ও নেকড়িয়া ব্যাঘ্রী লোভ। এইরূপে এই-সকল রিপুদিগের দ্বারা ভীত হইয়া অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন,

হেনকালে সহসা দেখিনু এক জন
বহুদিন মৌন রহি ক্ষীণ স্বর তাঁর—
'জীবিত বা মৃত আত্মা যে হও-না কেন
দয়া করো মোরে' আমি সমুচ্চে কহিনু
সে অরণ্য মাঝে যবে হেরিনু তাঁহারে।

ইনি আর কেহ নহেন— কবি বর্জিলের প্রেতাত্মা। তিনি দান্তেকে স্বর্গ ও নরক প্রদর্শন করাইতে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন বলিয়া প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু দান্তে ভয় প্রকাশ করিলেন—

মহাছায়া কহিলেন 'মিথ্যা আশঙ্কায়
হৃদয় হয়েছে তব বৃথা অভিভূত—
পশু যথা ভয় পায় সন্ধ্যার আঁধারে
হেরিয়া অলীক ছায়া— তেমনি মানুষ
মহান সংকল্প হতে হয় গো বিরত
বৃথা ভয়ে। এ আশঙ্কা করিবারে দূর—
কহি তোরে কোথা হতে এলেম হেথায়—
প্রথমে কাহার কথা করিয়া শ্রবণ
তোরে দয়া হল মোর, কহি তোরে তাহা।
পরলোকে থাকে যারা সংশয় আঁধারে—

তাহাদের মধ্যে মোর নিবাস কহিনু।
একদা রমণী এক আহ্বানিলা মোরে—
হেন পুণ্যময় মূর্তি এমন সুন্দরী
দেখেই অমনি তাঁর মাগিনু আদেশ—
অতিশয় মৃদু আর অতি সুকোমল
দেবতার স্বরে সুর বাঁধি, কহিলেন—
'অয়ি উপছায়া! তুমি যাহার সুযশ
যদিন প্রকৃতি রবে, রহিবে বাঁচিয়া—
এই অনুনয় মোর করহ শ্রবণ!—
বন্ধু এক মোর (নহে বন্ধু সম্পদের)
মহারণ্যে নিদারুণ বাধা বিঘ্ন পেয়ে—
ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছেন তিনি।
ভয় করি পাছে হন হেন পথহারা
আর তাঁরে একেবারে ফিরাতে না পারি!
উদ্দীপনা-বাক্যে তব, যে-কোনো উপায়ে,
ফিরাইয়া আনো, তবে লভিব বিরাম!
আসিয়াছি স্বর্গ হতে বিয়াত্রিচে আমি
প্রেম-উত্তেজনে আমি কৈনু অনুরোধ,

বর্জিল সেই বিয়াত্রিচের অনুরোধেই দান্তেকে ভ্রষ্ট-পথ হইতে ফিরাইতে আসিয়াছেন। দান্তে বর্জিলের সহিত নরক-দর্শন করিতে যাইতে আহ্লাদের সহিত সম্মত হইলেন। তৃতীয় স্বর্গে দান্তে নরকের তোরণে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তোরণে অস্ফুট অক্ষরে লিখা আছে—

মোর মধ্য দিয়া সবে যাও দুঃখদেশে;
মোর মধ্য দিয়া যাও চির-দুঃখভোগে—
চিরকাল তরে যারা হয়েছে পতিত,
মোর মধ্য দিয়া যাও তাহাদের কাছে!
ন্যায়ের আদেশে আমি হয়েছি নির্মিত—
অনন্ত জ্ঞান ও প্রেম স্বর্গীয় ক্ষমতা—
আমারে পোষণ করা কার্য তাহাদের!
মোর পূর্বে আর কিছু হয় নি সৃজিত—
অনন্ত-পদার্থ ছাড়া, তাই কহিতেছি
হেথায় অনন্ত কাল দহিতেছি আমি।
'হে প্রবেশি, ত্যজি স্পৃহা, প্রবেশ এ দেশে।'

কবি বর্জিল ভীত দান্তেকে সান্ত্বনা করিয়া এক স্থানে লইয়া গেলেন— সেখানে দীর্ঘশ্বাস, আর্তনাদ, ক্রন্দন, বিলাপ—

তারকা-অবিদ্ধ শূন্য করিছে ধ্বনিত,
শুনিয়া, প্রবেশি সেথা উঠিনু কাঁদিয়া।
নানাবিধ ভাষা আর ভয়ানক কথা,
যন্ত্রণার আর্তনাদ, ক্রোধের চীৎকার
করতালি— কঠোর ও ভগ্নকণ্ঠ-ধ্বনি—
নিরেট সে আঁধারের চার দিক ঘেরি
ঘূর্ণ-বায়ে রেণুসম ফিরিছে সতত!

এইরূপে আরম্ভ করিয়া কাব্যের প্রথম খণ্ড, অর্থাৎ ইনফর্নো, অর্থাৎ নরক— ক্রমাগত নরকের বর্ণনা; পরে পর্গেটরি— অর্থাৎ যাহাদের পরিত্রাণ পাইবার আশা আছে তাহাদের বাসভূমি— পরে স্বর্গ। ক্রমাগত একই পদার্থের বর্ণনার বিবরণ পাঠকদিগের নিদ্রাকর্ষক হইবে, এই নিমিত্ত তাহা হইতে বিরত হইলাম, পর্গেটরি কাব্যের শেষভাগে বিয়াত্রিচের সহিত কবির সাক্ষাৎ হইল।— বর্জিল ও দান্তে উভয়েই বিস্ময়ে দেখিলেন একটি আশ্চর্য রথে বিয়াত্রিচে আসিতেছেন। সুরবালারা তাঁহার চারি দিকে এমন পুষ্প-বৃষ্টি করিতেছেন যে, তাঁহার আকার অতি অস্ফুটভাবে দেখা যাইতেছে, দান্তে সে পুষ্পরাশির মধ্যে তাঁহাকে ভালো করিয়া দেখিতে পান নাই, চিনিতেও পারেন নাই— তিনি কহিতেছেন,

আঁখি মোর দেখে তাঁরে পারে নি চিনিতে,
তবু তাঁর দেহ হতে এমন একটি
বিকীরিত হতেছিল শুভ্র-পুণ্য-জ্যোতি,
তাহার পরশে যেন পুরাতন প্রেম
হৃদয়ে আমার পুন উঠিল জাগিয়া।
সেই পুরাতন স্বপ্ন কত শত দিন
যে স্বপ্নে হৃদয় মোর আছিল মগন—
যখনি উঠিল জাগি স্বর্গীয় কিরণে,
অমনি আকুল হয়ে ফিরিয়া ধাইনু।
কবি বর্জিলের পানে, শিশু সে যেমন
ভয় কিংবা শোক-ভারে হলে বিচলিত,
অমনি মায়ের বুকে যায় লুকাবারে!
ভাবিনু কাতর স্বরে কহিব তাঁহারে—
'প্রতি রক্তবিন্দু মোর কাঁপিছে শিরায়,
পুরানো সে অগ্নি পুন উঠিছে জ্বলিয়া।'
হা— বর্জিল কোথা— হয়েছেন অন্তর্ধান!
প্রিয়তম পিতা তুমি বর্জিল আমার!

দান্তেকে বর্জিলের এই সহসা অন্তর্ধানে ব্যথিত হইয়া কাঁদিতে দেখিয়া বিয়াত্রিচে কহিলেন যে 'দান্তে, কাঁদিয়ো না, ইহা অপেক্ষা তীক্ষ্ণতর ছুরিকা তোমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইবে ও তাহার যন্ত্রণায় তোমাকে কাঁদিতে হইবে।' সুরবালারা পুষ্পবৃষ্টি স্থগিত করিলেন ও পুষ্প-মেঘ-মুক্ত সূর্য প্রকাশ পাইলেন। বিয়াত্রিচে সেই উচ্চ রথের উপরি হইতে কহিলেন, 'চাহিয়া দেখো, আমি বিয়াত্রিচে।' বিয়াত্রিচের সেই 'অটল মহিমায়' দান্তে 'জননীর সম্মুখে ভীত সন্তানের' ন্যায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। বিয়াত্রিচে তখন তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, অল্পবয়সে দান্তের হৃদয় ধর্মে ভূষিত ছিল, বিয়াত্রিচে তাঁহার যৌবনময় চক্ষের আলোকে তাঁহাকে সর্বদাই সৎপথে লইয়া যাইতেন। কিন্তু তিনি যখন তাঁহার মর্ত্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া অমর দেহ ধারণ করিলেন, যখন ধূলি-আবরণ হইতে মুক্ত হইয়া পুণ্য ও সৌন্দর্যে অধিকতর ভূষিত হইলেন, তখন তাঁহার প্রতি দান্তের সে ভালোবাসা কমিয়া গেল। বিয়াত্রিচের তীব্র ভর্ৎসনায় তিনি অতিশয় যন্ত্রণা পাইলেন। পরে অনুতাপ-অশ্রু বর্ষণ করিয়া ও স্বর্গের নদীতে স্নান করিয়া তিনি পাপ-বিমুক্ত হইলেন। তখন তিনি তাঁহার প্রিয়তমা সঙ্গিনীর সহিত স্বর্গ দর্শনে চলিলেন। যখন স্বর্গনরক পরিভ্রমণ করা শেষ হইল, তখন কবি কহিলেন—

জাগি উঠি স্বপ্ন যদি ভুলে যাই সব,
তবু তার ভাব যেমন থাকে মনে মনে,

তেমনি আমারো হল, স্বপ্ন গেল ছুটে
মাধুর্য তবুও তার রহিল হৃদয়ে।

ভারতী
ভাদ্র ১২৮৫

পিত্রার্কা ও লরা

এ কথা বোধ হয় বলাই বাহুল্য যে, দান্তের মতো পিত্রার্কাও একজন প্রখ্যাতনামা ইতালীয় কবি ছিলেন। দান্তে যেমন তাঁহার মহাকাব্যের মহান ভাব দ্বারা সমস্ত য়ুরোপমণ্ডল উত্তেজিত করিয়াছিলেন, পিত্রার্কাও তেমনি তাঁহার সুললিত গীতি ও গাথা দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু দান্তে ও পিত্রার্কে আবার অনেক বিষয়ে এমন সৌসাদৃশ্য ছিল যে, সকল বিষয় উল্লেখ করিতে হইলে আমাদের এই প্রবন্ধটি অতি দীর্ঘকায় হইয়া পড়ে, সেইজন্য কেবল তাঁহাদের প্রণয়ের কথাই বর্ণনা করিতেছি।

দান্তের যেমন বিয়াত্রিচে, পিত্রার্কার তেমনি লরা। দান্তের ন্যায় তাঁহার লরাও অপ্রাপ্য, অনধিগম্য, দান্তের ন্যায় তিনিও দূর হইতে লরাকে দেখিয়াই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন। পিত্রার্কারও লরার সহিত তেমন ভালো করিয়া কথাবার্তা, আলাপ-পরিচয় হয় নাই। লরার ভবনে পিত্রার্কা কখনো যাইতে পান নাই, লরার নিকট হইতে তাঁহার প্রেমের কিছুমাত্র প্রত্যুপহার পান নাই। পিত্রার্কা কহিয়াছেন, লরা সংগীত ও কবিতার প্রতি উদাসীন। তাঁহার সমক্ষে তাহার মুখশ্রী সর্বদাই দৃঢ় ভাব প্রকাশ করিত। পিত্রার্কা তাঁহার অসংখ্য চিঠির মধ্যে একবার ভিন্ন কখনো লরার নামোল্লেখ করেন নাই, বোধ হয়, বন্ধুবর্গের প্রতি সাধারণ চিঠিপত্রে লরার নাম ব্যবহার করিতে তিনি কেমন সংকোচ বোধ করিতেন, বোধ হয় মনে করিতেন তাহাতে সে নামের গৌরব হানি হইবে। লরার যৌবনের অবসান, লরার মৃত্যু, তাঁহার প্রতি লরার ঔদাসীন্য কিছুই তাঁহার মহান প্রেমকে বিচলিত করিতে পারে নাই। বরঞ্চ লরার মৃত্যু তাঁহার প্রেমকে নূতন বল অর্পণ করে, কেননা এ পৃথিবীতে লরার সহিত তাঁহার সম্পর্ক অতি দূর ছিল, লরার প্রেম তাঁহার অপ্রাপ্য ও তাঁহার প্রেম লরার অগ্রাহ্য ছিল, কিন্তু লরা যখন দেহের সহিত সমাজ বন্ধন পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, তখন পিত্রার্কা অসংকোচে লরার আত্মার চরণে তাঁহার প্রেম উপহার দিতেন ও লরা তাহা অসংকোচে গ্রহণ করিতেছেন কল্পনা করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন। পিত্রার্কা কহিতেছেন—

যে রাত্রে লরা এই পৃথিবীর দুঃখ যন্ত্রণা চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিলেন, তাহার পররাত্রে তিনি স্বর্গ হইতে এই শিশিরে (শিশিরাক্ত পৃথিবীতে) নামিয়া আসিলেন, তাঁহার অনুরক্ত প্রেমিকের নিকট আবির্ভূত হইলেন ও হাত বাড়াইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন— 'সেই স্ত্রীলোক, যাহাকে দেখিয়া অবধি তোমার তরুণহৃদয় জন-কোলাহল হইতে বিভিন্ন পথে গিয়াছে, তাহাকে চেনো!' যখন আমার অশ্রুজল তাঁহার বিয়োগ-দুঃখ সূচনা করিল, তখন তিনি কহিলেন, 'যতদিন তুমি পৃথিবীর দাস হইয়া থাকিবে, ততদিন কিছুতেই সুখী হইতে পারিবে না। পবিত্র হৃদয়েরা জানেন, মৃত্যু অন্ধকার-কারাগার হইতে মুক্তি। যদি আমার আনন্দের এক-সহস্রাংশও তুমি জানিতে, তবে আমার মৃত্যুতে তুমি সুখ অনুভব করিতে।' এই বলিয়া তিনি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বর্গের দিকে নেত্র ফিরাইলেন। তিনি নীরব হইলে আমি কহিলাম, 'ঘাতকদিগের দ্বারা প্রযুক্ত যন্ত্রণা ও বার্ধক্যের ভার কি সময়ে সময়ে মৃত্যু-যন্ত্রণাকে তীব্রতর করে না?' তিনি কহিলেন, 'স্বীকার করি, যন্ত্রণা ও সম্মুখস্থ অনন্তকালের আশঙ্কা মৃত্যুর পূর্বে অনুভব করা যায়, কিন্তু যদি আমরা ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করি, তবে প্রাণত্যাগ নিশ্বাসের ন্যায় অতি সহজ হয়! আমার

বিকশিত যৌবনের সময় যখন তুমি আমাকে সর্বাপেক্ষা ভালোবাসিতে, তখন জীবনের প্রতি আমার অত্যন্ত মায়া ছিল, কিন্তু যখন আমি ইহা পরিত্যাগ করিলাম, তখন নির্বাসন হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আসিবার আমোদ অনুভব করিতে লাগিলাম। তখন তোমার প্রতি দয়া ভিন্ন অন্য কষ্ট পাই নাই!' আমি বলিয়া উঠিলাম, 'সেই সত্যপ্রিয়তা যাহা তুমি পূর্বে জানিতে এবং সর্বান্তর্যামীর নিকট থাকিয়া এখন যাহা অধিকতর জান, সেই সত্যপ্রিয়তার নামে জিজ্ঞাসা করিতেছি, বলো, আমার প্রতি সেই দয়া কি প্রেমের দ্বারাই উত্তেজিত হয় নাই?' আমার এই কথা শেষ না হইতে হইতেই দেখিলাম, সেই স্বর্গীয় হাস্য, যাহা চিরকাল আমার দুঃখের উপর শান্তি বর্ষণ করিয়া আসিয়াছে, সেই হাস্যে তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল— তিনি নিশ্বাস ফেলিলেন ও কহিলেন, 'চিরকাল তুমি আমার প্রেম পাইয়া আসিয়াছ ও চিরকালই তাহা পাইবে। কিন্তু তোমার প্রেম সংযত করিয়া রাখা আমার উচিত মনে করিতাম!' মাতা যখন তাহার পুত্রকে ভর্ৎসনা করেন, তখন যেমন তাঁহার ভালোবাসা প্রকাশ পায় এমন আর কখনো নয়। কতবার আমি মনে মনে করিয়াছি— 'উনি উন্মত্ত অনলে দগ্ধ হইতেছেন, অতএব উঁহাকে আমার হৃদয়ের কথা কখনো বলিব না। হায়, যখন আমরা ভালোবাসি অথচ শঙ্কায় ত্রস্ত থাকি, তখন এ-সব চেষ্টা কী নিষ্ফল কিন্তু আমাদের সম্ভ্রম বজায় রাখিবার ও ধর্মপথ হইতে ভ্রষ্ট না হইবার এই একমাত্র উপায় ছিল। কতবার আমি রাগের ভান করিয়াছি, কিন্তু তখন হয়তো আমার হৃদয়ে প্রেম যুঝিতেছিল। যখন দেখিতাম তুমি বিষাদের ভরে নত হইয়া পড়িতেছ, তখন হয়তো তোমার প্রতি সান্ত্বনার দৃষ্টি বর্ষণ করিতাম, হয়তো কথা কহিতাম! দুঃখ এবং ভয়েই নিশ্চয় আমার স্বর পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল, তুমি হয়তো তাহা দেখিয়াছ! যখন তুমি রোষে অভিভূত হইয়াছ তখন হয়তো আমি আমার একটি দৃঢ়-দৃষ্টির দ্বারা তোমাকে শাসন করিতাম! এই-সকল কৌশল, এই-সকল উপায়ই আমি অবলম্বন করিয়াছিলাম। এইরূপে কখনো অনুগ্রহ, কখনো দৃঢ়তার দ্বারা তোমাকে কখনো সুখী কখনো বা অসুখী করিয়াছি, যদিও তাহাতে শ্রান্ত হইয়াছিলে, কিন্তু এইরূপে তোমাকে সমুদয় বিপদের বাহিরে লইয়া গিয়াছিলাম, এইরূপে আমাদের উভয়কেই পতন হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিলাম— এবং এই কথা মনে করিয়া আমি অধিকতর সুখ উপভোগ করি!' যখন তিনি কহিতে লাগিলেন, আমার নেত্র হইতে অশ্রু পড়িতে লাগিল— আমি কাঁপিতে কাঁপিতে উত্তর দিলাম— যদি আমি তাঁহার কথা স্পর্ধাপূর্বক বিশ্বাস করিতে পারি, তবে আমি আপনাকে যথার্থ পুরস্কৃত জ্ঞান করি!— আমাকে বাধা দিয়া তিনি কহিলেন, বলিতে বলিতে তাঁহার মুখ আরক্তিম হইয়া আসিল 'হা— অবিশ্বাসী, সংশয় করিতেছ কেন? যদিও আমার হৃদয়ে যেমন ভালোবাসা ছিল আমার নয়নে তেমন প্রকাশ পাইত কি না, সে কথা আমার রসনা কখনোই ব্যক্ত করিবে না, কিন্তু এই পর্যন্ত বলিতে পারি— তোমার ভালোবাসায়, বিশেষত তুমি আমার নামকে যে অমরত্ব দিয়াছ তাহাতে যেমন সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম এমন আর কিছুতে না। আমার এই একমাত্র ইচ্ছা ছিল তোমার অতিরিক্ততা কিছু শমিত হয়। আমার কাছে তোমার হৃদয়ের গোপন-কাহিনী খুলিতে গিয়া তাহা সমস্ত পৃথিবীর নিকট খুলিয়াছ এই কারণেই তোমার উপরে আমার বাহ্য-ঔদাসীন্য জন্মে। তুমি যতই দয়ার নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে ভিক্ষা করিয়াছ, আমি ততই লজ্জা ও ভয়ে নীরব হইয়া গিয়াছি। তোমার সহিত আমার এই প্রভেদ ছিল— তুমি প্রকাশ করিয়াছিলে, আমি গোপন করিয়াছিলাম— কিন্তু প্রকাশে যন্ত্রণা যে বর্ধিত হয় ও গোপনে তাহা হ্রাস হয় এমন নহে।' তাঁহার অনুরক্ত তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তাঁহার সহিত যুক্ত হইবার আর কত বিলম্ব আছে? লরা এই বলিয়া চলিয়া গেলেন, 'যতদূর আমি জানি তাহাতে তুমি আমার বিয়োগ সহিয়া অনেক দিন পৃথিবীতে থাকিবে।' পিত্রার্কা লরার মৃত্যুর পর ছাব্বিশ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন।

এইরূপে পিত্রার্কা লরার দৃঢ়তা, তাঁহার প্রতি উদাসীনতার মধ্য হইতেও তাঁহার আপনার ইচ্ছার অনুকূল অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি সহজেই মনে করিতে পারেন যে, লরার

তাঁহার প্রতিই এত বিশেষ উদাসীনতার কারণ কী, তিনি তো তাহার বিরক্তিজনক কোনো কাজ করেন নাই। অবশ্যই লরা তাঁহাকে ভালোবাসে। এই মীমাংসা অনেকে বুঝিতে না পারুন, কিন্তু ইহার মধ্যে অনেকটা সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। লরা যদি তাঁহাকে ভালো না বাসিত, তবে অন্য লোকের সহিত যেরূপ মুক্তভাবে কথাবার্তা করিত, তাঁহার সহিতও সেইরূপ করিত; এ কথাটার মধ্যে অনেকটা হৃদয়-তত্ত্বজ্ঞতা আছে, কিন্তু ইহা যে ঠিক সত্য, তাহা বলা যায় না, লরা যে তাঁহাকে ভালোবাসিত, তাহার কোনো প্রমাণ নাই। পিত্রার্কা যেরূপ প্রকাশ্যভাবে কবিতা দ্বারা তাঁহার প্রণয়িনীর আরাধনা করিতেন, তাহাতে লরা তাঁহার প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইয়া বিবেচনার কাজ করিয়াছিল— পিত্রার্কার সহিত সামান্য কথোপকথনেও তাহার উপর লোকের সন্দিগ্ধচক্ষু পড়িত, সন্দেহ নাই। বিশেষত লরার স্বামী অতিশয় সন্দিগ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে লরা অতিশয় সুগৃহিণী ছিল বলিয়াই তো স্থির হইয়াছে। যদি সত্য সত্যই লরা মনে মনে পিত্রার্কাকে ভালোবাসিতেন, তবে আমরা লরার একটি মহান মূর্তি দেখিতে পাই— ভালোবাসিয়াছেন অথচ প্রকাশ করেন নাই— পিত্রার্কার প্রেমে কিছুমাত্র উৎসাহ দেন নাই— বরং তাঁহার প্রেমের স্রোত ফিরাইতেই চেষ্টা করিয়াছিলেন— প্রেম তাঁহাকে তাঁহার কর্তব্যপথ হইতে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই, বরং বোধ হয় তাঁহাকে কর্তব্যপথে অধিকতর নিয়োজিত করিয়াছিল।

জন-কোলাহল হইতে দূরে থাকিবার জন্য পিত্রার্কা ভোক্লুসের উপত্যকায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই উপত্যকার দৃশ্য অতিশয় সুন্দর। এখানকার মোহিনী বিজনতার মধ্যে থাকিয়া, পিত্রার্কার হৃদয় হইতে যে প্রথম কবিতা উৎসারিত হয় তাহা লরার উদ্দেশে প্রেম-গীতি। প্রকৃতির প্রতি সৌন্দর্যের মধ্যে তিনি যেন লরার সত্তা অনুভব করিতেন।

প্রতি উচ্চ-শাখাময় সরল কানন,
প্রতি স্নিগ্ধ ছায়া মোর ভ্রমণের স্থান;
শৈলে শৈলে তাঁর সেই পবিত্র-আনন
দেখিবারে পায় মোর মানস-নয়ন।
সহসা ভাবনা হতে উঠি যবে জাগি,
প্রেমে মগ্ন মন মোর বলে গো আমায়
'কোথায় ভ্রমিছ ওগো, ভ্রমিছ কী লাগি?
কোথা হতে আসিয়াছ, এসেছ কোথায়?'
হৃদে মোর এইসব চঞ্চল-স্বপন
ক্রমে ক্রমে স্থির চিন্তা করে আনয়ন,
আপনারে একেবারে যাই যেন ভুলি
দহে গো আমারে শুধু তারি চিন্তাগুলি।
মনে হয় প্রিয়া যেন আসিয়াছে কাছে
সে ভুলে উজলি উঠে নয়ন আমার,
চারি দিকে লরা যেন দাঁড়াইয়া আছে
এ স্বপ্ন না ভাঙে যদি কী চাহি গো আর?
দেখি যেন (কেবা তাহা করিবে বিশ্বাস?)
বিমল সলিল কিংবা হরিত কানন
অথবা তুষার-শুভ্র উষার আকাশ
তাঁহারি জীবন্ত-ছবি করিছে বহন!

...

দুর্গম-সংসারে যত করি গো ভ্রমণ,
ঘোরতর মরু মাঝে যতদূর যাই,
কল্পনা ততই তার মুরতি মোহন
দিশে দিশে আঁকে, যেন দেখিবারে পাই।
অবশেষে আসে ধীরে সত্য সুকঠোর
ভাঙি দেয় যৌবনের সুখস্বপ্ন মোর!

কখনো বা সেই মনোহর শৈলের প্রতি নির্ঝর তটিনী বৃক্ষলতায়, তিনি তাঁহার বিষণ্ণ-মর্মের নিরাশা সংগীত গাহিয়া গাহিয়া বেড়াইতেন—

বিমল বাহিনী ওগো তরুণ-তটিনী।
উজ্জ্বল-তরঙ্গে তব, প্রেয়সী আমার—
ভক্ত হৃদয়ের মম একমাত্র দেবী
সৌন্দর্য তাঁহার যত করেছেন দান!
শুন গো পাদপ তুমি, তব দেহ-'পরে
ভর দিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন সে দেবী,
নত হয়ে পড়েছিল ফুল পত্রগুলি
বসনের তলে; বক্ষ সুবিমল তার
পরশিয়াছিলে তব সুধা আলিঙ্গনে।
তুমি বায়ু সেইখানে বহিতেছ সদা
যেইখানে প্রেম আসি দেখাইলা মোরে
প্রিয়ার নয়নে শোভে ভাণ্ডার তাহার!
শুন গো তোমরা সবে আর-একবার
এই ভগ্ন-হৃদয়ের শেষ দুঃখ-গান!
অবশ্য ফলিবে যদি ভাগ্যের লিখন।
অবশ্যই অবশেষে প্রেম যদি মোর
অশ্রুময় আঁখিদ্বয় করে গো মুদিত,
ভ্রমিবে যখন আত্মা স্বদেশ আকাশে
তখন দেখো গো যেন এই প্রিয়-স্থানে
অভাগার শেষ-চিহ্ন হয় গো নিহিত!
মরণের কঠোরতা হবে কত হ্রাস,
যদি এই প্রিয় আশা, সেই ভয়ানক
অনন্তের পথ করে পুষ্প-বিকীরিত!
এই কাননের মতো সুশীতল ছায়া
কোথা আছে পৃথিবীতে, শ্রান্ত আত্মা যেথা
এক মুহূর্তের তরে করিবে বিশ্রাম!
নাহিকো এমন শান্ত হরিত-কবর
যেখানে সংসার-শ্রমে পরিশ্রান্ত-দেহ
ঘুমাইবে পৃথিবীর দুখ শোক ভুলি!

বোধ হয় একদিন সে মোর প্রেয়সী
স্বর্গীয়-সুন্দরী সেই নিষ্ঠুর-দয়ালু—

একদিন এইখানে আসিবে কি ভাবি,
যেইখানে একদিন মুগ্ধ নেত্র মোর
উজ্জ্বল সে নেত্র-'পরে রহিত চাহিয়া!
হয়তো নয়ন তাঁর আপনা আপনি
খুঁজিয়া খুঁজিয়া মোরে চারি দিক পানে
আমার কবর সেই পাইবে দেখিতে!
হয়তো শিহরি তার উঠিবে অন্তর,
হয়তো একটি তার বিষাদ-নিশ্বাস
জাগাইবে মোর 'পরে স্বর্গের করুণা!

...

এখনো সে মনে পড়ে— যবে পুষ্প বন
বসন্তের সমীরণে হইয়া বিনত
সুরভিকুসুমরাশি করিত বর্ষণ,
তখন রক্তিম-মেঘে হইয়া আবৃত
বসিতেন প্রকৃতির উপহার মাঝে।
কভু বা বসনে তাঁর কভু বা কুন্তলে
প্রকৃতি কুসুম-গুচ্ছ দিত সাজাইয়া।
চারি দিকে তাঁর, কভু তটিনী-সলিলে—
কভু বা তৃণের 'পরে পড়িত ঝরিয়া
পুষ্প বন হতে কত পুষ্প রাশি রাশি!
চারি দিকে তরুলতা কহিত মর্মরি
'প্রেম হেথা করিয়াছে সাম্রাজ্য বিস্তার!'

পূর্বেই বলিয়াছি, পিত্রার্কার মনে মনে বিশ্বাস ছিল, বা এক-একবার বিশ্বাস হইত যে লরা তাঁহাকে ভালোবাসে। অনেক কবিতাতেই তাঁহার এই বিশ্বাস প্রকাশ পাইত। অনুরাগের নেত্র অনুরাগের কাহিনী যেমন পড়িতে পারে, যুক্তিকে তাহার নিকট অনেক সময় পরাস্ত মানিতে হয়। লরার দৃঢ় দৃষ্টির মধ্যে হয়তো পিত্রার্কা গুপ্তপ্রেমের আভা দেখিতে পাইয়াছিলেন, যুক্তি এখন তাহা অনুধাবন করিতে পারিতেছে না, হয়তো তখনো পারিত না। এক সময়ে পিত্রার্কা যখন দূর-দেশে ভ্রমণ করিবার জন্য যাইতেছিলেন, তখন লরাকে দেখিয়া তিনি কহিতেছেন—

সুকোমল ম্লান ভাব কপোলে তাঁহার
ঢাকিল সে হাসি তাঁর, ক্ষুদ্র মেঘ যথা!
প্রেম হেন উথলিল হৃদয়ে আমার
আঁখি কৈল প্রাণপণ কহিবারে কথা!
তখন জানিনু আমি স্বরগ-আলয়ে
কী করিয়া কথা হয় আত্মায় আত্মায়;
উজলি উঠিল তাঁর দয়া দিকচয়ে
আমি ছাড়া আর কেহ দেখে নি গো তায়!

...

সবিষাদে অবনত নয়ন তাঁহার
নীরবে আমারে যেন কহিল সে এসে,
'কে গো হায় বিশ্বাসী এ বন্ধুরে আমার
লইয়া যেতেছে ডাকি এত দূর-দেশে?'

শীতের পত্রহীন তরুশাখায় বসিয়া সন্ধ্যাকালে বিহঙ্গম বিষণ্ণ-সংগীত গাহিতেছিল, কবির হৃদয়ের স্বরে তাহার স্বর মিলিয়া গেল, তিনি গাহিয়া উঠিলেন—

হা রে হতভাগ্য বিহঙ্গম সঙ্গীহীন।
সুখ-ঋতু অবসানে গাহিছিস গীত!
ফুরাইছে গ্রীষ্ম ঋতু ফুরাইছে দিন
আসিছে রজনী ঘোর আসিতেছে শীত!
ওরে বিহঙ্গম, তুই দুখ-গান গাস
যদি জানিতিস কী যে দহিছে এ প্রাণ
তা হলে এ বক্ষে আসি করিতিস বাস,
এর সাথে মিশাতিস বিষাদের গান!
কিন্তু হা— জানি না তোর কিসের বিষাদ,
ভ্রমিস রে যার লাগি গাহিয়া গাহিয়া,
হয়তো সে বেঁচে আছে বিহঙ্গিনী প্রিয়া,
কিন্তু মৃত্যু এ কপালে সাধিয়াছে বাদ!
সুখ দুঃখ চিন্তা আশা যা-কিছু অতীত,
তাই নিয়ে আমি শুধু গাহিতেছি গীত!

যখন তাঁহার লরার বর্তমানে প্রকৃতির মুখশ্রী আরও উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিত, তখন তিনি গাহিতেন—

কী সৌন্দর্য-স্রোত হোথা পড়িছে ঝরিয়া!
স্বর্গ দিতেছেন ঢালি কী আলোক-রাশি!

...

চরণে হরিত-তৃণ উঠে অঙ্কুরিয়া
শত বর্ণময় ফুল উঠিছে বিকাশি!
হর্ষময় ভক্তিভরে সায়াহ্ন-বিমান
সমুদয় দীপ তার করেছে জ্বলিত,
প্রচারিতে দিশে দিশে তার যশোগান
পাইয়া যাহার শোভা হয়েছে শোভিত!

আবার কখনো বা সন্ধ্যাকালে একাকী বিজনে বসিয়া ভগ্নহৃদয়ে নিরাশার গীতি গাহিতেছেন।—

স্তব্ধ সন্ধ্যাকালে যবে পশ্চিম আকাশে
রবি অস্তাচলগামী পড়েছে ঢলিয়া,
বৃদ্ধ যাত্রী কোন্ এক অজ্ঞাত প্রবাসে
শ্রান্ত-পদক্ষেপে একা যেতেছে চলিয়া।
তবু যবে ফুরাইয়া যাবে শ্রম তার,
তখন গভীর ঘুমে মজিয়া বিজনে
ভুলে যাবে দিবসের বিষাদের ভার,
যত ক্লেশ সহিয়াছি সুদূর-ভ্রমণে!
কিন্তু হায় প্রভাতের কিরণের সনে
যে জ্বালা জাগিয়া উঠে হৃদয়ে আমার,
রবি যবে ঢলি পড়ে পশ্চিম গগনে,
দ্বিগুণ সে জ্বালা হৃদি করে ছারখার!

প্রজ্বলন্ত রথচক্র নিম্ন পানে যবে
লয়ে যান সূর্যদেব, অসহায় ভবে
রাখি রাত্রি-কোলে, যার দীর্ঘীকৃত ছায়া
প্রত্যেক গিরিশিখর সমুন্নত-কায়া
উপত্যকা-'পরে দেয় বিস্তারিত করি;
তখন কৃষক হল লয়ে স্কন্ধোপরি,
ধরি কোন্ গ্রাম্যগীত অশিক্ষিত স্বরে,
চিন্তা ঢালি দেয় তার বন্য-বায়ু-'পরে!

...

চিরকাল সুখে তারা করুক যাপন!
আমার আঁধার দিনে হর্ষের কিরণ
এক তিল অভাগারে দেয় নি আরাম,
এক মুহূর্তের তরে দেয় নি বিরাম!
যে গ্রহ উঠিয়া কেন উজলে বিমান
আমার যে দশা তাহা রহিল সমান!

দগ্ধ হয়ে মর্মভেদী মর্ম-যন্ত্রণায়
এ বিলাপ করিতেছি, দেখিতেছি হায়—
অতি ধীর পদক্ষেপে স্বাধীনতা সুখে
হল-যুগ-মুক্ত বৃষ ধায় গৃহ-মুখে!
আমি কি হব না মুক্ত এ বিষাদ হতে,
সদাই ভাসিবে আঁখি অশ্রু-জল-স্রোতে!
তার সেই মুখপানে চাহিল যখন
কী খুঁজিতেছিল মোর নয়ন তখন?
এক দৃষ্টে চাহিনু স্বর্গীয় মুখপানে
সৌন্দর্য অমনি তার বসি গেল প্রাণে
কিছুতে সে মুছিবে না যত দিনে আসি
মৃত্যু এই জীর্ণ-দেহ না ফেলে বিনাশি!

এই বলিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করি যে, পিত্রার্কা তাঁহার সমসাময়িক লোকদিগের নিকট হইতে যেমন আদর পাইয়াছিলেন, এমন বোধ হয় আর কোনো কবি পান নাই। একদিনেই তিনি প্যারিস ও রোম হইতে লরেল-মুকুট গ্রহণ করিবার জন্য আহূত হন। তিনি নানা দেশে ভ্রমণ করেন, এবং যে দেশে গিয়াছিলেন সেইখানেই তিনি সমাদৃত হইয়াছিলেন। নৃপতিরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিতেন। তিনি যে রাজসভায় বাস করিতেন, কখনো তাঁহাকে অধীনভাবে বাস করিতে হয় নাই, তিনি যেন রাজ-পরিবারমধ্যে ভুক্ত হইয়া থাকিতেন। লরার নামকে তিনি অমরত্ব প্রদান করিলেন বলিয়া তিনি মনে মনে যে সন্তোষময় গর্ব অনুভব করিতেন, তাঁহার সে গর্ব সার্থক হইল। পাঁচশত বৎসরের কালস্রোত পৃথিবীর স্মৃতিপট হইতে লরার নাম মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। তাঁহার নামের সহিতই চিরকাল লরার নাম যুক্ত হইয়া থাকিবে; পিত্রার্কাকে স্মরণ করিলেই লরাকে মনে পড়িবে, লরাকে স্মরণ করিলেই পিত্রার্কাকে মনে পড়িবে।

ভারতী
আশ্বিন ১২৮৫

গেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ

গেটের বোধ হয় বিশেষ পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই। যিনি জর্মান-সাহিত্যের অহংকার ও অলংকারস্বরূপ, যিনি 'ফস্ট' নামক নাটক লিখিয়া মানব হৃদয়ের সূক্ষ্মতম শিরা পর্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিয়াছিলেন, যিনিই প্রথমে য়ুরোপমণ্ডলে আমাদের শকুন্তলার আদর বর্ধিত করিয়াছিলেন, তাঁর নূতন পরিচয় কী দিব?— কিন্তু তিনি অদ্বিতীয়রূপে সূক্ষ্মদর্শী ও বহুদর্শী হইয়াও জীবনে কতদূর দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন তাহা দেখাইবার জন্য পাঠকদের সম্মুখে তাঁহার প্রেম-কাহিনী আজ উদ্‌ঘাটিত করিতেছি—

গেটে তাঁহার পঞ্চদশ বৎসর বয়স হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ভালোবাসিয়া আসিয়াছেন, অথচ বিয়াত্রিচে বা লরার ন্যায় তাঁহার একটি প্রণয়িনীরও নাম করিতে পারিলাম না। দান্তে ও পিত্রার্কার প্রেম প্রেমের আদর্শ, আর গেটের প্রেম পার্থিব অর্থাৎ সাধারণ। শুদ্ধ যে গেটের দুর্বল প্রেম নিরাশা ও উপেক্ষা সহিয়াই স্থির থাকিতে পারে না এমন নহে, সে প্রেমের স্বভাব এই যে, তাহার আশা পূর্ণ হইলেই সে আর থাকিতে পারে না। গেটের প্রেম এক দ্বারে নিরাশ হইলে অমনি আর-এক দ্বারে যাইত, আবার আশা পূর্ণ হইলেও থাকিত না। গেটের পক্ষে আশাপূর্ণতা ও নৈরাশ্য উভয়ই সমান কার্য করিত; এ প্রেমের উপায় কী? গেটের জীবনে এক-একটি প্রেম-আখ্যান শেষ হইলে, অমনি তাহা লইয়া তিনি নাটক রচনা করিতেন, দান্তে বা পিত্রার্কার ন্যায় কবিতা লিখিতেন না। বাস্তব ঘটনাই নাটকের প্রাণ, আদর্শ জগৎই কবিতার বিলাসভূমি। যাহা হইয়া থাকে, নাটককারেরা তাহা লক্ষ করেন— যাহা হওয়া উচিত কবিদের চক্ষে তাহাই প্রতিভাত হয়। গেটে তাঁহার নিজের প্রেম নাটকে গ্রথিত করিতে পারিতেন, সাধারণ লোকেরা তাহাতে তাঁহার নিজ-হৃদয়ের আভাস পাইত। কিন্তু বিয়াত্রিচের প্রতি-অভিবাদনে, দান্তের হৃদয়ে যে ভাবতরঙ্গ উঠিত, তাহা তিনি কবিতাতেই প্রকাশ করিতে পারিতেন, তাহা দান্তে ভিন্ন আর কাহারও মুখে সাজিত না।

গেটে কহেন, বাল্যকালে তিনি ফুলের পাপড়ি ছিঁড়িয়া দেখিতেন তাহা কীরূপে সজ্জিত আছে— পাখির পালক ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া দেখিতেন তাহা ডানার উপর কীরূপে গ্রথিত আছে। বেটিনা তাঁহার প্রণয়িনীদের মধ্যে একজন। তিনি বলেন, রমণীর হৃদয় লইয়াও গেটে সেইরূপ করিয়া দেখিতেন। তিনি তাহাদের প্রেম উদ্রেক করিতেন— এবং প্রেম-কাহিনী সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য কল্পনার সাহায্যে নিজেও কিয়ৎপরিমাণে প্রেম অনুভব করিতেন, কিন্তু সে প্রেম তাঁহার ইচ্ছাধীন, প্রয়োজন অতীত হইলেই সে প্রেম দূর করিতে তাঁহার বড়ো একটা কষ্ট পাইতে হয় নাই। গেটে নিজেই কহেন, যদি বা প্রেম লইয়া তাঁহার হৃদয়ে কখনো আঘাত লাগিত, সে বিষয়ে একটি নাটক লিখিলেই সমস্ত চুকিয়া যাইত।[১] যতখানি পর্যন্ত ভালোবাসিলে কোনো আশঙ্কার সম্ভাবনা নাই, গেটে ততখানি পর্যন্ত ভালোবাসিতেন, তাহার উর্ধ্বে আর নহে।

বাল্যকাল হইতেই গেটের সকল শ্রেণীর লোকদের রীতিনীতি পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিবার ভাব ছিল। এই কারণে তিনি এক-এক সময় অত্যন্ত নীচ শ্রেণীর লোকদের সহিত মিশিতেন। তিনি পঞ্চদশ বৎসর বয়সে একবার এইরূপ এক শ্রেণীর লোকদের মধ্যে একটি রাত্রিভোজে উপস্থিত ছিলেন। অভ্যাগতগণ বার বার মদ্য প্রার্থনা করিলে দাসীর পরিবর্তে একটি বালিকা

---

১. ম্যানফ্রেডের সমালোচনায় গেটে লিখিয়াছেন যে, বাইরন ফ্লোরেন্সে এক বিবাহিতা মহিলার প্রেমে পড়েন, কিন্তু এই প্রেমবৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া স্বামী আপন স্ত্রীকে হত্যা করে, কিন্তু সেই রাত্রেই বিছানার উপরে তাহারও মৃতদেহ দৃষ্ট হয়, বাইরন সেই রাত্রেই ফ্লোরেন্স ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ম্যানফ্রেডে যে রমণীর প্রেতাত্মার কথা বর্ণিত আছে সে পূর্বোক্ত মহিলা। গেটে লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু এ গল্পটির কোনো মূল্য নাই, সম্পূর্ণ কাল্পনিক। গেটে নিজের সাদৃশ্য মনে করিয়াছিলেন, বাইরনও আপনার জীবনের ঘটনা হইতেই উক্ত নাটক লিখিয়া থাকিবেন।

আসিল। সে মৃদু হাস্যে নমস্কার করিয়া কহিল— 'দাসী অসুস্থা, শুইতে গিয়াছে, আপনাদের কী প্রয়োজন, আমাকে অনুমতি করুন।' এই রমণীকে দেখিয়া গেটের হৃদয় অতিশয় মুগ্ধ হইল— তিনি তাহাকে অতিশয় সুন্দরী দেখিলেন— তাহার বসন, ভূষণ, গঠন, তাহার টুপিটি পর্যন্ত তাঁহার বড়ো ভালো লাগিল। গেটে এই প্রথম প্রেমে পড়িলেন। গেটে তাহার বাড়িতে যাইবার কোনো ছুতা না পাইয়া গির্জায় গিয়া উপাসনার সময় তাহাকেই দেখিতেন। কিন্তু তথাপি উপাসনা ভঙ্গ হইলে পর তাহার সহিত কথা কহিতে বা তাহার সঙ্গ লইতে সাহস করিতেন না। এবং অন্য প্রেমিকদের ন্যায় দূর হইতে তাহার নমস্কার পাইয়াই পরিতৃপ্ত হইতেন— পরিতৃপ্ত না হউন সুখী হইতেন। এই রমণীর নাম গ্রেশেন। যে বাড়িতে তাহাকে প্রথমে দেখিয়াছিলেন সেই বাড়িতে কোনো উপায়ে পুনরায় তাহার সহিত একবার মিলন ধার্য করিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। যেন একজন রমণী একজন যুবাকে লিখিতেছে, এইরূপ ভাবের একখানি প্রেমের পত্র তাহাকে পড়িয়া শুনাইলেন। সে শুনিয়া কহিল— 'সুন্দর হইয়াছে বটে। কিন্তু এমন সুন্দর চিঠি যদি সত্য সত্য লেখা হইত, তবে বেশ হইত।' গেটে কহিলেন, 'বাস্তবিক সে যুবা যদি এই চিঠিখানি পাইয়া থাকে আর যে মহিলাকে সে প্রাণাপেক্ষা ভালোবাসে সেও তাহাকে এইরূপ ভালোবাসে, তাহা হইলে সে কী সুখীই হইত!' গ্রেশেন কহিল, 'হাঁ কথাটা শুনিতে যেমনই হউক— নিতান্ত অসম্ভব নহে।' গেটে কহিলেন, 'আচ্ছা মনে করো, একজন যে তোমাকে চেনে, মাথায় করিয়া পূজা করে, ভালোবাসে, সে যদি তোমার সম্মুখে এই চিঠিখানি দেয়, তবে তুমি কী কর?' গ্রেশেন ঈষৎ হাসিয়া, একটু ভাবিয়া চিঠিটা লইল ও তাহার নীচে আপনার নাম সই করিয়া দিল। গেটে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতে গেলেন। সে কহিল— 'না— চুম্বন করিয়ো না— উহা তো সচরাচর হইয়া থাকে, ভালোবাসিতে হয় তো ভালোই বাসো।' প্রেমিকের এরূপ সাহসিকতা আমাদের কাছে কেমন কেমন লাগে বটে— কিন্তু য়ুরোপীয়দের চক্ষে এরূপ দৃশ্য ও তাহাদের কর্ণে এরূপ কথাবার্তা চিরাভ্যস্ত। গেটের জীবনচরিত পড়িবার সময় অবশ্য কতকটা তাঁহাদের দেশীয় আচার-ব্যবহারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে। পরে গেটে সেই চিঠিটি লইয়া কহিলেন, 'এ চিঠি আমার কাছেই রহিল— সমস্ত গোল চুকিয়া গেল, তুমি আমাকে বাঁচাইয়াছ!' গ্রেশেন কহিল, 'আর কেহ না আসিতে আসিতে এই বেলা তুমি চলিয়া যাও।' গেটে কোনোমতে তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিলেন না। কিন্তু সে স্নেহের সহিত তাঁহার দুই হস্ত ধরিয়া এমন দয়ার্দ্রভাবে কহিল যে, গেটের চক্ষে জল আসিল, গেটে কল্পনায় দেখিলেন তাহারও চক্ষে যেন জল আসিয়াছে! অবশেষে তাহার হস্ত চুম্বন করিয়া চলিয়া আসিলেন। গেটে কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া প্রত্যহ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন; নানাবিধ ভোজে, নানা প্রমোদ স্থানে তিনি তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। গেটে একদিন গ্রেশেনদের বাড়িতে রাত্রি পর্যন্ত আছেন, সহসা তাঁহার মনে পড়িল তিনি তাঁহাদের দ্বারের চাবি আনিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। কহিলেন— তাঁহার বাড়ি ফিরিয়া যাওয়া অনর্থক, অনেক গোলমাল না করিয়া বাড়িতে প্রবেশ করা অসম্ভব। তাহারা সকলে কহিল— 'বেশ তো— এসো, আমরা সকলে মিলিয়া আজ এইখানেই রাত্রি জাগরণ করিয়া কাটাইয়া দিই।' গেটের তাহাতে কোনো আপত্তি ছিল না। এমন-কি, আমাদের এক-এক বার সন্দেহ হয়, তিনি ইচ্ছা করিয়াই বা চাবি আনিতে ভুলিয়া গিয়াছেন! কাফি পান করিয়া সকলে রাত্রি জাগরণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আস্তে আস্তে তাস খেলা বন্ধ হইল। গল্প ক্রমে ক্রমে থামিয়া আসিল, গৃহের কর্ত্রী তাঁহার চৌকির উপর ঘুমাইতে আরম্ভ করিলেন, অভ্যাগতগণ ঢুলিতে লাগিলেন। গেটে এবং গ্রেশেন জানালার এক ধারে বসিয়া অতি মৃদুস্বরে কথাবার্তা কহিতেছিলেন, ক্রমে গ্রেশেনেরও ঘুম আসিল, তাঁহার মস্তকটি সে ধীরে ধীরে গেটের কাঁধে রাখিল, ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িল। গেটেও অল্পে অল্পে ঘুমাইয়া পড়িলেন। এইরূপে সে রাত্রি কাটিয়া গেল। কিন্তু তিনি যে এইরূপ নীচ শ্রেণীর লোকদিগের সহিত মিশেন ইহা তাঁহার পিতার কানে গেল। তিনি মহা ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ওই বিষয়ের

অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। এই মনোবেদনায় গেটে অত্যন্ত পীড়িত হইলেন, এমন-কি, তাঁহার মস্তিষ্কের পীড়া জন্মিবার উপক্রম হইয়াছিল। তিনি গ্রেশেন ও তাহার বন্ধুদের ভাবনায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি তাঁহার বন্ধুকে গ্রেশেনের বার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন— বন্ধুটি ঘাড় নাড়িয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন— 'সে বিষয়ে তোমার বড়ো একটা ভাবিতে হইবে না— সে কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই; সে দিব্য স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে।' সে স্পষ্টই স্বীকার করিল যে, 'হাঁ আমি তাঁহাকে অনেকবার দেখিয়াছি বটে, এবং দেখিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি— কিন্তু সর্বদাই বালকটির ন্যায় তাঁহার প্রতি আমি ব্যবহার করিতাম— আর আমার তাঁহার প্রতি ভগিনীর মতো ভালোবাসা ছিল।' এইরূপে অতি গম্ভীরা-গৃহিণী-ভাবে গ্রেশেন যাহা যাহা বলিয়াছিল, তাঁহার বন্ধু সমস্ত বলিয়া যাইতে লাগিলেন। কিন্তু শেষ কথাগুলি আর গেটে শুনিলেন না— গ্রেশেন যে তাঁহাকে ক্ষুদ্র বালকটি মনে করিত তাহাই তাঁহার প্রাণে বিঁধিয়া গেল। ও কথাটা তাঁহার বড়োই খারাপ লাগিল— তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, গ্রেশেনের উপর হইতে তাঁহার সমস্ত ভালোবাসা চলিয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার বন্ধুকে স্পষ্টই বলিলেন, এখন হইতে সমস্তই চুকিয়া বুকিয়া গেল। গেটে গ্রেশেনের কোনো সম্পর্কে আর রহিলেন না— তাহার নামোল্লেখ পর্যন্ত করিতেন না। এমন-কি, পূর্বে তিনি তাহার মুখশ্রী যেরূপ চক্ষে দেখিতেন, এখন তাহা বিপরীতভাবে দেখিতে লাগিলেন— এতদিনে তাহার যথার্থ ভাব বুঝিতে পারিলেন— তাহার মমতাশূন্য নীরস মুখশ্রী তাঁহার চক্ষে পরিস্ফুট হইল। কিন্তু হৃদয়ের আঘাত যন্ত্রণা শীঘ্র নিবৃত্ত হইবার নহে। তিনি কহিলেন— 'যে-সকল বন্ধুদের ব্যবহারে স্পষ্টই বোধ হয়, তোমার চরিত্র তাহারা সংশোধন করিতে চাহিতেছে তাহাদের দ্বারা কোনো ফল জন্মে না— একজন স্ত্রীলোক যাহার ব্যবহারে সহসা মনে হইতে পারে সে তোমাকে নষ্ট করিতেছে সেই স্ত্রীলোকই অলক্ষিতভাবে তোমার চরিত্র সংশোধন করে।' তিনি তাঁহার লিখিত উপাখ্যানের এক স্থানে লিখিয়াছেন— 'কুমারীরা অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক বালকদের অপেক্ষা আপনাকে মহা বিজ্ঞ মনে করে— আর তাহাদিগকে প্রথমে যে বেচারী ভালোবাসা জানায়— তাহাদের নিকট তাহারা মহা দিদিমার চালে চলিতে থাকে।' এ কথাটা সত্য— এবং অনেক অশ্রুজলের মধ্য হইতে তিনি এ সত্যটি উপার্জন করিয়াছিলেন। গেটের প্রেম বহুদিন অলস ও নিষ্কর্মা হইয়া বসিয়া থাকে নাই— অ্যানসেন নামক আর-একটি সুশ্রী বালিকা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। গেটের এইবারকার প্রেম-কাহিনীতে আমরা প্রেমের আর-এক মূর্তি দেখিতে পাইব।

অ্যানসেন অল্পবয়স্ক, সুন্দরী, প্রফুল্ল এবং প্রিয়দর্শন ছিল। গেটে স্বীয় মোহিনী শক্তির বলে তাহার প্রেম আকর্ষণ করিয়াছিলেন, এবং সে প্রেমকে যথেষ্ট প্রশ্রয় দিয়াছিলেন। কিন্তু তেমনি গেটে সে বালিকার প্রেমের উপর অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করিতেন। তিনি নিজেই স্বীকার করেন— যে কারণেই হোক তাঁহার মন খারাপ হইলেই তিনি সেই বেচারীর উপরে আক্রোশ প্রকাশ করিতেন— কেন? না সে প্রাণপণে তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিত বলিয়া। তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখা তাহার ব্রত ছিল, এই সুমহৎ অপরাধে তিনি তাহার প্রতি ক্রমাগত অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন! অনর্থক অসূয়া ও অকারণ সন্দেহে তিনি আপনাকে ও তাহাকে সর্বদাই অসুখী করিতেন। এই-সকল প্রণয়ের অত্যাচার অ্যানসেন অনেক দিন পর্যন্ত সহ্য করিয়াছিল, প্রশংসনীয় ধৈর্যের সহিত সহ্য করিয়াছিল; কিন্তু আর সহিল না। ক্রমাগত জ্বালাতন হইয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঘাতের পর আঘাত পাইয়া অবশেষে তাহার ধৈর্য টুটিয়া গেল। অন্যায় অত্যাচারে তাহার প্রেম ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট হইয়া গেল। এদিকে গেটে তাহাকে সত্য সত্য মনের সহিত ভালোবাসিতেন। অ্যানসেন যখন বিমুখ হইয়া দাঁড়াইল তখন গেটের চৈতন্য জন্মিল। এতদিন অ্যানসেন তাঁহাকে সাধিয়া আসিতেছিল, এখন তাঁহার সাধিবার পালা পড়িল। তিনি তাহার প্রেম পুনর্জীবিত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু আর হয় না, অ্যানসেনের মন আর ফিরিবার নহে, একেবারে তাঁহার উপর হইতে তাহার প্রেম চলিয়া গিয়াছে। কিছুদিন পরে অ্যানসেনের বাসভূমি

লিপ্সিক্ হইতে তাঁর জন্মভূমি ফ্র্যাঙ্কফোর্টে তিনি ফিরিয়া আসিলেন, তখন অ্যানসেনের সহিত চিঠি লেখালেখি শুরু করিলেন— লিখিলেন— 'আমাকে মনে রাখিবার জন্য অনুরোধ করিবার বোধ হয় আবশ্যক নাই। যে ব্যক্তি সার্ধ দুই বৎসর প্রায় তোমাদের পরিবার মধ্যে ভুক্ত হইয়া বাস করিয়াছিল, যে ব্যক্তি অনেক সময় তোমার অসন্তোষের কারণ হইয়াছিল সত্য কিন্তু তথাপি তোমার প্রতি সর্বদাই অনুরক্ত ছিল, সহস্র ঘটনা বোধ হয় তাহাকে তোমার স্মৃতিপথে উদিত করিয়া দিবে— অন্তত তুমি তাহার অভাব অনুভব করিবে— তুমি না কর আমি অনেক সময় করিয়া থাকি।' দিন কতক গেটে তাহার সহিত চিঠি লেখালেখি করিয়াছিলেন— কিন্তু তাহার মন আর বিচলিত করিতে পারেন নাই। অবশেষে তাহার বিবাহবার্তা শুনিয়া কহিলেন—

'আমি তোমার লেখা আর দেখিতে চাহি না— তোমার কণ্ঠস্বর আর শুনিতে চাহি না— আমি যে স্বপ্নে মগ্ন রহিয়াছি তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। তুমি আমার আর-একটি মাত্র পত্র পাইবে, এ অঙ্গীকার আমি নিশ্চয় পালন করিব এবং এইরূপে আমার ঋণের এক অংশ মাত্র পরিশোধ দিব, অবশিষ্টটুকু আমাকে মার্জনা করিয়ো।' আর-একটি পত্র লিখিয়াছিলেন— তাহাতে কহিয়াছিলেন, 'আমার নিজের বিষয়ে বিশেষ কিছুই বক্তব্য নাই— আমি সবল সুস্থ শরীরে পরিশ্রম করিয়া অতি সুখশান্তিতে কাল যাপন করিতেছি— তাহার প্রধান কারণ— এখন আর আমাকে কোনো স্ত্রীলোকে পায় নি!' এইরূপে গেটে তাঁহার হৃদয়-জ্বালা শান্তি করিতে অ্যানসেনের দ্বারে নিরাশ হইয়া কল্পনার দ্বারে আশ্রয় লইলেন— একটা নাটক লিখিয়া ফেলিলেন। এই নাটকের নাম 'প্রেমিকের খেয়াল'। এরিডনকে (গ্রন্থের নায়ককে) তাঁহার প্রণয়িনীর সখী কহিলেন— 'অ্যামীন (নায়িকা) তোমাকে এত ভালোবাসে যে, কোনো স্ত্রীলোক তেমন ভালোবাসে নাই।' নায়িকাকে তাহার সখী কহিল, 'যে পর্যন্ত তাঁহার অসুখের সত্য কোনো কারণ না থাকিবে সে পর্যন্ত তিনি একটা-না-একটা কারণ কল্পনা করিয়া লইবেন; তিনি জানেন যে, তুমি তাঁহা অপেক্ষা আর অধিক কিছুই ভালোবাস না— তুমি তাঁহাকে সন্দেহের কোনো কারণ দাও না বলিয়াই তিনি তোমাকে সন্দেহ করেন, একবার তাঁহাকে দেখাও যে তাঁহাকে না হইলেও তোমার চলে। তাহা হইলে এখনকার একটি চুম্বন অপেক্ষা তখনকার একটি দৃষ্টিতে অধিকতর সন্তুষ্ট হইবেন।' এইখানে গেটের দ্বিতীয় প্রেমাভিনয়ের যবনিকা পড়িয়া গেল।

এক সময়ে গেটে গোল্ডস্মিথের 'বাইকার' নামক উপন্যাস পাঠে নিযুক্ত ছিলেন। এমন সময়ে তিনি শুনিলেন, স্ট্রাস্বর্গের নিকটে অবিকল প্রিম্রোস্ পরিবারের ন্যায় এক পাদ্রী পরিবার বাস করেন। তিনি কৌতূহলবশত তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিলেন। দেখিলেন— পাদ্রীর কনিষ্ঠা কন্যা ফ্রেড্রিকার সহিত সোফিয়ার অনেক সাদৃশ্য আছে। সে পরিবারের মধ্যে গেটে দুই দিন বাস করিলেন— এবং সেখানে তাঁহার অতুল্য মোহিনী শক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ফিরিয়া আসিবার সময় ফ্রেড্রিকার জন্য নিশ্বাস ফেলিয়া আসিলেন— বোধ হয় ফ্রেড্রিকাও তাঁহার জন্য নিশ্বাস ফেলিয়াছিল। কিছু দিন পরে আবার সহসা এক সন্ধ্যাকালে তাহাদের সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অলিভিয়া ও ফ্রেড্রিকা দুই বোনে দ্বারের কাছে বসিয়াছিল। আদরের সহিত তিনি সেখানে আহূত হইলেন। আলোতে আসিবামাত্র অলিভিয়া তাঁহাকে দেখিয়া হাসিয়া উঠিল— সে গেটের অদ্ভুত পরিচ্ছদ দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না। ফ্রেড্রিকা কহিল, 'কই— আমি তো হাসিবার মতো কিছুই দেখিতে পাই নাই'— কিন্তু ফ্রেড্রিকা দেখিতে পাইবে কেন?

এই কাহিনী শেষ করিবার পূর্বে ইহার অন্তর্ভুক্ত আর-একটি উপাখ্যান বলিয়া লই। গেটে ইতিপূর্বে এক ফরাসি শিক্ষকের নিকট নৃত্য শিখিতেন। তাঁহার শিক্ষকের দুই কন্যা ছিল, দুইজনই যুবতী ও রূপবতী— ইহাদের মধ্যে কনিষ্ঠাটি আর-এক জনের প্রেমাসক্তা। জ্যেষ্ঠা লুশিন্দা তাঁহার প্রেমে পড়িল, কিন্তু তিনি কনিষ্ঠা এমিলিয়ার প্রেমে পড়িলেন। এক সময়ে লুশিন্দা রোগশয্যায় শয়ান ছিল— তাহার ঘরের পার্শ্বে এমিলিয়া ও গেটে বসিয়াছিলেন। এমিলিয়া গেটের নিষ্ফল

প্রেম লইয়া কথোপকথন করিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে এমিলিয়া গেটেকে কহিল— 'তোমাতে আমাতে তবে এই পর্যন্ত।' গেটেকে দ্বার পর্যন্ত লইয়া গিয়া এমিলিয়া কহিল, 'আমাদের এই শেষ দেখা। তোমাকে যাহা কখনো দিই নাই ও দিতাম না, আজ তাহা দিলাম,' এই বলিয়া গেটের গলা ধরিয়া তাঁহাকে চুম্বন করিল। উন্মত্ত গেটে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন— এমন সময়ে লুশিন্দা তাহার রোগশয্যা হইতে বিশৃঙ্খল-বসনে ছুটিয়া আসিয়া এমিলিয়াকে কহিল, 'তুমি একলা কেবল উঁহার নিকট হইতে বিদায় লইতে পারিবে না।' এমিলিয়া গেটেকে ছাড়িয়া দিল— লুশিন্দা গেটের বক্ষ জড়াইয়া ধরিল— ও তাহার স্বর্ণবর্ণ কেশপাশ দিয়া তাঁহার মুখ ঢাকিয়া ফেলিল। লুশিন্দা অনেকক্ষণ নীরবে এই অবস্থায় রহিল— গেটে তো কতকটা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে লুশিন্দা গেটেকে ছাড়িয়া দিয়া ব্যাকুলনেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আবার কিয়ৎক্ষণ পরে ছুটিয়া গিয়া চুম্বনে তাঁহাকে যেন প্লাবিত করিয়া দিল; পরিশেষে কহিল— 'এখন আমার অভিশাপ শুন— আমার 'পরে প্রথম যে তোমার ওই অধর চুম্বন করিবে— চিরকাল তাহার দুঃখের পর দুঃখ হউক! যদি সাহস হয় তবে পুনরায় চুম্বন করিয়ো— কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি ঈশ্বর আমার প্রার্থনা শুনিয়াছেন। এখন তুমি বিদায় হও— যত শীঘ্র পার, বিদায় হও!' গেটে বিদায় হইতে কিছুমাত্র কালবিলম্ব করিলেন না।

এখন আমরা পুনরায় ফ্রেড়রিকার নিকট প্রত্যাবর্তন করি। পূর্বোক্ত দ্বিতীয় মিলনকালে গেটে ফ্রেড়্রিকার সহিত গ্রামপথে ভ্রমণ করিতেছেন— দিনগুলি অতি শীঘ্র ও অতি সুখে চলিয়া যাইতেছে— কিন্তু এ পর্যন্ত সেই অভিশাপের ভয়ে গেটে কখনো ফ্রেড়্রিকাকে চুম্বন করেন নাই। এইখানে পুনরায় পাঠকদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, বৈদেশিকের জীবন চরিত্র পড়িবার সময় আপনাকে কতকটা তাহাদেরই রীতিনীতি প্রথা সহাইয়া লওয়া প্রয়োজনীয়। তাহাদের কার্য তাহাদেরই আচার-ব্যবহারের সহিত তুলনা করিয়া বিচার করা কর্তব্য। এক প্রকার তাস খেলা আছে, হারিলে চুম্বন দণ্ড দিতে হয়— গেটে এই চুম্বনের পরিবর্তে কবিতা উপহার দিতেন— কিন্তু যে মহিলার তাঁহার নিকট হইতে চুম্বন প্রাপ্য থাকিত তাঁহার যে মর্মে আঘাত লাগিত তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু গেটে অধিক দিন এরূপ সামলাইয়া চলিতে পারেন নাই। একটি নাচের উৎসবে গেটে ফ্রেড়্রিকার সহিত নাচিয়াছিলেন— গেটের নাচ ফ্রেড়্রিকার বড়ো ভালো লাগিয়াছিল। নাচ শেষ হইলে উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া নির্জনে গিয়া আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, উভয়ই উভয়কে মনের সহিত ভালোবাসেন। দিনে দিনে উভয়ের ভালোবাসা বর্ধিত হইতে লাগিল— অবশেষে গেটের বিদায় লইবার সময় আত্মীয়দের সম্মুখেই ফ্রেড়্রিকা তাঁহাকে চুম্বন করিল। গেটে ফ্রেড়্রিকার প্রেমকে বরাবর পালন করিয়া আসিয়াছিলেন— কিছুই বলা কহা হয় নাই, অথচ একপ্রকার স্থির হইয়া গিয়াছিল যেন তিনি বিবাহ করিবেন। কিন্তু গেটে জানিতেন তাঁহার বিবাহ করিবার কোনো সম্ভাবনা নাই। বিদায় হ'ব হ'ব সময়ে ওই কথা তাঁহার স্মরণ হইল। তখন ফ্রেড়্রিকাকে দেখিলে তাঁহার মন কেমন অসুস্থ হইত— ফ্রেড়্রিকা হইতে দূরে থাকিতে পারিলেই একটু শান্ত হইতেন। বিদায়কালে গেটে অশ্বে আরোহণ করিয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন— ফ্রেড়রিকা তাঁহার হাত ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

মনে মনে বিবাহ করিব না জানিয়াও বালিকার প্রেমকে প্রশ্রয় দেওয়া যে অন্যায় হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু ফ্রেড়্রিকা তাঁহাকে কিছুমাত্র তিরস্কার বা তাঁহার নামে কোনো দোষারোপ তা সে করে নাই। গেটের হৃদয় হইতে প্রেম যেরূপ ধীরে ধীরে অপসৃত হইয়াছিল, ফ্রেড়্রিকারও সেইরূপ হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না। যাহা হউক অবিবাহিত অবস্থাতেই তাহার মৃত্যু হয়। গেটে ফ্রেড়্রিকা সম্বন্ধে কহেন—

'গ্রেশেন আমার নিকট হইতে দূরীকৃত হইয়াছিল— অ্যানসেন আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল— কিন্তু এই প্রথম আমি নিজে দোষী হইয়াছিলাম। আমি একটি অতি সুন্দর হৃদয়ের অতি গভীরতম স্থান পর্যন্ত আহত করিয়াছিলাম। অন্ধকারময় অনুতাপে সেই অতি আরামদায়ক

প্রেমের অবসানে কিছুকাল যন্ত্রণা পাইয়াছিলাম, এমন-কি, তাহা অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু মানুষকে তো বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, কাজে কাজেই অন্য লোকের উপরে মনোনিবেশ করিতে হইল।'

এখন গেটে শারলোট্ নামক এক রমণীর প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। কেজ্‌নার নামক যুবার সহিত শারলোটের বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। উভয়ই উভয়ের প্রেমে আসক্ত। কেজ্‌নারের প্রণয়ে অসূয়া বা সন্দেহ কিছুমাত্র ছিল না; যাহাকে সে ভালো মনে করিত তাহারই সহিত শারলোটের আলাপ করাইয়া দিত। এইরূপে গেটের সহিত শারলোটের প্রথম আলাপ হয়। প্রেমিক-যুগলের সহিত গেটের প্রণয়-সম্বন্ধ ক্রমেই পাকিয়া উঠিতে লাগিল। শারলোট্ ব্যতীত তিনি আর থাকিতে পারেন না। তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া ওয়েট্‌স্লারের উর্বর ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। যদি কাজকর্ম হইতে অবসর পাইতেন তবে কেজ্‌নারও তাঁহাদের সহিত যোগ দিতেন। এইরূপ ধীরে ধীরে তাহারা পরস্পরের সহিত এমন মিলিত হইয়া গেল যে, একজনকে নহিলে যেন আর-একজনের চলিত না। যতখানি উপযুক্ত, অলক্ষিতভাবে গেটের তদপেক্ষা প্রেম জন্মিয়া গিয়াছিল। কিন্তু শারলোটের মন কেজ্‌নার হইতে গেটের প্রতি ধাবিত হয় নাই। ক্রমে ক্রমে তাহাদের বিবাহের সময় হইয়া আসিতেছে— গেটে দেখিলেন, তাঁহার হৃদয়েও প্রেম দিন দিন বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছে— গেটে দেখিলেন এইবেলা হইতেই দূরে পলায়ন করা সৎপরামর্শ। দূরে প্রস্থান করিলেন ও এই বিষয় লইয়া তাঁহার বিখ্যাত উপাখ্যান 'যুবা ওরার্থরের যন্ত্রণা' লিখিয়া ফেলিলেন। লেখাও শেষ হইল আর তাঁহার প্রেমও শেষ হইল। এখন তিনি আবার নূতন পথে যাইবার বল পাইলেন।

নূতন পথে যাইতে তাঁহার বড়ো বিলম্ব হয় নাই। লিলি নামক এক ষোড়শবর্ষীয়া বালিকার (আমাদের দেশে যুবতী) সহিত তাঁহার প্রণয় জন্মিল। সে বালিকার অনেকগুলি অনুরাগী বা বিবাহাকাঙ্ক্ষী ছিল। তাহাদের সকলকেই তাহার প্রেমে বন্দী করিবার দিকে লিলির বিশেষ যত্ন ছিল, কিন্তু দৈবক্রমে আপনি গেটের প্রেমে জড়াইয়া পড়িল— এ কথা সে নিজেই গেটের কাছে স্বীকার করিল। দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের প্রেম বাড়িয়া উঠিল ইহা বলা বাহুল্য। অবশেষে তাঁহাদের অবস্থা এমন হইয়া উঠিল যে, সুদূর বিচ্ছেদের কথা মনে করিতেও কষ্ট হইত; উভয়ের উভয়ের উপর এমন বিশ্বাস জন্মিয়া গেল যে, অবশেষে তাঁহারা বিবাহের বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু উভয়েরই কর্তৃপক্ষের তাহাতে অমত হইল। অবশেষে একজন রমণী মধ্যস্থ হইয়া উভয় পক্ষকেই সম্মত করাইল। যতদিন কর্তৃপক্ষীয়েরা সম্মত হন নাই ততদিন গেটে বড়োই যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন। কিন্তু সম্মত হইলে পর তাঁহার মনের নূতন প্রকার পরিবর্তন হইল। তখন সমস্ত নূতনত্ব চলিয়া গেল। যখন লিলিকে হস্তপ্রাপ্য মনে করিলেন তখন লিলির উপর আর টান থাকিবে কেন? লিলির নিকট হইতে বিদায় না লইয়া তিনি আস্তে আস্তে ফ্র্যাঙ্কফোর্ট্ ত্যাগ করিয়া চলিলেন। তিনি বলেন, তিনি লিলিকে ভুলিতে পারেন কিনা— এবং লিলির উপর বাস্তবিক তাঁহার কতখানি প্রেম আছে, তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি বিদেশে যাইতেছেন। কিন্তু এই পরীক্ষার কথা যখনি তাঁহার মনে আসিয়াছে, তখনি বুঝা গিয়াছে বাস্তবিক তাঁহার প্রেম নাই। যদি তাঁহার প্রেমের তেমন গভীরতা থাকিত তবে কি পরীক্ষার কথা মনেই আসিত? কিছুদিন বিদেশে থাকিয়া আবার তিনি ফ্র্যাঙ্কফোর্টে ফিরিয়া আসিলেন। ইতিমধ্যে লিলির আত্মীয়বর্গ লিলির প্রেম বিনষ্ট করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিল— কিন্তু লিলি কহিল, সে গেটের জন্য সমস্ত ত্যাগ করিতে পারে— এমন-কি, গেটে যদি সম্মত হন, তবে সে তাঁহার সঙ্গে আমেরিকায় যাইতে পারে। কী সর্বনাশ— গেটে তাঁহার বাড়ি ঘর ছাড়িয়া কোথা এক সাত সমুদ্র পার আমেরিকা— সেইখানে যাইবেন। তাও কি হয়? লিলি গেটের জন্য সমস্ত করিতে পারে, কিন্তু গেটে তাহার জন্য বড়ো একটা ত্যাগস্বীকার করিতে সম্মত নহেন। ত্যাগস্বীকার করা দূরে থাকুক, কোনো ত্যাগস্বীকার করিতে না হইলেও তিনি লিলিকে বিবাহ করেন কিনা সন্দেহ।

আবার গেটে আস্তে আস্তে পলাইবার চেষ্টা দেখিলেন। একবার লিলির ঘরের জানালার সম্মুখে দাঁড়াইলেন— দেখিলেন যেখানে পূর্বে প্রদীপ জ্বলিত, সেইখানেই জ্বলিতেছে— লিলি পিয়ানো বাজাইয়া তাঁহারই রচিত একটি গান গাহিতেছে— তাহার প্রথম ছত্র :

'হায়— কী সবলে মোরে করিয়াছে আকর্ষণ।'

এ গানটি কিছুকাল পূর্বে তিনিই লিলিকে উপহার দিয়াছিলেন। যাহা হউক— গেটে লিলির সবল আকর্ষণ তো ছিঁড়িলেন।

যে ব্যক্তি মৃত্যুকাল পর্যন্ত একজনের পর আর-একজনকে ভালোবাসিয়া আসিয়াছিলেন, ও ভালোবাসা পাইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহার প্রেমের কথা আর কত বলিব। তাঁহার ছিয়াত্তর বৎসর বয়সের সময় মাডাম জিমানৌস্কা তাঁহার প্রেমে পড়েন।

গেটের এই প্রেম-কাহিনী সমুদয়ে পাঠকেরা যে মহাকবি গেটের হৃদয় জানিতে পারিবেন মাত্র তাহা নহে—প্রেমের বিচিত্র মূর্তিও দেখিতে পাইবেন।

ভারতী
কার্তিক ১২৮৫

নর্ম্যান জাতি ও অ্যাংলো-নর্ম্যান সাহিত্য

টিউটনিক জাতিরা রোমান রাজ্য অধিকার করুক কিন্তু রোমান জাতিদিগের সহিত না মিশিয়া থাকিতে পারে নাই। বিজিত জাতিদিগের সহিত তাহাদের আচার ব্যবহার ভাষা ধর্ম সমস্ত মিশিয়া গিয়াছিল। তাহারা রোমান রাজ্য শাসন করিত, কিন্তু রোমান শাসন-প্রণালী অনুসারে শাসন করিত। রোমান রাজ্যে তাহাদের আধিপত্য বিস্তার হইয়াছিল কিন্তু রোমান স্বভাব রোমান প্রথা তাহাদের জাতীয় স্বভাব, জাতীয় প্রথার উপর আধিপত্য লাভ করিয়াছিল। সেই টিউটনিক জাতি কেবল ইংলন্ডে আপনাদের জাতিত্ব রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। যে কেল্টিক জাতিকে তাহারা প্রায় ধ্বংস করিয়াছিল তাহারা টিউটন অর্থাৎ স্যাক্সন জাতিদিগের অপেক্ষা সভ্য ছিল সন্দেহ নাই, সভ্য রোমানদের শাসনে থাকিয়া তাহারা ধর্ম ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

আবার দেখো, নর্ম্যানেরা যখন স্যাক্সন-অধিকৃত ইংলন্ডে আধিপত্য বিস্তার করিল, তখন তাহারা আর আপনাদের জাতিত্ব রক্ষা করিতে পারিল না— অল্প দিনেই স্যাক্সনদিগের সহিত মিশিয়া গেল, কিন্তু ইহার প্রচুর কারণ বিদ্যমান আছে। প্রথমত, যখন স্যাক্সনেরা ব্রিটন অধিকার করিতে আইসে, তখন তাহাদের অবস্থা পশুদের অপেক্ষা অল্পই উন্নত ছিল মাত্র, তখন তাহারা স্বার্থের জন্য নহে, রক্ত-পিপাসা-শান্তির জন্যই রক্তপাত করিত, ধ্বংসকার্যই তাহাদের দুর্দমনীয় উদ্যমের ক্রীড়া ছিল। রোমানদিগের অন্তঃক্ষয়কর শাসন-ভারে দুর্বল হতভাগ্য কেল্টজাতি যে তাহাদের ধ্বংসপ্রবৃত্তির সম্মুখে পড়িয়া বিনষ্ট হইবে তাহাতে আশ্চর্য নাই। কিন্তু সভ্যতর নর্ম্যান জাতিরা যখন ব্রিটনে পদার্পণ করিল তখন অকারণে রক্তপাত করা তাহাদের ব্যবসায় ছিল না, তখন তাহারা খৃস্টীয় ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে ও অন্যায় কার্য করিতে হইলেও ন্যায়ের নামে করা তাহাদের প্রথা হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, স্যাক্সন জাতিরা আপনাদের অনুর্বর দেশ পরিত্যাগ করিয়া বাস করিবার নিমিত্ত দলে দলে ব্রিটনে ঝাঁকিয়া পড়িল, কেল্টদিগের উপর আধিপত্য করা তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল না, দেশের অধিবাসী হওয়াই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল, এরূপ অবস্থায় দেশের প্রাচীন অধিবাসীদিগকে বিনষ্ট করিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করাই তাহাদের স্বার্থ ছিল। কিন্তু নর্ম্যানেরা ব্রিটন শাসন করিতে আসিয়াছিল, ব্রিটনের অধিবাসী হওয়া তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল না, ব্রিটনের অধিপতি হওয়াই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। তৃতীয়ত, কেল্টদিগের সহিত

স্যাক্সনদিগের ধর্ম আচার ব্যবহার নীতি স্বভাব কোনো বিষয়েই ঐক্য ছিল না, কিন্তু স্যাক্সন ও নর্ম্যানদের মধ্যে অনেক ঐক্যস্থল ছিল। ভারতবর্ষ শাসন করিবার জন্য ও এখানে বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত যে-সকল অল্প সংখ্যক ইংরাজ বাস করে তাহারা নিয়মিত সময় উত্তীর্ণ হইলেই আবার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে, আবার নূতন দল এ দেশে আগমন করে, কিন্তু এরূপ না হইয়া যদি অল্প সংখ্যক শাসয়িতৃদল এ দেশে চিরকাল বাস করিত, তাহা হইলে সেই ক্ষুদ্র দল বিশেষ প্রতিবন্ধক না পাইলে খুব সম্ভবত ভারতবর্ষীয়দের সহিত মিশিয়া যাইত। নর্ম্যানদের সেই অবস্থা হইয়াছিল, নর্ম্যান্ডি হইতে একদল নর্ম্যান ব্রিটিশদিগকে অধীনে রাখিবার নিমিত্ত ব্রিটনে গিয়াছিল, কিন্তু তাহারা আর স্বদেশে ফিরিল না। ব্রিটন-বিজেতা যখন স্বয়ং ব্রিটনে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন তখন জেতা ও জিতদিগের মধ্যে মিলন না হওয়াই আশ্চর্য। হিন্দুজাতি যদি নিতান্ত স্বাতন্ত্র্য-প্রিয় না হইত, তাহা হইলে মুসলমান বিজেতাদিগের সহিত হয়তো মিলিয়া যাইত।

দূর পর্যন্ত দেখিতে গেলে যে জাতিই ইংলন্ড জয় করিয়াছে সকলেই টিউটনিক বংশভূত। স্যাক্সন, ডেনিস ও নর্ম্যান সকলেই এক জাতীয় লোক। টিউটনিক জাতিদিগের জাতিগত স্বভাব অনুসারে নর্ম্যান অর্থাৎ Northmanগণ দলে দলে তাহাদের জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া দেশে দেশে দস্যুতা করিয়া ফিরিত। এই মহা দুর্দান্ত সামুদ্রিক দস্যুগণের তরণী দূর হইতে দেখিলে সমস্ত যুরোপ কম্পিত হইত, ভূমধ্যস্থ সাগরে এই নর্ম্যান দস্যুদের জাহাজ দেখিয়া মহাবীর শার্লমেন একদিন অশ্রু বিসর্জন করিয়াছিলেন। ইহারা অসাধারণ সামুদ্রিক ছিল, ইহাদের রক্তে Blake এবং Nilson সৃষ্ট হইয়াছিল, ইহাদেরই নিকট হইতে ইংরাজেরা সুনাবিকতার বীজ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সত্য মিথ্যা জানি না, প্রবাদ আছে, ইহারা কলম্বসের বহুপূর্বে আটলান্টিক পার হইয়াছে। পূর্বকালে ফিনিসীয়গণ সামুদ্রিক ছিল কিন্তু তাহারা বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত দেশ-বিদেশ পর্যটন করিত, অর্থ উপার্জিত হইলে স্বদেশে ফিরিয়া যাইত, কিন্তু - নর্ম্যানগণ আপনাদের কুজ্ঝটিকাময় অন্ধকার অনুর্বর দেশ পরিত্যাগ করিয়া উজ্জ্বল, ধনধান্যশালী ইটালি, ফ্রান্স ও ইংলন্ড প্রভৃতি স্থানে চির-আশ্রয় গ্রহণ করে। আশ্চর্য এই যে, যেখানেই গিয়াছে সেইখানেই তাহাদের জাতিত্ব লোপ পাইয়াছে, এখন আর নর্ম্যান বলিয়া একটি জাতি নাই। যদিও নর্ম্যান জাতি স্যাক্সনদের সঙ্গে মিশিয়া গেল তথাপি ইংরাজ-ইতিহাসে তাহারা ঘোরতর পরিবর্তন বাধাইয়াছিল। নর্ম্যানেরা না মিশিলে ইংরাজেরা এ ইংরাজ হইত কি না সন্দেহস্থল। আমরা ফ্রান্সে নর্ম্যানদের উপনিবেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ইংলন্ড পর্যন্ত তাহাদের অনুগমন করিব।

ফ্রান্সে এখন ক্লোভিস (Clovis)-বংশোদ্ভব রাজগণ সিংহাসনচ্যুত হইয়াছেন ও শার্লমেন-বংশীয় রাজগণের রাজপ্রভাব জীর্ণপ্রায় হইয়াছে, এমন সময়ে উত্তর দেশীয় ক্ষুধিত পঙ্গপাল ফ্রান্সের উর্বর ক্ষেত্রে ঝাঁকিয়া পড়িল। প্যারিস তখন ফ্রান্সের রাজধানী ছিল না। নর্ম্যানদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ফ্রান্সের দুর্বল অধিপতি, Charles রবট্‌কে (Roborts the Strong) এক বৃহৎ জায়গীর দিয়া সীমান্ত রাজ্যে অধিষ্ঠিত করেন। রবটের পুত্র ওডোর সময়ে প্যারিস সেই রাজ্যের প্রধান নগরী হয়। ফরাসিরাজ তখন হয়তো সন্দেহ মাত্র করেন নাই যে, তিনি বহিঃশত্রু হইতে রাজ্যরক্ষা করিবার জন্য গৃহের মধ্যে শত্রু পোষণ করিতেছেন। যখন ফ্রান্স-অধিপতির রাজকীয় উপাধি ভিন্ন অন্য বড়ো একটা কিছু অবশিষ্ট ছিল না, তখন বলীয়ান প্যারিসের জায়গীরপতি তাঁহার সিংহাসনের প্রতি এক-একবার কটাক্ষপাত করিতেছিলেন, এমন সময়ে নর্ম্যানগণ প্রকৃত প্রস্তাবে ফ্রান্সের রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইল। তখন ফ্রান্সের বড়ো দুরবস্থা। বলিতে গেলে, তখন বর্তমান ফ্রান্স গঠিত হয় নাই, তখন পুরাতন ফ্রান্স জীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল। ফ্রান্স তখন খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছিল। ভিন্ন লোক তোমার শত্রু না হইতে পারে, কিন্তু আপনার লোক ভিন্ন হইয়া গেলে সে তোমার শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। ফ্রিমেন সাহেব অতি যথার্থ কথা বলিয়াছেন যে, 'ফ্রান্সের প্রতি বিভিন্ন খণ্ড যদি বিভিন্ন দেশ হইয়া যাইত, তাহাদের মধ্যে যদি কোনো যোগ না থাকিত, তবে সে বিভাগে ভয়ের কারণ থাকিত না। প্রত্যেক ক্ষুদ্র অধিরাজ্য-

স্বামীর ইচ্ছা তাঁহার সীমা বাড়াইয়া লন— বাহিরের শত্রু আক্রমণ করিলে জাতীয়ভাবে সকলে একত্রে মিলিত হইয়া তাহাকে বাধা দেওয়া দূরে থাকুক, সকলেই ভয় করিতে থাকে, পাছে তাহাদের মধ্যে আর কেহ শত্রুর সাহায্য লইয়া তাহার অধিকারে হস্তক্ষেপ করে, অতএব তাহা সহজেই মনে হইতে পারে যে, আগে হইতে আমিই যে কেন শত্রু-সাহায্যের সুবিধা ভোগ না করিয়া লই!'

তখন য়ুরোপের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। চারি দিক হইতে মুমূর্ষু অথবা মৃত রোমীয় প্রভাবের উপর শকুনি ও গৃধিনীদল ঝাঁকিয়া পড়িতেছিল। তখন দারুণ অরাজকতার কাল। স্যারাসীনগণ সার্ডিনিয়া ও সিসিলি অধিকার করিয়া গ্রীস, ইটালি ও নিকটবর্তী দেশসমূহে উপদ্রব করিতেছিল। দুর্দান্ত স্ক্ল্যাভোনীয়গণ (Sclavonians) জর্মনির অধিকার হইতে বোহেমিয়া, পোল্যান্ড এবং প্যানোনিয়া (আধুনিক অস্ট্রিয়া) কাড়িয়া লইয়াছিলেন। তাতার জাতীয় দস্যুদল নিদারুণ উপপ্লবে সমস্ত ইটালি, জর্মানি ও দক্ষিণ ফ্রান্স কম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু সর্বাপেক্ষা এই উত্তর দেশীয় সামুদ্রিক দস্যুগণ এই নর্থম্যান নরশোণিত-পিপাসুগণ প্রচণ্ড ছিল। উপর্যুপরি ইংলন্ড এবং ফ্রান্স তাহারা বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারা যখন ইংলন্ড আক্রমণ করিত, তখন ফ্রান্স বিশ্রাম করিত, যখন ফ্রান্স আক্রমণ করিত তখন ইংলন্ড বিশ্রাম করিত। Charles the Bald-এর রাজত্বকালে ইহারা ফ্রান্সের অন্তঃপ্রদেশে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিল। তখন চার্লস ও তাঁহার পরিবারের মধ্যে গৃহ-বিবাদ ঘটিয়া রক্তপাতে ফ্রান্স দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। ক্ষুদ্র প্রাদেশিক রাজগণ অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

নর্থম্যান দস্যুদল ফ্রান্সে এবং ইংলন্ডে নূতন প্রকার যুদ্ধের প্রথা অবলম্বন করিয়াছিল। নদী বাহিয়া তাহারা যে দ্বীপ পাইত, সেইখানেই দুর্গ নির্মাণ করিত। এই দুর্গসকল তাহাদের লোপ্‌ত্র দ্রব্যের ভাণ্ডার ছিল, তৎসমুদায় তাহাদের রমণী ও শিশুদিগের নিবাস-ভূমি ছিল ও পরাজয়কালে আশ্রয়স্থান ছিল। দুর্বল ফ্রান্স-অধিপতি অস্ত্রের বলে তাহাদের বাধা দিতে অক্ষম ছিলেন, সুতরাং অর্থ দিয়া তাহাদের অত্যাচার নিবারণ করিতে হইত মাত্র। অবশেষে Charles the Simple নর্ম্যান্ডি দেশ দান করিয়া তাহাদের নিকট শান্তি ক্রয় করিলেন। তাহাতে হানি হইল না, নর্ম্যান্ডি ফ্রান্স হইতে বিচ্ছিন্ন হইল না। নর্ম্যানদের ভাষা ফরাসি হইল, নর্ম্যানদের আচার-ব্যবহার ফরাসি হইল, নর্ম্যান জাতি ফরাসিস্ হইয়া দাঁড়াইল, নর্ম্যানদিগের অধিপতি রলফ (Hrolf) নর্ম্যান্ডির রাজা হইলেন।

ইহার এক শতাব্দী পরে নর্ম্যান্ডির রাজা উইলিয়ম ইংলন্ড আক্রমণ করিলেন। এক শতাব্দী পূর্বে যে জাতি অকারণে ও অন্যায়রূপে ফ্রান্সে পদার্পণ করিয়াছিল আজ তাহারাই পররাষ্ট্র ইংলন্ড আক্রমণ করিতে চলিল। কিন্তু ইতিমধ্যে সেই ডেনিস দস্যুদলের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। অন্যায় কার্যের উপর একটা ন্যায়ের আবরণ না পরাইতে পারিলে তাহাদের লজ্জা বোধ হয়। ন্যায্যরূপে ইংলন্ডের সিংহাসন তাঁহার প্রাপ্য বলিয়া উইলিয়ম ইংলন্ডের দ্বারে গিয়া আঘাত দিলেন। ন্যায়কে বল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করাই যেন তাঁহার উদ্দেশ্য, এমনি একটা ভান করিলেন। ইংলন্ড-জয়ের কাহিনী আজ আর নূতন করিয়া উল্লেখ করিতে হইবে না, সকলেই তাহা জানেন।

শতাব্দী-পূর্বে নর্ম্যানরা যখন ফ্রান্সে দস্যুতা করিত তখন লোকে তাহাদের দস্যু বলিত, শতাব্দী-পরে যখন তাহারা ইংলন্ডে দস্যুতা করিল, তখন লোকে তাহাদের বিজয়ী কহিল। কিন্তু এই এক শতাব্দীর মধ্যে নর্ম্যান জাতির কী পরিবর্তন হইয়াছে আলোচনা করিয়া দেখো, দেখিবে, তাহারা সেই দুর্দান্ত, বিপদ-অন্বেষী দস্যুই রহিয়াছে, কেবল ফরাসি কথা কহিতে ও ফরাসি জাতির আচার-ব্যবহার অনুকরণ করিতে শিখিয়াছে। যদিও তাহারা ফরাসিদের অন্তর্ভূত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি নর্ম্যান জাতি বলিয়া তাহাদের একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল। সভ্য জাতির উপযোগী শিল্পে তাহাদের সুরুচি জন্মিয়াছে; নর্ম্যান অধিকারের পর হইতে শিল্প-সমাগম-শূন্য ইংলন্ডে শত শত সুশোভন গির্জা ও প্রাসাদ নির্মিত হইল। এক শতাব্দীর মধ্যে এই অসভ্য দস্যুদিগের হৃদয়ে

সৌন্দর্য-জ্ঞান উদ্‌বোধিত হইল। নর্ম্যান্ডির সমাজে বিদ্যা যথোচিত সমাদর প্রাপ্ত হইল। ল্যান্‌ফ্রেঙ্কের (Lanfrenc) প্রতিষ্ঠিত বেকের বিদ্যালয় (School of Bec) তখনকার প্রধানতম বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে গণ্য হইল। বিজেতা উইলিয়মের পুত্র হেনরির বিদ্বান বলিয়া খ্যাতি ছিল, উপাধি ছিল সুপণ্ডিত, Beanclirk অল্প দিনের মধ্যেই ইহাদের ফরাসি ভাষায় অমন ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল যে, এই হঠাৎ-সভ্য দস্যুরা ফরাসিদের মতোই কবিতা ও গদ্য লিখিতে পারিত। কিন্তু তথাপি তাহাদের অন্তরে অন্তরে সেই টিউটনিক ভাব জাজ্বল্যমান ছিল। সভ্যতার মূল তাহাদের হৃদয়ে গাঢ়ভাবে নিহিত হইতে পারে নাই। তাহাদের নিষ্ঠুরতার কাহিনী যদি পাঠ কর, তবে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবে। বিজিত ইংলন্ডে তাহারা লোকদের পা বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিত, ও সেই নিম্নশির ব্যক্তিদের ধূম সেবন করাইয়া যন্ত্রণা দিত। কখনো বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, কখনো বা মুণ্ড বাঁধিয়া হতভাগ্যদের ঝুলাইয়া দিত ও তাহাদের পায়ে জ্বলন্ত বস্ত্র বাঁধিয়া দেওয়া হইত। মাথায় দড়ি বাঁধিয়া যতক্ষণ না তাহা মস্তিষ্ক ভেদ করিত, ততক্ষণ আকর্ষণ করিত। ভেক ও সরীসৃপসংকুল কারাগারে লোকদের কারাবদ্ধ করিত। ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ, অগভীর ও তীক্ষ্ণ-প্রস্তর-পূর্ণ সিন্দুকে জোর করিয়া মানুষ পুরিত এবং এইরূপে তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চূর্ণ করিত। অনেক ব্যারনদিগের দুর্গে rachetege নামে অতি ঘৃণ্য ও ভয়ংকর দ্রব্য থাকিত, সেই যন্ত্রণার যন্ত্র কড়িকাঠ হইতে ঝুলানো থাকিত, উহা কারারুদ্ধ ব্যক্তির স্কন্ধের উপর স্থাপিত হইত, তাহার চারি দিকে তীক্ষ্ণধার লৌহ, সুতরাং সেই হতভাগ্য ব্যক্তি বসিতে, শুইতে, ঘুমাইতে পারিত না, সর্বক্ষণ তাহাকে লৌহ-ভার বহন করিতে হইত। শত শত লোককে তাহারা অনাহারে যন্ত্রণা দিত। কেবলমাত্র মৃগয়া করিবার সুবিধার জন্য বিজেতা উইলিয়ম সমস্ত হ্যাম্পশিয়র অরণ্য করিয়া দিলেন, প্রতিহিংসা তুলিবার আশয়ে সমস্ত নর্দাম্বরল্যান্ড জনশূন্য করিয়া দিলেন। টাইন ও হাম্বারের মধ্যবর্তী ভূভাগে নয় বৎসর ধরিয়া একটি গ্রাম বা একটি জনপ্রাণী মাত্র ছিল না। নর্ম্যান অত্যাচারে দেশ কতখানি জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা নর্ম্যান অধিকারের পূর্ব ও পরের অধিবাসী সংখ্যা তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে। পূর্ব ইয়র্কে ১৬০৭ গৃহ ছিল, উইলিয়মের রাজত্বকালে ৯৬৭ অবশিষ্ট থাকে, অক্সফোর্ডে ৭২১ গৃহ ছিল, তাহার ২৪৩ মাত্র অবশিষ্ট থাকে, ডচেস্টরে ১৭২ গৃহের ৭২ মাত্র অবশিষ্ট থাকে, ডর্বিতে ২৪৩ গৃহের ১৪০ ধ্বংস হইয়া যায়, এমন আর কত কহিব? ইংলন্ডের নর্ম্যান রাজগণ, নিজে পাত্র নির্বাচিত করিয়া লইয়া তাঁহাদের অধীনস্থ ব্যক্তিদিগের দুহিতাদের বলপূর্বক বিবাহ দিয়া দিতেন। মনোমতো বিবাহ করিতে হইলে অর্থদণ্ড দিতে হইত। কাউন্টেস অফ অ্যালবেমালকে (Countess of Albimarle) একটি কোমরবন্ধ দিবার কথা মনে করাইয়া না দেওয়াতে রাজা জন উইঞ্চেস্টরের বিশপকে ১ টন মদিরা দণ্ড দিতে বাধ্য করান। এমন কত সামান্য সামান্য বিষয়ে দণ্ড দিতে হইত। বিশেষ ব্যক্তির নামে নালিশ করিতে বা বিশেষ আদালতে মকদ্দমা উত্থাপন করিতে বা বিচারে ন্যায্য ভূমিখণ্ড পাইলে তাহা দখল করিতে, টাকা দিতে হইত। পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখিলে প্রত্যর্থী বিচারের বিলম্ব করাইতে, কখনো বা অন্যায় বিচারের সাহায্য করিতে রাজাকে টাকা দিত। সুবিচার ও শীঘ্র বিচার পাইবার জন্য ন্যায্য বিচারাকাঙ্ক্ষী অর্থীকে আবার অর্থ দিতে হইত। স্যাক্সন ক্রনিকল-লেখক বিলাপ করিয়া বলিতেছেন, 'ঈশ্বর জানেন, এই হতভাগ্য ব্যক্তিগণ কী অন্যায়রূপে পীড়িত হইতেছে। প্রথমে তাহাদের ধন-সম্পত্তি কাড়িয়া লওয়া হয়, পরে তাহাদিগকে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করে। এ বৎসরে (১১২৪) অতি দুষ্কাল পড়িয়াছে। গুরুভার করে ও অন্যায় ডিক্রিতে সকলেই আপনার আপনার সম্পত্তি খোয়াইতেছে।' 'তাহারা (নর্ম্যানরা) করে করে গ্রামের সমস্ত ধন-সম্পত্তি শোষণ করিয়া লইয়া অগ্নি লাগাইয়া দেয়। ভ্রমণ করিতে বাহির হইলে দেখিতে পাইবে গ্রামে একটি লোক নাই, ভূমি আকৃষ্ট পড়িয়া রহিয়াছে। যদি দেখা যায় দুই-তিনটি মাত্র ব্যক্তি অশ্বারোহণে একত্রে চলিতেছে, অমনি গ্রামসুদ্ধ লোক তাহাদিগকে লুণ্ঠনকারী মনে করিয়া গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যায়। লোকে প্রকাশ্যভাবে বলিত যে, ক্রাইস্ট ও তাঁহার Saintগণ ঘুমাইয়া

আছেন।' টিউটনিক স্যাক্সন বিজেতাগণ পরাজিত শেল্‌টদিগকে যেরূপ নিষ্পীড়িত করিয়াছিল, এই ফরাসি চাকচিক্য-প্রাপ্ত টিউটনিক জাতিও কি পরাজিত জাতির প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিল না? বিজিতদের দেশে বিজেতার এরূপ অত্যাচার এরূপ অসভ্য ব্যবহার অনেক পরিমাণে স্বাভাবিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের নিজ দেশে, যেখানে চারি দিক হইতে খৃস্টধর্ম-দীক্ষিত সভ্য জাতির নেত্র পড়িয়া আছে, সেখানে তাহাদের কীরূপ ব্যবহার? বালক উইলিয়ম যখন নর্ম্যান্ডির সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তখন বালক-হস্ত-স্থিত রাজদণ্ডের দুর্বলতা প্রযুক্ত নর্ম্যান জাতির অন্তর্গত পশুত্ব কীরূপ প্রকাশ পাইয়া উঠিল একবার আলোচনা করিয়া দেখো। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামীগণের মধ্যে প্রকাশ্য যুদ্ধ-বিগ্রহের তো কথাই ছিল না, কিন্তু প্রকাশ্য যুদ্ধ-বিগ্রহ যতই অন্যায় হউক-না সচরাচর তাহা বীরত্বের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে, সুতরাং সে বিষয়ে আমরা কিছু বলিব না; কিন্তু গুপ্তহত্যা তখন এমন মুহুর্মুহু অনুষ্ঠিত হইত যে, লোকের চক্ষে তাহার ভীষণত্ব হ্রাস হইয়া গিয়াছিল। তখন ছুরিকা ও বিষ, রোগ বিপত্তি প্রভৃতি পৃথিবীর অনিবার্য আপদের মধ্যে গণ্য হইয়া গিয়াছিল। অনেক সময়ে অজ্ঞাত কারণে অসন্দিগ্ধ-চিত্ত নিরস্ত্র অতিথিকে ভোজের স্থলে হত্যা করা হইত। বেলেমের (Belesme) অধিস্বামী উইলিয়ম ট্যালভ্যাস তাঁহার স্ত্রীর ধর্মিষ্ঠতা ও সচ্চরিত্রতা হেতু বিরক্ত হইয়া গোপনে হত্যাকারী রাখিয়া গির্জায় যাইবার পথে তাহাকে বিনাশ করেন; বিনাশ করিবার এমন দারুণ কারণ শুনি নাই, এমন দারুণ সময় দেখি নাই! এই দুর্বৃত্ত তাহার দ্বিতীয়বার বিবাহকালে বিবাহ-সভাস্থ এক অসংশয়-চিত্ত অতিথির চক্ষু উৎপাটিত ও নাসা কর্ণ ছেদন করে। এইরূপ নীতির ঘোরতর ব্যভিচার দেখিয়া ধর্মযাজকগণ, নীতির সংস্কারের প্রতি মনোযোগ দিলেন। গুপ্ত যুদ্ধবিগ্রহ, অন্যায় মনুষ্যহত্যা নিবারণের জন্য তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইল না। অবশেষে হতাশ হইয়া তাঁহাদের সংস্কারের সীমা সংকীর্ণ করিলেন। কতকগুলি বিশেষ গুরুতর পাপকার্যের অনুষ্ঠান নিষেধ করিলেন, কতকগুলি বিশেষ ব্যক্তিদিগকে সম্মান করার নিয়ম করিলেন, এবং কতকগুলি বিশেষ পুণ্য মাসে বা সময়ে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ রাখার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু নর্ম্যান্ডিতে এ চেষ্টা সফল হইল না। যাজকগণ বুধবার সন্ধ্যা হইতে সোমবার প্রভাত পর্যন্ত সকল প্রকার ভীষণ কার্যের অনুষ্ঠান রহিত করিতে আদেশ দিলেন; কিন্তু নর্ম্যান্ডিতে ছুরিকা এতক্ষণ বিশ্রাম করিতে পারিত না, নর্ম্যান হৃদয়ে নরকের জাগ্রত উপদেবতা এতকাল নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে আপনাকে দংশন করিতে থাকিত, সুতরাং ইহাও অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। অবশেষে ক্যাম্‌ব্রের বিশপ জেরাড এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ভূপালদিগের কার্য রক্তপাত করা ও যাজকদিগের কার্য প্রার্থনা করা। এক দল পাপ করিবে, আর-এক দল তাহাদের হইয়া দেবতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে! জেরাড অন্যান্য বিশপদিগকে ক্ষান্ত হইতে পরামর্শ দিলেন, তাহাদের কার্য প্রার্থনা করা, তাহাদের অনধিকার চর্চা করিবার আবশ্যক কী? তিনি কহিলেন, সংস্কারের নিয়ম প্রচারিত করিলে লোকের মধ্যে কপটতা প্রশ্রয় পাইবে মাত্র। কাটাকাটির মুখ হইতে নর্ম্যানদিগকে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করা নিতান্ত দুরাশা। নিদারুণ কার্য নহিলে তাহারা আমোদ পাইত না। সিংহ-হৃদয় রিচার্ডকে নর্ম্যান কবি কহিতেছেন, ইহা অপেক্ষা উত্তম নৃপতির কথা কখনো কাব্যে গীত হয় নাই। এই নৃপতি ক্রুসেড যুদ্ধকালে একবার শূকর-মাংস খাইবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। পাচক শূকর না পাওয়াতে একজন স্যারাসীনকে কাটিয়া তাহার তাজা ও কোমল মাংস রন্ধন করিয়াছিল। সে মাংস রাজার বড়োই ভালো লাগিল, তিনি শূকরের মুণ্ড দেখিতে চাহিলেন। ভীত-হৃদয় পাচক সভয়ে নরমুণ্ড আনিয়া উপস্থিত করিল। রিচার্ডের বড়োই আমোদ বোধ হইল, তিনি হাসিয়া উঠিলেন, কহিলেন, 'খাদ্যের এমন সুবিধা থাকিলে দুর্ভিক্ষের ভয় থাকিবে না।' জেরুজিলাম বিজিত হইলে সত্তর হাজার (৭০,০০০) অধিবাসী হত হয়। দ্বিতীয় হেনরি একবার ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বালক ভৃত্যের চক্ষু ছিঁড়িয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। রিচার্ড নগর অধিকার করিলে পর স্যারাসীন-রাজ স্যারাসীন বন্দীদের মার্জনা প্রার্থনা করিয়া দূত প্রেরণ

করিলেন। রিচার্ড ত্রিশ জন স্যারাসীন বন্দীর মাথা কাটিয়া প্রত্যেক মাথায় হত ব্যক্তির নাম লিখিয়া, রন্ধন করিয়া প্রত্যেক দূতের সম্মুখে আহারার্থে রাখিতে অনুমতি দিলেন ও তাঁহার নিজের পাত্রে যে মুণ্ড ছিল তাহা অতি উপভোগ্য পদার্থের ন্যায় খাইতে লাগিলেন। যাট হাজার বন্দী ক্ষেত্রে আনীত হইলে নর্ম্যান কবি কহিতেছেন—

ক্ষেত্র পূরি দাঁড়াইল বন্দীগণ সবে,
দেবতারা স্বর্গ হতে কহিলেন তবে।
'মারো মারো কাহারেও ছেড়ো না, ছেড়ো না,
কাটো মুণ্ড, এক জনে কোরো না মার্জনা।'
শুনিলা রিচার্ড রাজা বাণী দেবতার,
ঈশে ও পবিত্র ক্রুসে কৈলা নমস্কার।

এমন নিদারুণ আদেশ নর্ম্যানদের দেবতাদের মুখেই সাজে। এ ঘটনা সত্য না হইতেও পারে, কিন্তু নর্ম্যান কবি রিচার্ডের গৌরব-প্রচার-মানসেই ইহা কীর্তন করিয়াছেন, ইহাতে কি তখনকার লোকের মনোভাব প্রকাশ পাইতেছে না? কীরূপ ঘটনায় তখনকার লোকের হৃদয়ে ভক্তিমিশ্রিত বিস্ময় ও বিস্ময়-মিশ্রিত আনন্দের উদয় হইবে তখনকার কবি তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেন। রিচার্ড কোনো নগর অধিকার করিলে সেখানকার শিশু ও অবলাদের পর্যন্ত হত্যা করিতেন। এই রিচার্ডই তখনকার লোকদের নিকট দেবতার স্বরূপ, কবিদের নিকট আদর্শ বীরের স্বরূপ বিখ্যাত ছিলেন। এমন-কি, এই 'উনবিংশ শতাব্দীর' ইংরাজি ঐতিহাসিকেরাও হয়তো তাঁহাকে তৈমুর বা জঙ্গিস্ খাঁর সহিত গণ্য করিতে সংকোচ বোধ করিবেন। সেনল্যাকের যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরাজ-সৈন্যের পরাজয়ের পর যেখানে বাণ-বিদ্ধ হ্যারল্ড ভূপতিত হন, সেইখানে বসিয়া উইলিয়ম মৃত দেহরাশির মধ্যে পান ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

নর্ম্যানেরা যখন ইংলন্ড বিজয় করিতে আইসে, তখন তাহাদের এইরূপ অবস্থা। স্যাক্সনেরা তখন কী করিতেছে? 'স্যাক্সনেরা পরস্পর জেদাজেদি করিয়া সর্বদা মদ্যপানে রত আছে; দিবারাত্রি পান ভোজনেই তাহারা অর্থ ব্যয় করিতেছে, অথচ তাহাদের বাসস্থান অতি হীন! কিন্তু ফরাসি ও নর্ম্যানগণ অতি অল্প ব্যয়ে জীবন যাপন করে, অথচ দিব্য বৃহৎ গৃহে বাস করে, তাহাদের আহার্য উত্তম, বস্ত্র অতিশয় পরিপাটি' অর্থাৎ স্যাক্সনদের এখনো শিল্পে রুচি জন্মে নাই, উত্তেজনাময় হীন আমোদেই তাহাদের জীবন কাটিতেছে। যেদিন নর্ম্যানদের সহিত যুদ্ধ হইবে তাহার পূর্বরাত্রে 'তাহারা সমস্ত রাত পান ভোজনে মত্ত আছে। তুমি দেখিতে পাইবে তাহারা মহা যুঝাযুঝি লাফালাফি, অট্টহাস্য ও গান-বাজনায় রত হইয়াছে'। তখন স্যাক্সনরা এমন মূর্খ, অনক্ষর অসভ্য ছিল যে, নর্ম্যানেরা মূর্খ স্যাক্সন যাজকদিগকে ধর্মমঠ হইতে দূর করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল। স্যাক্সনদের এইরূপ অতি হীন অবস্থার সময় অপেক্ষাকৃত সুরুচি ও সুসভ্য নর্ম্যানগণ ইংলন্ডে পদার্পণ করিল। এই উপলক্ষে ইংলন্ডে শুদ্ধ যে কেবল সুশোভন প্রাসাদ উত্থিত ও বিদ্যাধ্যাপনশীল যাজকগণের সমাগম হইল তাহা নহে, নর্ম্যানদের প্রবল প্রতাপে ডেনমার্ক ও নরোয়েবাসী দস্যুদের হস্ত হইতে ইংলন্ড পরিত্রাণ পাইল। নর্ম্যানদের আগমনে ইংলন্ডের আরও অনেক অলক্ষিত উপকার হইয়াছিল, কিন্তু বিজিত জাতি বিজেতাদের হস্ত হইতে ন্যায় ও সুবিচারের আশা করিতে পারে না, বিশেষত বিজিত জাতি যখন বিজেতাদের অপেক্ষা সভ্যতায় হীন, তখন ন্যায়ের আশা হতভাগ্যদের পক্ষে দুরাশা! সমযোগ্য ব্যক্তির প্রতিই ন্যায়াচরণ করাই প্রায় পৃথিবীর নিয়ম, নিকৃষ্টতরদিগকে পশুবৎ ব্যবহার করিতে লোকে অন্যায় মনে করে না; যদি তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করে তবে তাহা অনুগ্রহ মাত্র। পৃথিবীতে ন্যায়ের সীমাও এমন সংকীর্ণ। স্যাক্সনদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠিত হইল। যদি কোনো জেলায় একজন নর্ম্যান হত হইত, তাহা হইলে গ্রামবাসীদের হয় হত্যাকারীকে ধরাইয়া দিতে নয় প্রত্যেককে অর্থদণ্ড দিতে হইত, কিন্তু একজন স্যাক্সন হত হইলে বড়ো একটা গোলযোগ হইত না। নর্ম্যান ধর্মাচার্যগণ আসিয়া স্যাক্সন-রাজা ও তপস্বীদের

কবরস্থ অস্থিরাশি অমান্যের সহিত উৎখাত করিয়া ফেলিতেন, Ivo Taille-bois-এর নিকট তাঁহার প্রজারা যথানির্দিষ্ট বিনতি দেখাইতে প্রাণপণ করিত। এক হাঁটু গাড়িয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ করিত। তাঁহাকে যতখানি মান্য ও কর দিবার কথা, তদপেক্ষা অধিক দিয়াও বেচারীরা নিষ্কৃতি পাইত না। তিনি তাহাদিগকে যন্ত্রণা দিতেন, কয়েদ করিতেন, তাহাদের পশুপালের পশ্চাতে কুক্কুর লাগাইয়া দিতেন, তাহাদের বাহনদিগের মেরুদণ্ড ও পা ভাঙিয়া দিতেন। এই তো অত্যাচারী, উদ্ধত, গর্বিত, সভ্যতাভিমানী, বিজেতা নর্ম্যান জাতি!

আমরা অ্যাংলো-নর্ম্যান সাহিত্য আলোচনা করিবার পূর্বে নর্ম্যান জাতি-চরিত্র ও তাহাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লইয়া আন্দোলন করিলাম। কিন্তু ইহা যেন কেহ অনর্থক মনে না করেন। সাহিত্য মনুষ্য-হৃদয়ের ছায়ামাত্র; যে জাতির সাহিত্য আলোচনা করিবে তাহাদের চরিত্র আলোচনা যদি না কর তবে তাহা দারুণ অঙ্গহীন হইবে। এইখানে বলা কর্তব্য, আমরা যে অ্যাংলো-নর্ম্যান সাহিত্য আলোচনা করিতে বসিয়াছি, তাহার কারণ এমন নয় যে, অ্যাংলো-নর্ম্যান সাহিত্য অতি বিপুল, অ্যাংলো-নর্ম্যান সাহিত্য-ভাণ্ডার বহুমূল্য উজ্জ্বল মণিময়। কীরূপে ইংরাজি সাহিত্য গঠিত হইল তাহা জানিতে কাহার না ইচ্ছা হইবে? ইংরাজি সাহিত্যে ও ইংরাজি চরিত্রে নর্ম্যান প্রভাব স্পষ্ট লক্ষিত হয়— ইংরাজি সাহিত্যের ইতিবৃত্ত জানিবার নিমিত্তই আমরা নর্ম্যান সাহিত্য আলোচনা করিতেছি।

ভারতী
ফাল্গুন ১২৮৫

দ্বিতীয় প্রস্তাব

আমরা 'স্যাক্সন জাতি ও অ্যাংলো-স্যাক্সন সাহিত্য' নামক প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, অ্যাংলো-স্যাক্সন রাজত্বের পতনের কিছু পূর্বে অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতি ক্রমশই অবনতির গহ্বরে নামিতেছিল। মাহাত্মা অ্যালফ্রেড তাঁহার প্রজাদের মধ্যে বিদ্যাচর্চা বিষয়ে যে উদ্যম উদ্রেক করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তাহা ক্রমশ বিনষ্ট হইয়া গেল। অকর্মণ্যতা অজ্ঞতা ও আলস্যে সমস্ত জাতিই যেন জড়ীভূত ও অভিভূত হইয়া আসিতেছিল। টিউটনিক জাতির শিরায় শিরায় প্রধাবিত যে স্বাধীনতাপ্রিয়তার জ্বলন্ত-বহ্নি তাহাও যেন ক্রমশই নির্বাপিত ও শীতল হইয়া আসিতেছিল। স্যাক্সনগণ যখন দিগ্‌বিদিক লুণ্ঠন করিবার মানসে দলবদ্ধ হইয়া সমুদ্রবক্ষে বিচরণ করিত তখন তাহাদের দলপতি ছিল বটে কিন্তু রাজা ছিল না, তখন তাহারা সর্বতোমুখী প্রভুতার অধীনে গ্রীবা নত করিতে পারিত না, কিন্তু যখন তাহারা ইংলণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন করিল তখন দলপতি ও দলস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে ক্রমশ রাজা-প্রজার সম্বন্ধ স্থাপিত হইল, উভয়ের মধ্যে ঐক্যভাব ঘুচিয়া গেল ও সাধারণ ব্যক্তিদের অপেক্ষা দলপতি ক্রমে উচ্চতর আসনে অধিষ্ঠিত হইল। দলপতির পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আরও কতকগুলি উচ্চ পদের সৃষ্টি হইল, এইরূপে অধিবাসীগণ উচ্চ ও নীচ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইল। যেখানেই উচ্চ ও নীচ শ্রেণীর বিভাগ আছে, সেইখানেই যে উচ্চ শ্রেণী নীচ শ্রেণীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিবে তাহার আর কী কথা অছে; ডেনিস দস্যুদের অত্যাচারে নিবাসীদের ধন প্রাণ এমন সংকটাপন্ন হইয়াছিল যে অ্যালফ্রেডের সময় হইতে ইহা এক প্রকার স্থির হইয়া গিয়াছিল যে, সকলকেই একজন Thign-এর অর্থাৎ প্রভুর আশ্রয়ে থাকিতে হইবে; (Thign অর্থে ভৃত্য বুঝায় কিন্তু রাজার ভৃত্য হউক প্রজাদের প্রভু।) আশ্রয়দাতা ও আশ্রিতদের মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ স্থাপিত হইল, এইরূপে সকল অধিবাসীর সমান অধিকার ক্রমশ বিনষ্ট হইয়া গেল। বহিঃশত্রু, ডেনিস দস্যুদের দ্বারা স্যাক্সনেরা যথেষ্ট নিপীড়িত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাই তাহাদের একমাত্র দুর্ভাগ্য নয়; তাহাদের আপনাদের মধ্যে ঐক্য ছিল না, ক্ষুদ্র ইংলন্ড তখন খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছিল, প্রত্যেক প্রদেশ-স্বামী অপরাপর প্রদেশের উপর আধিপত্য স্থাপনের নিমিত্ত প্রাণ পণ করিতেছিল। এইরূপ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন উপদ্রুত

শ্রান্ত দেশে সাহিত্যের যে যথেষ্ট অবনতি হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কী? যাহা সমগ্র জাতির হৃদয়ের কথা প্রকাশ না করে, সমগ্র জাতির হৃদয়ে যাহা প্রতিধ্বনিত না হয় তাহাকে আর জাতীয় সাহিত্য বলিব কী করিয়া? যে বিদ্যা কেবল ধর্মাচার্যগণের অধিকারের মধ্যেই বদ্ধ ছিল ও যে সাহিত্য আশ্রম-গৃহের ধূলিময় গ্রন্থাধারের অন্ধকারের মধ্যেই আচ্ছন্ন ছিল, সে বিদ্যাকে সমগ্র জাতির উন্নতির চিহ্ন ও সে সাহিত্যকে সমস্ত জাতির হৃদয়ের কথা বলিতে পারি না। একে তো বিদ্যাচর্চা অতিশয় সংকীর্ণ শ্রেণীতেই বদ্ধ ছিল, তাহাতে তাহার সীমা আরও ক্রমশ সংকীর্ণতর হইয়া আসিতে লাগিল, ধর্মাচার্যদের মধ্যে ক্রমশ বিদ্যানুশীলন রহিত হইল। এইরূপে অজ্ঞতা-অন্ধকারাচ্ছন্ন ইংলন্ডে রক্তপাত ও অশান্তি রাজত্ব করিতে লাগিল।

এইরূপ অবস্থায় যখন নর্ম্যানেরা ইংলন্ডে আসিল তখন তাহারা সাহিত্যশূন্য নিষ্ফল স্যাক্সন ভাষা ও স্যাক্সনভাষীদের প্রাণপণে ঘৃণা করিতে লাগিল। সুতরাং স্বভাবতই ফরাসি তখনকার সাধুভাষা, রাজভাষা ও লিখিবার ভাষা হইয়া দাঁড়াইল। পাছে অসভ্য স্যাক্সনদের সহিত মিশিয়া তাহাদের ভাষা ও আচার-ব্যবহার কলুষিত হইয়া যায় এইজন্য নর্ম্যানেরা তাহাদের সন্তানদের ফ্রান্সে পাঠাইয়া দিত। পাঠশালে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সকলকেই ফরাসি অথবা ল্যাটিন ভাষায় কথা কহিতে হইত। স্যাক্সন ইতর ভাষা হইয়া দাঁড়াইল। সে ভাষায় আর পুস্তক লিখা হয় না। তখন তো মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, সুতরাং অতি অল্প লোকেরই পুস্তক প্রাপ্তি ও পাঠের সুবিধা ছিল, সাধারণ লোকদিগের পাঠ করিবার অবসর, সুবিধা ও ক্ষমতা ছিল না; যাহাদের পুস্তক পাঠ করিবার ক্ষমতা ছিল তাহারা সংগতিপন্ন উচ্চ শ্রেণীর লোক, তাহারা ফরাসি বা ল্যাটিন ছাড়িয়া গ্রাম্য স্যাক্সন পুস্তক পড়িতে স্বভাবতই সংকোচ ও অরুচি অনুভব করিত। আমাদের দেশে যখন নূতন ইংরাজি শিক্ষা প্রচলিত হয়, তখন আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ দুইছত্র ইংরাজি লিখিতে পারিলে যেমন বিদ্যাশিক্ষা সফল হইল মনে করিতেন, নর্ম্যান অধিকারে স্যাক্সন যুবাদেরও সেই দশা ঘটিয়াছিল। শুদ্ধ তাহাই নহে, এরূপ অবস্থায় স্যাক্সন ভাষায় লিখিতে চেষ্টা করা হেয় কার্যের মধ্যে গণ্য হওয়াই স্বাভাবিক। স্যাক্সন ভাষায় পুস্তক লিখিতে গেলে পাছে কেহ মনে করে, তবে বুঝি লেখক ফরাসি জানে না, ইহা অপেক্ষা লজ্জার কথা কী আছে বলো। কোনো কোনো কবি কয়েক ছত্র ফরাসি ও কয়েক ছত্র স্যাক্সন লিখিতেন, কেননা, এরূপ করিলে ফরাসি ভাষায় অজ্ঞতার অপবাদ লেখকের নামে পৌঁছাইতে পারে না, তাহা হইলেই তিনি এক প্রকার নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। নিম্নে একটি উদাহরণ উদ্‌ধৃত করিতেছি—

Len puet fere et defere,
Ceo fait-il trop sovent :
It nis nouther wel ne faire;
Therefore England is Shent.
Nostre prince de Englatere
Par le consail de sa gent
At Westministr after the feire
Made a gret parlement.

কেহ কেহ বা ল্যাটিন, ফরাসি ও চলিত ভাষা এই তিন মিশাইয়া কবিতা লিখিতেন—

When mon may mest do
Tunc ville suum manifestat
In donis also si vult tibi
prœmia proestat.
Ingrato benefac, post

Hœc á peyne te verra;
Pur bon vin tibi lac non dat
Nec rem tibi rindra.

দুই-তিনটি বিভিন্ন ভাষার এরূপ ঘোরতর মিশ্রণের ফল হয় এই যে, উহাদের কোনোটা বিশুদ্ধ থাকিতে পারে না, সকলগুলাই বিকৃত হইয়া যায়। ফরাসির মধ্যে স্যাক্সন ভাব ও কথা, স্যাক্সনের মধ্যে ফরাসি ভাব ও কথা প্রবেশ করিয়া ফরাসি ও স্যাক্সন উভয়ই ভিন্ন মূর্তি ধারণ করে। ইংলন্ডে তাহাই হইয়াছিল। নর্ম্যান আমীর-ওমরাওগণ স্যাক্সনমিশ্রিত ফরাসি কহিতে লাগিল ও সাধারণ অধিবাসীগণ ফরাসিমিশ্রিত স্যাক্সন কহিতে লাগিল। নর্ম্যানেরা যে এত চেষ্টা করিয়াছিল, যাহাতে তাহাদের ভাষা বিশুদ্ধ থাকে, সে চেষ্টা সফল হইল না। যখন নর্ম্যান ও স্যাক্সনদের মধ্যে বিবাহের কোনো বাধা ছিল না, তখন স্যাক্সন ও ফ্রেঞ্চ দুই ভাষার মিশ্রণ নিবারণের কোনো উপায় ছিল না। এইরূপে যখন দুই ভাষা মিশিয়াছিল বা মিশিতেছিল, তখনকার সাহিত্য Semi-Saxon অর্থাৎ অর্ধ-স্যাক্সন সাহিত্য নামে অভিহিত হইয়াছে।

সেমি-স্যাক্সন সাহিত্য আর কিছুই নহে, তাহা ইংরাজি সাহিত্যের বাল্যাবস্থা— সংগ্রহ, অনুকরণ ও অনুবাদের অবস্থা। ফরাসি সাহিত্যই তাহার আদর্শ। এ সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্বে Chivalry-র বিষয় সংক্ষেপে অনুশীলন করা আবশ্যক।

'য়ুরোপীয় ক্ষাত্র ধর্ম' বলিলে Chivalry-র একপ্রকার বাংলা অনুবাদ করা হয়, কেবল আমাদের ক্ষাত্রধর্মে মহিলা-পূজা ছিল না, Chivalry-তে তাহা ছিল। যদি 'ক্ষতাৎ কিল ত্রায়ত ইত্যুদগ্রঃ, ক্ষত্রস্য শব্দো ভুবনেষু রূঢ়' হয়, তবে Chivalrous অর্থেও তাহাই বুঝায়। মধ্যযুগে য়ুরোপে যখন বলের নামই ন্যায়, ধর্ম, শক্তি ছিল, তখন সেই নির্দয় বলের হস্ত হইতে দুর্বলকে রক্ষা করাই Chivalry-র উদ্দেশ্য ছিল! যদিও ইহাই তাহার উদ্দেশ্য তথাপি ফলে Chivalry সেই উদ্দেশ্য হইতে অনেক দূরে পড়িয়া ছিল— প্রকৃতপক্ষে, যশের ইচ্ছা তৃপ্ত করিবার নিমিত্ত বিজয় সাধন করিয়া বেড়ানোই Chivalry-র কার্য হইয়াছিল। আপনার বলের উপর বিশ্বাস থাকিলে সেই বল পরীক্ষা ও অনুশীলন করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী অন্বেষণের বাসনা হয়, এই নিমিত্ত মধ্যযুগের নাইটগণ (Knight) বিপদ অন্বেষণ ও দুঃসাহসিকতা অনুষ্ঠান করিয়া বেড়াইতেন। সমাজের আদিম অবস্থায় রক্তপিপাসা শান্তির নিমিত্তই লোকে রক্তপাত করিত, কিন্তু য়ুরোপের সমাজ যখন অধিকতর উন্নত হইল তখন যশ-ইচ্ছার নিমিত্ত রক্তপাত প্রচলিত হইল। সামাজিকতা বিষয়ে অনেক উন্নত না হইলে কখনো যশের ইচ্ছা জন্মিতে পারে না। সমাজে বিখ্যাত হইবার ইচ্ছাই সমাজের প্রতি অনেক পরিমাণে মমতা জন্মিবার চিহ্ন। Chivalry-র আর-এক ভাগ মহিলা-পূজা। এই মহিলা-পূজা এমন অপরিমিত সীমায় পৌঁছিয়াছিল যে, তাহা সমূহ গর্হিত ও হাস্যজনক। ঈশ্বর ও মহিলা -পূজা এক শ্রেণীর অন্তর্ভূত হইয়াছিল। বুর্বোঁর ডিউক Louis II তাঁহার নাইটদিগকে বলিয়াছিলেন যে, 'From them (ladies) after God comes all the honour that men can acquire.' অ্যারাগনের অধিপতি James II নিয়ম করিয়াছিলেন যে, মহিলার সঙ্গে থাকিলে হত্যা ভিন্ন যে-কোনো দোষে কেহ দোষী হউক-না কেন তাহাকে কেহ স্পর্শ করিতে পারিবে না। নর্ম্যানরা এই Chivalry ভাব ইংলন্ডে আনয়ন করিল। Chivalrous কবিতা ও সংগীত Semi-Saxon সাহিত্য পূর্ণ করিল। ইহার পূর্বে অ্যংলো-স্যাক্সন সাহিত্যে রক্তপাত ও যুদ্ধের বর্ণনা অনেক ছিল, কিন্তু তাহার মধ্যে Chivalry ভাব কিছুমাত্র ছিল না। এখন বীরত্বের গৌরব কীর্তন, বিজয়-সংগীত ও রমণীদের স্তুতিবাদে ইংরাজি সাহিত্যক্ষেত্র ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কিন্তু সকলগুলিই প্রায় অনুবাদ, ও তাহাদের মধ্যে কবিত্ব-উচ্ছ্বাস কিছুমাত্র নাই। অতি পরিষ্কারভাবে ছত্রের পর ছত্র আসিতেছে, গল্পের স্রোত অতি নির্বিবাদে চলিয়া যাইতেছে, তাহার মধ্যে ভাব নাই, তুলনা নাই, কবিত্বপূর্ণ বিশেষণ নাই, কতকগুলি কথা ও ঘটনা জোড়া-তাড়া দিয়া এক-একটা স্ফীতোদর পুস্তক রচিত হইয়াছে।

লেখক অতিশয় বিরক্তিজনক অনর্গল বক্তার মতো বকিয়া বকিয়া, গল্প টানিয়া বুনিয়া, কথা বিনাইয়া পাঠকের নিদ্রাকর্ষণ না করিয়া ক্ষান্ত নহেন। যত প্রকার অলীক অস্বাভাবিক, আশ্চর্যজনক কথা লেখকের কল্পনায় আসিতে পারে সকলই তিনি তাঁহার গল্পে গাঁথিয়া দিতে চাহেন। *Romance of Alexander* নামক কাব্যগ্রন্থ হইতে দুই-একটা নমুনা দিতেছি—

মকর নামেতে প্রাণী আশ্চর্য আকার
বলবান প্রাণী বটে, বড়ো জাঁক তার—
কুমীরের 'পরে যদি পড়ে তার চোখ,
তবে আর রক্ষে নেই, দেখে কেবা রোখ?
দুজনে লড়াই বাধে বড়ো ঘোরতর
প্রহারে দোঁহারে দোঁহে করে জর জর
মকর সেয়ানা বড়ো দোঁহার মাঝারে,
চুপি চুপি অমনি সে জলে ডুব মারে;
মুখে তার তীক্ষ্ণ অস্ত্র, কুমীরের পেটে
যেমন বিঁধিয়ে দেয়, মরে পেট ফেটে॥

একটি ypotame-এর বর্ণনা শুনুন—

জলহস্তী বড়োই আশ্চর্য জানোয়ার,
হাতিও তেমন নহে কী কহিব আর!
ঘোড়ার মতন তার ঘাড়, পিঠ, জানি,
লেজ তার বাঁকা আর খাটো শুঁড়খানি!
পিচের মতন তার রঙ বড়ো কালো
যত কিছু ফল খেতে বড়ো বাসে ভালো,
আপেল বাদাম আদি কিছু নাহি ছাড়ে,
কিন্তু সব চেয়ে তৃপ্তি মানুষের হাড়ে!

এই তো কবিতার শ্রী। এরূপ ধৈর্যনাশক শ্লোকসমূহ উদ্‌ধৃত করিতে আমরা ভয় করিতেছি, সুতরাং নিরস্ত হইতে হইল। কেবল তখনকার Romance নামক গ্রন্থসকলের ভাব বুঝাইবার জন্য *Geste of kyng Horn* নামক গ্রন্থের মর্ম পাঠকদের কহিতেছি। রাজা 'মারে' যুদ্ধে বিধর্মী স্যারাসীনদের দ্বারা হত হইলে পর তাঁহার পুত্র, গ্রন্থের নায়ক, হর্ন একটি ক্ষুদ্র নৌকায় কতকগুলি সঙ্গীর সহিত রাজা এমারের (Aylmer) দেশে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানকার রাজসভায় তিনি বিদ্যা শিক্ষা করেন। ক্রমে রাজা এমারের একমাত্র কন্যা রিমেন্‌হিল্‌ড্ (Rimenhild) তাঁহার প্রেমে পড়িল। রাজকন্যা, হর্নকে একটি মায়াময় অঙ্গুরী উপহার দেন। সেই অঙ্গুরী লইয়া তিনি স্যারাসীনদের সহিত যুদ্ধ করিতে বহির্গত হন, ও অঙ্গুরী প্রভাবে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া পুনরায় এমারের সভায় ফিরিয়া আসেন। কিন্তু রাজা এমার হর্নের সহিত তাঁহার কন্যার প্রেম বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া হর্নকে নির্বাসিত করিয়া দেন। হর্ন তাঁহার প্রণয়িনীর সহিত বিদায় লইবার সময় বলিয়া গেলেন যে, রাজকন্যা যেন সাত বৎসর তাঁহার জন্য অপেক্ষা করেন— ইতিমধ্যে তিনি যদি না ফিরিয়া আসেন, তবে রাজকুমারী আর কাহাকেও বিবাহ করিতে পারেন। ইতিমধ্যে রাজা মোডি রিমেন্‌হিল্‌ড্‌কে বিবাহ করিবার পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। রাজকুমার হর্ন ঘটনাচক্রের আবর্তনে অনেক বিপদ-আপদ সহিয়া রাজা মোডির মুষ্টি হইতে রাজকন্যাকে মুক্ত করিয়া বিবাহ করিলেন। বিবাহের পর তিনি যুদ্ধ করিয়া তাঁহার মাতৃভূমি সুদীন Suddine শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত করেন। যখন তিনি যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন তাঁহার কপট বন্ধু ফাইক্‌নিল্‌ড (Fykenild) সুযোগ পাইয়া রিমেন্‌হিল্‌ড্‌কে বলপূর্বক বিবাহ করিতে চেষ্টা

করিতেছিল। যুদ্ধাবসানে হর্ন ফাইক্‌নিল্‌ডের দুর্গে বীণাবাদকের বেশে প্রবেশ করিয়া তাহাকে নিহত করিলেন ও তাঁহার প্রণয়িনীর সহিত মিলিত হইলেন। গল্প কিছু মন্দ নহে কিন্তু লেখক এমন খুঁটিনাটি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন ও এমন সাদাসিধাভাবে লিখিয়া গিয়াছেন যে, ইহাকে কবিতা বলিতে পারি না।

সেমি-স্যাক্সন ভাষায় অনেক প্রেমের কবিতা আছে, কিন্তু এমন ভাববিহীন অসার কবিতা অনুবাদ করিতে গেলে তাহার আর রসকষ কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, এরূপ কবিতা অনুবাদ করিলে পাঠকদের কিছু লাভ নাই, কেবল অনুবাদকের যন্ত্রণাভোগ। একটি অনুবাদ উদ্‌ধৃত করিতেছি—

কথা মোর রাখো দেখি, একবার দেও সখি
প্রেমের আশ্বাস।
চাহি নাকো আর কারে, যতদিন এ সংসারে
করিতেছি বাস।
নিশ্চয় জানিয়ো প্রিয়ে, এখনি জুড়াবে হিয়ে
তুমি মোরে ভালো বাস' যদি,
ওই অধরের শুধু— একটি চুম্বন মধু
হবে মোর দুখের ঔষধি।

দুই-একটা স্বভাব-বর্ণনা অনুবাদ-সমেত উদ্‌ধৃত করিয়া দিতেছি—

Mury hit is in sonne risying.
The rose openith and unspring;
Weyes fairith, the clay's clyng;
The maidenes flowrith, the foulis syng,
Damosele makith mournyng
Whan hire leof makith pertyng.

অনুবাদ

অতিশয় সুখকর সূর্য যবে ওঠে
গোলাপ ফুলের কুঁড়ি বাগানেতে ফোটে;
রাস্তা হয় পরিষ্কার কাদা যায় এঁটে;
পাখি গান গায়, ফুল ফোটে মাঠে মাঠে;
প্রণয়ীদিগের সাথে হইয়া বিচ্ছেদ
বিরহিণী রমণীরা করে কত খেদ।

আর-একটি—

Averil is meory, and lengith the day,
Ladies loven solas, and play;
Swaynes, justes; knyghtis, turnay;
Syngith the nyghtyngale, gredeth thes fay;
The hote sunne clyngeth the clay,
As ye will y-sun may.

অনুবাদ

এপ্রেল সুখের মাস, বেড়ে যায় বেলা;
মহিলারা ভালোবাসে আদর ও খেলা;

চাষারা খেলায় জুস্ট্, টুর্নি নাইটেরা;
বুল্‌বুল্ গান করে, চেঁচায় কাকেরা;
কাদা সব এঁটে যায় খর রৌদ্র বলে
দেখিতেই পাও তাহা, জান তো সকলে।

Chivalry-র সঙ্গে সঙ্গে নর্ম্যানেরা রাজসভার আড়ম্বর ও চাকচিক্য, য়ুরোপ হইতে আনয়ন করিয়াছিল। কপট যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব যুদ্ধ, উৎসব আমোদ নর্ম্যান ব্যারনদিগের দুর্গে দুর্গে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। প্রথম এডোয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে স্কট্‌লন্ড-অধিপতি শত সংখ্যক অশ্বারোহী নাইট সঙ্গে করিয়া লন্ডনে আসিয়াছিলেন, তাহারা প্রত্যেকে অশ্ব হইতে নামিয়া বহুমূল্য আভরণ-সমেত অশ্বগুলি অর্থীদিগকে দান করিয়া গেল। আর্চবিশপ এ. বেকেট যখন ফ্রান্সে যান, তাঁহার সঙ্গে বিচিত্র বসন -ভূষিত এক দল ভৃত্য, দুইশত নাইট, বহু সংখ্যক ব্যারন ও আমীর-ওমরাও ছিল, আড়াইশত বালক তাঁহার সম্মুখে জাতীয় সংগীত গাহিতে গাহিতে চলিতেছিল, তদ্‌ভিন্ন গাড়ি ঘোড়া, প্রত্যেক ঘোড়ার পৃষ্ঠে এক-একটি বানর ও মানুষ, অনুচর, সহচর, পুরোহিত, বন্ধুবান্ধবের আর অন্ত নাই। এইরূপ সকল বিষয়েই ধুমধাম। হাঙ্গারির অধিপতি তাঁহার বিরহবিধুরা দুহিতাকে এইরূপে সান্ত্বনা করিতেছেন—

গাড়ি করে নিয়ে যাব শিকারে তোমায়,
সে গাড়িটি মুড়ে দেব লাল মকমলে;
পদ্ম আঁকা সাটিন ও জরির চাঁদোয়া
ঝলমল করিবেক মাথার উপরে;
পরিবি সোনার হার, সুনীল বসন;
সাথে সাথে যাবে তোর স্পেনের ঘোটক,
মকমল দিয়ে তার পিঠ দিব ঢেকে;
গান বাদ্য হবে কত বিবিধ আমোদ।
নানা মদ্য আনাইব নানা দেশ হতে।[১]
পোড়া হরিণের মাস করিবি আহার,
যত ভালো মুর্গী পাই এনে দেব তোরে।
পাইবি কুকুর কত হরিণ হরিণী,
খেলা করিবি রে বাছা তাহাদের সাথে।
হরিণেরা এমনি মানিবে তোর পোষ,
ডাকিলেই আসিবেক মুঠির কাছেতে।

---

১. এখানে এত প্রকার মদ্যের নাম লিখিত আছে যে, তাহা বাংলা পয়ারের মধ্যে দিলে ভালো শুনায় না—নিম্নে মূল উদ্‌ধৃত করিলাম— ইহার বানান আধুনিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে :

Ye shall have Rumney and malespine
Both hippocras and varnage wine:
Montrese and wine of Greek,
Both Algrade and dispice eke,
Antioch and Bastarde,
Pyment also and garnarde,
Wine of Greek and Muscadel,
Both clare, pyment and Rochelle.
The reed your stomach to defy
And pots of osey sit you by.

শিকারের শিঙ্গাধ্বনি করিলে শ্রবণ
মন হতে রোগ তোর যাবে দূর হয়ে।
অবশেষে বাড়ি ফিরে আসিবি যখন
নাচ গান কত হবে নাই তার ঠিক,
ছোট ছোট ছেলে মিলে কোকিলের স্বরে
গান শুনাইবে তোরে সে বড়ো মধুর।
অবশেষে আসিবেক সন্ধ্যার ভোজন;
যাইবি হরিত কুঞ্জে তাঁবুটির নীচে,
চুনি হীরে কাজ করা বিচিত্র বসন,
মাটির উপরে পাতা, বসিবি সেথায়;
একশো নাইট মিলি বাজাবে বাজন।
সরোবরে দেখিবি মাছেরা খেলিতেছে,
মন তোর তুষ্ট হবে দেখিলে সে খেলা।
রয়েছে একটি সাঁকো সরসীর 'পরে,
আধেক পাথর তার আধেক কাঠের।
নৌকা এক আসিবেক চব্বিশটি দাঁড়
বাজিবে বাজনা কত ভিতরে তাহার,
চড়ি সে নৌকার 'পরে যাবি হেথা হোথা,
জ্বলিবে সাঁকোর 'পরে চল্লিশটি বাতি,
গৃহে তোর ফিরে যাবি চড়ি সে নৌকায়।
বিছানাটি হবে তোর হীরা মণি গাঁথা,
সে কোমল বিছানায় শুইবি যখন
সোনার প্রদীপাধারে জ্বলিবেক আলো।
তবু যদি ঘুম তোর নাহি হয় বাছা
গায়কেরা গাবে গান সারারাত জেগে।

অসভ্য, মদ্যপানরত, কোলাহলপর, অপরিষ্কার, শিল্পজ্ঞানশূন্য স্যাক্সনদের সাহিত্যে এরূপ কবিতা নাই ও থাকিতে পারে না। স্যাক্সনদের আমোদের সহিত নর্ম্যানদের আমোদের অনেক প্রভেদ। নর্ম্যানদের আমোদের মধ্যে বিলাসের ভাব অধিকতর পরিস্ফুট। ব্রিটন-অধিপতি ভটিজরন যখন স্যাক্সন দলপতি হেঞ্জিস্টের শিবিরে নিমন্ত্রিত হইয়া হেঞ্জিস্টের পরম রূপবতী কন্যা রোয়নকে দেখিলেন, একজন নর্ম্যান কবি তখনকার বর্ণনা করিতেছে—

হেঞ্জিস্ট করিল চেষ্টা প্রাণপণ করি
রাজা ও নাইটগণ সুখী হয় যাতে।
আমোদে উন্মত্ত হইল সকলে,
গৃহমধ্যে প্রবেশিলা রোয়েন সুন্দরী;
করে মদিরার পাত্র, সুচারুবসনা;
জানু পাতি বসিল সে রাজার সমুখে,
মদিরা করিল পান, চুম্বিলা রাজারে;
কেমন সুন্দর বপু, গৌর কান্তি তার,
কেমন সুন্দর ভূষা, নয়নরঞ্জন!
দেখিয়া উন্মত্ত হইল নৃপতির মন,

মদ্যপানে ভ্রংশ-বুদ্ধি, মাগিলা ভূপতি,
বিধর্মী সে রমণীরে বিবাহের তরে।

স্যাক্সনদের কঠোর লেখনী হইতে এরূপ মৃদু বিলাসময়ী কবিতা বাহির হইতে পারিত না।

কুমারী মেরীই মধ্যযুগের দেবতা ছিলেন। মহিলা-পূজার উৎকর্ষ তাঁহাতে গিয়াই পৌঁছিয়াছিল। প্রথমত তিনি খৃস্টের জননী ছিলেন, দ্বিতীয়ত সাধারণ মহিলাদের তিনিই পূর্ণ প্রতিমাস্বরূপ ছিলেন। তখনকার লোকের রমণী-ভক্তি হইতেই তাঁহার স্তব উত্থিত হইত। একটি মেরীর স্তব উদ্‌ধৃত করিতেছি—

দেবী, তব হোক জয়, স্বর্গীয় আনন্দময়,
স্বর্গের মধুর পুষ্প তুমি!
মৃদুতার তুমি জন্ম-ভূমি!
দেবী, তব হোক জয়, উজ্জ্বল সৌন্দর্যময়!
সব মম আশা তোমা-'পরি,
কিবা দিবা কিবা বিভাবরী!
নক্ষত্রের রানী তুমি উজ্জ্বল বরন,
দেখাও গো পথ মোরে দাও গো কিরণ,
দেবি, এই বসুন্ধরা মিথ্যা কপটতা ভরা
তুমিই আমারে হেথা করো গো চালন!

রমণী-ভক্তির চর্চা করিয়া করিয়া সে ভাব লোকের মনে সত্য সত্যই এমন বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, এরূপ স্তব হৃদয় হইতে না বাহির হইয়া থাকিতে পারে না।

সেমি-স্যাক্সন সাহিত্যের উপদেশ অংশ হইতে উদাহরণস্বরূপ দুই-একটা উদ্‌ধৃত করিতেছি। মৃতদেহের প্রতি দেহমুক্ত আত্মার উক্তি—

একদা শীতের রাত্রে আছিনু নিদ্রিত;
দেখিনু আশ্চর্য দৃশ্য; ভূমির উপরে
গর্বিত ধনীর এক দেহ আছে পড়ি।
দেহ ছাড়ি আত্মা তার আসিল বাহিরে
ফিরিয়া দেখিল চাহি মৃত দেহ পানে।
কহিল সে, 'ধিক্ রক্ত মাংস কলুষিত!
হতভাগ্য দেহ, কেন এমন অসাড়,
আগে যে বড়োই ছিলি উন্মত্ত, অধীর!
অশ্বে চড়ি হেথা হোথা বেড়াতিস ছুটি;
ছিলি সুগঠন, যশ ছিল দেশব্যাপী!
কোথা গেল গর্ব তোর স্বর্গভেদী স্বর?
কেন পড়ি ভূমিতলে, বস্ত্র আচ্ছাদিত?
কোথা তোর দুর্গ, তোর গৃহ সুসজ্জিত?'
ইত্যাদি—

ইত্যাদি— পুরানো কথা লইয়া অনেক বকাবকি করা হইয়াছে। আন্‌ক্রেন রিউল নামক গদ্যগ্রন্থ হইতে কতকটা উপদেশ-দায়ক বিভীষিকা অনুবাদ করিয়া দিতেছি। ইহাতে পাঠকেরা সেমি-স্যাক্সন গদ্য রচনা ও তখনকার লোকের অজ্ঞান কু-সংস্কারের ভাব কতকটা বুঝিতে পারিবেন—

অলস ব্যক্তিরা ডেভিলের (devil) বুকে তাহার প্রিয় শিশুটির ন্যায় ঘুমাইতে থাকে এবং ডেভিল তাহার কানে মুখ দিয়া কথা কয় ও তাহার মনের বাসনা ব্যক্ত করে। যাহারা কোনো সৎকর্মে ব্যাপৃত না থাকে তাহাদের এইরূপ ঘটিয়া থাকে, ডেভিল ক্রমাগত কথা কহিতে থাকে,

এবং অলস ব্যক্তি অতিশয় ভালোবাসার সহিত তাহার নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করে। অলস ও নিশ্চিন্ত ব্যক্তিরা ডেভিলের বক্ষশায়ী bosom sleeper। ডুম্‌স্‌ডে দিবসে দেবদূতের ভেরীধ্বনিতে তাহারা সহসা চমকিত ও নরকের মধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠিবে।

লোভী ব্যক্তি ডেভিলের ছাই-কুড়ুনে Ash-gatherer। সে ছাইয়ের উপর ক্রমাগত শুইয়া থাকে, ছাই রাশীকৃত করিতে মহা ব্যস্ত থাকে, ছাই রাশ করিয়া তাহাতে ফুঁ দিতে থাকে ও ছাই উড়িয়া তাহাকে অন্ধ করিয়া তুলে, ছাইয়েতে খোঁচা মারে ও তাহার উপরে জমা-খরচের আঁক পাড়িতে থাকে। এই মূর্খের ইহাতেই আমোদ, ডেভিল তাহার এই-সমস্ত খেলা দেখিতে থাকে এবং হাসিতে হাসিতে তাহার পেট ফাটিয়া যায়। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সহজেই বুঝিতে পারেন যে, সোনা রুপা ও অন্যান্য পার্থিব ধনসম্পত্তি ছাই আর ধুলার রাশি মাত্র, যে ব্যক্তি তাহাতে ফুঁ দিতে যায় সেই অন্ধ হইয়া যায়, এই ছাইভস্মের জন্য তাহাদের মনে শান্তি থাকে না, ইহাদেরই জন্য তাহারা গর্বিত হইয়া পড়ে, যাহা-কিছু সে রাশীকৃত ও সংগ্রহ করিতে থাকে এবং প্রয়োজনাতীত যাহা-কিছু সঞ্চিত করিয়া রাখে তাহা ছাই ভিন্ন আর কিছুই নয়, নরকে গিয়া সে সমুদয় তাহার কাছে সাপ ও ব্যাঙ হইয়া দাঁড়ায়। ঈশায়া বলেন, যে ব্যক্তি প্রার্থীদিগকে খাদ্য বস্ত্র না দেয় তাহার কাপড়-চোপড় পোকার দ্বারা নির্মিত হইবে।

লোভী পেটুক ডেভিলের খাদ্য জোগাইয়া থাকে এইজন্য তিনি সর্বদাই রান্নাঘর ও ভাঁড়ার ঘরে ঘুর ঘুর করিয়া বেড়ান। তাঁহার মন খাবার থালায়, তাঁহার সমুদয় চিন্তা টেবিলের চাদরে, তাঁহার প্রাণ হাঁড়িতে, তাঁহার আত্মা ঘড়ায় পড়িয়া থাকে। এক হাতে থালা, এক হাতে বাটি লইয়া কাদা-মাখা কালি-মাখা অবস্থায় সে ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হয়। সে কত কী এলোমেলো বকিতে থাকে, মাতালের মতো টলমল করিতে থাকে, আপনার ভুঁড়ির দিকে চাহিয়া থাকে, ও এই-সকল দেখিয়া ডেভিলের এমন হাসি পায় যে তাহার পেট ফাটিয়া যায়। ঈশ্বর ঈশায়ার মুখ দিয়া এরূপ লোকদের এই বলিয়া ভয় দেখাইয়াছেন যে, 'আমার ভৃত্যেরা আহার করিতে পাইবে, কিন্তু তোমাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি হইবে না।' তোমরা ডেভিলের খাদ্যস্বরূপ হইবে। 'যে ব্যক্তি যত বিলাসে জীবন যাপন করিয়াছে তাহাকে তত যন্ত্রণা দেও।' 'গলানো তাঁবা তাহার গলায় ঢালিয়া দেও।' ইত্যাদি।

নর্ম্যান ও স্যাক্সন জাতিদ্বয়ের ভাব ও অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তখনকার সাহিত্য কেমন পরিবর্তিত হইতেছিল। যখন নর্ম্যানগণ প্রথম ইংলন্ড অধিকার করিল, যখন স্যাক্সন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ অধঃকৃত হইল ও নবাগত বিজয়ীগণ তাহাদের ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করিল, যখন স্যাক্সন ধর্মাচার্যগণ ধর্ম-মন্দির হইতে বহিষ্কৃত হইল ও নর্ম্যান পুরোহিতগণ বেদী অধিকার করিল, তখন স্যাক্সন সাহিত্যও ম্রিয়মাণ হইয়া ক্রমশ বিনষ্ট হইয়া গেল ও ফরাসি সাহিত্য তাহার পদে প্রতিষ্ঠিত হইল। যে দুই-একজন লেখক প্রাচীন ভাষা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, নিম্নশ্রেণী লোকদের পাঠের নিমিত্ত কাব্য রচনা করিয়াই তাহাদের আশা তৃপ্ত থাকিত, তাহাদেরও আদর্শ ফরাসি; ফরাসি পুস্তক হইতে অনুবাদ করাই তাহাদের একমাত্র গতি। কবি লেয়ামন Layamon একটি ল্যাটিন কাব্যের ফরাসি অনুবাদ হইতে এক কাব্য-সংকলন করিয়াছিলেন, তাহার ভাষা বিকৃত ও তাহার ছন্দ রচনায় কোথাও প্রাচীন প্রথানুযায়ী যমক-পদ্ধতি, কোথাও বা ফরাসি-আদর্শ-অনুযায়ী মিলের নিয়ম। লেয়ামনের ভাষা বিকৃত স্যাক্সন বটে কিন্তু তাহাতে ফরাসি প্রবেশ করে নাই, অনভ্যাস ও অপ্রচলিত থাকা প্রযুক্ত তখন স্যাক্সন অনেক পরিমাণে বিকৃত হইয়াছিল কিন্তু তখনো ফরাসি এমন চলিত হইয়া যায় নাই যে, স্যাক্সনের মধ্যে স্থান পাইতে পারে। নর্ম্যানদের যখন নূতন প্রভুত্ব, তখন স্যাক্সন সাহিত্যের এই দশা। যখন নর্ম্যানেরা ইংলন্ডে কিছুদিন বাস করিল, যখন নর্ম্যান ও স্যাক্সনদের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত হইল, যখন স্যাক্সন ভাষার সংস্পর্শে নর্ম্যান ফরাসি বিকৃত হইয়া গেল ও সাধারণ অনক্ষর নর্ম্যানগণ বিশুদ্ধ ফরাসি অনেক পরিমাণে ভুলিয়া গেল, শুদ্ধ তাহাই নহে, হয়তো স্যাক্সনদের সহবাসে স্যাক্সনই তাহাদের ভাষা হইল, তখন স্যাক্সন ও ফরাসি মিশিয়া একটা ভাষা জন্মিতে লাগিল, কিন্তু সেই ভাষায় যে কিছু

পুস্তক রচিত হইত, তাহার ভাব ফরাসি, তাহার রচনা-প্রণালী ফরাসি, শুদ্ধ তাহাই নহে, তাহা ফরাসি পুস্তকের অনুবাদ ও অনুকরণ! অবশেষে যখন স্যাক্সন ও নর্ম্যান জাতিদ্বয় সম্পূর্ণরূপে বা অনেক পরিমাণে মিশিয়া গেল, যখন জেতা ও জিত জাতির মধ্যে বিভিন্নতা রহিল না, তখন দেশে নূতন জাতীয় ভাবের সঞ্চার হইল। তখন সকলের ভাষাই অনেক পরিমাণে সমান হইল, তখনকার সাহিত্য সাধারণের সম্পত্তি হইল; তখন শ্রেণীবিশেষের জন্যই গ্রন্থ রচিত হইত না। তখন জাতির চক্ষুর সম্মুখ হইতে ফরাসি আদর্শ অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইল, লেখকেরা নিজের বুদ্ধি হইতে ও নিজের হৃদয় হইতে অনেক পরিমাণে লিখিতে লাগিল। এমন-কি, একদল লেখক প্রাচীন অ্যাংলো-স্যাক্সন আদর্শে লিখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কবি ল্যাংল্যান্ড (Langland) 'পিয়ার্স প্লৌম্যান' *(Piers Ploughman)* নামে এক কাব্য লিখিলেন, তাহাতে ছন্দ নাই, মিল নাই, কবি প্রাচীন স্যাক্সন-প্রণালী অনুযায়ী যমক-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন। নূতন জাতীয় ভাবের সঞ্চার হইলে লোকের পুরাতন সাহিত্যের প্রতি টান পড়ে। 'পিয়ার্স প্লৌম্যান'-লেখক প্রাচীন অ্যাংলো-স্যাক্সন রচনা-প্রণালীর অনুকরণ করিতে লাগিলেন ও একদল লেখক উত্থিত হইল, তাহারা 'পিয়ার্স প্লৌম্যান'-লেখকের অনুকরণ করিতে লাগিল। কিন্তু ফরাসি অনুকরণে কাব্যরচনার মিল ও ছন্দের নিয়ম তখনকার সাহিত্যে এমন বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, তাহার মধ্য হইতে বিজাতীয়ত্ব দূর হইয়া গিয়া তাহাই স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এমন অবস্থায় পিছু হঠিয়া অসভ্য অ্যাংলো-স্যাক্সন রীতির অনুসরণ করিতে যাওয়া অনর্থক। ল্যাংল্যান্ডের অনুবর্তী একদল উত্থিত হইল, কিন্তু তাহাদের চেষ্টা সফল হইল না, প্রচলিত রীতি যদিও বিদেশীয় আদর্শ হইতে গৃহীত হইয়াছিল তথাপি তাহারই জয় হইল। ল্যাংল্যান্ডের কাব্য হইতে উদাহরণস্বরূপ দুই-এক শ্লোক উদ্‌ধৃত করিতেছি—

Hire robe was ful riche,
Of rud searlit engrenyned,
With ribanes of rud gold
And of riche stones

ইহাতে ছন্দ নাই, মিল নাই, কেবল robe, riche, rud, ribanes প্রভৃতি কথায় R অক্ষরের যমক আছে মাত্র।

য়ুরোপ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে ইংলন্ড দ্বীপের একটা বিশেষ উপকার হইয়াছিল। যখন রোমে পোপের আসন অধিকারের জন্য বিবাদ বিদ্বেষ চলিতেছিল, যখন পোপেরা অধর্মাচরণে রত ছিল, তখন ইংলন্ড অমিশ্রভাবে থাকিয়া দূর হইতে অপক্ষপাতের সহিত বিচার করিতে পারিত, পোপের নর-দেবত্ব ভাব তাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায় নাই। রোমীয় চর্চের চরণে তাহাদের রাশি রাশি মুদ্রা ঢালিতে হইত, তাহাতে তাহারা মনে মনে অসন্তুষ্ট ছিল। ধর্মাচার্যগণের অনেক পরিমাণে স্বাধীনতা থাকায় তাহারা অধর্মাচরণে দারুণ রত ছিল, এই-সকল কারণে তখনকার চর্চের প্রতি ইংরাজদের অভক্তি জন্মিয়াছিল এবং সাধারণ লোকের মুখপাত্র হইয়া ল্যাংল্যান্ড তাঁহার 'পিয়ার্স প্লৌম্যান' কাব্যে তখনকার চর্চ, ধর্মাচার্য ও তখনকার নানা প্রকার কুনীতির প্রতি বিদ্রূপ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা উইক্লিফ্ ইহার পরে যে ধর্ম-সংস্কার করেন, রোমীয় চর্চের শৃঙ্খল হইতে ইংলন্ডকে মুক্ত করেন, এইপ্রকার কবিতা তাহার পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিল। এইপ্রকার কবিতা যখন লিখিত হইয়াছিল তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, তখনকার লোকের মনের ভাব এইরূপ ছিল, ল্যাংল্যান্ড তাহাই কেবল লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। এই কারণেই এই কাব্য তখন এমন সমাদৃত হইয়াছিল।

'পিয়ার্স প্লৌম্যান' কাব্যই সেমি-স্যাক্সন সাহিত্যের শেষ সীমাচিহ্নস্বরূপ করা গেল। তাহার পরেই গাউয়ার (Gower) ও চসারের (Chaucer) কাল। তখন হইতে প্রকৃতপক্ষে ইংরাজি

সাহিত্য আরম্ভ হইল। এতকাল ইংরাজি ভাষা নির্মিত হইতেছিল, এতক্ষণে তাহা একপ্রকার সমাপ্ত হইল।

সাহিত্যপ্রিয় ব্যক্তিরা সেমি-স্যাক্সন সাহিত্য চর্চা করিয়া বড়ো আমোদ পাইবেন না। অনুবাদ অনুকরণ ভাবহীন কথার স্রোতেই এই সাহিত্যক্ষেত্র পূর্ণ। তবে ভাষা-তত্ত্ব-প্রিয় ব্যক্তি ইহা চর্চা করিলে তাঁহাদের পরিশ্রমের অনেক পুরস্কার পাইবেন। সেমি-স্যাক্সন সাহিত্য প্রকৃতপক্ষে একটা বিশেষ সাহিত্য নহে, তাহা ইংরাজি সাহিত্যের সূত্রপাত মাত্র। তখন ব্যাকরণ বানান ও ভাষার কিছুই স্থিরতা ছিল না, একটি পুস্তকেই এক কথার নানা প্রকার বানান আছে, তাহাতে বুঝিবার বড়ো গোল পড়ে। একটা স্থির আদর্শ না থাকাতে সকলেই নিজের ব্যাকরণে, নিজের বানানে, নিজের ভাষায় পুস্তক লিখিত। নর্ম্যান ও স্যাক্সন জাতিদ্বয়ের অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তখনকার ভাষা ও সাহিত্য কেমন পরিবর্তিত হইতে লাগিল। অবশেষে কত প্রকার ঘাত-সংঘাতে ইংরাজি সাহিত্য ও ভাষা নির্মিত হইল। ১০৬৬ খৃস্টাব্দে নর্ম্যানেরা ইংলন্ডে প্রবেশ করে, তখন হইতে যদি ইংরাজি সাহিত্যের নির্মাণ-কালের আরম্ভ ধরা যায় ও ১৩৪৫ খৃস্টাব্দে চসার জন্মগ্রহণ করেন, তখন যদি তাহার শেষ ধরা যায় তবে ইংরাজি সাহিত্য ও ভাষা নির্মিত হইতে প্রায় তিন শত বৎসর লাগিয়াছে বলিতে হইবে।

ভারতী
জ্যৈষ্ঠ ১২৮৬

চ্যাটার্টন— বালক-কবি

'And we at sober eve would round thee throng,
Hanging, enraptured, on thy stately song;
And greet with smiles the young-eyed Poesy,
All deftly mashed, as near Antiquity.' --Coleridge

কবি যখন আপনার গুণ বুঝিতে পারিতেছেন ও জগৎ যখন তাঁহার গুণের সমাদর করিতেছে না, তখন তাঁহার কী কষ্ট! যখন তিনি মনে করিতেছেন পৃথিবীর নিকট হইতে যশ ও আদর তাঁহার প্রাপ্য, তাঁহার ন্যায্য অধিকার, তখন তিনি যদি ক্রমাগত উপেক্ষা সহ্য করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, কিন্তু কী উপায়ে সে প্রতিহিংসা সাধন করেন? আপনাকে বিনাশ করিয়া। তিনি বলেন, পৃথিবী যখন তাঁহাকে অনাদর করিল, তখন পৃথিবী তাঁহাকে পাইবার যোগ্য নহে, তিনি আপনাকে বিনষ্ট করেন ও মনে করেন পৃথিবী একদিন ইহার জন্য অনুতাপ করিবে। বালক কবি চ্যাটার্টন যখন যশ ও অর্থের নিমিত্ত লালায়িত হইয়া লন্ডনে গেলেন ও যখন নিরাশ হইয়া অনাহারে দিন যাপন করিতেছিলেন, তখন একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, তিনি কেন তাঁহার লেখা ছাপাইয়া অর্থ উপার্জন করেন না, তখন কবি কহিলেন, পুরানো বস্ত্র কিনিবার জন্য ও গৃহ সাজাইবার জন্য তিনি কোনো কবিতা লেখেন নাই; পৃথিবী যদি ভালোরূপ ব্যবহার না করে তাহা হইলে সে পৃথিবী তাঁহার কবিতার একটি ছত্রও দেখিতে পাইবে না! আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিলেন, দেখিলেন পৃথিবী ভালো ব্যবহার করিল না, তখন তিনি তাঁহার সমস্ত অপ্রকাশিত কবিতা দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন ও আপনার প্রাণও নষ্ট করিয়া ফেলিলেন; পৃথিবী আজ অনুতাপ করিতেছে। ১৭৭০ খৃস্টাব্দে যে পৃথিবী তাঁহার মৃত্যুর পর একটি অশ্রুজলও ফেলে নাই; ১৮৪০ খৃস্টাব্দে সেই পৃথিবী তাঁহার স্মরণার্থে প্রস্তরস্তম্ভ নির্মাণ করিয়া পূর্বকৃত অন্যায় ব্যবহারের যথাসাধ্য প্রতিকার করিবার চেষ্টা পাইল।

চ্যাটার্টন তাঁহার শৈশবকাল অবধি এমন সংসর্গে ছিলেন যে, তাঁহার প্রতিভা কিরূপে স্ফূর্তি পাইল ভাবিয়া পাওয়া যায় না। অনুকূল অবস্থায় অনেকের প্রতিভার বীজ অঙ্কুরিত হইতে দেখা যায়, কিন্তু প্রতিকূল অবস্থায় তাহা অতি অল্প লোকের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। অবস্থা বিশেষে অনুকূল না হইলে অসময়ে শৈশবে প্রতিভার পূর্ণস্ফূর্তি হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। পিতার মৃত্যুর তিন মাস পরে ব্রিস্টল নগরে চ্যাটার্টনের জন্ম হয়। তাঁহার মাতা, তাঁহার ধর্ম মা Mrs Edkins ও তাঁহার অপেক্ষা দুই বৎসরের জ্যেষ্ঠা এক ভগিনী তাঁহার শৈশবের সঙ্গী ছিলেন। ইঁহারা কেহই চ্যাটার্টনকে প্রকৃত প্রস্তাবে চিনিতে পারেন নাই। তাঁহার মাতা চ্যাটার্টনকে পাগল মনে করিয়া অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। প্রায় বালক মাঝে মাঝে অনেকক্ষণ ধরিয়া আপনার মনে বসিয়া বসিয়া কাঁদিত অথচ কেহ তাহার কোনো কারণ খুঁজিয়া পাইত না; একবার তাঁহার এইরূপ চিন্তিত বিষণ্ণ অবস্থায় Mrs Edkins বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, 'তোর বাপ যদি বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে তোকে সিধা করিতেন!' শুনিয়া বালক চমকিয়া উঠিয়া কহিল, 'আহা যদি তিনি বাঁচিয়া থাকিতেন।' বলিয়াই একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। কখনো কখনো অনেকক্ষণ কী কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার কপোলে একটি একটি করিয়া অশ্রু বহিয়া পড়িত, তাহা দেখিয়া তাঁহার মাতা আসিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বালক যথার্থ কারণ বলিতে চাহিত না! আবার এক-এক সময় কতক্ষণ নিস্তব্ধ বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ একটা কলম লইয়া অনর্গল লিখিতে আরম্ভ করিত, কিন্তু কী লিখিত সে বিষয়ে কাহারও কখনো কৌতূহল হয় নাই। এ-সকল যে অসাধারণ অস্ফূর্ত প্রতিভা-উদ্ভূত, তাহা তাঁহার মাতা কিরূপে বুঝিবেন বলো? স্কুলের শিক্ষক তাঁহাকে একটা গর্দভ মনে করিত, তাঁহার সহপাঠীরা তাঁহার ভাবগতিক বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইত। বাল্যকালে তাঁহার পাঠে তেমন মন ছিল না— কিন্তু হঠাৎ এক সময়ে এমন তাঁহার পড়িতে মন বসিয়া গেল যে, শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই পড়িতে আরম্ভ করিতেন, ও ঘুমাইতে যাইবার সময়ে বহি বন্ধ করিতেন। যখন তিনি পাঠের গৃহে বসিয়া পাঠে মগ্ন থাকিতেন, তখন কিছুতেই আহার করিতে আসিতেন না, অবশেষে Mrs Edkins তাঁহার বাল্য-প্রিয়তমা Miss Sukey Will-এর নাম করিলে তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিতেন।

যখন এমন কেহ তাঁহার সঙ্গী ছিল না যে তাঁহাকে বুঝিতে পারিবে, তাঁহার সহিত সমানুভব করিবে, তখন ব্রিস্টলের এক অতি প্রাচীন গির্জা ও সেই গির্জার মধ্যস্থিত অতি প্রাচীন কালের লোকদের পাষাণ-মূর্তি সকলই তাঁহার সঙ্গী ছিল। শুনা যায়, প্রায় তিনি সেই গির্জায় যাইতেন ও ক্রীড়া-সহচরদিগের মধ্যে তাঁহার বিশেষ সুহৃদ্‌দিগকে কবিতা শুনাইতেন। শৈশবে কী বিষয় লইয়া তিনি কবিতা লিখিবেন? স্কুলের হেডমাস্টার তাঁহাকে প্রহার করিয়াছিলেন, তাহার নামে ঠাট্টা করিয়া একটা কবিতা লিখিলেন, দুষ্টামি করিয়া পাড়ার একটা দোকানদারের নামে কবিতা লিখিয়া খবরের কাগজে ছাপাইয়া দিলেন। লোকে বলে এগারো বৎসরের সময় তিনি কবিতা লিখিতে শুরু করেন, কিন্তু তাহারও পূর্বে দশ বৎসরের সময় তাঁহার একটি কবিতা পাওয়া গিয়াছে। কবিতাটি যিশুখৃস্টের পৃথিবীতে অবতরণ সম্বন্ধে। আসলে এ কবিতাটির মূল্য তেমন কিছুই নহে, এ সম্বন্ধে তিনি স্কুলে যাহা পড়িয়াছেন তাহাই ছন্দে গাঁথিয়াছেন মাত্র, তথাপি দশ বৎসরের বালকের কবিতার একটা নমুনা পাঠকদের হয়তো দেখিতে কৌতূহল হইবে। অনুবাদ অবিকল করিবার মানসে অমিত্রাক্ষরে লিখিলাম—

উপর হইতে দেখো আসিছেন মেঘে,
বিচারক, বিভূষিত মহিমা ও প্রেমে;
আলোকের রাজ্য দিয়া আনিবারে তাঁরে
দ্বিধা হয়ে গেল দেখো শূন্য একেবারে
বদন ঢাকিয়া তার ফেলিল তপন

যিশুর উজ্জ্বলতর হেরিয়া কিরণ
চন্দ্র তারা চেয়ে থাকে বিস্ময়ে মগন!
ভীষণ বিদ্যুৎ হানে, গরজে অশনি
কাঁপে জলধির তীর কাঁপিল অবনী!
স্বর্গের আদেশ— শৃঙ্গ বাজিল অমনি
জল স্থল ভেদি তার উচ্ছ্বাসিল ধ্বনি!
মৃতেরা শুনিতে পেলে আদেশের স্বর
পুণ্যবান হাসে, পাপী কাঁপে থর থর
ভীষণ সময় কাছে এসেছে এখন
উঠিবেক কবরের অধিবাসীগণ
অনন্ত আদেশ তাঁর করিতে গ্রহণ।

ব্রিস্টলের রেডক্লিফ্ গির্জায় (St Mary Redcliffe Church) একটি ঘর ছিল, সেখানে কতকগুলি কাঠের সিন্দুকে অনেকদিনকার পুরানো নানা প্রকার কাগজপত্র দলিল দস্তাবেজ থাকিত। সে-সকল পুরানো অক্ষরের পুরানো ভাষার কাগজপত্রের বড়ো যত্ন ছিল না। চ্যাটার্টনের পিতা যখন গির্জার কর্মচারী ছিলেন, তখন মাঝে মাঝে সেই-সকল সিন্দুক হইতে রাশি রাশি লিখিত পার্চমেন্ট লইয়া তাঁহার রান্নাঘরের জিনিসপত্র সাফ করিতেন ও অন্যান্য নানা গৃহকর্মে নিয়োগ করিতেন। যাহা-কিছু প্রাচীন তাহারই উপর চ্যাটার্টনের অসাধারণ ভক্তি ছিল। চ্যাটার্টন সেই-সকল কাগজপত্র তাঁহার পড়িবার ঘরে লইয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া প্রাচীন অক্ষর ও ভাষা পাঠ করিতে চেষ্টা করিতেন ও সেই-সকল অক্ষর অনুকরণ করিতে প্রয়াস পাইতেন। এইরূপে প্রাচীন ইংরাজি ভাষা তাঁহার দখল হয় ও তখন হইতে প্রাচীন কবিদের অনুকরণ করিয়া কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সেই ক্ষুদ্র অন্ধকার পাঠগৃহে দরজা বন্ধ করিয়া কতকগুলা রঙ ও কয়লার গুঁড়া লইয়া স্তূপাকার প্রাচীন কাগজপত্রের মধ্যে চ্যাটার্টন কী করিতেন তাহা তাঁহার মাতা ভাবিয়া পাইতেন না। কিরূপ করিলে পার্চমেন্ট প্রাচীন আকার ধারণ করে তিনি তাহা নানাবিধ উপায়ে পরীক্ষা করিতেন। এই সময়ে চ্যাটার্টন প্রাচীন ভাষায় কবিতা লিখিতেন ও অতি যত্নে তাহা লুকাইয়া রাখিতেন ও যখন প্রকাশ করিতেন, কহিতেন রাউলি (Rowley) নামক একজন ব্রিস্টলের অতি প্রাচীন কবি এই-সকল কবিতা লিখিয়াছেন, তিনি অনেক অনুসন্ধান করিয়া সেই-সকল পুস্তক পাইয়াছেন। কেহ অবিশ্বাস করিত না, কে করিবে বলো? কে জানিবে যে, একজন পঞ্চদশবর্ষীয় বালক প্রাচীন কবিদের অনুকরণ করিয়া এই-সকল কবিতা লিখিয়াছে। তাঁহার সঙ্গীদের মধ্যেই বা এমন কে ছিল যে সেই-সকল প্রাচীন ইংরাজি ভালো করিয়া বুঝিবে? তাঁহার মাতা, তাঁহার ভগিনী, একটা অবৈতনিক বিদ্যালয়ের কতকগুলি মূর্খ বালক ও তাহাদের অপেক্ষা জ্ঞানে দুই-এক সোপান মাত্র উন্নত দুই-একটি অল্প বেতনের শিক্ষক প্রাচীন ইংরাজি সাহিত্যের অতি অল্পই ধার ধারিত।

Town and Country Magazine নামক এক পত্রিকায় চ্যাটার্টন রাউলির ছদ্মনাম ধারণ করিয়া 'Elinoure and Juga' (এলিনোর ও জুগা) নামকএকটি গাথা প্রকাশ করিলেন। রুড়বোর্ন নদীতীরে বসিয়া এলিনোর ও জুগা তাহাদের যুদ্ধ-নিহত প্রণয়ীর জন্য শোক করিতেছে। জুগা কহিতেছে—

আয় বোন, করি মোরা হেথায় বিলাপ,
এই ফুলময় তীরে, বিষাদ যথায়
রয়েছে তাহার দুটি পাখা ছড়াইয়া
উষার শিশির আর সায়াহ্নের হিমে
এইখানে বসি বসি ভিজিব দুজনে!

বজ্র-দগ্ধ, শুষ্ক দুই পাদপ যেমন
উভয়ের 'পরে রহে উভয়ে ঝুঁকিয়া।
কিংবা জনশূন্য যথা ভগ্ন নাট্যশালা
হৃদয়ে পুষিয়া রাখে বিভীষিকা শত,
অমঙ্গল কাক যেথা ডাকে অবিরাম।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া পেঁচা জাগায় নিশিরে।
বংশীরবে উষা আর উঠিবে না জাগি
নৃত্যগীত বাদ্য আদি হবে নাকো আর।

এলিনোর

ঘোটকের পদশব্দ শৃঙ্গের গর্জনে
অরণ্যে প্রাণীরা আর উঠিবে না কাঁপি!
সারা দীর্ঘ দিন আমি ভ্রমিব গহনে
সারা রাত্রি গোরস্থানে করিব যাপন
প্রেতাত্মারে কব যত দুখের কাহিনী।

যদিও চ্যাটার্টনের অহংকার অতি অল্পই প্রশ্রয় পাইয়াছিল ও তাঁহার যশ-লালসা তৃপ্ত হয় নাই তথাপি তাঁহার অহংকার ও যশের ইচ্ছা অতি বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত বলবান ছিল। তাঁহার বাল্যকালে তাঁহার মাতার এক কুম্ভকার বন্ধু চ্যাটার্টনকে একটি মৃৎপাত্র উপহার দিবার মানস করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সে পাত্রের উপর কী চিত্র আঁকিবে। চ্যাটার্টন কহিলেন, 'একটি দেবতা (angel) আঁকো, তাহার মুখে একটি শৃঙ্গা দেও, যেন সমস্ত পৃথিবীময় সে আমার যশঃকীর্তন করিতেছে।' তাঁহার এমন প্রশংসা-তৃষ্ণা ছিল যে, যতদিন তিনি ব্রিস্টলে ছিলেন, তিনি এমন একটি সামান্য কবিতা লিখেন নাই যাহা তাঁহার সহপাঠীদের শোনান নাই; অনেক সময়ে সে বেচারীরা বিরক্ত হইয়া উঠিত। সন্দিগ্ধ লোকের কহিত, যাঁহার যশ-লালসা এত প্রবল, তিনি কোন্ প্রাণে নিজে কবিতা লিখিয়া ছদ্মনামে প্রকাশ করিলেন? রাউলি-রচিত কবিতাগুলি চ্যাটার্টনের রচিত নয় বলিয়া সন্দেহ করিবার এই একটি প্রধান কারণ। মানুষের চরিত্রে এত প্রকার বিরোধী ভাব মিশ্রিত আছে যে, ওরূপ একদিক মাত্র দেখিয়া কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে গেলে ভ্রমে পড়িতে হয়। তাঁহার সহস্র অহংকার থাক্, তথাপি কত কারণবশত যে তিনি তাঁহার নিজের নাম প্রকাশ করেন নাই তাহা কে বলিতে পারে? তাঁহার চলিত ভাষায় লিখিত ছোটোখাটো কবিতাগুলিতে তাঁহার নিজের নাম প্রকাশ করিতেন ও তাহা লইয়া যথেষ্ট গর্ব অনুভব করিতেন, আর তাঁহার প্রাচীন ভাষায় রচিত কবিতাগুলি যদিও খুব গর্বের সহিত সকলকে শুনাইতেন, তথাপি তাহাতে নিজের নাম ব্যবহার করিতেন না, ইহার কারণ খুঁজিতে গেলে যে একেবারে নিরুপায় হইয়া পড়িতে হয় তাহা নহে। যতদূর জানা যায়, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি তাঁহার নিজের লিখিত প্রাচীন ভাষার কবিতাগুলিকে অতিশয় ভক্তির চক্ষে দেখিতেন, যেরূপ ভক্তির সহিত লোকে অতি পুরাকালের গ্রন্থসমূহকে পূজা করে, তাঁহার নিজ-রচিত কবিতার প্রতি তাঁহার ভক্তি যে তদপেক্ষা ন্যূন ছিল, তাহা নহে; কল্পনার মোহিনী-মায়ায় মানুষ নিজহস্তগঠিত প্রতিমাকে দেবতার মতো পূজা করে ও সেই কল্পনার ইন্দ্রজালে চ্যাটার্টন সাধারণ লোকের অনধিগম্য পবিত্র মৃত ভাষায় যে কবিতা লিখিতেন তাহা এক প্রকার সম্ভ্রমের সহিত নিরীক্ষণ করিতেন। যেন সেগুলি তাঁহার নিজের সাধ্যায়ত্ত কবিতা নহে, যেন প্রাচীন যুগের কোনো মৃত কবির আত্মা তাঁহাতে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার মুখ দিয়া সেই কবিতা বলাইয়াছেন মাত্র। সামান্য

সামান্য বিষয়মূলক— রাজনীতি বা বিদ্রূপসূচক কবিতা লইয়া তিনি খবরের কাগজে ছাপাইতেন, নাম দিতেন, সকলকে শুনাইতেন— অর্থাৎ সেগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে বড়ো সংকোচ অনুভব করিতেন না, কিন্তু 'রাউলি কবিতা' এক স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহা অতি গোপনে লিখিতেন, গোপন রাখিতেন, যদি কখনো বাহিরে প্রকাশ করিতেন তবে সে প্রাচীনকালের ও অতি প্রাচীন লেখকের বলিয়া। দুই-একবার, তিনি নিজে লিখিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু লোকের মুখে সন্দিগ্ধ উপহাসের হাসি দেখিয়া তখনি আবার ঢাকিয়া লইতেন। তাঁহার 'রাউলি কবিতা' লইয়া ওরূপ সন্দেহ, উপহাস তিনি সহিতে পারেন না, লোকের ওই কবিতাগুলি ভালো লাগিলেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। প্রথম প্রথম যখন তিনি প্রাচীন ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন হয়তো বালকস্বভাববশত অনেককে ফাঁকি দিবেন ও মজা করিবেন মনে করিয়া ছদ্মনাম ব্যবহার করেন, অথবা হয়তো মনে করিয়াছিলেন যদি তিনি নিজের নাম প্রকাশ করেন তাহা হইলে কেহ বিশ্বাস করিবে না এই ভাবিয়া একটা মিথ্যা নামের আশ্রয় লইয়া থাকিতেন। কিন্তু ক্রমে তিনি যতই লিখিতে লাগিলেন, ততই কল্পনা-চিত্রিত প্রাচীন পুরোহিত কবি রাউলি তাঁহার হৃদয়ে জীবন্ত হইয়া উঠিতে লাগিল, যেন সত্যই রাউলি একজন কবি ছিলেন, রাউলিকে যেন দেখিতে পাইতেন, রাউলির কথা যেন শুনিতে পাইতেন। আর প্রথমে যে কারণবশতই এই-সকল কবিতা তাঁহার লুকাইয়া ও ঢাকিয়া ঢুকিয়া রাখিতে প্রবৃত্তি হোক-না কেন, ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিজের চক্ষেও সেই-সকল কবিতার উপর একটা রহস্যের আবরণ পড়িয়া গেল, তাঁহার নিজের কাছেও সে-সকল কবিতা যেন কী একটি গোপনীয়, পবিত্র, প্রাচীন পদার্থ বলিয়া প্রতিভাত হইল। ইহা নূতন কথা নহে যে, অনেকে কোনো একটি বিষয়ে অন্যকে প্রতারণা করিতে গিয়া সেই বিষয়ে আপনাকেও প্রতারণা করে। তাহা ছাড়া তাঁহার চতুর্দিকে এমন সব সঙ্গী ছিল, যাহারা প্রতারিত হইতে চায়। একটি প্রাচীন ভাষায় রচিত ভালো কবিতা শুনিলে তাহারা বিশ্বাস করিতে চায় যে, তাহা কোনো প্রাচীন কবির রচিত। যদি তাহারা জানিতে পায় যে, সে-সকল কবিতা একটি আধুনিক বালকের লেখা, যে বালক তাহাদেরই ভাষায় কথা কয়, তাহাদেরই মতো কাপড় পরে— বাহিরের অনেক বিষয়েই তাহাদের সহিত সমান, তাহা হইলে তাহারা কি নিরাশ হয়! তাহা হইলে হয়তো তাহারা চটিয়া যায়, তাহারা সে কবিতাগুলির মধ্যে কোনো পদার্থ দেখিতে পায় না, নানা প্রকার খুঁটিনাটি ধরিতে আরম্ভ করে, যদি বা কেহ সে-সকল কবিতার প্রশংসা করিতে চায়, তবে সে নিজে একটি উচ্চতর আসনে বসিয়া বালকের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে অতি গম্ভীর স্নেহের স্বরে বলিতে থাকে যে, হাঁ, কবিতাগুলি মন্দ হয় নাই, এবং বালককে আশা দিতে থাকে যে, বড়ো হইলে চেষ্টা করিলে সে একজন কবি হইতে পারিবে বটে! তাহাদের যদি বল, এ-সকল একটি প্রাচীন কবির লেখা, তাহারা অমনি লাফাইয়া উঠিবে, ভাবে গদগদ হইয়া বলিবে, এমন লেখা কখনো হয় নাই হইবে না; কাগজে পত্রে একটা হুলস্থূল পড়িয়া যাইবে— শত প্রকার সংস্করণে শত প্রকার টীকা ও ভাষ্য বাহির হইতে থাকিবে, এরূপ অবস্থায় একজন যশোলোলুপ কবি-বালক কী করিবে? সে আপনার নাম প্রকাশ করিয়া কতকগুলি বিজ্ঞতাভিমানী বৃদ্ধের নিকট হইতে দুই-চারিটি ওজর করা ছাঁটাছোঁটা মুরুব্বিয়ানা আদর-বাক্য শুনিতে চাহিবে, না, যে নামেই হউক-না কেন, নিজের রচিত কবিতার অজস্র অবারিত প্রশংসাধ্বনি শুনিয়া তৃপ্ত হইতে চাহিবে? যে যশোলালসার দোহাই দিয়া তুমি 'রাউলি-কবিতা'গুলি বালকের লেখা বলিয়া অবিশ্বাস করিতে চাহ, সেই যশোলালসাই যে তাহাকে আত্মনাম গোপন করিতে প্রবৃত্তি দিবে, তাহার কী ভাবিলে বলো? লোকে যখন 'রাউলি-কবিতা' বিষয়ে সাধ করিয়া প্রতারিত হইতে চাহিত, তখন কবি তাহাদের প্রতারণা করিতেন। ব্যারেট নামক একজন লেখক ব্রিস্টলের বিস্তারিত ইতিহাস লিখিতেছিলেন। তাঁহার বন্ধুবর্গ সেই ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন। একদিন ক্যাট্‌কট নামক তাঁহার এক বন্ধু আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিলেন যে, চ্যাটার্টন নামক এক বালক অনুসন্ধান করিতে করিতে অনেকগুলি ব্রিস্টলের প্রাচীন কবিতা ও বিবরণ পাইয়াছে; ব্যারেট চ্যাটার্টনের নিকট হইতে তাঁহার ইতিহাসের

উপকরণ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। বালকের ভাণ্ডার অজস্র, তুমি যে বিষয় জানিতে চাও, সেই বিষয়েই সে একটা-না-একটা প্রাচীন ভাষায় লিখিত প্রমাণ আনিতে পারে— ঐতিহাসিকের তাঁহাকে সন্দেহ করিবার বড়ো একটা কারণ ছিল না। চ্যাটার্টন তাঁহাকে অনর্গল প্রমাণ রচনা করিয়া আনিয়া দিতে লাগিলেন, তাঁহার ইতিহাস লেখাও অবাধে অগ্রসর হইতে লাগিল। তিনি গর্বের সহিত লিখিলেন— 'এই নগরের (ব্রিস্টল) পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার উপযোগী প্রাচীন পুস্তকাদি আমি যেরূপে পাইয়াছি, এমন আর কাহারও ভাগ্যে কখনো ঘটে নাই।' তাহা সত্য বটে! ব্যারেট একবার 'রাউলি-রচিত' 'হেস্টিংসের যুদ্ধ' নামক এক অসম্পূর্ণ কবিতা আনিবার জন্য চ্যাটার্টনকে পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করেন, চ্যাটার্টন সমস্তটা লিখিয়া উঠিতে পারেন নাই; অনেক পীড়াপীড়ির পর তিনি স্বীকার করিলেন যে, সে কবিতাটি তাঁহার নিজের লেখা। সহস্র প্রমাণ পাইলেও ব্যারেট তখন বিশ্বাস করিতে চাহিবেন কেন? তাঁহার ইতিহাসের অমন সুন্দর উপকরণগুলি এক কথায় হাতছাড়া করিতে ইচ্ছা হইবে কেন? তিনি প্রতারিত হইতে চাহিলেন, চ্যাটার্টন তাঁহাকে প্রতারণা করিলেন। চ্যাটার্টন তাঁহার অসম্পূর্ণ 'হেস্টিংসের যুদ্ধ' সম্পূর্ণ করিয়া আনিয়া দিলেন।

ভারতী
আষাঢ়, ১২৮৬

বাঙালি কবি নয়

একটা কথা উঠিয়াছে, মানুষ মাত্রেই কবি। যাহার মনে ভাব আছে, যে দুঃখে কাঁদে, সুখে হাসে, সেই কবি। কথাটা খুব নূতনতর। সচরাচর লোকে কবি বলিতে এমন বুঝে না। সচরাচর লোকে যাহা বলে তাহার বিপরীত একটা কথা শুনিলে অনেক সময় আমাদের ভারি ভালো লাগিয়া যায়। যাহার মনোবৃত্তি আছে সেই কবি, এ কথাটা এখনকার যুবকদের মধ্যে অনেকেরই মুখে শুনা যায়। কবি শব্দের ওইরূপ অতি-বিস্তৃত অর্থ এখন একটা ফ্যাশান হইয়াছে বলিলে অধিক বলা হয় না। এমন-কি, নীরব-কবি বলিয়া একটি কথা বাহির হইয়া গিয়াছে, ও সে কথা দিনে দিনে খুব চলিত হইয়া আসিতেছে। এত দূর পর্যন্ত চলিত হইয়াছে যে, আজ যদি আমি এমন একটা পুরাতন কথা বলি যে, নীরব কবি বলিয়া একটা কোনো পদার্থই নাই, তাহা হইলে আমার কথাটাই লোকের নূতন বলিয়া ঠেকে। আমি বলি কী, যে নীরব সেই কবি নয়। দুর্ভাগ্যক্রমে, আমার যা মত অধিকাংশ লোকেরই আন্তরিক তাহাই মত। লোকে বলিবে "ও কথা তো সকলেই বলে, উহার উল্‌টাটা যদি কোনো প্রকারে প্রমাণ করাইয়া দিতে পার, তাহা হইলে বড়ো ভালো লাগে।" ভালো তো লাগে, কিন্তু বিষয়টা এমনতর যে, তাহাতে একটা বৈ দুইটা কথা উঠিতে পারে না। কবি কথাটা এমন একটা সমস্যা নয় যে তাহাতে বুদ্ধির মারপ্যাঁচ খেলানো যায়; "বীজ হইতে বৃক্ষ কি বৃক্ষ হইতে বীজ?" এমন একটা তর্কের খেলেনা নয়। ভাব প্রকাশের সুবিধা করিবার জন্য লোকসাধারণে একটি বিশেষ পদার্থের একটি বিশেষ নামকরণ করিয়াছে, সেই নামে তাহাকে সকলে ডাকিয়া থাকে ও অনেক দিন হইতে ডাকিয়া আসিতেছে, তাহা লইয়া আর তর্ক কী হইতে পারে? ভাব প্রকাশের সুবিধার জন্য লোকে পদতল হইতে আরম্ভ করিয়া কটিদেশ পর্যন্ত প্রসারিত অঙ্গকে পা বলিয়া থাকে, তুমি যদি আজ বল যে, পদতল হইতে আরম্ভ করিয়া স্কন্ধদেশ পর্যন্তকে পা বলা যায় তাহা হইলে কথাটা কেমন শোনায় বলো দেখি? পুণ্ডরীকাক্ষ নিয়োগী তাহার এক ছেলের নাম ধর্মদাস, আর-এক ছেলের নাম জন্মেজয়, ও তৃতীয় ছেলের নাম শ্যামসুন্দর রাখিয়াছে, তুমি যদি তর্ক করিতে চাও যে, পুণ্ডরীকাক্ষের তিন ছেলেরই নাম জন্মেজয় নিয়োগী, তাহা হইলে লোকে বলে যে, বৃদ্ধ পুণ্ডরীকাক্ষ তাহার তিন ছেলের যদি তিন স্বতন্ত্র নাম রাখিয়া থাকে, তুমি

বাপু কে যে, তাহাদের তিন জনকেই জন্মেজয় বলিতে চাও? লোকে কাহাকে কবি বলে? যে ব্যক্তি, বিশেষ শ্রেণীর ভাব সমূহ, (যাহাকে আমরা কবিতা বলি) ভাষায় প্রকাশ করে।* নীরব ও কবি দুইটি অন্যোন্য-বিরোধী কথা, তথাপি যদি তুমি বিশেষণ নীরবের সহিত বিশেষ্য কবির বিবাহ দিতে চাও, তবে এমন একটি পরস্পর-ধ্বংসী দম্পতির সৃষ্টি হয়, যে, শুভ দৃষ্টির সময় পরস্পর চোখাচোখি হইবামাত্রেই উভয়ে প্রাণ ত্যাগ করে। উভয়েই উভয়ের পক্ষে ভস্মলোচন। এমনতর চোখাচোখিকে কি অশুভ দৃষ্টি বলাই সংগত নয়, অতএব এমনতর বিবাহ কি না দিলেই নয়? এমন হয় বটে, যে, তুমি যাহাকে কবি বল, আমি তাহাকে কবি বলি না; এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া তুমি বলিতে পার বটে যে, "যখন বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন লোকে কবি বলিয়া থাকে তখন কী করিয়া বলা যাইতে পারে যে, কবি বলিতে সকলেই এক অর্থ বুঝে?" আমি বলি কী, একই অর্থ বুঝে। যখন গদ্যপুণ্ডরীকের গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত রামবাবুকে তুমি কবি বলিতেছ, আমি কবি বলিতেছি না, ও কবিতা-চন্দ্রিকার গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত শ্যামবাবুকে আমি কবি বলিতেছি তুমি বলিতেছ না, তখন তোমাতে আমাতে এই তর্ক যে, "রামবাবু কি এমন কবি যে তাঁহাকে কবি বলা যাইতে পারে?" বা "শ্যামবাবু কি এমন কবি যে তাঁহাকে কবি বলা যাইতে পারে?" রামবাবু ও শ্যামবাবু এক স্কুলে পড়েন, তবে তাঁহাদের মধ্যে কে ফার্স্ট ক্লাসে পড়েন, কে লাস্ট ক্লাসে পড়েন তাহাই লইয়া কথা। রামবাবু ও শ্যামবাবু যে এক স্কুলে পড়েন, সে স্কুলটি কী? না প্রকাশ করা। তাঁহাদের মধ্যে সাদৃশ্য কোথায়? না প্রকাশ করা লইয়া। বৈসাদৃশ্য কোথায়? কিরূপে প্রকাশ করা হয়, তাহা লইয়া! তবে, ভালো কবিতাকেই আমরা কবিতা বলি, কবিতা খারাপ হইলে তাহাকে আমরা মন্দ কবিতা বলি, সুকবিতা হইতে আরও দূরে গেলে তাহাকে আমরা কবিতা না বলিয়া শ্লোক বলিতে পারি, ছড়া বলিতে পারি, যাহা ইচ্ছা, যথা,

হরপ্রতি প্রিয় ভাষে কন হৈমবতী
বৎসরের ফলাফল কহ পশুপতি। ইত্যাদি।

পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীবকে আমরা মানুষ বলি, তাহার কাছাকাছি যে আসে তাহাকে বনমানুষ বলি, মানুষ হইতে আরও তফাতে গেলে তাহাকে মানুষও বলি না, বনমানুষও বলি না, তাহাকে বানর বলি। এমন তর্ক কখনো শুনিয়াছ যে Wordsworth শ্রেষ্ঠ কবি না ভজহরি (যে ব্যক্তি লেখনীর আকার কিরূপ জানে না) শ্রেষ্ঠ কবি? অতএব এটা দেখিতেছ, কবিতা প্রকাশ না করিলে কাহাকেও কবি বলা যায় না। বিশ্বব্যাপী ঈথর-সমুদ্রে যথোপযুক্ত তরঙ্গ উঠিলে তবে আমাদের চক্ষে আলোক প্রকাশ পায়। তবে কেন অন্ধকারে বসিয়া আমরা বলি না যে, আমরা আলোকের মধ্যে বসিয়া আছি? সর্বত্রই তো ঈথর আছে ও ঈথরের মধ্যে তো আলোক প্রকাশের গুণ আছে, এমন-কি হয়তো আমাদের অপেক্ষা উন্নততর চক্ষুষ্মান জীব সেই অন্ধকারে আলোক দেখিতেছে। কেন বলি না শুনিবে? অতি সহজ উত্তর। বলি না বলিয়া। অর্থাৎ লোকে ভাব প্রকাশের সুবিধার জন্য বস্তু-প্রকাশক শক্তি বিশেষের নাম আলোক রাখিয়াছে। চক্ষে প্রকাশিত না হইলে তাহাকে আলোক বলিবে না, তা তুমি যাহাই বল আর যাহাই কর। ইহার উপর আর তর্ক আছে? তোমার মতে তো বিশ্বশুদ্ধ লোককে চিত্রকর বলা যাইতে পারে। এমন ব্যক্তি নাই, যাহার মনে অসংখ্য চিত্র অঙ্কিত না রহিয়াছে, তবে কেন মনুষ্যজাতির আর-এক নাম রাখ না চিত্রকর? আমার কথাটি অতি সহজ কথা। আমি বলি যে, যে ভাববিশেষ ভাষায় প্রকাশ হয় নাই তাহা কবিতা নহে, ও যে ব্যক্তি ভাববিশেষ ভাষায় প্রকাশ করে না, সেও কবি নহে। যাঁহারা নীরব কবি কথার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা বিশ্বচরাচরকে কবিতা বলেন। এ-সকল কথা কবিতাতেই শোভা পায়। কিন্তু অলংকারশূন্য গদ্যে অথবা তর্কস্থলে বলিলে কি ভালো শোনায়?

* এ প্রবন্ধটির মধ্যে আড়ম্বর করিয়া কবিতা কথাটির একটি দুরূহ সংজ্ঞা নির্ণয় করিতে বসা সাজে না বলিয়া আমরা নিরস্ত হইলাম।

একটা নামকে এরূপ নানা অর্থে ব্যবহার করিলে দোষ হয় এই যে, তাহার দুইটা ডানা বাহির হয়, এক স্থানে ধরিয়া রাখা যায় না ও ক্রমে ক্রমে হাতছাড়া এবং সকল কাজের বাহির হইয়া বুনো হইয়া দাঁড়ায়, "আয়" বলিয়া ডাকিলেই আর খাঁচার মধ্যে আসিয়া বসে না। আমার কথাটা এই যে, আমার মনে আমার প্রেয়সীর ছবি আঁকা আছে বলিয়াই আমি কিছু চিত্রকর নই ও ক্ষমতা থাকিলে আমার প্রেয়সীকে আঁকা যাইতে পারিত বলিয়া আমার প্রেয়সী একটি চিত্র নহেন।

অনেকে বলেন, সমস্ত মনুষ্য জাতি সাধারণত কবি ও বালকেরা, অশিক্ষিত লোকেরা বিশেষরূপে কবি। এ মতের পূর্বোক্ত মতটির ন্যায় তেমন বহুল প্রচার হয় নাই। তথাপি তর্ককালে অনেকেরই মুখে এ কথা শুনা যায়। বালকেরা যে কবি নয়, তাহার প্রমাণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। তাহারা কবিতাময় ভাষায় ভাব প্রকাশ করে না। অনেকে কবিত্ব অনুভব করেন, কবিত্ব উপভোগ করেন, যদি বা বলপূর্বক তুমি তাঁহাদিগকেও কবি বল, তথাপি বালকদিগকে কবি বলা যায় না। বালকেরা কবিত্ব অনুভব করে না, কবিত্ব উপভোগ করে না, অর্থাৎ বয়স্ক লোকদের মতো করে না। অনুভব তো সকলেই করিয়া থাকে; পশুরাও তো সুখ দুঃখ অনুভব করে। কিন্তু কবিত্ব অনুভব কয়জন লোকে করে? যথার্থ সুন্দর ও যথার্থ কুৎসিত কয়জন ব্যক্তি পরখ করিয়া, তফাত করিয়া দেখে ও বুঝে? অধিকাংশ লোক সুন্দর চিনিতে ও উপভোগ করিতেই জানে না। সুন্দর বস্তু কেন সুন্দর তাহা বুঝিতে পারা, অন্য সমস্ত সুন্দর বস্তুর সহিত তুলনা করিয়া তাহাকে তাহার যথাযোগ্য আসন দেওয়া, একটা সুন্দর বস্তু হইতে দশটা সুন্দর বস্তুর কথা মনে পড়া, অবস্থা বিভেদে একটি সুন্দর বস্তুর সৌন্দর্য বিভেদ কল্পনা করিতে পারা কি সকলের সাধ্য? সকল চক্ষুই কি শরীরী পদার্থের মধ্যে অশরীরী কী-একটি দেখিতে পায়? অল্পই হউক আর অধিক হউক কল্পনা তো সকলেরই আছে। উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির অপেক্ষা কল্পনা কাহার আছে? কল্পনা প্রবল হইলেই কবি হয় না। সুমার্জিত, সুশিক্ষিত ও উচ্চ শ্রেণীর কল্পনা থাকা আবশ্যক। কল্পনাকে যথাপথে নিয়োগ করিবার নিমিত্ত বুদ্ধি ও রুচি থাকা আবশ্যক করে। পূর্ণ চন্দ্র যে হাসে, বা জ্যোৎস্না যে ঘুমায়, এ কয়জন বালকের কল্পনায় উদিত হয়? একজন বালক যদি অসাধারণ কাল্পনিক হয়, তবে পূর্ণ-চন্দ্রকে একটি আস্ত লুচি বা অর্ধচন্দ্রকে একটি ক্ষীর পুলি মনে করিতে পারে। তাহাদের কল্পনা সংলগ্ন নহে, কাহার সহিত কাহার যোগ হইতে পারে, কোন্ কোন্ দ্রব্যকে পাশাপাশি বসাইলে পরস্পর পরস্পরের আলোকে অধিকতর পরিস্ফুট হইতে পারে, কোন্ দ্রব্যকে কী ভাবে দেখিলে তাহার মর্ম, তাহার সৌন্দর্য চক্ষে বিকাশ পায়, এ-সকল জানা অনেক শিক্ষার কাজ। একটি দ্রব্য অনেক ভাবে দেখা যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিকেরা এক ভাবে জগৎ দেখেন, দার্শনিকেরা এক ভাবে দেখেন ও কবিরা আর-এক ভাবে দেখেন। তিন জনে তিন প্রকার পদ্ধতিতে একই বস্তু দেখিতে পারেন। তুমি কী বল, উহার মধ্যে দুই প্রকার পদ্ধতি আয়ত্ত করিতে শিক্ষার আবশ্যক করে, আর তৃতীয়টিতে করে না? শুদ্ধ করে না তাহাই নয়, শিক্ষাতেই তাহার বিনাশ। কোন্ দ্রব্য কোন্ শ্রেণীর, কিসের সহিত তাহার ঐক্য ও কিসের সহিত তাহার অনৈক্য, তাহা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে নির্ণয় করা দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও কবি তিন জনেরই কাজ। তবে, একটা দ্রব্যের তিনটি দিক আছে, তিন জন তিন বিভিন্ন দিকের ভার লইয়াছেন। তিন জনের মধ্যে এই মাত্র প্রভেদ, আর কিছু প্রভেদ আছে কি? অনেক ভালো ভালো কবি যে ভাবের পার্শ্বে যে ভাব বসানো উচিত, স্থানে স্থানে তাহার ব্যতিক্রম করিয়া শিক্ষার অসম্পূর্ণতা প্রকাশ করিয়াছেন। Marlowর "Come live with me and be my love" নামক সুবিখ্যাত কবিতাতে ইহা লক্ষিত হয়।

> "হবি কি আমার প্রিয়া, রবি মোর সাথে?
> অরণ্য, প্রান্তর, নদী, পর্বত, গুহাতে
> যত কিছু, প্রিয়তমে, সুখ পাওয়া যায়,
> দুজনে মিলিয়া তাহা ভোগ করি আয়!

শুনিব শিখরে বসি পাখি গায় গান,
তটিনী শবদ সাথে মিশাইয়া তান;
দেখিব চাহিয়া সেই তটিনীর তীরে
রাখাল গোরুর পাল চরাইয়া ফিরে।

রচি দিব গোলাপের শয্যা মনোমতো;
সুরভি ফুলের তোড়া দিব কত শত;
গড়িব ফুলের টুপি পরিবি মাথায়,
আঙিয়া রচিয়া দিব গাছের পাতায়।

লয়ে মেষ শিশুদের কোমল পশম
বসন বুনিয়া দিব অতি অনুপম;
সুন্দর পাদুকা এক করিয়া রচিত,
খাঁটি সোনা দিয়ে তাহা করিব খচিত।

কটি-বন্ধ গড়ি দিব গাঁথি তৃণ-জাল,
মাঝেতে বসায়ে দিব একটি প্রবাল।
এই-সব সুখ যদি তোর মনে ধরে
হ আমার প্রিয়তমা, আয় মোর ঘরে।

হস্তি-দন্তে গড়া এক আসনের 'পরে,
আহার আনিয়া দিবে দু জনের তরে,
দেবতার উপভোগ্য, মহার্ঘ এমন,
রজতের পাত্রে দোঁহে করিব ভোজন।

রাখাল-বালক যত মিলি একত্তরে
নাচিবে গাইবে তোর আমোদের তরে।
এই-সব সুখ যদি মনে ধরে তব,
হ আমার প্রিয়তমা, এক সাথে রব।

এ কবিতাতে একটি বিশেষ ভাবকে সমগ্র রাখা হয় নাই। মাঝখানে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। যে বিশাল কল্পনায় একটি ভাব সমগ্র প্রতিবিম্বিত হয়, যাহাতে জোড়াতাড়া দিতে হয় না, সে কল্পনা ইহাতে প্রকাশিত হয় নাই। কিয়দ্দূর পর্যন্ত একটা ভাব সম্পূর্ণ রহিয়াছে, তাহার পরে আর-একটি ভাব গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু দুই ভাবের মধ্যে এমন অসামঞ্জস্য যে, উভয়ে পাশাপাশি ঘেঁসাঘেঁসি থাকিয়াও উভয়ের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া আছে, উভয়েই ভাবিতেছে, এ এখানে কেন? পরস্পরের মধ্যে গলাগলি ভাব নাই। অরণ্য, পর্বত, প্রান্তরে যত কিছু সুখ পাওয়া যায়, তাহাই যে রাখালের আয়ত্তাধীন, যে ব্যক্তি গোলাপের শয্যা ফুলের টুপি ও পাতায় আঙিয়া নির্মাণ করিয়া দিবার লোভ দেখাইতেছে সে স্বর্ণখচিত পাদুকা, রজতের পাত্র, হস্তি-দন্তের আসন পাইবে কোথায়? তৃণ-নির্মিত কটিবন্ধের মধ্যে কি প্রবাল শোভা পায়? আমাদের পাঠকদের মধ্যে যে কেহ কখনো কবিতা লিখিয়াছেন, সকলেই বলিয়া উঠিবেন, আমি হইলে এরূপ লিখিতাম না। সে কথা আমি বিশ্বাস করি। তাহার অর্থ আর কিছুই নহে, তাঁহারা শিক্ষা পাইয়াছেন। কবিতা রচনায় তাঁহারা হয়তো অমন একটা জাজ্জ্বল্যমান দোষ করেন না, কিন্তু ওই শ্রেণীর দোষ সচরাচর করিয়া থাকেন। যাঁহারা বাস্তবিক কবি, অন্তরে অন্তরে কবি, তাঁহারা এরূপ দোষ করেন না; কিসের সহিত কিসের ঐক্য অনৈক্য আছে তাহা তাঁহারা অতি সূক্ষ্মরূপে দেখিতে পান।

কবিকঙ্কণের কমলে-কামিনীতে একটি রূপসী ষোড়শী হস্তি গ্রাস ও উদ্গার করিতেছে, ইহাতে এমন পরিমাণ-সামঞ্জস্যের অভাব হইয়াছে, যে, আমাদের সৌন্দর্যজ্ঞানে অত্যন্ত আঘাত দেয়।* শিক্ষিত, সংযত, মার্জিত কল্পনায় একটি রূপসী যুবতীর সহিত গজাহার ও উদ্গীরণ কোনো মতেই একত্রে উদয় হইতে পারে না। ইহাতে কেহ না মনে করেন, আমি কবিকঙ্কণকে কবি বলি না। যে বিষয়ে তাঁহার শিক্ষার অভাব ছিল, সেই বিষয়ে তাঁহার পদস্খলন হইয়াছে; এই মাত্র। পরিমাণ-সামঞ্জস্য, যাহা সৌন্দর্যের সার, সে বিষয়ে তাঁহার শিক্ষার অসম্পূর্ণতা দেখিতেছি।

কল্পনারও শিক্ষা আবশ্যক করে। যাহাদের কল্পনা শিক্ষিত নহে, তাহারা অতিশয় অসম্ভব, অলৌকিক কল্পনা করিতে ভালোবাসে; বক্র দর্পণে মুখ দেখিলে নাসিকা পরিমাণাধিক বৃহৎ এবং কপাল ও চিবুক নিতান্ত হ্রস্ব দেখায়। তাহাদের কুগঠিত কল্পনা-দর্পণে স্বাভাবিক দ্রব্য যাহা-কিছু পড়ে তাহার পরিমাণ ঠিক থাকে না; তাহার নাসা বৃহৎ ও তাহার কপাল খর্ব হইয়া পড়ে। তাহারা অসংগত পদার্থের জোড়াতাড়া দিয়া এক-একটা বিকৃতাকার পদার্থ গড়িয়া তোলে। তাহারা শরীরী পদার্থের মধ্যে অশরীরী ভাব দেখিতে পায় না। তথাপি যদি বল বালকেরা কবি, অর্থাৎ বালকদের হৃদয়ে বয়স্কদের অপেক্ষা কবিতা আছে, তবে নিতান্ত বালকের মতো কথা বলা হয়। প্রাচীন কালে অনেক ভালো কবিতা রচিত হইয়া গিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়, এই মতের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে যে, অশিক্ষিত ব্যক্তিরা বিশেষ রূপে কবি। তুমি বলো দেখি, ওটাহিটি দ্বীপবাসী বা এস্কুইমোদের ভাষায় কয়টা পাঠ্য কবিতা আছে? এমন কোন্ জাতির মধ্যে ভালো কবিতা আছে, যে জাতি সভ্য হয় নাই? যখন রামায়ণ মহাভারত রচিত হইয়াছিল, তখন প্রাচীনকাল বটে, কিন্তু অশিক্ষিত কাল কি? রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিয়া কাহারও মনে কি সে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে? ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে মহা মহা কবিরা ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কবিতায় কি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রভাব লক্ষিত হয় না? Copleston কহেন "Never has there been a city of which its people might be more justly proud, whether they looked to its past or to its future than Athens in the days of Æschylus."

অনেকে যে কল্পনা করেন যে, অশিক্ষিত অবস্থায় কবিত্বের বিশেষ স্ফূর্তি হয়, তাহার একটি কারণ এই বোধ হয় যে, তাঁহারা মনে করেন যে, একটি বস্তুর যথার্থ স্বরূপ না জানিলে তাহাতে কল্পনার বিচরণের সহস্র পথ থাকে। সত্য একটি মাত্র, মিথ্যা অগণ্য। অতএব মিথ্যায় কল্পনার যেরূপ উদর পূর্তি হয়, সত্যে সেরূপ হয় না। পৃথিবীতে অখাদ্য যত আছে, তাহা অপেক্ষা খাদ্য বস্তু অত্যন্ত পরিমিত। একটি খাদ্য যদি থাকে তো সহস্র অখাদ্য আছে। অতএব এমন মত কি

* অনেকে তর্ক করেন যে, গণেশকে দুর্গা এক-একবার করিয়া চুম্বন করিতেছিলেন, তাহাই দূর হইতে দেখিয়া ধনপতি গজাহার ও উদ্গীরণ কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা যথার্থ নহে। কারণ কবিকঙ্কণচণ্ডীতেই আছে, যে, চৌষট্টি যোগিনী পদ্মের দলরূপ ধারণ করিল, ও জয়া হস্তিনী রূপে রূপান্তরিত হইল। অতএব গণেশের সহিত ইহার কোনো সম্পর্কই নাই। কেহ বা তর্ক করেন যে, যখন কবির উদ্দেশ্য বিস্ময় ভাবের উদ্দীপন করা, তখন, বর্ণনা যাহাতে অদ্ভুত হয়, তাহারই প্রতি কবির লক্ষ্য। কিন্তু এ কথার কোনো অর্থ নাই। সুকল্পনার সহিত বিস্ময় রসের কোনো মনান্তর নাই।

যখন অগাধ সমুদ্রের মধ্যে মরালশোভিত কুমুদ কহ্লার পদ্মবনের মধ্যে এক রূপসী ষোড়শী প্রতিষ্ঠিত করিলেন; সমস্তই সুন্দর; নীল জল, সুকুমার পদ্ম, পুষ্পের সুগন্ধ, ভ্রমরের গুঞ্জন, ইত্যাদি ইত্যাদি তখন মধ্য হইতে এক গজাহার আনিয়া আমাদের কল্পনায় অমন একটা নিদারুণ আঘাত দিবার তাৎপর্য কী? সুন্দর পদার্থ যেমন কবিত্বপূর্ণ বিস্ময় উৎপন্ন করিতে পারে, এমন-কি, আর কিছুতে পারে? অপার সমুদ্রের মধ্যে পদ্মাসীনা ষোড়শী রমণীই কি যথেষ্ট বিস্ময়ের কারণ নহে? তাঁহার মস্তকের চারি দিকে ইন্দ্রধনুর মণ্ডল স্থাপন করো, তাঁহার করে তারকার বলয়, গলে তারকার হার বসাইয়া দেও দেখিয়া কে না আশ্চর্য হইবে?

কোনো পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছ যে, অখাদ্য বস্তু আহার না করিলে মনুষ্য বংশ ধ্বংস হইবার কথা?

প্রকৃত কথা এই যে, সত্যে যত কবিতা আছে, মিথ্যায় তেমন নাই। শত সহস্র মিথ্যার দ্বারে দ্বারে কল্পনা বিচরণ করিতে পারে, কিন্তু এক মুষ্টি কবিতা সঞ্চয় করিতে পারে কি না সন্দেহ, কিন্তু একটি সত্যের কাছে যাও, তাহার দশগুণ অধিক কবিতা পাও কি না দেখো দেখি? কেনই বা তাহার ব্যতিক্রম হইবে বলো? আমরা তো প্রকৃতির কাছেই কবিতা শিক্ষা করিয়াছি, প্রকৃতি কখনো মিথ্যা কহেন না। আমরা কি কখনো কল্পনা করিতে পারি যে, লোহিত বর্ণ ঘাসে আমাদের চক্ষু জুড়াইয়া যাইতেছে? বলো দেখি, পৃথিবী নিশ্চল রহিয়াছে ও আকাশে অগণ্য তারকারাজি নিশ্চল ভাবে খচিত রহিয়াছে, ইহাতে অধিক কবিত্ব, কি সমস্ত তারকা নিজের পরিবার লইয়া ভ্রমণ করিতেছে— তাহাতে অধিক কবিত্ব; এমনি তাহাদের তালে তালে পদক্ষেপ যে, এক জন জ্যোতির্বিদ্ বলিয়া দিতে পারেন, কাল যে গ্রহ অমুক স্থানে ছিল আজ সে কোথায় আসিবে? প্রথম কথা এই যে, আমাদের কল্পনা প্রকৃতি অপেক্ষা কবিত্বপূর্ণ বস্তু সৃজন করিতে অসমর্থ, দ্বিতীয় কথা এই যে, আমরা যে অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছি তাহার বহির্ভূত সৌন্দর্য অনুভব করিতে পারি না।

অনেক মিথ্যা, কবিতায় আমাদের মিষ্ট লাগে। তাহার কারণ এই যে, যখন সেগুলি প্রথম লিখিত হয় তখন তাহা সত্য মনে করিয়া লিখিত হয়, ও সেই অবধি বরাবর সত্য বলিয়া চলিয়া আসিতেছে। আজ তাহা আমি মিথ্যা বলিয়া জানিয়াছি, অর্থাৎ জ্ঞান হইতে তাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছি; কিন্তু হৃদয়ে সে এমনি শিকড় বসাইয়াছে যে, সেখানে হইতে তাহাকে উৎপাটন করিবার জো নাই। আমি কবি, যে, ভূত বিশ্বাস না করিয়াও ভূতের বর্ণনা করি, তাহার তাৎপর্য কী? তাহার অর্থ এই যে, ভূত বস্তুত সত্য না হইলেও আমাদের হৃদয়ে সে সত্য। ভূত আছে বলিয়া কল্পনা করিলে যে, আমাদের মনের কোন্‌খানে আঘাত লাগে, কত কথা জাগিয়া উঠে, অন্ধকার, বিজনতা, শ্মশান, এক অলৌকিক পদার্থের নিঃশব্দ অনুসরণ, ছেলেবেলাকার কত কথা মনে উঠে এ-সকল সত্য যদি কবি না দেখেন তো কে দেখিবে?

সত্য এক হইলেও যে, দশজন কবি সেই এক সত্যের মধ্যে দশ প্রকার বিভিন্ন কবিতা দেখিতে পাইবেন না তাহা তো নহে। এক সূর্যকিরণে পৃথিবীতে কত বিভিন্ন বস্তু বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করিয়াছে দেখো দেখি! নদী যে বহিতেছে, এই সত্যটুকুই কবিতা নহে। কিন্তু এই বহমানা নদী দেখিয়া আমাদের হৃদয়ে যে ভাব বিশেষের জন্ম হয় সেই সত্যই যথার্থ কবিতা। এখন বলো দেখি, এক নদী দেখিয়া সময়ভেদে কত বিভিন্ন ভাবের উদ্রেক হয়, কখনো নদীর কণ্ঠ হইতে বিষণ্ণ গীতি শুনিতে পাই, কখনো বা তাহার উল্লাসের কলস্বর, তাহার শত তরঙ্গের নৃত্য আমাদের মনকে মাতাইয়া তোলে। জ্যোৎস্না কখনো সত্য সত্যই ঘুমায় না, অর্থাৎ সে, দুটি চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া থাকে না, ও জ্যোৎস্নার নাসিকা-ধ্বনিও কেহ কখনো শুনে নাই। কিন্তু নিস্তব্ধ রাত্রে জ্যোৎস্না দেখিলে মনে হয় যে জ্যোৎস্না ঘুমাইতেছে ইহা সত্য। জ্যোৎস্নার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তন্ন তন্ন রূপে আবিষ্কৃত হউক; এমনও প্রমাণ হউক যে জ্যোৎস্না একটা পদার্থই নহে, তথাপি লোকে বলিবে জ্যোৎস্না ঘুমাইতেছে। তাহাকে কোন্ বৈজ্ঞানিক-চূড়ামণি মিথ্যা কথা বলিতে সাহস করিবে বলো দেখি?

কেহ কেহ যদি এমন করিয়া প্রমাণ করিতে বলেন যে, সমুদয় মনুষ্যই কবি, বাঙালি মনুষ্য, অতএব বাঙালি কবি; অশিক্ষিত লোকেরা বিশেষরূপে কবি, বাঙালি অশিক্ষিত, অতএব বাঙালি বিশেষরূপে কবি, তবে তাঁহাদের যুক্তিগুলি নিতান্ত অপ্রামাণ্য। তাহা ব্যতীত, তাঁহাদের প্রমাণ করিবার পদ্ধতিই বা কী রূপ? কবিত্ব কিছু একটা অদৃশ্য গুণ নহে, তাহা Algebraর x নহে যে, অমন অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াইতে হইবে। যদি, বাঙালি কবি কি না জানিতে চাও, তবে দেখো, বাঙালি কবিতা লিখিয়াছে কি না ও সে কবিতা অন্য অন্য জাতির কবিতার তুলনায় এত

ভালো কি না যে, বাঙালি জাতিকে বিশেষরূপে কবি জাতি বলা যাইতে পারে। তুমি জান যে, অতিরিক্ত মোটা মানুষেরা সহজে নড়িতে চড়িতে পারে না ও অল্প পরিশ্রমে হাঁপাইয়া পড়ে। দৃশ্যমান ব্যক্তি-বিশেষ মোটা কি না, জানিতে হইলে, তুমি কি প্রথমে দেখিবে সে ব্যক্তি সহজে নড়িতে চড়িতে পারে কি না ও অল্প পরিশ্রমে হাঁপাইয়া পড়ে কি না, ও তাহা হইতে মীমাংসা করিয়া লইবে সে ব্যক্তি মোটা? আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর তো আমি বলি, তাহা অপেক্ষা সহজ উপায় হইতেছে, তাহার প্রকাশমান শরীরের আয়তন দেখিয়া তাহাকে মোটা স্থির করা।

বাংলা ভাষায় কয়টিই বা কবিতা আছে? এমন কবিতাই বা কয়টি আছে, যাহা প্রথম শ্রেণীর কবিতা বলিয়া গণ্য হইতে পারে? কয়টি বাংলা কাব্যে এমন কল্পনা প্রকাশিত হইয়াছে, সমস্ত জগৎ যে কল্পনার ক্রীড়াস্থল। যে কল্পনা দুর্বল-পদ শিশুর মতো গৃহের প্রাঙ্গণ পার হইলেই টলিয়া পড়ে না? যে কল্পনা সূক্ষ্ম দ্রব্যেও যেমন অনুপ্রবিষ্ট, তেমনি অতি বিশাল দ্রব্যকেও মুষ্টির মধ্যে রাখে। যে কল্পনা বসন্ত বায়ুর অতি মৃদু স্পর্শে অচেতনের মতো এলাইয়া পড়ে, এবং শত ঝটিকার বলে হিমালয়ের মতো অটল শিখরকেও বিচলিত করিয়া তোলে। যে কল্পনা, যখন মৃদু তখন, জ্যোৎস্নার মতো, যখন প্রচণ্ড তখন ধূমকেতুর ন্যায়। কোনো বাংলা কাব্যে কি মনুষ্য চরিত্রের আদর্শ চিত্রিত দেখিয়াছ? নানাপ্রকার বিরোধী মনোবৃত্তির ঘোরতর সংগ্রাম বর্ণিত দেখিয়াছ? এমন মহান ঘটনা জীবন্তের মতো দেখিয়াছ যাহাতে তোমার নেত্র বিস্ফারিত ও সর্বাঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে? কোনো বাংলা কাব্য পড়িতে পড়িতে তোমার হৃদয়ে এমন ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে, যাহাতে তোমার হৃদয়ে পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গ উঠিয়াছে, অথবা পুষ্প-বাস-স্নিগ্ধ এমন মৃদু বায়ু সেবন করিয়াছ যাহাতে তোমার হৃদয়ের সমস্ত তরঙ্গ শান্ত হইয়া গিয়াছে, নেত্র মুদিয়া আসিয়াছে ও হৃদয়কে জীবন্ত জ্যোৎস্নার মতো অশরীরী ও অতি প্রশান্ত আনন্দে মগ্ন মনে করিয়াছ?

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে মহাকাব্যই নাই। কবিকঙ্কণচণ্ডীকে কি মহাকাব্য বল? তাহাকে উপাখ্যান বলা যাইতে পারে কিন্তু তাহা কি মহাকাব্য? কালকেতু নামে এক দুঃখী ব্যাধ কোনোদিন বা খাইতে পায় কোনোদিন বা খাইতে পায় না। যেদিন খাইতে পায়, সেদিন সে চারি হাঁড়ি ক্ষুদ, ছয় হাঁড়ি দাল ও ঝুড়ি দুই-তিন আলু-ওল পোড়া খায়। "ছোটো গ্রাস তোলে যেন তেআঁটিয়া তাল।" "ভোজন করিতে গলা ডাকে হড় হড়।" এই ব্যক্তি চণ্ডীর প্রসাদে রাজত্ব পায়। কিন্তু তাহার রাজসভায় ও একটি ছোটোখাটো জমিদারি কাছারিতে প্রভেদ কিছুই নাই। তাহার রাজত্বে "হানিফ গোপ" ক্ষেতে শস্য উৎপন্ন করে; ভাঁড়ু দত্ত বলিয়া এক মোড়ল আসিয়াছে, তাহার।

"ফোঁটা কাটা মহা দম্ভ, ছেঁড়া যোড়া কোঁচালম্ব
শ্রবণে কলম খরশাণ।"

ধনপতি নামে এক সদাগর আছে; সোনার পিঞ্জর গড়াইতে সে ব্যক্তি গৌড় দেশে যায়, তাহার দুই পত্নী ঘরে বসিয়া চুলাচুলি করে। দুর্বলা বলিয়া তাহাদের এক দাসী আছে, সে উভয়ের কাছে উভয়ের নিন্দা করে, ও দুই পক্ষেই আদর পায়। সমস্ত কাব্যই এইরূপ। গ্রন্থারম্ভে দেবদেবীদের কথা উত্থাপন করা হইয়াছে। কিন্তু কবিকঙ্কণের দেবদেবীরাও নিতান্ত মানুষ, কেবলমাত্র মানুষ নহে, কবিকঙ্কণের সময়কার বাঙালি। হরগৌরীর বিবাহ, মেনকার খেদ, নারীগণের পতিনিন্দা, হরগৌরীর কলহ পড়িয়া দেখো দেখি। কবিকঙ্কণ মহাকাব্য নহে। আয়তন বৃহৎ হইলেই কিছু তাহাকে মহাকাব্য বলা যায় না। ভারতচন্দ্রের কথা উল্লেখ করাই বাহুল্য। তাহার মালিনী মাসি, তাহার বিদ্যা, তাহার সুন্দর, তাহার রাজা ও কোটালকে মহাকাব্যের বা প্রথম শ্রেণীর কাব্যের পাত্র বলিয়া কাহারও ভ্রম হইবে না। বিদ্যাসুন্দর পড়িয়া কাহারও মনে কখনো মহানভাব বা যথার্থ সুন্দর ভাবের উদয় হয় নাই। কিন্তু এ গ্রন্থটি বাঙালি পাঠকদের রুচির এমন উপযোগী করিয়া রচিত হইয়াছে, যে, বঙ্গীয় আবালবৃদ্ধ বনিতার ইহা অতি উপাদেয়

হইয়াছে। বিদ্যাসুন্দর যত লোকে পড়িয়াছে, তত লোকে কি শ্রেষ্ঠতর কাব্য কবিকঙ্কণচণ্ডী পড়িয়াছে? বাঙালি জাতি কতখানি কবি, ইহা হইতেও কি তাহার একটা পরিমাণ পাওয়া যায় না? এই-সকল প্রাচীন বঙ্গীয় গ্রন্থে কল্পনা বঙ্গরমণীদের মতো অন্তঃপুরবদ্ধ। কখনো বা খুব প্রখরা, মুখরা, গাল ভরা পান খায়; হাতনাড়া ঘন ডাক, সতীনের "কেশ ধরি কিল লাথী মারে তার পিঠে" কখনো বা স্বামী আসিবে বলিয়া

"পরে দিব্য পাট শাড়ি, কনক রচিত চুড়ি
দুই করে কুলুপিয়া শঙ্খ।"

কখনো বা স্বামী প্রবাসে, সতীনের নিগ্রহে ভালো করিয়া খাইতে পায় না, ছিন্ন বস্ত্র পরিয়া থাকিতে হয়। কত অল্প আয়তন স্থানে কল্পনাকে বদ্ধ হইয়া থাকিতে হয়। ধনপতি একবার বঙ্গদেশ ছাড়িয়া সিংহলে গিয়াছিল বটে, কিন্তু হইলে হয় কি, স্বর্গে গেলেও যদি বাঙালি ইন্দ্র, বাঙালি ব্রহ্মা দেখা যায়, তবে সিংহলে নূতন কিছু দেখিবার প্রত্যাশা কিরূপে করা যায়? কবিকঙ্কণচণ্ডী অতি সরস কাব্য সন্দেহ নাই। বাঙালিরা এ কাব্য লইয়া গর্ব করিতে পারে, কিন্তু ইহা এমন কাব্য নহে, যাহা লইয়া সমস্ত পৃথিবী গর্ব করিতে পারে, অত আশায় কাজ কী, সমস্ত ভারতবর্ষ গর্ব করিতে পারে। তখনকার বঙ্গবাসীর গৃহ অতি সুচারুরূপে চিত্রিত হইয়াছে। কবিকঙ্কণের কল্পনা তখনকার হাটে, ঘাটে, মাঠে, জমিদারের কাছারিতে, চাষার ভাঙা কুঁড়েতে, মধ্যবিত্ত লোকের অন্তঃপুরে যথেষ্ট বিচরণ করিয়াছে। কোথায় ব্যাধের মেয়ে

"মাংস বেচি লয় কড়ি, চাল লয় ডালি বড়ি
শাক বাইগুণ কিনয়ে বেসাতি।"

কোথায় চাষার— "ভাঙ্গা কুঁড়িয়া, তালপাতার ছাউনি" আছে, যেখানে অল্প "বৃষ্টি হইলে কুঁড়ায় ভাসিয়া যায় বাণ।" কোথায় গাঁয়ের মণ্ডল ভাঁড়দত্ত হাটে আসিয়াছে—

"পসারী পসার লুকায় ভাঁড়ুর তরাসে।
পসার লুটিয়া ভাঁড়ু ভরয়ে চুপড়ি,
যত দ্রব্য লয় ভাঁড়ু নাহি দেয় কড়ি।"

তাহা সমস্ত তিনি ভালো করিয়া দেখিয়াছেন। কিন্তু এই হাট মাঠই কি কল্পনায় বিচরণের পক্ষে যথেষ্ট? কল্পনার, ইহা অপেক্ষা উপযুক্ততর ক্রীড়াস্থল আছে। যে কল্পনা রাম, সীতা, অর্জুন সৃষ্টি করে, তাহার পক্ষে কি কালকেতু, ভাঁড়ু দত্ত ও লহনা, খুল্লনাই যথেষ্ট? পর্বতে, সমুদ্রে, তারাময় আকাশে, জ্যোৎস্নায়, পুষ্পবনে যাহার লীলা, হাট, বাজার, জমিদারির কাছারিতে তাহাকে কি তেমন শোভা পায়? কবিকঙ্কণের কাব্য অতি সরস কাব্য। কিন্তু উহা লইয়াই আমরা বাঙালি জাতিকে কবি জাতি বলিতে পারি না। যাহাতে আদর্শ সৌন্দর্য, আদর্শ মনুষ্য চরিত্র চিত্রিত আছে, বৈচিত্র্যহীন বঙ্গসাহিত্যে এমন কবিতা কোথায়?

আধুনিক বাঙালি কবিতা লইয়া তেমন বিস্তারিত আলোচনা করা বড়ো সহজ ব্যাপার নহে। সাধারণ কথায় বলিতে হইলে বলা যায়, কবির সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে; সজনি, প্রিয়তমা, প্রণয়, বিরহ, মিলন লইয়া অনেক কবিতা রচিত হইয়া থাকে, তাহাতে নূতন খুব কম থাকে এবং গাঢ়তা আরও অল্প। আধুনিক বঙ্গ কবিতায় মনুষ্যের নানাবিধ মনোবৃত্তির ক্রীড়া দেখা যায় না। বিরোধী মনোবৃত্তির সংগ্রাম দেখা যায় না। মহান ভাব তো নাইই। হৃদয়ের কতকগুলি ভাসা-ভাসা ভাব লইয়া কবিতা। সামান্য নাড়া পাইলেই যে জল-বুদ্‌বুদগুলি হৃদয়ের উপরিভাগে ভাসিয়া উঠে তাহা লইয়াই তাঁহাদের কারবার। যে-সকল ভাব হৃদয়ের তলদেশে দিবানিশি গুপ্ত থাকে, নিদারুণ ঝটিকা উঠিলেই তবে যাহা উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে, সহস্র ফেনিল মস্তক লইয়া তীরের পর্বত চূর্ণ করিতে ছুটিয়া আসে সে-সকল আধুনিক বঙ্গকবিদের কবিতার বিষয় নহে। তথাপি কী করিয়া বলি বাঙালি কবি? হইতে পারে বাংলায় দুই-একটা ভালো কবিতা আছে, দুই-একটি

মিষ্ট গান আছে, কিন্তু সেইগুলি লইয়াই কি বাঙালি জাতি অন্যান্য জাতির মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলিতে পারে যে, বাঙালি কবি?

ভারতী
ভাদ্র ১২৮৭

বাঙালি কবি নয় কেন?

"বাঙালি কবি নয় কেন?" এ প্রশ্ন লইয়া গম্ভীর ভাবে আলোচনা করিতে বসিলে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের হয়তো ঈষৎ হাস্যরসের উদ্রেক হয়। তাঁহারা বলিবেন, প্রথম প্রশ্ন হউক, "বাঙালি কী" পরে দ্বিতীয় প্রশ্ন হইবে, "বাঙালি কী নয়"! যদি জিজ্ঞাসাই করিতে হইল, তবে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করা যায় "বাঙালি দার্শনিক নয় কেন", "বাঙালি বৈজ্ঞানিক নয় কেন", "বাঙালি শিল্পী নয় কেন", "বাঙালি বণিক নয় কেন" ইত্যাদি ইত্যাদি। বাঙালি জাতির মতো এমন একটা অভাবাত্মক গুণসমষ্টির সম্বন্ধে যদি প্রশ্ন করা যায় যে বাঙালিতে অমুক বিশেষ গুণের অভাব দেখা যায় কেন, তাহা হইলে শ্রোতারা সকলে সমস্বরে হাসিয়া উঠিয়া কহিবেন বাঙালিতে কী গুণের ভাব দেখিতে পাইতেছ? এরূপ ঘটনায় আমাদের মনে আঘাত লাগিতে পারে কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে কি আমাদের একটি কথা কহিবার আছে? "বাঙালি কী" ইহা অপেক্ষা দুরূহ সমস্যা কি আর কিছু হইতে পারে? ও বাঙালি কী নয় ইহা অপেক্ষা সহজ প্রশ্ন কি আর আছে?

তবে আজ, বাঙালি কবি নয় কেন, এ প্রশ্ন লইয়া আলোচনা করিতে বসিবার তাৎপর্য কী? তাহার তাৎপর্য এই যে, আজকাল শত সহস্র বঙ্গীয় বালক আধ পয়সা মূলধন লইয়া (বিদেশী মহাজনদিগের নিকট হইতে ধার করা) দিন রাত প্রাণপণপূর্বক বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে কবিত্ব চাষ করিতেছেন; আজ যখন দেখিলেন বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্র তাঁহাদের যত্নে কাঁটা গাছ ও গুল্মে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তখন তাঁহারা কপালের ঘাম মুছিয়া হর্ষ-বিস্ফারিত নেত্রে দশ জন প্রতিবাসীকে ডাকিয়া কহিতেছেন, "আহা, জমি কী উর্বরা!" বঙ্গবাসীগণ স্বপ্নেও স্বজাতিকে দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক বলিয়া অহংকার করিয়া বেড়ান না, অতএব সে বিষয়ে তাঁহাদের আত্মবিস্মৃতি লক্ষিত হয় না; কিন্তু সম্প্রতি দেখিতেছি তাঁহারা রাশীকৃত অসার কবিত্বের খড় তাঁহাদের কাক-পুচ্ছে গুঁজিয়া দিন রাত্রি প্রাণপণে পেখম তুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করেন, এমন-কি, ভালো ভালো কুলীন ময়ূরদের মুখের কাছে অম্লান বদনে পেখম নাড়িয়া আসেন; অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ময়ূর বলিয়া তাঁহাদের মনে মনে অত্যন্ত অভিমান হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদিগকে দশ জন লোক নিযুক্ত রাখিতে হইয়াছে, যাহারা অগ্রে অগ্রে যাইয়া উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতে থাকে, "আমাদের পশ্চাতে যাঁহাদের দেখিতেছ, তাঁহারা কাক নন, তাঁহারা ময়ূর!" আজকাল তো এইরূপ দেখিতেছি। বহু দিন হইতে ভাবিতেছি, বাঙালি কেন আপনাকে কবি বলিয়া এত অহংকার করে, জিজ্ঞাসা করিলে অনেকে বলে, "দেখিতেছ না, আজকাল বাংলার সকলেই কবিতা লেখে!" সকলেই মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর ছন্দে বাংলা বর্ণমালা কাগজে গাঁথিতেছে, তাহা দেখিয়াই যদি বাঙালি জাতিকে বিশেষ রূপে কবি জাতি আখ্যা দেও, হে চাষা, ক্ষেত্রে অগণ্য কাঁটা গাছ দেখিয়া ফসল ভ্রমে যদি তোমার মনে বড়ো আনন্দ হইয়া থাকে, তবে তোমার মঙ্গলের জন্যই তোমার সে ভ্রম ভাঙা আবশ্যক।

যদি এমন একটা কথা উঠে যে, ইংরাজ কবি কেন, তবে তাহা লইয়া দুই দণ্ড আলোচনা করিতে ইচ্ছা করে। ভাবিয়া দেখিলে কি আশ্চর্য বোধ হয় না যে, যে ইংরাজেরা এমন কাজের লোক, বাণিজ্যবৃত্তি যাহাদের ব্যবসায়, সময়কে যাহারা কান ধরিয়া খাটাইয়া লয়, একটি মিনিটকেও ফাঁকি দিতে দেয় না, জীবিকার জন্য যাহাদিগকে সংগ্রাম করিতে হয়, বাহ্য সুখসম্পদই

যাহাদের উপাস্য দেবতা, যাহারা রাজ্যতন্ত্রীয় মহাসাগরে দিনরাত মগ্ন থাকিয়া প্রত্যেকেই নিজ নিজ পুচ্ছ আস্ফালনে সেই সমুদ্রকে অবিরত ফেনিত প্রতিফেনিত করিতেছে, তাহারা এমন কবি হইল কিরূপে? ইংলন্ড দেশে, অমন একটা ঘোরতর কাজের ভিড়ের মধ্যে, হাটবাজারের দর-দামের মধ্যে, বড়ো রাস্তার ঠিক পাশেই— যেখানে আমদানি ও রপ্তানির বোঝাই করা গাড়ি দিনরাত আনাগোনা করিতেছে— সেখানে কী করিয়া কবিতার মতো অমন একটি সুকুমার পদার্থ নিজের সাধের নিকেতন বাঁধিল? আর আমরা যে, এই বঙ্গদেশে সূর্যাতপে বসিয়া ঘুমন্ত ঝিমন্ত স্বপ্নন্ত জীবন বহন করিতেছি, শত সহস্র অভাব আছে অথচ একটি অভাব অনুভব করি না, বাঁচিয়া থাকিলেই সন্তুষ্ট, অথচ ভালো করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার আবশ্যক বিবেচনা করি না, আমরা কেন উচ্চ শ্রেণীর কবি হইলাম না? অনেক কারণ আছে।

আমাদের জাতীয় চরিত্রে উত্তেজনা নাই। উত্তেজনা নাই বলিতে বুঝায়, আমরা কিছুই তেমন গভীর রূপে, তেমন চূড়ান্ত রূপে অনুভব করিতে পারি না। ঘটনা ঘটে, আমাদের হৃদয়ের পদ্মপত্রের উপর পড়িয়া তাহা মুহূর্তকাল টলমল করে, আবার পিছলিয়া পড়িয়া যায়। এমন কিছুই ঘটিতে পারে না, যাহা আমাদের হৃদয়ের অতি মর্মস্থলে প্রবেশ করিয়া সেখানে একটা আন্দোলন উপস্থিত করিতে পারে। আমরা সন্তুষ্ট প্রকৃতির লোক। সন্তুষ্ট প্রকৃতির অর্থ আর কিছুই নহে। তাহার অর্থ এই যে, আমাদের অনুভাবকতা তেমন তীব্র নহে, আমরা সুখ ও দুঃখ তেমন প্রাণপণে অনুভব করিতে পারি না। সুখ যদি আমাদের চক্ষে তেমন স্পৃহনীয় ঠেকিত, দুঃখ যদি আমাদের নিকট তেমন ভীতিজনক দন্ত বিকাশ করিত, তাহা হইলে কি আমরা অদৃষ্ট নামে একটা বল্‌গা-রজ্জুহীন ছুটন্ত অন্ধ অশ্বের উপর চড়িয়া বসিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে ঢুলিতে পারিতাম? আমাদের ঘৃণা নাই, আমাদের ক্রোধ নাই, অন্তর্দাহী জ্বলন্ত আগ্নেয় পদার্থের ন্যায় চিরস্থায়ী প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি নাই। একটা অন্যায় ব্যবহার শুনিলে ঘৃণায় আমাদের আপাদমস্তক জ্বলিতে থাকে না। একটা অন্যায়াচরণ পাইলে আমরা ক্রোধে আত্মহারা হই না, ও যতক্ষণ না তাহার প্রতিহিংসা সাধন করিতে পারি ততক্ষণ আমাদের হৃদয়ের মধ্যে রক্ত ফুটিতে থাকে না। আমাদের ক্ষীণ দুর্বল শরীরে অত উত্তেজনা সহিবেই বা কেন? আমাদের এই অল্প পরিসর বক্ষের মধ্যে, আমাদের এই জীর্ণ-জর্জর হাড় কখানির ভিতরে অত ঘৃণা, অত ক্রোধ যদি জ্বলিতে থাকে, সুখে ও দুঃখে যদি অত তরঙ্গ তুলিতে থাকে, তবে আমাদের পঞ্চাশ বৎসরের পরমায়ু কত সংক্ষিপ্ত হইয়া আসে! আমাদের মতো এমন একটি ভগ্নপ্রবণ এঞ্জিনে অত অগ্নি, অত বাষ্প সহিবে কেন? মুহূর্তে ফাটিয়া যাইবে। আমাদের হৃদয়ে বিস্ফারক মনোবৃত্তি সকল যেমন হীনপ্রভ, সংকোচক মনোবৃত্তি সকল তেমনি স্ফূর্তিমান। আমরা ভয়ে জড়োসড়ো হই, লজ্জায় মাটিতে মিশাইয়া যাই। সে লজ্জা আবার আত্মগ্লানি নহে, আত্মগ্লানির দাহকতা আছে; দোষ করিয়া নিজের নিকট নিজে লজ্জিত হওয়া তো পৌরুষিকতা। আমাদের লজ্জা, দশ জনের চোখের সুমুখে পড়িয়া জড়োসড়ো হইয়া যাওয়া, পরের নিন্দা-সূচক ঘৃণার দৃষ্টিপাতে মরোমরো হইয়া পড়া, একটা ঘোমটা থাকিলেই আর এ-সকল লজ্জা থাকিত না। যে-সকল মনোবৃত্তিতে উত্তেজিত করে ও একটা-কোনো কার্যে উদ্যত করে তাহা আমাদের নাই, কিন্তু যে-সকল মনোবৃত্তিতে আমাদের সংকুচিত করে ও সকল কার্য হইতে বিরত করে তাহা আমাদের আছে। আমাদের দেশে রাগারাগি হইয়া তৎক্ষণাৎ একটা খুনাখুনি হইয়া যায় না। বলবান জাতিদের মতো বিশেষ রাগ হইলেই অমনি ঘুষি আগেই লাফাইয়া উঠে না, রাগ হওয়া ও হাতাহাতি হওয়ার মধ্যে একটি দীর্ঘ ব্যবধান গালাগালিতেই কাটিয়া যায় এবং আমাদের দুর্বল-শরীর ক্রোধ সেই সময়ের মধ্যেই প্রায় প্রাণ ত্যাগ করে। কেবল রাগ নহে আমাদের সমস্ত মনোবৃত্তিই এত দুর্বল যে তাহারা তাহাদের ক্ষীণ হস্তে ধাক্কা মারিয়া আমাদের কোনো একটা কাজের মধ্যে ঠেলিয়া দিতে পারে না। যদি বা দেয় তো সে কাজ সমাপ্ত হইতে-না-হইতে সে নিজে পলায়ন করে; যদি বা লিখিতে বস তবে বড়োজোর কর্তা ও কর্ম পর্যন্ত লেখা হয়, কিন্তু ক্রিয়া কোনো কালে লেখা হয় না; যেমন, যদি লিখিতে চাও যে,

"বঙ্গনন্দন বাবু দেশলাই প্রস্তুত করিতেছেন" তবে বড়োজোর "বঙ্গনন্দন বাবু" ও 'দেশলাই" পর্যন্ত লেখা হয়, কিন্তু "প্রস্তুত করিতেছেন" পর্যন্ত আর লেখা হয় না। বলাই বাহুল্য যে, যাহার মনোবৃত্তি সকল অত্যন্ত দুর্বল, সে কখনো কবি হইতে পারে না। যে বিশেষরূপে অনুভব করে না সে বিশেষ রূপে প্রকাশ করিতে পারে না। বলা বাহুল্য যে, বাঙালির হৃদয়ে ভাবের অর্থাৎ অনুভাবকতার গভীরতা, বলবত্তা নাই, তাহা যদি থাকিত তবে কার্যের এত দরিদ্রদশা কেন থাকিবে? অতএব বাঙালি জাতি যদি না ভাবে তো সে প্রকাশ করিবে কীরূপে? কবি হইবে কীরূপে?

আমরা যে এত অনুভব কম করি কেবলমাত্র অনুভাবকতার অল্পতা তাহার কারণ নহে। তাহার কারণ আমাদের কল্পনার দৃষ্টি অতি সামান্য। যে ব্যক্তির কল্পনা অধিক, সে ব্যক্তির অনুভাবকতাও তেমনি তীক্ষ্ণ। কল্পনা আমাদের হৃদয়ে দর্পণের ন্যায় বর্তমান। যাহার কল্পনা মার্জিত ও মসৃণ তাহার হৃদয়ে প্রতিবিম্ব অতি সমগ্র ও সম্পূর্ণ হয়; প্রতিবিম্বও সত্য পদার্থের মতো প্রতিভাত হয়, কিন্তু মলিন কল্পনায় প্রতিবিম্ব অতি অস্পষ্ট হয়, ভালো করিয়া দেখা যায় না। একটা ঘটনা যদি হৃদয়ে ভালো করিয়া প্রতিবিম্বিতই না হইল, যদি তাহা ভালো করিয়া দেখিতেই না পাইলাম, তবে তজ্জনিত সুখ বা দুঃখ হইবে কেন? একজন কাল্পনিক ব্যক্তি যখন বহুদিন পরে বিদেশ হইতে দেশাভিমুখে যাত্রা করে, তখন দেশে আসিলে তাহার আত্মীয় বন্ধুদিগের নিকট কীরূপ সমাদর পাইবে, তাহার এমন একটি জাজ্বল্যমান চিত্র তাহার কল্পনাপটে অঙ্কিত হয় যে, সে আনন্দে অধীর হইয়া পড়ে। সে চক্ষু মুদিয়া স্পষ্ট অনুভব করিতে পারে, যেন সে তাহার সেই পুরাতন বাটির প্রাঙ্গণে গিয়া পৌঁছিয়াছে, সেই সম্মুখে আতা গাছটি রহিয়াছে, এক পাশে গাভীটি বাঁধা রহিয়াছে, ছোটো মেয়েটি দাওয়ায় বসিয়া খেলা করিতেছে, সে তাহাকে দেখিয়া কী বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, মা কী বলিয়া ছুটিয়া আসিলেন, বাড়িতে কিরূপ একটা কোলাহল পড়িয়া গেল, সমস্ত সে দেখিতে পায়; কে তাহাকে কী প্রশ্ন করিবে তাহা সে কল্পনা করিতে থাকে এবং সে তাহার কী উত্তর দিবে তাহা পর্যন্ত ঠিক করিয়া রাখে। কল্পনা যদি এমন জাজ্বল্যমান না হয়, তবে সে কখনো স্পষ্ট সুখ অনুভব করিতে পারে না। যখন একজন ভাবী দারিদ্র্য-দুঃখ ভাবিয়া আত্মহত্যা করে, তখন সে তাহার ভবিষ্যৎ দুঃখের দশা বর্তমানের মতো অতি স্পষ্ট ও জীবন্ত করিয়া দেখে, নহিলে আত্মহত্যা করিতে পারে না।

যে ব্যক্তির অনুভাবকতা অধিক সে ব্যক্তি কাজ করে, সে কখনো নিরুদ্যম থাকিতে পারে না। সুখ তাহাকে এত আনন্দ দেয় যে, সুখের জন্য সে প্রাণপণ করে, দুঃখ তাহাকে এত কষ্ট দেয় যে, দুঃখের হাত এড়াইতে সে বিধিমতে চেষ্টা করে। বাঙালিরা কাজ করিতে চাহে না, কেননা তাহারা জানে যে, কোনোরূপে দিনপাত হইয়া যাইবে। কষ্ট হউক দুঃখ হউক কোনো রূপে দিনপাত হইলেই সন্তুষ্ট। যাহাদের অনুভাবকতা অধিক, তাহাদের কি এরূপ ভাব? এমন হয় বটে, যে, অনেক সময় আমরা অনুভব করি কিন্তু শরীরের দৌর্বল্যবশত সে অনুভাবকতা আমাদের কাজে নিয়োগ করিতে পারে না। কিন্তু তেমন অবস্থায় ক্রমেই আমাদের অনুভাবকতা কমিয়া যায়। অনবরত যদি দুঃখের কারণ ঘটে, অথচ তাহার প্রতিকার করিতে না পারি; চুপচাপ বসিয়া দুঃখ সহিতেই হয়, জানি যে, কোনো চারা নাই, তাহা হইলে মন হইতে দুঃখবোধ কমিয়া যায় ও অদৃষ্টবাদ শাস্ত্রের উপর বিশ্বাস জন্মে। যেমন করিয়াই হউক অনুভাবকতার হ্রাস হয়ই!

বহুকাল হইতে একটা জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে যে, কাজের সহিত কল্পনার মুখ-দেখাদেখি নাই। কল্পনা যদি এখানে থাকে তো কাজ ওখান দিয়া চলিয়া যায়। সচরাচর লোকে মানুষকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে, কাজের লোক ও কল্পনাপ্রধান লোক। কাজের লোক যদি উত্তর মেরুতে থাকে তো কল্পনাপ্রধান লোক দক্ষিণ মেরুতে থাকিবে। কিন্তু ভাবনা ও প্রকাশের মধ্যে যেরূপ অকাট্য সম্বন্ধ কল্পনা ও কাজের মধ্যে কি ঠিক তেমনি নহে? তুমি একটি ছবি আঁকিতে চাও, আগে কল্পনায় সে ছবি না উঠিলে কীরূপে তাহা আঁকিবে? মাটির উপর তোমাকে একটি

বাড়ি গড়িতে হইবে কিন্তু তাহার আগে শূন্যের উপর সে বাড়ি না গড়িলে চলে কি? যদি কাজের বাড়ি গড়িবার পূর্বে কল্পনার বাড়ি গড়া নিতান্তই আবশ্যক, তবে কল্পনার বাড়ি যত পরিষ্কার ও ভালো করিয়া গড় কাজের বাড়িও তত ভালো হইবে সন্দেহ নাই। কল্পনার ভিত্তিতে বাড়ি যদি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ না হয় তবে মাটির উপর গড়িতে তাহা পাঁচবার করিয়া ভাঙিতে হইবে।*

অতএব দেখা যাইতেছে যে, কল্পনা কাজের বাধাজনক নহে বরঞ্চ শ্রীবৃদ্ধিসাধক। তবে কেন কল্পনার নামে অনর্থক এরূপ একটা বদনাম হইল? বোধ হয় তাহার কারণ এই যে, যাহারা নিত্যনিয়মিত ধরাবাঁধা কাজ করে, যে কাজে একটা যন্ত্রের অপেক্ষা অধিক বুদ্ধি থাকিবার আবশ্যক করে না, কালও যাহা করিয়াছিলাম আজও তাহা করিতেছি, আর কালও তাহাই করিতে হইবে, তাহাদের কল্পনা খোরাক না পাইয়া অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। এবং যাহাদের কল্পনা অধিক, তাহারা এরূপ কাজ করিতে সম্মত হয় না। তাহারা এমন কাজ করিতে চায় যাহাতে কিছু সৃষ্টি করিবার আছে, ভাবিবার আছে। একজন কাল্পনিক পুত্রকে যখন তাহার পিতা কহেন "ইহার কিছু হইবে না" তখন তাঁহার কথার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এ হতভাগ্যের পুত্র কেরানি হইতে পারিবে না বা হিসাব রাখিবার সরকার হইতে পারিবে না। কিন্তু একটা মহান কাজ মাত্রেই কল্পনার আবশ্যক করে তাহা বলাই বাহুল্য। নিউটন বা নেপলিয়নের কল্পনা কি সাধারণ ছিল? ইংলন্ডের লোকেরা কাজের লোক! এ কথা সত্য বটে কাজের লোক বলিতে বুঝায় যে তাহার মধ্যে অধিকাংশই চিঠি কাপি করা হিসাব রাখা প্রভৃতি ধরাবাঁধা কাজে ব্যস্ত। কিন্তু তাহা হইতে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়? যে দেশে যন্ত্রের বাহুল্য সে দেশে যন্ত্রীর বাহুল্য। একজন বা দুই জন বা কতকগুলি লোকে মিলিয়া একটা প্রকাণ্ড কাজের সৃজন ও স্থাপন করে ও তাহাতেই দশ জনে মিলিয়া খাটে। অন্ধকারে যদি কেবল দেখিতে পাও যে, দুইটি হাত ভারি কাজে ব্যস্ত আছে, তৎক্ষণাৎ জানিবে কাছাকাছি একটা মস্তক আছে। যে শরীরের মাথা নাই, সে শরীরের হাতে কোনো কাজ থাকে না। ইংলন্ডে অত্যন্ত কাজের ভিড় পড়িয়াছে, তাহা হইতে প্রমাণ হইতেছে ইংলন্ডের মাথা আছে। যখন তুমি দেখ যে শরীরের অধিকাংশ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ না ভাবিয়া যন্ত্রের মতো কাজ করে, পা চলিতেছে কিন্তু পায়ের ভিতরে মস্তিষ্ক নাই, পা ভাবিয়া চিন্তিয়া চলে না, অন্যান্য প্রায় সকল অঙ্গই সেইরূপ, যখন তুমি মনে কর না যে সে শরীরটায় মস্তিষ্ক নাই। একজন ব্যক্তির কল্পনা আছে বলিয়া দশ জন অকাল্পনিক লোক কাজ পায়। ইংলন্ডে যে এত কাজ দেখিতেছি তাহার অর্থ ইংলন্ডে অনেক কাল্পনিক লোক আছে। একজন দরিদ্র ইংরাজ যে তাহার স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া অতি দূরদেশে গিয়া ধন সঞ্চয় করিয়া সম্পত্তিশালী হইয়া উঠে তাহার

---

* অনেকে ভুল বুঝিতে আশ্চর্যরূপে পটু। তাঁহাদের ধন্য বলিতে হইবে। তাঁহাদের যদি বলা যায় যে, কামানের গোলা লাগিলে মানুষ মরিয়া যায়, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠেন, "বিলক্ষণ! এই সেদিন দেখিলাম সাতকড়ি সার্বভৌম মহাশয়ের লোকান্তর প্রাপ্তি হইল, কিন্তু বিশ ক্রোশের মধ্যে একটি কামান ছিল না!" এত ক্রোধ যে, তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া মারিতে উদ্যত। তাঁহাদের বলা গেল যে, কবি হইতে গেলে শিক্ষার আবশ্যক, তাঁহারা বলিলেন "কই, শিক্ষিত ব্যক্তিরা তো কবি হয় না।" তাঁহাদের প্রতি লেখকের এই নিবেদন যে, যখন তাঁহাদের বলা হয় যে, "আগুনের উপর না চড়াইলে পায়স প্রস্তুত হয় না" তখন তাঁহারা মনে না করিয়া বসেন যে, আগুনের উপর জল চড়াইলেও পায়স প্রস্তুত হয়। বক্তার এই বলা অভিপ্রায় যে, আগুনের উপর দুধ ও চাল চড়াইলেই তবে পায়স হয়। বক্তা জানিতেন যে, যাহাকে বলা হইতেছে সে জানে কী কী পদার্থে পায়স প্রস্তুত হয়, কেবল জানে না যে, আগুনের উপর চড়ানো পায়স প্রস্তুত করণের একটা অঙ্গ। যাহার কবিত্ব আছে শিক্ষায় সেই কবি হয়। বর্তমান লেখক যাঁহাদের জন্য এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, কবির কল্পনা থাকা নিতান্ত আবশ্যক, কেবল তাঁহারা অস্বীকার করেন যে, কবির প্রকাশক্ষমতা ও শিক্ষার আবশ্যক, এইজন্য কল্পনার বিষয়ে কিছুই বাহুল্য উল্লেখ করা হয় নি। যাহা হউক, উপরি-উক্ত শ্রেণীর পাঠকদিগের জন্য কি এমন একটি বাহুল্য কথা বলিতে হইবে যে, কল্পনা থাকিলেই যে, ভালো বাড়ি গড়া হয় তাহা নহে; দুই সমশ্রেণীর কারিগরের মধ্যে যাহার কল্পনা অধিক সেই অপরের অপেক্ষা ভালো বাড়ি গড়িবে!

কারণ তাহার কল্পনা আছে। এই কল্পনায় ইংরাজদের কোথায় না লইয়া গিয়াছে বলো দেখি। কোথায় আফ্রিকার রৌদ্রতপ্ত জ্বলন্ত হৃদয়, আর কোথায় উত্তর মেরুর তুষারময় জনশূন্য মরু প্রদেশ, কোথায় তাহারা না গিয়াছে? যাহা অনুপস্থিত, যাহা অনধিগম্য, যাহা দুষ্প্রাপ্য, যাহা কষ্টসাধ্য, অকাল্পনিক লোকেরা তাহার কাছ দিয়া ঘেঁসিবে না। যাহা উপস্থিত নাই অকাল্পনিক লোকদের কাছে তাহার অস্তিত্বই নাই। বর্তমানে যাহার মূল নিতান্ত স্পষ্ট প্রত্যক্ষ না হইতেছে, এমন কিছু তাহারা বিশ্বাস করিতে চাহে না, এমন-কি, অনুভব করিতে পারে না। এইজন্য অকাল্পনিক লোকেরা একটা কিছু সৃষ্টিছাড়া আশা করে না। সুতরাং কাল্পনিক লোকেরা যেমন অনেক বিষয়ে ঠকে, এক-একটা সৃষ্টিছাড়া খেয়ালে নিজের ও পরের সর্বনাশ করে, অকাল্পনিকদের তাহার কোনো সম্ভাবনা নাই। এইজন্যও বোধ করি কাল্পনিকদের একটা নাম খারাপ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যে ব্যক্তি ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকে সে ব্যক্তির ওই বাহিরের কূপটার মধ্যে পড়িয়া মরিবার কোনো সম্ভাবনা নাই কিন্তু সে ব্যক্তির ওই ফুলবাগানে বেড়াইবার বা বিদেশে গিয়া টাকা রোজগার করিবারও কোনো সম্ভাবনা নাই। একজন কাল্পনিক ব্যক্তির বুদ্ধি না থাকিলে সে অনেক হানিজনক কাজ করে, কিন্তু সে তাহার বুদ্ধির দোষ না কল্পনার দোষ? এক কথায় পৃথিবীতে যত বড়ো বড়ো কাজ হইয়াছে সকলই কল্পনার প্রসাদে। তবে কেন আজ, কাজ অমন মুখ ভার করিয়া কল্পনার প্রতি মহা অভিমান করিয়া বসিয়া আছে?

যে দেশে শেক্‌সপিয়র জন্মিয়াছে সেই দেশেই নিউটন জন্মিয়াছে, যে দেশে অত্যন্ত বিজ্ঞান-দর্শনের চর্চা, সেই দেশেই অত্যন্ত কাব্যের প্রাদুর্ভাব, ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে, কল্পনার কাজ কেবলমাত্র কবিতা সৃজন করা নয়। যে দেশে কাল্পনিক লোক বিস্তর আছে, সে দেশের লোকেরা কবি হয়, দার্শনিক হয়, বৈজ্ঞানিক হয়; সকলই হয়, বাঙালি বৈজ্ঞানিক নয়, বাঙালি দার্শনিক নয়, বাঙালি কবিও নয়।

লোকেরা যে মনে করে যে, অকেজো লোকেরা অত্যন্ত কাল্পনিক হয় তাহার একটি কারণ এই হইবে যে, যাহাদের হাতে কাজ নাই তাহারা কল্পনা না করিয়া আর কী করিবে? নানা লঘু অস্থায়ী ভাবনাখণ্ডের ছায়া মনের উপর পড়াকেই যদি কল্পনা বল, তবে তাহারা কাল্পনিক বটে। কিন্তু সেরূপ কল্পনার ফল কী বলো? সেরূপ কল্পনায় লোককে কবি করিতে পারে না। মনে করো এক ব্যক্তি যতক্ষণ বসিয়া থাকে ততক্ষণ সে নখ দিয়া ধীরে ধীরে মাটিতে আঁচড় কাটিতে থাকে, ইহাতে তাহার অতি ঈষৎ পদচালনা হয়; চলিতে আরম্ভ করিলে তাহার মাটিতে আঁচড় কাটিবার অবসর থাকে না কিন্তু তাহাই বলিয়া কি বলা যাইতে পারে যে, বসিয়া থাকিলেই তাহার যথার্থ পদচালনা হয়? কাজ করিতে যে কল্পনার আবশ্যক করে তাহাই পদচালনা, বসিয়া থাকিলে যে কল্পনা আপনা হইতে আসে তাহা মাটিতে আঁচড় কাটা। যদি কিছুতে সে পদের বলবৃদ্ধি করে, তবে সে চলাতেই। একটি কবিতা লিখিতে হইলে কল্পনাকে একটি নিয়মিত পথে চালন করিতে হয়, তখন তাহার একটি ক্রম থাকে, একটি পরিমাণ থাকে, শুদ্ধ তাহাই নহে, সে সময়ে কল্পনা অলস-কল্পনা অপেক্ষা অনেকটা গভীর ও বিশেষ শ্রেণীর হওয়া আবশ্যক করে। যাহার সর্বদা কবিতা লেখা অভ্যাস আছে, সে যখন কবিতা নাও লিখিতেছে, তখনও মাঝে মাঝে হয়তো সেই ক্রমানুযায়িক, পরিমিত, বিশেষ শ্রেণীর কল্পনা মনে মনে চালনা করিতে থাকে। সেরূপ চালনাতেও মনোনিবেশ আবশ্যক করে, পরিশ্রম বোধ হয়। অলস ব্যক্তি, ও যে কখনো কবিতা লেখে না, সে কখনো অবসর কাল এরূপ শ্রমসাধ্য কল্পনায় অতিবাহন করে না। স্বপ্ন ও সত্য ঘটনায় যত তফাত অলস ও কাজের কল্পনায় তাহা অপেক্ষা অল্প তফাত নয়। অতএব কাজের লোকের কল্পনা অলস লোকের কল্পনা অপেক্ষা অধিক জাগ্রত। যে জাতির মধ্যে বাণিজ্যের প্রাদুর্ভাব, বৈজ্ঞানিক সত্যের আবিষ্কার হয়, দর্শনের আলোচনা চলে, সে জাতির মধ্যে কল্পনার অত্যন্ত চর্চা হয় ও সবশুদ্ধ ধরিয়া কল্পনার ভাণ্ডার অত্যন্ত বাড়িতে থাকে; সুতরাং সে দেশে অলস দেশ অপেক্ষা কবি জন্মিবার অধিক সম্ভাবনা। বাঙালি কাজও করে না, বাঙালি কল্পনাও করে না।

স্বাভাবিক আলস্য, স্বাভাবিক নির্জীবভাব, সকল বিষয়ে বৈরাগ্য, ইহারাই বাঙালিকে মানুষ হইতে দিতেছে না। আমরা সকল দ্রব্যই অর্ধেক চক্ষু মুদিয়া দেখি। আমাদের কৌতূহল অত্যন্ত অল্প। হাতে একটা দ্রব্য পড়িলে তাহা উলটাইয়া পালটাইয়া দেখিতে ইচ্ছাই হয় না। কোনো স্থান দিয়া যখন যাই তখন দুই দিকে চাই না, মাটির দিকেই নেত্র। সত্য জানিবার জন্য কৌতূহল নাই। আমি জানি, ইংলন্ডে সামান্য শ্রমজীবীদিগের জন্য নানা সভা আছে। সেখানে সন্ধ্যাবেলা নানা বিষয়ে বক্তৃতা হয়। সমস্ত দিনের শ্রমের পর ৬ পেন্স খরচ করিয়া কত গরিব লোক শুনিতে আসে। একজন হয়তো ইজিপ্টের প্রাচীন দেবদেবীদের বিষয়ে বক্তৃতা দিবেন। একজন নিরক্ষর শ্রমজীবীর যে, সে বিষয় শুনিতে কৌতূহল হইবে ইহা আমাদের কাছে বড়োই আশ্চর্য বোধ হয়। সামান্য কৌতুকের বিষয় হইলে ছোটো বড়ো সকল লোকে একেবারে ঝাঁকিয়া পড়ে। য়ুরোপে যেখানে যাহা-কিছু দেখিবার আছে, সেইখানেই ইংরাজদের হোটেল নিশ্চয়ই আছে, এবং অন্যান্য বিদেশীয়দের মধ্যে ইংরাজদেরই আধিক্য। এটনার গর্ভের মধ্যে একজন ইংরাজই প্রথম অবতরণ করেন, এবং ইটালিয়নরা বলিয়াছিল এ ব্যক্তি হয় ইংরাজ নয় শয়তান হইবে। আমাদের সাধারণত কৌতূহলের অভাব। সেইজন্য আমরা যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করি তাহার সমস্তটা আমাদের চক্ষে পড়ে না। সুতরাং সে দ্রব্যটা আমরা সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিতেই পারি না। ইংরাজেরা একটা ভালো দ্রব্যের প্রতি খুঁটিনাটি পর্যন্ত উপভোগ করে। সুইজর্লন্ডের দৃশ্য রমণীয় বলিয়া তাহারা অবসর পাইলেই সেখানে যায়। সেখানে আবার একটা বিশেষ পর্বত-শিখর হইতে সূর্যোদয় অতি সুন্দর দেখায়; সেই সূর্যোদয় দেখিবার জন্য তাড়াতাড়ি অর্ধরাত্রে উঠিয়া হয়তো সেখানে যাত্রা করে, ঠিক পাঁচটার সময় সেখানে গিয়া পৌঁছায়, সূর্যোদয়টুকু দেখিয়া আবার ফিরিয়া আসে। তাহারা সেই উদয়োন্মুখ সূর্যের চতুর্দিকস্থ প্রতি মেঘ খণ্ড আলোচনা করে। আমাদের দেশে কত দিন রমণীয় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়। কিন্তু কয়জন একবার চাহিয়া দেখে? এমন সকল উদাসীন, বাহ্য বিষয়ে নির্লিপ্ত লোকদের জন্য কেন এমন সুন্দর দেশ সৃষ্ট হইয়াছিল? কয়জন বাঙালি কেবলমাত্র চক্ষু চরিতার্থ করিবার জন্য হিমালয়ে যায়? আমাদের পাঠকদের মধ্যে কয়জন ঘাটগিরি দেখিয়াছেন, ইলোরার গুহা দেখিয়াছেন? একটু কৌতূহল থাকিলে দেখিবার শত সহস্র অবসর ও উপায় পাইতেন। বাহ্য দৃশ্য আমরা উপভোগ করিতেই জানি না। একটি সামান্য গুল্মের পর্ণ যতই সুন্দর হউক-না-কেন, আমরা তাহা মাড়াইয়া যাই; কখনো একবার নত হইয়া দেখি? আর আমার পার্শ্বস্থ আমার ইংরাজ সহচরটি কেন তাড়াতাড়ি সেটি তুলিয়া লইয়া শুকাইয়া যত্নপূর্বক রাখিয়া দেয়? বাহ্য বিষয়ে ঔদাসীন্য বোধ করি আমাদের কুলক্রমাগত গুণ। সংসার অনিত্য, সংসার স্বপ্ন। একটা ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, উহাতে অত মনোনিবেশ করিয়া কী দেখিতেছ? উহা তো দুদণ্ডেই শুকাইয়া পড়িবে। সকলই তুচ্ছ, কিছুই চক্ষু মেলিয়া দেখিবার নাই। যাহা-কিছু দেখিবার আছে, সকলই চক্ষু মুদিয়া। জীবনের কূট সমস্যা সকল মীমাংসা করো। কিন্তু ইহা কি বুঝিবে না, ঐ অস্থায়ী ফুল যাহা শিক্ষা দেয় তাহা চিরস্থায়ী! সুন্দর দ্রব্যের প্রতি ভালবাসার চর্চা, যেমন শিক্ষা তেমন শিক্ষা আর কী হইতে পারে? এই বাহ্য প্রকৃতির প্রতি ঔদাসীন্য আমাদের কবিতাতে স্পষ্টই লক্ষিত হয়। যে ভালো কবি অর্থাৎ যাহার মনে সৌন্দর্যজ্ঞান বিশেষ রূপে আছে, সে কি কখনো এমন সুন্দর জগতের বাহ্য মুখশ্রী দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে? আমাদের বাংলা কবিতাতে এমন কেন দেখা যায় যে, একজন কবি একটি কাননের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, আর-এক জনও ঠিক সেইরূপ করিয়াছেন। তাহার কারণ এই যে, যখন আমরা একটি কানন দেখি তখন সে কাননের মুখের দিকে আমরা ভালো করিয়া চাহিয়া দেখি না; কাননের যে কী ভাব আছে তাহা আমরা বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন চোখে দেখি না। দেখিবার ইচ্ছাই নাই, দেখিবার ক্ষমতাই নাই। আমরা কেবল জানি যে, কানন অর্থে একটি ভূমিখণ্ড, যেখানে ফুলের গাছ আছে। আমরা জানি যে, মল্লিকা, মালতী প্রভৃতি ফুল দেখিতে ভালো এবং কবিতায় সে-সকল ফুলের নামোল্লেখ করিলে ভালো শুনাইবে; তাহা তুমিও

জান, তাহা আমিও জানি। কিন্তু কাননের মুখে এমন সকল ভাব বিকাশ পায়, যাহা ভাগ্যক্রমে তুমিই দেখিতে পাও, আমি দেখিতে পাই না, তুমিই জানিতে পার, আমি জানিতে পারি না, সে-সকল ভাব আমাদের চক্ষে পড়ে না। এইজন্যই বাংলা কাব্যে নিম্নলিখিত রূপে কানন বর্ণিত হয়—

মোহিনী মোহকর মহীরুহ রাজি
প্রকাশিল সুন্দর কিশলয় সাজি।
ধাবিল সমীরণ মলয় সুগন্ধি;
চুম্বনে ঘন ঘন কুসুম আনন্দি।
কাঁপিল ঝর ঝর তরুশিরে সাধে,
শিহরিত পল্লব মরমর নাদে।
হাসিল ফুলকুল মঞ্জুল মঞ্জুল,
মোদিত মৃদুবাসে উপবন ফুল।
কোকিল হরষিল কুহুরবে কুঞ্জ,
শোভিল সরোবরে সরোজিনী পুঞ্জ।
নাচিল চিত সুখে ময়ূর কুরঙ্গ;
গুঞ্জরে ঘন ঘন মধুপানে ভৃঙ্গ।
সুন্দর শতদল প্রিয়তর আভা
সুরয অরধ, অরধ শশি শোভা।
শোভিল সুতরুণ স্থল জল অঙ্গে;
বিরচিল হ্লাদিনী মায়াবন রঙ্গে।

ইহাতে না আছে কাননের শরীর না আছে কাননের প্রাণ। বীরবর সিংহের বর্ণনা করিতে গিয়া যদি তুমি বল যে, তাহার এক জোড়া হাত, এক জোড়া চোখ ও এক জোড়া কান আছে, তাহা হইলে শ্রীযুক্ত বীরবর সিংহের চিত্র আমাদের মনে যেরূপ উদিত হয়, উপরি-উদ্‌ধৃত বর্ণনায় কাননের চিত্র আমাদের হৃদয়ে তেমনি উঠিবার কথা। বীরবর সিংহের ওরূপ হাস্যজনক বর্ণনা করিলে বলা যায় যে, বর্ণনাকারী বীরবরের চেহারা একেবারে কল্পনাই করেন নাই। বাহ্য আকার বর্ণনা ছাড়া আর-এক প্রকারে বীরবরের বর্ণনা করা যাইতে পারে; বলা যাইতে পারে, বীরবরের দৃঢ়সংলগ্ন ওষ্ঠাধর তাহার স্থির প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করিতেছে, তাহার জ্যোতির্ময় নেত্রের দৃষ্টিপাত মর্মভেদী, ও তাহার উন্নত ললাট ভাবনার ভরে যেন ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। এরূপ বর্ণনার গুণ এই যে, এক মুহূর্তে বীরবরের সহিত আমাদের আলাপ হইয়া যায়। ইহাতে বুঝায়, বর্ণনাকারী বীরবরের চেহারা বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন। Shelley-র কবিতা হইতে একটি দ্বীপের বর্ণনা উদ্‌ধৃত করিয়া দিতেছি, ইহার বাংলা অনুবাদ অসম্ভব।

'It is an isle under Ionian skies,
Beautiful as a wreck of paradise,

. . .

The light clear element which the isle wears
Is heavy with the scent of lemon flowers,
Which floats like mist laden with unseen showers;
And falls upon the eyelids like faint sleep;
And from the moss violets and jonquils peep,
And dart their arrowy odour through the brain

Till you might faint with that delicious pain.
And every motion, odour, beam, and tone,
With that deep music is in unison
Which is a soul within the soul :

. . .

The winged storms, chanting their thunder psalm
To other lands, leave azure chasms of calm
Over this isle, or weep themselves in dew,
From which its fields and woods ever renew
Their green and golden immortality.
And from the sea their rise, and from the sky
There fall, clear exhalations, soft and bright,
Veil after veil, each hiding some delight;
Which sun or moon or zephyr draw aside.
Till the isle's beauty like a naked bride
Glowing at once with love and loveliness,
Blushes and trembles at its own excess.

. . .

But the Chief marvel of the wilderness
Is a lone dwelling, built by whom or how
None of the rustic island people know.

. . .

And, day and night aloof from the high towers
And terraces, the earth and ocean seem
To sleep in one another's arms, and dream
Of waves, flowers, clouds, woods' rocks, all that we
Read in their smiles, and call reality.'

অত্যন্ত দীর্ঘ বলিয়া মাঝে মাঝে ছাড়িয়া দিতে হইল এজন্য ইহার অত্যন্ত রসহানি করা হইয়াছে। Shelley এমন করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যে, ওই দ্বীপটি তিনি মনে মনে বিশেষ রূপে উপভোগ করিয়াছেন, বড়ো ভালো লাগিয়াছে তাই এত উচ্ছ্বাস। কেবলমাত্র কতকগুলি সত্যের উল্লেখ করিয়া যান নাই, প্রতি ছত্রে তাঁহার নিজের মনোভাব দীপ্তি পাইতেছে। যে দ্রব্য আমাদের ভালো লাগে, যে দ্রব্য আমরা প্রাণের সহিত উপভোগ করি, তাহা বর্ণনা করিতে হইলে আমরা নানা বস্তুর সহিত তাহার তুলনা করিতে চাই; তাহার নানা প্রকার নামকরণ করি। আমরা আমাদের ভালোবাসার লোককে, "নয়ন-অমৃত রাশি," "জীবন-জুড়ানো ধন," "হৃদি-ফুল হার" এবং এক নিশ্বাসে এমন শত প্রকার সম্বোধন করি কেন? সে যে, কতখানি আমাদের আনন্দদায়ক তাহা ঠিকটি প্রকাশ করিতে আমরা কথা হাতড়াইয়া বেড়াই, এটা একবার, ওটা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি কিছুতেই মনস্তুষ্টি হয় না। আমাদের কল্পনার ভাণ্ডারে তাহার সহিত ওজন করিবার উপযুক্ত বাটখারা খুঁজিয়া পাই না। মনের আগ্রহে ছটাক হইতে মণ পর্যন্ত যাহা-কিছু হাতে পাইতেছি সমস্তই তুলাদণ্ডে চড়াইতেছি, কিন্তু কিছুতেই সমান ওজন হইতেছে না। মনে হয়, আমাদের ভাষার ডানা এমন লৌহময়, যে, আমার ভালোবাসা যে উচ্চে

অবস্থিত সে পর্যন্ত সে উড়িতে পারে না, বার বার করিয়া চেষ্টা করে ও বার বার করিয়া পড়িয়া যায়। একটি Nightingale-এর গানের বিষয়ে Shelley কী লিখিতেছেন পাঠ করো। কেবলমাত্র যদি বলা যায় যে, কোকিল অতি মিষ্ট গান করিতেছে, তাহার এক কবিতা, আর নিম্নলিখিত বর্ণনার এক স্বতন্ত্র কবিতা।

A woodman whose rough heart was out of tune
Hated to hear, under the stars or moon,
One nightingale in an interfluous wood
Satiate the hungry dark with melody
And as a vale watered by a flood,
Or as the moonlight fills the open sky
Struggling with darkness— as a tube-rose
Peoples some Indian dell with scents which lie
Like clouds above the flowers from which they rose—
The singing of that happy nightingale
In this sweet forest, from the golden close
Of evening till the star of dawn may fail
Was interfused upon the silentness.
The folded roses and the violets pale
Heard her within their slumbers ; the abyss.
Of heaven with all its planets ; the dull ear
Of the night-cradled earth ; the loneliness
Of the circumfluous waters. Every sphere,
And every flower and beam and cloud and wave,
And every wind of the mute atmosphere,
And every beast stretched in its rugged cave
And every bird lulled on its mossy bough,
And every silver moth fresh from the grave
Which is its cradle . . .
. . . and every form
That worshipped in the temple of night.
Was awed into delight, and by the charm
Girt as with an interminable zone,
Whilst that sweet bird, whose music was a storm
Of sound, shook forth the dull oblivion
Out of their dreams. Harmony became love
In every soul but one.''

মনে হয় না কি যে, গান শুনিতে শুনিতে কবির চক্ষু মুদিয়া আসিয়াছে, মনুষ্যহৃদয়ে যতদূর সম্ভব তত দূর পর্যন্ত উপভোগ করিতেছেন? এই মুহূর্তে আমার হস্তে অবকাশরঞ্জিনী দ্বিতীয় ভাগ রহিয়াছে। সমস্ত বহি খুঁজিয়া দুই-একটি মাত্র স্বভাব বর্ণনা দেখিলাম। তাহাও এমন নির্জীব ও নীরস, যে, পড়িয়া স্পষ্ট মনে হয়, কবি যাহা বর্ণনা করিতেছেন, প্রাণের সহিত তাহা উপভোগ

করেন নাই। লিখা আবশ্যক বিবেচনায় লিখিয়াছেন। একটি সন্ধ্যার বর্ণনা। মন্দগমনা, বিষণ্ণ সায়াহ্নের মুখ যাহার বিশেষ ভালো লাগে, সে কখনো এরূপ নির্জীব বর্ণনা করিতে পারে না। সূর্যের সহিত আলোকের অপসরণ, এই প্রাকৃতিক ঘটনা মাত্রকে সে সন্ধ্যা বলিয়া জানে না। তাহার হৃদয়ে সন্ধ্যার একটি স্বতন্ত্র জীবন্ত অস্তিত্ব আছে। সন্ধ্যা তাহার মনের ভিতরে বসিয়া কথা কহে।

"আইল গোধূলি সৌর রঙ্গ ভূমে,—
নামিল পশ্চিমে ধীরে যবনিকা,
ধূসর বরণা; ফুরাইল ক্রমে
দিনেশ দৈনিক গতি অভিনয়।
অষ্টমীর চন্দ্র— রজতের চাপ!
নভোমধ্যস্থলে বিষণ্ণ বদনে
ভাসিল; লভিতে যেন প্রিয় রবি
আলিঙ্গন, ভ্রমি' অলক্ষেতে শশি
অর্ধ সৌর রাজ্য বিরহেতে কৃশ,
নিরাশা মলিন।"

যখন তুমি বল, আমি অমুক স্থানে একটি মানুষকে দেখিলাম, তখন জানিলাম, তুমি খুব অল্পই দেখিয়াছ; যখন বল যে, হরিহরকে দেখিয়াছ, তখন জানিলাম, যে, হাঁ, একটু ভালো করিয়া দেখিয়াছ; আর যখন বল যে, হরিহরকে দেখিলাম তাহার চোখে ও অধরে ক্রোধ, ও সমস্ত মুখে একটি গুপ্ত সংকল্প প্রকাশ পাইতেছে, তখন বুঝিলাম যে, একটি মানুষকে যতদূর দেখিবার তাহা দেখিয়াছ। আমরা কবিতায় যেরূপ স্বভাব বর্ণনা করি, তাহাতে প্রকাশ পায় যে, আমরা সেই মানুষটিকে মাত্র দেখিয়াছি, হরিহরকে দেখি নাই। যদি বা হরিহরকে দেখিয়া থাকি, অর্থাৎ সেই মানুষটির নাক কান চোখ মুখ বিশেষরূপে দেখিয়া থাকি, তথাপি তাহার নাক কান চোখ মুখের মধ্যে আর কিছু দেখিতে পাই নাই। যখন আমরা একটি মানুষের ঠোঁটে, চোখে ও সমস্ত মুখে একটা কিছু বিশেষ ভাব দেখিতে পাই তখন আমরা কেবলমাত্র সেই মানুষকে জীবন্ত বলিয়া দেখি না; তখন তাহার ঠোঁট ও চোখকে আমরা জীবন্ত করিয়া দেখি। তখন আমরা তাহার ঠোঁটের ও চোখের একটি হৃদয়, একটি প্রাণ দেখিতে পাই। এই হৃদয়, এই প্রাণ দেখিতে পাওয়া দেখিতে পাওয়ার চূড়ান্ত ফল। বাংলা কবিতার স্বভাব বর্ণনায় প্রকৃতির এই হৃদয়, এই প্রাণ দেখিতে পাই না।

"সরোবরে সরোরুহ, কুমুদ কহ্লার সহ
শরতে সুন্দর হোয়ে শোভা দিয়ে ফুটেছে।"

ইহা লক্ষ্য করিয়া দেখিতে একরূপ চক্ষুর আবশ্যক, আর—

"Then the pied wind flowers and the tulip tall,
And narcissi, the fairest among them all,
Who gaze on their eyes in the stream's recess
Till they die of their own dear loveliness
And the rose, like a nymph to the bath addressed.
Which unveiled the depth of her glowing breast,
Till, fold after fold, to the fainting air
The soul of her beauty and love lay bare."

ইহা দেখিতে স্বতন্ত্র চক্ষুর আবশ্যক করে। একটি narcissus ফুল, যে স্রোতের পার্শ্বে ফুটিয়া দিন রাত্রি জলের মধ্যে নিজের মুখখানি, নিজের সৌন্দর্য দেখিতে দেখিতে শুকাইয়া মরিয়া যায়,

তাহার সে একটি মিষ্ট ভাব, অথবা একটি বিকাশোন্মুখ গোলাপের পাপড়িগুলি যখন একটি একটি করিয়া খুলিতে থাকে অবশেষে তাহার অতুল রূপ একেবারে অনাবৃত হইয়া পড়ে তখন তাহার সেই লাজুক সৌন্দর্য কয়জন লোক দেখিতে পায়? কিন্তু—

"মরাল আনন্দ মনে ছুটিল কমল বনে,
চঞ্চল মৃণাল দল ধীরে ধীরে দুলিল;
বক হংস জলচর ধৌত করি কলেবর
কেলি হেতু কলরবে জলাশয়ে নামিল।"

এ ঘটনাগুলি দেখিতে কতটুকুই বা কল্পনার আবশ্যক করে? ইহা হয়তো সকলেই স্বীকার করিবেন, যাহাকে আমরা বিশেষ ভালোবাসি, যাহাকে আমরা বিশেষ করিয়া নিরীক্ষণ করি, যাহাকে আমরা মুহূর্তকাল আমাদের চক্ষের আড়াল হইতে দিই না, তাহার নাক চোখ আমরা দেখিতে পাই না, অর্থাৎ দেখি না। তাহাকে যখন দেখি তখন তাহার মুখের ভাবটি মাত্র দেখি, আর কিছুই নয়। এইজনাই সে মুখকে আমরা পদ্ম বলি বা চন্দ্র বলি। যখন আমরা মুখপদ্ম কথা ব্যবহার করি তখন তাহার অর্থ এমন নহে, যে, মুখ বিশেষে পদ্মের মতো পাপড়ি আছে, তখন তাহার অর্থ এই যে, পদ্মেরও যে ভাব সে মুখেরও সেই ভাব। আমার প্রেয়সীর মুখের গঠন বাস্তবিক ভালো কি মন্দ, তাহার নাক ঈষৎ চেপ্টা হওয়াতে ও তাহার ভুরু ঈষৎ বাঁকা হওয়াতে তাহাকে কতখানি খারাপ দেখিতে হইয়াছে, তাহাকে চব্বিশ ঘণ্টা নিরীক্ষণ করিয়াও তাহা আমি বলিতে পারি না, অথচ একজন অচেনা ব্যক্তি মুহূর্তকাল দেখিয়াই বলিয়া দিতে পারে আমার প্রেয়সীর গঠন বাস্তবিক কতখানি ভালো দেখিতে। তাহার কারণ, আমি তাহার মুখের ভাবটি ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাই না। যে কবি প্রকৃতিকে যত অধিক ভালোবাসেন সেই কবি প্রকৃতির নাক মুখ চোখ তত অল্প দেখিতে পান। যে কবি গোলাপকে বিশেষরূপে দেখিয়াছেন ও বিশেষরূপে ভালোবাসেন, তিনি সেই গোলাপটিকে একটি আকারবিশিষ্ট ভাব মনে করেন, তাহাকে পাপড়ি ও বৃন্তের সমষ্টি মনে করেন না। এইজন্যই একটি লাজুক বালিকার সহিত একটি গোলাপের আকারগত সম্পূর্ণ বিভেদ থাকিলেও তিনি উভয়ের মধ্যে তুলনা দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহেন। এইজন্য শেলী একটি nightingale-এর কণ্ঠস্বরের সহিত স্রোতের বন্যা, জ্যোৎস্নাধারা ও রজনীগন্ধার পরিমলের তুলনা করিয়াছেন। কোথায় পাখির গান, আর কোথায় বন্যা, জ্যোৎস্না ও ফুলের গন্ধ? জড়ই হউক আর জীবন্তই হউক, একটি আকারের মধ্যে একটি ভাব দেখিতে যে অতি সূক্ষ্ম কল্পনার আবশ্যক, তাহা বোধ করি আমাদের নাই। যদি থাকিত, তবে কেন আমাদের বাংলা কবিতার মধ্যে তাহার কোনো চিহ্ন পাওয়া যাইত না? বোধ করি অত সূক্ষ্ম ভাব আমরা ভালো করিয়া আয়ত্তই করিতে পারি না, আমাদের ভালোই লাগে না। আমাদের খুব খানিকটা রক্তমাংস চাই, যাহা আমরা ধরিতে পারি, যাহা দুই হাতে লইয়া আমরা নাড়াচাড়া করিতে পারি। আমাদের গণ্ডার-চর্ম মন অতি মৃদু সূক্ষ্ম স্পর্শে সুখ অনুভব করিতে পারে না। এইজন্য আমরা বাইরনের ভক্ত। শেলীর জ্যোৎস্নার মতো অতি অশরীরী কল্পনা খুব কম বাঙালির ভালো লাগে।

"দেখিয়াছি ভাগীরথী ভাদ্র মাসে ভরা,
পূর্ণ জোয়ারের জল মন্থর যখন;
দেখিয়াছি সুখস্বপ্নে নন্দনে অপ্সরা
কিন্তু হেন চারু চিত্র দেখি নি কখনো।
বিরহেতে গুরুতর উরসের ভারে
ঢলিয়া পড়েছে বামা কুসুমেষু শরে
কুসুম শয়নে; কিন্তু কুসুমে কি পারে

নিবাইতে যে অনল জ্বলিছে অন্তরে?
সুগোল সুবর্ণনিভ চারু ভুজোপরে
শোভে পূর্ণ বিকশিত বদন কমল,
(রূপের কমল মরি কাম সরোবরে),
ভানুর বিরহে কিন্তু নিমীলিত দল!
শোভিতেছে অন্য করে বাক্য মনোহর,
স্খলিত অলকারাশি, পয়োধর থর
বিশ্রামিছে অযতনে কাব্যের উপর,
পুণ্যবান কবি— কাব্য পুণ্যের আকর।
বিনোদ বদনচন্দ্র, বিনোদ নয়ন
পল্লবে আচ্ছন্ন, পাঠে স্থির সন্নিবেশ,
অতুল বিনোদতম, ত্রিদিব মোহন,
অঙ্গে অঙ্গে অনঙ্গের বিলাস আবেশ।
বিলাস বঙ্কিম রেখা, কুহকী যৌবন
চিত্রিয়াছে কী কৌশলে সর্ব অঙ্গে মরি
পূর্ণতার পূর্ণাবেশ— সুনীল বসন
বিকাশিছে তলে তলে কনক লহরী।"

এমনতর একটা স্থূল নশ্বর মাংসপিণ্ড নহিলে বাঙালি হৃদয়ের অসাড়, অপূর্ণ স্নায়ুবিশিষ্ট, কর্কশ ত্বকে তাহার স্পর্শই অনুভব হয় না। আর নিম্নলিখিত কবিতাটি পড়িয়া দেখো—

Wherefore those dim looks of thine
Shadowy, dreaming Adeline.
Whence that aery bloom of thine
Like a lily which the sun
Looks thro' in his sad decline
And a rose-bush leans upon,
Thou that faintly smilest still,
As a Naiad in a well,
Looking at the set of day.

. . .

Wherefore those faint smile of thine
Spiritual Adeline?
Who talketh with thee, Adeline?
For sure thou art not all alone.
Do beating-hearts of salient springs
Keep measure with thine own?
Hast thou heard the butterflies
What they say betwixt their wings?
Or in stillest evenings
With what voice the violet woos
To his heart the silver dews?

Or when little airs arise
How the merry bluebell rings
To the moss underneath ?
Hast thou look'd upon the breath
Of the lilies at sunrise ?"

এমন জ্যোৎস্নাশরীরী প্রতিমাকে কি বাঙালিরা প্রাণের সহিত ভালোবাসিতে পারেন? না। কেননা, শুনিয়াছি নাকি যে, বাঙালি কবিকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় "কেন ভালোবাস" তখন তিনি উত্তর দেন—

"দেখিয়াছ তুমি সেই মার্জিত কুন্তল
সুকুন্তল কিরীটিনী, প্রেমের প্রতিমাখানি,
আচরণ বিলম্বিত দীর্ঘ কেশরাশি
দেখিয়াছ কহো তবে, কেন ভালোবাসি?"

"আচরণ বিলম্বিত দীর্ঘ কেশরাশি" দেখিলে, "কেশের আঁধারে সেইরূপ কহিনুর" দেখিলে তবে যাঁহাদের প্রেমের উদ্রেক হয়, তাঁহারা অমন একটি ভাবটিকে কিরূপে ভালোবাসিবেন? আর এদিকে চাহিয়া দেখো—

"একদিন দেব তরুণ তপন,
হেরিলেন সুরনদীর জলে,
অপরূপ এক কুমারী রতন
খেলা করে নীল নলিনীদলে।
বিকসিত নীল কমল আনন,
বিলোচন নীল কমল হাসে,
আলো করে নীল কমল বরন,
পুরেছে ভুবন কমল বাসে।
তুলি তুলি নীল কমল কলিকা,
ফুঁ দিয়া ফুটায় অফুট দলে;
হাসি হাসি নীল নলিনী বালিকা,
মালিকা গাঁথিয়া পরেছে গলে।
লহরী লীলায় নলিনী দোলায়
দোলে রে তাহায় সে নীলমণি;
চারি দিকে অলি উড়িয়ে বেড়ায়,
করি গুনু গুনু মধুর ধ্বনি।
চারি দিক দিয়ে দেবীরা আসিয়ে
কোলেতে লইতে বাড়ানু কোল;
যেন অপরূপ নলিনী হেরিয়ে,
কাড়াকাড়ি করি করেন গোল।
তুমিই সে নীল নলিনী সুন্দরী,
সুরবালা সুর-ফুলের মালা;
জননীর হৃদিকমল-উপরি,
হেসে হেসে বেশ করিতে খেলা।
হরিণীর শিশু হরষিত মনে,

জননীর পানে যেমন চায়;
তুমিও তেমনি বিকচ নয়নে,
চাহিয়ে দেখিতে আপন মায়।
শ্যামল বরন, বিমল আকাশ;
হৃদয় তোমার অমরাবতী;
নয়নে কমলা করেন নিবাস,
আননে কোমলা ভারতী সতী।
কথা কহে দূরে দাঁড়ায়ে যখন,
সুরপুরে যেন বাঁশরি বাজে;
আলুথালু চুলে করে বিচরণ
মরি গো তখন কেমন সাজে!
মুখে বেশি হাসি আসে যে সময়
করতল তুলি আনন ঢাকে;
হাসির প্রবাহ মনে মনে বয়,
কেমন সরেস দাঁড়ায়ে থাকে!"

ইহাতে নিবিড় কেশভার, ঘন কৃষ্ণ আঁখিতারা, সুগোল মৃণাল ভুজ নাই তাই বোধ করি ইহার কবি বঙ্গীয় পাঠক সমাজে অপরিচিত, তাঁহার কাব্য অপঠিত। আন বিষ, মার ছুরি, ঢাল মদ— এমনতর একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড না হইলে বাঙালিদের হৃদয়ে তাহার একটা ফলই হয় না। এক প্রকার প্রশান্ত বিষাদ, প্রশান্ত ভাবনা আছে, যাহার অত ফেনা নাই, অত কোলাহল নাই অথচ উহা অপেক্ষা ঢের গভীর তাহা বাংলা কবিতায় প্রকাশ হয় না। উন্মত্ত আস্ফালন, অসম্বদ্ধ প্রলাপ, "আর বাঁচি না, আর সহে না, আর পারি না" ভাবের ছট্‌ফটানি, ইহাই তো বাংলা কবিতার প্রাণ। এমন সফরী অপেক্ষা রোহিত মৎস্যের মূল্য অধিক। বাঙালির কল্পনা চোখে দেখিতে পায় না, বাঙালির কল্পনা বিষম স্থূল। তথাপি বাঙালি কবি বলিয়া বড়ো গর্ব করে।

আর-একটি কথা বলিয়া শেষ করি। যেখানে নানাপ্রকার কাজকর্ম হইতে থাকে, সেইখানেই মানুষের সকল প্রকার মনোবৃত্তি বিশেষরূপে বিকশিত হইতে থাকে। সেইখানে রাগ, দ্বেষ, হিংসা, আশা, উদ্যম, আবেগ, আগ্রহ প্রভৃতি মানুষের মনোবৃত্তিগুলি ফুটিতে থাকে। সেখানে মানুষের অত্যাকাঙক্ষা উত্তেজিত হয়, (বাংলা ভাষায় ambition-এর একটা ভালো ও চলিত কথাই নাই) ও অবস্থার চক্রে পড়িয়া তাহার সমস্ত আশা নির্মূল হয়। সেখানে বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন স্রোত একত্র হইয়া মিশে, তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, আশা নিরাশা, আগ্রহ, উদ্যম, স্রোতের উপরিভাগে ফেনাইয়া উঠে। এই অনবরত সমুদ্রমন্থনে মহা মহা ব্যক্তিদের উৎপত্তি হয়। আর আমাদের এই স্তব্ধ অন্ধকার ডোবার মধ্যে স্রোত নাই, তরঙ্গ নাই, জল পচিয়া পচিয়া উঠিতেছে, উপরে পানা পড়িয়াছে, গুপ্ত নিন্দা ও কানাকানির একটা বাষ্প উঠিতেছে। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ভালোবাসার একটা স্বাধীন আদানপ্রদান নাই, ঢাকাঢাকি, লুকোচুরি, কানাকানির মধ্যে ঢাকা পড়িয়া সূর্যের কিরণ ও বায়ুর অভাবে ভালোবাসা নির্মল থাকিতে পারে না, দূষিত হইয়া উঠে। আমাদের ভালোবাসা কখনো সদর দরজা দিয়া ঘরে ঢোকে না; খিড়কির সংকীর্ণ ও নত দরজা দিয়া আনাগোনা করিয়া করিয়া তাহার পিঠ কুঁজা হইয়া গিয়াছে, সে আর সোজা হইয়া চলিতে পারে না, কাহারো মুখের পানে স্পষ্ট অসংকোচে চাহিতে পারে না, নিজের পায়ের শব্দ শুনিলে চমকিয়া উঠে। এমনতর সংকুচিত কুব্জ ভালোবাসার হৃদয় কখনো তেমন প্রশস্ত হইতে পারে না। মনে করো, "পিরীতি" কথার অর্থ বস্তুত ভালো, কিন্তু বাঙালিদের হাতে পড়িয়া দুই দিনে এমন মাটি হইয়া গিয়াছে যে, আজ শিক্ষিত ব্যক্তিরা ও কথা মুখে আনিতে লজ্জা বোধ করেন। বাংলা প্রচলিত প্রণয়ের গানের মধ্যে এমন গান খুব অল্পই পাইবে, যাহাতে কলঙ্ক নাই, লোক-

লাজ নাই ও নব যৌবন নাই, যাহাতে প্রেম আছে, কেবলমাত্র প্রেম আছে, প্রেম ব্যতীত আর কিছুই নাই। আমাদের এ পোড়া দেশে কাজকর্ম নাই, অদৃষ্টের সহিত সংগ্রাম নাই, আলস্য তাহার স্থূল শরীর লইয়া স্থূলতর উপধানে হেলিয়া হাই তুলিতেছে, ইন্দ্রিয়পরতা ও বিলাস, ফুল মোজা, কালাপেড়ে ধুতি, ফিন্‌ফিনে জামা পরিয়া, বুকে চাদর বাঁধিয়া, পান খাইয়া ঠোঁট ও রাত্রি-জাগরণে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া গুড়গুড়ি টানিতেছে, এই তো চারি দিকের অবস্থা! এমন দেশের কবিতায় চরিত্র-বৈচিত্র্যই বা কোথায় থাকিবে, মহান চরিত্র-চিত্রই বা কোথায় থাকিবে, আর বিবিধ মনোবৃত্তির খেলাই বা কীরূপে বর্ণিত হইবে? সম্প্রতি বাহির হইতে একটা নূতন স্রোত আসিয়া এই স্থির জলের মধ্যে একটা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে। ইহা হইতে শুভ ফল প্রত্যাশা করিতেছি, ইতস্তত তাহার চিহ্নও দেখা দিতেছে।

ভারতী
আষাঢ় ১২৮৭

'দেশজ প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি'
(প্রত্যুত্তর)

"দেশজ প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি" নামক সুরচিত প্রস্তাবে সুনিপুণ লেখক যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে আংশিক সত্য আছে— কিন্তু কথা এই, সত্যকে আংশিক ভাবে দেখিলে, অনেক সময়ে তাহা মিথ্যার রূপান্তর ধারণ করে। একপাশ হইতে একটা জিনিসকে দেখিয়া যাহা সহসা মনে হয়, তাহা একপেশে সত্য, তাহা বাস্তবিক সত্য না হইতেও পারে। আবার অপর পক্ষেও একটা বলিবার কথা আছে। সত্যকে সর্বতোভাবে দেখিতে গেলে প্রথমে তাহাকে আংশিক ভাবে দেখিতে হইবে, তাহা ব্যতীত আমাদের আর গতি নাই। ইহা আমাদের অসম্পূর্ণতার ফল। আমরা কিছু একেবারেই একটা চারি-কোনা দ্রব্যের সবটা দেখিতে পাই না— ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিতে হয়। এই নিমিত্ত উচিত এই যে, যে যে-দিকটা দেখিয়াছে সে সেই দিকটাই সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করুক, অবশেষে সকলের কথা গাঁথিয়া একটা সম্পূর্ণ সত্য পাওয়া যাইবে। আমাদের এক-চোখো মন লইয়া সম্পূর্ণ সত্য জানিবার আর কোনো উপায় নাই। আমরা একদল অন্ধ, আর সত্য একটি হস্তী। স্পর্শ করিয়া করিয়া সকলেই হস্তীর এক-একটি অংশের অধিক জানিতে পারি না; এইজন্যই কিছু দিন ধরিয়া, আমরা হস্তীকে, কেহ বা স্তম্ভ, কেহ বা সর্প, কেহ বা কুলা বলিয়া ঘোরতর বিবাদ করিয়া থাকি, অবশেষে সকলের কথা মিলাইয়া বিবাদ মিটাইয়া লই। আমি যে ভূমিকাচ্ছলে এতটা কথা বলিলাম, তাহার কারণ এই— আমি জানাইতে চাই— একপেশে লেখার উপর আমার কিছুমাত্র বিরাগ নাই। এবং আমার মতে, যাহারা একেবারে সত্যের চারি দিক দেখাইতে চায়, তাহারা কোনো দিকই ভালো করিয়া দেখাইতে পারে না— তাহারা কতকগুলি কথা বলিয়া যায়, কিন্তু একটা ছবি দেখাইতে পারে না। একটা উদাহরণ দিলেই আমার কথা বেশ স্পষ্ট হইবে। একটা ছবি আঁকিতে হইলে, যথার্থত যে দ্রব্য যেরূপ, ঠিক সেরূপ আঁকা উচিত নহে। যখন চিত্রকর নিকটের গাছ বড়ো করিয়া আঁকে ও দূরের গাছ ছোটো করিয়া আঁকে, তখন তাহাতে এমন বুঝায় না যে বাস্তবিকই দূরের গাছগুলি আয়তনে ছোটো। একজন যদি কোনো ছবিতে সব গাছগুলি সম-আয়তনে আঁকে, তবে তাহাতে সত্য বজায় থাকে বটে, কিন্তু সে ছবি আমাদের সত্য বলিয়া মনে হয় না— অর্থাৎ তাহাতে সত্য আমাদের মনে অঙ্কিত হয় না। লেখার বিষয়েও তাহাই বলা যায়। আমি যে ভাবটা নিকটে দেখিতে পাই, সেই ভাবটাই যদি বড়ো করিয়া না আঁকি, ও তাহার বিপরীত দিকের সীমান্ত যদি অনেকটা ক্ষুদ্র, অনেকটা ছায়াময়, অনেকটা অদৃশ্য করিয়া না দিই,

তবে তাহাতে কোনো উদ্দেশ্যই ভালো করিয়া সাধিত হয় না; না সমস্তটার ভালো ছবি পাওয়া যায়, না এক অংশের ভালো ছবি পাওয়া যায়। এইজন্যই লেখক-চিত্রকরদিগকে পরামর্শ দেওয়া যায়, যে যে-ভাবটাকে কাছে দেখিতেছ, তাহাই বড়ো করিয়া আঁকো; ভাবিয়া চিন্তিয়া, বিচার করিয়া, সত্যের সহিত পরামর্শ করিয়া— ন্যায়কে বজায় রাখিবার জন্য তাহাকে খাটো করিবার কোনো আবশ্যক নাই।

"দেশজ প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি" নামক প্রবন্ধের লেখক এক দিক হইতে ছবি আঁকিয়া তাঁহার নিকটের দিকটাকেই বড়ো করিয়া দেখাইয়াছেন;— আবার বিপরীত দিকটাও দেখানো আবশ্যক।

কবিতায় কৃত্রিমতা দোষার্হ, এ বিষয়ে কাহারো দ্বিমত থাকিতে পারে না। কিন্তু যখন লেখক এই সাধারণ মত ব্যক্ত না করিয়া কতকগুলি বিশেষ মতের অবতারণা করিয়াছেন, তখনই তাঁহার সহিত আমাদের মতান্তর উপস্থিত হয়। যখন তিনি বলেন, দেশকালপাত্র-বহির্ভূত হইলে কবিতা কৃত্রিম হয় ও আধুনিক বঙ্গীয় কবিতা দেশকালপাত্র-বহির্ভূত হইতেছে, সুতরাং কৃত্রিম হইতেছে, তখনই তাঁহার সহিত আমরা সায় দিতে পারি না।

"দেশকালপাত্র" কথাটাই একটা প্রকাণ্ড ভাঙা কুলা— উহার উপর দিয়া অনেক ছাই ফেলা গিয়াছে। কোনো বিষয়ে কোনো পরিবর্তন দেখিয়া ব্যক্তি বিশেষের তাহা খারাপ লাগিলেই তৎক্ষণাৎ তিনি দেশকালপাত্রের দোহাই দিয়া তাহার নিন্দা করিয়া থাকেন। যখন কোনো যুক্তিই নাই, তখনো দেশকালপাত্র মাটি কামড়াইয়া আছে।

যাঁহারা দেশকালপাত্রের দোহাই দিয়া কোনো পরিবর্তনের সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া থাকেন, তাঁহারাই হয়তো নিজের যুক্তিতে নিজে মারা পড়েন। দেশকালপাত্রের কিছু হাত-পা নাই— তাহাকে ধরিবার ছুঁইবার কোনো উপায় নাই। টলেমি দেশকালপাত্রের নাম করিয়া ঋতু পরিবর্তনের জন্য পৃথিবীকে অনায়াসেই ভর্ৎসনা করিতে পারেন, কিন্তু গ্যালিলিও বলিবেন যে আমরা এত ক্ষুদ্র ও পৃথিবী এত বৃহৎ, যে, পৃথিবী যে চলিতেছে, পৃথিবী যে একস্থানে দাঁড়াইয়া নাই ইহা আমরা জানিতেই পারি না; বাস্তবিকই যদি পৃথিবী না চলিত, তবে পৃথিবীতে ঋতু পরিবর্তন ঘটিবেই বা কেন? তেমনি সমাজ-সংস্কার-বিরোধীরা কোনো একটি পরিবর্তন দেখিয়া যখন অন্য কোনো যুক্তির অভাবে কেবলমাত্র দেশকালপাত্রের উল্লেখ করিয়া আর্তনাদ করিতে থাকেন, তখন তাঁহাদের বিরোধীপক্ষীয়েরা অনায়াসেই বলিতে পারেন যে, দেশকালপাত্রের যে পরিবর্তন হয় নাই, তাহা তোমাকে কে বলিল? তাহাই যদি না হইবে, তবে কি এ পরিবর্তন মূলেই ঘটিতে পারিত?

লেখক বলিতেছেন— আমাদের আধুনিক কবিরা দেশকালপাত্রের ব্যভিচার করিয়া কবিতা লেখেন। কী তাহার প্রমাণ? না আমাদের প্রাচীন কবিরা যেভাবে কবিতা লিখিতেন, এখনকার কবিরা সেভাবে কবিতা লেখেন না, কথাটা যদি সত্য হয় তবে তাহা হইতে কি ইহাই প্রমাণ হইতেছে না যে, বাস্তবিকই দেশকালপাত্রের পরিবর্তন হইয়াছে; নহিলে, কখনোই লেখার এরূপ পরিবর্তন ঘটিতেই পারিত না। অতএব লেখক যদি বলেন, যে, প্রাচীন কবিরা যেরূপ লিখিতেন, আমাদেরও সেইরূপ লেখা উচিত— তাহা হইলে আর-এক কথায় এই বলা হয় যে, দেশকালপাত্রের ব্যভিচার করিয়াই কবিতা লেখা উচিত।

ইংরাজি পড়িয়াই হউক, আর যেমন করিয়াই হউক, আমাদের মনের যে পরিবর্তন হইয়াছে সে নিশ্চয়ই। একবার লেখক বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি— তিনি যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহার ভাষা-বিন্যাস, তাহার ভাব-ভঙ্গি, তাহার রচনা প্রণালী, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেকার বাংলা হইতে কত তফাত। তাঁহার প্রবন্ধটির অস্থিমজ্জায় ইংরাজি শিক্ষার ফল প্রকাশ পাইতেছে কি না, একবার মনোযোগ দিয়া দেখুন দেখি! অতএব, এই উপলক্ষে আমি কি বলিতে পারি যে, লেখক কষ্ট করিয়া মেহন্নত করিয়া একটি ইংরাজি আদর্শ অবিরাম চক্ষের সম্মুখে খাড়া রাখিয়া উল্লিখিত

প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন— তাহা তাঁহার হৃদয়ের সহজ বিকাশ, তাঁহার ভাষার সহজ অভিব্যক্তি নহে?

"আমার হৃদয় আমারি হৃদয়,
বেচি নি তো তাহা কাহারো কাছে!
ভাঙাচোরা হোক, যা হোক, তা হোক,
আমার হৃদয় আমারি আছে!
চাহি নে কাহারো মমতার হাসি,
ভ্রূকুটির কারো ধারি নে ধার,
মায়াহাসিময় মিছে মমতায়
ছলনে কাহারো ভুলি নে আর!"

ইত্যাদি।

উপরি-উক্ত কবিতার ভাব আমাদের প্রাচীন বাংলা কবিতায় কখনো দেখা যায় না। এবং ওই শ্রেণীর কবিতা ইংরাজিতে দেখা যায়। শুদ্ধ এই কারণেই কি আমি বলিতে পারি যে, কবি হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিয়া উক্ত কবিতা লেখেন নাই, ইংরাজরা ওই প্রকারের কবিতা লেখেন বলিয়া তিনিও কোমর বাঁধিয়া লিখিয়াছেন? আমি বলিব যে—"না, তিনি অনুভব করিয়াই লিখিয়াছেন।" তাহার পরে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, প্রাচীন কবিরাই বা কেন এরূপ ভাব অনুভব করিতে পারিতেন না, এখনকার কবিরাই বা কেন করেন। সে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রশ্ন, এবং ইতিহাস দেখিয়া তাহার বিচার হইতে পারে। ইহা যদি সিদ্ধান্ত হইল যে, প্রাচীন কবিরা অনেক বিষয়ে যাহা অনুভব করিতেন, এখনকার কবিরা তাহা করেন না (কারণ, করিলে নিশ্চয়ই তাহা লেখায় প্রকাশ পাইত,) এবং এখনকার কবিরা অনেক বিষয়ে যাহা অনুভব করেন, প্রাচীন কবিরা তাহা করিতেন না; তাহা হইলে কেমন করিয়া কবিদিগকে পরামর্শ দিব যে, যাহা তোমরা অনুভব কর না, তাহাই তোমাদিগকে লিখিতেই হইবে! বাস্তবিকই যখন ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে বাংলা দেশের বদ্ধ, স্থির, নিস্তরঙ্গ সমাজের মধ্যে সহসা এক তুমুল পরিবর্তনের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, সমাজের কোনো পাড় ভাঙিতেছে, কোনো পাড় গড়িতেছে, সমাজের কত শত বদ্ধমূল বিশ্বাসের গোড়া হইতে মাটি খসিয়া যাইতেছে, কত শত নূতন বিশ্বাস চারি দিকে মূল প্রসারিত করিতেছে, যখন আমাদের বাহিরে ওলট্‌পালট্, যখন আমাদের অন্তরে ওলট্‌পালট্, তখনো যে আমরা দেশকালপাত্র অতিক্রম করিয়া প্রাচীন কবিদের কবিতার আঁচল ধরিয়া থাকিব, আমাদের কবিতার মধ্যে এই দুর্দান্ত পরিবর্তনের কোনো প্রভাব লক্ষিত হইবে না— ইহা যে নিতান্তই অস্বাভাবিক! লেখক যে একটি কল্পনার জেলখানা নির্মাণ করিবার প্রস্তাব করিতে চাহেন, দিশি ইঁট দিয়া তাহার প্রাচীর নির্মিত হইবে বলিয়াই যে কবিরা তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে রাজি হইবেন, এমন তো বোধ হয় না।

আধুনিক কবিরা তাঁহাদের কবিতায় সমাজ-বিরুদ্ধ ভাবের অবতারণা করেন বলিয়া লেখক একস্থলে দুঃখ করিয়াছেন। তিনি বলেন "সমাজ-উচ্ছেদকারী, শাসন-বিরহিত আড়ম্বরময় ভালোবাসাবাসি কি আমাদের এই নিরীহ দেশ-প্রসূত ভাব? একটি অবিকৃত বঙ্গমহিলার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করো, দেখিতে পাইবে যে, সে হৃদয় ভালোবাসায় পরিপ্লুত, সে হৃদয় ভাদ্রমাসের পদ্মানদীর মতো প্রেমে ভরপুর, প্রেমে উন্মত্ত, প্রেমে উচ্ছ্বসিত, কিন্তু প্রকৃত পদ্মার মতো সে প্রেমে কোনো কূলই সহসা ভাঙিয়া পড়ে না।... কিন্তু এই বঙ্গীয়-রমণী-হৃদয় আধুনিক লেখকদের হাতে কতদূর পর্যন্ত না কলঙ্কিত হইয়াছে!" সে কী কথা! আমি তো বলি, বঙ্গীয়-রমণী-হৃদয়-চিত্রের কলঙ্ক আধুনিক কবিদের দ্বারা অপসারিত হইয়াছে। আমাদের বৈষ্ণব কবিরা যে প্রেমের প্রবাহ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে কোন্ কূল অবশিষ্ট ছিল? "সমাজ-উচ্ছেদকারী শাসন-বিরহিত" প্রেম আর কাহাকে বলে? বিদ্যা এবং সুন্দরের যে প্রেম তাহাতে কলঙ্কের বাকি কী আছে! সচরাচর প্রচলিত আমাদের দেশীয় প্রেমের গানে "অবিকৃত বঙ্গ মহিলার" মনোবিকার কীরূপ মসীবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে? এখনকার কবিতায় ও উপন্যাসে যদিও বা সমাজ-বিরুদ্ধ ভাব দেখিতে পাই

কিন্তু রুচি-বিরুদ্ধ বীভৎসভাব কয়টা দেখি? লেখক কি বলিবেন যে, প্রেমের সেই কানাকানি, ঢাকাঢাকি, লুকাচুরি, সেই শাশুড়ি-ননদী-ভীতিময় পিরীতি, সেই মলয়, কোকিল, ভ্রমরের বিভীষিকাপূর্ণ বিরহ, সেই সুমেরু-মেদিনীসংকুল ভৌগোলিক শরীর বর্ণনা, তাহাই আমাদের দেশজ সহজ হৃদয়ের ভাব, অতএব তাহাই কবিতায় প্রবর্তিত হউক— আর আজকালকার এই প্রকাশ্য, মুক্ত, নির্ভীক, অলংকারবাহুল্য-বিরহিত কালাপাহাড়ী ভাব, ইহা বিদেশীয়, ইহা আমাদের কবিতা হইতে দূর হউক! সমাজের যথার্থ হানি কিসে হয়; গোপনে গোপনে সমাজের শিরায় শিরায় বিষ সঞ্চারিত করিয়া দিয়া, না প্রকাশ্যভাবে সমাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া?

প্রকৃত কথা এই যে, সমাজকে সমাজ বলিয়াই খাতির করা, এবং দেশকালপাত্রের অন্ধ অনুসরণ করিয়া চলা কবিরা পারিয়া উঠেন না। প্রবহমান সমাজের উপর যে-সকল ফেনা, যে-সকল তৃণখণ্ড ভাসে তাহা তো আজ আছে কাল নাই, কবিরা সেই ভাসমান খড়-কুটায় বাঁধিয়া তাঁহাদের কবিতাকে সমাজের স্রোতে ভাসান দিতে চান না। সেই স্রোতের বাহিরেই তাঁহারা ধ্রুব আশ্রয়ভূমি দেখিতে পান। সামাজিক নীতি ও সামাজিক নিয়ম প্রভৃতিরা সমাজের কাছে ঠিকা কাজে নিযুক্ত আছে— যতদিন তাহাদের আবশ্যক, ততদিন তাহারা মাহিয়ানা পায়, আবশ্যক ফুরাইলেই তাহাদের ছাড়াইয়া দেওয়া হয়— সমাজের সকল অবস্থায় তাহারা কাজ করিতে পারে না। সমাজের এই ঠিকা চাকরদের চাকরি করা কবিদের পোষায় না। এক কথায় বলিতে গেলে কবিদিগকে অনেক সময়ে অসামাজিক হইতেই হইবে। কারণ, সমাজ এখনো সম্পূর্ণ হয় নাই, সর্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই— সমাজ যাহাকে ভালো বলে, তাহা মন্দের ভালো, তাহা বাস্তবিক ভালো নহে— আবার সমাজ স্বয়ং মন্দ বলিয়া অনেক ভালোও সমাজের পক্ষে মন্দ হইয়াছে। কবিরা যথার্থ ভালোকে ভালো বলেন, ও যথার্থ মন্দকে মন্দ বলিতে চাহেন, তাহাতে ফল হয় এই যে— যাহাতে মন্দকে আমাদের চাকরি হইতে ছাড়াইয়া দিতে পারি, অর্থাৎ মন্দ আমাদের কাজে না লাগিতে পারে ক্রমে এমন অবস্থা হয়, আর ভালোর উপযোগী হইতে পারি এইরূপ চেষ্টা করিতে পারি। নহিলে, ক্ষণিক ভালোকে ভালো বলিয়া জানিলে, ও ক্ষণিক মন্দকে মন্দ বলিয়া জানিলে তাহারাই চিরস্থায়ী ভালোমন্দরূপে পরিণত হয়— এবং ভালোই হউক, মন্দই হউক, পরিবর্তনের নাম মাত্র শুনিলেই আমরা ডরাইয়া উঠি। সমাজকে দাসভাবে অনুসরণ করিয়া না চলিলে কবিদের এই একটি মহৎ উপকার হয়— যখন সমাজের উপর দিয়া সহস্র বৎসরের পরিবর্তন চলিয়া গিয়াছে, যখন এক সমাজ ভাঙিয়া আর-এক সমাজ গঠিত হইয়াছে, যখন চারি দিকে সকলই ভাঙিতেছে গড়িতেছে— তখনও তাঁহাদের কবিতা দীপস্তম্ভের ন্যায় সমুদ্রের মধ্যে অটল ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে। নতুবা সমাজের প্রত্যেক তরঙ্গের সহিত উঠিয়া পড়িয়া তাহারা কোথায় মিলাইয়া যায়।

ভারতী
ভাদ্র ১২৮৯

কাব্য : স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট

বুদ্ধিগম্য বিষয় বুঝিতে না পারিলে লোকে লজ্জিত হয়। হয় বুঝিয়াছি বলিয়া ভান করে, না-হয় বুঝিবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস পায় কিন্তু ভাবগম্য সাহিত্য বুঝিতে না পারিলে অধিকাংশ লোক সাহিত্যকেই দোষী করে। কবিতা বুঝিতে না পারিলে কবির প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা জন্মে, তাহাতে আত্মাভিমান কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। ইহা অধিকাংশ লোকে মনে করে না যে, যেমন গভীর তত্ত্ব আছে তেমনি গভীর ভাবও আছে। সকলে সকল তত্ত্ব বুঝিতে পারে না। সকলে সকল

ভাবও বুঝিতে পারে না। ইহাতে প্রমাণ হয়, লোকের যেমন বুদ্ধির তারতম্য আছে তেমনি ভাবুকতারও তারতম্য আছে।

মুশকিল এই যে, তত্ত্ব অনেক করিয়া বুঝাইলে কোনো ক্ষতি হয় না, কিন্তু সাহিত্যে যতটুকু নিতান্ত আবশ্যক তাহার বেশি বলিবার জো নাই। তত্ত্ব আপনাকে বুঝাইবার চেষ্টা করে, নহিলে সে বিফল; সাহিত্যকে বুঝিয়া লইতে হইবে, নিজের টীকা নিজে করিতে গেলে সে ব্যর্থ। তুমি যদি বুঝিতে না পার তো তুমি চলিয়া যাও, তোমার পরবর্তী পথিক আসিয়া হয়তো বুঝিতে পারিবে; দৈবাৎ যদি সমজদারের চক্ষে না পড়িল, তবে অজ্ঞাতসারে ফুলের মতো ফুটিয়া হয়তো ঝরিয়া যাইবে; কিন্তু তাই বলিয়া বড়ো অক্ষরের বিজ্ঞাপনের দ্বারা লোককে আহ্বান করিবে না এবং গায়ে পড়িয়া ভাষ্যদ্বারা আপনার ব্যাখ্যা করিবে না।

একটা হাসির কথা বলিলাম, তুমি যদি না হাস তবে তৎক্ষণাৎ হার মানিতে হয়, দীর্ঘ ব্যাখ্যা করিয়া হাস্য প্রমাণ করিতে পারি না। করুণ উক্তি শুনিয়া যদি না কাঁদ তবে গলা টিপিয়া ধরিয়া কাঁদাইতে হয়, আর কোনো উপায় নাই। কপালকুণ্ডলার শেষ পর্যন্ত শুনিয়া তবু যদি ছেলেমানুষের মতো জিজ্ঞাসা কর 'তার পরে?' তবে দামোদরবাবুর নিকটে তোমাকে জিম্মা করিয়া দিয়া হাল ছাড়িয়া দিতে হয়। সাহিত্য এইরূপ নিতান্ত নাচার। তাহার নিজের মধ্যে নিজের আনন্দ যদি না থাকিত, যদি কেবলই তাহাকে পথিকের মুখ চাহিয়া থাকিতে হইত তবে অধিকাংশ স্থলে সে মারা পড়িত।

জ্ঞানদাস গাহিতেছেন : হাসি-মিশা বাঁশি বায়। হাসির সহিত মিশিয়া বাঁশি বাজিতেছে। ইহার অর্থ করা যায় না বলিয়াই ইহার মধ্যে গভীর সৌন্দর্য প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। বাঁশির স্বরের সহিত হাসি মিশিতে পারে এমন যুক্তিহীন কথা কে বলিতে পারে? বাঁশির স্বরের মধ্যে হাসিটুকুর অপূর্ব আস্বাদ যে পাইয়াছে সেই পারে। ফুলের মধ্যে মধুর সন্ধান মধুকরই পাইয়াছে; কিন্তু বাছুর আসিয়া তাহার দীর্ঘ জিহ্বা বিস্তার করিয়া সমগ্র ফুলটা, তাহার পাপড়ি, তাহার বৃন্ত, তাহার আশপাশের গোটা-পাঁচ-ছয়-পাতা-সুদ্ধ মুখের মধ্যে নাড়িয়া-চাড়িয়া চিবাইয়া গলাধঃকরণ করে এবং সানন্দমনে হাম্বারব করিতে থাকে— তখন তাহাকে তর্ক করিয়া মধুর অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া দেয় এমন কে আছে?

কাব্যে অনেক সময়ে দেখা যায় ভাষা ভাবকে ব্যক্ত করিতে পারে না, কেবল লক্ষ করিয়া নির্দেশ করিয়া দিবার চেষ্টা করে। সে স্থলে সেই অনতিব্যক্ত ভাষাই একমাত্র ভাষা। এইপ্রকার ভাষাকে কেহ বলেন 'ধুঁয়া, কেহ বলেন 'ছায়া', কেহ বলেন 'ভাঙা ভাঙা' এবং কিছুদিন হইল নবজীবনের শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদকমহাশয় কিঞ্চিৎ হাস্যরসাবতারণার চেষ্টা করিতে গিয়া তাহাকে 'কাব্যি' নাম দিয়াছেন। ইহাতে কবি অথবা নবজীবনের সম্পাদক কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না। উভয়েরই অদৃষ্টের দোষ বলিতে হইবে।

ভবভূতি লিখিয়াছেন : স তস্য কিমপি দ্রব্যং যো হি যস্য প্রিয়োজনঃ! সে তাহার কী-জানি-কী যে যাহার প্রিয়জন! যদি কেবলমাত্র ভাষার দিক দিয়া দেখ, তবে ইহা ধুঁয়া নয় তো কী, ছায়া নয় তো কী! ইহা কেবল অস্পষ্টতা, কুয়াশা। ইহাতে কিছুই বলা হয় নাই। কিন্তু ভাবের দিক দিয়া দেখিবার ক্ষমতা যদি থাকে তো দেখিবে ভাবের অস্পষ্টতা নাই। তুমি যদি বলিতে 'প্রিয়জন অত্যন্ত আনন্দের সামগ্রী' তবে ভাষা স্পষ্ট হইত সন্দেহ নাই, তবে ইহাকে ছায়া অথবা ধুঁয়া অথবা কাব্যি বলিবার সম্ভাবনা থাকিত না, কিন্তু ভাব এত স্পষ্ট হইত না। ভাবের আবেগে ভাষায় একপ্রকার বিহ্বলতা জন্মে। ইহা সহজ সত্য, কাব্যে তাহার ব্যতিক্রম হইলে কাব্যের ব্যাঘাত হয়।

সীতার স্পর্শসুখে-আকুল রাম বলিয়াছেন : সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা। কী জানি ইহা সুখ না দুঃখ! এমন ছায়ার মতো, ধুঁয়ার মতো কথা কহিবার তাৎপর্য কী? যাহা হয় একটা স্পষ্ট করিয়া বলিলেই হইত। স্পষ্ট কথা অধিকাংশ স্থলে অত্যাবশ্যক ইহা নবজীবন-সম্পাদকের সহিত এক বাক্যে স্বীকার করিতে হয়, তথাপি এ স্থলে আমরা স্পষ্ট কথা শুনিতে চাহি না। যদি কেবল

রথচক্র আঁকিতে চাও তবে তাহার প্রত্যেক অর স্পষ্ট আঁকিয়া দিতে হইবে, কিন্তু যখন তাহার ঘূর্ণগতি আঁকিতে হইবে, তাহার বেগ আঁকিতে হইবে, তখন অরগুলিকে ধুঁয়ার মতো করিয়া দিতে হইবে— ইহার অন্য উপায় নাই। সে সময়ে যদি হঠাৎ আবদার করিয়া বস আমি ধুঁয়া দেখিতে চাহি না, আমি অরগুলিকে স্পষ্ট দেখিতে চাই, তবে চিত্রকরকে হার মানিতে হয়। ভবভূতি ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ভাবের আবেগ প্রকাশ করিতে গিয়াই বলিয়াছেন 'সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা'। নহিলে স্পষ্ট কথায় সুখকে সুখ বলাই ভালো তাহার আর সন্দহ নাই।

বলরামদাস লিখিয়াছেন—

আধ চরণে আধ চলনি,
আধ মধুর হাস।

ইহাতে যে কেবল ভাষার অস্পষ্টতা তাহা নহে, অর্থের দোষ। 'আধ চরণ' অর্থ কী? কেবল পায়ের আধখানা অংশ? বাকি আধখানা না চলিলে সে আধখানা চলে কী উপায়ে! একে তো আধখানি চলনি, আধখানি হাসি, তাহাতে আবার আধখানা চরণ! এগুলো পুরা করিয়া না দিলে এ কবিতা হয়তো অনেকের কাছে অসম্পূর্ণ ঠেকিতে পারে। কিন্তু যে যা বলে বলুক, উপরি-উদ্‌ধৃত দুটি পদে পরিবর্তন চলে না। 'আধ চরণে আধ চলনি' বলিলে ভাবুকের মনে যে একপ্রকার চলন সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, ভাষা ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট করিলে সেরূপ সম্ভবে না।

অত্যন্ত স্পষ্ট কবিতা নহিলে যাঁহারা বুঝিতে পারেন না তাঁহারা স্পষ্ট কবিতার একটি নমুনা দিয়াছেন। তাঁহাদের ভূমিকা-সমেত উদ্‌ধৃত করি। 'বাংলার মঙ্গল-কাব্যগুলিও জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা। কবিকঙ্কণের দারিদ্র্য-দুঃখ-বর্ণনা— যে কখনো দুঃখের মুখ দেখে নাই তাহাকেও দীনহীনের কষ্টের কথা বুঝাইয়া দেয়।

দুঃখ করো অবধান, দুঃখ করো অবধান
আমানি খাবার গর্ত দেখো বিদ্যমান।'

এই দুইটি পদের ভাষ্য করিয়া লেখক বলিয়াছেন, 'ইহাই সার্থক কবিত্ব; সার্থক কল্পনা; সার্থক প্রতিভা।' পড়িয়া সহসা মনে হয় এ কথাগুলি হয় গোঁড়ামি, না-হয় তর্কের মুখে অত্যুক্তি। আমানি খাবার গর্ত দেখাইয়া দারিদ্র্য সপ্রমাণ করার মধ্যে কতকটা নাট্যনৈপুণ্য থাকিতেও পারে, কিন্তু ইহার মধ্যে কাব্যরস কোথায়? দুটো ছত্র, কবিত্বে সিক্ত হইয়া উঠে নাই; ইহার মধ্যে অনেকখানি আমানি আছে, কিন্তু কবির অশ্রুজল নাই। ইহাই যদি সার্থক কবিত্ব হয় তবে 'তুমি খাও ভাঁড়ে জল আমি খাই ঘাটে', সে তো আরও কবিত্ব। ইহার ব্যাখ্যা এবং তার ভাষ্য করিতে গেলে হয়তো ভাষ্যকারের করুণরস উদ্‌বেলিত হইয়া উঠিতেও পারে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সকলেই স্বীকার করিবেন ইহা কাব্যও নহে, কাব্যিও নহে, যাঁহার নামকরণের ক্ষমতা আছে তিনি ইহার আর-কোনো নাম দিন। যিনি ভঙ্গি করিয়া কথা কহেন তিনি না-হয় ইহাকে কাব্যু বলুন, শুনিয়া দৈবাৎ কাহারও হাসি পাইতেও পারে।

প্রকৃতির নিয়ম-অনুসারে কবিতা কোথাও স্পষ্ট কোথাও অস্পষ্ট, সম্পাদক এবং সমালোচকেরা তাহার বিরুদ্ধে দরখাস্ত এবং আন্দোলন করিলেও তাহার ব্যতিক্রম হইবার জো নাই। চিত্রেও যেমন কাব্যেও তেমনই— দূর অস্পষ্ট, নিকট স্পষ্ট; বেগ অস্পষ্ট, অচলতা স্পষ্ট; মিশ্রণ অস্পষ্ট, স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট। আগাগোড়া সমস্তই স্পষ্ট, সমস্তই পরিষ্কার, সে কেবল ব্যাকরণের নিয়মের মধ্যে থাকিতে পারে; কিন্তু প্রকৃতিতেও নাই, কাব্যেও নাই। অতএব ভাবুকেরা স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট লইয়া বিবাদ করেন না, তাঁহারা কাব্যরসের প্রতি মনোযোগ করেন। 'আমানি খাবার গর্ত দেখো বিদ্যমান' ইহা স্পষ্ট বটে, কিন্তু কাব্য নহে। কিন্তু বিদ্যাপতির—

সখি, এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর

স্পষ্টও বটে কাব্যও বটে। ইহা কেবল বর্ণনা বা কথার কথা মাত্র নহে, কেবল একটুকু পরিষ্কার

উক্তি নহে, ইহার মধ্য হইতে গোপনে বিরহিণীর নিশ্বাস নিশ্বসিত হইয়া আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিতেছে—

শিশুকাল হৈতে বঁধুর সহিতে
পরানে পরানে লেহা

ইহা শুনিবামাত্র হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠে, স্পষ্ট কথা বলিয়া যে তাহা নহে, কাব্য বলিয়া। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ইহাও কি সকলের কাছে স্পষ্ট? এমন কি অনেকে নাই যাঁহারা বলিবেন, 'আচ্ছা বুঝিলাম, ভরা বাদল, ভাদ্র মাস এবং শূন্য গৃহ, কিন্তু ইহাতে কবিতা কোথায়? ইহাতে হইল কী?' ইহাকে আরও স্পষ্ট না করিলে হয়তো অনেক সমালোচকের 'কর্ণে কেবল ঝীম ঝীম রব' করিবে এবং 'শিরায় শিরায় রীণ রীণ' করিতে থাকিবে! ইহাকে ফেনাইয়া ফুলাইয়া তুলিয়া ইহার মধ্যে ধড়ফড় ছটফট বিষ ছুরি এবং দড়ি-কলসি না লাগাইলে অনেকের কাছে হয়তো ইহা যথেষ্ট পরিস্ফুট, যথেষ্ট স্পষ্ট হইবে না; হয়তো ধুঁয়া এবং ছায়া এবং 'কাব্যি' বলিয়া ঠেকিবে। এত নিরতিশয় স্পষ্ট যাঁহাদের আবশ্যক তাঁহাদের পক্ষে কেবল পাঁচালি ব্যবস্থা; যাঁহারা কাব্যের সৌরভ ও মধু-উপভোগে অক্ষম তাঁহারা বায়রনের 'জ্বলন্ত' চুল্লিতে হাঁক-ডাক ঝাল-মসলা ও খরতর ভাষার ঘণ্ট পাকাইয়া খাইবেন।

যাঁহারা মনোবৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন, যেমন জগৎ আছে তেমনি অতিজগৎ আছে। সেই অতিজগৎ জানা এবং না-জানার মধ্যে, আলোক এবং অন্ধকারের মাঝখানে বিরাজ করিতেছে। মানব এই জগৎ এবং জগদতীত রাজ্যে বাস করে। তাই তাহার সকল কথা জগতের সঙ্গে মেলে না। এইজন্য মানবের মুখ হইতে এমন অনেক কথা বাহির হয় যাহা আলোকে অন্ধকারে মিশ্রিত; যাহা বুঝা যায় না, অথচ বুঝা যায়। যাহাকে ছায়ার মতো অনুভব করি, অথচ প্রত্যক্ষের অপেক্ষা অধিক সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। সেই সর্বত্রব্যাপী অসীম অতিজগতের রহস্য কাব্যে যখন কোনো কবি প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন তখন তাঁহার ভাষা সহজে রহস্যময় হইয়া উঠে। সে স্থলে কেহ বা কেবলই ধুঁয়া এবং ছায়া দেখিয়া বাড়ি ফিরিয়া যায়, কেহ বা অসীমের সমুদ্রবায়ু সেবন করিয়া অপার আনন্দ লাভ করে।

পুনর্বার বলিতেছি, বুদ্ধিমানের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের ন্যায় প্রকৃতিতে যে সমস্তই স্পষ্ট এবং পরিষ্কার তাহা নহে। সমালোচকেরা যাহাই মনে করুন, প্রকৃতি অতি বৃহৎ, অতি মহৎ, সর্বত্র আমাদের আয়ত্তাধীন নহে। ইহাতে নিকটের অপেক্ষা দূর, প্রত্যক্ষের অপেক্ষা অপ্রত্যক্ষ, প্রামাণ্যের অপেক্ষা অপ্রামাণ্যই অধিক। অতএব যদি কোনো প্রকৃত কবির কাব্যে ছায়া দেখিতে পাওয়া যায় তবে বুদ্ধিমান সমালোচক যেন ইহাই সিদ্ধান্ত করেন যে, তাহা এই অসীম প্রকৃতির সৌন্দর্যময়ী রহস্যচ্ছায়া।

ভারতী ও বালক
চৈত্র ১২৯৩

সাহিত্যের উদ্দেশ্য

বিষয়ী লোকে বিষয় খুঁজিয়া মরে। লেখা দেখিলেই বলে, বিষয়টা কী? কিন্তু লিখিতে হইলে যে বিষয় চাই-ই এমন কোনো কথা নাই। বিষয় থাকে তো থাক্, না থাকে তো নাই থাক্, সাহিত্যের তাহাতে কিছু আসে যায় না। বিষয় বিশুদ্ধ সাহিত্যের প্রাণ নহে। প্রকৃত সাহিত্যের মধ্য হইতে তাহার উদ্দেশ্যটুকু টানিয়া বাহির করা সহজ নহে। তাহার মর্মটুকু সহজে ধরা দেয় না। মানুষের সর্বাঙ্গে প্রাণের বিকাশ— সেই প্রাণটুকু নাশ করিবার জন্য নানা দেশে নানা অস্ত্র আছে, কিন্তু

দেহ হইতে সেই প্রাণটুকু স্বতন্ত্র বাহির করিয়া আয়ত্তের মধ্যে আনিবার জন্য কোনো অস্ত্র বাহির হয় নাই।

আমাদের বঙ্গভাষায় সাহিত্যসমালোচকেরা আজকাল লেখা পাইলেই তাহার উদ্দেশ্য বাহির করিতে চেষ্টা করেন। বোধ করি তাহার প্রধান কারণ এই, একটা উদ্দেশ্য ধরিতে না পারিলে তাঁহাদের লিখিবার তেমন সুবিধা হয় না। যে শিক্ষকের ঝুঁটি ধরিয়া মারা অভ্যাস সহসা ছাত্রের মুণ্ডিত মস্তক তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত শোকের কারণ হয়।

মনে করো তুমি যদি অত্যন্ত বুদ্ধির প্রভাবে বলিয়া বস 'এই তরঙ্গভঙ্গময়, এই চূর্ণ-বিচূর্ণ সূর্যালোকে খচিত, অবিশ্রাম প্রবহমান জাহ্নবীর জলটুকু মারিয়া কেবল ইহার বিষয়টুকু বাহির করিব' এবং এই উদ্দেশে প্রবল অধ্যবসায়-সহকারে ঘড়া ঘড়া জল তুলিয়া চুলির উপরে উত্থাপন কর তবে পরিশ্রমের পুরস্কার-স্বরূপ বিপুল বাষ্প ও প্রচুর পঙ্ক লাভ করিবে— কিন্তু কোথায় তরঙ্গ! কোথায় সূর্যালোক! কোথায় কলধ্বনি! কোথায় জাহ্নবীর প্রবাহ!

উদ্দেশ্য হাতড়াইতে গিয়া কিছু-না-কিছু হাতে উঠেই। যেমন গঙ্গায় তলাইয়া অন্বেষণ করিলে তাহার পঙ্ক হইতে চিংড়িমাছ বাহির হইয়া পড়ে। ধীবরের পক্ষে সে কিছু কম লাভ নহে, কিন্তু আমার বলিবার তাৎপর্য এই যে, চিংড়িমাছ না থাকিলেও গঙ্গার মূলগত কোনো প্রভেদ হয় না। কিন্তু গঙ্গার প্রবাহ নাই, গঙ্গার ছায়ালোকবিচিত্র তরঙ্গমালা নাই, গঙ্গার প্রশান্ত প্রবল উদারতা নাই, এমন যদি হয় তবে গঙ্গাই নাই। কিন্তু প্রবাহ আয়ত্ত করা যায় না, ছিপ ফেলিয়া ছায়ালোক ধরা যায় না, গঙ্গার প্রশান্ত ভাব কেবল অনুভব করা যায়— কিন্তু কোনো উপায়ে ডাঙায় তোলা যায় না। উপরি-উক্ত চিংড়িমাছ গঙ্গার মধ্যে সহজে অনুভব করা যায় না, কিন্তু সহজেই ধরা যায়। অতএব বিষয়ী সমালোচকের পক্ষে মৎস্য-নাম-ধারী উক্ত কীটবিশেষ সকল হিসাবেই সুবিধাজনক।

বিশুদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে উদ্দেশ্য বলিয়া যাহা হাতে ঠেকে তাহা আনুষঙ্গিক। এবং তাহাই ক্ষণস্থায়ী। যাহার উদ্দেশ্য আছে তাহার অন্য নাম— কোনো-একটা বিশেষ তত্ত্ব নির্ণয় বা কোনো-একটা বিশেষ ঘটনা বর্ণনা যাহার উদ্দেশ্য তাহার লক্ষণ-অনুসারে তাহাকে দর্শন বিজ্ঞান বা ইতিহাস বা আর-কিছু বলিতে পারো। কিন্তু সাহিত্যের উদ্দেশ্য নাই।

ঐতিহাসিক রচনাকে কখন সাহিত্য বলিব? যখন জানিব যে তাহার ঐতিহাসিক অংশটুকু অসত্য বলিয়া প্রমাণ হইয়া গেলেও তাহা বাঁচিয়া থাকিতে পারে। অর্থাৎ যখন জানিব ইতিহাস উপলক্ষমাত্র, লক্ষ্য নহে। দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি অন্য বিভাগ সম্বন্ধেও এই কথা খাটে।

সৃষ্টির উদ্দেশ্য পাওয়া যায় না, নির্মাণের উদ্দেশ্য পাওয়া যায়। ফুল কেন ফোটে তাহা কাহার সাধ্য অনুমান করে, কিন্তু ইটের পাঁজা কেন পোড়ে, সুরকির কল কেন চলে, তাহা সকলেই জানে। সাহিত্য সেইরূপ সৃজনধর্মী; দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি নির্মাণধর্মী। সৃষ্টির ন্যায়, সাহিত্যই সাহিত্যের উদ্দেশ্য।

যদি কোনো উদ্দেশ্য নাই তবে সাহিত্যে লাভ কী! যাঁহারা সকলের চেয়ে হিসাব ভালো বুঝেন তাঁহারা এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন। উত্তর দেওয়া সহজ নহে। গোটাকতক সন্দেশ খাইলে যে রসনার তৃপ্তি ও উদরের পূর্তি-সাধন হয় ইহা প্রমাণ করা সহজ, যদি অজ্ঞানবশত কেহ প্রতিবাদ করে তবে তাহার মুখে দুটো সন্দেশ পুরিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার মুখ বন্ধ করা যায়। কিন্তু সমুদ্রতীরে থাকিলে যে এক বিশাল আনন্দ অলক্ষ্যে শরীর-মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বাস্থ্যবিধান করে তাহা হাতে হাতে প্রমাণ করা যায় না।

সাহিত্যের প্রভাবে আমরা হৃদয়ের দ্বারা হৃদয়ের যোগ অনুভব করি, হৃদয়ের প্রবাহ রক্ষা হয়, হৃদয়ের সহিত হৃদয় খেলাইতে থাকে, হৃদয়ের জীবন ও স্বাস্থ্য-সঞ্চার হয়। যুক্তিশৃঙ্খলের দ্বারা মানবের বুদ্ধি ও জ্ঞানের ঐক্যবন্ধন হয়, কিন্তু হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধিবার তেমন কৃত্রিম উপায় নাই। সাহিত্য স্বত উৎসারিত হইয়া সেই যোগসাধন করে। সাহিত্য অর্থেই একত্র থাকিবার

ভাব— মানবের 'সহিত' থাকিবার ভাব— মানবকে স্পর্শ করা, মানবকে অনুভব করা। সাহিত্যের প্রভাবে হৃদয়ে হৃদয়ে শীতাতপ সঞ্চারিত হয়, বায়ু প্রবাহিত হয়, ঋতুচক্র ফিরে, গন্ধ গান ও রূপের হাট বসিয়া যায়। উদ্দেশ্য না থাকিয়া সাহিত্যে এইরূপ সহস্র উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

বন্ধুতে বন্ধুতে মিলন হইলে আমরা কত বাজে কথাই বলিয়া থাকি। তাহাতে করিয়া হৃদয়ের কেমন বিকাশ হয়। কত হাস্য, কত আলাপ, কত আনন্দ! পরস্পরের নয়নের হর্ষজ্যোতির সহিত মিশিয়া সূর্যালোক কত মধুর বলিয়া মনে হয়! বিষয়ী লোকের পরামর্শমতো কেবলই যদি কাজের কথা বলি, সকল কথার মধ্যেই যদি কীটের মতো উদ্দেশ্য ও অর্থ লুকাইয়া থাকে, তবে কোথায় হাস্যকৌতুক, কোথায় প্রেম, কোথায় আনন্দ! তবে চারি দিকে দেখিতে পাইব শুষ্ক দেহ, লম্ব মুখ, শীর্ণ গণ্ড, উচ্চ হনু, হাস্যহীন শুষ্ক ওষ্ঠাধর, কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষু— মানবের উপছায়াসকল পরস্পরের কথার উপরে পড়িয়া খুদিয়া খুদিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া অর্থই বাহির করিতেছে, অথবা পরস্পরের পলিতকেশ মুণ্ড লক্ষ্য করিয়া উদ্দেশ্য-কঠিন কথার লোষ্ট্র বর্ষণ করিতেছে।

অনেক সাহিত্য এইরূপ হৃদয়মিলন-উপলক্ষে বাজে কথা এবং মুখোমুখি, চাহাচাহি, কোলাকুলি। সাহিত্য এইরূপ বিকাশ এবং স্ফূর্তি মাত্র। আনন্দই তাহার আদি অন্ত মধ্য। আনন্দই তাহার কারণ, এবং আনন্দই তাহার উদ্দেশ্য। না বলিলে নয় বলিয়াই বলা ও না হইলে নয় বলিয়াই হওয়া।

ভারতী ও বালক
বৈশাখ ১২৯৪

সাহিত্য ও সভ্যতা

বোধ করি সকলেই দেখিয়েছেন, বিলাতি কাগজে আজকাল সাহিত্যরসের বিশেষ অভাব দেখা যায়। আগাগোড়া কেবল রাজনীতি ও সমাজনীতি। মুক্ত বাণিজ্য, জামার দোকান, সুদানের যুদ্ধ, রবিবারে জাদুঘর খোলা থাকা উচিত, ঘুষ দেওয়া সম্বন্ধে নূতন আইন, ডাবলিন দুর্গ ইত্যাদি। ভালো কবিতা বা সাহিত্য সম্বন্ধে দুই-একটা ভালো প্রবন্ধ শুনিতে পাই বিস্তর টাকা দিয়া কিনিতে হয়। তাহাতে সাহিত্যের আদর প্রমাণ হয়, না সাহিত্যের দুর্মূল্যতা প্রমাণ হয় কে জানে! স্পেক্টেটর র‍্যাম্‌লার প্রভৃতি কাগজের সহিত এখনকার কাগজের তুলনা করিয়া দেখো, তখন কী প্রবল সাহিত্যের নেশাই ছিল! জেফ্রি, ডিকুইন্সি, হ্যাজ্‌লিট, সাদি, লে হান্ট, ল্যাম্বের আমলেও পত্র ও পত্রিকায় সাহিত্যের নির্ঝরিণী কী অবাধে প্রবাহিত হইত! কিন্তু আধুনিক ইংরাজি পত্রে সাহিত্যপ্রবাহ রুদ্ধ দেখিতেছি কেন? মনে হইতেছে আগেকার চেয়ে সাহিত্যের মূল্য বাড়িতেছে, কিন্তু চাষ কমিতেছে! ইহার কারণ কী?

আমার বোধ হয়, ইংলণ্ডে কাজের ভিড় কিছু বেশি বাড়িয়াছে। রাজ্য ও সমাজতন্ত্র উত্তরোত্তর জটিল হইয়া পড়িতেছে। এত বর্তমান অভাব-নিরাকরণ এত উপস্থিত সমস্যার মীমাংসা আবশ্যক হইয়াছে, প্রতিদিনের কথা প্রতিদিন এত জমা হইতেছে যে, যাহা নিত্য, যাহা মানবের চিরদিনের কথা, যে-সকল অনন্ত প্রশ্নের মীমাংসার ভার এক যুগ অন্য যুগের হস্তে সমর্পণ করিয়া চলিয়া যায়, মানবাত্মার যে-সকল গভীর বেদনা এবং গভীর আশার কাহিনী, সে আর উত্থাপিত হইবার অবসর পায় না। চিরনবীন চিরপ্রবীণ প্রকৃতি তাহার নিবিড় রহস্যময় অসীম সৌন্দর্য লইয়া পূর্বের ন্যায় তেমনি ভাবেই চাহিয়া আছে, চারি দিকে সেই শ্যামল তরুপল্লব, কালের চুপিচুপি রহস্যকথার মতো অরণ্যের সেই মর্মরধ্বনি, নদীর সেই চিরপ্রবাহময় অথচ চির-অবসরপূর্ণ কলগীতি; প্রকৃতির অবিরামনিশ্বসিত বিচিত্র বাণী এখনো নিঃশেষিত হয় নাই; কিন্তু যাহার

আপিসের তাড়া পড়িয়াছে, কেরানিগিরির সহস্র খুচরা দায় যাহার শাম্‌লার মধ্যে বাসা বাঁধিয়া কিচিকিচি করিয়া মরিতেছে, সে বলে— 'দূর করো তোমার প্রকৃতির মহত্ত্ব, তোমার সমুদ্র ও আকাশ, তোমার মানবহৃদয়, তোমার মানবহৃদয়ের সহস্রবাহী সুখ দুঃখ ঘৃণা ও প্রীতি, তোমার মহৎ মনুষ্যত্বের আদর্শ ও গভীর রহস্যপিপাসা, এখন হিসাব ছাড়া আর-কোনো কথা হইতে পারে না।' আমার বোধ হয় কল-কারখানার কোলাহলে ইংরেজেরা বিশ্বের অনন্ত সংগীতধ্বনির প্রতি মনোযোগ দিতে পারিতেছে না; উপস্থিত মুহূর্তগুলো পঙ্গপালের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া অনন্তকালকে আচ্ছন্ন করিয়াছে।

আমরা আর-একটি প্রবন্ধে[1] লিখিয়াছি— সৃষ্টির সহিত সাহিত্যের তুলনা হয়। এই অসীম সৃষ্টিকার্য অসীম অবসরের মধ্যে নিমগ্ন। চন্দ্রসূর্য গ্রহনক্ষত্র অপার অবসরসমুদ্রের মধ্যে সহস্র কুমুদ কহ্লার পদ্মের মতো ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। কার্যের শেষও নাই, অথচ তাড়াও নাই। বসন্তের একটি শুভ প্রভাতের জন্য শুভ্র চামেলি সৃষ্টির কোন্ অন্তঃপুরে অপেক্ষা করিয়া আছে, বর্ষার মেঘস্নিগ্ধ আর্দ্র সন্ধ্যার জন্য একটি শুভ্র জুঁই সমস্ত বৎসর তাহার পূর্বজন্ম যাপন করিতেছে। সাহিত্যও সেইরূপ অবসরের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে। ইহার জন্য অনেকখানি আকাশ, অনেকখানি সূর্যালোক, অনেকখানি শ্যামল ভূমির আবশ্যক। কার্যালয়ে শান-বাঁধানো মেজে খুঁড়িয়া যেমন মাধবীলতা উঠে না, তেমনি সাহিত্যও উঠে না।

উত্তরোত্তর ব্যাপমান বিস্তৃত রাজ্যভার, জটিল কর্তব্যশৃঙ্খল, অবিশ্রাম দলাদলি ও রাজনৈতিক কূটতর্ক, বাণিজ্যের জুয়াখেলা, জীবিকাসংগ্রাম, রাশীকৃত সম্পদ ও অগাধ দারিদ্র্যের একত্র অবস্থানে সামাজিক সমস্যা— এই-সকল লইয়া ইংরাজ মানবহৃদয় ভারাক্রান্ত। তাহার মধ্যে স্থানও নাই, সময়ও নাই। সাহিত্য সম্বন্ধে যদি কোনো কথা থাকে তো সংক্ষেপে সারো, আরও সংক্ষেপে করো। প্রাচীন সাহিত্য ও বিদেশী সাহিত্যের সার-সংকলন করিয়া পিলের মতো গুলি পাকাইয়া গলার মধ্যে চালান করিয়া দাও। কিন্তু সাহিত্যের সার-সংকলন করা যায় না। ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞানের সার-সংকলন করা যাইতে পারে। মালতীলতাকে হামান্‌দিস্তায় ঘুঁটিয়া তাল পাকাইলে সেই তালটাকে মালতীলতার সার-সংকলন বলা যাইতে পারে না। মালতীলতার হিল্লোল, তাহার বাহুর বন্ধন, তাহার প্রত্যেক শাখা-প্রশাখার ভঙ্গিমা, তাহার পূর্ণযৌবনভার, হামান্‌দিস্তার মধ্যে ঘুঁটিয়া তোলা ইংরাজেরও অসাধ্য।

ইহা প্রায় দেখা যায়, অতিরিক্ত কার্যভার যাহার স্কন্ধে সে কিছু নেশার বশ হয়। যো সো করিয়া একটু অবসর পাইলে উৎকট আমোদ নহিলে তাহার তৃপ্তি হয় না। যেমন উৎকট কাজ তেমনি উৎকট অবসর কিন্তু বিশুদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে নেশার তীব্রতা নাই। ভালো সন্দেশে যেমন চিনির আতিশয্য থাকে না, তেমনি উন্নত সাহিত্যে প্রচণ্ড বেগ এবং প্রশান্ত মাধুরী থাকে বটে, কিন্তু উগ্র মাদকতা থাকে না। এইজন্য নিরতিশয় ব্যস্ত লোকের কাছে সাহিত্যের আদর নাই। নেশা চাই। ইংলন্ডে দেখো খবরের নেশা। সে নেশা আমরা কল্পনা করিতে পারি না। খবরের জন্য কাড়াকাড়ি তাড়াতাড়ি, যে খবর দুই ঘণ্টা পরে পাইলে কাহারও কোনো ক্ষতি হয় না সেই খবর দুই ঘণ্টা আগে জোগাইবার জন্য ইংলন্ড ধনপ্রাণ অকাতরে বিসর্জন দিতেছে। সমস্ত পৃথিবী ঝাঁটাইয়া প্রতিদিনের খবরের টুকরা ইংলন্ড দ্বারের নিকট স্তূপাকার করিয়া তুলিতেছে। সেই টুকরাগুলো চা দিয়া ভিজাইয়া বিস্কুটের সঙ্গে মিলাইয়া ইংলন্ডের আবালবৃদ্ধবনিতা প্রতিদিন প্রভাতে এবং প্রদোষে পরমানন্দে পার করিতেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে সাহিত্যে কোনো খবর পাওয়া যায় না। কারণ, যে-সকল খবর সকলেই জানে অধিকাংশ সাহিত্য তাহাই লইয়া।

উপস্থিত বিষয় উপস্থিত ঘটনার মধ্যে যেমন নেশা, স্থায়ী বিষয়ের মধ্যে তেমন নেশা নাই। গোলদিঘির ধারে মারামারি বা চক্রবর্তী-পরিবারের গৃহবিচ্ছেদ যত তুমুল বলিয়া বোধ হয়,

---

১. পূর্ববর্তী প্রবন্ধে

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধও এমন মনে হয় না। অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি মহাশয় যখন কালো আলপাকার চাপকান পরিয়া ছাতা হাতে, ক্যাপ মাথায়, চাঁদার খাতা লইয়া ব্যস্ত হইয়া বেড়ান তখন লোকে মনে করে পৃথিবীর আর-সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ হইয়া আছে। যখন কোনো আর্য আর-কোনো আর্যকে অনার্য বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য গলা জাহির করেন ও দল পাকাইয়া তোলেন তখন নস্যরেণু তাম্রকূটধূম এবং আর্য-অভিমানে আচ্ছন্ন হইয়া তিনি এবং তাঁহার দলবল ভুলিয়া যান যে, তাঁহাদের চণ্ডীমণ্ডপের বাহিরেও বৃহৎ বিশ্বসংসার ছিল এবং এখনো আছে। ইংলন্ডে না জানি আরও কী কাণ্ড! সেখানে বিশ্বব্যাপী কারখানা এবং দেশব্যাপী দলাদলি লইয়া না জানি কী মত্ততা! সেখানে যদি বর্তমানই দানবাকার ধারণ করিয়া নিত্যকে গ্রাস করে তাহাতে আর আশ্চর্য কী!

বর্তমানের সহিত অনুরাগভরে সংলগ্ন হইয়া থাকা যে মানুষের স্বভাব এবং কর্তব্য তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। তাই বলিয়া বর্তমানের আতিশয্যে মানবের সমস্তটা চাপা পড়িয়া যাওয়া কিছু নয়। গাছের কিয়দংশ মাটির নীচে থাকা আবশ্যক বলিয়া যে সমস্ত গাছটাকে মাটির নীচে পুঁতিয়া ফেলিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। তাহার পক্ষে অনেকখানি ফাঁকা অনেকখানি আকাশ আবশ্যক। যে মাটির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে সেই মাটি খুঁড়িয়াও মানবকে অনেক ঊর্ধ্বে উঠিতে হইবে, তবেই তাহার মনুষ্যত্বসাধন হইবে। কিন্তু ক্রমাগতই যদি সে ধূলি-চাপা পড়ে, আকাশে উঠিবার যদি সে অবসর না পায়, তবে তাহার কী দশা!

যেমন বদ্ধ গৃহে থাকিলে মুক্ত বায়ুর আবশ্যক অধিক, তেমনি সভ্যতার সহস্র বন্ধনের অবস্থাতেই বিশুদ্ধ সাহিত্যের আবশ্যকতা অধিক হয়। সভ্যতার শাসন-নিয়ম, সভ্যতার কৃত্রিম-শৃঙ্খল যতই আঁট হয়— হৃদয়ে হৃদয়ে স্বাধীন মিলন, প্রকৃতির অনন্ত ক্ষেত্রের মধ্যে কিছুকালের জন্য রুদ্ধ হৃদয়ের ছুটি, ততই নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। সাহিত্যই সেই মিলনের স্থান, সেই খেলার গৃহ, সেই শান্তিনিকেতন। সাহিত্যই মানবহৃদয়ে সেই ধ্রুব অসীমের বিকাশ। অনেক পণ্ডিত ভবিষ্যদ্‌বাণী প্রচার করেন যে, সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের বিনাশ হইবে। তা যদি হয় তবে সভ্যতারও বিনাশ হইবে। কেবল পাকা রাস্তাই যে মানুষের পক্ষে আবশ্যক তাহা নয়, শ্যামল ক্ষেত্র তাহা অপেক্ষা অধিক আবশ্যক; প্রকৃতির বুকের উপরে পাথর ভাঙিয়া আগাগোড়া সমস্তটাই যদি পাকা রাস্তা করা যায়, কাঁচা কিছুই না থাকে, তবে সভ্যতার অতিশয় বৃদ্ধি হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই অতিবৃদ্ধিতেই তাহার বিনাশ। লন্ডন শহর অত্যন্ত সভ্য ইহা কে না বলিবে, কিন্তু এই লন্ডন-রূপী সভ্যতা যদি দৈত্যশিশুর মতো বাড়িতে বাড়িতে সমস্ত দ্বীপটাকে তাহার ইষ্টককঙ্কালের দ্বারা চাপিয়া বসে তবে সেখানে মানব কেমন করিয়া টিকে! মানব তো কোনো পণ্ডিত-বিশেষের দ্বারা নির্মিত কল-বিশেষ নহে।

দূর হইতে ইংলন্ডের সাহিত্য ও সভ্যতা সম্বন্ধে কিছু বলা হয়তো আমার পক্ষে অনধিকারচর্চা। এ বিষয়ে অভ্রান্ত বিচার করা আমার উদ্দেশ্য নয় এবং সেরূপ যোগ্যতাও আমার নাই। আমাদের এই রৌদ্রতাপিত নিদ্রাতুর নিস্তব্ধ গৃহের এক প্রান্তে বসিয়া কেমন করিয়া ধারণা করিব সেই সুরাসুরের রণরঙ্গভূমি য়ুরোপীয় সমাজের প্রচণ্ড আবেগ, উত্তেজনা, উদ্যম, সহস্রমুখী বাসনার উদ্দাম উচ্ছ্বাস, অবিশ্রাম মথ্যমান ক্ষুব্ধ জীবন-মহাসমুদ্রের আঘাত ও প্রতিঘাত— তরঙ্গ ও প্রতিতরঙ্গ— ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি, উৎক্ষিপ্ত সহস্র হস্তে পৃথিবী বেষ্টন করিবার বিপুল আকাঙ্ক্ষা—! দুই-একটা লক্ষণ মাত্র দেখিয়া, রাজ্যের অভ্যন্তরীণ অবস্থার মধ্যে লিপ্ত না থাকিয়া, বাহিরের লোকের মনে সহসা যে কথা উদয় হয় আমি সেই কথা লিখিয়া প্রকাশ করিলাম এবং এই সুযোগে সাহিত্য সম্বন্ধে আমার মত কথঞ্চিৎ স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিলাম।

ভারতী ও বালক
বৈশাখ ১২৯৪

আলস্য ও সাহিত্য

অবসরের মধ্যেই সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ সাহিত্যের বিকাশ, কিন্তু তাই বলিয়া আলস্যের মধ্যে নহে। মানবের সহস্র কার্যের মধ্যে সাহিত্যও একটি কার্য। সুকুমার বিকশিত পুষ্প যেমন সমগ্র কঠিন ও বৃহৎ বৃক্ষের নিয়ত শ্রমশীল জীবনের লক্ষণ তেমনি সাহিত্যও মানবসমাজের জীবন স্বাস্থ্য ও উদ্যমেরই পরিচয় দেয়, যেখানে সকল জীবনের অভাব সেখানে যে সাহিত্য জন্মিবে ইহা আশা করা দুরাশা। বৃহৎ বটবৃক্ষ জন্মিতে ফাঁকা জমির আবশ্যক, কিন্তু মরুভূমির আবশ্যক এমন কথা কেহই বলিবে না।

সুশৃঙ্খল অবসর সে তো প্রাণপণ পরিশ্রমের ফল, আর উচ্ছৃঙ্খল জড়ত্ব অলসের অনায়াসলব্ধ অধিকার। উন্নত সাহিত্য, যাহাকে সাহিত্য নাম দেওয়া যাইতে পারে, তাহা উদ্যমপূর্ণ সজীব সভ্যতার সহিত সংলগ্ন স্বাস্থ্যময়, সৌন্দর্যময়, আনন্দময় অবসর। যে পরিমাণে জড়ত্ব, সাহিত্য সেই পরিমাণে খর্ব ও সুষমারহিত, সেই পরিমাণে তাহা কল্পনার উদার দৃষ্টি ও হৃদয়ের স্বাধীন গতির প্রতিরোধক। অযত্নে যে সাহিত্য ঘনাইয়া উঠে তাহা জঙ্গলের মতো আমাদের স্বচ্ছ নীলাকাশ, শুভ্র আলোক, বিশুদ্ধ সুগন্ধ সমীরণকে বাধা দিয়া রোগ ও অন্ধকারকে পোষণ করিতে থাকে।

দেখো, আমাদের সমাজে কার্য নাই, আমাদের সমাজে কল্পনাও নাই, আমাদের সমাজে অনুভাবশক্তিও তেমন প্রবল নহে। অথচ একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, বাঙালিদের অনুভাবশক্তি ও কল্পনাশক্তি সবিশেষ তীব্র। কিন্তু বাঙালিরা যে অত্যন্ত কাল্পনিক ও সহৃদয় এ কথার প্রতিবাদ করিতে গেলে বিস্তর অপবাদের ভাগী হইতে হয়।

কাজ যাহারা করে না তাহারা যে কল্পনা করে ও অনুভব করে এ কথা কেমন করিয়া বিশ্বাস করা যায়। সুস্থ কল্পনা ও সরল অনুভাবের গতিই কাজের দিকে, আশমান ও আলস্যের দিকে নহে। চিত্রকরের কল্পনা তাহাকে ছবি আঁকিতেই প্রবৃত্ত করে; ছবিতেই সে কল্পনা আপনার পরিণাম লাভ করে। আমাদের মানসিক সমুদয় বৃত্তিই নানা আকারে প্রকাশ পাইবার জন্য ব্যাকুল। বাঙালির মন সে নিয়মের বহির্ভূত নহে। যদি এ কথা স্বীকার করা হয় সহজে বাঙালিকে কাজে প্রবৃত্ত করা যায় না, তবে এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে— বাঙালির মনোবৃত্তি-সকল দুর্বল।

কল্পনা যাহাদের প্রবল, বিশ্বাস তাহাদের প্রবল; বিশ্বাস যাহাদের প্রবল তাহারা আশ্চর্য বলের সহিত কাজ করে। কিন্তু বাঙালি জাতির ন্যায় বিশ্বাসহীন জাতি নাই। ভূত-প্রেত, হাঁচি-টিকটিকি, আধ্যাত্মিক জাতিভেদ ও বিজ্ঞানবহির্ভূত অপূর্ব বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-সকলের প্রতি একপ্রকার জীবনহীন জড় বিশ্বাস থাকিতে পারে; কিন্তু মহত্ত্বের প্রতি তাহাদের বিশ্বাস নাই। আফিসযানের চক্রচিহ্নিত পথ ছাড়িলে বৃহৎ জগতে আর-কোথাও যে কোনো গন্তব্য পাওয়া যাইবে ইহা কিছুতেই মনে লয় না। বড়ো ভাব ও বড়ো কাজকে যাহারা নীহার ও মরীচিকা বলিয়া মনে করে তাহাদের কল্পনা যে সবিশেষ সজীব তাহার প্রমাণ কী? স্পেনদেশ কলম্বসকে বিশ্বাস করিতে বহু বিলম্ব করিয়াছিল, কিন্তু যদি কোনো সুযোগে, বিধির কোনো বিপাকে, বঙ্গদেশে কোনো কলম্বস জন্মগ্রহণ করিত তবে দালান ও দাওয়ার আর্য দলপতি এবং আফিসের হেড় কেরানিগণ কী কাণ্ডটাই করিত। দুই-চারিজন অনুগ্রহপূর্বক সরলভাবে তাহাকে পাগল ঠাহরাইত এবং অবশিষ্ট সুচতুরবর্গ যাহারা কিছুতেই ঠকে না এবং যাহাদের যুক্তিশক্তি অতিশয় প্রখর, অর্থাৎ যাহারা সর্বদা সজাগ এবং কথায় কথায় চোখ টিপিয়া থাকে, তাহারা বক্রবুদ্ধিতে দুই-চারি প্যাঁচ লাগাইয়া আমাদের কৃষ্ণকায় কলম্বসের সহস্র সংকীর্ণ নিগূঢ় মতলব আবিষ্কার করিত এবং আপন আফিস ও দরদালানের স্থানসংকীর্ণতা হেতুই অতিশয় আরাম অনুভব করিত।

বাঙালিরা কাজের লোক নহে, কিন্তু বিষয়ী লোক। অর্থাৎ, তাহারা সর্বদাই বলিয়া থাকে,

'কাজ কী বাপু!' ভরসা করিয়া তাহারা বুদ্ধিকে ছাড়া দিতে পারে না; সমস্তই কোলের কাছে জমা করিয়া রাখে এবং যত-সব ক্ষুদ্র কাজে সমস্ত বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া বুদ্ধিকে অত্যন্ত প্রচুর বলিয়া বোধ করে। সুতরাং বড়ো কাজ, মহৎ লক্ষ্য, সুদূর সাধনাকে ইহারা সর্বদা উপহাস অবিশ্বাস ও ভয় করিয়া থাকে। কিন্তু কল্পনাকে এইরূপ সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিবার ফল হয় এই, জগতের বৃহত্ত্ব দেখিতে না পাইয়া আপনাকে বড়ো বলিয়া ভুল হয়। নিরুদ্যম কল্পনা অধিকতর নিরুদ্যম হইয়া মৃতপ্রায় হয়। তাহার আকাঙ্ক্ষার পথ রুদ্ধ হইয়া যায় এবং অভিমানস্ফীত হৃদয়ের মধ্যে রুদ্ধ কল্পনা, রুগ্‌ণ ও রোগের আকর হইয়া বিরাজ করিতে থাকে।

ইহার প্রমাণস্বরূপে দেখো, আমরা আজকাল আপনাকে কতই বড়ো মনে করিতেছি। চতুর্দিকে অষ্টাদশ সংহিতা এবং বিংশতি পুরাণ গাঁথিয়া তুলিয়া তাহার মধ্যে ক্রমাগত অন্ধকার ও অহংকার সঞ্চয় করিতেছি। বহু সহস্র বৎসর পূর্বে মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্বজাতিকে পার্শ্ববর্তী কৃষ্ণচর্ম অসভ্য জাতির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন বলিয়া আমরা তাঁহাদের ও তাঁহাদের দাসবর্গের হীনবুদ্ধি ক্ষীণকায় দীনপ্রাণ অজ্ঞান-অধীনতায়-অভিভূত সন্ততি ও পোষ্যসন্ততিগণ আপনাকে পবিত্র, আর্য ও সর্বাপেক্ষা মহৎ বলিয়া আস্ফালন করিতেছি এবং প্রভাতের স্ফীতপুচ্ছ ঊর্ধ্বগ্রীব কুক্কুটের ন্যায় সমস্ত জাগ্রত জগতের প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলার তারস্বর উত্থাপন করিতেছি। পশ্চিমের বৃহৎ সাহিত্য ও বিচিত্র জ্ঞানের প্রভাবে এক অত্যুন্নত, তেজস্বী, নিয়তগতিশীল, জীবন্ত মানবসমাজের বিদ্যুৎপ্রাণিত স্পর্শ লাভ করিয়াও তাহাদের মহত্ত্ব যথার্থ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না এবং বিবিধভঙ্গিসহকারে ক্ষীণ তীক্ষ্ণ সানুনাসিক স্বরে তাহাকে ম্লেচ্ছ ও অনুন্নত বলিয়া প্রচার করিতেছি। ইহাতে কেবলমাত্র আমাদের অজ্ঞতার অন্ধ অভিমান প্রকাশ পাইতেছে না, ইহাতে আমাদের কল্পনার জড়ত্ব প্রমাণ করিতেছে। আপনাকে বড়ো বলিয়া ঠাহরাইতে অধিক কল্পনার আবশ্যক করে না, কিন্তু যথার্থ বড়োকে বড়ো বলিয়া সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে উন্নত কল্পনার আবশ্যক।

অলস কল্পনা পবিত্র জীবনের অভাবে দেখিতে দেখিতে এইরূপ বিকৃতি প্রাপ্ত হইতে থাকে। আলস্যের সাহিত্যও তদনুসারে বিকৃত আকার ধারণ করে। ছিন্নবল্গ রথভ্রষ্ট অশ্বের ন্যায় অসংযত কল্পনা পথ হইতে বিপথে গিয়া উপস্থিত হয়। সেখানে দক্ষিণও যেমন বামও তেমনি; কেন যে এ দিকে না গিয়া ও দিকে যাই তাহার কোনো কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সেখানে আকার-আয়তনের মাত্রা পরিমাণ থাকে না। বলা নাই কহা নাই সুন্দর হঠাৎ কদর্য হইয়া উঠে। সুন্দরীর দেহ সুমেরু ডমরু মেদিনী গৃধিনী শুকচঞ্চু কদলী হস্তিশুণ্ড প্রভৃতির বিষম সংযোগে গঠিত হইয়া রাক্ষসী মূর্তি গ্রহণ করে। হৃদয়ের আবেগ কল্পনার তেজ হারাইয়া কেবল বঙ্কিম কথা-কৌশলে পরিণত হয়, যথা—

অদ্যাপি তন্মনসি সম্প্রতি বর্ততে মে
রাত্রৌ ময়ি ক্ষুতবতি ক্ষিতিপালপুত্র্যা
জীবেতি মঙ্গলবচঃ পরিহৃত্য কোপাৎ
কর্ণে কৃতং কনকপত্রমনালপত্ত্যা।

. . .

এখনো সে মোর মনে আছয়ে সর্বথা,
একরাতি মোর দোষে না কহিল কথা।
বিস্তর যতনে নারি কথা কহাইতে
ছলে হাঁচিলাম 'জীব' বাক্য বলাইতে।
আমি জীলে রহে তার আয়তি নিশ্চল
জানায়ে পরিল কানে কনককুণ্ডল।

—বিদ্যাসুন্দর

এইরূপ অত্যদ্ভুত মানসিক ব্যায়ামচর্চার মধ্যে শৈশবকল্পনার আত্মবিস্মৃত সরলতাও নাই এবং পরিণত কল্পনার সুবিচারসংগত সংযমও নাই। শাসনমাত্রবিরহিত আদর ও আলস্যে পালিত হইলে মনুষ্য যেমন পুত্তলির মতো হইয়া উঠে, শৈশব হারায়, অথচ কোনো কালে বয়োলাভ করে না এবং এইরূপে একপ্রকার কিম্ভূত বিকৃত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়, অনিয়ন্ত্রিত আলস্যের মধ্যে পুষ্ট হইলে সাহিত্যও সেইরূপ অদ্ভুত বামনমূর্তি ধারণ করে।

চিরকালই, সকল বিষয়েই, আলস্যের সহিত দারিদ্র্যের যোগ। সাহিত্যেও তাহার প্রমাণ দেখা যায়। অলস কল্পনা আর-সমস্ত ছাড়িয়া উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করে। প্রকৃতির মহৎ সৌন্দর্যসম্পদে তাহার অধিকার থাকে না; পরম সন্তুষ্ট চিত্তে আবর্জনাকণিকার মধ্যে সে আপনার জীবিকা সঞ্চয় করিতে থাকে। কুমারসম্ভবের মহাদেবের সহিত অন্নদামঙ্গলের মহাদেবের তুলনা করো। কল্পনার দারিদ্র্য যদি দেখিতে চাও অন্নদামঙ্গলের মদনভস্ম পাঠ করিয়া দেখো। বদ্ধ মলিন জলে যেমন দূষিতবাষ্পস্ফীত গাঢ় বুদ্‌বুদশ্রেণী ভাসিয়া উঠে তেমনি আমাদের এই বিলাসকলুষিত অলস বঙ্গসমাজের মধ্য হইতে ক্ষুদ্রতা ও ইন্দ্রিয়বিকারে পরিপূর্ণ হইয়া অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর ভাসিয়া উঠিয়াছিল। নিরবচ্ছিন্ন আলস্যের মধ্যে এইরূপ সাহিত্যই সম্ভব।

ক্ষুদ্র কল্পনা হয় আপনাকে সহস্র মলিন ক্ষুদ্র বস্তুর সহিত লিপ্ত করিয়া রাখে, নয় সমস্ত আকার-আয়তন পরিহার করিয়া বাষ্পরূপে মেঘরাজ্য নির্মাণ করিতে থাকে। তাহার ঠিক-ঠিকানা পাওয়া যায় না। স্থানে স্থানে দৈবাৎ এক-একটা আকৃতিমতী মূর্তির মতো দেখা যায়, কিন্তু মনোযোগ করিয়া দেখিতে গেলে তাহার মধ্যে কোনো অভিব্যক্তি বা সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহাকে ঘন বলিয়া মনে হয় তাহা বাষ্প, যাহাকে সত্য বলিয়া ভ্রম হয় তাহা মরীচিকা। কেহ কেহ বলিতেছেন, আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে এইরূপ কল্পনাকুজ্ঝটিকার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তাহা যদি সত্য হয় তবে ইহাও আমাদের ক্ষীণ ও অলস কল্পনার পরিচায়ক।

বলা বাহুল্য ইতিপূর্বে যখন আমি লিখিয়াছিলাম যে, অবসরের মধ্যেই সাহিত্যের বিকাশ তখন আমি এরূপ মনে করি নাই যে অবসর ও আলস্য একই। কারণ, আলস্য কার্যের বিঘ্নজনক এবং অবসর কার্যের জন্মভূমি।

কতকগুলি কাজ আছে যাহা সমস্ত অবসর হরণ করিয়া লইবার প্রয়াস পায়। সেইরূপ কাজের বাহুল্যে সাহিত্যের ক্ষতি করে। যাহা নিতান্তই আপনার ছোটো কাজ, যাহার জন্য উর্ধ্বশ্বাসে দাপিয়া বেড়াইতে হয়, যাহার সঙ্গে সঙ্গে ঝন্‌ঝনি খিটিমিটি খুঁটিনাটি দুশ্চিন্তা লাগিয়াই আছে, তাহাই কল্পনার ব্যাঘাতজনক। বৃহৎ কাজ আপনি আপনার অবসর সঙ্গে লইয়া চলিতে থাকে। খুচরা কাজের অপেক্ষা তাহাতে কাজ বেশি এবং বিরামও বেশি। বৃহৎ কাজে মানবহৃদয় আপন সঞ্চরণের স্থান পায়। সে আপন কাজের মহত্ত্বে মহৎ আনন্দ লাভ করিতে থাকে। মহৎ কাজের মধ্যে বৃহৎ সৌন্দর্য আছে, সেই সৌন্দর্যই আপন বলে আকর্ষণ করিয়া হৃদয়কে কাজ করায় এবং সেই সৌন্দর্যই আপন সুধাহিল্লোলে হৃদয়ের শ্রান্তি দূর করে। মানুষ কখনো ভাবে মাতোয়ারা হইয়া কাজ করে, কখনো ঝঞ্ঝাটে পড়িয়া কাজ করে। কতকগুলি কাজে তাহার জীবনের প্রসর বৃদ্ধি করিয়া দেয়, কতকগুলি কাজে তাহার জীবনকে একটা যন্ত্রের মধ্যে সংকুচিত করিয়া রাখে। কোনো কোনো কাজে সে আপনাকে কর্তা, আপনাকে দেবসন্তান বলিয়া অনুভব করে, আবার কোনো কোনো কাজে সে আপনাকে কঠিন নিয়মে অবিশ্রাম পরিচালিত এই বৃহৎ যন্ত্রজগতের এক ক্ষুদ্র অংশ বলিয়া মনে করে। মানুষের মধ্যে মানবও আছে যন্ত্রও আছে, উভয়েই একসঙ্গে কাজ করিতে থাকে, কাজের গতিকে কেহ কখনো প্রবল হইয়া উঠে। যখন যন্ত্রই অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে তখন আনন্দ থাকে না, সাহিত্য চলিয়া যায় অথবা সাহিত্য যন্ত্রজাত জীবনহীন পরিপাটি পণ্যদ্রব্যের আকার ধারণ করে।

বাংলা দেশে এক দল লোক কোনো কাজ করে না, আর-এক দল লোক খুচরা কাজে নিযুক্ত। এখানে মহৎ উদ্দেশ্য ও বৃহৎ অনুষ্ঠান নাই, সুতরাং জাতির হৃদয়ে উন্নত সাহিত্যের চির

আকরভূমি গভীর আনন্দ নাই। বসন্তের প্রভাতে যেমন বিহঙ্গেরা গান গাহে তেমনি বৃহৎ জীবনের আনন্দে সাহিত্য জাগ্রত হইয়া উঠে। সেই জীবন কোথায়? 'বঙ্গদর্শন' যখন ভগীরথের ন্যায় পাশ্চাত্যশিখর হইতে স্বাধীন ভাবস্রোত বাংলার হৃদয়ের মধ্যে আনয়ন করিলেন তখন বাংলা একবার নিদ্রোত্থিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার হৃদয়ে এক নূতন আশার সঞ্চার হইয়াছিল, তাহার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত বিহঙ্গের ন্যায় নূতন ভাবালোকে বিহার করিবার জন্য উড্ডীয়মান হইয়াছিল। সে এক সুন্দর ও মহৎ জীবনের সঙ্গসুখ লাভ করিয়া হৃদয়ের মধ্যে সহসা নবযৌবনের পুলক অনুভব করিতেছিল। পৃথিবীর কাজ করিবার জন্য একদিন বাঙালির প্রাণ যেন ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল— সেই সময় বঙ্গসাহিত্য মুকুলিত হইতেছিল। এমন সময়ে কোথা হইতে বার্ধক্যের শীতবায়ু বহিল। প্রবীণ লোকেরা কহিতে লাগিল, 'এ কী মত্ততা! ছেলেরা সৌন্দর্য দেখিয়াই ভুলিল, এ দিকে তত্ত্বজ্ঞান যে ধূলিধূসর হইতেছে!' আমরা চিরদিনের সেই তত্ত্বজ্ঞানী জাতি। তত্ত্বজ্ঞানের আস্বাদ পাইয়া আবার সৌন্দর্য ভুলিলাম। প্রেমের পরিবর্তে অহংকার আসিয়া আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিল! এখন বলিতেছি, আমরা মস্ত লোক, কারণ আমরা কুলীন, আমাদের অপেক্ষা বড়ো কেহই নাই! পশ্চিমের শিক্ষা ভ্রান্ত শিক্ষা! মনু অভ্রান্ত! কথাগুলো আওড়াইতেছি, অথচ ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। কূটবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া কুটিল ব্যাখ্যা-দ্বারা অবিশ্বাসকে বিশ্বাস বলিয়া প্রমাণ করিতেছি। এ উপায়ে প্রকৃত বিশ্বাস বাড়ে না, কিন্তু অহংকার বাড়ে, বুদ্ধিকৌশলে দেবতাকে গড়িয়া তুলিয়া আপনাকেই দেবতার দেবতা বলিয়া মনে হয়। দিন-কতকের জন্য অনুষ্ঠানের বাহুল্য হয়, কিন্তু ভক্তির সজীবতা থাকে না। যাহা আছে তাহাই ভালো, মিথ্যা তর্কের দ্বারা এইরূপ মন ভুলাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার ইচ্ছা হয়। জীবন্ত জগতের মধ্যে কোথাও যথার্থ মহত্ত্ব নাই, আছে কেবল এক মৃত জাতির অঙ্গবিকারের মধ্যে, এইরূপ বিশ্বাসের ভান করিয়া আমরা আরামে মৃত্যুকে আলিঙ্গনপূর্বক পরম নিশ্চেষ্টভাবে শ্রেষ্ঠত্বগর্বসুখ ভোগ করিতে থাকি। এরূপ অবস্থায় উদ্যমহীন, আকাঙ্ক্ষাহীন, প্রেমহীন, ছিন্নপক্ষ সাহিত্য যে ধুলায় লুণ্ঠিত হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য কী! এখন সকলে মিলিয়া কেবল তত্ত্বজ্ঞান ও আত্মাভিমান প্রচার করিতেছে।

এই জড়ত্ব অবিশ্বাস ও অহংকার চিরদিন থাকিবে না। দীপ আপন নির্বাপিত শিখার স্মৃতিমাত্র লইয়া কেবল অহর্নিশি দুর্গন্ধ ধূম বিস্তার করিয়াই আপনাকে সার্থক জ্ঞান করিবে তাহা বিশ্বাস হয় না। জ্বলন্ত প্রদীপের স্পর্শে সে আবার জ্বলিয়া উঠিবে এবং সে আলোক তাহার নিজেরই আলোক হইবে। দ্বাররোধপূর্বক অন্ধকারে ইহসংসারের মধ্যে আপনাকেই একাকী বিরাজমান মনে করিয়া একপ্রকার নিশ্চেষ্ট পরিতোষ লাভ করা যায় বটে, কিন্তু একবার যখন বাহির হইয়া সমগ্র মানবসমাজের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইব, এই বৃহৎ বিক্ষুব্ধ মানবজীবনের মধ্যে আপন জীবনের স্পন্দন অনুভব করিব, আপন নাভিপদ্মের উপর হইতে স্তিমিত দৃষ্টি উঠাইয়া লইয়া মুক্ত আকাশের মধ্যে বিকশিত আন্দোলিত জ্যোতির্মগ্ন সংসারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিব, তখনই আমরা আমাদের যথার্থ মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিব— তখন জানিতে পারিব, সহস্র মানবের জন্য আমার জীবন এবং আমার জন্য সহস্র মানবের জীবন। তখন সংকীর্ণ সুখ ও অন্ধ গর্ব উপভোগ করিবার জন্য কতকগুলা ঘর-গড়া তুচ্ছ মিথ্যারাশি ও ক্ষুদ্রতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবার আবশ্যকতা চলিয়া যাইবে। তখন যে সাহিত্য জন্মিবে তাহা সমস্ত মানবের সাহিত্য হইবে এবং সে সাহিত্য উপভোগ করিবার জন্য ব্যক্তিবিশেষের ক্ষুদ্র মত ও বুদ্ধিমানের ব্যাখ্যাকৌশলের প্রয়োজন থাকিবে না।

ভারতী ও বালক
শ্রাবণ ১২৯৪

কবিতার উপাদান রহস্য
(mystery)

ধরিতে গেলে স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের অপেক্ষা সন্তান-বাৎসল্য পৃথিবীতে অধিক বৈ কম নহে। কিন্তু কবিতায় তাহার নিতান্ত অল্পতা কেন দেখা যায়? মানব-হৃদয়ের এমন একটা প্রবল প্রবৃত্তি কবিতায় আপনাকে ব্যক্ত করে নাই কেন? তাহার কারণ আমার বোধহয় রহস্য সৌন্দর্যের আশ্রয়স্থল; স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের মধ্যে সেই রহস্য আছে, কিন্তু সন্তান-বাৎসল্যের মধ্যে সেই রহস্য নাই। খাদ্যের প্রতি ক্ষুধার আকর্ষণের রহস্য নাই, তেমনি সন্তানের প্রতি জননীর আসক্তির মধ্যে রহস্য নাই। অবশ্য রহস্য আছে, কিন্তু লোকের সহজেই মনে হয় আপনার পেটের ছেলেকে ভালোবাসিবে না তো কী! কিন্তু স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে আকর্ষণ সে এক অপূর্ব রহস্যময়। কাহাকে দেখিয়া কাহার প্রাণে যে কী সংগীত বাজিয়া উঠে, তাহার রহস্যের কেহ অন্ত পায় না। সৌন্দর্য সর্বাপেক্ষা রহস্যময় তাহার নিয়ম কেহ জানে না। ধর্মের মধ্যে দুই জায়গায় কবিতা আছে। এক, ঈশ্বরকে অতি মহান কল্পনা করিয়া; মেঘের মধ্যে, বজ্রনির্ঘোষের মধ্যে, অগ্নি, বিদ্যুৎ সূর্যের রুদ্র তেজের মধ্যে তাঁহার ভীষণ রহস্যের আভাস উপলব্ধি করিয়া। আর-এক, তাঁহাকে প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে আপন হৃদয়ের প্রেমের মধ্যে সুন্দর বলিয়া জানিয়া। Old Testament-এ এবং বেদে অনেক গাথা আছে যাহা ঈশ্বরের সেই রুদ্র রহস্য উদ্দেশ করিয়া গীত। এবং ঈশ্বরের সৌন্দর্য রহস্যের বৈষ্ণব কবিদের গান উঠিয়াছে। ঈশ্বর আমাদিগকে লালনপালন পোষণ করিতেছেন, সংসার বিধিবদ্ধ করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন— এ ভাব হইতে কবিতা উঠে নাই।

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক
২০/১১/১৮৮৮

সৌন্দর্য

৫৩-সংখ্যক প্রস্তাবে বড়দাদা সৌন্দর্য সম্বন্ধে যে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন তাহার রীতিমতো উত্তর দেওয়া দুঃসাধ্য। সে সম্বন্ধে দু-একটা কথা যাহা বলিবার আছে বলি।

"নিজে না মাতিলে অন্যকে মাতানো যায় না" এ কথাটা অতি অল্প জায়গায় খাটে। অধিকাংশ স্থলেই যে মাতাইবে তাহাকে মাতিলে চলিবে না। "মাতা" বলিতে বুঝায় প্রবৃত্তির তরঙ্গে বুদ্ধির হাল ছাড়িয়া দেওয়া। নিজের উপরে নিজের প্রভুত্ব চলিয়া যাওয়া। বাগ্মী, যিনি বক্তৃতা করিয়া দেশ মাতাইতে চান, তাঁহার এমনি ঠিক থাকা আবশ্যক যে, 'মাতা' না মাতা তাঁহার সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন হয়। বাষ্পকে অধিকারায়ত্ত করিয়া যেমন কল চলে তেমনি নিজের মনোবৃত্তিকে সম্পূর্ণ দখলে রাখিয়া তবে দশজনের মনোবৃত্তি নিজের অভিপ্রায়মতো উদ্রেক করা যাইতে পারে। তবে এই কথা বলা যায় বটে যাহার হৃদয় নাই সে [অন্যের] হৃদয় বিচলিত করিতে পারে না— কিন্তু প্রবৃত্তির প্রাবল্যবশত নিজের উপর যাহার অধিকার নাই সে আপনি যতই চঞ্চল হৌক অন্যকে ... অতএব "নিজে না মাতিলে অন্যকে মাতানো যায় না" এ কথা [ঠিক] নহে।

সে যাহাই হৌক, নিজের মনের ভাব অন্যের মনে উদ্রেক করিতে হইলে প্রথমেই নিজের মনের ভাব থাকা আবশ্যক এ কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সৌন্দর্য তো মনের ভাব নহে— সুতরাং এক হৃদয়বৃত্তি অন্য হৃদয়ে যে সমবেদনার নিয়মে সঞ্চারিত হয় সে নিয়ম এখানে খাটে না।

আমার তো মনে হয় সৌন্দর্য স্বভাবতই অপ্রমত্ত কারণ পৃথিবীতে সৌন্দর্যই পরিপূর্ণতার আদর্শ। পরিপূর্ণতার সহিত মত্ততা শোভা পায় না। সৌন্দর্যের আপনার মধ্যে আপনার একটি

সামঞ্জস্য আছে— সে নিজের মধ্যে নিজেই সম্পূর্ণ— সে আর সকল হইতে আপনাকে সংহৃত করিয়া রাখে। এইজন্যই আর সকলে এমন প্রবলবেগে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। সৌন্দর্যের মধ্যে দৈন্য নাই, এইজন্যই, আমাদের ভিক্ষুক হৃদয় তাহার দ্বারে অতিথি হইয়া উপস্থিত হয়। সৌন্দর্যের মধ্যে এই ঐশ্বর্য এই পরিপূর্ণতা আছে বলিয়া সৌন্দর্যেই ক্ষুদ্রতার মধ্যে মহত্ত্ব, সীমার মধ্যে অসীমতা প্রকাশ পায়। পূর্ণতাকে আপন আয়ত্তের মধ্যে পাইয়া হৃদয় আনন্দে অভিভূত হয়। এই-সকল কারণেই পৃথিবী সৌন্দর্য [পূর্ণতা] অনুভব করিবার এক প্রধান উপায়।

যে রমণী আত্মসৌন্দর্য সম্বন্ধে সর্বদাই সচেতন, অর্থাৎ সৌন্দর্যের হাত হইতে নিজের হাতে কর্তৃত্ব গ্রহণ করে এবং হাবভাব ও টীকাভাষ্য দ্বারা সৌন্দর্যকে বিক্ষিপ্ত করিয়া তোলে সে সৌন্দর্যের স্থায়ী এবং গভীর প্রভাব নষ্ট করিয়া ফেলে— কারণ তাহার সৌন্দর্যের মধ্যে উদ্দেশ্য সুতরাং দৈন্যের চিহ্ন দেখা যায়। তাহাতে উপস্থিতমতো মনে করিয়া সুখ জন্মে যে এমন সৌন্দর্য আমার দ্বারে আসিয়া হাজির হইয়াছে আমার প্রশংসার অপেক্ষা রাখিতেছে। কিন্তু এই আত্মাভিমানের সুখ স্থায়ী হইতে পারে না, কারণ অবহেলার ভাব যে পরিমাণে বাড়িতে থাকে অহংকারের ভাব সেই পরিমাণে কমিতে থাকে। রাজা যদি একদিন রাজার ভাবে আমার গৃহে পদার্পণ করেন তবে আমার যথাসর্বস্ব অতিথিসংকারে ব্যয় করিয়া চরিতার্থতা লাভ করি— কিন্তু যদি অভাব জানাইয়া স্থায়ী অতিথিরূপে আমার গৃহে জমি জুড়িয়া বসেন তবে তাঁহার বরাদ্দ ক্রমেই কমিয়া আসিতে থাকে। মানুষ যে "তেলা মাথায় তেল ঢালে" তাহার কারণ এই যে ক্ষমতা এবং সৌন্দর্যের মধ্যে মানুষ ঈশ্বরের ভাব দেখিতে পাইয়া অভিভূত হয় স্বতই তাহার নিকটে আপনাকে বিসর্জন দিতে প্রবৃত্তি হয়— নতুবা আমার জন্য একটা লোক কাঁদে না কেন, আর নেপোলিয়নের জন্য হাজার লোক মরে কেন? এই সীমাবদ্ধ মর্ত্যভূমিতে থাকিয়াও অসীমের প্রতি আমাদের এমনি স্বাভাবিক আকর্ষণ। ক্ষমতার মধ্যে চেষ্টার চিহ্ন অপেক্ষাকৃত অল্প কিন্তু তবু আছে কারণ, তাহা ক্রিয়াসাপেক্ষ— কিন্তু সৌন্দর্য নিষ্ক্রিয়, সুতরাং তাহাতে চেষ্টার নামগন্ধ নাই। এইজন্য সৌন্দর্য অধিক পরিপূর্ণ; এইজন্য তাহা ক্ষমতা অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী। এইজন্য বৈষ্ণবেরা কৃষ্ণকে মথুরাপতিভাবে দেখিয়া সুখ পায় না, তাঁহাকে বৃন্দাবনবিহারীভাবে দেখিতে চায়। কারণ স্বাধীন আত্মার উপরে ক্ষমতা অপেক্ষা সৌন্দর্যের প্রভাব অধিক। পাঠকের মন অনেক সময় Paradise Lost -এর শয়তানের স্বপক্ষতা অবলম্বন করে; তাহার কারণ শুদ্ধ ক্ষমতার উপরে স্বভাবতই মানবাত্মার বিদ্রোহভাব উপস্থিত হয়, কিন্তু ঈশ্বরকে সৌন্দর্যস্বরূপভাবে দেখিলে তবেই শয়তানের বিদ্রোহকে যথার্থ শয়তানী বলিয়া মনে হয়।

উপরে যাহা যাহা বলিলাম তাহা যদি সত্য হয় তবে ইহা নিশ্চয় সৌন্দর্য মাতে না বলিয়াই মাতাইতে পারে।

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক
১৯/১২/১৮৮৮

Dialogue/ Literature

Dramatis Personae

R. Tagore

P. Chaudhuri

L. Palit

P. Ch. একটা কোনো বিষয় আলোচনা করা যাক।

L. P. তার দরকার কী? Vast World-এ একটা-না-একটা subject পাওয়া যায়ই।

R. T. সাহিত্য জিনিসটা বিষয়ের উপর বেশি নির্ভর করে না বলবার ভঙ্গির উপর।

L. P. বুঝিয়ে বলো।

P. C. সাহিত্যের বিষয়টা কী?— Guide book আর Book of travels-এ ঢের তফাত।

R. T. ওইতেই তো আমার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল— দুটোরই বিষয় এক, খালি manner তফাত।

L. P. দুটোর বিষয় আবার মতে তফাত, কেননা different points of view থেকে deal করা হচ্ছে— যেমন Physics আর Chemistry.

P. C. Guide books-এ খালি fact পাওয়া যায়— Book of travels-এ personal element আছে— আর তাইতেই literature হয়। impersonal information-এ science হতে পারে। literature হয় না।

R. T. তা হলে দেখতে হবে কিসে personality প্রকাশ হয়।

L. P. সেটা কি method-এর question নয়?

P. C. Method তো আর খালি style নয়।

L. P. Rhetorical point of view থেকে।

R. T. Mere facts সরল ভাষায় ব্যক্ত করা যেতে পারে কিন্তু তার সঙ্গে emotions express করতে হলেই ভাষাকেও নিজের মনের মতোন করে গড়ে তুলতে হয় যাতে নিজের ভাব নিজে ভালো রকম ব্যক্ত করে উঠতে পারে।

P. C. Put করবার তফাত তত নয়—যত দেখবার তফাত। একজন যত points দেখছে আর-এক জনা তত হয়তো দেখছে না— feelings-এর question তত নয়— knowledge-এরও question হতে পারে।

R. T. তা হলে তুমি বলছ যে কতকগুলো points literature-এর পক্ষে বেশি উপযোগী।

P. C. না, তা ঠিক নয়। জ্ঞানস্পৃহা, সৌন্দর্যস্পৃহা ইত্যাদি আমাদের অনেক faculties আছে—Science & Art আলাদা department নিয়ে deal করে; কিন্তু literature সমস্ত faculties-এর সামঞ্জস্য দেয়। নিদেন তাই literature-এর চেষ্টা— সব সময়ে perfect success হয় না।

L. P. আগে দেখা উচিত Literature-এর end কী? তা হলেই আমরা বুঝতে পারব তার subject এবং তার method কিরকম হওয়া উচিত।

P. C. Matthew Arnold বলেন Literature-এর উদ্দেশ্য humanize করা। মানুষের যতগুলি ভালো প্রবৃত্তি আছে তার প্রত্যেকটার Perfect development-এর সহায়তা করা। জ্ঞানস্পৃহা, সৌন্দর্যস্পৃহা প্রভৃতি সকল বৃত্তির সম্যক স্ফূর্তি সাধন করা। আমি বলি সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হচ্ছে enjoyment মুখ্য ও instruction গৌণ হওয়া।

L. P. খুব ঠিক। তা হলে দাঁড়াল এই যে আমাদের emotional nature-এ সব চেয়ে বেশি appeal করবে। আমি ধরে নিচ্ছি যে ethical মানে emotional। এই sense-এ যে ethics emotion-এর through দিয়ে literature-এ act করে। Reason-এর through নয়।

P. C. এ সম্বন্ধে বক্তব্য আছে। সত্য দুই ভাবে দেখা যায়। প্রথম— চিন্তার বিষয়। দ্বিতীয়— feel করবার বিষয়। literature-এ আমাদের জীবন্ত সত্যর সঙ্গে পরিচিত করে। সত্যকে তাহার সমগ্রভাবে আমাদের আয়ত্তগত করে। দৃষ্টান্ত— প্রকৃতিকে আমরা Physical Science-এর মতে Matter এবং Force-এর একটা সমষ্টি বলে মনে

করতে পারি মাত্র। কিন্তু প্রকৃতিকে তার সমস্ত সৌন্দর্যর সঙ্গে একটা palpable concrete thing বলে অনুভব করা সেটা যে মানসিক শক্তির দ্বারা হয় literature তারই expression।

L. P. প্রমথ কিছু mystic। এই mystic nature-এর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলে analysis-এর দরকার। সত্য হৃদয়ের দ্বারা অনুভব করা কিরকমে সম্ভব হয় বুঝতে পারছি নে। Nature-এর beauty-কে কী হিসাবে সত্য বলা যেতে পারে তাও জানি নে unless সত্য শব্দটার আরেকটা নূতন মানে দেওয়া যায়। Beauty আমাদের feelings affect করে আর সেই sense-এ purely emotional। একে যদি truth বলে তবে আমি যা আগে বলেছিলুম তার সঙ্গে কোনো তফাতই থাকে না। একই জিনিসের দুই quality থাকতে পারে। গাছ নদী পাহাড় পর্বতের যে সমষ্টিকে আমরা nature বলি তার একটা side unemotional তাই সেই sideটা আমরা purely scientifically enquire into করতে পারি। যে sideটা আমাদের emotion excite করে তার সত্য মিথ্যা উচিত অনুচিত নেই। এটা সুন্দর হওয়া উচিত এমন কোনো কথা নেই। সৌন্দর্য relative। মানুষের মন এবং nature-এর সঙ্গে একটা relation। সে relationটা universal নয় তাই ordinary scientific truth-এর category থেকে বার করে নিই।

P. C. আমার কথার মানে— literary subject beautiful, moral, এবং আমাদের intellect-এর grasp-এর মধ্যে। এর একটা কোনোটাকে বাদ দিলে literature অসম্পূর্ণ হয়।

L. P. Literature-এর aim হচ্ছে beauty। তবে যা আমাদের moral nature rovolt করে তা আমাদের Sense of the Beautifulও shock করে। কতকগুলো intellectual truthও আছে যা ব্যতিক্রম করলে একই effect হয়। আমাদের sympathy হচ্ছে Highest moral quality। তাকে excite করতে হলে truthful হওয়া দরকার কেননা impossible কিংবা non-existent creature-দের সঙ্গে sympathy-র কোনো আবশ্যক নেই। Living Human being এর সঙ্গে sympathy-র দরকার। এইটুকু truth বজায় রেখে আর বাকি truth আমরা ignore করতে পারি। emotion তা হলে হল end এবং moral ও intellectual হল means।

P. C. এ যদি লোকেনের কথা হয় তা হলে আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে লোকেনের sympathy-র বদলে আমি love বসাতে চাই। আর meansটা aesthetical ও বটে।

প্রমথ প্রস্থান।

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক
Oct. 1. 89 [১৬ আশ্বিন ১২৯৬]

সাহিত্য

যেটুকু সাহিত্যের মর্ম, তাহা সংজ্ঞার মধ্যে ধরা দেয় না। তাহা প্রাণপদার্থের মতো— কী কী না থাকিলে তাহা টেঁকে না তাহা জানি, কিন্তু সে যে কী তাহা জানি না। জীবন হইতেই জীবন সংক্রামিত হয়, অগ্নি হইতেই অগ্নি জ্বালাইতে হয়— তেমনি লেখকের অন্তরাত্মা হইতে কলমের মুখে যখন প্রাণ ক্ষরিয়া পড়ে তখনই জীবন্ত সাহিত্যের জন্ম হয়। সাহিত্য সম্বন্ধে "জীবন" "প্রাণ" প্রভৃতি কথাগুলো হয়তো mystic। কিন্তু পরিষ্কার কথা বলিবার কোনো উপায় নাই। সাহিত্যের মধ্যে একটা জীবন আছে, এবং সে জীবন লেখকের মানবজীবনের নিগূঢ় কেন্দ্র হইতে

ঢুঁইয়া পড়ে, ভাষার মধ্যে স্থায়ী হয় ও ভাষাকে স্থায়ী করিয়া তুলে— এই কথাগুলো নিজের আন্তরিক অভিজ্ঞতার সাহায্যে একপ্রকার আন্দাজে বুঝিয়া লইতে হইবে।

Shakespeare তাঁহার নাটকের পাত্রগুলিকে আপনার প্রাণের মধ্য হইতে জন্ম দিয়াছেন— বুদ্ধি হইতেও নয়, ধর্মনীতি হইতেও নয়, এমন-কি, feelings হইতে নয়— সমস্ত মানববৃত্তির দ্বারা বেষ্টিত জীবনকোষের মধ্য হইতে। সাহিত্যের মধ্যে সৃজনের ভাব আছে, নির্মাণের ভাব নাই। সৃজনের মধ্যে একটা রহস্যময় প্রাণময় আত্মবিস্মৃত নিয়ম আছে, নির্মাণ আপনা হইতেই তাহার হাতধরা। সৃজনশক্তি এক হিসাবে নির্মাণশক্তি অপেক্ষা অচেতন, আবার আর-এক হিসাবে তাহা অপেক্ষা সচেতন। কারণ, নির্মাণকালে প্রতিমুহূর্তে সচেতন আত্মকর্তৃত্ব জড় উপাদানের প্রতি প্রয়োগ করিতে হয়। সৃজনে তাহা নয়। কিন্তু সৃজনকালে সেই জড় উপাদানের মধ্যে যেন এক অপূর্ব নিয়মে চেতনা সঞ্চার করিয়া দেওয়া হয়, সে যেন আপনাকে আপনি গড়িয়া তুলে। যেন নিজের নাড়ির সহিত তাহার যোগ সাধন করিয়া দেওয়া হয় এবং সহজেই তাহার মধ্যে জীবন প্রবাহিত হয়। বাষ্পীয় কলে দেখা যায় এক ঘূর্ণ্যমান চাকার সহিত আর-এক চাকার যোগ করিয়া বিভিন্ন দিকে গতি সঞ্চার করা [হয়।] তেমনি এই বৃহৎ সংসারচক্রের আবর্তনের সঙ্গে আমার জীবনচক্র ঘুরিতেছে, তাহারি কে[ন্দ্রের মধ্য] দিয়া সংসারের গতির সহিত সাহিত্যের যোগ সাধন করা হয়, এই উপায়ে সাহিত্য বৃহৎ জীবনের অনন্তগতি প্রাপ্ত হয়। কেহ-বা হাতে করিয়া ঠেলিতেছে, কেহ-বা ঘোড়া জুড়িয়া ছুটাইতেছে, কেহ-বা জীবনের চক্রের সহিত বাঁধিয়া দিতে পারিয়াছে, শেষোক্ত উপায়েই সাহিত্য স্থায়ী গতি প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু এই-সকল তুলনা উপমাকে কল্পনার খেলা বলিয়া মনে হয়, পাকা কথা বলিয়া বোধ হয় না। পাকা কথা মানে, যে কথা সকলেই যাচাই করিয়া লইতে পারে। পূর্বেই একরকম বলা গিয়াছে এ-সকল কথা তেমন সন্তোষজনকরূপে পাকা করিয়া লওয়া অসম্ভব।

আমি নিজে বার বার দেখিয়াছি, এবং এ কথা বোধ হয় কাহাকেও নূতন বলিয়া বোধ হইবে না, যে, যখন সাহিত্যরচনার মধ্যে মগ্ন থাকা যায় তখন যেন এক প্রকার অতিচেতন অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হয়। যেন আর-একজন অন্তঃপুরুষ আমার অধিকাংশ চেতনা অপহরণ করিয়া আমার অর্ধেক অজ্ঞাতসারে কাজ করিয়া যায়। সে যেন আমার সমস্ত সঞ্চিত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত অভিজ্ঞতাকে আমার Real এবং Ideal-কে প্রতিদিনের আমাকে এবং আমার সম্ভাবিত আমাকে গলাইয়া লেখার মধ্যে তাহারই এক বিন্দু ঢালিয়া দেয়। আমার জীবনের যাহা সারবিন্দু তাহা সমস্ত মানবজীবনের ধন, তাহা কেবলমাত্র আমার একটা অজ্ঞেয় অপরিচিত অসম্পূর্ণ অংশ নহে। সুতরাং সেই জীবনশক্তি সাহিত্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া চিরদিন সমস্ত মানবের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে।

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক

২।১০।৮৯

[১৭ আশ্বিন ১২৯৬]

বাংলায় লেখা

বাংলা ভাষায় লিখিবার এক বিশেষ সুবিধা এই যে বাংলায় নূতন কথা বলা যায়। প্রকৃত নূতন কথা পৃথিবীতে নাই বলিলেই হয়— কেবল যখন ব্যক্তিবিশেষ সেই কথাটা নূতন করিয়া [ভা]বিয়া বলে তখনই তাহা নূতন হইয়া উঠে। বাংলায় কোনো চিন্তা ব্যক্ত করিতে গেলে তাহার সমস্তটাই একান্ত একাগ্রতার সহিত ভাবিয়া লইতে হয়, তাহার আগাগোড়া নিজের হাতে গড়িয়া লইতে হয়। অক্ষমতাবশত অসম্পূর্ণ ও অসংলগ্ন হইতে পারে কিন্তু অলক্ষিতভাবে অন্যের

নির্মিত পথে পড়িবার সম্ভাবনা বিরল। ইংরাজিতে প্রায় সকল ভাবেরই বহুকালসঞ্চিত ভাষা আছে— ভাবের উদয় হইবামাত্রই তাহারা দলে দলে আসিয়া আপনাদের মধ্যে ভুলাইয়া লইয়া যায়। এইরূপ অনায়াসলব্ধ ভাষায় স্বতঃপ্রবাহিত গতির মধ্যে পড়িয়া চিন্তাশক্তি কথঞ্চিৎ নিরুদ্যম হইয়া পড়ে।— আমি দেখিয়াছি একটা সামান্য কথাও বাংলায় লিখিয়া মনে হয় নূতন কথা লিখি[লাম— কারণ] ভাবা-কথাও সম্যক্‌রূপে ভাবিয়া লইতে হয়। সমস্ত হৃদয় মন বুদ্ধি চেষ্টা জাগাইয়া রাখিতে হয়— প্রত্যেক কথাটিকে নিজে ডাকিয়া আনিতে হয়। আমাদের গরিব বাংলা ভাষায় বিস্তর অসুবিধা, সমস্তই নিজের হাতে করিয়া-কর্মিয়া লইতে হয়, কিন্তু সেইটেই একটা সুবিধা।

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক
৬।১০।৮৯
[২১ আশ্বিন ১২৯৬]

অপরিচিত ভাষা ও অপরিচিত সংগীত

বিদেশী ভাষা নূতন শিখিতে আরম্ভ করিয়া যখন সেই ভাষার সাহিত্য পুস্তক পড়িতে চেষ্টা করা যায়, তখন দুই কারণে সেই সাহিত্যের প্রকৃত রস গ্রহণ করা যায় না। ১ম— তখন আমরা পরপুরুষ বলিয়া ভাষার অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি না। প্রত্যেক কথার অন্দর মহলে যে লাজুক ভাব-সকল বাস করে, যাহারা সেই কথার শ্রী, সৌন্দর্য, হৃদয়দেবতা তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হয় না, কেবল তাহার বহির্দেশবাসী অর্থটুকুমাত্র আফিসের সাজে দেখা দেয়। ২য়— প্রত্যেক কথাটাকে পৃথক পৃথক করিয়া বুঝিতে হয়— অনভিজ্ঞ আনাড়ির কাছে তাহারা সকলেই স্বপ্রধান হইয়া নিজমূর্তি ধারণ করে, তাহারা সকলেই বড়ো হইয়া সমগ্র পদটিকে (sentence-কে) আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। পুলিসের কন্‌স্টেবল যেমন আইন-অনভিজ্ঞ পাড়াগেঁয়ের নিকট প্রবলপ্রতাপান্বিত, আইন বজায় রাখা যাহাদের কাজ সুযোগক্রমে তাহারাই যেমন আইনের উপরে টেক্কা দিয়া দাঁড়ায় এও সেইরূপ। একটি কথার সহিত আর-একটি কথা যে একটি সুন্দর [ঐক্য] শৃঙ্খলার দ্বারা বদ্ধ হইয়া আত্মসংবরণ করিয়া রাখে সেই ঐক্যশৃঙ্খলার উপরে সাহিত্যের সৌন্দর্য ও প্রাণ নির্ভর করে। অপরিচিত অজ্ঞ ব্যক্তি সেই ঐক্যবন্ধন হইতে কথাগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। ক্রমে ক্রমে অর্থ বোধ হয় কিন্তু সৌন্দর্যবোধ পলায়ন করে।

বিদেশী সংগীত সম্বন্ধে এ কথা আরও খাটে। অভ্যস্ত শ্রেণীয় সংগীতে, সুরবিন্যাসের মধ্যে যে একটি ঐক্য আছে সেইটি সহজে ও শীঘ্র ধরিতে পারি। বিগত সুর স্মৃতিতে থাকে ও আগামী সুর পূর্ব হইতে কতকটা অনুমান করিয়া লইতে পারি— স্বতন্ত্র সুরগুলির অপেক্ষা তাহাদের ঐক্যমাধুর্যের প্রাধান্য অনুভব করিতে পারি, অর্থাৎ প্রকৃত সংগীতটুকু শুনিতে পাই। অনভ্যস্ত সংগীতে প্রত্যেক স্বতন্ত্র সুর উপদ্রব করিয়া মনকে তাড়াইয়া লইয়া যায়, কিছুর উপরে আশ্রয় লইতে দেয় না। সর্বদাই যেন শূন্যে শূন্যে বিরাজ করিতে হয়। তবু লিখিত ভাষার একটা সুবিধা আছে এই যে যখন ইচ্ছা বার বার ফিরিয়া আসা যায়, কিন্তু সুর উড়িয়া চলে, ধরা দেয় না। ভাষার অন্তর্গত প্রত্যেক কথার একটা অর্থ আছে, আমরা মনে মনে সেই অর্থ যোজনা করিয়া লইতে পারি। কিন্তু স্বতন্ত্র সুরের কোনো অর্থ নাই, তাহার সমস্ত অর্থ তাহার ঐক্যের মধ্যেই বিরাজ করে। এইজন্য বিদেশী সাহিত্য অপেক্ষা বিদেশী সংগীত হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে অধিক বাধা প্রাপ্ত হয়।

সৌন্দর্য সমগ্রভাবে হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে, হৃদয়কে উদ্‌বেজিত করে না। বিশুদ্ধ বুদ্ধিগম্য বিষয়কে খণ্ড খণ্ড করিয়া বুঝিতে হয়, কার্যকারণশৃঙ্খলের প্রত্যেক অংশকে মনে মনে অনুসরণ

করিতে হয়— মনকে কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু সৌন্দর্যের নিকট মন নিশ্চেষ্টভাব ধারণ করিয়া উপভোগ করে। মনের চেষ্টা শান্ত করিতে না পারিলে সেই সৌন্দর্য উপভোগের ব্যাঘাত হয়। অপরিচিত সাহিত্যে বিশেষত অপরিচিত সংগীতে সেই চেষ্টা অবিশ্রাম জাগ্রত থাকে। প্রত্যেক অনভ্যস্ত শব্দ ও স্বরবিন্যাসে মুহূর্তে মুহূর্তে মনের বিস্ময় উদ্রেক করিয়া তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলে।

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক
৬।১০।৮৯

সৌন্দর্য সম্বন্ধে গুটিকতক ভাব

সৃষ্টিকার্যের মধ্যে সৌন্দর্য সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য রহস্যময়। কারণ, জগৎরক্ষায় তাহার একান্ত উপযোগিতা দেখা যায় না।

সৌন্দর্য অন্ন নহে, বস্ত্র নহে, তাহা কাহারও পক্ষে প্রত্যক্ষরূপে আবশ্যক নহে।

তাহা আবশ্যকের অতিরিক্ত দান, তাহা ঈশ্বরের প্রেম।

যাহা কেবলমাত্র আবশ্যক— যাহা নহিলে নয় বলিয়া চাই, তাহাতে আমাদের দারিদ্র্য স্মরণ করাইয়া দেয়। এইজন্য তাহার প্রতি আমরা অনেক সময় অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া আপনার মর্যাদা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করি। উদরপূর্তিকে আমরা হাতে কলমে অবহেলা করিতে পারি না, কিন্তু মুখে তাহার প্রতি যথেষ্ট দূরছাই প্রয়োগ করি। বুদ্ধি-চর্চার আনন্দকে আমরা উচ্চতর আসন দিই। তাহার একটা কারণ, উদরচর্চা অপেক্ষা বুদ্ধিচর্চা অধিকতর পরিমাণে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। বিদ্যালোচনা না করিলে তুমি মুর্খ হইবে কিন্তু মারা পড়িবে না।

সংসারে যদি কেবল নির্জল আবশ্যকটুকুমাত্র থাকিত তবে আমরা জগদীশ্বরের দ্বারে ভিক্ষুকরূপে থাকিতাম। তাহা হইলে আমাদিগকে নিতান্তই কেবল দায়ে ফেলিয়া রাখা হইত।

সঙ্গে সঙ্গে প্রেম থাকিলে ভিক্ষা আর ভিক্ষাই থাকে না, যেমন জননীর নিকট হইতে অভাব মোচন।

সৌন্দর্য সেই প্রেমের লক্ষণ, আমাদের মন ভুলাইবার চেষ্টা। যদি সংসারের কাজ লওয়াই উদ্দেশ্য হয় তবে আমাদের মনোহরণের চেষ্টা বাহুল্য। জগতের বড়ো বড়ো দানব-শক্তির মাঝখানে ক্ষুদ্র প্রাণীদের নিকট হইতে অনায়াসে কান ধরিয়া কাজ আদায় করিয়া লওয়া যাইতে পারিত। জগতের সৌন্দর্য বাপুবাছা বলিয়া আমাদের গায়ে হাত বুলাইতেছে কেন?

ওইখানেই যন্ত্রনিয়মের উপরে প্রেমের নিয়ম দেখা দিতেছে। খাদ্যের সহিত রস, শব্দের সহিত সংগীত, দৃশ্যের সহিত আকার ও বর্ণসুষমা, ইহাতেই প্রেমের হাত দেখা যায়।

আমরা টিকিয়া থাকিব প্রকৃতির আত্মরক্ষার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট, কিন্তু আনন্দে থাকিব ইহা বাড়ার ভাগ— বিশেষত তাহার জন্য আয়োজন তো কম করিতে হয় নাই! গ্রহতারা তো বেশ চলিতেছে, গাছপালা তো বেশ স্বাদহীন আহার করিয়া অন্ধ ও বধির ভাবে বংশবৃদ্ধি করিতেছে! কিন্তু যেখানেই চেতনার সঞ্চার করা হইয়াছে সেইখানেই কেবলমাত্র শক্তি নহে, তদতিরিক্ত প্রেম অনুভব করানো হইতেছে। শক্তিকে মধুর করিয়া তুলিবার চেষ্টা দেখা যাইতেছে।

শক্তির মধ্যে কার্যকারণশৃঙ্খলা দেখা যায়— এইজন্য তাহা কিয়ৎ-পরিমাণে বিজ্ঞানের আয়ত্ত। কিন্তু সৌন্দর্যের মধ্যে ইচ্ছা দেখা যায়, এইজন্য বিজ্ঞান সেখানে প্রতিহত। এইজন্য সৌন্দর্য অতীব আশ্চর্য রহস্যময়।

এইজন্য সৌন্দর্য অনাবশ্যক হইয়াও আমাদের আত্মার মধ্যে আলোড়ন উপস্থিত করে। যেন ওইখানে অনন্তের সহিত আমাদের নাড়ির টান উপলব্ধি করা যায়।

সৌন্দর্য সৃষ্টির সর্বকনিষ্ঠ, দুর্বল, সুকুমার। কিন্তু তাহাকে সকল বলের উপরিভাগে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। কঠিন গ্রানিটের ভিত্তির উপরে কোমল ধরণীর শ্যামল লাবণ্য। প্রবল গুঁড়ি ও ডালপালার উপরে সুন্দর পুষ্পপল্লব। কঠোর অস্থি-মাংসপেশীর উপরে সুকুমার দেহসৌন্দর্যের বিস্তার। উৎকট পুরুষবলের উপরে অবলা রমণী পুষ্পের মতো প্রস্ফুটিত।

স্বাধীনতাও সৃষ্টির সর্বশেষ সন্তান। মানবই আপন অন্তরে স্বাধীনতা অনুভব করিয়াছে। স্বাধীন আত্মার নিকটে এই দুর্বল সৌন্দর্যের বল সর্বাপেক্ষা অধিক। বলের প্রতিকূলে আমরা বল প্রয়োগ করি। সৌন্দর্যের কাছে আমরা আত্মবিসর্জন করি। সে আমাদের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে চাহে না, আমরা তাহার হস্তে স্বাধীনতা সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হই।

সৌন্দর্য ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করিয়া থাকে। ফুল এক বসন্তে অনাদৃত হইয়া দ্বিতীয় বসন্তে ফোটে। বহির্জগতে কত ফুল ঝরিয়া একটি ফল হয়— ফুল হইতে আমাদের অন্তর্জগতেও যে ফল জন্মে তাহাও এইরূপ বহুবিফলতার সন্তান।

কিন্তু ঈশ্বরের শক্তি ঈশ্বরের ঝড় অপেক্ষা করে না। সে যখন প্রবাহিত হয় তখনি অরণ্যপর্বত কাঁপিয়া উঠে— তরুলতা ভূমিশায়ী হয়। তাহার ফল সদ্য সদ্য।

ধীরে ধীরে আমাদের পাষাণ হৃদয় গলাইয়া দিতেছে, পাশব বলের প্রতি আমাদের লজ্জা জন্মাইয়া দিতেছে— অথচ একটি কথাও কহিতেছে না, সে কে? সে এই অসীম ধৈর্যবান সৌন্দর্য।

সে কাড়িয়া লয় না, আনন্দ দান করিয়া যায়, লোকের প্রাণ আপনি বশ হয়। মানব সভ্যতার উচ্চতম শিক্ষাই এই— প্রেমের দ্বারা দুর্বলভাবে পশুবলের উপর জয়লাভ করো। সৌন্দর্য ছাড়া জগতের আর কোথাও তো এ কথা লিপিবদ্ধ হয় নাই। আর সকলেই মারামারি কাড়াকাড়ি করে, প্রেম স্নিগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকে, সহিয়া যায়।

যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন— এই নিয়ম যদি আলোচনা করিয়া দেখা যায় তবে প্রতীতি হয় বলের অপেক্ষা সৌন্দর্যের টিকিবার শক্তি অধিক। কারণ, সৌন্দর্য কাহাকেও আঘাত করে না, সুতরাং জগতের আঘাত ইচ্ছা উদ্রেক করে না।

সৌন্দর্য ক্ষেত্রেই আমরা ঈশ্বরের সমকক্ষ। ক্ষমতায় তিনি কোথায় আমি কোথায়! যেখানে সৌন্দর্য সেখানে আমরা দেখিতে পাই ঈশ্বরও আমাদিগকে চাহিতেছেন।

বহির্জগতে সৌন্দর্য, অন্তর্জগতে প্রেম। ভয়ে, অভাববোধে কাজ চলে, আদান-প্রতিদানের নিয়মে কাজ চলে, প্রেম বাহুল্যমাত্র। এমন-কি, উহাতে কাজের ক্ষতিও হয়। প্রেম অনেক সময় আপন স্বাধীনতাগর্বে আমাদের কাজ বিগড়াইয়া দেয়— তবু প্রকৃতি উহাকে ধ্বংস করিতে পারে না, শাসন করিয়া নির্জীব করিতে পারে না। থাকিয়া থাকিয়া প্রচণ্ডবলে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করিয়া বসে। এমন-কি, প্রকৃতির ন্যায্য শাসনও অনেক সময়ে তাহার অসহ্য বোধ হয়। সে যেন বলে, আমি দেবকুমার, পরিপূর্ণ অক্ষয় স্বাধীনতাই আমার পিতৃভবন— সেইখানকার জন্যই সর্বদা আমার প্রাণ কাঁদিতেছে— এই মর্ত্য প্রকৃতির শাসন আমি মানিব না। জগৎ কে, সমাজ কে, লোকাচার কে! আমি যদি বলি, যাও— আমি তোমাদিগকে মানিতে চাহি না, তবে বড়ো জোর, আমাকে প্রাণে বিনাশ করিতে পারে, কিন্তু আমার সেই প্রবল স্বাধীন ইচ্ছাকে তো বাঁধিতে পারে না! সেই প্রেমের, সেই স্বাধীনতার মধ্যে একটি মরণাতীত দৈবভাব জাজ্জ্বল্যরূপে অনুভব করিতে পারি বলিয়াই তাহার খাতিরে অনেক সময়ে প্রাণকে তুচ্ছজ্ঞান করি, নহিলে প্রাণটা বড়ো সামান্য জিনিস নহে!

রচনা : [১৫] অক্টোবর ১৮৮৯
ভারতী ও বালক
শ্রাবণ ১২৯৯

বাংলা সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা

[শেষাংশ]

যাহা অসম্ভব তাহা প্রত্যাশা করা অজ্ঞতার লক্ষণ। বহু যুগের চিন্তাস্তরের উপর ইংরাজি সাহিত্য নির্মিত, বঙ্গসাহিত্য যতই শির উত্তোলন করুক একেবারেই তাহার সমকক্ষ হইতে পারিবে না। অতএব তুলনা করিবার সময় ইংরাজি সাহিত্য হইতে তাহার সেই উচ্চ সুবিধাটুকু হরণ করিয়া লইয়া দেখিতে হয়।

আমরা ইংরাজি সাহিত্য হইতে যাহা-কিছু শিক্ষা পাইতেছি তাহার একেবারে আরম্ভ হইতে বাংলা ভাষায় নূতন করিয়া চিন্তা করিয়া লইতে হইতেছে। ইংরাজিতে সেগুলা হয়তো অত্যন্ত গোড়াকার কথা, এবং সমালোচকের চক্ষে তাহা যৎসামান্য ও নূতন [নহে] কিন্তু বাংলায় তাহা নূতন আবিষ্কৃত। নূতন আবিষ্কারের মধ্যে যে তেজ ও উজ্জ্বলতা থাকে উক্ত সামান্য কথাগুলিও বাংলায় সেই মহিমা লাভ করে। পুরাতন কথা নূতন হৃদয়ের মধ্যে সদ্য পুনর্জন্ম লাভ করিয়া নবজীবন প্রাপ্ত হয়। বর্তমান কালে ইংরাজি ভাষার অধিকাংশ লেখক নির্মাণ কার্যে নিযুক্ত আছেন, অর্থাৎ পুরাতন পরিচিত ভাবগুলি লইয়া বিচিত্র আকারে বিন্যাস করিতেছেন মাত্র। বঙ্গ ভাষায় সৃষ্টি করিতে হইতেছে, সুতরাং অন্য সাহিত্যের ক্ষুদ্র কথাটিও বাংলা ভাষায় অত্যন্ত মহৎ। আমাদের হৃদয়ে বিবিধ কর্মকাণ্ডের সংঘর্ষজনিত প্রবল আবেগ নাই বটে তথাপি যেটুকু উত্তাপ আছে তাহাই অনুরাগভরে সঞ্চারিত করিয়া Fossil সত্যগুলিকে পুনর্জীবিত করিয়া তুলিতেছি। যাঁহাদের লেখনীমুখে বঙ্গভাষায় সেই অর্ধজড়ত্বপ্রাপ্ত যৌবনহারা সত্যগুলি নববসন্ততাপে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে, তাঁহারা সেই সৃজনের আনন্দে পুঁথিপড়া সমালোচকের উপেক্ষাকে উপেক্ষা করিতে পারেন।

বঙ্গদেশে প্রকৃত সাহিত্যের সমালোচনা করিতে পারেন এমন কয়জন লোক আছেন। কেহ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রচলিত বাংলা ভাষায় 'জ্যেঠামি' নামক একটি শব্দ আছে সেটি শ্রুতিমধুর নহে; কিন্তু আমাদের সমালোচনাকে আর কোনো নাম দেওয়া যায় না। যে ছেলে বুড়োদের মতো পাকা কথা কহে তাহাকে আমরা জ্যাঠা বলি। অর্থাৎ যাহার অভিজ্ঞতা নাই অথচ অভিজ্ঞতার বচনগুলি আছে সেই জ্যাঠা। বঙ্গদেশে আমাদের কোনো সাহিত্যের প্রকৃত অভিজ্ঞতা নাই। ইংরাজি সাহিত্য আমরা বই পড়িয়া জানি এবং বঙ্গসাহিত্য এখনো নূতন উর্বরা দ্বীপের ন্যায় অজ্ঞাত সমুদ্রগর্ভ হইতে সম্পূর্ণ জাগিয়া উঠে নাই। আমরা কোনো জীবনচঞ্চল সাহিত্যের সৃজনকার্যের মধ্যে থাকিয়া মানুষ হইয়া উঠি নাই। সুতরাং সাহিত্যের সেই অমোঘ নাড়িজ্ঞানটুকু আমরা লাভ করিতে পারি নাই। আমরা সাবধানে ভয়ে ভয়ে তুলনা করিয়া পুঁথি মিলাইয়া বিচার করি। কিন্তু সাহিত্যের ন্যায় জীবন্ত বস্তুর পক্ষে এরূপ নির্জীব বিচারপ্রণালী একেবারেই অসংগত। প্রতিক্ষণেই তাহার মধ্যে এত বিচিত্র আকার ও আলোকছায়ার সমাবেশ হইতেছে যে অলক্ষিতে বহুকালসঞ্চিত আন্তরিক সজাগ অভিজ্ঞতার দ্বারাই আমরা তাহার বিচার করিতে পারি।

চিত্রবিদ্যাই বল কবিত্বই বল এক হিসাবে প্রকৃতির সমালোচনা। চিত্রশিল্পী প্রকৃতির সহস্র আকারসংযোগের মধ্যে চিত্রপটের জন্য একটি বিশেষ অংশ নির্বাচন করিয়া লয়, কবি অন্তর ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে বিশেষ একটি দৃশ্য কল্পনার আলোকে আলোকিত করিয়া লয়; এই নির্বাচনের উপরেই তাহাদের অমরত্ব নির্ভর করে। এই নির্বাচনেই কবি ও শিল্পীর সমালোচনশক্তি প্রকাশ পায়। বহুকাল হইতে অলক্ষিতে নিজের জীবনের মর্মমধ্যে প্রকৃতির যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহা হইতেই তাঁহারা এই অভ্রান্ত সমালোচনপটুত্ব লাভ করিয়াছেন। যদি তাঁহারা প্রকৃতির মধ্যে বাস না করিয়া প্রকৃতির সতত আবর্তিত পরিবর্তিত জীবন্ত শক্তির মধ্যে মানুষ না হইয়া কেবল অলংকারশাস্ত্র ও সমালোচনার গ্রন্থ পাঠ করিতেন তবে তাঁহারা কি আন্তরিক

নিপুণতা লাভ করিতেন? তেমনি জীবন্ত সাহিত্যের প্রাণশক্তি যেখানে বর্তমান থাকিয়া কার্য করিতেছে সেইখানে সংলগ্নভাবে থাকিলে তবেই যথার্থ অন্তরের মধ্যে সেই অভ্রান্ত সাহিত্য-অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় ও সমালোচনা করিবার ক্ষমতা জন্মে। তখন আর পুঁথি মিলাইয়া কাজ করিতে হয় না, তখন আর তর্জমা করিয়া পরখ করিতে হয় না, তখন নূতন সৃষ্টি নূতন সৌন্দর্য দেখিলে অগাধ সমুদ্রে পড়িতে হয় না, তখন কল্পনারাজ্যের নূতন পুরাতন সকলেরই সহিত চক্ষের নিমেষে কী এক মন্ত্রের [বলে] পরিচয় হইয়া যায়।

২৪।৩।৯০ (আজ সু [রেনরা] সোলাপুর যাচ্ছে)—
পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক
[১২ চৈত্র ১২৯৬]

[কাব্য]

কাব্যের আসল জিনিস কোন্‌টা তাহা লইয়া সর্বদাই বকাবকি হইয়া থাকে কিন্তু প্রায় কোনো মীমাংসা হয় না। এ সম্বন্ধে আমার মত আমি সংগীত ও কবিতা নামক প্রবন্ধে বাল্যকালে লিখিয়াছিলাম, এই খাতায় সংক্ষেপে তাহারই পুনরুক্তি করিতে বসিলাম।

... এইখানে আমি এমন একটা কথা বলিতে চাহি যাহা শুনিতে অত্যন্ত বাষ্পময় কাল্পনিক মনে হইতে পারে কিন্তু যাহা আমি একান্ত প্রকৃত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি।— জগতের সমস্ত বিষয়ের মধ্যেই অসীমতা আছে; যাহাকে আমরা সুন্দর বলিয়া অনুভব করি এবং ভালোবাসি, তাহার মধ্যেই সেই অসীমতা আমরা কিয়ৎ পরিমাণে উপভোগ করিতে পারি। অতএব কোনো সৌন্দর্য সম্বন্ধে কেহ শেষ কথা বলিতে পারে না। কোনো ফুলের সম্বন্ধে পৃথিবীর আদি কবি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে তিনি তাহার সৌন্দর্যের শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার পরবর্তী কবি যদি আরও কিছু বলিয়া থাকেন তবে তাহা সেই ক্ষুদ্র ফুলের পক্ষে অধিক হয় না। বিষয়টা একই এবং পুরাতন কিন্তু আদিকাল হইতে এখনো পর্যন্ত মানুষ তাহার নূতনত্ব শেষ করিতে পারে নাই! আমি একটি তুচ্ছ ফুল সম্বন্ধে যতটা কথা বলিতে পারি, কোনো কবি তাহার অপেক্ষা ঢের বেশি বলিলেও যদি কথাটা অকৃত্রিম সুন্দররূপে প্রকাশ করা হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমার মনে হইবে, বটে, বটে, ফুল সম্বন্ধে এতটা কথা বলা যাইতে পারে বটে! আমি যে এতদিন স্বীকার করি নাই, তাহাতে ফুলের খর্বতা নাই আমারই খর্বতা। ফুল আপনার মধ্যে অসীমতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া সুন্দর হইয়া দাঁড়াইয়া আছে— যাহার যতটা ক্ষমতা সে ততটা অনুভব করে।

অতএব এখানে বিষয় লইয়া কথা নহে, প্রকাশ লইয়া কথা। জুঁইফুল সুন্দর এ কথা বড়ো কবিও জানে ছোটো কবিও জানে, অকবিও জানে— কিন্তু যে যত.ভালো করিয়া প্রকাশ করে জুঁইফুলকে সে তত অধিক করিয়া আমার হাতে আনিয়া দেয়।

কেবল তাহাই নয়। কারণ, যদি কেবল তাহাই হইত, তাহা হইলে জুঁইফুল সম্বন্ধে সবচেয়ে বড়ো কবির কবিতা পড়িয়া তৎসম্বন্ধে আর-কোনো কবির রচনা পড়া অনাবশ্যক ও বিরক্তিজনক হইত।

কিন্তু ফুলের মধ্যে অসীমতা আছে বলিয়াই শ্রেষ্ঠ কবির কবিতায় তাহার অগাধ গভীরতা এবং ভালো মন্দ সহস্র কবির কবিতায় তাহার অপার বিস্তৃতি অনুভব করি। দেখিতে পাই, কালের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে এবং মানবের মধ্যে অনেক বৈচিত্র্য আছে কিন্তু তথাপি সর্বকালে সর্বকবির মধ্যে এই ফুলের সমাদর। এইজন্য এক কবির পরে আর-এক কবি যখন একই পুরাতন কথা বলে তখন ফুলের অসীমতার প্রতি আমরা আরও একটু নূতন করিয়া অগ্রসর হই।

ফুলের মধ্যে প্রবেশ করিবার একটিমাত্র পথ আছে— তাহার বাহ্যিক সৌন্দর্য; আমাদের সমগ্র মানবত্ব তাহার মধ্যে আপনার স্থান করিয়া লইবার উপায় পায় না; এইজন্য ফুলে আমাদের আংশিক আনন্দ। কোনো কোনো কবির কবিতায় এই ফুলকে কেবলমাত্র জড়সৌন্দর্যভাবে না দেখিয়া ইহার মধ্যে আমাদের অনুরূপ মনোভাব এবং আত্মা কল্পনা করিয়া লইয়া আমাদের আনন্দ অপেক্ষাকৃত সংগতি প্রাপ্ত হয়।

যাহাদের কিছুমাত্র কল্পনাশক্তি আছে তাহারা সৌন্দর্যকে নির্জীবভাবে দেখিতে পারে না। কারণ, সৌন্দর্য বিষয়ের একটা অতিরিক্ত পদার্থ— তাহা তাহার আবশ্যকীয় নহে। এইজন্য মনে হয় সৌন্দর্যের মধ্যে যেন একটা ইচ্ছাশক্তি, একটা আনন্দ, একটা আত্মা আছে। ফুলের আত্মা যেন সৌন্দর্যে বিকশিত ও প্রফুল্ল হইয়া উঠে, জগতের আত্মা যেন অপার বহিঃসৌন্দর্যে আপনাকে প্রকাশ করে। অন্তরের অসীমতা যেখানে বাহিরে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারিয়াছে সেইখানেই যেন সৌন্দর্য— সেই প্রকাশ যেখানে যত অসম্পূর্ণ সেইখানে তত সৌন্দর্যের অভাব, রূঢ়তা, জড়তা, চেষ্টা, দ্বিধা ও সর্বাঙ্গীণ অসামঞ্জস্য।

সে যাহাই হউক, ফুলের মধ্যে আমাদের সম্পূর্ণ আত্মপরিতৃপ্তি সম্ভবে না। এইজন্য কেবলমাত্র ফুলের কবিতা সাহিত্যে সর্বোচ্চ সমাদর পাইতে পারে না। আমরা যে কবিতায় একত্রে যত অধিক চিত্তবৃত্তির চরিতার্থতা লাভ করি তাহাকে ততই উচ্চশ্রেণীয় কবিতা বলিয়া সম্মান করি। সাধারণত স্বভাবত যে জিনিসে আমাদের একটিমাত্র বা অল্পসংখ্যক চিত্তবৃত্তির তৃপ্তি হয় কবি যদি তাহাকে এমনভাবে দাঁড় করাইতে পারেন যাহাতে তাহার মধ্যে আমাদের অধিকসংখ্যক চিত্তবৃত্তির চরিতার্থতা লাভ হয় তবে সে কবি আমাদের আনন্দের একটি নূতন উপায় আবিষ্কার করিয়া দিলেন বলিয়া তাঁহাকে সাধুবাদ দিই। বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে আত্মার সৌন্দর্য সংযোগ করিয়া কবি Wordsworth এই কারণে আমাদের নিকট এত সম্মানাস্পদ হইয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে আমার একটি কথা মনে পড়িতেছে। একদিন চৈতন্য লাইব্রেরিতে একজন কাব্যরসসন্দিগ্ধ ব্যক্তি আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "আচ্ছা মহাশয়, বসন্তকালে বা জ্যোৎস্নারাত্রে লোকের মনে বিরহের ভাব কেন উদয় হইবে আমি তো কিছু বুঝিতে পারি না। গাছপালা ফুল পাখি প্রভৃতি ভালো ভালো জিনিসে মানুষ খুশি হইয়া যাইবে ইহা বুঝিতে পারি, কিন্তু বিরহব্যথায় চঞ্চল হইয়া উঠিবে ইহার কারণ পাওয়া যায় না।"

ইহার উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম— প্রকৃতির যে-সকল সৌন্দর্যে আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে মানবের পক্ষে তাহা আংশিক। জ্যোৎস্না কেবল দেখিতে পাই, পাখির গান কেবল শুনিতে পাই, ফুল আমাদের বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারে আসিয়া প্রতিহত হয়। উপভোগের আকাঙ্ক্ষামাত্র জাগ্রত করিয়া দেয়, তাহার পরিতৃপ্তির পথ দেখায় না। তখন মানবের মন স্বভাবতই মানবের জন্য ব্যাকুল হয়। কারণ, মানব ভিন্ন আর কোথাও একাধারে মানবের দেহ মন আত্মার চরম আকাঙ্ক্ষাতৃপ্তির স্থান নাই। এইজন্যই বসন্তে জ্যোৎস্নারাত্রে বাঁশির গানে বিরহ।

এইজন্য প্রেমের গানে চিরনূতনত্ব। প্রেম সমগ্র মানবপ্রকৃতিকে একেবারে কেন্দ্রস্থলে আকর্ষণ করে। এককালে তাহার দেহ মন আত্মায় পরিপূর্ণ টান পড়ে। এইজন্য পৃথিবীর অধিকাংশ কবিতাই প্রেমের— এবং সাধারণত প্রেমের কবিতাতেই মানুষকে অধিক মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

আমার মতে সবসুদ্ধ এই দাঁড়াইতেছে নূতন আনন্দ আবিষ্কার করিয়া ও পুরাতন আনন্দ ব্যক্ত করিয়া কবিতা আমাদের নিকট মর্যাদা লাভ করে। নূতন সত্য আবিষ্কার করিয়া বা পুরাতন সত্য ব্যাখ্যা করিয়া নহে।

১২।১।৯১
বির্জিতলাও

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক

একটি পত্র

সহৃদয়েষু— অল্পদিন হইল, আমি কোনো কাব্য সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ কোনো কাগজে বাহির করিয়াছিলাম। সেটা পড়িয়া আপনি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। আপনার মতে এরূপ লেখাকে রীতিমতো সমালোচনা বলা যায় না। আমার বক্তব্য এই যে, আমার সেই লেখাটুকুকে সমালোচনা না বলিয়া আর কোনো উপযুক্ত নাম দিলে যদি তাহার ভাব গ্রহণের অধিকতর সুবিধা হয়, আমার তাহাতে আপত্তি থাকিতে পারে না। আমি দেখিয়াছি, সমালোচক অনেক সময়ে নিজের নামকরণের সহিত নিজে বিবাদ করিয়া লেখকের উপর বিরক্ত হইয়া উঠেন। পুত্রমাত্রকেই পদ্মলোচন নাম দেওয়া যায় না— যদি মোহবশত অপাত্রে উক্ত নাম প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, এবং যদি সেই নামধারী দুর্ভাগ্য ব্যক্তি চক্ষুর আয়তির অপেক্ষা নাসার দৈর্ঘ্যের জন্য বিখ্যাত হইয়া পড়ে, তবে তাহার উপর রাগ করা সংগত হয় না।

সমালোচনা বলিতে যদি বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, মনস্তত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি ব্যায়ামপটু দলবল লইয়া কাব্যের অন্তঃপুর আক্রমণ বুঝায়, তবে আমার দ্বারা তাহা অসম্ভব। আমি এইটুকু বলিতে পারি, আমার কাছে কেমন লাগিল। আমি একজন মানুষ, আমার এক প্রকার বিশেষ মনের গঠন; বিশেষ কাব্যপাঠে আমার মনে যে ভাবোদয় হয়, আমি তাহাই প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি— কীরূপ ভাবোদয় হওয়া উচিত ছিল, তাহা আমি নির্ভয়ে সাহসপূর্বক বলিতে পারি না— যিনি বিশেষ কৌশলপূর্বক নিজেকে নিজে লঙ্ঘন করিতে পারেন, যিনি নিজের চেয়ে নিজে বেশি বুঝেন, তিনিই সে বিষয়ে নির্ভুল মত দিতে পারেন।

আমার অনেক সময়ে মনে হয়, ভূমিকা এবং উপসংহার ফাঁদিয়া আগাগোড়া মিল করিয়া বড়ো বড়ো প্রবন্ধ লেখা মনুষ্য-সমাজে প্রচলিত হওয়াতে পৃথিবীতে অনেক বাজে কথা এবং মিথ্যা কথার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের উপর মানুষের একটি বর্বর অনুরক্তি আছে— এইজন্য প্রায় সকল জিনিসেরই গজে মাপিয়া মূল্য স্থির হয়। এই কারণেই সকল কথা বড়ো করিয়া বলিতে হয়। কিন্তু সত্য রবারের মতো স্থিতিস্থাপক পদার্থ নয়। বরঞ্চ তাহাকে বাড়াইতে গেলেই কমাইতে হয়। খাঁটিকে খাঁটি করিতে হইলে তাহাকে যেমনটি তেমনই রাখিতে হয়, ওজন বাড়াইবার জন্য তাহাতে যতই জল মিশানো যায়, ততই তাহার দর কমিয়া আইসে।

একটি কাব্যগ্রন্থ যখন ভালো লাগে, তখন তাহার সম্বন্ধে বেশি কথা বলা কতই শক্ত! ঠিক মনের কথা, তাহা লিখিলে রীতিমতো প্রবন্ধ কিংবা গ্রন্থ হয় না। এইজন্য বসিয়া বসিয়া, ভাবিয়া ভাবিয়া, পরিচ্ছেদের উপর পরিচ্ছেদ স্তূপাকার করিয়া, তত্ত্বের উপর তত্ত্ব আকর্ষণ করিয়া, নিজের মানসিক পরিশ্রমের একটা কীর্তিস্তম্ভ নির্মাণ করিয়া, সেটাকে খুব একটা উন্নত সত্য বলিয়া মনে হয়। বেশি পরিশ্রমের ধনকে বেশি গৌরবের বলিয়া মনে হয়। মাঝের হইতে যেটি ঠিক সত্য, যেটি আসল কথা, সেটি স্তূপের মধ্যে চাপা পড়ে।

ঠিক সত্য মানে কী? কাব্যসম্বন্ধীয় সত্য বৈজ্ঞানিক সত্য নহে। পাঁচ-সাতশো প্রমাণ তাহার প্রমাণ নহে। হৃদয়ই তাহার প্রমাণ। আমি যতটুকু ঠিক অনুভব করি, ততটুকু সত্য। অবশ্য শিক্ষা এবং প্রকৃতিগুণে কোনো কোনো সহৃদয় বিশেষরূপে কাব্যরসজ্ঞ, এবং তাঁহাদের পরীক্ষিত সিদ্ধান্ত সাহিত্যপ্রিয় লোকদের নিকট চিরকাল সমাদৃত হয়। অপর পক্ষে কোনো কোনো হৃদয়ে কাব্যের জ্যোতি রীতিমতো প্রতিফলিত হইবার মতো স্বচ্ছতা নাই, কিন্তু যেমনই হউক, কাব্যসম্বন্ধে নিজের নিজের ভাব ব্যক্ত করা ছাড়া আর কিছু সম্ভব হয় না।

কোনো কোনো ইংরাজ লেখক বলেন, সমালোচনা একটি বিশেষ ব্যবসায়, ইহার জন্য বিশেষ শিক্ষা আবশ্যক। প্রকৃত সমালোচককে নিজের ব্যক্তিত্ব বিসর্জন করিয়া, নিজের ভালোমন্দ-লাগাকে খাতির না করিয়া, বিচার করিতে হইবে। অর্থাৎ অকূল পাথারে লেখনী ভাসাইতে হইবে।

এ কথা অস্বীকার করা যায় না, একজন অশিক্ষিত লোকের যাহা ভালো লাগে, শিক্ষিত লোকের তাহা ভালো লাগে না, এবং অশিক্ষিত লোকের যেখানে অধিকার নাই, শিক্ষিত লোকের সেখানে বিহারস্থল। অর্থাৎ বুনো আমগাছ মাটি এবং বাতাস হইতে যথেষ্ট পরিমাণ শর্করা সংগ্রহ করিতে পারে না, কিন্তু বহুকাল চাষের গুণে সেই গাছের এমন একটা পরিবর্তন হয় যে, মিষ্ট রস উৎপাদন করা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া পড়ে।

কিন্তু দুই গাছই একই পদ্ধতি অনুসারে ফল ফলায়। উভয়েই নিজের ভিতর হইতে কাজ করে।

কাব্য-সমালোচনা-সম্বন্ধেও শিক্ষিত অশিক্ষিত নিজের হৃদয় দ্বারা রস গ্রহণ করে, তবে অবস্থা-গতিকে হৃদয়ের পার্থক্য জন্মিয়াছে। বিজ্ঞানের মীমাংসার স্থল বহির্জগতে; কাব্যের মীমাংসার স্থল নিজের অন্তর ব্যতীত আর-কোথাও হইতে পারে না।

এইজন্য কাব্যসমালোচনা ব্যক্তিগত। চাঁদের আলো পদ্মার বালুচরের উপর পড়িয়া একরূপ আকার ধারণ করে, নদীর জলের উপর পড়িয়া আর-একরূপ ভাব ধারণ করে, আবার ওপারের ঘনসন্নিবিষ্ট বনভূমির মধ্যে পড়িয়া আর-এক রূপে প্রতিভাত হয়। চন্দ্রালোকের মধ্যে যে কাব্যরস আছে, ইহাই তাহার তিন প্রকার সমালোচনা। কিন্তু ইহা পাত্রগত, তাহার আর সন্দেহ নাই। তথাপি চন্দ্রালোকের কবিত্ব হিসাবে তিনই সত্য। চন্দ্রালোককে দেশকালপাত্র হইতে উঠাইয়া লইয়া, তাহার অতি বিশুদ্ধ নিরপেক্ষ সমালোচনা করিতে হইলে, তাহার কবিত্ব ছাঁটিয়া দিতে হয়। তখন তাহা হইতে কেবল বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাই সম্ভব।

আরও একটি কথা আছে। বিশেষ কাব্য সম্বন্ধে আমি যে-কোনো তত্ত্বকথা লিখি, তাহা কালক্রমে মিথ্যা হইবার কোনো আটক নাই, কিন্তু আমার কেমন লাগিল, তাহা কোনো কালে মিথ্যা হইবার জো নাই। আমি যদি এমন করিয়া লিখিতে পারি, যাহাতে আমার ভালোমন্দ-লাগা অধিকাংশ যোগ্য লোকের মনে সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারি, তবে সেটা একটা স্থায়ী সাহিত্য হইয়া দাঁড়ায়; কিন্তু আমি যদি একটা ভ্রান্তমত অধিকাংশ সাময়িক লোকের মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে পারি, তথাপি সেটা স্থায়ী হয় না। মনে করুন, আমি যদি প্রমাণ করিয়া দিই যে, কুমারসম্ভব সাংখ্য মতের একটি সুচতুর ব্যাখ্যা, অতএব তাহা একটি শ্রেষ্ঠ কাব্য, তবে তাহা বর্তমান কালের স্বদেশবৎসল দার্শনিকবর্গের যতই মুখরোচক হউক, সাময়িক ভাব ও মতের পরিবর্তনকালে তাহার কোনো মূল্য থাকিবে না। কিন্তু তাঁহার কাব্যাংশ আমার যে কতখানি ভালো লাগে, আমি যদি ভালো করিয়া ব্যক্ত করিতে পারি, আমি যদি সুন্দর করিয়া বলিতে পারি, আহা কুমারসম্ভব কী সুন্দর, তবে সে কথা কোনো কালে অমূলক হইয়া যাইবে না।

কিন্তু আমি আত্মরক্ষা করিতে গিয়া অন্যকে আক্রমণ করিতে চাহি না। যাঁহারা বুদ্ধি দিয়া কাব্যকে বিশ্লিষ্ট করিয়া সমালোচনা করেন, তাঁহাদিগকে নিন্দা করি না। যখন মানব-হৃদয় হইতে কাব্য প্রসূত, তখন কাব্যের মধ্যে ইতিহাস সমাজনীতি মনস্তত্ত্ব সমস্তই জড়িত আছে বলিয়াই কাব্য ন্যূনাধিক পরিমাণে আমাদের ভালো লাগে; অতএব কৌতূহলী লোকদিগের শিক্ষার জন্য সেগুলিকে টুকরা টুকরা করিয়া দেখানো দোষের নহে।

শুদ্ধ আমার বক্তব্য এই যে, সমালোচনা কেবল ইহাকেই বলে না। কেবল কাব্যের উপাদান আবিষ্কার করিলেই হইবে না; কাব্যকে উপভোগ করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। কোমর বাঁধিয়া নহে, তর্ক করিয়াও নহে। হৃদয়ের ভাব যে উপায়ে এক হৃদয় হইতে অন্য হৃদয়ে সংক্রামিত হয়, সেই পদ্ধতিতে অর্থাৎ ঠিক আন্তরিক ভাবটুকু অন্তরের সহিত ব্যক্ত করা। নিজের হৃদয়পটে কাব্যকে প্রতিফলিত করিয়া দেখানো। তালিকার পরিবর্তে চিত্র, তত্ত্বের পরিবর্তে ভাব প্রকাশ করা।

সাহিত্য
কার্তিক ১২৯৯

বাংলা লেখক

লেখকদিগের মনে যতই অভিমান থাক্, এ কথা অস্বীকার করিবার জো নাই যে, আমাদের দেশে পাঠক-সংখ্যা অতি যৎসামান্য। এবং তাহার মধ্যে এমন পাঠক 'কোটিকে গুটিক' মেলে কি না সন্দেহ, যাঁহারা কোনো প্রবন্ধ পড়িয়া, কোনো সুযুক্তি করিয়া আপন জীবনযাত্রার লেশমাত্র পরিবর্তন সাধন করেন। নির্জীব নিঃস্বত্ব লোকের পক্ষে সুবিধাই একমাত্র কর্ণধার, সে কর্ণের প্রতি আর কাহারও কোনো অধিকার নাই।

পাঠকের এই অচল অসাড়তা লেখকের লেখার উপরও আপন প্রভাব বিস্তার করে। লেখকেরা কিছুমাত্র দায়িত্ব অনুভব করেন না। সত্য কথা বলা অপেক্ষা চতুর কথা বলিতে ভালোবাসেন। সুবিজ্ঞ গুরু, হিতৈষী বন্ধু, অথবা জিজ্ঞাসু শিষ্যের ন্যায় প্রসঙ্গের আলোচনা করেন না, কূটবুদ্ধি উকিলের ন্যায় কেবল কথার কৌশল এবং ভাবের ভেলকি খেলাইতে থাকেন।

এখন দাঁড়াইয়াছে এই— যে যার আপন আপন সুবিধার সুখশয্যায় শয়ান, লেখকদিগের কার্য, স্ব স্ব দলের বৈতালিক বৃত্তি করিয়া সুমিষ্ট স্তবগানে তাঁহাদের নিদ্রাকর্ষণ করিয়া নেওয়া।

মাঝে মাঝে দুই দলের লেখক রঙ্গভূমিতে নামিয়া লড়াই করিয়া থাকেন এবং দ্বন্দ্বযুদ্ধের যত কৌশল দেখাইতে পারেন ততই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট বাহবা লাভ করিয়া হাস্যমুখে গৃহে ফিরিয়া যান।

লেখকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা হীনবৃত্তি আর কিছু হইতে পারে না। এই বিনা বেতনে চাটুকার এবং জাদুকরের কাজ করিয়া আমরা সমস্ত সাহিত্যের চরিত্র নষ্ট করিয়া দিই।

মানুষ যেমন চরিত্রবলে অনেক দুরূহ কাজ করে, অনেক অসাধ্য সাধন করে, যাহাকে কোনো যুক্তি, কোনো শক্তির দ্বারা বশ করা যায় না তাহাকেও চরিত্রের দ্বারা চালিত করে, এবং দীপস্তম্ভের নির্নিমেষ শিখার ন্যায় সংসারের অনির্দিষ্ট পথের মধ্যে জ্যোতির্ময় ধ্রুব নির্দেশ প্রদর্শন করে-- সাহিত্যেরও সেইরূপ একটা চরিত্র আছে। সে চরিত্র, কৌশল নহে, তার্কিকতা নহে, আস্ফালন নহে, দলাদলির জয়গান নহে, তাহা অন্তর্নিহিত নির্ভীক, নিশ্চল জ্যোতির্ময় সত্যের দীপ্তি।

আমাদের দেশে পাঠক নাই, ভাবের প্রতি আন্তরিক আস্থা নাই, যাহা চলিয়া আসিতেছে তাহাই চলিয়া যাইতেছে, কোনো কিছুতে কাহারও বাস্তবিক বেদনাবোধ নাই; এরূপ স্থলে লেখকদের অনেক কথাই অরণ্যে ক্রন্দন হইবে এবং অনেক সময়েই আদরের অপেক্ষা অপমান বেশি মিলিবে।

এক হিসাবে অন্য দেশ অপেক্ষা আমাদের এ দেশে লেখকের কাজ চালানো অনেক সহজ। লেখার সহিত কোনো যথার্থ দায়িত্ব না থাকাতে কেহ কিছুতেই তেমন আপত্তি করে না। ভুল লিখিলে কেহ সংশোধন করে না, মিথ্যা লিখিলে কেহ প্রতিবাদ করে না, নিতান্ত ছেলেখেলা করিয়া গেলেও তাহা ''প্রথম শ্রেণীর'' ছাপার কাগজে প্রকাশিত হয়। বন্ধুরা বন্ধুকে অম্লানমুখে উৎসাহিত করিয়া যায়, শত্রুরা রীতিমতো নিন্দা করিতে বসা অনর্থক পণ্ডশ্রম মনে করে।

সকলেই জানেন, বাঙালির নিকটে বাংলা লেখার, এমন-কি, লেখামাত্রেরই এমন কোনো কার্যকারিতা নাই, যেজন্য কোনোরূপ কষ্ট স্বীকার করা যায়। পাঠকেরা কেবল যতটুকু আমোদ বোধ করে ততটুকু চোখ বুলাইয়া যায়, যতটুকু নিজের সংস্কারের সহিত মেলে ততটুকু গ্রহণ করে, বাকিটুকু চোখ চাহিয়া দেখেও না। সেইজন্য যে-সে লোক যেমন-তেমন লেখা লিখিলেও চলিয়া যায়।

অন্যত্র, যে দেশের লোকে ভাবের কার্যকরী অস্তিত্ব স্বীকার করে, যাহারা কেবলমাত্র সংস্কার সুবিধা ও অভ্যাসের দ্বারাই বদ্ধ নহে, যাহারা স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারাও কিয়ৎপরিমাণে স্বহস্তে জীবন গঠিত করে, সুন্দর কাব্যে, প্রবল বাগ্মিতায়, সুসংলগ্ন যুক্তিতে যাহাদিগকে বাস্তবিকই

বিচলিত করে, তাহাদের দেশে লেখক হওয়া সহজ নহে। কারণ, লেখা সেখানে খেলা নহে, সেখানে সত্য। এইজন্য লেখার চরিত্রের প্রতি সেখানকার পাঠকদের সর্বদা সতর্ক তীব্র দৃষ্টি। লেখা সম্বন্ধে সেখানে কোনো আলস্য নাই। লেখকেরা সযত্নে লেখে, পাঠকেরা সযত্নে পাঠ করে। মিথ্যা দেখিলে কেহ মার্জনা করে না, শৈথিল্য দেখিলে কেহ সহ্য করে না। প্রতিবাদযোগ্য কথামাত্রের প্রতিবাদ হয় এবং আলোচনাযোগ্য কথামাত্রেরই আলোচনা হইয়া থাকে।

কিন্তু এ দেশে লেখার প্রতি সাধারণের এমনি সুগভীর অশ্রদ্ধা যে, কেহ যদি আন্তরিক আবেগের সহিত কাহারও প্রতিবাদ করে, তবে লোকে আশ্চর্য হইয়া যায়। ভাবে সময় নষ্ট করিয়া এত বড়ো একটা অনাবশ্যক কাজ করিবার কী এমন প্রয়োজন ঘটিয়াছিল! অনর্থক কেবল লোকটার মনে আঘাত দেওয়া! তবে নিশ্চয়ই বাদীর সহিত প্রতিবাদীর একটা গোপন বিবাদ ছিল, এই অবসরে তাহার প্রতিশোধ লইল।

কিন্তু যে কারণে, এক হিসাবে, এখানে লেখক হওয়া সহজ, সেই কারণেই, অন্য হিসাবে, এখানে লেখকের কর্তব্য পালন করা অত্যন্ত কঠিন। এখানে লেখকে পাঠকে পরস্পরের সহায়তা করে না। লেখককে একমাত্র নিজের বলে দাঁড়াইতে হয়। যেখানে কোনো লোক সত্য শুনিবার জন্য তিলমাত্র ব্যগ্র নহে, সেখানে আপন উৎসাহে সত্য বলিতে হয়। যেখানে লোকে কেবলমাত্র প্রিয়বাক্য শুনিতে চাহে, সেখানে নিতান্ত নিজের অনুরাগে তাহাদিগকে হিতবাক্য শুনাইতে হয়। যেখানে বহু-দর্শন থাকিলেও যা, না থাকিলেও তা, সযত্নে চিন্তা করিয়া কথা বলিলেও যা, অযত্নে রোখের মাথায় কথা বলিলেও তা— এবং অধিকাংশের নিকট শেষোক্ত কথারই অধিক আদর হয়, সেখানে কেবল নিজের শুভ ইচ্ছার দ্বারা চালিত হইয়া, চিন্তা করিয়া, সন্ধান করিয়া, বিবেচনা করিয়া কথা বলিতে হয়। চক্ষের সমক্ষে প্রতিদিন দেখিতে হইবে, বহু যত্ন, বহু আশার ধন সম্পূর্ণ অনাদরে নিষ্ফল হইয়া যাইতেছে; গুণ এবং দোষ, নৈপুণ্য এবং ত্রুটি সকলই সমান মূল্যে অর্থাৎ বিনামূল্যে পথপ্রান্তে পড়িয়া আছে; যে আশ্বাসে নির্ভর করিয়া পথে বাহির হওয়া গিয়াছিল, সে আশ্বাস প্রতিপদে ক্ষীণ হইতেছে অথচ পথ ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে— যথার্থ শ্রেষ্ঠতার আদর্শ একমাত্র নিজের অশ্রান্ত যত্নে সম্মুখে দৃঢ় এবং উজ্জ্বল করিয়া রাখিতে হইবে।

আমি বঙ্গদেশের হতভাগ্য লেখক-সম্প্রদায়ের হইয়া ক্রন্দনগীত গাহিতে বসি নাই। বিলাতের লেখকদের মতো আমাদের বহি বিক্রয় হয় না, আমাদের লেখা লোকে আদর করিয়া পড়ে না বলিয়া অভিমান করিয়া সময় নষ্ট করা নিতান্ত নিষ্ফল; কারণ, অভিমানের অশ্রুধারায় কঠিন পাঠকজাতির হৃদয় বিগলিত হয় না। আমি বলিতেছি, আমাদের লেখকদিগকে অতিরিক্তমাত্রায় চেষ্টান্বিত ও সতর্ক হইতে হইবে।

আমরা অনেকসময় অনিচ্ছাক্রমে অজ্ঞানত কর্তব্যভ্রষ্ট হই। যখন দেখি সত্য বলিয়া আশু কোনো ফল পাই না এবং প্রায়ই অনেকের অপ্রিয় হইতে হয়, তখন, অলক্ষিতে আমাদের, অন্তঃকরণ সেই দুরূহ কর্তব্যভার স্কন্ধ হইতে ফেলিয়া দিয়া নটের বেশ ধারণ করে। পাঠকদিগকে সত্যে বিশ্বাস করাইবার বিফল চেষ্টা ত্যাগ করিয়া চাতুরীতে চমৎকৃত করিয়া দিবার অভিলাষ জন্মে। ইহাতে কেবল অন্যকে চমৎকৃত করা হয় না, নিজেকেও চমৎকৃত করা হয়; নিজেও চাতুরীকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি।

একটা কথাকে যতক্ষণ না কাজে খাটানো হয়, ততক্ষণ তাহার নির্দিষ্ট সীমা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; ততক্ষণ তাহাকে ঘরে বসিয়া সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা মার্জনা করিতে করিতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম করিয়া তোলা যায়— ততক্ষণ এ পক্ষেও বিস্তর কথা বলা যায়, ও পক্ষেও কথার অভাব হয় না। আমাদের দেশে সেই কারণে অতিসূক্ষ্ম কথার এত প্রাদুর্ভাব। কারণ, কথা কথাতেই থাকিয়া যায়, তর্ক ক্রমে তর্কের সংঘর্ষণে উত্তরোত্তর শাণিতই হইতে থাকে, এবং সমস্ত কথাই বাষ্পাকারে এমন একটা লোকাতীত আধ্যাত্মিক রাজ্যে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দেওয়া হয় যেখানকার কোনো মীমাংসাই ইহলোক হইতে হইবার সম্ভাবনা নাই।

আমাদের দেশের অনেক খ্যাতনামা লেখকও পৃথিবীর ধারণাযোগ্য পদার্থসকলকে গুরুমন্ত্র পড়িয়া ধারণাতীত করিয়া অপূর্ব আধ্যাত্মিক কুহেলিকা নির্মাণ করিতেছেন। পাঠকেরা কেবল নৈপুণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতে আসিয়াছেন, তাহা লইয়া তাঁহারা গৃহকার্য করিবেন না, তাহাকে রীতিমতো আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া তাহার সীমা নির্ধারণ করাও দুঃসাধ্য, সুতরাং সে যে প্রতিদিন মেঘের মতো নব নব বিচিত্র আকার ধারণ করিয়া অলস লোকের অবসরযাপনের সহায়তা করিতেছে তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু এই বাষ্পগঠিত মেঘে কি মাঝে মাঝে সত্যকে ম্লান করিতেছে না? উদাহরণস্বরূপ কেবল উল্লেখ করি, চন্দ্রনাথবাবু তাহার "কড়াক্রান্তি" প্রসঙ্গে যেখানে মনুসংহিতা হইতে মাতৃসম্বন্ধে একটা নিরতিশয় কুৎসিত শ্লোক উদ্‌ধৃত করিয়া তাহা হইতে একটা বৃহৎ আধ্যাত্মিক বাষ্প সৃজন করিয়াছেন, সে কি কেবলমাত্র কথার কথা, রচনার কৌশল, সূক্ষ্মবুদ্ধির পরিচয়, আধ্যাত্মিক ওকালতি? সে কি মনুষ্যত্বের পবিত্রতম শুভ্রতম জ্যোতির উপরে নিঃসংকোচ স্পর্ধার সহিত কলঙ্ককালিমা লেপন করে নাই? অন্য কোনো দেশের পাঠক কি এরূপ নির্লজ্জ কদর্য তর্ক-চাতুরী সহ্য করিত?

আমরা সহ্য করি কেন? কারণ, আমাদের দেশে যে যেমন ইচ্ছা চিন্তা করুক, যে যেমন ইচ্ছা বিশ্বাস করুক, যে যেমন ইচ্ছা রচনা করুক, আমাদের কাজের সহিত তাহার যোগ নাই। অতএব আমরা অবিচলিতভাবে সকল কথাই শুনিয়া যাইতে পারি— তুমিও যেমন, উহাতে কাহার কী যায় আসে!

কিন্তু কেন কাহারও কিছু যায় আসে না! আমাদের সাহিত্যের মধ্যে চরিত্রবল নাই বলিয়া। যাহা অবহেলায় রচিত তাহা অবহেলার সামগ্রী। যাহাতে কেহ যথার্থ জীবনের সমস্ত অনুরাগ অর্পণ করে নাই, তাহা কখনো অমোঘ বলে কাহারও অন্তর আকর্ষণ করিতে পারিবে না।

এখন আমাদের লেখকদিগকে অন্তরের যথার্থ বিশ্বাসগুলিকে পরীক্ষা করিয়া চালাইতে হইবে, নিরলস এবং নির্ভীকভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে, আঘাত করিতে এবং আঘাত সহিতে কুণ্ঠিত হইলে চলিবে না।

একদিকে যেমন আমাদের কিছুতেই কিছু আসে যায় না, অন্য দিকে তেমনি আমাদের নিজের প্রতি তিলমাত্র কটাক্ষপাত হইলে গায়ে অত্যন্ত বাজে। ঘরের আদর অত্যন্ত অধিক পাইলে এই দশা হয়। নিজের অপেক্ষা আর কিছুকেই আদরণীয় মনে হয় না।

সেটা নিজের সম্বন্ধে যেমন, স্বদেশের সম্বন্ধেও তেমনিই। আদুরে ছেলের আত্মানুরাগ যেরূপ, আমাদের স্বদেশানুরাগ সেইরূপ। একটা যে হিতচেষ্টা কিংবা কঠিন কর্তব্যপালন তাহার নাম নাই— কেবল আহা উহু, কেবল কোলে কোলে নাচানো। কেবল কিছু গায়ে সয় না, কেবল চতুর্দিক ঘিরিয়া স্তবগান। কেহ যদি তাহার সম্বন্ধে একটা সামান্য অপ্রিয় কথা বলে, অমনি আদুরে স্বদেশানুরাগ ফুলিয়া ফাঁপিয়া কাঁদিয়া মুষ্টি উত্তোলন করিয়া অনর্থপাত করিয়া দেয়, অমনি তাহার মাতৃস্বসা এবং পিতৃস্বসা, তাহার মাতুলানী এবং পিতৃব্যানী মহা হাঁকডাক করিতে করিতে ছুটিয়া আসে এবং ছেলেটাকে কোলে তুলিয়া লইয়া, তাহার নাসাচক্ষু মোচন করিয়া তাহার চিরন্তন আদুরে নামগুলির পুনরাবৃত্তি করিয়া তাহার ব্যথিত হৃদয়ের সান্ত্বনা সাধন করে।

আমরা স্থির করিয়াছি, বাঙালির আত্মাভিমানকে নিশিদিন কোলে তুলিয়া নাচানো লেখকের প্রধান কর্তব্য নহে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে বয়স্ক সহযোগী ও প্রতিযোগীর সহিত আমরা যেরূপ ব্যবহার করি, তাহাদিগকে উচিত ভাবে প্রিয়বাক্যও বলি অপ্রিয় বাক্যও বলি, কিন্তু নিয়ত বাৎসল্য-গদগদ অত্যুক্তি প্রয়োগ করি না, স্বজাতি সম্বন্ধে সেইরূপ ব্যবহার করাই সুসংগত। আমরা আমাদের দেশের যথার্থ ভালো জিনিসগুলি লইয়া এত বাড়াবাড়ি করি, যে তাহাতে ভালো জিনিসের অমর্যাদা করা হয়। কালিদাস পৃথিবীর সকল কবির সেরা, মনুসংহিতা পৃথিবীর সকল সংহিতার শ্রেষ্ঠ, হিন্দুসমাজ পৃথিবীর সকল সমাজের উচ্চে— এরূপ করিয়া বলিয়া আমরা কালিদাস, মনুসংহিতা এবং হিন্দুসমাজের প্রতি মুরুব্বিয়ানা করি মাত্র। তাঁহারা যদি জীবিত ও উপস্থিত

থাকিতেন তাহা হইলে জোড়করে বলিতেন, 'তোমরা আমাদিগকে এত কৌশল এবং এত চীৎকার করিয়া বড়ো করিয়া না তুলিলেও আমাদের বিশেষ ক্ষতি হইত না। বাপু রে, একটু ধীরে, একটু বিবেচনাপূর্বক, একটু সংযতভাবে কথা বলো। পৃথিবীতে সকল জিনিসেরই ভালোও থাকে মন্দও থাকে— তোমরা যতই কূটতর্ক কর-না, অসম্পূর্ণতা হো হা দ্বারা ঢাকা পড়ে না। যাহার যথেষ্ট ভালো আছে, তাহার অল্পস্বল্প মন্দর জন্য ছলনা করিবার আবশ্যক হয় না, সে ভালো মন্দ দুই অবাধে প্রকাশ করিয়া সাধারণের ন্যায়বিচার অসংকোচে গ্রহণ করে। যাহারা ক্ষুদ্র, যাহাদের অল্পস্বল্প ভালো, তাহাদেরই জন্য সূক্ষ্ম পয়েন্ট ধরিয়া ওকালতি করো। চন্দ্র কখনো চন্দন দিয়া কলঙ্ক ঢাকে না, অথবা তাহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও করে না— তথাপি নিষ্কলঙ্ক কেরোসিন শিখার অপেক্ষা তাহার গৌরব বেশি। কিন্তু ওই কলঙ্কের জন্য বাজে কৈফিয়ত দিতে গেলেই কিংবা চন্দ্রকে নিষ্কলঙ্ক বলিয়া তাহার মিথ্যা আদর বৃদ্ধি করিতে গেলেই তাহার প্রতি অসম্ভ্রম করা হয়।'

সাধনা
মাঘ ১২৯৯

'সাহিত্য'-পাঠকদের প্রতি

কিয়ৎকাল পূর্বে ''হিং টিং ছট্‌' নামক একটি কবিতা সাধনায় প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত কবিতা যে চন্দ্রনাথবাবুকেই বিশেষ লক্ষ্য করিয়া লিখিত হয় 'সাহিত্য' পত্রের কোনো লেখক পাঠকদের মনে এইরূপ সংশয় জন্মাইয়া দেন। আমি তাহার প্রতিবাদ 'সাহিত্য'-সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিই, তিনি তাহা প্রকাশ করিয়া তাঁহার পাঠকদের অন্যায় সন্দেহমোচন করা কর্তব্য বোধ করেন নাই। এই কারণে, সাধনা পত্রিকা আশ্রয় করিয়া আমি পাঠকদিগকে জানাইতেছি যে, উক্ত কবিতা চন্দ্রনাথবাবুকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত নহে এবং কোনো সরল অথবা অসরল বুদ্ধিতে যে এরূপ অমূলক সন্দেহ উদিত হইতে পারে তাহা আমার কল্পনার অগোচর ছিল।

এতৎপ্রসঙ্গে এইস্থলে জানাইতেছি যে, চন্দ্রনাথবাবুর উদারতা ও অমায়িক স্বভাবের আমি এত পরিচয় পাইয়াছি যে নিতান্ত কর্তব্য জ্ঞান না করিলে ও তাঁহাকে বর্তমান কালের একটি বৃহৎসম্প্রদায়ের মুখপাত্র বলিয়া না জানিলে তাঁহার কোনো প্রবন্ধের কঠিন সমালোচনা করিতে আমার প্রবৃত্তিমাত্র হইত না। চন্দ্রনাথবাবুকে বন্ধুভাবে পাওয়া আমার পক্ষে গৌরব ও একান্ত আনন্দের বিষয় জানিয়াও আমি লেখকের কর্তব্য পালন করিয়াছি।

সাধনা
চৈত্র ১২৯৯

রবীন্দ্রবাবুর পত্র

সাহিত্য-সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

পুরী
৬ই ফাল্গুন

মান্যবরেষু,

চন্দ্রনাথবাবুর প্রতি আমার বিদ্বেষভাব আপনি যেরূপে প্রমাণ করিতে বসিয়াছেন, তাহা আপনার উপযুক্ত হয় নাই। কারণ, বিষয়টা আপনি কেবল একদিক হইতে দেখিয়াছেন। আমার, পক্ষ

হইতে যে দুই-একটি কথা বলা যাইতে পারিত তাহা আপনি একটিও বলেন নাই, সুতরাং আমাকেই বলিতে হইল।

বাল্যবিবাহ লইয়া চন্দ্রনাথবাবুর সহিত আমার প্রথম বাদ-প্রতিবাদ হয়। সে আজ বছর দুই-তিন পূর্বের কথা। ইতিমধ্যে আমি তাঁহার কোনো লেখা সম্বন্ধে কোনো কথা বলি নাই।

আপনার অবিদিত নাই, প্রথম ভাগ সাধনায় মাসিকপত্রের সমালোচনা বাহির হইত। তাহাতে উল্লেখযোগ্য অথবা প্রতিবাদযোগ্য প্রবন্ধ সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত হইত। সাহিত্যে চন্দ্রনাথবাবু যে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন সাধনার সাময়িক সমালোচনায় তাহার দুইটি লেখার প্রতিবাদ বাহির হয়— দুই-একটি প্রতিবাদ দীর্ঘ হইয়া পড়ায় স্বতন্ত্র প্রবন্ধরূপেও প্রকাশিত হইয়াছিল। চন্দ্রনাথবাবু যখন তাহার পুনঃপ্রতিবাদ করেন তখন তদুত্তরে আমাদের যাহা বক্তব্য ছিল আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম। আহার এবং লয়তত্ত্ব সম্বন্ধে এইরূপে উপর্যুপরি অনেকগুলি বাদ-প্রতিবাদ বাহির হয়। আপনি যদি এমন মনে করিয়া থাকেন যে, বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে চন্দ্রনাথবাবুর সহিত আমার মতান্তর হওয়াতেই আমি সাধনায় সমালোচনার উপলক্ষ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণপূর্বক আমার বিদ্বেষবুদ্ধির চরিতার্থতা সাধনা করিতেছিলাম, তবে তাহা আপনার ভ্রম— ইহার অধিক আর আমি কিছুই বলিতে চাহি না। 'কড়াক্রান্তি' প্রবন্ধে এমন দুই-একটি মত প্রকাশিত হইয়াছিল যাহার কঠিন প্রতিবাদ করা আমার একটি কর্তব্যস্বরূপে গণ্য করিয়াছিলাম। আপনি যদি সে প্রবন্ধটি সাধারণ সমক্ষে প্রকাশযোগ্য জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাহার মধ্যে গুরুতর আপত্তিযোগ্য কিছু না পাইয়া থাকেন তবে উক্ত প্রতিবাদটিকে বিদ্বেষভাবের পরিচায়ক মনে করা আপনার পক্ষে অসংগত হয় নাই।

"হিং টিং ছট্‌" নামক কবিতায় আমি যে চন্দ্রনাথবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপ করিয়াছি ইহা কাহারও সরল অথবা অসরল কোনোপ্রকার বুদ্ধিতে কখনো উদয় হইতে পারে তাহা আমার, স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। আপনি লিখিয়াছিলেন 'অনেকেই বুঝিয়াছে যে, এই বিদ্রূপ ও ঘৃণাপূর্ণ কবিতার লক্ষ্য চন্দ্রনাথবাবু'— এই পর্যন্ত বলিতে পারি, যাহারা আমার সেই কবিতাটি বুঝিয়াছে তাহারা সেরূপ বুঝে নাই। অবশ্য আপনি অনেককে জানেন, এবং আমিও অনেককে জানি— আপনার অনেকের কথা বলিতে পারি না কিন্তু আমি যে-অনেককে জানি তাঁহাদের মধ্যে একজনও এরূপ মহৎ ভ্রম করেন নাই। এবং আমার আশা আছে চন্দ্রনাথবাবুও তাঁহাদের মধ্যে একজন।

চন্দ্রনাথবাবুর সহিত মতভেদ হওয়া আমি আমার দুর্ভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করি। কারণ, আমি তাঁহার উদারতা ও অমায়িকতার অনেক পরিচয় পাইয়াছি। তাঁহার অধিকাংশ মত যদি বর্তমান কালের বৃহৎ একটি সম্প্রদায়ের মত না হইত তাহা হইলে তাঁহার সহিত প্রকাশ্য বাদ-প্রতিবাদে আমার কখনোই রুচি হইত না। কিন্তু মানুষ কর্তব্যবুদ্ধি হইতে যে কোনো কাজ করিতে পারে এ কথা দেশকালপাত্রবিশেষের নিকট প্রমাণ করা দুরূহ হইয়া পড়ে এবং তাহার আবশ্যকও নাই।

আপনি লিখিয়াছেন 'মানিলাম চন্দ্রনাথবাবুর মতই অপ্রামাণ্য, সকল সিদ্ধান্তই অসিদ্ধ এবং সকল কথাই অগ্রাহ্য। কিন্তু এই এক কথা একবার বলিয়াই তো রবীন্দ্রনাথবাবু খালাস পাইতে পারেন। এক কথা বারংবার বলিবার প্রয়োজন কী? যদি এমন সম্ভাবনা থাকিত যে, চন্দ্রনাথবাবু নিজের ভ্রান্ত মতসমূহ ত্যাগ করিয়া অবশেষে রবীন্দ্রনাথবাবুর মত গ্রহণ করিবেন, তাহা হইলেও এই অনন্ত তর্ক কতক বুঝা যাইত, কিন্তু সে সম্ভাবনা কিছুমাত্র নাই।' মার্জনা করিবেন, আপনার এই কথাগুলি নিতান্ত কলহের মতো শুনিতে হইয়াছে, ইহার ভালোরূপ অর্থ নাই। কলহের উত্তরে কলহ করিতে হয়, যুক্তি প্রয়োগ করা যায় না, অতএব নিরস্ত হইলাম।

উপসংহারে সবিনয় অনুরোধ এই যে, আপনি একটা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, নিজের মত যদি সত্য বলিয়া জ্ঞান না করা যায় তবে পৃথিবীতে কেহ কোনো কথা বলিতে পারে না। অবশ্য, কেন সত্য জ্ঞান করি তাহার প্রমাণ দিবার ভার আমার উপর। যদি আমার মত প্রচারদ্বারা

পৃথিবীর কোনো উপকার প্রত্যাশা করি, এবং বিরুদ্ধ মতের দ্বারা সমাজের অনিষ্ট আশঙ্কা করা যায় তবে যতক্ষণ প্রমাণ দেখাইতে পারিব ততক্ষণ নিজের মত প্রচার করিব ও বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করিব ইহা আমার সর্বপ্রধান কর্তব্য। এ কার্য যদি বারংবার করার আবশ্যক হয় তবে বারংবারই করিতে হইবে। কবে পৃথিবীতে এক কথায় সমস্ত কার্য হইয়া গিয়াছে? কোন্ বদ্ধমূল ভ্রমের মূলে সহস্রবার কুঠারাঘাত করিতে হয় নাই? আমি যাহা সত্য বলিয়া জানি তাহা বারংবার প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াও অবশেষে কৃতকার্য না হইতে পারি, আত্মক্ষমতার প্রতি এ সংশয় আমার যথেষ্ট আছে, তবু কর্তব্য যাহা তাহা পালন করিতে হইবে এবং যদি চন্দ্রনাথবাবুর সহিত আমার পুনর্বার মতের অনৈক্য হয় এবং তাঁহার কথার যদি কোনো গৌরব থাকে তবে আপনারা যিনি যেরূপ অর্থ বাহির করুন আমাকে পুনর্বার প্রতিবাদ করিতে হইবে।

পুঃ— অনুগ্রহপূর্বক নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রকাশ করিবেন। —শ্রীরঃ

সাহিত্য
বৈশাখ ১৩০০

সাহিত্যের গৌরব

মৌরস য়োকাই হঙ্গেরি দেশের একজন প্রধান লেখক। তাঁহার সাহিত্যচর্চায় প্রবৃত্ত হইবার পর পঞ্চাশৎবার্ষিক উৎসব সম্প্রতি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। দেশের আপামরসাধারণ কীরূপ মহোৎসাহের সহিত এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিল তাহা সংবাদপত্রপাঠকগণ অবগত আছেন।

সেই উৎসব-বিবরণ পাঠ করিলে তাহার সহিত আমাদের দেশে বঙ্কিমচন্দ্রের বিয়োগজনিত শোকপ্রকাশের তুলনা স্বতই মনে উদয় হয়।

ভিক্টর হ্যুগোর মৃত্যুর পর সমস্ত ফ্রান্স কীরূপ শোকাকুল হইয়া উঠিয়াছিল বর্তমান প্রসঙ্গে সে কথা উত্থাপন করিতে লজ্জা বোধ হয়, কারণ, ফ্রান্স য়ুরোপের শীর্ষস্থানীয়। বীরপ্রসবিনী হঙ্গেরির সহিতও নির্জীব বঙ্গদেশের তুলনা হইতে পারে না, তথাপি অপেক্ষাকৃত অসংকোচে তাহার নামোল্লেখ করিতে পারি।

আমরা যে বহু চেষ্টাতেও আমাদের দেশের মহাত্মাগণকে সম্মান এবং প্রীতি উপহার দিতে পারি না, আর য়ুরোপের একটি ক্ষুদ্র দুর্বল রাজ্যে রাজায়-প্রজায় মিলিয়া সামান্যবংশজাত একজন সাহিত্যব্যবসায়ীকে এমন অপর্যাপ্ত হৃদয়োচ্ছ্বাসে অভিষিক্ত করিয়া তুলিল ইহার কারণ কী?

ইহার প্রধান কারণ এই যে, সেখানে লেখক এবং পাঠক এক প্রাণের দ্বারা সঞ্জীবিত, পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ নাই। সেখানে সমস্ত দেশের লোক মিলিয়া একজাতি। তাহারা এর উদ্দেশ্যে এক জাতীয় উন্নতির অভিমুখে ধাবিত হইতেছে, তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সরলপথ নির্দেশ করিতেছে, সে সর্বসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইতেছে।

আমাদের দেশে পথিক নাই সুতরাং পথ খনন করিয়া কেহ যশস্বী হইতে পারে না। বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের রাজপথ খনন করিয়া দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু হায়, বঙ্গসাহিত্য কোথায়, বাঙালি জাতি কোথায়! যাহারা বাংলা লেখে তাহারাই বা কয়জন, যাহারা বাংলা পড়ে তাহাদেরই বা সংখ্যা কত!

বঙ্গসাহিত্য যে জাতীয়-হৃদয় অধিকার করিবার আশা করিতে পারে সে হৃদয় কোন্‌খানে! পূর্বকালে যখন আমাদের দেশে সাধারণজাতি নামক কোনো পদার্থ ছিল না তখন অন্তত রাজসভা ছিল। সেই সভা তখন সর্বসাধারণের প্রতিনিধি ছিল। সেই সভার মন হরণ করিতে পারিলে, সেই

সভার মধ্যে গৌরবের স্থান পাইলে সাহিত্য আপনাকে সার্থক জ্ঞান করিত। এখন সে সভাও নাই।

বঙ্গসাহিত্যের কোনো গৌরব নাই। কিন্তু সে যে কেবল বঙ্গসাহিত্যের দৈন্যবশত তাহা নহে। গৌরব করিবার লোক নাই। ইতস্ততবিক্ষিপ্ত কয়েকজনের নিকট তাহার সমাদর থাকিতে পারে কিন্তু একত্রসংহত সর্বসাধারণের নিকট তাহার কোনো প্রতিপত্তি নাই। কারণ, একত্রসংহত সর্বসাধারণ এ দেশে নাই।

যে দেশে আছে যেখানে সকলে সাধারণ মঙ্গল অমঙ্গল একত্রে অনুভব করে। সেখানে দেশীয় ভাষা এবং সাহিত্যের অনাদর হইতে পারে না, কারণ, যেখানে অনুভবশক্তি আছে সেইখানেই প্রকাশ করিবার ব্যাকুলতা আছে। যেখানে সর্বসাধারণে ভাবের ঐক্যে অনুপ্রাণিত হয় সেখানে সর্বসাধারণের মধ্যে ভাষার ঐক্য আবশ্যক হইয়া উঠে এবং এই সাধারণের ভাষা কখনোই বিদেশীয় ভাষা হইতে পারে না।

য়ুরোপে জাতি বলিতে যাহা বুঝায় আমরা বাঙালিরা তাহা নহি। অর্থাৎ, আমাদের একসঙ্গে আঘাত লাগিলে সর্ব অঙ্গে বেদনা বোধ হয় না। আমাদের সকলের মধ্যে বেদনাবহ বার্তাবহ আদেশবহ কোনো সাধারণ স্নায়ুতন্ত্র নাই। সুতরাং আমাদের মধ্যে সাধারণ সুখ-দুঃখ বলিয়া কোনো পদার্থ নাই, এবং সাধারণ সুখ-দুঃখ প্রকাশ করিবার কোনো আবশ্যক নাই।

এইজন্য দেশীয় ভাষার প্রতি সাধারণের আদর নাই এবং দেশীয় সাহিত্যের প্রতি সাধারণের অনুরাগের স্বল্পতা দেখা যায়। লোকে যে অভাব অন্তরের সহিত অনুভব করে না সে অভাব পূরণ করিয়া তাদের নিকট হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রত্যাশা করা যায় না। অনেকে কর্তব্যবোধে কৃতজ্ঞ হইবার প্রাণপণ প্রয়াস পাইয়া থাকেন কিন্তু সে চেষ্টা কোনো বিশেষ কাজে আসে না।

আমাদের দেশে সাধারণের কোনো আবশ্যকবোধ না থাকাতে এবং সাধারণের আবশ্যকপূরণজনিত গৌরববোধ লেখকের না থাকাতে আমাদের সাহিত্যের ক্ষেত্র স্বভাবতই সংকীর্ণ হইয়া আসে এবং লেখকে-পাঠকে ঘনিষ্ঠ যোগ থাকে না। সাহিত্য কেবলমাত্র অল্পসংখ্যক শৌখিন লোকের নিকট আদরণীয় হইয়া থাকে। অথচ সেই সাহিত্যশৌখিন লোকগুলি প্রাচীনকালের রাজাদিগের ন্যায় সর্বত্রপরিচিত প্রভাবশালী মহিমান্বিত নহেন, সুতরাং তাঁহাদের আদরে সাহিত্য সাধারণের আদর লাভ করে না। কথাটা বিপরীত শুনাইতে পারে কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, কিয়ৎপরিমাণে আদর না পাইলে আদর পাওয়ার যোগ্য হওয়া যায় না।

হঙ্গেরিতে যে উৎসবের উল্লেখ করা যাইতেছে সে উৎসবের ক্ষেত্র সমস্ত জাতির হৃদয়রাজ্যে। হঙ্গেরীয় জাতি একহৃদয় হইয়া অনেক সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়াছে, সকলে মিলিয়া রক্তপাত করিয়া জাতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল অক্ষরে অঙ্কিত করিয়াছে, স্বদেশের কল্যাণতরণী যখন বিপ্লবের ক্ষুব্ধ সমুদ্রমধ্যে নিমগ্নপ্রায় তখন সমস্ত দেশের লোক এক ধ্রুবতারার দিকে অনিমেষ দৃষ্টি স্থির রাখিয়া সেই দোদুল্যমান তরীকে উপকূলে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে; সেখানকার দেশীয় লেখক দেশীয় ভাষা অবলম্বন করিয়া শোকের সময় সান্ত্বনা করিয়াছে; বিপদের সময় আশা দিয়াছে, লজ্জার দিনে ধিক্কার এবং গৌরবের দিনে জয়ধ্বনি করিয়াছে, সমস্ত জাতির হৃদয়ে তাঁহার কণ্ঠস্বর প্রতিনিয়ত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। সুতরাং সে দেশে রাজারানী হইতে কৃষক পর্যন্ত সকলেই লেখকের নিকট পরমোৎসাহে কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছে ইহাতে আশ্চর্যের কারণ কিছুই নাই।

এককালে হঙ্গেরীয় ভাষা ও সাহিত্য নানা রাষ্ট্রবিপ্লবে বিপর্যস্ত হইয়া লাটিন ও জর্মানের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়াছিল। এমন-কি, ১৮৪৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত হঙ্গেরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে লাটিন এবং জর্মান ভাষা অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইত। সেই সময় গুটিকতক দেশানুরাগী পুরুষ দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের অবমানে ব্যথিত হইয়া ইহার প্রতিকার সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। আজ তাঁহাদের কল্যাণে হঙ্গেরিদেশে এমন ভূরি পরিমাণে শিক্ষা বিস্তার হইয়াছে যে,

প্রজা সংখ্যা তুলনা করিলে য়ুরোপে জর্মনি ব্যতীত আর কোথাও এত অধিক সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিজ্ঞানশিক্ষাশালা নাই এবং সেই-সকল পাঠাগারে কেবলমাত্র হঙ্গেরিভাষায় সমস্ত বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এই পরিবর্তনসাধনের জন্য হঙ্গেরি মৌরস য়োকাইয়ের নিকট ঋণে বদ্ধ।

১৮৪৮ খৃস্টাব্দে হঙ্গেরি যখন বিদ্রোহী হয় তখন য়োকাই কেবল যে লেখনীর দ্বারা তাহাকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন তাহা নহে স্বয়ং তরবারিহস্তে তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। অবশেষে শান্তিস্থাপনের সময় তিনিই বিপ্লবের বহ্নিদাহ নির্বাপণে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

ইহা হইতে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন হঙ্গেরি দেশের মধ্যে সর্বত্র একটা জীবনস্রোত একটা কর্মপ্রবাহ চলিতেছে। সমস্ত জাতির আত্মা সচেতনভাবে কাজ করিতেছে। সেখানে সৃজন করিবার শক্তিও সবল, গ্রহণ করিবার শক্তিও সজাগ। আমাদের দেশে কোনো উদ্দেশ্য নাই, কোনো কার্য নাই, কোনো জীবনের গতি নাই, তবে সাহিত্য কোথা হইতে জীবন প্রাপ্ত হইবে? কেবল গুটিকতক লোকের ক্ষীণমাত্রায় একটুখানি শখ আছে মাত্র, আপাতত সেইটুকুর উপরেই সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করিতে হয়।

'সমুদ্রের ন্যায় চক্ষু' নামক য়োকাইয়ের একটি উপন্যাস ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়াছে। ইহাতে উপন্যাসের সহিত লেখকের জীবনবৃত্তান্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিশ্রিত দেখা যায়। এই আশ্চর্য গ্রন্থখানি পাঠ করিলে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন লেখকের সহিত তাঁহার স্বদেশের কী যোগ। ইহাও বুঝিতে পারিবেন, যেখানে জীবনের বিচিত্র প্রবাহ একত্র মিশিয়া ঘাত-প্রতিঘাতে স্ফীত ও ফেনিল হইয়া উঠিতেছে লেখক সেইখানে কল্পনার জাল বিস্তারপূর্বক সজীব চরিত্রসকল আহরণ করিয়া আনিতেছেন। আমাদের সাহিত্যে কোথায় সেই ভালোমন্দের সংঘাত, কোথায় সে হৃদয়োচ্ছ্বাসের প্রবলতা, কোথায় সে ঘটনাস্রোতের দ্রুতবেগ, কোথায় সে মনুষ্যত্বের প্রত্যক্ষ জীবন্ত স্বরূপ!

আমরা নিক্তি হস্তে লইয়া বসিয়া বসিয়া তৌল করিতেছি সূর্যমুখী কুন্দনন্দিনীর অপেক্ষা এক মাষা এক রতি পরিমাণ অধিক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে কি না, আয়েষার ভালোবাসা ভ্রমরের ভালোবাসার অপেক্ষা এক চুল পরিমাণ উদারতর কি না, চন্দ্রশেখর এবং প্রতাপ উভয়ের মধ্যে কাহার চরিত্রে ভরি পরিমাণে মহত্ত্ব বেশি প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি না, কোন্‌টা যথার্থ, কে মানুষের মতো, কে সজীব, কোন্ চরিত্রের মধ্যে হৃদয়স্পন্দন আমরা সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিতেছি।

তাহার প্রধান কারণ, আমাদের দেশে সুদূরব্যাপী কর্মস্রোত না থাকাতে সজীব মানব-চরিত্রের প্রবল সংস্পর্শ কাহাকে বলে তাহা আমরা ভালো করিয়া জানি না। মানুষ যে কেবল মানুষরূপেই কত বিচিত্র, কত বলিষ্ঠ, কত কৌতুকাবহ, কত হৃদয়াকর্ষক, যেখানে কোনো একটা কাজ চলিতেছে সেখানে সে যে কত কাণ্ড বাধাইয়া বসিতেছে তাহা আমরা সম্যক্ প্রত্যক্ষ ও অনুভব করি না, সেইজন্য মনুষ্য কেবলমাত্র মনুষ্য বলিয়াই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে না। আমাদের এই মন্দগতি ক্ষীণপ্রাণ কৃশহৃদয় দেশে মানুষ জিনিসটা এতই অকিঞ্চিৎকর যে তাহাকে অনায়াসে বাদ দিতে পারি এবং তাহার স্থলে কতকগুলি নীতিশাস্ত্রোদ্‌ধৃত গুণকে বসাইয়া নির্জীব তুলাদণ্ডে প্রাণহীন বাটখারা দ্বারা তাহাদের গুরুলঘুত্ব পরিমাপ করাকে সাহিত্যসমালোচনা বলিয়া থাকি। কিন্তু এই হঙ্গেরীয় উপন্যাসখানি খুলিয়া দেখো, মানুষ কত রকমের, কত ভালো, কত মন্দ, কত মিশ্রিত এবং সবশুদ্ধ কেমন সম্ভব কেমন সত্য। উহাদের মধ্যে কোনোটিই নৈতিক গুণ নহে, সকলগুলিই রক্তমাংসের প্রাণী। 'বেসি' নামক এই গ্রন্থের নায়িকার চরিত্র পর্যালোচনা করিয়া দেখো, শাস্ত্রমতে সে যে বড়ো পবিত্র উন্নত স্বভাবের তাহা নহে, সে পরে পরে পাঁচ স্বামীকে বিবাহ করিয়াছে এবং শেষ স্বামীকে হত্যা করিয়া কারাগারে জীবন ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু তথাপি সে রমণী, সে বীরাঙ্গনা, অনেক সতীসাধ্বীর ন্যায় সে প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্রী, কিছু না

হউক তাহার নারীপ্রকৃতি পরিপূর্ণ প্রাণশক্তিতে নিয়ত স্পন্দমান; সে সমাজের কলে পিষ্ট এবং লেখকের গৃহ-নির্মিত নৈতিক চালুনিতে ছাঁকা গৃহস্থের ঘরে ব্যবহার্য পয়লা নম্বরের পণ্যদ্রব্য নহে, সুবোধ গোপাল এবং সুমতি সুশীলার ন্যায় সে বাংলাদেশের শিশুশিক্ষার দৃষ্টান্তস্থল বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। প্রাণের পরিবর্তে তৃণে পরিপূর্ণ মিউজিয়ামের সিংহী যদি সহসা জীবনপ্রাপ্ত হয় তবে রক্ষকমহলে যেরূপ একটা হুলস্থূল পড়িয়া যায়, 'বেসি'র ন্যায় নায়িকা সহসা বঙ্গসাহিত্যে দেখা দিলে সমালোচকমহলে সেইরূপ একটা বিভ্রাট বাধিয়া যায়, তাঁহাদের সূক্ষ্ম বিচার এবং নীতিতত্ত্ব বিপর্যস্ত হইয়া একটা দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা হয়।

য়ুরোপে হঙ্গেরির সহিত পোল্যান্ডের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। সেখানে আধুনিক পোল-সাহিত্যের নেতা ছিলেন ক্রাস্‌জিউস্কি।— ১৮৮৮ খৃস্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ১৮৭৯ খৃস্টাব্দে তাঁহার রচনারম্ভের পঞ্চাশৎ বার্ষিক উৎসব পরম সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে উপাধি দান করে, কার্পাথীয় গিরিমালার একটি শিখরকে তাঁহার নামে অভিহিত করা হয়। অস্ট্রিয়ার সম্রাট তাঁহাকে রাজসম্মানে ভূষিত করেন এবং দেশের লোকে মিলিয়া তাঁহাকে ছয় হাজার পাউন্ড মুদ্রা উপহার প্রদান করে।

এ সম্মান শূন্য সম্মান নহে। সমস্ত জীবন দিয়া ইহা তাঁহাকে লাভ করিতে হইয়াছে। তিনিই প্রথম পোলীয় উপন্যাস রচয়িতা। যখন তাঁহার বয়স আঠারো তখন পঠদ্দশাতেই তিনি পোল্যান্ডের স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য সহপাঠীদিগকে বিদ্রোহে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই অপরাধে দুই বৎসর কারাবাস যাপন করিয়া পুনর্বার তিনি বিদ্যালয়ে প্রবেশপূর্বক শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। কারাগারে অবস্থানকালে তিনি পোলীয়ভাষার প্রথম উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন।

পুনর্বার বিদ্রোহ অপরাধে জড়িত হইয়া তাঁহাকে পল্লীগ্রামে পলায়নপূর্বক বহুকাল সমাজ হইতে দূরে বাস করিতে হইয়াছিল। এবং অবশেষে পোল্যান্ড ত্যাগ করিয়া ১৮৬৩ খৃস্টাব্দে তিনি জর্মনিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং আমৃত্যুকালে আর স্বদেশে ফিরিতে পারেন নাই। সেখানেও বিস্মার্কের রাজনীতির বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করাতে মৃত্যুর অনতিপূর্বে বৃদ্ধবয়সে তাঁহাকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়।

ইহা হইতে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন পর্বততুল্য কঠিন প্রতিভার দ্বারা আলোড়নপূর্বক কীরূপ সংক্ষুব্ধ সমুদ্রমন্থন করিয়া এই পোলীয় মনস্বী অমরতাসুধা লাভ করিয়াছিলেন। পোল্যান্ডে একটি বৃহৎ জাতীয়-হৃদয় ছিল বলিয়া সেখানে জাতীয় সাহিত্য এবং জাতীয় সাহিত্যবীর এত সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সে সাহিত্য এমন প্রভূত বলে আপন প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

এই লেখক-রচিত 'ইহুদী' নামক একটি উপন্যাসগ্রন্থ ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিলে, পাঠকগণ জানিতে পারিবেন, লেখকের প্রতিভা জাতীয় হৃদয়ের আন্দোলন দোলায় কেমন করিয়া লালিত হইয়াছে।

বাংলা সাহিত্যের প্রসঙ্গে আমরা যে এই দুই হঙ্গেরীয় ও পোলীয় লেখকের উল্লেখ করিলাম তাহার কারণ, ইঁহারা উভয়েই স্ব স্ব দেশে এক নব সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন। ইঁহারা যেমন স্বদেশে সাহিত্যকে গতিশক্তি দিয়াছেন তেমনি তাহার চলিবার পথও স্বহস্তে খনন করিয়াছেন। প্রায় এমন কোনো বিষয় নাই যাহা তাঁহারা নিজে স্বভাষায় প্রচলিত করেন নাই। শিশুদের সুখপাঠ্য মনোরম রূপকথার গ্রন্থ হইতে আরম্ভ করিয়া বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস পর্যন্ত সমস্তই তাঁহারা নিজে রচনা করিয়াছেন। তাঁহারা স্বদেশীয় ভাষাকে বিদ্যালয়ে বদ্ধমূল এবং স্বদেশীয় সাহিত্যকে সমস্ত জাতির হৃদয়ে স্বহস্তে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে তাঁহাদের নিজের ক্ষমতা প্রকাশ পায় বটে কিন্তু জাতির সজীবতাও সূচনা করে।

আমাদের দেশে লেখকগণ বিচ্ছিন্ন বিষণ্ণ সঙ্গবিহীন। তাঁহারা বৃহৎ মানবহৃদয়ের মাতৃসংস্পর্শ

হইতে বঞ্চিত হইয়া দূরে বসিয়া আপন উপবাসী শীর্ণ প্রতিভাকে নীরস কর্তব্যের কঠিন খাদ্যখণ্ডে কোনোমতে পালন করিয়া তুলিতে থাকেন। সামান্য বাধা সে লঙ্ঘন করিতে পারে না, সামান্য আঘাতে সে মুমূর্ষু হইয়া পড়ে, দেশব্যাপী নিত্যপ্রবাহিত গতি প্রীতি আনন্দ হইতে রসাকর্ষণ করিয়া সে আপনাকে সতত সতেজ রাখিতে পারে না। অল্পকালের মধ্যেই আপনার ভিতরকার সমস্ত খাদ্য নিঃশেষ করিয়া রিক্তবল রিক্তপ্রাণ হইয়া পড়ে। বাহিরের প্রাণ তাঁহাকে যথেষ্ট প্রাণ দেয় না।

কিন্তু যথার্থ সাহিত্য যেমন যথার্থ জাতীয় ঐক্যের ফল তেমনি জাতীয় ঐক্য সাধনের প্রধানতম উপায় সাহিত্য। পরস্পর পরস্পরকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলে। যাহা অনুভব করিতেছি তাহা প্রকাশ করিতে পারিব, যাহা শিক্ষা করিতেছি তাহা রক্ষা করিতে পারিব, যাহা লাভ করিতেছি তাহা বিতরণ করিতে পারিব এমন একটা ক্ষমতার অভ্যুদয় হইলে তাহা সমস্ত জাতির উল্লাসের কারণ হয়। আমাদের বঙ্গদেশে সেই বিরাট ক্ষমতা শিশু আকারে জন্মগ্রহণ করিয়াছে কিন্তু এখনো সেই জাতি নাই যে উল্লাস প্রকাশ করিবে। তাহারই অপেক্ষা করিয়া আমরা পথ চাহিয়া আছি। যাঁহারা বাংলার সদ্যোজাত সাহিত্যের শিয়রে জাগরণপূর্বক নিস্তব্ধ রজনীর প্রহর গণিতেছেন তাঁহারা কোনো উৎসাহ কোনো পুরস্কার না পাইতে পারেন কিন্তু তাঁহাদের অন্তরে এক সুমহৎ আশা জাগ্রত দেবতার ন্যায় সর্বদা বরাভয় দান করিতেছে, তাঁহারা একান্ত বিশ্বাস করিতেছেন যে, এই শিশু অমর হইবে এবং জন্মভূমিকে যদি কেহ অমরতা দান করিতে পারে তো সে এই সাহিত্য পারিবে।

সাধনা
শ্রাবণ ১৩০১

মেয়েলি ব্রত

সাধনা পত্রিকা সম্পাদনকালে আমি ছেলে ভুলাইবার ছড়া এবং মেয়েলি ব্রত, সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম। ব্রতকথা সংগ্রহে অঘোরবাবু আমার প্রধান সহায় ছিলেন, সেজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি।

অনেকের নিকট এই-সকল ব্রতকথা ও ছড়া নিতান্ত তুচ্ছ ও হাস্যকর মনে হয়। তাঁহারা গম্ভীর প্রকৃতির লোক এবং এরূপ দুঃসহ গাম্ভীর্য বর্তমান কালে বঙ্গসমাজে অতিশয় সুলভ হইয়াছে।

বালকদিগের এমন একটি বয়স আসে যখন তাহারা বাল্যসম্পর্কীয় সকল প্রকার বিষয়কেই অবজ্ঞার চক্ষে দেখে, অথচ পরিণত বয়সোচিত কার্যসকলও তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক হয় না। তখন তাহারা সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকে, পাছে কোনো সূত্রে কেহ তাহাদিগকে বালক মনে করে। বঙ্গসমাজের গম্ভীর-সম্প্রদায়েরও সেই দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা বঙ্গভাষা, বঙ্গসাহিত্য, বঙ্গদেশ-প্রচলিত সর্বপ্রকার ব্যাপারের প্রতি অবজ্ঞামিশ্রিত কৃপাকটাক্ষপাত করিয়া আপন প্রকৃতির অতলস্পর্শ গাম্ভীর্য এবং পরিণতির প্রমাণ দিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। অথচ তাঁহারা আপন অভ্রভেদী মহিমার উপযোগী আর যে কিছু মহৎ কীর্তি রাখিয়া যাইবেন, এমন কোনো লক্ষণও প্রকাশ পাইতেছে না।

য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাসে যথেষ্ট মনোযোগ করিয়া থাকেন এবং ছড়া রূপকথা প্রভৃতি সংগ্রহেও সংকোচ বোধ করেন না। তাঁহাদের এ আশঙ্কা নাই, পাছে লোকসাধারণের নিকট তাঁহাদের মর্যাদা নষ্ট হয়। প্রথমত, তাঁহারা জানেন যে, যে-সকল কথা ও গাথা সমাজের অন্তঃপুরের মধ্যে চিরকাল স্থান পাইয়া আসিয়াছে, তাহারা দর্শন, বিজ্ঞান ও

ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ না হইয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, যাহারা স্বদেশকে অন্তরের সহিত ভালোবাসে তাহারা স্বদেশের সহিত সর্বতোভাবে অন্তরঙ্গরূপে পরিচিত হইতে চাহে এবং ছড়া, রূপকথা, ব্রতকথা প্রভৃতি ব্যতিরেকে সেই পরিচয় কখনো সম্পূর্ণতা লাভ করে না।

সাধনায় যখন আমি এগুলি সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তখন আমার কোনোপ্রকার মহৎ উদ্দেশ্য ছিল না। সমাজের সুধাভাণ্ডার যে অন্তঃপুর, তাহারই প্রতি স্বাভাবিক মমত্ববশত আকৃষ্ট হইয়া আমাদের মাতা মাতামহী আমাদের স্ত্রী কন্যা সহোদরাদের কোমল-হৃদয়-পালিত মধুর কণ্ঠলালিত চিরন্তন কথাগুলিকে স্থায়ী ভাবে একত্র করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম এবং অঘোরবাবুকে এই-সমস্ত মেয়েলি ব্রত গ্রন্থ-আকারে রক্ষা করিতে উৎসাহী করিয়াছি, সেজন্য গম্ভীর-প্রকৃতি পাঠকদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। এবং সেইসঙ্গে এ কথাও বলিয়া রাখি যে, এই-সকল সংগ্রহের দ্বারা ভবিষ্যতে যে কোনোপ্রকার গম্ভীর উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না, এমনও মনে করি না।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বাবু দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। তিনি বঙ্গদেশের জনসাধারণ-প্রচলিত পার্বণগুলির উজ্জ্বল ও সুন্দর চিত্র সাধনায় প্রকাশ করিয়া সাধনা-সম্পাদকের প্রিয় উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করিয়াছেন। সে চিত্রগুলি বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ীভাবে রক্ষা করিবার যোগ্য এবং আশা করি দীনেন্দ্রকুমারবাবু সেগুলি গ্রন্থ-আকারে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

কার্সিয়াং
৭ কার্তিক ১৩০৩

সাহিত্যের সৌন্দর্য

আদিত্য। সাহিত্য জিনিসটা বিষয়ের উপর বেশি নির্ভর করে না রচনার উপরে? লক্ষ্যের উপরে না লক্ষণের উপরে?

নগেন্দ্র। তুমি তো এ কথাও জিজ্ঞাসা করিতে পার মানুষ বাম পায়ের উপর বেশি নির্ভর করে না ডান পায়ের উপর?

আদিত্য। মানুষ দুই পায়েরই উপর সমান নির্ভর করে এ যেমন স্পষ্ট অনুভবগোচর, সাহিত্য তার বিষয় এবং রচনাপ্রণালীর উপর সমান নির্ভর করে সেটা তেমন নিশ্চয় বোধগম্য নয় এবং এই কারণেই সাহিত্যে আজকাল কেহ-বা নীতিকে প্রাধান্য দেন, কেহ-বা সৌন্দর্যকে, কেহ-বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-প্রচারকে। সেইজন্যই আলোচনা উত্থাপন করা গেল।

মন্মথ। বেশ কথা। তা হইলে একটা দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া আলোচনা শুরু করা যাক। ভ্রমণকারীদের সুবিধার জন্য যে 'গাইড'-বই রচনা করা হয় এবং ভ্রমণবৃত্তান্ত, এ দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টা সাহিত্যলক্ষণাক্রান্ত সে বিষয়ে বোধ করি কারও মতভেদ নাই।

আদিত্য। ভালো, মতভেদ নাই— গাইড-বই সাহিত্য নহে। কিন্তু ওই কথাতেই আমার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। গাইড-বই এবং ভ্রমণবৃত্তান্তের বিষয় এক, কেবল রচনাপ্রণালীর প্রভেদ।

নগেন্দ্র। আমার মতে দুয়ের বিষয়েরই প্রভেদ। ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রি যেমন একই বস্তুকে ভিন্ন দিক দিয়া দেখে এবং সেইজন্য উভয়ের বিষয়কে স্বতন্ত্র বলা যায়, তেমনি গাইড-বই এবং ভ্রমণবৃত্তান্ত দেশ-বিশেষকে ভিন্ন তরফ হইতে আলোচনা করে।

মন্মথ। গাইড-বইয়ে কেবলমাত্র তথ্যসংগ্রহ থাকে, ভ্রমণবৃত্তান্তে ভ্রমণকারী লেখকের ব্যক্তিগত প্রভাব বিদ্যমান এবং তাহাতেই সাহিত্যের বিকাশ। ব্যক্তিত্ববর্জিত সমাচারমাত্র বিজ্ঞানে স্থান পাইতে পারে, সাহিত্যে নহে।

আদিত্য। তাহা হইলে দেখিতে হইবে, কিসে ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করে। কেবলমাত্র তথ্য নিতান্ত সাদা ভাষায় বলা যায়, কিন্তু তাহার সহিত হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিতে গেলেই ভাষা নানাপ্রকার আকার-ইঙ্গিতের সাহায্যে নিজের মতো করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়। তাহাকেই কি ইংরাজিতে ম্যানার এবং বাংলায় রচনাভঙ্গি বলা যায় না?

মন্মথ। কেবল রচনার ভঙ্গি নহে, দেখিবার সামগ্রীটাও বিচার্য। এমন-কি, কেবলমাত্র হৃদয়ের ভাবও নহে, কে কোন্ জিনিসটাকে বিশেষ করিয়া দেখিতেছে তাহার উপরেও তাহার ব্যক্তিত্ববিকাশ নির্ভর করে। কেমন করিয়া দেখিতেছে এবং কী দেখিতেছে এই দুটা লইয়াই সাহিত্য। কেমন করিয়া দেখিতেছে সেটা হইল হৃদয়ের এলাকা এবং কী দেখিতেছে সেটা হইল জ্ঞানের।

আদিত্য। তুমি কি বলিতে চাও, সাহিত্যের উপযোগী কতকগুলি বিশেষ দেখিবার বিষয় আছে? অর্থাৎ, কতকগুলি বিষয় বিশেষরূপে সাহিত্যের এবং কতকগুলি তাহার বহির্ভূত?

মন্মথ। আমি যাহা বলিতে চাই তাহা এই— জ্ঞানস্পৃহা সৌন্দর্যস্পৃহা প্রভৃতি আমাদের অনেকগুলি স্বতন্ত্র মনোবৃত্তি আছে, বিজ্ঞান দর্শন এবং কলাবিদ্যা প্রভৃতিরা সেগুলোকে স্বতন্ত্ররূপে চরিতার্থ করে। বিজ্ঞানে কেবল জিজ্ঞাসাবৃত্তির পরিতৃপ্তি, সংগীত প্রভৃতি কলাবিদ্যায় কেবল সৌন্দর্যবৃত্তির পরিতৃপ্তি, কিন্তু সাহিত্যে সমস্ত বৃত্তির একত্র সামঞ্জস্য। অন্তত সাহিত্যের সেই চরম চেষ্টা, সেই পরম গতি।

নগেন্দ্র। সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আর-একটু খোলসা করিয়া বলো, শুনা যাক।

মন্মথ। ম্যাথ্যু আর্নল্ড্ বলেন, সাহিত্যের উদ্দেশ্য মনুষ্যত্ব বিকাশ করা। জ্ঞানস্পৃহা সৌন্দর্যস্পৃহা প্রভৃতি মানুষের যতগুলি উচ্চ প্রবৃত্তি আছে তাহার প্রত্যেকটার পরিপূর্ণ পরিণতির সহায়তা করা। আমার মতে শিক্ষাবিধানকে গৌণ করিয়া আনন্দ-উদ্রেককে মুখ্য করিলে সেই উদ্দেশ্য-সাধন হইতে পারে।

নগেন্দ্র। বেশ কথা। তাহা হইলে শেষে দাঁড়ায় এই যে, হৃদয়ের প্রতিই সাহিত্যের প্রধান অধিকার, মুখ্য প্রভাব। এ স্থলে নীতিবোধকেও আমি হৃদয়বৃত্তির মধ্যে ধরিতেছি। কারণ, সাহিত্যে হৃদয়পথ দিয়াই ধর্মবোধের উদ্দীপন করে, তর্কপথ দিয়া নহে।

মন্মথ। এ সম্বন্ধে বক্তব্য আছে। সত্যকে দুই খণ্ড করিয়া দেখা যায়। প্রথম, চিন্তার বিষয়রূপে; দ্বিতীয়, অনুভবের বিষয়রূপে। কিন্তু সাহিত্য সত্যকে আমাদের কাছে জীবন্ত অখণ্ড সমগ্রভাবে উপনীত করে। প্রাকৃত বিজ্ঞানের নির্দেশ অনুসারে আমরা প্রকৃতিকে কেবলমাত্র বস্তু এবং ক্রিয়ার সমষ্টিরূপে মনে করিতে পারি; কিন্তু প্রকৃতিকে তার সমস্ত বস্তু এবং ক্রিয়া এবং সৌন্দর্য -সহযোগে একটি অখণ্ড সত্তারূপে অনুভব করাইতে পারে যে-একটি একীভূত মানসিক শক্তি, সাহিত্যে সেই শক্তিরই বিকাশ।

নগেন্দ্র। সত্য হৃদয়ের দ্বারা কিরূপে অনুভব করা যায় বুঝিলাম না। প্রকৃতির সৌন্দর্যকেই বা কী হিসাবে সত্য বলা যায় ধারণা হইল না। সৌন্দর্য বিশেষরূপে আমাদের হৃদ্‌বৃত্তিকে উত্তেজিত করে, এই কারণে তাহা বিশুদ্ধরূপে হৃদয়-সম্পর্কীয়। ইহাকে যদি সত্য নাম দিতে চাও তবে ভাষার জটিলতা বাড়িয়া উঠিবে। নদী-অরণ্য-পর্বতের যে সমষ্টিকে আমরা প্রকৃতি বলি তাহার একটা বিভাগ হৃদয়-সম্পর্ক-বর্জিত, এইজন্য সেই বিভাগটাকে আমরা কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা করিতে পারি। কিন্তু তাহার যে দিকটা আমাদের হৃদয়ভাবকে উত্তেজিত করে সে দিকে সত্য-মিথ্যা উচিত-অনুচিত নাই। এটা সুন্দর হওয়া উচিত বা উচিত নয় এমনও কোনো কথা নাই। সৌন্দর্য মানুষের মন এবং বহিঃপ্রকৃতির মধ্যগত একটা সম্বন্ধ মাত্র। সে সম্বন্ধ সর্বত্র এবং সর্বকালে সমান নহে, সেইজন্যই সাধারণত তাহাকে বৈজ্ঞানিক কোঠা হইতে দূরে রাখা হয়।

মন্মথ। অনেক কথা আসিয়া পড়িল। আমার মোট কথাটা এই, সাহিত্যের বিষয় সুন্দর,

নৈতিক এবং যুক্তিসংগত। ইহার কোনো গুণটা বাদ পড়িলে সাহিত্য অসম্পূর্ণ হয়।

নগেন্দ্র। সাহিত্যের লক্ষ্য হইতেছে সৌন্দর্য। তবে যাহা আমাদের ধর্মবোধকে ক্ষুণ্ণ করে তাহা আমাদের সৌন্দর্যবোধকেও আঘাত করে; কতকগুলি যুক্তির নিয়ম আছে তাহাকেও অতিক্রম করিলে সৌন্দর্য পরাভূত হয়। সেইজন্যই বলি, হৃদয়বৃত্তিই সাহিত্যের গম্যস্থান, নীতি ও বুদ্ধি তাহার সহায়মাত্র। অতএব, বিষয়গত সত্য এবং বিষয়গত নীতি অপেক্ষা বিষয়গত সৌন্দর্যই তাহার মুখ্য উপাদান; এবং সেই সৌন্দর্যকে সুন্দর ভাষা সুন্দর আকার-দানই তাহাতে প্রাণসঞ্চার।

আদিত্য। পুঁথির গহনা এবং হীরার গহনা গঠনসৌন্দর্যে সমান হইতে পারে কিন্তু ভালো গহনার উপকরণে পুঁথি দেখিলে আমাদের চিত্তে একটা ক্ষোভ জন্মিতে পারে; তাহাতে করিয়া সৌন্দর্যের পূর্ণফল নষ্ট করে। কবি বলিয়াছেন— 'বীর বিনা আহা রমণীরতন আর কারে শোভা পায় রে', তেমনি পাঠক-হৃদয় সাহিত্য ও সৌন্দর্যের সহিত বীর্যের সম্মিলন প্রত্যাশা করে। যথেষ্ট মূল্যবান গৌরববান বিষয়ের সহিত সৌন্দর্যের সমাবেশ না দেখিলে সেই অসংগতিতে পীড়া এবং ক্রমে অবজ্ঞা উৎপাদন করিতে পারে।

মন্মথ। ইহার মধ্যে বিপদের সম্ভাবনা এই যে, গঠনের মূল্য অপেক্ষা হীরার মূল্য নির্ণয় করা সহজ, সেইজন্য অধিকাংশ লোক অলংকারের অলংকারত্ব উপেক্ষা করিয়া হীরার ওজনেই ব্যস্ত হয় এবং যে রসজ্ঞ ব্যক্তি মূল্যলাভ অপেক্ষা আনন্দলাভকেই গুরুতর বলিয়া গণ্য করেন, নিক্তির মানদণ্ড-দ্বারা তাঁহাকে অপমান করিয়া থাকে। এই-সকল বৈষয়িক সাংসারিক পাঠক-সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্রোহী হইয়াই এক-এক সময় রসজ্ঞের দল সাহিত্যের বিষয়গৌরবকে অত্যন্ত অবহেলাপূর্বক নিরালম্ব কলাসৌন্দর্য সম্বন্ধে অত্যুক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন।

ভারতী
জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫

সংগীত

সংগীত ও ভাব

অল্পদিন হইল বঙ্গসমাজের নিদ্রা ভাঙিয়াছে, এখন তাহার শরীরে একটা নব উদ্যমের সঞ্চার হইয়াছে। তাহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে স্ফূর্তি বিকাশ পাইতেছে। সেই স্ফূর্তি, সেই উদ্যম, সে কাজে প্রয়োগ করিতে চায়— সে কাজ করিতে চায়। সে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, সে চলিতে ফিরিতে চেষ্টা করিতেছে। একদল লোক মহা শশব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিয়াছেন, 'আরে, সর্বনাশ হইল! তুই উঠিস নে, তুই উঠিস নে! কে জানে কোথায় পড়িয়া যাইবি। তোর উঠিয়া কাজ নাই, তুই ঘুমা!' কিন্তু শিশুদেরও যে প্রকৃতি, নূতন সমাজেরও সেই প্রকৃতি। যখন তাহার ঘুম ভাঙিল, তখন সে নব উদ্যমে খেলা করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতে চায়। পড়িবে না তো কী। প্রকৃতি যদি শিশুদের হৃদয়ে পড়িবার ভয় দিতেন, তবে তাহারা ইহজন্মে চলিতে শিখিত না। নব-উত্থান-শীল সমাজের হৃদয়েও পড়িবার ভয় নাই। যাহারা খুব ভালো করিয়া চলিতে শিখিয়াছে এমন-সকল বড়ো বড়ো বয়ঃপ্রাপ্ত সমাজেরাই পড়িবার ভয় করুক; তাহাদের শক্ত হাড় দৈবাৎ একবার ভাঙিলে আর ঝট্ করিয়া জোড়া লাগিবে না। আমাদের শিশু সমাজ দশবার করিয়া পড়ুক তাহাতে বিশেষ হানি হইবে না; বরঞ্চ ভালো বৈ মন্দ হইবে না। তাই বলি, সমাজ একটা নূতন কাজে অগ্রসর হইবামাত্র অমনি দশজনে হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া না আসে যেন! আসিলেও বিশেষ কোনো ফল হইবে না। রক্ষণশীল মা বলিতেছেন, তাঁহার ছেলেটি চিরকাল তাঁহার স্তন্যপান করিয়া তাঁহার ঘরে থাকুক। উন্নতিপ্রিয় পিতা বলিতেছেন যে, তাঁহার ছেলেটির উপার্জন করিয়া খাইবার বয়স হইয়াছে, এখন তাহাকে ছাড়িয়া দাও, সে বাহির হইতে রোজগার করিয়া আনুক। ছেলেটিরও তাহাই ইচ্ছা। আর তাহাকে বাধা দেওয়া যায় না। এখন তাহাকে অস্বাস্থ্যকর স্নেহের জালে বদ্ধ করিয়া রাখা সুযুক্তিসংগত নহে।

আমাদের বঙ্গসমাজে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, এমন-কি, সে আন্দোলনের এক-একটা তরঙ্গ য়ুরোপের উপকূলে গিয়া পৌঁছাইতেছে। এখন হাজার চেষ্টা করো-না, হাজার কোলাহল করো-না কেন, এ তরঙ্গ রোধ করে কাহার সাধ্য! এই নূতন আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে সংগীতের নব অভ্যুদয় হইয়াছে। সংগীত সবে জাগিয়া উঠিয়াছে মাত্র, কাজ ভালো করিয়া আরম্ভ হয় নাই। এখনো সংগীত লইয়া নানা প্রকার আলোচনা আরম্ভ হয় নাই, নানা নূতন মতামত উত্থিত হইয়া আমাদের দেশের সংগীতশাস্ত্রের বদ্ধ জলে একটা জীবন্ত তরঙ্গিত স্রোতের সৃষ্টি করে নাই। কিন্তু দিন দিন সংগীত-শিক্ষার যেরূপ বিস্তার হইতেছে, তাহাতে সংগীত-বিষয়ে একটা আন্দোলন হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে বোধ করি। এ বিষয় লইয়া একটা তর্ক-বিতর্ক দ্বন্দ্ব-প্রতিদ্বন্দ্ব না হইলে ইহার তেমন একটা দ্রুত উন্নতি হইবে না।

আমাদের সংস্কৃত ভাষা যেরূপ মৃত ভাষা, আমাদের সংগীতশাস্ত্র সেইরূপ মৃত শাস্ত্র। ইহাদের প্রাণবিয়োগ হইয়াছে, কেবল দেহমাত্র অবশিষ্ট আছে। আমরা কেবল ইহাদের স্থির অচঞ্চল জীবনহীন মুখ মাত্র দেখিতে পাই; বিবিধ বিচিত্র ভাবের লীলাময়, ছায়ালোকময়, পরিবর্তনশীল মুখশ্রী দেখিতে পাই না। আমরা কতকগুলি কথা শুনিতে পাই; অথচ তাহার স্বরের উচ্চনীচতা শুনিতে পাই না, কেবল সমস্বরে একটি কথার পর আর-একটি কথা কানে আসে মাত্র। হয়তো ক্রমে ক্রমে তাহার অর্থবোধ মাত্র হয়, কিন্তু তাহার অর্থগুলিকে সম্যক্‌রূপে হজম করিয়া ফেলিয়া আমাদের হৃদয়ের রক্তের সহিত মিশাইয়া লইতে পারি না। আজ সংস্কৃত ভাষায় কেহ যদি কবিতা লেখেন, তবে নস্যসেবক চালকলাজীবী আলংকারিক সমালোচকেরা তাহাকে কী চক্ষে দেখেন? তৎক্ষণাৎ তাঁহারা ব্যাকরণ বাহির করেন, অলংকারের পুঁথিখানা খুলিয়া বসেন— যত্নগত

তদ্ধিতপ্রত্যয় সমাস সন্ধি মিলাইয়া যদি নিখুঁত বিবেচনা করেন, যদি দেখেন যশকে শুভ্র বলা হইয়াছে, নলিনীর সহিত সূর্যের ও কুমুদের সহিত চন্দ্রের মৈত্র সম্পাদন করা হইয়াছে, তবেই তাঁহারা পরমানন্দ উপভোগ করেন। আর, কেহ যদি আজ গান করেন, তবে তানপুরার কর্ণপীড়ক খরজ সুরের জন্মদাতাগণ তাহাকে কী চক্ষে সমালোচন করেন? তাঁহারা দেখেন একটা রাগ বা রাগিণী গাওয়া হইতেছে কি না; সে রাগ বা রাগিণীর বাদী সুরগুলিকে যথারীতি সমাদর ও বিসম্বাদী সুরগুলিকে যথারীতি অপমান করা হইয়াছে কি না; এ পরীক্ষাতে যদি গানটি উত্তীর্ণ হয় তবেই তাঁহাদের বাহবা-সূচক ঘাড় নড়ে। আমি সেদিন এক ব্যক্তির নিকট হইতে একটি চিঠি পাইয়াছিলাম; স্বাক্ষরিত নাম কিছুতেই পড়িয়া উঠিতে পারি নাই, অথচ সে চিঠির উত্তর দিতে হইবে। কী করি, সে যেরূপে তাহার নামটি লিখিয়াছিল অতি ধীরে ধীরে আমি অবিকল সেইরূপ নকল করিয়া দিলাম। যদি নামটি বুঝিতে পারিতাম, তবে সেই নামটি লিখিতাম অথচ নিজের হস্তাক্ষরে লিখিতাম। অবিকল নকল দেখিলেই বুঝা যায় যে, অনুকরণকারী অনুকৃত পদার্থের ভাব আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। মনে করুন আমি সাহেব হইতে চাই, অথচ আমি সাহেবদিগের ভাব কিছুমাত্র জানি না, তখন আমি কী করি? না, অ্যান্ড্রু-নামক একটি বিশেষ সাহেবকে লক্ষ্য রাখিয়া অবিকল তাহার মতো কোর্তা ও পাজামা ব্যবহার করি, তাহার কোর্তার যে দুই জায়গায় ছেঁড়া আছে যত্নপূর্বক আমার কোর্তার ঠিক সেই দুই জায়গায় ছিঁড়ি, ও তাহার নাকে যে স্থানে তিনটি তিল আছে আমার নাকের ঠিক সেইখানে কালি দিয়া তিনটি তিল চিত্রিত করি। ওই একই কারণ হইতে, যাহাদের স্বাভাবিক ভদ্রতা নাই তাহারা ভদ্র হইতে ইচ্ছা করিলে আনুষ্ঠানিক ভদ্রতার কিছু বাড়াবাড়ি করিয়া থাকে। আমাদের সংগীতশাস্ত্র নাকি মৃত শাস্ত্র, সে শাস্ত্রের ভাবটা আমরা নাকি আয়ত্ত করিতে পারি না, এইজন্য রাগরাগিণী বাদী ও বিসম্বাদী সুরের ব্যাকরণ লইয়াই মহা কোলাহল করিয়া থাকি। যে ভাষার ব্যাকরণ সম্পূর্ণ হইয়াছে, সে ভাষার পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে। ব্যাকরণে ভাষাকে বাঁচাইতে পারে না তো, প্রাচীন ইজিপ্ট্‌বাসীদের ন্যায় ভাষার একটা 'মমী' তৈরি করে মাত্র। যে সাহিত্যে অলংকারশাস্ত্রের রাজত্ব, সে সাহিত্যে কবিতাকে গঙ্গাযাত্রা করা হইয়াছে। অলংকারশাস্ত্রের পিঞ্জর হইতে মুক্ত হওয়াতে সম্প্রতি কবিতার কণ্ঠ বাংলার আকাশে উঠিয়াছে; আমার ইচ্ছা যে, কবিতার সহচর সংগীতকেও শাস্ত্রের লৌহকারা হইতে মুক্ত করিয়া উভয়ের মধ্যে বিবাহ দেওয়া হউক।

একটা অতি পুরাতন সত্য বলিবার আবশ্যক পড়িয়াছে। সকলেই জানেন— প্রথমে যেটি একটি উদ্দেশ্যের উপায় মাত্র থাকে, মানুষে ক্রমে সেই উপায়টিকে উদ্দেশ্য করিয়া তুলে। যেমন টাকা নানাপ্রকার সুখ পাইবার উপায় মাত্র, কিন্তু অনেকে সমস্ত সুখ বিসর্জন দিয়া টাকা পাইতে চান। রাগরাগিণীর উদ্দেশ্য কী ছিল? ভাব প্রকাশ করা ব্যতীত আর তো কিছু নয়। আমরা যখন কথা কহি তখনো সুরের উচ্চনীচতা ও কণ্ঠস্বরের বিচিত্র তরঙ্গলীলা থাকে। কিন্তু তাহাতেও ভাবপ্রকাশ অনেকটা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সেই সুরের উচ্চনীচতা ও তরঙ্গলীলা সংগীতে উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সংগীত মনোভাব-প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম উপায় মাত্র। আমরা যখন কবিতা পাঠ করি তখন তাহাতে অঙ্গহীনতা থাকিয়া যায়; সংগীত আর কিছু নয়— সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে কবিতা পাঠ করা। যেমন, মুখে যদি বলি যে 'আমার আহ্লাদ হইতেছে' তাহাতে অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যায়, কিন্তু যখন হাস্য করিয়া উঠি তখনই সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। যেমন, মুখে যদি বলি 'আমার দুঃখ হইতেছে' তাহাই যথেষ্ট হয় না, রোদন করিয়া উঠিলেই সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ হয়। তেমনি কথা কহিয়া যে ভাব অসম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করি, রাগরাগিণীতে সেই ভাব সম্পূর্ণতর রূপে প্রকাশ করি। অতএব রাগরাগিণীর উদ্দেশ্য ভাব প্রকাশ করা মাত্র। কিন্তু এখন তাহা কী হইয়া দাঁড়াইয়াছে? এখন রাগরাগিণীই উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে রাগরাগিণীর হস্তে ভাবটিকে সমর্পণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, সে রাগরাগিণী আজ বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক ভাবটিকে হত্যা করিয়া স্বয়ং সিংহাসন দখল করিয়া বসিয়া আছেন। আজ গান শুনিলেই সকলে

দেখিতে চান, জয়জয়ন্তী, বেহাগ বা কানেড়া বজায় আছে কি না। আরে মহাশয়, জয়জয়ন্তীর কাছে আমরা এমন কী ঋণে বদ্ধ যে, তাহার নিকটে অমনতর অন্ধ দাস্যবৃত্তি করিতে হইবে? যদি মধ্যমের স্থানে পঞ্চম দিলে ভালো শুনায়, আর তাহাতে বর্ণনীয় ভাবের সহায়তা করে, তবে জয়জয়ন্তী বাঁচুন বা মরুন, আমি পঞ্চমকেই বাহাল রাখিব না কেন— আমি জয়জয়ন্তীর কাছে এমনি কী ঘুষ খাইয়াছি যে, তাহার জন্য অত প্রাণপণ করিব? আজকাল ওস্তাদবর্গ যখন ভীষণ মুখশ্রী বিকাশ করিয়া গলদ্ঘর্ম হইয়া গান করেন, তখন সর্বপ্রথমেই ভাবের গলাটা এমন করিয়া টিপিয়া ধরেন ও ভাব বেচারিকে এমন করিয়া আর্তনাদ ছাড়ান যে, সহৃদয় শ্রোতামাত্রেরই বড়ো কষ্ট বোধ হয়। বৈয়াকরণে ও কবিতে যে প্রভেদ, উপরি-উক্ত ওস্তাদের সহিত আর-একজন ভাবুক গায়কের সেই প্রভেদ। একজন বলেন 'শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে', আর একজন বলেন 'নীরসতরুরুহ পুরতো ভাতি'।

কোন্ কোন্ রাগরাগিণীতে কী কী সুর লাগে না-লাগে তাহা তো মান্ধাতার আমলে স্থির হইয়া গিয়াছে, তাহা লইয়া আর অধিক পরিশ্রম করিবার কোনো আবশ্যক দেখিতেছি না। এখন সংগীতবেত্তারা যদি বিশেষ মনোযোগ-সহকারে আমাদের কী কী রাগিণীতে কী কী ভাব আছে তাহাই আবিষ্কার করিতে আরম্ভ করেন, তবেই সংগীতের যথার্থ উপকার করেন। আমাদের রাগরাগিণীর মধ্যে একটা ভাব আছে, তাহা যাইবে কোথা বলো। কেবল ওস্তাদবর্গেরা তাহাদের অত্যন্ত উৎপীড়ন করিয়া থাকেন, তাহাদের প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ দেন না, এমন-কি তাহারা তাঁহাদের চোখে পড়েই না। সংগীতবেত্তারা সেই ভাবের প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করুন। কেন বিশেষ-বিশেষ এক-এক রাগিণীতে বিশেষ-বিশেষ এক-একটা ভাবের উৎপত্তি হয় তাহার কারণ বাহির করুন। এই মনে করুন— পূরবীতেই বা কেন সন্ধ্যাকাল মনে আসে আর ভৈরোতেই বা কেন প্রভাত মনে আসে? পূরবীতেও কোমল সুরের বাহুল্য, আর ভৈরোতেও কোমল সুরের বাহুল্য, তবে উভয়েতে বিভিন্ন ফল উৎপন্ন করে কেন? তাহা কি কেবলমাত্র প্রাচীন সংস্কার হইতে হয়? তাহা নহে। তাহার গূঢ় কারণ বিদ্যমান আছে। প্রথমত প্রভাতের রাগিণী ও সন্ধ্যার রাগিণী উভয়েতেই কোমল সুরের আবশ্যক। প্রভাত যেমন অতি ধীরে ধীরে, অতি ক্রমশ নয়ন উন্মীলিত করে, সন্ধ্যা তেমনি অতি ধীরে ধীরে, অতি ক্রমশ নয়ন নিমীলিত করে। অতএব কোমল সুরগুলির, অর্থাৎ যে সুরের মধ্যে ব্যবধান অতি অল্প, যে সুরগুলি অতি ধীরে ধীরে অতি অলক্ষিত ভাবে পরস্পর পরস্পরের উপর মিলাইয়া যায়, সন্ধা ও প্রভাতের রাগিণীতে সেই সুরের অধিক আবশ্যক তবে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় কী বিষয়ে প্রভেদ থাকা উচিত? না, একটাতে সুরের ক্রমশ উত্তরোত্তর বিকাশ হওয়া আবশ্যক, আর-একটাতে অতি ধীরে ধীরে সুরের ক্রমশ নিমীলন হইয়া আসা আবশ্যক। ভৈরোতে ও পূরবীতে সেই বিভিন্নতা রক্ষিত হইয়াছে, এইজন্যই প্রভাত ও সন্ধ্যা উক্ত দুই রাগিণীতে মূর্তিমান।

কোন্ সুরগুলি দুঃখের ও কোন্ সুরগুলি সুখের হওয়া উচিত দেখা যাক। কিন্তু তাহা বিচার করিবার আগে, আমরা দুঃখ ও সুখ কিরূপে প্রকাশ করি দেখা আবশ্যক। আমরা যখন রোদন করি তখন দুইটি পাশাপাশি সুরের মধ্যে ব্যবধান অতি অল্পই থাকে, রোদনের স্বর প্রত্যেক কোমল সুরের উপর দিয়া গড়াইয়া যায়, সুর অত্যন্ত টানা হয়। আমরা যখন হাসি— হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, কোমল সুর একটিও লাগে না, টানা সুর একটিও নাই, পাশাপাশি সুরের মধ্যে দূর ব্যবধান, আর তালের ঝোঁকে ঝোঁকে সুর লাগে। দুঃখের রাগিণী দুঃখের রজনীর ন্যায় অতি ধীরে ধীরে চলে, তাহাকে প্রতি কোমল সুরের উপর দিয়া যাইতে হয়। আর সুখের রাগিণী সুখের দিবসের ন্যায় অতি দ্রুত-পদক্ষেপে চলে, দুই-তিনটা করিয়া সুর ডিঙাইয়া যায়। আমাদের রাগরাগিণীর মধ্যে উল্লাসের সুর নাই। আমাদের সংগীতের ভাবই— ক্রমে ক্রমে উত্থান বা ক্রমে ক্রমে পতন। সহসা উত্থান বা সহসা পতন নাই। উচ্ছ্বাসময় উল্লাসের সুরই অত্যন্ত সহসা। আমরা সহসা হাসিয়া উঠি, কোথা হইতে আরম্ভ করি কোথায় শেষ করি তাহার ঠিকানা নাই—

রোদনের ন্যায় তাহা ক্রমশ মিলাইয়া আসে না। এরূপ ঘোরতর উল্লাসের সুর ইংরাজি রাগিণীতে আছে, আমাদের রাগিণীতে নাই বলিলেও হয়। তবে আমাদের দেশের সংগীতে রোদনের সুরের অভাব নাই। সকল রাগিণীতেই প্রায় কাঁদা যায়। একেবারে আর্তনাদ হইতে প্রশান্ত দুঃখ, সকল প্রকার ভাবই আমাদের রাগিণীতে প্রকাশ করা যায়।

আমাদের যাহা-কিছু সুখের রাগিণী আছে তাহা বিলাসময় সুখের রাগিণী, গদগদ সুখের রাগিণী। অনেক সময়ে আমরা উল্লাসের গান রচনা করিতে হইলে রাগিণী যে ভাবেরই হউক তাহাকে দ্রুত তালে বসাইয়া লই, দ্রুত তাল সুখের ভাব প্রকাশের একটা অঙ্গ বটে।

যাহা হউক, এইখানে দেখা যাইতেছে যে, তালও ভাব প্রকাশের একটা অঙ্গ। যেমন সুর তেমনি তালও আবশ্যকীয়, উভয়ে প্রায় সমান আবশ্যকীয়। অতএব ভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তালও দ্রুত ও বিলম্বিত করা আবশ্যক— সর্বত্রই যে তাল সমান রাখিতেই হইবে তাহা নয়। ভাবপ্রকাশকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া, সুর ও তালকে গৌণ উদ্দেশ্য করিলেই ভালো হয়। ভাবকে স্বাধীনতা দিতে হইলে সুর এবং তালকেও অনেকটা স্বাধীন করিয়া দেওয়া আবশ্যক, নহিলে তাহারা ভাবকে চারি দিক হইতে বাঁধিয়া রাখে। এই-সকল ভাবিয়া আমার বোধ হয় আমাদের সংগীতে যে নিয়ম আছে যে, যেমন-তেমন করিয়া ঠিক একই স্থানে সমে আসিয়া পড়িতেই হয়, সেটা উঠাইয়া দিলে ভালো হয়। তালের সমমাত্রা থাকিলেই যথেষ্ট, তাহার উপরে আরো কড়াক্কড় করা ভালো বোধ হয় না। তাহাতে স্বাভাবিকতার অতিরিক্ত হানি করা হয়। মাথায় জলপূর্ণ কলস লইয়া নৃত্য করা যেরূপ, হাজার অঙ্গভঙ্গি করিলেও একবিন্দু জল উথলিয়া পড়িবে না, ইহাও সেইরূপ একপ্রকার কষ্টসাধ্য ব্যায়াম। সহজ স্বাভাবিক নৃত্যের যে-একটি শ্রী আছে ইহাতে তাহার যেন ব্যাঘাত করে; ইহাতে কৌশল প্রকাশ করে মাত্র। নৃত্যের পক্ষে কী স্বাভাবিক? না, যাহা নৃত্যের উদ্দেশ্য সাধন করে। নৃত্যের উদ্দেশ্য কী? না, অঙ্গভঙ্গির সৌন্দর্য, অঙ্গভঙ্গির কবিতা দেখাইয়া মনোহরণ করা। সে উদ্দেশ্যের বহির্ভূক্ত যাহা-কিছু তাহা নৃত্যের বহির্ভূক্ত। তাহাকে নৃত্য বলিব না, তাহার অন্য নাম দিব। তেমনি সংগীত কৌশলপ্রকাশের স্থান নহে, ভাবপ্রকাশের স্থান; যতখানিতে ভাবপ্রকাশের সাহায্য করে ততখানিই সংগীতের অন্তর্গত; যাহা-কিছু কৌশল প্রকাশ করে তাহা সংগীত নহে, তাহার অন্য নাম। একপ্রকার কবিতা আছে, তাহা সোজা দিক হইতে পড়িলেও যাহা বুঝায়, উন্টা দিক হইতে পড়িলেও তাহাই বুঝায়; সে রূপ কবিতা কৌশলপ্রকাশের জন্যই উপযোগী, আর কোনো উদ্দেশ্য তাহাতে সাধন করা যায় না। সেইরূপ আমাদের সংগীতে কৃত্রিম তালের প্রথা ভাবের হস্তপদে একটা অনর্থক শৃঙ্খল বাঁধিয়া দেয়। যাঁহারা এ প্রথা নিতান্ত রাখিতে চান তাঁহারা রাখুন, কিন্তু তালের প্রতি ভাবের যখন অত্যন্ত নির্ভর দেখিতেছি তখন আমার মতে আর-একটি অধিকতর স্বাভাবিক তালের পদ্ধতি থাকা শ্রেয়। আর-কিছু করিতে হইবে না, যেমন তাল আছে তেমনি থাকুক, মাত্রা-বিভাগ যেমন আছে তেমনি থাকুক, কেবল একটা নির্দিষ্ট স্থানে সমে ফিরিয়া আসিতেই হইবে এমন বাঁধাবাঁধি না থাকিলে সুবিধা বই অসুবিধা কিছুই দেখিতেছি না। এমন-কি, গীতিনাট্যে, যাহা আদ্যোপান্ত সুরে অভিনয় করিতে হয় তাহাতে, স্থানবিশেষে তাল না থাকা বিশেষ আবশ্যক। নহিলে অভিনয়ের স্ফূর্তি হওয়া অসম্ভব।

যাহা হউক, দেখা যাইতেছে যে, সংগীতের উদ্দেশ্যই ভাব প্রকাশ করা। যেমন কেবলমাত্র ছন্দ, কানে মিষ্ট শুনাক তথাপি অনাবশ্যক, ভাবের সহিত ছন্দই কবিদের ও ভাবুকদের আলোচনীয়, তেমনি কেবলমাত্র সুরসমষ্টি, ভাব না থাকিলে জীবনহীন দেহ মাত্র— সে দেহের গঠন সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে জীবন নাই। কেহ কেহ বলিবেন, তবে কি রাগরাগিণী-আলাপ নিষিদ্ধ? আমি বলি তাহা কেন হইবে? রাগরাগিণী-আলাপ ভাষাহীন সংগীত। অভিনয়ে pantomime যেরূপ ভাষাহীন অঙ্গভঙ্গি-দ্বারা ভাব প্রকাশ করা, সংগীতে আলাপও সেইরূপ। কিন্তু pantomime-এ যেমন কেবলমাত্র অঙ্গভঙ্গি হইলেই হয় না, যে-সকল অঙ্গভঙ্গি-দ্বারা ভাব

প্রকাশ হয় তাহাই আবশ্যক; আলাপেও সেইরূপ কেবল কতকগুলি সুর কণ্ঠ হইতে বিক্ষেপ করিলেই হইবে না, যে-সকল সুর-বিন্যাস-দ্বারা ভাব প্রকাশ হয় তাহাই আবশ্যক। গায়কেরা সংগীতকে যে আসন দেন, আমি সংগীতকে তদপেক্ষা উচ্চ আসন দিই; তাঁহারা সংগীতকে কতকগুলা চেতনাহীন জড় সুরের উপর স্থাপন করেন, আমি তাহাকে জীবন্ত অমর ভাবের উপর স্থাপন করি। তাঁহারা গানের কথার উপরে সুরকে দাঁড় করাইতে চান, আমি গানের কথাগুলিকে সুরের উপরে দাঁড় করাইতে চাই। তাঁহারা কথা বসাইয়া যান সুর বাহির করিবার জন্য, আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করিবার জন্য। এইখানে গান রচনা সম্বন্ধে একটি কথা বলা আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি। গানের কবিতা, সাধারণ কবিতার সঙ্গে কেহ যেন এক তুলাদণ্ডে ওজন না করেন। সাধারণ কবিতা পড়িবার জন্য ও সংগীতের কবিতা শুনিবার জন্য। উভয়ে যদি এতখানি শ্রেণীগত প্রভেদ হইল, তবে অন্যান্য নানা ক্ষুদ্র বিষয়ে অমিল হইবার কথা। অতএব গানের কবিতা পড়িয়া বিচার না করাই উচিত। খুব ভালো কবিতাও গানের পক্ষে হয়তো খারাপ হইতে পারে এবং খুব ভালো গানও হয়তো পড়িবার পক্ষে ভালো না হইতে পারে। মনে করুন, একজন হাঃ বলিয়া একটি নিশ্বাস ফেলিল, তাহা লিখিয়া লইলে আমরা পড়িব— হ'-এ আকার ও বিসর্গ, হাঃ। কিন্তু সে নিশ্বাসের মর্ম কি এরূপে অবগত হওয়া যায়? তেমনি আবার যদি আমরা শুনি কেহ খুব একটা লম্বাচৌড়া কবিত্বসূচক কথায় নিশ্বাস ফেলিতেছে, তবে হাস্যরস ব্যতীত আর কোনো রস কি মনে আসে? গানও সেইরূপ নিশ্বাসের মতো। গানের কবিতা পড়া যায় না, গানের কবিতা শুনা যায়।

উপসংহারে সংগীতবেত্তাদিগের প্রতি আমার এই নিবেদন যে, কী কী সুর কিরূপে বিন্যাস করিলে কী কী ভাব প্রকাশ করে, আর কেনই বা তাহা প্রকাশ করে, তাহার বিজ্ঞান অনুসন্ধান করুন। মূলতান ইমন-কল্যাণ কেদারা প্রভৃতিতে কী কী সুর বাদী আর কী কী সুর বিসম্বাদী তাহার প্রতি মনোযোগ না করিয়া, দুঃখ সুখ রোষ বা বিস্ময়ের রাগিণীতে কী কী সুর বাদী ও কী কী সুর বিসম্বাদী তাহাই আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হউন। মূলতান কেদারা প্রভৃতি তো মানুষের রচিত কৃত্রিম রাগরাগিণী, কিন্তু আমাদের সুখদুঃখের রাগরাগিণী কৃত্রিম নহে। আমাদের স্বাভাবিক কথাবার্তার মধ্যে সেই-সকল রাগরাগিণী প্রচ্ছন্ন থাকে। কতকগুলা অর্থশূন্য নাম পরিত্যাগ করিয়া, বিভিন্ন ভাবের নাম অনুসারে আমাদের রাগ-রাগিণীর বিভিন্ন নামকরণ করা হউক। আমাদের সংগীতবিদ্যালয়ে সুর-অভ্যাস ও রাগরাগিণী-শিক্ষার শ্রেণী আছে, সেখানে রাগরাগিণীর ভাব-শিক্ষারও শ্রেণী স্থাপিত হউক। এখন যেমন সংগীত শুনিলেই সকলে বলেন 'বাঃ, ইহার সুর কী মধুর', এমন দিন কি আসিবে না যেদিন সকলে বলিবেন, 'বাঃ, কী সুন্দর ভাব'!

আমাদের সংগীত যখন জীবন্ত ছিল, তখন ভাবের প্রতি যেরূপ মনোযোগ দেওয়া হইত সেরূপ মনোযোগ আর কোনো দেশের সংগীতে দেওয়া হয় কি না সন্দেহ। আমাদের দেশে যখন বিভিন্ন ঋতু ও বিভিন্ন সময়ের ভাবের সহিত মিলাইয়া বিভিন্ন রাগরাগিণী রচনা করা হইত, যখন আমাদের রাগরাগিণীর বিভিন্ন ভাবব্যঞ্জক চিত্র পর্যন্ত ছিল, তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের দেশে রাগরাগিণী ভাবের সেবাতেই নিযুক্ত ছিল। সে দিন গিয়াছে। কিন্তু আবার কি আসিবে না!

ভারতী
জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮

সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা

(হর্বার্ট্ স্পেন্সরের মত)

'সংগীত ও ভাব'-নামক প্রবন্ধ রচনার পর হর্বার্ট স্পেন্সরের রচনাবলী পাঠ করিতে করিতে দেখিলাম 'The Origin and Function of Music'-নামক প্রবন্ধে যে-সকল মত অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহা আমার মতের সমর্থন করে এবং অনেক স্থলে উভয়ের কথা এক হইয়া গিয়াছে।

স্পেন্সর সংগীতের শরীরগত কারণ সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, বাঁধা কুকুর যখন দূর হইতে তাহার মনিবকে দেখে, বন্ধনমুক্ত হইবার আশায় অল্প অল্প লেজ নাড়িতে থাকে। মনিব যতই তাহার কাছে অগ্রসর হয়, ততই সে অধিকতর লেজ নাড়িতে এবং গা দুলাইতে থাকে। মুক্ত করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে মনিব তাহার শিকলে হাত দিলে এমন সে লাফালাফি আরম্ভ করে যে, তাহার বাঁধন খোলা বিষম দায় হইয়া উঠে। অবশেষে যখন সম্পূর্ণ ছাড়া পায় তখন খুব খানিকটা ইতস্তত ছুটাছুটি করিয়া তাহার আনন্দের বেগ সামলায়। এইরূপ আনন্দে বা বিষাদে বা অন্যান্য মনোবৃত্তির উদয়ে সকল প্রাণীরই মাংসপেশিতে ও অনুভবজনক স্নায়ুতে উত্তেজনার লক্ষণ প্রকাশিত হয়। মানুষেও সুখে হাসে, যন্ত্রণায় ছটফট করে। রাগে ফুলিতে থাকে, লজ্জায় সংকুচিত হইয়া যায়। অর্থাৎ, শরীরের মাংসপেশিসমূহে মনোবৃত্তির প্রভাব তরঙ্গিত হইতে থাকে। মনোবৃত্তির অতিরিক্ত তীব্রতায় আমরা অভিভূত হইয়া পড়ি বটে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সাধারণ নিয়মস্বরূপে বলা যায় যে, শরীরের গতির সহিত হৃদয়ের বৃত্তির বিশেষ যোগ আছে। তাহা যেন হইল, কিন্তু সংগীতের সহিত তাহার কী যোগ? আছে। আমাদের কণ্ঠস্বর কতকগুলি বিশেষ মাংসপেশি দ্বারা উৎপন্ন হয়; সে-সকল মাংসপেশি শরীরের অন্যান্য পেশিসমূহের সঙ্গে সঙ্গে মনোভাবের উদ্রেকে সংকুচিত হইয়া যায়। এই নিমিত্ত আমরা যখন হাসি তখন অধরের সমীপবর্তী মাংসপেশি সংকুচিত হয়, এবং হাস্যের বেগ গুরুতর হইলে তৎসঙ্গে-সঙ্গে কণ্ঠ হইতেও একটা শব্দ বাহির হইতে থাকে। রোদনেও ঠিক সেইরূপ। এক কথায় বিশেষ বিশেষ মনোভাব- উদ্রেকের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের নানা মাংসপেশি ও কণ্ঠের শব্দনিঃসারক মাংসপেশিতে উত্তেজনার আবির্ভাব হয়। মনোভাবের বিশেষত্ব ও পরিমাণ -অনুসারে কণ্ঠস্থিত মাংসপেশিসমূহ সংকুচিত হয়; তাহাদের বিভিন্ন প্রকারের সংকোচন অনুসারে আমাদের শব্দযন্ত্র বিভিন্ন আকার ধারণ করে; এবং সেই বিভিন্ন আকার অনুসারে শব্দের বিভিন্নতা সম্পাদিত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, আমাদের কণ্ঠনিঃসৃত বিভিন্ন স্বর বিভিন্ন মনোবৃত্তির শরীরগত বিকাশ।

আমাদের মনের ভাব বেগবান হইলে আমাদের কণ্ঠস্বর উচ্চ হয়, নহিলে অপেক্ষাকৃত মৃদু থাকে।

উত্তেজনার অবস্থায় আমাদের গলার স্বরে সুরের আমেজ আসে। সচরাচর সামান্য-বিষয়ক কথোপকথনে তেমন সুর থাকে না। বেগবান মনোভাবে সুর আসিয়া পড়ে। রোষের একটা সুর আছে, খেদের একটা সুর আছে, উল্লাসের একটা সুর আছে।

সচরাচর আমরা যে স্বরে কথাবার্তা কহিয়া থাকি তাহাই মাঝামাঝি স্বর। সেই স্বরে কথা কহিতে আমাদের বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয় না। কিন্তু তাহার অপেক্ষা উঁচু বা নিচু স্বরে কথা কহিতে হইলে কণ্ঠস্থিত মাংসপেশির বিশেষ পরিশ্রমের আবশ্যক করে। মনোভাবের বিশেষ উত্তেজনা হইলেই তবে আমরা আমাদের স্বাভাবিক মাঝামাঝি সুর ছাড়াইয়া উঠি অথবা নামি। অতএব দেখা যাইতেছে, বেগবান মনোবৃত্তির প্রভাবে আমরা আমাদের স্বাভাবিক কথাবার্তার সুরের বাহিরে যাই।

সচরাচর যখন শান্তভাবে কথাবার্তা কহিয়া থাকি, তখন আমাদের কথার স্বর অনেকটা

একঘেয়ে হয়। সুরের উঁচুনিচু খেলায় না। মনোবৃত্তির তীব্রতা যতই বাড়ে, ততই আমাদের কথায় সুরের উঁচুনিচু খেলিতে থাকে। আমাদের গলা খুব নিচু হইতে খুব উঁচু পর্যন্ত উঠানামা করিতে থাকে। কণ্ঠের সাহায্য ব্যতীত ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়া দুরূহ। পাঠকেরা একবার কল্পনা করিয়া দেখুন আমরা যখন কাহারও প্রতি রাগ করিয়া বলি, 'এ তোমার কী রকম স্বভাব?' 'এ' শব্দটা কত উঁচু সুরে ধরি ও 'স্বভাব' শব্দটায় কতটা নিচুসুরে নামিয়া আসি। ঠিক এক গ্রামের বৈলক্ষণ্য হয়।

যাহা হউক, দেখা যাইতেছে সচরাচর কথাবার্তার সহিত মনোবৃত্তির উত্তেজিত অবস্থার কথাবার্তার ধারা স্বতন্ত্র। পাঠকেরা অবধান করিয়া দেখিবেন যে, উত্তেজিত অবস্থার কথাবার্তার যে-সকল লক্ষণ, সংগীতেরও তাহাই লক্ষণ। সুখ দুঃখ প্রভৃতির উত্তেজনায় আমাদের কণ্ঠস্বরে যে-সকল পরিবর্তন হয়, সংগীতে তাহারই চূড়ান্ত হয় মাত্র। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, উত্তেজিত মনোবৃত্তির অবস্থায় আমাদের কথোপকথনে স্বর উচ্চ হয়, স্বরে সুরের আভাস থাকে; সচরাচরের অপেক্ষা স্বরের সুর উঁচু অথবা নিচু হইয়া থাকে, এবং স্বরে সুরের উঁচুনিচু ক্রমাগত খেলিতে থাকে। গানের স্বরও উচ্চ, গানের সমস্তই সুর; গানের সুর সচরাচর কথোপকথনের সুর হইতে অনেকটা উঁচু অথবা নিচু হইয়া থাকে এবং গানের সুরে উঁচুনিচু ক্রমাগত খেলাইতে থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, উত্তেজিত মনোবৃত্তির সুর সংগীতে যথাসম্ভব পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। তীব্র সুখ দুঃখ কণ্ঠে প্রকাশের যে লক্ষণ সংগীতেরও সেই লক্ষণ।

আমাদের মনোভাব গাঢ়তম তীব্রতম রূপে প্রকাশ করিবার উপায়-স্বরূপে সংগীতের স্বাভাবিক উৎপত্তি। যে উপায়ে ভাব সর্বোৎকৃষ্টরূপে প্রকাশ করি, সেই উপায়েই আমরা ভাব সর্বোৎকৃষ্টরূপে অন্যের মনে নিবিষ্ট করিয়া দিতে পারি। অতএব সংগীত নিজের উত্তেজনা-প্রকাশের উপায় ও পরকে উত্তেজিত করিবার উপায়।

সংগীতের উপযোগিতা সম্বন্ধে স্পেন্‌সর বলিতেছেন— আপাতত মনে হয় যেন সংগীত শুনিয়া যে অব্যবহিত সুখ হয়, তাহাই সাধন করা সংগীতের কার্য। কিন্তু সচরাচর দেখা যায়, যাহাতে আমরা অব্যবহিত সুখ পাই তাহাই তাহার চরম ফল নহে। আহার করিলে ক্ষুধা-নিবৃত্তির সুখ হয় কিন্তু তাহার চরম ফল শরীর-পোষণ, মাতা স্নেহের বশবর্তী হইয়া আত্মসুখসাধনের জন্য যাহা করেন তাহাতে সন্তানের মঙ্গলসাধন হয়, যশের সুখ পাইবার জন্য আমরা যাহা করি তাহাতে সমাজের নানা কার্য সম্পন্ন হয়— ইত্যাদি। সংগীতে কি কেবল আমোদমাত্রই হয়? অলক্ষিত কোনো উদ্দেশ্য সাধিত হয় না?

সকল-প্রকার কথোপকথনে দুইটি উপকরণ বিদ্যমান আছে। কথা ও যে ধরনে সেই কথা উচ্চারিত হয়। কথা ভাবের চিহ্ন (signs of ideas) আর ধরন অনুভাবের চিহ্ন (signs of feeling)। কতকগুলি বিশেষ শব্দ আমাদের ভাবকে বাহিরে প্রকাশ করে এবং সেই ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদয়ে যে সুখ বা দুঃখ উদয় হয়, সুরে তাহাই প্রকাশ করে। 'ধরন' বলিতে যদি সুরের বাঁক্‌চোর উঁচুনিচু সমস্তই বুঝায় তবে বলা যায় যে, বুদ্ধি যাহা-কিছু কথায় বলে, হৃদয় 'ধরন' দিয়া তাহারই টীকা করে। কথাগুলি একটা প্রস্তাব মাত্র, আর বলিবার ধরন তাহার টীকা ও ব্যাখ্যা। সকলেই জানেন, অধিকাংশ সময়ে কথা অপেক্ষা তাহা বলিবার ধরনের উপর অধিক নির্ভর করি। অনেক সময়ে কথায় যাহা বলি, বলিবার ধরনে তাহার উল্টা বুঝায়। 'বড়োই বাধিত করলে!' কথাটি বিভিন্ন সুরে উচ্চারণ করিলে কীরূপ বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করে সকলেই জানেন। অতএব দেখা যাইতেছে, আমরা একসঙ্গে দুই প্রকারের কথা কহিয়া থাকি। ভাবের ও অনুভাবের।

আমাদের কথোপকথনের এই উভয় অংশই একসঙ্গে উন্নতি লাভ করিতেছে। সভ্যতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কথা বাড়িতেছে, ব্যাকরণ বিস্তৃত ও জটিল হইয়া উঠিতেছে, এবং সেইসঙ্গে-সঙ্গে যে আমাদের বলিবার ধরন পরিবর্তিত ও উন্নত হইতেছে তাহা সহজেই অনুমান

করা যায়। সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে কথা বাড়িতেছে তাহার অর্থই এই যে, ভাব ও অনুভাব বাড়িতেছে। সেইসঙ্গে-সঙ্গে যে, ভাব ও অনুভাব প্রকাশ করিবার উপায় সর্বতোভাবে সংস্কৃত ও উন্নত হইতেছে না তাহা বলা যায় না। বলা বাহুল্য যে, অনেকগুলি উন্নত ভাব ও সূক্ষ্ম অনুভাব অসভ্যদের নাই, তাহা প্রকাশ করিবার উপকরণও তাহাদের নাই। বুদ্ধির ভাষাও যেমন উন্নত হইতে থাকে, আবেগের (emotion) ভাষাও তেমনি উন্নত হয়। এখন কথা এই, সংগীত আমাদিগকে অব্যবহিত যে সুখ দেয়, তৎসঙ্গে-সঙ্গে আমাদের আবেগের ভাষার (language of the emotions) পরিস্ফুটতা সাধন করিতে থাকে। আবেগের ভাষাই সংগীতের মূল। সেই কারণ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া আজ ইহা এক স্বতন্ত্র বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু যেমন রসায়নশাস্ত্র বস্তুনির্মাণবিদ্যা হইতে জন্মলাভ করিয়া স্বতন্ত্র শাস্ত্ররূপে উন্নীত হইয়াছে, ও অবশেষে বস্তুনির্মাণবিদ্যার বিশেষ সহায়তা করিতেছে, যেমন শরীরতত্ত্ব চিকিৎসাবিদ্যা হইতে উৎপন্ন হইয়া স্বতন্ত্র শাস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে ও চিকিৎসাবিদ্যার উন্নতি সাধন করিতেছে, তেমনি সংগীত আবেগের ভাষা হইতে জন্মাইয়া আবেগের ভাষাকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেছে। সংগীতের এই কার্য।

অনেকে হয়তো সহসা মনে করিবেন এ কার্য তো অতি সামান্য। কিন্তু তাহা নহে। মনুষ্যজাতির সুখবর্ধনের পক্ষে আবেগের ভাষা, বুদ্ধির ভাষার সমান উপযোগী। কারণ সুরের বিচিত্র তরঙ্গ-ভঙ্গি আমাদের হৃদয়ের অনুভাব হইতে উৎপন্ন হয় এবং সেই অনুভাব অন্যের হৃদয়ে জাগ্রত করে। বুদ্ধি মৃত ভাষায় আপনার ভাব-সকল প্রকাশ করে আর সুরের লীলা তাহাতে জীবনসঞ্চার করে। ইহার ফল হয় এই যে, সেই ভাবগুলি আমরা কেবলমাত্র যে বুঝি তাহা নহে, তাহা আমরা গ্রহণ করিতে পারি। পরস্পরের মধ্যে সমবেদনা উদ্রেক করিবার ইহাই প্রধান উপায়। সাধারণের মঙ্গল ও আমাদের নিজের সুখ এই সমবেদনার উপর এতখানি নির্ভর করে যে, যাহাতে করিয়া আমাদের মধ্যে এই সমবেদনার বিশেষ চর্চা হয় তাহা সভ্য সমাজের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক ও উপকারী। এই সমবেদনার প্রভাবেই আমরা পরের প্রতি ন্যায্য ও সদয় ব্যবহার করিয়া থাকি; এই সমবেদনার ন্যূনাধিক্যই অসভ্যদিগের নিষ্ঠুরতা ও সভ্যদিগের সর্বজনীন মমতার কারণ; বন্ধুত্ব, প্রেম, পারিবারিক সুখ, সমস্তই এই সমবেদনার উপরে গঠিত। অতএব এই সমবেদনা প্রকাশ করিবার উপায় সভ্যতার পক্ষে কতখানি উপযোগী তাহা আর বলিবার আবশ্যক করে না।

সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের দ্বন্দ্বপরায়ণ ভাব-সকল অন্তর্হিত হইয়া সামাজিক ভাবের প্রাদুর্ভাব হইতেছে, কেবলমাত্র স্বার্থপর ভাব-সকল দূর হইয়া পরার্থসাধক ভাবের চর্চা হইতেছে। এইরূপ সামাজিক ভাবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সভ্য জাতিদের সমবেদনার ভাব বিকশিত হইতেছে ও সেইসঙ্গে তাহাদের মধ্যে সমবেদনার ভাষাও বাড়িয়া উঠিতেছে।

অনেকগুলি উন্নততর সূক্ষ্মতর ও জটিলতর অনুভাব অল্পসংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহা কালক্রমে জনসাধারণে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে— তখন আবেগের ভাষাও বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। এখন যেমন সভ্য দেশে ভাবপ্রকাশক ভাষা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ অবস্থা হইতে এমন দ্রুত উন্নতি লাভ করিতেছে যে, অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিল ভাব-সকলও তাহাতে অতি পরিষ্কাররূপে প্রকাশ হইতে পারিতেছে, তেমনি আবেগের ভাষা যদিও এখনো অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, তথাপি ক্রমে এতদূর উন্নতি লাভ করিতে পারিবে যে, আমরা আমাদের হৃদয়াবেগ অতি জাজ্বল্যরূপে ও সম্পূর্ণরূপে অন্যের হৃদয়ে মুদ্রিত করিতে পারিব। সকলেই জানেন অভদ্রদের অপেক্ষা ভদ্রলোকদের গলা অধিক মিষ্ট। একজন অভদ্র যাহা বলে একজন ভদ্র ঠিক তাহাই বলিলে, অপরের অপেক্ষা অনেক মিষ্ট শুনায়। তাহার কারণ আর কিছুই নহে, অভদ্রের অপেক্ষা একজন ভদ্রের অনুভাবের চর্চা অধিক হইয়াছে, সুতরাং অনুভাব প্রকাশের উপায়ও তাঁহাদের সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে। তাহার ঠিক সুরগুলি তাঁহারা জানেন, কণ্ঠস্বরেই বুঝা যায় যে তাঁহারা ভদ্র। বহুকাল হইতে তাঁহারা ভদ্রতার ঠিক সুরটি শুনিয়া আসিতেছেন, তাহাই ব্যবহার

করিয়া আসিতেছেন। অনুভাবপূর্ণ সংগীত যাঁহারা চর্চা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের যে অনুভাবের ভাষা বিশেষ মার্জিত ও সম্পূর্ণ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কী আছে?

সুন্দর রাগিণী শুনিলে আমাদের হৃদয়ে যে সুখের উদ্রেক হয় তাহার কারণ বোধ করি অতি দূর ভবিষ্যতে উন্নত সভ্যতার অবস্থায় যে এক সুখময় অনুভাবের দিন আসিবে, সুন্দর রাগিণী তাহারই ছায়া আমাদের হৃদয়ে আনয়ন করে। এই-সকল রাগিণী, যাহার উপযুক্ত অনুভাব আজকাল আমরা খুঁজিয়া পাই না, এমন সময় আসিবে যখন সচরাচর ব্যবহৃত হইতে পারিবে। আজ সুরসমষ্টি মাত্র আমাদের হৃদয়ে যে সুখ দিতেছে, উন্নত যুগে অনুভাবের সহিত মিলিয়া লোকদের তাহার দ্বিগুণ সুখ দিবে। ভালো সংগীত শুনিলে আমাদের হৃদয়ে যে একটি দূর অপরিস্ফুট আদর্শ জগৎ মায়াময়ী মরীচিকার ন্যায় প্রতিবিম্বিত হইতে থাকে, ইহাই তাহার কারণ। এই তো গেল স্পেন্‌সরের মত।

স্পেন্‌সরের মতকে আর-এক পা লইয়া গেলেই বুঝায় যে, এমন একদিন আসিতেছে যখন আমরা সংগীতেই কথাবার্তা কহিব। সভ্যতার যখন এতদূর উন্নতি হইবে যে, আমাদের হৃদয়ের অঙ্গহীন রুগ্ণ, মলিন বৃত্তিগুলিকে সশঙ্কিত ভাবে আর ঢাকিয়া বেড়াইতে হইবে না, তাহারা পরিপূর্ণ সুস্থ ও সুমার্জিত হইয়া উঠিবে— যখন সমবেদনার এতদূর বৃদ্ধি হইবে যে, পরস্পরের নিকট আমাদের হৃদয়ের অনুভাব-সকল অসংকোচে ও আনন্দে প্রকাশ করিব, তখন অনুভাব প্রকাশের চর্চা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিবে, তখন সংগীতই আমাদের অনুভাব প্রকাশের ভাষা হইয়া দাঁড়াইবে। মনুষ্যসমাজের তিনটি অবস্থা আছে। সমাজের বাল্য অবস্থায় মানুষ হৃদয় আচ্ছাদন করিয়া রাখে না, তাহারা দোষকে দোষ বলিয়া জানে না; যখন দোষ গুণ বিচার করিতে শিখে অথচ বহুকালক্রমাগত অসংযত স্বভাবের উপর একেবারে জয়লাভ করিতে পারে না, তখন সে আপনার হৃদয়কে নিতান্ত অনাবৃত রাখিতে লজ্জা বোধ করে; যখনি সমাজ অনাবৃত থাকিতে লজ্জা বোধ করিতে লাগিল তখন বুঝা গেল সংশোধন আরম্ভ হইয়াছে; অবশেষে যখন এই গোপন চিকিৎসার ফল এতদূর ফলিল যে ঢাকিয়া রাখিবার আর-কিছু রহিল না, তখন পুনর্বার প্রকাশ করিবার কাল আইসে। আধুনিক সভ্যতার গোপন রাখিবার ভাব উত্তীর্ণ হইয়া যখন ভবিষ্যৎ সভ্যতার প্রকাশ করিবার কাল আসিবে, তখন প্রকাশের ভাষার অত্যন্ত উন্নতি হইবার কথা। অনুভাব-প্রকাশের ভাষার অত্যন্ত উন্নতিই সংগীত। একজন মানুষের জীবনে তিনটি করিয়া যুগ আছে। প্রথম— বাল্যকালে সে যাহা-তাহা বকিয়া থাকে, তাহার নিয়ম নাই, শৃঙ্খলা নাই। দ্বিতীয়— তাহার শিক্ষার কাল, এই কাল তাহার চুপ করিয়া থাকিবার কাল। প্রবাদ আছে, চুপ না করিয়া থাকিলে কথা কহিতে শিখা যায় না। এখন চুপে চুপে তাহার চরিত্র, তাহার জ্ঞান গঠিত হইতেছে, এখনো গঠন সম্পূর্ণ হয় নাই। তৃতীয়— কথা কহিবার কাল। চুপ করিয়া সে যাহা শিখিয়াছে, এখন সে তাহাই বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার চরিত্র সংগঠিত হইয়াছে, ভাব পরিণত হইয়াছে, ভাষা সম্পূর্ণ হইয়াছে। সমাজেরও সেই তিন অবস্থা আছে। প্রথমে সে যাহা-তাহা বকে, ঈষৎ জ্ঞান হইলেই যাহা-তাহা বকিতে লজ্জা বোধ হয়। সেই সময়টা চুপচাপ করিয়া থাকে। জ্ঞান যখন সম্পূর্ণ হয় তখন তাহার সে লজ্জা দূর হয়, তখন তাহার ভাষা পরিস্ফুটতা প্রাপ্ত হয়। অনুভাব সম্বন্ধে বর্তমান সভ্যতার সেই লজ্জার অবস্থা, চুপ করিয়া থাকিবার অবস্থা। এখন যাহা কথা বলে ছেলেবেলা অপেক্ষা অনেক ভালো বলে বটে, কিন্তু ঢাকিয়া বলে— যাহা মনে আসে তাহাই বলে না। কণ্ঠস্বরে যেন ইতস্ততের ভাব, সংকোচের ভাব থাকে, সুতরাং পরিস্ফুটতার ভাব থাকে না। সুতরাং এখনকার অনুভাবের ভাষা ছেলেবেলাকার ভাষার অপেক্ষা অনেক ভালো বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ ভালো নহে। এমন অবস্থা আসিবে, যখন অনুভাবের ভাষা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে, তখনকার ভাষা, বোধ করি, এখনকার সংগীত। এখন যেমন জ্ঞান প্রকাশের স্বাধীনতা হইয়াছে— freedom of thought যাহা পূর্বে অত্যন্ত গর্হিত বলিয়া ঠেকিত, যাহা সমাজ দমন করিয়া রাখিত, এখন তাহা সভ্যদেশে বিশিষ্টরূপে প্রচলিত

হইয়াছে এবং জ্ঞান প্রকাশের ভাষাও বিশেষরূপে উন্নতি লাভ করিয়াছে, নিশ্চয় এমন কাল আসিবে, যখন অনুভাব প্রকাশের স্বাধীনতা হইবে— পরস্পরের মধ্যে অনুভাবের আদানপ্রদানের বিশেষরূপ চর্চা হইবে ও সেইসঙ্গে আবেগের ভাষাও সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে।

আমাদের দেশে সংগীত এমনি শাস্ত্রগত, ব্যাকরণগত, অনুষ্ঠানগত হইয়া পড়িয়াছে, স্বাভাবিকতা হইতে এত দূরে চলিয়া গিয়াছে যে, অনুভাবের সহিত সংগীতের বিচ্ছেদ হইয়াছে, কেবল কতকগুলা সুরসমষ্টির কর্দম এবং রাগরাগিণীর ছাঁচ ও কাঠামো অবশিষ্ট রহিয়াছে; সংগীত একটি মৃত্তিকাময়ী প্রতিমা হইয়া পড়িয়াছে— তাহাতে হৃদয় নাই, প্রাণ নাই। এইরূপ একই ছাঁচে-ঢালা, অপরিবর্তনশীল সংগীতের জড়প্রতিমা আমাদের দেবদেবীমূর্তির ন্যায় বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। যে-কোনো গায়ক-কুম্ভকার সংগীত গড়িয়াছে, প্রায় সেই একই ছাঁচে গড়িয়াছে। এইটুকু মাত্র তাহার বাহাদুরি যে, তাহার সম্মুখস্থিত আদর্শ-মূর্তির সহিত তাহার গঠিত প্রতিমার কিছুমাত্র তফাত হয় নাই— এমনি তাহার হাত দোরস্ত! মনসা শীতলা ওলাবিবি ও সত্যপীর প্রভৃতির ন্যায় দুই-চারিটা মাত্র প্রাদেশিক ও যাবনিক মূর্তি নূতন গঠিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাও প্রাণশূন্য মাটির প্রতিমা। সংগীতে এতখানি প্রাণ থাকা চাই, যাহাতে সে সমাজের বয়সের সহিত বাড়িতে থাকে, সমাজের পরিবর্তনের সহিত পরিবর্তিত হইতে থাকে, সমাজের উপর নিজের প্রভাব বিস্তৃত করিতে পারে ও তাহার উপরে সমাজের প্রভাব প্রযুক্ত হয়। সমাজবৃক্ষের শাখায় শুদ্ধ মাত্র অলংকারস্বরূপে সংগীত নামে একটা সোনার ডাল বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, গাছের সহিত সে বাড়ে না, গাছের রসে সে পুষ্ট হয় না, বসন্তে তাহাতে মুকুল ধরে না, পাখিতে তাহার উপর বসিয়া গান গাহে না। গাছের আর-কিছু উপকার করে না, কেবল শোভাবর্ধন করে।

শোভাবর্ধনের কথা যদি উঠিল তবে তৎসম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলা আবশ্যক। সংগীতকে যদি শুদ্ধ কেবল শিল্প, কেবল মনোহারিণী বিদ্যা বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হয় যে, আমাদের দেশীয় অনুভাবশূন্য সংগীত নিকৃষ্ট শ্রেণীর। চিত্রশিল্প দুই প্রকারের আছে। এক— অনুভাবপূর্ণ মুখশ্রী ও প্রকৃতির অনুকৃতি, দ্বিতীয়— যথাযথ রেখাবিন্যাস-দ্বারা একটা নেত্ররঞ্জক আকৃতি নির্মাণ করা। কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, প্রথমটিই উচ্চতম শ্রেণীর চিত্রবিদ্যা। আমাদের দেশে শালের উপরে, নানাবিধ কাপড়ের পাড়ে, রেখাবিন্যাস ও বর্ণবিন্যাস দ্বারা বিবিধ নয়নরঞ্জক আকৃতি-সকল চিত্রিত হয়, কিন্তু শুদ্ধ তাহাতেই আমরা ইটালীয়দের ন্যায় চিত্রশিল্পী বলিয়া বিখ্যাত হইব না। আমাদের সংগীতও সেইরূপ সুরবিন্যাস মাত্র, যতক্ষণ আমরা তাহার মধ্যে অনুভাব না আনিতে পারিব, ততক্ষণে আমরা উচ্চশ্রেণীর সংগীতবিৎ বলিয়া গর্ব করিতে পারিব না।

ভারতী
আষাঢ় ১২৮৮

শিল্প

[মন্দিরপথবর্তিনী]

"স্মাত্রে" উপাধিকারী একটি মহারাষ্ট্রী ছাত্র "মন্দিরপথবর্তিনী' (To the Temple) নামক একটি রমণীমূর্তি রচনা করিয়াছিলেন। তাহারই সম্মুখের ও পার্শ্বের দুইখানি ফোটোগ্রাফ ভারতীয় শিল্পকলার গুণজ্ঞপ্রবর সার্ জর্জ বার্ড্‌বুডের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। প্রস্তাব ছিল এই ছাত্রটিকে য়ুরোপে শিক্ষাদানের সুযোগ করিয়া দিলে উপকার হইবার সম্ভাবনা।

তদুত্তরে উক্ত ভারতবন্ধু ইংরাজমহোদয় এই মূর্তির প্রচুর প্রশংসা করিয়া পত্র লেখেন। তাহাতে প্রকাশ করেন, এই মূর্তিখানি গ্রীক ভাস্কর্যের চরমোন্নতিকালীন রচনার সহিত তুলনীয় হইতে পারে এবং বর্তমান য়ুরোপীয় শিল্পে ইহার উপমা মেলা দুষ্কর। তাঁহার মতে যে শিল্পী য়ুরোপীয় কলাবিদ্যা না শিখিয়া নিজের প্রতিভা হইতে এমন একটি অপরূপ সৌন্দর্যের উদ্‌ভাবন করিতে পারিয়াছেন তাহার ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ হইবার পূর্বে তাহাকে বিলাতে শিক্ষাদান না করাই শ্রেয়, কারণ য়ুরোপীয় শিল্পের অনুকরণে ভারতবর্ষের বিশেষ শ্রী, বিশেষ প্রাণটুকু অভিভূত হইয়া যাইতে পারে।

এইখানে বলা আবশ্যক, বার্ড্‌বুড্ সাহেব দুইটি ভুল করিয়াছিলেন। প্রথমত, তিনি ফোটোগ্রাফ হইতে বুঝিতে পারেন নাই যে, মূর্তিটি প্রস্তরমূর্তি নহে, তাহা প্যারিস-প্লাস্টারের রচনা মাত্র। দ্বিতীয়ত, স্মাত্রে বোম্বাই আর্টস্কুলে য়ুরোপীয় শিক্ষকের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

এই দুই ভ্রম উপলক্ষ করিয়া চিজ্‌হল্‌ম্ নামধারী কোনো অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান 'পায়োনিয়র' পত্রে বার্ড্‌বুড্ সাহেবের প্রতি কুটিল বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়াছেন— এবং স্মাত্রে-রচিত মূর্তির গুণপনা কথঞ্চিৎ স্বীকার করিয়াও তাহাকে খর্ব করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই।

শিল্প সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ। অসম্পূর্ণ কেন, অনারব্ধ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং এই তর্কের মধ্যে প্রবেশ করিতে ভারতবর্ষীয় কাহারও অধিকার আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু এই নবীন শিল্পীর অভ্যুদয়ে আমাদের চিত্ত আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছে।

বার্ড্‌বুড্ সাহেব -কর্তৃক সম্পাদিত 'ভারতশিল্প' পত্রিকায় পূর্বোক্ত দুটি ফোটোগ্রাফ বাহির হইয়াছে। তাহা বারংবার নিরীক্ষণ করিয়াও আমাদের পরিতৃপ্তি হয় না। রমণীর উত্তান বাম বাহুতে একটি থালা ও অধোলম্বিত দক্ষিণ হস্তে একটি পাত্র ঊরুদেশে সংলগ্ন। তাহার দক্ষিণজানু সুন্দর ভঙ্গিতে পশ্চাদ্‌বর্তী হইয়া সুকুমার পদাঙ্গুলির অগ্রভাগে ধরণীতল স্পর্শ করিয়া আছে। তাহার দেবীতুল্য গঠনলাবণ্য নিবিড় নিবদ্ধ কঞ্চুলিকা ও কুটিলকুঞ্চিত অঙ্গবস্ত্র-দ্বারা আচ্ছন্ন না হইয়াও, অতিশয় মনোরম ভাবে সংবৃত। তরুণ মুখখানি আমাদের ভারতবর্ষেরই মুখ; সরল, স্নিগ্ধ, শান্ত এবং ঈষৎ সকরুণ। সবসুদ্ধ চিত্রখানি বিশুদ্ধ, সংযত এবং সম্পূর্ণ।

এই চিত্রটি দেখিতে দেখিতে আমাদের বহুকালের বুভুক্ষিত আকাঙক্ষা প্রতিক্ষণে চরিতার্থতা লাভ করিতে থাকে। সহসা বুঝিতে পারি যে, আমরা ভারতবর্ষীয় নারীরূপের একটি আদর্শকে মূর্তিমান দেখিবার জন্য এতদিন প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম। সেই সৌন্দর্যকে আমরা লক্ষ্মীরূপে সরস্বতীরূপে অন্নপূর্ণারূপে অন্তরে অনুভব করিয়াছি, কিন্তু কোনো গুণীশিল্পী তাহাকে অমর দেহদান করিয়া আমাদের নেত্রসম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন নাই।

দেশীয় স্ত্রীলোকের ছবি অনেক দেখা যায় কিন্তু তাহা প্রাকৃত চিত্র। অর্থাৎ যাহারা প্রতিদিন ঘরে বাহিরে সঞ্চরণ করে, খায় পরে, আসে যায়, জন্মায় মরে তাহাদেরই প্রতিকৃতি। যে নারী আমাদের অন্তরে বাহিরে, আমাদের সাহিত্য সংগীতে নিত্যকাল জাগ্রত, বংশানুক্রমে চিরপ্রবহমান ভারতীয় নারীগণের মধ্যে স্থির হইয়া অমর হইয়া বিরাজ করিতেছেন, যিনি বৈদিককালে সরস্বতীতীরে তপোবনের গোষ্ঠগৃহে নবীনা ছিলেন এবং যিনি অদ্য লৌহশৃঙ্খলিত গঙ্গাকূলে

নবরাজধানীর ড্রয়িংরুম সোফাপর্যঙ্কেও তরুণী, সেই ভাবরূপিণী ভারত-নারী, যিনি সর্বকালে ভারতব্যাপিনী হইয়াও আমাদের প্রত্যক্ষগোচর নহেন— তাঁহাকে প্রত্যক্ষগম্য করা আমাদের চিত্তের কামনা, আমাদের শিল্পের সাধনা। যে শিল্পী কল্পনামন্ত্রে সেই দেহের অতীতকে মূর্তির দ্বারা ধরিতে পারেন তিনি ধন্য।

ম্হাত্রে-রচিত মূর্তির ছবিখানি দেখিলে মনে হয়, যে শুদ্ধশুচি ভক্তিমতী হিন্দুনারী চিরদিন মন্দিরের পথে গিয়াছে এবং চিরদিন মন্দিরের পথে যাইবে, এ সেই নামহীন জন্মহীন মৃত্যুহীন রমণী— ইহার সম্মুখে কোন্ এক অদৃশ্য নিত্য তীর্থদেবালয়, ইহার পশ্চাতে কোন্ এক অদৃশ্য নিত্য গৃহপ্রাঙ্গণ।

এই ছবির মধ্যে গ্রীসীয় শিল্পকলার একটা ছায়া যে পড়ে নাই, তাহা নহে। কিন্তু দেশীয় শিল্পীর প্রতিভাকে তাহা লঙ্ঘন করে নাই। বরঞ্চ তাহার সম্পূর্ণ অনুবর্তী হইয়া রহিয়াছে। ইহাকে ঠিক অনুকরণ বলে না। ইহাকে বরঞ্চ স্বীয়করণ নাম দেওয়া যায়। এইরূপ পরেরকে নিজের, বিদেশেরকে স্বদেশের, পুরাতনকে নূতন করিয়া লওয়াই প্রতিভার লক্ষণ।

ইংরাজি আর্টস্কুলে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া এই ছাত্রটির শিল্পবোধ উদ্‌বোধিত হইয়াছে তাহাতে আমাদের বিস্ময়ের বা ক্ষোভের কোনো কথা নাই। এবং তাহা হইতে এ কথাও মনে করা অকারণ যে, তবে তাহার রচনা মূলত য়ুরোপীয়।

ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাসে যাহাকে বলে শেক্‌স্‌পিরীয় যুগ তাহা তৎকালীন ইতালীয় ভাব-আন্দোলনের সংঘাত হইতে উদ্ভূত। তখন দেশীবিদেশীর সংস্রবে ইংরাজি সাহিত্যে খুব একটা আবর্ত জন্মিয়াছিল— তাহার মধ্যে অসংগত, অপরিণত, অপরিমিত, অনাসৃষ্টি অনেক জিনিস ছিল— তাহা শোভন সুসম্পূর্ণ এবং স্বাভাবিক হইয়া উঠিতে অল্প সময় লয় নাই। কিন্তু সেই আঘাতে ইংলন্ডের মন জাগিয়া উঠিয়াছিল এবং সাহিত্যকলার অনেকগুলি বাহ্য আকার প্রকার, ছন্দ এবং অলংকার ইংরাজ আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছিল। তাহাতে ইংরাজি সাহিত্যের ক্ষতি হয় নাই, বৃদ্ধি হইয়াছে।

আমাদের মনকেও সুগভীর নিশ্চেষ্টতা হইতে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য একটি নূতন এবং প্রবল ভাবপ্রবাহের সংঘাত আবশ্যক হইয়াছিল। পশ্চিমের বেগবান ও প্রাণবান সাহিত্য ও শিল্পকলা সেই আঘাত করিতেছে। আপাতত তাহার সকল ফল শুভ এবং শোভন হইতে পারে না। এবং প্রথমে বাহ্য অনুকরণই স্বভাবত প্রবল হইয়া উঠে— কিন্তু ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের লক্ষ্মী তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবে, অসংগতির মধ্যে সংগতি আনিবে— এবং সেই বিদেশী বন্যায় আনীত পলিমাটির ভিতর দিয়া দ্বিগুণ তেজে আপনারই শস্যগুলিকে অঙ্কুরিত, পুষ্পগুলিকে বিকশিত, ফলগুলিকে পরিণত করিয়া তুলিবে।

ইহা না হইয়া যায় না। আমাদের চতুর্দিকের বিপুল ভারতবর্ষ, আমাদের বহুকালের সুদূর ভারতবর্ষ, আমাদের অন্তর্নিহিত নিগূঢ় ভারতবর্ষকে নিরস্ত করিবার জো নাই। নূতন শিক্ষা ঝড়ের মতো বহিয়া যায়, বজ্রের মতো পতিত হয়, বৃষ্টির মতো ঝরিয়া পড়ে, আমাদের ভারতবর্ষ ধরণীর মতো তাহা গ্রহণ করে— কতকটা সফল হয়, কতকটা বিফল হয়, কতকটা কুফলও হয়, কিন্তু সমস্ত ফলাফলের মধ্যে ভারতবর্ষ থাকিয়া যায়।

বাংলা সাহিত্যে আমরা ইংরাজি হইতে অনেক বাহ্য আকার প্রকার লাভ করিয়াছি। তাহার মধ্যে যেগুলি, অন্তরের ভাবপরিস্ফুটনের জন্য সর্বজনীন ও সর্বকালীন রূপে সর্বাপেক্ষা উপযোগী তাহাই থাকিয়া যাইবে। উপন্যাস লিখিবার ধারা আমরা ইংরাজি সাহিত্য হইতে পাইয়াছি, কিন্তু প্রতিভাশালী লোকের হস্তে সে উপন্যাস সম্পূর্ণ বাংলা উপন্যাস হইয়াছে। সূর্যমুখী বাঙালি, ভ্রমর বাঙালি, কপালকুণ্ডলা ঘরের সংস্রব ছাড়িয়া, মনের মধ্যে পালিতা হইয়াও কোনো ছদ্মবেশধারিণী ইংরাজি রোমান্সের নায়িকা নহে, সে বাঙালি বনবালিকা।

আসল কথা, প্রতিভা বৃহৎ বনস্পতির ন্যায়। নূতন-চাষ-করা আধহাত গভীর জমির মধ্যে

শিকড় ঠেলিয়া, একটি বর্ষার ধারা এবং একটি শরতের রৌদ্র লইয়া অর্ধবৎসরের মধ্যে সে আপন জন্মমৃত্যু সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারে না। অনেক নিম্নে এবং অনেক দূরে তাহাকে অনেক শিকড় নামাইতে হয় তবেই সে আপনার উপযোগী রস ও প্রাণ আকর্ষণ করিতে পারে। সেই সুদূর এবং গভীর বন্ধন স্বভাবতই স্বদেশ ব্যতীত আর কোথাও হইতে পারে না। যতই শিক্ষা লাভ করি বিদেশের সহিত আমাদের উপরিতলের সম্বন্ধ— তাহার সর্বত্র আমাদের গতি নাই, আমাদের অধিকার নাই। কিন্তু যুগ-যুগান্তর ও দূর-দূরান্তরের নিগূঢ় ও স্বাভাবিক সম্বন্ধবন্ধন ব্যতীত বৃহৎ প্রতিভা কখনো আপনাকে দাঁড় করাইতে আপনাকে চিরজীবী রাখিতে পারে না। এইজন্য প্রতিভা স্বতই আপন স্বদেশের মর্মের মধ্যে মূল বিস্তার করিয়া সার্বলৌকিক আকাশের মধ্যে শিরোত্তোলন করিয়া থাকে।

কেবল সাহিত্যের প্রতিভা কেন, মহত্ত্বমাত্রেরই এই লক্ষণ। বাহ্য অনুকরণ, বিদেশীয় ধরনধারণের তুচ্ছ আড়ম্বর, এমন-কি, বিজাতীয় বিলাসবিভ্রমের সুখস্বচ্ছন্দতায় বৃহৎ হৃদয় কখনোই পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে না।

বিলাতি সমাজে বিলাতি ইতিহাসে যাহা গভীর, যাহা ব্যাপক, যাহা নিত্য— নকল বিলাতে তাহা যতই উজ্জ্বল ও দৃষ্টি-আকর্ষক হউক তাহা শুষ্ক সংকীর্ণ ও বিচ্ছিন্ন, তাহাতে উদার হৃদয়ের সমস্ত খাদ্য ও সমস্ত নির্ভর নাই। এইজন্য আমাদের যে-সকল বাঙালি অকস্মাৎ আপাদমস্তক সাহেবিয়ানায় কণ্টকিত হইয়া চতুর্দিককে জর্জরিত করিয়া তোলেন, তাঁহাদিগকে দেখিলে মনে হয়, সাহেবের বারান্দায় বিলাতি টবে মেমসাহেবের বারিসিঞ্চনে তাঁহারা একটি একটি সৌখিন চারা পল্লবিত হইয়া দড়িবাঁধা অবস্থায় শূন্যে ঝুলিতেছেন— দেশের মাটির সহিত যোগ নাই, অরণ্যের সহিত সম্বন্ধ নাই এবং সেই বিচ্ছেদসূত্রেই তাঁহাদের অহংকার এবং দোদুল্যমান অবস্থা।

কিন্তু অল্প খোরাকে যাহার চলে না, বহুমূল্য বিচিত্র চিনের টব অপেক্ষা দরিদ্র দেশের মাটি তাহার পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

অতএব শিক্ষার দ্বারা দ্বিগুণ বল ও নূতন ক্ষমতা লাভ করিলেও যথার্থ প্রতিভা স্বতই আপন প্রাণের দায়ে আপন নাড়ির টানে স্বদেশ হইতেই আপন অমৃতরস সঞ্চয় করিতে প্রবৃত্ত হয়।

ম্হাত্রে যদি যথার্থ প্রতিভাশালী হন, তবে তাঁহার জন্য ভাবনার কারণ নাই— তিনি তাঁহার রচনায়, তাঁহার প্রতিভাবিকাশে শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষীয় থাকিতে বাধ্য— তাঁহার আর অন্য গতি নাই। যদি তাঁহার প্রতিভা না থাকে তবে অসংখ্য ক্ষুদ্র অনুকারীদলের মধ্যে ক্ষমতা-বিকারের আর-একটি দৃষ্টান্ত বাড়িলে তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি বিশেষ দেখি না।

কিন্তু শিক্ষা এবং রীতিমতো শিক্ষা আবশ্যক। উপকরণের উপর সম্পূর্ণ দখল না থাকিলেই অনুকরণের নিরাপদ গণ্ডির বাহিরে পদার্পণ করিতে বিপদ ঘটে। অল্প সাঁতার জানিলে ঘাটের আশ্রয় ছাড়িতে পারা যায় না, তটের কাছাকাছি ঘুরিতে ফিরিতে হয়। সকল বিদ্যারই যে একটি বাহ্য অংশ আছে তাহাকে একান্ত আয়ত্ত করিতে পারিলে তবেই তাহাকে স্বাধীন ব্যবহারের স্বকীয় ভাবপ্রকাশের অনুকূল করা যায়। ভাস্কর্যবিদ্যার বাহ্য নিয়ম কৌশল এবং কারিগরিটুকু যখন ম্হাত্রের অধিকারগত এবং অনায়াসগম্য হইবে, তখন তাঁহার স্বদেশীয় প্রতিভা স্বাধীন সঞ্চরণের প্রশস্ত ক্ষেত্র লাভ করিবে, নতুবা তাঁহার রচনায় যখন-তখন পরকীয় আদর্শের ছায়া আসিয়া পড়িবে এবং তিনি অনুকরণবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন না।

কিন্তু ম্হাত্রে দরিদ্র ছাত্র। য়ুরোপের শ্বেতভুজা শিল্প-সরস্বতী তাঁহাকে ভূমধ্যসাগরের পরপার হইতে আপন ক্রোড়ে আহ্বান করিতেছেন, বালক সে আহ্বান আপন অন্তরের মধ্যে শ্রবণ করিয়া নিরতিশয় উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে— কিন্তু তাহার পাথেয় নাই। যদি কোনো গুণজ্ঞ বিদেশী তাহার য়ুরোপীয় শিক্ষার ব্যয়ভার বহনে প্রস্তুত হন তবে তাহা আমাদের দেশের পক্ষে লজ্জার বিষয় হইবে— এবং স্বদেশী বিদেশী কেহই যদি প্রস্তুত না হন তবে তাহা আমাদের দেশের পক্ষে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হইবে সন্দেহ নাই।

রুক্মিণীকান্ত নাগ নামক একটি বাঙালি ছাত্র কিছুদিন ইটালিতে শিল্প অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিয়া যথেষ্ট খ্যাতি ও উন্নতিলাভ করিতেছিলেন। কিন্তু অর্থাভাবে অনাহারে দুরারোগ্য রোগে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়া তাঁহার সমস্ত আশা অকালে অবসান হয়। আমাদের এই শিল্পদরিদ্র দেশের পক্ষে এ মৃত্যু যেমন লজ্জাজনক তেমনি শোকাবহ।

অনেকে হয়তো জানেন না, শশিভূষণ হেশ নামক কলিকাতা আর্ট-স্কুলের একটি বিশেষ ক্ষমতাশালী ছাত্র য়ুরোপে শিল্প অধ্যয়নে নিযুক্ত আছেন। মুক্তাগাছার মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী তাহার সমস্ত খরচ জোগাইতেছেন। সেজন্য বঙ্গদেশ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

ম্হাত্রেও য়ুরোপে শিল্পশিক্ষালাভের অধিকারী— অসামান্য ক্ষমতা প্রকাশের দ্বারা তাহার প্রমাণ দিয়াছেন। এক্ষণে দেশের লোক যদি আপন কর্তব্য পালন করে তবে বালকের উন্মুখী প্রতিভা পূর্ণপরিণতি লাভ করিয়া দেশের লোককে ধন্য, ভারতবন্ধু বার্ড্‌বুডের উৎসাহবাক্যকে সার্থক এবং চিজ্‌হলম্‌ প্রমুখ অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানগণের বিদ্বেষবিষাক্ত অবজ্ঞাকে অনন্তকালের নিকট ধিক্‌কৃত করিয়া রাখিবে।

ভারতী

আষাঢ় ১৩০৫

মন্দিরাভিমুখে

ম্হাত্রে নামক বোম্বাই শিল্পবিদ্যালয়ের একটি দরিদ্র ছাত্র প্যারিস-প্লাস্টারের এক নারীমূর্তি রচনা করিয়াছেন; তাহার নাম দিয়াছেন মন্দিরাভিমুখে (To the Temple)। এই ব্যাপারটুকু লইয়া ইংরাজিপত্রে একটি ছোটোখাটো রকমের দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইয়া গেছে।

স্যর জর্জ বার্ড্‌বুড় সাহেবের নিকট এই মূর্তির দুখানি ফোটোগ্রাফ পাঠানো হয়। ফোটোগ্রাফ দেখিয়া তিনি তাঁহার 'জর্নাল অফ ইন্ডিয়ান আর্টস অ্যান্ড ইন্ডস্ট্রিজ' নামক শিল্পবিষয়ক পত্রে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়া এক সমালোচনা লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি মূর্তিটিকে প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রীসীয় মূর্তি-সকলের সহিত তুলনীয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।

হয়তো সহৃদয় বার্ড্‌বুড় সাহেব তাঁহার ভারতবৎসলতা ও ভারতীয় শিল্পকলার ভাবী উন্নতি কল্পনার আবেগদ্বারা নীত হইয়া এই মূর্তি সম্বন্ধে কিছু অধিক বলিয়াছিলেন, সে কথা বিচার করা আমাদের সাধ্য নহে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি একটি ভুল করিয়াছিলেন। ফোটোগ্রাফ হইতে বুঝিতে পারেন নাই যে মূর্তিটি খড়ি দিয়া গঠিত। তিনি অনুমান করিয়াছিলেন ইহা পাথরের মূর্তি। অবশ্য উপকরণের পার্থক্যে শিল্পদ্রব্যের গৌরবের তারতম্য ঘটে এবং সেইজন্য খড়ির মূর্তির সহিত প্রাচীন পাথরের মূর্তির তুলনা করা হয়তো সংগত হয় নাই।

এই ছিদ্রটি অবলম্বন করিয়া কোনো অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান লেখক 'পায়োনিয়র' কাগজে বার্ড্‌বুডের সমালোচনার বিরুদ্ধে এক সুতীব্র বিদ্রূপ-বিষাক্ত পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং এইরূপে একটি মহারাষ্ট্রী ছাত্র -রচিত খড়ির মূর্তি লইয়া ইংরাজি সাময়িকপত্রের রঙ্গভূমিতে দুই ইংরাজ যোদ্ধার মধ্যে একটি ছোটোখাটো রকম রক্তপাত হইয়া গেছে।

আমরা যে এ স্থলে মধ্যস্থ হইয়া বিচারে অবতীর্ণ হইব এমন ভরসা রাখি না। আমরা একে আনাড়ি, তাহাতে পক্ষপাতী— আমরা যদি আমাদের স্বদেশীয় নবীন শিল্পীর রচনাকে কিছু বেশি করিয়াই মনে করি তবে আশা করি ভারতের নিমকে পালিত তীব্রতম ভারতবিদ্বেষীও তাহাতে ক্রুদ্ধ হইবেন না।

অপরপক্ষে শিল্প সম্বন্ধে আমাদের মতো দীনহীন সম্প্রদায় আপাতত অল্পেই সন্তুষ্ট হইবে।

সংস্কৃত ভাষায় একটা শ্লোক আছে—

পরিক্ষীণঃ কশ্চিৎ স্পৃহয়তি যবানাং প্রসৃতয়ে
স পশ্চাৎ সংপূর্ণঃ কলয়তি ধরিত্রীং তৃণসমাম্।
অতশ্চানৈকান্ত্যাদ্‌ গুরুলঘুতয়ার্থেষু, ধনিনাম্‌
অবস্থা বস্তূনি প্রথয়তি চ সংকোচয়তি চ॥

অর্থাৎ, দীন ব্যক্তি এইটুকু ইচ্ছা করিয়াই ক্ষান্ত হয় যে, তাহার যবের সঞ্চয়টুকু কিছু বাড়ুক, কিন্তু সেই ব্যক্তিই যখন পরিপূর্ণ হইয়া উঠেন তখন তিনি ধরিত্রীকে তৃণসমান দেখেন। অতএব অর্থ সম্বন্ধে গুরুলঘুতার কোনো একান্ততা নাই; ধনীর অবস্থাই বস্তু-সকলকে কখনো বড়ো করিয়া তোলে কখনো বা ছোটো করিয়া আনে।

আমাদেরও সেই অবস্থা। আমাদের কোনো তরুণ প্রতিভান্বিত শিল্পী -রচিত মূর্তি প্রাচীন গ্রীসীয় মূর্তির সমকক্ষ না হইলেও আমরা সন্তুষ্ট থাকিব। যখন আমাদের তেমন দিন আসিবে, যখন ধরিত্রীকে তৃণসমান দেখিবার মতো অবস্থা আমাদের হইবে, তখন আমাদের ভালোমন্দ তুলনীয় বাটখারাও ওজনে বাড়িয়া চলিতে থাকিবে। অতএব য়ুরোপের কাছে যে জিনিস ছোটো আমাদের কাছে সে জিনিস যথেষ্ট বড়ো— কারণ ধনীর অবস্থাই বস্তু-সকলকে কখনো ছোটো করে, কখনো বড়ো করিয়া তোলে।

মাদ্রাজবাসী চিত্রশিল্পী রবিবর্মার দেশী ছবিগুলি যখন প্রথম আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় তখন তাহা যে পরিমাণ আনন্দ আমাদিগকে দান করিয়াছিল, ভাবী সমালোচকের অপক্ষপাত বিচারে তাহার সে পরিমাণ উৎকর্ষ প্রমাণিত হইবে কি না সন্দেহ। কিন্তু তাহা বুভুক্ষিতের রিক্তস্থালীর উপর যবের মুষ্টি বর্ষণ করিয়াছিল— আপাতত সেই যবমুষ্টি ভবিষ্যতের পূর্ণোদর ব্যক্তির স্বর্ণমুষ্টির চেয়ে বেশি।

রবিবর্মার ছবিতে চিত্রকলা সম্বন্ধে কী সমস্ত অসম্পূর্ণতা আছে, সে-সকল বিচার আমরা যখন উপযুক্ত হইব, তখন করিব। কিন্তু সম্প্রতি আমাদের যে আনন্দ তাহা শুদ্ধমাত্র সৌন্দর্যসম্ভোগের আনন্দ নহে, তাহা আশার আনন্দ। আমরা দেখিতেছি ভারতবর্ষের নিদ্রিত অন্তঃকরণের এক প্রান্তে সৌন্দর্যরচনার একটা চেষ্টা জাগিয়া উঠিতেছে। তাহা যতই অপরিস্ফুট অসম্পূর্ণ হউক-না-কেন, তাহা অত্যন্ত বিরাট আকারে আমাদের কল্পনাকে অভিভূত করিয়া তোলে। প্রাচীন ভারতবর্ষের সেই যে-সকল যুগের ইতিহাসপ্রদীপ নির্বাপিত হইয়া গেছে, যে সময়ে এক অপূর্ব শিল্পচেষ্টা ভারতের নির্জন গিরিগুহায় এবং দেবালয়ের পাষাণপুঞ্জমধ্যে আপনাকে অমরসুন্দর-আকারে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিতেছিল, সেই মূর্তিগড়া, মন্দিরগড়া, সেই ভাবুকস্পর্শে-পাথরকে-প্রাণ-দেওয়া যুগ ভবিষ্যতের দিগন্তপটে নূতন করিয়া প্রতিফলিত দেখিতে পাই।

আধুনিক ভারতবর্ষে যাঁহারা মাঝে মাঝে এই আশার আলোক জ্বালিয়া তুলিতেছেন তাঁহারা যদি-বা আমাদের সূর্যচন্দ্র নাও হন তথাপি আমাদের স্বদেশের অন্ধ রজনীতে তাঁহারা এক মহিমান্বিত ভবিষ্যতের দিকে আমাদিগকে পথ দেখাইয়া জাগিতেছেন। সম্ভবত সেই ভবিষ্যতের আলোকে তাঁহাদের ক্ষুদ্র রশ্মিটুকু একদিন ম্লান হইয়া যাইতে পারে কিন্তু তথাপি তাঁহারা ধন্য।

ভারতবর্ষ আজ পৃথিবীর সমাজচ্যুত। তাহাকে আবার সমাজে উঠিতে হইবে। কোনো-এক সূত্রে পৃথিবীর সহিত তাহার আদানপ্রদান আবার সমানভাবে চলিবে, এ আশা আমরা কিছুতেই ছাড়িতে পারি না। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আমরা কবে ফিরিয়া পাইব এবং কখনো ফিরিয়া পাইব কিনা সে কথা আলোচনা করা বৃথা। কিন্তু নিজের ক্ষমতায় জগতের প্রতিভারাজ্যে আমরা স্বাধীন আসন লাভ করিব এ আশা কখনোই পরিত্যাগ করিবার নহে।

রাজ্যবিস্তারমদোদ্ধত ইংলন্ড আজকাল উষ্ণমণ্ডলবাসী জাতিমাত্রকে আপনাদের গোষ্ঠের গোরুর মতো দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সমস্ত এশিয়া এবং আফ্রিকা তাঁহাদের ভারবহন এবং

তাঁহাদের দুগ্ধ জোগাইবার জন্য আছে, কিড্ প্রভৃতি আধুনিক লেখকগণ ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্যরূপে ধরিয়া লইয়াছেন।

অদ্য আমাদের হীনতার অবধি নাই এ কথা সত্য কিন্তু উষ্ণমণ্ডলভুক্ত ভারতবর্ষ চিরকাল পৃথিবীর মজুরি করিয়া আসে নাই। ইজিপ্ট, ব্যাবিলন, কাল্ডিয়া, ভারতবর্ষ, গ্রীস এবং রোম ইঁহারাই জগতে সভ্যতার শিখা স্বহস্তে জ্বালাইয়াছিলেন, ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই ট্রপিক্সের অন্তর্গত, উষ্ণ সূর্যের করাধীন। সেই পুরাতন কালচক্র পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে পুনর্বার কেমন করিয়া ফিরিয়া আসিবে তাহা স্ট্যাটিস্টিক্স্ এবং তর্কদ্বারা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য, কারণ বড়ো বড়ো জাতির উন্নতি ও অধোগতি বিধির বিচিত্র বিধানে ঘটিয়া থাকে, তার্কিকের তর্কশৃঙ্খল তাহার সমস্ত মাপিয়া উঠিতে পারে না; তাহার কম্পাসের অর্ধাংশ মাত্রের ভুল বিশাল কালপ্রান্তরে ক্রমশই বাড়িতে বাড়িতে সত্য হইতে বহু দূরে গিয়া বিক্ষিপ্ত হয়।

প্রসঙ্গক্রমে এই অবান্তর কথা মনের আক্ষেপে আপনি উঠিয়া পড়ে। কারণ, যখন দেখিতে পাই ক্ষুধিত য়ুরোপ ঘরে বসিয়া সমস্ত উষ্ণভূভাগকে অংশ করিয়া লইবার জন্য খড়ি দিয়া চিহ্নিত করিতেছেন তখন নিজদিগকে সম্পূর্ণ মৃতপদার্থ বলিয়া শঙ্কা হয়, তখন নিজেদের প্রতি নৈরাশ্য এবং অবজ্ঞা অন্তঃকরণকে অভিভূত করিতে উদ্যত হয়।

ঠিক এইরূপ সময়ে জগদীশ বসুর মতো দৃষ্টান্ত আমাদিগকে পুনর্বার আশার পথ দেখাইয়া দেয়। জগদীশ বসু জগতের রহস্যান্ধকারমধ্যে বিজ্ঞানরশ্মিকে কতটুকু অগ্রসর করিয়াছেন তাহা আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই ঠিকমতো জানি না এবং জানিবার শক্তি রাখি না, কিন্তু সেই সূত্রে আশা এবং গৌরবের উৎসাহে আমাদের ক্ষমতা অনেকখানি বাড়াইয়া দিয়াছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

ম্লাত্রে-রচিত মূর্তিখানি দেখিয়া একজন বিদেশী গুণজ্ঞ প্রবীণ সমালোচক যখন উদারভাবে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেন তখন শিল্পকলা সম্বন্ধে আমরা যতই মূঢ় হই, আশার পুলকে আমাদের সমস্ত অন্তঃকরণ যেন বিদ্যুদ্দীপ্ত হইয়া উঠে।

চিত্রবিদ্যা এবং ভাস্কর্যের একটা মহৎ সুযোগ এই যে তাহার ভাষা সর্বজনবিদিত। অবশ্য তাহার সূক্ষ্ম গুণপনা যথার্থভাবে বুঝিতে বিস্তর শিক্ষা এবং চর্চার প্রয়োজন। কিন্তু তাহাকে শুদ্ধমাত্র প্রত্যক্ষ করিতে বিশেষ কোনো বাধা অতিক্রম করিতে হয় না। এইজন্য ইহা বিনা-পরিচয়েই সমস্ত জগৎসভার মধ্যে আসিয়া খাড়া হইতে পারে। অদ্য আমাদের মধ্যে যদি একজন প্রতিভাসম্পন্ন ভাস্করের অভ্যুদয় হয় তবে কল্যই তিনি বিশ্বলোকে প্রকাশলাভ করিবেন।

অতএব ভারতবর্ষ যদি শিল্পকলায় আপন প্রতিভাকে প্রস্ফুটিত করিতে পারে তবে জগৎ-প্রাসাদের একটা সিংহদ্বার তাহার নিকট দ্রুত উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়।

এ কথা অত্যন্ত প্রচলিত যে, 'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে।' যে বিদ্যার এই সর্বজনীনতা এবং সর্বকালীনতা আছে তাহা বিদ্বানকে পূজার যোগ্য করে। আমাদের দেশের পট-আঁকা যে চিত্রবিদ্যা তাহা প্রাদেশিক, তাহার যৎকিঞ্চিৎ মূল্য কেবলমাত্র সংকীর্ণ সম্প্রদায়ের মধ্যে। যখন আমাদের চিত্রবিদ্যাকে আমরা সর্বজনীন করিয়া তুলিতে পারিব, তখন সর্বজনসভায় স্থানলাভ করিয়া আমাদের মনুষ্যত্বে প্রসারিত হইবে।

ইহার উদাহরণ বাংলা সাহিত্য। অর্ধশতাব্দী পূর্বে পাঁচালি এবং কবির গানে এ সাহিত্য প্রাদেশিক ছিল। মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্রের মতো প্রতিভাশালী লেখকগণ এই সাহিত্যকে সর্বজনীন ক্ষেত্রে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরের মধ্যে যে আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা অলৌকিক বলিয়া মনে হয়। এখন এ সাহিত্য বাঙালির মনুষ্যত্বের প্রধান উপাদান। এখন এই সাহিত্যের মধ্য দিয়া বাঙালি জ্ঞানের স্বাধীনতা, কল্পনার উদারতা এবং হৃদয়ের বিস্তার অনুভব করিতেছে। এই সাহিত্যে বাঙালির হৃদয়ে বিশ্বহিতৈষা, দেশানুরাগ এবং একটি গভীর বিপুল ও অধীর আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার করিয়া দিতেছে। এখন এ

সাহিত্যের মধ্যে ভালো ও মন্দ, সৌন্দর্য ও অসৌন্দর্যের যে আদর্শ আসিয়াছে তাহা প্রাদেশিক নহে তাহা সর্বজনীন ও সর্বকালীন।

তথাপি দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলাভাষা কেবল ভারতবর্ষের একটি অংশের ভাষা। এ ভাষা যদি ভারতের ভাষা হইত এবং বঙ্গসাহিত্য যদি ভারতবর্ষের ত্রিশকোটি লোকের হৃদয়ের উপর দাঁড়াইতে পারিত, তবে ইহার মধ্যে যে কিছু অনিবার্য সংকোচ ও সংকীর্ণতা আছে তাহা ঘুচিয়া গিয়া এ সাহিত্য কী বিপুল বলিষ্ঠ হইয়া উঠিত এবং জগতের মধ্যে কী বিপুল বল প্রয়োগ করিতে পারিত। এখনো যে বাংলা সাহিত্য সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব, প্রবল স্বাতন্ত্র্য ও গভীর পারমার্থিকতা লাভ করিতে পারে নাই তাহার প্রধান কারণ, অল্প লোকের সম্মুখে ইহা বিদ্যমান। এবং সেই অল্প লোক যদিও য়ুরোপীয় ভাবুকতার ব্যাপক আদর্শ বিদ্যালয়ে লাভ করিয়াছেন তথাপি তাহা যথার্থ আত্মসাৎ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা আপনাদের সাহিত্যকে ক্ষুদ্রভাবে দেখেন, তাহাকে ব্যক্তিগত উদ্‌ভ্রান্ত খেয়াল ও সম্প্রদায়গত সংকীর্ণতার সহিত বিচার করেন। সাহিত্য বাহিরের আকাশ হইতে যথেষ্ট আলোক ও বৃষ্টি পাইতেছে কিন্তু সমাজের মৃত্তিকা হইতে প্রচুর আহার্য সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না।

সেজন্য আমরা নৈরাশ্য অনুভব করি না। কারণ, সাহিত্য গাছেরই মতো বৎসরে বৎসরে কালে কালে আপনারই পুরাতন চ্যুত পল্লবের দ্বারা আপনার তলস্থ ভূমিকে উর্বরা করিয়া তুলিবে।

কিন্তু চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্য প্রভৃতি কলাবিদ্যা যদিচ সাহিত্যের ন্যায় মানবপ্রকৃতির সর্বাঙ্গীণ খাদ্য নহে তথাপি তাহাদের একটা সুবিধা এই আছে যে, যেদিন তাহারা আপনার প্রাদেশিক ক্ষুদ্রতা মোচন করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইবে সেইদিনই তাহারা বিশ্বলোকের। সেদিন হইতে আর তাহাদিগকে ব্যক্তিগত অহমিকা ও সম্প্রদায়গত মূঢ়তার মুখাপেক্ষা করিতে হয় না। সমস্ত জগতের হৃদয় হইতে রসাকর্ষণ করিয়া দেখিতে দেখিতে তাহারা আপনাকে দেশকালের অতীত করিয়া তুলিতে পারে।

অদ্য মহারাষ্ট্রদেশে কোনো নবীন কবি মানবের হৃদয়বীণার কোনো নূতন তন্ত্রীতে আঘাত করিতে পারিয়াছেন কি না তাহা আমরা বাঙালিরা জানি না এবং জানিতে গেলেও যথেষ্ট শিক্ষা ও চেষ্টার প্রয়োজন হয়। কিন্তু ম্হাত্রে-নামক একটি মারাঠি ছাত্র যে খড়ির মূর্তিটি নির্মাণ করিয়াছেন তাহার প্রতিমূর্তি আমরা প্রদীপের পত্রে বাঙালির সম্মুখে ধরিয়া দিলাম, বুঝিতে ও উপভোগ করিতে কাহারও কোনো বাধা নাই। আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রকে মারাঠিরা আপনাদের বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া এখনো জানেন না, কিন্তু ম্হাত্রে যদি আপনার প্রতিভাকে সবলা করিয়া তুলিতে পারেন তবে অবিলম্বেই তিনি আমাদের ম্হাত্রে হইবেন।

আমরা যদি এই মূর্তিটির সমালোচনার চেষ্টা করি তবে কিয়ৎপরিমাণে ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ হইবে মাত্র, কিন্তু তাহাকে সমালোচনা বলে না। এইরূপ একটি সুসম্পূর্ণ মূর্তি আদ্যোপান্ত মনের মধ্যে প্রত্যক্ষবৎ কল্পনা করা যে কী অসামান্য ক্ষমতার কর্ম তাহা আমাদের মতো ভিন্ন-ব্যবসায়ীর ধারণার অগোচর। তাহার পরে সেই কল্পনাকে আকার দান করা— কোনো ক্ষুদ্রতম অংশও বাদ দিবার জো নাই, অঙ্গুলির নখাগ্রও নয়, গ্রীবাদেশের চূর্ণ কুন্তলও নয়— কাপড়ের প্রত্যেক ভাঁজটি, প্রত্যেক অঙ্গুলির ভঙ্গিটি স্পষ্ট করিয়া ভাবিতে ও প্রত্যক্ষ করিয়া গড়িতে হইবে। মূর্তিটির সম্মুখ পশ্চাৎ পার্শ্বে কোথাও কল্পনাকে অপরিস্ফুট রাখিবার পথ নাই। তাহার পরে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বসনভূষণ ভাবভঙ্গি সমস্ত লইয়া কেশের অবস্থান এবং পদাঙ্গুলির বিন্যাস পর্যন্ত সবটা মিলাইয়া মানবদেহের একটি অপরূপ সংগীত একটি সৌন্দর্যসামঞ্জস্য কল্পনার মধ্যে এবং সেখান হইতে জড় উপকরণপিণ্ডে জাগ্রত করিয়া তোলা প্রতিভার ইন্দ্রজাল। বামপদের সহিত দক্ষিণ পদ, পদন্যাসের সহিত দেহন্যাস, বাম হস্তের সহিত দক্ষিণ হস্ত, সমস্ত দেহলতার সহিত মস্তকের ভঙ্গি এইগুলি অতি সুকুমার নৈপুণ্যের সহিত মিলাইয়া তোলাই দেহসৌন্দর্যের ছন্দোবন্ধ। এই

ছন্দোরচনার যে নিগূঢ় রহস্য তাহা প্রতিভাসম্পন্ন ভাস্করই জানেন এবং ম্হাত্রে-রচিত মূর্তির মধ্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বসনভূষণ বেশবিন্যাস এবং উদ্যতলঘুসুন্দর ভঙ্গিটির মধ্য হইতে সেই বিচিত্র অথচ সরল সংগীতটি নীরবে ঊর্ধ্বদেশে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে, যেমন করিয়া একটি শুভ্র বিকচ রজনীগন্ধা আপন উদ্যত বৃন্তটির উপর ঈষৎ-হেলিত সরল ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া স্তব্ধনিশীথের নক্ষত্রলোকমধ্যে পরিপূর্ণতার একটি রাগিণী প্রেরণ করে।

পূর্বেই বলিয়াছিলাম সমালোচনা করিতে গেলে কতকটা ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ হইবে মাত্র, তাহাতে কোনো পাঠকের কিছুমাত্র লাভ হইবে কিনা সন্দেহ।

মূর্তিটির রচয়িতা শ্রীযুক্ত গণপত কাশীনাথ ম্হাত্রের জীবন-সম্বন্ধে তাঁহার পত্রে যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। সংক্ষিপ্ত হইবারই কথা। তাঁহার বয়স বাইশ মাত্র। তিনি জাতিতে সোমবংশী ক্ষত্রিয়। ম্হাত্রে দেশীভাষা শিক্ষার পর ইংরাজি অল্পই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ছবি আঁকা শিখিতে অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা বোধ করাতে অন্য-সকল পড়া ছাড়িয়া ম্হাত্রে বোম্বাই শিল্পবিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি সকল পরীক্ষাতেই ভালোরূপে উত্তীর্ণ হইয়া বারংবার পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। বোম্বাই শিল্পপ্রদর্শনীতে মধ্যে মধ্যে মূর্তি প্রদর্শন করাইয়া ম্হাত্রে অনেকগুলি রৌপ্যপদক লাভ করিয়াছেন। 'মন্দিরাভিমুখে' নামক মূর্তি রচনা করিয়া ম্হাত্রে বরোদার মহারাজার নিকট হইতে ২০০্ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন; এই মূর্তিটি বোম্বাই শিল্পবিদ্যালয় ১২০০্ টাকায় ক্রয় করিয়া চিত্রশালায় রক্ষা করিয়াছেন। এরূপ মূর্তির কীরূপ মূল্য হওয়া উচিত তাহা আমাদের পক্ষে বলা অসাধ্য, কিন্তু ম্হাত্রে ইহাকে যৎকিঞ্চিৎ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং সম্ভবত ইহা যৎকিঞ্চিৎই হইবে।

তরুণ শিল্পী আমাদের দেশে ভাস্কর্য প্রভৃতি কলাবিদ্যার আদর নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে সেরূপ আক্ষেপ করিবার বিষয় অনেক আছে অতএব এ সম্বন্ধে আমরা তাঁহাকে কোনোপ্রকার সান্ত্বনা দিতে পারি না। যখন আমাদের দেশে গুণী বাড়িবে এবং ধনীও বাড়িতে থাকিবে তখন ধনের দ্বারা গুণের আদর পরিমিত হইতে পারিবে। আপাতত আধপেটা খাইয়া আধা-উৎসাহ পাইয়া এমন-কি, গুণহীন অযোগ্যব্যক্তিদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্বেষ-কুশাগ্রের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া আপনার কাজ করিয়া যাইতে হইবে। যেখানে সকল অবস্থাই অনুকূল, সেখানে বড়ো হইয়া বিশেষ গৌরব নাই। আধুনিক য়ুরোপেও অনেক বড়ো বড়ো চিত্রলেখক ও ভাস্করকে বহুকাল অনাদর ও অনাহারের মধ্যে কাজ করিতে হইয়াছে, ভাগ্যের সেই প্রতিকূলতাও বশীভূত শত্রুর ন্যায় প্রতিভাকে বহুতর বহুমূল্য উপহার প্রদান করিয়াছে।

দুই-একজন পার্সি ভদ্রলোক কাজ দিয়া ম্হাত্রেকে সাহায্য করিতেছেন। ম্হাত্রে আশা করেন বঙ্গভূমিও এরূপ সাহায্যদানে কৃপণতা করিবেন না।

প্রদীপ
পৌষ ১৩০৫

ধর্ম/দর্শন

১৭॥২০

সাকার ও নিরাকার উপাসনা

সম্প্রতি কিছুকাল হইতে সাকার নিরাকার উপাসনা লইয়া তীব্রভাবে সমালোচনা চলিতেছে। যাঁহারা ইহাতে যোগ দিয়াছেন তাঁহারা এম্‌নি ভাব ধারণ করিয়াছেন যেন সাকার উপাসনার পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহারা প্রলয়জলমগ্ন হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার করিতেছেন। নিরাকার উপাসনা যেন হিন্দুধর্মের বিরোধী। এইজন্য তাহার প্রতি কেমন বিজাতীয় আক্রোশে আক্রমণ চলিতেছে। এইরূপে প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষি ও উপনিষদের প্রতি অসম্ভ্রম প্রকাশ করিতে তাঁহাদের পরম হিন্দুত্বের অভিমান কিছুমাত্র সংকুচিত হইতেছে না। তাঁহারা মনে করিতেছেন না, ব্রাহ্ম বলিয়া আমরা বৃহৎ হিন্দুসম্প্রদায়ের বহির্ভূত নহি। হিন্দুধর্মের শিরোভূষণ যাঁহারা, আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে ধর্মশিক্ষা লাভ করি। অতএব ব্রাহ্ম ও হিন্দু বলিয়া দুই কাল্পনিক বিরুদ্ধপক্ষ খাড়া করিয়া যুদ্ধ বাধাইয়া দিলে গোলাগুলির বৃথা অপব্যয় করা হয় মাত্র।

বুলবুলের লড়াইয়ে যেমন পাখিতে পাখিতেই খোঁচাখুঁচি চলে অথচ উভয়পক্ষীয় লোকের গায়ে একটিও আঁচড় পড়ে না, আমি বোধকরি অনেক সময়ে সেইরূপ কথাতে কথাতে তুমুল দ্বন্দ্ব বাধিয়া যায় অথচ উভয়পক্ষীয়মত অক্ষত দেহে বিরাজ করিতে থাকে। সাকার ও নিরাকার উপাসনার অর্থই বোধ করি এখনো স্থির হয় নাই। কেবল দুটো কথায় মিলিয়া বাঁও-কষাকষি করিতেছে।

একটি মানুষকে যখন মুক্ত স্থানে অবারিতভাবে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, সে যখন স্বেচ্ছামতে চলিয়া বেড়ায়, তখন সে প্রতিপদক্ষেপে কিয়ৎপরিমাণ মাত্র স্থানের বেশি অধিকার করিতে পারে না। হাজার গর্বে স্ফীত হইয়া উঠুন বা আড়ম্বর করিয়া পা ফেলুন, তিন-চারি হাত জমির বেশি তিনি শরীরের দ্বারায় আয়ত্ত করিতে পারেন না। কিন্তু তাই বলিয়া যদি সে বেচারাকে সেই তিন-চারি হাত জমির মধ্যেই বলপূর্বক প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেয়াল গাঁথিয়া গণ্ডিবদ্ধ করিয়া রাখা যায়, সে কি একই কথা হইল! আমি বলি ঈশ্বর-উপাসনা সম্বন্ধে এইরূপ হৃদয়ের বিস্তারজনক ও স্বাস্থ্যজনক স্বাধীনতাই অপৌত্তলিকতা এবং তৎসম্বন্ধে হৃদয়ের সংকীর্ণতা -জনক ও অস্বাস্থ্যজনক রুদ্ধভাবই পৌত্তলিকতা। সমুদ্রের ধারে দাঁড়াইয়া আমাদের দৃষ্টির দোষে আমরা সমুদ্রের সবটা দেখিতে পাই না, কিন্তু তাই বলিয়া একজন বিজ্ঞব্যক্তি যদি বলেন— এত খরচপত্র ও পরিশ্রম করিয়া সমুদ্র দেখিতে যাইবার আবশ্যক কী! কারণ, হাজার চেষ্টা করিলেও তুমি সমুদ্রের অতি ক্ষুদ্র একটা অংশ দেখিতে পাইবে মাত্র সমস্ত সমুদ্র দেখিতে পাইবে না। তাই যদি হইল তবে একটা ডোবা কাটিয়া তাহাকে সমুদ্র মনে করিয়া লও-না কেন?— তবে তাঁহার সে কথাটা পৌত্তলিকের মতো কথা হয়। আমরা মনে করিয়া ধরিয়া লইলেই যদি সব হইত তাহা হইলে যে ব্যক্তি আধগ্লাস জল খায় তাহার সহিত সমুদ্রপায়ী অগস্ত্যের তফাত কী? আমি যেন বলপূর্বক ডোবাকেই সমুদ্র মনে করিয়া লইলাম— কিন্তু সমুদ্রের সে বায়ু কোথায় পাইব, সে স্বাস্থ্য কোথায় পাইব, সেই হৃদয়ের উদারতাজনক বিশালতা কোথায় পাইব, সেটা তো আর মনে করিয়া ধরিয়া লইলেই হয় না!

আমরা অধীন এ কথা কেহই অস্বীকার করে না, কিন্তু অধীন বলিয়াই স্বাধীনতার চর্চা করিয়া আমরা এত সুখ পাই— আমরা সসীম সে সম্বন্ধে কাহারও কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু সসীম বলিয়াই আমরা ক্রমাগত অসীমের দিকে ধাবমান হইতে চাই, সীমার মধ্যে আমাদের সুখ নাই। 'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।' আমরা দুর্বল বলিয়া আমাদের যতটুকু বল আছে তাহাও কে বিনাশ করিতে চায়, আমরা সীমাবদ্ধ বলিয়া আমাদের যতটুকু স্বাধীনতা আছে তাহাও কে অপহরণ করিতে চায়, আমরা বর্তমানে দরিদ্র বলিয়া আমাদের সমস্ত ভবিষ্যতের আশাও কে উন্মূলিত করিতে চায়। আমাদের পথ রুদ্ধ করিয়ো না, আমাদের একমাত্র দাঁড়াইবার স্থান আছে আর

সমস্তই পথ— অতএব আমাদিগকে ক্রমাগতই চলিতে হইবে, অগ্রসর হইতে হইবে; কঞ্চির বেড়া বাঁধিয়া আমাদের যাত্রার ব্যাঘাত করিয়ো না।

কেহ কেহ পৌত্তলিকতাকে কবিতার হিসাবে দেখেন। তাঁহারা বলেন কবিতাই পৌত্তলিকতা, পৌত্তলিকতাই কবিতা। আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুসারে আমরা ভাবমাত্রকে আকার দিতে চাই, ভাবের সেই সাকার বাহ্যস্ফূর্তিকে কবিতা বলিতে পার বা পৌত্তলিকতা বলিতে পার। এইরূপ ভাবের বাহ্য প্রকাশ চেষ্টাকেই ভাবাভিনয়ন বলে।

কিন্তু কবিতা পৌত্তলিকতা নহে— অলংকারশাস্ত্রের আইনই পৌত্তলিকতা। ভাবাভিনয়নের স্বাধীনতাই কবিতা। ভাবাভিনয়নের অধীনতাই অলংকারশাস্ত্রসর্বস্ব পদ্য রচনা। কবিতায় হাসিকে কুন্দকুসুম বলে কিন্তু অলংকারশাস্ত্রে হাসিকে কুন্দকুসুম বলিতেই হইবে। ঈশ্বরকে আমরা হৃদয়ের সংকীর্ণতাবশত সীমাবদ্ধ করিয়া ভাবিতে পারি কিন্তু পৌত্তলিকতায় তাঁহাকে বিশেষ একরূপ সীমার মধ্যে বদ্ধ করিয়া ভাবিতেই হইবে। অন্য কোনো গতি নাই। কিন্তু কবরের মধ্যে জীবন বাস করিতে পারে না। কল্পনা উদ্রেক করিবার উদ্দেশ্যে যদি মূর্তি গড়া যায় ও সেই মূর্তির মধ্যেই যদি মনকে বদ্ধ করিয়া রাখি তবে কিছুদিন পরে সে মূর্তি আর কল্পনা উদ্রেক করিতে পারে না। ক্রমে মূর্তিটাই সর্বেসর্বা হইয়া উঠে, যাহার জন্য তাহার আবশ্যক সে অবসর পাইবামাত্র ধীরে ধীরে শৃঙ্খল খুলিয়া কখন যে পালাইয়া যায় আমরা জানিতেও পারি না। ক্রমেই উপায়টাই উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়। ইহার জন্য কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না— মনুষ্যপ্রকৃতিরই এই ধর্ম।

যেখানে চক্ষুর কোনো বাধা নাই এমন এক প্রশস্ত মাঠে দাঁড়াইয়া চারি দিকে যখন চাহিয়া দেখি, তখন পৃথিবীর বিশালতা কল্পনায় অনুভব করিয়া আমাদের হৃদয় প্রসারিত হইয়া যায়। কিন্তু কী করিয়া জানিলাম পৃথিবী বিশাল? প্রান্তরের যতখানি আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে ততখানি যে অত্যন্ত বিশাল তাহা নহে। আজন্ম আমরণকাল যদি এই প্রান্তরের মধ্যে বসিয়া থাকিতাম আর কিছুই না দেখিতে পাইতাম তবে এইটুকুকেই সমস্ত পৃথিবী মনে করিতাম— তবে প্রান্তর দেখিয়া হৃদয়ের এরূপ প্রসারতা অনুভব করিতাম না। কিন্তু আমি না কি স্বাধীনভাবে চলিয়া বেড়াইয়াছি সেইজন্যই আমি জানিয়াছি যে, আমার দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়াও পৃথিবী বর্তমান। সেইরূপ যাঁহারা সাধনা দ্বারা স্বাধীনভাবে ঈশ্বরকে ধ্যান করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন তাঁহারা যদিও একেবারে অনন্ত স্বরূপকে আয়ত্ত করিতে পারেন না তথাপি তাঁহারা ক্রমশই হৃদয়ের প্রসারতা লাভ করিতে থাকেন। স্বাধীনতা প্রভাবে তাঁহারা জানেন যে যতটা তাঁহারা হৃদয়ের মধ্যে পাইতেছেন তাহা অতিক্রম করিয়াও ঈশ্বর বিরাজমান। হৃদয়ের স্থিতিস্থাপকতা আছে, সে উত্তরোত্তর বাড়িতে পারে, কিন্তু স্বাধীনতাই তাহার বাড়িবার উপায়। পৌত্তলিকতায় তাহার বাধা দেয়। অতএব, নিরাকার উপাসনাবাদীরা আমাদিগকে কারাগার হইতে বাহির হইতে বলিতেছেন, অসীমের মুক্ত আকাশ ও মুক্ত সমীরণে স্বাস্থ্য বল ও আনন্দ লাভ করিতে বলিতেছেন, কারাগারের অন্ধকারের মধ্যে সংকোচ বিসর্জন করিয়া আসিয়া অসীমের বিশুদ্ধ জ্যোতি ও পূর্ণ উদারতায় হৃদয়ের বিস্তার লাভ করিতে বলিতেছেন, তাঁহারা জ্ঞানের বন্ধন মোচন করিতে আত্মার সৌন্দর্য সাধন করিতে উপদেশ করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, কারার মধ্যে অন্ধকার অসুখ অস্বাস্থ্য; অনন্তস্বরূপের আনন্দ-আহ্বানধ্বনি শুনিয়া দুঃখ শোক ভুলিয়া বাহির হইয়া আইস— ব্যবধান দূর করিয়া অনন্তসৌন্দর্য-স্বরূপ পরমাত্মার সম্মুখে জীবাত্মা প্রেমে অভিভূত হইয়া একবার দণ্ডায়মান হউক, সে প্রেম প্রতিফলিত হইয়া সমস্ত জগৎচরাচরে ব্যাপ্ত হইতে থাকুক, জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রেমের মিলন হইয়া সমস্ত জগৎ পবিত্র তীর্থস্থানরূপে পরিণত হউক। তাঁহারা এমন কথা বলেন না যে এক লম্ফে অসীমকে অতিক্রম করিতে হইবে, দূরবীক্ষণ কষিয়া অসীমের সীমা নির্দেশ করিতে হইবে, অসীমের চারি দিকে প্রাচীর তুলিয়া দিয়া অসীমকে আমাদের বাগানবাটির সামিল করিতে হইবে। তাঁহারা কেবল বলেন সুখশান্তি স্বাস্থ্য মঙ্গলের জন্য অসীমে বাস করো অসীমে বিচরণ করো, পরিবর্তনশীল বিকারশীল আচ্ছন্নকারী

বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র সীমার দ্বারা আত্মাকে অবিরত বেষ্টিত করিয়া রাখিয়ো না। সূর্যকিরণের অধিকাংশই সৌরজগতে নিযুক্ত আছে, অধিকাংশ অসীম আকাশে ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহার তুলনায় এই সর্ষপ পরিমাণ পৃথিবীতে সূর্যকিরণের কণামাত্র পড়িয়াছে। তাই বলিয়া এমন পৌত্তলিক কি কেহ আছেন যিনি বলিতে চাহেন এই আংশিক সূর্যকিরণের চেয়ে দীপশিখা পৃথিবীর পক্ষে ভালো! মুক্ত সূর্যকিরণসমুদ্রে পৃথিবী ভাসিতেছে বলিয়াই পৃথিবীর শ্রী সৌন্দর্য স্বাস্থ্য ও জীবন। পরমাত্মার জ্যোতিতেই আত্মার শ্রী সৌন্দর্য জীবন। আত্মা ক্ষুদ্র বলিয়া পরমাত্মার সমগ্র জ্যোতি ধারণ করিতে পারে না, কিন্তু তাই বলিয়া কি দীপশিখাই আমাদের অবলম্বনীয় হইবে?

অভিজ্ঞতার প্রভাবেই হউক অথবা যে কারণেই হউক, বহিরিন্দ্রিয়ের প্রতি আমরা অনেক সময় অবিশ্বাস করিয়া থাকি। চক্ষুরিন্দ্রিয়ে যেখানে আকাশের সীমা দেখি সেখানেই যে তাহার বাস্তবিক সীমা তাহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। চিত্রবিদ্যা অথবা দৃষ্টিবিজ্ঞানে যাঁহাদের অধিকার আছে তাঁহারা জানেন আমরা চোখে যাহা দেখি মনে তৎক্ষণাৎ তাহা পরিবর্তন করিয়া লই— দূরাদূর অনুসারে দ্রব্যের প্রতিবিম্বে যে-সকল বিকার উপস্থিত হয় তাহার অনেকটা আমরা সংশোধন করিয়া লই। অধিকাংশ সময়েই চোখে যাহাকে ছোটো দেখি মনে তাহাকে বড়ো করিয়া লই— চোখে যেখানে সীমা দেখি মনে সেখান হইতেও সীমাকে দূরে লইয়া যাই। অন্তরিন্দ্রিয় সম্বন্ধেও এই কথা খাটিতে পারে। অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা ঈশ্বরকে দেখিতে গিয়া আমরা ঈশ্বরের মধ্যে যদি-বা সীমা দেখিতে পাই তথাপি আমরা সেই সীমাকে বিশ্বাস করি না। অন্তরিন্দ্রিয়ের ক্ষমতা আমাদের বিলক্ষণ জানা আছে, তাহার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া যে সর্বতোরূপে তাহাকে আমাদের প্রভু বলিয়া বরণ করিয়াছি তাহা নহে। যেমন দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা চাঁদকে যত বড়ো দেখায় চাঁদ তাহার চেয়ে অনেক বড়ো আমরা জানি তথাপি দূরবীক্ষণ যন্ত্রকে অবহেলা করিয়া ফেলিয়া দিতে পারি না— তেমনি অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা দেখিতে গেলে ঈশ্বরকে যদি-বা সীমাবদ্ধ দেখায় তথাপি আমরা অন্তরিন্দ্রিয়কে অবহেলা করিতে পারি না— কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না, তাহাকে চূড়ান্ত মীমাংসক বলিয়া গণ্য করি না।

অসীমতা কল্পনার বিষয় নহে, সীমাই কল্পনার বিষয়। অসীমতা আমাদের সহজ জ্ঞান সহজ সত্য। সীমাকেই কষ্ট করিয়া পরিশ্রম করিয়া কল্পনা করিতে হয়। সীমা সম্বন্ধেই আমাদিগকে মিলাইয়া দেখিতে হয়, অনুমান ও তর্ক করিতে হয়, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হয়। যেমন সকল ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গেই স্বরবর্ণ পূর্বে কিংবা পরে বিরাজ করেই তেমনি অনন্তের ভাব আমাদের সমস্ত জ্ঞানের সহিত সহজে লিপ্ত রহিয়াছে। এইজন্য অসীমের ভাব আমাদের কল্পনার বিষয় নহে তাহা লক্ষ্য ও অলক্ষ্য ভাবে সর্বদাই আমাদের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছে। মনে করুন, আমরা ষাট ক্রোশ একটা মাঠের মধ্যে বসিয়া আছি। আমরা বিলক্ষণ জানি এ মাঠ আমাদের দৃষ্টির সীমা অতিক্রম করিয়া বিরাজ করিতেছে এবং আমরা ইহাও নিশ্চয় জানি এ মাঠ অসীম নহে— কিন্তু তাই বলিয়া যদি মাঠের ঠিক ষাটক্রোশব্যাপী আয়তনই কল্পনা করিতে চেষ্টা করি তাহা হইলে সে চেষ্টা কিছুতেই সফল হইবে না। আমরা তখন বলিয়া বসি এ মাঠ অসীম, অসীম বলিলেই আমরা আরাম পাই, সীমা নির্ধারণের কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাই।— সমুদ্রের মাঝখানে গেলে আমরা বলি সমুদ্রের কূলকিনারা নাই। আকাশের কোথাও সীমা কল্পনা করিতে পারি না, এইজন্য সহজেই আমরা আকাশকে বলি অসীম, আকাশকে সসীম কল্পনা করিতে গেলেই আমাদের মন অতিশয় ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে, অক্ষম হইয়া পড়ে। কালকে আমরা সহজেই বলি অনন্ত, নক্ষত্রমণ্ডলীকে আমরা সহজেই বলি অগণ্য— এইরূপে সীমার সহিত যুদ্ধ বন্ধ করিয়া অসীমের মধ্যেই শান্তি লাভ করি। অসীম আমাদের মাতৃক্রোড়ের মতো বিশ্রাম স্থল, শিশুর মতো আমরা সীমার সহিত খেলা করি এবং শ্রান্তি বোধ হইলেই অসীমের কোলে বিশ্রাম লাভ করি— সেখানে সকল চেষ্টার অবসান— সেখানে কেবল সহজ সুখ, সহজ শান্তি, সেখানে কেবলমাত্র পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জন। এই চিরপুরাতন চিরসঙ্গী অসীমকে বলপূর্বক বিভীষিকারূপে খাড়া করিয়া তোলা

অতি-পণ্ডিতের কাজ। তর্ক করিয়া যাঁহাদিগকে মা চিনিতে হয় মাকে দেখিলে তাহাদের সংশয় আর কিছুতেই ঘুচে না, কিন্তু স্বভাব-শিশু মাকে দেখিলেই হাত তুলিয়া ছুটিয়া যায়। সীমাতেই আমাদের শ্রান্তি, অসীমেই আমাদের শান্তি, ভূমৈব সুখং, ইহা লইয়া আবার তর্ক করিব কী! সীমা অসংখ্য, অসীম এক, সীমার মধ্যে আমরা বিক্ষিপ্ত, অসীমের মধ্যে আমরা প্রতিষ্ঠিত, সীমার মধ্যে আমাদের বাসনা, অসীমের মধ্যে আমাদের তৃপ্তি, ইহা লইয়া বিচার করিতে বসাই বাহুল্য। বুদ্ধি যখন দীপের আকার ধারণ করে তখন তাহা কাজে লাগে, যখন আলেয়ার আকার ধারণ করে তখন তাহা অনর্থের মূল হয়। অতএব পণ্ডিতেরা যাহাই বলুন, আমরা কেবল সীমায় সাঁতার দিয়া মরি কিন্তু অসীমে নিমগ্ন হইয়া বাঁচিয়া যাই।

পৌত্তলিকতার এক মহদ্দোষ আছে। চিহ্নকে যথার্থ বলিয়া মনে করিয়া লইলে অনেক সময়ে বিস্তর ঝঞ্ঝাট বাঁচিয়া যায় এইজন্য মনুষ্য স্বভাবতই সেইদিকে উন্মুখ হইয়া পড়ে। পুণ্য অত্যন্ত শস্তা হইয়া উঠে। পুণ্য হাতে হাতে ফেরে। পুণ্যের মোড়ক পকেটে করিয়া রাখা যায়, পুণ্যের পঙ্ক গায়ে মাখা যায়, পুণ্যের বীজ গাঁথিয়া গলায় পরা যায়। হরির নামের মাহাত্ম্যই এত করিয়া শুনা যায় যে, কেবল তাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়াই ভবযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় তৎসঙ্গে তাঁহার স্বরূপ মনে আনা আবশ্যকই বোধ হয় না। ব্রাহ্মদের কি এ আশঙ্কা নাই! কেবল মূর্তিই কি চিহ্ন, ভাষা কি চিহ্ন নয়! আমি এমন কথা বলি না। মনুষ্যমাত্রেরই এই আশঙ্কা আছে এবং সেইজন্যই ইহার যথাসাধ্য প্রতিবিধান করা আবশ্যক। সকল চিহ্ন অপেক্ষা ভাষাচিহ্নে এই আশঙ্কা অনেক পরিমাণে অল্প থাকে। তথাপি ভাষাকে সাবধানে ব্যবহার করা উচিত। ভাষার দ্বারা পূজা করিতে গিয়া ভাষা পূজা করা না হয়। দেবতার নিকটে ভাষাকে প্রেরণ না করিয়া ভাষার জড়ত্বের মধ্যে দেবতাকে রুদ্ধ করা না হয়।

আসল কথা, আমাদের সীমা ও অসীমতা দুইই চাই। আমরা পা রাখিয়াছি সীমার উপরে, মাথা তুলিয়াছি অসীমে। আমাদের একদিকে সীমা ও একদিকে অসীম। বস্তুগত (realistic) কবিতার দোষ এই, সে আমাদের কল্পনার চোখে ধুলা দিয়া আমাদের দৃষ্টি হইতে অসীমের পথ লুপ্ত করিয়া দেয়। বস্তুগত কবিতায় বস্তু নিজের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলে— আমাতেই সমস্ত শেষ, আমাকে ঘ্রাণ করো, আমাকে স্পর্শ করো, আমাকে ভক্ষণ করো, আমাকেই কায়মনোবাক্যে ভোগ করো। কিন্তু ভাব প্রধান (suggestive) কবিতার গুণ এই, সে আমাদিগকে এমন সীমারেখাটুকুর উপর দাঁড় করাইয়া দেয় যাহার সম্মুখেই অসীমতা। ভাবগত কবিতায় বস্তু কেবলমাত্র অসীমের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ইশারা করিয়া দেখাইয়া দেয়, চোখের অতিশয় কাছে আসিয়া অসীম আকাশকে রুদ্ধ করিয়া দেয় না। আমরা চিহ্ন না হইলে যদি না ভাবিতেই পারি তবে সে চিহ্ন এমন হওয়া উচিত যাহাতে তাহা পণ্ডি হইয়া না দাঁড়ায়। যাহাতে সে কেবল ভাবকে নির্দেশ করিয়া দেয়, ভাবকে আচ্ছন্ন না করে।

ঈশ্বরের আশ্রয়ে আছি বলিতে গিয়া ভক্তের মন মনুষ্যস্বভাববশত সহজেই বলিতে পারে 'আমি ঈশ্বরের চরণচ্ছায়ায় আছি' তাহাতে আমার মতে পৌত্তলিকতা হয় না। কিন্তু যদি কেহ সেই চরণের অঙ্গুলি পর্যন্ত গণনা করিয়া দেয়, অঙ্গুলির নখ পর্যন্ত নির্দেশ করিয়া দেয়, তবে তাহাকে পৌত্তলিকতা বলিতে হয়। কারণ, শুদ্ধমাত্র ভাব নির্দেশের পক্ষে এরূপ বর্ণনার কোনো আবশ্যক নাই— কেবল আবশ্যক নাই যে তাহা নয়, ইহাতে করিয়া ভাব হইতে মন প্রতিহত হইয়া বস্তুর মধ্যে রুদ্ধ হয়।

'চরণচ্ছায়ায় আছি' বলিতে গেলেই অমনি যে রক্তমাংসের একজোড়া চরণ মনে পড়িবে তাহা নহে। চরণের তলে পড়িয়া থাকিবার ভাবটুকু মনে আসে মাত্র। একটা দৃষ্টান্ত দিই।

যদি কোনো কবি বলেন বসন্তের বাতাস মাতালের মতো টলিতে টলিতে ফুলে ফুলে প্রবাহিত হইতেছে, তবে তৎক্ষণাৎ আমার মনে একটি মাতালের ছায়াছবি জাগিয়া উঠিবে; তাহার চলার ভাবের সহিত বাতাসের চলার ভাবের তুলনা করিয়া সাদৃশ্য দেখিয়া আনন্দ লাভ করিব। কিন্তু

তাই বলিয়া কি সত্যসত্যই কোনো মহা পণ্ডিত অঙ্গুলিবিশিষ্ট, নখবিশিষ্ট, বিশেষ কোনো বর্ণবিশিষ্ট, রোমবিশিষ্ট, একজোড়া টলটলায়মান রক্তমাংসের পা বাতাসের গাত্রে ঝুলিতে দেখেন। কিন্তু কবি যদি কেবল ইশারায় মাত্র ভাব প্রকাশ না করিয়া মাতালের পায়ের উপরেই বেশি ঝোঁক দিতেন, যদি তাহার পায়জামা ও ছেঁড়া বুট, বাঁ পায়ের ক্ষতচিহ্ন, ডান পায়ের এক হাঁটু কাদার কথার উল্লেখ করিতেন, তাহা হইলে স্বভাবতই ভাব ও ভঙ্গির সাদৃশ্যটুকু মাত্র মনে আসিত না, সশরীরে এক জোড়া পা আমাদের সম্মুখে আসিয়া তাহার পায়জামা ও ছেঁড়া বুট লইয়া আস্ফালন করিত। কে না জানেন চন্দ্রানন বলিলে থালার মতো একটা মুখ মনে পড়ে না, অথবা করপদ্ম বলিলে কুঞ্চিত দলবিশিষ্ট গোলাকার পদার্থ মনে আসে না— কিন্তু তাই বলিয়া চাঁদের মতো মুখ ও পদ্মের মতো করতল চিত্রপটে যদি আঁকিয়া দেওয়া যায় তবে তাহাই যথার্থ মনে করা ব্যতীত আমাদের আর অন্য কোনো উপায় থাকে না। 'ব্যূঢোরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ' ভাষাতে এই বর্ণনা শুনিলে কোনো তর্কবাগীশ একটা নিতান্ত অস্বাভাবিক মূর্তি কল্পনা করেন না, কিন্তু যদি একটা চিত্রে অথবা মূর্তিতে অবিকল বৃষের ন্যায় স্কন্ধ ও দুইটি শাল বৃক্ষের ন্যায় বাহু রচনা করিয়া দেওয়া যায় তবে দর্শক তাহাকেই প্রকৃত না মনে করিয়া থাকিতে পারে না।

আর-একটি কথা। কতকগুলি বিষয় আছে যাহা বিশুদ্ধ জ্ঞানের গম্য, যাহা পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করা যায় ও করাই উচিত। যেমন, ঈশ্বর ত্রিকালজ্ঞ। ঈশ্বরের কপালে তিনটে চক্ষু দিলেই যে ইহা আমরা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার বুঝিতে পারি তাহা নহে। বরঞ্চ তিনটে চক্ষুকে আবার বিশেষ রূপে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া বলিতে হয় ঈশ্বর ত্রিকালজ্ঞ। বিশুদ্ধ জ্ঞানের ভাষা অলংকারশূন্য। অলংকারে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়, বিকৃত করিয়া দেয়, মিথ্যা করিয়া দেয়। জ্ঞানগম্য বিষয়কে রূপকের দ্বারা বুঝাইতে গেলেই পৌত্তলিকতা আসিয়া পড়ে। কবি টেনিসন একটি প্রাচীন ইংরাজি কাহিনী অবলম্বন করিয়া কাব্য লিখিয়াছেন। তাহাতে আছে— মহারাজ আর্থরের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া নায়ক লান্‌স্‌লট্ কুমারী গিনেবিব্‌কে মহারাজের সহধর্মিণী করিবার জন্য কুমারীর পিতৃভবন হইতে আনিতে গিয়াছেন— কিন্তু সেই কুমারী প্রতিনিধিকেই আর্থর জ্ঞান করিয়া তাঁহাকেই মনে মনে আত্মসমর্পণ করেন; অবশেষে যখন ভ্রম বুঝিতে পারিলেন তখন আর হৃদয় প্রত্যাহার করিতে পারিলেন না— এইরূপে এক দারুণ অশুভ পরিণামের সৃষ্টি হইল। বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রতিনিধি রূপককে লইয়াও এইরূপ গোলযোগ ঘটিয়া থাকে। আমরা প্রথম দৃষ্টিতে তাহাকেই জ্ঞানের স্থলে অভিষিক্ত করিয়া লই ও জ্ঞানের পরিবর্তে তাহারই গলে বরমাল্য প্রদান করি— অবশেষে ভ্রম ভাঙিলেও সহজে হৃদয় ফিরাইয়া লইতে পারি না। ইহার পরিণাম শুভ হয় না। কারণ, জ্ঞানোদয় হইলে অজ্ঞানের প্রতি আমাদের আর শ্রদ্ধা থাকে না, অথচ অভ্যাস অনুসারে শ্রদ্ধাসূচক অনুষ্ঠানও ছাড়িতে পারি না। এইজন্য তখন টানিয়া বুনিয়া ব্যাখ্যা করিয়া হাড়গোড় বাঁকানো ব্যায়াম করিয়া জ্ঞানের প্রতি এই ব্যভিচারকে ন্যায়সংগত বলিয়া কোনোমতে দাঁড় করাইতে চাই। নিজের বুদ্ধির খেলায় নিজে আশ্চর্য হই, সুচতুর ব্যাখার সুচারু ফ্রেমে বাঁধাইয়া ধর্মকে ঘরের দেয়ালে টাঙাইয়া রাখি এবং তাহার চাকচিক্যে পরম পরিতোষ লাভ করি। কিন্তু এইরূপ ভেল্‌কিবাজির উপরে আত্মার আশ্রয়স্থল নির্মাণ করা যায় না। ইহাতে কেবল বুদ্ধিই তীক্ষ্ণ হয় কিন্তু আত্মা প্রতিদিন জড়তা কপটতা, ঘোরতর বৈষয়িকতার রসাতলে তলাইতে থাকে। ইহা তো ধর্মের সহিত চালাকি করিতে যাওয়া। ইহাতে ক্ষুদ্রতা প্রকাশ পায়। ইহার আচার্যেরা অভিমানী উদ্ধত ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠেন। কারণ ইহাঁরা জানেন ইহাঁরাই ঈশ্বরকে ভাঙিতেছেন ও গড়িতেছেন, ইহাঁরাই ধর্মের সেতু।

জ্ঞানগম্য বিষয়কে রূপকে ব্যক্ত করা অনাবশ্যক ও হানিজনক বটে কিন্তু আমাদের ভাবগম্য বিষয়কে আমরা সহজ ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারি না, অনেক সময়ে রূপকে ব্যক্ত করিতে হয়। ঈশ্বরের আশ্রয়ে আছি বলিলে আমার মনের ভাব ব্যক্ত হয় না, ইহাতে একটি ঘটনা ব্যক্ত হয় মাত্র; স্থাবর জঙ্গম ঈশ্বরের আশ্রয়ে আছে আমিও তাঁহার আশ্রয়ে আছি এই কথা বলা হয় মাত্র।

কিন্তু ঈশ্বরের চরণের তলে পড়িয়া আছি বলিলে তবেই আমার হৃদয়ের ভাব প্রকাশ হয়— ইহা কেবল আমার সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জনসূচক পড়িয়া থাকার ভাব। অতএব ইহাতে কেবল আমারই মনের ভাব প্রকাশ পাইল, ঈশ্বরের চরণ প্রকাশ পাইল না। অতএব ভক্ত যেখানে বলেন, হে ঈশ্বর আমাকে চরণে স্থান দাও, সেখানে তিনি নিজের ইচ্ছাকেই রূপকের দ্বারা ব্যক্ত করেন, ঈশ্বরকে রূপকের দ্বারা ব্যক্ত করেন না।

যাই হোক, যদি কোনো ব্যক্তি নিতান্তই বলিয়া বসে যে আমি কোনোমতেই গৃহকার্য করিতে পারি না, আমি খেলা করিতেই পারি, তবে আমি তাহার সহিত ঝগড়া করিতে চাই না। কিন্তু তাই বলিয়া সে যদি অন্য পাঁচজনকে বলে গৃহকার্য করা সম্ভব নহে খেলা করাই সম্ভব তখন তাহাকে বলিতে হয় তোমার পক্ষে সম্ভব নয় বলিয়া যে সকলের পক্ষেই অসম্ভব সে কথা ঠিক না হইতে পারে। অথবা যদি বলিয়া বসে যে খেলা করা এবং গৃহকার্য করা একই, তবে সে সম্বন্ধে আমার মতভেদ প্রকাশ করিতে হয়। একজন বালিকা যখন পুতুলের বিবাহ দিয়া ঘরকন্নার খেলা খেলে, তখন পুতুলকে সে নিতান্তই মৃৎপিণ্ড মনে করে না— তখন কল্পনার মোহে সে উপস্থিতমতো পুতুল দুটিকে সত্যকার কর্তা-গৃহিণী বলিয়াই মনে করে, কিন্তু তাই বলিয়াই যে তাহাকে খেলা বলিব না সত্যকার গৃহকার্যই বলিব এমন হইতে পারে না। এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, স্নেহ প্রেম প্রভৃতি যে-সকল বৃত্তি আমাদিগকে গৃহকার্যে প্রবৃত্ত করায় এই খেলাতেও সেই-সকল বৃত্তির অস্তিত্ব প্রকাশ পাইতেছে। ইহাও বলিতে পারি খেলা ছাড়িয়া যখন তুমি গৃহকার্যে প্রবৃত্ত হইবে, তখন তোমার এই-সকল বৃত্তি সার্থক হইবে। আত্মার মধ্যেই ঈশ্বরের সহিত আত্মার সম্বন্ধ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা এবং ঈশ্বরকে ইন্দ্রিয়গোচর করিবার চেষ্টা, এ দুইয়ের মধ্যেও সেই গৃহকার্য ও খেলার প্রভেদ। ইহার মধ্যে একটি আত্মার প্রকৃত লক্ষ্য, প্রকৃত কার্য, আত্মার গভীর অভাবের প্রকৃত পরিতৃপ্তিসাধন, আর-একটি তাহার খেলা মাত্র। কিন্তু এই খেলাতেই যদি আমরা জীবন ক্ষেপণ করি তবে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। সকলেই কিছু গৃহকার্য ভালোরূপ করিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদিগকে বলিতে পারি না, তবে তোমরা পুতুল লইয়া খেলা করো। তাহাদিগকে বলিতে হয় তোমরা চেষ্টা করো। যতটা পার তাই ভালো, কারণ ইহা জীবনের কর্তব্য কার্য। ক্রমেই তোমার অধিকতর জ্ঞান অভিজ্ঞতা ও বল লাভ হইবে। আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে দেখিতে হইবে, নতুবা উপাসনা হইলই না, খেলা হইল। ঈশ্বরের ধ্যান করিলে আত্মা চরিতার্থ হয়, কিন্তু এ বিষয়ে সকলে সমান কৃতকার্য হইতে পারেন না, আর রসনাগ্রে সহস্রবার ধ্যানহীন ঈশ্বরের নাম জপ করিলে বিশেষ কোনো ফলই হয় না, অথচ তাহা সকলেরই আয়ত্তাধীন। কিন্তু আয়ত্তাধীন বলিয়াই যে শাস্ত্রের অনুশাসনে, নরকের বিভীষিকায় সেই নিষ্ফল নাম জপ অবলম্বনীয় তাহা নহে।

সীমাবদ্ধ যে-কোনো পদার্থকে আমরা অত্যন্ত ভালোবাসি, তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের একটা বিলাপ থাকিয়া যায় যে তাহাদিগকে আমরা আত্মার মধ্যে পাই না। তাহারা আত্মময় নহে। জড় ব্যবধান মাঝে আসিয়া আড়াল করিয়া দাঁড়ায়। জননী যখন সবলে শিশুকে বুকে চাপিয়া ধরেন তখন তিনি যতটা পারেন ব্যবধান লোপ করিতে চান, কিন্তু সম্পূর্ণ পারেন না এইজন্য সম্পূর্ণ তৃপ্তি হয় না। কিন্তু ঈশ্বরকে আমরা ইচ্ছা করিয়া দূরে রাখি কেন? আমরা নিজে ইচ্ছাপূর্বক স্বহস্তে ব্যবধান রচনা করিয়া দিই কেন? তিনি আত্মার মধ্যেই আছেন আত্মাতেই তাঁহার সহিত মিলন হইতে পারে, তবে কেন আত্মার বাহিরে গিয়া তাঁহাকে শত সহস্র জড়ত্বের আড়ালে খুঁজিয়া বেড়াই? আত্মার বাহিরে যাহারা আছে তাহাদিগকে আত্মার ভিতরে পাইতে চাই, আর যিনি আত্মার মধ্যেই আছেন তাঁহাকে কেন আত্মার বাহিরে রাখিতে চাই?

নিরাকার উপাসনাবিরোধীদের একটা কথা আছে যে, নিরাকার ঈশ্বর নির্গুণ অতএব তাঁহার উপাসনা সম্ভবে না। আমি দর্শনশাস্ত্রের কিছুই জানি না, সহজ বুদ্ধিতে যাহা মনে হইল তাহাই বলিতেছি। ঈশ্বর সগুণ কি নির্গুণ কী করিয়া জানিব! তাঁহার অনন্ত স্বরূপ তিনিই জানেন। কিন্তু

আমি যখন সগুণ তখন আমার ঈশ্বর সগুণ। আমার সম্বন্ধে তিনি সগুণ ভাবে বিরাজিত। জগতে যাহা-কিছু দেখিতেছি তাহা যে তাহাই, তাহা কী করিয়া জানিব! তাহার নিরপেক্ষ স্বরূপ জানিবার কোনো সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আমার সম্বন্ধে তাহা তাহাই। সেই সম্বন্ধ বিচার করিয়াই আমাকে চলিতে হইবে, আর-কোনো সম্বন্ধ বিচার করিয়া চলিলে আমি মারা পড়িব। হল্যাণ্ডে সমুদ্রে বন্যা আসিত। তাই বলিয়া কি হল্যাণ্ড সমুদয় সমুদ্র বাঁধিয়া ফেলিবে! সমুদ্রের যে অংশের সহিত তাহার অব্যবহিত যোগ সেইটুকুর সঙ্গেই তাহার বোঝাপড়া। মনে করুন একটি শিশুর পিতা জমিদার, দোকানদার, ম্যুনিসিপলিটি সভার অধ্যক্ষ, ম্যাজিস্ট্রেট, লেখক, খবরের কাগজের সম্পাদক— তিনি কলিকাতাবাসী, বাঙালি, হিন্দু, ককেশীয় শাখাভুক্ত, আর্যবংশীয়, তিনি মনুষ্য— তিনি অমুকের পিসে, অমুকের মেসো, অমুকের ভাই, অমুকের শ্বশুর, অমুকের প্রভু, অমুকের ভৃত্য, অমুকের শত্রু, অমুকের মিত্র ইত্যাদি— এক কথায়, তিনি যে কত কী তাহার ঠিকানা নাই— কিন্তু শিশুটি তাঁহাকে কেবল তাহার বাবা বলিয়াই জানে (বাবা কাহাকে বলে তাহাও সে ভালো করিয়া জানে না)— শিশুটি কেবল তাঁহাকে তাহার আপনার বলিয়া জানে, ইহাতে ক্ষতি কী! এই শিশু যেমন তাহার পিতাকে জানেও বটে, না জানেও বটে, আমরাও তেমনি ঈশ্বরকে জানিও বটে, না জানিও বটে। আমরা কেবল এই জানি তিনি আমাদের আপনার। ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের হৃদয়ের যাহা উচ্চতম আদর্শ, তাহাই আমাদের পূজার ঈশ্বর, তাহাই আমাদের নেতা ঈশ্বর, তাহাই আমাদের সংসারের ধ্রুবতারা। তাঁহার যাহা নিগূঢ় স্বরূপ তাহার তথ্য কে পাইবে! কিন্তু তাই বলিয়া যে আমাদের দেবতা আমাদের মিথ্যা কল্পনা, আমাদের মনগড়া আদর্শ, তাহা নহে। আংশিক গোচরতা যেরূপ সত্য ইহাও সেইরূপ সত্য। পূর্বেই বলিয়াছি দৃষ্টিগোচর সমুদ্রকে সমুদ্র বলা এক আর ডোবাকে সমুদ্র বলা এক। ইহাকে আমি আংশিক বলিয়াই জানি— এইজন্য হৃদয় যতই প্রসারিত করিতেছি, আমার ঈশ্বরকে ততই অধিক করিয়া পাইতেছি— ন্যায় দয়া প্রেমের আদর্শ আমার যতই বাড়িতেছে ততই ঈশ্বরে আমি অধিকতর ব্যাপ্ত হইতেছি। প্রতি পদক্ষেপে, উন্নতির প্রত্যেক নূতন সোপানে পুরাতন দেবতাকে ভাঙিয়া নূতন দেবতা গড়িতে হইতেছে না। অতএব আইস, অসীমকে পাইবার জন্য আমরা আত্মার সীমা ক্রমে ক্রমে দূর করিয়া দিই, অসীমকে সীমাবদ্ধ না করি। যদি অসীমকেই সীমাবদ্ধ করি তবে আত্মাকে সীমামুক্ত করিব কী করিয়া। ঈশ্বরকে অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত দয়া, অনন্ত প্রেম জানিয়া আইস আমরা আমাদের জ্ঞান প্রেম দয়াকে বিস্তার করি, তবেই উত্তরোত্তর তাঁহার কাছে যাইতে পারিব। তাঁহাকে যদি ক্ষুদ্র করিয়া দেখি তবে আমরাও ক্ষুদ্র থাকিব, তাঁহাকে যদি মহৎ হইতে মহান বলিয়া জানি তবে আমরা ক্ষুদ্র হইয়াও ক্রমাগত মহত্ত্বের পথে ধাবমান হইব। নতুবা পৃথিবীর অসুখ অশান্তি, চিত্তের বিক্ষিপ্ততা বাড়িবে বৈ কমিবে না। সুখ সুখ করিয়া আমরা আকাশ-পাতাল আলোড়ন করিয়া বেড়াই, আইস আমরা মনের মধ্যে পুরাতন ঋষিদের এই কথা গাঁথিয়া রাখি 'ভূমৈব সুখং' ভূমাই সুখস্বরূপ, কোনো সীমা কোনো ক্ষুদ্রত্বে সুখ নাই— তা হইলে অনর্থক পর্যটনের দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইব।

ভারতী
শ্রাবণ ১২৯২

নববর্ষ উপলক্ষে গাজিপুরে ব্রহ্মোপাসনা

(উদ্‌বোধন)

গতরাত্রিতে আমরা সেই বিশ্বজননীর ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতেছিলাম। পাছে আমাদের নিদ্রার ব্যাঘাত হয় এইজন্য তিনি দীপ্ত ভানুকে নির্বাণ করিয়া দিলেন জগতের কোলাহল থামাইয়া দিলেন। চারি দিক নিস্তব্ধ হইল। বিশ্বচরাচর নিদ্রায় মগ্ন হইল। কেবল একমাত্র সেই বিশ্বতশ্চক্ষু

বিশ্বজননী শ্রান্ত জগতের শিয়রে বসিয়া অসংখ্য অনিমেষ তারকা-আঁখি তাহার উপর স্থাপিত করিয়া রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। দিবসের কঠোর পরিশ্রমে জীবশরীরের যে-কোনো অঙ্গ ব্যথিত হইয়াছিল তাঁহার কোমল কর-সঞ্চালনে সে ব্যথা দূর করিলেন, সংসারের জ্বালাযন্ত্রণায় যে মন নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল তাহাকে অল্পে অল্পে সতেজ করিয়া তুলিলেন— যে আত্মা সংসারের মোহ প্রলোভনে মুহ্যমান হইয়াছিল তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিলেন। জগৎ নব-বলে নব-উদ্যমে আবার কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল।

সেই বিশ্বকর্মা বিশ্ববিধাতার শিল্পাগার চির উন্মুক্ত— দিবারাত্রিই তাঁহার কার্য অবিরামে চলিতেছে। যখন আর সকলেই নিদ্রিত থাকে, সেই বিধাতা পুরুষ জাগ্রত থাকিয়া তাঁহার রচিত বিশ্বযন্ত্রের জীর্ণসংস্কার করিতে থাকেন— তাঁহার এই সংস্কারকার্য কেমন গোপনে, বিনা আড়ম্বরে সম্পন্ন হয়। তিনি তাঁহার অসম্পূর্ণ সৃষ্টিকে একটা রহস্যময় আবরণে আবৃত করিয়া রাখিতে ভালোবাসেন। যতক্ষণ তাঁহার সৃষ্টি জীবন ও সুখসৌন্দর্যে পূর্ণরূপে ভূষিত না হয় ততক্ষণ তিনি তাহাকে বাহিরের পূর্ণ আলোকে আনিতে চাহেন না। সেই মহাশিল্পী সেই মহারহস্যের আবরণ ক্রমশ ভেদ করিয়া তাহার মধ্য হইতে অভিনব বিচিত্র জীবন-সৌন্দর্যের বিকাশ করিতেছেন। তিনি জরায়ুর অন্ধকারে অবস্থান করিয়া মানবশিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যোজনা করেন। তিনি অণ্ডের মধ্যে থাকিয়া পক্ষীশাবকের শরীর গঠন করেন— তিনি বীজকোষে থাকিয়া বৃক্ষলতাকে পরিপুষ্ট করেন। তিনি পুরাতন বর্ষের গর্ভে নববর্ষের প্রাণ সঞ্চার করেন— তিনি করাল মৃত্যুর মধ্যে থাকিয়াও অমৃতের আয়োজন করেন। আর সেই মহারাত্রিকে একবার কল্পনার চক্ষে আনয়ন করো— যখন চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র কিছুই ছিল না— যখন সেই স্বয়ম্ভূ স্বপ্রকাশ তাঁহার সেই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অতি সূক্ষ্ম তন্মাত্রময় আবরণের মধ্যে বিলীন থাকিয়া আপনাকে আপনি বিকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই অবধি সৃষ্টি আরম্ভ হইল— প্রাণের স্রোত বহিতে লাগিল— সৌন্দর্যের উৎস উৎসারিত হইল। সেই মহাপ্রাণের বিরাম নাই— জগতের মৃত্যু নাই।— তাহা অস্তিত্বের অবসান নহে তাহা আবরণ মাত্র— তাহা প্রাণের লীন অবস্থা— তাহা নবজীবনের গূঢ় আয়োজন ভিন্ন আর কিছুই নহে। মৃত্যু আমাদের জীবনরঙ্গভূমির সজ্জাগৃহ মাত্র। ইহলোকের অভিনয়-মঞ্চ হইতে প্রস্থান করিয়া কিছুকাল আমরা মৃত্যুরূপ সজ্জাগৃহে বিশ্রাম করি ও পুনর্বার নবসাজে সজ্জিত হইয়া জীবনরঙ্গভূমিতে পুনঃপ্রবেশ করি ও নব-উদ্যমে পূর্ণ হইয়া জীবনের নূতন অঙ্ক অভিনয়ে প্রবৃত্ত হই।

বলিতে বলিতে ওই দেখো পূর্ব দিকের যবনিকা অল্পে অল্পে উদ্‌ঘাটিত করিয়া শুভ্রভূষা অকলুষা উষা ধীর পদক্ষেপে প্রবেশ করিতেছেন। সুকুমার শিশুর পবিত্র হাসির রেখা দিগন্তের রক্তিম অধরে দেখা দিয়াছে। সুখস্পর্শ প্রভাত সমীরণ মন্দ মন্দ বহিতেছে। উষার চুম্বনে কুসুমরাশি জাগ্রত হইয়া কেমন পবিত্র সৌরভ বিস্তার করিতেছে। বিহঙ্গকুলের মধুর কলরবে আকাশ ছাইয়া গেল। জগৎ জীবন সুখে পুনর্বার পূর্ণ হইল। এ সেই পবিত্র স্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ, মঙ্গল-স্বরূপেরই মহিমা। আইস এই নববর্ষের উৎসবে আমরা তাঁহারই মহিমা ঘোষণা করি, বর্ষের এই প্রথম দিনে সেই সর্বসিদ্ধিদাতার নাম উচ্চারণ করিয়া আমাদের রসনাকে পবিত্র করি— এই পবিত্র দিবসে এই পবিত্র প্রাতঃকালে তাঁহারই কার্যে আমাদের জীবনকে উৎসর্গ করিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
জ্যৈষ্ঠ, ১৮১০ শক। ১২৯৫ বঙ্গাব্দ

ধর্ম ও ধর্মনীতির অভিব্যক্তি
(Evolution)

অভিব্যক্তিবাদ বলে একেবারে সম্পূর্ণ আকারে সৃষ্ট না হইয়া নিখিল ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট হইতেছে। এককালে মনে হইয়াছিল এই মত ধর্মের মূলে আঘাত করিবে, তাই ধর্মযাজকগণ সশঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে এ মত সহিয়া গেল, সকলে মানিয়া লইল, অথচ ধর্মের মূল অবিচলিত রহিল। লোকে হঠাৎসৃষ্টি অপেক্ষা অমোঘ সৃষ্টিনিয়মের মধ্যে ঐশ্বরিক ভাব অধিক উপলব্ধি করিতে লাগিল। একদল লোকের বিশ্বাস আমাদের মনের ধর্মভাব, ঈশ্বরধারণা সহজ আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ। আর-একদল লোক বলেন তাহা ভূতের ভয় হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশ অভিব্যক্ত। প্রথমোক্ত দল ভয় করেন যে শেষ মতটি প্রমাণ হইলে ধর্মের মূলে আঘাত লাগিবে। কিন্তু আমি সেরূপ আশঙ্কা দেখি না। ভূতের ভয় হইতেও যে অসীম ঈশ্বরের ভাব আমাদের মনে বিকশিত হইতে পারে ইহা পরম আশ্চর্য। স্বার্থপরতা হইতে মানবধর্মনীতি ক্রমে নিঃস্বার্থপরতার অভিমুখিন হইতেছে ইহাতেই মানবহৃদয়ের অন্তর্নিহিত মঙ্গলনিয়ম অধিক মাত্রায় অনুভব করা যায়। বীজে ও বৃক্ষে যেমন দৃশ্যমান প্রভেদ, এমন আর কিছুতে না, কিন্তু বৃক্ষ হইবার উদ্দেশ্য তাহার মধ্যে বর্তমান। বাষ্প হইতে সৌরজগতের অভিব্যক্তি বলিলে সৌরজগৎ যে বাষ্পেরই সামিল হইয়া দাঁড়ায় তাহা নহে। ইতিপূর্বে অমঙ্গল ও মঙ্গলকে, শয়তান ও ঈশ্বরকে দুই বিপরীত শ্রেণীতে ভুক্ত করা হইয়াছিল। এখন অভিব্যক্তিবাদ হইতে আমাদের মনে এই ধারণা হইতেছে অসত্য হইতে সত্য অমঙ্গল হইতে মঙ্গল উদ্‌ভূত হয়। সত্যের নিয়ম মঙ্গলের নিয়ম অসত্য এবং অমঙ্গলের মধ্যেও বিরাজ করিতেছে। অনন্ত জগতের অনন্ত কার্য সমগ্রভাবে দেখা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, আংশিকভাবে দেখিতে গিয়া আমরা সকল সময়ে পাপপুণ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখিতে পাই না তথাপি মঙ্গল অভিব্যক্তির প্রতি আমাদের এমনি বিশ্বাস যে মন্দের মধ্যে হইতেও ভালো হইবে এই বিশ্বাস অনুসারে উপদেশ দিতে ও কাজ করিতে আমরা কিছুতেই বিরত হই না। অতএব অভিব্যক্তিবাদে এই মঙ্গলের প্রতি বিশ্বাস আমাদের মনে আরও বদ্ধমূল করিয়া দেয়, মনে হয় সৃষ্টির [মধ্যে যে] মঙ্গলকার্য দেখিতেছি তাহা সৃষ্টিকর্তার ক্ষণিক খেয়াল নহে, তাহা সৃষ্টির সহিত অবিচ্ছেদ্য অনন্ত নিয়ম।

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক

২২। ১১। ৮৮ [৮ অগ্রহায়ণ ১২৯৫]

চন্দ্রনাথবাবুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব

পাঠকদের স্মরণ থাকিতে পারে, পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া যাইবার চেষ্টাই হিন্দুর বিশেষত্ব এবং সেই বিশেষত্ব একান্ত যত্নে রক্ষা করাই আমাদের কর্তব্য, চন্দ্রনাথবাবু এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। আমাদের ভিন্নরূপ মানসিক প্রকৃতিতে ভিন্নরূপ ধারণা হওয়ায় 'সাধনা'য় চন্দ্রনাথবাবুর প্রতিবাদ করিয়াছিলাম।

ইহাতে চন্দ্রনাথবাবু আমাদের উপর রাগ করিয়াছেন। রাগ করিবার একটা কারণ দেখাইয়াছেন যে, 'পূর্ব প্রবন্ধে এ কথা যে রকম করিয়া বুঝাইয়াছি তাহাতেও যদি কেহ না বুঝেন তবে তিনি এ কথা বুঝিতে হয় অসমর্থ না হয় অনিচ্ছুক'— দৈবাৎ তাঁহারই বুঝাইবার কোনো ত্রুটি ঘটিতেও পারে, মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ, এরূপ সংশয়মাত্র চন্দ্রনাথবাবুর মনে উদয় হইতে পারিল না অতএব যে দুঃসাহসিক তাঁহার সহিত একমত হইতে পারে নাই সেই নরাধম। যুক্তিটা

যদিও তেমন পাকা নহে এবং ইহাতে নম্রতা ও উদারতার কিঞ্চিৎ অভাব প্রকাশ পায়, তথাপি তর্কস্থলে এরূপ যুক্তি অনেকেই প্রয়োগ করিয়া থাকেন। চন্দ্রনাথবাবুও যদি সেই পথে যান, তবে আমরা তাঁহাকে মহাজন জানিয়াও ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করি।

প্রবন্ধের উপসংহারে চন্দ্রনাথবাবু রাগের মাথায়, আমাদিগকে অথবা কাহাকে ঠিক জানি না, স্বজাতিদ্রোহী বলিয়াছেন। বিশুদ্ধ জ্ঞানানুশীলনার মধ্যেও লোকে পরস্পরকে এমন সকল কঠিন কথা বলিয়া থাকে। অতএব, চন্দ্রনাথবাবু যে বলিয়াছেন ক্ষুদ্রতা হইতে যতই ব্যাপকতার দিকে উত্থান করা যায় ততই তীব্রতা দুর্দমনীয়তার হ্রাস হয়, সে কথা সপ্রমাণ হইতেছে না। আমাদের বক্তব্য এই যে, সত্য স্বজাতি অপেক্ষা ব্যাপক এবং নব্য গুরুদিগের অপেক্ষা প্রাচীন, অতএব আমরা সত্যদ্রোহী হওয়াকেই সর্বাপেক্ষা গুরুতর অপরাধ জ্ঞান করি।

চন্দ্রনাথবাবু যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহা আকারে যদিও বৃহৎ কিন্তু তাহার মূল কথা দুটি-একটির অধিক নহে অতএব আসল তর্কটা সংক্ষেপে সারিতে পারিব এরূপ আশা করা যায়।

চন্দ্রনাথবাবু বলেন, হিন্দুর লয়তত্ত্বের অর্থ সগুণ অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া নির্গুণ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া। কিন্তু এই নির্গুণ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে গেলে যে একেবারেই সংসারে বিমুখ হইতে হইবে তাহা নহে, বরঞ্চ সংসারধর্ম পালন সেই অবস্থা প্রাপ্তির একটি মুখ্য সোপান। কারণ, যাঁহারা মনে করেন নির্গুণ অবস্থা লাভের অর্থ আত্মনাশ 'তাঁহারা বড়ো ভুল বুঝেন— তাঁহারা বোধহয় তাঁহাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির সংকীর্ণতা বা বিকৃতিবশত আমাদের লয়তত্ত্বে প্রবেশ করিতে একেবারেই অসমর্থ'। তাঁহার মতে নির্গুণতা প্রাপ্তির অর্থ 'আত্মসম্প্রসারণ'। স্বার্থপরতা হইতে পরার্থপরতা এবং পরার্থপরতা হইতে ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলনের সাহায্যে ক্রমশ নির্গুণতারূপ আত্মসম্প্রসারণ, ভিন্ন ভিন্ন পর্যায় মাত্র। অতএব পরার্থপরতার সম্যক্‌ অভ্যাসের জন্য সংসার-ধর্ম পালন অত্যাবশ্যক। আবার যাঁহারা বলেন, লয়তত্ত্ব মানিয়া চলিতে গেলে বিজ্ঞানশিক্ষা সৌন্দর্যচর্চা দূর করিতে হয় তাঁহারাও ভ্রান্ত। কারণ, 'পদার্থবিদ্যা প্রাণীবিদ্যা প্রভৃতি যাহাতে সৃষ্টিকৌশল ব্যাঘাত হয়, বিশ্বনাথের বিপুল বিচিত্র লীলা বর্ণিত হয় সে সকলই লয়প্রার্থীর অনুশীলনের জিনিস।' 'বিশ্বের সৌন্দর্য, বিশ্বের মাধুরী, বিশ্বের মধুময়তা (এই তিনটি শব্দবিন্যাসের মধ্যে বিশেষ যে অর্থবৈচিত্র্য আছে আমার বোধ হয় না। শ্রীরঃ) ব্রহ্মভক্ত ব্রহ্মপিপাসু ব্রহ্মচারী যেমন অনুভব করিবেন আর কেহই তেমন করিবেন না।' 'প্রকৃত সৌন্দর্যে মানুষকে ব্রহ্মেই মজাইয়া দেয়।'

মোট কথাটা এই। এক্ষণে, যদিও আশঙ্কা আছে আমাদের বুদ্ধিহীনতা অথবা অসারল্য, আমাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির সংকীর্ণতা ও বিকৃতি সম্বন্ধে চন্দ্রনাথবাবুর প্রত্যয় উত্তরোত্তর অধিকতর বদ্ধমূল হইয়া যাইবে, তথাপি আমাদিগকে অগত্যা স্বীকার করিতেই হইবে এবারে আমরা চন্দ্রনাথবাবুর কথা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

সগুণে নির্গুণে এমন একটা খিচুড়ি পাকাইয়া তোলা পূর্বে আমরা কোথাও দেখি নাই।

প্রথম কথা। ক্ষুদ্র অনুরাগ হইতে বৃহৎ অনুরাগ বুঝিতে পারি, কিন্তু বৃহৎ অনুরাগ হইতে নিরনুরাগের মধ্যে ক্রমবাহী যোগ কোথায় বুঝিতে পারি না।

যদি কেহ বলেন, অনুরাগের ব্যাপকতা অনুসারে তাহার প্রবলতা ক্রমশ হ্রাস হইয়া আসে সে কথা প্রামাণ্য নহে। একভাবে হ্রাস হইয়া আর-একভাবে বৃদ্ধি হয়। প্রকৃত দেশানুরাগ যে গৃহানুরাগের অপেক্ষা ক্ষীণবল ইতিহাসে এরূপ সাক্ষ্য দেয় না, দেশানুরাগের অপেক্ষা প্রকৃত সর্বজনীন প্রীতি যে নিস্তেজ এমন কথা কাহার সাধ্য বলে! বড়ো বড়ো অনুরাগে একেবারে প্রাণ লইয়া টানাটানি। দেশহিতের জন্য, লোকহিতের জন্য, ধর্মের জন্য মহাত্মারা যে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন তাহা যে কত বড়ো 'বিরাট' অনুরাগের বলে, তাহা আমরা ঘরে বসিয়া অনুমান করিতেই পারি না। এই যে অনুরাগের উত্তরোত্তর বিশ্বব্যাপী বিস্তার ইহাকেই কি নির্গুণ লয় বলে? প্রীতি কি কখনো প্রীতিহীনতার দিকে আকৃষ্ট হয়? আত্মপ্রেম হইতে বিশ্বপ্রেম, বিশ্বপ্রেম

হইতে সগুণ ঈশ্বরপ্রেমের মধ্যে একটি পরস্পরসংলগ্ন পরিণতির পর্যায় আছে। কিন্তু 'হাঁ'-কে বড়ো করিয়া 'না' করা যায় এ কথা বিশ্বাস করিতে যেরূপ অসাধারণ মানসিক প্রকৃতির আবশ্যক আমাদের তাহা নাই স্বীকার করিতে হয়।

দ্বিতীয় কথা। 'সৃষ্টিকৌশলের' মধ্যে 'বিশ্বনাথের বিপুল বিচিত্র লীলা' দেখিয়া লয়প্রার্থী কী করিয়া যে ব্রহ্মের নির্গুণস্বরূপ হৃদয়ংগম করিতে সমর্থ হন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। 'লীলা' কি নির্গুণতা প্রকাশ করে? 'লীলা' কি ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাশক্তির বিচিত্র বিকাশ নহে? 'সৃষ্টিকৌশল' জিনিসটা কি নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত কোনো যুক্তিসূত্রে যুক্ত হইতে পারে?

সৌন্দর্যের একমাত্র কার্য চিত্তহরণ করা অর্থাৎ হৃদয়ের মধ্যে প্রেমের আকর্ষণ সঞ্চার করিয়া দেওয়া। যাঁহারা প্রেমস্বরূপ সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন সৃষ্টির সৌন্দর্যে তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের প্রেম স্মরণ করাইয়া দেয়। ঈশ্বর যে আমাদিগকে ভালোবাসেন এই সৌন্দর্য বিকাশ করিয়াই যেন তাহার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যে কেবল আমাদিগকে অমোঘ নিয়মপাশে বাঁধিয়া আমাদিগকে বলপূর্বক কাজ করাইয়া লইতে চান তাহা নহে, আমাদের মনোহরণের প্রতিও তাঁহার প্রয়াস আছে। এই বিশ্বের সৌন্দর্যে তিনি আমাদিগকে বংশীস্বরে আহ্বান করিতেছেন— তিনি জানাইতেছেন তিনিও আমাদের প্রীতি চান। বৈষ্ণবদের কৃষ্ণরাধার রূপক এই বিশ্বসৌন্দর্য ও প্রেমের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। কৃষ্ণ কি নির্গুণ ব্রহ্ম? চন্দ্রনাথবাবু কী বলিবেন জানি না, কিন্তু চৈতন্যদেব অন্যরূপ বলেন। তিনি অহংব্রহ্মবাদীদিগকে 'পাষণ্ড' বলিয়াছেন। সে যাহাই হৌক, সৌন্দর্য বিরাট লয়প্রার্থীদিগকে যে কী করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মে 'মজাইতে' পারে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সেটা আমাদের বুদ্ধির দোষ হইতে পারে এবং সেজন্য চন্দ্রনাথবাবু আমাদিগকে যথেচ্ছা গালি দিবেন, আমরা নির্বোধ ছাত্র-বালকের মতো নতশিরে সহ্য করিব, কিন্তু অবশেষে বুঝাইয়া দিবেন।

চন্দ্রনাথবাবু তাঁহার প্রবন্ধের একস্থানে প্রহ্লাদ ও নারদের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার স্মরণ করা উচিত ছিল প্রহ্লাদ ও নারদ উভয়েই বৈষ্ণব। উভয়েই ভক্ত এবং প্রেমিক। প্রহ্লাদের কাহিনীতে ঈশ্বরের সগুণতার যেরূপ দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে পুরাণের অন্য কোনো কাহিনীতে সেরূপ দেওয়া হয় নাই। প্রকৃত ভক্তির বশে ভক্তের কাছে ঈশ্বর যে কীরূপ প্রত্যক্ষভাবে ধরা দেন ইহাতে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। যে ঈশ্বর নানা বিপদ হইতে ভক্তকে কোলে করিয়া রক্ষা করিয়াছেন এবং অবশেষে নৃসিংহ মূর্তি ধরিয়া দৈত্যকে সংহার করিয়াছেন তিনি কি নির্গুণ ব্রহ্ম?

প্রসঙ্গক্রমে চন্দ্রনাথবাবু বঙ্কিমবাবুকে এক স্থলে সাক্ষ্য মানিয়াছেন। কিন্তু বঙ্কিমবাবু শ্রীকৃষ্ণকে গুণের আদর্শরূপে খাড়া করিয়া তাঁহারই অনুকরণের জন্য আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন— নির্গুণতাকে আদর্শ করিয়া অপরূপ পদ্ধতি অনুসারে আত্মসম্প্রসারণ করিতে বলেন নাই।

আসল কথা, যাঁহারা যথার্থ লয়তত্ত্ববাদী, তাঁহারা লয়কে লয়ই বলেন, ইংরাজি শিখিয়া তাহাকে আত্মসম্প্রসারণ বলেন না। তাঁহাদের কাছে সৌন্দর্য কদর্য কিছুই নাই, এইজন্য তাঁহারা অতি কুৎসিত বস্তু ও চন্দনকে সমান জ্ঞান করেন। জগৎ তাঁহাদের কাছে যথার্থই অসৎ মায়া, বিশ্বনাথের সৃষ্টিকৌশল ও লীলা নহে।

মরুভূমি যেমন বিরাট এ তত্ত্বও তেমনি বিরাট, কিন্তু তাই বলিয়া ধরণীর বিচিত্র শস্যক্ষেত্রকে মরুভূমি করা যায় না; অকাতরে আত্মহত্যা করার মধ্যে একটা বিরাটত্ব আছে কিন্তু তাই বলিয়া প্রাণীদিগকে সেই বিরাটত্বে নিয়োগ করা কোনো জাতিবিশেষের একমাত্র কর্তব্য-কর্ম বলা যায় না। প্রেম প্রবল মোহ, জগৎ প্রকাণ্ড প্রতারণা এবং ঈশ্বর নাস্তিকতার নামান্তর এ কথা বিশ্বাস না করিলেও সংসারে 'বিরাটভাব' চর্চার যথেষ্ট সামগ্রী অবশিষ্ট থাকিবে।

আসল কথা, চন্দ্রনাথবাবু নিজের সহৃদয়তাগুণে লয়তত্ত্ব সম্যক্ গ্রহণ করিতে না পারিয়া ফাঁপরে পড়িয়াছেন। অথচ সেই সহৃদয়তাই দেশানুরাগের আকার ধারণ করিয়া তাঁহার নিকটে লয়তত্ত্বের সর্বোৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য প্রমাণের চেষ্টা করিতেছে। সেই হৃদয়ের প্রাবল্যবশতই তিনি

অকস্মাৎ ক্ষুব্ধ হইয়া আমাদিগকে গালি দিয়াছেন এবং ভরসা করি, সেই সহৃদয়তাগুণেই তিনি আমাদের নানারূপ প্রগল্‌ভতা মার্জনা করিবেন।

সাধনা
আষাঢ় ১২৯৯

নব্য লয়তত্ত্ব

'সাহিত্যে' চন্দ্রনাথবাবু 'লয়' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন, আমাদের মতের সহিত অনৈক্য হওয়াতে সাধনা পত্রিকায় উক্ত প্রবন্ধের সমালোচনাকালে আমরা ভিন্ন মত ব্যক্ত করি। তাহা লইয়া চন্দ্রনাথবাবুর সহিত আমাদের বাদ-প্রতিবাদ চলিতেছে, তাহা 'সাহিত্য'-পাঠকদিগের অগোচর নাই। বিষয়টা গুরুতর, অতএব এ সম্বন্ধে বাদ-প্রতিবাদ হওয়া কিছুই আশ্চর্য নহে, কিন্তু চন্দ্রনাথবাবু উত্তরোত্তর আমাদের প্রতি রাগ করিতেছেন, ইহাতেই আমরা কিছু চিন্তিত হইয়াছি। চন্দ্রনাথবাবুর যে-একটা বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে তাঁহার মতের সহিত যখন আমাদের বিরোধ তখন অবশ্যই আমরা হিন্দুমতদ্বেষী, এ কথাটা কিছু গুরুতর। তিনি নানা ছলে আমাদিগকে সেইরূপ ভাবে দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। হিন্দু হইয়া জন্মিলেই যে চন্দ্রনাথবাবুর সহিত কোনো মতভেদ হইবে না, এমন কথা কী করিয়া বলিব! বিশেষত, ইতিহাসে যখন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রসিদ্ধ ভক্ত রামপ্রসাদ 'লয়তত্ত্ব' সম্বন্ধে আপত্তি প্রকাশ করিয়া অবশেষে বলিয়াছেন, 'চিনি হতে চাই নে রে, ভাই, চিনি খেতে ভালোবাসি!' অর্থাৎ, 'বিরাট হিন্দু'র 'বিরাট লয়' তাঁহার নিকট প্রার্থনীয় নহে, এ কথা তিনি স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। চৈতন্য অহংব্রহ্মবাদীর প্রতি কীরূপ বিরক্ত ছিলেন, পূর্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ইঁহারা ছাড়া ভারতে দ্বৈতবাদী হিন্দুর সংখ্যা বিরল নহে। পূর্বোক্ত হিন্দু মহাপুরুষদিগের সহিত যখন চন্দ্রনাথবাবুর মতের ঐক্য হইতেছে না, তখন ভরসা করি আমার ন্যায় লোকের পক্ষেও তাঁহার সহিত মতবিরোধ প্রকাশ করা নিতান্তই দুঃসাহসের কাজ হইবে না।

চন্দ্রনাথবাবু যে লয়তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন সেটাকে আমি তাঁহার স্বরচিত লয়তত্ত্ব বলিয়াছি, ইহাতেই তিনি কিছু অধিক রাগ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হইল। অতএব ও কথাটা ব্যবহার না করিলেই ভালো করিতাম, স্বীকার করি; কিন্তু তাহা হইলে আমাদের আসল কথাটাই বলা হইত না। শাস্ত্রে যে একটা লয়তত্ত্ব আছে, বিশেষরূপে তাহার প্রমাণ প্রয়োগ করা বাহুল্য— কিন্তু চন্দ্রনাথবাবু যে লয়তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা যে শাস্ত্রে নাই, ইহাই আমার বক্তব্য।

এমনতরো স্বতোবিরোধী কথা শাস্ত্রে থাকিবেই বা কী করিয়া? লয় অর্থে আত্মসম্প্রসারণ, নির্গুণ অর্থে সগুণ, এ-সব কথা নূতন ধরনের। প্রথমত, আত্মসম্প্রসারণ বলিতে কাহার প্রসারণ বুঝায়, সেটা ঠিক করা আবশ্যক। ব্রহ্ম তো আছেনই; আমি যদি আপনাকে তাঁহার মধ্যে লুপ্ত করিয়া দিই, তাহাতে তাঁহার তিলমাত্র বৃদ্ধি হইবে না— তিনি পূর্বে যেমন ছিলেন, এখনো তেমনি থাকিবেন। আর আমি? আমি তখন থাকিব না। কারণ, আমি যদি থাকি তো আমাতে ব্রহ্মেতে ভেদ থাকে; আর আমি যদি না থাকি, তবে সম্প্রসারণ হইল কাহার? ব্রহ্মেরও নহে, আমারও নহে।

প্রকৃত লয়তত্ত্ববাদীগণ আত্মপ্রসারণ নহে, আত্মসংহরণ করিতে উপদেশ দেন। 'ইহা নহে' 'ইহা নহে' 'ইহা নহে' বলিয়া, সমস্ত উপাধি হইতেই তাঁহারা আপনাকে প্রত্যাহার করিয়া অবশেষে যে আমি ভাবিতেছে তাহাকেও বিলুপ্ত করিয়া দেন; জ্ঞাতৃ, জ্ঞান ও জ্ঞেয় -ভেদ দূর করিয়া দেন—

'নিষিধ্য নিখিলোপাধীন্নেতি নেতীতি বাক্যতঃ।
বিদ্যাদৈক্যং মহাবাক্যৈর্জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।'

তাঁহারা স্পষ্টই বলেন, কর্মের দ্বারা কখনোই এই লয়সাধন হয় না, কারণ কর্ম এবং অবিদ্যা

অবিরোধী। কর্ম হইতে কর্ম, অনুরাগ হইতে অনুরাগেই লইয়া যায়। এইজন্য শংকরাচার্য বলেন—

'অবিরোধিতয়া কর্ম নাবিদ্যাং বিনিবর্তয়েৎ।'

কিন্তু চন্দ্রনাথবাবু যে লয়তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন, সে লয় প্রাপ্তির পক্ষে কর্মসোপান 'একান্ত আবশ্যক।' তাহার কারণ, চন্দ্রনাথবাবু ব্রহ্মকে মুখে বলেন নির্গুণ, ভাবে বলেন সগুণ; মুখে বলেন লয়, কিন্তু তাহার অর্থ করেন সম্প্রসারণ।

আবার বলেন, লয়তত্ত্ববাদীরা 'যে জগৎকে অসৎ ও মায়া বলিয়াছেন সে কেবল ব্রহ্মের তুলনায়। নহিলে বলো দেখি কেন তাঁহারা এই অসৎটাকে এত ভয় করিয়া গিয়াছেন।' অর্থাৎ চন্দ্রনাথবাবুর মতে জগৎটা প্রকৃতপক্ষে অসৎ নহে। শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন, শুক্তিকাকে যেমন রজত বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। মোহমুদ্গরের নিম্নলিখিত শ্লোকটি সকলেরই নিকট সুপরিচিত—

অষ্টকুলাচল সপ্ত সমুদ্রা
ব্রহ্মপুরন্দরদিনকররুদ্রাঃ,
ন ত্বং নাহং নায়ং লোকঃ
তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ॥

তাহা ছাড়া, 'তুলনায় মিথ্যা' বলিলে বিশেষ কিছুই বুঝায় না। মিথ্যা মাত্রেই তুলনায় মিথ্যা। মিথ্যার যদি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিত, তবে তো সে সত্যই হইত।

অতঃপর সগুণ নির্গুণ লইয়া তর্ক।

লয়তত্ত্ববাদীরা ব্রহ্মকে নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিত্য, নির্বিকল্প, নিরঞ্জন, নির্বিকার, নিরাকার, নিত্য, মুক্ত ও নির্মল বলিয়া থাকেন। এইজন্য ব্রহ্মত্ব লাভের জন্য তাঁহারা উপদেশ দিয়া থাকেন—'ঔদাসীন্যমভীপ্স্যতাং।' অর্থাৎ অনুরাগ ছাড়িয়া ঔদাসীন্য অবলম্বন করিলে ব্রহ্মের অনুরূপ হওয়া যায়।

এদিকে আবার অন্যমতাবলম্বীরা ঈশ্বরকে ভক্তবৎসল বলেন। সে ঈশ্বর উদাসীন নহেন, কারণ তিনি পাপীর প্রতি ভীষণ ও পুণ্যাত্মার প্রতি প্রসন্ন। তিনি দৈত্যকে দলন করেন ও প্রহ্লাদকে রক্ষা করেন। তিনি নানা অবতার রূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীকে নানা বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। কেবল যদি তিনি চিদানন্দময় হন, কেবল যদি তাঁহার আপনাতেই আপনার আনন্দ হয়, তাঁহার যদি আর কোনো গুণ, আর কোনো স্বরূপ না থাকে এবং তাঁহার নিকট তিনি ছাড়া আর কিছুই স্থান না পায় (যথা— জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ভেদঃ পরাত্মনি ন বিদ্যতে। চিদানন্দৈকরূপত্বাদ্দীপ্যতে স্বয়মেব হি॥), তবে ঈশ্বর রুদ্র, ঈশ্বর দয়াময়, ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা, ঈশ্বর ভক্তবৎসল, এ সমস্ত কথাই মিথ্যা।

কিন্তু চন্দ্রনাথবাবু জগৎকে ঈশ্বরের 'সৃষ্টিকৌশল' 'ভগবানের লীলা' বলিতে কুণ্ঠিত হন না। এবং ব্যাখ্যা করিবার সময় বলেন, যদি ইহা তাঁহার লীলাই না হইবে, যদি তাঁহার সৃষ্টিই না হইবে, যদি নিতান্ত মায়া এবং অসৎ হইবে, তবে ইহাকে পণ্ডিতেরা কেন এত ভয় করিতে বলিয়া গিয়াছেন? আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, ইহা যদি ভগবানের লীলা হয়, সৃষ্টি হয়, তবেই বা ইহাকে ভয় করিতে হইবে কেন; তাঁহার লীলা কি দানবের লীলা? তাঁহার সৃষ্টি কি শয়তানের সৃষ্টি? জগৎ যদি তাঁহার ইচ্ছা হয়, তবে সে ইচ্ছা কি মঙ্গল ইচ্ছা নহে?

অতএব, যদি বল জগৎ তাঁহার ইচ্ছা নহে জগৎ সত্য নহে, তবেই বুঝিতে পারি মিথ্যা জগৎকে অতিক্রম করিবার জন্য সাধনা কর্তব্য, কিন্তু যদি বল জগৎ তাঁহার লীলা অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছা, তবে সে ইচ্ছাকে অবিশ্বাস করিলে তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস করা হয়।

যাঁহারা প্রথমোক্ত মতাবলম্বী, তাঁহারা জগৎ হইতে জগৎবাসীদের মন ফিরাইবার জন্য ক্রমাগত বিভীষিকা দেখাইয়া থাকেন। জগতের যে অংশ হীন তাহারই প্রতি তাঁহারা ক্রমাগত দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকেন। এমন-কি, সৌন্দর্যকে কদর্য বীভৎসভাবে আঁকিতেও চেষ্টা করেন। তাঁহারা বলেন, সংসারে প্রেম কপটতামাত্র; যে পর্যন্ত ধনোপার্জনে শক্তি থাকে, পরিজনগণ সেই

পর্যন্তই অনুরাগ দেখায়, জরাজর্জর হইলে কেহ একটি কথাও জিজ্ঞাসা করে না। মানবহৃদয়ে যে অকৃত্রিম মৃত্যুঞ্জয় প্রেম আছে, সে প্রেমের ছবি তাঁহারা গোপন করিয়া যান। তাঁহারা বলেন—

'অয়মবিচারিতচারুতয়া
সংসারো ভাতি রমণীয়ঃ।'

অর্থাৎ, যে-সকল চারুতা দ্বারা সংসারকে রমণীয় বোধ হয়, সে-সকল চারুতা বিচারের চক্ষে তিরোহিত হইয়া যায়।

এই-সকল লয়তত্ত্ববাদীরা জগতের মধ্য দিয়া আত্মসম্প্রসারণ করিতে চাহেন নাই বলিয়াই, জগৎ হইতে জগৎবাসীকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়াই, জগতের প্রতি বারংবার এত কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন। মানবের অকৃত্রিম প্রেমের মধ্যে, বিশ্বজগতের চিরনূতন চারুতার মধ্যে জগদীশ্বরের প্রেম এবং ঐশ্বর্য নির্দেশ করা তাঁহাদের তত্ত্বের বিরুদ্ধ। কারণ, তাঁহাদের ঈশ্বর নির্গুণ, তাঁহাদের জগৎ মায়া।

কিন্তু বৈষ্ণবেরা জগতের সৌন্দর্যকে সুন্দর বর্ণে চিত্রিত করিতে ভীত হন নাই এবং তাঁহারা ঈশ্বরপ্রেমকে মানবপ্রেমের সহিত তুলনা করিয়াছেন; তাহার কারণ, তাঁহারা ঈশ্বরকে সুন্দর বলেন, ঈশ্বরকে প্রেমস্বরূপ বলেন। বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য তাঁহার বংশীধ্বনি, তাঁহার প্রেমসংগীত, আমাদের প্রতি তাঁহার আহ্বান। ভক্ত এবং ঈশ্বর যদি স্বতন্ত্র না থাকেন, তবে এ সৌন্দর্য কিসের সৌন্দর্য, কাহার কাছে সৌন্দর্য! চন্দ্রনাথবাবু যে 'বিশ্বব্যাপী বিশ্বরূপ সৌন্দর্যের' কথা বলিয়াছেন, লয়তত্ত্বে সে সৌন্দর্যের স্থান কোথায়? কারণ, ভেদজ্ঞানমাত্রেই মায়া— ভেদজ্ঞান ব্যতীত সৌন্দর্যের কোনো অস্তিত্বই থাকিতে পারে না, যেহেতু সৌন্দর্য অনুভবসাপেক্ষ। ঈশ্বরকে যতক্ষণ সুন্দর বলিব, ততক্ষণ ভক্তকে তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র স্বীকার করা বৈ আর গতি নাই। এইজন্য চন্দ্রনাথবাবু ব্যতীত কোনো লয়তত্ত্ববাদী ব্রহ্মকে সুন্দর বলেন না। তাঁহারা বলেন—

অনণ্বস্থূলহ্রস্বমদীর্ঘমজমব্যয়ং।
অরূপগুণবর্ণাখ্যং তদ্‌ ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ।

যাহা হউক, চন্দ্রনাথবাবু যাহাকে 'বিরাট লয়' বলেন, তাহা লয় নহে আত্মসম্প্রসারণ, অর্থাৎ লয়ের ঠিক বিপরীত। তাঁহার মতে নির্গুণ ব্রহ্ম নির্গুণ নহেন, প্রকৃতপক্ষে সগুণ এবং এই জগৎ তাঁহার সৃষ্টি, তাঁহার লীলা। অসৎ জগৎ প্রকৃতপক্ষে অসৎ নহে এবং বহু সাধনার পর চরম জ্ঞান লাভ করিলে একটা বিশ্বব্যাপী বিশ্বরূপ সৌন্দর্য দেখিতে পাওয়া যায়।

এরূপ লয়তত্ত্ব যে আমাদের মতের বিরুদ্ধ নহে, তাহা আমাদের প্রতিবাদ পড়িলেই পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন। কারণ, আত্ম হইতে পর এবং পর হইতে পরমাত্মার প্রতি আত্মার প্রসারণ— এবং জগৎ হইতে জগদীশ্বরের অসীম সৌন্দর্যের উপলব্ধি, বোধ করি, জগতের সমুদায় শ্রেষ্ঠ ধর্মমতেরই লক্ষ্য। ঈশ্বরের প্রতি একান্ত আত্মসমর্পণ করিয়া স্বার্থপরতার বিনাশ সাধন, বোধ করি, খৃস্টানধর্মেরও উপদেশ। ঈশ্বরচরিত্রকে আদর্শ করিয়া আপন ক্ষুদ্রতা পরিহার করা খৃস্টীয় ধর্মশাস্ত্রের একটি প্রধান অনুশাসন এবং সকল উন্নত ধর্মশাস্ত্রেই সেই উপদেশ দেয়।

চন্দ্রনাথবাবু যদি ইহাকে লয়তত্ত্ব নাম দেন তবে তাঁহার ভাষা সম্বন্ধে আমরা আপত্তি করিব, বলিব— লয়কে লয় অর্থে ব্যবহার না করিয়া তাহার বিপরীত অর্থে ব্যবহার করিলে কোনো ফল নাই, বরঞ্চ বিপরীত ফলেরই সম্ভাবনা; অতএব যখন তিনি 'আত্মসম্প্রসারণ'-নামক একটি শব্দ রচনা করিয়াছেন এবং উক্ত শব্দে তাঁহার মনোভাব যথার্থ ব্যক্ত হইতেছে, তখন ওই শব্দটাকেই যথাস্থানে প্রয়োগ করিলে 'সাধনা'র সমালোচক এবং 'সাহিত্যে'র পাঠকগণকে কোনোরূপ বিভ্রাটে ফেলা হইবে না।

সাহিত্য
ভাদ্র ১২৯৯

[সুখ না দুঃখ]
উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে বক্তব্য

লেখক মহাশয়ের লেখনী অজ্ঞাতসারে বামের দিকেই কিঞ্চিৎ অধিক হেলিয়াছে— তিনি মনে মনে দুঃখকেই যেন বেশি প্রাধান্য দিয়াছেন। কারণ, সংসারে যদি সুখের পরিমাণ অধিক থাকে তাহা হইলে মীমাংসার তো কোনো গোল থাকে না। জমা অপেক্ষা খরচ অধিক হইলে তহবিল মেলে না— জগতের জমাখরচে যদি দুঃখটাই বেশি হইয়া পড়ে তবে জগৎটার হিসাব-নিকাশ হয় না।

ধর্মব্যবসায়ীরা অন্ধভাবে বলপূর্বক দুঃখের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে চাহেন। কিন্তু সেরূপ করিয়া কেবল ছেলে-ভুলানো হয় মাত্র। যাঁহারা সংসারের দুঃখতাপ অন্তরে বাহিরে চতুর্দিকে অনুভব করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটে জগতের দুঃখের অংশ কোনোমতে গোঁজামিলন দিয়া সারিয়া লইবার চেষ্টা করা নিতান্ত মূঢ়ের কাজ। জগতে এমন শত সহস্র দুঃখ আছে যাহার মধ্যে মানববুদ্ধি কোনো মঙ্গল উদ্দেশ্য আবিষ্কার করিতে পারে না। এমন অনেক কষ্ট অনেক দৈন্য আছে যাহার কোনো মহিমা নাই, যাহা জীবের আত্মাকে অভিভূত সংকীর্ণ শ্রীহীন করিয়া দেয়— দুর্বলের প্রতি সবলের, প্রাণের প্রতি জড়ের এমন অনেক অত্যাচার আছে, যাহা অসহায়দিগকে অবনতির অন্ধকূপে নিক্ষেপ করে— আমরা তাহার কোনো কারণ, কোনো উদ্দেশ্য খুঁজিয়া পাই না। মঙ্গল পরিণামের প্রতি যাঁহার অটল বিশ্বাস আছে তিনি এ সম্বন্ধে বিনীতভাবে অজ্ঞতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন না এবং জগদীশ্বরের পক্ষাবলম্বন করিয়া মিথ্যা ওকালতি করিতে বসা স্পর্ধা বিবেচনা করেন। অতএব জগতে দুঃখের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে চাহি না।

কিন্তু অনেক সময়ে একটা জিনিসকে তাহার চতুর্দিক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্রভাবে দেখিতে গেলে তাহাকে অপরিমিত গুরুতর করিয়া তোলা হয়। দুঃখকে বিশ্লিষ্ট করিয়া একত্র করিলে পর্বতের ন্যায় দুর্ভর ও স্তূপাকার হইয়া উঠে, কিন্তু স্বস্থানে তাহার এত ভার নাই।

সমুদ্র হইতে এক কলস জল তুলিয়া লইলে তাহা বহন করা কত কষ্টসাধ্য, কিন্তু জলের মধ্যে যখন ডুব দেওয়া যায়, তখন মাথার উপর শত সহস্র কলস জল তরঙ্গিত হইতে থাকে, তাহার ভার অতি সামান্য বোধ হয়। জগতে ভার যেমন অপরিমেয়, ভার সামঞ্জস্যও তেমনি অসীম। পরস্পর পরস্পরের ভার লাঘব করিতেছে। চিরজীবন নিত্যবহন করিবার পক্ষে আমাদের শরীর কিছু কম ভারী নহে। স্বতন্ত্র ওজন করিয়া দেখিলে তাহার ভারের পরিমাণ যথেষ্ট দুঃসহ মনে হইতে পারে। কিন্তু এমন একটি সামঞ্জস্য আছে যে, আমরা তাহা অক্লেশে বহন করি। সেইরূপ জগতে দুঃখ অপর্যাপ্ত আছে বটে, কিন্তু তাহা লাঘব করিবারও সহস্র উপায় বর্তমান। আমরা আমাদের কল্পনাশক্তির সাহায্যে দুঃখকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া একটা প্রকাণ্ড বিভীষিকা নির্মাণ করিতে পারি, কিন্তু অনন্ত সংসারের মধ্যে সে অনেকটা লঘুভারে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। সেই কারণেই এই দুঃখপারাবারের মধ্যেও সমস্ত জগৎ এমন অনায়াসে সন্তরণ করিতেছে, অমঙ্গল মঙ্গলকে অভিভূত করিতে পারিতেছে না, এবং আনন্দ ও সৌন্দর্য চতুর্দিকে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে।

সাধনা
মাঘ ১২৯৯

বেদান্তের বিদেশীয় ব্যাখ্যা

বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে জর্মন অধ্যাপক ডাক্তর পৌল্ ডয়সেন্ সাহেবের মত 'সাধনা'র পাঠকদিগের নিমিত্ত নিম্নে সংকলন করিয়া দিলাম।

আধুনিক ভারতবর্ষে অধিকাংশ প্রাচীন দর্শনের কেবল ঐতিহাসিক গৌরব আছে মাত্র। যথার্থ সাংখ্যমতাবলম্বী অল্পই দেখা যায়; ন্যায় শুদ্ধমাত্র ব্যাকরণ এবং অঙ্কশাস্ত্রের মতো বুদ্ধির চর্চা এবং কৌশল প্রকাশে নিযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু বেদান্ত এখনো প্রত্যেক চিন্তাপরায়ণ হিন্দুর হৃদয় মন জীবন্তভাবে অধিকার করিয়া আছে। যদিচ রামানুজ, মাধব এবং বল্লভ -কর্তৃক বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত এবং শুদ্ধাদ্বৈত নামে বেদান্তদর্শনের ভিন্ন ভিন্ন রূপান্তর প্রচলিত হইয়াছে তথাপি এ কথা বলা যাইতে পারে যে, বৈদান্তিকদের মধ্যে বারো-আনা অংশই শংকরাচার্যের অনুগামী।

অধ্যাপক মহাশয়ের মতে দরিদ্র ভারতবর্ষের বিপুল দুর্ভাগ্যের মধ্যে ইহাই একটি মহৎ সান্ত্বনার কারণ। কারণ অনিত্য বিষয়ের অপেক্ষা নিত্য বিষয়ের গৌরব অধিক; এবং পৃথিবীতে নিত্য সত্য অন্বেষণ-চেষ্টায় মানবের প্রতিভা যত কিছু অমূল্যতম পদার্থ সঞ্চয় করিয়াছে শংকরাচার্যের বেদান্তভাষ্য তাহার অন্যতম; উহা প্লেটো এবং কান্টের রচনার সহিত তুলনীয়।

শংকর উপনিষদকে ধ্রুব প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। সেইজন্য উপনিষদের নানা বিরুদ্ধ মতের সমন্বয়সাধনপূর্বক তাহা হইতে একটি আদ্যোপান্ত সুসংগত দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করা সহজ ব্যাপার হয় নাই। উপনিষদের স্থানে স্থানে ব্রহ্মকে নানাপ্রকারে রঞ্জিত করা হইয়াছে আবার তিনি অনির্বচনীয় ও মনের অগম্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন— কোথাও বা ব্রহ্ম কীরূপে জগৎ সৃষ্টি করিলেন তাহার দীর্ঘ বিবরণ পাঠ করা যায় আবার কোথাও বা ব্রহ্ম ব্যতীত আর সমস্তই মায়া ইহাও কথিত হইয়াছে। কোথাও বা আত্মার সংসারভ্রমণের বিচিত্র কল্পনা দৃষ্ট হয়, আবার কোথাও বা উক্ত হইয়াছে আত্মা কেবল একমাত্র।

শংকর এই-সকল বিরুদ্ধ বচনের মধ্য হইতে আশ্চর্য নৈপুণ্যসহকারে পথ কাটিয়া বাহির হইয়াছেন। তিনি উপনিষদের সমস্ত উক্তি হইতে দুইটি শাস্ত্র গঠন করিয়াছেন— একটি কেবল নিগূঢ় দার্শনিক, ইংরাজিতে যাহাকে esoteric কহে, শংকর যাহাকে কখনো বা সগুণা বিদ্যা কখনো বা পারমার্থিকা অবস্থা কহিয়াছেন; ইহার মধ্যে সেই তত্ত্বজ্ঞানের কথা আছে যাহা সর্বদেশে এবং সর্বকালেই অতি অল্পসংখ্যক লোকের ধারণাগম্য। দ্বিতীয়টি সাধারণ ধর্মতত্ত্ব, শংকর ইহাকে সগুণা বিদ্যা, ব্যবহারিকী অবস্থা কহিয়াছেন; ইহা সর্বসাধারণের জন্য, যাহারা রূপ চাহে স্বরূপ সত্য চাহে না, পূজা করে ধ্যান করে না!

অধ্যাপক মহাশয় এই দুইটি, এক্সোটেরিক্ এবং এসোটেরিক্— ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক বিদ্যাকে চারি প্রধান অংশে ভাগ করিয়া দেখাইতেছেন।

প্রথম।	ব্রহ্মতত্ত্ব	Theology
দ্বিতীয়।	জগত্তত্ত্ব	Cosmology
তৃতীয়।	অধ্যাত্মতত্ত্ব	Psychology
চতুর্থ।	পরকালতত্ত্ব	Eschatology

১। ব্রহ্মতত্ত্ব

উপনিষদে ব্রহ্মের স্বরূপ ব্যাখ্যায় নানা বিরুদ্ধ বর্ণনা দেখা যায়। তিনি সর্বব্যাপী আকাশ, তিনি সূর্যমধ্যস্থ দেবতা, তিনি চক্ষুরন্তর্গত পুরুষ; দ্যুলোক তাঁহার মস্তক, চন্দ্রসূর্য তাঁহার চক্ষু, বায়ু তাঁহার নিশ্বাস, পৃথিবী তাঁহার পাদপীঠ; তিনি জগদাত্মারূপে মহতোমহীয়ান এবং জীবাত্মা-রূপে অণোরণীয়ান্; তিনি বিশেষরূপে ঈশ্বর, মনুষ্যকৃত পাপপুণ্যের দণ্ডপুরস্কারবিধাতা।

শংকর এই-সমস্ত বর্ণনাকে তাঁহার সগুণা বিদ্যার মধ্যে সংগ্রহ করিয়াছেন। জ্ঞানের দ্বারা নহে,

ভক্তির দ্বারা নিত্য-সত্যের নিকটবর্তী হইবার জন্য এই-সকল বিদ্যা উপযোগী, এবং ইহাদের প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ ফল আছে। অধ্যাপক মহাশয় বলিতেছেন যে, লক্ষ করিয়া দেখা আবশ্যক, ব্রহ্মকে ঈশ্বররূপে বর্ণন সেও সগুণা বিদ্যার অন্তর্গত, সেও সাধারণের জন্য, তাহাতে পরমাত্মার যথার্থ তত্ত্ব প্রকাশ পায় না; বস্তুত যখন বিবেচনা করিয়া দেখা যায় গুণ (personality) বলিতে কী বুঝায়, তাহার সীমা কতই সংকীর্ণ, তাহা অহংকারের সহিত কত নিকটসম্বন্ধবিশিষ্ট, তখন ব্রহ্মের প্রতি গুণের আরোপ করিয়া তাঁহাকে খর্ব করিতে কে ইচ্ছা করিবে?

এই সগুণা বিদ্যার সহিত পরমাত্মার নির্গুণা বিদ্যার সম্পূর্ণ প্রভেদ। ব্রহ্ম মনুষ্যের বাক্যমনের অতীত ইহাই তাহার মূল সূত্র।

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।

পুনশ্চ—

অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্।

পুনশ্চ, বৃহদারণ্যকউপনিষদ -ধৃত— নেতি নেতি। অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানিতে যত প্রকার চেষ্টা কর এবং তাঁহাকে বর্ণনা করিতে যে-কোনো বাক্য প্রয়োগ কর, তাহার উত্তর, ইহা নহে, ইহা নহে। সেইজন্য রাজা বাষ্কলি যখন বাহ্ব ঋষিকে ব্রহ্মের স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি কেবল মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। রাজা পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিলে তিনি কহিলেন, আমি বলিলাম, কিন্তু তুমি বুঝিলে না— শান্তোহয়মাত্মা, পরমাত্মা শান্ত। আমরাও এক্ষণে কান্টের শিক্ষামতো জানিয়াছি যে, আমাদের মনের প্রকৃতিই এমন যে কিছুতেই আমরা দেশকাল ও কার্যকারণ সম্বন্ধের অতীত সত্তাকে জানিতে পারি না। অথচ তিনি আমাদের অপ্রাপ্য নহেন তিনি আমাদের হইতে দূরে নাই, কারণ তিনি সম্পূর্ণরূপে সমগ্রত আমাদের আত্মারূপেই রহিয়াছেন। এবং আমরা যখন বহির্দেশ হইতে, এই প্রতীয়মান জগৎসংসার হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অন্তরের গভীরতম গুহার মধ্যে প্রবেশ করি সেখানে ব্রহ্মে আসিয়া উপনীত হই— জ্ঞানের দ্বারা নহে অনুভবের দ্বারা, আপনার মধ্যে আপনার সংহরণের দ্বারা।[1] জ্ঞানে এবং অনুভবে প্রভেদ এই যে, জ্ঞানে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ থাকে পরন্তু অনুভবে উভয়ে সম্মিলিত ইয়া যায়। অনুভবের দ্বারা আমি ব্রহ্ম এই ধারণা লাভ করার অবস্থাকে শংকর 'সম্রাধন' কহিয়াছেন।

২। জগত্তত্ত্ব

জগত্তত্ত্বেরও দুই বিভাগ আছে, ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক। ব্যবহারিক বিদ্যায় জগৎকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে এবং ব্রহ্ম-কর্তৃক তাহার সৃষ্টিকাহিনী বিচিত্র কল্পনা-সহকারে বর্ণিত হইয়াছে।

কিন্তু অনন্তকাল অনর্থক যাপন করিয়া সহসা কালের একটি বিশেষ অংশে অবস্তু কারণের দ্বারা বস্তু-জগতের সৃষ্টি কেবল যে যুক্তি এবং বিজ্ঞানের বিরোধী তাহা নহে তাহা বেদান্তের একটি প্রধান মতের বিপরীত, যে মতে আমাদিগকে 'সংসারস্য অনাদিত্বম্' জন্ম-মৃত্যুর অনাদি স্বভাব শিক্ষা দিয়া থাকে। শংকরাচার্য সুন্দর কৌশলে এই বিরোধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন। তিনি বলেন, সৃষ্টি কেবল একবার হয় নাই, অনন্তকাল যাবৎ ব্রহ্মের দ্বারা সৃষ্টি হইতেছে এবং লয় পাইতেছে। কোনো সৃষ্টিকেই আমরা আদি সৃষ্টি বলিতে পারি না। কারণ, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিবে ব্রহ্ম কেন সৃষ্টি করিলেন? তাঁহার নিজের গৌরব প্রচারের জন্য? এরূপ অহংকার

১. এইখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক, ইংরাজি knowledge শব্দ জ্ঞান অর্থে এখানে অনুবাদ করিলাম।—অনুবাদক

তাঁহাতে আরোপ করা সংগত নহে। তাঁহার নিজের খেলার জন্য? কিন্তু অনন্তকাল তো তিনি এই খেলনকব্যতীত যাপন করিয়াছেন। জীবনের প্রতি প্রীতি প্রযুক্ত? কিন্তু জীবসৃষ্টির পূর্বে তাহার প্রতি প্রীতি কীরূপে সম্ভব হইবে, এবং অসংখ্য জীবকে সৃষ্টি করিয়া অনন্ত দুঃখে নিমগ্ন করার মধ্যে প্রীতির লক্ষণ কি দেখা যায়?— ব্যবহারিক বেদান্ত পুনঃপুনঃ-জগৎসৃষ্টির একটি ধর্মনিয়মগত আবশ্যকতা (moral necessity) দেখাইয়া এই-সকল প্রশ্নের সদুত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

শংকর কহেন— মনুষ্য উদ্ভিদের ন্যায়। অল্পে অল্পে বর্ধিত হইয়া অবশেষে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সম্পূর্ণ মরে না। শস্যের চারা যেমন মরিবার পূর্বে বীজ রাখিয়া যায় এবং সেই বীজ আপন গুণানুসারে নূতন চারা উৎপন্ন করে, তেমনি মনুষ্য মৃত্যুকালে আপন কর্ম রাখিয়া যায়, সেই কর্ম পরজন্মে অঙ্কুরিত হইয়া দণ্ডপুরস্কার বহন করে। কোনো জন্ম প্রথম নহে কারণ তাহা পূর্ববর্তী কর্মের ফল, এবং শেষ নহে কারণ তাহার কর্ম পরবর্তী জন্মে ফলিত হইবে। অতএব সংসার অনাদি অনন্ত এবং প্রলয়ের পরে জগতের পুনঃসৃজন ধর্মনিয়মানুসারে আবশ্যক।

অধ্যাপক মহাশয় বলেন, শাস্ত্রোল্লিখিত এই সংসার যদিচ পূর্ণ সত্য নহে, কিন্তু তাহা সত্যের কাল্পনিক ছবি। কারণ, সত্যকে স্বরূপভাবে আমরা বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণ করিতে পারি না। এই পুনঃপুনঃ-জন্মমৃত্যুবাদকে কাল্পনিক কেন বলিতেছেন? না, যাহা যথার্থত দেশকালের অতীত সুতরাং আমাদের বুদ্ধির অগম্য তাহাকে দেশকালের ছাঁচে ঢালিয়া দেখানো হইতেছে। নির্গুণ বিদ্যা হইতে সগুণ বিদ্যা যত দূরে, সত্য হইতে এই সংসার তত দূরে। অর্থাৎ ইহার মধ্যে অনন্ত সত্য আছে বটে কিন্তু তাহা সত্যের রূপকমাত্র, যেহেতু রূপক ব্যতীত মনুষ্যবুদ্ধিতে সত্যের ধারণা হইতেই পারে না। ব্যবহারিক বেদান্ত এই রূপক লইয়া এবং পারমার্থিক বেদান্ত রূপগুণাতীত বিশুদ্ধ সত্যের সন্ধানে নিযুক্ত।

পারমার্থিক বিদ্যা কহিতেছেন, যাহাকে আমরা জগৎ বলি তাহা মৃগতৃষ্ণিকাবৎ মায়ামাত্র, নিকটে আসিলেই তাহা বিলয় প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মব্যতীত আর কিছুই নাই। জগৎ যে মায়ামাত্র তাহা তর্কের দ্বারা নহে অনুভবের দ্বারা জানা যায়। নিজের আত্মগুহায় প্রবেশ করিয়া যখন দেশকালাতীত নির্বিকার শুদ্ধসত্যের অনুভব হয় তখন তদ্‌ব্যতীত আর সমস্তই স্বপ্নরূপে উপলব্ধি হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষীয় মনস্বীগণ এই পথে গিয়াছিলেন এবং গ্রীসীয় তত্ত্বজ্ঞানী প্লেটো, তিনিও এই সত্যে আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন, তিনিও বলিয়া গিয়াছেন, জগৎ ছায়ামাত্র এবং সত্য ইহার অন্তরালে অবস্থিতি করিতেছে। প্লেটো এবং বৈদান্তিক উভয়ের মতের আশ্চর্য ঐক্য আছে কিন্তু উভয়েই কেবল আত্মপ্রত্যয়দ্বারা এক সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন আপন মত কেহ প্রমাণ করিতে পারেন নাই। এইস্থানে জর্মন পণ্ডিত কান্ট আসিয়া গ্রীক এবং ভারতবর্ষীয় দর্শনের অভাব পূরণ করিয়া গিয়াছেন। কান্ট বৈদান্তিক ও প্লাটোনিক আত্মপ্রত্যয়ের পথ ছাড়িয়া বিশুদ্ধ যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দ্বারা আপন মত প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। মানবমনকে বিশ্লেষণ করিতে গিয়া কান্ট দেখাইয়াছেন যে, বাহ্য জগতের তিন মূল পদার্থ দেশ, কাল এবং কার্যকারণসম্বন্ধ প্রকৃতপক্ষে বাহ্যসত্তার অনাদি অনন্ত ভিত্তিভূমি নহে, তাহা আমাদেরই বুদ্ধিবৃত্তির ছাঁচ মাত্র। তাহা বাহিরে নাই আমাদের মনে আছে ইহা কান্ট এবং তাঁহার প্রধান শিষ্য শোপেনহৌয়ার পরিষ্কাররূপে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। অতএব আমরা এই যে জগৎকে দেশে ব্যাপ্ত, কালে প্রবাহিত এবং কার্যকারণ-সম্বন্ধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত দেখিতেছি তাঁহাদের মতে ইহা কেবল আমার মনের কার্য মাত্র। শংকর কহেন, জগৎ মায়া; প্লেটো কহেন জগৎ ছায়া; কান্ট কহেন, জগৎ আমাদের মনের প্রতীতি মাত্র সত্য পদার্থ নহে। পৃথিবীর তিন বিভিন্ন প্রদেশে এই এক মত দেখা দিয়াছে কিন্তু ইহার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ কেবল কান্ট-দর্শনের মধ্যেই আছে।

৩। অধ্যাত্মতত্ত্ব

সকলই মায়া, কেবল আমার আত্মা মায়া হইতে পারে না। শংকরাচার্য দেখাইয়াছেন আপনাকে অস্বীকার করিতে গেলেও স্বীকার না করিয়া থাকিবার জো নাই। এক্ষণে প্রশ্ন এই, জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ কী। তাঁহার পরবর্তী রামানুজ, মাধ্ব এবং বল্লভের মত শংকর পূর্বে হইতেই খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। জীব ব্রহ্মের অংশ হইতে পারে না কারণ ব্রহ্ম অংশরহিত (অংশ বলিতে হয় কালের পর্যায়, নয় দেশের সংস্থান বুঝায়)। জীবাত্মা ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে না, কারণ আমরা অনুভবের দ্বারা উপলব্ধি করিয়া থাকি ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্। জীব ব্রহ্মের বিকার হইতে পারে না। কারণ, ব্রহ্ম নির্বিকার (কান্টের দ্বারাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম কার্যকারণসম্বন্ধের অতীত)। সিদ্ধান্ত এই যে, জীব ব্রহ্মের অংশও নহে, ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্রও নহে, ব্রহ্মের বিকারও নহে— পরন্তু সম্পূর্ণতা স্বয়ং পরমাত্মা। এই সিদ্ধান্তে বেদান্তবাদী শংকর, প্লেটো-দর্শনবাদী প্লোটিনোস্ এবং কান্ট-দর্শনবাদী শোপেনহৌয়ার ঐক্য লাভ করিয়াছেন। শংকর অপর দুই দার্শনিক হইতে অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি কহেন আমার আত্মাই যদি স্বয়ং ব্রহ্ম হইল তবে সুতরাং সর্বব্যাপকতা, নিত্যতা এবং সর্বশক্তিমত্তাও আমার আছে। (অর্থাৎ, আমি দেশকাল এবং কার্যকারণবন্ধনের অতীত।) শংকর কহেন, যেমন, কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি গোপন থাকে তেমনি এ-সকল শক্তিও আমার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে, মুক্তির পরে তাহার প্রকাশ হয়।

কেনই বা প্রচ্ছন্ন থাকে?

শংকর কহেন উপাধি-সকল তাহার কারণ।

উপাধি কী কী? না, মন এবং ইন্দ্রিয়, প্রাণ এবং তাহার পঞ্চ শাখা, এবং সূক্ষ্ম শরীর। ইহারাই জন্মে জন্মে আত্মাকে আবৃত করিয়া থাকে।

উপাধিত্রয় কোথা হইতে আসিল? মায়া হইতে। আবার মায়ার উৎপত্তি অবিদ্যা হইতে। কিন্তু এই যে আমাদের অজ্ঞান, পাপ এবং দুঃখের মূল কারণ অবিদ্যা, ইহার কারণ কী? ভারতবর্ষ এবং গ্রীস ইহার সদুত্তর দেন নাই। কান্ট কহিতেছেন, তুমি অবিদ্যার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছ? অবিদ্যার কারণ থাকিতেই পারে না। যেহেতু এই সংসারের মধ্যেই কার্যকারণসূত্রের অবসান— সংসারের বাহিরে কার্যকারণের শাসন নাই— অতএব অবিদ্যার কারণ অনুসন্ধান বৃথা। এইটুকু জানিলেই যথেষ্ট যে, এই দুঃখ পাপ অজ্ঞান হইতে আমাদের মুক্তিপথ আছে।[১]

৪। পরকালতত্ত্ব

এক্ষণে, সংসার হইতে যে মুক্তির পথ আছে তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যাউক।

বেদের প্রাচীন শ্লোকে প্রথমে স্বর্গ এবং পরে নরকের কথা আছে কিন্তু সংসারবাদ অর্থাৎ পুনর্জন্মবাদ কোথাও দেখা যায় না।

বেদান্তে স্বর্গনরক ভোগ এবং পুনর্জন্ম উভয় মতই মিশ্রিত হইয়াছে। বেদান্তের মতে পুণ্যকারীগণ পিতৃযান প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশ চন্দ্রলোকে গমন করেন সেখানে আপন সৎকর্মের ফল নিঃশেষ করিয়া পুনশ্চ মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন। যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মের উপাসক তাঁহারা দেবযান মার্গ প্রাপ্ত হইয়া উত্তরোত্তর ব্রহ্মলোকে গমন করেন, পৃথিবীতে তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ, তাঁহাদের আর পুনরাবৃত্তি নাই। কিন্তু তাঁহারা যে-ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন তিনি সগুণ ব্রহ্ম এবং এই সগুণ ব্রহ্মের উপাসকেরা যদিচ পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন না তথাপি তাঁহাদিগকে সম্যক্দর্শন অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মের পূর্ণজ্ঞান লাভের দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য প্রতীক্ষা করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত পাপকারীদের জন্য নরক যন্ত্রণা এবং তদবসানে বারংবার নীচজন্মভোগ বর্ণিত হইয়াছে।

---

১. শংকরাচার্য কহিতেছেন— অজ্ঞানং কেন ভবতীতিচেৎ? ন কেনাপি ভবতীতি। অজ্ঞানমনাদ্যনির্বচনীয়ং। অজ্ঞান কাহা হইতে হয়? কাহা হইতেও হয় না। অজ্ঞান অনাদি অনির্বচনীয়। —অনুবাদক

কিন্তু এই জগৎ এবং সংসার কেবল তাহাদেরই পক্ষে সত্য যাহারা অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছন্ন। যাহারা অবিদ্যাকে অতিক্রম করিয়াছে তাহাদের পক্ষে নহে।

পারমার্থিক বেদান্তমতে এই জগৎ এবং সংসার কিছুই সত্য নহে, সত্য কেবল ব্রহ্ম যিনি আমাদের আত্মারূপে উপলব্ধ হন। 'আমিই ব্রহ্ম' এই জ্ঞানের দ্বারায় যে মোক্ষ লাভ হয় তাহা নহে, এই জ্ঞানই মোক্ষ।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব সংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্দৃষ্টে পরাবরে।

যখন শ্রেষ্ঠ এবং নিকৃষ্ট সর্বত্রই তাঁহাকে দেখা যায় তখন হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সর্বসংশয় দূর হয় এবং সকল কর্মের ক্ষয় হইয়া থাকে।

নিঃসন্দেহ কোনো লোক কর্ম ব্যতীত প্রাণ.ধারণ করিতে পারে না, জীবন্মুক্তও নহে। কিন্তু তিনি জানেন যে, সকল কর্মই মায়াময় এইজন্য কর্মে তাঁহার আসক্তি থাকে না এবং সেই আসক্তিহীন কর্ম মৃত্যুর পরে পুনর্জন্মের কারণ হইতে পারে না।

অধ্যাপক মহাশয় বলেন, লোকে বেদান্তকে ধর্মনীতিঅংশে অঙ্গহীন বলিয়া দোষ দিয়া থাকে। বাস্তবিকও ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি কর্ম অপেক্ষা ধ্যানের প্রতি অধিকতর পক্ষপাতী। কিন্তু তথাপি তাঁহার মতে উচ্চতম এবং বিশুদ্ধতম ধর্মনীতিজ্ঞান বেদান্ত হইতে প্রসূত হইয়া থাকে। প্রতিবেশীকে আপনার মতো ভালোবাসা বাইবেলের মতে সর্বোচ্চ ধর্মনীতি— এবং কথাটিও সত্য বটে। কিন্তু যখন আমি সমস্ত সুখ-দুঃখ নিজের মধ্যেই অনুভব করি প্রতিবেশীর মধ্যে করি না তখন প্রতিবেশীকে কেনই বা নিজের মতো ভালোবাসিব? বাইবেলে ইহার কোনো উত্তর নাই, কিন্তু বেদের একটি কথায় ইহার উত্তর আছে— তত্ত্বমসি— তুমিও সে। বেদ বলেন তুমি ভ্রমক্রমে আপনাকে প্রতিবেশী হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া জান, কিন্তু তোমরা এক। ভগবদ্‌গীতা বলিতেছেন— যিনি আপনার মধ্যে সকলকে দেখেন তিনি ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং, আপনার দ্বারা আপনাকে হিংসা করেন না। ইহাই সমস্ত ধর্মনীতির সার কথা এবং ইহাই ব্রহ্মজ্ঞানীর প্রতিষ্ঠাস্থল। তিনি আপনাকেই সর্ব বলিয়া জানেন এইজন্য কিছু প্রার্থনা করেন না; তিনি আপনাতেই সমস্ত উপলব্ধি করেন এইজন্য কাহারও ক্ষতি করেন না, তিনি মায়া দ্বারা পরিবৃত হইয়া জগতে বাস করেন অথচ মুগ্ধ হন না। অবশেষে যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন তাঁহার পক্ষে আর সংসার থাকে না; ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি। তিনি ব্রহ্ম এব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি। তিনি নদীর ন্যায় ব্রহ্মসমুদ্রে প্রবেশ করেন।

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্র
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়,
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।

এই যে মিলন ইহা অনন্ত সমুদ্রে জলবিন্দুর মিলনের ন্যায় নহে; এ যেন অনন্ত সমুদ্র তুষারবন্ধন মোচন করিয়া আপন সেই সর্বব্যাপী নিত্য এবং সর্বক্ষমস্বরূপে প্রত্যাগমন করিল, যথার্থত যে স্বরূপ তাহার চিরকাল আছে এবং কোনো কালেই দূর হয় নাই।

অনুবাদকের প্রশ্ন

অধ্যাপক ডয়সেন্ বেদান্তমতের যে সুন্দর বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা উপরে প্রকাশিত হইল।

আমরা অনেক সময় এক রহস্যের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার উদ্দেশ্যে অন্য রহস্যের হস্তে আত্মসমর্পণ করি।

ডয়সেন্ সাহেব বেদান্তমত অবলম্বন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, নির্বিকার ব্রহ্ম-কর্তৃক সৃষ্টি এবং অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মে ও জীবে বিভাগ কল্পনা করা মানব যুক্তির বিরোধী। সে কথা অস্বীকার

করা যায় না। কিন্তু সেই রহস্য ভেদ করিতে চেষ্টা করিয়া যখন বেদান্ত বলেন যে, জগৎ নাই এবং ব্রহ্মে এবং জীবে যে প্রভেদ প্রতীয়মান হয় তাহা ভ্রম মাত্র তখন মানবের মনে যে সহজ দুই-একটি প্রশ্ন উদয় হয়, তাহার পরিষ্কার উত্তর পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন। ভ্রম কাহার?

উত্তর। জীবের।

ইহাকে মীমাংসা বলে না। কারণ, জীবের ভ্রমে জীব হইতে পারে না।

শংকর কহেন, স্থূল সূক্ষ্ম এবং কারণ শরীর নামক উপাধিত্রয়ের দ্বারা আবৃত হওয়াতেই আত্মাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন জ্ঞান হয়। কিন্তু এই শরীর পরিগ্রহ কোথা হইতে হইল? শরীরপরিগ্রহঃ কেন ভবতি?

শংকরাচার্যই এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া তাহার উত্তর দিতেছেন।

কর্মণা। কর্ম দ্বারা শরীর পরিগ্রহ হয়।

কর্ম বা কেন ভবতীতি চেৎ? কর্মই বা কিসের দ্বারা হয়?

রাগাদিভ্যঃ। রাগ প্রভৃতি হইতে।

রাগাদিঃ কেন ভবতীতি চেৎ? রাগাদি কী করিয়া হয়?

অভিমানাৎ। অভিমান হইতে।

অভিমানঃ কেন ভবতীতি চেৎ? অভিমান কী জন্য হয়?

অবিবেকাৎ। অবিবেক হইতে।

অবিবেকঃ কেন ভবতীতি চেৎ? অবিবেক কী নিমিত্ত হয়?

অজ্ঞানাৎ। অজ্ঞান হইতে।

অজ্ঞানং কেন ভবতীতি চেৎ? অজ্ঞান কাহার দ্বারা হয়?

ন কেনাপি ভবতীতি। অজ্ঞানমনাদ্যনির্বচনীয়ম্। কাহার দ্বারাই হয় না। অজ্ঞান অনাদি অনির্বচনীয়।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে উপাধিপরিগ্রহ দ্বারা জীবব্রহ্মে ভেদ জ্ঞান হইবার পূর্বকারণ অজ্ঞান, অবিদ্যা।

অজ্ঞান বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহার স্বাধীন সত্তা মনে করিতে পারি না; তাহা কাহাকেও অবলম্বন করিয়া আছে। সে অজ্ঞান যদি ব্রহ্মের হয় তবে ব্রহ্মকে নিরঞ্জন নির্বিকার বলা যায় না। যদি তাহার পৃথক্ অনাদি অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় তবে ব্রহ্ম এবং অজ্ঞান এই দুই অস্তিত্ব মানিতে হয়। তবে ওটা কেবল একটা কথার কথা হইয়া দাঁড়ায়। অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং অব্রহ্মের পৃথক অস্তিত্ব ভিন্ন নামে স্বীকার করা হয়। ব্রহ্মও অনাদি অনির্বচনীয় এবং অজ্ঞানও অনাদি অনির্বচনীয়, অথচ ব্রহ্মই অজ্ঞান নহেন এবং অজ্ঞান ব্রহ্মে নাই। ইহা স্বীকার করা যদি সহজ হয় তবে জীব এবং ব্রহ্ম, জগৎ এবং ঈশ্বর, বিভিন্নরূপে স্বীকার করাও সহজ।

বেদান্তশাস্ত্রে জগৎভ্রমের যতগুলি উপমা দেওয়া হইয়াছে সমস্তই দ্বৈতমূলক। শুক্তিতে মুক্তাভ্রম। এ ভ্রম ঘটিতে অন্যূন তিনটি পদার্থের আবশ্যক হয়— শুক্তি এবং মুক্তা এবং ভ্রান্ত ব্যক্তি। মৃগতৃষ্ণিকাও এইরূপ। যাহাকে ভ্রম করা যায়, যাহা বলিয়া ভ্রম করা যায় এবং যে ভ্রম করে এই তিন ব্যতীত ভ্রম কীরূপে সম্ভব হইতে পারে তাহা আমরা কিছুতেই কল্পনা করিতে পারি না।

ডয়সেন্ সাহেব তাঁহার প্রবন্ধের শেষে যে তুলনা প্রয়োগ করিয়াছেন সেই তুলনার দ্বারাই কথাটার আত্মবিরোধ প্রকাশ পায়। মূলের ভাষা উদ্ধৃত করা উচিত।

It is not the falling of the drop into the infinite ocean, it is the whole ocean, becoming free from the fetters of ice, returning from its frozen state to that what it is really and has never ceased to be, to its own all-pervading, eternal, almighty nature.

বস্তুত ইহার অর্থ এই যে, নদী সমুদ্রে পড়িতেছে এ কথা বলা যায় না, কারণ, তাহা হইলে ভেদ স্বীকার করা হয়; কঠিন সমুদ্র গলিয়া স্বাভাবিক স্বরূপ প্রাপ্ত হইল তাহাও বলা যায় না, কারণ তাহা হইলে স্বরূপের বিক্রিয়া স্বীকার করা হয়— বলিতে হয় সমুদ্র যাহা আছে যাহা ছিল তাহাই রহিল। কিন্তু ইহাতেও অর্থ পাওয়া যায় না, কারণ পূর্বে বলা হইতেছিল জীবন্মুক্ত যখন মৃত্যুপ্রাপ্ত হন তখন তাঁহার কী দশা হয়— তিনি নদীর মতো সমুদ্রে পড়েন অথবা কঠিনাবস্থাপ্রাপ্ত সমুদ্রের ন্যায় গ্রীষ্মোত্তাপে গলিয়া স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হন? তাহা হইলে দাঁড়ায় এই যে, যে জীবের মৃত্যুর কথা হইতেছিল সে জীব ছিল না এবং তাঁহার মৃত্যুও হয় নাই। তবে, সে জীব ছিল এ কথা উঠে কোথা হইতে? ভ্রম হইতে। কাহার ভ্রম? যদি ব্রহ্মের ভ্রম হয় তবে তো যথার্থই তাঁহার বিকার উপস্থিত হইয়াছিল। উত্তর, ভ্রম বটে কিন্তু কাহারও ভ্রম নহে! সে স্বতই ভ্রম, সে অনাদি অনির্বচনীয়!

স্বীকার করিতে হয় যে, যদি দ্বৈতবাদ অবলম্বন করা যায় তাহা হইলেও মূলরহস্যের আবর্তমধ্যে বুদ্ধিতরণী হইয়া গেলেই এইরূপ গোলকধাঁধার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। কিন্তু যখন কোনো অদ্বৈতবাদী দ্বৈতবাদকে যুক্তির বিরোধী বলিয়া নিজ মত সমর্থন করিতে থাকেন, তখন তাঁহাকেও কৈফিয়তের দায়িক না করিয়া থাকা যায় না। বোধ করি, অধ্যাত্মরাজ্যের মূল প্রদেশে দ্বৈত এবং অদ্বৈতের কোনো এক আশ্চর্য সমন্বয় আছে যাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির নিকট রহস্যাচ্ছন্ন। সেখানে বোধ করি অঙ্ক এবং যুক্তিশাস্ত্রের সমস্ত নিয়ম অতিক্রম করিয়া এককে দুই বলা যায় এবং দুইকে এক বলিলেও অর্থের বিরোধ হয় না।

বেদান্তের ধর্মনীতিবিষয়ে ডয়সেন্ সাহেব যে কথা কয়েকটি বলিয়াছেন তাহার সম্বন্ধেও আমাদের প্রশ্ন আছে।

ডয়সেন্ কহেন, পুনঃপুনঃ জন্মমরণ ও জগৎসৃষ্টির একটি moral necessity অর্থাৎ ধর্মনিয়মগত আবশ্যকতা আছে। অর্থাৎ পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের দণ্ড বহনের জন্য জন্মলাভ অনন্তধর্মনিয়মের অবশ্যম্ভব বিধান। কর্মফল ফলিতেই হইবে।

কিন্তু অদ্বৈতবাদে ধর্মনিয়মের অবশ্যম্ভবতার কোনো অর্থ নাই। যেখানে এক ছাড়া দুই নাই সেখানে 'মরল্' বলিয়া কিছু থাকিতেই পারে না।

শংকরাচার্যের আত্মানাত্মবিবেক গ্রন্থ হইতে উদ্‌ধৃত করিয়া পূর্বেই দেখানো হইয়াছে যে, কর্ম অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন এবং অজ্ঞান অনাদি। অজ্ঞান নামক এক অনির্বচনীয় পদার্থ হইতে কর্ম নামক এক অনির্বচনীয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়া আমাদের শরীর গ্রহণের কারণ হইয়াছে এবং সেই অনির্বচনীয় পদার্থের ফলস্বরূপে আমরা শরীরধারীগণ পুনঃপুনঃ জন্ম ও দুঃখ ভোগ করিতেছি ইহাকে যে-কোনো নিয়ম বলা যাক ধর্মনিয়ম বলিবার কোনো হেতু দেখি না। প্রথমত, অজ্ঞান বলিতে কী বুঝায় আমরা জানি না এবং জানিতেও পারি না, কারণ তাহা অনির্বচনীয়। (তবে যে কেন তাহাকে অজ্ঞান নাম দেওয়া হইল বলা কঠিন; কারণ, উক্ত শব্দে একটা নির্বচন প্রকাশ পায়।) দ্বিতীয়ত, তাহা হইতে কর্ম হইল বলিতে যে কী বুঝায় আমাদের বলা অসাধ্য, কারণ আমরা কর্ম বলিতে যাহা বুঝি তাহার স্বাধীন সত্তা নাই। অবশেষে আরও কতকগুলি নিরালম্ব গুণপরম্পরা হইতে শরীরী জীবের জন্ম হইল। এ-সকল কথা বলাও যা আর শরীরের প্রথম সৃষ্টি কী করিয়া হইল তাহা বলিতে পারি না এবং যদি কেহ বলিতে পারিত তথাপি আমরা বুঝিতে পারিতাম না এ কথা বলাও তা— বরঞ্চ শেষোক্ত কথাটা অপেক্ষাকৃত সংক্ষেপ ও সরল।

পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে বেদান্ত যেমন আমাদের শরীর পরিগ্রহের কোনো জ্ঞানগম্য কারণ দেখাইতেছেন না, তেমনি আমাদের দুঃখভোগেরও কোনো কারণ নির্ণয় করিতেছেন না। যেহেতু, কর্ম নামক কোনো অনির্বচনীয় পদার্থকে আমাদের দুঃখভোগের কারণ বলাও যা, আর আমাদের দুঃখভোগের কারণ জানি না বলাও তা।

বেদব্যাস-রচিত ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থে এ তর্ক উত্থাপিত হইয়াছে।

বেদব্যাস বলিতেছেন, ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্ন অনাদিত্বাৎ। অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে কর্মের বিভাগ ছিল না এ কথা বলা যায় না যেহেতু কর্ম এবং সৃষ্টি কার্যকারণরূপে অনাদি। যেমন বীজ ও বৃক্ষ। বীজও বৃক্ষের কারণ এবং বৃক্ষও বীজের কারণ এইভাবে কোনো কালেও কাহারও আদি পাওয়া যায় না।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, কর্মের ফল সৃষ্টি এবং সৃষ্টির ফল কর্ম ইহার আর শেষ নাই। বোধ করি এ স্থলে কর্ম বলিতে যাহা বুঝায় ইংরাজি ফোর্স্‌ বলিতেও তাহা বুঝায়— অর্থাৎ এমন একটা কিছু বুঝায় যাহা আমরা ঠিক বুঝি না অথচ বুদ্ধিগম্য একটা ছবির আভাস আমাদের মনে আসে, কিন্তু সেটা মিলাইয়া দেখিতে গেলে মিলাইতে পারি না।

তথাপি যেমন করিয়াই দেখি এবং বেদান্তশাস্ত্রে যেমন ব্যাখ্যাই পাওয়া যায় শেষকালে দাঁড়ায় এই যে, আমরা কেন হইয়াছি এ প্রশ্নের কোনো অর্থ নাই। আমরা হইয়াছি— আমাদের হওয়াটা অনাদি। এবং হওয়াটিই দুঃখভোগের কারণ— সুতরাং কেন দুঃখভোগ করিতেছি তাহারও কোনো কেনত্ব নাই। অতএব এ স্থলে 'মরল্‌' অথবা অন্য কোনো 'নেসেসিটি' দেখা যায় না।

মুক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, যখন অজ্ঞান অনাদি তখন সে অনন্ত। যতক্ষণ সে আছে ততক্ষণ কাহারও মুক্তি কল্পনা করা যায় না। কারণ, বেদান্ত মতে আমি সকলের অন্তর্গত এবং আমার অন্তর্গত সকলই, যতক্ষণ অজ্ঞান কোথাও আছে ততক্ষণ সে অজ্ঞান আমাকে বদ্ধ করিতেছে। এ যেন আপনার ছায়াকে আপনি লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করার মতো।

কেন ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টি করিলেন তদুত্তরে ব্রহ্মসূত্র কহেন, লোকবত্তু লীলাকৈবল্যং। লোকেতে যেমন বালকেরা রাজা প্রভৃতি নানা রূপ ধারণ করিয়া লীলা করে জগৎও সেইরূপ ব্রহ্মের লীলামাত্র। এ মত অনুসারে, যাঁহার ইচ্ছাতেই জগৎ তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত জগতের মুক্তি হইতে পারে না। অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করিলে, অথবা ইচ্ছা প্রতিসংহার করিলে তাঁহার জগৎরূপ জীবরূপ দূর হইয়া তাঁহার শুদ্ধস্বরূপ প্রকাশ পাইতে পারে, অতএব এ স্থলে সমস্ত জগতের বিলয় ব্যতীত ব্যক্তিবিশেষের মুক্তির কোনো অর্থ থাকিতে পারে না। কারণ, ব্যক্তিবিশেষ হওয়া তাঁহার ইচ্ছা এবং ব্যক্তিবিশেষ না হওয়াও তাঁহার ইচ্ছা এবং ব্যক্তিবিশেষ না হইলেও যতক্ষণ জগৎ আছে ততক্ষণ তিনি লীলারূপেই বিরাজ করিবেন।

ডয়সেন্‌ সাহেব অন্যত্র তাঁহার দর্শনগ্রন্থে প্রকৃতিসম্বন্ধীয় তত্ত্ববিদ্যা নামক পরিচ্ছেদে প্রথমে দেখাইয়াছেন যে, কান্টের অকাট্যযুক্তি অনুসারে দেশকাল ও কার্যকারণত্ব আমাদের বুদ্ধির ধর্ম, বাহিরের ধর্ম নহে। অতএব বস্তুকে যে আমরা বস্তুরূপে দেখিতেছি তাহা আমাদের বুদ্ধির রচনা। এই বুদ্ধির আরোপ বাহির হইতে উঠাইয়া লইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই বস্তুর যথার্থ স্বরূপ— সেই দেশকাল কারণাতীত সত্তাকে অধ্যাপক মহাশয় শোপেনহৌয়ারের মতে উইল (ইচ্ছা) এবং বেদান্তমতে আত্মা বলিতেছেন। এই একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ অনবচ্ছিন্ন 'উইল' পদার্থের নেতি-আত্মক নির্গুণ ভাবই বিশুদ্ধভাব— তাহাতে পাপ নাই, দুঃখ নাই, অস্তিত্ব নাই।

এই বিশুদ্ধ, দুঃখবিহীন, কামনাবিহীন, নেতিত্বের আনন্দমধ্যে একটা মোহ একটা পাপের সূচনা দেখা দিল— (কোনো বিশেষকালে নহে, আজও বটে অনন্তকালও বটে অনন্তকালের পূর্বেও বটে) এই উইল এই আত্মা ইতি-আত্মক সগুণ ভাব ধারণ করিল।

মূলের ভাষা উদ্‌ধৃত করি—

Now there was formed— not at any time, but before all eternity, today and for ever, like an inexplicable clouding of the clearness of the heavens, in the pure, painless, and will-less bliss of denial a morbid propensity, a sinful bent : the affirmation of the Will to life. In it and with it is given the myriad host of all the sins and woes of which this immeasurable world is the revealer.

মানব-বুদ্ধি চিরকাল প্রশ্ন করিতেছে সৃষ্টি হইল কেমন করিয়া? দুঃখের উৎপত্তি হইল কেন?

শংকরাচার্য এবং ডয়সেন্ উত্তর দিতেছেন— এক অনাদি অনির্বচনীয় পদার্থে এক অনাদি অনির্বচনীয় ছায়া পড়িল তাহাই সৃষ্টি তাহাতেই দুঃখ। ইহার সরল অর্থ এই, সৃষ্টিই বা কী আর সৃষ্টির কারণই বা কী আর দুঃখ পাপই বা কেন তাহা কিছুই জানি না। এবং বেদান্ত মতে এই অনাদি অজ্ঞান হইতে মুক্তিই বা কীরূপে এবং মুক্তিই বা কাহার তাহাও সুস্পষ্টরূপে বলা যায় না।

বৌদ্ধ নাস্তিবাদীরা কিছুই মানে না। তাহারা এ কথাও স্বীকার করে না যে, জগৎ প্রতিভাত হইতেছে। তাহাদের মতে ব্রহ্মও নাই জগৎও নাই, আমিও নাই তুমিও নাই— তাহাদের যুক্তি কিছুকাল পূর্বে 'সাধনা'য় অনুবাদ করিয়া দেখানো হইয়াছিল। যাহা অনাদিকাল আছে তাহা অনন্তকালে ধ্বংস হইতে পারে না, তাহাকে মায়াই বল আর সত্যই বল, অতএব তাহাকে একবার স্বীকার করিলে মুক্তি স্বীকার করা যায় না। কিন্তু নাস্তিবাদীরা কিছুই মানে না তাহাদের পক্ষে সকল কথাই সহজ। যদি বলি কিছুই যদি নাই তবে তুমি তাহা প্রমাণ করিতেছ কী করিয়া। তখন তাহারা প্রমাণ করিতে বসে যে, তাহারা প্রমাণ করিতেছে না। যদি বলি, কিছুই যদি নাই তবে তুমি মুক্তির কথা পাড় কেন— তখন সে বলে যখন আমিই নাই, তখন আমি কোনো কথা বলিতেছি ইহাও হইতে পারে না। অতএব কোনো কথাই স্বীকার না করিলে গায়ের জোর খাটানো সহজ হয়। কিন্তু যখনই এক স্বীকার করা গেল অমনি দুই প্রমাণ করা অসাধ্য হইয়া দাঁড়ায় এবং দুই স্বীকার করিলেই তাহাকে এক বলিয়া চালানো কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

যদি আমাকে জিজ্ঞাসা কর, তুমি কী বল? আমি আদি অন্ত মধ্য কিছুই জানি না, আমি কেবল এইটুকু জানি, আমার হৃদয়ে যে প্রীতি ভক্তি দয়া স্নেহ সৌন্দর্যপ্রেম আছে তাহা অনন্ত চরিতার্থতা চায়— এমন-কি, আমার সেই-সকল আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই আমি অনন্তের আস্বাদ পাই— সেই আমার সর্বসফলতা যিনিই হৌন, যেখানেই থাকুন, তিনিই আমার ব্রহ্ম তাঁহাতেই আমার মুক্তি।

সাধনা
ভাদ্র ১৩০১

রামমোহন রায়

একদা পিতৃদেবের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, বাল্যকালে অনেক সময়ে রামমোহন রায় তাঁহাকে গাড়ি করিয়া স্কুলে লইয়া যাইতেন; তিনি রামমোহন রায়ের সম্মুখবর্তী আসনে বসিয়া সেই মহাপুরুষের মুখ হইতে মুগ্ধদৃষ্টি ফিরাইতে পারিতেন না, তাঁহার মুখচ্ছবিতে এমন একটি সুগভীর সুগম্ভীর সুমহৎ বিষাদচ্ছায়া সর্বদা বিরাজমান ছিল।

পিতার নিকট বর্ণনা-শ্রবণ-কালে রামমোহন রায়ের একটি অপূর্ব মানসী মূর্তি আমার মনে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে। তাঁহার মুখশ্রীর সেই পরিব্যাপ্ত বিষাদমহিমা বঙ্গদেশের সুদূর ভবিষ্যৎকালের সীমান্ত পর্যন্ত স্নেহচিন্তাকুল কল্যাণকামনার কোমল রশ্মিজালরূপে বিকীর্ণ দেখিতে পাই। আমরা বঙ্গবাসী নানা সফলতা এবং বিফলতা, দ্বিধা এবং দ্বন্দ্ব, আশা এবং নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে আপনার পথ নির্মাণ করিয়া চলিয়াছি। আমি দেখিতে পাইতেছি এখনো আমাদের প্রতি সেই নব্যবঙ্গের আদিপুরুষ রামমোহন রায়ের দূরপ্রসারিত বিষাদদৃষ্টি নিস্তব্ধভাবে নিপতিত রহিয়াছে। এবং আমরা যখন আমাদের সমস্ত চেষ্টার অবসান করিয়া এই জীবলোকের কর্মক্ষেত্র হইতে অবসৃত হইব, যখন নবতর বঙ্গবাসী নব নব শিক্ষা এবং চেষ্টা এবং আশার রঙ্গভূমি-মধ্যে অবতীর্ণ হইবে, তখনো রামমোহন রায়ের সেই স্নিগ্ধ গম্ভীর বিষণ্ণবিশাল দৃষ্টি তাহাদের সকল উদ্যোগের প্রতি আশীর্বাদ বিকীর্ণ করিতে থাকিবে। আমার পিতাকে যেদিন রামমোহন রায় সঙ্গে করিয়া বিদ্যালয়ে লইয়া যাইতেছিলেন সেদিন আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই ইহসংসারে ছিলেন না— সেদিন যে পথ দিয়া তাঁহার শকট চলিয়াছিল অদ্য সে পথের মূর্তি-পরিবর্তন

হইয়া গিয়াছে। তখন বঙ্গসমাজে একটি নূতন সন্ধ্যার আবির্ভাব হইয়াছিল— তখন পারস্য শিক্ষা অস্তপ্রায়, ইংরাজি শিক্ষার অরুণোদয় হইতেছে মাত্র এবং সংস্কৃত শিক্ষা স্বল্পতৈল দীপশিখার ন্যায় উজ্জ্বল আলোকের অপেক্ষা ভূরি পরিমাণে মলিন ধূম্র বিকীর্ণ করিতেছিল। তখনো বঙ্গ সমাজের অভ্যুদয় হয় নাই; তখন ছোটো ছোটো গ্রামসমাজ-পল্লীসমাজে বঙ্গদেশ বিচ্ছিন্ন বিভক্ত হইয়া ছিল; ব্যক্তিবিশেষের জাতিকুল, কার্য অকার্য, বেতন এবং উপরিপ্রাপ্য সংকীর্ণ গ্রাম্যমণ্ডলীর সর্বপ্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল— এমন সময়ে একদিন রামমোহন রায় তাঁহার মহৎ প্রকৃতির, তাঁহার বৃহৎ সংকল্পের সমস্ত অপরিমেয় বিষাদভার লইয়া আমার পিতাকে তাঁহার স্বপ্রতিষ্ঠিত নববিদ্যালয়ে পৌঁছাইয়া দিতেছিলেন।

অদ্য ইংরাজি শিক্ষা দশ দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, অদ্য বাংলাদেশের প্রভাতবিহঙ্গেরা ইংরাজি-অনুবাদ-মিশ্রিত সংগীতে দিগ্‌বিদিক্‌ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছেন, উষাসমীরণে শত শত সংবাদপত্র ইংরাজি ও বাংলাভাষায় মর্মরধ্বনি তুলিয়া অবিরাম আন্দোলিত হইতেছে। তখন গদ্য বাক্যবিন্যাস কী করিয়া বুঝিতে হয় রামমোহন রায় তাহা প্রথমে নির্দেশ করিয়া, তবে গদ্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আজ দেখিতে দেখিতে বঙ্গসাহিত্যলতা গদ্যে পদ্যে পাঠ্যে অপাঠ্যে কোথাও-বা কণ্টকিত কোথাও-বা মঞ্জরিত হইয়া উঠিতেছে— আজ সভা-সমিতি আবেদন-নিবেদন আলোচনা-আন্দোলন বাদ-প্রতিবাদে বঙ্গভূমি শুকপক্ষীকুলায়ের ন্যায় মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। ফলত, বঙ্গসমাজপুরীর পুরাতন রাজপথের আজ অনেক নূতন সংস্কার হইয়া গিয়াছে, পথ এবং জনতা উভয়েরই বহুল পরিমাণে রূপান্তর দেখা যাইতেছে। কিন্তু, তথাপি আমি কল্পনা করিতেছি— যে শকটে রামমোহন রায় আমার পিতাকে বিদ্যালয়ে লইয়া গিয়াছিলেন সেই শকটে অদ্য আমরা তাঁহার সম্মুখবর্তী আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছি, তাঁহার মুখ হইতে মুগ্ধ দৃষ্টি ফিরাইতে পারিতেছি না। দেখিতে পাইতেছি এখনো তাঁহার সমুন্নত ললাট ও উদার নেত্রযুগল হইতে সেই পুরাতন বিষাদচ্ছায়া অপনীত হয় নাই, এখনো তিনি ভবিষ্যতের দিগন্তাভিমুখে তাঁহার সেই গভীর চিন্তাবিষ্ট দূরদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

হিমালয়ের দুর্গম নির্জন অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গমালার মধ্যে যে একটি নির্মল নিস্তব্ধ নিঃশব্দ তপঃপরায়ণ বিষাদ বিরাজ করে রামমোহন রায়ের বিষাদ সেই বিষাদ— তাহা অবসাদ নহে, নৈরাশ্য নহে; তাহা দূরগামী সংকল্প, দূরপ্রসারিত দৃষ্টি, সুদূরব্যাপী মহৎ প্রকৃতির ধ্যানধৈর্যের বিশালতা, অনন্ত স্বচ্ছ আকাশের নীলিমা; অতলস্পর্শ নির্মল সরোবরে শ্যামলতা যেরূপ উজ্জ্বল তাঁহার বৃহৎ অন্তঃকরণের বিষাদ সেইরূপ জ্যোতির্ময়, সেইরূপ বহুদূরবিস্তীর্ণ। যে বঙ্গভূমি তাঁহার ধ্যানদৃষ্টির সম্মুখে নিয়ত প্রকাশ পাইতেছিল সে বঙ্গভূমি তখন কোথায় ছিল এবং এখনই বা কোথায় আছে! রামমোহন রায়ের সেই বঙ্গদেশ, তখনকার বঙ্গভূমির সমস্ত ক্ষুদ্রতা জড়তা সমস্ত তুচ্ছতা হইতে বহুদূরে পশ্চিমদিক্‌প্রান্তভাগে স্বর্ণপ্রভামণ্ডিত মেঘমালার মধ্যে ছায়াপুরীর মতো বিরাজ করিতেছিল। যখন বঙ্গদেশের পণ্ডিতগণ মূঢ়ের মতো তাঁহাকে গালি দিতেছিল তখন তিনি সেই মানস বঙ্গলোক হইতে দূরাগত সংগীতধ্বনির প্রতি কান পাতিয়াছিলেন; সমাজ যখন তাঁহাকে তিরস্কৃত করিবার উদ্দেশে আপন ক্ষুদ্র গৃহদ্বার অবরুদ্ধ করিতেছিল তখন তিনি প্রসারিতবাহু বিশ্ববন্ধুর ন্যায় সেই মানস বঙ্গসমাজের নিত্য-উন্মুক্ত উদার জ্যোতির্ময় সিংহদ্বারের প্রতি আপন উৎসুক দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সে সংগীত, সে দৃশ্য, ভবিষ্যতের সেই স্বর্গীয় আশারাজ্য যাহাদের সম্মুখে বর্তমান ছিল না, তাহারা তাঁহার সেই উদার ললাটের উপর সততসঞ্চরমাণ ছায়ালোকের কোনো অর্থই বুঝিতে পারিত না। তাহাদের আশা ছিল না, ভাষা ছিল না, সাহিত্য ছিল না, জাতিকে তাহারা বর্ণ বলিয়া জানিত, দেশ বলিতে তাহারা নিজের পল্লীকে বুঝিত; বিশ্ব তাহাদের গৃহকোণকল্পিত মিথ্যা বিশ্ব, সত্য তাহাদের অন্ধ সংস্কার; ধর্ম তাহাদের লোকাচারপ্রচলিত ক্রিয়াকর্ম, মনুষ্যত্ব কেবলমাত্র অনুগত-প্রতিপালন এবং পৌরুষ রাজদ্বারে সৎ ও অসৎ উপায়ে উচ্চ বেতন-লাভ। রামমোহন রায় যদি কেবল ইহাদের মধ্যে আপনার দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখিতেন,

যদি সেই সংকীর্ণ বর্তমান কালের মধ্যে আপনার সমস্ত আশাকে প্রতিহত হইতে দিতেন, তাহা হইলে কদাচ কাজ করিতে পারিতেন না— তাহা হইলে তাঁহার মাতৃভূমিকে আপন আদর্শলোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য ও অসম্ভব বলিয়া বোধ হইত।

যদিও একই পৃথিবী একই মৃত্তিকা, তথাপি মহাপুরুষদিগের জন্মভূমি আমাদের হইতে অনেক স্বতন্ত্র। এই পৃথিবী এই মৃত্তিকা আমাদের অজ্ঞাতসারে অদৃশ্যভাবে তাঁহাদের পদতলে বহু ঊর্ধ্বে উন্নত হইয়া উঠে। যখন তাঁহারা আমাদের সহিত এক সমভূমিতে সঞ্চরণ করিতেছেন তখনো তাঁহারা পর্বতের শিখরাগ্রভাগে আছেন; সেইজন্য তাঁহারা গৃহের মধ্যে থাকিয়াও বিশ্বকে দেখিতে পান, বর্তমানের মধ্যে থাকিলেও ভবিষ্যৎ তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে থাকে, ইহলোকের মধ্যে থাকিয়াও পরলোক তাঁহাদের প্রত্যক্ষগোচর হয়। আমরা ভূগোলবিদ্যার সাহায্যে জ্ঞানে জানি যে, আমাদের ক্ষুদ্র পল্লীকে অতিক্রম করিয়াও বিশ্ব বিরাজ করিতেছে, কিন্তু আমরা সেই উচ্চ ভূমিতে নাই যেখান হইতে বিশ্বলোকের সহিত প্রত্যহ প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়। আমরা কল্পনার সাহায্যে আমাদের ক্ষীণ দৃষ্টিকে ভবিষ্যৎ-অভিমুখে কিয়দ্দূর প্রেরণ করিতে পারি, কিন্তু আমরা সেই উন্নত লোকে বাস করি না যেখানে ভবিষ্যতের অনন্ত-আশ্বাস-সামগীতি বিশ্ব-বিধাতার নীরব মাভৈঃশব্দের সহিত নিরন্তর বিচিত্র স্বরে সম্মিলিত হইতেছে। আমাদের মধ্যে অনেকে পরলোকের প্রতি বিশ্বাসহীন নহি, কিন্তু আমরা সেই স্বাভাবিক সমুচ্চ আসনের উপর সর্বদা প্রতিষ্ঠিত নহি যেখান হইতে ইহলোক-পরলোকের জ্যোতির্ময় সংগমক্ষেত্র প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে অন্তরিন্দ্রিয়ের দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। সেইজন্য আমাদের এত সংশয়, এত দ্বিধা; সেইজন্যই আমাদের সংকল্প এমন দুর্বল, আমাদের উদ্যম এমন স্বল্পপ্রাণ; সেইজন্যই বিশ্বহিতের উদ্দেশে আত্মসমর্পণ আমাদের নিকট একটি সুমধুর কাব্যকথা মাত্র, সেইজন্য ক্ষুদ্র বাধা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাহাকে অতিক্রম করিয়া মহাসফলতার অনন্ত বিস্তীর্ণ উর্বরক্ষেত্র আর আমরা দেখিতেই পাই না। মর্ত্যসুখ যখন স্বর্ণমায়ামৃগের মতো আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া ধাবমান করে তখন অমৃতলোক আমাদের নিকট হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যায়। আমাদের নিকট সংসারের ক্ষুদ্র সুখদুঃখ, বর্তমানের উপস্থিত বাধাবিপত্তি, মর্ত্যসুখের বিচিত্র প্রলোভনই প্রত্যক্ষ সত্য, আর-সমস্ত শুনা কথা— শিক্ষালব্ধ মুখস্থবিদ্যা এবং ছায়াময় কল্পনা। কিন্তু মহাপুরুষদের নিকট আমাদের সেই-সকল ছায়ারাজ্য প্রত্যক্ষ সত্য; বস্তুত সেইখানেই তাঁহারা বাস করিতেছেন। আমাদের সংসার, আমাদের সুখদুঃখ, আমাদের বাধাবিপত্তি তাঁহাদিগকে চরম পরিণাম-স্বরূপে আবৃত করিয়া রাখে না।

রামমোহন রায় সেই মহাপুরুষ, যিনি বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হইয়াও বিধাতার প্রসাদে নিত্য সত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহার শারীরিক জন্মস্থানের সহিত তাঁহার মানসিক জন্মভূমির বিরোধ তাঁহার সম্মুখে প্রধূমিত হইয়া উঠিল। তাঁহার অন্তরে নিত্যসত্যের স্বাভাবিক আদর্শ, বাহিরে চতুর্দিকেই অসত্য প্রাচীন ভক্তিভাজন বেশে সঞ্চরণ করিতেছে। সেই অসত্যের সহিত তিনি কোনোক্রমেই সন্ধিস্থাপন করিতে পারেন না। সেইজন্য দেশের বৃদ্ধেরা যখন প্রাণহীন ক্রিয়াকর্ম ও প্রথার মধ্যে জড়ত্বের শান্তিসুখ অনুভব করিতেছিল তখন বালক রামমোহন মরীচিকাভীরু তৃষাতুর মৃগশাবকের ন্যায় সত্যের অন্বেষণে দুর্গম প্রবাসে দেশদেশান্তরে ব্যাকুলভাবে পর্যটন করিতেছিলেন। কত লক্ষ লক্ষ লোক, যেখানে জন্মগ্রহণ করে সেখানকার জড়সংস্কারের পুরাতন লূতাতন্তুজালের মধ্যে অনায়াসে নির্বিরোধে আত্মসমর্পণ করিয়া আশ্রয়লাভ করে, তদ্দ্বারা অন্তরাত্মাকে খর্ব জীর্ণ জড়বৎ করিয়া রাখে, তাহা আমৃত্যুকাল জানিতেও পারে না— রামমোহন রায়ের আত্মা প্রথম হইতেই সেই-সকল জড় সংস্কারে জড়িত হইতে চাহিল না। নীড়চ্যুত তরুণ ঈগল পক্ষী যেমন স্বভাবতই পৃথিবীর সমস্ত নিম্নভূমি পরিহার করিয়া আপন অভ্রংলিহ শৈলকুলায়ের প্রতি ধাবমান হয়, কিশোর রামমোহন রায় সেইরূপ বঙ্গসমাজের জীর্ণনীড় স্বভাবতই পরিত্যাগ করিয়া অভ্রভেদী অচলশিখর-প্রতিষ্ঠিত সত্য কুলায়ের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। লোকাচার,

সামাজিক সংস্কার, বহু পুরাতন হইতে পারে, কিন্তু সত্য তদপেক্ষা পুরাতন— সেই চিরপুরাতন সত্যের সহিত এই নবীন বাঙালি বালকের কোথায় পরিচয় হইয়াছিল? সেই সত্যের অভাবে গৃহবাস, সমাজের আশ্রয়, লৌকিক সুখশান্তি, এই গৃহপালিত তরুণ বাঙালির নিকটে কেমন করিয়া এত তুচ্ছ বোধ হইল? সেই ভূমা সত্যসুখের আস্বাদ সে কবে কোথায় লাভ করিয়াছিল? বঙ্গমাতা এই বালককে তাহার অন্যান্য শিশুর ন্যায় জ্ঞান করিয়া আপনার চিরপ্রচলিত ক্রীড়নকগুলি তাহার সম্মুখে একে একে আনিয়া উপস্থিত করিতে লাগিল; বালক কাতর কণ্ঠে বলিতে লাগিল, 'ইহা নহে, ইহা নহে— আমি ধর্ম চাহি, ধর্মের পুত্তলি চাহি না; আমি সত্য চাহি সত্যের প্রতিমা চাহি না।' বঙ্গমাতা কিছুতেই এই বালকটিকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিল না— সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সত্যের সন্ধানে সে একাকী বিশ্বজগতে বাহির হইয়া গেল। সে কোন্-এক সময় কেমন করিয়া বাংলাদেশের সমস্ত দেশাচার-লোকাচারের উপরে মস্তক তুলিয়া দেখিতে পাইয়াছিল যে, এই আচার-অনুষ্ঠানই চরম নহে, ইহার বাহিরে অসীম সত্য অনন্তকাল অমৃতপিপাসু ভক্ত মহাত্মাদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। পূর্বেই বলিয়াছি মহাপুরুষদের পদতলে ধরণী অদৃশ্যভাবে উন্নত হইয়া উঠিয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষগোচর চরাচরের বহির্বর্তী অনন্ত দৃশ্য দেখাইয়া দেয়, তখন তাঁহারা বরঞ্চ নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অস্তিত্ব অবিশ্বাস করিতে পারেন কিন্তু সেই বিশ্ববেষ্টনকারী দৃশ্যাতীত অনন্ত সত্যালোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে পারেন না।

নারিকেলের বহিরাবরণের ন্যায় সকল ধর্মেরই বাহ্যিক অংশ তাহার অন্তরস্থিত অমৃতরসকে ন্যূনাধিক পরিমাণে গোপন ও দুর্লভ করিয়া রাখে। তৃষার্ত রামমোহন রায় সেই-সকল কঠিন আবরণ স্বহস্তে ভেদ করিয়া ধর্মের রসশস্য আহরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি নিজে সংস্কৃত শিখিয়া বেদ-পুরাণের গহন অরণ্যের মধ্যে আপনার পথ কাটিয়া লইলেন, হিব্রু ও গ্রীক ভাষা শিখিয়া খৃস্টধর্মের মূল আকরের মধ্যে অবতরণ করিলেন, আরব্য ভাষা শিখিয়া কোরানের মূল মন্ত্রগুলি স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়া লইলেন। ইহাই সত্যের জন্য তপস্যা। সত্যের প্রতি যাহার প্রকৃত বিশ্বাস নাই সে বিনা চেষ্টায় যাহা হাতের কাছে প্রস্তুত দেখিতে পায় তাহাকেই আশ্রয় করিয়া অবহেলে জীবনযাপন করিতে চাহে— কর্তব্যবিমুখ অলস ধাত্রীর ন্যায় মোহ-অহিফেন-সেবনে অভ্যস্ত করাইয়া অন্তরাত্মার সমস্ত চেষ্টা সমস্ত ক্রন্দন নিরস্ত করিতে প্রয়াস পায় এবং জড়ত্বসাধনার দ্বারা আত্মাকে অভিভূত করিয়া সংসারাশ্রমে পরিপুষ্ট সুচিক্কণ হইয়া উঠে।

একদিন বহু সহস্র বৎসর পূর্বে সরস্বতীকূলে কোন্-এক নিস্তব্ধ তপোবনে কোন্-এক বৈদিক মহর্ষি ধ্যানাসনে বসিয়া উদাত্ত স্বরে গান গাহিয়া উঠিয়াছিলেন—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥

হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্র-সকল, তোমরা শ্রবণ করো— আমি সেই তিমিরাতীত মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি।

রামমোহন রায়ও একদিন উষাকালে নির্বাণদীপ তিমিরাচ্ছন্ন বঙ্গসমাজের গাঢ়নিদ্রামগ্ন নিশ্চেতন লোকালয়ের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন— হে মোহশয্যাশায়ী পুরবাসীগণ, আমি সত্যের দর্শন পাইয়াছি— তোমরা জাগ্রত হও!

লোকাচারের পুরাতন শুষ্ক পর্ণশয্যায় সুখসুপ্ত প্রাণীগণ রক্তনেত্র উন্মীলন করিয়া সেই জাগ্রত মহাপুরুষকে রোষদৃষ্টিদ্বারা তিরস্কার করিতে লাগিল। কিন্তু সত্য যাহাকে একবার আশ্রয় করে সে কি আর সত্যকে গোপন করিতে পারে? দীপবর্তিকায় অগ্নি যখন ধরিয়া উঠে তখন সেই শিখা লুক্কায়িত করা প্রদীপের সাধ্যায়ত্ত নহে— আমরা রুষ্ট হই আর সন্তুষ্ট হই, সে ঊর্ধ্বমুখী হইয়া জ্বলিতে থাকিবে, তাহার অন্য গতি নাই।

রামমোহন রায়েরও অন্য গতি ছিল না— সত্যশিখা তাঁহার অন্তরাত্মায় প্রদীপ্ত হইয়া

উঠিয়াছিল— সমাজ তাঁহাকে যত লাঞ্ছনা যত নির্যাতন করুক, তিনি সে আলোক কোথায় গোপন করিবেন? তখন হইতে তাঁহার আর বিশ্রাম নাই, নিভৃতগৃহবাসসুখ নাই, বঙ্গসমাজের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে হইবে। তাঁহাকে সমস্ত বিরোধ বিদ্বেষ প্রতিকূলতার রোষগর্জনের ঊর্ধ্বে কণ্ঠ তুলিয়া বলিতে হইবে— মিথ্যা! মিথ্যা! হে পৌরগণ, ইহাতে মুক্তি নাই, ইহাতে তৃপ্তি নাই, ইহা ধর্ম নহে, ইহা আত্মার উপজীবিকা নহে, ইহা মোহ, ইহা মৃত্যু! মিথ্যাকে স্তূপাকার করিয়া তুলিলেও তাহা সত্য হয় না, তাহা মহৎ হয় না; সত্যের প্রতি যদি বিশ্বাস থাকে তবে সাবধানে জ্ঞানালোকে তাহাকে অন্বেষণ করিয়া লইয়া তবে তাহার পূজা করো— যে ভক্তি যেখানে-সেখানে অর্ঘ্য-উপহার স্থাপন করিয়া দ্রুত তৃপ্তি লাভ করিতে চায় সে ভক্তি আত্মার আলস্য, তাহা আধ্যাত্মিক বিলাসিতা, তাহা তপস্যা নহে, তাহা যথার্থ আত্মোৎসর্গ নহে, তাহা অবহেলা, তাহাতে আত্মা বললাভ জ্যোতিলাভ মুক্তিলাভ করে না, কেবল উত্তরোত্তর জড়ত্বজালে জড়িত হইয়া সুপ্তিমগ্ন হইতে থাকে।

গ্রহণ করা এবং বর্জন করা জীবনের একটি প্রধান লক্ষণ। জীবনীশক্তি প্রবল থাকিলে এই গ্রহণবর্জনক্রিয়া অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে; যখন ইহার ব্যাঘাত ঘটে তখন স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এবং মৃত্যু আসিয়া অধিকার করে।

আমাদের শারীর প্রকৃতিতে এই গ্রহণবর্জনক্রিয়া আমাদের ইচ্ছার অপেক্ষা না রাখিয়া বহুলাংশে যন্ত্রবৎ চলিতে থাকে। আমরা অচেতনভাবে অম্লজান বায়ু গ্রহণ করি, অঙ্গারক বায়ু ত্যাগ করি; আমাদের দেহ প্রতিক্ষণে নূতন শারীর কোষ নির্মাণ করিতেছে— কী করিয়া যে তাহা আমরা জানি না।

আমাদের অন্তরপ্রকৃতিতেও বিচিত্র ক্রিয়া আমাদের অজ্ঞাতসারে গূঢ়ভাবে ঘটিয়া থাকে, কিন্তু সেখানে আমাদের কর্তৃত্বের অধিকার অপেক্ষাকৃত ব্যাপক এবং গুরুতরদায়িত্বপূর্ণ। ভালোমন্দ পাপপুণ্য শ্রেয়প্রেয় আমাদিগকে নিজের সতর্ক চেষ্টায় গ্রহণ ও বর্জন করিতে হয়। ইহাতেই আত্মার মাহাত্ম্যও। এ কার্য যদি সম্পূর্ণ জড়বৎ যন্ত্রবৎ সম্পন্ন হইতে থাকিত তবে আমাদের মনুষ্যত্বের গৌরব থাকিত না— তবে ধর্ম ও নীতিশব্দ অর্থহীন হইত।

আত্মার গ্রহণ বর্জন কার্য এইরূপ স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করাতে অনেক সময়ে ইচ্ছা আপন কর্তব্য কার্য সতর্কভাবে সম্পন্ন করে না; অনেক পুরাতন আবর্জনা সঞ্চিত হইতে থাকে, অনেক নূতন পোষণপদার্থ দূরে পরিত্যক্ত হয়। শরীর আপন মৃত কোষকে যেমন নির্মমভাবে বর্জন করে আমরা আমাদের মৃত বস্তুগুলিকে তেমন অকাতরে পরিহার করিতে পারি না, এইজন্য সকল মনুষ্যসমাজ এবং সকল ধর্মেরই চতুর্দিকে বহুযুগসঞ্চিত পরমপ্রিয় মৃতবস্তুগুলি উত্তরোত্তর স্তূপাকার হইয়া ক্রমে তাহার গতির পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায়— অভ্যন্তরের বায়ুকে দূষিত করিয়া তোলে, বাহিরের স্বাস্থ্যকর বায়ুকে প্রবেশ করিতে দেয় না। যাহারা শনৈঃ শনৈঃ অলক্ষিত ভাবে এই বিষবায়ুর মধ্যে পালিত হইয়া উঠে তাহারা বুঝিতে পারে না যে, তাহারা কী আলোক কী স্বাস্থ্য কী মুক্তি হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। তাহারা মমত্ববশত ভস্মকে ত্যাগ করিতে পারে না, অবশেষে পবিত্র অগ্নি উত্তরোত্তর আচ্ছন্ন হইয়া কখন নির্বাপিত হইয়া যায় তাহা তাহারা জানিতেও পারে না।

ক্রমে এমন হয় যে যাহা মুখ্য বস্তু, যাহা সারপদার্থ, তাহা লোকচক্ষুর অন্তরালে পড়িয়া অনভ্যস্ত হইয়া যায়, তাহার সহিত আর পরিচয় থাকে না, তাহাকে আমাদের আর একান্ত আবশ্যক বলিয়াই বোধ হয় না; যাহা গৌণ, যাহা ত্যাজ্য, তাহাই পদে পদে আমাদের চক্ষুগোচর হইয়া অভ্যাসজনিত প্রীতি আকর্ষণ করিতে থাকে।

এমন সময়ে সমাজে মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। তিনি বজ্রস্বরে বলেন, যে মিথ্যা সত্যকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে সেই মিথ্যাকে সত্য অপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করিয়া উপাসনা করিয়ো না। তখন এই অতি পুরাতন কথা লোকের নিকট সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া বোধ হয়। কেহ-বা বলে,

'সত্যকে মিথ্যা স্তূপের মধ্য হইতে অন্বেষণ করিয়া বাহির করিবার কষ্ট আমরা স্বীকার করিব না, আমরা যাহা সহজে পাই তাহাকেই সত্যজ্ঞানে সমাদর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে ইচ্ছা করি।' অর্থাৎ যাহা বর্জনীয় তাহা বর্জন করিতে চাহি না, যাহা গ্রহণীয় তাহাও গ্রহণ করিতে পারি না, আমাদের আধ্যাত্মিক মৃত্যুদশা উপস্থিত হইয়াছে। তখন সেই মহাপুরুষ বিধিপ্রেরিত উদ্যত বজ্রাগ্নি সেই মৃত আবর্জনাস্তূপের প্রতি নিক্ষেপ করেন। ধূর্জটি যখন মৃত সতীদেহ কোনোমতেই পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না, নিষ্ফল মোহে তাহাকে স্কন্ধে করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, তখন বিষ্ণু আপন সুদর্শনচক্র-দ্বারা সেই মৃতদেহ ছিন্নভিন্ন করিয়া শিবকে মোহভার হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। সেইরূপ মানব-সমাজকে মোহমুক্ত করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে মহাপুরুষগণ বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র লইয়া আবির্ভূত হন— সমাজ আপনার বহুকালের প্রিয় মোহভার হইতে বঞ্চিত হইয়া একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠে, কিন্তু দেবতার চক্রকে আপন কর্ম হইতে কে নিবৃত্ত করিতে পারে?

সর্বত্রই এইরূপ হইয়া থাকে। আমাদের দেশও তাহার ব্যতিক্রমস্থল নহে। বরঞ্চ যে জাতি সজীব সচেষ্ট, যাহারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করে, সবলভাবে কার্য করে, সানন্দমনে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে থাকে, যাহাদের সমাজে প্রাণের প্রবাহ কখনো অবরুদ্ধ থাকে না, তাহারা আপন গতিবেগের দ্বারা আপন ত্যাজ্য পদার্থকে বহুলাংশে দূরে লইয়া যায়, আপন দূষণীয়তা সংশোধন করিতে থাকে।

আমরা বহুকাল হইতে পরাধীন অধঃপতিত উৎপীড়িত জাতি; বহুদিন হইতে আমাদের সেই অন্তরের বল নাই যাহার সাহায্যে আমরা বাহিরের শত্রুকে বাহিরে রাখিতে পারি; সমাজের মধ্যে সেই জীবনশক্তির ঐক্য নাই যদ্দ্বারা আমরা বিপৎকালে এক মুহূর্তে এক হইয়া গাত্রোত্থান করিতে পারি; আমাদের মধ্যে বহুকাল হইতে কোনো মহৎ সংকল্পসাধন কোনো বৃহৎ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় নাই— সেইজন্য আমাদের অন্তরপ্রকৃতি ক্রমশ তন্দ্রামগ্ন হইয়া আসিয়াছিল। আমাদের হৃদয় রাজপুরুষদের অপ্রতিহত স্বেচ্ছাচারিতায় দলিত নিস্তেজ, আমাদের অন্তঃকরণ বুদ্ধিবৃত্তির স্বাভাবিক সানন্দ পরিচালনার অভাবে জড়বৎ হইয়া আসিয়াছিল। এমন স্থলে আমাদের সমাজ আমাদের ধর্ম যে আপনি আদিম বিশুদ্ধ উজ্জ্বলতা অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে ইহা কদাচ সম্ভবপর নহে। যদি রক্ষা করিত তবে সে উজ্জ্বলতা সকল অংশে সকল দিকেই প্রকাশ পাইত; তবে আমাদের মুখচ্ছবি মলিন, মেরুদণ্ড বক্র, মস্তক অবনত হইত না; তবে আমরা লোকসমাজে সর্বদা নির্ভীকভাবে অসংকোচে সঞ্চরণ করিতে পারিতাম। যাহার ধর্ম যাহার সমাজ সজীব সতেজ বিশুদ্ধ উন্নত, ত্রিভুবনে তাহার কাহাকেও ভয় করিবার নাই। বারুদ এবং সীসকের গোলক-দ্বারা তাহার স্বাধীনতা অপহৃত হইতে পারে না। আগে আমাদের সমাজ নষ্ট হইয়াছে, ধর্ম বিকৃত হইয়াছে, বুদ্ধি পরবশ হইয়াছে, মনুষ্যত্ব মৃতপ্রায় হইয়াছে, তাহার পরে আমাদের রাষ্ট্রীয় দুর্গতির সূচনা হইয়াছে। সকল অবমাননা সকল দুর্বলতার মূল সমাজের মধ্যে, ধর্মের মধ্যে।

রামমোহন রায় সেই সমাজ সেই ধর্মের মধ্যে বিশুদ্ধ সত্যের আদর্শ স্থাপন করিলেন। তাঁহার নিজের আদর্শ নহে। তিনি এ কথা বলিলেন না যে, আমার এই নূতন-রচিত মত সত্য, আমার এই নূতন-উচ্চারিত আদেশ ঈশ্বরাদেশ। তিনি এই কথা বলিলেন— সত্য মিথ্যা বিচার করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, সতর্ক যুক্তিদ্বারা সমাজের সমস্ত অকল্যাণ দূর করিতে হইবে। যেমন বলের দ্বারা ধূম নিরস্ত হয় না, অগ্নিকে সম্পূর্ণ প্রজ্বলিত করিয়া তুলিলে ধূমরাশি আপনি অন্তর্হিত হয়— রামমোহন রায় সেইরূপ ধর্মের প্রচ্ছন্ন বিশুদ্ধ অগ্নিকে প্রজ্বলিত জাগ্রত করিয়া তুলিয়া তাহার ধূমজাল দূর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বেদ পুরাণ তন্ত্রের সারভাগ উদ্ধার করিয়া আনিয়া তাহার বিশুদ্ধ জ্যোতি আমাদের প্রত্যক্ষগোচর করিতে লাগিলেন। যে-সমস্ত নূতন কালিমা সেই পুরাতন জ্যোতিকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল তাহাকে তিনি সেই জ্যোতির আদর্শের দ্বারাই নিন্দিত

করিতে লাগিলেন। কিন্তু, হায়, আমাদের পক্ষে সেই পুরাতন জ্যোতিই নূতন, এই নূতন কালিমাই পুরাতন; সেই সনাতন বিশুদ্ধ সত্য শাস্ত্রের মধ্যে আছে, আর এই-সমস্ত অধুনাতন লোকাচার আমাদের ঘরে বাহিরে, আমাদের চিন্তায় কার্যে, আমাদের সুখে দুঃখে শত সহস্র চিহ্ন রাখিয়াছে— চক্ষু উন্মীলন করিলেই তাহাকে আমরা চতুর্দিকে দেখিতে পাই, শাস্ত্র উদ্‌ঘাটন না করিলে সনাতন সত্যের সাক্ষাৎ পাই না। অতএব, হে রামমোহন রায়, তুমি যে মুক্তা আহরণ করিয়াছ তাহা শ্রেয় হইতে পারে, কিন্তু যে শুক্তি যুক্তি-অস্ত্রে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিয়া দিতেছ তাহাই আমাদের প্রেয়, আমাদের পরিচিত; আমরা মুক্তাকে মুখে বহুমূল্য বলিয়া সম্মান করিতে সম্মত আছি, কিন্তু শুক্তিখণ্ডকেই হৃদয়ের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিব।

তাহা হউক, সত্যকেও সময়ের অপেক্ষা করিতে হয়। কিন্তু, একবার যখন সে প্রকাশ পাইয়াছে তখন তাহার সহিতও আমাদের ক্রমশ পরিচয় হইবে। সত্যের পথ যদি বাধাগ্রস্ত না হয় তবে সত্যকে আমরা সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা করিয়া চিনিয়া লইতে পারি না; সন্দেহের দ্বারা পীড়িত নিষ্পীড়িত করিয়া তবে আমরা সত্যের অজেয় বল, অটল স্থায়িতা বুঝিতে পারি। যে প্রিয় পুরাতন মিথ্যা আমাদের গৃহে আমাদের হৃদয়ে এতকাল সত্যের ছদ্মবেশে বিরাজ করিয়া আসিয়াছে তাহাকে কি আমরা এক মুহূর্তের মধ্যে অকাতরে বিদায় দিতে পারি? সত্য যখন আপন কল্যাণময় কঠিন হস্তে তাহাকে আমাদের বক্ষ হইতে একেবারে কাড়িয়া ছিনিয়া লইয়া যাইবে তখন তাহার জন্য আমাদের হৃদয়ের শোণিতপাত এবং অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি তাহার পুরাতন প্রেয় বস্তুকে আপন শিথিল মুষ্টি হইতে অতি সহজেই ছাড়িয়া দিতে পারে সে লোক নূতন শ্রেয়কে তেমন সবলভাবে একান্তমনে ধারণ করিতে পারে না। পুরাতনের জন্য শোক যেখানে মৃদু, নূতনের জন্য আনন্দ সেখানে ম্লান। অবসন্ন রজনীর বিদায়-শিশিরাশ্রুজলের উপরেই প্রভাতের আনন্দ-অভ্যুদয় নির্মল উজ্জ্বল সুন্দর রূপে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠে।

প্রথমে সকলেই বলিব, না না, ইহাকে চাহি না, ইহাকে চিনি না, ইহাকে দূর করিয়া দাও; তাহার পর একদিন বলিব, এসো এসো হে সর্বশ্রেষ্ঠ, এসো হে হৃদয়ের মহারাজ, এসো হে আত্মার জাগরণ, তোমার অভাবেই আমরা এতদিন জীবন্মৃত হইয়া ছিলাম।

এসো গো নূতন জীবন।
এসো গো কঠোর নিঠুর নীরব,
এসো গো ভীষণ শোভন।
এসো অপ্রিয় বিরস তিক্ত,
এসো গো অশ্রুসলিলসিক্ত,
এসো গো ভূষণবিহীন রিক্ত,
এসো গো চিত্তপাবন।
থাক্ বীণাবেণু, মালতীমালিকা,
পূর্ণিমানিশি, মায়াকুহেলিকা—
এসো গো প্রখর হোমানলশিখা
হৃদয়শোণিতপ্রাশন।
এসো গো পরমদুঃখনিলয়,
মোহ-অঙ্কুর করো গো বিলয়,
এসো সংগ্রাম, এসো মহাজয়,
এসো গো মরণসাধন।

প্রথমে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম বলিয়াই, যখন আবাহন করিব তখন একান্তমনে সমস্ত হৃদয়ের সঙ্গে করিব— প্রবল দ্বন্দ্বের পর পরাজয় স্বীকার করিয়া যখন আত্মসমর্পণ করিব তখন সম্পূর্ণরূপেই করিব, তখন আর ফিরিবার পথ রাখিব না।

আমাদের দেশে এখনো সত্যমিথ্যার সেই দ্বন্দ্ব চলিতেছে। এই দ্বন্দ্বের অবতারণাই রামমোহন রায়ের প্রধান গৌরব। কারণ, যে সমাজে সত্যমিথ্যার মধ্যে কোনো বিরোধ নাই সে সমাজের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়; এমন-কি, জড়ভাবে অন্ধভাবে সত্যকে গ্রহণ করিলেও সে সত্যে কোনো গৌরব থাকে না। সীতার ন্যায় সত্যকেও বারংবার অগ্নিপরীক্ষা সহ্য করিতে হয়।

অনেকে মনে মনে অধৈর্য প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, রামমোহন রায় শাস্ত্র হইতে আহরণ করিয়া যে ধর্মকে বঙ্গসমাজে প্রেরণ করিয়াছিলেন এখনো তাহাকে সকলে গৃহে আহ্বান করিয়া লয় নাই; এমন-কি, এক-এক সময় আশঙ্কা হয় সমাজ সহসা সবেগে তাহার বিপরীত মুখে ধাবিত হইতেছে, এবং রামমোহন রায়ের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য সফল হইতেছে না। কিন্তু, সে আশঙ্কায় মুহ্যমান হইবার আবশ্যক নাই। রামমোহন রায় যে ধর্মকে সত্য বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন সে ধর্মকে তিনি সত্য বলিয়া জানিয়াছিলেন— আমরাও অগ্রে সে ধর্মকে প্রকৃতরূপে সত্য বলিয়া জানিব তবে তাহাকে গ্রহণ করিব ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়, সত্যকে কেবল পঠিত মন্ত্রের ন্যায় গ্রহণ করিব না।

সত্যকে যথার্থ সত্য বলিয়া জানা সহজ নহে— অনেকে যাঁহারা মনে করেন 'জানিয়াছি' তাঁহারাও জানেন না। রামমোহন রায় যে নিদারুণ পিপাসার পর যে কঠোর তপস্যার দ্বারা ধর্মে বিশ্বাস লাভ করিয়াছিলেন আমাদের সে পিপাসাও নাই, সে তপস্যাও নাই; আমরা কেবল পরম্পরাগত বাক্য শ্রবণ করিয়া যাই এবং মনে করি যে তাহা সত্য এবং তাহা বুঝিলাম। কিন্তু, আমাদের অন্তরাত্মা আকাঙ্ক্ষা-দ্বারা তাহাকে আকর্ষণ করিয়া তাহার সমস্ত সত্যতা একান্তভাবে লাভ করে না।

এখনো আমাদের বঙ্গসমাজে সেই আধ্যাত্মিক ক্ষুৎপিপাসার সঞ্চার হয় নাই, সত্যধর্মের জন্য আমাদের প্রাণের দায় উপস্থিত হয় নাই; যে ধর্ম স্বীকার করি সে ধর্ম বিশ্বাস না করিলেও আমাদের চলে, যে ধর্মে বিশ্বাস করি সে ধর্ম গ্রহণ না করিলেও আমাদের ক্ষতিবোধ হয় না— আমাদের ধর্মজিজ্ঞাসার সেই স্বাভাবিক গভীরতা নাই বলিয়া সে সম্বন্ধে আমাদের এমন অবিনয়, এমন চাপল্য, এমন মুখরতা। কোনো সন্ধান, কোনো সাধনা না করিয়া, অন্তরের মধ্যে কোনো অভাব অনুভব বা কোনো অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়া, এমন অনায়াসে কোনো-এক বিশেষ পক্ষ অবলম্বন-পূর্বক উকিলের মতো নিরতিশয় সূক্ষ্ম তর্ক করিয়া যাইতে পারি। এমন করিয়া কেহ আত্মার খাদ্য-পানীয় আহরণ করে না। ইহা জীবনের সর্বোত্তম ব্যাপার লইয়া বাল্যক্রীড়া মাত্র।

দীর্ঘ সুপ্তির পর রামমোহন রায় আমাদিগকে নিদ্রোত্থিত করিয়া দিয়াছেন। এখন কিছুদিন আমাদের চিত্তবৃত্তির পরিপূর্ণ আন্দোলন হইলে পর তবে আমাদের আত্মার স্বাভাবিক সত্যক্ষুধা সঞ্চার হইবে— তখনি সে যথার্থ সত্যকে সত্যরূপে লাভ করিতে সক্ষম হইবে।

রামমোহন রায় এখন আমাদিগকে সেই সত্যলাভের পথে রাখিয়া দিয়াছেন। প্রস্তুত সত্য মুখে তুলিয়া দেওয়া অপেক্ষা এই সত্যলাভের পথে স্থাপন করা বহুগুণে শ্রেয়। এখন আমরা বহুকাল অলীক জল্পনা, নাস্তিক্যের অভিমান, বৃথা তর্কবিতর্ক এবং বহুবিধ কাল্পনিক যুক্তির মধ্যে অবিশ্রাম নৃত্য করিয়া ফিরিব; ধর্মের নানারূপ ক্রীড়ায় প্রভাত অতিবাহন করিব; অবশেষে সূর্য যখন মধ্যগগনে অধিরোহণ করিবে, যখন অন্তঃকরণ অমৃতসরোবরে সুধাস্নানের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবে, ক্ষুধিত পিপাসিত অন্তরাত্মা তখন দেখিতে পাইবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তর্ক বিস্তার করিয়া শান্তি বৈ পরিতৃপ্তি নাই— তখন যথার্থ অনুসন্ধান পড়িয়া যাইবে এবং যতক্ষণ আত্মার যথার্থ খাদ্য-পানীয় না পাইব ততক্ষণ আপনাকে বৃথা বাক্যের ছলনায় ভুলাইয়া রাখিতে পারিব না। তখন রামমোহন রায় আত্মার স্বাধীন চেষ্টার যে রাজপথ বাঙালিকে নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন সেই পথযাত্রা সার্থক হইবে এবং তখন রামমোহন রায়ের সেই শকট আপন গম্যস্থানে আত্মার বিদ্যামন্দিরে আমাদিগকে উত্তীর্ণ করিয়া দিবে।

রামমোহন রায় তাঁহার যজুর্বেদীয় কঠোপনিষদের বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় যে প্রার্থনা করিয়াছেন আমরাও সেই প্রার্থনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করি—

'হে অন্তর্যামিন্, পরমেশ্বর, আমাদিগ্যে আত্মার অন্বেষণ হইতে বহির্মুখ না রাখিয়া যাহাতে তোমাকে এক অদ্বিতীয় অতীন্দ্রিয় সর্বব্যাপী এবং সর্বনিয়ন্তা করিয়া দৃঢ়রূপে আমরণান্ত জানি এমং অনুগ্রহ করো ইতি। ওঁ তৎসৎ।'

ভারতী

কার্তিক ১৩০৩

শিক্ষা

ছাত্রদের নীতিশিক্ষা

আজকাল আমাদের ছাত্রবৃন্দ নীতিশিক্ষা লইয়া অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কমিটি, বক্তৃতা আর চটি বইয়ের এত ছড়াছড়ি আরম্ভ হইয়াছে যে, এই কয়টি উপাদানের মাহাত্ম্যে নীতির উৎকর্ষসাধন হইবার সম্ভাবনা থাকিলে অনতিবিলম্বে আজকালকার বালকগণ এক-একটি ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির রূপে অভিব্যক্ত হইবে এরূপ আশা করা যাইতে পারে; আর যদি এই সুফল ফলিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয় তো সে কেবল ছাত্রচরিত্রে নীতির অভাবের আধিক্যবশত, চটি বইগুলার ব্যর্থতাবশত নয়।

ছাত্রদের নীতি লইয়া যে প্রকার আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে সহজে মনে হইতে পারে যে, হঠাৎ বুঝি এ দেশের যুবাদের মধ্যে দুর্নীতির এত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে যে, আমরা সকলে মিলিয়া 'জন্ দি ব্যাপ্‌টিস্ট' না সাজিলে আর চলে না। লেফ্‌টেনস্ট গবর্নর সার্কুলার জারি করিতেছেন, নন্-পোলিটিকাল স্বদেশহিতৈষীরা কমিটি করিতেছেন, কোনো কোনো কলেজের প্রিন্সিপাল 'মোরালিটি'তে পরীক্ষা প্রচলিত করাইবার চেষ্টায় আছেন, আর অনেকেই নিজের নিজের সাধ্যমতো 'মর‍্যাল টেক্স্‌ট্‌বুক্' প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত আছেন।

ব্যাপারটা দেখিয়া একটু হুজুকের মতন মনে হয়। শুদ্ধমাত্র 'মর‍্যাল টেক্স্‌ট্‌বুক' পড়াইয়া নৈতিক উন্নতিসাধন করা যায় এ কথা যদি কেহ বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে এ প্রকার অসীম বিশ্বাসকে সকৌতুকে প্রশংসা করা ছাড়া আমি আর কিছু বলিতে চাহি না। এরকম বিশ্বাসে পর্বত নড়ানো যায়, দুর্নীতি তো সামান্য কথা। 'চুরি করা মহাপাপ,' 'কদাচ মিথ্যা কথা বলিয়ো না' এইপ্রকার বাঁধি বোল দ্বারা যদি মানুষের মনকে অন্যায় কার্য হইতে নিবৃত্ত করা যাইতে পারিত তাহা হইলে তো ভাবনাই ছিল না। এ-সব কথা মান্ধাতার এবং তৎপূর্বকাল হইতেই প্রচলিত; ইহার জন্য নূতন করিয়া টেক্স্‌ট্ বুক ছাপাইবার প্রয়োজন নাই।

দুই-একটি টেক্স্‌ট্‌বুক দেখিয়া মনে হয় যেন বালকদের নীতিশিক্ষার জন্য নীতি শব্দটা একটি বিশেষ সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করাই আবশ্যক। আমাদের ছাত্রদের চরিত্র কি এই বিষয়ে এতই খারাপ যে, এই একটিমাত্র বিষয় লইয়াই এত বেশি আলোচনা করা দরকার? রাজসাহী কলেজের কোনো একজন প্রোফেসর 'ইন্দ্রিয়-সংযম' নামক এমন একখানি গ্রন্থ বাহির করিয়াছেন যে, আমি তো ওরকম পুস্তক বালকদের হস্তে দিতে সংকোচ বোধ করি। বালকবালিকা ও মহিলাদের পাঠ্য মাসিকপত্রে এরকম পুস্তকের সম্যক সমালোচনা করা অসম্ভব।

একটিমাত্র বিষয় অনেক দিক হইতে অনেক রকমে নাড়াচাড়া করিয়া প্রোফেসর মহাশয় দেখাইবার মধ্যে দেখাইয়াছেন যে, কতকগুলি প্রবৃত্তিকে সকলেই দূষণীয় জ্ঞান করে। তিনি কি মনে করেন যে, যাহারা সমাজের ও আত্মীয়স্বজনের মত উপেক্ষা করিয়া গোপনে দূষণীয় কার্যে রত থাকে তাহারা চটি বইটি পড়িবামাত্র চরিত্রসংশোধনের নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়া উঠিবে? আর যাহাদের এ-সকল প্রবৃত্তি নাই, তাহাদের নিকট এ-সকল বিষয় আলোচনা করা কি সংগত কিংবা প্রয়োজনীয়? এই বইখানি আবার রাজসাহী কলেজের নিয়ম অনুসারে সকল ছাত্রই পড়িতে ও শুধু পড়িতে নয় কিনিতে বাধ্য।

আমার কোনো এক তীক্ষ্ণ-জিহ্ব বন্ধু তাঁহার এক বক্তৃতার মধ্যে বলিয়াছিলেন, আজকাল নীতিশিক্ষার অর্থ দুইটি মাত্র : ১. রাজকর্মচারীদিগকে সেলাম করা এবং ২. সংস্কৃত কাব্যের কোনো কোনো বর্ণনা ছাঁটিয়া দেওয়া। প্রথমটি কলেজে কিংবা স্কুলে শিখাইবার কোনো প্রয়োজন নাই, স্কুল ছাড়িয়া একবার উমেদারী ধরিলেই শিক্ষাটি আপনা হইতেই আসিয়া পড়িবে। সংস্কৃত কাব্যের কোনো কোনো বর্ণনা ছাঁটিয়া দেওয়া কোনো কোনো সময়ে আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু

নিদানপক্ষে সে বর্ণনাগুলা তবু তো কবিতা বটে। এ-সব প্রসঙ্গ কাব্য হইতে ছাঁটিয়া দিয়া মর‍্যাল টেক্সট্‌বুক-এ নীরস শুষ্কভাবে আলোচনা করিবার প্রয়োজন দেখি না। বালকদের পাঠ্যপুস্তকে এরকম পাঁক লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করা আমার কাছে তো অত্যন্ত কুৎসিত মনে হয়।

নিঃসন্দেহ নীতিশিক্ষা দিবার ইচ্ছা ও চেষ্টা সর্বতোভাবেই প্রশংসনীয়। শুধু আমার বক্তব্য এই যে, কতকগুলি বাঁধি বোল দ্বারা এ কার্য সম্পন্ন হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। যাহাকে ইংরাজিতে 'কপি-বুক মোরালিটি' বলে, তাহার দ্বারা এ পর্যন্ত কাহারও চরিত্র সংশোধন হইতে দেখা যায় নাই। নীতিগ্রন্থে শুধু বলিয়া দেয় যে, এটা পাপ, ওটা পুণ্য; ইহা পাপ-পুণ্যের একটা ক্যাটালগস্বরূপ। কোন্‌টা ন্যায়, কোন্‌টা অন্যায় ইহা চলনসইরকম জানিবার নিমিত্ত ক্যাটালগের আবশ্যক করে না। অজ্ঞাত পাপ পৃথিবীতে অল্পই আছে। গুরুতর অন্যায় কার্যগুলা সকলেই অন্যায় বলিয়া জানে, এমন-কি, ব্যবসায়ী চোরেরাও চুরি করাটাকে নৈতিক কার্য বলিয়া বিবেচনা করে না।

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে কতকগুলি কার্য, জ্ঞানেই হউক বা অজ্ঞানেই হউক, করিলেই পাপ। যেখানে শাস্ত্রে লেখা আছে যে, দক্ষিণমুখী হইয়া বসিতে হইবে, সে স্থলে উত্তর দিকে মুখ করিয়া বসিলে হিন্দুমতে পাপ হইতে পারে এবং এ কথাটা সকলেও নাও জানিতে পারে। কিন্তু এ প্রকার পাপ-পুণ্য আপাতত আলোচ্য নহে। বালকদিগকে নীতিশিক্ষা দিবার নিমিত্ত গ্রন্থে যে-সব অন্যায় কার্য উল্লেখ করা যায়, কিংবা যাইতে পারে, তাহার মধ্যে কোনোটাকে বোধ হয় কাহারও ভ্রমবশত ন্যায় কার্য বলিয়া ভাবিবার সম্ভাবনা নাই।

নীতিশিক্ষার প্রণালী স্থির করিবার পূর্বে নীতি কী প্রকার ভিত্তির উপর স্থাপিত ইহা নির্ণয় করা আবশ্যক। দেয়াল গাঁথিতে আরম্ভ করিবার পূর্বে, বুনিয়াদটা কী রকম, মালমসলা কী রকম এবং কী প্রকারে গাঁথিলে দেয়ালটা সোজা হইয়া থাকিবে ও পড়িয়া যাইবে না, এই-সব কথা ভাবিয়া লওয়াই ভালো। চরিত্রের দোষ দূর করিবার চেষ্টার পূর্বে দোষের কারণটা অনুসন্ধান করা যুক্তিসংগত। রোগের হেতু না জানিয়া চিকিৎসা করিতে বসিলে বিপরীত ফল হইবার সম্ভাবনা।

মানবহৃদয়ে সুখস্পৃহাই একমাত্র চালক-শক্তি। ইচ্ছা করিয়া কেহ কখনো দুঃখ সহ্য করে না। কথাটা শুনিবামাত্রই অনেকে তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করিতে উঠিবেন, কিন্তু একটু বুঝাইয়া বলি। কর্তব্যপালনের জন্য অনেক সময় কষ্ট সহ্য করিতে হয় বটে, কিন্তু কর্তব্যপালনেই আমার যে আন্তরিক সুখ হয়, সেই সুখ ওই কষ্ট অপেক্ষা বলবান বলিয়া, কিংবা পরকালে অধিক পরিমাণে সুখ পাইবার অথবা ততোধিক দুঃখ এড়াইবার আশায় আমরা কর্তব্যের অনুরোধে কষ্ট সহ্য করিয়া থাকি। এ স্থলে আমি ফিলজফির নিগূঢ় তর্ক তুলিতে চাহি না; কিন্তু সকলেই বোধ হয় নিদানপক্ষে এ কথাটা স্বীকার করিবেন যে, লোকে সুখের প্রলোভনেই অন্যায় পথ অবলম্বন করে, এবং কর্তব্যের প্রতি আন্তরিক টানই এই প্রলোভন অতিক্রম করিবার একমাত্র উপায়।

মানুষকে অন্তরে বাহিরে কর্তব্যের পথে রাখিবার একটি সহজ উপায় ধর্ম। কিন্তু এ স্থলে ধর্মের তর্ক তুলিতে চাহি না ও তুলিবার প্রয়োজনও নাই। আমাদের তো এ পথ বন্ধ। শিক্ষকদের উপর নীতিশিক্ষা দিবারই হুকুম জারি হইয়াছে, ধর্মশিক্ষা নিষেধ। তাহার উপর বাড়িতেও যে বড়ো একটা ধর্মশিক্ষা হয় তা নয়। নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ প্রকাশ্য 'আগ্‌নাস্তিক,' আর বাকির মধ্যে বেশি ভাগ্‌ নামে হিন্দু, কাজে কী তা বলা কঠিন। অতএব, ধর্ম অবলম্বন করিয়া নীতিশিক্ষা দিবার কথা আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন।

নীতিশিক্ষার আর-এক সহজ উপায় আইন-অনুযায়ী দণ্ডের কিংবা সামাজিক নিন্দার ভয় দেখানো। বুদ্ধিমানের নিকট এইপ্রকার নীতিশিক্ষার একমাত্র অর্থ ধরা পড়িয়ো না। আমাদের সমাজের আবার এমন অবস্থা যে, নীচজাতিকে স্পর্শ করিলে তোমাকে অবিলম্বে সমাজচ্যুত হইতে হইবে, কিন্তু শঠতা করো, প্রবঞ্চনা করো, মিথ্যা কথা বলো, মাতাল হও, কুৎসিত আমোদ-আহ্লাদে জীবন যাপন করো, সমাজ এ-সমস্ত অম্লানবদনে হজম করিয়া লইয়া তোমাকে সাদরে

নিমন্ত্রণ করিবে, এবং যদি উত্তম কুলীন হও ও সেইসঙ্গে কিঞ্চিৎ সম্পত্তি থাকে তো তোমাকে কন্যাদান করিবার নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করিবে। এমনও শোনা গিয়াছে যে, কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে সমাজে লওয়া সম্বন্ধে এই একটিমাত্র আপত্তি কোনো কোনো স্থানে হইয়াছিল যে, জেলের মধ্যে পান-আহারের বন্দোবস্তে জাতিভেদটা নিখুঁত বজায় থাকে কি না সন্দেহ! এইপ্রকার সমাজের নিন্দার মূল্য লইয়া বাক্যব্যয় করিবার প্রয়োজন নাই।

মনুষ্যস্বভাব, বিশেষত বাল-স্বভাব অনুকরণশীল ও প্রশংসাপ্রিয়। অল্পবয়সে অন্যের, বিশেষত গুরুজনের ও প্রিয়জনের দৃষ্টান্ত ও তাঁহাদের প্রশংসা ও নিন্দা দ্বারা যে-সকল সংস্কার মনে বদ্ধমূল হয়, বস্তুত সেই-সব সংস্কার দ্বারাই আমাদের জীবন চালিত হয়। কিন্তু ছেলেরা বাড়িতে যে-সব দৃষ্টান্ত দেখে, তাহা হইতে নৈতিক উন্নতিসাধনের কোনোই আশা নাই। ছেলে স্কুলে শুষ্ক নীরস নীতিগ্রন্থে পড়িয়া আসিল যে, মিথ্যা কথা বলা অত্যন্ত নীতিবিরুদ্ধ; এবং বাড়ি আসিয়া দেখিল যে, তাহার বাপ, ভাই, জ্যাঠা, খুড়ো, সকলেই মুসলমান বাবুর্চির রান্না দ্বিপদ চতুষ্পদ প্রভৃতি সর্বপ্রকার জীবের মাংস গোপনে বিশেষ তৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়া বাহিরে এ প্রকার আচরণ করিতেছেন যেন কখনো নিষিদ্ধ দ্রব্য আহার করেন না, এবং প্রয়োজন হইলে এ বিষয়ে স্পষ্ট মিথ্যা কথা বলিতেও বিন্দুমাত্র সংকুচিত হইতেছেন না। সেই স্থানে আবার যদি সনাতন হিন্দুধর্ম রক্ষার নিমিত্ত ধর্মসভা স্থাপিত হইয়া থাকে তো সেই বালক দেখিবে যে, তাহার অখাদ্য-ভোজী বাপ, ভাই, জ্যাঠা, খুড়ো সকলেই এই ধর্মসভার সভ্য; এবং ধর্মসভার নিয়মাবলীর মধ্যে এমন নিয়মও দেখিবে যে, যাঁহারা 'প্রকাশ্য' খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে কোনোরূপ অবৈধ আচরণ করেন, তাঁহারা সমাজচ্যুত হইবেন। (কোনো সরলমতি পাঠক কি শুনিয়া আশ্চর্য হইবেন যে, এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এই বঙ্গদেশে এইরূপ ধর্মসভার ও এইরূপ নিয়মের অস্তিত্ব আমার কল্পনাজাত নহে?) বালকটি নিতান্ত নির্বোধ হইলেও এ কথা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে, উপরোক্ত নিয়মটির একমাত্র অর্থ সম্ভব— যাহা করিতে হয় লুকাইয়া করো; প্রয়োজন হইলে মিথ্যা কথা বলিয়ো, আমরা জানিয়া-শুনিয়াও চোখ-কান বুজিয়া থাকিব, কিছুই বলিব না; কিন্তু সাবধান, সত্য কথা বলিয়ো না, তাহা হইলেই তোমার সর্বনাশ। এই প্রকাণ্ড জীবন্ত মিথ্যার মধ্যে বাস করিয়া কি এই বালকের কখনো সত্যের প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠা জন্মিতে পারে?

দৃষ্টান্ত চুলায় যাক, উপদেশ দ্বারাও যে, বাড়িতে কোনোরূপ নীতিশিক্ষা হয় তাও নয়। বাড়িতে যতগুলি পিতৃতুল্য গুরুজন আছেন (এবং বয়োজ্যেষ্ঠ সকলেই এই শ্রেণীভুক্ত) তাঁহাদের সহিত ছেলেদের গৃহস্থের সহিত চোরের সম্পর্ক। ছেলেদের হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছাইতে তাঁহারা চেষ্টাও করেন না পৌঁছানও না। ছেলেরা বোঝে যে, এই-সব পিতৃতুল্য গুরুজন কেবল কারণে অকারণে ধমকাইবার নিমিত্ত ও 'যা, যা, পড়্‌গে যা' বলিয়া তাড়া দিবার নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদের ভালোবাসা, স্ফূর্তি, উচ্ছ্বাস, আনন্দ সে স্থানে ফুটিবার নহে। গুরুজনের প্রশংসাটা নিতান্ত বিরল বলিয়া ছেলেদের হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারে বটে, কিন্তু অমিশ্র প্রশংসা গুরুজনের নিকট পাওয়াই দুষ্কর। তাঁহারা আবার ছেলেদের নিকট হইতে এত তফাত যে, তাঁহাদের ভর্ৎসনা বা নিন্দা ছেলেদের মনে লেশমাত্র অঙ্কিত হইতে পারে না, তা ছাড়া তাঁহারা তো চিরকালই ভর্ৎসনা করিয়া থাকেন, এই তো তাঁহাদের কাজ। বকুনিটা খাবার সময় ছেলেদের মনে একটু অসোয়াস্তির ভাব আসে বটে, কিন্তু সেটা অন্যায় করিয়াছে বলিয়া নয়, বকুনি খাইতেছে বলিয়া, আর প্রহারের আশঙ্কায়।

বাড়ির ভিতরে মা পুত্রকে পিতৃশাসন হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত নিজে মিথ্যা বলিতেছেন ও মিথ্যা শিখাইতেছেন। ছেলেরা বাড়ির ভিতর যায় খাইবার জন্য ও আদর পাইবার জন্য। বাড়ির ভিতরটা নীতি কিংবা অন্য কোনো প্রকার শিক্ষার স্থান নহে। অশিক্ষিতা মাতারা, বালিকা বয়সেই মাতৃত্বভার স্কন্ধে লইয়া কীই বা শিক্ষা দিবেন! তাঁহারা কেবল ভালোবাসিতে পারেন, এবং তাঁহাদের কাছে অন্ধ ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু প্রত্যাশা করাও যায় না।

নীতিশিক্ষার উচিত উপায় হচ্ছে, কর্তব্য ও পবিত্রতার সৌন্দর্য বাল্যাবস্থায় মনের মধ্যে ফুটাইয়া তোলা। পবিত্রতা, সত্য, দয়া, অহিংসা, ইত্যাদিকে যদি হৃদয়মধ্যে সংস্কাররূপে বদ্ধমূল করিতে চাহ তো এই-সব গুণের সৌন্দর্য পরিস্ফুট করিয়া দেখাইতে হইবে এবং তাহা হইলেই মন আপনা হইতেই এদিকে আকৃষ্ট হইবে। অপবিত্রতা, রাগ, দ্বেষ, হিংসা যে কতদূর কুৎসিত তাহাই দেখাইতে হইবে। এবং এমন করিয়া চরিত্র গঠন করিতে হইবে যে, আমরা যেমন অপরিষ্কার কিংবা বীভৎস কোনো পদার্থ স্পর্শ করার কল্পনা করিতেও সংকোচ ও ঘৃণা অনুভব করি, তেমনি অপবিত্রতার সংস্পর্শ কল্পনা করিতেও ঘৃণা অনুভব করিব ও অন্যায় কার্য করিতে সংকোচ বোধ করিব। আমরা যেমন ছেলেদের কাদায় লুটাইবার সুখ পরিহার করিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবার সুখ ভোগ করিতে শিক্ষা দিই, সেই প্রকারে তাহাদিগকে অপবিত্র ও অন্যায় কার্য পরিহার করিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। কিন্তু এ প্রকার শিক্ষা দু-চারিটি শুষ্ক নীরস নীতিবচনের কর্ম নহে; ইহা ঘরে ঘরে পদে পদে সহস্র ছোটোখাটো খুঁটিনাটির উপর দৃষ্টি রাখার কর্ম, ইহা বাল-হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহাদের সুখদুঃখ, কষ্ট আহ্লাদ সহানুভূতির সহিত বুঝিয়া চলার কর্ম। নীতিবচনের বাঁধি বোলের মধ্যে পবিত্রতা ও ন্যায়ের সৌন্দর্য দেখিতে পাওয়া যায় না, যদি পবিত্রতা কতদূর সুন্দর ও অপবিত্রতা কতদূর কুৎসিত ইহা হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করাইতে চাহ তো বরং ভালো নভেল ও কবিতা পড়িতে দাও। মর‍্যাল টেক্সট্‌বুক-এর সহিত হৃদয়ের কোনোই সংস্রব নাই।

আমাদের নীতিজ্ঞেরা আমোদ-আহ্লাদের উপর বড়োই নারাজ। কিন্তু আমি বলি যে, যদি অবৈধ অপবিত্র আমোদ হইতে মনকে নিবৃত্ত করিতে চাও তো তাহার পরিবর্তে বৈধ আমোদ-আহ্লাদটা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, সমাজে যদি বৈধ আমোদ-আহ্লাদের স্থান না রাখ তো লোকে স্বভাবত সমাজের বাহিরে অবৈধ আমোদ-আহ্লাদ অন্বেষণ করিবে, সহস্র নীতিজ্ঞানে আমোদ-আহ্লাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হইবে না। আমাদের সমাজের অবস্থা এ রকম যে, বাড়ি অত্যন্ত নিরানন্দ, এবং সব সময়ে শান্তির আলয়ও নয়; কাজেই ক্রীড়া কৌতুক ও বিশ্রামের জন্য লোকের বাধ্য হইয়া অন্যত্র যাইতে হয়। পেট্রিয়টরা শুনিয়া রাগ করিবেন, কিন্তু আমার মনে হয় যে, ইংলন্ডের ন্যায় আমাদের 'হোম লাইফ্' থাকিলে ভালোই হইত।

সাধনা
মাঘ ১২৯৯

ছাত্রবৃত্তির পাঠ্যপুস্তক

ভোজনের মাত্রা পরিপাকশক্তির সীমা ছাড়াইয়া গেলে তাহাতে লাভ নাই বরঞ্চ ক্ষতি, এ কথা অত্যন্ত পুরাতন। এমন-কি, স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্‌দিগের মতে একেবারে ষোলো আনা ক্ষুধা মিটাইয়া আহার করাও ভালো নহে, দুই-এক আনা হাতে রাখাও কর্তব্য। মানসিক ভোজন সম্বন্ধেও এই নিয়ম খাটে এ কথাও নূতন নহে।

আমাদের এই দরিদ্র দেশের ছেলেদের আহারের পরিমাণ যেমনই হৌক, ইংরাজি শিক্ষার দায়ে পড়িয়া পড়াশুনাটা যে নিরতিশয় গুরুতর হইয়া পড়িয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। ডাক্তর ডেলি সাহেব কিছুকাল বাঙালি ছাত্রদের শিক্ষকতা করিয়া স্টেটস্‌ম্যান্‌পত্রে তাঁহার যে অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা হইতে এই বলপূর্বক শিক্ষা গলাধঃকরণের হাস্যজনক, অথচ সুগভীর শোচনীয় ফল প্রমাণিত হইতেছে। অনেক বাঙালি ডেলি সাহেবের উক্তপত্র হইতে শিক্ষাগ্রহণের চেষ্টা না করিয়া অযথা রোষ প্রকাশ করিয়াছেন। অভিমান, দুর্বলহৃদয় বাঙালিচরিত্রের একটা প্রধান লক্ষণ। হিতৈষীদের নিকট হইতেও তিলমাত্র আঘাত আমরা সহ্য

করিতে পারি না।

অন্তত এন্ট্রেন্স ক্লাস পর্যন্ত শিক্ষণীয় বিষয়গুলি যদি বাংলায় অধীত হয় তবে শিশুপীড়ন অনেকটা দূর হইতে পারে। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, ছাত্রবৃত্তি দিয়া যাহারা এন্ট্রেন্স পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয় তাহারা ভালো ফল প্রাপ্ত হয় না। প্রথমত, তাঁহাদের কথার সত্যতাসম্বন্ধে উপযুক্তরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, দ্বিতীয়ত, ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত যেরূপ ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল না হইবারই কথা। এগারো-বারো বৎসর বয়সের মধ্যে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগকে যে পরিমাণে বিষয় শিক্ষা করিতে হয়, এমন বোধ হয় আর কোথাও নাই। নিম্নে আমরা দেশীয় ভাষা-ভিত্তিমূলক এন্ট্রেন্স স্কুলের সহিত সেন্ট জেভিয়ার কলেজাধীন এন্ট্রেন্স স্কুলের শ্রেণীপর্যায় অনুসারে পাঠ্যপুস্তকের তালিকা পাশাপাশি বিন্যাস করিলাম। প্রথমোক্ত স্কুলে এন্ট্রেন্স পর্যন্ত নয় শ্রেণী, দ্বিতীয় স্কুলে ইন্‌ফ্যান্ট ক্লাস বাদ দিলে আট শ্রেণী। অতএব সেন্ট জেভিয়রের ইন্‌ফ্যান্ট ক্লাসকে আমরা প্রথমোক্তস্কুলের নবম শ্রেণীর সহিত তুলনা করিলাম। যদি ষোলোবৎসর বয়সকে এন্ট্রেন্স দিবার উপযুক্ত বয়স বলিয়া ধরা যায় তবে সাত বৎসর বয়সের সময় স্কুলের পাঠ আরম্ভ করা হইতেছে বলিয়া ধরিতে হইবে।

বাংলা স্কুল

নবম শ্রেণী

(৭ বৎসর বয়স)

ইংরাজি।	১।	প্যারি সরকারের ফার্স্ট বুক।
	২।	Modern spelling book ; Word lessons.
বাংলা।	৩।	রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ে -কৃত বর্ণপরিচয়।
	৪।	শিশুশিক্ষা দ্বিতীয় ভাগ।
	৫।	শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগ।
গণিত।	৬।	পাটিগণিত।
	৭।	ধারাপাত।
ভূগোল।	৮।	মৌখিক।

সেন্ট জেভিয়র স্কুল

ইন্‌ফ্যান্ট ক্লাস

(৭ বৎসর বয়স)

ইংরাজি।	১।	Longman's Infant Reader.
	২।	Longman's Second Primer.
গণিত।	৩।	একশত পর্যন্ত গণনা। যোগ, বিয়োগ এবং গুণ।

৮ম শ্রেণী

(৮ বৎসর বয়স)

ইংরাজি।	১।	প্যারি সরকারের সেকেন্ড বুক।
	২।	Modern spelling book.
	৩।	গঙ্গাধরবাবুর Grammar and Composition.
বাংলা।	৪।	চন্দ্রনাথবাবুর নূতন পাঠ।
	৫।	চিরঞ্জীব শর্মার বাল্যসখা।
	৬।	তারিণীবাবুর বাংলা ব্যাকরণ।

গণিত।	৭।	পাটিগণিত।
	৮।	শুভঙ্করী।
	৯।	মানসাঙ্ক।
ইতিহাস।	১০।	রাজকৃষ্ণবাবুর বাংলার ইতিহাস।
ভূগোল।	১১।	শশীবাবুর ভূগোল পরিচয়।
বিজ্ঞান।	১২।	কানিংহ্যামের স্বাস্থ্যের উপায়।

ফার্স্ট স্ট্যান্ডার্ড
(৮ বৎসর বয়স)

ইংরাজি।	১।	Longman's New Reader. No. 1
	২।	Arithmetical Primer. No. 1

৭ম শ্রেণী
(৯ বৎসর বয়স)

ইংরাজি।	১।	Royal Reader. No. 2
	২।	Child's Grammar and Composition.
বাংলা।	৩।	সাহিত্যপ্রসঙ্গ।
	৪।	পদ্যপাঠ দ্বিতীয় ভাগ।
	৫।	বাংলা ব্যাকরণ।
গণিত।	৬।	পাটিগণিত।
	৭।	শুভঙ্করী।
	৮।	মানসাঙ্ক।
	৯।	সরল পরিমিতি।
	১০।	ব্রহ্মমোহনের জ্যামিতি।
ইতিহাস।	১১।	বাংলার ইতিহাস।
	১২।	ভূগোল-পরিচয়।
	১৩।	বঙ্গদেশ ও আসামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।
বিজ্ঞান।	১৪।	কৃষি সোপান।
	১৫।	স্বাস্থ্যের উপায়।
	১৬।	ভারতচন্দ্র-কৃত স্বাস্থ্যশিক্ষা।

সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ড
(৯ বৎসর বয়স)

ইংরাজি।	১।	Longman's New Reader. No. 2.
	২।	Arithmetical Primer. No. 1.
ইতিহাস।	৩।	বাইবেল ইতিহাস।

৬ষ্ঠ শ্রেণী
(১০ বৎসর বয়স)

ইংরাজি।	১।	Royal Readers. No. 3
	২।	McLeod's Grammar
	৩।	Stapley's Exercises
বাংলা।	৪।	সীতা।

৫। কবিগাথা।
৬। সাহিত্য প্রবেশ ব্যাকরণ।
গণিত। ৭। পাটিগণিত।
৮। শুভঙ্করী।
৯। সরল পরিমিতি।
১০। জ্যামিতি।
ইতিহাস। ১১। ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।
১২। শশীবাবুর ভূগোল প্রকাশ।
১৩। যোগেশবাবুর প্রাকৃতিক ভূগোল।
বিজ্ঞান। ১৪। সরল পদার্থ বিজ্ঞান।
১৫। কানিংহ্যামের স্বাস্থ্যের উপায়।
১৬। রাধিকাবাবুর স্বাস্থ্যরক্ষা।

থার্ড স্ট্যান্ডার্ড
(১০ বৎসর বয়স)

ইংরাজি। ১। Longman's New Readers. No. 3
২। Arithmetical Primer. No. 2
ইতিহাস। ৩। বাইবেল ইতিহাস।
৪। Stories from English History No. 1.
ভূগোল। ৫। Geographical Primer No. 2

পঞ্চম শ্রেণী
(১১ বৎসর বয়স)

ইংরাজি। ১। Lethbridge's Easy selection.
২। McLeod's Child's Grammar.
৩। Stapley's Exercises.
বাংলা। ৪। প্রবন্ধকুসুম।
৫। সদ্ভাবশতক।
৬। সাহিত্যপ্রবেশ ব্যাকরণ।
৭। রচনা সোপান।
গণিত। ৮। পাটিগণিত।
৯। শুভঙ্করী।
১০। জ্যামিতি।
১১। পরিমিতি।
ইতিহাস। ১২। ইংলন্ডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।
১৩। ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।
ভূগোল। ১৪। ভূগোল প্রকাশ।
১৫। ভারতবর্ষের বিশেষ বিবরণ।
১৬। প্রাকৃতিক ভূগোল।
বিজ্ঞান। ১৭। সরল প্রাকৃতদর্শন।
১৮। স্বাস্থ্যরক্ষা।
১৯। স্বাস্থ্যের উপায়।

ফোর্থ স্ট্যান্ডার্ড
(১১ বৎসর বয়স)

ইংরাজি।	১।	Longman's New Readers. No. 4.
	২।	Dictionary for conjugation.
	৩।	Arithmetic for beginners.
ইতিহাস।	৪।	বাইব্‌ল্‌ ইতিহাস।
	৫।	Stories from English History. No. 2
ভূগোল।	৬।	First Geography

এইখানেই বাংলা পড়া শেষ হইল, অতএব আর উর্ধ্বে যাইবার আবশ্যক নাই। ইংরাজি স্কুলে ইংরাজিই মাতৃভাষা, সেখানে অন্যভাষা শিক্ষার প্রয়োজন নাই সেইজন্য তুলনাস্থলে বাংলা স্কুলের পাঠ্য তালিকা হইতে ইংরাজি বহিগুলা বাদ দেওয়া কর্তব্য। তাহা দিয়াও পাঠকেরা দেখিবেন, বাঙালি শিশুর স্কন্ধে কীরূপ বিপরীত বোঝা চাপানো হইয়াছে। অথচ তাহাদের স্বাস্থ্যের প্রতি শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষের এমনি সস্নেহ দৃষ্টিপাত যে, তিনজনের রচিত তিনখানা স্বাস্থ্য-বিষয়ক গ্রন্থ ছাত্রদিগকে মুখস্থ করাইয়া তবে তাঁহারা তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। ওই তিনখানি পুস্তকই যদি উঠাইয়া দেওয়া হয়, তবে সেই পরিমাণে ছাত্রদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। বাংলা স্কুলগ্রন্থকারদিগের প্রতি সানুনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা আর কেহ যেন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আর-একখানা বহি তৈরি করিয়া না বসেন, বরঞ্চ ছাত্রগণের পিতামাতাগণ বর্ষে বর্ষে তাঁহাদের অরচিত গ্রন্থের সম্ভাবিত মূল্য ধরিয়া দিতে পারেন; তাহা হইলেও ডাক্তার খরচটা লাভ থাকে।

যাঁহারা সাধারণ মফস্বল স্কুলপাঠীদিগের নিরতিশয় দারিদ্র্য-সম্বন্ধে কিছুমাত্র অবগত আছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন এইরূপ রাশীকৃত অনাবশ্যক গ্রন্থভারে ছাত্রদিগকে নিপীড়িত করা কীরূপ হৃদয়হীন বিবেচনাহীন নিষ্ঠুরতা। কত ছাত্রকে অর্ধাশনে থাকিয়া পাঠ্যগ্রন্থ সংগ্রহের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। এইরূপে নির্বাসনে অনশনে কঠোর পরিশ্রমে বিদেশী খনি হইতে জ্ঞান সংগ্রহে যাহারা বাধ্য তাহাদের ভার যত লঘু, পথ যত সুগম করিয়া দেওয়া যায় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। অল্পবয়সে শিক্ষার জাঁতায় বাঙালির ছেলের শরীর মন সম্পূর্ণ জীর্ণ নিষ্পেষিত করিয়া দিয়া সমস্ত বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া এক হাস্যহীন ক্রীড়াহীন স্বাস্থ্যহীন অকালপক্ব প্রবীণতার অন্ধকার কলিযুগ অবতীর্ণ হইতেছে। দেশের রোগ, বিদেশের শিক্ষা, ঘরের দারিদ্র্য এবং পরের দাসত্ব এই সব-কটায় মিলিয়া আমাদের স্বল্পায়ু জীবনটাকে শোষণ করিতেছে। ইহার উপরে যদি আবার পাঠ্য নির্বাচন সমিতির স্বদেশীয় সভ্যগণও বাঙালির দুরদৃষ্টক্রমে নির্বিচারে বাঙালির ছেলের স্কন্ধে হেয়ার-প্রেস-বিনির্গত সকল প্রকার শুষ্ক বিদ্যার বোঝা চাপাইতে থাকেন তবে আমাদের দেশের দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছে বলিতে হইবে।

অনেক ছাত্রবৃত্তিস্কুলে পদার্থবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য মহেন্দ্রবাবুর গ্রন্থ অবলম্বন করা হইয়াছে; তাহাতে ছেলেদের বিদ্যা প্রায় পূর্ববৎ থাকে এবং পদার্থও শরীরে বড়ো অবশিষ্ট থাকে না। যখন দেখা যায় তিন বৎসর পূর্বে উক্ত গ্রন্থের উনবিংশ সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছে এবং যখন কল্পনা করি অন্তত অষ্টাদশ সহস্র হতভাগ্য বালককে এই গ্রন্থের পাষাণ সোপানের উপর জল হইতে উত্তোলিত মীনশাবকের ন্যায় আছাড় খাইতে ও খাবি খাইতে হইয়াছে, তখন শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। যে-সকল ভীষণ প্রান্তরে প্রাচীনকাল হইতে দস্যুসম্প্রদায় নিরুপায় পান্থদিগের প্রাণসংহার করিয়া আসিয়াছে, সেই অস্থিসংকুল সুবিস্তীর্ণ দুর্গম প্রান্তর দেখিলে হৃদয় যেরূপ ব্যাকুল হয়, এই পদার্থবিদ্যার উনবিংশ সংস্করণ দেখিলেও মনের মধ্যে সেইরূপ করুণামিশ্রিত ভীষণ ভাবের উদ্রেক হইতে থাকে।

মফস্বলের দরিদ্রস্কুলে কীরূপ শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া থাকে, এবং সেখানে বিজ্ঞান সহজে

হৃদয়ংগম করাইবার কীরূপ উপকরণ পাওয়া যায় তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এমন অবস্থায় যাঁহারা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যারণ্য মহাশয়ের পদার্থবিদ্যা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছেন তাঁহারা বিনাপরাধেই শিশুপালবধের জন্য প্রস্তুত। বিশ্বজগতে অনেকগুলি দুর্বোধ বিষয় আছে। যথা, নারিকেলের মতো এমন উপাদেয় ফল শাখাসংস্থানহীন বৃক্ষশিরে পঞ্চাশ হস্ত ঊর্ধ্বে ঝুলাইবার কী উদ্দেশ্য ছিল; হীরকের মতো এমন উজ্জ্বল রত্ন খনিগর্ভে দুর্গম অন্ধকারের মধ্যেই বা নিহিত থাকে কী অভিপ্রায়ে; ধান্য গোধূম যবের জন্য এত শ্রম সহকারে চাষের প্রয়োজন হয় কেন আর কাঁটা গাছগুলা বিনা চেষ্টায় অজস্র উৎপন্ন হইয়া কী উপকার সাধন করে; হিমালয়ের নির্জন শীতপ্রদেশে এত প্রচুর বরফ কী কাজে লাগে অথচ কলিকাতায় বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের অসহ্য গ্রীষ্মের সময় হঠাৎ বরফের জোগান বন্ধ হইয়া যায় কেন; যখন চোর পালায় তখন হঠাৎ বুদ্ধি বাড়িয়া উঠিয়া ফল কী; গৃহে ফিরিয়া আসিয়া পরদিনে পরিহাসের উত্তর জোগায় কেন;

এবং ছাত্রবৃত্তিস্কুলে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যারণ্য মহাশয়ের রচিত পদার্থবিজ্ঞান প্রচলিত হইবার কারণ কী?

উপরি-উক্ত কয়টা বিষয়ই দুর্বোধ, কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের ভাষা ও বিষয়বিন্যাস এই-সকল কয়েকটি প্রহেলিকা হইতেই দুর্বোধতর।

এই গ্রন্থখানি শিক্ষক ও ছাত্রদের পক্ষে যে কতদূর নিষ্ঠুর তাহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই কয়েকপৃষ্ঠা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। ছাত্রদের অনেকের মা-বাপ আছে কি না জানি না, কিন্তু শিক্ষাবিভাগ যে তাহাদের মা-বাপ নহেন সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

বিলাতে সুকুমারমতি বালকদিগকে সহজে বিজ্ঞানশিক্ষা দিবার বিচিত্র উপায় আছে; তথাপি ইংরাজি ভাষায় প্রথম শিক্ষার্থীদিগের জন্য হক্স্‌লিসাহেবের সম্পাদকতায় যে বৈজ্ঞানিক প্রথম পাঠগুলি রচিত হইয়াছে তাহা কীরূপ আশ্চর্য সরল!— তাহাতে বিজ্ঞান-বিদ্যারণ্যের জটিলতা ও ভাষার দুর্গমতা লেশমাত্র নাই। কারণ, তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য, ছাত্রদিগকে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া। মুখ্যরূপে ভাষা শিক্ষা দেওয়া যে-সকল গ্রন্থের উদ্দেশ্য তাহাতে ভাষার কৌশল ও কাঠিন্য আবশ্যক হইতে পারে— কিন্তু যে বিজ্ঞান আমাদের দেশের ছাত্রদের পক্ষে সহজেই অত্যন্ত দুরূহ তাহার ভাষা ও বিষয়বিন্যাস যতদূর সম্ভব সহজ করা উচিত, নতুবা ছাত্রদিগের মানসিক শক্তির অন্যায় এবং নির্দয় অপব্যয় সাধন করা হয়। এবং মাঝে হইতে না বুঝিয়া মুখস্থ করিয়া তাহারা ভাষাও শেখে না বিজ্ঞানও শেখে না, কেবল মনকে ক্লান্ত, সময়কে নষ্ট ও শরীরকে ক্লিষ্ট করিয়া অপরাপর শিক্ষার ব্যাঘাত করে মাত্র।

আমরা ছাত্রদিগের শারীরিক ও মানসিক শক্তির এই অন্যায় অপব্যয় নিবারণের উদ্দেশেই এন্ট্রেন্স স্কুলে বাংলা ভাষায় বিষয় শিক্ষা দিতে অনুরোধ করি। এই প্রণালীতে, ছাত্রগণ যে সময় ও শক্তি হাতে পাইবে তাহা ইংরাজি শিক্ষায় প্রয়োগ করিয়া উক্ত ভাষা অনেক ভালো করিয়া শিখিবে সন্দেহ নাই এবং সেইসঙ্গে বিষয়গুলিও সহজে ও সম্পূর্ণতররূপে আয়ত্ত করিতে পারিবে। তাহাদের শরীরও অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইবে এবং মনোবৃত্তির চর্চাও অপেক্ষাকৃত সুসাধ্য ও স্বাভাবিক হইয়া উঠিবে।

সাধনা

ভাদ্র-আশ্বিন ১৩০২

মুসলমান ছাত্রের বাংলা শিক্ষা

গত বৎসর মুসলমান শিক্ষাসম্মিলন উপলক্ষে খ্যাতনামা জমিদার শ্রীযুক্ত সৈয়দ নবাবআলি চৌধুরী মহাশয় বাংলা শিক্ষা সম্বন্ধে একটি উর্দু প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহারই ইংরাজি অনুবাদ সমালোচনার্থে আমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছে।

বাংলা স্কুলে প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকগুলি বিশেষরূপে হিন্দুছাত্রদের পাঠোপযোগী করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে অথচ বাংলার অনেক প্রদেশেই হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান প্রজাসংখ্যা অধিক; ইহা লইয়া সৈয়দসাহেব আক্ষেপ করিয়াছেন। বিষয়টি আলোচ্য তাহার সন্দেহ নাই এবং বক্তামহাশয়ের সহিত আমাদের সহানুভূতি আছে।

এরূপ হইবার প্রধান কারণ, এতদিন বিদ্যালয়ে হিন্দু ছাত্রসংখ্যাই অধিক ছিল এবং মুলসমান লেখকগণ বিশুদ্ধ বাংলা সাহিত্য রচনায় অগ্রসর হন নাই।

কিন্তু ক্রমশই মুসলমান ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে এবং ভালো বাংলা লিখিতে পারেন এমন মুসলমান লেখকেরও অভাব নাই। অতএব মুসলমান ছাত্রদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পাঠ্যপুস্তক রচনার সময় আসিয়াছে।

স্বধর্মের সদুপদেশ এবং স্বজাতীয় সাধুদৃষ্টান্ত মুসলমান বালকের পক্ষে একান্ত আবশ্যক, এ কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। আমরা আরও বলি মুসলমান শাস্ত্র ও সাধুদৃষ্টান্তের সহিত পরিচয় হিন্দু বালকদের শিক্ষার অবশ্যধার্য অঙ্গ হওয়া উচিত।

বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান যখন ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী, পরস্পরের সুখ-দুঃখ নানা সূত্রে বিজড়িত, একের গৃহে অগ্নি লাগিলে অন্যকে যখন জল আনিতে ছুটাছুটি করিতে হয়, তখন শিশুকাল হইতে সকল বিষয়েই পরস্পরের সম্পূর্ণ পরিচয় থাকা চাই। বাঙালি হিন্দুর ছেলে যদি তাহার প্রতিবেশী মুসলমানের শাস্ত্র ও ইতিহাস এবং মুসলমানের ছেলে তাহার প্রতিবেশী হিন্দু শাস্ত্র ও ইতিহাস অবিকৃতভাবে না জানে তবে সেই অসম্পূর্ণ শিক্ষার দ্বারা তাহারা কেহই আপন জীবনের কর্তব্য ভালো করিয়া পালন করিতে পারিবে না।

অতএব সৈয়দসাহেব বাঙালি মুসলমান বালকের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যে-কথা বলিয়াছেন, আমরা বাঙালি হিন্দু বালকের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঠিক সেই কথাই বলি— অর্থাৎ বাংলা বিদ্যালয়ে হিন্দু ছেলের পাঠ্যপুস্তকে তাহার স্বদেশীয় নিকটতম প্রতিবেশী মুসলমানদের কোনো কথা না থাকা অন্যায় এবং অসংগত।

ইংরাজি শিক্ষার যেরূপ প্রচলন হইয়াছে, তাহাতে ইংরাজের ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, আচার-বিচার আমাদের কাছে লেশমাত্র অগোচর থাকে না; অথচ তাহারা বহুদূরদেশী এবং মুসলমানরা আমাদের স্বদেশীয়, এবং মুসলমানদের সহিত বহুদিন হইতে আমাদের রীতিনীতি পরিচ্ছদ ভাষা ও শিল্পের আদান-প্রদান চলিয়া আসিয়াছে। অদ্য নূতন ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে আত্মীয়ের মধ্যে প্রতিবেশীর মধ্যে ব্যবধান দাঁড়াইয়া গেলে পরম দুঃখের কারণ হইবে। বাঙালি মুসলমানের সহিত বাঙালি হিন্দুর রক্তের সম্বন্ধ আছে, এ কথা আমরা যেন কখনো না ভুলি।

বাংলায় একটা প্রবাদ আছে 'ঝিকে মারিয়া বউকে শেখানো'। ঝি আপনার বলিয়া তাহাকে দু ঘা মারিলে সয়, বউয়ের গায়ে হাত তোলা সকল সময় নিরাপদ নহে। সৈয়দসাহেব সেই নীতি অবলম্বন করিয়া বাংলা পাঠ্যপুস্তককে তর্জন করিয়াছেন, বোধকরি ইংরাজি পাঠ্যপুস্তকের প্রতি তাঁহার নিগূঢ় লক্ষ্য ছিল। মুসলমান শাস্ত্র ও ইতিহাসের বিকৃত বিবরণ বাংলা বই কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছে? অস্ত্র হস্তে ধর্মপ্রচার মুসলমানশাস্ত্রের অনুশাসন, এ কথা যদি সত্য না হয় তবে সে অসত্য আমরা শিশুকাল হইতে শিখিলাম কাহার কাছে? হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মনীতি ও ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে ইংরাজ লেখক যাহাই লিখিতেছে হিন্দু-মুসলমান ছাত্রগণ কি তাহাই নির্বিচারে

কণ্ঠস্থ করিতেছে না? এবং বাংলা পাঠ্যপুস্তক কি তাহারই প্রতিধ্বনি মাত্র নহে?

সম্প্রদায়গত পক্ষপাতের হাত একেবারে এড়ানো কঠিন। য়ুরোপীয় ইতিহাসের অনেক ঘটনা ও অনেক চরিত্রচিত্র প্রটেস্টান্ট লেখকের হাতে একভাবে এবং রোমান ক্যাথলিক লেখকের হাতে তাহার বিপরীতভাবে বর্ণিত হইয়া থাকে। য়ুরোপে দুই ধর্মসম্প্রদায়ের বিদ্যালয় অনেক স্থলে স্বতন্ত্র, সুতরাং ছাত্রদিগকে স্ব সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ কথা শিক্ষা করিতে বাধ্য হইতে হয় না। কিন্তু ইংরাজ লেখকের সকল প্রকার ব্যক্তিগত ও জাতিগত সংস্কার আমরা শিরোধার্য করিয়া লইতে বাধ্য, এবং সেই-সকল সংস্কারের বিরুদ্ধে কোনো বাংলা বই রচিত হইলে তাহা কোনো বিদ্যালয়ে প্রচলিত হইবার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। ইংরাজ লেখকেরই মত বাংলা বিদ্যালয়ের আদর্শ মত— সেই মত অনুসারে পরীক্ষা দিতে হইবে, নতুবা পরীক্ষার নম্বরেই দেখা যাইবে সমস্ত শিক্ষা ব্যর্থ হইয়াছে।

অনেক আধুনিক বাঙালি ঐতিহাসিক মুসলমান রাজত্বের ইতিহাসকে ইংরাজ-তূলিকার কালিমা হইতে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। অক্ষয়বাবু তাঁহার সিরাজচরিতে অন্ধকূপহত্যাকে প্রায় অপ্রমাণ করিতে কৃতকার্য হইয়াছেন কিন্তু প্রমাণ যতই অমূলক বা তুচ্ছ হউক পরীক্ষাতিতীর্ষু বালক মাত্রই অন্ধকূপহত্যা ব্যাপারকে অসন্দিগ্ধ সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য।

অতএব বক্তামহাশয়ের বিবেচনা করিয়া দেখা কর্তব্য, পাঠ্যপুস্তকের মতামত সম্বন্ধে আমরা কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ। যতদিন না স্বাধীন-গবেষণা ও সুযুক্তিপূর্ণ বিচারের দ্বারা আমরা ইংরাজ সাহিত্যসমাজে প্রচলিত ঐতিহাসিক কুসংস্কারগুলিকে বিপর্যস্ত করিয়া দিতে পারি ততদিন আমাদের নালিশ গ্রাহ্য হইবে না। আমরা হিন্দু ও মুসলমান লেখকগণকে ইতিহাস-সংস্কারব্রত গ্রহণ করিতে আহ্বান করি। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় দুই-একজন হিন্দু লেখক এই দুরূহ সাধনায় রত আছেন, কিন্তু ইতিহাসের উপকরণমালা প্রায়ই পার্সি উর্দুভাষায় আবদ্ধ, অতএব মুসলমান লেখকগণের সহায়তা নিতান্তই প্রয়োজনীয়।

সৈয়দসাহেব বাংলা সাহিত্য হইতে মুসলমান-বিদ্বেষের যে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন সেগুলি আমরা অনাবশ্যক ও অসংগত জ্ঞান করি। বঙ্কিমবাবুর মতো লেখকের গ্রন্থে মুসলমান-বিদ্বেষের পরিচয় পাইলে দুঃখিত হইতে হয় কিন্তু সাহিত্য হইতে ব্যক্তিগত সংস্কার সম্পূর্ণ দূর করা অসম্ভব। থ্যাকারের গ্রন্থে ফরাসি-বিদ্বেষ পদে পদে দেখা যায়, কিন্তু ইংরাজি সাহিত্যপ্রিয় ফরাসি পাঠক থ্যাকারের গ্রন্থকে নির্বাসিত করিতে পারেন না। আইরিশদের প্রতি ইংরাজের বিরাগ অনেক ইংরাজ সুলেখকের গ্রন্থে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এ-সমস্ত তর্ক-বিতর্ক ও সমালোচনার বিষয়। বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থে যাহা নিন্দার্হ তাহা সমালোচক-কর্তৃক লাঞ্ছিত হউক, কিন্তু নিন্দার বিষয় হইতে কোনো সাহিত্যকে রক্ষা করা অসাধ্য। মুসলমান সুলেখকগণ যখন বঙ্গ সাহিত্য রচনায় অধিক পরিমাণে প্রবৃত্ত হইবেন তখন তাঁহারা কেহই যে হিন্দু পাঠকদিগকে কোনোরূপ ক্ষোভ দিবেন না এমন আমরা আশা করিতে পারি না।

ভারতী
কার্তিক ১৩০৭

সমাজ

১৭॥২৩

বাঙালির আশা ও নৈরাশ্য

সভ্যতার প্রথম অবস্থায় ধনের আবশ্যক। যত দিন মনুষ্য আহারান্বেষণে ব্যস্ত থাকে, তত দিন তাহারা জ্ঞান অর্জনে যত্নশীল থাকে না। উর্বর দেশেই সভ্যতার প্রথম অঙ্কুর নিঃসৃত হয়। ভারতবর্ষ, ইটালি ও গ্রীস দেশের উর্বর ক্ষেত্রেই আর্যেরা আসিয়া জীবিকা ও সভ্যতা সহজে উপার্জন করেন। অভাবের উৎপীড়ন হইতে অবসর পাইলেই জ্ঞানের দিকে মনুষ্যের নেত্র পড়ে। এইরূপে অবসর-প্রাপ্ত ব্যক্তির অনুসন্ধিৎসু নেত্রের সম্মুখে জ্ঞানের দ্বার ক্রমশ উন্মুক্ত হইতে থাকে। এইজন্য আমাদের দেশের প্রাচীন ব্রাহ্মণদের কোনো কার্য ছিল না, জ্ঞানানুশীলনের উপযোগী বৃক্ষ-লতা-বেষ্টিত তপোবনে তাঁহাদের বাস ছিল; তাঁহারাই তো ভারতবর্ষে কবিতার সৃষ্টি করিয়াছেন, দর্শনের উন্নতি করিয়াছেন, বিজ্ঞানের অনুসন্ধান করিয়াছেন, শ্রেষ্ঠ ধর্মের আলোচনা করিয়াছেন, ভাষা ও ব্যাকরণের পূর্ণ-সংস্কার করিয়াছেন। অতএব সভ্যতার প্রথম অবস্থায় অবসর আবশ্যক করে, অবসর পাইবার জন্য ধন আবশ্যক, ও ধন উপার্জনের জন্য উর্বর ভূমির আবশ্যক।

উর্বর ভূমিই যদি সভ্যতার প্রথম কারণ হয়, তবে বঙ্গদেশ সে বিষয়ে সৌভাগ্যশালী, এই আশ্বাসে মুগ্ধ হইয়া আমরা মনে করিতে পারি যে, বঙ্গদেশ এককালে সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে পারিবে। ভারতবর্ষের ধ্বংসাবশিষ্ট সভ্যতার ভিত্তির উপর য়ুরোপীয় সভ্যতার গৃহ নির্মিত হইলে সে কী সর্বাঙ্গসুন্দর দৃশ্য হইবে! য়ুরোপের স্বাধীনতা-প্রধান ভাব ও ভারতবর্ষের মঙ্গল-প্রধান ভাব, পূর্বদেশীয় গম্ভীর ভাব ও পশ্চিমদেশীয় তৎপর ভাব, য়ুরোপের অর্জনশীলতা ও ভারতবর্ষের রক্ষণশীলতা, পূর্বদেশের কল্পনা ও পশ্চিমের কার্যকরী বুদ্ধি উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য হইয়া কী পূর্ণ চরিত্র গঠিত হইবে। য়ুরোপীয় ভাষার তেজ ও আমাদের ভাষার কোমলতা, য়ুরোপীয় ভাষার সংক্ষিপ্ততা ও আমাদের ভাষার গাম্ভীর্য, য়ুরোপীয় ভাষার প্রাঞ্জলতা ও আমাদের ভাষার অলংকার-প্রাচুর্য উভয়ে মিশ্রিত হইয়া আমাদের ভাষার কী উন্নতি হইবে। য়ুরোপীয় ইতিহাস ও আমাদের কাব্য উভয়ে মিশিয়া আমাদের সাহিত্যের কী উন্নতি হইবে! য়ুরোপের শিল্প বিজ্ঞান ও আমাদের দর্শন উভয়ে মিলিয়া আমাদের জ্ঞানের কী উন্নতি হইবে! এই-সকল কল্পনা করিলে আমরা ভবিষ্যতের সুদূর সীমায় বঙ্গদেশীয় সভ্যতার অস্পষ্ট ছায়া দেখিতে পাই। মনে হয়, ওই সভ্যতার উচ্চ শিখরে থাকিয়া যখন পৃথিবীর কোনো অধীনতায় ক্লিষ্ট অত্যাচারে নিপীড়িত জাতির কাতর ক্রন্দন শুনিতে পাইব, তখন স্বাধীনতা ও সাম্যের বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া তাহাদের অধীনতার শৃঙ্খল ভাঙিয়া দিব। আমরা নিজে শতাব্দী হইতে শতাব্দী পর্যন্ত অধীনতার অন্ধকার-কারাগৃহে অশ্রুমোচন করিয়া আসিয়াছি, আমরা সেই কাতর জাতির মর্মের বেদনা যেমন বুঝিব তেমন কে বুঝিবে? অসভ্যতার অন্ধকারে পৃথিবীর যে-সকল দেশ নিদ্রিত আছে, তাহাদের ঘুম ভাঙাইতে আমরা দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিব। বিজ্ঞান দর্শন কাব্য পড়িবার জন্য দেশ-বিদেশের লোক আমাদের ভাষা শিক্ষা করিবে! আমাদের দেশ হইতে জ্ঞান উপার্জন করিতে এই দেশের বিশ্ববিদ্যালয় দেশ-বিদেশের লোকে পূর্ণ হইবে। বঙ্গের ভবিষ্যৎ ইতিহাসের অলিখিত পৃষ্ঠায় এই-সকল ঘটনা লিখিত হইবে, ইহা আমরা কল্পনা করিয়া লইতেছি সত্য, কিন্তু পাঠকেরা ইহা নিতান্ত অসম্ভব বোধ করিবেন না। প্রকাণ্ড সমুদ্রের কোন্ এক প্রান্তে কতকগুলি বালুকণা জমিয়া ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র যে একটি তুষারাবৃত অনুর্বর দ্বীপ প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার পূর্ব-নিবাসীদের আকাশই অম্বর ছিল, পশুবৎ ব্যবহার ছিল, তরুকোটর বাসস্থান ছিল, নর-রক্তলোলুপ ড্রুইডগণ পুরোহিত ছিল, আজ তাহাদেরই পুত্রপৌত্রগণ কোথা হইতে তাড়িয়া ফুঁড়িয়া অসভ্যদের

সভ্য করিবেন বলিয়া মহা গোলযোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ইহাও যদি সম্ভব হইল, পতিত ইটালি ও গ্রীসও যদি পুনরায় জাগিয়া উঠিল, তবে যে নূতন জাতি আজ নব উদ্যমে জ্বলিয়া উঠিতেছে, নবজীবনে সঞ্জীবিত হইতেছে, নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত হইতেছে, সে যে সভ্যতার চরম শিখরে না উঠিয়া বিশ্রাম করিবে না, তাহাতে অসম্ভব কী আছে? সভ্যতা পৃথিবীতে স্তরে স্তরে নির্মিত হইতে থাকে, একেবারে প্রচুর পরিমাণে সভ্যতা কখনো পৃথিবীতে জন্মিতে পারে না। ক্রমই প্রকৃতির নিয়ম। সভ্যতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী আসিয়া ভারতবর্ষ, গ্রীস ও ইটালিতে এক স্তর সভ্যতা নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। ওই-সকল দেশ হইতে দেবী চলিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু এক স্তর সভ্যতা সেখানে এখনও অবশিষ্ট আছে। তিনি এখন ফ্রান্স জর্মনি প্রভৃতি দেশে সভ্যতা নির্মাণ করিতেছেন এবং কিছুদিন পরে সেখানেও পদচিহ্ন রাখিয়া আবার আমেরিকা, রুসিয়া, জাপান মাড়াইয়া পুনরায় সেই প্রাচীন ভারতবর্ষের পূর্ব দিকে উদিত হইবেন, তাহাতে অসম্ভব কিছুই নাই। সভ্যতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী এইরূপে পৃথিবীময় পরিভ্রমণ করিতেছেন এবং স্তরে স্তরে পৃথিবীতে পূর্ণ সভ্যতা নির্মাণ করিতেছেন। ভবিষ্যতের একদিন আমরা কল্পনাচক্ষে দেখিতেছি, যেদিন আমাদের দীপ্যমান সভ্যতার সম্মুখে ক্রমে ক্রমে ফ্রান্স, জর্মনি, ইংলন্ডের সভ্যতা নিবিয়া যাইবে। এ কথা অবিশ্বাস করিবার নহে। অনন্ত কাল-সমুদ্রে কত ঘটনা-তরঙ্গ উঠিবে ও পড়িবে, আর আমাদের এই বঙ্গদেশ, এই লক্ষ লক্ষ অধিবাসী চিরকালই যে অধীনতার অন্ধকারে নির্জীবভাবে ঝিমাইবে, তাহা আমরা কল্পনা করিতেও পারি না। আমরা য়ুরোপের সঞ্চিত সভ্যতা অল্পায়াসে অর্জন করিয়া লইতেছি, নিউটন যতখানি মাথা ঘুরাইয়া পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বুঝিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে আমাদের নিউটনের এক-পঞ্চদশ অংশও ভাবিতে হয় না। য়ুরোপ যখন বৃদ্ধ ও ক্লান্ত হইয়া যাইবেন, তখন তাঁহার সঞ্চিত সভ্যতা অর্জন করিয়া লইয়া আমরা আবার নব উদ্যমে অধিকতর সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করিব। যে জাতি নব উদ্যমে উঠিতে আরম্ভ করে, তাহারাই ক্রমে সভ্যতার উচ্চ-শিখরে আরোহণ করে। কী অল্প কালের মধ্যে আমাদের বঙ্গদেশ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। বঙ্গ ভাষায় গদ্য এই সেদিন তো নির্মিত হইয়াছে; যত দিন ভাষার উন্নতি না হয়, তত দিন জাতির উন্নতি হয় না, অথবা জাতির উন্নতির চিহ্নই ভাষার উন্নতি। যাঁহারা প্রায় বাংলা গদ্যের সৃষ্টিকর্তা তাঁহারা আজিও বর্তমান আছেন। বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য এই অর্ধশতাব্দীর মধ্যে আশ্চর্য উন্নত হইয়াছে। এত দ্রুত ও এত অল্প কালের মধ্যে বোধ হয় কোনো ভাষারই উন্নতি হয় নাই। এই উন্নতি-স্রোত যদি দারুণ প্রতিঘাত না পায় তবে কখনো থামিবে না। বাঙালিদের এই অর্ধশতাব্দীর উন্নতি, ইহার মধ্যে তাহাদের উদ্যম কত বাড়িয়া উঠিয়াছে, অধীনতার অনুৎসাহের মধ্যে এতদূর আশা করা যায় না। স্কটলন্ডে গিয়া তাহারা কৃষিবিদ্যা অধ্যয়ন করিতেছে, লন্ডনে গিয়া সেখানকার বিজ্ঞান-আচার্য উপাধি আহরণ করিতেছে, অঙ্কবিদ্যা শিখিতেছে, জর্মনিতে নিজের মত প্রচার করিতেছে, রুসিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের আসন অধিকার করিতেছে, সমস্ত ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ঐক্যতা স্থাপনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে, সাহস-পূর্বক কত সামাজিক শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে, সফল হউক বা না হউক, গবর্নমেন্টের কুনিয়মের বিরুদ্ধে সাহসপূর্বক স্বীয় মত প্রকাশ করিতেছে, আমেরিকায় শিক্ষা পাইবার জন্য কত যুবক উদ্যত হইয়াছেন এবং আমরা শীঘ্রই দেখিতে পাইব যে, তাহারা পোত-নির্মাণবিদ্যা, যন্ত্র-বিদ্যা এবং ইংরাজেরা যদি যুদ্ধ শিক্ষা না দেন, তবে ফ্রান্সে গিয়া, জর্মনিতে গিয়া যুদ্ধ শিখিয়া আসিবে, ইহা নিশ্চয়ই। গবর্নমেন্টের অধীনে কার্য জুটিতেছে না, সুতরাং জীবিকার অভাবে বিদেশে গিয়া অর্থের নিমিত্তেও বিদ্যা শিখিবে, বাণিজ্যের উন্নতি হইবে, এখনি আমাদের দেশীয় লোকের বাণিজ্যের দিকে মন পড়িয়াছে, অর্ধশতাব্দীর মধ্যে অধীনতার সীমাবদ্ধক্ষেত্রে এত দূর উন্নতি কোন্ জাতি করিয়াছে জানি না।

পাঠকেরা জিজ্ঞাসা করিবেন যে আমরা পূর্বে বলিলাম সভ্যতার প্রথম অবস্থায় অর্থের আবশ্যক করে, তবে এখন কেন বলিতেছি যে, অর্থাভাবও বাঙালিদের জ্ঞান উপার্জনের প্রধান

প্রবর্তক? স্বাধীন সভ্যতার নিমিত্ত প্রথম অবস্থায় নিশ্চয়ই অর্থ আবশ্যক, আমাদের যদি ভাবিয়া চিন্তিয়া নিজের মস্তিষ্ক হইতে এই সভ্যতা গঠিত করিতে হইত, তবে নিশ্চয়ই অবসর নহিলে পারিতাম না, অপরে আমাদের জ্ঞান গিলাইয়া দিতেছে, ইহার জন্য অধিক অর্থ আবশ্যক করে না, আমরা নূতন বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্ক্রিয়া করিতে পারিব না, নূতন যন্ত্র উদ্‌ভাবন করিতে পারিব না, সুতরাং আমরা একটি জাতীয় মহত্ত্ব উপার্জন করিতে পারিব না। পৃথিবীতে এখন সভ্যতা গঠিত হইতেছে, এই গঠন-কার্যে আমরা কোনো সাহায্য করিতে পারিব কি না সন্দেহস্থল, তবে গঠিত হইলে জাতিসাধারণের সহিত তাহা আমরা ভোগ করিতে পারিব। আমাদের গঠন-শক্তি নানা বাহ্য কারণ হইতে ব্যাঘাত পাইতেছে। প্রথম দারিদ্র্য, দ্বিতীয় জলবায়ু।

আমাদের দেশ উর্বর সত্য, কিন্তু অনেক কারণে দারিদ্র্য প্রশ্রয় পাইতেছে। সাধারণ লোকদের মধ্যে সমানরূপে ধন বিভক্ত হইলেই দেশ ধনী হয়। দেশীয় কৃষকেরা যাহা উৎপন্ন করে তাহার সমস্ত লাভ মহাজন প্রভৃতিরাই ভোগ করে, তাহাদের কেবল জীবিকা-নির্বাহোপযোগী কিছু অবশিষ্ট থাকে, তদধিক সঞ্চয় করিবার কোনো উপায় নাই, দুর্ভিক্ষের পর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যা শিখিবার জন্য অনেকে ধন এবং তদপেক্ষা বহুমূল্য স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছেন, কিন্তু শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ধন উপার্জন করিবার কোনো উপায় দেখিতেছেন না। দেশের মৃত্তিকা ক্রমশ অনুর্বর হইয়া যাইতেছে, এক স্থানে ক্রমাগত একই শস্য জন্মিলে মৃত্তিকার তেজ নষ্ট হইয়া যায়। প্রাচীন লোকেরা বলেন, এখনকার খাদ্য-সামগ্রী ক্রমশ বিস্বাদ হইয়া যাইতেছে; তাহার কারণ, মৃত্তিকা ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া যাইতেছে। এই দারিদ্র্যের জ্বালায় অস্থির হইয়া লোকে এক বিন্দু অন্য বিষয় ভাবিবার সময় পাইবে কোথায়? যদিই বা ক্রমে আমরা ধনী হই, তাহা হইলেও কি আমাদের দেশ জ্ঞান উপার্জন বিষয়ে সকল দেশের অগ্রগণ্য হইতে পারে, তাহাতেও সন্দেহ আছে। আমাদের জলবায়ু এমন অতেজস্কর যে, নিবাসীদের মন একেবারে উৎসাহশূন্য করিয়া ফেলিয়াছে। কোনো একটি কার্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগা এ দেশে কাহারো সাধ্য নহে। যদি বা কোনো কৃত্রিম উপায়ে একবার উৎসাহ উদ্দীপ্ত করা যায়, তথাপি অধিক দিন তাহা স্থায়ী হয় না, অল্প দিনের মধ্যে শিথিল হইয়া যায়। দেশের আর্দ্র বায়ু স্বাস্থ্যের এত বিঘ্নজনক যে, তাহাতে অনেক অনিষ্ট হইতেছে। খর্বাকার রুগ্‌ণ শীর্ণ কতকগুলি লোকের কাছে কত দূর আশা করা যায়? শারীরিক বলের অভাবে তাহাদের মনের মহত্ত্ব জন্মিবে কোথা হইতে? তাহারা অত্যাচারে অভাবে শিশু ও অবলার ন্যায় ক্রন্দন করিতে পারে; পুরুষের মতো, বীরের মতো অত্যাচারের বিরুদ্ধে, অভাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারে না। আধ ঘণ্টা কঠিন বিষয় চিন্তা করিলে মাথা ঘুরিয়া যাইবে, দুই-চারিটি চিন্তা-সাধ্য পুস্তক লিখিলে মাথার পীড়া হইবে। তবে এখন নূতন বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করিবে কী করিয়া? যাঁহারা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত, তাঁহারা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানান্বেষণে ব্যস্ত থাকেন, কত রাত্রি নিদ্রাহীন নেত্রে তারকার দিকে চাহিয়া থাকেন, কত দিবস আহার ত্যাগ করিয়া সূর্যগ্রহণের প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। এ-সকল কি আমাদের দেশের দৃষ্টি অভাবে চশমা-চক্ষু, রাত্রি জাগরণে অজীর্ণ-রোগী, বিশ্রাম অভাবে রুগ্‌ণ-দেহ, জলবায়ুর দোষে শীর্ণ-ধাতু বিএ এমে-র কর্ম? বাংলা দেশ হইতে উঠিয়া না গেলে আমাদের নিস্তার নাই। ভারতবর্ষের অন্য কোনো স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিলেই তবে আমাদের রক্ষা, নহিলে কতকগুলি অপচ্যজ্ঞান গিলিয়া গিলিয়া বিকৃতমস্তিষ্ক, বিলাতি প্রভুদের বুট জুতার আঘাত সহিয়া সহিয়া হীন-প্রকৃতি, দিন-রাত্রি পরিশ্রম করিয়া করিয়া রুগ্‌ণ দেহ ও সাহেবি সভ্যতার সহিত নানাবিধ অভাব আমদানি হওয়াতে দরিদ্র হইয়া মরিতে হইবে।

আমাদের জ্ঞান অর্জনের যে-সকল বাধা জন্মিয়াছে, তাহা নিরাকৃত করিবার কি কোনো উপায় নাই? আমাদের কতখানি উন্নতির আশা আছে দুই-একটি কারণে তাহা যে নষ্ট হইবে ইহা তো সহ্য হয় না। প্রথম বিঘ্ন দারিদ্র্য, এই দারিদ্র্য কি কখনো চিরকাল তিষ্ঠিতে পারে? ইহা অসম্ভব যে একটি সমগ্র জাতি একেবারে না খাইয়া মরিবে, অথবা অভাবের উৎপীড়ন সহিয়াও

স্থির হইয়া থাকিবে। ইংলন্ড দেশটি কিছু উর্বর নহে তবে তাহারা ধনী হইল কী করিয়া? ভাবিয়া দেখিতে গেলে অভাবই তাহাদের ধনী করিয়াছে। নিজের দেশে জীবিকার সংস্থান করিতে না পারিয়া তাহারা দেশ-বিদেশে গিয়া অর্থ উপার্জন করিতেছে। যেখানে অভাব সেখানেই একটি-না-একটি উপায় আছে। আমাদের দেশে স্বাধীন বাণিজ্য-প্রচার আরম্ভ হইয়াছে, ক্রমশ যে তাহার উন্নতি হইবে না তাহা কে বলিতে পারে? গবর্নমেন্ট যদি বিঘ্ন না দেন, তবে বাঙালিরা নিশ্চয়ই বাণিজ্যের উন্নতি করিতে পারিবে। ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতিরা অত্যন্ত বাণিজ্য-প্রিয়, কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে তাহাদের অনেক বাধা পড়িতেছে, কিন্তু শিক্ষিত ও স্বভাব-চতুর বাঙালিরা নদীবহুল ও সমুদ্রতীরস্থ বঙ্গদেশে এ বিষয়ে শীঘ্রই উন্নতি লাভ করিবে। অর্থ উপার্জিত হইলে জ্ঞান উপার্জনের অনেক সুবিধা হইবে। কিন্তু ইংরাজদের কিছু অতিরিক্ত হইয়া পড়িয়াছে; অর্থ জ্ঞানের সহায়তা করে বটে, কিন্তু অতিরিক্ত হইলেই আবার জ্ঞানের শত্রুতাচরণ করে; বিলাস মনকে এমন নিস্তেজ করিয়া ফেলে যে জ্ঞানের শ্রমসাধ্য আলোচনায় অক্ষম হইয়া পড়ে। ইংলন্ডে বিলাস-স্রোত যেরূপ অপ্রতিহত প্রভাবে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে ইংলন্ডের সভ্যতা যে শীঘ্র ভাঙিয়া চুরিয়া যাইবে তাহার সম্ভাবনা দেখিতেছি। বিলাসের শীতল ছায়ায় লালিত পালিত হইয়া এখন সেখানে কেহ যুদ্ধ প্রভৃতি গোলযোগে প্রবৃত্ত হইতে চাহিতেছে না। ক্রমেই তাহারা আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া পড়িবে। আমাদের দেশে অর্থ অধিক উপার্জিত হইলে বিলাস-বৃদ্ধির অধিকতর সম্ভাবনা, কিন্তু সে অনেক দিনের কথা। উত্থান-পতন-শীল কালের তরঙ্গে কত কী গঠিত হইবে ও কত কী বিপর্যস্ত হইয়া যাইবে, তাহা নিঃসংশয়ে স্থির করা সাধ্যাতীত। ভবিষ্যতের অন্ধকারময় পথে কী কী ঘটনা আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে তাহা দেখা অতিশয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কর্ম। কিন্তু এখনকার মতো আমাদের অর্থ নহিলে চলিতেছে না, এবং শীঘ্রই যে অর্থ উপার্জিত হইবে তাহার সম্ভাবনা দেখিতেছি। এক হিসাবে আমাদের অভাব অত্যন্ত উপকারী। অভাব না থাকিলে দেশের বাহিরে যাইবার প্রয়োজন হয় না, এবং একটি প্রদেশের ক্ষুদ্র সীমায় জ্ঞানও সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। বাণিজ্যদ্রব্যের সঙ্গে সঙ্গে দেশ-বিদেশ হইতে জ্ঞানও আহৃত হয়। এইরূপে নানা দেশের ধন লইয়া দেশ ধনশালী হয় এবং নানা জাতির জ্ঞান লইয়া জাতিও জ্ঞানশালী হয়। এইজন্য বলিতেছি যে, দারিদ্র্য প্রবল ও গবর্নমেন্ট অনুদার হইয়া আমাদের দেশের মূলে অনিষ্ট হইতেছে না, বরং তাহা দূরবর্তী মঙ্গলকে আহ্বান করিতেছে।

এক্ষণে একটি কথা উঠিতে পারে যে, নানা বাহ্য কারণে ও জলবায়ুর প্রভাবে বাঙালিদের এরূপ স্বভাব হইয়া গিয়াছে যে, বরং তাহারা না খাইয়া মরিবে, তথাপি পরিশ্রম করিয়া তাহা নিরাকরণ করিবে না, তবে অভাবে তাহাদের কী উপকার হইবে? কিন্তু বিদ্যা যতই প্রচার হইবে, ততই সে-সকল বাধা দূর হইবে। কর্তব্য-জ্ঞানে মনের এমন বল জন্মে যে, বাহিরের অনেক বাধা তাহার কোনো অনিষ্ট করিতে পারে না। এখন দেখা যাইতেছে যে, শিক্ষিতদের মধ্যে অনেকের বাণিজ্যের প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে বাণিজ্য বহুলরূপে প্রচারিত হইলে জন-সাধারণ শীঘ্রই তাঁহাদের অনুগামী হইবে।

আমাদের উন্নতির দ্বিতীয় বাধা জলবায়ু। ভাবিয়া দেখিলে ইহাই প্রতীতি হইবে যে, আমাদের দেশের জলবায়ু কিছু এত মন্দ নহে যে, তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার কোনো উপায় নাই। আমাদের দেশে পরিশ্রম করিলেই বল সঞ্চয় করিতে পারা যায়। পল্লীগ্রামের শ্রমশীল কৃষকেরা তো দুর্বল নহে। আমাদের মনে উদ্যম জ্বলিয়া উঠিয়াছে, কেবল দুর্বল শরীর তাহার বাধা দিতেছে; কিন্তু এদেশীয় কৃষকদের ন্যায় যদি বল লাভ করা যায় তাহা হইলে আমাদের শরীর আমাদের মনকে সাহায্য করিবে। কর্তব্য জ্ঞান ও শিক্ষা -বলে বলীয়ান হইয়া শ্রমসাধ্য বিষয়ের প্রতি আমাদের অরুচি অন্তর্হিত হইবে। মন বৃদ্ধ হইয়া গেলেই শরীর বৃদ্ধ হয়, আমাদের দেশে অল্প-বয়সেই মহা বিজ্ঞ রকমের চাল-চুল প্রকাশ পাইতে থাকে। যতদিন নাচিয়া হাসিয়া, ক্রীড়া করিয়া কাটাইয়া দেওয়া যায়, ততদিন মনে বার্ধক্যের মরিচা পড়িতে পারে না। যাহা হউক,

আমাদের দেশের উন্নতির পক্ষে যে দুইটি বাধা বদ্ধমূল হইয়া আছে, তাহা নষ্ট করিবার তেমনি দুইটি অমোঘ উপায় আছে— ব্যবসায় ও ব্যায়াম।

ভারতী
মাঘ ১২৮৪

ইংরাজদিগের আদব-কায়দা

ইংরাজদিগের এবং য়ুরোপীয় অন্যান্য দেশের আদব-কায়দার কাছে আমাদের দেশের আদব-কায়দা ঘেঁষিতেও পারে না। য়ুরোপে সকলই যেমন যন্ত্রে নির্বাহিত হয়, তেমনি হৃদয়ের ভাবও য়ুরোপীয়েরা এমন যন্ত্রবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে যে, দুঃখ না হইলেও তাহারা দুঃখ প্রকাশ করিতে পারে, হাসি না পাইলেও হাসিতে পারে। ভদ্রতার ভাব হইতে যে-সব নিয়ম প্রসূত তাহাকেই তো আদব-কায়দা বলে? তোমার নিয়ম বাঁধা থাক্ বা না থাক্, যাহারা ভদ্র তাহারা কখনো অভদ্রতা করিতে পারে না। তাহারা স্বাভাবিক অবস্থায় পরের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে তাহাই ভদ্রতা। আমাদের হিন্দুজাতির অত আইনকানুন নাই, অথচ স্বাভাবিক ভদ্রতার ভাব এমন আর কোথাও দেখিবে না। আমাদের দেশে তো এত নিয়মের বাঁধাবাঁধি নাই, তবুও তো মনিয়র উইলিয়াম্‌স কহিয়াছেন, ভারতবর্ষের ছোটোলোকেরাও এমন ভদ্র শান্ত প্রভুভক্ত, যে য়ুরোপে তাহার তুলনা পাইবে না। ইংরাজদিগের আচার-ব্যবহার আমাদের কাছে অনেক কারণে নূতন ও আমোদজনক লাগিবে।

ইংলন্ডে প্রণামের স্থলে শেক্-হ্যান্ড করিবার সময় স্ত্রীলোকরাই প্রথম হাত বাড়াইয়া দেন। তোমার অপেক্ষা মান-মর্যাদায় যিনি বড়ো তাঁহার প্রতি তুমি প্রথমে হাত বাড়াইতে বা গ্রীবা নত করিতে পার না। যাহাদের সঙ্গে তুমি আলাপ-পরিচয় রাখিতে ইচ্ছা কর না, তাহারা যদি তোমাকে প্রকাশ্যে অভিবাদন করে, তবে তুমি ফিরাইয়া না দিতেও পার। কিন্তু ইংরাজি আদব-কায়দাজ্ঞ ব্যক্তি কহেন— তাহা অপেক্ষা অভ্যস্ত-উপেক্ষার সহিত তাহার প্রণাম ফিরাইয়া দেওয়াই ভালো। কিন্তু তাই বলিয়া কোনো পুরুষ কোনো অবস্থায় স্ত্রীলোকের অভিবাদন উপেক্ষা করিতে পারেন না। স্ত্রীলোক ইচ্ছা করিলে কোনো পুরুষকে ওরূপ উপেক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু কোনো অবিবাহিতা স্ত্রী বিবাহিতা স্ত্রীর অভিবাদন ওরূপ অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। যদি কোনো ব্যক্তি নিমন্ত্রণ-সভায় কোনো মহিলাকে বিশেষ যত্ন করিয়া থাকেন, তাঁহার সহিত অধিক গল্প করিয়া থাকেন বা আহার-স্থানে হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া থাকেন, তবে তাহার পরদিন কোনো প্রকাশ্য স্থানে দেখা হইলে সে মহিলা সে ভদ্রলোকটির প্রতি সম্মান-প্রদর্শনার্থ গ্রীবা নত করিতে পারেন। অনেক সাহেব ভারতবর্ষীয়দের অভিবাদন, মাথা কাঁপাইয়া বা টুপি ছুঁইয়া মাত্র ফিরাইয়া দেন, কিন্তু ভালো আদব-কায়দা অমন হোমিওপ্যাথিকমাত্রায় প্রণাম করিতে পরামর্শ দেন না, সম্পূর্ণরূপে টুপি না খুলিয়া যদি অভিবাদন করিতে চাও, তবে তাহার চেয়ে না করাই ভালো। যাহার সহিত শেক্-হ্যান্ড করিতে চাও, তাহার সহিত দেখা হইলে বাম হস্তে টুপি খুলিতে হইবে ও ডান হস্তে শেক্-হ্যান্ড করিতে হইবে। পথে আসিতে আসিতে কোনো পরিচিতা মহিলা যদি তোমার সম্মুখে আসিয়া পড়েন, তবে কথা কহিবার জন্য তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার পথ বন্ধ করিয়ো না, যেদিকে তিনি যাইতেছেন তাহা তোমার গম্য পথের বিপরীত দিক হইতে পারে, কিন্তু মহিলার পাশে পাশে সে দিকেই তোমার যাওয়া উচিত, পরে কথা শেষ করিয়া তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা করিয়ো। যে মহিলার সহিত তুমি কথা কহিবে না, তাঁহার সহিত যদি দেখা হয়, তবে, তিনি যদি ডান দিকে থাকেন তবে বাম হস্তে বা যদি বাম দিকে থাকেন তবে ডান হস্তে টুপি খুলিতে হইবে অর্থাৎ যে হস্ত মহিলা হইতে অধিক দূর, সেই হস্তে টুপি খুলিতে হইবে।

ঘোড়ায় চড়িয়া যাইবার সময় যদি কোনো পদাতিক-মহিলার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তবে ঘোড়া হইতে নামিয়া তাহার লাগাম ধরিয়া মহিলার সঙ্গে সঙ্গে গিয়া কথা কহিবে, ঘাড় উঁচু করিয়া কথা কহিবার কষ্ট যেন মহিলাকে না দেওয়া হয়। কোনো মহিলার সঙ্গে সঙ্গে চলিবার সময় তাঁহার হস্তে পুস্তক প্রভৃতি যাহা-কিছু থাকিবে তাহা তুমি বহন করিবে। যদি চুরট খাইতে খাইতে পথে আইস, তবে কোনো মহিলার সহিত কথা কহিতে হইলেই তাহা ফেলিয়া দিয়ো। শেক্-হ্যান্ড করিতে হইলে যাহাকে শেক্-হ্যান্ড করিবে, তাহার খুব কাছে না আসিলে হাত বাড়াইয়ো না, দূর হইতে হাত বাহির করিয়া আসিলে বড়ো ভালো দেখায় না। মহিলারা আসিলে ভদ্রলোকদিগকে উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে, কিন্তু পুরুষেরা আসিলে মহিলাদিগকে উঠিতে হয় না। অগ্নিকুণ্ডের (Fire place) কাছাকাছি যাইবার জন্য তুমি এক চৌকি ছাড়িয়া আর-এক চৌকিতে যাইতে পার না। গৃহের কর্ত্রী তোমাকে যদি কাহারো সহিত পরিচিত করিয়া দেন, তবে তুমি তাহার প্রতি গ্রীবা নত করিবে, তবে যদি সে ব্যক্তি কর্ত্রীর বিশেষ আত্মীয় বা পুরাতন বন্ধু হয় ও কর্ত্রী যদি তাহার সহিত তোমার বিশেষ আলাপ করিয়া দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে শেক্-হ্যান্ড করিতে পার। মহিলারা পুরুষের প্রতি হাত বাড়াইয়া দেন বটে, কিন্তু হাত নাড়েন না, মহিলার হস্ত লইয়া নাড়িয়া দেওয়া পুরুষের কর্তব্য কর্ম। যুবতীরা অবিবাহিত পুরুষের প্রতি কেবলমাত্র গ্রীবা নত করিবেন। যখন কাহারো সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছ, যতক্ষণ থাকা প্রয়োজন ততক্ষণ থাকিয়াছ, এমন সময়ে যদি অন্য আগন্তুক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়া পাঠায়, তাহা হইলে তখনই তুমি উঠিয়া যাইয়ো না; যখন অভ্যাগতগণ চৌকিতে আসিয়া বসিল, তখন গৃহের কর্ত্রীর নিকট বিদায় লইয়া এবং নবাগতদিগকে অতি নম্র নমস্কার করিয়া চলিয়া যাইবে। হয়তো কর্ত্রী তোমাকে বসিবার জন্য অনুরোধ করিবেন, কিন্তু একবার যখন উঠিয়াছ, তখন আবার বসিতে গেলে বড়ো ভালো দেখাইবে না। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময় যদি ঘড়ি দেখিবার প্রয়োজন হয় তবে 'অন্য কাজ আছে এইজন্য ঘড়ি দেখিতেছ' এই বলিয়া কারণ দর্শাইয়া ও অনুমতি লইয়া তুমি ঘড়ি দেখিবে। কোনো মহিলা বিদায় লইতে উঠিলে পুরুষেরও উঠিয়া দাঁড়াইতে হয়, এবং যদি তাঁহার নিজের বাড়ি হয় তবে গাড়িতে পৌঁছিয়া দিতে হয়। অভ্যাগত আইলে বিশেষ সম্ভ্রম দেখাইবার ইচ্ছা না থাকিলে মহিলারা অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবেন না, যদি তিনি এক পদ মাত্র অগ্রসর হইয়া তাহাকে শেক্-হ্যান্ড করেন ও সে না বসিলে না বসেন, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে। অভ্যাগতগণ বিদায় লইবার সময় উঠিলে মহিলাকেও উঠিতে হইবে ও যতক্ষণ না তাঁহারা ঘর হইতে বাহির হইয়া যান ততক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবেন, কিন্তু ঘরের সীমা পর্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইবার কোনো প্রয়োজন নাই। নিজে যে চৌকিতে বসিয়া থাক, নিজে না বসিয়া সম্ভ্রম প্রদর্শনের জন্য সে চৌকি কাহাকেও বসিবার জন্য দিয়ো না, তবে যদি অন্য চৌকি না থাকে সে এক আলাদা কথা। এই তো গেল প্রণাম নমস্কার প্রভৃতি সম্ভ্রম প্রদর্শনের রীতি নীতি। এক্ষণে দেখা-সাক্ষাৎ করিবার নিয়ম-অনিয়মের বিষয় লিখি।

সকল সময়েই দর্শকদিগকে অভ্যর্থনা করাই ভদ্রতার নিয়ম। যদি তোমার হাতে সর্বদা কাজ থাকে, তবে চাকরদিগকে বলিয়া রাখিয়ো তাহারা আগন্তুকদিগকে বলিবে যে, প্রভু অমুক দিন বা অমুক সময় ব্যতীত কখনো ঘরে থাকেন না। যদি দৈবক্রমে ভৃত্য কাহাকেও ঘরের মধ্যে আনিয়া থাকে তবে যত অসুবিধাই হোক-না কেন, তাহাকে অভ্যর্থনা করাই উচিত। কোনো মহিলা আগন্তুকদিগকে অপেক্ষা করাইয়া রাখিবেন না। ছাতা এবং 'ওভার-কোট্' 'হলে' রাখিয়া দেখা করিতে যাইতে হইবে।

'মর্নিং-কল' অর্থাৎ দিনের বেলায় দেখা-সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া বিকাল ৩টা হইতে ৫টার মধ্যেই উচিত। কারণ আহারাদি ও সাজগোজ করিবার সময় দেখা করিতে গেলে বড়ো অসুবিধা হয়।

দেখা করিতে যাইবার সময় টুপি খুলিয়া টেবিল বা অন্য কোনো দ্রব্যের উপর রাখা উচিত

নহে, টুপি হাতে করিয়া রাখিতে হইবে, অথবা যদি রাখিতেই হয় তবে ভূমির উপর রাখা উচিত। 'মর্নিং কল' করিতে যাইবার সময় শখের কুকুর সঙ্গে লইয়া ঘরে যাইয়ো না, কারণ তাহারা চেঁচামেচি করিতে পারে, অথবা কোনো লেডির গাউনের উপর বা মকমলের কৌচের উপর শুইতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ না করিতে পারে। অথবা গৃহের কর্ত্রীর সাধের বিড়ালটি হয়তো অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে ঘুমাইতেছে, তাহার সহিত অনর্থক একটা বিবাদ বাধাইতে পারে। যদি কোনো মহিলা কাহারও সঙ্গে দেখা করিতে যান, তবে তিনি যেন তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছেলেপিলে সঙ্গে লইয়া না যান। কারণ, যাহার সঙ্গে দেখা করিতে যান সে বেচারীর হয়তো বুক ধড়াস ধড়াস করিতে থাকে, পাছে তাঁহার 'আলবাম' ছিঁড়িয়া ফেলে বা তাঁহার সাধের প্রস্তর-মূর্তিটি অঙ্গহীন করিয়া ফেলে। তোমার যদি গাড়ি না থাকে তবে বাদলার দিনে কাহারও সঙ্গে দেখা করিতে যাইয়ো না, কারণ তুমি যদি ভিজা কোটে ও কাদা-মাখা জুতায় কাহারও ঘরের কার্পেটের উপর বিচরণ কর তবে গৃহের কর্ত্রীর বড়োই মন খারাপ হইয়া যাইবে। লোকাকীর্ণ ঘরে গেলে প্রথমে গিয়াই গৃহের কর্ত্রীকে সম্ভ্রম জানানো আবশ্যক, পরে অন্য কাজ। কোনো মহিলা কাজকর্ম ছাড়া আর কোনো কারণে ভদ্র লোকদের সঙ্গে দেখা করিতে যাইতে পারেন না। বন্ধুত্বের সাক্ষাতে বড়ো অধিক কালব্যয় করিয়ো না, বড়ো জোর আধ ঘণ্টা কথাবার্তা কহিবে। আদব-কায়দাজ্ঞ ব্যক্তিরা কহেন যে, তুমি এতটুকু থাকিবে যাহাতে বন্ধুগণ তুমি এত শীঘ্র চলিয়া গেলে বলিয়া কষ্ট পান, কিন্তু দেরি করিতেছ বলিয়া মনে মনে তোমার বিদায় প্রার্থনা না করেন। কাহারও সামাজিক সাক্ষাৎ (অর্থাৎ যে সাক্ষাৎ বিশেষ নিয়মানুসারে করিতেই হয়, বন্ধুত্ব অথবা অন্য প্রকারের সাক্ষাৎ নহে) ফিরিয়া দিবার সময় ঘরের মধ্যে না গিয়া একটা কার্ড রাখিয়া গেলেও হয়। কিন্তু অমনি বাড়ির লোকেরা কেমন আছেন, সে সংবাদটা লইয়ো। আবার যে মহিলার সঙ্গে তুমি দেখা করিতে গিয়াছ তাঁহার সঙ্গে যদি তাঁহার ভগিনী বা কন্যাগণ থাকেন, তবে প্রত্যেককে আলাদা আলাদা কার্ড দিতে হইবে। অথবা যদি বাড়িতে অন্য অভ্যাগত উপস্থিত থাকেন, তবে কাহাকে কার্ড পাঠাইতেছ, তাহা বিশেষ করিয়া জানাইবার জন্য তোমার নামের উপর তাঁহার নাম লিখিয়ো। কাহারও শোকে শোক প্রকাশ করিবার জন্য যে সাক্ষাৎকারের নিয়ম আছে, তাহা শোকের ঘটনা ঘটিবার পরে সপ্তাহের মধ্যে পালন করা উচিত। তোমার যদি বিশেষ আত্মীয় বন্ধু না হন তবে কার্ড পাঠাইয়া দিয়ো। কাহারও আনন্দে আনন্দ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত সাক্ষাৎ করিতে হইলে কার্ড না পাঠাইয়া নিজে যাইয়ো। যে বন্ধু বা আলাপীর বাড়িতে নিমন্ত্রণে গিয়াছ, বা যাহাদের নিমন্ত্রণের চিঠি পাইয়াছ, সপ্তাহের মধ্যে তাহাদের সহিত দেখা করিয়ো। দেশে আগমন ও বিদায় -বার্তা জানানো ভিন্ন অন্য কোনো কারণে চাকরের হস্তে কার্ড পাঠানো বড়োই অসম্ভ্রম প্রদর্শনের চিহ্ন।

কার্ডের উপর নাম ধাম সমস্ত লিখা থাকিবে। সাক্ষাৎ করিবার কার্ড খুব সাদাসিদা হওয়া উচিত, চকচকে কার্ডের 'ফ্যাশান' এখন আর নাই। নিজের নামের সহিত খেতাব প্রভৃতি যেন না থাকে, সাদাসিদা 'ইটালিক' অক্ষরে নাম লিখা থাকিবে, 'রোমান' বা অন্য প্রকার ঘোর-ফের অক্ষরে যেন নাম লেখা না হয়। 'কন্টিনেন্টে' অর্থাৎ ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে নামের পূর্বে 'মশিও' বা 'মিস্টর' বা 'মিস' প্রভৃতি লেখে না, ইংলন্ডেও কেহ কেহ তাহার অনুকরণ করেন। নিজের হাতের লেখার অনুরূপ অক্ষরে নাম লিখিলে, হাস্যাস্পদ হইতে হয়। তবে বড়ো বড়ো প্রতিভাসম্পন্ন লোক, যাঁহাদের হাতের অক্ষর দেখিতে লোকের কৌতূহল জন্মে, তাঁহারা এরূপ করিতে পারেন; জন্ স্টুয়ার্ট মিল বা কার্লাইলের হাতের অক্ষরের কার্ড শোভা পায়, অন্য লোকের নহে। শোকগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের কার্ডের চারি দিকে কালো ঘের থাকিবে। অবিবাহিতা কুমারী যাঁহারা পিত্রালয়ে বাস করিতেছেন, তাঁহাদের আর স্বতন্ত্র কার্ডের প্রয়োজন নাই। কার্ডে তাঁহাদের মাতার নামের নিম্নে নিজের নাম লিখা থাকিবে। যেমন

Mrs Charles Gilbert
Miss Charles Gilbert

কোনো কোনো বিবাহিত সস্ত্রীক দেখা করিতে আইলে উভয় নামের একটি কার্ড ব্যবহার করেন; যেমন Mr. & Mrs. Stewart Austin। পরিবারের কাহারও মৃত্যু হইলে ইংরাজেরা অনেক সময়ে কার্ড পাঠাইয়া সেই সংবাদ দেন; সেই কার্ডে মৃত ব্যক্তির নাম, বয়স, জন্মস্থান, বাসস্থান ও কবরস্থান লিখিত থাকে। বিদায় লইবার কার্ডের এক কোণে P.P.C. (pour prendre congé) অথবা P.D.A. (pour dire adieu) এই অক্ষর তিনটি খোদিত থাকে।

বিদেশ হইতে নবাগত ব্যক্তি যদি তোমার বন্ধুর পরিচয়-পত্র (Letter of introduction) তোমার কাছে পাঠাইয়া দেয়, তবে তাহার পরদিন গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়ো। দেখা করিয়া তাহার পরেই তাঁহাকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিবে। যদি তেমন ক্ষমতা না থাকে, তবে তাঁহাকে লইয়া সংগীতালয় পশুশালা প্রভৃতি দেশে যাহা-কিছু দেখিবার স্থান আছে লইয়া যাইয়ো। যাহাকে কাহারও নিকট পরিচিত করিবার নিমিত্ত পরিচয়-পত্র লিখিবে, তাহার চরিত্রের বিষয় কিছু লিখিবার আবশ্যক নাই। চরিত্রের বিষয় কিছু না বলিলেও বুঝায় যে, যাহাকে তুমি তোমার বন্ধুর সহিত পরিচিত করিতে চাও, তাহাকে অবশ্য তোমার বন্ধুর পরিচয়ের যোগ্য মনে করিতেছ। শুদ্ধ এই লিখিলেই যথেষ্ট যে— 'অমুক ব্যক্তি তোমার বন্ধু হইলেন, ভরসা করি তোমার অন্যান্য বন্ধুরা তাঁহাকে আদরের সহিত গ্রহণ করিবেন।'

ভারতী
জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫

নিন্দা-তত্ত্ব

নিন্দা কাকে বলে জিজ্ঞাসা করলেই লোকে বলে, পরের নামে দোষারোপ করাকে নিন্দা বলে। লোকে তাই বলে বটে, কিন্তু লোকে তাই মনে করে না। কে এমন আছে বলো দেখি যে, সে তার জীবনের প্রতিদিনই পরের নামে দোষারোপ না করে? পর যত দিন দোষ করতে ক্ষান্ত না হবে, তত দিন দোষারোপের মুখ বন্ধ হবে না। যে হিসেবে সকল মানুষই স্বার্থপর, সে হিসেবে সকল মানুষই নিন্দুক। প্রতি মানুষের জীবনের সমস্ত কাজ তুমি রাশীকৃত করে পরীক্ষা করে দেখো, দেখবে, যে খনিতে জন্মেছে তার গায়ে তার মাটি লেগে থাকবেই থাকবে। স্বার্থ যখন স্বার্থপরতার সাধারণ সীমা ছাপিয়ে ওঠে, তখনই আমরা তাকে স্বার্থপরতা বলি। নিন্দাও ঠিক তাই।

যদি বল যে, মিথ্যা দোষারোপ করাকেই নিন্দা বলে, তা হলে নিন্দার অর্থ অসম্পূর্ণ থেকে যায়! মিথ্যা নিন্দা নিন্দার একটা অংশ মাত্র। কে না জানে, এমন অনেক সময় আসে, যখন পর-নিন্দা শোনবার কষ্ট আমাদের নীরবে ধৈর্য ধরে সহ্য করতে হয়, কেননা আমাদের কোনো কথা বলবার থাকে না, নিন্দুক ব্যক্তি প্রতি মুহূর্তে বলছে 'সত্য কথা বলছি, তার আর কী!' কিন্তু সে সহস্র সত্য কথা বলুক-না কেন, তবুও নিন্দুক বলে তার উপর কেমন এক প্রকার ঘৃণা জন্মে।

কিন্তু কেন? সত্যি কথা বলছে, তবু কেন তাকে নিন্দুক বল? তার একটা কারণ আছে। সত্য হোক, মিথ্যা হোক, আমরা উদ্দেশ্য বুঝে নিন্দার নিন্দা করি। সকলেই স্বীকার করেন পরের প্রশংসা করা মাত্রকেই খোশামোদ বলে না। যখন কারও সদ্‌গুণ দেখে আমাদের উচ্ছ্বসিত হৃদয় থেকে প্রশংসা বেরোয় তখন, অবিশ্যি তাকে কেউ খোশামোদ বলে না। কিন্তু যখন তুমি তোমার নিজের স্বার্থ বা অন্য কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রশংসা কর, সে প্রশংসা সত্য হলেও তাকে খোশামোদ বলে। নিন্দার সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাগুলি খাটে। তুমি একজনের কুকার্য দেখে ঘৃণায় অভিভূত হয়ে যদি বজ্রকণ্ঠে তার বিরুদ্ধে তোমার স্বর উত্থাপন কর, তা হলে নিন্দিত ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ তোমাকে নিন্দুক বলবে না। কিন্তু যখন দেখছি নিন্দা করতে আমোদ পাচ্ছ বলে তুমি

নিন্দা করছ, কাল যদি পৃথিবীতে সমস্ত কুকার্য রহিত হয় তা হলে তোমার জীবনের সুখের একটা উপাদান বিনষ্ট হয়, তা হলে তুমিও হয়তো অকাতরে তাদের সঙ্গে সহমরণে যাবার আয়োজন করতে পারো, তখন তুমি যুধিষ্ঠিরের চেয়ে সত্যবাদী হও-না-কেন, নিন্দুক বলে আমি তোমার সঙ্গে কথাবার্তা রহিত করি। যখন তুমি সত্য কথা বলবার জন্য নিন্দা কর না, কেবল নিন্দা করবার জন্য সত্য কথা বল, তখন তোমার সে সত্য কথা নীতির বাজারে মিথ্যা কথার সমান দরেই প্রায় বিক্রি হবে। অতএব নিন্দার যদি একটা বাঁধাবাঁধি ব্যাখ্যা স্থির করতে যাও, তা হলে বলা যেতে পারে যে, বিনা উদ্দেশ্যে বা হীন উদ্দেশ্যে পরের নামে সত্য বা মিথ্যা দোষারোপ করাকে নিন্দা বলে।

পরের নামে দোষারোপ করতে ও পরের নিন্দা শুনতে সাধারণত লোকের কেন অত ভালো লাগে? এক-এক সময়ে ভেবে দেখতে গেলে আশ্চর্য হতে হয়। মানুষের মনে সৌন্দর্যপ্রিয়তা সর্বদাই জেগে রয়েছে। বীভৎস-আবর্জনা-রাশি দেখতে তো আমাদের আমোদ বোধ হয় না, তবে পরের নিন্দে শুনতে কেন অত তৃপ্তি? অনেক দূর পর্যন্ত অনুসন্ধান করে এর মূল দেখতে গেলে আত্মশ্লাঘায় গিয়ে পৌঁছিতে হয়। নিন্দে শুনলে অলক্ষিত ভাবে আমাদের মনে হয় যে, আমি হলে এ কাজটা করতেম না, কিংবা আমি যে দোষ করে থাকি, অমুক লোকেরও তা আছে, অমুক লোকের চেয়ে আমি ভালো কিংবা আমি একলাই কেবল দোষী নই, এই দুটো কথা অজ্ঞাতসারে আমাদের মনে এক প্রকার গর্ব-মিশ্রিত তৃপ্তি জন্মিয়ে দেয়। সকল মানুষের মনেই সৌন্দর্যপ্রিয়তার ভাব রয়েছে বটে, কিন্তু শিক্ষা ও চর্চায় যে তার উন্নতি হয়, সে বিষয়ে তো আর কোনো সন্দেহ নেই। তুমি হয়তো চর্মচক্ষে একটা কুশ্রী জিনিস দেখতে পার না, কিন্তু তোমার হয়তো সৌন্দর্যপ্রিয়তা এত দূর প্রস্ফুটিত হয় নি, যে কুগুণ বা কুনীতির মতো একটা নিরাকার পদার্থের অসৌন্দর্য বা কুশ্রীত্ব তোমার মনে তেমন আঘাত দেয়। সুশিক্ষার গুণে সৌন্দর্যপ্রিয়তা যখন তোমার মনে যথেষ্ট বিকসিত হবে, তখন একটা কদাচরণের কথা শুনলে ঘৃণায় তোমার গা শিউরে উঠবে কিংবা লজ্জা ও সংকোচে তোমার মাথা হেঁট হয়ে যাবে বটে কিন্তু সেই কথা শুনে তোমার আমোদ বোধ হবে না, বা সেই কথা নিয়ে অবকাশের সময় বৈঠকখানায় বসে দশ জনের কাছে দশটা রসিকতা ও হাস্য-পরিহাস করতে রুচি হবে না। কিন্তু সৌন্দর্যের ভাব কজন লোকের মনে এমন প্রস্ফুটিত?

নিন্দা বিশ্বাস করবার দিকে আমাদের কেমন একটা টান আছে। একটা নিন্দা শুনলে আমরা প্রায় তার প্রমাণ জিজ্ঞাসা করি নে, আসল কথা হচ্ছে জিজ্ঞাসা করতে চাই নে। বোধ হয় আমাদের মনে মনে এক প্রকার সূক্ষ্ম ভয় থাকে, পাছে তার ভালো প্রমাণ না থাকে। নিন্দা বিশ্বাস করবার দিকে সাধারণের এত অনুরাগ যে, চণ্ডীমণ্ডপের বিচারালয়ে নিন্দিত ব্যক্তি অপেক্ষা নিন্দুকের সাক্ষী অধিকতর প্রামাণ্য বলে গৃহীত হয়। তুমি রাধামাধবের নামে আমার কাছে একটা দোষোত্থাপন করলে, আমি কোনো প্রমাণ না জিজ্ঞাসা করেও তা বিশ্বাস করলেম, তার পরে রাধামাধব যদি বলতে আসে যে, আমি কোনো দোষ করি নি, তা হলে আমি হয়তো প্রমাণ না পেলে তা ঝট্‌ করে বিশ্বাস করি নে। নিন্দিত ব্যক্তির অত্যন্ত সংকটের অবস্থা। আমরা সহজেই মনে করি, যে দোষী ব্যক্তি তো স্বভাবতই আপনার দোষ ক্ষালন করতে চেষ্টা পাবেই। সুতরাং আমরা তার কথায় কান দিই নে। অনেক সময়ে 'দোষ করি নি' ছাড়া আমাদের আর কিছু বক্তব্য থাকে না, আমরা অনেক সময়ে বিশেষ কতকগুলি গোপনীয় কারণে নির্দোষিতার প্রমাণ থাকতেও তা আমরা প্রমাণ করতে পারি নে। এ রকম অবস্থায় দায়ে পড়ে 'দশচক্রে ভগবান ভূত' হয়ে পড়েন। আমরা যে নিন্দা বিশ্বাস করতে ভালোবাসি তার আর-একটা প্রমাণ এই যে, মনে করো হরিহর রামধনের নামে তোমার কাছে একটা নিন্দা করেছে, তুমি সেটা বিশ্বাস করেছ ও সেই অবধি পরম আমোদে আছ, এবং দু-দশ জন বন্ধুর কাছে গল্প করেছ; আমি যদি আজ এসে তোমাকে বলি যে, হরিহর লোকটা অত্যন্ত নিন্দুক, তার কথা বিশ্বাস করবার যোগ্য নয়, তা হলে

তুমি কোনোমতে তা বিশ্বাস কর না, তুমি বলো, 'না, না, তা কি হয়? লোকটা কি একেবারে খাঁটি মিথ্যে কথা বলতে পারে?' কী আশ্চর্য! হরিহরের মুখে তুমি যখন রামধনের নিন্দের কথা শুনেছিলে, তখন তো তুমি প্রশংসনীয় উদারতার সঙ্গে বল নি যে, 'না, না, তা কি হয়! সে লোকটা কি এমন কাজ করতে পারে?' একটা নিন্দা তুমি অতি সহজে গলাধঃকরণ করলে, কিন্তু আর-একটা সেই শ্রেণীর নিন্দেই কেন তোমার গলায় হঠাৎ বাধল? এর কারণ অবশ্য সকলেই বুঝতে পারছেন। তিনি পরম আনন্দে একটি সুস্বাদ নিন্দা উপভোগ করছিলেন, আর তুমি কি না আর-একটি নীরস নিন্দা তাঁর হাতে দিয়ে সেটি তাঁর মুখ থেকে কেড়ে নিতে চাও? যে নিন্দুকের মুখ থেকে তিনি অমৃত পান করেন, তাকে তুমি আর যা খুশি বলে নিন্দে করো, কিন্তু মিথ্যেবাদী বলে খবরদার নিন্দে কোরো না, তা হলে তুমিই মিথ্যেবাদী হয়ে দাঁড়াবে।

বিশ্বাস-পরায়ণতা মনের সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থা। যাঁরা পরনিন্দা শুনলে অতি সহজেই তা বিশ্বাস করেন, তাঁদের হয়তো তুমি বিশ্বাস-পরায়ণ বলবে। আমি তো ঠিক তার উল্টো বলি। যেমন তুমি যখন বল, আমি চার দিক অন্ধকার দেখছি, তখন তার অর্থ বোঝায়, আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে, অর্থাৎ অন্ধকার দেখা, কিছু না-দেখার ভাষান্তর মাত্র, তেমনি নিন্দা-বিশ্বাসিতা, অবিশ্বাসিতার অন্য একটি নাম। তুমি দেখতে পাবে, সন্দিগ্ধ ও কুটিল হৃদয়েরাই নিন্দা নিয়ে লেনা-দেনা করে থাকেন। তুমি যথার্থ সরল ও অসন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তির কাছে কারও নিন্দা উত্থাপন করো, তিনি বলে উঠবেন, 'না, না, এমনও কি মানুষে করতে পারে।' মানুষের চরিত্রের উপর তাঁর এত বিশ্বাস যে, তিনি, কেহ যে খারাপ কাজ করেছে, তা শীঘ্র বিশ্বাস করতে পারেন না। মনে করো, তোমার এক পরিচিত ব্যক্তি অত্যন্ত ধার্মিক, তাঁকে তুমি প্রত্যহ দুই সন্ধে দেবপূজা করতে দেখ, আমি তোমাকে একদিন কানে কানে ফুসফুস করে বললেম যে, চক্রবর্তীমশায় বৃহস্পতিবারে গোমাংস খেয়েছেন, অমনি তুমি তা বিশ্বাস করলে; তুমি কতদূর সন্দিগ্ধহৃদয় বলো দেখি! তুমি প্রত্যহ নিজের চক্ষে তাঁর ধার্মিকতার প্রমাণ পাচ্ছ, আরেকদিন একটা কানে কানে কথা শুনেই সে-সমস্ত তুমি অবিশ্বাস করলে? চণ্ডীমণ্ডপে গুটিপাঁচেক বৃদ্ধ গৃহস্বামী বসে ধূম-সেবন করছেন, চাণক্যের শ্লোক পাঠ করে ও বয়ঃপ্রাপ্তি অবধি চণ্ডীমণ্ডপের তাম্রকূটধূমাচ্ছন্ন ও নস্যগন্ধী পর-চর্চা শুনে সংসারের বিষয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতা অসাধারণ পক্বতা প্রাপ্ত হয়েছে; রামশংকর খুড়ো তাঁদের এসে বললেন যে, মণ্ডলদের বাড়ির ছোটো বউ সমাজ-বিরুদ্ধ কাজ করেছে, তাঁরা অতি অল্প পরিশ্রমে সমস্ত সিদ্ধান্ত করে মহা বিজ্ঞভাবে বললেন যে, 'কিছু আশ্চর্য নয়, কারণ, "বিশ্বাসং নৈব কর্তব্যং স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ"।' তাই তো বলি, নিন্দা বিশ্বাস করা সন্দিগ্ধ হৃদয়ের লক্ষণ। তবে কেউ কেউ আছেন, যাঁরা দূর অপেক্ষা আশু, অনুপস্থিত অপেক্ষা উপস্থিত, ও নিজের চোখের দেখা অপেক্ষা পরের মুখের কথা অধিক বিশ্বাস করেন। এখন তুমি তাঁকে একটি খবর দেও, তা বিশ্বাস করতে তাঁর যত পরিশ্রম ও সময় ব্যয় হবে, দু ঘণ্টা পরে আর-এক জন ঠিক তার বিপরীত খবর দিলে, তা বিশ্বাস করতে তাঁর তার চেয়ে কিছু অধিক হবে না। এমন লোকের শিশু-প্রকৃতির একটা ঘোরতর ভ্রমের ফল। এ দলের সম্বন্ধে আমার অধিক কিছু বক্তব্য নেই। নিন্দা অবিশ্বাস করবার ঝোঁক অনেকটা শিক্ষা ও অভ্যাস -সাপেক্ষ। এ বিষয়ে বিশেষ অভ্যাস ও বিবেচনা আবশ্যক। যে নিন্দা শুনলে তোমার মনে কষ্ট হয়, তা তুমি না বিশ্বাস করতেও পার, কিংবা যে নিন্দায় তোমার কষ্ট বা সুখ কিছুই না জন্মায়, তা তুমি বিশেষ প্রমাণ না পেলে অবিশ্বাস করতে পার, কিন্তু স্বার্থজড়িত কতকগুলি বিশেষ কারণে যে নিন্দা শুনলে তোমার আমোদ জন্মাবার সম্ভাবনা, তা বিশেষ প্রমাণ না পেয়ে বিশ্বাস না করা শিক্ষিত মনের লক্ষণ। আর-এক অবস্থায় আমরা নিন্দা অতি সহজে বিশ্বাস করি। আমরা একজন লোককে খারাপ বলে জানি, তার নামে একটা নিন্দা শুনবামাত্রেই আমরা অনায়াসে বিশ্বাস করি, আমরা মনে করি এটা কিছুই অসম্ভব নয়। সুতরাং আমরা তার আর প্রমাণ জিজ্ঞাসা করি নে কিন্তু শিক্ষিতমনা ব্যক্তিরা তখন বলেন যে, 'সমস্ত সম্ভব ঘটনা পৃথিবীতে ঘটে না।' একটা জিনিস

সম্ভব হতে পারে কিন্তু সত্য নাও হতে পারে। এক ব্যক্তি এসে যখন আমাদের কাছে একটা প্রিয়-নিন্দা উত্থাপন ক'রে বলে যে, 'এইরকম তো সকলে বলছে।' তখন আমরা আর কিছু বিচার করি নে, মনে করি 'সকলে বলছে', এর চেয়ে সুদৃঢ় প্রমাণ আর কিছুই হতে পারে না! কিন্তু, এই 'সকলে বলছে' কথাটি অত্যন্ত শূন্যগর্ভ। একজন তোমাকে এসে বললেন, সকলে বলছে অমুকে অমুক কাজ করেছে। সেখেনে 'সকলে' অর্থে তিনি যে ব্যক্তির মুখে শুনেছেন, তুমি তাঁর ধুয়ো ধরে আমাকে বললে যে, সকলে অমুক কথা বলছে। আমি অকাতরে বিশ্বাস করি যে, যখন ''সকলে বলছে'' তখন অবিশ্যি সত্যি! আমাকে একজন এসে যদি জিজ্ঞাসা করে যে, 'তুমি যে বলছ 'সকলে বলছে,' আচ্ছা, কে কে বলছে বলো দেখি?' আমি ভেবে ভেবে একজনের বেশি নাম করতে পারি নে, অবশেষে অপ্রস্তুত হয়ে আমি তোমাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি— 'ওহে, কে কে বলছে বলো দেখি?' তুমিও তথৈবচ। মূল অন্বেষণ করতে যতদূর পর্যন্ত যাও-না কেন, দেখবে তোমার চেয়ে এ বিষয়ে কারও জ্ঞান অধিক নয়। 'সকলে বলছে' কথাটা একটা সংক্রামক পীড়া। প্রথমত একজনের মুখ থেকে কথাটা বেরোয়, তার পরে দিবসান্তে সকলেরই মুখে শুনতে পাবে 'সকলে বলছে।' সকালবেলায় যে কথাটি সম্পূর্ণ অলীক ছিল, সন্ধেবেলায় সেটা সম্পূর্ণ সত্য হয়ে দাঁড়ায়। আমি একটা বিশেষ নিয়ম করেছি যে, 'সকলে বলছে' কথাটি যখনি শুনব, তখনি জিজ্ঞাসা করব 'কে কে বলছে?'

শিক্ষিত ব্যক্তিরা যখন একটা নিন্দা শোনেন তখন অনেক রকম বিচার করেন। আমরা তিন রকম ব্যক্তির কাছে নিন্দা শুনি : ১. বিখ্যাত নিন্দুক অর্থাৎ যাদের আমরা নিন্দুক বলে জানি। ২. যাদের বিষয়ে আমরা কিছুই অবগত নই। ৩. যাদের আমরা সত্যবাদী বলে জানি। প্রথমোক্ত ব্যক্তিদের মুখ থেকে যখন শিক্ষিতমনা ব্যক্তি কোনো নিন্দা শোনেন তখন তা অবিশ্বাস করতে তাঁর বড়ো পরিশ্রম হয় না। দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তির মুখ থেকে যখন শোনেন তখন তাঁর একটা ভাবনা আসে; হয়তো মনে করেন যে, 'এ লোকটার কথা অবিশ্বাস করবার আমার কী অধিকার আছে?' কিন্তু এ ভাবনা কোনো কাজের নয়, কেননা তখন আমাদের দুটো বিরোধী কর্তব্যের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। আর-এক জনের সচ্চরিত্রে অবিশ্বাস করবার আমার কী অধিকার আছে? এ রকম অবস্থায় তিনি বিশ্বাসও করেন না অবিশ্বাসও করেন না। বিশ্বাস ও অবিশ্বাস দুইয়েরই অধিকার -বহির্ভূত একটি দাঁড়াবার স্থান আছে। তিনি তখন সে নিন্দুককে বলেন যে, 'তোমার কথা সত্য হতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ প্রমাণ না পাব ততক্ষণ তা বিশ্বাস করব না।' কিন্তু তৃতীয়োক্ত ব্যক্তির মুখে যখন তিনি নিন্দা শোনেন তখন তিনি যে-সকল যুক্তি অবলম্বন করেন সে বিষয় পরে বলছি।

যাকে তিনি নিন্দুক বলে জানেন তার মুখ থেকে কোনো নিন্দা শুনলে তিনি এই-সকল বিবেচনা করেন যে, 'প্রথমত এ ব্যক্তির কোনো অভিসন্ধি থাকতে পারে, কিংবা নিন্দার অভ্যাস থাকা বশত নিন্দা করছে। দ্বিতীয়ত, একটা সত্য কথার কিয়দংশ বাদ দিলে তা মিথ্যে হয়ে দাঁড়ায়, তুমি আমাকে এসে বললে যে, অমুক মদ খেয়েছে, কিন্তু তুমি হয়তো বাদ দিলে যে, তাকে ডাক্তারেরা মদ খেতে পরামর্শ দিয়েছিল; তুমি সত্য কথা বললে বটে কিন্তু এ মিথ্যার রূপান্তর মাত্র, অতএব একটা কথার সমগ্র না শুনলে সে বিষয়ে বিচার করা যায় না। যাঁকে তিনি সত্যবাদী বলে জানেন তাঁর কাছ থেকে যখন তিনি কোনো নিন্দা শোনেন, তখন তিনি প্রথমত মনে করেন, 'ইনি হয়তো একটা গুজব শুনে তাই বিশ্বাস করছেন। বিশ্বাস করবার কী কারণ জানি না, কিন্তু হয়তো সে কারণগুলি ভ্রমাত্মক।' দ্বিতীয়ত, 'ইনি হয়তো কতকগুলি কার্য দেখে একটা নিজের অনুমান করে নিয়েছেন, সে কার্যগুলি সমস্ত সত্য হতে পারে কিন্তু সে অনুমানটা হয়তো সমস্তই অমূলক।' তৃতীয়ত, 'তিনি হয়তো তাঁর নিজের কতকগুলি বিশেষ সংস্কারবশত একটা কাজ এমন খারাপ চক্ষে দেখছেন যে, তার তিল-প্রমাণ দোষ স্বভাবতই তাঁর সুমুখে তাল-প্রমাণ আকার ধারণ করছে।' চতুর্থত, অনেক সময় অনেক জিনিস যা আমাদের কল্পনায় সত্য বলে প্রতিভাত

হয়, তা আসলে সত্য নয়। মনে করো, একজন হিন্দু একদিন রবিবারে গির্জে দেখতে গিয়েছেন, সেইদিনকার বক্তৃতায় পাদ্রি সাহেব দৈবক্রমে Heathen-দের বিরুদ্ধে দুই-এক কথা উল্লেখ করেছিলেন। সেই হিন্দু কল্পনা করলেন যে, পাদ্রি তাঁর প্রতি লক্ষ্য করেই ওই বক্তৃতাটি করেন। এই কল্পনায় তাঁকে এমন অভিভূত করে তুললে যে, তাঁর মনে হল, যেন, বক্তা একবার তাঁর দিকে বিশেষ করে চেয়ে দেখলেন ও সেই সময়েই Heathen কথাটা বিশেষ জোর দিয়ে বললেন। সেই হিন্দুটি সত্যবাদী হতে পারেন, পাদ্রি যে সেদিন হীদেনদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেছিলেন সে বিষয়ে আমি তিল মাত্র সন্দেহ করি নে, কিন্তু তিনি যে তাঁর দিকে চেয়ে হীদেন কথাটি বিশেষ জোর দিয়ে বলেছিলেন, সে বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ রয়ে গেল। এইরকম কত শত বিচার করবার জিনিস রয়েছে। আমার কাছে একবার একজন আমার এক পরিচিত ব্যক্তির নামে নিন্দা করেন, আমি তা বিশ্বাস না করাতে তিনি বলেন যে, তিনি সেই ব্যক্তির এক বাড়ির লোকের কাছে শুনেছেন। আমি তাঁকে বললেম, 'তাতে বিশেষ কিছুই প্রমাণ হচ্ছে না। বাড়ির লোক বলেছে বলে বিশ্বাস করবার একটা প্রধান প্রমাণ দেখাচ্ছ এই যে, বাড়ির লোক কখনো তার আত্মীয়ের নামে নিন্দা করে না। আচ্ছা ভালো। কিন্তু যখন দেখছ, এক-একটা "বাড়ির লোক" তার "বাড়ির লোকের" নামে নিন্দা করছে, তখন তার বাড়ির লোকত্ব পরলোকত্ব প্রাপ্ত হয়েছে! খুব সম্ভব, নিন্দিত ব্যক্তির সঙ্গে তার কোনো কারণে মনান্তর হয়েছে, তা যদি হয়ে থাকে তবে তার নামে অলীক অপবাদ রটাতে আটক কী? বাড়ির লোক যখন তার আত্মীয়ের নিন্দা করে, তখন তাকে আমি সর্বাপেক্ষা কম বিশ্বাস করি।' অনেক লোক আছেন, তাঁরা পরের অনিষ্ট করব বলে নিন্দে করেন না। তাঁরা ভদ্রলোক, তাঁরা পরের মনে কষ্ট দিতে চান না। তাঁরা যখন নিন্দা করেন তখন তার ফল বিবেচনা করে দেখেন না। তাঁরা কৃষ্ণকান্তবাবুর নামে একটা নিন্দা শুনেছেন, তাই জহরীলালের কাছে গল্প করে বললেন, 'ওহে, শোনা গেল, কৃষ্ণকান্তবাবু অমুক কাজ করেছেন।' জহরীলালের সঙ্গে কৃষ্ণকান্তের কোনো আলাপ-পরিচয় যোগাযোগ নেই, সুতরাং হঠাৎ তাঁদের মনে ঠেকতে পারে না যে, এ নিন্দায় কোনো দোষ আছে। দৈবক্রমে দূরত তার একটা কুফল ঘটতে পারে, তা তাঁরা ভেবে উঠতে পারেন না। তা ছাড়া অনাবশ্যক কারও নিন্দা করব না, এমনও একটা নিয়ম তাঁরা বাঁধেন নি। যখন দশ জন বন্ধু দশ রকম কথা কচ্ছ, তখন জিব অত্যন্ত পিছল হয়ে ওঠে, মনের কপাট আলগা হয়ে যায়, তখন বিশেষ একটা হানি না দেখলে একটা মজার কথা সামলে রাখা তাঁদের পক্ষে দায় হয়ে ওঠে। তখন তাঁদের মনে করা উচিত যে, তাঁরা রোষে একেবারে অধীর হয়ে ওঠেন কি না? তখন তাঁরা কেন মনকে বোঝান না যে, 'আমরা কেই-বা? আমাদের এক মুহূর্তের একটা কাজ একটা মানুষ কতক্ষণই বা মনে রাখতে পারবে বলো? আমরা আমাদের নিজের মনে সর্বদাই এমন জাগ্রত রয়েছি যে অন্য একটা অপরিচিত বা অল্পপরিচিত মানুষ আমাদের বিষয় কত কম ভাবে, তা আমরা ঠিক মনে করতে পারি নে!' তখন তাঁরা কেন ভাবেন না যে 'একজন অপরিচিত ব্যক্তি আমার দোষ জানলেই বা তাতে কী ক্ষতি?'

খবর দেবার বাতিক অনেক লোকের আছে। একটা নতুন খবর দিতে পারলে একজন যত গর্ব অনুভব করেন, একজন লেখক তাঁর মনের মতো রচনা শেষ করে ততটা অনুভব করেন না। খবর দেবার অতৃপ্ত পিপাসা তাঁদের একটা রোগ। এঁদের অনুগ্রহেই নিন্দার বাজারে যথেষ্ট মালের আমদানি হয়। একজনের ঘরের খবর ফাঁকি দিয়ে জানতে পারলে লোকের ভারি আমোদ হয়। তুমি পর্দার আড়ালে খেমটা নাচছ, তুমি মনে করছ আমি দেখতে পাচ্ছি নে, অথচ আমি দেখে নিচ্ছি তাতে আমাদের অত্যন্ত তৃপ্তি হয়। একটা কাজ যতই দুর্জ্ঞেয় ও গোপনীয়, তার প্রকাশ বক্তার ও শ্রোতার মনে ততই আমোদ হয়। একজন লোক একটা করতে গেল, কিন্তু আর-একটা হয়ে পড়ল; সে মনে করছে এ কাজটা গোপন রইল, অথচ সেটা প্রকাশ হয়ে পড়ল, তাতে আমাদের ভারি একটা মজা মনে হয়। হাস্যরসের বিষয়ে এমার্সন বলেছেন যে, 'সমুদয়

কৌতুক ও প্রহসনের মূল ও সার হচ্ছে, উদ্দেশ্যের অসম্পূর্ণতা— যা সিদ্ধ হবার কথা ছিল তার অসিদ্ধি; বিশেষত এক ব্যক্তি যখন সিদ্ধ হবার বিষয়ে উচ্চৈঃস্বরে আশা প্রকাশ করছে তখন তার নিরাশ হওয়া। বুদ্ধির অসামর্থ্য, আশার হতসিদ্ধি ও একটা কার্য-সূত্রের হঠাৎ মাঝখানে ছেদ হওয়ার নাম comedy।' গুপ্ত নিন্দা শুনতে আমাদের এইজন্যেই ভালো লাগে। একে তো নিন্দা, তাতে আবার গুপ্ত! এইজন্যেই যারা লোকের পরিবার সংক্রান্ত কোনো খবর দিতে পারে, তারা আপনাকে কৃত-কৃতার্থ ও পূর্বজন্মের অনেক পুণ্যের অধিকারী মনে করে।

অনেকের বাড়িয়ে বলা স্বভাবসিদ্ধ। অনেক সময়ে তারা নিজে বুঝতে পারে না যে, তারা বাড়িয়ে বলছে। আমি জানি, গোবিন্দবাবুর বাড়িয়ে বলা একটা বদ্ধমূল রোগ। তাঁতে আমাতে দুজনে মিলে যা দেখেছি, তাও আমার সাক্ষাতেই আর-এক জনের কাছে এমন বাড়িয়ে বলেন যে, আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। তিনি যাকে পণ্ডিত বলে প্রশংসা করতে চান, তাকে বলেন তার মতো পণ্ডিত ভারতবর্ষে নেই, এই রকম করে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তিনি নিদেন ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চাশ জনকে ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিতের যশ অর্পণ করেছেন। তাঁর প্রধান রোগ হচ্ছে (অনেক ঐতিহাসিকের এই রোগটি আছে।), যে একটা সত্য ঘটনা বলা তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য নয়, সেই কথাটি বলে শ্রোতার মনে তাঁর অভিপ্রেত একটি ফল জন্মিয়ে দেওয়াই তাঁর মুখ্য অভিপ্রায়। যদি তিনি অসংলগ্ন দুই-একটা কথা দৈবাৎ শুনতে পান, তা হলে নিজের ট্যাঁক থেকে দু-চারটে কথা যোগ করে সেটা সংলগ্ন করে দেন, কেননা জানেন, নইলে শ্রোতাদের মনে কোনো ফল হবে না। যদি তিনি জানতে পারেন, একটা ঘটনা একটু মুচড়ে, ইতস্তত একটু ছেঁটে-ছুঁটে দিলে শ্রোতাদের মনে অধিকতর ফল হবে, তা হলে সে পরিশ্রমটুকু স্বীকার করতে তিনি কিছুমাত্র অসম্মত নন। সর্বদাই তাঁর শ্রোতৃমণ্ডলীকে হাঁ করিয়ে রাখা, তাঁর জীবনের প্রধান চেষ্টা। 'ভয়ানক' 'অসাধারণ' 'আশ্চর্য', এই-সকল বিশেষণে তাঁর তহবিল পূর্ণ রয়েছে। এঁরা যে-সকল নিন্দা ও মিথ্যে কথা বলেন, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, দশ জনকে তাক করে দেওয়া। এঁদের দল সংখ্যায় কম নয়।

এইরূপ যেমন নানা শ্রেণীর নিন্দুক আছে, নিন্দা করবার প্রথাও তেমনি শত সহস্র। এক দল নিন্দুক আছে, নিন্দা করাই যে তাদের উদ্দেশ্য তা স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু আর-এক দল আছে, নিন্দা করা যেন তাদের বাসনা নয় এই রকম প্রকাশ পেতে থাকে। বলা বাহুল্য যে, শেষোক্ত দলই অধিকতর ফল-জনক। তাঁদের নিন্দা করবার পদ্ধতি নানাবিধ। তাঁদের নিন্দের দু-চারটে নমুনা দিই।

অনেক সময়ে নীরবে নিন্দা করা যায়। পাঁচ জনে একজনের খুব প্রশংসা করছে, তুমি সেখানে এমন রহস্যপূর্ণ ভাবে চুপ করে বসে আছ, কিংবা তোমার ঠোঁটের এক কোণে এমন এক রত্তি হাসি উঁকি মারছে, যে খানিকক্ষণ তোমার এইরকম ভাবগতিক দেখে তাদের মুখের কথা মুখে মরে আসে, তারা মনে করে তুমি না জানি তার নামে কী একটা গুপ্ত সংবাদ জান, তোমাকে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করলে তুমি বল যে, 'নাঃ, কিছু না।' এমন স্বরে বল যে, তার অর্থ এই হয়ে দাঁড়ায় যে, 'সে অনেক কথা!' আর-এক রকম নিন্দে আছে, তাকে বাজে নিন্দে বা উপরি নিন্দে বলা যেতে পারে। সে হচ্ছে, পাঁচ কথা বলতে বলতে এক কথা বলা। রামধনবাবুর কাল রাত্রে অত্যন্ত কাশি হয়েছিল, এই গল্পটি বলবার সময় একটু সুবিধে, অবকাশ ও ছিদ্র পেলেই, সুদক্ষ নিন্দুক যেন বিশেষ কোনো কথা নয় এমনি ভাবে হরকুমার যে মদ খায় সেই কথাটা সংক্ষেপে বলে যান। গানের পক্ষে যেমন তান, গল্পের পক্ষে এরকম নিন্দাও তাই। যেমন গানের সুর ও তাল বজায় রেখে দুই-একটা বাজে তান দিলে হানি নেই, গানের সুর বিগড়ে বা তাল মাটি করে একটা অসংলগ্ন তান দিলে শ্রোতাদের কানে ভালো শোনায় না, তেমনি গল্পের তাল বজায় রেখে ঠিক জায়গায় একটা উপরি কথা তুললে শ্রোতাদের মন্দ লাগে না; এরকম স্থলে বক্তার নিন্দুক বলে বদনাম রটে না; মনে হয় পাঁচ কথা বলতে এক কথা দৈবাৎ বেরিয়ে পড়ল। বেকন-এ আছে, যে, এক-একজন বাজে কথায় চিঠি পুরিয়ে কাজের কথা পুনশ্চ

নিবেদনের মধ্যে লেখেন। অনেক নিন্দুকও তাই করেন, সমস্ত কথার মধ্যে যে নিন্দাটা তাঁর বিশেষ বলা উদ্দেশ্য সেইটেকে তিনি এমন অপ্রাধান্য দিয়ে বলেন যে, মনে হয় যেন, সেটা বলবার জন্যে তাঁর বিশেষ মাথা-ব্যথা পড়ে নি। আবার অনেকে ভান করেন যেন, দৈবাৎ তিনি এক কথা বলে ফেললেন, আধখানা বলেই জিব কামড়ান, তার পরে পীড়াপীড়ির পর অতি আস্তে আস্তে সব বের করে ফেলেন। লোকে বলবে তিনি ইচ্ছে করে পারতপক্ষে কারো নিন্দে করেন নি। কেউ বা, যেন তিনি মনে করছেন যে তুমি তো জানোই, এমনিভাবে তোমার কাছে একটা কথা বলে ফেলেন; তার পরে যখন শোনেন যে, তুমি জানতে না, তখন ঘোরতর অনুতাপ আফসোস করতে আরম্ভ করেন। আবার অনেকে নিন্দে করবার সময় এইরকম ভাব দেখান যে, যেন 'সকলেই এ কথা জানে, তুমি জান না, এ ভারি আশ্চর্য!' এ-সকল নিন্দে নিন্দের নামে সংসারে গণ্য হয় না। সংসারে আর-এক প্রকারের নিন্দা আছে, তাকে আত্ম-নিন্দা বলতে গেলে সকল সময়ে বিনয় বোঝায় না। অধিকাংশ আত্ম-নিন্দা গর্ব থেকে উত্থিত হয়। তুমি সমস্ত সমাজকে উপেক্ষা করে বলতে থাকো যে, আমি পৃথিবীর নিন্দা গ্রাহ্য করি নে! আমি অমুক অমুক পাপাচরণ করেছি, এখন সমাজ! তুমি আমার কী করতে পারো করো। সমাজের উপর মহা খাপা! কেন? না সমাজের শক্তি আছে বলে। পাপাচরণ করলে সমাজ বলপূর্বক শাসন করেন বলে। সমাজের দুই-একটি আদুরে ছেলে ছাড়া আর কেউ বিপথে গেলে সমাজ তাকে স্নেহের স্বরে উপদেশ দেন না, তাকে কান ধরে সিধা পথে আনেন। আদরের ও স্নেহের দানা দেখিয়ে তিনি ছিন্ন-রজ্জু ঘোড়াকে আস্তাবলে ফেরাতে চেষ্টা করেন না, তাঁর নিয়ম হচ্ছে চাবুকের ভয় দেখানো। কিন্তু এক-একটা মানুষ আছে, যাদের মন্দ কাজ না করতে অনুরোধ করো, শুনবে, কিন্তু আদেশ করো, অমনি তার বিরুদ্ধে তারা কোমর বেঁধে দাঁড়াবে। আত্ম-নিন্দুক দলেরা অধিকাংশ এই শ্রেণীর লোক। বায়রন তার একটি বিখ্যাত আদর্শ। পর-নিন্দুকদের মতো আত্ম-নিন্দুকদের সকল কথাও বিশ্বাসযোগ্য নয়। আত্মনিন্দা যখন গর্ব থেকে উত্থিত হচ্ছে, তখনও তা অনেক পীড়াপীড়িতে দায়ে পড়ে স্বীকার করা হয়, তখন যে তার অনেক কথা বাড়ানো থাকা সম্ভব, তা বলাই বাহুল্য। এইরকম সমাজের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করে তারা দুর্দান্ত বলিষ্ঠ-হৃদয় লোক। কিন্তু একটা দেখা যায়, এক ব্যক্তির সমাজ-বিদ্রোহিতা যতই বলবান হোক-না কেন, তবু এতটুকু আত্মশ্লাঘা ও নিন্দা-ভীরুতা তার মনে অবশিষ্ট থাকবে যে, কতকগুলি ছোটোখাটো দোষ সে সমাজের কাছে কোনো মতেই প্রকাশ করতে রাজি হবে না। একজন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে পারবে যে, সে ডাকাতি করেছে, কিন্তু চুরি করেছে স্বীকার করতে সে কুণ্ঠিত হবে। কিন্তু এমন যদি কেউ থাকে যে, তার হৃদয়ের-বীভৎসতম স্থান পর্যন্ত লোকের চক্ষে অনাবৃত করে দিতে পারে, এমন কোনো পাপ পৃথিবীতে নেই যা সে প্রকাশ্যভাবে আপনার স্কন্ধে না নিতে পারে, তবে সে নরকের এক খণ্ড। পাপ যে করে সে বিকৃত-চরিত্র, কিন্তু যে প্রকাশ্যভাবে পাপ করে সে সে-বিশেষণের অনধিগম্য। আত্ম-নিন্দা ও বিনয় কেউ যেন এক পদার্থ মনে না করেন। বাংলা এক মহাকাব্যে মহাকবি রামের মুখে অনেক স্থলে 'ভিখারী' বলে আত্ম-পরিচয় বসিয়েছেন। যেমন 'ভিখারী রাঘব; দূতি, বিদিত জগতে!' বোধ হয় কবি রামকে বিনয়ী করবার অভিলাষে এইরকম করে থাকবেন, কিন্তু আমরা একে বিনয় বলতে পারি নে। 'আমি দরিদ্র' এ কথা বিনয়ে বলা যেতে পারে, কিন্তু আমি ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করি এ কথা বিনয়ের কথা নয়। দারিদ্র্য দোষের নয়, কিন্তু পরমুখাপেক্ষী হয়ে ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করবার রুচি মনের একটা বিকৃত অবস্থা। কেউ কখনো আমি মিথ্যাবাদী বা আমি জুয়াচোর বলে বিনয় প্রকাশ করে না।

আত্ম-নিন্দার ছলে অনেক সময়ে আমরা আত্ম-প্রশংসা করি। একজন নানা প্রকার ভূমিকা করে বললেন যে, 'দেখুন মহাশয়, আমার একটা ভারি দোষ আছে, আমি তা কোনো মতেই ছাড়াতে পারি নে, আমার যা মনে আসে আমি তা স্পষ্ট না বলে থাকতে পারি নে, আমি যা বলি তা মুখের সামনে বলি।' একে বিনীতভাবে অহংকার করা বলে।

আমরা আর-এক সময়ে আত্ম-নিন্দা করি। আমরা যখন মনে মনে জানি আমাদের একটা গুণ আছে, আমরা তখন কখনো কখনো আমাদের সেই গুণ নেই বলে বাইরে প্রকাশ করি; তার তাৎপর্য এই যে শ্রোতা আমার কথার বিরুদ্ধে নিজের মত ব্যক্ত করুক, সেইটে আমাদের শোনবার ইচ্ছে। আমরা এক-একজনকে দেখেছি, তাঁরা বন্ধুমণ্ডলীতে 'লোকটা তো বড়ো খোলাখালা!' এই প্রশংসাটুকু পাবার জন্য আপনার কতকগুলি ছোটোখাটো দোষের কথা হাসতে হাসতে উল্লেখ করেন, তাঁর নিন্দার মূল্যে প্রশংসো ক্রয় করতে চান।

এইরকম যত আত্ম-নিন্দা দেখা যায় প্রায় দেখবে যে, বিনয়ের জমি থেকে তার চারা ওঠে নি। গর্বই তার মূল। পরনিন্দার মূলেও গর্ব, আত্ম-নিন্দার মূলেও গর্ব। পরনিন্দাও যেমন দোষ, আত্ম-নিন্দাও তেমনি। পরহত্যা ও আত্মহত্যার মধ্যে নীতিশাস্ত্রে যেমন কম তফাত লেখে, পরনিন্দা ও আত্ম-নিন্দার মধ্যেও তাই।

ভারতী
আশ্বিন ১২৮৬

পারিবারিক দাসত্ব

সম্প্রতি স্বাধীনতা-নামক একটি শব্দ আমাদের বাংলা সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু এ কথাটা আমাদের সাহিত্যের নিজস্ব সম্পত্তি নহে। এমন নহে যে, স্বাধীনতা বলিয়া একটা ভাব আমাদের হৃদয়ে আগে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, পরে আমরা যথা নিয়মে তাহার নামকরণ করিয়াছি; বরঞ্চ স্বাধীনতা বলিয়া একটা নাম আমরা হঠাৎ কুড়াইয়া পাইয়াছি, ও সেই নামটাকে বস্তু মনে করিয়া ষোড়শোপচারে তাহার পূজা করিতেছি। অল্প দিন হইল সংবাদপত্রে দেখিতেছিলাম যে, দাক্ষিণাত্যের অশিক্ষিত কৃষকদের য়ুরোপ হইতে আনীত কতকগুলি বাষ্পীয় হল-যন্ত্র দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা সেগুলি ব্যবহার না করিয়া অলৌকিক দেবতা জ্ঞানে পূজা আরম্ভ করিয়া দিল; আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্য-কৃষীগণ 'স্বাধীনতা' নামক ওইরূপ একটি বাষ্পীয় হল-যন্ত্র সহসা পাইয়াছে, কিন্তু না জানে তাহা ব্যবহার করিতে, না তাহা ব্যবহার করিতে অগ্রসর হয়। কেবল দিবানিশি ওই শব্দটার পূজাই চলিতেছে। কাগজে পত্রে পুঁথিতে সভাস্থলে মহা আড়ম্বরপূর্বক স্বাধীনতা শব্দের প্রতিমা প্রতিষ্ঠা হইতেছে। 'স্বাধীনতা স্বাধীনতা' বলিয়া ঢাকের একটা বোল তৈরি হইয়া গিয়াছে এবং কবিবর, মহাকবি ও সুপ্রসিদ্ধ কবি-নামক যত বড়ো বড়ো সাহিত্য-ঢাকীগণ ওই বোলে বাজাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। শুনিতেছি নাকি বড়ো মিঠা বাজিতেছে এবং সেই তালে তালে নাকি অধুনাতন বঙ্গ-যুবক-কলের-পুতুলগণ (ঈষৎ কল টিপিয়া দিলেই যাঁহারা নাচিয়া উঠেন এবং নাচা ব্যতীত যাঁহারা আর কিছু জানেন না) অতিশয় সুদৃশ্য নৃত্য আরম্ভ করিয়াছেন। যাহা যাহা হইতেছে তাহা অতিশয় সুদৃশ্য ও সুশ্রাব্য তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেক হৃদয়বান ব্যক্তি এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন যে, স্বাধীনতা শব্দ 'তাধিন্‌তা' শব্দের অপভ্রংশ নহে, ওই শব্দটি লইয়া যে কেবলমাত্র নৃত্যের ও ঢাকের বোল প্রস্তুত হয় তাহা নহে; ওই হল-যন্ত্র চালনা না করিয়া কেবলমাত্র পূজা করিলে কোনো প্রকার ফসলই জন্মাইবার সম্ভাবনা নাই।

স্বাধীনতা ও অধীনতা কাহাকে বলে তাহা বোধ হয় আমরা সকলে ঠিকটি হৃদয়ংগম করিতে পারি নাই। যে ভাব আমরা ভালোরূপে অনুভব করিতেই পারি না, সে ভাব হৃদয়ংগম করাও বড়ো সহজ ব্যাপার নহে। সাধারণত আমরা সকলে মনে করি যে, আমরা অধীন, কেননা ইংরাজেরা আমাদের রাজা, তাহারা আমাদের রাজা না থাকিলেই আমরা স্বাধীন। এরূপ কথা নিতান্তই লঘু। এই কথাটি সর্ব-সাধারণে চলিত থাকাতে ফল হইয়াছে এই যে, যাঁহারা দেশ-

হিতৈষী বলিয়া পরিচয় দিতে চান, তাঁহারা দেশ-হিতৈষী হইবার একটি সহজ উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। সেটি আর কিছু নয়, ইংরাজ জাতিকে যথেচ্ছা গালাগালি দেওয়া। তাঁহারা এই কথা বলেন যে, আমরা যে পরাধীন ইংরাজ জাতিই তাহার নিমিত্ত সম্পূর্ণরূপে দায়ী। কাঁঠাল বৃক্ষ যদি তাহার শাখাজাত ফলগুলির উপর মহা রাগ করিয়া বলিয়া উঠে যে, 'আঃ, এই ফলগুলা যদি না থাকিত তবে আমি আম্রবৃক্ষ হইতে পারিতাম,' তবে তাহাকে এই বলিয়া বুঝানো যায় যে, তুমি কাঁঠাল বৃক্ষ বলিয়াই তোমাতে কাঁঠাল ফলিয়াছে, তোমার শিকড় হইতে পাতা পর্যন্ত কাঁঠাল ফলিবার কারণে পরিপূর্ণ। আমাদের সমাজের শিরায় শিরায় অধীনতার কারণ সঞ্চারিত হইতেছে। ইংরাজেরা আছে, কারণ আমরা অধীন জাতি। ইংরাজ-রাজত্ব কাঁঠাল ফল মাত্র। আমাদের পক্ষে ইহা বড়ো কম সান্ত্বনার বিষয় নহে যে, আমরা যে পরাধীন ইংরাজেরাই তাহার কারণ, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইহা সত্য নহে। প্রকৃত কথা এই যে, সম্প্রতি আমরা স্বাধীনতা ও অধীনতা নামক দুইটা শব্দ হাতে পাইয়াছি, এবং হঠাৎ-ধনীর ন্যায় তাহার যথেচ্ছা অযথা প্রয়োগ করিতেছি। যদি স্বাধীনতা কথাটা যথার্থ আমাদের হৃদয়ের কথা হয়, তবে যে, আমরা কতকগুলি অসংগত ব্যবহার করি তাহার অর্থ কে বুঝাইয়া দিবে?

আমরা সংবাদপত্রে মহা ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকি যে, ইংরাজেরা ভারতবর্ষকে যথেচ্ছা-তন্ত্রে শাসন করিতেছেন। ভারতবর্ষের আইন ভারতবর্ষীয়দের মতামত অপেক্ষা করে না। দুই-চারিটি ব্যক্তি মিলিয়া যাহা-কিছু নির্ধারিত করিয়া দেয়, আমরা লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি তাহা চুপচাপ করিয়া পালন করি। ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। ইহা হইতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে আমরা অধীন জাতি। এবং কেতাবে পড়িয়াছি অধীনতা বড়ো ভালো দ্রব্য নহে, তাহা যদি হয় তবে দেখিতেছি আমাদের অবস্থা নিতান্তই শোচনীয়! তাহা যদি হয় তবে আমাদের বিলাপ করা নিতান্তই কর্তব্য। এইরূপ সাত-পাঁচ ভাবিয়া আমরা আজকাল যে-সকল শূন্যগর্ভ বিলাপ আরম্ভ করিয়াছি, তাহা আমরা কর্তব্য কাজ সমাধাস্বরূপে করিতেছি মাত্র! কিন্তু এ কথা আমরা কবে বুঝিব যে, যত দিনে না আমাদের হৃদয়ের অস্থিমজ্জাগত দাসত্বের ভাব দূর হইবে, ও স্বাধীনতা-প্রিয়তার ভাব হৃদয়ের শোণিতস্বরূপে হৃদয়ে বহমান হইবে ততদিন আমরা দাসই থাকিব। আমরা যে প্রতি পরিবারে এক-একটি করিয়া দাসের দল সৃষ্টি করিতেছি! আমরা যে আমাদের সন্তানদের— আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের শৈশবকাল হইতে চব্বিশ ঘণ্টা দাসত্ব শিক্ষা দিতেছি! বড়ো হইলে তাহারা যাহাতে এক-একটি উপযুক্ত দাস হইতে পারে, তাহার বিহিত বিধান করিয়া দেওয়া হইতেছে; বড়ো হইলে যাহাতে কথাটি না কহিয়া তাহারা তাহাদের প্রভুদের মার ও গালাগালিগুলি নিঃশেষে হজম করিয়া ফেলিতে পারে, এমন একটি অসাধারণ পরিপাক-শক্তি তাহাদের শরীরে জন্মাইয়া দেওয়া হইতেছে! এইরূপে ইহারাও বড়ো হইলে স্বাধীনতা স্বাধীনতা করিয়া একটা তুমুল কোলাহল করিতে থাকিবে, অথচ অধীনতাকে আপনার পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে স্থাপন করিয়া তাহাকে দুধ-কলা সেবন করাইবে! প্রাণের মধ্যে অধীনতার আসন ও রসনার উপরে স্বাধীনতার আসন। অমন একটা নর্তনশীল আসনের উপরে স্বাধীনতাকে বসাইয়া আমরা দিবানিশি ওই শব্দটার নৃত্যই দেখিতেছি। বড়ো আমোদেই আছি।

বঙ্গদেশের অনেক সৌভাগ্যফলে আজকাল দেশে যে-সকল মহা মহা জাতীয়-ভাব-গদ্‌গদ আর্যশোণিতবান তেজিয়ান দেশহিতৈষীগণের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, স্বাধীনতার মন্ত্র যাঁহারা চিৎকার করিয়া জপ করেন, নিজের পরিবারের মধ্যে তাঁহাদের অপেক্ষা যথেচ্ছাচারী শাসনকর্তা হয়তো অতি অল্পই পাইবে। ইহাই এক প্রধান প্রমাণ যে, স্বাধীনতার ভাব তাঁহাদের হৃদয়ের ভাব নহে।

যাহাদের স্বাভাবিক স্বাধীনতার ভাব আছে, আমাদের দেশের পরিবারের মধ্যে জন্মাইলে রুদ্ধ বায়ুতে তাহাদের হাঁপাইয়া উঠিতে হয়। বয়স্ক ব্যক্তিরা আজ্ঞা করিবার জন্য সততই উন্মুখ, অবসর পাইলেই হয়। অনেক গুরুজন গুরুজনের আর কোনো কর্তব্য সাধন করেন না, কেবল আজ্ঞা করিবার ও মারিবার ধরিবার সময়েই তাঁহারা সহসা গুরুজন হইয়া উঠেন। তাঁহারা 'হাঁরে'

করিয়া উঠিলেই ছেলেপিলেগুলার মাথায় বজ্র ভাঙিয়া পড়ে। এবং তাঁহারা যে তাঁহাদের কনিষ্ঠ সকলের ভীতির পাত্র, ইহাই তাঁহাদের প্রধান আমোদ।

মনুষ্য জাতি স্বভাবতই ক্ষমতার অন্ধ উপাসক। যে পক্ষে ক্ষমতা সেই পক্ষেই আমাদের সমবেদনা, আর অসহায়ের আমরা কেহ নই। এইজন্যই একজনের হাতে যথেচ্ছা ক্ষমতা থাকিলে অত্যন্ত ভয়ের বিষয়। তাহার ব্যবহারের ন্যায়ান্যায় বিচার করিবার লোক সংসারে পাওয়া যায় না। কাজেই তাহাকে আর বড়ো একটা ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিতে হয় না। যাহাদের বিবেচনা করিয়া চলা বিশেষ আবশ্যক, সংসারের গতিকে এমনি হইয়া দাঁড়ায় যে, তাহাদেরই বিবেচনা করিয়া চলিবার কম প্রবর্তনা হয়। এই গুরুজন সম্পর্কেই একবার ভাবিয়া দেখো-না। যত আইন, যত বাঁধাবাঁধি, যত কড়াক্কড় সমস্তই কি কনিষ্ঠদের উপরেই না? কেহ যদি নিতান্ত অসহ্য আঘাত পাইয়া গুরুজনের মুখের উপরে একটা কথা বলে, অমনি কি বড়ো বড়ো পক্ক-কেশ মস্তকে আকাশ ভাঙিয়া পড়ে না? আর, যদি কোনো গুরুজন বিনা কারণে বা সামান্য কারণে বা অন্যায় কারণে তাহার কনিষ্ঠের উপরে যথেচ্ছা ব্যবহার করে তবে তাহাতে কাহার মাথাব্যথা হয় বলো দেখি? গুরুজন মারুন, ধরুন, গালাগালি দিন, ঘরে বন্ধ করিয়া রাখুন, তাহাতে কাহারো মনোযোগ মাত্র আকর্ষণ করে না, আর কনিষ্ঠ ব্যক্তি যদি তাহার গুরুজনের আদিষ্ট পথের একচুল বামে কি দক্ষিণে হেলিয়াছে, গুরুজনের পান হইতে একতিল চুন খসাইয়াছে, অমনি দশ দিক হইতে দশটা যমদূত আসিয়া কেহ তাহার হাত ধরে, কেহ তাহার চুল ধরে, কেহ গালাগালি দেয়, কেহ বক্তৃতা দেয়, কেহ মারে ও তাহার দেহ ও মনকে সর্বতোভাবে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া তবে নিষ্কৃতি দেয়। সমাজের এ কীরূপ বিচার বলো দেখি? যে দুর্বল, যাহার দোষ করিবার ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত অল্প, তাহাকেই কথায় কথায় মেয়াদ ফাঁসি ও দ্বীপান্তরে চালান করিয়া দেওয়া হয়, আর যে বলিষ্ঠ, যাহার অন্যায় ব্যবহার করিবার সমূহ ক্ষমতা রহিয়াছে, তাহার কাজ একবার কেহ বিচার করিয়াও দেখে না। যেন ওই দন্তহীন কোমল শিশুগুলি এক-একটি দুর্জয় দৈত্য, উহাদের বশে রাখিতে সমাজের সমস্ত শক্তির আবশ্যক, আর ওই যমদূতাকার বেত্রহস্ত পাষাণহৃদয়রা নবনীতে গঠিত কুসুম-সুকুমার, উহাদের জন্য আর সমাজের পরিশ্রম করিতে হইবে না। এইজন্য সকল শাস্ত্রেই লিখিয়াছে যে, গুরুজনের অবাধ্য হওয়া পাপ, কোনো শাস্ত্রেই লিখে নাই, কনিষ্ঠদের প্রতি যথেচ্ছা ব্যবহার করা পাপ। কেহই হয়তো স্বীকার করিবেন না (যদি বা মুখে করেন তথাপি কাজে করিবেন না) যে গুরুজনের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা যতখানি পাপ, কনিষ্ঠদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করাও ঠিক ততখানি পাপ। একজন গুরু ব্যক্তি তাহার কনিষ্ঠকে অন্যায়রূপে মারিলে যতটুকু পাপে লিপ্ত হন, একজন কনিষ্ঠ ব্যক্তি তাহার গুরুজনকে অন্যায়রূপে মারিলে ঠিক ততটুকু পাপেই লিপ্ত হন, তাহার কিছুমাত্র অধিক নয়। ঈশ্বরের চক্ষে উভয়ই ঠিক সমান। কোন্ ব্যক্তি সাহসপূর্বক বলিতে পারে যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া ঈশ্বর তাহার প্রতি কনিষ্ঠের অপেক্ষা অধিক অন্যায়াচরণ করিবার অধিকার দিয়াছেন! কিন্তু সকলেই যেন মনে মনে সেই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। সেই একই কারণ হইতে আমরা অবলাদিগের সামান্য দোষটুকু পর্যন্ত বরদাস্ত করিতে পারি না, অথচ পুরুষদের প্রতিপদেই মার্জনা করিয়া থাকি! যেন সবলেরাই কেবলমাত্র মার্জনার যোগ্য। যেন হীনবল স্ত্রীলোকদিগকে শাসনে রাখিবার জন্য পুরুষের বাহুবলই যথেষ্ট নহে তাহার উপরে ধর্মের বিভীষিকা ও সমস্ত সমাজের নিদারুণতর বিভীষিকার আবশ্যক, আর পুরুষদের জন্য যেন সে-সকল কিছুই আবশ্যক নাই। যাহা হউক, ছেলেবেলা হইতেই আমরা কি এইরূপ বলের উপাসনা করিতে শিখি না? এবং যে শিক্ষা বাল্যকাল হইতে আমাদের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করে বড়ো হইলে কি তাহা আমরা দূরে নিক্ষেপ করিতে পারি? সুতরাং যেখানে বাঙালি সেইখানেই পদাঘাত, সেইখানেই গালাগালি, সেইখানেই অপমান, এবং সেই অপমান পদাঘাতবৃষ্টির মধ্যে এই ক্ষীণ-শরীর সুন্দর বনবাসীদের শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের ন্যায় অবিকৃত মুখশ্রী! ছেলেবেলা হইতে তাহারা

পদে পদে শিখিয়াছে যে, গুরুজনেরা মারে, ধরে, যাহা করে তাহার উপরে আর চারা নাই, ইচ্ছা করিলেই সকল করিতে পারেন, এবং সেরূপ ইচ্ছা প্রায়ই করিয়া থাকেন। জন্মগ্রহণ করিয়াই গুরুজনদের নিকট তাহাদের প্রথম শিক্ষা এই যে, 'যাহা বলি তাহার উপরে আর কথা নাই!' ভালো করিয়া বলিতে ও বুঝাইয়া বলিতে অনেক বাক্য ব্যয় হয়, অতএব যত অল্প পরিশ্রমে ও যত অল্প কথায় একটা আজ্ঞা দেওয়া যাইবে তাহা দেওয়া হইবে ও আজ্ঞা লইয়া যত কম আন্দোলন করিয়া যত শীঘ্র পালন করা হইবে ততই ভালো। দাদা আসিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, 'কী করছিস, শুতে যা।' যে ছেলে বলে, 'কেন দাদা, এখনও তো সন্ধ্যা হয় নি।' তাহার কিছু হইবে না, যে ছেলে বলে, 'যে আজ্ঞে দাদা মহাশয়' তাহার তুল্য ছেলে হয় না।

ছেলেবেলায় যে আমরা শিক্ষা পাই যে, গুরুজনদের ভক্তি করা উচিত, তাহার অর্থ কী? না গুরুজনদের ভয় করা উচিত। কারণ, ভক্তির ভাব বালকদের নহে। তাহাদের নিকট সকলই সমান। তাহাদের হৃদয়ে কেবল অনুরাগ ও বিরাগের ভাব জন্মে মাত্র তাহারা কাহারও অনুরক্ত হয়, কাহারও হয় না, আবার কাহারও প্রতি তাহাদের স্বতই বিরাগ জন্মে। তাহাদের যখন ভর্ৎসনা করিয়া বলা হয় 'গুরুজন বলছেন শুনছিস নে!' তখন তাহারা এই বুঝে যে, না শুনিলে ভয়ের কারণ আছে। না শুনিলে তাঁহাদের এমন ক্ষমতা আছে, যে শুনিতে বাধ্য করাইতে পারেন। অতএব গুরুজনদের ভক্তি করিবে, অর্থাৎ ভয় করিবে; কেন ভয় করিবে? না তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা বলিষ্ঠ, তাঁহাদের সঙ্গে আমরা কোনো মতে পারিয়া উঠি না। এইজন্যই, যখনি ছেলেরা দশজনে সমবয়স্কদের লইয়া মনের আমোদে খেলা করিতেছে, এবং যখনি গুরুজন বলিয়া উঠিয়াছেন, 'কী তোরা গোলমাল করছিস।' তখনি তাহারা তৎক্ষণাৎ থামিয়া যায়। বেশ বুঝিতে পারে যে, গুরুজন যে তাহাদের হিতাকাঙ্ক্ষা করিয়া ওই আজ্ঞাটি করিলেন তাহা নহে, তবে কেন তাহারা স্তব্ধ হইয়া গেল? না যিনি আজ্ঞা দিলেন তিনি তাহাদের অপেক্ষা ক্ষমতাশালী ব্যক্তি! আমার বল আছে অতএব তুই আজ্ঞা পালন কর্ এই ভাব ছেলেদের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া, তাহাদের চোখের সামনে দিনরাত্রি একটা অদৃশ্য বেত্র নাচানো, এইরূপ একটা ভয়ের ভাবে, একটা অবনতির ভাবে কোমল হৃদয় দীক্ষিত করা কি স্বাধীনতাপ্রিয় সহৃদয় গুরুজনের কাজ?

ভক্তির ভাব ভালো, কিন্তু ভক্তির অপেক্ষা অনুরাগের ভাব আরও ভালো; কারণ, ভক্তিতে অভিভূত করিয়া ফেলে আর অনুরাগে আকর্ষণ করিয়া আনে। যাহার হৃদয় যত প্রশস্ত, তাহার অনুরাগ ততই অধিক। পিতা তো পিতা, সমস্ত জগতের পিতাকে যাঁহারা সখা বলিয়া দেখেন তাঁহারা কে? না, তাঁহারা ভক্তদের অপেক্ষা অধিক ভক্ত! তাঁহারা ঈশ্বরের এত কাছে থাকেন যে, ঈশ্বরের সহিত তাঁহাদের সখ্যতা জন্মিয়া যায়। কত শত কালীভক্ত আছে, কিন্তু রামপ্রসাদের মতো কয় জন ভক্ত দেখা যায়! অন্য ভক্তেরা শত হস্ত দূরে থাকিয়া তটস্থ হইয়া কালীকে প্রণাম করে; কিন্তু রামপ্রসাদ যে কালীর কোলে মাথা রাখিয়া তাঁহার সঙ্গে কথাবার্তা কহিয়াছেন, রাগ করিয়াছেন, অভিমান করিয়াছেন! হাফেজের ন্যায় ঈশ্বর-ভক্ত কয় জন পাওয়া যায়, কিন্তু দেখো দেখি, হাফেজ কীভাবে ঈশ্বরের সহিত কথোপকথন করেন! হৃদয়ের প্রধান শিক্ষা অনুরাগ শিক্ষা, ভক্তি শিক্ষা তদপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর শিক্ষা। যে হৃদয় যত উদার সে হৃদয় ততই অন্য হৃদয়ের অধিকতর নিকটবর্তী হইতে সমর্থ হয়, এবং যতই নিকটবর্তী হয়, ততই ভক্তি অপেক্ষা অনুরাগ করিতে শিখে। পিতার প্রতি পুত্রের কী ভাব থাকা ভালো? না, অভক্তির অপেক্ষা ভক্তি থাকা ভালো, আবার ভক্তি অপেক্ষা অনুরাগ থাকা আরও ভালো। সেই পুত্রই যে পিতাকে সখা বলিয়া জানে। কর্তব্যের সহিত প্রিয়কার্যের যতখানি প্রভেদ, ভক্তির সহিত অনুরাগের ঠিক ততখানি প্রভেদ। কর্তব্যজ্ঞান যেমন আমাদের হৃদয়ের দূর সম্পর্কীয় অথচ আত্মীয়, ভক্তিভাবও তেমনি আমাদের হৃদয়ের দূর সম্পর্কীয় অথচ আত্মীয়। ভক্তিভাজন ব্যক্তি আমাদের দূরের লোক অথচ নিজের লোক। আমি যদি জানি যে, একজন আত্মীয় নিয়তই আমার শুভাকাঙ্ক্ষা করেন, বাল্যকালের বিঘ্ন-সংকুল পথে আমার হাতে ধরিয়া যৌবনকালে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন, আমার

সুখ-দুঃখের সহিত যাঁহার সুখ-দুঃখ অনেকটা জড়িত, তাঁহাকে আমার নিতান্ত নিকটের ব্যক্তি মনে না যদি করি তবে সে একটা কৃত্রিম প্রথার গুণে হইয়াছে বলিতে হইবে। মায়ের সহিত পিতার সম্পর্কগত প্রভেদ কিছু অধিক নহে, সমানই বলিতে হইবে। পিতা যদি ভক্তিভাজন হন তবে মাতাও ভক্তিভাজন হইবেন তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সাধারণত কী দেখা যায়? পিতার প্রতি পুত্রের যে ভাব মাতার প্রতি কি সেই ভাব? আমি তো বলি মাকে যে ছেলে শুদ্ধ কেবল ভক্তি করে সে মায়ের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করে। মায়ের সহিত আমাদের অনুরাগের সম্পর্ক। মায়ের এমন একটি গুণ আছে, যাহাতে তাঁহাকে আমরা অনুরাগ না করিয়া থাকিতে পারি না। সে গুণটি কী? না, তিনি আমাদের মনের ভাবগুলি বিশেষরূপে আয়ত্ত করিয়াছেন, আমাদের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ সমবেদনা আছে, তিনি কখনো জানিয়া শুনিয়া আমাদের হৃদয়ে আঘাত দিতে পারেন না, তিনি কখনো আমাদের আজ্ঞা দিতে চাহেন না, তিনি অনুরোধ করেন, বুঝাইয়া বলেন, আমরা একটা ভালো কাজে বিরত হইলে তিনি সাধ্যসাধনা করেন। এইজন্য মায়ের প্রতি আমাদের যে একটি আমরণ-স্থায়ী মর্মগত ভালোবাসা জন্মে, তাহা আমাদের হৃদয়ের একটি শিক্ষা। যে ব্যক্তি শৈশবকাল হইতে মাতৃস্নেহে বঞ্চিত হইয়াছে সে একটি শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। নিঃস্বার্থ ভালোবাসা পাওয়া নিঃস্বার্থপরতা শিক্ষা করিবার প্রধান উপায়। মনে করো, একজন বালক তাহার সঙ্গীদের লইয়া খেলা করিতেছে, গোল করিতেছে, সেই সময়ে আসিয়া একটি গুরুজন তাহাকে খুব একটা চড় কসাইয়া দিল, ইহাতে তাহাকে স্বার্থ ত্যাগের শিক্ষা দেওয়া হয় না। পরের সুখের প্রতি মনোযোগ দেওয়া শিক্ষা ওই এক চড়েই হয় না। আমি নিজের সুখের জন্যে আর-একজনের সুখের হানি করিলাম, এবং তাহার উপরে একটা চড় কসাইলাম, ইহাতে তাহাকে কী শিক্ষা দেওয়া হইল? একটা কাজ আপাতত বন্ধ করিয়া দেওয়া এক, আর তাহার কারণ উঠাইয়া দেওয়া এক স্বতন্ত্র। প্রতি কাজে একটা কান ধরিবার জন্য একটা হাত নিযুক্ত রাখা, সে কানের পক্ষে ও সে হাতের পক্ষেই খারাপ। যে শাসন করে তাহার চরিত্রেও কুফল জন্মে আর যে শাসিত হয় তাহার চরিত্রেও কুফল জন্মে। শাসনপ্রিয়তার ভাব বর্বর ভাব, সে ভাব যত দমন করা যায় ততই ভালো। আর যে ব্যক্তি শাসনে অভ্যস্ত হইয়া যায় তাহার পক্ষেও বড়ো শুভ নহে।

আমাদের পরিবারের মূলগত ভাবটা কী? না, শাসনকারী ও শাসিতের সম্পর্ক, প্রভু ও অধীনের সম্পর্ক, গুরু ও কনিষ্ঠের সম্পর্ক। আর কোনো সম্পর্ক নাই। সম্মান ও প্রসাদ ইহাই আমাদের পরিবারের প্রাণ। এমন-কি, স্বামীর প্রতিও ভক্তি করা আমাদের শাস্ত্রের বিধান। স্বামীর আদেশ পালন করা পুণ্য। সেই সুগৃহিণী যাহার পতিভক্তি আছে! যাহার প্রতি স্বতই ভালোবাসা ধাবিত হয় এমন যে স্বামী, তাহার কথা শুনিবার জন্য কি ভক্তির আবশ্যক করে? স্বামী ভক্তিভাজন অতএব ইঁহার কথা পালন করিব, ইহা কি স্ত্রীর মুখে শোভা পায়? ভক্তির স্থলে স্বার্থত্যাগ একটা কর্তব্য কার্য, অনুরাগের স্থলে স্বার্থত্যাগ একটা প্রিয় কার্য। অনুরাগে স্বার্থ বিসর্জন দিতেছি বলিয়া মনেই হয় না। অনুরাগের নিশ্বাস-প্রশ্বাস স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া। লোক মুখে শুনা গিয়াছে অনেক স্ত্রী প্রাতঃকালে উঠিয়া স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করে! এমন হাস্যজনক কৃত্রিম অভিনয় তো আর দুটি নাই! কিন্তু এ ভাবটি আমাদের পরিবারের ভাব। আমরা সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছি যে, ভক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনোবৃত্তি আর নাই। ভক্তি ভাব পরিবার হইতে নির্বাসন করিয়া দেওয়া আমার মত নহে ও তাহা দেওয়াও বড়ো সহজ নহে, আমার মত এই যে, ভক্তি ব্যতীত অন্য নানা প্রকার স্বাভাবিক মনোবৃত্তি আছে, সেগুলিকে কৃত্রিম শিক্ষা দ্বারা দমন করিবার আবশ্যক নাই। ভাইয়ে ভাইয়ে সমান ভাব, সখ্যতার ভাব, স্ত্রী পুরুষে সমান ভাব, প্রেমের ভাব, পিতা পুত্রে অনুরাগের ভাব, এবং তাহার সহিত শ্রদ্ধার ভাব মিশ্রিত (ভক্তির ভাব সর্বত্র নহে), এই তো স্বাভাবিক। শ্রদ্ধার ভাব, অর্থাৎ পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, চরণধূলি লইয়া পূজা করিবার ভাব নহে, সসম্ভ্রমে দশ হাত তফাতে দাঁড়াইবার ভাব নহে, কোনো কথা কহিলে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে বা তাহার উপরে তোমার মত ব্যক্ত করিতে নিতান্ত সংকোচের ভাব

নহে। এ ভাব শোভা পায় রাজার সম্মুখে, যাঁহার সহিত তোমার রক্তের সম্পর্ক নাই, যাঁহার প্রতি তোমার নাড়ীর টান নাই, যিনি তোমার কোনো প্রকার ত্রুটি মার্জনা করিবেন কি না তোমার সন্দেহ আছে। পিতার প্রতি শ্রদ্ধার ভাব কীরূপ? না, তোমার পিতার প্রতি তোমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, তিনি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী, জান যে, তিনি কখনো কুপরামর্শ দিবেন না, জান যে, তোমার অপেক্ষা তাঁহার অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে, বিপদে-আপদে পড়িলে সকলকে ফেলিয়া তাঁহার পরামর্শ লইতে মন যায় এমন একটা আস্থা আছে, তাঁহার সহিত মতামত আলোচনা করিতে ইচ্ছা করে, এই পর্যন্ত; একেবারে চক্ষু-কর্ণ-নাসাবরোধক অন্ধ নির্ভর নহে। আমি নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াও একজনকে শ্রদ্ধা করিতে পারি, কিন্তু আমরা যাহাকে ভক্তি বলি, তাহার কাছে আমাদের আর স্বাধীনতা থাকে না। শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি উপদেশ দেন, পরামর্শ দেন, বুঝাইয়া বলেন, মীমাংসা করিয়া দেন। আদেশ দেন না; শাস্তি দেন না। আদেশ ও শাস্তি বিচারালয়ের ভাব, পরিবারের ভাব নহে। উপদেশ, অনুরোধ ও অভিমান আত্মীয়-সমাজের ভাব। এ ভাব যদি চলিয়া যায় ও পূর্বোক্ত ভাব পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করে তবে সে পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে শত হস্ত ব্যবধান পড়িয়া যায়, তবে আত্মীয়েরা পর হইয়া, দূরবর্তী হইয়া একত্রে বাস করে মাত্র। সেরূপ পরিবারে ভয়ের ও শাসনের রাজত্ব। দৈবাৎ যদি ভয়টার রাজ্যচ্যুতি হয় (কর্তা ব্যক্তির মৃত্যুতে যেমন প্রায়ই হইয়া থাকে) তবে আত্মীয়দের মধ্যে কাক-চিলের সম্পর্ক বাধিয়া যায়। আর কোনো সম্পর্ক থাকে না।

আমাদের বঙ্গসমাজের মধ্যে এই ভয়ের এমন একাধিপত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, যেখানে ভয় সেইখানে কাজ, যেখানে ভয় নাই সেখানে কাজ নাই। একজন নবাগত ইংরাজ তাঁহার বাঙালি বন্ধুর সহিত রেলোয়েতে ভ্রমণ করিতেছিলেন। সন্ধ্যা হইয়া গেল তথাপি গাড়িতে আলো পাইলেন না, অতি নম্রভাবে তিনি স্টেশনের একজন ভদ্র (!) বাঙালি কর্মচারীকে কহিলেন, 'অনুগ্রহপূর্বক একটা আলো আনাইয়া দিন, নহিলে বড়ো অসুবিধা হইতেছে'; কর্মচারীটি চলিয়া গেল। অমনি ইংরাজটির বাঙালি বন্ধু কহিলেন, 'আপনি বড়ো ভালো কাজ করিলেন না, এমন করিয়া বলিলে বাঙালিদের দেশে কখনো আলো পাওয়া যায় না; যদি আপনি তেরিয়া হইয়া বলিতেন, এখনো আলো পাইলাম না, ইহার অর্থ কী— তাহা হইলে আলো পাইবার একটা সম্ভাবনা থাকিত।' আমি সেই বাঙালিটির কথা শুনিয়া নিতান্ত লজ্জা বোধ করিতে লাগিলাম। কিন্তু দুঃখের কথা বলিব কী, কথাটা সত্য হইয়া দাঁড়াইল। অবশেষে সে ইংরাজটি যথোপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া আলো আনাইলেন। এরূপ আরও সহস্র ঘটনা হয়তো আমাদের পাঠকেরা অবগত আছেন। অনেক বাঙালি রেলোয়েতে যাইতে হইলে কোট্ হ্যাট্ পরেন ও গলা বাঁকাইয়া কথা কহেন, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন যে, বাঙালি স্টেশন-কর্মচারীদের জন্য দায়ে পড়িয়া তাঁহারা এই উপায় অবলম্বন করেন। ইঙ্গবঙ্গেরা বাঙালি বলিয়া পরিচয় দিতে যে কুণ্ঠিত হন তাহার প্রধান কারণ এই যে, তাঁহারা জানেন যে, বাঙালিদের বাঙালিরা মানে না। তাহারা বলের দাস। একজন ভৃত্য তাহার কর্তব্যকাজে শৈথিল্য করিতেছে তাহাকে দুই চড় কসাইলে সে সিধা হয়। ভয় না থাকিলে সে হয়তো কাজ করিবেই না। অতএব দেখা যাইতেছে ভয়ের শাসনে কত কাজের ক্ষতি হয়। তাহাতে আপাতত একটু সুবিধা আছে। একটা চাবুক কসাইলে তৎক্ষণাৎ একটা কাজ সমাধা হয়, কিন্তু সেই চাবুকের কাজ অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। ছেলেবেলা হইতে ভয়ের শাসনে থাকিয়া ভয়টাকেই আমরা প্রভু, রাজা বলিয়া বরণ করিয়াছি, সে ব্যতীত আর কাহারও কথা আমরা বড়ো একটা খেয়াল করি না। স্বাধীনতা শিক্ষার প্রণালী এইরূপ নাকি!

যদি স্বজাতিকে স্বাধীনতাপ্রিয় করিয়া তুলিতে চাও, তবে সভা ডাকিয়া, গলা ভাঙিয়া, করতালি দিয়া একটা হট্টগোল করিবার তো আমি তেমন আবশ্যক দেখি না। তাহার প্রধান উপায়, প্রতি ক্ষুদ্র বিষয়ে স্বাধীনতা চর্চা করা। জাতির মধ্যে স্বাধীনতার স্ফূর্তি ও পরিবারের মধ্যে অধীনতার শৃঙ্খল ইহা বোধ করি কোনো সমাজে দেখা যায় না। প্রতি পরিবারেই যদি

কর্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাদের ভ্রাতাদের, পুত্রদের, ভৃত্যদের স্বাধীনতা অপহরণ না করেন, পরিবারের মধ্যে যদি কতকগুলি কৃত্রিম-প্রথার অষ্ট-পৃষ্ঠ বন্ধন না থাকে, তবেই আমাদের কিছু আশা থাকে। যাঁহারা স্ত্রীকে শাসন করেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের ও সন্তানদের প্রহার করেন, ভৃত্যদিগকে নিতান্ত নীচজনোচিত গালাগালি দেন, তাঁহারা জাতীয় স্বাধীনতার কথা যত কম ক'ন ততই ভালো। বোধ করি তাঁহারা চাকর-বাকর ছেলেপিলেগুলাকে মারিয়া ধরিয়া গালাগালি দিয়া বীর রসের চর্চা করিয়া থাকেন। এই মহাবীরবৃন্দ, এই পারিবারিক তৈমুরলঙ, জঙ্গিস খাঁ-গণ যথেচ্ছাচারের বিষয় যতই বলেন, আর স্বাধীনতার কথায় যত কম লিপ্ত থাকেন ততই তাঁহারা শোভা পান। তাঁহাদের আস্ফালনের প্রবৃত্তিটা কমিয়া গেলেই দেশের হাড় জুড়ায়।

আমাদের পরিবারের মধ্যে একটা স্বাধীন স্ফূর্তি নাই বলিয়া সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই বড়ো আক্ষেপ করিয়া থাকেন। আমোদের জন্য বিরামের জন্য আমাদের অন্যত্র যাইতে হয়। পরিবারের সকলে মিলিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিবার শত সহস্র বাধা বর্তমান। ইনি শ্বশুর, উনি ভাসুর, ইনি দাদা, উনি ছোটো ভাই, ইনি বড়ো, উনি ছোটো ইত্যাদি কত যে সাত-পাঁচ ভাবিবার আছে তাহার আর সংখ্যা নাই। লাভের হইতে হয় এই যে, আত্ম-বিনোদনের জন্য পরের সহায়তা আবশ্যক করে। আমাদের পরিবার আমাদের আমোদের স্থান নহে। (আমোদ বলিতে যাঁহারা দূষণীয় কিছু বুঝেন, তাঁহাদের কল্পনা নিতান্তই বিকৃত।) ইহাকে ছুঁইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, উহার সহিত কথা কহিলে, এমন-কি, উহার নিকট মুখ দেখাইলে বেহায়া বলিয়া বিষম অখ্যাতি হয়; যেদিন কোনো গুরুজন বাড়ির বধূর হাসির সুর শুনিতে পান, সেদিন সে বালিকা বেচারীর কপালে অনেক দুঃখ থাকে, দিনের বেলায় স্বামী-স্ত্রীতে দেখাশুনা কথাবার্তা হইলে পাড়ায় লোকের কাছে তাহাদের মুখ দেখাইবার জো থাকে না। নিজের ঘরেই যত বাঁধাবাঁধি, যত শাসন, যত আইন-কানুন, আর বন্ধনমুক্ত স্বাধীন ব্যবহার কি পরের সঙ্গেই! পরিবারের মধ্যেই কি যত ঢাকাঢাকি, লুকাচুরি, ত্রস্তভাব! ইহার অপেক্ষা অস্বাভাবিক কিছু কল্পনা করা যায় না। আধুনিক যে-সকল উন্নত পরিবারে এই-সকল কৃত্রিম বন্ধনসমূহ দূরীভূত হইয়াছে, আমোদের নিমিত্ত সে পরিবারভুক্ত কাহাকেও পরের নিকট ভিক্ষা করিতে হয় না। এই-সকল বন্ধনমুক্ত পরিবারে যে-কেহ প্রবেশ করেন তিনিই চমৎকৃত হইয়া যান। বুঝিতে পারেন যে, আপনার লোক আপনার হইলে পরের আবশ্যক অনেক কমিয়া যায়।

যাহারা আপনার কনিষ্ঠদের নিজের সম্পত্তি মনে করে, তাহারা যে নিজের ভৃত্যদেরও তাহাই মনে করিবে ইহাতে আর আশ্চর্য কী আছে। লেখক ইংলন্ড হইতে চিঠিতে লিখিয়াছিলেন যে, 'এখানে চাকরকে গালাগালি দেওয়া ও মারাও যা আর-একজন বাহিরের লোককে গালাগালি দেওয়া ও মারাও তাই। আমাদের দেশের মতো চাকরদের বেঁচে থাকা ছাড়া অন্য সমস্ত অধিকার মনিবদের হাতে নেই। চাকর কোনো কাজ করে দিলে "Thank you" ও তাকে কিছু আজ্ঞা করবার সময় "Please" বলা আবশ্যক।' ইহাতে কেহ কেহ এইরূপ বলিয়াছেন. 'চাকরদের সঙ্গে পদে পদে সম্মানসূচক ব্যবহার করা আষ্টেপৃষ্ঠে কাষ্ঠ-সভ্যতার ভার বহন করা আমাদের দেশের সহজ সভ্য লোকদের পোষায় না। এ-সকল কৃত্রিম সভ্যতার আমদানি যত কম হয় ততই ভালো; মনে করো ছেলের জ্বর হয়েছে আর যেই তার বাপ একটা হাতপাখা তুলে নিয়ে তার গায়ে বাতাস দিতে লাগল, অমনি ছেলে বলে উঠলেন, "Thank you বাবা!" এরূপ কাষ্ঠ-সভ্যতা কাষ্ঠ-হৃদয়ের উপরেই গুণ করিতে পারে, সহজ হৃদয়কে আগুন করিয়া তোলে।' জাতীয় ভাব এমন একটি যুক্তিবিহীন অন্ধ বধির ভাব যে, সে নিতান্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তিকেও অযৌক্তিক করিয়া তোলে। আমাদের দেশে একটা সাধারণ সংস্কার আছে যে, ইংরাজদের সমস্ত আচার-ব্যবহার কাষ্ঠ-সভ্যতাপ্রসূত, এরূপ সংস্কার সাধারণ লোকদের মধ্যে বদ্ধ থাকা স্বাভাবিক, যাহারা কিছু বিবেচনা করে না, প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, কেবল তাড়াতাড়ি বিশ্বাস করিতেই জানে তাহাদেরই মুখে এরূপ কথা শোভা পায়, কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তি অত শীঘ্র একটা সংস্কারে উপনীত

হন না। Please কথা বলিবার ভাবটার মূল যে রসনায় নহে হৃদয়ে, ইহা মনে করিতে আপত্তিটা কী? আমার যে ভাবটি নাই, আর-এক ব্যক্তির সেই ভাব থাকিলেই তাহাকে মৌখিক বলিয়া মনে করা নিতান্ত অন্যায়। তাহা হইলে যত প্রকার অনুষ্ঠান আছে সমস্ত মৌখিক; জাতীয় হৃদয়ের সহিত তাহার কোনো সম্পর্ক নাই বলিতে হইবে। তাহা হইলে আমরা যে পিতাকে প্রণাম করি, তাহা কৃত্রিম কাষ্ঠ-সভ্যতার প্রথা, তাহা আন্তরিক নহে। আমি তো বলি, এইরূপ মনে করা উচিত যে, ইংরাজ জাতির হৃদয়গত এমন একটি ভাব আছে, যাহাতে করিয়া তাহাকে স্বতই Please বলায়। সে ভাবটি কী? না তাহাদের স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্য ভাব। তাহারা সকলেই নিজে নিজে নিজের কার্য করিতে চায় ও তাহাই করে, এই নিমিত্ত অপরে যতটুকুই কাজ করিয়া দেয়, তাহা যতই সামান্য হউক-না কেন, Thank you কথা আপনি বাহির হইয়া পড়ে, এবং অপরকে সামান্য কাজটুকু করিতে বাধ্য করিতে হইলেও তাহারা Please না বলিয়া থাকিতে পারে না। আমরা যেমন অনেক সামান্য কাজে পরের উপর নির্ভর করি, এবং পরের নিকটে অনেকটা আশা করি, আমাদের অত সহজে Please ও Thank you বাহির হয় না। এমন হইতে পারে যে, প্রতিবারেই যখন তাহারা Please ও Thank you বলে তখন তাহাদের হৃদয়ে ওইরূপ ভাব উদয় হয় না, কিন্তু ওই ভাব হইতে যে এই প্রথার উৎপত্তি তাহা কি কেহই অস্বীকার করিবেন? আমরা যখন প্রতি অবসরেই প্রত্যেক গুরুজনকে প্রণাম করি তখন যে ভক্তির উচ্ছ্বাস হইতে করি, তাহা নহে, অনেক সময়ে প্রথার বশবর্তী হইয়া করি, কিন্তু ইহা অসংকোচে বলা যায় যে, গুরুভক্তি আমাদের দেশে বিশেষ প্রচলিত।

জাতীয় ভাব আমাদের কী অন্ধ করিয়াই তুলে! মনে করো আমাদের দেশে যদি কবরের প্রথা প্রচলিত থাকিত ও ইংলন্ডে শবদাহ প্রচলিত থাকিত তবে আমরা (অর্থাৎ জাতীয় ভাবোন্মত্ত পুরুষেরা) কী বলিতাম? আর আজকালই বা কী বলি, একবার কল্পনা করিয়া দেখা যাউক। আজকাল আমরা বলি, 'দেখো দেখি শবদাহে কত সুবিধা! স্থান সংক্ষেপ, ব্যয় সংক্ষেপ, স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদি। এমন-কি, আমাদের দেখাদেখি দেখো আজকাল য়ুরোপেও এই প্রথা প্রচলিত হইতেছে!' আর আমাদের দেশে যদি কবর প্রথা প্রচলিত থাকিত, তবে আমরাই বলিতাম, 'যে দেশে কাষ্ঠ-সভ্যতা প্রচলিত সেই দেশেই শবদাহ শোভা পায়। সুবিধাই কি সর্বস্ব হইল, আর হৃদয় কি কিছুই নহে? যে দেহে সামান্য আঘাত মাত্র দিতে কুণ্ঠিত হইয়াছি, যে দেহের স্পর্শে প্রভূত আনন্দ লাভ করিয়াছি, আজ তাহা কিনা অকাতরে দগ্ধ করিলাম? কী জন্য? না, স্থান সংক্ষেপের জন্য, ব্যয় সংক্ষেপের জন্য, সুবিধার জন্য? সহজ-সভ্য দেশের কি এই প্রথা? আবার নিজ হস্তে প্রিয়জনের মুখাগ্নি করা কি সহৃদয় জাতির কাজ!' জাতীয় ভাব এইরূপ একটা অদূর-দৃষ্টি, যুক্তিহীন অথচ গোঁ-বিশিষ্ট ভাব। উহা দ্বারা অতিমাত্র বিচলিত হওয়া সাধারণ লোকদের কাজ, চিন্তাশীল লোকদের নহে!

ভারতী
চৈত্র ১২৮৭

জুতা-ব্যবস্থা

(১৮৯০ খৃস্টাব্দে লিখিত)

গবর্নমেন্ট একটি নিয়মজারি করিয়াছেন যে, 'যে হেতুক বাঙালিদের শরীর অত্যন্ত বে-জুৎ হইয়া গিয়াছে, গবর্নমেন্টের অধীনে যে যে বাঙালি কর্মচারী আছে, তাহাদের প্রত্যহ কার্যারম্ভের পূর্বে জুতাইয়া লওয়া হইবে!'

শহরের বড়ো দালানে বাঙালিদের একটি সভা বসিয়াছে। একজন বক্তা যাজ্ঞবল্ক্য, বুদ্ধ ও বেদব্যাসের জ্ঞানের প্রশংসা করিয়া, ইংরাজ জাতির পূর্বপুরুষেরা যে গায়ে রঙ মাখিত ও রথের চাকায় কুঠার বাঁধিত তাহারই উল্লেখ করিয়া সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করিলেন যে, এই জুতা-মারার নিয়ম অত্যন্ত কু-নিয়ম হইয়াছে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে এমন নিয়ম অত্যন্ত অনুদার। (ঊনবিংশ শতাব্দীটা বোধ করি বাঙালিদের পৈতৃক সম্পত্তি হইবে; ও শব্দটা লইয়া তাঁহাদের এত নাড়াচাড়া, এত গর্ব।) তিনি বলিলেন, 'আমাদের যতদূর দুর্দশা হইবার তাহা হইয়াছে। ইংরাজ গবর্নমেন্ট আমাদের দরিদ্র করিবার জন্য সহস্রবিধ উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। মনে করো, বন্ধুকে পত্র লিখিতে হইবে, ইস্ট্যাম্প চাই, তাহার জন্য রাজা প্রতিজনের কাছে দুই পয়সা করিয়া লন। মনে করো, ইংরাজ বণিকেরা আমাদের বাজারে সস্তা পণ্য আনয়ন করিয়াছেন, আমাদের স্বজাতীয়েরা ঢাকাই বস্ত্র কিনে না, দেশীয় পণ্য চাহে না, আমাদের দেশের লোকের কি কম সহ্য করিতে হইতেছে, আর ইংরাজেরা কি কম ধূর্ত! এমন-কি, মনে করো গবর্নমেন্ট ষড়যন্ত্র করিয়া আমাদের দেশে ডাকাতি ও নরহত্যা একেবারে রদ করিয়া দিয়াছেন, ইহাতে করিয়া আমাদের বাঙালি জাতির পুরাতন বীরভাব একেবারে নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে, (উপর্যুপরি করতালি) সমস্তই সহ্য হয়, সমস্তই সহ্য করিয়াছি, উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে হিমালয় ও বঙ্গদেশ হইতে পঞ্জাবদেশ এক প্রাণ হইয়া উত্থান করে নাই, কিন্তু জুতা মারা নিয়ম যখন প্রচলিত হইল, তখন দেখিতেছি আর সহ্য হয় না, তখন দেখিতেছি আর রক্ষা নাই, সকলকে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিতে হইল, জাগিতে হইল, গবর্নমেন্টের নিকটে একখানা দরখাস্ত পাঠাইতেই হইল! (উৎসাহের সহিত হাততালি) কেন সহ্য হয় না যদি জিজ্ঞাসা করিতে চাও, তবে সমস্ত সভ্যদেশের, য়ুরোপের ইতিহাস খুলিয়া দেখো, ঊনবিংশ শতাব্দীর আচার-ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখো। দেখিবে, কোনো সভ্যদেশের গবর্নমেন্টে এরূপ জুতা-মারার নিয়ম ছিল না, এবং য়ুরোপের কোনো দেশে এ নিয়ম প্রচলিত নাই। ইংলন্ডে যদি এ নিয়ম থাকিত, ফ্রান্সে যদি এ নিয়ম থাকিত, তবে এ সভায় আজ এ নিয়মকে আমরা আনন্দের সহিত অভ্যর্থনা করিতাম, তবে এই সমবেত সহস্র সহস্র লোকের মুখে কী আনন্দই স্ফূর্তি পাইত, তবে আমরা এই সভ্য-দেশ-সম্মত অধিকার প্রাপ্তিতে পৃষ্ঠদেশের বেদনা একেবারে বিস্মৃত হইতাম!' (মুষলধারে করতালি বর্ষণ)। বক্তার উৎসাহ-অগ্নিগর্ভ বক্তৃতায় সভাস্থ সহস্র সহস্র ব্যক্তি এমন উত্তেজিত, উদ্দীপিত, উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সমবেত সাড়ে পাঁচ হাজার বাঙালির মধ্যে এত অধিক সংখ্যক লোকের মতের এমন ঐক্য হইয়াছিল যে, তৎক্ষণাৎ দরখাস্তে প্রায় সাড়ে চার শত নাম সই হইয়া গিয়াছিল।

লাটসাহেব রুখিয়া দরখাস্তের উত্তরে কহিলেন, 'তোমরা কিছু বোঝ না, আমরা যাহা করিয়াছি, তোমাদের ভালোর জন্যই করিয়াছি। আমাদের সিদ্ধান্ত ব্যবস্থা লইয়া বাগাড়ম্বর করাতে তোমাদের রাজ-ভক্তির অভাব প্রকাশ পাইতেছে। ইত্যাদি।'

নিয়ম প্রচলিত হইল। প্রতি গবর্নমেন্ট-কার্যশালায় একজন করিয়া ইংরাজ জুতা-প্রহর্তা নিযুক্ত হইল। উচ্চপদের কর্মচারীদের এক শত ঘা করিয়া বরাদ্দ হইল। পদের উচ্চ-নীচতা অনুসারে জুতা-প্রহার-সংখ্যার ন্যূনাধিক্য হইল। বিশেষ সম্মান-সূচক পদের জন্য বুট জুতা ও নিম্ন-শ্রেণীস্থ পদের জন্য নাগরা জুতা নির্দিষ্ট হইল।

যখন নিয়ম ভালোরূপে জারি হইল, তখন বাঙালি কর্মচারীরা কহিল, 'যাহার নিমক খাইতেছি, তাহার জুতা খাইব, ইহাতে আর দোষ কী? ইহা লইয়া এত রাগই বা কেন, এত হাঙ্গামাই বা কেন? আমাদের দেশে তো প্রাচীনকাল হইতেই প্রবচন চলিয়া আসিতেছে, পেটে খাইলে পিঠে সয়। আমাদের পিতামহ-প্রপিতামহদের যদি পেটে খাইলে পিঠে সইত তবে আমরা এমনই কী চতুর্ভুজ হইয়াছি, যে আজ আমাদের সহিবে না? স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মোভয়াবহঃ। জুতা খাইতে খাইতে মরাও ভালো, সে আমাদের স্বজাতি-প্রচলিত ধর্ম।' যুক্তিগুলি এমনই প্রবল বলিয়া বোধ হইল যে, যে যাহার কাজে অবিচলিত হইয়া রহিল। আমরা এমনই যুক্তির বশ! (একটা

কথা এইখানে মনে হইতেছে। শব্দ-শাস্ত্র অনুসারে যুক্তির অপভ্রংশে জুতি শব্দের উৎপত্তি কি অসম্ভব? বাঙালিদের পক্ষে জুতির অপেক্ষা যুক্তি অতি অল্পই আছে, অতএব বাংলা ভাষায় যুক্তি শব্দ জুতি শব্দে পরিণত হওয়া সম্ভবপর বোধ হইতেছে।)

কিছু দিন যায়। দশ ঘা জুতা যে খায়, সে একশো ঘা-ওয়ালাকে দেখিলে জোড় হাত করে, বুটজুতা যে খায় নাগরা-সেবকের সহিত সে কথাই কহে না। কন্যাকর্তারা বরকে জিজ্ঞাসা করে, কয় ঘা করিয়া তাহার জুতা বরাদ্দ। এমন শুনা গিয়াছে, যে দশ ঘা খায় সে ভাঁড়াইয়া বিশ ঘা বলিয়াছে ও এইরূপ অন্যায় প্রতারণা অবলম্বন করিয়া বিবাহ করিয়াছে। ধিক্, ধিক্, মনুষ্যেরা স্বার্থে অন্ধ হইয়া অধর্মাচরণে কিছুমাত্র সংকুচিত হয় না। একজন অপদার্থ অনেক উমেদারি করিয়াও গবর্নমেন্টে কাজ পায় নাই। সে ব্যক্তি একজন চাকর রাখিয়া প্রত্যহ প্রাতে বিশ ঘা করিয়া জুতা খাইত। নরাধম তাহার পিঠের দাগ দেখাইয়া দশ জায়গা জাঁক করিয়া বেড়াইত, এবং এই উপায়ে তাহার নিরীহ শ্বশুরের চক্ষে ধুলা দিয়া একটি পরমাসুন্দরী স্ত্রীরত্ন লাভ করে। কিন্তু শুনিতেছি সে স্ত্রীরত্নটি তাহার পিঠের দাগ বাড়াইতেছে বৈ কমাইতেছে না। আজকাল ট্রেনে হউক, সভায় হউক, লোকের সহিত দেখা হইলেই জিজ্ঞাসা করে, 'মহাশয়ের নাম? মহাশয়ের নিবাস? মহাশয়ের কয় ঘা করিয়া জুতা বরাদ্দ?' আজকালকার বি-এ এম-এ'রা নাকি বিশ ঘা পঁচিশ ঘা জুতা খাইবার জন্য হিমসিম খাইয়া যাইতেছে, এইজন্য পূর্বোক্ত রূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাকে তাঁহারা অসভ্যতা মনে করেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের ভাগ্যে তিন ঘায়ের অধিক বরাদ্দ নাই। একদিন আমারই সাক্ষাতে ট্রেনে আমার একজন এম-এ বন্ধুকে একজন প্রাচীন অসভ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'মহাশয়, বুট না নাগরা?' আমার বন্ধুটি চটিয়া লাল হইয়া সেখানেই তাহাকে বুট জুতার মহা সম্মান দিবার উপক্রম করিয়াছিল। আহা, আমার হতভাগ্য বন্ধু বেচারির ভাগ্যে বুটও ছিল না, নাগরাও ছিল না। এরূপ স্থলে উত্তর দিতে হইলে তাহাকে কী নতশির হইতেই হইত! আজকাল শহরে পাকড়াশী পরিবারদের অত্যন্ত সম্মান। তাঁহারা গর্ব করেন, তিন পুরুষ ধরিয়া তাঁহারা বুট জুতা খাইয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহাদের পরিবারের কাহাকেও পঞ্চাশ ঘা'র কম জুতা খাইতে হয় নাই। এমন-কি, বাড়ির কর্তা দামোদর পাকড়াশী যত জুতা খাইয়াছেন, কোনো বাঙালি এত জুতা খাইতে পায় নাই। কিন্তু লাহিড়িরা লেপ্টেনেন্ট-গবর্নরের সহিত যেরূপ ভাব করিয়া লইয়াছে, দিবানিশি যেরূপ খোশামোদ আরম্ভ করিয়াছে, শীঘ্রই তাহারা পাকড়াশীদের ছাড়াইয়া উঠিবে বোধ হয়। বুড়া দামোদর জাঁক করিয়া বলে, 'এই পিঠে মন্টিথের বাড়ির তিরিশটা বুট ক্ষয়ে গেছে।' একবার ভজহরি লাহিড়ি দামোদরের ভাইঝির সহিত নিজের বংশধরের বিবাহ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিল, দামোদর নাক সিটকাইয়া বলিয়াছিল, 'তোরা তো ঠন্‌ঠোনে।' সেই অবধি উভয় পরিবারে অত্যন্ত বিবাদ চলিতেছে। সেদিন পূজার সময় লাহিড়িরা পাকড়াশীদের বাড়িতে সওগাতের সহিত তিন জোড়া নাগরা জুতা পাঠাইয়াছিল; পাকড়াশীদের এত অপমান বোধ হইয়াছিল যে, তাহারা নালিশ করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল; নালিশ করিলে কথাটা পাছে রাষ্ট্র হইয়া যায় এইজন্য থামিয়া গেল। আজকাল সাহেবদিগের সঙ্গে দেখা করিতে হইলে সম্ভ্রান্ত 'নেটিব'গণ কার্ডে নামের নীচে কয় ঘা জুতা খান, তাহা লিখিয়া দেন, সাহেবের কাছে গিয়া জোড়-হস্তে বলেন, 'পুরুষানুক্রমে আমরা গবর্নমেন্টের জুতা খাইয়া আসিতেছি; আমাদের প্রতি গবর্নমেন্টের বড়োই অনুগ্রহ।' সাহেব তাঁহাদের রাজভক্তির প্রশংসা করেন। গবর্নমেন্টের কর্মচারীরা গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে চান না; তাঁহারা বলেন, 'আমরা গবর্নমেন্টের জুতা খাই, আমরা কি জুতা-হারামি করিতে পারি!'

সেদিন একটা মস্ত মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। বেণীমাধব শিকদার গবর্নমেন্টের বিশেষ অনুগ্রহে আড়াইশো ঘা করিয়া জুতা খায়। জুতাবর্দারের সহিত মনান্তর হওয়াতে একদিন সে তাহাকে সাত ঘা কম মারিয়াছিল। ডিস্ট্রিক্ট জজের কোর্টে মকদ্দমা উঠিল। জুতাবর্দার নানা মিথ্যা সাক্ষী সংগ্রহ করিয়া প্রমাণ করিল যে, মারিতে মারিতে তাহার পুরাতন বুট ছিঁড়িয়া যায় কাজেই সে মার বন্ধ

করিতে বাধ্য হইয়াছিল। জজ মকদ্দমা ডিসমিস করিয়া দিলেন। হাইকোর্টে আপিল হইল। উভয়পক্ষে বিস্তর ব্যারিস্টর নিযুক্ত হইল। তিন মাস মকদ্দমার পর জজেরা সাব্যস্ত করিলেন সত্যই জুতা ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, অতএব ইহাতে আসামীর কোনো দোষ নাই। বেণীমাধব প্রিবি কৌন্সিলে আপিল করিলেন। সেখানে বিচারক রায় দিলেন, 'হাঁ, সত্য সত্যই বেণীমাধবের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা হইয়াছে। সে যখন বারো বৎসর ধরিয়া নিয়মিত আড়াই শত জুতা খাইয়া আসিতেছে, তখন তাহাকে একদিন দুই শত তেতাল্লিশ জুতা মারা অতিশয় অন্যায় হইয়াছে। আর জুতা ছেঁড়ার ওজর কোনো কাজেরই নহে।' বেণীমাধব বুক ফুলাইয়া বলিল, 'হাঁ হাঁ, আমার সঙ্গে চালাকি!' সাধারণ লোকেরা বলিল, 'না হইবে কেন! কত বড়ো লোক? উঁহাদের সহিত পারিয়া উঠিবে কেন?' এই উপলক্ষে হিন্দু পেট্রিয়টে একটা আর্টিকেল লিখিত হয়; তাহাতে অনেক উদাহরণসমেত উল্লেখ থাকে যে, 'ইংরাজ জুতা-বর্দারেরা আমাদের বড়ো বড়ো সম্ভ্রান্ত নেটিব কর্মচারীদিগের মান-অপমানের প্রতি দৃষ্টি রাখে না। যাহার যত বরাদ্দ তাহাকে তাহার কম দিতে শুনা যায়। অতএব আমাদের মতে বাঙালি জুতাবর্দার নিযুক্ত হউক। কিন্তু এক কথায় তাঁহার সে-সমস্ত যুক্তি খণ্ডিত হইয়া যায়—'যদি বাঙালি জুতাবর্দার নিযুক্ত করা যায় তবে তাহাদের জুতাইবে কে?' আজকাল বঙ্গদেশে একমাত্র আশীর্বাদ প্রচলিত হইয়াছে, অর্থাৎ 'পুত্র-পৌত্রানুক্রমে গবর্নমেন্টের জুতা ভোগ করিতে থাকো, আমার মাথায় যত চুল আছে তত জুতা তোমার ব্যবস্থা হউক।' সেই আশীর্বচনের সহিত এই প্রবন্ধের উপসংহার করি।[১]

ভারতী
জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮

চীনে মরণের ব্যবসায়[২]

একটি সমগ্র জাতিকে অর্থের লোভে বলপূর্বক বিষপান করানো হইল; এমনতরো নিদারুণ ঠগীবৃত্তি কখনো শুনা যায় নাই। চীন কাঁদিয়া কহিল, 'আমি আহিফেন খাইব না।' ইংরাজ বণিক কহিল, 'সে কি হয়?' চীনের হাত দুটি বাঁধিয়া তাহার মুখের মধ্যে কামান দিয়া অহিফেন ঠাসিয়া দেওয়া হইল; দিয়া কহিল, 'যে অহিফেন খাইলে তাহার দাম দাও।' বহুদিন হইল ইংরাজেরা চীনে এইরূপ অপূর্ব বাণিজ্য চালাইতেছেন। যে জিনিস সে কোনো মতেই চাহে না, সেই জিনিস তাহার এক পকেটে জোর করিয়া গুঁজিয়া দেওয়া হইতেছে ও আর-এক পকেট হইতে তাহার উপযুক্ত মূল্য তুলিয়া লওয়া হইতেছে। অর্থ-সঞ্চয়ের এরূপ উপায়কে ডাকাইতি না বলিয়া যদি বাণিজ্য বলা যায়, তবে সে নিতান্তই ভদ্রতার খাতিরে। যে জাতি আফ্রিকার দাসত্ব-শৃঙ্খল মোচন করিয়া

১. 'This evening's Englishman has discovered the secret of correctly treating the people of Bengal. It says, 'Kick them first and then speak to them.'—*Indian Mirror*. যে সমগ্র জাতিকে কোনো বিজাতীয় কাগজ হাটের মধ্যে এরূপ জুতা মারিতে সাহস করে, সে জাতি উপরি-প্রকাশিত প্রবন্ধ পড়িয়া বিস্মিত হইবে না। বোধ হয়, লেখক রহস্যচ্ছলে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, কিন্তু উহা সত্যের এত কাছ ঘেঁষিয়া গিয়াছে যে, বাঙালি জাতির পক্ষে উহা রহস্যাত্মক হইবে না। আজ অন্য কোনো দেশে যদি কোনো কাগজ ওইরূপ অপমানের আভাস মাত্র দিত, তাহা হইলে দেশবাসীরা তৎক্ষণাৎ নানা উপায়ে তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করিত। কিন্তু এতদিন হইতে আমরা জুতা হজম করিয়া আসিতেছি যে, আজ উহা আমাদের নিকট গুরুপাক বলিয়া ঠেকিতেছে না।—সং

২. *The Indo-British Opium Trade* by Theodore Christlieb DD. Ph.D. Translated from the German by David B. Croom, M.A.

শত শত অসহায়ের আশীর্বাদভাজন হইয়াছেন, সেই জাতি আজ চীনকে কামানের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া বলিতেছেন, 'আমার পয়সার আবশ্যক হইয়াছে তুই বিষ খা!' আসিয়ার একটি বৃহত্তম, প্রাচীন সভ্যদেশের বক্ষঃস্থলে বসিয়া বিষ কীটের ন্যায় তাহার শরীরের ও মনের মধ্যে প্রতি মুহূর্তে তিল তিল করিয়া মরণের রস সঞ্চারিত করিতেছেন। ইহা আর কিছু নয়, একটি সবল জাতি দুর্বলতর জাতির নিকটে মরণ বিক্রয় করিয়া ধ্বংসে বিক্রয় করিয়া কিছু কিছু করিয়া লাভ করিতেছেন। এক পক্ষে কতই বা লাভ, আর-এক পক্ষে কী ভয়ানক ক্ষতি!

চীনে যেরূপ এই বাণিজ্য প্রবেশ করিয়াছে, তাহা পাঠ করিলে পাষাণ হৃদয়েও করুণা সঞ্চার হইবে। যুদ্ধ-বিগ্রহের নিদারুণ হত্যাকাণ্ড ও অত্যাচার সকল পাঠ করিলেও এত খারাপ লাগে না, তাহাতে মনে বিস্ময়-মিশ্রিত একটা ভীষণ ভাবের উদ্রেক হয় মাত্র, কিন্তু এই চীনের অহিফেন বাণিজ্যের মধ্যে এমন একটা নীচ হীন প্রবৃত্তির ভাব আছে, দস্যুবৃত্তির অপেক্ষা চৌর্যবৃত্তির ভাব এত অধিক আছে যে, তাহার ইতিহাস পড়িলে আমাদের ঘৃণা হয়।

১৭৮০ খৃস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মেকাও-সমীপবর্তী লার্ক উপসাগরে দুইটি ছোটো অহিফেনের জাহাজ পাঠাইয়া দেন। তখনো চীনে অহিফেন নেশার দ্রব্য স্বরূপে প্রচলিত ছিল না। ইতিপূর্বে কেবল ঔষধ স্বরূপে ২০০ সিন্ধুক অহিফেন চীনে আমদানি হইত। ১৭৮১ খৃস্টাব্দে যে ২৮০০ সিন্ধুক অহিফেন চীনে আসিয়াছিল, দেশে তাহার খরিদ্দার ছিল না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একমাত্র ব্রত হইল কিসে এই পাপ চীনের মধ্যে প্রবেশ করে। ইংরাজেরা যখন আবশ্যক বিবেচনা করেন, তখন চাতুরী ও ধূর্ততার খেলা চমৎকার খেলিতে পারেন। চীনে সেই খেলা আরম্ভ হইল। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের চেষ্টা এতদূর সফল হইয়া আসিল যে, ১৭৯৯ খৃস্টাব্দে অহিফেনের আমদানি একেবারে বন্ধ করিবার নিমিত্ত আইন প্রচার করিতে হইল। কিন্তু তথাপি ইংরাজ বণিকেরা বেআইনী গোপন ব্যবসায় (smuggling) চালাইতে লাগিলেন। ন্যায্য বা অন্যায্য যে উপায়েই হউক, প্রকাশ্যভাবেই হউক আর চৌরের ন্যায় অতি গোপনভাবেই হউক, চীনকে অহিফেন সেবন করাইতে কোম্পানি একবারে দৃঢ়-সংকল্প।

গোলযোগ দেখিয়া অহিফেনের জাহাজ লার্ক উপসাগর হইতে হ্বাম্পোয়াতে সরানো হইল। চীন গবর্নমেন্ট যাহাতে হ্বাম্পোয়াতে কোনো জাহাজে অহিফেন লইয়া না আসে, তাহার জামিন হংকং-এর সমস্ত বণিকদের নিকট হইতে লইলেন। এই আইন হইল যে, যদি কোনো জাহাজে অহিফেন থাকে, তবে সে জাহাজ তৎক্ষণাৎ মাল না নামাইয়া বন্দর হইতে চলিয়া যাইবেক এবং জামিনদাতাদের শাস্তি হইবে। এই আইন মাঝে মাঝে প্রায় পুনঃপ্রচারিত হইত, তথাপি তাহার বিশেষ ফল হইল না। অবশেষে ১৮২১ খৃস্টাব্দে ক্যান্টনের শাসনকর্তা বেআইনি গোপন ব্যবসায় সকল নিবারণে বিশেষ উদ্যোগী হইলেন। তিনি ইংরাজ, পর্টুগিজ ও মার্কিনদিগকে, এই অতি হীন বাণিজ্য-প্রণালী ও চীন রাজকর্মচারীদিগকে নীতিভ্রষ্ট করা রূপ অতি ঘৃণিত কার্য পরিত্যাগ করিতে বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি হ্বাম্পোয়া হইতে তাঁহাদের জাহাজ সরাইয়া লিন্-টিন দ্বীপে লইয়া গেলেন। চীনের সমস্ত উপকূল পর্যটন করিবার জন্য জাহাজ প্রেরিত হইল। সেই-সকল জাহাজ হইতে কিছু দূরে অন্যান্য অহিফেন সমেত জাহাজ সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিতে লাগিল। সেই জাহাজসমূহ হইতে অহিফেন লইয়া লুকাইয়া চুরাইয়া বেআইনি বাণিজ্য চলিতে লাগিল। দেশের অভ্যন্তর ভাগে লোকদের মধ্যে এই নেশা প্রচলিত করাইবার জন্য চীন রাজকর্মচারীদের ইংরাজেরা প্রায় মাঝে মাঝে ঘুষ দিতে লাগিল। ক্রিস্টলিয়েব্ বলিতেছেন যে, এইরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষীয় ইংরাজ গবর্নমেন্ট চীনবাসীদের নিজ দেশের আইন লঙ্ঘন করিতে ও উপরিস্থ ব্যক্তিদিগের অবাধ্য হইতে যেরূপ শিক্ষা দিয়াছেন, এমন আর কেহ দেয় নাই।

১৮৩৪ খৃস্টাব্দে অহিফেন বাণিজ্যের বিরুদ্ধে নূতন শাসন প্রচারিত হইল। কিন্তু তথাপি গোপন ব্যবসায় এতদূর পর্যন্ত বাড়িয়া উঠিল যে, সমস্ত চীন দেশে অহিফেন লইয়া একটা

আন্দোলন উপস্থিত হইল। চীনের দেশ-হিতৈষীরা ইংরাজদের সহিত সমস্ত বাণিজ্য রদ করিবার প্রস্তাব করিলেন। প্রজাদিগের ঘোর অনিষ্ট সম্ভাবনা দেখিয়া সম্রাট ব্যাকুল হইয়া প্রতিনিধিস্বরূপ লিন্‌কে ক্যান্টনে প্রেরণ করিলেন। লিন্ বন্দরস্থিত জাহাজের সমস্ত অহিফেন ধ্বংস করিয়া দিলেন, ইংরাজদের সহিত বাণিজ্য রহিত করিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সমস্ত কর্মচারীকে চীন হইতে দূর করিয়া দিলেন। অবশেষে ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ বাধিল।

যুদ্ধের ফল সকলেই অবগত আছেন। পরাজিত চীন সন্ধি করিল। পাঁচটি বন্দর ইংরাজ বণিকদের নিকটে উন্মুক্ত হইল, হংকং ইংরাজেরা লাভ করিলেন, এবং ২১ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ স্বরূপে চীনের নিকট হইতে আদায় করিলেন। ইংরাজেরা অনুগ্রহ করিয়া সন্ধিপত্রে সম্মতি দিলেন যে, 'বেআইনী সমস্ত পণ্যদ্রব্য চীন গবর্নমেন্ট কাড়িয়া লইতে পারিবেন।' এই অবসরে ইংরাজেরা চেষ্টা করিয়াছিলেন যাহাতে অহিফেন বেআইনী পণ্যের মধ্যে গণ্য না হয়। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। ইংরাজ প্রতিনিধি সার্ পটিঞ্জরকে চীন কর্তৃপক্ষীয়েরা অহিফেন বাণিজ্য একেবারে উঠাইয়া দিতে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনি কহিলেন, 'আচ্ছা, জাহাজে অহিফেন দেখিলে কাড়িয়া লইয়ো, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, তবে আমরা তোমাদের সাহায্য করিতে পারিব না।' তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন যে, অহিফেন-বাণিজ্যতরীসকল যুদ্ধ-সজ্জায় যেরূপ সুসজ্জিত, তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত দুর্বল চীন তাহাদের কাছে ঘেঁষিতে পারিবে না। এইরূপে প্রকাশ্যভাবে, অসহায় চীনের চোখের সামনে বেআইনী ব্যবসায় চলিতে লাগিল।

বিদেশীয়েরা উপর্যুপরি ও অবিরত তাহাদের দেশের আইন লঙ্ঘন করাতে চীনবাসীরা এত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল যে, 'লোহিত-কেশ' বিদেশীদের একেবারে বিনাশ করিতে তাহারা কল্পনা করিল। রাজকর্মচারী ইয়েঃ 'অ্যারো' নামক একটি ইংরাজ-জাহাজ ধৃত করাতে পুনর্বার চীনদের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ বাধিল। এবারে ফ্রান্স ইংলন্ডের সহিত যোগ দিলেন।

হতভাগ্য পরাজিত চীনকে সাতটি বন্দর বিদেশীদের নিকট উন্মুক্ত করিতে হইল। অহিফেন বেআইনী পণ্যের মধ্যে আর পরিগণিত হইল না। কেবল অহিফেনের উপর মাশুল নির্দিষ্ট হইল। যাহাতে মাশুল গুরুতর হয় চীনেরা তাহার জন্য বারংবার নিবেদন করে, কিন্তু ইংরাজরা তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছে। এইবারের সন্ধির পর হইতে অহিফেনের বাণিজ্য এমন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিল যে, ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে চীনে ৯০০০০ বাক্স অহিফেন আমদানি হইয়াছে।

এখন চীনে কোটি কোটি লোক অহিফেন সেবন করিতেছে। আমাদের দেশে যেমন বাড়িতে কেহ আসিলে আমরা তামাক দিই, চীনে সেইরূপ ধনী লোকেরা ও শ্রীসম্পন্ন ব্যবসায়ীরা প্রায় সাক্ষাৎকারীদের ও খরিদ্দারদের চণ্ডুর হুঁকা দিয়া থাকে। রাস্তায় রাস্তায় চণ্ডুর দোকান খুলিয়াছে। স্যানিহিয়েন নগরে অহিফেন-ধূম সেবনের এমন প্রাদুর্ভাব হইয়াছে যে, অধিবাসীরা নেশায় ভোর হইয়া দিনের বেলায় কোনো কাজ করিতে পারে না, মশাল জ্বালাইয়া রাত্রে কাজ করে। এক নিংপো নগরে কেবল দরিদ্র লোকদিগের জন্য ২৭০০ চণ্ডুর দোকান আছে। দেখা গিয়াছে যে যে স্থানে অহিফেন সেবনের বিশেষ প্রাদুর্ভাব, সেই সেই স্থানে দুর্ভিক্ষের প্রভাব অত্যন্ত অধিক হয়। প্রথম কারণ, লোকেরা অকর্মিষ্ঠ, দ্বিতীয় কারণ, এত অধিক জমি অহিফেনের চাষে নিয়োজিত যে, যথেষ্ট পরিমাণে শস্য উৎপাদনের স্থান নাই। এমন হইয়াছে দুর্ভিক্ষের সময় লোকের হাতে টাকা আছে, অথচ তাহারা টাকা খুঁজিয়া পায় না। তখন তাহারা বুঝিয়াছে যে, অহিফেনে পেট ভরে না। চীনবাসীরা ক্রমশই অকর্মণ্য হইয়া যাইতেছে। ১৮৩২ খৃস্টাব্দে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যখন এক হাজার সৈন্য প্রেরিত হয়, তাহার মধ্য হইতে দুইশত অহিফেনসেবী অকর্মণ্য সৈন্য ফেরত পাঠাইতে হইয়াছিল। বিদ্রোহী দলের মধ্যে সকলেই অহিফেন-বিদ্বেষী ছিল, অহিফেনসেবী রাজসৈনিকেরা তাহাদের নিকটে উপর্যুপরি পরাজিত হয়। চীনেরা বলে যে, সহজে চীনদেশ জয় করিবার অভিপ্রায়ে ধূর্ত ইংরাজেরা অহিফেন ব্যবসায় চীনে প্রচলিত করিয়াছে।

অহিফেনের জন্য প্রতি বৎসর চীনদেশ হইতে এত টাকা বাহির হইয়া যায় যে, ক্রমশই সে দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে। ১৮৭২ খৃস্টাব্দে চীন ৮ কোটি ২ লক্ষ ৬১ হাজার ৩ শত ৮১ পাউন্ড অহিফেন কিনিয়াছে। কী ভয়ানক ব্যয়! অহিফেনসেবীদের নীতি এমনি বিগড়িয়া যায় যে, তাহারা নিজের সন্তান বিক্রয় করে ও নিজের স্ত্রীকে ভাড়া দেয়, চুরি-ডাকাতির তো কথাই নাই।' এইরূপে এক বিদেশীয় জাতির হীন স্বার্থপরতা ও সীমাশূন্য অর্থলিপ্সার জন্য সমস্ত চীন তাহার কোটি কোটি অধিবাসী লইয়া শারীরিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধঃপতনের পথে দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছে। যেন, ইংরাজদিগের নিকট ধর্মের অনুরোধ নাই, কর্তব্যজ্ঞানের অনুরোধ নাই, সহৃদয়তার অনুরোধ নাই, কেবল একমাত্র পয়সার অনুরোধ বলবান। এই তো তাঁহাদের উনবিংশ শতাব্দীর খৃস্টীয় সভ্যতা!

পাদ্রিদিগের ধর্মোপদেশ শুনিলে চীনবাসীদের গা জ্বলিয়া যায়। জ্বলিবার কথাই তো বটে! একবার একজন আমেরিকান পাদ্রি কাইফংফু নগরে গিয়াছিলেন, সেখানে একদল লোক জুটিয়া তাঁহাকে দূর করিয়া দেয়। তাহারা তাঁহাকে বলে, 'তোমরা আমাদের সম্রাটকে হত্যা করিলে, আমাদের রাজপ্রাসাদ ভূমিসাৎ করিলে, আমাদের ধ্বংস করিবার জন্য বিষ আনয়ন করিলে, আর আজ আমাদের ধর্ম শিখাইতে আসিয়াছ!!' একজন ইংরাজ ফাট্‌সান নগরে চণ্ডুর দোকান দেখিতে গিয়াছিলেন, একজন চণ্ডুপায়ী তাঁহার কাছে স্বীকার করিয়াছিল যে, সে তাহার দৈনিক উপার্জনের দশ ভাগের আট ভাগ চণ্ডুপান করিয়া ব্যয় করে। সে অবশেষে ইংরাজটিকে বলে, 'তুমি তো ইংলন্ড হইতে আসিতেছ? তাহা হইলে অবশ্য তুমি আমাদের মৃত্যুর নিদান বিষ লইয়া কারবার করিয়া থাক। আচ্ছা, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের রানীটি না জানি কীরূপ দুষ্ট স্ত্রীলোক! আমরা তোমাদের ভালো ভালো চা ও রেশম পাঠাই, আর তিনি কি না তাহার পরিবর্তে আমাদের বধ করিবার জন্য বিষ পাঠাইয়া দেন?' ইংরাজদের সম্বন্ধে চীনেরা এইরূপ বলে।

এই এক অহিফেন ব্যবসায় সম্বন্ধে বিদেশীয়দের প্রতি চীনের এতদূর অবিশ্বাস হইয়াছে যে, তাহারা স্বদেশে রেলোয়ে প্রভৃতি নির্মাণ করিতে চাহে না, পাছে অহিফেন দেশের অভ্যন্তরদেশে অধিক করিয়া প্রবেশ করিতে পারে। পাছে বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয় ও তৎসঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত পরিমাণে বিদেশীদের আমদানি হয়! এমন-কি, লৌহ ও কয়লার খনি ব্যতীত দেশের অন্যান্য বড়ো বড়ো খনি চীন গবর্নমেন্ট স্পর্শ করেন না, পাছে খনিতে বিদেশীয় কর্মচারী রাখিতে হয় ও পাছে বিদেশীয় বাণিজ্য আরও বাড়িয়া উঠে। অহিফেনে চীনের রাজস্বলাভ বড়ো অল্প হয় না, তথাপি চীন জোড় হস্তে বলে, 'তোর ভিক্ষা দিয়া কাজ নাই, তোর কুকুর ডাকিয়া ল'!' পটিঞ্জর যখন অহিফেনকে নিষিদ্ধ পণ্য-শ্রেণী-বহির্ভূত করিতে সম্রাটের নিকট প্রস্তাব করেন, তখন সম্রাট টাও কাং এই কথা বলিয়াছিলেন, 'সত্য বটে, এ বিষের সঞ্চরণ আমি কোনো মতে রোধ করিতে পারিব না, কারণ অর্থলোলুপ, নীতিভ্রষ্ট লোকেরা লোভ ও ইন্দ্রিয়াসক্তির বশ হইয়া আমার মনের ইচ্ছা বিপর্যস্ত করিয়া দিবে। তথাপি আমি বলিতেছি— আমার নিজের প্রজাদের পাপ ও যন্ত্রণা হইতে যে আমি রাজস্ব লাভ করিব, এমন প্রবৃত্তি আমার কিছুতেই হইবে না।'

ইংরাজ জাতির প্রতি চীনের এইরূপ দারুণ অবিশ্বাস থাকাতে ইংরাজদের কম লোকসান হইতেছে না। চীনে ইংরাজ-বাণিজ্যের অত্যন্ত ক্ষতি হইতেছে। ইংরাজি পণ্য চীনে অল্প আমদানি হয়, এবং তাহা দেশের অভ্যন্তর ভাগে চালান করিতে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হয়। অল্প দিন হইল লন্ডন ব্যাঙ্ক-ওয়ালারা চীনে ইংরাজ-বাণিজ্যের শোচনীয় অবস্থা বিষয়ে গবর্নমেন্টের নিকট এক দরখাস্ত পাঠাইয়াছে।

এই অহিফেন বাণিজ্যে ভারতবর্ষেরই বা কী উপকার অপকার হইতেছে দেখা যাক।

---

১. একজন চীনবাসী অহিফেন-ধূমপায়ী বলিয়াছেন যে, 'দক্ষিণ পর্বতের সমস্ত বাঁশে (বাঁশের কলম) অহিফেনের দোষ বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না; উত্তর সমুদ্রের সমস্ত জলেও ইহার কলঙ্ক প্রক্ষালিত হয় না।'

ভারতবর্ষীয় রাজস্বের অধিকাংশ এই অহিফেন বাণিজ্য হইতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু অহিফেনের ন্যায় ক্ষতিবৃদ্ধিশীল বাণিজ্যের উপর ভারতবর্ষের রাজস্ব অত অধিক পরিমাণে নির্ভর করাকে সকলেই ভয়ের কারণ বলিয়া মনে করিতেছেন। ১৮৭১/৭২ খৃস্টাব্দে এই বাণিজ্য হইতে সাড়ে সাত কোটি পাউন্ডেরও অধিক রাজস্ব আদায় হইয়াছিল। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহা ৬ কোটি ৩ লক্ষ পাউন্ডে নামিয়া আসে। এরূপ রাজস্বের উপর নির্ভর করা অত্যন্ত আশঙ্কার কারণ। ভারতবর্ষীয় অহিফেন নিকৃষ্ট হইয়া আসিতেছে, সুতরাং তাহার দাম কমিবার কথা। তাহা ভিন্ন চীনে ক্রমশই অহিফেন চাষ বাড়িতেছে। চীনে স্থানে স্থানে অহিফেন-সেবন-নিবারক সভা বসিয়াছে। ক্যান্টনবাসী আমীর-ওমরাহগণ প্রায় সহস্র প্রসিদ্ধ পল্লীতে প্রতি গৃহস্থকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, 'তোমরা সাবধান থাকিয়ো যাহাতে বাড়ির ছেলেপিলেরা অহিফেন অভ্যাস না করিতে পায়।' যাহারা অহিফেন সেবন করে তাহাদের সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইয়াছেন। তিনটি বড়ো বড়ো নগরের অধিবাসী বড়োলোকেরা সমস্ত অহিফেনের দোকান বন্ধ করাইতে পারিয়াছেন। এইরূপে চীনে অহিফেনের চাষ এত বাড়িতে পারে, ও অহিফেন সেবন এত কমিতে পারে যে, সহসা ভারতবর্ষীয় রাজস্বের বিশেষ হানি হইবার সম্ভাবনা। অতএব ওই বাণিজ্যের উপর রাজস্বের জন্য অত নির্ভর না করিয়া অন্য উপায় দেখা উচিত। এতদ্ভিন্ন অহিফেন চাষে ভারতবর্ষের স্পষ্ট অপকার দেখা যাইতেছে। অহিফেন চাষ করিতে বিশেষ উর্বরা জমির আবশ্যক। সমস্ত ভারতবর্ষে দেড় কোটি একর (Acre) উর্বরতম জমি অহিফেনের জন্য নিযুক্ত আছে। পূর্বে সে-সকল জমিতে শস্য ও ইক্ষু চাষ হইত। এক বাংলা দেশে আধ কোটি একরেরও অধিক জমি অহিফেন চাষের জন্য নিযুক্ত। ১৮৭৭/৭৮-এর দুর্ভিক্ষে বাংলার প্রায় এক কোটি লোক মরে। আধ কোটি একর উর্বর ভূমিতে এক কোটি লোকের খাদ্য জোগাইতে পারে। ১৮৭১ খৃস্টাব্দে ডাক্তার উইল্‌সন পার্লিয়ামেন্টে কহিয়াছেন যে, মালোয়াতে অহিফেনের চাষে অন্যান্য চাষের এত ক্ষতি হইয়াছিল যে, নিকটবর্তী রাজপুতানা দেশে ১২ লক্ষ লোক না খাইয়া মরে। রাজপুতানায় ১২ লক্ষ লোক মরিল তাহাতে তেমন ক্ষতি বিবেচনা করি না, সে তো ক্ষণস্থায়ী ক্ষতি। এই অহিফেনে রাজপুতানার চিরস্থায়ী সর্বনাশের সূত্রপাত হইয়াছে। সমস্ত রাজপুতানা আজ অহিফেন খাইয়া আত্মহত্যা করিতে বসিয়াছে। অত বড়ো বীর জাতি আজ অকর্মণ্য, অলস, নির্জীব, নিরুদ্যম হইয়া ঝিমাইতেছে। আধুনিক রাজপুতানা নিদ্রার রাজ্য ও প্রাচীন রাজপুতানা স্বপ্নের রাজ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অত বড়ো জাতি অসার হইয়া যাইতেছে। কী দুঃখ! আসামে যেরূপে অহিফেন প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে আসামের অতিশয় হানি হইতেছে। বাণিজ্য-তত্ত্বাবধায়ক ক্রস্ সাহেব বলেন, 'অহিফেন সেবন রূপ ভীষণ মড়ক আসামের সুন্দর রাজ্য জনশূন্য ও বন্য জন্তুর বাসভূমি করিয়া তুলিয়াছে এবং আসামীদের মতো অমন ভালো একটি জাতিকে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধম, দাসবৎ এবং নীতিভ্রষ্ট করিয়া তুলিয়াছে।' অহিফেন বাণিজ্য আমাদের ভারতবর্ষের তো এই-সকল উপকার করিয়াছে!

চীনের রাজা যদি বলিতে পারেন যে, 'আমার নিজের প্রজাদের পাপ ও যন্ত্রণা হইতে যে আমি রাজস্ব লাভ করিব, এমন প্রবৃত্তি কিছুতেই হইবে না।' তবে খৃস্টীয় ধর্মাভিমানী ইংরাজেরা কি বলিতে পারেন না যে, 'একটি প্রকাণ্ড জাতির পাপ ও যন্ত্রণা হইতে যে আমরা লাভ করিব, এমন প্রবৃত্তি আমাদের না হয় যেন।' কিন্তু আমরা খৃস্টান জাতিকে তো চিনি! এই খৃস্টান জাতিই তো প্রাচীন আমেরিকানদিগকে ধ্বংস করিয়াছেন! এই খৃস্টান ইংরাজদের লোভ-দৃষ্টিতে কোনো দুর্বল 'হীদেন' দেশ পড়িলে তাঁহারা কীরূপ খৃস্টান উপায়ে তাহা আদায় করেন তাহাও তো আমরা জানি। এই খৃস্টান ইংরাজগণ বর্মায় কীরূপ খৃস্টান নীতি অবলম্বনপূর্বক অহিফেন প্রচলিত করেন তাহাও তো আমরা জানি। ইংরাজদের মুষ্টিতে আসিবার পূর্বে আরাকানে অহিফেনসেবীদের প্রতি মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ ছিল। অধিবাসীরা পরিশ্রমী, মিতব্যয়ী ও সরল-হৃদয় লোক ছিল। অবশেষে কী হইল? ইংরাজ বণিকগণ অহিফেনের দোকান খুলিলেন। যত প্রকার

উপায়ে এই নেশা দেশে প্রচলিত হইতে পারে তাহা অবলম্বন করিলেন। অল্পবয়স্ক লোকদের দোকানে ডাকিয়া আনিয়া অহিফেন দেওয়া হইত। প্রথমে তাহার মূল্য লওয়া হইত না, অবশেষে এই উপায়ে অহিফেন যতই প্রচলিত হইতে লাগিল ততই মূল্যও উঠিতে লাগিল, বণিকদের পকেট পূরিতে লাগিল, গবর্নমেন্টের রাজস্ব বাড়িতে লাগিল। তাহার ফল কী হইল? আরাকানের সুস্থ বলিষ্ঠ জাতি অহিফেনের অন্ধ অনুরক্ত হইল, দিগ্‌বিদিক্-জ্ঞানশূন্য জুয়া খেলোয়াড় হইয়া উঠিল। তাহাদের শরীর ও নীতির ধ্বংস সাধিত হইল। এই তো খৃস্টান জাতি! যাহাদের বল নাই, যাহাদের সহায় নাই, তাহাদের সহিত ইংরাজ খৃস্টানরা যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহা জগতে বিদিত। তাহাদের তাঁহারা লাথি মারিতে চান। খৃস্টানশাস্ত্রে লেখা আছে, তোমার এক গালে চড় মারিলে আর-এক গাল ফিরাইয়া দিবে! খৃস্টান ইংরাজগণ যখন রাজস্বের লোভ দেখাইয়া চীনের সম্রাটকে চীন হত্যা করিতে পরামর্শ দিতে গিয়াছিলেন, তখন অখৃস্টান চীনের সম্রাট যে মহদ্‌বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহাতে ইংরাজদের খৃস্টানী গালে চড় মারা হইয়াছিল সন্দেহ নাই, দুঃখের বিষয় তাহার কোনো ফল হইল না।

ভারতী
জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮

নিমন্ত্রণ-সভা

দশ জনে একত্রে মিলিত হইবার অনুষ্ঠান আমাদের নাই। আমাদের সামাজিক ভাব এতই অল্প যে, সম্মিলনের মূল্য আমরা বুঝি না। অনেক লোক একত্র হইলে সেই একত্র হওয়ার জন্যই যে আমোদ, শুদ্ধ পরস্পরের সহিত আলাপ-পরিচয়, কথাবার্তা কহিবার যে সুখ, তাহা আমরা ভালো করিয়া উপভোগ করিতেই পারি না। আমরা আলাপ-পরিচয়, আমোদ-প্রমোদ, হাস্য-পরিহাস করিতে নিমন্ত্রণ-সভায় যাই না, আহার করিতে যাওয়াই মুখ্য উদ্দেশ্য। নিরাহার নিমন্ত্রণ আমাদের কানে অত্যন্ত হাস্যজনক, ঘৃণাজনক বলিয়া ঠেকে। নিমন্ত্রণের আর-এক অর্থই— পরের বাড়িতে গিয়া আহার করা। 'নিমন্ত্রণ' বলিলেই আহার করা ভিন্ন আর কোনো ভাব আমাদের মনে আসে না। ঘণ্টা-দুই ধরিয়া কতকগুলা গোল, চৌকোণা, চেপ্টা, লম্বা, চৌড়া, তরল, কঠিন পদার্থ উদরের মধ্যে বোঝাই করাকেই কি আমরা শ্রেষ্ঠতম সুখ মনে করি না? একে তো আমরা শুদ্ধ কেবল সম্মিলনের উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করি না, বিবাহ উপলক্ষে, পূজা উপলক্ষে ও অন্যান্য ক্রিয়াকাণ্ড উপলক্ষে করিয়া থাকি, তাহাতে আবার নিমন্ত্রণ করি কী উদ্দেশ্যে? না, শুদ্ধ কেবল আহারের উদ্দেশ্য। সাধারণত আমরা ভাবিয়া পাই না যে, শুদ্ধ কেবল বিশ-ত্রিশ জন লোক মিলিয়া, ঘণ্টা-দুই ধরিয়া কথাবার্তা কহিয়া যে যাহার বাড়ি ফিরিয়া গেল, এ পাগলা গারদ ভিন্ন অন্য কোথাও সম্ভবে? মনে করো, নিজের বাড়ি হইতে পরের বাড়ি যাইতে হইলে আমাদের কি কম হাঙ্গামা করিতে হয়? ধুতির কোঁচাটা চাদরের কাজ করিতেছিল, সেটাকে তাহার যথা-কাজে নিয়োগ করিয়া আবার একটা চাদর বাহির করিতে হয়, জুতা পরিতে হয়, জামা পরিতে হয়, তাহা ছাড়া আবার যাতায়াতের হাঙ্গামা আছে। এত পরিশ্রম বাঙালি করিতে রাজি আছে, যদি কিঞ্চিৎ আহার পায়। নহিলে বাড়িতে তাঁহার এমনি কী শয্যাকণ্টক উপস্থিত হইয়াছে যে, তাঁহার তাকিয়া ত্যাগ করিয়া, হাই-তোলা কাজ কামাই করিয়া, পরের বাড়িতে বাজে কথা কহিতে যাইবেন? যাহা হউক, দশটা বাঙালিকে একত্রে জড়ো করিবার প্রধান উপায় আহারের লোভ দেখানো, বাঙালিদের অপেক্ষা আরও অনেক ইতর প্রাণীকেও ওই উপায়ে একত্রিত করা যায়।

একে তো আহারের সময়ে ব্রাহ্মণদের কথোপকথন নিষেধ, তাহাতে নিষেধ সত্ত্বেও যদি বা কথোপকথন চলে, তবে সে লুচিগত, সন্দেশগত, রসগোল্লাগত কথোপকথনে সুরুচিবান

ব্যক্তিদের বড়োই বিরক্তি বোধ হয়। আহারের সময়ে আহারটাই নিমন্ত্রিতবর্গের মনে সর্বাপেক্ষা জাগরূক থাকে, সে সময় যে কথোপকথন নির্মিত হইতে থাকে, তাহার ভিত্তি উদর, তাহার ইষ্টক সন্দেশ, তাহার কড়িকাঠ পানতোয়া ও তাহার ছাদ লুচির রাশি। নিমন্ত্রণকারীর বাড়িতে যাওয়া, আহারটি করা ও পান চিবাইতে চিবাইতে বাড়িতে ফিরিয়া আসা নিমন্ত্রিতের কর্তব্য কাজ।

আমাদের নিমন্ত্রণের মধ্যে সামাজিক ভাব এত অল্প যে, নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আমরা প্রতিনিধি পাঠাই। আমরা জানি যে, আহার করানোই আমাদের নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্য, আমি আহার না করি, আমার হইয়া আর-এক জন করিলেও সে উদ্দেশ্য সফল হইবে। আমার ভাইপোকে বা ভাগ্নেকে বা উভয়কে পাঠাইয়া দিলাম, তাহারা সাটিনের কাপড় পরিয়া এক পেট খাইয়া আসিল। পরস্পরকে আমোদ দেওয়া যদি আমাদের নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্য হইত, তবে আমার পরিবর্তে অর্ধস্ফুট-বাণী ঝি সহায় একটি ভাগ্নেকে সভাস্থলে পাঠানো কী হাস্যজনক বোধ হইত! নিমন্ত্রণ সারিয়া চলিয়া যাইবার সময় গৃহকর্তা বিনীতভাবে বলেন, 'মহাশয়কে অত্যন্ত কষ্ট দেওয়া হইল।' মনে মনে ভাবি কথাটা মিথ্যা নহে, সাড়ে দশটার সময় আমার অহার করা অভ্যাস, সাড়ে চারিটার সময় আহার জুটিল। আহার ব্যতীত আর কোনো আমোদের যদি বন্দোবস্ত থাকিত, তাহা হইলেও এ কষ্ট বরদাস্ত হইত! কিন্তু আমরা মনে করি, আহারই শ্রেষ্ঠতম আমোদ এবং আহার ব্যতীত ভদ্রজনোচিত আমোদ আর কিছুই নাই।

বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া আমরা গল্প করিতে লাগিলাম। যদি নিন্দা করিবার অভিপ্রায় থাকে তো বলি যে, আহারের ব্যবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইয়াছিল; প্রশংসা করিবার হইলে বলি যে, আহারের আয়োজন অতিশয় পরিপাটি হইয়াছিল। কাহারও কাছে নিমন্ত্রণের রিপোর্ট দিতে হইলে কোন্ খাদ্যটা ভালো ও কোন্ খাদ্যটা মন্দ তাহারই সমালোচনা বিস্তারিতরূপে করি। নিমন্ত্রণ-সভা হইতে ফিরিয়া আসিয়া এমন গল্প কোনো বাঙালি কখনো করে নাই যে—'হরিশবাবু আজ নিমন্ত্রণ-সভায় যে প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহাতে গিরিশবাবু এই কথা বলেন ও যোগেশবাবু এই কথা বলেন। সুরেশবাবু যাহা বলেন, এমনি চমৎকার করিয়া বলেন যে, সকলেরই মনে আঘাত লাগে।' নিমন্ত্রণ-সভায় লুচি, সন্দেশ ও মিঠায়েরই একাধিপত্য। সেখানে গিরিশবাবু, যোগেশবাবু ও সুরেশবাবুগণ আমার আমোদ সাধনের পক্ষে কিছুমাত্র আবশ্যকীয় পদার্থ নহেন। নাট্যশালায় সমাগত ক্রীত-টিকিট দর্শকবর্গ পরস্পরের আমোদের পক্ষে যতটুকু উপযোগী, প্রাপ্ত-পত্র নিমন্ত্রিতবর্গ পরস্পরের আমোদের পক্ষে ততটুকু উপযোগী।

নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্য কী হওয়া উচিত? যাঁহাদের মধ্যে প্রত্যহ পরস্পরের দেখাশুনা হয় না, তাঁহাদের মিলন করাইয়া দেওয়া, যাঁহাদের মধ্যে পরস্পরের আলাপ হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাঁহাদের একত্র করিয়া দেওয়া। সামাজিক মানুষের পরস্পরকে আমোদ দিবার ও পরস্পরের নিকট আমোদ পাইবার যে একটা আন্তরিক ইচ্ছা আছে, তাহাই চরিতার্থ করিবার সুযোগ দেওয়া। প্রত্যহ যাহা খাইতে পাই, তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক খাইতে দেওয়া নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্য নহে— অথবা নিমন্ত্রণকারীর বাড়িতে পদধূলি দিয়া ও তাঁহার খরচে এক উদর আহার করিয়া তাঁহাকে তাঁহার পূর্বপুরুষদিগকে কৃতকৃতার্থ করাও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের কার্য নহে।

নিমন্ত্রণকারীর কর্তব্য যে, যে-লোকদের নিমন্ত্রণ করিলে পরস্পরের আমোদ বর্ধন হইবে তাঁহাদের একত্র করা। এখন যেমন আমাদের দেশের নিমন্ত্রণকারী যশ পাইতে ইচ্ছা করিলে সন্দেশ টিপিয়া দেখেন তাহাতে ছানার পরিমাণ অধিক আছে কি না— উৎকৃষ্টতর নিমন্ত্রণ পদ্ধতি প্রচারিত হইলে সুখ্যাতি-প্রয়াসী নিমন্ত্রক দেখিবেন, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের আমোদ দিবার ও আমোদ পাইবার গুণ কাহার কীরূপ আছে। কে ভালো গল্প করিতে জানে ও কে মনোযোগ দিয়া শুনিতে জানে। কে ভালো রসিকতা করিতে জানে ও কে ভালো হাসিতে জানে। কে কথা কহিবার কৌশল জানে ও কে চুপ করিয়া থাকিবার কৌশল জানে। তিন জন উকিল যদি থাকেন তবে তাঁহাদের পৃথক পৃথক রাখা উচিত, নহিলে তাঁহারা মোকদ্দমা মামলার কথা পাড়িয়া আদালত-

ছাড়া লোকদিগকে দেশ-ছাড়া করিবার বন্দোবস্ত করেন। তিন জন গ্রন্থকার যদি সভাস্থলে থাকেন তবে তাঁহাদের পাশাপাশি একত্র রাখা যুক্তিসংগত কি না বিবেচনাস্থল, তাহা হইলে তাঁহারা তিন জনেই মুখ বন্ধ করিয়া থাকিবেন। আর, তিন জন যদি রসিকতাভিমানী ব্যক্তি থাকেন, তবে যে উপায়ে হউক তাঁহাদের ছাড়াছাড়ি রাখা আবশ্যক, তাঁহারা বিজ্ঞানের এই সহজ সত্যটি প্রায়ই বিস্মৃত হন যে, দুইটি পদার্থ একই স্থান অধিকার করিয়া থাকিতে পারে না। এক কথায় নিমন্ত্রণকারীর এই একমাত্র ব্রত হওয়া উচিত, যাহাতে নিমন্ত্রিতদিগের সর্বাঙ্গীণ আমোদ হয়। নিমন্ত্রিতদিগেরও কর্তব্য কাজ আছে, তাঁহারা যে মনে করিয়া রাখিয়াছেন যে, নিমন্ত্রকের কর্তব্য লুচি-সন্দেশের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া ও তাঁহাদের একমাত্র কর্তব্য সেগুলি জঠরে রপ্তানি করিয়া দেওয়া, তাহা যথার্থ নহে। উৎকৃষ্টতর নিমন্ত্রণে তাঁহারাই লুচি, তাঁহারাই সন্দেশ। পরস্পরের মানসিক ক্ষুধা পিপাসা নিবারণের জন্য তাঁহারাই খাদ্য ও পানীয়। মহারাজা সামাজিকতার নিকটে তাঁহার অধীনস্থ আমরা সকলেই এই কর্তব্য-সূত্রে বদ্ধ আছি যে, দশ জন একত্রে আহূত হইলেই পরস্পরকে সুখী রাখিবার জন্য আমরা যথাশক্তি প্রয়োগ করিব। নিমন্ত্রিতবর্গের সকলেরই একমাত্র কর্তব্য, যথাসাধ্য অন্যকে সুখী করিতে চেষ্টা করা। যাহারা সভাস্থলে গোঁ হইয়া বসিয়া থাকে, তাহারা অসামাজিক, যাহারা নিজেই কথা কহিতে চাহে, পরের কথা শুনিতে চাহে না তাহারা অসামাজিক, যাহারা নিজের রসিকতা ব্যতীত আর কোনো কারণে হাসিতে চাহে না তাহারা অসামাজিক। এক-এক জন যেন মনের মধ্যে কেবল বিছুটির চাষ করিয়াছে, অন্যকে জ্বালাইতে না পারিলে তাহাদের রসিকতা হয় না, তাহারা অসামাজিক— উন্নততর নিমন্ত্রণ-সভার মানসিক আহার্যের পাতে এরূপ অসামাজিক লুচি-সন্দেশগুলি না থাকে যেন, ইঁহাদের কাহারও বা ঘি খারাপ, কাহারও বা ছানা কম, কাহারও বা রসের অভাব।

আমাদের দেশের নিমন্ত্রণ-সভায় পরস্পরকে আমোদ দিবার ভাব নাই। অর্থাৎ উচ্চ শ্রেণীর সামাজিকতার ভাব নাই। একটা আমোদের উপকরণ আছে (যেমন নাচ বা আহার) আর আমরা সকলে মিলিয়া তাহা উপভোগ করিতেছি তাহাও সামাজিকতার ভাব কিন্তু নিকৃষ্টতর সামাজিকতা। বক্তৃতাস্থল, রঙ্গভূমি, নাট্যশালা প্রভৃতিই সেইরূপ অতি ক্ষীণ সামাজিকতার স্থল, নিমন্ত্রণ-সভা নহে। সত্য কথা বলিতে কি আহারই যে আমাদের নিমন্ত্রণস্থলে প্রধান আমোদ বলিয়া গণ্য হইয়াছে, তাহার একটা কারণ আছে। আমাদের সামাজিকতার ভাব এতই অল্প যে, পরস্পরকে কী করিয়া আমোদ দিতে হয় তাহা আমরা জানি না। আমোদ দিবার শিক্ষাই আমাদের নাই, আর সে শিক্ষাতেও আমরা কিছুমাত্র মনোযোগ দিই না। যে ব্যক্তি আমাদের হাসায়, তাহার কথায় আমরা হাসি বটে, কিন্তু তাহাকে কেমন একটু নীচু-নজরে দেখি, তাহার পদ পাইতে আমরা ইচ্ছা করি না। তাহারও আবার কারণ আছে। আমাদের দেশে সচরাচর যাহারা হাসায় তাহারা এমন অশিক্ষিত-রুচি যে, তাহাদের রসিকতা হয় অশ্লীল নয় ব্যক্তিগত, নয় অর্থশূন্য অঙ্গ ভঙ্গিময় ভাঁড়ামি হইয়া পড়ে। এমন-কি, আমাদের ভাষায় wit বা humour-এর কথা নাই। রসিকতা বলিলে যে ভাবটা আমাদের মনে আসে, সেটা কেমন নির্দোষ, নিরীহ, নিরামিষ নহে। আমাকে যদি কেহ 'রসিক' বলে তবে আমার পিত্ত জ্বলিয়া যায়। আমাদের ভাষায় রসিকতার সঙ্গে কেমন একটা কলুষিত ভাবের সংযোগ আছে। ইংলন্ডের সমাজে কথোপকথন-কুশল ব্যক্তিদের যেরূপ অসাধারণ মান, আমাদের দেশে তাহা কিছুই নাই, বরং তাহার উল্টা। ইংলন্ডে কথোপকথন একটা বিদ্যার মধ্যে পরিগণিত, তাহার নানা পদ্ধতি আছে, নানা নিয়ম আছে। আমাদের দেশে অধিক কতাবার্তাকে লোকে বড়ো ভালো বলে না। আমাদের দেশে 'স্বর্ণময় নীরবতার' মূল্য জনসাধারণ এত অধিক বুঝিয়াছে যে, আমাদের সামাজিক এক্‌সচেঞ্জে কথাবার্তার রুপার বড়োই হানি হইতেছে। Metallic question-এর বিষয়ে আমি কিছু বলিতে প্রস্তুত নহি, কিন্তু এই পর্যন্ত বলিতে পারি, আমাদের সমাজে রুপার দর না বাড়িলে বড়োই অসুবিধা হইতেছে। আমাদের দেশের সভায় পরিচয় হয়, আলাপ হয় না। 'মহাশয়ের নাম?

মহাশয়ের ঠাকুরের নাম?' ইত্যাদি প্রশ্নে 'মহাশয়ে'র চতুর্দশ পুরুষের পরিচয় লওয়া হয়, কিন্তু আলাপ হয় না। চুপচাপ করিয়া, সংযত হইয়া বসিয়া থাকাকেই আমরা বিশেষ প্রশংসা করি। নিতান্ত বক্তৃতা স্থলে, প্রকাশ্য সভায় এইরূপ ভাব ভালো। কিন্তু নিমন্ত্রণ-সভাতেও যদি চুপচাপ বসিয়া থাকা নিয়ম হয়, তবে নিতান্তই আমাদের ব্যাঘাত হয়, এমন-কি, শিক্ষার ব্যাঘাত হয়। বিস্তৃত কথোপকথনের প্রথা না থাকিলে ভাবের আদান-প্রদান চলিবে কীরূপে? নানা প্রকার ভাব সাধারণ সমাজময় ছড়াইয়া পড়িবে কী উপায়ে? আমোদ দিবার আর-এক উপায় গীত-বাদ্য। আজকাল সংগীত অনেকটা প্রচলিত হইতেছে, কিন্তু ইহার কিছু পূর্বে যে ভদ্রলোক সংগীত শিখিত, তাহার মা-বাপেরা তাহাকে খরচের খাতায় লিখিতেন। এখনও যাঁহারা গান-বাজনা শিখেন, তাঁহারা নিজের শখ চরিতার্থ করিতে শিখেন মাত্র। আমাদের সমাজে ভালোরূপে মেশামেশি করিবার জন্য গান শিখিবার যে কিছুমাত্র আবশ্যক আছে তাহা নহে। অতএব দেখা যাইতেছে আমাদের নিমন্ত্রণ-সভায় হাসানো দূষ্য। অধিক হাসা বা কথা কহা নিয়ম-বিরুদ্ধ, (কথা কহিবার বিষয়ও অধিক নাই,) নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে গান-বাজনা করা অপ্রচলিত, তবে আর বাকি রহিল কী? আহার। অতএব নিমন্ত্রণে যাও আর আহার করো। মনোরঞ্জনীবিদ্যা শিখি না, শিখিবার আবশ্যক বিবেচনা করি না, এমন-কি, অনেক স্থলে শিখা দূষ্য মনে করি। সাধারণত আমাদের কেমন ধারণা আছে যে, পরকে আমোদ দেওয়া পেশাদারের কাজ; আমোদ দেওয়ার কাজটাই যেন নীচু। ইহা অপেক্ষা অসামাজিকতার ভাব আর কী আছে! এমন-কি, গাহিতে বলিলেই নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ না করিয়া যদি কেহ তৎক্ষণাৎ গায় তবে সে যেন অন্যান্য লোকের চোখে হাস্যাস্পদ বলিয়া প্রতীত হয়। পরকে আমোদ দেওয়া কর্তব্যকাজ, তাহার জন্য ঔৎসুক্য ও আগ্রহ থাকা উচিত এ ভাব যে কেন হাস্যাস্পদ বলিয়া প্রতীত হইবে বুঝিতে পারি না। আমার ভালো গলা থাক্ বা না থাক্ আমি ভালো গাহিতে পারি না পারি, তোমার মনোবিনোদনে আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করিব, এ ভাব সামাজিক জাতিদিগের নিকট প্রশংসনীয় বলিয়াই মনে হয়। আমাদের দেশে নিমন্ত্রণের সহিত বহুব্যয়সাধ্য আহারের বিশেষ যোগ থাকাতে একটা হানি হইয়াছে। সদাসর্বদা নিমন্ত্রণ করা লোকের পোষায় না। একটা উপলক্ষ না হইলে কেহ প্রায় নিমন্ত্রণ করে না। ইহাতে আমাদের দেশে সম্মিলনের অবসর কম পড়িয়াছে। রোগী দেখিতেও যদি কোনো কুটুম্বের বাড়ি যাওয়া যায়, তাহা হইলেও খাওয়াইতে হইবে। আপাতত মনে হয়, ইহাতে সামাজিক ভাবের আরও বহুল চর্চা হয়, কিন্তু তাহা নহে। ইহার ফল হয় এই যে, নিতান্ত আবশ্যক না হইলে কুটুম্বের বাড়ি যাওয়া হয় না। সদাসর্বদা যাতায়াত করিলে লোকে নিন্দা করে, এবং কুটুম্বও বড়ো আহ্লাদের সহিত অভ্যর্থনা করে না! অতএব নিমন্ত্রণের আরেক অর্থ যদি আহার না হয়, তাহা হইলে নিমন্ত্রণ অনেক বাড়ে, নিমন্ত্রণের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয়। নিমন্ত্রণের অন্যান্য নানা উপকরণের মধ্যে আহার বলিয়া একটা পদার্থ রাখা যায়, কিন্তু সমস্ত নিমন্ত্রণটা যেন আহার না হয়। পরস্পরে মিলিয়া গান-বাজনা, আমোদ-প্রমোদ, কথোপকথনের চর্চা আরও বহুলতররূপে আমাদের সমাজে প্রচলিত হউক। তাহা হইলে প্রকৃত রসিকতা কাহাকে বলে সে শিক্ষা আমাদের লাভ হইবে, প্রসঙ্গ কীরূপে আলোচনা করিতে হয়, সে অভ্যাস আমাদের হইবে, আহার ব্যতীত যে ভদ্রজনোচিত আমোদ যথেষ্ট আছে তাহা আমাদের বোধগম্য হইবে।

ভারতী
আষাঢ় ১২৮৮

চেঁচিয়ে বলা

আজকাল সকলেই সকল বিষয়েই চেঁচিয়ে কথা কয়। আস্তে বলা একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। চেঁচিয়ে দান করে, চেঁচিয়ে সমাজ সংস্কার করে, চেঁচিয়ে খবরের কাগজ চালায়, এমন-কি, গোল থামাইতে গোল করে। সেকরা গাড়ি যত না চলে, ততোধিক শব্দ করে; তাহার চাকা ঝন ঝন করে, তাহার জানলা ঝর ঝর করে, তাহার গাড়োয়ান গাল পাড়িতে থাকে, তাহার চাবুকের শব্দে অস্থির হইতে হয়। বঙ্গসমাজও আজকাল সেই চালে চলিতেছে, তাহার প্রত্যেক ইঞ্চি হইতে শব্দ বাহির হইতেছে। সমাজটা যে চলিতেছে ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার জো নাই; মাইল মাপিলে ইহার গতিবেগ যে অধিক মনে হইবে তাহা নহে, কিন্তু ঝাঁকানি মাপিলে ইহার গতি-প্রভাবের বিষয়ে কাহারো সন্দেহ থাকিবে না। ঝাঁকানির চোটে আরোহীদের মাথায় মাথায় অনবরত ঠোকাঠুকি লাগিয়াছে, আর শব্দ এত অধিক যে, একটা কথা কাহারও কর্ণ-গোচর করিতে গেলে গলার শির ছিঁড়িয়া যায়।

কাজেই বঙ্গসমাজে চেঁচানোটাই চলিত হইয়াছে। পক্ষীজাতির মধ্যে কাকের সমাজ, পশুজাতির মধ্যে শৃগালের সমাজ, আর মনুষ্য জাতির মধ্যে বাঙালির সমাজ যে এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে, ইহা শত্রুপক্ষকেও স্বীকার করিতে হইবে।

শুনা গেছে, পূর্বে লোকে গরীবকে লাখ টাকা দান করিয়াছে, অথচ টাকার শব্দ হয় নাই, কিন্তু এখন চার গণ্ডা পয়সা দান করিলে তাহার ঝম্‌ঝমানিতে কানে তালা লাগে। এই তো গেল দানের কথা। আবার, দান না করিয়া এত কোলাহল করা পূর্বে প্রচলিত ছিল না। ভিক্ষুক আসিল, দয়ার উদ্রেক হইল না, তাহাকে এক কথায় হাঁকাইয়া দিলাম, এই প্রাচীন প্রথা। কিন্তু এখন লোকে ভিক্ষুক তাড়াইতে গেলে, পোলিটিকল ইকনমির বড়ো বড়ো কথা আওড়াইতে থাকে, বলে, দান না করাই যথার্থ দয়া, দান করাই নিষ্ঠুরতা, ইহাতে সমাজের অপকার করা হয়, আলস্যকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, ভিক্ষাবৃত্তিকে জিয়াইয়া রাখা হয়— ইত্যাদি ইত্যাদি। সমস্তই মানি। কিন্তু তোমার মুখে এ-সব কথা কেন? তুমি এক পয়সা উপার্জন কর না, ঘরের পয়সা ঘরে জমাইয়া রাখ, বাণিজ্য ব্যবসায়ের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই, কেবল অকেজো কতকগুলা বিলাস দ্রব্য কিনিয়া পয়সা ধ্বংস কর, ভিক্ষা দিবার সময়েই তোমার মুখে পোলিটিকল ইকনমি কেন? পোলিটিকল ইকনমিটাকে কেবল ঢাকের কাজেই ব্যবহার করা হয়, আর কোনো কাজে লাগে না।

দেশহিতৈষিতা, আলো জ্বালিবার গ্যাসের মতো যতক্ষণ গুপ্তভাবে চোঙের মধ্য দিয়া সঞ্চারিত হইতে থাকে, ততক্ষণ তাহা বিস্তর কাজে লাগে— কিন্তু যখন চোঙ্ ফুটা হইয়া ছাড়া পায় ও বাহির হইতে থাকে, তখন দেশ-ছাড়া হইতে হয়। আজকাল রাস্তায় ঘাটে দেশহিতৈষিতা-গ্যাসের গন্ধে ভূত পালাইতেছে, অথচ আবশ্যকের সময় অন্ধকার। গ্যাসটা কেবল নাকের মধ্য দিয়াই খরচ হইয়া যায়, বাকি কিছু থাকে না। আত্ম-পরিবারের মধ্যে যে ব্যক্তি শূল বেদনার মতো বিরাজমান, যে ব্যক্তি মাকে ভাত দেয় না, ভাইয়ের সঙ্গে লাঠালাঠি করে, পাড়া-প্রতিবেশীদের নাম পর্যন্তও জানে না— আজকাল সে ব্যক্তিও ভারতবর্ষকে মা বলে, বিশ কোটি লোককে ভাই বলে— শ্রোতারা আনন্দে হাততালি দিতে থাকে। পূর্বে আর-এক রূপ ছিল— তখনকার ভালো লোকেরা বাপ-পিতামহদের ভক্তি করিত— আত্ম-পরিবারের সহিত দৃঢ়রূপে সংলগ্ন ছিল, পাড়া-প্রতিবেশীর উৎসবে আমোদে কায়মনোবাক্যে যোগ দিত, বিপদে-আপদে প্রাণপণে সাহায্য করিত। কিন্তু বাপকে ভক্তি করিলে, ভাইকে ভালোবাসিলে, বন্ধু-বান্ধবদিগকে সাহায্য করিলে, তেমন একটা হট্টগোল উপস্থিত হয় না— পৃথিবীর বিস্তর উপকার হয়, কিন্তু সমস্ত চুপেচাপে সম্পন্ন হয়। কাজেই এখন 'ভ্রাতাগণ', 'ভগ্নীগণ', 'ভারতমাতা' নামক কতকগুলা শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহারা অনবরত হাওয়া খাইয়া খাইয়া ফুলিয়া উঠিতেছে— ও তারাবাজির মতো উত্তরোত্তর আসমানের দিকেই উড়িতেছে, অনেক দূর আকাশে উঠিয়া হঠাৎ আলো নিবিয়া যায় ও ধপ

করিয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। আমার মতে আকাশে এরূপ দুশো তারাবাজি উড়িলেও বিশেষ কোনো সুবিধা হয় না আর ঘরের কোণে মিটমিট করিয়া একটি মাটির প্রদীপ জ্বালিলেও অনেক কাজে দেখে।

আমি বেশ দেখিতেছি, আমার কথা অনেকে ভুল বুঝিবেন। আমি এমন বলি না যে, হৃদয়কে একটি ক্ষুদ্র পরিবারের মধ্যে অথবা একটি ক্ষুদ্র পল্লীর মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখাই ভালো। যদি সমস্ত ভারতবর্ষকে ভালোবাসিতে পারি, বিশ কোটি লোককে ভাই বলিতে পারি, তাহা অপেক্ষা আর কী ভালো হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইল কই? যাহা আমাদের খাঁটি ছিল, তাহা যে গেল; তাহার স্থানে রহিল কী? বীজের গাছগুলা উপড়াইয়া ফেলিলাম, তাহার পরিবর্তে গোটাকতক গোড়া-কাটা বৃক্ষ পুঁতিয়া আগায় জল ঢালিতেছি। বিদেশী বন্দুকে ফাঁকা আওয়াজ করার চেয়ে যে আমাদের দিশি ধনুকে তীর ছোঁড়াও ভালো। কিন্তু আমাদের শব্দপ্রিয়তা এমন বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি নাই, শব্দের প্রতিই মনোযোগ।

কানটাই আমাদের এখন একমাত্র লক্ষ্য হইয়াছে। দেখো-না, বাংলা খবরের কাগজগুলি কেবল শব্দের প্রভাবেই পাঠকদের কান দখল করিয়া বসিয়া আছে। কী যে বলিতেছে তাহা বড়ো একটা ভাবিয়া দেখে না, কেবল গলা খাটো না হইলেই হইল। একটা কথা উঠিলে হয়, অমনি বাংলা খবরের কাগজে মহা চেঁচামেচি পড়িয়া যায়। কথাটা হয়তো বোঝাই হয় নাই, ভালো করিয়া শোনাই হয় নাই, হয়তো সে বিষয়ে কিছু জানাই নাই— কিন্তু আবশ্যক কী? বিষয়টা যত কম বোঝা যায়, বোধ করি, ততই হো হা করিয়া চেঁচাইবার সুবিধা হয়। জ্ঞানের অপেক্ষা বোধ করি অজ্ঞতার আওয়াজটা অধিক। ইহা তো সচরাচর দেখা যায়, আমাদের বাংলা সংবাদপত্র দেশের অবস্থা কিছুই জানে না, এমন-কি, দেশের নামগুলা উচ্চারণ পর্যন্ত করিতে পারে না, অথচ গবর্নমেন্টকে বিজ্ঞভাবে উপদেশ দেয়; আইন জানে না, উভয় পক্ষ দেখে না অথচ বিচারককে বিচার করিতে শিখায়; অনেক অনুসন্ধান করিয়া, বিস্তর বিবেচনা করিয়া যোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা যাহা অনেক দিনে স্থির হইয়াছে, তাহা অবহেলা করিয়া, অথচ নিজে কিছুমাত্র অনুসন্ধান না করিয়া যাহা মুখে আসে তাহাই বলিয়া বসে। গলা ভারী করিয়া কথা কয়, অথচ কথাগুলা ছেলেমানুষের মতো, বলিবার ভঙ্গি এবং বলিবার বিষয়ের মধ্যে এমন অসামঞ্জস্য যে, শুনিলে হাসি পায়। কথায় কথায় ইংরাজ গবর্নমেন্টের নিকট হইতে কৈফিয়ত তলব করা হয়। কেহ বা লিখিলেন, 'অমুক গাঁয়ের নিকট পদ্মায় সহসা এক ঝড় উঠিয়া তিনখানা নৌকা ডুবিয়া গিয়াছে, অমুক সালে আর-একবার এইরূপ সহসা ঝড় উঠিয়া অমুক স্থানে আর-দুইখানা নৌকা ডুবিয়া যায়, আশ্চর্য তথাপি আমাদের গবর্নমেন্টের চৈতন্য হইল না।' কেহ বা বলিলেন—'অমুক গাঁয়ে রাত্রি তিন ঘটিকার সময় এক ভয়ানক ভূমিকম্প উপস্থিত হয় ও জমিদারবাবুদের এক আস্তাবল পড়িয়া যায়, গবর্নমেন্টের পূর্ব হইতে সাবধান হওয়া উচিত ছিল।' কেহ বা লিখিলেন—'বাঙালিরা দুইবেলা ডাল ভাত খাইয়া অতিশয় দুর্বল হইয়া যাইতেছে, অথচ আমাদের শাসনকর্তারা এ বিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগ দিতেছেন না!' হয়তো ইহা হইতে প্রমাণ করিলেন যে, ইংরাজদের স্বার্থই এই যে, আমাদের ডাল ভাত খাওয়াইয়া রোগা করিয়া রাখা। এই বিষয় অবলম্বন করিয়া এক উদ্দীপনাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিত হইল— বলা হইল যে, যে দেশে এককালে শাক্যসিংহ ও শঙ্করাচার্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই দেশের লোকেরা যে ডাল ভাত খাইয়া রোগা হইয়া যাইতেছেন ইহা কেবল বিদেশীয় শাসনের ফল! পাঠ করিয়া উক্ত জগৎবিখ্যাত কাগজের ১৩৭ জন অনারারি পাঠকের সর্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। মাঝে একবার সহসা দেখা গেল, কোনো কোনো বাংলা কাগজ তারস্বরে ইংরাজি *Statesman* পত্রকে গাল দিতে আরম্ভ করিয়াছেন— রুচি-বিরুদ্ধ কঠোর ও অভদ্রভাবে উক্ত পত্রের বিরুদ্ধে বড়ো বড়ো প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। স্টেটস্‌ম্যানের অপরাধের মধ্যে তিনি বলিয়াছেন যে, স্বায়ত্ত-শাসনপ্রণালী যখন প্রবর্তিত হইল, তখন কোথায় তাহার পদ-স্খলন হইতে পারে তাহাই

দেখাইয়া দেওয়া যথার্থ কাজ। অমনি বাংলা খবরের কাগজের ঢাকে কাঠি পড়িল। এরূপ আচরণ অতিশয় হাস্যজনক। যে ব্যক্তি অপ্রিয় সত্য শুনিতে পারে না, সে ব্যক্তি মানুষের মধ্যেই নহে, সে ব্যক্তি বালক, দুর্বল, লঘুচিত্ত! তুমি কি চাও, আদুরে ছেলেটির মতো কেবল তোমার স্তুতিগান করিয়া তোমাকে বুকে তুলিয়া নাচাইয়া বেড়ানোই *Statesman* পত্রের কাজ? তোমার একটা দোষ দেখাইয়া দিলেই অমনি তুমি হাত-পা ছুঁড়িয়া চিৎকার করিয়া আকাশ ফাটাইয়া দিবে? যাহার হিতৈষিতার সহস্র প্রমাণ পাইয়াছ, সে যদিই বা হিত কামনা করিয়া একটা কঠোর কথা বলে অমনি তাহা বরদাস্ত করিতে পার না, এমনি তুমি নন্দদুলাল হইয়াছ?— পূর্বকৃত সমস্ত উপকার বিস্মৃত হইয়া তার কুটিল অর্থ বাহির করিতে থাক, এমনি তুমি অকৃতজ্ঞ? এইরূপ প্রত্যেক সামান্য ঘটনায় চিৎকার করিবার ভাব প্রতিনিয়ত বাংলা সংবাদপত্রে দেখা যাইতেছে। ইহাতে ফল এই হইতেছে, সাধারণের মধ্যে ছেলেমানুষের মতো এক প্রকার খুঁৎখুঁতে কাঁদুনে ভাবের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। অনবরত আত্ম-প্রশংসা করিয়া নিজের দোষের জন্যে পরকে তিরস্কার করিয়া নিজের কর্তব্যভার পরের স্কন্ধে চাপাইয়া কেবল গলার আওয়াজেরই উন্নতি করিতেছি ও চক্ষু বুজিয়া মনে করিতেছি যে, আমাদের দুর্ভাগ্যের নিমিত্ত আমরা ব্যতীত আর বিশ্বসুদ্ধ সকলেই দায়ী।

গোটাকতক ইংরাজি শব্দ আসিয়া আমাদের অতিশয় অনিষ্ট করিতেছে। Independent Spirit নামক একটা শব্দ আমাদের সমাজে বিস্তর অপকার করিতেছে— বাঙালির ছেলেপিলে খবরের কাগজপত্র সকলে মিলিয়া এই Independent Spirit-এর চর্চায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই শব্দটার প্রভাবে প্রতিমুহূর্তে বাংলাদেশ হইতে সহজ ভদ্রভাব চলিয়া যাইতেছে ও এক প্রকার অভদ্র উদগ্র পরুষ ভাবের প্রাদুর্ভাব হইতেছে। খবরের কাগজের লেখাগুলার মধ্যে আগাগোড়া এক প্রকার অভদ্র ভঙ্গি দেখা যায়। ভালো মুখে মোলায়েম করিয়া কথা কহিলে যেন Spirit-এর অভাব দেখানো হয়— সেইজন্য সর্বদাই কেমন তেরিয়াভাবে কথা কহিবার ফেসিয়ান উঠিয়াছে— অনর্থক অনাবশ্যক গায়ে পড়িয়া অভদ্রতা করা খবরের কাগজে চলিত হইয়াছে। যেখানে উপদেশ দেওয়া উচিত সেখানে গালাগালি দেওয়া হয়— যেখানে কোনো প্রকার খুঁত ধরা রুচি-বিরুদ্ধ, সেখানে জোর করিয়া খুঁত ধরা হয়। এইরূপ সংবাদপত্রগুলি পাঠকদের পক্ষে যে কীরূপ কুশিক্ষার স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে অন্ধকার দেখিতে হয়! আজকালকার ছেলেদের সর্বাঙ্গ দিয়া এমনি Independent Spirit ফুটিয়া বাহির হইতেছে যে, তাহাদের ছুঁইতে ভয় করে। তাহারা সর্বদাই যেন মারিতে উদ্যত। চব্বিশ ঘণ্টা যেন তাহারা হাতের আস্তিন গুটাইয়া কোমর বাঁধিয়াই আছে। কিসে যে সহসা তাহাদের অপমান বোধ হয়, ভাবিয়া পাওয়া যায় না। এক-এক জন ইংরাজ যেমন দিশি-জুতা দেখিলে অপমান বোধ করে— তেমনি দিশি লৌকিক আচরণ ইহাদের পিঠে দিশি জুতার ন্যায় বাজিয়া থাকে। যদি দৈবাৎ কোনো অনভিজ্ঞ প্রাচীন ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে, 'মহাশয়ের ঠাকুরের নাম কী?' অমনি ইহারা ফোঁস করিয়া উঠে। ইহাদের ভাব দেখিয়া মনে হয় যেন, জগৎ সংসার ইহাদিগকে অপমান করিবার জন্য অবিরত উদ্যোগী রহিয়াছে, তাই জন্যে ইহারা আগে হইতে পদে পদে জগৎকে অপমান করিবার জন্য ধাবমান হয়। শুঁয়াপোকার ন্যায় দিনরাত্রি কণ্টকিত হইয়া থাকাকেই ইহারা Independent Spirit কহে। গল্পে শুনা যায়, এমন এক-এক জন অতি-বুদ্ধিমান আছেন, যাঁহারা নাকে-কানে তুলা দিয়া মশারির মধ্যে বসিয়া থাকেন, পাছে তাঁহাদের বুদ্ধি কোনো সুযোগে বাহির হইয়া যায়; ইঁহারাও তেমনি সজারুর মতো সর্বদাই চারি দিকে কাঁটা উঁচাইয়া সমাজে সঞ্চরণ করিতে থাকেন, পাছে ইঁহাদের কেহ অপমান করে। এদিকে আবার ইঁহারা ভীরুর অগ্রগণ্য; দুর্বলের কাছে, ভৃত্যের কাছে, স্ত্রীর কাছে ইঁহারা Independent Spirit নামক বৃহৎ লাঙ্গুলটা এমনি আস্ফালন করিতে থাকেন যে, কাছাকাছির মধ্যে লোক তিষ্ঠিতে পারে না, আর, একটা শ্বেত মূর্তি দেখিলেই সে লাঙ্গুলটা গুটাইয়া কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া যায় তাহার ঠিকানা

পাওয়া যায় না। যাহার যথার্থ বল আছে সে সর্বদাই ভদ্র— সে তাহার বলটাকে গণ্ডারের শিঙের মতো অহোরাত্র নাকের উপর খাড়া করিয়া রাখে না। আর যে দুর্বল, হয় সে লাঙুল গুটাইয়া কুঁকড়ি মারিয়া থাকে, নয় সে খেঁকি কুকুরের মতো ভদ্রলোক দেখিলেই দূর হইতে অবিরত ঘেউ ঘেউ করিতে থাকে। আমরাও কেবল দূর হইতে অভদ্রভাবে ঘেউ ঘেউ করিতেছি। শব্দে কান ফাটিয়া যাইতেছে।

প্রাণের সঙ্গে যখন কোনো কথা বলি, তখন যাহা বলি তাহারই একটা বল থাকে— যখন প্রাণে বাজে নাই অথচ মুখে বলিতে হইবে, তখন চেঁচাইয়া বলিতে হয়, বিস্তর বলিতে হয়। বঙ্গ সমাজে যে আজকাল বিশেষ চেঁচামেচি পড়িয়া গিয়াছে ইহাও তাহার একটি কারণ। বক্তা যখন বক্তৃতা দিতে উঠেন, তখন সে এক অতি কষ্টকর দৃশ্য উপস্থিত হয়। গ্রহণী রোগীর ন্যায় তাঁহার হাতে পায়ে আক্ষেপ ধরিতে থাকে, গলার শির ফুলিয়া ওঠে, চোখ দুটা বাহির হইয়া আসিতে চায়। যিনি বাংলা দেশের কিছুই জানেন না, তিনি কথায় কথায় বলেন, 'কুমারিকা হইতে হিমালয় ও সিন্ধুনদী হইতে ব্রহ্মপুত্র;' ফুঁ দিয়া দিয়া কথাগুলাকে যত বড়ো করা সম্ভব তাহা করা হয়; যেখানে বাংলা দেশ বলিলেই যথেষ্ট হয় সেখানে তিনি এশিয়া না বলিয়া থাকিতে পারেন না; যেখানে সামান্য জমা-খরচের কথা হইতেছে, সেখানে ভাস্করাচার্য ও লীলাবতীর উল্লেখ না করিলে তাহার মনঃপূত হয় না; একজন ফিরিঙ্গি বালকের সহিত দেশীয় বালককে ঝগড়া করিতে দেখিলে তাঁহার ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জুনকে পর্যন্ত মনে পড়ে। যথার্থ প্রাণের সঙ্গে বলিলে কথাগুলা খাটো খাটো হয় ও কিছুই অতিরিক্ত হইতে পারে না।

আজকালকার সাহিত্য দেখো-না কেন, এইরূপ চিৎকারে প্রতিধ্বনিত। পরিপূর্ণতার মধ্য হইতে যে একটা গম্ভীর আওয়াজ বাহির হয়, সে আওয়াজ ইহাতে পাওয়া যায় না। যাহা-কিছু বলিতে হইবে তাহাই অধিক করিয়া বলা, যে-কোনো অনুভাব ব্যক্ত করিতে হইবে, তাহাকেই একেবারে নিংড়াইয়া তিক্ত করিয়া তোলা। যদি আহ্লাদ ব্যক্ত করিতে হইল, অমনি আরম্ভ হইল, বাজ বাঁশি, বাজ কাঁশি, বাজ ঢাক, বাজ ঢোল, বাজ ঢেঁকি, বাজ কুলো— ইহাকে তো আনন্দ বলে না, ইহা এক প্রকার প্রাণপণ মত্ততার ভান, এক প্রকার বিকার রোগ; যদি দুঃখ ব্যক্ত করিতে হইল, অমনি ছুরি ছোরা, দড়ি কলসী, বিষ আগুন, হাঁসফাঁস, ধড়ফড়, ছটফট— সে এক বিপর্যয় ব্যাপার উপস্থিত হয়। এখনকার কবিরা যেন হৃদয়ের অন্তঃপুরবাসী অনুভাবগুলিকে বিকৃতাকার করিয়া তুলিয়া হাটের মধ্যে দিগবাজি খেলাইতে ভালোবাসেন। কোনো কোনো কবিসমাজের নাসিকাকে উপেক্ষা করিয়া হৃদয়ের ক্ষতগ্রস্ত ভাবকে হয়তো কোনো কুলবধূর নামের সহিত মিশ্রিত করিয়া নিতান্ত বেআব্রু কবিতা লিখিয়া থাকেন। ইহাকেই চেঁচাইয়া কবিতা লেখা বলে। আমাদের প্রাচ্য-হৃদয়ে একটি আব্রুর ভাব আছে। আমরা কেবল দর্শকদের নেত্রসুখের জন্য হৃদয়কে উলঙ্গ করিয়া হাটে-ঘাটে প্রদর্শনের জন্য রাখিতে পারি না। আমরা যদি কৃত্রিম উপায়ে আমাদের প্রাচ্য ভাবকে গলা টিপিয়া না মারিয়া ফেলিতাম, তবে উপরোক্ত শ্রেণীর কবিতা পড়িয়া ঘৃণায় আমাদের গা শিহরিয়া উঠিত। সহজ সুস্থ অকপট হৃদয় হইতে এক প্রকার পরিষ্কার অনর্গল অনতিমাত্র ভাব ও ভাষা বাহির হয়, তাহাতে অতিরিক্ত ও বিকৃত কিছু থাকে না— টানা-হেঁচড়া করিতে গেলেই আমাদের ভাব ও ভাষা স্থিতিস্থাপক পদার্থের মতো অতিশয় দীর্ঘ হইতে থাকে ও বিকৃতাকার ধারণ করে।

যখন বাংলা দেশে নূতন ইংরাজি শিক্ষার আরম্ভ হইল, তখন নূতন শিক্ষিত যুবারা জোর করিয়া মদ খাইতেন, গোমাংস খাইতেন। চেঁচাইয়া সমাজ-বিরুদ্ধ কাজ করিতে বিশেষ আনন্দ বোধ করিতেন। এখনও সেই শ্রেণীর একদল লোক আছেন। তাঁহাদের অনেকে সমাজ-সংস্কারক বলিয়া গণ্য। কিন্তু ইহা জানা আবশ্যক যে, তাঁহারা যে হৃদয়ের বিশ্বাসের বেগে চিরন্তন প্রথার বিরুদ্ধে গমন করেন তাহা নহে, তাঁহারা অন্ধভাবে চেঁচাইয়া কাজ করেন। ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকদের দুর্দশায় তাঁহাদের যে কষ্টবোধ হয় তাহা নহে, তাঁহারা যে হৃদয়ের মধ্যে অনুভব

করিয়া কোনো কাজ করেন তাহা নহে, তাঁহারা কেবল চেঁচাইয়া বলিতে চান আমরা স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী। ইঁহাদের দ্বারা হানি এই হয় যে, ইঁহারা নিজ কার্যের সীমা-পরিসীমা কিছুই দেখিতে পান না— কোথা গিয়া পড়েন ঠিকানা থাকে না। কিন্তু যাঁহাদের হৃদয়ের মধ্যে একটি বিশ্বাস একটি সংস্কার ধ্রুবতারার মতো জ্বলিতে থাকে, তাঁহারা সেই ধ্রুবতারার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে থাকেন; তাঁহারা জানেন কোন্‌খানে তাঁহাদের গম্যস্থান, কোন্ দিকে গেলে তাঁহারা কিনারা পাইবেন। কেবল দৈবাৎ কখনো স্রোতের বেগে ভাসিয়া বিপথে যান।

আমাদের সমাজে আজকাল যে এইরূপ অস্বাভাবিক চিৎকার-প্রথা প্রচলিত হইতেছে, তাহার কারণ আর কিছু নহে, আমরা হঠাৎ সভ্য হইয়াছি। আমরা বিদেশ হইতে কতকগুলা অচেনা ভাব পাইয়াছি, তাহাদের ভালো করিয়া আয়ত্ত করিতে পারি নাই, অথচ কর্তব্যবোধে তাহাদের অনুগমন করিতে গিয়া এক প্রকার বলপূর্বক চেঁচাইয়া কাজ করিতে হয়। আমরা নিজেই এখন ভালো করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না, কোন্ কাজগুলা আমরা বিশ্বাসের প্রভাবে করিতেছি, আর কোন্‌গুলা কেবলমাত্র অন্ধভাবে করিতেছি। কোন্‌খানে আমরা নিজে দাঁড় টানিয়া যাইতেছি, আর কোন্‌খানে আমাদের ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। বড়ো বড়ো বিদেশী কথার মুখোশ পরিয়া আমরা তো আপনাকে ও পরকে প্রবঞ্চনা করিতেছি না? আমাদের যেরূপ দেখাইতেছে আমরা সত্যই কি তাহাই হইয়াছি? যদি হইতাম তাহা হইলে কি এত চেঁচাইতে হইত? আর যদি না হইতেই পারিলাম, তবে কি মাংসখণ্ডের ছায়া দেখিয়া মুখের মাংসখণ্ডটি ফেলিয়া ভালো কাজ করিতেছি? শেষকালে কি অধ্রুবও যাইবে ধ্রুবও যাইবে?

ভারতী
ফাল্গুন ১২৮৯

জিহ্বা আস্ফালন

আমাদের সমাজে একদল পালোয়ান লোক আছেন, তাঁহারা লড়াই ছাড়া আর কোনো কথা মুখে আনেন না। তাঁহাদের অস্ত্রের মধ্যে একখানি ভোঁতা জিহ্বা ও একটি ইস্টিল পেন। তাঁহারা ম্লেচ্ছ অনার্যদের প্রতি অবিরত শব্দভেদী বাণ বর্ষণ করিতেছেন ও পরমানন্দে মনে করিতেছেন তাহারা যে-যাহার বাসায় গিয়া মরিতেছে। তাঁহাদের মুখগহ্বর হইতে ঘড়িঘড়ি এক-একটা বড়ো বড়ো হাওয়ার গোলা বাহির হইতেছে ও তাঁহাদের কল্পিত শত্রুপক্ষের আসমান-দুর্গের উপর এমনি বেগে গিয়া আঘাত করিতেছে ও তাহা হইতে এমনি মস্ত আওয়াজ বাহির হইতেছে যে, বীরত্বের গর্বে তাঁহাদের অল্প পরিসর একটুখানি বুক ফুলিয়া ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে। সুতরাং এই-সকল মিলিটেরি ব্যক্তিদিগের নিজের গলার শব্দে নিজের কানে এমনি তালা ধরিয়াছে যে, এখন, কী সৌন্দর্যের মোহন বংশিধ্বনি, কী বিশ্বপ্রেমের উদার আহ্বানস্বর, কী বিকাশমান অনন্ত জীবনের আনন্দ উচ্ছ্বাস, কী পরদুঃখকাতরের করুণ সংগীত, কিছুই তাঁহাদের কানের মধ্যে প্রবেশ করিবার রাস্তা পায় না। যে-কেহ ভাঙা গলায় কামানের আওয়াজের নকল করিতে না চায়, যে-কেহ শিশুদিগের মতো জুজুর অভিনয় করিয়া চতুর্দিকস্থ বয়স্ক-লোকদিগকে নিতান্ত শঙ্কিত করিতেছে কল্পনা করিয়া আনন্দে হাত পা না ছোঁড়ে, তাহারা তাঁহাদিগের নিকট খাতিরেই আসে না। তাঁহারা চান, ভারতবর্ষের যে যেখানে আছে, সকলেই কেবল লড়াইয়ের গান গায়, লড়াইয়ের কবিতা লেখে, মুখের কথায়, যতগুলা রাজা ও যতগুলা উজীর মারা সম্ভব সবগুলাকে মারিয়া ফেলে। যেন বঙ্গসাহিত্যের প্রতি ছত্রে বারুদের গন্ধ থাকে, যাহাতে শুদ্ধমাত্র বঙ্গসাহিত্য পড়িয়া ভবিষ্যতের পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ একবাক্যে স্বীকার করেন যে, বাঙালিজাতির মতো এত বড়ো পালোয়ান জাতি আজ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করে নাই। ইঁহারা সর্বদা সশঙ্কিত, পাছে বঙ্গসমাজ খারাপ

হইয়া যায়; ইঁহারা বঙ্গসমাজের কানে তুলা দিয়া রাখিতে চান পাছে সে গান শুনিয়া ফেলে ও তাহার প্রাণ কোমল হইয়া যায়, পাছে সে উপন্যাস পড়ে ও তাহার চিত্ত দুর্বল হইয়া পড়ে, পাছে সে নাট্যাভিনয় শোনে ও তাহার হৃদয় আর্দ্র হইয়া যায়। দিনরাত্রি কেবল বঙ্গসমাজকে ঘিরিয়া বসিয়া তাহার কানের কাছে তূরী ভেরী জগঝম্প বাজাও, যেখানে যে আছ ঢাকঢোল গলায় বাঁধো, ঢুলিতে দেখিলেই পরস্পর পরস্পরকে খোঁচা মারো এবং 'উঠ উঠ', 'জাগো জাগো' বলিয়া অস্থির করিয়া তোলো।

কিন্তু এই বীরপুরুষেরা বড়ো মনের আনন্দে আছেন। একখানা ছাতা ঘাড়ে করিয়া এই-সকল সরু সরু ব্যক্তিরা কেবলই চার দিকে ছটফট করিয়া বেড়াইতেছেন, বিশেষ একটা উদ্দেশ্য নাই, লক্ষ্য নাই, কেবল একটা গোলমাল চলিতেছে, মনে মনে অত্যন্ত স্ফূর্তি যে ভারি একটা কাজ করিতেছি। আর যত প্রকার কাজ আছে তাহা নিতান্ত অবহেলার চক্ষে দেখেন, যাহারা অন্যান্য কাজে মগ্ন রহিয়াছে তাহাদিগকে কৃপাপাত্র জ্ঞান করেন, ঈষৎ হাস্য করিয়া মনে করেন, আর সকলে কী ছেলেখেলাই করিতেছে! কাজ যা একমাত্র তিনিই করিতেছেন, কেননা তিনি যে কী করিতেছেন নিজেই তাহা পরিষ্কাররূপে জানেন না, কেবল এক প্রকার অস্পষ্ট ধারণা আছে যে, খুব একটা কী কাজ করিয়া বেড়াইতেছি। সত্য বটে, এক প্রকার ব্যস্ত কোমরবাঁধা মুষ্টিবদ্ধ উদগ্রভাব সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কেন যে এ ভাব তাহা তিনিও জানেন না, আমিও জানি না। কী যেন একটা ঘোরতর কারখানা বাধিয়াছে, কী যেন একটা সর্বনাশের উদ্যোগ হইতেছে, কেবল তিনি জাগ্রত সতর্ক আছেন বলিয়াই কোনো দুর্ঘটনা ঘটিতেছে না। শ্রাবণের রাত্রে বজ্রবিদ্যুৎ বর্ষণের সময় ব্যাঙের দল নিতান্ত ব্যস্তভাবে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া জগতের কানের কাছে অনবরত মকমক্ করিতে থাকে, তাহারাও বোধ করি মনে করে, ভাগ্যে তাহারা ছিল ও প্রাণপণে সমস্ত রাত্রি চিৎকার করিয়াছে, জগতে তাই আজ প্রলয় হইতে পারিল না। আমাদের বীরপুরুষেরাও মনে করেন, আজি এই দুর্যোগের রাত্রে ভারতবর্ষের ভার বিশেষরূপে তাঁহাদেরই হস্তে সমর্পিত হইয়াছে, এইজন্য উদ্দেশ্যহীনের ন্যায় অবিশ্রান্ত হো হো করিয়া হুটপাট করিয়া বেড়াইতেছেন ও মনে করিতেছেন জগতের অত্যন্ত উপকার হইতেছে। কাজেই ইহাদের বুক ক্রমেই ফুলিতে থাকে ও প্রাণ ক্রমেই সংকীর্ণ হইতে থাকে, বঙ্গসমাজ বা বঙ্গসাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ বিকাশকে অত্যন্ত ভয় করেন। ইঁহারা চান বঙ্গসাহিত্য কেবলমাত্র দাঁত ও নখের চর্চা করিতে থাকুক আর কিছু নয়। ক্ষমতাভেদেও ও অবস্থাভেদে যে প্রত্যেকে স্ব স্ব উপযোগী কার্যে প্রবৃত্ত হইবে ও এইরূপে সমাজের অন্তর্নিহিত বিচিত্র শক্তি চারি দিক হইতে বিকশিত হইয়া উঠিবে তাহা তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে। আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া এই শ্রেণীর কতকগুলি সংকীর্ণদৃষ্টি সমালোচক কবিদিগকে কবিত্ব শিখাইয়া আসিতেছেন ও অবিরত বীররস ফরমাস করিতেছেন এবং অবশিষ্ট আটটি রসের মধ্যে কোনো একটি রসের ছিটাফোঁটা দেখিবামাত্র ননীর পুতুলি বঙ্গসমাজের স্বাস্থ্যভঙ্গের ভয়ে শশব্যস্ত হইয়া উঠিতেছেন! তাহার কতকটা ফল ফলিয়াছে, বীররসটা ফ্যাশান হইয়া পড়িয়াছে। গদ্য লেখক ও পদ্য লেখকগণ পালোয়ান সমালোচকদিগের চিৎকার বন্ধ করিয়া দিবার জন্য তাহাদের মুখে বীররসের টুকরা ফেলিয়া দিতেছেন। সকলেই বলিতেছে, উঠ, জাগো; বাংলায় ইংরাজিতে গদ্যে, পদ্যে, মিত্রাক্ষরে, অমিত্রাক্ষরে, হাটে ঘাটে, নাট্যশালায়, সভায়, ছেলে মেয়ে বুড়ো সকলেই বলিতেছে, উঠ, জাগো। সকলেই যে অকপট হৃদয়ে বলিতেছে বা কেহই যে বুঝিয়া বলিতেছে তাহা নহে। সকলেই বলিতেছে, 'আজ উনবিংশ শতাব্দী', উনবিংশ শতাব্দীটা যেন বঙ্গসমাজের বাবা স্বয়ং রোজগার করিয়া আনিয়াছে! 'উনবিংশ শতাব্দী' নামক একটা অনুবাদিত শব্দ বাঙালির মুখে শুনিলে অত্যন্ত হাসি পায়। যে বাঙালি দুই দিন বিলাতে থাকিয়া বিলাতকে home বলেন তিনিও ইহা অপেক্ষা হাস্যজনক কথা বলেন না! উনবিংশ শতাব্দী আমাদের কে? আঠারোটি শতাব্দী যাহাদিগকে ক্রমান্বয়ে মানুষ করিয়া আসিয়াছে, নিজের বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করাইয়াছে, তাহারাই উনবিংশ শতাব্দী লইয়া গর্ব

করিতেছে। আর আমরা আজ দুদিন ইংরাজের সহিত আলাপ করিয়া এমনিভাবে কথাবার্তা আরম্ভ করিয়াছি যেন উনবিংশ শতাব্দীটা আমাদেরই। যেন উনবিংশ শতাব্দীটা অত্যন্ত সস্তা দামে বাংলা দেশে নিলাম হইয়া গিয়াছে, আর বঙ্গীয় বীরপুরুষ নামক জয়েন্ট স্টক্ কোম্পানি তাহা সমস্তটা কিনিয়া লইয়াছেন। ভাববিশেষ যখন সমাজে ফ্যাশান হইয়া যায় তখন এইরূপই ঘটে। তখন তাহার আনুষঙ্গিক কতকগুলা কথা মুখে মুখে চলিত হইয়া যায়, সে কথাগুলার যেন একটা অর্থ আছে এইরূপ ভ্রম হয়, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে কেহ তাহার অর্থ ভালো করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারেন না। কৃত্রিমতা মাত্রেই মন্দ, তথাপি মতের কৃত্রিমতা সহ্য করা যায়, কিন্তু হৃদয়ের অনুভাবের কৃত্রিমতা একেবারে অসহ্য। আজকাল যেখানে যাহার তাহার মুখে 'ভারত মাতা' সম্বন্ধীয় গোটাকতক হৃদয়সম্পর্কশূন্য বাঁধি বোল শুনিতে পাওয়া যায়; তাহারা এমনিভাবে কথাগুলো ব্যবহার করে যেন সব কথার মানে তাহারা জানে, যেন তাহা তাহাদের প্রাণের ভাষা! কিন্তু ইহাতে তাহাদের দোষ নাই, যে-সকল সমালোচক দিবারাত্রি চেষ্টা করিয়া এত বড়ো একটি মহৎ ভাবকে ফ্যাশানের ঘৃণিত হীনত্বে পরিণত করিয়াছেন, হৃদয়জাত ভাবকে সস্তা করিবার জন্য কলে ফেলিয়া গড়িতে পরামর্শ দিয়াছেন, অবশেষে তাহা আবালবৃদ্ধবনিতার হাতে হাতে দোকানের কেনাবেচা দ্রব্যের মতো, রাংতা-মাখানো শব্দ-উৎপাদক চকচকে ভেঁপুর মতো করিয়া তুলিয়াছেন তাঁহারাই ইহার জন্য দায়ী। যে ভাব ও যে কথার অর্থ ভুলিয়া যাই, যাহারা আর হৃদয় হইতে উঠে না, কেবল মুখে মুখে বিরাজ করে, তাহারা মরিয়া যায় ও জীবন অভাবে ক্রমশই পচিয়া উঠিতে থাকে। দেশহিতৈষিতার বুলিগুলিরও সেই দশা ধরিবে। তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ, 'বঙ্গসাহিত্যে ও ছাইভস্মগুলা কেন?' আমি বলিতেছি, 'কী করা যায়! একদল মহা বীর আছেন, তাঁহারা বঙ্গসাহিত্যে অগ্নিকাণ্ড করিতে চান। সময় অসময় আবশ্যক অনাবশ্যক কিছু না মানিয়া দিনরাত্রি আগুন জ্বালাইয়া রাখিতে চান, কাজেই বিস্তর ছাই ভস্ম জমিয়াছে।'

এইখানে একটা গল্প বলি। একটা পাড়ায় পাঁচ-সাতজন মাতাল বাস করিত। তাহারা একত্রে মদ্যপান করিয়া অত্যন্ত গোলমাল করিত। পাড়ার লোকেরা একদিন তাহাদিগকে ধরিয়া অত্যন্ত প্রহার দিল। সেই প্রহারের স্মৃতিতে পাঁচ-সাত দিন তাহাদের মদ খাওয়া স্থগিত রহিল, অবশেষে আর থাকিতে না পারিয়া তাহারা প্রতিজ্ঞা করিল আজ মদ খাইয়া আর কোনো প্রকার গোল করিব না। উত্তমরূপে দরজা বন্ধ করিয়া তাহারা নিঃশব্দে মদ্যপান আরম্ভ করিল। সকলেরই যখন মাথায় কিছু কিছু মদ চড়িয়াছে, তখন সহসা একজনের সাবধানের কথা মনে পড়িল ও সে গম্ভীর স্বরে কহিল, 'চুপ্!' অমনি আর-একজন উচ্চতর স্বরে কহিল, 'চুপ্!' তাহা শুনিয়া আবার আর-একজন আরও উচ্চস্বরে কহিল, 'চুপ্', এমনি করিয়া সকলে মিলিয়া চিৎকারস্বরে 'চুপ্ চুপ্' করিতে আরম্ভ করিল— সকলেই সকলকে বলিতে লাগিল 'চুপ্'। অবশেষে ঘরের দুয়ার খুলিয়া সকলে বাহির হইয়া আসিল, পাঁচ-সাতজন মাতাল মিলিয়া রাস্তায় 'চুপ্ চুপ্' চিৎকার করিতে করিতে চলিল, 'চুপ্ চুপ্' শব্দে পাড়া প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। আমাদের উঠ জাগো শব্দটিও কি ঠিক এইরূপ হয় নাই? সকলেই সকলকে বলিতেছে, উঠ, সকলেই সকলকে বলিতেছে, জাগো, কে যে উঠে নাই ও কে যে ঘুমাইতেছে সে বিষয়ে আজ পর্যন্ত ভালোরূপ মীমাংসাই হইল না।

ইহাতে একটা হানি এই দেখিতেছি, সকলেই মনে করিতেছে, কাজ করিলাম। গোলমাল করিতেছি, হাততালি দিতেছি, চেঁচাইতেছি, কী যেন একটা হইতেছে। দেশের জন্য প্রাণপণ করিতেছি মনে করিলে নিজের মহত্ত্বে নিজের শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, অতি নিষ্কণ্টকে সেই অতুল আনন্দ উপভোগ করিতেছি। মাথা-মুণ্ডহীন একটা গোলেমালেই সমস্ত চুকিয়া যাইতেছে, আর কাজ করিবার আবশ্যক হইতেছে না।

একদল লোক আছেন, তাঁহারা কেবল উত্তেজিত ও উদ্দীপ্তই করিতেছেন, তাঁহাদের বক্তৃতায় বা লেখায় কোনো উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহারা কেবল বলিতেছেন, 'এখনও চৈতন্য

হইতেছে না, এখনও ঘুমাইতেছ? এই বেলা আলস্য পরিহার করো, গাত্রোত্থান করো। আমাদের পূর্বপুরুষদের একবার স্মরণ করো— ভীষ্ম দ্রোণ গৌতম বশিষ্ঠ ইত্যাদি।' কী করিতে হইবে বলেন না, কোন্ পথে যাইতে হইবে বলেন না, পথের পরিণাম কোথায় বলেন না, কেবল উত্তেজিতই করিতেছেন। বন্দুকের বারুদে আগুন দিতেছেন, অথচ কোনো লক্ষ্যই নাই, ইহাতে ভালো ফল যে কী হইতে পারে জানি না, বরঞ্চ আপনা-আপনির মধ্যেই দু-চারজন জখম হওয়া সম্ভব। কোনো একটা কাজে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছি না কেবল তপ্তরক্তের প্রভাবে ইতস্তত ধড়ফড় করিতেছি। কতকগুলা অসম্ভব কল্পনা গড়িয়া তুলিয়া তাহাকে প্রাণ দিবার চেষ্টা করিতেছি, স্বদেশের বুকে যে শেল বিঁধিয়াছে, মনে করিতেছি বুঝি তাহা বলপূর্বক দুই হাতে করিয়া উপড়াইয়া ফেলিলেই দেশের পক্ষে ভালো, কিন্তু জানি না যে তাহা হইলে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইয়া সাংঘাতিক পরিণাম উপস্থিত করিবে। বীরত্ব ফলাইবার জন্য সকলেই অস্থির হইয়া উঠিতেছেন, অথচ সামর্থ্য নাই, কাজেই দৈবাৎ যদি সুবিধামতে পথে অসহায় ফিরিঙ্গি-বালক দেখিতে পান অমনি তিন-চার জনে মিলিয়া তাহাকে ছাতিপেটা করিয়া আপনাদিগকে মস্ত বীরপুরুষ মনে করেন, মনে করেন একটা কর্তব্য কাজ সমাধা হইল। যথার্থ কর্তব্য কাজ চুলায় যায়, আর কতকগুলা সহজসাধ্য মিথ্যা-কর্তব্য তাড়াতাড়ি সাধন করিয়া তপ্তরক্ত শীতল করিতে হয়, নহিলে মানুষ বাঁচিবে কী করিয়া? তাই বলিতেছি, কতকগুলা অর্থহীন অনির্দিষ্ট অস্পষ্ট উদ্দীপনাবাক্য বলিয়া মিথ্যা উত্তেজিত করিবার চেষ্টা পাইয়ো না। কারণ, এইরূপ করিলে দুর্বলেরা অভদ্র হইয়া উঠে, অভদ্রতাকে বীরত্ব মনে করে, স্ত্রীর কাছে গর্ব করে ও কার্যকালে কী করিবে ভাবিয়া পায় না। গুরুজনকে মানে না, পূজ্যলোককে অপমান করে ও একপ্রকার খেঁকিবৃত্তি অবলম্বন করে। সম্প্রতি নরিস্ সাহেব ও জুরিস্‌ডিক্‌শন বিল প্রভৃতি লইয়া কোনো কোনো বাংলা কাগজ যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে তাহা দেখিলেই আমাদের কথা সপ্রমাণ হইবে। তিরস্কার করিবার সময়, এমন-কি, গালাগালি দিবার সময়েও ভদ্রলোক ভদ্রলোকই থাকে, কিন্তু বানরের মতো মুখ-ভেংচাইয়া দাঁত বাহির করিয়া রুচিহীন অভদ্রের মতো অতিবড়ো শত্রুকেও অপমান করিতে চেষ্টা করিলে নিজেকেই অপমান করা হয়, তাহাতে বিপক্ষপক্ষের যত না মানহানি হয় ততোধিক আত্মগৌরবের লাঘব করা হয়। এরূপ ব্যবহারকে যাঁহারা নির্ভীকতা ও বীরত্ব মনে করেন তাঁহারা ভীরু, হীন, কারণ প্রকৃত বীরত্ব আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া চলে।

পুনশ্চ বলিতেছি, যাঁহারা বক্তৃতা দেন ও উদ্দীপক গদ্য পদ্য লেখেন তাঁহারা যেন একটা উদ্দেশ্য দেখাইয়া দেন, একটা কর্তব্য নির্দেশ করিয়া দেন। আমাদের সমাজের পদে পদে এতশত প্রকার কর্তব্য রহিয়াছে যে, কতকগুলা অস্পষ্ট বাঁধি বোল বলিয়া সময় ও উদ্যম নষ্ট করা উচিত হয় না। দীপ্তরক্ত যুবকেরা যাহাতে কতকগুলা কুহেলিকাময় পর্বতাকার উদ্দেশ্য লইয়াই নাচিয়া না বেড়ান, ছোটো ছোটো কাজের মধ্যে যে-সকল মহৎ বীরত্বের কারণ প্রচ্ছন্ন আছে সেগুলিকে যেন হেয় জ্ঞান না করেন। গড়ের মাঠে, বা কেল্লার মধ্যেই কেবল বীরত্বের রঙ্গভূমি নাই, হয়তো গৃহের মধ্যে, অন্তঃপুরের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে তাহা অপেক্ষা বিস্তৃত রণস্থল রহিয়াছে! এত সামাজিক শত্রু চারি দিকে রহিয়াছে তাহাদিগকে কে নাশ করিবে! দুর্ভাগ্যক্রমে ইহাতে agitation করিতে হয় না, ইহাতে ঢাকঢোল বাজে না, হট্টগোল হয় না। Agitation করা অনেকের একটা নেশার মতো হইয়াছে, মদ্যপানের মতো ইহাতে আমোদ পান— সকলেই উদ্দেশ্য বুঝিয়া কর্তব্য বুঝিয়া agitate করেন না।

সুযোগ্য বক্তা শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন বঙ্গবাসীদিগকে moderation, অর্থাৎ মিতব্যবহার অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। অধিকাংশ বঙ্গযুবক মনে করেন পেট্রিয়ট হইতে হইলে হঠাৎ অত্যন্ত উন্মাদ হইয়া উঠিতে হইবে, হাত-পা ছুঁড়িতে হইবে, ছটোপাটি করিতে হইবে, যাহাকে যাহা না বলিবার তাহা বলিতে হইবে। তাঁহারা মনে করেন, সফরীপুচ্ছের ন্যায় অবিরত ফর্‌ফরায়মান তাঁহাদের অতি লঘু, অতি ছিব্‌লা

ওই জিহ্বাটার জুরিস্‌ডিক্‌শন সর্বত্রই আছে। একটি স্থির উদ্দেশ্য অবলম্বন করিয়া, আত্মসংযমন করিয়া, না ফুলিয়া ফাঁপিয়া ফেনাইয়া, বালকের মতো কতকগুলা নিতান্ত অসার কথা না বলিয়া অপ্রতিহত বেগে বহিয়া যাও, গম্যস্থানে গিয়া পৌঁছিবে, যে-সকল পাষাণ স্তূপ পথে পড়িয়া আছে, অবিশ্রাম স্থির প্রবাহ-বেগে তাহারা ক্রমেই ভাঙিয়া যাইবে। যতদিন পর্যন্ত না আমরা আত্মসংযম করিতে শিখিব, যতদিন পর্যন্ত অপরিণত বুদ্ধির ন্যায় আমাদের ভাবে ভাষায় ব্যবহারে একপ্রকার ছেলেমানুষী আতিশয্য প্রকাশ করিব, ততদিন পর্যন্ত বুঝিতে হইবে যে, আমরা স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত হইতে পারি নাই। যখন আমরা নিজের স্বত্ব বুঝিব ও ধীর গম্ভীর দৃঢ়স্বরে যুক্তিসহকারে সেই স্বত্ব দাওয়া করিতে পারিব, তখন আমাদের কথা শুনিতেই হইবে। আর, নিতান্ত বালকের মতো না বুঝিয়া না শুনিয়া কেবল অনবরত আবদার করিলে, ঘ্যানঘ্যান করিলে, চিৎকার করিলে, কে আমাদের কথায় কর্ণপাত করিবে? তাই বলিতেছি, আগে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে উদাহরণ সংগ্রহ করো, ভাবিতে আরম্ভ করো ও বলিতে শেখো, তাহা হইলে আর সকলে শুনিতে আরম্ভ করিবে। বেশি করিয়া বলিলে কিছুই হয় না, ভালো করিয়া বলিলে কী না হয়! আতিশয্যের দিকে যাইয়ো না, কারণ যেখানেই যুক্তিহীন আতিশয্যপ্রিয় প্রজা, সেইখানেই স্বেচ্ছাচারী প্রভুতন্ত্র শাসন প্রণালী।

ভারতী
শ্রাবণ ১২৯০

জিজ্ঞাসা ও উত্তর

আমাদের কাছে এক প্রশ্ন আসিয়াছে, জাতীয়তার লক্ষণ কী? কী কী গুণ থাকিলে কতকগুলি লোক একজাতীয় বলিয়া গণ্য হয়। এক দেশে যাহারা থাকে তাহারাই কি এক জাতীয়? কিন্তু তাহা হইলে যে আর-একটা কথা ওঠে। এক দেশ কাহাকে বলে? যে পরিমিত ভূমির অধিকাংশ অধিবাসী এক জাতীয় তাহাই তো এক দেশ। অতএব, গোড়ায় জাতি নির্দেশ না হইলে দেশ নির্দেশ হইবে কী করিয়া? তাহা ছাড়া পূর্বোক্ত সংজ্ঞা অনুসারে মুসলমানেরাও আমাদের সহিত এক জাতীয় হইয়া পড়ে। তবে কি ধর্মের ঐক্যে জাতির ঐক্য স্থির হয়? তাহাই বা কী করিয়া বলিব? কারণ তাহা হইলে খৃস্টান হইলেই আমি ইংরাজ হইয়া যাই। তাহা হইলে ফরাসি ও জর্মানেরাও ধর্মের ঐক্যে ইংরাজদের সহিত একজাতি বলিয়া গণ্য হয়। যদি বল যাহারা এক রাজতন্ত্রের অন্তর্ভূত তাহারা এক জাতি, তবে তাহার বিরুদ্ধেও বক্তব্য আছে; কারণ তাহা হইলে ব্রিটিশ ব্রহ্মদেশীয়েরাও আমাদের সহিত এক জাতি। কেহ কেহ বলিবেন যাহাদের পরস্পরের মধ্যে সামাজিক আচার-ব্যবহারের ঐক্য আছে, তাহারা এক জাতীয় বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু সে কথা ঠিক নহে, কারণ আমাদের দেশীয় মহারাষ্ট্রী, বাঙালি, পঞ্জাবি প্রভৃতিদের সামাজিক আচার-ব্যবহারের বিস্তর অনৈক্য আছে; তাহা ছাড়া অনেক বিভিন্ন য়ুরোপীয় জাতির আচার-ব্যবহারের অনেক ঐক্য আছে। কেহ কেহ বলিবেন, যাহাদের পূর্বপুরুষগণ এক সূত্রে বদ্ধ ছিল, ও সেই অবধি পুরুষানুক্রমে একত্রে বাস করিয়া আসিতেছে তাহাদের এক জাতি বলা যায়। কিন্তু এ নিয়ম তো সর্বত্র খাটে না। একজন হিন্দু কয়েক বৎসর ইংলন্ডে বাস করিয়া অনুষ্ঠানবিশেষ আচরণ করিলে ইংরাজ হইয়া যাইতে পারেন। কিন্তু হিন্দুর পূর্বপুরুষ ইংরাজের পূর্বপুরুষের সহিত ঐতিহাসিক কালের মধ্যে কখনো একসূত্রে বদ্ধ ছিলেন না। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, ইংরাজেরা Nation বলিতে যাহা বুঝেন, আমরা জাতি বলিতে তাহা বুঝি না। জাতি শব্দ Nation অপেক্ষা অনেক বিস্তৃত এবং Nation অপেক্ষা অনেক সংকীর্ণ অর্থে প্রয়োগ হয়। আমরা মনুষ্য সাধারণকে মনুষ্যজাতি বলি, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদিগকে হিন্দুজাতি বলি, আবার তাহারও

উপবিভাগকে জাতি বলি, যথা, বাঙালি জাতি, আবার সামাজিক সংকীর্ণ শ্রেণী-বিভাগকেও জাতি শব্দে অভিহিত করিয়া থাকি, যথা ব্রাহ্মণ জাতি, কায়স্থ জাতি ইত্যাদি। জাতি শব্দের ধাতুগত অর্থ দেখিতে গেলে দেখা যায়, জন্মের সাদৃশ্য বুঝাইতেই জাতি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ক্রমশ ইহার অর্থান্তর ঘটিয়াছে।

প্রশ্নকর্তা হয়তো জিজ্ঞাসা করিবেন, আমরা হিন্দুজাতি বলিলে যাহা বুঝি, সে জাতিত্ব কিসে স্থির হয়? তাহার উত্তর, ধর্মে। কতকগুলি ধর্ম হিন্দুধর্ম বলিয়া স্থির হইয়া গিয়াছে। হিন্দুধর্ম নামক এক মূল ধর্মের নানা শাখা-প্রশাখা চারি দিকে বিস্তারিত হইয়াছে, (তাহা হইতে আরও অনেক শাখা-প্রশাখা এখনও বাহির হইতে পারে) এই-সকল ধর্ম উপধর্ম যাহারা আশ্রয় করিয়া থাকে তাহারা হিন্দু। কিন্তু যখনি কোনো হিন্দু এই-সকল শাখা-প্রশাখা পরিত্যাগ করিয়া একেবারে সর্বতোভাবে ভিন্ন ধর্মবৃক্ষ আশ্রয় করেন তখনি তিনি আর হিন্দু থাকেন না। মুসলমান জাতিদিগেরও এইরূপ। ইংরাজ ফরাসি প্রভৃতি য়ুরোপীয়দিগের এরূপ নহে। রাজ্যতন্ত্রের ঐক্যেই তাহাদের জাতিত্ব নির্ধারিত হয়। একজন ইংরাজ ও একজন মার্কিনবাসীর হয়তো আর কোনো প্রভেদ নাই, উভয়ের এক পূর্বপুরুষ, এক ভাষা, এক ধর্ম, এক আচার-ব্যবহার পরিচ্ছদ, তথাপি উভয়ে এক Nation-ভুক্ত নহেন, কারণ উভয়ের রাজ্য-তন্ত্রগত প্রভেদ আছে।

অতএব দেখা গেল, হিন্দু জাতির ধর্মই মুখ্য লক্ষণ, আহার ব্যবহার পরিচ্ছদ ভাষা প্রভৃতি গৌণ। ইংরাজ জাতির রাজ্যতন্ত্রই মুখ্য লক্ষণ, ধর্ম প্রভৃতি অবশিষ্ট আর-সকল গৌণ।

এইখানে একটি কথা উত্থাপন করা যাইতে পারে। 'জাতীয়' নামক একটি শব্দ আমাদের ভাষায় নূতন সৃষ্ট হইয়াছে। 'দেশীয়' শব্দটি কানে যেমন দেশী বোধ হয়, 'জাতীয়' শব্দটি সেরূপ হয় না। অনবরত ব্যবহার করিয়া এ শব্দটি যাঁহাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু 'জাতীয় পত্রিকা' বা 'জাতীয় নাট্যশালা' বলিতে কানে কেমন খারাপ শুনায়, কেবল তাহাই নয়, একজন সরল দিশি লোক ও শব্দটির অর্থ ঠিক বুঝিতেই পারিবে না; কারণ জাতি শব্দে আমাদের ভাষায় বৃহৎ হইতে ক্ষুদ্র এত অর্থ বুঝায়, যে বিশেষণ যোগ করিয়া না দিলে উহার ঠিক অর্থ নির্দিষ্ট হয় না। হিন্দুজাতীয় পত্রিকা বা হিন্দুজাতীয় নাট্যশালা বলিলে শুনিবামাত্রই অর্থবোধ হয়। তাহাতে এই বুঝায়, ধর্ম ও অন্যান্য ঐক্য থাকাতে যে জাতি হিন্দু নামে উক্ত হইয়াছেন, এই পত্রিকা ও এই নাট্যশালা তাঁহাদেরই কর্তৃক ও তাঁহাদেরই সম্বন্ধীয়। জাতীয় পত্রিকা ও জাতীয় নাট্যশালার পরিবর্তে দেশীয় পত্রিকা ও দেশীয় নাট্যশালা শব্দ ব্যবহার করো, তাহা হইলেই দেখিতে পাইবে কোন্ শব্দটা সাধারণ লোকে শুনিবামাত্রই বুঝিতে পারে।

National fund নামক শব্দ 'জাতীয় তহবিল' 'জাতীয় ধনভাণ্ডার' ইত্যাদি নানারূপে অনুবাদিত হইতেছে। কিন্তু ইহাতে কি অর্থের ব্যাঘাত হইতেছে না? যখন মুসলমানদিগের নিকট হইতেও উক্ত ভাণ্ডারের জন্য টাকা লওয়া হইতেছে, তখন উক্ত ভাণ্ডারকে জাতীয় কীরূপে বলা যায়? ইচ্ছা করিলে কে কী না বলিতে পারে কিন্তু ইহা আমাদের ভাষার বিরোধী। তাহার চেয়ে 'দেশীয় তহবিল' বা 'দেশীয় ধনভাণ্ডার' বলা হউক-না কেন? একেবারে অবিকল ইংরাজির তর্জমা করিবার আবশ্যক কী? ইংরাজি Nation শব্দের স্থলে আমাদের দেশ শব্দ ঠিক খাটে না বটে, কিন্তু ইংরাজেরা যেখানেই National শব্দ ব্যবহার করেন, সেইখানেই সহজ বাংলায় 'দেশীয়' শব্দ প্রয়োগ হয়। National Institution-কে 'দেশীয় অনুষ্ঠান' বলিলেই তবে ঠিক National হয়, নতুবা উহা প্রায় ইংরাজিই থাকিয়া যায়।

এইখানে একটি প্রশ্ন উঠে। প্রাচীন হিন্দুগণ নিজের নামকরণ করেন নাই। তাঁহারা অন্যান্য জাতির নাম দিয়াছিলেন, যথা শক, যবন, কিরাত রোমক ইত্যাদি, কিন্তু নিজের নাম নিজে দিবার আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। কেবল সাধারণত আর সকলের সহিত প্রভেদ জানাইবার সময় আপনাদিগকে আর্য ও আর সকলকে অনার্য বলিতেন। কিন্তু আর্য শব্দ একটি বিশেষণ শব্দ মাত্র, উহা জাতির বিশেষ নামবাচক শব্দ নহে। অতএব, Nation অর্থে জাতি শব্দের ব্যবহার সংস্কৃত

সাহিত্যে কখন হইতে আরম্ভ হইয়াছে? যবন রোমক প্রভৃতিকে শুদ্ধমাত্র যবন রোমক বলা হইত, না যবন জাতি, রোমক জাতি বলা হইত? সংক্ষেপে, Nation অর্থে জাতি শব্দের ব্যবহার প্রাচীন সংস্কৃতে আছে কি না? যদি না থাকে তো কখন হইতে আরম্ভ হইয়াছে কেহ বলিতে পারেন কি না? আর জাতি শব্দ ঠিক কী কী অর্থে সংস্কৃতে ব্যবহার হইত, তাহার প্রয়োগ সমেত কেহ অনুগ্রহ-পূর্বক দেখাইয়া দিবেন কি? ব্রাহ্মণ শূদ্র প্রভৃতি সামাজিক শ্রেণীবিভাগকে প্রাচীন ভাষায় 'বর্ণ' বলা হইত, কোথাও কি জাতি বলা হইয়াছে? মাগধ, কৈকেয়, প্রভৃতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশবাসীকে কি প্রাচীন সংস্কৃতে বিভিন্ন জাতি বলা হইয়াছে? এক কথায় জাতি শব্দে প্রাচীন সংস্কৃতে ঠিক কী কী অর্থ বুঝাইত, এবং কী কী বুঝাইত না, সে বিষয়ে আমরা শিক্ষা লাভ করিতে চাহি।

ভারতী
ভাদ্র ১২৯০

সমাজ সংস্কার ও কুসংস্কার[১]

উভয় পক্ষের কথা তো শুনা গেল। এখন বিচার করিয়া স্থির করিবার সময় আসিয়াছে। হাজার প্রয়োজনীয় বিষয় হউক তবু এক কথা বার বার শুনিতে ভালো লাগে না, তাহার পরে আবার, শ্রীমতীতে শ্রীমতীতে বোঝাপড়া চলিতেছিল মাঝে হইতে কোথাকার এক শ্রীযুক্ত আসিয়া যোগ দিলে পাঠকরা বিরক্ত হইতে পারেন। কিন্তু দুই পক্ষে তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হইলে শীঘ্র মিটিবে না ও পাঠকদের বিরক্তিজনক হইবে বিবেচনা করিয়া আমি শ্রী তৃতীয় পক্ষ আসিয়া যথাসাধ্য সংক্ষেপে সারিবার চেষ্টা করিলাম। প্রথমত, গোড়ায় কী কী কথা উঠিয়াছিল ও তাহার কীরূপ উত্তর দেওয়া হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে উত্তর-প্রত্যুত্তরচ্ছলে সাজাইয়া দিই, তাহা হইলে বোধ করি আমাকে আর বেশি কথা বলিতে হইবে না।

প্রথম পক্ষ। আমাদের নব্য সম্প্রদায় উন্নতিপথের কণ্টকস্বরূপ কুসংস্কারগুলিকে একেবারে উন্মূলিত করিতে চান, ইহা অপেক্ষা দেশের সৌভাগ্য আর কিছুই নাই। কিন্তু কোন্‌টা কুসংস্কার সেইটে বিশেষ মনোযোগ করিয়া আগে স্থির করা দরকার। মন্দ মনে করিয়া ভালোকে দূর করিয়া দিলে দেশের বিশেষ উপকার হয় না, কারণ, কেবলমাত্র মহৎ-উদ্দেশ্য লইয়া ঘরকন্না চলে না। তাহা ছাড়া, দেশী কুসংস্কারের জায়গায় হয়তো বিলাতি কুসংস্কার রোপণ করা হইল, তাহার ফল হইল এই যে, গোরা ডাকিয়া সিপাই তাড়াইলে, এখন গোরার উৎপাতে দেশছাড়া হইতে হয়। যাহা হউক, ইহা বোধ করি কেহ অস্বীকার করিবেন না যে, যদি সেই কুসংস্কারই পুষিতে হইল তবে আমাদের দেশের আয়ত্তাধীন রোগা ভেতো কুসংস্কারই ভালো, বিলাতের গোখাদক জোয়ান কুসংস্কার অতি ভয়ানক!

দ্বিতীয় পক্ষ। উত্তর নাই।

প্রথম পক্ষ। এমন কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা বিলাতি আচার-ব্যবহারের সহিত যাহার মিল আছে তাহাকেই সুসংস্কার মনে করেন ও যাহার বিলাতি প্রতিরূপ নাই তাহাকেই কুসংস্কার বলিয়া ত্যাগ করেন। এ বিষয়ে বিবেচনাশক্তি খাটানো বাহুল্য জ্ঞান করেন। যাঁহারা এই শ্রেণীর লোক, যাঁহারা বিলাতি অনাবশ্যক আচার-ব্যবহারও সগর্বে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কি

১. ভারতী, আষাঢ় ১২৯০ সংখ্যায় বঙ্গমহিলা সভায় জ্ঞানদানন্দিনী দেবী-কর্তৃক পঠিত 'সমাজ সংস্কার ও কুসংস্কার' প্রকাশিত হলে, ভাদ্র সংখ্যায় 'শ্রীমতী' স্বাক্ষরে এর প্রতিবাদ মুদ্রিত হয়। আশ্বিন সংখ্যায় 'তৃতীয় পক্ষ' নামে 'শ্রীরঃ' স্বাক্ষরে রবীন্দ্রনাথের রচনাটি প্রকাশিত হয়।

হৃদয়ের দোহাই দিয়া জিজ্ঞাসা করা যায় না যে, তোমরা আমাদের দেশের অনাবশ্যক, এমন-কি, বিশেষ আবশ্যক, অনুষ্ঠানগুলি সগর্বে ত্যাগ করিলে কেন? তোমরা নব্য বালিকারা, আত্মীয় ও সখীদিগের জন্মতিথির দিনে ছবি-আঁকা কার্ড পাঠাইয়া ইংরাজি ধরনে উৎসব কর, ইংরাজি বৎসরের আরম্ভের দিন ইংরাজি প্রথানুসারে পরস্পরকে কুশল-লিপি প্রেরণ করিয়া থাক, এপ্রিলের ১লা তারিখে ইংরাজদের অনুকরণে পরস্পরকে নানাপ্রকার ঠকাইতে চেষ্টা কর, এ কাজগুলি কিছু মহাপাতক নয়, ইহাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো বক্তব্যও নাই। কিন্তু একটা কথা আমার জিজ্ঞাসা করিবার আছে, তোমরা ভাইদ্বিতীয়ার অনুষ্ঠান ত্যাগ করিলে কেন? তোমরা বড়ো হইলে জামাইষষ্ঠী পালন কর না কেন? এমনও দেখিয়াছি সামান্য ইংরাজি অনুষ্ঠানের ব্যত্যয় হইলে তোমরা লজ্জায় মরিয়া যাও, আর ভালো ভালো দিশি অনুষ্ঠান পালন না করিলে কিছুই মনে হয় না। ইহা হইতে এইটেই দেখা যাইতেছে যে, তোমরা সুসংস্কার কুসংস্কার বাছিয়া কাজ কর না, দিশি বিলাতি বাছিয়া কাজ কর।

দ্বিতীয় পক্ষ। দেশীয় ভাবের অনাদরে লেখিকার প্রাণে বাজিয়াছে বলিয়া তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া কথা কহিতে পারেন নাই! লেখিকা দেশীয় ও বিদেশীয় ভাবের একজন নিরপেক্ষ বিচারক নহেন, তিনি দেশীয় ভাবের পক্ষপাতী। এরূপ পক্ষপাতে হৃদয় প্রকাশ পায় বটে কিন্তু যুক্তির অভাব অনুমান হয়। অনেক নব্যদের কাছে সেকেলে ভাবের আদর দেখা যায় না বটে, কিন্তু সাহেবিয়ানাই তাহার কারণ নয়। সমাজ সংস্কারের আবশ্যক হইয়াছে, নব্য সম্প্রদায় তাহা বুঝিয়াছেন ও কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উৎসাহের চোটে অনেক সময় হিতে বিপরীত করেন বটে, কিন্তু সেটা কি সাহেবিয়ানা? তাঁহারা সাহেবদের ভালো লইতে গিয়া ধাঁধা লাগিয়া মন্দও লন, কিন্তু দেশকে সাহেবি করিবার জন্য তাহা করেন না, দেশের ভালো করিবার জন্যই এরূপ করিয়া থাকেন। কারণ, সাহেবি করিবার ইচ্ছা করিলে অনায়াসে তাঁহারা হ্যাটকোট পরিয়া অবিকল ইংরাজ সাজিতে পারিতেন, কিছুমাত্র দিশি অবশিষ্ট রাখিবার দরকার কী ছিল? যাহা হউক, আমার কথাটার মর্ম এই, নব্য সম্প্রদায় যাহা-কিছু গলদ করেন তাহা অতিশয় উৎসাহের প্রভাবেই করিয়া থাকেন, সাহেবিয়ানা হইতে করেন না।

তৃতীয় পক্ষ। লোকের কাজ দেখিয়া মনের ভাব জানিতে হয়, আমি (এবং লেখিকাদ্বয়) কিছু অন্তর্যামী নহি। প্রথম পক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেছেন যে, একদল লোক আছেন তাঁহারা ইংরাজি অনাবশ্যক এবং অর্থহীন প্রথাগুলিকেও সমাদরে গ্রহণ করেন, অথচ, দিশি অনাবশ্যক, এমন-কি, আবশ্যক প্রথাগুলিকে অকাতরে পরিত্যাগ করেন। ইহা দেখিলেই কী মনে হয়? মনে হয় যে, ইঁহারা আবশ্যক অনাবশ্যক দেখিয়া যে কিছু গ্রহণ করিতেছেন তাহা নয়, ইঁহারা বিলাতিকে আবশ্যক জ্ঞান করেন, দিশিকে অনাবশ্যক জ্ঞান করেন। সাহেব দেখিয়া তাঁহাদের ধাঁধা লাগিতে পারে বটে, কারণ আমাদের বরাবর কালো দেখা অভ্যাস, সুতরাং সহসা সাদা দেখিলে ধাঁধা লাগিয়া যায়— কিন্তু ধাঁধা লাগিয়া নাহয় সাহেবদের দুটো মন্দই গ্রহণ করিলাম, কিন্তু ধাঁধা লাগিয়া আমাদের স্পষ্ট ভালো জিনিসগুলিকে পরিত্যাগ করি কেন? শ্রীমতী— গোড়াতেই একটা ভুল করিতেছেন। এইরূপ ধাঁধা লাগাকেই যে বলে সাহেবিয়ানা! সাহেব দেখিয়া ধাঁধা লাগিয়া যখন একজন দিশি লোক সাহেবের অনাবশ্যক প্রথাকে আবশ্যক জ্ঞান করেন ও আমাদের আবশ্যক প্রথাকেও অনাবশ্যক জ্ঞান করেন ও সেই অনুসারে কাজ করেন তখনই বলা যায় তিনি সাহেবিয়ানা করিতেছেন। কারণ, এই সামান্য ঘটনা হইতে দেখা যায় যে, একজন সাহেব দেখিয়াই আমাদের দেশের প্রতি তাঁহার সদ্ভাব এমনি বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে, দেশের ভালোও তাঁহার চক্ষে অনাবশ্যক বা মন্দ বলিয়া বোধ হইতেছে। তাঁহার উদ্দেশ্য খুবই ভালো হইতে পারে, তিনি হয়তো সত্য সত্যই মনের সহিত সাহেবিকে শ্রদ্ধেয় ও দিশিকে ঘৃণ্য জ্ঞান করেন, সুতরাং দেশে সাহেবি প্রচলিত করা ও দিশি নষ্ট করাই তিনি তাঁহার কর্তব্য বিবেচনা করেন, কিন্তু বিনা কারণে কেবলমাত্র ধাঁধা লাগিয়া এইরূপ মনে করাকেই বলে সাহেবিয়ানা অর্থাৎ সাহেবি-প্রিয়তা।

অতএব যখন দেবী জ্ঞানদানন্দিনী অকারণে বিলাতি প্রথা অনুষ্ঠান ও অকারণে দেশী প্রথা পরিত্যাগের উল্লেখ করিয়া তাহাকে সাহেবিয়ানা বলিয়াছেন, তখন তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না। আর যাহাই হউক, তিনি যে 'প্রকৃতিস্থ' ছিলেন তাহা সহজেই মনে হয়।

শ্রীমতী— বলেন, সাহেবিয়ানাই যদি তাঁহাদের উদ্দেশ্য হয়, তবে তাঁহারা পূরা সাহেবিয়ানা করেন না কেন? তাহা আমি কী জানি? কিন্তু তাঁহারা যতটা করিতেছেন ততটা যে সাহেবিয়ানা তাহা আমরা স্পষ্ট দেখিয়াছি, সে বিষয়ে প্রথম পক্ষ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন— তাঁহারা কী যে করেন না, তাহা তিনি বলেন নাই, সুতরাং তাহার জবাবদিহি তিনি করিতে পারেন না। হইতে পারে, সমাজের শাসন একেবারে লঙ্ঘন করিতে তাঁহারা সাহস করেন না, আস্তে আস্তে অল্পে অল্পে যতটা সয় ততটা অবলম্বন করিতেছেন; হইতে পারে, পাড়া-প্রতিবেশীদের উপহাস বিদ্রূপ সহ্য করিতে পারেন না; হইতে পারে, তাঁহারা যে অবস্থায় থাকেন সে অবস্থা পূরা সাহেবিয়ানার অনুকূল নহে। এমন আরও দুইশো কারণ থাকিতে পারে। এমনও হইতে পারে, সাহেবিয়ানাই তাঁহাদের আদর্শ বটে, অথচ সমাজ-সংস্কার করিতেছি মনে করিয়া আত্ম-প্রবঞ্চনা করেন, আগাগোড়া সাহেবি করিলে সংস্কার করিতেছি মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায় না, সুতরাং কিছু কিছু দিশি রাখিয়া মাঝে মাঝে বিলাতি চাকচিক্য অবলম্বন করিয়া সংস্কার করিবার গর্ব অনুভব করা যায়, কেবল তাহাই নয়, সেই আত্মপ্রসাদের প্রভাবে moral courage-এর ধুয়া ধরিয়া দেশীয় সমাজকে উপেক্ষা করিবার বল সঞ্চয় করা যায়। এই পর্যন্ত থাক্। পুনশ্চ পূর্বপক্ষের কথা শোনা যাউক।

প্রথম পক্ষ। এতক্ষণ ছোটো ছোটো প্রথার কথা বলিলাম। কিন্তু এখন একটা বড়ো বিষয়ে হাত দিতেছি। কোনো কোনো সমাজ-সংস্কারক সম্প্রদান প্রথা পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, 'মেয়ে কি একটা ঘটিবাটি যে, একজনের হাত হইতে আর-একজনের হাতে পড়িবে?' এ কী হৃদয়হীন কথা? জগতে ঘটিবাটির অধিকার ছাড়া আর কোনো প্রকারের অধিকার নাই কি? স্নেহ প্রেমের কোনো অধিকার নাই কি? মনুষ্য-সমাজে অরাজকতা উচ্ছৃঙ্খলতা কেন নাই? যার যা খুশি সে তা করে না কেন? তাহার কারণ মানুষের উপর মানুষের অধিকার আছে। পরস্পরের জন্য পরস্পরকে অনেকটা সহিয়া থাকিতে হয়, অনেকটা আত্মসংযম করিতে হয়। এই পরস্পরের প্রতি যে দৃষ্টি রাখা, এ কি কেবল সুবিধার শাসনেই হয়? তাহা নয়, সভ্য সমাজে হৃদয়ের শাসনই বলবান হইতে থাকে। আমি একটি জন্তুকে যত সহজে বধ করিতে পারি, একটি মানুষকে তত সহজে বধ করিতে পারি না, সমাজের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি দৃষ্টিপাত করাই কি তাহার কারণ? তাহা নয়। তাহার কারণ এই যে, একজন মানুষের হৃদয়ের উপর, দয়ার উপর আর একজন মানুষের অধিকার আছে, সেই অধিকার লঙ্ঘন করা অসভ্যতা, পাপ! এক জাতি বলিয়া মানুষের উপর মানুষের যেরূপ অধিকার আছে, তেমনি এক পরিবার বলিয়া পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের পরস্পরের প্রতি বেশি অধিকার আছে, সে অধিকার লঙ্ঘন করিলে সমাজে ঘোর উচ্ছৃঙ্খলতা ও পাপের সৃষ্টি হয়, আবার পরিবারস্থ বিশেষ ঘনিষ্ঠ-সম্পর্ক ব্যক্তির বিশেষ ঘনিষ্ঠ অধিকার আছে, এই-সকল অধিকারের সহিত ঘটিবাটির অধিকার কি তুলনীয়? অতএব মেয়ের উপরে বাপের অধিকার নাই এ কথা কী করিয়া বলা যায়? ইত্যাদি ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পক্ষ। তাহা যেন বুঝিলাম, মানিলাম সম্প্রদান প্রথা অন্যায় নহে। কিন্তু ইহা হইতে এই প্রমাণ হইতেছে যে, সংস্কারকদিগের বুঝিবার ভুল হইয়াছিল। কিন্তু ইহাকে তো আর সাহেবিয়ানা বলা যায় না। কারণ সাহেবদের মধ্যে সম্প্রদান প্রথা আছে।

তৃতীয় পক্ষ। সাহেবদের মধ্যে কীরূপ প্রথা প্রচলিত তাহা আমি জানি না, সুতরাং সে বিষয়ে কিছু বলিতে পারি না। সকলেই স্বাধীন, সকলেরই স্বতন্ত্র অধিকার আছে, ইত্যাদি ভাব আমরা ইংরাজের কাছ হইতে পাইয়াছি, সেই-সকল সাহেবি মতের ধুলায় অন্ধ হইয়া দেশীয় ভাবকে তাড়াতাড়ি উপেক্ষা করিতে যাওয়া কতকটা সাহেবি-প্রিয়তার ফল। ইংরাজেরা যদি ঠিক ইহার

উল্টা কথাটা বলিতেন, আমরা হয়তো ঠিক ইহার উল্টা আচরণ করিতাম। যাহাই হউক, ইহা দেখা যাইতেছে, নব্যদিগের হৃদয়ে এমন একটি ভাব প্রবেশ করিয়াছে, যাহার প্রভাবে কথায় কথায় অকাতরে তাঁহারা দেশীয় প্রথা ত্যাগ করিতে পারেন, তাহার প্রতি একটু দরদ থাকিলে যতটা সাবধানে যতটা বিবেচনা করিয়া কাজ করা যাইত, ততটা করা হয় না। একটা লম্বাচৌড়া মত শুনিবামাত্রই অমনি তড়িঘড়ি এক-একটা দিশি প্রথাকে নির্বাসন করিতে যাওয়ার ভাবটাই ভালো নহে।

প্রথম পক্ষ। আচ্ছা, যদি পূর্বোক্ত সংস্কারকগণ কন্যার উপরে পিতার বা স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার বাস্তবিকই স্বীকার না করেন, তবে কেন তাঁহারা, কন্যা যতদিন অবিবাহিত থাকে ততদিন তাহাকে তাহার পিতার পদবী দেন ও বিবাহিত হইলে কেন তাহাকে তাহার স্বামীর পদবীতে ডাকেন? যথা, অবিবাহিত কন্যার নাম কমলমণি ঘোষ, বিবাহিত কন্যার নাম কমলমণি নন্দী। তাহার নিজের নামের স্থায়িত্ব নাই কেন? সে কি একটা জড় পদার্থ, তাহার কি এতটুকু স্বাতন্ত্র্য নাই যে যখন যাহাদের ঘরে যাইবে তখনই তাহাদের নাম গ্রহণ করিবে?

দ্বিতীয় পক্ষ। লেখিকা কী অর্থে 'স্বাতন্ত্র্য' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা ঠিক বুঝা গেল না। স্ত্রীলোক বংশের পদবী গ্রহণ করিতে স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যের যে কী খর্বতা হয় তাহাও বুঝিতে পারি না। পুরুষরা তো বংশের উপাধি গ্রহণ করেন, সেইজন্য কি তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য বিন্দুমাত্র কমিয়াছে?

তৃতীয় পক্ষ। এ কেমনতরো খাপছাড়া উত্তর হইল কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। পদবী গ্রহণে তো স্বাতন্ত্র্যের খর্বতা হয় না, কিন্তু পদবী পরিবর্তনে হয়। যত দিন স্ত্রী ঘোষ-পিতার অধীনে আছে ততদিন সে ঘোষ, আর, যখন সে বোস-স্বামীর বাড়িতে গেল তখনই সে বোস হইল, ইহাকে 'প্রকৃতিস্থ' লোকে স্বাতন্ত্র্যের অভাব বলে না তো কী বলে? বিবাহের পর স্ত্রীর অনুসারে স্বামীর নামেরও পরিবর্তন হয় না কেন? স্বামীরা কর্তা বলিয়া। যাহা হউক, স্ত্রী স্বাতন্ত্র্য ভালো কি মন্দ সে কথা হইতেছে না, কথাটা এই যে যাঁহারা স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যের পাছে একটুখানি খর্বতা হয় বলিয়া সম্প্রদান প্রথা উঠাইয়া দিতে চান তাঁহারা কোন্ মুখে স্ত্রীলোকের পদবী পরিবর্তন প্রথা গ্রহণ করিতে পারেন?

প্রথম পক্ষ। তবে, যদি বল পরিচয়ের সুবিধার জন্য স্ত্রীলোকদের নামের সহিত পদবী গ্রহণ ও বিবাহ হইলে তাহার পরিবর্তন সমাজের বর্তমান অবস্থায় আবশ্যক করে, তবে তাহার বিরুদ্ধে বক্তব্য এই যে, ঘোষ বা বোস বলিলে আমাদের দেশে পরিচয়ের বিশেষ কী এমন সুবিধা হইল? আমাদের দেশের ঘোষ বোস প্রভৃতি উপাধি পরিবার-বিশেষের নাম নহে, বিস্তৃত শ্রেণীবিশেষের উপাধি, সুতরাং ইহাতে ব্যক্তিবিশেষগত পরিচয়ের কোনো সুবিধা হইল না।

দ্বিতীয় পক্ষ। পরিচয়ের সুবিধার জন্যই যে এই প্রথা প্রচলিত হইয়াছে সে কথা লেখিকা কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন? আমি তো মনে করি, দেবী ও দাসীর প্রভেদ উঠাইয়া দিবার জন্যই এই প্রথা অবলম্বন করিতে হইয়াছে। এককালে শূদ্রেরা দাসত্ব করিত, তাই বলিয়া যখন দাসত্ব করে না তখনও যে নামের সহিত সেই দাসত্বের স্মৃতি যত্নপূর্বক পুষিয়া রাখিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। দ্বিতীয়ত, এখন জাতিভেদ উঠিয়া গিয়া অসবর্ণ বিবাহ হইতেছে; একজন ব্রাহ্মণকন্যা শূদ্রপত্নী হইলে তিনি আপনাকে দেবী বলিবেন, না দাসী বলিবেন? এরূপ অবস্থায় তিনি কী করিবেন?

তৃতীয় পক্ষ। স্ত্রীলোকের নামের সম্বন্ধে শ্রীমতী অনামিকা একটি ভুল বুঝিয়াছেন দেখিতেছি। দেবী জ্ঞানদানন্দিনী স্ত্রীলোকদিগের নামের শেষে দেবী দাসী যোগ করা লইয়া কিছুই বলেন নাই, সে বিষয়ে তাঁহার কী মত তাহা জানিও না। তিনি কেবল বলিয়াছেন স্ত্রীলোকদের নামের সহিত বংশের পদবী যোগ করা, কানেও খারাপ শুনায় বটে আবার তাহাতে পরিচয়েরও কোনো সুবিধা হয় না। সুতরাং, এ প্রথাটি ভালো নয়। শ্রীমতী— যে বলিতেছেন নামের সঙ্গে দেবী দাসীর প্রভেদ থাকা ভালো নয়, সে বিষয়ে আমারও তাঁহার সহিত কোনো বিবাদ নাই, কিন্তু স্ত্রীলোকের

নামের সহিত বংশের পদবী যোগ করা যে ভালো এ কথার সহিত পূর্বোক্ত কথাটার বিশেষ যোগ কোথায়। একটা ভালো নয় বটে, কিন্তু আর-একটা যে তাই বলিয়া ভালো তাহা কী করিয়া বলিব। আর শ্রীমতী— যে পরিচয়ের সুবিধার কথাটা একেবারে উড়াইয়া দিয়াছেন, সেটা ভালো করেন নাই। জিজ্ঞাসা করি, নামের সৃষ্টি কিসের জন্য? কেবলমাত্র পরিচয়ের জন্য, উহার আর কোনোই উদ্দেশ্য নাই। যদি সে উদ্দেশ্য উপেক্ষা কর তবে নাম রাখিবার কোনো দরকার নাই। জাতিভেদের উপর আমাদের সমাজ-ব্যবহার অনেকটা নির্ভর করে, সুতরাং সামাজিকতার অনুরোধে দাসী ও দেবীর ভিন্ন পরিচয় পাওয়া আমাদের দেশে নিতান্ত আবশ্যক। যাঁহাদের সে অনুরোধ নাই, যাঁহারা জাতিভেদ মানেন না, তাঁহাদের আর দেবী দাসী বলিয়া পরিচয় দিবার দরকার নাই বটে, কিন্তু তাঁহারা বসু বা বাঁড়ুয্যে বলিয়াই বা পরিচয় দেন কীরূপে? কারণ 'বসু' ব্যক্তিবিশেষগত পরিচয় নয়, পরিবারবিশেষগত পরিচয় নয়, উহা জাতিবিশেষগত পরিচয়। যাঁহারা বলেন 'আমি বসু' তাঁহারা বলেন, 'আমি কায়স্থজাতির শ্রেণীবিশেষভুক্ত ব্যক্তি।' বসু বলিতে আর কিছুই বুঝায় না। সুতরাং সেই তো তাঁহারা জাতিভেদের পরিচয় দিলেন। সেই তো তাঁহারা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতির প্রভেদ স্বীকার করিলেন। আমাদের দেশের জাতিভেদ শাস্ত্র অনুসারে নির্দিষ্ট অতএব তুমি যদি একবার জাতিভেদ স্বীকার কর, তবে শাস্ত্র অনুসারে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ জাতি ও শূদ্র অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জাতি, এতটা পর্যন্তই যদি হইল তবে আর দেবী দাসী হইতে বেশি দূরে রহিল কই? তোমাদের কাজে ও কথায় মিল করিতে হইলে দেবী দাসীও ছাড়িতে হয়, ঘোষ বোসও ছাড়িতে হয়। হয়, কেবলমাত্র নামের পূর্বার্ধ রাখিয়া দাও, নয় রমণীপরিচয়সূচক এমন একটি নূতন সাধারণ শব্দ প্রচলিত করিয়া নামের শেষে যোগ করো যাহাতে জাতিভেদের অথবা শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্টত্বের কোনো উল্লেখ না থাকে। বোধ করি, মহারাষ্ট্রীয়দিগের 'বাই' শব্দ কতকটা এইরূপ। প্রতিবাদে যতগুলি কথা বলা হইয়াছিল, আমরা তাহার সকলগুলিই আলোচনা করিয়া দেখিলাম, কোনোটিই বোধ করি ছাড়িয়া দিই নাই।

যাহা হউক, যতদূর দেখা গেল, তাহাতে দেবী জ্ঞানদানন্দিনীর অপ্রকৃতিস্থতার কোনো লক্ষণ পাওয়া গেল না, তাঁহার লেখায় হৃদয় প্রকাশ পাইয়াছে, যুক্তিরও অভাব দেখিলাম না, এবং তাঁহার কথার প্রকৃত প্রতিবাদও দেখিলাম না, সুতরাং এখনও তাঁহারই মত প্রবল রহিল।

ভারতী
আশ্বিন ১২৯০

ন্যাশনল ফন্ড

'ন্যাশনল' শব্দটার ব্যবহার অত্যন্ত প্রচলিত হইয়াছে। ন্যাশনল থিয়েটর, ন্যাশনল মেলা, ন্যাশনল পেপর ইত্যাদি। এমন কোনোপ্রকার অনুষ্ঠান দেখিতে পাই না, যাহার প্রতি ন্যাশনল শব্দের প্রয়োগ রীতিবিরুদ্ধ হয়। আমি জিজ্ঞাসা করি ন্যাশনল কসাইখানা করিলে কেমন হয়। সেখানে ন্যাশনল গোরু জবাই করিয়া ন্যাশনল হোটেলে ন্যাশনল বীফস্টেকের আয়োজন করা যাইতে পারে। কারণ, এখন একদল আর্য উঠিয়াছেন, তাঁহারা বিলাতি ছাড়া কিছুই ব্যবহার করেন না, কিন্তু ন্যাশনল শব্দের গণ্ডূষ করিয়া তাহাকে শোধন করিয়া লন।

ক্রমেই ন্যাশনলের দল-পুষ্টি হইতেছে। সম্প্রতি ন্যাশনল ফন্ড নামে আর-একটা কথা শুনা যাইতেছে। যখনই কোনো অনুষ্ঠানকে আগেভাগে জোর করিয়া ন্যাশনল বলা হয় তখনই মনের ভিতর কেমন সন্দেহ হয় বুঝি এ জিনিসটা ঠিক ন্যাশনল নয়, তাই ইহাকে এত করিয়া ন্যাশনল বলা হইতেছে। দুর্গাপূজাকে কেহ যদি বলে ন্যাশনল দুর্গাপূজা, তাহা হইলেই ভয় হয় ইহার কিছু গোলযোগ আছে। এই ফন্ডের সম্বন্ধেও আমাদের সেইরূপ একটা সন্দেহ হইয়াছে।

ন্যাশনল বলিতে আমি তো এই বুঝি, সমস্ত নেশন যাহা করিতেছে, সমস্ত নেশনের ভিতর হইতে যাহা স্বতঃ উদ্ভিন্ন হইয়া বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, যাহা না হইয়া থাকিতে পারে না, যাহাকে জোর করিয়া ন্যাশনল বলিবার আবশ্যক হয় না; কারণ তাহা ন্যাশনল নয় বলিয়া কাহারও মুহূর্তের জন্য সন্দেহও হয় না। আমরা অকারণে বড়ো বড়ো কথা ব্যবহার ভালো বলি না, কারণ, তাহা হইলে ক্রমে সে কথাগুলির প্রতি লোকের অবিশ্বাস জন্মিয়া যায় ও তাহাদের দ্বারা ভবিষ্যতে আর কোনো ভালো কাজ হয় না। যাহা হউক, আলোচ্য প্রস্তাবটি ন্যাশনল কি না তাহা স্থির করা আবশ্যক।

শুনা যাইতেছে একমাত্র Political agitationই ওই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। ওই শব্দটার বাংলা কী ঠিক জানি না, কেহ কেহ বলেন রাজনৈতিক আন্দোলন, আমরাও তাহাই গ্রহণ করিলাম।

প্রথমত, Political agitation জিনিসটাই ন্যাশনল নয়। ইহা কেহই অস্বীকার করিবে না, ও কথাটা বোঝে খুব কম লোক, আবার যে দু-চার জন লোক বোঝে তাহাদের মধ্যে সকলের ও কাজটার প্রতি বিশেষ অনুরাগ নাই, কথাটার মানে জানে এই পর্যন্ত।

দ্বিতীয়ত, এই কাজটার ভার কাহাদের উপরে এবং তাঁহারা কী উপায়ে ইহা সাধন করিতেছেন? যাঁহারা বাংলা ভাষা অবহেলা করেন, বাংলা ভাষা জানেন না, ইংরাজি ভাষায় বাগ্মিতা প্রদর্শন করাই যাঁহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, তাঁহারাই ইহার প্রধান। গোড়াতে ইহার নামই হইয়াছে National Fund, ইংরাজিতেই ইহার উদ্দেশ্য প্রচার হইয়াছে, আজ পর্যন্ত ইংরাজিতেই ইহার কাণ্ডকারখানা চলিতেছে। অথচ মুখে বলা হইতেছে, peopleরাই আমাদের সহায়, peopleদের জন্যই আমরা এতটা করিতেছি, peopleদের উপরেই আমাদের ভরসা। এ-সব ভান করিবার দরকার কী? peopleরা যে তোমাদের কথাই বুঝিতে পারে না। ইংরাজি ভাষায় তোমাদের তর্জন গর্জন শুনিয়া সে বেচারিরা যে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকে! তোমরা যদি তাহাদের ভালোবাসিতে, তবে তাহাদের ভাষা শিখিতে; বিলাতি হৃদয় কী করিয়া উত্তেজিত করিতে হয় তাহাই তোমরা একরত্তি বয়স হইতে অভ্যাস করিয়া আসিতেছ, যাহারা হাততালি দিতে জানে না, যাহারা রেজোলিউশন মুব্‌ করে না, সেকেন্ড করে না, যাহারা constitutional history পড়ে নাই তাহাদের হৃদয়ের সুখদুঃখ কোন্‌খানে, কোন্‌খানে ঘা পড়িলে তাহাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে তাহা কি তোমরা জান, না, জানিতে কেয়ার কর? শুনিয়াছি বটে, মাঝে মাঝে তোমরা মিটিং ডাকিয়া একজন ইংরাজিতে বক্তৃতা দাও, আর-একজন সেইটেকে বাংলায় ব্যাখ্যা করেন, ইহা অপেক্ষা হাস্যজনক ও দুঃখজনক ব্যাপার কি কিছু আছে? যখন বাঙালির কাছে বাঙালিতে কথা কহিতেছে, তখনও কি ইন্টরপ্রেটরের দরকার হইবে? যদি বল, বাংলায় যাঁহাদের কাছ হইতে কাজের প্রত্যাশা করা যায় তাঁহারা বাংলা শুনিতে চান না, বাংলা ভাষা জানেন না, কাজেই ইংরাজিতে এ অনুষ্ঠান আরম্ভ করিতে হইয়াছে, প্রধানত ইংরাজিতে ইহা প্রচার করিতে হইয়াছে— তবে আর কী বলিব— তবে এই বলিতে হয় বাংলাদেশের অবস্থা নিতান্তই শোচনীয়, তবে আজিও বাংলাদেশে কোনো ন্যাশনাল অনুষ্ঠান আরম্ভ করিবার সময় হয় নাই। তবে আর people-এর নাম মুখে উচ্চারণ কর কেন? উহা কি একটা ছেলে ভুলাইবার কথা? আর, সে লোকেরা কাহারা? তোমরাই তো তাহারা! তোমরাই তো বাংলা জান না, ইংরিজিতে কথা কও! ইংরাজি খবরের কাগজে তোমাদের কথা ছাপা না হইলে তোমাদের মনস্তুষ্টি হয় না!

তোমরা বলিবে ইহা পোলিটিক্যাল ব্যাপার, ইংরাজদের জানানো আবশ্যক, কাজেই ইংরাজিতে বলা উচিত। কিন্তু সে কোনো কাজের কথা নয়। যখন agitation করিবে তখন নাহয় ইংরাজিতে করিয়ো, কিন্তু যখন দেশের লোকের কাছে সাহায্য চাহিতেছ তখনো কি দেশের লোকের ভাষায় কথা কহিবে না?

কিন্তু গোড়াতেই যে গলদ। একমাত্র Political agitation-ই যাহার প্রাণ, তাহার উদ্দেশ্য সাধারণের কাছে বুঝাইবে কীরূপে? সাধারণে যে বুঝিবে না। না বুঝিলেও যে আপাতত বিশেষ

ক্ষতি আছে তাহা নহে, কেন, তাহা বলিতেছি।

যে-সকল দেশহিতৈষীদিগের Political agitation একমাত্র ব্যবসায় তাহাদের উপর আমার বড়ো শ্রদ্ধা নাই। আমাদের দেশে Political agitation করার নাম ভিক্ষাবৃত্তি করা। যে নিতান্তই দরিদ্র সময়ে সময়ে তাহাকে ভিক্ষা করিতেই হয়, উপায় নাই, কিন্তু ভিক্ষাই যে একমাত্র উন্নতির উপায় স্থির করিয়াছে, তাহার প্রতি কাহারও ভক্তি থাকিতে পারে না। ভিক্ষুক মানুষেরও মঙ্গল নাই, ভিক্ষুক জাতিরও মঙ্গল নাই, ক্রমশই তাহাকে হীন হইতে হয়। ইতিহাস ভুল বুঝিয়া আমাদের এই-সকল বিড়ম্বনা ঘটিয়াছে। আমরা ভুলিয়া গিয়াছি যে স্বাধীন দেশে Political agitation-এর অর্থ, আর পরাধীন দেশে উহার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অর্থ। সে দেশে Political agitation অর্থ নিজের কাজ নিজে করা, আর এ দেশে Political agitation-এর অর্থ নিজের কাজ পরকে দিয়া করানো। কাজেই ইহার ফল উভয় দেশে এক প্রকারের নহে।

ইংরাজদের কাছে ভিক্ষা করিয়া আমরা আর সব পাইতে পারি, কিন্তু আত্মনির্ভর পাইতে পারি না। আর, তাহাই যদি না পাই, তবে আসল জিনিসটাই পাইলাম না। কারণ, ভিক্ষার ফল অস্থায়ী, আত্মনির্ভরের ফল স্থায়ী। আমাদের সমস্ত জাতির যদি এই একমাত্র কাজ হয়, ইংরাজদের কাছে আবদার করা, ইংরাজদের কাছে ভিক্ষা করা, তাহা হইলে প্রত্যহ আমাদের জাতির জাতিত্ব নষ্ট হইতে থাকিবে, ক্রমশই আমাদের আত্মত্ব বিসর্জন দিতে হইবে। তাহা হইলে আমরা শুভ্র ইংলন্ডের গায়ে একটা কালো পোকার মতো লাগিয়া থাকিব ও ইংরাজের গায়ের রক্ত শোষণ করিয়া আবশ্যকের অভাবে আমাদের পাকযন্ত্র অদৃশ্য হইয়া যাইবে! এইজন্যই কি ন্যাশনল ফন্ড?

আমরা কী শিখিতেছি? ন্যাশনল ফন্ড সংগ্রহ করিয়া আমরা কী কাজের জন্য প্রস্তুত হইতেছি? না, কেমন করিয়া দরখাস্ত করিতে হয়, পার্লামেন্টে কী উপায়ে মনের দুঃখ নিবেদন করা যাইতে পারে, কোন্ সাহেবকে কীরূপ করিয়া আয়ত্ত করা যায়, ঠিক কোন্ সময়ে ভিক্ষার পাত্রটি বাড়াইলে এক মুঠা পাওয়া যাইতে পারিবে। অনিমেষ নেত্রে পর্যবেক্ষণ করিতে থাকো ইংরাজি কোন্ মন্ত্রীর কী ভাব, কখন ministry বদল হয়, কখন রাজা আমাদের অনুকূল, কখন আমাদের প্রতিকূল ঘড়ি ঘড়ি ইংরাজদের কাছে গিয়া বলো, তোমরা অতি মহদাশয় লোক, তোমরা ধর্মাবতার, তোমাদের কাছে অনুগ্রহ প্রত্যাশা করিয়া কি আমরা বঞ্চিত হইব? কখনোই না। আজ রাজার মুখ প্রসন্ন দেখিলে কালীঘাটে পূজা দাও, আর কাল তাঁহাকে বিমুখ দেখিলে ঘরে হাহাকার পড়িয়া যাক। যাও, ছ লাখ টাকা দিয়া একটা মস্ত constitutional ভিক্ষার ঝুলি কেনো, কখন কে লাটসাহেব হইল, কখন কে রাজমন্ত্রী হইল তাহাই অনুসন্ধান করিয়া ঠিক সময় বুঝিয়া ভিক্ষার ঝুলি পাতো গে। কিন্তু, তার পরে মনে করো ইংরাজ চলিয়া গেল, মগের মুল্লুক হইল। তখন কাহার কাছে আবদার করিবে? তখন তোমাদের দিশি মুখে বিলাতি বোল শুনিয়া ইস্কুল মাস্টারের মতো কে তোমাদের পিঠে উৎসাহের থাবড়া দিবে? ঘর হইতে কাপড় আনাইয়া কে তোমাদের কাপড়টি পরাইয়া দিবে? সহসা পিতৃহীন আদুরে ছেলেটির মতো কঠোর সংসারে আসিয়া টিকিবে কীরূপে? আর কিছু না হউক সমস্ত বাঙালি জাতি যখন agitation-ওয়ালা হইয়া উঠিবে তখন হঠাৎ তাহাদের agitation বন্ধ হইলে যে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া মরিবে। বরঞ্চ দুই দিন আহার বন্ধ হইলে চলিয়া যাইবে, কিন্তু দুই দণ্ড মুখ বন্ধ হইলে বাঙালি বাঁচিবে কী করিয়া?

ইহা বোধ করি কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, যথেষ্ট টাকা সংগ্রহ করিলে আমাদের দেশে এমন ঢের কাজ আছে যাহা আমরা নিজেই করিতে পারি, এবং যাহা-কিছু আমরা নিজে করিব তাহা সফল না হইলেও তাহার কিছু-না-কিছু শুভ ফল স্থায়ী হইয়া থাকিবে। তাহাই যদি সত্য হয়, তবে যাঁহারা কেবলমাত্র অথবা প্রধানত গবর্মেন্টের কাছে ভালোরূপ ভিক্ষা করিয়া দেশের উন্নতি করিতে চান তাঁহারা কীরূপ দেশহিতৈষী! গবর্মেন্টকে চেতন করাইতে তাঁহারা যে পরিশ্রম করিতেছেন, নিজের দেশের লোককে চেতন করাইতে সেই পরিশ্রম করিলে যে বিস্তর

শুভ ফল হইত। দেশের লোককে তাঁহারা কেবলই জ্বলন্ত উদ্দীপনায় শাক্যসিংহ ব্যাস বাল্মীকি ও ভীষ্মার্জুনের দোহাই দিয়া গবর্মেন্টের কাছে ভিক্ষা চাহিতে বলিতেছেন। তাহার চেয়ে সেই উদ্দীপনাশক্তি ব্যয় করিয়া তাহাদিগকে উপার্জন করিতে বলুন-না কেন? আমরা কি নিজের সমস্ত কর্তব্য কাজ সারিয়া বসিয়া আছি যে, এখন কেবল গবর্মেন্টকে তাহার কর্তব্য স্মরণ করাইয়া দিলেই হইল! সত্য বটে পরাধীন জাতি নিজের সমস্ত হিত নিজে সাধন করিতে পারে না, কিন্তু যতখানি পারে ততখানি সাধন করাই তাহার প্রথম কর্তব্য, গবর্মেন্টের কাছে ভিক্ষা চাওয়া বা গবর্মেন্টকে পরামর্শ দিতে যাওয়া পরে হইতে পারে, বা তাহার আনুষঙ্গিক স্বরূপে হইতে পারে।

গবর্মেন্টের কাছ হইতে আজ আমাদিগকে ভিক্ষা চাহিতে হইতেছে কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দিবার আগে আর-একটা প্রশ্ন উঠে। ভিক্ষা কে চায়? যাহার অধিকার নাই সেই চায়; স্বল্পভাবে অর্থাভাবে এবং কোনো কোনো সময়ে বলের অভাবে যে তণ্ডুল মুষ্টিতে আমার অধিকার নাই সেই তণ্ডুল মুষ্টির জন্য আমাকে ভিক্ষা মাগিতে হয়। আমরা গবর্মেন্টের কাছে ভিক্ষা মাগিতেছি কেন? এখনও আমাদের অধিকার জন্মে নাই বলিয়া, অধিকার বিশেষের জন্য আমরা প্রস্তুত হইতে পারি নাই বলিয়া। যখন কেবল দুই-চারি জন নয়, আমরা সমস্ত জাতি অধিকার বিশেষের জন্য প্রস্তুত হইব, তখন কি আমরা ভিক্ষা চাহিব, তখন আমরা দাবি করিব, গবর্মেন্টকে দিতেই হইবে। আজ গবর্মেন্ট আমাদিগকে স্বায়ত্তশাসন দিয়াছেন, কিন্তু ভিক্ষার মতো দিয়াছেন, অনুগ্রহের মতো দিয়াছেন, যেন পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য দিয়াছেন, এ বিষয়ে যেন নানা সংশয় আছে, নানা বিবেচনার বিষয় আছে, কাল যদি দেখা যায় এ প্রণালী ভালো খাটিল না, তবে কালই হয়তো ইহা বন্ধ করিতে হইবে। কিন্তু যদি আমরা সমস্ত জাতি এই স্বায়ত্তশাসন প্রণালীর জন্য আগে প্রস্তুত হইতে পারিতাম, তবে এ অধিকার আমরা অসংকোচে গ্রহণ করিতাম ও গবর্মেন্টকে অবিচারে দিতে হইত। এইরূপ প্রস্তুত হইবার উপায় কী? তাহার এক উত্তর আছে বিদ্যাশিক্ষার প্রচার। আজ যে ভাবগুলি কেবল গুটি দুই-তিন মাত্র লোক জানে, সেই ভাব সাধারণে যাহাতে প্রচার হয় তাহারই চেষ্টা করা, এমন করা, যাহাতে দেশের গাঁয়ে গাঁয়ে, পাড়ায় পাড়ায়, নিদেন গুটিকতক করিয়া শিক্ষিত লোক পাওয়া যায়, এবং তাঁহাদের দ্বারা অশিক্ষিতদের মধ্যেও কতকটা শিক্ষার প্রভাব ব্যাপ্ত হয়। কেবল ইংরাজি লিখিলে কিংবা ইংরাজিতে বক্তৃতা দিলে এটি হয় না! ইংরাজিতে যাহা শিখিয়াছ তাহা বাংলায় প্রকাশ করো, বাংলা সাহিত্য উন্নতি লাভ করুক ও অবশেষে বঙ্গবিদ্যালয়ে দেশ ছাইয়া সেই সমুদয় শিক্ষা বাংলায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ুক। ইংরাজিতে শিক্ষা কখনোই দেশের সর্বত্র ছড়াইতে পারিবে না। তোমরা দুটি-চারটি লোক ভয়ে ভয়ে ও কী কথা কহিতেছ, সমস্ত জাতিকে একবার দাবি করিতে শিখাও কিন্তু সে কেবল বিদ্যালয় স্থাপনের দ্বারা হইবে, Political agitation-এর দ্বারা হইবে না।

তোমরা স্থির করিয়াছ যে, গবর্মেন্ট যখন একটা কলেজ উঠাইতে চাহিবে বা বিদ্যাশিক্ষা নিয়মের পরিবর্তন করিবে, তোমরা অমনি লাখ-দুই খরচ করিয়া সভা করিয়া, আবেদন করিয়া, বিলাতে লোক পাঠাইয়া, পার্ল্যামেন্টে দরখাস্ত করিয়া, ইংরাজিতে কাঁদিয়া কাটিয়া গবর্মেন্টকে বলিবে, 'ওগো গবর্মেন্ট, এ কালেজ উঠাইয়ো না।' যদি গবর্মেন্ট শুনিল তো ভালো, নহিলে সমস্ত ব্যর্থ হইল। তাহার চেয়ে তোমরা নিজেই একটা কলেজ করো-না কেন? গবর্মেন্টের কলেজের চেয়ে তাহা অনেকাংশে হীন হইতে পারে, শিক্ষার সুবিধা ততটা না থাকিতেও পারে, কিন্তু গবর্মেন্ট কলেজের চেয়ে সেখানে একটি শিক্ষা বেশি পাইবে, তাহার নাম আত্মনির্ভর। কেবলমাত্র পরকে কাজ করিতে অনুরোধ করিবার জন্য তোমরা যে টাকাটা সঞ্চয় করিতেছ, সেই টাকায় নিজে কাজ করিলেই ভালো হয়, এই আমার কথার মর্ম।

যথার্থ দেশোপকার ব্রত অতি গুরুতর ব্রত, সে কাজ অতি কঠিন কাজ— তাহাতে সদ্য সদ্য ফল পাওয়া যায় না কিন্তু নিশ্চয়ই ফল পাওয়া যায়। তাহাতে ছোটো ছোটো কাজে হাত দিতে

হয়, ক্রমে ক্রমে কাজ করিতে হয়, প্রত্যহ সংবাদপত্রের দৈনিক বাহবাই উদ্যমের একমাত্র জীবনধারণের উপায় নহে। অপর পক্ষে যাঁহারা agitation করিয়া কাজ করিতে চান তাঁহাদের কাজ কত সহজ, কত সামান্য! তাঁহাদের কাজ দেশের কোনো অভাব বা হানি দেখিলেই গবর্মেন্টকে তিরস্কার করা। অত্যন্ত সুখের কাজ! পরকে দায়ী করার চেয়ে আর সুখের কী হইতে পারে! পরকে কাজ করিতে স্মরণ করাইয়া দেওয়াই আমার একমাত্র কাজ, সে কাজ সাধন করা আমার কাজ নহে ইহার অপেক্ষা আরাম আর কী আছে! কিছুই করিলাম না, কেবল আর-একজনকে অনুরোধ করিলাম মাত্র, অথচ মনে মনে ভ্রম হইল যেন কাজটাই করিয়া ফেলিলাম। তাহার পরে আবার চারি দিকে একটা কোলাহল উঠিল, নামটা ব্যাপ্ত হইল। যত অল্পে যতটা বেশি হইতে পারে তাহা হইল, তাহার উপরে আবার মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম যে, দেশের জন্য আমি কী না করিলাম? কেবল মুখের কথাতেই এতটা যদি হয় তবে আর কাজ করিবার দরকার কী? একটা ছোটো রকমের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক : নাইট সাহেব যখন বোম্বাইয়ের সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন তখন তিনি সর্বদা দেশীয়দের পক্ষ সমর্থন করিতেন, অবশেষে যখন তিনি অবসর লইলেন, তখন বোম্বাইবাসীরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইল। কিন্তু কী করে, তাহারা তো আমাদের মতো এত কথা কহিতে পারে না কাজেই তাহাদিগকে কাজ করিতেই হইল— তাহাদিগকে টাকা দিতে হইল। এদিকে দেখো, রিয়ক সাহেব আমাদের অসময়ে অনেক উপকার করিয়াছেন— স্বজাতি সমাজ উপেক্ষা এতটা করিতে কে পারে? ইল্‌বর্ট বিলের জন্য ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য তিনি কতটা লড়িয়াছিলেন তাহা সকলেরই মনে আছে। সেই রিয়ক যখন স্বজাতি-সহায়-বর্জিত হইয়া প্রায় রিক্ত হস্তে দেশে ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন কৃতজ্ঞ বাঙালিরা কী করিলেন? বাচস্পতি মহাশয়েরা সভা ডাকিয়া দু-চারিটা মিষ্ট মুখের কথা বলিয়া ও মিষ্টান্ন খাওয়াইয়া এমনি পরিতৃপ্ত হইলেন যে, আর আর কিছু করিবার আবশ্যক জ্ঞান করিলেন না।

সেই জিভের খাটুনিটা আরও বাড়াইবার জন্য ছ লাখ টাকা সংগ্রহ হইতেছে। আমি বলি, এই ছ লাখ টাকা খরচ করিয়া বাঙালিদের জিভের কাজ একটু কমে যদি, তবে এতটা অর্থব্যয় সার্থক হয়!

যাঁহারা যথার্থ দেশহিতৈষী তাঁহারা দেশের অল্প উপকারকে নিজের অযোগ্য বলিয়া ঘৃণা করেন না। তাঁহারা ইহা নিশ্চয় জানেন যে যদি হাঙ্গাম করা উদ্দেশ্য না হয়, দেশের উপকার করাই বাস্তবিক উদ্দেশ্য হয়, তবে অল্পে অল্পে একটু একটু করিয়া কাজ করিতে হয়, তাহাতে এক রাত্রের মধ্যে যশস্বী হওয়া যায় না বটে, মোটা মোটা কথা বলিবার সুবিধা হয় না বটে কিন্তু দেশের উপকার হয়। তাঁহারা ইহা জানেন যে, মস্ত মস্ত উদ্দেশ্য জাহির করিলে দেশের যত না কাজ হয়, ছোটো ছোটো কাজ করিলে তাহার চেয়ে বেশি হয়। ন্যাশনল ফন্ড সংগ্রহ করিয়া একেবারে সমস্ত ভারতবর্ষের উপকার করিব এতটা সংকল্প না করিয়া যদি কেবল বাংলা দেশের জন্য ফন্ড সংগ্রহ করা হয় ও বাংলা দেশের অভাবের প্রতিই দৃষ্টিপাত করা হয়, তাহা হইলে তাহা সহজসাধ্য হয় ও সম্ভবপর হয়। শুনিতে তেমন ভালো হয় না বটে, কিন্তু কাজের হয়। যদি ভারতবর্ষের প্রত্যেক বিভাগ নিজের নিজের অভাব মোচন ও উন্নতি সাধনের জন্য ধন সঞ্চয় করিয়া রাখেন ও বিশেষ আবশ্যকের সময় সকলে একত্রে মিলিয়া যদি দেশহিতকর কাজে প্রবৃত্ত হন তবে তাহাতেই বাস্তবিক উপকার হইবে। নহিলে মস্ত একটা নাম লইয়া বৃহৎ কতকগুলা উদ্দেশ্যের বোঝা লইয়া ন্যাশনল ফন্ড নামক একটা নড়নচড়নহীন অতি বৃহৎ জড়পদার্থ প্রস্তুত হইবে।

উপসংহারে বলিতেছি কেবলমাত্র Political agitation লইয়া থাকিলে আমরা আরও অকেজো হইয়া যাইব, আমরা নিজের দায় পরের ঘাড়ে চাপাইতে শিখিব— দুটো কথা বলিয়াই আপনাকে খালাস মনে করিব। একে সেই দিকেই আমাদের সহজ গতি, তাহার উপর আবার

এত আড়ম্বর করিয়া আমাদের সেই গুণগুলির চর্চা করিবার আবশ্যক দেখিতেছি না। তবে যদি কাজ করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য হয় ও অসমর্থ পক্ষে ভিক্ষা চাওয়া ইহার গৌণ উদ্দেশ্য হয়, তবেই ইহার দ্বারা আমাদের দেশের স্থায়ী উন্নতি হইবে। নচেৎ ঠিক উন্নতি হইতেছে বলিয়া মনে হইবে, অনুষ্ঠানের ত্রুটি হইবে না বরং হাঁক-ডাক কিছু বেশি হইবে তথাপি দেশের অস্থি-মজ্জাগত উন্নতি হইবে না!

ভারতী
কার্তিক ১২৯০

টৌন্‌হলের তামাশা

সেদিন টাউনহলে একটা মস্ত তামাশা হইয়া গিয়াছে। দুই-চারিজন ইংরাজে মিলিয়া আশ্বাসের ডুগডুগি বাজাইতেছিলেন ও দেশের কতকগুলি বড়োলোক বড়ো বড়ো পাগড়ি পরিয়া নাচন আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন।

দেশের লোক অবাক হইয়া গেল। শীতের সময় কলিকাতায় অনেক প্রকার তামাশা আসিয়া থাকে, সার্কস্‌, অপেরা ইত্যাদি। কিন্তু বড়োলোকের নাচ্‌নী সচরাচর দেখা যায় না।

সাহেব বলিল, তাই, তাই, তাই; অমনি বড়ো বড়ো খোকারা হাততালি দিতে লাগিল!

কিন্তু ভালো দেখাইল না। কারণ, নাচন কিছু সকলকেই মানায় না। তোমাদের এ বয়সে, এ শরীরে এত সহজে যদি নাচিয়া ওঠ, সে একটা তামাশা হয় সন্দেহ নাই, রাস্তার লোকেরা হো হো করিয়া হাসিতে থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া আপনার লোকেরা তো আর হাসিতে পারে না! তাহাদের নিতান্ত লজ্জা বোধ হয়, দুঃখ হয়, ধিক ধিক করিয়া মুখ ফিরাইয়া, নতশির হইয়া চলিয়া যায়, সুতরাং ইহাকে ঠিক তামাশা বলা যায় না!

কিন্তু যাই বল, সাহেবদিগকে ধন্য বলিতে হয়। যাঁহারা উইল্‌সনের সার্কস্‌ দেখিতে গিয়াছেন তাঁহারা সকলেই দেখিয়াছেন ইংরাজ ঘোড়া নাচাইয়াছেন এবং অরণ্যের বড়ো বড়ো প্রাণীদের পোষ মানাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা যে বাংলার গোটাকতক জমিদার ধরিয়া আনিয়া এত সহজে বশ করিতে পারিবেন এ কে জানিত?

বশ করা কিছু আশ্চর্য নয়, কিন্তু ইহার কিছু পূর্বেই যে লাথি ঝাঁটা বৈ আর কিছু খোরাকি জোটে নাই, সেগুলি যে এত শীঘ্র হজম করিয়া ফেলিয়া দানার লোভে তোমরা উহাদের কাছে ঘেঁসিয়া যাইতেছ এইটেই আশ্চর্য!

ডারুয়িন বলিয়াছেন, প্রাণীর ক্রমোন্নতি সহকারে মানুষের কাছাকাছি আসিয়া তাহার লেজ খসিয়া যায়। যেমন শারীরিক লেজ খসিয়া যায়, তেমনি তাহার আনুষঙ্গিক মানসিক লেজটাও খসিয়া যায়। মান-অপমান তুচ্ছ করিয়া, লাথি ঝাঁটা শিরোধার্য করিয়া কেবল একটুখানি সুবিধার অনুরোধে বাপান্তবাগীশের গা ঘেঁসিয়া গেলে মানসিক লেজের অস্তিত্ব প্রকাশ পায়। সে জিনিসটা যদি থাকে তো চাপিয়ে রাখো, অত নাড়িতেছ কেন? ওটা দেখিতে পাইলে পণ্ডিতেরা তোমাদিগকে হীন ও মহৎ প্রাণীদের মধ্যস্থিত missing link বলিয়া গণ্য করিতেও পারে!

তোমাদের একটা কথা আছে যে, 'কাহারও সহিত এক বিষয়ে মতভেদ হইলে অন্য বিষয়ে মতের ঐক্য সত্ত্বেও মিশিতে বাধা কী?' সে তো ঠিক কথা। কিন্তু মতের আবার ইতরবিশেষ আছে। 'ক' কখন কহিল, সূর্য পশ্চিমে ওঠে, তখন 'খ'য়ের সহিত এ সম্বন্ধে তাহার সম্পূর্ণ মতভেদ সত্ত্বেও 'ক'য়ে 'খ'য়ে গলাগলি ভাব থাকার আটক নাই। কিন্তু যখন 'ক'য়ের মত 'খ' এবং তাহার বাপ-পিতামহ সকলেই চোর, মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক, তখন এ মতভেদ সত্ত্বেও উভয়ের আর ভালোরূপ বনিবনাও হওয়া সম্ভব নহে।

যাহারা দেশকে অপমান করে দেশের কোনো সুপুত্র তাহাদের সহিত সম্পর্ক রাখিতে পারে

না। একটুখানি সুযোগের প্রত্যাশায় যাহারা দাঁতের পাটি সমস্তটা বাহির করিয়া তাহাদের সহিত আত্মীয়তা করিতে যাইতে পারে তাহাদিগকে দেখিলে নিতান্তই ঘৃণা বোধ হয়।

তোমরা বলিবে, এ-সকল কথা বালকেরই মুখে শোভা পায়, ইহা পাকা কাজের লোকের মতো কথা হইল না। কার্য উদ্ধার করিতে হইলে অত বিচার করিয়া চলা পোষায় না। বড়ো বড়ো sentimentগুলি ঘরের শোভা সম্পাদনের জন্য, সচ্ছল অবস্থায় বড়ো বড়ো ছবির মতো তাহাদিগকে ঘরে টাঙাইয়া রাখিয়াছিলাম; কিন্তু যখন গাঁঠের কড়িতে টান পড়িল, তখন সুবিধামতো তাহাদের একটাকে টাউনহলে নিলামে highest bidder-দের বিক্রি করিয়া আসিলাম, ইহাতে আর দোষ হইয়াছে কী? Political Economy-র মতে ইহাতে দোষ কিছুই হয় নাই, যেমন বাজার দেখিয়াছ তেমনি বিক্রয় করিয়াছ এতবড়ো দোকানদারি বুদ্ধি কয়জনের মাথায় জোগায়। কিন্তু তাই যদি হইল, তোমরাই যদি এমন কাজ করিতে পার ও এমন কথা বলিতে পার, তবে ভারতবর্ষ এতকাল তাহার নিজের ক্ষীরটুকু সরটুকু খাওয়াইয়া তোমাদিগকে পোষণ করিল কেন? যাহারা প্রত্যহ একমুষ্টি উদরান্নের জন্য প্রাণপণ করিয়া মরে, এতবড়ো ভয়ংকর কাজের লোক হওয়া বরঞ্চ তাহাদিগকে শোভা পায়, বড়ো বড়ো sentiment বরঞ্চ তাহাদিগের নিকটেই মহার্ঘ বলিয়া গণ্য হইতে পারে কিন্তু তোমরা যে জন্মাবধি এতকাল এত অবসর পাইয়া আসিয়াছ একটা মহৎ sentiment চর্চা করিতেও কি পারিলে না? তবে আর কুলীন ধনী পরিবারদিগকে দেশ কেন পোষণ করিতেছে? তাহারা না খাটিবে, না তাহাদের অবকাশের সদ্‌ব্যবহার করিবে। দেশের সমস্ত স্বাস্থ্য শোষণ করিয়া মস্ত মস্ত জমকালো বিস্ফোটকের মতো শোভা পাওয়াই কি তাহাদের একমাত্র কাজ! আমাদের বিশ্বাস ছিল, কুলক্রমাগত সচ্ছল সম্ভ্রান্ত অবস্থা উদরতা ও মহত্ত্ব সঞ্চয়ের সাহায্য করে— এরূপ কুলীনেরা সামান্য হীন সুবিধার খাতির অগ্রাহ্য করে ও মানের কাছে প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করে— দেশের সম্ভ্রম তাহারাই রাখে; আর তাই যদি না হয়, একটু মাত্র কাল্পনিক সুবিধার আশা পাইলেই অমনি তাহার যদি নীচত্ব করিতে প্রস্তুত হয়, নিজের অপমান ও দেশের অপমানকে গুলি-পাকাইয়া অম্লানবদনে গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিতে পারে তবে তাহারা যত শীঘ্র সরিয়া পড়ে ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। দেখিতেছি চোখে ঠুলি পরিয়া তাহারা কেবল টাকার ঘানি টানিয়া দুই-চারি হাত জমির মধ্যে ঘুরিয়া মরিতেছে, কিছুই উন্নতি হয় নাই, এক পা অগ্রসর হইতে পারে নাই! মান-সম্ভ্রম-মহত্ত্ব সমস্তই ঘানিতে ফেলিয়া কেবল তেলই বাহির করিতে হইবে! বোধ করি স্বদেশকে ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তোমাদের ওই ঘানিতে ফেলিতে পার যদি একটুখানি তেল বাহির হয়! সমস্ত জীবন তোমাদের ওই ঘানি-দেবতাকে প্রদক্ষিণ করিয়া মরো ও উহার ক্যাঁচ্‌ ক্যাঁচ্‌ শব্দে জগতের সমস্ত সংগীত ডুবিয়া যাক!

তোমরা হিন্দু, তোমরা জাতিভেদ মানিয়া থাক। আমরণ তোমাদের সন্তানের যদি বিবাহ না হয় তথাপি সহস্র সুবিধা সত্ত্বেও একটা ফিরিঙ্গির সন্তানের সহিত তাহার বিবাহ দাও না, কেন? না শাস্ত্রে নিষেধ আছে। কিন্তু আর-একটি অলিখিত শাস্ত্র এবং মহত্ত্বর জাতিভেদ আছে, যদি সে শাস্ত্রজ্ঞান ও সে সহৃদয়তা থাকিত, তবে একটুখানি সুবিধার আশায় গোটাকতক অ্যাংলো-ইন্ডিয়নের সহিত মিলনসূত্রে বদ্ধ হইতে পারিতে না! সকলই প্রজাপতির নির্বন্ধ বলিতে হইবে। নহিলে তোমরা যত শ্যাম তনু, ক্ষীণ, ক্ষুদ্রগণ ঘড়ির চেনটি পরিয়া ললিত হাস্যে মধুর সম্ভাষণে ওই বড়ো বড়ো গোরাদের আদর কাড়িতে গিয়াছ ও কৃতকার্য হইয়াছ ইহা কী করিয়া সম্ভব হইল। এ তো প্রকাশ্যে, এ তবু ভালো! কিন্তু বিশ্বাস হয় না লোকে কানাকানি করিতেছে, কালায় গোরায় গোপনে নাকি গান্ধর্ব মিলন চলিতেছে! শুনিতেছি নাকি কানে কানে কথা, হাতে হাতে টেপাটেপি ও পরস্পর সুবিধার মালাবদল হইতেছে।

সুবিধাই বা কতটুকু! তোমরা নিজে কিছু কম লোক নও। রাজ-সরকারে তোমাদের যথেষ্ট মান-মর্যাদা, খ্যাতি-প্রতিপত্তি আছে। তাহা ছাড়া, তোমরা নিতান্ত মুখচোরাও নও যে, তোমাদের

হইয়া আর-একজনকে কথা কহিতে হইবে। তোমরা বেশ বলিতে পার লিখিতে পার, তোমাদের কথা গবর্মেন্ট কান পাতিয়া শুনিয়া থাকেন। তোমাদের টাকা আছে, পদ আছে, প্রতিপত্তি আছে, তবে দুঃখটা কিসের। তবে কেন ওই খোদাবন্দ্‌দিগের হাঁটুর কাছে হামাগুড়ি দিয়া বেড়াইতেছ! যাহারা সকল বিষয়েই অনবরত গবর্মেন্টের অন্ধ-বিদ্রোহিতা করিয়া আসিতেছে তাহাদিগকে কামানস্বরূপ করিয়া বারুদ ঠাসিয়া আগুন লাগাইয়া গবর্মেন্টের বিরুদ্ধে গোলাবর্ষণ করিতে থাকিলে কি সরকার বড়ো খুশি হইবে।

কী আর বলিব। ইহা এক অপূর্ব অথচ শোচনীয় দৃশ্য। আমাদের দেশের বড়ো বড়ো মাথাগুলা যে এত সহজেই সোডা-ওয়াটারের ছিপির মতো চারি দিকে টপাটপ উড়িতে আরম্ভ করিয়াছে ও জলধারা উচ্ছ্বসিত হইয়া বক্ষ ভাসাইয়া প্রবাহিত হইতেছে এ দৃশ্যে মহত্ত্ব কিছুই না। ইহাতে বঙ্গদেশের বর্তমানের জন্য লজ্জা বোধ হয় ও ভবিষ্যতের জন্য আশঙ্কা জন্মে।

ভারতী
পৌষ ১২৯০

অকাল কুষ্মাণ্ড

সাবিত্রী লাইব্রেরির সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে লিখিত

পরামর্শ দেওয়া কাজটা না কি গুরুতর নহে, অথচ যিনি পরমর্শ দেন তিনি সহসা অত্যন্ত গুরুতর হইয়া উঠেন, এই নিমিত্ত পরমার্শদাতার অভাব লইয়া সমাজ বা ব্যক্তিবিশেষকে বোধ করি কখনো আক্ষেপ করিতে হয় নাই। নিতান্ত যে গরীব, যাহার একবেলা এক কুন্‌কে চাল জোটে, সে তিন সন্ধে তিন বস্তা করিয়া পরামর্শ বিনি খরচায় ও বিনি মাসুলে পাইয়া থাকে— আশ্চর্য এই যে তাহাতে তাহার পেট ভরিবার কোনো সহায়তা করে না। বিশেষত কতকগুলি নিতান্ত সত্য কথা আছে তাহারা এত সত্য যে সচরাচর কোনো ব্যবহারে লাগে না অর্থাৎ তাহারা এত সস্তা যে, তাহাদের পয়সা দিয়া কেহ কেনে না— কিন্তু গায়ে পরিয়া বদান্যতা করিবার সময় তেমন সুবিধার জিনিস আর কিছু হইতে পারে না। যৎপরোনাস্তি সত্য কথাগুলির দশা কী হইত যদি সংসারে পরামর্শদাতার কিছুমাত্র অভাব থাকিত! তাহা হইলে কে বলিত, 'বাপু সাবধান হইয়া চলিয়ো, বিবেচনাপূর্বক কাজ করিয়ো, মনোযোগপূর্বক বিষয়-আশয় দেখিয়ো; এগ্‌জামিন পাস হইতে চাও তো ভালো করিয়া পড়া মুখস্থ করিয়ো— খামকা পড়িয়া হাত-পা ভাঙিয়ো না, খবরদার জলে ডুবিয়া মরিয়ো না— ইত্যাদি?' এই কথাগুলো কোম্পানির মাল হইয়া পড়িয়াছে, দরিয়ায় ঢালিতে হইলে ইহাদের প্রতি আর কেহ মায়া-মমতা করে না!

অনেক ভালো ভালো পরামর্শও দুরবস্থায় পড়িয়া সস্তা হইয়া উঠিয়াছে। সহসা তাহাদের এত বেশি আমদানি হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাদের দাম নাই বলিলেও হয়। যাহাদের মূলধন কম, এমন সাহিত্য-দোকানদার মাত্রেই তাড়াতাড়ি এই-সকল সস্তা ও পাঁচরঙা পদার্থ লইয়া দৈনিকে, সাপ্তাহিকে, পাক্ষিকে, মাসিকে, ত্রৈমাসিকে, পুঁথিতে চটিতে, এক কলম, দু কলম, এক পেজ, দু পেজ, এক ফর্মা দু ফর্মা, যাহার যেমন সাধ্য পসরা সাজাইয়া ভারি হাঁকডাক আরম্ভ করিয়াছে। দেশকে উপদেশ এবং আদেশ করিতে কেহই পরিশ্রমের ত্রুটি করেন না; রাস্তায় যত লোক চলিতেছে তাহা অপেক্ষা ঢের বেশি লোক পথ দেখাইয়া দিতেছে। (বাংলাটা Finger-Post-এরই রাজত্ব হইয়া উঠিল।) কিন্তু তাহাদের এই অত্যন্ত গুরুতর কর্তব্য সমাধান করিতে তাহারা এত বেশি ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, পথিকেরা চলিবার রাস্তা পায় না। সহসা সকলেরই একমাত্র ধারণা হইয়াছে যে, দেশটা যে রসাতলে যাইতেছে সে কেবলমাত্র উপদেশের অভাবে। কিন্তু কেহ কেহ এমনও বলিতেছেন যে, ঢের হইয়াছে— গোটাকতক কুড়োনো কথা ও আর তিনশোবার

করিয়া বলিয়ো না— ওটাতে যা-কিছু পদার্থ ছিল, সে তোমাদের আওয়াজের চোটে অনেক কাল হইল নিকাশ হইয়া গিয়াছে। আমাদের এই ক্ষুদ্র সাহিত্যের ডোঙাটা একটুখানি হাল্কা করিয়া দাও, বাজে উপদেশ ও বাঁধি পরামর্শ ইহার উপর আর চাপাইয়ো না— বস্তার উপর বস্তা জমিয়াছে, নৌকাডুবি হইতে আর বিস্তর বিলম্ব নাই— কাতর অনুরোধে কর্ণপাত করো, ওগুলো নিতান্তই অনাবশ্যক। তুমি তো বলিলে অনাবশ্যক! কিন্তু ওগুলো যে সস্তা! মাথার খোলটার মধ্যে একটা সিকি পয়সা ও আধুলি বৈ আর কিছু নাই, মাথা নাড়িলে সেই দুটোই ঝম্‌ঝম্ করিতে থাকে, মনের মধ্যে আনন্দ বোধ হয়— সেই দুটো লইয়াই কারবার করিতে হইবে— সুতরাং দুটো-চারটে অতি জীর্ণ উপদেশ পুরোনো তেঁতুলের সহিত শিকেয় তোলা থাকে— বুদ্ধির ডোবা হইতে এক ঘটি জল তুলিয়া তাহাতে ঢালিয়া দিলে তাহাই অনেকটা হইয়া ওঠে এবং তাহাতেই গুজ্‌রান্ চলিয়া যায়। একটা ভালো জিনিস সস্তা হইলে এই প্রকার খুচরা দোকানদার মহলে অত্যন্ত আনন্দ পড়িয়া যায়। দেখিতেছেন না, আজকাল ইহাদের মধ্যে ভারি স্ফূর্তি দেখা যাইতেছে! সাহিত্যের ক্ষুদে পিঁপড়েগণ ছোটো ছোটো টুকরো মুখে লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া ও অত্যন্ত গর্বের সহিত সার বাঁধিয়া চলিয়াছে! এখানে একটা কাগজ, ওখানে একটা কাগজ, সেখানে একটা কাগজ, এক রাত্রের মধ্যে হুস করিয়া মাটি ফুঁড়িয়া উঠিতেছে। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে, আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরা যখন ইংরিজি বিদ্যাটাকে কলা দিয়ে চটকাইয়া ফলার করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের পাতের চার দিকে পোলিটিকল্ ইকনমি ও কন্‌স্টিট্যুশনল হিস্ট্রির, বর্কলের ও মিলের এবং এ-ও-তার কিছু কিছু গুঁড়া পড়িয়াছিল— সাহিত্যের ক্ষুধিত উচ্ছিষ্টপ্রত্যাশী এক দল জীববিশেষ তাহাদের অসাধারণ ঘ্রাণশক্তি প্রভাবে শুঁকিয়া শুঁকিয়া তাহা বাহির করিয়াছে। বড়ো বড়ো ভাবের আধখানা শিকিখানা টুকরা পথের ধুলার মধ্যে পড়িয়া সরকারি সম্পত্তি হইয়া উঠিয়াছে, ছোটো ছোটো মুদি ও কাঁসারিকুলতিলকগণ পর্যন্ত সেগুলোকে লইয়া রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া ইঁটপাটকেলের মতো ছোড়াছুড়ি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এত ছড়াছড়ি ভালো কি না সে বিষয়ে কিছু সন্দেহ আছে— কারণ, এরূপ অবস্থায় উপযোগী দ্রব্যসকলও নিতান্ত আবর্জনার সামিল হইয়া দাঁড়ায়— অস্বাস্থ্যের কারণ হইয়া উঠে এবং সমালোচকদিগকে বড়ো বড়ো ঝাঁটা হাতে করিয়া ম্যুনিসিপলিটির শকট বোঝাই করিতে হয়।

এমন কেহ বলিতে পারেন বটে যে, ভালো কথা মুখে মুখে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে তাহাতে হানি যে কেন হইবে বুঝিতে পারিতেছি না। হানি হইবার একটা কারণ এই দেখিতেছি— যে কথা সকলেই বলে, সে কথা কেহই ভাবে না। সকলেই মনে করে, আমার হইয়া আর পাঁচশো জন এ কথাটা ভাবিয়াছে ও ভাবিতেছে, অতএব আমি নির্ভাবনায় ফাঁকি দিয়া কথাটা কেবল বলিয়া লই-না কেন? কিন্তু ফাঁকি দিবার জো নাই— ফাঁকি নিজেকেই দেওয়া হয়। তুমি যদি মনে করো একটা ঘোড়াকে স্থায়ীরূপে নিজের অধিকারে রাখিতে হইলে আর কিছুই করিতে হইবে না, কেবল রশারশি দিয়া খুব শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখিলেই হইল, তাহাকে দানা ছোলা দিবার কোনো দরকার নাই— এবং সেইমতো আচরণ কর, তাহা হইলে কিছুদিনের মধ্যে দেখিবে দড়িতে একটা জিনিস খুব শক্তরূপে বাঁধা আছে বটে কিন্তু সেটাকে ঘোড়া না বলিলেও চলে। তেমনি ভাষরূপ দড়িদড়া দিয়া ভাবটাকে জিহ্বার আস্তাবলে দাঁতের খুঁটিতে খুব শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখিলেই যে সে তোমার অধিকারে চিরকাল থাকিবে তাহা মনে করিয়ো না— তিন সন্ধ্যা তাহার খোরাক জোগাইতে হইবে। যে ভাবনার মাটি ফুঁড়িয়া যে কথাটি উদ্ভিদের মতো বাড়িয়ে উঠিয়াছে, সেই মাটি হইতে সেই কথাটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে সে আর বেশিদিন বাঁচিতে পারে না। দিন দুই-চার সবুজ থাকে বটে ও গৃহশোভার কাজে লাগিতে পারে কিন্তু তার পর যখন মরিয়া যায় ও পচিয়া উঠে তখন তাহার ফল শুভকর নহে। একটা গল্প আছে, একজন অতিশয় বুদ্ধিমান লোক বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনের উদ্দেশে একটা পরীক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন, তিনি দেখিতেছিলেন ঘোড়াকে

নিয়মিতরূপে না-খাওয়ানো অভ্যাস করাইলে সে টেঁকে কি না। অভ্যাসের গুণে অনেক হয় আর এটা হওয়াই বা আশ্চর্য কী! কিন্তু সেই বিজ্ঞানহিতৈষী বুদ্ধিমান ব্যক্তি সম্প্রতি এই বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন যে— প্রতিদিন একটু একটু করিয়া ঘোড়ার খোরাক কমাইয়া যখন ঠিক একটিমাত্র খড়ে আসিয়া নাবিয়াছি, এমন সময়টিতে ঘোড়াটা মারা গেল! নিতান্ত সামান্য কারণে এত বড়ো একটা পরীক্ষা সমাপ্ত হইতেই পারিল না, ও এ বিষয়ে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত নিতান্ত অসম্পূর্ণ রহিয়াই গেল। আমরাও বুদ্ধিমান বিজ্ঞানবীরগণ বোধ করি কতকগুলি ভাব লইয়া সেইরূপ পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছি— কিছুমাত্র ভাবিব না— অথচ গোটাকতক বাঁধা ভাব পুষিয়া রাখিব, শুধু তাই নয় চব্বিশ ঘণ্টা তাহাদের ঘাড়ে চড়িয়া রাস্তার ধুলা উড়াইয়া দেশময় দাপাদাপি করিয়া বেড়াইবে, অবশেষে পরীক্ষা সম্পূর্ণ হইবার ঠিক পূর্বেই দেখিব, কথা সমস্তই বজায় আছে অথচ ভাবটার যে কী খেয়াল গেল যে হঠাৎ মরিয়া গেল! অনেক সময়ে প্রচলিত কথার বিরুদ্ধ কথা শুনিলে আমাদের আনন্দ হয় কেন? কারণ, এই উপায়ে ডোবায় বদ্ধ স্তব্ধ নিস্তরঙ্গ প্রচলিত মতগুলি গুরুতর নাড়া পাইয়া আন্দোলনের প্রভাবে কতকটা স্বাস্থ্যজনক হয়। যে-সকল কথাকে নিতান্তই সত্য মনে করিয়া নির্ভাবনায় ও অবহেলায় ঘরের কোণে জমা করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহাদের বিরুদ্ধে সন্দেহ উত্থাপিত হইলে ফের তাহাদের টানিয়া বাহির করিতে হয়, ধুলা ঝাড়িয়া চোখের কাছে লইয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে হয়— ও এইরূপে পুনশ্চ তাহারা কতকটা ঝকঝকে হইয়া উঠে। যতবড়ো বুদ্ধিমানই হউন-না-কেন সত্য কথার বিরুদ্ধে কাহারও কথা কহিবার সাধ্য নাই— তবে যখন কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিকট হইতে প্রচলিত সত্যের বিপক্ষে কোনো কথা শুনা যায় তখন একটু মনোযোগপূর্বক ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যায় যে, সেটা একটা ফাঁকি মাত্র। তিনি সেই কথাটাই কহিতেছেন, অথচ ভান করিতেছেন যেন তাহার সহিত ভারি ঝগড়া চলিতেছে। এইরূপে নির্জীব কথাটার অন্ত্যেষ্টিসংকার করিয়া আর-একটা নূতন কথার দেহে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা হয়— দেখিতে ঠিক বোধ হইল যেন সত্যটাকেই পুড়াইয়া মারিলেন, কিন্তু আসলে কী করলেন, না, জরাগ্রস্ত সত্যের দেহান্তর প্রাপ্তি করাইয়া তাহাকে অমর যৌবন দান করিলেন।

য়ুরোপে যাহা হইয়াছে তাহা সহজে হইয়াছে, আমাদের দেশে যাহা হইতেছে তাহা দেখাদেখি হইতেছে এইজন্য ভারি কতকগুলি গোলযোগ বাধিয়াছে। সমাজের সকল বিভাগেই এই গোলযোগ উত্তরোত্তর পাকিয়া উঠিতেছে। আমরা য়ুরোপীয় সভ্যতার আগডালে বসিয়া আনন্দে দোল খাইতেছি, তাহার আগাটাই দেখিতেছি, তাহার যে আবার একটা গোড়া আছে ইহা কোনোক্রমেই বিশ্বাস হয় না। কিন্তু এরূপ ভ্রম শাখামৃগেরই শোভা পায়। যে কারণে এতটা কথা বলিলাম তাহা এই— য়ুরোপে দেখিতে পাই বিস্তর পাক্ষিক ত্রৈমাসিক বার্ষিক সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়, ইহা সেখানকার সভ্যতার একটা নিদর্শন বলিতে হইবে। আমাদের দেশেও বিস্তর সাময়িক পত্র বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু ইহাই লইয়া কি উল্লাস করিব? এ বিষয়ে আমি কিন্তু একটুখানি ইতস্তত করিয়া থাকি। আমার সন্দেহ হয় ইহাতে ঠিক ভালো হইতেছে কি না। য়ুরোপে লেখক ও চিন্তাশীল ব্যক্তি বিস্তর আছে তাই কাগজপত্র আপনা হইতে জাগিয়া উঠিতেছে। আমরা তাই দেখাদেখি আগেভাগে কাগজ বাহির করিয়া বসিয়া আছি, তার পরে লেখক লেখক করিয়া চতুর্দিকে হাৎড়াইয়া বেড়াইতেছি। ইহাতে যে কুফল কী হইতে পারে, তাহা ক্রমশ ব্যক্ত করা যাইতেছে।

আমার একটি বিশ্বাস এই যে, য়ুরোপেই কী আর অন্য দেশেই কী, সাহিত্য সম্বন্ধে নিয়মিত জোগান দিবার ভার গ্রহণ করা ভালো নয়; কারণ, তাহা হইলে দোকানদার হইয়া উঠিতে হয়। সাহিত্যে যতই দোকানদারি চলিবে ততই তাহার পক্ষে অমঙ্গল। প্রথমত, ভাবের জন্য সবুর করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, লেখাটাই সর্বাগ্রে আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও গুরুতর আশঙ্কার বিষয় আরেকটি আছে। ইংরাজেরা দাস-ব্যবসায় উঠাইয়া দিয়াছেন— কিন্তু

স্বাধীন ভাবগুলিকে ক্রীতদাসের মতো কেনাবেচা করিবার প্রথা তাঁহারাই অত্যন্ত প্রচলিত করিয়াছেন। এইরূপে শতসহস্র ভাব প্রত্যহই নিতান্ত হেয় হইয়া পড়িতেছে। স্বাধীন অবস্থায় তাহারা যেরূপ গৌরবের সহিত কাজ করিতে পারে, দাসত্বের জোর-জবরদস্তিতে ও অপমানে তাহারা সেরূপ পারে না ও এইরূপে ইংরাজিতে যাহাকে cant বলে সেই cant-এর সৃষ্টি হয়। ভাব যখন স্বাধীনতা হারায়, দোকাদারেরা যখন খরিদ্দারের আবশ্যক বিবেচনা করিয়া তাহাকে শৃঙ্খলিত করিয়া হাটে বিক্রয় করে তখন তাহাই cant হইয়া পড়ে। য়ুরোপের বুদ্ধি ও ধর্মরাজ্যের সকল বিভাগেই cant নামক একদল ভাবের শূদ্রজাতি সৃজিত হইতেছে। য়ুরোপের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা আক্ষেপ করেন যে, প্রত্যহ Theological cant, Sociological cant, Political cant-এর দলপুষ্টি হইতেছে। আমার বিশ্বাস তাহার কারণ— সেখানকার বহুবিস্তৃত সাময়িক সাহিত্য ভাবের দাস-ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে। কেননা, পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতেই বুঝাইতেছে— স্বাধীন ভাবেরই অবস্থান্তর cant। যদি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি cant-এর দাসত্বশৃঙ্খল খুলিয়া দিয়া পুনশ্চ তাহাকে মুক্ত করিয়া দেন, তবে সেই আবার স্বাধীন ভাব হইয়া ওঠে— এবং তাহাকেই সকলে বহুমান করিয়া পূজা করিতে থাকে। সত্যকথা মহৎকথাও দোকানদারীর অনুরোধে প্রচার করিলে অনিষ্টজনক হইয়া ওঠে। যথার্থ হৃদয় হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলে যে কথা দেবতার সিংহাসন টলাইতে পারিত, সেই কথাটাই কি না ডাকমাসুল সমেত সাড়ে তিন টাকা দরে মাসহিসাবে বাঁটিয়া-বাঁটিয়া ছেঁড়া কাগজে মুড়িয়া বাড়ি-বাড়ি পাঠান! যাহা সহজ প্রকৃতির কাজ তাহারও ভার নাকি আবার কেহ গ্রহণ করিতে পারে! কোনো দোকানদার বলুক দেখি সে মাসে মাসে এক-একটা ভাগীরথী ছাড়িবে, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় লাটাই বাঁধিয়া ধূমকেতু উড়াইবে বা প্রতি শনিবারে ময়দানে একটা করিয়া ভূমিকম্পের নাচ দেখাইবে। সে হুঁকার জল ফিরাইতে, ঘুড়ি উড়াইতে ও বাঁদর নাচাইতে পারে বলিয়া যে অম্লান বদনে এমনতরো একটা গুরুতর কার্য নিয়মিতরূপে সম্পন্ন করিবার ভার গ্রহণ করিতে চাহে, ইহা তাহার নিতান্ত স্পর্ধার কথা। আজকাল খাতায় টুকিয়া রাখিতে হয়— অমুক দিন ঠিক অমুক সময়ে পকেট হইতে রুমালটি বাহির করিয়া দেশের জন্য কাঁদিব— তাহার পরদিন সাড়ে তিনটের সময় সহসা দেশের লোকের কুসংস্কার কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিব না ও তাহাই লইয়া ঠিক তিনপোয়া-আন্দাজ রাগ ও একপোয়া-আন্দাজ দুঃখ করিব; বন্ধু যখন নিমন্ত্রণ করিতে আসেন— ঊনত্রিশে চৈত্র ১১টার সময় আমার ওখানে আহার করিতে আসিয়ো, তখন আমাকে বলিতে হয়— 'না ভাই তাহা পারিব না। কারণ ত্রিশে চৈত্র আমার কাগজ বাহির হইবে, অতএব কাল ঠিক এগারোটার সময় দেশের অনৈক্য দেখিয়া আমার হৃদয় ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া উঠিবে এবং ভীষ্ম দ্রোণ ও অশ্বত্থামাকে স্মরণ করিয়া আমাকে অতিশয় শোকাতুর হইতে হইবে।' য়ুরোপে লেখক বিস্তর আছে, সেখানে তবু এতটা হানি হয় না, কিন্তু হানি কিছু হয়ই। আর, আমাদের দেশে লেখক নাই বলিলেও হয়, তবুও তো এতগুলো কাগজ চলিতেছে। কেমন করিয়া চলে? লেখার ভান করিয়া চলে। সহৃদয় লোকদের হৃদয়ে অন্তঃপুরবাসী পবিত্র ভাবগুলিকে সাহিত্যসমাজের অনার্যেরা যখনি ইচ্ছা অসংকোচে তাহাদের কঠিন মলিন হস্তে স্পর্শ করিয়া অশুচি করিয়া তুলিতেছে। এই-সকল ম্লেচ্ছেরা মহৎবংশোদ্ভব কুলীন ভাবগুলির জাত মারিতেছে। কঠিন প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া তবে তাহাদিগকে সমাজে তুলিতে হয়। কারণ, সকল বিষয়েই অধিকারী ও অনধিকারী আছে। লেখার অধিকারী কে? না, যে ভাবে, যে অনুভব করে। ভাবগুলি যাহার পরিবারভুক্ত লোক। যে-খুশি-সেই কোম্পানির কাছ হইতে লাইসেন্স লইয়া ভাবের কারবার করিতে পারে না। সেরূপ অবস্থা মগের মুলুকেই শোভা পায় সাহিত্যের রাম-রাজত্বে শোভা পায় না। কিন্তু আমাদের বর্তমান সাহিত্যের অরাজকতার মধ্যে কি তাহাই হইতেছে না! না হওয়াই যে আশ্চর্য। কারণ এত কাগজ হইয়াছে যে, তাহার লেখার জন্য যাকে-তাকে ধরিয়া বেড়াইতে হয়— নিতান্ত অর্বাচীন হইতে ভীমরতিগ্রস্ত পর্যন্ত কাহাকেও ছাড়িতে পারা যায় না। মনে করো,

হঠাৎ যুদ্ধ করিবার আবশ্যক হইয়াছে, কেল্লায় গিয়া দেখিলাম সৈন্য বড়ো বেশি নাই— তাড়াতাড়ি মুটেমজুর চাষাভুষো যাহাকে পাইলাম এক-একখানা লাল পাগড়ি মাথায় জড়াইয়া সৈন্য বলিয়া দাঁড় করাইয়া দিলাম। দেখিতে বেশ হইল। বিশেষত রীতিমতো সৈন্যের চেয়ে ইহাদের এক বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা আছে— ইহারা বন্দুকটা লইয়া খুব নাড়িতে থাকে, পা খুব ফাঁক করিয়া চলে এবং নিজের লাল পাগড়ি ও কোমরবন্ধটার বিষয় কিছুতেই ভুলিতে পারে না— কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যুদ্ধে হার হয়। আমাদের সাহিত্যেও তাই হইয়াছে— লেখাটা চাই-ই চাই, তা-সে যেই লিখুক-না-কেন। এ লেখাতেও না কি আবার উপকার হয়! উপকার চুলায় যাউক স্পষ্ট অপকার হয় ইহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন। অনবরত ভান চলিতেছে— গদ্যে ভান, পদ্যে ভান, খবরের কাগজে ভান, মাসিকপত্রে ভান, রাশি রাশি মৃত-সাহিত্য জমা হইতেছে, ভাবের পাড়ায় মড়ক প্রবেশ করিয়াছে। ভারত-জাগানো ভাবটা কিছু মন্দ নয়। বিশেষত যথার্থ সহৃদয়ের কাতর মর্মস্থান হইতে এই জাগরণ-সংগীত বাজিয় উঠিলে, আমাদের মতো কুম্ভকর্ণেরও এক মুহূর্তের জন্য নিদ্রাভঙ্গ হয়; নিদেন হাই তুলিয়া গা-মোড়া দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইতে ইচ্ছা করে। কিন্তু এখন এমনি হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ভারত-জাগানো কথাটা যেন মারিতে আসে! তাহার কারণ আর কিছুই নয়, আজ দশ-পনেরো বৎসর ধরিয়া অনবরত বালকে এবং স্ত্রীলোকে পর্যন্ত ভারত-জাগানোর ভান করিয়া আসিয়াছে— ভাবটা ফ্যাশন হইয়া পড়িল, সাহিত্য-দোকানদারেরা লোকের ভাব বুঝিয়া বাজারের দর দেখিয়া দিনে দিনে সপ্তাহে সপ্তাহে মাসে মাসে প্রচুর পরিমাণে আমদানি করিতে লাগিল; কাপড়ের একটা নতুন পাড় উঠিলে তাহা যেমন সহসা হাটে-ঘাটে-মাঠে অত্যন্ত প্রচলিত হইয়া ওঠে— ভারত-জাগানোটাও ঠিক তেমনি হইয়া উঠিল— কাজেই ঝট্ করিয়া তাহাকে মারা পড়িতে হইল। কুম্ভকর্ণকে যেমন ঢাকঢোল জগঝম্প বাজাইয়া উৎপীড়ন করিয়া কাঁচাঘুম হইতে জাগাইয়া তুলিল ও সে যেমন জাগিল, তেমনি মরিল। ইহার বিপুল মৃতদেহ আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রের কতটা স্থান জুড়িয়া পড়িয়া আছে একবার দেখো দেখি! এখনও কেহ কেহ কাজকর্ম না থাকিলে জেঠাইমাকে গঙ্গাযাত্রা হইতে অব্যাহতি দিয়া এই মৃতদেহের কানের কাছে ঢাকঢোল বাজাইতে আসেন। কিন্তু এ আর উঠিবে না, এ নিতান্তই মারা পড়িয়াছে! যদি ওঠে তবে প্রতিভার সঞ্জীবনী মন্ত্রে নূতন দেহ ধারণ করিয়া উঠিবে। এমন একটার উল্লেখ করিলাম কিন্তু প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহে, প্রতি মাসে শতকরা কত কত ভাব হৃদয়হীন কলমের আঁচড়ে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া ও কপট কৃত্রিম রসনা শয্যার উপরে হাত-পা খিচাইয়া ধনুষ্টংকার হইয়া মরিতেছে তাহার একটা তালিকা কে প্রস্তুত করিতে পারে! এমনতরো দারুণ মড়কের সময় অবিশ্রাম চুলা জ্বালাইয়া এই শত সহস্র মৃত সাহিত্যের অগ্নিসংকার করিতে কোন্ সমালোচক পারিয়া ওঠে! চাহিয়া দেখো-না, বাংলা নবেলের মধ্যে নায়ক-নায়িকার ভালোবাসাবাসির একটা ভান, কবিতার মধ্যে নিতান্ত অমূলক একটা হা-হুতাশের ভান, প্রবন্ধের মধ্যে অত্যন্ত উত্তেজনা উদ্দীপনা ও রোখা-মেজাজের ভান! এ তো ভান করিবার বয়েস নয়— আমাদের সাহিত্য এই যে সে-দিন জন্মগ্রহণ করিল— এরই মধ্যে হাবভাব করিতে আরম্ভ করিলে বয়সকালে ইহার দশা যে কী হইবে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

কথাটা সত্য হইলেই যে সমস্ত দায় হইতে এড়াইলাম তাহা নহে। সত্য কথা অনুভব না করিয়া যে বলে তাহার বলিবার কোনো অধিকার নাই। কারণ সত্যের প্রতি সে অন্যায় ব্যবহার করে। সত্যকে সে এমন দীনহীনভাবে লোকের কাছে আনিয়া উপস্থিত করে, যে কেহ সহসা তাহাকে বিশ্বাস করিতে চায় না। বিশ্বাস যদি বা করে তা মৌখিকভাবে করে, সসম্ভ্রমে হৃদয়ের মধ্যে ডাকিয়া আনিয়া তাহাকে আসন পাতিয়া দেয় না। সে যত বড়ো লোকটা তদুপযুক্ত আদর পায় না। অনবরত রসনায় রসনায় দেউরিতে দেউরিতে ফিরিতে থাকে হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পায় না, ক্রমে রসনার শোভা হইয়া ওঠে, হৃদয়ের সম্পত্তি হয় না। হৃদয়ের চারা রসনায় পুঁতিলে কাজেই সে মারা পড়ে।

সত্যের দুই দিক আছে— প্রথম, সত্য যে সে আপনা-আপনিই সত্য, দ্বিতীয়, সত্য আমার কাছে সত্য। যতক্ষণ-না আমি সর্বতোভাবে অনুভব করি ততক্ষণ সত্য হাজার সত্য হইলেও আমার নিকটে মিথ্যা। সুতরাং আমি যখন অনুভব না করিয়া সত্য কথা বলি, তখন সত্যকে প্রায় মিথ্যা করিয়া তুলি। অতএব বরঞ্চ মিথ্যা বলা ভালো তবু সত্যকে হত্যা করা ভালো নয়। কিন্তু প্রত্যহই যে সেই সত্যের প্রতি মিথ্যাচারণ করা হইতেছে। যাহারা বোঝে না তাহারাও বুঝাইতে আসিয়াছে, যাহারা ভাবে না তাহারাও টিয়া পাখির মতো কথা কয়, যাহারা অনুভব করে না তাহারাও তাহাদের রসনার শুষ্ককাষ্ঠ লইয়া লাঠি খেলাইতে আসে। ইহার কি কোনো প্রায়শ্চিত্ত নাই! অপমানিত সত্য কি তাঁহার অপমানের প্রতিশোধ লইবেন না! লক্ষ লক্ষ বৎসর অবিশ্রাম ভান করিলেও কি কোনোকালে যথার্থ হইয়া ওঠা যায়! দেবতাকে দিনরাত্রি মুখ ভেংচাইয়াই কি দেবতা হওয়া যায়, না তাহাতে পুণ্য সঞ্চয় হয়!

সম্পূর্ণ বিদেশীয় ভাবের সংস্রবে আসিয়াই, বোধ করি, আমাদের এই উৎপাত ঘটিয়াছে। আমরা অনেক তত্ত্ব তাহাদের কেতাব হইতে পড়িয়া পাইয়াছি।— ইহাকেই বলে প'ড়ে পাওয়া— অর্থাৎ ব্যবহারী জিনিস পাইলাম বটে কিন্তু তাহার ব্যবহার জানি না। যাহা শুনিলাম মাত্র, ভান করি যেন তাহাই জানিলাম। পরের জিনিস লইয়া নিজস্ব স্বরূপে আড়ম্বর করি। কথায় কথায় বলি, উনবিংশ শতাব্দী, ওটা যেন নিতান্ত আমাদেরই। একে বলি ইনি আমাদের বাংলার বাইরন, ওঁকে বলি উনি আমাদের বাংলার গ্যারিবল্‌ডি, তাঁকে বলি তিনি আমাদের বাংলার ডিমস্থিনিস— অবিশ্রাম তুলনা করিতে ইচ্ছা যায়— ভয় পাছে এটুকুমাত্র অনৈক্য হয়— হেমচন্দ্র যে হেমচন্দ্রই এবং বাইরন যে বাইরনই, তাহা মনে করিলে মন কিছুতেই সুস্থ হয় না। জবরদস্তি করিয়া কোনোমতে বটকে ওক বলিতেই হইবে, পাছে ইংলন্ডের সহিত বাংলার কোনো বিষয়ে এক চুল তফাত হয়। এমনতরো মনের ভাব হইলে ভান করিতেই হয়— পাউডর মাখিয়া সাদা হইতেই হয়, গলা বাঁকাইয়া কথা কহিতেই হয় ও বিলাতকে 'হোম্‌' বলিতে হয়! সহজ উপায়ে না বাড়িয়া আর-একজনের কাঁধের উপরে দাঁড়াইয়া লম্বা হইয়া উঠিবার এইরূপ বিস্তর অসুবিধা দেখিতেছি! আমরা খল্‌সেরা দেখিতেছি অ্যাংবাংগণ খুব থপ্‌থপ্‌ করিয়া চলিতেছে, সুতরাং খল্‌সে বলিতেছেন, আমিও যাই! যাও তাহাতে তো দুঃখ নাই, কিন্তু আমাদের চাল যে স্বতন্ত্র! অ্যাব্যাংয়ের চালে চলিতে চেষ্টা করিলে আমাদের চলিবার সমূহ অসুবিধা হইবে এইটে জানা উচিত!

আমাদের এ সাহিত্য প্রতিধ্বনির রাজ্য হইয়া উঠিতেছে। চারি দিকে একটা আওয়াজ ভোঁ ভোঁ করিতেছে মাত্র, কিন্তু তাহা মানুষের কণ্ঠস্বর নহে, হৃদয়ের কথা নহে, ভাবের ভাষা নহে। কানে তালা লাগিলে যেমন একপ্রকার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়— সে শব্দটা ঘূর্ণ্যবায়ুর মতো বন্‌বন্‌ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে মস্তিষ্কের সমস্ত ভাবগুলিকে ধূলি ও খড়কুটার মতো আস্‌মানে উড়াইয়া দিয়া মাথার খুলিটার মধ্যে শাঁখ বাজাইতে থাকে; জগতের যথার্থ শব্দগুলি একেবারে চুপ করিয়া যায় ও সেই মিথ্যা শব্দটাই সর্বেসর্বা হইয়া বৃত্রাসুরের মতো সংগীতের স্বর্গরাজ্যে একাধিপত্য করিতে থাকে; মাথা কাঁদিয়া বলে, ইহা অপেক্ষা অরাজকতা ভালো, ইহা অপেক্ষা বধিরতা ভালো— আমাদের সাহিত্য তেমনি করিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে— শব্দ খুবই হইতেছে কিন্তু এ ভোঁ ভোঁ, এ মাথাঘোরা আর সহ্য হয় না! এই দিগন্ত-বিস্তৃত কোলাহলের মহামরুর মধ্যে, এই বধিরকর শব্দরাজ্যের মহানীরবতার মধ্যে একটা পরিচিত কণ্ঠের একটা কথা যদি শুনিতে পাই, তবে আবার আশ্বাস পাওয়া যায়— মনে হয়, পৃথিবীতেই আছি বটে, আকার-আয়তনহীন নিতান্ত রসাতলরাজ্যে প্রবেশ করিতেছি না।

আমরা বিশ্বামিত্রের মতো গায়ের জোরে একটা মিথ্যাজগৎ নির্মাণ করিতে চাহিতেছি— কিন্তু ছাঁচে ঢালিয়া, কুমারের চাকে ফেলিয়া, মস্ত একতাল কাদা লইয়া জগৎ গড়া যায় না! বিশ্বামিত্রের জগৎ ও বিশ্বকর্মার জগৎ দুই স্বতন্ত্র পদার্থ— বিশ্বকর্মার জগৎ এক অচল অটল

নিয়মের মধ্য হইতে উদ্ভিন্ন হইয়া বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার আর বিনাশ নাই; তাহা রেষারেষি করিয়া, তর্জমা করিয়া, গায়ের জোরে বা খামখেয়াল হইতে উৎপন্ন হয় নাই; এই নিমিত্তই তাহার ভিত্তি অচলপ্রতিষ্ঠ। এই নিমিত্তই এই জগৎকে আমার এত বিশ্বাস করি— এই নিমিত্তই এক পা বাড়াইয়া আর-এক পা তুলিবার সময় মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে হয় না পাছে জগৎটা পায়ের কাছ হইতে হুস করিয়া মিলাইয়া যায়! আর বিশ্বামিত্রের ঘরগড়া জগতে যে হতভাগ্য জীবদিগকে বাস করিতে হইত তাহাদের অবস্থা কী ছিল একবার ভাবিয়া দেখো দেখি! তাহারা তপ্ত ঘিয়ে ময়দার চক্র ছাড়িয়া দিয়া ভাবিতে বসিত ইহা হইতে লুচি হইবে কি চিনির শরবত হইবে! এক গাছ ফল দেখিলেও তাহাদের গাছে উঠিয়া পাড়িতে প্রবৃত্তি হইত না, সন্দেহ হইত পাছে হাত বাড়াইলেই ওগুলো পাখি হইয়া উড়িয়া যায়। তাহাদের বড়ো বড়ো পণ্ডিতেরা মিলিয়া তর্ক করিত পায়ে চলিতে হয় কি মাথায় চলিতে হয়; কিছুই মীমাংসা হইত না। প্রতিবার নিশ্বাস লইবার সময় দুটো-তিনটে ডাক্তার ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইত, নাকে নিশ্বাস লইব কি কানে নিশ্বাস লইব, কেহ বলিত নাকে, কেহ বলিত কানে। অবশেষে একদিন ঠিক দুপুরবেলা যখন সেখানকার অধিবাসীরা ক্ষুধা পাইলে খাইতে হয় কি উপবাস করিতে হয়, এই বিষয়ে তর্ক করিতে করিতে গলদ্‌ঘর্ম হইয়া উঠিতেছিল, এমন সময়ে হঠাৎ বিশ্বামিত্রের জগৎটা উল্টোপাল্টা, হিজিবিজি, হ-য-ব-র-ল হইয়া, ভাঙিয়া চুরিয়া ফাটিয়া, বোমার মতো আওয়াজ করিয়া, হাউয়ের মতো আকাশে উঠিয়া সবসুদ্ধ কোন্‌খানে যে মিলাইয়া গেল, আজ পর্যন্ত তাহার ঠিকানাই পাওয়া গেল না! তাহার কারণ আর কিছু নয়— সৃষ্ট হওয়ায় এবং নির্মিত হওয়ায় অনেক তফাত। বিশ্বামিত্রের জগৎটা যে অন্যায় হইয়াছিল তা বলিবার জো নাই— তিনি এই জগৎকেই চোখের সুমুখে রাখিয়া এই জগৎ হইতেই মাটি কাটিয়া লইয়া তাঁহার জগৎকে তাল পাকাইয়া তুলিয়াছিলেন, এই জগতের বেলের খোলার মধ্যে এই জগতের কুলের আঁটি পুরিয়া তাঁহার ফল তৈরি করিয়াছিলেন; অর্থাৎ এই জগতের টুকরো লইয়া খুব শক্ত শিরীষের আঠা দিয়া জুড়িয়াছিলেন সুতরাং দেখিতে কিছু মন্দ হয় নাই। আমাদের এই জগৎকে যেমন নিঃশঙ্কে আকাশে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, এ আপনার কাজ আপনি করিতেছে, আমার নিয়মে আপনি বাড়িয়া উঠিতেছে, কোনো বালাই নাই, বিশ্বামিত্রের জগৎ সেরূপ ছিল না; তাহাকে ভারি সন্তর্পণে রাখিতে হইত, রাজর্ষির দিন-রাত্রি তাহাকে তাঁহার কোঁচার কাপড়ে বাঁধিয়া লইয়া বেড়াইতেন, এক দণ্ড ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু তবু তো সে রহিল না! তাহার কারণ, সে মিথ্যা! মিথ্যা কেমন করিয়া হইল! এইমাত্র যে বলিলাম, এই জগতের টুকরা লইয়াই সে গঠিত হইয়াছে, তবে সে মিথ্যা হইল কী করিয়া? মিথ্যা নয় তো কী? একটি তালগাছের প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম অংশ বজায় থাকিতে পারে, তাহার ছাল আঁশ কাঠ মজ্জা পাতা ফল শিকড় সমস্তই থাকিতে পারে; কিন্তু যে অমোঘ সজীব নিয়মে তাহার নিজ চেষ্টা ব্যতিরেকেও সে দায়ে পড়িয়া তালগাছ হইয়াই উঠিয়াছে, মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও তাহার তুলসীগাছ হইবার জো নাই, সেই নিয়মটি বাহির করিয়া লইলে সে তালগাছ নিতান্ত ফাঁকি হইয়া পড়ে, তাহার উপরে আর কিছুমাত্র নির্ভর করা যায় না! তাহার উপরে যে লোক নির্ভর করিতে পারে, সে কৃষ্ণনগরের কারিগরের গঠিত মাটির কলা খাইতেও পারে— কিন্তু সে কলায় শরীর পুষ্টও হয় না, জিহ্বা তুষ্টও হয় না, কেবল নিতান্ত কলা খাওয়াই হয়।

যাহা বলা হইল তাহাতে এই বুঝাইতেছে যে, অংশ লইয়া অনেক লইয়া সত্য নহে, সত্য একের মধ্যে মূল নিয়মের মধ্যে বাস করে। আমাদের সাহিত্যে নবেল থাকিতে পারে, নাটক থাকিতে পারে, মহাকাব্য গীতিকাব্য খণ্ডকাব্য থাকিতে পারে, সাপ্তাহিক পত্র থাকিতে পারে এবং মাসিক পত্রও থাকিতে পারে কিন্তু সেই অমোঘ নিয়ম না থাকিতেও পারে, যাহাতে করিয়া নবেল নাটক পত্রপুষ্পের মতো আপনা-আপনি বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। আমরা একটি গঠিত সাহিত্য দিনরাত্রি চোখের সুমুখে দেখিতে পাইতেছি। আমরা লিখিবার আগেই সমালোচনা পড়িতে

পাইয়াছি; আমরা আগেভাগেই অলংকারশাস্ত্র পড়িয়া বসিয়া আছি, তাহার পরে কবিতা লিখিতে শুরু করিয়াছি। সুতরাং ল্যাজায় মুড়ায় একাকার হইয়া সমস্তই বিপর্যয় ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাহিত্যটা যেরূপ মোটা হইয়া উঠিতেছে তাহাকে দেখিলে সকলেই পুলকিত হইয়া উঠেন। কিন্তু ওই বিপুল আয়তনের মধ্যে রোগের বীজ বিনাশের কারণ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। কোন্ দিন সকালে উঠিয়াই শুনিব— 'সে নাই।' খবরের কাগজে কালো গণ্ডি আঁকিয়া বলিবে 'সে নাই।' 'কিসে মরিল?' 'তাহা জানি না হঠাৎ মরিয়াছে।' বঙ্গসাহিত্য থাকিতে পারে, খাঁটি বাঙালি জন্মিতে পারে, কিন্তু এ সাহিত্য থাকিবে না। যদি থাকে তো কিছু থাকিবে। যাঁহারা খাঁটি হৃদয়ের কথা বলিয়াছেন তাঁহাদের কথা মরিবে না।

সভ্য ঘরে না জন্মাইলে সভ্যকে 'পুষ্যি' করিয়া লইলে ভালো কাজ হয় না। বরঞ্চ সমস্তই সে মাটি করিয়া দেয়। কারণ সে সভ্যকে জিহ্বার উপরে দিনরাত্রি নাচাইয়া নাচাইয়া আদুরে করিয়া তোলা হয়। সে কেবল রসনা-দুলাল হইয়া উঠে। সংসারের কঠিন মাটিতে নামাইয়া তাহার দ্বারা কোনো কাজ পাওয়া যায় না। সে অত্যন্ত খোশ-পোশাকী হয় ও মনে করে আমি সমাজের শোভা মাত্র! এইরূপ কতকগুলো অকর্মণ্য নবাবী সভ্য পুষিয়া সমাজকে তাহার খোরাক জোগাইতে হয়। আমাদের দেশের অনেক রাজা-মহারাজা শখ করিয়া এক-একটা ইংরাজ চাকর পুষিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাদের দ্বারা কোনো কাজ পাওয়া দূরে থাক্ তাহাদের সেবা করিতে করিতেই প্রাণ বাহির হইয়া যায়! আমরাও তেমনি অনেকগুলি বিলিতি সভ্য পুষিয়াছি, তাহাদিগকে কোনো কাজেই লাগাইতে পারিতেছি না, কেবল গদ্যে পদ্যে কাগজে পত্রে তাহাদের অবিশ্রাম সেবাই করিতেছি। ঘোরো সভ্য কাজকর্ম করে ও ছিপছিপে থাকে, তাহাদের আয়তন দুটো কথার বেশি হয় না আর নবাবী সভ্যগুলো ক্রমিক মোটা হইয়া ওঠে ও অনেকটা করিয়া কাগজ জুড়িয়া বসে— তাহার সাজ-সজ্জা দেখিলে ভালো মানুষ লোকের ভয় লাগে— তাহার সর্বাঙ্গে চারি দিকে বড়ো বড়ো নোটগুলো বটগাছের শিকড়ের মতো ঝুলিতেছে— বড়ো বড়ো ইংরিজির তর্জমা, অর্থাৎ ইংরিজি অপেক্ষা ইংরিজিতর সংস্কৃত, যে সংস্কৃত শব্দের গন্ধ নাকে প্রবেশ করিলে শুচি লোকদিগকে গঙ্গাস্নান করিতে হয়, এমনতরো বৃহদায়তন স্লেচ্ছ সংস্কৃত ও অসাধু সাধু ভাষা গলগণ্ডের মতো, ফোস্কার মতো, ব্রণর মতো তাহার সর্বাঙ্গে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে— তাহারই মধ্যে আবার বন্ধনী-চিহ্নিত ইংরিজি শব্দের উল্কির ছাপ— ইহার উপরে আবার ভূমিকা উপসংহার পরিশিষ্ট— পাছে কেহ অবহেলা করে এইজন্য তাহার সঙ্গে সঙ্গে সাত-আটটা করিয়া নকীব তাহার সাতপুরুষের নাম হাঁকিতে হাঁকিতে চলে— বেকন্, লক্, হব্‌স্, মিল্, স্পেন্সর, বেন্— শুনিয়া আমাদের মতো ভীতু লোকের সর্দিগর্মি হয়, পাড়াগেঁয়ে লোকের দাঁতকপাটি লাগে। যাহাই হউক, এই বক্তিতার শাসনেই আমরা চলিতেছি। এমনি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সভ্য বিলিতি বুটজুতা পরিয়া না আসিলে তাহাকে ঘরে ঢুকিতে দিই না। এবং সত্যের পায়ে [illegible] পায়ে নাগ্‌রা জুতো দেখিলে আমাদের পিত্তি জ্বলিয়া ওঠে ও তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত [illegible] আরম্ভ করি! যদি শুনিতে পাই, সংস্কৃতে এমন একটা দ্রব্যের বর্ণনা আছে, যাহাকে টানিয়া-বুনিয়া টেবিল বলা যাইতে পারে বা রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের বিশেষ একটা জায়গায় কাঁটাচামচের সংস্কৃত প্রতিশব্দ পাওয়া গিয়াছে। বা বারুণী ব্র্যান্ডির, সুরা শেরীর, মদিরা ম্যাডেরার, বীর বিয়ারের অবিকল ভাষান্তর মাত্র— তবে আর আমাদের আশ্চর্যের সীমা-পরিসীমা থাকে না— তখনই সহসা চৈতন্য হয় তবে তো আমরা সভ্য ছিলাম! যদি প্রমাণ করিতে পারি, বিমানটা আর কিছুই নয়, অবিকল এখানকার বেলুন, এবং শতঘ্নীটা কামান ছাড়া আর কিছু হইতেই পারে না, তাহা হইলেই ঋষিগুলোর উপর আর কথঞ্চিৎ শ্রদ্ধা হয়! এ-সকল তো নিতান্ত অপদার্থের লক্ষণ! সকলেই বলিতেছেন, এইরূপ শিক্ষা, এইরূপ চর্চা হইতে আমরা বিস্তর ফল লাভ করিতেছি। ঠিক কথা, কিন্তু সে ফলগুলো কী রকমের? গজভুক্তকপিত্থবৎ।

ইহার ফল কি এখনি দেখা যাইতেছে না! আমরা প্রতিদিনই কি মনুষ্যত্বের যথার্থ গাম্ভীর্য

হারাইতেছি না। এক প্রকার বিলিতি পুতুল আছে তাহার পেট টিপিলেই যে মাথা নাড়িয়া ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করিয়া খঞ্জনী বাজাইতে থাকে, আমরাও অনবরত সেইরূপ ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দও করিতেছি, মাথা নাড়িয়া খঞ্জনীও বাজাইতেছি, কিন্তু গাম্ভীর্য কোথায়। মানুষের মতো দেখিতে হয় কই যে, বাহিরের পাঁচ জন লোক দেখিয়া শ্রদ্ধা করিবে। আমরা জগতের সম্মুখে পুৎলোবাজি আরম্ভ করিয়াছি, খুব ধড়ফড় ছটফট করিতেছি ও গগনভেদী তীক্ষ্ণ উচ্চস্বরে কথোপকথন আরম্ভ করিয়াছি। সাহেবরা কখনো হাসিতেছেন, কখনো হাততালি দিতেছেন, আমাদের নাচনী ততই বাড়িতেছে, গলা ততই উঠিতেছে! ভুলিয়া যাইতেছি এ কেবল অভিনয় হইতেছে মাত্র— ভুলিয়া যাইতেছি যে জগৎ একটা নাট্যশালা নহে, অভিনয় করাও বা কাজ করাও তা একই কথা নহে। পুতুল নাচ যদি করিতে চাও, তবে তাহাই করো— আর কিছু করিতেছি মনে করিয়া বুক ফুলাইয়া বেড়াইয়ো না; মনে করিয়ো না যেন সংসারের যথার্থ গুরুতর কার্যগুলি এইরূপে অতি সহজে অবহেলে ও অতি নিরুপদ্রবে সম্পন্ন করিয়া ফেলিতেছি; মনে করিয়ো না অন্যান্য জাতিরা শত শত বৎসর বিপ্লব করিয়া প্রাণপণ করিয়া, রক্তপাত করিয়া যাহা করিয়াছেন আমরা অতিশয় চালাক জাতি কেবলমাত্র ফাঁকি দিয়া তাহা সারিয়া লইতেছি— জগৎসুদ্ধ লোকের একেবারে তাক লাগিয়া গিয়াছে। আমাদের এই প্রকার চাটুলতা অত্যন্ত বিস্ময়জনক সন্দেহ নাই— কিন্তু ইহা হইতেই কি প্রমাণ হইতেছে না আমরা ভারি হাল্কা। এ প্রকার ফড়িংবৃত্তি করিয়া জাতিত্বের অতি দুর্গম উন্নতিশিখরে উঠা যায় না এবং এই প্রকার ঝিঁঝিপোকার মতো চেঁচাইয়া কাল নিশীথের গভীর নিদ্রাভঙ্গ করানো অসম্ভব ব্যাপার। অত্যন্ত অভদ্র, অনুদার, সংকীর্ণ গর্বস্ফীত ভাবের প্রাদুর্ভাব কেন হইতেছে! লেখায় কুরুচি, ব্যবহারে বর্বরতা, সহৃদয়তার আত্যন্তিক অভাব কেন দেখা যাইতেছে! কেন পূজ্য ব্যক্তিকে ইহারা ভক্তি করে না, গুণে সম্মান করে না, সকলই উড়াইয়া দিতে চায়। মনুষ্যত্বের প্রতি ইহাদের বিশ্বাস নাই কেন? যখনি কোনো বড়ো লোকের নাম করা যায়, তখনি সমাজের নিতান্ত বাজে লোকেরা রাম শ্যাম কার্তিকেরাও কেন বলে, হ্যাঁঃ, অমুক লোকটা হম্বগ, অমুক লোকটা ফাঁকি দিয়া নাম করিয়া লইয়াছে, অমুক লোকটা আর-এক জনকে দিয়ে লিখাইয়া লয়, অমুক লোকটা লোকের কাছে খ্যাত বটে, কিন্তু খ্যাতির যোগ্য নহে। ইহারা প্রাণ খুলিয়া ভক্তি করিতে জানে না, ভক্তি করিতে চাহে না, ভক্তিভাজন লোকদিগকে হট করিতে পারিলেই আপনাদিগকে মস্ত লোক মনে করে, এবং যখন ভক্তি করা আবশ্যক বিবেচনা করে তখন সে কেবল ইংরাজি দস্তুর বলিয়া সভ্যজাতির অনুমোদিত বলিয়া করে, মনে করে দেখিতে বড়ো ভালো হইল। এত অবিশ্বাস কেন, এত [illegible] এত স্পর্ধা কেন— অভদ্রতা এত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে কেন, ছেলেপিলেগুলো [illegible] কেন, [illegible] ভীরুদিগের ন্যায় অকারণ গায়ে পড়া রূঢ় ব্যবহার ও [illegible] পারিলেই আপনাদিগকে মহাবীর বলিয়া মনে করিতেছে কেন, [illegible] বুকে চাদর বাঁধিয়া মালকোঁচা আঁটিয়া হাতের আস্তিন [illegible] ছুরি দিয়া খুঁ দিয়া [illegible] উড়াইয়া দিবার সংকল্প করিয়াছেন [illegible]! তাহার [illegible] প্রাদুর্ভাব হইয়াছে বলিয়া— কিছুরই 'পরে যথার্থ [illegible] নাই, কিছুরই যে যথার্থ মূল্য আছে তাহা কেহ মনে করে না, সকলই মুখের কথা, [illegible] ও মাদকতার সহায় মাত্র। সেইজন্যই সকলেই দেখিতেছেন, আজকাল [illegible] ছিবলেমির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। জগৎ যেন একটা তামাশা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং আমরা কেবল যেন মজা দেখিতেই আসিয়াছি। খুব মিটিং করিতেছি, খুব কথা কহিতেছি, আজ এখানে যাইতেছি, কাল ওখানে যাইতেছি, ভারি মজা হইতেছে। আতসবাজি দেখিলে ছেলেরা যেমন আনন্দে একেবারে অধীর হইয়া উঠে, এক-একজন লোক বক্তৃতা দেয় আর ইহাদের ঠিক তেমনিতরো আনন্দ হইতে থাকে, হাত-পা নাড়িয়া চেঁচাইয়া, করতালি দিয়া আহ্লাদ আর রাখিতে পারে না; বক্তাও উৎসাহ পাইয়া আর কিছুই করেন না, কেবলই মুখ-গহ্বর হইতে তুবড়িবাজি ছাড়িতে

থাকেন, উপস্থিত ব্যক্তিদিগের আর কোনো উপকার না হউক অত্যন্ত মজা বোধ হয়। মজার বেশি হইলেই অন্ধকার দেখিতে হয়, মজার কম হইলেই মন টেঁকে না, যেমন করিয়া হউক মজাটুকু চাই-ই। যতই গম্ভীর হউক ও যতই পবিত্র হউক-না কেন, জীবনের সমুদয় অনুষ্ঠানই একটি মিটিং, গোটাকতক হাততালি ও খবরের কাগজের প্রেরিত পত্রে পরিণত করিতে হইবে— নহিলে মজা হইল না! গম্ভীরভাবে অপ্রতিহত প্রভাবে আপনার কাজ আপনি করিব, আপনার উদ্দেশ্যের মহত্ত্বে আপনি পরিপূর্ণ হইয়া তাহারই সাধনায় অবিশ্রাম নিযুক্ত থাকিব, সুদূর লক্ষ্যে প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দক্ষিণে বামে কোনো দিকে দৃক্‌পাতমাত্র না করিয়া সিধা রাস্তা ধরিয়া চলিব; চটক লাগাইতে করতালি জাগাইতে চেঁচাইয়া ভূত ভাগাইতে নিতান্তই ঘৃণা বোধ করিব, কোথাকার কোন্ গোরা কী বলে না-বলে তাহার প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ করিব না এমন ভাব আমাদের মধ্যে কোথায়! কেবলই হৈ হৈ করিয়া বেড়াইব ও মনে করিব কী-যেন একটা হইতেছে! মনে করিতেছি, ঠিক এইরকম বিলাতে হইয়া থাকে, ঠিক এইরকম পার্লামেন্টে হয়, এবং আমাদের এই আওয়াজের চোটে গবর্মেন্টের তক্তপোশের নীচে ভূমিকম্প হইতেছে। আমরা গবর্মেন্টের কাছে ভিক্ষা করিতেছি, অথচ সেইসঙ্গে ভান করিতেছি যেন বড়ো বীরত্ব করিতেছি; সুতরাং চোখ রাঙাইয়া ভিক্ষা করি ও ঘরে আসিয়া ভাত খাইতে খাইতে মনে করি হ্যাম্প্‌ডেন ও ক্রমোয়েলগণ ঠিক এইরূপ করিয়াছিলেন; আহারটা বেশ তৃপ্তিপূর্বক হয়। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, চোখ-রাঙানি ও বুক-ফুলানির যতই ভান কর-না-কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত ভিক্ষাবৃত্তিকে আমাদের উন্নতির একমাত্র বা প্রধানতম উপায় বলিয়া গণ্য করিব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের যথার্থ উন্নতি ও স্থায়ী মঙ্গল কখনোই হইবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার অলক্ষ্য ও অদৃশ্যভাবে পিছনের দিকেই অগ্রসর হইতে থাকিব। গবর্মেন্ট যতই আমাদিগকে এক-একটি করিয়া অধিকার ও প্রসাদ দান করিতেছেন, ততই দৃশ্যত লাভ হইতেছে বটে, কিন্তু অদৃশ্যে যে লোকসানটা হইতেছে তাহার হিসাব রাখে কে? ততই যে গবর্মেন্টের উপর নির্ভর বাড়িতেছে। ততই যে ঊর্ধ্ব কণ্ঠে বলিতেছি 'জয় ভিক্ষাবৃত্তির জয়'— ততই যে আমাদের প্রকৃত জাতিগত ভাবের অবনতি হইতেছে। বিশ্বাস হইতেছে চাহিলেই পাওয়া যায়, জাতির যথার্থ উদ্যম বেকার হইয়া পড়িতেছে, কণ্ঠস্বরটাই কেবল অহংকারে ফুলিয়া উঠিতেছে ও হাত-পাগুলো পক্ষাঘাতে জীর্ণ হইতেছে। গবর্মেন্ট যে মাঝে মাঝে আমাদের আশাভঙ্গ করিয়া দেন, আমাদের প্রার্থনা বিফল করিয়া দেন, তাহাতে আমাদের মহৎ উপকার হয়, আমাদের সহসা চৈতন্য হয় যে, পরের উপরে যতখানা নির্ভর করে ততখানাই অস্থির, এবং নিজের উপর যতটুকু নির্ভর করে, ততটুকুই ধ্রুব! এ সময়ে, এই লঘুচিত্ততার নাট্যোৎসবের সময়ে আমাদিগকে যথার্থ মনুষ্যত্ব ও পৌরুষ শিখাইবে কে? অতিশয় সহজসাধ্য ভান দেশহিতৈষিতা হইতে ফিরাইয়া লইয়া যথার্থ গুরুতর কঠোর কর্তব্য সাধনে কে প্রবৃত্ত করাইবে! সাহেবদিগের বাহবাধ্বনির ঘোরতর কুহক হইতে কে মুক্ত করিবে! সে কি এই ভা[illegible] সাহিত্য! এ[illegible] ফাঁকা আওয়াজ! সকলেই একতানে ওই একই কথা বলিতেছে কেন? সকলে[illegible] একবাক্যে কেন বলিতেছে ভিক্ষা চাও, ভিক্ষা চাও! কেহ কি হৃদয়ের কথা বলিতে জানে না কেবলই কি প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনি উঠাইতে হইবে! যতবড়ো গুরুতর কথাই হউক-না-কেন দেশের যতই হিত বা অহিতের কারণ হউক-না-কেন, কথাটা লইয়া কি কেবল একটা রবারে[illegible] গোলার মতো মুখে মুখে লোফালুফি করিয়া বেড়াইতে হইবে! এ কি কেবল খেলা! এ [illegible] তামাশা, আর কিছুই নয়। হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবার নাই, বিবেচনা করিবার নাই— গুলি[illegible]গুলো খেলানো ছাড়া তাহার আর কোনো ফলাফল নাই! যথার্থ হৃদয়বান লোক যদি থাকে[illegible] তাঁহারা একবার একবাক্যে বলুন— যে, যথার্থ কর্তব্য কার্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া পরে[illegible] মুখাপেক্ষা না করিয়া পরের প্রশংসাপেক্ষা না করিয়া গম্ভীরভাবে আমরা নিজের কাজ নি[illegible] করিব, সবই যে ফাঁকি, সবই যে তামাশা, সবই যে কণ্ঠস্থ, তাহা নয়— কর্তব্য যতই সামা[illegible] হউক-না-কেন, তাহার গাম্ভীর্য আছে, তাহার মহিমা আছে, তাহার সহিত ছেলেখেলা করি[illegible]

গেলে তাহা অতিশয় অমঙ্গলের নিদান হইয়া উঠে। Agitation করিতে হয় তো করো, কিন্তু দেশের লোকের কাছে করো— দেশের লোককে তাহাদের ঠিক অবস্থাটি বুঝাইয়া দাও— বলো যে, গবর্মেন্ট যাহা করিবার তাহা করিতেছেন, কেবল তোমরাই কিছু করিতেছ না। তোমরা শিক্ষা লাভ করো, শিক্ষা দান করো, অবস্থার উন্নতি করো। দেশের যাহা-কিছু অবনতি তাহা তোমাদেরই দোষে, গবর্মেন্টের দোষে নহে। এ কথা বলিবামাত্রই চারি দিকের খুচরা কাগজপত্রে বড্ড গোলমাল উঠিবে— তাহারা বলিবে এ কী কথা! ইংলন্ডে তো এরূপ হয় না, Political Agitation বলিতে তো এমন বুঝায় না, Mazzini তো এমন কথা বলেন নাই; Garibaldi যে আর-এক রকম কথা বলিয়াছেন— Washington-এর কথার সহিত এ কথাটার ঐক্য হইতেছে না, যদি একটা কাজ করিতেই হইল তবে ঠিক পার্ল্যামেন্টের অনুসারে করাই ভালো ইত্যাদি। উহারাও আবার যদি কথা কহিতে আসে তো কহুক-না, উহাদের মাথা চাষ করিলে বালি ওঠে, আবাদ করিলে কচুও হয় না, অতএব বাঁধি বোলের মহাজনী না করিলে উহাদের গুজরান চলে না। কিন্তু হৃদয়ের কথা সমস্ত কোলাহল অতিক্রম করিয়া কানের মধ্যে গিয়া পৌঁছাইবেই ইহা নিশ্চয়ই!

সেদিন কথোপকথনকালে একজন শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি বলিতেছিলেন যে, রোমকেরা যখন প্রাচীন ইংলন্ডের অকালসভ্য শেল্টদিগকে ফেলিয়া আসিয়াছিল, তখন তাহার ইংলন্ডেই পড়িয়াছিল, কিন্তু ইংরাজ যদি কখনো ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া যায়, তবে জাহাজে গিয়া দেখিবে বাঙালিরা আগেভাগে গিয়া কাপ্তেন নোয়া সাহেবের পা-দুটি ধরিয়া জাহাজের খোলের মধ্যে চাদর মুড়ি দিয়া গুটিসুটি মারিয়া বসিয়া আছে! আর কেহ যাক না-যাক— আধুনিক বাংলা সাহিত্যটা তো যাইবেই! কারণ ইংরাজি সাহিত্যের গ্যাসলাইট ব্যতীত এ সাহিত্য পড়া যায় না, হৃদয়ের আলোক এখানে কোনো কাজে লাগিবে না, কারণ, ইহা হৃদয়ের সাহিত্য নহে। আমার বাংলা পড়ি বটে কিন্তু ইংরাজির সহিত মিলাইয়া পড়ি— ইংরাজি চলিয়া গেলে এ বাংলা রাশীকৃত কতকগুলো কালো কালো আঁচড়ে পরিণত হইবে মাত্র! সুতরাং সেই হীনাবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য এ যে আগেভাগে জাহাজে গিয়া চড়িয়া বসিবে তাহার কোনো ভুল নাই— সেখানে গিয়া বাবুর্চিখানার উনুন জ্বালাইবে বটে, কিন্তু তবুও থাকিবে ভালো!

অকাল কুষ্মাণ্ড কাহাকে বলে জানি না, কিন্তু এরূপ সাহিত্যকে কি বলা যায় না!

একটা আশার কথা আছে; এ সাহিত্য চিরদিন থাকিবার নহে। এ সাহিত্য নিজের রোগ নিজে লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এ নিজের বিনাশ নিজে সাধন করিবে— কেবল দুঃখ এই যে, মরিবার পূর্বে বিস্তর হানি করিয়া তবে মরিবে; অতএব এ পাপ যত শীঘ্র বিদায় হয় ততই ভালো। প্রভাত হইবে কবে, নিশাচরের মতো অন্ধকারে কতকগুলা মশাল জ্বালাইয়া তারস্বরে উৎকট উৎসবে না মাতিয়া, নিশীথের গুহার মধ্যে দল বাঁধিয়া বিশৃঙ্খল অস্বাভাবিক উন্মত্ততা না করিয়া কবে পরিষ্কার দিনের আলোতে বিমল-হৃদয়ে আগ্রহের সহিত, সকলে মিলিয়া নূতন উৎসাহে, স্বাস্থ্যের উল্লাসে, সংসারের যথার্থ কাজগুলি সমাধা করিতে আরম্ভ করিব! সেই দিন প্রভাতে বাঙালির যথার্থ হৃদয়ের সাহিত্য জাগিয়া উঠিবে, অলসদিগকে ঘুম হইতে জাগাইয়া তুলিবে, নিরাশ-হৃদয়েরা পাখির গান শুনিয়া প্রভাতের সমীরণ স্পর্শ করিয়া ও নবজীবনের উৎসব দেখিয়া নূতন প্রাণ লাভ করিবে অর্থাৎ বাংলাদেশ হইতে নিদ্রার রাজত্ব, প্রেতের উৎসব, অস্বাস্থ্যের গুপ্ত সঞ্চরণ একেবারে দূর হইয়া যাইবে। জানি না সে কোন্ শক কোন্ সাল, সেই বৎসরই সাবিত্রী লাইব্রেরির যথার্থ গৌরবের সাংবৎসরিক উৎসব হইবে, সেদিনকার লোক সমাগম, সেদিনকার উৎসাহ, সেদিনকার প্রতিভার দীপ্তি ও কেবলমাত্র বহিঃস্থিত দর্শকদের জড় কৌতূহলের ভাব নহে যথার্থ প্রাণে প্রাণে মিলন কল্পনাচক্ষে অস্পষ্ট ছায়ার মতো দেখা যাইতেছে।

ভারতী
চৈত্র ১২৯০

হাতে কলমে

প্রেমের ধর্ম এই, সে ছোটোকেও বড়ো করিয়া লয়। আর, আড়ম্বর-প্রিয়তা বড়োকেও ছোটো করিয়া দেখে। এই নিমিত্ত প্রেমের হাতে কাজের আর অন্ত নাই, কিন্তু আড়ম্বরের হাতে কাজ থাকে না। প্রেম শিশুকেও অগ্রাহ্য করে না, বার্ধক্যকে উপেক্ষা করে না, আয়তন মাপিয়া সমাদরের মাত্রা স্থির করে না। প্রেমের অসীম ধৈর্য; যে চারা শত বৎসর পরে ফলবান হইবে, তাহাতেও সে এমন আগ্রহসহকারে জলসেক করে যে, ব্যবসায়ী লোকেরা ফলবান তরুকেও তেমন যত্ন করিতে পারে না। সে যদি একটা বড়ো কাজে হাত দেয়, তবে তাহার ক্ষুদ্র সোপানগুলিকে হতাদর করে না। প্রেম, প্রেমের সামগ্রীর বসনের প্রান্ত চরণের চিহ্ন পর্যন্ত ভালোবাসিয়া দেখে। আর আড়ম্বর ধরাকেও সরা জ্ঞান করে। ছোটো কাজের কথা হইলেই তিনি বলিয়া বসেন, 'ও পরে হইবে।' তিনি বলেন, এক-পা এক-পা করিয়া চলাও তো আপামরসাধারণ সকলেই করিয়া থাকে, তবে উৎকট লম্ফ-প্রয়োগ যদি বল তবে তিনিই তাহা সাধন করিবেন এবং ইতিহাসে যদি সত্য হয় তবে ত্রেতাযুগে তাঁহারই এক পূর্বপুরুষ তাহা সাধন করিয়াছিলেন।[1] তিনি এমন সকল কাজে হস্তক্ষেপ করেন যাহা 'ঊনবিংশ শতাব্দীর' শাস্ত্রসম্মত, ইতিহাসসম্মত, যাহা কনস্টিট্যুশনল। সমস্ত ভারতবর্ষের যত দুঃখ-দুর্দশা, দুর্ঘটনা, দুর্নাম আছে সমস্তই তিনি বালীর লাঙ্গুলপাশবদ্ধ দশাননের ন্যায় এক পাকে জড়াইয়া একই কালে ভারতসমুদ্রের জলে চুবাইয়া মারিবেন, কিন্তু ভারতবর্ষের কোনো-একটা ক্ষুদ্র অংশের কোনো-একটা কাজ সে তাঁহার দ্বারা হইয়া উঠিবে না। বিপুলা পৃথিবীতে জন্মিয়া ইঁহার আর কোনো কষ্ট নাই, কেবল স্থানাভাবের জন্য কিঞ্চিৎ কাতর আছেন। বামনদেব তিনপায়ে তিন লোক অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু তদাপেক্ষা বামন এই বামনশ্রেষ্ঠের জিহ্বার মধ্যে তিনটে লোক তিনটে বাতাসার মতো গলিয়া যায়! 'হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী' ও 'সিন্ধুনদ হইতে ব্রহ্মপুত্রের' মধ্যে অবিশ্রাম ফুঁ দিয়া ইনি একটা বেলুন বানাইতেছেন; অভিপ্রায়, আসমানে উড়িবেন; সেখানে আকাশ-কুসুমের ফলাও আবাদ করিবার অনুষ্ঠান-পত্র বাহির হইয়াছে। ইনি যদি ইঁহার উদ্দেশ্য কিঞ্চিৎ সংক্ষেপ করেন সে একরকম হয়, আর তা যদি নিতান্ত না পারেন তবে না হয় খুব ঘটা করিয়া নিদ্রার আয়োজন করুন। হিমালয় নামক উঁচু জায়গাটাকে শিয়রের বালিশ করিয়া কন্যাকুমারী পর্যন্ত পা ছড়াইয়া দিন, দুই পাশে দুই ঘাটগিরি রহিল। স্থানসংক্ষেপ করিয়া কাজ নাই, কারণ আড়ম্বরের স্বভাবই এই, একবার সে যখন ঘুমায় তখন চতুর্দিকে হাত-পা ছড়াইয়া এমনি আয়োজন করিয়া ঘুমায় যে, কাহার সাধ্য তাহাকে জাগায়। তাহার জাগরণও যেরূপ বিকট তাহার ঘুমও সেইরূপ সুগভীর।

কেবল আড়ম্বর-প্রিয়তার নহে, ক্ষুদ্রত্বেরই লক্ষণ এই যে, সে ক্ষুদ্রের প্রতি মন দিতে পারে না। পিপীলিকাকে আমার যে চক্ষে দেখি ঈশ্বর সে চক্ষে দেখেন না। বড়োর প্রতি যে মনোযোগ বা হস্তক্ষেপ করে, আত্মশ্লাঘা, যশ, ক্ষমতাপ্রাপ্তির আশায় সদাসর্বক্ষণ তাহাকে উত্তেজিত করিয়া রাখিতে পারে, সে তাহার ক্ষুদ্রত্বের চরম পরিতৃপ্তি লাভ করিতে থাকে। কিন্তু ছোটোর প্রতি যে মন দেয়, তাহার তেমন উত্তেজনা কিছুই থাকে না, সুতরাং তাহার প্রেম থাকা চাই, তাহার মহত্ত্ব থাকা চাই— তাহার পুরস্কারের প্রত্যাশা নাই, সে প্রাণের টানে সে নিজের মহিমার প্রভাবে কাজ করে, তাহার কাজের আর অন্ত নাই।

আত্মপরতা অপেক্ষা স্বদেশ-প্রেম যাহার বেশি সেই প্রাণ ধরিয়া স্বদেশের ক্ষুদ্র দুঃখ ক্ষুদ্র অভাবের প্রতি মন দিতে পারে; সে কিছুই ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করে না। বাস্তবিকপক্ষে কোন্‌টা

১. ইহা যদি কেহ 'রুচিবিরুদ্ধ' বা গালাগালি জ্ঞান করেন তবে আমি 'ঊনবিংশ শতাব্দীর' ডারুয়িনের দোহাই দিব!

ছোটো কোন্‌টা বড়ো তাহা স্থির করিতে পারে কে! ইতিহাসবিখ্যাত একটা কুহেলিকাময় দিগ্‌গজ ব্যাপারই যে বড়ো, আর দ্বারের নিকটস্থ একটি রক্তমাংসময় দৃষ্টিগোচর অসম্পূর্ণতাই যে সামান্য তাহা কে জানে! কিসের হইতে যে কী হয়, কোন্ ক্ষুদ্র বীজ হইতে যে কোন্ বৃহৎ বৃক্ষ হয় তাহা জানি না, এই পর্যন্ত জানি সহজ হৃদয়ের প্রেম হইতে কাজ করিলে কিছুই আর ভাবিতে হয় না। কারণ, সহজ ভাবের গুণ এই, সে আর হিসাবের অপেক্ষা রাখে না। তাহার আপনার মধ্যেই আপনার নথী, আপনার দলিল। তাহাকে আর চৌদ্দ অক্ষর গণিয়া ছন্দ রচনা করিতে হয় না, সুতরাং তাহার আর ছন্দোভঙ্গ হয় না; আর যাহাকে গণনা করিতে হয়, তাহার গণনায় ভুল হইতেই বা আটক কী! সে বড়োকে ছোটো মন করিতে পারে, ছোটোকে বড়ো মনে করিতে পারে।

আমাদের স্বদেশহিতৈষীদের কোনো দোষ দেওয়া যায় না। তাঁহাদের এক হাতে ঢাল এক হাতে তলোয়ার— তাঁহাদের হাতের অপেক্ষা হাতিয়ার বেশি হইয়া পড়িয়াছে, এইজন্য কাজকর্ম সমস্তই একেবারে স্থগিত রাখিতে হইয়াছে। এবং এই অবসরে দুশো পাঁচশো ঊর্ধ্বপুচ্ছ জিহ্বা এককালে ছাড়া পাইয়া দেশের লোকের কানের মাথাটি মুড়াইয়া ভক্ষণ করিতেছে। এই-সকল ভীমার্জুনের প্রপৌত্রগণের, স্বদেশের উপর প্রেম এত অত্যন্ত বেশি যে স্বদেশের 'লোকের' উপর প্রেম আর বড়ো অবশিষ্ট থাকে না। এই কারণে, ইহারা স্বদেশের হিতসাধনে অত্যন্ত উন্মুখ, সুতরাং স্বদেশীর হিতসাধনে সময় পান না। ব্যাপারটা যে কীরূপ হইতেছে তাহা বলা বাহুল্য। ঘোড়াটা না খাইতে পাইয়া মরিতেছে ও সকলে মিলিয়া একটা ঘোড়ার ডিম লইয়া তা' দিতেছেন, দেশে-বিদেশে রাষ্ট্র তাহা হইতে এক জোড়া পক্ষিরাজের জন্ম হইবে।

যে ব্যক্তি দয়া প্রচার করিয়া বেড়ায় অথচ ভিক্ষুককে এক মুঠা ভিক্ষা দেয় না, তাহার প্রতি আমার কেমন স্বভাবতই অবিশ্বাস জন্মে। সে কথায় বড়ো বড়ো চেক কাটে, কেননা কোনো ব্যাঙ্কেই তাহার এক পয়সা জমা নাই। পুরাকালে কাঠবিড়ালীদের মধ্যে একজন জ্ঞানী জন্মিয়াছিলেন। তিনি কুলবৃক্ষে বাস করিতেন। দর্শনশাস্ত্রে যখন তাঁহার অত্যন্ত ব্যুৎপত্তি জন্মিল, তখন তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন যে, একটি শ্বেত পদার্থের অপেক্ষা শ্বেতবর্ণ ব্যাপক, একটি কুলফলের অপেক্ষা কুলফলত্ব বৃহৎ, কারণ তাহা চরাচরস্থ যাবৎ কুলফলের আধার। এই মহৎতত্ত্ব আবিষ্কারের পর হইতে কুলের প্রতি তাঁহার এমনি ঘৃণা জন্মিল যে, তিনি কুল ভক্ষণ একেবারে পরিত্যাগ করিলেন— কুলত্বের চারা কীরূপে আবাদ করা যাইতে পারে ইহারই অন্বেষণে তাঁহার অবশিষ্ট জীবন ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই গুরুতর গবেষণার প্রভাবে তাঁহার অবশিষ্ট জীবন এমন সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিল যে, কুলত্বের চারা আজ পর্যন্ত বাহির হইল না। আজিও সেই কুলগাছ তাঁহার সমাধির উপরে মুনমেন্টস্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে, এবং ভক্ত কাঠবিড়ালীগণ আজিও দূর-দূরান্তর হইতে আসিয়া তাঁহাকে স্মরণপূর্বক সেই বৃক্ষ হইতে পেট ভরিয়া কুল খাইয়া যায়। বিষ্ণুশর্মার অপ্রকাশিত পুঁথিতে এই গল্পটি পাঠ করিয়া আমার মনে হইল, হিতবাদ, প্রত্যক্ষবাদ এবং অন্যান্য বাদানুবাদের ন্যায় উক্ত কুলফলত্ববাদও সমাজে বহুল পরিমাণে প্রচলিত আছে। কিন্তু এই 'বাদ'কে যে কোনো অনুষ্ঠান আশ্রয় করে সে উক্ত পূজনীয় কাঠবিড়ালী মহাশয়ের ন্যায় বেশিদিন বাঁচে না। আমাদের দেশহিতৈষিতাও বোধ করি নিজের মহত্ত্বের অভিমানে স্থূল খাদ্য ভক্ষণ করা নিতান্ত হেয় জ্ঞান করিয়া হাওয়া ও বাষ্পের মতো খোরাকে জীবনধারণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। এই নিমিত্ত দেখা যায় আমাদের এই দেশহিতৈষিতা পদার্থটা কামারের হাপরের ন্যায় মুহূর্তের মধ্যে ফুলিয়া ঢাক হইয়া উঠিতেছে এবং পরের মুহূর্তেই চুপসিয়া শুকনা চামচিকার আকার ধারণ করিতেছে। ইহার উত্তরোত্তর উন্নতি নাই। ইহা হাওয়ার গতিকে হঠাৎ ফাঁপিয়া উঠে, আবার একটু আঘাত পাইলেই আওয়াজ করিয়া ফাটিয়া যায়, তার পরে আর সে আওয়াজও করে না, কোলেও না। কিন্তু, খোরাক বদল করা যায় যদি, যদি ইহা ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল পদার্থের প্রতি দক্ষিণহস্ত চালনা করে, তবে আর এমনতরো আকস্মিক

দুর্ঘটনাগুলো ঘটিতে পায় না।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। আজকাল প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়াই ইংরাজ-কর্তৃক দেশীয়দের প্রতি অত্যাচারের কাহিনী একটা-না-একটা শুনিতেই হয়। কিন্তু কে সেই স্বদেশীয় অসহায়দের সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়! বাংলার জেলায় জেলায় নবাব সিরাজুদ্দৌলার বিলিতি উত্তরাধিকারীগণ চাবুক হস্তে দোর্দণ্ড প্রতাপে যে রাজত্ব অর্থাৎ অরাজকত্ব করিতেছে, তাহাদের হাত হইতে আমাদের দেশের সরলপ্রকৃতি গরীব অনাথদের পরিত্রাণ করিতে কে ধাবমান হয়! পেট্রিয়টেরা বলিতেছেন স্বদেশের দুঃখে তাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, অর্থাৎ তাঁহারা পাকে-প্রকারে জানাইতে চান তাঁহাদের হৃদয় নামক একটা পদার্থ আছে; তাঁহার তাঁহাদের 'মাথাব্যথার' কথাটা এমনই রাষ্ট্র করিয়া দিতেছেন যে, লোকে তাঁহাদের মাথা না দেখিতে পাইলেও মনে করে সেটা কোনো এক জায়গায় আছে বা। কিন্তু হৃদয় যদি থাকিবে, হৃদয়ের সাড়া পাওয়া যায় না কেন? চারি দিক হইতে যখন নিপীড়ত স্বদেশীদের আর্তস্বর উঠিতেছে, তখন সেই স্বজাতিবৎসল হৃদয় নিদ্রা যায় কী করিয়া? এই তো সেদিন শুনিলাম, স্বজাতিদুঃখকাতর কতকগুলি লোক মিলিয়া একটি সভা স্থাপন করিয়াছেন, আমাদের দেশীয় ব্যারিস্টর অনেকগুলি তাহাতে যোগ দিয়াছেন। কিন্তু বোধ করি, উক্ত ব্যারিস্টরগুলির মধ্যে মহাত্মা মনোমোহন ঘোষ ব্যতীত এমন অল্প লোকই আছেন যাঁহারা বিদেশীয় অত্যাচারীর হস্ত হইতে স্বদেশীয় অসহায়কে মুক্তি দিবার জন্য প্রাণ ধরিয়া টাকার মায়া ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন। স্বজাতির প্রতি যাঁহাদের আন্তরিক প্রাণের টান নাই, তাঁহাদের 'স্বদেশ' জিনিসটা কী জানিতে কৌতূহল হয়! সেটা কি রাম লক্ষ্মণ সীতা হনুমান ও রাবণ -বিবর্জিত রামায়ণ? না কলার আত্যন্তিক অভাববিশিষ্ট কলার কাঁদি! না লাঙ্গুলের সম্পর্কশূন্য কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড! ইতিহাসপড়া স্বদেশহিতৈষিতা এমনিতরো একটা ঘোড়া-ডিঙাইয়া ঘাস-খাওয়া। দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্ত স্বদেশের দুঃখে যাহাদের হৃদয় একেবারে বিদীর্ণ হয়, তাহারা সেই হৃদয়বিদারণ-ব্যাপারটাকে বিশেষ একটা দুর্ঘটনা বলিয়া জ্ঞান করে না। তাহারা সেই বিদীর্ণ হৃদয়টাকে সভায় লইয়া আসে, তাহার মধ্যে ফুঁ দিয়া ভেঁপু বাজাইতে থাকে ও উৎসব বাধাইয়া দেয়। আমাদের দেশে সম্প্রতি এই বিদীর্ণ-হৃদয়ের রীতিমতো কন্সর্ট বসিয়া গেছে, নৃত্যেরও বিরাম নাই। কিন্তু এই অবিশ্রাম নৃত্যের উৎসাহে কিছুক্ষণের মধ্যে নটদিগের শরীর ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে ও তাহারা নাট্যশালার আলো নিভাইয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া গৃহে গিয়া শয়ন করে। কিন্তু দেশের লোকের সত্যকার ক্রন্দনধ্বনিতে— অলংকারশাস্ত্রসম্মত কাল্পনিক অশ্রুজলে নহে— মনুষ্যচক্ষুপ্রবাহিত লবণাক্ত জলবিশিষ্ট সত্যকার অশ্রুধারায় যাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, কেবলমাত্র শ্রোতৃবর্গের করতালিবর্ষণে তাঁহাদের সে বিদীর্ণ-হৃদয়ের শান্তি নাই। তাঁহারা কাতরের অশ্রুজল মুছাইবার জন্য নিজের ক্ষতিস্বীকার অনায়াসে করিতে পারেন। তাঁহারা কাজ করেন।

যেরূপ অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে কীরূপ কাজ তাহার উপযোগী তাহা জানি না! অনেকের মতে মুষ্টিযোগের ন্যায় অত্যাচারের আর ঔষধ নাই— অবশ্য, রোগীর ধাত বুঝিয়া যাহারা খৃস্টান সভ্যতার ভান করিয়াও মনে মনে পশুবলের উপাসক, অকাতরে অসহায়দের প্রতি শারীরিক বল প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হয় না এবং তাহা ভীরুতা মনে করে না, খেলাচ্ছলে কালো মানুষের প্রাণহিংসা করিতে পারে, কড়া মুষ্টিযোগ ব্যতীত আর কোনো ঔষধ কি তাহারা মানে! স্নিগ্ধ কবিরাজি তৈল তাহাদের চরণে অবিশ্রাম মর্দন করিয়া তাহার কি কোনো ফল দেখা গেল! ইহাদের হিংস্র প্রবৃত্তি, বোধ করি ব্যাঘ্রের মতো ইহাদের হৃদয়ের ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া থাকে, অবসর পাইলেই কাতরের মাথার উপরে অকাতরে লম্ফ দিয়া পড়ে। ইহাদের ধাত ইহারাই বুঝে। তাহার সাক্ষী আইরিশ জাতি। তাহারাও খুনী, এইজন্য তাহারা খুনের মাদারটিংচার ব্যবস্থা করিয়াছে। তাহারা তাহাদের দুঃখ নিরাকরণের সহজ উপায় দেখে নাই, এইজন্য ডাকের পরিবর্তে ডাইনামাইটযোগে আগ্নেয় দরখাস্ত ইংলন্ডের ঘরে ঘরে প্রেরণ করিতেছে। তাহাদের ধর্মশাস্ত্র স্বয়ং

তাহাদের রোগীর জন্য অনন্ত অগ্নিদাহ প্রেস্‌ক্রিপশন করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের আর অন্বেষণে কী করিবে? Similia Similibus curantur, অর্থাৎ শঠে শাঠ্যাৎ সমাচরেৎ, ইহা হোমিওপ্যাথিক বৈদ্যদের মত। কিন্তু আমরা তো খুনী জাত নহি, এবং ততদূর সভ্য হইয়া উঠিতে আমরা চাহিও না; মুষ্টিযোগ চিকিৎসাশাস্ত্রে আমাদের কিছুমাত্র ব্যুৎপত্তি নাই, এবং সে চিকিৎসা রোগীর পক্ষে আশুফলপ্রদ হইলেও চিকিৎসকের পক্ষে পরিণামে শুভকরী নহে। সুতরাং আমাদিগকে অন্য কোনো সহজ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। ইংরাজের অত্যাচার নিবারণের উদ্দেশ্যে আমরা দেশীয় লোকদিগকে প্রাণপণে সাহায্য করিব। দেশের লোকের জন্য কেবল জিহ্বা আন্দোলন নহে, যথার্থ স্বার্থত্যাগ করিতে শিখিব। বিদেশীয়ের হস্তে দেশের লোকের বিপদ নিজের অপমান ও নিজের বিপদ বলিয়া জ্ঞান করিব। নহিলে একে, ইংরাজেরা আমাদের বিধাতৃপুরুষ, মফস্বলে তাহাদের অসীম প্রভাব, তাহারা সুশিক্ষিত সতর্ক, তাহাতে আবার ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেট ও ইংরাজ জুরি তাহাদের বিচারক; কেবল তাহাই নয়, তাহাদের স্বজাতি সমস্ত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান তাহাদের সহায়— এমন স্থলে একজন ভীত ত্রস্ত অশিক্ষিত স্বদেশী-সহায়বর্জিত দরিদ্র কৃষ্ণকায়ের আশা-ভরসা কোথায়।

আমাদের দেশের বাগীশবর্গ বলেন, agitate করো, অর্থাৎ বাকযন্ত্রটাকে এক মুহূর্ত বিশ্রাম দিয়ো না। ইল্‌বার্ট বিল ও লোকল সেলফ্ গবর্মেন্ট সম্বন্ধে পাড়ায় পাড়ায় বক্তৃতা করিয়া বেড়াও। তাহার একটা ফল এই হইবে যে, লোকেদের মধ্যে পোলিটিকল এডুকেশন বিস্তৃত হইবে। স্বদেশের হিত কাহাকে বলে লোকে তাহাই শিখেবে। ইত্যাদি। কিন্তু ইন্দ্রদেবের ন্যায় আকাশের মেঘের মধ্যে থাকিয়া মর্ত্যবাসীদের পরম উপকার করিবার জন্য কনস্টিট্যুশনল হিস্ট্রি-পড়া ইংরাজি বক্তৃতায় শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করিয়া তাহাদের মাথা ভাঙিয়া দিলেও তাহাদের মস্তিষ্কের মধ্যে 'পোলিটিকল এডুকেশন' প্রবেশ করে কি না সন্দেহ। আমি বোধ করি এ-সকল শিক্ষা ঘরের ভিতর হইতে হয়, অত্যন্ত পরিপক্ব লাউ-কুমড়ার মতন চালের উপর হইতে গড়াইয়া পড়ে না! যতবার মফস্বলে একজন ইংরাজ একজন দেশীয়ের প্রতি অত্যাচার করে, যতবার সেই দেশীয়ের পরাভব হয়, যতবার সে অদৃষ্টের মুখ চাহিয়া সেই অত্যাচার ও পরাভব নীরবে সহ্য করিয়া যায়, যতবার সে নিজেকে সর্বতোভাবে অসহায় বলিয়া অনুভব করে, ততবারই যে আমাদের দেশ দাসত্বের গহ্বরে এক-পা এক-পা করিয়া আরও নামিতে থাকে। কেবল কতকগুলা মুখের কথায় তুমি তাহাকে আত্মমর্যাদা শিক্ষা দিবে কী করিয়া! যাহার গৃহের সম্ভ্রম প্রতিদিন নষ্ট হইতেছে, তুমি তাহাকে লোকল সেলফ্ গবর্মেন্টের মাচার উপর চড়াইয়া কী আর রাজা করিবে বলো! ঘরে যাহার হাঁড়ি চড়ে না, তুমি তাহার ছবির হাতে একটা টাকার তোড়া আঁকিয়া তাহার ক্ষুধার যন্ত্রণা কীরূপে নিবারণ করিবে! যাহারা নিজের সম্ভ্রম রক্ষার বিষয়ে হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছে, শাসনকর্তাদের ভয়ে যাহাদের অহর্নিশি নাড়ী ঠকঠক করিতেছে, তাহাদের হাতে শাসনভার দিতে যাওয়া নিষ্ঠুর বিদ্রূপ বলিয়া বোধ হয়। শিক্ষা দিতে চাও তো এক কাজ করো; একবার একজন ইংরাজের হাত হইতে একজন দেশীয়কে ত্রাণ করো, একবার সে বুঝিতে পারুক ইংরাজ ও অদৃষ্ট একই ব্যক্তি নহে, একবার সে হৃদয়ের মধ্যে জয়গর্ব অনুভব করুক, একবার তাহার হৃদয়ের ন্যায্য প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ হউক। তখন আমাদের দেশের লোকের আত্মমর্যাদাজ্ঞান বাস্তবিক হৃদয়ের মধ্যে অঙ্কুরিত হইতে থাকিবে। সে জ্ঞান যদি হৃদয়ের মধ্যে বদ্ধমূল না হয় তবে জাতির উন্নতি কোথায়। ইংরাজেরা যে আমাদের পশুর ন্যায় জ্ঞান করে ও তাহা ব্যবহারে ক্রমাগত প্রকাশ করে, ড্যাম নিগর বলিয়া সম্বোধন করে ও কটাক্ষপাতে কাঁপাইয়া তোলে, ইহার যে কুফল তাহার প্রতিবিধান কিসে হইবে। Agitate করিয়া দরখাস্ত করিয়া একটা সুবিধাজনক আইন পাস করাইয়া যেটুকু লাভ, তাহাতে এ লোকসান পূরণ করিতে পারে না। ইংরাজের প্রতিদিনকার ব্যবহারগত যথেচ্ছাচারিতা দমন করিয়া যখন দেশের লোকেরা আপনাদিগকে কতকটা তাহাদের সমকক্ষ জ্ঞান করিবে, তখনই আমাদের যথার্থ উন্নতি আরম্ভ

হইবে, দাসত্বের থরহরভীতি দূর হইবে ও আমরা নতশির আকাশের দিকে তুলিতে পারিব! সে কখন হইবে, যখন আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরাও ইংরাজের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষার প্রত্যাশা করিতে পারিবে। সে শুভদিনই বা কখন আসিবে? যখন স্বদেশের লোক স্বদেশের লোকের সাহায্য করিবে। এ যে শিক্ষা, এই যথার্থ শিক্ষা এ জিহ্বার ব্যায়াম শিক্ষা নহে, ইহাই স্বদেশহিতৈষিতার প্রকৃত চর্চা।

আমরা যখন স্বদেশীয় বিপন্নদের সাহায্য করিতে অগ্রসর হইব, তখন আমাদের আর-এক মহৎ উপকার হইবে। তখন আমাদের দেশের লোক স্বদেশ কাহাকে বলে বুঝিতে পারিবে। স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি কথা আমরা বিদেশীদের কাছ হইতে শিখিয়াছি, কিন্তু স্বদেশীদের কাছ হইতে আজিও শিখিতে পাই নাই। তাহার কারণ, আমরা স্বদেশপ্রেম দেখিতে পাই না। আমাদের চারি দিকে জড়তা, নিশ্চেষ্টতা, হৃদয়ের অভাব। কেহ কাহারো সাড়া পাই না, কেহ কাহারো সাহায্য পাই না, কেহ বলে না মাভৈঃ। এমন শ্মশানক্ষেত্রের মধ্যে দাঁড়াইয়া ইহাকেও গৃহ মনে করা অসাধারণ কল্পনার কাজ! আমি উপবাসে মরিয়া গেলেও যে জনমণ্ডলী আমাকে এক মুঠা অন্ন দেয় না, আমাকে বাহিরের লোক আক্রমণ করিলে দাঁড়াইয়া তামাশা দেখে, আমার পরম বিপদের সময়েও আমার সম্মুখে বসিয়া স্বচ্ছন্দে নৃত্যগীত উৎসব করে, তাহাদিগকে আমার আত্মীয়-পরিবার মনে করিতে হইবে! কেন করিতে হইবে! না, শহরের কালেজ হইতে একজন বক্তা আসিয়া অত্যন্ত উর্ধ্বকণ্ঠে বলিতেছেন তাহাই মনে করা উচিত। আমাকে যদি একজন ইংরাজ পথে অন্যায় প্রহার করে, তবে সেই বক্তাই পাশ কাটাইয়া চলিয়া যান। সে সময়ে কি আমরা আমাদের স্বদেশের কোনো লোকের সাহায্য প্রত্যাশা করি! স্বদেশীয়দের মধ্যে আমরা যেমন অসহায় এমন আর কোথাও নহি! এইজন্যই বলিতেছি, যদি স্বদেশপ্রেম শিক্ষা দিতে হয় তবে সে পিতামহদের নাম উল্লেখ করিয়া সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র বিকম্পিত করিয়া agitate করিয়া বেড়াইলে হইবে না! হাতে কলমে এক-একজন করিয়া স্বদেশীয়ের সাহায্য করিতে হইবে। যে কৃষক, নাগরিক মহাশয়ের উদ্দীপক বক্তৃতা ও জাতীয় সংগীত শুনিয়া প্রথমে হাঁ করিয়াছিল, তাহার পর হাই তুলিয়াছিল, তাহার পর চোখ বুজিয়া ঢুলিয়াছিল ও অবশেষে বাড়ি ফিরিয়া গিয়া স্ত্রীকে সংবাদ দিয়াছিল যে কলিকাতার বাবু সত্যিপীরের গান করিতে আসিয়াছেন; সেই যখন বিপদের সময়, অকূলপাথারে ডুবিবার সময় দেখিবে তাহার স্বদেশীয় দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন, তখন তাহার যে শিক্ষা হইবে সে শিক্ষার কোনো কালে বিনাশ নাই। আমাদের সন্তানরা যখন দেখিবে চারি দিকে স্বদেশীয়েরা স্বদেশীয়ের সাহায্য করিতেছে, তখন কি আর স্বদেশপ্রেম নামক কথাটা তাহাদিগকে ইংরাজের গ্রন্থ হইতে শিখিতে হইবে! তখন সেই ভাব তাহারা পিতার কাছে শিখিবে, মাতার কাছে শিখিবে, ভ্রাতাদের কাছে শিখিবে, সঙ্গীদের কাছে শিখিবে। কাজ দেখিয়া শিখিবে, কথা শুনিয়া শিখিবে না। তখন আমাদের দেশের সম্ভ্রম রক্ষা হইবে, আমাদের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি পাইবে; তখন আমরা স্বদেশে বাস করিব স্বজাতিকে ভাই বলিব। আজ আমরা বিদেশে আছি, বিদেশীয়দের হাজতে আছি, আমাদের সম্ভ্রমই বা কী, আস্ফালনই বা কী! আমাদের স্বজাতি যখন আমাদিগকে স্বজাতি বলিয়া জানে না, তখন কাহার কাছে কোন্ চুলায় আমরা 'agitate' করিতে যাইব।

তবে agitate করিতে যাইব কি ইংরাজের কাছে! আমরা পথে সসংকোচে ইংরাজকে পথ ছাড়িয়া দিই, আফিসে ইংরাজ প্রভুর গালাগালি ও ঘৃণা সহ্য করি, ইংরাজের গৃহে গিয়া জোড়া হস্তে তাহাকে মা বাপ বলিয়া তাহার নিকটে উমেদারি করি, ও তাহার খানসামা রসুলবক্সকে সেলাম করিয়া খাঁ-সাহেব বলিয়া চাচা বলিয়া খুশি করি, ইংরাজ আমাদিগকে সরকারি বাগানের বেঞ্চিতে বসিতে দেখিলে ঘাড় ধরিয়া উঠাইয়া দিতে চায়, ইংরাজ তাহাদের ক্লবে আমাদিগকে প্রবেশ করিতে দিতে চায় না, ইংরাজ রেলগাড়িতে তাহাদের বসিবার আসন স্বতন্ত্র করিয়া লইতে চায়, Gentleman শব্দে ইংরাজ ইংরাজকে বোঝে ও ব্যাবু অর্থে মসীজীবী ভীরু দাসকে বোঝে,

ইংরাজ আমাদের প্রাণ তাহাদের আহার্য পশুর প্রাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করে না, ইংরাজ আমাদের গৃহে আসিয়া আমাদিগকে অপমান করিয়া যায় আমরা তাহার প্রতিবিধান করিতে পারি না, সেই ইংরাজের কাছে আমরা agitate করিতে যাইব যে, তোমরা আমাদিগকে তোমাদের সমকক্ষ আসন দাও! মনে করি, কেবলমাত্র আমাদের হাঁক শুনিয়া তাহারা ত্রস্ত হইয়া তাহাদের নিজের আসন তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিবে! কেতাবে পড়িয়াছি ইংরাজেরা স্বদেশে কী করিয়া agitate করে, মনে করি তবে আর কী, আমরাও ঠিক অমনি করিব ফলও ঠিক সেইরূপ হইবে; কিন্তু একটা constitutional সিংহচর্ম পরিলেই কি ক্ষুরের জায়গায় নখ উঠিবার সম্ভাবনা আছে! গল্প আছে একটা গোরু রোজ তাহার গোয়াল হইতে দেখিত তাহার মনিবের কুকুরটি লম্ফ-ঝম্প করিয়া ল্যাজ নাড়িয়া মনিবের কোলের উপর দুই পা তুলিয়া দিত এবং পরমাদরে প্রভুর পাত হইতে খাদ্যদ্রব্য খাইতে পাইত; গোরুটা অনেক দিন ভাবিয়া, অনেক খড়ের আঁটি নীরবে চর্বণ করিয়া স্থির করিল, মনিবের পাত হইতে দুই-এক টুকরা সুস্বাদু প্রসাদ পাইবার পক্ষে এই চরণ উত্থাপন এবং সঘনে লাঙ্গুল ও লোলজিহ্বা আন্দোলনই প্রকৃত Constitutional agitation; এই স্থির করিয়া সে তাহার দড়িদড়া ছিঁড়িয়া ল্যাজ নাড়িয়া মনিবের কোলের উপরে লম্ফ-ঝম্প আরম্ভ করিল। কুকুরের সহিত তাহার ব্যবহার সমস্ত অবিকল মিলিয়াছিল কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তথাপি গোষ্ঠবিহারীকে নিরাশ হইয়া অবিলম্বে গোয়াল-ঘরে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। কিঞ্চিৎ আহার হইয়াছিল বটে, কিন্তু এই বাহ্যিক আহারে পেট না ফুলিয়া পিঠ ফুলিয়া উঠিয়াছিল। আমরাও agitate করি, বাহ্যিক পিঠ-থাবড়াও খাই, কিন্তু তাহাতে কি পেট ভরে? আর, ইংরাজের সমকক্ষ হইবার জন্য ইংরাজের কাছে হাতজোড় করিতে যাওয়া এই বা কেমনতরো তামাশা! সমকক্ষ আমরা নিজের প্রভাবে হইব না? আমরা নিজের জাতির গৌরব নিজে বাড়াইব না? নিজের জাতির শিক্ষা বিস্তার করিব না? নিজের জাতির অপমানের প্রতিবিধান করিব না, অসম্মান দূর করিব না? কেবল ইংরাজের পায়ের ধুলা লইয়া জোড়হাতে সম্মুখে দাঁড়াইয়া গলবস্ত্র হইয়া বলিতে থাকিব, 'দোহাই সাহেব', দোহাই হুজুর, ধর্মাবতার, আমরা তোমাদের সমকক্ষ, আমরা তোমাদের ওই ঊনবিংশ শতাব্দীর অতি পরিপক্ব কদলী-লোলুপ, আমাদিগকে তোমাদের লাঙ্গুলে জড়াইয়া উঠাও, তোমাদের উচ্চ শাখার পাশে বসাও, আমরা তোমাদের উক্ত পরহিতৈষী লাঙ্গুলে তৈল দিব!' যদি বা ইংরাজ অত্যন্ত দয়ার্দ্রচিত্তে আমাদিগকে বসিবার আসন দেয় ও আমাদের পিঠে হাত বুলাইয়া দেয়, তাহাতেই কি আমাদের প্রতিদিনকার নেপথ্যপ্রাপ্য লাথি-ঝাঁটার অপমানচিহ্ন একেবারে মুছিয়া যাইবে! ইংরাজের প্রসাদে আমাদের যখন পদবৃদ্ধি হয়, সে পায়া কাঠের পায়া মাত্র, সহজ পদের অপেক্ষা তাহাতে পদশব্দ বেশি হয় বটে, কিন্তু সে জিনিসটা যখনই খুলিয়া লয় তখনই পুনশ্চ অলাবুর মতো ভূতলে গড়াইতে থাকি। কিন্তু নিজের পদের উপরে দাঁড়ালেই আমরা ধ্রুবপদ প্রাপ্ত হই। ভিক্ষালব্ধ সম্মানের তাজ না হয় মাথায় পরিলাম, কিন্তু কৌপীন তো ঘুচিল না; এইরূপ বেশ দেখিয়া কি প্রভুরা হাসে না! ঢেঁকিরা দরখাস্ত করিতেছেন স্বর্গস্থ হইবার দুরাশায়, কিন্তু ধানভানাই যদি কপালে থাকে তবে স্বর্গে গেলে তাঁহারা এমনিই কী ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইবেন!

নিজের সম্মান যে নিজে রাখে না, পরের এমনিই কী মাথাব্যথা তাহাকে সম্মানিত করিতে আসিবে? আমরাই বা কেন আমাদের স্বজাতিকে ঘৃণা করি, স্বভাষায় কথা কই না, স্ববস্ত্র পরিতে চাই না, ইংরাজের রুমালটা কুড়াইয়া দিতে পারিলে গোলোক-প্রাপ্তিসুখ অনুভব করিতে থাকি! আমরা আমাদের ভাষার, আমাদের সাহিত্যের এমন উন্নতি করিতে চেষ্টা না করি কেন, যাহাতে আমাদের ভাষা আমাদের সাহিত্য পরম শ্রদ্ধেয় হইয়া উঠে! যে স্বদেশীয়েরা আমাদের জাতিকে, আমাদের ব্যবহারকে, আমাদের ভাষাকে, আমাদের সাহিত্যকে নিতান্ত হেয় জ্ঞান করিয়া নিজের উন্নতিগর্বে স্ফীত হইয়া উঠেন, তাঁহারাই হয়তো সভা করিয়া জাতীয় সম্মানের জন্য ইংরাজের কাছে নাম-সহি-করা দরখাস্ত পাঠাইতেছেন; নিজে যাহাদিগকে সম্মান করিতে পারেন না, প্রত্যাশা

হইবে, দাসত্বের থরহরভীতি দূর হইবে ও আমরা নতশির আকাশের দিকে তুলিতে পারিব! সে কখন হইবে, যখন আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরাও ইংরাজের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষার প্রত্যাশা করিতে পারিবে। সে শুভদিনই বা কখন আসিবে? যখন স্বদেশের লোক স্বদেশের লোকের সাহায্য করিবে। এ যে শিক্ষা, এই যথার্থ শিক্ষা এ জিহ্বার ব্যায়াম শিক্ষা নহে, ইহাই স্বদেশহিতৈষিতার প্রকৃত চর্চা।

আমরা যখন স্বদেশীয় বিপন্নদের সাহায্য করিতে অগ্রসর হইব, তখন আমাদের আর-এক মহৎ উপকার হইবে। তখন আমাদের দেশের লোক স্বদেশ কাহাকে বলে বুঝিতে পারিবে। স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি কথা আমরা বিদেশীদের কাছ হইতে শিখিয়াছি, কিন্তু স্বদেশীদের কাছ হইতে আজিও শিখিতে পাই নাই। তাহার কারণ, আমরা স্বদেশপ্রেম দেখিতে পাই না। আমাদের চারি দিকে জড়তা, নিশ্চেষ্টতা, হৃদয়ের অভাব। কেহ কাহারো সাড়া পাই না, কেহ কাহারো সাহায্য পাই না, কেহ বলে না মাভৈঃ। এমন শ্মশানক্ষেত্রের মধ্যে দাঁড়াইয়া ইহাকেও গৃহ মনে করা অসাধারণ কল্পনার কাজ! আমি উপবাসে মরিয়া গেলেও যে জনমণ্ডলী আমাকে এক মুঠা অন্ন দেয় না, আমাকে বাহিরের লোক আক্রমণ করিলে দাঁড়াইয়া তামাশা দেখে, আমার পরম বিপদের সময়েও আমার সম্মুখে বসিয়া স্বচ্ছন্দে নৃত্যগীত উৎসব করে, তাহাদিগকে আমার আত্মীয়-পরিবার মনে করিতে হইবে! কেন করিতে হইবে! না, শহরের কালেজ হইতে একজন বক্তা আসিয়া অত্যন্ত উর্ধ্বকণ্ঠে বলিতেছেন তাহাই মনে করা উচিত। আমাকে যদি একজন ইংরাজ পথে অন্যায় প্রহার করে, তবে সেই বক্তাই পাশ কাটাইয়া চলিয়া যান। সে সময়ে কি আমরা আমাদের স্বদেশের কোনো লোকের সাহায্য প্রত্যাশা করি! স্বদেশীয়দের মধ্যে আমরা যেমন অসহায় এমন আর কোথাও নহি! এইজন্যই বলিতেছি, যদি স্বদেশপ্রেম শিক্ষা দিতে হয় তবে সে পিতামহদের নাম উল্লেখ করিয়া সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র বিকম্পিত করিয়া agitate করিয়া বেড়াইলে হইবে না! হাতে কলমে এক-একজন করিয়া স্বদেশীয়ের সাহায্য করিতে হইবে। যে কৃষক, নাগরিক মহাশয়ের উদ্দীপক বক্তৃতা ও জাতীয় সংগীত শুনিয়া প্রথমে হাঁ করিয়াছিল, তাহার পর হাই তুলিয়াছিল, তাহার পর চোখ বুজিয়া ঢুলিয়াছিল ও অবশেষে বাড়ি ফিরিয়া গিয়া স্ত্রীকে সংবাদ দিয়াছিল যে কলিকাতার বাবু সত্যিপীরের গান করিতে আসিয়াছেন; সেই যখন বিপদের সময়, অকূলপাথারে ডুবিবার সময় দেখিবে তাহার স্বদেশীয় দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন, তখন তাহার যে শিক্ষা হইবে সে শিক্ষার কোনো কালে বিনাশ নাই। আমাদের সন্তানরা যখন দেখিবে চারি দিকে স্বদেশীয়েরা স্বদেশীয়ের সাহায্য করিতেছে, তখন কি আর স্বদেশপ্রেম নামক কথাটা তাহাদিগকে ইংরাজের গ্রন্থ হইতে শিখিতে হইবে! তখন সেই ভাব তাহারা পিতার কাছে শিখিবে, মাতার কাছে শিখিবে, ভ্রাতাদের কাছে শিখিবে, সঙ্গীদের কাছে শিখিবে। কাজ দেখিয়া শিখিবে, কথা শুনিয়া শিখিবে না। তখন আমাদের দেশের সম্ভ্রম রক্ষা হইবে, আমাদের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি পাইবে; তখন আমরা স্বদেশে বাস করিব স্বজাতিকে ভাই বলিব। আজ আমরা বিদেশে আছি, বিদেশীয়দের হাজতে আছি, আমাদের সম্ভ্রমই বা কী, আস্ফালনই বা কী! আমাদের স্বজাতি যখন আমাদিগকে স্বজাতি বলিয়া জানে না, তখন কাহার কাছে কোন্‌ চুলায় আমরা 'agitate' করিতে যাইব।

তবে agitate করিতে যাইব কি ইংরাজের কাছে! আমরা পথে সসংকোচে ইংরাজকে পথ ছাড়িয়া দিই, আফিসে ইংরাজ প্রভুর গালাগালি ও ঘৃণা সহ্য করি, ইংরাজের গৃহে গিয়া জোড়া হস্তে তাহাকে মা বাপ বলিয়া তাহার নিকটে উমেদারি করি, ও তাহার খানসামা রসুলবক্সকে সেলাম করিয়া খাঁ-সাহেব বলিয়া চাচা বলিয়া খুশি করি, ইংরাজ আমাদিগকে সরকারি বাগানের বেঞ্চিতে বসিতে দেখিলে ঘাড় ধরিয়া উঠাইয়া দিতে চায়, ইংরাজ তাহাদের ক্লবে আমাদিগকে প্রবেশ করিতে দিতে চায় না, ইংরাজ রেলগাড়িতে তাহাদের বসিবার আসন স্বতন্ত্র করিয়া লইতে চায়, Gentleman শব্দে ইংরাজ ইংরাজকে বোঝে ও ব্যাবু অর্থে মসীজীবী ভীরু দাসকে বোঝে,

ইংরাজ আমাদের প্রাণ তাহাদের আহার্য পশুর প্রাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করে না, ইংরাজ আমাদের গৃহে আসিয়া আমাদিগকে অপমান করিয়া যায় আমরা তাহার প্রতিবিধান করিতে পারি না, সেই ইংরাজের কাছে আমরা agitate করিতে যাইব যে, তোমরা আমাদিগকে তোমাদের সমকক্ষ আসন দাও! মনে করি, কেবলমাত্র আমাদের হাঁক শুনিয়া তাহারা ত্রস্ত হইয়া তাহাদের নিজের আসন তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিবে! কেতাবে পড়িয়াছি ইংরাজেরা স্বদেশে কী করিয়া agitate করে, মনে করি তবে আর কী, আমরাও ঠিক অমনি করিব ফলও ঠিক সেইরূপ হইবে; কিন্তু একটা constitutional সিংহচর্ম পরিলেই কি ক্ষুরের জায়গায় নখ উঠিবার সম্ভাবনা আছে! গল্প আছে একটা গোরু রোজ তাহার গোয়াল হইতে দেখিত তাহার মনিবের কুকুরটি লম্ফ-ঝম্প করিয়া ল্যাজ নাড়িয়া মনিবের কোলের উপর দুই পা তুলিয়া দিত এবং পরমাদরে প্রভুর পাত হইতে খাদ্যদ্রব্য খাইতে পাইত; গোরুটা অনেক দিন ভাবিয়া, অনেক খড়ের আঁটি নীরবে চর্বণ করিয়া স্থির করিল, মনিবের পাত হইতে দুই-এক টুকরা সুস্বাদু প্রসাদ পাইবার পক্ষে এই চরণ উত্থাপন এবং সঘনে লাঙ্গুল ও লোলজিহ্বা আন্দোলনই প্রকৃত Constitutional agitation; এই স্থির করিয়া সে তাহার দড়িদড়া ছিঁড়িয়া ল্যাজ নাড়িয়া মনিবের কোলের উপরে লম্ফ-ঝম্প আরম্ভ করিল। কুকুরের সহিত তাহার ব্যবহার সমস্ত অবিকল মিলিয়াছিল কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তথাপি গোষ্ঠবিহারীকে নিরাশ হইয়া অবিলম্বে গোয়াল-ঘরে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। কিঞ্চিৎ আহার হইয়াছিল বটে, কিন্তু এই বাহ্যিক আহারে পেট না ফুলিয়া পিঠ ফুলিয়া উঠিয়াছিল। আমরাও agitate করি, বাহ্যিক পিঠ-থাবড়াও খাই, কিন্তু তাহাতে কি পেট ভরে? আর, ইংরাজের সমকক্ষ হইবার জন্য ইংরাজের কাছে হাতজোড় করিতে যাওয়া এই বা কেমনতরো তামাশা! সমকক্ষ আমরা নিজের প্রভাবে হইব না? আমরা নিজের জাতির গৌরব নিজে বাড়াইব না? নিজের জাতির শিক্ষা বিস্তার করিব না? নিজের জাতির অপমানের প্রতিবিধান করিব না, অসম্মান দূর করিব না? কেবল ইংরাজের পায়ের ধুলা লইয়া জোড়হাতে সম্মুখে দাঁড়াইয়া গলবস্ত্র হইয়া বলিতে থাকিব, 'দোহাই সাহেব', দোহাই হুজুর, ধর্মাবতার, আমরা তোমাদের সমকক্ষ, আমরা তোমাদের ওই ঊনবিংশ শতাব্দীর অতি পরিপক্ক কদলী-লোলুপ, আমাদিগকে তোমাদের লাঙ্গুলে জড়াইয়া উঠাও, তোমাদের উচ্চ শাখার পাশে বসাও, আমরা তোমাদের উক্ত পরহিতৈষী লাঙ্গুলে তৈল দিব!' যদি বা ইংরাজ অত্যন্ত দয়ার্দ্রচিত্তে আমাদিগকে বসিবার আসন দেয় ও আমাদের পিঠে হাত বুলাইয়া দেয়, তাহাতেই কি আমাদের প্রতিদিনকার নেপথ্যপ্রাপ্য লাথি-ঝাঁটার অপমানচিহ্ন একেবারে মুছিয়া যাইবে! ইংরাজের প্রসাদে আমাদের যখন পদবৃদ্ধি হয়, সে পায়া কাঠের পায়া মাত্র, সহজ পদের অপেক্ষা তাহাতে পদশব্দ বেশি হয় বটে, কিন্তু সে জিনিসটা যখনই খুলিয়া লয় তখনই পুনশ্চ অলাবুর মতো ভূতলে গড়াইতে থাকি। কিন্তু নিজের পদের উপরে দাঁড়ালেই আমরা ধ্রুবপদ প্রাপ্ত হই। ভিক্ষালব্ধ সম্মানের তাজ না হয় মাথায় পরিলাম, কিন্তু কৌপীন তো ঘুচিল না; এইরূপ বেশ দেখিয়া কি প্রভুরা হাসে না! ঢেঁকিরা দরখাস্ত করিতেছেন স্বর্গস্থ হইবার দুরাশায়, কিন্তু ধানভানাই যদি কপালে থাকে তবে স্বর্গে গেলে তাঁহারা এমনিই কী ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইবেন!

নিজের সম্মান যে নিজে রাখে না, পরের এমনিই কী মাথাব্যথা তাহাকে সম্মানিত করিতে আসিবে? আমরাই বা কেন আমাদের স্বজাতিকে ঘৃণা করি, স্বভাষায় কথা কই না, স্ববস্ত্র পরিতে চাই না, ইংরাজের রুমালটা কুড়াইয়া দিতে পারিলে গোলোক-প্রাপ্তিসুখ অনুভব করিতে থাকি! আমরা আমাদের ভাষার, আমাদের সাহিত্যের এমন উন্নতি করিতে চেষ্টা না করি কেন, যাহাতে আমাদের ভাষা আমাদের সাহিত্য পরম শ্রদ্ধেয় হইয়া উঠে! যে স্বদেশীয়েরা আমাদের জাতিকে, আমাদের ব্যবহারকে, আমাদের ভাষাকে, আমাদের সাহিত্যকে নিতান্ত হেয় জ্ঞান করিয়া নিজের উন্নতিগর্বে স্ফীত হইয়া উঠেন, তাঁহারাই হয়তো সভা করিয়া জাতীয় সম্মানের জন্য ইংরাজের কাছে নাম-সহি-করা দরখাস্ত পাঠাইতেছেন; নিজে যাহাদিগকে সম্মান করিতে পারেন না, প্রত্যাশা

করিতে থাকেন ইংরাজেরা তাহাদিগকে সম্মান করিবে! সে স্থলে স্বজাতি বলিয়া বোধ হয় তাঁহারা আপনাদের গুটি কয়েককে বুঝেন ও নিজেদের সামান্য অভিমানে আঘাত লাগাতে স্বজাতির অপমান হইয়াছে জ্ঞান করেন। আমাদের গলার শৃঙ্খলটা ধরিয়া ইংরাজ যদি আমাদিগকে তাহাদের কড়িকাষ্ঠে অত্যন্ত উঁচু জায়গায় লটকাইয়া দেয় তাহা হইলেই কি আমাদের চরম উন্নতি আমাদের পরম সম্মান হইল! যথার্থ স্থায়ী ও ব্যাপক উন্নতি কি আমাদের নিজের ভাষা নিজের সাহিত্য নিজের গৃহের মধ্যে হইতে হইবে না। নহিলে পেটের মধ্যে ক্ষুধা লইয়া হাওয়া খাইয়া বেড়াইলে কীরূপ স্বাস্থ্যরক্ষা হইবে! হৃদয়ের মধ্যে আত্মাবমান বহন করিয়া অনুগ্রহলব্ধ বাহিরের সম্মান খুঁটিয়া খুঁটিয়া মোরগপুচ্ছ বিস্তার করিলে মহত্ত্ব কী! যেমন তেলো মাথায় লোকে তেল দেয়, তেমনি টাকগ্রস্ত মাথা হইতে লোকে চুল ছিঁড়িয়া লয়। যে অবমানিত, তাহাকে আরও অবমানিত করিতে লোকে কুণ্ঠিত হয় না। আমরা ঘরে অবমানিত, সেইজন্য আমাদিগকে পরে অবমান করে। সেইজন্য বলিতেছি, আইস আমরা ঘরের সম্মান রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হই; স্বহস্তে আমাদের উৎকর্ষ সাধন করি; আমাদের গৃহের মধ্যে লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা করি; তবে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে বল সঞ্চয় হইবে। তখন এমন মহত্ত্ব লাভ করিব যে, পরের কাছে সামান্য সম্মানটুকু না পাইলে দিন রাত্রি খুঁত খুঁত করিয়া মারা পড়িব না।

যাহা বলিলাম, তাহার সংক্ষেপ মর্ম এই— ইংরাজেরা আমাদিগকে সম্মান করে না, তাহাদের অপেক্ষা হীন জ্ঞান করে এইজন্য সর্বত্র শ্বেত-কৃষ্ণের প্রভেদ রাখিতে চায়। এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। ইহার প্রতিবিধানের জন্য সকলেই প্রস্তাব করিতেছেন, আমরা ইংরাজের নিকটে খুব গলা ছাড়িয়া বলিতে থাকি, তোমরা আমাদিগকে হীন-জ্ঞান করিয়ো না, তাহা হইলেই তাহারা আমাদিগকে সম্মান করিতে আরম্ভ করিবে।

আমি বলিতেছি, প্রথমত, এ প্রস্তাবটা অসংগত, দ্বিতীয়ত, যদি বা ইংরাজরা আমাদিগের প্রতি সম্মানের ভান করে, তাহাতেই বা আমাদের লাভ কী! বিকারের রোগী কতকগুলা প্রলাপ বকিতেছে দেখিয়া তুমি নাহয় তাহার মুখে কাপড় গুঁজিয়া দিলে কিন্তু তাহার রোগের উপায় কী করিলে! আমাদের দেশের দুরবস্থার কারণ তাহার অস্থি-মজ্জার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে, বাহ্যিক লক্ষণ যে-সকল প্রকাশ পাইতেছে তাহা ভালো বৈ মন্দ নহে, কারণ, তাহাতে রোগের নির্ণয় হয়। আমি তাহার রীতিমতো চিকিৎসার জন্য সকলের কাছে প্রার্থনা করিতেছি। আর, রোগও তো এক-আধটা নহে; আমাদের দেশের শরীরং তো ব্যাধিমন্দিরং নহে, যে একেবারে ব্যাধিব্যারাকং।

যদি আমার এই কথা কাহারো যথার্থ বলিয়া বোধ হয়, যদি দৈবক্রমে আমার এ-সকল কথা কাহারও হৃদয়ের মধ্যে স্থান পায়, তিনি সহসা এমন স্থির করিতে পারেন যে, একটা সভা আহ্বান করিয়া সকলে মিলিয়া দেশের উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া যাক। কিন্তু আমার বলিবার অভিপ্রায় তাহা নহে।

এখন আমাদের কী কাজ! এখন কি 'সভা' নামক একটা প্রকাণ্ডকায় যন্ত্রের মধ্যে আমাদের সমস্ত কাজকর্ম ফেলিয়া দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইব? মনে করিব যে, আমাদের স্বদেশকে একটা এঞ্জিনের পশ্চাতে জুড়িয়া দিলাম, এখন এ ঊর্ধ্বশ্বাসে উন্নতির পথেই ছুটিতে থাকুক। এখন কি Public নামক একটা কাল্পনিক ভাঙা-কুলার উপরে দেশের সমস্ত ছাই ফেলিবার ভার অর্পণ করিব ও যদি তাহাতে ত্রুটি দেখিতে পাই, তবে সেই অনধিগম্য উপচ্ছায়ার প্রতি অত্যন্ত অভিমান করিয়া ঘরের ভাত বেশি করিয়া খাইব! অর্থাৎ, কর্তব্য কাজকে কোনো মতেই গৃহের মধ্যে না রাখিয়া অনাবশ্যক জেঠাইমার মতো অবসর পাইবামাত্র সুদূরে গঙ্গাতীরে সমর্পণ করিয়া আসিব ও তাহার পরম সদ্গতি করিলাম মনে করিয়া আত্মপ্রসাদসুখ অনুভব করিব! তাহা নহে। জিজ্ঞাসা করি, Public কোথায়, Public কী। চারি দিকে মরুভূমির এই যে বালুকাসমষ্টি ধূ ধূ করিতেছে দেখিতেছি, ইহাই কি Public। ইহার মধ্য হইতে কয়েক মুষ্টি একত্র করিয়া স্তূপ করিয়া একটা যে মূর্তির মতো গড়িয়া তোলা হয়, তাহাই কি Public! তাহারই মাথার উপরে আমরা

যত পারি কার্যভার নিক্ষেপ করি ও তাহা বার বার ধসিয়া যায়। তাহার মধ্যে অটল স্থায়িত্বের লক্ষণ কি আমার কিছু দেখিতে পাইতেছি!

কথায় কথায় সভা ডাকিয়া Public নামক একটা কাল্পনিক মূর্তির হৃদয় হাতড়াইয়া বেড়াইবার একটা কুফল আছে। তাহাতে কোনো কাজই হইয়া উঠে না; একটা কাজ উঠিলেই মনে হয়, আমি কী করিব, একটা বিরাট সভা নহিলে এ কাজ হইতে পারে না! আমি একলা যতটুকু কাজ করিতে পারি, ততটুকুও কোনো কালে হইয়া উঠে না। মনে করি, একটা অত্যন্ত ফলাও ব্যাপার করিব, নয় কিছুই করিব না। ক্ষুদ্র কাজ মনে করিলেই হাসি আসে। তাহা ছাড়া হয়তো এমনও মনে হয়, সভা করিয়া তোলা সভ্যদেশপ্রচলিত একটা দস্তুর; সুতরাং সভা না করিয়া কোনো কাজ করিলে মনের তেমন তৃপ্তি হয় না! ইহা ব্যতীত, নিজের উদ্যম নিজের উৎসাহ, নিজের দায়িকতা, অতলস্পর্শ সভার গর্ভে অকাতরে জলাঞ্জলি দিয়া আসা যায়।

আমাদের দেশের অবস্থা কী, তাহাই প্রথমে দেখা আবশ্যক। এখানে Public নাই। উপন্যাসের দুয়ারানী যেমন কুলগাছের কাঁটায় আঁচল বাধাইয়া স্বামী-কর্তৃক অবরোধসুখ কল্পনা করিত, আমরা তেমনি কাপড়চোপড় পরাইয়া একটা ফাঁকি পবলিক সাজাইয়া রাখিয়াছি, কখনো তাহাকে আদর করিতেছি, কখনো তিরস্কার করিতেছি, কখনো বা তাহার প্রতি অভিমান প্রকাশ করিতেছি এবং এইরূপে মনে মনে ঐতিহাসিক সুখ অনুভব করিতেছি। কিন্তু এখনও কি খেলার সময় ফুরায় নাই, এখনও কি কাজের সময় আসে নাই! মনে যদি কষ্ট হয় তো হউক, কিন্তু এই পুত্তলিকাটাকে বিসর্জন করিতে হইবে। এমন এই মনে করিতে হইবে, আমরা সকলেই কাজ করিব। যেখানে প্রত্যেক স্বতন্ত্র ব্যক্তি নিরুদ্যমী, সেখানে ব্যক্তিসমষ্টির কার্যতৎপরতা একটা গুজবমাত্র। আমি উনি তুমি তিনি সকলেই নিদ্রা দিব, অথচ আশা করিব 'আমরা' নামক সর্বনাম শব্দটা জাগ্রত থাকিয়া কাজ করিতে থাকিবে! সর্বত্রই সমাজের প্রথম অবস্থায় ব্যক্তিবিশেষ ও পরিণত অবস্থায় ব্যক্তিসাধারণ। প্রথম অবস্থায় মহাপুরুষ, পরিণত অবস্থায় মহামণ্ডলী। জলনিমগ্ন শৈশব পৃথিবীতেও আভ্যন্তরিক গূঢ়বিপ্লবে বিচ্ছিন্ন উন্নত শিখরসকল জয়ের উপর ইতস্তত জাগিয়া উঠিত। তাহারা একক মাহাত্ম্যে চতুর্দিকের কল্লোলময় মহাপ্লাবনের মধ্যে জীবদিগকে আশ্রয় দিত। সমলগ্ন সমতল উন্নত মহাদেশ, সে তো আজ পৃথিবীর পরিণত অবস্থায় দেখিতেছি। এখনই যথার্থ পৃথিবীর ভূ-পবলিক তৈরি হইয়াছে। আগে যেখানে ছিল মহাশিখর, এখন সেখানে হইয়াছে মহাদেশ। আমাদের এই তরুণ সমাজে, আমাদের এই ভাবিতে হইবে, কবে আমাদের এই সামাজিক মহাদেশ সৃজিত হইবে! কিন্তু সেই মহাদেশ তো একটা ভুঁইফোঁড়া ভেল্কি নহে! সেই মহাদেশ সৃজন করিবার উদ্দেশে আমাদের সকলকেই আপনাকে সৃজন করিতে হইবে, আপনার আশপাশ সৃজন করিতে হইবে। আপনাকে উন্নত করিয়া তুলিতে হইবে। প্রত্যেকে উঠিব, প্রত্যেককে উঠাইব, এই আমাদের এখনকার কাজ। কিন্তু সে না কি কঠোর সাধনা, সে না কি নিভৃতে সাধ্য, সে না কি প্রকাশ্যস্থলে হাঙ্গাম করিবার বিষয় নহে, সে প্রত্যহ অনুষ্ঠেয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজের সমষ্টি, সে কঠিন কর্তব্য বটে, অথচ ছায়াময়ী বৃহদাকৃতি দুরাশা নহে, এই নিমিত্ত উদ্দীপ্ত হৃদয়দের তাহাতে রুচি হয় না। এরূপ অবস্থায় এই-সকল ছোটো কাজই বাস্তবিক দুরূহ, প্রকাণ্ড মূর্তি কাজের ভান ফাঁকি মাত্র! আমাদের চারি দিকে, আমাদের আশেপাশে, আমাদের গৃহের মধ্যে আমাদের কার্যক্ষেত্র। সমস্ত কাজই বাকি রহিয়াছে, এমন স্থলে সমস্ত ভারতবর্ষকে একেবারে উদ্ধার করা, সে বরাহ বা কূর্ম অবতারই পারেন; আমাদের না আছে নাসার পার্শ্বে তেমন দন্ত না আছে পৃষ্ঠের উপরে তেমন বর্ম।

এখন আমাদের গঠন করিবার সময়, শিক্ষা করিবার সময়। এখন আমাদিগকে চরিত্র গঠন করিতে হইবে, সমাজ গঠন করিতে হইবে, পবলিক গঠন করিতে হইবে। বিদেশীয়দের দেখাদেখি আগেভাগে মনে করিতেছি, সমস্ত গঠিত হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য গঠনশালার গোপনীয়তা নষ্ট করিয়া কতকগুলি কুগঠিত কাঠখড়-বাহির-করা অসম্পূর্ণ বিরূপ মূর্তি জনসমাজে আনয়ন করিয়া

আমরা তামাশা দেখিতেছি। শত্রুপক্ষ হাসিতেছে।

এতক্ষণে সকলে নিশ্চয় বুঝিয়াছেন পবলিকের উপযোগিতা স্বীকার করি বলিয়াই আমি এত কথা বলিতেছি। এখন দেখিতে হইবে পবলিক গঠন করিতে হইবে কী উপায়ে! সে কেবল পরস্পরকে সাহায্য করিয়া। হাতে কলমে প্রকৃত সাহায্য করিয়া। পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস করা চাই, পরস্পর পরস্পরের প্রতি নির্ভর করা চাই। মমতাসূত্রে সকলের একত্রে গাঁথা থাকা চাই। নতুবা, কাজের বেলায় কে কাহার তাহার ঠিকানা নাই, অথচ বক্তৃতা করিবার সময় বক্তা ওঝা মহাশয় মন্ত্র পড়িয়া কোন্‌ বটবৃক্ষ হইতে যে পবলিক ব্রহ্মদৈত্যটাকে সভাস্থলে নাবান তাহা ঠাহর পাওয়া যায় না। পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস, পরস্পরের প্রতি মমতা, পরস্পরের প্রতি নির্ভর— এ তো চাঁদা করিয়া রেজোল্যুশন পাস করিয়া হয় না। প্রত্যেকের ক্ষুদ্র কাজের উপর ইহার প্রতিষ্ঠা। এবং সে-সকল কাজ সকলেরই আয়ত্তাধীন। এখন সেই উদ্দেশ্যের প্রতি আমরা সকলে লক্ষ্য স্থির করি না কেন! অর্থাৎ যেখানে বাস করিতেছি, সেখানটা যাহাতে গৃহের মতো হয় তাহার চেষ্টা করি না কেন! নহিলে যে, বাহির হইতে যে-সে আসিয়া আমাদের সম্ভ্রম হানি করিয়া যাইতেছে; এমন একটু স্থান পাইতেছি না যাহা নিতান্ত আমাদেরই, যেখানে পরের কোনো অধিকার নাই, যেখানে আত্মীয়দের স্নেহের অমৃতে পুষ্টিলাভ করিয়া আমরা কার্যক্ষেত্রে প্রতিদিন দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করিতে যাই, বাহির হইতে সঞ্চয় করিয়া যেখানে আনয়ন ও বিতরণ করি, আমাদের পিতামাতারা যেখানে আশ্রয় পাইয়াছিলেন, আমাদের সন্তানেরা যেখানে আশ্রয় পাইবে বলিয়া আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস, যেখানে কেহ আমাদিগকে হীন জ্ঞান করিবে না, কেহ আমাদিগের প্রতি অবিচার করিবে না, কেহ আমাদিগের ম্লানমুখ নতশির সহ্য করিতে পারিবে না, যেখানকার রমণীরা আমাদিগের লক্ষ্মীস্বরূপিণী আনন্দবিধায়নী অন্নপূর্ণা, যেখানকার বালক-বালিকারা আমাদেরই গৃহের আলোক আমদেরই গৃহের ভাবী আশা, যেখানে কেহ আমাদের মাতৃভাষা আমাদের দেশীয় সাহিত্য আমাদের জাতির আচার-ব্যবহার অনুষ্ঠানকে কঠোরহৃদয় বিদেশীয়ের ন্যায় অকাতরে উপহাস ও উপেক্ষা করিবে না। আর কিছু নয়, সেই গৃহপ্রতিষ্ঠা, স্বদেশে সেই স্বদেশপ্রতিষ্ঠা, স্বদেশীয়ের প্রতি স্বদেশীয়ের বাহু প্রসারণ, এই আমাদের এখনকার ব্রত, এই আমাদের প্রত্যেকের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। ইংরাজেরা আমাদিগকে সোহাগ করে কি না করে তাহারই প্রতীক্ষা করা তাহার জন্য আবদার করিতে যাওয়া— সে তো অনেক হইয়া গেছে, এখন এই নূতন পথ অবলম্বন করিয়া দেখা যাক-না কেন।

ভারতী
ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯১

একটি পুরাতন কথা

অনেকেই বলেন, বাঙালিরা ভাবের লোক, কাজের লোক নহে। এইজন্য তাঁহারা বাঙালিদিগকে পরামর্শ দেন practical হও। ইংরাজি শব্দটাই ব্যবহার করিলাম। কারণ, ওই কথাটাই চলিত। শব্দটা শুনিলেই সকলে বলিবেন, 'হাঁ হাঁ, বটে, এই কথাটাই বলা হইয়া থাকে বটে।' আমি তাহার বাংলা অনুবাদ করিতে গিয়া অনর্থক দায়িক হইতে যাইব কেন? যাহা হউক তাহাদের যদি জিজ্ঞাসা করি, practical হওয়া কাহাকে বলে, তাঁহারা উত্তর দেন— ভাবিয়া চিন্তিয়া ফলাফল বিবেচনা করিয়া কাজ করা, সাবধান হইয়া চলা, মোটা মোটা উন্নত ভাবের প্রতি বেশি আস্থা না রাখা, অর্থাৎ ভাবগুলিকে ছাঁটিয়া ছুঁটিয়া কার্যক্ষেত্রের উপযোগী করিয়া লওয়া। খাঁটি সোনায় যেমন ভালো মজবুত গহনা গড়ানো যায় না, তাহাতে মিশাল দিতে হয়, তেমনি খাঁটি ভাব লইয়া সংসারের কাজ চলে না, তাহাতে খাদ মিশাইতে হয়। যাহারা বলে সত্য কথা বলিতেই হইবে, তাহারা sentimental লোক, কেতাব পড়িয়া তাহারা বিগড়াইয়া গিয়াছে, আর যাহারা

আবশ্যকমতো দুই-একটা মিথ্যা কথা বলে ও সেই সামান্য উপায়ে সহজে কার্যসাধন করিয়া লয় তাহারা Practical লোক।

এই যদি কথাটা হয়, তবে বাঙালিদিগকে ইহার জন্য অধিক সাধনা করিতে হইবে না। সাবধানী ভীরু লোকের স্বভাবই এইরূপ। এই স্বভাববশতই বাঙালিরা বিস্তর কাজে লাগে, কিন্তু কোনো কাজ করিতে পারে না। চাকরি করিতে পারে কিন্তু কাজ চালাইতে পারে না।

উল্লিখিত শ্রেণীর practical লোক ও প্রেমিক লোক এক নয়। Practical লোক দেখে ফল কী— প্রেমিক তাহা দেখে না, এই নিমিত্ত সেইই ফল পায়। জ্ঞানকে যে ভালোবাসিয়া চর্চা করিয়াছে সেই জ্ঞানের ফল পাইয়াছে; হিসাব করিয়া যে চর্চা করে তাহার ভরসা এত কম যে, যে-শাখাগ্রে জ্ঞানের ফল সেখানে সে উঠিতে পারে না, সে অতি সাবধান-সহকারে হাতটি মাত্র বাড়াইয়া ফল পাইতে চায়— কিন্তু ইহারা প্রায়ই বেঁটে লোক হয়— সুতরাং 'প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্‌বাহুরবি বামনঃ' হইয়া পড়ে।

বিশ্বাসহীনেরাই সাবধানী হয়, সংকুচিত হয়, বিজ্ঞ হয়, আর বিশ্বাসীরাই সাহসিক হয়, উদার হয়, উৎসাহী হয়। এইজন্য বয়স হইলে সংসারের উপর হইতে বিশ্বাস হ্রাস হইলে পর তবে সাবধানিতা বিজ্ঞতা আসিয়া পড়ে। এই অবিশ্বাসের আধিক্য হেতু অধিক বয়সে কেহ একটা নূতন কাজে হাত দিতে পারে না, ভয় হয় পাছে কার্য সিদ্ধ না হয়— এই ভয় হয় না বলিয়া অল্প বয়সে অনেক কার্য হইয়া উঠে, এবং হয়তো অনেক কার্য অসিদ্ধও হয়।

আমি সাবধানিতা বিজ্ঞতার নিন্দা করি না, তাহার আবশ্যকও হয়তো আছে। কিন্তু যেখানে সকলেই বিজ্ঞ সেখানে উপায় কী! তাহা ছাড়া বিজ্ঞতার সময় অসময় আছে। বারোমেসে বিজ্ঞতা কেবল বঙ্গদেশেই দেখিতে পাওয়া যায়, আর কোথাও দেখা যায় না। শিশু যদি সাবধানী হইয়াই জন্মিত তবে সে চিরকাল শিশুই থাকিয়া যাইত, সে আর মানুষ হইয়া বাড়িয়া উঠিতে পারিত না। কালক্রমে জ্ঞানার্জনশক্তির অশক্ত ডানা হইতে পালক ঝরিয়া যায়— তখন সে ব্যক্তি কোটরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শাবকদিগকে ডানা ছাঁটিয়া ফেলিতে বলে, ডানার প্রতি বিশ্বাস তাহার একেবারে চলিয়া যায়। এই ডানা যাহাদের শক্ত আছে তাহারাই নির্ভয়ে উড়িয়া চলিয়া যায়, তাহাদের বিচরণের ক্ষেত্র প্রশস্ত, তাহাদিগকেই জরাগ্রস্তগণ sentimental বলিয়া থাকেন— আর এই ডানার পালক খসাইয়া যাহারা বদনমণ্ডল গোলাকার করিয়া বসিয়া থাকে, এক পা এক পা করিয়া চলে, ধূলির মধ্যে খুঁটিয়া খুঁটিয়া খায়, চাণক্যেরা তাহাদিগকে বিজ্ঞ বলিয়া থাকেন।

মানুষের প্রধান বল আধ্যাত্মিক বল। মানুষের প্রধান মনুষ্যত্ব আধ্যাত্মিকতা। শারীরিকতা বা মানসিকতা দেশ কাল পাত্র আশ্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা অনন্তকে আশ্রয় করিয়া থাকে। অনন্ত দেশ ও অনন্ত কালের সহিত আমাদের যে যোগ আছে, আমরা যে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র নহি, ইহাই অনুভব করা আধ্যাত্মিকতার একটি লক্ষণ। যে মহাপুরুষ এইরূপ অনুভব করেন, তিনি সংসারের কাজে গোঁজামিলন দিতে পারেন না। তিনি সামান্য সুবিধা অসুবিধাকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। তিনি আপনার জীবনের আদর্শকে লইয়া ছেলেখেলা করিতে পারেন না— কর্তব্যের সহস্র জায়গায় ফুটা করিয়া পালাইবার পথ নির্মাণ করেন না। তিনি জানেন অনন্তকে ফাঁকি দেওয়া চলে না। সত্যই আছে, অনন্তকাল আছে, অনন্তকাল থাকিবে, মিথ্যা আমার সৃষ্টি— আমি চোখ বুজিয়া সত্যের আলোক নিকটে রুদ্ধ করিতে পারি, কিন্তু সত্যকে মিথ্যা করিতে পারি না। অর্থাৎ, ফাঁকি আমাকে দিতে পারি কিন্তু সত্যকে দিতে পারি না।

মানুষ পশুদের ন্যায় নিজে নিজের একমাত্র সহায় নহে। মানুষ মানুষের সহায়। কিন্তু তাহাতেও তাহার চলে না। অনন্তের সহায়তা না পাইলে সে তাহার মনুষ্যত্বের সকল কার্য সাধন করিতে পারে না। কেবলমাত্র জীবন রক্ষা করিতে হইলে নিজের উপরেই নির্ভর করিয়াও চলিয়া যাইতে পারে, স্বত্বরক্ষা করিতে হইলে পরস্পরের সহায়তার আবশ্যক, আর প্রকৃতরূপ আত্মরক্ষা করিতে হইলে অনন্তের সহায়তা আবশ্যক করে। বলিষ্ঠ নির্ভীক স্বাধীন উদার আত্মা সুবিধা,

কৌশল, আপাতত প্রভৃতি পৃথিবীর আবর্জনার মধ্যে বাস করিতে পারে না। তেমন অস্বাস্থ্যজনক স্থানে পড়িলে ক্রমে সে মলিন দুর্বল রুগ্‌ণ হইয়া পড়িবেই। সাংসারিক সুবিধাসকল তাহার চতুর্দিকে বল্মীকের স্তূপের মতো উত্তরোত্তর উন্নত হইয়া উঠিবে বটে, কিন্তু সে নিজে তাহার মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া প্রতি মুহূর্তে জীর্ণ হইতে থাকিবে। অনন্তের সমুদ্র হইতে দক্ষিণা বাতাস বহিলে তবেই তাহার স্ফূর্তি হয়; তবেই সে বল পায়, তবেই তাহার কুজ্‌ঝটিকা দূর হয়; তাহার কাননে যত সৌন্দর্য ফুটিবার সম্ভাবনা আছে সমস্ত ফুটিয়া উঠে।

বিবেচনা বিচার বুদ্ধির বল সামান্য, তাহা চতুর্দিকে সংশয়ের দ্বারা আচ্ছন্ন, তাহা সংসারের প্রতিকূলতায় শুকাইয়া যায়— অকূলের মধ্যে তাহা ধ্রুবতারার ন্যায় দীপ্তি পায় না। এইজন্যেই বলি, সামান্য সুবিধা খুঁজিতে গিয়া মনুষ্যত্বের ধ্রুব উপাদানগুলির উপর বুদ্ধির কাঁচি চালাইয়ো না। কলসি যত বড়োই হউক না, সামান্য ফুটা হইলেই তাহার দ্বারা আর কোনো কাজ পাওয়া যায় না। তখন যে তোমাকে ভাসাইয়া রাখে সেই তোমাকে ডুবায়।

ধর্মের বল নাকি অনন্তের নির্ঝর হইতে নিঃসৃত, এইজন্যই সে আপাতত অসুবিধা, সহস্রবার পরাভব, এমন-কি, মৃত্যুকে পর্যন্ত ডরায় না। ফলাফল লাভেই বুদ্ধিবিচারের সীমা, মৃত্যুতেই বুদ্ধিবিচারের সীমা— কিন্তু ধর্মের সীমা কোথাও নাই।

অতএব এই অতি সামান্য বুদ্ধিবিবেচনা বিতর্ক হইতে কি একটি সহস্র জাতি চিরদিনের জন্য পুরুষানুক্রমে বল পাইতে পারে। একটি মাত্র কূপে সমস্ত দেশের তৃষানিবারণ হয় না। তাহাও আবার গ্রীষ্মের উত্তাপে শুকাইয়া যায়। কিন্তু যেখানে চিরনিঃসৃত নদী প্রবাহিত সেখানে যে কেবলমাত্র তৃষা নিবারণের কারণ বর্তমান তাহা নহে, সেখানে সেই নদী হইতে স্বাস্থ্যজনক বায়ু বহে, দেশের মলিনতা অবিশ্রাম ধৌত হইয়া যায়, ক্ষেত্র শস্যে পরিপূর্ণ হয়, দেশের মুখশ্রীতে সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। তেমনি বুদ্ধিবলে কিছুদিনের জন্য সমাজ রক্ষা হইতেও পারে, কিন্তু ধর্মবলে চিরদিন সমাজের রক্ষা হয়, আবার তাহার আনুষঙ্গিকস্বরূপে চতুর্দিক হইতে সমাজের স্ফূর্তি, সমাজের সৌন্দর্য, ও স্বাস্থ্য-বিকাশ দেখা যায়। বদ্ধ গুহায় বাস করিয়া আমি বুদ্ধিবলে রসায়নতত্ত্বের সাহায্যে কোনো মতে অক্সিজেন গ্যাস নির্মাণ করিয়া কিছু কাল প্রাণধারণ করিয়া থাকিতেও পারি— কিন্তু মুক্ত বায়ুতে যে চিরপ্রবাহিত প্রাণ চিরপ্রবাহিত স্ফূর্তি চিরপ্রবাহিত স্বাস্থ্য ও আনন্দ আছে তাহা তো বুদ্ধিবলে গড়িয়া তুলিতে পারি না। সংকীর্ণতা ও বৃহত্ত্বের মধ্যে যে কেবলমাত্র কম ও বেশি লইয়া প্রভেদ তাহা নহে, তাহার আনুষঙ্গিক প্রভেদই অত্যন্ত গুরুতর।

ধর্মের মধ্যে সেই অত্যন্ত বৃহত্ত্ব আছে— যাহাতে সমস্ত জাতি একত্রে বাস করিয়াও তাহার বায়ু দূষিত করিতে পারে না। ধর্ম অনন্ত আকাশের ন্যায়; কোটি কোটি মনুষ্য পশুপক্ষী হইতে কীটপতঙ্গ পর্যন্ত অবিশ্রাম নিশ্বাস ফেলিয়া তাহাকে কলুষিত করিতে পারে না। আর যাহাই আশ্রয় কর-না-কেন, কালক্রমে তাহা দূষিত ও বিষাক্ত হইবেই। কোনোটা বা অল্প দিনে হয়, কোনোটা বা বেশি দিনে হয়।

এইজন্যেই বলিতেছি— মনুষ্যত্বের যে বৃহত্তম আদর্শ আছে, তাহাকে যদি উপস্থিত আবশ্যকের অনুরোধে কোথাও কিছু সংকীর্ণ করিয়া লও, তবে নিশ্চয়ই ত্বরায় হউক আর বিলম্বেই হউক, তাহার বিশুদ্ধতা সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যাইবে। সে আর তোমাকে বল ও স্বাস্থ্য দিতে পারিবে না। শুদ্ধ সত্যকে যদি বিকৃত সত্য, সংকীর্ণ সত্য, আপাতত সুবিধার সত্য করিয়া তোল তবে উত্তরোত্তর নষ্ট হইয়া সে মিথ্যায় পরিণত হইবে, কোথাও তাহার পরিত্রাণ নাই। কারণ, অসীমের উপর সত্য দাঁড়াইয়া আছে, আমারই উপর নহে, তোমারই উপর নহে, অবস্থা বিশেষের উপর নহে— সেই সত্যকে সীমার উপর দাঁড় করাইলে তাহার প্রতিষ্ঠাভূমি ভাঙিয়া যায়— তখন বিসর্জিত দেবপ্রতিমার তৃণ-কাষ্ঠের ন্যায় তাহাকে লইয়া যে-সে যথেচ্ছা টানা-ছেঁড়া করিতে পারে। সত্য যেমন অন্যান্য ধর্মনীতিও তেমনি। যদি বিবেচনা কর পরার্থপরতা আবশ্যক, এইজন্যই তাহা শ্রদ্ধেয়; যদি মনে কর, আজ আমি অপরের সাহায্য করিলে কাল সে আমার

সাহায্য করিবে, এইজন্যই পরের সাহায্য করিব— তাকে কখনোই পরের ভালো রূপ সাহায্য করিতে পারে না ও সেই পরার্থপরতার প্রবৃত্তি কখনোই অধিক দিন টিকিবে না। কিসের বলেই বা টিকিবে। হিমালয়ের বিশাল হৃদয় হইতে উচ্ছ্বসিত হইতেছে বলিয়াই গঙ্গা এতদিন অবিচ্ছেদে আছে, এতদূর অবাধে গিয়াছে, তাই এত গভীর এত প্রশস্ত; আর এই গঙ্গা যদি আমাদের পরম সুবিধাজনক কলের পাইপ হইতে বাহির হইত তবে তাহা হইতে বড়ো জোর কলিকাতা শহরের ধূলাগুলি কাদা হইয়া উঠিত আর-কিছু হইত না। গঙ্গার জলের হিসাব রাখিতে হয় না; কেহ যদি গ্রীষ্মকালের দুই কলসি অধিক তোলে বা দুই অঞ্জলি অধিক পান করে তবে টানাটানি পড়ে না— আর কেবলমাত্র কল হইতে যে জল বাহির হয় একটু খরচের বাড়াবাড়ি পড়িলেই ঠিক আবশ্যকের সময় সে তিরোহিত হইয়া যায়। যে সময়ে তৃষা প্রবল, রৌদ্র প্রখর, ধরণী শুষ্ক, যে সময়ে শীতল জলের আবশ্যক সর্বাপেক্ষা অধিক সেই সময়েই সে নলের মধ্যে তাতিয়া উঠে, কলের মধ্যে ফুরাইয়া যায়।

বৃহৎ নিয়মে ক্ষুদ্র কাজ অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু সেই নিয়ম যদি বৃহৎ না হইত তবে তাহার দ্বারা ক্ষুদ্র কাজটুকুও অনুষ্ঠিত হইতে পারিত না। একটা পাকা আপেল ফল যে পৃথিবীতে খসিয়া পড়িবে তাহার জন্য চরাচরব্যাপী মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবশ্যক— একটি ক্ষুদ্র পালের নৌকা চলিবে কিন্তু পৃথিবীবেষ্টনকারী বাতাস চাই। তেমনি সংসারের ক্ষুদ্র কাজ চালাইতে হইবে এইজন্য অনন্ত-প্রতিষ্ঠিত ধর্মনীতির আবশ্যক।

সমাজ পরিবর্তনশীল, কিন্তু তাহার প্রতিষ্ঠাস্থল ধ্রুব হওয়া আবশ্যক। আমরা জীবগণ চলিয়া বেড়াই কিন্তু আমাদের পায়ের নীচেকার জমিও যদি চলিয়া বেড়াইত, তাহা হইলে বিষম গোলাযোগ বাধিত। বুদ্ধি-বিচারগত আদর্শের উপর সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলে সেই চঞ্চলতার উপর সমাজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। মাটির উপর পা রাখিয়া বল পাই না, কোনো কাজই সতেজে করিতে পারি না। সমাজের অট্টালিকা নির্মাণ করি কিন্তু জমির উপরে ভরসা না থাকাতে পাকা গাঁথুনি করিতে ইচ্ছা যায় না— সুতরাং ঝড় বহিলে তাহা সবসুদ্ধ ভাঙিয়া আমাদের মাথার উপরে আসিয়া পড়ে।

সুবিধার অনুরোধে সমাজের ভিত্তিভূমিতে যাঁহারা ছিদ্র খনন করেন, তাঁহারা অনেকে আপনাদিগকে বিজ্ঞ practical বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারা এমন ভাব প্রকাশ করেন যে, মিথ্যা কথা বলা খারাপ, কিন্তু political উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলিতে দোষ নাই। সত্যঘটনা বিকৃত করিয়া বলা উচিত নহে, কিন্তু তাহা করিলে যদি কোনো ইংরাজ অপদস্থ হয় তবে তাহাতে দোষ নাই। কপটতাচরণ ধর্মবিরুদ্ধ, কিন্তু দেশের আবশ্যক বিবেচনা করিয়া বৃহৎ উদ্দেশ্যে কপটতাচরণ অন্যায় নহে। কিন্তু বৃহৎ কাহাকে বল। উদ্দেশ্য যতই বৃহৎ হউক-না-কেন, তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর উদ্দেশ্য আছে। বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে গিয়া বৃহত্তর উদ্দেশ্য ধ্বংস হইয়া যায় যে! হইতেও পারে, সমস্ত জাতিকে মিথ্যাচরণ করিতে শিখাইলে আজিকার মতো একটা সুবিধার সুযোগ হইল— কিন্তু তাহাকে যদি দৃঢ় সত্যানুরাগ ও ন্যায়ানুরাগ শিখাইতে তাহা হইলে সে যে চিরদিনের মতো মানুষ হইতে পারিত! সে যে নির্ভয়ে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিত, তাহার হৃদয়ের যে অসীম বল জন্মাইত। তাহা ছাড়া সংসারের কার্য আমাদের অধীন নহে। আমরা যদি কেবলমাত্র একটি সূচী অনুসন্ধান করিবার জন্য দীপ জ্বালাই সে সমস্ত ঘর আলো করিবে, তেমনি আমরা যদি একটি সূচী গোপন কবিবার জন্য আলো নিবাইয়া দিই, তবে তাহাতে সমস্ত ঘর অন্ধকার হইবে। তেমনি আমারা যদি সমস্ত জাতিকে কোনো উপকার সাধনের জন্য মিথ্যাচরণ শিখাই তবে সেই মিথ্যাচরণ যে তোমার ইচ্ছার অনুসরণ করিয়া কেবলমাত্র উপকারটুকু করিয়াই অন্তর্হিত হইবে তাহা নহে, তাহার বংশ সে স্থাপনা করিয়া যাইবে। পূর্বেই বলিয়াছি বৃহত্ত্ব একটি মাত্র উদ্দেশ্যের মধ্যে বদ্ধ থাকে না, তাহার দ্বারা সহস্র উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সূর্যকিরণ উত্তাপ দেয়, আলোক দেয়, বর্ণ দেয়, জড় উদ্ভিদ্ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সকলেরই

উপরে তাহার সহস্রপ্রকারের প্রভাব কার্য করে; তোমার যদি এক সময়ে খেয়াল হয় যে পৃথিবীতে সবুজ বর্ণের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত অধিক হইয়াছে, অতএব সেটা নিবারণ করা আবশ্যক ও এই পরম লোকহিতকর উদ্দেশে যদি একটা আকাশজোড়া ছাতা তুলিয়া ধর তবে সবুজ রঙ তিরোহিত হইতেও পারে কিন্তু সেইসঙ্গে লাল রঙ নীল রঙ সমুদয় রঙ মারা যাইবে— পৃথিবীর উত্তাপ যাইবে, আলোক যাইবে, পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ সবাই মিলিয়া সরিয়া পড়িবে। তেমনি কেবলমাত্র political উদ্দেশ্যের মধ্যেই সত্য বদ্ধ নহে। তাহার প্রভাব মনুষ্য সমাজের অস্থিমজ্জার মধ্যে সহস্র আকারে কার্য করিতেছে— একটি মাত্র উদ্দেশ্য বিশেষের উপযোগী করিয়া যদি তাহার পরিবর্তন কর, তবে সে আর আর শত সহস্র উদ্দেশ্যের পক্ষে অনুপযোগী হইয়া উঠিবে। যেখানে যত সমাজের ধ্বংস হইয়াছে এইরূপ করিয়াই হইয়াছে। যখনি মতিভ্রমবশত একটি সংকীর্ণ হীত সমাজের চক্ষে সর্বেসর্বা হইয়া উঠিয়াছে এবং অনন্ত হিতকে সে তাহার নিকটে বলিদান দিয়াছে, তখনি সেই সমাজের মধ্যে শনি প্রবেশ করিয়াছে; তাহার কলি ঘনাইয়া আসিয়াছে। একটি বস্তা সর্ষপের সদ্‌গতি করিতে গিয়া ভরা নৌকা ডুবাইলে বাণিজ্যের যেরূপ উন্নতি হয় উপরি-উক্ত সমাজের সেইরূপ উন্নতি হইয়া থাকে। অতএব স্বজাতির যথার্থ উন্নতি যদি প্রার্থনীয় হয়, তবে কলকৌশল ধূর্ততা চাণক্যতা পরিহার করিয়া যথার্থ পুরুষের মতো মানুষের মতো মহত্ত্বের সরল রাজপথে চলিতে হইবে, তাহাতে গম্য স্থানে পৌঁছিতে যদি বিলম্ব হয় তাহাও শ্রেয়, তথাপি সুরঙ্গ পথে অতি সত্বরে রসতল রাজ্যে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করা সর্বথা পরিহর্তব্য।

পাপের পথে ধ্বংসের পথে যে বড়ো বড়ো দেউড়ি আছে সেখানে সমাজের প্রহরীরা বসিয়া থাকে, সুতরাং সে দিক দিয়া প্রবেশ করিতে হইলে বিস্তর বাধা পাইতে হয়; কিন্তু ছোটো ছোটো খিড়কির দুয়ারগুলিই ভয়ানক, সে দিকে তেমন কড়াক্কড় নাই। অতএব, বাহির হইতে দেখিতে যেমন হউক, ধ্বংসের সেই পথগুলিই প্রশস্ত।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। যখনই আমি মনে করি 'লোকহিতার্থে যদি একটা মিথ্যা কথা বলি তাহাতে তেমন দোষ নাই' তখনই আমার মনে যে বিশ্বাস ছিল 'সত্য ভালো', সে বিশ্বাস সংকীর্ণ হইয়া যায়, তখন মনে হয় 'সত্য ভালো, কেননা সত্য আবশ্যক।' সুতরাং যখনি কল্পনা করিলাম লোকহিতের জন্য সত্য আবশ্যক নহে, তখন স্থির হয় মিথ্যাই ভালো। সময় বিশেষে সত্য মন্দ মিথ্যা ভালো এমন যদি আমার মনে হয়, তবে সময় বিশেষেই বা তাহাকে বদ্ধ রাখি কেন? লোকহিতের জন্য যদি মিথ্যা বলি, তো আত্মহিতের জন্যই বা মিথ্যা না বলি কেন?

উত্তর— আত্মহিত অপেক্ষা লোকহিত ভালো।

প্রশ্ন— কেন ভালো? সময় বিশেষে সত্যই যদি ভালো না হয়, তবে লোকহিতই যে ভালো এ কথা কে বলিল?

উত্তর— লোকহিত আবশ্যক বলিয়া ভালো।

প্রশ্ন— কাহার পক্ষে আবশ্যক?

উত্তর— আত্মহিতের পক্ষেই আবশ্যক।

তদুত্তর— কই, তাহা তো সকল সময়ে দেখা যায় না। এমন তো দেখিয়াছি পরের অহিত করিয়া আপনার হিত হইয়াছে।

উত্তর— তাহাকে যথার্থ হিত বলে না।

প্রশ্ন— তবে কাহাকে বলে।

উত্তর— স্থায়ী সুখকে বলে।

তদুত্তর— আচ্ছা, সে কথা আমি বুঝিব। আমার সুখ আমার কাছে। ভালোমন্দ বলিয়া চরম কিছুই নাই। আবশ্যক অনাবশ্যক লইয়া কথা হইতেছে; আপাতত অস্থায়ী সুখই আমার আবশ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে। তাহা ছাড়া পরের অহিত করিয়া আমি যে সুখ কিনিয়াছি তাহাই যে স্থায়ী

নহে তাহার প্রমাণ কী? প্রবঞ্চনা করিয়া যে টাকা পাইলাম তাহা যদি আমরণ ভোগ করিতে পাই, তাহা হইলেই আমার সুখ স্থায়ী হইল।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইখানেই যে তর্ক শেষ হয়, তাহা নয়, এই তর্কের সোপান বাহিয় উত্তরোত্তর গভীর হইতে গভীরতর গহ্বরে নামিতে পারা যায়— কোথাও আর তল পাওয়া যায় না, অন্ধকার ক্রমশই ঘনাইতে থাকে; তরণীর আশ্রয়কে হেয়জ্ঞানপূর্বক প্রবল গর্বে আপনাকেই আপনার আশ্রয় জ্ঞান করিয়া অগাধ জলে ডুবিতে শুরু করিলে যে দশা হয় আত্মার সেই দশা উপস্থিত হয়।

আর, লোকহিত তুমিই বা কী জান, আমিই বা কী জানি! লোকের শেষ কোথায়! লোক বলিতে বর্তমানের বিপুল লোক ও ভবিষ্যতের অগণ্য লোক বুঝায়। এত লোকের হিত কখনোই মিথ্যার দ্বারা হইতে পারে না। কারণ মিথ্যা সীমাবদ্ধ, এত লোকে আশ্রয় সে কখনোই দিতে পারে না। বরং, মিথ্যা একজনের কাজে ও কিছুক্ষণের কাজে লাগিতে পারে, কিন্তু সকলের কাজে ও সকল সময়ের কাজে লাগিতে পারে না। লোকহিতের কথা যদি উঠে তো আমার এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, সত্যের দ্বারাই লোকহিত হয়, কারণ লোক যেমন অগণ্য সত্য তেমনি অসীম।

এত কথা আমি কি অনাবশ্যক বলিতেছি? এই-সকল পুরাতন কথার অবতারণা করা কি বাহুল্য হইতেছে? কী করিয়া বলিব! আমাদের দেশের প্রধান লেখক প্রকাশ্যভাবে অসংকোচে নির্ভয়ে অসত্যকে সত্যের সহিত একাসনে বসাইয়াছেন, সত্যের পূর্ণ সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন, এবং দেশের সমস্ত পাঠক নীরবে নিস্তব্ধভাবে শ্রবণ করিয়া গিয়াছেন। সাকার-নিরাকারের উপাসনা ভেদ লইয়াই সকলে কোলাহল করিতেছেন, কিন্তু অলক্ষ্যে ধর্মের ভিত্তিমূলে যে আঘাত পড়িতেছে সেই আঘাত হইতে ধর্মকে ও সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য কেহ দণ্ডায়মান হইতেছে না। এ কথা কেহ ভাবিতেছেন না যে, যে সমাজে প্রকাশ্যভাবে কেহ ধর্মের মূলে কুঠারঘাত করিতে সাহস করে, সেখানে ধর্মের মূল না জানি কতখানি শিথিল হইয়া গিয়াছে। আমাদের শিরার মধ্যে মিথ্যাচরণ ও কাপুরুষতা যদি রক্তের সহিত সঞ্চারিত না হইত তাহা হইলে কি আমাদের দেশের মুখ্য লেখক পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া স্পর্ধা সহকারে সত্যের বিরুদ্ধে একটি কথা কহিতে সাহস করিতেন! অথচ কাহারো তাহা অদ্ভুত বলিয়াও বোধ হইল না! আমরা দুর্বল. ধর্মের যে অসীম আদর্শ চরাচরে বিরাজ করিতেছে আমরা তাহার সম্পূর্ণ অনুসরণ করিতে পারি না, কিন্তু তাই বলিয়া আপনার কলঙ্ক লইয়া যদি সেই ধর্মের গাত্রে আরোপ করি, তাহা হইলে আমাদের দশা কী হইবে! যে সমাজের গণ্য ব্যক্তিরাও প্রকাশ্য রাজপথে ধর্মের সেই আদর্শপটে নিজ দেহের পঙ্ক মুছিয়া যায়— সেখানে সেই আদর্শে না জানি কত কলঙ্কের চিহ্নই পড়িয়াছে. তাই তাঁহাদিগকে কেহ নিবারণও করে না। তা যদি হয় তবে সে সমাজের পরিত্রাণ কোথায়? তাহাকে আশ্রয় দিবে কে, সে দাঁড়াইবে কিসের উপরে! সে পথ খুঁজিয়া পাইবে কেমন করিয়া? তাহার অক্ষয় বলের ভাণ্ডার কোথায়! সে কি কেবলই কুতর্ক করিয়া চলিতে থাকিবে, সংশয়ের মধ্যে গিয়া পড়িবে, আকাশের ধ্রুবতারার দিকে না চাহিয়া নিজের ঘূর্ণ্যমান মস্তিষ্ককেই আপনার দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্র বলিয়া স্থির করিয়া রাখিবে এবং তাহারই ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া লাঠিমের মতো ঘুরিতে ঘুরিতে পথপার্শ্বস্থ পয়ঃপ্রণালীরা মধ্যে গিয়া বিশ্রাম লাভ করিবে?

লেখক মহাশয় একটি হিন্দুর আদর্শ কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন, তিনি 'যদি মিথ্যা কহেন তবে মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তি স্মরণ পূর্বক যেখানে লোক হিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয়— অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেইখানেই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন।' কোনোখানেই মিথ্যা সত্য হয় না, শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু বলিলেও হয় না স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও হয় না। বঙ্কিমবাবু শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু, ঈশ্বরের লোকহিত সীমাবদ্ধ নহে— তাঁহার অখণ্ড নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। অসীম দেশ ও অসীম কালে তাঁহার হিত-ইচ্ছা কার্য করিতেছে— সুতরাং একটুখানি বর্তমান সুবিধার উদ্দেশ্যে খানিকটা মিথ্যার দ্বারা তালি-দেওয়া লোকহিত তাঁহার কার্য হইতেই পারে না। তাঁহার অনন্ত ইচ্ছার নিম্নে পড়িলে ক্ষণিক ভালোমন্দ চূর্ণ হইয়া

যায়। তাঁহার অগ্নিতে সৎলোকও দগ্ধ হয় অসৎলোকও দগ্ধ হয়। তাঁহার সূর্যকিরণ স্থানবিশেষের সাময়িক আবশ্যক অনাবশ্যক বিচার না করিয়াও সর্বত্র উত্তাপ দান করে। তেমনি তাঁহার অনন্ত সত্য ক্ষণিক ভালোমন্দের অপেক্ষা না রাখিয়া অসীমকাল সমভাবে বিরাজ করিতেছে। সেই সত্যকে লঙ্ঘন করিলে অবস্থা নির্বিচারে তাহার নির্দিষ্ট ফল ফলিতে থাকিবেই। আমরা তাহার সমস্ত ফল দেখিতে পাই না, জানিতে পারি না। এজন্যই আরও অধিক সাবধান হও। ক্ষুদ্র বুদ্ধির পরামর্শে ইহাকে লইয়া খেলা করিয়ো না।

অসত্যের উপাসক কি বিস্তর নাই? আত্মহিতের জন্যই হউক আর লোকহিতের জন্যই হউক অসত্য বলিতে আমাদের দেশের লোক কি এতই সংকুচিত যে অসত্য ধর্ম প্রচারের জন্য শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয়বার অবতরণের গুরুতর আবশ্যক হইয়াছে? কঠোর সত্যাচরণ করিয়া আমাদের এই বঙ্গসমাজের কি এতই অহিত হইতেছে যে অসাধারণ প্রতিভা আসিয়া বাঙালির হৃদয় হইতে সেই সত্যের মূল শিথিল করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু হায়, অসাধারণ প্রতিভা ইচ্ছা করিলে স্বদেশের উন্নতির মূল শিথিল করিতে পারেন কিন্তু সত্যের মূল শিথিল করিতে পারেন না।

যেখানে দুর্বলতা সেইখানেই মিথ্যা প্রবঞ্চনা কপটতা, অথবা যেখানে মিথ্যা প্রবঞ্চনা কপটতা সেইখানেই দুর্বলতা। তাহার কারণ, মানুষের মধ্যে এমন আশ্চর্য একটি নিয়ম আছে, মানুষ নিজের লাভ ক্ষতি সুবিধা অসুবিধা গণনা করিয়া চলিলে যথেষ্ট বল পায় না। এমন-কি, ক্ষতি, অসুবিধা, মৃত্যুর সম্ভাবনাতে তাহার বল বাড়াইতেও পারে। Practical লোকে যে-সকল ভাবকে নিতান্ত অবজ্ঞা করেন, কার্যের ব্যাঘাতজনক জ্ঞান করেন, সেই ভাব নহিলে তাহার কাজ ভালোরূপ চলেই না। সেই ভাবের সঙ্গে বুদ্ধি বিচার তর্কের সম্পূর্ণ ঐক্য নাই। বুদ্ধি বিচার তর্ক আসিলেই সেই ভাবের বল চলিয়া যায়। এই ভাবের বলে লোকে যুদ্ধে জয়ী হয়, সাহিত্যে অমর হয়, শিল্পে সুনিপুণ হয়— সমস্ত জাতি ভাবের বলে উন্নতির দুর্গমশিখরে উঠিতে পারে, অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলে, বাধাবিপত্তিকে অতিক্রম করে। এই ভাবের প্রবাহ যখন বন্যার মতো সবল পথে অগ্রসর হয় তখন ইহার অপ্রতিহত গতি। আর যখন ইহা বক্রবুদ্ধির কাটা নালা-নর্মদার মধ্যে শত ভাগে বিভক্ত হইয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলে তখন ইহা উত্তরোত্তর পঙ্কের মধ্যে শোষিত হইয়া দুর্গন্ধ বাষ্পের সৃষ্টি করিতে থাকে। ভাবের এত বল কেন? কারণ, ভাব অত্যন্ত বৃহৎ। বুদ্ধিবিবেচনার ন্যায় সীমাবদ্ধ নহে। লাভক্ষতির মধ্যে তাহার পরিধির শেষ নহে— বস্তুর মধ্যে সে রুদ্ধ নহে। তাহার নিজের মধ্যেই তাহার নিজের অসীমতা। সম্মুখে যখন মৃত্যু আসে তখনও সে অটল, কারণ ক্ষুদ্র জীবনের অপেক্ষা ভাব বৃহৎ। সম্মুখে যখন সর্বনাশ উপস্থিত তখনও সে বিমুখ হয় না, কারণ লাভের অপেক্ষাও ভাব বৃহৎ। স্ত্রী পুত্র পরিবার ভাবের নিকট ক্ষুদ্র হইয়া যায়। এই ভাবের সমুদ্রকে বাঁধাইয়া বাঁধাইয়া যাঁহারা কূপ খনন করিতে চান, তাঁহারা সেই কূপের মধ্যে তাঁহাদের নিজের গুরুভার বিজ্ঞতাকে বিসর্জন দিন, কিন্তু সমস্ত স্বজাতিকে বিসর্জন না দিলেই মঙ্গল।

আমাদের জাতি নতুন হাঁটিতে শিখিতেছে, এ সময়ে বৃদ্ধ জাতির দৃষ্টান্ত দেখিয়া ভাবের প্রতি ইহার অবিশ্বাস জন্মাইয়া দেওয়া কোনোমতেই কর্তব্য বোধ হয় না। এখন ইতস্তত করিবার সময় নহে। এখন ভাবের পতাকা আকাশে উড়াইয়া নবীন উৎসাহে জগতের সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে। এই বাল্য-উৎসাহের স্মৃতিই বৃদ্ধ সমাজকে সতেজ করিয়া রাখে। এই সময়ে ধর্ম, স্বাধীনতা, বীরত্বের যে একটি অখণ্ড পরিপূর্ণ ভাব হৃদয়ে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে, তাহারই সংস্কার বৃদ্ধকাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এখনি যদি হৃদয়ের মধ্য ভাঙাচোরা টলমল অসম্পূর্ণ প্রতিমা তবে উত্তরকালে তাহার জীর্ণ ধূলিমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। অল্প বয়সে শরীরের যে কাঠামো নির্মিত হয়, সমস্ত জীবন সেই কাঠামোর উপর নির্ভর করিয়া চালাইতে হয়। এখন আমাদের সাহিত্য সম্বন্ধে অনেকেই বলিয়া থাকেন, বই বিক্রি করিয়া টাকা হয় না, এ সাহিত্যের মঙ্গল হইবে কি করিয়া!

বুড়া য়ুরোপীয় সাহিত্যের টাকার থলি দেখিয়া হিংসা করিয়া এই কথা বলা হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের এ বয়েসের এ কথা নহে। বই লিখিয়া টাকা নাই হইল! যে না লিখিয়া থাকিতে পারিবে না সেই লিখিবে, যাহার টাকা না হইলে চলে না সে লিখেবে না। উপবাস ও দারিদ্র্যের মধ্যে সাহিত্যর মূল পত্তন, ইহা কি অন্য দেশেও দেখা যায় না! বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিয়া কি কুবেরের ভাণ্ডার লুঠ করিয়াছিলেন? যদি তাঁহার কুবের ভাণ্ডার থাকিত রামায়ণ রচনার প্রতিবন্ধক দূর করিতে তিনি সমস্ত ব্যয় করিতে পারিতেন। প্রখর বিজ্ঞতার প্রভাবে মনুষ্যপ্রকৃতির প্রতি অত্যন্ত অবিশ্বাস না থাকিলে কেহ মনে করিতে পারে না যে উদরের মধ্যেই সাহিত্যের মূল হৃদয়ের মধ্যে নহে। লেখার উদ্দেশ্য মহৎ না হইলে লেখা মহৎ হইবে না।

যেমন করিয়াই দেখি, সংকীর্ণতা মঙ্গলের কারণ নহে। জীবনের আদর্শকে সীমাবদ্ধ করিয়া কখনোই জাতির উন্নতি হইবে না। উদারতা নহিলে কখনোই মহত্ত্বের স্ফূর্তি হইবে না। মুখশ্রীতে যে একটি দীপ্তির বিভাস হয়, হৃদয়ের মধ্যে যে একটি প্রতিভার বিকাশ হয়, সমস্ত জীবন যে সংসার তরঙ্গের মধ্যে অটল অচলের ন্যায় মাথা তুলিয়া জাগিয়া থাকে, সে কেবল একটি ধ্রুব বিপুল উদারতাকে আশ্রয় করিয়া। সংকোচের মধ্যে গেলেই রোগে জীর্ণ, শোকে শীর্ণ, ভয়ে ভীত, দাসত্বে নতশির, অপমানে নিরুপায় হইয়া থাকিতে হয়, চোখ তুলিয়া চাহিতে পারা যায় না, মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না, কাপুরুষতার সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। তখন মিথ্যাচারণ, কপটতা, তোষামোদ জীবনের সম্বল হইয়া পড়ে। অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিরা কাপুরুষতার আশ্রয়স্থল এই হীন মিথ্যাকে সবলে সমূলে উৎপাটন না করিয়া যদি তাহার বীজ গোপনে বপন করেন তবে সমাজের ঘোরতর অমঙ্গলের আশঙ্কায় হতাশ্বাস হইয়া পড়িতে হয়। যিনিই যাহা বলুন, পরম সত্যবাদী বলিয়া আমাদিগকে উপহাস করুন, sentimental বলিয়া আমাদিগকে অবজ্ঞাই করুন, বা শ্রীকৃষ্ণের দোহাই দিন, এ মিথ্যাকে আমরা কখনোই ঘরে থাকিতে দিব না, ইহাকে আমরা বিসর্জন দিয়া আসিব। সুবিধাই হউক লাভই হউক, আত্মহিতই হউক লোকহিতই হউক, মিথ্যা বলিব না, মিথ্যাচরণ করিব না, সত্যের ভান করিব না, আত্মপ্রবঞ্চনা করিব না— সত্যকে আশ্রয় করিয়া মহত্ত্বে উন্নত হইয়া সরল ভাবে দাঁড়াইয়া ঝড় সহ্য করিব সেও ভালো, তবু মিথ্যায় সংকুচিত হইয়া সুবিধার গর্তর মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিরাপদ সুখ অনুভব করিবার অভিলাষে আত্মার কবর রচনা করিব না।

ভারতী
অগ্রহায়ণ ১২৯১

কৈফিয়ত

আমি গত অগ্রহায়ণ মাসের ভারতীতে 'পুরাতন কথা' নামক একটি প্রবন্ধ লিখি, তাহার উত্তরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উক্ত মাসের প্রচারে 'আদি ব্রাহ্মসমাজ ও নব হিন্দু সম্প্রদায়' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা পাঠ করিয়া জানিলাম যে, বঙ্কিমবাবুর কতগুলি কথা আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম। অতিশয় আনন্দের বিষয়। কিন্তু পাছে কেহ আমার প্রতি অন্যায় দোষারোপ করেন এইজন্য, কেন যে ভুল বুঝিয়াছিলাম, সংক্ষেপে তাহার কারণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমার প্রবন্ধের প্রসঙ্গক্রমে বঙ্কিমবাবু আনুষঙ্গিক যে-সকল কথার উল্লেখ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহা পরে বলিব। আপাতত প্রধান আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করা যাউক।

বঙ্কিমবাবু বলেন, 'রবীন্দ্রবাবু "সত্য" এবং "মিথ্যা" এই দুইটি শব্দ ইংরাজি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। সেই অর্থেই আমার ব্যবহৃত "সত্য" "মিথ্যা" বুঝিয়াছেন। তাঁহার কাছে সত্য

Truth মিথ্যা Falsehood। আমি সত্য মিথ্যা শব্দ ব্যবহারকালে ইংরেজির অনুবাদ করি নাই...“সত্য” “মিথ্যা” প্রাচীনকাল হইতে যে অর্থে ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, আমি সেই অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। সে দেশী অর্থে, সত্য Truth, আর তাহা ছাড়া আরও কিছু। প্রতিজ্ঞা রক্ষা, আপনার কথা রক্ষা, ইহাও সত্য।'

বঙ্কিমবাবু যে অর্থে মনে করিয়া সত্য মিথ্যা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা এখন বুঝিলাম। কিন্তু প্রচারের প্রথম সংখ্যার হিন্দুধর্ম শীর্ষক প্রবন্ধে যে কথাগুলি ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে এই অর্থ বুঝিবার কোনো সম্ভাবনা নাই, আমার সামান্য বুদ্ধিতে এইরূপ মনে হয়।

তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্‌ধৃত করি। 'যদি মিথ্যা কহেন, তবে মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তি স্মরণপূর্বক যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয় অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেইখানেই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন।'

প্রথমে দেখিতে হইবে সংস্কৃতে সত্য মিথ্যার অর্থ কী। একটা প্রয়োগ না দেখিলে ইহা স্পষ্ট হইবে না। মনুতে আছে—

সত্যং ব্রুয়াৎ, প্রিয়ং ব্রুয়াৎ ন ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রুয়াৎ, এষ ধর্মঃ সনাতনঃ।

অর্থাৎ— সত্য বলিবে, প্রিয় বলিবে, কিন্তু অপ্রিয় সত্য বলিবে না, প্রিয় মিথ্যাও বলিবে না, ইহাই সনাতন ধর্ম— এখানে সত্য বলিতে কেবলমাত্র সত্য কথাই বুঝাইতেছে, তৎসঙ্গে প্রতিজ্ঞা-রক্ষা বুঝাইতেছে না। যদি প্রতিজ্ঞারক্ষা বুঝাইত তবে প্রিয় ও অপ্রিয় শব্দের সার্থকতা থাকিত না। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এখানে মনু সত্য শব্দে Truth ছাড়া 'আরও কিছু'-কে ধরেন নাই, এই অসম্পূর্ণতাবশত সংহিতাকার মনুকে যদি কেহ অনুবাদপরায়ণ বা খৃস্টান বলিয়া গণ্য করেন, তবে আমি সেই পুরাতন মনুর দলে ভিড়িয়া খৃস্টিয়ান হইব— আমার নতুন হিন্দুয়ানিতে আবশ্যক? সত্য শব্দের মূল ধাতু ধরিয়াই দেখি আর ব্যবহার ধরিয়াই দেখি— দেখা যায়, সত্য অর্থে সাধারণত Truth বুঝায় ও কেবল স্থলবিশেষে প্রতিজ্ঞা বুঝায়। অতএব যেখানে সত্যের সংকীর্ণ ও বিশেষ অর্থের আবশ্যক সেখানে বিশেষ ব্যাখ্যারও আবশ্যক।

দ্বিতীয়ত— 'সত্য' বলিতে প্রতিজ্ঞা 'রক্ষা' বুঝায় না। সত্য পালন বা সত্য রক্ষা বলিতে প্রতিজ্ঞারক্ষা বুঝায়— কেবলমাত্র সত্য শব্দ বুঝায় না।

তৃতীয়ত— বঙ্কিমবাবু 'সত্য' শব্দের উল্লেখ করেন নাই, তিনি 'মিথ্যা' শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন। সত্য শব্দে সংস্কৃতে স্থলবিশেষে প্রতিজ্ঞা বুঝায় বটে— কিন্তু মিথ্যা শব্দে তদ্‌বিপরীত অর্থ সংস্কৃত ভাষায় বোধ করি প্রচলিত নাই— আমার এইরূপ বিশ্বাস।

ভ্রম হইবার আর-একটি গুরুতর কারণ আছে। বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন 'যদি মিথ্যা কথা কহেন'— সত্য রক্ষা না করাকে 'মিথ্যা কথা কওয়া' কোনো পাঠকের মনে হইতে পারে না। তিনি হিন্দুই হউন খৃস্টিয়ানই হউন স্বাধীনচিন্তাশীলই হউন আর অনুবাদপরায়ণই হউন 'মিথ্যা কথা কহা' শুনিলেই তাহার প্রত্যহপ্রচলিত সহজ অর্থই মনে হইবে। অর্জুন যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যে-কেহ তাঁহার গাণ্ডীবের নিন্দা করিবে তাহাকে তিনি বধ করিবেন, তখন তিনি মিথ্যা কথা কহেন নাই। কারণ, অর্জুন এখানে কোনো সত্য গোপন করিতেছেন না, তাঁহার হৃদয়ের যাহা বিশ্বাস বাক্যে তাহার অন্যথাচরণ করিতেছেন না, তৎকালে সত্য সত্যই যাহা সংকল্প করিয়াছেন তাহাই ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, কোনো প্রকার সত্যের ভানও করেন নাই। আমি যদি বলি যে 'আমি কাল তোমার বাড়ি যাইব' ও ইতিমধ্যে আজই মরিয়া যাই তবে আমাকে কোন্ নৈয়ায়িক মিথ্যাবাদী বলিবে? এখানে হৃদয়ের বিশ্বাস ধরিয়া সত্য মিথ্যা বিচার করিতে হয়— আমি যখন বলিয়াছিলাম তখন আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে তোমার বাড়ি যাইতে পারিব। মানুষ যখন অতীত বা বর্তমান সম্বন্ধে কোনো কথা বলে তখন তাহার জ্ঞান লইয়া সত্য মিথ্যা বিচার করিতে হয়, সে যদি বলে কাল তোমার বাড়ি গিয়াছিলাম অথচ না

গিয়া থাকে তবে সে মনের মধ্যে জানিল এক মুখে বলিল আর, অতএব সে মিথ্যাবাদী। আর যখন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনো কথা বলে তখন তাহার বিশ্বাস লইয়া সত্য মিথ্যা বিচার করিতে হয়। যে বলে কাল তোমার বাড়ি যাইব, তাহার মনে যদি বিশ্বাস থাকে যাইব না, তবেই সে মিথ্যাবাদী। অর্জুন যে তাঁহার সত্য পালন করিলেন না সে যে তাঁহার ক্ষমতাসত্ত্বেও কেবলমাত্র খেয়াল-অনুসারে করিলেন না তাহা নহে, সহৃদয় ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি পক্ষে সম্পূর্ণ অনতিক্রমণীয় গুরুতর বাধাপ্রযুক্ত করিতে পারিলেন না— মনুষ্য-জ্ঞানের অসম্পূর্ণতাবশত এ বাধার সম্ভাবনা তাঁহার মনে উদয় হয় নাই। যদি বা উদয় হইয়া থাকে তবে মনুষ্যবুদ্ধির অসম্পূর্ণতাবশত বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তথাপি সংকল্প রক্ষা করিতে পারিবেন, কিন্তু কার্যকালে দেখিলেন তাহা তাঁহার ক্ষমতার অতীত (শারীরিক ক্ষমতার কথা বলিতেছি না)। অতএব সত্যপালনে অক্ষম হওয়াকে 'মিথ্যা কথা কহা' বলা যায় না যদি কেহ বলেন তবে তিনি মনুষ্যের সহজ বুদ্ধিকে নিতান্ত পীড়ন করিয়া বলেন। যদি বা আবশ্যকের অনুরোধে নিতান্তই বলিতে হয় তবে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন, সেখানে বিশেষ ব্যাখ্যারও নিতান্ত আবশ্যক।

বঙ্কিমবাবু এইরূপ বলেন যে, আমি যখন মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তির উপর বরাত দিয়াছি তখন অগ্রে সেই কৃষ্ণোক্তি অনুসন্ধান করিয়া পড়িয়া তবে আমার কথার যথার্থ মর্মগ্রহণ করা সম্ভব। কিন্তু বঙ্কিমবাবু যখন তাঁহার প্রবন্ধে মহাভারতীয় কৃষ্ণের বিশেষ উক্তির বিশেষ উল্লেখ করেন নাই, তখন, আমার এবং অনেক পাঠকের সর্বজনখ্যাত দ্রোণপর্বস্থ কৃষ্ণের সত্য-মিথ্যা সম্বন্ধে উক্তিই মনে উদয় হওয়া অন্যায় হয় নাই। বিশেষত যখন তাঁহার লেখা পড়িয়া সত্য কথনের কথাই মনে হয় সত্য পালনের কথা মনে হয় না তখন মহাভারতের যে কৃষ্ণোক্তি তাহারই সমর্থনের স্বরূপ সংগত হয় অগত্যা তাহাই আমাদের মনে আসে। মনে না আসাই আশ্চর্য। বিশেষত সেইটাই অপেক্ষাকৃত প্রচলিত। 'হত ইতি গজে'র কথা সকলেই জানে, কিন্তু গাণ্ডীবের কথা এত লোক জানে না।

যখন অর্থ বুঝিতে কষ্ট হয় তখনই লোকে নানা উপায়ে বুঝিতে চেষ্টা করে, কিন্তু যখন কোনো অর্থ সহজেই মনে প্রতিভাত হয় ও সাধারণের মনে কেবলমাত্র সেইরূপ অর্থই প্রতিভাত হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে হয় তখন চেষ্টা করিবার কথা মনেই আসে না। আমি সেইজন্যই বঙ্কিমবাবুর উক্ত কথা বুঝিতে অতিরিক্ত মাত্রায় চেষ্টা করি নাই।

প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় এইটুকু, এখন অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ের উল্লেখ করা যাক।

বঙ্কিমবাবু একস্থলে কৌশলে ইঙ্গিতে বলিয়াছিলেন যে, আমার প্রবন্ধে আমি মিথ্যাকথা কহিয়াছি। যদিও বলিয়াছেন কিন্তু তিনি যে তাহা বিশ্বাস করেন তাহা আমার কোনোমতেই বোধ হয় না, কৌতুক করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে না পারিয়া তিনি একটি ক্ষুদ্র কথাকে কিঞ্চিৎ বৃহৎ করিয়া তুলিয়াছেন, এই মাত্র। আমি বলিয়াছিলাম, 'লেখক মহাশয় একটি হিন্দুর আদর্শ কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন' ইত্যাদি। বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন, 'প্রথম, "কল্পনা" শব্দটি সত্য নহে; আমি আদর্শ হিন্দু "কল্পনা" করিয়াছি এ কথা আমার লেখার ভিতর কোথাও নাই। আমার লেখার ভিতরে এমন কিছুই নাই যে, তাহা হইতে এমন অনুমান করা যায়। প্রচারের প্রথম সংখ্যার হিন্দুধর্ম শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে কথাটা রবীন্দ্রবাবু তুলিয়াছেন। পাঠক ওই প্রবন্ধ পড়িয়া দেখিবেন যে, "কল্পনা" নহে। আমার নিকট পরিচিত দুই জন হিন্দুর দোষগুণ বর্ণনা করিয়াছি।'

উল্লিখিত প্রচারের প্রবন্ধে দুই জন হিন্দুর কথা আছে, একজন ধর্মভ্রষ্ট আর-একজন আচারভ্রষ্ট। ধর্মভ্রষ্ট হিন্দুর উল্লেখস্থলে তিনি বলিয়াছেন বটে, 'আমরা একটি জমিদার দেখিয়াছি, তিনি' ইত্যাদি— কিন্তু আমা-কর্তৃক আলোচিত আচারভ্রষ্ট হিন্দুর উল্লেখস্থলে তিনি কেবলমাত্র বলিয়াছেন— 'আর একটি হিন্দুর কথা বলি।' কাল্পনিক আদর্শের উল্লেখকালেও এরূপ ভাষা প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। প্রথমে একটি সত্য উদাহরণ দিয়া তাহার পরেই সর্বতোভাবে তাহার একটি বিরুদ্ধ-পক্ষ খাড়া করিবার উদ্দেশ্যে একটি কাল্পনিক উদাহরণ গঠিত করা অনেক স্থলেই

দেখা যায়। প্রচারের লেখা হইতে এরূপ অনুমান করা যে কোনোমতেই সম্ভব হইতে পারে না এমন কথা বলা যায় না। যদি স্বল্পবুদ্ধিবশত আমি এরূপ অনুমান করিয়া থাকি তবে তাহা তরুণবয়সসুলভ ভ্রম মনে করাই বঙ্কিমবাবুর ন্যায় উদারহৃদয় মহদাশয়ের উচিত, স্বেচ্ছাকৃত মিথ্যা উক্তি মনে করিলে আমি কিঞ্চিৎ বিস্মিত এবং অত্যন্ত ব্যথিত হইব। বিশেষত তিনি যখন প্রকাশ্যে আমাকে তাঁহার সুহৃৎশ্রেণীমধ্যে গণ্য করিয়াছেন তখন সেই আমার গর্বের সম্পর্ক ধরিয়া আমি কিঞ্চিৎ অভিমান প্রকাশ করিতে পারি, সে অধিকার আমাকে তিনি দিয়াছেন।

আমার দ্বিতীয় নম্বর মিথ্যার উল্লেখে বলিয়াছেন— 'তার পর "আদর্শ" কথাটি সত্য নহে। "আদর্শ" শব্দটা আমার উক্তিতে নাই। ভাবেও বুঝায় না। যে ব্যক্তি কখনো কখনো সুরাপান করে সে ব্যক্তি আদর্শ হিন্দু বলিয়া গৃহীত হইল কী প্রকারে?'

প্রথম কথা এই যে, আমি বলিয়াছিলাম 'তিনি একটি "হিন্দুর আদর্শ" কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন' ইত্যাদি। আমি এমন বলি নাই যে— তিনি একটি আদর্শ হিন্দু কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন। 'একটি হিন্দুর আদর্শ কল্পনা করা' ও 'একটি আদর্শ হিন্দু কল্পনা করা' উভয়ে অর্থের কত প্রভেদ হয় পাঠকেরা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। দ্বিতীয় কথা— ভাবেও কি বুঝায় না? আদর্শ বলিতে আমি সাধারণ্যে প্রচলিত হিন্দুর আদর্শস্থল মনে করি নাই। বঙ্কিমবাবুর আদর্শস্থল মনে করিয়াছিলাম। মনে করার কারণ যে কিছুই নাই তাহা নহে। প্রবন্ধ পড়িয়া এমন সংস্কার হয় যে, বঙ্কিমবাবুর মতে, কথঞ্চিৎ আচারবিরুদ্ধ কাজ করিলেই যে সমস্ত একেবারে দূষ্য হইয়া গেল তাহা নহে, ধর্মবিরুদ্ধ কাজ করিলেই বাস্তবিক দোষের কথা হয়। ইহাই দাঁড় করাইবার জন্য তিনি এমন একটি চিত্র আঁকিয়াছেন যাহা বিরুদ্ধাচার সমর্থন করিয়াও সাধারণের চক্ষে অপেক্ষাকৃত মনোহর আকারে বিরাজ করে। দুইটি চিত্রের মধ্যে কোন্ চিত্রে লেখক মহাশয়ের হৃদয় পড়িয়া রহিয়াছে, কোন্ চিত্রের প্রতি তিনি (জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক) পাঠকদের হৃদয়াকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছেন তাহা পড়িলেই টের পাওয়া যায়। দুইটি চিত্রই যে তিনি সমান অপক্ষপাতিতার সঙ্গে আঁকিয়াছেন তাহা নহে। ইহার মধ্যে যে চিত্রের উপর তাঁহার প্রীতির লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে সেইটিকেই সম্পূর্ণ না হউক অপেক্ষাকৃত আদর্শস্থল বলিয়া মনে করা অসম্ভব নহে। যখন বলা যায় বঙ্কিমবাবু একটি হিন্দুর আদর্শ কল্পনা করিয়াছেন, তখন যে মহত্তম আদর্শই বুঝায় তাহাও নহে। দোষে গুণে জড়িত একটি আদর্শও হইতে পারে। যে-কোনো-একটা চিত্র খাড়া করিলেই তাহাকে আদর্শ বলা যায়।

তৃতীয় কথা— কেহ বলিতে পারেন যে, আলোচ্য হিন্দুটিকে বঙ্কিমবাবু যদি মহত্তম আদর্শস্থল বলিয়া খাড়া করিয়া না থাকেন তবে তাহার চরিত্রগত কোনো-একটা গুণ অথবা দোষ লইয়া এত আলোচনা করিবার আবশ্যক কী ছিল। কিন্তু আদর্শ হিন্দুর দোষ-গুণ লইয়া আমি সমালোচনা করি নাই। বঙ্কিমবাবু নিজের মুখে যাহা বলিয়াছেন তৎসম্বন্ধেই আমার বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছি। যেখানে বলিয়াছেন— 'যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয় অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়'— সেখানে তিনি নিজেরই মত ব্যক্ত করিয়াছেন— এ তো আদর্শ হিন্দুর কথা নহে।

বঙ্কিমবাবু যে দুইটি অসত্যের অপবাদ আমাকে দিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য আমি বলিলাম। কিন্তু যেখানে তিনি বলিয়াছেন 'প্রয়োজন হইলে এরূপ উদাহরণ আরও দেওয়া যাইতে পারে' সেখানে আমার বক্তব্যের পথ রাখেন নাই। প্রয়োজন আছে কি না জানি না; যদি থাকিত তবে উদাহরণ দিলেই ভালো ছিল আর যদি না থাকিত তবে গোপনে এই বিষবাণক্ষেপণেরও প্রয়োজন ছিল না।

বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন 'লোকহিত' শব্দের অর্থ বুঝিতে আমি ভুল করিয়াছি। তিনি সংশোধন করিয়া দেন নাই এইজন্য সেই ভুল আমার এখনও রহিয়া গেছে। সলজ্জে স্বীকার করিতেছি, এখনও আমি আমার ভ্রম বুঝিতে পারি নাই। অন্য যাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিয়াছি তাঁহারাও আমার অজ্ঞান দূর করিতে পারেন নাই।

লেখকের নিজের সম্বন্ধে আর-একটি কথা আছে। বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন ভারতীতে প্রকাশিত মল্লিখিত প্রবন্ধে গালিগালাজের বড়ো ছড়াছড়ি বড়ো বাড়াবাড়ি আছে। শুনিয়া আমি নিতান্ত বিস্মিত হইলাম। বঙ্কিমবাবুর লেখার প্রসঙ্গে আমার যাহা বলিবার বলিয়াছি কিন্তু বঙ্কিমবাবুকে কোথাও গালি দিই নাই। তাঁহাকে গালি দিবার কথা আমার মনেও আসিতে পারে না। তিনি আমার গুরুজন তুল্য, তিনি আমা অপেক্ষা কিসে না বড়ো! আমি তাঁহাকে ভক্তি করি, আর কেই বা না করে। তাঁহার প্রথম সন্তান দুর্গেশনন্দিনী বোধ করি আমা অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা। আমার যে এতদূর আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছিল যে তাঁহাকে অমান্য করিয়াছি কেবলমাত্র অমান্য নহে তাঁহাকে গালি দিয়াছি তাহা সম্ভব নহে। ক্ষুব্ধ-হৃদয়ে অনেক কথা বলিয়াছি, কিন্তু গালিগালাজ হইতে অনেক দূরে আছি। মেছোহাটার তো কথাই নাই আঁষটে গন্ধটুকু পর্যন্ত নাই। যে স্থান উদ্‌ধৃত করিয়াছেন তাহা গালি নহে তাহা আক্ষেপ উক্তি। 'মেছোহাটা'ই বলো আর 'প্রার্থনা মন্দির'ই বলো আমি কোথা হইতেও ফরমাশ দিয়া কথা আমদানি করি নাই— আমি বাণিজ্য-ব্যবসায়ের ধার ধারি না— হৃদয় হইতে উৎসারিত না হইলে সে কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইত না, যিনি বিশ্বাস করেন করুন, না করেন নাই করুন।

বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন— প্রথম সংখ্যক 'প্রচার' বাহির হওয়ার পর রবীন্দ্রবাবুর সহিত আমার চার-পাঁচ বার দেখা হইয়াছিল এবং প্রধানত সাহিত্য সম্বন্ধে কথোপকথন হইয়াছিল, তিনি কেন আমাকে প্রচারের উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই? করি নাই বটে, কিন্তু তাহাতে কী আসে যায়! মূল কথাটার সহিত তাহার কী যোগ? না করিবার অনেক কারণ থাকিতে পারে। সে-সব ঘরের কথা। পাঠকদের বলিবার নহে। বর্তমান লেখকের নানা দোষ থাকিতে পারে। দুর্বলস্বভাবশত আমার চক্ষুলজ্জা হইতে পারে। বঙ্কিমবাবু পাছে বিরোধী মত সহিতে না পারিয়া আমাকে ভুল বুঝেন এমন আশঙ্কা মনে উদয় হইতে পারে। প্রথম যখন পড়িয়াছিলাম তখন স্বাভাবিক অনবধানতা বা মন্দবুদ্ধিবশত উক্ত কয়েক ছত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি না করিতে পারি। কিছুদিন পরে অন্য কোনো ব্যক্তির মুখে এ সম্বন্ধে আলোচনা শুনিয়া আমার মনে আঘাত লাগিতেও পারে। উক্ত প্রবন্ধ দ্বিতীয়বার পড়িবার সময় আমার মনে নূতন ভাব উদয় হওয়াও অসম্ভব নহে। কিন্তু, প্রকৃত কারণ এই যে, বাড়িতে 'প্রচার' আসিবামাত্র কে কোন্ দিক হইতে লইয়া যায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এইজন্য ভালো করিয়া পড়িতে প্রায় বিলম্ব হইয়া যায়। আমার মনে আছে প্রথম খণ্ড প্রচার একটি পুস্তকালয়ে গিয়া চোখ বুলাইয়া দেখিয়া আসি। সকল লেখা পড়িতে পাই নাই। পরে একদিন শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মুখে হিন্দুধর্ম নামক প্রবন্ধের মর্মটা শুনি কিন্তু তিনি সত্য-মিথ্যা বিষয়ে কোনো উল্লেখ করেন নাই। পরে সুবিধা অথবা অবসর অনুসারে বহু বিলম্বে উক্ত প্রবন্ধ প্রচারে পড়িতে পাই। কিন্তু এ-সকল কথা কেন? আমার প্রবন্ধে আমি যদি কোনো অন্যায় কথা না বলিয়া থাকি তাহা হইলে আমার আর কোনো দুঃখ নাই।

আমার নিজের সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহা বলিলাম। এখন আর দুই-একটি কথা আছে। বঙ্কিমবাবুর লেখার ভাব এই যে, তিনি রবীন্দ্রনাথ নামক ব্যক্তিবিশেষের লেখার উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিতেন না যদি না উক্ত রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত লিপ্ত থাকিতেন। বাস্তবিকই আমি বঙ্কিমবাবুর সহিত মুখোমুখি উত্তর-প্রত্যুত্তর করিবার যোগ্য নহি, তিনিই আমার স্পর্ধা বাড়াইয়াছেন। তবে, বঙ্কিমবাবুর হস্ত হইতে বজ্রাঘাত পাইবার সুখ ও গর্ব অনুভব করিবার জন্যই আমি লিখি নাই, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া আমার জ্ঞান হইয়াছিল, তাই আমার কর্তব্যকার্য সাধন করিয়াছি। নহিলে সাধ করিয়া বঙ্কিমবাবুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে আমার প্রবৃত্তিও হয় না ভরসাও হয় না। যাহা হউক, আলোচ্য বিষয়ের গৌরবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বঙ্কিমবাবু উত্তর লিখিতে প্রবৃত্ত হন নাই; তিনি আমার প্রবন্ধকে উপলক্ষ মাত্র করিয়া আদি ব্রাহ্মসমাজকে দুই-এক কথা বলিয়াছেন। প্রথম কথা এই যে, আদি ব্রাহ্মসমাজের লেখকেরা

উত্তরোত্তর মাত্রা চড়াইয়া বঙ্কিমবাবুকে আক্রমণ ও গালিগালাজ করিয়াছেন। আক্রমণমাত্রই যে অন্যায় এরূপ আমার বিশ্বাস নহে। আদি ব্রাহ্মসমাজের কতকগুলি মত আছে। উক্ত ব্রাহ্মসমাজের দৃঢ় বিশ্বাস যে, সেই-সকল মত প্রচার হইলে দেশের মঙ্গল। যদি উক্ত সমাজবর্তী কেহ সত্যসত্যই অথবা ভ্রমক্রমেই এমন মনে করেন যে অন্য কোনো মত তাঁহাদের মত-প্রচারের ব্যাঘাত করিতেছে, এবং দেশের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যদি সে মতকে খণ্ডন করিবার চেষ্টা করেন, তবে তাহাতে তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না এবং তাহাতে কোনো পক্ষেরই ক্ষুব্ধ হইবার কোনো কারণ দেখা যায় না। এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক এবং ভালো, এইরূপ না হওয়াই মন্দ। তবে, গালিগালাজ করা কোনো হিসাবেই ভালো নহে সন্দেহ নাই। এবং সে কাজ আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে হয়ও নাই। তত্ত্ববোধিনীতে বঙ্কিমবাবুর মতের বিরুদ্ধে যে দুইটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহাতে গালিগালাজের কোনো সম্পর্ক নাই। বিশেষত নব্য হিন্দু সম্প্রদায় নামক প্রবন্ধে বিশেষ বিনয় ও সম্মানের সহিত বঙ্কিমবাবুর উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাশচন্দ্র সিংহ নব্যভারতে বঙ্কিমবাবুর বিরুদ্ধে যে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহার সহিত আদি ব্রাহ্মসমাজের বা 'জোড়াসাঁকোর ঠাকুর মহাশয়দের' কোনো যোগই থাকিতে পারে না। তিনি ইচ্ছা করিলে আরও অনেক ঐতিহাসিক প্রবন্ধে আরও অনেক মহারথীকে আরও গুরুতররূপে আক্রমণ করিতে পারেন, আদি ব্রাহ্মসমাজের অথবা ঠাকুর মহাশয়দের তাঁহাকে নিবারণ করিবার কোনো অধিকার নাই। আমি যদি বলি বঙ্কিমবাবু নবজীবনে অথবা প্রচারে যে-সকল প্রবন্ধ লেখেন, তাঁহার এজলাসের সহিত অথবা ডেপ্যুটি ম্যাজিস্ট্রেটসমাজের সহিত তাহাদের সবিশেষ যোগ আছে তবে সে কেমন শুনায়? আমার লেখাতেও কোনো গালিগালাজ নাই। দ্বিতীয়ত, আমি যে লেখা লিখিয়াছি তাহা সমস্ত বঙ্গসমাজের হইয়া লিখিয়াছি বিশেষরূপে আদি ব্রাহ্মসমাজের হইয়া লিখি নাই।[১]

বঙ্কিমবাবু তাঁহার প্রবন্ধে যেখানেই অবসর পাইয়াছেন আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সুকঠোর সংক্ষিপ্ত ও তির্যক কটাক্ষপাত করিয়াছেন। সেরূপ কটাক্ষপাতে আমি ক্ষুদ্র প্রাণী যতটা ভীত ও আহত হইব আদি ব্রাহ্মসমাজের ততটা হইবার সম্ভাবনা নাই। আদি ব্রাহ্মসমাজের নিকটে বঙ্কিমবাবু নিতান্তই তরুণ। বোধ করি বঙ্কিমবাবু যখন জীবন আরম্ভ করেন নাই তখন হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজ নানা দিক হইতে নানা আক্রমণ সহ্য করিয়া আসিতেছেন কিন্তু কখনোই তাঁহার ধৈর্য বিচলিত হয় নাই। বঙ্কিমবাবু আজ যে বঙ্গভাষার ও যে বঙ্গসাহিত্যের পরম গৌরবের স্থল, আদি ব্রাহ্মসমাজ সেই বঙ্গভাষাকে পালন করিয়াছেন সেই বঙ্গসাহিত্যকে জন্ম দিয়াছেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ বিদেশীদ্বেষী তরুণ বঙ্গসমাজে য়ুরোপ হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়া আনিয়াছিলেন এবং পাশ্চাত্যালোকে অন্ধ স্বদেশদ্বেষী বঙ্গযুবকদিগের মধ্যে প্রাচীন হিন্দুদিগের ভাব রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন; আদি ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজপ্রচলিত কুসংস্কার বিসর্জন দিয়াছেন কিন্তু তৎসঙ্গেসঙ্গে হিন্দুহৃদয় বিসর্জন দেন নাই— এইজন্য চারি দিক হইতে ঝঞ্ঝা আসিয়া তাঁহার শিখর আক্রমণ

---

১. সঞ্জীবনীতে নবজীবনের সূচনা লইয়া যে লেখালেখি চলিয়াছিল তাহার সহিত বঙ্কিমবাবুর কী যোগ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। যদি বলেন বঙ্কিমবাবু নবজীবনের লেখক তবে সে বিষয়ে আমিও তাঁহার সহযোগী বলিয়া গর্ব করিতে পারি। অতএব সঞ্জীবনীর উক্ত লেখা আমার প্রতি আক্রমণই বা নহে কেন? যদি বলেন যে, বঙ্কিমবাবু যে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা করিতেছেন উক্ত প্রবন্ধে তাহার প্রতি আক্রমণ করা হইয়াছে, তাহাও ঠিক কথা নহে। নবজীবনের সূচনা নামক প্রবন্ধে যে নবযুগ প্রতিষ্ঠার কিঞ্চিৎ আড়ম্বর করা হইয়াছিল সঞ্জীবনীতে তাহারই প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছিল। তাহার পর চন্দ্রনাথবাবুতে আর আমাতে যে কিঞ্চিৎ কথা কাটাকাটি হইয়াছিল সে তাহাতে আমাদের বোঝাপড়া। বঙ্কিমবাবু এই ব্যাপারটি অকারণে কেন নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

করিয়াছে, কিন্তু কখনো তাঁহার গাম্ভীর্য নষ্ট হয় নাই। আজি সেই পুরাতন আদি ব্রাহ্মসমাজের অযোগ্য সম্পাদক আমি কাহারও কটাক্ষপাত হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইব ইহা দেখিতে হাস্যজনক।

বঙ্কিমবাবুর প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি আছে তিনি তাহা জানেন। যদি তরুণ বয়সের চপলতাবশত বিচলিত হইয়া তাঁহাকে কোনো অন্যায় কথা বলিয়া থাকি তবে তিনি তাঁহার বয়সের ও প্রতিভার উদারতাগুণে সে সমস্ত মার্জনা করিয়া এখনও আমাকে তাঁহার স্নেহের পাত্র বলিয়া মনে রাখিবেন। আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি সরলভাবে যে-সকল কথা বলিয়াছি, আমাকে ভুল বুঝিয়া তাহার অন্য ভাব গ্রহণ না করেন।

ভারতী

পৌষ ১২৯১

[দুর্ভিক্ষ]

অধিক দূরে নয়, তোমাদের দ্বারের নিকট ক্ষুধিতেরা দাঁড়াইয়া আছে। তোমরা দুই বেলা যে উচ্ছিষ্ট অন্ন কুক্কুর বিড়ালদের ফেলিয়া দিতেছ, তাহার প্রতি তাহার কী কাতরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে। তোমাদের নবকুমারের জন্মোপলক্ষে গৃহে কত আনন্দ পড়িয়াছে— আহারাভাবে কোলের ছেলেটির কাঁদিবার শক্তিও নাই— তোমাদের গৃহে বিবাহের বাঁশি বাজিতেছে, কেবল একমুষ্টি অন্নের অভাবে তাহাদের গৃহে বিবাহ-বন্ধন চিরদিনের মতো বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে— স্ত্রীর মুখে অন্ন দিয়া স্বামী তাহার শেষ কর্তব্য সাধন করিতে পারিতেছে না। তোমরা গৃহে বসিয়া নিশ্চিতমনে কত কথা লইয়া আলাপ করিতেছ, কত হাস্য-পরিহাস করিতেছ, সংসারের কত শত কাজে মন দিতেছ— তাহাদের আর কোনো কথা নাই, কোনো ভাবনা নাই, কোনো কাজ নাই— তাহাদের জীবনের সমস্ত চিন্তা, তাহাদের হৃদয়ের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা, তাহাদের দিনরাত্রির সমস্ত আশা কেবল একটি মুষ্টি অন্নের উপরে বদ্ধ রহিয়াছে। তাহাদের চক্ষে এক্ষণে সমস্ত জগতে একমুষ্টি অন্নের চেয়ে বাঞ্ছনীয় আর কিছু নাই— একমুষ্টি অন্ন উপার্জনের চেয়ে আর মহত্তর উদ্দেশ্য নাই— এমন-কি, সমস্ত জগতে অন্নের অতীত আর কোনো কিছুই নাই।

ক্ষুধা যে কী ভয়ানক বিপদ, তাহা আমরা অনেকে কল্পনা করিতে পারি না। অন্যান্য অনেক বিপদে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব জাগাইয়া তুলে— কিন্তু ক্ষুধায় মনুষ্যত্ব দূর করিয়া দেয়। ক্ষুধার সময় মনুষ্য অত্যন্ত ক্ষুদ্র। আত্মরক্ষার জন্য যখন একমুষ্টি অন্নাভাবের সহিত মনুষ্যকে যুদ্ধ করিতে হয়, তখন মনুষ্য একটি পিপীলিকার সমতুল্য। সে যুদ্ধেও যখন মনুষ্যের পরাজয় হয়— একমুষ্টি তণ্ডুলের অভাবেও যখন মনুষ্যজীবনের শত সহস্র মহৎ আশা উদ্দেশ্য ধরাশায়ী হয়, তখন মনুষ্যজাতির দীনতা দেখিয়া হৃদয় হাহাকার করিতে থাকে। ক্ষুধার জ্বালায় বড়ো ভাই ছোটো ভাইয়ের মুখ হইতে তাহার বহু কষ্টের গ্রাস কাড়িয়া লইতে সংকুচিত হয় না— ক্ষুধায় মানুষ অত্যন্ত হীন, ক্ষুধায় কোনো মহত্ত্ব নাই। এই ক্ষুধার হাত হইতে কাতরদিগকে পরিত্রাণ করো— এই ক্ষুধায় মানুষদের— আপনার ভাইদের মরিতে দিয়ো না— সে মানুষের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার কথা।

তোমার যদি আপনার ভাই থাকে, তবে যাহার ভাই আজ অনাহারে মরিতেছে, তাহার প্রতি একবার মুখ তুলিয়া চাও— তোমার যদি আপনার মা থাকে, তবে অন্নাভাবে মরণাপন্ন মায়ের মুখের দিকে হতাশ হইয়া যে তাকাইয়া আছে, তাহাকে কিছু সাহায্য করো— তোমার যদি নিজের সন্তান থাকে তবে কোলের উপর বসিয়া যাহার শিশু-সন্তান প্রতিমুহূর্তে শীর্ণ হইয়া মরিতেছে, তোমার উদ্ধৃত [উদ্‌বৃত্ত] অন্নের কিছু অংশ তাহাকে দাও। সত্যসত্যই তোমার কি কিছুই নাই? যে আজ কয় দিন ধরিয়া কেবল তেঁতুল বীজের শস্য সিদ্ধ করিয়া খাইয়াছে, তাহার চেয়েও কি

তুমি নিঃসম্বল? যে আজ তিনদিন ধরিয়া কেবল শুষ্ক ইক্ষুমূল জলে ভিজাইয়া অল্প অল্প চর্বণ করিতেছে, তাহাকেও কি তুমি সাহায্য করিতে পার না? তুমি হয়তো মনে মনে বলিতেছ— 'এত শত ধনী আছে তাহারাই যদি দুঃখীদের সাহায্য না করিল তো আমরা আর কী করবি!' এমন কথা বলিয়ো না। যে নিষ্ঠুর সে আপনাকে আপনি বঞ্চিত করিতেছে। যে পাষাণ কোনো বেদনাই অনুভব করে না সে নিজের জড়ত্বসুখ লইয়া স্বচ্ছন্দে থাকুক, তাই বলিয়া তাহার দেখাদেখি আপনাকে পাষাণ করিয়ো না! বিলাসসুখ প্রতিদিবসের অন্নপানের ন্যায় যাহার অভ্যাস হইয়াছে যে নিজের সামান্য অনাবশ্যক সুখকে পরের অত্যাবশ্যক অভাবের চেয়ে গুরুতর জ্ঞান করে, সে দুঃখীর মুখের দিকে চায় নাই বলিয়া সকলেই যদি দুঃখীর প্রতি বিমুখ হয়, তবে তো মানবসমাজ রাক্ষসপুরী হইয়া উঠে। হৃদয়হীন বিলাসের ক্রোড়ে যে নিদ্রিত আছে, মহেশ্বরের বজ্রশব্দে যদি একদিন সে জাগিয়া উঠে তবেই তাহার চেতনা হইবে, নতুবা দুঃখী-অনাথের ক্রন্দন ধ্বনিতে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইবে না।

তত্ত্বকৌমুদী
জ্যৈষ্ঠ ১২৯২

লাঠির উপর লাঠি

সম্পাদক মহাশয়

আপনি ব্যায়ামচর্চা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন সে বিষয়ে কাহারও দ্বিরুক্তি করিবার সম্ভাবনা নাই, ক্ষুদ্রবুদ্ধিবশত আমার মনে দু-একটা প্রশ্নোদয় হইয়াছে। সংশয় দূর করিয়া দিবেন।

আপনি য়ুরোপীয় ও আমেরিকানদের সঙ্গে আমাদের যে তুলনা করিয়াছেন সে তুলনা ভালো খাটে না। আমাদের ব্যায়ামচর্চা কর্তব্যবোধে করিতে হইবে, য়ুরোপীয়দের ব্যায়ামচর্চায় স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। সে অনেকটা জলবায়ুর গুণে। শীতের হাত এড়াইবার প্রধান উপায় ব্যায়ামচর্চা। গ্রীষ্মের হাত এড়াইবার প্রধান উপায় যথাসাধ্য বিরাম। তবে যে ইংরাজেরা এ দেশে আসিয়াও ব্যায়াম ভুলেন না তাহার কারণ আজীবন ও পুরুষানুক্রমিক সংস্কার। আমরাও বোধ করি বিলাতে গেলে আমাদের জড়তা সম্পূর্ণ পরিহার করিতে পারি না।

দ্বিতীয় কথা— দেখিতে হইবে আমরা কী খাই ও য়ুরোপীয়রা কী খায়। য়ুরোপীয়েরা যে মদ মাংস খায় তাহার প্রবল উত্তেজনায় তাহাদের একদণ্ড স্থির থাকিতে দেয় না। আমরা ডাল ভাত খাইয়া অত্যন্ত স্নিগ্ধ থাকি, চোখে ঘুম আসে। তবে কি খাদ্য পরিবর্তন করিতে হইবে? সে কি সহজ কথা! আর য়ুরোপীয়দের খাদ্য আমাদের দেশে খাটে কি না খাটে তাই বা কে বলিবে। কেবল সে কথা নহে। এত টাকা কোথায়! পেট ভরিয়া ডাল ভাত তাই জোটে না। নুনের ট্যাক্সের দায়ে অনেক গরীব শুধু ভাত খাইয়া মরে, নুনও জোটে না। এদেশে সকলে মিলিয়া যে মাংস খাইতে আরম্ভ করিবে সে সম্ভাবনাও অত্যন্ত বিরল।

ছাত্রেরা যে খেলাধুলা আমোদ প্রমোদ ভুলিয়া ঘরে বসিয়া বিদেশী ব্যাকরণের শুষ্ক সূত্র, বীজগণিতের কঠিন আঁটি ও জ্যামিতির তীক্ষ্ণ ত্রিকোণ চতুষ্কোণ গিলিতে থাকে, তাহার অবশ্যই একটা কারণ আছে। জ্যামিতি বীজগণিতের প্রেমে পড়িয়া তাহারা কিছু নিতান্তই আত্মহত্যা করিতে বসে নাই। আসল কথা এই যে, আমরা নিতান্ত গরীব, আমরা যে কত গরীব সম্পাদক মহাশয়ের বোধ করি তাহা ধারণা নাই। সম্পাদক মহাশয় বোধ করি ঠিক কল্পনা করিতে পারেন না যে তাঁহার 'বালকের' দু টাকা মূল্য দিবার সময় আমাদিগকে কত ভাবিতে হয়। আমি যে কাগজখানায় লিখিতেছি তাহাতে তাঁহারা জুতাও মোড়েন না। যে কলমটায় লিখিতেছি তাহা তাঁহাদের কান চুলকাইবারও অযোগ্য। আমাদের সবুর করিবার সময় নাই। বিদ্যাটাকে আফিসের ভাতের মতো গিলিতে হয়। পান তামাক খাইবারও সময় থাকে না। সম্পাদক বলিবেন তাহাতে

তো ভালো শেখা হয় না। কে বলে যে হয়। এক্‌জামিন পাস হয় সন্দেহ নাই। যদি কেহ বলেন মাঝে মাঝে খেলাধুলা না থাকিলে এক্‌জামিনও পাস হয় না, তবে তাহার প্রমাণাভাব। বাঙালির ছেলের আর যাই দোষ থাক্‌ পাস করিতে তাহারা যে পটু এ কথা শত্রুপক্ষীয়দিগকেও স্বীকার করতে হয়।

তাড়াতাড়ি পাস না করিলে চলে কই? আমাদের টাকাও অল্প, জীবনও অল্প, অথচ দায় অল্প নয়। সৌভাগ্যক্রমে আমার পিতা বর্তমান। তিনি মাসে চল্লিশটি টাকা করিয়া বেতন পান। শীঘ্রই বাধ্য হইয়া পেনশন লইতে হইবে। আমার দুটি ছোটো ভাই আছে। আমি বিদ্যা সমাপন করিয়া কিঞ্চিৎ রোজগার করিলে তবে তাহাদের রীতিমতো অধ্যয়নের কতকটা সুবিধা হইবে। আমি গত বৎসর এল. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি। এম. এ. পর্যন্ত পড়িয়া একটা যৎসামান্য চাকরি জোটাইতে নিদেনপক্ষে আর পাঁচটা বৎসর মাথা খুঁড়িতে হইবে। ইতিমধ্যে আমার ভগ্নীটির বিবাহ না দিলে নয়। আমরা কায়স্থ। আমাদের ঘর হইতে মেয়ে বিদায় করিতে হইলে যথার্থই ঘরের লক্ষ্মী বিদায় করিতে হয়। সে যখন যায় ঘর হইতে সোনারুপার চিহ্ন মুছিয়া যায়। অ্যাসিড-বিশেষে বাসনের গিল্টি যেমন উঠাইয়া দেয়, আমাদের মেয়েরা তেমনি গৃহের সচ্ছলতা উদরের অন্ন উঠাইয়া লইয়া যায়। ঋণদায় গ্রহণ করিয়া কন্যাদায় মোচন করিতে হয়। বাবার মুখে অন্ন রোচে না, রাত্রে নিদ্রা হয় না। পড়াশুনা আর চলে না, চাকরির চেষ্টা দেখিতেছি। বালকের কার্যাধ্যক্ষের কিংবা কেরানির কিংবা কোনো একটা কাজ খালি যদি হয় তবে হতভাগ্যকে একবার স্মরণ করিবেন।

ভগ্নীর বিবাহ দিতে হইলে নিজে বিবাহ করিতে হইবে। তাহা হইলে হাতে কিঞ্চিৎ টাকা আসিবে। যে হতভাগ্যের ভগ্নীকে বিবাহ করিব তাহার তহবিলে রসকষ কিছু বাকি থাকিবে না। তাহার পাতে পিঁপড়ার হাহাকার উঠিবে।

আমি সবে এল. এ. পাস করিয়াছি, আমার দর বেশি নয়। বিবাহ করিয়া নিতান্ত বেশি কিছু পাইব না। কিন্তু সংসারের নতুন বোঝার চাপুনি যে মাথায় পড়িবে তাহাতে মাথা তুলিবার শক্তি থাকিবে না।

খেলাধুলা ছাড়িয়া কেন যে দিনরাত্রি ব্যাকরণ লইয়া পড়িয়াছি তাহা বোধ করি সম্পাদক মহাশয় এতক্ষণে কিছু বুঝিয়াছেন। কেবল পাস করিলেই চলিবে না, যাহাতে ছাত্রবৃত্তি পাই সে চেষ্টাও করিতে হইবে। আমার মতো ও আমার চেয়ে গরীব ঢের আছে। ছাত্রবৃত্তির প্রতি তাঁহারা সকলেই লুব্ধনেত্রে চাহিয়া— এমন স্থলে লাঠি ঘুরাইয়া ব্যায়াম করিতে কি ইচ্ছা যায়? পেটের দায়ে বিলাতে দরজির মেয়েরা খেলা ভুলিয়া সূর্যালোক ও মুক্ত বায়ু ছাড়িয়া কামিজ সেলাই করিতেছে। কবি হুড তাহাদের বিলাপগান জগতে প্রচার করিয়াছেন। আমরাও পেটের দায়ে লাঠি ঘুরাইয়া ব্যায়াম করিতে পারি না, দিনরাত্রি ব্যাকরণের দুয়ারে মাথা খুঁড়িতেছি। কই, আমাদের দুঃখের কথা তো কোনো মহাকবি উল্লেখ করেন না। উন্টিয়া স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম জানি না বলিয়া মাঝে মাঝে ভর্ৎসনা সহিতে হয়। (বোধ করি যত সব স্কুল-পালানে ছেলেই কবি হয়। এক্‌জামিনের যন্ত্রণা তাহারা জানে না।)

আমি একজন অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ভালো ইংরাজের কাছে শুনিয়াছি যে সেখানকার দরিদ্র ছেলেরা মাথায় ভিজে তোয়ালে বাঁধিয়া ছাত্রবৃত্তির জন্য যেরূপ গুরুতর পরিশ্রম করে আমরা তাহার সিকিও পারি না। তাহাদের অনেকে নৌকার দাঁড় টানে না, ক্রিকেট খেলে না, বই কামড়াইয়া পড়িয়া থাকে। সেখানকার ঠাণ্ডা বাতাসের জোরে টিকিয়া থাকে, পাগল হইয়া যায় না। সেখানকার চেয়ে এখানে এরূপ ছাত্রের সংখ্যা যদি বেশি দেখা যায় তবে এই বুঝিতে হইবে এখানে দরিদ্রের সংখ্যাও বেশি। এখানকার ছেলেরা যদি আমেরিকার ছেলেদের মতো লাঠি না ঘুরায় তবে তাহাতে আর কাহারো দোষ দেওয়া যায় না, সে দারিদ্র্যের দোষ। ছাত্রদের বুঝিতে বাকি নাই যে ব্যায়ামচর্চা করিলে শরীর সুস্থ হয় এবং সুস্থ থাকিলেই

ভালো, অসুস্থ থাকিলে কষ্ট পাইতে হয়।

পড়াশুনা সম্বন্ধেও য়ুরোপীয়দের সঙ্গে আমাদের তুলনা হয় না। তাহারা নিজের ভাষায় জ্ঞান উপার্জন করে, আমরা পরের ভাষায় জ্ঞানোপার্জন করি। বিদেশীয় ভাষা ও বিদেশীয় ভাব আয়ত্ত করিতে আমাদের কত সময় চলিয়া যায়, তাহার পরে সেই ভাষার ভাণ্ডারস্থিত জ্ঞান। মাতার ভাষা আমরা স্নেহের সঙ্গে শিক্ষা করি। মাতৃদুগ্ধের সহিত তাহা আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত তাহা আমরা আকর্ষণ করি। সে ভাষা আমাদের আদরের ভাষা, প্রতিদিনের সুখদুঃখের ভাষা, সে ভাষা আমাদের মা-বাপের ভাষা, আমাদের ভাই-বোনের ভাষা, আমাদের খেলাধুলার ভাষা। আর বিমাতৃ-ভাষা আমাদের তিক্ত ঔষধ, শক্ত পিল, গিলিতে হয়। গলায় বাধে, নাক চোখ চলে ভাসিয়া যায়। 'হি ইজ্ আপ্'— তিনি হন উপরে, 'আই গেট্ ডাউন্'— আমি পাই নীচে— ইহা মুখস্থ করিতে করিতে কোন্ বাঙালির ছেলের না রক্ত জল হইয়া যায়! ভাষা নামক কেবল একটা যন্ত্র আয়ত্ত করিতে গিয়াই আমাদের হাড়গোড় সেই যন্ত্রের তলে পিষিয়া যায়। ইংরাজের কি সে অসুবিধা আছে? যে শৈশবকাল স্নেহের মাতৃদুগ্ধ পান করিবার সময়, সেই শৈশবে বিদেশী চালকড়াইভাজা দন্তহীন মাড়ি দিয়া চিবাইয়া কোনোমতে গলাধঃকরণ করিতে হয়। তবুও যদি পাকশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। জ্ঞানের প্রতি অরুচি না হয়, তবে সে পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে। আমাদের মাথার উপরে দারিদ্র্যের বোঝা, সম্মুখে বিদেশীয় ভাষার দুর্গম পর্বত, তাড়াতাড়ি করিয়া পার হইতে হইবে। সত্যসত্যই আমাদের লাঠি ঘুরাইবার সময় নাই।

আমাদের মেয়েরাও আবার আজকাল এক্জামিন পাস করিতে উদ্যত হইয়াছেন; বাঙালি জাতটাই কি একেবারে এক্জামিন দিতে দিতে জগৎ সংসার হইতে 'পাস' হইয়া যাইবে? পাসকরা ছেলেদেরই শরীর তো ভাঙিয়া পড়িতেছে। মেয়েদের মধ্যেও কি শীর্ণ শরীর, জীর্ণ মস্তিষ্ক, রুগ্ণ পাকযন্ত্র প্রচলিত হইবে? মেয়েদেরও কি চোখে চশমা, পকেটে কুইনাইন, উদরে দাওয়াইখানার প্রাদুর্ভাব হইবে? পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার আশায় ছয় মাস ধরিয়া উন্মাদ উত্তেজনা, এবং পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইলে হৃদয়বিদারক লজ্জা ও নিরাশা— ইহা কি আমাদের দেশের সকমারী বালিকাদেরও আয়ুক্ষয় করিতে থাকিবে? পরীক্ষাশালায় প্রবেশ করিবার সময় বড়ো বড়ো জোয়ান বালকের যে হৃৎকম্প উপস্থিত হয় তাহাতেই তাহাদের দশ বৎসর পরমায়ু হ্রাস হইয়া যায়, তবে মেয়েদের দশা কী হইবে? মেয়েরা যে বিদ্যাশিক্ষা করিবে তাহার একটা অর্থ বুঝিতে পারি— কিন্তু মেয়েরা কেন যে পরীক্ষা দিবে তাহার কোনো অর্থ বুঝিতে পারি না। এমন সযত্নে তাহাদিগকে এমন সৎশিক্ষা দাও যাহাতে জ্ঞানের প্রতি তাহাদের স্বাভাবিক অনুরাগ জন্মে। আয়ুক্ষকর এবং কোমল হৃদয়ের বিকারজনক প্রকাশ্য গৌরবলাভের উত্তেজনায় তাহাদিগকে নাকে চোখে জ্ঞান গিলিতে প্রবৃত্ত করানো ভালো বোধ হয় না। পরীক্ষা দেওয়া গৌরব লোভে একপ্রকার জুয়া খেলা। ইহা হৃদয়ের অস্বাভাবিক উত্থান-পতনের কারণ। প্রকাশ্য গৌরবলাভের জন্য প্রকাশ্য রঙ্গভূমিতে যোঝাযুঝি করিতে দণ্ডায়মান হইলে অধিকাংশ স্থলেই হৃদয়ের দুর্মূল্য সৌকুমার্য দূর হইয়া যায়। কেবল তাহাই নয়, জ্ঞানলাভ গৌণ এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়। পরীক্ষার অপকার সম্পূর্ণ পাওয়া যায় অথচ জ্ঞানলাভের সম্পূর্ণ উপকার পাওয়া যায় না। আমাদের বাংলাদেশটা একটা প্রকাণ্ড ইউনিভার্সিটি চাপা পড়িয়া মরিবার উদ্যোগ হইয়াছে। এসো-না কেন, আমরা এম. এ., বি. এ. ডিগ্রিগুলি গলায় বাঁধিয়া মেয়েপুরুষে মিলিয়া বঙ্গোপসাগরের জলে ডুবিয়া মরি? সে বড়ো গৌরবের কথা হইবে। আমেরিকা ও য়ুরোপ হাততালি দিতে থাকিবে।

এক কথা বলিতে গিয়া আর-এক কথা উঠিল। একেবারে যে যোগ নাই তাহা নহে। স্বাস্থ্যের কথা উঠিল বলিয়া এত কথা বলিতে হইল।

সম্পাদক মহাশয় আমার প্রগল্‌ভতা মাপ করিবেন। লিখিতে বিস্তর সময় গেল, এতক্ষণ লাঠি ঘুরাইলেও হইত। যাহা হউক, এক্ষণে একজামিনের পড়া মুখস্থ করিতে চলিলাম।

বশংবদ শ্রীঃ-

বালক
জ্যৈষ্ঠ ১২৯২

সত্য

সরলরেখা আঁকা সহজ নহে, সত্য বলাও সহজ ব্যাপার নহে। সত্য বলিতে গুরুতর সংযমের আবশ্যক। দৃঢ় নির্ভর দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত তোমাকেই সত্যের অনুসরণ করিতে হইবে, সত্য তোমার অনুসরণ করিবে না। আমরা অনেক সময়ে মনে করিয়া থাকি, সত্য যে সত্য হইল সে কেবল আমি প্রচার করিলাম বলিয়া। সত্যের প্রতি আমরা অনেক সময়ে মুরুব্বিয়ানা করিয়া থাকি— আমরা তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলি, তোমার কিছু ভয় নাই, আমি তোমাকে খাড়া করিয়া তুলিব। সত্যের যেন বাস্তবিক কোনো দাওয়া নাই তাই আমার অনুগ্রহের উপরে সে দাবি করিতে আসিয়াছি, এবং আমি তাহাকে আমার মহৎ আশ্রয় দিয়া যেন কৃতার্থ করিলাম এবং হৃদয়ের মধ্যে মহত্ত্বাভিমান অনুভব করিলাম। এইরূপে সত্যের চেয়ে বড়ো হইতে গিয়া আমরা সত্যকে দূর করিয়া দিই, মিথ্যাকে আহ্বান করিয়া আনি। আমরা ভুলিয়া যাই যে, সত্য সমস্ত জগতের আশ্রয়স্থল, এজন্য সত্য কোনো ব্যক্তিবিশেষের অনুগ্রহ বা তোষামোদের বশ নহে। আমার সুবিধামতো আমি যদি সত্যকে বাঁকাইতে পারিতাম তো সত্য কি সহজ হইতে পারিত! কিন্তু আমি সত্যের কাছে বাঁকিয়া ভাঙিয়া যাইতে পারি, সত্য তাহার অটল সরল সুন্দর মহিমায় দাঁড়াইয়া থাকে— সত্য আমার মুখ তাকাইলে চলে না, কারণ সকলেই তাহার মুখ তাকাইয়া আছে।

এইজন্যই সত্যের এত বল। সত্য আমার প্রতি নির্ভর করে না বলিয়াই আমি সত্যের প্রতি নির্ভর করিতে পারি। সত্যকে যদি আবশ্যকমতো বাঁকানো যাইতে পারিত তবে আমরা সিধা থাকিতাম কী করিয়া! সত্য যদি কথায় কথায় স্থান পরিবর্তন করিত তবে আমরা দাঁড়াইতাম কিসের উপরে! সত্য যদি না থাকে তবে আমরা আছি কে বলিল!

আমরা যখন মিথ্যাপথে চলি, তখন আমরা দুর্বল হইয়া পড়ি এইজন্য। তখন আমরা আত্মহত্যা করি। তখন আমরা একেবারে আমাদের মূলে আঘাত করি। আমরা যাহার উপরে দাঁড়াইয়া আছি তাহাকেই সন্দেহ করিয়া বসি। যতখানি আমাদের মিথ্যা অভ্যাস হয় ততখানি আমরা লুপ্ত হইয়া যাই। সত্যের প্রভাবে আমরা বাড়িতে থাকি, মিথ্যার বশে আমরা কমিয়া আসি। কারণ সত্যরাজ্যের সীমানা কোথাও নাই। দেশ, জাতি, সম্প্রদায়, আত্মপর প্রভৃতি যে-সকল ব্যবধানকে আমরা পাষাণ-প্রাচীর মনে করিয়া নিশ্চেষ্ট ছিলাম, সহসা সত্যের বিদ্যুতালোকে দেখি তাহারা কোথাও নাই। তাহারা আমার কল্পনায়। তাহারা অসীম সত্যরাজ্যের কাল্পনিক সীমানা, বালুকার উপরে মানুষের অঙ্গুলির চিহ্ন। তাহারা ছেলে ভুলাইয়া আমার অধিকার সংক্ষেপ করিতেছে। মিথ্যা আমাদিগকে এই বৃহৎ জগতের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চাহিতেছে। সত্যের আশ্রয়ে আমরা বিশ্বজগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ি, মিথ্যা তাহার কুঠারাঘাতে প্রতিদিন আমাদিগকে ছেদন করিতে থাকে। মিথ্যা আমাদিগকে একেবারে নিঃস্ব করিয়া দেয়, অল্পে অল্পে আমাদের সব কাড়িয়া লয়; আমাদের আশ্রয়ের স্থান, আমাদের জীবনের খাদ্য, আমাদের লজ্জা নিবারণের বস্ত্র। এমন ঘোর দারিদ্র্য জন্মাইয়া দেয় যে, পৃথিবীসুদ্ধকে দরিদ্র দেখি; অন্নপূর্ণাকে অন্নহীন বলিয়া বোধ হয়।

ইহার প্রমাণ কি আমরা প্রতিদিন দেখিতে পাই না? আমরা মিথ্যাচারীর দল, আমরা প্রতিদিন

প্রতি ক্ষুদ্র কাজে কি মনে করি না যে, ন্যূনাধিক প্রবঞ্চনা ব্যতীত পৃথিবীর কাজ চলিতে পারে না, খাঁটি সত্য ব্যবহার কেতাবে পড়িতে যত ভালো শুনায় কাজের বেলায় তত ভালো বোধ হয় না। অর্থাৎ যে নিয়মের উপর সমস্ত জগৎ নির্ভয়ে নির্ভর করিয়া আছে, সে নিয়মের উপর আমি নির্ভর করিতে পারি না, মনে হয় আমার ভার সে সাম্‌লাইতে পারিবে না— চন্দ্র সূর্য তাহাতে গাঁথা রহিয়াছে কিন্তু আমাকে সে ধারণ করিতে পারিবে না, আমাকে সে বিনাশের পথে নিক্ষেপ করিবে। প্রতিদিন মিথ্যার জাল রচনা করিয়া আমরা সত্যকে এমনই আচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছি যে, আমাদের স্থূলে ভুল, মূলে অবিশ্বাস জন্মায়— মনে হয় জগতের গোড়ায় গলদ। এইজন্যই আমাদের ধারণা হয় যে, কেবল কৌশল করিয়াই টিকিতে হইবে। কৌশলই একমাত্র উপায়। ডালপালা মনে করে আমি কৌশল করিয়া থাকিব, গুঁড়িতে সংলগ্ন হইয়া থাকা কোনো কাজের নহে, গুঁড়ি বলে আমার শিকড় নাই, কোনোপ্রকার ফন্দি করিয়া সিধা থাকিতে হইবে। দুই পা বলে মাটিকে নিতান্ত মাটি জ্ঞান করিয়া আমি আপনারই উপরে দাঁড়াইব, সে কম কৌশলের কথা নয়, কিন্তু অবশেষে যে আশ্রয় ছাড়িয়া তাহারা লম্ফ দেয়, সেই আশ্রয়ের উপরে পড়িয়াই তাহাদের অস্থি চূর্ণ হইয়া যায়।

মনুষ্যসমাজের এই অতি বৃহৎ জটিল মিথ্যা-ব্যবসায়ের মধ্যে পড়িয়া সত্যকে অবলম্বন করা আমাদের পক্ষে কী কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। চক্ষের উপরে চতুর্দিক হইতে ধুলাবৃষ্টি হইতেছে— আমরা সত্যকে দেখিব কী করিয়া! আমরা জন্মাবধিই গুটিপোকার মতো সামাজিক গুটির মধ্যে আচ্ছন্ন। অতি দীর্ঘ পুরাতন দৃঢ় মিথ্যাসূত্রে সেই গুটি রচিত। সত্যের অপেক্ষা প্রথাকে আমরা অধিক সত্য বলিয়া জানি। প্রথা আমাদের চক্ষু আচ্ছন্ন করিয়া ধরিয়াছে, আমাদের হাতে পায়ে শৃঙ্খল বাঁধিয়াছে, বলপূর্বক আমাদিগকে চিন্তা করিয়া নিষেধ করিতেছে, পাছে তাহাকে অতিক্রম করিয়া আমরা সত্য দেখিতে পাই— বাল্যকাল হইতে আমাদিগকে মিথ্যা মান, মিথ্যা মর্যাদার কাছে পদানত করিতেছে; মিথ্যা কথন, মিথ্যাচরণ আমাদের কর্তব্যের মতো করিয়া শিক্ষা দিতেছে। আমরা বলি এক, করি এক; জানি এক, মানি এক— স্নায়ুর বিকার ঘটিলে যেমন আমরা ইচ্ছা করি একরূপ অথচ আমাদের অঙ্গ অন্যরূপে চালিত হয়— তেমনি বিকৃত শিক্ষায় আমরা সত্যের আদেশ শুনি একরূপ, অথচ মিথ্যার বশে পড়িয়া অন্যরূপে চালিত হই। প্রথা বলে অন্যায়চারণ করো পাপাচরণ করো তাহাতে হানি নাই, কিন্তু আমার বিরুদ্ধাচরণ করিয়ো না, তাহা হইলে তোমার মানহানি হইবে, তোমার মর্যাদা নষ্ট হইবে— অতি পুরাতন মান, অতি পুরাতন মর্যাদা, সত্য তাহার কাছে কিছুই নয়। এই-সকল সহ্য করিতে না পারিয়া মাঝে মাঝে মহৎ লোকেরা আসিয়া মানমর্যাদা, কুলশীল চিরন্তন প্রথা, সমাজের সহস্র মিথ্যাপাশ সকল ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া আসেন, তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে শত শত কারাবাসী মুক্তিলাভ করে। কেবল প্রথার প্রিয় সন্তান-সকল বহুকাল শৃঙ্খলের আলিঙ্গনে পড়িয়া জড় শৃঙ্খলের উপরে যাহাদের প্রেম জন্মিয়াছে, বিমল অনন্ত মুক্ত আকাশকে যাহারা বিভীষিকার স্বরূপে দেখে, তাহারাই তাহাদের ভগ্ন কারাপ্রাচীরের পার্শ্বে বসিয়া ছিন্ন শৃঙ্খল বক্ষে লইয়া মুক্তিদাতাকে গালি দেয় ও ভগ্নাবশেষের ধূলিস্তূপের মধ্যে পুনরায় আপনার অন্ধকার বাসগহ্বর খনন করিতে থাকে।

এই সমাজ-ধাঁধার মধ্যে পড়িয়া আমি সত্যের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিতে চাই। যেমন নানারূপে বিচলিত হইলেও চুম্বকশলাকা সরলভাবে উত্তরে দিকে মুখ রাখে। সত্যের সহিত আত্মার যে একটি সরল চুম্বকার্ষণ যোগ আছে, সেইটি চিরদিন অক্ষুণ্ণভাবে যেন রক্ষা করিতে পারি। ভয় হয় পাছে সংসারের সহস্র মিথ্যার অবিশ্রাম সংস্পর্শে আত্মার সেই সহজ চুম্বকশক্তি নষ্ট হইয়া যায়। যেন এই দৃঢ় পণ থাকে যে, সত্যানুরাগের প্রচারের চারি দিকের জটিলতা-সকল ছিন্ন করিয়া সমাজকে সরল করিতে হইবে। মানুষের চলিবার পথ নিষ্কণ্টক করিতে হইবে। সংশয় ভয় ভাবনা অবিশ্বাস দূর করিয়া দিয়া দুর্বলকে বলিষ্ঠ করিতে হইবে।

আমাদের জাতি যেমন সত্যকে অবহেলা করে এমন আর কোনো জাতি করে কি না জানি

না। আমরা মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া অনুভব করি না। মিথ্যা আমাদের পক্ষে অতিশয় সহজ স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে। আমরা অতি গুরুতর এবং অতি সামান্য বিষয়েও অকাতরে মিথ্যা বলি। অনেক কাগজ বঙ্গদেশে অত্যন্ত প্রচলিত হইয়াছে তাহারা মিথ্যাকথা বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, পাঠকদের ঘৃণা বোধ হয় না। আমরা ছেলেদের সযত্নে ক খ শেখাই, কিন্তু সত্যপ্রিয়তা শেখাই না— তাহাদের একটি ইংরাজি শব্দের নানান ভুল দেখিলে আমাদের মাথায় বজ্রাঘাত হয়, কিন্তু আমাদের প্রতিদিবসের সহস্র ক্ষুদ্র মিথ্যাচরণ দেখিয়া বিশেষ আশ্চর্য বোধ করি না। এমন-কি, আমরা নিজে তাহাদিগকে ও তাহাদের সাক্ষাতে মিথ্যাকথা বলি ও স্পষ্টত তাহাদিগকে মিথ্যাকথা বলিতে শিক্ষা দিই। আমরা মিথ্যাবাদী বলিয়াই তো এত ভীরু! এবং ভীরু বলিয়াই এমন মিথ্যাবাদী। আমরা ঘুষি মারিতে লড়াই করিতে পারি না বলিয়া যে আমরা হীন তাহা নহে— স্পষ্ট করিয়া সত্য বলিতে পারি না বলিয়া আমরা এত হীন। আবশ্যক বা অনাবশ্যক মতো মিথ্যা আমাদের গলায় বাধে না বলিয়াই আমরা এত হীন। সত্য জানিয়া আমরা সত্যানুষ্ঠান করিতে পারি না বলিয়াই আমরা এত হীন। পাছে সত্যের দ্বারা আমাদের তিলার্ধমাত্র অনিষ্ট হয় এই ভয়েই আমরা মরিয়া আছি।

কবি গেটে বলিয়াছেন, মিথ্যাকথা বলিবার একটা সুবিধা এই যে তাহা চিরদিন ধরিয়া বলা যায়, অথচ তাহার সহিত কোনো দায়িত্ব লগ্ন থাকে না, কিন্তু সত্যকথা বলিলেই তৎক্ষণাৎ কাজ করিতে হইবে, অতএব বেশিক্ষণ বলিবার অবসর থাকে না। মিথ্যার কোনো হিসাব নাই ঝঞ্ঝাট নাই; কিন্তু সত্যের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার একটা হিসাব লাগিয়া আছে তোমাকে মিলাইয়া দিতে হইবে। লোকে বলিবে, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্য কি না দেখিতে চাই। আমরা বাঙালিরা মিথ্যা বলিতেছি বলিয়াই এতদিন ধরিয়া কাজ না করিয়াও অনর্গল বলিবার সুবিধা হইয়াছে; কাহাকেও হিসাব দিতে, প্রমাণ দেখাইতে হইতেছে না— আমরা যদি সত্যবাদী হইতাম তবে আমাদের কাজও কথার মতো সহজ হইত। আমরা সত্য বলিতে শিখিলেই আমরা একটা জাতি হইয়া উঠিব— আমাদের বক্ষ প্রশস্ত হইবে, আমাদের ললাট উচ্চ হইবে, আমাদের শির উন্নত হইবে, আমাদের মেরুদণ্ড দৃঢ় সবল ও সরল হইয়া উঠিবে। লাট ডাফ্‌রিনের প্রসাদে ভলান্টিয়ার হইতে পারিলেও আমাদের এত উন্নতি হইবে না। সত্যকথা বলিতে শিখিলে আমরা মাথা তুলিয়া মরিতে পারিব, গুটিসুটি মারিয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা দাঁড়াইয়া মরিতে সুখ বোধ হইবে। নিতান্ত ম্যালেরিয়া বা ওলাউঠায় না ধরিলে যে জাতি মরিতে জানে না, যে জাতি যেমন-তেমন করিয়াই হৌক বাঁচিয়া থাকিতে চায়, সে জাতির মূলে অনুসন্ধান করিয়া দেখো তাহারা প্রকৃত সত্যপ্রিয় নহে। মিথ্যায় যাহাকে মারিয়া রাখিয়াছে সে আর মরিবে কী, সত্যের বলে যে জীবন পাইয়াছে সে অকাতরে জীবন দিতে পারে। আমরা বাঙালিরা আমাদের জীবনের যতটা সত্য করিয়া অনুভব করি আর-কোনো সত্যকে ততটা সত্য বলিয়া বোধ করি না— এইজন্য আমরা এই প্রাণটুকুর জন্য সমস্ত সত্য বিসর্জন দিতে পারি, কিন্তু কোনো সত্যের জন্য এই প্রাণ বিসর্জন দিতে পারি না। তাহার কারণ, যাহা আমাদের কাছে মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত, তাহার জন্য আমরা এক কানাকড়িও দিতে পারি না, কেবলমাত্র যাহাকে সত্য বলিয়া অনুভব করি তাহার জন্যই ত্যাগ স্বীকার করিতে পারি। মমতার প্রভাবে মা সন্তানকে এতখানি জীবন্ত সত্য বলিয়া অনুভব করিতে থাকে যে, সন্তানের জন্য মা আপনার প্রাণ বিসর্জন দিতে পারে। আর মিথ্যাচারীরা বলিয়া থাকে, 'আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি।' অর্থাৎ আপনার কাছে আর কিছুই সত্য নহে, দারা সত্য নহে, দারার প্রতি কর্তব্য সত্য নহে।

অতএব, প্রাণবিসর্জন শিক্ষা করিতে চাও তো সত্যাচরণ অভ্যাস করো। সত্যের অনুরোধে সমাজের মধ্যে পরিবারের মধ্যে প্রতিদিন সহস্র ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। উদ্দাম মনকে মাঝে মাঝে কঠোর রশ্মি দ্বারা সংযত করিয়া বলিতে হইবে, আমার ভালো লাগিতেছে না বলিয়াই যে অমুক কাজ বাস্তবিক ভালো নয় তাহা না হইতেও পারে, আমার ভালো লাগিতেছে বলিয়াই যে

অমুক জিনিস বাস্তবিক ভালো তাহা কে বলিল? পাঁচজনে বলিতেছে বলিয়াই যে এইটে ভালো, এতকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে বলিয়াই যে ওইটে ভালো তাহাও নয়। এইরূপ প্রতিদিন প্রত্যেক পারিবারিক ও সামাজিক কাজে কর্তব্যানুরোধে আপনাকে দমন করিয়া ও লোকভয় বিসর্জন দিয়া চলিলে প্রতিদিন সত্যকে সত্য বলিয়া হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে শিখিব, জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত সত্যের সহবাসে যাপন করিয়া সত্যের প্রতি আমাদের প্রেম বদ্ধমূল হইয়া যাইবে, তখন সেই প্রেমে আত্মবিসর্জন করা সহজ ও সুখকর হইয়া উঠিবে। আর, যাহারা শিশুকাল হইতে সংসারে প্রতিদিন কেবল আপনার সুখ ও পরের সুখ চাহিয়া কাজ করিয়া আসিতেছে, সুবিজ্ঞ পিতামাতা আত্মীয়স্বজনদের নিকট হইতে উপদেশ পাইয়া প্রতি নিয়মের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছলনা ও ভীরু আত্মগোপন অভ্যাস করিয়া আসিতেছে, তাহারা কি সহসা একদিন সেই বিপুল মিথ্যাপঙ্ক হইতে গাত্রোত্থান করিয়া নির্মল সত্যের জন্য সমাজের রণক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া প্রাণপণ সংগ্রাম করিতে পারিবে! তাহাদের সত্যনিষ্ঠা কি কখনো এতদূর বলিষ্ঠ থাকিতে পারে!

মিথ্যাপরায়ণ বাঙালি তবে কি বাস্তবিক সত্যের জন্য সংগ্রাম করিবে! চতুর্দিকে এই যে কলরব শুনা যাইতেছে, এ কি বাস্তবিক রণসংগীত! নিদ্রিত বাঙালি তবে কি সত্যসত্যই সত্যের মর্মভেদী আহ্বান শুনিয়াছে! এ কথা বিশ্বাস হয় না। যদি বা আমরা সংশয়গ্রস্ত ভীত দুর্বলচিত্তে রণক্ষেত্রে গিয়া দাঁড়াই যুদ্ধ করতে পারিব না, বিঘ্নবিপদ দেখিলে মূর্ছিত হইয়া পড়িব, ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিব। যে বাঙালি স্বজাতিকে স্পষ্ট উপদেশ দেয় যে, ছলনা আশ্রয় করিয়া গোপনে অখাদ্যখাদন প্রভৃতি সমাজবিরুদ্ধ কাজ করিলে কোনো দোষ নাই, প্রকাশ্যে করিলেই তাহা দূষণীয়, যে বাঙালি এই উপদেশ অসংকোচে শুনিতে পারে, এবং যে বাঙালি কাজেও এইরূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, সে বাঙালি কখনো ধর্মযুদ্ধের আহ্বানে উত্থান করিবে না। তাহারা দলাদলি গালাগালি ঝগড়াঝাঁটি তর্কবিতর্ক এ-সকল কার্য পরম উৎসাহের সহিত সম্পন্ন করিবে, কপট কৃত্রিম মিথ্যাকথা সকল অত্যন্ত সহজে উচ্চারণ করিবে— তদূর্ধ্বে আর কিছুই নয়। এ কথা কি কাহাকেও বলিতে হইবে যে, বাঙালিদের একমাত্র বিশ্বাস সেয়ানামির উপরে! প্রবাদ আছে, 'হুজুগে বাঙালি'। বাঙালি মনে করে যথেষ্ট পরিমাণে পরিশ্রম না করিয়াও গোলেমালে কাজ সারিয়া লওয়া যায়, বীজ রোপণ না করিয়াও কৌশলে ফললাভ করা যায়, তেমন ফন্দি করিতে পারিলে মিথ্যার দ্বারাও সত্যের কাজ আদায় করা যাইতে পারে। এইজন্য বাঙালি কাগজ লইয়া দাম দেয় না, দাম লইয়া কাগজ দেয় না, কাজ না করিয়াও দেশহিতৈষী হইয়া উঠে, বিশ্বাস করে না তবু লেখে ও এই উপায়ে মিথ্যাকথা বলিয়া অর্থ সঞ্চয় করে। বাঙালির জীবনটা কেবল গোঁজামিলন। যেখানে সহজে ফাঁকি চলে সেখানে বাঙালি ফাঁকি দিবেই। এইরূপে পৃথিবীকে বঞ্চনা করিতে চেষ্টা করিয়া বাঙালি প্রতিদিন বঞ্চিত হইতেছে।

কেবলই কি বাঙালিকে মিষ্ট মিথ্যাকথা-সকল বলিতে হইবে? কেবলই বলতে হইবে, আমরা অতি মহৎ জাতি, আমরা আর্যশ্রেষ্ঠ, ইংরাজেরা অতি হীন, উহারা ম্লেচ্ছ যবন। আমরা সকল বিষয়েই উপযুক্ত, কেবল ইংরেজেরাই আমাদিগকে ফাঁকি দিতেছে। বলিতে হইবে ইংরেজসমাজ স্বেচ্ছাচারিতার রসাতলে গমন করিয়াছে, আর আমাদের আর্যসমাজ উন্নতির এমনি চূড়ান্ত সীমায় উঠিয়াছিল যে তদূর্ধ্বে আর এক ইঞ্চি উঠিবার স্থান ছিল না, তাহাতে আর এক-তিল পরিবর্তন চলিতে পারে না। এই উপায়ে ক্ষুদ্রের অহংকার ক্রমিক পরিতৃপ্ত করিয়া কি 'পপুলার' হইতেই হইবে? আমরা যে কত ক্ষুদ্র তাহা আমরা জানি না, সেইটাই আমাদের জানা আবশ্যক। আমরা যে কত মস্ত লোক, তাহা ক্রমাগতই চতুর্দিক হইতে শুনা যাইতেছে। কর্ণ জুড়াইয়া নিদ্রাকর্ষণ হইতেছে, সুখস্বপ্নে আপন ক্ষুদ্রত্বকে অত্যন্ত বৃহৎ দেখাইতেছে। এখন মিথ্যাকথা সব দূর করো, একবার সত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করো। অন্য জাতির কেন উন্নতি হইতেছে এবং আর্যশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতিরই বা কেন অবনতি হইতেছে, তাহা ভালো করিয়া দেখো। আমাদের মজ্জার মধ্যে কী হীনত্ব আছে, আমাদের শাস্ত্রের কোন্ মর্মস্থলে ঘুণ ধরিয়াছে যাহাতে আমাদের

এমন দুর্দশা হইল, তাহা ভালো করিয়া দেখো। ইংরেজসমাজের মধ্যে এমন কী গুণ আছে, যাহার ফলে এমন উন্নত সাহিত্য, এমন-সকল বীরপুরুষ, স্বদেশপ্রেমী মানবহিতৈষী, জ্ঞান ও প্রেমের জন্য আত্মবিসর্জন-তৎপর নরনারী ইংরেজসমাজে জন্মলাভ করিতেছে, আর আমাদের সমাজের মধ্যেই বা এমন কী গুরুতর দোষ আছে যাহার ফলে এমন-সকল অলস, ক্ষুদ্র, স্বার্থপর, পল্লবগ্রাহী, মিথ্যাঅহংকার-পরায়ণ সন্তান-সকল জন্মগ্রহণ করিতেছে, সত্যজিজ্ঞাসু হইয়া অপক্ষপাতিতার সহিত তাহা পর্যালোচনা করিয়া দেখো। ইহাতে উপকার হইতে পারে। আর, আমরাই ভালো এবং ইংরেজেরাই মন্দ ইহা ক্রমাগত বলিলে ও ক্রমাগত শুনিলে ক্রমাগতই মিথ্যাপ্রচার ছাড়া আর কোনো ফললাভ হইবে না।

. সত্যকথা বলা ভালো আজ আমার এই কথা সকলের পুরাতন ঠেকিতেছে। সত্য চিরদিনই নূতন, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে, দুর্বলতাবশত পুরাতন হইয়া যায়। সত্যকে যতক্ষণ সত্য বলিয়া অনুভব করিতে থাকি, ততক্ষণ তাহা নূতন থাকে, কিন্তু যখন মনের অসাড়তাবশত আমরা সত্যকে কেবলমাত্র মানিয়া লই অথচ মনের মধ্যে অনুভব করিতে পারি না, তখন তাহার অর্ধেক সত্য চলিয়া যায়, সে প্রায় মিথ্যা হইয়া উঠে। যে শব্দ আমরা ক্রমাগত শুনি, অভ্যাসবশত তাহা আর শুনিতে পাই না, এই কারণে পুরাতন সত্য সকলে বলিতে পারে না। মহাপুরুষেরাই পুরাতন সত্য বলিতে পারেন— বুদ্ধ, খৃস্ট, চৈতন্যেরাই পুরাতন সত্য বলিতে পারেন। সত্য তাঁহাদের কাছে চিরদিন নূতন থাকে, কারণ সত্য তাঁহাদের যথার্থ প্রিয়ধন। আমরা যাহাকে ভালোবাসি সে কি আমাদের কাছে কখনো পুরাতন হয়! তাহাকে কি প্রতি নিমেষেই নূতন করিয়া অনুভব করি না? প্রথম সাক্ষাতেও নেত্র যেমন অসীম তৃপ্তি অথবা অপরিতৃপ্তির সহিত তাহার মুখের প্রতি আবদ্ধ থাকিতে চায়, দশ বৎসর সহবাসের পরেও কি নেত্র সেই প্রথম আগ্রহের সহিত তাহাকেই চারি দিকে অনুসন্ধান করিতে থাকে না? সত্য মহাপুরুষদের পক্ষে সেইরূপ চিরনূতন প্রিয়বস্তু। আমার কি তেমন সত্যপ্রেম আছে যে, আজ এই পুরাতন যুগে মানবসভ্যতা প্রাদুর্ভাবের কত সহস্র বৎসর পরে পুরাতন সত্যকে নূতন করিয়া মানবহৃদয়ে জাগ্রত করিতে পারিব!

যাহারা সহজেই সত্য বলিতে পারে তাহাদের সে কী অসাধারণ ক্ষমতা! যাহারা হিসাব করিয়া পরম পারিপাট্যের সহিত সত্য রচনা করিতে থাকে, সত্য তাহাদের মুখে বাধিয়া যায়, তাহারা ভরসা করিয়া পরিপূর্ণ সত্য বলিতে পারে না। রামপ্রসাদ ঈশ্বরের পরিবারভুক্ত হইয়া যেরূপ আত্মীয় অন্তরঙ্গের ন্যায় ঈশ্বরের সহিত মান অভিমান করিয়াছেন, আর কেহ কি দুঃসাহসিকতায় ভর করিয়া সেরূপ পারে! অন্য কেহ হইলে এমন এক জায়গায় এমন একটা শব্দ প্রয়োগ, এমন একটা ভাবের গলদ করিত যে, তৎক্ষণাৎ সে ধরা পড়িত। অনুভব করিয়া বলিলে সত্য কেমন সহজে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইয়া ধরা দেয় তাহার একটা দৃষ্টান্ত আমার মনে পড়িতেছে।

প্রাচীন ঋষি সরল হৃদয়ে যে প্রার্থনা উচ্চারণ করিয়াছিলেন, 'অসত্যে মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়, আবিরাবীর্ম এধি, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।' অপরূপ নিয়মে হীরক যেমন সহজেই হীরক হইয়া উঠে, এই প্রার্থনা তেমনি সহজে ঋষিহৃদয়ে উজ্জ্বল আকার ধারণ করিয়া উদিত হইয়াছিল, আজ যদি কেহ হিসাব করিয়া এই প্রার্থনার ভাব সংশোধন করিতে বসেন, তাহা হইলে আমাদের হৃদয়ে আঘাত লাগে, হয়তো তাহাতে এই প্রার্থনান্থিত সত্যের সহজ উজ্জ্বলতা ম্লান হইয়া যায়। 'রুদ্র তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহার দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা করো' প্রার্থনার এই অংশটুকু পরিবর্তন করিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, 'দয়াময় তোমার যে অপার করুণা, তাহার দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা করো,' এইরূপে ঋষিদিগের এই প্রাচীন প্রার্থনার কিয়দংশ ছিন্ন করিয়া তাহাতে একটি নূতন ভাব তালি দিয়া লাগানো হইয়াছে— কিন্তু এ কি বাস্তবিক সংশোধন হইল? সরলহৃদয় ঋষি কি মিথ্যা

বলিয়াছেন? এই প্রার্থনায় ঈশ্বরকে যে রুদ্র বলা হইয়াছে সত্যপরায়ণ ঋষির মুখ দিয়া অতি সহজে এই সম্বোধন বাহির হইয়াছে। অসত্য, অন্ধকার মৃত্যুর ভয়ে ভীত হইয়াই ঋষি ঈশ্বরকে ডাকিতেছেন, কিন্তু সেইসঙ্গে তাঁহার মনের এই বিশ্বাস ব্যক্ত হইতেছে, যে, সত্য আছে, জ্যোতি আছে, অমৃত আছে। এই বিশ্বাসে ভর করিয়াই তিনি বলিয়াছেন, 'রুদ্র তোমার যে প্রসন্ন মুখ'— এমন আশ্বাসবাণী আর কী হতে পারে, এমন মাভৈঃ ধ্বনি শুনিতেছি আমাদের আর ভয় কী। যে 'প্রসন্ন মুখ'— এমন আশ্বাসবাণী আর কী হইতে পারে, এমন মাভৈঃ ধ্বনি শুনিতেছি আমাদের ভয় কী! যে ঋষি অসত্যের মধ্যে সত্য, অন্ধকারের মধ্যে জ্যোতি, মৃত্যুর মধ্যে অমৃত দেখিয়াছেন, তিনিই রুদ্রের দক্ষিণমুখ দেখিয়াছেন, এবং সেই আনন্দবারতা প্রচার করিতেছেন, তিনি বলিতেছেন ভয়ের মধ্যে অভয়, শাসনের মধ্যে প্রেম বিরাজ করিতেছে। এখানে 'দয়াময়' বলিলে এত কথা ব্যক্ত হয় না, সে কেবল একটা কথার কথা হয় মাত্র। তাহাতে রুদ্রভাবের মধ্যেও প্রসন্নতা, আপাতপ্রতীয়মান অমঙ্গলরাশির মধ্যেও সরল হৃদয়ে মঙ্গলস্বরূপের প্রতি দৃঢ় নির্ভর এমন সুন্দররূপে ব্যক্ত হয় না। মহর্ষি এতশত ভাবিয়া বলেন নাই, ঈশ্বরের প্রসন্ন দক্ষিণমুখ দেখিতে পাইয়াছেন বলিয়াই তিনি নির্ভয়ে ঈশ্বরকে রুদ্র বলিতে পারিয়াছেন, তাঁহার মুখ দিয়া সত্য অবাধে বাহির হইয়াছে, আর আমরা বিস্তর তর্ক করিয়া যুক্তি করিয়া তাহার একটি কথা পরিবর্তন করিলাম, তাহার সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণতা নষ্ট হইয়া গেল।

ইহা হইতেই প্রমাণ হইতেছে, সত্য বলা সহজ নয়। ইস্কুলের পড়ার মতো সত্য মুখস্থ করিয়া সত্য বলা যায় না। সত্যের প্রতি ভালোবাসা আগে সাধনা করিতে হইবে, ভালোবাসার দ্বারা সত্যকে বশ করিতে হইবে, সংসারের সহস্র কুটিলতার মধ্যে হৃদয়কে সরল রাখিতে হইবে তার পরে সত্য বলা সহজ হইবে। কেবল যদি লোভ ক্রোধ প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি-সকল আমাদের সত্যপথের বাধা হইত, তাহা হইলেও আমাদের তত ভাবনার কারণ ছিল না। কিন্তু আমাদের অনেক সুপ্রবৃত্তিও আমাদিগকে সত্যপথ হইতে বিচলিত করিবার জন্য আমাদিগকে আকর্ষণ করিতে থাকে। আমাদের আত্মানুরাগ, দেশানুরাগ, লোকানুরাগ অনেক সময়ে আমাদিগকে সত্যভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে থাকে; এইজন্যই সত্যানুরাগকে এই-সকল অনুরাগের উপরে শিরোধার্য করা আবশ্যক।

আমার আর সকল কথা লোকের বিরক্তিজনক পুরাতন ঠেকিতে পারে কিন্তু আমার একটি কথা পুরাতন হইলেও বোধ করি অনেকের কর্ণে অত্যন্ত নূতন ঠেকিতেছে। আমি বলিতেছি, সত্যকথা বলো, সত্যাচরণ করো, কারণ দেশের উন্নতি তাহাতেই হইবে। এ কথা সচরাচর শুনা যায় না। কথাটা এত অল্প, এত শীঘ্র ফুরাইয়া যায়, এবং এমন প্রাচীন ফ্যাশনের যে, কাহারো বলিয়া সুখ হয় না, শুনিতে প্রবৃত্তি হয় না, ইহাতে সুগভীর চিন্তাশীলতা বা গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায় না, ইহাতে এমন উদ্দীপনা উত্তেজনা নাই যাহাতে করতালি আকর্ষণ করিতে পারে। দেশহিতৈষীরা কেহ বলেন দেশের উন্নতির জন্য জিম্‌ন্যাস্টিক করো, কেহ বলেন সভা করো, আন্দোলন করো, ভারতসংগীত গান করো, কেহ বলেন মিথ্যা বলো, মিথ্যা প্রচার করো, কিন্তু কেহ বলিতেছেন না সত্যকথা বলো, ও সত্যানুষ্ঠান করো। উপরি-উক্ত সকল ক'টার মধ্যে এইটেই সকলের চেয়ে বলা সহজ এবং সকলের চেয়ে করা শক্ত, এইটেই সকলের চেয়ে আবশ্যক বেশি, এবং সকলের চেয়ে অধিক উপেক্ষিত। সত্য সকলের গোড়ায় এবং সকলের শেষে, আরম্ভে সত্যবীজ রোপন করিলে শেষে সত্যফল পাওয়া যায়; মিথ্যায় যাহার আরম্ভ মিথ্যায় তাহার শেষ। আমরা যে ভীত সংকুচিত সংশয়গ্রস্ত ক্ষুদ্র ধূলিবিহারী কীটাণু হইয়াছি ইংরেজের মিথ্যা নিন্দা করিলে আমরা বড়ো হইব না, আপনাদের মিথ্যা প্রশংসা করিলেও আমরা মস্ত হইব না। আমরা যে পরস্পরকে ক্রমাগত সন্দেহ করি, অবিশ্বাস করি, দ্বেষ করি, মিলিয়া কাজ করিতে পারি না, পরের স্তুতি পাইবার জন্য হাঁ করিয়া থাকি, কথায় কথায় আমাদের দল ভাঙিয়া যায়, কাজ আরম্ভ করিতে সংশয় হয়, কাজ চালাইতে উৎসাহ থাকে না,

আমরা যে ক্ষুদ্রতা লইয়া থাকি, খুঁটিনাটি লইয়া মান অভিমান করি, মুখ্য ভুলিয়া গিয়া গৌণ লইয়া অশিক্ষিতা মুখরার ন্যায় বিবাদ করিতে থাকি, আড়ালে পরস্পরের নিন্দা করি, সম্মুখে দোষারোপ করিতে অত্যন্ত চক্ষুলজ্জা হয়, তাহার কারণ আমরা মিথ্যাচারী, সত্যের প্রভাবে সরল নহি, উদার উৎসাহী ও বিশ্বাসপরায়ণ নহি। আমরা যে আগাটায় জল ঢালিতেছি, তাহার গোড়া নাই, নানাবিধ অনুষ্ঠান করিতেছি কিন্তু তাহার মূলে সত্য নাই, এইজন্য ফললাভ হইতেছে না। যেমন, যে রাগিণীতে যে গান গাও-না-কেন, একটা বাঁধা সুর অবলম্বন করিতে হইবে, সেই এক সুরের প্রভাবে গানের সকল সুরের মধ্যে ঐক্য হয়, নানা বিভিন্ন সুর এক উদ্দেশ্য সাধন করিতে থাকে, কেহ কাহাকেও অতিক্রম করে না, তেমনি আমরা যে কাজ করি-না-কেন সত্যকে তাহার মূল সুর ধরিতে হইবে। আমরা সেই মূল সুর ভুলিয়াছি বলিয়াই এ কলরব হইতেছে, ঐক্য ও শৃঙ্খলার এত অভাব দেখা যাইতেছে। এত বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও সকলে কোলাহলই উত্তেজিত করিতেছেন, কেহ মূল সুরের প্রতি লক্ষ করিতে বলিতেছেন না, তাহার কারণ ইহার প্রতি সকলের তেমন দৃঢ় আস্থা নাই, ইহাকে তাঁহারা অলংকারের হিসাবে দেখেন, নিতান্ত আবশ্যকের হিসাবে দেখেন না। পেট্রিয়টেরা দেশের উন্নতির জন্য নানা উপায় দেখিতেছেন, নানা কৌশল খেলিতেছেন। এদিকে মিথ্যা নীরবে আপনার কার্য করিতেছে, সে ধীরে ধীরে আমাদের চরিত্রের মূল শিথিল করিয়া দিতেছে, সে আমাদের পেট্রিয়টদিগের কোলাহলময় ব্যস্ততাকে কিছুমাত্র খাতির করিতেছে না। পেট্রিয়টেরা পদ্মার তীরে দুর্গ নির্মাণে মত্ত হইয়াছেন, কিন্তু মায়াবিনী পদ্মা তাহার অবিশ্রাম খরস্রোতে তলে তলে তটভূমি জীর্ণ করিতেছে। তাই মাঝে মাঝে দেখিতে পাই আমাদের পেট্রিয়টদিগের বিস্তৃত আয়োজন-সকল সহসা একরাত্রের মধ্যে স্বপ্নের মতো অন্তর্ধান করে। যেখানে জাতীয় চরিত্রের মূল শিথিল হইয়া গিয়াছে, সেখানে যে পাঁচজন পেট্রিয়টে মিলিয়া জোড়াতাড়া, তালি ঠেকো প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া কৌশল খেলাইয়া স্থায়ী কিছু করিয়া উঠিতে পারিবেন এমন আমার বিশ্বাস হয় না। অনন্তের অমোঘ নিয়মকে কৌশলের দ্বারা ঠেলিবে কে? যেখানে সত্য সিংহাসনচ্যুত হওয়াতে অরাজকতা ঘটিয়াছে, সেখানে চাতুরী আসিয়া কী করিবে! হায়, দেশ উদ্ধারের জন্য সত্যকে কেহই আবশ্যক বিবেচনা করিতেছেন না। চিরনবীন চিরবলিষ্ঠ সত্যকে বুদ্ধিমানেরা অতি প্রাচীন বলিয়া অবহেলা করিতেছেন। কিন্তু যাঁহারা জীবন নূতন আরম্ভ করিয়াছেন, যৌবনের পূত হুতাশন যাঁহাদের হৃদয়কে উদ্দীপ্ত ও উজ্জ্বল করিয়া বিরাজ করিতেছে যাহার সহস্র শিখা দীপ্ত তেজে মহত্ত্বের দিকেই অবিশ্রাম অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে, যাঁহারা বিষয়ের মিথ্যাজালে জড়িত হন নাই, মিথ্যা যাঁহাদের নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় অভ্যস্ত হইয়া যাই নাই, তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করুন প্রার্থনা করুন যেন সত্যপথে চিরদিন অটল থাকিতে পারেন, তাহা হইলে অমর যৌবন লাভ করিয়া তাঁহারা পৃথিবীর কাজ করিতে পারিবেন। মিথ্যাপরায়ণ বিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গেই জরাগ্রস্ত বার্ধক্য আমাদের প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করে, আমাদের মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যায়, আমাদের প্রাণের দৃঢ় সূত্র-সকল শিথিল হইয়া পড়ে, সংশয় ও অবিশ্বাসের প্রভাবে মাংস কুঞ্চিত হইয়া যায়। আমরা এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সংসারের কার্যক্ষেত্রে বাহির হইব যে মিথ্যার জয় দেখিলেও আমরা সত্যকে বিশ্বাস করিব, মিথ্যার বল দেখিলেও আমরা সত্যকে আশ্রয় করিব, মিথ্যার চক্রান্ত ভেদ করিবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা অস্ত্র ব্যবহার করিব না। আমরা জানি শাস্ত্রেও মিথ্যা আছে, চিরন্তন প্রথার মধ্যেও মিথ্যা আছে, আমরা জানি, অনেক সময়ে আমাদের হিতৈষী আত্মীয়েরা মিথ্যাকেই আমাদের যথার্থ হিতজ্ঞান করিয়া জ্ঞানত বা অজ্ঞানতা আমাদিগকে মিথ্যা উপদেশ দিয়া থাকেন। সত্যানুরাগ হৃদয়ের মধ্যে অটল রাখিয়া এইসকল মিথ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে। সত্যানুরাগ সত্ত্বেও আমরা ভ্রমে পড়িব, কিন্তু সেই ভ্রম সংশোধন হইবে, সেই ভ্রমই আমাদিগকে পুনরায় সত্যপথ নির্দেশ করিয়া দিবে। কিন্তু শুদ্ধমাত্র প্রথানুরাগ বা শাস্ত্রানুরাগ -বশত যখন ভ্রমে পড়ি তখন সে ভ্রম হইতে আর আমাদের উদ্ধার নাই, তখন ভ্রমকে আমরা আলিঙ্গন করি, মিথ্যাকে প্রিয় বলিয়া বরণ করি. মিথ্যা প্রাচীন ও পূজনীয়

হইয়া উঠে, পূর্বপুরুষ হইতে উত্তরপুরুষে সযত্নে সংক্রামিত হইতে থাকে এইরূপ সমাদর পাইয়া বিনাসের বীজ মিথ্যা আপন আশ্রয়ের স্তরে স্তরে শিকড় বিস্তার করিতে থাকে, অবশেষে সেই জীর্ণ জর্জর মন্দিরকে সঙ্গে করিয়া ভূমিসাৎ হয়। আমাদের এই দুর্দশাপন্ন ভারতবর্ষ সেই ভূমিসাৎ জীর্ণ মন্দিরের ভগ্নস্তূপ। কালক্রমে বন্ধনজর্জর সত্য এই ভারতবর্ষে এমনি হীনাসনপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, গুরু, শাস্ত্র এবং প্রথাই এখানে সর্বেসর্বা হইয়া উঠিয়াছিল; স্বর্গীয় স্বাধীন সত্যকে গুরু শাস্ত্র এবং প্রথার দাসত্বে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। মিথ্যা উপায়ের দ্বারা সত্য প্রচার করিবার ও সহস্র মিথ্যা অনুশাসন দ্বারা সত্যকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। বুদ্ধিমানেরা বলিয়া থাকেন মিথ্যার সাহায্য না হইলে সাধারণের নিকটে সত্য গ্রাহ্য হয় না, এবং মিথ্যা বিভীষিকা না দেখাইলে দুর্বলেরা সত্যপালন করিতে পারে না। মিথ্যার প্রতি এমনি দৃঢ় বিশ্বাস। ইতিহাসে পড়া যায় বিলাসী সভ্যজাতি বলিষ্ঠ অসভ্যজাতিকে আত্মরক্ষার্থ আপন ভৃত্যশ্রেণীতে নিযুক্ত করিত, ক্রমে অসভ্যেরা নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া মনিব হইয়া দাঁড়াইল— সত্যকে মিথ্যার দ্বারস্থ হইতে হইল। সত্যের এইরূপ অবমান দশায় শতসহস্র মিথ্যা আসিয়া আমাদের হিন্দুসমাজে, হিন্দুপরিবারে নির্ভয়ে আশ্রয় লইল কেহ তাহাদিগকে রোধ করিবার রহিল না; তাহার ফল এই হইল সত্যকে দাস করিয়া আমরা মিথ্যার দাসত্বে রত হইলাম, দাসত্ব হইতে গুরুতর দাসত্বে উত্তরোত্তর নামিতে লাগিলাম। আজ আর উত্থানশক্তি নাই— আজ পঙ্গুদেহে পথপার্শ্বে বসিয়া ভিক্ষাপাত্র হাতে লইয়া কাতরস্বরে বলিতেছি, 'দেও বাবা ভিখ্ দেও!'

বালক

চৈত্র ১২৯২

আপনি বড়ো

মুখে যাহারা বড়াই করে তাহারা সুখে থাকে, তাহাদের অল্প অহংকার অল্পেই উদ্‌বেলিত হইয়া প্রশমিত হইয়া যায়। কিন্তু মনে মনে যাহারা বড়ো হইয়া বসিয়া আছে, অথচ বুদ্ধির আতিশয্যবশত মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না, তাহাদের অবস্থা সুখের নহে। যেমন বাষ্পের ধর্ম ব্যাপ্ত হওয়া, তেমনি অহংকারের ধর্মই প্রকাশ পাওয়া। যে তাহাকে অন্তরে আটকে রাখিতে চায় সে তাহার সেই রুদ্ধ অহংকারের অবিশ্রাম আঘাতে সর্বদাই পীড়িত হইতে থাকে। বরং নিজের দুঃখশোক নিজের মধ্যে রোধ করিয়া থাকিলে মহৎ ধৈর্যজনিত একপ্রকার গভীর সুখ লাভ করা যাইতে পারে, কিন্তু চপল অহংকারকে হৃদয়ের গোপন কক্ষের মধ্যে শোষণ করিয়া সেই মহত্ত্বের সুখটুকুও পাওয়া [যায়] না।

যাহারা দুঃখ শোক নীরবে বহন করিয়া সহিষ্ণুতা সঞ্চয় করিয়াছে, তাহাদের বিশীর্ণ পাণ্ডুমুখের উপরে একপ্রকার উত্তাপবিহীন জ্যোতির্ময় ছায়া পড়ে, কিন্তু অপরিতৃপ্ত অহংকার যাহাদের হৃদয়-বিবরে ক্ষণে ক্ষণে উষ্ণনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে, তাহাদের নেত্রের অধঃপল্লবে একপ্রকার জ্যোতিহীন জ্বালা, তাহাদের চিরশীর্ণ তীক্ষ্ণ মুখে, দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধরপ্রান্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গভীর রহস্যরেখা সকল প্রকাশ পায়। বরঞ্চ যৌবনকালে এই উগ্র প্রাখর্য তাহাদের সৌন্দর্যের তেমন ক্ষতিকর না হইতেও পারে, কিন্তু প্রৌঢ় বয়সের যে বিমল শান্তিময় মমতাপূর্ণ অচঞ্চল শারদ শোভা তাহা তাহারা কিছুতেই রক্ষা করিতে পারে না। বয়সকালে তাহাদের চক্ষুপল্লবে সেই উজ্জ্বল কোমল অশ্রুরেখার ন্যায় ভারাক্রান্ত স্নিগ্ধদৃষ্টি, তাহাদের ওষ্ঠাধরে সেই স্নেহভাষায় জড়িত বাসনাহীন সান্ত্বনাপূর্ণ সুধাধৌত মৃদুহাস্য কিছুতেই প্রকাশ পায় না। তাহারা সৌন্দর্য প্রাণপণে রক্ষা করিতে চায়, কিন্তু তাহাদের হৃদয়ের অন্ধকূপ হইতে কুণ্ডলিত বাষ্প অল্পে অল্পে উত্থিত হইয়া তাহাদের মুখের সহজ মানব-শোভা লোপ করিয়া দেয়। তাঁহারা বার্ধক্য গোপন করিতে চায়, অকালে বৃদ্ধ হইয়া পড়ে, অথচ কোনোকালে বার্ধক্যের পরিণত গাম্ভীর্য লাভ করিতে পারে না।

যাহারা কিছু একটা কাজ করিয়া তুলিয়াছিল, কোনো একটা অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং সাধ্যানুসারে ক্রমশ তাহা সম্পন্ন করিতেছে, তাহাদের হৃদয়ে অহংকার সঞ্চিত হইতে পারে না, কার্যস্রোতের সঙ্গে বাহির হইয়া ভাঙিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু যাহারা কিছু করে না, করিতে পারে না, মনে করে করিতে পারি অথচ করিতে গিয়া নিষ্ফল হয়, তাহারা অহংকার বাহির করিয়া ফেলিবার পথ পায় না। তাহারা কিছুতেই আপনার কাছে এবং পরের কাছে প্রমাণ করিতে পারে না যে তাহারা বড়ো, এইজন্য মনের খেদে মনে মনে আপনার বড়োত্বের প্রতি ক্রমশ অধিকতর অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আপনাকে প্রাণপণে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করে। কিন্তু কণ্টকশয্যায় যেমন বিরাম নাই, তেমনি সে সান্ত্বনায় সান্ত্বনা নাই। তাহারা যত আপনাকে বড়ো মনে করে ততই আরও অধিকতর দগ্ধ হইতে থাকে।

আমি যাহাদের কথা বলিতেছি, তাহাদের বুদ্ধি আছে অথচ এমন ক্ষমতা নাই যে কোনো মহৎ কাজ সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারে। এই বুদ্ধির প্রভাবে তাহারা আপনাকে সম্পূর্ণ প্রতারণা করিতে পারে না। কেবল সচেতন বেদনা অনুভব করিতে থাকে। তাহারা দেখিতে পায় যে, আমরা আপনাকে এত বড়ো মনে করিতেছি তবুও কিছুতেই বড়ো হইয়া উঠিতেছি না। এই অলস অহংকার দাস্তের নরকযন্ত্রণা বর্ণনায় স্থান পাইবার যোগ্য। বিপুল অভিমানে বিদীর্ণ হইবার উপক্রম করিতেছি অথচ এক-তিল প্রসর বাড়িতেছে না, সে কোন্ মহাপাতকের ভোগ!

এইরূপ বুদ্ধিমান গুপ্ত অহংকারী সর্বদাই বৃহৎ সংকল্প সৃষ্টি করিতে থাকে। সকল দিকেই হাত বাড়াইতে থাকে অথচ নাগাল পায় না। পাশের লোক তাহাকে যে, কোনো বিষয়ে অতিক্রম করিয়া যাইবে ইহা তাহার ইচ্ছা নহে। এইজন্য কাহাকে কোনো লক্ষ্যমুখে যাত্রা করিতে দেখিলে সেও এক-এক সময়ে তাড়াতাড়ি ছুটিতে আরম্ভ করে, পথের মধ্য হইতে ফিরিয়া আসে ও মনে মনে কহে যদি শেষ পর্যন্ত যাইতাম তো আমিই জিতিতাম। সে চুপি চুপি এইরূপ প্রচার করে আমি যে কোনো কিছুতেই বাস্তবিক কৃতকার্য হইতে পারি নাই, সে কেবল ঘটনাবশত। কারণ যাহারা নিজ নিজ সংকল্পে কৃতকার্য হইয়াছে, তাহাদের অপেক্ষা সে আপনাকে মনে মনে এত বড়ো বলিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছে যে নিজের অক্ষমতা সে কল্পনা করিতে পারে না, ক্ষমতা আছে অথচ ক্রমিক প্রতিকূল ঘটনাবশত বড়ো হইতে পারিতেছি না, এই দুঃখে সে সর্বদাই এক প্রকার তীরস্বভাব অবলম্বন করিয়া থাকে। এমন-কি, তাহার ঈশ্বর ভক্তি চলিয়া যায়। তাহার সমস্ত ভক্তি সে নিজের পদতলে আনিয়া গোপনে আপনার পূজা করিতে থাকে— বলিতে থাকে 'আমি মহৎ— সমস্ত জগৎ আমার প্রতিকূল, ঈশ্বর আমার প্রতিবাদী। কিন্তু যে যাহা বলে বলুক, আমি আমাকেই আমার শিরোধার্য করিয়া সংসারের পথে সবলে পদক্ষেপ করিব।' এই বলিয়া সে কখনো কখনো সবলে বন্ধন ছিঁড়িয়া হঠাৎ এক রোখে ছুটিতে থাকে, সগর্বে চারি দিকে চাহিতে থাকে— বলে 'কী আমার দৃঢ়চিত্ততা! স্বকপোলকল্পিত কর্তব্যের অনুরোধে সমস্ত জগৎসংসারের প্রতি কী প্রবল উপেক্ষা!' বুঝিতে পারে না যে তাহা সহসা প্রতিহত সংকীর্ণ আত্মাভিমানের সফেন উচ্ছ্বাস মাত্র।

পূর্বেই বলিয়াছি ইহাদের বুদ্ধি যথেষ্ট আছে, এত আছে যে, বন্ধুবান্ধবেরা সকলেই প্রত্যাশা করিয়া আছেন কবে ইহারা আপন বুদ্ধিকে স্থায়ী কার্যে নিযুক্ত করিবে। বন্ধুদিগের উত্তেজনায় এবং আত্মাভিমানের তাড়নায় তাহাদের বুদ্ধি অবিশ্রাম চঞ্চল হইয়া বেড়াইতে থাকে, মনে করে হাতের কাছে আমার অনুরূপ কার্য কিছুই নাই। কোনো একটা অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে ভয় হয় পাছে ক্ষমতায় কুলাইয়া না উঠে এবং আত্মীয়সাধারণের চিরবর্ধিত প্রত্যাশার মূলে কুঠারাঘাত পড়ে। ফলাফলের ভার বিধাতার হস্তে সমর্পণপূর্বক মহৎ কার্যের অমোঘ আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া আত্মসমর্পণ করা এরূপ লোকের দ্বারা সম্ভবপর নহে।

সুতরাং অবজ্ঞা, উপেক্ষা, প্রবল তর্ক এবং সমালোচনার আগ্নেয় বেগে ইহারা আপনাকে সকলের ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করিতে চায়। অভিমান-শাণিত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া ইহারা সমস্ত

সৃষ্টিকার্যকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া তোলে। অন্য সকলকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিচারে বিপর্যস্ত করিয়া মনে করে, 'গঠন কার্যে নিশ্চয়ই আমার অসাধারণ নৈপুণ্য আছে নহিলে এমন সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম বুঝিতে পারি কী করিয়া!' কিন্তু এত ক্ষমতা সত্ত্বেও তাহারা কেন যে কোনো সৃজনকার্যে প্রবৃত্ত হইতে চাহে না ইহাই ভাবিয়া ভাবিয়া তাহারা এবং তাহাদের প্রতিবেশীবর্গ নিরতিশয় আশ্চর্য হইতে থাকে।

ইহারা নিতান্ত পার্শ্ববর্তী লোকের প্রশংসা সহ্য করিতে পারে না। কারণ পাশের লোক হইতে নিজের ব্যবধান অধিক নহে। পাশের লোক যদি বড়ো তবে আমিই বা বড়ো নহি কেন এই কথা মনে আসিয়া আঘাত দেয়। আমার বুদ্ধি ইহার অপেক্ষা অল্প নহে। বিচার করিতে তর্ক করিতে সূক্ষ্ম যুক্তি বাহির করিতে আমার মতো কয়জন আছে? তবে আমিই বা ইহার অপেক্ষা খাটো কিসে! এ ব্যক্তি কেবল আপন সামান্য শক্তি প্রকাশ করিয়াছে এবং পাঁচজন মূর্খ লোকে ইহাকে বলপূর্বক বাড়াইয়া তুলিয়াছে— দৈবক্রমে আমার বিপুল শক্তি মহৎ মস্তিষ্কভারে চাপা পড়িয়া আছে বলিয়া আমাকে আমি এবং দুই-একটি বন্ধু ছাড়া আর কেহ চিনিল না! আমি বর্তমান থাকিতে আমার পার্শ্বে যে লোকের দৃষ্টি পড়ে ইহা অপেক্ষা মূঢ়-সাধারণের অবিবেচনার প্রমাণ আর কী আছে! এরূপ স্থলে নিকটস্থ লোককে খাটো করিবার অভিপ্রায়ে ইহারা দূরস্থ লোকের অতিশয় প্রশংসা করে, হঠাৎ এত প্রশংসা করিতে আরম্ভ করে যে তাহার আর আদি অন্ত পাওয়া যায় না!

অধিকাংশ স্থলে ইহাদের কতকগুলি করিয়া নিজের জীব থাকে। তাহাদিগকে ইহারা সমাধা করিয়া তুলিতে চাহে। এই-সকল স্বহস্তগঠিত পুত্তল মূর্তিকে যখন তাহারা সর্বসাধারণের সমক্ষে পূজা করিতে থাকে, তখন তাহাতে করিয়া তাহাদের আত্মাভিমান ক্ষুণ্ণ হয় না, বরঞ্চ পরিতৃপ্ত হইতে থাকে। কারণ এই পুত্তলপ্রতিষ্ঠার মধ্যে তাহারা আপনাদের আত্মকর্তৃত্ব বিশেষরূপে অনুভব করিতে থাকে।

ইহাদের একপ্রকার শুষ্ক বিনয় আছে তাহার মধ্যে বিনয়ের মাধুর্য কিছুই নাই। সে বিনয় এত কঠিন যে অবিনয় তাহা অপেক্ষা অধিক কঠিন নহে। মনে হয় যেন অহংকার তাহার সমস্ত মাংসপেশী কাষ্ঠের ন্যায় শক্ত করিয়া সবলে স্থির হইয়া আছে। বিনয়বচনের মধ্যে যেন কেমন একটা পরিহাসের স্বর প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। অভিমান যেন গভীর বিদ্রূপভরে বিনয়ের অনুকরণ করিতেছে। অথবা সে যেন সকলকে ডাক দিয়া বলিতেছে, 'আমি নিজের মহোচ্চ স্কন্ধের উপর চড়িয়া এতই উন্নত উঠিয়াছি যে বিনয় প্রকাশ করিলেও আমার কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আমি আপনাকে বিস্তর বড়ো বলিয়া জানি এইজন্য বিস্তর অহংকারভরে বিস্তর বিনয় করিয়া থাকি।'

ইহারা যতই আত্মসংযম অভ্যাস করুক না, থাকিয়া থাকিয়া আত্মীয়স্বজনদের প্রতি ইহাদের কঠোর কটাক্ষ, নিষ্ঠুর বাক্য, ক্রূর পরিহাস বাহির হইয়া পড়ে। সংবরণ করিতে পারে না। তীব্র জ্বালাস্রোত মরুহৃদয়ের ভূগর্ভে অন্তঃসলিলা বহিতে থাকে, সময়ে সময়ে সামান্য কারণে ক্ষীণ আবরণ ভেদ করিয়া রক্তনেত্র, বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র, বিদীর্ণ ওষ্ঠাধরের মধ্য দিয়া বাহিরে উৎসারিত হইয়া উঠে। এক-এক সময়ে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গের ন্যায় এক-একটি ক্ষুদ্র তীক্ষ্ণ সহাস্য বাক্যে তাহাদের গোপন মর্মগহ্বরের বিস্তীর্ণ অগ্নিকুণ্ড চক্ষের সমক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এরূপ আকস্মিক নিষ্ঠুরতার কারণ তৎক্ষণাৎ খুঁজিয়া বাহির করা যায় না, কিন্তু সে কারণ অল্পে অল্পে বহুদিন ধরিয়া হৃদয়ে সঞ্চিত হইতেছিল। অবরুদ্ধ অহংকারে অজ্ঞানে অলক্ষিতভাবে যখন-তখন আঘাত সহিতেছিল, অবশেষে সহিষ্ণুতা উত্তরোত্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া একদিন সামান্য আঘাতে দ্বিধা হইয়া যায় এবং অভিমানের বিষদন্ত সম্মুখে যাহাকে পায় তাহাকেই আসিয়া বিদ্ধ করে।

এই হৃদয়বিবরবাসী অহংকারের উষ্ণ নিশ্বাস-বাষ্পে প্রশান্ত স্নেহ, নিরভিমান, প্রেম ও উদার করুণা আচ্ছন্ন হইয়া যায় এবং ক্রমশ কলুষিত হইয়া উঠে। আত্মবিস্মৃত সরল সহৃদয়তার সুখ

আর ভোগ করিতে পারি না, সর্বদাই রুদ্ধ দ্বার, রুদ্ধ হৃদয়, তামসী মুখশ্রী, সংকীর্ণ জীবনের গতি। গৃহকোণ অবলম্বন করিয়া কাল্পনিক উদারতার অভাব নাই, অথচ যথার্থ হৃদয়ের সহিত কাহাকেও হৃদয়ের কাছাকাছি অভ্যর্থনা করিয়া আনিতে পারি না। এই বিচিত্র জনপূর্ণ সহস্র সুখদুঃখময় পৃথিবীতে সকলকে দূরে রাখিয়া, স্বজনদিগকে আঘাত দিয়া, আত্মম্ভরিতার অন্ধকূপের মধ্যে আপনাকে লুপ্ত করিয়া আমাদের মর্ত্যজীবন অন্ধকারে নিষ্ফল অতিবাহিত করিয়া দিই, অবশেষে মৃত্যু আসিয়া আমাদিগকে এই জীবন্মৃত্যু হইতে শুভক্ষণে মুক্ত করিয়া দেয়!

কল্পনা
জ্যৈষ্ঠ ১২৯৪

হিন্দুদিগের জাতীয় চরিত্র ও স্বাধীনতা

সেদিন মোহিনী এক Theory বাহির করিয়াছিলেন যে, যে জাতি সমতলভূমিতে থাকে তাহারা অপেক্ষাকৃত ন্যায়শাস্ত্রব্যবসায়ী হয়। কথাটা নিতান্তই কাল্পনিক বোধ হয় না। যাহারা সমতলক্ষেত্রে থাকে, কষ্টস্বীকার করিয়া অতিক্রম করিবার অভ্যাস তাহাদের চলিয়া যায়, স্বভাবতই অলস হইয়া যায়। এইজন্য কোনোপ্রকার মানসিক [চিন্তা] তাহাদের পক্ষে দুঃসহ, ঘর-পড়া ন্যায়শাস্ত্রের জাদুপ্রভাবে সমস্তই তাহারা পরিষ্কার সমভূমি করিয়া দিতে চায়, সমস্তই একটা System একটা তন্ত্রের মধ্যে আনিতে চায়। তাহারা স্বাধীন মানবমন হইতে প্রসূত সাহিত্য [রচনার] একটা কল বানাইয়া দিয়াছে— এমন একটা স্বভাববিরুদ্ধ অলংকারশাস্ত্র গড়িয়া দিয়াছে, যাহাতে আপন হইতে লিখিবার ল্যাঠা যথাসম্ভব ঘুচিয়া যায়। সংগীতকে তাহারা এমন রাগরাগিণীজালের মধ্যে বাঁধিয়া দিয়াছে [যাহাতে] গীতরচনা করিতে যান্ত্রিক শিক্ষা ছাড়া স্বাভাবিক ক্ষমতার বড়ো একটা আবশ্যক বোধ হয় না। সকল দুরূহ [প্রশ্নেরই] চটপট্‌ একটা মীমাংসা বাহির করিয়া ফেলে। কিছুতেই যখন পাওয়া যায় না তখন একটা গল্প তৈরি করে। পঞ্চপাণ্ডব যে এক স্ত্রী বিবাহ করিল সেটা যেম্‌নি বুঝিতে একটু গোল বাধে অম্‌নি তাহার গল্প বাহির হয়। [ইহ]জন্মে যাহার নিকাশ পাওয়া যায় না পূর্বজন্ম হইতে তাহার কৈফিয়ত তলব হয়। কিছুই অমীমাংসিত থাকে না। যাহারা সকল বিষয়েরই চরম মীমাংসার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র, তাহারা কোনো বিষয়ের প্রকৃত মীমাংসায় [পৌঁছিতে পারে] না, অথবা যদিবা পৌঁছায় তো দৈবাৎ পৌঁছায়— কারণ তাহারা হাতের কাছে যাহা পায় তাহাকে [সত্য] মানিয়া নিষ্কৃতি পাইতে চাহে। Facts কাহারো মন জোগাইয়া চলে না, এইজন্য Facts-কে তাহারা [ভয় পায়]— এইজন্য চোখ বুজিয়া বহিঃপ্রকৃতির মুখ-চাপা দিয়া নিজের মন হইতে মনের মতো তন্ত্র বাহির করিতে [চায়, এই] জন্য সমস্তটাকে অত্যন্ত Elaborate করিতে হয়— আরম্ভের কথাগুলো অসত্য হৌক কিন্তু সেগুলিকে মানিয়া [লইলে] তাহার পরে তাহাদের মধ্যে একটা সুবিস্তৃত জটিল সামঞ্জস্য স্থাপন করা আবশ্যক হয়, নহিলে লোকে সেগুলিকে গ্রাহ্য করিবে না। এইজন্য প্রাণপণে Consistent হইতে হয়, যাহাতে গঠননৈপুণ্য দেখিয়াই লোকের [বিশ্বাস] জন্মে। পৃথিবীকে দেখা হয় নাই অথচ পৃথিবীর বিষয় লিখিতে হইবে এইজন্য পৃথিবীকে অবিকল একটি [বিকশিত] শতদলের ন্যায় কল্পনা করা হইল তাহার প্রত্যেক দলের স্বতন্ত্র নামকরণ হইল, সুমেরু-নামক কাল্পনিক পর্বতকে [তার] মধ্যস্থিত সুবর্ণ বীজকোষের মতো স্থাপন করা হইল, সমস্ত কল্পনার মধ্যে এমনি একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সুষমা প্রকাশ পাইল যে অজ্ঞ লোকের পক্ষে তাহাকে অবিশ্বাস করা দুরূহ— এবং লোকেরাও বিশ্বাস করিবার জন্য নিরতিশয় ব্যাকুল— অবিশ্বাসের পক্ষে যে অশান্তি ও পরিশ্রম আছে সেটুকু অলস লোকে বহন করিতে চায় না। সত্যের মধ্যে যে পরিপূর্ণ শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য আছে এ কথা সত্য— কিন্তু প্রথমত আংশিক সত্যগুলিকে খণ্ড খণ্ড বিশৃঙ্খলভাবে দেখিয়া ক্রমে যথানিয়মে সেই শৃঙ্খলাবদ্ধ

সুন্দর সত্যের প্রতি ধাবমান হওয়া যায়। তাড়াতাড়ি করিতে গেলে আপনার মনের সংকীর্ণ কল্পনার ক্ষুদ্র পারিপাট্যটুকু লাভ করা যায় কিন্তু উদার প্রকৃতির বৃহৎ সামঞ্জস্য [দেখা] যায় না। টলেমির কাল্পনিক জ্যোতিষ্কমণ্ডল যতই সুবিহিত সুষম হউক-না- কেন সুষমা-সৌন্দর্যে প্রাকৃতিক জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সহিত তাহার তুলনা হয় না। কাল্পনিক পারিপাট্যের চর্চা করিতে গেলে ক্রমে তাহা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম অবস্থা প্রাপ্ত হয়, কারণ বহির্জগৎ হইতে তাহার বাধা নাই এবং তাহার টীকাভাষ্যও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সূত্রে [মাকড়সাজালে] প্রকৃতি আচ্ছন্ন হইয়া যায়— তখনই এই কাল্পনিক জগৎই একপ্রকার সত্য হইয়া দাঁড়ায়।

আমার বিশ্বাস অন্য কোনো দেশের ধর্মশাস্ত্র লোকের আহার বিহার শয়ন নিদ্রা প্রভৃতি দিনের প্রত্যেক [মুহূর্তের] কার্য নিয়মে বাঁধিয়া দেয় নাই। আমাদের দেশেই এইরূপ অনুশাসন স্বাভাবিক এবং হয়তো আবশ্যক। আমাদের স্বাধীনতা অপহৃত হইলে আমরা বাঁচিয়া যাই— নির্ভাবনা বাঁধা রাস্তায় চলিতে পারি। এমন-কি আমরা নিজের [স্বাতন্ত্র্য] রক্ষা করিতে পারি না— এমন স্থলে আমাদের হস্তে যে-কোনো বিষয়ে স্বাধীনতা দিবে তাহাই ক্রমে ক্রমে [নিতান্তই] শিথিল ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইবে। এইজন্য আমাদের দেশে বাঁধা নিয়মের প্রাদুর্ভাব এবং নিয়মের দাসত্বকে সাধারণে দুঃখ জ্ঞান করে না। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে বাঁধা নিয়ম করিতে গেলেই সকল অবস্থা ও সকল [সময়ের] প্রতি দৃষ্টি রাখা অসম্ভব— সকল অবস্থায় সকল সময়েই সকলকেই সকল বিষয়েই একটা মোটামুটি নিয়মের মধ্যে আপনাকে যো-সো করিয়া স্থাপিত করিতে হয়। এইরূপে আমরা হাড়গোড় ভাঙিয়া সকলেই সমান নির্বীর্য নির্জীব... শান্তিসুখ উপভোগ করিতেছি। আর যাহা হৌক বা না হৌক কোনো উপদ্রব নাই। ভাবনা-চিন্তা তর্ক [বিতর্কের বদলে] শাস্ত্র আছে এবং পঞ্জিকা আছে। একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়া... মিলিয়া দুই হাতে শাস্ত্রখণ্ড অবলম্বন করিয়া ভবস্রোতে নির্বিঘ্নে ভাসিয়া যাইতেছি, সন্তরণ শিক্ষা করিবার আবশ্যক নাই, ব্যক্তিগত বল সঞ্চয় করিবার প্রয়োজন নাই। কেবল যে প্রয়োজন নাই তাহা নহে, তাহা অন্যায়; একজন নিজের বলে আর-একজনের চেয়ে বেশি মাথা তুলিতে চেষ্টা করিলে আমাদের শান্তিপূর্ণ নিয়মবদ্ধ সমাজের মধ্যে আগাগোড়া একটা গোল উপস্থিত হয়। এইজন্য যখন রাম-রাজত্ব শূদ্রক তপশ্চরণাদি দ্বারা আপনাকে... পদবীতে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন তখন দয়াময় রামচন্দ্র সমাজের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদন করিলেন। সীতার বনবাস আমাদের এই অতি-নিয়মবদ্ধ সমাজতন্ত্রের একটি দৃষ্টান্তস্থল বলিয়া বোধ হয়। ব্যক্তিগত ন্যায়পরতাও এই সমাজশাসনে পিষ্ট হইয়া যায়— অর্থাৎ ব্যক্তি একেবারেই কেহ নহে... পূর্বেই বলিয়াছি ইহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে আমাদের জাতীয় অভিজ্ঞতা হইতে এই স্থির হইয়াছে যে, সামান্য এমন কোনো বিষয় নাই যাহাতে আমরা আপনাকে বিশ্বাস করিতে পারি। খাওয়া শোওয়া সে বিষয়েও হে শাস্ত্র তুমি বলিয়া দাও আমাদিগকে কী করিতে হইবে। কোথাও কিছু যদি ছিদ্র থাকে আমাদের আলস্যবশত ক্রমেই সেটা বাড়িয়া উঠিবে। সীতার প্রতি প্রমাণহীন সন্দেহ সেটা একটা ছিদ্র কিন্তু সেটা যদি রাখিতে দাও তবে আমাদের (জাতীয়) স্বভাবগুণে ক্রমে সেটা মস্ত হইয়া উঠিবে।

[আজি]কার দিনে যে সমস্যা উঠিয়াছে তাহা এই যে এমন লোকদিগকে কী নিয়মে চালনা করা উচিত? ইহারা [বহুদিন] হইতে স্বাধীনতা পায় নাই এবং না পাইবার কারণও ছিল। ইহারা পরজাতীয়ের নিকট হইতে যে স্বাধীনতা প্রত্যাশা করিতেছে তাহা কি সংগত? স্বাধীনতা লাভের জন্য কঠোর সাধনা সকল জাতিরই [করিতে হয়] ... কিন্তু যদি অতি বিশেষ সাধনা কাহারো আবশ্যক থাকে তবে তাহা ভারতবর্ষীয়ের। কিন্তু ইহারা [যদি] কেবলমাত্র আবদার করিয়াই পায় তবে কি তাহা তাহাদের জাতীয় জীবনের মধ্যে তাহাদের হাড়ে হাড়ে [প্রবেশ] করিতে পাইবে? তাহা কি তাহারা যথার্থ পাইবে, না বাহিরে দেখিতে হইবে যেন পাইল?

দ্বিতীয় কথা। আমরা যে যথার্থই স্বাধীনতা চাহি তাহা জানিবার উপায় কী? যাহা আমাদের

কখনো [আছে] কখনো নাই তাহা আমরা হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা করিতে পারি না। কারণ আমরা জানি না [সেটা] কী? আমরা শুনিয়াছি তাহা ভালো জিনিস, বিশ্বাস হইয়াছে তাহা পাইলে ভালো হয়... কিন্তু তাহা আমাদের আবশ্যক ও উপযোগী কি না তাহা বলা শক্ত। ঘোড়া মূল্যবান পদার্থ এবং ঘোড়া চড়িলে আনন্দ [হয়] একজন ছেলে এ কথা শুনিয়া বাপের কাছে আবদার করিতে পারে যে 'হে বাবা আমাকে একটা ঘোড়া দাও।' বাবা বলিল, 'কেন রে। তোর আবার এ বাতিক গেল কেন!' সে বলিল, 'কেন বাবা, [তুমি] তো বলো ঘোড়া খুব ভালো, ঘোড়ায় চড়তে ভালো লাগে।' তখন বাবা মনে করে, এ ছেলেটা ঘোড়ার ব্যবহার জানে না তাই ঘোড়ায় চড়তে এত ব্যস্ত। কিন্তু যদি ঘোড়ার পিঠে একে চড়িয়ে দিই তা হলে ওঠবার জন্যে যত [আগ্রহ] প্রকাশ করেছিল নাব্‌বার জন্যে ততোধিক আগ্রহ প্রকাশ করবে।...স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমাদের [এইরূপ] ঘটিতে পারে। স্বাধীনতা কী তাহার স্বাদ জানিয়া এবং তাহা Realize করিয়া যদি স্বাধীনতা চাহিতাম [তাহা হইলে] লোকে নিদেন এইটে বুঝিত যে ঠিক জিনিসটা চাহিতেছে বটে। কিন্তু কানে-শোনা স্বাধীনতাব নামে [আমরা] যে কী চাহিতেছি তাহা আমরা নিজেই জানি না। যথার্থ স্বাধীনতা পাইলে হয়তো আমরা চীৎকার [করিয়া] বলিয়া উঠি 'দোহাই, তোমার কুস্তা বুলাইয়া লও।' কিছু আশ্চর্য নাই। স্বাধীনতা আমাদের জাতীয় স্বভাব। আমরা চিরদিন শাস্ত্রের অধীন, রাজার অধীন, গুরুর অধীন, গুরুজনের অধীন— সেটা তো একটা দৈব ঘটনামাত্র [নয় তাহার] মূল কারণ আমাদের মর্মের মধ্যে নিহিত।

আমাদের দেশের এত অল্প পরিমাণ লোক শিক্ষিত এবং অল্পশিক্ষিত— যে আমরা সমস্ত জাতির দায় স্কন্ধে লইতে পারি না। আমরা ক'জনে মিলিয়া যাহা চাহিতেছি তাহা সমস্ত জাতির পক্ষে বাস্তবিক ভালো কি মন্দ (তাহা) আমরা কি জানি? অশিক্ষিত লোকদের ভালোমন্দ সুবিচার করিবার ক্ষমতা আমরা অনেকটা হারাইয়া [ফেলিয়াছি]। শিক্ষিত লোকে নিজের অবস্থা বিচার করিয়া স্থির করিতে পারে যে বাল্যবিবাহ মন্দ, কিন্তু যখনি... [হইতে] মনে করে বর্তমান অবস্থায় সমস্ত ভারতবর্ষের পক্ষে তাহা মন্দ তখনি ভ্রমে পতিত হয়। এবং [অশিক্ষিত] লোকদের মৌন অবসরের মধ্যে সে যদি বকিয়া বকিয়া বাল্যবিবাহের বিপক্ষে একটা সাধারণ আইন জারী [করিয়া] লয় তবে সে কি গুরুতর অন্যায় করে? আমাদের গুরুতর দায়িত্ব বিস্মৃত হইয়া আমরা সমস্ত জাতির নামে [যখন] আবদার করিতে থাকি তখন বোধ করি মুহূর্তের জন্য আমাদিগকে সচেতন করিয়া দেওয়া আবশ্যক। [এখন] আবশ্যক শিক্ষা বিস্তার করা— অনেক অবস্থার অনেক লোক অনেকদিন হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া যে বিষয়ে [নিজের]... মত প্রকাশ করে তাহাকে দেশের মত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। ইংরাজি শিক্ষা দ্বারা প্রথম প্রথম [আমা]দের জাতীয়স্বভাবের এক প্রকার বাহ্যিক বিপর্যয় দৃষ্ট হয়। তখন হঠাৎ মনে হয় ইহারা [বুঝি] সত্যই ভারতবর্ষীয় বিশেষ ভাব পরিহার করিয়াছে এবং ইংরাজি institution সকলের উপযোগী হইয়াছে। অনেক দিন ধরিয়া অনেক লোকের মধ্যে শিক্ষা বিস্তৃত হইলে তবে এ বিষয়ে একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত [হইতে পারা] যাইবে। কেবল কতকগুলি লোকের মধ্যে ইংরাজি শিক্ষা প্রচলিত হইয়া কীরূপে যে দেশের... অবস্থার পরিবর্তন হইতে পারে, তাহা আমি জানি না।

[অনেকে বলিতে] পারেন যে ইংলন্ডেই কি আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই শিক্ষিত? কিন্তু তবে [সেখানে কী করে] লোকেরা অশিক্ষিত লোকদের প্রতিনিধিস্বরূপ নিযুক্ত হইতে পারেন? কিন্তু আমার বিবেচনায় ইংলন্ডের শিক্ষিত অশিক্ষিত লোকের সহিত আমাদের দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত লোকের অনেক প্রভেদ আছে। তাহাদের শিক্ষা ও উন্নতির মূল কারণ তাহাদের সমাজ তাহাদের অবস্থার মধ্যেই নিহিত। সুতরাং তাহাদের শিক্ষিত অশিক্ষিতের মধ্যে জাতিগত ভেদ নাই, শিক্ষার ন্যূনাধিক্যের ভেদমাত্র। জাতীয় স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাহাদের সকলেরই একটা স্বাভাবিক ধারণা আছে— তবে কাহারো মনে স্পষ্ট কাহারো মনে অস্পষ্ট। আমাদের দেশে শিক্ষিত অশিক্ষিতের মধ্যে সম্পূর্ণ আলো-অন্ধকারের ভেদ। একের কথা আরেকের পক্ষে বিদেশীয়। উভয়ের মধ্যে

মানসিক সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। একজন ইংরাজের সহিত বাঙালি অশিক্ষিতের যে প্রভেদ, ইংরাজিওয়ালা বাঙালির সহিত সাধারণের তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম প্রভেদমাত্র। আমাদের শিক্ষিত লোকদের আর-একটা গোল এই যে আমাদের এই নূতন শিক্ষা আমাদের মধ্যে কতটা খাপ খাইয়া বসিয়াছে তাহা আমরা অর্থাৎ কতক পরিমাণে আমরা নিজেকে নিজে জানি না। অর্থাৎ যে কথা [বলিতেছি] যে কাজ করিতেছি তাহা ঠিক বলিতেছি ঠিক করিতেছি কি না নিজেরই সন্দেহ বোধ হয়। তাহার [ফলে] আমাদের অশিক্ষিত সাধারণকে জানিবার উপায় হইতেও অনেক পরিমাণে বঞ্চিত হইতেছি। আমরা কী এবং উহারা কে ঠিক জানি না। অনেক সময়ে চোখ বুজিয়া মনে করি যে যাহা মনে করিতেছি তাহাই ঠিক।... তবে আমাদের একটা কথা বলিবার আছে। স্বাধীনতা এতই আমাদের পক্ষে বিদেশীয় যে তাহা আমাদের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইতে বাহিরের সাহায্য অনেক পরিমাণে আবশ্যক। প্রথমে কতকটা ঔদাসীন্য বা অনিচ্ছা সত্ত্বেও... কতক পরিমাণে স্বাধীনতার স্বাদ আবশ্যক। অতএব এ অবস্থায় আমাদের ইচ্ছা ও... অভাব থাকিলেও আমরা অল্পে অল্পে স্বাধীনতা শিক্ষালাভের জন্য অন্য স্বাধীনতাপ্রিয় জাতির নিকটে আবেদন করিতে পারি। তাহা ব্যতীত আমাদের আর গতি নাই। তাহার পরে আমাদের চেষ্টা স্বভাব ও অবস্থার উপর সমস্ত নির্ভর করিবে। কিন্তু যেমন করিয়াই দেখি ইহা একটা পরীক্ষা মাত্র। সকল জাতিই যে স্বাধীনতার সমান অধিকারী তাহা নহে। হয়তো এমন দেখা যাইতে পারে আমরা স্বাধীনতার যোগ্যই নহি। হয়তো আমরা অনেকগুলি স্বাভাবিক কারণে [অধীন] অবস্থার উপযোগী হইয়া আছি। সে কারণগুলি কী এবং সে কারণগুলি দূর হইতে পারে কি না তাহা বিশেষ বিবেচনার সহিত আলোচনা করিয়া দেখা কর্তব্য। জলবায়ু ভৌগোলিক অবস্থা সমাজনীতি ধর্মনীতির মধ্যে ইহার মূল... কেবল দুই-একটা আকস্মিক অবস্থার উপর ইহার নির্ভর তাহা চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। তাহা হইলে আমরা [কামনা] করিতেছি তাহার একটা সীমা ও লক্ষ্য নিরূপিত হইতে পারে— নতুবা আমরা ইতিহাসে যাহাই পড়ি তাহাই হাত বাড়াইয়া চাহিয়া বসিব ইহা আমার ঠিক বোধ হয় না।

১৭/১১/[১৮৮৮]
শনিবার
পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক

স্ত্রী ও পুরুষের প্রেমে বিশেষত্ব

ক

আমার মনে হয় স্ত্রীলোকের প্রতি পুরুষের এবং পুরুষের প্রতি স্ত্রীলোকের ভালোবাসার মধ্যে মাত্রাভেদ নহে জাতিভেদ বর্তমান। পুরুষের ভালোবাসা সৌন্দর্যপ্রিয়তার সহিত সংযুক্ত, আর স্ত্রীলোকের ভালোবাসা নির্ভরপরতা সুতরাং ক্ষমতার প্রতি আসক্তি হইতে উৎপন্ন। পুরুষের যথার্থ ভালোবাসা Ideal-এর প্রতি এবং স্ত্রীলোকের যথার্থ ভালোবাসা Real-এর প্রতি। এ স্থলে Ideal এবং Real আমি হয়তো একটু বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিতেছি। সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ Ideality-র সহিতই বিশেষরূপে সম্বন্ধ এবং ক্ষমতার প্রতি অনুরাগ Reality-র মধ্যে নিবিষ্ট। ক্ষমতার প্রতি অবলম্বন করা যায়, তাহার মধ্যে আপন দুর্বলতা বিসর্জন দিয়া বিশ্রাম লাভ করা যায়। কিন্তু সৌন্দর্যকে ধরা যায় না, তাহার প্রতি ভর দেওয়া যায় না, আমাদের পক্ষে তাহার যে কী উপযোগিতা তাহা সম্পূর্ণ জানি না, এই পর্যন্ত জানি যে, তাহার প্রতি আমাদের আত্মার একটি অনিবার্য আকর্ষণ আছে। স্পর্শনযোগ্য নির্ভরযোগ্য Reality-র পক্ষে সৌন্দর্য অতি অক্ষম,

তাহাকে সযত্নে সকাতরে রক্ষা করিতে হয়; তাহা আঘাতে ক্লিষ্ট হয়, উত্তাপে ম্লান হইয়া যায় কিন্তু Ideality-র পক্ষে তাহার অসীম প্রভাব, সমস্ত বলবুদ্ধি অবহেলে তাহার শরণাপন্ন হইয়া পড়ে। পুরুষ যখন রমণীকে ভালোবাসে তখন সেই ভালোবাসার মধ্যে সে সম্পূর্ণ বিরাম পায় না; যদিও তাহার ভালোবাসার মধ্যে একটি অনির্বচনীয় সুখ থাকে তথাপি কী একটা আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ সুগভীর বিষাদ ছায়ার ন্যায় তাহার অনুবর্তী হইয়া থাকে। কারণ সমুদয় যথার্থ সৌন্দর্যের মধ্যে একটি চিরনিলীন আকাঙ্ক্ষা সর্বদা বিরাজ করিতে থাকে। যেমন ভালো গান শুনিলে প্রাণ উদাস হইয়া যায়, প্রকৃতির উদার সৌন্দর্য অনুভব করিলে হৃদয়ের মধ্যে ব্যাকুলতা জন্মে। বস্তুর মধ্যেই সৌন্দর্যের সমাপ্তি নহে, সে যেন আপন আশ্রয়স্থলকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করিয়া একটি অসীমতাকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে। আমরা বস্তুকে গ্রহণ করি, স্পর্শ করি, ঘ্রাণ করি, কিন্তু সেই অসীমতাকে আয়ত্ত করিতে পারি না। এইজন্য আমাদের কর্মের চঞ্চলতা দূর হয় না। এইজন্য আমরা ভ্রমবশত সহস্র বস্তুকে স্পর্শ করিয়া দেখিতে চাহি এবং সেই স্পর্শকেই সৌন্দর্যের ভোগ বলিয়া ভ্রম হয়, এবং এইরূপে ভ্রান্ত লোকের মন হইতে সৌন্দর্যের আধ্যাত্মিকতার প্রতি বিশ্বাস নিতান্ত শারীরিকতার মধ্যে হারাইয়া যাইতে পারে। এইজন্য পুরুষের প্রেমের চাঞ্চল্য ও ভোগপ্রিয়তা লোকবিখ্যাত। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর পদার্থ মাত্রেরই মধ্যে পরিপূর্ণতা (Perfection) অতি বিরল। একটি গাছের মধ্যে তাহার অধিকাংশ ফুল ও পাতা তাহার আপনার মধ্যে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া সুন্দর হইয়া উঠে। কুশ্রী বেল জুঁই চাঁপা অতি দুর্লভ। কিন্তু মানুষের মধ্যে শারীরিক সর্বতোমুখী সম্পূর্ণতা বিরল। সেইরূপ, আমার বিশ্বাস, সৌন্দর্যপ্রিয়তা হইতে যে প্রেমের উৎপত্তি তাহা উন্নতশ্রেণীয় প্রেম। এইজন্য সাধারণত সেই প্রেমের চরম বিকাশ দেখা যায় না, এবং অধিকাংশ স্থলে তাহার বিকার লক্ষিত হয়। আমি অনুভব করি পুরুষের সম্পূর্ণ প্রেমের সহিত স্ত্রীলোকের প্রেমের তুলনা হয় না। পুরুষ যখন তাহার সমস্ত বলবুদ্ধি বৃহত্ত্ব কুসুমপেলব সৌন্দর্যের নিকট বিসর্জন দেয় তখন সেই প্রেমের মধ্যে একটি সুমহৎ রহস্য উদ্ভাবিত হইতে থাকে। প্রেম রমণীর পক্ষে বাস্তবিক আশ্রয়স্থল— এইজন্য সে তাহার মধ্যে পরিতৃপ্ত থাকে— ক্ষমতাকে সর্বতোভাবে কায়মনোবাক্যে অবলম্বন করিয়া সে পরিপূর্ণ বিশ্রাম লাভ করে। সৌন্দর্য তাহার হৃদয়কে চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত করে না। সে যাহা পাইয়াছে তাহার মধ্যেই তাহার আকাঙ্ক্ষার অবসান। রমণী এই কারণে বিশেষ Practical। সে কিছু অসমাপ্ত দেখিতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত গল্পের সমস্ত হিসাব না চুকিয়া যায় ততক্ষণ সে জিজ্ঞাসা করে 'তার পর।' শুদ্ধ কাল্পনিকতার প্রতি তাহার এক প্রকার বিদ্বেষ আছে। আমার সামান্য অভিজ্ঞতায় এই দেখিয়াছি রমণীরা প্রকৃত সাহিত্যের যথার্থ রসগ্রাহী ও সমালোচক হইতে পারে না।

রমণীর প্রেমের মধ্যে পরিতৃপ্তি আছে, বিশ্বাস আছে, নিষ্ঠা আছে, কিন্তু পুরুষের প্রেমের মধ্যে যে একটি চির অতৃপ্তিপূর্ণ অনির্বচনীয় সুখ আছে তাহা বোধ করি খুব অল্প রমণী উপভোগ করিয়াছে। সেই প্রেমে যেন মানবাত্মার অন্তর্নিহিত গভীর অমরতা হইতে এক অপূর্ব রাগিণীময় গান বাহিরের সৌন্দর্যময়ী অসীমতার দিকে কম্পিত হোমশিখার ন্যায় সর্বদা উত্থিত হইতে থাকে। প্রেমের অবস্থায় যত কবিতা এবং [গান তাহা] হৃদয় হইতেই বাহির হইয়াছে। সৌন্দর্যপ্রেমের মধ্যে সেই চিরচঞ্চলা শক্তি আছে যাহা হইতে কবিতা ও গান বাহির হইতে পারে— গভীর সুখ গভীর দুঃখ গভীর তৃপ্তির সহিত গভীর কামনার যোগে মানব হৃদয়ের এই-সকল কাতর গান জাগিয়া উঠে— প্রেমিক গাহিয়া উঠে—

> 'জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল,
> লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।'

কেহ কাহাকেও সত্য সত্যই লাখ যুগ হৃদয়ে হৃদয়ে রাখে নাই, কিন্তু উদ্দাম মুহূর্তের মধ্যে সেই লক্ষ যুগ রহিয়াছে। মনের মধ্যে অনুভব হয় যে, যে সৌন্দর্যের জন্যে হৃদয় কাতর লক্ষ যুগেও সে সৌন্দর্যের তৃপ্তি নাই কারণ তাহা অসীম।

খ

পুরুষের কবিতায় স্ত্রীলোকের প্রেমের ভাব

যদিও যোগেশচন্দ্র শুনিয়া অত্যন্ত হাসিবেন তথাপি আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, আমার Ideal সৌন্দর্য আমি কেবল স্ত্রীসৌন্দর্যের মধ্যেই দেখিতে পাই। যতবার আমি সুন্দরী স্ত্রী দেখি ততবারই আমার মনে এক বৃহৎ... উদয় হয়— আমি মনে মনে না বলিয়া থাকিতে পারি না 'কী আশ্চর্য! কেমন করিয়া এমনটা হইল'! জগতের সমস্ত সৌন্দর্যের কেন্দ্রস্থলে আমি যেন এক লক্ষ্মীরূপিণী মানসী স্ত্রীমূর্তি দেখিতে পাই। কী পুষ্পলতার মতো লালিত্য, মাধুর্য পরিস্ফুটিত, কী গতির হিল্লোল! কী সর্বাঙ্গে হৃদয়ের বিকাশ! কী আপনার মধ্যে আপনার সামঞ্জস্য, আত্মসম্ভ্রম, ইতরসাধারণ হইতে নির্লিপ্ত অনিন্দ্য শোভন ভাব! সমস্ত সৌন্দর্যের মধ্যে কী একটি সুমধুর সংযম!

আমাদের দেশের বৈষ্ণব কবিরা অনেক স্থলে রাধিকার যে প্রেম বর্ণনা করিয়াছেন আমার বোধ হয় তাহা পুরুষের প্রেম, স্ত্রীলোকের প্রেম নহে। সৌন্দর্যের অতৃপ্তিভাব পুরুষের প্রেমেরই বিশেষ লক্ষণ— কৃষ্ণের প্রতি রাধিকার যে ব্যাকুল সৌন্দর্যমোহ তাহা পুরুষ কবির পুরুষভাব হইতে উত্থিত। উষাকে দেখিয়া ঋষিরা যেমন গান গাহিয়া উঠিতেন, কৃষ্ণের সৌন্দর্য দেখিয়া রাধা স্থানে স্থানে সেইরূপ গীতোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন ইহা আমার অত্যন্ত বিপরীত বলিয়া বোধ হয়। পুরুষের মধ্যে সেই বিকশিত মঞ্জরিত পরিপূর্ণ সংহৃত হৃদয়ের ভাব দিয়া সুসংযত সৌন্দর্য মূর্তিমান হইয়া প্রকাশ পায় না, তাহাকে দেখিয়া যথার্থ সৌন্দর্যস্তব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে পারে না। পুরুষ কবিরা এইরূপে অনেক সময়ে আত্মভাব স্ত্রীতে আরোপ করিয়া একপ্রকার অস্বাভাবিক সুখ অনুভব করে— তাহারা কল্পনা করে 'আমরা উহাদিগকে যেরূপ আগ্রহের সহিত যেরূপ ভালোবাসিতেছি উহাদের কোমল হৃদয়ের মধ্য হইতে উহারাও আমাদিগকে অবিকল সেইরূপ ভালোবাসা দিতেছে।' কিন্তু তাহা ঠিক নহে। উহারা আমাদিগকে আর-এক রকম করিয়া ভালোবাসে এবং ভালোবাসিয়া আর-এক রকম সুখ পায়। আমরা উহাদিগকে প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্যের সহিত মিলাইয়া উহাদের সীমা দূর করিয়া উহাদিগকে আয়ত্তের বাহির করিয়া সুখ পাই। আর উহারা আমাদিগকে সমস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আমাদের সীমা নির্ধারণ করিয়া আপন আয়ত্তটুকুর মধ্যে আনিয়া সুখ পায়। আমরা আশ্রয়হীন আকাশে সুখী হই, উহারা পরিবৃত নীড়ে নির্ভর করিয়া সুখী হয়। আমাদিগকে উহারা দৃঢ়, আশ্রয়যোগ্য definite মনে করিয়াই ভালোবাসে, আমাদের মধ্যে দর্শনস্পর্শনাতীত অতিলৌকিক অসীম suggestiveness দেখিয়া যে ভালোবাসে তাহা নহে।

গ

ধর্মে ভয়, কৃতজ্ঞতা ও প্রেম

প্রথম প্রথম প্রকৃতির মধ্যে একটা প্রবল শক্তি দেখিয়া আমরা ঈশ্বরকে অনুভব করিতাম ও সভয়ে তাঁহার নিকট নত হইতাম। তাহার পরে প্রকৃতির মধ্যে করুণার ভাব, লালন-পালনের ভাব দেখিয়া ঈশ্বরের সহিত বাধ্যবাধক সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতা সূত্রে পিতার প্রতি পুত্রের কর্তব্যপাশে বদ্ধ হইলাম। তাহার পরে প্রকৃতিতে সৌন্দর্য দেখিয়া ঈশ্বরের সহিত প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। প্রেমের সম্বন্ধের মধ্যে 'কেন' 'কী বৃত্তান্ত' নাই— তুমি সুন্দর বলিয়া তোমাকে ভালোবাসি, তোমাকে না ভালোবাসিয়া থাকিতে পারি না বলিয়া ভালোবাসি। তুমি রাজা বলিয়া পিতা বলিয়া নহে, তুমি আত্মার আনন্দ বলিয়া।

মনে হয় ঈশ্বরের প্রতি এই সৌন্দর্যপ্রেম চরম আধ্যাত্মিকতা। কারণ, ইহাতেই আত্মার নিঃস্বার্থ স্বাধীনতা। বৈষ্ণব ধর্ম এই প্রেমের ধর্ম।

১৯/১১/১৮৮৮
পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক

আমাদের সভ্যতায় বাহ্যিক ও মানসিকের অসামঞ্জস্য

জ্ঞানের রাস্তার দুই ভাগ আছে— একটা ঐন্দ্রিয়ক অর্থাৎ শারীরিক আর-একটা মানসিক। একটা, Facts প্রত্যক্ষ করা, আরেকটা তাহার মধ্য হইতে তত্ত্ব উদ্ভাবন। জলবায়ুর প্রভাবজনিত জড়তাবশত আমাদের দেশে সেই শারীরিক অংশের প্রতি অবহেলা ছিল। সুতরাং মানসিক দিকটাই স্বভাবত অতিপ্রবল হইয়া সমস্ত জ্ঞানরাজ্য অধিকার করিয়া লইল। অলস শরীর পড়িয়া রহিল, মন ঘরে বসিয়া তন্ত্র বাঁধিতে লাগিল।

পৃথিবীর মধ্যে বৃহৎ সমতলক্ষেত্রে বৃহৎ সভ্যতার দুই দৃষ্টান্ত আছে। এক চীন আর-এক ভারতবর্ষ। উভয় দেশেই সভ্যতার মধ্যে জীবনের গতি নাই— নূতন গ্রহণ ও পুরাতন পরিহার নামক জীবনের যে প্রধান তাহা নাই। যাহা কিছু উদ্ভুত হয় তাহা তৎক্ষণাৎ বদ্ধ হইয়া যায়, তাহার আর বর্ধনশক্তি থাকে না। বহিঃপ্রকৃতির সহিত সংঘর্ষণে তাহাদের চরিত্র দৃঢ় হইয়াছে, বাধা অতিক্রমণের চেষ্টাতেই তাহারা স্বভাবত সুখ পায় এবং বহিঃপ্রকৃতিকে তাহারা অবহেলার সামগ্রী মনে করে না, সর্বদাই তাহার প্রতি তাহাদের মনোযোগ দায়ে পড়িয়া আকৃষ্ট হয়। প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে কাল্পনিক কেল্লা কোনো কাজেই লাগে না। কঠিন Fact সকলের মধ্যে যে বৃহৎ নিয়ম বিরাজ করে সেই নিয়মকে আবিষ্কার করিলে তবে Facts-এর উপর জয়লাভ করিবার সম্ভাবনা থাকে। এরূপ স্থলে কেহ ইচ্ছা করিয়া ঘরে বসিয়া মিথ্যা মায়াগণ্ডি রচনা করিয়া চোখ বুজিয়া নিজেকে নিরাপদ জ্ঞান করিতে পারে না। শরীর মন দুই একসঙ্গে সমান বলে কাজ করিতে থাকে— তাই দুয়েরই উন্নতি হয় এবং মাঝে হইতে [কাম] সিদ্ধ হয়। আমরা যদি পৃথিবীতে না জন্মিয়া কোনো কল্পনারাজ্যে জন্মিতাম তাহা হইলে কোনো ভাবনা ছিল না; তাহা হইলে কেবলমাত্র মানসিক ও আধ্যাত্মিক চর্চা করিয়া আমরা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিতাম। কিন্তু পৃথিবীতে শরীরকে অবহেলা করিয়া মন উন্নতি লাভ করিতে পারে না। বহিশ্চক্ষুকে উপেক্ষা করিয়া কেবল অন্তশ্চক্ষুর সাহায্যে জ্ঞান লাভ করা যায় না। আমাদের দেশে শরীর হইতে একপ্রকার বিচ্ছিন্ন হইয়া [মন] অস্বাভাবিক কুষ্মাণ্ডের মতো অকালে অন্যায়রূপ ডাগর হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকগুলো আশ্চর্য আশ্চর্য কাজ করিয়াছিল, কিন্তু কোনোটাই পূর্ণতা লাভ করে নাই, সকলগুলোই মাঝে এক সময় হঠাৎ টোল খাইয়া তুবড়াইয়া বাঁকিয়া শুকাইয়া গেল। অঙ্কুর উদ্গম হইল শস্য হইল কিন্তু তাহার মধ্যে নূতন শস্যের বীজ হইল না। যাহা হইয়াছিল তাহার স্মৃতিমাত্র রহিল। নব নব জীবনের মধ্যে জীবন্ত হইয়া রহিল না। য়ুরোপে Alchemy Chemistry হইল, Astrology Astronomy হইল— কিন্তু আমাদের দেশে শিশুবিজ্ঞান হঠাৎ লম্বা হইয়া উঠিয়া মাজা ভাঙিয়া পড়িয়া রহিল। বোধ হয় ইহার কারণ আমাদের সভ্যতায় মন ও শরীর, অন্তর ও বাহিরের অসমান বিকাশ।

অধীনতার সহিত যখনি সংগ্রাম করিয়াছে য়ুরোপ তখনি জয়ী হইয়াছে। Catholic ধর্মের অধীনতার উপর Protestantগণ জয়ী হইল। জ্ঞান ধর্ম ও রাজ্য সম্বন্ধীয় অধীনতার বিরুদ্ধে য়ুরোপ বার বার জয়ী হইয়াছে। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ শাসনের সময় বুদ্ধধর্ম একবার বিদ্রোহ

আনয়ন করিয়াছিল— অধীনতাপাশের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের মানবহৃদয় সেই একবার বলপ্রয়োগ করিয়াছিল, কিন্তু পরাভূত হইয়া নির্বাসিত হইল।

২০/১১/১৮৮৮
পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক

সমাজে স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের প্রভাব

স্ত্রী-পুরুষগত প্রেমের ন্যায় প্রবল শক্তি আর কিছু আছে কি না সন্দেহ। এই শক্তি ষোলো আনা মাত্রায় সমাজের কাজে লাগাইলে মানবসভ্যতা অনেকটা বল পায়। এই শক্তি হইতে বঞ্চিত করিলে সমাজের একটি প্রধান বল অপহরণ করা হয়। দাবাহীন শতরঞ্চ খেলার মতো হয়। য়ুরোপীয় সমাজে এই শক্তি সম্পূর্ণ প্রয়োগ করা হইয়াছে। তাহাদের স্ত্রী-পুরুষপ্রেম ব্যক্তিবিশেষে বদ্ধ নহে, সমস্ত সমাজের মধ্যে সঞ্চারিত। স্ত্রী-সাধারণের প্রতি পুরুষসাধারণ এবং পুরুষসাধারণের প্রতি স্ত্রীসাধারণের আকর্ষণে সমস্ত সমাজ গতিপ্রাপ্ত হইতেছে। স্ত্রী-প্রকৃতি এবং পুরুষ-প্রকৃতি উভয়ে আপনাকে পরিপূর্ণ মাত্রায় বিকশিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রেমের প্রভাবেই মানব সমগ্রভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। স্বাভাবিক নিয়মে পুষ্প ও ফল যেমন সমগ্রভাবে সূর্যের উত্তাপ গ্রহণ করে, তেমনি প্রেমে মানব-প্রকৃতির মধ্যে সর্বত্র সমভাবে উত্তাপ সঞ্চারিত করিয়া দেয়, তাহার চূড়ান্ত সুমিষ্টতা ও সৌরভ তাহার আদ্যোপান্তে পরিণত হইয়া উঠে। অনুশাসন ও সংহিতা ধোঁয়া দিয়া পাকানোর মতো তাহাতে এককালে সর্বাঙ্গীণ পরিণতি হয় না। তাহাতে কোথাও রঙ ধরে কোথাও ধরে না, তাহাতে আঁঠি পর্যন্ত পাকিয়া উঠে না। প্রেমে আমাদের অন্তঃকরণ সজীব হইয়া উঠিয়া বাহিরের সজীব শক্তিকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করিতে পারে— প্রেমের অভাবে অন্তঃকরণ অসাড় থাকে, কেবল বাহিরের শক্তি তাহার উপরে বলপ্রয়োগ করিয়া যতটুকু করিয়া তোলে। অতএব সংহিতা অনুশাসন মুমূর্ষু সমাজের প্রতি সেঁকতাপের ন্যায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সজীব সমাজের আপাদমস্তকে উক্ত কৃত্রিম তাপ অবিশ্রাম প্রয়োগ করিলে তাহার স্বাভাবিক তেজ হ্রাস হয়। য়ুরোপীয় সমাজে স্ত্রী-পুরুষপ্রেম স্বাভাবিক ব্যাপ্ত সূর্যতাপের ন্যায় সমাজের সর্বাঙ্গে পত্র, পুষ্প, ফল বীর্য ও সৌন্দর্য সমগ্রভাবে উদ্ভিন্ন করিয়া তুলিতেছে। স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা বায়ুর ন্যায় অদৃশ্যভাবে সর্বত্র প্রবাহিত হইতেছে। কেবল যন্ত্রের ন্যায় জড়চালনা নহে জীবনের বিচিত্র গতিহিল্লোল রক্ষিত হইতেছে।

কিন্তু এই জীবন পদার্থটা অত্যন্ত দুরায়ত্ত। তাহাকে কাটাছাঁটা নিয়মের মধ্যে আনা যায় না। তাহার সহস্রমুখী নিয়ম সহজে ধরা দেয় না। অতএব যাহারা সমাজকে একটা স্বকপোলকল্পিত নিয়মের মধ্যে বাঁধিতে চাহে এই জীবন পদার্থটা তাহাদের অত্যন্ত বিঘ্নের কারণ হয়। ইহার গলায় ফাঁস লাগাইয়া ইহাকে আধমারা করিয়া তবে তাহাদের উদ্দেশ্য সফল হয়। ইহার নিজের একটা জটিল নিয়ম আছে কিন্তু সেটাকে কায়দা করিয়া আপন মতের স্বপক্ষে খাটাইয়া লওয়া অত্যন্ত দুরূহ। অতএব প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া যাঁহারা উন্নতির একটা ভারি সহজ উপায় বাহির করিতে চান, তাঁহারা এই উপদ্রবটাকে সর্বাগ্রে নিকাশ করিতে ইচ্ছা করেন। স্ত্রী-পুরুষপ্রেম ভারতবর্ষীয় সমাজের মৃত্যুবৎ শান্তির পক্ষে অত্যন্ত ব্যাঘাতজনক, তাহাতে সমাজে একটা জীবনপূর্ণ চাঞ্চল্য সর্বদা সঞ্চরণ করিতে থাকে; এই চাঞ্চল্য সম্পূর্ণ দমন করিয়া সমাজকে নিতান্ত ভালোমানুষ করিয়া তোলাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। স্ত্রীলোকদিগকে প্রাচীররুদ্ধ করিয়া রাখা সেই উদ্দেশ্য সফলতার অন্যতম কারণ হইয়াছে। অনেক বিপদ অনেক অশান্তির হাত

এড়ানো গিয়াছে, সেইসঙ্গে অনেকখানি জীবন একরকম চুকাইয়া দেওয়া গেছে। আমরা সকল সভ্যসমাজ অপেক্ষা বেশি ঠাণ্ডা হইয়াছি, তাহার কারণ আমাদের নাড়ি নাই বলিলেই হয়।

আমাদের দেশে পরিবার আছে, কিন্তু সমাজ নাই তাহার এক প্রধান কারণ স্ত্রীলোকেরা পরিবারের মধ্যে বদ্ধ, সমাজের মধ্যে ব্যাপ্ত নহে। স্ত্রীলোকের প্রভাব কেবলমাত্র পরিবারের পরিধির মধ্যেই পর্যাপ্ত। পরিবারের বাহিরে আর মানব সমাজ নাই, কেবল পুরুষ সমাজ আছে। কেবল পুরুষে পুরুষ গড়িতে পারে না। এমন-কি পুরুষ প্রকৃতি গড়িয়া তুলিতে স্ত্রীলোকেরই বিশেষ আবশ্যক। কারণ, স্ত্রীলোকেই চাহে পুরুষ পরিপূর্ণ রূপে পুরুষ হউক। পুরুষের উন্নত আদর্শ স্ত্রীলোকের হৃদয়েই বিরাজ করিতে পারে। স্ত্রীলোকের জন্যই পুরুষদিগকে বিশেষরূপে পুরুষ হওয়া আবশ্যক।

কেহ বলিতে পারেন পরিবারের মধ্যে স্ত্রীলোকের প্রভাব আবদ্ধ থাকাতে পরিবারের সুখ ও উন্নতি বৃদ্ধি হইয়াছে। সে সম্বন্ধে দুই-একটা কথা বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক লোকের সাধারণ শিক্ষা ও বিশেষ কাজ আছে। প্রথমে মানুষ হওয়া আবশ্যক, তাহার পরে কেরানি হওয়া বা জজ হওয়া বা আর কিছু হওয়া। সমস্ত জীবন কেবলমাত্র বিশেষ আবশ্যকের জন্য প্রস্তুত হইতে গেলে কখনো মনুষ্যত্ব লাভ করা যায় না। চাষা আজন্মকাল প্রধানত কৃষি ব্যবসায়ের জন্যই উপযোগী হইয়াছে, এইজন্য সে কেবল চাষা। ব্যবসায়ীদের প্রতি সাধারণ ঘৃণার ভাব কতকটা এই কারণবশত। তাহারা বিশেষ কাজের যন্ত্র হইয়া পড়ে, মানুষ হইতে পায় না। স্ত্রীলোকের সম্বন্ধেও এই নিয়ম খাটে। আমাদের স্ত্রীলোকেরা অতি বাল্যকাল হইতে কেবলমাত্র পরিবারের সেবা করিবার জন্য বিশেষরূপে প্রস্তুত হইতে থাকে। আত্মোৎকর্ষ সাধনের জন্য পৃথিবীতে যে-সকল উপায় আছে তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহারা পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। তাহারা সম্পূর্ণ স্ত্রীলোক হইতে পারে না, তাহারা কেবলমাত্র গার্হস্থ্যের উপাদান সামগ্রী হইয়া উঠে। অবশ্য পরিবারের কাজ করিতে গেলে স্নেহ, প্রেম প্রভৃতি অনেকগুলি উচ্চ মানব প্রবৃত্তির চর্চা স্বভাবতই হইয়া থাকে, এইজন্য আমাদের দেশের স্ত্রীলোক আমাদের দেশের পুরুষ সাধারণের অপেক্ষা অনেক ভালো, তথাপি ইহা নিশ্চয় স্ত্রীলোকের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথ আমাদের দেশে সম্পূর্ণ রুদ্ধ। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা কেবলমাত্র গৃহিণী, তাহা ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাহাদের সহিত কেবল আমাদের সুবিধার যোগ, শিক্ষিত পুরুষের অধিকাংশই তাহাদের নিকট রহস্য। অর্থাৎ মানবের উন্নতি ব্যাপারে তাহারা সামান্য দাসীর কার্য করে মাত্র। সুতরাং স্বভাবতই তাহাদের আত্মসম্ভ্রম থাকে না এবং সমাজের নিকট হইতে যথোচিত সম্মান প্রাপ্ত হয় না— দীনভাবে নিতান্ত আচ্ছন্ন, সংকুচিত, জড়ীভূত হইয়া থাকে, তাহাদের সমগ্র মধুর মহৎ স্ত্রীপ্রকৃতি বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে না।

চাষা কেবলমাত্র চাষা থাকিয়াই চাষের কাজ একরকম চালাইয়া দিতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোক কেবলমাত্র গৃহিণী হইয়া গৃহকার্য যথোচিত সম্পন্ন করিতে পারে না। কারণ ইহা কেবলমাত্র জড়প্রকৃতির সহিত কারবার নহে। সন্তান পালন কেবলমাত্র স্তনদান নহে, স্বামীর সঙ্গিনী হওয়া কেবল স্বামীর ভাতের মাছি তাড়ানো, পা ধুইবার জল জোগানো নহে। এ-সকল কাজের জন্য প্রথমত সাধারণ শিক্ষা আবশ্যক, মানুষ হওয়া আবশ্যক।

আমাদের জাতি কেবল পরিবারের সমষ্টি, কিন্তু জাতি নহে এবং প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজ নহে। স্ত্রী-পুরুষের যোগে এই সমাজ স্থাপিত এবং স্ত্রী-পুরুষের আকর্ষণে ইহা গতিপ্রাপ্ত হইতে পারে। আমরা কেবল অসম্পূর্ণ পুরুষ, স্ত্রীলোকেরা কেবল আমাদের ঘরের কাজ অসম্পূর্ণরূপে করে মাত্র।

২৪/১১/১৮৮৮

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক

আমাদের প্রাচীন কাব্যে ও সমাজে স্ত্রী-পুরুষ প্রেমের অভাব

আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে দাম্পত্যপ্রেমের বহুল উল্লেখ আছে, কিন্তু স্ত্রী-পুরুষ স্বাধীন প্রেমের কথা অতি...[অল্পই] আছে। য়ুরোপীয় কাব্যসাহিত্যে দাম্পত্যপ্রেম অপেক্ষা স্বাধীন প্রেমই অধিক বিস্তৃত। আমাদের সমাজে... [স্বাধীন] প্রেমের স্থান ছিল না। কিন্তু তথাপি মানবহৃদয় আপন স্বাধীন প্রেমের আকাঙ্ক্ষা দমন করিয়া রাখিতে পারে নাই। নানা কৌশলে প্রাচীন কবি সেই গভীর আকাঙ্ক্ষা কাব্যে ব্যক্ত করিতেন। প্রাচীররুদ্ধ সমাজের বহির্ভাগে তাঁহারা এমন সকল কল্পকুঞ্জ রচনা করিতেন যেখানে স্বাধীন প্রেম অব্যাহতভাবে ক্রীড়া করিতে পারিত। মালিনী [তটবর্তী] তপোবনে, বনজ্যোৎস্না ও সহকারকুঞ্জে বিকাশোন্মুখী শকুন্তলা, অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা সমাজকারাবাসী হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাস্বপ্ন। শকুন্তলা সমাজবিরোধী কাব্য। বিক্রমোর্বশী অসামাজিক। তাহাতে সমাজবন্ধন ছিন্ন করিয়া... প্রেম সৌন্দর্যের প্রতি ধাবিত হইয়াছে। মৃচ্ছকটিকও অস্বাভাবিক সমাজের বিরুদ্ধে মানবহৃদয়ের বিদ্রোহ, [বসন্তসেনা] সমাজ হইতে নির্বাসিতা, তাহার প্রতি চারুদত্তের ন্যায় সর্বগুণসম্পন্ন নাগরিকের একনিষ্ঠ প্রেম সমাজের বাঁধা নিয়মের প্রতি কবির বিশ্বাসের ও আন্তরিক অনুরাগের অভাব। মেঘদূত বিরহের কাব্য— বিরহাবস্থায় দাম্পত্য সূত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া মানব যেন পুনশ্চ স্বাধীনভাবে ভালোবাসিবার অবসর পায়। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সেই পড়ে... যেখানে হৃদয়ের প্রবল অভিমুখী গতি আপনাকে স্বাধীনভাবে প্রবাহিত করিতে স্থান পায়।... আকর্ষণে এক হইতে আর-একের দিকে ধাবমান হইবার জন্য হৃদয় মধ্যবর্তী আকাশ পায়। যেখানে দাম্পত্য... সেখানে একটি চিরস্থায়ী বিরহ থাকে, সেই বিরহকে অবলম্বন করিয়া প্রেমের আকর্ষণ আপন কার্য করিতে... হৃদয়ের সমস্ত শক্তিকে বহির্মুখী করিয়া বিকশিত করিয়া তোলে।

সঙ্গমবিরহবিকল্পে
বরমপি বিরহো, ন সঙ্গমস্তস্যা
সঙ্গে সৈব তথৈকা
ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে।

...বিরহে হৃদয়ের স্বাধীনতা থাকে, সে আপনার প্রেম দিয়া সমস্ত বিরহকে পূর্ণ করিয়া ফেলে। এইজন্য... দাম্পত্যের মধ্যে বিরহ আনিয়া প্রেমকে স্বাধীন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কুমারসম্ভবে কুমারী গৌরী একাকিনী মহাদেবের সেবা করিতেছেন ইহা সমাজ নিয়মের ব্যতিক্রম, কিন্তু এ নিয়ম লঙ্ঘন না করিলে তৃতীয় ...অমন অতুল্য কাব্যের সৃষ্টি হইবে কী করিয়া? একদিকে বসন্তপুষ্পাভরণা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার মতো শিরিষ...বেপথুমতী উমা, আর-একদিকে যোগাসীন মহাদেবের অগাধস্তম্ভিত সমুদ্রবিশাল হৃদয়, চক্ষুর পলকে [উভয়ের] মধ্যে বিশ্ববিজয়ী প্রেমের আকর্ষণ বদ্ধ হইবে কী করিয়া? ইহাতে কঠিন নিয়মের কারাপ্রাচীরের মধ্য হইতেও স্বাধীন প্রকৃতির জয়সংগীত ধ্বনিত হইতেছে। রাধাকৃষ্ণের সমাজবিদ্রোহী প্রেমগান যে আমাদের এই আটঘাট [বাঁধা] সমাজের ও সর্বত্র প্রচলিত হইল ইহাতেও প্রমাণ হইতেছে আমাদের রুদ্ধ হৃদয় ব্যাকুলভাবে প্রেমের স্বাধীনতা [খুঁজিতেছে]। চিরদিন বদ্ধ থাকিয়াও সৌন্দর্যের প্রতি হৃদয়ের সেই স্বাধীন আকাঙ্ক্ষা এখনও সম্পূর্ণ বিনষ্ট [হয় নাই]। কারণ,... সমাজনিয়ম আর যাহাই করুক, প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য আপন জটিল জালের দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে পারে নাই। প্রকৃতি তাহার বিচিত্র সৌন্দর্য দ্বারা সর্বদা আমাদের সৌন্দর্যচাঞ্চল্য জাগাইয়া রাখে... সে কী করিতে চায়; বৃদ্ধ সমাজপতিরা এই চাঞ্চল্য দমন করিবার জন্য নানা ফন্দি বাহির করেন, কিন্তু সেই চঞ্চলতা জীবন থাকিতে কিছুতেই বাঁধা পড়ে না।

প্রাকৃতিক শক্তি সকলকে লোপ করিয়া বাহাদুরী করাকে সভ্যতা বলে না, সাধারণ মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া... নিয়মিত করাই সভ্যতার কার্য। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে একটি অমোঘ আকর্ষণ

আছে এইজন্য ভয়ে ভয়ে তাড়াতাড়ি উভয়ের... দিলে মঙ্গল হয় না, সেই আকর্ষণকে যথানিয়মে মানবের কার্যে প্রয়োগ করা আবশ্যক। আমরা কোনো প্রাকৃতিক শক্তিকে লোপ করিতে পারি না, কিন্তু নিয়মিত করিয়া আপন কার্যে লাগাইতে পারি।

বিদ্যাসুন্দর এবং আমাদের সাধারণ প্রচলিত প্রেমগান হইতে এই প্রমাণ হয় যে, সমাজনিয়মের শাসন সত্ত্বেও প্রেম আমাদের হৃদয় হইতে লুপ্ত হয় নাই, কেবল সূর্যকিরণের অভাবে কলুষিত হইয়া গিয়াছিল। আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে হৃদয়ে বিরাজ করিতেছিল, কেবল তাহা মুক্ত আকাশের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া কুঞ্চিত কীটের ন্যায় মৃত্তিকাতলে সহস্র গহ্বর খোদিত করিয়াছিল। হেয় বিকৃত অমরতা লাভ করিয়া সে তলে তলে সমাজকে ধ্বংসের পথে আকর্ষণ করিতেছিল।

২৬/১১/১৮৮৮
পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক

CHIVALRY

কুমারী Mary-র প্রতি ভক্তি য়ুরোপে স্ত্রীসম্মানের এক প্রধান কারণ বলিয়া উল্লিখিত হয়। কিন্তু আমাদের দেশে শাক্তদের মধ্যে chivalry-র প্রচলন হয় নাই কেন? chivalry-র মধ্যে যে সম্মানের ভাব আছে তাহা প্রেমের সম্মান তাহা ভক্তির সম্মান নহে। সুকুমার সৌন্দর্যের প্রতি যে একটি সযত্নসম্ভ্রম ভাবের উদয় হয় chivalry তাহাই। আমাদের দেশে স্ত্রীলোকের প্রতি যে সম্মান আছে, তাহা জননীভাবে, দেবীভাবে। তাহার কারণ, কেবলমাত্র পতিব্রতা সতী এবং জননী এই দুইভাবে আমাদের স্ত্রীলোকেরা ভক্তির যোগ্য। তাহারা কোনোকালে কুমারী বা সুন্দরী নহে— সুন্দরী না হওয়াটার অর্থ এই যে, সাধারণের মধ্যে তাহাদের সৌন্দর্যের কোনো কার্য নাই। আমাদের দেশে কুমারী শিশু আছে কিন্তু কুমারী স্ত্রীলোক নাই। সুতরাং স্ত্রীপুরুষ মাত্রেরই মধ্যে যে একটি স্বাভাবিক প্রেমের সম্বন্ধ তাহা এদেশে জন্মিতে পারে নাই। প্রেম আকর্ষণই স্ত্রীলোকের প্রধান বল; যে সমাজে স্ত্রীলোক প্রেম উদ্রেক করিতে পারে সেই সমাজেই স্ত্রীলোক প্রকৃত আত্মশক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। যে সমাজে সেই প্রেম উদ্রেকের বাধা আছে সেইখানে স্ত্রীলোকের প্রধান বল অপহরণ করা হইয়াছে। স্ত্রী বলিয়া নহে, জননী বলিয়া নহে, স্ত্রীলোক বলিয়াই স্ত্রীলোকের একটি মাহাত্ম্য আছে, সে মাহাত্ম্য পুরুষের হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত; কেবলমাত্র গার্হস্থ্যের মধ্যে [রুদ্ধ] থাকিলে স্ত্রীলোক সেই আপন রাজ্য হইতে সিংহাসন হইতে বঞ্চিত হয়। কেবল সতী বা জননীভাবে এক প্রকার দূরস্থিত মৃদু ভক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু সেভাবে ধন মন জীবন সমর্পণ করা যায় না। কিন্তু পুরুষ স্ত্রীলোকের জন্য ধন মন জীবন দান করিবে প্রকৃতিতে এইরূপ কথা আছে, স্বভাব শাস্ত্রে এইরূপ বিধান আছে। সুতরাং আত্মোৎসর্গের জন্য হৃদয় উন্মুক্ত হয় ম্রিয়মাণ হইয়া থাকে নয় নানাবিধ গোপন পথ অবলম্বন করে। য়ুরোপীয় সমাজে স্ত্রীলোকের প্রতি স্বাভাবিক আত্মোৎসর্গ হইতে সহস্র মানবকার্যের জন্য আত্মোৎসর্গ শিক্ষা হয়। স্বাভাবিক পদ্ধতি ত্যাগ করিয়া কেবল শুষ্ক ধর্মোপদেশ দ্বারা লোকের ধন মন প্রাণ কাড়িতে পারা যায় না। আমাদের দেশের লোকেরা উক্ত তিনটে পদার্থ গর্ত খুঁড়িয়া কত সযত্নে সঞ্চয় করিয়া রাখে। সুদৃঢ় অভ্যাসবশত এক প্রকার দাসের মতো প্রাণ দেওয়া যায় বটে, কিন্তু স্বাধীনভাবে প্রাণ দিবার শিক্ষা কেবল প্রেম হইতেই হয়।

নানা কারণে আমার মনে হয় না যে দেবভক্তি হইতে chilvary-র উৎপত্তি। আমাদের দেশে শাক্তদের মধ্যে কৃত্রিম কুমারী পূজা আছে কিন্তু প্রকৃত কুমারী পূজা নাই। যেখানে স্ত্রীলোক রুদ্ধ নহে সেইখানেই chilvary-র জন্ম। chilvary অন্ধ পশুবলের উপরে সৌন্দর্যের জয়লাভ সৌন্দর্যের স্বাভাবিক কার্যই তাই। স্বাধীনতা লাভ করিয়া স্ত্রীলোক সবল হয় এবং সবলতা লাভ

করিয়া স্ত্রীলোক জয়ী হয়। কেবল স্বামী পুত্র পরিবারের নহে, সমস্ত পুরুষের প্রেম আকর্ষণ করিয়া তবে সমাজে একটি সমগ্র স্ত্রীলোক উদ্ভিন্ন হইতে পারে। সেই স্ত্রীলোককে আমরা ভালোবাসি, কিন্তু আংশিক অসম্পূর্ণ স্ত্রীলোককে মাতা দেবী সম্বোধন করিয়া দূরে চলিয়া যাই। Browning-এর *In a Balcony* নামক নাট্যকাব্যে রাজ্ঞী দুঃখ করিতেছেন যে, কেবলমাত্র রানী হইয়া স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণতা নাই সুখ নাই; যদি একজন সামান্যতম প্রজা সমস্ত রাজসম্মান উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে ভালোবাসে তাহা হইলেও যেন তাঁহার স্ত্রী-প্রকৃতি কতকটা চরিতার্থ হয়। স্ত্রীলোক কেবল মাতা ও দেবী হইতে চাহে না, পুরুষের হৃদয় অধিকার করিয়া তবে তাহারা পূর্ণতা লাভ করে।

২৬/১১/১৮৮৮

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক

নব্যবঙ্গের আন্দোলন

আজকাল গবর্নমেন্টের কর্তব্য সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে যে-সকল আন্দোলন চলিতেছে তাহা দেখিয়া আশা ও আনন্দ জন্মে। কিন্তু যেখানে ভালোবাসা বেশি সেখানে আশঙ্কাও বেশি। স্বজাতির উন্নতি যদি বাস্তবিক প্রিয় এবং ঈপ্সিত হয় তবে ভাবনার কারণ সম্বন্ধে দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অন্ধভাবে কেবল আনন্দ করিয়া বেড়ানো স্বাভাবিক নহে।

যাঁহারা স্বজাতিবৎসল, তাঁহাদের কি মাঝে মাঝে সর্বদাই এরূপ আশঙ্কা উদয় হয় না, এই যে সমস্ত কাণ্ডকারখানা দেখিতেছি, এ কি সত্য না স্বপ্ন? যদি একান্ত অমূলক হয় তবে আগেভাগে তাড়াতাড়ি আনন্দ করিয়া বেড়ানো পরিণামে দ্বিগুণ লজ্জা ও বিষাদের কারণ হইবে।

ন্যাশনাল শব্দটা যখন বাংলা দেশে প্রথম প্রচার হয় তখনকার কথা মনে পড়ে। একদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া হঠাৎ দেখা গেল, চারি দিকে ন্যাশনাল পেপার, ন্যাশনাল মেলা, ন্যাশনাল সং (song), ন্যাশনাল থিয়েটার— ন্যাশনাল কুজ্ঝটিকায় দশ দিক আচ্ছন্ন।

হঠাৎ এরূপ ঘটিবার কারণ ছিল। প্রথম ইংরাজি শিখিয়া বাঙালি যুবকেরা বিকট বিজাতীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। গোরু খাওয়া তাঁহারা নৈতিক কর্তব্যস্বরূপ জ্ঞান করিতেন এবং প্রাচীন হিন্দুজাতিকে গবাদি চতুষ্পদের সহিত একশ্রেণীভুক্ত বলিয়া তাঁহাদের ভ্রম জন্মিত। ইতিমধ্যে মহাত্মা রামমোহন রায়- প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম দেশে অল্পে অল্পে মূল বিস্তার করিতে লাগিল। আমাদের দেশে যে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ বহু প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল এই জ্ঞানই স্বদেশীয় প্রাচীনকালের প্রতি শ্রদ্ধা আকর্ষণের মূল কারণ হইল। এমন সময়ে য়ুরোপেও সংস্কৃত ভাষার আদিমতা, আমাদের প্রাচীন দর্শনের গভীরতা, শকুন্তলা প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্যের মাধুর্য প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা উপস্থিত হইল। তখন হিন্দুসভ্যতার কাহিনী বিলাত হইতে জাহাজে চড়িয়া হিন্দুস্থানে আসিয়া পৌঁছিল। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ পুঁথি খুলিয়া অনুসন্ধান করিতে বসিয়া গেলেন, আমরা পুঁথি বন্ধ করিয়া ঢোল লইয়া ন্যাশনাল বোল বাজাইতে বাজাইতে ভারি খুশি হইয়া বেড়াইতে লাগিলাম। তাঁহারা বিশুদ্ধ জ্ঞানস্পৃহার বশবর্তী হইয়া সমস্ত স্বাভাবিক বাধা অতিক্রম করিয়া দুরূহ দুষ্প্রাপ্য দুর্বোধ সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে ইতিহাস উদ্ধার করিতে লাগিলেন, আর আমরা তখন হইতে এ পর্যন্ত ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসারে আমাদের শাস্ত্রালোড়নের পরিশ্রম স্বীকার করিলাম না অথচ শাস্ত্রের উপরিভাগ হইতে অহংকার-রস শোষণ করিয়া লইয়া বিপরীত মাত্রায় স্ফীত হইয়া উঠিলাম।

যে জাতি স্বদেশের প্রাচীনকাল লইয়া বহুদিন হইতে অবিশ্রাম অহংকার করিয়া আসিতেছে অথচ স্বদেশের প্রাচীনকালের যথার্থ অবস্থা সম্বন্ধে জানিবার জন্য তিলমাত্র শ্রম স্বীকার করিতে

প্রস্তুত নহে তাহাদের রচিত একটা আন্দোলন দেখিলে প্রথমেই সন্দেহ জন্মে যে, ইহার সহিত যতটুকু অহংকার-আস্ফালনের যোগ ততটুকুই তাহাদের লক্ষ্য ও অবলম্বনস্থল, প্রকৃত আত্মবিসর্জন অনেক দূরে আছে।

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'গীতসূত্রসার' নামক অতি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের এক স্থলে লিখিয়াছেন, 'ভারতীয় লোকের প্রাচীন বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও আদর আছে বটে। কিন্তু তাহা ইতিহাস-প্রিয়তাজনিত নহে, তাহা আলস্য ও নিশ্চেষ্টতার ফল।' এ কথা আমার সত্য বলিয়া বোধ হয়। মনে আছে বাল্যকালে যখন ন্যাশনাল ছিলাম তখন অর্ধজ্ঞাত ইতিহাসের অনতিস্ফুট আলোকে অহরহ প্রাচীন আর্যকীর্তি সম্বন্ধে জাগ্রতস্বপ্ন দেখিয়া চরম আনন্দ লাভ করিতাম। ইংরাজের উপর তখন আমাদের কী আক্রোশই ছিল। তাহার কারণ আছে। যখন কাহারো মনে দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, তিনি তাঁহার প্রতিবেশীর সমকক্ষ সমযোগ্য লোক, অথচ কাজকর্মে কিছুতেই তাহার প্রমাণ হইতেছে না, তখন উক্ত প্রতিবেশীর বাপান্ত না করিলে তাঁহার মন শান্তিলাভ করে না। আমরা ন্যাশনাল অবস্থায় ঘরে বসিয়া এবং সভায় দাঁড়াইয়া নিষ্ফল আক্রোশে ইংরাজ জাতির বাপান্ত করিতাম; বলিতাম, আমাদের পূর্বপুরুষ যখন ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করিতেছেন তখন ইংরাজের পূর্বপুরুষ গায়ে রঙ মাখিয়া কাঁচা মাংস খাইয়া বনে বনে নেকড়িয়া বাঘের সহিত লড়াই করিয়া বেড়াইতেছে। আবার বিদ্রূপ করিয়া এমনও বলিতাম— ডারুয়িন ইংরাজ তাই আদিম পূর্বপুরুষদিগকে বানর বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইংরাজের লালমূর্তি ও কদলীপ্রিয়তার উল্লেখপূর্বক চতুর্ভুজ জাতীয় রক্তমুখচ্ছবি জীবের সহিত তুলনা করিয়া ন্যাশনাল পাঠকদিগের মনে সবিশেষ কৌতুক উদ্দীপন করিতাম। ইংরাজি বই পড়িতাম, ইংরাজি কাগজ লিখিতাম, ইংরাজি খাদ্য একটু বিশেষ ভালোবাসিতাম, ইংরাজি জিনিসপত্র বিশেষ আদরের সহিত ব্যবহার করিতাম, মূর্তিমান ইংরাজ দেখিলে মনে বিশেষ সম্ভ্রমের উদয় হইত, অথচ তাহাতে করিয়া ইংরাজের প্রতি রাগ বাড়িত বৈ কমিত না। দেশে ডাকাতি হয় না বলিয়া আক্ষেপ করিতাম, বলিতাম, অতিশাসনে দেশ হীনবীর্য হইয়া পড়িল, আবার গ্রামের কাছাকাছি ডাকাতির সংবাদ পাইলে ইংরাজ শাসনের শৈথিল্যের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হইত।

এই ন্যাশনাল উদ্দীপনা এককালে অত্যন্ত টনটনে হইয়া উঠিয়াছিল এখন ইহা chronic ভাব ধারণ করাতে ইহার প্রকাশ্য দব্‌দবানি অনেকটা কমিয়াছে। অনেকটা সংহত হইয়া এখন ইহা Political agitation আকার ধারণ করিয়াছে।

এই আজিটেশনের মধ্যে একটা ভাব এই লক্ষ হয় যে, আমাদের নিজের কিছুই করিবার নাই, কেবল পশ্চাৎ হইতে মাঝে মাঝে গবর্নমেন্টের কোর্তা ধরিয়া যথাসাধ্য টান দেওয়া আবশ্যক। আমরা বড়ো, তবু আমাদিগকে ভারি ছোটো দেখাইতেছে, সে কেবল তোমরা চাপিয়া রাখিয়াছ বলিয়া। স্প্রিংয়ের পুতুল বাক্সর মধ্যে চাপা থাকে ডালা খুলিবামাত্র এক লম্ফে নিজমূর্তি ধারণ করে। আমাদেরও সেই অবস্থা। কিছুই করিবার নাই— তোমরা বাহির হইতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের টিপন্ দিয়া ডালা খুলিয়া দাও আমরা ক্যাঁচ্ শব্দ করিয়া গাত্রোত্থান করি।

আবার এইসঙ্গে যাঁহারা আমাদের সাহিত্যের নেতা তাঁহারা সম্প্রতি এক বিশেষ ভাব ধারণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, আমাদের মতো এমন সমাজ আর পৃথিবীতে কোথাও নাই। হিন্দু বিবাহ আধ্যাত্মিক এবং বাল্যবিবাহ ব্যতীত তাহার সেই পরম আধ্যাত্মিকতা রক্ষা হয় না, আবার একান্নবর্তী প্রথা না থাকিলে উক্ত বিবাহ টেঁকে না— এবং যেহেতুক হিন্দু বিবাহ আধ্যাত্মিক, বিধবা বিবাহ অসম্ভব, এদিকে জাতিভেদ প্রথা এই অপূর্ব আধ্যাত্মিক সমাজের শৃঙ্খলা, শ্রমবিভাগও সর্বাঙ্গীণ উন্নতির কারণ। অতএব আমাদের সমাজ একেবারে সর্বাঙ্গসম্পন্ন। য়ুরোপীয় সমাজ ইন্দ্রিয়সুখের উপরেই গঠিত, এইজন্য তাহার মধ্যে আদ্যোপান্ত উচ্ছৃঙ্খলতা। আবার বলেন, আমাদের দেশের প্রচলিত উপধর্ম মানবজাতির একমাত্র অবলম্বনীয়, উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম মানব-বুদ্ধির অতীত।

সবসুদ্ধ দাঁড়াইতেছে এই সমাজ বা ধর্ম সম্বন্ধে হাত দিবার বিষয় আমাদের কিছুই নাই। যাহা আছে সর্বাপেক্ষা ভালোই আছে এখন কেবল গবর্নমেন্ট আমাদের ডালা খুলিয়া দিলেই হয়। মাঝে একবার দিনকতক সমাজ সংস্কারের ধুয়া উঠিয়াছিল। শিক্ষিত যুবকেরা সকলেই জাতিভেদ বাল্যবিবাহ প্রভৃতির অপকারিতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দিগ্ধ ছিল। কিন্তু তথাপি কেবল দুই-চারি ঘর উৎপীড়িত সমাজবহির্ভূত ব্রাহ্ম পরিবার ছাড়া আর সর্বত্রই সমাজনিয়ম পূর্ববৎ সমানই ছিল। জড়তা এবং কর্তব্যের সংগ্রামে জড়তাই জয়লাভ করিল, অবশেষে কালক্রমে তাহার সহিত অহংকার আসিয়া যোগ দিল। মাঝে যে ঈষৎ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল তাহা দূর হইয়া বাঙালি ঠাণ্ডা হইয়া বসিল। তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসাকে যখন আবার কর্তব্য বলিয়া স্থির করি তখন যেমন নিরনুতাপ আরাম ও নিঃস্বপ্ন নিদ্রার সুযোগ এমন অন্য সময়ে নহে। আমরা প্রাচীন দেশাচারকে স্ফীত তাকিয়ার মতো বানাইয়া লইয়া পশ্চাতের দিকে সমস্ত স্থূল শরীরটিকে হেলান দিয়া রাখিয়াছি— সম্মুখে অগ্রসর হওয়াই একটা গুরুতর অন্যায় বলিয়া জ্ঞান করিতেছি— কেবল মাঝে মাঝে পাশ ফিরিয়া গবর্নমেন্টকে ডাকিয়া বলিতেছি, 'বাবা, এই খাটসুদ্ধ তাকিয়াসুদ্ধ তুলিয়া তোমাদের বিলাতের বানানো একটা কলের গাড়িতে তুলিয়া দাও আমি ভোঁ হইয়া উন্নতির টর্মিনসে গিয়া পৌঁছিব।'

নব্যবঙ্গেরা প্রথম অবস্থায় গোরু খাইত এবং মনে করিত, এই সহজ উপায়ে ইংরাজ হইতে পারিবে। দ্বিতীয় অবস্থায় আবিষ্কার করিল পূর্বপুরুষেরাও গোরু খাইতেন অতএব তাঁহারা য়ুরোপীয় অপেক্ষা সভ্যতায় ন্যূন ছিলেন না, সুতরাং আমরা ইংরাজের চেয়ে কম নহি। সম্প্রতি তৃতীয় অবস্থায় গোবর খাইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং মনে মনে ইংরাজকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। বৈজ্ঞানিক যুক্তির সহিত প্রমাণ হইয়া গেছে, গোরুর চেয়ে গোবরে ঢের বেশি আধ্যাত্মিকতা আছে; সমস্ত মাথাটার মধ্যে কিছুই নাই থাকুক শুদ্ধ পশ্চাদ্দিকে টিকিটুকুর ডগায় আধ্যাত্মিকতা গলায় ফাঁস লাগাইয়া ঝুলিতে থাকে। পূর্বে যখন দেশে বড়ো বড়ো বনেদি টিকির ছিল তখন সে ছিল ভালো। আজকাল শিক্ষিত লোকদের মাথার পিছনে যে ক্ষুদ্রকায় হঠাৎ-টিকির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে তাহা হইতে কেবল একটা অনাবশ্যক অস্বাভাবিক কৃত্রিম দাম্ভিকতা উৎপন্ন হইতেছে।

যদি কোনো দুঃসাহসিক ব্যক্তি এমন কথা বলেন যে, কেবল গবর্নমেন্টকে ডাকাডাকি না করিয়া আমাদের নিজের হাতেও কিছু কাজ করা আবশ্যক তাহা হইলে সে কথাটা তাড়াতাড়ি চাপা দিতে ইচ্ছা করে। তাহার প্রধান কারণ আমার এই মনে হয় যে, কী কী উপায়ে আমাদের দেশের অভাববিশেষ নিরাকৃত হইতে পারে তাহা নির্ধারণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে— কম কাজ করিয়া বেশি করিতেছি দেখানোই উদ্দেশ্য। তা ছাড়া আমাদের যে কিছু দোষ আছে, আমাদের যে কোনো বিষয়ে চেষ্টা করিয়া যোগ্য হওয়া আবশ্যক এ কথা আমরা সহ্য করিতে পারি না। মনে হয় ওরকম কথা Patriotic নহে। মনে হয় ও কথা সত্য হইলেও বলা উচিত নহে, কারণ তাহা হইলে গবর্নমেন্ট সচেতন হইয়া উঠিবে। অতএব নিদেন Policy-র জন্য বলা আবশ্যক আমাদের যাহা হইবার তাহা বেবাক হইয়া গেছে, এখন তোমাদের পালা। আমরা সকলেই সকল বিষয়ের জন্য যোগ্য, এখন তোমরা যোগ্যের সহিত যোগ্যকে যোজনা করো। আমি নিজের কথা আলোচনা করিয়া এবং আমার অভিজ্ঞতার প্রতি নির্ভর করিয়া বলিতে পারি, আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই আছেন যাঁহারা আমাদের রাজ্যশাসনতন্ত্র এবং Representative Government-এর মূল নিয়ম এবং আমাদের দেশে বর্তমানকালে তাহার উপযোগিতা ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু অবগত আছেন অথবা প্রকৃত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া তদ্‌বিষয়ে কিছু জানিতে অভিলাষী আছেন। কিন্তু আমরা সকলেই জানি রাজ্যশাসনের আমরা যোগ্য, Representative Government লাভে আমরা অধিকারী। কথাগুলা উচ্চারণ করিতে পারিলেই যে প্রকৃত বস্তুতে অধিকার জন্মে তাহা নহে। অন্য দেশের লোকেরা যাহা প্রাণপণ চেষ্টায়, স্বাভাবিক মহত্ত্ব ও প্রবল বীরত্বের প্রভাবে আবিষ্কার ও উপার্জন করিয়াছে, আমরা তাহা কানে

শুনিয়াই আপনাদিগকে অধিকারী জ্ঞান করিতেছি। শিক্ষা করিবার পরিশ্রমটুকুও স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। যদি গবর্নমেন্ট এমন একটা নিয়মজারী করিতেন যে, আমাদের দেশের শাসনতন্ত্র এবং Representative Government-এর সম্বন্ধে একটা বিশেষ পরীক্ষায় আপনার সম্পূর্ণ জ্ঞান প্রকাশ না করিলে সে বিষয়ে কাহাকেও কথা কহিতে দিবেন না, তাহা হইলে বোধ করি কথাবার্তা এক প্রকার বন্ধ হয়। আমাদের চরিত্রে আমাদের জীবনে আমরা যোগ্যতা লাভ করিব না, পরিশ্রম করিয়া কতকগুলি fact শিক্ষা তাহাও করিব না। দেশের যে-সকল অভাব মোচন অধিক পরিমাণে আমাদের নিজের সাধ্যায়ত্ত তাহাতেও হস্তক্ষেপ করিব না, অথচ কোন্ মুখে বলিব, আমরা আন্তরিক নিষ্ঠার সহিত Political agitation-এ যোগ দিয়াছি?[১]

এ-সকল agitation-এর উপর যে সাধারণ লোকের বিশেষ বিশ্বাস আছে তাহাও দেখিতে পাই না। এ-সকল বিষয়ে কেহ ঝট করিয়া টাকা দিতে চাহে না, বলে— ও কতদিন টিকিবে! আর তাহা ছাড়া আমাদের দেশে এক প্রবাদ প্রচলিত আছে— কোম্পানিকা মাল দরিয়ামে ডাল্! সাধারণ কার্যে টাকা দিয়া লোকের বিশ্বাস হয় না যে, সে টাকার যথোপযুক্ত সদ্‌ব্যয় হইবে। মনে করে পাঁচজনের টাকা গোলেমালে দশজনের ট্যাঁকে অদৃশ্য হইয়া যাইবে অথবা এমন এলোমেলোভাবে খরচ হইবে যে, সমস্তটাই ন দেবায় ন ধর্মায় হইবে। আমরা বলি 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না' অর্থাৎ মাকে গঙ্গাযাত্রা করানো এক বিষম লেঠা, নিতান্ত কেহ না থাকিলে কাজেই কায়ক্লেশে নিজেকে ভার লইতে হয় কিন্তু যখন আরও পাঁচটা ভাই আছে, তখন আর কে ওঠে! আমরা আমাদের জাতভাইকে এমন চিনি যে কাহারো বিশ্বাস হয় না যে, সাধারণের কাজ সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হইতে পারে। এমন-কি, বাণিজ্যে যাহাতে সকলেরই স্বার্থ আছে তাহাতেও আমরা পাঁচজনে মিলিয়া লাগিতে পারি না। একে তো পরস্পরকে অবিশ্বাস করিব অথচ নিজেও কাজ করিব না। কাহারো সততা এবং সত্যনিষ্ঠার উপর বিশ্বাস নাই। গোড়াতেই মনে হয় সমস্তটা ফাঁকি একটা হুজুক মাত্র।

ইহার কারণ আমাদের জাতীয় চরিত্রের মধ্যে নিহিত। আমরা সত্যপরায়ণ নহি সুতরাং কোনো কাজেই পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। বিশ্বাস ব্যতীত কোনো কাজই হয় না, আবার বিশ্বাসযোগ্য না হইলে বিশ্বাস করা যায় না। অতএব গোড়ায় দরকার চরিত্র গঠন। জাতির মধ্যে উদ্যম, সত্যপরতা, আত্মনির্ভর, সৎসাহস না থাকিলে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া রেপ্রেজেন্টেটিব গবর্নমেন্ট ভিক্ষা চাহিতে বসা বিড়ম্বনা। আমার মনে হয়, আমাদের দেশের

---

১. লেখক আমাদের এখনকার পলিটিক্যাল আন্দোলন যেরূপ অসার মনে করেন একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখিবেন তাহা নহে। এই আন্দোলনের মধ্যেই— কাজ করিবার একটি ইচ্ছা জাতীয় মহত্ত্ব লাভের দিকে অগ্রসর হইবার একটি উদ্যম প্রকাশ পাইতেছে, তবে লেখক একদিনেই যদি আমাদের শত শত বৎসরের অবনতির বিনাশ দেখিতে চান তাহা কী করিয়া পাইবেন? লেখক বলিয়াছেন, 'আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই আছেন যাঁহারা আমাদের রাজ্যশাসনতন্ত্র এবং Representative Government-এর মূল নিয়ম এবং আমাদের দেশে বর্তমানকালে তাহার উপযোগিতা ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু অবগত আছেন অথবা প্রকৃত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া তদ্‌বিষয়ে কিছু জানিতে অভিলাষী আছেন।' অবশ্য দেশের অধিকাংশ লোক যদি যোগ্য হইত তাহা হইলে তো সমস্ত গোল চুকিয়া যাইত, এরূপ পলিটিক্যাল আন্দোলনেরই বা তাহা হইলে আবশ্যক কোথা? কিন্তু আমাদের দেশ কোন্ ছার কথা য়ুরোপের কোনো দেশেই কি অধিকাংশ লোকে রাজ্যশাসনতন্ত্রের মর্মগত নিয়ম বিচার করিয়া কাজ করে? এরূপ স্থলে সর্বত্রই নেতাগণ প্রধান, তাহাদের প্রাণগত চেষ্টা, মহত্ত্বই জাতীয় উন্নতির কারণ। আমাদিগের পলিটিক্যাল নেতাগণের সকলে না হউন যখন অনেকেই তাঁহাদের উদ্দেশ্যসাধনে প্রাণগত চেষ্টা করিতেছেন, তখন কি এই আন্দোলনকে আমরা সারশূন্য বলিতে পারি? চরিত্র মাহাত্ম্য নহিলে কোনো উন্নতি হয় না সত্য, কিন্তু ইহার দিকে আমাদের যে লক্ষ পড়িয়াছে— তাহার উজ্জ্বলরূপ অনেক প্রমাণ দেখা যাইতেছে, তাহা ছাড়া লেখকের বর্তমান প্রবন্ধই তাহার একটি প্রমাণ।—ভারতী-সম্পাদক।

লোকদের ডাকিয়া ক্রমাগত এই কথা বলা আবশ্যক যে, ইংরেজ গবর্নমেন্ট প্রসাদে সুশাসন প্রভৃতি যে-সকল ভালো জিনিস পাইয়াছি, কোনো জাতি সেগুলি পড়িয়া পায় নাই, তাহার জন্য বিস্তর যোঝাযুঝি, সংযম, আত্মশিক্ষা, ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে। আমরা যে-সকল অধিকার অনায়াসে অযাচিতভাবে পাইয়াছি, তাহার জন্য গবর্নমেন্টকে ধন্যবাদ দিয়া প্রাণপণে যেন তাহার যোগ্য হইবার চেষ্টা করি— কারণ পড়িয়া পাওয়াকে পাওয়া বলে না, কেননা তাহার স্থায়িত্ব নাই, তাহাতে কেবল নিশ্চিন্ত বা নিশ্চেষ্টভাবে সুখে থাকা যায় মাত্র কিন্তু তাহাতে জাতীয় চরিত্রের বিশেষ উন্নতি হয় না। আমরা যে সুখ পাইতেছি আমরা তাহার যোগ্য নহি, আমরা যে দুঃখ পাইতেছি সে কেবল আমাদের নিজের দোষে। এ কথা শুনিলে লোকে অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া উঠিবে না— এ কথা কেবলমাত্র জয়ধ্বজায় লিখিয়া উড়াইয়া বেড়াইবার কথা নহে, এ কথার অর্থ নিজে কাজ করো, ধৈর্যসহকারে শিক্ষা লাভ করো, বিনয়ের সহিত গভীর লজ্জার সহিত আপনার দোষ ও অযোগ্যতা স্বীকার করিয়া তাহা আপন যত্নে দূর করিবার চেষ্টা করো, যাঁহাদের কাছে সহস্র বিষয়ে ঋণী আছ তাঁহাদের ঋণ স্বীকার করো, সে ঋণ ধীরে ধীরে শোধ করো। আমাদের লোকের একটি যে দোষ আছে ভিক্ষাকে আমরা হক্‌ মনে করি, পরের উপার্জনের উপর অতি অসংকোচে আপনার ভাগ বসাই, আবার তাহাতে সামান্য ত্রুটি হইলে চোখ রাঙাইয়া উঠি এই প্রকৃতিগত অভ্যাস যেন ত্যাগ করি। কেবল অলসভাবে পড়িয়া পড়িয়া পরের কর্তব্য সমালোচনা করিয়া নিজের কর্তব্য ভুলিয়া না যাই। গবর্নমেন্টের 'আহ্লাদে ছেলেটি'র মতো কেবল সকল বিষয়েই আবদার করিব এবং নিজের দোষ স্মরণ করাইয়া দিলেই অমনি ফুলিয়া দাপাইয়া কাঁদিয়া-কাটিয়া মাথা খুঁড়িয়া কুরুক্ষেত্র করিয়া দিব এই ভাবটি ত্যাগ করি। আজকাল যে কাণ্ড চলিতেছে তাহাতে ইহার উল্টা ভাবটাই আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে যে, গবর্নমেন্ট সহস্র বিষয়ে অপরাধী এবং আমাদের কোনো অপরাধ নাই— অলস এবং অহংকারী লোকদের মন হইতে এ ভাবটা দূর করাই একান্ত চেষ্টাসাধ্য, এ ভাব মুদ্রিত করিবার জন্য বিশেষ আয়োজনের অপেক্ষা করে না।

ভারতী ও বালক

ভাদ্র ও আশ্বিন ১২৯৬

ইতিহাস

ঝান্সীর রানী

আমরা এক দিন মনে করিয়াছিলাম যে, সহস্রবর্ষব্যাপী দাসত্বের নিপীড়নে রাজপুতদিগের বীর্য-বহ্নি নিভিয়া গিয়াছে ও মহারাষ্ট্রীয়েরা তাহাদের দেশানুরাগ ও রণকৌশল ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে দিন বিদ্রোহের ঝটিকার মধ্যে দেখিয়াছি কত বীরপুরুষ উৎসাহে প্রজ্বলিত হইয়া স্বকার্য-সাধনের জন্য সেই গোলমালের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে যুঝাযুঝি করিয়া বেড়াইয়াছেন। তখন বুঝিলাম যে, বিশেষ বিশেষ জাতির মধ্যে যে-সকল গুণ নিদ্রিতভাবে অবস্থিতি করে, এক- একটা বিপ্লবে সেই-সকল গুণ জাগ্রত হইয়া উঠে। সিপাহি যুদ্ধের সময় অনেক রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয় বীর তাঁহাদের বীর্য অযথা পথে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, এ কথা স্বীকার করিলেও মানিতে হইবে যে, তাঁহারা যথার্থ বীর ছিলেন। তাঁতিয়া টোপী ও কুমারসিংহ ক্ষুদ্র দুইটি বিদ্রোহী মাত্র নহেন, ইতিহাস লিখিতে হইলে পৃথিবীর মহা মহা বীরের নামের পার্শ্বে তাঁহাদের নাম লিখা উচিত; যে অশীতিবর্ষীয় অশ্বারোহী কুমারসিংহ লোলভ্রূ রজ্জুতে বাঁধিয়া হস্তে কৃপাণ লইয়া হাইলন্ডের সৈন্যদলকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন, যে তাঁতিয়া টোপী কতকগুলি বিক্ষিপ্ত সৈন্যদল লইয়া যথোচিত অস্ত্র নাই, আহার নাই, অর্থ নাই, অথচ ভারতবর্ষে বিদেশীয় শাসন বিচলিতপ্রায় করিয়াছিলেন, যদিও তাঁহাদের কার্য লইয়া গৌরব করিবার আমদিগের অধিকার নাই তথাপি তাঁহাদের বীর্যের, উদ্যমের, জ্বলন্ত উৎসাহের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু ভারতবর্ষের কী দুর্ভাগ্য, এমন সকল বীরেরও জীবনী বিদেশীয়দের পক্ষপাতী ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে সংগ্রহ করিতে হয়।

সিপাহি যুদ্ধের সময় রাসেল টাইম্স্ পত্রে লিখেন যে, 'তাঁতিয়া টোপী মধ্য ভারতবর্ষকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন; বড়ো বড়ো থানা ও ধনাগার লুঠ করিয়াছেন, অস্ত্রাগার শূন্য করিয়াছেন, বিক্ষিপ্ত সৈন্যদল সংগ্রহ করিয়াছেন, বিপক্ষ সৈন্য বলপূর্বক তাঁহার সমুদয় অপহরণ করিয়া লইয়াছে, আবার যুদ্ধ করিয়াছেন, পরাজিত হইয়াছেন, পুনরায় ভারতবর্ষীয় রাজাদিগের নিকট হইতে কামান লইয়া যুদ্ধ করিয়াছেন, বিপক্ষ সৈন্যেরা পুনরায় তাহা অপহরণ করিয়া লইয়াছে, আবার সংগ্রহ করিয়াছেন, আবার হারাইয়াছেন। তাঁহার গতি বিদ্যুতের ন্যায় দ্রুত। সপ্তাহ ধরিয়া তিনি প্রত্যহ ২০/২৫ ক্রোশ ভ্রমণ করিয়াছেন, নর্মদা এপার হইতে ওপার, ওপার হইতে এপার ক্রমাগত পার হইয়াছেন। তিনি কখনো আমাদের সৈন্যশ্রেণীর মধ্য দিয়া, কখনো পার্শ্ব দিয়া, কখনো সম্মুখ দিয়া, সৈন্য লইয়া গিয়াছেন। পর্বতের উপর দিয়া, নদী অতিক্রম করিয়া, শৈলপথে, উপত্যকায় জলার মধ্য দিয়া, কখনো সম্মুখে, কখনো পশ্চাতে, কখনো পার্শ্বে, কখনো তির্যকভাবে চলিয়াছেন। ডাকগাড়ির উপর পড়িয়া, চিঠি অপহরণ করিয়া, গ্রাম লুঠিয়া কখনো বা সৈন্য চালনা করিতেছেন, কখনো বা পরাজিত হইয়া পলাইতেছেন, অথচ কেহ তাঁহাকে ধরিতে ছুঁইতে পারিতেছে না।' এই অসামান্য বীর যখন পারোনের জঙ্গলের মধ্যে ঘুমাইতেছিলেন, তখন মানসিংহ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিয়াছিল। গুরুভার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া, সৈনিক-বিচারালয়ে আহূত হইয়া তিনি ফাঁসি কাষ্ঠে আরোহণ করিলেন। মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার প্রকৃতি নির্ভীক ও প্রশান্ত ছিল। তিনি বিচারের প্রার্থনা করেন নাই, তিনি বলিয়াছিলেন যে, 'আমি ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের হস্তে মৃত্যু ভিন্ন অন্য কিছুই আশা করি না। কেবল এইমাত্র প্রার্থনা যে, আমার প্রাণ-দণ্ড যেন শীঘ্রই সমাধা হয়, ও আমার জন্য যেন আমার নির্দোষী বন্দী পরিবারেরা কষ্ট ভোগ না করে।'

ইংরাজেরা যদি স্বার্থপর বণিক জাতি না হইতেন, যদি বীরত্বের প্রতি তাঁহাদের অকপট ভক্তি থাকিত, তবে হতভাগ্য বীরের এরূপ বন্দীভাবে অপরাধীর ন্যায় অপমানিত হইয়া মরিতে হইত

না, তাহা হইলে তাঁহার প্রস্তর-মূর্তি এত দিনে ইংলন্ডের চিত্রশালায় শ্রদ্ধার সহিত রক্ষিত হইত। যে ঔদার্যের সহিত আলেক্জান্ডার পুরুরাজের ক্ষত্রিয়োচিত স্পর্ধা মার্জনা করিয়াছিলেন, সেই ঔদার্যের সহিত তাঁতিয়া টোপীকে ক্ষমা করিলে কি সভ্যতাভিমানী ইংরাজ জাতির পক্ষে আরও গৌরবের বিষয় হইত না? যাহা হউক ইংরাজেরা এই অসামান্য ভারতবর্ষীয় বীরের শোণিতে প্রতিহিংসারূপ পশু-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিলেন।

আমরা সিপাহি যুদ্ধ সময়ের আরও অনেক বীরের নামোল্লেখ করিতে পারি, যাঁহারা ইউরোপে জন্মগ্রহণ করিলে, ইতিহাসের পৃষ্ঠায়, কবির সংগীতে, প্রস্তরের প্রতিমূর্তিতে, অভ্রভেদী স্মরণস্তম্ভে অমর হইয়া থাকিতেন। বৈদেশিকদের লিখিত ইতিহাসের একপ্রান্তে তাহাদের জীবনীর দুই-এক ছত্র অনাদরে লিখিত রহিয়াছে, ক্রমে ক্রমে কালের স্রোতে তাহাও ধৌত হইয়া যাইবে এবং আমাদের ভবিষ্যবংশীয়দের নিকট তাঁহাদের নাম পর্যন্ত অজ্ঞাত থাকিবে।

শঙ্করপুরের রাণা বেণীমাধু লর্ড ক্লাইভের আগমনে নিজ দুর্গ পরিত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার ধন সম্পত্তি অনুচরবর্গ কামান ও অন্তঃপুরচারিণী স্ত্রীলোকদিগকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যার বেগম ও বির্জিস্ কাদেরের সহিত যোগ দিলেন। তিনি তাঁহাদিগকেই আপনার অধিপতি বলিয়া জানিতেন, এই নিমিত্ত তাঁহাদিগকে রাজার ন্যায় মান্য করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট তাঁহাকে তাঁহার রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে চাহিলেন, তাঁহাকে মৃত্যু-দণ্ড হইতে অব্যাহতি দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন, তাঁহার ক্ষতিপূরণ করিতে প্রস্তুত হইলেন এবং তাঁহার কষ্টের কারণ অনুসন্ধান করিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু রাজা সমুদয় প্রস্তাব তুচ্ছ করিয়া বেগম ও তাঁহার পুত্রের জন্য টেরাই প্রদেশে আশ্রয়হীন ও রাজ্যহীন হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বেণীমাধু জীবনের বিনিময়েও তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন নাই এবং ইংরাজদের হস্তে কোনো মতে আত্মসমর্পণ করেন নাই। রাজপুত বীর নহিলে আপনার প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য কয়জন লোক এরূপ ত্যাগস্বীকার করিতে পারে?

রয়ার রাজপুত অধিপতি, নৃপৎসিং খঞ্জ ছিলেন। তিনি যুদ্ধের সময় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, 'ঈশ্বর আমার একটি অঙ্গ লইয়াছেন, অবশিষ্ট অঙ্গগুলি আমার দেশের জন্য দান করিব।'

কিন্তু আমরা সর্বাপেক্ষা বীরাঙ্গনা ঝান্সীর রানী লক্ষ্মীবাইকে ভক্তিপূর্বক নমস্কার করি। তাঁহার যথার্থ ও বিস্তারিত ইতিহাস পাওয়া দুষ্কর, অনুসন্ধান করিয়া যাহা পাওয়া গেল তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠকদিগকে উপহার দিলাম।

লর্ড ড্যালহৌসি ঝান্সী রাজ্য ইংরাজশাসনভুক্ত করিলেন, এবং ঝান্সীর রানী লক্ষ্মীবাইয়ের জন্য অনুগ্রহ করিয়া উপজীবিকাস্বরূপ যৎসামান্য বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া দিলেন। এই স্বল্প বৃত্তি রানীর সম্ভ্রম-রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না, এই নিমিত্ত তিনি প্রথমে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন, অবশেষে অগত্যা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইল। কিন্তু ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়েরা ইহাতেই ক্ষান্ত হইলেন না, লক্ষ্মীবাইয়ের মৃত স্বামীর যাহা-কিছু ঋণ ছিল তাহা রানীর জীবিকা হইতে পরিশোধ করিতে লাগিলেন। রানী ইহাতে আপত্তি করিলেন, কিন্তু তাহা গ্রাহ্য হইল না। ইংরাজেরা তাঁহার রাজ্যে গো-হত্যা আরম্ভ করিল, ইহাতে রাজ্ঞী ও নগরবাসীরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া ইহার বিরুদ্ধে আবেদন করিল কিন্তু তাহাও গ্রাহ্য হইল না।

এইরূপে রাজ্যহীনা, সম্পত্তিহীনা, অভিমানিনী রাজ্ঞী নিষ্ঠুর অপমানে মনে মনে প্রতিহিংসার অগ্নি পোষণ করিতে লাগিলেন এবং যেমন শুনিলেন কোম্পানির সৈনিকেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে, অমনি তাঁহার অপমানের প্রতিশোধ দিবার জন্য সুকুমার দেহ রণসজ্জায় সজ্জিত করিলেন। লক্ষ্মীবাই অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসরের কিছু অধিক, তাঁহার দেহ যেমন বলিষ্ঠ মনও তেমনি দৃঢ় ছিল।

রাজ্ঞী অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। রাজ্যপালনের জটিল ব্যাপার সকল অতিসুন্দররূপে

বুঝিতেন। ইংরাজ কর্মচারীগণ তাঁহাদের জাতিগত স্বভাব অনুসারে এই হৃতরাজ্য-রাজ্ঞীর চরিত্রে নানাবিধ কলঙ্ক আরোপ করিলেন, কিন্তু এখনকার ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেন যে, তাহার এক বর্ণ সত্য নহে।

ঝান্সী নগরী অতিশয় পরিপাটী পরিচ্ছন্ন, উহা দৃঢ় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত, এবং বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের কুঞ্জ ও সরোবরে-সেই সকল প্রাচীরের চতুর্দিকে সুশোভিত ছিল। একটি উচ্চ শৈলের উপর দৃঢ়-দুর্গ-বদ্ধ রাজপ্রাসাদ দাঁড়াইয়া আছে। নগরীতে বাণিজ্য-ব্যবসায়ের প্রাদুর্ভাব ছিল বলিয়া অনেক ইংরাজ অধিবাসী সেখানে বাস করিত। কাপ্তেন ডান্‌লপের হস্তে ঝান্সী নগরীর রক্ষাভার ছিল। ভারতবর্ষে যখন বিদ্রোহ জ্বলিয়া উঠিয়াছে তখন ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাকে সতর্ক হইতে পরামর্শ দেন, কিন্তু ঝান্সীর শান্ত অবস্থা দেখিয়া তিনি তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন।

এই প্রশান্ত ঝান্‌সিরাজ্যে বিধবা রাজ্ঞী ও তাঁহার ভৃত্যবর্গের উত্তেজনায় ভিতরে ভিতরে একটি বিষম বিপ্লব ধূমায়িত হইতেছিল। সহসা একদিন স্তব্ধ আগ্নেয়গিরির ন্যায় নীরব ঝান্‌সি নগরীর মর্মস্থল হইতে বিদ্রোহের অগ্নিস্রাব উদ্‌গীরিত হইল।

প্রকাশ্য দিবালোকে কান্টনমেন্টের মধ্যে দুইটি ডাকবাঙলা বিদ্রোহীরা দগ্ধ করিয়া ফেলিল, যেখানে বারুদ ও ধনাগার রক্ষিত ছিল, সেখান হইতে বিদ্রোহীদিগের বন্দুক-ধ্বনি শ্রুত হইল, এক দল সিপাহি ওই দুর্গ অধিকার করিয়াছে, তাহারা উহা কোনো মতে প্রত্যর্পণ করিতে চাহিল না। ইউরোপীয়েরা আপনাপন পরিবার ও সম্পত্তি লইয়া নগরী-দুর্গে আশ্রয় লইল। ক্রমে ক্রমে সৈন্যেরা স্পষ্ট বিদ্রোহী হইয়া অধিকাংশ ইংরাজ সেনানায়কদিগকে নিহত করিল। বিদ্রোহীগণ দুর্গে উপস্থিত হইল।

ক্যাপটেন ডান্‌লপ হিন্দু সৈন্যদিগকে নিরস্ত্র করিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু তাহারা সেইখানেই তাঁহাকে বন্দুকে হত করিল। দুর্গস্থ সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মধ্যাহ্নে বিদ্রোহী-সৈন্যেরা দুর্গের নিম্নঅংশ অধিকার করিয়া লইল। পরাজিত ইংরাজ সেনারা বিদ্রোহী সেনাদের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিল, কিন্তু উন্মত্ত সৈন্যেরা তাহাদিগকে নিহত করিল। এই নিধন কার্যে রাজ্ঞীর কোনো হস্ত ছিল না, এমন-কি, এ সময়ে রাজ্ঞীর কোনো অনুচরও উপস্থিত ছিল না। যখন রাজ্যে একটিও ইংরাজ অবশিষ্ট রহিল না তখন রাজ্ঞী এই অন্যায়কারীদিগকেও রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। এক্ষণে কথা উঠিল, কে রাজ্য অধিকার করিবে? রাজ্ঞী সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন; সদাশিব রাও নামে একজন ওই রাজ্যের প্রার্থী কুরারা দুর্গ অধিকার করিল। পরে রাজ্ঞীর সৈন্য-কর্তৃক তাড়িত হইয়া সিন্ধিয়া-রাজ্যে পলায়ন করিল। এইরূপে ইংরাজেরা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হত ও তাড়িত হইলে পর ১৮৫৭ খৃ. অব্দে লক্ষ্মীবাই হৃত-সিংহাসনে পুনরায় আরোহণ করিলেন। কিছুকাল রাজত্ব করিয়া লক্ষ্মীবাই ১৮৫৮ খৃস্টাব্দে পুনরায় ইংরাজ সৈন্যদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইংরাজ সেনানায়ক সার হিউ রোজ সৈন্যদল সমভিব্যাহারে ঝান্‌সী নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রস্তরময় নগর-প্রাচীরে ব্রিটিশ কামান গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিল। দুর্গস্থ লোকেরা আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। পুরমহিলাগণ দুর্গ-প্রাকার হইতে কামান ছুড়িতে আরম্ভ করিল এবং সৈন্যদের খাদ্যাদি বণ্টন করিতে লাগিল, এবং সশস্ত্র ফকিরগণ নিশান হস্তে লইয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

৩১ মার্চ রানী দেখিলেন, তাঁতিয়া টোপী ও বানপুরের রাজা অল্পসংখ্যক সৈন্যদল লইয়া ইংরাজ-শিবির-পার্শ্বে নিবেশ স্থাপন করিয়া সংকেত-অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিয়াছেন। হর্ষধ্বনি ও তোপের শব্দে ঝান্‌সীদুর্গ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তাহার পর দিন ইংরাজ সৈন্যদের সহিত তাঁতিয়া টোপীর ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল, এই যুদ্ধে তাঁতিয়া টোপীর ১৫০০ সৈন্য হত হইল এবং তিনি পরাজিত হইয়া বেটোয়ার পরপারে পলায়ন করিলেন।

যুদ্ধে প্রত্যহ রাজ্ঞীর ৫০/৬০ জন করিয়া লোক মরিতে লাগিল। তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট

কামানগুলির মুখ বন্ধ করা হইয়াছে এবং ভালো ভালো গোলন্দাজেরা হত হইয়াছে।

ক্রমে ইংরাজ সৈন্যেরা গোলার আঘাতে নগর প্রাচীর ভেদ করিল এবং প্রাসাদ ও নগরীর প্রধান প্রধান অংশ অধিকার করিল। প্রাসাদের মধ্যে ঘোরতর সম্মুখযুদ্ধ বাধিল। রানীর শরীর-রক্ষকদের মধ্যে ৪০ জন অশ্বশালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। আহত সৈন্যেরা মুমূর্ষু অবস্থাতেও ভূতলে পড়িয়া অস্ত্র চালনা করিতে লাগিল। একে একে ৩৯ জন হত হইলে অবশিষ্ট এক জন বারুদে আগুন লাগাইয়া দিল, আপনি উড়িয়া গেল ও অনেক ইংরাজ সৈন্যও সেইসঙ্গে হত হইল।

রাত্রেই রাজ্ঞী কতকগুলি অনুচরের সহিত দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, শত্রুরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছিল এবং আর একটু হইলেই তাঁহাকে ধরিতে সক্ষম হইত। লেপ্টনেন্ট বাউকর অশ্বারোহী সৈন্যদলের সহিত ঝান্‌সী হইতে দশ ক্রোশ পর্যন্ত রাজ্ঞীর অনুসরণ করিয়াছিলেন। অবশেষে দেখিলেন অশ্বারোহী লক্ষ্মীবাই চারি জন অনুচরের সহিত গমন করিতেছেন। বহুসৈন্যবেষ্টিত বাউকর এই চারি জন অশ্বারোহী-কর্তৃক এমন আহত হইলেন যে, আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। এই সময়ে তাঁতিয়া টোপী কতকগুলি সৈন্য লইয়া রানীর রক্ষক হইলেন।

৪ এপ্রিলে ইংরাজরা সমস্ত ঝান্‌সী নগরী অধিকার করিয়া লইল। সৈনিকেরা নগরে দারুণ হত্যা আরম্ভ করিল, কিন্তু নগরবাসীরা কিছুতেই নত হইল না। পাঁচ সহস্রের অধিক লোক ব্রিটিশ বেয়নেটে বিদ্ধ হইয়া নিহত হইল। নগরবাসীরা শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করা অপমান ভাবিয়া স্বহস্তে মরিতে লাগিল। অসভ্য ইংরাজ সৈনিকেরা স্ত্রীলোকদের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচার করিবে জানিয়া পৌরজনেরা স্বহস্তে স্ত্রী-কন্যাগণকে বিনষ্ট করিয়া মরিতে লাগিল।

রাও সাহেব পেশোয়া বংশের শেষ বাজিরাওয়ের দ্বিতীয় পোষ্য পুত্র। তিনি, তাঁতিয়া টোপী ও ঝান্‌সীরানী বিক্ষিপ্ত সৈন্যদল সংগ্রহ করিয়া ব্রিটিশদিগকে প্রতিরোধ করিবার জন্য কুঞ্চ নগরে সৈন্য স্থাপন করিলেন। অবিরল কামান বর্ষণ করিয়া হিউ রোজ তাঁহাদের তাড়াইয়া দিল। চারিক্রোশ রানীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়না করিয়া সেনাপতি চারিবার ঘোড়ার উপর হইতে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

অবশেষে লক্ষ্মীবাই কাল্পীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার এই শেষ অস্ত্রাগার রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিলেন। মনে করিয়াছিলেন রাজপুতেরা যোগ দিবে, কিন্তু তাহারা দিল না। ব্রিটিশ সৈন্যেরা একত্র হইয়া আক্রমণ করিল, অদৃঢ়দুর্গ কাল্পীতে রাজ্ঞীর সৈন্য আর তিষ্ঠিতে পারিল না।

কুঞ্চের পরাজয়ের পর তাঁতিয়া টোপী যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন কেহ জানিতে পারিল না। তিনি এখন গোয়ালিয়রের বাজারে প্রচ্ছন্নভাবে ইংরাজদের মিত্ররাজা সিন্ধিয়াকে সিংহাসনচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। তাঁতিয়া টোপী অধিবাসীদিগকে উত্তেজিত করিতে অনেকটা কৃতকার্য হইলে পর রাজ্ঞীকে সংবাদ দিলেন। রাজ্ঞী গোপালপুর হইতে রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহারা রাজার সহিত শত্রুতা করিতে যাইতেছেন না, তবে কিছু অর্থ ও খাদ্যাদি পাইলেই তাঁহারা দক্ষিণে চলিয়া যাইবেন, রাজা তাহাদের যেন বাধা না দেন, কারণ বাধা দেওয়া অনর্থক। গোয়ালিয়রের লোকেরা ইংরাজ-বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়াছে। তাঁহারা তাহাদের নিকট হইতে দুইশত আহ্বান-পত্র পাইয়াছেন। কিন্তু ইংরাজভক্ত সিন্ধিয়া তাহাতে অসম্মত হইলেন।

রাও ও রানী দৃঢ়স্বরে তাঁহাদের অনুচরদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'আমরা বোধ হয় নাগরিকদের নিকট হইতে কোনো বাধা প্রাপ্ত হইব না, যদি বা পাই তবে তোমাদের ইচ্ছা হয় তো পলাইয়ো, কিন্তু আমরা মরিতে প্রস্তুত হইয়াছি।'

১ জুনে সিন্ধিয়া ৮০০০ লোক ও ২৪টি কামান লইয়া বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে তাঁহার সৈন্যদল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। সিন্ধিয়া তাঁহার শরীর-রক্ষকদিগকে

যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইলেন কিন্তু তাহারা হত ও আহত হইল। সিন্ধিয়া অশ্বারোহণে আগ্রার দিকে পলায়ন করিলেন। মহারানীর মাতা 'গুজ্জারাজা' সিন্ধিয়া বিদ্রোহীদের হস্তে বন্দী হইয়াছেন মনে করিয়া, কৃপাণ লইয়া অশ্বারোহণে তাঁহাকে মুক্ত করিতে গেলেন; অবশেষে সিন্ধিয়া পলায়ন করিয়াছেন শুনিয়া নিবৃত্ত হইলেন। ঝান্সীরাজ্ঞীর সৈন্যগণ সিন্ধিয়ার রাজকোষ হস্তগত করিল, এবং তাহা হইতে রানী সৈন্যদের ছয় মাসের বেতন চুকাইয়া দিলেন ও নগরবাসীদিগকে পুরস্কার দানে সন্তুষ্ট করিলেন। কিন্তু তাঁতিয়া টোপী ও রাজ্ঞী দুর্গরক্ষার কিছুমাত্র আয়োজন করেন নাই; তাঁহারা প্রকাশ্য ক্ষেত্রেই সৈন্য স্থাপন করিয়াছিলেন; সমুদয় বন্দোবস্ত রানী একাকীই সম্পন্ন করিতেছিলেন। তিনি সৈনিকের বেশ পরিয়া, যে রৌদ্রে ইংরাজ-সেনাপতি চারিবার মূর্ছিত হইয়া পড়েন, সেই রৌদ্রে অপরিশ্রান্ত ভাবে মুহূর্ত বিশ্রাম না করিয়া অশ্বারোহণে এখানে ওখানে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন।

সার হিউ রোজ যখন শুনিলেন যে, গোয়ালিয়র শত্রুহস্তগত হইয়াছে, তখন সৈন্যদল সংগ্রহ করিয়া রাজ্ঞী-সৈন্যের দুর্বলভাগ আক্রমণ করিলেন। ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। সেই যুদ্ধের দরুন বিপ্লবের মধ্যে রাজ্ঞী অসি হস্তে ইতস্তত অশ্বচালনা করিতেছেন। রাজ্ঞীর সৈন্যরা ভঙ্গ দিল; বিপক্ষ সৈন্যদের গুলিতে রাজ্ঞী অত্যন্ত আহত হইলেন। তাঁহার অশ্ব সম্মুখে একটি খাত দেখিয়া কোনো-মতে উহা উল্লঙ্ঘন করিতে চাহিল না; লক্ষ্মীবাইয়ের স্কন্ধে বিপক্ষের তলবারের আঘাত লাগিল, তথাপি তিনি অশ্বপরিচালনা করিলেন। তাঁহার পার্শ্ববর্তিনী ভগিনীর মস্তকে তলবারের আঘাত লাগিল এবং উভয়ে পাশাপাশি রণক্ষেত্রে পতিত হইলেন। এই ভগিনী যুদ্ধের সময়ে কোনো ক্রমে রাজ্ঞীর পার্শ্ব পরিত্যাগ করেন নাই, অবিশ্রান্ত তাঁহারই সহযোগিতা করিয়া আসিয়াছেন। কেহ কেহ বলে যে, তিনি রাজ্ঞীর ভগিনী নহেন, তিনি তাঁহার স্বামীর উপপত্নী ছিলেন।

ইংরাজি ইতিহাস হইতে আমরা রাজ্ঞীর এইটুকু জীবনী সংগ্রহ করিয়াছি। আমরা নিজে তাঁহার যেরূপ ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

ভারতী
অগ্রহায়ণ ১২৮৪

কাজের লোক কে

আজ প্রায় চারশো বৎসর হইল পঞ্জাবে তলবন্দী গ্রামে কালু বলিয়া একজন ক্ষত্রিয় ব্যাবসা-বাণিজ্য করিয়া খাইত। তাহার এক ছেলে নানক। নানক কিছু নিতান্ত ছেলেমানুষ নহে। তাহার বয়স হইয়াছে, এখন কোথায় সে বাপের ব্যাবসা-বাণিজ্যে সাহায্য করিবে তাহা নহে— সে আপনার ভাবনা লইয়া দিন কাটায়, সে ধর্মের কথা লইয়াই থাকে।

কিন্তু বাপের মন টাকার দিকে, ছেলের মন ধর্মের দিকে— সুতরাং বাপের বিশ্বাস হইল এ ছেলেটার দ্বারা পৃথিবীর কোনো কাজ হইবে না। ছেলের দুর্দশার কথা ভাবিয়া কালুর রাত্রে ঘুম হইত না। নানকেরও যে রাত্রে ভালো ঘুম হইত তাহা নহে, তাহারও দিনরাত্রি একটা ভাবনা লাগিয়া ছিল।

বাবা যদিও বলিতেন ছেলের কিছু হইবে না, কিন্তু পাড়ার লোকেরা তাহা বলিত না। তাহার একটা কারণ বোধ করি এই হইবে যে, নানকের ধর্মে মন থাকাতে পাড়ার লোকের বাণিজ্য-ব্যাবসার বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু বোধ করি তাহারা, নানকের চেহারা, নানকের ভাব দেখিয়া আশ্চর্য হইয়াছিল। এমন-কি, নানকের নামে একটা গল্প রাষ্ট্র আছে। গল্পটা যে সত্য নয় সে আর কাহাকেও বলিতে হইবে না। তবে, লোকে যেরূপ বলে তাহাই লিখিতেছি। একদিন নানক মাঠে গোরু চরাইতে গিয়া গাছের তলায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। সূর্য অস্ত যাইবার সময় নানকের

মুখে রোদ লাগিতেছিল। শুনা যায় নাকি একটা কালো সাপ নানকের মুখের উপর ফণা ধরিয়া রোদ আড়াল করিয়াছিল। সে দেশের রাজা সে সময়ে পথ দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি নাকি স্বচক্ষে এই ঘটনা দেখিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা রাজার নিজের মুখে এ কথা শুনি নাই, নানকও কখনো এ গল্প করেন নাই, এবং এমন পরোপকারী সাপের কথাও কখনো শুনি নাই— শুনিলেও বড়ো বিশ্বাস হয় না।

কালু অনেক ভাবিয়া স্থির করিলেন, নানক যদি নিজের হাতে ব্যাবসা আরম্ভ করেন তবে ক্রমে কাজের লোক হইয়া উঠিতে পারেন। এই ভাবিয়া তিনি নানকের হাতে কিছু টাকা দিলেন; বলিয়া দিলেন, 'এক গাঁয়ে লুন কিনিয়া আর-এক গাঁয়ে বিক্রয় করিয়া আইস।' নানক টাকা লইয়া বালসিন্ধু চাকরকে সঙ্গে করিয়া লুন কিনিতে গেলেন। এমন সময়ে পথের মধ্যে কতকগুলি ফকিরের সঙ্গে নানকের দেখা হইল। নানকের মনে বড়ো আনন্দ হইল। তিনি ভাবিলেন, এই ফকিরদের কাছে ধর্মের বিষয় জানিয়া লইবেন। কিন্তু কাছে গিয়া যখন তাহাদিগকে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন তখন তাহারা কথার উত্তর দিতে পারে না। তিন দিন তাহারা খাইতে পায় নাই, এমনি দুর্বল হইয়া গিয়াছে যে মুখ দিয়া কথা সরে না। নানকের মনে বড়ো দয়া হইল। তিনি কাতর হইয়া তাঁহার চাকরকে বলিলেন, 'আমার বাপ কিছু লাভের জন্য আমাকে লুনের ব্যাবসা করিতে হুকুম করিয়াছেন। কিন্তু এ লাভের টাকা কতদিনই বা থাকিবে! দুই দিনেই ফুরাইয়া যাইবে। আমার বড়ো ইচ্ছা হইতেছে। এই টাকায় এই গরিবদের দুঃখ মোচন করিয়া যে লাভ চিরদিন থাকিবে সেই পুণ্য লাভ করি।' বালসিন্ধু কাজের লোক ছিল বটে, কিন্তু নানকের কথা শুনিয়া তাহার মন গলিয়া গেল। সে কহিল, 'এ বড়ো ভালো কথা।' নানক তাঁহার ব্যাবসার সমস্ত টাকা ফকিরদের দান করিলেন। তাহার পেট ভরিয়া খাইয়া যখন গায়ে জোর পাইল তখন নানককে ডাকিয়া ঈশ্বরের কথা শুনাইল। তাহারা নানককে বুঝাইয়া দিল, ঈশ্বর কেবল একমাত্র আছেন আর সমস্ত তাঁহারই সৃষ্টি। এই-সকল কথা শুনিয়া নানকের মনে বড়ো আনন্দ হইল।

তাহার পরদিন নানক বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। কালু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কত লাভ করিলে?' নানক বলিল, 'বাবা, আমি গরিবদের খাওয়াইয়াছি। তোমার এমন ধনলাভ হইয়াছে যাহা চিরকাল থাকিবে!' কিন্তু সেরূপ ধনের প্রতি কালুর বড়ো একটা লোভ ছিল না। সুতরাং সে রাগিয়া ছেলেকে মারিতে লাগিল। এমন সময়ে সে প্রদেশের ক্ষুদ্র রাজা পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার নাম রায়বোলার। নানককে মারিতে দেখিয়া তিনি ঘরে প্রবেশ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কী হইয়াছে? এত গোল কেন?' যখন সমস্ত ব্যাপার শুনিলেন তখন তিনি কালুকে খুব করিয়া তিরস্কার করিলেন। বলিলেন, 'আর যদি কখনো নানকের গায়ে হাত তোল তো দেখিতে পাইবে।' এমন-কি, রাজা অত্যন্ত ভক্তির সহিত নানককে প্রণাম করিলেন। লোকে বলে যে, যখন সাপ নানককে ছাতা ধরিয়াছিল তখন রাজা তাহা দেখিয়াছিলেন, এইজন্যই নানকের উপর তাঁহার এত ভক্তি হইয়াছিল। কিন্তু সে সাপের ছাতা-ধরা সমস্তই গুজব; আসল কথা, নানকের সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে নানক একজন মস্তলোক।

নানকের উপর আর তো মারধোর চলে না। কালু অন্য উপায় দেখিতে লাগিলেন।

জয়রাম নানকের ভগিনীপতি। পাঠান দৌলতখাঁর শস্যের গোলা জয়রামের জিম্মায় ছিল। কালু স্থির করিলেন, নানককেও জয়রামের কাজে লাগাইয়া দিবেন, তাহা হইলে ক্রমে নানক কাজের লোক হইয়া উঠিবেন। নানকের বাপ যখন নানকের কাছে এই প্রস্তাব করিলেন তখন তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা।' এই বলিয়া নানক সুলতানপুরে জয়রামের কাছে গিয়া উপস্থিত। সেখানে দিনকতক বেশ কাজ করিতে লাগিলেন। সকলের 'পরেই তাঁহার ভালোবাসা ছিল, এইজন্য সুলতানপুরের সকলেই তাঁহাকে ভালোবাসিতে লাগিল। কিন্তু কাজে মন দিয়া নানক তাঁহার আসল কাজটি ভুলেন নাই। তিনি ঈশ্বরের কথা সর্বদাই ভাবিতেন।

এমন কিছুকাল কাটিয়া গেল। একদিন সকালে নানক একলা বসিয়া ঈশ্বরের ধ্যান

করিতেছেন, এমন সময়ে একজন মুসলমান ফকির আসিয়া তাঁহাকে বলিল, 'নানক, তুমি আজকাল কী লইয়া আছ বলো দেখি। এ-সকল কাজকর্ম ছাড়িয়া দাও। চিরদিনের যথার্থ ধন তাহাই উপার্জনের চেষ্টা করো।' ফকির যাহা বলিলেন তাহার অর্থ এই যে, ধর্ম উপার্জন করো, পরের উপকার করো, পৃথিবীর ভালো করো, ঈশ্বরে মন দাও— টাকা রোজগার করিয়া পেট ভরিয়া খাওয়ার চেয়ে ইহাতে বেশি কাজ দেখে।

ফকিরের এই কথাটা হঠাৎ এমনি নানকের মনে লাগিল যে তিনি চমকিয়া উঠিলেন, ফকিরের মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন ও মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্ছা ভাঙিতেই তিনি গরিব লোকদিগকে ডাকিলেন ও শস্য যাহা-কিছু ছিল সমস্ত তাহাদিগকে বিলাইয়া দিলেন। নানক আর ঘরে থাকিতে পারিলেন না; কাজকর্ম সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া তিনি পলাইয়া গেলেন।

নানক পলাইলেন বটে কিন্তু অনেক লোক তাঁহার সঙ্গ লইল। যাঁহার ধর্মের দিকে এত টান, এমন মধুর ভাব, এমন মহৎ স্বভাব, তিনি সকলকে ছাড়িলেও তাঁহাকে সকলে ছাড়ে না। মর্দানা তাঁহার সঙ্গে গেল; সে ব্যক্তি বীণা বাজাইত, গান গাহিত। লেনা তাঁহার সঙ্গে গেল। সেই-যে পুরানো চাকর বালসিন্ধু ছেলেবেলায় নানকের সঙ্গে লুন বিক্রয় করিয়া টাকা লাভ করিতে গিয়াছিল আজও সে নানকের সঙ্গে চলিল; এবারেও বোধ করি কিঞ্চিৎ ধনলাভের আশা ছিল, কিন্তু যে-সে ধন নয়, সকল ধনের শ্রেষ্ঠ যে ধন সেই ধর্ম। রামদাসও নানককে ছাড়িতে পারিল না; তাহার বয়স বেশি হইয়াছিল বলিয়া সকলে তাহাকে বলিত বুড্ঢা। আর কত নাম করিব, এমন ঢের লোক সঙ্গে গেল।

নানক যথাসাধ্য সকলের উপকার করিয়া সকলকে ধর্মোপদেশ দিয়া দেশে দেশে বেড়াইতে লাগিলেন। হিন্দু মুসলমান সকলকেই তিনি ভালোবাসিতেন। হিন্দুধর্মের যাহা দোষ ছিল তাহাও তিনি বলিতেন, মুসলমান ধর্মের যাহা দোষ ছিল তাহাও তিনি বলিতেন। অথচ হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিত। নানক আমাদের বাংলাদেশেও আসিয়াছিলেন। শিবনাভ বলিয়া কোন্-এক দেশের রাজা নানা লোভ দেখাইয়া নানককে উচ্ছন্ন দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু নানক তাহাতে ভুলিবেন কেন? উল্‌টিয়া রাজাকে তিনি ধর্মের দিকে লওয়াইলেন। মোগল সম্রাট বাবরের সঙ্গে একবার নানকের দেখা হয়। সম্রাট নানকের সাধুভাব দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিস্তর টাকা পুরস্কার দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু নানক তাহা লইলেন না; তিনি বলিলেন, 'যে জগদীশ্বর সকল লোককে অন্ন দিতেছেন, অনুগ্রহ ও পুরস্কার আমি তাঁহারই কাছ হইতে চাই, আর কাহারো কাছে চাই না।' নানক যখন মক্কায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন তখন একদিন তিনি মসজিদের দিকে পা করিয়া ঘুমাইতেছিলেন। তাহাই দেখিয়া একজন মুসলমানের বড়ো রাগ হইল। সে তাঁহাকে জাগাইয়া বলিল, 'তুমি কেমন লোক হে! ঈশ্বরের মন্দিরের দিকে পা করিয়া তুমি ঘুমাইতেছ!' নানক বলিলেন, 'আচ্ছা ভাই, জগতের কোন্ দিকে ঈশ্বরের মন্দির নাই একবার দেখাইয়া দাও।' নানক লোক ভুলাইবার জন্য কোনো আশ্চর্য কৌশল দেখাইয়া কখনো আপনাকে মস্ত লোক বলিয়া প্রচার করিতে চাহেন নাই। গল্প আছে একবার কেহ কেহ তাঁহাকে বলিয়াছিল, 'আচ্ছা, তুমি যে একজন মস্ত সাধু, আমাদিগকে একটা কোনো আশ্চর্য অলৌকিক ঘটনা দেখাও দেখি।' নানক বলিলেন, 'তোমাদিগকে দেখাইবার যোগ্য আমি কিছুই জানি না। আমি কেবল পবিত্র ধর্মের কথা জানি, আর কিছুই জানি না। ঈশ্বর সত্য, আর সমস্ত অস্থায়ী।'

নানক অনেক দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া গৃহস্থ হইলেন। গৃহে থাকিয়া তিনি সকলকে ধর্মোপদেশ দিতেন। তিনি কোরান পুরাণ কিছুই মানিতেন না। তিনি সকলকে ডাকিয়া বলিতেন, এক ঈশ্বরকে পূজা করো, ধর্মে মন দাও, অন্য সকলের দোষ মার্জনা করো, সকলকে ভালোবাসো। এইরূপ সমস্ত জীবন ধর্মপথে থাকিয়া সকলকে ধর্মোপদেশ দিয়া সত্তর বৎসর বয়সে নানকের মৃত্যু হয়।

কালু বেশি কাজের লোক ছিল কি কালুর ছেলে নানক বেশি কাজের লোক ছিল আজ

তাহার হিসাব করিয়া দেখো দেখি। আজ যে শিখ জাতি দেখিতেছ, যাহাদের সুন্দর আকৃতি, মহৎ মুখশ্রী, বিপুল বল, অসীম সাহস দেখিয়া আশ্চর্য বোধ হয়, এই শিখ জাতি নানকের শিষ্য। নানকের পূর্বে এই শিখ জাতি ছিল না। নানকের মহৎ ভাব ও ধর্মবল পাইয়া এমন একটি মহৎ জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। নানকের ধর্মশিক্ষার প্রভাবেই ইহাদের হৃদয়ের তেজ বাড়িয়াছে, ইহাদের শির উন্নত হইয়াছে, ইহাদের চরিত্রে ও ইহাদের মুখে মহৎ ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। কালু যে টাকা রোজগার করিয়াছিল নিজের উদরেই তাহা খরচ করিয়াছে, আর নানক যে ধর্মধন উপার্জন করিয়াছিলেন আজ চারশো বৎসর ধরিয়া মানবেরা তাহা ভোগ করিতেছে। কে বেশি কাজ করিয়াছে।

বালক

বৈশাখ ১২৯২

গুটিকত গল্প

১

নেপোলিয়ন বোনাপার্টের নাম তোমরা সকলেই শুনিয়াছ। তিনি এক সময়ে ইংরাজের দেশ আক্রমণ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। যখন যুদ্ধের উদ্‌যোগ চলিতেছে তখন কী-গতিকে একজন ইংরাজি জাহাজের গোরা ফরাসি সৈন্যদের কাছে ধরা পড়ে। শত্রুপক্ষের লোক দেখিয়া ফরাসিরা তাহাকে নিজের দেশে ধরিয়া আনিয়া সমুদ্রের ধারে ছাড়িয়া দেয়। সে বেচারা একা একা সমুদ্রের ধারে ঘুরিয়া বেড়াইত। দেশে ফিরিবার জন্য তাহার প্রাণ কাঁদিত। সমুদ্রের পরপারেই তার স্বদেশ। সে সমুদ্রও কিছু বেশি বড়ো নয়। এমন-কি, এক-এক দিন হয়তো মেঘ কাটিয়া গেলে রোদ উঠিলে ইংলন্ডের সাদা সাদা পাহাড়ের রেখা নীল-সমুদ্রের উপর মেঘের মতো দেখা যাইত। সে আকাশে চাহিয়া দেখিত, গরমির দিনে কত ছোটো ছোটো পাখি পাখা তুলিয়া ইংলন্ডের দিকে উড়িয়া যাইতেছে।

একদিন রাত্রে ঝড় হইয়া গেলে পর সকালে উঠিয়া দেখে একটি পিপে সমুদ্রের ঢেউয়ে ডাঙার দিকে ভাসিয়া আসিতেছে। সেই পিপেটি লইয়া সে একটি পাহাড়ের গর্তের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। সমস্তদিন ধরিয়া বসিয়া বসিয়া সেই পিপেটি ভাঙিয়া সে নৌকা বানাইত। কিন্তু সে গরিব— নৌকা বানাইবার সরঞ্জাম কোথায় পাইবে? সে সেই ভাঙা পিপের কাঠের চারি দিকে নরম গাছের ডাল বুনিয়া একপ্রকার নৌকার মতো গড়িয়া তুলিল। দেশের জন্য এমনি তাহার প্রাণ আকুল হইয়াছে যে সে একবার বিবেচনা করিল না যে এ নৌকা সমুদ্রের জলে একদণ্ড টিকিতে পারিবে না। যাহা হউক, সেই নৌকাটি লইয়া যখন সে সমুদ্রে ভাসাইতেছে, এমন সময় ফরাসি সৈন্যেরা তাহাকে দেখিতে পাইল। ফরাসিরা তাহাকে ধরিল। বেচারার এত কষ্টের নৌকা ভাসানো হইল না— এতদিনের আশা নির্মূল হইল।

এই কথা কী করিয়া নেপোলিয়নের কানে উঠিল। নেপোলিয়ন সমুদ্রের ধারে গিয়া সমস্ত দেখিলেন। তিনি সেই ইংরাজ বালককে বলিলেন— 'তোমার এ কী রকম সাহস! এই খানকতক কাঠ আর গাছের ডাল বেঁধে তুমি সমুদ্র পার হতে চাও। দেশে তোমার কেই বা আছে!'

সেই ইংরাজ বলিল— 'আমার মা আছে। আমার মাকে অনেক দিন দেখি নাই, মাকে দেখিবার জন্য আমার প্রাণ বড়ো ব্যাকুল হইয়াছে।' বলিতে বলিতে তাহার চোখ ছলছল করিয়া আসিল।

নেপোলিয়ন তৎক্ষণাৎ বলিলেন— 'আচ্ছা— মায়ের সঙ্গে তোমার দেখা হবে, আমি দেখা করিয়ে দেব। যে ছেলে এমন সাহসী তাহার মা না-জানি কত মহৎ।'

নেপোলিয়ন তাহাকে একটি মোহর দিলেন— এবং নিজের জাহাজে করিয়া তাহাকে ইংলন্ডে পাঠাইয়া দিলেন। দুঃখে পড়িলেও সেই মোহরটি সে কখনো ভাঙায় নাই, নেপোলিয়নের দয়া মনে রাখিবার জন্য সেই মোহরটি সে চিরদিন কাছে রাখিয়াছিল।

২

একশো বৎসরেরও অধিক হইল একদিন জর্মনির একটি ছোটো প্রদেশের চার্লস্ নামে এক রাজা আহার করিয়া উঠিয়া আসিতেছেন এমন সময়ে শুনিতে পাইলেন তাঁহার রাজবাটির সম্মুখে একদল লোক জমা হইয়াছে। বাটির বাহিরে আসিয়া দেখিলেন একদল ছেলে। কী, ব্যাপারটা কী? রাজার নিকট একটি নিবেদন আছে। রাজার সহিসের ছেলে ডানেকর, পায়ে জুতা নাই, গায়ে ময়লা কাপড়— সে অগ্রসর হইয়া আপনাদের প্রার্থনা রাজাকে জানাইল। রাজার একটি স্কুল আছে, কেবল তাঁহার সৈন্যেরা সেই স্কুলে পড়ে। সম্প্রতি শুনা গেছে রাজা নিয়ম করিয়াছেন অন্য ছেলেরাও সেখানে পড়িতে পাইবে, তাই শুনিয়া রাজার সেই স্কুলে ভর্তি হইবার জন্য ইহারা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছে।

সহিসের ছেলে ডানেকর ছবি আঁকিতে বড়ো ভালোবাসিত। সে মাটিতে দেয়ালে যেখানে পাইত খড়ি দিয়া নানারকম ছবি আঁকিত। সে জানিত রাজার স্কুলে ছবি আঁকা শিখানো হয়। তাই যখন সে শুনিল রাজার স্কুলে সকলেই যাইতে পারে তখন ভারি খুশি হইয়া সেই স্কুলে ভর্তি হইবার জন্য বাপের কাছে প্রস্তাব করে। বাপ চটিয়া গরম হইয়া উঠিল— বলিল, 'তুমি নিজের কাজে মন দাও তো বাপু। লেখাপড়া শিখিতে হইবে না।' এই বলিয়া তাহাকে মারিয়া ঘরে চাবিবন্ধ করিয়া রাখিল। ডানেকর জানালার মধ্য দিয়া গলিয়া আপনার সমবয়সী একদল ছোটো ছেলে জুটাইয়া স্বয়ং রাজার দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া ডানেকরকে স্কুলে পাঠাইতে রাজি হইলেন। ডানেকরের বাপ দেখিল ছেলে স্কুলে গেলে আস্তাবলের কাজের কিছু অসুবিধা হইবে— ভারি বিরক্ত হইয়া মারধোর করিয়া ছেলেকে বাড়ি হইতে দূর করিয়া দিল। কিন্তু ছেলের মা গুটিকতক গায়ের কাপড় পুঁটুলিতে বাঁধিয়া তাহার সঙ্গে দিলেন— এবং খানিক রাস্তা তাহার সঙ্গে গিয়া ছেলের কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিয়া কাঁদিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

ডানেকর গরিব— এইজন্য স্কুলে তাহাকে কেহ গ্রাহ্য করিত না। সেখানে তাহাকে উঠান ঝাঁট দিতে হইত, চাকরের কাজ করিতে হইত। বোধ করি যত্ন করিয়া তাহাকে কেহ শিখাইত না— অনেক সময়ে ডানেকর লুকাইয়া গোপনে শিক্ষা করিত। স্কুলে ছবি-আঁকা শেখা ফুরাইলে পর, আরও বেশি করিয়া শিখিবার জন্য ডানেকর পায়ে হাঁটিয়া দেশে বিদেশে ভ্রমণ করেন। এমনি করিয়া প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বৎসর কাটিয়া গেল।

এখন এই ডানেকরের নাম য়ুরোপে সকল জায়গায় বিখ্যাত। ডানেকরের মতো পাথরের মূর্তি গড়িতে কয়জন লোক পারে! যে রাজার স্কুলে তিনি পড়িতে অনুমতি পাইয়াছিলেন, সেই রাজার নাম আজ আর বড়ো কাহারো মনে পড়ে না, কিন্তু সেই রাজার একজন সহিসের ছেলের নাম য়ুরোপের দেশে দেশে রাষ্ট্র হইতেছে!

৩

মাড়োয়ারের রাজপুত রাজা যশোবন্ত দিল্লির বাদশা আরঞ্জীবের একজন সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার অধীনে নহর খাঁ নামক এক হিন্দু রাজপুত বীর ছিলেন। নহর খাঁ বলিয়া তাহাকে সকলে ডাকিত বটে কিন্তু তাঁহার আসল নাম ছিল মুকুন্দদাস। এক সময়ে তিনি বাদশাকে অমান্য করাতে বাদশা তাঁহার উপর চটিয়া যান। বাদশা হুকুম দিলেন— 'কোনো প্রকার অস্ত্র না লইয়া মুকুন্দকে একটা বাঘের খাঁচার মধ্যে গিয়া বাঘের সঙ্গে লড়াই করিতে হইবে।' মুকুন্দ বলিলেন, 'আচ্ছা,

তাহাই হইবে।' নির্ভয়ে খাঁচার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি বাঘকে ডাকিয়া বলিলেন— 'ওহে তুমি তো মিঞা সাহেবের বাঘ, একবার যশোবন্তের বাঘের কাছে এসো দেখি!' এই বলিয়া চোখ রাঙাইয়া তিনি বাঘের দিকে চাহিলেন। হঠাৎ কী কারণে বাঘের এমনি ভয় হইল যে, সে মুখ ফিরাইয়া লেজ গুটাইয়া সুড়সুড় করিয়া কোণে চলিয়া গেল। রাজপুত বীর কহিলেন, 'যে-শত্রু ভয়ে পালায় তাহাকে তো আমরা মারিতে পারি না। তাহা আমাদের ধর্মবিরুদ্ধ।' এই আশ্চর্য ঘটনা দেখিয়া বাদশা তাঁহাকে পুরস্কার দিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

বাঘেরা অত্যন্ত ভয়ানক জানোয়ার বটে কিন্তু এক-এক সময়ে তাহারা হঠাৎ অত্যন্ত সামান্য কারণে কেমন ভয় পায়। একটা গল্প বোধ করি তোমরা সকলে শুনিয়া থাকিবে— একদল ইংরাজ সুন্দরবনে শিকার করিতে গিয়াছিলেন। যখন আহারের সময় হইল, বনের মধ্যে আসন পাতিয়া সকলে আহারে বসিয়া গেলেন। এমন সময়ে জঙ্গলের ভিতর হইতে একটা বাঘ লাফ দিয়া তাঁহাদের কাছে আসিয়া পড়িল। বাঘ দেখিয়া একটি মেমসাহেব তাড়াতাড়ি ছাতা খুলিয়া তাহার মুখের সামনে ধরিলেন। হঠাৎ অদ্ভুত একটা ছাতা-খোলার ব্যাপার দেখিয়া বাঘের এমনি ভয় লাগিল যে সেখানে অধিকক্ষণ থাকা সে ভালো বোধ করিল না, চটপট ঘরে ফিরিয়া গেল। এমন শোনা যায় বাঘের চোখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিলে বাঘ আক্রমণ করিতে সাহস করে না। এটা লোকের মুখে শোনা কথা। কথাটার সত্যমিথ্যা ঠিক বলিতে পারি না। নিজে পরখ করিয়া যে বলিব এমন সুবিধাও নাই সাধও নাই। পরখ করিতে গেলে ফিরিয়া আসিয়া বলিবার সাবকাশ না থাকিতে পারে।

নহর খাঁর আর-একটা গল্প বলি। রাজপুতদের একপ্রকার খেলা আছে। ঘোড়ায় চড়িয়া একটা গাছের নীচে দিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিতে হয়। ঘোড়া যখন ছুটিতেছে তখন গাছের ডাল ধরিয়া ঝুলিতে হয়, ঘোড়া পায়ের নীচে দিয়া চলিয়া যায়। বাদশাহের এক ছেলে একবার নহর খাঁকে এই খেলা খেলিতে হুকুম করেন। নহর রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'আমি তো আর বাঁদর নই। রাজা যদি খেলা দেখিতে ইচ্ছা করেন তো লড়াই করিতে হুকুম দিন একবার তলোয়ারের খেলাটা দেখাইয়া দিই।' বাদশার পুত্র বলিলেন— 'আচ্ছা, তুমি সৈন্য লইয়া সিরোহীর রাজা সুরতানকে ধরিয়া লইয়া আইস।' নহর রাজি হইলেন। সিরোহীর রাজা অচলগড় নামক তাঁর এক পর্বতের দুর্গের মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। নহর বাছা-বাছা একদল লোক লইয়া গভীর রাত্রে গোপনে দুর্গের মধ্যে গিয়া রাজাকে নিজের পাগড়ির কাপড়ে বাঁধিয়া ফেলিলেন। রাজাকে এইরূপে বন্দী করিয়া নহর তাঁহাকে দিল্লীতে নিজের প্রভু যশোবন্ত সিংহের নিকট আনিয়া দিলেন। যশোবন্ত সুরতানকে বাদশার সভায় লইয়া যাইবেন স্থির করিলেন এবং সেইসঙ্গে কথা দিলেন যে বাদশাহের সভায় কেহ তাঁহাকে কোনোরূপ অপমান করিতে পারিবে না। সিরোহীর রাজাকে আরঙ্জীবের সভায় লইয়া যাওয়া হইল। দস্তুর আছে যে বাদশাহের সভায় গেলে বাদশাহকে সকলেরই নত হইয়া সেলাম করিতে হয়। সেই দস্তুর অনুসারে সকলে সুরতানকে সেলাম করিতে বলিল। তিনি সদর্পে মাথা তুলিয়া বলিলেন— 'আমার প্রাণ বাদশাহের হাতে— কিন্তু আমার মান আমার নিজের হাতে। কখনো কোনো মানুষের কাছে মাথা নোয়াই নাই কখনো নোয়াইব না।' সভার লোকেরা আশ্চর্য হইয়া গেল। কিন্তু যশোবন্তের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া কেহ তাঁহাকে কিছু বলিল না। তাহারা একটা কৌশল করিল। একটি ছোটো দরজার মতো ছিল তাহার মধ্য দিয়া গলিতে হইলে মাথা নীচু না করিলে চলে না— সেই দরজার ভিতর দিয়া তাঁহাকে বাদশাহের সম্মুখে যাইতে বলিল। কিন্তু পাছে মাথা হেঁট হয় বলিয়া তিনি আগে পা গলাইয়া দিয়া মাথা বাহির করিয়া আনিলেন। বাদশাহ রাজার এই নির্ভীকতায় রাগ না করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'তুমি কোন্ রাজ্য পুরস্কার চাও আমি দিব।' রাজা তৎক্ষণাৎ বলিলেন, 'আমার অচলগড়ের মতো রাজ্য আর কোথায় আছে, সেইখানেই আমাকে ফিরিয়া যাইতে দিন।' বাদশাহ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাই অনুমতি করিলেন। এই রাজা এবং রাজবংশ চিরদিন আপনাদের স্বাধীনতা

রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। কখনোই মোগল সম্রাটদের দাস হন নাই। যিনি বন্দী অবস্থাতেও নিজের মান রাখিয়া চলিতে পারেন তাঁহাকে দমন করিতে পারে কে?

বালক
বৈশাখ ১২৯২

আকবর শাহের উদারতা

একজন প্রাচীন ইংরাজ ভ্রমণকারী আকবর বাদশাহের উদারতা সম্বন্ধে একটি গল্প করিয়াছেন তাহা নিম্নে লিখিতেছি।

আকবর শাহের মাতৃভক্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল। এমন-কি, এক সময়ে যখন তাঁহার মা পালকি চড়িয়া লাহোর হইতে আগ্রায় যাইতেছিলেন, তখন আকবর এবং তাঁহার দেখাদেখি অন্যান্য বড়ো বড়ো ওমরাওগণ নিজের কাঁধে পালকি লইয়া তাঁহাকে নদী পার করিয়াছিলেন। সম্রাটের মা সম্রাটকে যাহা বলিতেন তিনি তাহাই পালন করিতেন। কেবল আকবর শা মায়ের একটি আজ্ঞা পালন করেন নাই। সম্রাটের মা সংবাদ পাইয়াছিলেন যে পর্টুগিজ নাবিকগণ একটি মুসলমান জাহাজ লুঠ করিয়া একখণ্ড কোরান গ্রন্থ পাইয়াছিল, তাহারা সেই গ্রন্থ একটি কুকুরের গলায় বাঁধিয়া বাজনা বাজাইয়া অর্মজ শহর প্রদক্ষিণ করিয়াছিল। এই সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া সম্রাটমাতা আকবরকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে একখণ্ড বাইবেল গাধার গলায় বাঁধিয়া আগ্রা শহর ঘোরানো হউক। সম্রাট তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন— 'যে কার্য একদল পর্টুগালবাসীর পক্ষেই নিন্দনীয় সে কার্য একজন সম্রাটের পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত সন্দেহ নাই। কোনো ধর্মের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিলে ঈশ্বরের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করা হয়। অতএব আমি একখানা নিরীহ গ্রন্থের উপর দিয়া প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করিতে পারিব না।'

বালক
আষাঢ় ১২৯২

ন্যায় ধর্ম

প্রুসিয়ার 'মহৎ' উপাধিপ্রাপ্ত ফ্রেড্‌রিক সম্রাট রাজধানী হইতে কিছু দূরে একটি বাগানবাড়ি নির্মাণের সংকল্প করিয়াছিলেন। যখন সমস্ত বন্দোবস্ত স্থির হইয়া গেল তখন শুনিতে পাইলেন যে, একজন কৃষকের একটি শস্য চূর্ণ করিবার জাঁতাকলগৃহ মাঝে পড়াতে তাঁহার বাগান সম্পূর্ণ হইতে পারিতেছে না। বিস্তর টাকার প্রলোভনেও কৃষক তাহার গৃহ উঠাইয়া লইতে রাজি হয় নাই শুনিয়া সম্রাট কৃষককে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন— 'তুমি এত টাকা পাইতেছ তবু কেন ঘর ছাড়িতেছ না?' কৃষক উত্তর করিল— 'ইহা আমার পৈতৃক গৃহ। ওইখানেই আমার পিতা তাঁহার জীবন নির্বাহ করিয়াছেন ও মরিয়াছেন, এবং ওইখানেই আমার পুত্রের জন্ম হইয়াছে, আমি উহা বেচিতে পারিব না।'

সম্রাট কহিলেন, 'আমি ওই স্থানে আমার প্রাসাদ নির্মাণ করিতে চাহি।'

কৃষক কহিল, 'মহারাজ বোধ করি বিস্মৃত হইয়াছেন যে, ওই জাঁতাকলের ঘর আমার প্রাসাদ।'

সম্রাট কহিলেন—'তুমি যদি বিক্রয় না কর তো ওই গৃহ আমি কাড়িয়া লইতে পারি।'

কৃষক কহিল, 'না, পারেন না। বার্লিন নগরে বিচারক আছে।'

এই কথা শুনিয়া সম্রাট কৃষকের ঘরে আর হস্তক্ষেপ করিলেন না। তিনি ভাবিলেন রাজারা

আইন গড়িতে পারেন কিন্তু আইন ভাঙিতে পারেন না। কৃষকের সেই জাঁতাকল আজ পর্যন্ত সম্রাটের উদ্যানে রহিয়াছে।

গুজরাটের রানীর সম্বন্ধে এইরূপ আর-একটি গল্প প্রচলিত আছে। বহু পূর্বের কথা। তখন গুজরাট সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। রানীর নাম মীনল দেবী। তাঁহার রাজত্বকালে ধোলকা গ্রামে তিনি 'মীনলতলাও' নামে একটি পুষ্করিণী খনন করাইতেছিলেন। ওই পুষ্করিণীর পূর্ব দিকে একটি দুশ্চরিত্রা রমণীর বাসগৃহ ছিল। সেই গৃহ থাকাতে পুষ্করিণীর আয়তনসামঞ্জস্যের ব্যাঘাত হইতেছিল। রানী অনেক অর্থ দিয়া সেই ঘর ক্রয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু গৃহকর্ত্রী মনে করিল, পুষ্করিণী খনন করাইয়া রানী যেরূপ কীর্তিলাভ করিবেন, পুষ্করিণী খননের ব্যাঘাত করিয়া আমারও তেমনি একটা নাম থাকিয়া যাইবে। এই বলিয়া সে গৃহ বিক্রয় করিতে অসম্মত হইল। রানী কিছুমাত্র বলপ্রয়োগ করিলেন না। গৃহ সেইখানেই রহিল। আজিও মীনলতলাওয়ের পূর্ব দিকের সীমা অসমান রহিয়াছে। সেই অবধি উক্ত প্রদেশে একটি প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে যে, 'ন্যায় ধর্ম দেখিতে চাও তো মীনলতলাও যাও।'

বালক
শ্রাবণ ১২৯২

বীর গুরু

বনের একটা গাছে আগুন লাগিলে অন্যান্য যে-সকল গাছে উত্তাপ প্রচ্ছন্ন ছিল সেগুলাও যেমন আগুন হইয়া উঠে, তেমনি যে জাতির মধ্যে একজন বড়োলোক উঠে, সে জাতির মধ্যে দেখিতে দেখিতে মহত্ত্বের শিখা ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তাহার গতি আর কেহই রোধ করিতে পারে না।

নানক যে মহত্ত্ব লইয়া জন্মিয়াছিলেন সে তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই নিবিয়া গেল না। তিনি যে ধর্মের সংগীত, যে আনন্দ ও আশার গান গাহিলেন, তাহা ধ্বনিত হইতে লাগিল। কত নূতন নূতন গুরু জাগিয়া উঠিয়া শিখদিগকে মহত্ত্বের পথে অগ্রসর করিতে লাগিলেন।

তখনকার যথেচ্ছাচারী মুসলমান রাজারা অনেক অত্যাচার করিলেন, কিন্তু নবধর্মোৎসাহে দীপ্ত শিখ জাতির উন্নতির পথে বাধা দিতে পারিলেন না। বাধা ও অত্যাচার পাইয়া শিখেরা কেমন করিয়া বীর জাতি হইয়া উঠিল তাহার গল্প বলি শুন।

নানকের পর পঞ্জাবে আট জন গুরু জন্মিয়াছেন, আট জন গুরু মরিয়াছেন, নবম গুরুর নাম তেগ্‌বাহাদুর। আমরা যে সময়কার কথা বলিতেছি তখন নিষ্ঠুর আরঞ্জীব দিল্লীর সম্রাট ছিলেন। রামরায় বলিয়া তেগ্‌বাহাদুরের একজন শত্রু সম্রাটের সভায় বাস করিত। তাহারই কথা শুনিয়া সম্রাট তেগ্‌বাহাদুরের উপরে ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছেন।

আরঞ্জীবের লোক যখন তেগ্‌বাহাদুরকে ডাকিতে আসিল তখন তিনি বুঝিলেন যে তাঁহার আর রক্ষা নাই। যাইবার সময়ে তিনি তাঁহার ছেলেকে কাছে ডাকিলেন। ছেলের নাম গোবিন্দ, তাহার বয়স চোদ্দ বৎসর। পূর্বপুরুষের তলোয়ার গোবিন্দের কোমরে বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে বলিলেন, 'তুমিই শিখেদের গুরু হইলে। সম্রাটের আদেশে ঘাতক আমাকে যদি বধ করে তো আমার শরীরটা যেন শেয়াল-কুকুরে না খায়। আর এই অন্যায় অত্যাচারের বিচার তুমি করিয়ো, ইহার প্রতিশোধ তুমি লইয়ো।' বলিয়া তিনি দিল্লী চলিয়া গেলেন।

রাজসভায় তাঁহাকে তাঁহার গোপনীয় কথা সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করা হইল। কেহ বা বলিল, 'আচ্ছা, তুমি যে মস্ত লোক তাহার প্রমাণস্বরূপ একটা অলৌকিক কারখানা দেখাও দেখি!' তেগ্‌বাহাদুর বলিলেন, 'সে তো আমার কাজ নহে। মানুষের কর্তব্য ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া থাকা। তবে তোমাদের অনুরোধে আমি একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখাইতে পারি। একটা কাগজে

মন্ত্র লিখিয়া ঘাড়ে রাখিয়া দিব, সে ঘাড় তলোয়ারে বিচ্ছিন্ন হইবে না।' এই বলিয়া মন্ত্র-লেখা কাগজ ঘাড়ে রাখিয়া তিনি ঘাড় পাতিয়া দিলেন। ঘাতক তরবারি উঠাইয়া আঘাত করিলে মাথা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। কাগজ তুলিয়া লইয়া সকলে দেখিল, তাহাতে লেখা আছে, 'শির দিয়া, সির নেহি দিয়া।' অর্থাৎ মাথা দিলাম, গুপ্ত কথা দিলাম না।' এইরূপে মাথা দিয়া তেগ্‌বাহাদুর রাজসভার প্রশ্নের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

বালক গোবিন্দের মনে বড়ো আঘাত লাগিল। মুসলমানদের যথেচ্ছাচার নিবারণ করিবেন এই তাঁহার সংকল্প হইল। কিন্তু তাড়াতাড়ি করিলে তো কিছুই হয় না; এখনও সুসময়ের জন্যে ধৈর্য ধরিয়া অপেক্ষা করিতে হইবে, আয়োজন করিতে হইবে, বহুদিন অবিশ্রাম চিন্তা করিয়া মনে মনে সমস্ত সংকল্প গড়িয়া তুলিতে হইবে, তবে যদি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। যাহারা দুই দিনেই দেশের উপকার করিয়া সমস্ত চুকাইয়া দিতে চায়, যাহাদের ধৈর্য নাই, যাহারা অপেক্ষা করিতে জানে না, তাহাদের তড়িঘড়ি কাজ ও আড়ম্বর দেখিয়া লোকের চমক লাগিয়া যায়, কিন্তু তাহারা বড়ো লোক নহে, তাহাদের কাজ স্থায়ী হয় না। তাহারা তাহাদের উদ্দেশ্যের জন্য সমস্ত জীবন দিতে চাহে না, জীবনের গোটাকতক দিন দিতে চাহে মাত্র, অথচ তাড়াতাড়ি বড়ো লোক বলিয়া খুব একটা প্রশংসা পাইতে চাহে। গোবিন্দ সেরূপ লোক ছিলেন না। তিনি প্রায় কুড়ি বৎসর ধরিয়া যমুনাতীরের ছোটো ছোটো পাহাড়ের মধ্যে বিজনে পারস্যভাষা-শিক্ষা ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন; বাঘ ও বন্য শূকর শিকার করিয়া এবং মনে মনে আপনার সংকল্প স্থির করিয়া অবসরের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

গুরু গোবিন্দের শিষ্যেরা তাঁহার চারি দিকে জড়ো হইতে লাগিল। সমস্ত শিখজাতিকে একত্রে আহ্বান করিবার জন্য তিনি চারি দিকে তাঁহার শিষ্যদিগকে পাঠাইয়া দিলেন। এইরূপে সমস্ত পঞ্জাব হইতে বিস্তর লোক আসিয়া তাঁহাকে চারি দিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তিনি তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন, দেব-দৈত্য সকলেই নিজের উপাসনা প্রচলিত করিতে চায়; গোরখনাথ রামানন্দ প্রভৃতি ধর্মমতের প্রবর্তকেরা নিজের নিজের এক-একটা পন্থা বাহির করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিবার সময়ে মহম্মদ নিজের নাম উচ্চারণ করিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি, গোবিন্দ, ধর্মপ্রচার, পুণ্যের জয়-বিস্তার ও পাপের বিনাশ-সাধনের জন্য আসিয়াছেন। অন্যান্য মানুষও যেমন তিনিও তেমনি একজন; তিনি পিতা পরমেশ্বরের দাস; এই পরমাশ্চর্য জগতের একজন দর্শক মাত্র; তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া যে পূজা করিবে নরকে তাহার গতি হইবে। কোরান পুরাণ পাঠ করিয়া, প্রতিমা বা মৃত ব্যক্তির পূজা করিয়া, ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। শাস্ত্রে বা কোনো প্রকার পূজার কৌশলে ঈশ্বর মিলে না। বিনয়ে ও ভক্তিতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।

তিনি বলিলেন, 'আজ হইতে সমস্ত লোক এক হইয়া গেল। উচ্চ-নীচের প্রভেদ রহিল না। জাতিভেদ উঠিয়া গেল। সকলে অত্যাচারী তুর্ক জাতির বিনাশের ব্রত গ্রহণ করিলাম।'

জাতিভেদ উঠিয়া গেল শুনিয়া ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দের অনেকে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল, অনেকে রাগ করিয়া চলিয়া গেল। গোবিন্দ বলিলেন, 'যাহারা নীচে আছে তাহাদিগকে উঠাইব, যাহাদিগকে সকলে ঘৃণা করে তাহারা আমার পাশে স্থান পাইবে।' ইহা শুনিয়া নীচজাতির লোকেরা অত্যন্ত আনন্দ করিতে লাগিল। এই সময়ে গোবিন্দ সমস্ত শিখ জাতিকে সিংহ উপাধি দিলেন। কুড়ি হাজার লোক গোবিন্দের দলে রহিল।

এইরূপে গোবিন্দ শিখ জাতিকে নূতন উৎসাহে দীপ্ত করিয়া ধনমানের আশা বিসর্জন করিয়া নিজের সংকল্প-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। গোবিন্দের যদি মনের আশা থাকিত তাহা হইলে তিনি অনায়াসে আপনাকে দেবতা বলিয়া চালাইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। ধনের প্রতি গোবিন্দের বিরাগ সম্বন্ধে একটা গল্প আছে বলি। গোবিন্দের একজন ধনী শিষ্য তাঁহাকে পঞ্চাশ হাজার টাকার মূল্যের একজোড়া বলয় উপহার দিয়াছিল। গোবিন্দ তাহার মধ্য হইতে

একটি বলয় লইয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিলেন। দৈবাৎ পড়িয়া গেছে মনে করিয়া একজন শিখ পাঁচ শত টাকা পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া একজন ডুবারিকে সেই বলয় খুঁজিয়া আনিতে অনুরোধ করিল। সে বলিল, 'আমি খুঁজিয়া আনিতে পারি, যদি আমাকে ঠিক জায়গাটা দেখাইয়া দেওয়া হয়।' শিখ গোবিন্দকে ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বালা কোন্‌খানে পড়িয়া গেছে। গোবিন্দ অবশিষ্ট বালাটি লইয়া জলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন, 'ওইখানে।' শিখ তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া আর খুঁজিল না।

হিমালয়ের ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজাদের সঙ্গে গুরু গোবিন্দের এক যুদ্ধ হয়, তাহাতে গোবিন্দের জয় হয়। মুখোয়াল-নামক স্থানে থাকিয়া গোবিন্দ চারিটি নূতন দুর্গ নির্মাণ করিলেন। দুই বৎসর যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়া চারি দিকের অনেক দেশ জয় ও অধিকার করিলেন। পর্বতের রাজারা ইহাতে ভয় পাইয়া দিল্লীর সম্রাটের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এক দরখাস্ত পাঠাইয়া দিল। জবর্দস্ত খাঁ ও শম্‌স্‌ খাঁ নামক দুই আমীরকে সম্রাট পার্বত্য রাজাদের সাহায্যে নিয়োগ করিলেন। এইরূপে দুই মুসলমান আমীর এবং পর্বতের রাজারা একত্র হইয়া মুখোয়াল দুর্গ ঘিরিয়া ফেলিল। দুর্গের বাহিরে সাত মাস ধরিয়া ক্রমাগত যুদ্ধ চলিল। অবশেষে গোবিন্দ তাঁহার দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার আহার ফুরাইয়া গেল। তাহা ছাড়া গোবিন্দের অনুচরেরা তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। এ দিকে তাঁহার মা গুজরী একদিন রাত্রে গোবিন্দের দুটি ছেলে লইয়া পলাইয়া গেলেন। কিন্তু ছেলে দুটিকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। পথের মধ্যে সির্হিন্দ-নামক স্থানে মুসলমানেরা তাহাদিগকে জীবিত অবস্থায় পুঁতিয়া ফেলে। গুজরী সেই শোকে প্রাণত্যাগ করেন। এ দিকে আহারাভাবে গোবিন্দ অত্যন্ত বিপদে পড়িলেন। তাঁহার অনুচরেরা আর থাকিতে চাহে না। তিনি তাহাদিগকে ভীরু বলিয়া ভর্ৎসনা করিলেন। দুর্গের দরজা খুলিয়া ফেলিয়া বলিলেন, 'এসো, তবে আর-একবার যুদ্ধ করিয়া দেখা যাক। যদি মরি তাহা হইলে কীর্তি থাকিয়া যাইবে; যদি জয়লাভ করি তবে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইল। বীরের মতো মরিলে গৌরব আছে, ভীরুর মতো মরা হীনতা।' কিন্তু গোবিন্দের কথা কেহ মানিল না। তাঁহাকে একখানি চিঠি লিখিয়া অনুচরেরা দুর্গ হইতে বাহির হইয়া গেল। কেবল চল্লিশ জন গোবিন্দের সঙ্গে রহিল। গোবিন্দ তাহাদিগকে বলিলেন, 'তোমরাও যাও।' তাহারা বলিল, 'যে শিখেরা ছাড়িয়া পালাইয়াছে তাহাদিগকে মাপ করো গুরু, আমরা তোমার জন্য প্রাণ দিব।' এই চল্লিশ জন অনুচর সঙ্গে লইয়া মুখোয়াল হইতে পালাইয়া গুরু চমকৌর দুর্গে আশ্রয় লইলেন। সেখানেও বিপক্ষেরা তাঁহাদিগকে ঘিরিল। প্রাতঃকালে দুর্গের দ্বার খুলিয়া তাঁহারা মুসলমানদের উপর গিয়া পড়িলেন। বিপক্ষ-পক্ষের অনেকগুলিকে মারিলেন এবং তাঁহাদেরও অনেকগুলি মরিল। কেবল পাঁচ জন মাত্র বাকি রহিল। গোবিন্দের দুই পুত্র রণজিৎ ও অজিত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন। গোবিন্দ আবার পলায়ন করিলেন। বহুদিন ধরিয়া পথে অনেক বিপদ-আপদ সহ্য করিয়া অবশেষে গোবিন্দ একে একে পলাতক শিষ্যদিগকে সংগ্রহ করিয়া লইলেন। এইরূপে গোবিন্দের অধীনে বারো হাজার সৈন্য জড়ো হইল।

মুসলমানেরা এই খবর পাইয়া তাঁহাকে আবার আক্রমণ করিল। শিখেরা বলিল, 'এবার হয় জয় করিব নয় মরিব।' জয় হইল। মুকতসরের নিকট যুদ্ধে মুসলমানদের সম্পূর্ণ হার হইল। এই জয়ের খবর চারি দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। প্রত্যহ চারি দিক হইতে নূতন সৈন্য আসিয়া গোবিন্দের দলে প্রবেশ করিতে লাগিল।

সম্রাট আরঙ্গজীব তখন দক্ষিণে ছিলেন। গোবিন্দের জয়ের সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তাঁহার কাছে হাজির হইবার জন্য গোবিন্দকে এক আদেশপত্র পাঠাইয়া দিলেন। গোবিন্দ তাহার উত্তরে লিখিয়া পাঠাইলেন, 'তোমার উপরে আমার কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই। তুমি আমাদের প্রতি যে অন্যায়াচরণ করিয়াছ শিখেরা তাহার প্রতিশোধ লইবে।' গোবিন্দ তাঁহার পত্রে, মোগলেরা শিখগুরুদিগের প্রতি যে-সকল অত্যাচার করিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া বলিলেন,

'আমার সন্তানেরা বিনষ্ট হইয়াছে; আমার পৃথিবীর সমস্ত বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়াছে; মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিয়া আছি; আমি কাহাকেও ভয় করি না, ভয় করি কেবল জগতের একমাত্র সম্রাট রাজার রাজাকে। ভগবানের নিকট দরিদ্রের প্রার্থনা বিফল হয় না; তুমি যে-সকল অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতাচরণ করিয়াছ একদিন তাহার হিসাব দিতে হইবে।' এই পত্রে গোবিন্দ সম্রাটকে লিখিয়াছিলেন যে, 'তুমি হিন্দুদিগকে মুসলমান করিয়া থাক, আমি মুসলমানদিগকে হিন্দু করিব। তুমি আপনাকে নিরাপদ ভাবিয়া সুখে আছ, কিন্তু সাবধান, আমি চড়াই পাখিকে শিখাইব বাজপাখিকে কী করিয়া ভূমিশায়ী করিতে হয়!' পাঁচ জন শিখের হাত দিয়া এই চিঠি গোবিন্দ সম্রাটের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। সম্রাট সেই চিঠি পড়িয়া ক্রুদ্ধ না হইয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন ও সেই পাঁচ জন শিখের হাত দিয়া গোবিন্দকে চিঠি ও সওগাত পাঠাইয়া দিলেন। চিঠিতে লিখিয়া দিলেন যে, গোবিন্দ যদি দাক্ষিণাত্যে আসেন তবে সম্রাট তাঁহাকে সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিবেন। এই চিঠি পাইয়া গোবিন্দ কিছুদিন শান্তি উপভোগ করিতে লাগিলেন। অবশেষে আরঙ্জীবের সহিত সাক্ষাৎ করাই স্থির করিলেন ও সেই অভিপ্রায়ে দক্ষিণে যাত্রা করিলেন। তিনি যখন পথে তখন আরঙ্জীবের মৃত্যু হইয়াছে। দক্ষিণে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বাহাদুরশা সম্রাট হইয়াছেন। বাহাদুরশা বহুবিধ সওগাত উপহার দিয়া গোবিন্দকে পাঁচ হাজার অশ্বারোহীর অধিপতি করিয়া দিলেন।

গোবিন্দের মৃত্যুঘটনা বড়ো শোচনীয়। কেহ কেহ বলে, ক্রমাগত শোকে বিপদে নিরাশায় অভিভূত হইয়া গোবিন্দ শেষ দশায় কতকটা পাগলের মতো হইয়াছিলেন ও জীবনের প্রতি তাঁহার অতিশয় বিরাগ জন্মিয়াছিল। একদিন একজন পাঠান তাঁহার নিকট একটি ঘোড়া বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল; গোবিন্দ সেই ঘোড়া কিনিয়া তাহার দাম দিতে কিছুদিন বিলম্ব করিয়াছিলেন। অবশেষে পাঠান ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে গালি দিয়া তরবারি লইয়া আক্রমণ করিল। গোবিন্দ পাঠানের হাত হইতে তরবারি কাড়িয়া লইয়া তাহাকে কাটিয়া ফেলিলেন।

এই অন্যায় কার্য করিয়া তাঁহার অত্যন্ত অনুতাপ উপস্থিত হইল। তিনি সেই পাঠানের পুত্রকে অনেক অর্থ দান করিলেন। তাহাকে তিনি যথেষ্ট স্নেহ করিতেন এবং তাহার সহিত খেলা করিতেন। একদিন সেই পাঠান-তনয়কে তিনি বলিলেন, 'আমি তোমার পিতাকে বধ করিয়াছি, তুমি যদি তাহার প্রতিশোধ না লও তবে তুমি কাপুরুষ ভীরু।' কিন্তু সেই পাঠান গোবিন্দকে অত্যন্ত মান্য করিত, এইজন্য সে গোবিন্দের হানি না করিয়া মনে মনে পালাইবার সংকল্প করিল।

আর-একদিন সেই পাঠানের সহিত শতরঞ্চ খেলিতে খেলিতে গোবিন্দ তাহাকে তাহার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে উত্তেজিত করিয়া দিলেন। সে আর থাকিতে না পারিয়া গোবিন্দের পেটে ছুরি বসাইয়া দিল।

গোবিন্দের অনুচরেরা সেই পাঠানকে ধরিবার জন্য চারি দিক হইতে ছুটিয়া আসিল। গোবিন্দ তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া বলিলেন, 'আমি উহার কাছে অপরাধ করিয়াছিলাম, ও তাহার প্রতিশোধ দিয়াছে। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য আমিই উহাকে এইরূপ পরামর্শ দিয়াছিলাম। উহাকে তোমরা ধরিয়ো না।'

অনুচরেরা গোবিন্দের ক্ষতস্থান সেলাই করিয়া দিল। কিন্তু জীবনের প্রতি বিরক্ত হইয়া গোবিন্দ এক দৃঢ় ধনুক লইয়া সবলে নোওয়াইয়া ধরিলেন, সেই চেষ্টাতেই তাঁহার ক্ষতস্থানে সেলাই ছিঁড়িয়া গেল ও তাঁহার মৃত্যু হইল।

গোবিন্দ যে সংকল্প সিদ্ধ করিতে তাঁহার জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন সে সংকল্প বিফল হইল বটে, কিন্তু তিনিই প্রধানত শিখদিগকে যোদ্ধৃজাতি করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে একদিন শিখেরা স্বাধীন হইয়াছিল; সে স্বাধীনতার দ্বার তিনিই উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়াছিলেন।

বালক
শ্রাবণ ১২৯২

শিখ-স্বাধীনতা

গুরু গোবিন্দই শিখদের শেষ গুরু। তিনি মরিবার সময় বন্দা-নামক এক বৈরাগীর উপরে শিখদের কর্তৃত্বভার দিয়া যান। তিনি যে সংকল্প অসম্পূর্ণ রাখিয়া যান সেই সংকল্প পূর্ণ করিবার ভার বন্দার উপরে পড়িল। অত্যাচারী বিদেশীদের হাত হইতে স্বজাতিকে পরিত্রাণ করা গোবিন্দের এক ব্রত ছিল, সেই ব্রত বন্দা গ্রহণ করিলেন।

বন্দার চতুর্দিকে শিখেরা সমবেত হইতে লাগিল। বন্দার প্রতাপে সমস্ত পঞ্জাব কম্পিত হইয়া উঠিল। বন্দা সির্হিন্দ হইতে মোগলদের তাড়াইয়া দিলেন। সেখানকার শাসনকর্তাকে বধ করিলেন। সির্‌মুরে তিনি এক দুর্গ স্থাপন করিলেন। শতদ্রু এবং যমুনার মধ্যবর্তী প্রদেশ অধিকার করিয়া লইলেন, এবং জিলা সাহারানপুর মরুভূমি করিয়া দিলেন।

মুসলমানদের সঙ্গে মাঝে মাঝে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। লাহোরের উত্তরে জম্বু পর্বতের উপরে বন্দা নিবাস স্থাপন করিলেন, পঞ্জাবের অধিকাংশই তাঁহার আয়ত্ত হইল।

এই সময়ে দিল্লির সম্রাট বাহাদুরশা'র মৃত্যু হইল। তাঁহার সিংহাসন লইয়া তাঁহার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে গোলযোগ চলিতে লাগিল। এই সুযোগে শিখেরা সমবেত হইয়া বিপাশা ও ইরাবতীর মধ্যে গুরুদাসপুর নামক এক বৃহৎ দুর্গ স্থাপন করিল।

লাহোরের শাসনকর্তা বন্দার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে মুসলমানদের জয় হইল। এই জয়ের পর সির্হিন্দে একদল শিখসৈন্য পুনর্বার প্রেরিত হইল। সেখানকার শাসনকর্তা বয়াজিদ্ খাঁ শিখদিগকে আক্রমণ করিলেন। একজন শিখ গোপনে বয়াজিদের তাম্বুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে নিহত করিল; দিল্লির সম্রাট কাশ্মীরের শাসনকর্তা আবদুল সম্মদ খাঁ নামক এক পরাক্রান্ত তুরানিকে শিখদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। দিল্লি হইতে তাঁহার সাহায্যার্থে এক দল বাছা বাছা সৈন্য প্রেরিত হইল। সম্মদ্ খাঁও সহস্র সহস্র স্বজাতীয় তুরানি সৈন্য লইয়া যাত্রা করিলেন। লাহোর হইতে কামান-শ্রেণী সংগ্রহ করিয়া তিনি শিখদিগের উপরে গিয়া পড়িলেন। শিখেরা প্রাণপণে যুদ্ধ করিল। আক্রমণকারীদের বিস্তর সৈন্য নষ্ট হইল। কিন্তু অবশেষে পরাজিত হইয়া বন্দা গুরুদাসপুরের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শত্রুসৈন্য তাঁহার দুর্গ সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া ফেলিল। দুর্গে খাদ্য-যাতায়াত বন্ধ হইল। সমস্ত খাদ্য এবং অখাদ্য পর্যন্ত যখন নিঃশেষ হইয়া গেল তখন বন্দা শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। ৭৪০ জন শিখ বন্দী হইল। কথিত আছে, যখন বন্দীগণ লাহোরের পথ দিয়া যাইতেছিল তখন বয়াজিদ্ খাঁর বৃদ্ধা মাতা তাহার পুত্রের হত্যাকারীর মস্তকে পাথর ফেলিয়া দিয়া বধ করিয়াছিল। বন্দা যখন দিল্লিতে নীত হইলেন তখন শত্রুরা শিখদের ছিন্নশির বর্শাফলকে করিয়া তাঁহার আগে আগে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল। প্রতিদিন একশত করিয়া শিখ বন্দী বধ করা হইত। একজন মুসলমান ঐতিহাসিক লিখিয়াছিলেন যে, 'শিখেরা মরিবার সময় কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করে নাই; কিন্তু অধিকতর আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আগে মরিবার জন্য তাহারা আপনা-আপনির মধ্যে বিবাদ ও তর্ক করিত। এমন-কি, এইজন্য তাহারা ঘাতকের সঙ্গে ভাব করিবার চেষ্টা করিত।' অষ্টম দিনে বন্দা বিচারকের সমক্ষে আনীত হইলেন। একজন মুসলমান আমীর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এমন বুদ্ধিমান্ ও শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও এত পাপাচরণে তোমার মতি হইল কী করিয়া?' বন্দা বলিলেন, 'পাপীর শাস্তি-বিধানের জন্য ঈশ্বর আমাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের আদেশের বিরুদ্ধে যাহা-কিছু কাজ করিয়াছি তাহার জন্য আবার আমারও শাস্তি হইতেছে।' বিচারকের আদেশে তাঁহার ছেলেকে তাঁহার কোলে বসাইয়া দেওয়া হইল। তাঁহার হাতে ছুরি দিয়া স্বহস্তে নিজের ছেলেকে কাটিতে হুকুম হইল। অবিচলিত ভাবে নীরবে তাঁহার ক্রোড়স্থ ছেলেকে বন্দা বধ করিলেন। অবশেষে দগ্ধ লৌহের সাঁড়াশি দিয়া তাঁহার মাংস

ছিঁড়িয়া তাঁহাকে বধ করা হইল।

বন্দার মৃত্যুর পর মোগলেরা শিখদের প্রতি নিদারুণ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। প্রত্যেক শিখের মাথার জন্য পুরস্কার-স্বরূপ মূল্য ঘোষণা করা হইল।

শিখেরা জঙ্গলে ও দুর্গম স্থানে আশ্রয় লইল। প্রতি ছয় মাস অন্তর তাহারা একবার করিয়া অমৃতসরে সমবেত হইত। পথের মধ্যে যে-সকল জমিদার ছিল তাহারা ইহাদিগকে পথের বিপদ হইতে রক্ষা করিত। এই ষাণ্মাসিক মিলনের পর আবার তাহারা জঙ্গলে ছড়াইয়া পড়িত।

পঞ্জাব জঙ্গলে আবৃত হইয়া উঠিল। নাদিরশা আফগানিস্থান হইতে ভারতবর্ষে আসিবার সময় পঞ্জাব দিয়া আসিতেছিলেন। নাদিরশা জিজ্ঞাসা করিলেন, শিখদের বাসস্থান কোথায়? পঞ্জাবের শাসনকর্তা উত্তর করিলেন, ঘোড়ার পৃষ্ঠের জিনই শিখদের বাসস্থান।

নাদিরশাহের ভারত-আক্রমণকালে শিখেরা ছোটো ছোটো দল বাঁধিয়া তাঁহার পশ্চাদ্‌বর্তী পারসিক সৈন্যদলকে আক্রমণ করিয়া লুটপাট করিতে লাগিল। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধবিগ্রহে রত হইয়া শিখেরা পুনশ্চ দুঃসাহসিক হইয়া উঠিল। এখন তাহারা প্রকাশ্যভাবে শিখতীর্থ অমৃতসরে যাতায়াত করিতে লাগিল। একজন মুসলমান লেখক বলেন— প্রায়ই দেখা যায়, অশ্বারোহী শিখ পূর্ণবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া তাহাদের তীর্থ উপলক্ষে চলিয়াছে। কখনো কখনো কেহ বা ধৃতও হইত, কেহ বা হতও হইত, কিন্তু কখনো এমন হয় নাই যে, একজন শিখ ভয়ে তাহার স্বধর্ম ত্যাগ করিয়াছে। অবশেষে শিখেরা উত্তরোত্তর নির্ভীক হইয়া ইরাবতীর তীরে এক ক্ষুদ্র দুর্গ স্থাপন করিল। ইহাতেও মুসলমানেরা বড়ো একটা মনোযোগ দিল না। কিন্তু তাহারা যখন বৃহৎ দল বাঁধিয়া আমিনাবাদের চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থানে কর আদায় করিতে সমবেত হইল, তখন মুসলমান সৈন্য তাহাদের আক্রমণ করিল। কিন্তু মুসলমানেরা পরাজিত হইল ও তাহাদের সেনাপতি বিনষ্ট হইল। মুসলমানেরা অধিকসংখ্যক সৈন্য লইয়া দ্বিতীয়বার আক্রমণ করিল ও শিখদিগকে পরাভূত করিল। লাহোরে এই উপলক্ষে বিস্তর শিখবন্দী নিহত হয়। যেখানে এই বধকার্য সমাধা হয় লাহোরের সেই স্থান সুহিদগঞ্জ নামে অভিহিত। এখনও সেখানে ভাই তরুসিংহের কবরস্থান আছে। কথিত আছে, তরুসিংহকে তাঁহার দীর্ঘ কেশ ছেদন করিয়া শিখধর্ম ত্যাগ করিতে বলা হয়। কিন্তু গুরু গোবিন্দের এই বৃদ্ধ অনুচর তাঁহার ধর্ম ত্যাগ করিতে অসম্মত হইলেন এবং শিখদের শাস্ত্রানুমোদিত জাতীয় চিহ্নস্বরূপ দীর্ঘ কেশ ছেদন করিতে রাজি হইলেন না। তিনি বলিলেন, 'চুলের সঙ্গে খুলির সঙ্গে এবং খুলির সঙ্গে মাথার সঙ্গে যোগ আছে। চুলে কাজ কী, আমি মাথাটা দিতেছি।'

এইরূপে ক্রমাগত জয়পরাজয়ের মধ্যে সমস্ত শিখ জাতি আন্দোলিত হইতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই তাহারা নিরুদ্যম হইল না। এক সময়ে যখন তাহারা সির্হিন্দের শাসনকর্তা জেইন খাঁর উপরে ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ দিবার উদ্‌যোগ করিতেছিল। এমন সময়ে দুর্দান্তপরাক্রম পাঠান আমেদশা তাঁহার বৃহৎ সৈন্যদলসমেত তাহাদের উপর আসিয়া পড়িলেন। এই যুদ্ধে শিখদের সম্পূর্ণ পরাজয় হয়, তাহাদের বিস্তর লোক মারা যায়। আমেদশা অমৃতসরের শিখ-মন্দির ভাঙিয়া দিলেন। গোরক্ত ঢালিয়া অমৃতসরের সরোবর অপবিত্র করিয়া দিলেন। শিখদের ছিন্ন শির স্তূপাকার করিয়া সজ্জিত করিলেন। এবং কাফের শত্রুদের রক্তে মসজিদের ভিত্তি ধৌত করিয়া দিলেন।

কিন্তু ইহাতেও শিখেরা নিরুদ্যম হইল না। প্রতিদিন তাহাদের দল বাড়িতে লাগিল। প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি সমস্ত জাতির হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। প্রথমে তাহারা কসুর-নামক পাঠানদের উপনিবেশ আক্রমণ, লুণ্ঠন ও গ্রহণ করিল। তাহার পরে তাহারা সির্হিন্দে অগ্রসর হইল। সেখানকার শাসনকর্তা জেইন খাঁর সহিত যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধে পাঠান পরাজিত ও নিহত হইল। শতদ্রু হইতে যমুনা পর্যন্ত সির্হিন্দ প্রদেশ শিখদের করতলস্থ হইল। লাহোরের শাসনকর্তা কাবুলি-মলকে শিখেরা দূর করিয়া দিল। ঝিলম হইতে শতদ্রু পর্যন্ত সমস্ত পঞ্জাব শিখদের হাতে

আসিল। এই বিস্তৃত ভূখণ্ড সর্দারেরা মিলিয়া ভাগ করিয়া লইলেন। শিখেরা বিস্তর মসজিদ ভাঙিয়া ফেলিল। শৃঙ্খলবদ্ধ আফগানদের দ্বারা শূকররক্তে মসজিদ-ভিত্তি ধৌত করানো হইল। সর্দারেরা অমৃতসরে সম্মিলিত হইয়া আপনাদের প্রভাব প্রচার এবং শিখমুদ্রা প্রচলিত করিলেন।

এতদিন পরে শিখেরা সম্পূর্ণ স্বাধীন হইল। গুরু গোবিন্দের উদ্দেশ্য কিয়ৎপরিমাণে সফল হইল। তার পরে রণজিৎ সিংহের অভ্যুদয়। তার পরে ব্রিটিশ-সিংহের প্রতাপ। তার পরে ধীরে ধীরে সমস্ত ভারতবর্ষ লাল হইয়া গেল। রণজিতের বিখ্যাত ভবিষ্যদ্‌বাণী সত্য হইল। সে-সকল কথা পরে হইবে।

বালক
আশ্বিন-কার্তিক ১২৯২

গ্রন্থসমালোচনা

ভারতবর্ষের ইতিহাস। শ্রীহেমলতা দেবী। মূল্য আট আনা।

বিধাতা স্ত্রীজাতিকে এত কোমল করিয়াছেন, যে সেই কোমলতার অবশ্যসহচর দুর্বলতার দ্বারা তাহারা অসহায় এবং পরাধীন। তথাপি তাহা যুগ যুগান্তর চলিয়া আসিতেছে, তাহার কারণ ছেলেদের মানুষ করিবার জন্য এই কোমলতা অত্যাবশ্যক। মাকে কোমলকান্ত করিয়া বিধাতা বলিয়াছেন বাল্যাবস্থায় মাধুর্যের আনন্দচ্ছটা এবং স্নেহের সুধাভিষেকে মানুষ পালনীয়। পীড়ন, শাসন, সংকীর্ণ নিয়মের লৌহশৃঙ্গল তখনকার উপযোগী নয়। খাওয়ানো পরানো সম্বন্ধীয় মানুষ করা চিরকাল এইভাবেই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইতিমধ্যে মানুষের মনুষ্যত্ব বিপুল বিস্তার লাভ করিয়াছে। মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এখন মানুষ-করা ব্যাপারটা জটিল হইয়া উঠিয়াছে। এখন কেবল অন্নপান নহে বিদ্যাদানেরও প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু বিধাতার নিয়ম সমান আছে। বাল্যাবস্থায় বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গেও আনন্দের স্বাভাবিক স্ফূর্তি এবং স্বাধীনতা অত্যাবশ্যক। কিন্তু অবস্থাগতিকে পুরুষের হাতে বিদ্যাদানের ভার পড়িয়া জগতে বহুল দুঃখ এবং অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। বালকের স্বাভাবিক মুগ্ধতার প্রতি পুরুষের ধৈর্য নাই, শিশুচরিত্রের মধ্যে পুরুষের সস্নেহ প্রবেশাধিকার নাই। আমাদের পাঠালয় এবং পাঠ্যনির্বাচনসমিতি তাহার নিষ্ঠুর দৃষ্টান্ত। এইজন্য মানুষের বাল্যজীবন নিদারুণ নিরানন্দের আকর হইয়া উঠিয়াছে। পুনরায় শিশু হইয়া জন্মিয়া বিদ্যালাভ করিতে হইবে এই ভয়ে পুনর্জন্মে বিশ্বাস করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। আমাদের মত এই যে, মা মাসি দিদিরাই অন্নপান ও জ্ঞান শিক্ষার দ্বারা বিশেষ বয়স পর্যন্ত ছেলেদের সর্বতোভাবে পালন পোষণ করিবেন। তাহাই তাঁহাদের কর্তব্য। বেত্রবজ্রধর গুরুমহাশয় তাঁহাদের স্নেহস্বর্গের অধিকার হরণ করিয়া লইয়াছে। ছেলে যখন কাঁদিতে কাঁদিতে পাঠশালায় যায় তখন মাকে কি কাঁদাইয়া যায় না? এই প্রকৃতিদ্রোহী অবস্থা কি চিরদিন জগতে থাকিবে?

সমালোচ্য বাল্যপাঠ্যগ্রন্থখানি শিক্ষিত মহিলার রচনা বলিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। পূর্বেই বলিয়াছি শিশুদিগকে শিক্ষা দান তাঁহাদের শিক্ষালাভের একটি প্রধান সার্থকতা। অধুনা আমাদের দেশের অনেক স্ত্রীলোক উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতেছেন, তাঁহাদের সেই শিক্ষা যদি তাঁহারা মাতৃভাষায় বিতরণ করেন তবে বঙ্গগৃহের লক্ষ্মীমূর্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের সরস্বতীমূর্তি বিকশিত হইয়া উঠিবে।

শ্রীমতী হেমলতা দেবী যে ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন স্কুলে প্রচলিত সাধারণ ইতিহাসের অপেক্ষা দুই কারণে তাহা শ্রেষ্ঠ। প্রথমত তাহার ভাষা সরল, দ্বিতীয়ত ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাসের একটি চেহারা দেখাইবার জন্য গ্রন্থকর্ত্রী প্রয়াস পাইয়াছেন। আমাদের মতে ইতিহাসের নামাবলী ও ঘটনাবলী মুখস্থ করাইবার পূর্বে আর্য ভারতবর্ষ, মুসলমান ভারতবর্ষ

এবং ইংরেজ ভারতবর্ষের একটি পুঞ্জীভূত সরস সম্পূর্ণ চিত্র ছেলেদের মনে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া উচিত। তবেই তাহারা বুঝিতে পারিবে ঐতিহাসিক হিসাবে ভারতবর্ষ জিনিসটা কী। এমন-কি, আমরা বলি, ভারতবর্ষের ভূগোল ইতিহাস এবং সমস্ত বিবরণ জড়াইয়া শুদ্ধমাত্র 'ভারতবর্ষ' নাম দিয়া একখানি বই প্রথমে ছেলেদের পড়িতে দেওয়া উচিত। পরে ভারতবর্ষের ভূগোল ও ইতিহাস পৃথকভাবে ও তন্ন তন্ন রূপে শিক্ষা দিবার সময় আসিবে। আমরা বোধ করি ইংরাজিতে এরূপ গ্রন্থের বিস্তৃত আদর্শ সার্ উইলিয়ম্ হন্টারের 'ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার'। এই সুসম্পূর্ণ সুন্দর পুস্তকটিকে যদি কোনো শিক্ষিত মহিলা শিশুদের অথবা তাহাদের পিতামাতাদের উপযোগী করিয়া বাংলায় রচনা করেন তবে বিস্তর উপকার হয়।

কিন্তু টেক্সট্‌বুক্ কমিটির খাতিরে গ্রন্থকর্ত্রী তাঁহার বইখানিকে যে সম্পূর্ণ নিজের মনের মতো করিয়া লিখিতে পারেন নাই তাহা বেশ বুঝা যায়। ইস্কুলে ছেলেদের যে-সকল সম্পূর্ণ অনাবশ্যক শুষ্ক তথ্য মুখস্থ করিতে দেওয়া হয় লেখিকা তাহার সকলগুলি বর্জন করিতে সাহসী হন নাই। আমরা ভরসা করিয়া বলিতে পারি যে, মোগল রাজত্বের পূর্বে তিনশত বৎসরব্যাপী কালরাত্রে ভারত সিংহাসনে দাসবংশ হইতে লোদিবংশ পর্যন্ত পাঠান রাজন্যবর্গের যে রক্তবর্ণ উল্কাবৃষ্টি হইয়াছে তাহা আদ্যোপান্ত কাহারই বা মনে থাকে। এবং মনে রাখিয়াই বা ফল কী? অন্তত এ ইতিহাসে তাহার একটা মোটামুটি বর্ণনা থাকিলেই ভালো হইত। নীরস ইংরাজ শাসনকাল সম্বন্ধেও আমাদের এই মত।

ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থে আর্য-ইতিবৃত্তের তারিখ সম্বন্ধে মৌনাবলম্বনই শ্রেয়। 'খৃষ্ট জন্মের প্রায় ২০০০ বৎসর পূর্বে আর্যগণ উত্তর-পশ্চিম দিক্ দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন", "ভারতবর্ষে আসিবার একহাজার বৎসর পরে তাঁহারা মিথিলা প্রদেশ পর্যন্ত আসিয়াছিলেন"— এ-সমস্ত সম্পূর্ণ আনুমানিক কালনির্দেশ আমরা অসংগত জ্ঞান করি।

সিরাজদৌল্লার রাজ্যশাসনকালে অন্ধকূপহত্যার বিবরণ লেখিকা অসংশয়ে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি যদি শ্রীযুক্তবাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রের "সিরাজদ্দৌলা" পাঠ করিতেন তবে এ ঘটনাকে ইতিহাসে স্থান দিতে নিশ্চয়ই কুণ্ঠিত হইতেন।

ভারতী
জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫

মুর্শিদাবাদ কাহিনী। শ্রীনিখিলরায় প্রণীত। মূল্য কাগজে বাঁধা দুই টাকা, কাপড়ে বাঁধা ২ টাকা আট আনা।

মুসলমানের রাজত্ব গিয়াছে অথচ কোথাও তাহার জন্য শূন্য স্থান নাই। ইংরাজ রাজত্বের রেলের বাঁশি, স্টীমারের বাঁশি, কারখানার বাঁশি চারি দিকে বাজিয়া উঠিয়াছে— চারি দিকে আপিস ঘর, আদালত ঘর, থানা ঘর মাথা তুলিতেছে, ইংরাজের নূতন চুনকামকরা ফিট্‌ফাট্ ধব্‌ধবে প্রতাপ দেশ জুড়িয়া ভিত্তি গাড়িয়াছে— কোথাও বিচ্ছেদ নাই। তথাপি নিখিলবাবুর মুর্শিদাবাদকাহিনী পড়িতে পড়িতে মনে হয়, এই নূতন কর্মকোলাহলময় মহিমা মরীচিকাবৎ নিঃশব্দে অন্তর্হিত, তাহার পাটের কলের সমস্ত বাঁশি নীরব, কেবল আমাদের চতুর্দিকে মুসলমানদের পরিত্যক্ত পুরীর প্রকাণ্ড ভগ্নাবশেষ নিস্তব্ধ দাঁড়াইয়া। নিঃশব্দ নহবৎখানা, হস্তীহীন হস্তীশালা, প্রভুশূন্য রাজতক্ত, প্রজাশূন্য আম্ দরবার, নির্বাণদীপ বেগম মহল একটি পরম বিষাদময় বৈরাগ্যময় মহত্ত্বে বিরাজ করিতেছে। মুসলমান রাজলক্ষ্মী যেন শতাধিক বৎসর পরে তাহার সেই অনাথ পুরীর মধ্যে গোপনে প্রবেশ করিয়া একে একে তাহার পূর্বপরিচিত কীর্তিমালার ভগ্ন চিহ্নসকল অনুসরণ করিয়া সনিশ্বাসে দূরস্মৃতি আলোচনায় নিরত হইয়াছে।

নিখিলবাবু তাঁহার অধিকাংশ প্রবন্ধে সেকাল একালের তুলনা বা ভালোমন্দ বিচারের অবতারণা করেন নাই। তিনি সেই প্রাচীন কালকে খণ্ড খণ্ড চিত্র আকারে নিবদ্ধ করিয়া পাঠকদের

সম্মুখে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বইখানি যেন নবাবী আমলের ভগ্নশেষের অ্যালবম্‌। চিত্রগুলি সেদিনকার অসীম ঐশ্বর্য এবং বিচিত্রব্যাপারসংকুল মহৎ প্রতাপের অবসানদশার জন্য একটি স্নিগ্ধ করুণা এবং গভীর বিষাদের উদ্রেক করিতেছে।

এ প্রকার ঐতিহাসিক চিত্রগ্রন্থ বঙ্গভাষায় আর নাই। নিখিলবাবুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া যদি ভিন্ন ভিন্ন জেলা-নিবাসী লেখকগণ তাঁহাদের স্থানীয় প্রাচীন ঐতিহাসিক চিত্রাবলী সংকলন করিতে থাকেন তাহা হইলে বাংলাদেশের সহিত বঙ্গবাসীর যথার্থ সুদূরব্যাপী পরিচয় সাধন হইতে পারে। নিখিলবাবুর এই সদৃষ্টান্ত, তাঁহার এই গবেষণা ও অধ্যবসায়ের জন্য বঙ্গসাহিত্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

এই বৃহৎ গ্রন্থে কেবল একটি নিন্দার বিষয় উল্লেখ করিবার আছে। নিখিলবাবু যেখানে সরলভাবে ঐতিহাসিক তথ্য বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহার রচনা অব্যাহত ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু যেখানে তিনি অলংকার প্রয়োগের প্রয়াস পাইয়াছেন সেখানে তাঁহার লেখার লাবণ্য বৃদ্ধি হয় নাই, পরন্তু তাহা ভারগ্রস্ত হইয়াছে।

ভারতী
শ্রাবণ ১৩০৫

ঐতিহাসিক চিত্র

ঐতিহাসিক চিত্রের সূচনা লিখিবার জন্য সম্পাদক-দত্ত অধিকার পাইয়াছি, আর কোনো প্রকারের অধিকারের দাবি রাখি না। কিন্তু আমাদের দেশের সম্পাদক ও পাঠকবর্গ লেখকগণকে যেরূপ প্রচুর পরিমাণে প্রশ্রয় দিয়া থাকেন তাহাতে অনধিকার প্রবেশকে আর অপরাধ বলিয়া জ্ঞান হয় না।

এই ঐতিহাসিক পত্রে আমি যদি কিছু লিখিতে সাহস করি তবে তাহা সংক্ষিপ্ত সূচনাটুকু। কোনো শুভ অনুষ্ঠানের উৎসব-উপলক্ষে ঢাকীকে মন্ত্রও পড়িতে হয় না, পরিবেশনও করিতে হয় না— সিংহদ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া সে কেবল আনন্দধ্বনি ঘোষণা করিতে থাকে। সে যদিচ কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে কেহই নহে, কিন্তু সর্বাগ্রে উচ্চকলরবে কার্যারম্ভের সূচনা তাহারই হস্তে।

যাঁহারা কর্মকর্তা, গীতা তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন যে : কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। অর্থাৎ, কর্মেই তোমার অধিকার আছে, ফলে কদাচ নাই। আমরা কর্মকর্তা নহি। আমাদের একটা সুবিধা এই যে, কর্মে আমাদের অধিকার নাই, কিন্তু ফলে আছে! সম্পাদক মহাশয় যে অনুষ্ঠান ও যেরূপ আয়োজন করিয়াছেন তাহার ফল বাংলার, এবং আশা করি অন্য দেশের, পাঠকমণ্ডলী চিরকাল ভোগ করিতে পারিবেন।

অদ্য 'ঐতিহাসিক চিত্রে'র শুভ জন্মদিনে আমরা যে আনন্দ করিতে উদ্যত হইয়াছি তাহা কেবলমাত্র সাহিত্যের উন্নতিসাধনের আশ্বাসে নহে। তাহার আর-একটি বিশেষ কারণ আছে।

পরের রচিত ইতিহাস নির্বিচারে আদ্যোপান্ত মুখস্থ করিয়া পণ্ডিত এবং পরীক্ষায় উচ্চ নম্বর রাখিয়া কৃতী হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু স্বদেশের ইতিহাস নিজেরা সংগ্রহ এবং রচনা করিবার যে উদ্‌যোগ সেই উদ্‌যোগের ফল কেবল পাণ্ডিত্য নহে। তাহাতে আমাদের দেশের মানসিক বদ্ধ জলাশয়ে স্রোতের সঞ্চার করিয়া দেয়। সেই উদ্যমে, সেই চেষ্টায় আমাদের স্বাস্থ্য— আমাদের প্রাণ।

বঙ্গদর্শনের প্রথম অভ্যুদয়ে বাংলাদেশের মধ্যে একটি অভূতপূর্ব আনন্দ ও আশার সঞ্চার হইয়াছিল, একটি সুদূরব্যাপী চাঞ্চল্যে বাংলার পাঠকহৃদয় যেন কল্লোলিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে আনন্দ স্বাধীন চেষ্টার আনন্দ। সাহিত্য যে আমাদের আপনাদের হইতে পারে, সেদিন তাহার ভালোরূপ প্রমাণ হইয়াছিল। আমরা সেদিন ইস্কুল হইতে, বিদেশী মাস্টারের শাসন হইতে, ছুটি

পাইয়া ঘরের দিকে ফিরিয়াছিলাম।

বঙ্গদর্শন হইতে আমরা 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর', 'কমলাকান্তের দপ্তর' এবং বিবিধ ভোগ্য বস্তু পাইয়াছি, সে আমাদের পরম লাভ বটে। কিন্তু সকলের চেয়ে লাভের বিষয় সাহিত্যের সেই স্বাধীন চেষ্টা। সেই অবধি আজ পর্যন্ত সে চেষ্টার আর বিরাম হয় নাই। আমাদের সাহিত্যের ভাবী আশার পথ চিরদিনের জন্য উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে।

বঙ্গদর্শন আমাদের সাহিত্যপ্রাসাদের বড়ো সিংহদ্বারটা খুলিয়া দিয়াছিলেন। এখন আবার তাহার এক-একটি মহলের চাবি খুলিবার সময় আসিয়াছে। 'ঐতিহাসিক চিত্র' অদ্য 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' নামক একটা প্রকাণ্ড রুদ্ধবাতায়ন রহস্যাবৃত হর্ম্যশ্রেণীর দ্বারদেশে দণ্ডায়মান।

সম্পাদক-মহাশয় তাঁহার প্রস্তাবনাপত্রে জানাইয়াছেন— 'নানা ভাষায় লিখিত ভারতভ্রমণ-কাহিনী এবং ইতিহাসাদি প্রামাণ্য গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ, অনুসন্ধানলব্ধ নবাবিষ্কৃত ঐতিহাসিক তথ্য, আধুনিক ইতিহাসাদির সমালোচনা এবং বাঙালি রাজবংশ ও জমিদারবংশের পুরাতত্ত্ব প্রকাশিত করাই মুখ্য উদ্দেশ্য।'

এই তো প্রত্যক্ষ ফল। তাহার পর পরোক্ষ ফল সম্বন্ধে আশা করি যে, এই পত্র আমাদের দেশে ঐতিহাসিক স্বাধীন চেষ্টার প্রবর্তন করিবে। সেই চেষ্টাকে জন্ম দিতে না পারিলে, 'ঐতিহাসিক চিত্র' দীর্ঘকাল আপন মাহাত্ম্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে না— সমস্ত দেশের সহকারিতা না পাইলে ক্রমে সংকীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া লুপ্ত হইবে। সেই চেষ্টাকে জন্ম দিয়া যদি 'ঐতিহাসিক চিত্রে'র মৃত্যু হয়, তথাপি সে চিরকাল অমর হইয়া থাকিবে।

সমস্ত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আশা করিতে পারি না, কিন্তু বাংলার প্রত্যেক জেলা যদি আপন স্থানীয় পুরাবৃত্ত সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে, প্রত্যেক জমিদার যদি তাহার সহায়তা করেন এবং বাংলার রাজবংশের পুরাতন দপ্তরে যে-সকল ঐতিহাসিক তথ্য প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে 'ঐতিহাসিক চিত্র' তাহার মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে, তবেই এই ত্রৈমাসিক পত্র সার্থকতা প্রাপ্ত হইবে।

এখন সংগ্রহ এবং সমালোচনা ইহার প্রধান কাজ। সমস্ত জনশ্রুতি, লিখিত এবং অলিখিত, তুচ্ছ এবং মহৎ, সত্য এবং মিথ্যা— এই পত্রভাণ্ডারে সংগ্রহ হইতে থাকিবে। যাহা তথ্য-হিসাবে মিথ্যা অথবা অতিরঞ্জিত, যাহা কেবল স্থানীয় বিশ্বাস-রূপে প্রচলিত, তাহার মধ্যেও অনেক ঐতিহাসিক সত্য পাওয়া যায়। কারণ, ইতিহাস কেবলমাত্র তথ্যের ইতিহাস নহে, তাহা মানবমনের ইতিহাস, বিশ্বাসের ইতিহাস। আমরা একান্ত আশা করিতেছি, এই সংগ্রহকার্যে 'ঐতিহাসিক চিত্র' সমস্ত দেশকে আপন সহায়তায় আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারিবে।

অর্থব্যবহারশাস্ত্র শ্রমকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে— বন্ধ্য এবং অবন্ধ্য (productive এবং unproductive)। বিলাসসামগ্রী যে শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন তাহাকে বন্ধ্য বলা যায়; কারণ, ভোগেই তাহার শেষ, তাহা কোনোরূপে ফিরিয়া আসে না। আমরা আশা করিতেছি, 'ঐতিহাসিক চিত্র' যে শ্রমে প্রবৃত্ত হইতেছে তাহা বন্ধ্য হইবে না; কেবলমাত্র কৌতূহল পরিতৃপ্তিতেই তাহার অবসান নহে। তাহা দেশকে যাহা দান করিবে তাহার চতুর্গুণ প্রতিদান দেশের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইবে, একটি বীজ রোপণ করিয়া তাহা হইতে সহস্র শস্য লাভ করিতে থাকিবে।

আমাদের দেশ হইতে রূঢ় দ্রব্য বিলাতে গিয়া সেখানকার কারখানায় কারুপণ্যে পরিণত হইয়া এ দেশে বহুমূল্যে বিক্রীত হয়— তখন আমরা জানিতেও পারি না তাহার আদিম উপকরণ আমাদের ক্ষেত্র হইতেই সংগৃহীত। যখন দেশের কোনো মহাজন এইখানেই কারখানা খোলেন তখন সেটাকে আমাদের সমস্ত দেশের একটা সৌভাগ্যের কারণ বলিয়া জ্ঞান করি।

ভারত-ইতিহাসের আদিম উপকরণগুলি প্রায় সমস্তই এখানেই আছে; এখনও যে কত নূতন নূতন বাহির হইতে পারে তাহার আর সংখ্যা নাই। কিন্তু, কী বাণিজ্যে, কী সাহিত্যে, ভারতবর্ষ কি কেবল আদিম উপকরণেরই আকর হইয়া থাকিবে? বিদেশী আসিয়া নিজের চেষ্টায় তাহা

সংগ্রহ করিয়া নিজের কারখানায় তাহাকে না চড়াইলে আমাদের কোনো কাজেই লাগিবে না?

'ঐতিহাসিক চিত্র' ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি স্বদেশী কারখানাস্বরূপ খোলা হইল। এখনও ইহার মূলধন বেশি জোগাড় হয় নাই, ইহার কল-বলও স্বল্প হইতে পারে, ইহার উৎপন্ন দ্রব্যও প্রথম প্রথম কিছু মোটা হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু ইহার দ্বারা দেশেও যে গভীর দৈন্য— যে মহৎ অভাব-মোচনের আশা করা যায় তাহা বিলাতের বস্তা বস্তা সূক্ষ্ম ও সুনির্মিত পণ্যের দ্বারা সম্ভবপর নহে।

ঐতিহাসিক চিত্র
পৌষ ১৩০৫

বিজ্ঞান

সামুদ্রিক জীব

প্রথম প্রস্তাব

কীটাণু

এই সমুদ্র, এই জলময় মহা মরুপ্রদেশ, যাহা মনুষ্যদিগের মৃত্যুর আবাস, যাহা শত শত জলমগ্ন অসহায় জলযাত্রীর সমাধিস্থান, তাহাই আবার কত অসংখ্য জীবের জন্মভূমি, ক্রীড়াস্থল। স্থল-প্রদেশ এই জলজগতের তুলনায় কত সামান্য, কত ক্ষুদ্র। মিশ্লে (Michelet) কহেন, পৃথিবীতে জলই নিয়ম-স্বরূপ, শুষ্ক ভূমি তাহার ব্যতিক্রম মাত্র। পৃথিবীর এই চর্তুদিকব্যাপী, এই কুমেরু হইতে সুমেরু পর্যন্ত বিস্তৃত মহাপরিখা যদি শুষ্ক হইয়া যায়, তবে কী মহান, কী গম্ভীর দৃশ্য আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হয়, কত পর্বত, কত উপত্যকা, সামুদ্রিক-উদ্ভিদ-শোভিত কত কানন কত ক্ষুদ্র ও প্রকাণ্ড জীব আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। এই সামুদ্রিক অরণ্যে কত প্রাণী ছুটিতেছে, সাঁতার দিতেছে, বালির মধ্যে লুকাইতেছে, কেহ বা বিশাল পর্বতের গাত্রে লগ্ন হইয়া আছে, কেহ বা গহ্বরে আবাস নির্মাণ করিতেছে, কোথাও বা পরস্পরের মধ্যে মহা বিবাদ বাধিয়া গিয়াছে, কোথাও পরস্পর মিলিয়া স্নেহের খেলায় রত রহিয়াছে। আমাদের প্রসিদ্ধ কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী মহাশয় সমুদ্র-বর্ণনাস্থলে যে একটি লোমহর্ষণ চিত্র দিয়াছেন তাহা এই স্থলে উদ্‌ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

৪১

'যতই তোমার ভাব, ভাবি হে অন্তরে,
ততই বিস্ময়-রসে হই নিমগন;
এমন প্রকাণ্ড কাণ্ড যাহার উপরে,
না জানি কী কাণ্ড আছে ভিতরে গোপন।

৪২

আজি যদি আসি সেই মুনি মহাবল,
সহসা সকল জল শোষেন চুম্বুকে;
কী এক অসীমতর গভীর অতল,
আচম্বিতে দেখা দেয় আমার সমুখে!

৪৩

কী ঘোর গর্জিয়া উঠে প্রাণী লাখে লাখ,
কী বিষম ছটফট ধড়ফড় করে;
হঠাৎ পৃথিবী যেন ফাটিয়া দোফাক,
সমুদয় জীবজন্তু পড়েছে ভিতরে।

৪৪

কোলাহলে পুরে গেছে অখিল সংসার,
জীবলোক দেবলোক চকিত স্থগিত;
আর্তনাদে হাহাকারে আকাশ বিদার
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যেন বেগে বিলোড়িত।

৪৫

আমি যেন কোন্ এক অপূর্ব পর্বতে
উঠিয়া দাঁড়ায়ে আছি সর্বোচ্চ চূড়ায়;
বালুময় ঢালুভাগ পদমূল হতে
ক্রমাগত নেমে গিয়ে মিশেছে তলায়।

৪৬

ধুধু করে উপত্যকা, অতল অপার,
অসংখ্য দানব যেন তাহার ভিতরে,
করিতেছে হুড়াহুড়ি— তুমুল ব্যাপার,
মরীয়া হইয়া যেন মেতেছে সমরে।

৪৭

ফেরো গো ও পথ থেকে কল্পনা সুন্দরী
ওই দেখো যাদকুল নিতান্ত আকুল,
নিতান্তই মারা যায় মরুর উপরি,
হেরে কি অন্তর তব হয় নি ব্যাকুল?

৪৮

সেই মহা জলরাশি আনো ত্বরা ক'রে,
ঢেকে দাও এই মহা মরুর আকার,
অমৃত বর্ষিয়া যাক ওদের উপরে;
শান্তিতে শীতল হোক সকল সংসার।'

ক্ষুদ্রতম অদৃশ্য কীটাণু হইতে বৃহৎ তিমি মৎস্য পর্যন্ত এবং আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ হইতে সহস্র হস্ত দীর্ঘ অ্যাল্‌জি (Algæ) নামক উদ্ভিদ পর্যন্ত এই সমুদ্রের গর্ভে প্রতিপালিত হইতেছে। এই সমুদ্রগর্ভে যত প্রাণী আছে, স্থল-প্রদেশে তত প্রাণী নাই।

সমুদ্রে এক প্রকার অতি নিকৃষ্টতম শ্রেণীর প্রাণী দেখিতে পাইবে। তাহারা উদ্ভিজ্জ শ্রেণী হইতে এক সোপান মাত্র উন্নত। তাহাদের শারীরযন্ত্র এত সামান্য যে, সহসা তাহাদের প্রাণী বলিয়া বোধ হয় না। ইহারাই পৃথিবীর প্রাণীসৃষ্টির মধ্যে আদিম সৃষ্টি বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। পৃথিবী যত প্রাচীন হইতে লাগিল, ততই জটিল শরীর-প্রকৃতি-বিশিষ্ট জীবের উৎপত্তি হইল, অবশেষে তাহার উৎকর্ষের সীমা মনুষ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ মনে করেন, এইখানেই আসিয়া শেষ হইল, আর অধিক অগ্রসর হইবে না, কিন্তু কে বলিতে পারে, এই মনুষ্যালয়ের উপর আর-এক স্তর মৃত্তিকা পড়িয়া যাইবে না, ও এই মনুষ্য-সমাজের সমাধির উপর আর-একটি উন্নততর জীবের উৎপত্তি হইবে না। পৃথিবীর প্রথম অবস্থায় উদ্ভিদ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, তাহার মধ্যে প্রথমে আবার নিকৃষ্টতম উদ্ভিদের জন্ম হয়।

যদি কিয়ৎপরিমাণে জল খোলা জায়গায় কোনো পাত্রে রাখিয়া দেওয়া হয়, তবে শীঘ্রই দেখা যায়, তাহার উপর পীত ও হরিৎবর্ণের অতি সূক্ষ্ম আবরণ পড়িয়াছে, অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিতে গেলে দেখা যাইবে, সেগুলি আর কিছুই নহে, সহস্র সহস্র উদ্ভিদ-পদার্থ ভাসিতেছে। তাহার পরেই সহস্র কীটাণু দেখা যাইবে, তাহারা দলবদ্ধ হইয়া সাঁতার দিতেছে ও সেই উদ্ভিজ্জ আহার করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছে। এই উদ্ভিদ-পদার্থ যাহা আমরা অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত দেখিতে পাই না, তাহাই হয়তো তাহাদের নিকটে একটি বৃহৎ রাজ্য। পরে আর-এক দল কীটাণু

উত্থিত হইয়া প্রথমজাত কীটাণুদিগকে আক্রমণ করে, ও উদরসাৎ করিয়া ফেলে। প্রথমে উদ্ভিদ, পরে উদ্ভিদ-ভোজী জীব, তৎপরে মাংসাশী প্রাণী উৎপন্ন হয়।

কোন্খানে উদ্ভিদ-শ্রেণী শেষ হইল ও জীব-শ্রেণীর আরম্ভ হইল, তাহা ঠিক নিরূপণ করা অতিশয় কঠিন। দেখা গিয়াছে যে, শৈবালের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে, অ্যাল্‌জি জাতীয় উদ্ভিদে, প্রাণী-জীবনের কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ বর্তমান আছে; মনে হয় যেন তাহাদের চলনেন্দ্রিয় আছে। তাহাদের গাত্রে চলনশীল যে সূক্ষ্ম সূত্র লম্বমান থাকে, তাহার দ্বারা তাহারা ইতস্তত চলিয়া বেড়ায়, তাহা দেখিয়া সর্বতোভাবে মনে হয় যেন তাহারা ইচ্ছাপূর্বক চলিয়া বেড়াইতেছে। কতকগুলি উদ্ভিদের অঙ্কুর এবং উদ্ভিদের উৎপাদনী আণবিক রেণুকণা (Fecundating corpuscles) জলে ভাসিবার সময় নিকৃষ্ট প্রাণীদিগের ন্যায় ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে, আবার পুনরায় ফিরিয়া আসে ও পুনরায় সেদিকে ধাবমান হয়। এইরূপে আপাতত প্রতীয়মান হয়, যেন তাহাদের চেষ্টা করিবার ক্ষমতা আছে। ইহাদের সহিত যদি সামুদ্রিক কতকগুলি নিকৃষ্ট জাতীয় জীবের তুলনা করা হয়, তবে কাহারা উদ্ভিদ ও কাহারা প্রাণী তাহা স্থির করা দুষ্কর হইয়া পড়ে।

পূর্বোক্ত নিকৃষ্ট জাতীয় জীবদিগকে য়ুরোপীয় ভাষায় জুফাইট (Zoophyte) অর্থাৎ উদ্ভিদজীব বা উদ্ভিদ-প্রাণী কহে। কারণ ইহাদের মধ্যে অনেকের বাহ্য আকৃতি উদ্ভিদের ন্যায়, তাহাদের শরীর হইতে উদ্ভিদের ন্যায় শাখা বহির্গত হয়। এবং তাহাদের কোনো কোনো অঙ্গ নানা বর্ণে চিত্রিত এবং দেখিতে পুষ্পের ন্যায়। প্রবালদিগকে দেখিতে অবিকল উদ্ভিদের ন্যায়, মৃত্তিকায় বা পর্বতে তাহাদের মূল-দেশ নিহিত থাকে, এবং গাত্র হইতে শাখা-প্রশাখা বহির্গত হয়, এবং তাহাদের রঙিল অঙ্গগুলি কাল-বিশেষে অবিকল পুষ্পের ন্যায় আকার ধারণ করে। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা এই প্রবালকে নিঃসংশয়ে উদ্ভিদ বলিয়া গণ্য করিয়া গিয়াছেন, সম্প্রতি ইহা প্রাণী বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

এই নিকৃষ্টতম প্রাণীদিগের কি বুদ্ধি বা মনোবৃত্তি আছে? ইহা স্থির করা এক প্রকার অসম্ভব। প্রথমত ইহারা প্রাণী কি উদ্ভিদ, তাহাই কত কষ্টে স্থিরীকৃত হইয়াছে, এক্ষণে ইহাদের বুদ্ধি বা মনোবৃত্তি আছে কি না তাহা স্থির করিতে বোধহয় অনেক বিলম্ব লাগিবে। শুক্তিরা তো জন্মাবধি এক শৈলেই আবদ্ধ থাকে। কীটাণুরাও একটিমাত্র ক্ষুদ্রতম স্থান ব্যাপিয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। অ্যামিবি কীটগণ, মিনিটের মধ্যে যাহারা শত বার আকার পরিবর্তন করে, তাহারা তো জীবন্ত পরমাণু মাত্র। ইহাদের বুদ্ধি ও মনোবৃত্তি আছে কি না তাহা স্থির করা যে দুরূহ, তাহা বলা বাহুল্য।

উদ্ভিদজীবদিগের কঙ্কাল অতিশয় অপূর্ণ, স্নায়ুযন্ত্র অত্যন্ত অপরিস্ফুট। এই জাতীয় অধিকাংশ জীবের স্পর্শ ভিন্ন অন্য প্রকার অনুভূতি নাই, ইহারাই প্রাণী-জগতের শেষ শ্রেণীর নিকৃষ্টতম জাতির অন্তর্ভূত। উদ্ভিদজীবেরা অনেক জাতিতে বিভক্ত।

লয়বেনহয়েক (Leuwenhoek) যখন অণুবীক্ষণ লইয়া সমুদ্রের এক বিন্দু জল পরীক্ষা করিতে গেলেন, তখন দেখিলেন, সেই এক বিন্দু জলের মধ্যে একটি নূতন জগৎ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। সেই নূতন রাজ্যের অধিবাসীদিগের সংক্ষেপ বিবরণ পাঠ করা যাক।

রিজোপডা (Rizopoda) বা শীকড়-পদ কীটগণের বিশেষ প্রকৃতির মধ্যে, উহাদের পাকযন্ত্র নাই, জলজ উদ্ভিদগণের ন্যায় উহাদের গাত্রে যে সূক্ষ্ম সূত্র থাকে তাহা দ্বারা চলা-ফিরা করে, নিজ শরীর ইচ্ছাক্রমে বর্ধিত ও শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত করিতে পারে। সময়ে সময়ে দেখা যায়, শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত অঙ্গগুলি ক্রমে গ্রমে গুটাইয়া আসে ও ক্রমে তাহাদের শরীরের মধ্যে মিলাইয়া যায়। মনে হয় যেন আপনার শরীর আপনিই ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। এই জাতীয় কীটেরা আবার অন্যান্য কীট এবং অন্যান্য জন্তুদিগের গাত্রে লগ্ন হইয়া প্রাণ ধারণ করে। অনেক জাতীয় রিজোপডা আছে, তন্মধ্যে দুই-তিনটির বিবরণ প্রকাশ করা যাইতেছে।

অ্যামিবি (Amibæ) নামক কীটাণুদিগের আঠাবৎ শরীর এমন স্বচ্ছ, এত ক্ষুদ্র যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রে রাখিয়া সময়ে সময়ে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহাদের শরীরের গঠন যে কী প্রকার তাহা কিছুই ভাবিয়া পাওয়া যায় না। অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিতে ইহারা এক বিন্দু জলের ন্যায়, কিন্তু মুহূর্তে মুহূর্তে ইহারা এত বিভিন্ন আকার ধারণ করে যে, ইহাদের আকৃতি কোনোমতে নির্ধারিত করা যায় না। ইহাদের শরীরে পাকযন্ত্র দেখা যায় না, তবে ইহারা কী করিয়া জীবন ধারণ করে? এইরূপ স্থির হইয়াছে যে, খাদ্যদ্রব্য তাহারা শরীরের সহিত মিশাইয়া লয়। অণুবীক্ষণ দিয়া ইহাদের শরীরে মাঝে মাঝে উদ্ভিদের অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা যেরূপ ইচ্ছামতে শরীর প্রসারিত ও কুঞ্চিত করিতে পারে, তাহাতে শরীরের সহিত খাদ্য মিশ্রিত করিবার ইহাদের অনেকটা সুবিধা আছে। কোনো একটি উদ্ভিদাণুর উপরে নিজ শরীর প্রসারিত করিয়া পুনরায় কুঞ্চিত করিলে সহজেই তাহা তাহাদের শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যায়।

ফরামিনিফেরা (Foraminifera) নামক পূর্বোক্ত জাতীয় আর-এক প্রকার কীট আছে, তাহারা প্রায় চক্ষুর অদৃশ্য বলিলেও হয়, তাহাদের আয়তন এক ইঞ্চির দুই শতাংশ অপেক্ষা অধিক নহে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র কীটগণের দ্বারা কত বৃহৎ ব্যাপার সম্পাদিত হইয়াছে, ভাবিয়া দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। পৃথিবীর অনেক স্থানের আবরণ কেবলমাত্র ইহাদেরই দেহে নির্মিত হইয়াছে। আমাদের আবাস-গ্রহের তরুণাবস্থায় বোধহয় এই কীটগণ অসংখ্য পরিমাণে সমুদ্রের বাস করিত। তাহাদের রাশীকৃত মৃত দেহে কত বৃহৎ পর্বত সৃষ্টি হইয়া সমুদ্র-গর্ভ হইতে মাথা তুলিয়াছে। সমুদ্রের বালুকা অণুবীক্ষণ দিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, তাহাদের অর্ধেক ইহাদের কঠিন গাত্রাবরণ। রুসিয়ার প্রকাণ্ড চুনের পর্বতগুলি ইহাদের দেহে নির্মিত। যে চা-খড়ির পর্বত ফ্রান্স দেশস্থ শ্যাম্পেন হইতে ইংলন্ডের মধ্য পর্যন্ত বিস্তৃত, তাহা এই জীবদেহের স্তূপ মাত্র। যে চা-খড়ির দ্বারা প্রায় প্যারিসের সমগ্র ভূভাগ নির্মিত, তাহা ইহাদেরই দেহ-সমষ্টি। এই কীট-সমষ্টির উপরে কত বিদ্রোহ, কত বিপ্লব, কত রক্তপাত হইয়া গেছে, ও হইবে। এই কীট-সমষ্টির উপর সভ্যতার উন্নততম প্রাসাদ নির্মিত। প্রকৃত কথা এই যে, এই ক্ষুদ্র কীটগণের মৃতদেহ-রাশির উপরে জগতের আর-এক জাতীয় উন্নততর কীটাণু ক্রীড়া করিতেছে!

ডর্বিঞি (D'orbigny) তিন গ্রাম বালুকার মধ্যে চারি লক্ষ চল্লিশ সহস্র ফরামিনিফেরার গাত্রাবরণ পাইয়াছেন। ইহাদের কত দেহ যে পৃথিবীর ভূভাগের আয়তন বর্ধিত করিতে নিযুক্ত হইয়াছে তাহা কল্পনারও অগম্য। ইহাদের স্তূপে অ্যালেকজান্দ্রিয়ার বন্দর ক্রমশ পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে, ইহাদের স্তূপে সমুদ্রের কত স্থানের তীরভাগ নির্মিত হইয়াছে। প্রবাল এবং অন্যান্য দুই-একটি সামুদ্রিক পদার্থের ন্যায় ইহারাও সমুদ্রের মধ্যে অনেক দ্বীপ নির্মাণ করিয়াছে। এই চক্ষুর অদৃশ্য পদার্থ সমুদ্রের বিশাল উদর পূর্ণ করিয়া ক্রমে ক্রমে কীরূপে দ্বীপ ও পর্বতসমূহ নির্মাণ করে ভাবিয়া দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়।

ইহাদের দেহ আঠাবৎ পদার্থে নির্মিত। স্বীয় গাত্রাবরণের মধ্য দিয়া ইহারা শাখা-প্রশাখাবান অঙ্গ বহির্গত করে, এই অঙ্গ দ্বারা তাহারা চলা-ফিরা করিয়া থাকে। ইহাদের ওই ক্ষুদ্রতম হস্তপদে আবার বিষাক্ত পদার্থ আছে। দেখা গিয়াছে, ইন্‌ফিউসোরিয়া (Infusoria) প্রভৃতি কীটের গাত্রে ইহাদের বিষাক্ত হস্ত লাগিলে তৎক্ষণাৎ তাহারা অচল হইয়া যায়। এইরূপে তাহারা শিকার করিয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র কীটগণ নিষ্ঠুর মাংসাশী, ইহারা আবার কত কীটাণুর বিভীষিকাস্বরূপ। ইহারা আবার আপনাদিগের ক্ষুদ্র কীটাণু-রাজ্যে আক্রমণ করে, সংহার করে, কতই গোলযোগ করে। দুর্জার্দ্যা (Durjadin) দেখিয়াছেন, ইহারা ইচ্ছা করিলে আপনার শরীর হইতে নূতন হস্তপদ নির্মিত করিতে পারে, প্রয়োজন অতীত হইয়া গেলেই পুনরায় তাহা আপনার শরীরের সহিত মিশাইয়া ফেলে। ইহাদেরও শরীরে এ পর্যন্ত পাকযন্ত্র দেখা যায় নাই। ইহাদের সুদৃশ্য গাত্রাবরণ নানা প্রকার। ইহাদের বিভিন্ন গাত্রাবরণ অনুসারে ইহাদের জাতির ভিন্নতা নিরূপিত হয়।

সমুদ্রে নক্তালোকা (Noctiluca) নামক কীটের বিষয় দুই-এক কথা বলা যাউক। বাল্মীকি

সমুদ্র-বর্ণনায় লিখিয়াছেন যে, 'স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড শৈল। উহা অতলস্পর্শ। ভীম অজগরগণ গর্ভে লীন রহিয়াছে; উঁহাদের দেহ জ্যোতির্ময়। সাগর-বক্ষে যেন অগ্নি-চূর্ণ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।' এখনকার নাবিকেরাও সমুদ্র ভ্রমণ করিবার সময়, সময়ে সময়ে দেখিতে পান, সাগরবক্ষে যেন অগ্নিচূর্ণ প্রক্ষিপ্ত রহিয়াছে। দাঁড়ের আঘাতে এবং তরঙ্গের গতিতে তাহাদের উজ্জ্বলতা আরও বৃদ্ধি হইয়া উঠে। সমস্ত সমুদ্র যেন একটি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড বলিয়া বোধ হয়। কখনো ভাঁটা পড়িয়া গেলে দেখা যায় পর্বত-দেহে, সামুদ্রিক তৃণসমূহে ও তীর-ভূমিতে যেন আগুন লাগিয়াছে। বাল্মীকির সময়ে যাহা লোকে অজগরের দেহজ্যোতি বলিয়া মনে করিত, বৈজ্ঞানিকেরা অসংখ্য ক্ষুদ্র কীটের দেহ-নিঃসৃত ফস্‌ফরিয় আলোক বলিয়া জানিয়াছেন। সেই কীটদিগের নাম নক্তালোকা। ঝটিকামত্ত অন্ধকার রাত্রে রজত ফেনময় অধীর তরঙ্গের দ্বারা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া এই জ্বলন্ত কিরণ কী সুন্দর শোভাই ধারণ করে।

ইনফিউসোরিয়া (Infusoria) কীট অ্যামিবির ন্যায় পরিষ্কার বা লবণাক্ত, শীতল বা উষ্ণ সকল প্রকার জলেই বাস করে। সপ্তদশ শতাব্দীর বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ লয়বেনহয়েক ইহাদের প্রথম আবিষ্কর্তা, এই চির-অস্থির কীটাণুগণ এত ক্ষুদ্র যে, একবিন্দু জলে ইহাদের কোটি কোটি বাস করিতে পারে। গঙ্গা প্রতিবৎসর এত ইনফিউসোরিয়া সমুদ্রকে উপহার দিতেছে যে, তাহা একত্র করিলে ইজিপ্টের পিরামিড অপেক্ষা ছয়-সাত গুণ অধিক হয়। মরুপ্রদেশে উৎকৃষ্ট জীবগণ বাস করিতে পারে না, কিন্তু সেখানেও ইহারা অসংখ্য পরিমাণে জীবন ধারণ করিয়া আছে। পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতের পরিমাণ অপেক্ষা গভীরতর সমুদ্র-তলদেশে এই অসংখ্য জীবিত-কণা বাস করিতেছে। মনুষ্যের ন্যায় এই অদৃশ্য কীটাণুগণও এই মহান জগতের একটি অংশ। এই কীটাণুদিগকে জগৎ হইতে বাদ দাও, জগৎ এক বিষয়ে অসম্পূর্ণ হইল। এমন স্থান নাই, যেখানে ইহারা নাই। সমুদ্রে, নদীতে, পুষ্করিণীতে, এমন-কি, আমাদের শরীরস্থ রসে ইহারা সঞ্চরণ করে। অনেক স্থানে পৃথিবীর স্তর বহুদূর ব্যাপিয়া কেবল মাত্র ইহাদের দেহে নির্মিত। ইহাদিগের দেহের নিমিত্তই গঙ্গা নীল প্রভৃতি নদীতীরস্থ কর্দমে উর্বরা শক্তি জন্মে। ইহাদের ক্ষুদ্রতম গাত্রাবরণ জমিয়া এক প্রকার প্রস্তর নির্মিত হয়। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ কহেন— অনেক উচ্চ পর্বত ইহাদেরই দ্বারা নির্মিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র— বিন্দু-জলে যাহারা কোটি কোটি বাস করিতে পারে— তাহাদের স্তূপে পর্বত নির্মিত হইয়াছে।

এই কীটাণুগণ, কেহ কেহ জলে, কেহ বা আর্দ্র শৈলে, কেহ কেহ বা অন্য জন্তুর শরীরে বাস করিয়া থাকে। এমন-কি, স্ত্রীলোকের স্তন-দুগ্ধেও ইহাদিগকে পাওয়া গিয়াছে। পাঠকেরা যদি কেহ অণুবীক্ষণ দিয়া এই কীটাণুগণকে দেখিতে চান, তবে এক পাত্র জলে, ডিম্বের শ্বেতাংশ ফেলিয়া মুক্ত স্থানে রাখিয়া দিবেন, ইহাতে ফসফেট অফ সোডা বা কার্বোনেট অফ সোডা অথবা নাইট্রেট কিংবা অক্সালেট্‌স অফ অ্যামোনিয়া দিলে এই কীটাণুগণ অতি শীঘ্র শীঘ্র বর্ধিত হইয়া উঠিবে।

এই কীটাণুদিগের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের প্রভেদ আছে। কিন্তু গর্ভ ভিন্ন অন্য কারণেও ইহারা জন্মলাভ করে। ইহাদের অসংখ্য সঙ্গীগণ হইতে একটি কীটাণুকে স্বতন্ত্র লইয়া যদি অণুবীক্ষণ দিয়া পরীক্ষা করা যায়, তবে দেখা যাইবে, ইহার দেহের মধ্যভাগ ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, এবং ক্রমে নিম্ন প্রদেশে কতকগুলি চলনেন্দ্রিয়সূত্র দেখা যাইতেছে। অবশেষে ক্রমশ ওই কীট একেবারে দুই ভাগে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, এবং এইরূপে দুইটি কীটের জন্ম হয়। বিচ্ছিন্ন অংশটিরও মুখ এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে যেমন 'আত্মাবৈ জায়তে পুত্রঃ' এমন মনুষ্যের মধ্যে নহে। এইরূপে একটি ইনফিউসোরিয়া, যাহা কত যুগ পূর্বে বর্তমান ছিল, তাহারই খণ্ডাংশ হয়তো আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। দেখা গিয়াছে এক মাসের মধ্যে দুইটি কীটাণুর বিচ্ছিন্ন শরীরে ১০ লক্ষ ৪৮ সহস্র কীটাণু জন্মলাভ করিয়াছে। ৪২ দিনে একটি কীটাণু শরীর হইতে এক কোটি ছত্রিশ লক্ষ চল্লিশ সহস্র কীটাণু জন্মিয়াছে।

এই অতি ক্ষুদ্র কীটাণুর গাত্রেও আবার ক্ষুদ্রতর কীটাণু সঞ্চরণ করিতেছে, বৃহত্তর কীটাণুর গাত্র তাহার নিবাস ও আহারস্থান। ঘণ্টাকতক মাত্র এই কীটাণুদিগের জীবনকাল। কিন্তু একটি আশ্চর্য দেখা গিয়াছে, যাহাতে বায়ু না পায় এমন করিয়া যত্নপূর্বক ইনফিউসোরিয়াকে ঢাকিয়া রাখো, যতদিন পরেই হউক-না-কেন, গাত্রে এক বিন্দু জল লাগিলেই পুনরায় বাঁচিয়া উঠিবে। এইরূপে এই দুই ঘণ্টার জীব শত বৎসর মৃত থাকিয়া আবার মুহূর্তে বাঁচিয়া উঠিতে পারে।

এই কীটাণুদিগের আর-একটি আশ্চর্য প্রকৃতি আছে। ইহাদের শরীরের কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেও ইহারা মরিয়া যায় না। মৃত অর্ধাংশ অদৃশ্য হইয়া যায়, আর জীবিত অংশটি যেন অতি নিশ্চিতভাবে পুনরায় খেলা করিয়া বেড়ায়, যেন তাহার কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হয় নাই, অথচ সে হয়তো তাহার পূর্ব শরীরের ষোড়শ অংশে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে।

যে জলবিন্দুতে এই কীটাণুগণ সাঁতার দিয়া বেড়ায়, তাহাতে যদি অ্যামোনিয়াসিক্ত একটি পালক ডুবানো যায়, তবে তৎক্ষণাৎ তাহাদের গতি বন্ধ হইয়া যায়। চলিবার জন্য তাহারা হাত-পা সঞ্চালন করিতে থাকে বটে কিন্তু চলিতে পারে না। ক্রমে তাহাদের শরীর গলিয়া যাইতে থাকে। আবার যদি তাহাতে ভালো জল দেওয়া যায়, তৎক্ষণাৎ তাহাদের গলন বন্ধ হইয়া যায়, আবার অবশিষ্ট অংশ সুখে সাঁতার দিয়া বেড়ায়।

এক প্রকার ইনফিউসোরিয়া আছে, উদ্ভিদ অথবা প্রাণীগণের গলিত দেহে তাহাদিগকে পাওয়া যায় কিন্তু যখনই অন্যান্য কীট তাহাদের স্থান অধিকার করে, তখনই তাহারা অদৃশ্য হইয়া যায়। অর্থাৎ অন্য জাতীয় কীটেরা তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া ফেলে। আবার যখন সেই-সমস্ত দ্রব্য এমন পচিয়া যায় যে আর অন্য কোনো কীট তাহাতে থাকিতে পারে না, তখন তাহারা পুনরায় আবির্ভূত হয়। দাঁতে যে শ্বেত পদার্থ আছে তাহাতেও লয়বেনহয়েক এই কীটাণু দেখিতে পাইয়াছিলেন। অনেক রোগগ্রস্ত প্রাণীর শরীরস্থ রসেও ইহাদের বসতি। এক প্রকার ইনফিউসোরিয়া আছে, তাহার শরীর স্ক্রুর ন্যায় পেঁচালো। ইহারা এমন আশ্চর্য বেগে ঘুরিতে থাকে যে, চোখ দিয়া দেখা যায় না, এবং কেন যে অত বেগে ঘুরিতেছে তাহার কোনো কারণ ভাবিয়া পাওয়া যায় না। আর-এক প্রকার কীটাণু আছে, তাহাদের শরীর যেন তাহাদের নিজের নহে। ইহাদের অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর কীটসমূহ ইহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে তাড়না করিয়া বেড়ায়, এবং ধরিতে পারিলেই তাহাদের গাত্রে চড়িয়া বসে, এবং বেচারীর সমস্ত রক্ত শোষণ করে এবং রহিয়া বসিয়া তাহাকেও ভক্ষণ করিয়া ফেলে। উকুন বা ছারপোকার মতো একটুতেই ইহারা সন্তুষ্ট নহেন, যতক্ষণে সমস্ত আহার্য না ফুরাইয়া যায় ততক্ষণ ইহারা ছাড়েন না। এ কীটাণুদের শুদ্ধ এই এক যন্ত্রণা নহে, আর-এক প্রকারের কীটাণু ইহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আছে, যেমন ইহারা কাছে আসে, অমনি তাহারা ইহার শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এবং অল্প সময়ের মধ্যে সে বেচারীর শরীরে ঘর-কন্না ফাঁদিয়া বসে, অবশেষে পুত্র-পৌত্র লইয়া সুখে তাহার শরীর ভক্ষণ করিতে থাকে। একটি কীটাণুর শরীরের মধ্যে অমন পঞ্চাশটা ক্ষুদ্রতর ক্ষুদ্রতম কীটাণু পাওয়া গিয়াছে।

ভারতী
বৈশাখ ১২৮৫

দেবতায় মনুষ্যত্ব আরোপ

হর্বর্ট্‌ স্পেন্সর তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে "The use of Anthropomorphism" নামক প্রবন্ধে দেবতায় মনুষ্যত্ব আরোপ সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিয়াছেন, তৎবিষয়ে আমাদের কতকগুলি বক্তব্য আছে। অগ্রে, তিনি যাহা বলেন, তাহা প্রকাশ করি, পরে আমাদের যাহা মত তাহা ব্যক্ত করিব।

স্পেন্সর বলেন মনুষ্য-সমাজে যখন যে ধর্মমতের প্রাদুর্ভাব থাকে, তখনকার পক্ষে সেই ধর্মমতই সর্বাপেক্ষা উপযোগী। এ কথা শুনিলেই হয়তো অনেকে আশ্চর্য হইবেন, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই ইহার প্রমাণ পাইবেন।

মনুষ্য-বিশেষ এবং মনুষ্য-সমাজ উভয়েই গাছের মতো করিয়া বাড়ে, ইহাদের মধ্যে হঠাৎ-আরম্ভ কিছুই নাই। তাহা যদি সত্য হয়, তবে মনুষ্যের ধর্মমত, মনুষ্যের রাজ্যতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ন্যায় অবস্থানুসারে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। যে সময়ে যেরূপ ধর্ম প্রয়োজনীয়, সে সময়ে সেইরূপ ধর্ম আপনাআপনিই উদ্ভূত হইয়া থাকে। কেন হইয়া থাকে তাহা বিস্তৃত করিয়া বলা যাক।

ইহা সাধারণত সকলেই স্বীকার করেন যে, ঈশ্বরকে কল্পনা করিতে গেলে, আমরা তাঁহাতে আমাদের নিজত্ব আরোপ না করিয়া থাকিতে পারি না। ইহা আমাদের মনের ধর্ম। ন্যূনাধিক পরিমাণে সকল ধর্মেই এই মানব-স্বভাব লক্ষিত হয়। কোনো ধর্মে ইহারই মাত্রাধিক্য দেখিলেই আমাদের ঘৃণা উদয় হয়। যখন শুনা যায়, পলিনেসীয় জাতির ধর্মে তাহাদের দেবতারা মৃত মনুষ্যের আত্মা ভক্ষণ করে, অথবা প্রাচীন গ্রিসীয়দিগের দেবতারা কুটুম্ব-মাংস ভক্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া জঘন্যতম পাপাচরণ পর্যন্ত কিছুই বাকি রাখে নাই, তখন আমাদের মনে অতিশয় ঘৃণা উদয় হয়। কিন্তু যদি আমরা যুক্তি সহকারে বিবেচনা করিয়া দেখি, যদি আমরা দেবভক্তদিগের মনোভাব ও সময়ের অবস্থা আলোচনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে, সেই ধর্মই সেই অবস্থার উপযোগী, অতএব তাহা নিন্দনীয় নহে।

কারণ, ইহা কি সত্য নহে যে কেবল অসভ্য দেবতাদেরই ভয়ে অসভ্য মনুষ্যেরা শাসনে থাকিতে পারে, তাহাদের প্রকৃতি যতই দুর্দান্ত হয় তাহাদের শাসন বিভীষিকা ততই নিদারুণ হওয়া আবশ্যক, ও শাসন নিদারুণ হইতে গেলে শাসনকর্তা দেবতাদেরও সেই পরিমাণে নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা-পরায়ণ হওয়া আবশ্যক? বিশ্বাসঘাতক, চৌর্য-বৃত্তিপরায়ণ, মিথ্যাবাদী হিন্দুরা যে তপ্ত-তৈল-কটাহপূর্ণ নরকে বিশ্বাস করে, ইহা কি তাহাদের পক্ষে ভালো হয় নাই? এবং এইরূপ নরক সৃষ্টি করিতে পারে এমন নিষ্ঠুর দেবতা থাকাও আবশ্যক, সেইজন্যই তো তাহাদের দেবতারা ফকিরদের আত্মপীড়ন দেখিয়া সুখী হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে, অসভ্য মনুষ্যের পক্ষে অসভ্য দেবতাই উপযোগী। আমরা যে ঈশ্বরকে আমাদের নিজ স্বভাবের আদর্শ করিয়াই গড়ি, তাহা আমাদের পক্ষে শুভ বৈ অশুভ নহে।

আবার ইহাও দেখা গিয়াছে, যে ধর্ম যে অবস্থার উপযোগী নহে, সে ধর্ম সে অবস্থায় বলপূর্বক প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিতে গেলে কোনো মতে টিঁকিতে পারে না। অসভ্য দেশে খৃস্টান ধর্ম নামেমাত্র খৃস্টান ধর্ম, অসভ্যদিগের প্রাচীন ধর্ম তাহার অভ্যন্তরে বিরাজ করিতে থাকে।

স্পেন্সরের মত উপরে উদ্‌ধৃত করা গেল, এক্ষণে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা বলি।

স্পেন্সরের প্রথম যুক্তি এই— মনুষ্য দেবতাকে নিজের আকার দিয়া পূজা করে অতএব, মনুষ্যেরও যেরূপ পরিবর্তন হইতে থাকে, দেবতারও সেইরূপ পরিবর্তন হইতে থাকে। মনুষ্য যখন ক্রোধপরায়ণ থাকে, তখন তাহাদের দেবতারাও ক্রোধপরায়ণ থাকে, মনুষ্য যখন দয়াবান হয়, তখন তাহাদের দেবতারাও দয়াবান হয়, ইত্যাদি। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, একটি জাতির দেব চরিত্রে বা ধর্মে যত দিন গর্হিত আচরণের উল্লেখ থাকিবে, ততদিন জানা যাইবে যে, সে জাতির স্বভাবও গর্হিত।

স্পেন্সরের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, 'যেমন মানুষ, তেমনি দেবতাই তাহার পক্ষে ঠিক উপযোগী।' তাহা হইতে সিদ্ধান্ত হয় যে, সকল ধর্মই স্ব স্ব ভক্তের নিকট উপযোগী। কারণ পূর্বেই প্রমাণ হইয়াছে, মানুষ স্বভাবতই নিজেরই মতো করিয়া দেবতা গড়িয়া লয়, এখন যদি প্রমাণ

হয়, সেইরূপ দেবতাই তাহার পক্ষে যথার্থ উপযোগী, তাহা হইলেই প্রমাণ হইল যে, সকল জাতিরই নিজের নিজের ধর্ম নিজের নিজের পক্ষে উপযোগী। স্পেন্সর ধর্মের উপযোগিতা কাহাকে বলিতেছেন তাহাও এখানে বলা আবশ্যক। দুষ্কর্ম হইতে বিরত করিয়া রাখাই ধর্মের উপযোগিতা।

স্পেন্সরের তৃতীয় যুক্তি এই যে, যত দিন একটি দ্রব্যের উপযোগিতা থাকে, তত দিনই সে টিকিতে পারে, তাহার ঊর্ধ্বে নহে। অতএব জাতিবিশেষের স্বভাব যখন পরিবর্তিত হয়, তখন তাহাদের প্রাচীন ধর্ম অনুপযোগী হইয়া পড়ে, অতএব আপনাআপনিই ধ্বংস হইয়া যায়। তাহার পূর্বে যদি নূতন ধর্ম তাঁহাদের মধ্যে প্রচার করিতে যাও, তবে তাহা স্থান পায় না।

স্পেন্সর যে বলিতেছেন, যে, মনুষ্যেরা যখন নিজে ক্রোধপরায়ণ থাকে, তখন তাহাদের দেবতারাও ক্রোধপরায়ণ হয়, তাহাদের নিজের যে-সকল দুষ্প্রবৃত্তি থাকে দেবতাদিগের প্রতিও তাহাই আরোপ করে, তাহা নিতান্ত অঙ্গহীন অসম্পূর্ণ যুক্তি। যদি এমন হইত, মনুষ্য সর্বতোভাবে নিজের মন হইতেই দেবতা কল্পনা করিত, বাহ্য-জগতের সহিত, আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সহিত দেবতা-কল্পনার কোনো যোগ না থাকিত, তাহা হইলে স্পেন্সরের কথা সত্য হইত। কিন্তু তাহা তো নহে। ধর্মের শৈশব অবস্থায় মনুষ্যেরা বাহ্য প্রকৃতির এক-এক অংশকে দেবতা বলিয়া পূজা করে। তখন সূর্য, অগ্নি, বায়ু, সকলই দেবতা। যদি কোনো ভক্ত অগ্নিকে নিষ্ঠুর বলিয়া কল্পনা করে, তবে তাহা হইতে প্রমাণ হয় না যে, তাহার নিজের স্বভাব নিষ্ঠুর বলিয়া তাহার দেবতাকেও নিষ্ঠুর করিয়াছে, যদি কেহ বায়ুকে কোপন-স্বভাব কল্পনা করে, তবে তাহা হইতে অনুমান করা যায় না যে, সে নিজে কোপন-স্বভাব। সে যখন প্রত্যক্ষ দেখিতেছে, অগ্নি সহস্র জিহ্বা বিকাশ করিয়া কুটির, গ্রাম, বন, ধ্বংস করিয়া ফেলিতেছে, সে তখন নিজে দয়ালু হইলেও অগ্নিকে নিষ্ঠুর দেবতা সহজেই মনে করিতে পারে। বাহ্য জগতে সুখ দুঃখ, বিপদ সম্পদ, জীবন মৃত্যু দুইই আছে অতএব যাহারা বাহ্য-জগতের উপর দেবতা প্রতিষ্ঠা করে, তাহারা কতকগুলি দেবতাকে স্বভাবতই নিষ্ঠুর বলিয়া কল্পনা করে। বিশেষত অসভ্য অবস্থায় পদে পদে বিপদ, পদে পদে মৃত্যু, অতএব সে অবস্থায় নির্দয় দেবতা কল্পনা কেবলমাত্র মনের উপরেই নির্ভর করে না। অতএব আমি দয়ালুই হই, আর নিষ্ঠুরই হই, অগ্নির ধ্বংসশক্তিকে যতদিন দেবতা বলিয়া মনে করিব, ততদিন তাহা নিষ্ঠুর বলিয়া জানিব। আমার স্বভাবের পরিবর্তন হইতে পারে, কিন্তু অগ্নির স্বভাবের পরিবর্তন হইবে না তো। অতএব দেবতায় হীন স্বভাব হইতে মনুষ্যের হীন স্বভাব কল্পনা করা সকল সময় ঠিক খাটে না। আমাদের শাস্ত্র হইতে ইহার শত শত প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। ব্রহ্মার নিজ কন্যার প্রতি আসক্তির বিষয়ে সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু সেরূপ ঘৃণিত আচরণ আর্যদিগের মধ্যে কখনোই প্রচলিত ছিল না, তবে এরূপ অসংগত কল্পনা কী করিয়া প্রাচীন আর্যদের হৃদয়ে উদিত হইল?

শতপথ ব্রাহ্মণে আছে— প্রজাপতি নিজের দুহিতা আকাশ অথবা উষাকে দেখিয়া তাহার সহিত সংগত হইলেন। দেবতাদের চক্ষে এ আচরণ পাপ, অতএব তাঁহারা কহিলেন, যিনি নিজের দুহিতা ও আমাদের ভগ্নীর প্রতি এরূপ আচরণ করেন, তিনি পাপ করেন, অতএব তাঁহাকে বিদ্ধ করো। রুদ্র তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন।— আমাদের বোধ হয় ইহা উষার প্রতি কুজ্ঝটিকা-আক্রমণের রূপক। কারণ ভাগবত পুরাণের এক স্থলে আছে— পিতার অধর্মে মতি দেখিয়া তাঁহার পুত্র মুনিগণ মরীচিকে পুরোভাগে লইয়া তাঁহাকে এই বলিয়া তিরস্কার করিলেন, 'তুমি যে আত্মদমন না করিয়া নিজ-দুহিতাগামী হইয়াছ, এমন পূর্বেও কখনো কৃত হয় নাই, এমন পরেও কখনো কৃত হইবে না। হে জগদ্গুরু, যাহাদের অনুসরণ করিয়া লোকে ক্ষেম প্রাপ্ত হয় এমন তেজস্বীদের পক্ষে এ কার্য কিছুতেই প্রশংসনীয় নহে।' নিজের সন্তানদিগকে এইরূপ কথা কহিতে শুনিয়া প্রজাপতি লজ্জিত হইলেন ও নিজ দেহ পরিত্যাগ করিলেন। সেই ঘোর দেহ দিক্ আচ্ছন্ন করিল ও তাহাই পণ্ডিতেরা অন্ধকার নীহার বলিয়া জানেন।

ভাগবত-পুরাণে ব্রহ্মার কন্যা উষার পরিবর্তে বাণী রহিয়াছে, আমরা উভয়কে মিলিত করিলাম। উপরে যাহা উদ্‌ধৃত হইল তাহাতেই দেখা যাইবে, ব্রহ্মার পাপাচরণ আর্যদিগের দ্বারা নিতান্ত নিন্দনীয় বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু নিন্দনীয় হউক বা না হউক, তাঁহারা প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন, কুজ্‌ঝটিকা বলপূর্বক উষাকে আচ্ছন্ন করিতেছে, ইহা তাঁহাদের পক্ষে সত্য ঘটনা-স্বরূপ।

গ্রীসীয় পুরাণে কোনো দেবতা যদি নিজের কুটুম্বকে ভক্ষণ করিয়া থাকেন, তবে তাহার কারণ কি এই যে, গ্রীসীয়গণ এমন অসভ্য ছিল যে, কুটুম্ব মাংস ভক্ষণ করিত, অথবা কুটুম্ব মাংসে ভক্ষণ করা অন্যায় মনে করিত না? রজনী ও প্রভাত সম্বন্ধে এক সমস্যা শুনিয়াছিলাম, যে, জন্মাইয়া মাকে সন্তান খাইয়া ফেলিতেছে। উপরি-উক্ত গ্রীসীয় কাহিনীও কি সেরূপ কোনো একটা রূপকমূলক হইতে পারে না? যদি ইহা সত্য হয় যে, গ্রীসীয়গণ কুটুম্বকে ভক্ষণ করিত না ও কুটুম্ব ভক্ষণ করা পাপ মনে করিত, তবে তাহাদের দেবতাদের কেন কুটুম্ব মাংসে প্রবৃত্তি জন্মিল। যদি বল, অসভ্য অবস্থায় এককালে হয়তো গ্রীসীয়গণ আত্মীয়দিগকে উদরসাৎ করিয়া অধিকতর আত্মীয় করিত, সেই সময়েই উক্ত কাহিনীর আরম্ভ হয়— তবে, যখন সভ্য অবস্থায় গ্রীসীয়দের সে বিষয়ে মত ও আচরণ পরিবর্তিত হইল, তখন তাহাদের বিশ্বাসও পরিবর্তিত হইল না কেন?

মানুষেরা যে-সকল কার্য প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বলিয়া অনুষ্ঠান করে না ও যে-সকল কার্যকে নিতান্ত নিন্দনীয় জ্ঞান করে, সে-সকলও যদি তাহাদের দেবতায় আরোপ করে, তবে কেমন করিয়া বলিব যে, তাহারা নিজের গুণ-দোষগুলিই দেবতায় আরোপণ করে?

অবস্থানুসারে সকল ধর্মই উপযোগী ইহাই প্রমাণ করিতে গিয়া স্পেন্সর বলিতেছেন, 'ইহা কি সত্য নহে যে, কেবল অসভ্য দেবতাদের ভয়েই অসভ্য মনুষ্যেরা শাসনে থাকিতে পারে, তাহাদের প্রকৃতি যতই দুর্দান্ত হয়, তাহাদের শাসন-বিভীষিকা ততই নিদারুণ হওয়া আবশ্যক ও শাসন নিদারুণ হইতে গেলে শাসনকর্তা দেবতাদেরও সেই পরিমাণে নিষ্ঠুর প্রতিহিংসাপরায়ণ হওয়া আবশ্যক।' স্পেন্সরের এ কথাটাও সর্বাঙ্গীণ সত্য নহে। ধর্মের একটা অবস্থা আছে, যখন কার্যসিদ্ধির জন্য, বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্যও স্বভাবত অনিষ্টকারী দেবতাদিগের হিংস্র-প্রবৃত্তি নিবারণ করিবার জন্য দেব-আরাধনা করাই ধর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে। চুরি করিতে যাইতেছি, দেবতার পূজা করিলাম, খুন করিতে যাইতেছি, দেবতার পূজা করিলাম, কার্যসিদ্ধি হইবে। শত্রু দেশ আক্রমণ করিয়াছে, দেবতার পূজা করিলাম, বিপদ হইতে উদ্ধার পাইব। ওলাবিবি, শীতলা মনসা প্রভৃতি দেবতাদের পূজা করি, নহিলে তাহারা আমার অনিষ্ট করিবে। এরূপ অবস্থায় দেবতারা যতই নিদারুণ হউক-না-কেন, উপাসকদিগের দুষ্প্রবৃত্তি দমনের জন্য তাহারা কিছুমাত্র উপযোগী নহে। বরঞ্চ দুষ্প্রবৃত্তির উত্তেজক ও দুষ্কর্মের সহায়। কালীর উপাসনা করিয়া ও কালীর নিকট নরবলি দিয়া দস্যুদিগের হিংস্র-প্রবৃত্তির কি কিছু উপশম হয়? তাহারা কি তাহাদের দুষ্কর্মে দ্বিগুণ বল পায় না? অন্য শত সহস্র বাহ্য কারণ হইতে দস্যুদের স্বভাব পরিবর্তন হইতে পারে। কিন্তু যুগযুগান্তর কালী পূজা করিয়া আসিলে তাহাদের নিষ্ঠুরতা বর্ধিত হইবে বৈ হ্রাস হইবে না। তবে দেবতা নিদারুণ হওয়াতে উপাসকের দুর্দান্ত ভাবের দমন হইল কই? বরঞ্চ সে আরও স্ফূর্তি পাইল। সমাজের যখন কিয়ৎ পরিমাণে উন্নতি হইয়াছে, যখন, দেবতাদের কতকগুলি শুভ আদেশ আছে বলিয়া লোকের বিশ্বাস জন্মিয়াছে ও সেইগুলি লঙ্ঘন করিলে দেবতার কোপ দৃষ্টিতে পড়িতে হইবে বলিয়া ধারণা হইয়াছে, তখন স্পেন্সরের কথা অনেকটা খাটে। কিন্তু সে অবস্থা সমাজের অনেক উন্নতির ফল। এখনও শত শত লোক চারি দিকে দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা কেবলমাত্র বিপদ-সম্পদের জন্যই দেব-আরাধনা করে, তাহারা অন্যায় মকদ্দমা জিতিবার জন্য, নিরীহ ব্যক্তিকে জেলে পাঠাইবার জন্য দেবতার পূজা করে ও একবার মনেও করে না যে, দেবতার আদেশ লঙ্ঘন করিবার জন্যই দেবতার প্রসাদ

প্রার্থনা করিতেছি। তাহারা তিন সন্ধ্যা দেবতার পূজা করিতে ভোলে না, কিন্তু দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা অসংকোচে শত সহস্র পাপাচরণ করে। পূজার একটা ফুল কম পড়িলে, একটা সামান্য ত্রুটি থাকিলে তাহারা সশঙ্কিত হইয়া উঠে, অথচ অন্যায় কাজ করিতে কিছু মনেই করে না! দেবতার নিকট রক্তপাত করিয়া ও দেবতার নিকট মন্ত্রপাঠ করিয়া ইহাদের স্বভাবের কি উন্নতি হইতে পারে?

এইস্থলে হর্বার্ট স্পেন্সর একটি গোঁজামিলন দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

'Certainly, such conceptions as those of the Greeks, who ascribed to the personages of their Pantheon every vice, are repulsive enough. But... the question to be answered is, whether these beliefs were beneficent in their effects on those who held them.'

এই-সকল বিশ্বাস যে উপাসকদিগের পক্ষে যথার্থ হিতসাধক তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য বলিয়াছেন যে, অসভ্যদের প্রকৃতি যতই দুর্দান্ত হয় ততই তাহাদের শাসন কঠোর হওয়া আবশ্যক। এবং শাসন কঠোর হইতে গেলেই শাসনকর্তা দেবতাদিগকেও নিষ্ঠুর, প্রতিহিংসাপরায়ণ হওয়া আবশ্যক। যতটুকু স্পেন্সরের যুক্তির পক্ষে আবশ্যক, ততটুকুই তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, অবশিষ্ট অংশটুকু গোপন করিয়া গিয়াছেন। নিষ্ঠুরতাই কিছু একমাত্র পাপ-প্রবৃত্তি (Vice) নহে। দেবতা নিষ্ঠুর না হইতেও পারে, দেবতা যদি চৌর্যবৃত্তিপরায়ণ শঠ হয়, দেবতা যদি মিথ্যাবাদী ভীরু হয়, তাহা হইলে সে দেবতা উপাসকের কী হিতসাধন করিতে পারে জানিতে ইচ্ছা করি! সকল দেবতারই যদি উপযোগিতা থাকে এমন মত হয়, তবে আমাদের এ প্রশ্নের উত্তর কী? সমস্ত ছাঁটিয়া এই দাঁড়ায় যে, স্পেন্সরের মতে অসভ্য অবস্থায় নিষ্ঠুর দেবতারই উপযোগিতা আছে। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, এ কথাও সর্বতোভাবে সত্য নহে। সমাজের এমন অবস্থা আছে, যখন দেবতা যতই নিষ্ঠুর হউক-না-কেন, উপাসকদিগের দুর্দান্ত ভাব আরও বর্ধিত হইতে থাকে বৈ হ্রাস পায় না। যদি বল, সে সময়ে তাহাদের নিজ ধর্ম ব্যতীত আর কোনো ধর্ম তাহাদের নিকট টিকিতে পারে না, অতএব সেই ধর্মই তাহাদের পক্ষে একমাত্র সম্ভব ধর্ম ও সেই হিসাবে উপযোগী ধর্ম, তবে আমরা বলি তাহার যথেষ্ট প্রমাণ কোথায়? স্পেন্সর যে একমাত্র দৃষ্টান্ত উদ্‌ধৃত করিয়াছেন তাহা আমাদের নিকটে যথেষ্ট বলিয়া বোধ হইল না। তিনি বলেন, ফিজি দ্বীপবাসী ভেওয়া খৃস্টান অনুতাপীগণ আত্মার অশান্তিবশত অনেকক্ষণ ধরিয়া আর্তনাদ করিতে থাকে। অবশেষে শ্রান্ত হইয়া মূর্ছিত হইয়া পড়ে; চেতনা লাভ করিয়া তাহারা পুনরায় প্রার্থনা করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া স্পেন্সর কহিতেছেন, ফিজি দ্বীপবাসীগণ নিতান্ত অসভ্যজাতি। তাহারা মানুষ খায়, শিশু হত্যা করে, নরবলি দেয়। তাহাদের পরিবারের মধ্যেও পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিশ্বাস নাই। তাহারা সর্পের পূজা করে। দেখা যাইতেছে, তাহারা খৃস্টান হইয়া খৃস্টান ধর্মের প্রতিহিংসা, অনন্ত যন্ত্রণা ও শয়তান-তন্ত্রটুকুই বাছিয়া লইয়াছে। এই নিমিত্তই তাহারা ভয়ে আর্তনাদ করে। তাহাদের সেই পুরাতন সর্প-উপাসনাই খৃস্টান ধর্ম নাম ধারণ করিয়াছে মাত্র। উন্নততর ধর্ম অবলম্বন করিয়া ভেওয়া খৃস্টানগণের যে কিছু উন্নতি হয় নাই, উপরি-উক্ত দৃষ্টান্তে তাহার কিছু প্রমাণ হয় না।

যদি এমন যুক্তি প্রয়োগ কর যে, যতদিন একটি দ্রব্যের উপযোগিতা থাকে ততদিনই সে টিকিতে পারে, তাহার ঊর্ধ্বে নহে, অতএব যে ধর্ম যে দেশে টিকিয়া আছে, সে ধর্ম সে দেশের উপযোগী। তবে সে সম্বন্ধেও আমাদের দুই-একটি কথা আছে।

মনুষ্য স্বভাবে উভয়ই আছে, স্থিতিশীলতা ও পরিবর্তনশীলতা। আবশ্যকের উপযোগী করিয়া পরিবর্তন যে হইয়াই থাকে তাহা নহে। মনুষ্য স্বভাবে কেন, সমস্ত জগতেই এই নিয়ম। প্লায়োসিন যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত ঘোড়ার পায়ে যে অঙ্গুলির অসম্পূর্ণ আরম্ভ বর্তমান রহিয়াছে, তাহা তাহার কোনো কাজে লাগে না, উপযোগিতার নিয়মানুসারে তাহা কেন

ধ্বংস হইল না? স্তন্যপায়ী জীবের পুরুষ জাতিরও স্তন আছে, এমন-কি, তাহাদের 'mammary glands' পর্যন্ত বর্তমান আছে। অনেকে শুনিয়া থাকিবেন, অনেক পুরুষের স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হইয়াছে। পুরুষ জীবেরা যে কোনো কালে শাবকদিগকে স্তন্যপান করাইয়াছিল তাহার কোনো প্রমাণ নাই। প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্যন্ত যদি পুরুষ মানুষ সন্তানকে স্তন দান করিয়া না থাকে তবে এই অনাবশ্যক প্রত্যঙ্গ কেন পুরুষ শরীরে বর্তমান রহিল?

উপাধ্যায় হেকেল বলেন, জীবিত প্রাণীদিগের মধ্যে দুই প্রকারের উদ্যম আছে; এক কেন্দ্রানুগ (centripetal) যাহাতে করিয়া তাহাদের বংশপরম্পরাগত বিশেষত্ব রক্ষা করে; আর এক কেন্দ্রাতিগ (centrifugal) যাহাতে করিয়া বাহ্য অবস্থার অনুকূল করিয়া তাহাদের পরিবর্তন সাধন করে। অর্থাৎ নিতান্ত প্রতিকূল অবস্থায় না পড়িলে অনেক অনাবশ্যক অঙ্গপ্রত্যঙ্গও থাকিয়া যায়। "The Genealogy of Animals" নামক প্রবন্ধে উপাধ্যায় হক্সলি যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্‌ধৃত করিয়া দিই—

'I think it must be admitted that the existence of an internal metamorphic tendency must be as distinctly recognized as that of an internal conservative tendency; and that the influence of conditions is mainly, if not wholly, the result of the extent to which they favour the one, or the other, of these tendencies.'

এই নিয়ম ধর্ম সম্বন্ধেও খাটে। যদি স্বীকার করা যায়, যে অসভ্য অবস্থায় দুর্দান্ত হৃদয় দমনে রাখিবার জন্যই কুম্ভীপাক প্রভৃতি বিভীষিকাপূর্ণ নরক স্বভাবতই কল্পিত হইয়াছিল, তথাপি ইহা নিশ্চয় বলা যায় যে, যত দিন পর্যন্ত কোনো জাতির সেই নরকে বিশ্বাস বর্তমান থাকিবে, ততদিন পর্যন্তই যে, তাহাদের সেই অসভ্য অবস্থা ও দুর্দান্ত হৃদয় আছে বলিয়া প্রমাণ হইবে তাহা নহে। অবস্থা-বিশেষে একটা বিশ্বাসের জন্ম হইলে অবস্থার পরিবর্তনে যে সেই বিশ্বাসের ধ্বংস হয় তাহা নহে। বিশেষত স্বর্গ-নরকের বিশ্বাস শীঘ্র ধ্বংস হইবার কোনো কারণ নাই। তাহার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। অর্থাৎ সে বিশ্বাসের প্রতিকূল অবস্থাবিশেষ কিছুই বর্তমান নাই। অতএব একবার যাহা বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে, তাহা পুনশ্চ ভাঙিয়া অবিশ্বাস করিবার কোনো কারণ নাই। আমাদের শাস্ত্রোল্লিখিত কুম্ভীপাক প্রভৃতি নরকের উল্লেখ করিয়া হর্বার্ট স্পেন্সর হিন্দুদিগকে বিশ্বাসঘাতক, চৌর, মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন। ইহাই যদি হইল, তবে আমরা খৃস্টানদিগকে কী না বলিতে পারি! আমাদের শাস্ত্রে অনন্ত যন্ত্রণা নাই। যাহাদের অনন্ত নরকে বিশ্বাস করিতে হইয়াছে, না জানি তাহাদের স্বভাব কী পৈশাচিক হইবে! আসল কথা এই বিশ্বাসকে মানুষেরা উপযোগিতার চক্ষে দেখে না। 'আবশ্যক হইয়াছে, অতএব, আইস আমরা বিশ্বাস করি' এমন করিয়া যদি লোকে বিশ্বাস করিত, 'আবশ্যক চলিয়া গিয়াছে, অতএব আইস আমরা বিশ্বাস করিব না' এমন করিয়া যদি বিশ্বাস পরিত্যাগ করিত, তাহা হইলে সমস্তই অত্যন্ত সহজ হইয়া যাইত। একবার যাহা বিশ্বাস হয়, সে বিশ্বাস অনেক কাল চলিতে থাকে। একটা দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করি। কোনো রাজ্যে এক জনের দোষে যদি আর-একজনকে শাস্তি দিবার প্রথা থাকে তবে সে প্রথাকে কে না নিন্দা করিবে? ন্যায়পরতার যে ভাব আমাদের হৃদয়ে বর্তমান আছে, তাহার সহিত উক্ত রূপ বিচারের ঐক্য হয় না। কিন্তু মনুষ্যের নিমিত্ত খৃস্টের মৃত্যু ঘটনাকে খৃস্টানেরা কেন ঈশ্বরের ন্যায়পরতার প্রমাণ স্বরূপেই উল্লেখ করেন? তাঁহারা নিজে যাহা করেন না, অন্যকে যাহা করিতে দেখিলে নিন্দা করেন, তাহাকেই ন্যায়পরতা বলিয়া ১৮০০ বৎসর বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন কীরূপে? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুসংস্কারে বিশ্বাস কীরূপে চলিয়া আসে? ইংরাজেরা অনেকে যে বিশ্বাস করেন যে, এক টেবিলে ১৩ জন খাইলে তাহাদের মধ্যে ১ জনের এক বৎসরের মধ্যে মৃত্যু হইবে, অনেকবার হয়তো তাহার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছেন তথাপি তাহা যায় না কেন?

অবশেষে জিজ্ঞাসা করি, গরিব হিন্দুদিগের প্রতি কেন যে নানাবিধ রূঢ় বিশেষণ প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহার কি একটা কারণ আছে? কুম্ভীপাক নরকের কথা পড়িয়াই কি স্পেন্সর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, হিন্দুরা বিশ্বাসঘাতক, চোর, মিথ্যাবাদী? না, উহা একটা জানা সত্য, ও বিষয়ে কাহারো দ্বিরুক্তি বা দ্বিমত হইতে পারে না? হিন্দুরা যে বিশ্বাসঘাতক, চোর ও মিথ্যাবাদী সেইটে আগে প্রমাণ করিয়া তার পরে কুম্ভীপাক নরকের কথা তুলিয়া তাঁহার যুক্তি সমর্থন করিলে ঠিক ন্যায়শাস্ত্র অনুযায়ী কাজ হইত।

স্পেন্সর বলিয়াছেন, হিন্দুদের কঠোর নরক আছে, অতএব নিষ্ঠুর দেবতাও আছে। দেবতারা যে নিষ্ঠুর, তাহার প্রমাণ কী? না, তাহাদের ফকিরেরা আত্মপীড়ন করে। যে দেবতারা কষ্ট দেখিয়া সুখী হয়, তাহারা অবশ্য নিষ্ঠুর। প্রথমত, ফকিরেরা হিন্দু নহে। দ্বিতীয়ত, অনেক হিন্দু দেবতার নিকট আত্মপীড়ন করিয়া থাকে বটে (যেমন তারকেশ্বরের নিকট হত্যা দেওয়া ইত্যাদি) কিন্তু তাহা হইতে প্রমাণ হয় না যে, তাহাদের দেবতা নিষ্ঠুর। বরঞ্চ উল্টাটাই সত্য। আমাদের দেশে অনেক ভিক্ষুক আছে, তাহারা হত্যা দিয়া ভিক্ষা আদায় করে। তাহার কারণ এমন নহে যে ভিক্ষাদাতারা কষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত পুলকিত হইয়া ভিক্ষুককে পুরস্কার দেন। মনুষ্যের পরকষ্ট-অসহিষ্ণুতার প্রতি ভারতবর্ষীয় ভিক্ষুকদের এমন বিশ্বাস আছে যে তাহারা ভিক্ষা করিবার জন্য নিজেকে পীড়ন করে। দেবতার দয়ার প্রতিও হিন্দু উপাসকের তেমনি বিশ্বাস। সে জানে যে, আমি যদি নিজেকে এতখানি কষ্ট দিই, তবে দয়াময় কখনোই সহিতে পারিবেন না, নিশ্চয়ই আসিয়া আমার বাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। যদি আমাদের তপস্বীদিগকে স্পেন্সর ফকির বলিয়া থাকেন তবে সে সম্বন্ধে এই বলিতে পারি যে দেহকে দমন করিয়া আত্মার উন্নতি সাধন করিবার জন্য তপস্বীরা যে ঐহিক সুখ ও আরাম হইতে ইচ্ছাপূর্বক নিজেকে বঞ্চিত করিতেন, পাশ্চাত্য দার্শনিক তাহার মর্ম হয়তো ঠিক বুঝিতে পারিবেন না। এ বিষয়ে স্পেন্সরের ভ্রম বদ্ধমূল। এ ভ্রম কেবলমাত্র যে, এই প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নহে, তাঁহার *Data of Ethics* নামক গ্রন্থে স্পেন্সর ঠিক এই কথাগুলিই বলিয়াছেন।

ভারতী
বৈশাখ ১২৮৯

বৈজ্ঞানিক সংবাদ

আমরা তো জানিতাম, আমাদের দেশেই যত বিশ্বের মশা। শীতের দেশে মশার উৎপাত নাই। সে কথাটা ঠিক নহে। মেরু প্রদেশের আলাস্কা নামক শীতপ্রধান স্থানে মশার যেরূপ প্রাদুর্ভাব তাহা শুনিলে আশ্চর্য হইতে হয়। একজন লিখিয়াছেন— এখানে পশুপক্ষী শিকার করা দায়, ঘন মশার ঝাঁক মেঘের মতো উড়িয়া লক্ষ্য আচ্ছন্ন করে। কখনো কখনো মশায় সেখানকার কুকুর মারিয়া ফেলে। সোয়াট্‌কা সাহেব লিখিতেছেন যে, তিনি শুনিয়াছেন মশায় সেখানকার বৃহৎ ভল্লুককে মারিয়া ফেলিয়াছে। ভল্লুক মশা-সমাচ্ছন্ন জলাপ্রদেশে গিয়া পড়িলে দাঁড়াইয়া দুই পা দিয়া মশার ঝাঁকের সহিত যুদ্ধ করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। মশার গায়ে তাহার বড়ো বড়ো নখের একটি আঁচড়ও পড়ে না, এবং মশাকে জড়াইয়া ধরিবার কোনো সুবিধা হইয়া উঠে না। অবশেষে মশার দংশনে অন্ধ হইয়া ভল্লুক পড়িয়া থাকে, ও না খাইতে পাইয়া মরিয়া যায়। শীতপ্রধান মেরুদেশে মশার যেমন প্রবল প্রতাপ এমন আর কোথাও নহে। জাহাজে করিয়া যাঁহারা মেরুদেশে ভ্রমণ করিতে যান তাঁহারা সকলেই এ কথা জানেন। যেখানে যেখানে জাহাজ থামে সেইখানেই মশার পাল আসিয়া জাহাজ আক্রমণ করে— জামার আস্তিনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভয়ানক রক্ত-শোষণ করিতে থাকে। জাহাজ হইতে নামিয়া দুইজন বীরপুরুষ শিকার করিতে গিয়াছিলেন। তাহার একজন জর্মন্ সেনা। ইনি যুদ্ধের সময় অশ্বারোহণে বীরপরাক্রমে ফ্রান্স পর্যটন করিয়াছিলেন,

কোনো বিপদ হয় নাই; কিন্তু এখানে মশার উপদ্রবে ঘোড়া হইতে পড়িয়া খোঁড়া হইয়া যান। মশার জ্বালায় ঘোড়া এবং আরোহী এমনই অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন যে আত্মসংযমন উভয়ের পক্ষেই অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সৈন্য জাহাজে আসিয়া গল্প করিলেন— 'পেটের মধ্যে মশা যায়, নিশ্বাস টানি নাকে মশা ঢোকে, থু থু করিয়া মুখের মধ্য হইতে মশা ফেলিয়া দিতে হয়।' সে দেশে গ্রীষ্মকালে মশার উপদ্রব বরঞ্চ কিছু কম থাকে, কারণ পাখিরা আসিয়া অনেক মশা খাইয়া ফেলে। আমাদের দেশে এত পাখি আছে, মশাও তো কম নাই।

জলে আগুন জ্বলিতে দেয় না এইরূপ সাধারণের ধারণা, কিন্তু সম্প্রতি বেকর সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, যদি কোনো জিনিস একেবারে শুকাইয়া ফেলা যাইতে পারে, তবে তাহা আর জ্বলে না। সম্পূর্ণ শুষ্ককাঠ জ্বলে না। কিন্তু ইহার পরীক্ষা করা শক্ত। কারণ, চতুর্দিকেই জলীয় পদার্থ আছে। বাতাসের মধ্যে জল আছে। গ্যাসে জল আছে। জলকে দূর করা দায়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, এই জলীয় পদার্থ না থাকিলে অতিশয় দাহ্য পদার্থও জ্বলিতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে, জল জ্বালাইবার সহায়তা করে।

যুদ্ধে বন্দুকের গুলি কত যে বৃথা খরচ হয়, তাহার একটা হিসাব বাহির হইয়াছে। ফরাসি-প্রুশীয় যুদ্ধে দেখা গিয়াছে এক-একটি সৈন্য মারিতে ১৩০০ গুলি খরচ হইয়াছে। সল্‌ফেরিনোর যুদ্ধে প্রত্যেক সৈন্য বধ করিতে ৪২০০ গুলি লাগিয়াছে।

অনেক পণ্ডিত অনুমান করেন সমুদ্রের ন্যায় ভূপৃষ্ঠও ক্রমাগত তরঙ্গিত বিচলিত হইতেছে; ভূপৃষ্ঠে জোয়ারভাটা খেলিতেছে। কোথাও বা বড়ো ঢেউ কোথাও বা ছোটো ঢেউ উঠিতেছে। পৃথিবীর তরঙ্গসংকুল দেশের মধ্যে জাপান একটি প্রধান স্থান। সেখানে ছোটো বড়ো ঢেউ ক্রমাগত উত্থিত হইতেছে। আমাদের এখানে এতটা ঢেউ নাই, কিন্তু সম্পূর্ণ যে স্থির আছে তাহা নহে। সমুদ্রে দাঁড় ফেলিলে সমুদ্রের জল যেমন কাঁপিয়া উঠে, রাস্তা দিয়া গাড়ি প্রভৃতি চলিলে ভূতল তেমনি কাঁপিতে থাকে, ইহা সকলেই দেখিয়াছেন। এই ভূ-তরঙ্গ সম্বন্ধে য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা সম্প্রতি পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন।

আহারান্বেষণ ও আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে ছদ্মবেশ ধারণ কীটপতঙ্গের মধ্যে প্রচলিত আছে তাহা বোধ করি অনেকে জানেন। তাহা ছাড়া, ফুল, পত্র প্রভৃতির সহিত স্বাভাবিক আকার-সাদৃশ্য থাকাতেও অনেক পতঙ্গ আত্মরক্ষা ও খাদ্যসংগ্রহের সুবিধা করিয়া থাকে। একটা নীল প্রজাপতি ফুলে ফুলে মধু অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিল। পুষ্পস্তবকের মধ্যে একটি ঈষৎ শুষ্কপ্রায় ফুল দেখা যাইতেছিল, প্রজাপতি যেমন তাহাতে শুঁড় লাগাইয়াছে, অমনি তাহার কাছে ধরা পড়িয়াছে। সে ফুল নহে, সে একটি সাদা মাকড়সা। কিন্তু এমন একরকম করিয়া থাকে যাহাতে তাহাকে সহসা ফুল বলিয়া ভ্রম হয়।

টিকটিকির কাটা লেজ যেমন নড়িতে থাকে, মাকড়সার বিচ্ছিন্ন পাও তেমনি নড়িয়া থাকে। কোনো শত্রু আসিয়া পা ধরিলে মাকড়সা অনায়াসে পায়ের মায়া ত্যাগ করিয়া তাহার পা খসাইয়া ফেলে। দুই-একটা পা গেলেও তাহাদের বড়ো একটা ক্ষতি হয় না— অনায়াসে ছুটিয়া চলে।

বিলাতের উদ্যানকারদের মধ্যে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, যেখানে বিলাতি বেগুনের গাছ রোপণ করা হয় সেখানে পোকামাকড় আসিতে পারে না। যে গাছে পোকা ধরিবার সম্ভাবনা আছে তাহার চারি পাশে বিলাতি বেগুন রোপণ করিয়া গাছকে রক্ষা করা যায়। এটা অনায়াসেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারা যায়।

পণ্ডিতবর টাইলর সাহেব বলেন— পরীক্ষা করিয়া দেখিলে উদ্ভিদদের কার্যেও কতকটা যেন স্বাধীন বুদ্ধির আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। বৃক্ষ নিতান্ত যে জড়যন্ত্রের মতো কাজ করে তাহা নহে, কতকটা যেন বিচার-বিবেচনা করিয়া চলে। টাইলর সাহেব এই বিষয় লইয়া অনেক বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তিনি বলেন কৃত্রিম বাধা স্থাপন করিলে গাছেরা তাহা নানা উপায়ে অতিক্রম করিবার চেষ্টা করে, এমন-কি, নিজের সুবিধা অনুসারে পল্লব সংস্থানের বন্দোবস্ত পরিবর্তন করিয়া থাকে। এ বিষয়ে তিনি অন্যান্য নানাবিধ প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া সম্প্রতি একটি বক্তৃতা দিয়াছেন।

ত্রিবাঙ্কুরের উপকূলে নারাকাল ও আলেপিতে যে বন্দর আছে, সেখানে সমুদ্র অতিশয় প্রশান্ত। চারি দিকে যখন ঝড় ঝঞ্ঝা উপপ্লব তখনও এ বন্দর দুটির শান্তিভঙ্গ হয় না। ইহার একটি কারণ আছে। ইংরাজিতে প্রাচীনকাল হইতে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, ক্ষুব্ধ সমুদ্রে তেল ঢালিলে তাহা শান্ত হয়। অনেকে তাহা অমূলক মনে করিতেন। কিন্তু সম্প্রতি পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে যে, বাস্তবিকই তেল ঢালিলে জলের ঢেউ থামিয়া যায়। কিছুদিন হইল একটি প্রস্তাব পাঠ করিয়াছিলাম তাহাতে প্রত্যেক জাহাজে প্রচুর পরিমাণে তৈল রাখিতে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল; ঝড়ের সময় অল্পে অল্পে সেই তৈল জাহাজের দুই পার্শ্বে ঢালিতে হইবে। নারাকাল এবং আলেপি বন্দরের সমুদ্রতল হইতে ক্রমাগত পেট্রোলিয়ম তৈল উত্থিত হইতেছে। কালিফর্নিয়াতীরের নিকটবর্তী একস্থানের সমুদ্রে এইরূপ তৈল-উৎস আছে। সেখানকার সমুদ্রও শান্ত থাকে।

আমেরিকার শিল্পী ও মজুরদের মধ্যেও বহুল পরিমাণে বিদ্যাচর্চা প্রচলিত আছে এইজন্য সেখানকার হাতের কাজ অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। য়ুনাইটেড স্টেট্‌স্‌-এ দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার আটশত প্রকাশ্য বিদ্যালয় আছে, অর্থাৎ প্রত্যেক দুইশো লোকের মধ্যে একটি করিয়া বিদ্যালয় আছে। একমাত্র মাসচুসেট্‌স্‌ প্রদেশে দুই হাজার পুস্তকালয় আছে, অর্থাৎ প্রত্যেক আটশত লোকের মধ্যে একটি করিয়া পুস্তকালয় আছে। অনেকে মনে করেন বিদ্যাশিক্ষায় শিল্পকাজের ব্যাঘাত করে, কিন্তু তাহা ভ্রম। বিদ্যাশিক্ষায় সকল কাজেরই সহায়তা করে। ফরাসি-প্রুশীয় যুদ্ধে জর্মনদের যে জিত হইল তাহার একটা প্রধান কারণ তাহারা শিক্ষিত— এই নিমিত্ত তাহারা যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করিতে অধিকতর নিপুণতা লাভ করিয়াছিল।

আমাদের বিশ্বাস ছিল, যাহাদের এক ইন্দ্রিয় অসম্পূর্ণ তাহাদের অন্য ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণতর হয়। কিন্তু এ কথা সকল স্থানে খাটে না। দেখা গিয়াছে যাহারা বধির তাহারাই অধিকাংশ অন্ধ এবং যাহারা অন্ধ তাহারাই অধিকাংশ বধির।

কার্বনিয়ে নামক একজন ফরাসি পণ্ডিত বলেন যে, গঙ্গার নিকটবর্তী জলাশয়ে একপ্রকার অতি ক্ষুদ্র মৎস্য আছে, তাহারা পাখির ন্যায় জলে নীড় প্রস্তুত করে। ইহারা দেখিতে অতি সুন্দর, রামধনুর ন্যায় নানা বর্ণে রঞ্জিত। ইহারা জলের মধ্য হইতে একপ্রকার উদ্ভিদ মুখে করিয়া জলের

উপরে রাখে, পুনর্বার তাহা জলমগ্ন না হয় এই উদ্দেশ্যে তাহারা মুখ হইতে বায়ু নির্গত করিয়া জলবুদ্‌বুদের উপর তাহা ভাসাইয়া রাখে। পরদিন সেই গাছের মধ্যে জলবুদ্‌বুদ পুরিয়া দেয় এবং তাহা গোলাকারে পরিণত করে। পুরুষ মৎস্য তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহা পরিষ্কার করিলে পর স্ত্রী মৎস্য ডিম পাড়িতে আহূত হয়। ডিম পাড়িয়া সে তো প্রস্থান করে, পুরুষ মৎস্য সেই ডিম্বের তত্ত্বাবধান করে। এইরূপে দশ দিবস যায়। ডিম ফুটিয়া গেলে সে সেই নীড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ফুটা করিয়া জলবুদ্‌বুদ কতকটা বাহির করিয়া দেয়। তখন তাহা আর গোলাকার থাকে না, প্রশস্ত হইয়া পড়ে।

আমরা তো গঙ্গার কাছাকাছি থাকি, কিন্তু এ মাছটি যে কী মাছ তাহা তো ঠিক জানি না। গঙ্গাতীরবর্তী পাঠকেরা কি এই মাছের কোনো খবর রাখেন?

বালক
আশ্বিন-কার্তিক ১২৯২

গতি নির্ণয়ের ইন্দ্রিয়

আমাদের কর্ণকুহরের এক অংশে তিনটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি চোঙের মতো আছে তাহার বিশেষ কার্য কী এ পর্যন্ত ভালোরূপ স্থির হয় নাই। পূর্বে শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অনুমান করিতেন যে ইহার দ্বারা শব্দের দিক নির্ণয় হইয়া থাকে। কিন্তু সম্প্রতি দুই-এক জন পণ্ডিত ইহার অন্যরূপ কার্য স্থির করিয়াছেন।

তাঁহারা বলেন, আমরা কী করিয়া গতি অনুভব করি এ পর্যন্ত তাহার কোনো ইন্দ্রিয়তত্ত্ব জানা যায় নাই। একটা গাড়ি যদি কোনোরূপ ঝাঁকানি না দিয়া সমভাবে সরল পথে চলিয়া যায় তাহা হইলে গাড়ি যে চলিতেছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না— পালের নৌকা ইহার দৃষ্টান্তস্থল। কিন্তু গাড়ি যদি ডাহিনে কিংবা বামে বেঁকে অথবা থামিয়া যায় তবে আমরা তৎক্ষণাৎ জানিতে পারি। পণ্ডিতগণের মতে কর্ণেন্দ্রিয়ের উক্ত অংশই এই গতিপরিবর্তন অনুভব করিবার উপায়। এক- প্রকার রোগ আছে যাহাতে রোগী টলমল করিয়া চলে, একপাশে কাত হইয়া পড়ে এবং কানে শুনিতে পায় না। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে সেই অর্ধচন্দ্রাকৃতি কর্ণযন্ত্রের বিকৃতিই তাহাদের রোগের কারণ। কোন্ দিকে কতটা হেলিতেছে ঠিক বুঝিতে না পারিলে কাজেই তাহাদের পক্ষে শক্ত হইয়া চলা অসম্ভব হইয়া পড়ে। সকলেই জানেন ভূমির উচ্চ-নীচতা মাপিবার জন্য কাঁচের নলের মধ্যে তরল পদার্থ দিয়া একপ্রকার যন্ত্র নির্মিত হয়, আমাদের উক্ত কর্ণপ্রণালীর মধ্যেও সেই প্রকার তরলদ্রব্য আছে, সম্ভবত তাহা আমাদের গতিপরিবর্তন অনুসারে স্থান পরিবর্তন করিয়া আমাদের স্নায়ুকে সচেতন করিয়া দেয় এবং আমরাও তদনুযায়ী তৎক্ষণাৎ আমাদের শরীরের ভার সামঞ্জস্য করিতে প্রবৃত্ত হই।

ইচ্ছামৃত্যু

শরীরের সকল ইন্দ্রিয়ের উপরেই আমাদের ইচ্ছাশক্তির আধিপত্য নাই। পরিপাক রক্তচলাচল প্রভৃতি কার্য আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। আমরা ইচ্ছা করিলে চোখের পাতা বুজিতে পারি কিন্তু কান বুজিতে পারি না। সীল মৎস্য জলে ডুবিবার সময় স্বেচ্ছামতো নাক কান বুজিতে পারে। আমাদের নাসা ও কর্ণ রুদ্ধ করিবার মাংসপেশী আছে কিন্তু তাহারা প্রায় অকমর্ণ্য হইয়া গিয়াছে— দুর্গন্ধ অনুভব করিলে আমরা নাসা কুঞ্চিত করিতে পারি বন্ধ করিতে পারি না। কিন্তু দৈবাৎ এক-এক জন লোক পাওয়া যায় যাহারা জন্তুর ন্যায় অবলীলাক্রমে কান

দুলাইতে পারে, মাথার উপরকার চর্ম নাড়াইতে পারে। গোরু জাবর কাটিতে পারে মানুষের পক্ষে তাহা অসাধ্য, কিন্তু অনেক লোক ইচ্ছা-মাত্র অনায়াসে বমন করিতে পারে, দৈবক্রমে পাকস্থলীর মাংসপেশীর উপর তাহাদের কর্তৃত্ব জন্মিয়াছে। সকলেই জানেন আমাদের কতকগুলি স্নায়ু আছে যাহারা আমাদের ইচ্ছার হুকুম তামিল করে। ইচ্ছা হইল হাত তুলিব অমনি স্নায়ুযোগে সেই হুকুম হাতের মাংসপেশীর উপর জারি হইল, হাত উঠিল। কিন্তু পূর্বে বলিয়াছি, শরীরের সর্বত্র এই ইচ্ছাদূতের গতিবিধি নাই; দৈবাৎ শরীরসংস্থানের কোনোরূপ বিপর্যয়বশত এই ইচ্ছা-প্রচারী স্নায়ুর অস্থানে সঞ্চার হইয়া মানুষের অসাধারণ ইন্দ্রিয়ক্ষমতা জন্মিতে পারে। সাধারণত ইচ্ছামাত্র শরীরক্রিয়া নিরোধ করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে। কিন্তু ডাক্তারি শাস্ত্রে তাহার এক আশ্চর্য উদাহরণ লিপিবদ্ধ আছে। কর্নেল টাউনশেন্ড নামক এক ব্যক্তি ইচ্ছা করিলেই মরিতে পারিতেন। প্রথমে ডাক্তাররা তাহা বিশ্বাস করেন নাই। তাঁহারা পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কর্নেল সাহেব চিত হইয়া স্থিরভাবে কিছুক্ষণ শুইয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার নাড়ী কমিয়া হৃৎপিণ্ডের গতিরোধ হইয়া আসিল; অবশেষে জীবনের কোনো লক্ষণ রহিল না। ডাক্তাররা ভয় পাইলেন। কিন্তু আবার আধঘণ্টা পরে ক্রমে তাঁহার নাড়ী ফিরিয়া আসিল, নিশ্বাস-প্রশ্বাস চলিতে আরম্ভ করিল, তিনি কথা কহিতে লাগিলেন। ডাক্তারি শাস্ত্রে বলে, কোনো এক অস্বাভাবিক কারণে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের মাংসপেশীর উপর তাঁহার স্বেচ্ছাস্নায়ুর অধিকার জন্মিয়াছিল। কিন্তু আধঘণ্টাকাল শরীরক্রিয়া রোধ করিয়া কীরূপে প্রাণরক্ষা হয় তাহা কে বলিতে পারে? আমাদের দেশে যোগীদের মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত মাঝে মাঝে পাওয়া গিয়াছে শুনা যায়। কিন্তু যোগী ও রোগীর মধ্যে প্রভেদ এই যে, যোগী সাধনার দ্বারা যে ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন রোগী দেহযন্ত্রের অনিচ্ছাকৃত বিকৃতিক্রমে সেই ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মাকড়সা-সমাজে স্ত্রীজাতির গৌরব

পৌরুষ সম্বন্ধে স্ত্রী-মাকড়সার সহিত পুরুষ-মাকড়সার তুলনাই হয় না। প্রথমত, আয়তনে মাকড়সার অপেক্ষা মাকড়সিকা ঢের বড়ো, তার পর তাহার ক্ষমতাও ঢের বেশি। স্বামীর উপর উপদ্রবের সীমা নাই, তাহাকে মারিয়া কাটিয়া অস্থির করিয়া দেয়। এমন-কি, অনেক সময় তাহাকে মারিয়া ফেলিয়া খাইয়া ফেলে; এরূপ সম্পূর্ণ দাম্পত্য একীকরণের দৃষ্টান্ত উচ্চশ্রেণীর জীবসমাজে আছে কি না সন্দেহ।

উটপক্ষীর লাথি

নীড় রচনার সময় এই মরুবিহারী বিরাট পক্ষী অত্যন্ত দুর্ধর্ষ হইয়া উঠে। নিকটে মানুষ দেখিলে ছুটিয়া গিয়া আক্রমণ করে, পা দুলাইয়া দুলাইয়া এক প্রচণ্ড লাথি কসাইয়া দেয়। এই এক লাথির চোটে অশ্বের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া গিয়াছে শুনা যায়। এই পাখির আক্রমণ হইতে ছুটিয়া পালানো অসম্ভব। দ্রুতবেগে ইহাকে কেহ হারাইতে পারে না। এরূপ স্থলে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িয়া সহিষ্ণুভাবে ইহার লাথি সহ্য করাই একমাত্র গতি। একজন এইরূপ পাখির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সবলে তাহার গ্রীবা ভূমিতে নত করিয়া ধরিয়াছিল। দৈবক্রমে পাখির লাথি নিজেরই নতমস্তকের উপর পড়িয়া আপনার মস্তিষ্ক বিক্ষিপ্ত করিয়া দিল এবং সেই লোকটি বিনা আঘাতে পরিত্রাণ পাইল।

সাধনা

অগ্রহায়ণ ১২৯৮

জীবনের শক্তি

আমরা ইচ্ছা করি আর নাই করি আমাদের শরীরের ক্রিয়া অবিশ্রাম চলিতেছে; তাহাতে যে কী বিপুল শক্তি ব্যয় হইতেছে তাহা আমরা জানিতে পারি না।

আমাদের হৃৎপিণ্ড চারিটি কোটরে বিভক্ত। তাহার মধ্যে দুইটি কোটরে শরীরের রক্ত আসিয়া প্রবেশ করিতেছে এবং অপর দুইটি অংশ স্যাকরার হাপরের মতো সংকুচিত হইয়া শরীরের সর্বত্র রক্ত প্রবাহিত করিতেছে। দিনরাতি এ কাজের আর বিশ্রাম নাই। এইটুকু চর্মযন্ত্রের পক্ষে কাজও নিতান্ত সামান্য নয়। রক্তসঞ্চারী কোটরদ্বয়ের বাম কোটরটি প্রত্যেক সংকোচনে চার আউন্স রক্ত নয় ফুট দূরে উৎসারিত করে। দক্ষিণ কোটরটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল, কিন্তু তাহাকেও খাটিতে হয়। সুস্থশরীর বয়স্ক লোকের হৃৎপিণ্ড মিনিটে ৭৫/৭৬ বার সংকুচিত হয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে রক্তসঞ্চালনক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ড চব্বিশ ঘণ্টায় যে শক্তি ব্যয় করে সেই শক্তিদ্বারা তিন হাজার মণের অধিক (১২০ টন) ভার এক ফুট ঊর্ধ্বে তুলা যাইত।

যেমন হৃৎপিণ্ডের সংকোচন-প্রসারণ অবিশ্রাম চলিতেছে তেমনি নিশ্বাস-প্রশ্বাসেরও বিরাম নাই। তাহাতে করিয়া বক্ষস্থল ক্রমাগত উঠিতেছে পড়িতেছে এবং বুকের পাঁজরা মাংসপেশী এবং ফুসফুস সেই উত্থান-পতনের কার্যে লাগিয়া রহিয়াছে। বিশ্রামকালে চব্বিশ ঘণ্টায় প্রাপ্তবয়স্ক লোকের ফুসফুসের মধ্য দিয়া ছয় লক্ষ ছিয়াশি হাজার বর্গ ইঞ্চি পরিমাণ বায়ু প্রবাহিত হয় এবং পরিশ্রমকালে সেই বায়ুর পরিমাণ পনেরো লক্ষ আটষট্টি হাজার তিনশো নব্বই বর্গ ইঞ্চি পর্যন্ত বাড়িতে পারে। এতটা বায়ু আকর্ষণ ও নিঃসারণ বড়ো সামান্য কাজ নহে। তাহা ছাড়া ফুসফুস এবং বক্ষপ্রাচীর এই বাতাস বাধা দেয় এবং মাংসপেশীর বলে সেই বাধা অতিক্রম করিয়া নিশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়। চব্বিশ ঘণ্টায় আমাদের শ্বাসসাধক মাংসপেশী যে শক্তি প্রয়োগ করে তাহার দ্বারা ২০০ মণের অধিক ভার (২১ টন) এক ফুট ঊর্ধ্বে তুলা যাইতে পারে।

ইহা ছাড়া মস্তিষ্কের কাজ, পাকযন্ত্রের কাজ এবং অন্যান্য বিবিধ শারীরিক ক্রিয়া বাকি আছে, সে-সমস্ত হিসাব করিয়া দেখিলে দেখা যায় নিরবচ্ছিন্ন আলস্যেও কী প্রচুর শক্তি ব্যয় হইয়া থাকে। আমরা তো কেবল চব্বিশ ঘণ্টার হিসাবের কিঞ্চিদংশ দেখিলাম। একজন মানুষের সমস্ত জীবিতকাল আলোচনা করিলে জীবনের শক্তি যে কী অপরিমেয় তাহা বুঝা যায়।

ভূতের গল্পের প্রামাণিকতা

সার এডমন্ড হর্নবি চীন এবং জাপানের সর্বোচ্চ কন্সুলার কোর্টের প্রধান জজ ছিলেন। তিনি নিজের জীবনের একটি প্রত্যক্ষ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।

তিনি মকদ্দমায় যে রায় লিখিতেন সন্ধ্যার সময় খবরের কাগজের সংবাদদাতারা আসিয়া সেই রায় চাহিয়া লইয়া যাইত এবং পরদিনের সংবাদপত্রে প্রকাশ করিত। একদিন এইরূপ রায় লিখিয়া তাঁহার খানসামার কাছে রাখিয়া দিয়াছিলেন; কথা ছিল যখন সংবাদদাতা আসিবে ভৃত্য এই রায় তাহার হস্তে দিবে। জজসাহেব রাত্রে নিদ্রিত আছেন এমন সময় শয়নগৃহের দ্বারে আঘাত শুনিয়া জাগিয়া উঠিলেন। বুঝিলেন কেহ গৃহে প্রবেশের অনুমতির অপেক্ষা করিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে, তিনি প্রবেশ করিবার আদেশ করিলে সেই খবরের কাগজের সংবাদদাতা গম্ভীরভাবে গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার রায় প্রার্থনা করিল। শয়নগৃহে তাহার এরূপ অনধিকার প্রবেশে ক্রোধ প্রকাশ করিয়া হর্নবি তাহাকে খানসামার নিকট হইতে রায় চাহিয়া লইতে আদেশ করিলেন, কিন্তু তথাপি সে পুনঃ পুনঃ পূর্বমতো প্রার্থনা করিতে লাগিল। কতক বা তাহার অনুনয়ে বিচলিত হইয়া কতক বা নিজপত্নী লেডি হর্নবির জাগরণ আশঙ্কায় তিনি আর কিছু না

করিয়া সংক্ষেপে তাঁহার লিখিত রায়ের মর্ম মুখে মুখে বলিয়া গেলেন, সে তাহা লিখিয়া লইল এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া চলিয়া গেল। তখন রাত্রি দেড়টা। অনতিবিলম্বে লেডি হর্নবি জাগ্রত হইলে তাঁহার স্বামী তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা বলিলেন। পরদিন জজসাহেব আদালতে গেলে সংবাদ পাইলেন যে, সেই সংবাদদাতা পূর্বরাত্রে একটা হইতে দেড়টার মধ্যে প্রাণত্যাগ করিয়াছে এবং সে রাত্রে সে গৃহত্যাগ করে নাই। ইন্‌কোয়েস্ট পরীক্ষায় হৃদ্‌রোগই তাহার মৃত্যুর কারণ বলিয়া স্থির হইয়াছে।

এই গল্পটি যখন নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরি পত্রিকায় প্রকাশিত হইল তখন সাধারণের মনে অত্যন্ত বিস্ময় উদ্রেক করিল। বিশেষত হর্নবি সাহেব একটি বড়ো আদালতের বড়ো জজ— প্রমাণের সত্য-মিথ্যা সূক্ষ্মভাবে অবধারণ করাই তাঁহার কাজ। এবং তিনি নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তিনি পুরুষানুক্রমে আইনব্যবসায়ী, কল্পনাশক্তিপরিশূন্য এবং অলৌকিক ঘটনার প্রতি বিশ্বাসবিহীন।

এই ঘটনা কাগজে প্রকাশ হইবার চারি মাস পরে 'নর্থ চায়না হেরাল্ডে'-র সম্পাদক ব্যাল্‌ফোর সাহেব নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরিতে নিম্নলিখিতমতো প্রতিবাদ করেন।

১। হর্নবি সাহেব বলেন, বর্ণিত ঘটনাকালে লেডি হর্নবি তাঁহার সহিত একত্রে ছিলেন। কিন্তু সে সময়ে লেডি হর্নবি নামক কোনো ব্যক্তিই ছিলেন না। কারণ হর্নবি সাহেবের প্রথম স্ত্রী উক্ত ঘটনার দুই বৎসর পূর্বে গত হন এবং ঘটনার চারি মাস পরে তিনি দ্বিতীয় স্ত্রীকে বিবাহ করেন।

২। হর্নবি সাহেব ইন্‌কোয়েস্টের দ্বারা মৃতদেহ পরীক্ষার উল্লেখ করেন, কিন্তু স্বয়ং পরীক্ষক 'করোনার' সাহেবের নিকট সন্ধান লইয়া জানিলাম, উক্ত মৃতদেহ সম্বন্ধে ইনকোয়েস্ট বসে নাই।

৩। হর্নবি সাহেব ১৮৭৫ খৃস্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি তাঁহার রায় প্রকাশের দিন বলিয়া নির্দেশ করেন। কিন্তু আদালতের গেজেটে সে দিনে কোনো রায় প্রকাশিত হয় নাই।

৪। হর্নবি বলেন, সংবাদদাতা রাত্রি একটার সময় মরে। এ কথা অসত্য। প্রাতঃকালে ৮/৯ ঘটিকার সময় তাহার প্রাণত্যাগ হয়।

ব্যাল্‌ফোর সাহেবের এই প্রতিবাদের বিরুদ্ধে সার হর্নবি কিছু বলিতে পারিলেন না, সব কথা এক প্রকার মানিয়া লইতে হইল।

ইহার পর অলৌকিক ঘটনার প্রামাণ্য সাক্ষ্য সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া দুঃসাধ্য হইয়া উঠে।

মানব শরীর

যাঁহারা সাধনায় প্রকাশিত 'প্রাণ ও প্রাণী' প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা পূর্বেই আভাস পাইয়াছেন যে, প্রাণীশরীর অণুপরিমাণ জীবকোষের সমষ্টি। এ কথা ভালো করিয়া পর্যালোচনা করিলে বিস্ময়ের উদ্রেক হয়।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলেন, আমাদের শরীরের যে যে অংশে জীবনের প্রবাহ আছে সমস্তই প্রটোপ্লাজ্‌ম নামক পঙ্কবৎ পদার্থে নির্মিত। কেবল মানবশরীর নহে উদ্ভিদ প্রভৃতি যে-কোনো জীবিত পদার্থ আছে প্রটোপ্লাজ্‌ম ব্যতীত আর কোনো পদার্থেই জীবনীশক্তি নাই।

মানবশরীর অণুবীক্ষণযোগে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, এই প্রটোপ্লাজ্‌ম অতি ক্ষুদ্র কোষ আকারে বদ্ধ হইয়া সর্বদা কার্য করিতেছে। কোথাও কোথাও তন্তু আকার ধারণ করিয়া আমাদের মাংসপেশী ও স্নায়ু রচনা করিয়াছে। কিন্তু পূর্বোক্ত কোষগুলিই আমাদের শরীরের জীবনপূর্ণ কর্মশীল উপাদান।

কণামাত্র প্রটোপ্লাজ্‌ম নামক প্রাণপদার্থ সূক্ষ্ম আবরণে বদ্ধ হইয়া এক-একটি কোষ নির্মাণ করে। প্রত্যেক প্রাণকোষের কেন্দ্রস্থলে একটি করিয়া ঘনীভূত বিন্দু আছে। এই কোষগুলি এত ক্ষুদ্র যে, তাহার ধারণা করা অসম্ভব।

এই কোষগুলিই আমাদের শরীরের কর্মকর্তা, আমাদের প্রাণরাজ্যের প্রজা। ইহারাই আমাদের অস্থি নির্মাণ করিতেছে, শরীরের আবর্জনা বাহির করিয়া দিতেছে, মাংসপেশীরূপে পরিণত হইতেছে। স্নায়ুকোষগুলি শরীরের রাজস্থানীয়। তাহারাই শরীরের রাজ্যরক্ষা আইনজারি প্রভৃতি বড়ো বড়ো কাজে নিযুক্ত।

ইহাদের মধ্যে কার্যের ভাগ আছে, পাকযন্ত্রের পাচক রস নিঃসারণ হইতে অস্থি নির্মাণ পর্যন্ত সমস্ত কাজ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দলের উপর বিলি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। একদল অন্যদলের কার্যে তিলমাত্র হস্তক্ষেপ করে না। তাহাদের অধিকাংশ কার্যই প্রায় স্বাধীনভাবে নির্বাহিত হয়। যদিও তাহারা মস্তিষ্ক ও স্নায়ুকে কর্তৃপক্ষীয় বলিয়া স্বীকার করে।

আমাদের শরীরের কাজ যে কত অসংখ্য এবং কোষের দল সেই-সমস্ত কাজ কত শৃঙ্খলাপূর্বক নির্বাহ করিতেছে তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। কেহ বা জিহ্বাতলে লালা জোগাইতেছে, কেহ বা বাষ্প সৃজন করিয়া চক্ষুতারকাকে সরস করিয়া রাখিতেছে, কেহ বা পাকস্থলীতে রস নির্মাণ করিতেছে— আরও কতক সহস্র কাজ আছে। যকৃৎ যে-সকল জীব-কোষে নির্মিত তাহারা কেবল যকৃতেরই সহস্র কাজ করিয়া থাকে, আর কিছুই করে না, প্রত্যেক প্রত্যঙ্গবর্তী কোষের এইরূপ কার্যনিয়ম। মস্তিষ্ক যে-সকল কোষে নির্মিত তাহারা শরীরের সর্বোচ্চ মণ্ডপে বসিয়া অবিশ্রাম রাজকার্যে নিযুক্ত।

অতএব মানবশরীরটা একটা সমাজের মতো। অসংখ্য প্রজার ঐক্যসমষ্টি। একটা সৈন্যের দল যেমন অশ্বারোহী পদাতি প্রভৃতি নানা অংশে বিভক্ত। এবং প্রত্যেক অংশে নানা লোকের সমষ্টি অথচ সকলে মিলিয়া একটা বৃহৎ প্রাণীর মতো অতিশয় সংহত ঐক্য রক্ষা করিয়া চলে; কতকগুলি মরিতেছে আবার নূতন লোক আসিয়া তাহার স্থান পূরণ করিতেছে— মানবের জীবিত শরীর অবিকল সেইভাবে কাজ করিতেছে। আমরা প্রত্যেকেই একা এক সহস্র, এমন-কি তাহার চেয়ে ঢের বেশি।

সাধনা
পৌষ ১২৯৮

রোগশত্রু ও দেহরক্ষক সৈন্য

জল যেমন মৎস্যে, স্থল যেমন জীবজন্তুতে, বায়ু তেমনি অসংখ্য জীবাণু-বীজে পরিপূর্ণ এ কথা আজকালকার দিনে নূতন নহে। সকলেই জানেন গুড় এবং মধুতে যে গাঁজ উৎপন্ন হয়, জিনিসপত্রে ছাতা পড়ে, মৃতদেহ পচিয়া যায়, এই জীবাণুই তাহার কারণ। এই জীবাণুবীজ উপযুক্ত ক্ষেত্রে পড়িলে অবিলম্বে পরিণতি লাভ করিয়া বংশ বৃদ্ধি করিতে থাকে। ইহারা যে কত ক্ষুদ্র ভালো করিয়া তাহা ধারণা করা অসম্ভব। কোনো লেখক বলেন, এক বর্গ ইঞ্চি স্থানে এক থাক করিয়া সাজাইলে তাহাতে ব্যাক্টিরিয়া নামক জীবাণু লন্ডনের জনসংখ্যার একশত গুণ ধরানো যাইতে পারে।

বিখ্যাত ফরাসিস্ পণ্ডিত প্যাস্টর্ এই জীবাণুকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। একদলের নাম দিয়াছেন এরোবি, অন্য দলের নাম অ্যানেরোবি। এরোবিগণ মৃতদেহের উপরিভাগে জন্মলাভ করিয়া তাহাকে পচাইয়া অল্পে অল্পে জ্বালাইয়া ধ্বংস করিয়া ফেলে, এবং অ্যানেরোবিগণ গলিত পদার্থের নিম্নভাগে উৎপন্ন হইয়া তাহার ক্ষয় সাধন করিতে থাকে; বিশুদ্ধ বায়ুর অক্সিজেন-বাষ্প লাগিলেই তাহারা মরিয়া যায় এবং উপরিতলস্থ এরোবিগণ তাহাদিগকে নষ্ট করিয়া ফেলে। এইরূপে দুইদলে মিলিয়া পৃথিবীর সমস্ত মৃত পদার্থ অপসৃত করিতে থাকে। ইহারা না থাকিলে মৃত্যু অমর হইয়া থাকিত এবং অবিকৃত মৃতদেহস্তূপে ধরাতলে পা ফেলিবার স্থান থাকিত না। পৃথিবীর যে অংশে এই জীবাণুদের গতিবিধি নাই সেখানে জীবজন্তু উদ্ভিদ

কিছুই নাই। সেখানে হয় বালুকাময় মরুভূমি নয় অনন্ত তুষারক্ষেত্র। সেখানে মৃতদেহ কিছুতেই পচিতে চায় না; শকুনি গৃধিনী ও দৈবাগত কোনো মাংসাদ জীবের সাহায্য ব্যতীত সেখানকার মৃতদেহ অপসারণের অন্য কোনো উপায় নাই।

ফ্রান্সে যখন একসময়ে গুটিপোকার মধ্যে একপ্রকার মড়ক উপস্থিত হইয়া রেশমের চাষের বড়োই ব্যাঘাত করিতে লাগিল তখন বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়া প্যাস্টর অন্য কর্ম ফেলিয়া সেই গুটিপোকার রোগতথ্য অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। প্যাস্টর ডাক্তার নহেন, জীবতত্ত্ববিৎ নহেন, রসায়নশাস্ত্রেই তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি— মদ কী করি গাঁজিয়া বিকৃত হইয়া উঠে সেই অনুসন্ধানেই তিনি অধিকাংশ সময়ক্ষেপ করিয়াছেন, সহসা গুটিপোকার রোগ নির্ণয় করিতে বসা তাঁহার পক্ষে একপ্রকার অনধিকারচর্চা বলিয়া মনে হইতে পারে। এবং প্যাস্টরও এই কার্যভার গ্রহণ করিতে প্রথমে কিছু ইতস্তত করিয়াছিলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, অণুবীক্ষণের সাহায্যে কিছুদিন সন্ধান করিতে করিতে পণ্ডিতবর দেখিতে পাইলেন, জীবাণুতে যেমন মদ গাঁজিয়া উঠে, জীবাণুই তেমনি গুটিপোকার রোগের কারণ। মদের রোগ ও প্রাণীর রোগের মধ্যে ঐক্য বাহির হইয়া পড়িল, এবং পূর্বে তিনি যে সন্ধানে প্রবৃত্ত ছিলেন এখানেও তাহার অনুবৃত্তি ধরিতে পারিলেন। অবশেষে এই সূত্র অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, জীবশরীরের অনেক রোগ এই জীবাণুদের দ্বারাই সংঘটিত হইয়া থাকে। ইহারা অনুক্ষণ শনি ও কলির ন্যায় শরীরে প্রবেশ করিবার ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছে; স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম লঙ্ঘন করিলেই ইহারা সেই অবসরে দেহ আশ্রয় করিয়া বসে এবং শরীরের রসকে বিকৃত করিতে থাকে।

বাহিরে যখন আমাদের এত অদৃশ্য শত্রু অন্তরে অবশ্য তাহার কতকটা প্রতিবিধান আছে সন্দেহ নাই। সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে শত্রুও যেমন, আমাদের অন্তর্বর্তী রক্ষকও সেইরূপ। কুকুরের অনুরূপ মুগুর। দুইই নিরতিশয় ক্ষুদ্র। ডাক্তার উইলসন সাহেব তৎসম্বন্ধে যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন আমরা তাহারই কতক কতক সংকলন করিয়া দিলাম।

ভালো অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিতে গেলে রক্তকণা জলের মতো বর্ণহীন দেখায়। তাহার কারণ এই, আসলে, বর্ণহীন রসের উপর অসংখ্য লোহিত কণা ভাসিতেছে; খালি চোখে সেই লোহিত বর্ণের কণাগুলিই আমাদের নিকটে রক্তকে লাল বলিয়া প্রতিভাত করে— অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত সেই বর্ণহীন রস আমরা দেখিতে পাই না। রক্তের এই লোহিত কণাগুলির বিশেষ কাজ আছে। আমরা নিশ্বাসের সহিত যে বায়ু গ্রহণ করি ওই লোহিত কণাগুলি তাহার মধ্য হইতে অক্সিজেন সংগ্রহ করিয়া লয় এবং শরীরের কার্বনিক অ্যাসিড বাষ্প নামক বিষবায়ু ফুসফুসের নিকট বহন করিয়া আনে এবং আমরা তাহা প্রশ্বাসের সহিত নিষ্ক্রান্ত করিয়া দিই।

রক্তস্থ শ্বেতকণার কার্য অন্যরূপ। তাহারা প্রত্যেকে অতিশয় ক্ষুদ্র জীবনবিশিষ্ট কোষ। ইহাদের আয়তন এক ইঞ্চির পঁচিশ শত ভাগের একভাগ। গতসংখ্যক সাধনায় 'প্রাণ ও প্রাণী' প্রবন্ধে প্রটোপ্ল্যাজ্‌ম নামক সর্বাপেক্ষা আদিম প্রাণীপিণ্ডের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে; রক্তের এই শ্বেতকণাগুলি সেই প্রটোপ্ল্যাজ্‌ম কোষ। আমাদের শরীরে বাস করে বটে তথাপি ইহারা স্বাধীন জীব। এই লক্ষ লক্ষ প্রাণীপ্রবাহ আমাদের শরীরে যথেচ্ছ চলাফেরা করিয়া বেড়ায়; ইহাদের গতিবিধির উপরে আমাদের কোনো হাত নাই। ইহারা অনেক সময় যেন যদৃচ্ছাক্রমে রক্তবহ নাড়ি ভেদ করিয়া আমাদের শরীরতন্তুর মধ্যে প্রবেশ করে, এবং দেহের নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে বাহির হয়।

অণুবীক্ষণযোগে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যায় অ্যামিবা প্রভৃতি জীবাণুদের ন্যায় ইহারা অনুক্ষণ আকার পরিবর্তন করিতে থাকে। এবং ইহাও দেখা গিয়াছে খাদ্যকণা পাইলে ইহারা তাহাকে আক্রমণ করিয়া রীতিমতো পরিপাক করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই আহারের ক্ষমতা দেখিয়াই পণ্ডিতগণ ইহার নাম 'ফ্যাগোসাইট' অর্থাৎ ভক্ষককোষ রাখিয়াছেন। ইহার অপর নাম 'লিউকোসাইট' বা শ্বেতকোষ।

ইহারা যে কীরূপ আহারপটু তাহার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। সকলেই জানেন ব্যাঙাচি ব্যাঙ হইয়া দাঁড়াইলে তাহার ল্যাজ অন্তর্হিত হইয়া যায়। আণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, ব্যাঙাচির রক্তবহ নাড়ি ত্যাগ করিয়া বিস্তর শ্বেতকোষ দলে দলে তাহার ল্যাজটুকু অধিকার করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সেখানকার স্নায়ু এবং মাংসপেশী ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইতেছে। শরীরের অধিবাসীরা এমনতরো মনঃসংযোগপূর্বক লাগিলে তুচ্ছ পুচ্ছটুকু আর কতক্ষণ টিকিতে পারে। বয়ঃপ্রাপ্তি হইলে ব্যাঙাচির কান্‌কা লোপ পায় সেও এইরূপ কারণে।

কেবল যে শরীরের অনাবশ্যক ভার মোচন ইহাদের কাজ তাহা নহে। রোগস্বরূপে বাহিরের যে-সকল জীবাণু আমাদের শরীরে প্রবেশ করে ইহারা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া রীতিমতো হাতাহাতি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। বাহিরের আক্রমণকারীগণ যদি যুদ্ধে জয়ী হয় তবে আমরা জ্বর প্রভৃতি বিবিধ ব্যাধি দ্বারা অভিভূত হই, আর যদি আমাদের শরীরের রক্ষক-সৈন্যদল জয়ী হয় তবে আমরা রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাই।

স্মরণ হইতেছে, অন্যত্র কোনো প্রবন্ধে পাঠ করিয়াছি কেবল রোগ কেন, পীড়াজনক যে-কোনো পদার্থ আমাদের শরীরে নিবিষ্ট হয় এই সর্বভুকগণ তাহাকে আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিতে চেষ্টা পায়। চোখে একটুকরা বালি পড়িলে সেটাকে লোপ করিবার জন্য ইহারা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসে— চক্ষু সেই সংগ্রামচিহ্নে রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। শরীরে কিছু বিদ্ধ হইলে এই সৈন্যকণিকাগুলি ভিড় করিয়া আসিয়া সে স্থান লাল করিয়া তোলে। ক্ষতস্থানের পুঁজ পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়, ব্যাধিবীজগুলিকে ইহারা চারি দিক হইতে আক্রমণ করিয়া খাইবার চেষ্টা করিতেছে।

শরীরের সবল অবস্থায় বোধ করি এই শ্বেতকোষগুলি স্বভাবত তেজস্বী থাকে এবং ব্যাধিবীজকে সহজে পরাহত করিতে পারে। অনাহার অতিশ্রম অজীর্ণ প্রভৃতি কারণে শরীরের দুর্বল অবস্থায় যখন ইহারা হীনতেজ থাকে তখন ম্যালেরিয়া ওলাউঠা প্রভৃতি ব্যাধিবীজগণ অকস্মাৎ আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাভূত করে।

যাহা হউক, বায়ুবিহারী জীববীজাণুগণ ব্যাধিশস্য উৎপাদনের জন্য সর্বদা উপযুক্ত ক্ষেত্র অনুসন্ধান করিতেছে এই কথা স্মরণ করিয়া আহার, পানীয় ও বাসস্থান পরিষ্কার রাখা আমাদের নিজের ও প্রতিবেশীদের হিতের পক্ষে কত অত্যাবশ্যক তাহা কাহারো অবিদিত থাকিবে না।

সাধনা
পৌষ ১২৯৮

উদয়াস্তের চন্দ্রসূর্য

উদয়াস্তের সময় দিক্‌সীমান্তে চন্দ্রসূর্যকে কেন বড়ো দেখিতে হয় ইহাই লইয়া প্রথম বৎসরের সাধনায় কিঞ্চিৎ আলোচনা চলে। সাধনার কোনো পাঠক লিখিয়া পাঠান, বায়ুর রিফ্রাক্‌শন্ বশতই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। তৎসম্বন্ধে প্রক্টর ও র‍্যানিয়ার্ড সাহেবের রচিত 'ওল্‌ড্ অ্যাণ্ড্ নিয়ু অ্যাস্ট্রনমি' নামক গ্রন্থে যাহা কথিত হইয়াছে আমরা তাহার সার সংকলন করিয়া দিলাম।

প্রক্টর সাহেব দেখাইয়াছেন, বায়ুর রিফ্রাক্‌শন্ বশত সূর্যের দৃশ্যমান পরিধি লম্বভাবে কমিয়া যায় অথচ পার্শ্বের দিকে বাড়ে না। এমন-কি, চন্দ্রের পরিধি লম্বভাগে এবং পার্শ্বভাগে উভয়তই কমিয়া যায়।

কী কী কারণবশত এরূপ ঘটে তাহার বিস্তারিত বিবরণ অনেক পাঠকের নিকট জটিল ও বিরক্তিজনক হইবে জানিয়া আমরা বিবৃত করিতে ক্ষান্ত হইলাম। ইচ্ছা করিলে পাঠকগণ আমাদের বর্তমান অবলম্বনীয় গ্রন্থের ২৪৭ পৃষ্ঠা পাঠ করিলে সমস্ত জানিতে পারিবেন।

যাহা হউক, বায়ুর রিফ্র্যাক্‌শনে চন্দ্রসূর্যমণ্ডল ছোটো দেখিতে হয়— তবে তাহাদিগকে বড়ো

বলিয়া ভ্রম হয় কেন?

প্রক্টর সাহেব বলেন, আকাশ আমাদের চক্ষে একটি গোলাকার মণ্ডপস্বরূপ দেখা দেয়। আমাদের মাথার উপরে এই মণ্ডপ যতটা দূর মনে হয়, নিম্নে দিগন্তের দিকে ইহার সীমা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি দূরবর্তী বলিয়া বোধ হয়। তাহার কারণ, সাধারণত আকাশের উচ্চতা পরিমাপের সামগ্রী বড়ো বেশি নাই, কিন্তু যখন দেখি, বাড়ি ঘর, লোকালয়, শস্যক্ষেত নদী অরণ্য পর্বত অতিক্রম করিয়াও আকাশ দিগন্তে মিশিয়াছে তখন সেই দিকে তাহার দূরত্ব নির্দেশ করিবার অনেকগুলি পদার্থ পাওয়া যায়। এইরূপে চিরাভ্যাসক্রমে অজ্ঞানত দিগন্তবর্তী আকাশকে ঊর্ধ্বাকাশের অপেক্ষা আমরা অনেক দূরস্থ বলিয়া মনে করি।

অতএব চন্দ্রসূর্যকে যখন উদয়াস্তকালে দিগন্তসংলগ্ন দেখি তখন উক্ত সংস্কারবশত তাহাকে অপেক্ষাকৃত বহুদূরবর্তী বলিয়া জ্ঞান হয়; এইজন্য, চক্ষে তাহার পরিধি যতটা দেখা যায় মনে মনে তদপেক্ষা তাহাকে বড়ো করিয়া লই।

ইহার অনুকূলে একটি পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণ আছে। সাদা কাগজে খুব বড়ো একটি কালো অক্ষর আঁকিয়া তাহার প্রতি অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকো। অবশেষে চাহিয়া চাহিয়া চক্ষু যখন পরিশ্রান্ত হইয়া যাইবে, তখন অক্ষর হইতে চোখ তুলিয়া লইয়া যদি সেই কাগজের সাদা অংশে দৃষ্টিপাত কর, তবে সেখানেও সেই অক্ষরের অনুরূপ একটা সাদা অক্ষর দেখিতে পাইবে। কারণ, বহুক্ষণ চাহিয়া থাকায় চক্ষুতারকায় উক্ত অক্ষর মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই অক্ষরের দিকে দীর্ঘকাল চাহিয়া যদি সহসা দূরের দেয়ালের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ কর, তবে অতিশয় বৃহদাকারের একটা অক্ষর দেখিতে পাইবে। অথচ প্রকৃতপক্ষে কাগজে লিখিত অক্ষরের অপেক্ষা তাহা কখনোই বৃহৎ নহে, কারণ, ঠিক সেই অক্ষরটিই চক্ষুরতারকায় অঙ্কিত হইয়াছে। কিন্তু দেয়ালের দূরত্বের সহিত গুণ করিয়া লইয়া আমরা চিরসংস্কার অনুসারে তাহাকে মনে মনে বাড়াইয়া লই।

অনেক সময় কুয়াশার ভিতর দিয়া চন্দ্রসূর্যকে ওই একই কারণে, তাহার যথার্থ দৃশ্যমান আয়তনের অপেক্ষা বড়ো বলিয়া মনে হয়। কারণ, দূরের জিনিস ঝাপ্‌সা হয়, এইজন্য, ঝাপসা জিনিসকে বেশি দূরের বলিয়া ভ্রম হয়। যত বেশি দূর মনে হইবে, আয়তনও তদনুসারে বৃহত্তর বলিয়া প্রতিভাত হইবে। লেখক বলেন, অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কুয়াশার ভিতর দিয়া একটা জাহাজ বিসদৃশ বৃহৎ দেখায়, কিন্তু উপযুক্ত যন্ত্রের দ্বারা তুলনা করিয়া পরিমাপ করিলে দেখা যায়, কুয়াশামুক্ত অবস্থার সহিত তাহার আয়তনের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই।

যথারীতি পরিমাপের দ্বারা দিগন্তবিলম্বী চন্দ্র মধ্যাকাশগত চন্দ্রের অপেক্ষা কিছুমাত্র বড়ো প্রমাণ হয় নাই।

সাধনা
জ্যৈষ্ঠ ১৩০০

অভ্যাসজনিত পরিবর্তন

অভ্যাসের দ্বারা আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে। হলধারী চাষা এবং লেখনীধারী ভদ্রলোকের হাতের অনেক প্রভেদ। কৃত্রিম উপায়ে চীনরমণীর পা কীরূপ ক্ষুদ্র ও বিকৃত হইয়া যায় তাহা সকলেই অবগত আছেন।

কিন্তু এইরূপ অভ্যাস ও কৃত্রিমকারণজনিত পরিবর্তন সকল পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত হয় কি না ইহা লইয়া আজকাল বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে আলোচনা চলিতেছে।

হার্বার্ট স্পেন্সর বলেন, হয় যে, এ কথা না মানিলে অভিব্যক্তিবাদ অসম্পূর্ণ থাকে। কিন্তু জর্মান পণ্ডিত বাইস্‌মান্ বহুল যুক্তি, দৃষ্টান্ত ও পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, অভ্যাসজনিত নূতনসাধিত অঙ্গবৈচিত্র্য সন্ততিপরম্পরায় সঞ্চারিত হয় না। বিখ্যাত অভিব্যক্তিবাদী ওয়ালেস্

সাহেবও বাইস্‌মানের পক্ষ সমর্থন করেন।

তিনি বলেন, ভালো জাতের যুবক ঘোড়া অথবা কুকুর যদি কোনো কারণে পঙ্গু অথবা অঙ্গহীন হইয়া পড়ে, তবে পশুব্যবসায়ীরা তাহাকে সন্তান উৎপাদনের জন্য স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়া দেয়। এবং তাহার সন্ততিবর্গ তাহার পূর্বপুরুষদের অপেক্ষা কোনো অংশে হীন হয় না।

সাধারণের মধ্যেও একটা সংস্কার আছে যে, তন্তুবায় প্রভৃতি শিল্পীশ্রেণীদের মধ্যে পূর্বপুরুষদিগের অভ্যাসপ্রসূত বিশেষ কার্যনৈপুণ্য উত্তরবংশীয়েরা বিনা শিক্ষাতেও প্রাপ্ত হয়। ওয়ালেস্‌ বলেন ইহা ভ্রম। কারণ, যদি ইহা সত্য হইত তবে পিতার অধিক বয়সের সন্তান অধিকতর স্বাভাবিক নিপুণতা লাভ করিত। তাহা হইলে কনিষ্ঠ ছেলেরাই শ্রেষ্ঠ হইত। কিন্তু তৎপক্ষে কোনো প্রমাণ নাই। প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির সন্তানেরা প্রতিভাসম্পন্ন হয় না, বরং তাহার বিপরীত হয় এরূপ দৃষ্টান্তই অধিক পাওয়া যায়। তাহা যদি না হইত তবে জগতে শিল্পনৈপুণ্য ও প্রতিভা উত্তরোত্তর বংশানুক্রমে অত্যন্ত বিকাশ লাভ করিয়াই চলিত।

কিন্তু কোনো কোনো লেখক বলেন যে, বিশেষ শ্রেণীর জন্তুদের মধ্যে যে বিশেষ নূতন প্রত্যঙ্গের উদ্ভব দেখা যায় তাহা বহুকালের ক্রমশ অভ্যাসজনিত না মনে করিলে অন্য কারণ পাওয়া যায় না। যেমন শৃঙ্গ। যে-সমস্ত জন্তু মাথা দিয়া ঢুঁ মারিত তাহাদেরই কপালের চামড়া পুরু হইয়াছিল এবং হাড় ঠেলিয়া উঠিয়াছিল; সেই পরিবর্তন সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া অভ্যাসে বৃদ্ধি পাইয়া বিচিত্রাকার শৃঙ্গে পরিণত হইয়াছে।

ওয়ালেস্‌ বলেন এ কথার কোনো প্রমাণ নাই। ডারুয়িনের গ্রন্থে দেখা যায় কোনো কোনো দেশে ঘোড়ার কপালে ক্ষুদ্র শৃঙ্গের মতো উচ্চতা দেখা গিয়াছে। কিন্তু ঘোড়ার প্রাচীন বংশের মধ্যে কোনো জাতেরই শিং দেখা যায় নাই। যদি শিং থাকিত তবে প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মানুসারে এমন একটা আত্মরক্ষার অস্ত্র বিলুপ্ত না হইবারই সম্ভাবনা ছিল। অতএব এই ঘোড়ার ছোটো শিং নূতন উদ্ভব।

শজারুর কাঁটা, পাখির পালক এ-সমস্ত যে, বিশেষ অভ্যাসের দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে এমন বলা যায় না।

পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে আমাদের শরীরের সর্বাংশে স্পর্শশক্তি সমান নহে। আমাদের পিঠের মাঝখানে যে জিনিস অনুভব করিতে পারি না, আমাদের আঙুলের ডগায় তাহা অনায়াসে অনুভূত হয়। হার্বার্ট স্পেন্সর বলেন ইহার কারণ, প্রধানত অঙ্গুলি দ্বারা আমরা সকল দ্রব্য স্পর্শ করিয়া দেখি বলিয়া অভ্যাসে তাহার স্পর্শশক্তি বাড়িয়া উঠিয়াছে এবং সেই শক্তি বংশানুক্রমে চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু পৃষ্ঠে তাহার বিপরীত।

ওয়ালেস্‌ বলেন প্রাকৃতিক নির্বাচন ইহার কারণ। স্পর্শশক্তির উপরে আমাদের জীবনরক্ষা অনেকটা নির্ভর করিতেছে। শরীরের যে যে স্থানে আঘাত লাগিলে জীবনের অধিক ক্ষতি করে সেই সেই স্থানে স্পর্শশক্তি সেই পরিমাণে অধিক। চক্ষুর স্পর্শশক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক, অথচ এ কথা কেহ বলিতে পারে না যে, চক্ষু দ্বারা দ্রব্যাদি স্পর্শ করা আমাদের সর্বাপেক্ষা অভ্যস্ত। কিন্তু চক্ষু গেলে জীবনধারণ করা দুরূহ; অতএব যে-সকল প্রাণীর চক্ষু অত্যন্ত স্পর্শক্ষম, চক্ষে তিলমাত্র আঘাত লাগিলেই জানিতে পারে ও চক্ষুরক্ষার জন্য তৎক্ষণাৎ সচেষ্ট হইতে পারে তাহারাই প্রাকৃতিক নির্বাচনে টিকিয়া যায়। এরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেখানো হইয়াছে।

অতএব ওয়ালেসের মতে অভিব্যক্তির অভ্যাসের কোনো কার্যকারিতা নাই। প্রাকৃতিক নির্বাচনই তাহার প্রধান অঙ্গ। অর্থাৎ, যে সন্তানগণ কোনো কারণে অন্যদের অপেক্ষা একটা অতিরিক্ত সুবিধা লইয়া জন্মগ্রহণ করে তাহারাই জীবনযুদ্ধে জয়ী হইয়া টিকিয়া যায়, অন্যেরা তাহাদের সহিত পারিয়া উঠে না, সুতরাং মারা পড়ে। এইরূপে এই নূতন সুবিধা ও তৎসম্পন্ন জীব স্থায়ী হয়। শৃঙ্গহীন হরিণদের মধ্যে যদি নিগূঢ় কারণে একটা শৃঙ্গী হরিণ জন্মগ্রহণ করে তবে তাহার শিংয়ের জোরে সেই বেশি আহার এবং মনোমতো হরিণী সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইবে।

এবং তাহার বংশে যতই শৃঙ্গী হরিণের জন্ম হইবে ততই শৃঙ্গহীন হরিণের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িবে।

অতএব বর্তমান অনেক অভিব্যক্তিবাদীদের মতে সহজাত সুবিধাগুলি জীবরাজ্যে স্থায়ী হয়, অভ্যাসজাত সুবিধাগুলি নহে।

সাধনা
আষাঢ় ১৩০০

ওলাউঠার বিস্তার

ভারতবর্ষ যে ওলাউঠা রোগের জন্মভূমি, এ সম্বন্ধে সন্দেহ অতি অল্পই আছে। ১৮১৭ খৃস্টাব্দে এই ভীষণ মড়ক বঙ্গদেশ হইতে দিগ্‌বিজয় করিতে বাহির হইয়া সিন্ধু, য়ুফ্রাটিস, নীল, দানিয়ুব, ভল্‌গা, অবশেষে আমেরিকার সেন্টলরেন্স এবং মিসিসিপি নদী পার হইয়া দেশবিদেশে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত করিয়াছিল।

কিন্তু এই রোগ জল, খাদ্য অথবা বায়ু কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া ভ্রমণ করে এখনও তাহা নিঃসংশয়রূপে স্থির হয় নাই। তবে, জলটাই তাহার সর্বাপেক্ষা প্রধান বাহন তাহার অনেকগুলা প্রমাণ পাওয়া যায়। মে মাসের নিয়ু রিভিয়ু পত্রে এ সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

১৮৪৯ খৃস্টাব্দে লন্ডনে যখন এই মড়কের প্রাদুর্ভাব হয় তখন সেখানে সাধারণত টেম্‌স্ নদীর জল ব্যবহার হইত। শহরের নর্দমা এই নদীতে গিয়া মিশিত। সেই সময় দেখা গিয়াছে, নদীর জল শহরের যত নীচে হইতে লওয়া হইয়াছে মৃত্যুসংখ্যা ততই বাড়িয়াছে, এবং শহরের সম্রেবে অপেক্ষাকৃত অল্পদূষিত অংশের জল যাহারা ব্যবহার করিয়াছে তাহাদের মধ্যে মৃত্যু-সংখ্যাও তত অল্প হইয়াছে।

১৮৫৪ খৃস্টাব্দে লন্ডনে যে ওলাউঠার মড়ক হয় তখনও এ সম্বন্ধে একটি প্রমাণ পাওয়া গেছে। লন্ডনে যে দুই জলের কলওয়ালা জল জোগাইয়া থাকে তন্মধ্যে সাউথ্‌ওয়ার্ক্ ওয়াটার কোম্পানি ব্যাটার্সি নামক স্থানের পয়ঃপ্রণালীর নিকটবর্তী টেম্‌স্ হইতে জল লইত। এবং ল্যাম্বেথ্ ওয়াটার কোম্পানি নদীর অনেক উপর হইতে অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ জল আহরণ করিত। লন্ডনের স্থানে স্থানে এই দুই কম্পানির পাইপ সংলগ্নভাবে দুই পাশাপাশি বাড়িতে ব্যবহৃত হইয়াছে অথচ মৃত্যুসংখ্যা তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছে সাউথ্‌ওয়ার্ক্ কোম্পানির জল যাহারা ব্যবহার করিয়াছে তাহাদের মধ্যে হাজার করা সাতান্ন জন মরিয়াছে আর ল্যাম্বেথ্ কোম্পানির জল যাহারা পান করিত তাহাদের মধ্যে হাজার করা এগারো জনের মৃত্যু হয়।

১৮৫৪ খৃস্টাব্দে ইংলন্ডে সোহোপল্লীর গোল্‌ডন্ স্কোয়ার নামক একটি ক্ষুদ্র অংশে ওলাউঠা দেখা দেয়। তাহার কারণ নির্ণয়ের জন্য যে কমিশন বসে তাঁহারা দেখিলেন সেখানে পল্লীর লোক একটি বিশেষ কূপের জল পান করিয়া থাকে। এবং সন্ধানের দ্বারা জানিলেন, মড়কের প্রাদুর্ভাবের প্রাক্‌কালে স্থানীয় একটি নল-কূপ কীরূপে জীর্ণ হইয়া যায় এবং মৃত্তিকাতল দিয়া আবর্জনাপ্রবাহ এই জলের সহিত মিশ্রিত হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যেখানে এই জলাশয় অবস্থিত সেই রাস্তার উপরেই একটি মদ চোঁয়াইবার কারখানা ছিল, সেখানকার কর্মচারীরা উক্ত জল পান করিত না এবং তাহাদের মধ্যে একজনেরও ওলাউঠা হয় নাই।

১৮৮৫ খৃস্টাব্দে ডোরাডো নামক একটি কুলিজাহাজ ইংলন্ড ছাড়িয়া মাসখানেক পরে জাভাদ্বীপের বন্দরে কয়লা তুলিয়াছিল। সেখানে কোনো মাল বোঝাই হয় নাই, কেবল ফার্স্ট ক্লাস প্যাসেঞ্জারদের জন্য ফল এবং শাকসবজি লওয়া হয়। সমস্ত পথ ডিস্টিল্-করা জল ব্যবহার হইয়াছে এবং কোনো বন্দর হইতে জল লওয়া হয় নাই। বন্দর ছাড়ার পর জাহাজে ওলাউঠা দেখা দিল। কিন্তু প্রথমশ্রেণীর প্যাসেঞ্জারদের কেহ রোগগ্রস্ত হয় নাই। তাহারাই ফল ও উদ্ভিজ্জ

খাইয়াছিল এবং বন্দরে নামিয়া রাত্রিযাপন করিয়া আসিয়াছিল। জাহাজের ডেক্ সাফ করিবার জন্য তীর হইতে কিয়ৎ পরিমাণে বালুকা আনা হইয়াছিল। সেই বালুকা জাহাজের কোনো কোনো বিভাগে দুই দিন ব্যবহার করিয়া দুর্গন্ধবোধে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, জাহাজের লোকের বিশ্বাস সেই বালুকার মধ্যেই ওলাউঠার বীজ ছিল। যদি তাহাই সত্য হয় তবে এ স্থলে জলের দোষ দেওয়া যায় না। বালুকা হইতে বিষ নিশ্বাসযোগে শরীরে গৃহীত হইয়াছে এইরূপ অনুমান করিতে হয়।

'ইংলন্ড' নামক স্টীমার ১৮৬৬ খৃস্টাব্দে লিভারপুল হইতে যাত্রা করিয়া হ্যালিফ্যাক্সে পৌঁছায়। পথের মধ্যে ওলাউঠায় তিনশো লোক মরে। বন্দরে আসিলে পাইলট উক্ত জাহাজের সহিত নৌকা বাঁধিয়া তাহাকে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দেয়। ওই পাইলট এবং তাহার দুই জন সঙ্গী জাহাজে পদার্পণমাত্র করে নাই। দুই দিন পরেই ওই পাইলট ওলাউঠায় আক্রান্ত হয় এবং তৃতীয় দিনে তাহার একটি সঙ্গীকেও ওলাউঠায় ধরে। তখন সে অঞ্চলে আর কোথাও ওলাউঠা ছিল না। এখানেও বায়ু ব্যতীত আর কিছুকে দায়ী করা যায় না।

১৮৮৪ খৃস্টাব্দে কক্ সাহেব, ওলাউঠাকে শরীরের উপরে জীবাণুবিশেষের ক্রিয়া বলিয়া সাব্যস্ত করেন। যদিও এ মত এখনো সম্পূর্ণ সর্ববাদীসম্মত হয় নাই তথাপি অধিকাংশের এই বিশ্বাস।

অনেক জীবাণুবীজ বহুকাল শুষ্ক অবস্থায় থাকিয়া অনুকূল আধার পাইলে পুনরায় বাঁচিয়া উঠে। কিন্তু কক্ সাহেবের ওলাউঠা-জীবাণুগণকে এ পর্যন্ত বীজ সৃজন করিতে দেখা যায় নাই এবং একবার শুষ্ক হইয়া গেলে তাহারা মরিয়া যায়। এ কথা যদি সত্য হয় তবে ধুলা প্রভৃতি শুষ্ক আধার অবলম্বন করিয়া সজীব ওলাউঠা-জীবাণু বায়ুযোগে চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইতে পারে না। জলপথই তাহার, প্রশস্ত পথ এবং ওলাউঠা-জীবাণু জলজ।

ঈথর

ঈথর স্পর্শের অতীত, এবং পদার্থের গতিকে কিছুমাত্র বাধা দেয় না, এ সম্বন্ধে বিস্তর পরীক্ষা করা হইয়াছে। এইজন্য বোধ হয়, অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি ঈথরের অস্তিত্বকে কাল্পনিক অনুমান মনে করেন। কিন্তু ঈথর আমাদের ইন্দ্রিয়ের অগম্য নহে, আলোকবোধ ও উত্তাপবোধই তাহার প্রমাণ।

কথাটা সংক্ষেপে এই— পৃথিবীতে প্রধানত সূর্য হইতে আলোক ও উত্তাপ বিকীর্ণ হইতেছে। এই পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানকার আকাশে যদি কোনো জানত বস্তু থাকে, সে অতি সূক্ষ্ম গ্যাস; কোথাও বা পরমাণু আকারে, কোথাও বা খানিকটা সমষ্টিবদ্ধভাবে; কিন্তু ইহাদের পরস্পরের মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান। এই বিচ্ছিন্ন পদার্থগুলি আলোকবহনকার্যে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। বিশেষত আলোক যে গতি অবলম্বন করিয়া আসে, কোনো কঠিন, তরল অথবা বাষ্পীয় পদার্থ সে গতি চালনা করিতে পারে না। অতএব তাহার একটা স্বতন্ত্র বাহন আছে সন্দেহ নাই। বাহন আছে তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই, কারণ, কিরণমাত্রই যে তরঙ্গবৎ কম্পমান এবং তাহার গতির সময় সুনির্দিষ্ট ইহা সম্পূর্ণ প্রমাণ হইয়া গেছে।

ক্রিয়া শূন্য আশ্রয় করিয়া হইতে পারে না ইহাও বিজ্ঞানের একটি অকাট্য সিদ্ধান্ত। বস্তু আপন সংলগ্ন পদার্থের উপরেই কাজ ক '। শক্তি অবিচ্ছিন্ন মধ্যস্থ পদার্থ অবলম্বন করিয়াই একস্থান হইতে অন্যস্থানে সঞ্চরণ করিতে পারে। পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে যে কেবল কিরণের সম্বন্ধ তাহা নহে, একটা আকর্ষণের যোগ আছে। আকর্ষণটি বড়ো কম নহে; যে টান পড়ে তাহা সতেরো ফুট চওড়া ১০০০০০০০০০০০০টা ইস্পাতের রজ্জুও সহিতে পারে না। এত বড়ো একটা প্রবল শক্তিকে কে চালনা করিতেছে? একটা ইস্পাতের পাতকে বিস্তর বলপ্রয়োগ

করিয়াও বিচ্ছিন্ন করা কঠিন; অথচ এ কথা সকলেরই জানা আছে যে, বস্তুমাত্রেরই পরমাণু গায়ে গায়ে সংলগ্ন নহে; পরস্পরের মধ্যে ফাঁক আছে এবং সেই ফাঁকে ঈথর নামক বিশ্বব্যাপী যোজক পদার্থ অবস্থিতি করিয়া অসংলগ্ন পরমাণুপুঞ্জকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। এই মধ্যস্থ জিনিসটি স্পর্শাতীত বটে, কিন্তু তাহার এমন গুণ আছে যে, প্রবলতম আকর্ষণ সঞ্চার করিতে পারে।

এই ঈথরের কম্পন কেবল যে আমরা আলোক ও উত্তাপবোধের দ্বারা অনুভব করি তাহা নহে। যে-সকল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের দ্বারা তড়িৎপ্রবাহ সম্বন্ধে আমরা জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি, সেগুলাও যেন সেই বিশ্বব্যাপী ঈথরের নাড়ীর বেগ অনুমান করিবার যন্ত্র। এখনো এই আলোক এই তড়িতের গতি ও শক্তিতত্ত্ব নির্ণয় হয় নাই; এখনো ইহার ক্রিয়াকলাপ যন্ত্রতন্ত্রের ধারণার বাহিরে। বর্তমান শতাব্দীতে ইহাদের সম্বন্ধে বিস্তর তথ্য জানা গিয়াছে। অনেক পণ্ডিত আশা করিয়া আছেন ভাবী শতাব্দীতে ইহার একটা তত্ত্বনির্ণয় হইবে এবং সেই তত্ত্বের উপর সমস্ত পদার্থবিদ্যার একটা নূতন ভিত্তি স্থাপিত হইবে। জীবনীশক্তি এবং মানসশক্তি এখনো বিজ্ঞানের হস্তে ধরা দেয় নাই, কিন্তু বিখ্যাত পদার্থতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক অলিভার লজ সাহেব অনুমান করিতেছেন ঈথরের সঙ্গে সঙ্গেই সে দুটো ধরা পড়িবে, পরস্পরের মধ্যে বোধ করি বা কোনো একটা নিগূঢ় যোগ আছে।

সাধনা
ভাদ্র ১৩০০

ভূগর্ভস্থ জল এবং বায়ুপ্রবাহ

বৃষ্টির জল ভূতলে আসিয়া পড়িলে তাহার কিয়দংশ মাটিতে শুষিয়া লয়, কিয়দংশ বাতাসে উবিয়া যায় এবং অবশিষ্ট অংশ জলস্রোত এবং নদী-আকারে ভূমিতল হইতে গড়াইয়া পড়ে।

মাটি যদি তেমন কঠিন হয় তবে অনেকটা জল উপরে থাকিয়া গিয়া বিল, জলা প্রভৃতির সৃষ্টি করে।

যে জল মাটির মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে বর্তমান প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

এই মৃত্তিকা-শোষিত জলের কিছু অংশ ঘাস এবং গাছের শিকড় টানিয়া লয় এবং সেই রস পাতার মধ্য দিয়া বাষ্প আকারে উবিয়া যায়। কিন্তু বেশির ভাগ জল ছিদ্র এবং ফাটলের মধ্য দিয়া নিম্নস্তরে সঞ্চিত হয় এবং স্তর যদি ঢালু হয় তবে সেই ভূমধ্যস্থ জলও তদনুসারে গড়াইয়া পড়িতে থাকে।

মৃত্তিকাস্তর ছিদ্রবহুল হইলে উপরিস্থ জলস্রোত কীরূপ অন্তর্ধান করে তাহা ফল্গু প্রভৃতি অন্তঃসলিলা নদীর দৃষ্টান্তে বুঝিতে পারা যায়।

পৃথিবীর উপরকার জল ক্রমে মাটির ভিতরে কত নীচে পর্যন্ত চুঁইয়া পড়ে এবং কেন বা একস্থানে আসিয়া বাধা পায় এখনও তাহার ভালোরূপ তথ্য নির্ণয় হয় নাই। কিন্তু ইহা দেখা গিয়াছে যে, ভূতলের নিম্নস্তরে কিছুদূর নামিয়া আসিলেই একটি সম্পূর্ণ জলসিক্তস্থানে আসিয়া পৌঁছানো যায়, সেখানে মৃত্তিকার প্রত্যেক ছিদ্র বায়ুর পরিবর্তে কেবলমাত্র জলে পরিপূর্ণ।

যেমন সমুদ্রের জল সর্বত্রই সমতল তেমনি মাটির নীচের জলেরও একটা সমতলতা আছে। কোনো বিশেষ প্রদেশের ভূগর্ভস্থ জলের তলোচ্চতা কী, তাহা সে দেশের কূপের জলতল দেখিলেই বুঝা যাইতে পারে।

এই জল অবিশ্রাম মন্দগতিতে সমুদ্র অথবা নিকটবর্তী জলাশয়ের দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে, এবং ঋতুবিশেষে এই জলতল কখনো উপরে উঠে কখনো নীচে নামিয়া যায়।

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে মাটির প্রকৃতি অনুসারে এই ভূগর্ভস্থ জলতলের উচ্চতা পরিমিত হয়।

জলা জায়গায় হয়তো কয়েক ফুট নীচেই এই জলতল পাওয়া যায়, আবার কোনো কোনো জায়গায় বহুশত ফুট নিম্নে এই জলতল দৃষ্টিগোচর হয়। যে প্রদেশে ভূতলের যত নিম্নে জলধারণযোগ্য অভেদ্য মৃত্তিকাস্তর আছে সে প্রদেশে ভূগর্ভস্থ জলতল সেই পরিমাণে নির্দিষ্ট হয়।

এই ভূগর্ভস্থ সর্বব্যাপী জলপ্রবাহ মানুষের পক্ষে নিতান্ত সামান্য নহে। কূপ সরোবর উৎস প্রভৃতি আশ্রয় করিয়া এই জলই পৃথিবীর অধিকাংশ মানবের তৃষ্ণা নিবারণ করে— এবং স্বাস্থ্যরক্ষার সহিতও ইহার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, ঋতুবিশেষে এই ভূগর্ভস্থ জলের তলোচ্চতা উঠিয়া-নামিয়া থাকে। এবং এই উঠা-নাবার সহিত রোগবিশেষের হ্রাস-বৃদ্ধির যোগ আছে। পেটেন্‌কোফার সাহেব বলেন, জলতল যত উপরে উঠে টাইফয়েড জ্বর ততই বিস্তার লাভ করে। তাঁহার মতে, ভূমির আর্দ্রতা রোগবীজপালনের সহায়তা করে বলিয়াই এরূপ ঘটে।

কোনো কোনো পণ্ডিত অন্য কারণ নির্দেশ করেন। তাঁহারা বলেন, ভূগর্ভস্থ জল ভূতলের অনতিনিম্নে পর্যন্ত যখন উঠে তখন পৃথিবীর অনেক আবর্জনার সহিত সহজে মিশ্রিত হইতে পারে।

কীরূপে মিশ্রিত হয় তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা স্পষ্ট হইবে। পল্লীগ্রামে যেখানে শহরের মতো পয়ঃপ্রণালীর পাকা বন্দোবস্ত নাই সেখানে অনেক স্থলে কুণ্ডের মধ্যে মলিন পদার্থ সঞ্চিত হইতে থাকে— যখন উপরে উঠে তখন মলমিশ্রিত মৃত্তিকার সহিত জলের সংযোগ হইতে থাকে এবং সেই জল রোগবীজ ও দূষিত পদার্থসকল বহন করিয়া কূপ ও সরোবরকে কলুষিত করিয়া ফেলে।

ইহা হইতে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন, পানীয় জল বিশুদ্ধ রাখিতে হইলে বিস্তর সতর্কতার আবশ্যক। কাপড় কাচিয়া স্নান করিয়া জলাশয়ের জল মলিন করিতে না দিলেও অদূরবর্তী আবর্জনা প্রভৃতির মলিনতা জলমধ্যে সঞ্চারিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে।

এই মলিনতা অনেক সময় দূরের জলাশয়কে স্পর্শ করে অথচ নিকটের জলাশয়কে অব্যাহতি দেয় এমন দেখা গিয়াছে। তাহার একটি কারণ আছে। পূর্বে বলা হইয়াছে ভূগর্ভস্থ জল সমুদ্র অথবা অন্য কোনো নিকটবর্তী জলাশয়ের অভিমুখে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতে থাকে। আবর্জনাকুণ্ডের উজানে যে কূপ প্রভৃতি থাকে তাহা নিকটবর্তী হইলেও, মলিন পদার্থ স্রোতের প্রতিকূলে সে জলাশয়ে গমন করিতে পারে না, কিন্তু অনুকূল স্রোতে দূষিত পদার্থ অনেক দূরেও উপনীত হইতে পারে। ভূগর্ভস্থ জলপ্রবাহের অভিমুখ-গতি কোন্ দিকে তাহা স্থির হইলে জলাশয়ের জলদোষ নিবারণ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

কূপ হইতে অধিক পরিমাণে জল তুলিয়া লওয়া হইলে সেই শূন্যপ্রায় কূপ চতুর্দিক হইতে বলসহকারে জল আকর্ষণ করিতে থাকে। তখন উপর হইতে নিম্ন হইতে দূর-দূরান্তর হইতে জলধারা আকৃষ্ট হওয়াতে সেইসঙ্গে অনেক দূষিত পদার্থ সঞ্চারিত হইতে পারে। অছিদ্র জমির অপেক্ষা সছিদ্র বালুময় জমিতে এইরূপ আকর্ষণের সম্ভাবনা অনেক অধিক। ওলাউঠা প্রভৃতি সংক্রামক রোগের বীজ এইরূপ উপায়ে বালু-জমিতে অতি শীঘ্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

ভূতলের নিম্নে যেমন জলপ্রবাহ আছে, তেমনি বায়ুপ্রবাহও আছে। এঁটেল মাটিতে এই বায়ুপ্রবাহ কিছু কম এবং সছিদ্র আল্‌গা মাটিতে কিছু বেশি।

আকাশে প্রবাহিত বায়ুস্রোতে যে পরিমাণে কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস আছে ভূগর্ভস্থ বায়ুস্রোতে তদপেক্ষা অনেক বেশি থাকিবার কথা। কারণ, মাটির সহিত নানা প্রকার জান্তব এবং উদ্ভিজ্জ পদার্থ মিশ্রিত থাকে, সেই-সকল পদার্থজাত কার্বনের সহিত বাতাসের অক্সিজেন মিশ্রিত হইয়া কার্বনিক অ্যাসিডের উৎপত্তি হয়; ইহা ছাড়া মাটির নীচেকার অনেক পচা জিনিস হইতেও কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাসের উদ্ভব হইয়া থাকে।

মাটির আর্দ্রতা এবং উত্তাপ অনুসারেও এই কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাসের পরিমাণ বাড়িতে

থাকে। ম্যুনিক্‌ শহরে পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে আষাঢ়-শ্রাবণে ভূগর্ভস্থ বায়ুর কার্বনিক অ্যাসিডের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বাড়িয়া ওঠে, এবং মাঘ-ফাল্গুনে সর্বাপেক্ষা কমিয়া যায়।

সাধারণত ইহাও দেখা গিয়াছে যে, আল্‌গা ভাঙা মাটিতে কার্বনিক অ্যাসিড অল্প এবং যে শক্ত মাটিতে সহজে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না তাহাতে কার্বনিক অ্যাসিডের পরিমাণ অধিক। চষা জমি অপেক্ষা পতিত জমিতে কার্বনিক অ্যাসিড চতুর্গুণ অধিক। ইহার কারণ, যে মাটির মধ্যে বায়ু বদ্ধ হইয়া থাকে তাহাতে কার্বনিক অ্যাসিড অধিক সঞ্চিত হয়।

ভূগর্ভস্থ জলের ন্যায় ভূগর্ভস্থ বায়ুরও একটা স্রোত আছে তাহা পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়া গেছে। এই বায়ুচলাচলের উপর আমাদের স্বাস্থ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি অনেকটা নির্ভর করে। কারণ, দেখা গিয়াছে এই বায়ুতে বহুল পরিমাণে কার্বনিক অ্যাসিড এবং অন্যান্য দূষিত গ্যাস আছে। তাহা ছাড়া, মাটির ভিতরকার রোগ-বীজ এই বায়ুপ্রবাহ অবলম্বন করিয়া চতুর্দিকে সঞ্চারিত হইতে পারে।

নানা কারণে ভূগর্ভস্থ বায়ুর প্রবাহ রক্ষিত হইয়া থাকে। ভূতলের উপরিস্থ বায়ু-চলাচল তাহার একটা কারণ।

আরও কারণ আছে। বহুকাল অনাবৃষ্টির পরে যখন মুষলধারে বৃষ্টি পতিত হয় তখন সেই বৃষ্টিজল ভূগর্ভস্থ বায়ুকে ঠেলিয়া অনেকটা নীচের দিকে লইয়া যায় এবং সিক্তভূমি হইতে তাড়িত হইয়া শুষ্কভূমি দিয়া বায়ুপ্রবাহ উপরে উঠিতে থাকে। যে বাড়ির মেজে ভালো করিয়া বাঁধানো নহে বর্ষার সময় ভূগর্ভবায়ু সেই মেজে দিয়া বাহির হইবার সুবিধা পায়। কোনো কোনো স্থলে ডাক্তারেরা দেখিয়াছেন বহুকাল অনাবৃষ্টি-অন্তে বৃষ্টিপতনের পর সহসা নিউমোনিয়া কাশের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তাহার একটি কারণ এইরূপ অনুমান করা যায় যে, বৃষ্টিতাড়িত ভূগর্ভবায়ু রোগ-বীজ সঙ্গে লইয়া নানা শুষ্ক স্থান দিয়া উপরে উঠিতে থাকে।

পূর্বে বলিয়াছি, পেটেন্‌কোফারের মতে, যখন ভূগর্ভস্থ জলতল উপরে উঠিতে থাকে তখন সেই জলসংযোগে কোনো কোনো রোগের বৃদ্ধি হয়। রোগ-বীজের উপর জলের ক্রিয়াই যে তাহার একমাত্র কারণ তাহা নহে। জলতল যত উপরে উঠে ভূগর্ভের বায়ুকেও সে তত ঠেলিয়া তুলিতে থাকে— এবং সেই বায়ুর সঙ্গে অনেক দূষিত বাষ্প এবং রোগ-বীজ উঠিয়া পড়ে।

ভূগর্ভে বায়ু-চলাচলের আর-একটি বৃহৎ কারণ আছে। তাহা আকাশ-বায়ু এবং ভূগর্ভ-বায়ুর উত্তাপের অসাম্য। তাহার বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক।

মাটি নানা প্রকৃতির আছে এবং সকল মাটি সমান সহজে উত্তপ্ত হয় না। কিন্তু জল সকল মাটি অপেক্ষাই বিলম্বে উত্তাপ গ্রহণ করে।

যে জিনিস সহজে উত্তাপ গ্রহণ করে সে জিনিস সহজে উত্তাপ ত্যাগও করে। এই কারণে, জল মাটি অপেক্ষা বিলম্বে উত্তপ্ত হয় এবং উত্তাপ ছাড়িতেও বিলম্ব করে। ভিজা স্যাঁতসেঁতে মাটি রৌদ্রোত্তাপ সহজে গ্রহণ করে না। তেমনি, সহজে ত্যাগও করে না, শুষ্ক বেলে মাটি শীঘ্রই গরম হইয়া উঠে আবার শীঘ্রই জুড়াইয়া যায়।

ভূমির উত্তাপের ফল কেবল যে ভূমিতেই পর্যবসান হয় তাহা নহে। আকাশের বায়ুতাপের প্রতিও তাহার প্রভাব আছে। সাধারণত উক্ত হয় যে, শুষ্ক বায়ু বিকিরিত উত্তাপকে সহজে পথ ছাড়িয়া দেয় এবং ভিজা বায়ু সেই উত্তাপ বহুল পরিমাণে শোষণ করিয়া লয়। সম্পূর্ণ শুষ্ক বাতাস প্রকৃতির কোথাও দেখা যায় না, এইজন্য সকল বায়ুই সূর্যোত্তাপ এবং পৃথিবী হইতে বিকিরিত উত্তাপের দ্বারা উত্তপ্ত হয়। পরীক্ষা দ্বারা যতদূর দেখা গিয়াছে তাহাতে বোধ হয় বাতাসের তাপ অব্যবহিত সূর্যতাপের অপেক্ষা ভূমির তাপের দ্বারাই অধিক পরিমাণে নিয়মিত হয়। তপ্ত ভূমির সংস্পর্শে প্রথমত বায়ুর নিম্নতন স্তর উত্তপ্ত হইয়া বিস্তার লাভ করে এবং উপরে উঠিয়া যায়, উপরের অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ু নীচে নামিয়া ভূমির তাপ গ্রহণ করে, এমনি করিয়া সমস্ত বায়ু গরম হইয়া উঠে। সকলেই জানেন, বহু উচ্চ আকাশের বায়ু পৃথিবীর নিকটবর্তী বায়ুর অপেক্ষা

অনেক পরিমাণে শীতল।

ইহা হইতে বুঝা যাইবে মাটির তাপ এবং বাতাসের তাপ সমান নহে। এবং সাধারণত মাটির তাপই অধিক।

মাটি ভালো তাপ-পরিচালক নহে, এইজন্য মাটির উপরিতলের উত্তাপ নিম্নতলে পৌঁছিতে বিলম্ব হয়। এই কারণেই গ্রীষ্মকালে ভূতল যখন উষ্ণ হইয়া উঠে তখন নিম্নস্তর অপেক্ষাকৃত শীতল থাকে এবং শীতকালে যখন ভূতলের তাপ হ্রাস হয় তখন সেই শৈত্য নিম্নস্তরে পৌঁছিতে বিলম্ব হয়; এইজন্য শীতকালে ভূমির উপরিতলের মাটির অপেক্ষা নিম্নতলের মাটি বেশি গরম থাকে। চাণক্য-শ্লোকে আছে যে, কূপোদক শীতকালে উষ্ণ এবং গ্রীষ্মকালে শীতল হইয়া থাকে। পূর্বলিখিত নিয়মানুসারে ইহার কারণ নির্ণয় কঠিন নহে।

গ্রীষ্মকালে ভূতল ভূগর্ভ হইতে অধিকতর উত্তপ্ত হওয়াতে ভূমির উপরিস্তরবর্তী বায়ু নিম্নস্তরের অভিমুখে প্রবেশ করিতে থাকে এবং শীতকালে তাহার বিপরীত ঘটিয়া থাকে। ঘর যদি অগ্নির উত্তাপে অত্যন্ত গরম করা যায় এবং মেজে যদি উপযুক্তরূপ বাঁধানো না থাকে তবে স্থানীয় ভূগর্ভস্থ গ্যাস সেই গৃহে ভাসমান হইয়া উঠিতে থাকে ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

অল্পকাল হইল ডবলিন শহরের রাস্তা পাথরে বাঁধানো হইয়াছে। তাহার পর হইতে সেখানে টাইফয়েড জ্বরের প্রাদুর্ভাব অনেক বাড়িয়াছে। তাহার কারণ, ভূগর্ভবায়ু এখন রাজপথে বাহির হইতে পায় না, কাঁচা মেজের ভিতর দিয়া বাহির হইতে থাকে। এইরূপে গৃহমধ্যে দূষিত বাষ্পের সঞ্চার হয়।

এমনও দেখা গিয়াছে খুব শীতের সময় যখন পথঘাটে বরফ জমিয়া যায়, তখন রাজপথের নিম্নবর্তী গ্যাস-পাইপের পলাতক গ্যাস রাস্তা দিয়া বাহির হইবার স্থান না পাইয়া ঘরের ভিতরে বাহির হইতে থাকে এবং এইরূপে বিষাক্ত বায়ু গ্রহণে অনেকে সংকটাপন্ন অবস্থায় পতিত হইয়াছে।

যাহা হউক, এই প্রবন্ধ হইতে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন ভূগর্ভস্থ জল এবং বায়ুর উপর আমাদের স্বাস্থ্য বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। যাহাতে জলাশয়ের নিকটবর্তী কোনো স্থানে দূষিত পদার্থ না জমিতে পারে সেজন্য সতর্ক হওয়া উচিত। এবং ঘরের মেজে ও বাড়ির চারি দিকে কিছুদূর পর্যন্ত ভালো করিয়া বাঁধাইয়া দিয়া ভূগর্ভস্থ দূষিত বাষ্পমিশ্রিত বায়ুর পথ রোধ করা বিশেষ আবশ্যক।

সাধনা
আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১

বিবিধ

সান্ত্বনা

আমার সময়ে সময়ে কেমন মন খারাপ হইয়া যায়, হয় হউক গে তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু অমনি লোকে সান্ত্বনা দিতে আইসে কেন? অমনি দশ জনে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কী হইয়াছে, কেন হইয়াছে, করিয়া এমন বিরক্ত করিয়া তুলে যে, হাজার কষ্ট হইলেও 'কিছুই হয় নাই কিছুই হয় নাই' করিয়া মুখে হাসি টানিয়া আনিতে হয়, সে হাসির চেয়ে আর কষ্টকর কিছু আছে? এ হাসি হাসার অপেক্ষা যদি সমস্ত দিনরাত্রি মুখ গম্ভীর করিয়া ভাবিতে পারিতাম তবে বাঁচিয়া যাইতাম। তাহারা কি এ-সকল বুঝে না? হয়তো বুঝে, কিন্তু মনে করে, পাছে আমি মনে করি যে, আমি এমন মুখ বিষণ্ণ করিয়া বসিয়া আছি, তথাপি আমাকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিল না, কাজেই তাহাদের কর্তব্য কাজ করিতে আসে। যেমন চিঠিতে মান্যবর, পরম পূজনীয়, প্রাণাধিক প্রভৃতি সম্বোধন পড়িবার সময় আমরা চোখ বুলাইয়া যাই মাত্র, তখন মনে একতিলও বিশ্বাস হয় না যে, যিনি আমাকে লিখিতেছেন তিনি আমাকে সর্বাপেক্ষা মান্য করেন বা আমাকে পরম পূজা করিয়া থাকেন, বা আমি তাঁহার প্রাণেরও অধিক, অতীত কালের শিরোনামা-স্রষ্টারা উহা আমাদের বরাদ্দ দিয়াছেন মাত্র, তেমনি উহারা আমাকে যখন জিজ্ঞাসা করিতে আসে, তখন বেশ বুঝিতে পারি যে, আমাকে মমতা করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে না, জিজ্ঞাসা করিতে হয় বলিয়া করিতেছে, তাহাতে আমার যে কী সান্ত্বনা হয়, তাহা আমিই জানি। অধিকাংশ লোক সান্ত্বনা করিবার পদ্ধতি জানে না, তাহারা যে দুঃখে সান্ত্বনা দিতে আসে, সে দুঃখ তাহাদের সান্ত্বনা বাক্য অপেক্ষা অধিকতর মিষ্ট বোধ হয়। সান্ত্বনা দিতে হইলে প্রায়ই লোকে কহিয়া থাকে, তোমার কিসের দুঃখ? আরও তো কত লোক তোমার মতো কষ্ট পাইতেছে। এমন কষ্টকর সান্ত্বনা আর নাই, প্রথমত, যে এ কথা বলিয়া সান্ত্বনা দিতে আইসে, স্পষ্টই বোধ হয় আমার দুঃখে তাহার কিছু মাত্র মমতা হয় নাই; কারণ সে আমার দুঃখকে এত তুচ্ছ বলিয়া জানে যে, এত ক্ষুদ্র দুঃখে তাহার মমতাই জন্মিতে পারে না, দ্বিতীয়ত, মনে হয় যে, আমার মনের দুঃখ সে বুঝিলই না, যে সকলের সঙ্গে আমার দুঃখের তুলনা করিয়া বেড়ায়, সে আমার দুঃখের মর্যাদাই বুঝে নাই, আমার যেটুকু দুঃখ হইয়াছে তাহাতেই তোমার মমতা জন্মায় তো জন্মাউক, নহিলে আর কেহ এরূপ দুঃখ পায় কি না, আর কাহাকেও এত কষ্ট পাইতে হয় কি না, এত শত ভাবিয়া চিন্তিয়া আমার দুঃখের গুরুলঘুত্ব ওজন করিয়া তবে তুমি আমার সহিত একটুখানি মমতা করিতে আসিবে, আমার সে মমতায় কাজ নাই। যদিও মমতা উদয় হইবার অব্যবহিত পূর্বেই ওই-সকল ভাবনা হয়তো অলক্ষিতভাবে হৃদয়ে কার্য করে; কিন্তু তাই বলিয়া মুখে ওই-সকল কথা বলিয়া সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিলে তাহা কষ্টকর হইয়া পড়ে, আর কাহারো হয় কি না জানি না কিন্তু আমার হয়। আমি কাহাকেও সান্ত্বনা করিতে গেলে অমনি করি না, আমি হয়তো বলি যে, আহা, বাস্তবিক তোমার বড়ো কষ্টের অবস্থা, সে মনে করে যে, আহা, তবু আমার কষ্ট একজন বুঝিতে পারিল, সে তাহাতে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে ও তখন আমার কাছে কত কথাই বলিতে থাকে, এইরূপে তাহার হৃদয়ের ভার অনেকটা লঘু হইয়া যায়। এমন করিয়া সান্ত্বনা দেওয়া আবশ্যক যে, শোকগ্রস্ত ব্যক্তি না বুঝিতে পারে যে তাহাকে সান্ত্বনা দিতে আসা হইয়াছে। আমি যদি বুঝিতে পারি আমাকে কেহ সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছে, অমনি মনে হয়, ও ব্যক্তি আমার কষ্টে কষ্ট অনুভব করে নাই, ও ব্যক্তি মনে করে যে, আমার এ কষ্টে কষ্ট পাওয়া উচিত নহে, নহিলে সে আমার এ কষ্ট থামাইতে চেষ্টা করিবে কেন? যে ব্যক্তি মনে করে যে, যে কষ্টে আমি শোক করিতেছি সে কষ্ট শোকের উপযুক্ত নহে, সে ব্যক্তি আমার কষ্টে তেমন মমতা অনুভব করিতেছে না, ইহা অনেকটা নিশ্চয়। সে হয়তো মনে করিতেছে যে এ কী ছেলেমানুষ! আমি হইলে তো এরূপ করিতাম না। মনে না করুক আমাকে সেইরূপ বিশ্বাস করাইতে চায়। অতটা আত্মাবমাননা

স্বীকার করিয়া আমি মমতা প্রর্থনা করি না। একজন যে গম্ভীরভাবে বসিয়া বসিয়া আমার অশ্রুজলের সমালোচনা করিতেছে ইহা জানিতে পারা অতিশয় কষ্টকর। কী। আমি যে কষ্টে কষ্ট পাইতেছি, তাহা কষ্ট পাইবার যোগ্যই নহে; আমার কষ্ট এতই সামান্য, আমি এতই দুর্বল যে অত সামান্য কষ্টেই কষ্ট পাই? এ কথা মনে করিয়া কেহ কেহ হয়তো সান্ত্বনা পাইতেও পারে, আপনার প্রতি ধিক্কার দিতেও পারে ও ক্রমে দুঃখ ভুলিতেও পারে। কিন্তু আমার মতো লোকও তো ঢের আছে, আমার সে সান্ত্বনাকারীর প্রতি রাগ হয়, মনে হয় কী, আমাকে এত ক্ষুদ্র ঠাহরাইতেছে? তুমি যদি আমার শোকের কারণ দেখিয়া কষ্ট পাইয়া থাক তো আইস, তোমাকে আমার মনের কথা বলি, তাহা হইলে আমার কষ্টের অনেকটা লাঘব হইবে, নহিলে তোমার যদি মনে হইয়া থাকে, দুর্বল হৃদয়, অল্পেতেই কষ্ট পাইতেছে, উহাকে একটু থামাইয়া থুমাইয়া দিই, তবে তোমায় কাজ নাই, তোমার সান্ত্বনা দিতে হইবে না। আসল কথাটা এই যে, সান্ত্বনা অনেক সময় বড়ো বিরক্তিজনক, অনেক সময় মনে হয় যে, আমার নিজের দুঃখের ভাবনা ভাবিবার যেটুকু সময় পাইয়াছি, একজন আসিয়া তাহা মিছামিছি নষ্ট করিয়া দিতেছে মাত্র; দুঃখ ভাবনা ভাবিবার সময় নষ্ট হইলে যে কষ্ট হয় না তাহা নহে, দুঃখের ভাবনা ভাবিবার সময় লোকে গোলমাল করিতে আসিলে বড়ো কষ্ট হয়, এইজন্যই বিজনে দুঃখের ভাবনা ভাবিতে ভালো লাগে। শোকার্ত ব্যক্তির পক্ষে তাহার দুঃখের কারণ কষ্টের হউক কিন্তু দুঃখের ভাবনা অনেকটা সুখের, যদি তুমি তাহার দুঃখের কারণ বিনাশ করিতে পার তো ভালো, নতুবা তাহার ভাবনার সময় অলীক সান্ত্বনা দিতে গিয়া তাহার ভাবনায় ব্যাঘাত দিয়ো না।

ভারতী
চৈত্র ১২৮৪

নিঃস্বার্থ প্রেম

দেখো ভাই, সেদিন আমার বাস্তবিক কষ্ট হয়েছিল। অনেকদিন পরে তুমি বিদেশ থেকে এলে; আমরা গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম। 'আমাদের কি মনে পড়ত?' তুমি ঠোঁটে একটু হাসি, চোখে একটু ভ্রূকুটি করে বললে, 'মনে পড়বে না কেন? উত্তরটা শুনেই তো আমার মাথায় একেবারে বজ্রাঘাত হল; নিতান্ত দুঃসাহসে ভর করে সংকুচিত স্বরে আর-একবার জিজ্ঞাসা করলুম, 'অনেক দিন পরে এসে আমাদের কেমন লাগছে?' তুমি আশ্চর্য ও বিরক্তিময় স্বরে অথচ ভদ্রতার মিষ্টহাসিটুকু রেখে বললে, 'কেন, খারাপ লাগবার কী কারণ আছে?' আর সাহস হল না। ও-রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা আর হল না। বিদেশে গিয়ে অবধি তুমি আমাকে দু-তিনখানা বৈ চিঠি লেখ নি, সেজন্য আমার মনে মনে একটুখানি অভিমান ছিল। বড়ো সাধ ছিল, সেই কথাটা নিয়ে হেসে হেসে অথচ আন্তরিক কষ্টের সঙ্গে, ঠাট্টা করে অথচ গম্ভীরভাবে একটুখানি খোঁটা দেব', কিন্তু তোমার ভাব দেখে, তোমার ভদ্রতার অতিমিষ্ট হাসি দেখে তোমার কথার স্বর শুনে আমার অভিমানের মূল পর্যন্ত শুকিয়ে গেল। তখন আমিও প্রশ্নের ভাব পরিবর্তন করলুম। জিজ্ঞাসা করলুম, 'যে দেশে গিয়েছিলে সে দেশের জল-বাতাস নাকি বড়ো গরম? সে দেশের লোকেরা নাকি মস্ত মস্ত পাগড়ি পরে, আর তামাক খাওয়াকে ভারি পাপ মনে করে? এখান থেকে সেকেন্ড ক্লাসে সেখেনে যেতে কত ভাড়া লাগে?' এইরকম করে তোমার কাছ থেকে সেদিন অনেক জ্ঞান লাভ করে বাড়ি ফিরে এয়েছিলুম! তোমার আচরণ দেখে দুঃখ প্রকাশ করেছিলুম শুনে তুমি লিখেছ যে, 'প্রথমত আমার যতদূর মনে পড়ে তাতে আমি যে তোমার ওপর কোনো প্রকার কুব্যবহার করেছিলুম, তা তো মনে হয় না। দ্বিতীয়ত, যদি-বা তোমার কতকগুলি প্রশ্নের ভালোরকম উত্তর না দিয়ে দু-চার কথা বলে উড়িয়ে দিয়ে থাকি, তাতেই বা আমার দোষ কী?

সে রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবারই বা তোমার কি আবশ্যক ছিল?' তোমার প্রথম কথার কোনো উত্তর দেওয়া যায় না। সত্যই তো, তুমি আমার সঙ্গে কোনো কু-ব্যবহারই কর নি। যতগুলি কথা জিজ্ঞাসা করেছিলুম, সকলগুলিরই তুমি একটা-না-একটা উত্তর দিয়েছিলে, তা ছাড়া হেসেও ছিলে, গল্পও করেছিলে। তোমার কোনোরকম দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু তবু তুমি আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার কর নি; সে তোমাকে বা আর কাউকে আমি বোঝাতে পারব না সুতরাং তার আর বাহুল্য উল্লেখ করব না। দ্বিতীয় কথাটি হচ্ছে, কেন তোমাকে ও-রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলুম। আচ্ছা ভাই তোমার তো হৃদয় আছে, একবার তুমিই বিবেচনা করে দেখো-না— কেন জিজ্ঞাসা করেছিলুম। তোমার ভালোবাসার উপর সন্দেহ হয়েছিল বলেই কি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, যে, 'আমাদের কি মনে পড়ত' কিংবা 'আমাদের কি ভালো লাগছে', না তোমার ভালোবাসার ওপর সন্দেহ তিলমাত্র ছিল না বলেই জিজ্ঞাসা করেছিলুম? যদি স্বপ্নেও জানতুম যে, আমাকে তোমার মনে পড়ত না, কিংবা আমাকে তোমার ভালো লাগছে না, তা হলে কী ও-রকমের কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করতুম। তোমার মুখে শোনবার ভারি ইচ্ছা ছিল যে, বিদেশে আমাকে তোমার প্রায়ই মনে পড়ত। কেবলমাত্র ওই কথাটুকু নয়, ওই কথা থেকে তোমার আরও কত কথা মনে আসত। আমার বড়ো ইচ্ছা ছিল যে, তুমি বলবে— 'অমুক জায়গায় আমি একটি সুন্দর উপত্যকা দেখলুম; সেখেনে একটি নির্ঝর বয়ে যাচ্ছিল, জায়গাটা দেখেই মনে হল, আহা ভা— যদি এখানে থাকত তা হলে তার বড়ো ভালো লাগত!' একটা ছোটো প্রশ্ন থেকে এইরকম কত উত্তরই শুনতে পাবার সম্ভাবনা ছিল। যখন প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করেছিলুম তখন মনের ভিতর এইরকম অনেক কথা চাপা ছিল!

আমি তোমার কাছে দুঃখ করবার জন্যে এ চিঠিটা লিখছি নে; কিংবা তোমার কাছে অভিমান করাও আমার উদ্দেশ্য নয়! আমি ভাই, কোনো কোনো লোকের মতো ঢাক ঢোল বাজিয়ে অভিমান করতে পারি নে; যার প্রতি অভিমান করেছি, তার কাছে গিয়ে 'ওগো আমি অভিমান করেছি গো, আমি অভিমান করেছি' বলে হাঁকাহাঁকি করতেও ভালোবাসি নে। যদি আমি অভিমান করি তো সে মনে মনে। আমার অভিমানের অশ্রু কেউ কখনো দেখতে পায় না, আমার অভিমানের কথাও কেউ কখনো শোনে নি; অভিমান আমার কাছে এমনই গোপনের সামগ্রী। তাই বলছি তোমার কাছে আজ আমি অভিমান করতে বসি নি। তোমার সঙ্গে আমার কতকগুলি তর্ক আছে, তার মীমাংসা করতে আমার ভারি ইচ্ছে।

তোমার সমস্ত চিঠিটার ভাব দেখে আমার এই মনে হল যে তোমার মতে যারা নিঃস্বার্থ ভালোবাসে তারা আর ভালোবাসা ফেরত পাবার আশা করে না। যেখানে ভালোবাসার বদলে ভালোবাসা পাবার আশা আছে সেইখানেই স্বার্থপরতা আছে। এ সম্বন্ধে তোমাকে একটি কথা বলি শোনো। আমরা অনেক সময়ে ভালো করে অর্থ না বুঝে অনেক কথা ব্যবহার করে থাকি। মুখে মুখে কথাগুলো এমন চলিত, এমন পুরোনো, হয়ে যায় যে, সেগুলো আমরা কানে শুনি বটে কিন্তু মনে বুঝি নে, নিঃস্বার্থ ভালোবাসা কথাটাও বোধ করি সেইরকম একটা কিছু হবে। যখন আমরা শুনে যাই তখন আমরা কিছুই বুঝি নে, একটু পীড়াপীড়ি করে বোঝাতে বললে হয়তো দশজনে দশ রকম ব্যাখ্যা করি। স্বার্থপরতা কথা সচরাচর আমরা কী অর্থে ব্যবহার করে থাকি? আহার করা বা স্নান করাকে কি স্বার্থপরতা অতএব নিন্দনীয় বলে? আহার না করা বা স্নান না করাকে কি নিঃস্বার্থপরতা অতএব প্রশংসনীয় বলে? মূল অর্থ ধরতে গেলে আহার বা স্নান করাকে স্বার্থপরতা বলা যায় বৈকি? কিন্তু চলিত অর্থে তাকে স্বার্থপরতা বলে না। সকল মানুষই মনে মনে এমন সামঞ্জস্যবাদী, যে, যখন বলা হল যে, 'আহার করা ভালো' তখন কেউ এমন বোঝেন না, বিরাম বিশ্রাম না দিয়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ছাব্বিশ ঘণ্টাই আহার করা ভালো। তেমনি যখন আমরা স্বার্থপরতা কথা ব্যবহার করি, তখন কেউ মনে করে না যে, নিশ্বাস গ্রহণ করা স্বার্থপরতা বা বাতাস খাওয়া স্বার্থপরতা। যা-কিছু পঙ্কজ তাকে যেমন পঙ্কজ বলে না, যা

কিছু অ-চল তাকে যেমন অচল বলে না, তেমনি যা-কিছু স্বার্থপরতা তাকেই স্বার্থপরতা বলে না। খাওয়াদাওয়াকে স্বার্থপরতা বলে না, কিন্তু যে ব্যক্তি কেবলমাত্র খাওয়াদাওয়া করে আর কিছু করে না, কিংবা যার খাওয়াদাওয়াই বেশি, পরের জন্য কোনো কাজ অতি যৎসামান্য, তাকে স্বার্থপর বলা যায়। আবার তার চেয়ে স্বার্থপর হচ্ছে যারা পরের মুখের গ্রাস কেড়ে নিজে খায়। এ ছাড়া আর কোনো অর্থে, কোনো ভাবে স্বার্থপর কথা ব্যবহার করা হয় না। তা যদি হয় তা হলে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা বলতে কী বুঝায়? যদি মূল অর্থ ধর তাহলে ভালোবাসাই স্বার্থপরতা। যখন এক জনকে দেখতে ভালো লাগে, তার কথা শুনতে ভালো লাগে, তার কাছে থাকতে ভালো লাগে ও সেইসঙ্গে সঙ্গে তাকে না দেখলে, তার কথা না শুনলে ও তার কাছে না থাকলে কষ্ট হয়, তার সুখ হলে আমি সুখী হই, তার দুঃখ হলে আমি দুঃখী হই, তখন অতগুলো ভাবের সম্মিলনকেই ভালোবাসা বলে। ভালোবাসার আর-একটা উপাদান হচ্ছে, সে আমাকে ভালো বাসুক, অর্থাৎ তার চোখে আমি সর্বাংশে প্রীতিজনক হই এই বাসনা। ভেবে দেখতে গেলে এর মধ্যে সকলগুলিই স্বার্থপরতা। এতগুলি স্বার্থপরতার সমষ্টি থেকে একটি স্বার্থপরতা বাদ দিলেই কি বাকিটুকু নিঃস্বার্থ হয়ে দাঁড়ায়? কিন্তু যেটিকে বাদ দেওয়া হল সেটি অন্যান্যগুলির চেয়ে কী এমন বেশি অপরাধ করেছে? তা ছাড়া এর মধ্যে কোনোটাকেই বাদ দেওয়া যায় না। এর একটি যখন নেই তখন বোঝা গেল যে, যথার্থ ভালোবাসাই নেই। যাকে তোমার দেখতে ভালো লাগে না, যার কথা শুনতে ইচ্ছে করে না, যার কাছে থাকতে মন যায় না তাকে যদি ভালোবাসা সম্ভব হয় তা হলেই যার ভালোবাসা পেতে ইচ্ছে করে না তাকে ভালোবাসাও সম্ভব হয়। যাকে দেখতে শুনতে ও যার কাছে থাকতে ভালো লাগে, কোনো কোনো ব্যক্তি দুদিন তাকে দেখতে শুনতে না পেলে ও তার কাছে না থাকলে তাকে ভুলে যায় ও তার ওপর থেকে তার ভালোবাসা চলে যায়, তেমনি আবার যার ভালোবাসা পেতে ইচ্ছে করে তার ভালোবাসা না পেলেই কোনো কোনো ব্যক্তির ভালোবাসা তার কাছ থেকে দূর হয়; তাদের সম্বন্ধে এই বলা যায় যে, তাদের গভীররূপে ভালোবাসবার ক্ষমতা নেই। এটা নিশ্চয় বলা যায় যে, ভালোবাসার যতগুলি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উল্লেখ করলুম, ভালোবাসা যেখানে থাকে তারাও সেইখানে থাকবেই থাকবে। তাদের মধ্যে একটাকে বাদ দিয়ে বাকিটুকুকে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা বলাও যা আর ঘড়ির কল বা তার কাঁটা বা তার সময় চিহ্ন বাদ দিয়ে তাকে খাঁটি ঘড়ি বলাও তা। এখন এক-এক সময় হয় বটে, যখন ভালোবাসার প্রতিদান পাবার কথা মনেই আসে না— যেমন দ্বারশূন্য বাতায়নশূন্য আলোকশূন্য জনশূন্য কারাগারে রুদ্ধ ব্যক্তির মুক্তির কথা কল্পনাতেই আসে না; কিন্তু সেই কারারুদ্ধ ব্যক্তির মুক্তির কথা মনে আসে না বলে বলা যায় না যে স্বাধীনতার ইচ্ছা মানুষের স্বভাব-সিদ্ধ নহে। তেমনি যখন আমার ভালোবাসার পাত্র আকাশের জ্যোতির্ময় জলদ-সিংহাসনে, আর আমি পৃথিবীর মৃত্তিকায় একটি সামান্য কীট ধূলায় অন্ধ হয়ে বিচরণ করছি— যখন তার পদ-জ্যোতির একটুমাত্র আভাস দেখা, যখন সংগীত নয় কথা নয়, কেবল অতি দূর থেকে তাঁর কণ্ঠের অস্ফুট স্বরটুকু মাত্র শোনা আমার অদৃষ্টে আছে, যখন তাঁর নিশ্বাস বহন ক'রে তাঁর গাত্র স্পর্শ ক'রে তাঁর কুন্তল উড়িয়ে বাতাস আমার গায়ে অমৃত সিঞ্চন করে, ও সেইটুকু সুখেই আমার চোখ ঢুলে পড়ে, আমার গা শিউরে উঠে, তার চেয়ে আমার আর কোনো আশা নেই, তখন যদি আমার ভালোবাসার প্রতিদান পাবার কথা মনে না আসে তো তা থেকে বলা যায় না যে, ভালোবাসার প্রতিদান পাবার আশা স্বভাবতই ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে যে থাকবে এমন নয়, সেইরকম অবস্থায় ভালোবাসার প্রতিদান পাবার আশা মনে স্পষ্ট না আসুক, তবু কি সে ব্যক্তির মনে তৃপ্তি থাকে? সর্বদাই কি তার মনটা হাহাকার করতে থাকে না? তার মনের মধ্যে কি এমন একটা নিদারুণ অভাব ঘোরতর শূন্যতা থাকে না, যে-শূন্য সমস্ত জগৎ গ্রাস করেও পূর্ণ হতে পারে না? তার হৃদয়ের সে মরুভাব কেন? সে কি তার প্রতিদানের মর্মভেদী আশাকে নিরাশার সর্বব্যাপী বালুকার তলে নিহিত করে ফেলা হয়েছে বলেই না? এমন কোনো

অমানুষিক মানুষকে কি কেউ দেখেছে, যে ভালোবাসার প্রতিদান না পেয়েও, প্রতিদানের আশা বা কল্পনা না করেও মহাযোগীর মতো মনের আনন্দে আছে। প্রতিদানের আশা ত্যাগ করেও অনেকে ভালোবাসে বটে, কিন্তু ভালোবেসে কি সুখী হয়? আচ্ছা তর্কের অনুরোধে মনেই করা যাক যে, ভালোবাসার প্রতিদান পাবার আশা যে ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে থাকবেই তা নয়, কিন্তু তাই বলে কি প্রতিদান পাবার একটা ইচ্ছামাত্রই স্বার্থপরতা? যোগাভ্যাস-ক্রমে কোনো যোগী ক্ষুধাতৃষ্ণা একেবারে দূর করে নিষ্কাম হয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু ক্ষুধাতৃষ্ণা কি স্বার্থপরতা? আমার শরীরের ধর্মই এই যে, অবস্থা বিশেষে আমার ক্ষুধাতৃষ্ণার উদ্রেক হয়, সে উদ্রেকটুকু অবশ্য স্বার্থপরতা নয়; কিন্তু আমার সেই ক্ষুধানিবৃত্তির জন্যে আর-একজন ক্ষুধিত ব্যক্তিকে যদি তার আহার থেকে বঞ্চিত করি, তা হলে আমার স্বার্থপরতা হয় বটে! আমার মনের ধর্ম এই যে, ভালোবাসার প্রতিদান পেতে ইচ্ছে করে কিন্তু সেই ইচ্ছাটুকুই স্বার্থপরতা নয়; তবে যদি সেই ইচ্ছায় অন্ধ হয়ে এমন অন্যায় উপায়ে আমার ভালোবাসার পাত্রের কাছে প্রতিদান পাবার চেষ্টা করি যে, সে তাতে কষ্ট পায় বা বিপদে পড়ে তা হলেই সেটা স্বার্থপরতা হয়ে দাঁড়ায়।

তোমার চিঠি পড়ে একটা কারণে বড়ো হাসি পেল। ভাবে বোধ হয় যে, তোমার মতে যারা নিঃস্বার্থ ভালোবাসে তারা ভালোবাসার পাত্রের কাছে যে আদর না পেয়েও কেবল সুখী থাকবে তা নয়, অনাদর পেয়েও তারা কষ্ট পাবে না। যেরকম অবস্থা হোক না তারা কেবল নিজে ভালোবেসেই সুখী থাকবে। ভালোবাসার লোকের মিষ্টি হাসিমুখখানি দেখলে যদি নিঃস্বার্থ প্রেমিকের আনন্দ হয় তবে তার কাছে আদর পেলেই বা কেন না হবে। তার মুখখানি না দেখলে যদি কষ্ট হয় তবে আদর গেলেই বা কষ্ট না হবে কেন?

আমি কাকে স্বার্থপর ভালোবাসা বলি জান? যে ভালোবাসা খাঁটি ভালোবাসা নয়। ভালোবাসার গিল্টি করা ইন্দ্রিয়-বিকার। সে ভালোবাসায় ভালোবাসার চাকচিক্য আছে, ভালোবাসার সুবর্ণ বর্ণ আছে, কেবল ভালোবাসা নেই। সেরকম ভালোবেসে যে তোমার ভালোবাসার পাত্রকে তোমার চক্ষে অত্যন্ত নীচ করে ফেলছ তাতে তোমার বুকে লাগে না। তোমার চক্ষে যে সে রক্তমাংসের সমষ্টি একটা উপভোগ্য সামগ্রী বৈ আর কিছুই দাঁড়াচ্ছে না, তাতে তোমার কিছুমাত্র আত্মগ্লানি উপস্থিত হয় না! যখন তার প্রতিমাকে তোমার হৃদয়ের মধ্যে আনো, তখন তোমার হৃদয়ের মধ্যে এমন এক তিল নির্মল স্থান রাখ নি যেখানে তাকে বসাতে পারো! তোমার বীভৎস দুর্গন্ধময় হৃদয়ে সে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করে, দিনরাত তার পদে কুৎসিত লালসা ও কলুষিত কল্পনা উপহার দিচ্ছ, তেমন বীভৎস প্রতিমাপূজাকে যদি ভালোবাসা নিতান্ত বলতে হয় তা হলে একেই আমি স্বার্থপর ভালোবাসা বলি। আমার মত এই যে, দৈত্যদের যেমন দৈত্যই বলে, কুদেবতা বা কোনো রকম বিশেষত্ব-বিশিষ্ট দেবতা বলে না তেমনি উপরি-উক্ত ব্যবহারকে স্বার্থপর ভালোবাসা না বলে তার যা যথার্থ নাম তাকে সেই নামেই ডাকা উচিত, তার জাল-নাম ভালোবাসা তার যথার্থ নাম ইন্দ্রিয়পরতা। ভালোবাসার চক্ষে যাকে দেখা যায়, কল্পনা তাকে স্বর্গের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করে, তার চার দিকে স্বর্গের কিরণ দীপ্তি পেতে থাকে— আর ইন্দ্রিয়পরতার চক্ষে যাকে দেখ, সে যদি স্বর্গীয় হয় তবু তোমার কল্পনা তাকে সে স্বর্গের আসন থেকে নামিয়ে, পৃথিবীর আবর্জনা-মধ্যে স্থাপন করে, এর চেয়েও কি স্বার্থপরতা আর আছে?

ভারতী
কার্তিক ১২৮৭

যথার্থ দোসর

হে তারকা, ছুটিতেছে আলোকের পাখা ধরে,
তোমারে শুধাই আমি, বলো গো বলো গো মোরে,
তুমি তারা রজনীর কোন্ গুহা মাঝে যাবে?
আলোকের ডানাগুলি মুদিয়া রাখিতে পাবে?
ম্লান মুখ হে শশাঙ্ক, ভ্রমিছ সমস্ত রাত্রি,
আশ্রয় আলয়-হীন আকাশ-পথের যাত্রী,
দিবসের, নিশীথের কোন্ ছায়াময় দেশে
বিশ্রাম লভিতে তুমি পাইবে গো অবশেষে?

পরিশ্রান্ত সমীরণ, বলো গো খুঁজিছ কারে?
আতিথ্য না পেয়ে ভ্রম' জগতের দ্বারে দ্বারে,
গোপন আলয় তব আছে কি মলয় বায়,
তরঙ্গ-শয়নে কিংবা নিভৃত নিকুঞ্জ-ছায়?

—Shelley

আধুনিক ইংরাজি কবিতার মধ্যে আশ্রয়-প্রয়াসী হৃদয়ের বিলাপ-সংগীত প্রায় শুনা যায়। আধুনিক ইংরাজ কবিরা অসন্তোষ ও অতৃপ্তির রাগিণীতেই অধিকাংশ গান গাহিয়া থাকেন। যাহা ছিল ও হারাইয়া গিয়াছে তাহার জন্য যে কেহ বিলাপ করিবেন তাহাতে আশ্চর্য নাই, কিন্তু যাহা ছিল না, যাহা পাইতেছি না, অথচ যাহা জানি না, তাহার জন্যই সম্প্রতি একটা বিলাপ-ধ্বনি উঠিয়াছে। কিছুতেই একটা আশ্রয় মিলিতেছে না, এই একটা ভাব; যেন একটা আশ্রয় আছে, আমি জানি, তাহার ঠিক রাস্তাটা খুঁজিয়া পাইতেছি না বলিয়া মিলিতেছে না, দিক্‌ভ্রম ঘুচিলেই মিলিবে, এইরূপ একটা বিশ্বাস। মনে হইতেছে জানি, অথচ জানি না, কী চাহি তাহা যেন ভাবিলেই মনে আসিবে, অথচ মনে আসে না। এক-এক সময়ে একজনকে ডাকিয়া, যেমন কী জন্য ডাকিলাম ভুলিয়া যাই, তখন যেমন অধীরতা উপস্থিত হয়, ইহাও সেইরূপ অধীর ভাব। এখনকার কবিরা দেখিতেছেন, প্রেমে তৃপ্তি নাই, সে অতৃপ্তি নিরাশার অতৃপ্তি নহে, অভাবের অতৃপ্তি। তাঁহারা কাহাকে ভালোবাসিবেন খুঁজিয়া পান না, অথচ হৃদয়ে ভালোবাসার অভাব নাই। প্রেমের অগ্নি, আলেয়ার আলোকও বিদ্যুতের শিখার ন্যায় আপনি জ্বলিতেছে। অথচ তাহার ইন্ধন নাই। ভালোবাসিবার জন্য তাঁহাদিগকে কাল্পনিক প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। এমনতর প্রেম পূর্বকার কবিদিগের ছিল না, এমনতর প্রেম সাধারণ লোকেরা বুঝে না। পূর্বকার কবিদিগের প্রেম ব্যক্তিগত ছিল, হাত, পা, নাক, মুখ, চোখ অবলম্বন না করিয়া যে ভালোবাসা থাকিতে পারে, ইহা তাঁহাদের কল্পনার অতীত ছিল। তাঁহারা ব্যক্তিবিশেষকে লইয়া মাতিয়া উঠিতেন, এইজন্য তাহাদের প্রেমের ধর্মে পৌত্তলিকতার উন্মত্ততা ছিল। তাহারা মিলনে একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেন, বিরহে একেবারে মুমূর্ষ হইয়া পড়িতেন। অতৃপ্তির নীচু সুরের নিশ্বাস তাঁহারা ফেলিতেন না, আর্তনাদের উঁচু সুরে তাঁহারা বিরহের গান গাহিতেন। সভ্যতা বৃদ্ধি সহকারে হৃদয়ের বৃত্তিসকল যে ক্রমশ মার্জিত ও সূক্ষ্ম হইয়া আসিয়াছে ইহাই তাহার একটি প্রমাণ। এমন এক সময় ছিল যখন প্রেম ইন্দ্রিয়গত ছিল, যখন বড়ো বড়ো চোখের কটাক্ষে কবিদিগের হৃদয়ে ভূমিকম্প উপস্থিত হইত, তিলফুল নাসা কুঞ্চিত দেখিলে তাঁহারা জগৎ অন্ধকার দেখিতেন। ফণিনী-গঞ্জিত বেণী তাঁহাদের হৃদয়কে সাতপাকে বাঁধিয়া রাখিত। তখন বিরহিণী গান করিত, 'আসার আশা রবে, কিন্তু নবযৌবন রবে না!' ক্রমে প্রেমের

অতীন্দ্রিয় ভাব কবিদিগের হৃদয়ে পরিস্ফুট হইতে লাগিল। তাঁহারা এমন ভালোবাসা অনুভব করিতে লাগিলেন, যাহাতে মুখ চক্ষু নাসিকার কোনো হাত নাই। তাঁহারা যাহাকে ভালোবাসিতেন, তাহার শরীরকেই ভালোবাসিতেন না, কিন্তু কিছুতেই ঠাহর করিতে পারিতেন না, কেনই বা তাহাকে ভালোবাসেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এখন এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, কবিরা ভালোবাসিতেছেন, অথচ ভালোবাসিবার লোক নাই। এক ব্যক্তির সহিত মিলনের জন্য অত্যন্ত ঔৎসুক্য, অথচ তাহার সঙ্গে কোনো জন্মে দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয়, জানাশুনা পর্যন্ত হয় নি। মন যেন কে-একজনকে ভালোবাসিতেছে, অথচ নিজে তাহার সম্বন্ধে কিছুমাত্র জানে না। পূর্বে নাক-চোখ-মুখের উপর ভালোবাসার পরগাছা ঝুলিত; অথবা ব্যক্তিবিশেষের উপর ভালোবাসার উদ্ভিদ গজাইত, যদিও তাহার বীজ পাখিতেই আনিয়া দিত, বা বাতাসেই বহন করিয়া আনিত, বা কী করিয়া আসিত কেহ ঠিকানা করিতে পারিত না। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে, ভালোবাসা হৃদয়ে সর্বপ্রথমে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্যক্তিবিশেষকে খুঁজিয়া বেড়ায়। তাহার মাপে ঠিক হইবে, এমন ব্যক্তিবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া ফিরে। দুই-চারিটা (বা তাহার অধিক) গায়ে দিয়া দেখে। কোনোটা বা ঢিলা হয় কোনোটা বা কষা হয়; কোনোটা বা মনে হয় হইবে, কিন্তু গায়ে দিলে হয় না; কোনোটা বা আর-সব দিকে বেশ হইয়াছে কেবল গলার কাছটা আঁট হয়; কোনোটা বা ভালোরূপে না হউক একপ্রকার চলনসইরূপে হয় ও তাহা লইয়াই ভালোবাসা সন্তুষ্ট থাকে। আগে ছিল প্রথমে আমদানি, পরে 'চাহিদা' (demands), এখন হইয়াছে প্রথমে 'চাহিদা' পরে আমদানি। ইহাই স্বাভাবিক অবস্থা। এখন কবিরা দেখিতেছেন, হৃদয় প্রেমের অতিথিশালা নহে, হৃদয় প্রেমের জন্মভূমি। প্রেম একটি পাত্র অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু পূর্বে খুব একটা বড়ো চোখ, সোজা নাক বা বিম্বৌষ্ঠের নাড়া না খাইলে কবিরা বুঝিতেই পারিতেন না যে, হৃদয়ে প্রেমের অস্তিত্ব আছে। সুতরাং তাঁহারা মনে করিতেন যে, ওই বড়ো চোখ ও বিম্বৌষ্ঠের সঙ্গে সঙ্গে প্রেম বলিয়া এক ব্যক্তি বুঝি হৃদয়ে বলপূর্বক আতিথ্য গ্রহণ করিল; এইজন্যই কেহ-বা তাহাকে ভালো মুখে সম্ভাষণ করিত, কেহ-বা গালাগালমন্দ দিত; যাহার যেমন স্বভাব! সে যে ঘরের লোক এমন কাহারো মনে হয় নাই।

পূর্বকার কবিরা সহসা আশ্চর্য হইতেন যে, ইহাকে ভালোবাসিলাম কেন? এ পাষাণ-হৃদয়া, মনোরাজ্য-অধিকার-লোলুপ, ইহার নিকট হইতে প্রেমের প্রতিদান পাইবার কোনো সম্ভাবনাই নাই, তবে ইহাকে ভালোবাসিলাম কেন? ইহার বিশেষ কোনো গুণ নাই, আমি যে যে গুণ ভালোবাসি, তাহা যে ইহার আছে এমন নহে, আমি যে যে দোষ ঘৃণা করি, তাহা যে ইহার নাই এমন নহে, আমি চেষ্টা করিতেছি ইহাকে না ভালোবাসি, তবে ইহাকে ভালোবাসি কেন? এখনকার কবিরা এক-একবার সহসা আশ্চর্য হন যে, ইহাকে ভালোবাসিলাম না কেন? এ কোমল-হৃদয়, আমার প্রতি নিতান্ত অনুরাগিণী, যে যে গুণ আমি ভালোবাসি সকলই ইহার আছে, যে যে দোষ ঘৃণা করি সকলই ইহার নাই; আমি ইচ্ছা করিতেছি ইহাকে ভালোবাসি, তবে ইহাকে ভালোবাসিতে পারিলাম না কেন? সাধারণ লোকে সহজেই উত্তর দিবে, চেষ্টা করিয়া কি ভালোবাসা বা না বাসা যায়? সে তো অতি সহজ উত্তর, কিন্তু কেনই বা না যাইবে? ভালো না বাসিলে যাহাকে ঘৃণা করিতাম, কেনই বা তাহাকে ভালোবাসিব? আর যে সর্বতোভাবে ভালোবাসিবার যোগ্য কেনই বা তাহাকে না ভালোবাসিব? এক দল কবি তাহার উত্তর দিতেছেন—

কে জানে কোথায় এই জগতের পরে
রয়েছে অপেক্ষা করি দীর্ঘ— দীর্ঘ দিন
একটি আশ্রয়হীন হৃদয়ের তরে
আরেকটি হৃদয় একেলা সঙ্গীহীন।
উভয়ে উভয়ে খুঁজে দিনরাত্রি ধ'রে

অবশেষে তাদের সহসা একদিন
দেখা হয় দুই জনে কে জানে কী করে।
উভয়ে সম্পূর্ণ হয়ে হয় রে বিলীন।
জীবনের দীর্ঘ নিশা তখনি ফুরায়
অনন্ত দিনের দিকে পথ খুলে যায়।

—Edwin Arnold

অর্থাৎ একটি হৃদয়ের জন্য আর-একটি হৃদয় গঠিত হইয়া আছেই। তাহারা পরস্পর পরস্পরের জন্য। শত ক্রোশ ব্যবধানে, এমন-কি জগৎ হইতে জগদন্তরের ব্যবধানেও তাহাদের মধ্যে একটা আকর্ষণ থাকে। তাহাদের মধ্যে দেখাশুনা হউক বা না-হউক, জানাশুনা থাকুক বা না-থাকুক, তাহাদের উভয়ের মধ্যে যেমন সম্বন্ধ, তেমন কোনো দুই পরিচিত ব্যক্তির, কোনো দুই বন্ধুর মধ্যে নাই। ঘটনাচক্রে পড়িয়া তাহারা বিচ্ছিন্ন, কিন্তু তাহারা বিবাহিত। তাহাদের অনন্ত দাম্পত্য। সামাজিক বিবাহ, অনন্তকালস্থায়ী বিবাহ নহে। সচরাচর বিবাহে হয় একতর পক্ষে নয় উভয় পক্ষে প্রেমের অভাব দেখা যায়, এমন-কি, হয়তো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আমরণ-স্থায়ী ঘৃণার সম্পর্ক। হয়তো একজন বৃদ্ধ একজন তরুণীকে বিবাহ করিল, উভয়ের মধ্যে সকল বিষয়েই আকাশ-পাতাল প্রভেদ, মাল্য পরিবর্তন হইল, কিন্তু হৃদয় স্ব-স্ব স্থানে রহিল। হয়তো একজন রূপবতী একজন ধনবানকে বিবাহ করিল; ধনের আকর্ষণে রূপ অগ্রসর হইল বটে কিন্তু হৃদয়ের আকর্ষণে হৃদয় অগ্রসর হইল না। হয়তো এমন দুইজনে বিবাহ হইল, শুভদৃষ্টির পূর্বে যাহাদের মধ্যে দেখাশুনা হয় নাই। হয়তো এমন বালক-বালিকার বিবাহ দেওয়া হইল, যাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া দেখিল উভয়ের প্রকৃতিতে দারুণ বৈসাদৃশ্য। এই বৃদ্ধ ও তরুণী, এই রূপবতী ও ধনবান, এই দুই বিসদৃশ প্রকৃতি সামাজিক দম্পতির বিবাহ কি কখনো অনন্ত-কাল-স্থায়ী বিবাহ বলিয়া গণ্য হইতে পারে? কিন্তু দুই-দুইটি করিয়া হৃদয় আছে, প্রকৃতি নিজে পৌরোহিত্য করিয়া যাহাদের বিবাহ দিয়াছেন। তাহাদের বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। হৃদয় যে একটি প্রেমের পাত্র চায়, সে প্রেমের পাত্র আর কেহ নহে। সেই নির্দিষ্ট হৃদয়। হয়তো পৃথিবীতে তাহার সহিত দেখাশুনা হইল না, কবে যে হইবে তাহার স্থিরতা নাই। কোথায় সে আছে তাহা জানি না। কিন্তু—

কোথা-না-কোথাও আছেই আছে
যে মুখ দেখি নি, শুনি নি যে স্বর;
সে হৃদয়, যাহা এখনো— এখনো
আমার কথায় দেয় নি উত্তর।
কোথা-না-কোথাও আছেই আছে,
হয়তো বা দূরে হয়তো কাছে;
ছাড়াইয়া দেশ, সাগরের তীরে,
হয়তো বা কোথা দৃষ্টির বাহিরে,
হয়তো ছাড়ায়ে চাঁদের সীমানা,
হয়তো কোথায় তারকা অজানা,
রয়েছে তাহারি কাছে,
কে জানে কোথায় আছে!
কোথা-না-কোথাও আছেই আছে,
হয়তো বা দূরে হয়তো কাছে;
একটি হয়তো বেড়া বা দেয়াল
মাঝে রাখিয়াছে করিয়া আড়াল।

নব বরষের ঘাসের 'পরে
গত বরষের কুসুম ঝরে,
নূতন, পুরানো, মাঝখানে তার
হয়তো দাঁড়ায়ে সেজন আমার।

—Christina Rossetti

হয়তো ওই একটি বেড়ার আড়াল পড়িল বলিয়া, যাহার সহিত আমার চিরজীবনের সম্বন্ধ, তাহার সহিত ইহজন্মে আর দেখা হইল না। হয়তো রাজপথে সে আমার পাশ দিয়া চলিয়া গিয়াছে, মুখ ফিরানো ছিল বলিয়া দেখা হইল না, মিলন হইল না। তোমার জন্য যে হৃদয় নির্দিষ্ট রহিয়াছে তোমার মনের এমনই ধর্ম যে, তাহাকে দেখিয়া তুমি না ভালোবাসিয়া থাকিতে পারিবে না, এবং সেও তোমাকে ভালোবাসিবে, প্রকৃতি এমনই উপায় করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তবে কেন সংসারে প্রণয় লইয়া এত গোলযোগ হয়? তবে কেন 'প্রকৃত স্রোত প্রশান্তভাবে বহে না?' যতক্ষণে না আমাদের যথার্থ দোসরকে পাই, ততক্ষণে তাহার সহিত যাহার কোনো বিষয়ে মিল আছে, আমরা তাহার প্রতিই আকৃষ্ট হই। এমনও সচরাচর হইয়া থাকে, প্রথমে একজনকে ভালোবাসিলাম, তাহার কিছুদিন পরে তাহাকে আর ভালোবাসিলাম না, এমন-কি, আর-একজনকে ভালোবাসিলাম। তাহার কারণ এই যে প্রথমে তাহার সহিত আমার প্রকৃত দোসরের সাদৃশ্য দেখিয়া তাহার প্রতি অনুরক্ত হইলাম, কিন্তু কিছুদিন নিরীক্ষণ করিয়া তাহার বৈসাদৃশ্যগুলি একে একে চক্ষে পড়িতে লাগিল ও অবশেষে তাহার অপেক্ষা সদৃশতর লোককে দেখিতে পাইলাম, আমার ভালোবাসা স্থান পরিবর্তন করিল। এমন এক-এক সময় হয়, আমরা সহসা এক ব্যক্তির মুখের এক পার্শ্বভাগ দেখিতে পাইলাম, সহসা মনে হইল, ইহাকে অমুকের মতন দেখিতে, হয়তো তাহার ভুরুর প্রান্তভাগ, তাহার অধরের সীমান্তভাগ মাত্র দেখিয়া মনে হইয়াছে ইহার সহিত অমুকের আদল আসে, হয়তো সমস্ত মুখটা দেখিলে দেখিতে পাই কিছুমাত্র আদল নাই। অনেক সময়ে দূর হইতে দেখিলে সহসা মনে হয় ইহাকে অমুকের মতন দেখিতে, কাছে আসিয়া দেখি তাহা নয়, অনেক সময় পশ্চাৎ হইতে দেখিয়া মনে হয় 'এ অমুক হইবে', সম্মুখে আসিয়া দেখি যে সে নয়। আমরা অনেক সময়ে পাশ হইতে ভালোবাসি, দূর হইতে ভালোবাসি, পশ্চাৎ হইতে ভালোবাসি, সুতরাং এমন হয় যে সম্মুখে আসিয়া কাছে আসিয়া আর ভালোবাসি না। অনেক সময়ে আবার হয়তো সত্যসত্যই আমরা আদল দেখিতে পাইয়া ভালোবাসি, কিন্তু তাহার অপেক্ষা অধিকতর আদল দেখিতে পাইলে আর-একজনকেও ভালোবাসিতে পারি। এইরূপ অবস্থায় আমরা আমাদের ভালোবাসার প্রতিদান দৈবক্রমে পাইতেও পারি, আবার অনেক সময়ে না পাইতেও পারি। এই-সকল কারণেই প্রেমে এত গোলযোগ বাধে। এই-সকল কারণেই আমরা (তাহার দোষ থাকুক বা গুণ থাকুক) একজনকে অন্ধভাবে ভালোবাসি, অথচ কেন ভালোবাসি ভাবিয়া পাই না, সে আমাদের প্রতি সহস্র নির্যাতন করুক, সহস্র অন্যায় ব্যবহার করুক, কিছুতেই তাহাকে না ভালোবাসিয়া থাকিতে পারি না। এই-সকল কারণেই, আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না যে, এইরূপ চরিত্রবিশিষ্ট ব্যক্তি ভালোবাসিব, আর এইরূপকে ভালোবাসিব না।

একটি রঙের সহিত আর-একটি রঙ যখন মিলাইয়া গেল, তখন সেই উভয় বর্ণের অতি সূক্ষ্মতম বর্ণাণুগুলি কোন্ সীমায় ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল আমরা দেখিতে পাই না, এই পর্যন্ত বুঝিতে পারি যে, উভয় বর্ণের বর্ণাণুগুলির মধ্যে পরস্পর মিলিবার শক্তি আছে, আর কোনো শ্রেণীর বর্ণাণু হইলে মিলিতে পারিত না। তেমনি আমার বর্ণাণু আর কোন্ হৃদয়ের বর্ণাণুর সহিত মিলিতে পারিবে, তাহা কোনো পার্থিব সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পড়িবার জো নাই, কিন্তু মিল আছেই। এমন বস্তু নাই যাহার মিল নাই। এ জগতে মিলের রাজ্য, প্রতি বর্ণের মিল আছে, প্রতি সুরের মিল আছে, প্রতি হৃদয়েরও মিল আছে। এ জগৎ মিত্রাক্ষরের কবিতা। এত মিল, এত অনুপ্রাস কোনো কবিতাতেই নাই।

যখন ভাবিয়া দেখা যায় যে, মনুষ্যের হৃদয়ে দোসর পাইবার ইচ্ছা কী বলবতী, তাহার জন্য সে কী না করিতে পারে, সে ইচ্ছার নিকটে জীবন পর্যন্ত কী অকিঞ্চিৎকর, মনের মতো দোসর পাইলে সে কী আনন্দই পায়, না পাইলে সে কী হাহাকারই করে, তখন মনে হয় যে, প্রতি লোকের দোসর আছেই, এককালে-না-এককালে পরস্পরের সহিত মিলন হইবেই। সংসারে যখন মাঝে মাঝে দোসরের মরীচিকা দেখিতে পাওয়া যায়, তখন নিশ্চয় বোধ হয়, জলাশয় কোনো দিকে-না-কোনো দিকে আছেই, নহিলে আকাশপটে তাহার প্রতিবিম্ব পড়িতই না। মনের মানুষ পাইবার জন্য যেরূপ দুর্দান্ত ইচ্ছা অথচ সংসারে মনের মানুষ লইয়া এত অশ্রুপাত, হৃদয়ের এত রক্তপাত করিতে হয় যে, মনে হয় একদিন বোধ করি আসিবে যেদিন মনের মানুষ মিলিবে, অথচ এত কাঁদিতে হইবে না। হৃদয়ের প্রতিমার নিকট হৃদয়কে বলিদান দিতে হইবে না। ভালোবাসা ও সুখ, ভালোবাসা ও শান্তি এক পরিবারভুক্ত হইয়া বাস করিবে। এ সংসারে লোকে ভালোবাসে, অথচ ভালোবাসার সমগ্র প্রতিদান পায় না, ইহা বিকৃত অবস্থা, অসম্পূর্ণ অবস্থা। এ অসম্পূর্ণ অবস্থা, একদিন-না-একদিন দূর হইবে। যখন বন্ধুত্বের প্রতারণায় প্রেমের যন্ত্রণায় মন অশ্রুবর্ষণ করিতে থাকে, মন একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়া ধুলায় লুটাইয়া পড়ে, তখন ইহা অপেক্ষা সান্ত্বনা কী হইতে পারে? একবার যদি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভাবে, এ-সমস্ত মরীচিকা; তাহার যথার্থ ভালোবাসিবার লোক যে আছে সে কখনো তাহাকে কাঁদাইবে না, তাহাকে তিলমাত্র কষ্ট দিবে না, তাহার সহিত একদিন অনন্ত সুখের মিলন হইবে, তখন কী আরাম সে না পায়। আর-একজন 'আমার' আছে, সৃষ্ট জীবের মধ্যে তেমন 'আমার' আর কেহ নাই। এমন সময় যখন আসে, যখন ভালোবাসিবার জন্য হৃদয় লালায়িত হয়, এমন ঋতু যখন আসে যখন

> 'How many a one, though none be near to love,
> Loves then the shade of his own soul half seen
> In any mirror—'

তখন হৃদয়ে সেই দোসরের একটি অশরীরী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকেই ভালোবাসো, তাহার সহিত কথোপকথন করো। তাহাকে বলো, 'হে আমার প্রাণের দোসর, আমার হৃদয়ের হৃদয়, আমি সিংহাসন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, কবে তুমি আসিবে? এ সিংহাসনে যদি আর কাহাকেও বসাইয়া থাকি তবে তাহা ভ্রমক্রমে হইয়াছে; কিছুতেই সন্তোষ হয় নাই, কিছুতেই তৃপ্তি হয় নাই, তাই তোমার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছি।'

তাহাকে বলো—

> In all my singing and speaking,
> I send my soul forth seeking;
> O soul of my soul's dreaming;
> When wilt thou hear and speak?
> Lovely and lonely seeming,
> Thou art there in my dreaming.
> Hast thou no sorrow for speaking
> Hast thou no dream to seek?
> In all my thinking and sighing,
> In all my desolate crying,
> I send my heart forth yearning ,
> O heart that may'st be nigh!
> Like a bird weary of flying,
> My heavy heart, returning,

Bringeth me no replying.
  Of word, or thought, or sigh.
In all my joying and grieving.
  Living, hoping, believing,
I send my love forth flowing,
  To find my unknown love.
O world, that I am leaving,
O heaven, where I am going,
Is there no finding and knowing,
  Around, within or above?
O soul of my soul's seeing
  O heart of my heart's being.
O love of dreaming and waking
  And living and dying for—
Out of my soul's last aching
Out of my heart just breaking—
Doubting, falling forsaking,
  I call on you this once more.
Are you too high or too lowly
  To come at lengh upto me?
Are you too sweet or too holy
  For me to have and to see?
Wherever you are, I call you,
Ere the falseness of life enthral you,
Ere the hollow of death appal you,
  While yet your spirit is free.
Have you not seen, in sleeping,
  A lover that might not stay,
And remembered again with weeping
And thought of him through the day
Ah! thought of him long and dearly,
Till you seemed to behold him clearly
And could follow the dull time merely
With heart and love far away?
And what are you thinking and saying,
In the land where you are delaying?
Have you a chain to sever?
  Have you a prison to break?
O love! there is one love for ever,
And never another love— never,
And hath it not reached you, my praying?

And singing these years for your sake?
We two made one, should have power
To grow to a beautiful flower,
A tree for men to sit under
Beside life's flowerless stream;
But I without you am only
A dreamer fruitless and lonely;
And you without me, a wonder
In my most beautiful dream.

—Arthur O'Shaughnessy

ভারতী
জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮

গোলাম-চোর

অদৃষ্ট আমাদের জীবনের তাসে অনেকগুলির মিল রাখিয়াছেন, কিন্তু মাঝে মাঝে একটা একটা করিয়া গোলাম রাখিয়া দিয়াছেন, তাহার আর মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। চিরজন্ম গোলাম-চোর খেলিয়া আসিতেছি, কত বাজি যে খেলা হইল তাহার আর সংখ্যা নাই, খেলোয়াড়দের মধ্যে কে জাঁক করিয়া বলিতে পারে যে, সে একবারও গোলাম-চোর হয় নাই? অদৃষ্টের হাতে নাকি তাস, আমরা দেখিয়া টানিতে পারি না, তাহা ছাড়া অদৃষ্টের তাস খেলায় নাকি গোলামের সংখ্যা একটি নহে, এমন অসংখ্য গোলাম আছে কাজেই সকলকেই প্রায় গোলাম-চোর হইতে হয়। আমরা সকলেই চাই— মিলকে পাইতে ও অমিলকে তাড়াইতে। গোলাম পাইলে আমরা কোনো উপায়ে গলাবাজি করিয়া চালাকি করিয়া প্রতিবেশীর হাতে চালান করিয়া দিতে চাই। উদাহরণ দেওয়া আবশ্যক। মনে করো অ্যাকাউন্টেন্ট জেনেরালের আপিসে গোলাম-চোর খেলা হইতেছে— যতক্ষণ হিসাবে মিল হইতেছে ততক্ষণ কোনো গোলযোগ নাই। প্রথম সাহেব খেলোয়াড় যেই অমিলের গোলামটি পাইয়াছেন অমনি এক হাত দু হাত করিয়া সকলের শেষ খেলোয়াড় কেরানি বাবুটির হাতে গোলামটি চালান করিয়া দিলেন, মাঝে হইতে গরিব কেরানি বাবুটি গোলাম-চোর হইয়া দাঁড়াইলেন। দায়িত্বের গোলামটি কেহই হাতে রাখিতে চায় না। এমন প্রতি বিষয়েই গোলাম-চোর খেলা চলিতেছে। খুব সামান্য দৃষ্টান্ত দেখো। ঘোড়ার নিলামে যাঁহারা ঘোড়া কেনেন, সকলেই জানেন, যাহার হাতে খোঁড়া ঘোড়ার গোলাম আছে, কেমন কৌশলপূর্বক তোমার হাতে তাহা চালান করিয়া দেয়, যখন টানিবার উপক্রম করিয়াছ, তখন হয়তো জানিতে পার নাই, গোলাম টানিয়া চৈতন্য হইল, সেই নিলামেই গোলাম আর-একজনের হাতে চালান করিয়া দিলে। এমন দশ হাত ফিরিয়া জানি না কোন্ হতভাগ্য গোলাম-চোর হয়।

বাপের হাতে একটি অতি কুরূপা কন্যার গোলাম আসিয়াছে, গোলাম-দায়গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, বেহাত করিতে পারিলে বাঁচেন, হতভাগ্য বরের হাতে বেমালুম চালান করিয়া দিলেন, বর বেচারি শুভ দৃষ্টির সময়ে দেখিল, সে গোলাম-চোর হইয়াছে।

হোমিওপ্যাথি ডাক্তারেরা প্রায় গোলাম-চোর হন। তাঁহারাই নাকি সকলের শেষ খেলোয়াড়— এমন প্রায়ই হয় যে, গোলাম ছাড়া আর কোনো কাগজ তাঁহাদের টানিবার থাকে না, অ্যালোপ্যাথি ডাক্তার হোমিওপ্যাথির হাতে গোলামটি সমর্পণ করিয়া বিদায় হন, তিনি গোলাম-চোর হইয়া ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরেন।

অদৃষ্টের হাত হইতে যখন তাস টানি, তখন হয়তো আমার হাতের সকল তাসগুলিই প্রায়

মিলিয়া গেল, কেবল একটা বা দুইটা এমন গোলাম টানিয়া বসি যে, চিরকালের মতো গোলাম-চোর হইয়া থাকি। মনে করো, আমার বিদ্যার তাস মিলিয়াছে, ধনের তাস মিলিয়াছে, কোথা হইতে একটা অপযশের গোলাম টানিয়া বসিয়াছি, গোলাম-চোর বলিয়া পাড়ায় টী টী পড়িয়া গিয়াছে। মনে করো, আমার ভ্রাতার তাস মিলিয়াছে, বন্ধুর তাস মিলিয়াছে, কোথা হইতে একটা স্ত্রীর গোলাম টানিয়াছি, আমরণ গোলাম-চোর হইয়া কাটাইতে হইল। এইরূপ একটা-না-একটা গোলাম সকলেরই হাতে আছে। তথাপি মানুষের এমনি স্বভাব, একজন গোলাম-চোর হইলেই নিকটবর্তী খেলোয়াড়েরা হাসিয়া উঠে; তখন তাহারা ভুলিয়া যায় যে, তাহাদের হাতে, সে রঙের না হউক, অমন দশখানা অন্য রঙের গোলাম আছে। জীবনের তাস খেলা যখন ফুরায়-ফুরায় হয়, সুখ-দুঃখ, আশা-ভরসার মিল-অমিল সকল তাসই যখন মৃত্যু একত্র করিয়া চিরকালের তরে বাক্সয় তুলে, তখন যদি প্রতি খেলোয়াড় একবার করিয়া গনিয়া দেখে, কতবার সে গোলাম-চোর হইয়াছে আর কত রঙের গোলাম তাহার হাতে আসিয়াছিল, তাহা হইলেই সে বুঝিতে পারে, অন্যান্য খেলোয়াড়দের তুলনায় তাহার হার কি জিত।

আমাদের দেশের বিবাহ-প্রণালীর মতো গোলাম-চোর খেলা আর নাই। প্রজাপতি তাস বিলি করিয়া দিয়াছেন। সত্য মিথ্যা জানি না, বিবাহিত বন্ধুবান্ধবের মুখে শুনিতে পাই যে, তাসে গোলামের ভাগই অধিক। চৌধুরী হালদারের হাত হইতে তাস টানিবে; দেখিয়া টানা-পদ্ধতি নাই। চৌধুরীর হাতে যদি দুরি থাকে আর হালদারের হাতেও দুরি থাকে তবেই শুভ, নতুবা যদি গোলাম টানিয়া বসেন, তবেই সর্বনাশ। আন্দাজ করিয়া টানিতে হয়, আগে থাকিতে জানিবার উপায় নাই। কিন্তু কী আশ্চর্য। কোথায় চৌধুরী কোথায় হালদার; হালদারের হাত হইতে চৌধুরী দৈবাৎ একটা তাস টানিল, চৌষট্টিটা তাসের মধ্যে হয়তো সেইটাই মিলিয়া গেল। যেই মিলিল, অমনি মিল-দম্পতি বিশ্রাম পাইল। অন্যান্য অবিবাহিত তাসেরা হাতে হাতে মিল অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিল, তাহাদের আর বিরাম বিশ্রাম নাই। এইখানে সাধারণকে বিদিত করিতেছি, আমি একটি অবিবাহিত তাস আছি, আমার মিল কাহার হাতে আছে জানিতে চাই। আমার বন্ধুবান্ধবেরা আমাকে বলেন, গোলাম। বলেন, আমার মিল ত্রিজগতে নাই। যে কন্যাকর্তা টানিবেন তিনি গোলাম-চোর হইবেন। কিন্তু বোধ করি, তাঁহারা রহস্য করিয়া থাকেন, কথাটা সত্য নহে।

অনেক অসাবধানী এমন আলগা করিয়া তাস ধরেন, তাঁহাদের হাতের কাগজ সকলেই দেখিতে পায়। পাঠকেরা যেন এমন করিয়া তাস না ধরেন। এমন অনেক বড়ো বড়ো ধনী খেলোয়াড় দেখিয়াছি, তাঁহারা এমনই আলগা করিয়া তাস ধরেন যে, প্রতিবেশীরা তাঁহাদের হাত হইতে আবশ্যকমতো সাতা টানে, আটা টানে, নহলা টানে, তাঁহারা মনে মনে ফুলিতে থাকেন, তবে বুঝি গোলামটাও টানিবে। তাঁহাদের হাতের কাগজ সব ফুরাইয়া যায়, কেবল গোলামটাই অবশিষ্ট থাকে।

পাঠকদের হাতে যদি গোলাম আসিয়া থাকে, চালান করিয়া দিবার কৌশল অবগত হউন। কোনো মতে মুখ-ভাবে না প্রকাশ হয়, হাতে গোলাম আছে। অনেক বড়ো বড়ো হৌসের হাতে গোলাম আসিয়া থাকে, লোকে যদি অঙ্কুশ মাত্রে জানিতে পারে যে, হৌসের হাতের কাগজে গোলাম দেখা দিয়াছে, তাহা হইলেই তাহার খেলা সাঙ্গ হয়। যে পরিবারের হাতে মূর্খ বরের গোলাম আছে, তাহারা যদি চারি দিকে কেতাব ছড়াইয়া রাখে, মুখস্থ বুলি বলিতে পারে, তাহা হইলে তাহারাও গোলাম চালাইয়া দিতে পারে। তুমি আমি যদি এ সংসারে মুখের জোরে চলিয়া যাইতে পারি, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইতে পারি, রায় বাহাদুর হইতে পারি, তাহা হইলে আরও অনেক গোলাম চলিয়া যাইতে পারে।

একে তো গোলাম-চোর হইতেই বিশেষ আপত্তি আছে, তাহাতে যদি জানিতে পারি যে, আর-একজন কৌশল করিয়া ভাঁড়াইয়া আমার হাতে গোলামটি চালান করিয়া দিয়াছেন, তাহা

হইলে কিছু অপ্রস্তুত হইতে হয়। সংবাদপত্র ও মাসিকপত্রের সমালোচনা ও বিজ্ঞাপন যাঁহারা পাঠ করেন তাঁহারা ট্যাকের পয়সা খরচ করিয়া সহসা আবিষ্কার করেন, যে, গোলাম-চোর হইয়াছেন। সত্য কথা বলিতে কী, অনেক পাঠক তাসের কাগজ চেনেন না, তাঁহারা অনেক সময়ে জানিতেই পারেন না যে, তাঁহারা গোলাম টানিয়াছেন। রঙচঙ দেখিয়া তাঁহারা ভারি খুশি হন, কিন্তু যাঁহারা তাসের কাগজ চেনেন, তাঁহারা গোলাম-চোরকে দেখিয়া মনে মনে হাসেন।

যাহা হউক, পাঠকেরা একবার ভাবিয়া দেখুন, কতবার গোলাম-চোর হইয়াছেন, কত রঙের গোলাম তাঁহার হাতে আছে। প্রকাশ করিবার আবশ্যক নাই, কথাটা চাপিয়া রাখুন, কিন্তু প্রতিবেশী গোলাম-চোর হইলে তাহা লইয়া অতিরিক্ত হাস্য-পরিহাস না করেন।

ভারতী
আষাঢ় ১২৮৮

চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়

জঠর-তত্ত্ববিৎ বুধগণ উদর-সেবাকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। চর্বণ করা, শোষণ করা, লেহন করা ও পান করা। আহারের অনুষঙ্গিক ও অতি নিকট সম্পর্কীয় একটি পদার্থ আছে, পুরাতন নস্য-সেবকেরা তাহাকে অনাদর করিয়াছেন যথা, ধূমায়ন অর্থাৎ ধোঁয়ান। যাহা হউক, 'ভক্ষণ ও ভক্ষণায়ন' সভার সভ্যগণ তাঁহাদের শাস্ত্রের পাঁচটা পরিচ্ছেদ নির্মাণ করিয়াছেন, প্রথম চর্ব্য; দ্বিতীয় চোষ্য; তৃতীয় লেহ্য; চতুর্থ পেয় ও পঞ্চম ধৌম্য। এই শেষ পরিচ্ছেদটাকে অনেকে রীতিমতো পরিচ্ছেদ বলিয়া গণনা করেন না, তাঁহারা ইহাকে পরিশিষ্ট স্বরূপে দেখেন।

আমাদের বুদ্ধির খোরাককেও এইরূপ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায়। শ্রীযুক্ত লালা আহার-বিহারী উদরাম্বুধি মহাশয় দেখিবেন, তাঁহাদের ভোজের সহিত বুদ্ধির ভোজের যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে।

চর্ব্য। কাঁচা, আভাঙা সত্য। ইহা একেবারে উদরে যাইবার উপযোগী নহে। গলা দিয়া নামে না, পেটে গিয়া হজম হয় না। ইহা অতিশয় নিরেট পদার্থ। ইংরাজি বুদ্ধিজীবী ঔদরিকগণ ইহাকে facts বলেন। যদি ইহাকে দাঁত দিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া, বিশ্লেষণ করিয়া, রহিয়া বসিয়া না খাও, যেমন পাও তেমনি গিলিতে আরম্ভ কর তবে তাহাতে বুদ্ধিগত শরীরের পুষ্টি সাধন হয় না। এইটি না জানার দরুন অনেক হানি হয়। স্কুলে ছেলেদের ইতিহাসের পাতে যে আহার দেওয়া হয় তাহা আদ্যোপান্ত চর্ব্য। বেচারিদের ভাঙিবার দাঁত নাই, কাজেই ক্রমিক গিলে। কোন্ রাজার পর কোন্ রাজা আসিয়াছে; কোন্ রাজা কোন্ সালে সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছে ও কোন্ সালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, এই-সকল শক্ত শক্ত ফলের আঁঠিগুলি তাহাদের গিলিতে হয়। মাস্টারবর্গ মনে করেন, ছাত্রদের মনের ক্ষেত্রে এই যে-সকল বীজ রোপণ করিতেছেন, ভবিষ্যতে ইহা হইতে বড়ো বড়ো গাছ উৎপন্ন হইবে। কথাটা যে চাষার মতো হইল; কারণ, এ যে ক্ষেত্র নয়, এ পাকযন্ত্র। এখানে গাছ হয় না, রক্ত হয়। আজকাল য়ুরোপে এই সত্যটি আবিষ্কৃত হইয়াছে ও পাঠ্য ইতিহাস লিখিবার ধারাও পরিবর্তিত হইয়াছে। এখনকার ইতিহাস কতকগুলা ঘটনার সংবাদপত্র ও রাজাদিগের নামাবলী নহে। অবশ্য চর্ব্য পদার্থের কাঠিন্যের কমবেশ পরিমাণ আছে। কোনোটা বা চিবাইতে কষ্ট বোধ হয় না মুখে দিলেই মিলাইয়া যায়, কোনোটা চিবাইতে বিষম কষ্ট হয়। যাঁহাদের বুদ্ধি দাঁত-ওয়ালা, চর্ব্য তাঁহাদের স্বাভাবিক খাদ্য। তাঁহারা কঠিন কঠিন চর্ব্যগুলিকে লইয়া বিশ্লেষণ দাঁত দিয়া ভাঙিয়া, মুখের মধ্যে আনুমানিক ও প্রামাণিক যুক্তির রসে রসালো করিয়া লইয়া এমনি আকারে তাহাকে পরিণত করেন যে, তাহার চর্ব্য অবস্থা ঘুচিয়া যায় ও সে পরিপাকের উপযোগী ও রক্ত-নির্মাণক্ষম হইয়া উঠে। ইহা একটি শারীর-তত্ত্বের নিয়ম যে, খাদ্য যতক্ষণ চর্ব্য অবস্থায় থাকে, অর্থাৎ facts যখন কেবলমাত্র facts রূপেই থাকে, ততক্ষণ তাহা

রক্ত নির্মাণ করিতে পারে না, রক্তের সহিত মিশিতে পারে না। তাহার সাক্ষ্য, আমাদের অসংখ্য এম-এ বি-এ'দের খাইয়া খাইয়া পিলে হয়; উদরী হয়; কাহারো কাহারো বা অপরিমিত চর্বি হয়, ও বাহির হইতে বিষম বলিষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু বল হয় না।

আমরা এখনও ভালো করিয়া চর্ব্য খাইতে পারি না, আমরা চোষ্য খাইয়া থাকি। যাহাদের দাঁত উঠে নাই তাহারা শোষণ করিয়া খায়। মাতৃস্তন্য শোষণ করিয়া খাইতে হয়। অর্থাৎ মাতার শরীরে চর্ব্য দ্রব্য সকল হজম হইয়া সার দুগ্ধরূপে পরিণত হয়, সন্তান তাহাই শোষণ করিয়া খায়। অনেকগুলি সহজ সত্য আমরা অতীত কালের স্তন হইতে পান করি। বহুবিধ অভিজ্ঞতার চর্ব্য খাইয়া খাইয়া অতীতের স্তনে সেই দুগ্ধ জন্মিয়াছিল। আমরা বিনা আয়াসে তাহা প্রাপ্ত হই। তাহা আর চিবাইতে হয় না, একেবারে পরিপাকের উপযোগী হইয়াই থাকে। কোনো কোনো মাতার স্তনে দুগ্ধ অধিক থাকে, কাহারো দুগ্ধ কম থাকে। আমরা একটা বিলাতি দাইয়ের দুগ্ধ পান করিতেছি, আমাদের মায়ের দুধ কম। এই অস্বাভাবিক উপায়ে দুধ খাওয়া অনেকের সহে না, অনেকের পক্ষে ঘটিয়া উঠে না, ইহা বড়োই ব্যয়সাধ্য। পণ্ডিতদিগের মত এই যে, আমাদের সাহিত্য-মা যদি ভালো ভালো পুষ্টিকর খাদ্য খাইয়া, দুধ কিনিয়া নিজে খাইয়া, শরীর সুস্থ রাখিয়া স্তনে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ সঞ্চার করিতে পারেন, তবে দাই নিযুক্ত করা অপেক্ষা তাহাতে অনেক বিষয়ে ভালো হয়। সন্তানদের সে দুধ ভালোরূপে হজম হয়, সকল সন্তানই সে দুধ পাইতে পারে ও তাহা ব্যয়সাধ্য হয় না। এইখানে একটা কথা বলা আবশ্যক, নিতান্ত শিশু-অবস্থা অতীত হইয়া গেলে একটু একটু করিয়া চর্ব্য দেওয়া আবশ্যক, তাহাতে দাঁত শক্ত হয়, দাঁত উঠিবার সহায়তা করে। অনেক সময়ে চিবাইয়া দাঁত শক্ত করিবার জন্য ছেলেদের হাতে চুষি দেয়। বড়ো বড়ো উন্নত সমাজ এক কালে এইরূপ খাদ্য ভ্রমে চুষি চিবাইয়াছে, তাহাতে আর কিছু না হউক, তাহাদের দাঁত উঠিবার অনেকটা সহায়তা করিয়াছে। মধ্যযুগের য়ুরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীতে এইরূপ কূট তর্কের চুষি চিবানোর প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। আমাদের ন্যায়শাস্ত্রের অনেকগুলি তর্ক এইরূপ চুষি, অতএব দাঁত উঠিবার সহায়তা করিতে কঠিন দ্রব্যের বিশেষ আবশ্যক। আমাদের, বোধ করি, এতটুকু দাঁত উঠিয়াছে যে, একটু একটু করিয়া চর্ব্য খাইতে পারি। অতএব হে বঙ্গ বিদ্বন্মণ্ডলী, একটা ভালো দিন স্থির করিয়া আমাদের অন্নপ্রাশন করা হউক। হে মাসিকপত্রসমূহ, আমাদের কেবলমাত্র দুগ্ধ না দিয়া একটু একটু করিয়া অন্ন খাইতে দিয়ো।

'লেহ্যে'র কোঠায় আসিবার আগে 'পেয়' সম্বন্ধে আলোচনা করা আবশ্যক। প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের শরীরের পক্ষে চর্ব্য যেরূপ আবশ্যক, পেয়ও সেইরূপ আবশ্যক। শরীরের তরল জলীয় অংশ পূরণ করাই পানীয় দ্রব্যের কাজ। অতএব, ইহা শরীরের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বুদ্ধিজীবী লোকদের খোরাকে কবিতাই পানীয়। ইহা তাঁহাদের রক্তের জলীয় অংশ প্রস্তুত করে, ইহা তাঁহাদের শিরায় উপশিরায় প্রবাহিত হয়। ইহা কখনো মাদকের স্বরূপে তাঁহাদের মুহ্যমান দেহে চেতনার বল সঞ্চার করে, অলস শরীরে স্ফূর্তি ও উদ্যমের উদ্রেক করে, সময় বিশেষে আবেশে গদগদ করিয়া দেয়। আবার কখনো শীতল জলস্বরূপে সংসারের রৌদ্রদগ্ধ ব্যক্তির পিপাসা শান্তি করে, শরীর শীতল করে। দেহের রক্ত উষ্ণ হইয়া যখন একটা অসংযত উত্তেজনা শরীরে জ্বলিয়া উঠে তখন তাহা জুড়াইয়া দেয় অর্থাৎ, অকর্মণ্যকে উত্তেজিত করে, অশান্তকে শান্তি দেয়, শ্রান্ত ক্লান্তকে বিশ্রাম বিতরণ করে। অতএব বয়স্ক বুদ্ধিজীবী লোকদের পক্ষে বুদ্ধির খাদ্য চর্ব্য সকলও যেমন আবশ্যক, আবেগের পানীয় কবিতাও তেমনি উপযোগী।

চর্ব্য কঠিন ও পেয় গভীর, কিন্তু লেহ্য তরল, অগভীর ও বিস্তৃত। যাহাদের শোষণ করিবার বয়স গিয়াছে, অথচ দাঁতের জোর কম, তাহারা লেহ্য খাইয়া বাঁচে। অধিক চিবাইতে হয় না, অধিক তলাইতে হয় না, উপর হইতে লেহন করিয়া লয়। এই বেচারিদের উপকার করিবার জন্য অনেক দন্তবান বলিষ্ঠ লোকে কঠিন কঠিন চর্ব্য পদার্থকে বিধিমতে গলাইয়া, রসে পরিণত করিয়া লেহ্য বানাইয়া দেন। নিতান্তই যাহা গলে না তাহা ফেলিয়া দেন। বলা বাহুল্য যে, এইরূপ

গলাইতে অধিকাংশ সময়ে পানীয় পদার্থের আবশ্যক করে। প্রক্টর সাহেব কঠিন জ্যোতির্বিদ্যাকে পানীয় পদার্থে গলাইয়া জনসাধারণের জন্য মাঝে মাঝে প্রায় এক-এক পাত্র লেহ্য প্রস্তুত করিয়া দেন। আজকাল ইংলন্ডে এই লেহ্য সেবনের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব পড়িয়াছে। ম্যাকমিলান, ব্ল্যাকবুড প্রভৃতি দোকানদারেরা এইরূপ নানা প্রকার পদার্থের লেহ্য প্রস্তুত করিয়া ইংলন্ডের ভোজনপরায়ণদের দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছেন। কোনো কোনো পণ্ডিত আশঙ্কা করিতেছেন যে, লেহ্য সাহিত্যের অধিক প্রাদুর্ভাব হইলে লোকের দাঁতের ব্যবহার এত কমিয়া যাইবে যে, দাঁত ক্রমশই শিথিলতর হইয়া পড়িবে।

এই সকল প্রকার খাদ্য ও পানীয়ের আবার নানা প্রকার আস্বাদন আছে, কোনোটা বা মিষ্ট, কোনোটা বা তিক্ত, কোনোটা বা ঝাল, কোনোটা বা অম্ল। কোন্ প্রকারের খাদ্য মিষ্ট তাহা বলিবার আবশ্যক নাই, সকলেই জানেন। যাহা তীব্র, ঝাঁঝালো বিদ্রূপ; যাহাতে বেলেস্তরার কাজ করে; যাহা খাইতে খাইতে চোখে জল আসে, তাহাই ঝাল। অনেকের নিকট ইহা মুখরোচক, কিন্তু শরীরের পক্ষে বড়ো ভালো নহে। সচরাচর লোকে বলিয়া থাকে 'ঝাল ঝাড়া'। অর্থাৎ মনে জ্বালা ধরিলে আর-একজনকে জ্বালানো। বেচারি পূর্ববঙ্গবাসীগণ ক্রমাগতই ঝাল খাইয়া আসিতেছে। অম্লরস ঝালের মতো ঝাঁঝালো উষ্ণ নহে। ইহা বড়ো ঠাণ্ডা আর হজমের সহায়তা করে। ইহার বর্ণ লঙ্কার ন্যায় লাল টক্‌টকে নয়, দধির ন্যায় বিশদ, স্নিগ্ধ। ইহাকে ইংরাজিতে humour বলে, বাংলায় কিছুই বলে না। ইহার নাম বিমল, অপ্রখর রসিকতা। ইহা মুচকি হাসির ন্যায় পরিষ্কার ও শুভ্র। ইহা দুধকে ঈষৎ বিকৃত করিয়া দেয়, কিন্তু সে বিকৃত পদার্থ অন্যান্য বিকৃত পদার্থের ন্যায় ঘৃণাজনক, দুর্গন্ধ ও বিস্বাদ নহে। সেই বিকারের কেমন একটু বেশ মজার স্বাদ আছে। আমাদের বঙ্কিমবাবুর সকল লেখায় এইরূপ কেমন একটু অম্লরসের সঞ্চার আছে, মুখে বড়োই ভালো লাগে। তাঁহার কমলাকান্তের দপ্তরে অনেক সময়ে তিনি শুষ্ক চিড়া-সকল দই দিয়া এমন ভিজাইয়া দিয়াছেন যে, সে চিড়ার ফলারও ভোক্তাদের মুখরোচক হইয়াছে। 'ঘোল খাওয়ানো' বলিয়া একটা কথা আমাদের শাস্ত্রে প্রচলিত আছে, তাহার অর্থ— মুচকি হাসিয়া অতি ঠাণ্ডা ভাবে একজনের পিত্ত টকাইয়া তুলা, ইহাতে ভোজন-কর্তার হাস্য ও পিত্ত একসঙ্গে উদ্দীপিত করে; ঝালের সে গুণটি নাই, অশ্রুর সহিত তাহার কারবার! অতিরিক্ত টক ভালো নহে। টক কেন, সকল দ্রব্যেই প্রায় অতিরিক্ত কিছুই ভালো নহে। যখন মিষ্ট খাইয়া খাইয়া রুচি খারাপ হইয়া গেছে তখন তিক্ত কাজে দেখে। সম্পাদকগণ ও গ্রন্থকারবর্গ আমাদের বাঙালি পাঠকদের মিষ্ট ছাড়া আর কিছু খাওয়াইতে চান না। যাহা পাঠকদের মুখে রোচে, তাহাই তাঁহারা সংগ্রহ করিয়া দেন, স্বাস্থ্যজনক হউক আর না হউক। তাঁহারা ক্রমাগত পাঠকদের শুনাইতে থাকেন—'আমাদের দেশের যাহা-কিছু তাহাই ভালো, বিদেশ হইতে যাহা আনীত হয় তাহাই মন্দ। যাহা চলিয়া আসিতেছে তাহা হইতে ভালো আর কিছু নাই, যাহা নূতন আসিতেছে, তাহা অপেক্ষা মন্দ আর কিছু হইতে পারে না।' এই-সকল কথা আমাদের পাঠকদের বড়োই মিষ্ট লাগে, এইজন্য দোকানেও প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হয়। আমার বোধ হয় এখন একটু একটু তিক্ত খাওয়াইবার সময় আসিয়াছে, নতুবা স্বাস্থ্যের বিষম ব্যাঘাত হইতেছে।

কথা প্রসঙ্গে তামাকের কথাটা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। জঠর-তত্ত্বের যে পরিচ্ছেদে এই তামাকের কথা আছে, তাহার নাম ধূমায়ন। বুদ্ধির ভোজে নভেলকে তামাক বলে। বুদ্ধিজীবীগণ ইহাকে বুদ্ধিগত শরীরের পক্ষে অপরিহার্য আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করেন না। তাঁহাদের অনেকে ইহাকে মৌতাতের স্বরূপে দেখেন। বড়ো বড়ো আহারের পর এক ছিলিম তামাক বড়ো ভালো লাগে, পরিশ্রম করিয়া আসিয়া এক ছিলিম তামাক বিশেষ আবশ্যক। নিতান্ত একলা বসিয়া আছি, হাতে কিছু কাজ নাই। বসিয়া বসিয়া তামাক টানিতেছি। ইহার মাদকতা শক্তি কিয়ৎ পরিমাণে আছে। কিন্তু ইহার ফল উপরি-উল্লিখিত ভোজ্যসমূহের অপেক্ষা অনেকটা ক্ষণস্থায়ী ও লঘু, খানিকটা ধোঁয়া টানিলাম, উড়িয়া গে[illegible] তামাক পুড়িয়া গেল, আগুন নিভিয়া গেল, লঘু

ধোঁয়ার উপর চড়িয়া সময়টাকে আকাশের দিকে চলিয়া গেল। তামাকের আবার নানাবিধ শ্রেণী আছে। অনেক আষাঢ়ে আছে, যাহাকে গাঁজা বলা যায়। বঙ্কিমবাবু ডাবা হুঁকায় আমাদের যে তামাক খাওয়ান এমন তামাক সচরাচর খাওয়া যায় না। ইহার গুণ এই, ধোঁয়া অনেকটা জলের মধ্য দিয়া ঠাণ্ডা হইয়া আসে। বঙ্কিমবাবুর হুঁকার খোলে অনেকটা কবিতার জল থাকে। এক-এক জন লোক আছে, তাহারা হুঁকার জল ফিরায় না; দশ দিন দশ ছিলিম তামাক সাজিয়া দেয়, একই জল থাকে। এক-এক জন পাঠক আছে, তাহাদের চুরট না হইলে চলে না। তাহারা বর্ণনা চায় না, কবিত্বপূর্ণ ভাব চায় না, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনুভাবের লীলাখেলা দেখিতে চায় না; তাহারা মাথায়-আকাশ-ভাঙা, গা-শিওরনো, চমক-লাগা ঘটনার দশ-বারোটা গরম গরম টান টানিয়া একেবারে সমস্তটা ছাই করিতে চায়। কোনো কোনো নবন্যাসবর্দার আমাদের গুড়গুড়িতে তামাক দেন। তাহার দশ হাত লম্বা, দশ পাক পেঁচানো নলের মধ্য দিয়া ধোঁয়া মুখের মধ্যে আসিতে অনেকটা দেরি করে। কিন্তু একবার আসিলেই অবিশ্রাম আসিতে থাকে। কোনো কোনো হুঁকায় আগুন (interest) নিভিয়া যায়। কোনো কোনো কলিকায় পাঠক যদি শ্রম স্বীকারপূর্বক প্রথম প্রথম খানিকটা ফুঁ দিয়া দিয়া আগুন জাগাইয়া রাখিতে পারেন, তবে শেষাশেষি অনেকটা ধোঁয়া পান।

মাসিক সংবাদপত্রের ভাণ্ডারে উপরি-উল্লিখিত ভোজের সমস্ত উপকরণগুলিই থাকা আবশ্যক। সকল প্রকার ভোক্তার খোরাক জোগানো দরকার। বিভিন্ন বিভিন্ন দোকানে ফুরন করা থাকে, কিন্তু তাহারা প্রতিবারে সময়মতো সরবরাহ করিতে পারে না, কাজেই এক-একবার এক-এক শ্রেণীর পাঠক চটিয়া উঠেন। ভারতীয় নিমন্ত্রণ-সভায় সম্পাদক মহাশয়, স্বর-রহস্য, জ্যামিতি, ভৌতিক বিজ্ঞান, অধ্যাত্মবিদ্যা প্রভৃতি যে-সকল দাঁতভাঙা চর্ব্যের পরিবেশন আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে উপস্থিত প্রস্তাব-লেখক বিশেষ ভীত ও ব্যাকুল হইয়া তাঁহার নিকট সবিনয় নিবেদন করিতেছে যে, যে-সকল গুরুপাক খাদ্যের মাসিক বরাদ্দ হইয়াছে, তাহাদিগকে আর-একটু লেহ্য আকারে পাতে দিলে মুখে তুলিতে ভরসা হয়, নচেৎ তাহাতে পাত পূরিবে বটে, কিন্তু পেট পূরিবে না।

ভারতী
শ্রাবণ ১২৮৮

দরোয়ান

আমাদের কর্তা আমাদের যে স্থানে বিদ্যা শিক্ষার জন্য পাঠাইয়াছেন, সেখানে এত প্রকারের আপদ-বিপদের সম্ভাবনা আছে যে, আমাদের প্রত্যেকের মনের দেউড়িতে তিনি যুক্তি বা বুদ্ধি বলিয়া এক-একটা দরোয়ান খাড়া করিয়া রাখিয়াছেন। এ ব্যক্তি আমাদের কী ভয়ানক শাসনেই রাখিয়াছে। আমাদের উপরে ইহার কী দারুণ একাধিপত্য! ইনি যাহাদের না চেনেন, এমন কোনো লোককে ঘরে ঢুকিতে দেন না। সদা সর্বদা পাহারা। ইনি যে গণ্ডিটি দিয়া রাখিয়াছেন, তাহার বাহিরে আমাদের কোনো মতেই যাইতে দেন না। রাত্রি হইলে এ লোকটি ঘুমাইয়া পড়ে, সেই অবসরে অনেক প্রকারের লোক পা টিপিয়া পা টিপিয়া আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসে, কখনো বা উৎপাত করে কখনো বা আমোদে রাখে। যেই দরোয়ানটা জাগিয়া উঠে, ঘরের মধ্যে গোলযোগ শুনিতে পাইয়া সে ডাকিয়া উঠে, 'কে রে? আমার হুকুম না লইয়া ঘরে কে আসিয়াছিস?' অমনি আমাদের স্বপ্ন-নাটকের পাত্রগণ, আমাদের Dreamatis Personœ[1] দরজা দিয়া, জানালা দিয়া, খিড়কি দিয়া উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া পালায়। আমরা সকলে ছেলেমানুষ লোক, যে আসে তাহাকেই বিশ্বাস করি, এই নিমিত্ত দরোয়ান এমন কাহাকেও প্রবেশ করিতে

১. অপূর্ব লাটিন হইল।

দেয় না যে বিশ্বাসযোগ্য নহে। স্বপ্নে আমরা কাহাকে না বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করাই আমাদের স্বাভাবিক অবস্থা। কিন্তু আমাদের দরোয়ান হাজার হুঁশিয়ার হউক-না-কেন, ভদ্রলোকের মতো কাপড়-চোপড় পরিয়া অনেক অবিশ্বাস্য লোক আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহারা অনেক লোকসান করিয়া থাকে। অনেক সময়ে আমাদের প্রতিবেশীর দরোয়ান আমাদের দরোয়ানকে সাবধান করিয়া দেয়। যদি দরোয়ানের তাহাতে চৈতন্য হয় তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে ডাকিয়া গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দেন। নানা চরিত্রের দরোয়ান আছে, ভাব অতিথিগণ তাহাদের নানা উপায়ে বশ করিতে পারে। কেহ-বা হীরার আংটি ঘড়ির চেন-পরা বাবুটিকে দেখিলেই ছাড়িয়া দেয়; কেহ-বা মিষ্ট কথা শুনিলেই গলিয়া যায়, অবিশ্বাস মন হইতে চলিয়া যায়; কেহ-বা বিশ্বাস করুক বা না করুক, সন্দেশের লোভ পাইলে চক্ষুকর্ণ বুজিয়া তাহাকে প্রবেশ করিতে দেয়। কত বড়ো বড়ো জাঁকালো-মত, ভুঁড়িবান ভাব হীরা জহরাৎ পরিয়া কত নাবালকের বৈঠকখানায় আদরের সহিত গৃহীত হইয়াছে, অথচ তাহারা আদরের যোগ্য নহে; কত মতকে আমরা মিঠা ভাবা, মিঠা গলা শুনিয়া ডাকিয়া আনিয়াছি; আবার অনেক মতকে আমরা ঠিক বিশ্বাস করি না, কিন্তু বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে বলিয়া, বিশ্বাস করিবার প্রলোভন আছে বলিয়া ঘরে ঢুকিতে দিই। অনেক সময়ে দিনের বেলায় দরোয়ান ঝিমায়। দুই প্রহরে চারি দিক হয়তো খাঁ খাঁ করিতেছে, জানালা দিয়া অল্প অল্প বাতাস আসিতেছে, খাটিয়াটির উপরে পড়িয়া দরোয়ানের তন্দ্রা আসিয়াছে, সেই সময়ে কত শত পরস্পর অচেনা ভাব আমাদের হৃদয়ের প্রবেশ-দ্বার অরক্ষিত দেখিয়া আস্তে আস্তে প্রবেশ করে; কত প্রকার অদ্ভুত খেলা খেলিতে থাকে তাহার ঠিকানা নাই; অনেকের এইরূপ অলস দরোয়ান আছে। আবার এক-একটা এমন দুর্দান্ত ভাব আছে যে, আমাদের দরোয়ানদের ঠেঙাইয়া জোর-জবরদস্তি করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। এই মনে করো, ভূতের-ভয় বলিয়া এক ব্যক্তি যখন কাহারো মনের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন যুক্তিসিং হাজার ঢাল-তলোয়ার লইয়া আস্ফালন করুন-না-কেন, তাহার কাছে ঘেঁষিতে পারেন না। কাহারো বা রোগা দরোয়ান, কাহারো বা ভালো মানুষ দরোয়ান, কাহারো বা অলস দরোয়ান।

এক-একটি ছেলে আছে, যাহার এই দরোয়ানটির উপর দৃঢ় বিশ্বাস। তাহাকে না লইয়া কোথাও যাইতে চায় না; সকল কাজেই তাহাকে খাড়া করিয়া রাখিয়া দেয়। সে ভাবে, কে জানে কোথায় কে দুষ্ট লোক আছে, কোথায় কোন্‌খানে গিয়া পৌঁছিব, তাহার ঠিক নাই। সে যেখানে আছে, যুক্তিও তাহার তক্‌মা পরিয়া পাগড়ি আঁটিয়া আসাসোঁটা ধরিয়া কাছে কাছে হাজির আছে। আবার এমন এক-একটা যথেচ্ছাচারী দুষ্ট ছেলে আছে, যে এই দরোয়ানটাকে দুচক্ষে দেখিতে পারে না। সে ভাবে, এ একটা কোথাকার মেড়ুয়াবাদী আমার স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া বসিয়া আছে। একটা যে সংকীর্ণ গণ্ডি টানিয়া দিয়াছে, তাহার মধ্যে কষ্টই থাক্‌ আর দুঃখই থাক্‌, আগুনেই পুড়ি, আর জলেই হাবুডুবু খাই, তাহার বাহিরে কোনো মতেই যাইতে দেয় না। অবশেষে নিতান্ত জ্বালাতন হইয়া দুষ্টামি করিয়া তাহাকে মদ খাওয়াইয়া দেয়; এইরূপে বুদ্ধি যখন মাতাল হইয়া অচেতন হইয়া পড়ে, তখন তাহারা গণ্ডির বাহিরে গিয়া উপস্থিত হয়। অনেক লোকে যে মদ খাইতে ভালোবাসে, তাহার কারণ এই যে, তাহারা স্বাধীনতা পাইতে চায়; বুদ্ধিটাকে কোনো প্রকারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়া যথেচ্ছা বিচরণ করিতে চায়; ইহাতে যে বিপদই ঘটুক-না-কেন তাহারা ভাবে না। এই উভয় দলেই কিছু অন্যায় বাড়াবাড়ি করিয়া থাকেন। নিতান্তই যুক্তির নির্দিষ্ট চারটি দেয়ালের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ানো মনের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নহে, আবার সর্বতোভাবে যুক্তিকে অমান্য করিয়া যথেচ্ছাচার করিয়া বেড়ানোও ভালো নয়। যুক্তির সীমানা ছাড়াইয়া যে নিরাপদ স্থান নাই, এমত নহে। অতএব মাঝে মাঝে যুক্তির অনুমতি লইয়া কল্পনার রাজ্যে খুব খানিকটা ছুটিয়া বেড়াইয়া আসা উচিত। এইরূপে যুক্তিকে কাজ হইতে অব্যাহতি দিয়া মাঝে মাঝে ছুটি দিলে তাহার শরীরের পক্ষেও ভালো।

'সিদ্ধি খাইলে বুদ্ধি বাড়ে।' অর্থাৎ বুদ্ধি-দরোয়ান সিদ্ধিটি খাইলে থাকে ভালো। অল্প পরিমাণে সিদ্ধি খাইলে ভালো থাকে বটে, কিন্তু অধিক পরিমাণে খাইলে খুব বলবান দরোয়ান নহিলে সামলাইতে পারে না; মাথা ঘুরিয়া যায়, ভোঁ হইয়া পড়ে। অল্প সিদ্ধি খাইলে সাবধানিতা বাড়ে, কিন্তু অধিক সিদ্ধি খাইলে এমন যশের নেশা লাগিতে পারে যে, একেবারে অসাবধানী হইয়া পড়া সম্ভব। শুনিয়াছি সিদ্ধি ও ভাঙে প্রভেদ নাই। হিন্দুস্থানীতে যাহাকে ভাঙ্‌ বলে বাঙালিরা তাহাকেই সিদ্ধি বলে। জাতি বিশেষে এইরূপ হওয়াই সম্ভব। একটি জাতির পক্ষে নেশা করিয়া, উদ্যম হারাইয়া, অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকায় সিদ্ধি, অর্থাৎ চরম ফল, সেইটি হইলে সে চূড়ান্ত মনে করে; আর-একটি জাতির পক্ষে নেশা করিয়া অজ্ঞান হইয়া থাকা ভাঙ্‌ মাত্র; অর্থাৎ অবসরমতো একটু একটু কাজে ভঙ্গ দেওয়া, সচরাচর অবস্থা, স্বাভাবিক অবস্থা হইতে একটু বিক্ষিপ্ত হওয়া। যাহা হউক, আমাদের বুদ্ধির দরোয়ানদের মধ্যে সিদ্ধি ও ভাঙ্‌ দুই এক পদার্থ নহে। উভয়ের ফল বিভিন্ন। সিদ্ধিতে উত্তেজিত উল্লাসিত করিয়া তুলে, ভাঙেতে অবসন্ন ম্রিয়মাণ করিয়া দেয়। লেখকের দরোয়ানটা ক্রমিক ভাঙ্‌ খাইয়া আসিতেছে। সে বেচারির কপালে সিদ্ধি আর জুটিল না।

দরোয়ানদের আর-একটা কাজ আছে। লাঠালাঠি করা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা করা। আমোদের জন্যও বটে, কাজের জন্যও বটে। এক-এক জন এমন দাঙ্গাবাজ লোক আছে, তাহারা তাহাদের লাঠিয়াল দরোয়ানটাকে সভাস্থলে, নিমন্ত্রণে, যেখানে-সেখানে লইয়া যায়, সামান্য সূত্র পাইলেই অমনি অন্যের দরোয়ানের সঙ্গে মারামারি বাধাইয়া দেয়। এই লোকগুলা অত্যন্ত অসামাজিক। একটা দরোয়ানকে কাছে হাজির রাখা দোষের নহে, কিন্তু ছুতানাতা ধরিয়া, যখন-তখন যেখানে-সেখানে একটা তর্কের লাঠি চালাইতে হুকুম দেওয়া মনের একটা অসভ্য অসামাজিক ভাব। নিজের বুদ্ধিকে যাহারা ভেড়া মনে করে, তাহারাই বুদ্ধিকে লইয়া এইরূপ ভেড়ার লড়াই করিয়া বেড়াক। কিন্তু যাহারা ভেড়া-বুদ্ধি নহে তাহারা যেন উহাদের অনুকরণ না করে। উহারা এমনতরো দাঙ্গাবাজ যে, দাঙ্গা করিবার কিছু না থাকিলে দেয়ালে ঢুঁ মারিয়া থাকে। সর্বত্রই এমনতরো বাহাদুরি করিয়া বেড়ানো সুরুচি-সংগত নহে।

এক-এক জনের দেউড়িতে এমন এক-একটা লম্বাচৌড়া দরোয়ান আছে, তাহাকে কেহ কখনো লড়িতে দেখে নাই, অথচ তাহাকে মস্ত পালোয়ান বলিয়া লোকের ধারণা। মুখে মুখে তাহার খ্যাতি সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া গিয়াছে; কী করিয়া যে হইল, তাহার ঠিকানা পাওয়া যায় না। তাহাকে দরোয়ানেরা দেখে, নমস্কার করে, আর চলিয়া যায়। তাহার এক সুবিধা এই যে, তাহাকে প্রায় লাঠি ব্যবহার করিতে হয় না। অন্য লোকদের বড়ো বড়ো ভাব, বড়ো বড়ো মতসকলকে কেবল চোখ রাঙাইয়া ভাগাইয়া দেয়। যদি দৈবাৎ কেহ সাহস করিয়া তাঁহার সঙ্গে লড়াই করিতে যায়, তবেই তাঁহার সর্বনাশ। এক-একটা দরোয়ান আছে, গায়ে ভয়ানক জোর, কিন্তু সাহস কম; কোনো মতেই কুস্তিতে অগ্রসর হইতে চাহে না। কিন্তু কোনো কোনো দরোয়ানের গায়ে জোর কম থাকুক, এত প্রকার কুস্তির প্যাঁচ জানে যে, অপেক্ষাকৃত বলবানদেরও পাড়িয়া ফেলিতে পারে।

যাঁহারা দেউড়ির উন্নতি করিতে চান তাঁহারা দরোয়ানদের ভালো আহার দিবেন, মাঝে মাঝে ছুটি দিবেন, দিনরাত্রি অকর্মণ্য করিয়া রাখিবেন না, আর মদ খাইতে না দেন। আমরা যেরূপ শিশু-প্রকৃতি, যাহা তাহা বিশ্বাস করি, সকলই সমান চক্ষে দেখি; আমরা যে বিপদের দেশে আছি, নানা চরিত্রের, নানা ব্যবসায়ের লোকের মধ্যে বাস; এখানে ভালো দরোয়ান রাখা নিতান্তই আবশ্যক। তাহা ছাড়া, নিতান্ত স্বার্থপর হইয়া নিজের দরোয়ানকে যেন কেবলমাত্র নিজের কাজেই নিযুক্ত না রাখি, আবশ্যকমতো পরের সাহায্য করিতে দেওয়া সামাজিক কর্তব্য। আমাদের দেশে অতি পূর্বকালে পুলিসের পদ্ধতি ছিল। ব্রাহ্মণ, ঋষি ইন্‌স্পেক্টরগণ নিজের নিজের কনস্টেবল লইয়া বাড়ি বাড়ি, রাস্তায় রাস্তায়, হাটে-বাজারে, চোর-ডাকাত তাড়াইয়া

বেড়াইতেন। তাঁহাদের বেতন ছিল, ওই কাজেই তাঁহারা নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু ইহার একটু কুফল এই হয় যে, স্বার্থ-সাধন উদ্দেশে বা ভুল বুঝিয়া ইন্‌স্পেক্টরগণ যথার্থ ভদ্রলোকদের প্রতিও উৎপীড়ন করিতে পারেন। শুনা যায় তাঁহারা সেইরূপ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত বৌদ্ধদলেরা খেপিয়া এমন পুলিস ঠেঙাইতে আরম্ভ করিয়াছিল যে, কন্‌স্টেবলগণ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িয়াছিল। কিন্তু বিদ্রোহী-দল বেশি দিন টিকিতে পারে নাই। অবশেষে তাহারা নির্বাসিত হইয়াছিল। আজকাল এরূপ পুলিসের পদ্ধতি নাই। সুতরাং সাধারণের উপকারার্থে সকলকেই নিজের নিজের দরোয়ানকে মাঝে মাঝে পুলিসের কাজে নিযুক্ত করা উচিত। দেশে এত শত প্রকার সিঁদেল চোর আছে, রাত্রিযোগে এমন পা টিপিয়া তাহারা গৃহে প্রবেশ করে যে, এরূপ না করিলে তাহাদের শাসন হইবার সম্ভাবনা নাই। আমার দরোয়ানটা রোগা হউক, যাহা হউক, তাহাকে এইরূপ অনরারি পুলিস কন্‌স্টেবলের কাজে নিযুক্ত করিয়াছি। অনেক সময়ে লড়াই করিয়া সে বেচারি পারিয়া উঠে না, বলবান দস্যুদের কাছ হইতে লাঠি খাইয়া অনেকবার অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তথাপি তাহার উদ্যম ভঙ্গ হয় নাই।

ভারতী
ভাদ্র ১২৮৮

জীবন ও বর্ণমালা

আমাদের পণ্ডিত মহাশয়ের এমনি খরদৃষ্টি (বলা বাহুল্য, 'খরদৃষ্টি' ষষ্ঠী তৎপুরুষ নহে) যে তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে একটি তৃণ পর্যন্তও এড়ায় না। তিনি সকলেরই মধ্যে গূঢ় অর্থ দেখিতে পান। যে যেমন ভাবেই কথা কহুক-না-কেন, তিনি তাহার মধ্য হইতে এমন একটি ভাব বাহির করিতে পারেন, যাহা বক্তার ও শ্রোতার মনে কস্মিন কালেও উদয় হয় নাই। ইহাকেই বলে প্রতিভা! প্রতি সামান্য কথার অসামান্য অর্থসকল বাহির করিয়া সংসারে তিনি এত অনর্থের উৎপত্তি করিয়াছেন যে, এ বিষয়ে কেহ তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারে না! সাধারণ যশের কথা! এই অতি উদার মহৎ গুণ প্রতিপদে চালনা করিতে করিতে দৈবাৎ মাঝে মাঝে এক-একটা অতি নিরীহ কার্যও তিনি সাধন করিয়া থাকেন। সম্প্রতি তিনি বর্ণমালার গূঢ় অর্থ বাহির করিয়াছেন অথচ তাহাতে কাহারো সর্বনাশ করা হয় নাই এই নিমিত্ত তাহা সংক্ষেপে পাঠকদের উপহার দিব।

এই পণ্ডিত-প্রবর আজ পঁচিশ বৎসর, বর্ণজ্ঞানশূন্য শিশুদের কর্ণধার হইয়া তাহাদিগকে জ্ঞান-তরঙ্গিণী পার করিয়া আসিতেছেন। যদি কোনো শিশু বিস্মৃতির ভাটায় এক পা পিছাইয়া পড়ে, তবে তাহার কর্ণ ধরিয়া এমন সুন্দর ঝিঁকা মারিতে পারেন যে, সে আর এগোইবার পথ পায় না। 'উঃ' 'ইঃ' 'আঃ' প্রভৃতি স্বরবর্ণগুলি অতি সহজে, সতেজে ও সমস্ত মনের সহিত উচ্চারণ করাইবার জন্য তিনি অতি সহজ কতকগুলি কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন। অতএব বর্ণমালা সম্বন্ধে ইঁহার কথাগুলি বিনা উত্তরে শিরোধার্য করা উচিত।

লিখিত ভাষা-বিশেষ পড়িবার জন্য যে বর্ণমালা বিশেষ উপযোগী তাহা নহে। তাহাতে জাতীয় জীবন প্রতিবিম্বিত থাকে। একটা উদাহরণ দিলেই সমস্ত স্পষ্ট হইবে। ইংরেজদের ও আমাদের বিবাহ পদ্ধতির কী প্রভেদ, তাহা দেখিতে মনুও খুলিতে হইবে না, ইতিহাসও পড়িতে হইবে না; বর্ণমালা অনুসন্ধান করিয়া দেখো, বাহির হইয়া পড়িবে। ইংরাজি বর্ণমালায় 'L' অক্ষরের পর 'M' অর্থাৎ Love-এর পর Marriage। আমাদের বর্ণমালায় 'ব'-এর পর 'ভ' অর্থাৎ বিবাহের পর ভালোবাসা। ইহার উপরে আর কথা আছে? আসল কথা এই, সমাজ যে নিয়মে গঠিত হয়, বর্ণমালাও সেই নিয়মে গঠিত হয়।

যাহা হউক, কয়েক বৎসর ধরিয়া পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার বিশাল নাসাগহ্বরে এক-এক টিপ

করিয়া নস্য নামাইয়াছেন ও বর্ণজ্ঞান-সমুদ্র হইতে এক-এক রাশি রত্ন তুলিয়াছেন। পাঠকদিগকে তাহার নমুনা দেওয়া যাইতেছে।

আমাদের বর্ণমালায় পাঁচটি বর্গ আছে, আমাদের জীবনেও পাঁচ ভাগ আছে। কবর্গ, চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ, পবর্গ; শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্ধক্য।

কবর্গ, অর্থাৎ শৈশব। (কাঁ)দা, (খে)লা, (গে)লা, (ঘা)লাগা ও উ আঁ(ঙ) করা; ইহার অধিক আর কিছুই নহে।

চবর্গ, কৈশোর। এখন আর গিলিতে হয় না, (চি)বাইতে শিখিয়াছে; গড়াইতে হয় না, (চ)লিতে শিখিয়াছে; (ছু)টাছুটি করিতে পারে। সামাজিকতার বিকাশ আরম্ভ হইয়াছে। পাঁচ জন সমবয়স্কে মিলিয়া (জ)ড়ো হইতে শিখিয়াছে। কিন্তু প্রথম সামাজিকতার আরম্ভে (ঝ)গড়া হইবেই। অসভ্যদের মধ্যে দেখো। তাহারা একত্র হইয়া ঝগড়া করে, ঝগড়া করিতেই একত্র হয়। দ্বন্দ্ব শব্দের অর্থ মিলন ও বিবাদ উভয়ই। সামাজিকতা শব্দের অর্থও কতকটা সেইরূপ। বালকেরা ঝগড়া আরম্ভ করিয়াছে। এবং পরস্পরের মধ্যে ইঁ অঁ(ঞ) নামক একটা কুঁজ-বিশিষ্ট বক্র-ভাবের ও তদনুযায়ী মুখভঙ্গির আদান-প্রদান চলিতেছে।

টবর্গ বা যৌবন। এইবার যথার্থ জীবনের আরম্ভ। ইহা পাঁচ বর্গের মধ্যবর্গ। ইহার পূর্বে দুইটি বর্গ জীবনের ভূমিকা; ইহার পরে দুইটি বর্গ জীবনের উপসংহার। এবং এই বর্গই জীবন। এইবার (ট)লমল করে তরী; এ পথে যাইব কী ও পথে যাইব? পথে বিষম (ঠে)লাঠেলি; ভিড়ের মধ্যে সকলেই পথ করিয়া লইতে চায়! (ঠো)কর খাইতেছে (ঠে)কিয়া শিখিতেছে বা শিখিতেছে না। বন্ধন আরম্ভ হইতেছে; যশের (ডো)রে, প্রেমের (ডো)রে, চির-উদ্দীপিত আশার (ডো)রে মন বাঁধা পড়িতেছে। যশেরই হউক আর অপযশেরই হউক, চারি দিকে (ঢা)ক (ঢো)ল বাজিতেছে। চোখে নিদ্রা নাই, মাঝে মাঝে (ঢু)লিয়া থাকে মাত্র। ইহা একটি ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির কাল। যৌবন কাল টঠ অক্ষরের ন্যায় কঠিন দৃঢ়প্রতিষ্ঠ। 'ক' ও 'চ'-র ন্যায় কচি নহে 'ত'য়ের ন্যায় শিথিল নহে, 'প ফ'য়ের ন্যায় একেবারে ওষ্ঠাগত নহে।

তবর্গ বা প্রৌঢ়। 'ট'য়ে যাহা কঠিন ছিল, 'ত'য়ে তাহা শিথিল (ত)লতোলে হইয়া পড়িয়াছে। এখন (ত)লাইয়া বুঝিবার কাল। যৌবনে উপরে উপরে যাহা চক্ষে পড়িত, তাহাই খাঁটি বলিয়া মনে হইত, এখন না (ত)লাইয়া কিছু বিশ্বাস হয় না। মনের দরজায় একটা (তা)লা পড়িয়াছে। যৌবনে এক মুহূর্তের তরে দ্বার বন্ধ করা মনে আসিত না; সেই অসাবধানে বিস্তর লোকসান হইয়াছে, এমন-কি, আস্ত মনটি চুরি গিয়াছে এবং সেই ডাকাতির সময় মনের সুখ শান্তি সমুদয় ভাঙিয়া চুরিয়া একেবারে নাস্তানাবুদ হইয়া গিয়াছে। কেহ-বা হারানো মন ভাঙাচোরা অবস্থায় উদ্ধার করিতে পারিয়াছেন, কেহ-বা পারেন নাই, আস্তে আস্তে দুয়ারে তালা লাগাইয়াছেন। ইঁহাদের মন (থি)তাইয়া আসিয়াছে, এক জায়গায় আসিয়া (দাঁ)ড়াইয়াছেন; মত বাঁধিয়াছেন, সংসার বাঁধিয়াছেন, ছেলেমেয়েদের বিবাহে বাঁধিয়াছেন। মাঝে মাঝে একটা একটা (ধা)ক্কা খাইতেছেন; (যৌবনের ন্যায় সামান্য ঠোকর খাওয়া নহে) উপযুক্ত পুত্র মরিয়া গেল, জামাই যথেচ্ছাচারী হইয়া গিয়াছে, দেনায় বিষয় যায় যায়। অবশেষে তাহার মন (ন)রম হইয়া আসিয়াছে, তাহার শরীর মন (নু)ইয়া পড়িয়াছে। তবর্গে লোকে (তা)স্ খেলে, (তা)মাক খায়, (দা)লানে বসিয়া (দ)লাদলি করে, (নি)ন্দা করে ও (নি)দ্রা যায়। যৌবনে ঢুলিত মাত্র, এখন (নি)দ্রা আরম্ভ হইয়াছে। যাহা হউক, দন্ত্য ন শেষ হইল, দন্তেরও শেষ হইল।

পবর্গ বা বার্ধক্য। প্রৌঢ়ে যাহা নুইতে আরম্ভ করিয়াছিল, এখন তাহার (প)তন হইল। পতিত বৃক্ষকে যেমন সহস্র লতায় চারি দিক হইতে জড়াইয়া ধরে, তেমনি সংসারের সহস্র (ফাঁ)দে বৃদ্ধকে চারি দিক হইতে আচ্ছন্ন করে; ছেলে, মেয়ে, নাতি, নাতনী ইত্যাদি। (বি)রাম, (বি)শ্রাম। (ভ্রা)ন্তি, (ভ)য়, (ভ)র, (ভি)ক্ষা ও অবশেষে (ম)রণ। ঢোলা নয়, নিদ্রা নয়, মহা নিদ্রা।

মানুষ (ক)(র্ম)-ক্ষেত্রে নামিল— ক হইতে আরম্ভ করিল, ম-য়ে শেষ করিল। কাঁদিয়া জন্মিল, ক্রন্দনের মধ্যে অপসারিত হইল। কিন্তু মানুষের এই সমগ্র জীবন আরম্ভ ক-বর্গের মধ্যে প্রতিবিম্বিত আছে। ক-বর্গে কী কী আছে? কাঁদা, খেলা, গেলা, ঘা লাগা ও উঁ আঁ করা। প্রথম কাঁদা, শৈশবের ক্রন্দন, দ্বিতীয় খেলা, কৈশোরের খেলা। তৃতীয় গেলা অর্থাৎ ভোগ, যৌবনের ভোগ। চতুর্থ ঘা লাগা, প্রৌঢ়ের শোক। পঞ্চম উঁ আঁ করা, বৃদ্ধের রোগ; বৃদ্ধের বিলাপ। জীবনের ভোজ অবসান হইলে যে-সকল ছেঁড়া পাত ভাঙা পাত্র, বিক্ষিপ্ত উচ্ছিষ্ট ইতস্তত পড়িয়া থাকে, তাহাও ক-বর্গের মধ্যে গিয়া পড়ে, যথা— (কা)ঠ, (খা)ট, (গ)ঙ্গার (ঘা)ট ও বিলাপের উঁ আঁ শব্দ। আরম্ভের সহিত অবসানের এমনি নিকট সম্বন্ধ।

অ আ প্রভৃতি স্বরবর্ণগুলি আমাদের জীবনের অনুভাবসমূহ। এগুলি ব্যতীত কোনো ব্যঞ্জনবর্ণ দাঁড়াইতে পারে না। জীবনের যে-কোনো ঘটনা ঘটুক-না তাহার সহিত একটা অনুভাবের স্বরবর্ণ লিপ্ত আছেই। কখনো বা তৃপ্তিসূচক আ, কখনো বা তীব্র যন্ত্রণা-সূচক ই, কখনো বা গভীর যন্ত্রণা-সূচক উ, আমাদের ঘটনার ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হয়। মর্ত্য-জীবনের বর্ণমালায় সমুদয় ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত অভাব-সূচক 'অ' লিপ্ত থাকে। তাহাই তাহার মূল সহচর। অদৃষ্ট আমাদের এই-সকল অক্ষর সাজাইয়া এক-একটা গ্রন্থ রচনা করিতেছে। কাহারো বা কাব্য হয়, কাহারো বা দর্শন হয়, কাহারো বা ছাড়া ছাড়া অর্থহীন কতকগুলা অক্ষর-সমষ্টি হয় মাত্র, দেখিয়া মনে হয়, তাহার অদৃষ্ট হাত-পাকাইবার জন্য চিরজীবন কেবল মক্‌শো করিয়াই আসিতেছে, পদরচনা করিতে আর শিখিল না! এই-সকল রচনার খাতা হাতে করিয়া বোধ করি পরলোকে মহাগুরুর নিকটে গিয়া একদিন দাঁড়াইতে হইবে; তিনি যাহাকে যে শ্রেণীর উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন, উত্তীর্ণ করিয়া দিবেন।

বিষয়টা অত্যন্ত শোকাবহ হইয়া দাঁড়াইল। আমাদের আলংকারিকেরা বিয়োগান্ত নাটকের বিরোধী। তবে কেন আমাদের বৈয়াকরণিকেরা এমনতরো বিয়োগান্ত করুণ রসোদ্দীপক বর্ণমালার সৃষ্টি করিলেন? কিন্তু পাঠকেরা ভুলিয়া গেছেন, আমাদের সাহিত্যে পাঁচ অঙ্কেই নাটক শেষ হয় না, আরো দুটো অঙ্ক বাকি থাকে। পাঁচটা বর্গেই আমাদের বর্ণমালা শেষ হয় না, আরো দুটো বর্গ থাকে। মরণেই আমাদের জীবন-পুস্তকের সমাপ্তি নহে; তাহা একটা পদের পর একটা দাঁড়ি মাত্র। অমন কত সহস্র পদ আছে, কত সহস্র দাঁড়ি আছে কে জানে? অবশিষ্ট দুটি বর্গের কথা পরে বলিব; আপাতত পাঠকদিগকে আশ্বাস দিবার জন্য এইটুকু বলিয়া রাখি 'হ'য়ে আমাদের বর্ণমালা শেষ। হ অর্থে হওয়া, মরা নহে। অতএব বিলাপ করিবার কিছুই নাই। আমাদের ব্যঞ্জনবর্ণ আমাদের নাটকের ন্যায় (কাঁ)দায় আরম্ভ (হা)সায় শেষ।

আমাদের বর্ণমালা 'অহং' শব্দের একটি ব্যাখ্যা। অ-য়ে ইহার আরম্ভ, হ-য়ে ইহার শেষ!

ভারতী
আশ্বিন-কার্তিক ১২৮৮

রেল গাড়ি

আমরা মনে করি, বিশ্বাসের উপর কিছুমাত্র নির্ভর না করিয়া কেবলমাত্র যুক্তির হাত ধরিয়া আমরা জ্ঞানের পথে চলিতে পারি। অনেক ন্যায়রত্ন এই বলিয়া গর্ব করেন যে— সমস্ত জীবনে তাঁহারা যত কাজ করিয়াছেন, তাহাতে বিশ্বাসের কোনো হাত নাই। ইঁহারা ইহা বুঝেন না যে, বিশ্বাস না থাকিলে যুক্তি এক দণ্ড টিকিয়া থাকিতে পারে না। যুক্তিকে বিশ্বাস করি বলিয়াই তাহার এত জোর, নহিলে সে কোথাকার কে? যুক্তিকে কেন বিশ্বাস করি, তাহার একটা যুক্তি কেহ দেখাইতে পারে? কেহই না। অতএব দেখা যাইতেছে যুক্তির উপর আমাদের একটা যুক্তিহীন বিশ্বাস, অন্ধ বিশ্বাস আছে। আমরা দৃশ্যমান পদার্থকে বিশ্বাস করি কোন্ যুক্তি

অনুসারে? স্পৃশ্যমান বস্তুর উপরে অটল বিশ্বাস স্থাপন করি কোন্ যুক্তি অনুসারে? তথাপি আমাদের বিশ্বাস, যুক্তিই সর্বেসর্বা, বিশ্বাস কেহই নয়। ইহা হইতে একটা তুলনা আমার মনে পড়িতেছে। যুক্তি হচ্ছে, স্টিম-এঞ্জিন, আর বিশ্বাস হচ্ছে রেলের রাস্তা। বিশ্বসুদ্ধ লোকের নজর এঞ্জিনের উপরে; সকলে বলিতেছে— 'বাহবা, কী কল বাহির হইয়াছে! অত বড়ো গাড়িটাকে অবাধে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।' নীচে যে একটা রেল পাতা রহিয়াছে, ইহা কাহারো চোখে পড়ে না, মনেও থাকে না। বিশ্বাসের রেলের উপর একটা বাধা স্থাপন করো, একটা গাছের গুঁড়ি ফেলিয়া রাখো, অমনি গাড়ি থামিয়া যায়; দুটি ক্ষুদ্র নুড়ি রাখিয়া দেয়, অমনি গাড়ি উল্টাইয়া পড়ে, ইহা কেহ মনে ভাবিয়া দেখে না কেন? যেখানে বিশ্বাসের রেল, সেইখানেই যুক্তির গাড়ি চলে, যে রাস্তায় রেল পাতা নাই, সে রাস্তায় চলে না, ইহা কাহারো মনে হয় না কেন? তাহার কারণ আর-কিছু নয়; স্টিম-এঞ্জিনটা বিষম শব্দ করে, তাহার একটা সারথি আছে, তাহার শরীর প্রকাণ্ড, তাহার মধ্যে কত-কী কল উঠিতেছে, পড়িতেছে, এগোইতেছে, পিছাইতেছে; তাহার চোখ দিয়া আলো, নাক দিয়া ধোঁয়া বাহির হইতেছে; পদভরে মেদিনী কম্পমান। আর, রেল কত দিন হইতে পাতা রহিয়াছে, কে পাতিয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই; অধিক শব্দ করে না, বরঞ্চ শব্দ নিবারণ করে; নিঃশব্দে রাস্তা দেখাইয়া দেয়, বহন করিয়া লইয়া যায়। সে পথ, সে বিঘ্ন-অপহারক সে ধ্রুব, নিশ্চল, পুরাতন, ভারবহ। সে কাহারো নজরে পড়ে না; আর, একটা ধূমন্ত, ফুঁসন্ত, জ্বলন্ত, চলন্ত পদার্থকে সকলে সর্বেসর্বা বলিয়া দেখে।

রেলের গাড়ির তুলনা যদি উঠিলে, তবে ও বিষয়ে যত কথা উঠিতে পারে, উঠানো যাক। সাহিত্যের রেল গাড়িতে ভাবগণ বা ভাবুকগণ আরোহী। যশের এঞ্জিনে কালের রাস্তায় চলিতেছে। যে যত মূল্য দিয়াছে, সে তত উচ্চ-শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছে, কেহ ফার্স্ট ক্লাসে, কেহ সেকেন্ড ক্লাসে, কেহ থার্ড ক্লাসে। যে যত মূল্য দিয়াছে, সে সেই পরিমাণে দূরে যাইতে পারিবে। কোন্ কালে বাল্মীকি ফার্স্ট ক্লাসে টিকিট লইয়া গাড়িতে চড়িয়াছেন, এখনও পর্যন্ত তাঁহার স্টেশন ফুরায় নাই। আমাদের ক্ষীণ দৃষ্টি যতদূর চলে ততদূর চালনা করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে অলংকার দিয়া এইরূপ বলিতে পারি যে, যেখানে কালের Terminus— যাহার ঊর্ধ্বে আর স্টেশন নাই, যে স্টেশনে চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র আসিয়া থামিবে, সেই স্টেশনে যাইবার টিকিট তিনি ক্রয় করিয়াছেন। গাড়ির গার্ড পাঠক সম্প্রদায়, সমালোচক। ইঁহারা যে নিজের কাজ যথেষ্ট মনোযোগ দিয়া করেন না, তাহা সকলেই জানেন। আরোহীদের প্রতি সর্বদাই বিশেষ অন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। কত শত ভাব তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া গোলমালে প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়া পড়ে; সকলেই তাহাকে খাতির করে, সেলাম করে, অভ্যর্থনা করে। এমন দু-এক স্টেশনে গিয়া কেহ কেহ ধরা পড়ে, গার্ড তৎক্ষণাৎ তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বাহির করে, তাহার যথোপযুক্ত গাড়িতে উঠাইয়া দেয়; কেহ কেহ এমন কত স্টেশন পার হইয়া যায় কেহ খোঁজ লয় না। ইহা তো কেবলমাত্র অমনোযোগিতা, কিন্তু গার্ডেরা ইহা অপেক্ষাও অন্যায় কাজ করিয়া থাকেন। আলাপ থাকিলে, বন্ধুতা থাকিলে অনেক থার্ড ক্লাসকে ফার্স্ট ক্লাসে চড়াইয়া দেন। এমন তো সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, নালিশ করি কাহার কাছে? যিনি দোষী, তিনিই বিচারক। কত শত মুখচোরা, ভীরুস্বভাব, সংকোচ-পরায়ণ বেচারি ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কিনিয়া, ভিড়ে, গোলেমালে, ঠেলাঠেলিতে শশব্যস্ত হইয়া থার্ড ক্লাসে উঠিয়া পড়েন, কত শত স্টেশন পার হইয়া সহসা গার্ডের নজরে পড়েন ও তাঁহারা উপযুক্ত শ্রেণীতে স্থান পান। এই-সকল বে-বন্দোবস্ত কোনো কালে যে দূর হইবে, এমন ভরসা হয় না। সকল বিষয়েই দেখো, জগতে মূল্য দিয়া তাহার উপযুক্ত সামগ্রী খুব কম লোকেই পাইয়াছে; হয় দোকানদার তাহাকে ঠকাইয়াছে, নয়, সে দোকানদারকে ঠকাইয়াছে। এ-সকল কেবল অসাবধানিতার ফল। যত দিন রেলগাড়ি থাকিবে, তত দিন শত শত ফার্স্ট ক্লাসের আরোহী থার্ড ক্লাসে চড়িবে, থার্ড ক্লাসের আরোহী ফার্স্ট ক্লাসে চড়িবে, ইহা নিবারণের উপায় দেখিতেছি না। কিন্তু ইহা অপেক্ষা আর-একটা আমার দুঃখ আছে।

রেলোয়ের কর্মচারীগণ বিনা টিকিটে সেকেন্ড ক্লাসে ভ্রমণ করিতে পারেন। তাঁহারা চিরদিন পরের টিকিট সমালোচনা করিয়াই কালযাপন করিয়াছেন, নিজে একখানি টিকিটও ক্রয় করেন নাই। ইহা কি সত্য নয় যে, তিনি নিজে আপনাকে যত বড়ো ব্যক্তিই মনে করুন-না, যতক্ষণে না তিনি ট্যাকের পয়সায় টিকিট কিনিবেন, ততক্ষণে তিনি চতুর্থ শ্রেণীর আরোহী অপেক্ষাও অল্প সম্মান পাইবার যোগ্য। কিন্তু এই সমালোচকবর্গ যে বিনা পয়সায় দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট-ক্রেতাদিগের সমতুল্য সম্মান পাইয়া থাকেন, ও অহংকারে এতখানি ফাঁপিয়া উঠেন যে, পাঁচটা আরোহীর জায়গা একা জুড়িয়া বসেন, ইহা সর্বতোভাবে ন্যায়-বিরুদ্ধ। অনেকে বিনা টিকিটে অসংকোচে গাড়িতে চড়িয়া বসেন, ভাব দেখিয়া সকলেই মনে করে, অবশ্য ইহার কাছে টিকিট আছে, কেহ সন্দেহও করে না, জিজ্ঞাসাও করে না। গার্ড দেখিল, তাঁহার পাকা দাড়ি, পাকা চুল; অনেকদিন হইতে ফার্স্ট ক্লাসে চড়িয়া আসিতেছেন; তাঁহাকে টিকিটের কথা জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্তিও হইল না সাহসও হইল না। কাহারো বা হীরার আংটি, ঘড়ির চেন, জরির তাজ দেখিল— আর টিকিট দেখিল না। সাহিত্য রেলোয়ে কোম্পানিতে এইরূপ বহুবিধ অনিয়ম ঘটিতেছে; আমি বরাবর বলিয়া আসিতেছি, যত বড়ো লোকই হউন-না-কেন টিকিট নিতান্ত মনোযোগ সহকারে আলোচনা না করিয়া কাহাকেও ছাড়া উচিত নহে। কিন্তু অত পরিশ্রম করে কে? আবার, অধিক কড়াক্কড় করিলেও নিন্দা হয়।

যাঁহারা টিকিট কিনিয়া ট্রেন মিস্ করেন, তাঁহাদের জন্য বড়ো মায়া করে। তাঁহারা ঠিক সময়ে আসেন নাই। সময়মাফিক আসিয়াছিল বলিয়া কত থার্ড ক্লাসের লোক গাড়িতে উঠিল, এমন-কি, কত লোক টিকিট না কিনিয়াও গাড়িতে উঠিল; অসময়ে আসিয়াছেন বলিয়া কত ফার্স্ট ক্লাসের লোক পড়িয়া রহিলেন। যাহা হউক, তাঁহাদের জন্য ভবিষ্যৎ আছে, দ্বিতীয় ট্রেন আসিলে তাঁহারা চড়িতে পাইবেন। কিন্তু ইঁহাদের অনেকে বিরক্ত, ক্ষুব্ধ হইয়া বাড়িতে ফিরিয়া যান, স্টেশনে অপেক্ষা করেন না। এইরূপে কত প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তি বিরক্ত হইয়া তাঁহাদের টিকিট ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছেন, পকেটে পয়সা আনিয়া টিকিট ক্রয় করেন নাই, তাঁহাদের সংখ্যা গণনা কে করিবে? জেফ্রি যে ট্রেনে গার্ড ছিলেন, বাইরন যে ট্রেনে আরোহী ছিলেন, সেই ট্রেন ধরিবার জন্য ওয়ার্ড্স্‌বার্থ ও শেলী স্টেশনে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তখন গাড়ি দ্রুতবেগে চলিয়াছে; তাঁহারা ট্রেন মিস্ করিলেন; দ্বিতীয় ট্রেন আসিলে পর তাঁহারা স্থান পাইলেন। আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্যে সম্প্রতি যে ট্রেন চলিতেছে, অনেক বড়ো বড়ো ব্যক্তি সে ট্রেনটা মিস্ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কেন নিরাশ হইতেছেন? দশ মিনিট সবুর করুন আর-একখানা ট্রেন এল বলে!

বঙ্গীয় সাহিত্য ট্রেনে ফার্স্ট সেকেন্ড ক্লাসে আরোহী নিতান্তই কম, অন্যান্য ক্লাসে অত্যন্ত ভিড়। এই নিমিত্ত গার্ডেরা বাছিয়া বাছিয়া দুই-এক জনকে ফার্স্ট ক্লাসে বসিতে দেয়। তাহারা যদিও ফার্স্ট ক্লাসে বসিয়াছে, তথাপি গার্ড জানে যে, তাহারা থার্ড ক্লাসের আরোহী। তাহাদের বলে, বাংলার মিল্‌টন, বাংলার বাইরন, বাংলার ফসেট্ ইত্যাদি, অথচ মনে মনে সকলেই জানে যে, তাহারা মিল্‌টন, বাইরন, ফসেটের সমতুল্য নহে; অনুগ্রহ করিয়া এক ক্লাসে বসিতে দিয়াছে মাত্র। কিন্তু এমন করিবার আবশ্যক কী? ইহাতে বুদ্ধিমান লোকের নিতান্ত সংকোচ জন্মিবার কথা। তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র গাড়ির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেই তো ভালো হয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য কোম্পানিতে, খুচরা, টুকরা মাল-বোঝাই গোটা কতক মালগাড়ি অর্থাৎ খবরের কাগজ, একরকম বেশ চলিতেছে। কিন্তু ভাব-আরোহীদিগের জন্য আরোহী-শকট অর্থাৎ মাসিক প্রবন্ধ-পত্র ভালো চলিতেছে না। গাড়ি চলিবার জন্য এঞ্জিনে শ্বেতবর্ণ খনিজ কয়লার আবশ্যক। কোথায় পাইবে বলো! সাহিত্য এঞ্জিন কেন, দেশে সহস্র এঞ্জিন বেকার পড়িয়া আছে ভারতবর্ষের রাজা-গঞ্জে রানী-গঞ্জে কয়লা যে নাই, এমন নহে, কিন্তু এত গভীর অকালে নিহিত যে, সহস্র মাথা খুঁড়িলেও পাইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। আর এক উদ্যমের কয়লা আছে, তাহাও বাংলা দেশে এমন বিরল ও বাংলার কয়লায় এত অধিক ধোঁয়া হয় ও এত কম আগুন

জ্বলে যে, দুই পা গিয়াই গাড়ি চলে না। আমারও কলমের কয়লা ফুরাইয়া গিয়াছে, এইখানেই চলা বন্ধ করিয়াছে; স্টেশন যদিও দূরে আছে, কথা যদিও বাকি আছে, কিন্তু আর লিখিতে পারিতেছি না, কয়লা নিভিয়া গিয়াছে।

ভারতী
অগ্রহায়ণ ১২৮৮

লেখা কুমারী ও ছাপা সুন্দরী

গুটিকতক কবিতা লেখা ছিল, অনেক দিন ধরিয়া খাতায় পড়িয়াছিল, যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই সে লেখাগুলিকে ভালো বলিয়া জ্ঞান হইতে লাগিল। অবশেষে সম্প্রতি সেগুলি ছাপা হইয়া গেছে। ধারণা ছিল, নিজের লেখা ছাপার অক্ষরে পড়িতে বুঝি বড়োই আনন্দ হইবে।

কিন্তু কই, তাহা তো হইল না! আজ সমস্তদিন ধরিয়া মুদ্রাযন্ত্রের লৌহগর্ভ হইতে সদ্যপ্রসূত বইখানি হাতে লইয়া এ-পাত ও-পাত করিতেছি, কিছুই ভালো লাগিতেছে না।

লেখাগুলির পানে চাহিয়া চাহিয়া আমার প্রাণ বলিতেছে 'বাছারা, আজ তোদের এমনতর দেখিতেছি কেন? অক্ষরগুলি মাথায় মাথায় সমান, কাষ্ঠের মতো খাড়া দাঁড়াইয়া আছে! একটু কিছুই এদিক-ওদিক হয় নাই। লাইনগুলি সমান, দুই ধারে মার্জিন, উপরে পাতার সংখ্যা। এ-সব তো সিপাহিদের মতো ছোরা-ছুরি-সঙ্গিন ওচানো সার-বাঁধা পোশাক-পরা অক্ষর। এ-সব তো সীসা ঢালা ছাঁচের অক্ষর, যেখানে যত বই দেখি, সকলই তো এইরকম অক্ষরের দেখিতে পাই! আমার সে বাঁকাচোরা সরু-মোটা অক্ষরগুলি কী হইল? কোনোটা-বা শুইয়া, কোনোটা-বা বসিয়া, কোনোটা উপরে, কোনোটা-বা নীচে। সেগুলি তো এমনতর কোণ-ওয়ালা খোঁচা-খোঁচা রেখা-রেখা খাড়া-খাড়া অক্ষর নহে; গোল, মোলায়েম, আঁকাবাঁকা, জড়ানো, অক্ষর। প্রত্যেক অক্ষরগুলি স্ব-স্ব প্রধান নয়। সকলেই সকলের গায়ে পড়িয়া, গলা ধরিয়া, হাতে হাতে জড়াইয়া ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া থাকে। তাহাদের পানে চাহিলে ভাবের একটা চেহারা দেখিতে পাওয়া যায়, ভাবটিকে রক্তমাংসের বলিয়া মনে হয়। সে লেখা আমার প্রিয়জনেরা সকলেই ভালো করিয়া জানে, সে লেখা পথের প্রান্তে কুড়াইয়া পাইলেও তাহারা আমার বলিয়া চিনিতে পারে, সে লেখা বিদেশে পাইলে তাহাদের মন আনন্দে নাচিয়া উঠে। তাহারা সে লেখার মধ্যে আমার মুখ দেখিতে পায়, আমার স্পর্শ অনুভব করে, আমার কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পায়। সে আমার চিরপরিচিতগণ গেল কোথায়? আর এরা কে রে! এরা তো সব দাসের জাতি। সীসার কঠিন শৃঙ্খলে বাঁধা, ভাবশূন্য মুখে খাড়া রহিয়াছে, টাকার লোভে কাজ করিতেছে। ইহাদের সহিত আমার ভাবের নাড়ির টান নাই, ইহারা আমার ভাবগুলির প্রতি মমতার দৃষ্টিতে চায় না। আমার কাজ সমাধা করিয়া দিয়াই আবার তখনই হয়তো আমার সমালোচকের কাজ করিতে যায়! এ-সকল হৃদয়হীন দাসগুলিকে দেখিয়া আমার মন খারাপ হইয়া গেছে।

ওরে, তোদের সে কাটাকুটিগুলি গেল কোথায়! তোদের সে কালির দাগগুলা যে দেখি না! পূর্বে তো তোদের এমনতর নিখুঁত ভদ্রলোকটির মতো চেহারা ছিল না। ঘরের ছেলের মতো গায়ে ধুলা-কাদা মাখা, কাপড়ে দাগ, সেই তো তোকে শোভা পাইত। আর আজ সহসা তোদের এমনতর পরিপাটি বিজ্ঞভাব দেখিলে যে জেঠামি বলিয়া মনে হয়। বাপু, তোরা কি জানাইতে চাস তোদের মধ্যে একেবারে বানান ভুল ছিল না? কোথাও দন্ত্য সয়ের জায়গায় তালব্য শ ছিল না? আজ বড়ো লজ্জা বোধ হইল? পাড়াগেঁয়ে ছেলে শহরে আসিয়া যেমন প্রাণপণে শহুরে উচ্চারণে কথা কহিতে চায় তোদেরও কি সেই দশা হইল? তোরা আমার পাড়াগেঁয়ে ছেলে, তোদের উচ্চারণ শুনিয়া শহরশুদ্ধ লোকের পেট ফাটিয়া যাইবে, কিন্তু বাপের কানে অমন মিষ্ট

আর কী আছে। তোদের সে বানান-ভুলগুলি আমার পরিচিত হইয়া গেছে, তোদের মুখের সহিত, আমার স্নেহের সহিত তাহারা জড়িত হইয়া গেছে। তাহাদের না দেখিলে আমি ভালো থাকি না। তাহাদের না দেখিলে তোদের যে ভাবে লিখিয়াছিলাম, সে ভাব আমার ঠিক মনে পড়ে না।

আগে তোদের আদর কম ছিল? জলটি লাগিলে তোদের অক্ষর মুছিয়া যাইত, একটি পাতা দৈবাৎ ছিঁড়িয়া বা হারাইয়া গেলে হাজার টাকা দিলেও আর সেটি পাওয়া যাইত না। ছাপার অক্ষর ধোয় না মোছে না, একটা বই হারাইয়া গেলে একটা টাকা দিলেই তৎক্ষণাৎ আর-একটা বই আসিয়া পড়ে। তোরা এখন আর অমূল্য নহিস, একমাত্র নহিস, তোদের গায়ে দোয়াত-শুদ্ধ কালি উলটাইয়া পড়িলেও কেহ আহা-উহু করিবে না।

আসল কথা, এখন তোরা যে নতুন কাগজে, নতুন অক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছিস, ইহাতে তোদের আজন্মকালের ইতিহাস লুপ্ত করিয়া দিয়াছে। তোদের দেখিলেই মনে হয় যেন তোরা এই নির্ভুল নির্বিকার অবস্থাতেই একেবারে হঠাৎ আকাশ হইতে পড়িলি। যে মানুষকে ভাবিতে হয়, যাহাকে সংশোধন করিতে হয় তাহার ঘরে যেন তুই জন্মগ্রহণ করিস নাই! কেহ যদি তোকে তোর খাতা-নিবাসী সহোদরটির কথা জিজ্ঞাসা করে, তুই যেন এখনই লজ্জিত হইয়া বলিবি, ও আমার বাড়ির সরকার! এইজন্যই কেহ তোকে মায়া করে না, তোর একটা দোষ দেখিলেই সমালোচকেরা ঝাঁটা তুলিয়া ধরে। কাঁচা কালির অক্ষর ও কাটাকুটির মধ্যে তোকে দেখিলে কি কেহ আর তোকে অমন কঠোর নিষ্ঠুরভাবে পীড়ন করিতে পারে! তুই এমনি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান অক্ষরে সাজসজ্জা করিয়াছিস যে তোর সামান্য ভুলটিও কাহারো বরদাস্ত হয় না।

সেই কাঁচা অক্ষর, কাটাকুটি, কালির দাগ দেখিলেই, আমার সমস্ত কথা মনে পড়ে; কখন লিখিয়াছিলাম, কী ভাবে লিখিয়াছিলাম, লিখিয়া কী সুখ পাইয়াছিলাম, সমস্ত মনে পড়ে। সেই বর্ষার রাত্রি মনে পড়ে, সেই জানলার ধারটি মনে পড়ে, সেই বাগানের গাছগুলি মনে পড়ে, সেই অশ্রুজলে সিক্ত আমার প্রাণের ভাবগুলিকে মনে পড়ে। আর, আর-একজন যে আমার পাশে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে মনে পড়ে, সে যে আমার খাতায় আমার কবিতার পার্শ্বে হিজিবিজি কাটিয়া দিয়াছিল, সেইটে দেখিয়া আমার চোখে জল আসে। সেই তো যথার্থ কবিতা লিখিয়াছিল। তাহার সে অর্থপূর্ণ হিজিবিজি ছাপা হইল না, আর আমার রচিত গোটাকতক অর্থহীন হিজিবিজি ছাপা হইয়া গেল! তোদের সেই সুখদুঃখপূর্ণ শৈশবের ইতিহাস আর তেমন স্পষ্ট দেখিতে পাই না, তাই আর তেমন ভালো লাগে না।

তোরা আমার কন্যা। যখন তোরা খাতায় তোদের বাপের বাড়িতে থাকিতিস, তখন তোরা কেবলমাত্র আমারই সুখ-দুঃখের সহচরী ছিলি। মাঝে মাঝে তোদের কাছে যাইতাম, তোদের সঙ্গে কথাবার্তা কহিতাম, মনের ভার লাঘব হইত। বন্ধু-বান্ধবরা আসিলে তোদের ডাকিয়া আনিতাম, তাহারা আদর করিত। তাহারা কহিত এমন মেয়ে কাহারো আজ পর্যন্ত হয় নাই, শীঘ্র হইবে যে এমন বোধ হয় না, শুনিয়া বড়ো খুশি হইতাম। এখন আর তোরা আমার নহিস, তোদের রাজশ্রী শ্রীমান সাধারণের হাতে সমর্পণ করিয়াছি।। তোরা এখন দিনরাত্রি ভাবিতেছিস আমার এই দোর্দণ্ড-প্রতাপ জামাতা বাবাজি তোদের আদর করে কি না। যদি দৈবাৎ কোথাও একটা ভুল হয়, পান হইতে চুন খসে, অমনি অপ্রস্তুত হইয়া তাড়াতাড়ি শুদ্ধিপত্রে মার্জনা ভিক্ষা করিস। রঙকরা পাড়ওয়ালা মলাটের ঘোমটা দিয়া মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিস। শ্বশুরবাড়ি পাছে কেহ তোকে ভুল বোঝে এই ভয়েই সারা, সর্বদা ভূমিকা, সূচীপত্র, পরিশিষ্ট প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। সমালোচনা শাশুড়িমাগী উঠিতে বসিতে খুঁত ধরে। কথায় কথায় তোদের বাপের বাড়ির দৈন্য লইয়া খোঁটা দেয়। বাপের বাড়ির নিঃসংকোচ লজ্জাহীনতা, ঘোমটাহীন এলোথেলোভাব যত্নপূর্বক দূর করিয়াছিস, শ্বশুরবাড়ির খোঁপা-বাঁধা পারিপাট্য ও ঘোমটা-দেওয়া বিনীত ভাব অবলম্বন করিয়াছিস। এক কথায়, বাপের বাড়ির আর কিছু রহিল না। এখন আর

একমাত্র আমার কথাই ভাবিস না, কে কী বলে তাই ভাবিয়া সারা।

আবার আমার চিরায়ুষ্মান জামাইটির মতো খামখেয়ালি মেজাজের লোক অতি অল্পই আছে। সে আজ আদর করিল বলিয়া যে কালও আদর করিবে তাহা নহে। এক-এক সময় তাহার এক-একটি সুয়ারানী থাকে তাহারই প্রাদুর্ভাবে আর বাকি সকল রূপবতী গুণবতীগণ দুয়ারানীর শ্রেণীতে গণ্য হইয়া যায়। তাহার রাজান্তঃপুরে কত আদরের মহিষী আছে, তাহাদের মধ্যে আমার এই গুটিকতক ভীরু স্বভাব দুর্বল কুসুম-পেলবা কন্যা স্থাপন করা কি ভালো হইল! একবার চাহিয়া দেখো, অপরিচিত স্থানে গিয়া, অনভ্যস্ত অলংকার পরিয়া উহাদের মুখশ্রীর স্বাভাবিকতা যেন চলিয়া গিয়াছে। উহাদিগকে যেন এক সার কাঠের পুতুলের মতো দেখাইতেছে। আর যাহাই হউক, আমার এ সাদাসিধা পাড়াগেঁয়ে কবিতাগুলিকে এরকম ছাপার অক্ষরে মানায় না। দম্ভোলি, ইরম্মদ ও কড়কড় শব্দ নহিলে যেন ছাপার অক্ষর সাজে না।

এমন কাজ কেন করিলাম। কবিতাগুলি যখন খাতায় ছিল তখন আমার সুখের কি অভাব ছিল! এখন যে সকলেই বিদেশীর মতো ইহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিবে! কেহ বলিবে ভালো, কেহ বলিবে মন্দ, কেহ সম্মান করিবে, কেহ অপমান করিবে, কিন্তু ইহার ত্রুটি তো কেহই মার্জনা করিবে না; ইহাকে আপনার লোক বলিয়া কেহই তো কোলে তুলিয়া লইবে না। আপনার ধন পরের সম্পত্তি হইয়া গেল, যে যাহা করে, যে যাহা বলে চুপ করিয়া সহিতেই হইবে। আয় রে ফিরিয়া আয়— তোদের সেই কাঁচা অক্ষর, বানান-ভুল, কালির দাগের মধ্যে ফিরিয়া আয়, স্নেহের আরামে থাকিবি। চব্বিশ ঘণ্টা সোজা লাইনের নীচে অমনতর খাড়া হইয়া থাকিতে হইবে না।'

ভারতী
জ্যৈষ্ঠ ১২৯০

গোঁফ এবং ডিম

সকলেই বলিতেছেন, এখানে গোঁফ না বলিয়া গুম্ফ বলা উচিত ছিল। আমি বলিতেছি তাহার কোনো আবশ্যক নাই। গোঁফটা কিছু এমন একটা হেয় পদার্থ নহে যে, তাহাকে সংস্কৃত গঙ্গাজলে না ধুইয়া ভদ্রসমাজে আনা যায় না। স্বনামা পুরুষো ধন্যঃ। গোঁফের পিতামহের নাম ছিল গুম্ফ; তিনি ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, শাণ্ডিল্যদের মুখে যথাকাল বিরাজ করিয়া গুম্ফলীলা সংবরণ করিয়াছেন, তাঁহারই কুল-কজ্জল বংশধর শ্রীযুক্ত গোঁফ অধুনা চাটুর্যে বাঁড়ুয্যে মুখুয্যেদের ওষ্ঠ বৈদূর্য সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট হইয়া দিবারাত্রি নাসারন্ধ্রের সমীরণ সুখে সেবন করিতেছেন। অতএব গোঁফ যখন তাহার পিতা-পিতামহের বাস্তুভিটা না ছাড়িয়া তাহার পাঁচ-ছয় সহস্র বৎসরের পৈতৃক স্বত্ব সমান প্রভাবে বজায় রাখিয়াছে, তখন যদি তাহাকে তাহার নিজের নামে অভিহিত না করিয়া গুম্ফের নামে তাহার পরিচয় দেওয়া হয়, তবে অভিমানে সে চিবুকের নীচে আসিয়া ঝুলিয়া পড়ে।

তোমাদের কল্পনাশক্তি সামান্য, এইজন্যই ছোটো কথাকে বড়ো করিয়া না বলিলে তোমাদের কানে পৌঁছায় না। বাজের শব্দ তোমরা শুনিতেই পাও না, কাজেই তোমাদের জন্য ইরম্মদের কড়্কড়্ করা আবশ্যক। প্রকৃতির ছোটো জিনিসের মহত্ত্ব তোমরা দেখিতে পাও না, এইজন্য তোমাদিগকে হাঁ করাইবার অভিপ্রায়ে বড়ো বড়ো আতস কাচ আনাইয়া শিশুদের মুখের উপর ধরিয়া তাহাদিগকে দৈত্য দানব করিয়া তুলিতে হয়। কিন্তু তাই বলিয়া যে তোমাদের স্থূল কল্পনাকে আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য আমি এই দুই-চারি ইঞ্চি গোঁফকে টানিয়া টানিয়া চিনেম্যানের টিকির মতো অযথা পরিমাণে বাড়াইয়া তুলি, এবং গোঁফ শব্দের সহজ-মাহাত্ম্যের পেটের মধ্যে গোটা আষ্টেক-দশ বড়ো বড়ো অভিধান পুরিয়া তাহাকে উদরী রোগীর মতো অসম্ভব স্ফীত

করিয়া তুলি তাহা আমার কর্ম নহে।

আমি আজ গোঁফের সম্বন্ধে কেবলমাত্র গুটিকতক সহজ সত্য বলিব ও আমার বিশ্বাস, তাহা হইলেই কল্পনাবান মনস্বীগণ স্বতই তাহার পরম মহত্ত্ব অনুভব করিতে পারিবেন।

ইহা দেখা গিয়াছে গোঁফ যতদিন না উঠে ততদিন পরিষ্কাররূপে বুদ্ধির বিকাশ হয় না। স্ত্রীলোকদের গোঁফ উঠে না, স্ত্রীলোকদের পরিপক্ব বুদ্ধিরও অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বিপদে পড়িলে বুদ্ধির নিমিত্ত গোঁফের শরণাপন্ন হইতে হয় না, এমন কয়জন গুঁফো লোক আছে জানিতে চাহি। সংসার ক্ষেত্রে কাজ করিতে করিতে একটা কঠিন সমস্যা উপস্থিত হইলেই তৎক্ষণাৎ দুই হাতে গোঁফের হাতে ধরিয়া পায়ে ধরিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া ১০/১৫ মিনিট অনবরত খোশামোদ করিতে হয়, তবেই তিনি প্রসন্ন হইয়া ভক্তের সেব্যমান হস্তে পাকা বুদ্ধি অর্পণ করেন।

অতএব স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে, বুদ্ধির সহিত গোঁফের সহিত একটা বিশেষ যোগ আছে। বয়স্কেরা যে শ্মশ্রুগর্বে গর্বিত হইয়া অজাত-শ্মশ্রুদিগকে অর্বাচীন জ্ঞান করেন, অবশ্যই তাহার একটা মূল আছে। গোঁফ উদ্গাত হইয়াই তৎক্ষণাৎ একজোড়া ঝাঁটার মতো বালকদের বুদ্ধিরাজ্যের সমস্ত মাকড়সার জাল ঝাঁটাইয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলে, ভাবের ধুলা ঝাড়িয়া দেয়, সমস্ত যেন নূতন করিয়া দেয়। অতএব এই অজ্ঞান-ধূমকেতু গোঁফ যুগলের সহিত বুদ্ধির কী যোগ আছে, আলোচনা করিয়া দেখা যাক।

এ বিষয়ে মনোনিবেশপূর্বক ধ্যান করিতে করিতে সহসা আমার মনে উদিত হইল, 'গোঁফে তা দেওয়া' নামক একটি শব্দ চলিত ভাষায় ব্যবহৃত হয়। আপেল ফল পতন যেমন মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব আবিষ্কারের মূলস্বরূপ হইয়াছিল, 'গোঁফে তা দেওয়া' শব্দটি তেমনি বর্তমান আলোচ্য মহত্তর আবিষ্কারের মূলস্বরূপ হইল। ইহা হইতে এই অতি দুর্লভ সত্য বা তত্ত্ব সংগ্রহ করা যায় যে বায়ুবাহিত বা পক্ষীমুখভ্রষ্ট বীজ অপেক্ষা তদুৎপন্ন বৃক্ষ অনেকগুণে বৃহৎ ও বিস্তৃত হইয়া থাকে।

'তা দেওয়া' শব্দ আমার মাথায় আসিতেই আমার সহসা মনে পড়িল যে নাকের গুহার নীচে এই যে গোঁফটা ঝুলিতেছে ইহা বুদ্ধির নীড় মাত্র। বুদ্ধি বল, ভাব বল, এইখানে তাহার ডিম পাড়িয়া যায়। কতশত বুদ্ধির ডিম, ভাবের ডিম আমাদের গোঁফ-নীড়ের অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য ভাবে রক্ষিত হইয়াছে, দিবারাত্রি উত্তপ্ত নিশ্বাসবায়ু লাগিয়া ফুটিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহা কি আমরা জানিতে পারি? মায়াবিনী প্রকৃতিদেবী সকল কার্য কী গোপনেই সম্পন্ন করিতেছেন! বিশেষত অপরিস্ফুট জন্ম-পূর্ব অবস্থায় তিনি সকল দ্রব্যকে কী প্রচ্ছন্ন ভাবেই পোষণ করিতে থাকেন। বৃক্ষ হইবার পূর্বে বীজ মৃত্তিকার মধ্যে লুক্কায়িত থাকে, প্রাণীদিগের ভ্রূণ জঠরান্ধকারে নিহিত থাকে, এবং এই চরাচর অস্ফুট শৈশবে অন্ধকারগর্ভে আবৃত ছিল, মনুষ্যের বুদ্ধির এবং ভাবের ডিমও গোঁফের মধ্যেই আচ্ছন্ন হইয়া বাস করিতে থাকে। মনুষ্যবুদ্ধি বিজ্ঞান মায়াবীর কাঁধে চড়িয়া প্রকৃতির মহা-রহস্যশালার দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া আছে ও সেই রুদ্ধ দ্বারের ছিদ্রের মধ্য দিয়া সেই অপরিসীম অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টি চালাইবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু আজ পর্যন্ত কয়জন বিজ্ঞানবিৎ গোঁফের অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভাবডিম্ব পরিস্ফুটনের মহত্তত্ত্ব আবিষ্কারে অগ্রসর হইয়াছেন। আমি আজ দুঃসাহসে ভর করিয়া সেই গোঁফের মহারণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি, ইহার অগণ্য শাখা-প্রশাখার উপরে কতবিধ জাতীয় ভাব আসিয়া নিঃশব্দে ডিম পাড়িয়া যাইতেছে, তাহাই চুপ করিয়া দেখিতেছি।

আমরা অনেক সময়ে জানিতেই পারি না কোথা হইতে সহসা এ বুদ্ধি আমার মাথায় আসিয়া উপস্থিত হইল! কেমন করিয়া জানিব বলো! কখন আমাদের গোঁফে নিঃশব্দে ডিম্ব ভাঙিয়া পাখিটি মাথায় আসিয়া উড়িয়া বসিল, তাহা সব সময়ে টের পাওয়া যায় না তো। কিন্তু যখন আমাদের তাড়াতাড়ি একটা কোনো বুদ্ধির আবশ্যক পড়ে, তখন স্বভাবতই আমরা ঘন ঘন

গোঁফে তা দিতে থাকি, ও তামাক টানিয়া তাহার উত্তপ্ত ধোঁয়া গোঁফের শাখায় শাখায় সঞ্চারিত করিয়া দিই।

আজ গোঁফের কী মহত্ত্ব আমাদের মনের সম্মুখে সহসা উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। ভাবের প্রবাহ অনুসরণ করিয়া করিয়া আমরা গোঁফের গঙ্গোত্রী শিখরের উপরে গিয়া উপনীত হইয়াছি। আজ ভূতত্ত্বশাস্ত্র অনুসারে পৃথিবীর যুগপরম্পরা অতিক্রম করিয়া, দ্রব অবস্থায় পৃথিবী যে চতুর্দিকব্যাপী ঘন মেঘনীড়ের মধ্যে আচ্ছন্ন ছিল, ভাবজগতের সেই আদিম গুম্ফমেঘনীড়ের মধ্যে বিজ্ঞান-বলে গিয়া উপস্থিত হইয়াছি, মহৎ ভাবে সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিয়াছে।

ব্যাসদেবের যে অত্যন্ত বৃহৎ এক জোড়া গোঁফ ছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই; কারণ যে গোঁফে তিনি বৃহৎ মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের আঠারোটা ডিম নয়টা নয়টা করিয়া দুইদিকে অদৃশ্যভাবে ঝুলাইয়া বহন করিয়া বেড়াইতেন সে বড়ো সাধারণ গোঁফ হইবে না। ক্রম্‌ওয়েল সাহেবের গোঁফে ইংলন্ডের বর্তমান পার্ল্যামেন্টের ডিম যখন ঝুলিত, তখন কেহ দেখিতে পায় নাই, আজ দেখো, সেই পার্ল্যামেন্ট ডিম ভাঙিয়া মস্ত ডাগর হইয়া ক্যাঁক ক্যাঁক করিয়া বেড়াইতেছে। পিতামহ ব্রহ্মার আর কিছু থাক্ না থাক্, চার মুখে চার জোড়া খুব বড়ো বড়ো গোঁফ অনন্ত আকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছিল, ইহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে? নহিলে চরাচর কোথায় থাকিত।

হায় হায়, যাহারা গোঁফ কামায়, তাহারা জানে না কী ভয়ানক কাজ করিতেছে। হয়তো এক জোড়া গোঁফের সঙ্গে সঙ্গে একটা দেশের স্বাধীনতা কামাইয়া ফেলা হইল! একটা ভাষার সাহিত্য কামাইয়া ফেলা হইল। হয়তো কাল প্রত্যুষেই আমি মানব সমাজে এক ভূমিকম্প উপস্থিত করিতে পারিতাম, কিন্তু আজ সন্ধ্যাবেলায় গোঁফ কামাইয়া ফেলিলাম, ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটা সমাজের ভূমিকম্প কামাইয়া ফেলিলাম! কবি গ্রে সাহেব কবরস্থানে গিয়া মূক, গৌরবহীন মৃত গ্রাম্য মিল্‌টনদের স্মরণ করিয়া বিলাপ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি যদি নাপিতের ক্ষৌরশালায় গিয়া কবির দিব্যচক্ষে ছিন্ন গোঁফরাশির মধ্যে শত শত ধূলিধূসরিত সভ্যতা, সাধু সংকল্প ও মহৎ উদ্দেশ্যের ভ্রূণহত্যা দেখিতে পাইতেন, ধূলিতে লুণ্ঠমান নীরব সংগীত শিশু, অঙ্কুরে বিদলিত মহত্ত্বের কল্পবৃক্ষ সকল দেখিতে পাইতেন, তবে না জানি কী বলিতেন।

আমি যখন কোনো বড়ো লোক দেখি, তখন তাঁহার গোঁফজোড়াটা দেখিয়াই সম্ভ্রমে অভিভূত হইয়া পড়ি। তাঁহার সহিত তর্ক করিবার সময় তিনি যদি গোঁফে চাড়া লাগান্ তো ভয়ে তর্ক বন্ধ করিয়া ফেলি! মনে মনে একবার কল্পনা করিয়া দেখি, যেন, বর্তমান কাল অত্যন্ত ভীত হইয়া ওই গোঁফের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, ভাবিতেছে, না জানি কোন্ একটা বলবান ভবিষ্যৎ-বাচ্ছা কাল-পরশুর মধ্যে ডিম্ব ভেদ করিয়া গরুড়-পরাক্রমে ওই গোঁফের ভিতর দিয়া হুস্ করিয়া বাহির হইয়া পড়িবে, ও বর্তমান কালটাকে সিংহাসন হইতে হেঁচড়াইয়া আনিয়া নিজে তাহার উপরে গট্ হইয়া বসিবে! মনে মনে এই কামনা করি যে নাপিতের ক্ষুর কখনো যেন ও গোঁফজোড়া স্পর্শ না করে।

নৈয়ায়িক মহাশয়েরা গোটাকতক তীক্ষ্ণ-চঞ্চু ক্ষুদ্রচক্ষু হিংস্র পাখি পুষিয়া রাখিয়াছেন, তাহারা কোনো কালে নিজে ডিম পাড়িতে পারে না, কেবল পরের নীড়ে খোঁচা মারিয়া ও পরের শাবককে ঠোকরাইয়া বেড়ায়। এইরূপে ইহাঁরা অনেক ভালো ভালো জাতের ভাবগুলিকে বধ করিয়া থাকেন। মনে মনে বিষম অহংকার। কিন্তু ইহা হয়তো জানেন না, যদি এই শাবক বেচারিরা নিতান্তই শিশু অবস্থায় এরূপ খোঁচা না খাইত ও পুষ্ট হইয়া কিছু বড়ো হইতে পারিত, তবে এই নৈয়ায়িক হিংস্র পক্ষীগণ ইহাদের কাছে ঘেঁসিতে পারিত না। আমার সামান্য গোঁফ হইতে আজ এই যে একটি পাখি বাহির হইয়াছে, ইহার জন্ম সংবাদ পাইয়াই অমনি চারি দিক হইতে নৈয়ায়িক পক্ষীগণ ইহার চারিদিকে চ্যাঁ চ্যাঁ করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কেহ-বা ইতিহাসে ঠোঁট শানাইয়া আসিয়াছেন, কেহ-বা পুরাণের আগায় ঠোঁট ঘষিয়া আসিয়াছেন, কেহ-

বা তর্কশাস্ত্র নামক ইস্পাতের ছুরি দিয়া ঠোঁট চাঁচিয়া চাঁচিয়া নিন্দুকের কলমের আগার মতো ঠোঁটটাকে খরধার করিয়া আসিয়াছেন, রক্তপাত করিবার আশায় উল্লসিত। ইঁহারা আমার শাবককে নানারূপে আক্রমণ করিতেছেন। একজন নিতান্ত কর্কশ স্বরে বলিতেছেন, যে, 'তোমার কথা অপ্রামাণ্য। কারণ ভারতবর্ষের পূর্বতন ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ গোঁফ দাড়ি এমন-কি, চুল পর্যন্ত কামাইয়া কেবল একটুখানি টিকি রাখিতেন! তাঁহারা কি আর বুদ্ধির চর্চা করিতেন না!' এই লোকটার কর্কশ কণ্ঠ শুনিয়া একবার ভাবিলাম, 'আমি ভাবকে জন্ম দিয়া থাকি, কাজেই ন্যায়শাস্ত্র লইয়া খোঁচাখুঁচি করা আমার কাজ নহে। আমরা ভাবের উচ্চ আসনে বসিয়া থাকি, কাজেই উহারা নীচে হইতে চেঁচামেচি করিয়া থাকে। করুক, উহাদের সুখে ব্যাঘাত দিব না।' অবশেষে গোলমালে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উহাদেরই অস্ত্র অবলম্বন করিতে হইল। আমি কহিলাম— 'প্রমাণ খুঁটিয়া খুঁটিয়া বেড়ানো আমার পেশা নহে, সুতরাং আমার সে অভ্যাস নাই; আমি কেবল একটি কথা বলিতে চাহি, ভারতবর্ষে যখন বৃহৎভাবের জন্ম হইত, তখন ঋষিদের বড়ো বড়ো গোঁফ ছিল। অবশেষে ভাবের জন্ম যখন বন্ধ হইল, কেবলমাত্র সঞ্চয়ের ও শ্রেণীবিভাগের পালা পড়িল, তখন গোঁফের আবশ্যকতা রহিল না। তখন সঞ্চিত ভাবের দলকে মাঝে মাঝে টিকি টানিয়া জাগাইয়া দিলেই যথেষ্ট হইত, তখন আর তা দিয়া ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়োজন রহিল না। কিন্তু আর্যদের অবনতির আরম্ভ হইল কখন হইতে? না, যখন হইতে তাঁহারা গোঁফ কামাইয়া টিকি রাখিতে আরম্ভ করিলেন। এককালে যে ওষ্ঠের ঊর্ধ্বে ভাবের নিবিড় তপোবন বিরাজ করিত, এখন সেখানে সমতল মরুভূমি! কেবল প্রাচীন কালের কতকগুলি ভাবের পক্ষী ধরিয়া স্মৃতির খাঁচায় রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহারা সকালে বিকালে একটু একটু শুষ্ক মস্তিষ্ক খাইয়া থাকে। অনেকগুলা মরিয়া গিয়াছে, অনেকগুলা ডাকে না, কেহ আর ডিম পাড়ে না, স্বাধীন ভাবে গান গায় না, কেবল টিকি নাড়া দিলে মাঝে মাঝে চেঁচায়! গোঁফ কামাইয়া এই তো ফল হইল! অতএব হে ভারতবর্ষীয়গণ, আজই তোমরা 'রাখো গোঁফ কাটো টিকি'।

'যাঁহারা বিশুদ্ধ জ্ঞান ও বিশুদ্ধ কাব্যের প্রতি বিমুখ, যাঁহারা পদে পদে ফল, উদ্দেশ্য ও তত্ত্ব দেখিতে চান তাঁহাদের নিমিত্ত আমার এই গোঁফ তত্ত্ব আবিষ্কারের ফল বুঝাইয়া দিই! আমার এই লেখা পড়িলে ভারতবাসীদের চৈতন্য হইবে যে— ভারতবর্ষে বহুবিধ খনিজ ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ সত্ত্বেও আমাদের জ্ঞান ও উদ্যমের অভাবে যেরূপ তাহা থাকা না থাকা সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তেমনি আমরা গোঁফের উপযোগিতা জানি না বলিয়া তাহার যথার্থ সদ্ব্যবহার করিতে পারিতেছি না, ও এইরূপে দেশের উন্নতির ব্যাঘাত হইতেছে। আজ হইতে আমরা যদি গোঁফের শুশ্রূষা করি, গোঁফে অনবরত তা দিতে থাকি ও গোঁফ না কামাই, তবে তাহা হইতে না জানি কী শুভ ফলই প্রসূত হইবে। যেদিন ভারতবর্ষের বিংশতি কোটি লোক আকর্ণ-পূরিত গোঁফ নাপিতের ভীষণ আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া রাখিবে, সেদিন ভারতবর্ষের কী শুভদিন! আমি যেন দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি পূর্ব দিকের মেঘমালার অন্ধকার হইতে যেমন ধীরে ধীরে সূর্য উত্থান করিতে থাকেন, তেমনি ভারতবর্ষের বিংশতি কোটি সন্তানের গুম্ফমেঘের মধ্য হইতে ওই দেখো ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সূর্য ধীরে ধীরে উত্থান করিতেছে, ওই দেখো সিন্ধুনদ হইতে ব্রহ্মপুত্র ও হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত আলোকিত হইয়া উঠিতেছে, যাজ্ঞবল্ক্য ও শাক্যসিংহের পবিত্র জন্মভূমিতে পুনরায় প্রভাত কিরণ বিস্তীর্ণ হইতেছে!' (ঘন ঘন করতালি)।

হে আমি, হে গোঁফতত্ত্ববিৎ বুধঃ, তুমি আজ ধন্য হইলে! আজ তোমার গোঁফের কী গর্বের দিন! তাহারই নীড়জাত শাবকগুলি আজ কলকণ্ঠে গাহিতে গাহিতে তোমার মুখ দিয়া অনর্গল বাহির হইয়া আসিতেছে এবং সেই গোঁফ স্নেহভরে নতনেত্রে মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সগর্বে মুখ হইতে উড্ডীন শাবকদিগের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে।

হে সমালোচকশ্রেষ্ঠ, তুমি যদি এই শাবকগুলি ধরিয়া তোমার খরশাণ কলম দিয়া জবাই কর

ও লঙ্কা মরিচ দিয়া রন্ধন কর তবে তাহা নব্যশিক্ষিত পাঠকদের মুখরোচক হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু সে কাজটা কি হিন্দুসন্তানের মতো হইবে?

ভারতী
আষাঢ় ১২৯০

সত্যং শিবং সুন্দরম্

সত্য কেবলমাত্র হওয়া, শিব থাকা, সুন্দর ভালো করিয়া থাকা। সত্য শিব না হইলে থাকিতে পারে না, বিনাশ প্রাপ্ত হয়, অসত্য হইয়া যায়। শিব আপনার শিবত্বের প্রভাবে অবশেষে সুন্দর হইয়া উঠে। সত্য আমাদিগকে জন্ম দেয়, শিব আমাদিগকে বলপূর্বক বাঁচাইয়া রাখে, সুন্দর আমাদিগকে আনন্দ দিয়া আমাদের স্বেচ্ছার সহিত বাঁচাইয়া রাখে। মনুষ্যজীবন সত্য, কর্তব্য অনুষ্ঠান শিব, প্রেম সুন্দর। বিজ্ঞান সত্য, দর্শন শিব, কাব্য সুন্দর।

ভারতী
আষাঢ় ১২৯১

ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী

ভারতবর্ষের কোন্ মূর্খ বা কোন্ পণ্ডিত কোন্ খৃস্টাব্দে জন্মিয়াছিলেন বা মরিয়াছিলেন, তাহার কিছুই স্থির নাই, অতএব ভারতবর্ষে ইতিহাস ছিল না ইহা স্থির। এ বিষয়ে পণ্ডিতবর হচিন্‌সন সাহেব যে অতি পরমাশ্চর্য সারগর্ভ গবেষণাপূর্ণ যুক্তিবহুল কথা বলিয়াছেন তাহা এইখানে উদ্ধৃত করি— 'প্রকৃত ইতিহাস না থাকিলে আমরা প্রাচীনকালের বিষয় অতি অল্পই জানিতে পারি।'[১]

আমাদের দেশে যে ইতিহাস ছিল না, এবং ইতিহাস না থাকিলে যে কিছুই জানা যায় না তাহার প্রমাণ, বৈষ্ণব চূড়ামণি অতি প্রাচীন কবি ভানুসিংহ ঠাকুরের বিষয় আমরা কিছুই অবগত নহি। ইহা সামান্য দুঃখের কথা নহে। ভারতবর্ষের এই দুরপনেয় কলঙ্ক মোচন করিতে আমরা অগ্রসর হইয়াছি। কৃতকার্য হইয়াছি এই তো আমাদের বিশ্বাস। যাহা আমরা স্থির করিয়াছি, তাহা যে পরম সত্য তদ্‌বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।

কোন্ সময়ে ভানুসিংহ ঠাকুরের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাই প্রথমে নির্ণয় করিতে হয়। কেহ বলে বিদ্যাপতি ঠাকুরের পূর্বে, কেহ বলে পরে। যদি পূর্বে হয় তো কত পূর্বে ও যদি পরে হয় তো কত পরে? বহুবিধ প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে এ সম্বন্ধে বিস্তর সাহায্য পাওয়া যায়; যথা—

প্রথমত— চারি বেদ। ঋক্ যজু সাম অথর্ব। বেদ চারি কি তিন, এ বিষয়ে কিছুই স্থির হয় নাই। আমরা স্থির করিয়াছি, কিন্তু অনেকেই করেন নাই। বেদ যে তিন তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। ঋগ্‌বেদে আছে— 'ঋষয় স্ত্রয়ী বেদা বিদুঃ ঋচো যজুংষি সামানি।' চতুর্থ শতপথ ব্রাহ্মণে কী লেখা আছে তাহা কাহারো অবিদিত নাই। বেদের সূত্র যাঁহারা অবসরমতে পড়িয়া থাকেন, তাঁহারাও দেখিয়া থাকিবেন তন্মধ্যে অথর্ব বেদের সূত্রপাত নাই। যাহা হউক, প্রমাণ হইল বেদ

---

১. *Memories of Catternob Cruikshank Hutchinson*, Vol. V, p. 1058.

ইংরাজিতে বানান ভুল যদি কিছু থাকে, পাঠকেরা জানিবেন তাহা মুদ্রাকরের দোষ। ভবানী মাস্টারের কাছে আমি দেড় বৎসর যাবৎ ইংরাজি পড়িয়াছিলাম, বাংলা আমাকে পড়িতে হয় নাই; কাঁটাগাছের মতো বিনা চাষে আপনিই গজাইয়া উঠিয়াছে।

তিন বৈ নয়। এক্ষণে সেই তিন বেদে ভানুসিংহের বিষয় কী কী প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাক। বেদে ছন্দ আছে, মন্ত্র আছে, ব্রাহ্মণ আছে, সূত্র আছে, কিন্তু ভানুসিংহের কোনো কথা নাই।[১] এমন-কি, বেদের সংহিতা ভাগে ইন্দ্র, বরুণ, মরুৎ, অগ্নি, রুদ্র, রবি প্রভৃতি দেবগণের কথাও আছে কিন্তু ইতিহাস রচনায় অনভিজ্ঞতাবশত ভানুসিংহের কোনো উল্লেখ নাই।[২]

শ্রীমদ্ভাগবতে ও বিষ্ণুপুরাণে নন্দবংশ রাজগণের কথা পাওয়া যায়। এমন-কি, তাহাতে ইহাও লিখিয়াছে যে, মহাপদ্ম নন্দীর সুমাল্য প্রভৃতি আট পুত্র জন্মিবে— কৌটিল্য ব্রাহ্মণের কথাও আছে, অথচ ভানুসিংহের কোনো কথা তাহাতে দেখিতে পাইলাম না।[৩] যদি কোনো দুঃসাহসিক পাঠক বলেন যে, হাঁ, তাহাতে ভানুসিংহের কথা আছে, তিনি প্রমাণ প্রয়োগপূর্বক দেখাইয়া দিন— তিনি আমাদের এবং ভারতবর্ষের ধন্যবাদভাজন হইবেন।

আমরা ভোজ প্রবন্ধ আনাইয়া দেখিলাম, তাহাতে ধারা নগরাধিপ ভোজরাজার বিস্তারিত বিবরণ আছে। তাহাতে নিম্নলিখিত পণ্ডিতগণের নাম পাওয়া যায়— কালিদাস, কর্পূর, কলিঙ্গ , কোকিল, শ্রীদচন্দ্র। এমন-কি মুচকুন্দ, ময়ূর ও দামোদরের নামও তাহাতে পাওয়া গেল, কিন্তু ভানুসিংহের নাম কোথাও পাওয়া গেল না।[৪]

বিশ্বগুণাদর্শ দেখো— মাঘশ্চোরো ময়ূরো মুরারি পুরসরো ভারবিঃ সারবিদ্যঃ
শ্রীহর্ষঃ কালিদাসঃ কবিরথ ভবভূত্যাদয়ো ভোজরাজঃ

দেখো, ইহাতেও ভানুসিংহের নাম নাই।[৫]

বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন উল্লেখ স্থলে ভানুসিংহের নাম পাওয়া যায় ভাবিয়া আমরা বিস্তর অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি—

ধন্বন্তরিঃ ক্ষপণকোমর সিংহ শঙ্কুর্বেতাল ভট্ট ঘটকর্পর কালিদাসাঃ
খ্যাতা বরাহ মিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্ণব বিক্রমস্য।

কৈ ইহার মধ্যেও তো ভানুসিংহের নাম পাওয়া গেল না।[৬] তবে, কোনো কোনো ভাবুকব্যক্তি সন্দেহ করেন কালিদাস ও ভানুসিংহ একই ব্যক্তি হইবেন। এ সন্দেহ নিতান্ত অগ্রাহ্য নহে, কারণ কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে উভয়ের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দেখা যায়।

অবশেষে আমরা বত্রিশ সিংহাসন, বেতাল পঁচিশ, তুলসীদাসের রামায়ণ, আরব্য উপন্যাস ও সুশীলার উপাখ্যান বিস্তর গবেষণার সহিত অনুসন্ধান করিয়া কোথাও ভানুসিংহের উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না। অতএব কেহ যেন আমাদের অনুসন্ধানের প্রতি দোষারোপ না করেন— দোষ কেবল গ্রন্থগুলির।

ভানুসিংহের জন্মকাল সম্বন্ধে চারি প্রকার মত দেখা যায়। শ্রদ্ধাস্পদ পাঁচকড়িবাবু বলেন ভানুসিংহের জন্মকাল খৃস্টাব্দের ৪৫১ বৎসর পূর্বে। পরম পণ্ডিতবর সনাতনবাবু বলেন খৃস্টাব্দের ১৬৮৯ বৎসর পরে। সর্বলোকপূজিত পণ্ডিতাগ্রগণ্য নিতাইচরণবাবু বলেন ১১০৪

১. See *English Translation of Hitopadesha* by H.M. Dibdin. Vol. 3, p. 551.

২. কোনো কোনো অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তি এরূপ সন্দেহ করিয়া থাকেন যে, উক্ত ইন্দ্র প্রভৃতি ঠাকুরগণের মধ্যে রবির যে উল্লেখ দেখা যায়, তাহা ভানুর নামান্তর হইতে পারে। কিন্তু তাহা নিতান্ত অপ্রামাণিক।

৩. Vide *Pictorial Handbook of Modern Geography*, Vol. 1, p. 139.

৪. See *Hong-chang-ching* by Kong-fu.

৫. 'সাহনামা', দ্বিতীয় সর্গ।

৬. Peterhoff's *Chromkroptologisheder Unterlutungeln.*

খৃস্টাব্দ হইতে ১৭৯৯ খৃস্টাব্দের মধ্যে কোনো সময়ে ভানুসিংহের জন্ম হইয়াছিল। আর, মহামহোপাধ্যায় সরস্বতীর বরপুত্র কালাচাঁদ দে মহাশয়ের মতে ভানুসিংহ, হয় খৃস্ট শতাব্দীর ৮১৯ বৎসর পূর্বে, না-হয় ১৬৩৯ বৎসর পরে জন্মিয়াছিলেন, ইহার কোনো সন্দেহ মাত্র নাই। আবার কোনো কোনো মূর্খ নির্বোধ গোপনে আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবদের নিকটে প্রচার করিয়া বেড়ায় যে, ভানুসিংহ ১৮৬১ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ধরাধাম উজ্জ্বল করেন। ইহা আর কোনো বুদ্ধিমান পাঠককে বলিতে হইবে না যে, এ কথা নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়। যাহা হউক, ভানুসিংহের জন্মকাল সম্বন্ধে আমাদের যে মত তাহা প্রকাশ করিতেছি। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কোনো বুদ্ধিমান সুবিবেচক পাঠকের সন্দেহ থাকিবে না। নীল পুরাণের একাদশ সর্গে বৈতস মুনিকে ভানব বলা হইয়াছে।[১] তবেই দেখা যাইতেছে তিনি ভানুর বংশজাত। এক্ষণে, তিনি ভানুর কত পুরুষ পরে ইহা নিঃসন্দেহ স্থির করা দুঃসাধ্য। রামকে রাঘব বলা হইয়া থাকে। রঘুর তিন পুরুষ পরে রাম। মনে করা যাক, বৈতস ভানুর চতুর্থ পুরুষ। প্রত্যেক পুরুষের মধ্যে ২০ বৎসরের ব্যবধান ধরা যাক, তাহা হইলে ভানুসিংহের জন্মের আশি বৎসর পরে বৈতসের জন্ম। যিনি রাজতরঙ্গিণী পড়িয়াছেন, তিনিই জানেন বৈতস ৫১৮ খৃস্টাব্দের লোক।[২] তাহা হইলে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে ভানুসিংহের জন্মকাল ৪৩৮ খৃস্টাব্দে। কিন্তু ভাষার প্রমাণ যদি দেখিতে হয় তাহা হইলে ভানুসিংহকে আরও প্রাচীন বলিয়া স্থির করিতে হয়। সকলেই জানেন, ভাষা লোকের মুখে মুখে যতই পুরাতন হইতে থাকে ততই সংক্ষিপ্ত হইতে থাকে। 'গমন করিলাম' হইতে 'গেলুম' হয়। 'ভ্রাতৃজায়া' হইতে 'ভাজ' হয়। 'খুল্লতাত' হইতে 'খুড়ো' হয়। কিন্তু ছোটো হইতে বড়ো হওয়ার দৃষ্টান্ত কোথায়? অতএব নিঃসন্দেহ 'পিরীতি' শব্দ 'প্রীতি' অপেক্ষা 'তিখিনী' শব্দ 'তীক্ষ্ণ' অপেক্ষা প্রাচীন। অষ্টাদশ ঋকের এক স্থলে দেখা যায় 'তীক্ষ্ণানি সায়কানি'। সকলেই জানেন অষ্টাদশ ঋক্ খৃস্টের ৪০০০ বৎসর পূর্বে রচিত হয়। একটি ভাষা পুরাতন ও পরিবর্তিত হইতে কিছু না-হউক দুহাজার বৎসর লাগে। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, খৃস্টজন্মের ছয় সহস্র বৎসর পূর্বে ভানুসিংহের জন্ম হয়। সুতরাং নিঃসন্দেহ প্রমাণ হইল যে, ভানুসিংহ ৪৩৮ খৃস্টাব্দে অথবা খৃস্টাব্দের ছয় সহস্র বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। কেহ যদি ইহার প্রতিবাদ করিতে পারেন, তাঁহাকে আমাদের পরম বন্ধু বলিয়া জ্ঞান করিব কারণ, সত্যের প্রতিই আমাদের লক্ষ্য; এ প্রবন্ধের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

ভানুসিংহের আর সমস্তই তো ঠিকানা করিয়া দিলাম, এখন এইরূপ নিঃসন্দেহে তাঁহার জন্মভূমির একটা ঠিকানা করিয়া দিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হইতে পারি। এ সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। পরম শ্রদ্ধাস্পদ সনাতনবাবু একরূপ বলেন ও পরমভক্তিভাজন রূপনারায়ণ বাবু আর-একরূপ বলেন। তাঁহাদের কথা এখানে উদ্‌ধৃত করিবার কোনো আবশ্যক নাই। কারণ, তাঁহাদের উভয়ের মতই নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় ও হেয়। তাঁহারা যে লেখা লিখিয়াছেন তাহাতে লেখকদিগের শরীরে লাঙ্গুল ও ক্ষুরের অস্তিত্ব এবং তাঁহাদের কর্ণের অমানুষিক দীর্ঘতা সপ্রমাণ হইতেছে। ইতিহাস কাহাকে বলে আগে তাহাই তাঁহারা ইস্কুলে গিয়া শিখিয়া আসুন, তার পরে আমার কথার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইবেন। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি তাঁহাদের উপরে আমার বিন্দুমাত্র রাগ নাই, এবং আমার কেহ প্রতিবাদ করিলে আমি আনন্দিত বৈ রুষ্ট হই না, কেবল সত্যের অনুরোধে ও সাধারণের হিতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এক-একবার ইচ্ছা করে তাঁহাদের লেখাগুলি চণ্ডালের দ্বারা পুড়াইয়া তাহার ভস্মশেষ কর্মনাশার জলে নিক্ষিপ্ত হয় এবং লেখকদ্বয়ও গলায় কলসি বাঁধিয়া তাহারই অনুগমন করেন।

---

১. See *The Grammer of the Red Indian Tchouk-Tchouk-Hmhm-Hmhm Language,* Conjongation of Verbs. Vol. 3 p. 999

২. *History of the Art of Embroidery and Crewel Work.* Appendix.

তিন বৈ নয়। এক্ষণে সেই তিন বেদে ভানুসিংহের বিষয় কী কী প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাক। বেদে ছন্দ আছে, মন্ত্র আছে, ব্রাহ্মণ আছে, সূত্র আছে, কিন্তু ভানুসিংহের কোনো কথা নাই।[১] এমন-কি, বেদের সংহিতা ভাগে ইন্দ্র, বরুণ, মরুৎ, অগ্নি, রুদ্র, রবি প্রভৃতি দেবগণের কথাও আছে কিন্তু ইতিহাস রচনায় অনভিজ্ঞতাবশত ভানুসিংহের কোনো উল্লেখ নাই।[২]

শ্রীমদ্ভাগবতে ও বিষ্ণুপুরাণে নন্দবংশ রাজগণের কথা পাওয়া যায়। এমন-কি, তাহাতে ইহাও লিখিয়াছে যে, মহাপদ্ম নন্দীর সুমাল্য প্রভৃতি আট পুত্র জন্মিবে— কৌটিল্য ব্রাহ্মণের কথাও আছে, অথচ ভানুসিংহের কোনো কথা তাহাতে দেখিতে পাইলাম না।[৩] যদি কোনো দুঃসাহসিক পাঠক বলেন যে, হাঁ, তাহাতে ভানুসিংহের কথা আছে, তিনি প্রমাণ প্রয়োগপূর্বক দেখাইয়া দিন— তিনি আমাদের এবং ভারতবর্ষের ধন্যবাদভাজন হইবেন।

আমরা ভোজ প্রবন্ধ আনাইয়া দেখিলাম, তাহাতে ধারা নগরাধিপ ভোজরাজার বিস্তারিত বিবরণ আছে। তাহাতে নিম্নলিখিত পণ্ডিতগণের নাম পাওয়া যায়— কালিদাস, কর্পুর, কলিঙ্গ , কোকিল, শ্রীদচন্দ্র। এমন-কি মুচকুন্দ, ময়ূর ও দামোদরের নামও তাহাতে পাওয়া গেল, কিন্তু ভানুসিংহের নাম কোথাও পাওয়া গেল না।[৪]

বিশ্বগুণাদর্শ দেখো— মাঘশ্চোরো ময়ূরো মুরারি পুরসরো ভারবিঃ সারবিদ্যঃ
শ্রীহর্ষঃ কালিদাসঃ কবিরথ ভবভূত্যাদয়ো ভোজরাজঃ

দেখো, ইহাতেও ভানুসিংহের নাম নাই।[৫]

বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন উল্লেখ স্থলে ভানুসিংহের নাম পাওয়া যায় ভাবিয়া আমরা বিস্তর অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি—

ধন্বন্তরিঃ ক্ষপণকোমর সিংহ শঙ্কুর্বেতাল ভট্ট ঘটকর্পর কালিদাসাঃ
খ্যাতা বরাহ মিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্ণব বিক্রমস্য।

কৈ ইহার মধ্যেও তো ভানুসিংহের নাম পাওয়া গেল না।[৬] তবে, কোনো কোনো ভাবুকব্যক্তি সন্দেহ করেন কালিদাস ও ভানুসিংহ একই ব্যক্তি হইবেন। এ সন্দেহ নিতান্ত অগ্রাহ্য নহে, কারণ কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে উভয়ের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দেখা যায়।

অবশেষে আমরা বত্রিশ সিংহাসন, বেতাল পঁচিশ, তুলসীদাসের রামায়ণ, আরব্য উপন্যাস ও সুশীলার উপাখ্যান বিস্তর গবেষণার সহিত অনুসন্ধান করিয়া কোথাও ভানুসিংহের উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না। অতএব কেহ যেন আমাদের অনুসন্ধানের প্রতি দোষারোপ না করেন— দোষ কেবল গ্রন্থগুলির।

ভানুসিংহের জন্মকাল সম্বন্ধে চারি প্রকার মত দেখা যায়। শ্রদ্ধাস্পদ পাঁচকড়িবাবু বলেন ভানুসিংহের জন্মকাল খৃস্টাব্দের ৪৫১ বৎসর পূর্বে। পরম পণ্ডিতবর সনাতনবাবু বলেন খৃস্টাব্দের ১৬৮৯ বৎসর পরে। সর্বলোকপূজিত পণ্ডিতাগ্রগণ্য নিতাইচরণবাবু বলেন ১১০৪

---

১. See *English Translation of Hitopadesha* by H.M. Dibdin, Vol. 3, p. 551.

২. কোনো কোনো অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তি এরূপ সন্দেহ করিয়া থাকেন যে, উক্ত ইন্দ্র প্রভৃতি ঠাকুরগণের মধ্যে রবির যে উল্লেখ দেখা যায়, তাহা ভানুর নামান্তর হইতে পারে। কিন্তু তাহা নিতান্ত অপ্রামাণিক।

৩. Vide *Pictorial Handbook of Modern Geography*, Vol. 1, p. 139.

৪. See *Hong-chang-ching* by Kong-fu.

৫. 'সাহনামা', দ্বিতীয় সর্গ।

৬. Peterhoff's *Chromkroptologisheder Unterlutungeln.*

খৃস্টাব্দ হইতে ১৭৯৯ খৃস্টাব্দের মধ্যে কোনো সময়ে ভানুসিংহের জন্ম হইয়াছিল। আর, মহামহোপাধ্যায় সরস্বতীর বরপুত্র কালাচাঁদ দে মহাশয়ের মতে ভানুসিংহ, হয় খৃস্ট শতাব্দীর ৮১৯ বৎসর পূর্বে, না-হয় ১৬৩৯ বৎসর পরে জন্মিয়াছিলেন, ইহার কোনো সন্দেহ মাত্র নাই। আবার কোনো কোনো মূর্খ নির্বোধ গোপনে আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবদের নিকটে প্রচার করিয়া বেড়ায় যে, ভানুসিংহ ১৮৬১ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ধরাধাম উজ্জ্বল করেন। ইহা আর কোনো বুদ্ধিমান পাঠককে বলিতে হইবে না যে, এ কথা নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়। যাহা হউক, ভানুসিংহের জন্মকাল সম্বন্ধে আমাদের যে মত তাহা প্রকাশ করিতেছি। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কোনো বুদ্ধিমান সুবিবেচক পাঠকের সন্দেহ থাকিবে না। নীল পুরাণের একাদশ সর্গে বৈতস মুনিকে ভানব বলা হইয়াছে।[১] তবেই দেখা যাইতেছে তিনি ভানুর বংশজাত। এক্ষণে, তিনি ভানুর কত পুরুষ পরে ইহা নিঃসন্দেহ স্থির করা দুঃসাধ্য। রামকে রাঘব বলা হইয়া থাকে। রঘুর তিন পুরুষ পরে রাম। মনে করা যাক, বৈতস ভানুর চতুর্থ পুরুষ। প্রত্যেক পুরুষের মধ্যে ২০ বৎসরের ব্যবধান ধরা যাক, তাহা হইলে ভানুসিংহের জন্মের আশি বৎসর পরে বৈতসের জন্ম। যিনি রাজতরঙ্গিণী পড়িয়াছেন, তিনিই জানেন বৈতস ৫১৮ খৃস্টাব্দের লোক।[২] তাহা হইলে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে ভানুসিংহের জন্মকাল ৪৩৮ খৃস্টাব্দে। কিন্তু ভাষার প্রমাণ যদি দেখিতে হয় তাহা হইলে ভানুসিংহকে আরও প্রাচীন বলিয়া স্থির করিতে হয়। সকলেই জানেন, ভাষা লোকের মুখে মুখে যতই পুরাতন হইতে থাকে ততই সংক্ষিপ্ত হইতে থাকে। 'গমন করিলাম' হইতে 'গেলুম' হয়। 'ভ্রাতৃজায়া' হইতে 'ভাজ' হয়। 'খুল্লতাত' হইতে 'খুড়ো' হয়। কিন্তু ছোটো হইতে বড়ো হওয়ার দৃষ্টান্ত কোথায়? অতএব নিঃসন্দেহ 'পিরীতি' শব্দ 'প্রীতি' অপেক্ষা 'তিখিনী' শব্দ 'তীক্ষ্ণ' অপেক্ষা প্রাচীন। অষ্টাদশ ঋকের এক স্থলে দেখা যায় 'তীক্ষ্ণানি সায়কানি'। সকলেই জানেন অষ্টাদশ ঋক্ খৃস্টের ৪০০০ বৎসর পূর্বে রচিত হয়। একটি ভাষা পুরাতন ও পরিবর্তিত হইতে কিছু না-হউক দুহাজার বৎসর লাগে। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, খৃস্টজন্মের ছয় সহস্র বৎসর পূর্বে ভানুসিংহের জন্ম হয়। সুতরাং নিঃসন্দেহ প্রমাণ হইল যে, ভানুসিংহ ৪৩৮ খৃস্টাব্দে অথবা খৃস্টাব্দের ছয় সহস্র বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। কেহ যদি ইহার প্রতিবাদ করিতে পারেন, তাঁহাকে আমাদের পরম বন্ধু বলিয়া জ্ঞান করিব কারণ, সত্যের প্রতিই আমাদের লক্ষ্য; এ প্রবন্ধের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

ভানুসিংহের আর সমস্তই তো ঠিকানা করিয়া দিলাম, এখন এইরূপ নিঃসন্দেহে তাঁহার জন্মভূমির একটা ঠিকানা করিয়া দিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হইতে পারি। এ সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। পরম শ্রদ্ধাস্পদ সনাতনবাবু একরূপ বলেন ও পরমভক্তিভাজন রূপনারায়ণ বাবু আর-একরূপ বলেন। তাঁহাদের কথা এখানে উদ্‌ধৃত করিবার কোনো আবশ্যক নাই। কারণ, তাঁহাদের উভয়ের মতই নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় ও হেয়। তাঁহারা যে লেখা লিখিয়াছেন তাহাতে লেখকদিগের শরীরে লাঙ্গুল ও ক্ষুরের অস্তিত্ব এবং তাঁহাদের কর্ণের অমানুষিক দীর্ঘতা সপ্রমাণ হইতেছে। ইতিহাস কাহাকে বলে আগে তাহাই তাঁহারা ইস্কুলে গিয়া শিখিয়া আসুন, তার পরে আমার কথার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইবেন। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি তাঁহাদের উপরে আমার বিন্দুমাত্র রাগ নাই, এবং আমার কেহ প্রতিবাদ করিলে আমি আনন্দিত বৈ রুষ্ট হই না, কেবল সত্যের অনুরোধে ও সাধারণের হিতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এক-একবার ইচ্ছা করে তাঁহাদের লেখাগুলি চণ্ডালের দ্বারা পুড়াইয়া তাহার ভস্মশেষ কর্মনাশার জলে নিক্ষিপ্ত হয় এবং লেখকদ্বয়ও গলায় কলসি বাঁধিয়া তাহারই অনুগমন করেন।

---

১. See *The Grammer of the Red Indian Tchouk-Tchouk-Hmhm-Hmhm Language*, Conjongation of Verbs. Vol. 3 p. 999

২. *History of the Art of Embroidery and Crewel Work.* Appendix.

সিংহল দ্বীপের অন্তর্বর্তী ত্রিনকমলিতে একটি পুরাতন কূপের মধ্যে একটি প্রস্তরফলক পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে ভানুসিংহের নামের ভ এবং হ অক্ষরটি পাওয়া গিয়াছে। বাকি অক্ষরগুলি একেবারেই বিলুপ্ত। 'হ'টিকে কেহ বা 'স্ক' বলিতেছেন, কেহ-বা 'ঞ্জ' বলিতেছেন কিন্তু তাহা যে 'হ' তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার 'ভ'টিকে কেহ-বা বলেন 'র্চ্চ', কেহ-বা বলেন 'ক্লে', কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, 'ভানুসিংহ' শব্দের মধ্যে উক্ত দুই অক্ষর আসিবার কোনো সম্ভাবনা নাই। অতএব ভানুসিংহ ত্রিনকমলিতে বাস করিতেন, কূপের মধ্যে কি না সে বিষয়ে তর্ক উঠিতে পারে। কিন্তু আবার আর-একটা কথা আছে। নেপালে কাটমুণ্ডের নিকটবর্তী একটি পর্বতে সূর্যের (ভানু) প্রতিমূর্তি পাওয়া গিয়াছে, অনেক অনুসন্ধান করিয়া তাহার কাছাকাছি সিংহের প্রতিমূর্তিটা পাওয়া গেল না। পাষণ্ড যবনাধিকারে আমাদের কত গ্রন্থ, কত ইতিহাস, কত মন্দির ধ্বংস হইয়াছে; সেই সময়ে ঔরংজীবের আদেশানুসারে এই সিংহের প্রতিমূর্তি ধ্বংস হইয়া থাকিবে। কিন্তু সম্প্রতি পেশোয়ারের একটি ক্ষেত্র চাষ করিতে করিতে সিংহের প্রতিমূর্তিখোদিত ফলকখণ্ড প্রস্তর বাহির হইয়া পড়িয়াছে— স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ইহা সেই নেপালের ভানুপ্রতিমূর্তির অবশিষ্টাংশ, নাহলে ইহার কোনো অর্থই থাকে না। অতএব দেখা যাইতেছে ভানুসিংহের বাসস্থান নেপালে থাকা কিছু আশ্চর্য নয়, বরঞ্চ সম্পূর্ণ সম্ভব। তবে তিনি কার্যগতিকে নেপাল হইতে পেশোয়ারে যাতায়াত করিতেন কি না সে কথা পাঠকেরা বিবেচনা করিবেন এবং স্নান-উপলক্ষে মাঝে মাঝে ত্রিনকমলির কূপে যাওয়াও কিছু আশ্চর্য নহে। ভানুসিংহের বাসস্থান সম্বন্ধে অভ্রান্তবুদ্ধি সূক্ষ্মদর্শী অপ্রকাশচন্দ্রবাবু যে তর্ক করেন তাহা নিতান্ত বাতুলের প্রলাপ বলিয়া বোধ হয়। তিনি ভানুসিংহের স্বহস্তে-লিখিত পাণ্ডুলিপির একপার্শ্বে কলিকাতা শহরের নাম দেখিয়াছেন। ইহার সত্যতা আমরা অবিশ্বাস করি না। কিন্তু আমরা স্পষ্ট প্রমাণ করিতে পারি যে, ভানুসিংহ তাঁহার বাসস্থানের উল্লেখ সম্বন্ধে অত্যন্ত ভ্রমে পড়িয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন বটে আমি কলিকাতায় বাস করি— কিন্তু তাহাই যদি সত্য হইবে, তাহা হইলে কলিকাতায় এত কূপ আছে কোথাও কি প্রমাণসমেত একটা প্রস্তরফলক পাওয়া যাইত না? শব্দশাস্ত্র অনুসারে কাটমুণ্ডু ও ত্রিনকমলির অপভ্রংশে কলিকাতা লিখিত হওয়ারও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। যাহা হউক, ভানুসিংহ যে নিজ বাসস্থানের সম্বন্ধে ভ্রমে পড়িয়াছিলেন তাহাতে আর ভ্রম রহিল না।

ভানুসিংহের জীবনের সম্বন্ধে কিছুই জানা নাই। হয়তো বা অন্যান্য মতিমান লেখকেরা জানিতে পারেন, কিন্তু এ লেখক বিনীতভাবে তদ্‌বিষয়ে অজ্ঞতা স্বীকার করিতেছেন। তাঁহার ব্যবসায় সম্বন্ধে কেহ বলে তাঁহার কাঠের দোকান ছিল, কেহ বলে তিনি বিশ্বেশ্বরের পূজারী ছিলেন।

ভানুসিংহের কবিতা সম্বন্ধে বেশি কিছু বলিব না। ইহা মা সরস্বতীর চোরাই মাল। জনশ্রুতি এই যে, এ কবিতাগুলি স্বর্গে সরস্বতীর বীণায় বাস করিত। পাছে বিষ্ণুর কর্ণগোচর হয় ও তিনি দ্বিতীয়বার দ্রব হইয়া যান, এই ভয়ে লক্ষ্মীর অনুচরগণ এগুলি চুরি করিয়া লইয়া মর্ত্যভূমে ভানুসিংহের মগজে গুঁজিয়া রাখিয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে, এগুলি বিদ্যাপতির অনুকরণে লিখিত, সে কথা শুনিলে হাসি আসে। বিদ্যাপতি বলিয়া একব্যক্তি ছিল কি না ছিল তাহাই তাঁরা অনুসন্ধান করিয়া দেখেন নাই।

যাহা হউক, ভানুসিংহের জীবনী সম্বন্ধে সমস্তই নিঃসংশয়রূপে স্থির করা গেল। তবে, এই ভানুসিংহই যে বৈষ্ণব কবি তাহা না হইতেও পারে। হউক বা না হউক সে অতি সামান্য বিষয়, আসল কথাটা তো স্থির হইয়া গেল।

নবজীবন
শ্রাবণ ১২৯১

পুষ্পাঞ্জলি

সূর্যদেব, তুমি কোন্ দেশ অন্ধকার করিয়া এখানে উদিত হইলে? কোন্‌খানে সন্ধ্যা হইল? এদিকে তুমি জুঁইফুলগুলি ফুটাইলে, কোন্‌খানে রজনীগন্ধা ফুটিতেছে? প্রভাতের কোন্ পরপারে সন্ধ্যার মেঘের ছায়া অতি কোমল লাবণ্যে গাছগুলির উপরে পড়িয়াছে! এখানে আমাদিগকে জাগাইতে আসিয়াছ সেখানে কাহাদিগকে ঘুম পাড়াইয়া আসিলে? সেখানকার বালিকারা ঘরে দীপ জ্বালাইয়া ঘরের দুয়ারটি খুলিয়া সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া কি তাহাদের পিতার জন্য অপেক্ষা করিতেছে? সেখানে তো মা আছে— তাহারা কি তাহাদের ছোটো ছোটো শিশুগুলিকে চাঁদের আলোতে শুয়াইয়া, মুখের পানে চাহিয়া, চুমো খাইয়া, বুকে চাপিয়া ধরিয়া ঘুম পাড়াইতেছে? কত শত সেখানে কুটির গাছপালার মধ্যে, নদীর ধারে, পর্বতের উপত্যকায়, মাঠের পাশে অরণ্যের প্রান্তে আপনার আপনার স্নেহ প্রেম সুখ-দুঃখ বুকের মধ্যে লইয়া সন্ধ্যাচ্ছায়ায় বিশ্রাম ভোগ করিতেছে। সেখানে আমাদের কোনো অজ্ঞাত একটি পাখি এই সময়ে গাছের ডালে বসিয়া ডাকে; সেখানকার লোকের প্রাণের সুখ-দুঃখের সহিত প্রতি সন্ধ্যাবেলায় এই পাখির গান মিশিয়া যায়। তাহাদের দেশে যে-সকল কবিরা বহুকাল পূর্বে বাস করিত, যাহারা আর নাই, লোকে যাহাদের গান জানে কিন্তু নাম জানে না, তাহারাও কোন্ সন্ধ্যাবেলায় কোন্-এক নদীর ধারে ঘাসের 'পরে শুইয়া এই পাখির গান শুনিত ও গান গাহিত। সে হয়তো আজ বহুদিনের কথা— কিন্তু তখনকার প্রেমিকেরাও তো সহসা এই স্বর শুনিয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়াছিল, বিরহীরা এই পাখির গান শুনিয়া সন্ধ্যাবেলায় নিশ্বাস ফেলিয়াছিল! কিন্তু তাহারা তাহাদের সে-সমস্ত সুখ-দুঃখ লইয়া একেবারে চলিয়া গিয়াছে। তাহারাও যখন জীবনের খেলা খেলিত ঠিক আমাদের মতো করিয়াই খেলিত, এমনি করিয়াই কাঁদিত— তাহারা ছায়া ছিল না, মায়া ছিল না, কাহিনী ছিল না। তাহাদের গায়েও বাতাস ঠিক এমনি জীবন্তভাবেই লাগিত— তাহারা তাহাদের বাগান হইতে ফুল তুলিত— তাহারা এককালে বালক-বালিকা ছিল— যখন মা-বাপের কোলে বসিয়া হাসিত, তখন মনে হইত না তাহারাও বড়ো হইবে। কিন্তু তবুও তাহারা আজিকার এই চারি দিকের জীবময় লোকারণ্যের মধ্যে কেমন করিয়া একেবারে 'নাই' হইয়া গেল। বাগানে এই যে বহুবৃদ্ধ বকুল গাছটি দেখিতেছি— একদিন কোন্ সকাল বেলায় কী সাধ করিয়া কে একজন ইহা রোপণ করিতেছিল— সে জানিত সে ফুল তুলিবে, সে মালা গাঁথিবে; সেই মানুষটি শুধু নাই, সেই সাধটি শুধু নাই, কেবল ফুল ফুটিতেছে আর ঝরিয়া পড়িতেছে। আমি যখন ফুল সংগ্রহ করিতেছি তখন কি জানি কাহার আশার ধন কুড়াইতেছি, কাহার যত্নের ধনে মালা গাঁথিতেছি! হায় হায়, সে যদি আসিয়া দেখে, সে যাহাদিগকে যত্ন করিত, সে যাহাদিগকে রাখিয়া গিয়াছে, তাহারা আর তাহার নাম করে না, তাহারা আর তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেয় না— যেন তাহারা আপনিই হইয়াছে, আপনিই আছে এমনি ভান করে— যেন তাহাদের সহিত কাহারো যোগ ছিল না!

—

কিন্তু, এই বুঝি এ জগতের নিয়ম! আর, এ নিয়মের অর্থও বুঝি আছে! যতদিন কাজ করিবে ততদিন প্রকৃতি তোমাকে মাথায় করিয়া রাখিবে। ততদিন ফুল তোমার জন্যই ফুটে, আকাশের সমস্ত জ্যোতিষ্ক তোমার জন্যই আলো ধরিয়া থাকে, সমস্ত পৃথিবীকে তোমারই বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যেই তোমা দ্বারা আর কোনো কাজ পাওয়া যায় না, যেই তুমি মৃত হইলে, অমনি সে তাড়াতাড়ি তোমাকে সরাইয়া ফেলে— তোমাকে চোখের আড়াল করিয়া দেয়— তোমাকে এই জগৎ দৃশ্যের নেপথ্যে দূর করিয়া দেয়। খরতর কালস্রোতের মধ্যে তোমাকে খরকুটার মতো ঝাঁটাইয়া ফেলে, তুমি হু হু করিয়া ভাসিয়া যাও, দিন-দুই বাদে তোমার আর একেবারে নাগাল পাওয়া যায় না। এমন না হইলে মৃতেরাই এ জগৎ অধিকার করিয়া থাকিত, জীবিতদের এখানে স্থান থাকিত না। কারণ, মৃতই অসংখ্য, জীবিত নিতান্ত অল্প। এত মৃত অধিবাসীর জন্য

আমাদের হৃদয়েও স্থান নাই। কাজেই অকর্মণ্য হইলে যত শীঘ্র সম্ভব প্রকৃতি জগৎ হইতে আমাদিগকে একেবারে পরিষ্কার করিয়া ফেলে। আমাদের চিরজীবনের কাজের, চিরজীবনের ভালোবাসার এই পুরস্কার! কিন্তু পুরস্কার পাইবে কে বলিয়াছিল! এই তো চিরদিন হইয়া আসিতেছিল, এই তো চিরদিন হইবে। তাহা যদি সত্য হয়, তবে এই অতিশয় কঠিন নিয়মের মধ্যে আমি থাকিতে চাই না। আমি সেই বিস্মৃতদের মধ্যে যাইতে চাই— তাহাদের জন্য আমার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা হয়তো আমাকে ভুলে নাই, তাহারা হয়তো আমাকে চাহিতেছে! এককালে এ জগৎ তাহাদেরই আপনার রাজ্য ছিল— কিন্তু তাহাদেরই আপনার দেশ হইতে তাহাদিগকে সকলে নির্বাসিত করিয়া দিতেছে— কেহ তাহাদের চিহ্নও রাখিতে চাহিতেছে না। আমি তাহাদের জন্য স্থান করিয়া রাখিয়াছি, তাহারা আমার কাছে থাকুক। বিস্মৃতিই যদি আমাদের অনন্তকালের বাসা হয় আর স্মৃতি যদি কেবলমাত্র দুদিনের হয় তবে সেই আমাদের স্বদেশেই যাই-না কেন। সেখানে আমার শৈশবের সহচর আছে; সে আমার জীবনের খেলাঘর এখান হইতে ভাঙিয়া লইয়া গেছে— যাবার সময় সে আমার কাছে কাঁদিয়া গেছে— যাবার সময় সে আমাকে তাহার শেষ ভালোবাসা দিয়া গেছে। এই মৃত্যুর দেশে এই জগতের মধ্যাহ্ন কিরণে কি তাহার সেই ভালোবাসার উপহার প্রতি মুহূর্তেই শুকাইয়া ফেলিব! আমার সঙ্গে তাহার যখন দেখা হইবে, তখন কি তাহার আজীবনের এত ভালোবাসার পরিণামস্বরূপ আর কিছুই থাকিবে না, আর কিছুই তাহার কাছে লইয়া যাইতে পারিব না কেবল কতকগুলি নীরস স্মৃতির শুষ্ক মালা! সেগুলি দেখিয়া কি তাহার চোখে জল আসিবে না!

—

হে জগতের বিস্মৃত, আমার চিরস্মৃত, আগে তোমাকে যেমন গান শুনাইতাম, এখন তোমাকে তেমন শুনাইতে পারি না কেন? এ-সব লেখা যে আমি তোমার জন্য লিখিতেছি। পাছে তুমি আমার কণ্ঠস্বর ভুলিয়া যাও, অনন্তের পথে চলিতে চলিতে যখন দৈবাৎ তোমাতে আমাতে দেখা হইবে, তখন পাছে তুমি আমাকে চিনিতে না পার, তাই প্রতিদিন তোমাকে স্মরণ করিয়া আমার এই কথাগুলি তোমাকে বলিতেছি, তুমি কি শুনিতেছ না! এমন একদিন আসিবে যখন এই পৃথিবীতে আমার কথার একটিও কাহারো মনে থাকিবে না— কিন্তু ইহার একটি-দুটি কথা ভালোবাসিয়া তুমিও কি মনে রাখিবে না! যে-সব লেখা তুমি এত ভালোবাসিয়া শুনিতে, তোমার সঙ্গেই যাহাদের বিশেষ যোগ, একটু আড়াল হইয়াছ বলিয়াই তোমার সঙ্গে আর কি তাহাদের কোনো সম্বন্ধ নাই! এত পরিচিত লেখার একটি অক্ষরও মনে থাকিবে না? তুমি কি আর-এক দেশে আর-এক নূতন কবির কবিতা শুনিতেছ?

—

আমরা যাহাদের ভালোবাসি তাহারা আছে বলিয়াই যেন এই জ্যোৎস্না রাত্রির একটা অর্থ আছে— বাগানের এই ফুলগাছগুলিকে এমনিতরো দেখিতে হইয়াছে— নহিলে তাহারা যেন আর-একরকম দেখিতে হইত। তাই যখন একজন প্রিয় ব্যক্তি চলিয়া যায়, তখন সমস্ত পৃথিবীর উপর দিয়া যেন একটা মরুর বাতাস বহিয়া যায়— মনে আশ্চর্য বোধ হয় তবুও কেন পৃথিবীর উপরকার সমস্ত গাছপালা একেবারে শুকাইয়া গেল না। যদিও তাহারা থাকে তবু তাহাদের থাকিবার একটা যেন কারণ খুঁজিয়া পাই না! জগতের সমুদয় সৌন্দর্য যেন আমাদের প্রিয়-ব্যক্তিকে তাহাদের মাঝখানে বসাইয়া রাখিবার জন্য। তাহারা আমাদের ভালোবাসার সিংহাসন। আমাদের ভালোবাসার চারি দিকে তাহারা জড়াইয়া উঠে, লতাইয়া উঠে, ফুটিয়া উঠে। এক-একদিন কী মাহেন্দ্রক্ষণে প্রিয়তমের মুখ দেখিয়া আমাদের হৃদয়ের প্রেম তরঙ্গিত হইয়া উঠে. প্রভাতে চারি দিকে চাহিয়া দেখি সৌন্দর্যসাগরেও তাহারই একতালে আজ তরঙ্গ উঠিয়াছে— কত বিচিত্র বর্ণ, কত বিচিত্র গন্ধ, কত বিচিত্র গান। কাল যেন জগতে এত মহোৎসব ছিল না। অনেকদিনের পরে সহসা যেন সূর্যোদয় হইল। হৃদয়ও যখন আলো দিতে লাগিল সমস্ত জগৎও

তাহার সৌন্দর্যচ্ছটা উদ্ভাসিত করিয়া দিল। সমস্ত জগতের সহিত হৃদয়ের এক অপূর্ব মিলন হইল! একজনের সহিত যখন আমাদের মিলন হয়, তখন সে মিলন আমরা কেবল তাহারই মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারি না, অলক্ষ্যে অদৃশ্যে সে মিলন বিস্তৃত হইয়া জগতের মধ্যে গিয়া পৌঁছায়। সূচ্যগ্র ভূমির জন্যও যখন আলো জ্বালা হয়, তখন সে আলো সমস্ত ঘরকে আলো না করিয়া থাকিতে পারে না!

—

যখন আমাদের প্রিয়-বিয়োগ হয়, তখন সমস্ত জগতের প্রতি আমাদের বিষম সন্দেহ উপস্থিত হয় অথচ সন্দেহ করিবার কোনো কারণ দেখিতে পাই না বলিয়া হৃদয়ের মধ্যে কেমন আঘাত লাগে; যেমন নিতান্ত কোনো অভূতপূর্ব ঘটনা দেখিলে আমাদের সহসা সন্দেহ হয় আমরা স্বপ্ন দেখিতেছি, আমাদের হাতের কাছে যে জিনিস থাকে তাহা ভালো করিয়া স্পর্শ করিয়া দেখি এ সমস্ত সত্য কি না; তেমনি আমাদের প্রিয়জন যখন চলিয়া যায়, তখন আমরা জগৎকে চারি দিকে স্পর্শ করিয়া দেখি— ইহারা সব ছায়া কি না, মায়া কি না, ইহারাও এখনই চারি দিক হইতে মিলাইয়া যাইবে কি না। কিন্তু যখন দেখি ইহারা অচল রহিয়াছে, তখন জগৎকে যেন তুলনায় আরও দ্বিগুণ কঠিন বলিয়া মনে হয়। দেখিতে পাই যে, তখন যে ফুলেরা বলিত, সে না থাকিলে ফুটিব না, যে জ্যোৎস্না বলিত সে না থাকিলে উঠিব না, তাহারাও আজ ঠিক তেমনি করিয়াই ফুটিতেছে, তেমনি করিয়াই উঠিতেছে। তাহারা তখন যতখানি সত্য ছিল, এখনও ঠিক ততখানি সত্যই আছে— একচুলও ইতস্তত হয় নাই!—

এইজন্য সে যে নাই এই কথাটাই অত্যন্ত বেশি করিয়া মনে হয়, কারণ, সে ছাড়া আর সমস্তই অতিশয় আছে।

—

আমাকে যাহারা চেনে সকলেই তো আমার নাম ধরিয়া ডাকে, কিন্তু সকলেই কিছু একই ব্যক্তিকে ডাকে না এবং সকলকেই কিছু একই ব্যক্তি সাড়া দেয় না! এক-একজনে আমার এক-একটা অংশকে ডাকে মাত্র, আমাকে তাহারা ততটুকু বলিয়াই জানে। এইজন্য, আমরা যাহাকে ভালোবাসি তাহার একটা নূতন নামকরণ করিতে চাই; কারণ সকলের-সে ও আমার-সে বিস্তর প্রভেদ। আমার যে গেছে সে আমাকে কতদিন হইতে জানিত— আমাকে কত প্রভাতে, কত দ্বিপ্রহরে, কত সন্ধ্যাবেলায় সে দেখিয়াছে! কত বসন্তে, কত বর্ষায় কত শরতে আমি তাহার কাছে ছিলাম! সে আমাকে কত স্নেহ করিয়াছে, আমার সঙ্গে কত খেলা করিয়াছে, আমাকে কত শত সহস্র বিশেষ ঘটনার মধ্যে খুব কাছে থাকিয়া দেখিয়াছে! যে-আমাকে সে জানিত সে সেই সতেরো বৎসরের খেলাধুলা, সতেরো বৎসরের সুখ-দুঃখ, সতেরো বৎসরের বসন্ত বর্ষা। সে আমাকে যখন ডাকিত, তখন আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের অধিকাংশই, আমার এই সতেরো বৎসর তাহার সমস্ত খেলাধুলা লইয়া তাহাকে সাড়া দিত। ইহাকে সে ছাড়া আর কেহ জানিত না, জানে না। সে চলিয়া গেছে, এখন আর ইহাকে কেহ ডাকে না, এ আর কাহারো ডাকে সাড়া দেয় না! তাঁহার সেই বিশেষ কণ্ঠস্বর, তাঁহার সেই অতি পরিচিত সুমধুর স্নেহের আহ্বান ছাড়া জগতে এ আর কিছুই চেনে না। বহির্জগতের সহিত এই ব্যক্তির আর কোনো সম্বন্ধই রহিল না— সেখান হইতে এ একেবারেই পালাইয়া আসিল— এ-জন্মের মতো আমার হৃদয়-কবরের অতি গুপ্ত অন্ধকারের মধ্যে ইহার জীবিত সমাধি হইল।

আমি কেবল ভাবিতেছি, এমন তো আরও সতেরো বৎসর যাইতে পারে! আবার তো কত নূতন ঘটনা ঘটিবে কিন্তু তাহার সহিত তাঁহার তো কোনো সম্পর্কই থাকিবে না। কত নূতন সুখ আসিবে, কিন্তু তাহার জন্য তিনি তো হাসিবেন না— কত নূতন দুঃখ আসিবে কিন্তু তাহার জন্য তিনি তো কাঁদিবেন না। কত শত দিন-রাত্রি একে একে আসিবে কিন্তু তাহারা একেবারেই তিনি-হীন হইয়া আসিবে! আমার সম্পর্কীয় যাহা-কিছু তাহার প্রতি তাঁহার বিশেষ স্নেহ আর এক

মুহূর্তের জন্যও পাইব না! মনে হয়— তাঁহারও কত নূতন সুখ-দুঃখ ঘটিবে, তাহার সহিত আমার কোনো যোগ নাই। যদি অনেকদিন পরে সহসা দেখা হয়, তখন তাঁহার নিকটে আমার অনেকটা অজানা, আমার নিকট তাঁহার অনেকটা অপরিচিত। অথচ আমরা উভয়ের নিতান্ত আপনার লোক।

কোথায় নহবৎ বসিয়াছে। সকাল হইতে-না-হইতেই বিবাহের বাঁশি বাজিয়া উঠিয়াছে। আগে বিছানা হইতে নূতন ঘুম ভাঙিয়া যখন এই বাঁশি শুনিতে পাইতাম তখন জগৎকে কী উৎসবময় বলিয়া মনে হইত। বাঁশিতে কেবল আনন্দের কণ্ঠস্বরটুকুমাত্র দূর হইতে শুনিতে পাইতাম, বাকিটুকু কী মোহময় আকারে কল্পনায় উদিত হইত! কত সুখ, কত হাসি, কত হাস্য-পরিহাস, কত মধুময় লজ্জা, আত্মীয়-পরিজনের আনন্দ, আপনার লোকদের সঙ্গে কত সুখের সম্বন্ধে জড়িত হওয়া, ভালোবাসার লোকের মুখের দিকে চাওয়া, ছেলেদের কোলে করা, পরিহাসের লোকদের সহিত স্নেহময় মধুর পরিহাস করা— এমন কত-কী দৃশ্য সূর্যালোকে চোখের সমুখে দেখিতাম। এখন আর তাহা হয় না। আজি ওই বাঁশি শুনিয়া প্রাণের একজায়গা কোথায় হাহাকার করিতেছে। এখন কেবল মনে হয়, বাঁশি বাজাইয়া যে-সকল উৎসব আরম্ভ হয়, সে-সব উৎসবও কখন একদিন শেষ হইয়া যায়। তখন আর বাঁশি বাজে না। বাপ-মায়ের যে স্নেহের ধনটি কাঁদিয়া অবশেষে কঠিন পৃথিবী হইতে নিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া যায়— একদিন সকালে মধুর সূর্যের আলোতে তাহার বিবাহেও বাঁশি বাজিয়াছিল। তখন সে ছেলেমানুষ ছিল, মনে কোনো দুঃখ ছিল না, কিছুই সে জানিত না। বাঁশির গানের মধ্যে, হাসির মধ্যে, লোকজনের আনন্দের মধ্যে, চারি দিকে ফুলের মালা ও দীপের আলোর মধ্যে সেই ছোটো মেয়েটি গলায় হার পরিয়া পায়ে দুগাছি মল পরিয়া বিরাজ করিতেছিল। অল্প বয়সে খুব বৃহৎ খেলা খেলিতে যেরূপ আনন্দ হয় তাহার সেইরূপ আনন্দ হইতেছিল। কে জানিত সে কী খেলা খেলিতে আরম্ভ করিল। সেদিনও প্রভাত এমনি মধুর ছিল!

দেখিতে দেখিতে কত লোক তাহার নিতান্ত আত্মীয় হইল, তাহার প্রাণের খুব কাছাকাছি বাস করিতে লাগিল, পরের সুখ-দুঃখ লইয়া সে নিজের সুখ-দুঃখ রচনা করিতে লাগিল। সে তাহার কোমল হৃদয়খানি লইয়া দুঃখের সময় সান্ত্বনা করিত, কোমল হাত দুখানি লইয়া রোগের সময় সেবা করিত। সেদিন বাঁশি বাজাইয়া আসিল, সে আজ গেল কী করিয়া! সে কেন চোখের জল ফেলিল! সে তাহার গভীর হৃদয়ের অতৃপ্তি, তাহার আজন্ম কালের দুরাশা, শ্মশানের চিতার মধ্যে বিসর্জন দিয়া গেল কোথায়! সে কেন বালিকাই রহিল না, তাহার ভাই-বোনদের সঙ্গে চিরদিন খেলা করিল না! সে আপনার সাধের জিনিস-সকল ফেলিয়া, আপনার ঘর ছাড়িয়া, আপনার বড়ো ভালোবাসার লোকদের প্রতি একবার ফিরিয়া না চাহিয়া— যে কোলে ছেলেরা খেলা করিত, যে হাতে সে রোগীর সেবা করিত, সেই স্নেহমাখানো কোল, সেই কোমল হাত, সেই সুন্দর দেহ সত্যসত্যই একেবারে ছাই করিয়া চলিয়া গেল।

কিন্তু সেদিনকার সকালবেলার মধুর বাঁশি কি এত কথা বলিয়াছিল? এমন রোজই কোনো-না-কোনো জায়গায় বাঁশি তো বাজিতেছেই! কিন্তু এই বাঁশি বাজাইয়া কত হৃদয় দলন হইতেছে, কত জীবন মরুভূমি হইয়া যাইতেছে, কত কোমল হৃদয় আমরণকাল অসহায়ভাবে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে নূতন নূতন আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যাইতেছে— অথচ একটি কথা বলিতেছে না, কেবল চোখে তাহাদের কাতরতা এবং হৃদয়ের মধ্যে চিরপ্রচ্ছন্ন তুষের আগুন। সবই যে দুঃখের তাহা নহে কিন্তু সকলেরই তো পরিণাম আছে। পরিণামের অর্থ— উৎসবের প্রদীপ নিবিয়া যাওয়া, বিসর্জনের পর মর্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলা। পরিণামের অর্থ— সূর্যালোক এক মুহূর্তের মধ্যে একেবারে ম্লান হইয়া যাওয়া— সহসা জগতের চারি দিক সুখহীন, শান্তিহীন, প্রাণহীন, উদ্দেশ্যহীন মরুভূমি হইয়া যাওয়া। পরিণামের অর্থ— হৃদয়ের মধ্যে কিছুতেই বলিতেছে না যে,

সমস্তই শেষ হইয়া গেছে অথচ চারি দিকেই তাহার প্রমাণ পাওয়া— প্রতি মুহূর্তে প্রতি নূতন ঘটনায় অতি প্রচণ্ড আঘাতে নূতন করিয়া অনুভব করা যে— আর হইবে না, আর ফিরিবে না, আর নয়, আর কিছুতেই নয়। সেই অতি নিষ্ঠুর কঠিন বজ্র পাষাণময় 'নয়' নামক প্রকাণ্ড লৌহদ্বারের সম্মুখে মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও সে এক তিল উদ্ঘাটিত হয় না।

—

মানুষে মানুষে চিরদিনের মিলন যে কী গুরুতর ব্যাপার তাহা সহসা সকলের মনে হয় না। তাহা চিরদিনের বিচ্ছেদের চেয়ে বেশি গুরুতর বলিয়া মনে হয়। আমরা অন্ধভাবে জগতের চারি দিক হইতে গড়াইয়া আসিতেছি, কে কোথায় আসিয়া পড়িতেছি তাহার ঠিকানা নাই। যে যেখানকার নয়, সে হয়তো সেইখানেই রহিয়া গেল। এ জীবনে আর তাহার নিষ্কৃতি নাই। যাহা বাসস্থান হওয়া উচিত ছিল তাহাই কারাগার হইয়া দাঁড়াইল। আমরা সচেতন জড়পিণ্ডের মতো অহর্নিশি যে গড়াইয়া চলিতেছি আমরা কি জানিতে পারিতেছি পদে পদে কত হৃদয়ের কত স্থান মাড়াইয়া চলিতেছি, আশেপাশের কত আশা কত সুখ দলন করিয়া চলিতেছি। সকল সময়ে তাহাদের বিলাপটুকুও শুনিতে পাই না, শুনিলেও সকল সময়ে অনুভব করিতে পারি না। সারাদিন আঘাত তো করিতেছিই, আঘাত তো সহিতেছিই, কিছুতেই বাঁচাইয়া চলিতে পারিতেছি না! তাহার কারণ, আমরা পরস্পরকে ভালো করিয়া বুঝিতে পারি না— দেখিতে পাই না— কোন্‌খানে যে কাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়িলাম জানিতেই পারি না। আমরা শৈলশিখর-চ্যুত পাষাণ-খণ্ডের মতো। আমাদের পথে পড়িয়া দুর্ভাগা ফুল পিষ্ট হইতেছে, লতা ছিন্ন হইতেছে, তৃণ শুষ্ক হইতেছে— আবার, হয়তো, আমরা কাহার সুখের কুটিরের উপর অভিশাপের মতো পড়িয়া তাহার সুখের সংসার ছারখার করিয়া দিতেছি। ইহার কোনো উপায় দেখা যায় না। সকলেরই কিছু-না-কিছু ভার আছেই, সকলেই জগৎকে কিছু-না-কিছু পীড়া দেয়ই। যতক্ষণ তাহারা দৈবক্রমে তাহাদের ভারসহনক্ষম স্থানে তিষ্ঠিয়া থাকে ততক্ষণ সমস্ত কুশল, কিন্তু সময়ে তাহারা এমন স্থানে আসিয়া পৌঁছায় যেখানে তাহাদের ভার আর সয় না। যাহার উপর পা দেয় সেও ভাঙিয়া যায়, আর অনেক সময় যে পা দেয় সেও পড়িয়া যায়।

—

হৃদয়ে যখন গুরুতর আঘাত লাগে তখন সে ইচ্ছাপূর্বক নিজেকে আরও যেন অধিক পীড়া দিতে চায়। এমন-কি, সে তাহার আশ্রয়ের মূলে কুঠারাঘাত করিতে থাকে। যে-সকল বিশ্বাস তাহার জীবনের একমাত্র নির্ভর তাহাদের সে জলাঞ্জলি দিতে চায়। নিষ্ঠুর তর্কদিগের ভয়ে যে প্রিয় বিশ্বাসগুলিকে সযত্নে হৃদয়ের অন্তঃপুরে রাখিয়া দিত, আজ অনায়াসে তাহাদিগকে তর্কে-বিতর্কে ক্ষত-বিক্ষত করিতে থাকে। প্রিয়বিয়োগে কেহ যদি তাহাকে সান্ত্বনা করিতে আসিয়া বলে— 'এত প্রেম, এত স্নেহ, এত সহৃদয়তা, তাহার পরিণাম কি ওই খানিকটা ভস্ম। কখনোই নহে।' তখন সে যেন উদ্ধত হইয়া বলে— 'আশ্চর্য কী! তেমন সুন্দর মুখখানি— কোমলতায় সৌন্দর্যে লাবণ্যে হৃদয়ের ভাবে আচ্ছন্ন সেই জীবন্ত চলন্ত দেহখানি সেও যে— আর কিছু নয়, দুই মুঠা ছাইয়ে পরিণত হইবে এই বা কে হৃদয়ের ভিতর হইতে বিশ্বাস করিতে পারিত। বিশ্বাসের উপরে বিশ্বাস কী!' এই বলিয়া সে বুক ফাটিয়া কাঁদিতে থাকে। সে অন্ধকার জগৎ-সমুদ্রের মাঝখানে নিজের নৌকাডুবি করিয়া আর কূল-কিনারা দেখিতে চায় না। তাহার খানিকটা গিয়াছে বলিয়া সে আর বাকি কিছুই রাখিতে চায় না। সে বলে, তাহার সঙ্গে সমস্তটাই যাক। কিন্তু সমস্তটা তো যায় না, আমরা নিজেই বাকি থাকি যে। তাই যদি হইল তবে কেন আমরা সহসা আপনাকে উন্মাদের মতো নিরাশ্রয় করিয়া ফেলি? হৃদয়ের এই অন্ধকারের সময় আশ্রয়কে আরও বেশি করিয়া ধরি না কেন? এ সময়ে মনে করি না কেন, বিশ্বের নিয়ম কখনোই এত ভয়ানক ও এত নিষ্ঠুর হইতেই পারে না! সে আমাকে একেবারেই ডুবাইবে না, আমাকে আশ্রয় দিবেই। যেখানেই হউক এক জায়গায় কিনারা আছেই, তা সে সমুদ্রের তলেই হউক আর সমুদ্রের পারেই হউক—

মরিয়াই হউক, আর বাঁচিয়াই হউক! মিছামিছি তো আর ভাবা যায় না।

তুমি বলিতেছ, প্রকৃতি আমাদিগকে প্রতারণা করিতেছে। আমাদিগকে কেবল ফাঁকি দিয়া কাজ করাইয়া লইতেছে। কাজ হইয়া গেলেই সে আমাদিগকে গলাধাক্কা দিয়া দূর করিয়া দেয়। কিন্তু এতবড়ো যাহার কারখানা, যাহার রাজ্যে এমন বিশাল মহত্ত্ব বিরাজ করিতেছে সে কি সত্যসত্যই এই কোটি কোটি অসহায় জীবকে একেবারেই ফাঁকি দিতে পারে! সে কি এই-সমস্ত সংসারের তাপে তাপিত, অহর্নিশি কার্যতৎপর, দুঃখে ভাবনার ভারাক্রান্ত দীনহীন গলদ্‌ঘর্ম প্রাণীদিগকে মেকি টাকায় মাহিয়ানা দিয়া কাজ করাইয়া লইতেছে। সে টাকা কি কোথাও ভাঙাইতে পারা যাইবে না! এখানে না হয়, আর কোথাও! এমন ঘোরতর নিষ্ঠুরতা ও হীন প্রবঞ্চনা কি এতবড়ো মহত্ত্ব ও এতবড়ো স্থায়িত্বের সহিত মিশ খায়! কেবলমাত্র ফাঁকির জাল গাঁথিয়া গাঁথিয়া কি এমনতরো অসীম ব্যাপার নির্মিত হইতে পারিত। কেবলমাত্র আশ্বাসে আজন্মকাল কাজ করিয়া যদি অবশেষে হৃদয়ের শীতবস্ত্রটুকুও পৃথিবীতে ফেলিয়া পুরস্কারস্বরূপ কেবলমাত্র অতৃপ্তি ও অশ্রুজল হইয়া সকলকেই মরণের মহামরুর মধ্যে নির্বাসিত হইতে হয়— তবে এই অভিশপ্ত রাক্ষস সংসার নিজের পাপসাগরে নিজে কোন্‌কালে ডুবিয়া মরিত। কারণ, প্রকৃতির মধ্যেই ঋণ এবং পরিশোধের নিয়মের কোথাও ব্যতিক্রম নাই। কেহই এক কড়ার ঋণ রাখিয়া যাইতে পারে না, তাহার সুদসুদ্ধ শুধিয়া যাইতে হয়— এমন-কি, পিতার ঋণ পিতামহের ঋণ পর্যন্ত শুধিতে সমস্ত জীবন যাপন করিতে হয়। এমন স্থলে প্রকৃতি যে চিরকাল ধরিয়া অসংখ্য জীবের দেনদার হইয়া থাকিবে এমন সম্ভব বোধ হয় না, তাহা হইলে সে নিজের নিয়মেই নিজে মারা পড়িত।

তুমি যে-ঘরটিতে রোজ সকালে বসিতে, তাহারই দ্বারে স্বহস্তে যে-রজনীগন্ধার গাছ রোপণ করিয়াছিলে তাহাকে কি আর তোমার মনে আছে। তুমি যখন ছিলে, তখন তাহাতে এত ফুল ফুটিত না, আজ সে কত ফুল ফুটাইয়া প্রতিদিন প্রভাতে তোমার সেই শূন্য ঘরের দিকে চাহিয়া থাকে। সে যেন মনে করে বুঝি তাহারই 'পরে অভিমান করিয়া তুমি কোথায় চলিয়া গিয়াছ! তাই সে আজ বেশি করিয়া ফুল ফুটাইতেছে। তোমাকে বলিতেছে— তুমি এসো, তোমাকে রোজ ফুল দিব। হায় হায়, যখন সে দেখিতে চায় তখন সে ভালো করিয়া দেখিতে পায় না— আর যখন সে শূন্য হৃদয়ে চলিয়া যায়, এ জন্মের মতো দেখা ফুরাইয়া যায়— তখন আর তাহাকে ফিরিয়া ডাকিলে কী হইবে! সমস্ত হৃদয় তাহার সমস্ত ভালোবাসার ডালাটি সাজাইয়া তাহাকে ডাকিতে থাকে। আমিও তোমার গৃহের শূন্যদ্বারে বসিয়া প্রতিদিন সকালে একটি একটি করিয়া রজনীগন্ধা ফুটাইতেছি— কে দেখিবে! ঝরিয়া পড়িবার সময় কাহার সদয় চরণের তলে ঝরিয়া পড়িবে! আর-সকলেই ইচ্ছা করিলে এ ফুল ছিঁড়িয়া লইয়া মালা গাঁথিতে পারে, ফেলিয়া দিতে পারে— কেবল তোমারই স্নেহের দৃষ্টি এক মুহূর্তের জন্যও ইহাদের উপরে আর পড়িবে না!

—

তোমার ফুলবাগানে যখন চারি দিকেই ফুল ফুটিতেছে, তখন যে তোমাকে দেখিতে পাই না, তাহাতে তেমন আশ্চর্য নাই। কিন্তু যখন দেখি ঘরে ঘরে রোগের মূর্তি, তখনও যে রোগীর শিয়রের কাছে তুমি বসিয়া নাই, এ যেন কেমন বিশ্বাস হয় না। উৎসবের সময় তুমি নাই, বিপদের সময় তুমি নাই, রোগের সময় তুমি নাই! তোমার ঘরে যে প্রতিদিন অতিথি আসিতেছে— হৃদয়ের সরল প্রীতির সহিত তাহাদিগকে কেহ যে আদর করিয়া বসিতে বলে না। তুমি যাহাকে বড়ো ভালোবাসিতে সেই ছোটো মেয়েটি যে আজ সন্ধ্যাবেলায় আসিয়াছে— তাহাকে আদর করিয়া খেতে দিবে কে! এখন আর কে কাহাকে দেখিবে! যে অযাচিত-প্রীতি স্নেহ-সান্ত্বনায় সমস্ত সংসার অভিষিক্ত ছিল সে নির্ঝর শুষ্ক হইয়া গেল— এখন কেবল কতকগুলি স্বতন্ত্র স্বার্থপর কঠিন পাষাণখণ্ড তাহারই পথে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিল।

—

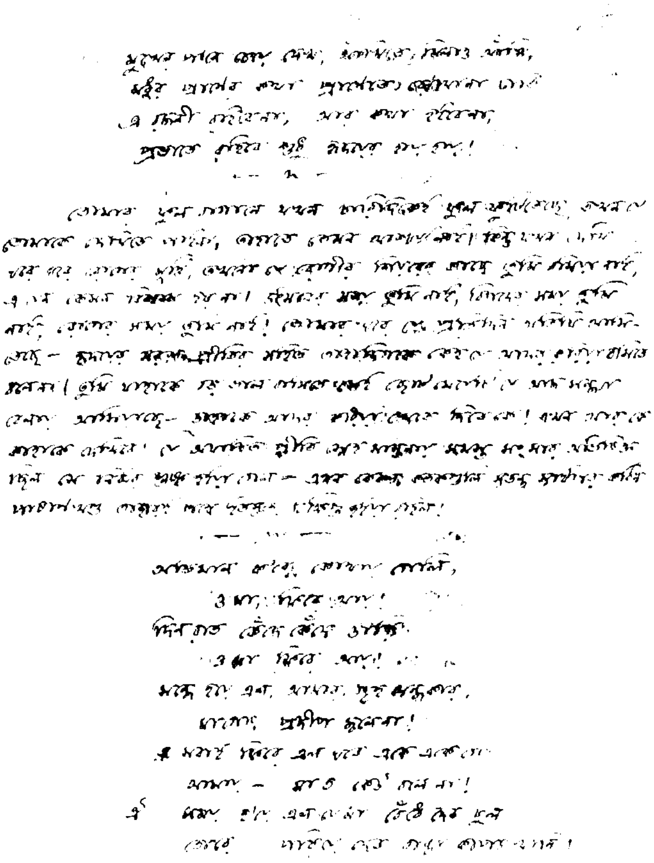

পুষ্পাঞ্জলি
রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপিচিত্র

যাহারা ভালো, যাহারা ভালোবাসিতে পারে, যাহাদের হৃদয় আছে সংসারে তাহাদের কিসের সুখ! কিছু না, কিছু না। তাহারা তারের যন্ত্রের মতো, বীণার মতো— তাহাদের প্রত্যেক কোমল স্নায়ু, প্রত্যেক শিরা সংসারের প্রতি আঘাতে বাজিয়া উঠিতেছে। সে গান সকলেই শুনে, শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হয়— তাহাদের বিলাপ ধ্বনি রাগিণী হইয়া উঠে, শুনিয়া কেহ নিশ্বাস ফেলে না। তাই যেন হইল, কিন্তু যখন আঘাত আর সহিতে পারে না, যখন তার ছিঁড়িয়া যায়, যখন আর বাজে না, তখন কেন সকলে তাহাকে নিন্দা করে, তখন কেন কেহ বলে না আহা!— তখন কেন তাহাকে সকলে তুচ্ছ করিয়া বাহিরে ফেলিয়া দেয়! হে ঈশ্বর, এমন যন্ত্রটিকে তোমার কাছে লুকাইয়া রাখ-না কেন— ইহাকে আজিও সংসারের হাটের মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছে কেন— তোমার স্বর্গলোকের সংগীতের জন্য ইহাকে ডাকিয়া লও— পাষণ্ড নরাধম পাষাণহৃদয় যে ইচ্ছা সেই ঝন্‌ঝন্‌ করিয়া চলিয়া যায়, অকাতরে তার ছিঁড়িয়া হাসিতে থাকে— খেলাচ্ছলে তাহার প্রাণে সংগীত শুনিয়া তার পরে যে যার ঘরে চলিয়া যায়, আর মনে রাখে না। এ বীণাটিকে তাহারা দেবতার অনুগ্রহ বলিয়া মনে করে না— তাহারা আপনাকেই প্রভু বলিয়া জানে— এইজন্য কখনো-বা উপহাস করিয়া কখনো-বা অনাবশক জ্ঞান করিয়া এই সুমধুর সুকোমল পবিত্রতার উপরে তাহাদের কঠিন চরণের আঘাত করে, সংগীত চিরকালের জন্য নীরব হইয়া যায়।

ভারতী
বৈশাখ ১২৯২

বিবিধ প্রসঙ্গ ১

আমি মাঝে মাঝে ভাবি, এই পৃথিবী কত লক্ষকোটি মানুষের কত মায়া কত ভালোবাসা দিয়া জড়ানো। কত যুগ-যুগান্তর হইতে কত লোক এই পৃথিবীর চারি দিকে তাহাদের ভালোবাসার জাল গাঁথিয়া আসিতেছে! মানুষ যেটুকু ভূমিখণ্ডে বাস করে, সেটুকুকে কতই ভালোবাসে। সেইটুকুর মধ্যে চারি দিকে গাছটি পালাটি, ছেলেটি, গোরুটি, তাহার ভালোবাসার কত জিনিসপত্র দেখিতে দেখিতে জাগিয়া উঠে; তাহার প্রেমের প্রভাবে সেইটুকু ভূমিখণ্ড কেমন মায়ের মতো মূর্তি ধারণ করে, কেমন পবিত্র হইয়া উঠে, মানুষের হৃদয়ের আবির্ভাবে বন্য প্রকৃতির কঠিন মৃত্তিকা লক্ষ্মীর পদতলস্থ শতদলের মতো কেমন অপূর্ব সৌন্দর্যপ্রাপ্ত হয়। ছেলেপিলেদের কোলে করিয়া মানুষ যে গাছের তলাটিতে বসে সে গাছটিকে মানুষ কত ভালোবাসে, প্রণয়িনীকে পাশে লইয়া মানুষ যে আকাশের দিকে চায় সেই আকাশের প্রতি তাহার প্রেম কেমন প্রসারিত হইয়া যায়! যেখানেই মানুষ প্রেম রোপণ করে, দেখিতে দেখিতে সেই স্থান প্রেমের শস্যে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। মানুষ চলিয়া যায় কিন্তু তাহার প্রেমের পাশে পৃথিবীকে সে বাঁধিয়া রাখিয়া যায়। সে ভালোবাসিয়া যে গাছটি রোপণ করিয়াছিল সে গাছটি রহিয়া গেছে, তাহার ঘর-বাড়িটি আছে, ভালোবাসিয়া সে কত কাজ করিয়াছে সে কাজগুলি আছে— জয়দেব তাঁহার কেন্দুবিল্বগ্রামের তমালবনে বসিয়া ভালোবাসিয়া কতদিন মেঘের দিকে চাহিয়া গিয়াছেন, তিনি নাই কিন্তু তাঁহার সেই বহুদিনসঞ্চিত ভালোবাসা একটি গানের ছত্রে রাখিয়া গিয়াছেন— মেঘৈর্মেদুরম্বরম্বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ। অতীত কালের সংখ্যাতীত মৃত মনুষ্যের প্রেমে পৃথিবী আচ্ছন্ন; সমস্ত নগর গ্রাম কানন ক্ষেত্রে বিস্মৃত মনুষ্যের প্রেম শতসহস্র আকারে শরীর ধারণ করিয়া আছে, শতসহস্র আকারে বিচরণ করিতেছে; মৃত মনুষ্যের প্রেম ছায়ার মতো আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে; আমাদের সঙ্গে শয়ন করিতেছে, আমাদের সঙ্গে উত্থান করিতেছে।

২

আমরাও সেই মৃত মনুষ্যের প্রেম, নানা ব্যক্তি-আকারে বিকশিত। আমাদের এক-এক জনের মধ্যে অতীত কালের কত কোটি কোটি মাতার মাতৃস্নেহ, কত কোটি কোটি পিতার পিতৃস্নেহ,

কত কোটি কোটি মনুষ্যের প্রণয় প্রেম সৌভ্রাত্র পুঞ্জীভূত হইয়া জীবন লাভ করিয়া বিরাজ করিতেছে। কত বিস্মৃত যুগ-যুগান্তর আমার মধ্যে আজ আবির্ভূত। তাই যখন শুনি আমাদের অতি প্রাচীন পূর্বপুরুষদের সময়েও 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মেঘমাশ্লিষ্ট সানু' দেখা যাইত, তখন এমন অপূর্ব আনন্দ লাভ করি। তখন আমরা আমাদের আপনাদের মধ্যে আমাদের সেই পূর্বপুরুষদিগকে অনুভব করিতে পাই, তাঁহাদের সেই মেঘ-দেখার সুখ আমাদের আপনাদের মধ্যে লাভ করি, বুঝিতে পারি আমাদের পূর্বপুরুষদিগের সহিত আমরা বিচ্ছিন্ন নহি। যাঁহারা গেছেন তাঁহারাও আছেন।

৩

মানুষের প্রেম যেন জড়পদার্থের সঙ্গেও লিপ্ত হইয়া যাইতে পারে। নূতন বাড়ির চেয়ে যে বাড়িতে দুই পুরুষে বাস করিয়াছে সেই বাড়ির যেন বিশেষ একটা কী মাহাত্ম্য আছে! মানুষের প্রেম যেন তাহার ইটকাঠের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আছে এমনি বোধ হয়। বিজনে অরণ্যের বৃক্ষ নিতান্ত শূন্য, কিন্তু যে বৃক্ষের দিকে একজন মানুষ চাহিয়াছে, সে বৃক্ষে সে মানুষের চাহনি যেন জড়িত হইয়া গেছে। বহুদিন হইতে যে গাছের তলায় রৌদ্রের বেলায় মানুষ বসে সে গাছে যেমন হরিৎবর্ণ আছে তেমনি মনুষ্যত্বের অংশ আছে। স্বদেশের আকাশ আমাদের সেই পূর্বপুরুষদিগের প্রেমে পরিপূর্ণ— আমাদের পূর্বপুরুষদিগের নেত্রের আভা আমাদের স্বদেশ-আকাশের তারকার জ্যোতিতে জড়িত। স্বদেশের বিজনে আমাদের শতসহস্র সঙ্গীরা বাস করিতেছেন, স্বদেশে আমাদের দীর্ঘজীবন, আমাদের শতসহস্র বৎসর পরমায়ু।

৪

ছেলেবেলা হইতে দেখিয়া আসিতেছি আমাদের বাড়ির প্রাচীরের কাছে ওই প্রাচীন নারিকেল গাছগুলি সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে। যখনই ওই গাছগুলিকে দেখি তখনই উহাদিগকে রহস্য-পরিপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। উহারা যেন অনেক কথা জানে! তা নহিলে উহারা অমন নিস্তব্ধ দাঁড়াইয়া আছে কেন? বাতাসে অমন ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িতেছে কেন? পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার সময়ে উহাদের মাথার উপরকার ডালপালার মধ্যে অমন অন্ধকার কেন? গাছেরা বাস্তবিক রহস্যময়। উহারা যেন বহুদিন দাঁড়াইয়া তপস্যা করিতেছে। এ পৃথিবীতে সকলেই আনাগোনা করিতেছে, কিন্তু আনাগোনার রহস্য কেহই ভেদ করিতে পারিতেছে না। বৃক্ষের মতো যাহারা মাঝখানে খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহারাই যেন এই অবিশ্রাম আনাগোনার রহস্য জানে। চারি দিকে কত-কে আসিতেছে যাইতেছে উহারা সমস্তই দেখিতেছে, বর্ষার ধারায়, সূর্যকিরণে, চন্দ্রালোকে আপনার গাম্ভীর্য লইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

৫

ছেলেবেলায় এককালে যাহারা এই গাছের তলায় খেলা করিয়াছে, যাহাদের খেলা একেবারে সাঙ্গ হইয়া গেছে, আজ এ গাছ তাহাদের কথা কিছুই বলিতেছে না কেন? আরও কত দ্বিপ্রহর রাত্রে এমনি ভাঙা মেঘের মধ্য হইতে ভাঙা চাঁদের আলো নিদ্রাকুল নেত্রে পরাজিত চেতনার মতো অন্ধকারের এখানে-সেখানে একটু-আধটু জড়াইয়া যাইতেছিল; তেমন রাত্রে কেহ কেহ এই জানলা হইতে নিদ্রাহীন নেত্রে ওই রহস্যময় বৃক্ষশ্রেণীর দিকে চাহিয়াছিল, সে কথা ইহারা আজ মানিতেছে না কেন? সে যে কীভাবে কী মনে করিয়া জীবনের কোন্ কাজের মধ্যে থাকিয়া ওই গাছের দিকে— গাছ অতিক্রম করিয়া ওই আকাশের দিকে— চাহিয়াছিল, ওই গাছে ওই আকাশে তাহার কোনো আভাসই পাই না কেন? যেন এমন জ্যোৎস্না আজ প্রথম হইয়াছে, যেন এ বাতায়ন হইতে আমিই উহাদিগকে আজ প্রথম দেখিতেছি, যেন কোনো মানুষের জীবনের কোনো কাহিনীর সহিত এ গাছ জড়িত নহে। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। ওই দেখো, উহারা যেন দীর্ঘ হইয়া মেঘের দিকে মাথা তুলিয়া সেই দূর অতীতের পানেই চাহিয়া আছে। উহাদের ধীর

গম্ভীর ঝর ঝর শব্দে সেই প্রাচীনকালের কাহিনী যেন ধ্বনিত হইতেছে, আমিই কেবল সকল কথা বুঝিতে পারিতেছি না। উহাদের ধ্যাননেত্রের কাছে অতীতকালের সুখ-দুঃখপূর্ণ দৃষ্টিগুলি বিরাজ করিতেছে, আমিই কেবল সেই দৃষ্টির বিনিময় দেখিতে পাইতেছি না। আজিকার এই জ্যোৎস্নারাত্রির মধ্যে এমন কত রাত্রি আছে; তাহাদের কত আলো-আঁধার লইয়া এই গাছের চারি দিকে তাহারা ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই ওই ছায়ালোকে বেষ্টিত স্তব্ধ প্রাচীন বৃক্ষশ্রেণীর দিকে চাহিয়া আমার হৃদয় গাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ হইয়া যাইতেছে।

৬

শোকে মানুষকে উদাস করিয়া দেয়, অর্থাৎ স্বাধীন করিয়া দেয়। এতদিন জগৎসংসারের প্রত্যেক ক্ষুদ্র জিনিস আমাদের মাথার উপর ভারের মতো চাপিয়া ছিল, আজ শোকের সময় সহসা যেন সমস্ত মাথার উপর হইতে উঠিয়া যায়। চন্দ্র সূর্য আকাশ আর আমাদিগকে ঘেরিয়া রাখে না, সুখ-দুঃখ আশা আর আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখে না, ক্ষুদ্র জিনিসের গুরুত্ব একেবারে চলিয়া যায়। তখন এক মুহূর্তে আবিষ্কার করি যে, আমরা স্বাধীন। যাহাকে এতদিন বন্ধন মনে করিয়াছিলাম তাহা তো বন্ধন নহে, তাহা তো লূতা-তন্তুর মতো বাতাসে ছিঁড়িয়া গেল; বুঝিলাম বন্ধন কোথাও নাই; ধরা না দিলে কেহ কাহাকেও ধরিয়া রাখিতে পারে না; যাহারা বলে আমি তোমাকে বাঁধিয়াছি, তাহারা নিতান্তই ফাঁকি দিতেছে। প্রতিদিনের সুখ-দুঃখ, প্রতিদিনের ধূলিরাশি আমাদের চারি দিকে ভিত্তি রচনা করিয়া দেয়, শোকের এক ঝটিকায় সে-সমস্ত ভূমিসাৎ হইয়া যায়, আমরা অনন্তের রাজপথে বাহির হইয়া পড়ি। এতদিন আমরা প্রতিদিনের মানুষ ছিলাম, এখন আমরা অনন্তকালের জীব; এতদিন আমরা বাড়ি-ঘর-দুয়ারের জীব ছিলাম, এখন আমরা অনন্ত জগতের সীমাহীনতার মধ্যে বাস করি। যাহাদিগকে নিতান্ত আপনার মনে করিয়াছিলাম, তাহারা তত আপনার নহে, সেইজন্য তাহাদিগকে বেশি করিয়া আদর করি, মনে করি এ পান্থশালা হইতে কে কবে কোন্ পথে যাত্রা করিব, এ দুদিনের সৌহার্দ্যে যেন বিচ্ছেদ বা অসম্পূর্ণতা না থাকে। যাহাদিগকে নিতান্ত পর মনে করিতাম তাহারা তত পর নহে, এইজন্য তাহাদিগকে ঘরে ডাকিয়া আনিতে ইচ্ছা করে। এতদিন আমার চারি দিকে একটা গণ্ডি আঁকা ছিল, সে রেখাটাকে দৃঢ় প্রাচীরের অপেক্ষা কঠিন মনে হইত, হঠাৎ উল্লঙ্ঘন করিয়া দেখি সেটা কিছুই নহে, গণ্ডির ভিতরেও যেমন বাহিরেও তেমন। আপনিও যেমন পরও তেমনি। আপনার লোকও চিরদিনের তরে পর হইয়া যায়, তখন একজন পথিকের সহিত যে সম্বন্ধ তাহার সহিত সে সম্বন্ধও থাকে না।

৭

সচরাচর লোকে মাকড়সার জালের সহিত আমাদের জীবনের তুলনা দিয়া থাকে। কথাটা পুরানো হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাহা যে কতটা সত্য তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বন্ধনই আমাদের বাসস্থান। বন্ধন না থাকিলে আমরা নিরাশ্রয়। সে বন্ধন আমরা নিজের ভিতর হইতে রচনা করি। বন্ধন রচনা করা আমাদের এমনই স্বাভাবিক যে, একবার জাল ছিঁড়িয়া গেলে দেখিতে দেখিতে আবার শত শত বন্ধন বিস্তার করি, জাল যে ছেঁড়ে এ কথা একেবারে ভুলিয়া যাই। যেখানেই যাই সেখানেই আমাদের বন্ধন জড়াইতে থাকি। সেখানকার গাছে ভূমিতে আকাশে সেখানকার চন্দ্র সূর্য তারায়, সেখানকার মানুষে, সেখানকার রাস্তায় ঘাটে, সেখানকার আচারে ব্যবহারে, সেখানকার ইতিহাসে, আমাদের জালের শত শত সূত্র লগ্ন করিয়া দিই, মাঝখানে আমরা মস্ত হইয়া বিরাজ করি। কাছে একটা কিছু পাইলেই হইল। এমনই আমরা মাকড়সার জাতি!

৮

সংসারে লিপ্ত না থাকিলে তবেই ভালোরূপে সংসারের কাজ করা যায়। নহিলে চোখে ধুলা লাগে, হৃদয়ে আঘাত লাগে, পায়ে বাধা লাগে। মহৎ লোকেরা আপন আপন মহত্ত্বের উচ্চ

শিখরে দাঁড়াইয়া থাকেন, চারি দিকের ছোটোখাটো খুঁটিনাটি অতিক্রম করিয়া তাঁহারা দেখিতে পান। ক্ষুদ্রসকল বৃহৎ হইয়া তাঁহাদিগকে বাধা দিতে পারে না। তাঁহাদের বৃহত্ত্ববশত চতুর্দিক হইতে তাঁহারা বিচ্ছিন্ন আছেন বলিয়াই চতুর্দিকের প্রতি তাঁহাদের প্রকৃত মমতা আছে। যে ব্যক্তি সংসারের আবর্তের মধ্যস্থলে ঘুরিতেছে, সে কেবল আপনার সহিত পরের সম্বন্ধ দেখিতে পায়, কিন্তু মহৎ যে সে আপনা হইতে বিযুক্ত করিয়া পরকে দেখিতে পায়, এইজন্য পরকে সেই বুঝিতে পারে। কাজ সেই করিতে পারে। হাতের শৃঙ্খল সেই ছিঁড়িয়াছে। প্রত্যেক পদক্ষেপে সে ব্যক্তি সহস্র ক্ষুদ্রকে অতিক্রম করিতে না পারে, প্রত্যেক ক্ষুদ্র উঁচু-নিচুতে যাহার পা বাধিয়া যায় সে আর চলিবে কী করিয়া। সংসারের সুখে-দুঃখে যাহারা ভারাক্রান্ত, সংসারপথের প্রত্যেক সূচ্যগ্র ভূমি তাহাদিগকে মাড়াইয়া চলিতে হয়। এইজন্য ঘর হইতে আঙিনা তাহাদের বিদেশ, আপনার সাড়ে-তিন হাতের বাহিরে তাহাদের পর। এইজন্যে তাহারা দূরদেশের কথা, জগতের বৃহত্ত্বের কথা, সত্যের অসীমত্বের কথা বিশ্বাস করিতে পারে না। আপনার খোলসটির মধ্যে তাহাদের সমস্ত বিশ্বাস বদ্ধ। অসীম জগৎ-সংসারের অপেক্ষা আপনার চারি দিকের বাঁশের বেড়া ও খড়ের চাল তাহাদের নিকট অধিক সত্য।

শোকে আমাদের সংসারের ভার লাঘব করিয়া দেয়, আমাদের চরণের বেড়ি খুলিয়া দেয়, সংসারের অবিশ্রাম মাধ্যাকর্ষণ রজ্জু যেন ছিন্ন করিয়া দেয়। আমরা সংসারের সহিত নির্লিপ্ত হই। এইজন্য শোকে আমরা মহত্ত্ব উপার্জন করি। এইজন্য বিধবারা মহৎ। এইজন্য বিধবারা সংসারের কাজ অধিক করিতে পারে।

৯

মানুষের মধ্যে উদারতা এবং সংকীর্ণতা দুই থাকা চাই, কারণ তাহাই স্বাভাবিক। উদারতা এবং সংকীর্ণতার মিলনে জগৎ সৃষ্ট। অসীম ভাব সীমাবদ্ধ আকারে প্রকাশ হওয়ার অর্থই জগৎ। পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হওয়ার অর্থ মৃত্যু, একত্ব প্রাপ্ত হওয়ার অর্থ জীবন। অর্থাৎ, পঞ্চ একে পরিণত হওয়া, বৃহৎ ক্ষুদ্রে পরিণত হওয়াই সৃষ্টি। অতএব একাধারে ক্ষুদ্র বৃহৎ, উদারতা সংকীর্ণতা থাকাই স্বাভাবিক, ইহার বিপরীত হওয়াই অস্বাভাবিক। প্রকৃতিতে আকর্ষণ-বিকর্ষণ মেলামেশা করিয়া থাকে, কেন্দ্রানুগ এবং কেন্দ্রাতিগ শক্তি একসঙ্গে কাজ করে, ঐক্য এবং অনৈক্য এক গৃহে বাস করে। দুই বিপরীতের মিলনই এই বিশ্ব। মনুষ্য এই বিশ্ব-নিয়মের বাহিরে থাকে না। মনুষ্যও বৃহৎ এবং ক্ষুদ্রের মিলনস্থল। মনুষ্য, আপনাস্থ না থাকিলে, পরের দিকে যাইতে পারে না, সীমাবদ্ধ না হইলে সে অসীমের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে না, অনন্তকালে থাকিলে সে কোনোকালে হইতেই পারিত না।

১০

আমরা বদ্ধ না হইলে মুক্ত হইতে পাই না। ইংরাজিতে যাহাকে Freedom বলে তাহা আমাদের নাই, বাংলায় যাহাকে স্বাধীনতা বলে তাহা আমাদের আছে। কঠিনতর অধীনতাকেই স্বাধীনতা বলে। সর্বং পরবশং দুঃখং সর্বমাত্মবশং সুখং। কিন্তু পরের অধীন হওয়াই সহজ, আপনার অধীন হওয়াই শক্ত।

স্বাধীনতার অর্থ আপনার অর্থাৎ একের অধীনতা, অধীনতার অর্থ পরের অর্থাৎ সহস্রের অধীনতা। যাহার গৃহ নাই, তাহাকে কখনো গাছতলে, কখনো মাঠে, কখনো খড়ের গাদায়, কখনো দয়াবানের কুটিরে আশ্রয় লইতে হয়; যাহার গৃহ আছে সে সংসারের অসংখ্যের মধ্যে ব্যাকুল নহে; তাহার এক ধ্রুব আশ্রয় আছে। যে নৌকা হালের অধীন নহে সে কিছু স্বাধীন বলিয়া গর্ব করিতে পারে না, কারণ সে শতসহস্র তরঙ্গের অধীন। যে দ্রব্য পৃথিবীর ভারাকর্ষণের অধীনতাকে উপেক্ষা করে, তাহাকে প্রত্যেক সামান্য বায়ু-হিল্লোলের অধীনতায় দশ দিকে ঘুরিয়া মরিতে হইবে। অসীম জগৎসমুদ্রে অগণ্য তরঙ্গ, এখানে স্বাধীনতা ব্যতীত আমাদের গতি নাই। অতএব, স্বাধীনতা অর্থে বন্ধনমুক্তি নহে, স্বাধীনতার অর্থ নোঙরের শৃঙ্খল গলায় বাঁধিয়া রাখা।

১১

যাহাদের সহিত চোখের দেখা মুখের আলাপ মাত্র, তাহাদের সহিত আমরা চিরদিন নির্বিরোধে কাটাইয়া দিতে পারি, বিবাদ হইলেও তাহার পরদিন আবার তাহাদের সহিত হাস্যমুখে কথা কওয়া যায়, ভদ্রতা রক্ষা করিয়া চলা যায় কিন্তু যেখানে গভীর প্রেম ছিল, সেখানে যদি বিচ্ছেদ হয় তো হাসিমুখে কথা কহা আর চলে না, ভদ্রতা রক্ষা আর হয় না। অনেক সময়ে উচ্চশ্রেণীর জীবের গাত্রে একটা আঁচড় লাগিলে সে মরিয়া যায় আর নিকৃষ্ট পুরুভুজকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেও সেই বিচ্ছিন্ন অংশ খেলাইয়া বেড়ায়। নিকৃষ্ট প্রেমের বন্ধনও এইরূপ বিচ্ছিন্ন হইলেও বাঁচিয়া থাকে।

১২

অনেক বড়ো মানুষ দেখা যায় তাহারা ক্রমাগত আপনাদের চারি দিকে বিপুল মাংসরাশি সঞ্চয় করিতে থাকে, অতিশয় স্ফীত হইয়া সমাজের সামঞ্জস্য নষ্ট করে। আমার তো বোধ হয় এইরূপ বিপুল স্ফীতির যুগ পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইতেছে। এইরূপ প্রচুর মাংসস্তূপ, প্রকাণ্ড জড়তা ও অসাড়তা এখনকার দিনের উপযোগী নহে। এককালে ম্যামথ্ ম্যাস্টডন, হস্তিকায় ভেক, প্রকাণ্ডকায় সরীসৃপগণ পৃথিবীর জলস্থল অধিকার করিয়াছিল। এখন সে-সকল মাংসপিণ্ডের লোপ হইয়া গেছে ও যাইতেছে। এখন পরিমিতদেহ ও সূক্ষ্মস্নায়ু জীবদিগের রাজত্ব। এখন সুমহৎ জড় পদার্থেরা অন্তর্ধান করিলেই পৃথিবীর ভার লাঘব হয়।

১৩

সেদিন আমাকে একজন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, নূতন কবির আর আবশ্যক কী? পুরাতন কবির কবিতা তো বিস্তর আছে। নূতন কথা এমনিই কী বলা হইতেছে? এখন পুরাতন লইয়াই কাজ চলিয়া যায়।

সকল গোরুই তো জাবর কাটিয়া থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া ঘাস বন্ধ করিলে জাবর কাটাও বেশি দিন চলে না। নূতনই পুরাতনকে রক্ষা করিয়া থাকে। নূতনের মধ্যেই পুরাতন বাঁচিয়া থাকে, পুরাতনের মধ্যেই নূতন বাস করে। পুরাতন বৃক্ষ যে প্রতিদিন নূতন পাতা নূতন ফুল নূতন ডালপালা উৎপন্ন করে তাহার কারণ তাহার জীবন আছে। যেদিন সে আর নূতন গ্রহণ করিতে পারিবে না ও নূতন দান করিতে পারিবে না সেই দিনই তাহার মৃত্যু হইবে। নূতনে পুরাতনে বিচ্ছেদ হইলেই জীবনের অবসান। যেদিন দেখিব পৃথিবীতে নূতন কবি আর উঠিতেছে না, সেদিন জানিব পুরাতন কবিদের মৃত্যু হইয়াছে।

আমাদের হৃদয়ের সহিত প্রাচীন কবিতার যোগ-রক্ষা প্রবাহ-রক্ষা করিতেছে কে? নূতন কবিতা। নূতন কবিতা শুষ্ক হইয়া গেলে আমরা কোন্ স্রোত বাহিয়া পুরাতনের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইব? আমাদের মধ্যেকার এ দীর্ঘ ব্যবধান অবিশ্রাম লোপ করিয়া রাখিতেছে কে? নূতন কবিতা।

জগৎ হইতে সংগীতের প্রবাহ লোপ করিতে কে চাহে? নূতন বসন্তের নূতন পাখির গান বন্ধ করিতে কে চাহে। বসন্ত যদি পুরাতন গানকে প্রতি বৎসর নূতন করিয়া না গাওয়াইত, পুরাতন ফুলকে প্রতি বৎসর নূতন করিয়া না ফুটাইত তবে তো নূতনও থাকিত না পুরাতনও থাকিত না, থাকিত কেবল শূন্যতা, মরুভূমি।

ভারতী
জ্যৈষ্ঠ ১২৯২

বিবিধ প্রসঙ্গ ২

এক 'আমি' মাঝে আসাতেই প্রকৃতিতে কত গোলযোগ ঘটিয়াছে দেখো। 'আমি'-কে যেমনি লোপ করিয়া ফেলিবে অমনি প্রকৃতির পূর্ব-পশ্চিমে, অতীত-ভবিষ্যতে, অন্তর-বাহিরে গলাগলি এক হইয়া যাইবে। 'আমি' আসাতেই প্রকৃতির মধ্যে এত গৃহবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। কাহাকেও বা আমি আমার পশ্চাতে ফেলিয়াছি, কাহাকেও বা আমার সম্মুখে ধরিয়াছি, কাহাকেও বা আমার দক্ষিণে বসাইয়াছি, কাহাকেও বা আমার বামে রাখিয়াছি। মনে করিতেছি আমার পিঠের দিক এবং আমার পেটের দিক চিরকাল স্বভাবতই স্বতন্ত্র, কারণ, জগতের আর সমস্তের প্রতি আমার অবিশ্বাস হইতে পারে কিন্তু 'আমার পিঠ' ও 'আমার পেট' এ আমি কিছুতেই ভুলিতে পারি না। 'আমি'কে যে যত দূরে সরাইয়াছে জগতের মধ্যে সে ততই সাম্য দেখিয়াছে। যেখানে যত বিবাদ, যত অনৈক্য, যত বিশৃঙ্খলা, 'আমি'টাই সকল নষ্টের গোড়া, যত প্রেম, যত সদ্ভাব, যত শান্তি, আমার বিলোপই তাহার কারণ।

২

উদরের ভিতরকার একটা অংশই যে কেবল পাকযন্ত্র তাহা নহে, আমাদের মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতি যাহা-কিছু আছে সমস্তই আমাদের পাকযন্ত্র। ইহারা সমস্ত জগৎকে আমাদের উপযোগী করিয়া বানাইয়া লয়। আমাদের যাহা যতটুক যেরূপ আকারে আবশ্যক, ইহাদের সাহায্যে আমরা কেবল তাহাই দেখি, তাহাই শুনি, তাহাই পাই, তাহাই ভাবি। অসীম জগৎ আমাদের হাত এড়াইয়া কোথায় বিরাজ করিতেছে! আমাদের যে জগৎদৃশ্য, জগৎজ্ঞান, তাহা, আমাদের ভুক্ত জগৎ, পরিপাকপ্রাপ্ত জগতের বিকার, তাহা আমাদের উপযোগী রক্ত মাত্র, আমাদের ইন্দ্রিয় মনের কারখানায় প্রস্তুত হইয়া আমাদের ইন্দ্রিয় মনের মধ্যেই প্রবাহিত হইতেছে। তাহা প্রকৃত জগৎ নয়, অসীম জগৎ নহে।

৩

আমরা সকলে বাতায়নের পাশে বসিয়া আছি। আমরা বাতায়নের ভিতর হইতে দেখি, বাতায়নের বাহিরে গিয়া দেখিতে পাই না। এইজন্য নানা লোক নানা রকম দেখে। কেহ এ-পাশ দেখে কেহ ও-পাশ দেখে, কাহারো দক্ষিণে জানলা কাহারো উত্তরে জানলা। এই আশপাশ দেখিয়া, খানিকটা ভুল দেখিয়া, খানিকটা না দেখিয়া যত আমাদের ভালোবাসা ঘৃণা, যত আমাদের তর্কবিতর্ক। একেকটি মানুষ একেকটি খড়খড়ি খুলিয়া বসিয়া আছি, কেহ-বা হাসিতেছি কেহ-বা নিশ্বাস ফেলিতেছি। জানলার ভিতরকার ওই মুখগুলি কেহ যদি আঁকিতে পারিত! পৃথিবীর রাস্তার দুই ধারে ওই-সকল অন্তঃপুরবাসী মুখের কতই ভাব, কতই ভঙ্গি! সবাই ছবির মতো বসিয়া কতই ছবি দেখিতেছে!

৪

'সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।' কারণ অনেক সত্য কথা কে বলিতে পারে! স্থূল কারাগারের ফুটাফাটা দিয়া সত্যের দুই-একটা রশ্মিরেখা শুভলগ্নে দৈবাৎ দেখিতে পাই। একটুখানি সত্যের চতুর্দিকে পুঞ্জীভূত অন্ধকার থাকিয়া যায়। সংশয় নিশীথের একটি ছিদ্রের মধ্য দিয়া বিশ্বাসকে তারার মতো দেখিতে পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি মনে করে সত্যকে ফলাও করিয়া তুলিতে হইবে— তাহাকে বৃহৎ করিয়া একটা বিস্তৃত তন্ত্রের মতো শাস্ত্রের মতো গড়িয়া তুলিতে হইবে— প্রলোভনে এবং দায়ে পড়িয়া সে ব্যক্তি একটি সত্যের সহিত অনেক মিথ্যা মিশাল দেয়। সে আপনার কাছে আপনি প্রবঞ্চিত হয়। সত্য হীরার মতো একটুখানি পাওয়া যায়, কিন্তু যা পাই তাই ভালো। কত মূল্যবান সত্যের কণিকা সঙ্গদোষে মারা পড়িয়াছে।

৫

ব্যাপ্ত হইলে যাহা অন্ধকার, সংহত হইলে তাহা আলোক, আরও সংহত হইলে তাহা অগ্নি। বৃহত্ত্বই জড়ত্ব। সংক্ষেপ সংহতিই প্রাণ। সংহত হইলেই তেজ, প্রাণ, আকার, ব্যক্তি, জাগ্রত হইয়া উঠে। আমরা জড়োপাসক শক্তি-উপাসক বলিয়া বৃহত্ত্বের উপাসনা করিয়া থাকি। বৃহত্ত্বে অভিভূত হইয়া যাই। কিন্তু বৃহৎ অপেক্ষা ক্ষুদ্র অধিক আশ্চর্য। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বাষ্পরাশি অপেক্ষা এক বিন্দু জল আশ্চর্য। সুবিস্তৃত নীহারিকা অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত সৌরজগৎ আশ্চর্য। আরম্ভ বৃহৎ পরিণাম ক্ষুদ্র। আবর্তের মুখ অতি বৃহৎ আবর্তের শেষ একটি বিন্দুমাত্র। সুবিশাল জগৎ ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই ক্ষুদ্রত্বের দিকে বিন্দুত্বের দিকে যাইতেছে কি না কে জানে! কেন্দ্রের মহৎ আকর্ষণে পরিধি সংক্ষিপ্ত হইয়া কেন্দ্রত্বে আত্মবিসর্জন করিতে যাইতেছে কি না কে জানে!

৬

যত বৃহৎ হই তত দেশকালের অধীন হইতে হয়। আয়তন লইয়া আমাদিগকে কেবল যুদ্ধ করিতে হয়। কাহার সঙ্গে? দানব-কাল ও দানব দেশের সঙ্গে। দেশকাল বলে— আয়তন আমার; আমার জিনিস আমাকে ফিরাইয়া দাও। অবিশ্রাম লড়াই করিয়া অবশেষে কাড়িয়া লয়। শ্মশানক্ষেত্রে তাহার ডিক্রিজারি হয়। আমাদের ক্ষুদ্র আয়তন মহা আয়তনে মিশিয়া যায়।

৭

কিন্তু আমরা জানি আমরা মৃত্যুকে জিতিব। অর্থাৎ দেশকালকে অতিক্রম করিব। মনুষ্যের অভ্যন্তরে এক সেনাপতি আছে সে দৃঢ়বিশ্বাসে যুদ্ধ করিতেছে। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মরিতেছে কিন্তু যুদ্ধের বিরাম নাই। অনেক মরিয়া তবে বাঁচিবার উপায় বাহির হইবে। আমরা সংহতিকে অধিকার করিয়া ব্যাপ্তিকে জিতিব— মনুষ্যত্বের এই সাধনা।

৮

সংহতিকে অধিকার করাই শক্ত। আমাদের হৃদয় মন বাষ্পের মতো চারি দিকে ছড়াইয়া আছে। হু হু করিয়া ব্যাপ্ত হইয়া পড়া যেমন বাষ্পের স্বাভাবিক গুণ— আমরাও তেমনি স্বভাবতই চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ি— অভ্যন্তরে সুদৃঢ় আকর্ষণ শক্তি না থাকিলে আমার হইয়া আমরা পর হইয়া যাই। আমাকে বিন্দুতে নিবিষ্ট করাই শক্ত। যোগীরা এই বিন্দুমাত্রে স্থায়ী হইবার জন্য বৃহৎ সংসারের আশ্রয় ছাড়িয়াছেন। সূচ্যগ্রস্থানের জন্যই তাঁহাদের লড়াই। তাঁহারা বিন্দুর বলে ব্যাপককে অধিকার করিবেন। সংকীর্ণতার বলে বিকীর্ণতা লাভ করিবেন।

৯

সংহত দীপশিখা তাহার আলোকে সমস্ত গৃহ অধিকার করে। কিন্তু সেই শিখা যখন প্রচ্ছন্ন উত্তাপ আকারে গৃহের কাঠে, উপকরণে ইতস্তত ব্যাপ্ত হইয়া থাকে তখন গৃহই তাহাকে বধ করিয়া রাখে, সে জাগিতে পায় না। যতটা ব্যাপ্ত হইব ততটা অধিকার করিব এইরূপ কেহ কেহ মনে করেন। কিন্তু ইহার উল্টাটাই ঠিক। অর্থাৎ যতটা ব্যাপ্ত হইবে তুমি ততই অধিকৃত হইবে। কিন্তু চারি দিক হইতে আপনাকে প্রত্যাহার করিয়া যখন বহ্নিশিখার মতো স্বতন্ত্র দীপ্তি পাইবে, তখন তোমার সেই প্রখর স্বাতন্ত্র্যের জ্যোতিতে চারি দিক উজ্জ্বল রূপে অধিকার করিতে পারিবে এইরূপ কাহারো কাহারো মত।

১০

য়ুরোপীয় সভ্যতার চরম— ব্যাপ্তি, অর্থাৎ বিজ্ঞান শাস্ত্র— ভারতবর্ষীয় সভ্যতার চরম— সংহতি, অর্থাৎ অধ্যাত্মযোগ। য়ুরোপীয়েরা প্রকৃতির সহিত সন্ধি করিতে চান, ভারতবর্ষীয়েরা প্রকৃতিকে জয় করিতে চান। প্রাণশক্তি, মানসশক্তি, অধ্যাত্মশক্তিকে সংহত করিতে পারিলে বিরাট প্রকৃতিকে জয় করা যায়। এই কি যোগশাস্ত্র?

১১

আমার কোনো বন্ধু লিখিয়াছেন— অতীতকাল অমরাবতী। আমি তাহার অর্থ এইরূপ বুঝি যে, অতীতে যাহারা বাস করে তাহারা অমর। অতীতে অমৃত আছে। অতীত সংক্ষিপ্ত। বর্তমান কেবল কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহত্ত্ব, অতীতকালে সেই মহত্ত্বরাশি সংহত হইয়া যায়। বর্তমান ত্রিশটা পৃথক দিন, অতীত একটা সমগ্র মাস। বর্তমান বিচ্ছিন্ন, অতীত সমগ্র। যাহাকে প্রত্যেক বর্তমান মুহূর্তে দেখি আমরা প্রতিক্ষণে তাহার মৃত্যুই দেখিতে পাই, যাহাকে অতীতে দেখি তাহার অমরতা দেখিতে পাই।

১২

আরম্ভের মধ্যে পূর্ণতার ছবি ও সমাধানেই অসম্পূর্ণতা— মানুষের সকল কাজেই প্রায় বিধাতার এই অভিশাপ। যখন গড়িতে আরম্ভ করি তখন প্রতিমা চোখের সম্মুখে জাগিয়া থাকে, যখন শেষ করিয়া ফেলি তখন দেখি তাহা ভাঙিয়া গেছে। সুদূর গৃহাভিমুখে যখন যাত্রা আরম্ভ করি তখন গৃহের প্রতি এত টান যে, গৃহ যেন প্রত্যক্ষ, আর পথপ্রান্তে যখন যাত্রা শেষ করি তখন পথের প্রতি এত মায়া যে গৃহ আর মনে পড়ে না। যাহাকে আশা করি তাহাকে যতখানি পাই আশা পূর্ণ হইলে তাহাকে আর ততখানি পাই না। অর্থাৎ, চাহিলে যতখানি পাই, পাইলে ততখানি পাই না। যখন মুকুল ছিল তখন ছিল ভালো, ফলের আশা তাহার মধ্যে ছিল, যখন মাটিতে পড়িয়াছে তখন দেখি মাটি হইয়াছে ফল ধরে নাই। এইজন্য আরম্ভ দিনের স্মৃতি আমাদের নিকট এত মনোহর, এইজন্য সমাপ্তির দিনে আমরা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া থাকি, নিশ্বাস ফেলি। জন্মদিনে যে বাঁশি বাজে সে বাঁশি প্রতিদিন বাজে না। অশ্রুনেত্রে আমরা প্রতিদিন দেখিতেছি উপায়ের দ্বারা উদ্দেশ্য নষ্ট হইতেছে। বাঁশি গানকে বধ করিতেছে। হাতের দ্বারা হাতের কাজ আঘাত পাইতেছে।

১৩

আসল কথা, শেষ মানুষের হাতে নাই। 'শেষ হইল' বলিয়া যে আমরা দুঃখ করি তাহার অর্থ এই— 'শেষ হয় নাই তবুও শেষ হইল! আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে অথচ চেষ্টার অবসান হইল।' এইজন্য মানুষের কাছে শেষের অর্থ দুঃখ। কারণ মানুষের সম্পূর্ণতার অর্থ অসম্পূর্ণতা।

১৪

জীবনের কাজ দেখিয়া সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি কাহার হয় জানি না— যাহার হয় সে আপনাকে চেনে নাই। সে আপনার চেয়ে আপনাকে ছোটো বলিয়া জানে। সে জানে না সে যে-কাজ করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা বড়ো কাজ করিতে আসিয়াছিল। সে আপনাকে ছোটো করিয়া লইয়াছে বলিয়াই আপনাকে এত বড়ো মনে করে। মনুষ্যের পদমর্যাদা সে যদি যথার্থ বুঝিত, তাহা হইলে তাহার এত অহংকার থাকিত না।

১৫

আমি কি জানিতাম অবশেষে আমি খেলেনাওয়ালা হইব? প্রতিদিন একটা করিয়া কাচের পুতুল গড়িয়া সাধারণের খেলার জন্য জোগাইব। আমি কি জানি না আমার একেকটি কাজ আমারই একেকটি অংশ— আমারই জীবনের একেকটি দিন। দিনকে ছাড়িয়া দিলেই দিন চলিয়া যায়, কিন্তু দিনের কাজের মধ্যে দিনকে আটক করিয়া রাখা যায়। আমার জীবন তো কতকগুলি দিনের সমষ্টি, সেই জীবনকে যদি রাখিতে চাই তবে তাহার প্রত্যেক দিনকে কার্য আকারে পরিণত করিতে হইবে। কিন্তু আমি যে আমার সমস্ত দিনটি হাতে করিয়া লইয়া তাহাকে কেবল একটি পুতুল করিয়া তুলিতেছি— আমি কি জানি না আমার যতগুলি পুতুল ভাঙিতেছে আমিই ভাঙিয়া যাইতেছি! অবশেষে যখন একে একে সবগুলি ধূলিসাৎ হইয়া গেল তখন কি আমার সমস্ত জীবন বিফল হইয়া গেল না! এই চীনের পুতুলগুলি লইয়া আজ সকলে হাসিতেছে খেলিতেছে, কাল যখন এগুলিকে অকাতরে পথের প্রান্তে ফেলিয়া দিবে তখন কি সেই হৃতগৌরব ভগ্ন কাচখণ্ডের

সঙ্গে আমার সমস্ত মানব জন্মের বিসর্জন হইবে না। 'আমি নিষ্ফল হইলাম' বলিয়া যে দুঃখ সে অপরিতৃপ্ত অহংকারের দুঃখ নহে। ইহা নিজের হাতে নিজের একমাত্র আশা একমাত্র আদর্শকে বিসর্জন দিয়া প্রাণাধিকের বিনাশের জন্য শোক!

১৬

কারণ, আমার হৃদয়ের মধ্যস্থিত আদর্শ আমার চেয়ে বড়ো। তাহা আমার মনুষ্যত্ব। আমি আমার ধর্মজ্ঞানের হাতে একটি যন্ত্রমাত্র। সে আমাকে দিয়া তাহার কাজ করাইয়া লইতে চায়। আমার একমাত্র দুঃখ এই যে আমি তাহার উপযোগী নহি— আমার দ্বারা তাহার কাজ সম্পন্ন হয় না। আমি দুর্বল। তাহার কাজ করিতে গিয়া আমি ভাঙিয়া যাই। কিন্তু সেই ভাঙিয়া যাওয়াতে আনন্দ আছে। মনে এই সান্ত্বনা থাকে যে, তাহারই কাজে আমি ভাঙিলাম। আমি নিষ্ফল হইলাম বলিতে বুঝায়, আমার প্রভুর কাজ হইল না। মনুষ্যত্ব আমাকে আশ্রয় করিয়া মগ্ন হইল। স্বামিন্, তোমার আদেশ পালন হইল না!

১৭

সাধারণের কাছ হইতে যে ব্যক্তি খ্যাতি উপহার পায় তাহার রক্ষা নাই। এ বিষকন্যার হাতে যদি মৃত্যু না হয় তো বন্দী হইতে হইবে। এই খ্যাতি তাপসের তপস্যা ভঙ্গ করিতে সাধকের সাধনায় ব্যাঘাত করিতে আসে। যে ব্যক্তি সাধারণের প্রিয় সাধারণ তাহার জন্য আফিম বরাদ্দ করিয়া দেয়, সাধারণের দাঁড়ে বসিয়া সে ঝিমাইতে থাকে, সে আগেকার মতো তাহার ডানাদুটি লইয়া মেঘের দিকে তেমন করিয়া আর উড়িতে পারে না। তার পরে এক দিন যখন খামখেয়ালি সাধারণ তাহার সাধের পাখির বরাদ্দ বন্ধ করিয়া দিবে, তখন পাখির গান বন্ধ তাহার প্রাণ কণ্ঠাগত।

ভারতী
ভাদ্র ১২৯২

বর্ষার চিঠি

সুহৃদ্বর, আপনি তো সিন্ধুদেশের মরুভূমির মধ্যে বাস করছেন। সেই অনাবৃষ্টির দেশে বসে একবার কলকাতার বাদলাটা কল্পনা করুন।

এবারকার চিঠিতে আপনাকে কেবল বাংলার বর্ষাটা স্মরণ করিয়ে দিলুম— আপনি বসে বসে ভাবুন। ভরা পুকুর, আমবাগান, ভিজে কাক ও আষাঢ়ে গল্প মনে করুন। আর যদি গঙ্গার তীর মনে পড়ে, তবে সেই স্রোতের উপর মেঘের ছায়া, জলের উপর জলবিন্দুর নৃত্য, ওপারের বনের শিয়রে মেঘের উপর মেঘের ঘটা, মেঘের তলে অশথগাছের মধ্যে শিবের দ্বাদশ মন্দির স্মরণ করুন। মনে করুন পিছল ঘাটে ভিজে ঘোমটায় বধূ জল তুলছে; বাঁশঝাড়ের তলা দিয়ে, পাঠশাল ও গয়লাবাড়ির সামনে দিয়ে সংকীর্ণ পথে ভিজতে ভিজতে জলের কলস নিয়ে তারা ঘরে ফিরে যাচ্ছে; খুঁটিতে বাঁধা গোরু গোয়ালে যাবার জন্যে হাম্বারবে চিৎকার করছে; আর মনে করুন, বিস্তীর্ণ মাঠে তরঙ্গায়িত শস্যের উপর পা ফেলে ফেলে বৃষ্টিধারা দূর থেকে কেমন ধীরে ধীরে চলে আসছে; প্রথমে মাঠের সীমান্তস্থিত মেঘের মতো আমবাগান, তার পরে এক-একটি করে বাঁশঝাড়, এক-একটি করে কুটির, এক-একটি করে গ্রাম বর্ষার শুভ্র আঁচলের আড়ালে ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে আসছে, কুটিরের দুয়ারে বসে ছোটো ছোটো মেয়েরা হাততালি দিয়ে ডাকছে 'আয় বৃষ্টি হেনে, ছাগল দেব মেনে'— অবশেষে বর্ষা আপনার জালের মধ্যে সমস্ত মাঠ, সমস্ত বন, সমস্ত গ্রাম ঘিরে ফেলেছে; কেবল অবিশ্রান্ত বৃষ্টি— বাঁশঝাড়ে, আমবাগানে, কুঁড়ে ঘরে, নদীর জলে, নৌকোর হালের নিকটে আসীন গুটিসুটি জড়োসড়ো কম্বলমোড়া মাঝির

মাথায় অবিশ্রাম ঝরঝর বৃষ্টি পড়ছে। আর কলকাতায় বৃষ্টি পড়ছে আহিরিটোলায়, কাঁশারিপাড়ায়, টেরিটির বাজারে, বড়বাজারে, শোভাবাজারে, হরিকৃষ্ণর গলি, মতিকৃষ্ণর গলি, রামকৃষ্ণর গলিতে, জিগ্‌জ্যাগ্‌ লেনে— খোলার চালে, কোঠার ছাতে, দোকানে, ট্রামের গাড়িতে, ছ্যাকরা গাড়ির গাড়োয়ানের মাথায় ইত্যাদি।

কিন্তু আজকাল ব্যাঙ ডাকে না কেন? আমি কলকাতার কথা বলছি। ছেলেবেলায় মেঘের ঘটা হলেই ব্যাঙের ডাক শুনতুম— কিন্তু আজকাল পাশ্চাত্য সভ্যতা এল, সার্বভৌমিকতা এবং 'উনবিংশ শতাব্দী' এল, পোলিটিকল্‌ অ্যাজিটেশন, খোলা ভাঁটি এবং স্বায়ত্তশাসন এল, কিন্তু ব্যাঙ গেল কোথায়? হায় হায়, কোথায় ব্যাস বশিষ্ঠ, কোথায় গৌতম শাক্যসিংহ, কোথায় ব্যাঙের ডাক!

ছেলেবেলায় যেমন বর্ষা দেখতেম, তেমন ঘনিয়ে বর্ষাও এখন হয় না। বর্ষার তেমন সমারোহ নেই যেন, বর্ষা এখন যেন ইকনমিতে মন দিয়েছে— নমোনমো করে জল ছিটিয়ে চলে যায়— কেবল খানিকটা কাদা, খানিকটা ছাঁট, খানিকটা অসুবিধে মাত্র— একখানা ছেঁড়া ছাতা ও চীনে বাজারের জুতোয় বর্ষা কাটানো যায়— কিন্তু আগেকার মতো সে বজ্র বিদ্যুৎ বৃষ্টি বাতাসের মাতামাতি দেখি নে। আগেকার বর্ষায় একটা নৃত্য ও গান ছিল, একটা ছন্দ ও তাল ছিল— এখন যেন প্রকৃতির বর্ষার মধ্যেও বয়স প্রবেশ করেছে, হিসাব কিতাব ও ভাবনা ঢুকেছে, শ্লেষ্মা শঙ্কা ও সাবধানের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। লোকে বলছে, সে আমারই বয়সের দোষ।

তা হবে! সকল বয়সেরই একটা কাল আছে, আমার সে বয়স গেছে হয়তো। যৌবনের যেমন বসন্ত, বার্ধক্যের যেমন শরৎ, বাল্যকালের তেমনি বর্ষা। ছেলেবেলায় আমরা যেমন গৃহ ভালোবাসি এমন আর কোনো কালেই নয়। বর্ষাকাল ঘরে থাকবার কাল, কল্পনা করবার কাল, গল্প শোনবার কাল, ভাইবোনে মিলে খেলা করবার কাল। বর্ষার অন্ধকারের মধ্যে অসম্ভব উপকথাগুলো কেমন যেন সত্যি হয়ে দাঁড়ায়। ঘনবৃষ্টিধারার আবরণে পৃথিবীর আপিসের কাজগুলো সমস্ত ঢাকা পড়ে যায়। রাস্তায় পথিক কম, ভিড় কম, হাটে ঘাটে কাজের লোকের ঘোরতর ব্যস্ত ভাব আর দেখা যায় না— ঘরে ঘরে দ্বাররুদ্ধ, দোকানপসারের উপর আচ্ছাদন পড়েছে— উদরানলের ইস্টিম প্রভাবে মনুষ্যসমাজ যে রকম হাঁসফাঁস ক'রে কাজ করে সেই হাঁসফাঁসানি বর্ষাকালে চোখে পড়ে না এইজন্যে মনুষ্যসমাজের সাংসারিক আবর্তের বাইরে বসে উপকথাগুলিকে সহজেই সত্য মনে করা যায়, কেউ তার ব্যাঘাত করে না। বিশেষত মেঘ বৃষ্টি বিদ্যুতের মধ্যে উপকথার উপকরণ আছে যেন। যেমন মেঘ ও বৃষ্টিধারা আবরণের কাজ করে— তেমনি বৃষ্টির ক্রমিক একঘেয়ে শব্দও একপ্রকার আবরণ। আমরা আপনার মনে যখন থাকি তখন অনেক কথা বিশ্বাস করি— তখন আমরা নির্বোধ, আমরা পাগল, আমরা শিশু; সংসারের সংস্রবে আসলেই তবে আমরা সম্ভব-অসম্ভব বিচার করি, আমাদের বুদ্ধি জেগে ওঠে, আমাদের বয়স ফিরে পাই। আমরা অবসর পেলেই আপনার সঙ্গে পাগলামি করি, আপনাকে নিয়ে খেলা করি— তাতে আমাদের কেউ পাগল বলে না, শিশু বলে না— সংসারের সঙ্গে পাগলামি বা খেলা করলেই আমাদের নাম খারাপ হয়ে যায়। একটু ভেবে দেখলেই দেখা যায় বুদ্ধি বিচার তর্ক বা চিন্তার শৃঙ্খলা— এ আমাদের সহজ ভাব নয়, এ আমাদের যেন সংসারে বেরোবার আপিসের কাপড়— দ্বিতীয় ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করবার সময়েই তার আবশ্যক— আপনার ঘরে এলেই ছেড়ে ফেলি। আমরা স্বভাব-শিশু, স্বভাব-পাগল, বুদ্ধিমান সেজে সংসারে বিচরণ করি। আমরা আপনার মনে বসে যা ভাবি— অলক্ষ্যে আমাদের মনের উপর অহরহ যে-সকল চিন্তা ভিড় করে— সেগুলো যদি কোনো উপায়ে প্রকাশ পেত। সংসারের একটু সাড়া পেয়েছি কী, একটু পায়ের শব্দ শুনেছি কী অমনি চকিতের মধ্যে বেশ পরিবর্তন করে নিই— এত দ্রুত যে আমরা নিজেও এ পরিবর্তনপ্রণালী দেখতে পাই নে। তাই বলছিলেম যদি কোনোমতে আমরা আপনার মনে থাকতে পাই তা হলে আমরা অনেক অসম্ভবকে বিশ্বাস করতে পারি। সেইজন্যে গভীর অন্ধকার রাত্রে যা সম্ভব বলে বোধ হয় দিনের আলোতে তার অনেকগুলি কোনোমতে সম্ভব বোধ হয় না— কিন্তু

এমনি আমাদের ভোলা মন যে, রোজ দিনের বেলায় যা অবিশ্বাস করি রোজ রাত্রে তাই বিশ্বাস করি। রাত্রিকে রোজ সকালে অবিশ্বাস করি, সকালকে রোজ রাত্রে অবিশ্বাস করি! আসল কথা এই, আমাদের বিশ্বাস স্বাধীন, সংসারের মধ্যে পড়ে সে বাঁধা পড়েছে— আমরা দায়ে পড়েই অবিশ্বাস করি— একটু আড়াল পেলে, একটু ছুটি পেলে, একটু সুবিধা পেলেই আমরা যা-তা বিশ্বাস করে বসি, আবার তাড়া খেলেই গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করি। নিতান্ত আপনার কাছে থাকলে তাড়া দেবার লোক কেউ থাকে না। বর্ষাধারার ক্রমিক ঝর্ঝর শব্দ সংসারের সহস্র শব্দ হতে আমাদের ঢেকে রাখে— আমরা অবিশ্রাম ঝর্ঝর শব্দের আচ্ছাদনের মধ্যে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে বিশ্রাম করবার স্বাধীনতা উপভোগ করি। এইজন্যই বর্ষাকাল উপকথার কাল। এইজন্য আষাঢ় মাসের সঙ্গেই আষাঢ়ে গল্পের যোগ। এইজন্যই বলছিলাম, বর্ষাকাল বালকের কাল— বর্ষাকালে তরুলতার শ্যামল কোমলতার মতো আমাদের স্বাভাবিক শৈশব স্ফূর্তি পেয়ে ওঠে— বর্ষার দিনে আমাদের ছেলেবেলার কথাই মনে পড়ে।

তাই মনে পড়ে, বর্ষার দিন আমাদের দীর্ঘ বারান্দায় আমরা ছুটে বেড়াতেম— বাতাসে দুমদাম করে দরজা পড়ত, প্রকাণ্ড তেঁতুলগাছ তার সমস্ত অন্ধকার নিয়ে নড়ত, উঠোনে একহাঁটু জল দাঁড়াত, ছাতের উপরকার চারটে টিনের নল থেকে স্থূল জলধারা উঠোনের জলের উপর প্রচণ্ড শব্দে পড়ত ও ফেনিয়ে উঠত, চারটে জলধারাকে দিক্‌হস্তীর শুঁড় বলে মনে হত। তখন আমাদের পুকুরের ধারের কেয়াগাছে ফুল ফুটত (এখন সে গাছ আর নেই)। বৃষ্টিতে ক্রমে পুকুরের ঘাটের এক-এক সিঁড়ি যখন অদৃশ্য হয়ে যেত ও অবশেষে পুকুর ভেসে গিয়ে বাগানে জল দাঁড়াত— বাগানের মাঝে মাঝে বেলফুলের গাছের ঝাঁকড়া মাথাগুলো জলের উপর জেগে থাকত এবং পুকুরের বড়ো বড়ো মাছ পালিয়ে এসে বাগানের জলমগ্ন গাছের মধ্যে খেলিয়ে বেড়াত, তখন হাঁটুর কাপড় তুলে কল্পনায় বাগানময় জলে দাপাদাপি করে বেড়াতেম। বর্ষার দিনে ইস্কুলের কথা মনে হলে প্রাণ কী অন্ধকারই হয়ে যেত, এবং বর্ষাকালের সন্ধেবেলায় যখন বারান্দা থেকে সহসা গলির মোড়ে মাস্টার মহাশয়ের ছাতা দেখা দিত তখন যা মনে হত তা যদি মাস্টারমশায় টের পেতেন তা হলে—। শুনেছি এখনকার অনেক ছেলে মাস্টারমশায়কে প্রিয়তম বন্ধুর মতো জ্ঞান করে, এবং ইস্কুলে যাবার নাম শুনে নেচে ওঠে। এটা শুভলক্ষণ বোধ হয়। কিন্তু তাই বলে যে ছেলে খেলা ভালোবাসে না, বর্ষা ভালোবাসে না, গৃহ ভালোবাসে না এবং ছুটি একেবারেই ভালোবাসে না— অর্থাৎ ব্যাকরণ ও ভূগোলবিবরণ ছাড়া এই বিশাল বিশ্বসংসারে আর কিছুই ভালোবাসে না, তেমন ছেলের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াও কিছু নয়। তেমন ছেলে আজকাল অনেক দেখা যাচ্ছে। তবে হয়তো প্রখর সভ্যতা, বুদ্ধি ও বিদ্যার তাত লেগে ছেলেমানুষের সংখ্যা আমাদের দেশে কমে এসেছে, পরিপক্কতার প্রাদুর্ভাব বেড়ে উঠেছে। আমাদেরই কেউ কেউ ইঁচড়ে-পাকা বলত, এখন যে-রকম দেখছি তাতে ইঁচড়ের চিহ্নও দেখা যায় না, গোড়াগুড়িই কাঁঠাল।

বালক
শ্রাবণ ১২৯২

বরফ পড়া

(দৃশ্য)

ছবির রেখা মন হইতে কেমন অল্পে অল্পে অস্পষ্ট হইয়া আসে; প্রতিদিন যে-সকল জিনিস দেখি, তাহাদেরই ছায়া অগ্রবর্তী হইয়া মনের মধ্যে ভিড় করিয়া দাঁড়ায়, কিছুদিন আগে যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহাদের প্রতিবিম্ব গোলেমালে কোথায় মিলাইয়া যায়, ভালো করিয়া ঠাহর করিবার জো থাকে না।

১৮৭৮ খৃস্টাব্দে আমি ইংলন্ডে যাই, সে আজ সাত বৎসর হইল। তখন আমার বয়সও নিতান্ত অল্প ছিল। তখন ইংলন্ডে যাহা দেখিয়াছিলাম তাহার একটা মোটামুটি ভাব মনে আছে বটে, কিন্তু তাহার সকল ছবি খুব পরিষ্কাররূপে মনে আনিতে পারি না, রেখায় রেখায় মিলাইয়া লইতে পারি না। ইহারই মধ্যে আমার স্মৃতিপটবর্তী ইংলন্ডের উপর কোয়াশা পড়িয়া আসিতেছে। ছবিগুলি মাঝে মাঝে রৌদ্রে বাহির করিয়া ঝাড়িয়া দেখিতে হয়। সেইজন্য আজ স্মৃতিপট রৌদ্রে বাহির করিয়াছি।

আমি যখন ইংলন্ডে গিয়া পৌঁছাই, তখন অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি। তখনও খুব বেশি শীত বলিয়া আমার মনে হয় নাই। আমরা ব্রাইটনে ছিলাম। ব্রাইটনে তখনও যথেষ্ট রৌদ্র ছিল। রৌদ্রে পুলকিত হইয়া সমুদ্রের ধারের পথে ছেলে বুড়ো ঝাঁকে ঝাঁকে বাহির হইয়াছে। রোগীরা এবং জরাগ্রস্তরা ঠেলাগাড়িতে চলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে পাশে পাশে একটি-দুইটি মেয়ে, বা পরিবারের কেহ। মেয়েরা নানাসাজপরা, ছাতা মাথায়। ছোটো ছেলেরা লোহার চাকা গড়াইয়া পথে ছুটিতেছে। সমুদ্রের তীরে কোনো মেয়ে ছাতা মাথায় দিয়া বসিয়া। সমুদ্রের ঢেউয়ের অনুসরণ করিয়া কেহ কেহ নানাবিধ ঝিনুক সংগ্রহ করিতেছে। ইটালীয় ভিক্ষুক পথে পথে আর্গিন বাজাইয়া ফিরিতেছে। শাকসবজিওয়ালা, দুধওয়ালা, গাড়ি করিয়া ঘরে ঘরে জোগান দিয়া ফিরিতেছে। বেড়াইবার পথে অশ্বারোহী এবং অশ্বারোহিণী পাশাপাশি ছুটিয়াছে— পশ্চাতে কিছুদূরে একটি করিয়া অশ্বারোহী সহিস তকমা পরিয়া অনুসরণ করিতেছে। এক-একটি শিক্ষক তাহার পশ্চাতে এক পাল ইস্কুলের ছেলে লইয়া— অথবা এক-একটি শিক্ষয়িত্রী ঝাঁকে ঝাঁকে ইস্কুলের মেয়ে লইয়া সার বাঁধিয়া সমুদ্রতীরের পথে হাওয়া খাইতে আসিয়াছে; হাওয়া না হউক— রৌদ্র খাইতে আসিয়াছে। আমরা প্রায় মাঝে মাঝে ছেলেদের লইয়া সমুদ্রতীরের তৃণক্ষেত্রে ছুটাছুটি করিতাম। ছুটাছুটি করিবার ঠিক বয়স নয় বটে— কিন্তু সেখানে আমাদের এই রীতি-বহির্ভূত ব্যবহার সমালোচনা করিবার যোগ্যপাত্র কেহ উপস্থিত ছিলেন না। দশটা-এগারোটার সময় আমাদের বেড়াইবার সময় ছিল। যাহা হউক, আমরা যখন ব্রাইটনে আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন সমুদ্রতীরে সূর্যকরোৎসব।

দিন যাইতে লাগিল— শীত বাড়িতে লাগিল। রাস্তার কাদা শীতে শক্ত হইয়া উঠিল। ঘাসের উপরে শিশির জমিয়া যাইত, কে যেন চুন ছড়াইয়াছে। সকালে উঠিয়া দেখি শার্শির কাচে চিত্রবিচিত্র তুষারের স্ফটিকলতা আঁকা রহিয়াছে। কখনো কখনো পথে দেখিতাম, দুই-একটা চড়ুই পাখি শীতে মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। গাছের যে কয়েকটা হলদে পাতা অবশিষ্ট ছিল, তাহাও ঝরিয়া পড়িল, শীর্ণ ডালগুলো বাহির হইতে লাগিল। বিশ্বস্ত-হৃদয় ছোটো ছোটো রবিন পাখি কাচের জানালার কাছে আসিয়া রুটির টুকরা ভিক্ষা চায়। সকলে আশ্বাস দিল, শীঘ্রই বরফ পড়া দেখিতে পাইবে।

ক্রিস্টমাসের সময় আগতপ্রায়। কনকনে শীত। জ্যোৎস্না রাত্রি। ঘরের জানলা দরজা বন্ধ, পরদা ফেলা। গ্যাস জ্বলিতেছে। গরমের জন্য আগুন জ্বালা হইয়াছে। সন্ধ্যাবেলা আহার করিয়া অগ্নিকুণ্ড ঘিরিয়া আমরা গল্পে নিমগ্ন। দুটি ছেলে আমার প্রতি আক্রমণ করিয়াছেন। তাঁহারা যে আমার সঙ্গে ভদ্রজনোচিত ব্যবহার করিতেন না, তাহার সহস্র প্রমাণ সত্ত্বেও আমি এখানে সে-সকল কথার উল্লেখ করিতে চাহি না। তাহারা এখন বড়ো হইয়া উঠিয়াছে, 'বালক' পড়িয়া থাকে— তাহাদের সম্বন্ধে একটা কথা লিখিয়া শেষকালে জবাবদিহি করিতেই প্রাণ বাহির হইয়া যায়। আর কিছুদিন পরে তাহারা আবার প্রতিবাদ করিতেও শিখিবে। তখন আমি তাহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠিব না— এই ভয়ে আমি ক্ষান্ত রহিলাম। পাঠকেরা তাহাদের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে যাহার যেমন সাধ্য অনুমান করিয়া লইবেন— আমি ইচ্ছাপূর্বক কোনোরূপ দায় স্কন্ধে লইতে চাই না।

গরম হইয়া সকলে বসিয়া আছি, এমন সময়ে খবর আসিল, বরফ পড়িয়াছে। কখন পড়িতে আরম্ভ হইয়াছিল, জানিতে পারি নাই, আমাদের দ্বার সমস্ত রুদ্ধ ছিল। ছেলেপিলে মিলিয়া

লাফালাফি করিয়া বাহিরে গিয়া দেখি— কী চমৎকার দৃশ্য! শীতে জ্যোৎস্না-স্তর যেন জমিয়া জমিয়া, রাস্তায়, ঘাসের উপর, গাছের শূন্য ডালে, গড়ানো স্লেটের ছাতে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। পথে লোক নাই। আমাদের সম্মুখের গৃহশ্রেণীর জানলা দরজা সমস্ত বন্ধ। সেই রাত্রি ও নির্জনতা, জ্যোৎস্না ও বরফ সমস্ত মিলিয়া কেমন এক অপূর্ব দৃশ্য সৃজন করিয়াছিল। ছেলেরা (এবং আমিও) ঘাসের উপর হইতে বরফ কুড়াইয়া পাকাইয়া গোলা করিতেছিল। সেগুলো ঘরে আনিতেই ঘরের তাতে গলিয়া জল হইয়া যাইতে লাগিল।

আমার পক্ষে এই প্রথম বরফ পড়া রাত্রি। ইহার পরে আরও অনেক বরফ পড়া দেখিয়াছি। কিন্তু তাহার বর্ণনা করা সহজ নহে; বিশেষত এতদিন পরে। সর্বাঙ্গ কালো গরম কাপড়ে আচ্ছন্ন; রাস্তা দিয়া চলিয়াছি। আকাশ ধূসর বর্ণ। গুঁড়িগুঁড়ি বরফ কুইনাইনের গুঁড়ার মতো চারি দিকে পড়িতেছে। বৃষ্টির মতো টপ্‌টপ্ করিয়া পড়ে না— লঘুচরণে উড়িয়া উড়িয়া নাচিয়া নাচিয়া পড়ে। কাপড়ের উপরে আসিয়া ছুঁইয়া থাকে, ঝাড়িলেই পড়িয়া যায়। চারি দিক শুভ্র। কোমল বরফের স্তরের উপর গাড়ির চাকার দাগ পড়িয়া যাইতেছে। শুভ্র বরফের আস্তরণের উপরে কাদাসুদ্ধ জুতার পদচিহ্ন ফেলিতে কেমন মায়া হয়। মনে হয়, স্বর্গ হইতে যেন ফুলের পাপড়ি, যেন পারিজাতের কেশর ঝরিয়া পড়িতেছে। পথিকদের কালো কাপড়ে কালো ছাতায় বরফ লাগিয়াছে।

কেমন অল্পে অল্পে সমস্ত বরফে আচ্ছন্ন হইয়া আসে। প্রথমে পথে ঘাটে সাদা-সাদা রেখা-রেখার মতো পড়িতে লাগিল। আমাদের বাড়ির সম্মুখেই অল্প একটুখানি জমি আছে, তাহাতে খানকতক গাছের চারা ও গুল্ম আছে— গাছে পাতা নাই, কেবল ডাঁটা সার; সেই ডাঁটাগুলি এখনও আচ্ছন্ন হয় নাই— সবুজে সাদায় মেশামেশি হইতেছে। গাছের চারাগুলো যেন শীতে হীহী করিতেছে। তাহাদের গাত্রবস্ত্র গিয়াছে, বরফের সাদা শোক-উত্তরীয় পরিয়া তাহাদের শিরার ভিতরকার রস যেন জমিয়া যাইতেছে। বাড়ির কালো স্লেটের চাল অল্প অল্প পাণ্ডুবর্ণ হইয়া ক্রমে সাদা হইয়া উঠিতেছে। ক্রমে পথ আচ্ছন্ন হইয়া গেল— ছোটো ছোটো চারা বরফে ডুবিয়া গেল। জানালার সম্মুখে সংকীর্ণ আলিসার উপরে বরফের স্তর উঁচু হইয়া উঠিতে লাগিল। যে দুই-একজন পথিক দেখা যায়, তাহাদের নাক নীল হইয়া গিয়াছে, মুখ শীতে সংকুচিত। অদূরে গির্জার চূড়া শ্বেতবসন প্রেতের মতো আকাশে আবছায়া দেখা যাইতেছে।

শীত যে কতখানি তাহা এই ভাদ্রমাসের গুমটে কল্পনা করা বড়ো শক্ত। মনে আছে, সকালে ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়া হাত এমন অসাড় হইয়া যাইত যে, পকেটে রুমাল খুঁজিয়া পাইতাম না। গায়ে গরম কাপড়ের সীমা পরিসীমা নাই— মোটা জুতো ও মোটা মোজার মধ্যে পায়ের তেলো দুটো কথায় কথায় হিম হইয়া উঠিত। রাত্রে কম্বলের বস্তার মধ্যে প্রবেশ করিয়াও পাশ ফিরিতে নিতান্ত ভাবনা উপস্থিত হইত, কারণ যেখানে ফিরিব সেইখানেই ছ্যাঁক করিয়া উঠিবে। শুনা গেল, একটা জেলে-নৌকায় চারজন জেলে সমুদ্রে মাছ ধরিতে গিয়াছিল, কোনো জাহাজের কাছে আসিতে জাহাজের লোকেরা দেখিল, তাহারা চারজনেই শীতে জমিয়া মরিয়া আছে। রাত্রে গাড়ির উপরে গাড়ির কোচমান মরিয়া আছে। জলের নলের মধ্যে জল জমিয়া মাঝে মাঝে নল ফাটিয়া যায়। টেম্‌স্ নদীর উপরে বরফ জমিয়াছে। হাইড্‌পার্ক নামক উদ্যানের ঝিল জমিয়া গেছে। প্রতিদিন শতসহস্র লোক একপ্রকার লৌহপাদুকা পরিয়া সেই ঝিলের উপর স্কেট করিতে সমাগত।

এই স্কেট করা এক অপূর্ব ব্যাপার। কঠিন জলাশয়ের উপর শতসহস্র লোক স্কেটজুতা পরিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া হেলিয়া দুলিয়া পিছলিয়া চলিতেছে। পালে নৌকা চলা যেমন, স্কেটে মানুষ চলাও তেমনি— শরীর ঈষৎ হেলাইয়া মাটির উপর দিয়া কেমন অবলীলাক্রমে ভাসিয়া যাওয়া যায়। পদক্ষেপ করিবার পরিশ্রম নাই— মাটির সহিত বিবাদ করিয়া, পদাঘাতের দ্বারা প্রতিপদে মাটিকে পরাভূত করিয়া চলিতে হয় না।

কিন্তু কল্পনাযোগে আমাদের দেশে সেই বিলাতের শীত আমদানি করিবার চেষ্টা করা বৃথা— আমাদের এখানকার উত্তাপে তাহা দেখিতে দেখিতে তাতিয়া উঠে, বরফের মতো গলিয়া যায় তাহাকে আয়ত্ত করা যায় না। আমাদের এখানকার লেপ-কাঁথার মধ্যে তাহার যথেষ্ট সমাদর হয় না।

বালক
আশ্বিন-কার্তিক ১২৯২

শিউলিফুলের গাছ

আমি সমস্ত দিন কেবল টুপ্‌টাপ্‌ করিয়া ফুল ফেলিতেছি; আমার তো আর কোনো কাজ নাই। আমার প্রাণ যখন পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, আমার সাদা সাদা হাসিগুলি মধুর অশ্রুজলের মতো আমি বর্ষণ করিতে থাকি।

আমার চারি দিকে কী শোভা! কী আলো! আমার শাখায় শাখায় পাতায় পাতায় সূর্যের কিরণ নাচিতেছে। বীণার তারের উপর মধুর সংগীত যেমন আপনার আনন্দে থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিয়া উঠে, স্বর্গ হইতে নামিয়া আসে, এবং কাঁপিতে কাঁপিতে স্বর্গেই চলিয়া যায়; আমার পাতায় পাতায় প্রভাতের আলো তেমনি করিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, চমক খাইয়া আকাশে ঠিক্‌রিয়া পড়িতেছে, সেই আলোকের চম্পক-অঙ্গুলি স্পর্শে আমার প্রাণের ভিতরেও ঝিন্‌ঝিন্‌ করিয়া বাজিয়া উঠিতেছে, কাঁদিয়া উঠিতেছে— আমি আপনাকে আর রাখিতে পারিতেছি না— বিহ্বল হইয়া আমার ফুলগুলি ঝরিয়া পড়িতেছে।

বাতাস আসিয়াছে। ভোরের বেলায় জাগিয়া উঠিয়াই আমাকে তাহার মনে পড়িয়াছে। রাত্রে সে স্বপ্ন দেখিয়া মাঝে মাঝে জাগিয়া আমার কোলের উপর আসিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়ে। আমার কোমল পল্লবের স্তরের মধ্যে আসিয়া সে আরাম পায়। আধো-আধো স্বরে সে আমাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া কথা কহে, সে তাহার খেলার গল্প করে, আকাশের মেঘ ও সমুদ্রের ঢেউয়ের কাহিনী বলে— বলিতে বলিতে ভুলিয়া যায়, চলিয়া যায়— আবার কখন আপন মনে ফিরিয়া আসে। সে যখন দূর হইতে আসিয়া দুই-একটা কথা বলিয়া আমার পাশ দিয়া চলিয়া যায়, তাহার উড়ন্ত আঁচলটি আমার গায়ে একটু ঠেকিয়া অমনি উড়িয়া যায়, আমার সমস্ত ডালপালা চঞ্চল হইয়া উঠে, আমার ফুলগুলি তাহার পিছন পিছন উড়িয়া যায়, স্নেহভরে ভূমিতে পড়িয়া যায়।

দুপুরবেলা চারি দিক নিঝুম হইয়া গেলে একটি পাখি আসিয়া আমার পাতার মধ্যে বসিয়া এক সুরে ডাকিতে থাকে। তাহার সেই সুর শুনিয়া ছায়াখানি আমার তলায় ঘুমাইয়া পড়ে। বাতাস আর চলিতে পারে না। মেঘের টুকরা স্বপ্নের মতো ভাসিয়া যায়। দূর হইতে রাখালের বাঁশির স্বর মিলাইয়া আসে। ঘাসের ভিতরে বেগুনি ফুলগুলি বৃন্তসুদ্ধ মাথা হেঁট করিয়া থাকে। দুই-একটা করিয়া আমার ফুল যেন ভুলিয়া ঝরিয়া পড়ে। তাহারাও সেই পাখির এক সুরে এক গানের মতো, সমস্ত দুপুরবেলা একভাবে একছন্দে একটির পরে একটি করিয়া ঝরিতে থাকে— ভূমিতে পড়িয়া মরিতে থাকে— আপনার মনে মিলাইয়া যায়।

সন্ধ্যার কনক-উপকূল ছাপাইয়া অন্ধকার যখন জগৎ ভাসাইয়া দেয়, আমি তখন আকাশে চাহিয়া থাকি। আমার মনে হয় আমার আজন্মকালের ঝরা ফুলগুলি আকাশে তারা হইয়া উঠিয়াছে। উহাদের মধ্যেও দু-একটা কখনো কখনো ঝরিয়া আসে, বোধ করি আমারই তলায় আসিয়া পড়ে, সকালে তাহার উপরে শিশির পড়িয়া থাকে। এইরূপ স্বপ্ন ভাবিতে ভাবিতে আমি ঘুমাইয়া পড়ি এবং ঘুমাইতে ঘুমাইতে স্বপ্ন দেখি; নিশীথের মাধুরী আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। আমি স্বপ্নে অনুভব করিতে থাকি ধীরে ধীরে আমার কুঁড়িগুলি আমার সর্বাঙ্গে পুলকের মতো ফুটিয়া উঠিতেছে। আধঘুমঘোরে শুনিতে পাই আমার সন্ধ্যাবেলাকার ফোটা ফুলগুলি টুপ্‌টাপ্‌ করিয়া অন্ধকারে ঝরিয়া পড়িতেছে।

আমি সমস্ত দিনরাত্রি এই নীল আকাশের তলে দাঁড়াইয়া আছি— আমি চলিতে পারি না, খুঁজিতে পারি না, কোথায় কী আছে সকল দেখিতে পাই না। আমি কেবল আকাশের গুটিকত তারা চিনিয়া রাখিয়াছি, আর কাননের গুটিকতক গাছ দেখিতে পাই, তাহারা প্রভাতের আনন্দে আমারই মতো কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে। আমার কাছে দূর বন হইতে ফুলের গন্ধ আসে, কিন্তু সে ফুল আমি দেখিতে পাই না। পল্লবের মর্মর শুনিতে পাই কিন্তু কোথায় সে ছায়াময় বন! শুভ্র ক্ষীণ মেঘ আকাশের উপর দিয়া ভাসিয়া যায়— কিন্তু কোথায় সে যায়! যে পাখি অনেক দূর হইতে উড়িয়া আমার ডালে আসিয়া বসে সে কেন আমাকে জগতের সকল কথা বলিয়া যায় না!

আমি এক জায়গায় দাঁড়াইয়া থাকি— যাহার জন্য আমার ফুল ফুটিতেছে মনের সাধ মিটাইয়া তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে পারি না। এইজন্য আমি সমস্তদিন ফুল ফেলিয়া ফেলিয়া দিই— আমি দাঁড়াইয়া থাকি কিন্তু আমার সুগন্ধ আমার প্রাণের আশা ঘুরিয়া বেড়ায়। আমার ফুলগুলি আমি বাঁধিয়া রাখি না, তাহারা উড়িয়া যায়। তাহাদের আমি জগতে পাঠাইয়া দিই, আমার আনন্দের বার্তা তাহারা দূরে গিয়া প্রচার করিয়া আসে। আমি আমার অজানা অচেনাকে ফুলের অক্ষরে চিঠি লিখিয়া পাঠাই। নিশ্চয় তাহার হাতে গিয়া পৌঁছায়, নহিলে আমার মনের ভার লাঘব হয় কেন? আমি নীলাকাশে চাহিয়া উদ্দেশে আমার প্রিয়তমের চরণে অনুক্ষণ অঞ্জলিপূর্ণ ফুল ঢালিয়া দিই, আমি যেখানে যাইতে পারি না, আমার ফুলেরা সেখানে চলিয়া যায়।

ছোটো মেয়েটি আমার তলা হইতে অবহেলে অমনি একমুঠো ফুল কুড়াইয়া লয়, মাথায় দুটো ফুল গুঁজিয়া চলিয়া যায়। কোথায় কোন্ নদীর ধারে কোন্ ছোটো কুটিরে তাহার ছোটো ছোটো সুখদুঃখের মধ্যে আমার ফুলের গন্ধ মিশাইতে থাকে। বৃদ্ধ সকালে সাজি করিয়া আমার ফুল দেবতার চরণে অর্পণ করে, তাহার ভক্তির সহিত আমার ফুলের গন্ধ আকাশে উঠিতে থাকে।

আমি প্রতিদিন সকালে যে আনন্দপূর্ণ সূর্যালোক, স্নেহপূর্ণ বাতাস পাই, আমি আমার ফুলের মধ্যে করিয়া সেই আলোক সেই বাতাস ফিরাইয়া দিই। জগতের প্রেম আমার মধ্যে ফুল হইয়া ফুটিয়া জগতে ফিরিয়া যায়। আমার যত আছে তত দিই। আরও থাকিলে আরও দিতাম।

দিয়া কী হয়? শুকাইয়া যায় ছড়াইয়া যায়— কিন্তু ফুরাইয়া যায় না, আমার কোল তো শূন্য হয় না, প্রতিদিন আবার আমার প্রাণ ভরিয়া উঠে। প্রতিদিন নূতন প্রাণের উচ্ছ্বাস হৃদয় হইতে বাহির করিয়া সূর্যালোকে ফুটাইয়া তুলা, এবং প্রতিদিন আনন্দধারা অজস্রধারে জগতের মধ্যে বিসর্জন করিয়া দেওয়া এই সুখই আমি কেবল জানি; তার পরে আমার ফুল কে চায় আমার ফুল কে গ্রহণ করে, আমার ফুল কে দলন করে আমি তাহার কিছুই জানি না। মনের মধ্যে এই বিশ্বাস যে, আমার এই ফুল ফোটানো ফুল বিসর্জন অবশ্য কিছু-না-কিছু কাজে লাগেই। আমার ঝরা ফুলগুলি জগৎ কুড়াইয়া লয়। অতীত আমার ঝরা ফুল লইয়া মালা গাঁথে। আমার সহস্র ফুল অবিশ্রাম ঝরিয়া ঝরিয়া সুদূর ভবিষ্যতের জন্য এক অপূর্ব নূতন শতদল রচনা করে। প্রভাতসংগীতের তালে তালে আমার ফুলের পতন হয়। সেই সুমধুর ছন্দে আমার ফুলের পতনে জগতের নৃত্যগীত সম্পূর্ণ হইতেছে।

আকাশের তারাগুলিও স্বর্গীয় কল্পতরুর ঝরা ফুল, তাহারা কি কোনো কাজে লাগে না? মালার মতো গাঁথিয়া কেহ কি তাহাদের গলায় পরে নাই? কোমল বলিয়া আমার ফুলগুলির উপরে কেহ কি পাও রাখিবে না? আমি জানি আমার ফুলগুলি ঝরিয়া জননী লক্ষ্মীর পদ্মাসনের তলে পুনর্জন্ম লাভ করে। সেখানে অমৃতধারায় অনন্তকাল প্রফুল্ল হইয়া থাকে। সেই অমর সৌন্দর্যের স্তরের উপর স্তরে জগৎব্যাপী স্তরের মধ্যে একটি ছোটো পাপড়ি হইয়া আনন্দে বিকশিত হইতে থাকে।

বালক

অগ্রহায়ণ ১২৯২

বানরের শ্রেষ্ঠত্ব

বানর বলিতেছেন— আমরা বানর, অতি শ্রেষ্ঠ পুরাতন বনুবংশজাত, অতএব আমরাই সকল জীবের প্রধান। নল নীল অঙ্গদ এবং সুবিখ্যাত মর্কটেরা এই বনুবংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের নমস্কার।

আমরা যে শ্রেষ্ঠ, তার প্রমাণ এই যে, আমাদের ভাষায় বানর অর্থই শ্রেষ্ঠ— আর আর সকল জীবই অশ্রেষ্ঠ। মনুষ্যদের আমরা ম্লেচ্ছ বলিয়া থাকি। যেহেতু তাহারা অপক্ব কদলী দগ্ধ করিয়া খায়, এরূপ আচরণ আমরা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারি না। তাহা ছাড়া তাহারা সাতজন্মে গায়ের উকুন বাছিয়া খায় না এমনি অশুচি। আত্মীয় বান্ধবের সহিত দেখা হইলে তাহারা পরস্পরের গায়ের উকুন বাছিয়া দেয় না তাহাদের সমাজে এমনি সহৃদয়তার অভাব। শ্রেষ্ঠজাতি বানর জাতি এই-সকল কারণে মনুষ্য জাতিকে ম্লেচ্ছ বলিয়া থাকে।

আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় কত দিব? আমরা পুরুষানুক্রমে কখনো চাষ করিয়া খাই না। সনাতন বানরশাস্ত্রে চাষ করার কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। প্রাচীন বনুর সময়ে যে নিয়ম ছিল আমরা আজও সেই নিয়ম পালন করিয়া আসিতেছি— এমনি আমরা শ্রেষ্ঠ! আমাদিগকে ভ্রষ্টাচারী কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু ম্লেচ্ছ মনুষ্য জাতি চাষ করিয়া খায়, তাহারা চাষা।

চাষ না করাই যে সাধু আচার তাহার প্রমাণ এই, এতকাল ধরিয়া শ্রেষ্ঠ বানরসমাজে চাষ না করাই প্রচলিত। চাষ করাই যদি সদাচার হইত, তবে বনু-আচার্য কি চাষ করিতে বলিতেন না? আমাদের বানর বংশে যে মহাত্মা জাম্বুবানের মতো এত বড়ো দূরদর্শী পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কই তিনি তো চাষের কোনো উল্লেখ করেন নাই। তবে যদি আধুনিক অর্বাচীন নব্য বানরের মধ্যে কোনো মহাপুরুষ লেজ খসাইয়া মানুষীয়ানা করিতে চান, তবে তিনি সনাতন পবিত্র বানর প্রথা ত্যাগ করিয়া চাষ করিতে থাকুন!

কিন্তু অত্যন্ত আমোদের বিষয় এই যে, বানরদের শ্রেষ্ঠতায় মুগ্ধ হইয়া মানুষেরা সম্প্রতি প্রমাণ করিতে আসিয়াছে যে, মানুষরা বানর বংশজাত। এইরূপ মিথ্যাযুক্তির সাহায্যে গোলেমালে কোনোপ্রকারে মানুষ বানরের দলে মিশিতে চায়! হে বানর ভ্রাতৃবৃন্দ, তোমরা সাবধান, মানুষ যে বানর এরূপ গুরুতর ভ্রম মনে স্থান দিয়ো না।

গোটাকতক বিষয়ে বানরে ও মানবে সাদৃশ্য দেখা যায় বটে। কিন্তু তাহা হইতে কী প্রমাণ হইতেছে! এই প্রমাণ হইতেছে যে, মানবেরা বানর হইবার দুরাকাঙ্ক্ষায় ক্রমাগত আমাদের অনুকরণ করিতেছে— ক্রমাগত আমাদিগকে ape করিতেছে। ম্লেচ্ছ মানব কাঁচকলা খাইত বটে, কিন্তু পক্ব কদলীর গৌরব আমাদের কাছ হইতে শিখিয়াছে। উকুনবাছা সম্বন্ধেও মানবীরা আমাদের অতি অসম্পূর্ণ অনুকরণ আরম্ভ করিয়াছে, শ্রেষ্ঠ বানরেরা তাহা দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারে না। আনন্দ উপলক্ষে অনেক সময়ে মানবেরা দন্তপঙ্‌ক্তি বিকাশ করে বটে, এবং মনে করে বুঝি অবিকল বানরের মতো হইলাম— কিন্তু সে মুখভঙ্গি আমাদের পবিত্র বানরজাতি-প্রচলিত সনাতন দন্তবিকাশের কাছ দিয়াও যায় না।

মানবের ভাষায় দুই-একটা এমন শব্দপ্রয়োগ দেখা যায় বটে, যাহাতে সহসা কোনো নির্বোধের ভ্রম হইতেও পারে যে বানরের সহিত মানবের যোগ আছে। 'লেজে তেল দেওয়া' 'লেজ মোটা হওয়া' শব্দ মানবেরা এমনভাবে ব্যবহার করে যেন তাহাদের সত্যসত্যই লেজ আছে। কিন্তু উহা ভান মাত্র— উহাতে কেবল তাহাদের হৃদয়ের বাসনা প্রকাশ পায় মাত্র— হায় রে দুরভিলাষ! আমি শুনিয়াছি দুরাশাগ্রস্ত লোককে মানুষ বলিয়া থাকে 'অমুক কাজ করিয়া এমনি কী চতুর্ভুজ হইয়াছ!' ইহাতে চতুর্ভুজ হইবার জন্য মানুষের প্রাণপণ চেষ্টা প্রকাশ পায়। শ্রেষ্ঠ বনুবংশজাত বানরেরা সহজেই চতুর্ভুজ হইয়াছে, কিন্তু ম্লেচ্ছ মানবেরা শত জন্ম তপস্যা করিলেও তাহা হইতে পারিবে না।

যাহা হউক, স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, মানবেরা বানর বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। এমন-কি, বস্ত্রদ্বারা তাহারা সযত্নে গাত্র আচ্ছাদন করিয়া রাখে, পাছে তাহাদের রোমাবলীর বিরলতা ও লাঙুলের অভাব ধরা পড়ে— পবিত্র বানরতনুর সহিত ম্লেচ্ছ মানবতনুর প্রভেদ দৃশ্যমান হয়। লজ্জার বিষয় বটে। কিন্তু বনুবংশীয়দের কী আনন্দ! আমরা কী গৌরবের সহিত আমাদের লাঙুল আস্ফালন করিতে পারি।

আমাদের কিচিকিচি-পুরাণ মানুষের পিতৃপুরুষের সাধ্য নাই যে বুঝে— কারণ শ্রেষ্ঠজাতির শাস্ত্র নিকৃষ্টজাতি কখনোই বুঝিতে পারে না। আমি জিজ্ঞাসা করি, মানুষের ভাষায় কি কোনো প্রকৃত তত্ত্বকথা আছে— যদি থাকিত তবে কি আমাদের পবিত্র কিচিকিচির সহিত তাহার কোনো সাদৃশ্য পাইতাম না?

অতএব আমাদের বনুদেব ও হনুমদাচার্য চিরজীবী হইয়া থাকুন, আমরা যেন চিরদিন বানর থাকি, এবং কিচিকিচি শাস্ত্রে সম্যক পারদর্শী হইয়া উত্তরোত্তর অধিকতর বানরত্ব লাভ করি। আমাদের সনাতন লেজ যেন সযত্নে রক্ষা করিতে পারি, এবং আস্ফালনের প্রভাবে তাহা দিনে দিনে যেন দীর্ঘতর হইতে থাকে! আর যে যা খায় খাক আমরা যেন কেবল কলা খাইতেই থাকি, এবং শ্রেষ্ঠ বানর ব্যতীত অন্য জীবকে দেখিবামাত্র দাঁত খিঁচাইয়া আনন্দলাভ করি।

বালক
চৈত্র ১২৯২

কার্যধ্যক্ষের নিবেদন

কার্যাধ্যক্ষের অপটুতাবশত কিছুকাল হইতে বালক প্রকাশে ও বিতরণে অনিয়ম ঘটিয়াছে এবং উত্তরোত্তর অধিকতর অনিয়ম ঘটিবার সম্ভাবনা, এইজন্য পাঠকদিগের নিকটে মার্জনা প্রার্থনা করিয়া কার্যাধ্যক্ষ অবসর গ্রহণ করিতেছেন। বালক কার্যাধ্যক্ষ সাহিত্য-ব্যবসায়ী, যথেষ্ট অবকাশ তাঁহার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক— তিনি কর্মিষ্ঠতা ও কার্যনিপুণতার জন্যও বিখ্যাত নহেন, তৎসত্ত্বেও তাঁহার হাতে অন্যান্য কাজের ভার আছে, ভরসা করি এই-সকল বিবেচনা করিয়া বালকের গ্রাহকেরা প্রসন্ন মনে তাঁহাদের কার্যধ্যক্ষকে বিদায় দিবেন।

বালক কার্যাধ্যক্ষ

বালক
চৈত্র ১২৯২

সৌন্দর্য ও বল

পরিমিত বেশভূষা দ্বারা স্ত্রীলোক আপন সৌন্দর্য বৃদ্ধির চেষ্টা করিলে আমাদের খারাপ লাগে না। কিন্তু কেহ বিশেষ কোনো হাবভাবভঙ্গি অনুশীলন করিয়া রূপচ্ছটা বিকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে ইহা জানিতে পারিলেই আমাদের অত্যন্ত খারাপ লাগে এবং অধিকাংশ স্থলে রূপসীর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। ইহার কারণ কী? সৌন্দর্য আমাদের মনে পূর্ণতার ভাব আনয়ন করে, পূর্ণতার সহিত চপলতার যোগ নাই; পূর্ণতার মধ্যে একটি বিরাম আছে। পরিমিত বসনভূষণ আমাদের মনকে নিমেষে নিমেষে উত্তেজিত করে না— রূপের সহিত মিলিয়া মিশিয়া একটি পরিপূর্ণতা আমাদের সমক্ষে আনয়ন করে। এইজন্য সর্বত্র বলে লজ্জা স্ত্রীলোকের ভূষণ। লজ্জা অর্থে সংযম, সামঞ্জস্য, বিরাম। কোনো প্রকার গতিচাপল্য বা উচ্চস্বর প্রভৃতি যাহাতে সৌন্দর্যের শোভন সামঞ্জস্য নষ্ট করে তাহা নির্লজ্জতার অঙ্গ। এই হিসাবে অত্যধিক অলংকার এবং অতি রঙচঙ নির্লজ্জতা। বিবসন নিশ্চল প্রশান্ত গ্রীক প্রস্তরমূর্তির মধ্যে একটি আশ্চর্য সসম্ভ্রম সলজ্জ ভাব আছে— কিন্তু বিস্তর বাহার-করা বাসাচ্ছাদিতা ভঙ্গি-নিপুণা রূপসীর মধ্যে তাহা নাই। চেষ্টার

ভাব পূর্ণতার ভাবকে হ্রাস করে— বসনভূষণ অপেক্ষা হাবভাবে অধিক চেষ্টা প্রকাশ পায়— মন প্রতিক্ষণে প্রশ্ন করে এমন সময়ে হাত কেন নাড়িল, অমন সময়ে ঘাড় কেন বাঁকাইল, যদি তাহার কোনো স্বাভাবিক উদ্দেশ্য না খুঁজিয়া পায় তবে তখনই বুঝিতে পারে তাহা সৌন্দর্য-বৃদ্ধির চেষ্টা; এবং মন বলে সৌন্দর্যের সহিত চেষ্টার তো কোনো যোগ নাই। বলের সহিত সৌন্দর্যের প্রভেদ তাহাই। চেষ্টা হইতে চেষ্টার জন্ম হয়। বলের মধ্যে চেষ্টা আছে, এইজন্য সেই চেষ্টাকে প্রতিহত করিবার জন্য স্বভাবতই আমাদের মনে চেষ্টার উদয় হয়। এইজন্য বলের অধীন হইতে আমাদের লজ্জা বোধ হয়, দাসত্ব বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহার মধ্যে পরাজয় অনুভব করি। নিশ্চেষ্ট নিরস্ত্র সৌন্দর্যের নিকট আমরা নিশ্চেষ্ট নিরস্ত্র ভাবে আত্মসমর্পণ করি। তাহার মধ্যে যখনই চেষ্টা দেখি তখনই তাহা বলের সামিল হইয়া দাঁড়ায়, তৎক্ষণাৎ আমাদের মন সচেতন হইয়া তাহার বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হয়। 'দেখি, কে হারে কে জেতে' এই ভাবটাই প্রবল হইয়া উঠে।

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক

২১।১১।১৮৮৮

আবশ্যকের মধ্যে অধীনতার ভাব

আবশ্যকের প্রতি আমাদের এক প্রকার ঘৃণা আছে। যাহার মধ্যে আবশ্যকের ভাব যত পরিস্ফুট তাহাকে ততই নীচশ্রেণীয় মনে করি। চাষ নিতান্তই আবশ্যকীয়— বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে একান্ত আবশ্যকতা তত জাজ্বল্যরূপে নজরে পড়ে না। যাহারা খাটিয়া খায় তাহারা সমাজের পক্ষে একান্ত আবশ্যক এবং তাহারা নীচশ্রেণীয়, যাহারা বসিয়া খায় সমাজের পক্ষে তাহাদের তেমন স্পষ্ট আবশ্যক দেখা যায় না তাহারা উচ্চশ্রেণীয়। ঘটিবাটির প্রতি আমাদের এক ভাব ফুলদানির প্রতি অন্যভাব। এইজন্য আমরা আবশ্যকের বিবাহকে হেয় এবং প্রেমের বিবাহকে উচ্চশ্রেণীয় মনে করি। স্ত্রীকে যদি আবশ্যক জ্ঞান করি তবে স্ত্রী দাসী, স্ত্রীকে যদি ভালোবাসি তবে সে লক্ষ্মী। Marriage de convenance-কে এইজন্য ইংরাজেরা সাধারণত কেমন ঘৃণার ভাবে উল্লেখ করে। প্রকৃত প্রেমের মধ্যে সেই অত্যাবশ্যকতা নাই, এইজন্য তাহার মধ্যে স্বাধীনতার গৌরব আছে, তাহাতে দাসত্ববন্ধন নাই। মর্ত্যের সমস্ত নিয়ম আবশ্যকের নিয়ম, প্রেম যেন সেই নিয়মকে অতিক্রম করিয়া অমর্ত্য উজ্জ্বলভাব ধারণ করে এবং সেই প্রেমের বন্ধনে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধের মধ্যে বিশুদ্ধ সম্মানের ভাব আসিয়া পড়ে। মনুষ্য সহস্র আবশ্যক বন্ধনে বদ্ধ প্রকৃতির দাস— কেবল প্রেমের মধ্যে সে আপনাকে স্বাধীন ও গৌরবান্বিত জ্ঞান করে। এই স্বাধীনতার বন্ধন অন্য সকল বন্ধন অপেক্ষা গুরুতর, কারণ অন্য সকল বন্ধন ছিন্ন করিবার প্রয়াস আমাদের মনে সর্বদা জাগ্রত থাকে, এ বন্ধনে সেই প্রয়াসকেও অভিভূত করিয়া রাখে। সেইজন্য এক হিসাবে প্রকৃত স্বাধীনতা সকল অধীনতা অপেক্ষা দৃঢ়তর অধীনতা— কারণ স্বাধীনতা সবল অধীনতা, পরাধীনতা দুর্বল অধীনতা। যথেচ্ছাচারিতাকে আমি স্বাধীনতা বলিতেছি না তাহা, অধীনতার সোপান ও অঙ্গ।

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক

২১।১১।১৮৮৮

শরৎকাল

আবার শরৎকাল আসিয়াছে। এই শরৎকালের মধ্যে আমি একটি নিবিড় গভীরতা, একটি নির্মল নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করি। এই প্রথম বর্ষা অপগমে প্রভাতের প্রকৃতি কী অনুপম প্রসন্নমূর্তি ধারণ করে। রৌদ্র দেখিলে মনে হয় যেন প্রকৃতি কী এক নূতন উত্তাপের দ্বারা সোনাকে গলাইয়া

বাষ্প করিয়া এত সূক্ষ্ম করিয়া দিয়াছেন যে, সোনা আর নাই কেবল তাহার লাবণ্যের দ্বারা চারি দিক আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। বায়ু-হিল্লোলের মধ্যে একটি চিরপরিচিত স্পর্শ প্রবাহিত হইতে থাকে, কাজকর্ম ভুলিয়া যাইতে হয়; বেলা চলিয়া যাইতেছে, না মন্ত্রমুগ্ধ আলস্যে অভিভূত হইয়া পড়িয়া আছে, বুঝা যায় না। শরতের প্রভাতে যেন আমার বহুকালের স্মৃতি একত্রে মিশিয়া রূপান্তরিত হইয়া রক্ত আকারে আমার হৃদয়ের শিরার মধ্যে সঞ্চরণ করিতে থাকে। কবিতার মধ্যে অনেক সময়ে এইরূপ স্মৃতিজাগরণের কথা লেখা হয়, সে কথা সকল সময়ে ঠিক বোঝা যায় না— মনে হয় ও একটা কবিতার অলংকার মাত্র। হৃদয়ের ঠিক ভাবটি ভাষায় প্রকাশ করা এমনি কঠিন কাজ! বাঁশির শব্দে, পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায়, কবিরা বলেন, হৃদয়ের মধ্যে স্মৃতি জাগিয়া উঠে। তাহাকে স্মৃতির অপেক্ষা বিস্মৃতি বলিলেই ঠিক হয়। কিন্তু যে বিস্মৃতি বলিলে একটি অভাবাত্মক অবস্থা বোঝায় এ তাহা নয়, এ একপ্রকার ভাবাত্মক বিস্মৃতি। নহিলে 'বিস্মৃতি জাগিয়া উঠা' কথাটা ব্যবহার হইতেই পারে না। এরূপ অবস্থায় স্পষ্ট যে কিছু মনে পড়ে তাহা নয়, কিন্তু ধীরে ধীরে পুরাতন কথা মনে পড়িলে যেমনতর মনের ভাবটি হয়, অনেকটা সেইরূপ ভাবমাত্র অনুভব করা যায়। যে-সকল স্মৃতি স্বাতন্ত্র্য পরিহার করিয়া একাকার হইয়াছে, যাহাদিগকে পৃথক করিয়া চিনিবার জো নাই, আমাদের হৃদয়ের চেতনরাজ্যের বহির্ভাগে যাহারা বিস্মৃতি-মহাসাগররূপে স্তব্ধ হইয়া শয়ান আছে, তাহারা যেন এক-এক সময়ে চঞ্চল ও তরঙ্গিত হইয়া উঠে; তখন আমাদের চেতনহৃদয় সেই বিস্মৃতি-তরঙ্গের আঘাত অনুভব করিতে থাকে, তাহাদের রহস্যময় অগাধ প্রবল অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়, সেই মহা বিস্মৃত, অতি বিস্তৃত বিপুলতার ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।

শরৎকালের সূর্যালোকে আমার এইরূপ অবস্থা হয়। দুই-একটা জীবনের ঘটনা, দুই-একটা অতীতকালের মধুর শরৎ মনে পড়ে, কিন্তু সেইসঙ্গে যে-সকল শরৎকাল মনে পড়ে না, যে-সকল ঘটনা ভুলিয়া গিয়াছি, সেইগুলিই যেন অধিক মনে পড়ে। বছর তিন-চারের পূর্বে একটি শরৎকাল আমি অন্তরের সহিত উপভোগ করিয়াছিলাম। বাড়ির প্রান্তে একটি ছোট্ট ঘরে একটি ছোট্ট ডেস্কের সম্মুখে বাস করিতাম। আরও দুটি-একটি ছোট্ট আনন্দ আমার আশেপাশে আনাগোনা করিত। সে বৎসর যেন আমার সমস্ত জীবন ছুটি লইয়াছিল। আমি সেই ঘরটুকুর মধ্যে থাকিয়াই জগতে ভ্রমণ করিতাম, এবং বহির্জগতের মধ্যে থাকিয়াও ঘরের ভিতরটুকুর মধ্যে যে স্নেহপ্রেমের বিন্দুটুকু ছিল তাহা একান্ত আগ্রহের সহিত উপভোগ করিতাম। আমি যেন একপ্রকার আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম। মনের উপর হইতে সমস্ত ভার চলিয়া গিয়া, আমি একপ্রকার লঘুভাবে জগতের সমস্ত মধুরতার মধ্য দিয়া অতি সহজে সঞ্চরণ করিতাম। বোধহয় সেই বৎসরই শরৎকালের সহিত আমার প্রথম বন্ধুভাবে পরিচয় হইয়াছিল।

এক মুহূর্তের জন্য প্রগাঢ় সুখ অনুভব করিলে, সেই মুহূর্তকে যেমন আর মুহূর্ত বলিয়া মনে হয় না— মনে হয় যেন তাহার সহিত অনন্তকালের পরিচয় ছিল, বোধহয় আমারও সেইরূপ এক শরৎকাল রাশীকৃত শরৎ হইয়া উঠিয়াছে। আমি সেই শরতের মর্মের মধ্য দিয়া যেন বহুসহস্র সুদূর শরৎপরম্পরা দেখিতে পাই— দীর্ঘ পথের দুই পার্শ্ববর্তী বৃক্ষশ্রেণী যেমন অবিচ্ছিন্ন সংহতভাবে দেখা যায়, সেইরূপে— অর্থাৎ সবসুদ্ধ মিলিয়া একটা নিবিড় শারদ আনন্দের ভাবরূপে।

আমার মনে হয় স্বভাবতই শরৎকাল স্মৃতির কাল এবং বসন্ত বর্তমান আকাঙ্ক্ষার কাল। বসন্তে নবজীবনের চাঞ্চল্য, শরতে অতীত সুখদুঃখময় জীবনের পূর্ণতা। বাল্যকাল না গেলে যেন শরতের অতলস্পর্শ প্রশান্তি অনুভব করা যায় না।

আশ্বিন সপ্তমীপূজা ১৮৮৯।
পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক
মানসী, আশ্বিন ১৩২০

ছেলেবেলাকার শরৎকাল

এই শরতের প্রভাতের রৌদ্রে জানলার বাহির দিয়া গাছপালার দিকে চাহিয়া দেখিলেই আমার মনে পড়ে ছেলেবেলায় চারি দিকের প্রকৃতির শোভা কী একান্ত ভালো লাগিত। ভোরের বেলায় বাড়িভিতরের বাগানে গিয়া পথের দুইধারি ফুটন্ত জুঁই ফুলের গন্ধে কী আশ্চর্য আনন্দ লাভ করিতাম! গাছের গোপন সবুজের মধ্য হইতে একটি আধফুটো জহরী-চাঁপা খুঁজিয়া পাইলে কী যেন একটা সম্পদ লাভ করিতাম মনে হইত। বাহিরের তেতালার টবে অনাহূত অতিথির মতো একটু বুনোলতা কী সুযোগে জন্মিয়াছিল, প্রতিদিন সকালে উঠিয়া যখন দেখিতাম সেই লতা বেগুনি ফুলে একেবারে ভরিয়া গেছে আমার মনে কী এক অপূর্ব বিস্ময়পূর্ণ উল্লাসের সঞ্চার হইত। বাস্তবিক বিস্ময়ের কথা বটে। সকালবেলায় ঘুম হইতে উঠিয়াই একেবারে, দুর্বল, কোমল পেলব, কতরকমের সুন্দর ভঙ্গিমায় বঙ্কিম ক্ষীণ লতাটির শাখায় শাখায় ফুল— নবীন, পরিপূর্ণ পরিস্ফুট— সকল রঙগুলি ফলানো, রঙের আভাসগুলি অতি সুকোমলভাবে আঁকা, পাপড়ির অগ্রভাগগুলি অতি সযত্নে বাঁকাইয়া অমনি টুপ করিয়া একটুখানি মুখ করিয়া দেওয়া, সুকুমার বৃন্তটুকুর উপর অতি সরল সুন্দর ভারলেশহীন নিশ্চেষ্ট ভঙ্গিতে বসানো— কোথাও কিছুমাত্র তাড়াতাড়ি নাই, ভ্রম নাই, ত্রুটি নাই, রসভঙ্গ নাই, প্রতিকূল বিমুখ ভাব নাই— সমস্ত বিশ্বসংসার যেন তাহার প্রতি একাগ্র প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিতেছে এবং সে যেন সমস্ত বিশ্বের প্রতি পরিপূর্ণ প্রসন্ন হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে; তাহার প্রত্যেক সুকুমার বঙ্কিমার লেশটুকুর মধ্যে অপরিসীম প্রেমের ইতিহাস যেন লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহার সর্বাঙ্গের সুকোমল সুগোলতার মধ্যে, বিশেষত তাহার বুকের মাঝখানটিতে যেখানে চারি দিকের রঙের ঘোর অতি ধীরে ধীরে নরম হইয়া একেবারে মোলায়েম সাদা হইয়া আসিয়াছে— যেন অনন্তকালের সযত্ন সোহাগের চুম্বন লাগিয়া আছে। অতিশয় আশ্চর্য! একটি গোপন জহরী চাঁপা একটি গোপন সম্পদ তাহার আর সন্দেহ নাই। ইহা ছেলেমানুষের অপরিণত হৃদয়ের মোহমাত্র নহে। এখন সে বিস্ময়ের আনন্দ চলিয়া গেছে। এখন একটা অনাদৃত বুনোলতার বেগুনি ফুলকে নিতান্ত যৎকিঞ্চিৎ মনে হয়। ফুল যে ফুটিবারই কথা। ফুল সুন্দর বটে এবং অনেক ফুল দুর্লভও বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে সেই নিবিড় বিস্ময়ের স্থান নাই। ভিক্ষুকের যখন ভিক্ষা বরাদ্দ হইয়া যায়, তখন তাহার আর কৃতজ্ঞতা জন্মে না। শিশুকালে আমরা ভালো করিয়া জানিতাম না চারি দিকের এ অসীম সৌন্দর্য আমাদের নিত্যনিয়মিত বরাদ্দ। জননী যেমন প্রতি ক্ষুদ্র কাজে অজস্র স্নেহের দ্বারা আমাদিগকে অনুক্ষণ আচ্ছন্ন করিয়া রাখেন, তাহার মধ্যে অনেকটাই আমাদের আবশ্যকের অতিরিক্ত, তাহার অনেকটা আমাদের নজরে পড়ে না, তাহার অনেকটা আমরা অবহেলে গ্রহণ করি, কিন্তু বিচার করি না, কিন্তু উদার মাতৃস্নেহের তাহাতে কিছুই আসে যায় না— ইহাও সেইরূপ।

১০।১০।৮৯
[২৫ আশ্বিন ১২৯৬]

ইন্দুর-রহস্য

দিনকতক দেখা গেল সুরির দুটো-একটা বাজনার বই খোয়া যাইতেছে। সন্ধান করিয়া জানা গেল একটা ইন্দুর রাতারাতি উক্ত বইয়ের কাগজ কাটিয়া ছিন্ন খণ্ডগুলি পিয়ানোর তারের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়াছে। বৈজ্ঞানিক কৌতূহল ছাড়া ইহার তো কোনো উদ্দেশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইন্দুর জাতির স্বাভাবিক... মধ্যে একটা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ পায়। তাহারা যেরূপ নিজের ল্যাজের উপরে খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া চারি দিক পর্যবেক্ষণ করে, তাহাদের যেরূপ উজ্জ্বল ক্ষুদ্র দৃষ্টি, যেরূপ তীক্ষ্ণ দন্ত, যেরূপ আগ্রহপূর্ণ সন্ধানপর নাসিকা, যেরূপ ঊর্ধ্বোত্থিত সতর্ক

কর্ণযুগল, যেরূপ বিদ্যুৎগতিতে চারি দিকে ধাবমান হইবার ক্ষমতা, সকল জিনিসেই যেরূপ ছিদ্রখনন করিবার তৎপরতা এবং যাহা পায় তাহারই টুক্‌রা যেরূপ সযত্নে নিভৃত গহ্বর— Laboratory-র মধ্যে সঞ্চয় করিবার স্পৃহা তাহাতে তাহাদের Scientific training সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকে না। বর্তমান প্রবন্ধের ইন্দুরের উল্লেখ করা যাইতেছে সে বোধ করি স্বভাব-বৈজ্ঞানিক ইন্দুরবংশে একটি বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন মহৎ ইন্দুর। বিস্তর গবেষণায় সে বাজনার বইয়ের সহিত বাজনার তারের একটা সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে পারিয়াছে। এখন সমস্ত রাত ধরিয়া পরীক্ষা করিতেছে। বিচিত্র ঐকতানপূর্ণ সংগীতের আশ্চর্য রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছে। তীক্ষ্ণ দন্তাগ্রভাগ দ্বারা বাজনার বই ক্রমাগত analyse করিতেছে, পিয়ানোর তারের সহিত তাহার মিলন সাধন করিতেছে। মনে করিতেছে ঠিক রাস্তা পাইয়াছে, এখন অধিকতর গবেষণার সহিত analyze করিয়া গেলে সংগীততত্ত্ব বাহির হইয়া পড়িবে। এখন বাজনার বই কাটিতে শুরু করিয়াছে, ক্রমে বাজনার তার কাটিবে, কাঠ কাটিবে, বাজনাটাকে শতছিদ্র করিয়া সেই ছিদ্রপথে আপন সরু নাসিকা ও চঞ্চল কৌতূহল প্রবেশ করাইয়া দিবে— মাঝে হইতে সংগীত দেশছাড়া। আমার মনে কেবল এই তর্ক উদয় হইতেছে যে, ইন্দুরকুলতিলক যে উপায় অবলম্বন করিয়াছে তাহাতে তার এবং কাগজের উপাদানসম্বন্ধে নূতন তত্ত্ব আবিষ্ক্রিয়া হইতে পারে কিন্তু উক্ত কাগজের সহিত উক্ত তারের যথার্থ যে সম্বন্ধ তাহা কি সহস্র বৎসরেও বাহির হইবে? অবশেষে কি সংশয়পরায়ণ নব্য ইন্দুরদিগের মনে এইরূপ একটা বিতর্ক উপস্থিত হইবে না যে, কাগজ কেবল কাগজ মাত্র, এবং তার কেবল তার— কোনো জ্ঞানবান জীব-কর্তৃক উহাদের মধ্যে যে একটা আনন্দজনক উদ্দেশ্যবন্ধন বদ্ধ হইয়াছে তাহা কেবল প্রাচীন ইন্দুরদিগের যুক্তিহীন সংস্কার; সেই সংস্কারের একটা পরম সফলতা এই দেখা যাইতেছে তাহারই প্ররোচনায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া তার এবং কাগজের আপেক্ষিক কঠিনতা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা জন্মিয়াছে। কিন্তু এক-একদিন গহ্বরের গভীরতলে দন্তচালনকার্যে নিযুক্ত থাকিয়া মাঝে মাঝে অপূর্ব সংগীতধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। সেটা ব্যাপারটা কী? সেটা একটা রহস্য বটে। কিন্তু এই কাগজ এবং তার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে করিতে ক্রমে এই রহস্য শতছিদ্র আকারে উদ্‌ঘাটিত হইয়া যাইবে।

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক

১৬।১০।১৮৮৯

কাজ ও খেলা

কাজ ও খেলা নামক ৭৩-সংখ্যক প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

খেলা কাহাকে বলে ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিলে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়।

আমাদের মানবকার্য সাধনের জন্য বহুকাল হইতে কতকগুলি প্রবৃত্তি ও শক্তির চর্চা হইয়া আসিয়াছে। বংশানুক্রমে তাহারা আমাদের মধ্যে সংক্রামিত সঞ্চিত ও অনুশীলিত হইয়া আসিতেছে। সকল সময়ে আমরা তাহাদের হাতে কাজ দিতে পারি না। অথচ কাজ করিবার জন্য তাহারা অস্থির। সুতরাং যখন তাহাদিগকে সত্যকার কাজে খাটাইবার অবসর পাই না, তখন সঙ্গীদের সহিত একটা বোঝাপড়া করিয়া একটা কাজের ভান গড়িয়া তুলি ও এই উপায়ে আবশ্যকের অতিরিক্ত সঞ্চিত উদ্যমকে ছাড়া দিয়া আনন্দ অনুভব করি। অনেক সময়ে দীর্ঘ আলস্যের পর মাংসপেশীর রুদ্ধ উদ্যমকে দৌড়াদৌড়ি করিয়া খাটাইয়া লইতে ইচ্ছা করি। মানবহৃদয়ে একটা প্রতিযোগিতার প্রবৃত্তি আছে, দৈনিক কাজে তাহার যথেষ্ট ব্যয় হয় না, সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভান করিয়া হারজিতের খেলা গড়িয়া তাহার চরিতার্থতা সাধন করিতে হয়।

সভ্যতা-বৃদ্ধিসহকারে আমাদিগকে অনেক প্রবৃত্তি দমন করিয়া রাখিতে হয়, সুতরাং খেলাচ্ছলে তাহাদের নিবৃত্তি সাধন করিতে হয়। অসভ্য অবস্থায় শুদ্ধমাত্র গৌরবলাভের জন্য যুদ্ধ এই প্রবৃত্তির উত্তেজনায়। সভ্য অবস্থায় নানা প্রণালী বাহিয়া এই প্রবৃত্তি আপন শক্তি-উচ্ছ্বাস নিঃশেষিত করিতেছে। কতক কাজের ঠেলাঠেলিতে, কতক লেখালেখিতে, কতক শারীরিক কতক মানসিক প্রতিযোগিতায় এবং বাকি নানাবিধ খেলায়। কাব্য লিখিয়া, কাব্য পড়িয়া, অভিনয় দেখিয়া ও করিয়া নানা প্রবৃত্তির অলক্ষিত চরিতার্থতা সাধন হয়।

সত্যকার কাজে এত অধিক উত্তেজনা, তাহার সহিত স্বার্থের এত যোগ, তাহাতে এত প্রাণপণ কঠিন চেষ্টার উদ্রেক হয় যে শুদ্ধমাত্র প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির সুখ তাহাতে লাভ করা যায় না। বিশেষত তাহাতে আমাদের স্বাধীনতা নষ্ট করে। কার্যের কঠিন শৃঙ্খলে একেবারে বদ্ধ হইয়া পড়িতে হয়। খেলার মধ্যেও নিয়ম আছে নহিলে বাধা-অতিক্রমণের স্বাভাবিক সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়— কিন্তু সে নিয়মের বাধার মধ্যে কেবল ততটুকু দুঃখ আছে যতটুকু না থাকিলে সুখ নির্জীব হইয়া পড়ে। নিয়মকে নিয়ম অথচ তাহার ভার কিছুই নাই। অত্যাবশ্যকের মধ্যে স্বাধীনতার একান্ত পরাভবদুঃখ অনুভব করিতে হয়, খেলায় তাহা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

অতএব দেখা যাইতেছে কাজের ভান করিয়া শারীরিক মানসিক নানাবিধ শক্তিচালনা করা খেলা। কিন্তু ইহাতেও কথাটা সম্পূর্ণ হয় না। প্রবঞ্চনা করাকে খেলা বলে না। অনেকে মিথ্যা নিন্দা রটাইয়া সুখ পায়, কিন্তু তাহাকে খেলা বলিলে চলে না। খেলার মধ্যে প্রকাশ্য ভান থাকা চাই। আপনা-আপনির মধ্যে বোঝাপড়া করিয়া প্রবঞ্চনা। আমাদের একটা অংশ ভুলিতেছে এবং আরেকটা অংশ ভুলিতেছে না এমনি একটা ব্যাপার। আমরা যদি আপনাকে ও অন্যকে বা কেবল আপনাকে বা কেবল অন্যকে সম্পূর্ণ প্রবঞ্চনা করি তাহা হইলে আর খেলা হয় না।

অতএব 'কাজের ভান'ই খেলা বটে কিন্তু এমনি বাঁচাইয়া চলিতে হইবে যে বেশি 'কাজ'ও না হয় বেশি 'ভান'ও না হয়। সর্বস্ব অথবা বিস্তর টাকা পণ রাখিয়া জুয়াখেলা খেলাকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। লাভ-স্পৃহা ও প্রতিযোগিতা প্রবৃত্তিকে খেলার দ্বারা চরিতার্থ করিতে গেলে অল্প পয়সাকে বেশি পয়সা মনে করিয়া লইতে হয়— নতুবা খেলার বিশুদ্ধতা রক্ষা হয় না; স্বার্থের সহিত জড়িত হইলে খেলার লঘুতা দূর হয়, সে আমাদের প্রাণটা যেন চাপিয়া ধরে।— অপরপক্ষে Flirtationকে খেলা বলা যাইতে পারে। নিরুদ্যম প্রেমের প্রবৃত্তিকে খেলাচ্ছলে চরিতার্থ করিবার জন্য যদি উভয়পক্ষের মধ্যে মনে মনে বোঝাপড়া থাকে তবে তাহা খেলা বটে— কিন্তু আত্মপ্রবঞ্চনা বা পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করিলে তাহা আর খেলা থাকে না। রীতিমতো প্রবঞ্চনা করিতে গেলে খেলার লঘুতা চলিয়া যায়— কারণ, খেলায় দুইপক্ষ কিয়ৎপরিমাণে আপনাকে ধরা দেয়, এইজন্য ভান করা গুরুতর চেষ্টাসাধ্য বা অধিক চিন্তার কারণ হয় না— তাহাতে আমাদের ধর্মবুদ্ধি পীড়িত হয় না এবং লোকসমাজের নিন্দা সহ্য করিতে হয় না— সমস্ত ফলাফল অল্পেই চুকিয়া যায়। নিয়মবন্ধন, কর্মফল, স্বার্থের প্রবল আকর্ষণ এইগুলো যথাসাধ্য বাদ দিয়া সুদ্ধ শরীর- হৃদয়-মনের অতিরিক্ত উদ্যমকে খাটাইয়া আনন্দ লাভ করা খেলার উদ্দেশ্য।

তবে দেখা যাইতেছে শারীরিক মানসিক শক্তিচালনার উদ্দেশে কাজের প্রকাশ্য ভান করা খেলা। অতএব Political Agitation-এর সঙ্গে খেলার তুলনা খাটে কি না ভাবিয়া দেখিতে হয়। আমরা কি আপনাকে ও পরকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতেছি না?

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক

১৭।১০।১৮৮৯

[ঘানির বলদ]

ঘানির বলদ যদি মনে করে আমি যতই ঘুরছি ততই নূতন রাজ্য আবিষ্কার করছি তবে সেটা তার একটা অন্ধ ভ্রম, কিন্তু সে যদি জানে আমি সর্ষেকে পেষণ করে তার মধ্যেকার নিগূঢ় তেলটুকু বের করে নিচ্ছি তবে সে ঠিক কথাটা জানে।

বিজ্ঞান নিজের ঘানিযন্ত্রের চতুর্দিকে যতই সশব্দে ঘুরছে, রহস্যরাজ্যের সীমার দিকে এক পা অগ্রসর হতে পারছে না, কিন্তু বিবিধ বীজকে বিশ্লেষণ এবং পেষণ করে তার ভিতরকার তেল অনেকটা পরিমাণে বের করছে, এবং সে তেল থেকে মানুষের গৃহকোণের অন্ধকার দূর করবার একটা উপাদান তৈরি করছে সে কথা নিয়ে সে বাস্তবিক গর্ব করতে পারে।

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক
৬ এপ্রিল। সোমবার। ১৮৯১।
[২৪ চৈত্র ১২৯৭]

[জীবনের বুদ্‌বুদ]

মানুষকে দেখলে আমার অনেক সময়ে মনে হয়, গোলাকার মাথাটা নিয়ে পৃথিবী জুড়ে ক্রমাগতই কতকগুলো জীবনের বুদ্‌বুদ উঠছে। খানিকক্ষণের জন্যে সূর্যালোকে নীলাকাশের দিকে উন্মুখ হয়ে থাকে; তার পরে হঠাৎ ফেটে যায়, জীবনের তপ্তবাষ্পটুকু বেরিয়ে যায়, মৃত্তিকার আবরণটুকু এই মৃৎ-সাগরে মৃত্যুসাগরে লুপ্ত হয়, কারো গণনার মধ্যে আসে না।

উপমাটা অত্যন্ত পুরাতন, কিন্তু যখনই ভেবে দেখা যায় তখনই নূতন মনে হয়। মৃত্যুর চেয়ে পুরাতন এবং মৃত্যুর চেয়ে নূতন আর কিছু নেই।

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক
৬।৪।৯১। বির্জিতলাও।
[২৪ চৈত্র ১২৯৭]

বাগান

ভদ্রতার ভাষা, পরিচ্ছদ এবং আচরণের একটু বিশেষত্ব আছে। কুৎসিত শব্দ ভদ্রলোকের মুখ দিয়া বাহির হইতে চায় না, এবং যাহার মনে আত্মসম্মান বোধ আছে সে কখনো হাঁটুর উপরে একখানা ময়লা গামছা পরিয়া সমাজে সঞ্চরণ করিতে পারে না। তেমনি ভদ্রলোকের বাসস্থানেরও একটা পরিচ্ছদ এবং ভাষা আছে, নিদেন, থাকা উচিত। ভদ্রলোকের কুলে শীলে ঘরে বাহিরে সর্বত্রই একটা উজ্জ্বলতা থাকা চাই— যেখানে তাঁহার আবির্ভাব সেখানে পৃথিবী আদৃত শোভিত এবং স্বাস্থ্যময় যদি না হয়, যদি তাহার চারি দিকে আগাছা, জঙ্গল, বাঁশঝাড়, পানাপুকুর এবং আবর্জনাকুণ্ড থাকে তবে সেটা যে অত্যন্ত লজ্জার বিষয় হয় এ কথা আমরা সকল সময় মনে করি না। কেবল লোক দেখাইবার কথা হইতেছে না। অশোভনতার মধ্যে বাস করিলে আপনার প্রতি তেমন শ্রদ্ধা থাকে না, নিজের চতুর্দিক নিজেকে অপমান করিতে থাকে, আর সুখ-স্বাস্থ্যের তো কথাই নাই। আমরা যেমন স্নান করি এবং শুভ্র বস্ত্র পরি তেমনি বাড়ির চারি দিকে যত্নপূর্বক একখানি বাগান করিয়া রাখা ভদ্রপ্রথার একটি অবশ্যকর্তব্য অঙ্গ হওয়া উচিত।

রসিক লোকেরা পরিহাস করিয়া বলিবেন, উনবিংশ শতাব্দীর আর-একটা নূতন বাবুয়ানার অবতারণা হইতেছে, অন্নচিন্তায় রাত্রে ঘুম হয় না বাগান করিবার অবসর কোথায়। কিন্তু এ কথাটা একটা ওজরমাত্র। কাজের তো আর সীমা নাই! বঙ্গদেশে এমন কোন্‌ পল্লী আছে যেখানে প্রায় ঘরে ঘরে দুটি-চারটি অকর্মণ্য ভদ্রলোক পরমালস্যে কালযাপন না করেন। শহরের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু পাড়াগাঁয়ে অবসর নাই এমন ব্যস্ত লোক অতি বিরল। তাহা ছাড়া বাংলা দেশের মৃত্তিকায় একখানি বাগান করিয়া রাখা যে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের সাধ্যাতীত তাহাও নহে। তবে আলস্য একটা অন্তরায় এবং ঘরের চারি দিক সুশ্রী এবং স্বাস্থ্যজনক করিয়া রাখা তেমন অত্যাবশ্যক বলিয়া ধারণা না হওয়ায় তাহার জন্য দুই পয়সা ব্যয় করিতে আমরা কাতর বোধ করি এবং যেমন-তেমন করিয়া ঝোপ-ঝাড় ও কচুবনের মধ্যে জীবনযাপন করিতে থাকি। এইজন্য বাংলার বসতি-গ্রামে মনুষ্যযত্ন-কৃত সৌন্দর্যের কোনো চিহ্ন দেখা যায় না, কেবল পদে পদে অযত্ন অনাদর ও আলস্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

মানুষের ভিতরে বাহিরে একটা ঘনিষ্ঠ যোগ আছে সে কথা বলাই বাহুল্য। অন্তর বাহিরকে আকার দেয় এবং বাহিরও অন্তরকে গড়িতে থাকে। বাহিরে চতুর্দিক যদি অযত্নসম্ভূত শ্রীহীনতায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকে তবে অন্তরের স্বাভাবিক নির্মল পারিপাট্যপ্রিয়তাও অভ্যাসক্রমে জড়ত্ব প্রাপ্ত হইতে থাকে। অতএব চারি দিকে একখানি বাগান তৈরি করা একটা মানসিক শিক্ষার অঙ্গ বলিলেই হয়। ওটা কিছুতেই অবহেলার যোগ্য নহে। সন্তানদিগকে সৌন্দর্য, নির্মলতা এবং যত্নসাধ্য নিরলস পারিপাট্যের মধ্যে মানুষ করিয়া তুলিয়া অলক্ষ্যে তাহাদিগের হৃদয়ে উচ্চ আত্মগৌরব সঞ্চার করা পিতামাতার একটা প্রধান কর্তব্য। চারি দিকে অবহেলা, অমনোযোগ আলস্য এবং যথেচ্ছ কদর্যতার মতো কুশিক্ষা আর কী আছে বলিতে পারি না। বাহিরের ভূখণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তঃকরণ পর্যন্ত সর্বত্রই নিয়ত-জাগ্রত চেষ্টা এবং উন্নতি-ইচ্ছা সর্বদা প্রত্যক্ষ করিলে ছেলেরা মানুষ হইয়া উঠিতে পারে। বাসস্থানের বাহিরে যেখানে অবহেলায় জঙ্গল জন্মিতেছে, অযত্নে সৌন্দর্য দূরীভূত হইতেছে সেখানে ঘরের মধ্যে মনের ভিতরেও আগাছা জন্মিতেছে এবং সর্বাঙ্গীণ উন্নতির প্রতি ঔদাসীন্য মজ্জার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

সাধনা
অগ্রহায়ণ ১২৯৮

ঠাকুরঘর

বড়ো ভয়ে ভয়ে লিখিতে হয়। এখানে সকলেই সকল কথা গায় পাতিয়া লয়। বিশেষত যদি দুটো অপবাদের কথা থাকে। মনে করি, এমন কৌশলে লিখিলাম যে, সকলেই মনে করিবে আমার প্রতিবেশীকে লক্ষ্য করা হইতেছে, ভারি খুশি হইবে; কিন্তু দেখি বিপরীত ফল হয়। সকলেই মনে করে ওর মধ্যে যে কথাটা সব চেয়ে গর্হিত সেটা বিশেষরূপে আমার প্রতি আড়ি করিয়াই লেখা হইয়াছে— নতুবা এমন লোক আর কে আছে!

ভান এবং অন্ধ অহংকারের উপর স্বভাবতই দুটো শক্ত কথা বলিতে ইচ্ছা করে। যদি ঠিক জায়গায় আঘাত লাগে তো খুশি হওয়া যায়। কিন্তু ও সম্বন্ধে কিছু নাড়া দিলেই দুই-দশজন নয় একেবারে দেশের লোকে তাড়া করিয়া আসে। ইহার কারণ কী?

তবে কি আমরা দেশসুদ্ধ লোকই ঠাকুরঘরে বসিয়া কলা খাইতেছি? অর্থাৎ যেটা দেবতার উদ্দেশে দেওয়া উচিত, গোপনে তাহার মধ্য হইতে উপাদেয় জিনিসটি লইয়া নিজে ভক্ষণ করিতেছি? আসলে, দেবতার প্রতি ষোলো-আনা বিশ্বাসই নাই?

যে নৈবেদ্যটা সম্পূর্ণ স্বদেশের প্রাপ্য তাহার সারভাগ নিজের জন্য সঞ্চয় করিতেছি। শাস্ত্রের দোহাই দিয়া অন্তর্গুহাশায়ী জড়ত্বটাকে দুধকলা খাওয়াইতেছি।

যে কারণেই হৌক, আমরা সহজে ঠাকুরঘর আর ছাড়িতে চাই না। কার্যক্ষেত্রে বিস্তর কাজ, এবং অনেক চিন্তা, এবং বাধা-বিপত্তির সঙ্গে কেবলই সংগ্রাম। কিন্তু ঠাকুরঘরে কোনো কাজকর্ম নাই; কেবলই স্তবপাঠ এবং ঘণ্টানাড়া। অথচ নিজের কাছে এবং পরের কাছে অতি অল্প চেষ্টায় পরম পবিত্র ভক্তিভাজন হইয়া উঠা যায়।

যদি কেহ বলে, ওহে, কাজকর্মের চেষ্টা দেখো। আমাদের ঠাকুর বলেন, আমরা জাত-পুরোহিত, কাজকর্মকে আমরা হেয় জ্ঞান করি; আমাদের পক্ষে সেটা শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

এমন উন্নত মহানভাবে বলেন শুনিয়া তাঁর প্রতি ভক্তি হয়। ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া বলি— যে আজ্ঞা! আপনাকে আর কিছু করিতে হইবে না; আপনি এমনি পট্টবস্ত্র পরিয়া কেবল পবিত্র হইয়া বসিয়া থাকুন। ম্লেচ্ছদের মতো আপনি কাজকর্মে প্রবৃত্ত হইবেন না। মহাপুরুষেরা যে-সকল বচন রচনা করিয়া গিয়াছেন আপনি সেইগুলি সুর করিয়া আওড়ান (অর্থ না জানিলেও বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই)। যেগুলা সরল হৃদয়ের কথা সেগুলাকে পরম কৌশলে অতি সূক্ষ্ম তর্কের কথা করিয়া তুলুন এবং যেগুলা স্বভাবতই তর্কের কথা সেগুলা হইতে যুক্তি নির্বাসিত করিয়া দিয়া সহসা অকারণ হৃদয়াবেগপ্রাচুর্যে শ্রোতাদিগকে আর্দ্র বিগলিত বিমুগ্ধ করিয়া দিন। গোপনে কলা খান এবং দেশের শ্রাদ্ধ নির্বিবাদে সম্পন্ন করুন।

সাধনা
শ্রাবণ ১২২৯

নিষ্ফল চেষ্টা

অনেকগুলি বাংলা পদ্য, বিশেষত গদ্যপ্রবন্ধ পড়িয়া আমরা সর্বদাই কী-যেন কে-যেন কখন-যেন কেমন-যেন কী-যেন-কী-ময় হইয়া যাইতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু কোনোরূপ সুযোগ পাইয়া উঠি না।

আপিসের ছুটি হইলে পদব্রজে পথে বাহির হই; মনে করি, একেবারে উদাস হইয়া কী-যেন হইয়া যাইব; কিন্তু দেখিয়াছি ঠিক নিয়মিত সময়ে বাড়িতে পৌঁছিয়া হাত-মুখ ধুইয়া জলযোগ করিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে তামাক টানিতে বসি— মনে কোনো জায়গায় কোনোরূপ বিহ্বলতা অনুভব করি না।

বাড়ির গলির মোড়ে একটা প্রৌঢ়া পানওয়ালী বসিয়া থাকে সকালেও দেখিতে পাই, বিকালেও দেখিতে পাই, এবং নিমন্ত্রণ খাইয়া অনেক রাত্রি বাড়ি ফিরিবার সময় স্তিমিত দীপালোকে তাহার ক্লান্ত মুখচ্ছবি দৃষ্টিপথে পড়ে। মনে করা দুঃসাধ্য নয় যে, সে নিশিদিন যেন কাহার জন্য, যেন কিসের জন্য, যেন কোন্ অপরিচিত স্মৃতির জন্য, যেন কোন্ পরিচিত বিস্মৃতির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া প্রত্যেক পথিকের মুখের দিকে চাহিতেছে। কিন্তু সেরূপ কল্পনা করিয়াও কোনো ফল হয় না। বিস্তর চেষ্টা করি, তবু কিছুতেই তাহাকে দেখিয়া হৃদয়ের মধ্যে জ্যোৎস্নার সুগন্ধ, বাঁশির আলিঙ্গন, নিস্তব্ধতার সংগীত জাগ্রত হইয়া উঠে না। তাঁহার স্বহস্তরচিত অনেক পান কিনিয়া খাইয়াছি কিন্তু তাহার মধ্যে চুন খয়ের এবং গুটিদুয়েক খণ্ড সুপারি ছাড়া একদিনের জন্যও বাসনা, স্মৃতি, আশা অথবা স্বপ্নের লেশমাত্রও পাই নাই।

যেদিন চাঁদ উঠে সেদিন মনে করি, চাঁদের দিকে তাকাইয়া থাকা যাক, দেখি তাহাতে কীরূপ ফল হয়। বেশিক্ষণ একভাবে থাকিতে পারি না। অনতিবিলম্বে ঘুম আসে।

বাতায়নে গিয়া বসি। রান্নাঘর হইতে ধোঁয়া আসে, আস্তাবল হইতে গন্ধ পাই এবং প্রতিবেশিনীগণ অসাধু ভাষায় পরস্পর সম্বন্ধে স্ব স্ব মনোভাব উচ্ছ্বসিত স্বরে ব্যক্ত করিতে থাকে। নিদ্রিত অথবা জাগ্রত কোনো প্রকার স্বপ্নই টিকিতে পারে না।

সেখান হইতে উঠিয়া একাকী ছাতে গিয়া বসি। আপিসের ময়রা, ইন্ডিওরেন্সের টাকা,

ধোবার কাপড় দিতে বিলম্ব প্রভৃতি বিচিত্র বিষয় অসংলগ্নভাবে মনে উদয় হইতে থাকে, কিন্তু কিছুতেই কোনো বিস্মৃত মুখচ্ছবি, কোনো পূর্বজন্মের সুখস্বপ্ন মনে পড়ে না।

দেখিয়াছি আমার বন্ধুরা প্রায় সকলেই নীরব কবি। সকলেরই প্রায় হৃদয় ভাঙিয়া গেছে, অশ্রুজল শুকাইয়া গেছে, আশা ফুরাইয়া গেছে, কেবল স্মৃতি আছে এবং স্বপ্ন আছে। সুতরাং তাঁহাদের কাছে আমার মনের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করিতে লজ্জা হয়।

হৃদয় আছে অথচ প্রাণপণ চেষ্টাতেও হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে না এ কথা আমি কেমন করিয়া স্বীকার করি!

আমি বেশ আছি, আরামে আছি, নিয়মিত বেতন পাইলে আমার কোনোরূপ কষ্ট হয় না এ কথা একবার যদি প্রকাশ হইয়া পড়ে তবে বন্ধুসমাজে আমার আর কিছুমাত্র প্রতিপত্তি থাকিবে না।

সেই ভয়ে নীরব হইয়া থাকি। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলি, নীরব চিন্তা সর্বাপেক্ষা গভীর চিন্তা, নীরব বেদনা সর্বাপেক্ষা তীব্র বেদনা এবং নীরব কবিতা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবিতা। চোখে যে সহজে অশ্রুজল পড়ে না ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ আমার হইয়া তাহার জবাব দিয়া গেছেন।

আসল কথা, আমার বন্ধু-বান্ধবদের সকলেরই একটি করিয়া 'কে-যেন' 'কী-যেন' আছে, অথবা ছিল অথবা ভবিষ্যতে থাকিবার সম্ভাবনা আছে; আমার আর-সমস্ত আছে কেবল সেইটা নাই।

আমি কী করিব? কী করিলে আমার বুক ফাটিবে, সুখ থাকিবে না, আশা ফুরাইবে। হাসিব কিন্তু সে কেবল লোক-দেখানো; আমোদ করিতে ছাড়িব না কিন্তু সে কেবল অদৃষ্টকে সবলে উপেক্ষা করিবার জন্য! আপিসে যাইব, কিন্তু সে কেবল কাজের মধ্যে আপনাকে নিমগ্ন করিবার অভিপ্রায়ে।

এক কথায়— কী করিলে একটি 'কে-যেন' একটি 'কী-যেন' পাওয়া যায়!—

ভারতী ও বালক
আশ্বিন ১২৯২

সফলতার দৃষ্টান্ত

হরি হরি! আমার কী হইল! মরি মরি, আমাকে এমন করিয়া পাগল কে করিতেছে!

তবে সমস্ত ইতিহাসটি খুলিয়া বলি।

কিছুদিন হইতে প্রত্যহ সকালে আমার ডেস্কের উপর একটি করিয়া ফুলের তোড়া কে রাখিয়া যায়?

হায়! কে বলিবে কে রাখিয়া যায়! তোমরা জান কি, কাহার কোমল চম্পক-অঙ্গুলি এই চাঁপাগুলি চয়ন করিয়াছিল? বলিতে পারে কি, এই গোলাপে কাহার লজ্জা, এই বেলফুলে কাহার হাসি, এই দোপাটি ফুলে কাহার দুটি বিন্দু অশ্রুজল এখনও লাগিয়া আছে? তোমরা সংসারের লোক, তোমরা বুঝিতে পারিবে কি সে হৃদয়ে কত ভালোবাসা, হরি হরি কত প্রেম!

রোজ মনে করি আজ দেখিব— এই নীরব হৃদয়ের প্রেমের উচ্ছ্বাস আমার ডেস্কের উপর কে রাখিয়া যায় আজ তাহাকে ধরিব, আমার অন্তরে অন্তরে যে ব্যথা হাহাকার করিতেছে আজ তাহাকে বলিব এবং মরিব।

কিন্তু ধরি ধরি ধরা হয় না, বলি বলি বলা হয় না, মরি মরি মরিতে পাইলাম না!

কেমন করিয়া ধরিব! যে গোপনে আসে গোপনে চলিয়া যায় তাহাকে কেমন করিয়া বাঁধিব! যে অদৃশ্যে থাকিয়া পূজা করে, যে নির্জনে গিয়া অশ্রুবর্ষণ করে, যে দেখা দেয় না, দেখিতে আসে, ওরে পাষাণ-হৃদয় তাহার গোপন প্রেমব্রত ভঙ্গ করিবি কেমন করিয়া?

কিন্তু থাকিতে পারিলাম কই— অশান্ত হৃদয় বারণ মানিল কই— একদিন প্রত্যূষে উঠিলাম। দেখিলাম আমার বাগানের মালী তোড়া হাতে করিয়া লইয়া আসিতেছে।

কৌতূহল সংবরণ করিতে পারিলাম না। কম্পিত হৃদয়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম— 'ওরে জগা, তুই এ তোড়া কোথায় পাইলি রে!'

সে তৎক্ষণাৎ কহিল, 'বাগান হইতে তৈয়ার করিয়া আনিলাম।'

আমি কাতরকণ্ঠে কহিলাম, 'প্রবঞ্চনা করিস না রে জগা, সত্য করিয়া বল— এ তোড়া তোকে কে দিল!'

সে কহিল, 'প্রভু, এ আমি নিজে বানাইয়াছি!'

আমি পুনশ্চ ব্যাকুল অনুনয়ের সহিত কহিলাম— 'আমার মাথা খাইস জগা, আমার কাছে কিছু গোপন করিস না, যে এ তোড়া তোকে দিয়াছে তাহার নামটি আমাকে বল!'

মালাকর অনেকক্ষণ অবাকভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল— প্রভুর আজ্ঞা পালন করিবে, না রমণীর বিশ্বাস রক্ষা করিবে, বোধ করি এই দুই কর্তব্যের মধ্যে তাহার চিত্ত দোদুল্যমান হইতেছিল। অবশেষে করজোড়ে একান্ত কাতরতা সহকারে সে উৎকল উচ্চারণমিশ্রিত গ্রাম্য ভাষায় কহিল— 'প্রভো, এ কুসুমগুচ্ছ আমারি স্বহস্তে রচনা।'

বুঝিলাম সে কিছুতেই সেই অজ্ঞাতনাম্নীর নাম প্রকাশ করিবে না।

আমি যেন চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইলাম, আমার সেই অপরিচিত অনামিকা— আমার সেই জন্মান্তরের বিস্মৃতনামা, প্রিয়তমা তোড়াটি প্রস্তুত করিয়া মালীর হাতে দিতেছেন এবং অশ্রুগদগদ কাতরকণ্ঠে কহিতেছেন— 'এই তোড়াটি গোপনে তাঁহার ঘরে রাখিয়া আয় জগা, কিন্তু আমার মাথা খাস, আমার মৃতমুখ দর্শন করিস জগা, আমার নাম তাঁহাকে শুনাইস না, আমার কথা তাঁহাকে বলিস না, আমার পরিচয় তাঁহাকে দিস না, আমার হৃদয়ের বেদনা হৃদয়েই থাকুক, আমার জীবনের কাহিনী জীবনের সহিতই অবসান হইয়া যাক!'—

জগা তো চলিয়া গেল। কিন্তু আমি আর অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলাম না। তোড়াটি হৃদয়ে চাপিয়া ধরিলাম, দুটি-একটি কণ্টক বক্ষে বিঁধিল— বুকের রক্তের সহিত ফুলের শিশির এবং ফুলের শিশিরের সঙ্গে আমার চোখের জল মিশিল। হরি হরি, সেই অবধি আমার এ কী হইল। কী যেন-আমাকে কী করিল! কে যেন আমাকে কী বলিয়া গেল! কোথায় যেন আমার কাহার সহিত দেখা হইয়াছিল! কখন যেন তাহাকে হারাইয়াছি। কেবল যেন এই তোড়াটি— এই কয়েকটি ক্রোটনের পাতা, এই শ্বেত গোলাপ এবং এই গুটিকতক দোপাটি— আমার কাছে চিরজীবনের মতো কী-যেন-কী হইয়া রহিল এবং এখন হইতে যখনই জগা মালীকে দেখি তাহার মুখে যেন কী-যেন-কী দেখিতে পাই এবং সেও আমার ভাবগতিক দেখিয়া অবাক হইয়া আমারও মুখে যেন কী-যেন-কী দেখিতে পায়! জগতের লোকে সকলে জানে যে, আমার জগা মালী আমাকে বাগান হইতে ফুল তুলিয়া তোড়া বাঁধিয়া দেয়, কেবল আমার অন্তর জানে, আমাকে কে যেন গোপনে তোড়া পাঠাইয়া দেয়।

ভারতী ও বালক
আশ্বিন ১২৯৯

[লেখক-জন্ম]

পূর্বজন্মে অবশ্য একটা মহাপাপ করিয়াছিলাম নতুবা লেখক হইয়া জন্মিলাম কেন? মনের ভাবগুলা যখন বাহিরে আনিয়া ফেলিয়াছি তখন বাহিরের লোক উচিত অনুচিত যে কথাই বলে না শুনিয়া উপায় নাই। সুধাকর চন্দ্র, তুমি যদি ক্ষীরোদ সমুদ্রের মধ্যেই আরামে শয়ান থাকিতে তাহা হইলে কবিদের কবিত্ব করিবার কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত হইত বটে কিন্তু নিশীথের শৃগাল তোমার

দিকে মুখ তুলিয়া অকস্মাৎ তারস্বরে অসম্মান জানাইয়া যাইত না।

মনের ভাব যখন মনে ছিল সে যেন আমার গৃহদেবতা ইষ্টদেবতা ছিল; এখন কী মনে করিয়া তাহাকে চতুষ্পথে বটবৃক্ষের তলায় স্থাপন করিলাম? সকল জীবজন্তুই কি তাহার সম্মান বোঝে? যদি বা না বোঝে তবুও কি তাহাকে বিশ্বের চোখের সামনে পাথর হইয়া বসিয়া থাকিতে হয় না।

তাহার পর আবার আত্মীয় বন্ধুদের কাছেও জবাবদিহি আছে। এটা কেন লিখিলে, ওটা কীভাবে বলিলে, সেটার অর্থ কী? এও তো বিষম দায়! যেন আমি কোদাল দিয়া পথ কাটিতেছি বলিয়া গাড়ি করিয়া মানুষকে পার করিয়া দেওয়াও আমার কর্তব্য।

যাহা হৌক, ঝগড়া কাহার সহিত করিব? জন্মকালে অদৃষ্ট পুরুষ ললাটে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। বসিয়া কিন্তু সেই প্রবীণ ভাগ্যলিপিলেখক মহাশয়কে তাঁহার কোন্ লিখনের জন্য সহস্র লাঞ্ছনা করিলেও তিনি দিব্য গা-ঢাকা দিয়া বসিয়া থাকেন। আর তাঁহারই বশবর্তী হইয়া আমরা যদি দুটো কথা লিখি তাহা হইলে কথার আর শেষ থাকে না।

পকেটবুক

[রচনাকাল : ফাল্গুন ১২৯৯]

সম্পাদকের বিদায় গ্রহণ

এক বৎসর ভারতী সম্পাদন করিলাম। ইতিমধ্যে নানা প্রকার ত্রুটি ঘটিয়াছে। সে-সকল ত্রুটির যত-কিছু কৈফিয়ত প্রায় সমস্তই ব্যক্তিগত। সাংসারিক চিন্তা চেষ্টা আধিব্যাধি ক্রিয়াকর্মে সম্পাদকের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীকেও নানারূপে বিক্ষিপ্ত হইতে হইয়াছে। নিরুদ্‌বিগ্ন অবকাশের অভাবে পাঠকদেরও আশা পূর্ণ করিতে পারি নাই এবং সম্পাদকের কর্তব্য সম্বন্ধে নিজেরও আদর্শকে খণ্ডিত করিয়াছি।

সম্পাদক যদি অনন্যকর্মা হইয়া কর্ণধারের মতো পত্রিকার চূড়ার উপর সর্বদাই হাল ধরিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন তবেই তাঁহার যথাসাধ্য মনের মতো কাগজ চালানো সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশের সম্পাদকের পত্রসম্পাদন হালগোরুর দুধ দেওয়ার মতো— সমস্ত দিন খেতের কাজে খাটিয়া কৃশ প্রাণের রসাবশেষটুকুতে প্রচুর পরিমাণে জল মিশাইয়া জোগান দিতে হয়; তাহাতে পরম ধৈর্যবান জন্তুটারও প্রাণান্ত হইতে থাকে, ভোক্তাও তাঁহার বার্ষিক তিন টাকা হিসাবে ফাঁকি পড়িল বলিয়া রাগ করিয়া উঠেন।

ধনীপল্লীতে যে দরিদ্র থাকে তাহার চাল খারাপ হইয়া যায়। তাহার ব্যয় ও চেষ্টা আপন সাধ্যের বাহিরে গিয়া পড়ে। য়ুরোপীয় পত্রের আদর্শে আমরা কাগজ চালাইতে চাই— অথচ অবস্থা সমস্ত বিপরীত। আমাদের সহায় সম্পদ অর্থবল লোকবল লেখক পাঠক সমস্তই স্বল্প— অথচ চাল বিলাতি, নিয়ম অত্যন্ত কড়া; সেই বিভ্রাটে হয় কাগজ, নয় কাগজের সম্পাদক মারা পড়ে।

ঠিক মাসান্তে ভারতী বাহির করিতে পারি নাই; সেজন্য যথেষ্ট ক্ষোভ ও লজ্জা অনুভব করিয়াছি। একা সম্পাদককে লিখিতে হয়, লেখা সংগ্রহ করিতে হয় এবং অনেক অংশে প্রুফ ও প্রবন্ধ সংশোধন করিতে হয়। এদিকে দেশী ছাপাখানার ক্ষীণ প্রাণ, কম্পোজিটর অল্প, শারীরধর্মবশত কম্পোজিটরের রোগতাপও ঘটে এবং প্লেগের গোলমালে ঠিকা লোক পাওয়াও দুর্লভ হয়।

যে ব্যক্তি পত্র চালনাকেই জীবনের মুখ্য অবলম্বন করিতে পারে, এই-সকল বাধা-বিঘ্নের সহিত প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করা তাহাকেই শোভা পায়। কিন্তু পত্রের অধিকাংশ নিজের লেখার দ্বারা

পূরণ করিবার মতো যাহার প্রচুর অবকাশ ও ক্ষমতা নাই, নিয়মিত পরের লেখা সংগ্রহ করিবার মতো অসামান্য ধৈর্য ও অধ্যবসায় নাই, এবং ছাপাখানা ইত্যাদির সর্বপ্রকার সংকট নিবারণ যাহার সাধ্যের অতীত তাহার পক্ষে সম্পাদকের গৌরবজনক কাজ প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্‌বাহু বামনের চেষ্টার মতো হয়। ফলও যে নিরবচ্ছিন্ন মিষ্টস্বাদ এবং লোভের কারণও যে অত্যধিক তাহাও স্বীকার করিতে পারি না। আশা করি এই ফলের যাহা-কিছু মিষ্ট তাহাই পাঠকদের পাতে দিয়াছি, এবং যাহা-কিছু তিক্ত তাহা চোখ বুজিয়া নিঃশব্দে নিজে হজম করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

প্রশ্ন উঠিতে পারে এ-সকল কথা গোড়ায় কেন ভাবি নাই। গোড়াতেই যাঁহারা শেষটা সুস্পষ্ট দেখিতে পান, তাঁহারা সৌভাগ্যবান ব্যক্তি এবং তাঁহারা প্রায়ই কোনো কার্যে ব্রতী হন না— আমার একান্ত ইচ্ছা সেই দলভুক্ত হইয়া থাকি। কিন্তু ঘূর্ণাবাতাসের মতো যখন কর্মের আবর্ত ঘেরিয়া ফেলে তখন ধুলায় বেশি দূর দেখা যায় না এবং তাহার আকর্ষণে অসাধ্য স্থানে গিয়া উপনীত হইতে হয়।

উপদেষ্টা পরামর্শদাতাগণ অত্যন্ত শান্ত স্নিগ্ধভাবে বলিয়া থাকেন একবার প্রবৃত্ত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হওয়া ভালো দেখায় না। এ প্রসঙ্গে জনসনের একটি গল্প মনে পড়ে। একদা জনসন পার্শ্বে কোনো মহিলাকে লইয়া আহারে প্রবৃত্ত ছিলেন। না জানিয়া হঠাৎ এক চামচ গরম সুপ মুখে লইয়াই তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা ভোজন পাত্রে নিক্ষেপ করিলেন— এবং পার্শ্ববর্তিনী ঘৃণাসংকুচিতা মহিলাকে কহিলেন, 'ভদ্রে, কোনো নির্বোধ হইলে মুখ পুড়াইয়া গিলিয়া ফেলিত।' গরম সুপ যে ব্যক্তি একেবারেই লয় না সেই সব চেয়ে বুদ্ধিমান, যে ব্যক্তি লইয়া লজ্জার অনুরোধে গিলিয়া ফেলে, সর্বত্র তাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে ইচ্ছা করি না।

যাহাই হউক, সম্পাদন কার্যে ত্রুটি উপলক্ষে যাঁহারা আমাকে মার্জনা করিয়াছেন এবং যাঁহারা করেন নাই তাঁহাদের নিকট আর অধিক অপরাধী হইতে ইচ্ছা করি না। এবং সম্পাদকপদ পরিত্যাগ করিতেছি বলিয়াই যে-সকল পক্ষপাতী পাঠক অপরাধ গ্রহণ করিবেন তাঁহারা প্রীতিগুণেই পুনশ্চ অবিলম্বে ক্ষমা করিবেন বলিয়া আমার নিশ্চয় বিশ্বাস আছে। এক্ষণে গত বর্ষশেষে যে স্থান হইতে ভারতীর মহত্তার স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলাম বর্ষান্তে ঠিক সেই জায়গায় তাহা নামাইয়া ললাটের ঘর্ম মুছিয়া সকলকে নববর্ষের সাদর অভিবাদন জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

ভারতী

চৈত্র ১৩০৫

গ্রন্থসমালোচনা

রাবণ-বধ দৃশ্য কাব্য। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। মূল্য ১ টাকা।

অভিমন্যু-বধ দৃশ্য কাব্য। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। মূল্য ১ টাকা।

সে দিন আমরা একখানি বাংলা কবিতা গ্রন্থে দেখিতেছিলাম সীতা দেবীকে বনবাস দিয়া লক্ষ্মণ যখন চলিয়া আসিতেছেন, তখন সীতা দেবী সকাতরে তাঁহাকে একটু দাঁড়াইবার জন্য এই বলিয়া মিনতি করিতেছেন—

"লক্ষ্মণ দেবর কেন ধাওয়া-ধাওয়ি যাও রে।
তোমার দাদার কিরে বারেক দাঁড়াও রে।"

এমন-কি, মাইকেলও তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যে শূর-শ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ দেবকে কী বেরঙে আঁকিয়াছেন।— ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয় যে, যে লক্ষ্মণকে আমরা রামায়ণে শৌর্যের আদর্শ স্বরূপ মনে করিয়াছিলাম— যে লক্ষ্মণকে আমরা কেবলমাত্র মূর্তিমান ভ্রাতৃস্নেহ ও নিঃস্বার্থ উদারতা ও বিক্রম বলিয়া ভাবিয়া আসিতেছি, সেই লক্ষ্মণকে মেঘনাদবধ কাব্যে একজন ভীরু স্বার্থপূর্ণ—"গোঁয়ার" মাত্র দেখিলে আমাদের বুকে কী আঘাতই লাগে! কেনই বা তা হইবে না? কল্পনার আদর্শভূত একটি পশুপক্ষীরও একগাছি লোমের হানি করিলেও আমাদের সহ্য হয় না। সুখের বিষয় এই যে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র আমাদের প্রাণে সে আঘাত দেন নাই। কি তাঁহার অভিমন্যু-বধ, আর কি তাঁহার রাবণ-বধ— এই উভয় নাটকেই তিনি রামায়ণ ও মহাভারতের নায়ক ও উপনায়কদের চরিত্র অতি সুন্দর রূপে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। ইহা সামান্য সুখ্যাতির কথা নহে। এক খণ্ড কয়লার মধ্যে সূর্যের আলোক তো প্রবেশই করিতে পারে না, কিন্তু এক খণ্ড স্ফটিকে শুদ্ধ যে সূর্যকিরণ প্রবেশ করিতে পারে এমন নয়, আবার স্ফাটিক্য গুণে সেই কিরণ সহস্র বর্ণে প্রতিফলিত হইয়া সূর্যের মহিমা ও স্ফটিকের স্বচ্ছতা প্রচার করে। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রবাবুর কল্পনা সেই স্ফটিক-খণ্ড— এবং তাঁহার অভিমন্যু-বধ ও রাবণ-বধ প্রকৃত রামায়ণ ও মহাভারতের প্রতিফলিত রশ্মিপুঞ্জ। অভিমন্যুর নাম উচ্চারণ হইলেই আমাদের মনে যে ভাব উদয় হয় অভিমন্যু-বধ কাব্য পড়িয়া সে ভাবের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় না, বরং সে ভাব আরও উজ্জ্বলতর রূপে ফুটিয়া উঠে। যে অভিমন্যু বিশ্ববিজয়ী অর্জুন ও বীরাঙ্গনা সুভদ্রার সন্তান, তাহার তেজস্বিতা তো থাকিবেই, অথচ অভিমন্যুর কথা মনে আসিলেই সূর্যের কথা মনে আসে না, কারণ সূর্য বলিতেই কেবল প্রখর তীব্র তেজোরাশির সমষ্টি বুঝায়— কিন্তু অভিমন্যুর সঙ্গে কেমন একটি সুকুমার সুন্দর যুবার ভাব ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযোজিত আছে যে, তাহার জন্য অভিমন্যুকে মনে পড়িলেই চন্দ্রের কথা মনে হওয়া উচিত, কিন্তু তাহাও হইতে পারে না, কারণ চন্দ্রের তেজস্বিতা তো কিছুই নাই। সেইজন্য অভিমন্যুকে আমরা চন্দ্র-সূর্য-মিশ্রিত একটি অপরূপ সামগ্রী বলিয়াই মনে করি। অভিমন্যু-বধের অভিমন্যু, আমাদের সেই মহাভারতের অভিমন্যু সেই আমাদের অভিমন্যু— সেই কল্পনার আদর্শভূত অভিমন্যু। এই বঙ্গীয় নাটকখানিতে যেখানেই আমরা অভিমন্যুকে পাইয়াছি— কি উত্তরার সঙ্গে প্রেমালাপে, কি সুভদ্রার সঙ্গে স্নেহ-বিনিময়ে, কি সপ্তরথীর দুর্ভেদ্য ব্যূহমধ্যে বীরকার্য সাধনে— সকল স্থানেই এই নাটকের অভিমন্যু প্রকৃত অভিমন্যুই হইয়াছে। বলিতে কি, মহাভারতের সকল ব্যক্তিগুলিই শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রের হস্তে কষ্টকর মৃত্যুতে, জীবন না ফুরাইলেও অপঘাত মৃত্যুতে প্রাণ ত্যাগ করে নাই। ব্যাসদেবের কথা অনুসারে, যাহার যখন মৃত্যু আবশ্যক, গিরিশবাবু তাহাই করিয়াছেন। মাইকেল মহাশয় যেমন অকারণে লক্ষ্মণকে অসময়ে মেঘনাদের সঙ্গে যুদ্ধে মারিয়াছেন অর্থাৎ প্রকৃত প্রস্তাবে লক্ষ্মণের ধ্বংস সাধন করিয়াছেন গিরিশবাবু অভিমন্যুকে কি অর্জুনকে কি কৃষ্ণকে কোথাও সেরূপ হত্যা করেন নাই— ইহা তাঁহার বিশেষ গৌরব। তাঁহার আরও গৌরবের কথা বলিতে বাকি আছে। তাঁহার কল্পনার পরিচয় দিতে আমরা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিতেছি।

স্বপ্নদেবীর সঙ্গে রজনীর যে আলাপ আছে, তাহা আমাদের অত্যন্ত প্রীতিকর বোধ হইয়াছে, এবং রোহিণীও আমাদের প্রিয় সখী হইয়া পড়িয়াছেন। স্বপ্ন ও তদীয় সঙ্গিনীগণের গানে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। তবে দোষ দেখাইয়া দেওয়া সমালোচকদের কর্তব্য ভাবিয়াই বলিতে হইল যে নাটকের রাক্ষস-রাক্ষসীদের কথাগুলিতে বেণীসংহারের কথা আমাদের মনে পড়ে। কিন্তু তাহা মনে পড়িলেও আমরা এ কথা বলিতে সংকুচিত হইব না যে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র একজন প্রকৃত কবি— একজন প্রকৃত ভাবুক। তাঁহার রাবণ-বধে যদিও রাম-লক্ষ্মণের প্রকৃতি বিশেষ রূপে পরিস্ফুট হয় নাই, তবুও তাঁহার রাবণ ও মন্দোদরী এমন জীবন্ত হইয়াছে, যে সেইজন্যই রাবণ-বধ নাটকখানি এত প্রীতিকর লাগে। রাবণের মহান বীরত্ব ও মন্দোদরীর কবিত্বময় তেজস্বিতা এত পরিস্ফুট রূপে রাবণ-বধ নাটকে প্রতিফলিত হইয়াছে যে তাহার উপরে আমাদের একটি কথা কহিবার আবশ্যক নাই। বিশেষত দেবী আরাধনা ও দেবী স্তোত্রগুলি অতি সুন্দর হইয়াছে। কেবল মৃত্যুবাণ আনয়ন ঘটনাটি ও সেই স্থানের বর্ণনাটি আমাদের বড়ো মনঃপূত হয় নাই। আমরা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রের নূতন ধরনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিশেষ পক্ষপাতী। ইহাই যথার্থ অমিত্রাক্ষর ছন্দ। ইহাতে ছন্দের পূর্ণ স্বাধীনতা ও ছন্দের মিষ্টতা উভয়ই রক্ষিত হইয়াছে। কি মিত্রাক্ষরে কি অমিত্রাক্ষরে অলংকারশাস্ত্রোক্ত ছন্দ না থাকিয়া হৃদয়ের ছন্দ প্রচলিত হয়, ইহাই আমাদের একান্ত বাসনা ও ইহাই আমরা করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। গিরিশবাবু এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করাতে আমরা অতিশয় সুখী হইলাম।

অভিমন্যু সম্ভব কাব্য। শ্রীপ্রসাদ দাস গোস্বামী কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। ইডেন্ প্রেস, মূল্য ছয় আনা মাত্র।

এই অমিত্রাক্ষর ছন্দের কাব্যখানি সুন্দর ও প্রাঞ্জল হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থকারের কল্পনা সুকুমার কিশোর কল্পনা। স্থলে স্থলে তাহার পদস্খলন হয়। সর্বত্রই সমভাবে তাঁহার বলিষ্ঠ স্ফূর্তি দেখা যায় না। ভাষাও সকল স্থানে সহজ স্রোতোবাহী হয় নাই। তথাপি আমরা কাব্যখানি পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি।

The Indian Homœopathic Review. Edited by B. L. Bhaduri.

এখানি আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মাসিক পত্র। কবিরাজী বা হাকিমী, অ্যালোপ্যাথি বা হোমিওপ্যাথি, কোন্ প্রথাটা যে আমাদের উপকারী— সে বিষয় লইয়া তর্ক করিতে আমরা এখন চাহি না— চাহিলেও সিদ্ধান্তে আসিতে আমরা পারগ কি না, তাহাও বলিতে পারি না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি, যে এরূপ সাময়িক পত্রে আমাদের উপকার ব্যতীত অপকারের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই— এই পত্র আংশিক ভাবে বাংলা ভাষায় না হইয়া সমস্তটাই বাংলা ভাষায় প্রচারিত হইল না কেন?— কাহাদের জন্য এ পত্র প্রকাশিত হইতেছে?— যদি বাঙালিদের জন্য হয় তবে তাহা বাংলা ভাষাতেই প্রচারিত হওয়া উচিত। আর যদি ইংরাজদের জন্য হয়, তবে ইহা প্রকাশ করিবার আবশ্যক নাই। তবে এই আধা-ইংরাজি আধা-বাঙালি পত্র— এই "ইঙ্গ-বঙ্গ" মাসিক পত্রের উদ্দেশ্য কী?

এই-সকল কথা মহোদয় সম্পাদকের ভাবা উচিত ছিল। আমরা স্বীকার করি যে সম্পাদকীয় কার্য সুন্দররূপে সম্পাদিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্রের সরল ও সহজ বাংলাতে যে প্রবন্ধগুলি লিখিত হইয়াছে তাহার আমরা সুখ্যাতি করি, কিন্তু এই পত্রিকাতে আরও বিস্তর লোকের লেখা আছে। M. M. Bose. M. D. L. R. C. P. একজন উক্ত পত্রিকার লেখক। তিনি ইংলন্ড ও আমেরিকায় শিক্ষা লাভ করিয়াও লিখিতেছেন যে "May we hope that our educated countrymen of the locality will come forward to help the commission with informations as respects to drinking water &c." তিনি আরও লিখিতেছেন "We would like to call the attention of manager &c to the teaching of elimentary

knowledge of Animal Physiology &c.'' যদিও আমরা স্বীকার করি, বাঙালির ইংরাজিতে ভুল থাকাই সম্ভব, তথাপি যেমন করিয়া হউক ইংরাজি যে লিখিতেই হইবে তাহার আমরা কোনো আবশ্যক দেখি না। তবুও যাহা হউক লেখকের উন্নত উদ্দেশ্য দেখিয়া তাঁহার ইংরাজি লেখা মার্জনা করা যায়। আমরা এই অত্যাবশ্যক পত্রটির উন্নতি কামনা করি।

ভারতী
মাঘ ১২৮৮

আনন্দ রহো। ঐতিহাসিক নাটক। শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য ১ টাকা। এমনতর মাথা-মুণ্ড-বিরহিত নাটক আমরা কখনো দেখি নাই। ইহার না আছে শৃঙ্খলা, না আছে অর্থ, না আছে ভাব, না আছে একটা পরিষ্কার উপন্যাস। লেখকের কল্পনা, লাগাম খুলিয়া লইয়া, এই ৭৭ পৃষ্ঠার মধ্যে উনপঞ্চাশ বায়ুর ঘোড়দৌড় করাইয়াছেন। গিরিশবাবুর লেখায় আমরা এরূপ কল্পনার অরাজকতা আশা করি নাই।

সীতার বনবাস। দৃশ্যকাব্য। শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। মূল্য ১ টাকা।
লক্ষ্মণ-বর্জন। দৃশ্যকাব্য। শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। মূল্য চারি আনা।
গিরিশবাবুর রচিত পৌরাণিক দৃশ্য কাব্যগুলিতে তাঁহার কবিত্বশক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার বিষয়গুলির সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব কবির ন্যায় বুঝিয়াছেন ও তাহা অনেক স্থলে কবির ন্যায় প্রকাশ করিয়াছেন। সীতার বনবাসে লক্ষ্মণের বীরত্বই যথার্থ বীরত্ব। রাম যে কর্তব্যজ্ঞানের গুরুভারে অভিভূত হইয়া সীতাকে বনবাসে দিতে পারিয়াছেন, লক্ষ্মণের নিকট সে কর্তব্যজ্ঞান নিতান্ত লঘু। প্রজারঞ্জনের অনুরোধে যে, নির্দোষী সীতাকেও বনবাস দিতে হইবে, ইহার কর্তব্যতা লক্ষ্মণ বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু তবুও সেই সীতাকে বনবাসে দিতে তিনি বাধ্য হইয়াছিলেন। রাম তো আজ্ঞামাত্র দিয়া গৃহের মধ্যে লুক্কায়িত হইলেন, কিন্তু লক্ষ্মণ স্বহস্তে সেই সীতাকে বিসর্জন দিয়া আসিয়াছিলেন। সীতার বনবাসে রামকে নায়ক না করিয়া লক্ষ্মণকে নায়ক করিলে একটি অতি মহান চিত্র অঙ্কিত করা যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে সীতার বিসর্জন আমাদের সমালোচ্য দৃশ্যকাব্যের এক অংশ মাত্র, উহাই সমস্ত নহে; সুতরাং সীতা বর্জনের মধ্যে যতটা কবিত্ব আছে, তাহা ইহাতে স্ফূর্তি পায় নাই। সীতা বর্জন ব্যাপারে রামের বাহ্য ঘটনার সহিত হৃদয়ের দ্বন্দ্ব, কর্তব্যজ্ঞানের সহিত অনুরাগের সংগ্রাম; লক্ষ্মণের কর্তব্যের সহিত কর্তব্যজ্ঞানের অনৈক্য, করুণার সহিত নিষ্ঠুরতার অনিচ্ছা সহবাস; সীতার জীবনের সহিত মরণের তর্কবিতর্ক, অর্থাৎ মরণের প্রতি অনুরাগের ও জীবনের প্রতি কর্তব্যজ্ঞানের সম্বন্ধ, এই যে-সকল দ্বন্দ্ব-প্রতিদ্বন্দ্ব ও কর্তব্যের সহিত হৃদয়ের সংগ্রাম আছে, তাহা এই দৃশ্যকাব্যে পরিস্ফুট হয় নাই। যতগুলি ঘটনা লইয়া এই কাব্যখানি রচিত হইয়াছে, তাহা একটি ক্ষুদ্রায়তন দৃশ্যকাব্যের মধ্যে পরিস্ফুট ভাবে বর্ণিত হইতে পারে না। ইহাতে সমস্তটার একটি ছায়া মাত্র পড়িয়াছে। কিন্তু ইহাতে কবিতার অভাব নাই। সীতা-বর্জনের ভার লক্ষ্মণের প্রতি অর্পিত হইলে লক্ষ্মণ রামকে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা অতি সুন্দর। যদিও বনবাসের পর সীতার বিলাপ সংক্ষেপ ও মর্মভেদী হয় নাই, দীর্ঘ ও অগভীর হইয়াছে, তথাপি সীতার শেষ প্রার্থনাটি অতি মনোহর হইয়াছে। যখন পৃথিবীতে জীবনের কোনো বন্ধন নাই, অথচ জীবন রক্ষা কর্তব্য, তখন দেবতার কাছে এই প্রার্থনা করা, সন্তান বাৎসল্য ভিক্ষা করা,

"জগৎ মাতা,
শিখাও গো দুহিতারে জননীর প্রেম।
ছিন্ন অন্য ডুরি,

প্রেমে বাঁধা রেখো মা সংসারে;
ওরে, কে অভাগা এসেছে জঠরে?"

অতি সুন্দর হইয়াছে।

"যবে গভীরা যামিনী, বসি দ্বারে।
শিশুদুটি ঘুমায় কুটিরে,
চাঁদ পানে চাহি কাঁদি সই,
চাঁদ মুখ পড়ে মনে।"

এই সরল কথায় সীতার বেশ একটি চিত্র দেওয়া হইয়াছে। অধিক উদ্‌ধৃত করিবার স্থান নাই, উদ্‌ধৃত করিলাম না।

লক্ষ্মণ-বর্জন বিষয়টি অতি মহান, কিন্তু তাহা দৃশ্যকাব্য রচনার উপযোগী কি না সন্দেহ। লেখক রাম-চরিত্রের অর্থ, রামচরিত্রের মর্ম ইহাতে নিবিষ্ট করিয়াছেন। রামের সমস্ত কার্য, সমস্ত বীরত্ব-কাহিনীকে তিনি দুইটি অক্ষরে পরিণত করিয়াছেন। সে দুইটি অক্ষর— প্রেম। এই সংক্ষেপ দৃশ্যকাব্যখানিতে লেখক একটি মহান কাব্যের রেখাপাত মাত্র করিয়াছেন। ইহাতে লক্ষ্মণের মহত্ত্ব অতি সুন্দর হইয়াছে। কবি যাহা বলেন, তাহার মর্ম এই, যে, বীরত্ব নামক গুণ স্বাবলম্বী গুণ নহে, উহা পরমুখাপেক্ষী গুণ। যেখানে বীরত্ব দেখা যাইবে, সেইখানে দেখিতে হইবে, সে বীরত্ব কাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, সে বীরত্বের বীরত্ব কী লইয়া। কে কত মানুষ খুন করিয়াছে, তাহা লইয়া বীরত্ব বিচার করা উচিত নহে, কাহাকে কিসে বীর করিয়া তুলিয়াছে, তাহাই লইয়া বীরত্বের বিচার। কেহ বা আত্মরক্ষার জন্য বীর, কেহ বা পরের প্রাণ রক্ষার জন্য বীর। জননী সন্তান-স্নেহের জন্য বীর, দেশ-হিতৈষী স্বদেশ-প্রেমে বীর। তেমনি লক্ষ্মণও বীর বলিয়াই বীর নহেন, তিনি বীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিসে তাঁহাকে বীর করিয়া তুলিয়াছিল? প্রেমে। রামের প্রেমে। অনেকে প্রেমকে হৃদয়ের দুর্বলতা বলেন, কিন্তু সেই প্রেমের বলেই লক্ষ্মণ বীর। যখন সত্যের অনুরোধে রাম লক্ষ্মণকে ত্যাগ করিলেন, তখন লক্ষ্মণ কহিলেন,

"সেবা মম পূর্ণ এত দিনে,
আত্ম-বিসর্জনে পূজা করি সম্পূরণ!
ত্যাগ-শিক্ষা মোরে শিখাইলা দয়াময়,
করি আপনা বর্জন,
রঘুমণি,
সেই প্রেম স্মরি, সেই প্রেমবলে
জিনি অবহেলে পুরন্দর-জয়ী অরি,
পঙ্গু আমি লঙ্ঘিনু সুমেরু!
সেই প্রেম বলে
না টলিনু শক্তি-শেল হেরি,
উচ্চ-হৃদে পেতে নিনু শেল
রাম-প্রেমে শেলে পাইনু ত্রাণ।"

রাম ও লক্ষ্মণ, হিংসা, ঘৃণা, যশোলিপ্সা বা দুরাকাঙ্ক্ষার বলে বীর নহেন, তাঁহারা প্রেমের বলে বীর। তাঁহাদের বীরত্ব সর্বোচ্চ-শ্রেণীর বীরত্ব। এই মহান ভাব এই সংক্ষেপ দৃশ্যকাব্যখানির মধ্যে নিহিত আছে।

মুক্তি ও সাধন সম্বন্ধে হিন্দু-শাস্ত্রের উপদেশ। শ্রীবিপিন বিহারী ঘোষাল প্রণীত।
পুস্তকখানির জন্য আমরা গ্রন্থকারকে প্রাণের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। ইহাতে গ্রন্থকর্তার অসাধারণ

অনুসন্ধান, বিস্তৃত সংগ্রহ ও সরল অনুবাদের ভাবায় আমরা নিতান্ত প্রীত হইয়াছি। বাংলায় এ শ্রেণীর পুস্তক আমরা যতগুলি দেখিয়াছি, তন্মধ্যে এখানি সর্বোৎকৃষ্ট।

কুসুম-কানন। প্রথম ভাগ। শ্রীকায়কোবাদ প্রণীত।
এই গ্রন্থখানিতে দুটি-একটি মিষ্ট কবিতা আছে।

সরলা। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।
প্রায়শ্চিত্ত। শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।
এই দুইখানি গ্রন্থ ক্ষুদ্রায়তন সরল সামাজিক উপন্যাস। ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য কিছুই নাই।

আদর। (প্রিয়তমার প্রতি)। শ্রীকল্পনাকান্ত গুহ প্রণীত।
ইহা পড়িয়া প্রিয়তমা সন্তুষ্ট হইতে পারেন। কিন্তু পাঠকেরা সন্তুষ্ট হইবেন না।

উর্মিলা-কাব্য। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত। মূল্য চারি আনা।
এই কাব্যখানির বিষয় নূতন ও কবিতাপূর্ণ। ইহাতে উর্মিলার দুঃখ বর্ণিত হইয়াছে। উর্মিলা বনবাসিনী সীতাকে পত্র লিখিতেছেন। এই ক্ষুদ্র পত্রখানিতে উর্মিলার চরিত্র ও উর্মিলার মনোভাব সুন্দর বিকশিত হইয়াছে। বিরহিণী উর্মিলা প্রাসাদের উদ্যানে বিচরণ করিতে করিতে কল্পনা-কুহকে নিজের চারি দিকে নানাবিধ মায়াজাল রচনা করিতেছেন ও ভাঙিতেছেন, এ ভাবটি সুন্দর হইয়াছে। স্থানে স্থানে ইহাতে সুন্দর কবিতা আছে।

সাদরে চিবুক মোর ধরি বীরবর
অধরে চুম্বিলা দেবী, হায় সে চুম্বন—
নিচল যমুনাজলে চন্দ্র-কর-লেখা
পড়ে গো নিঃশব্দে যথা, অথবা যেমতি
উষার মুকুট শোভা কুসুমের শিরে
নিশির শিশির পাত; নীরব, মৃদুল!

পত্র শেষ করিয়া পত্র সম্বন্ধে উর্মিলা কহিতেছেন—

পাঠ করি মনোসাধে, পরম কৌশলে
নিদ্রিত নাথের বক্ষে নিঃশব্দ চরণে—
রাখিয়া আসিয়ো দিদি করি গো বিনতি।

...

নিদ্রান্তে চকিতে যবে হেরিয়া এ লেখা,
শুধাবেন "কে আনিল!" কহিয়ো তাঁহারে,
"স্বর্গ হতে ফেলেছেন বুঝি রতিদেবী
চেতাইতে সুকঠিন অপ্রেমিক জনে,
নহে মানবের কাজ, দেবের এ লীলা।"
দাও গো বিদায় তবে আসিছে মন্থরা।
ভক্তিপূর্ণ নমস্কার জানায়ো শ্রীরামে,
কহিয়ো তাঁহারে দেবি, "দেব রঘুমণি
ফিরিয়া আসিলে ঘরে, ব্যাপিকা উর্মিলা,
পূর্বের কৌতুক আর করিতে নারিবে,
হাসিতেন রঘুবর সে ব্যঙ্গ কৌতুকে।
সে আমোদ হাসিমুখ ভুলিয়া গিয়াছে।"

...

আর জানাইয়ো দিদি তোমার দেবরে—
কী জানাবে? জানাবার কি গো আর আছে?
জানাইয়ো উর্মিলার নিষ্ফল প্রণয়,
জানাইয়ো উর্মিলার নয়নের বারি,
জানাইয়ো, প্রিয় দিদি, জানাইয়ো তারে,
অযোধ্যার রাজপুরে কি নিশি দিবসে,
ঊর্ধ্বমুখে, কখনো বা অবনত মুখে,
বিগলিত কেশপাশ পাণ্ডুর অধরা,
একটি রমণী মূর্তি ঘোরে অবিরত!

নির্ঝরিণী। (গীতি কাব্য) প্রথম খণ্ড। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত। মূল্য আট আনা।
এই কাব্যগ্রন্থখানিতে "আঁখির মিলন" প্রভৃতি দুই-একটি সুন্দর কবিতা আছে, কিন্তু সাধারণত সমস্ত কবিতাগুলি তেমন ভালো নহে।

রাজ-উদাসীন। প্রথম স্তবক। শাক্য সিংহ ও রামমোহন রায়। শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা মাত্র।
এই ক্ষুদ্র কাব্যখানির স্থানে স্থানে বর্ণনা উত্তম হইয়াছে। কিন্তু বিষয়টি যেরূপ গুরুতর তদুপযুক্ত রচনা হয় নাই। বুদ্ধদেব বা রামমোহন রায়ের স্বগত-উক্তি ও কথোপকথনগুলি উপদেশ-প্রবাহের ন্যায় শুনায়, তাহার সহিত কল্পনা-মিশ্রিত করিয়া তাহাকে কবিতা করিয়া তোলা হয় নাই। কাব্যখানি পড়িয়া মনে হয়, লেখক তাঁহার বিষয়ের মহান ভাব যতটা কল্পনা করিতে পারিয়াছেন, ততটা প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

ভারতী
ফাল্গুন, ১২৮৮

জন্ স্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম্ এ বিরচিত। মূল্য ১।০ মাত্র।
ইতালীর ইতিবৃত্ত সম্বলিত ম্যাট্‌সিনির জীবন-বৃত্ত। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম্ এ বিরচিত। মূল্য ১।০ মাত্র।
এই গ্রন্থ দুইখানি বহুকাল হইল, প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা সম্প্রতি সমালোচনার্থে পাইয়াছি। যদি কোনো পাঠক আজিও এ গ্রন্থদ্বয়ের পরিচয় না পাইয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের অনুরোধ করি, এ দুইখানি পুস্তক ক্রয় করিয়া পাঠ করিবেন। ইহার পূর্বে ভালো জীবনবৃত্ত বঙ্গভাষায় প্রচারিত হয় নাই। যোগেন্দ্রবাবু এ বিষয়ে পথ দেখাইয়া বঙ্গসাহিত্যের যথার্থ উপকার করিয়াছেন। আমাদের মতে এই দুইখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থের মধ্যে ম্যাট্‌সিনির জীবনবৃত্ত উৎকৃষ্টতর। তাহার দুই কারণ আছে— প্রথম, ম্যাট্‌সিনির জীবনবৃত্তে গ্রন্থের নায়কের সহিত লেখকের জ্বলন্ত সমবেদনা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সমভাবে প্রকাশ পাইতেছে; লেখক হৃদয়-লেখনী দিয়া সমস্ত পুস্তকখানি লিখিয়াছেন, এই নিমিত্ত পাঠকদের হৃদয়ের পত্রে তাহার মুদ্রাঙ্কন পড়িয়াছে। দ্বিতীয়, প্রথম পুস্তকখানি মস্তিষ্ক ও জ্ঞান চর্চার বিবরণ, দ্বিতীয় পুস্তকখানি হৃদয় ও কার্যের কাহিনী, সুতরাং বিষয়ের গুণে শেষ গ্রন্থটি অধিকতর মনোরম হইয়াছে।

হৃদয়োচ্ছ্বাস, বা ভারত বিষয়ক প্রবন্ধাবলি। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম এ প্রণীত। মূল্য ১ টাকা।
আজকাল অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাসিক পত্র বাহির হইয়াছে। এই নিমিত্ত বঙ্গদেশে লেখকের সংখ্যা অল্প হইলেও লেখার আবশ্যক অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে, সুতরাং সাহিত্যসমাজে অত্যন্ত

চুরির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সমালোচ্য গ্রন্থখানির বিজ্ঞাপনে দেখিতেছি, যোগেন্দ্রবাবুর আর্যদর্শনে প্রকাশিত অনেকগুলি প্রবন্ধ এইরূপ চুরি যায়; চোরের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য আর্যদর্শন-সম্পাদক তাঁহার ভারত-বিষয়ক প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়াছেন। অনেকগুলি প্রবন্ধে লেখকের চিন্তাশীলতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু যথার্থ কথা বলিতে কি, প্রাচীন ভারতের উন্নতি লইয়া গর্ব, আধুনিক ভারতের অবনতি লইয়া দুঃখ, ঐক্যের অভাব লইয়া বিলাপ, বদ্ধপরিকর হইবার জন্য উত্তেজনা এত শুনা গিয়াছে যে, ও বিষয়ে শুনিবার আর বাসনা নাই। শুনিয়া যত দূর হইতে পারে তাহা এত দিনে হইয়াছে বোধ করি, বরঞ্চ ভাবগতিকে বোধ হয় মাত্রা অধিক হইয়া গিয়াছে। না যদি হইয়া থাকে তো আশ্চর্য বলিতে হইবে। ভারতের বিষয়ে কতকগুলা বিলাপ ও উদ্দীপন বাক্য উচ্চারণ করিবার কাল চলিয়া গিয়াছে। যখন দেশানুরাগের ভাব মাত্র লোকে জানিত না, তখন তাহা উপযোগী ছিল। ভারতের যে পূর্বে উন্নতি ছিল ও এখন যে অবনতি হইয়াছে, ভারতের উন্নতি সাধন করিতে সকলের যে সম্মিলিত হওয়া উচিত এ বিষয়ে বঙ্গীয় পাঠকমাত্রেই এতবার শুনিয়াছেন, যে, এ বিষয় বোধ করি কাহারো জ্ঞানের অগোচর নাই। অতএব আর অধিক নহে। এখন "ঐক্য" "উন্নতি" "বন্ধন" প্রভৃতি কতকগুলা সাধারণ কথা পরিত্যাগ করিয়া, ঐক্য ও উন্নতি সাধনের যে শত সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাধা আমাদের সহিত এক পরিবারভুক্ত হইয়া বাস করিতেছে সেই-সকল বিশেষ বিশেষ বিষয়ের আলোচনা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। বড়ো বড়ো কথা শুনিয়া আমাদের যুবকদিগের একটা বিষম রোগ উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা তাঁহাদের দুই দুর্বল হস্তে দুই গুরুভার তরবারি লইয়া অধীনতা ছেদন করিবার জন্য দিগ্‌বিদিক্ হাতড়াইয়া দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহাদের যদি বলা যায়, অত হাঙ্গাম করিবার আবশ্যক কী? অধীনতার অন্বেষণে ছুঁচাবাজির মতো চারি দিকে ধড়্‌ফড়্ করিয়া বেড়াইতেছে কেন? অধীনতা যে তোমাদের দুয়ারের কাছে। এমন-কি, তোমাদের গৃহের কোণ হইতে শত শত অধীনতার পাশ অতি সূক্ষ্ম মাকড়সার জালের মতো তোমাদের হাত-পা বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে। তলোয়ার দুটা রাখো। একে একে ধীরে ধীরে সেই সূক্ষ্ম গ্রন্থিগুলা মোচন করো। এ কথা শুনিলে তাঁহারা নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন। তাঁহারা জাহাজের কাছি, লোহার শিকল ছিঁড়িবার জন্য তলোয়ার ঝন্‌ঝন্ করিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাদের ওই সরু সুতাগুলি দেখাইয়া দিলে তাঁহারা অপমান বোধ করেন। কেবল বড়ো বড়ো ভারী ভারী কথা শুনিয়া আমাদের এই দশা হইয়াছে। এখন ছোটো ছোটো ঘরের কথা কহিবার সময় আসিয়াছে। এখন এই মহাবীরবৃন্দকে ঠাণ্ডা করিয়া তাঁহাদের মুখের কথাগুলাকে ছাঁটিয়া, তাঁহাদের হাতের তলোয়ার দুটাকে নামাইয়া ছোটোখাটো ঘরের কাজে নিযুক্ত করানো আবশ্যক হইয়াছে। বনে মহিষ তাড়াইতে যাইবার পূর্বে ঘরে ইন্দুরের উৎপাত দূর করা হউক। তাই বলিতেছি হৃদয়োচ্ছ্বাসের অনেকগুলি প্রবন্ধে লেখকের দেশানুরাগ প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু বর্তমান পাঠকদের পক্ষে তাহার আবশ্যকতা অল্প। তাই বলিয়া হৃদয়োচ্ছ্বাসের সকল প্রবন্ধ সম্বন্ধেই আমরা এমন কথা বলিতে পারি না। ইহাতে অনেকগুলি প্রবন্ধ আছে যাহা সময়োপযোগী, বিশেষ-বিষয়গত ও সমাজের হিতসাধক।

স্যামুয়েল হানিমানের জীবনবৃত্ত। শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় কর্তৃক বিরচিত। মূল্য ছয় আনা।

যোগেন্দ্রবাবুর অনুসরণ করিয়া ইতিমধ্যেই আর-এক জন লেখক বঙ্গভাষায় আর-এক মহাত্মার জীবনবৃত্ত, রচনা করিয়াছেন, দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। ইহা পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নহে; লেখক অনেক পরিশ্রম ও অন্বেষণ করিয়া গ্রন্থখানি সংকলন করিয়াছেন। আমাদের দেশে এরূপ অধ্যবসায় প্রশংসাযোগ্য। গ্রন্থের ভাষা তেমন সহজ, পরিষ্কার সরস হয় নাই। অনর্থক কতকগুলা কঠোর সংস্কৃত কথা ও ঘোরালো পদ ব্যবহার করা হইয়াছে, এইজন্য পুস্তকখানি সুপাঠ্য হয় নাই। গ্রন্থকার হানিমানের জীবনী হইতে পদে পদে রাশি রাশি নীতি কথা বাহির করিয়াছেন,

সেগুলি বিশেষ করিয়া লিখিবার কোনো আবশ্যক ছিল না। তাহা ছাড়া, গ্রন্থের প্রধান দোষ এই যে, হানিমানের প্রতি পাঠকদের ভক্তি উদ্রেক করিবার জন্য লেখক প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। একটা শ্রমসাধ্য চেষ্টার ভাব গ্রন্থের সর্বাঙ্গে প্রকাশ পাইতেছে। দুটা-তিনটা করিয়া জিজ্ঞাসার চিহ্ন দিয়া, "আহা" "আশ্চর্য" "ধন্য" "ভাবিতে মন অবসন্ন হইয়া পড়ে" "অদ্ভুত হানিমানের সকলি অদ্ভুত" ইত্যাদি বিস্ময়াত্মক কথা পদে পদে ব্যবহার করা হইয়াছে; যেন, পাঠকদিগকে ঠেলিয়া, ধাক্কা মারিয়া, চোখে আঙুল দিয়া কোনো প্রকারে আশ্চর্যান্বিত করিতেই হইবে, ইহাই লেখকের ব্রত হইয়াছে। এরূপ করিলে অনেক সময়ে পাঠকদের বিরক্তি বোধ হয়। নিজের ভাব পদে পদে প্রকাশ না করিয়া বর্ণনার গুণে স্বভাবতই পাঠকদের ভাব উদ্রেক করা সুলেখকের কাজ। অধিক করিয়া বলিয়া শ্রোতাদিগকে অভিভূত করিয়া দিবার বাসনা মহেন্দ্রবাবুর লেখার প্রধান দোষ দেখিতেছি। যে স্থলে হানিমানের স্ত্রীর গুণ বর্ণনা করা হইয়াছে, সে স্থল উদ্‌ধৃত করি।

"ফ্রেঞ্চ জর্মান, ইংরাজি, প্রভৃতি ভাষায় মিলানীর, 'অসাধারণ' অধিকার।... সভ্য জগতের তাবৎ সাহিত্যে তিনি 'অলৌকিক ব্যুৎপত্তি-শালিনী'। তিনি স্বীয় 'অপ্রতিদ্বন্দ্বী' রচনা বিষয়ে এক 'অলোকসামান্য' কবি। তাঁহার কবিতা পাঠ করিতে করিতে 'প্রাণ মন বিগলিত' হইয়া যায়— 'শরীর শিথিলিত' হইয়া পড়ে। 'আহা কি সুন্দর মধুর কবিতা'! 'অন্তরাত্মা উচ্চ হইতে উচ্চতর ভাবে' উঠিতে থাকে এবং ভাবগ্রহ সমাপ্ত হইলে, 'উচ্চতম অবস্থা প্রাপ্ত হয়'। ইচ্ছা করে অনবরত তাহা আবৃত্তি করি। এই তো গেল কাব্যের কথা। চিত্র অঙ্কনেও 'অনির্বচনীয় যোগ্যতা— অনুপম অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা'।"

বিশেষণগুলা দেখিলে ভীত হইয়া পড়িতে হয়। হানিমানের স্ত্রী ব্যতীত পৃথিবীতে এত বড়ো আর-একটি লোক জন্মগ্রহণ করে নাই। এমন কাহারো নাম শুনি নাই, একাধারে কবিতা ও চিত্রবিদ্যায় যাঁহার "অনুপম অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা!" জীবনবৃত্ত লিখিতে হইলে ভাষাকে ইহা অপেক্ষা আরও অনেকটা সংযত করা আবশ্যক। বিষয়টিও ভালো, উপস্থিত গ্রন্থখানিও অনেক বিষয়ে ভালো, এই নিমিত্তই এত কথা বলিলাম।

যেমন রোগ তেমনি রোজা। প্রহসন। শ্রীরাজকৃষ্ণ দত্ত প্রণীত। মূল্য চারি আনা।
এ প্রহসনখানি মলিয়েরের-রচিত "Le medecin malgre lui" নামক ফরাসী প্রহসনের স্বাধীন অনুবাদ। লেখক কেন যে তাহা স্বীকার করেন নাই, বুঝিতে পারিলাম না। স্বীকার করাতে দোষের কিছুই নাই। বিদেশীয় ভাষার ভালো ভালো কাব্য নাটক বাংলায় অনুবাদিত হইলে বাংলা সাহিত্যের উন্নতি হইবার কথা। গ্রন্থখানি আমাদের ভালো লাগিয়াছে।

গার্হস্থ্য চিকিৎসা বিদ্যা। শ্রীঅম্বিকাচরণ রক্ষিত কর্তৃক সংকলিত। মূল্য ১।০।
এই গ্রন্থের চিকিৎসাশাস্ত্র অনুযায়ী দোষ গুণ বলিতে আমরা ভরসা করি না। তবে ইহার একটি প্রধান গুণ এই দেখিলাম, ইহাতে আমাদের দেশী ও ইংরাজি উভয়বিধ ঔষধের উল্লেখ আছে। গ্রন্থের ভূমিকা হইতে উদ্‌ধৃত করিয়া দিতেছি। "ইহা কোনো পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নহে। ইহাতে বর্ণিত বিষয় সকল বিবিধ গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ...এদেশে সচরাচর যে-সকল পীড়া জন্মে তাহাদের ডাক্তারী ও দেশীয় ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা বিবরণ ইহাতে বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে বর্ণিত দেশীয় ঔষধ সকল প্রায় পল্লীগ্রামের সকল স্থানেই পাওয়া যায়। সহজ সহজ পীড়ায় ও যে-সকল স্থানে চিকিৎসক পাওয়া না যায় তথায় এই পুস্তকের সাহায্যে গৃহস্থগণ অনেক উপকার প্রাপ্ত হইবেন বলিয়া আশা করা যায়।" আমরাও তাহাই আশা করি।

শার্ঙ্গধর। মহর্ষি শার্ঙ্গধর কৃত স্বনামখ্যাত আয়ুর্বেদীয় সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসা গ্রন্থ। শ্রীঅম্বিকাচরণ রক্ষিত কর্তৃক অনুবাদিত। মূল্য দুই টাকা দুই আনা।
আমাদের প্রাচীন গ্রন্থের এইরূপ সহজ অনুবাদ নানা কারণে হিতসাধক। এই গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া

গ্রন্থকার সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

যাবনিক পরাক্রম। (উপন্যাস।) শ্রীনীলরত্ন রায় চৌধুরী প্রণীত। মূল্য বারো আনা।
এই গ্রন্থখানির কিছুই প্রশংসা করিবার নাই।

স্বপন-সঙ্গীত। (গীতিকাব্য।) শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত। মূল্য ছয় আনা।
এখানি একটি ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ। লেখকের এখনো হাত পাকে নাই। কিন্তু ইহার অনেক স্থানে যথার্থ কবিতা আছে, অনেক স্থানে লেখকের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

উষাহরণ বা অপূর্ব-মিলন। গীতিনাট্য। শ্রীরাধানাথ মিত্র প্রণীত। মূল্য দশ পয়সা মাত্র।
মেঘেতে বিজলী বা হরিশ্চন্দ্র। গীতিনাট্য। শ্রীরাধানাথ মিত্র প্রণীত। মূল্য ।০ মাত্র।
উক্ত গ্রন্থকার-রচিত দুই-চারিখানি গীতিনাট্য আমরা সমালোচনার্থ পাইয়াছি। গীতগুলি রাগ-রাগিণী সংযোগে গাহিলে কিরূপ শুনায় বলিতে পারি না, কিন্তু পড়িতে ভালো লাগিল না।

ভারতী

বৈশাখ ১২৮৯

বনবালা। ঐতিহাসিক উপন্যাস। মূল্য বারো আনা।
এই ঐতিহাসিক উপন্যাসে না আছে ইতিহাস, না আছে উপন্যাস। নভেলের সমস্ত কাঠ-খড় আনা হইয়াছে, কেবল মূর্তি গড়া হয় নাই।

হরবিলাপ। শ্রীরাধানাথ মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা।
এই গীতিনাট্যখানিতে কতকগুলি সুন্দর গান আছে। পড়িতেই যখন ভালো লাগিতেছে, তখন সুর-সংযোগে শুনিলে আরও ভালো লাগিবার কথা। এই গ্রন্থখানি অভিনয়ের যোগ্য কি না বলিতে পারি না, কারণ ইহাতে উপাখ্যান ভাগ কিছুই নাই বলিলেও হয়, কিন্তু গ্রন্থখানি পাঠের যোগ্য ও গানগুলি গাহিবার যোগ্য সন্দেহ নাই।

কমলে কামিনী বা ফুলেশ্বরী। শ্রীরাধানাথ মিত্র প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা।
এই গীতিনাট্যখানি পড়িতে তেমন ভালো লাগিল না। কমলে-কামিনী দেখিয়া শ্রীমন্ত যে গান গাহিয়া উঠিয়াছে, সেই গানটিই পুস্তকের মধ্যে ভালো লাগিল।

কল্পনা-কুসুম। শ্রীমতী কামিনী সুন্দরী দেবী-কর্তৃক বিরচিত। মূল্য ।।০ আনা।
এই গ্রন্থখানি পড়িয়া স্পষ্টই মনে হয়, লেখিকার কবিত্ব শক্তি আছে। "অভাগিনীর বিলাপ" "নারদ" প্রভৃতি কতকগুলি যথার্থ কবিতা এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।

কবিতাবলী। প্রথম ভাগ। শ্রীরামনারায়ণ অগস্তি প্রণীত। মূল্য দশ আনা।
কবিতাবলীর এই প্রথম ভাগ দেখিয়া দ্বিতীয় ভাগ দেখিবার আর বাসনা রহিল না। যে বন্ধু গ্রন্থকারকে এই কবিতাগুলি ছাপাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন তিনি বাস্তবিকই বন্ধুর মতো কাজ করেন নাই।

কুসুমারিন্দম। শ্রীইন্দ্রনারায়ণ পাল প্রণীত। মূল্য ১ টাকা।
এই উপন্যাসখানি পড়িয়া আমরা বিস্মিত হইলাম। ইহার আদ্যোপান্ত একটা ঘোরতর বিশৃঙ্খল গোলমাল। ইহার অনেক জায়গায় বাস্তবিকই লেখকের ছেলেমানুষী প্রকাশ পাইয়াছে, আবার স্থানে স্থানে লেখকের ক্ষমতা ব্যক্ত হইয়াছে।

ভারতী

ভাদ্র ১২৮৯

সমালোচক কাব্য। মূল্য এক আনা।
সমালোচনা স্থলে ভারতী বর্তমান গ্রন্থকারের কোনো একটি কাব্যকে ভালো বলেন নাই, এই অপরাধে ভারতীকে আক্রমণ করিয়া এই গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই কাব্যখানি পড়িয়া তাঁহার পূর্বতন গ্রন্থ সম্বন্ধে আমাদের মতের কিছুমাত্র পরিবর্তন হইল না। এই লেখার দরুন পাঠকদিগের নিকটেও যে তাঁহার পূর্বগ্রন্থের বিশেষ আদর বাড়িবে, তাহাও নহে। তবে লিখিয়া ফল কী হইল? লেখক কি মনে মনে বড়ো আনন্দ উপভোগ করিতেছেন? তবে তাহাই করুন, তাহাতে আমরা ব্যাঘাত দিব না।

কথাটা এই যে, নিজের লেখা ভালো বলিয়া লেখকের দৃঢ় বিশ্বাস থাকিতে পারে, তাহা লইয়া কেহ তাঁহার সহিত বিবাদ করিবে না, কিন্তু সমালোচকেরও যে সে বিষয়ে তাঁহার সহিত মতের সম্পূর্ণ ঐক্য হইয়া যাইবে এরূপ আশা করাটা কিছু অতিরিক্ত হয়। আমাদের মতে অনর্থক গালিমন্দ দেওয়া বা ঠাট্টা বিদ্রূপ করা সমালোচকের কর্তব্য কাজ নহে। কিন্তু যে সমালোচক কোনো প্রকার অভদ্রতাচরণ না করিয়া শুদ্ধ মাত্র নিজের মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাঁহার সহিত লেখকের ঝগড়া করা ভালো দেখায় না। সমালোচকের কাজটা দেখিতেছি, ঘরের কড়ি খরচ করিয়া বনের মহিষ তাড়ানো, মাঝে মাঝে গুঁতাটাও খাইতে হয়।

তৃণপুঞ্জ। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বিরচিত। মূল্য আট আনা।
ইহা একখানি কাব্যগ্রন্থ। মনে হয় যেন, ইহার অনেকগুলি কবিতাতে লেখকের যাহা মনে আসিয়াছে তাহাই লিখিয়াছেন; তাহার একটা বিশেষ ভাব নাই, একটা দাঁড়াইবার স্থান নাই, একটা উদ্দেশ্য নাই— অথচ তাহার একটা নাম আছে ও তাহার সহিত মিল বা অমিল বিশিষ্ট, বাংলায় বা বিকৃত বাংলায় লিখিত কয়েকটি ছত্র সংলগ্ন আছে। তবে, স্থানে স্থানে কবিত্বের রেখা পড়ে, কিন্তু আবার তখনি মুছিয়া যায়— কবিত্বে সমস্ত ছত্রগুলি ভরিয়া উঠে না, কঠিন ও বিকৃত ভাষার উৎপীড়নে ও ভাবের অভাবে কল্পনা ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে। লেখক অনেক স্থলে ইংরাজি ভাব বাংলায় আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা দোষের কথা নহে, কিন্তু তিনি ইংরাজিকে বাংলা করিতে পারেন নাই, মাঝের হইতে বাংলাকে কেমন ইংরাজি করিয়া তুলিয়াছেন। এই গ্রন্থ পড়িয়া স্পষ্ট বুঝা যায়, লেখক বাংলায় কবিতা লিখিতে নূতন প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই নিমিত্ত এখনো তাঁহার ভাবের প্রবাহ উন্মুক্ত হয় নাই, এখনো তিনি প্রতিকূল ভাষাকে আপনার অনুকূল করিয়া লইতে পারেন নাই, ভাষা তাঁহাকে অপরিচিত দেখিয়া তাঁহার ভাবগুলির প্রতি ভালোরূপ আতিথ্য-সংকার করিতেছে না। দেখা যাউক ভবিষ্যতে কী হয়।

শান্তি-কুসুম। শ্রীবিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।
বিষয়টা কিছুই নহে, লিখিবার যোগ্যই নয়। বোধ করি গ্রন্থখানি ব্যক্তিবিশেষের জন্য লিখিত, সাধারণের জন্য লেখা হয় নাই। সুতরাং এ গ্রন্থ সমালোচনা করিবার কোনো আবশ্যক দেখিতেছি না। তবে প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছি, লেখাটি বড়ো ভালো হইয়াছে। বাংলা ভাবটি অবিকল বজায় আছে। আধুনিক গ্রন্থগুলি পড়িতে পড়িতে এ গ্রন্থখানি সহসা পড়িলে ইহার ভাষা দেখিয়া কিছু আশ্চর্য বোধ হয়। কিন্তু ইহার আর কোনো গুণ নাই।

সুরসভা। শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত। মূল্য দুই আনা।
কৈলাস-কুসুম। ...
মণি মন্দির।... মূল্য তিন আনা।
পার্থ প্রসাদন।...
প্রমীলার পুরী। ... মূল্য এক আনা।
এই গ্রন্থগুলির মধ্যে শেষোক্ত দুইখানি ব্যতীত আর সকলগুলিই গীতিনাট্য। গীতিনাট্যের যথার্থ সমালোচনা সম্ভবে না, কারণ গীতগুলি কেবলমাত্র পড়িয়া সমালোচনা করা যায় না। গান

লিখিবার সময় কবিত্ব কিছু-না-কিছু হাতে রাখিয়া চলিতে হয়, সমস্তটা প্রকাশ করা যায় না, কারণ তাহা হইলে সুরের জন্য আর কিছুই স্থান থাকে না। গানের লেখাতে কবিত্বের যে কোরকটুকুমাত্র দেখা যায় সুরেতে তাহাকেই বিকশিত করিয়া তোলে। এই নিমিত্ত সকল সময় গান পাঠ করা বিড়ম্বনা, তথাপি বলিতে পারি, এই গীতিনাট্যগুলির স্থানে স্থানে ভালো ভালো গান আছে। মণি-মন্দিরের গানগুলিই আমাদের সর্বাপেক্ষা ভালো লাগিয়াছে।

ষড়ঋতুবর্ণন কাব্য। শ্রীআশুতোষ ঘোষ প্রণীত। মূল্য পাঁচ আনা।
গ্রন্থকার লিখিতেছেন "বহু দিবস হইতে আমার ইচ্ছা ছিল যে, পদ্যে একখানি গ্রন্থ রচনা করিব; অধুনা অনেক কষ্টে দুরাশাগ্রস্ত হইয়া অমিত্রাক্ষর চতুর্দশপদী ষড়ঋতুবর্ণন নামক কাব্যখানি রচনা করিয়া মহানুভাব পাঠক মহাশয়গণের করকমলে উপহার স্বরূপ অর্পণ করিলাম।" গ্রন্থকর্তার এতদিনকার এত আশার গ্রন্থখানিকে ভালো না বলিলে তিনি মনে আঘাত পাইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু কর্তব্যানুরোধ পালন করিতে হইলে এ গ্রন্থখানিকে কোনো মতেই সুখ্যাতি করিতে পারি না।

ভারতী
চৈত্র ১২৮৯

সিন্ধু-দূত। শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ।০ আনা মাত্র।
প্রকাশক সিন্ধুদূতের ছন্দ সম্বন্ধে বলিতেছেন—"সিন্ধুদূতের ছন্দঃ প্রচলিত ছন্দঃ-সকল হইতে একরূপ স্বতন্ত্র ও নূতন। এই নূতনত্ব হেতু অনেকেরই প্রথম প্রথম পড়িতে কিছু কষ্ট হইতে পারে।... বাংলা ছন্দের প্রাণগত ভাব কী, ও তাহার স্বাভাবিক গতি কোন্ দিকে, এবং কী প্রণালীতেই বা ইচ্ছামতে উহার সুন্দর বৈচিত্র্যসাধন করা যায়, ইহার নিগূঢ়তত্ত্ব সিন্ধুদূতের ছন্দঃ আলোচনা করিলে উপলব্ধ হইতে পারে।"

আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থের ছন্দ পড়িতে প্রথম প্রথম কষ্ট বোধ হয় সত্য কিন্তু ছন্দের নূতনত্ব তাহার কারণ নহে, ছত্র বিভাগের ব্যতিক্রমই তাহার একমাত্র কারণ। নিম্নে গ্রন্থ হইতে একটি শ্লোক উদ্‌ধৃত করিয়া দিতেছি।

"একি এ, আগত সন্ধ্যা, এখনো রয়েছি ব'সে সাগরের তীরে?
দিবস হয়েছে গত না জানি ভেবেছি কত,
প্রভাত হইতে বসে র'য়েছি এখানে বাহ্য জগৎ পাশরে
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রাহার কিছু নাহি মোর; সব ত্যেজেছে আমারে।"

রীতিমতো ছত্র বিভাগ করিলে উপরি-উদ্‌ধৃত শ্লোকটি নিম্নলিখিত আকারে প্রকাশ পায়।

"একিএ, আগত সন্ধ্যা, এখনো রয়েছি ব'সে
সাগরের তীরে?
দিবস হয়েছে গত,
না জানি ভেবেছি কত,
প্রভাত হইতে বসে রয়েছি এখানে বাহ্য
জগৎ পাশরে
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রাহার কিছু নাহি মোর; সব
ত্যেজেছে আমারে।"

মাইকেল-রচিত নিম্নলিখিত কবিতাটি যাঁহাদের মনে আছে তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, সিন্ধুদূতের ছন্দ বাস্তবিক নূতন নহে।

"আশার ছলনে ভুলি কী ফল লভিনু, হায়,
তাই ভাবি মনে,
জীবনপ্রবাহ বহি কালসিন্ধু পানে ধায়
ফিরাব কেমনে?"

একটি ছত্রের মধ্যে দুইটি ছত্র পুরিয়া দিলে পর প্রথমত চোখে দেখিতে খারাপ হয়, দ্বিতীয়ত কোন্‌খানে হাঁফ ছাড়িতে হইবে পাঠকরা হঠাৎ ঠাহর পান না। এখানে-ওখানে হাতড়াইতে হাতড়াইতে অবশেষে ঠিক জায়গাটা বাহির করিতে হয়। প্রকাশক যে বলিয়াছেন, বাংলা ছন্দের প্রাণগত ভাব কী ও তাহার স্বাভাবিক গতি কোন্‌দিকে তাহা সিন্ধুদূতের ছন্দ আলোচনা করিলে উপলব্ধ হইতে পারে, সে বিষয়ে আমাদের মতভেদ আছে। ভাষার উচ্চারণ অনুসারে ছন্দ নিয়মিত হইলে তাহাকেই স্বাভাবিক ছন্দ বলা যায়, কিন্তু বর্তমান কোনো কাব্যগ্রন্থে (এবং সিন্ধুদূতেও) তদনুসারে ছন্দ নিয়মিত হয় নাই। আমাদের ভাষায় পদে পদে হসন্ত শব্দ দেখা যায়, কিন্তু আমরা ছন্দ পাঠ করিবার সময় তাহাদের হসন্ত উচ্চারণ লোপ করিয়া দিই এইজন্য যেখানে চোদ্দটা অক্ষর বিন্যস্ত হইয়াছে, বাস্তবিক বাংলার উচ্চারণ অনুসারে পড়িতে গেলে তাহা হয়তো আট বা নয় অক্ষরে পরিণত হয়।

রামপ্রসাদের নিম্নলিখিত ছন্দটি পাঠ করিয়া দেখো—

মন্ বেচারীর কি দোষ আছে,
তারে, যেমন নাচাও তেম্‌নি নাচে।

দ্বিতীয় ছত্রের "তারে" নামক অতিরিক্ত শব্দটি ছাড়িয়া দিলে দুই ছত্রে ১১টি করিয়া অক্ষর থাকে। কিন্তু উহাই আধুনিক ছন্দে পরিণত করিতে হইলে নিম্নলিখিতরূপ হয়—

মনের কি দোষ আছে,
যেমন নাচাও নাচে।

ইহাতে দুই ছত্রে আটটি অক্ষর হয়; তাল ঠিক সমান রহিয়াছে অথচ অক্ষর কম পড়িতেছে। তাহার কারণ, শেষোক্ত ছন্দে আমরা হসন্ত শব্দকে আমল দিই না। বাস্তবিক ধরিতে গেলে রামপ্রসাদের ছন্দেও আটটির অধিক অক্ষর নাই—

মন্‌বেচারী কি দোষাছে,
যেমন্নাচা তেম্নি নাচে।

দ্বিতীয় ছত্র হইতে "নাচাও" শব্দের "ও" অক্ষর ছাড়িয়া দিয়াছি; তাহার কারণ, এই "ও"টি হসন্ত ও, পরবর্তী "তে"-র সহিত ইহা যুক্ত।

উপরে দেখাইলাম বাংলা ভাষার স্বাভাবিক ছন্দ কী। আর, যদি কখনো স্বাভাবিক দিকে বাংলা ছন্দের গতি হয় তবে ভবিষ্যতের ছন্দ রামপ্রসাদের ছন্দের অনুযায়ী হইবে।

আমাদের সমালোচ্য কবিতার বিষয়টি—"জাতীয় স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গীকৃতপ্রাণ জনৈক নির্বাসিত ফরাসীস্ সাধারণতান্ত্রিক বীরবর কর্তৃক স্বদেশ সমীপে সাগরদূত দ্বারা সংবাদ প্রেরণ।" এই গ্রন্থ সচরাচর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ হইতে অনেক ভালো। তবে সত্য কথা বলিতে কী ইহাতে ভাষার অবিরাম প্রবাহ যেমন দেখিলাম কবিতার উচ্ছ্বাস তেমন দেখা গেল না।

রামধনু। — শিল্প বিজ্ঞান স্বাস্থ্য গৃহস্থালী বিষয়ক সরল বিজ্ঞান। ঢাকা কলেজের লেবরেটরি অ্যাসিস্‌টান্ট ও ঢাকা মেডিকেল স্কুলের কেমিকেল অ্যাসিস্টেন্ট শ্রীসূর্যনারায়ণ ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত। মূল্য এক টাকা চারি আনা।

এই বৃহদায়তন ১৯৩ পৃষ্ঠার অতি সুলভমূল্য গ্রন্থখানি পাঠকদিগের বিস্তর উপকারে লাগিবে সন্দেহ নাই। ইহার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নিতান্ত সরল। কিন্তু ইহার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ অপেক্ষা ইহাতে যে-সকল গার্হস্থ্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ আছে তাহা আবালবৃদ্ধবনিতার বিস্তর কাজে

লাগিবে। দোষের মধ্যে, ইহাতে বিষয়গুলি ভালো সাজানো নাই, কেমন হিজিবিজি আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার চিত্রগুলিও অতি কদর্য, কতকগুলা অনাবশ্যক চিত্র দিয়া ব্যয়বাহুল্য ও স্থানসংক্ষেপ করিবার আবশ্যক ছিল না, যেগুলি না দিলে নয় সেইগুলি মাত্র থাকিলেই ভালো ছিল। যাহা হউক, পাঠকেরা, বিশেষত গৃহিণীরা, এ গ্রন্থ পাঠ করিয়া উপকার প্রাপ্ত হইবেন।

ঝংকার। গীতিকাব্য। শ্রীসুরেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত প্রণীত। মূল্য ।।০ আনা।
এরূপ বিশৃঙ্খল কল্পনার কাব্যগ্রন্থ সচরাচর দেখা যায় না। স্থানে স্থানে এক-একটি ছত্র জ্বল্‌জ্বল্‌ করিতেছে, কিন্তু কাহার সহিত কাহার যোগ, কোথায় আগা কোথায় গোড়া কিছুই ঠিকানা পাওয়া যায় না। সমস্ত গ্রন্থখানির মধ্যে কেবল বরষণ নামক কবিতাটিতে উন্মাদ উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যায় না।

উচ্ছ্বাস। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য তিন আনা মাত্র।
লেখক কবিতা লিখিতে নূতন আরম্ভ করিয়াছেন বোধ হয়, কারণ তাঁহার ভাষা পরিপক্ক হইয়া উঠে নাই। বিশেষত গ্রন্থের আরম্ভ ভাগের ভাষা ও ভাববিন্যাস পরিষ্কার হয় নাই। কিন্তু গ্রন্থের শেষ ভাগে উল্লাস শীর্ষক কবিতায় কবিত্বের আভাস দেখা যায়। ইহাতে প্রাণের উদারতা, কল্পনার উচ্ছ্বাস ও হৃদয়ের বিকাশ প্রকাশ পাইয়াছে। এবং ইহাতে ভাষার জড়তাও দূর হইয়াছে।

ভারতী
শ্রাবণ ১২৯০

সংগীত সংগ্রহ। (বাউলের গাথা)। দ্বিতীয় খণ্ড।
এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড সমালোচনাকালে গ্রন্থের মধ্যে আধুনিক শিক্ষিত লোকের রচিত কতকগুলি সংগীত দেখিয়া আমরা ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলাম। তদুপলক্ষে সংগ্রহকার বলিতেছেন, "যখন আধুনিক অশিক্ষিত বাউলের ও বৈষ্ণবের গান সংগ্রহ করিব— কারণ আধুনিক ও প্রাচীন গান প্রভেদ করিবার বড়ো কোনো উপায় নাই— তখন সুশিক্ষিত সুভাবুক লোকের সুন্দর সুন্দর স্বভাবপূর্ণ সংগীত কেন সংগ্রহ করিব না আমি বুঝিতে পারি না। এই সংগ্রহের লক্ষ্য ও ভাবের বিরোধী না হইলেই আমি যথেষ্ট মনে করি।" এ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য আছে নিবেদন করি। প্রথমত গ্রন্থের নাম হইতে গ্রন্থের উদ্দেশ্য বুঝা যায়। এ গ্রন্থের নাম শুনিয়া মনে হয়, বাউল সম্প্রদায় -রচিত গান অথবা বাউলদিগের অনুকরণে রচিত গান-সংগ্রহই ইহার লক্ষ্য। তবে কেন ইহাতে শঙ্করাচার্য-রচিত "মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং" ইত্যাদি সংস্কৃত গান নিবিষ্ট হইল? মুন্সী জালালউদ্দিন-রচিত "আহে বন্দে খোদা, যুরা ছুচ্চা কারো" ইত্যাদি দুর্বোধ উর্দুগান ইহার মধ্যে দেখা যায় কেন। গ্রন্থের উদ্দেশ্যবহির্ভূত গান আরও অনেক এই গ্রন্থে দেখা যায়। একটা তো নিয়ম রক্ষা, একটা তো গণ্ডি থাকা আবশ্যক। নহিলে, বিশ্বে যত গান আছে সকলেই তো এই গ্রন্থের মধ্যে স্থান পাইবার জন্য নালিশ উপস্থিত করিতে পারে। দ্বিতীয় কথা— আমরা কেন যে প্রাচীন ও অশিক্ষিত লোকের রচিত সংগীত বিশেষ মনোযোগ সহকারে দেখিতে চাই তাহার কারণ আছে। আধুনিক শিক্ষিত লোকদিগের অবস্থা পরস্পরের সহিত প্রায় সমান। আমরা সকলেই একত্রে শিক্ষা লাভ করি, আমাদের সকলেরই হৃদয় প্রায় এক ছাঁচে ঢালাই করা। এই নিমিত্ত আধুনিক হৃদয়ের নিকট হইতে আমাদের হৃদয়ের প্রতিধ্বনি পাইলে আমরা তেমন চমৎকৃত হই না। কিন্তু, প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে যদি আমরা আমাদের প্রাণের গানের একটা মিল খুঁজিয়া পাই, তবে আমাদের কী বিস্ময়, কী আনন্দ। আনন্দ কেন হয়? তৎক্ষণাৎ সহসা মুহূর্তের জন্য বিদ্যুতালোকে আমাদের হৃদয়ের অতি বিপুল স্থায়ী প্রতিষ্ঠাভূমি আমরা দেখিতে পাই বলিয়া। আমরা দেখিতে পাই, মগ্নতরী হতভাগ্যের ন্যায় আমাদের এই হৃদয় ক্ষণস্থায়ী যুগবিশেষের অভ্যাস ও শিক্ষা নামক খরস্রোতে ভাসমান বিচ্ছিন্ন কাষ্ঠখণ্ড আশ্রয় করিয়া ভাসিয়া

বেড়াইতেছে না। অসীম মানবহৃদয়ের মধ্যে ইহার নীড় প্রতিষ্ঠিত। আমাদের হৃদয়ের উপরে ততই আমাদের বিশ্বাস জন্মে, সুতরাং ততই আমরা বললাভ করিতে থাকি। আমরা তখন যুগের সহিত যুগান্তরের গ্রন্থনসূত্র দেখিতে পাই। আমার এই হৃদয়ের পানীয়, এ কি আমার নিজের হৃদয়স্থিত সংকীর্ণ কূপের পঙ্ক হইতে উত্থিত, না অভ্রভেদী মানবহৃদয়ের গঙ্গোত্রীশিখরনিঃসৃত সুদীর্ঘ অতীত কালের শ্যামল ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত বিশ্ব সাধারণের সেবনীয় স্রোতস্বিনীর জল! যদি কোনো সুযোগে জানিতে পারি শেষোক্তটিই সত্য, তবে হৃদয় কী প্রসন্ন হয়। প্রাচীন কবিতার মধ্যে আমাদের হৃদয়ের ঐক্য দেখিতে পাইলে আমাদের হৃদয় সেই প্রসন্নতা লাভ করে! অতীত কালের প্রবাহধারা যে হৃদয়ে আসিয়া শুকাইয়া যায়, সে হৃদয় কি মরুভূমি।

ওরে বংশীবট, অক্ষয় বট, কোথা রে তমাল বন!
ওরে বৃন্দাবনের তরুলতা শুকায়েছে কি কারণ!
ওরে শ্যামকুণ্ড, রাধা কুণ্ড, কোথা গিরি গোবর্ধন!

গ্রন্থ হইতে একটি গান উদ্‌ধৃত করিয়া আমাদের বক্তব্যের উপসংহার করি।

ঐ বুঝি এসেছি বৃন্দাবন।
আমায় বলে দে রে নিতাই ধন।।
ওরে বৃন্দাবনের পশুপাখীর রব শুনি না কি কারণ!

কেন এ বিলাপ! এ বৃন্দাবনের মধ্যে সে বৃন্দাবন নাই বলিয়া। বর্তমানের সহিত অতীতের একেবারে বিচ্ছেদ হইয়াছে বলিয়া! তা যদি না হইত, আজ যদি সেই কুঞ্জের একটি লতাও দৈবাৎ চোখে পড়িত, তবে সেই ক্ষীণ লতাপাশের দ্বারা পুরাতন বৃন্দাবনের কত মাধুরী বাঁধা দেখিতে পাইতাম! আমাদের হৃদয়ের কত তৃপ্তি হইত!

স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ক আপত্তি খণ্ডন।—
কালীকচ্ছের কোনো পণ্ডিত স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কতকগুলি আপত্তি উত্থাপিত করায় কালীকচ্ছ সার্বজনিক সভান্তর্গত স্ত্রীশিক্ষা বিভাগের সম্পাদিকা শ্রীমতী গুণময়ী— সেই আপত্তি সকল খণ্ডন করিয়া উল্লিখিত পুস্তিকাখানি রচনা করিয়াছেন।
পণ্ডিত মহাশয় যে আটটি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার দারুণ গুরুত্ব পাঠকদিগকে অনুভব করাইবার জন্য আমরা নিম্নে সমস্তগুলিই উঠাইয়া দিলাম।

আপত্তি।

১। স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যক কী? শিখিলে উপকার কী?
২। স্ত্রীলোকে লেখাপড়া শিখিলে অন্ধ হয়।
৩। স্ত্রীলোকে লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হয়।
৪। স্ত্রীলোকের, লেখাপড়া শিখিলে, সন্তান হয় না।
৫। স্ত্রীলোক শিক্ষিতা হইলে, অবিনীতা, লজ্জাহীনা ও অকর্মণ্যা হয়।
৬। লেখাপড়া করিয়া কি মেয়েরা চাকুরি করিবে না জমিদারি মহাজনী করিবে?
৭। মেয়ে লেখাপড়া না শিখিলে কী ক্ষতি আছে।
৮। বিদ্যাশিক্ষায় নারীগণের চরিত্র দোষ জন্মে?

আপত্তিগুলির অধিকাংশই এমনতর যে একজন বালিকার মুখেও শোভা পায় না— পণ্ডিতের মুখে যে কিরূপ সাজে তাহা সকলেই বুঝিবেন। শ্রীমতী গুণময়ী যে আপত্তিগুলি অতি সহজেই খণ্ডন করিয়াছেন তাহা ইহার পর বলা বাহুল্য।

ভাষাশিক্ষা—
গ্রন্থকারের নাম নাই। গ্রন্থকর্তা নিজেই লিখিয়াছেন যে এই পুস্তকখানি ইংরাজি প্রণালী অনুসারে লিখিত, বাস্তবিকই তাহা সত্য। আজকাল "A Higher English Grammar, by Bain."

"Studies in English" by W. Mc. Mordie, Translation and Retranslation by Gangadhor Banerjee, প্রভৃতি যে-সকল পুস্তক এন্ট্রেন্স পরীক্ষার্থী বালক মাত্রেই পড়িয়া থাকেন, বলা বাহুল্য যে এই পুস্তকগুলির সম্পূর্ণ সাহায্য গ্রহণ করিয়া এই পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। পুস্তকখানি পাঠে, লেখকের ভাষা শিক্ষা দিবার সুরুচি দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইঁহার সহিত আমাদের অনেকগুলি মতের ঐক্য হইয়াছে, এবং সে মতগুলি সুরুচিসংগত জ্ঞান করি। আমাদিগের বিশ্বাস যে পুস্তকখানি পাঠে ব্যাকরণজ্ঞ বালকদিগের উপকার জন্মিতে পারে।

ভারতী

ভাদ্র, আশ্বিন ১২৯১

লালা গোলোকচাঁদ। পারিবারিক নাটক। শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র বসু।

নাটকটি অসম্ভব আতিশয্যে পরিপূর্ণ। সমস্তটা একটা সামাজিক ভেলকির মতো। কতকগুলি অদ্ভুত ভালো লোক এবং অদ্ভুত মন্দ লোক একটা অদ্ভুত সমাজে যথেচ্ছা অদ্ভুত কাজ করিয়া যাইতেছে, মাথার উপরে একটা বুদ্ধিমান অভিভাবক কেহ নাই। স্থানে স্থানে লেখকের পারিবারিক চিত্ররচনায় ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। তীর্থযাত্রাকালে বৃদ্ধ কর্তা-গিন্নির গৃহত্যাগের দৃশ্য গ্রন্থের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট অংশ।

দেহাত্মিক-তত্ত্ব। ডাক্তার সাহা প্রণীত।

এই গ্রন্থে শ্রীদর্শন রাজচক্রবর্তী নামক একব্যক্তি গুরুর আসনে উপবিষ্ট। ভোলানাথ দাস নামক এক ব্যক্তি তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য। উভয়ের মধ্যে কথোপকথন চলিতেছে। গুরুজি রূপকচ্ছলে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিতেছেন— শিষ্য সেই উপদেশ শুনিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। দেহ-মন ও জগতের শক্তি সকলকে দেব-দেবী রূপে কল্পনা করিয়া জগৎ-ব্রহ্মবাদের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। "যোগাকর্ষণ-দেব" "মাধ্যাকর্ষণ-দেব" "রসায়ন-দেব" "মস্তিষ্কাদেবী"প্রভৃতি দেব-দেবীর অবতারণা করা হইয়াছে। গ্রন্থের সার মর্ম এই যে, ব্রহ্ম কতকটা দৈহিকভাবে ও কতকটা আত্মিকভাবে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। এবং সকল ধর্মের মধ্যেই কতকটা দৈহিক ও কতকটা আত্মিক ভাব বিদ্যমান। উপদেশের কিঞ্চিৎ নমুনা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

"বলি, মস্তিষ্কা দেবি! আপনার কয়টি পুত্র ও কয়টি কন্যা আমায় বলিবেন কি?"

"ভোলানাথ! তুমি কী নিমিত্ত এরূপ প্রশ্ন করিতেছ? তোমার সাধ্য নয় যে, তুমি এ সকল বুঝিতে পার। এই দেখো, আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা, ইহার নাম স্পর্শ সত্তা বা ত্বক্, এই আমার দ্বিতীয় কন্যা, রসনা। এই আমার প্রথম পুত্র নয়ন, দ্বিতীয় পুত্র শ্রবণ, এই আমার তৃতীয় কন্যা নাসিকা" ইত্যাদি। গ্রন্থের "দৈহিক ভাবটি" অতি পরিপাটি। গ্রন্থের আত্মিক ভাব বুঝিবার জন্য ভোলানাথের ন্যায় সমজদার ব্যক্তির আবশ্যক। যাহা হউক, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এইটুকু বুঝিতে পারি, এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে "মস্তিষ্কা দেবী"কে বিবিধ শৈত্য-উপচারে ঠাণ্ডা রাখা কর্তব্য।

সাধনা

ফাল্গুন ১২৯৮

সংগ্রহ। শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

গ্রন্থখানি ছোটো ছোটো গল্পের সমষ্টি। ইহার অধিকাংশ গল্পই সুপাঠ্য। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ইহাই লেখকের পক্ষে যথেষ্ট প্রশংসার বিষয় নহে। যিনি "শ্যামার কাহিনী" লিখিতে পারেন তাঁহার নিকট হইতে কেবলমাত্র কৌতূহল অথবা বিস্ময়জনক গল্প আমরা প্রত্যাশা করি না। "শ্যামার কাহিনী" গল্পটি আদ্যোপান্ত জীবন্ত এবং মূর্তিমান, ইহার কোথাও বিচ্ছেদ নাই। অন্য গল্পগুলিতে লেখকের নৈপুণ্য থাকিতে পারে কিন্তু এই গল্পেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

লীলা। শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
লেখক এই গ্রন্থখানিকে "উপন্যাস" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ইহা লইয়াই তাঁহার সহিত আমাদের প্রধান বিরোধ। ইহাতে উপন্যাসের সুসংলগ্নতা নাই এবং গল্পের অংশ অতি যৎসামান্য ও অসম্পূর্ণ। মাঝে মাঝে অনেক অকারণ অনাবশ্যক পরিচ্ছেদ সংযোগ করা হইয়াছে, এবং লেখকের স্বগত-উক্তিও স্থানে স্থানে সুদীর্ঘ এবং গায়েপড়া গোছের হইয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই বইখানি পড়িয়া আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। বাংলার গার্হস্থ্য চিত্র ইহাতে উজ্জ্বলরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। গ্রন্থের নাম যদিও 'লীলা' কিন্তু কিরণ ও সুরেশচন্দ্রই ইহার প্রধান আলেখ্য। তাহাদের বাল্যদাম্পত্যের সুকুমার প্রেমাঙ্কুর-উদ্‌গম হইতে আরম্ভ করিয়া সংসারক্ষেত্রে নানা উপলক্ষে পরস্পরের মধ্যে ঈষৎ মনোবিচ্ছেদের উপক্রম পর্যন্ত আমরা আগ্রহের সহিত অনুসরণ করিয়াছি— অন্যান্য আর সমস্ত কথাই যেন ইহার মধ্যে মধ্যে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হইয়াছে। যাহা হউক, বইখানি পড়িতে পড়িতে দুই-একটি গৃহস্থ ঘর আমাদের নিকট সুপরিচিত হইয়া উঠে। কিরণ, কিরণের মা, দিদিমা, বিন্দুবাসিনী, দাসী, ব্রাহ্মণী, প্রফুল্ল ইহারা সকলেই বাঙালি পাঠকমাত্রেরই চেনা লোক, ইহারা বঙ্গগৃহের আত্মীয় কুটুম্ব, কেবল সুরেশচন্দ্রকে স্থানে স্থানে ভালো বুঝিতে পারি নাই এবং লীলা ও আনন্দময়ী তেমন জীবন্তবৎ জাগ্রত হইয়া উঠে নাই। মনোমোহিনী অল্পই দেখা দিয়াছেন কিন্তু কী আবশ্যক উপলক্ষে যে আমরা তাঁহার সাক্ষাৎকার-সৌভাগ্য লাভ করিলাম তাহা বলিতে পারি না; কেবল, পিতৃধন-গর্বিতা রমণীর চিত্রাঙ্কনে প্রলুব্ধ হইয়া লেখক ইঁহার অনাবশ্যক অবতারণা করিয়াছেন তাহা বেশ বুঝা যায়।— যদিও গল্পের প্রত্যাশা উদ্রেক করিয়া গ্রন্থকার আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছেন তথাপি বঙ্গগৃহের উজ্জ্বল চিত্রদর্শনসুখলাভ করিয়া তাঁহাকে আনন্দান্তঃকরণে মার্জনা করিলাম।

রায় মহাশয়। শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
যখন এই গল্পটি খণ্ডশ 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইতেছিল তখনি আমরা 'সাধনা'য় ইহার প্রশংসাবাদ করিয়াছিলাম। লেখকের ভাষা এবং রচনানৈপুণ্যে আমরা পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। তাঁহার লেখার বেশ-একটি বাঁধুনি আছে, আবোল তাবোল নাই; লেখক যেন সমস্ত বিষয়টিকে সমস্ত ব্যাপারটিকে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিতে পারিয়াছেন; যে একটি নিষ্ঠুর কাণ্ড বর্ণনা করিয়াছেন তাহার কিছুই যেন তাঁহার হাত এড়াইয়া যাইতে পারে নাই। জমিদারি সেরেস্তার গোমস্তা মুহুরি হইতে সামান্য প্রজা পর্যন্ত সকলেই যথাযথ পরিমাণে বাহুল্যবর্জিত হইয়া আপন আপন কাজ দেখাইয়া গেছে। এরূপ বাস্তব চিত্র বঙ্গসাহিত্যে বিরল।

প্রবাসের পত্র। শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।
প্রকাশক বলিতেছেন "সাধারণের জন্য পত্রগুলি লিখিত হয় নাই। নবীনবাবু ভ্রমণ-উপলক্ষে যেখানে যাইতেন সেখান হইতে সহধর্মিণীকে পত্র লিখিতেন। পত্রগুলিও তাড়াতাড়ি লেখা। হয়তো রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষায় বিশ্রামগৃহে বসিয়া আছেন এবং পত্র লিখিতেছেন।'— এই গ্রন্থখানির সমালোচনা অতিশয় কঠিন কার্য। কারণ, ইহাকে প্রকাশ্য গ্রন্থ হিসাবে দেখিব, না, পত্র হিসাবে দেখিব ভাবিয়া পাই না। পড়িয়া মনে হয় যেন গোপন পত্র ভ্রমক্রমে প্রকাশ হইয়া গেছে। এ-সকল পত্র কবির জীবনচরিতের উপাদানস্বরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে কিন্তু স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে বাহির হইতে পারে ইহাতে এমন কোনো বিশেষত্ব নাই। যখন একান্তই গ্রন্থ আকারে বাহির হইল তখন স্থানে স্থানে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়সম্বন্ধীয় যে-সকল বিশ্রব্ধ কথা আছে সেগুলি বাদ দিলেই ভালো হইত। প্রথম পত্রেই উমেশবাবু ও মধুবাবুর স্ত্রীর তুলনা আমাদের নিকট সংকোচজনক বোধ হইয়াছে— এমন আরও দৃষ্টান্ত আছে। এইখানে প্রসঙ্গক্রমে আরও একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। আজকালকার উচ্ছ্বাসময় লেখামাত্রেই স্থানে অস্থানে "হরি হরি" "মরি মরি" এবং "বুঝি" শব্দ-প্রয়োগের কিছু বাড়াবাড়ি

দেখা যায়। উহা আমাদের কাছে কেমন একটা ভঙ্গিমা বলিয়া ঠেকে— প্রথম যে লেখক এই ভঙ্গিটি বাহির করিয়াছিলেন তাঁহাকে কথঞ্চিৎ মার্জনা করা যায়— কিন্তু যখন দেখা যায় আজকাল অনেক লেখকই এই-সকল সুলভ উচ্ছ্বাসোক্তির ছড়াছড়ি করিয়া হৃদয়বাহুল্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন তখন অসহ্য হইয়া উঠে। নবীনবাবুও যে এই-সকল সামান্য বাক্য-কৌশল অবলম্বন করিবেন ইহা আমাদের নিকট নিতান্ত পরিতাপের বিষয় বলিয়া মনে হয়।

অপরিচিতের পত্র।
জগতের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া জ-রি নামক প্রচ্ছন্ননামা কোনো ব্যক্তি এই পুস্তক ছাপাইয়াছেন। জগৎ ক্ষমা করিবে কি না জানি না কিন্তু আমরা এ ধৃষ্টতা মার্জনা করিতে পারি না। ইহাতে নির্লজ্জ এবং ঝুঁটা সেন্টিমেন্টালিটির চূড়ান্ত দেখানো হইয়াছে। এবং সর্বশেষে আড়ম্বরপূর্বক জগতের নিকট ক্ষমাভিক্ষার অভিনয়টি সর্বাপেক্ষা অসহ্য।

প্রকৃতির শিক্ষা।
গদ্যে অবিশ্রাম হৃদয়োচ্ছ্বাস বড়ো অসংগত শুনিতে হয়। গদ্যে যেমন ছন্দের সংযম নাই তেমনি ভাবের সংযম অত্যাবশ্যক— নতুবা তাহার কোনো বন্ধন থাকে না, সমস্ত অশোভনভাবে আলুলায়িত হইয়া যায়। গদ্যে যদি হৃদয়ভাব প্রকাশ করিতেই হয় তবে তাহা পরিমিত, সংযত এবং দৃঢ় হওয়া আবশ্যক। সমালোচ্য গ্রন্থের আরম্ভ দেখিয়াই ভয় হয়।

"আর পারি না! সংসারের উত্তপ্ত মরুভূমিতে শান্তির পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া আর ঘুরিতে পারি না। প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিতেছে। শুষ্কতার উষ্ণ নিশ্বাসে হৃদয়ের সদ্ভাব ফল শুকাইয়া যাইতেছে, চারি দিকে কঠোরতা, কেবল কঠোরতাই দেখিতেছি। কিছুতেই তৃপ্তি হইতেছে না। জীবনটা অত্যন্ত নীরস বোধ হইতেছে। যেন কী হৃদয়হীন সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছি, যেন ভালো করিয়া, বুক ভরিয়া নিশ্বাস ফেলিতে পারিতেছি না। কী যে ভার বুকের উপর চাপিয়া ধরিতেছে, বুঝিতে পারিতেছি না।... আর ভালো লাগে না ছাই সংসার!"

যদি সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিতে না পারা যায় তবে সাহিত্যে হৃদয়ের ভাব প্রকাশের কোনো অর্থ নাই। কারণ, হৃদয়ভাব চিরপুরাতন, তাহা নূতন সংবাদও নহে এবং বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালকও নহে। তাহা সহস্রবার শুনিয়া কাহারও কোনো লাভ নাই। তবে যদি ভাবটিকে অপরূপ নূতন সৌন্দর্য দিয়া প্রকাশ করিতে পারা যায় তবেই তাহা মানবের চিরসম্পত্তিস্বরূপ সাহিত্যে স্থান পায়। এইজন্য ছন্দোময় পদ্য হৃদয়ভাব প্রকাশের অধিক উপযোগী। ভাবের সহিত একটি সংগীত যোগ করিয়া তাহার অন্তরের চিরনূতন সৌন্দর্যটি বাহির করিয়া আনে। কিন্তু সাধারণ গদ্যে হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে গেলে তাহা প্রায়ই নিতান্ত মূল্যহীন প্রগল্‌ভতা হইয়া পড়ে এবং তাহার মধ্যে যদি বা কোনো চিন্তাসাধ্য জ্ঞানের কথা থাকে তবে তাহাও উচ্ছ্বাসের ফেনরাশির মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া যায়।

দ্বারকানাথ মিত্রের জীবনী। শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত।
এ গ্রন্থখানি লিখিবার ভার যোগ্যতর হস্তে সমর্পিত হইলে আমরা সুখী হইতাম। গ্রন্থকার যদি নিজের বক্তৃতা কিঞ্চিৎ ক্ষান্ত রাখিয়া কেবলমাত্র দ্বারকানাথের জীবনীর প্রতি মনোযোগ করিতেন তবে আমরা তাঁহার নিকট অধিকতর কৃতজ্ঞ হইতাম। আমরা মহৎ ব্যক্তির জীবনচরিত পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিব এই আশ্বাসে গ্রন্থখানি পড়িতে বসি, কিন্তু মাঝের হইতে সমাজ ও লোকব্যবহার সম্বন্ধে কালীপ্রসন্নবাবুর মতামত শুনিবার জন্য আমাদের কী এমন মাথাব্যথা পড়িয়াছে! তিনি যেন পাঠকসাধারণের একটি জ্যেষ্ঠতাত অভিভাবক— একটি ভালো ছেলেকে দাঁড় করাইয়া ক্রমাগত অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন "দেখ্ দেখি এ ছেলেটি কেমন! আর তোরা এমন লক্ষ্মীছাড়া হলি কেন।" আমরা দ্বারকানাথ মিত্রকে অন্তরের সহিত ভক্তি করি

এইজন্য কালীপ্রসন্নবাবুর মতামত ও সুমহৎ উপদেশ বাক্যাবলি হইতে পৃথক করিয়া আমরা স্বরূপত তাঁহাকেই দেখিতে ইচ্ছা করি। যাঁহারা বড়োলোকের জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহাদের সসম্ভ্রম বিনয়ের সহিত আপনাকে অন্তরালে রাখা নিতান্ত আবশ্যক। অন্যত্র তাঁহাদের মতের মূল্য থাকিতে পারে কিন্তু যেখানে বড়োলোকের কথা হইতেছে সেখানে থাকিয়া থাকিয়া নিজের কথার প্রতি সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিলে বিরক্তিভাজন হইতে হয়।

সাধনা
অগ্রহায়ণ ১২৯৯

অশোকচরিত। শ্রীকৃষ্ণবিহারী সেন প্রণীত।
এই গ্রন্থখানি সকলেরই পাঠ করা উচিত। এইরূপ গ্রন্থ বঙ্গভাষায় দুর্লভ। শুধু বঙ্গভাষায় কেন, কোনো বিদেশীয় গ্রন্থে অশোকের চরিত এত বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হয় নাই। প্রসঙ্গক্রমে ইহাতে যে-সকল জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা সমস্ত জানিতে হইলে অনেকগুলি গ্রন্থ পাঠ করিতে হয়। তাহা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। গ্রন্থকার তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের ফল একাধারে সন্নিবিষ্ট করিয়া, সাধারণ পাঠকবর্গের মহৎ উপকার করিয়াছেন। এই অশোকচরিত পাঠ করিলে তৎকালীন ভারতবর্ষের ইতিহাস, অবস্থা, ভাষা, সভ্যতার উন্নতি প্রভৃতি অনেক বিষয়ের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই গ্রন্থের আর-একটি গুণ এই যে, ইহা অতি সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। গ্রন্থের উপসংহারে, অশোকচরিত সম্বন্ধীয় একটি ক্ষুদ্র নাটিকা সংযোজিত হইয়াছে। ইহাকে একটি 'ফাউ' স্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারে। 'ফাউ'টিও ফেলার সামগ্রী নহে— উহাতেও একটু বেশ রস আছে।

পঞ্চামৃত। শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন প্রণীত।
এই গ্রন্থে আমাদের দেশের পূর্বতন ভগবদ্‌ভক্ত মহাত্মাদিগের যে-সকল কল্যাণপ্রদ বচন উদ্‌ধৃত হইয়াছে তাহা বাছা বাছা রত্ন। এই গ্রন্থখানি কবিরত্ন মহাশয় অনাথ কুষ্ঠরোগীদিগের উপকারার্থ উৎসর্গ করিয়াছেন। ইহার জন্য তিনি তো সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেনই; কিন্তু জনসমাজে একজন যদি শারীরিক ব্যাধিতে প্রপীড়িত হয়, তবে তাহার তুলনায় শতসহস্র ব্যক্তি মানসিক ব্যাধিতে প্রপীড়িত। শেষোক্ত ব্যাধির ঔষধ যদি কিছু থাকে, তবে তাহা শুভানুধ্যায়ী দয়ার্দ্রচিত্ত সাধু ব্যক্তিদিগের অমৃতময় আশ্বাসবাণী এবং উপদেশ। বর্তমান গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় শেষোক্ত-রূপ মহৌষধ স্তরে স্তরে সাজানো রহিয়াছে। এইজন্য কবিরত্ন মহাশয়ের বিরচিত গ্রন্থ জয়যুক্ত হউক, ইহা আমাদিগের আন্তরিক প্রার্থনা।

সাধনা
পৌষ ১২৯৯

কঙ্কাবতী। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।
এই উপন্যাসটি মোটের উপর যে আমাদের বিশেষ ভালো লাগিয়াছে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। লেখাটি পাকা এবং পরিষ্কার। লেখক অতি সহজে সরল ভাষায় আমাদের কৌতুক এবং করুণা উদ্রেক করিয়াছেন এবং বিনা আড়ম্বরে আপনার কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। গল্পটি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে প্রকৃত ঘটনা এবং দ্বিতীয় ভাগে অসম্ভব অমূলক অদ্ভুত রসের কথা। এইরূপ অদ্ভুত রূপকথা ভালো করিয়া লেখা বিশেষ ক্ষমতার কাজ। অসম্ভবের রাজ্যে যেখানে কোনো বাঁধা নিয়ম, কোনো চিহ্নিত রাজপথ নাই, সেখানে স্বেচ্ছাবিহারিণী কল্পনাকে একটি নিগূঢ় নিয়মপথে পরিচালনা করিতে গুণপনা চাই। কারণ রচনার

বিষয় বাহ্যত যতই অসংগত ও অদ্ভুত হউক-না কেন, রসের অবতারণা করিতে হইলে তাহাকে সাহিত্যের নিয়ম বন্ধনে বাঁধিতে হইবে। রূপকথার ঠিক স্বরূপটি, তাহার বাল্য-সারল্য, তাহার অসন্দিগ্ধ বিশ্বস্ত ভাবটুকু লেখক যে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে অল্প প্রশংসার বিষয় নহে।

কিন্তু লেখক যে তাঁহার উপাখ্যানের দ্বিতীয় অংশকে রোগশয্যার স্বপ্ন বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে তিনি কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। ইহা রূপকথা, ইহা স্বপ্ন নহে। স্বপ্নের ন্যায় সৃষ্টিছাড়া বটে, কিন্তু স্বপ্নের ন্যায় অসংলগ্ন নহে। বরাবর একটি গল্পের সূত্র চলিয়া গিয়াছে। স্বপ্নে এমন কোনো অংশ থাকিতে পারে না যাহা স্বপ্নদর্শী লোকের অগোচর, কিন্তু এই স্বপ্নের মধ্যে মধ্যে লেখক এমন সকল ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন যাহা নেপথ্যবর্তী, যাহা বালিকার স্বপ্নদৃষ্টির সম্মুখে ঘটিতেছে না। তাহা ছাড়া মধ্যে মধ্যে এমন সকল ভাব ও দৃশ্যের সংঘটন করা হইয়াছে, যাহা ঠিক বালিকার স্বপ্নের আয়ত্তগম্য নহে। দ্বিতীয়ত, উপাখ্যানের প্রথম অংশের বাস্তব ঘটনা এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে যে, মধ্যে সহসা অসম্ভব রাজ্যে উত্তীর্ণ হইয়া পাঠকের বিরক্তিমিশ্রিত বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। একটা গল্প যেন রেলগাড়িতে করিয়া চলিতেছিল, হঠাৎ অর্ধরাত্রে অজ্ঞাতসারে বিপরীত দিক হইতে আর-একটা গাড়ি আসিয়া ধাক্কা দিল এবং সমস্তটা রেলচ্যুত হইয়া মারা গেল। পাঠকের মনে রীতিমতো করুণা ও কৌতূহল উদ্রেক করিয়া দিয়া অসতর্কে তাহার সহিত এরূপ রূঢ় ব্যবহার করা সাহিত্য-শিষ্টাচারের বহির্ভূত। এই উপন্যাসটি পড়িতে পড়িতে 'অ্যালিস্ ইন্ দি ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড' নামক একটি ইংরাজি গ্রন্থ মনে পড়ে। সেও এইরূপ অসম্ভব, অবাস্তব, কৌতুকজনক বালিকার স্বপ্ন। কিন্তু তাহাতে বাস্তবের সহিত অবাস্তবের এরূপ নিকট সংঘর্ষ নাই। এবং তাহা যথার্থ স্বপ্নের ন্যায় অসংলগ্ন, পরিবর্তনশীল ও অত্যন্ত আমোদজনক।

কিন্তু গ্রন্থখানি পড়িতে পড়িতে আমরা এই-সমস্ত ত্রুটি মার্জনা করিয়াছি। এবং আমাদের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে যে, এতদিন পরে বাংলায় এমন লেখকের অভ্যুদয় হইতেছে যাঁহার লেখা আমাদের দেশের বালক-বালিকাদের এবং তাহাদের পিতামাতার মনোরঞ্জন করিতে পারিবে। বালক-বালিকাদের উপযোগী যথার্থ সরস গ্রন্থ আমাদের দেশের অতি অল্প লোকেই লিখিতে পারেন। তাহার একটা কারণ, আমরা জাতটা কিছু স্বভাববৃদ্ধ, পৃথিবীর অধিকাংশ কাজকেই ছেলেমানুষি মনে করি; সে স্থলে যথার্থ ছেলেমানুষি আমাদের কাছে যে কতখানি অবজ্ঞার যোগ্য তাহা সকলেই অবগত আছেন। আমরা ছেলেদের খেলাধুলা গোলমাল প্রায়ই ধমক দিয়া বন্ধ করি, তাহাদের বাল্য উচ্ছ্বাস দমন করিয়া দিই, তাহাদিগকে ইস্কুলের পড়ায় ক্রমিক নিযুক্ত রাখিতে চাহি, এবং যে ছেলের মুখে একটি কথা ও চক্ষে পলকপাত ব্যতীত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কোনো প্রকার গতি নাই, তাহাকেই শিষ্ট ছেলে বলিয়া প্রশংসা করি। আমরা ছেলেকে ছেলেমানুষ হইতে দিতে চাহি না, অতএব আমরা ছেলেমানুষি বই পছন্দই বা কেন করিব, রচনার তো কথাই নাই। শিশুপাঠ্য গ্রন্থে আমরা কেবল গলা গম্ভীর ও বদনমণ্ডল বিকটাকার করিয়া নীতি উপদেশ দিই। য়ুরোপীয় জাতিদের কাজও যেমন বিস্তর, খেলারও তেমনি সীমা নাই। যেমন তাহারা জ্ঞানে বিজ্ঞানে ও সকল প্রকার কার্যানুষ্ঠানে পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে, তেমনি খেলাধুলা, আমোদপ্রমোদ কৌতুক-পরিহাসে বালকের ন্যায় তাহাদের তরুণতা। এইজন্য তাহাদের সাহিত্যে ছেলেদের বই এত বহুল এবং এমন চমৎকার। তাহারা অনায়াসে ছেলে হইয়া ছেলেদের মনোহরণ করিতে পারে এবং সে কার্যটা তাহারা অনাবশ্যক ও অযোগ্য মনে করে না। তাহাদের সমস্ত সাহিত্যেই এই তরুণতার আভাস পাওয়া যায়। চার্লস ল্যাম্বের অধিকাংশ প্রবন্ধগুলি যেরূপ উদ্দেশ্যবিহীন অবিমিশ্র হাস্যরসপূর্ণ, সেরূপ প্রবন্ধ বাংলায় বাহির হইলে, লেখকের প্রতি পাঠকের নিতান্ত অবজ্ঞার উদয় হইত— তাহারা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া বলিত, হইল কী? ইহা হইতে কী পাওয়া গেল? ইহার তাৎপর্য কী, লক্ষ্য কী? তাহারা পাকালোক, অত্যন্ত বিজ্ঞ,

সরস্বতীর সঙ্গেও লাভের ব্যবসায় চালাইতে চায়; কেবল হাস্য, কেবল আনন্দ লইয়া সন্তুষ্ট নহে, হাতে কী রহিল দেখিতে চাহে। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে বর্ণিত একঠেঙো মুল্লুকনিবাসী শ্রীমান ঘ্যাঁঘো ভূতের সহিত শ্রীমতী নাকেশ্বরী প্রেতিনীর শুভবিবাহবার্তা আমাদের এই দুইঠেঙো মুল্লুকের অত্যন্ত ধীর গম্ভীর সম্রান্ত পাঠকসম্প্রদায়ের কিরূপ ঠেকিবে আমাদের সন্দেহ আছে। আমাদের নিবেদন এই যে, সকল কথারই যে অর্থ আছে, তাৎপর্য আছে, তাহা নহে, পৃথিবীতে বিস্তর বাজে কথা, মজার কথা, অদ্ভুত কথা থাকাতেই দুটো-চারটে কাজের কথা, তত্ত্বকথা, আমরা ধারণা করিতে পারি। আমাদের দেশের এই পঞ্চবিংশতিকোটি সুগম্ভীর কাঠের পুতুলের মধ্যে যদি কোনো দয়াময় দেবতা একটা বৈদ্যুতিক তার সংযোগে খুব খানিকটা কৌতুকরস এবং বাল্যচাপল্য সঞ্চার করিয়া দিয়া এক মুহূর্তে নাচাইয়া তুলিতে পারেন তবে সেই অকারণ আনন্দের উদ্দাম চাঞ্চল্যে আমাদের ভিতরকার অনেক সার পদার্থ জাগ্রত হইয়া উঠিতে পারে। সাহিত্য যে সকল সময়ে আমাদের হাতে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষগোচর লাভ আনিয়া দেয় তাহা নহে; আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একটা আনন্দপূর্ণ আন্দোলন উপস্থিত করিয়া তাহাকে সজাগ ও সজীব করিয়া রাখে। তাহাকে হাসাইয়া কাঁদাইয়া, তাহাকে বিস্মিত করিয়া, তাহাকে আঘাত করিয়া তাহাকে তরঙ্গিত করিয়া তোলে। বিশ্বের বিপুল মানবহৃদয়জলধির বিচিত্র উত্থান-পতনের সহিত সংযুক্ত করিয়া তাহার ক্ষুদ্রত্ব ও জড়ত্ব মোচন করিয়া দেয়। কখনো বাল্যের অকৃত্রিম হাস্য, কখনো যৌবনের উন্মাদ আবেগ, কখনো বার্ধক্যের স্মৃতিভারাতুর চিন্তা, কখনো অকারণ উল্লাস, কখনো সকারণ তর্ক, কখনো অমূলক কল্পনা, কখনো সমূলক তত্ত্বজ্ঞান আনয়ন করিয়া আমাদের হৃদয়ের মধ্যে মানসিক ষড়ঋতুর প্রবাহ রক্ষা করে, তাহাকে মরিয়া যাইতে দেয় না।

সাধনা
ফাল্গুন ১২৯৯

ভক্তচরিতামৃত। শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য দশ আনা।
রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবনচরিত। শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য দুই আনা।
এই দুইখানি গ্রন্থে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভক্তপ্রবর শ্রীমৎ রূপ, সনাতন, জীবগোস্বামী এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে।

সম্প্রতি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় নব্যভারতে রূপ ও সনাতনের অকৃত্রিম সাধুতার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থে রূপ সনাতনের জীবনের প্রথমাবস্থার বিবরণ সুস্পষ্ট নহে। এমন-কি, গৌড়েশ্বর হুসেন্ সাহা [শাহ্] রূপকে পরস্বলুণ্ঠনকারী পলাতক দস্যু জ্ঞান করিতেন ইহাতে তাহার উল্লেখ আছে, এবং সনাতন রাজকার্য হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য পীড়ার ভান করিয়া মিথ্যাচার অবলম্বন করিয়াছিলেন এ কথাও চরিতলেখক স্বীকার করিয়াছেন।

কিন্তু তথাপি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পূজ্য ভক্ত সাধুচরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিতে সংকোচ বোধ হয়। তাহার অনেক কারণ আছে।

প্রথমত, মানুষের চরিত্র আদ্যোপান্ত সুসংগত নহে। অনেকগুলি ছিদ্র সত্ত্বেও মোটের উপরে চরিত্রবিশেষকে মহৎ বলা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়ত, কালবিশেষে ধর্মনীতির আদর্শের কথঞ্চিৎ ইতরবিশেষ ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ, এক সময়ে ধর্মনীতির যে অংশে সাধারণের শৈথিল্য ছিল এখন হয়তো সে অংশে নাই অপর কোনো অংশে আছে। এক সময় ছিল, যখন সম্রাটের প্রাপ্য নবাব লুণ্ঠন করিত, নবাবের প্রাপ্য ডিহিদার লুণ্ঠন করিত এবং দস্যুতা রাজ্যতন্ত্রের মধ্যে আদ্যোপান্ত ধারাবাহিকভাবে বিরাজ করিত। সে দস্যুতা এক প্রকার প্রকাশ্য ছিল এবং সাধারণের নিকট তাহা লজ্জার কারণ না হইয়া সম্ভবত শ্লাঘার বিষয় ছিল। সকলেই জানেন অল্পকাল পূর্বেও উপরি পাওনা সম্বন্ধে প্রশ্ন ভদ্রসমাজের

মধ্যেও শিষ্টাচারবিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইত না। মিথ্যাচার, বিশেষত সদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য মিথ্যাভান, যে, আমাদের দেশে অত্যন্ত নিন্দনীয় নহে এ কথা স্বীকার করিতে আমরা লজ্জিত হইতে পারি কিন্তু এ কথা সত্য। অতএব, স্বসাময়িক সাধারণ দুর্নীতিবশত কোনো কোনো বিষয়ে সৎপথভ্রষ্ট হইলেও মহৎলোকের সাধুতার প্রতি সম্পূর্ণ সন্দিহান হইবার কারণ দেখি না।

তৃতীয়ত, আমাদের সম্মুখে সমস্ত প্রমাণ বর্তমান নাই। সামান্য দুই-একটা আভাস মাত্র হইতে বিচার করা সংগত হয় না।

চতুর্থত, রূপ এবং সনাতন তাঁহাদের স্বসাময়িক প্রধান প্রধান লোকের নিকট সাধু বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের চরিত্রের মধ্যে এমন সকল গুণ ছিল যাহাতে নিকটবর্তী লোকদিগকে তাঁহারা আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করিয়াছিলেন— এবং আজ পর্যন্ত তাহারই স্মৃতি অক্ষুণ্ণভাবে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। আমাদের মতে অন্য সমস্ত প্রমাণাভাবে ইহাই তাঁহাদের মহত্ত্বের যথেষ্ট প্রমাণ।

সমালোচ্য গ্রন্থে অঘোরবাবু ভক্তচরিত্র অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণব ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বসকল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এজন্য তিনি ধন্যবাদের পাত্র। ভক্তিতত্ত্ব ভক্তের জীবনীর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রকাশ করিলে পাঠকের নিকট উভয়ই সজীব হইয়া উঠে। শুষ্ক শাস্ত্রের মধ্যে তত্ত্ব পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু সেই তত্ত্বের গভীরতা, মাধুর্য— মানবজীবনের মধ্যে তাহার পরিণতি, অনুভব করিতে গেলে ভক্তচরিত্রের মধ্য হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া দেখিতে হয়। অতএব বৈষ্ণবধর্মের সুগভীর তত্ত্বসকল যাঁহারা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা অঘোরবাবুর এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন।

চরিত রত্নাবলী। প্রথম ভাগ। শ্রীকাশীচন্দ্র ঘোষাল প্রণীত। মূল্য চারি আনা।
ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী অনেক সাধু নরনারীর সংক্ষিপ্ত চরিত বর্ণিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কেবল "করমেতি বাই" নামক প্রথম চরিতটি আমাদের ভালো লাগে নাই। মানবহিতৈষণার জন্য যাঁহারা সংসার বিসর্জন করেন তাঁহাদের জীবনচরিত বর্ণনযোগ্য। কিন্তু আত্মসুখের আকর্ষণে যাঁহারা সুকঠিন সংসারকৃত্য ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন তাঁহাদের চরিত্রকে আদর্শ জ্ঞান করিতে পারি না। করমেতি বাই স্বামীগৃহ ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে "শ্যামল সুন্দর সিন্ধু তরঙ্গ মাঝারে" নিমগ্ন হইবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। সুখী হইয়া থাকেন তো তিনিই সুখী হইয়াছেন— আমাদের তাহাতে কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আমরা তাঁহার হতভাগ্য স্বামীর জন্য দুঃখিত।

অর্থই অনর্থ। দারোগার দপ্তর। শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য তিন আনা।
ঠগী কাহিনী। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য দেড় টাকা।
রোমহর্ষণ গল্প অনেকের ভালো লাগে, তাঁহাদের জন্য উপরিলিখিত গ্রন্থদ্বয় রচিত হইয়াছে।

সাধনা
অগ্রহায়ণ ১৩০১

উপনিষদঃ। অর্থাৎ ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য এই ছয়খানি উপনিষৎ। শ্রীসীতানাথ দত্ত কৃত 'শঙ্কর-কৃপা' নাম্নী টীকা ও 'প্রবোধক' নামক বঙ্গানুবাদ সহিত। সুপ্রসিদ্ধ বেদাচার্য শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী কর্তৃক সংশোধিত। মূল্য এক টাকা।
আমরা সম্পাদকোচিত সর্বজ্ঞতার ভান করিতে পারি না। আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, গ্রন্থকার-কৃত উপনিষদের টীকা ও বঙ্গানুবাদে কোনোপ্রকার ভ্রম অথবা ত্রুটি আছে কি না তাহা নির্ণয় করিতে আমরা সম্পূর্ণ অশক্ত। তবে যখন সামশ্রমী মহাশয়-কর্তৃক সংশোধিত তখন আমরা বিশ্বাসপূর্বক এই টীকা এবং অনুবাদ গ্রহণ করিতে পারি। এই উপনিষৎগুলি বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া সীতানাথবাবু যে ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নাই। তাঁহার

টীকা ও অনুবাদের সাহায্যে জগতের এই প্রাচীনতম তত্ত্বজ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশলাভ করিয়া আমরা চরিতার্থ হইয়াছি।

প্রবেশ লাভ করিয়াছি এ কথা বলা ঠিক হয় না। কারণ, এই প্রাচীন উপনিষৎগুলিতে ব্রহ্মতত্ত্ব আদ্যোপান্ত সংশ্লিষ্টভাবে প্রকাশিত হয় নাই। পাঠ করিতে করিতে মনে হয়, শ্লোকগুলি যেন কঠিন তপস্যার সংঘর্ষজনিত এক-একটি তেজ-স্ফুলিঙ্গের মতো ঋষিদের হৃদয় হইতে বর্ষিত হইতেছে— যে স্ফুলিঙ্গের সংস্পর্শে পরবর্তীকালে ভারতীয় দর্শন ষড়্‌শিখা হুতাশনের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

এই-সকল উপনিষৎ-কথিত শ্লোকগুলি সর্বত্র সুগম নহে এবং বহুকালের পরবর্তী কোনো ভাষ্যকার, ঋষিদের গূঢ় অভিপ্রায় যে সর্বত্র ভেদ করিতে সক্ষম হইয়াছেন অথবা সক্ষম হইতে পারেন এরূপ আমাদের বিশ্বাস নহে; কারণ, অনেক স্থলেই শ্লোকগুলি পড়িলে, আর কিছুই ভালো বুঝা যায় না, কেবল এইটুকু বুঝা যায়, যে, সেগুলি নিগূঢ় এবং সংক্ষিপ্ত সংকেত মাত্র। সেই সংকেতের প্রকৃত অর্থ তপোবনবাসী সাধক এবং তাঁহার শিষ্যদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল, এবং সেই ভাবার্থ ক্রমশ শিষ্যানুশিষ্যপরম্পরাক্রমে এবং কালভেদে মতের বিচিত্র পরিণতি অনুসারে বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হইবার কথা। তাঁহারা যে শব্দ যে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিতেন এখন আমরা আমাদের বর্তমান জ্ঞানের অবস্থা অনুসারে সম্ভবত তাহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। এইজন্য সর্বত্র আমরা ভাবের সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারি না। অথচ অনেকগুলি উজ্জ্বল সত্যের আভাস আমাদের হৃদয়ে জাগ্রত হইয়া উঠে। কিন্তু সেইগুলিকে যখন আপন মনে স্পষ্টীকৃত করিতে চেষ্টা করি তখনই সংশয় হয়, ইহার কতখানি বাস্তবিক সেই ঋষির কল্পিত এবং কতখানি আমার কল্পনা। একটি উদাহরণ দিলে পাঠকগণ আমার কথা বুঝিতে পারিবেন।

অথর্ববেদের প্রশ্নোপনিষদে আছে— প্রজাপতি প্রজাকাম হইয়া তপস্যা করিলেন এবং তপস্যা করিয়া রয়ি (অর্থাৎ আদিভূত) এবং প্রাণ (অর্থাৎ চৈতন্য) এই মিথুন উৎপাদন করিলেন। আদিত্যই প্রাণ, চন্দ্রমাই রয়ি; মূর্ত ও অমূর্ত (সংশ্লিষ্ট) যাহা-কিছু এই সমস্তই রয়ি; (তন্মধ্যগত) মূর্ত বস্তু তো রয়ি বটেই।

বন্ধনী চিহ্নবর্তী শব্দগুলি মূলের নহে। অতএব, পিপ্পলাদ ঋষি রয়ি এবং প্রাণ শব্দ ঠিক কী অর্থে ব্যবহার করিতেন তাহা বলা কঠিন। ভাষ্যকার-কৃত অর্থের অনুবর্তী হইয়াও যে, সর্বত্র সমস্তই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে তাহাও বলিতে পারি না; কারণ, আদিত্যকেই বা কেন চৈতন্য এবং চন্দ্রমাকেই বা কেন আদিভূত বলা হইল তাহার কোনো তাৎপর্য দেখা যায় না। অথচ আভাসের মতো এই তত্ত্ব মনে উদয় হয়, যে— দুই বিরোধী শক্তির মিলনে এই সৃষ্টিপ্রবাহ চলিয়া আসিতেছে, ভালো ও মন্দ, চেতনা ও জড়তা, জীবন ও মৃত্যু, আলোক ও অন্ধকার— রয়ি এবং প্রাণশব্দে স্পষ্ট ভাবে হৌক অস্পষ্টভাবে হৌক এই মিথুন নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই প্রশ্নোপনিষদের স্থানান্তরে রহিয়াছে শুক্লপক্ষ প্রাণ এবং কৃষ্ণপক্ষ রয়ি; দিন প্রাণ এবং রাত্রি রয়ি। কর্ণ দ্বারা আমরা রয়িকে প্রাপ্ত হই, ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা ও জ্ঞান দ্বারা আমরা প্রাণকে প্রাপ্ত হই।

যাহাই হৌক, এই শ্লোকগুলি হইতে আমাদের মনে যে তত্ত্বটি প্রতিভাত হইতেছে তাহা এই উপনিষদের অভিপ্রেত কি না আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না— আর কাহারও মনে অন্য কোনোরূপ অর্থেরও উদয় হইতে পারে।

অর্থ স্পষ্ট হৌক বা না হৌক এই উপনিষৎগুলির মধ্যে যে একটি সরল উদারতা, গভীরতা, প্রশান্তি এবং আনন্দ আছে তাহা বাংলা অনুবাদেও প্রকাশ পাইতেছে। ইহার সর্বত্রই অনির্বচনীয়কে বচনে প্রকাশ করিবার যে অসীম ব্যাকুলতা বিদ্যমান আছে তাহা এত সুগভীর যে, তাহাতে চাঞ্চল্য নাই। ইহাতে ঋষিরা জ্ঞানের এবং বাক্যের পরপারে ব্রহ্মকে যতদূর পর্যন্ত অনুসরণ করিয়াছেন এমন আর কোনো ধর্মে করে নাই, অথচ তাঁহাকে যত নিকটতম অন্তরতম আত্মীয়তম

করিয়া অনুভব করিয়াছেন এমন দৃষ্টান্তও বোধ করি অন্যত্র দুর্লভ। তাঁহারা একদিকে জ্ঞানের উচ্চতা অন্য দিকে আনন্দের গভীরতা উভয়ই সমানভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। আমাদের বাংলাদেশে শাক্ত বৈষ্ণবেরা ঈশ্বরের নৈকট্য অনুভবকালে তাঁহার দূরত্বকে একেবারে লোপ করিয়া দেয়, ভক্তিকে অন্ধভাবে উন্মুক্ত করিয়া দিবার কালে জ্ঞানকে অবমানিত করে; কিন্তু উপনিষদে এই উভয়ের অটল সামঞ্জস্য থাকাতে তাহার মহাসমুদ্রের ন্যায় এমন অগাধ গাম্ভীর্য। এইজন্যই উপনিষদে সাধকের আত্মা কলনাদিনী কূলপ্লাবিনী প্রমত্ততায় উচ্ছ্বসিত না হইয়া নির্বাক্ আত্মসমাহিত ভূমানন্দে প্রসারিত হইয়া গিয়াছে।*

সাধনা
পৌষ ১৩০১

হাসি ও খেলা। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত। মূল্য দশ আনা।

বইখানি ছোটো ছেলেদের পড়িবার জন্য। বাংলা ভাষায় এরূপ গ্রন্থের বিশেষ অভাব ছিল। ছেলেদের জন্য যে-সকল বই আছে তাহা স্কুলে পড়িবার বই; তাহাতে স্নেহের বা সৌন্দর্যের লেশমাত্র নাই; তাহাতে যে পরিমাণে উৎপীড়ন হয় সে পরিমাণে উপকার হয় না।

ছেলেরা অত্যন্ত মূঢ় অবস্থাতেও কত আনন্দের সহিত ভাষা-শিক্ষা এবং কিরূপ কৌতূহলের সহিত বস্তুজ্ঞান লাভ করিতে থাকে তাহা কাহারও অগোচর নাই। প্রকৃতি যে নিয়মে যে প্রণালীতে ছেলেদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকেন, মানুষ তাহার অনুসরণ না করিয়া নিজের পদ্ধতি প্রচার করিতে গিয়া শিশুদিগের শিক্ষা অনর্থক দুরূহ করিয়া তুলিয়াছে এবং তাহাদের আনন্দময় সুকুমার জীবনে একটা উৎকট উপদ্রব আনয়ন করিয়াছে।

শিক্ষা দিতে হইলে শিশুদের হৃদয় আকর্ষণ করা বিশেষ আবশ্যক; তাহাদের স্বাভাবিক কল্পনাশক্তি এবং কৌতূহল প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিয়া তাহাদিগকে জ্ঞানের পথে অগ্রসর করিতে হইবে; বর্ণমালা প্রভৃতি চিহ্নগুলিকে ছবির দ্বারা সজীব এবং শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে ভালো ভালো চিত্রের দ্বারা মনের মধ্যে মুদ্রিত করিয়া দিতে হইবে। অর্থাৎ, একসঙ্গে তাহাদের ইন্দ্রিয়বোধ কল্পনাশক্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন সাধন করিতে হইবে। সেইরূপ করা হয় না বলিয়াই অধ্যাপনার জন্য শিশুদিগকে বিভীষিকার হস্তে সমর্পণ করিতে হয়। বালকদিগের অনেক বালাই আছে; সবচেয়ে প্রধান বালাই পাঠশালা।

পাঠশালার শুষ্ক শিক্ষাকে সরস করিয়া তুলিবার প্রত্যাশা রাখি না। কারণ, অধিকাংশ লোকের ধারণা, যে, ঔষধ যতই কুস্বাদু, চিকিৎসার পক্ষে তাহা ততই উপযোগী, এবং কঠোর ও অপ্রিয়

---

*এই স্থলে প্রসঙ্গক্রমে আমরা কেনোপনিষৎ হইতে একটি শ্লোক উদ্‌ধৃত করিতে ইচ্ছা করি।

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি।

ইহার তাৎপর্য এই— মন কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া পতিত হয়, অর্থাৎ নিজ বিষয়ের উপরে উপনীত হয়। প্রাণ কাহার দ্বারা প্রৈতিপ্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ নিজ বিষয়ের অভিমুখে গতিলাভ করিয়াছে। কাহার দ্বারা প্রেরিত এই বাক্য লোকে উচ্চারণ করে এবং কোন্ দেবতাই বা চক্ষু শ্রোত্রকে স্ববিষয়ে যোজনা করেন।

"প্রৈতি" শব্দটির প্রতি আমরা পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। বাংলা ভাষায় এই শব্দটির অভাব আছে। যেখানে বেগপ্রাপ্তি বুঝাইতে ইংরাজিতে impulse শব্দের ব্যবহার হয় আমাদের বিবেচনায় বাংলায় সেই স্থলে "প্রৈতি" শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে।

শিক্ষাই শিশুদের অজ্ঞানবিনাশের পক্ষে সবিশেষ ফলপ্রদ। অতএব, বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক-প্রণয়নের ভার বিদ্যালয়ের নিষ্ঠুর কর্তৃপক্ষদের হস্তে রাখিয়া আপাতত ছেলেদের ইচ্ছাপূর্বক ঘরে পড়িবার বই রচনা করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে; নতুবা বাঙালির ছেলের মানসিক আনন্দ ও স্বাস্থ্যানুশীলনের এবং বুদ্ধিবৃত্তির সহজ পুষ্টিসাধনের অন্য উপায় দেখা যায় না।

হাসি ও খেলা বইখানি সংকলন করিয়া যোগীন্দ্রবাবু শিশুদিগের এবং শিশুদিগের পিতামাতার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বইখানি যেমন ভালো বাঁধানো, তেমনি ভালো করিয়া ছাপানো এবং ছবিতে পরিপূর্ণ। নিঃসন্দেহ গ্রন্থখানি অনেক ব্যয়সাধ্য হইয়াছে। আশা করি, যাহাতে প্রকাশককে ক্ষতিগ্রস্ত না হইতে হয় সেজন্য বাঙালি অভিভাবক মাত্রেই দৃষ্টি রাখিবেন।

এই গ্রন্থে যে রচনাগুলি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা শিশুপাঠ্য। স্থানে স্থানে ভাষা ও ভাবের কথঞ্চিৎ অসংগতিদোষ ঘটিয়াছে। কিন্তু সেগুলি সত্ত্বেও যে, এই বইখানি শিশুদের মনোরঞ্জন করিতে পারিবে আমরা তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। বালকদের হস্তে পড়িয়া অল্পকালের মধ্যে একখানি হাসি ও খেলার যেরূপ দুরবস্থা হইয়াছে তাহা দর্শন করিলে গ্রন্থপ্রণয়নকর্তা এককালে শোক ও আনন্দ অনুভব করিতেন। এরূপ গ্রন্থের পক্ষে, শিশুহস্তের অবিরল ব্যবহারে মলিন ও বিবর্ণ মলাট এবং বিচ্ছিন্নপ্রায় পত্রই সর্বাপেক্ষা অনুকূল সমালোচনা।

সাধন সপ্তকম্। মূল্য চারি আনা।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে জয়দেবের দশাবতার স্তোত্র, শঙ্করাচার্যের যতিপঞ্চক, সাধনপঞ্চক, অপরাধভঞ্জন স্তোত্র, ও মোহমুদ্গর, কুলশেখরের মুকুন্দমালা, এবং বিশ্বরূপস্তোত্র বাংলা পদ্যানুবাদসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে।

সংস্কৃত ভাষায় এমন অনেক শ্লোক পাওয়া যায়, যাহা কেবলমাত্র উপদেশ অথবা নীতিকথা, যাহাকে কাব্যশ্রেণীতে ভুক্ত করা যাইতে পারে না। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার সংহতিগুণে এবং সংস্কৃত শ্লোকের ধ্বনিমাধুর্যে তাহা পাঠকের চিত্তে সহজে মুদ্রিত হইয়া যায় এবং সেই শব্দ ও ছন্দের ঔদার্য শুষ্ক বিষয়ের প্রতিও সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য অর্পণ করিয়া থাকে। কিন্তু বাংলায় তাহাকে ব্যাখ্যা করিয়া অনুবাদ করিতে গেলে তাহা নিতান্ত নির্জীব হইয়া পড়ে। বাংলা উচ্চারণে যুক্ত অক্ষরের ঝংকার, হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরের তরঙ্গলীলা, এবং বাংলা পদে ঘনসন্নিবিষ্ট বিশেষণবিন্যাসের প্রথা না থাকাতে সংস্কৃত কাব্য বাংলা অনুবাদে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর শুনিতে হয়। যতিপঞ্চকের নিম্নলিখিত শ্লোকে বিশেষ কোনো কাব্যরস আছে তাহা বলিতে পারি না—

পঞ্চাক্ষরং পাবনমুচ্চরন্তঃ
পতিং পশূনাং হৃদি ভাবয়ন্তঃ
ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ।

তথাপি ইহাতে যে শব্দযোজনার নিবিড়তা ও ছন্দের উত্থানপতন আছে তাহাতে আমাদের চিত্ত গুণী হস্তের মৃদঙ্গের ন্যায় প্রহৃত হইতে থাকে; কিন্তু ইহার বাংলা পদ্য অনুবাদে তাহার বিপরীত ফল হয়—

পঞ্চাক্ষর যুক্ত মন্ত্র পরম পাবন,
একান্তেতে সদা যারা করে উচ্চারণ;
নিখিল জীবের পতি, পশুপতি দেবে,
হৃদয়েতে ভক্তিভরে সদা যারা ভাবে;
ভিক্ষাশী হইয়া, সুখে সর্বত্র চারণ,
কৌপীনধারীরা হেন, বটে ভাগ্যবান্।

এক তো, আমরা পাঠকদিগকে ভিক্ষাশী ও কৌপীনধারী হইতে উপদেশ দিই না, দ্বিতীয়ত, বাংলার নিস্তেজ পয়ার ছন্দে সে উপদেশ শুনিতেও শ্রুতিমধুর হয় না। একস্থানে দেখা গেল "পাণিদ্বয়ং ভোক্তুমমন্ত্রয়ন্তঃ" পদটিকে অনুবাদে "আহারের পাত্ররূপ শুধু বাহুদ্বয়" করা হইয়াছে; বলা বাহুল্য, এ স্থলে পাণিদ্বয়ের স্থলে বাহুদ্বয় শব্দের প্রয়োগ সমুচিত হয় নাই।

নীতিশতক বা সরল পদ্যানুবাদসহ চাণক্যশ্লোক। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় -সম্পাদিত। মূল্য দুই আনা মাত্র।

চাণক্যশ্লোকের নীতিগুলি যে নূতন তাহা নহে কিন্তু তাহার প্রয়োগনৈপুণ্য ও সংক্ষিপ্ততাগুণে তাহা আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। যে-সকল উপদেশ জীবনযাত্রায় সর্বদা ব্যবহার্য তাহাকে সরল লঘু এবং সুডৌল করিয়া গড়িতে হয়; তাহাকে মুখে মুখে বহনযোগ্য এবং হাতে হাতে চালনযোগ্য করা চাই; চাণক্যশ্লোকের সেই গুণটি আছে, এইজন্য তাহা আমাদের সংসারের কাজে পুরাতন মুদ্রার মতো চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু আমরা পূর্বেই ব্যক্ত করিয়াছি বাংলা ছন্দে সংক্ষিপ্ততা ও ত্বরিতগতি না থাকাতে সংস্কৃতের জোড়া কথাকে ভাঙিয়া এবং ছোটো কথাকে বড়ো করিয়া গুরু কথার গুরুত্ব এবং লঘু কথার লঘুত্ব উভয়ই নষ্ট করা হয়। মহতের আশ্রয়ে থাকিলে সকল সময়ে যদি বা কোনো প্রত্যক্ষ উপকার না পাওয়া যায় তথাপি তাহার অপ্রত্যক্ষ সুফল আছে এই কথাটিকে চাণক্য সংক্ষেপে সুনিপুণভাবে বলিয়াছেন।—

সেবিতব্যো মহাবৃক্ষঃ ফলচ্ছায়াসমন্বিতঃ।
যদি দৈবাৎ ফলং নাস্তি ছায়া কেন নিবার্যতে॥

মনে রাখিবার এবং আবশ্যকমতো প্রয়োগ করিবার পক্ষে এ শ্লোকটি কেমন উপযোগী! ইহার বাংলা অনুবাদে মূলের উজ্জ্বলতা এবং লাঘবতা হ্রাস হইয়া এরূপ শ্লোকের কার্যকারিতা নষ্ট করিয়াছে।

ফল আর ছায়া যাতে আছে এ উভয়,
এরূপ তরুর তলে লইবে আশ্রয়।
দৈববশে ফল যদি নাহি মিলে তায়,
সুশীতল ছায়া তার বলো কে ঘুচায়।

দুটিমাত্র ছত্রে ইহার অনুবাদ হওয়া উচিত ছিল।

সাধনা
মাঘ ১৩০১

দেওয়ান গোবিন্দরাম বা দুর্গোৎসব। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাধু -কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

গ্রন্থখানি একটি রীতিমতো উপন্যাস। লেখক আয়োজনের ত্রুটি করেন নাই। ইহাতে ভীষণ অন্ধকার রাত্রি, ঘন অরণ্য, দস্যু পাতালপুরী, ছদ্মবেশিনী সাধ্বী স্ত্রী, কপটাচারী পাষণ্ড এবং সর্ববিপৎলঙ্ঘনকারী ভাগ্যবান সাহসী সাধু পুরুষ প্রভৃতি পাঠক ভুলাইবার বিচিত্র উপকরণ আছে। গ্রন্থখানির উদ্দেশ্যও সাধু, ইহাতে অনেক সদুপদেশ আছে এবং গ্রন্থের পরিণামে পাপের পতন ও পুণ্যের জয় প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এ কথা একবারও ভুলিতে পারি নাই, যে, গ্রন্থকার পাঠককে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছেন। দেওয়ানজি হইতে উজ্জ্বলা পর্যন্ত কেহই সত্যকার সজীব মানুষের মতো হয় নাই, তাহারা যে-সকল কথা কয় তাহার মধ্যে সর্বদাই লেখকের প্রম্প্‌টিং শুনা যায় এবং ঘটনাগুলির মধ্যে যদিও সম্ভবতা আছে কিন্তু অবশ্যসম্ভাব্যতা নাই। এইখানে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া রাখা আবশ্যক, যে, উপন্যাসের সম্ভব অসম্ভব সম্বন্ধে আমাদের কোনোপ্রকার বাঁধা মত নাই। লেখক আমাদের বিশ্বাস জন্মাইতে পারিলেই

হইল, তা ঘটনা যতই অসম্ভব হউক। অনেক রচনায় সুসম্ভব জিনিসও নিজেকে সপ্রমাণ করিয়া উঠিতে পারে না, আবার, অনেক রচনায় অসম্ভব ব্যাপারও চিরসত্যরূপে স্থায়ী হইয়া যায়। 'মণ্টেক্রিস্টো'-উপন্যাস বর্ণিত ঘটনা প্রাকৃত জগতে সম্ভবপর নহে কিন্তু "ড্যুমা"র প্রতিভা তাহাকে সাহিত্যজগতে সত্য করিয়া রাখিয়াছে। কপালকুণ্ডলাকে বঙ্কিমের কল্পনা সত্য করিয়া তুলিয়াছে কিন্তু হয়তো নিকৃষ্ট লেখকের হাতে এই গ্রন্থ নিতান্ত অবিশ্বাস্য হাস্যকর হইয়া উঠিতে পারিত।

গ্রন্থখানি পড়িয়া বোধ হইল, যে, যদিচ ঘটনা সংস্থান এবং চরিত্র রচনায় গ্রন্থকার কৃতকার্য হইতে পারেন নাই তথাপি গ্রন্থ-বর্ণিত কালের একটা সাময়িক অবস্থা কতক পরিমাণে মনের মধ্যে জাগ্রত করিতে পারিয়াছেন। তখনকার সেই খাল বিল মাঠের ভিতরকার ডাকাতি এবং দস্যুবৃত্তিতে সম্ভ্রান্ত লোকদিগের গোপন সহায়তা প্রভৃতি অনেক বিষয় বেশ সত্যভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। মনে হয় লেখক এ-সকল বিষয়ে অনেক বিবরণ ভালো করিয়া জানেন; কোমর বাঁধিয়া আগাগোড়া বানাইতে বসেন নাই।

মনোরমা। শ্রীকুমারকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত।

গ্রন্থখানি দুই ফর্মায় সমাপ্ত একটি ক্ষুদ্র উপন্যাস। আরম্ভ হইয়াছে "রাত্রি দ্বি-প্রহর। চারিদিক নিস্তব্ধ। প্রকৃতিদেবী অন্ধকার সাজে সজ্জিত হইয়া গম্ভীরভাবে অধিষ্ঠিতা।" শেষ হইয়াছে "হায়! সামান্য ভুলের জন্য কী না সংঘটিত হইত পারে।" ইহা হইতে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র, ভুলটিও সামান্য কিন্তু ব্যাপারটি খুব গুরুতর।

কৌতুকপ্রিয় সমালোচক হইলে বলিতেন, "গ্রন্থখানির মধ্যে শেক্‌সপিয়ার হইতে উদ্‌ধৃত কোটেশনগুলি অতিশয় সুপাঠ্য হইয়াছে" এবং অবশিষ্ট অংশসম্বন্ধে নীরব থাকিতেন। কিন্তু গ্রন্থ সমালোচনায় সকল সময়ে কৌতুক করিবার প্রবৃত্তি হয় না। কারণ, এই কঠিন পৃথিবীতে যখন আর কিছু দিবার সাধ্য থাকে না তখন দুটো মিষ্ট কথা দিবার ক্ষমতা এবং অধিকার সকলেরই আছে, নাই কেবল সমালোচকের। একে তো যে গ্রন্থখানি সমালোচনা করিতে বসে তাহার মূল্য তাহাকে দিতে হয় না, তাহার উপরে সুলভ প্রিয়বাক্য দান করিবার অধিকার তাহাও বিধাতা তাহাকে সম্পূর্ণভাবে দেন নাই। এইজন্য, যখন কোনো গ্রন্থের প্রতি প্রশংসাবাদ প্রয়োগ করিতে পারি না তখন আমরা আন্তরিক ব্যথা অনুভব করি। নিজের রচনাকে প্রশংসাযোগ্য মনে করা লেখকমাত্রেরই পক্ষে এত সাধারণ ও স্বাভাবিক, যে, সেই ভ্রমের প্রতি কঠোরতা প্রকাশ করিতে কোনো লেখকের প্রবৃত্তি হওয়া উচিত হয় না। কিন্তু গ্রন্থকার যথার্থই বলিয়াছেন— হায়! সামান্য ভ্রমের জন্য কী না সংঘটিত হয়! অর্থব্যয়ও হয়, মনস্তাপও ঘটে।

সাধনা

ফাল্গুন ১৩০১

নূরজাহান। শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ দ্বারা প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

গ্রন্থখানি নাটক। এই নাটকের কি গদ্য, কি পদ্য, কি ঘটনা সংস্থান, কি চরিত্রচিত্র, কি আরম্ভ, কি পরিণাম সকলই অদ্ভুত হইয়াছে। ভাষাটা যেন বাঁকা বাঁকা, নিতান্তই বিদেশীয় বাংলার মতো এবং সমস্ত গ্রন্থখানি যেন পাঠকদের প্রতি পরিহাস বলিয়া মনে হয়। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই, যে, স্থানে স্থানে ইহাতে নাট্যকলা এবং কবিত্বের আভাস নাই যে তাহাও নহে কিন্তু পরক্ষণেই তাহা প্রলাপে পরিণত হইয়াছে। তাই এক-এক সময়ে মনে হয় লেখকের ক্ষমতা আছে কিন্তু সে ক্ষমতা যেন প্রকৃতিস্থ অবস্থায় নাই।

শুভ পরিণয়ে।

বন্ধুর শুভ পরিণয়ে কোনো প্রচ্ছন্ননামা লেখক এই ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। ইহা

পাঠকসাধারণের জন্য প্রকাশিত হয় নাই, এই কারণে আমাদের পত্রিকায় এ গ্রন্থের সমালোচনা অনাবশ্যক বোধ করি।

সাধনা
চৈত্র ১৩০১

রঘুবংশ। দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীনবীনচন্দ্র দাস এম.এ. কর্তৃক অনুবাদিত। মূল্য এক টাকা।
বাংলা ভাষায় সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থের অনুবাদ করা নিরতিশয় কঠিন কাজ; কারণ, সংস্কৃত কবিতার শ্লোকগুলি ধাতুময় কারুকার্যের ন্যায় অত্যন্ত সংহতভাবে গঠিত— বাংলা অনুবাদে তাহা বিশ্লিষ্ট এবং বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। কিন্তু নবীনবাবুর রঘুবংশ অনুবাদখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। মূল গ্রন্থখানি পড়া না থাকিলেও এই অনুবাদের মাধুর্যে পাঠকদের হৃদয় আকৃষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। অনুবাদক সংস্কৃত কাব্যের লাবণ্য বাংলা ভাষায় অনেকটা পরিমাণে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন ইহাতে তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু পঞ্চদশ সর্গে তিনি যে দ্বাদশাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা আমাদের কর্ণে ভালো ঠেকিল না। বাংলার পয়ার ছন্দে প্রত্যেক ছত্রে যথেষ্ট বিশ্রাম আছে— তাহা চতুর্দশ অক্ষরের হইলেও তাহাতে অন্যূন ষোলোটি মাত্রা আছে— এইজন্য পয়ার ছন্দে যুক্ত অক্ষর ব্যবহার করিবার স্থান পাওয়া যায়। কিন্তু দ্বাদশাক্ষর ছন্দে যথেষ্ট বিশ্রাম না থাকাতে যুক্ত অক্ষর ব্যবহার করিলে ছন্দের সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া যায়; যেন কুঠির পানসিতে মহাজনী নৌকার মাল তোলা হয়। দ্বাদশাক্ষর ছন্দে ধীর গমনের গাম্ভীর্য না থাকাতে তাহাতে সংস্কৃত কাব্যসুলভ ঔদার্য নষ্ট করে। আমরা সমালোচ্য অনুবাদ হইতে একটি পয়ারের এবং একটি দ্বাদশাক্ষরের শ্লোক পরে পরে উদ্ধৃত করিলাম :

প্রসবান্তে কৃশা এবে কোশল-নন্দিনী,
শয্যায় শোভিছে পাশে শয়ান কুমার—
শরদে ক্ষীণাঙ্গী যথা সুরতরঙ্গিণী
শোভিছে পূজার পদ্ম পুলিনে যাঁহার।

সে প্রভামণ্ডলী মাঝে সমুজ্জ্বলা
ফণীন্দ্রের ফণা-উৎক্ষিপ্ত আসনে
রাজিলা বসুধা স্ফুরিত কিরণে,
কটিতটে যাঁর সমুদ্র-মেখলা।

শেষোদ্‌ধৃত শ্লোকটির প্রত্যেক যুক্ত অক্ষরে রসনা বাধাপ্রাপ্ত হয় কিন্তু পূর্বোদ্‌ধৃত পয়ারে প্রত্যেক যুক্ত অক্ষরে ছন্দের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াছে। এমন-কি, দ্বিতীয় ছত্রে আর-একটি যুক্ত অক্ষরের জন্য কর্ণের আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যায়।

ফুলের তোড়া। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য এক আনা।
এই ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থখানির মধ্যে "ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি কোকিল" কবিতাটি আমাদের ভালো লাগিয়াছে।

নীহার-বিন্দু। শ্রীনিতাইসুন্দর সরকার প্রণীত। মূল্য চারি আনা।
গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিতেছেন— 'পাখি গান গাহিয়া যায়— সুর, মিষ্ট কি কড়া— মানুষে শুনিয়া, ভালো কি মন্দ বলিবে— সে তার কোনো ধার ধারে না; সে শুধু, আপন মনে আপনিই,

নীলাকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া, গাহিয়া যায়।' অতএব ভরসা করি আমরা এই গ্রন্থলিখিত গান ক'টি ভালো না বলিলেও গ্রন্থকারের নীলাকাশ প্রতিধ্বনিত করিবার কোনো ব্যাঘাত হইবে না।

সাধনা
বৈশাখ ১৩০২

নির্ঝরিণী। শ্রীমতী মৃণালিনী প্রণীত। মূল্য এক টাকা।

মহিলা-প্রণীত গ্রন্থ সর্বতোভাবে নিরপেক্ষচিত্তে সমালোচনা করা কঠিন। বিশেষত বর্তমান সমালোচ্য গ্রন্থের লেখিকা নিতান্ত অল্পবয়স্কা এবং নববৈধব্যবেদনায় ব্যথিতা। গ্রন্থকর্ত্রীও ভূমিকায় পাঠকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহার গ্রন্থে "কতখানি কবিত্ব আছে, কতখানি উচ্চতা আছে, কতখানি মাধুরী ও সৌন্দর্য আছে তাহার বিচার না করিয়া, বালিকার হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই পুস্তক প্রকাশিত করা সার্থক হইবে।"

এ কথার তাৎপর্য এই যে, নবীনা লেখিকা তাঁহার কবিতাগুলিকে কেবল কবিত্বের হিসাবে সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছেন না, তাঁহার তরুণ হৃদয়ের সুখ দুঃখশোকের জন্য সমবেদনা প্রত্যাশা করিতেছেন। ইহাতে গ্রন্থকর্ত্রীর অল্পবয়স এবং সংসারতত্ত্বে অনভিজ্ঞতা সূচিত হইতেছে। ব্যক্তিগত দুঃখসুখের প্রকাশ যতক্ষণ না সর্বজনীন ও সর্বকালীন সৌন্দর্য লাভ করে ততক্ষণ সাহিত্যে তাহা কাহারও নিকট সমবেদনা প্রাপ্ত হয় না। এইজন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই সাহিত্যে প্রধানত আত্মহৃদয়ের পরিচয় দিতে সংকোচ বোধ করেন। টেনিসনের 'ইন্ মেমোরিয়ম্' নামক কাব্য কেন সর্বসাধারণের নিকট এত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে? তাহা টেনিসনের বন্ধুবিয়োগশোকের প্রকাশ বলিয়া নহে, তাহাতে মানবজাতির বিচ্ছেদশোকমাত্রই বিচিত্র রাগিণীতে আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছে বলিয়াই তাহা সর্বসমক্ষে প্রকাশযোগ্য হইয়াছে— নচেৎ ব্যক্তিগত শোকের প্রকাশ্য বিলাপ টেনিসনের পক্ষে লজ্জার কারণ হইত।

অতএব, এই গ্রন্থের যে যে অংশে মুখ্যরূপে বালিকার আত্মশোকের কথা আছে তাহা আমরা সসংকোচে পরিহার করিতে ইচ্ছা করি। যথার্থ পতিশোকের উচ্ছ্বাসে যখন বালিকা বিধবা বিলাপ করিতে থাকে— তখন সেই বিলাপকে সমালোচনার যন্ত্রাদির দ্বারা বিশ্লেষণ করিতে বসিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কেবল সাধারণভাবে এই কথা বলিতে পারি, যে, প্রথম জোয়ারের জলের ন্যায় প্রথম শোকের উচ্ছ্বাসে কাব্যকলার পরমাবশ্যক সংযম অনেকটা ভাসিয়া যায়, সর্বত্রই যেন বাহুল্য দৃষ্ট হইতে থাকে। শোক যখন জীবনের মধ্যে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া একটি উদার গম্ভীর বৈরাগ্যের আকার ধারণ করে তখনি তাহা কাব্যে সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হইবার অবসর লাভ করে।

এই গ্রন্থের মধ্যে গ্রন্থকর্ত্রী যেখানেই ব্যক্তিগত শোকের অন্ধ কারাগার হইতে বাহিরের সৌন্দর্য-রাজ্যে পদার্পণ করিয়াছেন, সেইখানেই তাঁহার কবিত্বের যথার্থ নিদর্শন পাওয়া যায়। "অনন্ত কালের পরিচয়" এবং "বিশ্বপ্রেম" নামক কবিতায় ভাষা ও ভাবের যে নৈপুণ্য ও গভীরতা এবং অকৃত্রিম সত্যতা, দেখিতে পাওয়া যায় তাহা কোনো বালিকার রচনায় কদাচ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না; এবং তাহা বিশেষরূপে প্রশংসনীয়।

সাধনা
জ্যৈষ্ঠ ১৩০২

বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম। শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত। মূল্য চারি আনা।

লেখক এই গ্রন্থে স্বহস্তে একটি উচ্চ মঞ্চ নির্মাণ করিয়া তাহার উপরে চড়িয়া বসিয়াছেন, এবং বঙ্কিমকেও সেইসঙ্গে বঙ্গসাহিত্যের আর কতকগুলি পরীক্ষোত্তীর্ণ ভালো ছেলেকে হাস্যমুখে

ছোটো বড়ো পারিতোষিক বিতরণ করিয়া লেখকসাধারণকে পরম আপ্যায়িত এবং উৎসাহিত করিয়াছেন। লেখক স্পষ্টই বলিয়াছেন তিনি কাহাকেও খাতির করিয়া কথা কহেন নাই। ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা খুব মিষ্ট বটে, কিন্তু তাহাতেও যেন প্রাণের অভাব দেখিতে পাই। ... স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে যখন আমাদের এই মত, তখন অন্য (?) পরে কা কথা।"

শুনিয়া ভয়ে গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে এবং এত বড়ো দোর্দণ্ড-প্রতাপের নিকট সহজেই অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। তথাপি কর্তব্যবোধে দুই-একটি কথা বলা আবশ্যক বোধ করি। বর্তমান গ্রন্থকার পাঠকদিগকে নিতান্ত যেন ঘরের ছেলে অথবা স্কুলের ছাত্রের মতো দেখিয়া থাকেন। এক স্থলে শুদ্ধমাত্র বঙ্কিমের "বন্দে মাতরং" গানটি তুলিয়া দিয়া লেখক প্রবীণ হেড্‌মাস্টারের মতো লিখিতেছেন "বঙ্কিমের কবিত্ব বুঝিলে?" তাহার পরেই প্রতাপ ও শৈবলিনীর সন্তরণ দৃশ্যটি উদ্‌ধৃত করিয়া দিয়া লেখক নবীন রসিক পুরুষের মতো বলিতেছেন "কবিত্ব কাহাকে বলে দেখিলে? আ মরি মরি! কী সুর রে!" পরপৃষ্ঠায় পুনশ্চ অতি পরিচিত কুটুম্বের মতো পাঠকদের গায়ে পড়িয়া বলিতেছেন "আরও শুনিবে? তবে শুন।" এক স্থলে দামোদরবাবুর রচিত 'কপালকুণ্ডলার অনুবৃত্তি' গ্রন্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া লেখক নথ-পরিহিতা প্রৌঢ়ার মতো বলিতেছেন— "সে, মৃন্ময়ী আবার পুনর্জীবিতা হইয়া সুখে ঘরকন্না করিতে লাগিল। পোড়াকপাল আর কি!" ভাষার এই-সকল অশিষ্ট ভঙ্গিমা ভদ্র সাহিত্য হইতে নির্বাসনযোগ্য।

গ্রন্থকার, বঙ্কিম-রচিত উপন্যাসের পাত্রগুলির মধ্যে কে কতটা পরিমাণে হিন্দুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাই অতি সূক্ষ্মরূপে ওজন করিয়া তাহাদিগকে নিন্দা ও প্রশংসা বণ্টন করিয়া দিয়াছেন। এমন-কি, সেই ওজন অনুসারে 'মডেল ভগিনী'কেও 'চন্দ্রশেখরে'র সহিত তুলনা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের পরম দুর্ভাগ্য এই যে, এ কথা আমাদের সমালোচকদিগকে সর্বদাই স্মরণ করাইয়া দিতে হয় যে, সাহিত্য-সমালোচনা-কালে মনুসংহিতা আদর্শ নহে, মানবসংহিতাই আদর্শ।

সাধনা

আষাঢ় ১৩০২

কবি বিদ্যাপতি ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবিবৃন্দের জীবনী। শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য এম্-এ, বি-এল্ প্রণীত। মূল্য বারো আনা।

এই গ্রন্থে প্রধানত বিদ্যাপতির এবং সংক্ষেপে অন্যান্য অনেক বৈষ্ণব কবির জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। এ পর্যন্ত বিদ্যাপতির জীবনী সম্বন্ধে যতগুলি আলোচনা বাহির হইয়াছে গ্রন্থকার তাহার সকলগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন এবং নানা স্থান হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। বক্ষ্যমাণ বিষয় সম্বন্ধে আমাদের নিজের ভালোরূপ অভিজ্ঞতা নাই কিন্তু লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইতিহাসজ্ঞ ত্রৈলোক্যবাবু এই গ্রন্থে যেরূপ সতর্কতা ও ভূয়োদর্শন সহকারে আপন মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহাতে সাহসপূর্বক তাঁহার উপর আমরা সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারি। গ্রন্থকার ভিন্ন ভিন্ন কবির জীবনী স্বতন্ত্র ভাগ না করিয়া দেওয়াতে ইচ্ছামতো বিষয় খুঁজিয়া পাওয়া দুরূহ হইয়াছে; গ্রন্থে একখানি সূচিপত্র থাকার বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

প্রসঙ্গমালা। মূল্য চারি আনা। শ্রীহরনাথ বসু প্রণীত।

মনোহর পাঠ। মূল্য ছয় আনা। শ্রীহরনাথ বসু প্রণীত।

এই শিশুপাঠ্য গ্রন্থ দুটি নীতিপ্রসঙ্গ, প্রাণীপ্রসঙ্গ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে বিভক্ত। বিষয়গুলি সরস করিয়া লেখাতে এই দুইখানি পুস্তক অল্পবয়স্ক ছাত্রদের মনোরম হইয়াছে সন্দেহ নাই। গল্পগুলির অধিকাংশই আমাদের দেশীয় গল্প হইলে ভালো হইত। প্রসঙ্গমালায় "স্পষ্টবাদিতা" নামক গল্পে

যে একটু কৌতুক-কৌশল আছে তাহা বালকবালিকাদের বোধগম্য হইবে না। গ্রন্থ দুইখানি বিদ্যালয়ে প্রচলিত হইবার উপযোগী হইয়াছে কেবল আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে ভূরি পরিমাণ ছাপার ভুল সংশোধিত হইবে।

ন্যায় দর্শন। গৌতমসূত্র, নূতন টীকা, বঙ্গভাষায় বিস্তৃত ব্যাখ্যা।[১]
এতৎশীর্ষক পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া আমরা যার পর নাই আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়াছি। কেননা, এ যাবৎ বাংলা ভাষায় গৌতমের ন্যায় অনুবাদিত হয় নাই এবং উহার নূতন টীকাও এ পর্যন্ত কেহ করেন নাই। ভরসা করি, এই পুস্তক প্রচারিত হইলে সাহিত্য সংসারের বিশেষ উপকার সাধিত হইবে।

অনেক বঙ্গীয় পাঠক (যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন নহেন) গৌতমের ন্যায় কিরূপ তাহা জানিবার জন্য ইচ্ছুক আছেন, এই পুস্তকের দ্বারা তাঁহাদের সে ইচ্ছা বহু পরিমাণে পূর্ণ হওয়া সুসম্ভব।

গৌতমের সূত্রনিচয় আমাদের সমালোচ্য নহে। নূতন টীকা ও তাহার বাংলা ভাষার ব্যাখ্যা সমালোচ্য হইলেও ন্যায় বিষয়ে অল্পাধিকার থাকায় আমরা ওই দুই অংশের যথোচিত সমালোচনা অর্থাৎ গুণদোষ বিচার করিতে অক্ষম। তবে পুস্তক পাঠে যাহা বোধগম্য হইয়াছে তাহা সাধারণ সমক্ষে ব্যক্ত করা দোষাবহ নহে বিবেচনায় ওই দুই বিষয়ে অল্প কিছু বলিলাম।

কোনো গভীর বিষয় সংক্ষেপে লিখিতে গেলে যে দোষের সম্ভাবনা থাকে সে দোষ ব্যতীত অন্য কোনো দোষ প্রাপ্ত ন্যায়দর্শনের নূতন টীকায় লক্ষিত হইল না। নূতন টীকার ভাষাটি বিশেষ সুখবোধ্য হইয়াছে। বাংলা ব্যাখ্যাও বিশেষ মনোরম ও নির্দোষ হইয়াছে। প্রাচীন টীকাকারেরা যে রীতিতে শব্দ বিন্যাস করিতেন, ন্যায়দর্শনের টীকা যেরূপ হওয়া উচিত, সেরূপ না হইলেও সাধারণত এই বলা যাইতে পারে যে, নূতন টীকাটি মন্দ হয় নাই। কেননা, কোথাও পদার্থের বৈপরীত্য ঘটনা হয় নাই। চতুরস্রা বুদ্ধির অথবা বহুদর্শনের অভাবে যে-সকল গুণের অভাব হইয়াছে, তাহার একটি এই—

টীকালেখক প্রথম সূত্রর টীকায় "প্রমাণপ্রমেয়াদীনাং ষোড়শ পদার্থানাং তত্ত্বজ্ঞানাৎ অসাধারণধর্ম্মপ্রকারেণাবধারণাৎ নিঃশ্রেয়সাবিগমঃ মোক্ষপ্রাপ্তির্ভবতীত্যর্থঃ" এই মাত্র লিখিয়াছেন। এই স্থানে অন্তত এরূপ একটা কথা লেখা উচিত ছিল যে, বস্তুতত্ত্ব আত্মতত্ত্বজ্ঞানাদেব মোক্ষঃ। কেননা, আত্মাতিরিক্ত প্রমেয়ের জ্ঞানে মোক্ষ হয় না, এ কথা বোধ হয় সকল লোকেই জানে। দেখুন উক্ত সূত্রের প্রাচীন ব্যাখ্যায় কেমন সুসমঞ্জস কথা আছে।

"যদি পুনঃ প্রমাণাদিপদার্থতত্ত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সংস্যাৎ ন মোক্ষ্যমাণা মোক্ষায় ঘটেরন্। নহি কস্যচিৎ কচিচ্চ তত্ত্বজ্ঞানং নাস্তীতি। তস্মাৎ আত্মাদ্যেব প্রমেয়ং মুমুক্ষুণা জ্ঞেয়ম ইতি।"—বার্ত্তিক।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন অতি সমঞ্জসরূপে ওই কথার সংগতার্থ প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা—

"তদিদং তত্ত্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সার্থং যথাবিদ্যং বেদিতব্যম্। ইহ তু অধ্যাত্ম বিদ্যায়াং আত্মাদি তত্ত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ অপবর্গঃ।"

বার্ত্তিককার ঐ ভাষ্যের আরও অধিক বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা—

"সর্বাসু বিদ্যাসু তত্ত্বজ্ঞানমস্তি নিঃশ্রেয়সাধিগমশ্চেতি। ত্রয্যাং তাবৎ কিং তত্ত্বজ্ঞানং কশ্চ নিঃশ্রেয়সাধিগম ইতি? তত্ত্বজ্ঞানং তাবৎ অগ্নিহোত্রাদিসাধনা নাঃ সাধ্যত্বাদিপরিজ্ঞানঃ অনুপহতত্বাদিপরিজ্ঞানঞ্চ। নিঃশ্রেয়সাধিগমোপি স্বর্গপ্রাপ্তি। তথাহ্যত্র। স্বর্গঃফলং শ্রূয়তে। অথ বার্ত্তায়াং কিং তত্ত্বজ্ঞানং কশ্চ নিঃশ্রেয়সাধিগম ইতি? ভূম্যাদিপরিজ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানং কৃষ্যাদ্যধিগমশ্চ

১. সুশিক্ষিত সুবিখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের বিশেষ সাহায্যে ও উদ্যোগে শ্রীকালীপ্রসন্ন ভাদুড়ির দ্বারা বরাহনগরে প্রকাশিত।

নিঃশ্রেয়সমিতি তৎফলত্বাৎ। দণ্ডনীত্যাং কিং তত্ত্বজ্ঞানকেন্দ নিঃশ্রেয়সাধিগম ইতি? সামদানদণ্ডভেদানাং যথাকালং যথাদেশং যথাশক্তি বিনিয়োগস্তত্ত্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সং পৃথিবীজয়াদি। ইহ তু অধ্যাত্মবিদ্যায়াং আত্মজ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সমপবর্গ ইতি।"

নিঃশ্রেয়স শব্দের মোক্ষ অর্থ গ্রহণকালে অন্যান্য পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান কারণ কোটিতে পরিত্যক্ত হয়। কেননা একমাত্র আত্মতত্ত্ব জ্ঞানই মোক্ষের কারণ। নিঃশ্রেয়স শব্দের মঙ্গল সাধারণতার্থ গ্রহণকালে অন্যান্য পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান সেই সেই প্রকারে উন্নয়ন করিতে হয়। কেননা, বিশেষ বিশেষ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ ফল নির্দিষ্ট আছে।

এইরূপ ত্রুটি আরও কতিপয় স্থানে লক্ষিত হয়, সে-সকল পরিহৃত হইলে পুস্তকখানি বিশেষ উপকারী হইতে পারে।

কাতন্ত্রব্যাকরণম্ ভাবসেনত্রৈবিদ্যবিরচিতরূপমালা প্রক্রিয়াসহিতম্।
ব্যাকরণমিদং বাঙ্গৈঃ পণ্ডিতৈঃ কলাপব্যাকরণমিত্যাখ্যায়তে। স্বীকুর্বন্তি চাস্য ব্যাকরণস্যোৎকৃষ্টত্বং পণ্ডিতাঃ ক্রান্তি চাস্য হেতুরুৎকৃষ্টত্বে সারল্যমিতি। বয়মপাস্য সুষ্ঠুতাং অবগচ্ছামঃ। যৎকারণং অনেনৈব ব্যাকরণেন সুকুমারমতিকুমারাণাং স্বল্পায়াসেন ব্যাকরণপদপদার্থজ্ঞানং জায়ত ইতি। সন্তি হি বহূনি ব্যাকরণানি সিদ্ধান্তকৌমুদীপ্রমুখানি। পরন্তু তেষামতি দুরূহত্বাৎ ন যোগ্যানি বালানাম্। ব্যাকরণস্যৈতস্য দুর্গসিংহকৃতা বৃত্তির্বঙ্গে প্রচরদ্রূপা ন তু ভাবসেনত্রৈবিদ্যদেববিরচিত রূপমালা। ইয়ং সমীচীনতমা রূপমালা প্রক্রিয়া দুষ্প্রাপ্যা আসীৎ। সম্প্রতি তু তদন্বিতং কৃত্বা কাতন্ত্র সূত্রমুদ্রণেন মহানুপকারোজাত ইতি মন্যামহে। এতদেব ব্যাকরণং রূপমালা প্রক্রিয়া সহিতং চেৎ পাঠশালায়াং প্রচরদ্রূপং ভবেৎ তর্হি বালানাং ব্যাকরণজ্ঞানং সহজেনোপায়েন সম্পৎস্যত ইত্যাশাস্মহে বয়ম্। অস্য চ মুদ্রণকার্য সর্বাঙ্গ সুন্দরংজাতমিত্যপরঃ পরিতোষহেতুরস্মাকং। কিং বহুনা, এতৎ প্রকাশকার শ্রীহীরাচন্দ্র নিমিচন্দ্র শ্রেষ্ঠনে মুম্বয্যবাসিনে বয়ং প্রশংসাবাদং উদীরয়াম ইতিশম্।

কাতন্ত্র ব্যাকরণ বঙ্গদেশে কলাপ ব্যাকরণ নামে প্রসিদ্ধ। এই ব্যাকরণ অন্যান্য ক্ষুদ্র ব্যাকরণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহার অনেকগুলি বৃত্তি ও ব্যাখ্যা বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে দুর্গসিংহকৃত ব্যাখ্যা বঙ্গদেশে প্রচলিত। দুর্গসিংহের ব্যাখ্যা অপেক্ষা ভাবসেন ত্রৈবিদ্য দেবের "রূপমালা প্রক্রিয়া" নাম্নী ব্যাখ্যা অনেক অংশে উৎকৃষ্ট। কিন্তু তাহা এ পর্যন্ত এদেশে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য ছিল। সম্প্রতি বরোদা রাজ্যের অন্তর্গত ব্রহ্মণগ্রামোৎপন্ন বুম্বাপুরানিবাসী পণ্ডিত শ্রীনাথরামশাস্ত্রী ও বুম্বাইনিবাসী শ্রীহীরাচন্দ্র নেমিচন্দ্র শ্রেষ্ঠী এই দুই মহানুভাব উক্ত ব্যাখ্যার সহিত (রূপমালার সহিত) কাতন্ত্র সূত্র মুদ্রিত করিয়া সংস্কৃত শিক্ষার্থীদিগের সমূহ উপকার করিয়াছেন। পুস্তকের অক্ষর, মুদ্রাঙ্কণ, কাগজ, সমস্তই উত্তম এবং পরিশুদ্ধতায় অনবদ্য। মূল্য এক টাকা সুতরাং অধিক নহে। বলা বাহুল্য যে, এই পুস্তক মুগ্ধবোধের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইলে ব্যাকরণ শিক্ষা সহজসাধ্য হইতে পারে।

সাধনা
ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২

সাহিত্য চিন্তা। শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু। মূল্য এক টাকা।
পূর্ণবাবু আর্য সাহিত্য ও য়ুরোপীয় সাহিত্য তুলনা করিয়া সাহিত্যের আদর্শ নির্ণয়ে প্রয়াসী হইয়াছেন। গ্রন্থকার নৈপুণ্যসহকারে তাঁহার প্রবন্ধগুলিতে যথেষ্ট সূক্ষ্মবুদ্ধি খাটাইয়াছেন। কিন্তু আমাদের সন্দেহ হয়, যে, যে সরস্বতী এতদিন বিশ্বজনের বিচিত্রদল হৃৎপদ্মের উপর বিরাজ করিতেছিলেন তিনি হঠাৎ অদ্য পূর্ণবাবুর কঠিন গণ্ডিটুকুর মধ্যে আসিয়া বাস করিতে সম্মত হইবেন কি না। এবং তাহার জগদ্বাসী শতলক্ষ ভক্তের বিনীত প্রার্থনা এই যে, তিনি যেন

অসীমবিস্তৃত মানব হৃদয়ের রাজসিংহাসন পরিহার করিয়া পূর্ণবাবুর নীতি পাঠশালার হেড্‌মাস্টরি পদ গ্রহণ না করেন। সংক্ষেপে আমাদের বক্তব্য এই, যে সাহিত্যে খুন ভালো কি ভালো নয়, সাহিত্যে প্রেমের কোনো বিশেষ রূপ গ্রাহ্য কি পরিত্যাজ্য তাহা এক কথায় বলিয়া দেওয়া কাহারও সাধ্য নহে। কোনো বিশেষ কাব্যে বিশেষ স্থানে খুনের অবতারণায় সাহিত্যরস নষ্ট হইয়াছে কি না তাহাই রসজ্ঞলোকের বিচার্য— চরিত্র বিশেষে এবং অবস্থা বিশেষে প্রেমের কিরূপ বিকাশ সুরসিক পাঠকচিত্তে অখণ্ড আনন্দের কারণ হয় তাহাই সাহিত্যে আলোচনার বিষয় হইতে পারে। সাহিত্যের কল্পনাসংসার এই বাস্তব সংসারের ন্যায় অসীম বিচিত্র এবং পরম রহস্যময়, তাহা কেবলমাত্র, একখণ্ড আর্যদের বেড়া-দেওয়া ধর্মের ক্ষেত এবং আর-এক খণ্ড অনার্যদের প্রবৃত্তির কাঁটাবন নহে।

বামা সুন্দরী বা আদর্শ নারী। শ্রীচন্দ্রকান্ত সেন-প্রণীত। মূল্য আট আনা।
গ্রন্থখানি বামাসুন্দরসী নামধেয়া কোনো স্বর্গগতা পুণ্যবতী মহিলার জীবনচরিত, ভক্ত-কর্তৃক রচিত। এরূপ গ্রন্থের সমালোচনা করিতে সংকোচ বোধ করি। লেখকের আন্তরিক ভক্তি-উচ্ছ্বাস তাঁহার ভক্তি-ভাগিনীর জন্য উচ্চ সিংহাসন রচনার একান্ত চেষ্টা করিয়াছে। সেই স্পষ্ট প্রত্যক্ষ চেষ্টা তাঁহার উদ্দেশ্যকে কিয়ৎপরিমাণে ব্যর্থ করিয়াছে তথাপি বামাসুন্দরীর এই চরিত্রচিত্রে গৃহধর্মের নিংস্বার্থপর উন্নত আদর্শ কতক পরিমাণে ব্যক্ত হইয়াছে। উপদেশপূর্ণ উচ্চভাবকে অতিস্ফুট করিবার প্রয়াসে চিত্রখানি সজীব, স্বাভাবিক ও প্রত্যক্ষগোচর হয় নাই।

শুশ্রূষা। প্রথম ভাগ। শ্যামাচরণ দে-প্রণীত। মূল্য এক টাকা।
আমাদের দেশের বহুবিস্তৃত একান্নবর্তী পরিবারে রোগেরও প্রাদুর্ভাব যথেষ্ট এবং শুশ্রূষারও অভাব নাই। বরং অতিশুশ্রূষায় রোগী বিপন্ন হইয়া পড়ে। এবং আত্মীয়দের একান্ত চেষ্টা ও উদ্‌বেগবশতই শুশ্রূষার ফল অনেক সময় বিপরীত হয়। রোগীর সুখস্বাস্থ্যবিধান কেবলমাত্র ইচ্ছা ও প্রয়াসের দ্বারা হয় না— সেজন্য শিক্ষা ও অভ্যাসের প্রয়োজন আছে। তাহা ছাড়া রোগীর পরিচর্যায় সুপ্রণালীবদ্ধ নিয়ম পালন বড়োই আবশ্যক— রুগ্‌ণকক্ষে প্রবেশ অবারিত, কথাবার্তা অসংযত, এবং সমস্তই বিধিব্যবস্থাহীন হইলে চলে না। কিন্তু হায়, সতর্ক এবং সুবিহিত ব্যবস্থা আমাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ, এবং চারি দিক হইতে আত্মীয়জনোচিত হৃদয়োচ্ছ্বাস-প্রকাশের সমস্ত পথ খুলিয়া রাখিতে গিয়া বিধিব্যবস্থার নিয়ম সংযমে সম্পূর্ণ ঢিলা দিতে হয়।

এই কারণে সমালোচ্য গ্রন্থখানি আমাদের দেশে মহোপকারী বলিয়া বোধ করি। গ্রন্থকার উপযুক্ত গ্রন্থ এবং সুচিকিৎসক বন্ধুর সাহায্যে এই পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা সরল এবং যথাসম্ভব পরিভাষাবর্জিত; ডাক্তারি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানবিহীন পাঠক-পাঠিকাদের পক্ষে এ গ্রন্থখানি উপাদেয়।

কিন্তু কেবলমাত্র পাঠদ্বারা অল্পই ফল লাভ হইবে, শিক্ষা এবং চর্চা চাই। বালিকামাত্রেরই এই গ্রন্থ স্কুলপাঠ্য এবং পরীক্ষার বিষয় হওয়া উচিত। ঔষধ প্রয়োগ, ব্যান্ডেজ বাঁধা, পুল্টিস দেওয়া, পথ্য প্রস্তুত করা, রোগীর অবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা, সংক্রামক রোগাদিতে মারীবীজনাশক উপায়াদির সহিত সুপরিচিত হওয়া, এ-সমস্তই স্ত্রীশিক্ষার অবশ্যনির্দিষ্ট অঙ্গরূপে প্রচলিত হওয়া কর্তব্য। আজকাল দুরূহ শিক্ষা প্রণালী, পরীক্ষা-প্রতিযোগিতা এবং জীবিকা চেষ্টায় পুরুষ জাতির মধ্যে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত রুগ্‌ণসংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে, রোগী-পরিচর্যা বিদ্যাটা যদি আমাদের স্ত্রীগণ বিশেষরূপে শিক্ষা করেন তবে দেশটা কিঞ্চিৎ সুস্থ হইতে পারে। তাঁহারাও যদি বাতি জ্বালিয়া রাত জাগিয়া আকণ্ঠ পড়া গিলিয়া পুরুষদের সহিত উর্ধ্বশ্বাসে বিদ্যা-বাহাদুরির ঘোড়-দৌড় খেলাইতে যান, দেহলতা জীর্ণ, মেরুদণ্ড নত এবং হরিণচক্ষু চশমাচ্ছন্ন করিয়া তোলেন তবে জয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়— কিন্তু পরাজয় আমাদের জাতীয় সুখস্বাস্থ্যসৌন্দর্যের।

বাসনা। শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী প্রণীত। মূল্য আট আনা।
বঙ্গসাহিত্যের এক সময় গিয়াছে যখন স্ত্রীলোকের রচনামাত্রকেই অযথা উৎসাহ দেওয়া সমালোচকগণ সামাজিক কর্তব্য বলিয়া জ্ঞান করিতেন, সেই সময়ে লেখিকা এই কাব্যগ্রন্থখানি প্রকাশ করিলে কিঞ্চিৎ যশঃ সঞ্চয় করিতে পারিতেন। কিন্তু এখন অনেক লেখিকা সাহিত্য-দরবারে উপস্থিত হওয়াতে সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে— সুতরাং আজকাল স্ত্রীরচনা হইলেও কথঞ্চিৎ বিচার করিয়া প্রশংসা বিতরণ করিতে হয়, এইজন্য উপস্থিত গ্রন্থখানি সম্বন্ধে আমরা অধিক কথা বলিতে ইচ্ছা করি না।

পুষ্পাঞ্জলি। শ্রীরসময় লাহা -বিরচিত। মূল্য আট আনা।
গ্রন্থখানি কতকগুলি চতুর্দশপদী কবিতাবলীর সমষ্টি। এই পেলব কাব্যখণ্ডগুলির মধ্যে একটি সুকুমার মৃদু সৌরভ আছে। লেখকের ভাষায় যে একটি মিষ্ট সুর পাওয়া যায় তাহা সরল সংযত ও গম্ভীর এবং তাহাতে চেষ্টার লক্ষণ নাই। যদি এই-সকল পুষ্পের মধ্যে ভবিষ্যৎ ফলের আশা থাকে, যদি লেখকের রচনা চিন্তার বীজ এবং ভাবের রসে ভরিয়া পাকিয়া উঠে তবেই তাহা সার্থক হইবে, নচেৎ আপন মৃদু গন্ধ ক্ষণকালের মধ্যে নিঃশেষ করিয়া দিয়া ধূলিতে তাহার অবসান। যে-সকল বসন্তমুকুলে বৃন্তের জোর থাকে তাহারাই কালবৈশাখীর হাত হইতে টিকিয়া গিয়া সফলতা লাভ করে; লেখকের এই ক্ষুদ্র কাব্যগুলির মধ্যে নবমুকুলের গন্ধটুকু আছে কিন্তু এখনো তাহার বৃন্তের বল প্রমাণ হয় নাই।

ভারতী
জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫

চিন্তালহরী। শ্রীচন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ প্রণীত।
শামুক যেমন তাহার নিজের বাসভবনটি পিঠে করিয়া লইয়া উপস্থিত হয় এ গ্রন্থখানিও তেমনি আপনার সমালোচনা আপনি বহন করিয়া বাহির হইয়াছে। গ্রন্থসম্পাদক শ্রীযুক্তবাবু অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিজ্ঞাপনে গ্রন্থ সম্বন্ধে নিজের অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই জানাইয়াছেন চিন্তালহরী পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত না হইলে তিনি ইহার প্রচারকার্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না; এবং ইহাও বলিয়াছেন "ইহার প্রতি প্রবন্ধে ভাবুকমাত্রেরই মর্মের কথার— প্রাণের ব্যথার পরিস্ফুট ছায়া পড়িয়াছে।" অবিনাশবাবু জানেন না, ওই মর্মের কথা এবং প্রাণের ব্যথার অবতারণাকে ভাবুকেরা যত ভয় করেন এমন আর কাহাকেও নহে; ও জিনিসটা মর্মের মধ্যে প্রাণের মধ্যে থাকিয়া গেলেই ভালো হয়— এবং যদি উহাকে বাহিরে আসিতেই হয়ে তবে অপরিমিত প্রগল্‌ভতা ও ভাবভঙ্গিমার অবারিত, আড়ম্বর পরিহার করিয়া সরল সংযত সুন্দর বেশে আসাই তাহার পক্ষে শ্রেয়।

ইংরাজিতে যাহাকে বলে সেন্টিমেন্টালিজ্‌ম অর্থাৎ ভাবুকগিরি ফলানো, সহৃদয়তার ভড়ং করা, তাহার একটা বাংলা কথা থাকা উচিত ছিল। কিন্তু কথা না থাকিলেও জিনিসটা যে থাকে বাংলা সাহিত্যে এই ভাবুকতাবিকারে, কৃত্রিম হৃদয়োচ্ছ্বাসের উদ্‌ভ্রান্ত তাণ্ডব নৃত্যে তাহার প্রমাণ প্রতিদিন বাড়িয়া উঠিতেছে। এবং বর্তমান গ্রন্থখানি তাহার একটি অদ্ভুত দৃষ্টান্ত।

ভূমিকম্প। শ্রীবিপিনবিহারী ঘটক প্রণীত। মূল্য ছয় আনা।
ইহারও আরম্ভে বন্ধু-কর্তৃক এই কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা ও প্রশংসাবাক্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গদ্যে উচ্ছৃঙ্খল ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস এক সম্প্রদায় পাঠকের রুচিকর; এবং তাহার রচনা সহজসাধ্য ও অহমিকাগর্ভ হওয়ায় অনেক লেখক তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। এই কারণে সেই-সকল অশোভন অশ্রুজলার্দ্র বিলাপ প্রলাপ ও কাকুক্তির আক্রমণ হইতে গদ্যকে রক্ষা করিবার চেষ্টা

সমালোচকমাত্রেই করা কর্তব্য। কিন্তু পদ্যে অমিত্রাক্ষরছন্দে গত বর্ষের ভূমিকম্পমূলক ইতিহাস, বর্ণনা ও তত্ত্বোপদেশ কবিসাধারণের নিকট অনুকরণযোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে না।

ভারতী
শ্রাবণ ১৩০৫

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। সমন্বয় ভাষ্য। সংস্কৃতের অনুবাদ। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। নববিধান মণ্ডলীর উপাধ্যায় কর্তৃক উদ্ভাসিত। প্রতিখণ্ডের মূল্য ছয় আনা।

ইংরাজি সাময়িক পত্র সম্পাদকগণের অধীনে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অনেকগুলি সমালোচক সমালোচনা কার্যে নিযুক্ত থাকেন। বিষয়ভেদে যথোপযুক্ত লোকের হস্তে গ্রন্থ সমালোচনার ভার পড়ে। বাংলা পত্রিকার কম্পোজ করা এবং ছাপানো ছাড়া বাকি অধিকাংশ কাজই একা সম্পাদককে বহন করিতে হয়। অথচ সম্পাদকের যোগ্যতা সংকীর্ণ-সীমাবদ্ধ। সুতরাং সাধারণের নিকট মুখরক্ষা করিতে হইলে অনেক চাতুরী অনেক গোঁজামিলনের প্রয়োজন হয়।

বর্তমান গ্রন্থের উপযুক্ত সমালোচনা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। ইহাতে ভগবদ্গীতার বিচিত্র ভাষ্যের যথোচিত সমন্বয় হইয়াছে কি না তাহা বিচার করিবার মতো পাণ্ডিত্য আমাদের নাই। অথচ এখানি পণ্ডিতপ্রবর গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়-কর্তৃক রচিত— সুতরাং ইহার সম্বন্ধে কোনো কথা না বলিয়া আমরা অবহেলা-অপরাধের ভাগী হইতে পারি না। ইহার অনুবাদ অংশ যে নির্ভরযোগ্য, এবং ইহার বিস্তারিত বাংলা ভাষ্য যে, মনোযোগ এবং শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ্য সে বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নাই।

ভারতী
অগ্রহায়ণ ১৩০৫

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা

ভারতী। ১৫শ ভাগ। আশ্বিন ও কার্তিক [১২৯৮]

এবারকার ভারতীতে লজ্জাবতী নামক একটি গল্প প্রকাশিত হইয়াছে। এ রচনাটি ছোটো গল্পলেখার আদর্শ বলিলেই হয়। দুটি-একটি বাঙালি অন্তঃপুরবাসিনীর জাজ্বল্যমান ছবি আঁকা হইয়াছে অথচ তাহাকে কোনোপ্রকার কাল্পনিক ভঙ্গি করিয়া বসানো হয় নাই, যেমনটি তেমনি উঠিয়াছে। কোনো বাড়াবাড়ি নাই, রকম-সকম নাই, রোমহর্ষণ ভাষাপ্রয়োগ নাই, অথচ পাঠসমাপ্তি কালে পাঠকের চোখে অতি সহজে অশ্রুবিন্দু সঞ্চিত হইয়া আসে। 'বিলাপ' একটি গদ্যপ্রবন্ধ। কিন্তু ইহাতে না আছে গদ্যের সংযম, না আছে পদ্যের ছন্দ। আজকাল এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল অমূলক প্রবন্ধ বাংলা ভাষায় প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এমন লেখার কোনো আবশ্যক দেখি না। —লিটারেরি। ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে যেমন প্রতিধ্বনি থাকে তেমনি সকল দলেরই পশ্চাতে কতকগুলি অনুবর্তী লোক থাকে তাহারা খাঁটি দলভুক্ত নহে অথচ ভাবভঙ্গির অনুকরণ করিয়া দলপতির সঙ্গে একত্রে তরিয়া যাইতে চাহে। এরূপ লোক সর্বত্রই উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে। সেইরূপ যাঁহারা সারস্বতমণ্ডলীর ছায়াস্বরূপে থাকিয়া সাহিত্যের ভড়ং করিয়া থাকেন লেখক তাঁহাদিগকে লিটারেরি নাম দিয়া কিঞ্চিৎ বিদ্রূপ করিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলা দেশে সেরূপ মণ্ডলীও নাই এবং তাঁহাদের ফিকা অনুকরণও নাই। লেখক যে বর্ণনা প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা বাংলা দেশের কোনো বিশেষ দলের প্রতিই প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। লেখা পড়িয়াই মনে হয় সাহিত্য সম্বন্ধে কাহারও সহিত লেখকের তর্ক হইয়া থাকিবে, এবং প্রতিপক্ষের নিকট হইতে এমন কোনো রূঢ় উত্তর শুনিয়া থাকিবেন যে, "ও-সকল তুমি বুঝিবে কী করিয়া!" সেই ক্ষোভে তাঁহার প্রতিপক্ষের একটি বিরূপ প্রতিমূর্তি আঁকিয়া অমনি কাগজে ছাপাইয়া বসিয়াছেন। লেখকের বিবেচনায় তাঁহার এ রচনা যতই তীব্র এবং অসামান্য ব্যঙ্গ রসপূর্ণ হৌক-না-কেন ইহা ছাপায় প্রকাশ করিবার যোগ্য নয়। এরূপ লেখা সত্যও নহে, সুন্দরও নহে, এবং ইহাতে কাহারও কোনো উপকার দেখি না। —প্ল্যাঞ্চেট। আদি ব্রাহ্মসমাজের শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় উক্ত নামে যে পত্র প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য। প্ল্যাঞ্চেটে বিদ্যারত্ন মহাশয় এবং একটি বালকের সহযোগে যে দুইটি ইংরাজি কবিতা বাহির হইয়াছে তাহা অতিশয় বিস্ময়জনক। বিশেষত শেষ কবিতাটি কোনো বাঙালির নিকট হইতে আশা করা যায় না। —'একাল ও ওকালের মেয়ে' যে লেখিকার রচনা আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিই। এরূপ সরল পরিষ্কার যুক্তিপূর্ণ এবং চিত্রিতবৎ লেখা কয়জন লেখক লিখিতে পারেন? লেখিকা কালের পরিবর্তন সম্বন্ধে যে গুটিকতক কথা বলিয়াছেন তাহা অতিশয় সারগর্ভ। যে লোক ট্রামে চড়িতেছে; পূর্বে যাহারা ঠনঠনের চটিও পরিত না আজ তাহারা বিলাতি জুতা-মোজা পরিতেছে; জীবনযাত্রা সম্বন্ধে পুরুষসমাজে যে আশ্চর্য পরিবর্তন প্রচলিত হইয়াছে তাহা কয়জন পূর্বের সহিত তুলনা করিয়া দেখেন? কিন্তু আমাদের স্ত্রীলোকদের মধ্যে বর্তমান কালোচিত পরিবর্তনের লেশমাত্র দেখিলেই এই নূতন ভাবের ভাবুক, এই নূতন বিদ্যালয়ের ছাত্র এই নূতন পরিচ্ছদ-পরিহিত নববিলাসী পরিহাস করেন, প্রহসন লেখেন এবং কেহ কেহ সীতা দময়ন্তীকে স্মরণ করিয়া প্রকাশ্যে অশ্রু বিসর্জন করিয়া থাকেন। তাঁহারা আশা করেন সমাজের পুরুষার্ধ শিক্ষাকিরণে পাকিয়া রাঙা হইয়া উঠিবে এবং বাকি অর্ধেক সনাতন কচিভাব রক্ষা করিবে। এক যাত্রায় পৃথক ফল হয় না, এক ফলে পৃথক নিয়ম খাটে না। অতএব ভালোই বল আর মন্দই বল পুরুষের অনুগামিনী হওয়া স্ত্রীলোকের প্রাচীন ধর্ম— বর্তমান সহস্র নূতনত্বের মধ্যে সেই প্রাচীন মনু-কথিত ধর্ম অব্যাহত থাকিবার চেষ্টা করিতেছে। লেখিকা বর্তমান আতিথ্য সম্বন্ধে যে দু-এক কথা লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে অনেক ভাবিবার বিষয় আছে।

নব্যভারত। আশ্বিন ও কার্তিক। [১২৯৮]
'চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যধর্ম'; বহুকাল হইতে এই প্রবন্ধ নব্যভারতে প্রকাশিত হইতেছে। চৈতন্যের জীবনচরিত ও ধর্ম সম্বন্ধে লেখক একটি কথাও বাকি রাখিতেছেন না। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক বিচার দ্বারা সত্য মিথ্যা নির্বাচন করিয়া গেলে ভালো হইত। যাহা হৌক, লেখকের পরিশ্রম এবং বিপুল সংগ্রহের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে হয় এবং সেইসঙ্গে সম্পাদককে বলিতে হয় এরূপ বিস্তারিত গ্রন্থ সাময়িক পত্রে প্রকাশের যোগ্য নহে। "সাঁওতালের বিবাহ প্রণালী" প্রবন্ধটি বিশেষ কৌতুকজনক। "মহা তীর্থযাত্রা" লেখকের নরোয়ে ভ্রমণ বৃত্তান্ত। বর্ণনাংশ বড়ো বেশি সংক্ষিপ্ত এবং লেখকের হৃদয়াবেগ অতিরিক্ত মাত্রায় প্রবল। শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় "শকাব্দ" প্রবন্ধে শকাব্দ প্রবর্তনের ইতিহাস সমালোচনা করিয়াছেন। সাধারণের বিশ্বাস, এই অব্দ বিক্রমাদিত্য-কর্তৃক প্রচলিত। লেখক প্রমাণ করিতেছেন যে, এক সময়ে মধ্য এশিয়াবাসী শক জাতি (ইংরাজিতে যাহাদিগকে সাইথিয়ান্‌স্ বলে) ভারতে রাজ্য স্থাপন করিয়া এই অব্দ প্রচলিত করে। লেখক প্রাচীন গ্রন্থ হইতে অনেকগুলি প্রমাণ আবিষ্কার করিয়াছেন। রচনাটি অতিশয় প্রাঞ্জল হইয়াছে। সাধারণত বাংলা সাময়িক পত্রে পুরাতত্ত্ব প্রবন্ধগুলি অসংখ্য তর্কজালে জড়িত হইয়া পাঠকসাধারণের পক্ষে যেরূপ একান্ত দুর্গম ও ভীতিজনক হইয়া উঠে এ লেখাটিকে সে অপবাদ দেওয়া যায় না— আশ্চর্য এই যে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সুসংলগ্ন সংক্ষিপ্ত এবং বোধগম্য। "আত্মসম্ভ্রম" প্রবন্ধ হইতে আমরা দুই-এক জায়গা উদ্‌ধৃত করি। বিলাতি পণ্যদ্রব্য ব্যবহার সম্বন্ধে লেখক লিখিতেছেন, "তুমি যাহার কাপড় পরিয়া আরাম পাও, যাহার হার্মোনিয়ম বাজাইয়া পুলকিত হও, যাহার রেলগাড়ি ও টেলিগ্রাফ দেখিয়া চমকিয়া যাও, যাহার পমেটাম ল্যাভেন্ডার মাথায় দিয়া কৃতার্থ মনে কর, যাহার ফেটিঙে চড়িয়া স্বর্গসুখ লাভ কর, যাহার জাহাজ কামান তোমার দেবকীর্তি বোধ হয় তাহার সহিত তোমার কোনো সম্বন্ধ থাকুক বা না থাকুক, তাহার গোলাম তোমাকে হইতেই হইবে।... ইংরাজের শিল্প সম্বন্ধে আমার এ বিশ্বাস অটল যে, তাহার এ দেশের অর্ধেক আধিপত্য রেল ও স্টিমার হইতে হইয়াছে; কারণ, সাধারণে এইগুলি সর্বদা দেখিয়া থাকে ও বিস্ময়জনক মনে করে, সুতরাং ইহাতেই নিজের নিজের বল, সাহস ও অভিমান হারায়।"

সাহিত্য। দ্বিতীয় ভাগ। আশ্বিন। [১২৯৮]
এই সংখ্যায় 'ফুলদানী' নামক একটি ছোটো উপন্যাস ফরাসীস্ হইতে অনুবাদিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ লেখক প্রস্পর মেরিমে -প্রণীত এই গল্পটি যদিও সুন্দর কিন্তু ইহা বাংলা অনুবাদের যোগ্য নহে। বর্ণিত ঘটনা এবং পাত্রগণ বড়ো বেশি য়ুরোপীয়— ইহাতে বাঙালি পাঠকদের রসাস্বাদনের বড়োই ব্যাঘাত করিবে। এমন-কি, সামাজিক প্রথার পার্থক্যহেতু মূল ঘটনাটি আমাদের কাছে সম্পূর্ণ মন্দই বোধ হইতে পারে। বিশেষত মূল গ্রন্থের ভাষা-মাধুর্য অনুবাদে কখনোই রক্ষিত হইতে পারে না, সুতরাং রচনার আব্রুটুকু চলিয়া যায়। "শিক্ষিতা নারী" প্রবন্ধে শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী বিস্তর গবেষণা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় নারীদের অর্থোপার্জনশক্তির দৃষ্টান্তস্বরূপে মার্কিন স্ত্রী-ডাক্তার স্ত্রী-অ্যাটর্নি এবং ইংরাজ স্ত্রী-গ্রন্থকারদিকের আয়ের আলোচনা করা নিষ্ফল। বড়ো বড়ো ধনের অঙ্ক দেখাইয়া আমাদিগকে মিথ্যা প্রলোভিত করা হয় মাত্র। জর্জ এলিয়ট তাহার প্রথম গ্রন্থ বিক্রয় করিয়া লক্ষ টাকা মূল্য পাইয়াছিলেন। যদি নাও পাইতেন তাহাতে তাঁহার গৌরবের হানি হইত না। এমন দৃষ্টান্ত শুনা গিয়াছে অনেক পুরুষ গ্রন্থকার তাঁহাদের জগদ্‌বিখ্যাত গ্রন্থ নিতান্ত যৎসামান্য মূল্যে বিক্রয় করিয়াছেন। দ্বিতীয় কথা এই, পুরুষের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া অর্থোপার্জন স্ত্রীলোকের কার্য নহে। যদি দুর্ভাগ্যক্রমে কোনো স্ত্রীলোককে বাধ্য হইয়া স্বয়ং উপার্জনে প্রবৃত্ত হইতে হয় তবে তাঁহাকে দোষ দেওয়া বা বাধা দেওয়া উচিত হয় না স্বীকার করি— 'কিন্তু সংসার রক্ষা করিতে হইলে সাধারণ স্ত্রীলোককে

স্ত্রী এবং জননী হইতেই হইবে। সর্বদেশে এবং সর্বকালেই স্ত্রীলোক যে পুরুষের সমান শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন অবশ্যই তাহার একটা প্রাকৃতিক কারণ আছে। মানুষের প্রথম শিক্ষা বিদ্যালয়ে নহে, বহির্জগতে, কর্মক্ষেত্রে। গর্ভধারণ এবং সন্তানপালনে অবশ্য নিযুক্ত হইয়া স্ত্রীলোক চিরকাল এবং সর্বত্র সেই শিক্ষায় বহুল পরিমাণে বঞ্চিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া এই জননীকর্তব্যের উপযোগী হইবার অনুরোধে তাঁহাদের শারীরিক প্রকৃতিও ভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই ভিন্নতাই যে স্ত্রী-পুরুষের বর্তমান অবস্থাপার্থক্যের মূল প্রাকৃতিক কারণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এক্ষণে সভ্য সমাজের অবস্থা অনেক পরিমাণে নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। প্রথমত, এককালে মানুষকে যাহা দায়ে পড়িয়া প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া শিক্ষা করিতে হইত, এখন তাহার অধিকাংশ বিনা বিপদ ও চেষ্টায় বিদ্যালয়ে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, অবিশ্রাম যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি নিবারিত হইয়া স্ত্রীপুরুষের মধ্যে ক্রমশ প্রকৃতির সামঞ্জস্য হইয়া আসিতেছে। কিন্তু সভ্যতার একটি লক্ষণ এই, উত্তরোত্তর কর্তব্যের ভাগ। কুঁড়ি যত ফুটিতে থাকে তাহার প্রত্যেক দল ততই স্বতন্ত্র হইয়া আসে। সভ্যতার উন্নতি অনুসারে স্ত্রীলোকের কর্তব্যও বাড়িয়া উঠিয়া তাহাকে পুরুষ হইতে পৃথক করিতে থাকিবে। অনেক পশু জন্মদান করিয়াই জননীকর্তব্য হইতে অব্যাহতি পায়। কিন্তু মনুষ্যমাতা বহুকাল সন্তানভার ত্যাগ করিতে পারেন না। অসভ্য অবস্থায় সন্তানের প্রতি মাতার কর্তব্য অপেক্ষাকৃত লঘু ও ক্ষণস্থায়ী। যত সভ্যতা বাড়িতে থাকে, যতই মানুষের সম্পূর্ণতা পরিস্ফুট হইতে থাকে, ততই "মানুষ করা" কাজটা গুরুতর হইয়া উঠে। প্রথমে যাহা বিনা শিক্ষায় সম্পন্ন হইতে পারিত, এখন তাহাতে বিশেষ শিক্ষার আবশ্যক করে। অতএব মানুষ যতই উন্নত হইয়া উঠিতে থাকে মাতার কর্তব্য ততই গৌরবজনক এবং শিক্ষাসাধ্য হইয়া উঠে। তাহার পর, যিনি জননী হইয়াছেন, জননীর স্নেহ, জননীর সেবাপরায়ণতা, জননীর শিক্ষা বিশেষ করিয়া লাভ করিয়াছেন তিনি কি সন্তান যোগ্য হইবামাত্র সেগুলি বাক্সয় তুলিয়া রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। তাঁহার সেই-সমস্ত শিক্ষা তাঁহার সেই-সমস্ত কোমল প্রবৃত্তির নিয়ত চর্চা ব্যতীত তিনি কি চরিতার্থতা লাভ করিতে পারেন? এইজন্য তিনি স্বতই তাঁহার স্বামী ও পরিবারের জননীপদ গ্রহণ করেন— ইহা তাঁহার জীবনের স্বাভাবিক গতি। এবং তাঁহার কন্যাও সেই জননীর গুণ প্রাপ্ত হয়, এবং নিঃসন্তান হইলেও হৃদয়ের গুণে তাঁহার সন্তানের অভাব থাকে না। প্রকৃতিই রমণীকে বিশেষ কার্যভার ও তদনুরূপ প্রবৃত্তি দিয়া গৃহবাসিনী করিয়াছেন, পুরুষের সার্বভৌমিক স্বার্থপরতা ও উৎপীড়ন নহে— অতএব বাহিরের কর্ম দিলে তিনি সুখীও হইবেন না, সফলও হইবেন না। দেনা-পাওনা, কেনাবেচা নিষ্ঠুর কাজ। সে কাজে যাহারা কৃতকার্যতা লাভ করিতে চাহে তাহারা কেহ কাহাকেও রেয়াত করে না। পরস্পরকে নানা উপায়ে অতিক্রম করিয়া নিজের স্বার্থটুকুকে রক্ষা করা ব্যাবসা, বিজ্‌নেস্। এইজন্য কার্যক্ষেত্রে সহৃদয়তা অধিকাংশ স্থলে হাস্যাস্পদ এবং বেশিদিন টিকিতেও পারে না। যিনি প্রকৃতির নির্দেশানুসারে সংসারের মা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন তিনি যে শিক্ষা লাভ করিবেন তাহা বিক্রয় করিবার জন্য নহে, বিতরণ করিবার জন্য। অতএব আমেরিকায় যে দোকানদারি আরম্ভ হইয়াছে সে কথা না উত্থাপন করাই ভালো, তাহার ফলাফল এখনো পরীক্ষা হয় নাই।

তবে এ কথা সহস্রবার করিয়া বলিতে হইবে, মানুষকে 'মানুষ করিয়া' তুলিতে শিক্ষার আবশ্যক। সেও যে কেবল সামান্য ছিটেফোঁটা মাত্র তাহা নহে, রীতিমতো শিক্ষা। অবশ্য মানুষকে কেরানি করিয়া তুলিতে বেশি শিক্ষা চাই না, স্তনদানের পালা সাঙ্গ করিয়া পাঠশালায় ছাড়িয়া দিলেই চলে; দোকানদার করিতে হইলেও প্রায় তদ্রূপ। কিন্তু আমরা সচরাচর মনে করি মানুষ হইয়া তেমন লাভ নাই, সুদে পোষায় না, যেমন-তেমন করিয়া আপিসে প্রবেশ করিতে পারিলেই জীবনের কৃতার্থতা; অতএব মেয়েদের শিক্ষা দিবার আবশ্যক নাই, তাহারা স্তনদান এবং রান্না-বাড়্না করুক, আমরা সে কাজগুলাকে আধ্যাত্মিক আখ্যা দিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিব এবং শিক্ষা স্বাস্থ্য ও সুখ সম্মানের পরিবর্তে দেবী উপাধি দিয়া তাহাদিগকে বিনামূল্যে ক্রয় করিয়া রাখিব।

কার্তিক। [১২৯৮] কার্তিক মাসের সাহিত্যে "হিন্দুজাতির রসায়ন" একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে অনেকগুলি প্রাচীন রাসায়নিক যন্ত্রের বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংখ্যায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আত্মজীবনচরিতের কয়েক পৃষ্ঠা বাহির হইয়াছে। ইহাতে অলংকারবাহুল্য বা আড়ম্বরের লেশমাত্র নাই। পূজনীয় লেখকমহাশয় সমগ্র গ্রন্থটি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই বলিয়া মনে একান্ত আক্ষেপ জন্মে। এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে বাঙালিদের পক্ষে শিক্ষার স্থল হইত। প্রথমত, একটি অকৃত্রিম মহত্ত্বের আদর্শ বঙ্গসাহিত্যে চিরজীবন লাভ করিয়া বিরাজ করিত, দ্বিতীয়ত, আপনার কথা কেমন করিয়া লিখিতে হয় বাঙালি তাহা শিখিতে পারিত। সাধারণত বাঙালি লেখকেরা নিজের জবানী কোনো কথা লিখিতে গেলে অতিশয় সহৃদয়তা প্রকাশ করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকেন— হায় হায় মরি মরি শব্দে পদে পদে হৃদয়াবেগ ও অশ্রুজল উদ্‌বেলিত করিয়া তোলেন। 'আত্মজীবনচরিত' যতটুকু বাহির হইয়াছে তাহার মধ্যে একটি সংযত সহৃদয়তা এবং নিরলংকার সত্য প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছে। স্ত্রীজাতির প্রতি লেখকমহাশয় যে ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কেমন সরল সমূলক ও অকৃত্রিম। আজকাল যাঁহারা স্ত্রীজাতির প্রতি আধ্যাত্মিক দেবত্ব আরোপ করিয়া বাক্‌চাতুরি প্রকাশ করিয়া থাকেন তাঁহাদের সহিত কী প্রভেদ!

সাধনা
অগ্রহায়ণ ১২৯৮

নব্যভারত। অগ্রহায়ণ। [১২৯৮]
"হিন্দুধর্মের আন্দোলন ও সংস্কার" নামক প্রবন্ধে লেখক প্রথমে বাংলার শিক্ষিত সমাজে হিন্দুধর্মের নূতন আন্দোলনের ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার পর দেখাইয়াছেন আমাদের বর্তমান অবস্থায় পুরাতন হিন্দুপ্রথা সম্পূর্ণভাবে পুনঃপ্রচলিত হওয়া অসম্ভব। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলেন 'ভিন্ন দেশজাত দ্রব্যমাত্রই হিন্দুদের ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। কিন্তু বিলাতি আলু, কপি, কাবুলি মেওয়া প্রভৃতিও এখন বিলক্ষণ প্রচলিত হইয়াছে।' 'সোডা লিমনেড্ বরফ প্রভৃতি প্রকাশ্যরূপে হিন্দুসমাজে প্রচলিত। এ-সমস্ত যে স্পষ্ট যবন ও ম্লেচ্ছদের হাতের জল।' তিনি বলেন, শাস্ত্রে পলাণ্ডুভক্ষণ নিষেধ কিন্তু দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণ হইতে ইতর জাতি পর্যন্ত সকলেই পলাণ্ডু ভক্ষণ করিয়া থাকে। 'যবনকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়, কিন্তু বঙ্গদেশ ব্যতীত, ভারতবর্ষের অপর অংশের হিন্দুগণ মুসলমানদের সহিত একত্রে বসিয়া তাম্বুল ভক্ষণ করেন।' 'যজ্ঞ-উপবীত হইবার পর আমাদিগকে অন্যূন বারো বৎসর গুরুগৃহে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য অবলম্বনকরত শাস্ত্র আলোচনা এবং গুরুর নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে হয়। পরে গুরুর অনুমতি লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। কিন্তু বর্তমান সময়ে এ পদ্ধতি অনুসারে কে কার্য করিয়া থাকে?' 'ব্রাহ্মণের ত্রিসন্ধ্যা করিতে হয় কিন্তু বর্তমান সময়ে যাঁহারা চাকুরি করেন তাঁহারা কী প্রকারে মধ্যাহ্নসন্ধ্যা সমাধা করিতে পারেন?' লেখক বলেন, যাঁহারা অনাচারী হিন্দুদিগকে শাসন করিবার জন্য সমুৎসুক তাঁহাদিগকেই হিঁদুয়ানি লঙ্ঘন করিতে দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপে দেখাইয়াছেন, বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রকাশ হইতেছে; ইহাতে করিয়া শাস্ত্রীয় বাক্য বেদবাক্যসকল স্ত্রী, শূদ্র, বলিতে কি, যবন ও ম্লেচ্ছদের গোচর হইতেছে। অধিক কী, বৈদিক সন্ধ্যাও তাঁহাদের কর্তৃক পরিচালিত পত্রিকায় প্রকাশিত ও ব্যাখ্যাত হইতেছে। অতঃপর লেখক বহুতর শাস্ত্রবচন উদ্‌ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন প্রাচীনকালেই বা ব্রাহ্মণের কীরূপ লক্ষণ ছিল এবং বর্তমানকালে তাহার কত পরিবর্তন হইয়াছে। এই প্রবন্ধের মধ্যে অনেক শিক্ষা ও চিন্তার বিষয় আছে। কেবল একটা কথা আমাদের নূতন ঠেকিল। বঙ্কিমবাবু যে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ও শশধর তর্কচূড়ামণির ধুয়া ধরিয়া হিন্দুধর্মের পক্ষপাতী হইয়াছেন এ কথা মুহূর্তকালের জন্যও প্রণিধানযোগ্য নহে। "ঋষি চিত্র" একটি কবিতা। লেখক শ্রীযুক্ত মধুসূদন রাও। নাম শুনিয়া কবিকে মহারাষ্ট্রীয় বলিয়া বোধ

হইতেছে। কিন্তু বঙ্গভাষায় এরূপ কবিত্ব প্রকাশ আর-কোনো বিদেশীর দ্বারায় সাধিত হয় নাই। কবির রচনার মধ্যে প্রাচীন ভারতের একটি শিশির-স্নাত পবিত্র নবীন উষালোক অতি নির্মল উজ্জ্বল এবং মহৎভাবে দীপ্তি পাইয়াছে। এই কবিতার মধ্যে আমরা একটি নূতন রসাস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে বাংলার অধিকাংশ লেখক যাহা লেখেন তাহার মধ্যে প্রাচীনত্বের প্রকৃত আস্বাদ পাওয়া যায় না; কিন্তু ঋষিচিত্র কবিতার মধ্যে একটি প্রাচীন গম্ভীর ধ্রুপদের সুর বাজিতেছে। নব্যভারতে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের 'হিন্দু আর্যদিগের প্রাচীন ইতিবৃত্ত' খণ্ডশ বাহির হইতেছে। রমেশবাবু যে এতটা শ্রম স্বীকার করিয়াছেন দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম, কারণ, আমাদের দেশের বুদ্ধিমানগণ প্রাচীন হিন্দুসমাজ ঘরে বসিয়া গড়িয়া থাকেন। সে সমাজে কী ছিল কী না ছিল, কোন্‌টা হিন্দু কোন্‌টা অহিন্দু সেটা যেন বিধাতাপুরুষ সূতিকাগৃহে তাঁহাদের মস্তিষ্কের মধ্যে লিখিয়া দিয়াছেন, তাহার অন্য কোনো ইতিহাস নাই। ঐতিহাসিক প্রণালী অনুসরণ করিয়া রমেশবাবু এই যে প্রাচীন সমাজচিত্র প্রকাশ করিতেছেন ইহার সহিত আমাদের বাংলার আজন্ম-পণ্ডিতগণের মস্তিষ্ক-লিখনের ঐক্য হইবে এরূপ আশা করা যায় না। নিজের শখ অনুসারে তাঁহারা প্রত্যেকেই দুটি-চারিটি মনের মতো শ্লোক সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন, ইতিহাস বিজ্ঞানকে তাহার কাছে ঘেঁসিতে দেন না। মনে করো তাহার কোনো-একটি শ্লোকে ঋষি বলিতেছেন রাত্রি, আমরা দেখিতেছি দিন। বঙ্গপণ্ডিত তৎক্ষণাৎ তাহার মীমাংসা করিয়া দিবেন 'আচ্ছা চোখ বুজিয়া দেখো দিন কি রাত্রি।' অমনি বিংশতি সহস্র চেলা চোখ বুজিবেন এবং মস্তক আন্দোলন করিয়া বলিবেন 'অহো কী আশ্চর্য! ঋষিবাক্যের কী মহিমা! গুরুদেবের কী তত্ত্বজ্ঞান! দিবালোকের লেশমাত্র দেখিতেছি না'। যে হতভাগ্য চোখ খুলিয়া থাকিবে, যদি তাহার চোখ বন্ধ করিতে অক্ষম হন তো ধোপা নাপিত বন্ধ করিবেন, এবং দুই-একজন মহাপ্রাজ্ঞ সৃষ্টিছাড়া তত্ত্ব উদ্‌ভাবন করিয়া তাহার চোখে ধুলা দিতে ছাড়িবেন না। দুঃখের বিষয়, বাঙালির এই স্বরচিত ভারতবর্ষ, সত্য হৌক, মিথ্যা হৌক খুব যে উচ্চশ্রেণীর ভারতবর্ষ তাহা নহে। বাংলাদেশের একখানি গ্রামকে অনেকখানি ''আধ্যাত্মিক' গঙ্গাজলের সহিত মিশাল করিয়া একটি বৃহৎ ভারতবর্ষ রচনা করা হয়; সেখানেও কয়েকজন নিস্তেজ নির্বীর্য মানুষ অদৃষ্টের কর-ধৃত নাসারজ্জু অনুসরণ করিয়া সাতিশয় কৃশ ও পবিত্রভাবে ধীরে ধীরে চলিতেছে; সমাজ অর্থে জাতি লইয়া দলাদলি, ধর্ম অর্থে সর্ববিষয়েই স্বাধীন বুদ্ধিকে বলিদান, কর্ম অর্থে কেবল ব্রতপালন এবং ব্রাহ্মণভোজন, বিদ্যা অর্থে পুরাণ মুখস্থ, এবং বুদ্ধি অর্থে সংহিতার শ্লোক লইয়া আবশ্যক অনুসারে ব্যাকরণের ইন্দ্রজাল দ্বারা আজ 'না'-কে হাঁ করা কাল 'হাঁ'-কে না করার ক্ষমতা। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে বঙ্গসমাজ প্রাচীন হিন্দুসমাজের ন্যায় উন্নত ও সজীব নহে, অতএব বাঙালির কল্পনার দ্বারা প্রাচীন ভারতের প্রতিমূর্তি নির্মাণ অসম্ভব— প্রকৃষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া রীতিমতো ইতিহাসের সাহায্য ব্যতীত আর গতি নাই। একজন চাষা বলিয়াছিল, আমি যদি রানী রাসমণি হইতাম তবে দক্ষিণে একটা চিনির হাঁড়ি রাখিতাম, বামে একটা চিনির হাঁড়ি রাখিতাম, একবার ডান দিক হইতে একমুষ্টি লইয়া খাইতাম একবার বাম দিক হইতে একমুষ্টি লইয়া মুখে পুরিতাম। বলা বাহুল্য, চিনির প্রাচুর্যে রানী রাসমণির এতাধিক সন্তোষ ছিল না। রমেশবাবুও প্রমাণ পাইয়াছেন প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মণ্য ও সাত্ত্বিকতারই সর্বগ্রাসী প্রাদুর্ভাব ছিল না; মৃত্যুর যেরূপ একটা ভয়ানক নিশ্চল ভাব আছে তখনকার সমাজনিয়মের মধ্যে সেরূপ একটা অবিচল শ্বাসরোধী চাপ ছিল না, তখন বর্ণভেদ প্রথার মধ্যেও সজীব স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু চিনিকেই যে লোক সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য বলিয়া স্থির করিয়াছে, তাহাকে রানী রাসমণির আহারের বৈচিত্র্য কে বুঝাইতে পারিবে?— দুর্ভাগ্যক্রমে একটি মত বহুকাল হইতে প্রচারিত হইয়াছে যে, হিন্দুসমাজের পরিবর্তন হয় নাই। সেই কথা লইয়া আমরা গর্ব করিয়া থাকি যে আমাদের সমাজ এমনি সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল যে সহস্র বৎসরে তাহার এক তিল পরিবর্তন সাধন করিতে পারে নাই। জগতের কোথাও কিছুই থামিয়া নাই, হয় সংস্কার নয় বিকারের দিকে যাইতেছে; যখন গঠন বন্ধ হয় তখনই ভাঙন আরম্ভ হয় জীবনের এই

নিয়ম। জগতের মধ্যে কেবল হিন্দুসমাজ থামিয়া আছে। হিন্দুসমাজের শ্রেষ্ঠতার পক্ষে সেই একটি প্রধান যুক্তি, এ সমাজ সাধারণ জগতের নিয়মে চলে না, এই ঋষি-রচিত সমাজ বিশ্বামিত্র-রচিত জগতের ন্যায় সৃষ্টিছাড়া। কিন্তু ইঁহারা এক মুখে দুই কথা বলিয়া থাকেন। একবার বলেন হিন্দুসমাজ নির্বিকার নিশ্চল, আবার সময়ান্তরে পতিত ভারতের জন্য বর্তমান অনাচারের জন্য কণ্ঠ ছাড়িয়া বিলাপ করিতে থাকেন। কিন্তু পতিত ভারত বলিতে কি প্রাচীন ভারতবর্ষের বিকার বুঝায় না? সেই হিন্দুধর্ম সেই হিন্দুসমাজ সবই যদি ঠিক থাকে তবে আমরা নূতনতর জীব কোথা হইতে আসিলাম? 'য়ুরোপীয় মহাদেশ' লেখাটি সন্তোষজনক নহে। কতকগুলা নোট এবং ইংরাজি, বাংলা, ফরাসি (ভুল বানানসমেত) একত্র মিশাইয়া সমস্ত ব্যাপারটা অত্যন্ত অপরিষ্কার এবং অসংলগ্ন হইয়াছে। বাংলা লেখার মধ্যে অনেকখানি করিয়া ইংরাজি এই পত্রে অন্যান্য প্রবন্ধেও দেখা যায় এবং সকল সময়ে তাহার অত্যাবশ্যকতা বুঝা যায় না। 'বঙ্গবাসীর মৃত্যু' প্রবন্ধে লেখক বড়ো বেশি হাঁসফাঁস করিয়াছেন; লেখক যত সংযত ভাবে লিখিতেন লেখার বল তত বৃদ্ধি পাইত। হৃদয়ের উত্তাপ অতিমাত্রায় রচনার মধ্যে প্রয়োগ করিলে অনেক সময়ে তাহা বাষ্পের মতো লঘু হইয়া যায়।

সাহিত্য। অগ্রহায়ণ।

বর্তমান-সংখ্যক সাহিত্যে 'আহার' সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহার বিস্তারিত সমালোচনা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।[1] 'প্রাকৃতিক নির্বাচনে' চন্দ্রশেখরবাবু ডারুয়িনের মতের কিয়দংশ সংক্ষেপে সরল ভাবায় ব্যক্ত করিয়াছেন। 'মুক্তি' একটি ছোটো গল্প। কতকটা রূপকের মতো। কিন্তু আমরা ইহার উপদেশ সম্যক্ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। মুক্তি যে সংসারের বাহিরে হিমালয়ের শিখরের উপরে প্রাপ্তব্য তাহা সংগত বোধ হয় না। মুক্তি অর্থে আত্মার স্বাধীনতা, কিন্তু স্বাধীনতা অর্থে শূন্যতা নহে। অধিকার যত বিস্তৃত হয় আত্মার ক্ষেত্র ততই ব্যাপ্ত হয়। সেই অধিকার বিস্তারের উপায় প্রেম। প্রেমের বিষয়কে বিনাশ করিয়া মুক্তি নহে, প্রেমের বিষয়কে ব্যাপ্ত করিয়াই মুক্তি। বৈষয়িক স্বার্থপরতায় আমরা সমস্ত সুখ সম্পদ কেবল নিজের জন্য সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করি— কিন্তু সুখকে অনেকের মধ্যে বিভাগ করিয়া না দিলে সুখের প্রসারতা হয় না— এইজন্য কৃপণ প্রেমের বৃহত্তর সুখ হইতে বঞ্চিত হয়। আত্মসুখে বিশ্বসুখকে বাদ দিলে আত্মসুখ অতি ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে। তেমনি আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতায় আমরা আপনার আত্মাটি কক্ষে লইয়া অনন্ত বিশ্বকে লঙ্ঘন করিয়া একাকী মুক্তিশিখরের উপরে চড়িয়া বসিতে চাহি। কিন্তু প্রেমের মুক্তি সেরূপ নহে— যে বিশ্বকে ঈশ্বর ত্যাগ করেন নাই, সে বিশ্বকে সেও ত্যাগ করে না। যে দিন নিখিলকে আপনার ও আপনাকে নিখিলের করিতে পারিবে সেই দিনই তাহার মুক্তি। কিন্তু তাহার পূর্বে অসংখ্য সোপান আছে তাহার কোনোটিকে অবহেলা করিবার নহে। অধিকারের স্বাধীনতা এবং অধিকারহীনতার স্বাধীনতায় আকাশপাতাল প্রভেদ। —চীন পরিব্রাজক হিউএন্ সঙের ভ্রমণবৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় 'প্রাচীন ভারতবর্ষ' নামে খৃ. সপ্তম শতাব্দীর ভারতবর্ষের একটি চিত্র প্রকাশ করিতেছেন। নাম লইয়া তারিখ লইয়া কেবল তর্কবিতর্কের আবর্ত রচনা না করিয়া প্রাচীন কালের এক-একটি চিত্র অঙ্কিত করিলে পাঠকদিগের বাস্তবিক উপকার হয়। গুপ্ত মহাশয় যদি ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের সামাজিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার প্রণালী তৎসাময়িক সাহিত্য ও অন্যান্য প্রমাণ হইতে উদ্ধার করিয়া চিত্রবৎ পাঠকদের সম্মুখে ধরিতে পারেন তবে সাহিত্যের একটি মহৎ অভাব দূর হয়।

সাধনা

পৌষ ১২৯৮

---

১. দ্র. "আহার সম্বন্ধে চন্দ্রনাথবাবুর মত", সমাজ, পরিশিষ্ট, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২, পৃ. ৪৬২

নব্যভারত। পৌষ [১২৯৮]

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই সংখ্যায় 'হিন্দু আর্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস' প্রবন্ধে প্রাচীন হিন্দুদিগের সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবন বর্ণনা করিয়াছেন। কথায় কথায় তুমুল তর্কবিতর্কের ঝড় না তুলিয়া এবং মাকড়সার জালের মতো চতুর্দিকে ইংরাজি বাংলা নোটের দ্বারা মূল কথাটাকে আচ্ছন্ন ও লুপ্তপ্রায় না করিয়া তিনি প্রাচীন ইতিহাসকে ধারাবাহিক চিত্রের ন্যায় পাঠকের সম্মুখে সুন্দররূপে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেছেন এজন্য আমরা লেখকের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। অজীর্ণ অন্নকে জীর্ণ অন্নের অপেক্ষা অধিক গুরুভার বলিয়া অনুভব হয়, সেই কারণে রমেশবাবুর এই ঐতিহাসিক প্রবন্ধ অনেক পাঠকের নিকট তেমন গুরুতর বলিয়া প্রতিভাত হইবে না; তাঁহারা মনে করিবেন ইহাতে যথেষ্ট 'গবেষণা' প্রকাশ হয় নাই; পড়িতে নিতান্ত সহজ হইয়াছে। বিপর্যয় পাণ্ডিত্য এবং ঐতিহাসিক ব্যায়াম-নৈপুণ্য আমরা বিস্তর দেখিয়াছি। তর্কের ধুলায় অস্পষ্ট প্রাচীন জগৎ উত্তরোত্তর অস্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে; রমেশবাবু নিজের পাণ্ডিত্য আড়ালে রাখিয়া আলোচ্য বিষয়টিকেই যে প্রকাশমান করিয়া তুলিয়াছেন, ইহাতে আমরা বড়ো আনন্দ লাভ করিয়াছি। লতাগুল্মসমাকীর্ণ অন্ধকার অরণ্যপথ ছাড়িয়া সহসা যেন একেবারে রাজপথে আসিয়া পড়িয়াছি।

সাহিত্য। পৌষ [১২৯৮]

পূর্ব মাস হইতে সাহিত্যে 'রায় মহাশয়' নামক এক উপন্যাস বাহির হইতেছে। গল্পটি শেষ না হইলে কোনো মত দেওয়া যায় না। এই পর্যন্ত বলিতে পারি ভাবাটি পরিষ্কার এবং সরস, ও পল্লিগ্রামের জমিদারি সেরেস্তার বর্ণনা অতিশয় যথাযথরূপে চিত্রিত হইতেছে। মাননীয়া শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাস 'অশিক্ষিতা ও দরিদ্রা নারী' নামক প্রবন্ধে স্ত্রীজাতি, যে, 'সকল দেশে ও সকল অবস্থাতেই একরূপ কোমল প্রেমে ভূষিত, একরূপ সহিষ্ণুতায় মণ্ডিত ও একপ্রকার দৃঢ়তায় আবৃত' তাহাই প্রমাণ করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন 'এ জগতে যদি তাহাদের সেই কোমলতা, সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তার অপব্যবহার না হইত, তাহা হইলে, আজ আর নারীজাতির শ্রেষ্ঠতার বিষয়ে তর্কবিতর্কের কিছুমাত্র আবশ্যক রহিত না।' এখনো কোনো আবশ্যক দেখি না। যাহা সত্য তাহা স্বতই সত্য, তর্কবিতর্কের সাহায্যবশতই সত্য নহে। নিকৃষ্টতা কখনোই শ্রেষ্ঠতাকে পরাভূত করিয়া রাখিতে পারে না। অতএব শ্রেষ্ঠতা আপনিই প্রতিপন্ন হইবে। কেহ যদি-বা মুখে তাহাকে অস্বীকার করে তাহাতে তাহার কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, কারণ, কার্যে তাহার গৌরব স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু আজকাল কোনো কোনো নারীলেখক এই প্রমাণকার্যে এতই প্রাণপণে লাগিয়াছেন যে, মনে হয়, এ বিষয়ে যেন তাঁহাদের নিজেরই মনে কথঞ্চিৎ সংশয় আছে। আমার বোধ হয় স্বশ্রেণীর শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে অতিমাত্র সচেতন না হইয়া নিরভিমান ও সহজভাবে আত্মকর্তব্য সম্পন্ন করিয়া যাওয়ার মধ্যে একটি সুন্দর শ্রেষ্ঠতা আছে; আজকাল নারীগণ সেই শ্রেষ্ঠতা হইতে বিচ্যুত হইবার আয়োজন করিতেছেন। আর-একটি কথা আছে; যে রমণীগণ আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিতেছেন তাঁহাদের এইটি স্মরণ রাখা উচিত যে, যুগযুগান্তর হইতে যে কর্তব্যপথ অবলম্বন করিয়া তাঁহারা আজি এই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন, সে পথ ত্যাগ করিলে ক্রমশ কীরূপ অবস্থা ঘটিবে বলা কঠিন। নারী নারী বলিয়াই শ্রেষ্ঠ, তিনি পুরুষের কার্যে হস্তক্ষেপ করিলে যে শ্রেষ্ঠতর হইবেন তাহা নহে বরং বিপরীত ঘটিতে পারে; তাহাতে তাঁহাদের চরিত্রের কোমলতা, সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তার সামঞ্জস্য নষ্ট হওয়া আশ্চর্য নহে।— বর্তমান সংখ্যায় সাহিত্যসম্পাদক মহাশয় সাধনার সমালোচনা প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে সবিশেষ উৎসাহিত করিয়াছেন।

সাহিত্য ও বিজ্ঞান। কার্তিক [১২৯৮]

এই নামে এক নূতন মাসিক পত্র বাহির হইতেছে। বর্তমান সংখ্যায় শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ

দেউস্কর 'এটা কোন্ যুগ' নামক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। লেখাটি বিশেষ কৌতুকাবহ। লেখক মনুসংহিতা, মহাভারত ও হরিবংশ হইতে দেখাইয়াছেন যে সত্যযুগ চারি সহস্র বৎসরে, ত্রেতাযুগ তিন সহস্র বৎসরে, দ্বাপরযুগ দুই সহস্র বৎসরে ও কলিযুগ এক সহস্র বৎসরে সম্পূর্ণ হয়। সর্বসমেত চারি যুগের পরিমাণ দ্বাদশ সহস্র বৎসর। প্রচলিত পঞ্জিকানুসারে কলিযুগ আরম্ভের পর ৪৯৯২ বৎসর অতীত হইয়াছে। সুতরাং মনুর মতে খৃস্টজন্মের ১৯০০ বৎসর পূর্বেই কলিযুগ শেষ হইয়াছে। তবে এখন এটা কোন্ যুগ। কুল্লুকভট্ট ও মেধাতিথি ইহার মীমাংসা চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন এই-সকল যুগবৎসর দৈব বৎসর। বাইবেলের সাপ্তাহিক সৃষ্টি বর্ণনার সহিত বিজ্ঞানের ঐক্য হয় না দেখিয়া য়ুরোপের অনেক খৃস্টান এইরূপ দৈব দিনের কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু এই দৈব বৎসরের কথা লেখক পরিষ্কাররূপে খণ্ডন করিয়াছেন। লেখক যে প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন তাহার কোনো উত্তর দেন নাই। উত্তর দেওয়াও কঠিন বটে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি আজকাল হঠাৎ সত্যযুগের লক্ষণ দেখা দিয়াছে; আর কোথাও না হৌক বাংলা দেশে। ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে কলির কুয়াশা ক্রমেই কাটিয়া উঠিতেছে এবং এক রাত্রির মধ্যেই আধ্যাত্মিকতার নব নব কুশাঙ্কুর সূচির মতো জাগিয়া উঠিয়া গত কলিযুগের বকেয়া পাপীদিগের পথ চলা বন্ধ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে। অতএব পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের পূর্বাচলে নব সত্যযুগের অভ্যুদয় যে আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সাধনা
মাঘ ১২৯৮

সাহিত্য। মাঘ [১২৯৮]

—লয়।[১] এই প্রবন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ চন্দ্রনাথবাবু পরব্রহ্মে বিলীন হইবার কামনা ও সাধনাই যে হিন্দুর হিন্দুত্ব তাহাই নির্দেশ করিয়াছেন। এবং প্রবন্ধের উপসংহারে আক্ষেপ করিয়াছেন য়ুরোপের সংস্পর্শে আমাদের এই জাতীয়তা সংকটাপন্ন হইয়াছে, অতএব তাহা প্রাণপণে রক্ষা করা আমাদের সকলের একান্ত কর্তব্য। এ সম্বন্ধে আমাদের গুটিকতক কথা বলিবার আছে। ব্রহ্মে বিলীন হইবার সাধনা জাতীয়তা রক্ষার বিরোধী। কারণ সে সাধনার নিকট কোথায় গৃহবন্ধন, কোথায় সমাজবন্ধন, কোথায় জাতিবন্ধন! অতএব জাতীয়তা বিনাশচেষ্টাকেই যদি হিন্দুর জাতীয়তা বলা হয় তবে সে জাতীয়তা ধ্বংস করাই, যে, আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্যে তাহা অস্বীকার করা যায় না। জগৎকে মায়া এবং চিত্তবৃত্তিকে মোহ বলিয়া স্থির করিলে বিজ্ঞানচর্চা বিদ্যাচর্চা সৌন্দর্যচর্চা সমস্তই নিষ্ফল এবং অনিষ্টকর বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। আমি ছাড়া যতদিন আর-কিছুকে দেখিতে পাইব অনুভব করিতে পারিব ততদিন আমি মায়াবদ্ধ; যখন আমি ছাড়া আর কেহ নাই কিছু নাই, অতএব যখন আমিও নাই (কারণ, অন্যের সহিত তুলনা করিয়াই আমির আমিত্ব) তখন সাধনার শেষ, মায়ামোহের বিনাশ। এমন সর্বনাশিনী জাতীয়তা যদি হতভাগ্য হিন্দুর স্কন্ধে আবির্ভূত হইয়া থাকে তবে সেটাকে প্রাণপণে বিলুপ্ত করা আমাদের সকলের একান্ত কর্তব্য। এই অসীম বৈরাগ্যতত্ত্ব আমাদের হিন্দুসমাজের অন্তরে অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে এ কথা সত্য; তাহার ফল হইয়াছে আমাদের এ কূল ও কূল দুই গেছে। প্রত্যেকে এক-একটি সোহহং ব্রহ্ম হইতেও পারি নাই অথচ মনুষ্যত্ব একেবারে নির্জীব হইয়া আছে। মরণও হয় না, অথচ ষোলো আনা বাঁচিয়াও নাই। প্রকৃতিনিহিত প্রীতিবৃত্তিকে দর্শনশাস্ত্রের বিরাট পাষাণ একেবারে পিষিয়া ফেলিতে পারে নাই অথচ তাহার কাজ করিবার বল ও উৎসাহ যথাসম্ভব অপহরণ করা হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে এরূপ বিরাট নাস্তিকতা মহামারীর মতো সমস্ত বৃহৎ জাতিকে একেবারে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিতে পারে না। সেইজন্য আমাদের দেশে মুখে মুখে

১. দ্র. "চন্দ্রনাথবাবুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব" এবং "নব্যলয়তত্ত্ব", বর্তমান গ্রন্থ, পৃ. ৪১৬-৪২৩

বৈরাগ্যের কথা প্রচলিত, কিন্তু তৎসত্ত্বেও মানুষের প্রতি, সংসারের প্রতি, সৌন্দর্যের প্রতি নিগূঢ় অনুরাগ চিরানন্দস্রোতে মনুষ্যত্বকে যথাসাধ্য সতেজ ও সফল করিয়া অন্তরে অন্তরে প্রবাহিত হইতেছে। বিরাট নিপীড়নে সেই প্রেমানন্দকে পরাহত করিতে পারে নাই বলিয়াই চৈতন্য আসিয়া যেমনি প্রেমের তান ধরিলেন অমনি 'বিরাট' হিন্দুর 'বিরাট' হৃদয়ের কঠোর পাষাণ ভেদ করিয়া প্রেমের স্রোত আনন্দধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। আবার কি সেই বিরাট পাষাণখানাকে তিল তিল করিয়া গড়াইয়া জগতের অনন্ত জীবন-উৎসের মুখদ্বারে তুলিয়া বিরাট হিন্দুর বিরাট জাতীয়তা রক্ষা করিতে হইবে? কিন্তু হে বিরাট বিরাগী সম্প্রদায়, এ স্রোত তোমাদের দর্শনশাস্ত্রের সাধ্য নহে রুদ্ধ করা; যদি বা কিছুকালের মতো কিয়ৎপরিমাণে প্রতিহত থাকে আবার একদিন চতুর্গুণ বলে সমস্ত বাধা বিদীর্ণ করিয়া শাস্ত্রদগ্ধ শুষ্ক শূন্য বিরাট বৈরাগ্যমরুকে প্রাণ-স্রোতে প্লাবিত করিয়া কোমল করিয়া শ্যামল করিয়া সুন্দর করিয়া তুলিবে।

আমাদের আর-একটি কথা বলিবার অছে। আজকাল আমরা যখন স্বজাতির গুণগরিমা-কীর্তনে প্রবৃত্ত হই, তখন আমরা অন্য জাতিকে খাটো করিয়া আপনাদিগকে বড়ো করিতে চেষ্টা করি। তাহার একটা উপায়, স্বদেশে যে মহোচ্চ আদর্শ কেবল শাস্ত্রেই আছে সাধারণের মধ্যে নাই তাহার সহিত অন্য দেশের সাধারণ-প্রচলিত জীবনযাত্রার তুলনা করা। দুঃখের বিষয়, চন্দ্রনাথবাবুর লেখাতেও সেই অন্যায় অনুদারতা প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি বলিতে চান হিন্দুরা কেবল ব্রহ্মত্ব লাভের জন্যেই নিযুক্ত, আর য়ুরোপীয়েরা কেবল আত্মসুখের জন্যই লালায়িত। তিনি একদিকে বিষ্ণুপুরাণ হইতে প্রহ্লাদচরিত্র উদ্‌ধৃত করিয়াছেন, অন্য দিকে য়ুরোপীয়দের কথায় বলিয়াছেন 'ক্ষুধায় অন্ন এক মুঠা কম পাইলে, তৃষ্ণায় জল এক গণ্ডূষ কম পাইলে, শীতে একখানি কম্বল কম হইলে, চায়ের বাটিতে এক ফোঁটা চিনির অভাব হইলে, স্নান করিয়া একখানি বুরুশ না পাইলে, বেশবিন্যাসে একটি আলপিন কম হইলে তাহারা কাঁদিয়া রাগিয়া চেঁচাইয়া মহাপ্রলয় করিয়া তোলে।'

চন্দ্রনাথবাবু যদি স্থিরচিত্তে প্রণিধান করিয়া দেখেন তো দেখিতে পাইবেন, আমাদের দেশেও আদর্শের সহিত আচরণের অনেক প্রভেদ। নির্গুণ ব্রহ্ম হইয়া যাওয়া যদি আমাদের আদর্শ হয় তবে ব্যবহারে তাহার অনেক বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। এত দেব এত দেবী এত কাষ্ঠ এত পাষাণ এত কাহিনী এত কল্পনার দ্বারা ব্রহ্মের উচ্চ আদর্শ কোন্ দেশে আচ্ছন্ন করিয়াছে! আমাদের দেশের নরনারীগণ কি প্রতিদিন মৃন্মূর্তির নিকট ধন পুত্র প্রভৃতি ঐহিক সুখসম্পত্তি প্রার্থনা করিতেছে না? মিথ্যা মকদ্দমায় জয়লাভ করিবার জন্য তাহারা দেবীকে কি বলির প্রলোভন দেখাইতেছে না? নিরপরাধী বিপক্ষকে বিনাশ করিবার জন্য তাহারা কি দেবতাকে নিজপক্ষ অবলম্বন করিতে স্তুতিবাক্যে অনুরোধ করিতেছে না? তাহারা কি নিজের স্বাস্থ্যের জন্য স্বস্ত্যয়ন ও প্রতিযোগীর ধ্বংসের জন্য হোমযাগ করে না? রাগদ্বেষ হিংসা মিথ্যাব্যবহার এবং বিবিধ কলঙ্কমসি দ্বারা তাহারা কি আপনাদের দেবচরিত্র অঙ্কিত করে নাই? শাস্ত্রের মধ্যে নিরঞ্জন ব্রহ্ম এবং মন্দিরের মধ্যে বিকৃত কল্পনা এমন আর কোথায় আছে!

অতএব তুলনার স্থলে আমাদের দেশের আদর্শের সহিত য়ুরোপের আদর্শের তুলনাই ন্যায়সংগত।

য়ুরোপীয় সভ্যতার আদর্শ আত্মসুখ নহে, বিশ্বসুখ। মনুষ্যত্বের চরম পরিণতি সাধনই তাহার সাধনার বিষয়। জ্ঞান এবং প্রেম, 'মাধুর্য এবং জ্যোতি' সমস্ত মানব-সাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দেওয়া তাহার উদ্দেশ্য। তাহাদের কবি সেই গান গাহিতেছে, তাহাদের মহাপুরুষ ও মহানারীগণ সেই উদ্দেশ্যে দেশদেশান্তরে জীবন বিসর্জন করিতেছে। আবার এদিকে সাধারণের মধ্যে আত্মসুখান্বেষণও বড়ো কম নহে; এদিকে পরের ধনে লোভ দিতে, পরের অন্ন কাড়িয়া খাইতে, পরের সুখ ছারখার করিতে ইহারা সকল সময়ে বিমুখ নহে। এবং এক দিকে ইহারা হিংস্র বিদেশের মরুনির্বাসনে একাকী ধর্মপ্রচার করিতে ও তুষার-কঠিন দুর্গম উত্তর মেরুর নিষ্ঠুর

শীতের মধ্যে জ্ঞানান্বেষণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না, অন্য দিকে স্নানের পর বুরুশ না পাইলে এবং বেশবিন্যাসে আলপিনটি কম হইলে বাস্তবিক অস্থির হইয়া পড়ে। মানুষ এমনি মিশ্রিত, এমনি অদ্ভুত অসম্পূর্ণ জীব।

সর্বশেষে পাঠকদিগকে একটি কথা বলিয়া রাখি। আমরা য়ুরোপীয় সভ্যতার যে আদর্শভাব উপরে উল্লেখ করিয়াছি বঙ্কিমবাবু তাঁহার 'ধর্মতত্ত্বে' লিখিয়াছেন আমাদের হিন্দুধর্মেরও সেই আদর্শ— অর্থাৎ মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশসাধন। চন্দ্রনাথবাবুর মতে হিন্দুধর্মের আদর্শ মনুষ্যত্বের পূর্ণ ধ্বংসসাধন। তিনি বলেন হিন্দুধর্মের মূল মন্ত্র প্রলয়। এখন হিন্দুগণ বঙ্কিমবাবুর মতে বাঁচিবেন কি চন্দ্রনাথবাবুর মতে মরিবেন সেই একটা সমস্যা উঠিতে পারে। আমরা এ বিষয়ে একটা মত স্থির করিয়াছি। আমরা জীবনের প্রয়াসী, এবং ভরসা করি, লয় ব্যাপারটা যতই 'বিরাট' হোক তাহার এখনো বিস্তর বিলম্ব আছে।

সাধনায় [অগ্রহায়ণ ১২৯৮] আমরা 'শিক্ষিতা নারী' নামক প্রবন্ধের যে সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছিলাম বর্তমান সংখ্যায় তাহার উত্তর বাহির হইয়াছে। লেখিকা বলিয়াছেন আমরা তাঁহার প্রবন্ধের মর্ম ভুল বুঝিয়াছিলাম। ভুল বুঝিবার কিঞ্চিৎ কারণ ছিল। তিনি আমেরিকার স্ত্রী-অ্যাটর্নি, স্ত্রী-বক্তা প্রভৃতি প্রবলা রমণীদের কথা এমনভাবে লিখিয়াছিলেন যাহাতে সহজেই মনে হইতে পারে যে, তিনি উক্ত ধনোপার্জনকারিণীদিগকে প্রধানত, শিক্ষিতা নারীর আদর্শস্থলরূপে খাড়া করিতে চাহেন। তাঁহার যদি এরূপ উদ্দেশ্য না থাকে তবে আমাদের সহিত তাঁহার মতান্তর দেখি না। কেবল এখনও তিনি 'নারীজাতির অবরোধ ও অশিক্ষিত জীবনের মূলে যে পুরুষের স্বার্থপরতা বা উৎপীড়ন' এ অভিযোগ ছাড়েন নাই। লেখিকা ভাবিয়া দেখিবেন 'মূল' বলিতে অনেকটা দূর বুঝায়। যদি আমরা বাঙালিরা বলি ইংরাজের স্বার্থপরতাই বাঙালির জাতীয় অধীনতার মূল তাহা হইলে তাহাতে দুর্বল প্রকৃতির বিবেচনাশূন্য কাঁদুনি প্রকাশ পায় মাত্র। ইংরাজ আপন স্বার্থপর প্রবৃত্তি আমাদের উপর খাটাইতেই পারিত না যদি আমরা গোড়ায় দুর্বল না হইতাম। অতএব স্বার্থপরতাকেই মূল না বলিয়া দুর্বলতাকেই মূল বলিয়া ধরা আবশ্যক। সকলপ্রকার অধীনতারই মূলে দুর্বলতা। লেখিকা বলিতে পারেন যে, এই সুসভ্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে শারীরিক দুর্বলতাকে দুর্বলতা বলাই উচিত হয় না। কিন্তু বুদ্ধিচর্চা এবং জ্ঞানোপার্জনও বলসাধ্য। দুই জন লোকের যদি সমান বুদ্ধি থাকে এবং তাহাদের মধ্যে একজনের শারীরিক বল অধিক থাকে তবে বলিষ্ঠ ব্যক্তি বুদ্ধি-সংগ্রামেও অন্যটিকে পরাভূত করিবে, শরীর ও মনের মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। তবে যদি প্রমাণ হয় স্ত্রীলোকের বুদ্ধিবৃত্তি পুরুষের অপেক্ষা অনেক বেশি তবে কথাটা স্বতন্ত্র হয়। যাহা হউক, প্রকৃতির পক্ষপাতের জন্য পুরুষকে অপরাধী করা উচিত হয় না। কারণ, পুরুষের পাপের বোঝা যথেষ্ট ভারী আছে। যেখানে ক্ষমতা সেখানে প্রায়ই ন্যূনাধিক অত্যাচার আছেই। ক্ষমতাকে সম্পূর্ণ সংযত করিয়া চলা সর্বসাধারণের নিকট প্রত্যাশা করা যায় না; সেই কারণে, রমণীর প্রতি পুরুষের উপদ্রবের অপরাধ পর্বত-প্রমাণ স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে; তাহার উপরে আবার একটা 'ওরিজিনাল্ সিন্' একটা মূল পাপ পুরুষের স্কন্ধে চাপানো নিতান্ত অন্যায়। সেটা পুরুষের নহে প্রকৃতির। রমণীর কাছে পুরুষেরা সহস্র প্রেমের অপরাধে চির অপরাধী সেজন্য তাঁহারা সুমধুর অভিমানে আমাদিগকে দণ্ডিত করেন, সে-সকল আইন ঘরে ঘরে প্রচলিত; এমন-কি, তাহার দণ্ডবিধি বঙ্গসাহিত্যে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আজকাল নারীরা পুরুষের নামে এ কী এক নূতন অভিযোগ আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন এবং আমাদিগকে নীরস ও নিষ্ঠুরভাবে ভর্ৎসনা করিতেছেন। এরূপ অশ্রুজলশূন্য শুষ্ক শাসনের জন্য আমরা কোনোকালে প্রস্তুত ছিলাম না; এটা আমাদের কাছে নিতান্ত বেআইনি রকম ঠেকিতেছে।— রমণী সৌন্দর্যে পুরুষের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (কেবল শারীরিক সৌন্দর্যে নহে)। দুর্ভাগ্যক্রমে মানবসমাজে সৌন্দর্যবোধ অনেক বিলম্বে পরিণতি লাভ করে। কিন্তু অনাদৃত

সৌন্দর্যও প্রেমপরিপূর্ণ ধৈর্যের সহিত প্রতীক্ষা করিতে জানে; অন্ধবল তাহার সম্মুখে দম্ভ প্রকাশ করে বলিয়া বলের প্রতি তাহার কোনো ঈর্ষা নাই; সে সেই খেদে বলিষ্ঠ হইয়া বলকে অতিক্রম করিতে চায় না, সুন্দর হইয়া অতি ধীরে ধীরে জয়লাভ করে। যিশু খৃস্ট যেরূপ মৃত্যুর দ্বারা অমর হইয়াছেন সৌন্দর্য সেইরূপ উৎপীড়িত হইয়াই জয়ী হয়। অধৈর্য হইবার আবশ্যক নাই; নারীর আদর কালক্রমে আপনি বাড়িবে, সেজন্য নারীদিগকে কোমর বাঁধিতে হইবে না; বরঞ্চ আরও অধিক সুন্দর হইতে হইবে। রাবণের ঘরে সীতা অপমানিতা; সেখানে কেবল পশুবল, সেখানে সীতা বন্দিনী। রামের ঘরে সীতা সম্মানিতা; সেখানে বলের সহিত ধর্মের মিলন, সেখানে সীতা স্বাধীনা। ধৈর্যকঠিন প্রেমকোমল সৌন্দর্যের অলক্ষ্য প্রভাবে মনুষ্যত্ব বিকশিত হইতে থাকিবে এবং সেই মনুষ্যত্ব বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যথার্থ পৌরুষ যখন পরিণত হইয়া উঠিবে, তখন এই উদারহৃদয় পৌরুষই অনাদরের হাত হইতে সৌন্দর্যকে উদ্ধার করিবে; এজন্য নারীদিগকে লড়াই করিতে হইবে না।

সমালোচ্য প্রবন্ধের দুই-একটা বাংলা কথা আমাদের কানে নিরতিশয় বিলাতি রকম ঠেকিয়াছে এখানে তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না, মাননীয়া লেখিকা মার্জনা করিবেন। 'কর্ষিত বিচারশক্তি' 'মানসিক কর্ষণ' শব্দগুলা বাংলা নহে। একস্থানে আছে 'সংসারে যে গুরুতর কর্তব্য তাহার উপর অর্পিত হয়, তজ্জন্য, সমভাবময় হৃদয়ের ন্যায়, কর্ষিত মস্তকেরও একান্ত আবশ্যক।' 'সমভাবময় হৃদয়' কোন্ ইংরাজি শব্দের তর্জমা ঠাহর করিতে পারিলাম না সুতরাং উহার অর্থ নির্ণয় করিতে অক্ষম হইলাম; 'কর্ষিত মস্তক' কথাটার ইংরাজি মনে পড়িতেছে কিন্তু বাংলাভাষার পক্ষে এ শব্দটা একেবারে গুরুপাক।

'সোম' নামক প্রবন্ধে বৈদিক সোমরস যে সুরা অর্থেই ব্যবহৃত হইত না লেখক তাহাই প্রমাণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। 'সোম' বলিতে কী বুঝাইত ভবিষ্যৎসংখ্যক সাহিত্যে তাহার আলোচনা হইবে লেখক আশ্বাস দিয়াছেন। আমরা ঔৎসুক্যের সহিত প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম।

'রায় মহাশয়' গল্পে বাংলার জমিদারি শাসনের নিষ্ঠুর চিত্র বাহির হইতেছে। ক্ষমতাশালী লেখকের রচনা পড়িয়া সমস্তটা অত্যন্ত সত্যবৎ প্রতীয়মান হয়; আশা করি, ইহার মধ্যে কিছু কিছু অত্যুক্তি আছে।

সাধনা
ফাল্গুন ১২৯৮

নব্যভারত। মাঘ [১২৯৮]
'আলোক কি অন্ধকার?' সম্পূর্ণ অন্ধকার। এবং এরূপ লেখায় সে অন্ধকার দূর হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। কী করিলে ভারতবর্ষে জাতীয় জীবন সংঘটন হইতে পারিবে লেখক তাহারই আলোচনা করিয়াছেন। অবশেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 'হিন্দুধর্মের ন্যায় আর ধর্ম নাই, এমন কল্পবৃক্ষ আর জন্মিবে না— যাঁহার যে প্রকার ধ্যান-ধারণার শক্তি তিনি সেই প্রকারেই সাধনা করিতে পারেন; এমন ধর্ম আর কোথায়? ছিন্নভিন্ন ভারতকে আবার যদি কেহ এক করিতে পারে, আবার যদি কেহ ভারতকে উন্নত করিয়া তাহার শরীরে হৈমমুকুট পরাইতে পারে, তবে সে সনাতন হিন্দুধর্ম।' লেখক মনে করিতেছেন কথাটা সমস্ত পরিষ্কার হইয়া গেল এবং আজ হইতে তাঁহার পাঠকেরা কেবল কল্পবৃক্ষের হাওয়া খাইয়া ভারতের 'শরীরে হৈমমুকুট' পরাইতে থাকিবে, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। হিন্দুধর্ম কী? তাহা কবে ভারতবর্ষে ছিল না? তাহা কবেই বা ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া গেল? তাহাকে আবার কোথা হইতে আনিতে হইবে এবং কোন্ 'অবতার' আনিবেন? যাঁহার যেরূপ শক্তি তিনি তদনুসারেই সাধনা করিতে পারিবেন এমন বহুরূপী ধর্মের মধ্যে ঐক্যবন্ধন কোন্‌খানে? এবং এই হিন্দুধর্মের প্রভাবে আদিম বৈদিক সময়ের পরে কোন্ কালে ভারতবর্ষে জাতীয় ঐক্য ছিল?

'সাঁওতালের শ্রাদ্ধ প্রণালী' লেখাটি কৌতূহলজনক। 'জাতীয় একতা' প্রবন্ধে লেখক কৌতুক করিতেছেন কি জ্ঞান দান করিতেছেন সহসা বুঝা দুঃসাধ্য; এই পর্যন্ত বলা যায় দুইটির মধ্যে কোনো উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় নাই।

'দোকানদারী।' বঙ্গসাহিত্যে এই ধরনের অশ্রুগদ্‌গদ সানুনাসিক প্রলাপোক্তি উত্তরোত্তর অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। কোনো উচ্চশ্রেণীর সাময়িক পত্রে এরূপ গদ্যপ্রবন্ধ কেন স্থান প্রাপ্ত হয় বুঝা কঠিন।

সাহিত্য। ফাল্গুন [১২৯৮]

'সোম।' এই উৎকৃষ্ট প্রবন্ধে লেখক মহাশয় বেদ হইতে অনেকগুলি দৃষ্টান্ত উদ্‌ধৃত করিয়া প্রমাণ করিতেছেন বেদে সোম বলিতে ঈশ্বরপ্রেম বুঝায়। সোম বলিতে ঈশ্বরপ্রেম রূপকভাবে বুঝাইত, না তাহার প্রকৃত অর্থই এই, লেখক মহাশয় কোথাও তাহার আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে পড়িতেছে না। সুরাপানের আনন্দের সহিত ঈশ্বরপ্রেমানন্দের তুলনা অন্যত্রও পাওয়া যায়, হাফেজের কবিতা তাহার দৃষ্টান্তস্থল। রামপ্রসাদের কোনো গানেও তিনি সুরাকে আধ্যাত্মিক ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু তাহা হইতে প্রমাণ হয় না যে, তান্ত্রিকেরা কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক সুরাই সেবন করিয়া থাকেন। যাহা হউক, এখনো আমাদের সম্পূর্ণ সন্দেহ মোচন হয় নাই।

'আহার।' শ্রদ্ধাস্পদ লেখক মহাশয় বলেন 'আমাদের মহাজ্ঞানী ও সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকারেরা আহারকে ধর্মের অন্তর্গত করিয়া গিয়াছেন।' এই ভাবের কথা আমরা অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু ইহার তাৎপর্য সম্পূর্ণ বুঝিতে পারি না। অনেকেই গৌরব করিয়া থাকেন আমাদের আহার ব্যবহার সমস্তই ধর্মের অন্তর্ভূত— কিন্তু এখানে ধর্ম বলিতে কী বুঝায়? যদি বল ধর্মের অর্থ কর্তব্যজ্ঞান, মানুষের পক্ষে যাহা ভালো তাহাই তাহার কর্তব্য, ধর্ম এই কথা বলে, তবে জিজ্ঞাসা করি সে কথা কোন্‌ দেশে অবিদিত! শরীর সুস্থ রাখা যে মানুষের কর্তব্য, যাহাতে তাহার কল্যাণ হয় তাহাই তাহার অনুষ্ঠেয় এ কথা কে না বলে! যদি বল, এ স্থলে ধর্মের অর্থ পরলোকে দণ্ড-পুরস্কারের বিধান, অর্থাৎ বিশেষ দিনে বিশেষ ভাবে বিশেষ আহার করিলে শিবলোক প্রাপ্তি হইবে এবং না করিলে চতুর্দশ পুরুষ নরকস্থ হইবে, ধর্ম এই কথা বলে, তবে সেটাকে সত্য ধর্ম বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কোনো এক মহাজ্ঞানী সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকার লিখিয়া গিয়াছেন মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে গঙ্গাস্নান করিলে 'ত্রিকোটিকুলমুদ্ধরেৎ'; মানিয়া লওয়া যাক উক্ত ত্রয়োদশীতে নদীর জলে স্নান করিলে শরীরের স্বাস্থ্যসাধন হয়, কিন্তু ইহার মধ্যে গৌরবের অংশ কোন্‌টুকু? ওই পুরস্কারের প্রলোভনটুকু? কেবল ওই মিথ্যা প্রলোভন সূত্রে এই স্বাস্থ্যতত্ত্ব অথবা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের নিয়মটুকুকে ধর্মের সহিত গাঁথা হইয়াছে। নহিলে, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন করা ভালো, এবং যাহা ভালো তাহাই কর্তব্য এ কথা কোন্‌ দেশের লোক জানে না? আহারের সময় পূর্বমুখ করিয়া উপবেশন করিলে তাহাতে পরিপাকের সহায়তা ও তৎসঙ্গে মানসিক প্রসন্নতার বৃদ্ধি সাধন করে অতএব পূর্বমুখে আহার করা ধর্মবিহিত এ কথা বলিলে প্রমাণ লইয়া তর্ক উঠিতে পারে কিন্তু মূল কথাটা সম্বন্ধে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু যদি বলা হয় পূর্বমুখে আহার না করিলে অপবিত্র হইয়া ত্রিকোটিকুলসমেত নরকে পতিত হইতে হইবে, ইহা ধর্ম, অতএব ইহা পালন করিবে, তবে এ কথা লইয়া গৌরব করিতে পারি না। যাহার সত্য মিথ্যা প্রমাণের উপর নির্ভর করে, যে-সকল বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানোন্নতি সহকারে মতের পরিবর্তন কিছুই অসম্ভব নহে তাহাকে কী বলিয়া ধর্মনিয়মভুক্ত করা যায়? স্বাস্থ্য রক্ষা করা মানুষের কর্তব্য অতএব তাহা ধর্ম এ মূলনীতির কোনোকালে পরিবর্তন সম্ভব নহে, কিন্তু কোনো একটা বিশেষ উপায়ে বিশেষ দ্রব্য আহার করা ধর্ম, না করা অধর্ম, এরূপ বিশ্বাসে গুরুতর অনিষ্টের কারণ ঘটে।

মানব নীতির দুই অংশ আছে, এক অংশ স্বতঃসিদ্ধ, এক অংশ যুক্তিসিদ্ধ।* আধুনিক সভ্য জাতিরা এই দুই অংশকে পৃথক করিয়া লইয়াছেন; এই অংশকে ধর্মনৈতিক ও অপর অংশকে সামাজিক এবং রাজনৈতিক শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। একদিকে এই ধ্রুব শক্তি এবং অপর দিকে চঞ্চল শক্তির স্বাতন্ত্র্যই সমাজ-জীবনের মূল নিয়ম। সকলেই জানেন, আকর্ষণ শক্তি না থাকিলে জগৎ বাষ্প হইয়া অনন্তে মিশাইয়া যাইত এবং বিপ্রকর্ষণ শক্তি না থাকিলেও বিশ্বজগৎ বিন্দুমাত্রে পরিণত হইত। তেমনি অটল ধর্মনীতির বন্ধন না থাকিলে সমাজ বিচ্ছিন্ন হইয়া সমাজ-আকার ত্যাগ করে, এবং চঞ্চল লোকনীতি না থাকিলে সমাজ জড় পাষাণবৎ সংহত হইয়া যায়। আধুনিক হিন্দুসমাজে খাওয়া শোয়া কোনো বিষয়েই যুক্তির স্বাধীনতা নাই, সমস্তই এক অটল ধর্মনিয়মে বদ্ধ এ কথা যদি সত্য হয় তবে ইহা আমাদের গৌরবের আমাদের কল্যাণের বিষয় নহে। চন্দ্রনাথবাবুও অন্যত্র এ কথা একরূপ স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'হিন্দুশাস্ত্রের নিষিদ্ধ দ্রব্যের মধ্যে কোনোটি ভক্ষণ করিয়া যদি মানসিক প্রকৃতির অনিষ্ট না হয় তবে সে দ্রব্যটি ভক্ষণ করিলে তোমার হিন্দুয়ানিও নষ্ট হইবে না তোমার হিন্দু নামেও কলঙ্ক পড়িবে না।' অর্থাৎ এ-সকল বিষয় ধ্রুব ধর্ম-নিয়মের অন্তর্গত নহে। ইহার কর্তব্যতা প্রমাণ ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে।

কিন্তু এই একটিমাত্র কথায় চন্দ্রনাথবাবু বর্তমান হিন্দুসমাজের মূলে আঘাত করিতেছেন। আমি যদি বলি গোমাংস খাইলে আমার মানসিক প্রকৃতির অনিষ্ট হয় না, আমি যদি প্রমাণস্বরূপে দেখাই গোমাংসভুক্ যাজ্ঞবল্ক্য অনেক কুষ্মাণ্ডভুক্ স্মার্তবাগীশের অপেক্ষা উচ্চতর মানসিক প্রকৃতিসম্পন্ন, তবে কি হিন্দুসমাজ আমাকে মাপ করিবেন? যদি কোনো ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাস্পদ চন্দ্রনাথবাবুর সহিত একাসনে বসিয়া আহার করেন এবং প্রমাণ করেন তাহাতে তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রকৃতির কিছুমাত্র বিকার জন্মে নাই, তবে কি তাঁহার হিন্দুনামে কলঙ্ক পড়িবে না? যদি না পড়ে, এই যদি হিন্দুধর্ম হয়, হিন্দুধর্মে যদি মূল ধর্মনীতিকে রক্ষা করিয়া আচার সম্বন্ধে স্বাধীনতা দেওয়া থাকে তবে এতক্ষণ আমরা বৃথা তর্ক করিতেছিলাম।

'কাশ্মীর'। এরূপ সাময়িক প্রসঙ্গ লইয়া বাংলা কাগজে প্রায়ই লেখা হয় না। তাহার কারণ, উপযুক্ত লেখক পাওয়া কঠিন। কেবল অন্ধভাবে ইংরাজি কাগজের অনুবাদ বা প্রতিবাদ করিলে সকল সময়ে সত্য পাওয়া যায় না। নগেন্দ্রবাবু কাশ্মীরের বর্তমান বিপ্লব সম্বন্ধে এই যে প্রস্তাব লিখিয়াছেন ইহা কোনো কাগজের প্রতিধ্বনি নহে, ইহা তিনি যেন রঙ্গভূমিতে উপস্থিত থাকিয়া লিখিয়াছেন। সমালোচ্য প্রবন্ধটি বিশেষ সমাদরণীয়।

সাধনা
চৈত্র ১২৯৮

নব্যভারত। চৈত্র [১২৯৮]
—'পঞ্জিকা বিভ্রাট'। প্রবন্ধটি ভালো এবং আবশ্যক কিন্তু সাধারণের আয়ত্তগম্য নহে। 'জীবন ও কাব্য'।— লেখক বলিতেছেন, কবির জীবনের সঙ্গে তাঁহার কবিতার ঘনিষ্ঠ যোগ থাকে। গাছের সঙ্গে ফলের যোগ আছে বলাও যেমন বাহুল্য, কবির প্রকৃতির সঙ্গে কাব্যের প্রকৃতির যোগ আছে এ কথা বলাও তেমনি বাহুল্য। কিন্তু লেখক একটি নূতন সমাচার দিয়াছেন— তিনি বলেন বর্তমান বাংলা কবিদের জীবনের সহিত কাব্যের সামঞ্জস্য নাই। বঙ্গকবিদের জীবনবৃত্তান্ত লেখক কোথা হইতে সন্ধান করিয়া বাহির করিলেন বলা শক্ত। সামান্যতম মানবজীবনেও কত প্রহেলিকা

* এখানে আমরা তত্ত্ববিদ্যার তর্কে নামিতে চাহি না। বলা আবশ্যক, স্বতঃসিদ্ধ কিছু আছে বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন না।

কত রহস্য আছে, তাহা উদ্‌ভেদ করিতে কত যত্ন, কত নিপুণতা, কত সহৃদয়তার আবশ্যক। লেখক ঘরে বসিয়া অবজ্ঞাভরে বঙ্গ-কবিদের জীবনের উপর দিয়া যে, তাঁহার মহৎ লেখনীর একটা কালির আঁচড় চালাইয়া গিয়াছেন কাজটা তাঁহার মতো লোকের উচিত হয় নাই। কারণ, তাঁহার প্রবন্ধে তিনি খুব উচ্চদরের নীতি-উপদেশ দিয়াছেন, অতএব লেখার সহিত লেখকের জীবনের যদি অবশ্যম্ভাবী যোগ থাকে তবে তাঁহার নিকট হইতেও ন্যায়াচরণ সম্বন্ধে মহৎ দৃষ্টান্ত প্রত্যাশা করিতে পারি। যাহা হউক, একটা কথা স্মরণ রাখা উচিত— আজকালকার কবি যদি কাব্যে কাপট্য করেন সত্য হয়, যাঁহারা সমালোচনা করেন কবিকে উপদেশ দেন তাঁহারা যে অকৃত্রিম সারল্য প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহারও প্রমাণ আবশ্যক। আসল কথা, কাব্যই লিখুন আর সমালোচনাই লিখুন, সকল বিষয়েই অধিকার অনধিকার আছে, তাহাই বুঝিতে না পারিয়া অনেক লেখক মিথ্যা কাব্য লেখেন এবং অনেক সমালোচক কাব্য হইতে যথার্থ সত্য ও সৌন্দর্য উদ্ধার করিতে অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

'সুখাবতী'। বিখ্যাত ভ্রমণকারী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাস মহাশয় সুখাবতী অর্থাৎ বৌদ্ধ স্বর্গ সম্বন্ধে এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। হিন্দু-মুসলমানদের স্বর্গে যেরূপ ভোগের প্রলোভন আছে বৌদ্ধদের স্বর্গে সেরূপ নাই। বৌদ্ধ স্বর্গে প্রাণীগণ হিংসাদ্বেষ ভুলিয়া পরস্পরের উপকার ও সুখবর্ধনে নিযুক্ত। 'তাঁহাদের এই মূলমন্ত্র যে, জগতে যাহা-কিছু সুখ আছে, সমস্তই পরের উপকার করিতে বাসনা করিলেই লাভ করা যায়। স্বার্থচিন্তাতে কেবল অনবচ্ছিন্ন দুঃখরাশিই উৎপন্ন হইয়া থাকে, কল্পবৃক্ষগণেরও ফলপ্রদান সময়ে স্বভাবতই শরীর কম্পিত হইয়া থাকে, অপরিসীম ক্ষীর সমুদ্রও অমৃতাভিলাষী দেবগণ -কর্তৃক মথিত হইয়া কম্পিত হন, কিন্তু সুখাবতীবাসী বোধিসত্ত্বগণ পরার্থে শত শতবার শরীর দানে নিষ্কম্পভাবে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ। সে সময়ে তাঁহাদের দেহ আনন্দে পুলকোৎকর বহন করে।' আমরা এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম।

চৈত্র মাসের 'সাহিত্যে' শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় 'প্রাচীন ভারত' প্রবন্ধে খৃস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধ রাজা শিলাদিত্যের রাজত্বকালীন 'সন্তোষক্ষেত্রের উৎসব' ব্যাপারের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আমরা পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি। শিলাদিত্যের রাজত্বকালে পাঁচবার এই উৎসবকার্য যথাবিধি সম্পাদিত হইয়াছিল।...

গঙ্গাযমুনার সংগম-স্থল পরম পবিত্র প্রয়াগ এই মহোৎসবের ক্ষেত্র। এই স্থানের পাঁচ-ছয় মাইল পরিমাণের বিস্তীর্ণ ভূমিতে উৎসবকার্য সম্পন্ন হইত। দীর্ঘকাল হইতে এই ভূমি 'সন্তোষক্ষেত্র' নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছিল। এই ক্ষেত্রের চারি হাজার বর্গফিট পরিমিত ভূমি গোলাপ ফুলের গাছে পরিবেষ্টিত হইত। পরিবেষ্টিত স্থানের বৃহৎ বৃহৎ গৃহে, স্বর্ণ ও রৌপ্য, কার্পাস ও রেশমের নানাবিধ বহুমূল্য পরিচ্ছদ এবং অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য স্তূপাকারে সজ্জিত থাকিত। এই বেষ্টিত স্থানের নিকটে ভোজনগৃহ-সকল বাজারের দোকানের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধভাবে শোভা পাইত। এই-সমস্ত গৃহের এক-একটিতে একেবারে প্রায় সহস্র লোকের ভোজন হইতে পারিত। উৎসবের অনেক পূর্বে সাধারণ্যে ঘোষণা দ্বারা ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, নিরাশ্রয়, দুঃখী বা মাতাপিতৃহীন, আত্মীয়বন্ধুশূন্য, নিঃস্ব ব্যক্তিদিগকে নির্দিষ্ট সময়ে পবিত্র প্রয়াগে আসিয়া দানগ্রহণের জন্য আহ্বান করা হইত। মহারাজ শিলাদিত্য আপনার মন্ত্রী ও করদ রাজগণের সহিত এই স্থানে উপস্থিত থাকিতেন। বল্লভী-রাজ ধ্রুবপতু ও আসাম-রাজকুমার এই করদ রাজগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন। এই করদ রাজা ও মহারাজ শিলাদিত্যের সৈন্য, সন্তোষক্ষেত্রের চারি দিক বেষ্টন করিয়া থাকিত। ধ্রুবপতুর সৈন্যের বহুসংখ্য অভ্যাগত লোক আপনাদের তাম্বু স্থাপন করিত।

অসীম আড়ম্বরের সহিত উৎসবের কার্য আরম্ভ হইত। শিলাদিত্য বৌদ্ধধর্মের পরিপোষক

হইলেও হিন্দুধর্মের অবমাননা করিতেন না, তিনি ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, উভয়কেই আদরসহকারে আহ্বান করিতেন, এবং বুদ্ধের প্রতিকৃতি ও হিন্দু দেব-মূর্তি উভয়ের প্রতিই সম্মান দেখাইতেন। প্রথম দিন পবিত্র মন্দিরে বুদ্ধের প্রতিমূর্তি স্থাপিত হইত। এই দিনে সর্বাপেক্ষা বহুমূল্য দ্রব্য বিতরিত হইত, এবং সর্বাপেক্ষা সুখাদ্য দ্রব্য অতিথি-অভ্যাগতদিগকে দেওয়া যাইত। দ্বিতীয় দিনে বিষ্ণু ও তৃতীয় দিনে শিবের মূর্তি মন্দিরের শোভা বিকাশ করিত। প্রথম দিনের বিতরিত দ্রব্যের অর্ধাংশ এই এক-এক দিনে বিতরণ করা হইত। চতুর্থ দিন হইতে সাধারণ দান-কার্য আরম্ভ হইত। কুড়ি দিন ব্রাহ্মণ ও শ্রমণেরা, দশ দিন হিন্দু দেবতা-পূজকেরা, এবং দশ দিন উলঙ্গ সন্ন্যাসীরা দান গ্রহণ করিতেন। এতদ্‌ব্যতীত ত্রিশ দিন পর্যন্ত দরিদ্র নিরাশ্রয়, মাতাপিতৃহীন ও আত্মীয়স্বজনশূন্য ব্যক্তিদিগকে ধন দান করা হইত। সমুদয়ে পঁচাত্তর দিন পর্যন্ত উৎসবের কার্য চলিত। শেষদিনে মহারাজ শিলাদিত্য আপনার বহুমূল্য পরিচ্ছদ, মণিমুক্তা-খচিত স্বর্ণাভরণ, অত্যুজ্জ্বল মুক্তাহার প্রভৃতি সমুদয় অলংকার পরিত্যাগপূর্বক চীরশোভী বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশ পরিগ্রহ করিতেন। এই মহামূল্য আভরণরাশিও দরিদ্রদিগকে দান করা হইত। চীর ধারণ করিয়া মহারাজ শিলাদিত্য জোড় হাতে গম্ভীর স্বরে কহিতেন, 'আজ আমার সম্পত্তিরক্ষার সমুদায় চিন্তার অবসান হইল। এই সন্তোষক্ষেত্রে আজ আমি সমুদায় দান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। মানবের অভীষ্ট পুণ্য-সঞ্চয়ের মানসে ভবিষ্যতেও আমি এইরূপ দান করিবার জন্য আমার সমস্ত সম্পত্তি রাশীকৃত করিয়া রাখিব।' এইরূপে পবিত্র প্রয়াগে সন্তোষক্ষেত্রের উৎসব পরিসমাপ্ত হইত। মহারাজ মুক্তহস্তে প্রায় সমস্তই দান করিতেন। কেবল রাজ্য-রক্ষা ও বিদ্রোহ-দমন জন্য হস্তী, ঘোটক ও অস্ত্রাদি অবশিষ্ট থাকিত।

সাধনা

বৈশাখ ১২৯৯

নব্যভারত। বৈশাখ [১২৯৯]

'পুরাতন ও নূতন'। লেখক মহাশয়ের বক্তব্য এই যে, নূতন আসে এবং পুরাতন যায়— কিন্তু হায়, বর্তমান প্রবন্ধে সেই বিশ্বব্যাপী নিয়মের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। পদের পর পদ আসিতেছে, কিন্তু পুরাতন কথাও ঘুচে না নূতন কথাও জুটে না। কোনো কোনো মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলেন কথা ব্যতীত ভাবা অসম্ভব, সে কথা কত দূর সত্য বলিতে পারি না, কিন্তু দেখা যাইতেছে আমরা কিছুমাত্র না ভাবিয়াও অনর্গল কথা কহিয়া যাইতে পারি। অনেক স্থলে কথা কীটের মতো অতি দ্রুতবেগে আপনার বংশবৃদ্ধি করিয়া চলে, ভাবের জন্য অপেক্ষা করে না। যদি একবার দৈবাৎ কলমের মুখে বাহির হইল— 'নূতনের ধারে পুরাতন থাকে না' অমনি তাহার পর আরম্ভ হইল 'বৃক্ষে নূতন পত্রের উদ্‌গম হইলে পুরাতন পত্র খসিয়া পড়ে।' তস্য পুত্র : 'নূতন ফুল ফুটিতেছে দেখিলে পুরাতন ফুল ঝরিয়া পড়ে।' তস্য পুত্র : 'নবীন সূর্য উঠিতেছে দেখিলে চাঁদ পালায়।' তস্য পুত্র : 'নব বসন্ত আসিতেছে দেখিলে শীত অন্তর্ধান হয়।' তস্য পুত্র : 'নূতন বন্ধুর উদয়ে পুরাতন বন্ধু লজ্জায় মুখ নত করিয়া চলিয়া যায়।' (মানবের সৌভাগ্যক্রমে পুরাতন বন্ধুর এরূপ অকারণ অতিলজ্জাশীলতা সচরাচর দেখা যায় না।) তস্য পুত্র : 'নূতন বৎসর আসিতেছে দেখিয়া পুরাতন বৎসর থাকিবে কেন?' অবশেষে '৯৯ উদয়ে ওই দেখো ৯৮ সাল কালের গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে।' এতক্ষণে কারণটা পাওয়া গেল— নববর্ষ আসিয়াছে, অতএব সময়োচিত কতকগুলা বাক্যবিন্যাস অত্যাবশ্যক, অতএব প্রথা অনুসারে কালের গতি সম্বন্ধে উন্নতিজনক উপদেশ.হতভাগ্য পাঠককে নতশিরে সহ্য করিতে হইবে। তাই 'হ্রাসবৃদ্ধি' কাহাকে বলে সেই অতি নূতন ও দুরূহ তত্ত্বটি সম্পাদক মহাশয় দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে বসিয়াছেন, পাঠকেরাও অগত্যা কাঁচিয়া শিশু সাজিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন— 'হ্রাসবৃদ্ধির

কথাটা বলিয়াছি তো আর-একটু ভালো করিয়া বলি। ছোটো ছেলেটি ক্রমাগতই বড়ো হইতেছে। কত ভাব, কত শিক্ষা, কত রূপ, কত শোভা, কত বুদ্ধি, কত প্রতিভা ক্রমে ক্রমে ফুটিতেছে। ক্রমাগত সে বাড়িতেছে। কাল সে যেরূপ ছিল, আজ আর সেরূপ নয়। বাড়িতে বাড়িতে যখন সে বার্ধক্যে উপস্থিত, তখন আবার তাহার সব হ্রাস হইতে লাগিল। সৌন্দর্য ডুবিতেছে, বুদ্ধি কমিতেছে, স্মৃতি লোপ পাইতেছে। দন্ত নড়িল, চর্ম শিথিল হইল, কালো চুল পাকিল, সে ক্রমে ক্রমে আরও পুরাতন, আরও পুরাতন হইতে লাগিল। শেষে নবীনের পার্শ্বে আর দাঁড়াইতে না পারিয়া, নবীনকে সকল সম্পদ ছাড়িয়া দিয়া, লজ্জায় মুখ নত করিয়া মরণকে চুম্বন করিল। নূতন আসিল পুরাতন সরিল।'— ছোটো ছেলেটি যে ক্রমে বড়ো হয় এবং তাহার বুদ্ধিও বাড়ে এ কথা সম্পাদক মহাশয় স্পষ্ট বুঝিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন— কিন্তু তাঁহার পাঠকদের সম্বন্ধে কি এ নিয়ম খাটে না? তাহারা যদি যথেষ্ট বড়ো হইয়া থাকে সেইসঙ্গে তাহাদের বুদ্ধি বিকাশ কি হয় নাই? এরূপ লেখা পড়িতে পড়িতে অবশেষে লেখকের অদ্ভুত সংযমশক্তি দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হয়। লেখক যে বিস্তর কথা জোটাইতে পারেন ক্রমে সেটা আর তেমন আশ্চর্য বোধ হয় না; কিন্তু অবশেষে তাঁহাকেও যে একটা জায়গায় আসিয়া থামিতে হয় সেইটেই বিস্ময় এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা উৎপাদন করে। এ কথা দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে অবাধে বাক্য সৃষ্টি করিয়া যাওয়া এবং অবসর পাইলেই পুরাতন উপদেশের ঝুলি খুলিয়া বসা ব্রাহ্মদের অত্যন্ত অভ্যস্ত হইয়াছে।— 'মামলায় মরণ'। মামলা-মোকদ্দমা ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মড়কের ন্যায় আমাদের দেশে ব্যাপ্ত হইয়া কীরূপ সর্বনাশের উপক্রম করিয়াছে এই সুলিখিত প্রবন্ধটি পড়িলে হৃদয়ংগম হইবে। সকল ব্যাধিই আপন অনুকূল ক্ষেত্রে অতি শীঘ্র ফলবান হইয়া উঠে— সেই কারণে কূটবুদ্ধি বাঙালির ঘরে মামলা-মোকদ্দমার নিদারুণ প্রকোপ দেখা যাইতেছে। লেখক মহাশয় মামলার পরিবর্তে সালিশি নিষ্পত্তির পরামর্শ দিতেছেন। কিন্তু এ পরামর্শ কাহার কর্ণগোচর হইবে? দেশে এমন কয়টা মোকদ্দমা হয় যেখানে উভয় পক্ষই ন্যায্য নিষ্পত্তির প্রার্থী? অধিকাংশ স্থলেই, হয় দুই পক্ষেই নয় এক পক্ষে ফাঁকি দিতে চায়, সে অবস্থায় আদালতের মতো এমন সুবিধার জায়গা কোথায় পাওয়া যাইবে? মামলা তো একপ্রকার আইনসংগত জুয়াখেলা, অনেকটা দৈব এবং অনেকটা কৌশলের উপর জয়-পরাজয় নির্ভর করে। সেই খেলার সর্বনাশী উত্তেজনায় যাহারা সর্বস্ব পর্যন্ত পণ করিয়া বসে তাহাদিগকে উপদেশবাক্যে কে নিবৃত্ত করিবে? তাহারা বেশ জানে, মোকদ্দমার ফলাফল দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ, কিন্তু সেই তাহাদের পক্ষে প্রধান আকর্ষণ।— 'মুক্তিফৌজের অদ্ভুত কীর্তি' প্রবন্ধে জেনেরাল বুথ যে কীরূপ অসাধারণ উদ্যম, বুদ্ধি ও সহৃদয়তার সহিত পতিত-উদ্ধার কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া আর-কিছু না হউক আমাদের— বাঙালিদের— অত্যুগ্র আত্মাভিমান যদি ক্ষণকালের জন্য কিঞ্চিৎ হ্রাস হয় তো সেও পরম লাভ বলিতে হইবে।

সাহিত্য। বৈশাখ [১২৯৯]

'প্রভাবতী সম্ভাষণ'। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় -রচিত এই প্রবন্ধটি পাঠ করিলে হৃদয় করুণারসে আর্দ্র না হইয়া থাকিতে পারে না। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা প্রভাবতীকে বিদ্যাসাগর মহাশয় অপত্যনির্বিশেষে ভালোবাসিতেন। তাহার অকালমৃত্যুতে একান্ত ব্যথিত হইয়া প্রভাবতীর স্মৃতি চিরজাগরূক রাখিবার জন্য তিনি এই প্রবন্ধ রচনা করেন। ইহার একটি অংশ উদ্‌ধৃত করিয়া দিই।— লেখক মহাশয় প্রভাবতীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন— 'আমি বাহিরের বারান্ডায় বসিয়া আছি; তুমি, বাড়ির ভিতরের নীচের ঘরের জানালায় দাঁড়াইয়া আমার সঙ্গে কথোপকথন করিতেছ। এমন সময়ে, শশী (রাজকৃষ্ণবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র) কৌতুক করিবার নিমিত্ত বলিল, 'উনি আর তোমায় ভালো বাসবেন না।' তুমি অমনি শিরশ্চালনপূর্বক, 'ভালো বসবি, ভালো বসবি' এই কথা আমায় বারংবার বলিতে লাগিলে। অন্যান্য দিন, আমি, ভালো বাসিব

বলিয়া, অবিলম্বে তোমার শঙ্কা দূর করিতাম। সেদিন, সকলের অনুরোধে, আর ভালো বাসিব না, এই কথা বারংবার বলিতে লাগিলাম; তুমিও, প্রতিবারেই, 'না ভালো বস্‌বি' এই কথা বলিতে লাগিলে। অবশেষে, আমায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ স্থির করিয়া, তুমি, স্ফূর্তিহীন বদনে, 'তুই ভালো বস্‌বিনি, আমি ভালো বস্‌ব' এই কথা, এরূপ মধুর স্বরভঙ্গি ও প্রভূত স্নেহরসসহকারে বলিয়া বিরত হইলে, যে তদ্দর্শনে সন্নিহিত ব্যক্তি মাত্রেরই অন্তঃকরণ অননুভূতপূর্ব প্রীতিরসে পরিপূর্ণ হইল।'—

'মহারাষ্ট্রীয় ভাষার প্রাচীনত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব' প্রবন্ধটি বিশেষ অবধানযোগ্য। 'নূতন বাড়ি' গল্পটি পড়িয়া আমরা সন্তোষলাভ করিতে পারিলাম না— প্রভু মহেন্দ্রনাথবাবুকে কৌশলে আপনার সহিত বিবাহবন্ধনে বাঁধিবার জন্য বাগানের মালীর বিধবা কন্যা যে এমনতর আজগবি ফন্দি খাটায় সে আমাদের কাছে নিতান্ত সৃষ্টিছাড়া ঠেকিয়াছে।

সাধনা
জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

সাহিত্য। জ্যৈষ্ঠ [১২৯৯]
'লয়'। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য পূর্ব পত্রিকাতেই বলিয়াছি। 'প্রাইভেট্ টিউটার'।— পত্রের উত্তর-প্রত্যুত্তর অবলম্বন করিয়া একটি ছোটো গল্প। গল্পের উপসংহারটি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমাদের বরাবর ভয় ছিল পাছে সবশেষে, হয় একটা-দুটা আত্মহত্যা, নয় সমাজ-বিদ্রোহ, নয় কোনো রকমের একটা উৎকট কবিত্ব আসিয়া পড়ে। কিন্তু তাহা দূরে যাউক, লেখক এমতভাবে শেষ করিয়াছেন যে, নায়ক-নায়িকার প্রেমবৃত্তান্তটা অমূলক কি সমূলক পাঠকদের ধাঁধা লাগিয়া যায়। বিজয় তাঁহার শেষ পত্রে যে ভাবটুকু ব্যক্ত করিয়াছেন সাধারণত নব্য বঙ্গযুবকের পক্ষে তাহাই স্বাভাবিক— একদিকে হৃদয়ের টান, আর-এক দিকে উদরের টান, শেষোক্ত অঙ্গটির আকর্ষণশক্তিই কিঞ্চিৎ প্রবলতর— একটুখানি উপন্যাসের ধরনে প্রেমচর্চা করিবার দিকেও মন যায়, অথচ সেটা এত প্রকৃত এবং দৃঢ় নয় যে তাহার জন্য খুব বেশিমাত্রায় একটা বিপ্লব বাধাইতে পারে। ওটা একটা শখ মাত্র, কিন্তু শামলা বাঁধিয়া আপিসে যাওয়া বাঙালির পক্ষে নিতান্ত শখের নহে, ওইটেই জীবনের সর্বপ্রধান ঘটনা। বিজয়ের মনের ভাবটা মোটের উপরে একটু মিশ্রিত গোছের, না-এদিক না-ওদিক, বিশেষ কোনো রকমের নয়, যেমন সচরাচর হইয়া থাকে; অথচ এখনো তাহার মনে মনে একটু বিশ্বাস আছে সে কেবলমাত্র তুলা-হাটের কেরানি নহে, সে উপন্যাসের নায়ক— কিন্তু সেটা ভুল বিশ্বাস। 'বৈদিক সোম। ৩য় প্রস্তাব'।— বেদে সোম অর্থে যে ঈশ্বরপ্রেম বুঝাইত লেখক মহাশয় তাহার আরও দুই-একটি নূতন দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন— পড়িয়া আমরা পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি।

সাহিত্য। আষাঢ় [১২৯৯]
'কাশ্মীরের বর্তমান অবস্থা'। লেখাটি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। বাংলায় এরূপ প্রবন্ধ প্রায় অত্যুক্তি এবং শূন্য হাহুতাশে পরিপূর্ণ থাকে— তাহার প্রধান কারণ, খাঁটি খবর আমরা পাই না, খাঁটি খবর আমরা চাইও না— মনে করি, খুব অলংকার দিয়া কেবল কতকগুলা ফাঁকা আবেগ প্রকাশ করিলে খুব উচ্চ অঙ্গের লেখা হয়। কোনো একটা আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত বেশ পরিষ্কার সহজভাবে লিপিবদ্ধ করিতে আমরা অক্ষম, সময়ে অসময়ে নিজের হৃদয়টাকে যেখানে-সেখানে টানিয়া আনিয়া তাহাকে খুব খানিকটা আস্ফালন বা অশ্রুপাত না করাইলে আমাদের কিছুতেই মনঃপূত হয় না। আমরা যে ভারি সহৃদয় কেবল এইটে প্রমাণ করিবার জন্যই যেন আমরা নানা ছুতো অন্বেষণ করিতেছি; সেইজন্য আসল কথাটা ভালো করিয়া বলিবার সুযোগ হয় না, মনে হয় ততক্ষণ নিজের হৃদয়টা প্রকাশ করিলে কাজে লাগিত। সহৃদয়তা করিতে, কাঁদুনি গাহিতে,

বিস্মিত চকিত স্তম্ভিত হইতে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয় না, অনুসন্ধান অথবা চিন্তার আবশ্যক করে না এবং লেখাটাও বিস্তার লাভ করে। নগেন্দ্রবাবুর লেখায় কাশ্মীরের বর্তমান অবস্থা এবং তদপেক্ষা ভাবী অবস্থা সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা জন্মাইয়া দেয়। 'সমুদ্রযাত্রা ও জন্মভূমি পত্রিকা'— প্রবন্ধটি প্রাঞ্জল, সরল ও নির্ভীক।

সাধনা
শ্রাবণ ১২৯৯

নব্যভারত। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় [১২৯৯]
'মেঘনাদবধচিত্র'।— বহুকাল হইল প্রথম বর্ষের ভারতীতে [শ্রাবণ-কার্তিক, পৌষ, ফাল্গুন ১২৮৪] মেঘনাদবধ কাব্যের এক দীর্ঘ সমালোচনা বাহির হইয়াছিল, লেখক মহাশয় এই প্রবন্ধে তাহার প্রতিবাদ প্রকাশ করিতেছেন। তিনি যদি জানিতেন ভারতীর সমালোচক তৎকালে একটি পঞ্চদশবর্ষীয় বালক ছিল তবে নিশ্চয়ই উক্ত লোকবিস্মৃত সমালোচনার বিস্তারিত প্রতিবাদ বাহুল্য বোধ করিতেন।[১]— রিজ্‌লি সাহেবের নবপ্রকাশিত গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া ক্ষীরোদচন্দ্রবাবু 'ব্রাহ্মণ্যধর্মের শ্রীবৃদ্ধি' নামক যে প্রবন্ধ সংকলন করিয়াছেন, তাহাতে ভারতবর্ষের অনার্যজাতীয়েরা কী করিয়া ব্রাহ্মণ্যের গণ্ডির মধ্যে অল্পে অল্পে প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়— প্রবন্ধটি নিরতিশয় সংক্ষিপ্ত হওয়ায় আমরা যথেষ্ট তৃপ্তি লাভ করিলাম না।— 'সাকার ও নিরাকার উপাসনা'। ইহাতে যে-সকল তর্ক অবলম্বিত হইয়াছে তাহা এতই সরল যে, সহসা মনে প্রশ্ন উদয় হয় এ-সকল কথা কি কাহাকেও বিশেষ করিয়া বুঝানো আবশ্যক? দুঃখের বিষয় এই যে, আবশ্যক আছে। আরও দুঃখের বিষয় এই যে যাঁহারা মনে মনে এ সমস্তই বুঝেন, তাঁহারাও নানারূপ কৃত্রিম কূট তর্ক উদ্‌ভাবন করিতেছেন, সুতরাং এ যুক্তিগুলি স্থলবিশেষে ভুল ভাঙিবার এবং স্থলবিশেষে কেবলমাত্র মুখবন্ধ করিবার জন্য আবশ্যক হইয়াছে।[২]— 'অনাহারে মরণ'। বাল্যকাল হইতে যথেষ্ট পুষ্টিকর আহার পায় না বলিয়া যে বাঙালি জাতির মনুষ্যত্ব অসম্পূর্ণ থাকে এ কথা আমরা লেখকের সহিত স্বীকার করি। শরীর অপুষ্ট থাকাতে আমাদের চরিত্রের ভিত্তি কাঁচা থাকিয়া যায়। লেখকের মতের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে কেবল তাঁহার রচনার দুই-এক স্থলে আমাদের খটকা লাগিয়াছে। এক স্থলে আছে 'তাঁহারা বাক্যসার, বক্তাদিগের অপেক্ষা ভালো স্বদেশপ্রেমিক 'better patriots'।' ইংরাজি কথাটা জুড়িয়া দিবার অত্যাবশ্যক কারণ বুঝিতে পারিলাম না। প্রবন্ধের উপসংহারে গদ্য সহসা বিনা নোটিসে একপ্রকার ভাঙাছন্দ পদ্যে পরিণত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য বুঝা কঠিন। সেইজন্য এই আড়ম্বরহীন গম্ভীর প্রবন্ধ শেষকালটায় হঠাৎ এক অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়াছে; সংযতবেশ ভদ্রলোক সভাস্থলে অকস্মাৎ নটের ভাব ধারণ করিলে যেমন হয় সেইরূপ। শেষ অংশটুকু বিচ্ছিন্ন করিয়া একটা স্বতন্ত্র পদ্য রচনা করিলে এরূপ খাপছাড়া হইত না।

সাহিত্য। শ্রাবণ [১২৯৯]
'মধুচ্ছন্দার সোমযাগ'।— বেদে যে সোমযাগের উল্লেখ আছে এই অতি উপাদেয় প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা উত্থাপিত হইয়াছে, লেখক মহাশয় বলেন বৈদিক ঋষিদের মধ্যে 'মধুবিদ্যা' নামক একটি গোপনীয় বিদ্যা ছিল। সেই বিদ্যার রহস্য যে জ্ঞানীরা অবগত ছিলেন তাঁহাদের নিকট মধু

---

১. দ্র. পশ্চিমবঙ্গ সরকার -প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫, পৃ. ১১২-১৪৮, বর্তমান গ্রন্থ, পৃ. ৮২-১২৫ এবং রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ ২, পৃ. ৭৫

২. দ্র. বর্তমান গ্রন্থ, পৃ. ৪০৫-৪১৩

অর্থাৎ সোম অর্থে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানন্দ। লেখক বলিতেছেন, 'ঋগ্বেদের প্রথমেই মধুচ্ছন্দা নামক এক ঋষির কয়েকটি মন্ত্র আছে সেই মন্ত্রগুলির আদ্যন্ত আলোচনা করিলে, মধুচ্ছন্দার সোমযাগ কীরূপ ছিল, পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন।' এবারকার সংখ্যায়, মধুচ্ছন্দা ঋষি কে, তাহারই আলোচনা হইয়াছে। সোমযাগ কী তাহা জানিবার জন্য কৌতূহল রহিল। 'উপাধি-উৎপাত' প্রবন্ধে লেখক মনের আক্ষেপ তেজের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহাদের আত্মসম্মান আপনাতেই পর্যাপ্ত, যাঁহারা রাজসম্মান চাহেন না, এমন-কি, প্রত্যাখ্যান করেন, তাঁহাদের মতো মানী লোক জগতে সর্বত্রই দুর্লভ। কিন্তু সাধারণত যাঁহারা রাজোপাধি লাভ করিয়া গৌরব অনুভব করেন তাঁহারা কি এতই তীব্র আক্রমণের যোগ্য! তাঁহাদের মধ্যে কি দেশের অনেক যথার্থ সারবান যোগ্য লোক নাই? উপাধি যদি স্থলবিশেষে অযোগ্য পাত্রে বর্ষিত হয় তবে সে রাজার দোষ— কিন্তু যাঁহারা রাজসম্মানের চিহ্নস্বরূপ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া সন্তোষলাভ করেন তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। কেবল রাজাদর কেন, পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় জনাদরও অনেক সময় যোগ্য পাত্রকে উপেক্ষা করিয়া অযোগ্য পাত্রে ন্যস্ত হয়, তাই বলিয়া জনাদর যে নিতান্তই অবজ্ঞার সামগ্রী তাহা বলিতে পারি না। সম্মান, আদর মনুষ্যের নিকট চিরকাল প্রিয়, মানুষের এ দুর্বলতার জন্য স্থলবিশেষে ঈষৎ হাস্যের উদ্রেক হইতে পারে কিন্তু এতটা তর্জন কিছু যেন বেশি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বিশেষত, বঙ্কিমবাবু গবর্মেন্টের হস্ত হইতে রায় বাহাদুর উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া লেখক যে আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট নিতান্ত অযথা বলিয়া বোধ হয়। কারণ, বঙ্কিমবাবু বঙ্গদেশের দেশমান্য লেখক বলিয়া গবর্মেন্ট তাঁহাকে উপাধি দেন নাই— তিনি গবর্মেন্টের পুরাতন কর্মচারী— তাঁহার যোগ্যতা ও কর্তব্যনিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হইয়া গবর্মেন্ট যদি তাঁহাকে যথোচিত সম্মানচিহ্ন দান করেন তাহা অবজ্ঞা করিলে তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত অশোভন এবং অন্যায় কার্য হইত সন্দেহ নাই। বঙ্কিমবাবু দেশের জন্য যাহা করিয়াছেন দেশের লোক তজ্জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত উচ্চ আসন দিয়াছে— তিনি রাজার জন্য যাহা করিয়াছেন সে কাজ স্বতন্ত্র প্রকৃতির, তাহার পুরস্কারও স্বতন্ত্র শ্রেণীর— তাহার সহিত হৃদয়ের বিশেষ যোগ নাই, সে সমস্তই যথানির্দিষ্ট নিয়মানুগত— অতএব তাহা লইয়া ক্ষোভ করিতে বসা মিথ্যা। উপাধি লওয়া সম্বন্ধে কার্লাইল ও টেনিসনের সহিত বঙ্কিমবাবুর তুলনা ঠিক খাটে নাই। যাহা হউক, লেখাটি ভালো হইয়াছে সন্দেহ নাই। 'বন্ধু' গল্পটির মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলের স্নিগ্ধ শ্রাবণ মাস বেশ একটি সংগীতমিশ্রিত সৌন্দর্য নিক্ষেপ করিয়াছে।— 'আদর্শ সমালোচনা'। বোধ করি এমন ভাগ্যবান সমালোচক কখনো জন্মেন নাই যিনি আপন কর্তব্য কার্য সম্পন্ন করিয়া অক্ষত শরীরে পৃথিবী হইতে অপসৃত হইতে পারিয়াছেন। যখন উক্ত অপ্রিয় কর্তব্য স্কন্ধে লইয়াছি তখন আমরাও যে সহজে অব্যাহতি পাইব এমন দুরাশা আমাদের নাই। অতএব 'আদর্শ-সমালোচনা'-লেখক যে গুপ্তভাবে আমাদের প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন সেজন্য আমরা লেশমাত্র আশ্চর্য বা দুঃখিত হই নাই। দুঃখের বিষয় এই যে, লেখকের নিপুণতার আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। আমরা বন্ধুভাবে তাঁহাকে পরামর্শ দিতে পারি যে, তিনি যদি রসিকতা প্রকাশের নিষ্ফল চেষ্টা না করিয়া অন্য কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন তো হয়তো কৃতকার্য হইতেও পারেন। 'কালিদাস ও সেক্ষপিয়র' লেখার মধ্যে যথেষ্ট চিন্তাশীলতা আছে, আমরা ইহার পরিণামের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। 'আমার "স্বরচিত" লয়তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা সাহিত্যেই লিখিয়া পাঠাইয়াছি।[১] এখানে কেবল সংক্ষেপে একটি কথা বলিয়া রাখি। আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ক্ষুদ্র অনুরাগ বৃহৎ অনুরাগে পরিণত হইতে পারে কিন্তু বৃহৎ অনুরাগ কী করিয়া নিরনুরাগে লইয়া যাইবে আমরা বুঝিতে পারি না। চন্দ্রনাথবাবু তাহার উত্তরে লিখিয়াছেন, ছোটো অনুরাগ যখন স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন বা বিপরীত প্রকৃতির বড়ো

১. দ্র. বর্তমান গ্রন্থ, পৃ. ৪১৯-৪২৩

অনুরাগে পরিণত হইতেছে তখন বড়ো অনুরাগ নিরনুরাগে পরিণত হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। এক শক্তি ভিন্ন শক্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে বলিয়াই শক্তির ধ্বংস হওয়া আশ্চর্য নহে এরূপ যুক্তি আমরা প্রত্যাশা করি নাই। দেখিতেছি আমাদের আলোচনা ক্রমশ কথাকাটাকাটিতে পরিণত হইতেছে, অতএব এ আলোচনা এইখানেই লয় প্রাপ্ত হইলে মন্দ হয় না।

সাধনা

ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯

সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা। প্রথম ভাগ। দ্বিতীয় সংখ্যা। শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত। বার্ষিক মূল্য তিন টাকা।

সাহিত্য পরিষদ সভা হইতে এই ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। এই পত্রিকায় আমরা এমন সকল প্রবন্ধের প্রত্যাশ্যা করি যাহাতে বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস এবং বঙ্গভাষার পুরাবৃত্ত, ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব ও অভিধান রচনার সহায়তা করে। অমাদের দেশের প্রাচীন পুঁথির পাঠোদ্ধার এবং অপ্রচলিত পুরাতন শব্দের অর্থবিচারও ইহার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এবং বাংলা রূপকথা (Folk-lore), প্রবচন (Proverb), হরুঠাকুর, রামবসু প্রভৃতি লোকপ্রসিদ্ধ কবিওয়ালাদিগের গান, ছড়া (nursery-rhyme) প্রভৃতি সংগ্রহের প্রতিও ইহার দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। বর্তমান-সংখ্যক পত্রিকাটি দেখিয়া আমরা কিয়ৎপরিমাণে আশান্বিত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত -লিখিত কৃত্তিবাস এবং শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী -লিখিত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা পরিষদ-পত্রিকার সম্পূর্ণ উপযোগী এবং সাধারণের সমাদরযোগ্য হইয়াছে। কিন্তু আমরা দুঃখের সহিত বলিতেছি সম্পাদক-লিখিত ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রবন্ধটির মধ্যে কেবল যে-সকল ছত্র ভূদেববাবুর গ্রন্থ হইতে উদধৃত সেই অংশগুলিই পাঠ্য এবং অবশিষ্ট সমস্তই অপ্রাসঙ্গিক ও অনাবশ্যক বাগাড়ম্বরে পরিপূর্ণ। আমরা লেখক মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া প্রবন্ধের একটি অংশ উদ্‌ধৃত করি :

'মিল্টন যখন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখন ভয়াবহ বিপ্লবে সমগ্র ইংলন্ড আন্দোলিত হইয়াছিল। তখন স্বাধীনতার সহিত যথেচ্ছাচারের ভীষণ সংগ্রাম ঘটিয়াছিল। এই সংগ্রাম একদিনে পর্যবসিত হয় নাই; একস্থানে এই সংগ্রামস্রোতে অবরুদ্ধ হইয়া থাকে নাই, এক সম্প্রদায় এই সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করে নাই। এই সংগ্রামে ইংরেজ জাতির যেরূপ স্বাধীনতা লাভ হয়, সেইরূপ আমেরিকার আরণ্যপ্রদেশ সুদৃশ্য নগরাবলীতে শোভিত হইতে থাকে। অন্য দিকে গ্রীস দুইহাজার বৎসরের অধীনতাশৃঙ্খল ভগ্ন করিতে উদ্যত হইয়া উঠে। এই দীর্ঘকালব্যাপী সমরে যুরোপের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এরূপ প্রচণ্ড বহ্নিস্তূপের আবির্ভাব হয় যে, উহার জ্বালাময়ী শিখা প্রত্যেক নিপীড়িত ও নিগৃহীত ব্যক্তির হৃদয়ে উদ্দীপিত হইয়া তাহাদিগকে দীর্ঘকালের নিপীড়ন ও নিগ্রহের গতিরোধে শক্তিসম্পন্ন করে।'

পাঠকেরা মনে করিতে পারেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় যুরোপের এই এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তব্যাপী জ্বালাময়ী শিখার কিয়দংশ কোনো উপায়ে আহরণ করিয়া এই বাঙালি লেখকের ভাষায় ও কল্পনায় বর্তমান অগ্নিদাহ উপস্থিত করিয়াছেন; কিন্তু লেখক বলিতেছেন— তাহা নহে। 'ভূদেবের সময় হিন্দুসমাজে যে বিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহা মিল্টনের সময়ের বিপ্লবের ন্যায় সর্বত্র ভীষণ ভাবের বিকাশ করে নাই; উহাতে নরশোণিতস্রোত প্রবাহিত হয় নাই; প্রজালোকের সমক্ষে দেশাধিপতির শিরশ্ছেদন ঘটে নাই বা জনসাধারণ স্বাধীনতার জন্য উত্তেজিত হইয়া ভয়ংকর কার্যসাধনে আত্মোৎসর্গ করে নাই।'

বিস্তারিত ভাবে এমন হাস্যকর তুলনার অবতারণ এবং অবশেষে একে একে তাহার আদ্যন্ত খণ্ডন কোনো দেশের কোনো প্রহসনেও এ পর্যন্ত স্থান পায় নাই। গ্রন্থকার কুরুক্ষেত্রের সমস্ত যুদ্ধবর্ণনা মহাভারত হইতে আদ্যোপান্ত উদ্‌ধৃত করিয়া সর্বশেষে লিখিতে পারিতেন যে, ভূদেবের সময় যদিচ 'নবীন ভাবের বাহ্যবিভ্রমে পুরাতন ভাবের স্থিতিশীলতা কিয়ৎপরিমাণে বিচলিত'

হইয়াছিল, যদিচ 'তখন ইংরেজি ভাবের প্রচার ও ইংরেজি শিক্ষা বদ্ধমূল হইয়াছিল' এবং 'বিজ্ঞানের কৌশলে ভারতবর্ষ যেন ইংলণ্ডের দ্বারস্থ হইয়া উঠিয়াছিল' কিন্তু ঘটোৎকচবধ হয় নাই।

সাহিত্য পরিষদ সভার প্রতি আমাদের আন্তরিক মমতা আছে বলিয়া এবং তাহার নিকট হইতে আমরা অনেক প্রত্যাশা করি বলিয়াই সাধারণের সমক্ষে তাহার এরূপ অদ্ভুত বাল্যলীলা আমাদের নিকট নিরতিশয় লজ্জা ও কষ্টের কারণ হয়।

সাধনা
পৌষ ১৩০১

প্রদীপ। বৈশাখ [১৩০০]
'লাল পল্টন' ঐতিহাসিক প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রের রচনা। বিষয় এবং লেখকের নাম শুনিলেই পাঠকদের সন্দেহ থাকিবে না যে প্রবন্ধটি সর্বাংশেই পাঠ্য হইয়াছে। কিন্তু আমাদের একটি কথা বক্তব্য আছে। প্রবন্ধটি দীর্ঘ এবং গত দুই-তিনবারের অনুবৃত্তি। আমাদের বিবেচনায় ধারাবাহিকরূপে গ্রন্থ প্রকাশ সাময়িক পত্রের উদ্দেশ্য নহে। সাময়িক পত্রে বিচিত্র খণ্ড প্রবন্ধ এবং সাময়িক বিষয়ের আলোচনায় পাঠকের চিত্তকে নানা দিকে সজাগ করিয়া রাখে। কোনো শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট বিস্তৃত বিষয়কে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করা স্বভাবতই ইহার কাজ নহে। কারণ, বৃহৎ বিষয় অখণ্ড মনোযোগের দাবি রাখে, একক-সমগ্রতাই তাহার প্রধান গৌরব, নানা বিচিত্র বিষয়ের মাঝখানে তাহাকে টুকরা করিয়া বসাইয়া দেওয়া অসংগত। এইরূপে গৌরববান রচনাও তাহার লঘুপক্ষ সঙ্গীদের দ্রুতগামী জনতার মধ্যে পাঠকদের মনোযোগ হইতে ক্রমশই দূরে পিছাইয়া পড়িতে থাকে এবং কথঞ্চিৎ অবজ্ঞার বিষয় হইয়া উঠে। ক্ষমতাপন্ন লেখকদের লেখার এরূপ দুর্গতিসম্ভাবনা আমাদের নিকট অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় বলিয়া মনে হয়। যাহাই হৌক, বৃহৎ গ্রন্থ এবং সাময়িক পত্রের মধ্যে একটা সীমা নির্দিষ্ট থাকা কর্তব্য। 'বিজ্ঞান বা প্রকৃতির ইচ্ছা'— আমরা এরূপ গদ্য রচনার পক্ষপাতী নহি। ইহার মধ্যে ভাবুকতার চেষ্টা এবং চিন্তাশীলতার আড়ম্বর আছে কিন্তু আসল জিনিসটুকু নাই। 'বৃহস্পতির কলঙ্ক' সরল, সরস এবং কৌতুকাবহ। ধূমকেতুর সংঘর্ষে পৃথিবীর যে কী বিভ্রাট ঘটিতে পারে সুবিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ফ্লামারিয়ঁ তাঁহার 'পৃথিবীর সংহার' নামক ফরাসি উপন্যাস গ্রন্থে তাহা সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সৌরজগতের বিপুলতম গ্রহ বৃহস্পতি ধূমকেতুর কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাকে কীরূপে আপন অন্তঃপুরসাৎ করিয়াছেন অপূর্ববাবু সমালোচ্য প্রবন্ধে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন, আমাদের অবলা পৃথিবী উন্মাদ ধূমকেতুকে সেরূপ নিরাপদে আয়ত্ত করিতে পারে কি না সন্দেহ। 'চুলকাটা মিষ্‌মী' সচিত্র প্রবন্ধটি সুপাঠ্য। 'শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি' উপন্যাসটি সংক্ষিপ্ত, স্বভাবসংগত এবং সুরচিত হইয়াছে। সুবিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের সচিত্র যে সংক্ষিপ্ত জীবনী বাহির হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। ভারতবর্ষীয় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মহাত্মাগণের সহিত আমাদের পরিচয় সাধন নানা কারণে শ্রেয়স্কর।

উৎসাহ। ফাল্গুন-চৈত্র [১৩০৪]
অক্ষয়বাবুর 'লাল পল্টন'কে যখন সাময়িক পত্রের অধিকার হইতে পরাহত করিবার চেষ্টা করিয়াছি তখন উৎসাহে প্রকাশিত তাঁহার 'অজ্ঞেয়বাদ'কে কোনোমতে আমল দিতে পারি না। বিষয়টি দুরূহ এবং ইহার যুক্তিগুলি পরস্পরসাপেক্ষ, এমত অবস্থায় ইহাকে ছিন্ন ছিন্ন করিয়া প্রকাশ করিলে প্রবন্ধের দুরূহতা বাড়িয়া যায় অথচ তাহার যুক্তির সংহত বল খণ্ডীকৃত হয়। লেখাটি এই খণ্ডেই সম্পূর্ণ হইয়াছে এক্ষণে গ্রন্থাকারে ইহার সহিত যথাযোগ্য সম্ভাষণের প্রত্যাশায় রহিলাম। শ্রীযুক্তবাবু রজনীকান্ত চক্রবর্তী 'শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃত' নামক দুইশত বৎসরের একটি

প্রাচীন বৈষ্ণব কাব্যের পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীযুক্তবাবু শশধর রায় 'বর্ণ' প্রবন্ধে মনুষ্য-ত্বকের বর্ণোৎপত্তির কারণ আলোচনা করিয়াছেন। পাঠকদের বোধ হয়, এবং লেখকও স্বীকার করিয়াছেন, প্রবন্ধ-ধৃত মত পরীক্ষা ও প্রমাণের অপেক্ষা রাখে। 'ভৌতিক নোট' গল্পটি সুনিপুণ। ছোটো কথা, আকারে অতি ছোটো এবং উপদেশে অত্যন্ত বড়ো বটে কিন্তু বিষয়ে অতিশয় পুরাতন এইজন্য রচনার বিশেষরূপ নৈপুণ্য না থাকায় তাহা নিরর্থক। 'উকিল কলঙ্ক'-নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লেখক ব্যঙ্গচ্ছলে ওকালতি করিয়াছেন; সব শেষে তাহাতে এই কথাটা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, নীতি-উপদেষ্টাগণ নিজের হাতে ধর্মনীতির যে সোজা সোজা চক-কাটা ঘর বানাইয়াছেন, বিচিত্র মনুষ্য-চরিত্র তাহার মধ্যে সঞ্চরণ করিতে পারে না এবং জোর করিয়া চালনা করিতে গেলে হিতে বিপরীত হইয়া উঠে।

ভারতী
জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫

নব্যভারত। বৈশাখ [১৩০৫]
'কি চাই কি পাই?' প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া আমরা সম্পাদকের জন্য চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছি। দোষদুর্বলতা আমাদের সকলেরই আছে এবং এই মাটির পৃথিবীতে দোষগুণে জড়িত আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবদিগকে লইয়া আমরা কোনোপ্রকারে সন্তোষ অবলম্বন করিয়া আছি। কিন্তু নব্যভারতের ষোড়শবার্ষিক জন্মদিনে সম্পাদক মহাশয় বলিতেছেন 'পঞ্চদশ বর্ষ আমি কেবল আদর্শ খুঁজিতেছি।' মূঢ়সাধারণে ভুল করিত তিনি কেবল তাঁহার মাসিক পত্রের জন্য গ্রাহক ও লেখক খুঁজিতেছেন। কিন্তু লেখক বলেন 'সাহিত্যের সেবা আমার কেবল কথার কথা, উপলক্ষ মাত্র; আমি লোক খুঁজিয়া লোক ধরিয়া কেবল অন্তর পরীক্ষা করিতেছি। পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, এমন লোক সম্মুখে পড়ে নাই, যিনি পরের সেবা করিতে করিতে আপনার স্বার্থ ভুলিয়াছেন, যিনি অম্লান চিত্তে দেশের জন্যে সর্বস্ব বিসর্জন দিতে পারিয়াছেন— যিনি চরিত্রে অটল, পুণ্য পবিত্রতায় উজ্জ্বল, যিনি দ্বেষহিংসা পরশ্রীকাতরতাহীন, যিনি পূর্ণাদর্শ।' এইরূপে অনাহূত পরকে যাচাই করিয়া বেড়াইবার অনাবশ্যক কার্যভার নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া পরীক্ষক মহাশয় এতই কষ্ট পাইতেছেন যে, আপন নাট্যমঞ্চের উপর চড়িয়া বসিয়া সকলকে বলিতেছেন 'কাতরে পা ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছি ঘৃণা লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া আমার সম্মুখে আদর্শ রূপে দাঁড়াও।' তাঁহার কাতরতা দেখিয়া বিচলিত হইতে হয় কিন্তু 'ঘৃণালজ্জা' ত্যাগ করা সহজ নহে। এমন-কি, তিনিও তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। বর্তমান প্রবন্ধে আদর্শরূপে দাঁড়াইতে গিয়া তিনিও স্থানে স্থানে পরমসাধুতাসম্মত বিনয়ের আবরণ রাখিয়াছেন; তিনিও বলিয়াছেন 'আমি পতিত, মলিন, পাপে জর্জরিত— আমি অসারের অসারে মণ্ডিত— ঘৃণিত, মলিন। পরিত্যক্ত, নির্যাতিত, লাঞ্ছিত হওয়াই আমার পক্ষে সাজে ভালো।' বিনয়ের সাধারণ অত্যুক্তিগুলিকে কেহ কখনো সত্য বলিয়া গ্রহণ করে না— সম্পাদক মহাশয়ও সেরূপ আশঙ্কা করেন নি। যদিবা আশঙ্কা থাকে লেখক তাহার প্রচুর প্রতিকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন 'স্বার্থ ভুলিয়া পরার্থ, নীচত্ব ভুলিয়া মহত্ত্ব, পশুত্ব ভুলিয়া চিন্ময়ত্ব, রিপুর উত্তেজনা ভুলিয়া সংযম পাইব আশায়, তোমার আহ্বানে, আমি কাঙাল, স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যের মুকুট মস্তকে বহিয়া, আত্মীয়দিগের মায়ামমতায় ছাই ঢালিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিলাম।' ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত আর দুটি-চারটি আছে মাত্র এবং সেই ক্ষণজন্মা আদর্শ পুরুষদের ন্যায় আমাদের সম্পাদক মহাশয়ও কাঙাল, এবং তিনিও মায়ামমতায় ছাই ঢালিয়া ছুটিয়া আসেন। কিন্তু এ কথাটিও ভুলিতে পারেন নাই যে, যে দারিদ্র্য তিনি মস্তকে বহিয়াছেন তাহা 'মুকুট'— এবং সেই মুকুট নাড়া দিয়া তিনি অদ্য আমাদের নিকট হইতে রাজকর আদায় করিতে আসিয়াছেন। ক্রমে যতই উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন তাঁহার লজ্জা ততই ঘুচিয়াছে— সকলকে ধিক্কার দিয়া বলিয়াছেন 'সাধে কি আমি নৈরাশ্যের আগুন

জ্বালিয়া ভস্ম হইতে বসিয়াছি! পিতামাতার স্নেহের বন্ধন যাহার ছিন্ন, সে যে ভালোবাসার কত কাঙাল, তাহা, তুমি, ঐশ্বর্যের দাসানুদাস, কী বুঝিবে? আমি ভালোবাসার কাঙাল, কিন্তু ভালোবাসাকেও তুচ্ছ করিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়াছি, দেবত্বের আকর্ষণে।' সম্পাদক মহাশয়কে আমরা কেহই বুঝিতে পারি নাই— কারণ আমরা ঐশ্বর্যের দাসানুদাস এবং তাঁহার মহীয়ান্ মস্তকে দারিদ্র্যের মুকুট; কিন্তু এমনি করিয়া যদি মধ্যে মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে নিজেই বুঝাইতে শুরু করেন তাহা হইলে না বুঝিয়া আমাদের উপায় থাকিবে না। 'দেবত্বের আকর্ষণে' তিনি আমাদিগকে ছাড়াইয়া যে কতদূর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছেন তাহা লিখিয়াছেন— 'আদর্শ ভুলিয়া আমি জটিল, কুটিল, মলিন, অপবিত্র ভালোবাসা বা একতা চাহি না। যদি তাহারই কাঙাল হইতাম, যাহাদের সহিত রক্তের সম্বন্ধ ছিল তাঁহাদের স্নেহ ভুলিতাম না। তাঁহাদের স্নেহডোর ছিন্ন করিয়া দূরে দূরে, বিদেশে বিদেশে, নির্জনে নির্জনে, একাকিত্বের রাজ্যে কাঙালের ন্যায় বেড়াইতাম না!' কিন্তু এ কথা কেহ মনে করিয়ো না, নব্যভারতের সম্পাদক হওয়ার পর হইতে অদ্য পঞ্চদশ বৎসর ইহাঁর এই দশা! বাল্যকালে সুলক্ষণগুলি ছিল লেখক সে আভাস দিতে ছাড়েন নাই। 'আদর্শহীনতার জন্য বাল্যকাল হইতে কতজনের স্নেহডোর ছিঁড়িয়াছি; যত লোকের নিকট গিয়াছি, যখনই তাঁহাদের মধ্যে আদর্শহীনতা দেখিয়াছি, তখনই ছুটিয়া পলাইয়াছি। সেজন্য তাঁহারা আমার প্রতি আজ কত বিরক্ত! সেজন্য তাঁহারা কত ক্রোধান্বিত!!' আমাদের সহিত কত প্রভেদ! আমরা যখন ইস্কুল পলাইতাম, আমাদের সম্পাদক মহাশয় সেই বয়সে 'আদর্শহীনতা' হইতে পলায়ন করিতেন। মাস্টার আমাদের প্রতি রাগ করিতেন কিন্তু তাঁহার প্রতি ক্রোধান্বিত হইত জগতের সমস্ত আদর্শহীন ব্যক্তিরা! ভাবিয়া দেখো, সেই বালকটি বড়ো হইয়াছে এবং আজ লিখিতেছে 'চাহিয়াছি সত্য, পাইয়াছি মিথ্যা; চাহিয়াছি পুণ্য, পাইয়াছি পাপ; চাহিয়াছি স্বর্গ, পাইয়াছি নরক; চাহিয়াছি আন্তরিকতা, পাইয়াছি বাহ্যাড়ম্বর; চাহিয়াছি দেবত্ব, পাইয়াছি পশুত্ব; চাহিয়াছি সাত্ত্বিকতা, পাইয়াছি রাজসিকতা; চাহিয়াছি অমরত্ব, পাইয়াছি নশ্বরত্ব। কী তীব্র অভিজ্ঞতা!!' মহাপুরুষকে মিনতি করি তিনি শান্ত হউন, ক্ষান্ত হউন, ভাষাকে সংযত করুন, পৃথিবীকে ক্ষমা করুন, পাঠকদিগের প্রতি দয়া করুন, তাঁহার নববর্ষ-নাট্যশালার কৃত্রিম বজ্রটিকে প্রতিসংহার করিয়া লউন। তিনি যে সত্য চাহিয়াছিলেন সে গৌরব তাঁহারই থাক্ এবং যে মিথ্যা পাইয়াছেন সে লাঞ্ছনা আর সকলে বহন করিবে; তিনি যে পুণ্য চাহিয়া ফিরিয়াছিলেন সে দুর্বিষহ সাধুতা তাঁহাতেই বর্তিবে, এবং যে পাপ পাইয়াছেন সে অক্ষয় কলঙ্ক অপর সাধারণের ললাটে আঁকিয়া দিন; তিনি স্বর্গীয় তাই স্বর্গ চাহিয়াছিলেন কিন্তু নরক পাইয়াছেন সে হয়তো তাঁহারই আত্মদোষে নহে; তিনি অকপট, তাই চাহিয়াছিলেন আন্তরিকতা কিন্তু বাহ্যাড়ম্বরটা— সে আর কী বলিব! পরন্তু বর্তমান প্রবন্ধে তিনি যেরূপ আদর্শ হইয়া উঠিয়াছেন, পায়ে ধরিয়া প্রার্থনা করিলেও সকলে তেমনটি হইতে পারিবে না, কারণ, 'ঘৃণালজ্জা' একেবারেই পরিত্যাগ করা বড়ো কঠিন!

এই প্রসঙ্গে সম্পাদকের নিকট আমাদের একটি মিনতি আছে। যদিও তাঁহার হৃদয়োচ্ছ্বাস সাধারণের অপেক্ষা অনেক বেশি তথাপি বিস্ময়সূচক বা প্রবলতাসূচক তিলকচিহ্নগুলি (!) স্থানে স্থানে দ্বিগুণীকৃত করিয়া কোনো লাভ নাই। উহাকে লেখার মুদ্রাদোষ বলা যাইতে পারে। এ প্রকার চিহ্নকে একাধিক করিয়া তুলিলে কোথাও তাহার সীমা স্থাপন করা যায় না। ভাবিয়া দেখুন কোনো একটি নব্যতর-ভারত সম্পাদকের হৃদয়োচ্ছ্বাস যদি দুর্দৈবক্রমে দ্বিগুণতর হয় তবে তিনি 'কী তীব্র অভিজ্ঞতা' লিখিয়া তাহার পশ্চাতে চারটি!!!! তিলক চিহ্ন বসাইতে পারেন— এবং এইরূপ রোখ চড়িয়া গেলে ক্রমে ভাষার অপেক্ষা ইঙ্গিতের উপদ্রব বাড়িয়া চলিবে। এ কথা সম্পাদক মহাশয় নিশ্চয় জানিবেন, তাঁহার ভাবাই যথেষ্ট, তাঁহার ভঙ্গিমাও সামান্য নহে, তাহার পরে যদি আবার মুদ্রাদোষ যোগ করিয়া দেন, তবে তাহা সাধারণ লোকের পক্ষে কিছু অধিক হইয়া পড়ে।

প্রদীপ। জ্যৈষ্ঠ [১৩০৪]
'নবদ্বীপ' কবিতা শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় -রচিত। কবিতাটি একদিকে সহজ এবং ব্যঙ্গোক্তিপূর্ণ অপর দিকে গম্ভীর এবং ভক্তিরসার্দ্র; একত্রে এরূপ অপূর্ব সম্মিলন যেমন দুরূহ তেমনি হৃদয়গ্রাহী। ইহাতে ভাষা ছন্দ এবং মিলের প্রতি কবির অনায়াস অধিকার পদে পদে সপ্রমাণ হইয়াছে। শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাস 'আজকালকার ছেলেরা' শীর্ষক যে ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা বিশেষ শ্রদ্ধা ও মনোযোগ সহকারে পাঠ্য। ছাত্রদের স্বভাব ও শিক্ষা ক্রমশ যে হীনতা পাইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই; লেখিকার মতে তাহার একটি কারণ, আজকাল বিদ্যাদান দোকানদারিতে পরিণত হইয়াছে এবং ছাত্রদিগকে হস্তগত রাখিবার জন্য স্কুলের কর্তৃপক্ষদিগকে সর্বপ্রকার শাসন শিথিল করিতে হইয়াছে। ইহা ছাড়া, আমাদের বিশ্বাস, পরীক্ষার উত্তেজনা, পাঠ্যগ্রন্থের পরিমাণ, কী-পুস্তকের প্রচার এবং প্রাইভেট স্কুলগুলির প্রতিযোগিতায় মুখস্থ শিক্ষা ক্রমেই প্রবল বেগে বাড়িয়া উঠিয়াছে; পাঠ্যগ্রন্থ হইতে নব নব সরস ভাব গ্রহণের দ্বারা বালকদের হৃদয় স্বতই যে উপায়ে জাগ্রত হইয়া উচ্চ আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয় এখন তাহা যেন প্রতিরুদ্ধ হইতেছে; এখন কেবল কথা ও কথার মানে, শিক্ষার সমস্ত শুষ্ক ধূলিরাশি, তাহাদের চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। 'ওয়েলস্-কাহিনী' প্রবন্ধে লেখক দেখাইয়াছেন, ওয়েলস্ ভাষা ইংরাজি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং সেখানকার অধিবাসীগণ স্বপ্রদেশের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত। কিন্তু আমরা বলিতেছি তৎসত্ত্বেও যদি তাহারা দায়ে পড়িয়া ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যকে গ্রহণপূর্বক ইংরাজের সহিত এক হইয়া না যাইত তবে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার হস্ত এড়াইয়া তাহারা কখনোই জাতিমহত্ত্ব লাভ করিতে পারিত না। আমাদের দেশের উড়িয়া, আসামি ও বেহারিগণ যদি সামান্য অন্তরায়গুলি নষ্ট করিয়া ভাষা ও সাহিত্যসূত্রে বাঙালির সহিত মিশিতে পারে তবে বাঙালি জাতির অভ্যুত্থান আশাজনক হইয়া উঠে। 'সার্ সৈয়দ আহমদ খাঁর' সচিত্র জীবনী পাঠ করিলে আমরা একটি অকৃত্রিম মহৎ জীবনের আদর্শ লাভ করিতে পারি। আলিগড়ে যেরূপ কলেজ তিনি স্থাপন করিয়াছেন সেইরূপ ছাত্রনিবাসসহ-কৃত একটি কলেজ বাংলাদেশে স্থাপিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে।

উৎসাহ। বৈশাখ [১৩০৫]
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের 'পুণ্যাহ' প্রবন্ধটি ক্ষুদ্র, মনোরম এবং কৌতুকাবহ হইয়াছে। অক্ষয়বাবু সেকালের মুসলমানরাজত্বের একটি অদৃশ্য বিস্মৃত ক্ষুদ্র কোণের উপর একটি ছোটো বাতি জ্বালিয়া ধরিয়াছেন এবং পাঠকের কল্পনাবৃত্তিকে ক্ষণকালের জন্য তৎকালীন ইতিহাসরহস্যের প্রতি উৎসুক করিয়া তুলিয়াছেন। 'জগৎশেঠ' প্রবন্ধটি সুলিখিত সারবান। কিছুকাল পূর্বে বাংলা সাময়িক পত্রে পুরাতত্ত্বঘটিত প্রবন্ধগুলি যেরূপ শুষ্ক, তর্কবহুল ও নোট-জালে জড়ীভূত জটিল ছিল অক্ষয়বাবু-নিখিলবাবুর ন্যায় লেখকদের প্রসাদে সে দশা ঘুচিয়া গেছে এবং বাংলা ইতিহাসের শুষ্ক তরু পল্লবিত মঞ্জরিত হইবার উপক্রম করিয়াছে। 'সে দেশে' শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাসের রচিত একটি কবিতা। কবিতা সমালোচনা করিতে আমরা সংকোচ বোধ করি কিন্তু এ স্থলে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না যে, এই আটটি শ্লোকের কবিতাকে চারিটি শ্লোকে পরিণত করিলে ইহার গীতিরসমাধুর্য সুন্দর সুসম্পূর্ণ হইয়া উঠে— ইহার জোড়া জোড়া শ্লোকের দ্বিতীয় শ্লোকগুলি বাহুল্য, এবং তাহারা অতিবিস্তারে ভাবের গাঢ়তা হ্রাস করিয়াছে। আমরা নিম্নে এই মধুর কবিতার একটি সংক্ষিপ্ত পাঠ দিলাম :—

সে দেশে বসন্ত নাই, নাহি এ মলয়।
সে দেশে সরলা আছে, তাই ফুল ফোটে গাছে,
কোকিল কুহরি উঠে, কথা যদি কয়।

সে দেশে বসন্ত নাই, নাহি এ মলয়।
সে দেশে বরষা নাই, নাহি মেঘচয়।
সরলা আছে সে দেশে, তারি নীল কালো কেশে,
খেলে প্রেম ইন্দ্রধনুঃ চারু শোভাময়।
সে দেশে বরষা নাই, নাহি মেঘচয়।
সে দেশে শরৎ নাই, নাহি শীতভয়।
সে দেশে সরলা হাসে, জ্যোছনা তা নীলাকাশে,
স্থলে তাহা স্থলপদ্ম, জলে কুবলয়।
সে দেশে শরৎ নাই, নাহি শীত ভয়।
সে দেশে দিবস নাই, নিশা নাহি হয়।
সে দেশে সরলা আছে, রবি শশী তারি কাছে,
ঘোমটার তলে হাসে, একত্র উভয়।
সে দেশে দিবস নাই, নিশা নাহি হয়।

হেমেন্দ্রপ্রসাদবাবু 'রমণীর অধিকার' প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছেন সে সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমাদের মতের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে; কিন্তু যাহাদের সহিত তাঁহার মতের ঐক্য নাই তাহাদিগকে পরাভূত করিবার উপযোগী যুক্তি ও প্রমাণবিন্যাস এই ক্ষুদ্রপরিসর প্রবন্ধে সম্ভবপর হইতে পারে না। 'হেমের অনধিকার' নামক গল্পে স্ত্রীবিয়োগবিধুর উদ্‌ভ্রান্ত বিলাপকারীদের প্রতি করুণরসমিশ্রিত একটি নিগূঢ় বিদ্রূপ প্রকাশিত হইয়াছে। অসংযত হৃদয়োচ্ছ্বাসের মধ্যে যে একটি গোপন অলীকতা আছে লেখক সংক্ষেপে তাহার আভাস দিয়াছেন।

নির্মাল্য। জ্যৈষ্ঠ [১৩০৫]
এই নূতন পত্রের অধিকাংশ গদ্য ও পদ্য প্রবন্ধ পূর্ব্ববারের অনুবৃত্তি। শেষ পত্রে প্রকাশিত 'প্রিয়তমের প্রতি নামক কবিতায় একটি অভূতপূর্ব অসাধারণ নূতনত্ব দেখা গেল; লেখাটি আমরা বঙ্কিমবাবুর পুরাতন রচনা বলিয়াই জানি কিন্তু নির্মাল্যে উক্ত কবিতার নিম্নে রমণীমোহন বসুর নাম প্রকাশিত; ওইটুকু নূতন, নির্লজ্জভাবে নূতন!

ভারতী
আষাঢ় ১৩০৫

নব্যভারত। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়। [১৩০৫]
এই সংখ্যায় শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী -লিখিত 'সহরৎ-এ-আম্' প্রবন্ধটি বিশেষ ঔৎসুক্যজনক। মুসলমান শাসনকালে ভারতবর্ষে পব্লিক-ওয়র্কস্-ডিপার্টমেণ্ট ছিল—লেখক প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। সেই বিভাগের পারসি নাম ছিল সহরৎ-এ-আম, অর্থাৎ সাধারণের সুবিধা। তাহার এইরূপ কর্ত্তব্য বিভাগ ছিল— '১ম, প্রজাসাধারণের কৃষিকার্য ও জলের সুবিধা। ২য়, ডাকখানার বন্দোবস্ত। ৩য়, ঝটিতি শুভাশুভ সমাচার প্রেরণ বা জ্ঞাপন। ৪র্থ, সমাচার পত্র প্রকাশ করা। ৫ম, পূর্ত্তবিভাগ অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ারিং।' এই প্রবন্ধে তৎকালীন সংবাদপত্র, ও ডাক বন্দোবস্তের যে আলোচনা আছে তাহা কৌতূহলজনক। পয়ঃপ্রণালী দ্বারা বহুদূর হইতে বিশুদ্ধ জল আনিবার যে ব্যবস্থা ছিল তৎপ্রসঙ্গে লেখক বলিতেছেন— 'এখন water works-এর সহিত তখনকার জলের কলের প্রভেদ এই যে, ইঞ্জিনের ব্যবহার মুসলমানদের সময়ে ছিল না, অথচ ইংরাজের জলের কলের ন্যায় অনায়াসে অনর্গল নির্মল জল দিবারাত্রি মিলিত, সুতরাং প্রজাসাধারণের নিকট হইতে জলের ট্যাক্স লওয়া হইত না।...

পিপাসিতকে পানীয় জল দিয়া তাহার নিকট হইতে পয়সা লওয়া আসিয়ার (oriental) রাজাদিগের ধর্ম ও আচারবিরুদ্ধ। জয়পুর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যের রাজারা প্রজাসাধারণকে জল জোগাইয়া কর গ্রহণ করেন না।' ইংরাজের ব্যবস্থায় জলও যেমন কলে আসে, সঙ্গে সঙ্গে করও তেমনি কলে আদায় হইয়া যায়। ইংরাজরাজ্যের সুশাসন ও সুব্যবস্থা যে আমাদের কাছে কলের মতো বোধ হয়, তাহা যে অনেক সময় আমাদের কল্পনা এবং হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে না তাহার কারণ ইংরাজ-রাজকার্যে রাজোচিত প্রত্যক্ষ ঔদার্য দেখিতে পাওয়া যায় না। রাজত্ব যেন একটা বৃহৎ দোকান : সওদাগরের 'একচেটে' রাজকার্য-নামক মালগুলি প্রজাদিগকে অগত্যা কিনিতে হয়। এমন-কি, রাজদ্বারে বিচারপ্রার্থী হইলেও দীনতম প্রজাকেও ট্যাক হইতে পয়সা গণিয়া দিতে হয়। হইতে পারে, সে কালে বিচারক ঘুষ লইতে ছাড়িত না, কিন্তু তাহা রাজার দাবি নহে, তাহা কর্মচারীর চুরি। তখন রাজপথ, পান্থশালা, দীর্ঘিকা রাজার দান বলিয়া প্রজারা কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করিত। এখন পথকর পাবলিক কর গণিয়া দিয়াও তাহার প্রত্যক্ষফল অল্প লোকে দেখিতে পায়। পূর্বে রাজার জন্মদিনে রাজাই দান বিতরণ করিয়া সাধারণকে বিস্মিত করিয়া দিতেন এক্ষণে রাজকীয় কোনো মঙ্গলউৎসবে প্রজাদিগকেই চাঁদা জোগাইতে হয়। জেলায় ছোটোলাট প্রভৃতি রাজপ্রতিনিধির শুভাগমনকে আপনাদের নিকট স্মরণীয় করিবার জন্য প্রজাদের আপনাদিগকেই চেষ্টা করিতে হয় এবং তাহাদের সেই কৃতকীর্তিতে রাজা নিজের নাম অঙ্কিত করেন। কানুজংশনে যখন প্লেগ-সন্দিগ্ধদের বন্দীশালা দেখিতাম তখন বারংবার এ কথা মনে হইত যে, অশোকের ন্যায় আকবরের ন্যায় কোনো প্রাচ্য রাজা যদি সাধারণের হিতের জন্য এইপ্রকারের অবরোধ আবশ্যক বোধ করিতেন তবে তাহার ব্যবস্থা কখনোই এমন দীনহীন ও একান্ত অপ্রবৃত্তিকর হইত না— অন্তত নিরপরাধ অবরুদ্ধদের পানাহার রাজব্যয়ে সম্পন্ন হইত; যথেষ্ট বেতনভুক ডাক্তার প্রভৃতিরা সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতেছেন অথচ রাজ্যের হিতোদ্দেশে উৎসৃষ্ট যে-সকল দুর্ভাগা তাঁহাদের সযত্নসেব্য অতিথিস্থানীয়, যাহারা পরদেশে বিনাদোষে নিরুপায় ভাবে বন্দীকৃত, হয়তো পাথেয়বান সঙ্গীগণ হইতে বিচ্ছিন্ন, তাহাদিগকে স্বচেষ্টায় নিজব্যয়ে কষ্টে জীবনধারণ করিতে দেওয়া অন্তত প্রাচ্য প্রজাদের চক্ষে কোনোমতে রাজোচিত বলিয়া বোধ হয় না। সাধারণের জন্য রাজার হিতচেষ্টা বিভীষিকাময় না হইয়া যথার্থ রমণীয় মূর্তি ধারণ করিত যদি এই-সকল অবরোধশালা এবং মারী হাসপাতালের মধ্যে যত্ন ও ঔদার্য প্রকাশ পাইত। দৃষ্টিমাত্রেই যাহার বহিরাকারে দৈন্য এবং অবহেলা পরিস্ফুট হইয়া উঠে তাহার মধ্যে যে সাংঘাতিক অবস্থায় যথোপযুক্ত সেবা-শুশ্রূষা মিলিবে ইহা কাহারও প্রতীতি হয় না; রাজপুরুষের নিকট সর্ববিষয়ে আমাদের মূল্য যে কতই অল্প তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া সংকটের সময় আমাদের আতঙ্ক বাড়িয়া যায় এবং তখন ভীতসাধারণকে সান্ত্বনাদান করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। ঘোষণাদ্বারা আশ্বাসের দ্বারা যথেষ্ট ফল হয় না; যে-সকল প্রত্যক্ষ রাজচেষ্টা বরাভয় উদারমূর্তি ধারণ করিয়া আমাদের কল্পনাবৃত্তিকে রাজার কল্যাণ ইচ্ছার দিকে স্বতই আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায় তাহাই ফলদায়ক। যাহা সংকল্পে শুভ এবং যাহা পরিণামে শুভ তাহাকে আকারেপ্রকারেও শুভসুন্দর করিয়া না তুলিলে তাহার হিতকারিত্ব সম্পূর্ণ হয় না, এমন-কি, অনেক সময় তাহা হিতে বিপরীত হয়। যাহা হউক, আলোচ্য প্রবন্ধের জন্য শাস্ত্রীমহাশয় আমাদের ধন্যবাদার্হ। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল ইংরাজি কবি হুড্-রচিত 'এ প্যেরেন্টাল্ ওড্ টু মাই সন্' নামক কবিতার মর্ম গ্রহণ করিয়া 'আদর' নামক যে কবিতা রচনা করিয়াছেন তাহা সুন্দর হইয়াছে— তাহাতে মূল কবিতার হাস্যমিশ্রিত স্নেহরসটুকু আছে অথচ তাহাতে অনুবাদের সংকীর্ণতা দূর হইয়া কবির স্বকীয় ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'প্লেগ্ বা মহামারী' সুলিখিত সময়োচিত প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত আবদুল করিমের 'খলিফাদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়া গেছে— নব্যভারতে তাহার খণ্ডশ পুনঃপ্রকাশ বাহুল্যমাত্র।

সাহিত্য। গতবর্ষের [১৩০৪] মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্রের সাহিত্য একত্রে হস্তগত হইল।

বাংলায় আজকাল ইতিহাসের আলোচনা সাহিত্যের অন্য সকল বিভাগকে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে, 'সাহিত্য' পত্রের সমালোচ্য তিন সংখ্যা তাহার প্রমাণ। মাঘের পত্রে 'রাজা টোডরমল', 'রানী ভবানী' এবং 'বাংলার ইতিহাসে বৈকুণ্ঠ' এই তিনটি প্রবন্ধ প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। 'রানী ভবানী' একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ, অনেক দিন হইতে খণ্ডাকারে সাহিত্যে বাহির হইতেছে। 'বৈকুণ্ঠ' প্রবন্ধে লেখক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর প্রতি ইতিহাসের অন্যায় অভিযোগ সকল ক্ষালনের চেষ্টা করিয়াছেন। নবাবী আমল সম্বন্ধে প্রচলিত ইতিহাসের চূড়ান্ত বিচারের উপরেও যে আপিল চলিতে পারে সুযোগ্য লেখক মহাশয় তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। আমাদের মনে ক্রমে সংশয় জন্মিতেছে যে, বাল্যকালে বহুকষ্টে যে কথাগুলো মুখস্থ করিয়াছি, প্রৌঢ়বয়সে আবার তাহার প্রতিবাদগুলি মুখস্থ করিতে হয় বা! পরীক্ষাশালা হইতে নির্গত হইয়া ওগুলো যাঁহারা ভুলিতে পারিয়াছেন তাঁহারাই সৌভাগ্যবান। ফাল্গুন ও চৈত্রের সাহিত্যে 'রানী ভবানী', 'মগধের পুরাতত্ত্ব' এবং 'রত্নাবলীর রচয়িতা শ্রীহর্ষ' এই তিনটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ সর্বাপেক্ষা অধিক স্থান ও মাহাত্ম্য লাভ করিয়াছে। কোন্ শ্রীহর্ষ রত্নাবলী-রচয়িতা বলিয়া খ্যাত তাহার নির্ণয়ে লেখক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় যথেষ্ট অনুসন্ধান প্রকাশ করিয়াছেন। 'সহযোগী সাহিত্যে' লেখক মহাশয় সমালোচনা সম্বন্ধে যে কয়েকটি উপদেশ দিয়াছেন তাহাতে লেখকসম্প্রদায় পরম উপকৃত হইবেন। আমরা তাহা উদ্‌ধৃত করিলাম। 'অস্মদ্দেশে সাহিত্যসেবা নিতান্তই শখের জিনিস; তজ্জন্য সাহিত্যসেবীরাও অসাধারণ সূক্ষ্মচর্মী। কেহ আমাদিগের রচনার সমালোচনা করিয়া কেবল প্রশংসা না করিয়া কোনোরূপ দোষ দেখাইলে আর আমাদিগের সহ্য হয় না। আমরা তাহার প্রতিবাদে সমালোচকের যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি না দেখাইয়া তাঁহার উপর কেবল গালিবর্ষণ করি। আমাদিগের আত্মীয়, বন্ধুরা আশ্রিত অনুগতদিগের মধ্যে কেহ সমালোচককে গালি দিবার ভার গ্রহণ না করিলে আপনারাই মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া বা সভা ডাকিয়া, সমালোচককে গালি দিয়া আদর্শের ক্ষুদ্রতা, উদ্দেশ্যের হীনতা ও হৃদয়ের নীচতার পরিচয় প্রদান করি, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পরিতৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকি। আবার আমাদের 'লিটারারি' মোসাহেবগণ আমাদের এইরূপ কার্যকেও মহৎ কার্য বলিয়া আমাদিগকে আত্মদোষের বিষয়ে অন্ধ করিতে ক্রটি করে না।' এরূপ তীব্র ভাষায় এরূপ অনুতাপ-উক্তি আমরা দেখি নাই। কিন্তু লেখক নিজের প্রতি যতটা কালিমা প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার প্রয়োজন ছিল না। কারণ সূক্ষ্মচর্ম কেবল তাঁহার একলার নহে, প্রায় লেখকমাত্রেরই। এবং তিনি আত্মগ্লানির প্রাবল্যবশত লেখকবর্গ সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন ঠিক সেই কথাই সমালোচকদিগকেও বলা যায়। সকল লেখাও নির্দোষ নহে, সকল সমালোচনাও অভ্রান্ত নহে। কিন্তু মাংসাশী প্রাণীর মাংস যেরূপ ভক্ষ্য নহে, সেইরূপ সমালোচকের সমালোচনা সাহিত্যসমাজে অপ্রচলিত। সমালোচনার উপযোগিতা সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ হইতে পারে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সমালোচকের প্রবীণতা অভিজ্ঞতা ও উপযুক্ত শিক্ষা অভাবে আমাদের দেশের সমালোচনা অনেক স্থলেই কেবলমাত্র উদ্ধত স্পর্ধার সূচনা করে, এবং কেমন করিয়া নিংসংশয়ে জানিব যে তাহা 'আদর্শের ক্ষুদ্রতা, উদ্দেশ্যের হীনতা ও হৃদয়ের নীচতার পরিচয় প্রদান' করে না? যে লেখকের কিছুমাত্র পদার্থ আছে তাঁহার স্বপক্ষ বিপক্ষ দুই দলই থাকিবে— বিপক্ষ দল স্বপক্ষকে বলেন স্তাবক, এবং স্বপক্ষ দল বিপক্ষকে বলেন নিন্দুক; সমালোচ্য প্রবন্ধের লেখকও কোনো এক পক্ষকে লক্ষ্য করিয়া 'মোসাহেব' 'স্তাবক' বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। অধিকাংশ স্থলেই ভক্তকে 'স্তাবক' এবং বিরক্তকে 'নিন্দুক' বলে তাহারাই, যাহারা সত্য প্রচার করিতে চাহে না, বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে চায়। কিন্তু লেখক যখন বিশ্বসাধারণের বিশেষ হিতের জন্য সমালোচনার উপকারিতা সম্বন্ধে নিরতিশয় পুরাতন ও সাধারণ সত্য প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত, কোনো ব্যক্তিবিশেষকে আক্রমণ করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে তখন এ-সকল বিদ্বেষপূর্ণ অত্যুক্তি অসংগত শুনিতে হয়।

পূর্ণিমা। শ্রাবণ [১৩০৫?]

'বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সম্প্রদায়'। লেখক মহাশয় বঙ্কিমবাবুর বিরুদ্ধ সমালোচকদের প্রতি এতই রুষ্ট হইয়াছেন যে প্রবন্ধের একস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন 'ইনিও (বঙ্কিমবাবু) নিন্দুকের নিন্দা অথবা মূর্খের ধৃষ্টতা হইতে নিরাপদ হইতে পারেন নাই।' এইরূপ সাধারণভাবের রূঢ় উক্তি, হয় অনাবশ্যক, নয় অন্যায়। কারণ, নিন্দুক ও মূর্খগণ, কেবল বঙ্কিমবাবুর সম্বন্ধে কেন, অনেকেরই সম্বন্ধে নিন্দা ও ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়া থাকে— সেটা কিছু নূতন কথাও নহে, আশ্চর্যের কথাও নহে। তবে যদি এ কথা লেখকের বলিবার অভিপ্রায় হয় যে, যাহারা বঙ্কিমবাবুর বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছে তাহারা মূর্খ ও নিন্দুক তবে তিনি নিজেও অপবাদভাজন হইবেন। 'সাহিত্য ও সমাজ' নামক পুস্তিকায় বিষবৃক্ষের কী সমালোচনা বাহির হইয়াছে দেখি নাই; লেখক সমালোচ্য প্রবন্ধে তাহার যেরূপ মর্ম উদ্ধার করিয়াছেন তাহা যদি অযথা না হইয়া থাকে, তবে সেই সমালোচক মহাশয় অন্তত বুদ্ধিপ্রভাবের পরিচয় দেন নাই। কিন্তু 'মীরকাসিম'-লেখকের প্রতি মতবিরোধ লইয়া অবজ্ঞা প্রকাশের অধিকার কাহারও নাই। বঙ্কিমবাবুর প্রতি ভক্তি সম্বন্ধে আমরা সমালোচ্য প্রবন্ধলেখকের অপেক্ষা ন্যূনতা স্বীকার করিতে পারি না, তাই বলিয়া মীরকাসিম-লেখক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয়ের প্রতি অবমাননা প্রদর্শন আমরা উচিত বোধ করি না। কারণ, ক্ষমতাবলে তিনিও বঙ্গসাহিত্যহিতৈষীগণের সম্মানভাজন হইয়া উঠিতেছেন। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে অন্য হিসাবে অক্ষয়বাবুর সহিত আমাদের সহানুভূতি নাই। কালানুক্রমে ভূপঞ্জরের যেরূপ স্তর পড়িয়াছিল হিমালয় পর্বতে তাহার অনেক বিপর্যয় দেখা যায়, তাই বলিয়া কোনো ভূতত্ত্ববিৎ হিমালয়কে খর্ব করিলেও কালিদাসের নিকট তাহার দেবাত্মা গুপ্ত থাকে না। বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসে ইতিহাস যদি বা বিপর্যস্ত হইয়া থাকে তাহাতে বঙ্কিমবাবুর কোনো খর্বতা হয় নাই। উপন্যাসের [ইতিহাসের] বিকৃতি হইয়াছে বলিয়া নালিশ করাও যা, আর ধান্যজাত মদিরা অন্ন হইয়া উঠে নাই বলিয়া রাগ করাও তাই। উপকরণের মধ্যে ঐক্য থাকিতে পারে কিন্তু তবুও অন্ন মদ্য নহে এবং মদ্য অন্ন নহে এ কথাটা গোড়ায় ধরিয়া লইয়া তবে বস্তু-বিচার করা উচিত। অক্ষয়বাবু জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যদি ইতিহাসকে মানিবে না তবে ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিবার প্রয়োজন কী? তাহার উত্তর এই যে, ইতিহাসের সংস্রবে উপন্যাসে একটা বিশেষ রস সঞ্চার করে, ইতিহাসের সেই রসটুকুর প্রতি ঔপন্যাসিকের লোভ, তাহার সত্যের প্রতি তাঁহার কোনো খাতির নাই। কেহ যদি উপন্যাসে কেবল ইতিহাসের সেই বিশেষ গন্ধটুকু এবং স্বাদটুকুতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহা হইতে অখণ্ড ইতিহাস উদ্ধারে প্রবৃত্ত হন তবে তিনি ব্যঞ্জনের মধ্যে আস্ত জিরে ধনে হলুদ শর্ষের সন্ধান করেন। মসলা আস্ত রাখিয়া যিনি ব্যঞ্জনে স্বাদ দিতে পারেন তিনি দিন. এবং যিনি বাঁটিয়া ঘাঁটিয়া একাকার করিয়া স্বাদ দিয়া থাকেন তাঁহার সঙ্গেও আমার কোনো বিবাদ নাই, কারণ স্বাদই এ স্থলে লক্ষ্য, মসলা উপলক্ষ মাত্র। কিন্তু ইতিহাস অক্ষয়বাবুর এতই অনুরাগের সামগ্রী যে ইতিহাসের প্রতি কল্পনার লেশমাত্র উপদ্রব তাঁহার অসহ্য, সিরাজদ্দৌলা গ্রন্থে নবীনবাবু তাহা টের পাইয়াছেন। ইতিহাস-ভারতীয় উদ্যানে চঞ্চলা কাব্য-সরস্বতী পুষ্পচয়ন করিয়া বিচিত্র ইচ্ছানুসারে তাহার অপরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, প্রহরী অক্ষয়বাবু সেটা কোনোমতেই সহ্য করিতে পারেন না— কিন্তু মহারানীর খাস হুকুম আছে। উদ্যান প্রহরীরই জিম্মায় থাক্, কিন্তু এক সখীর কুঞ্জ হইতে আর-এক সখী পূজার জন্য হৌক বা প্রসাধনের জন্য হৌক যদি একটা ডালি ফুল পল্লব তুলিয়া লইয়া যায় তবে তিনি তাহার কৈফিয়তের দাবি করিয়া এত গোলমাল করেন কেন? ইহাতে ইতিহাসের কোনো ক্ষতি হয় না অথচ কাব্যের কিছু শ্রীবৃদ্ধি হয়। বিশেষ স্থলে যদি শ্রী সাধন না হয় তবে কাব্যের প্রতি দোষারোপ করা যায় সৌন্দর্যহানি হইল বলিয়া, সত্য হানি হইল বলিয়া নহে।

প্রদীপ। আষাঢ় [১৩০৫]
শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসুর 'বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধটি আন্তরিক সহৃদয়তা ও সরলতাগুণে সবিশেষ উপাদেয় হইয়াছে। সাধারণ লেখকের হস্তে পড়িলে সুলভ এবং শূন্য হৃদয়োচ্ছ্বাসের আড়ম্বরে প্রবন্ধটি স্ফীত ফেনিল হইয়া উঠিত। 'সমরু' প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় নবাবী আমলের সৈন্যরচনায় য়ুরোপীয় নায়কদিগের কর্তৃত্ব আলোচনা করিয়াছেন। 'চৈতালি-সমালোচনা সম্বন্ধে বক্তব্য' নামক প্রবন্ধরচয়িতার প্রতি ভারতী-সম্পাদক যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তবে প্রার্থনা করি পাঠকগণ সেই অহমিকা ক্ষমা করিবেন। কোনো লেখকের কবিতা যে সকল পাঠকেরই ভালো লাগিবে এমন দুরাশা কেহ করিতে পারেন না, কিন্তু যিনি সরল শ্রদ্ধার সহিত তাহার মর্মগ্রহণে প্রবৃত্ত হন এবং উপভোগের আনন্দ মুক্তভাবে প্রকাশ করেন তাঁহার উৎসাহ লেখকের কাব্যকাননে বসন্তের দক্ষিণ সমীরণের ন্যায় কার্য করে। 'ঋণ-পরিশোধ' গল্পে ভাষার সরসতা সত্ত্বেও ঘটনা বর্ণনা এবং চরিত্র রচনার মধ্যে একটা বানানো ভাব থাকাতে তাহা পাঠকের নিকট সত্যবৎ প্রত্যয়জনক হইয়া উঠে নাই। প্রভাতকুমারের অধিকাংশ কবিতায় যে একটি প্রচ্ছন্ন স্নিগ্ধ হাস্য থাকে 'অনন্ত শয্যা' কবিতাটির মধ্যেও তাহা পাওয়া যায়।

অঞ্জলি। জ্যৈষ্ঠ [১৩০৫]। ২য় সংখ্যা। এখানি একটি শিক্ষা-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর গুপ্ত -কর্তৃক সম্পাদিত।
আমরা এই পত্রিকার উন্নতি প্রার্থনা করি। শিক্ষাপ্রণালীর উৎকর্ষবিধান সম্বন্ধে য়ুরোপে উত্তরোত্তর আলোচনা বাড়িয়া চলিয়াছে। শিক্ষা কী উপায়ে সহজ, মনোরম স্থায়ী এবং যুক্তিসংগত হইতে পারে তৎসম্বন্ধে নানা প্রকার পদ্ধতি এবং পুস্তকের প্রচার হইতেছে। ইংরাজি ভাষায় শিক্ষাসাধন করিতে হয় বলিয়া বাঙালির শিক্ষাকার্য একটি গুরুতর ভারস্বরূপ হইয়া আমাদের শরীর মনকে জীর্ণ করিতেছে— অতএব শিক্ষার নবাবিষ্কৃত সহজ ও প্রকৃষ্ট পথগুলির সম্বন্ধে আলোচনা আমাদের দেশে বিশেষ ফলপ্রদ হইবার কথা কিন্তু আমাদের দেশের উদাসীন শিক্ষকগণ চিরপ্রচলিত দুঃখাবহ পথগুলি যে সহজে ছাড়িবেন এমন আশা রাখি না। যাহা হউক, আমাদের স্কুলে প্রচলিত বিশেষ বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়, যথা ইতিহাস, ভূগোল, পাটিগণিত, জ্যামিতি, সংস্কৃতভাষা, ইংরাজিভাষা, ব্যাকরণ, প্রকৃতিবিজ্ঞান প্রভৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিস্তারিত আলোচনা এবং প্রতিবৎসর যে-সকল পাঠ্যপুস্তক নির্দিষ্ট ও পরীক্ষার প্রশ্ন দেওয়া হয় তাহার উপযুক্ত সমালোচনা আমরা অঞ্জলির নিকট হইতে আশা করি।

ভারতী
শ্রাবণ ১৩০৫

সাহিত্য। বৈশাখ [১৩০৫]
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' প্রবন্ধটি চিন্তাপূর্ণ। নামটি এবং বিষয়টি আমাদের অপরিচিত। লেখক বলিতেছেন, ভগবান শাক্যকুমার সিদ্ধার্থ 'বোধিদ্রুমমূলে বুদ্ধত্বলাভের সময় জীবনব্যাধির কারণস্বরূপ দ্বাদশটি নিদানের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই নিদানতত্ত্বের নাম প্রতীত্যসমুৎপাদ। দ্বাদশটি নিদানের নাম যথাক্রমে এই— অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি, জরামরণ।' এই নিদানতত্ত্বের ব্যাখ্যা লইয়া নানা মত আছে, ত্রিবেদী মহাশয় তাহাতে আর-একটি যোগ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যা কিয়দ্দূর পর্যন্ত শক্ত মাটির উপর দিয়া আসিয়া চোরাবালির মধ্যে হারাইয়া গেছে; পরিণাম পর্যন্ত পৌঁছে নাই। ত্রিবেদী মহাশয়ের ব্যাখ্যার প্রথমাংশ যদি ইতিহাসসংগত হয়, অর্থাৎ স্বাধীন যুক্তিমূলক না হইয়া যদি নানা বৌদ্ধশাস্ত্র ও সাহিত্যদ্বারা পোষিত হয়, তবে ইহা সত্য যে, বৌদ্ধদর্শন আধুনিক পাশ্চাত্যবিজ্ঞানমূলক দর্শনের সহিত প্রধানত একমতাত্মক। কিন্তু প্রচুর

ঐতিহাসিক প্রমাণ ব্যতীত এ সম্বন্ধে কথা চূড়ান্ত হইতে পারে না। অতএব ত্রিবেদী মহাশয় যে পথে চিন্তা প্রয়োগ করিয়াছেন সেই পথে গবেষণারও প্রেরণ আবশ্যক। 'একনিষ্ঠ বিবাহ' প্রবন্ধটি সংক্ষিপ্ত তথ্যপূর্ণ সুপাঠ্য। 'মহারাজ রামকৃষ্ণ' পাঠকদের বহুআশাউদ্দীপক একটি প্রবন্ধের প্রথম পরিচ্ছেদ। লেখক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র লিখিতেছেন 'ইংরাজেরা যখন দেওয়ানি সনন্দ লাভ করেন, তখন জমিদারদল পদগৌরবে ও শাসনক্ষমতায় সর্বত্র গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। মহারাজ রামকৃষ্ণ ও তাঁহার সমসাময়িক জমিদারদিগের সময়ে সেই পদগৌরব ধূলিপটলের ন্যায় উড়িয়া গিয়াছে। সেকালের জমিদারগণ কী কৌশলে একালের উপাধিব্যাধিপীড়িত ক্রীড়াপুত্তলে পরিণত হইয়াছিলেন, মহারাজ রামকৃষ্ণের জীবনকাহিনী কিয়ৎপরিমাণে তাহার রহস্যোদ্‌ঘাটন করিতে সক্ষম।'

প্রদীপ। শ্রাবণ [১৩০৫]
'জীবজাতি নির্বাচন' প্রবন্ধটি সরল অথচ গভীর এবং চিন্তাউদ্রেককারী। জাতি নির্বাচন যে কত কঠিন তাহাই প্রমাণপূর্বক সেই সোপান বাহিয়া লেখক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় অভিব্যক্তিবাদের সীমায় আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। এই সংখ্যায় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের সচিত্র জীবনচরিতের প্রথম অংশ পাঠ করিয়া সুখী হইলাম।

অঞ্জলি। আষাঢ় [১৩০৫]
'বণিক বন্ধু' নামক প্রবন্ধে পণ্য ও বণিক্‌ শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় আলোচনা উদ্‌ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। 'সংস্কৃত পণ ধানু হইতে বণিজ্‌ শব্দ সিদ্ধ করা হইয়াছে। বৈয়াকরণেরা বণ ধাতু না করিয়া পণধাতু কেন করিলেন উহার তত্ত্ব এক রহস্যময় ব্যাপার। পুরাকালে রোমানেরা ফিনিসিয়ানদিগকে পুণিক বলিত। পুণিকেরা অতিবৈয়াকরণ যুগে ভারতবর্ষে ব্যাবসা-বাণিজ্য করিত। ভারতবাসীরা পুণিকদিগকে পণিক বলিত। পণিক সাধিবার জন্য পণ ধাতুর সৃষ্টি হইল। উত্তর কালে (আভিধানিক কালে) পণ ধাতুর চিহ্ন পণ্য রাখিয়া পণিকদের মাহাত্ম্য বিলোপ হওয়াতে পণিকনামও সংস্কৃত অভিধান হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। পণিকদের পরে— সুদীর্ঘকাল পরে ভেনিজিয়া বা বণিজগণ ভারতে আগমন করে। তখন বৈয়াকরণিক ঋষিযুগ অতীত হইয়াছে। সংস্কৃতের আইনকানুন হইয়াছে, সংস্কৃত পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গী, কাজেই পরবর্তীরা অনন্যোপায় হইয়া নবাগত বিজাতীয় শব্দগুলিকে নিপাতনের হাত ছোঁয়াইয়া শুদ্ধ করিয়া লইলেন। বণিজ্‌ শব্দও সেইরূপ শোধিত ও পণ ধাতুর পোষ্যপুত্র হইল। এই ভেনিস বা বণিজ্‌দের অতি আদরের সামগ্রী বলিয়া নীল বণিকবন্ধু আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল।'

ভারতী
ভাদ্র ১৩০৫

সাহিত্য। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় [১৩০৫] সংখ্যা একত্রে হস্তগত হইল।
'জ্যৈষ্ঠের সাহিত্যে 'মোহনলাল' প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় অক্ষয়বাবু ও নিখিলবাবুর প্রতিবাদ করিয়া যে তর্ক তুলিয়াছেন তাহার মীমাংসা আমাদের আয়ত্তাতীত। লেখাটি ভাষার সরস সুস্পষ্টতা ও প্রমাণ সংগ্রহ এবং বাঙালি পাঠকের বিশেষ আগ্রহজনক কয়েকটি নূতন তথ্যের জন্য বিশেষ উপাদেয় হইয়াছে। 'সেকালের কলিকাতা গেজেট' সুপাঠ্য কৌতুকাবহ প্রবন্ধ। আষাঢ়ে নিখিলবাবুর 'মীরণের পরিণাম রহস্য' রহস্যপূর্ণ উপন্যাসের ন্যায় ঔৎসুক্যজনক।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু-কর্তৃক সম্পাদিত।
বর্তমান সম্পাদকের হস্তে আসিয়া অবধি এই পত্রিকা আশাতীত গৌরব লাভ করিয়াছে। এখন

ইহার কোনো সংখ্যাই অবহেলাপূর্বক হারাইতে দেওয়া যায় না— ইহার প্রতি সংখ্যাই বঙ্গ সাহিত্যের একটি মূল্যবান ভাণ্ডার নির্মাণ করিয়া তুলিতেছে। সম্পাদক মহাশয় তাঁহার গুরুতর কর্তব্য যথারূপে নির্ণয় করিতে পারিয়াছেন এবং তাহা পালন করিবার শক্তিও তাঁহার আছে।

প্রদীপ। ভাদ্র [১৩০৫]

'বেনামী চিঠি' কৌতুকরসপূর্ণ ক্ষুদ্র সুলিখিত গল্প। গত বৎসর সূর্যের পূর্ণগ্রাস পরিদর্শন উপলক্ষে দেশবিদেশ হইতে পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সমবেত হইয়াছিলেন। কাপ্তেন হিল্‌স্ কেম্‌ব্রিজের নিউয়ল সাহেব পুলগাঁও স্টেশনে গ্রহণ পর্যবেক্ষণের জন্য শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। ভারত গবর্মেন্ট ইঁহাদের সহায়তার জন্য দেরাদুন হইতে কর্মচারী প্রেরণ করিয়াছিলেন। 'পুলগাঁওয়ে সূর্যগ্রহণ' প্রবন্ধের লেখক তাঁহাদের মধ্যে একজন। কীরূপ বহুচেষ্টাকৃত অভ্যাস ও সতর্কতার সহিত কিরূপ যন্ত্রসাধ্যবৎ শৃঙ্খলা সহকারে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সূর্যগ্রাসের বৈজ্ঞানিক পরিদর্শনকার্য সমাধা হয় এই প্রবন্ধে তাহার বর্ণনা পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিলাম। 'ছেলেকে বিলাতে পাঠাইব কি?' প্রবন্ধে লেখক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁহার স্বাভাবিক সরস ভাষায় সময়োপযোগী আলোচনার অবতারণা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস এই যে, বিলাতফেরতার দল যত সংখ্যায় বাড়িবে ততই তাঁহাদের বাহ্য বেশভূষার অভিমান ও উদ্ধত স্বাতন্ত্র্য কমিয়া যাইবে। প্রথম চটকে যে বাড়াবাড়ি হয় তাহার একটা সংশোধনের সময় আসে। হিন্দুসমাজও ক্রমে আপন অসংগত ও কৃত্রিম কঠোরতা শিথিল করিয়া আনিতেছে, তাঁহারাও যেন তাঁহাদের পুরাতন পৈতৃক সমাজের প্রতি অপেক্ষাকৃত বিনীতভাবে ধারণ করিতেছেন। তাহা ছাড়া বোধ করি কন্‌গ্রেস উপলক্ষে বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশের সবল ও সরল জাতীয় ভাবের আদর্শ আমাদের পক্ষে সুদৃষ্টান্তের কাজ করিতেছে। এই সংখ্যায় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের সুরচিত জীবনী শেষ হইয়া পরলোকগত দীনবন্ধু মিত্রের সচিত্র জীবনচরিত বাহির হইয়াছে। স্বদেশের মহৎজীবনী প্রচারের দ্বারা প্রদীপ উত্তরোত্তর জ্যোতি লাভ করিতেছে।

উৎসাহ। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় [১৩০৫]

'বিশ্বরচনা' প্রবন্ধটি সুগম্ভীর। 'জগৎশেঠ' নিখিলবাবুর রচিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধগুলিতে বাংলার ইতিহাস উত্তরোত্তর সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইতেছি। 'রাজা রামানন্দ রায়' স্বনামখ্যাত বৈষ্ণব মহাত্মার জীবনচরিত; উৎসাহের ক্ষুদ্রায়তনবশত ক্ষুদ্রখণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে ইহাই এ প্রবন্ধের একমাত্র দোষ। 'ভূগর্ভে' বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ যত্নপূর্বক পাঠ্য। আষাঢ় মাসের উৎসাহে 'হেস্টিংসের শিক্ষানবিশী' প্রবন্ধে সংক্ষেপে অনেক গুরুতর কথার সন্নিবেশ আছে। হেস্টিংস যখন ইংরাজের নবরাজ্যক্ষেত্রে সবেমাত্র অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতেছেন তখনি বর্ধিতপ্রতাপ নন্দকুমারের ছায়া তাঁহাকে অভিভূত করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার পর যখন হেস্টিংসের দিন আসিল তখন কি তিনি সে কথা একেবারে ভুলিয়াছিলেন?

অঞ্জলি। শ্রাবণ [১৩০৫]

আমরা আশা করি, অঞ্জলিতে শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত প্রবন্ধ বাহির হইবে; নতুবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধে শিক্ষকেরা বিশেষ সাহায্য লাভ করিতে পারিবেন না। আজকাল শিক্ষাপদ্ধতি লইয়া ইংরাজিতে এত পুস্তক এবং পত্রিকা বাহির হইতেছে যে শিক্ষাসুগমের নূতন নূতন উপায় সম্বন্ধে লেখা শেষ করা যায় না। 'উচ্চারণ দোষ সংশোধন', 'ভৌগোলিক নাম লিখন ও পঠন', 'পুনরালোচনা' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি যথেষ্ট বিস্তীর্ণ হয় নাই— অনেকটা সাধারণ কথার উপর দিয়াই গিয়াছে। এবারকার অঞ্জলিতে 'সোনারুপার বিবাদ' প্রবন্ধটি প্রাঞ্জল এবং

সময়োপযোগী হইয়াছে। বর্তমান কালে মুদ্রাবিপাকের আলোচনা দেশে বিদেশে জাগিয়া উঠিয়াছে অথচ এ সম্বন্ধে মোটামুটি কথাও আমাদের দেশের অনেকের অগোচর।

ভারতী
আশ্বিন ১৩০৫

সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা। ৫ম ভাগ, ৩য় সংখ্যা [১৩০৫]
বর্তমান সংখ্যাটি বিচিত্র বিষয় বিন্যাসে বিশেষ ঔৎসুক্যজনক হইয়াছে। পত্রিকায় চণ্ডিদাসের যে নূতন পদাবলী প্রকাশিত হইতেছে তাহা বহু মূল্যবান। বিশেষত কয়েকটি পদের মধ্যে চণ্ডিদাসের জীবনবৃত্তান্তের যে আভাস পাওয়া যায় তাহা বিশেষ কৌতুকাবহ। সম্পাদক মহাশয় আদর্শ পুঁথির বানান সংশোধন করিয়া দেন নাই সেজন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদভাজন। প্রাচীন-গ্রন্থ-সকলের যে-সমস্ত মুদ্রিত সংস্করণ আজকাল বাহির হয় তাহাতে বানান-সংশোধকগণ কালাপাহাড়ের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা সংস্কৃত বানানকে বাংলা বানানের আদর্শ কল্পনা করিয়া যথার্থ বাংলা বানান নির্বিচারে নষ্ট করিয়াছেন। ইহাতে ভাষাতত্ত্বজিজ্ঞাসুদিগের বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়াছে। বর্তমান সাহিত্যের বাংলা বহুল পরিমাণে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের উদ্‌ভাবিত বলিয়া বাংলা বানান, এমন-কি, বাংলা পদবিন্যাস-প্রণালী তাহার স্বাভাবিক পথভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে, এখন তাহাকে স্বপথে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু আধুনিক বাংলার আদর্শে যাঁহারা প্রাচীন পুঁথি সংশোধন করিতে থাকেন তাঁহারা পরম অনিষ্ট করেন।

'স্ত্রী কবি মাধবী' প্রবন্ধের প্রারম্ভে লেখক শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী লিখিয়াছেন— 'এ পর্যন্ত প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে আমরা একজনমাত্র স্ত্রী-কবির কবিতাকুসুমের সৌরভ সুষমার সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছি, তিনিই মাধবী দেবী।' মাধবী উৎকলবাসিনী। প্রবন্ধে তাঁহার রচিত বাংলা পদাবলীর যে আদর্শ পাওয়া গিয়াছে তাহা বিস্ময়জনক। তাহার ভাষা পুরুষ বৈষ্ণব কবিদের অপেক্ষা কোনো অংশেই ন্যূন নহে। সেই প্রাচীনকালে উৎকল ভূমি বাংলা ভাষার উপর যে অধিকার লাভ করিয়াছিল এক্ষণে নব্যউৎকল তাহা স্বেচ্ছাপূর্বক পরিত্যাগ করিতেছে তাহা বাংলার পক্ষে দুঃখের কারণ এবং উৎকলের পক্ষেও দুর্ভাগ্যের বিষয়।

'গৌড়াধিপ মহীপালদেবের তাম্রশাসন' দিনাজপুরের ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত নন্দকৃষ্ণ বসুর সহায়তায় বর্তমান পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে। 'বিলাসপুর নামক জয়স্কন্ধাবার হইতে, বিষুবসংক্রান্তিতে গঙ্গাস্নান করিয়া পরম সৌগত পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ মহীপালদেব ভট্টপুত্র হৃষীকেশের পৌত্র, মধুসূদনের পুত্র, পরাশর-গোত্রজ (শক্তি, বশিষ্ঠ ও পরাশর প্রবরভুক্ত) যজুর্বেদান্তর্গত বাজসনেয়-শাখাধ্যায়ী চাবটিগ্রামবাসী ভট্টপুত্র কৃষ্ণাদিত্যশর্মাকে বর্তমান তাম্রশাসন দান করেন।' যিনি দিয়াছেন এবং তাম্রশাসনোক্ত যে গ্রাম দান করা হইয়াছে পত্রিকায় তাহার আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু যাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে তাঁহার সম্বন্ধে কোনোরূপ আলোচনাই নাই। কুলজিগ্রন্থ হইতে তাঁহার বিবরণ উদ্ধার করিলে ঐতিহাসিক কাল নির্ণয়ের অনেক সহায়তা হয়।

'ধোয়ী কবির পবনদূত' প্রবন্ধটি বিশেষ মনোহর হইয়াছে। গীতগোবিন্দের শ্লোকে ধোয়ী কবির নামোল্লেখ অনেকে দেখিয়াছেন। অনেকে দিন অনুসন্ধানের পর সম্প্রতি তাঁহার রচিত পবনদূত কাব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাহার যে বিবরণ এবং মধ্যে মধ্যে অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত সরস হইয়াছে।

'পাঁচালিকার ঠাকুরদাস' প্রবন্ধে লেখক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি বাংলা পাঁচালি-সাহিত্য-ইতিহাসের একাংশ উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন।

প্রদীপ। আশ্বিন ও কার্তিক [১৩০৫]
এই যুগল-সংখ্যক প্রদীপ পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ পরিতৃপ্ত হইয়াছি। ইহার প্রায় প্রত্যেক গদ্য

প্রবন্ধই আদরণীয় হইয়াছে। বাংলা সাময়িক পত্রে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী -রচিত 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর'-এর মতো প্রবন্ধ কদাচিৎ বাহির হয়। শাস্ত্রীমহাশয় প্রচুর ভাবসম্পদের অধিকারী হইয়াও বঙ্গসাহিত্যের প্রতি কৃপণতা করিয়া থাকেন এ অপবাদ তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবে।

'হামির' প্রবন্ধটি বিষয়গুণে চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

'হাফ্‌টোন্ ছবি' শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর রচনা। অনেকেই হয়তো জানেন না হাফ্‌টোন্ লিপি সম্বন্ধে উপেন্দ্রবাবুর নিজের আবিষ্কৃত বিশেষ সংস্কৃত পদ্ধতি বিলাতের শিল্পী-সমাজে খ্যাতি লাভ করিয়াছে; উপেন্দ্রবাবু স্বাভাবিক বিনয়বশত তাঁহার প্রবন্ধের মধ্যে কোথাও এ ঘটনার আভাসমাত্র দেন নাই। তিনি বাঙালির মধ্যে প্রথম নিজচেষ্টায় হাফ্‌টোন্ শিক্ষা করেন এবং অল্পকালের মধ্যেই তাহার সংস্কার সাধনে কৃতকার্য হন। ভারতবর্ষের প্রতিকূল জলবায়ু এবং সর্বপ্রকার সহায়তা ও পরামর্শের অভাব সত্ত্বেও এই নূতন শিল্পবিদ্যা আয়ত্ত এবং তাহাকে সংস্কৃত করিতে যে কী পরিমাণ অধ্যবসায় ও মানসিক ক্ষমতার প্রয়োজন তাহা অব্যবসায়ীর পক্ষে মনে আনাই কঠিন। উপেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধ অপেক্ষা তাঁহার রচিত যে সুন্দর আলেখ্যগুলি প্রদীপে বাহির হইয়াছে তাহাতেই তাঁহার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়।

'হীরার মূল্য' নামক ছোটো গল্পটিতে লেখক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের স্বাভাবিক প্রতিভা পরিস্ফুট হইয়াছে। গল্পটি ভাষার শ্রী, আখ্যায়িকার কৌশল, চরিত্ররচনার সহজ-নৈপুণ্য এবং সংক্ষিপ্ত সংহত উজ্জ্বলতাগুণে হীরকখণ্ডের মতো দীপ্তি পাইতেছে। গল্পটি পাঠ করিতে করিতে নবাব পরিবারের একটি হিন্দুস্থানী আবহাওয়া পাঠকের অন্তঃকরণকে বেষ্টন করিয়া ধরে। 'রাসায়নিক পরিভাষা' খ্যাতনামা বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের রচনা। প্রফুল্লবাবু বিশুদ্ধ বাংলা রাসায়নিক পরিভাষা প্রচলনের পক্ষপাতী। এ সম্বন্ধে তিনি জর্মনির দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। ইংরাজি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে যেখানে লাটিনমূলক পরিভাষা গৃহীত হইয়াছে জর্মানেরা সে স্থলে স্বদেশীভাষামূলক পরিভাষা ব্যবহার করিতেছেন। প্রফুল্লবাবু আর-একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। অদ্বিতীয় পণ্ডিত মাণ্ডেলিয়েফ্ রাসায়নিক তত্ত্বে নূতন পথ-প্রদর্শক। ইনি রুশীয়। 'কিছুদিন হইল এই জগদ্‌বিখ্যাত রাসায়নিক ও তাঁহার সহযোগীগণ স্বদেশপ্রেমে পূর্ণ হইয়া দৃঢ় সংকল্প করিলেন, আর পরকীয় ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বা গ্রন্থ রচনা করা হইবে না। পাশ্চাত্য রাসায়নিকগণ মহাসংকটে পড়িলেন। কাজেই অনেকে রুশীয় ভাষা শিক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। রসায়নবিদ্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবন্ধলেখকের দুই জন বিলাতি বন্ধু কঠোর পরিশ্রমের পর মাণ্ডেলিয়েফ্ মূল ভাষায় পাঠ করিয়া সার্থকতা লাভ করেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, হতভাগ্য বাংলা ভাষা কি এতই অপরাধ করিল যে, ইহাকে রাসায়নিক পরিভাষা সংকলন হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে।' বঙ্গভাষাও রুশীয় ভাষার ন্যায় গৌরব লাভ করিবে এ কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে আমরা আর সংকোচ বোধ করি না; সম্প্রতি যে দুই-একজন বাঙালি আমাদিগকে এই উচ্চ আশার দিকে লইয়া যাইতেছেন ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহাদের মধ্যে একজন।

'দাতা কালীকুমার' প্রবন্ধে লেখক এ কথা সম্পূর্ণ প্রমাণ করিয়াছেন যে স্বর্গগত কালীকুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত কোনোমতেই বিস্মৃতির যোগ্য নহে। আশা করি এই মহাত্মার সম্পূর্ণ জীবনচরিত আমরা গ্রন্থাকারে দেখিতে পাইব। দেশের বর্তমান আর্থিক অবস্থা ও নূতন শিক্ষায় একান্নবর্তী পরিবারবন্ধন বিশ্লিষ্ট হইবার সময় আসিয়াছে; কালীকুমার দত্তের মহৎ জীবনবৃত্তান্ত ভবিষ্যৎ বাঙালি পাঠকের নিকট প্রাচীন বাংলা সমাজের এক উজ্জ্বল আদর্শ অঙ্কিত করিয়া রাখিবে। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বর্তমান সংখ্যক প্রদীপে তাঁহার বন্ধু এবং ভারতের বন্ধু আনন্দমোহন বসু সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন 'আনন্দমোহনের জীবনে প্রাচ্য প্রেম ভক্তি ও প্রতীচ্য-কর্মশীলতা অপূর্বভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, ইহাতেই তাঁহাকে অনেক পরিমাণে আমাদের আদর্শস্থানীয় করিয়াছে।'

'স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল' নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্তী উক্ত মহাত্মা

সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল উদ্রেক করিয়াছেন। উমেশচন্দ্র অধিক বয়সে বঙ্গসাহিত্যে প্রবেশ করিয়া অল্পকালের মধ্যেই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার লেখা যেমন সরস, প্রাঞ্জল এবং পরিপক্ক ছিল তেমনি তাহার মধ্যে লেখকের স্বকীয়তা, নির্ভীকতা এবং অকৃত্রিম দৃঢ় ধারণা প্রকাশ পাইত। কেবল যে রচনাগুণে তিনি শ্রদ্ধেয় ছিলেন তাহা নহে; রজনীকান্তবাবু লিখিতেছেন, 'ব্যবহারে তিনি কলঙ্কশূন্য ছিলেন। কোনোরূপ কুসংস্কার তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিত না। পৌত্তলিকতার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না। উপনিষৎপ্রোক্ত ব্রহ্মোপাসনাই প্রকৃত হিন্দুধর্ম এ কথা তাঁহার মুখে ব্যক্ত হইত। উচ্চ শ্রেণীর সংস্কৃত শিক্ষার সহ উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজি শিক্ষা মিলিত হইলে কী অমৃতময় ফল প্রসব করে, তাহা তাঁহার জীবনে পরিলক্ষিত হইত। তাঁহার কোনোরূপ আড়ম্বর ছিল না। তাঁহার রামনগর বাসাবাটিতে গিয়াছি, এক কম্বলাসনে বসিয়া নানা আলাপ করিয়াছি। যখনই গিয়াছি কিছু-না-কিছু শিখিয়া আসিয়াছি। নিয়ম পথ হইতে তিনি রেখামাত্র বিচ্যুত হইতেন না।'

সর্বশেষে, আমরা প্রদীপের উন্নতির সঙ্গে তাহার স্থায়িত্ব কামনা করি। প্রদীপ যেরূপ প্রচুর পরিমাণে তৈল পুড়াইতেছে তাহাতে আশঙ্কা হয় কোন্ দিন তাহার অকাল নির্বাণ হইবে। এত ছবি না ছাপাইয়া এবং এত খরচপত্র না করিয়াও কেবল প্রবন্ধগৌরবে প্রদীপ স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিবে এইরূপ আমাদের বিশ্বাস।

ভারতী

অগ্রহায়ণ ১৩০৫

সাময়িক সারসংগ্রহ

নাইন্‌টীন্থ্‌ সেঞ্চুরি

মণিপুরের বর্ণনা

সার জেমস্‌ জন্‌স্টন্‌ জুন মাসের নাইন্‌টীন্থ্‌ সেঞ্চুরি পত্রিকায় মণিপুরের যে বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া সহসা মনের মধ্যে একটি বিষাদের ভাব উদয় হয়।

স্থানটি রমণীয়। চারি দিকে পর্বত, মাঝখানে একটি উপত্যকা; বাহিরের পৃথিবীর সহিত কোনো সম্পর্ক নাই। ভূমি অত্যন্ত উর্বরা, মানুষগুলি সরল এবং উদ্‌যোগী, রাজকর নাই বলিলেই হয়, রাজাকে কেবল বরাদ্দমতো পরিশ্রম দিতে হয়। যে শস্য উৎপন্ন হয় আপনারাই সংবৎসর খায় এবং সঞ্চয় করে, বাহিরে পাঠায় না, বাহির হইতেও আমদানি করে না। অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে এখানকার দৃশ্যটি বড়ো মনোহর হইয়া উঠে। দিন উজ্জ্বল, আকাশ পরিষ্কার, বাতাস শীতল, পাকাধানে শস্যক্ষেত্র সোনার বর্ণ ধারণ করিয়াছে। মেয়েরা শোভন বস্ত্র পরিয়া দলে দলে ধান কাটিতেছে, বলিষ্ঠ পুরুষেরা শস্যের আঁটি বহন করিয়া ঘরে লইয়া যাইতেছে। নিকটে গোরুগুলি ধীর গতিতে প্রদক্ষিণ করিয়া ধান মাড়াই করিতেছে, শস্যবিচ্ছিন্ন তৃণ এক পার্শ্বে রাশীকৃত হইতেছে, ধান যখন ঘরে আসিবে তখন সেই তৃণে আনন্দোৎসবের অগ্নি প্রজ্বলিত হইবে।

রাজধানীতে সন্ধ্যাবেলায় হাট বসে, সেইটেই দিবসের মধ্যে প্রধান ঘটনা। যতই বেলা পড়িয়া আসিতে থাকে পথ হাট লোকে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। পুরুষদের নির্মল শুভ্র বসন এবং মেয়েদের নানাবিধ উজ্জ্বল বর্ণের বিচিত্র সজ্জা। মেয়েরাই বিক্রেতা। দেখিতে পাওয়া যায় মাথায় পণ্য দ্রব্য এবং কোলে অথবা পিঠে কচি ছেলে লইয়া তাহারা 'সেনা কাইথেল' অর্থাৎ সোনাবাজারে হাট করিতে আইসে, পথ উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

বাজারের কাছে পোলো খেলিবার মাঠ। শহরের ভালো ভালো খেলোয়াড় এমন-কি রাজপুত্রগণ সেইখানে প্রায় প্রত্যহ খেলা করে; সেখানে কুস্তিও চলে এবং রাজসৈন্যদের কুচও হইয়া থাকে।

রাজবাড়ির চারি দিকে খাল কাটা আছে সেইখানে আশ্বিন মাসে একবার করিয়া নৌকা বাচ হয়। সেই উপলক্ষে মহা সমাগম হয়। রাজা, রাজকুটুম্ব, রানী এবং রাজকন্যাগণ নির্দিষ্ট মঞ্চে বসিয়া বাচ খেলা দেখেন; মেয়েদের কোনোরূপ পর্দা নাই, অবগুণ্ঠন নাই।

ইহা ছাড়া জন্মাষ্টমী, দেওয়ালি, হোলি, রথযাত্রা প্রভৃতি আরও অনেক উৎসব আছে। আষাঢ় মাসে এক ব্যায়াম-উৎসব হইয়া থাকে তখন চারি দিক হইতে সমাগত পাহাড়িয়াদিগের সহিত মণিপুরীদের কুস্তি প্রভৃতি নানাবিধ ব্যায়ামনৈপুণ্যের পরীক্ষা হয়।

এই প্রচ্ছন্ন পর্বতপুরীতে ঐশ্বর্য-আড়ম্বরের কোনো চিহ্ন দেখা যায় না, কিন্তু এখানে সরল সুখ-সন্তোষের লেশমাত্র অভাব নাই। রাজা যথেচ্ছাচারী, কিন্তু প্রজাদিগের মনে স্বজাতীয় রাজগৌরব সর্বদা জাগরূক। তাহারা বহুকাল হইতে আপনাদের রাজা এবং রাজকীয় বিবিধ অনুষ্ঠান, আপনাদের সোনার হাট, নৌকাখেলা, উৎসব আমোদ লইয়া শৈলকুলায়ের মধ্যে সুখে বাস করিতেছে। এই জগতের একান্তবর্তী সন্তোষকলকূজিত নিভৃত নীড়ের মধ্যে সভ্যতার নির্মম হস্তক্ষেপ দেখিলে এই কথা মনে পড়ে,

গড়ন ভাঙিতে, সখি, আছে নানা খল,
ভাঙিয়া গড়িতে পারে সে বড়ো বিরল।

আমেরিকার সমাজচিত্র

বিখ্যাত ইংরাজলেখক হ্যামিল্টন আইডে লিখিতেছেন যে, যদিও আমেরিকায় আইরিশ হইতে আরম্ভ করিয়া কাফ্রি এবং চীনেম্যান প্রভৃতি বিচিত্র জাতির সমাবেশ হইয়াছে তথাপি তাহাদের মধ্যে একটা স্বভাবের ঐক্য দেখা যায়। যাহার টাকাকড়ি আছে সে আপন নিবাসস্থান শহরের উন্নতির জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করা প্রধান কর্তব্য বোধ করে। তাহা ছাড়া খাঁটি মার্কিন, বিশ্রাম কাকে বলে জানে না; একদণ্ড স্থির থাকিতে হইলে তাহার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া যায়। নিজের কাজই করুক বা সাধারণের কাজেই লিপ্ত থাকুক প্রাণপণ খাটুনির ত্রুটি নাই। চিকাগো শহর একবার আগুন লাগিয়া ধ্বংস হইয়া গেল আবার দেখিতে দেখিতে কয়েক বৎসরের মধ্যে এমনি কাণ্ড করিয়া তুলিল যে, আজকাল অত বড়ো শহর মুল্লুকের মধ্যে আর দ্বিতীয় নাই। ইংরাজ যেখানে হতাশ্বাস হইয়া নিরস্ত হয়, মার্কিন সেখানে কিছুতেই দমে না। ব্যবসায়ে একবার যথাসর্বস্ব খোয়াইয়া পুনর্বার নবোদ্যমে অর্থসঞ্চয় আমেরিকায় প্রতিদিন দেখা যায়। ইহারা হাল ছাড়িয়া দিবার জাত নয়। ইংরাজের একান্ত অধ্যবসায় দেখিয়া আমাদের তাক লাগিয়া যায়, ইংরাজ আবার আমেরিকার অপ্রতিহত উদ্যম দেখিয়া ধন্য ধন্য করিতেছে।

কিন্তু লেখক বলেন, অবিশ্রাম কাজ করিয়া ইহারা যে সুখী আছে তাহা বলা যায় না। পুরুষদের মধ্যে অতিরিক্ত শ্রমের পর শ্রান্তি এবং মেয়েদের মধ্যে নিয়ত চাঞ্চল্য ও পরিবর্তনপ্রিয়তাকে সুখের অবস্থা বলা যায় না। আমেরিকায় দেখা যায়, উচ্চ শ্রেণীর নাট্যাভিনয় অপেক্ষা ভাঁড়ামি মস্করামি প্রভৃতিতে অধিকসংখ্যক লোক আকৃষ্ট হয়। লোকেরা এত অধিক মাত্রায় পরিশ্রম করে যে, অবসরের সময় তাহারা নিছক আমোদ চায়, যাহাতে মনোযোগ, চিন্তা বা মনোবৃত্তি বেশি উদ্রেক করে এমন কিছুই তাহাদের সহ্য হয় না।

মেয়েরা কেবলই বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে চঞ্চলভাবে উড়িয়া বেড়াইতেছে। শহর হইতে দূরে আপনার নিভৃত কুটিরের মধ্যে গার্হস্থ্য এবং গ্রাম কর্তব্য লইয়া দিনযাপন করা মার্কিন মেয়ের পক্ষে অসাধ্য। কোথায় ব্রাউনিং সম্বন্ধে ব্যাখ্যা হইতেছে, কোথায় বাগ্‌নারের সংগীত সম্বন্ধে তর্ক চলিতেছে; কোথায় কোন্ পণ্ডিত আজ্‌তেক জাতির বিবরণ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেছে, কোথায় ভূতনামানো হইতেছে, চঞ্চল কৌতূহল লইয়া সর্বত্রই আমেরিকানি উপস্থিত আছেন। সাধারণ ইংরাজ মেয়ে বিদ্যালয় ছাড়িলেই মনে করে শিক্ষা সমাপ্ত হইল, কিন্তু মার্কিন মেয়ে একটা-না-একটা কোনো অধ্যয়ন লইয়া লাগিয়া আছেই। সকলেরই প্রায় ক্ষুদ্র পরিবার এবং দুটি-চারটি চাকর, গৃহকর্ম সামান্য, এইজন্য মেয়েরা আমোদ অথবা শিক্ষা লইয়া চঞ্চলভাবে ব্যাপৃত থাকে। অনেক গৃহস্থ আপন কন্যাদিগকে শিক্ষার্থে য়ুরোপে প্রেরণ করেন। তাঁহারা বলেন, আমেরিকায় মেয়েরা বড়ো শীঘ্র পাকা হইয়া যায়। নিতান্ত অল্প বয়স হইতেই লোকলৌকিকতা আমোদ-অনুষ্ঠানে সকলের সহিত সমকক্ষভাবে দেখা-সাক্ষাৎ ও প্রেমাভিনয়ে অকালেই তাহাদের তারুণ্যের স্নিগ্ধ সৌরভ দূর হইয়া যায়। যাহা হউক, ইংরাজলেখক বলিতেছেন এমন অতিকর্মশীলতা এবং অতিচাঞ্চল্য সুখের অবস্থা নহে।

পৌরাণিক মহাপ্লাবন

বাইবল্-কথিত মহাপ্লাবনের বিবরণ সকলেই বিদিত আছেন। এবারকার পত্রিকায় বিখ্যাত বিজ্ঞান-অধ্যাপক হক্‌স্‌লি তাহার অসম্ভাব্যতা প্রমাণ করিয়াছেন। আমাদের দেশে প্রাচীন ধর্ম যে-যে স্থানে জীর্ণ হইয়া ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে নব্য পণ্ডিতেরা সেইখানে বিজ্ঞানের 'ঠেকো' দিয়া তাহাকে অটল বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইংলণ্ডে সেইরূপ বিচিত্র কৌশলে বিজ্ঞানকে শাস্ত্রোদ্ধারের কার্যে নিযুক্ত করার প্রয়াস চলিতেছে। কিন্তু সত্যের দ্বারা

ভ্রমকে বজায় রাখা অসাধারণ বুদ্ধিকৌশলেও সুসিদ্ধ হয় না। যখনই দেখা যায় সরল বিশ্বাসের স্থানে কুটিল ভাষ্যের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে তখনই জানা যায় শাস্ত্রের স্বাভাবিক মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে। ইতিহাসে শুনা যায় প্রাচীন গ্রীক ধর্মশাস্ত্র মরিবার প্রাক্‌কালে নানা প্রকার রূপক ব্যাখ্যার ছলে আপনার সার্থকতা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তৈল না থাকিলে কেবল দীর্ঘ বর্তিকায় প্রদীপ জ্বলে না; কালক্রমে বিশ্বাস যখন হ্রাস হইয়াছে তখন বড়ো বড়ো ব্যাখ্যাকৌশল সূক্ষ্ম শির তুলিয়া অন্ধকারকে আলো করিতে পারে না।

মুসলমান মহিলা

কোনো তুরস্কবাসিনী ইংরাজরমণী মুসলমান নারীদিগের একান্ত দুরবস্থার যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রমাণ না পাইলে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা উচিত জ্ঞান করি না। কিন্তু অসূর্যম্পশ্যা জেনানার সুখ-দুঃখ সত্য-মিথ্যা কে প্রমাণ করিবে? তবে, আমাদের নিজের অন্তঃপুরের সহিত তুলনা করিয়া কতকটা বুঝা যায়।

লেখিকা গল্প করিতেছেন, তিনি দুইটি মুসলমান অন্তঃপুরচারিণীর সহিত গল্প করিতেছেন এমন সময়ে হঠাৎ দেখিলেন তাহাদের মধ্যে একজন তক্তার নীচে আর-একজন সিন্ধুকের তলায় তাড়াতাড়ি প্রবেশ করিয়া লুকাইয়া পড়িল। ব্যাপারটা আর কিছুই নয় তাহাদের দেবর দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। আমাদের দেশে ভ্রাতৃবধূর দৃষ্টিপথে ভাসুরের অভ্যুদয় হইলে কতকটা এই মতোই বিপর্যয় ব্যাপার উপস্থিত হয়। নব্য মুসলমানেরা এইরূপ সতর্ক অবরোধ সম্বন্ধে বলিয়া থাকেন— 'বহুমূল্য জহরৎ কি কেহ রাস্তার ধারে ফেলিয়া রাখে? তাহাকে এমন সাবধানে ঢাকিয়া রাখা আবশ্যক যে, সূর্যালোকেও তাহার জ্যোতিকে ম্লান না করিতে পারে।' আমাদের দেশেও যাঁহারা বাক্যবিন্যাসবিশারদ তাঁহারা এইরূপ বড়ো বড়ো কথা বলিয়া থাকেন। তাঁহারা শাস্ত্রের শ্লোক ও কবিত্বের ছটার দ্বারা প্রমাণ করেন যে, যাহাকে তোমরা মনুষ্যত্বের প্রতি অত্যাচার বল তাহা প্রকৃতপক্ষে দেবত্বের প্রতি সম্মান। কিন্তু কথায় চিঁড়া ভিজে না। যে হতভাগিনী মনুষ্যসুলভ ক্ষুধা লইয়া বসিয়া আছে তাহাকে কেবলই শাস্ত্রীয় স্তুতি দিয়া মাঝে মাঝে পার্থিব দধি না দিলে তাহার বরাদ্দ একমুষ্টি শুষ্ক চিঁড়া গলা দিয়া নাবা নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে।

লেখিকা একটি অতিশয় রোমহর্ষণ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। জেনাবের যখন দশ বৎসর বয়স তখন তাহার বাপ তাহাকে হীরা জহরাতে জড়িত করিয়া পুত্তলিবেশে আপনার চেয়ে বয়সে ও ধনে সম্ভ্রমে বড়ো একটি বৃদ্ধ স্বামীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। একবার স্বামীগৃহে পদার্পণ করিলে বাপ-মায়ের সহিত সাক্ষাৎ বহু সাধনায় ঘটে, বিশেষত যখন তাঁহারা কুলে মানে স্বামীর অপেক্ষা ছোটো। জেনাব দুই ছেলের মা হইল তথাপি বাপের সহিত একবার দেখা হইল না। নানা উপদ্রবে পাগলের মতো হইয়া একদিন সে দাসীর ছদ্মবেশে পলাইয়া পিতার চরণে গিয়া উপস্থিত হইল। কাঁদিয়া বলিল, 'বাবা আমাকে মারিয়া ফেলো কিন্তু শ্বশুরবাড়ি পাঠাইয়ো না।' ইহার পর তাহার প্রাণসংশয় পীড়া উপস্থিত হইল। তাহার অবস্থা ও আকৃতি দেখিয়া বাপের মনে বড়ো আঘাত লাগিল। বাপ জামাতাকে বলিয়া পাঠাইলেন, 'কন্যার প্রাপ্য হিসাবে এক পয়সা চাহি না বরঞ্চ তুমি যদি কিছু চাও তো দিতে প্রস্তুত আছি তুমি তোমার স্ত্রীকে মুসলমান বিধি অনুসারে পরিত্যাগ করো।' সে কহিল, 'এত বড়ো কথা! আমার অন্তঃপুরে হস্তক্ষেপ! মশাল্লা! এত সহজে যদি সে নিষ্কৃতি পায় তবে যে আমার দাড়িকে সকলে উপহাস করিবে!'

তাহার রকম-সকম দেখিয়া দূতেরা বাপকে আসিয়া কহিল, 'যে রকম গতিক দেখিতেছি তোমার মেয়েকে একবার হাতে পাইলেই বিষম বিপদ ঘটাইবে।' বাপ বহুযত্নে কন্যাকে লুকাইয়া রাখিলেন।

বলিতে হৃৎকম্প হয় পাষণ্ড স্বামী নিজের অপোগণ্ড বালক দুটিকে ঘাড় মটকাইয়া বধ করিয়া

তাহাদের সদ্যমৃত দেহ স্ত্রীর নিকট উপহারস্বরূপ পাঠাইয়া দিল।

মা কেবল একবার আর্তস্বরে চিৎকার করিয়া আর মাথা তুলিল না, দুই-চারি দিনেই দুঃখের জীবন শেষ করিল।

এইরূপ অমানুষিক ঘটনা জাতীয় চরিত্রসূচক দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করা লেখিকার পক্ষে ন্যায়সংগত হইয়াছে বলিতে পারি না কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, একীকরণের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যিনিই যত বড়ো বড়ো কথা বলুন, মানুষের প্রতি মানুষের অধিকারের একটা সীমা আছে; পৃথিবীর প্রাচ্য প্রদেশের স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অধিকার সেই সীমা এতদূর অতিক্রম করিয়াছে যে, আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়া কতকগুলা আগড়ম্ বাগড়ম্ বকিয়া আমাদিগকে কেবল কথার ছলে লজ্জা নিবারণ করিতে হইতেছে।

প্রাচ্য সভ্যতার প্রাচীনত্ব

মে মাসের পত্রিকায় আচার্য ম্যাক্সমূলার লিখিতেছেন প্রাচীনতার একটি বিশেষ গৌরব আছে সন্দেহ নাই কিন্তু প্রাচ্যতত্ত্ব আলোচনায় সেইটেকেই মুখ্য আকর্ষণ জ্ঞান করা উচিত হয় না। যাহা-কিছু বহুকেলে এবং সৃষ্টিছাড়া তাহাই যে বিশেষ আদরের সামগ্রী তাহা নহে। বরঞ্চ প্রাচীনের সঙ্গে যখন নবীনের যোগ দেখা যায়, যখন সম্পর্কসূত্রে নবীন প্রাচীন হইয়া যায় এবং প্রাচীন নবীন হইয়া আসে, তখনই আমাদের যথার্থ আনন্দ বোধ হয়। আর্য সভ্যতা আবিষ্কারের প্রধান মাহাত্ম্য এই যে, ইহার দ্বারা দূর নিকটবর্তী হইয়াছে এবং যাহাদিগকে পর মনে করিতাম তাহাদিগকে আপনার বলিয়া জানিয়াছি। মনুষ্যপ্রেম বিস্তারের, পৃথিবীর দেশ-বিদেশের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের একটি প্রাচীন পথ পাওয়া গিয়াছে। অতএব এ কেবল একটি শুষ্ক তত্ত্বমাত্র নহে, মনুষ্যত্বই ইহার আত্মা, মানবই ইহার লক্ষ্যস্থল।

তিনি বলিতেছেন একবার ভাবিয়া দেখো 'ইন্ডো-য়ুরোপিয়ান' শব্দটার মধ্যে কতটা মহত্ত্ব আছে। এই নামে ইংরাজি, জর্মান, কেল্টিক্, স্লাভোনিক, গ্রীক এবং লাটিন -ভাষীদের সহিত সংস্কৃত, পারসিক এবং আর্মানি -ভাষীরা এক হইয়া গিয়াছে। এই নামে এমন একটি বৃহৎ মিলনমণ্ডলীর সৃষ্টি হইয়াছে পৃথিবীর সমস্ত মহত্তম জাতি যাহার অঙ্গ— এই নামের প্রভাবে সেই-সমস্ত জাতি আপনাদের অন্তরের মধ্যে বৃহৎ ইন্ডো-য়ুরোপীয় ঐক্যের, প্রাচীন আর্য ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনের একটি মহৎ মর্যাদা অনুভব করিতে পারিতেছে।

ম্যাক্সমূলার মহাত্মার মতো কথা বলিয়াছেন। হায়, তিনি জানেন না তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই 'আর্য' শব্দ লইয়াই আমাদের দেশে দূরে নিকটে, মানবে মানবে কাল্পনিক ব্যবধান স্থাপিত হইতেছে। বাঙালি পণ্ডিতের মুখে যখন এই 'আর্য' নাম উচ্চারিত হয় তখন তাহার সুদূরব্যাপী উদারতা ঘুচিয়া গিয়া তাহা একটা গ্রাম্য দলাদলির কলহকোলাহলে পরিণত হয়। নামের দোষ নাই, যাহার যেমন প্রকৃতি, ভাষা তাহার মুখে তেমনি আকার ধারণ করে।

এই উপলক্ষে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত 'আর্যামি এবং সাহেবিয়ানা' পুস্তিকাখানি আমরা পাঠকগণকে পড়িতে সবিনয় অনুরোধ করি।

সাধনা

অগ্রহায়ণ ১২৯৮

ক্ষিপ্ত রমণীসম্প্রদায়

যে-সকল ইংরাজ স্ত্রীলোক রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিয়া পুরুষের সমকক্ষ হইবার চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে বিলাতের বিখ্যাত লেখিকা লিন্ লিন্টন্ জুলাই মাসের নাইন্টিন্থ

সেঞ্চুরিতে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা গত সংখ্যক সাধনায় 'সাহিত্যে' প্রকাশিত প্রবন্ধবিশেষের সমালোচনায় রমণীদের বিশেষ কার্য সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করিয়াছিলাম পাঠকগণ লিন্ লিন্টনের এই প্রবন্ধের সহিত তাহার বিস্তর ঐক্য দেখিতে পাইবেন।

লেখিকা বলেন, কথাটা শুনিতে ভালো লাগুক বা না লাগুক, জননী হওয়াই স্ত্রীলোকের অস্তিত্বের প্রধান সার্থকতা, এবং প্রকৃতি সেই কারণেই তাহাকে অঙ্গে প্রত্যঙ্গে পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া গড়িয়াছে। যাহাতে করিয়া রমণীর সুস্থ সন্তান উৎপাদন ও শিশুসন্তান পালনপোষণ করিবার শক্তি হ্রাস করে তাহা সমাজ ও প্রকৃতির নিকটে অপরাধস্বরূপ গণ্য হওয়া উচিত।

মনুষ্যের কতকগুলি বিশুদ্ধ ও উচ্চ ভাবের আকরস্থল আছে, গৃহ তাহার মধ্যে একটি। যদি পুরুষেরা উপার্জন রাজ্যশাসন প্রভৃতি বাহিরের কার্য এবং স্ত্রীলোকেরা স্বজনসেবা সমাজরক্ষা প্রভৃতি ভিতরের কার্য না করে তবে এই গৃহ এক দণ্ড টিকিতে পারে না। সমাজের যতই উন্নতি হয় স্ত্রী-পুরুষের কার্যবিভাগ ততই সুনির্দিষ্ট হইতে থাকে। সমাজের নিম্নস্তরেই দেখা যায় চাষাদের মেয়েরা কৃষিকার্যে পুরুষের সহযোগিতা করিয়া থাকে।

যাঁহারা একদিকে আত্মমাহাত্ম্য এবং অন্য দিকে রমণীর সুমিষ্ট সুকোমল হৃদয়বত্তার মধ্যে দোদুল্যমান হইতেছেন তাঁহাদিগকে একটু বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি। একসঙ্গে দুই দিক রক্ষা হয় না। হয় রাজনৈতিক সংগ্রাম নয় পারিবারিক শান্তি, হয় বক্তৃতামঞ্চ নয় গৃহ, হয় স্বাতন্ত্র্য নয় প্রেম, হয় ধর্মপ্রবৃত্তির শুষ্কতা ও নিষ্ফলতা নয় উর্বরা পরিপূর্ণা বিচিত্রফলশালিনী স্ত্রীপ্রকৃতি, এই দুয়ের মধ্যে একটাকে বরণ করিতে হইবে।

স্ত্রীলোকের হস্তে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দিবার বিরুদ্ধে এমন একটি যুক্তি আছে যাহার আর উত্তর সম্ভবে না। রাজকার্যে যখন আবশ্যক হইবে তখন পুরুষেরা রণক্ষেত্রে রক্তপাত করিতে বাধ্য কিন্তু স্ত্রীলোকের নিকট তাহা প্রত্যাশা করা যায় না। অতএব যুদ্ধ বাধাইবার বেলা স্ত্রীলোক থাকিবেন আর রক্তপাতের বেলায় পুরুষ এটা ঠিক সংগত হয় না। আর স্ত্রীলোক যে স্বভাবতই শান্তির পক্ষপাতী হইবে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। য়ুরোপের কতকগুলি দারুণতর যুদ্ধ স্ত্রীলোকের দ্বারাই ঘটিয়াছে। মাডাম্ ডে ম্যান্টর্ন কি শান্তিপ্রয়াসিনী ছিলেন? ফ্রাঙ্কো-প্রুসীয় যুদ্ধের প্রাক্কালে 'বর্লিনে চলো' বলিয়া ফ্রান্সে যে একটা রব উঠিয়াছিল, যে উন্মত্ততার ফলে এত রক্ত এবং এত অর্থব্যয় হইয়া গেল, সম্রাজ্ঞী য়ুজেনির কি তাহাতে কোনো হাত ছিল না? রুশিয়ার সুন্দরী যুবতীদের মধ্যে কি এমন কোনো নাইহিলিস্ট নাই যাঁহারা হত্যা ও সর্বনাশ প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন? বাতাসে উইলোপত্র যেরূপ কাঁপিয়া ওঠে, উত্তেজনাবাক্যে রমণীহৃদয় সেইরূপ বিচলিত হয়। তাহার পর একবার রমণী খেপিয়া দাঁড়াইলে তাহার বাধা-বিপদের চেতনা থাকে না, হিতাহিতের জ্ঞান দূর হইয়া যায়।

ফ্রান্সে সর্ববিষয়ে স্ত্রীলোকের শাসন যেরূপ বলবৎ এমন আর কোথাও নয়, কিন্তু সেখানে স্ত্রীলোক যখনই রাজ্যতন্ত্রে হস্তক্ষেপ করিয়াছে তখনই বিপদ ঘটাইয়াছে।

সর্বময় প্রভুত্বপ্রিয়তা এবং আপনার মতকেই পাঁচ কাহন করা স্ত্রীস্বভাবের অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ। আমেরিকায় রমণী যখনই প্রবল হয় একেবারে জবরদস্তি করিয়া মদের দোকান ভাঙিয়া দেয় এবং জোর হুকুমে মদ্যবিক্রয় বন্ধ করিয়া বসে। এদিকে ইঁহারা নিজে হয়তো চা, ইথর্ ক্লোরালে অভিষিক্ত হইয়া নিজের স্বাস্থ্য ও স্নায়ু জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছেন, অপ্রিয় কর্মফল হইতে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে বিবিধ বিপজ্জনক পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইতেছেন, কাহার সাধ্য তাহাতে হস্তক্ষেপ করে!

মাতৃত্বের মধ্যে একটি অপ্রতিহত কর্তৃত্ব আছে। শিশুসন্তানের উপর মায়ের অখণ্ড অধিকার। এ সম্বন্ধে কাহারো কাছে তাহার কোনো জবাবদিহি নাই। যুগ-যুগান্তর এই মাতৃকর্তৃত্ব চালনা করিয়া রমণীহৃদয়ে একটা অন্ধ আত্মপ্রভুত্বের ভাব বদ্ধমূল হইয়া আছে। বংশরক্ষার পক্ষে এই নিজ হৃদয়ানুসারী কর্তৃত্বপ্রিয়তা বিশেষ আবশ্যক কিন্তু রাজ্যরক্ষার পক্ষে, ব্যাপক ন্যায়াচরণের পক্ষে, সাধারণ হিতোদ্দেশে অল্পসংখ্যকের দমনের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

সীমান্ত প্রদেশ ও আশ্রিতরাজ্য

ইংরাজ যে কী কৌশলে রাজ্যবিস্তার ও রাজ্যরক্ষা করিতেছেন, অগস্ট মাসের নাইন্টিন্থ্ সেঞ্চুরি পত্রিকায় সার অ্যালফ্রেড লায়াল 'সীমান্তপ্রদেশ ও আশ্রিত রাজ্য' নামক প্রবন্ধে তাহা অনেকটা প্রকাশ করিয়াছেন।

লেখক বলেন, নিজ অধিকারের সন্নিকটে যখন প্রবল প্রতিবেশী থাকে তখন ইংরাজ মাঝখানে একটি করিয়া আশ্রিত রাজ্যের ব্যবধান রাখিয়া দেন। আশ্রিতরাজ্য স্থাপনের অর্থ এই যে, পার্শ্ববর্তী দুর্বল রাজাকে বল বা কৌশলের দ্বারা ইংরাজের আনুগত্য স্বীকার করানো। পরস্পরের মধ্যে এইরূপ করার থাকে যে, ইংরাজ তাহাকে শত্রু-আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে এবং সে ইংরাজ ছাড়া অন্য কোনো প্রবল রাজাকে সাহায্য করিতে পারিবে না। ১৭৬৫ খৃস্টাব্দে যখন ইংরাজ বঙ্গদেশ অধিকার করিলেন তখন মহারাট্টাদের সংঘর্ষ হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে মাঝখানে অযোধ্যাকে আশ্রিতরাজ্যস্বরূপ রক্ষা করিয়াছিলেন এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে সেই কারণেই মধ্য ভারতের রাজপুত রাজ্যসকলকে আশ্রয় দান করা হইয়াছিল। পঞ্জাব অধিকারের পূর্বে শিখদিগের আক্রমণ ঠেকাইবার জন্য শতদ্রুতীরে গুটিকতক ছোটো ছোটো পোষ্য রাজা রাখিতে হইয়াছিল। এইরূপে বাংলাদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া মাঝে মাঝে এক-একটা বাঁধ বাঁধিয়া ইংরাজ ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অধিকার করিয়া লইল।

ভারতের নীচের দিকে সমুদ্র ও উপরের দিকে হিমালয়ের দুই মস্ত বেড়া আছে। অতএব মনে হইতে পারে একবার ভারতের প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিলে আর আশ্রিত রাজ্যপাতের আবশ্যক নাই। কিন্তু ওদিকে মধ্য এশিয়া হইতে রুশিয়া ঠিক ইংরাজের কৌশল অবলম্বন করিয়া এক-এক পা অগ্রসর হইতেছে। সেও খানিকটা করিয়া দখল এবং খানিকটা করিয়া সন্ধিরাজ্য স্থাপন করে। এমনি করিয়া ইংরাজ ও রুশিয়া দুই সাম্রাজ্যের সন্ধিরাজ্য অক্সস নদীর দুই তীরে আসিয়া ঠেকিয়াছে। রুশিয়ার পক্ষে বোখারা এবং ইংরাজের পক্ষে আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তান। অতএব পর্বতের আড়ালে আসিয়াও রক্ষা নাই, তাহার পরপারেও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তানের সহিত যে কোনোরূপ পাকাপাকি লেখাপড়া আছে তাহা নহে— কিন্তু ইংরাজ এই পর্যন্ত একটা সীমা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন এবং পারস্য ও রুশিয়ার সহিত কথা আছে তাঁহারা সে সীমা লঙ্ঘন করিতে পারিবেন না।

এইরূপে স্বরাজ্য ও সন্ধিরাজ্যে মিলিয়া ইংরাজের আধিপত্য ক্রমশই বিপুল হইয়া উঠিতেছে। এতদূর পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, তাঁহারা নিজেই অনেক সময় শঙ্কা পান, কিন্তু সহসা আর অধিক বাড়িবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, এতদিন পরে ইংরাজের প্রতাপ পূর্ব ও পশ্চিমে দুই শক্ত জায়গায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। উভয় পার্শ্বেই সুনিয়ন্ত্রিত দুই বৃহৎ রাজ্যের কঠিন বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে। একদিকে রুশিয়া এবং একদিকে চীন।

ভারতবর্ষের উত্তরপ্রান্তে কাশ্মীর হইতে নেপাল পর্যন্ত কোনো সন্ধিরাজ্য স্থাপনার আবশ্যক হয় নাই। কারণ সেখানে তিনটি দুর্লঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক প্রহরী আছে। হিমালয়, তৎপশ্চাতে মধ্য এশিয়ার উচ্চ মালক্ষেত্র এবং তাহার উত্তর মঙ্গোলীয় মরুভূমি। কিন্তু উত্তর রাষ্ট্র হইতে নেপালের সহিত কোনোপ্রকার গোলযোগ ইংরাজ সহ্য করিবেন না; এবং এক সময় তিব্বত ইংরাজাশ্রিত সিকিমের ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছিল বলিয়া বছর দুয়েক হইল তাহার সহিত ইংরাজের একটি ছোটোখাটো খিটিমিটি বাধিয়া উঠিয়াছিল। এদিকে পূর্বাঞ্চলে বর্মার অভিমুখে চীনের সংস্রব সম্বন্ধে ইংরাজকে অনেকটা সাবধান থাকিতে হয়। যখন বর্মা ইংরাজের হস্তে আসে নাই তখন উহা একটি ব্যবধানস্বরূপ ছিল— এখন বর্মা অধিকার করিয়া ইংরাজ চীনের অত্যন্ত নিকট প্রতিবেশী হইয়াছেন; এইজন্য সম্প্রতি ইংরাজ বর্মা ও চীনের মধ্যবর্তী ক্যাম্বোডিয়ার অর্ধস্বাধীন অধিনায়কগণের সহিত সন্ধিবন্ধনে উদ্‌যোগী হইয়াছেন।

এইরূপে হিমালয়কে তাকিয়া করিয়া দুই দিকে দুই পাশবালিশ লইয়া ইংরাজ এক মস্ত রাজ-শয্যা পাতিয়াছেন কিন্তু গদি যে আর বেশি অগ্রসর হইবে এমন সম্ভাবনা সম্প্রতি নাই।

কেবল ভারতবর্ষের আশপাশ নহে ওদিকে ভূমধ্যসাগরে জিব্রাল্টর, সাইপ্রেস দ্বীপ, লোহিত সমুদ্রের প্রান্তে এডেন ইংরাজ-সতর্কতার পরিচয়স্থল। এডেন ভারতসমুদ্রপথে প্রবেশ করিবার প্রথম পদনিক্ষেপস্থান। এইখানে ইংরাজ একটি দুর্গ স্থাপন করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে। এডেনের চতুর্দিকে বিস্তৃত ভূখণ্ড ইংরাজের আশ্রয় স্বীকার করিয়াছে। এডেনের অনতিদূরবর্তী সাকোট্রা দ্বীপ ইংরাজের আশ্রিত এবং এডেনের পূর্ব দিকে ওমান হইতে মস্কট ও পারস্য উপসাগর পর্যন্ত আরবের সমস্ত উপকূল ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ইংরাজের জাহাজ সেখানকার সামুদ্রিক পুলিসের কাজ করে এবং আরব নায়কগণ পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদে ইংরাজের মধ্যস্থতা অবলম্বন করিয়া থাকে।

ইহার উপর আবার ইজিপ্টের প্রতি ইংরাজের দৃষ্টি। সেটা পাইলে ইংরাজের রাজপথ আরও পাকা হইয়া উঠে। কিন্তু তাহার প্রতি সমস্ত য়ুরোপের সমান টান থাকাতে ইংরাজের তেমন সুবিধা দেখিতেছি না।

যাহা হউক, ভারতের রাজলক্ষ্মীকে নিরাপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ইংরাজের দূরদর্শিতা দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। এমন আটঘাট বন্ধন, এমন অন্তরে বাহিরে পাহারা, এমন ছোটো বড়ো সমস্ত ছিদ্রাবরোধ কোনো আসিয়িক চক্রবর্তীর কল্পনাতেও উদয় হইতে পারিত না।

ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ

বিখ্যাত রণসংবাদদাতা আর্চিবল্ড্ ফর্বস্ কয়েক সংখ্যক নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরিতে অনেকগুলি রণক্ষেত্রের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতেছেন। ফ্রাঙ্কো-প্রুসীয় যুদ্ধের সময় জর্মান সৈন্য যখন প্যারিস নগরী অবরোধ করিয়াছিল তখন অবরুদ্ধ পুরীর মধ্যে মহা অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়। বিস্মার্ক উপহাস করিয়া বলিয়াছিলেন, প্যারিস আপন রসে আপনি সিদ্ধ হইতেছে। ঘোড়া কুকুর খাইয়া অবশেষে ক্ষুধার জ্বালা যখন অসহ্য হইয়া উঠিল তখন প্যারিস আপনার দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিল। রাজপথে আলো নাই, গ্যাস নির্মাণ করিবার কয়লার অভাব, হোটেলে হাসপাতাল, আহারের দোকান বন্ধ, বাণিজ্যের চলাচল রহিত, পথে কেবল সারি সারি মৃতদেহ-বাহক চলিয়াছে, অধিবাসীগণ ক্ষুধায় শীর্ণ এবং অনেকেই খঞ্জ ও অঙ্গহীন। যুদ্ধাবসানে দানব্রত-ইংরাজ প্যারিসে অন্নছত্র স্থাপন করিল। কিন্তু মানী লোকেরা বরঞ্চ মরিতে পারে কিন্তু দানগ্রহণ করিতে পারে না। লেখক বলিতেছেন, বিশেষত স্ত্রীলোকদের এ সম্বন্ধে অভিমান অত্যন্ত প্রবল। হয়তো খবর পাওয়া গেল, দুই জন স্ত্রীলোক অমুক বাসায় উপবাসে দিনযাপন করিতেছে। বার্তা লইতে গেলেই তাহারা মাথা তুলিয়া খাড়া হইয়া বসে, বলে, 'ইংরাজ অতিশয় দয়ালু জাতি এবং ঈশ্বর তাহাদের কল্যাণ করুন। উপরের তলায় কতকগুলি দরিদ্র বেচারা আছে বটে, তাহারা আহারাভাবে বিশেষ কষ্ট পাইতেছে। আমাদিগকে সাহায্য করিতে চাও, সেজন্য ধন্যবাদ দিই, কিন্তু না, আমরা দানগ্রহণ করিতে পারিব না।' এই বলিয়া সেই জ্যোতির্হীন নেত্র কোটরাবিষ্ট কপোল শীর্ণ রমণী ধীরে ধীরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয়।

সাধনা
পৌষ ১২৯৮

স্ত্রী-মজুর

কারখানার মজুরদের লইয়া য়ুরোপে আজকাল শ্রমিক আন্দোলন চলিতেছে। কল-কারখানা য়ুরোপের একটা প্রকাণ্ড অংশ অধিকার করিয়াছে এবং তাহার অধিকার উত্তরোত্তর বিস্তৃত

হইতেছে। পৃথিবীর ভার বাড়িয়া উঠিলে ভূভার-হরণের জন্য অবতারের আবশ্যক হয়। কল-কারখানা য়ুরোপীয় সমাজের মধ্যে একদিকে প্রকাণ্ড চাপ দিয়া তাহার ভার সামঞ্জস্যের যদি ব্যাঘাত করে তবে স্বাভাবিক নিয়মে একটা বিপ্লব উপস্থিত হওয়া কিছুই আশ্চর্য নহে। ব্যাপারটা কতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে আমাদের পক্ষে বলা বড়োই শক্ত, কিন্তু এই কথাটা লইয়াই সর্বাপেক্ষা অধিক নাড়াচাড়া চলিতেছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কলের প্রাদুর্ভাব হইয়া অবধি মজুরী সম্বন্ধে স্ত্রী-পুরুষের প্রভেদ অনেকটা লুপ্ত হইয়া আসিতেছে। পূর্বে বিশেষ কারুকার্যে বিশেষ শিক্ষার আবশ্যক ছিল; এবং গৃহকার্যের ভার স্বভাবতই স্ত্রীলোকদের উপর থাকাতে পুরুষদেরই বিশেষ শিক্ষা ও অভ্যাসের অবসর ছিল। তাহা ছাড়া, পূর্বে অধিকাংশ কাজ কতক পরিমাণে বাহুবলের উপর নির্ভর করিত, সেজন্য পুরুষ কারিগরেরই প্রাধান্য ছিল। কেবল চরকা কাটা প্রভৃতি অল্পায়াসসাধ্য কাজ স্ত্রীলোকের মধ্যে ছিল। এখন কলের প্রসাদে অনেক কাজেই নৈপুণ্য এবং বলের আবশ্যক কমিয়া গিয়াছে, অথচ কাজের আবশ্যক অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এইজন্য স্ত্রীলোক এবং বালকও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের সহিত দলে দলে মজুরী কার্যে প্রবৃত্ত হইতেছে। কিন্তু কেবল কলের কাজ দেখিলেই চলিবে না, সমাজের উপরেও ইহার ফলাফল আছে।

সমাজের হিতের প্রতি লক্ষ করিয়া কারখানার মজুরদের সম্বন্ধে য়ুরোপে দুটো-একটা করিয়া আইনের সৃষ্টি হইতেছে। কলের আকর্ষণ কথঞ্চিৎ পরিমাণে খর্ব করাই তাহার উদ্দেশ্য।

সেপ্টেম্বর মাসের 'নিউ রিভিউ' পত্রিকায় খ্যাতনামা ফরাসি লেখক জুল্ সিমঁ ফ্রান্সের স্ত্রী-মজুরদের সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

তিনি বলেন, ফ্রান্সে প্রথম যখন বালক মজুরদিগের বয়সের সীমা নির্দিষ্ট করিবার জন্য আইন হয় তখন একটা কথা উঠে যে, ইহাতে করিয়া সন্তানের প্রতি পিতামাতার স্বাভাবিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে। তাছাড়া কারখানাওয়ালারা ভয় দেখায় যে, শিশুসহায় হইতে বঞ্চিত হইলে কারখানার ব্যয়ভার এত বাড়িয়া উঠিবে যে, কারখানা বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু আইন পাস হইল এবং কারখানা এখনও সমান তেজে চলিতেছে। কলিকালের সকল ভবিষ্যৎ-বাণীরই প্রায় এই দশা দেখা যায়। বালক মজুরদের পক্ষে প্রথমে আট বৎসর, পরে নয় বৎসর, পরে বারো বৎসর এবং অবশেষে তেরো বৎসরের অন্যূন বয়স নির্দিষ্ট হইয়াছে।

স্ত্রী-মজুরদের খাটুনি সম্বন্ধে যখন কতকগুলি বিশেষ আইন বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা হয় তখন চারি দিক হইতে তুমুল আপত্তি উত্থাপিত হয়। সকলেই বলিতে লাগিল ইহাতে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা হরণ করা হইতেছে। যদি কোনো বয়ঃপ্রাপ্ত স্ত্রীলোক বারো ঘন্টা খাটিতে স্বীকার করে আইনের জোরে তাহাকে দশ ঘন্টা খাটিতে বাধ্য করা অন্যায়। অনেকে বলেন, স্ত্রী-মজুরদের সম্বন্ধে বিশেষ আইন পাস করিলে স্ত্রীজাতির প্রতি কতকটা অসম্মান প্রকাশ হয়। তাহাতে বলা হয় যেন তাহারা পুরুষের সমকক্ষ নহে।

লেখক বলিতেছেন, যখন গর্ভধারণ করিতে হয় তখন বাস্তবিকই পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের বৈষম্য আছে। কারখানার ডাক্তারদের জিজ্ঞাসা করিলে জানা যায় যে, স্ত্রী-মজুরদিগকে প্রায়ই দুরারোগ্য রোগ বহন করিতে হয়। গর্ভাবস্থায় কাজ করা এবং প্রসবের দুই-তিন দিন পরেই বারো ঘন্টা দাঁড়াইয়া খাটুনি এই-সকল রোগের প্রধানতম কারণ।

কেবল আজীবন রোগ বহন এবং রুগ্ণ সন্তান প্রসব করাই যে স্ত্রীলোকের অনিয়ন্ত্রিত খাটুনির একমাত্র কুফল, তাহা নহে। গৃহকার্যে অনবসর সমাজের পক্ষে বড়ো সামান্য অকল্যাণের কারণ নহে। পূর্ণ মাতৃস্নেহ হইতে শিশুদিগকে বঞ্চিত করিলে তাহা হইতে যে কত অমঙ্গলের উৎপত্তি হইতে পারে তাহা কে বলিতে পারে!

লেখক বলিতেছেন, বাষ্পীয় কল স্ত্রী-পুরুষ উভয়কে নিজের কাজে টানিয়া লইয়া স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইতেছে। স্ত্রী-মজুর এখন স্ত্রী নহে মাতা নহে কেবলমাত্র মজুর।

ইহা হইতে যতদূর অনিষ্ট আশঙ্কা করা যায়, তাহা এখনও সম্পূর্ণ পরিণত হইবার সময় পায় নাই। কেবল দেখা যাইতেছে, পুরুষদের মধ্যে মদ্যপান এবং পাশবতা ক্রমশ দুর্দান্ত হইয়া উঠিতেছে এবং স্ত্রীলোকদের মধ্যে নারীসুলভ হৃদয়বৃত্তি শুষ্ক হইয়া মানসিক অসুখ এবং সন্তানপালনে অবহেলা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

দেখা যাইতেছে, য়ুরোপে আজকাল প্রধান সমস্যা এই— জিনিসপত্র, না মনুষ্যত্ব, কাহার দাম বেশি?

প্রাচীন-পুঁথি উদ্ধার

য়ুরোপের মধ্যযুগে যখন এক সময় বিদ্যার আদর সহসা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিল তখন প্রাচীন গ্রীক ও রোমান গ্রন্থের অন্বেষণ পড়িয়া যায়। বহু চেষ্টায় ধর্মমন্দিরস্থিত পুস্তকালয় হইতে অনেক প্রাচীন গ্রন্থের উদ্ধার হয়। সেই অন্বেষণকার্য এখনও চলিতেছে। কাজটা কীরূপ অসামান্য যত্নসাধ্য তাহা নভেম্বর মাসীয় 'লেজার আওয়ার' পত্রের প্রবন্ধবিশেষ হইতে কতকটা আভাস পাওয়া যায়।

প্রাচীন পুস্তকালয় অনুসন্ধান করিয়া যতদূর বাহির হইতে পারে তাহা বোধ করি একপ্রকার সমাধা হইয়াছে। কাজটা নিতান্ত সহজ নহে। কেবল বসিয়া বসিয়া পুঁথি বাছা বিস্তর ধৈর্যসাধ্য, তাহা ছাড়া আর একটা বড়ো কঠিন কাজ আছে। পুরাকালে লিপিকরগণ অনেক সময়ে একটা পুঁথির অক্ষর মুছিয়া ফেলিয়া তাহার উপর আর একটা গ্রন্থ লিখিতেন। বহুকষ্টে সেই মোছা অক্ষর পড়িয়া পড়িয়া অনেক দুর্লভ গ্রন্থ উদ্ধার করা হইয়াছে। এইরূপ এক-একখানি পুঁথি লইয়া এক-এক পণ্ডিত বিস্তর চেষ্টায় গুটিকতক লুপ্তপ্রায় দাঁড়ি কষি বিন্দু খুঁজিয়া বাহির করিলেন, আবার আর এক পণ্ডিত দ্বিগুণতর ধৈর্যসহকারে তাহাতে আরও গুটিকতক যোগ করিয়া দিলেন। এইরূপে পতিনিষ্ঠ সাবিত্রীর ন্যায় তাঁহারা অনেক সত্যবান গ্রন্থকে যমের দ্বার হইতে ফিরাইয়া লইয়া আসিয়াছেন।

নেপল্‌সের নিকটবর্তী ক্ষেত্র খনন করিয়া হর্ক্যুলেনিয়ম্‌ নামক একটি প্রাচীন নগর ভূগর্ভমধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেখানে একটি বৃহৎ অট্টালিকার মধ্যে সেকালের এক পুস্তকালয় বাহির হইয়াছে। তন্মধ্যে সহস্র সহস্র পুঁথি একেবারে কয়লা হইয়া গিয়াছে। ইহার কতকগুলি পুঁথি অসামান্য যত্নে অতি ধীরে ধীরে খোলা হইয়াছিল, কিন্তু কোনো বিশেষ ভালো বহি এ পর্যন্ত বাহির হয় নাই।

উত্তর ইজিপ্টের মরুমৃত্তিকা এত শুষ্ক যে তাহার মধ্যে কোনো জিনিস সহজে নষ্ট হয় না। কাগজ সুতা বস্ত্র পাতা প্রভৃতি দ্রব্যও তিন সহস্র বৎসর পরেও অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে— যেন তাহা সপ্তাহখানেক পূর্বে পুঁতিয়া রাখা হইয়াছে। সেখানে প্রাচীন নগরীর ভগ্নাবশেষের মধ্য হইতে অনেক গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। ইলিয়াড্‌ প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ মৃতদেহের সহিত একত্রে পাওয়া গিয়াছে।

সকলেই জানেন প্রাচীন ইজিপ্টীয়গণ বিশেষ উপায়ে মৃতদেহ রক্ষা করিতেন। অনেক সময় তাঁহারা কাগজ দিয়া এই মৃতদেহের আবরণ প্রস্তুত করিতেন। তাহার মধ্যে অধিকাংশ ছেঁড়া কাগজ। মাঝে মাঝে আস্ত কাগজও পাওয়া যায়। অনেক সাহিত্যখণ্ড, দানপত্র, হিসাব, খৎ, চিঠি এই উপায়ে হস্তগত হইয়াছে। ভাবিয়া দেখিলে হৃদয় স্তম্ভিত হয়, কত সহস্র বৎসর পূর্বেকার কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশা-ভরসা, কত বৈষয়িক বিবাদ-বিসম্বাদ, দর-দাম, মামলা-মোকদ্দমা আজ বিস্মৃত মৃতদেহ আচ্ছন্ন করিয়া পড়িয়া আছে।

আমাদের দেশেও কি অনেক প্রাচীন পুঁথি নানা গোপন স্থানে পুনরাবিষ্কারের প্রতীক্ষা করিয়া নাই? কিন্তু কাহার সেদিকে দৃষ্টি আছে? যে বিদেশীরা আমাদের খনি খুঁড়িয়া সোনা তুলিতেছে,

মাটি চষিয়া নব নব পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন করিতেছে, তাহারাই পুঁথিরাশির মধ্য হইতে আমাদের লুপ্ত শাস্ত্র উদ্ধার করিতেছে এবং সেইগুলিই অলসভাবে নাড়িয়া চাড়িয়া, তাহাদেরই কৃত তর্জমা পড়িয়া আমরা এক-একজন আর্য দিগ্‌গজ হইয়া উঠিতেছি এবং মনে করিতেছি পৃথিবীতে আমাদের তুলনা কেবল আমরাই।

ক্যাথলিক সোশ্যালিজ্‌ম্‌

য়ুরোপে কিছুদিন হইতে সোশ্যালিস্ট নামক এক দলের অভ্যুদয় হইয়াছে তাহারা সর্বসাধারণের মধ্যে ধন সমভাবে বিভাগ করিয়া দিতে চায়। এ সম্বন্ধে ফরাসি পণ্ডিত রেনাঁ বলিতেছেন, বর্তমানকালে, এ একটি বিষম সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে; একদিকে সভ্যতা বজায় রাখিতে হইবে অন্য দিকে সভ্যতার সমস্ত সুখ-সম্পদ সাধারণের মধ্যে সমানভাবে বাঁটিয়া দিতে হইবে। কথাটা শুনিবামাত্রই স্বতোবিরোধী বলিয়া বোধ হয়; এক পক্ষে উত্থান এবং অপর পক্ষের পতন এ যেন প্রকৃতি এবং সমাজের মূল নিয়ম।

প্রাচীন সমাজে যখন হীনাবস্থার লোক সর্ব বিষয়েই হীনাবস্থায় ছিল তখন এ সম্বন্ধে কোনো কথা উঠে নাই। কিন্তু আজকাল য়ুরোপে সকলেরই রাজপুরুষ নির্বাচনের অধিকার জন্মিয়াছে। প্রত্যেকেরই আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা বলে, আমরা সকলেই সমান রাজা কিন্তু আমাদের সমান রাজত্ব কই? তাহারা যে সংখ্যায় বেশি এবং তাহাদের হাতে অনেক ক্ষমতা আছে, এ কথা তাহারা প্রতিদিন বুঝিতেছে; এইজন্য সমস্যা প্রতিদিন গুরুতর এবং তাহার মীমাংসাকাল উত্তরোত্তর নিকটবর্তী হইতেছে।

এতকাল এই সোশ্যালিজ্‌ম্‌ মত প্রায় নাস্তিকতার সহচরস্বরূপে ছিল। প্রায় সমস্ত সোশ্যালিস্ট পত্রই নাস্তিকতার গোঁড়ামি প্রচার করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি একটা পরিবর্তন দেখা যাইতেছে। রোমান-ক্যাথলিক ধর্মমণ্ডলী এই মতের প্রতি পক্ষপাত করিতেছে।

ইহাতে সোশ্যালিজ্‌মের বল কত বাড়িয়া উঠিতেছে তাহা বলা বাহুল্য। রোমান-ক্যাথলিকমণ্ডলীর অধিপতি পোপ লিয়ো অল্পদিন হইল তীর্থযাত্রী একদল ফরাসি মজুরদের সম্বোধন করিয়া আপনার অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ইহা একটা লক্ষণস্বরূপ ধরা যাইতে পারে। রোমান-ক্যাথলিক সম্প্রদায় প্রায়ই প্রবল পক্ষকে আশ্রয় করিয়া বললাভ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। রোমের মোহন্তটি য়ুরোপের নাড়ী টিপিয়া বসিয়া আছেন। সোশ্যালিজ্‌মের আসন্ন উন্নতি ও ব্যাপ্তি নিশ্চিত অনুমান না করিলে তাঁহারা যে সহসা ইহার প্রতি প্রকাশ্য প্রসন্নতা দেখাইতেন ইহা তেমন সম্ভবপর বোধ হয় না; তাঁহারা এমন বালুকার 'পরে কখনোই চরণক্ষেপ করিতেন না যাহা দুই দণ্ডে ধসিয়া যাইবে।

সাধনা
মাঘ ১২৯৮

আমেরিকানের রক্তপিপাসা

বিখ্যাত আমেরিকান কবি লোয়েল তাঁহার কোনো কবিতায় লিখিয়াছেন, আমেরিকার দক্ষিণ হইতে উত্তর সীমা পর্যন্ত এই সমগ্র বৃহৎ জাতি রক্তের গন্ধ ভালোবাসে। একজন ইংরাজ লেখক নবেম্বর মাসের 'কন্টেম্পোরারি রিভিয়ু' পত্রিকায় এই কথার সাক্ষ্য দিয়াছেন। তিনি বলেন, যাহারা কখনো আমেরিকায় পদার্পণ করে নাই, বহি পড়িয়া আমেরিকান সভ্যতা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়াছে তাহারা কল্পনা করিতে পারে না আমেরিকায় জীবনের মূল্য কত যৎসামান্য এবং

সেখানকার লোকেরা খুন অপরাধকে কত তুচ্ছ মনে করে। প্রথমত, সকল দেশেই যে-সকল কারণে কম-বেশি খুন হইয়া থাকে আমেরিকাতেও তাহা আছে। দ্বিতীয়ত, সেখানে অধিকাংশ লোকেই অস্ত্র বহন করিয়া বেড়ায় এবং সামান্য কারণে তাহা ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হয় না। দুই-একটা দৃষ্টান্ত দেখানো যাইতে পারে। কালিফর্নিয়া বিভাগের সুপ্রীমকোর্টের এক জজ রেলোয়ে স্টেশনের ভোজনশালায় খাইতে বসিয়াছেন, আদালতের আর-একটি উচ্চ কর্মচারী তাঁহার সঙ্গী ছিল। ইতিমধ্যে এক বারিস্টার পূর্বকৃত অপমান স্মরণ করিয়া জজের সহিত বিবাদ বাধাইয়া দেন, এমন-কি, তাঁহার গায়েও হাত তোলেন। অন্য কর্মচারীটি তৎক্ষণাৎ পিস্তল ছুড়িয়া বারিস্টারকে বধ করিলেন, এমন-কি, সে মরিয়া পড়িয়া গেলেও তাহাকে আর এক গুলি মারিলেন। বারিস্টারের স্ত্রী চিৎকার করিয়া গাড়িতে ফিরিয়া গেলেন। ইঁহারা তাঁহাকে ধরিয়া তাঁহার মাল অনুসন্ধান করিয়া একটি পিস্তল বাহির করিলেন। জুরিরা তাহাই দেখিয়া অপরাধীকে খালাস দিল; কারণ এই পিস্তল দিয়া জজকে খুন করা নিতান্ত অসম্ভব ছিল না। সকলেই এই আইনের, এই বিচারের, এই কর্মচারীর সতর্কতার বিস্তর প্রশংসা করিল। পুলিসের হাতেও সর্বদা অস্ত্র থাকে এবং তাহাদের দ্বারা শত শত অন্যায় খুন ঘটিয়া থাকে। নিউইয়র্ক শহরে একজন পুলিসম্যান খবর পাইল একজন চোর অমুক রাস্তা দিয়া পলাইতেছে। অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিল, একজন লোক কোনো বাড়ির সিঁড়ির উপর ঘুমাইতেছিল, গোলেমালে জাগিয়া উঠিয়া পলাইতে উদ্যত হইল। পুলিসম্যান তৎক্ষণাৎ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিল। গুলি দৈবাৎ তাহাকে না লাগিয়া পথের অপর প্রান্তে আর-একজন পথিককে সাংঘাতিকরূপে আহত করিল। অবশেষে পলাতক ধরা পড়িলে জানা গেল তাহার কোনো অপরাধ ছিল না; সে কেবল ভয়ে দৌড় দিয়াছিল। বিচারে স্থির হইল পুলিসম্যান তাহার কর্তব্য পালন করিয়াছিল। যে দেশের আইনে এইরূপ ব্যবস্থা, পুলিসের এইরূপ ব্যবহার, সে দেশের সাধারণ লোকেরাও যে অস্ত্র প্রয়োগ সম্বন্ধে কোনোরূপ সংযম অভ্যাস করে না, তাহা বেশ অনুমান করা যায়। দেশের সর্বত্রই পরিবারগত বিদ্বেষ, ব্যক্তিগত বিবাদ, এমন-কি, অপরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে সামান্য বচসাতেই খুনাখুনি ঘটিয়া থাকে। প্রায় মাঝে মাঝে এমন ঘটিয়া থাকে, পথে, কর্মস্থানে অথবা সভাস্থলে দুই বিপক্ষে সাক্ষাৎ হইল, কেহ কোনো কথা না বলিয়া পরস্পরের প্রতি পিস্তল লক্ষ্য করিল, একজন অথবা দুইজনেই মরিয়া পড়িয়া গেল। কেবল ছোটোলোকের মধ্যে নহে, শিক্ষিত এবং পদস্থ ব্যক্তিদের মধ্যেও এরূপ ঘটিয়া থাকে। অনেক ভদ্র খুনী সমাজের মধ্যে সম্মানের সহিত বাস করিতেছে; তাহারাও নিজের অপরাধের জন্য লজ্জিত নহে, তাহাদের বন্ধু এবং সমাজও তাহাদের জন্য লজ্জা অনুভব করে না।

আমেরিকায় বালকে, এমন-কি, স্ত্রীলোকেও অনেক খুন করিয়া থাকে। লেখক রাস্তা দিয়া চলিতেছিলেন, দেখিলেন, একজন ভদ্রবেশধারিণী স্ত্রীলোকের সম্মুখে আর একজন ফিট্‌ফাট্ কাপড় পরা ভদ্রলোক যেমন দাঁড়াইল, অমনি দুই-এক কথার পরেই স্ত্রীলোকটি এক পিস্তল বাহির করিয়া সম্মুখবর্তী লোকটির প্রতি পরে পরে তিন-চারটি গুলি চালাইয়া দিল, লোকটা রাস্তায় পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল। লেখক খবরের কাগজ পড়িয়া জানিলেন, মৃত ব্যক্তিটি বিখ্যাত দালাল; তাহার নিকটে কোনো সূত্রে স্ত্রীলোকটির টাকা পাওনা ছিল কিন্তু আইনের দ্বারা বাধ্য করিবার কোনো উপায় না পাইয়া খুন করিয়া সে মনের ক্ষোভ মিটায়। মেয়েটির সাহস এবং তাহার চমৎকার লক্ষ্য সম্বন্ধে সকলেই ধন্য ধন্য করিতেছে। আমেরিকার এরূপ স্ত্রীলোকের বিশেষ সমাদর আছে। পুরুষেরা প্রায়ই বলিয়া থাকে, যে রমণীর মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিমাণে শয়তানের অংশ নাই, তাহার এক কড়াও মূল্য নাই।

ইহা ছাড়া বিনা দোষে কালা আদমি খুনের যে দুটা-চারটা দৃষ্টান্ত লেখক প্রকাশ করিয়াছেন আমাদের পাঠকদের জন্য তাহা উদ্ধৃত করা বাহুল্য।

লেখক আমেরিকান জাতীয় চরিত্রগত এই বর্বরতার যে একটি প্রধান কারণ নির্দেশ

করিয়াছেন তাহা বিশেষ অবধানযোগ্য। তিনি বলেন, বহুকাল পর্যন্ত আমেরিকায় যে দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল তাহাতে করিয়া সেখানকার অধিবাসীদের মনুষ্যত্ব নষ্ট করিয়াছে। দাসদের প্রতি যথেচ্ছ অত্যাচারে অভ্যস্ত হইলে ন্যায়ান্যায় বোধ হ্রাস হইয়া মনুষ্যত্বের সংযম দূর হয়। অবশেষে চরিত্রের সেই উচ্ছৃঙ্খলতা তাহাদের নিজেরই সর্বনাশ সাধন করিতে থাকে।

আমাদের বিবেচনায় লেখক একটি কারণের উল্লেখ করেন নাই। এককালে আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের প্রতি নির্দয় উপদ্রবও যে এই চরিত্রগত পশুত্বের একটি মূল কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। যেখানে অপ্রতিহত পশুবলচালনার স্থান, সেখানেই মানুষের ভয়ানক বিপদ। স্বার্থ অথবা আত্মগৌরবের অনুরোধে নিরুপায়ের প্রতি আপনার কর্তৃত্ব প্রচার করিতে গিয়া নিজেরই অমূল্যধন স্বাধীনতাপ্রিয়তা ম্লান হইয়া আসে। ভারতশাসন ভারতবাসীদের পক্ষে যেমনই হউক ইংরাজের পক্ষে সুশিক্ষার কারণ নহে। আমাদের প্রতি তাঁহাদের যে একটি অনুরাগহীন অবহেলার ভাব সহজেই উদয় হইতেছে, তাহাতে করিয়া তাঁহাদের চরিত্রের উচ্চ আদর্শ অল্পে অল্পে অবনত হইতেছে সন্দেহ নাই। ফিট্‌জ্‌জেমস্ স্টীফন, স্যার লেপেল গ্রিফিন প্রভৃতি অনেক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান লেখকের রচনায় একপ্রকার কঠিন নিষ্ঠুরতা, একটা নৈতিক অধঃপতনের লক্ষণ দেখা যায়, যাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ভারতবর্ষে অসীম ক্ষমতা-মদিরার স্বাদ পাইয়া তাঁহাদের এই দুর্দশা ঘটিয়াছে। মনুষ্যজাতির মধ্যে একটা বিষ আছে; যখন এক জাতি আর-এক জাতিকে আহার করিতে বসে তখন ভক্ষ্য জাতি মরে এবং ভক্ষক জাতির শরীরেও বিষ প্রবেশ করে। আমেরিকানদের রক্তের মধ্যে বিষ গেছে।

সাধনা
ফাল্গুন ১২৯৮

উন্নতি

দিনেমার দার্শনিক হারাল্‌ড্ হ্যফ্‌ডিং জুলাই মাসের 'মনিস্ট্' পত্রিকায় মঙ্গলের মূলতত্ত্ব নামক এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার যে অংশ ভারতবর্ষীয় পাঠকদের পক্ষে বিশেষ অবধানের যোগ্য, আমরা সংকলিত করিয়া দিলাম।

যে-সকল জীবের চিত্তবৃত্তি নিতান্ত আদিম অবস্থায় আছে তাহাদের পরিবর্তন সহজে ঘটে না। তাহাদের জীবনধারণের সামান্য অভাবগুলি যতদিন পূরণ হইতে থাকে ততদিন তাহারা একভাবেই থাকে। ইন্‌ফ্যুসোরিয়া, রিজোপড্ প্রভৃতি নিম্নতম শ্রেণীর জন্তুগণের আজও যে দশা, যুগ-যুগান্তর পূর্বেও অবিকল সেই দশা ছিল। তাহাদের আভ্যন্তরিক অবস্থার সহিত বাহ্য অবস্থার এমনি সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য যে, কোনোরূপ পরিবর্তনের কোনো কারণ ঘটে না। মনুষ্যের মধ্যেও ইহার উদাহরণ পাওয়া যায়। যাহাদের অভাববোধ অল্প, যাহারা আপনার চারি দিকের অবস্থার সহিত সম্পূর্ণ বনিবনাও করিয়া থাকিতে পারে তাহাদিগকে পরিবর্তন এবং উন্নতির দিকে প্রবর্তিত করিবার কোনোরূপ উত্তেজনা থাকে না। সংকীর্ণ সীমার মধ্যে সংকীর্ণ মনোবৃত্তি লইয়া তাহারা নিশ্চিন্তে কালযাপন করিতে থাকে। জটিল এবং বিচিত্র অবস্থাপন্ন মানবদের অপেক্ষা ইহাদের সুখ-সন্তোষ অনেকটা সম্পূর্ণ এবং অবিমিশ্র তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ছোটো পাত্র বড়ো পাত্র অপেক্ষা ঢের কম জলে ঢের বেশি পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে।

তবে তো সেই ছোটো পাত্র হওয়াই সুবিধা। জীবনের কেবল কতকগুলি একান্ত আবশ্যক পূরণ করিয়া হৃদয়ের কেবল কতকগুলি আদিম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া নির্বিকার শান্তি লাভ করাই তো ভালো। ফ্যুজিদ্বীপবাসীরা তো বেশ আছে— দক্ষিণ আমেরিকার আদিম নিবাসীরা বন্যজীবনের মধ্যে তো চিরকাল সমভাবেই কাটাইয়াছিল, সভ্যতার নব নব অশান্তি এবং বিপ্লবের কোনো ধার তাহারা ধারে না।

কিন্তু সে আক্ষেপ এখন করা বৃথা। সভ্য জাতিদের পক্ষে এরূপ জীবনযাত্রা নিতান্ত অসহ্য। তাহার কারণ, সভ্যতাবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে একটি নূতন মনোবৃত্তির উদ্ভব হইয়াছে, তাহার নাম কাজ করিবার ইচ্ছা, উন্নতির ইচ্ছা। এক কথায়, তাহাকে অসন্তোষ বলা যাইতে পারে। এ মনোবৃত্তি সকল জাতির সকল অবস্থায় থাকে না।

প্রথম প্রথম বাহিরের তাড়ায় মানুষ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। ক্রমে, কাজ করিতে করিতে অন্তরের মধ্যে কর্মানুরাগ নামক একটা স্বতন্ত্র শক্তির সঞ্চার হয়; তখন বাহিরের উত্তেজনার অভাব সত্ত্বেও সে ভিতর হইতে আমাদিগকে অহর্নিশি কাজে প্রবৃত্ত করাইতে থাকে। তখন মানুষ বাহিরের শাসন হইতে অনেকটা মুক্তি লাভ করে; বাহ্য অভাব মোচন হইলেও অন্তরের সেই নবজাগ্রত শক্তি বিশ্রাম করিতে চাহে না, তখন নব নব উন্নত আদর্শের সৃষ্টি হইতে থাকে; তখন হইতে আমাদের পক্ষে নির্জীব নিস্পন্দভাবে থাকা অসাধ্য হইয়া উঠে, এবং তাহাতে আমরা যথার্থ সুখও পাই না।

জাতীয় আত্মরক্ষার পক্ষে এই প্রবৃত্তির একটা উপযোগিতা আছে, তাহা বিচার করিয়া দেখা কর্তব্য। প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ স্থায়িত্ব কোথাও নাই। তোমার অব্যবহিত চতুষ্পার্শ্বে যদি বা পরিবর্তন তেমন খরস্রোতে প্রবাহিত না হয় তথাপি অনতিদূরে কোনো-না-কোনো জাতির মধ্যে পরিবর্তন ঘটিতেছেই, সুতরাং কোনো-না-কোনো সময়ে তাহাদের সহিত জীবিকাযুদ্ধের সংঘর্ষ অনিবার্য। সে সময়ে, যাহারা বহুকাল স্থিরভাবে সন্তুষ্টচিত্তে আছে তাহাদের পক্ষে নূতন আপৎপাতের বিরুদ্ধে নূতন পরিবর্তন সহজসাধ্য হয় না; যাহারা কর্মানুরাগী উদ্যোগী জাতি তাহারাই পরিবর্তনে অভ্যস্ত এবং সকল সময়েই প্রস্তুত, সুতরাং এই চঞ্চল সংসারে টিকিবার সম্ভাবনা তাহাদেরই সব চেয়ে বেশি।

কেবল জাতি নহে, ব্যক্তিবিশেষের পক্ষেও সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণ নিহিত করিয়া সুখী হওয়ার অনেক বিপদ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপে দেখা যায়, ঘরের আদুরে ছেলে হইয়া চিরকাল খোকা হইয়া থাকার অনেক সুবিধা থাকিতে পারে; কিন্তু চিরদিন ঘরের মধ্যে কাটাইয়া চলে না, এক সময়ে কঠিন সংসারের সংস্রবে আসিতে হয় তখন নিতান্ত নিঃসহায় হইয়া পড়িতে হয়। সংকীর্ণ সম্পূর্ণতা লাভ অপেক্ষা বৃহৎ বিকাশের উদ্যম ভালো।

উন্নতি বলিতে সর্বকামনার পর্যবসানরূপিণী একটা নির্বিকার নিরুদ্যম অবস্থা বুঝায় না। ভবিষ্যতের নব নব মঙ্গল সম্ভাবনার জন্য নব নব শক্তি সঞ্চয় করিয়া চলাই উন্নতি। সেই-সমস্ত শক্তির উত্তেজনায় ক্রমাগত নূতন নূতন উদ্দেশ্যের পশ্চাতে নূতন নূতন চেষ্টা ধাবিত হইতে থাকে। সেইসঙ্গে কেবল উদ্যমেই কার্যে বিকাশেই একটা সুখ জাগ্রত হইয়া উঠে, সমগ্র প্রকৃতির পরিচালনাতেই একটা গভীর আনন্দ লাভ হয়। সেই আনন্দে সভ্য জাতিরা এমন সকল দুঃসহ কষ্ট সহ্য করিতে পারে যাহার পেষণে অসভ্য জাতিরা মারা পড়ে। এই যে একটি স্বতন্ত্র উন্নতির প্রবৃত্তি, এই যে কর্মের প্রতিই একটা স্বতন্ত্র অনুরাগ, ইহা লইয়াই সভ্য ও অসভ্য জাতির মধ্যে প্রধান প্রভেদ।

সুখ দুঃখ

যাহারা রীতিমতো বাঁচিতে চাহে, মুমূর্ষুভাবে কালযাপন করিতে চাহে না, তাহারা দুঃখ দিয়াও সুখ কেনে। হাফ্‌ডিং বলেন ভালোবাসা ইহার একটি দৃষ্টান্তস্থল। ভালোবাসাকে সুখ বলিবে না দুঃখ বলিবে? গেটে তাঁহার কোনো নাটকের নায়িকাকে বলাইয়াছেন যে, ভালোবাসায়

কভু স্বর্গে তোলে, কভু হানে মৃত্যুবাণ।

অতএব সহজেই মনে হইতে পারে এ ল্যাঠায় আবশ্যক কী? কিন্তু এখনও গানটা শেষ হয় নাই। সুখ দুঃখ সমস্ত হিসাব করিয়া শেষ কথাটা এইরূপ বলা হইয়াছে—

সেই শুধু সুখী, ভালোবাসে যার প্রাণ।

ইহার মর্ম কথাটা এই যে, ভালোবাসায় হৃদয় মন যে একটা গতি প্রাপ্ত হয় তাহাতেই এমন একটা গভীর এবং উদার পরিতৃপ্তি আছে যে, প্রবল বেগে সুখ-দুঃখের মধ্যে আন্দোলিত হইয়াও মোটের উপর সুখের ভাবই থাকিয়া যায়, এমন-কি, এই আন্দোলনে সুখ বল প্রাপ্ত হয়।[১]

এই সুখের সহিত দুইটি মানসিক কারণ লিপ্ত আছে। প্রথমত, দুঃখ যে পর্যন্ত একটা বিশেষ সীমা না লঙ্ঘন করে সে পর্যন্ত সুখের পশ্চাতে থাকিয়া সুখকে প্রস্ফুটিত করিয়া তোলে। এই কারণে, যাহারা সুখের গাঢ়তাকে প্রার্থনীয় জ্ঞান করে তাহারা অবিমিশ্র সামান্য সুখের অপেক্ষা দুঃখমিশ্রিত গভীর সুখের জন্য অধিকতর সচেষ্ট। দ্বিতীয়ত, দুঃখেরই একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। কারণ, দুঃখের দ্বারা হৃদয়ের মধ্যে যে একটা প্রবল বেগ, সমস্ত প্রকৃতির একটা একাগ্র পরিচালনা উপস্থিত হয় তাহাতেই একটা বিশেষ পরিতৃপ্তি আছে। ক্ষমতার চালনামাত্রই নিতান্ত অপরিমিত না হইলে একটা আনন্দ দান করে। বিখ্যাত দার্শনিক ওগুস্ত্ কোঁৎ তাঁহার প্রণয়িনীর মৃত্যুর পরে এই বলিয়া শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন, 'আমি মরিবার পূর্বে মনুষ্যপ্রকৃতির সর্বোচ্চ মনোভাব যে অনুভব করিতে পারিয়াছি সে কেবল তোমারই প্রসাদে। এই মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গে যত কিছু কঠিনতম যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি সেইসঙ্গে এ কথা সর্বদাই মনে উদয় হইয়াছে যে, হৃদয়কে পরিপূর্ণ করাই সুখের একমাত্র উপায়, তা সে যদি দুঃখ দিয়া তীব্রতম যন্ত্রণা দিয়া হয় সেও স্বীকার।'— আমরা যদি দুঃখ হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাইতে চাই তবে কিছুতেই ভালোবাসিতে পারি না। কিন্তু ভালোবাসাই যদি সর্বোচ্চ সুখ হয় তবে দুঃখের ভয়ে কে তাহাকে ত্যাগ করিবে! কর্মানুষ্ঠানের প্রবলতা ও জীবনের পরিপূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে বিস্তর ব্যয়, মুহুর্মুহু ঘাত-প্রতিঘাত এবং অবিশ্রাম আন্দোলন আছেই। কিন্তু জীবনের সর্বোচ্চ সম্পদগুলি বিনামূল্যে কে প্রত্যাশা করে!

মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের কথা উপরে প্রকাশিত হইল এখন কবি চণ্ডিদাসের দুটি কথা উদ্ধৃত করিয়া শেষ করি। রাধিকা যখন অসহ্য বেদনায় বলিতেছেন—

'বিধি যদি শুনিত, মরণ হইত,
ঘুচিত সকল দুখ'

তখন—

চণ্ডীদাস কয় 'এমতি হইলে
পিরীতির কিবা সুখ!'

দুঃখই যদি গেল তবে সুখ কিসের!

সাধনা
চৈত্র ১২৯৮

সোশ্যালিজম্

বিলাতি খবরের কাগজে দেখা যায় য়ুরোপে সোশ্যালিস্ট সম্প্রদায়ের উপদ্রব প্রতিদিন গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। ইহাদের দ্বারা সেখানে আজ হউক বা দুই দিন পরে হউক, একটা প্রচণ্ড সামাজিক বিপ্লব ঘটা অসম্ভব নহে। অতএব সোশ্যালিজম্ মতটা কী তাহা আলোচনা করিয়া দেখিতে কৌতূহল জন্মে।

---

১. বলা আবশ্যক, এ-সকল কথা বলিষ্ঠ এবং মহৎহৃদয় লোকদের কথা। যাহারা দুর্বল এবং ক্ষুদ্র তাহারা এত দুঃখ এবং এত সুখ সহিতে পারে না, সুতরাং তাহাদের পক্ষে দুঃখের পরিণামই অধিক হইয়া পড়ে। এইজন্য তাহারা বলিয়া থাকে, আমার সুখে কাজ নাই দুঃখেও কাজ নাই আমি স্বস্তি পাইলেই বাঁচি।

সোশ্যালিস্টদিগের মধ্যে যে মতের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে তাহা নহে; এই কারণে, তাহাদিগের সকল মতগুলির বিস্তারিত সমালোচনা সহজসাধ্য নহে। আমরা এ স্থলে কেবল বেল্‌ফর্ট্‌ ব্যাক্স্‌ সাহেবের গ্রন্থ হইতে তাঁহার মত সংকলন করিয়া দিতেছি।

কিছুকাল পূর্বে ইংলন্ডে যাঁহারা কোনো কোনো প্রচলিত নিয়ম সংশোধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদের বর্তমান মতাবলম্বীদিগকে 'লিবারাল্‌' কহিয়া থাকে।

এই লিবারাল্‌দিগের সহিত সোশ্যালিস্টদিগের কোথায় প্রভেদ ব্যাক্স্‌ সাহেব তাহারই আলোচনা করিয়াছেন।

তিনি বলেন, এককালে রাজা ও প্রধানবর্গের সর্বময় কর্তৃত্ব ছিল; তাহারই বিরুদ্ধে যে চেষ্টা হয় তাহাকেই 'লিবারালিজ্‌ম্‌' বলা হইয়া থাকে। প্রজাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই স্বাধীন অর্থসঞ্চয় এবং সম্পত্তি উপার্জনের অধিকার এই চেষ্টার দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। এই লিবারাল্‌দের সাহায্যে এমন সকল নিয়ম প্রচলিত হয় যাহাতে সকলের বিষয়-সম্পত্তি সম্পূর্ণ সুরক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু এখন আবার এই স্বাধীনতা নূতন অধীনতার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। এখন ধনের কর্তৃত্ব সর্বময় হইয়া উঠিতেছে। ধনকে সুরক্ষিত করিয়া লিবারালিজ্‌ম্‌ কেবল ধনীরই সুবিধা করিতেছে; সর্বসাধারণকে তাহার সম্যক্‌ সুখ ও উন্নতি হইতে বঞ্চিত করিতেছে।

সোশ্যালিজ্‌ম্‌ ধনীর কর্তৃত্বের স্থলে মানব-সাধারণের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে।

কলের সৃষ্টি হওয়ার পর হইতে একটি নূতন বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। কলের দ্বারা দুইটি দলের উৎপত্তি হইয়াছে। এক কলওয়ালা নব্য উন্নতিশীল, আর এক, কর্মচ্যুত প্রাচীন কারিকরের দল।

এক সময় ছিল, যখন কারিকরের ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের উপরে পণ্য নির্ভর করিত। তখন, তাহাদের অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা ছিল। আপনার বুদ্ধি ও কৌশলের জোরে কারিকর অনেকটা নিজের গুমরে থাকিতে পারিত।

এখন কলে পণ্য উৎপন্ন এবং বিতরিত হওয়ায় কারিকরের নৈপুণ্যজাত স্বাধীনতার স্বভাবতই হ্রাস হইয়া কলওয়ালা ধনীর ক্ষমতা উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিয়াছে।

স্যোশ্যালিস্ট্‌রা চাহে যে, এই পণ্য উৎপাদন ও বিতরণ কোনো বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির হস্তে না থাকিয়া সাধারণ সমাজের হস্তে পড়ে। তাহারা বলে, ধন উৎপাদন এবং বণ্টন সমস্ত সমাজের কাজ। সম্প্রতি কেবল সম্পত্তিবান ব্যক্তিদের মর্জি এবং স্বার্থের উপরে তাহার নির্ভর থাকাতে জনসাধারণ স্ব স্ব অবস্থার সম্পূর্ণ উন্নতির সম্ভাবনা হইতে বঞ্চিত হইতেছে।

ধনের অধীনতা সামান্য নহে। ডাকাত যদি পিস্তল দেখাইয়া বলে 'টাকা দে নয় মারিব' সেও যেমন, তেমনি কলওয়ালা মহাজন যখন বলে 'হয় এমনি করিয়া খাট্‌, নয় মর্‌' সেও তদ্রূপ। যে নির্ধন সে একেবারে নিরুপায়। যখন ধন এবং জমি সাধারণের মধ্যে বিলি হইবে তখন এমন দৌরাত্ম্য হইতে পারিবে না।

তাহা ছাড়া কাজ এখনকার চেয়ে অনেক ভালো হইবে। দৃষ্টান্ত। মনে করো। সোশ্যালিস্ট বিধানমতে কোনো এক লোকের উপর সরকারি রুটি তৈয়ার করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে। লোকটা রুটি যদি খারাপ করিয়া গড়ে তবে তাহার নিজের এবং সমাজের অসুখের কারণ হইবে। কাজে গোঁজামিলন দিয়া অথবা সস্তা মালমসলা যোগ করিয়া তাহার কোনো লাভ নাই— কারণ, সে বেতনও পায় না মূল্যও পায় না— সমাজের আদেশমতে কাজ করে। অতএব, যখন মন্দ রুটি গড়িয়া তাহার কোনো লাভ নাই এবং ভালো রুটি গড়িলে তাহার নিজের এবং সমস্ত সমাজের পরিতোষের কারণ হইবে তখন ভালো রুটি গড়া তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু বণিক মহাজনের স্বার্থই এই যত সস্তায় কাজ করিতে পারে— অর্থাৎ নিঃস্বার্থভাবে জিনিসটা ভালো করিবার দিকে তাহার কোনো দৃষ্টি থাকে না।

অনেকে বলিয়া থাকেন ধনের সহিত স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য যোগ। যাহার ধন নাই তাহাকে স্বভাবতই নানা বিষয়ে অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে, অতএব নির্ধনকে স্বাধীনতা দিবার জন্য

সোশ্যালিস্টগণ যে পণ করিয়াছেন তাহা প্রকৃতিবিরুদ্ধ। গ্রন্থকর্তা তদুত্তরে বলেন ধনহীন স্বাধীনতা অসম্ভব, কথাটা সত্য। সেইজন্যই ধন সাধারণের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া বিশেষ আবশ্যক— কারণ, তাহা ব্যতীত স্বাধীনতা সর্বসাধারণের মধ্যে কিছুতেই ব্যাপ্ত হইতে পারে না।

অতএব দেখা যাইতেছে সর্বসাধারণের স্বাধীনতাই সোশ্যালিজ্‌মের উদ্দেশ্য। এখন, কথা উঠিতে পারে যে, উদ্দেশ্য যাহাই হউক ফলে বিপরীত হইবে। কারণ, এখন স্বার্থের তাড়নায় লোকে খাটিতেছে এবং সমাজের কাজ চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু ধনের প্রলোভন চলিয়া গেলে সমাজের তাড়নায় লোককে কাজ করিতেই হইবে, সে পীড়ন কম নহে। সকলেই ইচ্ছামতো আলস্যে নিযুক্ত থাকিলে কখনো সমাজ টিকিতে পারে না, অতএব একটা কোনোরূপ পীড়নের প্রথা থাকিবেই। গ্রন্থকার বলেন, একেবারে কোনোরূপ পীড়ন ব্যতীত সংসার চলে না, এখনকার বিধানমতে সমাজে অন্ধ পীড়নের প্রাদুর্ভাব, কিন্তু সোশ্যালিজ্‌মের নিয়মে সমাজে যুক্তি ও বিবেচনাসংগত যথাবশ্যক সুসংযত পীড়ন প্রচলিত হইবে। এবং স্বার্থের সংস্রব না থাকাতে সে পীড়ন ক্রমশ হ্রাস হইতে থাকিবে এরূপ আশা করা যায়।

ব্যাক্স্‌সাহেব বলেন, আদিমকালে সাধারণের মধ্যে ধনের বিভাগ ছিল, সভ্যতার প্রাদুর্ভাবে ক্রমে তাহার ব্যত্যয় হয়; ক্রমে সকলের স্ব স্ব প্রধান হইবার বাসনা জন্মে, প্রধান হইতে চেষ্টা করিলেই স্বভাবত দুই বিরোধী প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সৃষ্টি হয়। এইরূপে সামাজিক ঐক্য নষ্ট হইয়া পার্থক্যের জন্ম হইতে থাকে। পূর্বে কেবলমাত্র বহির্জাতির সহিত শত্রুতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, এখন প্রত্যেকে বড়ো হইতে চেষ্টা করিয়া ঘরের মধ্যে দলাদলি ঘটিতে থাকে। সভ্যতার স্বাভাবিক ফল এই। ইহার প্রধান লক্ষণ, সমাজের সহিত ব্যক্তির বিরোধ— প্রত্যেকের সমগ্রের অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা হস্তগত করিবার চেষ্টা।

সোশ্যালিজ্‌ম সকলের মধ্যে ধনের সমবিভাগ করিয়া দিয়া পুনশ্চ সকলকে একতন্ত্রের মধ্যে বাঁধিতে চাহে এবং এই উপায়ে সকলকে যথাসম্ভব স্বাধীনতার অধিকারী করিতে চাহে, মানবসমাজে ঐক্য এবং স্বাধীনতার সামঞ্জস্য ইহার উদ্দেশ্য।

সাধনা
জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

প্রাচীন শূন্যবাদ

মায়ার হস্ত এড়াইবার উদ্দেশ্যে কীরূপ তর্কের মায়াপাশ বিস্তার করিতে হয় তাহার একটি দৃষ্টান্ত পাঠকদের কৌতূহলজনক বোধ হইতে পারে।

গ্রন্থখানির নাম মধ্যমকবৃত্তি। ইহা 'বিনয় সূত্র' নামক কোনো এক প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থের প্রাচীন ভাষ্য। ভাষ্যকারের নাম চন্দ্রকীর্তি আচার্য।

ইনি একজন শূন্যবাদী। কিছুই যে নাই ইহা প্রমাণ করাই ইহার উদ্দেশ্য। কী করিয়া প্রমাণ করিতেছেন দেখা যাউক।

প্রথমে প্রতিপক্ষ বলিলেন— দর্শন শ্রবণ ঘ্রাণ রসন স্পর্শন এবং মন এই ছয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দ্রষ্টব্য প্রভৃতি বিষয় আমাদের গোচর হইয়া থাকে।

টীকাকার বলিতেছেন, দর্শন যে একটা স্বাভাবিক শক্তি উপরি-উক্ত বচনে এই কথা মনিয়া লওয়া হইল। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। দর্শনশক্তি যে আছে এ কথা কে বলিল?

কারণ,

স্বমাত্মানং দর্শনং হি তত্ত্বমেব ন পশ্যতি।
ন পশ্যতি যদাত্মানং কথং দ্রক্ষ্যতি তৎ পরান্।

অর্থাৎ চক্ষু আপনার তত্ত্ব আপনি দেখিতে পায় না, অতএব যে আপনাকে দেখিতে পায় না সে

অন্যকে কী করিয়া দেখিবে?

প্রমাণ হইয়া গেল চক্ষু দেখিতে পায় না। 'তস্মান্নাস্তি দর্শনং।'

কিন্তু প্রতিবাদী বলিতে পারেন—

'যদ্যপি স্বাত্মানং দর্শনং ন পশ্যতি, তথাপি অগ্নিবৎ পরান্ দ্রক্ষ্যতি। তথাহি অগ্নি পরাত্মানমেব দহতি ন স্বাত্মানং এবং দর্শনং পরানেব দ্রক্ষ্যতি ন স্বাত্মানং ইতি।

অর্থাৎ অগ্নি যেমন পরকে দহন করে কিন্তু আপনি দগ্ধ হয় না, তেমনি চক্ষু অন্যকে দেখে নিজেকে দেখিতে পায় না— ইহা অসম্ভব নহে।

উত্তরদাতা বলেন— এতদপ্যযুক্তং। ইহাও যুক্তিসিদ্ধ নহে।

কারণ,

ন পর্যাপ্তোহগ্নিদৃষ্টান্তো দর্শনস্য প্রসিদ্ধয়ে।
সদর্শনঃ স প্রত্যুক্তো গম্যমানগতাগতৈঃ।

অর্থাৎ অগ্নিদৃষ্টান্ত দর্শন প্রমাণের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। কারণ, গম্যমানগতাগতের দ্বারা দহনশক্তি এবং দর্শনশক্তি উভয়ই অপ্রমাণ হইতেছে।

'গম্যমানগতাগত' বলিতে কী বুঝায় সেটা একটু মনোযোগ করিয়া বুঝা আবশ্যক।

'গতং ন গম্যতে নাগতং ন গম্যমানং এবং অগ্নিনাপি দগ্ধং ন দহ্যতে নাদগ্ধং দহ্যতে ইত্যাদিনা সমং বাচ্যং। যথা চ ন গতং নাগতং ন গম্যমানং গম্যতে এবং ন দৃষ্টং দৃশ্যতে তাবদদৃষ্টং নৈব দৃশ্যতে। দৃষ্টাদৃষ্টবিনির্মুক্তং দৃশ্যমানং ন দৃশ্যতে।'

অর্থাৎ যাহা গত তাহা যাইতে পারে না, যাহা অগত তাহাও যাইতে পারে না এবং যাহা গতও নহে অগতও নহে কেবলমাত্র গম্যমান, তাহারই বা যাওয়া হইল কই? তেমনি, যাহা দগ্ধ তাহার দহন হয় না, যাহা অদগ্ধ তাহারও দহন হয় না, যাহা দহ্যমান তাহারই বা দাহ হইল কই? পুনশ্চ যাহা দৃষ্ট তাহা আর দেখা হয় না, যাহা অদৃষ্ট তাহাও দেখা হয় না, যাহা দৃষ্টও নহে অদৃষ্টও নহে কেবল দৃশ্যমান তাহাও দেখা হইতে পারে না। ভাবটা এই, যাহা হইয়া গেছে তাহা তো চুকিয়াই গেছে, যাহা হয় নাই তাহার কথা ছাড়িয়াই দাও, যাহা হইতেছে মাত্র তাহাকে হইল এমন কথা কেহ বলিতে পারে না।

'এবং দর্শনং পশ্যতে তাবদিত্যাদিনা অগ্নিদৃষ্টান্তেন সহ গম্যমানগতাগতৈর্যস্মাৎ সমং দূষণং অতোহগ্নিবদ্দর্শনসিদ্ধিরিতি ন যুজ্যতে।'

তবেই তো এক 'গম্যমানগতাগতে'র দ্বারা চক্ষুই বল অগ্নিই বল সমস্ত অসিদ্ধ হইয়া গেল। সিদ্ধ হইল কী?

'ততশ্চ সিদ্ধমেতৎ স্বাত্মবদ্দর্শনং পরানপি ন পশ্যতীতি।'

অর্থাৎ চক্ষু যেমন আপনাকে দেখিতে পায় না তেমনি পরকেও দেখিতে পায় না।

সাধনা

অগ্রহায়ণ ১২৯৯

পরিবারাশ্রম

ফ্রান্সে ওয়াজ্ নদীর ধারে গীজ্ নামক একটি ক্ষুদ্র শহর আছে। সেখানে আজ চোদ্দ বৎসর হইল গোড্যাঁ সাহেব নূতন ধরনে এক বৃহৎ কারখানা খুলিয়াছেন, তাহার নাম দিয়াছেন, পরিবারাশ্রম সভা।

লোকটি তালাচাবি-নির্মাতা একটি কর্মকারের পুত্র। নিজের যত্নে ধন উপার্জন করিয়া, তিনি সমাজ হইতে কিসে দৈন্য দুঃখ দূর হয় এবং কী উপায়ে শ্রমজীবী লোকেরা রোগ, বার্ধক্য প্রভৃতি

অনিবার্য কারণজনিত অর্থক্লেশ হইতে রক্ষিত হইতে পারে সেই চিন্তা ও চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন।

তাঁহার সেই আমরণ চেষ্টার ফল এই পারিবারিক সমাজ। ইহা একটি কারখানা। এখানে প্রধানত লোহার উনান, অগ্নিকুণ্ড, ইমারৎ প্রস্তুতের সরঞ্জাম প্রভৃতি তৈয়ারি হয়।

এখানকার কর্মপ্রণালী অন্যান্য কারখানা হইতে অনেক স্বতন্ত্র। সংক্ষেপে এখানকার নিয়ম এই, কারবারের সুদ খরচা বাদে মোট যে লাভ হয়, তাহা হইতে শতকরা পঁচিশ অংশ বুদ্ধি অনুসারে এবং পঁচাত্তর অংশ পরিশ্রম অনুসারে কর্মচারীদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হয়। ইহা ব্যতীত তাহাদের যথানিয়মিত বেতন আছে। ত্রিশ বৎসর কাজের পর পেনশন নির্দিষ্ট হয়, কিন্তু বিশেষ কারণে অক্ষম হইয়া পড়িলে পনেরো বৎসরের পরেই একটা মাসহারার অধিকারী হওয়া যায়। দুঃখদুর্দিনের জন্য একটা বিশেষ বন্দোবস্ত আছে, এবং এই সভাভুক্ত যে-কেহ ইচ্ছা করিলে সন্তানদিগকে চোদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত সরকারি ব্যয়ে বিদ্যাশিক্ষা দিতে পারে।

১৮৮৮ খৃস্টাব্দে গোড্যা সাহেবের মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার উপার্জিত ধনের অর্ধেক, অর্থাৎ এক লক্ষ চল্লিশ হাজার পৌন্ড এই কারখানায় দান করিয়া যান। শর্ত এই থাকে যে, নির্দিষ্ট সংখ্যক পরিবার যেখানে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রার সামান্য অভাবসকল অনুভব না করিয়া কালযাপন করিতে পারে, এমন বাসস্থানের বন্দোবস্ত করা হইবে।

পীড়িত, অক্ষম, বৃদ্ধ, বিধবা, পিতৃমাতৃহীন বালকবালিকা, এমন-কি, সর্বপ্রকার অশক্ত লোকদিগের জন্য ইন্সিউরেন্সের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আশ্রমবাসীদের আহার্য জোগাইতে হইবে।

তাহাদের শারীরিক মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য যে-সকল আমোদ-আহ্লাদের আবশ্যক, তাহার উপায় করিতে হইবে।

বালকবালিকারা যে পর্যন্ত না কাজে নিযুক্ত হয় সে পর্যন্ত তাহাদিগকে পালন করিতে ও শিক্ষা দিতে হইবে।

কর্মশালার নিকটেই মজুরদের বাসা ঠিক করিয়া দিতে হইবে।

এক কথায়, এমন বন্দোবস্ত করিতে হইবে, যাহাতে কারখানায় শ্রমজীবীরা সুখে একত্র বাস করিতে পারে, যাহাতে কারখানা ও ব্যবসায়ের লাভ কর্মকারদের মধ্যে ন্যায়নিয়মে ভাগ হইতে পারে এবং যাহাতে ক্রমে ক্রমে সমাজের সমুদয় সম্পত্তি অল্পে অল্পে তাহাদেরই হস্তগত হয়।

ছয় কারণে সভ্যগণ সমাজ হইতে দূরীভূত হইতে পারেন : ১. পানদোষ; ২. বাসস্থানের বায়ু দূষিত করা; ৩. গর্হিত আচরণ; ৪. শ্রমবিমুখতা; ৫. নিয়মের অবাধ্যতা অথবা উপদ্রব করা; ৬. সন্তানদিগকে উপযুক্ত শিক্ষাদানে শৈথিল্যাচরণ।

কেহ না মনে করেন, এই সমাজে পদে পদে নিয়মের কড়াক্কড়। প্রত্যেককে যথাসম্ভব স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। 'ফর্টনাইটলি রিভিয়ু' পত্রে যে লেখক এই প্রবন্ধ লিখিতেছেন, তিনি স্বয়ং সেখানে গিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন। তিনি বলেন, সকলেই বেশ প্রফুল্লমুখে সন্তুষ্টভাবে কাজকর্মে প্রবৃত্ত আছে। স্ত্রীলোকেরা স্ব স্ব পরিবারের জন্য কাপড় কাচিতেছে, এবং কাজ করিতে করিতে গুনগুনস্বরে গান ও গল্প করিতেছে, কেহ বা বাগানে মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে বসিয়া বসিয়া সেলাই করিতেছে। ছেলেদের থাকিবার ঘর ভিন্ন ভিন্ন বয়সের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত এবং তাহার সমস্ত বন্দোবস্ত অতি চমৎকার। সাধারণের জন্য রুটি তৈয়ারির ঘর, কসাইখানা, সন্তরণ-শিক্ষার উপযোগী স্নানগৃহ, খেলা ও আমোদের জায়গা, নাট্যশালা, ভাণ্ডার প্রভৃতি নির্দিষ্ট আছে। ঘরদ্বার সমস্তই বহুযত্নে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়। এ সমাজের একটি বিশেষ নিয়ম এই যে, ধর্মসম্বন্ধে প্রত্যেকের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

একান্নবর্তী পরিবার-প্রথার সহিত এই পরিবারাশ্রমের ঐক্য নিঃসন্দেহে পাঠকদের মনে উদয় হইয়াছে। কিন্তু আমাদের পরিবারতন্ত্রের যে-সকল কু-প্রথা হইতে সমাজে বিস্তর অমঙ্গলের উদ্ভব হয় সেগুলি উক্ত বাণিজ্য-সমাজে নাই। প্রথমত সকলকেই কাজ করিতে হয় এবং প্রত্যেকে

আপন কার্য ও যোগ্যতা অনুসারেই অংশ পাইয়া থাকে। দ্বিতীয়ত, ধর্ম ও কর্তব্যপালন সম্বন্ধে প্রত্যেকের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা। তৃতীয়ত, একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে একজনের চরিত্র দূষিত হইলে তাহার দৃষ্টান্ত ও ব্যবহারে সমস্ত পরিবারের গুরুতর অহিত ও অসুখের কারণ হইয়া দাঁড়ায়, কিন্তু পরিবারাশ্রমের সভ্যগণ চরিত্রদোষ ও গর্হিতাচরণের জন্য সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইবার যোগ্য। এমন-কি, আলস্য ও অপরিচ্ছন্নতাবশত বাসস্থানের স্বাস্থ্যহানি করিয়া কেহ নিজের ও অন্যের অসুবিধা ঘটাইতে পারে না। এক কথায়, ইহাতে একত্রবাসের সমুদয় সুবিধা রক্ষা করিয়া অসুবিধাগুলি দূর করা হইয়াছে।

সাধনা
জ্যৈষ্ঠ ১৩০০

মানুষসৃষ্টি

জুন মাসের 'ফর্টনাইটলি রিভিয়ু' পত্রিকায় বিখ্যাত পর্যটক স্ট্যান্‌লি সাহেব মধ্য-আফ্রিকাবাসীদের মধ্যে প্রচলিত কতকগুলি গল্প প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে মানুষসৃষ্টির গল্প পাঠকদের কৌতুকাবহ মনে হইতে পারে।

প্রাচীনকালে এক সময় পৃথিবীতে কোনো জীবজন্তু ছিল না, কেবল একটি পুষ্করিণীতে একটি বড়োগোছের ব্যাঙ ছিল। আর আকাশে ছিল চাঁদ। উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা চলিত।

একদিন চাঁদ বলিল, দেখো ব্যাঙ, মনে করিতেছি পৃথিবীর ফলশস্য ভোগ করিবার জন্য আমি একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী নির্মাণ করিব।

ব্যাঙ কহিল, আমি পৃথিবীতে থাকি, পৃথিবীর প্রাণী আমিই ভালোরূপ গড়িতে পারিব, অতএব সে ভার আমি লইলাম।

চাঁদ কহিল, আমি যাহাদের সৃজন করিব তাহারা অমর হইবে, তোমার সে শক্তি নাই।

ব্যাঙ কহিল, ভাই, তোমার আকাশ লইয়া তুমি থাকো-না, এ পৃথিবীর জীবসৃষ্টি আমারই কর্তব্য কার্য।

অতঃপর ব্যাঙ ভাবাবেশে ক্রমশ স্ফীত হইয়া একজোড়া পূর্ণতা-প্রাপ্ত নরনারীকে জন্মদান করিল।

চাঁদ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, এ কী কাণ্ড করিয়াছ? এই যে দুটো জীবকে জন্ম দিয়াছ ইহাদের না আছে বুদ্ধি না আছে আত্মরক্ষার ক্ষমতা না আছে দীর্ঘ জীবন। বেচারাদের প্রতি দয়া করিয়া আমি যতটা পারি সংশোধন করিয়া লইব। উহাদিগকে কিছু বুদ্ধি দিব এবং আয়ুও বাড়াইয়া দিব কিন্তু তোমাকে আর রাখিতেছি না।

এই বলিয়া অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিয়া ব্যাঙটাকে চাঁদ দগ্ধ করিয়া ফেলিল।

অতঃপর ভীত লুক্কায়িত মানুষ দুটোকে ধরিয়া তাহাদিগকে স্নান করাইয়া, ইতস্তত টিপিয়া-টুপিয়া তাহাদের শরীরের গড়ন কতকটা দুরস্ত করিয়া লইল। এবং পুরুষের নাম দিল বাটেটা এবং মেয়ের নাম দিল হানা। অবশেষে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল, দেখো, এই তৃণলতা তরুগুল্ম সবই তোমাদের এবং তোমাদের সন্তানদের জন্য। তোমাদিগকে বুদ্ধি দিয়াছি অতএব ইহার মধ্য হইতে তোমরা নিজেরা ভালোমন্দ বাছিয়া লইবে। এই লও একটি কুঠার। এবং তোমাদের জন্য আমি এই আগুন করিয়া দিলাম ইহাকে রক্ষা করিবে এবং কেমন করিয়া আহারের পাত্র গড়িতে হয় দেখাইয়া দিতেছি, শিখিয়া লও।

এই শিক্ষা দিয়া এবং রাঁধিয়া খাইবার উপদেশ দিয়া চাঁদ আকাশে চড়িলেন এবং প্রসন্ন হাস্যের সহিত ইহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

তখন এই নরনারী চন্দ্রালোকে ভ্রমণ করিতে করিতে একটি তরুকোটর দেখিয়া তাহার মধ্যে আশ্রয় লইল।

মাসখানেকের মধ্যেই হানা একটি যমজ পুত্রকন্যাকে জন্ম দিল। বাটেটা বড়ো খুশি হইয়া তাহার স্ত্রীর সেবা করিতে লাগিল এবং তাহার জন্য উত্তম সুখাদ্য সন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিল কিন্তু কিছুই প্রসূতির রুচিকর বোধ হয় না। তখন চাঁদের দিকে হাত তুলিয়া কহিল— হে চাঁদ, আমি তো আমার স্ত্রীর পছন্দমতো কোনো খাদ্যই খুঁজিয়া পাই না, একটা উপায় বলিয়া দাও!

চাঁদ নামিয়া আসিয়া বাটেটার হাতে একছড়া কলা দিয়া কহিল, দেখো দেখি, ইহার গন্ধটা কেমন লাগে?

বাটেটা কহিল, বাঃ অতি চমৎকার!

তখন চাঁদ একটির খোসা ছাড়াইয়া তাহার হাতে দিয়া কহিল, খাইয়া দেখো দেখি কেমন বোধ হয়?

সে খাইয়া মহা খুশি হইয়া স্ত্রীর জন্য লইয়া গেল। স্ত্রীও বড়ো পরিতোষ লাভ করিল। কহিল, জিনিসটি উত্তম কিন্তু ইহাতে শরীরে বল পাইতেছি না।

বাটেটা চাঁদকে সে কথা জানাইলে চাঁদ কহিল, দেখো দেখি ওই কী যায়?

বাটেটা কহিল, ও তো মহিষ।

চাঁদ বলিল— ঠিক বলিয়াছ। উহার পশ্চাতে কী যায়?

বাটেটা কহিল— ছাগল।

চাঁদ কহিল— আচ্ছা। তাহার পশ্চাতে কী বল দেখি!

বাটেটা কহিল— হরিণ।

চাঁদ কহিল— অতি উত্তম। তাহার পরে?

বাটেটা— ভেড়া।

চাঁদ— ভেড়াই বটে। এখন আকাশে কী উড়িতেছে দেখো দেখি!

বাটেটা— মুরগি এবং পায়রা।

চাঁদ কহিল— বেশ বলিয়াছ। তা, এই-সমস্ত তোমাদিগকে দেওয়া গেল। ইহারই মাংস স্ত্রীকে রাঁধিয়া খাওয়াও।

এইভাবে সময় যায়। আদি-দম্পতি হঠাৎ একদিন সকালে উঠিয়া দেখে মস্ত একটা আগুনের চাকার মতো আকাশে উঠিয়া আলোকে চতুর্দিক উজ্জ্বল করিয়াছে। হানা কহিল, বাটেটা এ কি হইল?

বাটেটা কহিল, চাঁদকে না জিজ্ঞাসা করিয়া তো বলিতে পারি না। এই বলিয়া চাঁদকে ডাকাডাকি করিতে লাগিল। একটা বজ্রতুল্য স্বর আকাশ হইতে কহিল— রোসো, আগে এই নূতন আলোকটা নিবিয়া যাক তার পরে কথাবার্তা হইবে।

অন্ধকার হইলে চাঁদ উঠিয়া কহিল, এখন হইতে সময় দিন এবং রাত্রে ভাগ হইবে। সকালে সূর্য এবং রাত্রে আমি এবং আমার সন্তান নক্ষত্রগণ আলো দিবে। এ নিয়মের কোনো কালে লঙ্ঘন হইবে না। এবং যেহেতু তোমরা সর্বপ্রথম প্রাণী তোমাদের সন্তানেরা জীবরাজ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইবে। তোমাদিগকে আমি পরিপূর্ণতা এবং অনন্ত জীবন দান করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই ব্যাঙটার জন্মদোষ তোমাদের শরীরে রহিয়া গেছে অতএব মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইবে না। সবশেষে কহিল, যে পর্যন্ত তুমি এবং হানা পৃথিবীতে থাকিবে আমি আবশ্যকমতো তোমাদের সাহায্য ও পরামর্শ দিতে ত্রুটি করিব না— কিন্তু তোমাদের অবর্তমানে মানুষের সহিত আলাপ পরিচয় আর চলিবে না। অতএব তোমরা যাহা-কিছু শিখিবে ছেলেদের শিখাইয়া দিয়ো।

মানুষের উৎপত্তির এই ইতিহাস। ডারুয়িনের এভোল্যুশন থিওরি যে বহুপূর্বে আফ্রিকা দেশে আবিষ্কৃত হইয়াছিল এই ভেক হইতে মনুষ্যোৎপত্তির গল্প তাহার প্রমাণ; কিন্তু উক্ত জাতির মধ্যে এখনও তেমন সূক্ষ্মবুদ্ধি কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই যে এই অকাট্য প্রমাণ অবলম্বন করিয়া য়ুরোপের দর্প চূর্ণ করে।

জিব্রল্টার বর্জন

গ্যাম্বিয়র সাহেব বলিতেছেন, ইংরাজ জিব্রল্টারের উপর দুর্গ ফাঁদিয়া ভারতবর্ষের পথ আগলাইয়া বসিয়া আছে, কিন্তু সে তাহার পণ্ডশ্রম মাত্র। কারণ, যুদ্ধের সময় যদি সুয়েজখালের পথ ব্যবহার করা সম্ভব হয় তবে জিব্রল্টার দুর্গের উপযোগিতা থাকে; কিন্তু লেখকের মতে তাহা সম্ভব নহে। কেননা, রুশিয়া প্রভৃতি কোনো য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যের সহিত ইংরাজের যদি যুদ্ধ বাধে, তবে ইজিপ্ট কোনো পক্ষ অবলম্বন করিতে না পারিয়া সন্ধির নিয়মানুসারে ইংরাজকে খালের পথে প্রবেশ করিতে দিবে না। ফ্রান্স [ফরাসি] এবং রুশিরা যদি কখনো একত্র মিলিত হইয়া তুরস্ক আক্রমণ করে তবে তুরস্কের অধীনস্থ ইজিপ্ট আক্রমণে বাধা দিবার অধিকার ইংরাজের নাই, কারণ, ইংরাজ সেখানে অতিথি মাত্র। অতএব বিপদের সময় সুয়েজপথের কোনো মূল্য দেখা যায় না। কেবল তাহাই নহে। লেখক বলেন, জিব্রল্টার প্রণালী দিয়া অন্য য়ুরোপীয় সৈন্যপ্রবেশ প্রতিহত করা সহজ নহে, কারণ, প্রণালীটি যথেষ্ট প্রশস্ত। এবং আটলান্টিক ও ভূমধ্যসাগরের যোগসাধন করিয়া ফ্রান্স যে খাল খনন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহা সমাধা হইলে জিব্রাল্টরের কোনো মূল্যই থাকে না।

আরও একটা কথা আছে। সুয়েজখাল বালির মধ্য দিয়া একটা সামান্য নালা মাত্র। সের দেড়েক ডাইনামাইট লাগাইলেই তাহাকে ধ্বংস করা যায় এবং একটা জাহাজ যদি ইঁট ও লোহার রেলে বোঝাই পূর্বক আড় করিয়া মাঝখানে ডুবাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলেই পথ বন্ধ।

লেখক বলেন, ভূমধ্যসাগরের পথ ছাড়িয়া ইংলন্ড যদি উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়া পথ ঘুরাইয়া লন তাহা হইলে আর কোনো চিন্তার কারণ থাকে না। তাহা হইলে য়ুরোপের সহিত আর কোনো সংস্রবই থাকে না, সমস্ত পথ খোলসা পাওয়া যায়।

লেখক প্রস্তাব করেন, স্পেনকে জিব্রল্টার ছাড়িয়া দিয়া তৎপরিবর্তে তাহার নিকট হইতে ক্যানারি দ্বীপ লওয়া হউক। সেখানে পথের মধ্যে দিব্য একটি দুর্গ ফাঁদিয়া বেশ শক্ত হইয়া বসা যায় এবং জাহাজ মেরামত, কয়লাতোলা এবং সৈন্যনিবাসের পক্ষে একটি সুবিধামতো আড্ডা হয়।

পর্টুগালের নিকট হইতে ম্যাডেরা দ্বীপটাও পাঁচরকম প্রলোভন দ্বারা জোগাড় করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

তাহার পর ইজিপ্টের দখল ছাড়িয়া দিয়া ফ্রান্সের নিকট হইতে তৎপরিবর্তে ম্যাডাগাস্কর চাহিয়া লইলে ফ্রান্স নারাজ হইবে না।

তাহার পর ইংলন্ড হইতে বুক ফুলাইয়া ধূমোদ্গার করিয়া রণতরী ছাড়িবে এবং অবাধে সমস্ত আটলান্টিক কর্ষণ করিয়া ভারতসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া একেবারে ভারতবর্ষের ঘাটে আসিয়া লাগিবে; য়ুরোপের চোখরাঙানিকে আর কিছুমাত্র কেয়ার করিতে হইবে না। ভারতবর্ষের কণ্ঠলগ্ন লৌহশৃঙ্খলটি বরাবর নিরাপদ সমুদ্রমধ্যে দিয়া একটানে চলিয়া গিয়া ইংলন্ডের দ্বারদেশে দৃঢ়পাকে বদ্ধ হইয়া থাকিবে।

সাধনা
ভাদ্র ১৩০০

পলিটিক্স্‌

আমাদের জাতীয় প্রজাসমিতি বা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কন্‌গ্রেসের দশম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি মিঃ ওয়েব এবং হিন্দুহিতৈষিণী শ্রীমতী অ্যানি বেসেন্ট স্ব স্ব বক্তৃতাস্থলে পলিটিক্সের উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

বিবি বেসেন্টের মতে পলিটিক্স্‌ ভারতবর্ষের ধাতুর সহিত ঠিক মিশ খায় না। চিন্তা করা, শিক্ষাদান করা এবং কার্যসাধন করা এই তিনের মধ্যে প্রথম দুইটি মহত্তর কার্যই ভারতবর্ষকে শোভা পায়, শেষোক্ত কার্যটা পলিটিক্সের অঙ্গ এবং তাহা ভারতবর্ষীয়ের জীবনের আদর্শ হওয়া উচিত হয় না।

এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, অট্টালিকাকে আকাশের দিকে উচ্চ করিয়া তুলিতে হইলে তাহাকে মাটির মধ্যে গভীর করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। যদি কেহ মনে করেন অট্টালিকার যতটুকু মাটির মধ্যে প্রোথিত হইল সেটা অপব্যয় হইল, সেটাকে উচ্চে যোগ করিয়া দিলে অট্টালিকা আরও উচ্চতর হইতে পারিত তবে তাঁহাকে উন্নতির স্থায়িত্ব-তত্ত্বে অনভিজ্ঞ বলিতে হইবে।

শক্তিপরম্পরার মধ্যে একটা নিবিড় যোগ আছে। যে জাতি কেবল চিন্তা ক'রে কার্য করে না তাহার চিন্তাশক্তি ক্রমশ বিকৃত হইয়া যায়; যে জাতি কেবল কার্য করে চিন্তা করে না তাহার কার্যকারিতা নিষ্ফল হইতে থাকে। একটা জাত কেবল চিন্তা করিবে এবং আর-একটা জাত কেবল কার্য করিবে এমন বিভাগের নিয়ম টিকিতে পারে না; কারণ যে যেখানে অসম্পূর্ণতা পোষণ করে সেইখানে আঘাত লাগিয়াই সে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

কোনো প্রাণীকে প্রচুর বাঁধা খোরাক দিয়া কেবলমাত্র মেদবৃদ্ধি করিলে তাহার মাংস অন্যের পক্ষে বড়ো উপাদেয় হয় কিন্তু তাহাতে তাহার নিজের সুবিধা দেখি না; আমরা ঘরে বসিয়া কেবলই চিন্তার খোরাকে পরিপুষ্ট হইয়াছি, তাহাতে অন্যান্য মাংসাশী জাতির বিশেষ উপকার হইয়াছে, এখন বুঝিতেছি শিং নাড়িয়া গুঁতা দিবার শিক্ষাটা আমাদের নিজের পক্ষে বিশেষ কার্যকরী।

কিন্তু কেবল আত্মরক্ষার শিক্ষাই পলিটিক্স্‌ নহে। চিন্তালব্ধ উচ্চতর নীতিগুলিকে মনুষ্যসমাজে কার্যে পরিণত করিবার উপায়সাধনও পলিটিক্সের অঙ্গ। এ সম্বন্ধে মি. ওয়েব যাহা বলিয়াছেন তাহা সারগর্ভ। তিনি বলেন— Politics are amongst the most comprehensive spheres of human activity and none should eventually be excluded from their exercise. There is much that is ludicrous much that is sad, much that is deplorable about them : yet they remain, and ever will remain the most effective field upon which to work for the good of our fellows.

মি. ওয়েব বলেন, রাজনীতির নির্মল ক্ষেত্র নীচ স্বার্থপরতা, অর্থলালসা ও আত্ম-পিপাসার পূতিগন্ধময় পঙ্কে কলুষিত হইতে দেওয়া কিছুতেই কর্তব্য নহে। পরার্থপরতায় ও সর্বসাধারণের হিতার্থে আত্মোৎসর্গেরই নাম 'পাবলিক লাইফ' বা রাজনীতিকের জীবন। সে জীবন সর্বথা সংস্কৃত, সংযত ও সমুন্নত থাকা প্রয়োজন। যতই ক্ষুদ্র, যতই নিম্ন ও অবনত, অবমানিত ও ঘৃণিত হউক, জাতি বর্ণ শ্রেণী ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে মনুষ্য মাত্রেরই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কার্যাধিকার আছে, ফলত অবনতকে উন্নত ও পদদলিতকে মনুষ্যত্বের স্বত্ব ও দায়িত্বাধিকার প্রদান করাই উচ্চ রাজনীতি।

ইহা আধুনিক য়ুরোপীয় প্রজাতান্ত্রিক রাজনীতি বা ডেমোক্রেসির অনাবিল অংশ। ইহাই 'উচ্চতর পলিটিক্স্‌'। এবারকার কংগ্রেস সভাপতি অত্যল্প মাত্র মাত্রায় আমাদিগকে ইহারই আভাস দিয়াছিলেন।

পরন্তু বিবি বেসেন্ট বলেন পুরাতন সমাজের বনিয়াদ প্রথমত এবং প্রধানত মনুষ্যের কর্তব্যজ্ঞান ও কর্তব্য পরিচালনের উপকরণেই গঠিত হইয়াছিল; তাহার পর মনুষ্যের স্বত্বাধিকার (rights of man) বলিয়া একটি সামগ্রী তাহাতে আসিয়া সংযুক্ত হইয়াছে। তাঁহার বিবেচনায় মনুষ্যের কর্তব্যপরায়ণতাই সমাজ সংরক্ষণার্থে প্রচুর; উহার সহিত মানুষের স্বাভাবিক স্বত্বাধিকার রক্ষণচেষ্টার সংযোগ শুভদায়ক নহে। অতএব পলিটিক্স্ কেবল কর্তব্যাবধারণ, পরিচালন ও শাসনেই পর্যবসিত হওয়া উচিত; স্বত্বাধিকার বলিয়া যে সামগ্রীটি উপরপড়া হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, উহা মনুষ্যসমাজের সীমানার মধ্যেই না থাকা ভালো। বলা বাহুল্য বিবির এই মর্মের উক্তি এবং ইঙ্গিত, তাঁহার প্রতি আমাদের সবিশেষ শ্রদ্ধা সত্ত্বেও, আমরা আদৌ অঙ্গীকার বা অনুমোদন করিতে প্রস্তুত নই। তিনি নিজেই অনতিকালপূর্বে, মনুষ্য জাতির স্বাভাবিক স্বত্বাধিকারের সমূহ পক্ষপাতিনী এবং অগ্রগণ্যা পরিচালিকা ও প্রচারিকা ছিলেন। ভারতবর্ষে আসিয়া আমাদের ভাগ্যদোষেই, বোধ হয়, তিনি তাঁহার পূর্বপ্রচারিত পবিত্র মত প্রত্যাহার করিতেছেন। কর্তব্যজ্ঞান ও কর্তব্যপালনের মাহাত্ম্য অবিসম্বাদিত। উহা সমাজের, মানুষের মনুষ্যত্বের মূল ভিত্তি, আদি উপাদান; তাহাতে কিছু মাত্র-সন্দেহ নাই। কিন্তু কর্তব্যানুভব করিয়া কর্তব্যপালন, বোধ হয়, কেবল মানবধর্ম-যুক্ত জীব মানুষেই করে; পশু, পতঙ্গ, কীটাণুকীটে মনুষ্যোচিত উচ্চতর কর্তব্যপালন করে না; তাহাদের মধ্যে কর্তব্যজ্ঞানের স্ফূর্তি হওয়াই সম্ভবে না। মনুষ্য জানে সে মানুষ; মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক স্বত্বাধিকার সুতরাং কর্তব্যপালনের দায়িত্ব তাহার আছে। স্মরণ রাখা আবশ্যক স্বত্বাধিকারের সঙ্গেই দায়িত্ব সংযুক্ত। মনুষ্য যে-সকল স্থলে পশু অপেক্ষাও অধম বলিয়া পরিগণিত, তথায় তাহার কর্তব্যজ্ঞান পশু অপেক্ষা অধিক হওয়ার আশা করা যায় না। ফলত মনুষ্যের স্বাভাবিক স্বত্বাধিকারজনিত দায়িত্ব হইতেই প্রধানত তাহার কর্তব্যজ্ঞান উদ্ভূত হয়। যে স্থানে সে দায়িত্বের অভাব, সে স্থলে কর্তব্যজ্ঞানের অনটন অবশ্যম্ভব। পরন্তু, মনুষ্যত্বের স্বত্বাধিকারে বঞ্চিত হইলে তাহার উদ্ধার সাধনে তৎপর হওয়া নিজেই মানবধর্মের একটি প্রধান কর্তব্য।

যে ব্রাহ্মণ প্রাচীন ভারতে চিন্তা করিত এবং শিক্ষাদান করিত তাহার কি কেবল কর্তব্যজ্ঞানই ছিল স্বত্বাধিকার ছিল না? রাজ্যের মধ্যে তাহার কি একটা বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট ছিল না? অপর সাধারণের নিকট তাহার কি কোনোপ্রকার দাবি ছিল না? প্রাচীন ইতিহাসে এমন আভাসও কি পাওয়া যায় না যে, একসময়ে ব্রাহ্মণের স্বত্বাধিকার লইয়া ক্ষত্রিয়দের সহিত তাহার রীতিমতো বিরোধ বাধিয়াছিল? ব্রাহ্মণ যদি আত্মসম্মান, আপনার স্বত্বাধিকার রক্ষা করিতে না পারিত তবে সে কি চিন্তা করিতে এবং শিক্ষা দান করিতে সক্ষম হইত? পরন্তু তখন রাজা এবং গুরু, ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ আপন স্বত্ব এতদূর পর্যন্ত বিস্তার করিয়া ছিলেন যে, অপর সাধারণের মনুষ্যোচিত অধিকার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছিল— তাহাদের চিন্তার স্বাধীনতা, তাহাদের মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন— ভারতবর্ষের পতনের সেই একটা প্রধান কারণ, এখনকার পলিটিক্সের গতি অনুসারে সর্বসাধারণেই আপনার স্বাভাবিক স্বত্ব পূর্ণমাত্রায় লাভ করিবার অধিকারী। সকলেই আপন মনুষ্যগৌরব অনুভব করিয়া মনুষ্যত্বের কর্তব্য সাধনে উৎসাহী হইবে। যাহার হাতে ক্ষমতা আছে সে আপন খেয়াল অনুসারে অক্ষম ব্যক্তিকে উৎপীড়ন করিবে না, যাহার হাতে শাস্ত্র আছে সে কেবলমাত্র অনুশাসন দ্বারা অন্যের চিন্তা এবং কার্যকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিবে না। রাজমন্ত্রীরাও ন্যায়মতে (অর্থাৎ দীনতম ব্যক্তিরও ন্যায্য স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করিয়া) আইন করিবেন, রাজপুরুষেরাও আইনমতে শাসন করিবেন, গুরুও যুক্তির দ্বারা আপন মত প্রচার করিবেন। এইরূপে প্রত্যেক আপন স্বত্বাধিকার রক্ষা করিতে পারিলে তবেই আপন সাধ্যমতো আপনার উন্নতি এবং সেইসঙ্গে জগতের উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইবে। স্বত্বাধিকার ব্যতীত কর্তব্য অনুভব করা এবং কর্তব্য পালন করা সম্ভব নহে। স্বত্বাধিকার সংক্ষেপ হইলে কর্তব্যের পরিধিও সংক্ষিপ্ত হইয়া আসে।

ইংলন্ড, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার বৈভববিলাসের বিপন্নতা ও বীভৎস ব্যাপার দেখাইয়া বিবি বেসেন্ট আমাদিগকে পাশ্চাত্য জড়বাদের আপাতমনোহর এবং অত্যন্ত মোহকর আদর্শ পরিবর্জন পূর্বক ভারতীয় প্রাচীনকাল-প্রবর্তিত অধ্যাত্মপথ অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সদুপদেশ সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের ন্যায় পুণ্য দেশেও একেবারে পঞ্চবিংশতি কোটি মহামুনির উদ্ভব সম্ভবপর নহে। যথাসম্ভব লোক আধ্যাত্মিক হইয়াও যথেষ্ট পরিমাণে পার্থিব লোক বাকি থাকিবে। তাহারা যাহাতে আত্মসম্ভ্রম, উন্নতি এবং মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে সেজন্য চেষ্টা করা আবশ্যক; যাঁহারা না আধ্যাত্মিক না পার্থিব তাঁহাদের মতো শোচনীয় জীব জগতে আর নাই।

পাশ্চাত্যের পাপাদর্শ অতি সাবধানেই পরিবর্জনীয়। কিন্তু পুণ্যাদর্শও যদি সেখানে পাই, তাহা পরিত্যাগ করিব কেন? মিঃ ওয়েব আইরিশম্যান। আইরিশে ইংরেজে স্বার্থ ও রাজনৈতিক স্বত্বাধিকারের সম্বন্ধটা যে খুব সুমিষ্ট তাহা নহে। সকলেই জানেন যে সম্বন্ধ তীব্র তিক্তরসমিশ্রিত। এতাদৃশ অবস্থায় মিঃ ওয়েব আইরিশ 'হোমরুলার' হইয়াও, ইংরাজের একটি অতি মহৎ স্বরূপের আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তি এই—

'ইংরাজেরা অন্যান্য জাতি অপেক্ষা স্বভাবত অধিকতর সাহসীও নয়, সৎ ও শক্তিশালীও নয়। তাহাদের আত্মনির্ভরতা ও কর্তব্যজ্ঞানের উচ্চতা হইতেই, তাহাদের বিজয়কীর্তি ও কার্য-সফলতা অংশত উদ্ভূত। তাহারা যাহা সংকল্প করে, নিশ্চয়ই তাহা সিদ্ধ করে। অন্যান্য লোকের ন্যায়, তাহারাও স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া কার্যে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই হউক কিংবা রাজ্য-শাসন ব্যাপারেই হউক; যখন তাহারা সাধারণের হিতসাধন সংকল্প করিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হইল, তখন তাহারা কোনো ক্রমেই ব্যক্তিগত স্বার্থের বশবর্তী হইয়া সে সংকল্প সাধনে বিরত হইবে না; সে কার্য সম্পাদনে কিছুতেই শৈথিল্য করিবে না; ইহা নিশ্চয়। এবং ইহাও নিশ্চয় যে, তাহারা পরস্পরে পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে জানে। অতএব এই-সকল বিষয়ে ইংরাজ-গুণের আদর্শ আমাদের গ্রহণীয়।'

এ দেশীয়দিগের বিশেষত এ দেশে অধুনা যাঁহারা রাজনৈতিক ব্যাপারে সংলিপ্ত, ও রাজ-প্রদত্ত আংশিক আত্ম-শাসনাধিকার ব্যপদেশে সাধারণ জনসাধারণের কার্য সম্পাদনে নিযুক্ত তাঁহাদের আপাতত যত কিছু শিক্ষণীয় আছে তাহার মধ্যে উপরোক্ত শিক্ষা সর্বপ্রধান স্থানীয়। জনসাধারণের কার্যে অক্ষুণ্ণ ও আন্তরিক মনঃসংযোগ, শম এবং অনুরাগ এবং তাহা সম্পাদনকালে আত্ম-স্বার্থের বা আত্মীয়স্বজনের ব্যক্তিগত বিরোধী স্বার্থের বশবর্তী হইয়া সর্বসাধারণের স্বার্থ বিনষ্ট না করা, উপস্থিত ক্ষেত্রে আমাদের এই দুইটি শিক্ষা অতিশয় আবশ্যক হইয়াছে। কাউন্সিলের মেম্বর, মিউনিসিপাল কমিশনর, ডিস্ট্রিক্ট ও লোকালবোর্ডের সদস্য হইতে গ্রাম্য চৌকিদারি সমিতির পঞ্চায়েতদিগের পর্যন্ত অল্পাধিক পরিমাণে ওই দুই শিক্ষার প্রয়োজন। পরন্তু নগরবাসী ও গ্রাম্য লোকদিগেরও এ শিক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন থাকা উচিত নয়। ইহাই স্বায়ত্তশাসনাধিকারের অস্থিমজ্জা প্রাণ। এই শিক্ষার অভাবে, বলিতে লজ্জায় ও ঘৃণায় উদ্রেক হয়, আমরা যে এক বিন্দু আত্মশাসনাধিকার পাইয়াছি অনেকস্থলেই তাহার কেবল অপব্যবহার হইতেছে। ফলত সাধারণের কার্য সম্পাদন সম্বন্ধে এই শিক্ষায় সুশিক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা অতিরিক্ত পরিমাণে আত্মশাসনাধিকার পাইবার উপযুক্ত হইব, এ কথা বলিতে অন্তত আমরা সাহসী নহি। আমাদের মধ্যে আত্ম-গরিমা প্রকাশের ইদানীং ইয়ত্তা নাই। অতএব এ স্থলে আমরা সেটা না করিয়া, সংগোপনে যদি দুই-একটি আত্মকথা এবং আসল কথার আলোচনা করিয়া থাকি, তাহাতে ইষ্ট বৈ অনিষ্ট হইবে না। সংবাদপত্রের আস্ফালন ও অফিসিয়াল রিপোর্টের আবরণ ক্ষণকালের জন্য দূরে রাখিয়া, উপস্থিত ক্ষেত্রে, আমাদের আত্মশাসনব্যাপারের অপক্ষপাত সমালোচনা করিয়া অকপট চিত্তে বলুন দেখি সে বিষয়ে আমাদের উপযুক্ততা কীরূপ জন্মিয়াছে?

কিন্তু, আমরা চিরকালই অনুপযুক্ত থাকিব এমনও কেহ মনে করিবেন না। কোনো কার্যের প্রথমে ও প্রারম্ভে পরিপক্কতা স্বভাবতই সম্ভবে না। কেবল সেই পরিপক্কতার কপট পরিচয় দেওয়াই মহাভ্রম। পক্ষান্তরে, গবর্নমেন্টের অযথা কঠোরতা এবং অশেষ ত্রুটি সত্ত্বেও, উহা মূলত প্রজাতান্ত্রিক প্রণালী। ভারতীয় ইংরাজের অসীম প্রভুত্ব-স্পৃহার অভ্যন্তরেও শাসনপ্রণালীর প্রজাতান্ত্রিক আসক্তি অলক্ষ্যে বিদ্যমান। য়ুরোপীয় ডেমক্রেসিকে একেবারে অতিক্রম করিয়া য়ুরোপীয়দিগের শাসনযন্ত্র কোথাও চলিতে পারে না। কোনো-না-কোনো প্রকারে তাহার সঙ্গে সংস্রব রাখিতে বাধ্য হয়। সুতরাং সাধারণ মত ও জনসাধারণের স্বত্বাধিকারকে উহা একেবারেই উপেক্ষা করিতে পারে না। ইহাই অবশ্য আমাদিগের আশা এবং এ আশা একান্ত বৃথা আশাও নহে। ইংরাজ শাসনের যেরূপ গতি প্রকৃতি তাহাতে এমন দিন অবশ্যই একসময়ে আসিতে পারে, যখন এদেশীয়েরা শ্রেণী ও সম্প্রদায়নির্বিশেষে ব্রিটিশ প্রজার প্রাপ্য স্বত্বাধিকারের সম্যক বা আংশিক অংশ পাইলেও পাইতে পারে। কিন্তু, তাহার উপযুক্ত ও তাহার জন্য প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। প্রজানীতি, প্রকৃত প্রস্তাবে প্রতিষ্ঠিত ও সমগ্রদেশে পরিব্যাপ্ত হওয়ার পূর্বে, ব্রিটিশ রাজনীতি, ব্রিটিশ প্রজার স্বত্বাধিকার এদেশীয়দিগকে দিবেন না, ইহা নিশ্চয়; পরন্তু আমাদের অনুপযুক্ততা ও অপ্রস্তুত অবস্থায় তাহা দেওয়াও নিষ্ফল। উষরক্ষেত্রে বীজ বপন বৃথা। আমাদের আশঙ্কা, ক্ষেত্র অদ্যাপি প্রস্তুত হয় নাই। প্রকৃত প্রজানৈতিক পলিটিক্সের এখনও আমাদের মধ্যে অত্যন্ত অভাব। পলিটিক্স্ এখনও আমাদের মধ্যে একটি পোশাকি জিনিসের বেশি আর কিছুই নয়। উহা এখনও আমাদের রক্ত মাংসে মেদ মজ্জায় মিশে নাই। উহা অদ্যাপি আমাদের প্রাত্যহিক জীবন ধারণের আহার্য স্বরূপ হয় নাই। তাহা না হওয়া পর্যন্ত আমাদের দাসত্ব ঘুচিয়া প্রকৃত ও পুষ্টিকর প্রজাত্ব জন্মিবে না।

আমরা বোধ হয় আমাদের রাজনৈতিক প্রবণতা কী প্রকৃতির তাহা উপরি-উক্ত আলোচনায় কিয়ৎ পরিমাণে বিবৃত করিয়াছি। এক্ষণে, সাম্রাজ্যের রাশিচক্র কৌন্সিলগৃহের উচ্চাকাশে কীরূপে আবর্তিত হইতেছে তাহা খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখা আবশ্যক।

কন্‌গ্রেসে বিদ্রোহ

কিন্তু তৎপূর্বে প্রসঙ্গক্রমে সংক্ষেপে একটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি। কন্‌গ্রেসের গত অধিবেশনে নর্টন সাহেবের প্রতি কোনো বিশেষ বক্তৃতার ভার ছিল বলিয়া কোনো কোনো সভ্য বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিলেন। চরিত্র-দোষজন্য কন্‌গ্রেসের সহিত নর্টনের ঘনিষ্ঠতা তাঁহারা প্রার্থনীয় মনে করেন না।

নর্টন যদি সমাজে পতিত হইয়া থাকেন তবে সমাজে তাঁহার নিমন্ত্রণ বন্ধ হইতে পারে—কিন্তু কন্‌গ্রেসসভায় অকৃত্রিম ভারতহিতৈষী মাত্রেরই অধিকার আছে। হাবড়ার ব্রিজ যদি কোনো মাতাল এঞ্জিনিয়ারের দ্বারা নির্মিত হইত তবে টেম্পারেন্স সভার সভ্যগণ কি সাঁতার দিয়া নদী পার হইতেন?

ভারত কৌন্সিলের স্বাধীনতা

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার 'সেসন'ই এ শীতে, সতেজ, সরগরম। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক বৈঠক বরং কিছু বিমর্ষ। কটন আইন ও ক্যান্টনমেণ্ট বিলের আলোচনায় এক বিরাট সমস্যা উপস্থিত; পুলিস রেগুলেশন বিলে বিস্তৃত আন্দোলনতরঙ্গ উত্তোলন করিয়াছে। আমাদের সুপ্রিম কৌন্সিল (বা বড়ো ব্যবস্থাপক সভা) সর্বতোভাবে স্বাধীন অথবা স্টেট সেক্রেটারির সারথ্যে ব্রিটিশ

পার্লামেন্টের কিঞ্চিৎ অধীন এই প্রশ্ন কটন বা কাপড় সুতার আইন যখন বিল ছিল তখনই অঙ্কুরিত হইয়া ক্যান্টনমেন্ট বিলের অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় একটা কণ্টকবৃক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। বৃক্ষটার অনেকগুলা শাখা-প্রশাখা ও কাঁটা-খোঁচা বাহির হইয়াছে। কটন-অ্যাক্ট সম্বন্ধে সেক্রেটারি অব্ স্টেটের আদেশ বা 'ম্যান্ডেট' অথবা ব্যবস্থাপক সভাপতি 'এলগিন কর্তৃক তাহার উল্লেখ এই আকস্মিক উৎকণ্ঠা উৎপাদন ও বিপদপাতের অব্যবহিত কারণ। 'ম্যান্ডেট' উক্তিটিই যেন বোধ হয়, অনর্থ ঘটাইয়াছে। ব্যবস্থাপকগণ, বিশেষত 'আনঅফিশিয়াল' অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেম্বরেরা মহা বিরক্ত হইয়াছেন। সুতরাং এ ব্যাপারে ব্যবস্থাপক সভার বিশাল হিমাচলবৎ গাম্ভীর্যের এক বিন্দু ব্যতিক্রম হইয়াছে।

সকলেই জানেন যে ব্যবস্থাপক সভার অসীম স্বাধীনতা সংরক্ষণের চেষ্টায় শ্রীমান স্যর গ্রিফিথ ইভান্স এবং মাননীয় মি. প্লেফেয়ার এই দুই রথী অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের উভয়েরই বিবেচনায় এখানকার এই আইন-সভার স্বাধীনতা অসীম হওয়া উচিত; অসীমই ছিল; কিছুকাল হইতে স্টেট সেক্রেটারি সংকল্প করিয়া সসীম করিতে বসিয়াছেন। ইহা, বে-আইনি, বে-নজিরি এবং বিষম বিপত্তিজনক। ইহাতে করিয়া ব্যবস্থাপক সভার বে-ইজ্জত, সে সভার সভাপতি স্বয়ং রাজপ্রতিনিধির সম্ভ্রমের হানি এবং ব্যবস্থাপকদিগের বিধিব্যবস্থা বিদ্রূপকর হইবে; পরন্তু, তদ্দ্বারা ভারতরাজ্য শাসন সম্বন্ধেও ভয়ানক বিভীষিকা উপস্থিত হইবে। কেবল তাহাই নহে, ব্রিটিশ ডেমক্রেসি আদৌ সাম্রাজ্য শাসনে সমর্থ কি না, সে বিষয়েই (শুনিতেছি) ঘোর সন্দেহ, উপস্থিত হইবে! কেবল সন্দেহ নহে; সে অসমর্থতা সম্পূর্ণরূপে সাব্যস্তই হইবে। The question whether a democracy can govern an Empire will have to be answered in the negative। পরন্তু, এরূপ অত্যাচার হইলে, ব্যবস্থাপক সভায় সুযোগ্য সভ্যই জুটিবে না। সিবিল সার্ভিসেও সম্ভবত সমর্থ লোক মিলা ভার হইবে। কেহই আর সাম্রাজ্যের শাসনযন্ত্র ছুঁইতে চাহিবে না; সংহিতাকার ও শাসয়িতাভাবে শাসন-রশ্মি শিথিল হইয়া সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবে না; তাহাই বা কে বলিবে। গবর্নমেন্টের প্রতি প্রজাসাধারণের বিশ্বাস থাকিবে না, সম্ভ্রম ও শঙ্কা টলিবে; কাজেই শক্তির হ্রাস হইবে; সুতরাং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল— ধ্বংসই বটে!

একদিকে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট; অপরদিকে ভারত গবর্নমেন্ট; মধ্যস্থলে স্টেট সেক্রেটারি। এই সেক্রেটারিই হইয়াছেন, এ ক্ষেত্রে, যত সর্বনাশের মূল। কিন্তু, এই সেক্রেটারি যথার্থই কি আমাদের সংহিতাকারদিগের স্বাধীনতাপহরণে প্রবৃত্ত? যতদূর দেখা যাইতেছে, তাহাতে কোনো প্রকারেই তো তাঁহার সেরূপ অসদভিসন্ধির লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় না।

ভারতে রাজ-শক্তি শতসহস্র স্রোতে, শাখা এবং প্রশাখায় প্রবাহিত। সে শক্তির মূল প্রস্রবণ আদি কেন্দ্রস্থলে ব্যক্তিবিশেষ নহেন, বিরাট ব্রিটিশ পার্লামেন্ট, অন্তত ইহাই আমরা অবগত আছি। বিধিব্যবস্থা ব্যবহারও ইহার বিরোধী নয়। অতএব রাজ-শক্তির আদিকেন্দ্রস্থল ব্রিটিশ পার্লামেন্ট-কর্তৃক, সে শক্তির সঞ্চালন, সংযম বা সম্প্রসারণ অন্যায় ও অসংগত বলিতে পারি না। স্টেট সেক্রেটারি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আদেশ, ইচ্ছা ও অবলম্বিত নীতি অনুধাবন করিয়া ভারতশাসন সম্বন্ধে, প্রধান প্রধান বিষয়ে রাজপ্রতিনিধির সমীপে পরামর্শ প্রেরণ করেন। অন্তত লর্ড এলগিন নিজেই এ কথা বলিয়াছেন; এবং তাঁহার কথা সমূলক নহে, এমন অনুমান করার কিছুমাত্র কারণও নাই। অতএব স্টেট সেক্রেটারির উপর দোষারোপ করা অনর্থক। তিনি পার্লামেন্টেরই শক্তি সঞ্চালন করেন; নিজে কোনো অভিনব নীতি সংগঠন করিয়া পাঠান না; পুরাতন নীতিরও পরিবর্তন করেন না। অতএব অপক্ষপাত বিচার করিলে, এ বিষয়ে তাঁহাকে 'বেকসুর' খালাসই দিতে হয়। তিনি তফাত হইলে অবশিষ্ট থাকে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও আমাদের ব্যাবস্থাপক সভা। সভা কি সত্যসত্যই পার্লামেন্টকেও প্রত্যাখ্যান করিতে প্রস্তুত? স্যর গ্রিফিথ্ ও মি. প্লেফেয়ারের প্রস্তাবে তাহাই বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু পার্লামেন্টকে উল্লঙ্ঘন করার এ অভিলাষ বা আবদার এদেশীয় লোকেরা কখনোই অনুমোদন করিতে পারে না। শাসনশক্তির শত

শত তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ বিদ্ধ হইয়া তাহাদের আর্তনাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও ব্রিটিশ প্রজা। অতএব শাসকই হউন আর ব্যবস্থাপকই হউন, পার্লামেন্টের প্রভাব হইতে পৃথক হইয়া, ভারতশাসন ও ভারতীয় বিধিব্যবস্থা প্রস্তুত করুন, এরূপ প্রস্তাবে এদেশীয়রা কিছুতেই সায় দিতে পারে না। এ সম্বন্ধে মি. মেহতা ব্যবস্থাপক সভায় যাহা বলিয়াছেন, তাহাই এদেশীয় সমীচীন ব্যক্তিমাত্রের মত। হইতে পারে, অনেক সময়ে পার্লামেন্ট হইতে অবিচার ও এদেশীয় ব্যবস্থাপক সভা ও ভারত গবর্নমেন্টের নিকটে সুবিচারের সম্ভাবনা আছে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পার্লামেন্টের উপর, শেষ বিচারের জন্য, নির্ভর করা ভিন্ন উপায় নাই। পার্লিয়ামেন্টীয় শাসন ও অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানের শাসন দুয়ের কোনোটিই অবশ্য সম্যকরূপে নিরাপদ নহে; কেননা সময়ে সময়ে প্রবল স্বার্থ সংঘাতে সমূহ অমঙ্গলেরই সম্ভাবনা; পক্ষান্তরে এদেশীয়দিগের নিজের শাসনও এখন আকাশকুসুম অপেক্ষাও অসম্ভব; এরূপ স্থলে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানের শাসন অপেক্ষা পার্লিয়ামেন্টের শাসনই আমাদের পক্ষে শ্রেয়; যেহেতু পার্লিয়ামেন্টের ও ব্রিটিশ প্রজাসাধারণের ন্যায়পরতা ও মহত্ত্ব সাধারণত অধিকতর বিশ্বসনীয়।

পুলিস রেগুলেশন বিল

এই বিলটি ১৮৬১ সালের ৫ আইন সংশোধনের পাণ্ডুলিপি। ইহার ১৫ ধারার লিখিত বিষয়টি সংশোধন সম্বন্ধেই সমস্যা। ওই ধারার পূর্ব মর্মানুসারে নিয়ম ছিল এই যে, কোনো স্থানে বাদ বিসম্বাদ বা যে-কোনো কারণেই হউক দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া শান্তিভঙ্গ হইলে বা শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা থাকিলে, তথাকার শান্তিরক্ষার্থে অতিরিক্ত পুলিস প্রহরী নিযুক্ত হইত এবং তাহার নির্বাহার্থে স্থানীয় অধিবাসীদিগের উপর একটি কর সংস্থাপিত হইত। কর সংস্থাপিত হইত দোষী ও নির্দোষী নির্বিশেষে; দাঙ্গায় সংশ্লিষ্ট থাকুক বা না থাকুক স্থানীয় লোক মাত্রই সে কর দিতে আইনানুসারে বাধ্য হইত। কিন্তু এরূপ আইন স্পষ্টত অন্যায়। ইহা কখনোই ন্যায়ানুমোদিত হইতে পারে না যে দোষীর সহিত নির্দোষীও শাস্তি পাইবে।

নির্দোষীর শাস্তি নিবারণ উপরোক্ত সংশোধনের উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য সাধনের উপায় উদ্ভাবন করা দুষ্কর। গবর্নমেন্ট যে উপায় অবলম্বন করিতে চাহেন তাহাতে দোষী ও নির্দোষী নির্বাচনের ভার জিলার মাজিস্টর ও জজদিগের উপর বিন্যস্ত হয়। জজ বা মাজিস্টর ইহাদের যিনিই হউন স্থানীয় অবস্থা বুঝিয়া দোষী ও নির্দোষী নির্বাচনে ক্ষমবান হইবেন। সে ক্ষমতা পরিচালন করার দ্বারা দোষী ও নির্দোষী নিরাকরণকল্পে, দস্তুরমতো বিচার প্রণালী অবলম্বন করিয়া সাক্ষ্য প্রমাণাদি গ্রহণ ও উকিল-মোক্তারের সোয়াল জবাব গ্রহণান্তে, রায় লিখিত হইবে না— জজ বা মাজিস্টর স্থানীয় অবস্থানুসারে যাহা স্থির করিবেন তাহাই হইবে। দস্তুরমতো দেওয়ানি বিচার যখন হইবে না, তখন অবশ্য তাহার দেওয়ানি আপিলও চলিবে না। তবে বিভাগীয় কমিশনরের উহাতে হাত থাকিবে।

গবর্নমেন্ট পক্ষের যুক্তি এই যে এরূপ স্থলে দস্তুরমতো দেওয়ানি বিচার দ্বারা দোষী নির্দোষী নির্ধারণ করা সুকঠিন; অথচ নির্দোষীরও রক্ষা পাওয়া উচিত। শান্তি রক্ষা করিতে গবর্নমেন্ট স্বতঃ বাধ্য। শান্তিরক্ষার্থে, শান্তিভঙ্গের দণ্ডের জন্য দেওয়ানি বিচার সম্ভবে না। অতএব শাসন ও শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নির্দোষীদিগকে অব্যাহতি দিবার জন্য জিলার জজ ও মাজিস্টরদিগকে যে অধিকার দেওয়া হইতেছে ইহাই প্রচুর। পূর্বে দোষী ও নির্দোষী দেশসুদ্ধ লোকেরই দণ্ড হইত, এখন অন্তত কতক লোকও তো রক্ষা পাইবে। নির্দোষী মাত্রই পরিত্রাণ না পাউক তাহাদের কতকও তো পাইবে। সংশোধিত আইন সর্বাঙ্গসুন্দর না হইলেও উহা মন্দের ভালো। বিশেষত এ আইন দণ্ড দিবার জন্য নয়, দাঙ্গা নিবারণই ইহার উদ্দেশ্য। গবর্নমেন্টের যুক্তি এই।

অপর পক্ষের কথা এই যে, শান্তিভঙ্গের আশঙ্কাস্থলে যখন দোষী নির্দোষী সকলেরই উপর

পুলিসের ব্যয়ভার স্থাপন করা হয় তখন বস্তুত কাহাকেও বিশেষ করিয়া দোষী করা হয় না। ইহাতে কেবল স্থানীয় লোকের 'পরে শান্তির ট্যাক্স বসানো হয় মাত্র। পরন্তু নূতন নিয়মে ব্যক্তিবিশেষদের প্রতি বিনা বিচারে অপরাধের কলঙ্ক এবং দণ্ড আরোপ করিবার ক্ষমতা কর্তৃপুরুষদের থাকিবে অথচ সে কলঙ্ক ক্ষালন করিবার কোনো উপায় দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে দেওয়া হইবে না। বিচার হইবে না অথচ দোষী সাব্যস্ত হইবে।

যদি এ কথা বলা যায় যে, আইনমতে বিচার করিতে গেলে অনেক সময় প্রকৃত দোষী ধরা পড়ে না, অতএব কর্তৃপক্ষীয়দিগকে সকল সময়েই আইনের দ্বারা বাধ্য করা কর্তব্য নহে, তবে জিজ্ঞাস্য এই, শাসনপ্রণালীর মধ্যে এই ছিদ্রকে একবার স্থান দিলে কোথায় ইহার সীমা নির্ণয় হইবে? বিচারকেরা যে মনুষ্যস্বভাবের দুর্বলতাবশত পক্ষপাত করিতে পারেন সে-সকল কথা আমরা দূরে রাখিতেছি— স্থূল কথা এই যে, আবশ্যক বুঝিয়া ট্যাক্স বসাইতে গবর্নমেন্টের অধিকার আছে; কিন্তু বিনা বিচারে দোষী করিতে এবং কোনো ব্যক্তিকে আপন দোষক্ষালনের অধিকার না দিতে গবর্নমেন্টের ন্যায্য অধিকার নাই। ম্যাজিস্ট্রেট যদি স্থানীয় অভিজ্ঞতাবশত সর্বজ্ঞ হইয়া থাকেন তবে শান্তিভঙ্গের আয়োজন জন্য চেষ্টা কেন অন্য অপরাধেরও আন্দাজমতো খেয়ালমতো বিচারের ভার তাঁহার উপর দেওয়া উচিত।

ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি

জর্মান অধ্যাপক ওল্‌ডেন্‌বার্গ বুদ্ধের যে জীবনচরিত লিখিয়াছেন, তাহা ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়াছে এবং সেই সূত্রে তাঁহার বাঙালি পাঠকদিগের নিকট পরিচিতি হইয়াছে। সম্প্রতি তিনি জর্মন ভাষায় বেদের ধর্ম নামক এক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহার অনুবাদের প্রতীক্ষা করিয়া আছি।

মনিস্ট নামক আমেরিকান পত্রিকায় সমালোচনাস্থলে এই গ্রন্থের কিয়দংশ উদ্‌ধৃত হইয়াছে, নিম্নে তাহা সংকলন করিয়া দিলাম।

আধুনিক হিন্দুগণ আপনাদের শান্তিপ্রিয় নির্দ্বন্দ্ব প্রকৃতিকে শ্রেষ্ঠতার লক্ষণ বলিয়া গর্ব করে, কিন্তু অধ্যাপক বলেন ইহা তাহাদের দুর্বলতার লক্ষণ। যে-সকল মহা দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে য়ুরোপীয় জাতি বলিষ্ঠ পৌরুষ লাভ করিয়াছেন— ইরানীদের সহিত বিচ্ছেদের পর ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া অবধি ভারতবাসী আর্যগণ সেই-সকল প্রবল দ্বন্দ্ব হইতে বঞ্চিত হইয়া ক্রমশই শিথিলবল হইয়াছেন। এই ফলশস্যশালী নূতন নিবাসের নিস্তব্ধতার মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ আদিম অসভ্য জাতির সহিত একত্র অবস্থান করিয়া তাঁহাদের হিন্দুত্ব ক্রমশই প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল। একে তো শীত দেশ হইতে আসিয়া এখানকার আবহাওয়ায় তাঁহাদের অনেকটা নিস্তেজ করিয়াছিল, তাহার পরে অসমকক্ষ অসভ্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের সহিত সহজ সংগ্রামে জয়লাভপূর্বক উর্বরা বসুন্ধরা নির্বাধে ভোগ করিয়া তাঁহাদের চরিত্রে পুরুষোচিত কাঠিন্যের অভাব জন্মিতে লাগিল। তাঁহাদের জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার মধ্যে সেই কঠিন প্রয়াসের সুকঠোর সংঘাত ছিল না, যদ্দ্বারা বাস্তব জগতের গভীরতা ভেদ করিয়া সফলকাম হইয়া চিন্তারাজ্যের ভূমানন্দলোকে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। অতি অনায়াসেই তাঁহারা বস্তুজগতের উপরিতলে সত্যের সহিত কল্পনা, সুন্দরের সহিত অদ্ভুত, বিবিধ নবতর আকারে জড়িত মিশ্রিত করিয়া বিচিত্র চিত্রজাল রচনা করিয়াছিলেন।

ওল্‌ডেন্‌বর্গের মত উদ্‌ধৃত করিয়া সমালোচক তাঁহার হিন্দু বন্ধুবর্গকে সম্বোধনপূর্বক বলিয়াছেন উপরি-উক্ত কথাগুলি চিন্তা করিয়া নিজেদের প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করিয়া দেখিলে আত্মোন্নতি সাধনের যথার্থ উপায় নির্ণয় হইতে পারে। তিনি বলেন, যে-সকল প্রাকৃতিক অবস্থাবশত হিন্দুরা অবসর এবং স্বচ্ছলতা লাভ করিয়াছিলেন সেই-সকল অবস্থাগতিকেই তাঁহাদের অনুষ্ঠান এবং চিন্তাপ্রণালী এমন কৃত্রিমতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহাদের বুদ্ধি স্বেচ্ছাচারিণী

কল্পনাকে সঙ্গে লইয়া বড়ো বড়ো রহস্যময় প্রহেলিকার সহিত স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া করিতে ভালোবাসিয়াছে— একদিকে তাঁহারা ধর্ম এবং দর্শনের উচ্চতম শ্রেষ্ঠতম ভাবের মঞ্জরী বিকশিত করিয়া তুলিয়াছেন, অপর দিকে তাঁহাদের থিওরিগুলি বাস্তবতথ্যের সহিত একেবারে অসম্বদ্ধ রহিয়া গিয়াছে। যদি ইহা সত্য হয় যে, ভারতবর্ষের উন্নতি এক সময় মাঝখানে আসিয়া অবরুদ্ধ হইয়াছে, এবং তরুণতর পাশ্চাত্য সভ্যতা, বলে বুদ্ধিতে বিজ্ঞানে তাহাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, তবে, দৈবাগত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে তাহার কারণ অন্বেষণ করিতে গেলে ভ্রমে পতিত হইতে হইবে; তাহার প্রকৃত কারণ, বিচারের, বিশেষত আত্মবিচারের অভাব (lack of criticism, and especially of self-criticism)। পাশ্চাত্যজাতির মধ্যে এই বিচার এবং আত্মবিচারের' প্রবৃত্তি নানা উৎপাত, প্রতিযোগিতা এবং দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের দ্বারা সঞ্জাত হইয়াছে। হিন্দুদিগকে সর্বদা এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উন্নতি অর্থে দ্বন্দ্ব— তাঁহাদিগকে বলিষ্ঠ এবং কার্যতৎপর হইতে হইবে, বাস্তব সত্যের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে তাঁহাদিগকে শক্ত হইয়া উঠিতে হইবে। ভারতবর্ষের নিকট, তাহার প্রাচীন আচার্যদের নিকট, পাশ্চাত্য জাতি অনেক শিক্ষালাভ করিয়াছে এক্ষণে পাশ্চাত্যজাতির নিকট ভারতবর্ষের শিক্ষালাভ করিবার সময় আসিয়াছে; কী বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে কাহারো দ্বিমত থাকিতে পারে না— তাহা আর কিছু নহে, বৈজ্ঞানিক প্রণালীর কঠিন যাথাযথ্য (exactness)। এই শিক্ষা করিতে হইবে যে, পরীক্ষাসিদ্ধ অভিজ্ঞতাই সত্যের চরম মানদণ্ড, ধ্যানলব্ধ কল্পনা নহে। (The ultimate criterion of Truth is not apriori speculation, but experience; not subjective thought, but objective reality.)

সমালোচক মহাশয়ের উপদেশে অনেক কথা আছে যাহাতে আমাদের দন্তে আঘাত লাগিতে পারে, কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে ক্রমাগত আত্মশ্লাঘাদ্বারা নিশ্চেষ্ট অহংকারে পরিস্ফীত হইয়া ওঠাকে মহত্ত্বলাভ বলে না। যে-সকল কঠিন আঘাতে আমাদিগকে যথার্থ পৌরুষ দান করে, যাহা অপর্যাপ্ত অতি মিষ্ট তরল স্তুতিরসে অহরহ আমাদের আকণ্ঠ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে তাহা আমাদিগকে সাংঘাতিক অন্ধস্নেহে নিরুদ্যম জড়ত্বের দিকে, সর্বপ্রকার শৈথিল্যের দিকে কোমল আলিঙ্গনপাশে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে; তাহারা মায়া ছেদন করিতে না পারিলে আমাদের নিস্তার নাই।

ধর্মপ্রচার

হিন্দু কখনো ধর্মপ্রচার করিতে বাহির হয় নাই। কিন্তু কালের গতিকে হিন্দুকেও বিদেশে স্বধর্মের জয়ঘোষণা করিতে বাহির করিয়াছে। সম্প্রতি আটলান্টিক পার হইয়া হিন্দু আপন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিয়া আসিয়াছে এবং সেই নব ধরাতলবাসীগণ আমাদের প্রাচীন ধরাতলের পুরাতন কথা শুনিয়া পরিতৃপ্তি প্রকাশ করিয়াছে। ইহাতে উভয় জাতিরই গৌরবের কথা। পুরুষানুক্রমে এবং শৈশবকাল হইতেই যে-সকল সংস্কারের মধ্যে বর্ধিত হওয়া যায়, তাহার বাহিরের কথা, এমন-কি, বিরোধী কথা, ধৈর্যের সহিত ও শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করা বড়ো কঠিন। ধর্ম সম্বন্ধে আমরা তো আপনাদিগকে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উদার বলিয়াই জানি, কিন্তু সংস্কার-বিরোধী কথা আমরা তিলার্ধ পরিমাণও সহ্য করিতে পারি না। আমেরিকা যেরূপ অনুরাগ-সহকারে বিদেশীর মুখ হইতে হিন্দুধর্মের মর্ম ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছে তাহাতে এই প্রমাণ হয়, যে, তাহাদের জাতীয় প্রকৃতির মধ্যে সেই জীবনীশক্তি আছে যাহার প্রধান লক্ষণ, দান করিবার শক্তি এবং গ্রহণ করিবার শক্তি।

যাহা হউক, আমরা যে আমাদের ধর্মের সত্য প্রচার করিবার জন্য পল্লী ছাড়িয়া বাহির হইয়াছি ইহা আমাদের নবজীবনের লক্ষণ। এই উপলক্ষে নানা মতের সহিত রীতিমতো সংঘর্ষ

প্রাপ্ত হইয়া, সকল বিরোধের সহিত যুদ্ধ করিয়া, সকল আপত্তি খণ্ডনপূর্বক যখন নিজের ধর্মকে সকলের ধর্ম করিয়া তুলিতে পারিব, তখনই প্রকৃত উদারতা লাভ করিব; এখন আমরা যাহাকে উদারতা বলিয়া থাকি, তাহা ঔদাসীন্য, তাহা সকল অনুদারতার অধম।

সম্প্রতি ন্যুইয়র্ক নগরের নাইন্টিস্থ সেঞ্চুরি ক্লাবে বিশপ থোবর্ন এবং বীরচাঁদ গন্ধী নামক বোম্বাইবাসী জৈনধর্মাবলম্বী ব্যারিস্টারের মধ্যে 'ভারতবর্ষে ক্রিশ্চান মিশন' সম্বন্ধে তর্ক হয়— ডাক্তর পল্ কেরস্ মধ্যস্থ থাকেন। থোবর্ন, মিশনের হিতকারিতা, এবং বীরচাঁদ, তাহার অনুপযোগিতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। মধ্যস্থ কেরস্ সাহেব যাহা বলেন তাহার মধ্যে আমাদের প্রণিধানযোগ্য অনেক কথা আছে।

তিনি বলেন, যথার্থ দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে প্রচারকার্য অপরিহার্য হইয়া উঠে। যে ধর্মে বিশ্বাস করি সে ধর্ম প্রচার করিতে বিরত হওয়াকে অপক্ষপাত বলে না, তাহাতে ঔদাসীন্য, এবং প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব প্রকাশ পায়।

আধ্যাত্মিক বিষয়েও প্রতিযোগিতার আবশ্যক, কারণ, প্রতিযোগিতা উন্নতির প্রধান সহায়। ভিন্ন ভিন্ন মতের সংঘর্ষ উপস্থিত না হইলে কখনোই সত্যের বিশুদ্ধতা ও উজ্জ্বলতা রক্ষিত হয় না। তিনি বলেন, অখৃস্টানদের নিকট ধর্মপ্রচার করিতে গিয়া খৃস্টধর্ম আপন সংকীর্ণতা পরিহার করিয়া উত্তরোত্তর প্রশস্ত হইয়া উঠে। অনেক সময় পরধর্মের ছিদ্র অন্বেষণ করিতে গিয়া নিজধর্মের ছিদ্র বাহির হইয়া পড়ে। তাহার একটি উদাহরণ দেখাইয়াছেন। স্পেন্স্ হার্ডি নামক মিশনারির নাম অনেকে অবগত আছেন। তিনি বুদ্ধধর্ম সম্বন্ধে অনেক রচনা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের একস্থলে আছে, বুদ্ধ নিজের ও অন্যের পূর্বজন্ম সম্বন্ধে যে-সকল তথ্য বলিয়াছেন তাহা প্রতারণা মাত্র। কারণ, বুদ্ধ বস্তুতই যদি অতি প্রাচীনকালে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে বিজ্ঞানে যে-সকল লুপ্তবংশ প্রাচীন জীবজন্তুর বিবরণ আছে, বুদ্ধের পূর্বজন্মের ইতিহাসে তাহাদের উল্লেখ থাকিত। পৃথিবীকে গোল না বলিয়া সমতল বলাতে বৌদ্ধ সাধুগণকে হার্ডি সাহেব নিন্দা করিয়াছেন। এবং বুদ্ধ যে-সকল অলৌকিক কার্য করিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে সেগুলি হার্ডিসাহেবের মতে এত অবিশ্বাস্য, যে, তাহা গম্ভীর ভাবে প্রতিবাদের যোগ্যই নহে।

কেরস্ সাহেব বলেন, হার্ডি সাহেবের এই-সকল নিন্দাবাদ শুনিবামাত্র মনে উদয় হয় যে, খৃস্টের প্রতিও এ সকল কথার প্রয়োগ হইতে পারে। খৃস্ট বলেন তিনি এব্রাহামের পূর্বেও ছিলেন অথচ ম্যামথ্ কিংবা টেরোড্যাক্টিল্ জন্তুর কোনোরূপ উল্লেখ করেন নাই। জলের উপর দিয়া বুদ্ধের গমন যদি অসম্ভব হয় তবে খৃস্টের গমনই বা কেন সম্ভব হইবে? পৃথিবীর সমতলতা সম্বন্ধে হার্ডিসাহেবের মৌন থাকাই শ্রেয় ছিল, কারণ খৃস্টানদের হাতে গ্যালিলিয়োর কীরূপ লাঞ্ছনা হইয়াছিল তাহা সকলেই অবগত আছে।

অতঃপর কেরস্ সাহেব বলিতেছেন, কিছুকাল হইতে বৌদ্ধধর্ম পাশ্চাত্য মনের প্রতি আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ ধর্মকে য়ুরোপে কে আনয়ন করিল? স্পেন্স্ হার্ডি প্রভৃতি মিশনারিগণ। তাহারা বৌদ্ধধর্মের দেশে বৌদ্ধধর্মকে বিনাশ করিতে গিয়া খৃস্টধর্মের দেশে বৌদ্ধধর্মকে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে এবং যদিচ বৌদ্ধপ্রচারক পাশ্চাত্য দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিতে যায় নাই তথাপি খৃস্টান প্রচারক সেই অভাব পূরণ করিয়া বৌদ্ধধর্মের সাহায্যে খৃস্টধর্মকে প্রশস্ত করিয়া তুলিতেছে।

কেরস্ সাহেবের এই-সকল উক্তির মধ্যে আমাদের গর্বানুভব করিবার উপযোগী যে অংশ আছে তাহা আমাদের কাহারো চক্ষু এড়াইবে না, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। ভারতবর্ষের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়া খৃস্টানগণ নিজধর্মের উন্নতি সাধন করিতেছেন ইহা শুনিবামাত্র আমাদের ক্ষুদ্রবক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিবে, কিন্তু কেরস্ সাহেবের উক্তির মধ্যে আমাদের শিক্ষা করিবার যে বিষয় আছে তাহা সম্ভবত আমাদের নিকট সমাদর প্রাপ্ত হইবে না। প্রকৃত কথা এই যে, হিন্দুগণ

ঘরে বসিয়া আপনাদের ধর্ম এবং আপনাদের প্রকৃতিকে যত উদার বলিয়া মনে করে তাহা তাঁহাদের কল্পনামাত্র হইতে পারে। যতক্ষণ না প্রকৃত জগৎরঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন ততক্ষণ তাঁহারা যাহাকে সত্য বলিয়া মনে করিতেছেন তাহা প্রকৃত সত্য কি, তাঁহাদের সংস্কার মাত্র তাহার প্রমাণ হইবে না। মিথ্যার সহিত যখন হাতে হাতে সংগ্রাম বাধে তখনই সত্যের প্রভাব প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। আমরা নিজে জানি না আমাদের ধর্ম কতখানি সত্য; কারণ, সে সত্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, সে সত্যকে অগ্রবর্তী করিয়া আমরা মিথ্যার বিরুদ্ধে অগ্রসর হই না; আমরা আপন ধর্মকে আচ্ছাদন করিয়া রাখি; আমরা বলি হিন্দুর ধর্ম কেবল হিন্দুরই; অর্থাৎ হিন্দুধর্মের মধ্যে যে সত্য আছে সে সত্য অন্যত্র সত্য নহে; অতএব সকল ক্ষেত্রেই তাহাকে উপস্থিত করিয়া তাহার সত্যতা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই; কেবল হিন্দুর বিশ্বাসের উপরেই তাহাকে স্থাপিত করিয়া রাখিতে হইবে।

হিন্দুমতে স্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ; বৈজ্ঞানিকেরাও বলেন, স্বগোত্রে বিবাহ প্রচলিত হইলে বংশানুক্রমে নানা রোগ, পঙ্গুতা এবং মানসিক বিকার বদ্ধমূল হইয়া যায়। ধর্মমত সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। যে ধর্ম বহুকাল অবধি অন্য ধর্মের সহিত সমস্ত সংস্পর্শ সযত্নে পরিহার করিয়া কেবল নিজের গণ্ডির মধ্যে বদ্ধ হইয়া উপধর্ম সৃজন দ্বারা বংশবৃদ্ধি করিতে থাকে, তাহার বংশে উত্তরোত্তর নানাজাতীয় বিকার ক্রমশ বদ্ধমূল হইয়া উঠে। মুসলমানধর্মের সংস্রববশত ভারতবর্ষের নানাস্থানে হিন্দুধর্মের মধ্যে অনেক বিপ্লবের লক্ষণ দেখা দিয়াছিল; এবং আধুনিক বৈষ্ণবধর্মের মধ্যেও মুসলমান ধর্মের প্রভাব কতটা আছে তাহা আলোচনা করিয়া দেখিবার যোগ্য। বঙ্কিম যদিচ পাশ্চাত্যদের প্রতি বহুল অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন তথাপি তাঁহার কৃষ্ণচরিত্র যিনি মনোযোগ-পূর্বক পাঠ করিয়া দেখিবেন তিনি দেখিতে পাইবেন খৃস্টধর্মের সাহায্য ব্যতীত এ গ্রন্থ কদাচ রচিত হইতে পারিত না। অনেকের নিকট তাহা কৃষ্ণচরিত্রের অগৌরবের বিষয় বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে। আমরা বলি ইহা তাহার প্রধান গৌরব। বঙ্কিম খৃস্টধর্মের আলোকে হিন্দুধর্মের মর্মনিহিত সত্যকে উজ্জ্বল করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা দ্বারা হিন্দুধর্মের কৃত্রিম সংকীর্ণতা ছেদন করিয়াছেন এবং সেই উপায়েই ইহার যথার্থ মাহাত্ম্যকে বাধামুক্ত করিয়া সর্বদেশকালের উপযোগী করিয়া অসংকোচে সগর্বে জগতের সমক্ষে প্রকাশিত করিয়াছেন। বিশুদ্ধ সত্যের উপর কদাচ জাতিবিশেষের শিলমোহর ছাপ পড়ে না— যেখানে ছাপ পড়ে নিশ্চয় সেখানে খাদ আছে।

সাধনা
ফাল্গুন ১৩০১

ইন্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটি

অর্থাৎ ভারত দুঃখ নিবারণ সভা। সভার নাম হইতেই তাহার উদ্দেশ্য অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই সভাটি গোপনে স্থাপিত হইয়া কিছুকাল হইতে ভারতবর্ষের হিতোদ্দেশে নানা কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া আসিতেছে। সভা যে পরিমাণে কাজ করিয়াছে সে পরিমাণে আপন নাম ঘোষণা করে নাই। ইহাতে আমাদের মনে যথেষ্ট আশার সঞ্চার হয়।

সাধারণত আমাদের দেশের রাজনৈতিক সভাসকল কী কী উদ্দেশ্য এবং উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে তাহা সকলেই অবগত আছেন। এ সভারও সে-সকল অঙ্গের কোনো ত্রুটি নাই। কিন্তু তাহা ছাড়া ইহার একটি বিশেষত্ব আছে। এ সভা উপযুক্ত বোধ করিলে লোকবিশেষ এবং সম্প্রদায়বিশেষের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে। কারণ, সভার মতে, ভারতবর্ষকে যেমন অনুচিত আইন হইতে রক্ষা করা চাই, তেমনি তাহাকে

অন্যায় শাসন হইতেও পরিত্রাণ করা আবশ্যক।

সভার এই বিশেষত্বটুকু আমাদের কাছে সব চেয়ে ভালো লাগিতেছে। তাহার বিশেষ কারণও আছে। অনুচিত আইন এবং অন্যায় শাসন যদি কোনো মন্ত্রবলে ভারতবর্ষ হইতে একেবারে উঠিয়া যায়— আইনকর্তারা যদি সম্পূর্ণ অপক্ষপাত এবং অপরিসীম বিচক্ষণ ব্যক্তি হন, ও শাসনকর্তারা সকলেই অভ্রান্ত ন্যায়পর ও অন্তর্যামী হইয়া উঠেন তবে দেশের অনেক দুঃখ দূর ও সুখ বৃদ্ধি হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে আমাদের জাতিগত আভ্যন্তরিক অবস্থার অধিক কিছু পরিবর্তন হয় না। কেবল সুআইন এবং সুশাসনে একটা জাত বাঁধিয়া দিতে পারে না; তাহাতে রাজভক্তি এবং রাজনির্ভর বাড়াইয়া দিতে পারে, কিন্তু স্বজাতিভক্তি এবং আত্মনির্ভর তাহাতে বাড়ে না। অথচ সেই স্বজাতিবন্ধনই দেশের সমস্ত স্থায়ী মঙ্গলের মূল ভিত্তি।

গবর্নমেন্টকে কোনো প্রকার শিক্ষা দিবার পূর্বে, স্বজাতি এবং স্বজাতির কর্তব্য কাহাকে বলে এই শিক্ষা দেশের লোককে দেওয়া বিশেষ আবশ্যক। এ শিক্ষা কেবল বই পড়াইয়া বা বক্তৃতা দিয়া হইতে পারে না, এ শিক্ষা কেবল প্রত্যক্ষ উদাহরণের দ্বারা হইয়া থাকে।

যখন একজন সামান্য চাষা দেখিতে পাইবে তাহাকে বিজাতি-কৃত অন্যায় হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিঃস্বার্থ স্বদেশীয় দল অগ্রসর হইতেছে, এমন-কি, পরের বিপদ দূর করিতে গিয়া অনাবশ্যক নিজের বিপদ আহ্বান করিয়া লইতেছে তখন সে অন্তরের সহিত অনুভব করিতে স্বজাতি কাহাকে বলে; তখন সে ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিবে কেবল ভাই বন্ধু তাহার আপন নহে, সমস্ত স্বজাতি তাহার আপন।

অনেক অন্যায় কেবল অবহেলাবশত ঘটিয়া থাকে। যখন জানা থাকে যে, দুর্বল ব্যক্তির অন্যায় প্রতিকারের কোনো ক্ষমতা নাই এবং অন্যায়কে সে আপন অদৃষ্টের লিখন জ্ঞান করিয়া তেমন সুতীব্রভাবে অনুভব করে না, তখন তাহার প্রতি সূক্ষ্মভাবে ন্যায়াচরণ করিতে তেমন একান্ত সতর্কতা জন্মে না। তখন তাহার হীনতা উপলব্ধি করিয়া তাহার সুখদুঃখের প্রতি কথঞ্চিৎ অবজ্ঞা জন্মিয়াই থাকে। কিন্তু যখন প্রত্যেক লোক তাহার স্বজাতির বলে বলী, তখন সে নিজেই অন্যায়ের প্রতি অসহিষ্ণু হইয়া উঠে এবং অন্যেও তাহার প্রতি নির্বিচারে অন্যায় করিতে সাহসী হয় না। কাঁদাকাটি করিয়া পরকে ন্যায়পর করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা অপেক্ষা একত্র হইয়া নিজেকে বলশালী করিবার চেষ্টা করাই সংগত।

রিলিফ সোসাইটি যখন ব্যক্তিবিশেষ অথবা সম্প্রদায় বিশেষকে অন্যায় হইতে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইবে তখন স্বজাতির নিকটে স্বজাতির মূল্য অনেক বাড়াইয়া দিবে। ইহা অপেক্ষা মহৎ উদ্দেশ্য আর কী হইতে পারে? যে অন্যায় নিবারণের জন্য তাঁহারা চেষ্টা করিবেন সে অন্যায় নিবারণে তাঁহারা সক্ষম না হইতে পারেন কিন্তু সেই নিষ্ফল চেষ্টাতেও তাঁহারা যে ফল লাভ করিবেন, তাহা, কোনো বিশেষ অন্যায় প্রতিকারের অপেক্ষা অনেক গুরুতর।

অন্যায় আইন রহিত করিয়া ভালো আইন প্রচলিত করা এবং ভারতবাসীদের স্বত্বাধিকার বিস্তার করার জন্য কন্‌গ্রেস্‌ যে চেষ্টা করিতেছেন সে চেষ্টা পরম হিতকর সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহার মুখ্য ফলের অপেক্ষা গৌণ ফল আমাদের নিকট অনেক বেশি মূল্যবান বলিয়া বোধ হয়। ভারতবর্ষীয় ভিন্ন জাতির একত্র সম্মিলন এবং পরস্পর হৃদয় বিনিময়— ইহাই আমাদের পরম লাভ— ইংরাজের রাজসভায় আসন লাভ করার অপেক্ষা ইহা অনেক সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। এবং এই কারণেই, রিলিফ্‌ সোসাইটির অন্যান্য সকল কর্তব্য অপেক্ষা পূর্বোক্ত বিশেষ কর্তব্যটি আমাদের নিকট সর্বাপেক্ষা আদরণীয় বলিয়া বোধ হয়। অবস্থাবিশেষে পরের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে হয়, কিন্তু সকল অবস্থাতেই নিজের স্বাধীন বলবৃদ্ধির চেষ্টাই শ্রেয়।

উদ্দেশ্য সংক্ষেপ ও কর্তব্য বিস্তার

অনেক সময় বৃহৎ উদ্দেশ্য লইয়া বসিলে অল্পই কাজ হয় এবং উদ্দেশ্য খাটো করিলে ফল বেশি পাওয়া যায়। বিশেষত আমাদের অর্থ এবং সামর্থ্য উভয়ই স্বল্প— এইজন্য যথার্থ নিজের কর্তব্য পালন করিবার ইচ্ছা থাকিলে সে কর্তব্যকে আপন সাধ্যসীমার মধ্যে আনিতে হইবে।

বড়ো বড়ো স্বাধীন দেশে প্রায় অধিকাংশ শুভকার্যের ভূমিপত্তন হইয়া আছে। এইজন্য কোনো একটা ফলাও কাজে প্রবৃত্ত হওয়া তাহাদের পক্ষে সহজ। কিন্তু আমাদের দেশে সকল প্রকার দেশহিতকর কাজ একেবারে গোড়া হইতে আরম্ভ করিতে হয়। অতএব বহুদূরে না গিয়া নিকট হইতে কাজ শুরু করাই আবশ্যক।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, যাহারা সহজে কর্মপ্রিয় নহে তাহাদিগকে কর্মে উৎসাহিত করিতে হইলে খুব একটা বৃহৎ সংকল্পের উত্তেজনা সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হয়। ছোটো কাজ হইতে বড়ো কাজে যাওয়া, না, বড়ো কাজ হইতে ছোটো কাজে আসা কোন্‌টা স্বাভাবিক পথ সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন ছোটো কাজের নদীপ্রবাহ বাহিয়া বড়ো কাজের সমুদ্রে গিয়া অবতীর্ণ হইতে হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, বড়ো কাজের গুঁড়ি অবলম্বন করিয়া ছোটো কাজের শাখা-প্রশাখায় উত্তীর্ণ হওয়াই সংগত।

আসল কথাটা এই, দেশে যখন একটা নূতন ভাবের আবির্ভাব হয় তখন প্রথমে সেটার দ্বারা আপন কল্পনাকে পরিপূর্ণ করিয়া লইতে হয়— প্রথমে তাহার সমগ্র বৃহত্ত্বটা সম্মুখে রাখিয়া তাহার সম্যক পরিচয় গ্রহণ করিতে হয়— প্রথমে সেই ভাবটাকে সাধারণত দেশের আবহাওয়ার সঙ্গে মিশাইয়া লইতে হয়— তাহার পরে তাহার গূঢ় প্রভাব ছোটো বড়ো নানা কাজে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতে আরম্ভ করে।

সেইজন্য, এক সময়ে বঙ্গসাহিত্যে সে-সকল ভারত-জাগানো গানের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল এখন তাহাকে অনেকে পরিহাসচক্ষে দেখিয়া থাকেন; কারণ, দেশহিতৈষণার সাধারণ ভাবটা এখন শিক্ষিতসাধারণের নিকট সুপরিচিত হইয়া গিয়াছে; এখন সাধারণ কথার অপেক্ষা বিশেষ কথার প্রয়োজন বেশি। এখন কোনো লোককে জাগিতে বলিলে সে বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠে, আরে বাপু, আমি অনেকক্ষণ জাগিয়া বসিয়া আছি এখন কী করিতে হইবে বলো দেখি!

যেমন ভাবের সম্বন্ধে তেমনি কাজের সম্বন্ধেও। এখনও আমাদের দেশহিতৈষিণী সভাগুলি অত্যন্ত বৃহৎ ব্যাপক উদ্দেশ্যের মধ্যে আপনাদিগকে দিশাহারা করিয়া রাখিয়াছেন। সে-সকল সভার দ্বারা অনেক শুভফল ফলিতেছে সন্দেহ নাই কিন্তু সেইসঙ্গে এমন কতকগুলি সভার আবশ্যক যাঁহারা উদ্দেশ্যের পরিধি সংক্ষিপ্ত করিয়া যথার্থ কর্তব্যের পরিধি বিস্তৃত করিবেন। অর্থাৎ যাঁহারা কেবল আন্দোলন না করিয়া কাজে হাত দিবেন।

আমাদের প্রথমেই মনে হয় সমস্ত ভারতবর্ষের জন্য বিস্তর সভাসমিতির সৃষ্টি হইয়াছে, এক্ষণে কোনো সভা যদি কেবলমাত্র সমস্ত বাংলা দেশের দুঃখ অভাব মোচনের জন্য কৃতসংকল্প হন তবে সম্ভবত কতকটা বেশি কাজ করিতে পারেন। আমাদের লোকবল, অর্থবল এবং চরিত্রবল যেরূপ, তাহাতে সমস্ত ভারতের হিতসাধনোদ্দেশে আমরা কেবল দরখাস্ত করিতে পারি— কিন্তু কেহ কেহ যদি কেবল বাংলাদেশের মধ্যেই আপন হিতৈষণার উদ্যম বদ্ধ করেন তবে সম্ভবত কতকটা পরিমাণে কাজ করিতে পারেন— এবং ক্রমে সেই উপায়ে সমস্ত ভারতবর্ষের উন্নতির পাকা ভিত্তি পত্তন করিতে পারেন।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। এখন, অধিকাংশ রাজনৈতিক আন্দোলন ইংরাজিতেই হইয়া থাকে; তাহার কারণ, সমস্ত ভারতবর্ষ এবং সমস্ত ভারতবর্ষের রাজাকে কোনো কথা নিবেদন করিতে হইলে অগত্যা ইংরাজি ভাষা অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু তাহার ফল হয় এই যে, কেবল শিক্ষিতের নিকট শিক্ষা ছড়ানো হয়। ইংরাজ যে সর্বদাই খোঁটা দিয়া থাকে যে, আমাদের দেশের

পোলিটিকাল আন্দোলন কেবল ইংরাজিশিক্ষিতদিগের কৃত্রিম আন্দোলন, সেই নিন্দাবাদের কোনো যথার্থ প্রতিকার করা হয় না। পুলিস বিল, চৌকিদারি বিল, প্রভৃতি আইন সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি আমরা বিদেশীভাষায় টাউন্‌হলে প্রকাশ করিয়া থাকি, তদ্দ্বারা সে-সকল বিল সংশোধন হইতেও পারে কিন্তু বিল সংশোধন অপেক্ষা দেশ-সংশোধন ঢের বড়ো কাজ। এই-সকল বিলে দেশের যে প্রজা-সাধারণের শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে, সেই প্রজাদিগকে বিলগুলির উদ্দেশ্য এবং আমাদের সকলের কর্তব্য বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। তাহারা কী অধিকার পাইল এবং তাহাদের নিকট হইতে কী অধিকার প্রত্যাহরণ করা হইল ইহা তাহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিলে যে উপকার হইবে ইংরাজ রাজসভায় দরবার করিয়া সে পরিমাণ উপকার হইবে না।

কেবল ইহাই নয়— দেশের রোগনিবারণ, শিক্ষাবিস্তার, ধনবৃদ্ধি, শান্তিরক্ষা, অন্যায়প্রতিকার প্রভৃতি সমস্ত কাজে ঢের বেশি তন্ন তন্ন করিয়া মনোযোগ দেওয়া যাইতে পারে। গবর্মেন্টকে কর্তব্যশিক্ষা দান করিবার বিস্তৃত আয়োজনে সমস্ত উদ্যম নিয়োগ না করিয়া নিজেদের অদূরবর্তী কর্তব্যপালনের জন্য কিছু অবশিষ্ট রাখা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

উৎসবে ব্যসনেচৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ।

দারিদ্র্যে, দুর্ভিক্ষে রাজদ্বারে আমরা আপন দেশের লোকের সাহায্যে আপনারা উপস্থিত থাকিয়া স্বজাতিই স্বজাতির সর্বপ্রধান বান্ধব ইহাই প্রমাণ করা আমাদের প্রধান কাজ। পার্লামেন্টের সহিত বন্ধুত্বস্থাপনচেষ্টাও মন্দ কাজ নহে— কিন্তু দেশের লোকের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের ন্যায় ফল তাহাতে পাইব না।

হিন্দু ও মুসলমান

আমাদের একটা মস্ত কাজ আছে হিন্দু-মুসলমানে সখ্যবন্ধন দৃঢ় করা। অন্য-দেশের কথা জানি না কিন্তু বাংলাদেশে যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সৌহার্দ্য ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাংলায় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা বেশি এবং হিন্দু-মুসলমানে প্রতিবেশিসম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। কিন্তু আজকাল এই সম্বন্ধ ক্রমশ শিথিল হইতে আরম্ভ করিয়াছে। একজন সম্ভ্রান্ত বাঙালি মুসলমান বলিতেছিলেন বাল্যকালে তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ পরিবারদের সহিত নিতান্ত আত্মীয়ভাবে মেশামেশি করিতেন। তাঁহাদের মা-মাসিগণ ঠাকুরানীদের কোলে পিঠে মানুষ হইয়াছেন। কিন্তু আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে নূতন হিন্দুয়ানি অকস্মাৎ নারদের ঢেঁকি অবলম্বন করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। তাঁহারা নবোপার্জিত আর্য অভিমানকে সজারুর শলাকার মতো আপনাদের চারি দিকে কণ্টকিত করিয়া রাখিয়াছেন; কাহারো কাছে ঘেঁসিবার জো নাই। হঠাৎবাবুর বাবুয়ানার মতো তাঁহাদের হঠাৎ হিঁদুয়ানি অত্যন্ত অস্বাভাবিক উগ্রভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। উপন্যাসে নাটকে কাগজে পত্রে অকারণে বিধর্মীদের প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়া থাকে। আজকাল অনেক মুসলমানেও বাংলা শিখিতেছেন এবং বাংলা লিখিতেছেন— সুতরাং স্বভাবতই এক পক্ষ হইতে ইঁট এবং অপরপক্ষ হইতে পাটকেল্ বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। কোথায় তুর্কীর সুলতান তিনশত পাচক রাখিয়াছেন ইহা লইয়া ম্লেচ্ছদিগকে তিরস্কার ও হিঁদুয়ানির বড়াই করিয়া আপন পাড়ার প্রতিবেশীদের সহিত বিরোধের সূত্রপাত করিলে তাহাতে হিন্দুদের, মাহাত্ম্য নহে, পরন্তু ক্ষুদ্রতারই পরিচয় দেওয়া হয়। যদি আমাদের ধর্মের এমন কোনো গুণ থাকে যাহাতে আমাদের পুরাতন পাড়ার লোককেও আপন করিয়া লইতে বাধা দেয় তবে সে ধর্মের জন্য অহংকার করিবার কারণ কিছুই দেখি না।

কন্‌গ্রেসে বিদ্রোহ

কন্‌গ্রেসে নর্টনকে লইয়া যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে আমাদের মত আমরা পূর্বেই ব্যক্ত করিয়াছিলাম। আমরা এই কথা বলিয়াছিলাম, যে ব্যক্তি সমাজে পতিত, সে যে অকৃত্রিম হিতৈষণাসত্ত্বেও ভারতহিতব্রতে যোগ দিতে পারিবে না আমরা এরূপ জুলুমের কোনো অর্থ বুঝিতে পারি না। মনে করা যাক হঠাৎ বর্ষায় নদী বাড়িয়া উঠিতেছে, হয়তো এক রাত্রেই জলপ্লাবনে দেশ নষ্ট হইতে পারে; কতকগুলি লোক বাঁধ বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এমন সময় যদি কোনো পাপী লোক আসিয়াও পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে চাহে, নৈপুণ্যের সহিত সেই দুষ্কর কার্যে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হয়— তবে কি তাহাকে বলিতে হইবে, আমরা সকলে সাধু এবং তুমি পাপী; অতএব তোমার নৈপুণ্য এবং তোমার হিতৈষণাবৃত্তি লইয়া তুমি চলিয়া যাও, তুমি বাঁধ বাঁধিতে পাইবে না? তখন কি ইহা দেখিব না, যাহার যথার্থ হিতেচ্ছা আছে হিতকর্মে তাহার অধিকার আছে— এবং তাহার অন্য অপরাধ স্মরণ করিয়া তাহাকে ভালো কাজ করিতে বাধা দিলে কেবল তাহাকেই বাধা দেওয়া হয় না, সে কাজকেও বাধা দেওয়া হয়? আমরা এই কথা বলি, দুঃসময়ে যে লোক বাঁধ বাধিতে আসিয়াছে, তাহার বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাইতে না যাইতে পারি, তাহার সহিত কন্যার বিবাহ না দিতে পারি— কিন্তু তাহাকে বাঁধ বাঁধিতে বাধা দিতে পারি না। আমাদের মধ্যে এমন নিষ্কলঙ্ক সাধু অতি অল্পই আছেন যাঁহারা অকৃত্রিম সদনুষ্ঠান হইতে কোনো পাপীকে নিরস্ত করিবার অধিকার অসংকোচে লইতে পারেন?

আমরা একটি সংক্ষিপ্ত উপমা অবলম্বন করিয়া পূর্বোক্তরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছিলাম। সঞ্জীবনী সেই উপমা প্রয়োগে বিষম বিচলিত হইয়া আমাদের প্রতি অত্যন্ত স্থূল গোছের একটা রসিকতা নিক্ষেপ করিয়াছেন। আমরা উপমা প্রয়োগ করিয়াছিলাম সে অপরাধ স্বীকার করিতেই হইবে কিন্তু কাহারো প্রতি গালি প্রয়োগ করি নাই। সঞ্জীবনীর মতো কাগজ, যাঁহাকে বিস্তর প্রচলিত মতের সহিত সর্বদা বিরোধ করিতে হয়, তিনি যে আজও মতের অনৈক্যে ধৈর্যরক্ষা করিতে শিক্ষা করিলেন না ইহাতে আমরা বিস্মিত হইয়াছি।

রাষ্ট্রীয় ব্যাপার

আমাদের কোনো বন্ধু গত মাসের সাধনায় পলিটিক্স শব্দের ব্যবহার দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন পলিটিক্স্‌ শব্দের স্থানে রাষ্ট্রীয় ব্যাপার শব্দ প্রয়োগ করা যাইতে পারে কি না?

বাংলার পলিটিক্সের পরিবর্তে রাজনীতি শব্দ প্রচলিত হইয়া গেছে। কিন্তু রাজনীতি শব্দটি পুরাতন, পলিটিক্স্‌ আমাদের পক্ষে নূতন। আমাদের দেশে যখন রাজনীতি ছিল তখন ঠিক আধুনিক পলিটিক্স্‌ ছিল না। সুতরাং উভয় শব্দের মধ্যে অর্থের কিছু ইতরবিশেষ আছেই। বোধ করি তাহারই প্রতি লক্ষ করিয়া আমাদের বন্ধু রাষ্ট্রীয় ব্যাপার শব্দটি ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক।

যখন পূর্বকার রাজার সহিত এখনকার রাজার অনেক তফাত হইয়া গেছে তখন রাজনীতি হইতে রাজা শব্দটাই বাদ দেওয়া দরকার। অতএব রাজনীতি না বলিয়া রাষ্ট্রনীতি বলিলে কথাটা আরও পরিষ্কার হয় বটে। কারণ, রাষ্ট্রে রাজা থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে। যেমন আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রে রাজা নাই, সেখানে রাজনীতি নাই, রাষ্ট্রনীতি আছে। এই হিসাবে রাষ্ট্রনীতি শব্দ রাজনীতি শব্দের অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক।

পলিটিক্স্‌ জিনিসটা আমরা ইংরাজের নিকট হইতে পাইয়াছি, অতএব ওই শব্দটা ইংরাজি আকারে ব্যবহার করিতে আমাদের কোনো আপত্তি নাই, তাহাতে উহার ইতিহাসও রক্ষা হয় ভারও রক্ষা হয়। সেইসঙ্গে যদি একটা বাংলা প্রতিশব্দ থাকে তো থাক্‌। রাজনীতি শব্দটি প্রচলিত

হইয়া গিয়াছে। অনেক পুরাতন শব্দ কালক্রমে অর্থ পরিবর্তন করে এ স্থলেও তাহা খাটিতে পারে। অপর পক্ষে রাষ্ট্রনীতি শব্দটিও দুরূহ নহে, এবং অধিকতর সংগত।

সাধনা
চৈত্র ১৩০১

ফেরোজ শা মেটা

মাননীয় ফেরোজ শা মেটা ভারত মন্ত্রীসভায় পুলিস বিলের যে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন তাহা আমাদের কর্তৃপুরুষদিগের সহ্য হয় নাই। হঠাৎ একটা বজ্রের শব্দ শুনিলে ছেলেরা কাঁদিয়া উঠে— তাহারা মনে করে কে যেন উপর হইতে তাহাদের প্রতি ভারি একটা অন্যায় করিল, যেন তাহাদের কোথায় এক জায়গায় ঘা লাগিয়াছে— শ্রীযুক্ত মেটা ভারতসভায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে যদিও তিনি কাহাকেও আঘাত করেন নাই তথাপি হঠাৎ তাহার শব্দে এবং নূতন আলোকের ছটায় সাহেবদের খামকা মনে হইল তাঁহাদের সিবিল সর্বিসের সুকোমল পৃষ্ঠে বুঝি কে মুষ্টিপাত করিল অমনি তাঁহারা বিচলিত হইয়া উঠিলেন। একটা নূতন আলোক অকস্মাৎ একটা জ্যোতির্ময় কষাঘাতের মতো মন্ত্রীসভার আকাশের গায়ে চমক দিয়া গিয়াছিল— তাই সাহেবরা অকস্মাৎ এতই চকিত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তাঁহারা মনে করিতে পারেন নাই তাঁহাদিগকে কেহ আঘাত করে নাই।

মেটা বলিয়াছিলেন— বিনা বিচারে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহার আপিলের অধিকার না দিলে অবিচারের সম্ভাবনা আছে। কর্তৃপুরুষেরা ক্ষাপা হইয়া বলিয়া উঠিলেন— কেন, আমরা কি তবে সকলেই অবিচারী? গম্ভীরভাবে ইহার উত্তর দিতে বসিলে আমাদের কর্তাদের বুদ্ধির প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হয়— কেবল, এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করি, তবে কোনো অপরাধের জন্য কোনো প্রকার বাঁধা বিচারপ্রণালী থাকে কেন? আমাদের স্বর্গসম্ভব সিবিল সর্বিসের সভ্যগণকেও আইন পালন করিয়া বিচার করিতে হয় এ অপমান তাঁহারা স্বীকার করেন কেন? নিয়ম মাত্রই তো মানুষের স্বেচ্ছাধীন বিবেচনা, স্বাধীন ধর্মবুদ্ধি এবং অবাধ হৃদয়বৃত্তির প্রতি সন্দেহ প্রকাশ।

তাহার পরে আবার বাজেটের আলোচনাকালেও আমাদের বাংলাদেশের ছোটো বিধাতা ইস্কুলমাস্টারের মতো গলা করিয়া শ্রীযুক্ত মেটাকে বিস্তর উপদেশপূর্ণ ভর্ৎসনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, মেটা সাহেব খুব ভালো ছেলে শুনিয়াছিলাম কিন্তু তিনি আমাদের আশানুরূপ উচ্চ নম্বর রাখিতে পারিতেছেন না, অতএব তাঁহাকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করা যায়। কর্তাদের মতে, বাজেটের আলোচনায় শ্রীযুক্ত মেটা কোনো প্রকার কাজের পরামর্শ দেন নাই কেবল সাধারণভাবে বিরোধ প্রকাশ করিয়াছেন।

মেটা সাহেব বলিয়াছিলেন, সৈন্যবিভাগের খরচ অত্যন্ত বেশি বাড়িয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব রাজস্বসচিব সার্ অক্‌লাণ্ড কলভিনও ওই কথা বলিয়াছেন।

ওয়েস্ট্‌ল্যাণ্ড সাহেব পাকেপ্রকারে বলেন খরচ বাড়ে নাই, এক্সচেঞ্জের দুর্বিপাকে অধিক টাকা নষ্ট হইতেছে। তিনি বলেন পৌণ্ডের হিসাবে হিসাব ধরিলে খরচ কম দৃষ্ট হইবে। এ কৈফিয়তটার মধ্যে কিছু চোখে ধুলা দেওয়া আছে এইরূপ আমরা অনুমান করি। ভারতবর্ষে যখন রৌপ্যমুদ্রায় অধিকাংশ খরচ নির্বাহিত হয় তখন পৌণ্ডহিসাবে হিসাব করিয়া খরচ কম দৃষ্ট হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহাতে ব্যয়ের ন্যূনতা প্রমাণ হয় না। অতএব ওয়েস্ট্‌ল্যাণ্ড সাহেবের এ যুক্তির মধ্যে সরলতা নাই এবং তাহাতে আমাদের কোনো সান্ত্বনাও দেখি না।

আমরা কাজের কথা কী বলিব? আমরা যদি বলি, সাহেব কর্মচারীদিগকে ক্ষতিপূরণবৃত্তি (কম্পেন্‌সেশন অ্যালাউয়েন্স) দিবার আবশ্যক নাই, তোমরা বলিবে, না দিলে নয়। বর্তমান

এক্সচেঞ্জের হিসাবে ধরিয়াও তোমাদের স্বদেশের সহিত এখানকার বেতনের তুলনা করিয়া দেখো। এখানে বিদেশে থাকিয়া তোমাদের খরচ বেশি হয়? কেন হয়? এমন যদি বুঝিতাম এখানে তোমাদের যেরূপ চাল বিলাতেও তোমাদের সেই চাল তাহা হইলে আমাদের কোনো আপত্তির কারণ ছিল না। বিলাতের মধ্যবিত্ত অবস্থায় কয়জন লোক বৎসরের মধ্যে কয়দিন শ্যাম্পেন-ডিনার ভোগ করিয়া থাকে? এ কথা কি সাহেবরা অস্বীকার করিতে পারেন যে, ভারতবর্ষে তাঁহারা বিস্তর অনভ্যস্ত এবং অনাবশ্যক নবাবী করিয়া থাকেন? সে-সমস্ত যদি তাঁহারা কিঞ্চিৎ খাটো করিতে প্রস্তুত হইতেন তাহা হইলে কি আমাদের এই-সকল অর্ধ-উপবাসীদের কষ্টসঞ্চিত উদরান্নে হাত দিতে হইত?

গল্পে কথিত আছে, বাবু যখন গোয়ালার বিল হইতে তাহার অর্ধেক পাওনা কাটিয়া দিলেন তখনও সে প্রসন্নমুখে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল— তাহার প্রসন্নতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল, এখনও দুধে পৌঁছায় নাই। অর্থাৎ কাটাটা কেবল জলের উপর দিয়াই গিয়াছে। প্রতিকূল এক্সচেঞ্জেও এখনও সাহেবদের হুইস্কি সোডা এবং মুর্গি মটনে আঘাত করে নাই তাহা বড়ো জোর শ্যাম্পেন টোকে, এবং অতিরিক্ত ঘোড়া ঘোড়দৌড়ের উপর দিয়াই গিয়াছে; কিন্তু কম্পেন্‌সেশন অ্যালাউয়েন্স আমাদের মোটা চাউল এবং বহুজলমিশ্রিত কলাইয়ের ডালে গিয়া হস্তক্ষেপ করিয়াছে।

আমরা বলিতেছি, তোমাদের ভারত শাসনের যন্ত্রটা অত্যন্ত বহুব্যয়সাধ্য হইয়াছে— যদি অধিকতর পরিমাণে দেশী লোক নিয়োগ কর তাহা হইলে সস্তা হয়। তাহাতে যে কাজ খারাপ হয় এমন কোনো প্রমাণ নাই। তোমরা বলিবে সে কোনো মতেই হইতে পারে না।

তোমাদের কথাটা এই, আমরা সৈন্য বিভাগের বিস্তার করিব, ভারতবর্ষের দুশো-পাঁচশো মাইল দূরে যেখানে যত ভীমরুলের চাক আছে গায়ে পড়িয়া সবগুলাতে খোঁচা মারিয়া বেড়াইব, ইংরাজ কর্মচারীদিগকে ক্ষতিপূরণবৃত্তি দিব, এবং মোটা পদের ইংরাজ কর্মচারী নিয়োগ করিয়া ভারতবর্ষের রক্তরিক্ত দেহে মোটা দাঁত বসাইয়া খাদ্য শোষণ করিব— ইহার অন্যথা হইবে না, এক্ষণে ব্যয়সংক্ষেপ সম্বন্ধে আমাদিগকে কাজের পরামর্শ দাও।

অনেক সময় যথার্থ কাজের পরামর্শ অত্যন্ত সহজ এবং পুরাতন। অজীর্ণ রোগী যত বড়ো ডাক্তারের নিকট উপদেশ লইতে যাক সকলেই বলিবেন, তুমি পথ্যসংযম করো। কিন্তু রোগী যদি বলে 'ওটা কোনো কাজের কথা হইল না— আমি ঘৃতপক্ব অখাদ্য খাইবই, এবং ক্ষুধার অবস্থা যেমনই থাক্ আহারের পরিমাণ বাড়াইতে থাকিব, তুমি যদি বড়ো ডাক্তার হও আমাকে একটা চিকিৎসার উপায় বলিয়া দাও'— তবে সে রোগীর নিকট খাদ্য পরিবর্তন, বায়ু পরিবর্তন প্রভৃতি স্বাস্থ্যতত্ত্বের সমস্ত মূলনীতিই নিতান্ত বাজে এবং সাধারণ কথা বলিয়াই মনে হইবে।

বিবাহ করিতে উদ্যত কোনো যুবকের প্রতি পাঞ্চ পত্রিকার একটি অত্যন্ত সহজ এবং সংক্ষিপ্ত উপদেশ ছিল— সেটি এই— 'এমন কাজ করিয়ো না!' অপব্যয় করিতে উদ্যত গবর্মেন্টের প্রতিও এতদপেক্ষা সহজ এবং সংগত উপদেশ হইতে পারে না। ফেরোজ শা মেটা সেই উপদেশটি দিয়াছিলেন— তাহাতেই কর্তারা অত্যন্ত উষ্মা প্রকাশপূর্বক বলিয়াছিলেন ইহা কোনো কাজের উপদেশ হইল না।

বেয়াদব

কৌন্সিল সভায় একটা নূতন জীবনের লক্ষণ দেখা দিয়াছে ইহাতেই রাজপুরুষেরা কিছু ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এতদিন মন্ত্রণাকার্য যেন যন্ত্রের মতো চলিয়া আসিতেছিল এখন হঠাৎ তাহারই মাঝখানে একটা ব্যথিত হৃদয়ের আওয়াজ শুনিয়া ছোটো হইতে বড়োকর্তা পর্যন্ত ক্ষিপ্তপ্রায়

হইয়াছেন, তাঁহারা বলিতেছেন মন্ত্রিসভার গম্বুজের মধ্যে ভারতবর্ষের হৃদয়ের মতো এমন একটা সজীব পদার্থকে হঠাৎ আনয়ন করা কেহ প্রত্যাশা করে নাই— কৌন্সিল সভায় এত বড়ো বেয়াদবি ইতিপূর্বে কখনো ঘটে নাই।

কিন্তু, হায়, এই অবাধ্য বেয়াদবটিকে আর তো চাপিয়া রাখা যায় না। এ এখন সর্বত্রই প্রবেশ করিতেছে। সভা, সমিতি, সাহিত্য, সংবাদপত্র, সমুদ্রপারের পার্লামেন্টপরিষদ, সর্বত্রই ইহার অভ্যুদয় দেখা যাইতেছে। অবশেষে সজীব ভারতবর্ষ তাহার পক্ষে সর্বাপেক্ষা দুর্গমতম স্থানের দ্বারমোচন করিয়াছে, সে ভারত মন্ত্রিসভায় প্রবেশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

যাঁহার বক্ষ আশ্রয় করিয়া ভারতবর্ষের হৃদয় এমন অসম্ভব স্থানে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারিয়াছে সেই ফিরোজ শা মেটার নিকট অল্পকাল হইল আমরা ভারতবাসী প্রকাশ্যে কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছি। মেটা যে কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহাতে সফল হইতে পারেন নাই কিন্তু তাহা হইতে উচ্চতর সফলতা লাভ করিয়াছেন।

কিন্তু এই উপলক্ষে গবর্মেন্ট এবং প্রজার মধ্যে আর-একটি বিভাগের সৃষ্টি হইল। মন্ত্রিসভায় এক পক্ষে ভারতবর্ষ এবং অন্যপক্ষে গবর্মেন্ট দণ্ডায়মান হইলেন; ইহাতে মাঝে মাঝে সংঘাত সংঘর্ষ হইবেই। সর্বত্রই এইরূপ হইয়া থাকে। যেখানে জীবন প্রবেশ করিয়াছে সেইখানেই জীবনের যুদ্ধ অনিবার্য।

কিন্তু আমরা দুর্বল পক্ষ। এ সংঘাতে কি আমাদের ভালো হইবে? যাঁহারা কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ প্র্যাক্‌টিক্যাল ভালোর দিকে দৃষ্টি রাখেন তাঁহারা অনেক সময় নিরাশ হইবেন, অনেক সময় কেবল দলাদলির জিদ্‌ বজায় রাখিতে গিয়া গবর্মেন্ট আমাদের সংগত প্রস্তাবকেও অগ্রাহ্য করিবেন। কিন্তু সভ্যসমাজে গায়ের জোর একমাত্র জোর নহে; ক্রমশ আমরাই আবিষ্কার করিতে থাকিব যে যুক্তির বল, ঐক্যের বল, নিষ্ঠার বল, অধ্যবসায়ের বল সামান্য নহে। আমরা নিজে যুঝিয়া চেষ্টা করিয়া যতটুকু ক্ষুদ্র ফল পাই সেও পরের অযাচিত বদান্যতার অপেক্ষা মহত্তর।

আমরা যে আমরা, আমাদের লোক যে আমাদেরই লোক, এই চেতনাটি যত প্রকারে যত আকারে সজাগ হইয়া উঠে ততই আমাদের মঙ্গল; আমাদের কাজ আমাদের দেশের লোক করিতেছে ইহা আমরা যেখানে যত পরিমাণে দেখিতে পাই ততই আমাদের পক্ষে আনন্দের বিষয়। সম্ভবত অনেকস্থলে আমরা অনেক ভ্রম করিব, অনেক অযথাচরণ করিব, এমন-কি, অনভিজ্ঞতাবশত আমাদের নিজেদের স্বার্থেও আঘাত দিব তথাপি পরিণামে তাহাতে আমাদের পরিতাপের বিষয় থাকিবে না। অতএব ভারত মন্ত্রিসভায় যে লোক আমাদের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া কর্তৃপক্ষের লাঞ্ছনা শিরোধার্য করিয়া আমাদের হইয়া লড়িয়াছেন রাজপুরুষেরা তাঁহার উপদেশকে যতই তুচ্ছ জ্ঞান করুন, তাঁহার সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হউক, তথাপি তাঁহাকে আমরা ভারতবাসীরা যে আপনার লোক বলিয়া এক সকৃতজ্ঞ আত্মীয়তার আনন্দ অনুভব করিতেছি সেই আনন্দের মূল্য নাই। তাঁহাকে আমাদের সুহৃৎ জানিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের প্রীতি প্রকাশ করিয়া আমরা অলক্ষিত ভাবে আপনারা সকলেই ঘনিষ্ঠতর সৌহার্দ্যবন্ধনে বদ্ধ হইতেছি।

এক্ষণে কর্তৃগণের নিকট নিবেদন এই যে, ভারতবর্ষের নবজাগ্রত হৃদয়টি যদি তাঁহাদের রাজসভায়, আরামশালায়, পাঠ্যপুস্তকে, তাঁহাদের সুখস্বপ্নে, তাঁহাদের সুরচিত সংকল্পের মাঝখানে গিয়া হঠাৎ প্রবেশ করে তবে তাহার সেই বেয়াদবিটি মাপ করিতে হইবে। হৃদয় জিনিসটাই বেয়াদব— তাঁহাদের নিজের পার্লামেন্টে, সাহিত্যে, সমাজে, তাহার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। তবে যে ভারতবর্ষে তাহার অস্তিত্ব তাঁহাদের অতিমাত্র অসহ্য বোধ হইতেছে, তাহার একটা কারণ, ভারতবর্ষ বাসকালে হৃদয়ের চর্চা তাঁহাদের অনভ্যস্ত হইয়া গেছে। অন্য কোনো কারণ আছে কি না জানি না।

কথামালার একটি গল্প

এক কৃষক কৃষিকর্মের কৌশল সকল বিলক্ষণ অবগত ছিল। সে পুত্রদিগকে ওই-সকল কৌশল শিখাইবার নিমিত্ত, মৃত্যুর পূর্বক্ষণে বলিল, হে পুত্রগণ! আমি এক্ষণে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিতেছি। আমার যে কিছু সংস্থান আছে, অমুক অমুক ভূমিতে অনুসন্ধান করিলে পাইবে। পুত্রেরা মনে করিল ওই-সকল ভূমির অভ্যন্তরে পিতার গুপ্তধন স্থাপিত আছে।

কৃষকের মৃত্যুর পর, তাহারা গুপ্তধনের লোভে সেই-সকল ভূমির অতিশয় খনন করিল। এইরূপে যারপরনাই পরিশ্রম করিয়া তাহারা গুপ্তধন কিছু পাইল না বটে, কিন্তু, ওই-সকল ভূমির অতিশয় খনন হওয়াতে, সে বৎসর এত শস্য জন্মিল, যে, গুপ্তধন না পাইয়াও তাহারা পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল পাইল। —'কথামালা', পৃ. ৩৮

আমাদের পোলিটিক্যাল ক্ষেত্র হইতে কোনো গুপ্তধন পাইয়া আমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে এরূপ যাঁহারা প্রত্যাশা করেন তাঁহারা নিরাশ হইবেন— কিন্তু সকলে একত্র মিলিয়া কর্ষণে যে শস্য জন্মিবে তাহাতে পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যাইবে।

সাধনা
বৈশাখ ১৩০২

চাবুক-পরিপাক

ইংরাজ গবর্নমেন্ট তাঁহার ইংরাজ কর্মচারীদিগকে প্রশ্রয় দিয়া কীরূপে নষ্ট করিতেছেন, কোনো দেশীয় পত্রে তাহারই উদাহরণস্বরূপে নিম্নলিখিত ঘটনাটি প্রকাশিত হইয়াছে।

ল্যাকস্ সাহেব সিন্ধুদেশের একটি সব্‌ডিবিশনের হর্তাকর্তা। তাঁহার ভৃত্য সেই অভিমানে রেলওয়ে পুলিসের নিষেধ অমান্য করিয়া রেলওয়ের বেড়া লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছিল। পুলিস ইন্সপেক্টর তৎসম্বন্ধে তদন্ত করিয়া সাহেবের সেবককে জ্বলন্ত অঙ্গারবৎ পরিত্যাগ করে। সাহেব সেই সংবাদ পাইয়া ইন্সপেক্টরকে চাবুক মারে, ঘোড়ার পশ্চাতে দৌড় করায়, রাত্রি পর্যন্ত নিজের বাড়িতে ধরিয়া রাখে।— আমাদের দেশীয় পত্রিকা এই উপলক্ষে ইংরাজ গবর্নমেন্টের প্রতি অভিমান প্রকাশ করিতেছেন— বলিতেছেন, তোমাদের চাকরদের তোমরা খারাপ করিয়া দিতেছ তাহারা আমাদিগকে বড়ো মারে, আমাদের বড়ো লাগে!

এরূপ সংবাদ এবং তৎসম্বন্ধে এরূপ ভাষ্য পাঠ করিলে আমাদের স্বজাতির প্রতি নিরতিশয় ধিক্কার উপস্থিত হয়। এবং নতশির লুকাইবার স্থান খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যে ব্যক্তি চাবুক খাইয়া স্থির থাকে, সেই কাপুরুষ যে চাবুক খাইবার যোগ্য এ কথা আমাদের কোনো সম্পাদক কেন আমাদের দেশের লোককে জানিতে দেন না— কেন হঠাৎ পিসিমা সাজিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া আহা উহু করিতে থাকেন? যাহার সম্মান-বোধ নাই তাহার অপমানের সম্ভাবনা কোথায়? এরূপ ব্যক্তিকে বলবানের অবজ্ঞা হইতে রক্ষা করা কি কোনো মর্ত্য গবর্নমেন্টের সাধ্যায়ত্ত? গবর্নমেন্ট কি কখনো প্রাকৃতিক নিয়মের পরিবর্তন সাধন করিতে পারেন?

মনে করা যাক, পারেন; মনে করা যাক গবর্নমেন্ট এমন এক আশ্চর্য আইন করিলেন, যদ্দ্বারা হেয় ব্যক্তিও লাঞ্ছনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল। তাহাতে আমাদের উপকারটা কী হইল? চাবুক হজম করিবার জন্য যে এক অসাধারণ পরিপাক শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি সেটার কি কিছু লাঘব হইল? গবর্মেন্টের সতর্কতা যখনই শিথিল হইবে তখনই তো উন্নত প্রভুলোক হইতে আমাদের নতপৃষ্ঠে আবার চাবুক-বৃষ্টি হইতে থাকিবে। অপমান চাবুক-পাতে

নহে, চাবুক খাইবার যোগ্যতায়; চাবুকধারী অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে চাবুক মারিতে নিরস্ত থাকিয়া সে অপমান দূর করিতে পারে না— সে অপমান দূর করা একমাত্র আমাদের নিজের হাতে। কিন্তু আদুরে ছেলের মতো আমরা নিজেদের কেবল আদর দিতেই জানি এবং পরের নিকট কেবল আবদার কাড়িতেই শিখিয়াছি!

আমাদের দেশীয় পত্রিকা নাকী সুরে নালিশ করিতেছেন যে, ইংরাজ গবর্মেন্ট তাঁহার ভৃত্যদিগকে আদর দিয়া তাহাদিগকে চাবুক মারিতে শিখাইতেছেন— সম্পাদক মহাশয় এ কথা কেন ভুলিয়া যান যে, গবর্মেন্টের প্রতি অভিমান করিয়া এবং দেশের লোককে আদর দিয়া তিনি দেশের লোককে চাবুক খাইতে শিখাইতেছেন? যখন ঘরের ছেলে পরের পদাঘাত অনায়াসে শিরোধার্য করিয়া আদর পাইবার জন্য বাড়িতে কাঁদিতে আসে তখন অতিবৃদ্ধা পিতামহীর ন্যায় সেই পরকে গৃহ-কোণ হইতে বাপান্ত করিতে বসার চেয়ে ছেলেটাকে বেত্রাঘাত করিয়া বাড়ি হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া উচিত।

চাবুক খাইবার জন্য আমাদিগকে সহস্রবার ধিক্— এবং চাবুক খাইয়া সাশ্রু নেত্রে ও সজল নাসিকায় গবর্মেন্টের প্রতি রাগ করিতে বসার জন্য আমাদিগকে ততোধিক ধিক্।

জাতীয় আদর্শ

আমরা স্বজাতির নিকট হইতে যদি কিছুমাত্র মনুষ্যত্ব আশা না করি তবে তদপেক্ষা আত্মাবমাননা আর কিছুই হইতে পারে না। আমরা সকরুণ সস্নেহ স্বরে বলিতে থাকি, আহা, আমরা বড়ো দুর্বল— আমাদিগকে যদি কেহ আঘাত করে আমরা তাহার প্রতিঘাত করিতে পারিব না— আমাদিগকে যদি কেহ অপমান করে তবে আমরা তাহার প্রতিকার করিতে অক্ষম— অতএব যাহারা আমাদিগকে আঘাত ও অপমান করে তাহারা অতি পাষণ্ড— শুনিয়া আমরা এত সান্ত্বনা লাভ করি, নিজেদের প্রতি এত অধিক স্নেহরসার্দ্র হইয়া উঠি যে, আপন অক্ষমতায় লজ্জা অনুভব করিবার অবসর পাওয়া যায় না। আমরা স্বজাতির নিকট হইতে তিলমাত্র সামর্থ্য প্রত্যাশা করি না বলিয়া আমাদের সামর্থ্য প্রকাশের চেষ্টামাত্র চলিয়া যায়, আমাদের জাতীয় সম্মানবোধের অঙ্কুরমাত্র উঠিতে পারে না। আমাদের জাতীয় আদর্শ সর্বদা উচ্চ রাখিতে হইবে— সেই আদর্শ হইতে লেশমাত্র স্খলন হইলে সুতীব্র ভর্ৎসনা দ্বারা আত্মগ্লানি উৎপাদন করিয়া দিতে হইবে, যে ব্যক্তি কাপুরুষতা প্রকাশ করিয়া স্বজাতির লাঞ্ছনার কারণ হইবে তাহার প্রতি অজস্র স্নেহ বর্ষণ না করিয়া তাহাকে আমাদের সমবেদনা লাভের অযোগ্য বলিয়া একবাক্যে তিরস্কৃত করিতে হইবে— তবেই আমাদের এই অগাধ অধঃপাত হইতে মাথা তুলিয়া উঠিবার সম্ভাবনা থাকে। হইতে পারে, ম্যাজিস্ট্রেট বেল্ কেশবলাল মিত্রকে মারিয়া ভালো কাজ করেন নাই, কিন্তু যে কেশবলাল মার খাইয়া ভূমে লুটাইয়াছিল তাহার মতো অবজ্ঞার পাত্র পৃথিবীতে দুর্লভ। রাউঁচি কোনো জমিদার বিশেষকে অবমানিত করিয়া হঠকারিতা প্রকাশ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু যে জমিদার উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহার প্রতিকারের চেষ্টামাত্র না করিয়া সমস্ত উপদ্রব নতশিরে বহন করিয়াছিল সে যৎপরোনাস্তি হেয়। এই-সকল কাপুরুষেরা অপমান সহ্য করিয়া স্বজাতিকে হীন আদর্শ দেখায় এবং পরজাতিকে স্পর্ধিত করিয়া তুলে।

অপূর্ব দেশহিতৈষিতা

অথচ আশ্চর্য এই যে, আমাদের সম্পাদক মহাশয়গণ জাতীয় আদর্শকে উচ্চে তুলিবার কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া পরজাতিকে সর্বদা মহত্ত্বের পথে অটল রাখিতে প্রাণপণ প্রয়াস পাইয়া থাকেন। সে সম্বন্ধে তাঁহাদের সতর্কতার বিশ্রাম নাই। ইংরাজেরা রক্তমাংসের মানুষ নহেন, তাঁহারা

দেবতা— সেই দেবত্ব হইতে তাঁহাদের তিলমাত্র স্খলন না হয় এজন্য আমাদের সম্পাদক সম্প্রদায় দিবারাত্রি সজাগ হইয়া আছেন। তাঁহাদের মতে আমরাও দেবতা, কিন্তু আমরা ভূতপূর্ব দেবতা— আমাদের পিতামহগণ দেবতা ছিলেন, অতএব এক্ষণে আমরা বিশ্রাম করিতে পারি— আমাদের নিকট কাহারো কিছু প্রত্যাশা করিবার আবশ্যক নাই। গর্ব করিবার বেলায় অতীত কালকে লইয়া গর্ব করিব, এবং লাঞ্ছনা করিবার বেলায় পরকে লাঞ্ছনা করিব, এবং নিজেদের জড়ত্ব ও অক্ষমতাকে নির্লজ্জভাবে সর্বসমক্ষে বক্ষে তুলিয়া লইয়া তাহাকে স্নেহাশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া দিব— অহংকার করিব অথচ আত্মোন্নতির চেষ্টা করিব না, অভিমান করিতে থাকিব অথচ অপমানের প্রতিকার করিব না, এইরূপ অদ্ভুত আচরণকে আমরা দেশহিতৈষিতা নাম দিয়াছি।

কুকুরের প্রতি মুগুর

পাশবতা সকল দেশেই আছে— কেবল তাহা নানাপ্রকার শাসনে সংযত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষীয়ের সহিত ব্যবহারে অনেক ইংরাজের পশুত্ব যে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয় তাহার প্রধান কারণ, ভারতবর্ষের দিক হইতে তাহাদের পক্ষে কোনো প্রকার শাসন নাই। সেইজন্য তাহাদের আদিম প্রবৃত্তি, তাহাদের স্বাভাবিক রূঢ়তা নিয়া আত্মপ্রকাশ করে। য়ুরোপের বাহিরে আফ্রিকা আমেরিকা অস্ট্রেলিয়ায় ভ্রমণ অথবা উপনিবেশ স্থাপনকালে য়ুরোপীয়েরা আজ অনিয়ন্ত্রিত বর্বরতার সহস্র পরিচয় দিয়া থাকে। নাইট্ নামক এক ইংরাজ ভ্রমণকারী অল্পদিন হইল কাশ্মীর ও তাহার উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছিল— সেই ব্যক্তি "Where three empires meet" নামক এক ভ্রমণবৃত্তান্ত রচনা করিয়াছে, তাহাতে স্বজাতি সম্বন্ধে ইংরাজের অপরিমেয় অন্ধ অহংকার, এবং দেশীয়দের প্রতি তাহার অত্যুগ্র অশিষ্ট ঔদ্ধত্য পদে পদে প্রকাশ পাইতেছে। ইংরাজ ভ্রমণকারীদের অনেক গ্রন্থেই ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। যদি ইংরাজকে উচ্চতর মনুষ্যত্বের পথে রক্ষা করিতে হয়, যদি তাহার অন্তর্নিহিত পাশবতাকে প্রশ্রয় না দিয়া দমন করা আবশ্যক বোধ কর— তবে কাঁদিয়া, অভিমান করিয়া গভর্নমেন্টের দোহাই পাড়িয়া তাহা কদাচ হইবে না। বল ব্যতীত পশুত্বের প্রতিষেধক আর কিছুই নাই। আমরা যখন অপমান কিছুতেই সহ্য করিব না, অন্যায় প্রতিকারের জন্য যখন প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হইব না তখন ইংরাজ আপন পাশবতাকে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিবে এবং আমাদিগকে সম্মান করিতে শিখিবে।

সাধনা
জ্যৈষ্ঠ ১৩০২

ইংলন্ডে ও ভারতবর্ষে সমকালীন সিবিল সর্বিস পরীক্ষা

হাউস্ অফ্ কমন্স্ সভার অর্ডর-বুকে ভারতবর্ষে ও ইংলন্ডে একই সময়ে সিবিল সর্বিস্ পরীক্ষা প্রচলন সম্বন্ধে দাদাভাই নওরোজি -কর্তৃক নিম্নলিখিত মোশনের বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে। এক্ষণে সাধারণ ভারতবাসীর নিকট নিবেদন, তাঁহারা এ সম্বন্ধে প্রচুর স্বাক্ষরসমেত বহুল আবেদনপত্র শ্রীযুক্ত দাদাভাই নওরোজির যোগে পার্লামেন্টে প্রেরণ করিলে কার্যসিদ্ধির সম্ভাবনা আছে।

মোশনের বিজ্ঞাপন

মিস্টার নওরোজি— সিবিল সর্বিস্ (ইন্ডিয়া) (ইংলন্ডে এবং ভারতবর্ষে সমকালীন প্রকাশ্য পরীক্ষা)— যে, এই সভার মতে ব্রিটিশ প্রতাপের স্থায়িত্ব এবং ভারতবাসীর রাজভক্তি,

রাজবিশ্বাস এবং কৃতজ্ঞতা রক্ষা করিতে হইলে, তাহাদের আর্থিক ও নৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে হইলে, সমস্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাণিজ্য ও শিল্পের বহুল পরিমাণে বিস্তার করিতে হইলে ১৮৩৩ খৃস্টাব্দের অ্যাক্টের প্রতিজ্ঞা সকল, সিপাই বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ খৃস্টাব্দের ঘোষণাপত্র, দিল্লির দরবারে সম্রাজ্ঞী উপাধিধারণকালীন ১৮৭৭ খৃস্টাব্দের ঘোষণাপত্র, এবং মহামহিমান্বিতা রাজ্ঞী ও ভারতসম্রাজ্ঞীর পঞ্চাশৎবার্ষিক রাজ্যাভিষেক উৎসব-ঘোষণাপত্রগুলির পুনঃপ্রতিশ্রুতি অনুসারে, রাষ্ট্রনীতির অন্যান্য সংস্কার সাধনের মধ্যে, ৩রা জুন ১৮৯৩ খৃস্টাব্দে বর্তমান সভা -কর্তৃক নিম্নলিখিত রেজোল্যুশন গ্রাহ্য হইয়াছিল তাহাকে কার্যে পরিণত করা আবশ্যক :—

যে, এ পর্যন্ত ভারতবর্ষীয় সিবিল সর্বিস পদপ্রাপ্তির জন্য একমাত্র ইংলণ্ডে যে প্রকাশ্য পরীক্ষাসকল নির্ধারিত ছিল এক্ষণ হইতে তাহা ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ড উভয়ত্রই সম্পাদিত হইতে থাকিবে— এই-সকল পরীক্ষা উভয় দেশেই সমান প্রকৃতির হইবে এবং যাঁহারা পরীক্ষা দিবেন তাঁহারা সকলেই যোগ্যতা অনুসারে এক তালিকায় শ্রেণীভুক্ত হইতে থাকিবেন।

মতের আশ্চর্য ঐক্য

পাঠকদের স্মরণ আছে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন সভায় 'সাধনা'-সম্পাদক ''বাংলা জাতীয় সাহিত্য'' নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। গত জ্যৈষ্ঠ মাসের 'সাহিত্য' পত্রে আমাদের বান্ধব শ্রীমান যোগিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় তাহার প্রতিবাদ করিয়া আমাদিগকে সম্মানিত করিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত সরলভাবে 'অনুমান' করিয়া লইয়াছেন যে, যাহাতে 'গ্রন্থকারদের ভিক্ষার থলিতে কিঞ্চিৎ অর্থ সমাগমেরও সম্ভাবনা হয়' আমাদের পঠিত প্রবন্ধের এমন গোপন উদ্দেশ্যও থাকিতে পারে। আমাদের 'মাতৃভাষাবৎসলতার ঠাট' যে 'অলীক' তাহাও তাঁহার সুতীক্ষ্ণ এবং উদার অনুমানশক্তির নিকট ধরা পড়িয়াছে। এ সম্বন্ধে শ্রীমান যোগিনীমোহনের প্রতি আমাদের একটিমাত্র বক্তব্য আছে— নানা স্বাভাবিক কারণে মাতৃভাষার প্রতি আমাদের অনুরাগ অন্ধ এবং পক্ষপাতবিশিষ্ট হইতে পারে কিন্তু তাহা 'অলীক' এ কথা প্রকাশ করিয়া তিনি যে কেবল আমাদের প্রতি অন্যায় অসম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা নহে; সত্যের প্রতি যে-সকল ভদ্রজনের স্বাভাবিক ভক্তি আছে তাঁহারা অন্যকে অকারণে এরূপ অপবাদ দিতে অত্যন্ত কুণ্ঠিত বোধ করে।

মতের ঐক্য আমরা সকলেরই কাছে প্রত্যাশা করিতে পারি না, অতএব শ্রীমান যোগিনীমোহন আমাদের বিরুদ্ধবাদী হইলে আমরা কিছুমাত্র বিস্মিত হইতাম না। কিন্তু প্রকৃত আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিনি কোথাও আমাদের কিছুমাত্র প্রতিবাদ করেন নাই। বাংলা ভাষা বাঙালি জাতির ভাষা; তাহা যে ভারতবর্ষের নানা বিভিন্ন জাতির ভাষা হইবে এ কথা আমরা বলি নাই। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের অপেক্ষা কোনো অংশে শ্রেষ্ঠ অথবা বঙ্গদেশে ইংরাজি শিক্ষা উঠিয়া গিয়া বাংলা শিক্ষা প্রচলিত হউক এমন কথারও আমরা কুত্রাপি আভাস দিই নাই, অতএব আমাদের প্রবন্ধের প্রতিবাদচ্ছলে যোগিনীমোহন ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সহিত আমাদের বিশেষ মতবিরোধ নাই এবং উক্ত চিন্তাশীল সারগর্ভ রচনা 'সাহিত্য' পত্রে প্রকাশিত হইবার পূর্বেও ছিল না।

ইংরাজি ভাষা শিক্ষা

এই প্রসঙ্গে ইংরাজি ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের একটি বক্তব্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি। ভাষা শিক্ষা ও বিষয় শিক্ষা উভয়ই ছাত্রদের পক্ষে অত্যাবশ্যক— কিন্তু বিদেশী ভাষা যথাকথঞ্চিৎ

আয়ত্ত হইতে-না-হইতেই সেই ভাষাতেই যদি বিষয় শিক্ষা দিবার উপক্রম করা যায় তবে তাহাতে ভাষা শিক্ষা এবং বিষয়শিক্ষা উভয়েরই ব্যাঘাত হয়। না বুঝিয়া অনবরত মুখস্থ করিতে যে সময় ও শক্তির অপব্যয় হয় তাহাই রীতিমতো ভাষাশিক্ষায় প্রয়োগ করিলে উক্ত শিক্ষা অনেক পরিমাণে সম্পূর্ণতা লাভ করে। যাহারা এককালে দুই হাতে দুই লাঠি লইয়া খেলে, তাহারা শিক্ষাকালে প্রথমে স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক হাতের অভ্যাস করিয়া পরে দুই হাত মিলাইয়া লয়। সেইরূপ, আমাদের মতে, অন্তত এন্ট্রেন্স পর্যন্ত ভাষা এবং বিষয়কে স্বতন্ত্ররূপে আয়ত্ত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উভয়কে একত্র মিলাইয়া লওয়া কর্তব্য। শিক্ষা এবং পরীক্ষা দুই ভাষায় হইলে যাহা ইংরাজিতে শিক্ষা করি তাহা বাংলায় এবং যাহা বাংলায় শিখি তাহা ইংরাজিতে পরখ করিয়া লওয়া যায়— নতুবা মুখস্থ বিদ্যার অন্তরালে যে সুগভীর শূন্যতা থাকিয়া যায় তাহার আবিষ্কার এবং সংশোধন করিবার কোনো উপায় দেখা যায় না।

জাতীয় সাহিত্য

আমরা "বাংলা জাতীয় সাহিত্য" প্রবন্ধের নামকরণে ইংরাজি "ন্যাশনাল" শব্দের স্থলে "জাতীয়" শব্দ ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া 'সাহিত্য'-সম্পাদক মহাশয় আমাদের প্রতি কিঞ্চিৎ শ্লেষ কটাক্ষপাত করিয়াছেন।

প্রথমত, অনুবাদটি আমাদের কৃত নহে; এই শব্দ বহুকাল হইতে বাংলা সাহিত্যে ন্যাশনাল্ শব্দের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। দ্বিতীয়ত, ভাষার পরিণতি সহকারে স্বাভাবিক নিয়মে অনেকগুলি শব্দের অর্থ বিস্তৃতি লাভ করে। 'সাহিত্য' শব্দটি তাহার উদাহরণস্থল। সাহিত্য-সম্পাদক মহাশয়ও সাহিত্য শব্দটিকে ইংরাজি 'লিটারেচর' অর্থে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। সম্পাদক মহাশয় সংস্কৃতজ্ঞ, ইহা তাঁহার অবিদিত নাই যে, লিটারেচর শব্দের অর্থ যতদূর ব্যাপক, সাহিত্য শব্দের অর্থ ততদূর পৌঁছে না। শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে 'সাহিত্য' শব্দের অর্থ এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে : 'মনুষ্যকৃত শ্লোকময় গ্রন্থবিশেষঃ। স তু ভট্টি রঘু কুমারসম্ভব মাঘ ভারবি মেঘদূত বিদগ্ধমুখমণ্ডন শান্তিশতক প্রভৃতয়ঃ।' এমন-কি, রামায়ণ-মহাভারতও সাহিত্যের মধ্যে গণ্য হয় নাই, তাহা ইতিহাসরূপে খ্যাত ছিল। এইজন্য মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় 'সাহিত্য' শব্দের পরিবর্তে 'বাঙ্ময়' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রঘুবংশের তৃতীয় সর্গে ২৭শ শ্লোকে আছে :

লিপেযথাবদ্ গ্রহণেন বাঙ্ময়ং
নদীমুখেনেব সমুদ্রমাবিশৎ।

অর্থাৎ রঘু লিপিবদ্ধ নদীপথ দিয়া বাঙ্ময়রূপ সমুদ্রে প্রবেশ করিলেন।

'জাতি' শব্দ এবং 'নেশন্' শব্দ উভয়েরই মূল ধাতুগত অর্থ এক। জন্মগত ঐক্য নির্দেশ করিবার জন্য উভয় শব্দের উৎপত্তি। আমরা ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণকে জন্মগত ঐক্যবশত জাতি বলি আবার বাঙালি প্রভৃতি প্রজাবর্গকেও সেই কারণেই জাতি বলিয়া থাকি। জাতি শব্দের শেষোক্ত প্রয়োগের স্থলে ইংরাজিতে 'নেশন্' শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা, বাঙালি জাতি,—বেঙ্গলি নেশন্। এরূপ স্থলে 'ন্যাশনাল্' শব্দের প্রতিশব্দরূপে 'জাতীয়' শব্দ ব্যবহার করাতে বিশেষ দোষের কারণ দেখা যায় না। আমরাও তাহাই করিয়াছি। কিন্তু সম্পাদক মহাশয় অকস্মাৎ অকারণে অনুমান করিয়া লইয়াছেন যে আমরা 'জাতীয় সাহিত্য' শব্দে 'ভর্ন্যাক্যুলর লিট্‌রেচর' শব্দের অপূর্ব তর্জমা করিয়াছি! বিনীতভাবে জানাইতেছি আমরা এমন কাজ করি নাই। সাহিত্য যে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত আমোদ বা শিক্ষাসাধক নহে, তাহা যে সমস্ত জাতির 'জাতীয়' বন্ধন দৃঢ়তর করে, বাংলা সাহিত্য, যে বাঙালি জাতির ভূত ভবিষ্যৎকে এক সজীব সচেতন নাড়ি-বন্ধনে বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে বৃহত্তর এবং ঘনিষ্ঠতর করিয়া তুলিবে— আমাদের প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গের বিশেষরূপ অবতারণা ছিল বলিয়া, আমরা বাংলা সাহিত্যকে, ব্যক্তিগত রসসম্ভোগের হিসাবে

নহে, সমস্ত জাতীয় উপযোগিতার হিসাবে আলোচনা করিয়াছিলাম বলিয়াই তাহাকে বিশেষ করিয়া জাতীয় সাহিত্য আখ্যা দিয়াছিলাম। সভাস্থলে বক্তৃতা পাঠ করিতে হইলে শ্রোতৃসাধারণের দ্রুত অবগতির জন্য বিষয়টিকে কিঞ্চিৎ বিস্তারিত করিয়া বলা আবশ্যক হইয়া পড়ে— আমরাও বক্তৃতার বিষয় যথোচিত বিস্তৃত করিয়া বলিয়া কেবল সম্পাদক মহাশয়ের নিন্দাভাজন হইলাম কিন্তু তথাপিও তিনি আমাদের বক্তব্য বিষয়টিকে সম্যক্ গ্রহণ করিতে পারিলেন না ইহাতে আমাদের দ্বিগুণ দুঃখ রহিয়া গেল।

সাধনা
আষাঢ় ১৩০২

ভ্রম স্বীকার

গত জ্যৈষ্ঠমাসের 'সাহিত্য' পত্রে "বাংলা জাতীয় সাহিত্য" নামক প্রবন্ধ সমালোচনায় উক্ত প্রবন্ধের নামকরণ লইয়া একটি বিরূপবক্র নোট ছিল। ভ্রমক্রমে উক্ত নোট 'সাহিত্য'-সম্পাদক মহাশয়ের লিখিত মনে করিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম এবং সবিস্তারে তাহার উত্তর দিয়াছিলাম। কিন্তু পুনর্বার পাঠ করিয়া জানিলাম যে সেই নোটটুকুও প্রবন্ধলেখক শ্রীমান যোগিনীমোহনের স্বরচিত। এই অনবধান ও ভ্রমের জন্য আমরা সাহিত্য-সম্পাদক মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আষাঢ় মাসের সাহিত্যেও শ্রীমান লেখক পুনশ্চ তর্ক তুলিয়াছেন; তাহা পড়িয়া এইটুকু স্পষ্ট বুঝা গেল যে, এই আলোচনায় তাঁহার চিত্ত অত্যন্ত অশান্ত হইয়াছে। কিন্তু আর কিছুই স্পষ্ট বুঝিবার জো নাই।

চিত্রল অধিকার

চিত্রলের লড়াই তো শেষ হইল। এক্ষণে তাহার দখল রাখা লইয়া কাগজের লড়াই আরম্ভ হইয়াছে। উভয় পক্ষেই বিস্তর ইংরাজ সেনানায়ক এবং ভূতপূর্ব ভারতশাসনকর্তা সমবেত হইয়াছেন। চিত্রলের দখল ত্যাগ করার পক্ষে অনেক বড়ো বড়ো যোদ্ধা লড়িতেছেন, কিন্তু কোন্ পক্ষে আমাদের ভারতরথের সারথি জনার্দন আছেন এখনও তাহার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। ভারতরক্ষার পক্ষে চিত্রল অধিকারের উপযোগিতা যে নাই এবং যদি থাকে তবে অপব্যয়ের তুলনায় তাহা অতি যৎসামান্য এ কথা অনেক প্রামাণ্য সাক্ষীর মুখে শুনিয়াছি। তাঁহারা ইহাও বলেন, ইংরাজ-অধিকারে রাস্তাঘাট নির্মাণ হইয়া চিত্রলের স্বাভাবিক দুর্গমতা দূর হইয়া যাইবে সেটা শত্রুর পক্ষে অসুবিধাজনক নহে।

কিন্তু ইঁহারা একটা কথা কেহই বলিতেছেন না। বন্ধুত্ব করিবার ক্ষমতা ইংরাজের নাই। অনর্থক অনাবশ্যক স্থানে অনধিকার প্রবেশ করিয়া অযথা ঔদ্ধত্যের দ্বারা শান্তির জায়গায় অশান্তি আনয়ন করিবার অসাধারণ প্রতিভা ইংরাজ জাতির আছে। চিত্রলের পথ সুগম হইল, এখন মাঝে মাঝে এক-এক ইংরাজ শিকারী কাঁধে এক বন্দুক তুলিয়া পার্বত্য ছাগ শিকারে বাহির হইবেন এবং অপরিমেয় দম্ভের দ্বারা দেশবাসীদিগকে ত্যক্তবিরক্ত করিয়া তুলিবেন। অতএব, চিত্রলের পথঘাট বাঁধিয়া দিয়া শত্রু-আগমনের পথ সুগম করা হইতেছে বলিয়া ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞ ও যুদ্ধনীতিজ্ঞেরা যে আশঙ্কা করিতেছেন তাহা সমীচীন হইতে পারে কিন্তু পথ সুগম হইলে ইংরাজের সমাগম বাড়িবে, ইংরাজরাজ্যের এবং পার্বত্য জাতির শান্তির পক্ষে সেও একটা কম আশঙ্কার বিষয় নহে।

ইংরাজের লোকপ্রিয়তা

কিন্তু পৃথিবীসুদ্ধ লোকের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ইংরাজ এক দৃঢ় বিশ্বাস মনে পোষণ করিয়া থাকেন, যে, তাঁহারা বড়ো লোকপ্রিয়। যেখানে পদার্পণ করেন সেখানকার লোকেই তাঁহাদিগকে মা-বাপ বলিয়া জানে। তাঁহারা অনেক দিন হইতে বলিয়া আসিতেছেন যে, ইজিপ্টের প্রজাবর্গ তাঁহাদিগকে পরম সুহৃদ বলিয়া জ্ঞান করে, কিন্তু অদৃষ্টের এমনি পরিহাসপ্রিয়তা, যে, সেই দেশের লোকের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা আইনবন্ধনহীন সরাসরি বিচারের ভার নিজের হস্তে লইতে উদ্যত। সেখানকার লোকে তাঁহাদের প্রতি যে-সকল গুরুতর উপদ্রব আরম্ভ করিতেছে তাঁহাদের বিশ্বাস সেখানকার বিচারক তাহার উপযুক্ত শাসন করে না— তাঁহাদের প্রতি সাধারণের এতই প্রবল ভালোবাসা।

কর্তৃপক্ষেরা হয়তো ক্ষাপা হইবেন (কারণ, এখানে তাঁহারা কর্তৃপক্ষ) কিন্তু আমরা যদি ইজিপ্টে তাঁহাদের নিজের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বলি যে, ইংরাজ-কর্তৃক দেশীয় উৎপীড়নের বিচারভার সম্পূর্ণরূপে দেশীয় লোকের হস্তে না দিলে ইংরাজ জুরির নিকট দেশীয় হতভাগ্যের সুবিচার প্রাপ্তির আশা অত্যল্প তবে সেটা কি অসংগত শুনিতে হয়?

কিন্তু ইংরাজের মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইজিপ্টে তিনি লোকপ্রিয় পরমসুহৃদ্, এবং ভারতবর্ষে তিনি সম্পূর্ণ অপক্ষপাত সুবিচারক।

ইংরাজের স্বদোষ-বাৎসল্য

নিজেদের জাতিগত দোষগুলির প্রতি ইংরাজদের এমন একটি স্নেহদৃষ্টি আছে যে, এক-এক সময় তাহা দেখিলে আঘাতও লাগে এবং হাসিও পায়। ইংলন্ডের 'স্পেক্টেটর' পরম খৃস্টান কাগজ। কিন্তু সেই কাগজে '*With Wilson in Matabeleland*' নামক গ্রন্থের প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনার মধ্যে একস্থলে লিখিত হইয়াছে : "We have never seen the delight in killing, which is perhaps a normal trait in healthy human male animals, so frankly expressed as in these pages." অর্থাৎ বধস্পৃহা সুস্থপ্রকৃতি পুরুষজাতীয় মানবপ্রাণীর একটা স্বাভাবিক ধর্ম এ কথা সমালোচক মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্য, ইহাতে বধস্পৃহার প্রশংসা বুঝাইতেছে না, কিন্তু ওই সুস্থপ্রকৃতি বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া এই বধস্পৃহার প্রতি বিশেষ একটু স্নেহ প্রকাশ করা হইয়াছে। সম্পাদক স্বজাতিসুলভ দোষের প্রতি মমতানুভব করিবার কালে এ কথা ভুলিয়াছেন যে, তাঁহার স্বাস্থ্যের আদর্শ অনুসারে যিশুখৃস্টের মতো রোগজীর্ণ প্রকৃতির দৃষ্টান্ত জগতে দুর্লভ। এই স্বজাতিসুলভ দোষগুলির প্রতি ইংরাজের বিশেষ স্নেহ-দৃষ্টি আছে বলিয়াই ভারতবর্ষে এতগুলি ইংরাজ উপর্যুপরি এতদ্দেশীয়কে হত্যা করিতেছে এবং উপর্যুপরি নিষ্কৃতিও পাইতেছে। এতগুলি ইংরাজকে যদি দেশীয়রা হত্যা করিত তবে তাঁহারা যে পরিমাণে রাগ করিতেন ও প্রতিহিংসা ও প্রতিকারের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিতেন দেশীয় হত্যায় তাঁহাদের সে পরিমাণ ক্রোধের সঞ্চার হয় না। তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারেন একজন 'টমি অ্যাট্‌কিন্স' সামান্য রাগ হইলেই কেন একজন দেশীয় কালো লোককে হত্যা করিয়া ফেলে। তাঁহারা সেটাকে অপরাধ বলিয়া স্বীকার করেন কিন্তু মনের এক কোণে এই কথা উদয় হয় যে ওটা সুস্থপ্রকৃতি টমি অ্যাট্‌কিন্সের স্বাভাবিক ধর্ম।

ইংরাজের লোকলজ্জা

দেখিলাম, 'টাইম্‌স্‌' পত্রে একজন ইংরাজ লেখক আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে, চিত্রল অধিকার করিয়া যদি ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে ইংরাজের এই অনিশ্চিত আগুপিছু পলিসি লইয়া ভারতবর্ষের দেশীয় রাজসভায় এবং প্রজাবর্গের মধ্যে বিরুদ্ধ সমালোচনা উত্থাপিত হইবে। আমরা দেখিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলাম যে, ভারতবাসীদের নিকটেও সময়ে সময়ে ইংরাজ লোকলজ্জা অনুভব করিয়া থাকেন। কিন্তু এ স্থলে লজ্জার কোনো কারণ দেখি না। একটা দেশ জয় করিয়া অপরাধীদিগকে শাসন করিয়া তাহা ত্যাগ করিয়া আসিলে ইংরাজের সেই নির্লোভ উদারতা ভারতবর্ষের নিকট প্রশংসার বিষয় বলিয়াই গণ্য হইবে।

কিন্তু যথার্থ যদি ইংরাজের তিলমাত্র লোকলজ্জা থাকে তবে গরিব ভারতবাসীর নিকট হইতে টাকা লইয়া মহারানীর নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের আতিথ্য করিতে ক্ষান্ত থাকা তাঁহাদের কর্তব্য। ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গের নিকট মহারানীর নামে এই হীনতা-কলঙ্ক প্রচার না করিলেই ভালো হয়। গরীবের অর্থে রাজার আতিথ্য রাজোচিত দেখিতে হয় না। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইলেও উলুখড়ের প্রাণ যায় আবার রাজায় রাজায় বন্ধুত্বের বেলাও উলুখড় বেচারার পরিত্রাণ নাই।

তাহা ছাড়া, স্পষ্টরূপে স্বীকার করিয়া, কাবুলের মন পাইবার জন্য নসেরুল্লাকে লইয়া এমন অতিমাত্রায় ব্যগ্রতা প্রকাশ করাতে দেশীয় রাজা ও প্রজার নিকটে মহারানীর সম্মান যে কতখানি খর্ব হইতেছে তাহা ইংরাজ অন্ধভাবে বিস্মৃত হইতেছেন। নসেরুল্লাকে যদি মহারানী নিজের অতিথিভাবেই অভ্যর্থনা করিতেন তবে তাহাতে লজ্জার বিষয় কিছুই ছিল না, কিন্তু এই আতিথ্যকে ভারত-রাজকীয় পলিসির অঙ্গ করিয়া লইয়া ভারত ভাণ্ডার হইতে অর্থ লইবার উপক্রম করাতে ইংরাজের মর্যাদা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইতেছে। যে ইংরাজের ঔদ্ধত্য ও অভিমান জগদ্‌বিখ্যাত, কাজ উদ্ধারের সময় সেই ইংরাজের মেরুদণ্ড কাবুলের পাঠানের নিকটে এমন অনায়াসে অবনত হইতেছে ইহা লইয়া কি হাসিবার লোক কেহই নাই? শুনা যাইতেছে অনেক মুকুটধারী য়ুরোপীয় রাজাও ইংলণ্ডে এরূপ আতিথ্য লাভ করেন নাই। পলিসিও যে খুব পাকা তাহা বলিতে পারি না। পদ্মাতীরে বালুভিত্তির উপর বহুব্যয়ে অট্টালিকা নির্মাণ করা সংগত নহে, সেখানে অল্প খরচে ক্ষণিক বন্দোবস্ত করাই শ্রেয়। কাবুলের সহিত বহুব্যয়সাধ্য সখ্য নির্মাণও সেইরূপ অবিবেচনার কাজ। কাবুলের সিংহাসন ইংরাজের বহুমূল্য সখ্যসমেত আজ বাদে কাল ধসিয়া যাওয়া কিছুই বিচিত্র নহে, অতএব কাবুলের মতো রাজ্যের সহিত স্বল্পব্যয়ে ক্ষণিক সখ্যের আয়োজন রাখাই সংগত। ভারতবর্ষের বহুকষ্টসঞ্চিত রাজভাণ্ডার তাহার পদমূলে উজাড় করিয়া দিলেও কাবুলের সিংহাসন এক বংশে স্থায়ী হইবে না।

প্রাচী ও প্রতীচী

নসেরুল্লার একটি আচরণে আমরা সন্তোষ লাভ করিয়াছি। পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রাচ্য প্রথার প্রতি সর্বদাই নাসা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন। এবারে নসেরুল্লা প্রাচ্য সভ্যতার তরফ হইতে পাশ্চাত্য বর্বর প্রথার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন। রাজপুত্র লেডি টুইড্‌মাউথের নৃত্যোৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া অভ্যাগত মহিলাদের উত্তরাঙ্গের বিবস্ত্রতা দর্শনে এতই লজ্জা বোধ করিয়াছিলেন যে, ঘরে প্রবেশ না করিয়া বহিঃকক্ষে বিচরণ করিতে লাগিলেন। নসেরুল্লা লেডি ল্যান্সডাউনের হস্ত ধরিয়া ভোজনাগারে লইয়া যাইবেন এইরূপ বন্দোবস্ত ছিল কিন্তু লেডির অনাবৃত হস্ত দেখিয়া তিনি ভদ্রোচিত সংকোচ প্রকাশপূর্বক করগ্রহণ না করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়া গেলেন।

ইহাতে মহিলাদের প্রতি রূঢ়তা প্রকাশ হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রাচ্য রাজপুত্রের মনে যে সভ্যতার আদর্শ বিরাজ করিতেছে তাহাকে উপেক্ষা করাও তাঁহার কর্তব্য হইত না।

সাধনা
শ্রাবণ ১৩০২

নূতন সংস্করণ

নব্য হিন্দুদের বিশেষ সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা উনবিংশ শতাব্দীর নূতন জ্ঞান উপার্জন করিয়া, পুরাতনের প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা হারান নাই বটে, কিন্তু রুচির পরিবর্তন হওয়াতে তাঁহারা উহাকে অধুনাতনের সঞ্চিত মলিন আবরণশুদ্ধ গ্রহণ করিতে বড়োই কুণ্ঠিত।

মনুষ্যজীবনকে আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে কবিত্বময় কল্পনার দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া উহাকে সংসারের দৈনিক বৈষয়িক ভাবনার কালুষ্য হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার সৌন্দর্য ও আবশ্যকতা বুঝিয়াও, সেগুলিকে তাঁহাদের আধুনিক অর্থশূন্য কবিত্বহীন অসুন্দর আকারে অবলম্বন করিতে তাঁহারা কিছুতেই প্রস্তুত নহেন।

সম্প্রতি বোম্বাই অঞ্চলের একদল নব্য হিন্দু এই সমস্যা মীমাংসার যেরূপ উপায় স্থির করিয়াছেন তাহা পাঠকদের বিবেচনার নিমিত্ত বিবৃত করা যাইতেছে। তাঁহারা পুরাতন গঠনের আদিম সৌন্দর্যকে তাহার হীন ও মলিন বেশ হইতে মুক্ত করিয়া তাহার মধ্যে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়া দিতে চাহেন। দুই-একটি দৃষ্টান্ত দিলে তাঁহাদের উদ্দেশ্য ও উপায় স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

রাম-নবমীর দিনে রামকে দেবতারূপে পূজা করায়, দেবাধিদেব পরমেশ্বরের মহিমা ও ভারতের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যের সাহিত্য-মর্যাদা যুগপৎ খর্ব হওয়াতে তাঁহারা বিশেষ ব্যথিত হইয়াছেন, কিন্তু রাম-নবমীর দিন উৎসবে যোগ না দিয়া প্রচলিত কুসংস্কারে গালি দিয়া তাঁহারা কোনো সান্ত্বনা অনুভব করেন না। সুতরাং তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, উক্ত শুভদিবস উপলক্ষে উৎসবক্ষেত্রে সকলে উপস্থিত হইয়া, ভোজনাদি আমোদপ্রমোদরূপ উৎসবের বাহ্য অঙ্গের পরে, কথকতা কীর্তন প্রভৃতির দ্বারা রামায়ণের কবিত্ব-রসাস্বাদন করিবেন এবং প্রবন্ধপাঠ ও আলোচনাদির দ্বারা উহার সাহিত্যনৈপুণ্য ও নীতি-মহত্ত্ব উপলব্ধি করিবেন।

শ্রাবণ মাসের দিনবিশেষে ব্রাহ্মণদের পুরাতন উপবীত পরিত্যাগ করিয়া নূতন উপবীত গ্রহণ করিবার রীতি আছে। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা প্রভাবে, এইরূপ সূত্রগুচ্ছ পরিবর্তন এবং তাহার সহিত মন্ত্র উচ্চারণ ও পুরোহিতকে কিঞ্চিৎ অর্থ দান করিলেও তাঁহারা কোনো প্রকার আমোদ বা তৃপ্তি অনুভব করেন না। সুতরাং তাঁহারা এই দিবসকে মহৎ সংকল্প স্থির করিবার ও ব্রত গ্রহণ করিবার কার্যে উৎসর্গ করিতে চাহেন; একত্র মিলিত হইয়া স্মরণ করিতে চাহেন যে গলায় উপবীতধারণ করিয়া নিজেকে সর্বোচ্চ জাতির মধ্যে গণ্য হইবার উপযুক্ত বিবেচনা করা কী দারুণ দাম্ভিকতার কাজ; এবং বৎসরের মধ্যে অন্তত এই একবার অনুভব করিতে চাহেন যে, যে পবিত্র উপবীত পূর্ব মহর্ষিরা করিয়াছেন তাহার উপযুক্ত হইতে গেলে, অতি বিনীতভাবে নিজ হীনতা স্বীকার করিয়া, ব্রাহ্মণ জন্মের সুমহৎ দায়িত্ব বুঝিয়া জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তে সত্যের ও মহত্ত্বের প্রতি কায়মনোবাক্যে অগ্রসর হইতে হইবে।

বোম্বাইয়ের নব্য হিন্দু সম্প্রদায় এইরূপে প্রত্যেক উৎসব ও পবিত্র দিবসকে উপযুক্ত অনুষ্ঠানের দ্বারা সজীব করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের ক্ষুদ্র দলের মধ্যে অনেকটা কৃতকার্যও হইয়াছেন। উল্লিখিত সমস্যার এইরূপ সুন্দর মীমাংসা আমাদের দেশে

প্রচলিত হইবার উপযুক্ত। আমাদেরও প্রত্যেক শুভকার্যের সহিত যে-সকল সুরুচিবিরুদ্ধ ও অপ্রীতিকর প্রথা জড়িত আছে তাহা পরিত্যাগ করিলে নব্য হিন্দুরা নব উৎসাহে সেগুলিতে যোগ দিতে পারেন।

জাতিভেদ

'স্টেট্‌সম্যান' পত্রে কিছু দিন ধরিয়া জাতিভেদ ও বিবাহে পণগ্রহণ প্রথা লইয়া আলোচনা চলিতেছে।

দেখা গিয়াছে, লেখকদিগের মধ্যে অনেকে এই বলিয়া আমাদের দেশের জাতিভেদ প্রথার সমর্থন করিয়াছেন যে, য়ুরোপ প্রভৃতি অন্য সকল সভ্য দেশেই নানা আকারে জাতিভেদ বিরাজ করিতেছে।

সভ্য মনুষ্য যেমন ইটকাঠের ঘরে থাকে, তেমনি তাহার সামাজিক ঘর আছে; সেই ঘরগুলির নাম সম্প্রদায়। সামাজিক মনুষ্য দেখিতে দেখিতে সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে, তাহা তাহার স্বাভাবিক ধর্ম। সভা, সমিতি, ধর্মসম্প্রদায়, রাজনৈতিক সম্প্রদায়, আচারগত সম্প্রদায়— বৃহৎ সমাজমাত্রেই এমন নানাবিধ বিভাগের সৃষ্টি হয়। যে মূল নিয়মের প্রবর্তনায় মানুষ সমাজবন্ধনে বদ্ধ হয়, সেই নিয়মেরই প্রভাব সমাজের অঙ্গে প্রত্যঙ্গে কার্য করিয়া তাহার মধ্যে স্বভাবতই বিচিত্র শ্রেণীভেদ জন্মাইতে থাকে। সমাজবন্ধনের ন্যায় সম্প্রদায়বন্ধনও মানুষের স্বাভাবিক গৃহ, তাহার আশ্রয়স্থল।

কিন্তু গৃহ নির্মাণ করিতে হইলে যেমন ছাদ প্রাচীর গাঁথিতে হয়, তেমনি দরজা জান্‌লা বসানোও অত্যাবশ্যক। গৃহ যেমন কতক অংশে বদ্ধ, তেমনি তাহা কতক অংশে মুক্ত। এই জানলা দরজা বন্ধ করিয়া দিলে গৃহ গোরস্থানে পরিণত হয়। উভয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ।

সম্প্রদায়-গৃহের মধ্যেও যাতায়াতের দ্বার থাকা চাই; ভিতর হইতে বাহিরে যাইবার ও বাহির হইতে ভিতরে আসিবার পথ থাকিলে তবেই তাহার স্বাস্থ্য রক্ষা হয় নতুবা তাহা মৃত্যুর আবাসভূমি হইয়া উঠে।

য়ুরোপে বিশেষ গুণ বা কীর্তিদ্বারা সাধারণ শ্রেণীর লোক অভিজাতমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। আমাদের দেশে জন্ম ব্যতীত জাতিবিশেষের মধ্যে অন্য কোনোরূপ প্রবেশোপায় নাই।

প্রতিবাদকারীগণ বলেন, পূর্বে এরূপ ছিল না, এবং দেশের স্বাধীন রাজা থাকিলে এরূপ থাকিত না। কিন্তু এ বৃথা তর্কে আমাদের লাভই বা কী, সান্ত্বনাই বা কোথায়?

বিবাহে পণগ্রহণ

পুরুষ যখন কোনো বিশেষ কন্যাকে বিবাহ করে অবশ্যই তাহার কোনো বিশেষ কারণ থাকে। হয়, তাহাকে ভালোবাসে, নয়, তাহার কুলশীল রূপগুণ অথবা অর্থের আকর্ষণে বদ্ধ হয়। আমাদের দেশে বিবাহযোগ্যা কন্যার বয়স অল্প, এবং তাহার সহিত বিবাহযোগ্য পুরুষের পরিচয় থাকে না সুতরাং বিবাহের পূর্বে ভালোবাসার কোনো সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। কন্যার কী কী গুণ আছে এবং কালক্রমে কী কী গুণ ফুটিয়া বাহির হইবার সম্ভাবনা, তাহা কেবল কন্যাকর্তারা এবং অন্তর্যামীই জানেন। রূপ জিনিসটা দুর্লভ এবং বাল্য-সৌন্দর্য যুবকের চিত্তে অনতিক্রমণীয় মোহসঞ্চার করে না। আজকালকার ছেলেদের কাছে কুলগৌরবের বিশেষ কোনো মর্যাদা নাই। তবে একজন বুদ্ধিমান জীব কী দেখিয়া আমৃত্যু কালের জন্য সংসারভার মাথায় তুলিয়া লইবে?

সে কি পঞ্জিকার বিশেষ একটা দিনস্থির করিয়া প্রাতঃকালে উঠিয়া যে-কোনো কন্যাকে সম্মুখে দেখিবে তাহাকেই বিবাহ করিবে? সে কি কন্যাদায়গ্রস্তের কন্যাভার মোচনের জন্যই সংসারে আগমন করিয়াছিল?

মনুর বিধানের ফলে আমাদের দেশে একটি বিবাহযোগ্য পুরুষকে যখন কন্যার পিতা দশজনে আসিয়া আক্রমণ করে, তখন তাহাকে কোনো একটা বিশেষ সদ্‌বিবেচনার নিয়ম অবলম্বন করিয়া কন্যা নির্বাচন করিতে হইবে— যদি তাহা না করে তবে সে গর্দভ, এবং দশটি কন্যাদায়িকেরই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া কর্তব্য। কলেজ হইতে বাহির হইবামাত্র অথবা বাহির হইবার পূর্বেই তাহাকে বিবাহের ফাঁদে ফেলিবার জন্য টানাটানি চলিতে থাকে। তখন তাহার সম্মুখে তরঙ্গসংকুল অকূল সংসার, এবং সেই সংকটসমুদ্রে পার হইবার উপায় অর্থ তরণী। তুমি নিজের স্কন্ধ হইতে একটি ভার লইয়া আর-একটি বুদ্ধিবৃত্তিবিশিষ্ট জীবের স্কন্ধে চাপাইয়া তাহাকে ওই অকূল সমুদ্রের মধ্যে ফেলিয়া দিতে চাও; সে সহজেই বলিতে পারে, আগে নৌকার সন্ধান দাও তাহার পরে তোমার বোঝাটি লইয়া আমি এই পারাবারে অবতীর্ণ হইতে পারি নতুবা ওটিকে কাঁধে করিয়া আমি সন্তরণ করিতে পারিব না— আজকালকার দিনে নিজের ভার সংবরণ করাই দুঃসাধ্য।

এই প্রস্তাবের জন্য ছেলেটিকে নিন্দা করা যায় না। অথচ যে সম্বন্ধ চিরজীবনের নিকটতম সম্বন্ধ আরম্ভকালেই সে সম্বন্ধকে ইতর দোকানদারির দ্বারা কলুষিত করিয়া তুলিতে আত্মসম্মানজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই ধিক্কার অনুভব করা স্বাভাবিক। কিন্তু পৃথিবীতে সকল সম্বন্ধের মূলেই হয় প্রীতি, নয় স্বার্থ। যেখানে প্রীতিসম্বন্ধের পথ নাই সেখানে স্বার্থ সম্বন্ধ ব্যতীত কী আশা করিতে পারি!

অতএব, দোষ দিতে হইলে সমাজবিধানকেই দোষ দিতে হয়, যে ব্যক্তি পণ লইয়া বিবাহ করে তাহাকে নহে। একটু সবুর করো, যুবকটিকে নিজের চেষ্টায় ও উপার্জনে স্বাধীন হইতে দাও, তাহার পরে সে যখন নিজের হৃদয়ের অনুসরণ করিয়া বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইবে তখন যদি টাকার জন্য হাত বাড়াইয়া বসে তবে তাহাকে নির্লজ্জ অভদ্র অর্থলোলুপ অযোগ্য বলিয়া তিরস্কার করিতে পারো। যতক্ষণ তাহার পক্ষে কোনো বিশেষ আকর্ষণ নাই এবং তোমার পক্ষে স্বার্থ, ততক্ষণ স্বার্থের বিনিময়েই স্বার্থ সাধন করিয়া লইতে হইবে ইহাই সংসারের নিয়ম। এ নিয়মকে কোনো আইন অথবা আবদারের দ্বারা পরাহত করা সম্ভব নহে।

ইংরাজের কাপুরুষতা

আসানসোল স্টেশনে একটি দেশীয় বালিকার প্রতি পাশব অত্যাচার করা অপরাধে কয়েকজন রেলওয়ে সংক্রান্ত ইংরাজ অথবা ফিরিঙ্গি কর্মচারী অভিযুক্ত হয়। হাজির আসামীগণ জুরির বিচারে খালাস পাইয়াছে। এ সংবাদ যে-কোনো ভারতবর্ষীয়ের কর্ণগোচর হইয়াছে সকলেরই অন্তর্দাহ উপস্থিত করিয়াছে।

আমাদের ধারণা ছিল, বলিষ্ঠ স্বভাববশত অবলাজাতির প্রতি ইংরাজ পুরুষের একটি বিশেষ স্নেহ আছে। কিন্তু উক্ত নিদারুণ পাশবাচারে ভারতবর্ষীয় ইংরাজের পক্ষ হইতে যখন তাহার কোনো পরিচয় পাওয়া গেল না, তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে, অপরিসীম বিজাতিবিদ্বেষে ও উচ্ছৃঙ্খল প্রভুত্বগর্বে বীরজাতিরও পৌরুষ নষ্ট করে।

আমাদের প্রভুরা বলিতে পারেন, আইনমতে যাহার বিচার হইয়াছে তাহার উপরে আর কথা কী! ধরিয়া লইলাম সুবিচার করা হইয়াছে, আইন এবং অভিযুক্ত ইংরাজ উভয়েই রক্ষা পাইয়াছে; কিন্তু দেশের ইংরাজ এবং সমস্ত ইংরাজি সংবাদপত্র এ সম্বন্ধে এমন নীরব উদাসীন কেন? এ

ঘটনায় তাঁহাদের মনে তিলমাত্র ঘৃণা রোষের উদ্রেক হয় নাই? বালিকা যদি ইংরাজ ও উপদ্রবকারী যদি দেশীয় হইত তাহা হইলে ভারত জুড়িয়া তাঁহারা যেরূপ তূরী ভেরি পটহ নিনাদ করিয়া ভীষণ রণবাদ্য বাজাইতেন ততটা নাই আশা করিলাম কিন্তু কাহারো মুখে যে একটি শব্দ মাত্র নাই।

দুর্গম চিত্রলের যুদ্ধ জয় লইয়া ইংরাজ দেশে বিদেশে বীরত্বের আস্ফালন করিতেছেন; কিন্তু নিঃসহায় রমণীর প্রতি নির্দয়তম অত্যাচারে অবিচলিত থাকিয়া ভারতবর্ষীয় ইংরাজ যে আন্তরিক কাপুরুষতা প্রদর্শন করিয়াছেন যুদ্ধজয়গৌরবের অপেক্ষা তাহা অনেকগুণে গুরুতর। চিত্রল জয় করিয়া তাঁহারা শত্রুকে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু নিরুপায় অধীন জাতির প্রতি এইরূপ মনুষ্যত্ববিহীন অবজ্ঞার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া তাঁহারা আপন রাজ্যতন্ত্রের ভিত্তিমূলে স্বহস্তে পরম শত্রুতার বীজ রোপণ করিয়া রাখিতেছেন।

সাধনা

ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২

পরিশিষ্ট

সারস্বত সমাজ ১

১২৮৯ সালে শ্রাবণ মাসের প্রথম রবিবারে ২ তারিখে দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি ৬ নম্বর ভবনে সারস্বত সমাজের প্রথম অধিবেশন হয়।

ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্র সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সারস্বত সমাজ স্থাপনের আবশ্যকতা বিষয়ে সভাপতি মহাশয় এক বক্তৃতা দেন। বঙ্গভাষার সাহায্য করিতে হইলে কী কী কার্যে সমাজের হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক হইবে, তাহা তিনি ব্যাখ্যা করেন। প্রথমত, বানানের উন্নতিসাধন। বাংলা বর্ণমালায় অনাবশ্যক অক্ষর আছে কি না এবং শব্দবিশেষ উচ্চারণের জন্য অক্ষরবিশেষ উপযোগী কি না, এই সমাজের সভ্যগণ তাহা আলোচনা করিয়া স্থির করিবেন। কাহারও কাহারও মতে আমাদের বর্ণমালায় স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ নাই, এ তর্কটিও আমাদের সমাজের সমালোচ্য। এতদ্‌ব্যতীত ঐতিহাসিক অথবা ভৌগোলিক নাম-সকল বাংলায় কীরূপে বানান করিতে [হইবে তাহা] স্থির করা আবশ্যক। আমাদের সাম্রাজ্ঞীর নামকে অনেকে "ভিক্‌টো [রিয়া" বানান] করিয়া থাকেন, অথচ ইংরাজি "V" অক্ষরের স্থলে অন্তঃস্থ "ব" সহজেই...হইতে পারে। ইংরাজি পারিভাষিক শব্দের অনুবাদ লইয়া বাংলায় বিস্তর ... ঘটিয়া থাকে— এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া সমাজের কর্তব্য। দৃ[ষ্টান্ত] স্বরূপে উল্লেখ করা যায়— ইংরাজি isthmus শব্দ কেহবা "ডমরু-মধ্য" কেহবা "যোজক" বলিয়া অনুবাদ করেন, উহাদের মধ্যে কোনোটাই হয়তো সার্থক হয় নাই।— অতএব এই-সকল শব্দ নির্বাচন বা উদ্‌ভাবন করা সমাজের প্রধান কার্য। উপসংহারে সভাপতি কহিলেন— এই-সকল, এবং এই শ্রেণীর অন্যান্য নানাবিধ সমালোচ্য বিষয় সমাজে উপস্থিত হইবে— যদি সভ্যগণ মনের সহিত অধ্যবসায় সহকারে সমাজের কার্যে নিযুক্ত থাকেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই সমাজের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

পরে সভাপতি মহাশয় সমাজের নিয়মাবলী পর্যালোচনা করিবার জন্য সভায় প্রস্তাব করেন।

স্থির হইল— বিদ্যার উন্নতিসাধন করাই এই সমাজের উদ্দেশ্য।

তৎপরে তিন-চারিটি নামের মধ্য হইতে অধিকাংশ উপস্থিত সভ্যের সম্মতিক্রমে সভার নাম স্থির হইল সারস্বত সমাজ।

সমাজের দ্বিতীয় নিয়ম নিম্নলিখিত মতে পরিবর্তিত হইল—

যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন এবং যাঁহারা বাংলাভাষার উন্নতিসাধনে বিশেষ অনুরাগী, তাঁহারাই এই সমাজের সভ্য হইতে পারিবেন।

সমাজের তৃতীয় নিয়ম কাটা হইল।

[সমাজের] চতুর্থ নিয়ম নিম্নলিখিত মতে রূপান্তরিত হইল—

সমাজের মাসিক অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যের মধ্যে অধিকাংশের ঐকমত্যে [নূ]তন সভ্য গৃহীত হইবেন। সভ্যগ্রহণ কার্যে গোপনে সভাপতিকে মত জ্ঞাত করা হইবেক।

সমাজের চতুর্বিংশ নিয়ম নিম্নলিখিত মতে রূপান্তরিত হইল—

সভ্যদিগকে বার্ষিক ৬ টাকা আগামী চাঁদা দিতে হইবেক। যে সভ্য এককালে ১০০ টাকা চাঁদা দিবেন তাঁহাকে ওই বার্ষিক চাঁদা দিতে হইবেক না।

অধিকাংশ উপস্থিত সভ্যের সম্মতিক্রমে বর্তমান বর্ষের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সমাজের কর্মচারীরূপে নির্বাচিত হইলেন।

সভাপতি। ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

সহযোগী সভাপতি। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ডাক্তর শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক। শ্রীকৃষ্ণবিহারী সেন। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

রচনাকাল : শ্রাবণ ১২৮৯
রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা ১, ১৯৬৫

সারস্বত সমাজ ২

১২৮৯ সালের ১৭ অগ্রহায়ণ শনিবার অপরাহ্ণ চার ঘটিকার সময় আলবার্ট হলে সারস্বত সমাজের অধিবেশন হয়।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রধান আসন গ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্ত বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাব করিলেন যে সারস্বত সমাজের মুদ্রিত নিয়মাবলী গ্রাহ্য হউক। শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু উক্ত প্রস্তাবের অনুমোদন করিলে পর সর্বসম্মতিক্রমে সারস্বত সমাজের মুদ্রিত নিয়মাবলী গ্রাহ্য হইল।

সভ্যসাধারণের দ্বারা আহূত হইয়া সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত মতে ভৌগোলিক পরিভাষা সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিলেন—

প্রত্যেক গ্রন্থকার তাঁহার ভূগোল-গ্রন্থে নিজের নিজের মনোমতো শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন— আবার মানচিত্রকারও তাঁহার মানচিত্রে স্বতন্ত্র শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুতরাং বালকেরা সর্বত্র এক শব্দ পায় না।

বক্তা দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করিলেন যে— এক Isthmus শব্দের স্থলে কেহ-বা যোজক, কেহ- বা ডমরু-মধ্যস্থান কেহ- বা সংকটস্থান ব্যবহার করিয়া থাকেন। শেষোক্ত শব্দটি বক্তাই প্রচার করিয়াছেন। সংস্কৃত অর্থ অনুসারে সংকট শব্দ স্থলেও ব্যবহার করা যায়, জলেও ব্যবহার করা যায়, গিরিতেও ব্যবহার করা যায়— সুতরাং উক্ত এক শব্দে Isthmus, channel, mountain-pass সমস্তই বুঝায়। অনেক গ্রন্থকার strait শব্দের স্থলে প্রণালী ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রণালী শব্দে মল-নির্গম পথ বুঝায়। প্রণালী অর্থাৎ খাল বা খানা শব্দ সমুদ্রে আরোপ করা অকর্তব্য।

Peninsula বাংলায় সকলে উপদ্বীপ বলিয়া থাকেন। কিন্তু উপদ্বীপগুলিতে দ্বীপের ছোটোই বুঝায়, অতএব এইরূপে প্রসিদ্ধ শব্দের অপভ্রংশ করা উচিত হয় না। বক্তা উক্ত স্থলে "প্রায়দ্বীপ" শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রায়দ্বীপ শব্দেই তাহার আকার বুঝায়।

এইরূপ অনেক পারিভাষিক শব্দ আছে, তাহার একটা নিয়ম করা উচিত।

ভূগোলে কতকগুলি কথা আছে যাহা রূঢ়িক— এবং আর-কতকগুলি কথা আছে, যাহা অর্থজ্ঞাপনের নিমিত্ত সৃষ্ট। যেগুলি রূঢ়িক শব্দ তাহার অনুবাদ করা উচিত নহে, আর অপরগুলি অনুবাদের যোগ্য। ইংরাজিতে যাহাকে Red Sea বলে, ফরাসি প্রভৃতি ভাষাতেও তাহাকে লোহিত সমুদ্র বলে। কিন্তু India শব্দ অন্য ভাষায় অনুবাদ করে না। আমাদের ভাষায় এ নিয়মের প্রতি আস্থা নাই— কখনো এটা হয় কখনো ওটা হয়।

বক্তা বলিলেন, ইংরাজেরা বিদেশীয় ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করে, কিন্তু সেইসঙ্গে শব্দের তদ্ধিত গ্রহণ করে না। ইন্ডিয়া শব্দ গ্রহণ করিয়া তাহার তদ্ধিত করিবার সময় তাহাকে ইন্ডিয়ান বলিয়া থাকে। বিভক্তিসুদ্ধ অনুকরণ করে না। কিন্তু বাংলায় এ নিয়মের ব্যভিচার দেখা যায়। অনেক বাংলা গ্রন্থকার কাস্পীয় সাগর না বলিয়া কাস্পিয়ান সাগর বলিয়া থাকেন।

এইরূপ শব্দ গ্রহণের একটা কোনো নিয়ম করা উচিত এবং কোন্‌গুলি অনুবাদ করিতে হইবে ও কোন্‌গুলি অনুবাদ না করিতে হইবে তাহাও স্থির করা আবশ্যক।

পরিভাষা— বিশেষ বিবেচনাপূর্বক ব্যবহার করা উচিত। Long সাহেবকে কেহই অনুবাদ

করিয়া দীর্ঘ সাহেব বলে না— কিন্তু একটা পর্বতের নামের বেলায় অনেকে হয়তো ইহার বিপরীত আচরণ করেন। আমরা যাহাকে ধবলগিরি বলি— তাহার ইংরাজি অনুবাদ করিতে হইলে তাহাকে White mountain বলিতে হয়— কিন্তু আমেরিকায় White mountain নামে এক পর্বত আছে। আবার ফরাসিতে ধবলগিরির অনুবাদ করিতে হইলে তাহাকে Mont Blanc বলিতে হয়, অথচ Mont Blanc নামে অন্য প্রসিদ্ধ পর্বত আছে। এইরূপ স্থলে একটি নিয়ম স্থির না হইলে দেশের নামের ব্যবহারে অত্যন্ত ব্যভিচার হইয়া থাকে।

গ্রন্থের স্থৈর্যরক্ষা করিতে হইলে সর্বত্র এক অর্থ রাখা আবশ্যক। অভিধান স্থির করিলে ইহা সহজ হইতে পারিত; কিন্তু তাহার উপায় নাই। কারণ অনেক শব্দ এখনও প্রস্তুত হয় নাই। অতএব এক-এক শাস্ত্র লইয়া তাহার শব্দগুলি আগে স্থির করা একান্ত আবশ্যক।

বক্তা বলিলেন, অল্পবয়স্ক শিশুদের হাতেই ভূগোল দেওয়া হয়— অতএব ভূগোলের পরিভাষা স্থির করাই সারস্বত সমাজের প্রথম কার্য হউক, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণেরও কিছু কিছু হইলে ভালো হয়।

উপসংহারে বক্তা বলিলেন— সারস্বত সমাজের তিন-চারিজন সভ্য মিলিয়া একটি সমিতি করিয়া প্রথমত ভৌগোলিক পরিভাষা সম্বন্ধে একটা মীমাংসা করুন, পরে সাধারণ সভায় তাহা স্থির হউক।

তৎপরে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সভায় পরে পরে উত্থাপিত ও গ্রাহ্য হইল—

প্রথম— ভূগোলের পরিভাষা স্থির করা আবশ্যক। দ্বিতীয়— তদ্‌বিষয়ে কী করা কর্তব্য তাহা অনুসন্ধানার্থ একটি সমিতি বসিবে ও নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সমিতির সভ্য হইবেন।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীবর বেদান্তবাগীশ, রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

তৃতীয়— তিনমাস পরে উক্ত সমিতির কার্য সাধারণ সভায় বিজ্ঞাপিত হইবে।

চতুর্থ— যে-সকল ভৌগোলিক শব্দ আলোচনা করিতে হইবে, শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাহার তালিকা প্রস্তুত করিয়া সমিতিকে সমর্পণ করিবেন।

সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

রচনাকাল : অগ্রহায়ণ ১২৯১
মন্মথনাথ ঘোষ, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ'

বিশেষ বিজ্ঞাপন

ত্রৈমাসিক সাধনা

আগামী অগ্রহায়ণ মাস হইতে সাধনা ত্রৈমাসিকপত্ররূপে প্রকাশিত হইতে থাকিবে। বর্তমান ত্রিসংখ্যক সাধনা হইতে গ্রাহকগণ ত্রৈমাসিক সাধনার আকার আয়তন কতকটা বুঝিতে পারিবেন। যাহাতে ত্রৈমাসিক পত্রিকাখানি বর্তমান সাধনা অপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করে তৎপক্ষে আমাদের চেষ্টার ত্রুটি থাকিবে না। গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্বক অগ্রিম মূল্য তিন টাকা পাঠাইয়া আমাদিগকে বাধিত করিবেন। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইবার একমাস মধ্যে যাঁহারা সাধনার মূল্য না দিবেন তাঁহাদিগকে নগদ ক্রেতাস্বরূপে গণ্য করা যাইবে। ত্রৈমাসিক সাধনার প্রতিখণ্ডের নগদ মূল্য এক টাকা।

৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি
যোড়াসাঁকো
১৫ ভাদ্র ১৩০২

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক
শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর
কার্যাধ্যক্ষ

প্রাদেশিক সভার উদ্‌বোধন

ঢাকায় বিগত বঙ্গীয় প্রাদেশিক জনসভার যে অধিবেশন বসিয়াছিল তাহার সভাপতি ছিলেন মান্যবর শ্রীযুক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। তাঁহার উদ্‌বোধনের সারমর্ম নিম্নে বাংলায় প্রকাশ করিলাম। ইহাতে মূল বক্তৃতার অসামান্য গাম্ভীর্য নৈপুণ্য ও তেজ, ভাষার প্রাঞ্জলতা ও সৌন্দর্য রক্ষা করিবার দুরাশা পরিত্যাগ করিয়াছি কেবল তাঁহার প্রধান বক্তব্য বিষয়গুলি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে— আশা করি, পাঠকগণ ইহা হইতে সংক্ষেপে আমাদের বর্তমান রাজনীতির অবস্থা ও আমাদের রাজনৈতিক কর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবেন। এ স্থলে বলিয়া রাখা কর্তব্য, অনুবাদটি কালীচরণবাবুকে দেখাইবার অবকাশ পাই নাই, এজন্য যদি কোনো অনৈক্য অসংগতি ঘটিয়া থাকে তবে আমরা তাঁহার ও পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।

—সম্পাদক।

আমাকে অদ্য আপনারা সভাপতিত্বে বরণ করিয়াছেন, সেজন্য যেমন আমি আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞ, তেমনি আপন অযোগ্যতা অনুভব করিয়া সংকুচিত। আমি আপনাদের আদেশ শিরোধার্য করিয়া গ্রহণ করিলাম কিন্তু আমাকে এই ভার প্রদানের জন্য আপনারাই দায়ী তাহা স্মরণ রাখিবেন। এক্ষণে ঈশ্বরের এই আশীর্বাদ কামনা করি যে, এ সভা যেন প্রজাদের সহায় হয় এবং প্রজাপালকদেরও সাহায্য করে।

ভারতেশ্বরী মহারানীর মহৎজীবনের আরও একবৎসর কাল আমরা সৌভাগ্যস্বরূপে লাভ করিয়াছি।— যে উদার ঘোষণাপত্র তাঁহার রাজত্বের স্থায়ীকীর্তি, প্রার্থনা করি, তিনি বহুদীর্ঘকাল সজীব থাকিয়া তাঁহার সেই প্রতিশ্রুতিগুলিকে অটল ভিত্তির উপর স্থাপনপূর্বক প্রজাদিগকে আনন্দিত এবং আপন রাজবাক্যকে চরিতার্থ করিতে পারেন।

বর্ষে বর্ষে আমরা ইংলন্ডের প্রবীণ মহাপুরুষকে (Grand old man) তাঁহার জন্মোৎসবের আনন্দ-অভিবাদন প্রেরণ করিয়াছি। রাজনৈতিক আকাশের সেই উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক অদ্য অস্তমিত হইয়া উচ্চতর গগনে অধিরোহণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকাকুল পরিবারের অশ্রুর সহিত অশ্রু সম্মিলিত করি, এবং তাঁহার পবিত্র স্মৃতির সহিত তাঁহার সেই মহাবাণী গ্রথিত করিয়া রাখি যে-বাণী অদ্য বিংশতি বৎসর হইল, তৎকালীন ভারতশাসনকর্তা-কর্তৃক প্রচলিত রাজদ্রোহীরচনা বিলের বিরুদ্ধে তিনি উচ্চারণ করিয়াছিলেন, যে অখণ্ডনীয় বাণী আমরা বিরোধীপক্ষকে পরাভব করিবার জন্য মহাস্ত্ররূপে গ্রহণ করিতে পারি। তিনি বলিয়াছিলেন—

মহাশয়গণ, যদিও মধ্যে মধ্যে আমরা ভারতরক্ষাকার্যের সহিত ব্রিটিশ স্বার্থকে বিজড়িত করিয়া আমাদের সেই প্রথম ও পরম কর্তব্য হইতে— অর্থাৎ সেখানকার প্রজাবর্গের উন্নতিসাধনে আমাদের একান্ত সহায়তা এবং সুবুদ্ধি পরিচালনা হইতে— বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ি, তথাপি, একটিমাত্র উপায় আছে যদ্দ্বারা আমরা ভারতশাসনের দুরূহ কার্যকে আশাপ্রদ ও সম্ভবপর করিয়া তুলিতে পারি— সে কেবল ভারতবাসীদের হিতের জন্য ভারতশাসনের চেষ্টা। আমরা যে এই ভিত্তির উপরে ভারতশাসনকার্যকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি ইহা অত্যুক্তি নহে এবং ইহাও সত্য যে, ভারতবাসীগণ তাহা জানে ও বিশ্বাস করে। তাহাদের নালিশ করিবার অনেক বিষয় আছে, অন্তত এইরূপ তাহাদের ধারণা। দুঃখের সহিত বলিতেছি বর্তমান প্রেস অ্যাক্ট তাহার মধ্যে একটি প্রধান। কিন্তু আমি দেখিয়াছি— বিশেষত এই অ্যাক্টের পোষকস্বরূপে যে-সকল লেখা উদ্‌ধৃত করিয়া পাঠানো হইয়াছে তাহাই পাঠ করিয়া দেখিয়াছি— ভারতবর্ষের এই-সকল নালিশ বিশেষ বিশেষ হেতুগত। আমরা এ দেশে যেমন করি তাহারাও সেইরূপ গবর্মেন্টের ত্রুটি অবলম্বন করিয়া অভিযোগ করে। যখন এমন কোনো আইন পাস হয় যাহাকে আমরা মন্দ জ্ঞান করি তখন তাহার বিরুদ্ধে আপত্তি জানাই, কিন্তু তাই বলিয়া রাজার সহিত প্রজাসম্বন্ধ

বিচ্ছিন্ন করি না। সেইরূপ— যদি ভারতবাসীর অন্তঃকরণ আমি ঠিক বুঝিয়া থাকি— তাহারাও বিশেষ ধারা অথবা বিশেষ আইনের প্রচলন সম্বন্ধেই আপত্তি প্রকাশ করে— কিন্তু ব্রিটিশ শাসন যে ভারতের পক্ষে হিতকারী তাহা অস্বীকার করিবার কোনো লক্ষণ কোথাও দেখা যায় না, এবং যখন একটি উদ্‌ধৃত রচনায় দেখিলাম লেখক বলিতেছেন, যে, বর্তমান অবস্থায়— ব্রিটিশ রাজ্যের ধ্বংস নহে— প্রত্যুত তাহার স্থায়িত্বই ভারতবর্ষের সকল আশার আশ্রয়স্থান— তখন আমি বিস্ময় এবং বিস্ময়ের সহিত আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। ভালো, যখন এত দূরই অগ্রসর হইয়াছ, অথচ অনিবার্য অবস্থাবৈষম্যবশত যখন সমস্ত ভারতবর্ষে স্বায়ত্ত রাজ্যবিধির মূল সূত্রপাত করিতেও যথেষ্ট দ্বিধা উপস্থিত হয়, তখন অন্তত এটুকু অঙ্গীকার করিতেই হইবে যে, যাহা আমরা দান করিব তাহা আমরা প্রত্যাখ্যান করিব না; সুতরাং, আমাদের স্বরাজ্যতন্ত্রে আমরা যে সর্বোচ্চ উপকারগুলি ভোগ করি, অর্থাৎ প্রজাগণ যে-সকল রাজকার্যবিধিতে ঔৎসুক্যবান তাহাকে প্রকাশ্যতা দান করা, এবং অন্যায় ও ভ্রম হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বিচার ও আলোচনার উদ্দেশে তাহাকে যথেষ্ট সময় দেওয়া— সেই অধিকার যখন আমরা ভারতবর্ষকে দান করিয়াছি; তখন বর্তমান ঘটনায় ভারতবর্ষীয় গবর্মেন্টের নিরতিশয় শঠকারিতা ও একান্ত গোপনতা পরম দুঃখের বিষয় হইয়াছে ; বিশেষত যখন এই ত্বরাতিশয্য ও মন্ত্রগুপ্তি কেবলমাত্র কোনো আংশিক সংশোধন ও পরিবর্তন-উদ্দেশে নহে, পরন্তু দেশীয় সংবাদপত্র সম্বন্ধে একটি গুরুতর আইনস্থাপনা উপলক্ষে।—

কনফারেন্সের গত অধিবেশনের পর আমরা আমাদের দেশের প্রবীণা মহানারীর মৃত্যুশোক অনুভব করিয়াছি— সেই কাশিমবাজারের রানী স্বর্ণময়ী যাঁহার দেশবিশ্রুত সদ্‌গুণ, ভারতবর্ষেরই সর্বসম্মত বিশেষ সদ্‌গুণ, দয়া। তাঁহার সেই দয়ায় প্রাচ্য দেশের মুক্তহস্ত বদান্যতা এবং প্রতীচ্যভাগের অর্থনৈতিক দূরদর্শিতা একত্রে মিশ্রিত হইয়াছিল।

এক্ষণে আমাদের এই সভার প্রথম কর্তব্য, বাংলার নূতন শাসনকর্তাকে স্বাগত সম্ভাষণ। তিনি তাঁহার রাজাসনে পদক্ষেপমাত্রেই আমাদের হৃদয় অধিকার করিয়াছেন। প্রজাপালনের জন্য সার জন্‌ বুড্‌বর্ন যে সর্বপ্রকার ত্যাগস্বীকারে উন্মুখ ইতিমধ্যে তিনি তাহার প্রমাণ দিয়াছেন, গুরুতর সংকটের সময় রাজনীতিকে তিনি প্রজাদের প্রার্থনার অনুকূল করিয়াছেন। তাঁহার মন্ত্রগৃহের আসনে বসিয়া তিনি অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, শিল্পশিক্ষাপ্রাপ্ত দেশীয় লোকদিগকে সাহায্য করিবার জন্য তিনি প্রস্তুত এবং তিনি রাষ্ট্রীয় ব্যয় সংক্ষেপের উপায় উদ্‌ভাবনের জন্য মন্ত্রসভার বেসরকারি মন্ত্রীগণকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়াছেন। এইরূপে সার জন বাংলা দেশের ভবিষ্যৎকে আশার আলোকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন।

বৎসরটি দুর্দৈবের বৎসর চলিতেছে। ভূমিকম্পের আন্দোলনের মধ্যে গত কনফারেন্সের অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছিল। বঙ্গদেশের গাত্র হইতে দৈবনিগ্রহের ক্ষতচিহ্নগুলি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত না হইতেই পরে পরে দুর্ভিক্ষ এবং মারীর আবির্ভাব হইল। বিধাতার বিধানে অশুভ হইতেও শুভ ফল উৎপন্ন হয় গত দুর্ভিক্ষে তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সেই অন্নাভাবের দিনে বিপন্ন ভারতের প্রতি জগতের সর্বত্র হইতেই করুণা বর্ষিত হইয়াছে। পৃথিবীর বৃহৎ জাতির সহিত যে আমাদের এক বন্ধন আছে তাহা তাঁহারা এই উপলক্ষে স্বীকার করিয়াছেন এবং আমরাও তাহা হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে পারিয়াছি।

কিন্তু প্লেগে যেন কতকটা তাহার বিপরীত ফল ফলিয়াছে; ইহাতে দুই জাতির হৃদয়বন্ধনে যেন কঠোর আঘাত করিয়াছে। রাজা-প্রজার পরস্পর বুঝাপড়ার অভাব হওয়াই তাহার মূল এবং শাসিত ও শাসনকর্তার মধ্যে অবাধ বার্তাবহনের অসম্পূর্ণতাই তাহার কারণ। জনসাধারণের স্বাভাবিক নেতাগণ, যে, বার্তা প্রদানে বিরত ছিলেন তাহা নহে, কিন্তু গবর্মেন্ট তাঁহাদিগকে মন্ত্রণায় আহ্বান না করায় সর্বসাধারণেও তাঁহাদের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারে নাই। বোম্বাইয়ের দুর্বিপাক হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া সার জন্‌ যে রাজনীতির অবতারণা করিয়াছেন

তাহাতে জননায়কদের হস্তেই এই মারীনিবারণের ভার অর্পিত হইয়াছে। ইহাতে আমাদের একটি বিশেষ সান্ত্বনার কথা আছে।— ইতিপূর্বে ম্যুনিসিপালিটির প্রতি এক অকারণ অভিযোগ আসিয়াছিল যে প্লেগসম্বন্ধীয় প্রতিকার বিধান তাহার সাধ্য নহে; এক্ষণে দেখা যাইতেছে লোকনায়কগণেরই সেই কাজ, সরকারি কর্মচারীদের দ্বারাই তাহা দুঃসাধ্য। এই প্রসঙ্গে বলিতে চাহি, প্লেগনিবারণের জন্য আমরা গবর্মেন্টের অপেক্ষা কম উৎসুক নহি কিন্তু প্রমাণহীন নূতন পরীক্ষার বিষয়ীভূত হইতে আমরা কুণ্ঠিত। উপযুক্ত পণ্ডিতদের যাহা বিধান হয় তাহা আমরা বহন করিতে প্রস্তুত আছি, এবং সেই বিধান পালনের ভার আমাদের নিজ হস্তে থাকিলে তাহার অনাবশ্যক কঠোরতা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইবে।

এক্ষণে আলোচ্য এই যে, প্রাদেশিক জনসভার উদ্দেশ্য কী। কন্‌গ্রেসে এবং কন্‌ফারেন্সে, ভারতজনসভা ও প্রাদেশিক জনসভায় এই প্রভেদ নির্দিষ্ট হইয়াছে যে, একটি সাম্রাজ্য-ব্যাপারঘটিত এবং আর-একটি কেবল প্রাদেশিক। কিন্তু কন্‌গ্রেসে যে-সকল প্রস্তাব উত্থাপিত হয় কন্‌ফারেন্স তাহাতে বিশেষরূপ সাহায্য না করায় কন্‌গ্রেস ক্রমশ একঘেয়ে হইবার উপক্রম হইয়াছে। যদি এমন বন্দোবস্ত হয় যে, কনগ্রেসের আলোচিত প্রস্তাবগুলির তদন্তভার কনফারেন্সের বিশেষ বিশেষ বিভাগগত সেক্রেটারিদের হস্তে দেওয়া যায় এবং তাঁহারা সংবৎসরকাল সেই-সকল বিষয়ে স্থানীয় বিবরণ সংগ্রহ করিয়া বেসরকারি একটি শাসন-বিবরণী (administration report) প্রস্তুত করেন ও তাহা কনফারেন্সে গ্রাহ্য হইলে পর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে কনগ্রেসের সেক্রেটারির নিকট পাঠানো হয় এবং তিনি তাহা হইতে একটি সাধারণ বিবরণী প্রস্তুত করিয়া কনগ্রেসে পাঠ করেন তবে তাহা বিশেষ ফলদায়ক হইতে পারে। রাজ্যচালনার মূলনীতি সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা বুঝিয়াছি কিন্তু দোষের বিষয় এই যে, রাজ্যের সংবাদ আমাদের অল্পই জানা আছে— সেইজন্য আমাদের কথার জোর নাই, এবং অনেক সময় সেই কারণেই বিপক্ষের নিকট আমাদের হার মানিতে হয়। বর্তমান প্রস্তাবে তাহার প্রতিকার সম্ভব।

কনফারেন্সেও যে-সকল বিশেষ বিষয়ের অবতারণা হয় তৎসম্বন্ধে যদি আমরা একবৎসর ধরিয়া তথ্য সংগ্রহ করি ও যথোচিত প্রস্তুত হইয়া আসি তাহা হইলে আমাদের এই কনফারেন্স তিন দিবসব্যাপী একটা ইন্দ্রজালের মতো হয় না— সমস্ত বৎসর তাহার কাজ থাকে।

কনফারেন্সের আরও একটি উদ্দেশ্য জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষাবিস্তার। যদিও আমরা তাহাদের হিতেচ্ছা করি ও তাহাদের হিতকার্যে প্রবৃত্ত কিন্তু আরও নিকটভাবে প্রত্যক্ষভাবে তাহাদিগকে আমাদের এই অনুষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত করিতে না পারিলে যথার্থ উপকার হয় না এবং বিপক্ষেও বলিবার পথ পায় যে আমরা সাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধি নহি। এই জনসাধারণকে আকর্ষণ করিবার জন্য গত কনফারেন্সে বাংলা ভাষায় কার্যনির্বাহের অবতারণা হয়। ইহা ছাড়া, সাধারণে, জলকষ্ট প্রভৃতি, যে-সকল বিষয়ে বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট কনফারেন্সে তাহার যথেষ্ট আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

বৎসরের আলোচনায় দুটি বিষয় বিশেষ করিয়া চক্ষে পড়ে; রাজদ্রোহের ধুয়া এবং সর্বপ্রকারে দমন করিবার চেষ্টা।

আমাদের বিশ্বাস, একদল ইংরাজের প্ররোচনায় নিতান্ত বাধ্য হইয়া কর্তৃপুরুষেরা রাজদ্রোহ সম্বন্ধে বিশেষ শাসন প্রচার করিয়াছেন। আসল কথা এই যে, একপক্ষে আমাদের রাজা আমাদিগকে কতকগুলি স্বাধীন অধিকার দিতে প্রতিশ্রুত, অপরপক্ষে পারকতা দ্বারা আমাদের দাবিও আমরা সপ্রমাণ করিয়াছি, এক্ষণে রাজদ্রোহের অপরাধ আরোপ না করিলে আমাদিগকে প্রাপ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার কোনো যুক্তিসংগত কারণ পাওয়া যায় না। আমাদের বিপক্ষগণ সেই অন্যায় ধুয়া তুলিয়া আমাদের দাবিকে দুর্বল করিবার চেষ্টায় আছেন।

রাজপুরুষগণ কখনো কখনো মৌখিক রাজভক্তির উল্লেখ করিয়া অবজ্ঞা প্রকাশ করেন, কিন্তু

রাজদ্রোহও যে অনেক সময় মৌখিক হইতে পারে সে তাঁহারা খেয়াল করেন না। হৃদয়ে আমাদের রাজদ্রোহ নাই, যদি কখনো চিত্তক্ষোভে অনবধানে মুখে বিরুদ্ধ কথা বাহির হয় তাহা কর্ণপাতের যোগ্য নহে।

জগদীশ্বরের রাজ্যই ধরণীশ্বরের রাজত্বের আদর্শ। ঈশ্বর মনুষ্যকে অনেক স্বাধীন অধিকার দিয়াছেন, মনুষ্য তাহার অসদ্ব্যবহার করিয়া পদে পদে দণ্ডনীয় হয় কিন্তু তাই বলিয়া সমূলে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হয় না। আমাদের নরপতি, বিশ্বপতির এই বিধান স্মরণ রাখিলে রাজনীতির উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিতে পারিতেন।

এই তো গেল রাজদ্রোহের ধুয়া। তাহার পরে আমাদিগকে বিবিধ প্রকারে দমনের জন্য আয়োজন নানা আকারে দেখা যাইতেছে। ইহার মূলে শাসনকর্তাদিগের ক্ষমতা, এবং প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির চেষ্টা। ভারত-রাজতন্ত্রে বিচার বিভাগ এবং কর্তৃত্ব বিভাগের অধিকার, ন্যায়াধীশ এবং দণ্ডাধীশের ক্ষমতা অনেক স্থলে একাধারে বর্তমান বলিয়া অনেক অন্যায়ের সৃষ্টি হইয়া থাকে— এই দুই ক্ষমতার পৃথকীকরণের জন্য দীর্ঘকাল আন্দোলন চলিতেছে, পাছে সেই যুক্তিযুক্ত আন্দোলন সফল হয় এইজন্যই বুঝিবা তৎপূর্বেই কর্তৃপুরুষের ক্ষমতা অসংগতরূপে বৃদ্ধি করা হইতেছে।

অনেক সময় দণ্ডাধীশ যাহাকে দোষী বলিয়া খাড়া করেন ন্যায়াধীশের বিচারে সে খালাস পায়— ইহাতে দণ্ডবিধানের একটা ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু চাণক্যের ন্যায় আমাদের কর্তারা স্থির করিয়াছেন— "তাড়নে বহবো গুণাঃ"— অতএব দমন-তাড়নের শক্তিকে তাঁহারা অপ্রতিহত করিতে চান। এক তো এমন এক ধারা বাহির হইল যাহাতে কোনো বিচারই নাই— তাহার পরে যেখানে বিচার আছে সেখানেও নূতন সংশোধিত দণ্ডবিধি এমন সকল বাধা স্থাপন করিয়াছে, যাহাতে অভিযুক্তগণ আপন নিরপরাধ প্রমাণের চিরপ্রচলিত অনেকগুলি সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। সওয়াল-জবাবের অধিকার হ্রাস করা হইয়াছে; পুলিসের ডায়ারি তদন্ত করিয়া কৃত্রিম প্রমাণ ধরিতে পারিবার যে উপায় ছিল তাহাও রোধ করা হইয়াছে; অবিচারের আশঙ্কায় এক হাকিমের হস্ত হইতে অন্য হাকিমের হস্তে মকদ্দমা চালান করিবার যে অধিকার ছিল তাহাও হ্রাস করা হইয়াছে। অবশ্য, বিচারকর্তারা অভিজ্ঞতার দ্বারা কোনো ত্রুটি পাইয়া যদি এই-সকল বিধি সংশোধনের পরামর্শ দিতেন তাহা হইলেও বুঝিতাম— কিন্তু তাহা নহে— এ কেবল কর্তৃপুরুষদেরই কৃতকার্য। নূতন বিধি প্রণয়নে হাইকোর্টের এক জজ নিযুক্ত ছিলেন বটে— কিন্তু এই সংশোধনগুলি তাঁহার বিচার-করা-কালীন পরামর্শসম্ভূত নহে। একদিকে আইন কড়া, অন্য দিকে দণ্ডবিধিও যদি সংকীর্ণ হয় তবে অভিযুক্তদিগের পক্ষে বড়োই সংকট। ইহা ব্রিটিশ ন্যায়নীতির বিরুদ্ধে। কারণ তাঁহাদের ন্যায়ের মূলসূত্র এই যে, ৯৯ জন অপরাধী খালাস পাইলেও ক্ষতি নাই কিন্তু একজনও নিরপরাধ যেন দণ্ড না পায়।

কর্তৃপুরুষদের ক্ষমতাবৃদ্ধির এই চেষ্টা আমাদের প্রাদেশিক শাসনেও লক্ষিত হয়। প্রজাস্বত্বসম্বন্ধীয় নূতন আইনে খাস মহল এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বহির্ভূক্ত মহলের প্রজাদের খাজানা বৃদ্ধির ক্ষমতা এক্ষণে একেবারে রেভিন্যু কর্মচারীদের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। এই রেভিন্যু কর্মচারীরা কর্তৃত্ববিভাগের অঙ্গ।

পূর্বে এই রেভিন্যু কর্মচারীদিগকে দেওয়ানীকার্যবিধি অনুসারে চলিতে হইত, এবং তাঁহাদের রায়ের উপর সিভিল কোর্টে আপিল চলিবার বাধা ছিল না। নূতন নিয়ম অনুসারে তাঁহারাই সরাসরি ভাবে হুকুম দিবেন এবং তাহার উপরে আর আপিল চলিবে না। ইহাতে খাজনা বৃদ্ধির পথ সম্পূর্ণ অবাধ হইল। দুঃখের সহিত বলিতেছি আমাদের মধ্যে যাঁহারা মন্ত্রীসভায় এই আইনের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন জমিদারসম্প্রদায় তাঁহাদিগকে উপলক্ষ করিয়া কনগ্রেসের প্রতি বিমুখভাব প্রকাশ করিয়াছেন। কন্‌গ্রেসপক্ষীয়দের অবস্থা এমন যে, আমাদিগকে জমিদার ও রায়ত উভয়েরই প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। যেখানে সামঞ্জস্য সম্ভব

সেখানে কথাই নাই, যেখানে বিরোধ অনিবার্য সেখানে আমরা বিশিষ্টসাধারণের খাতিরে জনসাধারণকে ত্যাগ করিতে পারিব না।

কলিকাতা ম্যুনিসিপাল বিলেও দমনচেষ্টার লক্ষণ দেখা যায়। এই বিলে কর্তৃপুরুষদিগকে এত অধিক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে তাঁহারা আর কোনো প্রকার জবাবদিহির অধীনে নাই। ম্যুনিসিপালিটির অধিকাংশ সভ্যের হস্তে, কেবলমাত্র শ্মশানঘাট, কবরস্থান, নূতন বাজার স্থাপন, লোকসংখ্যা গণনা, টাকা জমা দিবার ব্যাঙ্ক স্থির করা প্রভৃতি সামান্য বিষয়ের ভার দেওয়া আছে। কথা আছে, মানহানি অপেক্ষা প্রাণহানি ভালো, এ বিল যদি পাস হয় তবে আমাদের স্বায়ত্তশাসনের অবশিষ্ট অনুগ্রহকণাটুকুও বিসর্জন দেওয়া শ্রেয়।

এক্ষণে, আমাদের কনফারেন্স সভায় যে-সকল কার্য উপস্থিত হইয়াছে আশা করি আপনারা তাহা দৃঢ়তা ও সংযমের সহিত পরিচালনা করিবেন এবং স্মরণ রাখিবেন রাজা ও প্রজা উভয়েরই প্রকৃত স্বার্থ অবিচ্ছিন্ন অবিরোধী।

ভারতী

আষাঢ় ১৩০৫

শারদ জ্যোৎস্নায়

ভগ্নহৃদয়ের গীতোচ্ছ্বাস

আবার, আবার, শুনা রে আবার,
পীযূষ-ভরা সে প্রেমের গান,
আবার, আবার, সে রবে আমার,
মাতিয়ে উঠুক অবশ প্রাণ!

সুমধুর সুরে বাঁধ্ রে বীণা,
পঞ্চমে চড়ায়ে ললিত তান,
আবার, আবার, সে রবে আমার,
মাতিয়ে উঠুক অবশ প্রাণ!

মাতিয়ে উঠুক অবশ পরান,
নাচিয়ে উঠুক হৃদয় আজ;
জোছনা-হাসিনী এমন যামিনী—
বিষাদের মাথে পড়ুক বাজ!

'জোছনা-হাসিনী, এমন যামিনী,'
প্রতিধ্বনি দিল সকল দিক্,
দিগঙ্গনা মেলি, দিল করতালি,
কুহু কুহু করি উঠিল পিক্!

ভাবে উজলিল যমুনার জল,
কুমুদের মুখে হাসি না ধরে,
হরষে পাপিয়া, আকাশ ছাপিয়া,
ধরিল সে গীত মধুর স্বরে!

ভ্রমর ভূতলে, ফুল-দলে দলে
গুন্ গুন্ রবে ধরিল তান,
'জোছনা-হাসিনী, এমন যামিনী'
দিশি দিশি এই উঠিল গান!

করো করো শশি, সুধা বরিষন!
মিটাও মিটাও চকোর-আশ,
ফুটাও ফুটাও কুমুদের বন,
পরাও জগতে রজত বাস!

'সব-ই অকারণ, বৃথাই জীবন,
জীবন কেবলই যাতনা সার—'
ধিক্ ও কথায়, শুনিতে কে চায়,
কবির কাঁদুনি সহে না আর!

জোছনা-হাসিনী, এমন যামিনী—
এমন শরৎ, এমন শশী,
আবার ভূতলে, যমুনার জলে,
কত ভাঙা চাঁদ পড়েছে খসি!

লহরী লীলায়, নেচে নেচে যায়,
নেচে নেচে যায় তারকাকুল!
লতাপাতাগুলি, নাচে হেলি দুলি,
ঘুম ঘুম আঁখি মেলিল ফুল!

ডাগর ডাগর, ফুটেছে টগর,
গোলাপ প্রলাপ বাড়ায় প্রাণে,
চামেলির ফুল, হেসেই আকুল,
কেতকী কত কী কুহক জানে!

শেফালিকা বেলা, করে কত খেলা,
মৃদুল পবন সহায় তায়,
মৃদুল পরশে, অলস-আবেশে
ঢুলে ঢুলে পড়ে এ ওর গায়!

বাঁধ্ তবে বীণা, আরও তুলে বাঁধ্,
নিখাদে চড়ায়ে ললিত তান,
আবার আবার, সে রবে আমার,
মাতিয়ে উঠুক অবশ প্রাণ!

এই যে চাঁদিমা বিমান উজলে,
উজলে তো আজি আমারি তরে,
আমারি তো লাগি, হইয়ে সোহাগী,
বহিছে যমুনা পুলক-ভরে!

বিষাদের ঘোর কেন রবে তবে,
ভাবনায় কেন দলিত হব,
চাহে না পৃথিবী, চাহি না পৃথিবী,
আপনার ভাবে আপনি রব।

আমার হৃদয় আমারি হৃদয়,
বেচি নি তো তাহা কাহারো কাছে,
ভাঙা-চোরা হোক, যা হোক তা হোক,
আমার হৃদয় আমারি আছে।

চাহি নে কাহারো আদরের হাসি,
ভ্রূকুটির কারো ধারি নে ধার,
মায়া-হাসিময় মিছে মমতায়,
ছলনে কাহারো ভুলি নে আর।

কাহারো ছলনে আর নাহি ভুলি
জ্বলিয়া পুড়িয়া হয়েছি খাক্‌,
তাদের সোহাগ, তাদের বিরাগ
তাদের আদর তাদেরি থাক্‌।

বাঁধ্‌ তবে বীণা, আরও তুলে বাঁধ্‌,
নিখাদে চড়ায়ে ললিত তান,
আপনার মন আপনারি ঠাঁই,
আপনারি ভাবে ভাসুক প্রাণ।

থাক্‌ থাক্‌ বীণা, শুনিতে চাহি না,
মরম-বিঁধুনি ও-সব গান,
শোন্‌ শোন্‌ শোন্‌ কোকিল উদিকে,
ধরেছে কেমন মধুর তান।

ক্ষণেক দাঁড়াও যমুনা। যমুনা!
পিউ পিউ ওই পাপিয়া গায়;
আকাশ পাতাল, সে রবে মাতাল,
আকাশ পাতাল অঘোর প্রায়!

গাও গাও, পাখি, আমোদের গান!
মৃদুল পবন, মাতিয়ে বও!
আয় লো যমুনা বহিয়ে উজান!
আজ শশি! তুমি হোথাই রও!

নিশি তুমি! আজ হোয়ো না প্রভাত,
ভানুর মাথায় পড়ুক বাজ,
কাঁদায়ে চকোরে, ফেলিয়ে আমারে,
মধুর যামিনী, যেয়ো না আজ॥

ভারতী
কার্তিক ১২৮৪

গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি

কোনো মেঘ-বিনির্মুক্তা তারকাসমুজ্জ্বলা রজনীতে গৃহের বাহির হইয়া গগনমণ্ডলের প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই মনে কতকগুলি চিন্তার উদয় হইবেই হইবে। যে-সকল অগণ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডল দ্বারা নভস্তল বিভূষিত হইয়া রহিয়াছে, তাহারা কি শূন্য না আমাদের ন্যায় জ্ঞান-ধর্ম-প্রেম-বিশিষ্ট উন্নত জীবধারা পূর্ণ? প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বরের বিচিত্র অনন্ত রাজ্যের মধ্যে এমন কি কোনো স্থান থাকিতে পারে যেখানে প্রাণের চিহ্ন নাই? এই-সকল বিষয় সম্বন্ধে যাহাদের জ্ঞানের গভীরতা নাই, তাহারা হয়তো মনে করিবে, যে, দূরবীক্ষণের সাহায্য অবলম্বন করিলেই এই-সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহা ভ্রম মাত্র। এই যন্ত্রের প্রবল শক্তি সত্ত্বেও, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই প্রকার প্রশ্ন-সকলের উত্তর দেওয়া এখনও উহার সাধ্যাতীত। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের এখনও এতদূর উন্নতি হয় নাই, যে ইহার সাহায্যে আমরা অতি দূরস্থ লোকের অতি ক্ষুদ্রতম পদার্থ পর্যন্ত জাজ্বল্যরূপে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হই। দূরবীক্ষণের এক্ষণে এই পর্যন্ত ক্ষমতা হইয়াছে, যে অতি দূরের বস্তুকে অপেক্ষাকৃত নিকটে আনিয়া দিতে পারে। মনে করো তুমি সহস্রমাত্রা-শক্তি-সম্পন্ন একটি দূরবীক্ষণ দ্বারা চন্দ্রলোক পর্যবেক্ষণ করিতেছ। চন্দ্র সৌরজগতের মধ্যস্থিত সমস্ত গ্রহমণ্ডলী অপেক্ষা পৃথিবীর নিকটস্থ। পৃথিবী হইতে চন্দ্র প্রায় ১২০,০০০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত— এক্ষণে, এই দূরবীক্ষণের সাহায্যে, ১২০,০০০ ক্রোশ— ১২০ ক্রোশে পরিণত হইতে পারে এই মাত্র। তথাপি এই ১২০ ক্রোশ দূর হইতে চন্দ্রলোকের মনুষ্য ঘোটক, হস্তী অথবা অন্য কোনো প্রাকৃতিক পদার্থ আমাদের কি দৃষ্টিগোচর হইতে পারে? কখনোই না।

এই পৃথিবীর ন্যায় অন্যান্য গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি কি না যদিও বিজ্ঞানশাস্ত্র এ পর্যন্ত এই প্রশ্নের উত্তরে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারেন নাই তথাপি আনুমানিক প্রমাণ এতৎ সম্বন্ধে এত রাশি রাশি সংগ্রহ করিয়াছেন, যাহা প্রত্যক্ষের ন্যায় সমান বিশ্বাসযোগ্য, তদপেক্ষা কিছুমাত্র ন্যূন নহে।

যে-সকল গ্রহ পৃথিবীর সহিত সাদৃশ্য থাকা প্রযুক্ত পার্থিব গ্রহ বলিয়া উক্ত হয়, আমরা প্রথমে সেই-সকল গ্রহ সম্বন্ধে এই প্রশ্নটি বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

এই পার্থিব গ্রহ তিনটি : বুধ, শুক্র এবং মঙ্গল। ইহারা সৌরজগতের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য গ্রহগণ অপেক্ষা সূর্য হইতে কম দূরে অবস্থিত হইয়া, তাহার চতুর্দিকে পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে পরিভ্রমণ করে। সৌরজগতের অন্যান্য দূরবর্তী গ্রহগণের বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করিব।

কীরূপে আমাদের এই পৃথিবী মনুষ্য এবং অন্যান্য ইতর প্রাণীর বাসযোগ্য হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে প্রথমে দেখিতে পাওয়া যায়, যে পরম কারুণিক পরমেশ্বর পৃথিবীকে আমাদের বাসযোগ্য করিবার জন্য বিবিধ প্রকার পরস্পর-উপযোগী ব্যবস্থা-সকল পূর্ব হইতে নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন, সেই ব্যবস্থাগুলি এমন কোনো সাধারণ যান্ত্রিক নিয়ম হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না, যাহা দ্বারা সাধারণত জড় জগতের গতিবিধি পরিবর্তন নিয়মিত হইতেছে। জড় জগতে কেবলই গতি ও পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, যন্ত্রের ন্যায় চক্র-সকল কেবলই ঘূর্ণিত হইতেছে। কিন্তু যে নিয়মের বশবর্তী হইয়া এই পরস্পর-বিরোধী অসংখ্য চক্র-সকল পরস্পর উপযোগী হইয়া প্রাণিপুঞ্জের সুখ সৌকর্য বিধান করিতেছে, সেই নিয়মটি স্রষ্টার মঙ্গল সংকল্পের যত স্পষ্ট পরিচয় দেয়, এমন আর কিছুই নহে। মনে করো, এক্ষণকার ন্যায় তোমার নৈসর্গিক অভাব এবং তদ্‌বিষয়ক জ্ঞান রহিয়াছে— মনের প্রবৃত্তিসকল সমান রহিয়াছে— সুখ-দুঃখবোধ জাগরূক রহিয়াছে— অর্থাৎ এক্ষণকার ন্যায় সর্বাবয়ব-সম্পন্ন মনুষ্যই রহিয়াছে— আর হঠাৎ তুমি এই শোভাপূর্ণ পৃথিবীতে পদার্পণ করিলে। তুমি দেখিবে সুখস্পর্শ সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে— স্বচ্ছ নির্মল জলরাশি প্রসারিত রহিয়াছে— প্রাণী ও উদ্ভিদ জগৎ জীবনসৌন্দর্যে পূর্ণ রহিয়াছে— পৃথিবীর এতটুকু আকর্ষণিক শক্তি তোমার শরীরের উপর

রহিয়াছে যে তাহাতে তোমার শরীরের প্রয়োজনীয় স্থায়িত্ব বিধান হইতেছে অথচ তাহার স্বাধীন গতিবিধির কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইতেছে না— তোমার শরীরের মাংসপেশীর গঠন প্রণালী অনুযায়ী, পরিশ্রম এবং বিশ্রামের প্রয়োজন অনুসারে আলোক এবং অন্ধকার পর্যায়ক্রমে যাতায়াত করিতেছে— তোমার শরীরের প্রয়োজন অনুসারে, ছয় ঋতু যথাসময়ে পরিবর্তিত হইতেছে— এই-সমস্ত উপযোগিতার নিদর্শন পাইয়া, তুমি কি ক্ষণকাল মাত্রও সন্দেহ করিতে পার, যে তোমার বাসের জন্যই এই পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছে?

তবে যদি আমরা বিজ্ঞানের সাহায্যে জানিতে পারি যে আমাদের এই পৃথিবীর ন্যায় প্রত্যেক গ্রহই, নিয়মিত-কাল-মধ্যে সূর্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে— পৃথিবীর ন্যায় আলোক, উত্তাপ, বায়ু এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী দ্বারা সুসম্পন্ন— একই নিয়মে তথায় আলোক-অন্ধকারের পর্যায় উপস্থিত হইতেছে— ঋতুর পরিবর্তন হইতেছে— শীতোত্তাপের বিভিন্নতা হইতেছে— জলভূমির সুচারু বিভাগ সম্পাদিত হইতেছে— তখন কি ওই-সকল গ্রহগণ সর্বপ্রকারে আমাদেরই মতো জীবপুঞ্জের যে আবাসভূমি এ বিষয়ে আর সংশয় হইতে পারে?

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

পৌষ ১৭৯৬ শক। ১২৮০ বঙ্গাব্দ

বঙ্গে সমাজ-বিপ্লব

বিশৃঙ্খলা অধিকদিন তিষ্ঠিতে পারে না। প্রাকৃতিক ঘটনায় এক-একটা যে বিপ্লব বিশৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া যায়, সে-সকল প্রকৃতির কার্য-শৃঙ্খলারই একটি অঙ্গ। বিপ্লব-বিশৃঙ্খলার অর্থই এই যে, এখন যে অবস্থা আছে ইহা এখনকার সময়ের উপযোগী নহে। ইহা পরিবর্তিত না হইলে সমূহ অনিষ্ট হইবে। বর্তমানে যখনই বিপ্লব দেখিব, তখনই জানিব যে, ভূতকালের যে ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আছি, তাহা জীর্ণ বা অকর্মণ্য হইয়া গিয়াছে, ভবিষ্যতে পুনঃ-সংস্কার হইবে। যেখানকার বায়ু লঘু হইয়া যাইবে, সেইখানেই চারি দিক হইতে বায়ুর স্রোত আসিয়া একটি ঝটিকা বাধিবে বটে, কিন্তু তাহার ফল এই হইবে যে, বায়ু পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। মনুষ্যের সামাজিক রাজ্যেও সেইরূপ এক-এক সময় ঝঞ্ঝা ঝটিকা বহিতে থাকে, তখন সকলেই ভয় করেন যে, বুঝি সমাজের সমুদয় শৃঙ্খলা উলটপালট হইয়া যায়। কিন্তু তাঁহাদের ভয় করিবার কোনো কারণ নাই ; তাঁহারা যদি ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইতেন, তো দেখিতেন যে, জীর্ণ সমাজের কতক কতক ভগ্ন ও চূর্ণ হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু আবার দৃঢ়তর উপাদানে নূতন সমাজ নির্মিত হইয়াছে। রাজপুরুষের একাধিপত্য অনেকদিন য়ুরোপ-খণ্ডে চলিয়া আসিতেছিল, হয়তো ততদিন প্রয়োজন ছিল, কিন্তু যখনই সে সময় অতীত হইয়া গেল, অমনই একটা বিপ্লব বাধিল; দারুণ রক্তপাত, অরাজকতা, অত্যাচার উপস্থিত হইল, কিন্তু পরিণামে তাহা হইতে অশুভ ফল উৎপন্ন হইল না। অসভ্য অবস্থায় অসাধারণ পরাক্রমশালী প্রভুর প্রয়োজন ছিল, নচেৎ তখনকার দুর্দান্ত লোকেরা যুক্তিতে বা সুমিষ্ট ব্যবহারে বশ হইত না, কিন্তু সে অবস্থা চলিয়া গেলে সে নিয়ম খাটিল না। এক কথায় বলিতে গেলে বিপ্লব আপাতত অতিশয় বিকটাকার বোধ হইলেও পরিণামে তাহা হইতে অনেক শুভ ফল উৎপন্ন হয়। লন্ডনে যখন দারুণ মড়ক হইয়াছিল, তখন যে অগ্নিদাহ হয়, তাহা হইতে যদিও অনেক অনিষ্ট ঘটিয়াছিল, কিন্তু মড়কের বীজ দগ্ধ হইয়া গুরুতর অনিষ্ট নিরাকৃত হয়।

বঙ্গদেশের প্রাচীন লোকেরা সভয়ে দেখিতেছেন যে, নূতন বংশের অভ্যুত্থানশীল যুবকদের মধ্যে অতিশয় বিপ্লব চলিতেছে। তাঁহারা ভাবিতেছেন, কলির সন্ধ্যাকাল বুঝি উপস্থিত হইয়াছে; কেহ কাহাকে মানে না, সকলে স্ব স্ব প্রধান, স্বদেশ-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বৃদ্ধদের কাছে তাহারা পরামর্শ

চায় না, বিদেশের সর্ববিদ্যাভিমানী গ্রন্থকারের কথাই তাহাদের বেদবাক্য, প্রাচীন প্রথার অনুসরণ করিতে নিতান্ত বিমুখ, এবং ভালোই হউক আর মন্দই হউক তাহা লঙ্ঘন করিতে পারিলে আপনাকে মহাবীর বলিয়া মনে করে, সকলেই মনে করে, আমারই উপর বিধাতা এই অসভ্য বঙ্গদেশের সংস্কারের ভার অর্পণ করিয়াছেন, আমার কথাতেই সকলে চলিবে, আমি কাহারো কথায় চলিব না, এবং যাঁহারা একবার বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্পণ করেন বা তথা হইতে নির্গত হন, তাঁহারা দেশের লোকের রুচির, জ্ঞানের, সভ্যতার দোষ ধরিয়া বেড়ান, তাঁহারা মনে করেন সকল বিষয়েই আমার অধিকার আছে, এইজন্য তিনি বুঝুন বা না বুঝুন সকল কথা লইয়াই তোলাপাড়া করিয়া থাকেন। যাহা হউক, আমাদের এই নব্য বংশ এখনও বৃদ্ধদের শাসনে আছেন, কিন্তু যখন এই প্রাচীন বংশ লোপ পাইবেক, তখন এই যথেচ্ছাচারী শত শত শিক্ষিত লোক কী গোলযোগ বাধাইবেন কে বলিতে পারে। এই-সকল ভাবিয়া অনেকে ভয় পাইতেও পারেন, কিন্তু আমরা বলি এ বিপ্লব চিরকাল থাকিবে না। নিদ্রোন্মীলিত নয়নে নূতন জ্ঞানের আলোক লাগিয়া বঙ্গবাসীরা অন্ধ হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা দিগ্‌বিদিক্-শূন্য হইয়া কী করিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না। যখন এই আলোক তাঁহাদের চক্ষে সহিয়া যাইবে, তখন আবার তাঁহারা চারি দিক স্পষ্টতর দেখিতে পাইবেন এবং দেশ-কাল-পাত্র বুঝিয়া কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারিত করিতে পারিবেন। তাঁহারা পারিবারিক সুখের বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলাকেই স্বাতন্ত্র্য মনে করেন, যথেচ্ছারিতাকেই স্বাধীনতা বলিয়া আলিঙ্গন করেন ও স্বদেশকে ঘৃণা করাকেই সার্বভৌমিক ভাব মনে করেন। এ অবস্থা যে চিরকাল থাকিবে আমরা সে ভয় করি না, কিন্তু একটি বিষয়ে আমাদের ভয় হয়। এখন এই যে একটি সম্পূর্ণ নূতন ভাবস্রোত বহিতেছে, ইহাতে যাহা-কিছু সময়ের অনুযোগী তাহা ভাঙিয়া যাইবে বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে যাহা উপযোগী তাহাও ভাঙিয়া যাইতে পারে, বা যাহা অনুপযোগী তাহাও নূতন ভাসিয়া আসিতে পারে, এই বিষয়ে আমাদের সাবধান হওয়া কর্তব্য; সহস্র-সহস্র বৎসরে যাহা গঠিত হয়, তাহা ভাঙিয়া গেলে গড়িতে কত পরিশ্রম করিতে হইবে এবং সহস্র বৎসরে যাহার ভার বহনে আমরা সমর্থ হইব, এখনই তাহা স্কন্ধে লইলে চাপা পড়িয়া মরিতে হইবে।

বঙ্গদেশের সামাজিক-বিপ্লব যে চিরকাল তিষ্ঠিতে পারিবে না, এখনই তাহার প্রমাণ পাইতেছি। আমাদের দেশের যুবকেরা যখন প্রথম ইংরাজি শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তখন যাহা-কিছু দেশীয় তাহারই উপর তাঁহাদের আন্তরিক ঘৃণা ছিল ও যাহা-কিছু বিদেশীয় তাহারই উপর তাঁহাদের অতিশয় অনুরাগ জন্মিয়াছিল; এমন-কি, বিদেশীয় পানাহার চলিত হওয়াও তাঁহারা বঙ্গদেশের সভ্যতার একটি মুখ্য অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন; কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের সে ভাব অপনীত হইতেছে। এখন দেশীয় কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির উপর আমাদের অনুরাগ জন্মিতেছে ও বিদেশীয় অনেক আচার-ব্যবহারকে আমরা তুচ্ছ করিতে শিখিয়াছি। আমাদের দেশীয় কোনো লোক বিদেশীয়ের ছদ্মবেশ পরিয়া আসিলে আমরা তাহাকে ঘৃণা করি। কিছুদিন আগে কেবল ভাঙ্ ভাঙ্ শব্দ পড়িয়া গিয়াছিল, এখন সকলে রাখ্ রাখ্ করিয়া ছুটিয়া আসিতেছেন।

এখন সমাজে তিন দল উত্থিত হইয়াছেন। যাঁহারা আমূল-সংস্কার-প্রিয় তাঁহারা সকলই ভাঙিতে চান। যাঁহারা আমূল-রক্ষণ-প্রিয় তাঁহারা সকলই রাখিতে চান। যাঁহারা রক্ষণ-সংস্কার-প্রিয় তাঁহারা যাহা ভালো তাহাই রাখিতে চান, যাহা মন্দ তাহাই ভাঙিতে চান। এইরূপে উপরি-উক্ত দুইটি শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে এবং শেষোক্ত শক্তির উত্তেজনায় সমাজ ঠিক উন্নতির সরল পথে চলিতেছে।

উন্নতির পথ মধ্যবর্তী, উন্নতির পথ এক-ঝোঁকা নহে। কেন্দ্রাতিগ এবং কেন্দ্রানুগ শক্তি দুই দিক হইতে কোনো বস্তুর উপর কার্য করিলে তাহা মধ্যপথ আশ্রয় করে, আমূল-রক্ষণ-প্রিয় ও আমূল-সংস্কার-প্রিয় এই দুই শক্তি আমাদের সমাজের উপর কার্য করাতে সমাজ উন্নতির মধ্যবর্তী পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে আবার রক্ষণ-সংস্কার-প্রিয় উত্তেজনা করাতে সমাজ দ্বিগুণ সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছে। যাঁহারা আমূল-রক্ষণ-প্রিয় তাঁহারা উন্নতিশীল নাম ধারণ করিতে পারেন

না; যাঁহারা আমূল-সংস্কার-প্রিয় তাঁহারাও উন্নতিশীল নহেন, যাঁহারা রক্ষণ-সংস্কার-প্রিয় তাঁহারাই প্রকৃত উন্নতিশীল। কিন্তু ইঁহাদের কাহাকেও সমাজ হইতে বাদ দেওয়া যাইতে পারে না। আমূল-রক্ষণ-প্রিয় মনে করিতেছেন, আমূল-উন্নতি-প্রিয় সমাজকে অবনতির দিকে আকর্ষণ করিতেছেন, আবার আমূল-উন্নতি-প্রিয় মনে করিতেছেন যে, আমূল-রক্ষণ-প্রিয় সমাজকে অবনতির গহ্বর হইতে উদ্ধার করিতে বাধা দিতেছেন, আবার রক্ষণ-সংস্কারশীল মনে করিতেছেন যে, আমূল-রক্ষণ-প্রিয় ও আমূল-সংস্কার-প্রিয় উভয়ে মিলিয়া সমাজের দারুণ অনিষ্ট সাধন করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইঁহারা কেহই সমাজের উন্নতিপথের কণ্টক নহেন। তবে আমূল-সংস্কার ও আমূল-উন্নতি -প্রিয় উভয়ে ভ্রান্ত পথ আশ্রয় করিয়া সমাজের উন্নতির সাহায্য করিতেছেন ও রক্ষণ-সংস্কার-প্রিয় প্রকৃত পথ আশ্রয় করিয়া সমাজের উন্নতি সাধন করিতেছেন। যখন যুবকেরা নূতন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহির্গত হন, যখন তাঁহাদের উন্নতির ইচ্ছা আছে কিন্তু অভিজ্ঞতা নাই, যখন তাঁহারা উন্নতির কতকগুলি মূল সূত্র শিখিয়াছেন, কিন্তু দেশ-কাল-পাত্রে প্রয়োগ করিতে শিখেন নাই, যখন তাঁহারা মনে করেন যে বলিষ্ঠ ব্যক্তির খাদ্য ও রোগীর পথ্য একই, যখন তাঁহারা মনে করেন যে, ইংলন্ডের বোঝা বাংলার স্কন্ধের উপযোগী, তখন তাঁহারা বঙ্গদেশকে একেবারে ইংলন্ড করিতে চান, ভাগীরথীকে টেম্‌স্ করিতে চান, বাঙালিকে ফিরাঙ্গি করিতে চান। কিন্তু যখন তাঁহারা সংসারে প্রবিষ্ট হন, তখন ক্রমশ শান্ত ও শীতল হইয়া আসেন ও রক্ষণশীলতার প্রতি একটু একটু করিয়া ঝুঁকিতে থাকেন। আবার তখনকার নব্য বংশ সমাজের আগাগোড়া ভাঙিবার জন্য গদা উদ্যত করেন। এইরূপে রক্ষণশীল ও সংস্কারশীল চিরকালই সমাজে জাগ্রত থাকে, না থাকিলে সমাজের দারুণ অনিষ্ট হয়। যখন ভারতবর্ষে উন্নতির মধ্যাহ্নকাল, তখন ধীরে ধীরে কতকগুলি নূতন দর্শন ও নূতন দল নির্মিত হইতে লাগিল এবং তাহাদের প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম উত্থিত হইয়া সমাজে একটি ঘোরতর বিপ্লব বাধাইয়া দিল। পৌরাণিক ঋষিরা ভুল বুঝিলেন, তাঁহারা মনে করিলেন এরূপ বিপ্লব অনিষ্টজনক। অমনি পুরাণে, সংহিতায় ও অন্যান্য নানাপ্রকারে সমাজের হস্তপদ অষ্টপৃষ্ঠে বন্ধন করিয়া ফেলিলেন এবং ভবিষ্যতে এরূপ বিপ্লব না বাধে তাহার নানা উপায় করিয়া রাখিলেন। সমাজের স্বাস্থ্য নষ্ট হইল এবং সমাজ ক্রমশই অবনতির অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। সংস্কারশীলতার অভাবে ও রক্ষণশীলতার বাড়াবাড়িতেই হিন্দুসমাজ নির্জীব হইয়া পড়িল।

বঙ্গদেশের এই সামাজিক বিপ্লব আমাদের তো শুভ লক্ষণ বলিয়া মনে হয়; যে উপায়েই হউক, এই যে বহুকাল-ব্যাপী নিরুদ্যমের ঘুম ভাঙিয়াছে এবং শিক্ষিত লোকেরা নবউদ্যমে কার্য করিবার ক্ষেত্র অন্বেষণ করিতেছেন ইহা তো মঙ্গলেরই চিহ্ন। যেমন যুদ্ধ-বিপ্লবের অনুষ্ঠানে জাতির শারীরিক বল বর্ধিত হয়, সেইরূপ মানসিক বিপ্লবে মনের বল বাড়িবার কথা। আর অধিক দিন নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে সমস্ত বাঙালি জাতি নির্জীব হইয়া পড়িত। এখন যেরূপ ভাঙাগড়া ও চারি দিক হইতে উপাদান সংগ্রহ আরম্ভ হইয়াছে, ইহাতে বোধ হয়, অল্প-দিনের মধ্যে এই বাংলার সমাজ নূতন দৃঢ়তর ভিত্তিতে স্থাপিত হইবে।

ভারতী
মাঘ ১২৮৪

বিজন চিন্তা : কল্পনা

এই মহাকল্লোলময় মহানগরের এক প্রান্তে একখানি পর্ণকুটিরে আমার বাস। আমি সংসারী নহি, কেননা আমার সংসার নাই— আমি বিধবা, আমার আদর করিবার স্বামী নাই, সান্ত্বনা করিবার বন্ধু নাই, স্নেহ কিনিবার বিভব নাই, যত্ন লাভের সামর্থ্য নাই ; ছিন্ন তৃণবৎ আমি সংসার-সাগর-স্রোতে একলাই ভাসিতেছি, একলাই উঠিতেছি, একলাই পড়িতেছি। ভিক্ষা ভিন্ন আমার আর

উপায় নাই। ভিক্ষা করিতে গিয়া আমি নানা প্রকার লোক দেখিতে পাই— তাহাদের নানাবিধ ভাবভঙ্গি আলোচনা করি— বিদ্বান মূর্খদের দলে দাঁড়াইয়া তাহাদের মতামত শুনি, মনে মনে হাসি কখনো বা কাঁদি, আবার বাড়ি আসিয়া সেই-সব কথা লিখি। এইরূপে কোনোপ্রকারে সময় কাটাই। আমি এখন খুব স্বাধীন, অথচ স্বাধীনতায় সুখ পাই না। মনের ভিতর যেন কেমন একটা হু হু করিতে থাকে। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রিকাল পর্যন্ত আমি কত লোকই দেখিতেছি কিন্তু আমি কেমন আছি, বা আমি কে, এ কথা জিজ্ঞাসা করিবার একজনকে দেখিতে পাই না— সুতরাং লক্ষ লক্ষ মানবের মধ্যে থাকিয়াও আমার পর্ণকুটিরের বিজনতা কখনোই ভঙ্গ হয় না। আমি আপনি হাসি, আপনি কাঁদি, আপনি ভাবি। মনে করিয়াছিলাম যে সংসারের শৃঙ্খল ছেদ করিয়া এই বিজন কুটিরে মনের সুখে বাস করিব। মনে করিয়াছিলাম যে, যখন কাহারো সঙ্গে আর সম্পর্ক নাই তখন কিসের উদ্‌বেগ, যখন আমি আর মোহের অধীন নহি তখন আর কিসের যাতনা, যখন মায়ায় আবদ্ধ নহি তখন কিসের ভাবনা, কিন্তু অপরিমিত স্বাধীনতাতেই কি সুখ?— অপরিমিত স্বাধীনতাতে রাজ্য উচ্ছিন্ন হয়, সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হয়, ব্রহ্মাণ্ড বিপ্লবস্থ হয়। লোকে যেমন ভাষা কথায় বলিয়া থাকে— 'বড়ো হবে তো ছোটো হও' তেমনি স্বাধীনতা সম্বন্ধে এ কথাও বলা যাইতে পারে যে, স্বাধীন হবে তো পরাধীন হও। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডপক্ষে যে কথা স্থির সিদ্ধান্তপ্রায়, সমস্ত সমাজ, সমস্ত রাজ্যপক্ষে যে কথা স্থির সিদ্ধান্তপ্রায়, প্রত্যেক মনুষ্যের পক্ষে কেনই বা তাহা অপ্রতিষ্ঠ হইবে? সমস্ত বাহ্য প্রকৃতির নিয়ম পরাধীনতা; সমস্ত বাহ্য অন্তঃপ্রকৃতির নিয়মও পরাধীনতা; সমস্ত বাহ্য প্রকৃতি এক আকর্ষণের অধীন হইয়া চলিতেছে, সমস্ত অন্তঃপ্রকৃতিও এক আকর্ষণের অধীন হইয়া চলিতেছে। যে লোকে বলিয়াছেন—

> 'আমার হৃদয় আমারি হৃদয়
> বেচি নি তো তাহা কাহারো কাছে।'

তিনি মিথ্যা কথা কহিয়াছেন। এরূপ গর্বিত আস্ফালন কোনো হৃদয়সম্পন্ন মানুষের কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইতে পারে না। আমার হৃদয় আছে যখনই ভাবিতে পারিলাম তখন ইহাও নিশ্চয় যে সে হৃদয় পরাধীন— হয় কোনো ব্যক্তিবিশেষের নয় কোনো বস্তুবিশেষের। কিন্তু এই প্রকার পরাধীনতা কি বিষাদের? এই পরাধীনতার শৃঙ্খল কি মানুষ মাকড়শার মতো আপনা হইতেই উদ্‌গত করিয়া আপনিই তাহাতে বিজড়িত হইতে চাহে না? এই পরাধীনতার বীজ মানবহৃদয়ে নিহিত থাকিলেও মানুষে আপনি কি প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া তাহা অঙ্কুরিত করিতে— তাহা বৃক্ষে পরিণত করিতে চাহে না? পরিণামে সেই বৃক্ষে বিষময় ফলই উৎপন্ন হোক আর সুধাময় ফলই উৎপন্ন হোক, সে বৃক্ষকে ফলিত করিতে কি মানুষে কোনো প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে শিথিলপ্রযত্ন হয়? মানবহৃদয়ের ইতিবৃত্ত পড়িলে কখনোই তাহা বোধ হইবে না। কিন্তু কিসের মোহে মুগ্ধ হইয়া মানুষে এইরূপ স্ব-নির্মিত তরঙ্গে তরঙ্গিত হইতে থাকে? সে কেবল কল্পনার মোহে! মহাকবি শেক্‌স্‌পিয়র বলিয়াছেন বটে যে, কবি প্রণয়ী আর উন্মাদগ্রস্ত ইহারাই কল্পনাপ্রধান, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বাহ্যপ্রকৃতি যেমন এক মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতে পরিচালিত হইতেছে, মানবহৃদয়ও সেইপ্রকার কেবল কল্পনা-প্রভাবেই পরিচালিত হইতেছে। ম্যাডেগ্যাস্কর দ্বীপের অসভ্য জাতিরা যখন তাহাদের বিকট-দর্শন প্রস্তরময় দেবমূর্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কাতর হৃদয়ে বর প্রার্থনা করে, হিন্দুরা যখন বিজয়া-দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জন করিয়া ভগ্নহৃদয় হয়, খৃস্টানেরা যখন কুমারীপুত্র যিশুখৃস্টকে আপনাদের পাপের ভার বহন করিতে প্রার্থনা করে, তখন কি কল্পনার মোহন প্রভাব প্রতীত হয় না? ধনোপার্জন, বিদ্যাশিক্ষা, পুত্রপালন, এ সকলেরই গভীরতম মূল প্রদেশে কল্পনা-শক্তিই প্রচ্ছন্ন ভাবে বিরাজিত থাকে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, এ-সকল কার্যে আশাই আমাদিগকে প্রবর্তিত করে, কিন্তু যদি আশানুরূপ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের কাচ কল্পনার দ্বারা সুমার্জিত ও সুরঞ্জিত না হইত, তাহা হইলে আশার উত্তেজনায় কেহই উত্তেজিত হইত না।

কল্পনার মহান প্রভাব এখানেই ক্ষান্ত নহে, শুদ্ধ যে আমরা ইহার প্রভাবে সুন্দর সামগ্রীকে

সুন্দরতর দেখি এমন নহে, সুদ্ধ যে আমরা ইহার প্রভাবে সকল-প্রকার বিঘ্ন ব্যবধান অতিক্রম করিয়া মরুভূমিতে থাকিয়াও নন্দনকাননের শোভা সন্দর্শন করি এমন নহে, কিন্তু ইহার প্রভাবে আমরা সকল-প্রকার সুন্দর পদার্থ হইতে তাহাদের সুন্দরতম অংশগুলি গ্রহণ করিয়া অশেষবিধ তিলোত্তমা বা প্যান্ডোরা সৃজন করিতে পারি।

সত্য বটে যে কল্পনা যেমন সুখের কারণ, আবার কল্পনা তেমনি দুঃখের কারণ, সত্য বটে যে, কল্পনা-প্রভাবে আমরা বৈজয়ন্তধামকেও শ্মশানের চিতা আকারে রূপান্তরিত করিতে পারি, সত্য বটে যে কল্পনা প্রভাবে আমরা মিলটন-বর্ণিত দেবতুল্য মানবমুখেও বায়রন-বর্ণিত পিশাচের প্রতিকৃতি উপলব্ধি করিতে পারি এবং মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর দেবী-অংশভূতা নারীজাতিকেও হ্যামলেটের মতো অসতীত্বরূপ দুর্বলতার নামান্তর মনে করিতে পারি, কিন্তু তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে কল্পনার দোষ নহে, তাহা আমাদেরই দোষ। কল্পনাকে সংযত করা, শিক্ষিত করা ও বিবেকবুদ্ধির অধীন করা আমাদের উপরেই নির্ভর করিতেছে। কল্পনাই আমাদের কার্যের প্রবর্তক, ভাবনার প্রকৃত উত্তেজক, আশার চিত্রকর, সুখের আত্মা।

কল্পনার তারতম্যে আমাদের সুখেরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। এই যে সমস্ত বিশ্বকাণ্ড আমাদের সম্মুখে প্রসারিত রহিয়াছে, এই যে অনন্ত শোভার ভাণ্ডার আমাদের সম্মুখে মুক্তদ্বার রহিয়াছে— ইহার কি কোনো রসই আমরা অনুভব করিতে পারিতাম, কোনো ভাবই কি গ্রহণ করিতে পারিতাম, কোনো শোভাই কি উপভোগ করিতে পারিতাম যদি কল্পনার দ্বারা আমাদের দিব্য চক্ষু না পরিস্ফুটিত হইত? পৃথিবী তো মৃত্তিকাময়, সমুদ্র তো সলিলময়, সূর্য তো অগ্নিময় মাত্র— তবে কেন পৃথিবীর শোভা সন্দর্শনে হৃদয় দ্রবীভূত হয়, সাগরের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ও উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে এবং সূর্যের অভ্যুদয়ে হৃদয়ও এক নূতন জীবনে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে।

কল্পনা বিরহিত হইলে কে আর শেক্‌স্‌পিয়রের মতন বৃক্ষ-পল্লবের অস্ফুট ভাষা বুঝিতে পারিত, প্রবহমান নদীবক্ষে গ্রন্থ পাঠ করিতে পারিত, প্রস্তর-খণ্ডে উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিত ও সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডময় মঙ্গলভাব উপলব্ধি করিতে পারিত? কল্পনায় সকল দ্রব্যকেই হৃদয়ের উপভোগের মতো করিয়া লওয়া যায়—

The meanest floweret of the vale,
The simplest note that swells the gale,
The common sun, the air, the skies,
To him are sweetest Paradise.

ভারতী
ফাল্গুন ১২৮৪

কবিতা-পুস্তক

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

সকল পুস্তকের উদ্দেশ্যই হয় জ্ঞান না-হয় আমোদ না-হয় উভয়ের সম্মিশ্র। এখানে আমোদ শব্দটি আমরা অতি প্রশস্তভাবে ব্যবহার করিতেছি। ডিকুইন্সি বলেন যে উচ্চ অঙ্গের কাব্য বা নাটক পড়িয়া আমরা আমোদ পাই— এ কথা বলিতে গেলে সে-সকল কাব্য বা নাটকের অবমাননা করা হয়; তিনি বলেন আমাদের হৃদয়ের নিভৃত বিজনে অনেক মহান্ ভাব এমন সুষুপ্ত ভাবে অবস্থান করে যে প্রাত্যহিক জীবনের কোনো ঘটনাই তাহাদিগকে জাগাইয়া দিতে পারে না— কিন্তু প্রকৃত কবিদের কাব্য পাঠ করিতে করিতে সেই-সকল ভাব জাগরিত হইয়া উঠে এবং আমরা এই দীন হীন ক্ষুদ্র জীব হইতে যে প্রকৃত পক্ষে কত দূর উচ্চপদবীগত তাহার প্রতি তখন আমাদের চেতন হয়। এ স্থলে সেই-সকল কাব্যগুলিকে আমোদ বা জ্ঞানপ্রদ বলা

অপেক্ষা শক্তিপ্রদ বলা উচিত। কিন্তু ডিকুইন্সির উত্তরে আমরা বলি যে ওই শক্তিপ্রদ গুণটি উচ্চ-অঙ্গের জ্ঞান ও আমোদের সমষ্টি বলিলে কোনো দোষ হয় না। এ বিষয়ে তর্ক না তুলিয়া আমরা এই সিদ্ধান্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম যে সকল পুস্তকের উদ্দেশ্যই প্রশস্ত ভাবে জ্ঞান কিংবা আমোদ কিংবা উভয়ের সমষ্টি। এই সিদ্ধান্তটি মনে রাখিলে অনেক পুস্তকের সমালোচনা সহজ হইয়া পড়ে।— এই সিদ্ধান্তটির উপর দৃষ্টি রাখিয়াই আমরা বলিতে বাধ্য হইলাম যে বঙ্কিমবাবুর কবিতা-পুস্তক আমাদিগের ভালো লাগিল না— জ্ঞানের কথা এ স্থলে উল্লেখ করাই বাহুল্য মাত্র, কিন্তু আমোদ— সাধারণ, সামান্য, অকিঞ্চিৎকর আমোদ পর্যন্ত এ পুস্তকের কোনো স্থল পাঠ করিয়া আমরা পাইলাম না— বঙ্কিমবাবুর কোনো গ্রন্থই যে এরূপ নীরস, নির্জীব, স্বাদগন্ধহীন— কিছুই না— হইবে, তাহা আমরা কখনো স্বপ্নেও ভাবি নাই।

প্রথম কবিতা পৃথ্বীরাজ-মহিষী সংযুক্তার বিষয়। বিষয়টি অতিশয় উচ্চ ও মহৎ। পৃথ্বীরাজ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন— সেই দুঃস্বপ্ন যবন-কর্তৃক ভারত-বিজয়ের আভাস মাত্র, ক্রমে সেই স্বপ্ন প্রকৃত ঘটনায় পরিণত হইল— ঘোরির মহম্মদ আসিয়া স্থানেশ্বরে হিন্দুরাজকে পরাভব করিলেন, সংযুক্তা নিরুপায় হইয়া চিতারোহণ করিলেন।— এই বিষয়টির উপর যদি একজন প্রকৃত কবির কল্পনা খেলিতে পাইত, তাহা হইলে ইহাকে সূর্যকিরণসংযুক্ত স্ফটিকের ন্যায় নানা বর্ণে সুরঞ্জিত করিতে পারিত, কিন্তু বঙ্কিমবাবু যেন পরীক্ষা স্থলে 'সংযুক্তা কে ছিল'— 'স্থানেশ্বরের যুদ্ধে কী হইল' এবং 'সংযুক্তা কী রূপে মরিল'— এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। সমস্ত কবিতাটিতে এমন একটি ভাব নাই, এমন একটি কথা নাই, যাহাতে হৃদয় নাচিয়া উঠে, যাহাতে ধমনী দিয়া রক্ত প্রবলতর বেগে প্রবাহিত হয়— যাহাতে আর্য-গৌরবের কণামাত্রও কল্পনার চক্ষে বিভাসিত হয়।— অনর্থক শব্দ আড়ম্বরে কবিতাটির কায়া বৃদ্ধি হইয়াছে— অসংগত-মেদ-স্ফীত রোগীর ন্যায় ইহার লাবণ্য-শ্রী নাই— জীবনের আভাস মাত্রও আছে কি না সন্দেহ। পৃথ্বীরাজ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন— মহিষীকে স্বপ্নের কথা ও আশঙ্কিত উৎপাতের কথা বলিয়া দুঃখে ও ভয়ে নিবেদন করিলেন

'বার বার বুঝি এই বার শেষ!
পৃথ্বীরাজ নাম বুঝি না রয়।'

তখন

'শুনি পতিবাণী, যুড়ি দুই পাণি
জয় জয় জয়! বলে রাজরানী
জয় জয় জয় পৃথ্বীরাজে জয়
জয় জয় জয়! বলিল বামা।
কার সাধ্য তোমা করে পরাভব
ইন্দ্র চন্দ্র যম বরুণ বাসব!
কোথাকার ছার তুরস্ক পহ্লব
জয় পৃথ্বীরাজ প্রথিতনামা॥

. . .

এত বলি বামা দিল করতালি
দিল করতালি গৌরবে উছলি।' ইত্যাদি।

আর্য-মহিষীর সহস্রবার সঘনে 'জয় জয়' করাতে আমাদের শৈশবকালের একটি কথা মনে পড়ে— ভূতের স্বপ্ন দেখিয়া সহসা জাগিয়া পড়িয়া যখন ভয়সূচক ক্রন্দন করিয়া উঠিতাম, তখন ওইরূপ সঘনে বারংবার 'রাম রাম' উচ্চারণ করিয়া ভীত ধাত্রী প্রেতযোনিকে খেদাইতে চেষ্টা করিতেন। পৃথ্বীরাজের মতো বীরপুরুষের পক্ষে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ভীত হওয়া এবং তাঁহার রানী সংযুক্তার পক্ষে সহস্র 'জয় জয়' ধ্বনি করিয়া আশ্বাস প্রদান করা যে কতদূর কল্পনার ব্যভিচার

তাহা আর কী বলিব। সিজরের মৃত্যুর পূর্বআভাসস্বরূপ তাঁহার মহিষী যখন নানা প্রকার দুঃস্বপ্ন, নানা অমঙ্গল-লক্ষণ দেখিয়া সিজরকে রোমের সাধারণ সভাস্থলে যাইতে নিষেধ করিতে লাগিলেন তখন সিজর এই বলিয়া উত্তর দিলেন— 'ভীরুরাই প্রকৃত মৃত্যুর পূর্বে শত সহস্রবার মরিয়া থাকে— কিন্তু বীরপুরুষ একবার ব্যতীত আর মৃত্যু আস্বাদন করে না।' সে যা হউক, সংযুক্তা হিন্দুমহিলা হইয়া কেমন করিয়া 'ইন্দ্র' ও 'বাসব' ভিন্ন ভিন্ন দেবতা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন? কিন্তু সংযুক্তার এই শিক্ষার দোষ মার্জনীয় হইলেও তাঁর এরূপ স্থলে ঘন ঘন করতালি দেওয়া মার্জনীয় হইতে পারে না— তাঁহার ঘোর করতালি 'দেখিয়া হাসিল ভারতপতি'— তিনি তো স্বচক্ষে রানীর ওরূপ উন্মাদ অবস্থা দেখিয়া হাসিবেনই— আমরা কল্পনার চক্ষে দেখিয়াই হাসি সংবরণ করিতে পারিতেছি না— ওরূপ করতালির উপর করতালি অল্পবয়স্ক বালক-বালিকারই সাজে— রাজরানীর তো কথাই নাই— কোনো ভদ্র কুলনারী সহসা ওরূপ করিলে তাঁহাকে লোকে উন্মাদ মনে করিবে না তো আর কী করিবে।

দ্বিতীয় কবিতাটি 'আকাঙ্ক্ষা'— অর্থাৎ রাধিকা-সুন্দরী শ্রীকৃষ্ণকে কী কী হইতে অভিলাষ করিতেছেন এবং শ্যামসুন্দর তাহার কী কী উত্তর দিতেছেন তাহার একটা তালিকা। আমাদের মতে উত্তর-প্রত্যুত্তর-কবিতাতে প্রায়ই বড়ো একটা প্রকৃত কবিতা থাকিতে পারে না; কারণ উত্তরগুলি প্রায়ই হৃদয় অপেক্ষা বুদ্ধি-সাপেক্ষ— এরূপ স্থলে কেমন করিয়া খুব জবাব দিব ইহাই কবির উদ্দেশ্য হয়। প্রাচীন হরু ঠাকুর বা রাম বসু প্রভৃতি প্রকৃত কবিরা প্রশ্ন কবিতায় যতখানি কবিত্ব দেখাইয়াছেন, উত্তর কবিতায় তাহার শতাংশের একাংশও দেখাইতে পারেন নাই। স্বীকার করি যে তাহাদের উত্তরে কতকটা কারিগুরি, বাক্যবিন্যাসের কারিগুরি, দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা ব্যতীত প্রকৃত কবিতার আভাস মাত্রও কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। বঙ্কিমবাবুর 'সুন্দর সুন্দরী' দেখিয়া শুকশারীর পুরাতন কবিতাটি আমাদের মনে পড়িল—

শুক বলে আমার কৃষ্ণ কদমতলায় থানা,
শারী বলে আমার রাধা করে আনাগনা,
নইলে কিসের থানা,
শুক বলে আমার কৃষ্ণ গিরি ধ'রে ছিল,
শারী বলে আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল,
নইলে পারবে কেন?

কিন্তু 'শুক শারীর' কবিতার সহিত 'সুন্দর সুন্দরী'র কবিতার এই প্রভেদ যে— প্রথমটি উত্তর-কাটাকাটির দৃষ্টান্ত, দ্বিতীয়টি মনস্তুষ্টিকর উত্তর-প্রত্যুত্তরের দৃষ্টান্ত। সুন্দরী শ্রীকৃষ্ণকে নানা বস্তু হইতে অভিলাষ করিতেছেন, সুন্দরও তাহাই হইতে উত্তরে অভিলাষ করিতেছেন— কিন্তু সুন্দরী, রমণী-প্রকৃতি-সুলভ লজ্জায় সকল কথা খুলিয়া বলিতে পারিতেছেন না, সুন্দর সুরসিক পুরুষের মতো কেবল সুন্দরীর অভিলাষের উপর মাত্রা চড়াইতেছেন।

সুন্দরী বলিলেন :

কেন না হইলে তুমি চাঁদের কিরণ,
ওহে হৃষীকেশ।
বাতায়নে বিষাদিনী, বসিত যবে গোপিনী,
বাতায়ন পথে তুমি লভিতে প্রবেশ॥
আমার প্রাণেশ।

সুন্দর উত্তর করিলেন :

কেন না হইনু আমি চন্দ্রকরলেখা,
রাধার বরন,
রাধার শরীরে থেকে, রাধারে ঢাকিয়ে রেখে,

ভুলাতাম রাধারূপে অন্যজনমন—
পর ভুলান কেমন?

সুন্দরী বলিলেন :

কেন না হইলি তুই, কাননকুসুম,
রাধাপ্রেমাধার—
না ছুঁতেম অন্য ফুলে, বাঁধিতাম তোরে চুলে,
চিকণ গাঁথিয়া মালা, পরিতাম হার॥
মোর প্রাণাধার!

সুন্দর উত্তর করিলেন :

কেন না হইনু হায়! কুসুমের দাম,
কণ্ঠের ভূষণ।
এক নিশা স্বর্গ সুখে, বঞ্চিয়া রাধার বুকে,
ত্যজিতাম নিশি গেলে জীবন যাতন—
মেখে শ্রীঅঙ্গচন্দন॥

দুঃখের বিষয় আমরা 'তথাস্তু' বলিতে পারিলাম না।

তৃতীয়, অধঃপতন সংগীতটিতে বঙ্কিম-ভাবের(?) রসিকতার চূড়ান্ত হইয়াছে। কিন্তু বিষয়ের দোষে রস মারা পড়িয়াছে— হাসিতে হাসিতে অধঃপতনে যাইতেছি কুখনো যেন আর কাঁদিতে হইবে না— এ ভাব কী ভয়ানক ভাব! মানুষ মরিতেছে তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হাস্য-পরিহাস আমোদ-প্রমোদ— আমোদ-প্রমোদ করিবার আর কি স্থান নাই! কবিতাটিতে উত্তম রসিকতা প্রকাশ হইয়াছে; কিন্তু বিষয় নাকি অধঃপতন— নাম শুনিলেই গা কাঁপে— এ স্থানে রসিকতার হাস্যবদন দেখিয়া, অমাবস্যা রজনীতে শ্মশানমধ্যে একজন সুন্দরী রমণীকে খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিতে দেখিয়া— কাহারো যে হাসি পাইবে, সহৃদয় মানব প্রকৃতিতে তো এরূপ লেখে না; তবে যদি গ্রন্থকার দানব-প্রকৃতিকে লক্ষ্য করিয়া কবিতাটি রচিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহা বিকট হাস্য হাসাইবার মতো— ঘোরতর একটি অধঃপতনের পাথেয় সম্বল হইয়াছে— ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

চতুর্থ— 'সাবিত্রী'— এই কবিতাটির স্থানে স্থানে দু-একটি সুন্দর বর্ণনা আছে— যখন যমরাজ শোকাতুরা সাবিত্রীর সম্মুখীন হইতেছে কবি লিখিতেছেন :

'হেরে আচম্বিতে এ ঘোর সংকটে,
ভয়ংকর ছায়া আকাশের পটে,
ছিল যত তারা তাহার নিকটে
ক্রমে ম্লান হয়ে গেল নিবিয়া।*
সে ছায়া পশিল কাননে— অমনি,
পলায় শ্বাপদ, উঠে পদধ্বনি,
বৃক্ষ শাখা কত ভাঙিল আপনি,
সতী ধরে শবে বুকে আঁটিয়া॥

কিন্তু গ্রন্থকার যে সত্যবানকে জীবন দান না করিয়া সাবিত্রীকে পর্যন্ত মারিয়া ফেলিলেন কেন— তাহা তো আমরা বুঝিতে পারি না। কোথায় সতীত্বের অমোঘ প্রভাবে যমহস্ত হইতেও

* ছায়ার নিকট তারা ম্লান হইয়া নিভিয়া গেল— ইহা কীরূপ সংগত বুঝিতে পারি না। ছায়া কি দিবাকরতুল্য?

পতিব্রতা সতী মৃত স্বামীকে ফিরিয়া লইবেন— না সাবিত্রীও এ দেশীয় শত সহস্র স্ত্রীর মতো যমের নিকটে সহমরণের বর প্রার্থনা করিয়া পতির সঙ্গেই সহমরণে অন্তর্ধান হইলেন। যদি কোনো পুরাণে এরূপ কথা থাকিত তা হইলেও বুঝিতাম যে গ্রন্থকার কী করিবেন— কিন্তু তাহা নয়, বঙ্কিমবাবু স্বেচ্ছামতো পুরাণের উৎকর্ষ সাধন করিতে গিয়া দেশীয় একটি অতি সুন্দর কাহিনীর সুন্দরতম অংশটুকু একেবারে মৃত্তিকাসাৎ করিয়াছেন। আমরা স্বীকার করি যে স্বামীর সহিত ইচ্ছাপূর্বক সহমরণে যাওয়া বিশেষ অনুরাগের লক্ষণ। কিন্তু তাহা মহান সতীত্বের পরাকাষ্ঠা নহে;— অসতীর অগ্রগণ্যা ক্লিয়োপেট্রাও আণ্টনির মৃত্যুর পর ইচ্ছাপূর্বক জীবন বিসর্জন করিয়াছিলেন— তিনিও মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে ইরাস্ নামক সহচরীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন 'ত্বরায়— ত্বরায়— রে শান্ত ইরাস্— আর বিলম্ব করিস না— আমি যেন শুনিতে পাইতেছি আমাকে আণ্টনি ডাকিতেছেন, আমি যেন দেখিতে পাইতেছি তিনি আমার এই আত্ম-বিসর্জনরূপ মহৎ কার্য দেখিবার জন্য জাগিয়া উঠিতেছেন।' স্বীকার করি যে এ কথাগুলি শেক্‌সপিয়রের, কিন্তু শেক্‌সপিয়র ইতিহাসের মূলোচ্ছেদ করিয়া কপোলকল্পিত কতকগুলি প্রলাপ বাক্য কহেন নাই— তিনি ইতিহাসকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও কল্পনা-প্রাচুর্য খুবই দেখাইয়াছেন— বঙ্কিমবাবু বিপরীত প্রথা অবলম্বন করিয়া বিপরীত ফল উৎপাদন করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে আণ্টনি ক্লিয়োপেট্রার স্বামী ছিল না— কিন্তু তাহাতে কী এলো গেল— তাহাতে আরও সপ্রমাণ হইতেছে যে সতী স্ত্রী না হইলেও অনুরাগের ঝোঁকে এক জন অসতীও সহমরণে যাইতে পারে; মনে করো— ক্লিয়োপেট্রার শেষ দশায় যখন আণ্টনির সহিত প্রণয় হইল— তখন আণ্টনির যদি বিবাহই হইত, তাহা হইলেই কি ক্লিয়োপেট্রার পূর্বের বেশ্যাবৃত্তি ভুলিয়া তাঁহার ইচ্ছামৃত্যু দেখিয়াই তাঁহাকে সতী ও পতিব্রতা কহিতাম?— সহমরণে যাওয়াই কি সাবিত্রীর অলৌকিক পাতিব্রত্যের পরাকাষ্ঠা মনে করিতে হইবে?— পুরাণে তাহা বলে না। পুরাণে এই কথাই বলে যে সাবিত্রী আপনার সতীত্ব-প্রভাবে উত্তেজিত হইয়া এই সংকল্প করিলেন যে সতীত্বের অলৌকিক মাহাত্ম্যে যমের হস্ত হইতে পর্যন্ত আমার মৃত স্বামীকে ফিরাইয়া আনিব। সেই সংকল্প অনুসারে তিনি একাকিনী চতুর্দশীর ভীষণ নিশীথ-যোগে বিকট অরণ্যে মৃত পতিকে ক্রোড়ে লইয়া যমরাজের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন— যমরাজ সাবিত্রীকে দেখিয়া প্রীত হইলেন— প্রীত হইয়া অবশেষে সত্যবানকে সতী স্ত্রীর আলিঙ্গনে প্রত্যর্পণ করিলেন।— পুরাণের এ কথা কেহ বিশ্বাস করিবেন না বটে, কিন্তু ইহার ভিতর একটি ভাব আছে— এবং সেই ভাবের প্রভাবে সাবিত্রীর গল্পটি ভারতবাসিনীদের হৃদয়ের শিরা এবং উপশিরায় ঘোর ঘনিষ্ঠ ভাবে বিজড়িত আছে। দুই-তিন সহস্র সতী স্ত্রী মৃত পতির সহিত সহমরণে গিয়াছে— কিন্তু কেহই তাহাদের সহমরণকে সতীত্বের যারপরনাই মাহাত্ম্য লক্ষণ মনে করে না। পুরাণের সহিত বাল্যক্রীড়া করা আমাদের মতে যুক্তি-সংগত নহে।

পঞ্চম— 'আদর'— এ কবিতাটি মন্দ নহে— ইহার প্রথম কথাগুলিই অতি সুন্দর হইয়াছে—

'মরুভূমিমাঝে যেন, একই কুসুম,
পূর্ণিত সুবাসে।
বরষার রাত্রে যেন, একই নক্ষত্র,
আঁধার আকাশে॥
নিদাঘ সন্তাপে যেন একই সরসী,
বিশাল প্রান্তরে।
রতন শোভিত যেন, একই তরণী,
অনন্ত সাগরে।
তেমনি আমার তুমি, প্রিয়ে, সংসার-ভিতরে॥

কিন্তু গ্রন্থকার কিছু বাড়াবাড়ি করিতে গিয়া হাস্যাস্পদ হইয়া পড়িয়াছেন— তিনি আরও বলিতেছেন—

সুশীতল ছায়া তুমি, নিদাঘ সন্তাপে,
রম্য বৃক্ষতলে।
শীতের আগুন তুমি, তুমি মোর ছত্র,
বরষার জলে॥

এই কথাগুলি পড়িয়া বাউলদের একটি পুরানো গান আমাদের মনে পড়িল—

'গৌর আমার নাকের নথ, কণ্ঠের কণ্ঠমালা
গৌর আমার কানের দুল, হাতের বাজু বালা
গো-উ-র হ-রি।

ষষ্ঠ— 'বায়ু'— এই কবিতাটি একটি প্রহেলিকা স্বরূপ। ইহার শীর্ষে 'বায়ু' শব্দটি না থাকিলে ইহা একটি সুন্দর হেঁয়ালি হইতে পারিত। বায়ু বলিতেছে—

'আমিই রাগিণী, আমি ছয় রাগ,
কামিনীর মুখে আমিই সোহাগ,
বালকের বাণী অমৃতের ভাগ,
মম রূপান্তর॥'

'কামিনী সোহাগ' বা 'বালকের বাণী' যে বায়ুরই রূপান্তর তাহা একজন কবি অপেক্ষা একজন বৈজ্ঞানিক বুঝাইয়া দিলে ভালো হইত। এইজনাই কবি ক্যাম্প্‌বেল বলিয়াছেন যে 'কঠোর বিজ্ঞানশাস্ত্র আসিয়া প্রকৃতির মুখ হইতে মোহিনী অবগুণ্ঠন তুলিয়া লয় এবং সকল বস্তুকেই পাঞ্চভৌতিক নিয়মের অধীন করিতে চাহে।'

—আমরা বিজ্ঞানের অবমাননা করিতে চাহি না— কিন্তু কবির কল্পনা হইতে বিজ্ঞানের তন্ন তন্ন দৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য রাখা উচিত। কিন্তু বায়ুর আরও বক্তব্য আছে— সে বলিতেছে—

আমি বাক্য, ভাষা আমি,
সাহিত্য বিজ্ঞান স্বামী,
মহীর ভিতর॥'

এত কথা— আরও বিস্তর-বিস্তর কথা পর্যায়ক্রমে না বলিয়া বায়ু তো এক কথা বলিতে পারিত— 'আমি সংসারের জীবন— সংসারে যাহা-কিছু আছে আমি না থাকিলে কিছুই থাকিত না।' বায়ু অতিশয় বাচাল, তাই আরও বলিতেছে—

'উড়াই খগে গগনে—'

গ্রন্থকার মনে করিলেন যে বায়ুর এ কথা সহজে কেহ বিশ্বাস করিবে না, অথবা বুঝিতে পারিবে না— তিনি সেইজনা পাঠকদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া নীচে টীকার ছলে বলিয়াছেন— 'Vide Reign of Law, by Duke of Argyll, —chap VII. Flight of Birds.' কিন্তু গ্রন্থকার এ স্থলে টীকা না করিয়া বায়ু কেমন করিয়া 'সাহিত্য বিজ্ঞান স্বামী' হইল তাহা বুঝাইয়া দিলে আমরা প্রকৃতপক্ষে উপকৃত হইতাম।

সপ্তম— 'আকবর সাহেব খোষ রোজ' এ কবিতাটি কতক সুশ্রাব্য হইয়াছে— কিন্তু ইহাতে আবার কল্পনার যতদূর ব্যভিচার হইয়াছে এমন আর কুত্রাপি হয় নাই। একটি ক্ষত্র-কুলনারী আকবর শার খোষ রোজ দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি 'খোষরোজের' অশ্লীল ব্যাপার দেখিয়া ঘৃণায় ও ক্রোধে সে স্থল হইতে পলাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পথ না দেখিতে পাওয়ায় যখন তিনি কাতর স্বরে রোদন করিতেছেন তখন আকবর শা সেইখানে আসিয়া পড়িল এবং রমণীর রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া রমণীর ধর্মনাশ কামনায় সবলে তাঁহাকে ধরিয়া টানিতে লাগিলেন— তখন রমণী নিরুপায় হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

'শুকাল বামার বদন-নলিনী
ডাকে ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি মে দুর্গে।
ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি! বাঁচাও জননি!
ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি মে দুর্গে॥'

এত 'ত্রাহি'র আদ্য শ্রাদ্ধ হইলেও পাষণ্ড যখন কিছুই শুনিল না, তখন রূপসী ছুরিকা বাহির করিয়া আকবর শাকে বধ করিতে কৃতসংকল্প হইল। সম্রাট আশ্চর্য হইয়া এবং প্রীত হইয়া নিরস্ত হইলেন। তখন আর্যকুলনারী অসি নামাইলেন—

হাসিয়া রূপসী নামাইল অসি,
বলে মহারাজ এ বড় রস।
রমণীর রণে হারি মান তুমি
পৃথিবীপতির বাড়িল যশ॥
দুলায়ে কুণ্ডল, অধরে অঞ্চল,
হাসে খল খল, ঈষৎ হেলে।
বলে মহাবীর, এই বলে তুমি
রমণীরে বল করিতে এলে?

সহৃদয় পাঠকমাত্রকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি যে এই কল্পিত ছবিখানি কতদূর বীভৎসকর! ইহা কি একটি রোষান্বিতা অগ্নিশিখাবৎ ক্ষত্রকুলনারীর প্রতিমা, না লীলাময়ী যবন-বেগমের বিভ্রমবিলাসের মূর্তি?— থাক্— আর আমরা পারি না— 'মন এবং সুখ' ইত্যাদি নানা বিষয়ক কতকগুলি যে কবিতা আছে তাহা সকলই এক ছাঁচে ঢালা, সুতরাং সেগুলির সমালোচনা করা বাহুল্য— 'ললিতা' ও 'মানস' নামক কবিতা দুটি গ্রন্থকার পঞ্চদশ বয়সের সময় লিখিয়াছিলেন— সুতরাং শৈশবরচনা প্রায় সকলই যেমন হইয়া থাকে, এ দুটিও সেইরূপ।

সমস্ত কবিতাপুস্তকের মধ্যে তিনটি গদ্য-পদ্যই আমাদের ভালো লাগিয়াছে। উপসংহার কালে আমরা একটিমাত্র কথা বলিব— বঙ্কিমবাবু উপন্যাস লিখিয়া যতদূর প্রতিষ্ঠাবান হইয়াছেন, এই নিকৃষ্ট কবিতাখানির প্রভাবে তাঁহার সে যশ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইবে না। আমরা বিলক্ষণ জানি যে ভালো একজন উপন্যাস-লেখক ভালো কবি হইতে পারেন না। সর্ ওয়াল্টর স্কটের কবিতাগুলি পর্যন্ত প্রধান প্রধান সমালোচকদের মতে ছন্দগ্রথিত উপন্যাস মাত্র। কিন্তু তাহা না হইলেও সকল ব্যক্তিতে সর্ ওয়াল্টর স্কটের প্রতিভা সম্ভাবিত নহে। কবি এবং উপন্যাস-লেখক ভিন্ন উপাদানে নির্মিত— তাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি ও বহির্দৃষ্টি ভিন্নভাবে নিক্ষিপ্ত হয়, একজন কেবল ঘটনাগুলি এমন করিয়া সাজাইতে চাহেন যে তাহাতে উদ্দেশ্য-সাধন হইতে পারে— অপর জন ঘটনার প্রতি ঈষৎ মাত্র দৃষ্টি রাখিয়া কেবল ভাবের বিকাশের দিকেই লক্ষ্য স্থির রাখেন।— স্কটের 'লেডি অফ্ দি লেকে'র সহিত বাইরনের 'জিওয়ারে'র তুলনা করিয়া দেখিলে আমাদের কথার সার্থকতা সপ্রমাণ হইবে।

ভারতী
ভাদ্র ১২৮৫

আবদারের আইন

ভারত গবর্নমেন্ট সুদীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশের পর গৃহে আসিয়াই এক উৎকট কর সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি অভিনব আইনের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। সুপ্রিম কাউন্সিলের কলিকাতা অধিবেশনে এবারকার সর্বপ্রথম কার্য সুতা ও কাপড়ের উপর কর সংস্থাপন আইনের পাণ্ডুলিপি। ইহা প্রবাসেই প্রস্তুত হইয়াছিল; গবর্নমেন্ট পকেটে করিয়াই ইহা আনিয়াছিলেন; রাজধানীতে পদার্পণ

করিয়াই রাজ্যমধ্যে এই পাণ্ডুলিপি প্রচার করেন। কয়েকদিনের মধ্যেই পাণ্ডুলিপি পুরা আইনে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

ইহার— এই কাপড় ও সুতার শুল্ক-আইনের এক অংশে পুরাতনের ও পরিবর্জিতের পুনঃপ্রচার; অপর অংশ সম্পূর্ণ অভিনব, তাহা একটি স্বতন্ত্র ও সাংঘাতিক আইন। শেষোক্ত প্রথমেরই অবশ্যম্ভাবী ফল; উভয়ের একটিও কিন্তু অযাচিত নয়, আকস্মিকও নয়। অনেক সময়ে আকাশ হইতে আইন আসিয়া অকস্মাৎ আমাদের মাথার উপর পড়ে। আইনের আবশ্যকতা লোকের ইষ্টানিষ্টের প্রতি অপরিসীম উপেক্ষা করিয়া গবর্নমেন্ট দেশীয় সংবাদপত্র ও সভা-সমিতির অজ্ঞাতে ও অনভিমতে নূতন নূতন আইন-কানুন করিয়া থাকেন। বলা অনাবশ্যক, ইহা অন্যায়, যথেচ্ছাচার, যারপরনাই দূষণীয়। কিন্তু উপস্থিত আইনের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে গবর্নমেন্টকে এ দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। যে কারণেই হোক, গবর্নমেন্ট আত্ম-ইচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া অযাচিতভাবে ও অকস্মাৎ এ আইনের অবতারণা করেন নাই। প্রত্যুত এ দেশে যাহা ও যাঁহারা সাধারণ অভিমতের অধিনেতা বলিয়া অভিহিত ও আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন, তাহার ও তাঁহাদের তুমুল আন্দোলনে ও অস্বাভাবিক আবেদনে গবর্নমেন্ট এই আইন উপস্থিত করিবার অবসর পাইয়াছেন, উপস্থিত করিতে অগত্যা বাধ্য হইয়াছেন। নহিলে এ আইন সম্ভবত হইত না; সহজে হইবার সুদূর সম্ভাবনা মাত্র ছিল না। গবর্নমেন্ট এ-দেশীয় লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া যে এ আইন করিতেন না, তাহা নহে; এ-দেশীয় বস্ত্রশিল্প অচিরাৎ উৎসন্নে যাইবে বা কাপড়-সুতার কল শৈশবেই স্বর্গারোহণ করিবে বলিয়া যে গবর্নমেন্ট কিছুমাত্র শঙ্কিত হইতেন তাহাও নহে; পরন্তু এ-দেশীয়দিগের পরিধেয়ের জন্যও যে পরম উৎকণ্ঠিত হইয়া গবর্নমেন্ট এই আইন করিতেন না, এমনও বলি না। এ দেশের লোক অনাহার অর্ধাহারে মরুক আর উলঙ্গ অবস্থায় থাকুক বা প্রদেশীয় শিল্প-বাণিজ্য পঞ্চভূতে বিলীন হউক, তাহাতে এই গুরুগম্ভীর গবর্নমেন্টের অবিচলিত ঔদাসীন্যের এক বিন্দুও উদ্‌বেগ উপস্থিত হইবার আদৌ কারণাভাব। কিন্তু, তথাচ এই আইন হইত না। হইত না সম্পূর্ণ অন্য কারণে। সে কারণ, সকলেই জানেন, মাঞ্চেস্টারের মহীয়সী শক্তি, লাঙ্কাশায়রের বাণিজ্যস্বার্থ। কিন্তু, শুনিতে পাই, মাঞ্চেস্টার, লাঙ্কাশায়র আমাদের শত্রু। স্বীকারই করি উহারা আমাদের পরম শত্রু। শত্রুর স্বার্থ সর্বথা হননীয় শুক্রাদির নীতি অনুসারে ইহাও আসুন, স্বীকার করি। কিন্তু, এই শত্রুদিগের স্বার্থের অনুরোধে এ-দেশীয় গরিব-দুঃখীরা একটু সুলভ বস্ত্র পরিধান করিতে পাইত; পরন্তু, সেই স্বার্থেরই অনুরোধে, এ দেশের আধুনিক অনুষ্ঠান কলের কাপড় সুতার উপর এত দিন কোনো শুল্ক সংস্থাপিত হয় নাই, ইহাও অগত্যা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য। এক কথায়, শত্রুর স্বার্থে সাধারণত এ দেশেরই সুবিধা ছিল, সরল ও সত্য কথা বলিতে হইলে, অপেক্ষাকৃত সস্তা বস্ত্রে সুখও কিছু না হইয়াছিল এমন নয়। কিন্তু, তথাচ শত্রু শত্রু ভিন্ন মিত্র নহে। স্বদেশহিতৈষী সম্প্রদায়ের শত্রুহনন-স্পৃহাসমূহ বলবতী; তবে সে শক্তির অত্যন্ত অভাব বটে। কিন্তু, এ সম্বন্ধে শত্রুহননের এক মহা শুভক্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল। কী-জানি-কোনো এক অজ্ঞাত অভিসন্ধি-সূত্রে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বণিকসম্প্রদায় মাঞ্চেস্টারের স্বার্থের বিরুদ্ধে বন্দুকে সঙিন চড়াইয়া, বারুদবাহকের কার্য করিবার জন্য নেটিব পেট্রিয়টদিগকে ডাকিয়াছিলেন। সাহেবি ডাক; সামান্য নয়, অসুমার সম্ভ্রমেরই কথা। ডাক পড়িবা মাত্র পেট্রিয়টেরা, পূর্বাপর না ভাবিয়া, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া, স্বদেশের প্রকৃত, অতি প্রত্যক্ষ ও অব্যবহিত, অস্থিমজ্জাময় শরীরী স্বার্থ আদৌ উপেক্ষা করিয়া, তাহার একটা মরীচিকা-কঙ্কালের কল্পনায়, সাহেবদের পদ-প্রান্তে দলে দলে যাইয়া হাজির হন; বিদেশীয় ও বিলাতি আমদানি বস্ত্র এবং সূত্রের উপর শুল্ক সংস্থাপনের জন্য, সজোরে ও সমস্বরে হল্লা করিতে আরম্ভ করেন। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানের বিলাতি বন্দুকে নেটিব পেট্রিয়টের বাক্য-বারুদ বিক্ষিপ্ত হইয়া একটা বিষম বিসদৃশ রাজনৈতিক আওয়াজ উৎপন্ন ও উৎসারিত করে। তাহারই ফল আমাদের অদ্যকার আলোচ্য এই আইন। ইতর কথায়, ইহাকেই বলে 'আপন নাসিকা কর্তন করিয়া পরের

যাত্রাভঙ্গ'। শত্রুর শুভযাত্রা ভঙ্গ করা সর্বথা কর্তব্য হইতে পারে; কিন্তু, নিজের নাসিকাটিও তো নেহাত নিষ্কর্মা দ্রব্য নহে। নাসিকাটির কি একেবারেই কোনো মূল্য নাই যে, নির্মম হইয়া তাহাকে নির্মূল করিবে? কিন্তু, পরিতাপ এ-দেশীয় পেট্রিয়টেরা, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাই করিয়াছেন, অথচ পূর্ণমাত্রায় তাহা কাহারো যাত্রাভঙ্গের প্রতিবন্ধক হয় নাই। বিদেশীয় বস্ত্রশিল্পের শুভযাত্রা সম্যক্‌রূপে ভঙ্গ হইবে না; আদৌ এক বিন্দু ভঙ্গ হইবে কি না সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সন্দেহ; কিন্তু স্বদেশীয় সূত্র-শিল্পের ও সুলভ বস্ত্রের নাসিকাটি নিশ্চিন্তপুরে পলায়ন করিয়াছে। নাসিকা-ছেদনজনিত যন্ত্রণায় এখন রোদন করা বৃথা। যাতনার তীব্রতার সঙ্গে এক রত্তি তামাশাও আছে। নাসা না থাকা নিজেই এক তামাশা বটে; কিন্তু, এ ব্যাপারে তদতিরিক্ত আর-একটু তামাশা আছে। নাসিকাটি কোথা হইতে কতখানি স্থান পর্যন্ত কর্তিত হইয়াছে, তাহার সহিত অন্য কোনো অঙ্গের হানি হইয়াছে কি না, আমাদের পরিচালক ও পেট্রিয়টবৃন্দ, তাহা এখনও নাকে হাত দিয়া দেখেন নাই। সেই সামগ্রীটি 'গিয়াছে গিয়াছে', বলিয়াই কেবল রোদন ও রোষ প্রকাশ করিতেছেন। কেন গেল, কাহার দোষে গেল, কত দূর লইয়া গিয়াছে, নাসিকা পুনঃপ্রাপ্তির কোনো সম্ভাবনা নাই, তবুও তো এ-সকল কথা এখন অনায়াসে নিশ্চিন্তভাবে ভাবিয়া দেখা যাইতে পারে। অনর্থক চিৎকারে ও চাঞ্চল্য প্রকাশেই কি পুরুষার্থ?

গত বৎসর ফেব্রুয়ারির শেষে লর্ড এলগিনের রাজত্ব আরম্ভ। তাঁহার অভিষেকের অব্যবহিত পরেই প্রাথমিক ব্যবস্থাপক বৈঠকে বাজেটের আলোচনা। অর্থের অনটন; অর্থাগমের অন্যতম উপায় উদ্ভাবন— ট্যারিফ ট্যাক্সের পুনঃ সংস্থাপন। ক'মাসেরই বা কথা; সকলেরই ইহা স্মরণ আছে এবং সে স্মৃতি এখনও খুব টাটকা আছে। বিদেশ ও বিলাত হইতে আমদানি বহু দ্রব্যের উপর কর বসিল; কেরোসিন তৈলের ট্যাক্স বাড়িল। পেট্রিয়টগণ পুলকিত হইলেন। ইন্‌কম ট্যাক্স বাড়িল না বলিয়া কেহ, নূতন ট্যাক্স হইল না বলিয়া কেহ, বিলাতি দ্রব্যের স্পর্শে মহাপাতকগ্রস্ত হইতে ও নরক গমন করিতে হইবে না বলিয়া কেহ, পরন্তু স্বদেশীয় শিল্পী ও শ্রমজীবীদিগের সুবিধার স্বপ্ন কল্পনা করিয়া কেহ; নানা জনে নানা অনুমানে আনন্দিত হইলেন। কিন্তু এই অস্বাভাবিক আনন্দের প্রকৃত কোনো কারণ ছিল না; রক্তমাংসময় পৃথিবীর সহিতও উহার সবিশেষ কোনো সম্বন্ধ ছিল না। দেশের অনিবার্য ব্যবহার্য দ্রব্যের উপর আমদানি-শুল্ক সংস্থাপনে সজীব জাতির যেরূপ আনন্দ উৎপন্ন হয়, তাহা আমেরিকার ইতিবৃত্তেই জ্ঞাতব্য। আনন্দই বটে! সে আনন্দে অস্ত্রনির্ঘোষ, রাষ্ট্রবিপ্লব ও শোণিতস্রোতেরই সম্ভাবনা। কিন্তু অঙ্গহীন অসাড় জাতির সবই উল্টা। পক্ষাঘাতে পাঁচটি ইন্দ্রিয়ই বিকল, কাজেই হর্ষ-বিষাদের কারণ অনুভবে অক্ষম। বুদ্ধিবৃত্তিও তদনুরূপ সূক্ষ্ম; সংসারের সংবাদ রাখেন তেমনি সবিশেষ; সুতরাং আমদানি-শুল্কে উপরোক্ত আমোদ অনুভূত হইয়াছিল। সে আমোদের যদি একান্তই কোনো কারণ নির্দেশ করিতে হয়— তাহার একটা কারণ হুজুগ; আর-একটা কারণ 'হবি'। বাতিকের অশ্ব আরোহণ করিয়া অহরহ ইন্দ্রলোকে গমনের চেষ্টা। ইহাই 'হবি'। সংসারে হবিওয়ালা লোকের অভাব নাই, হুজুগওয়ালা তো অসংখ্য। সুতরাং সেই জাতীয় লোকের মধ্যেই ওই আমদানি-শুল্কে আনন্দের উদ্রেক হইয়াছিল। নহিলে যাঁহারা সংসারের সবিশেষ সংবাদ রাখেন, বাজারের বৃত্তান্ত বুঝিয়া অপক্ষপাতে বিচার করিতে পারেন এবং দেশের অস্থি মজ্জা মেধ, দরিদ্র রায়ত ও কৃষকের সুখ-দুঃখের একটা অস্তিত্ব অনুভব করেন, তাঁহাদের কেহই এই আমদানি-শুল্কে সন্তুষ্ট হন নাই। উহাতে দেশের অন্তর্ভেদী একটি অসন্তোষই উৎপন্ন হইয়াছে। দেশের লোক অদৃষ্টবাদী বল-ও-বাক-শক্তি-বিরহিত, তজ্জন্যই এ অসন্তোষ অস্ফুট ও অব্যক্ত; সংবাদপত্রে উঠে নাই, বাগ্মীর বক্তৃতায় ফুটে নাই, বলে বণিকের পণ্য-পাট লুণ্ঠিত হয় নাই। লোকের বাক্‌শক্তি ও বল থাকিলে ফল অন্যরূপ হইত। এই অন্তর্ভেদী অব্যক্ত অসন্তোষের কারণ অতীব স্পষ্ট। পেট্রিয়টিজমের প্রিয় 'হবি' যাহাই হউক, ইহা পরিষ্কার ও প্রতিদৈনিক প্রত্যক্ষ ঘটনা যে, স্বদেশীয় বা বিলাতি বিদেশীয়ও হউক, যে দ্রব্য জনসমাজে অনিবার্যভাবে চলিয়া গিয়াছে, যাহা জীবনধারণোপকরণের

একটা অংশ অথবা জীবনধারণের সহিত এবং স্বাভাবিক ও সামাজিক সম্ভ্রমরক্ষণের সহিত যে সামগ্রীর অলঙ্ঘনীয় সম্বন্ধ, তাহার উপর শুল্ক বসিয়া সে দ্রব্য দুর্মূল্য বা মহার্ঘ হইলে মনুষ্য মাত্রেরই মর্মান্তিক বাজে; বিশেষত এই দরিদ্র দেশের দুঃখী লোকদের হৃদয়ে তাহা অধিকতর দারুণভাবে অনুভূত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই-একটা দ্রব্যই গ্রহণ করুন। প্রথম ধরুন লবণ; লবণের সের ছয় পয়সা মাত্র। তুমি আমি হয়তো মনে করিতে পারি লবণ খুব শস্তা। কিন্তু শতকরা অন্তত ৭০ জন লোকের মধ্যে এ দেশে এখন লবণ শস্তা নয়; মহা মহার্ঘ। লবণ-শুল্ক অর্থাৎ উক্ত দ্রব্য সরকার বাহাদুরের একচাটিয়া হওয়ার পূর্বে তাহাদের মধ্যে উহা শস্তা ছিল; তাহাদের অনেকে লবণ প্রস্তুত করিয়া খাইত, গবাদি গৃহপালিত পশুকে খাওয়াইতে পারিত। কিন্তু এখন আর তাহা পারে না। ছয় পয়সা সেরের লবণ কিনিয়া খাইতেও তাহাদের কষ্ট হয়। গবাদিকে লবণ খাওয়ানোর তো কথাই নাই; নিজেদের অন্ন জুটিলে অনেক সময়েই তাহাতে লবণ জুটে না। বিনা লবণে ভাত খায় ও আপন আপন অদৃষ্টকে অভিসম্পাত করে। ইহা কি খুব একটা সন্তোষের কারণ? স্বদেশীয় সম্পাদক মহাশয়দিগের প্রতিই প্রশ্নটি করিলাম। কেহ কেহ হয়তো লুকাইয়া এক-আধ বিন্দু লবণ তৈয়ারি করিতে যায়; কিন্তু সে পাপের কী প্রচণ্ড শাস্তি তাহা প্রতিদিনের পুলিস রিটার্ন ও ফৌজদারি রিপোর্টেই প্রকাশ। পুনঃ জিজ্ঞাসা করি, ইহাও কি মহাশয় স্বদেশীয় ইতর সাধারণের একটা সন্তোষের কারণ? পরন্তু ধরুন কেরোসিন তৈল। কেরোসিন তৈল ক্রমে এখন এ দেশের প্রায় আপাদমস্তক প্রচলিত হইয়াছে; কারণ তাহা অন্যান্য তৈল অপেক্ষা শস্তা। তেলি নিজে সর্বপাদির তৈল প্রস্তুত করে, তথাচ কেরোসিন তৈল কিনিয়া পোড়ায়; কারণ তাহা শস্তা। দরিদ্রের দেশে শস্তা দ্রব্যেরই আদর; শস্তা দ্রব্যেরই আবশ্যক; তা দেশীই হউক আর বিলাতিই হউক; শস্তাতেই লোকের সুখ শান্তি সুবিধা। সুতরাং শস্তাগণ্ডাই গরিব লোকে দেখে; দেশী বিলাতি বুঝে না। ইহা স্বভাবের নিয়ম ও মনুষ্যপ্রকৃতি। তোমার পক্ষপঞ্জরবিহীন ও পুচ্ছহীন পেট্রিয়টিজম দ্বারা মনুষ্যপ্রকৃতি পরিবর্তন করিতে যে চাহ সে কেবল পাগলামি। নেহাত নির্বোধ ব্যতীত আর কেহই নৈসর্গিক নিয়মে হস্তক্ষেপ করিতে যাইয়া হাস্যাস্পদ হয় না। যদি প্রকৃত প্রস্তাবেই পেট্রিয়ট হও, দেশী দ্রব্য ও স্বদেশীয় শিল্পে যথার্থই আন্তরিক অনুরাগ থাকে, তবে তাহার উন্নতিকল্পে অগ্রে চেষ্টা করো; প্রাণপণ প্রতিযোগিতা করিয়া দেশী দ্রব্যের দুর্মূল্যত্ব ঘুচাও; নহিলে তাহা কখনোই গরিব লোকের ব্যবহার্য হইবে না; যে নিজে তাহা স্বহস্তে তৈয়ার করে, সেও তাহা ব্যবহার করিবে না। কিন্তু যাউক সে কথা। গত মার্চ মাসে ট্যারিফট্যাক্সের পুনরাবির্ভাবে কেরোসিন তৈলের মাশুল বৃদ্ধি হইয়া তাহা পূর্বাপেক্ষা মহার্ঘ হইয়াছে। মাশুলের পরিমাণে মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে কি না ঠিক বলিতে পারি না; অত হিসাব করিয়া দেখি নাই। কিন্তু মূল্য বিলক্ষণই বৃদ্ধি হইয়াছে। ওই তৈলের যে টিন ছিল ১৷৷/০ তাহা হইয়াছে এখন ১৸/০; টিন প্রতি অন্যূনাধিক ।০ বৃদ্ধি। মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরই যখন ইহা মর্মান্তিক বাজিয়াছে, তখন গরিব ইতর সাধারণের আর কথা কী! যাহারা এক পয়সার তৈল কিনিয়া তিন রাত্রি পোড়াইত, তাহাদের সে তৈলে এখন পুরা দুই রাত্রিও চলে না। অতএব পুনঃ জিজ্ঞাসা করি, কেরোসিন তৈলের এই 'পোত'টা কি পরম সন্তোষেরই বিষয় হইয়াছে? এখন কেরোসিন তৈলের দৃষ্টান্ত কাপড়ের উপর প্রয়োগ করুন; ফল সেই একই হইবে। দেশী তাঁতের কাপড় অপেক্ষা বিলাতি বা বোম্বাই কলের কাপড় শস্তা। সংগতিহীনে শস্তাই পরে। তাঁতি নিজহস্তে তাঁত বুনে; দেশী বস্ত্র তৈয়ার করে; কিন্তু পরে কি? পরে কি শিমলার কালাপেড়ে? না শান্তিপুরের কল্কাপেড়ে? কিংবা ফরাসডাঙার কাশীপেড়ে? সম্পাদক শিরোমণিরা নিজে এ-সব বরং পরিয়া বাহার দিতে পারেন। কিন্তু তন্তুবায় তাহা পারে না। তাহার প্রাণে পেট্রিয়টিজম থাকিলেও হাতে পয়সা নাই। সুতরাং সে স্বহস্তে কল্কাপেড়ে প্রস্তুত করিয়াও পরিয়া থাকে বিলাতি কলের থানফাড়া ধুতি; কাপড় সুতায় শুল্ক বসিল, সে ধুতির উপর চাদর জুটা ভার হইবে। অনেকের ধুতিও জুটিবে না; লঙ্গটিতে লজ্জা নিবারিত যদি হইবার হন তবেই হইবেন; নহিলে লজ্জা

নিজেই লজ্জা পাইয়া পলাইবেন। পরন্তু দেশীয় তাঁতির তাঁতের সম্বল বিলাতি সুতা; ইহাও বারেক স্মরণীয়। বিলাতি সূত্র-শুল্কে দেশী কাপড়ের উন্নতিকল্পনা আকাশকুসুমেরই অন্তর্গত।

বিগত মার্চের ট্যারিফঅ্যাক্টে অনেকানেক দ্রব্যের উপরেই আমদানিমাশুল বসিয়াছে। কিন্তু এখনও কতক দ্রব্য আছে, যাহাদের উপর হয়তো মাশুল বসে নাই; অথচ মূল্য তাহাদের বাড়িয়াছে। বাজারে যে দ্রব্যই দর কর সবই মহার্ঘ; বানিয়া বলে 'মহাশয় মাশুল বসিয়াছে; কাজেই মহার্ঘ'। ইহা বানিয়ার চাতুরী অথবা ট্যারিফ তহশীলদারদের বাহাদুরি ঠিক বলা যায় না। তবে ট্যারিফের নিয়ম গঠনেও যে গলদ আছে ইহাও নিশ্চয়। আইনের উপস্থিত সংশোধনে সে দোষ দূরীভূত হইলেও হইতে পারে। কিন্তু কেবল করদ দ্রব্যের দুর্বোধ্য ও অনির্দিষ্ট শ্রেণী বাঁধিয়া দিলেই চলিবে না। পরন্তু কেবল ইন্ডিয়া গেজেটে ট্যারিফের নিয়মাবলী প্রকাশিত করিয়া তাহা বড়ো বড়ো বন্দরে প্রেরণ করা প্রচুর নহে। কোন্ কোন্ দ্রব্যের উপর আমদানি মাশুল বসিল তাহা নির্দিষ্ট ও পরিষ্কারভাবে দেশীয় ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় লিখিয়া সর্বসাধারণের বিদিতার্থে বাজারে প্রচার করা উচিত। নহিলে বিক্রেতা ক্রেতা উভয়েরই সংকট। এ বিষয়ে যে কেবল বড়ো বড়ো সওদাগরেরাই সংশ্লিষ্ট তাহা নহে। ক্ষুদ্র দোকানী পসারী ও দ্রব্যের খরচকারী ক্রেতা মাত্রেই ইহার সহিত জড়িত। অতএব অর্থসচিব শ্রীযুক্ত ওয়েস্টল্যান্ড বাহাদুর যে কেবল ইন্ডিয়া গেজেটের উপরেই নির্ভর করিতেছেন,[১] ইহা ঠিক নহে।

গত মার্চ মাসে অনেকানেক আমদানি দ্রব্যের উপরেই মাশুল বসিয়াছিল; বসে নাই কেবল কাপড় ও সুতার উপরে। মাঞ্চেস্টারের মাহাত্ম্যেই হউক কিংবা অন্য যে কারণেই হউক, সম্ভবত মাঞ্চেস্টারের মহিমাতেই, সেক্রেটারি-অব্-স্টেট কাপড় সুতার মাশুল অনুমোদন করেন নাই। নহিলে ইন্ডিয়া গবর্নমেন্টের তাহাতে সবিশেষ ইচ্ছা না ছিল এমন নহে। স্টেট-সেক্রেটারি মি. ফাউলার সাহেবকে তাঁহার উক্ত অনভিমতের জন্য অনেক নিন্দা তিরস্কার ও লাঞ্ছনার ভাগী হইতে হইয়াছিল। কাউন্সিলের প্রায় সকল মেম্বরই তাঁহার প্রতি কুটিল কটাক্ষ করিয়াছিলেন। সরকারি সদস্যেরা সাফই বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা হুকুমের চাকর সুতরাং কাপড় সুতার কর বসাইতে পারিলেন না। পরন্তু সাহেব সওদাগরেরা সাংঘাতিক রুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন; একটা অস্বাভাবিক আন্দোলন উঠাইয়াছিলেন। নেটিব পেট্রিয়টেরা যাইয়া সে আন্দোলনে যেরূপে যোগ দেন অগ্রে উল্লেখ করিয়াছি। কাপড় সুতার করের অভিলাষে আন্দোলন ভয়ানক ফাঁপিয়া উঠে। দেশীয় স্বদেশহিতৈবী ও সম্পাদকবর্গ একবাক্যে বলিয়া উঠেন— 'ইহা ইংরাজের একান্ত অন্যায়, অপরিসীম অবিচার, পৈশাচিক অত্যাচার; সুতা ও কাপড়ের কর অবিলম্বে চাই, এখনই চাই; নহিলে দেশ এই দণ্ডেই উৎসন্নে যাইবে।'

আশ্চর্য! আমরা এরূপ আশ্চর্য আন্দোলন ও অভিমত খুব কমই দেখিয়াছি। ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী লোক, সর্ববিষয়ে স্বতন্ত্র পথানুসারী সংবাদপত্র, এ সম্বন্ধে সকলেরই এক রায়— 'কাপড় সুতার কর না বসিলে ভারতভূমি অচিরাৎ অধঃপাতে যাইবে।' ঘোরতর কংগ্রেস-বাদী 'বেঙ্গলী' হইতে কংগ্রেসের বিকট বিদ্বেষী 'বঙ্গবাসী' পর্যন্ত উভয় শ্রেণীর স্বদেশভক্তই, এ ক্ষেত্রে একাসনে উপবিষ্ট! তৈলে জলে দুগ্ধ শর্করাবৎ সংমিশ্রণ! অর্থনৈতিক সমস্যায় এরূপ অস্বাভাবিক একাকার আমরা আর কখনো দেখি নাই। এরূপ প্রকাণ্ড প্রমাদও আর কখনো দেখি নাই।

আন্দোলনের তুফান উঠিল। কয়েক মাস ধরিয়া আরজি ও আবেদনের ফুটকড়াই ছুটিল। সহস্র সহস্র স্বাক্ষরপূর্ণ সুদীর্ঘ আবেদন বিলাতে প্রেরিত হইল। স্বাক্ষর গ্রহণের সীমা ছিল না; দিগ্‌বিদিগ্‌বিচার ছিল না; অজ্ঞানে সজ্ঞানে যেমনেই হউক দস্তখত হইলেই হইল। দস্তখত সংগ্রহের জন্য দস্তুরমতো কমিশন কবুল করিয়া লোক নিযুক্ত হইয়াছিল। শুনিয়াছি কোনো পেট্রিয়ট তাঁহার আপিসের পবিত্র প্রকোষ্ঠে বসিয়া এই সৎকার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

১. মি. ওয়েস্টল্যান্ডের ইন্ডিয়া কাউন্সিলের বক্তৃতা : ১৭ ডিসেম্বর ১৮৯৪।

ব্রিটিশ সিংহ আন্দোলন গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্যই করুন, একান্ত উপেক্ষা করেন না; দৃশ্যত উপেক্ষার ভাব দেখাইলেও তাহাতে করিয়া অন্তরে অন্তরে তিনি একটু উত্তেজিত হইয়া থাকেন; ঈষৎ মাত্রায় আশঙ্কিতও না হইয়া থাকেন এমন নহে। মৌলিক হউক বা মেকিই হউক 'পাবলিক ওপিনিয়ন' নামক পদার্থমাত্রই অবিকৃত বিলাতি ধাতুতে 'সূচিকাভরণ'স্বরূপ। এ লক্ষণ সাধারণত সুলক্ষণ তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে কোনো কোনো সময়ে যে তদ্দ্বারা সুবিধার পরিবর্তে অসুবিধাও হইতে পারে, সে স্বতন্ত্র কথা। সেটা 'পাবলিক ওপিনিয়ন' প্রস্তুতকারীদের উক্ত পদার্থ প্রস্তুতকরণের পাপনিবন্ধনই ঘটে। উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহাই ঘটিয়াছে। ব্রিটিশ সিংহ বাহিরের কোলাহলে বিচলিত হইবার পাত্র নহেন; এ কথা লর্ড এলগিন, সিংহশক্তির সামঞ্জস্য ও তৎকৃত কার্যমাত্রের মাহাত্ম্য বা প্রমাদরাহিত্য প্রতিপাদনার্থে অবশ্যই বলিতে পারেন; আলোচ্য আইন বিধিবদ্ধ করিবার দিন ইহা বিশিষ্টভাবে বুঝাইবারই চেষ্টা করিয়াছিলেন।[১] কিন্তু তাই বলিয়া কথাটা অখণ্ডভাবে অঙ্গীকার করা যাইতে পারে না। কাপড়ের কর আন্দোলন ব্যতীত আদৌ জন্মিত না; পূর্বাপর ঘটনাতেই ইহা প্রমাণ হইয়াছে।

ওই কর-সংস্থাপন কামনায় সাহেব সওদাগরদিগের সংগ্রামের সহিত দেশীয় স্বদেশ-হিতৈষীদিগের সংযোগে ভারত গবর্নমেন্ট না হউন ব্রিটিশ রাজনৈতিকেরা বিলক্ষণ বিচলিত হইয়াছিলেন। পার্লামেন্টে প্রশ্নের পর প্রশ্ন উঠিয়াছিল। এবং অচিরাৎ বিলাতি আমদানি কাপড় সুতার উপর কর না বসিলে অসন্তোষের উগ্র অনলে ভারতরাজ্য দগ্ধ হইবে, বিলাতে ও ভারতে এই অমূলক অলীক কথাও অপ্রকাশ ছিল না। তৎকালে ওই অসন্তোষ আস্ফালিত করিবার এক হাস্যকর অতি বৃহৎ সুযোগও উপস্থিত হইয়াছিল। ট্যারিফ আন্দোলনের সময় উত্তরবিহারের আমবাগানে এক আমোদ উপস্থিত হয়। সকলেরই স্মরণ আছে সে আমোদ কী— বৃক্ষে বৃক্ষে কর্দমাক্ত কেশ শোণিত সম্পৃক্ত। কোন্ গ্রাম্য বালকেরা ওই বালসুলভ ক্রীড়া করিত, অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। ত্রিহুতিয়েরা উহাকে বলিয়াছিল 'হনুমানজীউর তিলক'। হনুমানজীউর হউক, আর যাহারই হউক, এই তথাকথিত তিলক একটা রাজনৈতিক তুফান উপস্থিত করিয়াছিল। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানেরা উহাতে একটা অজ্ঞাত আসন্ন ও অতি বিরাট বিভ্রাট কল্পনা করিয়াছিলেন, তিলকাঙ্কে প্রকৃত প্রস্তাবেই সেই ত্রেতাযুগপ্রসিদ্ধ বীরের লঙ্কাদগ্ধকারী মার্তণ্ড মূর্তি সন্দর্শন করিয়া আতঙ্কে অতি চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাজার জাতি যাহাতে জুজু দেখেন, তাহাই রাজনীতির অন্তর্গত; অন্যের তুচ্ছাদপি তুচ্ছ হইলেও তাহা রাজনীতির চক্ষে ভীষণ বিভীষিকা; সুতরাং ত্রিহুতের তিলক-চালাচালি সিপাই মিউটিনির সময়ের চাপাটি-চালাচালির অনুরূপ বলিয়াই উক্ত হইয়াছিল। অন্যান্য অনেক অদ্ভুত কারণের মধ্যে এই তিলকের একটা প্রকাণ্ড কারণ আবিষ্কৃত হইয়াছিল এই যে, কাপড় সুতার উপর কর না বসাতেই লোকে অসন্তোষে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে; অচিরাৎ একটা মিউটিনি করিয়া অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদিগকে অ্যাভাবাচ্ছাসহ সটান অক্ষয় স্বর্গধামে পাঠাইবে। বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী আসন্ন। সেই বিপ্লবের পূর্বলক্ষণ আম্রবৃক্ষে তিলকাকারে অঙ্কিত!!

মোটের উপর অবস্থা হইয়াছিল এই। অতএব উপরোক্ত আন্দোলন অস্বাভাবিক ও মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে উত্থিত হইলেও নিষ্ফল হইবে কেন? মাঞ্চিস্টারের স্বার্থ ও স্টেট-সেক্রেটারির সদিচ্ছা সত্ত্বেও বিলাতি আমদানি কাপড় সুতার করের অঙ্কুর তখনই হইয়াছিল। সে অঙ্কুর এখন

---

১. লর্ড এলগিন ইঙ্গিতে বোধ হয় মাঞ্চিস্টারের ইষ্ট সিদ্ধির আরোপিত পক্ষপাতকে আক্রমণ করিয়া বলিয়াছিলেন : It is alleged in certain quarters. . .that in consenting to introduce this Bill in its present form the Government has made a cowardly surrender to a pressure which if not unconscious is at any rate unusual, and oppressive. I wish to take exception to any such statement. ইত্যাদি।

এক বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। বিলাতি আমদানি কাপড় ও সুতার উপর শুল্ক বসিয়াছে এবং সেইসঙ্গে ও সেই অনুপাতে এ-দেশীয় কলের সুতার উপরেও কর নির্দিষ্ট হইয়াছে। হইবারই কথা। স্বাধীন বাণিজ্যের মূল সূত্র এবং ততোধিক, বাণিজ্যপরায়ণ ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের লাঙ্কেশায়েরি স্বার্থ, উহা অগত্যাই করিতে বাধ্য। বিলাতি আমদানি কাপড় সুতার উপর কর বসিলে এ-দেশীয় কলের কাপড় সুতার উপর অবশ্যই কর বসিবে, এ কথা গবর্নমেন্ট তখনই স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। আন্দোলনকারীদের কতক লোকে হয়তো তাহা বুঝেন নাই; কতক লোকে তাহা বুঝিয়া সজ্ঞানে ও সুস্পষ্ট ভাষায় সে করও বহনে সম্মত হইয়াছিলেন। নহিলে পরের যাত্রা- ভঙ্গার্থে আপন নাসিকার সম্পূর্ণ ছেদনকার্য সম্পাদন হইবে কেন? অতএব যাঁহারা বিলাতি আমদানি বস্ত্রের মাশুলের আকাঙ্ক্ষায় এ-দেশীয় কলের কাপড়ের উপর কর দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন, অন্তত তাঁহাদের পক্ষে এখন উক্ত কর বসিয়াছে বলিয়া ক্রন্দন করা কেবল অন্যায় ও অসংগত নহে, উন্মাদ রোগের লক্ষণ। বিলাতি আমদানি কাপড়ের উপর কর বসিলে দেশী কাপড়েও কর লাগিবে ইহা সকলেই জানিত; গবর্নমেন্ট নিজে এ কথা বলিয়াছিলেন, স্টেট-সেক্রেটারি সেই শর্তে আমদানি কর মঞ্জুর করিয়াছিলেন; কাউন্সিলগৃহে স্বদেশহিতৈষী পক্ষ সে কর স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।[১] তবে এখন আবার কথা কেন, গবর্নমেন্টকে গালাগালি কেন আর এত গণ্ডগোলই বা কেন? আপন নাসিকা আপনারাই কাটিয়াছ তাহাতে পরের দোষ কী? আবদার করিয়াছিলে আইন হইয়াছে আবার কী?

সাহেব সওদাগরেরা বিলাতি কাপড়ের জন্য কেন অত আন্দোলন করিয়াছিলেন আমরা অদ্যাপি ভালো করিয়া বুঝিতে পারি নাই। তাঁহাদের সাধুতার অন্তরালে আসল অভিপ্রায় যাহা তাহা অত্যল্প পরিমাণে অনুমান করিতে পারিলেও আমরা এ স্থলে বলিতে চাই না। পরন্তু স্বদেশভক্ত সম্প্রদায় সে করের জন্য কেন অত 'উতলা' হইয়াছিলেন তাহাও বুঝা কঠিন। তাঁহাদের অধৈর্যের একটা কারণ আমরা উপরেই নির্দেশ করিয়াছি। তাহা হুজুক 'হবি' ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, বিলাতি কাপড়ে মাশুল হইলে, কাপড়ের দেশী কলওয়ালাদিগের সুবিধা হইবে, দেশের শিল্পোন্নতি হইবে এই অনুমানেই স্বদেশহিতৈষীরা আমদানি-করের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু এ কথা কার্যত কোনো কথাই নয়। কেননা আমদানি-কর হইলে 'এক্সাইস' করও হইবে ইহা উভয় পক্ষে অঙ্গীকারই করা হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে সুপ্রিম কাউন্সিলের সম্মাননীয় সদস্য মি. ফাজুলভাই বিশরামের ইংরাজি উক্তি আমরা ফুটনোটে উদ্‌ধৃত করিয়াছি। তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমি নিজে কাপড়ের কলের স্বত্বাধিকারী তথাচ বিলাতি কাপড় সুতার উপর আমদানি করের আকাঙ্ক্ষায় এ-দেশীয় কাপড় সুতায় শুল্ক সংস্থাপনে সম্মত হইতেছি।'

পরন্তু আমদানি-করে হস্তনির্মিত দেশীয় বস্ত্রশিল্পের উন্নতিকল্পনা কেবল বিড়ম্বনা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এরূপ বিড়ম্বনাময়ী বিচিত্র কল্পনা কেবল মরীচিকাপ্রলুব্ধ পেট্রিয়টি মস্তিষ্কেই উদ্ভূত হওয়া সম্ভবে। ক্ষুদ্র লোকের এমনি বৃহৎ কল্পনা করা সাধ্য নহে। তাঁতি রাজা মান্ধাতার আমলের আর্য-তাঁতে বিশুদ্ধ বস্ত্র বয়ন করে; সে বস্ত্র মাঞ্চিস্টারের ম্লেচ্ছভাবাপন্ন নহে; অতি উত্তম কথা। পরন্তু সেই বিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া পূতাত্মা আর্যসন্তানদিগের সন্ধ্যাহ্নিক আওড়াইবার অতিরিক্ত সুবিধা হইতে পারে। ইহা আরও উত্তম। কিন্তু এই যে আর্য-তাঁতের বিশুদ্ধ বস্ত্র ইহাতে সূত্র কাহার? সুতা কোথা হইতে আসে সে সংবাদ কি সত্য সত্যই আপনারা

---

১. সুপ্রিম কাউন্সিলের বেসরকারি সদস্য মাননীয় শ্রীযুক্ত ফাজুলভাই বিশরাম বলিয়াছিলেন : I, for one, speaking as a mill owner, would be willing to support the levying of an excise duty on cotton goods manufactured in India, assuming of course that such an import can be practically levied without injustice and serious trouble.

কেহ রাখেন না? চিক্কণ চটকদার কালাপেড়ে পরিয়া তাহার উপর অভ্র ইস্তিরির অতি সূক্ষ্ম উড়ানি উড়াইয়া তুমি যে দেশী বস্ত্রের বাহার দেখাও সুতা কিন্তু তাহার বিলাতি। বিলাতি সুতা ব্যতীত, তোমার দেশী বস্ত্রের বাবুগিরি গলিয়া যায়; দেশী তাঁতির তাঁত শিকায় উঠে। বোম্বায়ের কলে জোর ২৪ নম্বরের সূত্র অবধি জন্মে, তাহার অধিক সূক্ষ্ম সূত্র জন্মে না; কিন্তু তোমার বাবুয়ানার উপকরণ ও গৃহিণীর লজ্জানিবারণের (!) জন্য বস্ত্রটা ৮০ নম্বরেরও অতিরিক্ত সূক্ষ্ম সূত্রে প্রস্তুত হইলে ভালো হয়; কিন্তু, সে-সব সূত্র বিলাত হইতেই আসিয়া থাকে। দেশী তাঁতি বিলাতি সূত্রের দ্বারাই বস্ত্র বোনে। অতএব বিলাতি সূত্রে শুল্ক বসিয়া দেশীয় বস্ত্রের শিল্পোন্নতি কোন্ ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রবলে হইবে তাহা আমরা আদৌ বুঝিতে অক্ষম। ট্যারিফ শুল্কে বিলাতি বস্ত্রের মূল্যাধিক্যের অনুপাতে দেশী বস্ত্রের মূল্যও দারুণ বৃদ্ধি হইবে; কেননা বিলাতি সূত্রে দেশী বস্ত্র নির্মিত; সূত্রের মূল্য বৃদ্ধি হইলেই বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি হয়। অতএব এরূপ স্থলে লোকে বিলাতি কাপড় (তাহার মূল্য আমদানি শুল্কে এখনকার অপেক্ষা বাড়িলেও) ছাড়িয়া তদপেক্ষা চতুর্গুণ অধিক মূল্যের দেশী বস্ত্র কিনিতে চাহিবে কেন? আর পেট্রিয়টিজমের অনুরোধে তাহা চাহিলেও তত পয়সা পাইবে কোথায়? পেট্রিয়টিক স্পিরিটে তো আর উলঙ্গ হইয়া থাকা চলে না। বলিবে, 'বোম্বাই কলের কাপড় পরিবে। বঙ্গদেশেও কাপড়ের কল হইতেছে।' বঙ্গীয় কলের বস্ত্র আজও বাহির হয় নাই; হইলেও তাহা এবং বোম্বাই কলের বস্ত্র, বিলাতি বস্ত্রের অপেক্ষা এক কাক্রিও সস্তা হইবে না; বরং এক আনা বেশিই হইবে। কারণ আকাঙ্ক্ষিত আমদানি-করের অনুকম্পায় সে কাপড়ের সুতার উপরেও এক্সাইস শুল্ক বসিয়াছে। এক্সাইস শুল্ক না বসিলেও সম্ভবত তাহা বিলাতি কাপড়ের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইত না। পরন্তু দেশী কলে কাপড় অপেক্ষাকৃত অতি অল্পই জন্মে, আর সে কাপড় এত অধিক মোটা যে এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তাহা সর্বদা ব্যবহারেরও যোগ্য নহে। আমরা প্রত্যক্ষ ঘটনা ও সংসারের প্রাতিদৈনিক সম্ভাবনাকেই সম্মুখে রাখিয়া এই কথাগুলি বলিতেছি। উদ্ভট 'অঘটনপটিয়স' পেট্রিয়টিজমের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র বটে। সে কথায় বড়ো বড়ো বক্তৃতা ও লম্বা-চওড়া প্রবন্ধ প্রস্তুতই হইতে পারে; সংসারের আর কোনো কার্যই তদ্দ্বারা হয় না; বিশেষত উদরের অন্ন ও অঙ্গের আবরণের সহিত তাহার আকাশ-পাতাল অপেক্ষাও সুদূর সম্বন্ধ। তবেই এখন দেখা যাইতেছে যে, আমদানিকারীদের অনর্থক আবদারে বস্ত্রাদির উপর আমদানি-কর বসিয়া আমাদের ইতঃভ্রষ্টস্ততোনষ্ট হইয়াছে। বিলাতি বস্ত্র মহার্ঘ হইল, বোম্বাই কলের কাপড়ের মূল্য বাড়িল; পরন্তু দেশী কাপড়ও অগ্নিমূল্য হইল। অতএব এই আমদানি শুল্কে দেশটা রাতারাতি উন্নতির ঊর্ধ্বমার্গে দশ যোজন ঠেলিয়া উঠিয়াছে, পাপমুখে এ কথা কীরূপে বলিব?

বলিবে আর যত কিছু না হউক মাঞ্চেস্টার বস্ত্রবণিকের তো অনিষ্ট হইল। তা বটে! কিন্তু প্রথম জিজ্ঞাস্য মাঞ্চেস্টারের অনিষ্ট চেষ্টা করা পুরাতন নীতিশাস্ত্রানুসারে অন্যায়; কিন্তু ইষ্ট না থাকা সত্ত্বেও পরের অনিষ্ট করাকে কী বলিবে? দ্বিতীয় জিজ্ঞাস্য মাঞ্চেস্টারের সবিশেষ অনিষ্টই বা হইবে কেন? তাহার দশ জোড়া কাপড় যেখানে বিক্রয় হইত, সেখানে না-হয় এখন ছয় জোড়া বিক্রয় হইবে; ইহার অধিক তো আর কিছু নয়! কিন্তু তাহার অবশিষ্ট ও অবিকৃত সেই চারি জোড়া কাপড় যাহারা কিনিয়া এত দিন পরিতে পারিত, তাহারা অতঃপর যে একেবারেই কাপড় পরিতে পারিবে না; এই মাঘের শীতে 'জানু ভানু কৃষাণু' ব্যতীত অনন্যোপায় হইবে, সে অনিষ্ট কাহার? মাঞ্চেস্টারের অথবা তুমি যে দেশের ভক্ত বলিয়া ভড়ং দেখাইয়া থাক, সেই দেশেরই? তৃতীয় প্রশ্ন, প্রকৃত প্রস্তাবে মাঞ্চেস্টারের অপরাধই বা কী যে, তাহার পশ্চাতে লাগিয়াছিলে? স্বদেশের প্রাচীন সভ্যতা আমাদের স্বতঃশিরোধার্য, কিন্তু, তাহার অযথার্থত মহিমা কীর্তন করাকে আমরা তাহার প্রকৃত মর্যাদাটিকে মাটি করাই মনে করি। তুমি বড়ায়ের বোকামি করিয়া আর্যামির যতই অতিরিক্ত আস্পর্ধা কর-না কেন, ইহা সকলেই জানে যে, সে কালের চরকার আমলে দেশের অদরিদ্রদের মধ্যেও অতি অল্প লোকে দুইখানা বস্ত্র একত্রে ব্যবহার

করিতে পাইত। দরিদ্র শ্রেণীর বস্ত্র-পরিধান-বিলাসের কথা এখানে না বলাই ভালো। ব্রাহ্মণ-ঠাকুরানীরাও তখন চরকা কাটিতেন। অন্যূন চারিমাস চরকা না ঘুরাইলে একখানা কাপড়ের উপযুক্ত সুতার সংস্থান হইত না। ইহাতেই বুঝিতে হইবে বস্ত্রের সুবিধাটি তখন কেমন ছিল। তোমার সাত গাঁটের বস্ত্র সওদাগরি ও ঢাকাই মসলিন মসলন্দের কথা শুনিবা মাত্রই আমরা মোহিত হইয়া 'মরি মরি' বলিলেও বলিতে পারি। কিন্তু সে 'মরি মরিতে' আসল ঘটনা মারা যাইবে না। তখন সমগ্র দেশমধ্যেই বস্ত্রের অভাব বিলক্ষণই ছিল। মাঞ্চিস্টারের অপরাধ এই যে, সে এ দেশে বহু পরিমাণে বস্ত্র আমদানি করিয়াছিল এবং করিতেছে। সুলভ বস্ত্র আনিয়া দেশের ইতর ভদ্র সর্বসাধারণকে বস্ত্র পরাইয়াছে। সে সূক্ষ্ম সূত্র পাঠাইয়া তোমার বাবুগিরি বজায় রাখিয়াছে; বরং বিলক্ষণ বৃদ্ধিই করিয়াছে। পরন্তু, তাহারই জন্য দেশীয় তাঁতির তাঁত আজও চলিয়াছে। মাঞ্চিস্টারের অপরাধ এই। এই অপরাধে এত রাগ? তুমি আরও রাগিয়া বলিবে, 'অপরাধ অবশ্যই অপরিসীম অপরাধ। তাহারই জন্য তো এ-দেশীয় তাঁতিকুল উৎসন্নে গিয়াছে।' এইরূপ উক্তির ধুয়াটা কিছুকাল হইতে খুব অতিরিক্ত মাত্রায় উঠিয়াছে বটে; কিন্তু, প্রিয় মহাশয়, আপনার এ কথাটা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কেন স্বীকার করা যায় না তাহা বুঝাইবার স্থান এখানে নাই; কিছু সবুর করিলে বুঝাইতে পারি। কিন্তু, তাহা স্বীকার করিলেই বা কী? স্বীকারই না-হয় করিলাম মাঞ্চিস্টারের সুলভ বস্ত্রের দৌরাত্ম্যে দেশের তাঁতিদের তাঁতবোনার ব্যাঘাত হইয়াছে; তাহাদের অন্ন মারা গিয়াছে; তাহারা উৎসন্ন হইতেছে। কিন্তু মাঞ্চিস্টারের এই অনিষ্টে, অনিষ্টই যদি ইহা হয়— আমাদের তাঁতিরা কি উৎসন্নের পথ হইতে ফিরিতে পারিবে? আমরা উপরেই দেখাইয়াছি, মহাশয়রা অনর্থক আন্দোলনে যাহা করিলেন, তাহাতে আমাদের তাঁতিদের তাঁতিকুল ও বৈষ্ণবকুল দুই কূলই বরং গেল। তার পর কেবল এক তাঁতিকুলের সুবিধা সচ্ছলতার জন্য, সমগ্র দেশের লোক দুঃখ সহ্য করিবে, সুলভ বস্ত্র ব্যবহারে বঞ্চিত হইবে, সভ্যতার কথা ছাড়িয়া দিয়া, ইহাই কি স্বভাবের নিয়ম? অথবা সুযুক্তির কথা? এখন সর্বশেষে আর-একটি প্রশ্ন আছে। এই যে আমদানি মাশুল বসিল, এ মাশুল ফলিতার্থে দিবে কে? দিবে বিক্রেতা কিংবা ক্রেতা? ক্রেতারই তো এ মাশুল দিতে হইবে। মাঞ্চিস্টার তো এ মাশুল দিবে না মহাশয়; দিতে হইবে যে আমাদেরই। এ কথাটি কি আপনারা একটিবারও ভাবিয়াছিলেন? হায়! ভাবিবার অবসর পান নাই; ভাবা অনাবশ্যক মনে করিয়াছিলেন।

অতীব অভাগ্যের বিষয় যে, আবদারকারীরা চিন্তাশীলতার অতি গুরুত্বে বস্ত্রক্রেতা বলিয়া যে একটা জীবও জগতে আছে তাহা একেবারেই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন; অথবা তাহাদের অস্তিত্ব আদৌ বিবেচনাধীনে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা হয়তো মনে করিয়াছিলেন এ মাশুল মাঞ্চিস্টারই দিবে। ভারতবাসীর দিতে হইবে না। কিন্তু স্টেট-সেক্রেটারি আপন কর্তব্য ভুলেন নাই। তিনি যথাসময়েই স্মরণ করিয়া দিয়াছিলেন যে, আমদানি-কর মাঞ্চিস্টারের স্কন্ধে পড়িবে না; প্রকৃত প্রস্তাবে পড়িবে তাহা ভারতেরই স্কন্ধে। পরন্তু তাহাতে করিয়া দরিদ্র রায়তের বস্ত্র ব্যবহারে সবিশেষ বিভ্রাটই ঘটিবে।[১] কিন্তু সে কথা শুনে কে? সেক্রেটারির সমীচীন উক্তি তৎপ্রতি প'লিসি আরোপেরই কারণ হইয়াছিল। কিন্তু উচিত কথা বলিতে হইলে সেক্রেটারি-অব-স্টেট এ সম্বন্ধে অবশ্যই ধন্যবাদের পাত্র। তবে তিনি সকল দিক রাখিতে গিয়া কোনো দিকই রক্ষা করিতে পারেন নাই; এ কথাও সত্য। তিনি এ-দেশীয় আন্দোলকদিগের সন্তোষার্থে বিলাতি

---

১. I should like to ask who is going to pay the taxes on the goods imported ? The people of India, the consumers of India. . . .Whether import duties are right or wrong, whatever duty you levy on cotton goods must inevitably be paid by the people who wear these cotton goods in India. The tax, would therefore be a tax upon the people of India and not upon the Lancashire manufacture. সেক্রেটারি-অব-স্টেট মি. কাউলারের বক্তৃতা হইতে উদ্‌ধৃত।

বস্ত্রের আমদানি-কর এবং মাঞ্চেস্টারের মন রাখিবার জন্য এ দেশে এক্সাইস কর বসাইয়াছেন— ফল হইয়াছে উভয় পক্ষেরই অসন্তোষ। পরন্তু বস্ত্রক্রেতা দরিদ্র প্রজা-সাধারণেরও তিনি সন্তোষভাজন হইতে পারেন নাই। কারণ কাপড়ের কর তাহাদিগেরই দিতে হইবে।

এ স্থলে কথা উঠিতে পারে যে, গবর্নমেন্টের অর্থের অনটন। বজেটে আয় অপেক্ষা ব্যয়ের অঙ্ক বিষম বেশি। ব্যয়ের অঙ্কের সহিত আয়ের অঙ্ক যে রূপেই হউক সমান করিতে হইত। তজ্জন্য গরিব রায়তের শরীরের শিরা কাটিয়া শোণিত বাহির করিতে হইলেও গবর্নমেন্ট ছাড়িতেন না। অতএব ট্যারিফট্যাক্স হইয়া বরং ঠেকাইয়াছে। নহিলে নিশ্চয়ই আর-একটা নেহাত সাংঘাতিক শুল্ক সংস্থাপিত হইয়া দেশমধ্যে মহা অনর্থ ঘটাইত।

আমরা এরূপ যুক্তি আপাদমস্তক অনুমোদন করিতে পারি না। বজেটের দুই দিকে একই অঙ্ক সন্নিবেশের জন্য গবর্নমেন্ট গর্হিত উপায়ে আয়ের অঙ্ক না বাড়াইয়া উচিত উপায়ে ব্যয়ের অঙ্ক কমাইয়া আয়ের অঙ্কের অনুপাতে আনিতে পারিতেন। তজ্জন্য আন্দোলন হইতেছিল। সেই আন্দোলন অধিকতর ব্যাপ্ত ও বলশালী করা উচিত ছিল। ন্যাশনাল কংগ্রেস গবর্নমেন্টের অন্যায্য ও অতিরিক্ত ব্যয় কমাইবার জন্য বহুকাল আন্দোলন করিতেছেন। সে আন্দোলন একেবারেই যে নিষ্ফল হইয়াছে ও হইবে এমনও নয়! এ সম্বন্ধে অন্তত একটা কমিশনেরও আদেশ হইয়াছে। সে কমিশনের কার্য আরম্ভ ও শেষ না হওয়া পর্যন্ত গবর্নমেন্টকে এই উৎকট কর বসাইবার অবসর দেওয়া ও অনুরোধ করা প্রজানীতির উচিত হয় নাই। গবর্নমেন্ট স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যের উপর আমদানি ট্যাক্স বসাইয়াছিলেন। তাহারই প্রাণপণ প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক ছিল; গবর্নমেন্ট যে দ্রব্যের উপর ট্যাক্স বসাইতে উৎসুক ছিলেন না, অস্বাভাবিক আন্দোলন দ্বারা তাহাতে তাঁহাকে প্রবৃত্ত করা প্রকৃত প্রজানীতির অনুরূপ কার্য হয় নাই। পরন্তু, এই কাপড়ের কর আর কোনো একটা কুৎসিত কর সংস্থাপন করিলে এবং প্রজাপক্ষ হইতে অধ্যবসায়ের সহিত তাহাতে আপত্তি হইলে, সে কর নিশ্চয়ই চিরকাল টিঁকিত না। ফলত আবদার করিয়া একটা এত বড়ো করভার গ্রহণ করা নেহাত নির্বোধের কাজ— নিজের নাসিকা ছেদনের মতোই হইয়াছে। কর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষই হউক কর ভিন্ন আর কিছুই নহে। পরোক্ষ হওয়াতে করের প্রচণ্ডতা কিছুই কমে না; তাহাতে করিয়া কেবল তাহার কপটতা ও প্রবঞ্চনাই সূচিত হয়।

এ দেশে ইংরাজের আমলে বস্ত্রকর বহুকালই ছিল না। খৃ. ১৮৫৯ সালে এই কর প্রবর্তিত হয়। আমদানি কাপড় ও সুতার উপর শতকরা পাঁচ টাকা হারে শুল্ক বসে। এবং সেই হিসাবে ওই শুল্ক পাঁচ বৎসর পর্যন্ত চলে। ১৮৬৪ সালের ২৩ আইনে উহা পাঁচ টাকা হইতে শতকরা সাড়ে সাত টাকায় উঠে। ১০/১১ বৎসর পরে ১৮৭৫ সালের ১৬ আইনে উহা পুনঃ পাঁচ টাকায় পরিণত হয়। ১৮৮২ সালে এই শুল্ক একেবারেই উঠিয়া যায়। ১৮৮২ সালের ১১ আইনে ট্যারিফ ট্যাক্স সম্পূর্ণরূপে রহিত হইয়াছিল এবং অনেকানেক রপ্তানি দ্রব্যের মাশুলও উঠিয়া গিয়াছিল।

আজ আবার বারো বৎসর পরে পুনঃ বস্ত্রকর আসিয়া উপস্থিত। বস্ত্র যখন নিষ্কর ছিল তখনই সব লোকে বস্ত্রের ব্যয় কুলাইয়া উঠিতে পারিত না। দেশ এতই দরিদ্র যে, মাঞ্চেস্টারের মহা সুলভ বস্ত্রও সকলে কিনিতে পারে নাই। এই প্রবন্ধের লেখক দেশমধ্যে এমন অনেক পল্লী ও পরগনা দেখিয়াছে যেখানে বারো আনা রকম লোক নির্বস্ত্র। কৃষাণ ও মজুর শ্রেণীর পরিধেয় কেবল অর্ধহস্ত পরিমিত একটি লঙ্গটি মাত্র। 'শতগ্রন্থি বস্ত্র' প্রবাদবাক্য; কিন্তু সহস্রাধিক গ্রন্থিযুক্ত জীর্ণ বস্ত্রে ললনা-অঙ্গের লজ্জা আবৃত বা অনাবৃত হইতেও অনেক স্থলে দেখিয়াছি। বস্ত্রের নিষ্কর সময়েও অনেক স্থলে অবস্থা এই; অতএব বস্ত্রের উপর কর বসিয়া তাহার মূল্য কিঞ্চিৎমাত্র বাড়িলেও ওই অবস্থা কীরূপ হইবে তাহা কেবল অনুভবনীয়। অন্ন এবং বস্ত্র এই দুইটি দ্রব্য মনুষ্যজীবনে এবং মনুষ্যসমাজে একান্ত অপরিহার্য আবশ্যকীয়; এই দুই সামগ্রী যত সুলভ ও

সুপ্রাপ্য হওয়া সম্ভাবিত হইতে পারে, তাহা করা রাজনীতি ও প্রজানীতি উভয়েরই কর্তব্য। মনুষ্য-অস্তিত্বের সর্বপ্রধান উপাদান অন্নবস্ত্রের উপর কোনো কর বসাই উচিত নয়; বিশেষত উহা অতিরিক্ত করের বিষয়ীভূত হওয়া ন্যায়ত ও ধর্মত অন্যায়; রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উহা প্রাজ্ঞতারও অনুমোদিত নহে।

এবারকার আইনটি যেরূপ হইল অল্পের মধ্যেই বলা যাইতেছে। বিদেশী ও বিলাতি আমদানি কাপড় ও সুতার শতকরা পাঁচ টাকা কর নির্ধারিত হইয়াছে। ইহা সাবেক সি কাসটাম ট্যারিফ আইনেরই অন্তর্গত। কিন্তু ইহা ব্যতীত স্বতন্ত্র একটি আইন হইয়াছে, তাহার নাম ১৮৯৪ সালের 'কটন ডিউটিস্ অ্যাক্ট'। এই আইন আমদানি বস্ত্র শুল্ক আইনেরই অনিবার্য ফল, অগ্রেই বলিয়াছি। কেননা বিদেশী বা বিলাতি বস্ত্র বিক্রয়ের ব্যারসা করিয়া, গবর্নমেন্ট, স্বাধীন বাণিজ্যের সূত্রানুসারে, এ-দেশীয় কল-শিল্পজাত বস্ত্রপণ্যের বিক্রয় সংরক্ষণ করিতে সমর্থ নহেন। সুতরাং এ-দেশীয় কলের কাপড়ের উপর কর বসাইতে বাধ্য। সেই কর বসাইবার জন্যই এই 'কটন ডিউটিস্ অ্যাক্ট'। বিলাতি বস্ত্রে শুল্ক না বসিলে এ অ্যাক্ট বা আইন নিশ্চয়ই হইত না। এই আইন অনুসারে দেশী কলের সুতার উপর কর বসিল। সুতার শুল্কের অর্থই বস্ত্রের কর; কারণ যে সুতার বস্ত্রে বয়ন হইবে সে সুতারও শুল্ক লাগিবে; সুতরাং বোনা বস্ত্রের উপর কর না বসিয়া অবোনা সুতার উপরেই শুল্ক হইয়াছে। অর্থ একই। করের হার আমদানি-করেরই সমান অর্থাৎ শতকরা পাঁচ টাকা করিয়াই হইয়াছে। তবে ইহার মধ্যে একটু কথা এই যে, দেশী কলে হয় মোটা সুতা; বিলাতি কলে জন্মে সরু সুতা। বোম্বে অঞ্চলের কল, বিলাতি কলের সরু সুতার সহিত বড়ো বেশি প্রতিযোগিতা করে না। যে পরিমাণে প্রতিযোগিতা সেই পরিমাণেই কর বা আইন প্রয়োজন। অতএব দেশী কলে যে পরিমাণে অপেক্ষাকৃত ও অত্যল্প সরু সুতা উৎপন্ন হয়; তাহারই উপর কর বসিয়াছে। অর্থাৎ দেশী কলে ২০ নম্বরের সুতার ও তন্নিম্ন শ্রেণীর সুতার কর লাগিবে না; ২১ নম্বর হইতে তদূর্ধ্ব নম্বরের সরু সুতারই শুল্ক লাগিবে। গবর্নমেন্ট যদি কখনো ইচ্ছা করেন অর্থাৎ ইহার পর অতিরিক্ত তথ্য সংগৃহীত হইয়া প্রতিপন্ন হয় যে, এ-দেশীয় কলে ২০ নম্বরের সুতা অপেক্ষা সূক্ষ্ম সুতা প্রস্তুত হয় না; তাহা হইলে আইন একটু সংশোধিত করিবেন; ২০ নম্বর ২৪ নম্বরে পরিণত হইবে। অর্থাৎ ২৪ নম্বর পর্যন্ত সুতার শুল্ক লাগিবে না, তদূর্ধ্ব হইলেই তাহা লাগিবে। পরন্তু, এ-দেশীয় কল হইতে যে-সকল সুতা অন্য দেশে রপ্তানি হইবে, তাহার শুল্ক লাগিবে না; দেশমধ্যে যে-সকল সুতা বিক্রয় হইবে এবং দেশমধ্যে বিক্রেয় বস্ত্র যে-সকল সুতায় প্রস্তুত হইবে তাহারই কেবল শুল্ক লাগিবে। দেশের লোকের সুখ-সুবিধার প্রতি ইহা যৎপরোনাস্তি শুভ দৃষ্টি বটে!! 'কটন ডিউটিস্ অ্যাক্ট' সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে সমান বর্তিবে এবং আইন হওয়ার পর হইতেই, আজ কয়েক দিন হইল উহা আমলে আসিয়াছে। দেশীয় রাজাদিগের রাজ্যও বাদ পড়ে নাই। তাহা বিদেশ ও বিলাতের মধ্যেই পরিগণিত হইয়াছে। তথাকার কল হইতে যে-সকল কাপড় সুতা ব্রিটিশ-ভারতে আসিবে তাহারও শুল্ক চাই। অতএব দেশীয় রাজার রাজ্যে গিয়াও যে কাপড় সুতার কল পাতিয়া আইনের হস্ত এড়াইবে, সে উপায়ও নাই। মাননীয় মি. ওয়েস্টল্যান্ডের এ সম্বন্ধে আমাদের উপকারে উক্তি অতি চমৎকার উপাদেয়। তাহাতে হাস্য করুণ এই উভয়বিধ বিরোধী রসেরই একত্রে উদ্রেক হয়।

কয়েক দিন ধরিয়া সুপ্রিম কাউন্সিলে এই আইনের অল্পাধিক আলোচনা হইয়াছিল। এবং তাহাতে অল্পাধিক পরিমাণে অর্থনৈতিক কথাও নিহিত ছিল। কিন্তু তাহা সমালোচনা করার স্থান নাই। তবে এক কথায় ইহা বলা যাইতে পারে যে, এ দেশের পক্ষ হইতে বেসরকারি সদস্যেরা যে-সকল তর্ক উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহা রাজনৈতিক ও আনুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক হিসাবে এত দুর্বল যে, তাহা দাঁড়াইতে পারে নাই বলিয়া আমরা আশ্চর্য নহি।

কটন ডিউটি আইনে অন্যান্য অনিষ্ট ব্যতীত স্বদেশীয় শিল্প ও শ্রমের বিপুল অনিষ্টসাধন করিবে। এ আইন যতই সাবধানে অনুষ্ঠিত হউক এখন হইতে এ-দেশীয় কাপড় সুতার

কলগুলিকে সরকারি পাহারার প্রচণ্ড দৃষ্টির উপর সর্বদাই থাকিতে হইবে। বিন্দুমাত্রও পদস্খলন হইলে নিস্তার থাকিবে না। কলের কার্য ও সমস্ত কাগজপত্র যদৃচ্ছা সরকারি পরীক্ষা ও পরিদর্শনের অধীন হইবে, হিসাবের একটুকুও এদিক-ওদিক হইলে দ্রব্যের দেয় মাশুলের তিনগুণ মাশুল আদায় হইবে। সরকারি তফিখাতে কোনো রকমের তঞ্চকতা-প্রবঞ্চনাদি প্রমাণ হইলে হাজারো টাকা জরিমানা হইবে; পেনালকোড আমলে আসিবে; কলওয়ালাদিগের কারাবাসও হইতে পারিবে। কলের কাপড় সুতার স্বদেশীয় শিল্প তাহার এই শৈশবাবস্থায় আইনের এত অগ্নিপরীক্ষা পার হইয়া উঠিতে পারিবে কি না সন্দেহ। সুতরাং কলের স্বত্বাধিকারীরা স্বভাবতই মহা উৎকণ্ঠিত ও আতঙ্কিত হইয়াছেন। আইনে আপত্ত করিতেছেন। কিন্তু এখন আপত্তি করা অনর্থক। 'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।' আক্ষেপ এই যে, স্বদেশহিতৈষীরা তাঁহাদিগকে ভাবিবার অবসর দেন নাই। আবদার করিয়াই এই উৎকট আইন করাইয়াছেন। আইনের উদ্দেশ্যে স্পষ্টই লিখিত আছে—

The finer classes of cotton manufactured in India enter into direct competition with the cotton manufactures imported from England. As it is intended to weight these last with an import duty, it is considered necessary to levy at the same time a contervailing duty upon the competitive classes of Indian manufactures.

অতএব আপত্তি করা এখন বৃথা। এই আইন হওয়ার অঙ্গীকারেই আমদানি-কর বসিয়াছে। আমদানি-কর না উঠিয়া গেলে, এ আইন রদেরও সম্ভাবনা নাই! আমরা এ উভয়কেই সমান আপদজনক বিবেচনা করি। বেঙ্গল কাউন্সিলে ড্রেনেজ কর প্রস্তুত হইয়াছে; অবিলম্বেই আবির্ভূত হইয়া জমিদার ও রায়তের কর-ভারপীড়িত স্কন্ধ পুনঃ প্রপীড়িত করিবে। তাহার পূর্বেই কাপড়ের কর উপস্থিত। দেশে অন্নবস্ত্রের একেই তো এই সচ্ছলতা তাহার উপর আইন-কানুনের এমন সব মেওয়া ফল, পরম রমণীয়ই বটে! তবে আমাদের শত্রুশিবির হইতে বরং কিঞ্চিৎ মঙ্গল আগমনের আশা করা যাইতে পারে। আমদানি মাশুলে মাঞ্চিস্টারের মহাজন ও শক্তিশালী শ্রমজীবীগণ আপত্তি উপস্থিত করিয়াছেন। এ আপত্তি উগ্রভাব ধারণ করিলে, তাহা উল্লঙ্ঘন করা বড়ো সহজসাধ্য হইবে না; একটা সুযোগ খুঁজিয়া আমদানি-কর উঠাইতেই হইবে। যদি আদৌ কোনো আশা থাকে, ইহাই এখন আশা।

সাধনা

মাঘ ১৩০১

সংযোজন

পৃ ১২৯ ।। ছত্র ১৩-এর পরে 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী' প্রবন্ধটির শেষাংশ :

"THE WOUNDED CUPID"

Cupid, as he lay among
Roses, by a bee was stung.
Whereupon, in anger flying
To his mother said thus, crying,
Help, O help, your boy's a-dying!
And why my pretty lad, said she.
Then, blubbering, replied he,
A winged snake has beaten me,
Which country people call a bee.
At which she smiled; then with her hairs
And kisses drying up his tears
Alas, said she, my wag! if this
Such a pernicеous torment is;
Come, tell me then, how great's the smart
Of those thou woundest with thy dart?

"HERRICK"

মধুমক্ষিকা-দংশন

একদা মদন করিয়া যতন,
বাছি বাছি তুলি কুসুমরতন
রচিল শয়ন মনের মতন,

*

ঘুমের ঘোরেতে হয়ে অচেতন
মুদিয়া নয়ন রহিল মদন

*

ঘুমঘোরে কাম নড়িল যেমন,
মধুমাছি-দেহে বাজিল চরণ;
রাগভরে মাছি সবলে তখন
ফুটাইল কাম-চরণে হুল।
অধীর হইয়া বিষের জ্বালায়
উঠি রতিপতি ছুটিয়ে পালায়
প্রিয়তমা রতি বসিয়ে যথায়
গাঁথিতে ছিলেন মালতী ফুল।
'অয়ি প্রিয়তমে!' কহিল রতিরে
'রতিনাথ, প্রাণ যায় যে অচিরে

*

কেন শুইলাম বিছাইয়া ফুল
তাই মধুমাছি ফুটাইল হুল
কী হবে কী করি প্রাণ যে যায়!'

*

কহে কামে রতি নিকটে আসিয়ে,
'ছোটো মধুমাছি দিয়েছে বিঁধিয়ে

*

তাই তুমি, নাথ! হইলে কাতর
ভালো, বলো দেখি দাসীর গোচর
কতই জ্বলিবে তাহার অন্তর,
পঞ্চশর তুমি বিঁধিবে যায়?'

Flow on thou shining river;
But ere thou reach the sea,
Seek Ella's bower and give her
The wreath I fling o'er thee etc.

MOORE

প্রবাহি চলিয়া যাও অয়ি লো তটিনি!
কিছু দূরে গিয়ে, পরে দেখিবে নয়নে;
তব তটে বসি মম সুচারু হাসিনী
নব বিবাহিতা বালা আনত আননে!
এই লও, স্রোতে তব দিনু ভাসাইয়া
কমলকুসুমমালা, দিয়ে করে তার।

ইত্যাদি।

এই ইংরাজি কবিতা ও বাংলা কবিতাগুলিতে অতি অল্প প্রভেদ আছে।

বাঙালি ভায়ারা করি নিবেদন
জোড় করি বন্দি ও রাঙা চরণ!
যা-কিছু বলিনু ভালোরি কারণ
ভাবি দেখো মনে কোরো না রাগ।
রাগ তো কর না দাসত্ব করিতে
রাগ তো কর না নিগার হইতে
পাদুকা বহিতে অধীন রহিতে
হৃদয়ে লেপিয়া কলঙ্কদাগ!
এ-সব করিতে রাগ যদি নাই
আমার কথায় রেগো না দোহাই
বাড়িবে কলঙ্ক আরও তা হলে!

অবসরসরোজিনীর কবি ভাবিতেছেন তিনি হাসিতে হাসিতে, উপহাস করিতে করিতে খুব বুঝি অর্থ স্পর্শ করিতেছেন, কিন্তু 'বাঙালি ভায়ারা' ইত্যাদিতে কবিতার উপর অভক্তি ভিন্ন আর কোনো ভাব মনে আসে না। তাঁহার মনোরচিত কবিতার মধ্যে ছন্দ আছে বটে, কিন্তু ভাব নাই। তাঁহার প্রেমের কবিতার মধ্যে কৃত্রিমতা ও আড়ম্বর আছে বটে কিন্তু অনুরাগের জ্বলন্ত তেজ নাই। তিনি 'কেন ভালোবাসি?'র ন্যায় একটি কবিতা লিখিতে পারেন না এবং ভুবনমোহিনীরও

তাঁহার 'প্রিয়তমা হাসিল'র ন্যায় কবিতা মনে আসিতে পারে না। সরোজিনীর মধ্যে রূপক তুলনার কৌশলবাক্যের আড়ম্বর আছে, কিন্তু সেগুলি হৃদয় স্পর্শ করে না। ভুবনমোহিনীর কবিতার মধ্যে অর্থহীনতা, অসম্বদ্ধ রচনা অনেক আছে তথাপি সেগুলি সত্ত্বেও কতকগুলি কবিতা হৃদয় স্পর্শ করে।

যদিও ভুবনমোহিনীর কবিতার মধ্যে প্রয়াসজাত কবিতা নাই, সবগুলিই প্রতিভার চিরজীবন্ত নির্ঝরিণী হইতে উৎসারিত, তথাপি যদি ভুবনমোহিনীকে মন হইতে স্থানান্তরিত করিয়া কবিতাগুলি পড়ি তবে কেমন লাগে বলিতে পারি না। আমরা ইহার যাহাই পড়িতে যাই তাহাতেই ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে। গুণ পাইলে অমনি ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে, অমনি সেই গুণ দ্বিগুণিত হইয়া মনে উঠে। দোষ পাইলে অমনি ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে, অমনি তাহার চতুর্থাংশ কমিয়া যায়। যখন আমরা

রুধির মেখেছে, রুধির পিতেছে,
রুধির প্রবাহে দিতেছে সাঁতার
ছিন্ন শীর্ষ শব, ভেসে যায় সব
পিশাচী প্রেতিনী কাতারে কাতার!
সস্বনে নিস্বনে মলয় পবন,
আহ্বরি সুরভি নন্দনরতন
মন্দারসৌরভ অমৃতরাশি
মর্মরিছে তরু অটল ভূধর,
দমিছে দাপেতে কাঁপিছে শিখর—

প্রভৃতি পড়িয়া কিছুই অর্থ করিতে পারি না তখন ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে এবং ইহার অর্থ বুঝিতেও চাই না! যখন উন্মাদিনী পড়িয়া আমাদের হাসি আসে তখন ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে, অমনি হাসি চাপিয়া ফেলি! যখন প্রতিভার 'পিশাচী' 'প্রেতিনী' -ময়ী কবিতার মধ্যে কোনো কর্কশ কথা পাই তখনি ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে ও আমরা যথাসাধ্য কোমল করিয়া পাঠ করি! একজনকে আমি 'উন্মাদিনী' কবিতার অর্থ বুঝাইতে বলি; তিনি কহিলেন আমি ইহার অর্থ বুঝাইতে পারি না, কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে একটি মাধুর্য আছে। কবিতার মধ্যে যাহা অসম্বদ্ধ প্রলাপ, যাহার অর্থ হয় না, লোকে তাহার মধ্যে মাধুর্য কল্পনা করে; এবং দর্শনের মধ্যে যে অংশটুকু দুর্বোধ্য ও কঠোর তাহাই পাঠকেরা গভীর দর্শন বলিয়া মনে করেন। অনেক গীতিকাব্যের দোষ এই যে তাহার শৃঙ্খলা নাই, অর্থ নাই, উন্মত্ততাময়; অনেকে মনে করেন এরূপ উন্মত্ততা না হইলে কবির উচ্ছ্বসিত হৃদয় হইতে যে কবিতা প্রসূত হইয়াছে তাহার প্রমাণ থাকে না। প্রতিভা এই দোষে কলঙ্কিত। ইহার অনেক দোষ পরিহার করিয়া কতকগুলি কবিতা পাই যাহা উচ্চশ্রেণীর কবিতা বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

'সরোজিনী' ও 'প্রতিভা' পড়িতে পড়িতে আমরা 'দুঃখসঙ্গিনী'কে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। দুঃখসঙ্গিনীতে আর্যসংগীত নাই, আর্যরক্ত নাই, যবন নাই, রক্তারক্তি নাই; ইহাতে হৃদয়ের অশ্রুজল, হৃদয়ের রক্ত ও প্রেম ভিন্ন আর কিছুই নাই। হৃদয়ের বৃত্তিনিচয়ের মধ্যে প্রেমে যেমন বৈচিত্র্য আছে এমন আর কিছুতেই নাই। প্রেমের মধ্যে দুঃখ আছে, সুখ আছে, নৈরাশ্য আছে, দ্বেষ আছে, এবং প্রেমের সহিত অনেকগুলি মনোবৃত্তি জড়িত। এখন কতকগুলি সমালোচক ধুয়া ধরিয়াছেন যে প্রেমের কথা কহিলে বঙ্গদেশ অধঃপাতে যাইবে। এ কথার অর্থ খুব অল্পই আছে। হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি প্রেমকে অবহেলা করিয়া যিনি তেজস্বিতা সঞ্চয় করিতে চাহেন তিনি মানবপ্রকৃতি বুঝেন না। যে মনুষ্যের হৃদয়ে প্রেম নাই তেজস্বিতা আছে, তাহার হৃদয় নরক! কিন্তু যাহার হৃদয়ে প্রকৃত প্রেম আছে, তাহার তেজস্বিতা আছেই। তুমি কবি! নৈরাশ্য বিষাদ -জনিত অশ্রুজল যদি তোমার হৃদয়ে জমিয়া থাকে, তবে তাহা প্রকাশ করিয়া ফেলো! তাহা দমন করিয়া

তুমি বলপূর্বক যেন 'ভারত' 'একতা' 'যবন' প্রভৃতি বলিয়া চিৎকার করিয়ো না। কবিতা হৃদয়ের প্রস্রবণ হইতে উত্থিত হয়, সমালোচকদের তিরস্কার হইতে উত্থিত হয় না। দুঃখসঙ্গিনীর বিষয় আমরা এই বলিতে পারি— তাহার ভাষা অতিশয় মিষ্ট। তিনি যেখানে কিছু বর্ণনা করিয়াছেন সেইখানকার ভাষাই মিষ্ট হইয়াছে। তবে একটি কথা স্বীকার করিতে হয় যে, তাঁহার ভাবের মাধুর্য অপেক্ষা ভাষার মাধুর্য অধিকতর মন আকর্ষণ করে। এই পুস্তকের মধ্যে হইতে আমরা অনেক সুন্দর পঙ্‌ক্তি তুলিয়া দিবার মানস করিয়াছিলাম, কিন্তু বাহুল্য-ভয়ে পারিলাম না।

গ্রন্থপরিচয়

রবীন্দ্রনাথের যে-সকল রচনা দীর্ঘকাল যাবৎ অগ্রন্থিত থাকিয়া গিয়াছে এবং বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকীর্ণ হইয়া আছে, বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রানুরাগী গবেষকেরা তাহার তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। সম্পূর্ণ এবং অভ্রান্ত না হইলেও, সেইসব তালিকা আমাদের বিচার-বিবেচনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সাহায্য করে। বর্তমান খণ্ডের রচনাগুলি এবং ইহার গ্রন্থপরিচয় সংকলনের কাজে আমরা প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র সেন, পুলিনবিহারী সেন এবং কানাই সামন্তের বিভিন্ন গবেষণার কাছে ঋণী। পরবর্তী পর্যায়ে এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য কাজ করিয়াছেন শ্রীঅমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, শ্রীমতী সঙ্ঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল, শ্রীমতী সাধনা মজুমদার এবং শ্রীঅনাথনাথ দাস। সেইসব কাজের, এবং আরও কোনো কোনো নূতন সন্ধানের সাহায্য লইয়া এই গ্রন্থপরিচয় সংকলিত হইল। গ্রন্থপরিচয় প্রস্তুত করিয়াছেন শ্রীঅনাথনাথ দাস এবং শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল।

কবিতা

কবিতাগুলির সাময়িকপত্রে, কোনো কোনো স্থলে গ্রন্থে, প্রথম প্রকাশের সূচী নিম্নে দেওয়া হইল :

১. অভিলাষ	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ৮ম কল্প, ৪র্থ ভাগ, অগ্রহায়ণ ১৭৯৬ শক (১২৮১ বঙ্গাব্দ)
২. 'হোক ভারতের জয়'	বান্ধব, মাঘ ১২৮১
৩. হিন্দুমেলায় উপহার	অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৪ ফাল্গুন ১২৮১। ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫
৪. প্রকৃতির খেদ : দ্বিতীয় পাঠ	প্রতিবিম্ব, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ ১২৮২
৫. প্রকৃতির খেদ : প্রথম পাঠ	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আষাঢ়, ১৭৯৭ শক। ১২৮২ বঙ্গাব্দ, জুন ১৮৭৫ খৃস্টাব্দ।
৬. 'জ্বল্ জ্বল্ চিতা! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ'	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর -প্রণীত 'সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক'-এর অন্তর্গত। অগ্রহায়ণ ১২৮২। নভেম্বর ১৮৭৫
৭. প্রলাপ ১	জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব, অগ্রহায়ণ ১২৮২
৮. প্রলাপ ২	জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব, ফাল্গুন ১২৮২
৯. প্রলাপ ৩	জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব, বৈশাখ ১২৮৩
১০. দিল্লি দরবার	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত 'স্বপ্নময়ী' নাটকের অন্তর্গত। ১৮৮২ খৃস্টাব্দ
১১. ভারতী	ভারতী, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, শ্রাবণ ১২৮৪
১২. হিমালয়	ভারতী, ভাদ্র ১২৮৪
১৩. আগমনী	ভারতী, আশ্বিন ১২৮৪
১৪. আকুল আহ্বান	বালক, আশ্বিন-কার্তিক ১২৯২
১৫. অবসাদ	বালক, চৈত্র ১২৯২
১৬. মেঘ্লা শ্রাবণের বাদ্লা রাতি	আনন্দবাজার পত্রিকা, শারদীয়া সংখ্যা ১৩৭১
১৭. শারদা	ভারতবর্ষ, কার্তিক ১৩২৪

১. ৩৯টি স্তবকে রচিত 'অভিলাষ' কবিতাটির শিরোনামের নীচে 'দ্বাদশবর্ষীয় বালকের রচিত' এই সম্পাদকীয় মন্তব্য মুদ্রিত আছে। সজনীকান্ত দাস কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের রচনা, এইরূপ

অনুমান করিয়া 'তাঁহার নিকট উপস্থিত করিলে তিনি উহা নিঃসংশয়ে আপনার বলিয়া স্বীকার' করেন। বর্তমান প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, সজনীকান্ত দাস -কৃত 'রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী', শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৪৬ এবং 'রবীন্দ্রনাথ/জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থ (প্রকাশ ১৩৬৭)।

২. কালীপ্রসন্ন ঘোষ -সম্পাদিত, ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'বান্ধব' মাসিক পত্রিকার মাঘ ১২৮১ সংখ্যায় 'হোক ভারতের জয়' শীর্ষক কবিতাটি প্রকাশিত। রচনাশেষে '(র)' আদ্যক্ষর মুদ্রিত। 'হিন্দুমেলা উপলক্ষে এই কবিতাটি রচিত হইয়াছিল' এই মন্তব্য পাদটীকায় আছে। কবিতাটি রথীন্দ্রকান্ত ঘটকচৌধুরী 'রবীন্দ্রনাথের একটি দুষ্প্রাপ্য কবিতা' শিরোনামে ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৩ সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকায় প্রাসঙ্গিক তথ্যসহ পুনর্মুদ্রণ করেন। এই কবিতা হিন্দুমেলার উদ্‌বোধন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করেন তাহার প্রমাণ *Indian Daily News* (১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫) ও *The Bengalee*-র প্রতিবেদনে (২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫) লক্ষ করা যায়। *The Bengalee* পত্রিকার পরিবেশিত তথ্যানুসারে, কবিতাপাঠের তারিখ ১ ফাল্গুন ১২৮১ (১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫), কিন্তু *Indian Daily News* পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ অনুসারে কবিতাপাঠের তারিখ ৩০ মাঘ ১২৮১ (১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫)।

অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর -রচিত 'মিলে সবে ভারত সন্তান' গান হইতে 'হোক ভারতের জয়' শিরোনামটি যে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন, তাহা উদ্‌ধৃতি-চিহ্নযুক্ত কবিতা-শিরোনাম হইতে অনুমেয়।

৩. দ্বি-ভাষিক সাপ্তাহিক অমৃতবাজার পত্রিকায় ১৪ ফাল্গুন ১২৮১ (২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫) 'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' স্বাক্ষরে 'হিন্দুমেলায় উপহার' কবিতাটি প্রকাশিত। পত্রিকার পুরাতন ফাইল হইতে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতাটি উদ্ধার করিয়া ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের 'প্রবাসী' পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত করেন। রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ-স্বাক্ষরিত সাময়িকপত্রে মুদ্রিত ইহাই প্রথম কবিতা।

৪. অস্বাক্ষরিত। কবিতা শেষে 'ক্রমশঃ' শব্দটি মুদ্রিত ছিল। পরে অন্য-কোনো পত্রিকায় পরবর্তী অংশ প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, এ-বিষয়ে সন্দেহ আছে।

'বিদ্বজ্জন সমাগম'-এর সভায়, রবিবার ২৭ বৈশাখ ১২৮২ (৯ মে ১৮৭৫) কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ পাঠ করিয়াছিলেন। উল্লেখনীয়, এই সভায় রবীন্দ্রনাথ 'প্রকৃতির খেদ' কবিতার যে রূপটি আবৃত্তি করিয়া শোনান 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় প্রকাশকালে তাহার অনেকখানি পরিবর্তিত হইয়া প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় সম্পাদকীয় টীকা হইতে জানা যায়, '...লেখক প্রথমে এই পদ্যটির কাপি যেরূপ প্রেরণ করেন, প্রুফ সংশোধনের সময় তাহার অনেক পরিবর্ত্ত করিয়া দেন।... লেখকের সংশোধিত পদ্যটি তৎকালে ['বিদ্বজ্জন সমাগম'-এর সভা : রবিবার ২৭ বৈশাখ ১২৮২] আমাদের নিকট থাকায় অসংশোধিত কাপিখানি দেখিয়া অর্দ্ধাংশমাত্র মুদ্রিত করিয়া 'বিদ্বজ্জনসমাগম' সভায় প্রদান করা হয়। এ জন্য রচয়িতার এই সংশোধিত রচনার সহিত সভার মুদ্রিত রচনার স্থানে স্থানে অনেক প্রভেদ লক্ষিত হইবে।'

৫. 'বালকের রচিত' এই উল্লেখ শিরোনামের নীচে মুদ্রিত। সজনীকান্ত দাস মুদ্রিত কবিতাটি রবীন্দ্রনাথকে দেখাইলে তাঁহার রচনা বলিয়া স্বীকার করেন। বর্তমান প্রসঙ্গে সজনীকান্ত শনিবারের চিঠি-র অগ্রহায়ণ ১৩৪৬ সংখ্যায় প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী'তে লিখিয়াছেন, 'আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথকে দেখাইতেই তিনি ইহার কয়েক পংক্তি মুখস্থ বলিতে পারিলেন, যদিও দীর্ঘ চৌষট্টি বৎসরের পূর্বেকার কথা।...' এই কবিতা যে রবীন্দ্রনাথ-রচিত তাহার আরও প্রমাণ, অক্ষয়চন্দ্র সরকার -সম্পাদিত 'সাধারণী' ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৮২ সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদ— 'বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "প্রকৃতির খেদ" নামে স্বরচিত একটি পদ্যপ্রবন্ধ পাঠ করেন।...' প্রবোধচন্দ্র সেন সম্পূর্ণ সংবাদটি 'রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা' শীর্ষক প্রবন্ধে (প্রকাশ, দেশ, ১৬ চৈত্র ১৩৫২) সংকলন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া, ১২৮২ বঙ্গাব্দের ২ জ্যৈষ্ঠ

শিলাইদহ হইতে লেখা একটি পত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গুণেন্দ্রনাথকে এই কবিতা প্রসঙ্গে লেখেন, 'বিদ্বজ্জনের card ও রবির কবিতা পাইয়াছি— কর্ত্তামহাশয় কবিতাটী পাঠ করিয়া ভাল বলিলেন।...'

৬. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক'-এর (প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১২৮২। নভেম্বর ১৮৭৫) ষষ্ঠ অঙ্কের অন্তর্ভুক্ত গান। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' (প্রকাশ ১৩২৬) গ্রন্থ হইতে এই তথ্যটি প্রথম জানা গিয়াছে—

> "আমি [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ] ও রামসর্ব্বস্ব দুইজনে রবির পড়ার ঘরে বসিয়াই 'সরোজিনী'র প্রুফ্ সংশোধন করিতাম। রামসর্ব্বস্ব খুব জোরে জোরে পড়িতেন। পাশের ঘর হইতে রবি শুনিতেন, ও মাঝে মাঝে পণ্ডিত মহাশয়কে উদ্দেশ্য করিয়া, কোন্ স্থানে কি করিলে ভাল হয়, সেই মতামত প্রকাশ করিতেন। রাজপুত মহিলাদের চিতা প্রবেশের যে একটা দৃশ্য আছে, তাহাতে পূর্ব্বে আমি গদ্যে একটা বক্তৃতা রচনা করিয়া দিয়াছিলাম। যখন এই স্থানটা পড়িয়া প্রুফ্ দেখা হইতেছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ পাশের ঘরে পড়াশুনা বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া শুনিতেছিলেন। গদ্য-রচনাটি এখানে একেবারেই খাপ খায় নাই বুঝিয়া, কিশোর রবি একেবারে আমাদের ঘরে আসিয়া হাজির। তিনি বলিলেন— এখানে পদ্য রচনা ছাড়া কিছুতেই জোর বাঁধিতে পারে না। প্রস্তাবটা আমি উপেক্ষা করিতে পারিলাম না— কারণ, প্রথম হইতেই আমারও মনটা কেমন খুঁৎ খুঁৎ করিতেছিল। কিন্তু এখন আর সময় কৈ? আমি সময়াভাবের আপত্তি উত্থাপন করিলে, রবীন্দ্রনাথ সেই বক্তৃতাটির পরিবর্ত্তে একটা গান রচনা করিয়া দিবার ভার লইলেন, এবং তখনই খুব অল্প সময়ের মধ্যেই 'জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ' এই গানটি রচনা করিয়া আনিয়া, আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন।"

৭-৯. স্বাক্ষরিত রচনা। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কোনো কাব্যের মধ্যে 'প্রলাপ' কবিতাগুচ্ছকে স্থান দেন নাই। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের "রচনাপ্রকাশ" অধ্যায়ে আলোচ্য পর্বের কবিতাগুলি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "এমন সময় 'জ্ঞানাঙ্কুর' নামে এক কাগজ বাহির হইল। কাগজের নামের উপযুক্ত একটি অঙ্কুরোদ্গত কবিও কাগজের কর্তৃপক্ষেরা সংগ্রহ করিলেন। আমার সমস্ত পদ্যপ্রলাপ নির্বিচারে তাঁহারা বাহির করিতে শুরু করিয়াছিলেন। কালের দরবারে আমার সুকৃতি দুষ্কৃতি বিচারের সময় কোন্‌দিন তাহাদের তলব পড়িবে, এবং কোন্ উৎসাহী পেয়াদা তাহাদিগকে বিস্মৃত কাগজের অন্দরমহল হইতে নির্লজ্জভাবে লোকসমাজে টানিয়া বাহির করিয়া আনিবে, জেনানার দোহাই মানিবে না, এ ভয় আমার মনের মধ্যে আছে।"

ইতিপূর্বে প্রকাশিত 'অভিলাষ', 'হোক ভারতের জয়', 'হিন্দুমেলায় উপহার', 'প্রকৃতির খেদ' ইত্যাদি কবিতার সঙ্গে 'প্রলাপ'গুচ্ছটিকেও রবীন্দ্রনাথ বর্জন করেন। 'প্রলাপ' প্রথম সংকলিত হয় রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার -কর্তৃক প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-রচনাবলী,' তৃতীয় খণ্ডে।

১০. লর্ড লিটনের সময়ে অনুষ্ঠিত (১৮৭৭ খৃস্টাব্দ) দিল্লি দরবার উপলক্ষে রচিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বপ্নময়ী' নাটকের (প্রকাশ ১৮৮২ খৃস্টাব্দ) চতুর্থ অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে শুভসিংহের স্বগত-উক্তিরূপে মুদ্রিত। 'সাধারণী' সাপ্তাহিক পত্রে ৪ মার্চ ১৮৭৭ তারিখে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, "... রবীন্দ্রবাবু 'দিল্লীর দরবার' সম্পর্কে একটি কবিতা এবং একটি গীত রচনা করিয়াছিলেন। আমরা একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ ছায়ার দূর্ব্বাসনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার কবিতা এবং গীতটি শ্রবণ করি।... ইচ্ছা হইল রবীন্দ্রের গলা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলি— আয় ভাই 'আমরা গাইব অন্য গান'।"

যতিনাথ ঘোষ কবিতাটি যথার্থভাবে নিরূপণ করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসকে জানান। বর্তমান প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, ব্রজেন্দ্রনাথের 'রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়' (সং মাঘ ১৩৫০) ও সজনীকান্তের 'রবীন্দ্রনাথ / জীবন ও সাহিত্য' (১৩৬৭) গ্রন্থ। উভয় স্থলেই কবিতাটি সংকলিত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের সঙ্গে আলোচনাকালে রবীন্দ্রনাথ 'ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ'/'ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ' নামে একটি কবিতা ('লর্ড লিটনের সময়ের কবিতা') হিন্দুমেলায় পাঠ করিয়া প্রশংসা অর্জন করিয়াছিলেন, অস্পষ্টভাবে এইটুকু স্মরণ করিতে পারিয়াছিলেন। কবিতাটির সন্ধান এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।— দ্রষ্টব্য, 'রবীন্দ্রনাথ', প্রশান্তচন্দ্র মহলাবিশ, দিনলিপি। 'রবীন্দ্রবীক্ষা', সংকলন ২৮, শ্রাবণ ১৪০২।

১১. অস্বাক্ষরিত। 'ভারতী' পত্রিকার প্রথম কয়েক বৎসরের অস্বাক্ষরিত রবীন্দ্ররচনা তালিকাবদ্ধ করিয়া সজনীকান্ত দাস রবীন্দ্রনাথকে দিয়া যে অনুমোদন করাইয়া লইয়াছিলেন, তাহাতে এই কবিতাটি আছে। রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালেই 'শনিবারের চিঠি'র অগ্রহায়ণ ১৩৪৬ সংখ্যায় প্রকাশিত সজনীকান্ত-কৃত 'রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী' প্রবন্ধে 'ভারতী' কবিতার নাম তালিকাবদ্ধ হইয়াছে।

শিল্পী ত্রৈলোক্যনাথ দেব -অঙ্কিত 'ভারতী' পত্রিকার প্রচ্ছদ-চিত্রের সহিত রবীন্দ্রনাথের কবিতাটির ভাব-সামঞ্জস্য লক্ষণীয়।

১২. অস্বাক্ষরিত। সজনীকান্ত দাসের পূর্ব-উল্লিখিত তালিকা এবং 'রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী'-ভুক্ত। পরবর্তীকালে 'মালতীপুঁথি'তে ইহার প্রাথমিক রূপটির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার -প্রকাশিত (১৩৯০) 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', তৃতীয় খণ্ডে সংকলিত।

১৩. অস্বাক্ষরিত। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের 'রবীন্দ্র-পরিচয়' প্রবন্ধাবলির (প্রকাশ 'প্রবাসী', মাঘ-চৈত্র ১৩২৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩২৯) রচনাপ্রকাশ' অধ্যায়ে রবীন্দ্র-রচনা হিসাবে চিহ্নিত। দ্রষ্টব্য. প্রসঙ্গ 'রবীন্দ্রনাথ' (১৩৯২) গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ-সমর্থিত, সজনীকান্ত দাস -কৃত তালিকাতেও রচনাটির নাম পাওয়া যায়।

১৪. 'পুষ্পাঞ্জলি'র পাণ্ডুলিপিতে কবিতাটির আদিরূপের সন্ধান পাওয়া যায়, সেখানে ৩৬টি ছত্রে কবিতাটি শেষ হইয়াছে। 'বালক' পত্রিকায়, কবিতাটির মুদ্রিত রূপে দেখা যায় ৭৬টি ছত্রে সমাপ্ত। পাণ্ডুলিপি ও পত্রিকা -ধৃত 'আকুল আহ্বান'-এর মধ্যে নানাবিধ পার্থক্য আছে।

'কড়ি ও কোমল' কাব্যের প্রথম সংস্করণে (১২৯৩) রবীন্দ্রনাথ কবিতাটিকে বিভিন্ন শিরোনামে, নানারূপ গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়া তিনটি স্বতন্ত্র কবিতায় পরিণত করিয়াছেন। কবিতাগুলি যথাক্রমে, 'আকুল আহ্বান', 'পাষাণী মা', 'মায়ের আশা'। পরবর্তীকালে প্রকাশিত 'শিশু' কাব্যে 'আকুল আহ্বান' ও 'মায়ের আশা' সংকলনকালে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় সম্পাদনা করিয়াছেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, পত্রিকা হইতে গ্রন্থে সংকলনকালে কবিতামধ্যস্থ ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ ক্রমশ বর্জিত হইয়াছে।

আলোচ্য কবিতা-বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, কানাই সামন্ত, "রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি-বিবরণ/পুষ্পাঞ্জলি", 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৫ এবং 'রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি-পরিচয়' (প্রকাশ ১৩৯৮) গ্রন্থ।

১৫. 'মালতীপুঁথি'তে শিরোনামহীন অবস্থায় কিঞ্চিৎ ভিন্নতর পাঠে কবিতাটি পাওয়া যায়। রচনার স্থান কাল রবীন্দ্রনাথ লিখিয়া রাখিয়াছেন 'Ahmedabad/1878-July 6th / আষাঢ় ২৩শে [১২৮৫] শনিবার।' প্রবোধচন্দ্র সেন 'রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা' প্রথম খণ্ডে (প্রকাশ, কার্তিক ১৩৭২), 'মালতীপুঁথি/পাণ্ডুলিপি-পরিচয়' প্রবন্ধে রচনাটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার -প্রকাশিত শতবার্ষিক সংস্করণ 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', চতুর্থ খণ্ডে

'শৈশব সঙ্গীত' কাব্যের পরিশিষ্টরূপে 'অবসাদ' সংগ্রথিত হইয়াছে।

১৬. শিরোনামহীন এই কবিতাটি গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর -গৃহীত একটি আলোকচিত্র গ্রহণ উপলক্ষে অথবা আলোকচিত্রটি দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন। গগনেন্দ্রনাথের ফোটোগ্রাফি-চর্চার সময়ের হিসাব অনুমান করিয়া কবিতাটির রচনাকাল ১৮৯০ হইতে ১৮৯৫ খৃস্টাব্দের মধ্যে, এইরূপ ধরা যাইতে পারে। কবিতায় যে-পাঁচজন বন্ধুর উল্লেখ আছে, তাঁহারা অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ও হরিশ্চন্দ্র হালদার। রবীন্দ্রনাথও সম্ভবত এই সান্ধ্য-মজলিশের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, ঘটনার অনুপুঙ্খ বর্ণনা পড়িয়া তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। এই কবিতা-বিষয়ে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য তথ্যাদি আছে, 'রবীন্দ্রবীক্ষা' সংকলন ২৮, শ্রাবণ ১৪০২ সংখ্যায়।

১৭. ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়কে (১২৫৮-১৩১০) লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের সহিত 'শারদা' কবিতাটির সন্ধান পাইয়া অমরেন্দ্রনাথ রায় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার কার্তিক ১৩২৪ সংখ্যায় 'সাহিত্য-প্রসঙ্গ' (পৃ. ৫৭৭) নিবন্ধের-মধ্যে মুদ্রিত করেন। ১৩০১ হইতে ১৩০৯ বঙ্গাব্দের মধ্যে কোনো সময়ে কবিতাটি রচিত হয় বলিয়া অনুমান। এই সময়সীমার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সহিত ঠাকুরদাসের যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া যায়। কোনো সাময়িক পত্রিকার শারদ সংখ্যার জন্য কবিতাটি রচিত হইয়াছিল এরূপ অনুমান করা যায়, কিন্তু কোথাও মুদ্রিত হইয়াছিল কি না, আমাদের জানা নাই। অমরেন্দ্রনাথ রায় বর্তমান প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন, এখানে তাহা উদ্‌ধৃত হইল—

রবীন্দ্রবাবুর পত্র :—

রবীন্দ্রবাবু ঠাকুরদাসবাবুকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার একখানির মধ্যে তাঁহার হাতের লেখা 'শারদা' শীর্ষক একটি চতুর্দ্দশপদী কবিতা পাইয়াছি। কবিতাটি কোথাও মুদ্রিত হইয়াছে কি না জানি না। সময়োপযোগী বোধে আমরা পত্রের সঙ্গে তাহা মুদ্রিত করিলাম।—

ওঁ

যোড়াসাঁকো

সাদর নমস্কার নিবেদন—

আমি আগামী সোমবার রাত্রে বোলপুর 'শান্তি-নিকেতন' উদ্যানে যাত্রা করিব। ইতিমধ্যে কখন আপনি আমার সহিত দেখা করিতে পারিবেন লিখিয়া পাঠাইলে সুখী হইব। ইতি। শনিবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মালতীপুঁথি-ধৃত কবিতাবলী। রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে সংরক্ষিত, এ-তাবৎ প্রাপ্ত, সর্বপ্রাচীন রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি 'মালতীপুঁথি' (অভিজ্ঞান সংখ্যা ২৩১) হইতে ১৩টি কবিতা রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে সংকলিত হইল। দিল্লির লেডি আরউইন স্কুলের অধ্যাপিকা মালতী সেন ১৯৪৩ খৃস্টাব্দের প্রথম দিকে এই পাণ্ডুলিপি বিশ্বভারতীকে দান করেন। তাঁহার নাম হইতেই পাণ্ডুলিপিটির 'মালতীপুঁথি' নামকরণ হইয়াছে। এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে প্রবোধচন্দ্র সেনের প্রবন্ধ "মালতীপুঁথি : পাণ্ডুলিপি-পরিচয়" 'রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা' প্রথম খণ্ড (১৯৬৫), বর্তমান প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। তাঁহার যুক্তি অনুসারে পাণ্ডুলিপিভুক্ত রচনাবলী ১৮৭৪ খৃস্টাব্দ হইতে ১৮৮২ খৃস্টাব্দ কালসীমার মধ্যে রচিত। পরবর্তীকালে 'রবীন্দ্রবীক্ষা' সংকলন ৮ পৌষ ১৩৮৯ সংখ্যায় প্রকাশিত কানাই সামন্তর 'মালতীপুঁথি পর্যালোচনা'য় নূতনতর কিছু আলোচনা আছে।

বর্তমান রচনাবলীতে 'মালতীপুঁথি'ভুক্ত যে-সকল কবিতা সম্পূর্ণ বলিয়া বিবেচিত সেগুলি গৃহীত হইল। সংকলিত কবিতাবলীর মধ্যে শিরোনামযুক্ত একমাত্র কবিতা 'উপহার-গীতি'। শিরোনামহীন কবিতাগুলির ক্ষেত্রে কবিতার প্রথম ছত্র অথবা প্রথম ছত্রের অংশবিশেষ

শিরোনামরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে :

১. হা বিধাতা ছেলেবেলা হতেই এমন
২. এসো আজি সখা
৩. পার কি বলিতে কেহ
৪. ছেলেবেলাকার আহা
৫. আমার এ মনোজ্বালা
৬. উপহার-গীতি
৭. পাষাণ হৃদয়ে কেন
৮. ভেবেছি কাহারো সাথে
৯. হা রে বিধি কী দারুণ
১০. ও কথা বোলো না সখি
১১. কী হবে বলো গো সখি
১২. এ হতভাগারে ভালো
১৩. জানি সখা অভাগীরে

—রচনাকাল : ১৮৭৪-১৮৮২ খৃস্টাব্দ

১. হা বিধাতা— ছেলেবেলা হতেই এমন। পাণ্ডুলিপিতে শিরোনামহীন, তবে শিরোনামস্থলে 'প্রথম সর্গ' লিখিত থাকায় অনুমান করা যায়, এটি একটি কাব্য-পরিকল্পনার সূচনা-অংশ। কবিতাটি 'মালতীপুঁথি'র আরম্ভে সংস্কৃত-শিক্ষার নিদর্শনমূলক পৃষ্ঠার পরই লিখিত আছে। প্রবোধচন্দ্র সেনের অনুমান, 'প্রথম সর্গ' রবীন্দ্রনাথের লুপ্ত পাণ্ডুলিপি 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' কাব্যের 'কবিকৃত দ্বিতীয় সংস্করণের অসমাপ্ত অংশ।'

৬. 'উপহার-গীতি' শিরোনামযুক্ত কবিতাটির রচনাকাল অনুমান করা যাইতে পারে ১২৮৪ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসের শেষ দিকে। এরূপ অনুমানের কারণ, কবিতাটির নীচেই '১লা কার্ত্তিক...' তারিখচিহ্নিত 'কবি-কাহিনী' কাব্যের সূচনা। 'উপহার-গীতি', কবি-কাহিনীর 'উৎসর্গপত্ররূপে কল্পিত হওয়া অবাস্তব মনে হয় না'— কানাই সামন্ত এরূপ অনুমান করিয়াছেন (দ্রষ্টব্য, 'রবীন্দ্রবীক্ষা', সংকলন ৮, পৌষ ১৩৮৯)। কবিতাটির শেষে লিখিত আছে '*Les Poetes* হইতে/অনুবাদিত—।' এই শিরোনামের পাশে অস্পষ্টভাবে দেখা যায় 'ভগ্ন [হৃদয়ের] উপরে'। সম্ভবত, ভিক্টর হ্যুগোর *Les Contemplations* কাব্যগ্রন্থের *Les Poetes* কবিতার অনুবাদ এই স্থলে করিবেন, রবীন্দ্রনাথ এইরূপ ভাবিয়াছিলেন। 'উপহার-গীতি'র পাশের পৃষ্ঠায় ভিক্টর হ্যুগোর একটি কবিতার অনুবাদ দৃষ্ট হয় : ওই যেতেছেন কবি কাননের পথ দিয়া।

সংযোজন

সন্ধ্যাসংগীত (১৮৮২), প্রভাতসংগীত (১৮৮৩), ছবি ও গান (১৮৮৪), ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (১৮৮৪) ও কড়ি ও কোমল (১৮৮৬) কাব্যগ্রন্থগুলির প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত নিম্নলিখিত কবিতাগুলি পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ বর্জন করিয়াছিলেন; সেই কবিতাগুলি এই অংশে সংকলিত হইল। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার -প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রথম খণ্ডে (১৩৮৭) এই কবিতাগুলি মূল কাব্যগ্রন্থের 'সংযোজন' অংশে সংকলিত হইয়াছে।

সন্ধ্যাসংগীত

১. সন্ধ্যা
২. কেন গান গাই
৩. কেন গান শুনাই
৪. বিষ ও সুধা

প্রভাতসংগীত

৫. স্নেহ-উপহার
৬. শরতে প্রকৃতি

ছবি ও গান

৭. বিরহ

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

৮. সখি রে— পিরীত বুঝবে কে?

৯. হম সখি দারিদ নারী।

কড়ি ও কোমল

১০. শরতের শুকতারা

১১. পত্র (মাগো আমার লক্ষ্মী)

১২. পত্র (বসে বসে লিখলেম চিঠি)

১৩. জন্মতিথির উপহার

১৪. চিঠি (চিঠি লিখব কথা ছিল)

১৫. পত্র (দামু বোস আর চামু বোসে)

১. বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' প্রথম খণ্ড (আশ্বিন ১৩৪৬) প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথ 'সন্ধ্যা' শীর্ষক কবিতাটি বর্জন করেন।

২-৩. এই কবিতা দুইটি সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় -কর্তৃক প্রকাশিত 'কাব্য গ্রন্থাবলী' (আশ্বিন ১৩০৩) সংস্করণে বর্জ্জিত হয়।

৪. 'বিষ ও সুধা' 'সন্ধ্যাসংগীত' কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯) বর্জ্জিত। কবিতাটির কিয়দংশের পাণ্ডুলিপি 'মালতীপুঁথি'তে পাওয়া যায়।
বর্তমান প্রসঙ্গে বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 'সন্ধ্যাসংগীত' পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণ (১৯৬৯) দ্রষ্টব্য।

৫. দশম বর্ষীয়া ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীর উদ্দেশে 'প্রভাতসংগীত' কাব্যগ্রন্থের প্রথম সংস্করণে উৎসর্গ-কবিতারূপে মুদ্রিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণ (চৈত্র ১২৯৮) হইতে কবিতাটি বর্জ্জিত।

৭. 'বিরহ' কবিতাটি পরবর্তী সংস্করণ সমূহের অনেকগুলিতে বর্জিত হয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রথম খণ্ডে (আশ্বিন ১৩৪৬) ও সুলভ প্রথম খণ্ডে গ্রহণ করা হয় নাই। বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 'ছবি ও গান' পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণ (১৯৯৫) বর্তমান প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

৮. প্রকাশ, ভারতী, ফাল্গুন ১২৮৪

৯. প্রকাশ, ভারতী, মাঘ ১২৮৪
—দুইটি কবিতাই পত্রিকাতে 'ভানুসিংহের কবিতা' শিরোনামে মুদ্রিত।
দ্রষ্টব্য, 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী', পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণ (১৩৭৬)।

১০. প্রকাশ, ভারতী, অগ্রহায়ণ ১২৯১। দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে বর্জিত।

১১-১২. ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীর উদ্দেশে রচিত।

১৩. বালক, চৈত্র ১২৯২। 'জন্মতিথির উপহার/(একটি কাঠের বাক্স)' শিরোনামে প্রকাশিত। ইন্দিরা দেবীর জন্মদিন উপলক্ষে রচিত।

১৪. প্রকাশ, বালক, ফাল্গুন ১২৯২। ইন্দিরা দেবীর উদ্দেশে রচিত।

১৫. প্রকাশ, 'সঞ্জীবনী', ১ চৈত্র ১২৯২। ১৩ মার্চ ১৮৮৬। 'প্রাপ্ত' কলমে 'দামু ও চামু। (বাউলের সুর)' শিরোনামে স্বাক্ষরহীনভাবে মুদ্রিত হয়। কবিতাটি 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ও বিশিষ্ট লেখক চন্দ্রনাথ বসুকে ব্যঙ্গ করিয়া লিখিত, এই অনুমানে বিভিন্ন পত্রিকায় তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, প্রশান্তকুমার পাল, 'রবিজীবনী' তৃতীয় খণ্ড (১৩৯৪)।

অনুবাদ-কবিতা

'ভারতী' প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা (শ্রাবণ ১২৮৪) হইতেই 'সম্পাদকের বৈঠক' নামক একটি বিভাগে বিভিন্ন লেখকের মৌলিক রচনা মুদ্রিত হইয়া আসিতেছিল। মাঘ ১২৮৪ সংখ্যা হইতে রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু অনুবাদ-কবিতা প্রকাশিত হইতে থাকে। এই রচনাগুলি অস্বাক্ষরিত। রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো কাব্যগ্রন্থে ও গীত-সংকলনে কয়েকটি গৃহীত হইয়াছে। 'মালতী-পুঁথি'তে কয়েকটি অনুবাদের মূল পাওয়া যায়।

ডাকিনী। ম্যাকবেথ। 'সম্পাদকের বৈঠক', ভারতী আশ্বিন ১২৮৭। William Shakespeare (1564-1616)-লিখিত *Macbeth* নাটকের প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যটির সম্পূর্ণ, তৃতীয় দৃশ্যের প্রথমাংশ এবং চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্য প্রথম অংশের অনুবাদ। বর্তমান গ্রন্থে মুদ্রিত বানানরীতি পত্রিকার অনুরূপ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের গৃহশিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের নির্দেশানুযায়ী সম্পূর্ণ ম্যাকবেথ নাটকের তর্জমা করিয়াছিলেন। ১৮৭৫ খৃস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের (মাঘ ১২৮১ বঙ্গাব্দ) মধ্যেই সম্ভবত এই অনুবাদকর্ম সমাপ্ত করেন। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে এই অনুবাদ এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তাহা শোনাইবার প্রসঙ্গ আছে। অনুবাদের মূল খাতাটি বিনষ্ট হইলেও অংশত 'ভারতী' পত্রিকায় মুদ্রিত আকারে থাকিয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনাসূত্রে এই অনুবাদের কোনো কোনো অংশ জানিতে পারিয়া সজনীকান্ত দাস 'ভারতী' পত্রিকা হইতে কিয়দংশ তাঁহার সংকলিত 'রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী'তে (শনিবারের চিঠি, কার্তিক-চৈত্র ১৩৪৬) মুদ্রিত করেন। সজনীকান্ত 'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য' (১৩৬৭) গ্রন্থে এ বিষয়ে জানাইয়াছেন, 'রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ -প্রদত্ত সূত্র ধরিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে ১২৮৭ সালের ভারতীর আশ্বিন সংখ্যায় 'সম্পাদকের বৈঠকে' তাহার সন্ধান পাইলাম।'

পশ্চিমবঙ্গ সরকার -প্রকাশিত জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' পঞ্চদশ খণ্ডে (১৩৭৩) এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার -প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' পঞ্চদশ খণ্ডে (১৪০১) এই অনুবাদ সংকলিত হইয়াছে।

বিচ্ছেদ। প্রতিকূল বায়ুভরে, ঊর্মিময় সিন্ধু-'পরে। সম্পাদকের বৈঠক। অনুবাদ। ভারতী, মাঘ ১২৮৪।

Thomas Moore (1779-1882), *Moore's Irish Melodies* (1846)

প্রথম ছত্র : As slow our ship her foamy track। চারিটি স্তবকযুক্ত এই কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকের অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক ব্যবহৃত গ্রন্থটি রবীন্দ্রভবন গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। 'মালতীপুঁথি'তে এই অনুবাদটির পাণ্ডুলিপি আছে।

বিদায়-চুম্বন। একটি চুম্বন দাও প্রমদা আমার। সম্পাদকের বৈঠক। অনুবাদ। ভারতী, মাঘ ১২৮৪

Robert Burns (1759-1796)

শিরোনাম : Parting Song to Clarinda

প্রথম ছত্র : Ae Fond kiss, and then we sever

কষ্টের জীবন। মানুষ কাঁদিয়া হাসে। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, মাঘ ১২৮৪।

George Gordon Byron (1788-1824)

গ্রন্থ : *Childe Harold's Pilgrimage,* সর্গ XXXII, XXXIII, XXXIV

প্রথম ছত্র : They mourn, but smile, at length ; and, মূল কবিতার শেষাংশের অনুবাদ 'ভারতী'তে মুদ্রিত হয় নাই। 'মালতীপুঁথি'তে অনুবাদটির পাণ্ডুলিপি আছে,

সেখানে অতিরিক্ত কয়েকটি ছত্র নিম্নরূপ—

মানুষের নিরাশার
অগ্নিময় আছে কি জীবন।
সে বিষ বাঁচায়ে রাখে
কোনো ক্রমে ভগন হৃদয়,
নিরাশার সে জীবন
কিন্তু সেই ফলের মতন
মৃত সিন্ধুতীরে জন্মে
অভ্যন্তর যার ভস্মময়।

জীবন উৎসর্গ। এসো এসো এই বুকে নিবাসে তোমার। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, মাঘ ১২৮৪।

Thomas Moore, *Moore's Irish Melodies*
প্রথম ছত্র : Come, rest in this bosom, my own stricken deer
মালতীপুঁথিতে মূল অনুবাদটি পাওয়া গিয়াছে।

ললিত-নলিনী। (কৃষকের প্রেমালাপ)। ললিত/হা নলিনী গেছে আহা কী সুখের দিন। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, মাঘ ১২৮৪

Robert Burns.
শিরোনাম : Philly and Willy : A duet
প্রথম ছত্র : He/O Philly, happy be that day

বিদায়। যাও তবে প্রিয়তম সুদূর প্রবাসে। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, মাঘ ১২৮৪।
Mrs. Amelia Opie (1769-1853)
প্রথম ছত্র : Go youth, beloved, in distant glades

সংগীত। কেমন সুন্দর আহা ঘুমায়ে রয়েছে। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, মাঘ ১২৮৪।
William Shakespeare, *Merchant of Venice*, Act V Sc I
প্রথম ছত্র : How sweet the moonlight sleeps upon this bank !

গভীর গভীরতম হৃদয়প্রদেশে। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, আষাঢ় ১২৮৫।
George Gordon Byron, *The Corsair* XIV (1-4)
প্রথম ছত্র : Deep in my soul that tender secret dwells

যাও তবে প্রিয়তম সুদূর সেথায়। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, আষাঢ় ১২৮৫
Thomas Moore, *Moore's Irish Melodies*
প্রথম ছত্র : Go where Glory waits thee

আবার আবার কেন রে আমার। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, আষাঢ় ১২৮৫
George Gordon Byron, *Hours of Idleness*
প্রথম ছত্র : I would I were a careless child

বৃদ্ধ কবি। মন হতে প্রেম যেতেছে শুকায়ে। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, কার্তিক ১২৮৬। সুর নির্দেশ : ভূপালী রাগিণী। অনুবাদের শেষে প্রদত্ত তথ্য : Translated from an English translation of the poem, by Talhaiarn the Welsh poet.

জাগি রহে চাঁদ আকাশে যখন। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, কার্তিক ১২৮৬। সুর নির্দেশ : বেহাগ রাগিণী।

পাতায় পাতায় দুলিছে শিশির। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, কার্তিক ১২৮৬। সুর নির্দেশ : পূরবী।

অনুবাদের শেষে প্রদত্ত তথ্য : Translated from an English translation of an Irish Song.

বলো গো বালা, আমারি তুমি। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, কার্তিক ১২৮৬। সুর নির্দেশ : পিলু।

Thomas Moore, *Moore's Irish Melodies*

শিরোনাম : If thou 'lt be mine.

প্রথম ছত্র : If thou 'lt be mine, the treasures of air,

গিয়াছে সে দিন, যে দিন হৃদয়। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, কার্তিক ১২৮৬

Thomas Moore, *Moore's Irish Melodies*

শিরোনাম : Love's young Dream.

প্রথম ছত্র : Oh ! the days are gone, when Beauty bright। মূল কবিতার তৃতীয় স্তবকটির বঙ্গানুবাদ করা হয় নাই।

রূপসী আমার, প্রেয়সী আমার। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, কার্তিক ১২৮৬

Robert Burns

শিরোনাম : The Birds of Aberfeldy

প্রথম ছত্র : Bonnie Lassie, will ye go,

সুশীলা আমার, জানালার 'পরে। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, কার্তিক ১২৮৬

Robert Burns

শিরোনাম : Mary Morison

প্রথম ছত্র : O Mary, at thy window be,

কোরো না ছলনা, কোরো না ছলনা। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, কার্তিক ১২৮৬

William Chappel (1809-1888)

চপলারে আমি অনেক ভাবিয়া। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, কার্তিক ১২৮৬

Lord Cantalupe

পত্রিকায় অনুবাদের শেষাংশ মুদ্রণত্রুটির ফলে ৩২২ পৃষ্ঠায় স্থানান্তরিত হইয়াছে।

প্রেমতত্ত্ব। নিঝর মিশিছে তটিনীর সাথে। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, কার্তিক ১২৮৬

P. B. Shelley (1792-1822)

শিরোনাম : Love's Philosophy

প্রথম ছত্র : The fountains mingle with the river

নলিনী/লীলাময়ী নলিনী। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, কার্তিক ১২৮৬

Alfred Tennyson (1809-1892)

শিরোনাম : Lilian

প্রথম ছত্র : Airy, fairy Lilian

দিনরাত্রি নাহি মানি। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, আষাঢ় ১২৮৮

Thomas Moore

শিরোনাম : Ne'er ask the hour

প্রথম ছত্র : Ne'er ask the hour— what is it to us

দামিনীর আঁখি কিবা ধরে জ্বল জ্বল বিভা। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, আষাঢ় ১২৮৮
Thomas Moore, *Moore's Irish Melodies*
প্রথম ছত্র : Lesbia hath a beaming eye,
'মালতীপুঁথি'তে সম্পূর্ণ অনুবাদটি পাওয়া গিয়াছে।

অদৃষ্টের হাতে লেখা সূক্ষ্ম এক রেখা। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, কার্তিক ১২৮৮
Matthew Arnold (1822-1888)
শিরোনাম : Too Late
প্রথম ছত্র : Each on his own strict line we move,

ভুজ-পাশ-বদ্ধ অ্যান্টনি। এই তো আমরা দোঁহে বসে আছি কাছে কাছে। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, আশ্বিন-কার্তিক ১২৮৮
Robert Buchanan (1841-1901)
শিরোনাম : Antony in Arms
প্রথম ছত্র : So, we are side by side

সুখী প্রাণ। জানো না তো নির্ঝরিণী, আসিয়াছ কোথা হতে। আলোচনা, প্রথম খণ্ড প্রথম সংখ্যা, ভাদ্র ১৮০৬ শক। ১২৯১ বঙ্গাব্দ।
Robert Buchanan
রবীন্দ্র-রচনাবলী, শতবার্ষিক সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ডে সংকলিত।

জীবন মরণ। ওরা যায়, এরা করে বাস। আলোচনা, প্রথম বর্ষ, কার্তিক ১৮০৬ শক। ১২৯১ বঙ্গাব্দ।
Victor Hugo (1802-1885)
গ্রন্থ : *Les Contemplations* (1857) Vol 1.
শিরোনাম : Quia/Pulvis/es
প্রথম ছত্র : Ceux-ei partent, ceux-la demeurent.

রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল গ্রন্থটির মধ্যে (পৃ. ২২৬) রবীন্দ্রনাথের স্বহস্ত-কৃত অনুবাদ লক্ষ করা যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার -প্রকাশিত শতবার্ষিক সংস্করণ, রবীন্দ্র-রচনাবলী চতুর্থ খণ্ডে সংকলিত।

১৯২৪ খৃস্টাব্দে চীন ভ্রমণকালে প্রদত্ত একটি ভাষণে (At the Scholar's Dinner, Peking, *Talks in China* (1925) গ্রন্থের Autobiographical II অধ্যায়ভুক্ত) রবীন্দ্রনাথ হাইনের অনুবাদচর্চার মধ্য দিয়া জার্মান ভাষা শিক্ষার যে বিবরণ দিয়াছেন, এখানে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় তাহা উদ্‌ধৃত হইল—

'I also wanted to know German literature and, by reading Heine in translation, I thought I had caught a glimpse of the beauty there. Fortunately I met a missionary lady from Germany and asked her help. I worked hard for some months, but being rather quick-witted, which is not a good quality, I was not persevering. I had the dangerous facility which helps one to guess the meaning too easily. My teacher thought I had almost mastered the language,— which was not true. I succeeded, however, in getting through Heine, like a man walking in sleep crossing unknown paths with ease, and I found immense pleasure.'

ইহার পূর্বে ইংরাজি অনুবাদের মধ্য দিয়া হাইনের কবিতার সহিত রবীন্দ্রনাথের

পরিচয় ঘটিয়াছিল। ১৮৮৭ খৃস্টাব্দে, রবীন্দ্রনাথের জন্মদিবসে স্বর্ণকুমারী দেবীর পুত্র জ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল রবীন্দ্রনাথকে Edgar Alfred Bowring -অনূদিত *The Poems of Heine* (1884) গ্রন্থটি উপহার দিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ মূল জার্মান *Poetische Werke von H. Heine* (1885) গ্রন্থটি সংগ্রহ করেন। উল্লিখিত দুইটি গ্রন্থই রবীন্দ্রভবন গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। দ্বিতীয় গ্রন্থটিতে রবীন্দ্রনাথ-অনূদিত হাইনের সকল মূল কবিতাই দেখা যায়।

Heinrich Heine (1790-1850)-এর মোট নয়টি কবিতার অনুবাদ সাধনা, বৈশাখ ১২৯২ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত :

স্বপ্ন দেখেছিনু প্রেমাগ্নিজ্বালার
প্রথম ছত্র : Mir traümte einst von Wildem Liebesglühn,
গ্রন্থ : *Junge Leiden* (1817-1821) : Traumbilder No. 1.

আঁখি পানে যবে আঁখি তুলি।
প্রথম ছত্র : Wenn ich in deine Augen sehe,
গ্রন্থ : *Lyrisches Intermezzo* (1822-1823). No. 4.

প্রথমে আশাহত হয়েছিনু।
প্রথম ছত্র : Anfangs Wollt ich fast verzagen,
গ্রন্থ : *Junge Leiden* : Lieder, No. 8

নীল বায়লেট নয়ন দুটি করিতেছে ঢলঢল।
প্রথম ছত্র : Die blauen veilchen der Äeugelein,
গ্রন্থ : *Lyrisches Intermezzo*, No. 30

গানগুলি মোর বিষে ঢালা।
প্রথম ছত্র : Vergifted sind miene Lieder;—
গ্রন্থ : *Lyrisches Intermezzo*, No. 51

তুমি একটি ফুলের মতো মণি।
প্রথম ছত্র : Du bist wie wine Blume,
গ্রন্থ : *Die Heimkehr* (1823-1824), No. 47

রানী, তোর ঠোঁটদুটি মিঠি।
প্রথম ছত্র : Mädchen mit dem roten Mündchen.
গ্রন্থ : *Die Heimkehr*. No. 50

বারেক ভালোবেসে যে জন মজে।
প্রথম ছত্র : Wer zum ersien Male liebt,
গ্রন্থ : *Die Heimkehr*. No. 63

বিশ্বামিত্র, বিচিত্র এ লীলা।
প্রথম ছত্র : Den könig Wiswamitra,
গ্রন্থ : *Die Heimkehr*. No. 45

ভালোবাসে যারে তার চিতাভস্ম পানে। 'মালতীপুঁথি'-ধৃত।
George Gordon Byron, *Childe Harold's Pilgrimage* Canto II, Stanza XV

'রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা' প্রথম খণ্ডে (প্রকাশ ১৯৬৫, পৃ. ৬) এই অনুবাদটির নয়টি ছত্র উদ্ধার করা হইয়াছে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রবীক্ষা সংকলন ৮ (পৃ. ৩২) মুদ্রণে আরও দুই-একটি ছত্রের উদ্ধার সম্ভব হওয়ায়, বর্তমান রচনাবলীতে পরিবর্তিত পাঠটি গৃহীত হইল।

প্রবন্ধ

সাহিত্য

সাময়িক পত্রিকাতে ও কোনো কোনো স্থলে গ্রন্থে, প্রবন্ধগুলির প্রকাশের সূচী নিম্নরূপ—

১. ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দু[ঃ]খসঙ্গিনী।	জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব, কার্তিক ১২৮৩
২. মেঘনাদবধ কাব্য। (মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত)	ভারতী, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, পৌষ, ফাল্গুন ১২৮৪
৩. স্যাক্‌সন জাতি ও অ্যাংলো স্যাক্‌সন সাহিত্য	ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৫
৪. বিয়াত্রিচে দান্তে ও তাঁহার কাব্য	ভারতী, ভাদ্র ১২৮৫
৫. পিত্রার্কা ও লরা	ভারতী, আশ্বিন ১২৮৫
৬. গেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ	ভারতী, কার্তিক ১২৮৫
৭. নর্ম্যান জাতি ও অ্যাংলো-নর্ম্যান সাহিত্য [প্রথম প্রস্তাব]	ভারতী, ফাল্গুন ১২৮৫
৮. [নর্ম্যান জাতি ও অ্যাংলো-নর্ম্যান সাহিত্য] দ্বিতীয় প্রস্তাব	ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৬
৯. চ্যাটার্টন— বালক কবি	ভারতী, আষাঢ় ১২৮৬
১০. বাঙালি কবি নয়	ভারতী, ভাদ্র ১২৮৭
১১. বাঙালি কবি নয় কেন?	ভারতী, আশ্বিন ১২৮৭
১২. 'দেশজ প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি' (প্রত্যুত্তর)	ভারতী, ভাদ্র ১২৮৯
১৩. কাব্য : স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট	ভারতী ও বালক, চৈত্র ১২৯৩
১৪. সাহিত্যের উদ্দেশ্য	ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৪
১৫. সাহিত্য ও সভ্যতা	ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৪
১৬. আলস্য ও সাহিত্য	ভারতী ও বালক, শ্রাবণ ১২৯৪

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক -ধৃত রচনা

১৭. কবিতার উপাদান রহস্য (Mystery)	দেশ, শারদীয়া ১৩৫৩
১৮. সৌন্দর্য	দেশ, শারদীয়া ১৩৫২
১৯. Dialogue/Literature	রবীন্দ্রবীক্ষা ১, শ্রাবণ ১৩৮৩
২০. সাহিত্য	রবীন্দ্রবীক্ষা ১, শ্রাবণ ১৩৮৩
২১. বাংলায় লেখা	রবীন্দ্রবীক্ষা ১, শ্রাবণ ১৩৮৩
২২. অপরিচিত ভাষা ও অপরিচিত সংগীত	রবীন্দ্রবীক্ষা ১, শ্রাবণ ১৩৮৩
২৩. সৌন্দর্য সম্বন্ধে গুটিকতক ভাব	ভারতী ও বালক, শ্রাবণ ১২৯৯
২৪. বাংলা সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা	রবীন্দ্রবীক্ষা ১, শ্রাবণ ১৩৮৩
২৫. [কাব্য]	রবীন্দ্রবীক্ষা ১, শ্রাবণ ১৩৮৩
২৬. একটি পত্র	সাহিত্য, কার্তিক ১২৯৯
২৭. বাংলা লেখক	সাধনা, মাঘ ১২৯৯

২৮. 'সাহিত্য'-পাঠকদের প্রতি — সাধনা, চৈত্র ১২৯৯
২৯. রবীন্দ্রবাবুর পত্র — সাহিত্য, বৈশাখ ১৩০০
৩০. সাহিত্যের গৌরব — সাধনা, শ্রাবণ ১৩০১
৩১. মেয়েলি ব্রত — অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়-লিখিত গ্রন্থের ভূমিকা, ১৩০৩ বঙ্গাব্দ
৩২. সাহিত্যের সৌন্দর্য — ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫

১. নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' কাব্য (প্রথম ভাগ, প্রকাশ ১৭৯৭ শক। ১৮৭৫ খৃস্টাব্দ), রাজকৃষ্ণ রায়ের 'অবসর সরোজিনী' (প্রথম ভাগ, ১২৮৩ বঙ্গাব্দ) ও হরিশ্চন্দ্র নিয়োগীর 'দুঃখসঙ্গিনী' (১২৮২ বঙ্গাব্দ) কাব্যত্রয়ের রবীন্দ্রনাথ-লিখিত প্রথম সমালোচনামূলক প্রবন্ধ। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের 'রচনাপ্রকাশ' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ রচনাটির ইতিহাস এইভাবে জানাইয়াছেন—

"প্রথম যে গদ্যপ্রবন্ধ লিখি তাহাও এই জ্ঞানাঙ্কুরেই বাহির হয়। তাহা গ্রন্থসমালোচনা। তাহার একটু ইতিহাস আছে।

তখন ভুবনমোহিনীপ্রতিভা নামে একটি কবিতার বই বাহির হইয়াছিল। বইখানি ভুবনমোহিনী নামধারিণী কোনো মহিলার লেখা বলিয়া সাধারণের ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল। সাধারণী কাগজে অক্ষয় সরকার মহাশয় এবং এডুকেশন গেজেটে ভূদেববাবু এই কবির অভ্যুদয়কে প্রবল জয়বাদ্যের সহিত ঘোষণা করিতেছিলেন।

তখনকার কালের আমার একটি বন্ধু আছেন— তাঁহার বয়স আমার চেয়ে বড়ো। তিনি আমাকে মাঝে মাঝে 'ভুবনমোহিনী' সই-করা চিঠি আনিয়া দেখাইতেন। 'ভুবনমোহিনী' কবিতায় ইনি মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং 'ভুবনমোহিনী' ঠিকানায় প্রায় তিনি কাপড়টা বইটা ভক্তি-উপহাররূপে পাঠাইয়া দিতেন।

এই কবিতাগুলির স্থানে স্থানে ভাবে ও ভাষায় এমন অসংযম ছিল যে, এগুলিকে স্ত্রীলোকের লেখা বলিয়া মনে করিতে আমার ভালো লাগিত না। চিঠিগুলি দেখিয়াও পত্রলেখককে স্ত্রীজাতীয় বলিয়া মনে করা অসম্ভব হইল। কিন্তু আমার সংশয়ে বন্ধুর নিষ্ঠা টলিল না, তাঁহার প্রতিমাপূজা চলিতে লাগিল।

আমি তখন ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, দুঃখসঙ্গিনী ও অবসরসরোজিনী বই তিনখানি অবলম্বন করিয়া জ্ঞানাঙ্কুরে এক সমালোচনা লিখিলাম।'

উক্ত বন্ধু সম্ভবত প্রবোধচন্দ্র ঘোষ।

২. রচনাশেষে 'ভঃ' চিহ্নিত। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের 'ভারতী' শীর্ষক অধ্যায়ে বর্তমান রচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"এই সময়টাতেই বড়দাদাকে সম্পাদক করিয়া জ্যোতিদাদা ভারতী পত্রিকা বাহির করিবার সংকল্প করিলেন। এই আর-একটা আমাদের পরম উত্তেজনার বিষয় হইল। আমার বয়স তখন ঠিক ষোলো। কিন্তু আমি ভারতীর সম্পাদকচক্রের বাহিরে ছিলাম না। ইতিপূর্বেই আমি অল্পবয়সের স্পর্ধার বেগে মেঘনাদবধের একটি তীব্র সমালোচনা লিখিয়াছিলাম। কাঁচা আমের রসটা অম্লরস— কাঁচা সমালোচনাও গালিগালাজ। অন্য ক্ষমতা যখন কম থাকে তখন খোঁচা দিবার ক্ষমতাটা খুব তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে। আমিও এই অমর কাব্যের উপর নখরাঘাত করিয়া নিজেকে অমর করিয়া তুলিবার সর্বাপেক্ষা সুলভ উপায় অন্বেষণ করিতেছিলাম। এই দাম্ভিক সমালোচনাটা দিয়া আমি ভারতীতে প্রথম লেখা আরম্ভ করিলাম।..."

ভারতীর পত্রে পত্রে আমার বাল্যলীলার অনেক লজ্জা ছাপার কালির কালিমায় অঙ্কিত হইয়া আছে। কেবলমাত্র কাঁচা লেখার জন্য লজ্জা নহে— উদ্ধত অবিনয়, অদ্ভুত আতিশয্য ও সাড়ম্বর কৃত্রিমতার জন্য লজ্জা।'

পশ্চিমবঙ্গ সরকার -প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' শতবার্ষিক সংস্করণ পঞ্চদশ খণ্ডে (১৩৭৩), এই প্রবন্ধটিতে একস্থলে একটি বাক্য, অপর এক স্থলে একটি বাক্যাংশ যোজনা দেখা যায়। ইহা ছাড়া, অনেকগুলি জায়গায় শব্দ-সংস্কার লক্ষিত হয়। অনুমান করা যাইতে পারে, রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত 'ভারতী' হইতে তৎকালে এই পরিমার্জিত পাঠ গ্রহণ করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহার কোনো সূত্রোল্লেখ না থাকায় বর্তমান রচনাবলীতে পত্রিকা-ধৃত পাঠটিই গৃহীত হইল।

পত্রিকা-ধৃত পাঠের সহিত শতবার্ষিক সংস্করণ রবীন্দ্র-রচনাবলীর যে-যে স্থলে পাঠ-বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়, তাহা নিম্নরূপ—

বর্তমান রচনাবলী পৃষ্ঠা	ছত্র	ভারতী-ধৃত পাঠ	শতবার্ষিক রচনাবলী-ধৃত পাঠ
১৩২	৩৩	'...দ্বারবানের তুলনা দিয়াছেন।'	পুষ্করিণীর সহিত সমুদ্রের তুলনা দিলে সমুদ্রকেই ছোটো বলিয়া মনে হয়।
১৩২	৩৭-৩৯	ইহার পর সংযোজিত বাক্য : বাংলার একটি ক্ষুদ্র কাব্যের সহিত বাল্মীকির বিশাল কাব্যের তুলনা করিতে যাওয়াও যা, আর মহাদেবের সহিত একটা দ্বারবানের তুলনা করাও তা, কিন্তু কি করা যায়, কোনো কোনো....	বাংলার একটি ক্ষুদ্র কাব্যের সহিত বাল্মীকির বিশাল কাব্যের তুলনা করিতে যাওয়া অন্যায় বটে কিন্তু কোনো কোনো...
১৩৫	১১	বিকাশপূর্বক	উদ্গারপূর্বক
১৩৯	৩২	আমি রাম এবং তাঁহার দলবলগুলাকে ঘৃণা করি, রাবণের ভাব মনে করিলে...	আমি রাম এবং তাঁহার অনুচরদিগকে ঘৃণা করি, কিন্তু রাবণের ভাব মনে করিলে...
১৪০	১২	...যদি পুত্র থাকিত, তবে তাহাদের...	...যদি পুত্র থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের...
১৫২	১০	...লক্ষ্মী প্রায় মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে,	...লক্ষ্মী প্রায় মাথার দিব্য দিয়া বলিয়াছিলেন যে,
১৫৬	১৮	অবলা স্ত্রীলোকদের	অবলা স্ত্রীলোকের
১৫৯	৩২	রামের সম্বন্ধে	রাম সম্বন্ধে
১৫৯	৩৪	...অতিশয় হীনতা প্রকাশ করা মাত্র।	...অতিশয় হীনতা প্রকাশ মাত্র।
১৬০	১৪	...অন্যান্য দেবগণকেও বিসংজ্ঞ করিতে পারে।	...অন্যান্য দেবগণকেও বিসংগত করিত—

৩. প্রথমবার বিলাত যাত্রার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে আমেদাবাদে থাকার সময় (জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫। মে ১৮৭৮ - শ্রাবণ ১২৮৫। আগস্ট ১৮৭৮) কতকটা নিজেকে প্রস্তুত করিবার জন্য ইংরাজি সাহিত্য এবং য়ুরোপীয় ইতিহাসের যে চর্চা করিয়াছিলেন তাহারই অনিবার্য ফল বিশ্বসাহিত্য বিষয়ে তাঁহার একাধিক প্রবন্ধ। প্রবন্ধগুলি আমেদাবাদ ও বোম্বাইয়ে অবস্থানকালে (জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র ১২৮৫। মে-সেপ্টেম্বর ১৮৭৮) রচিত। উল্লেখ করা যাইতে পারে, রবীন্দ্রনাথ ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৭৮ (৫ আশ্বিন ১২৮৫) তারিখে বোম্বাই হইতে ইংল্যান্ডের উদ্দেশে যাত্রা করেন। কলিকাতা ত্যাগের পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ ইংরাজি গ্রন্থ সংগ্রহ আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

'জীবনস্মৃতি'র প্রথম পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে তাঁহার ইংরাজি-চর্চার যে বিবরণ দিয়াছেন, প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় তাহা এখানে সংকলিত হইল, "ইংরাজিতে যে আমি নিতান্তই কাঁচা ছিলাম বিলাত যাইবার পূর্ব্বে সেটা আমার একটা বিশেষ ভাবনার বিষয়

হইল। মেজদাদাকে বলিলাম আমি ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাস বাংলায় লিখিব, আমাকে বই আনাইয়া দিন। তিনি আমার সম্মুখে টেন্ প্রভৃতি গ্রন্থকার রচিত ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসসংক্রান্ত রাশি রাশি গ্রন্থ উপস্থিত করিলেন। আমি তাহার দুরূহতা বিচারমাত্র না করিয়া অভিধান খুলিয়া পড়িতে বসিয়া গেলাম। সেইসঙ্গে আমার লেখাও চলিতে লাগিল। এমন-কি, অ্যাংলো স্যাক্সন ও অ্যাংলো নর্মান সাহিত্য সম্বন্ধীয় আমার সেই প্রবন্ধগুলাও ভারতীতে বাহির হইয়াছিল। এইরূপ লেখার উপলক্ষ্যে আমি সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মেজদাদার কাছারি হইতে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত একান্ত চেষ্টায় ইংরাজি গ্রন্থের অর্থসংগ্রহ করিয়াছি।"

আলোচ্য 'স্যাক্সন জাতি ও অ্যাংলো স্যাক্সন সাহিত্য' প্রবন্ধমধ্যে রবীন্দ্রনাথ *Beowulf* মহাকাব্যের সারাংশ এবং কাব্যের কিয়দংশ গদ্যানুবাদ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত, Cædmon-রচিত *Genesis* ও *Exodus* কাব্যের কোনো কোনো অংশের পদ্যানুবাদও করিয়াছেন। উল্লিখিত অনুবাদগুলির একটি কবিতা ছাড়া বাকি সকল কবিতার খসড়া 'মালতীপুঁথি'তে দেখা যায়, পরে প্রবন্ধমধ্যে ব্যবহারের সময় রবীন্দ্রনাথ কোনো কোনো স্থলে পরিমার্জনা করিয়াছেন।

৪. পূর্ববর্তী প্রবন্ধের মতো এই প্রবন্ধের মধ্যেও অনেকগুলি গদ্য ও পদ্যানুবাদ আছে। চীন ভ্রমণকালে (১৯২৪) প্রদত্ত একটি ভাষণে রবীন্দ্রনাথ জানাইয়াছিলেন, "When I was young I tried to approach Dante, unfortunately through a translation. I failed utterly, and felt it my pious duty to desist. Dante remained a closed book to me."—*Talks in China*, Autobiographical II (1925)। এরূপ অনুবাদের প্রধান আধার 'মালতীপুঁথি' হইলেও বর্তমান প্রবন্ধ-ধৃত অনুবাদগুলি 'মালতীপুঁথি'তে নাই। অনুমান করা যাইতে পারে, অনুরূপ একাধিক খাতায় এই সময় রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যচর্চা করিয়াছিলেন, সেগুলির মধ্যে একমাত্র 'মালতীপুঁথি'ই রক্ষা পাইয়াছে।

৫. পিত্রার্কার অনেকগুলি কবিতার অনুবাদ 'মালতীপুঁথি'তে পাওয়া যায়, 'পিত্রার্কা ও লরা' প্রবন্ধমধ্যে অনুবাদগুলি মুদ্রিত হইয়াছে।

৬. 'বিয়াত্রিচে দান্তে ও তাঁহার কাব্য', 'পিত্রার্কা ও লরা' এবং 'গেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ'— এই প্রবন্ধত্রয় একই ভাবসূত্রে গ্রথিত।

'ভারতী'র কার্তিক ১২৮৫ সংখ্যায় 'গেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ' প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথ ব্রাইটনে বসবাস করিতেছিলেন।

পরবর্তীকালে মূল জার্মান ভাষায় রবীন্দ্রনাথ গেটে-র রচনা পড়িবার যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, পূর্ব-উল্লিখিত *Talks in China* গ্রন্থ হইতে তাহা জানা যায়, 'Then I tried Goethe. But that was too ambitious. With the help of the little German I had learnt, I did go through Faust. I believe I found my entrance to the palace, not like one who has keys for all the doors, but as a casual visitor who is tolerated in some general guest room, comfortable but not intimate.'

৭-৮. 'ভারতী' শ্রাবণ ১২৮৫ সংখ্যায় প্রকাশিত 'স্যাক্সন জাতি ও অ্যাংলো স্যাক্সন সাহিত্য' প্রবন্ধের অনুক্রমে এই প্রবন্ধ দুটি রচিত। Hippolyte Taine (1828-1893)-রচিত ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাস ও অপর কোনো গ্রন্থ হইতে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধগুলির উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সম্ভবত এইভাবে, রবীন্দ্রনাথ ইংরাজি সাহিত্যের একটি ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইতেছিলেন, অনুমান করা যাইতে পারে।

৯. ইংল্যান্ডে বসবাসকালে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি রচনা করেন, ধরা যাইতে পারে; যদিও

ইংল্যান্ডের 'বালক-কবি' Thomas Chatterton (1752-1770)-এর জীবনকাহিনীর সহিত রবীন্দ্রনাথের পরিচয় অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর সূত্রে পূর্বেই ঘটিয়াছিল। চ্যাটার্টনের পদাঙ্ক অনুসরণে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী রচনার যে সূত্রপাত হইয়াছিল, 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের সূত্রে এই তথ্য আমাদের নিকট পরিজ্ঞাত। এই গ্রন্থের 'ভানুসিংহের কবিতা' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ জানাইয়াছেন, "ইতিপূর্বে অক্ষয়বাবুর কাছে ইংরেজ বালককবি চ্যাটার্টনের বিবরণ শুনিয়াছিলাম।... চ্যাটার্টন প্রাচীন কবিদের এমন নকল করিয়া কবিতা লিখিয়াছিলেন যে অনেকেই তাহা ধরিতে পারে নাই। অবশেষে ষোলো বছর বয়সে এই হতভাগ্য বালককবি আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছিলেন। আপাতত ঐ আত্মহত্যার অনাবশ্যক অংশটুকু হাতে রাখিয়া, কোমর বাঁধিয়া দ্বিতীয় চ্যাটার্টন হইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম।"

স্বদেশে চ্যাটার্টনের কবিতা পাঠের সুযোগ রবীন্দ্রনাথের ঘটিয়াছিল কি না জানা যায় না, তবে ইংল্যান্ডে থাকাকালীন এই অকালমৃত কবির রচনার সহিত তাঁহার যে পরিচয় ঘটে, তাহার প্রমাণ আলোচ্য প্রবন্ধে চ্যাটার্টন-রচিত তিনটি কাব্যাংশের অনুবাদ।

'ভারতী' পত্রিকায় এই প্রবন্ধের শেষে 'ক্রমশঃ' থাকিলেও প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ হয় নাই।

১০-১১. এই দুটি প্রবন্ধের সম্পাদিত রূপ 'নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি', সমালোচনা (১২৯৪) গ্রন্থভুক্ত, বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' অচলিত দ্বিতীয় খণ্ডে : সুলভ পঞ্চদশ খণ্ডে সংকলিত।

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার পৌষ ১২৮২ সংখ্যায় প্রকাশিত লেখকের স্বাক্ষরহীন প্রবন্ধ 'বাঙালি কবি কেন' এবং 'বান্ধব' পত্রিকার মাঘ ১২৮১ সংখ্যায় প্রকাশিত কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'নীরব কবি' পাঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকায় কতকটা প্রতিবাদ করিয়াই সাহিত্যতত্ত্বমূলক এই দুটি প্রবন্ধ রচনা করেন।

'বাঙালি কবি নয়' প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ Christopher Marlow -রচিত 'The Passionate Shepherd to His Love' শীর্ষক কবিতার সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। 'বাঙালি কবি নয় কেন?' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সমকালীন বাংলাসাহিত্য হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। সাহিত্যতত্ত্বমূলক প্রবন্ধ হিসাবে এই দুটি প্রবন্ধকে রবীন্দ্ররচনার মধ্যে অগ্রাধিকার দেওয়া যাইতে পারে। ইহার সূত্রপাত অবশ্যই 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকার কার্তিক ১২৮৩ সংখ্যায় প্রকাশিত 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দু[ঃ]খসঙ্গিনী' কাব্যত্রয়ের সমালোচনামূলক প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিয়া।

১২. রচনাশেষে 'শ্রীরঃ' আদ্যক্ষর মুদ্রিত। সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থভুক্ত না হইলেও প্রথম অনুচ্ছেদটির সম্পাদিত রূপ 'সত্যের অংশ' নামে 'সমালোচনা' (১২৯৪) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ-লিখিত এই 'প্রত্যুত্তর', ভারতী পত্রিকার আষাঢ় ও শ্রাবণ ১২৮৯ দুটি সংখ্যায় প্রকাশিত, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী -রচিত ('শ্রী অঃ' আদ্যক্ষরে) 'দেশজ প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি' (প্রথম প্রস্তাব, দ্বিতীয় প্রস্তাব) শিরোনামে প্রকাশিত একটি দীর্ঘ প্রবন্ধের বক্তব্যের উত্তর।

১৩. অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'নবজীবন' পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১২৯৩ সংখ্যায় 'কাব্যি-সমালোচনা' নামে একটি ব্যঙ্গধর্মী সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের নাম অনুচ্চারিত রাখিয়া 'কুয়াসার প্রহেলিকায়, নিরাশার প্রহেলিকায় বঙ্গসাহিত্যে গো-ধূলি গোধূলি করিবার চেষ্টা'র যে অভিযোগ আনেন, বস্তুত তাহারই প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধ। বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 'সাহিত্য' (১৩৬১) গ্রন্থের সংযোজন অংশে এই প্রবন্ধ সংকলিত হইয়াছে।

১৪-১৬. তিনটি প্রবন্ধই 'কাব্য : স্পষ্ট ও অস্পষ্ট' প্রবন্ধের সূত্রে লিখিত। 'সাহিত্য' (১৩৬১) গ্রন্থের সংযোজনভুক্ত।

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কলিকাতা বির্জিতলাওস্থিত বাসভবনে রক্ষিত একটি বড়ো মাপের খাতায় তাঁহাদের পরিবারস্থ অনেকে বিচিত্রবিষয়ক রচনা স্বহস্তে লিখিয়া রাখিতেন। ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী 'রবীন্দ্রস্মৃতি' (১৩৬৭) গ্রন্থে খাতাটি সম্পর্কে লিখিয়াছেন, 'আমাদের একটি পারিবারিক খাতা ছিল যেটি... ভবানীপুরের বাড়িতে সিঁড়ির উপরে একটি উঁচু ডেস্কের উপর শিকল দিয়ে বাঁধা থাকত। যার যখন ইচ্ছে তাতে নিজের বক্তব্য লিখে রাখত।... এরকম দুখানি খাতা পর পর ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় দ্বিতীয়টির কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নি। প্রথমটি রথীর পঞ্চাশত্তম জন্মদিনে তাকে উপহার দিই, এখন এটি সযত্নে রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে।'

এই পাণ্ডুলিপিটি 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক' নামে পরিচিত। লিপিবদ্ধ রচনাগুলির কালব্যাপ্তি মোটামুটি কার্তিক ১২৯৫ হইতে চৈত্র ১২৯৭ বঙ্গাব্দ। খাতাটির মুখপাতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়া রাখিয়াছেন '... ইহাতে পরিবারের/ অন্তর্ভূক্ত/ সকলেই/ (আত্মীয়, বন্ধু, কুটুম্ব, স্বজন)/ আপন আপন মনের ভাব চিন্তা স্মর্তব্য বিষয়/ ঘটনা প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিতে পারেন।...' এই বিধির পূর্বে রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে কয়েকটি 'নিষেধ' এইরূপ— '১। পেন্সিলে লেখা। ২। আমাদের পরিবারের বাহিরে এই খাতা লইয়া যাওয়া। ৩। যতদিন এই খাতা লেখা চলিবে ততদিন এ খাতার প্রবন্ধ কাগজে অথবা পুস্তকে ছাপান।'

ইতিপূর্বে এই পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এবং রচনাগুলি সংকলন করিয়াছেন পুলিনবিহারী সেন, পশুপতি শাসমল ও কানাই সামন্ত।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তকের অন্তর্গত রবীন্দ্র-রচনাগুলি বিষয়ানুক্রমে বিভিন্নস্থলে বিন্যস্ত হইল। সাহিত্য-বিষয়ক রচনাগুলি প্রথমে সংকলিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে তথ্যাদি নিম্নরূপ—

১৭. কবিতার উপাদান রহস্য (Mystery)। রচনাকাল : ২০ নভেম্বর ১৮৮৮

১৮. সৌন্দর্য। রচনাকাল : ১৯ ডিসেম্বর ১৮৮৮

১৯. Dialogue/Literature। রচনাকাল : ১ অক্টোবর ১৮৮৯

সাহিত্যবিষয়ক এই আলোচনায় যাঁহারা যোগ দিয়াছিলেন, পাণ্ডুলিপিতে তাঁহাদের নামের আদ্যক্ষরটুকু পাওয়া যায়। আলোচনাকারীগণ যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ও লোকেন্দ্রনাথ পালিত। এই সংক্ষিপ্ত রচনার পরিমার্জিত রূপ 'ভারতী' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫ সংখ্যায় 'সাহিত্যের সৌন্দর্য' নামে প্রকাশিত। রচনাটি অস্বাক্ষরিত। 'সাহিত্য' (১৩৬১ সংস্করণ) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

২০. সাহিত্য। রচনাকাল : ২০ অক্টোবর ১৮৮৯

২১. বাংলায় লেখা। রচনাকাল : ৬ অক্টোবর ১৮৮৯

২২. অপরিচিত ভাষা ও অপরিচিত সংগীত। রচনাকাল : ৬ অক্টোবর ১৮৮৯

২৩. সৌন্দর্য সম্বন্ধে গুটিকতক ভাব। প্রকাশ : ভারতী ও বালক, শ্রাবণ ১২৯৯। 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তকে' শিরোনাম, 'সৌন্দর্য সম্বন্ধে notes'। রচনাশেষে লিখিত আছে : '১৫ই বোধহয়।' অক্টোবর ১৮৮৯।

২৪. বাংলা সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা। রচনাকাল : ২৪ মার্চ ১৮৯০। প্রকাশ : সাধনা, বৈশাখ ১২৯৯। 'সাহিত্য' গ্রন্থে সংকলিত। পত্রিকায় ও গ্রন্থে প্রবন্ধের শেষাংশ বর্জিত। পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক -ধৃত, গ্রন্থে বর্জিত পাঠ এখানে গৃহীত হইয়াছে।

২৫. [কাব্য]। রচনাকাল : ১২ জানুয়ারি ১৮৯১, প্রকাশ : সাধনা, চৈত্র ১২৯৮ সংখ্যায় 'কাব্য' শিরোনামে। 'সাহিত্য' গ্রন্থভুক্ত। 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক'-ধৃত প্রথম অনুচ্ছেদ ও শেষ একাদশটি অনুচ্ছেদ বাদ দিয়া 'সাধনা' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়, অনুরূপভাবে 'সাহিত্য' গ্রন্থেও সংকলিত। বর্তমান রচনাবলীতে শুধু বর্জিত অংশগুলি সংকলন করা হইল।

২৬. একটি পত্র। সাহিত্য, কার্তিক ১২৯৯। সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে 'সুহৃদ্বরেষু' এই সম্বোধনে লিখিত হইলেও এটি প্রবন্ধের মর্যাদা পাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের কোনো প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সুরেশচন্দ্র অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহারই প্রসঙ্গে পত্রাকারে এই প্রবন্ধ।

২৭. বাংলা লেখক। সাধনা। মাঘ ১২৯৯। 'সাহিত্য' গ্রন্থের (১৩৬১) সংযোজন অংশভুক্ত।

২৮-২৯. 'সাধনা' শ্রাবণ ১২৯৯ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'হিং টিং ছট্' কবিতা প্রকাশিত হইলে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'সাহিত্য' ফাল্গুন ১২৯৯ সংখ্যায় 'তর্কবৈচিত্র্য' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে 'হিং টিং ছট্' কবিতাটি চন্দ্রনাথ বসু ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিতর্কের সূত্রে রচিত, এইরূপ মন্তব্য করেন। সামাজিক মতামত বিষয়ে চন্দ্রনাথ বসুর সহিত রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ইতিপূর্বেই নানা কারণে তিক্ত থাকায় এই কবিতা প্রকাশকে কেন্দ্র করিয়া তাহা আরও জটিল হইয়া উঠে। 'তর্কবৈচিত্র্য' প্রবন্ধে লেখকের নাম না থাকায় রবীন্দ্রনাথ রচনাটি সুরেশচন্দ্র সমাজপতি -কর্তৃক লিখিত, এই অনুমানে তাঁহার নিকট যে প্রতিবাদপত্রটি পাঠান সুরেশচন্দ্র সেটি 'সাহিত্য' পত্রিকায় না ছাপাইয়া, রবীন্দ্রনাথকে একটি ব্যক্তিগত পত্রে তাহার উত্তর দেন। ইহা হইতে রবীন্দ্রনাথের ধারণা হয়, "তিনি তাহা প্রকাশ করিয়া তাঁহার পাঠকদের অন্যায় সন্দেহ মোচন করা কর্তব্য বোধ করেন নাই।" ফলে, "সাধনা পত্রিকা আশ্রয় করিয়া", চৈত্র ১২৯৯ সংখ্যায় 'সাহিত্য-পাঠকদের প্রতি' শীর্ষক এই রচনাটি প্রকাশ করিয়া তাঁহার বক্তব্য জানান।

অতঃপর, 'সাহিত্য' বৈশাখ ১৩০০ সংখ্যায়, পুরী হইতে ৬ ফাল্গুন ১২৯৯ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথের লেখা পত্রাকারে রচিত প্রবন্ধটি 'রবীন্দ্রবাবুর পত্র' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এই পত্রের পাদটীকায় 'সাহিত্য'-সম্পাদকের যে দীর্ঘ মন্তব্যটি মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহা এ স্থলে সংকলিত হইল—

"গত বর্ষের একাদশ-সংখ্যক সাহিত্যে 'তর্কবৈচিত্র্য' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেই প্রবন্ধ প্রসঙ্গে মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্র ঠাকুর মহাশয়ের এই পত্র। কিন্তু, এই পত্র, সাহিত্য সম্পাদককে কেন লেখা হইল, তাহা কেবল এক রবীন্দ্রবাবু ব্যতীত আর কাহারও বুঝিতে পারিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে কথা তিনি কিছুই বুঝাইয়া বলেন নাই। রবীন্দ্রবাবু কোন বনিয়াদে আমাদিগকে তর্কবৈচিত্র্যের লেখক স্থির করিলেন? ইহা তাঁহার কবিজনোচিত স্বপ্ন হইতে পারে, কিন্তু ইহার মধ্যে কবিত্ব কিছুই নাই! সুতরাং, পুরাতন বা তাঁহার নবাবিষ্কৃত সত্যও নাই। তর্কবৈচিত্র্য প্রবন্ধ আমরা নিজে লিখি নাই। অতএব, তাহার মতামতের জন্য আমরা দায়ী নহি। সে বিষয়ে রবীন্দ্রবাবুর যাহা কিছু বক্তব্য, তাহা প্রবন্ধাকারে ও প্রাসঙ্গিকভাবে লিখিয়া পাঠানই রবীন্দ্রবাবুর উচিত ছিল। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া আমাদিগকে অনর্থক আক্রমণ করিয়া এই পত্র লেখেন ও প্রকাশিত করিতে অনুরোধ করেন। পরের কথা যাহাই হউক, প্রথমেই রবীন্দ্রবাবুর এই বিষম ভ্রম। পত্র প্রকাশিত করিয়া, তাঁহার এই ভ্রম প্রদর্শন করা আমাদের ইচ্ছা ছিল না; আর সেই জন্যই তাঁহার পত্র আমরা প্রকাশিত না করিয়া, পত্রের দ্বারা পত্রের প্রত্যুত্তর দিয়াছিলাম। কিন্তু রবীন্দ্রবাবু তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন। উপস্থিত বিষয়ে যে তিনি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহা প্রকাশিত না হইলে কিছুতেই তিনি নিরস্ত হইবেন না। কাজেই অগত্যা আমরা, তাঁহার পত্র, প্রকাশের উপযুক্ত না হইলেও, প্রকাশ করিলাম। প্রকাশ করিলাম কেবল তাঁহারও অনুরোধে এবং সাধনায় অযথা দোষারোপের জন্য। নহিলে, বহুদিনাবধি সাময়িকপত্রের লেখক ও কিয়ৎ পরিমাণে পরিচালক হইয়া রবীন্দ্রবাবু এরূপ বেতালা পত্র লিখিতে কুণ্ঠিত হয়েন না এবং তাহা প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ করেন, ইহা সাধারণ্যে প্রকাশ করা তাঁহার সম্মানের পরিচায়ক নহে।

রবীন্দ্রবাবু আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া যে সকল কথা বলিতেছেন, আমাদিগকে সম্বোধন করার জন্যই তাহাদের একটিরও অর্থ নাই। অতএব সে সকল কথার উত্তর দেওয়া আমরা আদৌ আবশ্যক বিবেচনা করি না। 'তর্কবৈচিত্র্য' প্রবন্ধের লেখক যদি আবশ্যক বোধ করেন, দিতে পারেন।— সাহিত্য-সম্পাদক।"

ইহা ছাড়া, 'রবীন্দ্রবাবুর পত্র' রচনাটির তৃতীয় অনুচ্ছেদের শেষে (...আপনার পক্ষে অসঙ্গত হয় নাই।), পাদটীকার চিহ্ন দিয়া সুরেশচন্দ্র সমাজপতি যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহাও এখানে মুদ্রিত হইল—

"তা বটে। এই অযাচিত উপদেশের জন্য মাননীয় উপদেষ্টাকে ধন্যবাদ। তাঁহার এ উক্তির দ্বারা চন্দ্রনাথবাবুর প্রতি যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রকট হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর এই অদ্ভুত যুক্তি দেখিয়া আমাদের, 'আদর্শ সমালোচনা'র দু'একটি ছত্র মনে পড়ে।'

দ্রষ্টব্য, 'আদর্শ সমালোচনা', 'সাহিত্য', শ্রাবণ ১২৯৯।

৩০. 'সাহিত্য' (১৩৬১) গ্রন্থের সংযোজনভুক্ত।

বর্তমান প্রবন্ধ রচনার অব্যবহিত পূর্বে রবীন্দ্রনাথ দুটি বিদেশী উপন্যাস পাঠ করিয়াছিলেন, সেই অভিজ্ঞতা হইতে প্রবন্ধটির উৎপত্তি বলা যাইতে পারে। প্রবন্ধমধ্যে উপন্যাসদুটির উল্লেখ আছে— পোলিশ লেখক Jozef Igancy Kraszewski (1821-1887)-রচিত *The Jew* এবং হাঙ্গেরিয়ান লেখক Mourus Jokai (1825-1904)-রচিত *Eyes like Sea*। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসদুটির ইংরাজি অনুবাদ পড়িয়াছিলেন। প্রথম উপন্যাস প্রসঙ্গে 'ছিন্নপত্রাবলী' গ্রন্থে ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১২৯ সংখ্যক পত্রে 'নভেলটা নিতান্তই অপাঠ্য' এরূপ মন্তব্য করিলেও প্রবন্ধ রচনার সময় ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গির সহিত বিচার করিয়াছেন।

৩১. অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় -রচিত 'মেয়েলি ব্রত' (প্রকাশ ১৩০৩ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থের ভূমিকা। 'সাধনা' পত্রিকা সম্পাদনার শেষ বৎসরে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন আশ্রমের কর্মী অঘোরনাথকে নানাভাবে উৎসাহিত করিয়া বাংলাদেশের ব্রতকথার একটি সংকলন করাইয়াছিলেন। এগুলির মধ্যে কয়েকটি তৎকালে 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ৭ কার্তিক ১৩০৩ বঙ্গাব্দে, কার্সিয়ঙে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করিয়া অঘোরনাথের কাছে পাঠাইয়া দেন।

৩২. অস্বাক্ষরিত রচনা। 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক'-ধৃত, বর্তমান রচনাবলীতে সংকলিত 'Dialogue/ Literature' শীর্ষক আলোচনার পরিমার্জিত রূপ 'সাহিত্যের সৌন্দর্য'। 'সাহিত্য' গ্রন্থের (১৩৬১) সংযোজন অংশভুক্ত।

সংগীত

সংগীত বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের দুইটি রচনা এখানে সংকলিত হইল :

১. সংগীত ও ভাব — ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮

২. সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা (হর্বার্ট স্পেন্সরের মত) — ভারতী, আষাঢ় ১২৮৮

এই বিষয়ে তাঁহার অধিকাংশ রচনা 'সংগীতচিন্তা' (বৈশাখ ১৩৭৩) গ্রন্থে ও রবীন্দ্র-রচনাবলী অষ্টাবিংশ খণ্ডে (পৌষ ১৪০২) : সুলভ ষোড়শ খণ্ডে সংকলিত হইয়াছে। ভারতী ১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় প্রকাশিত 'সংগীত ও ভাব' এবং ভারতী ১২৮৮ আষাঢ়-সংখ্যায় প্রকাশিত 'সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা' প্রবন্ধ দুইটিকে মিলাইয়া এবং সংশোধন পরিবর্ধন পরিবর্জন করিয়া

রবীন্দ্রনাথ যে পাঠ প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহাই সেখানে 'সংগীত ও ভাব' নামে মুদ্রিত হইয়াছিল। 'সংগীতচিন্তা'র নূতন সংস্করণে (১৩৯২) দুইটি প্রবন্ধ আলাদা করিয়া ছাপা হয়। এখানেও দুইটি প্রবন্ধ স্বতন্ত্রভাবে সংকলিত হইল।

'সংগীত ও ভাব' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ ৯ বৈশাখ ১২৮৮ (বুধবার ২০ এপ্রিল ১৮৮১) তারিখে রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজের হলে বেথুন সোসাইটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভায় পাঠ করেন। তিনি 'জীবনস্মৃতিতে' লিখিয়াছেন, "দ্বিতীয়বার বিলাতে যাইবার পূর্বদিন সায়াহ্নে বেথুন-সোসাইটির আমন্ত্রণে মেডিকাল কলেজের হলে আমি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। সভাস্থলে এই আমার প্রথম প্রবন্ধ পড়া।... প্রবন্ধের বিষয় ছিল সংগীত। যন্ত্রসংগীতের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমি গেয় সংগীত সম্বন্ধে ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, গানের কথাকেই গানের সুরের দ্বারা পরিস্ফুট করিয়া তোলা এই শ্রেণীর সংগীতের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমার প্রবন্ধে লিখিত অংশ অল্পই ছিল। আমি দৃষ্টান্ত দ্বারা বক্তব্যটিকে সমর্থনের চেষ্টায় প্রায় আগাগোড়াই নানাপ্রকার সুর দিয়া নানাভাবের গান গাহিয়াছিলাম। সভাপতি মহাশয় 'বন্দে বাল্মীকি-কোকিলং' বলিয়া আমার প্রতি যে প্রচুর সাধুবাদ প্রয়োগ করিয়াছিলেন আমি তাহার প্রধান কারণ এই বুঝি যে, আমার বয়স তখন অল্প ছিল এবং বালককণ্ঠে নানা বিচিত্র গান শুনিয়া তাঁহার মন আর্দ্র হইয়াছিল।" পত্রিকার পাদটীকায় লেখা হয়, "এই বক্তৃতাতে বক্তার মত উদাহরণ দ্বারা সমর্থিত হইয়াছিল। এই বক্তৃতাতে বহু সংখ্যক গান গাহিয়া কি-কি সুরবিন্যাস দ্বারা কি-কি ভাব প্রকাশিত হয়, তাহারই দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছিল। বিভিন্ন ভাব-ব্যঞ্জক গানের ভাবকে ও তৎসঙ্গে সুরকে বিশ্লেষণ করিয়া বক্তা নিজ-মত সমর্থন করিয়াছিলেন। সে সকল উদাহরণে কণ্ঠের সাহায্য আবশ্যক, এ নিমিত্ত সমস্তই পরিত্যাগ করিতে হইল, কেবল মাত্র ভূমিকা ও উপসংহার প্রকাশিত হইতেছে। —সং।" পত্রিকায় শিরোনামের নীচেই মুদ্রিত হয় '(বেথুন সোসাইটিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতা)'—ভারতী-তে এইটিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম নামাঙ্কিত রচনা।

শিল্প

শিল্প-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত দুইটি রচনা এখানে সংকলিত হইয়াছে :

১. [মন্দিরপথবর্তিনী]	ভারতী, আষাঢ় ১৩০৫
২. মন্দিরাভিমুখে	প্রদীপ, পৌষ ১৩০৫

১. গণপত কাশীনাথ ম্হাত্রে (মহাত্রে, ১৮৭৬-১৯৪৭) বোম্বাইয়ের স্যার জে. জে. স্কুল অব্ আর্ট হইতে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া 'টু দি টেম্পল' নামের ৫ ফুট দীর্ঘ প্লাস্টার অব্ প্যারিসের এক নারীমূর্তি প্রস্তুত করেন। ইহার জন্য তিনি বম্বে আর্ট সোসাইটির পদক লাভ করেন (১৮৯৫)। এই মূর্তির সম্মুখ ও পার্শ্বের দুইটি ফোটোগ্রাফ ভারতশিল্পের বিশিষ্ট পণ্ডিত স্যার জর্জ বার্ডউডের নিকট পাঠাইয়া ছাত্রটির য়ুরোপে শিক্ষালাভের সুযোগ করিয়া দেওয়ার জন্য প্রার্থনা জানানো হইয়াছিল। স্যার বার্ডউড ফোটোগ্রাফ দুইটি তাঁহার সম্পাদিত *The Journal of Indian Arts and Industries* পত্রিকায় ছাপাইয়া শিল্পীর প্রতিভার প্রশংসা করেন। উক্ত ফোটোগ্রাফ ও মন্তব্য অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'প্রসঙ্গকথা' শিরোনামে বর্তমান রচনাটি লিখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধের ভিতরে মূর্তিটিকে 'মন্দিরপথবর্তিনী' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তাহা হইতে শিরোনামটি গ্রহণ করা হইয়াছে।

২. 'মন্দিরাভিমুখে'ও একই বিষয় অবলম্বনে লিখিত। তবে প্রবন্ধটি সচিত্র, স্যার বার্ডউডের উল্লিখিত পত্রিকায় প্রকাশিত ফোটোগ্রাফ দুইটি ইহার সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ যে লিখিয়াছেন, 'ইংরাজিপত্রে একটি ছোটোখাটো রকমের দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইয়া

গেছে'— তাহার ইতিহাসটি এইরূপ : ২৬ নভেম্বর ১৮৯৬ স্যার বার্ডউড-লিখিত 'To the Temple'-শীর্ষক একটি রচনা *Bombay Gazette*-এ প্রকাশিত হয়। ইহার উত্তরে জে. জে. স্কুল অব্ আর্টের তৎকালীন অধ্যক্ষ Edwin Greenwood রচনাটির কোনো-কোনো ত্রুটি দেখাইয়া উক্ত পত্রিকায় ৫ ডিসেম্বর একটি পত্র প্রকাশ করেন। প্রত্যুত্তরে বার্ডউডের পত্র মুদ্রিত হয় পত্রিকাটির ৭ জানুয়ারি ১৮৯৭-সংখ্যায়। রবীন্দ্রনাথ কোনো অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান লেখকের যে তীব্র সমালোচনার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা 'An Art Critic Astray' নামে ৩১ ডিসেম্বর ১৮৯৬ *Pioneer Mail* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, লেখকের নাম R. F. Chisholm।

ধর্ম/দর্শন

১. সাকার ও নিরাকার উপাসনা	ভারতী, শ্রাবণ ১২৯২
২. নববর্ষ উপলক্ষে গাজিপুরে ব্রহ্মোপাসনা (উদ্‌বোধন)	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৮১০ শক : ১২৯৫
৩. ধর্ম ও ধর্মনীতির অভিব্যক্তি (Evolution)	রবীন্দ্রবীক্ষা ১, শ্রাবণ ১৩৮৩ রচনা : ১২৯৫
৪. চন্দ্রনাথবাবুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব	সাধনা, আষাঢ় ১২৯৯
৫. নব্য লয়তত্ত্ব	সাহিত্য, ভাদ্র ১২৯৯
৬. 'সুখ না দুঃখ' / উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে বক্তব্য	সাধনা, মাঘ ১২৯৯
৭. বেদান্তের বিদেশীয় ব্যাখ্যা	সাধনা, ভাদ্র ১৩০১
৮. রামমোহন রায়	ভারতী, কার্তিক ১৩০৩

১. ১০ শ্রাবণ ১২৯২ তারিখের 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় : "১১ শ্রাবণ রবিবার অপরাহ্ণ ৫।০টার সময়ে আদি ব্রাহ্ম-সমাজে শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সাকার ও নিরাকার উপাসনা" বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন।" এইটিই সেই প্রবন্ধ। ইহা ভাদ্র সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেও (পৃ. ৯৪-১০২) সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি ব্যাখ্যাত্মক টীকা-সহ পুনর্মুদ্রিত হয়। ১৯তম অনুচ্ছেদে 'কিন্তু আমার সম্বন্ধে তাহা তাহাই সেই সম্বন্ধ বিচার করিয়াই আমাকে চলিতে হইবে, আর কোন সম্বন্ধ বিচার করিলে আমি মারা পড়িব' বাক্যটির টীকায় তিনি লেখেন,

"কাগজের যেমন ও পিট্ বাদে শুদ্ধ কেবল এ-পিট্-মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে পারে না— সেইরূপ কোন সত্তারই গুণ-বাদে শুদ্ধ কেবল বস্তু-মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে পারে না। শাস্ত্র এবং আত্মপ্রত্যয় দুইই এই সত্যটি প্রতিপাদন করিতেছে যে, চিৎ এবং আনন্দ এই দুই আধ্যাত্মিক গুণ এবং তাহার আধার-ভূত বস্তু সৎ তিন ধরিয়া "সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম" এই এক সত্য আত্মাতে প্রতীয়মান হয়। সং"

প্রবন্ধটি সেই সময়ে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। ভারতী-র আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় গোবিন্দলাল দত্ত ইহার একটি সুদীর্ঘ 'প্রতিবাদ' (পৃ. ২৮৭-৯২) প্রকাশ করেন। শ্রীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও 'সোমপ্রকাশ'-এর ২৩ ও ৩০ অগ্রহায়ণ সংখ্যাতে একটি দীর্ঘ প্রতিবাদ-পত্র মুদ্রিত করিয়াছিলেন।

২. ১ বৈশাখ ১২৯৫ গাজিপুর ব্রাহ্মসমাজে রবীন্দ্রনাথ যে প্রারম্ভিক উপাসনা করিয়াছিলেন, তাহাই 'নববর্ষ উপলক্ষে গাজিপুরে ব্রহ্মোপাসনা (উদ্বোধন)' নামে মুদ্রিত হয়। রচনাটিতে লেখকের নাম নাই, ভাষা ও ভাবের বিচারে ইহা রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।

৩. 'ধর্ম ও ধর্মনীতির অভিব্যক্তি (Evolution)' রচনাটি পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক-এ রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে পাওয়া গিয়াছে, রচনার তারিখ ২২ নভেম্বর ১২৮৮ (৮ অগ্রহায়ণ ১২৯৫)।

৪. 'সাধনা'-য় রবীন্দ্রনাথ 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা' নামক একটি বিভাগের প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। 'চন্দ্রনাথবাবুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব' প্রবন্ধটি প্রকৃতপক্ষে এইরূপই একটি রচনা, আকারের দীর্ঘতার জন্য স্বতন্ত্র প্রবন্ধরূপে মুদ্রিত হইয়াছে। সাধনা-র আষাঢ় ১২৯৯ সংখ্যায় উক্ত বিভাগটির অনুপস্থিতিও লক্ষণীয়। চন্দ্রনাথ বসুর 'লয়'-সংক্রান্ত প্রথম প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় মাঘ ১২৯৮-সংখ্যা 'সাহিত্য'-তে, রবীন্দ্রনাথ তাহার সমালোচনা করেন সাধনা-র ফাল্গুন সংখ্যায় (দ্র বর্তমান রচনাবলী, 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা' : সাধনা, ফাল্গুন ১২৯৮)। সেই সমালোচনার প্রত্যুত্তরে চন্দ্রনাথ উক্ত বিষয়ে দ্বিতীয় প্রবন্ধটি রচনা করেন, তাহা সাহিত্য ১২৯৯ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। তাহারই উত্তর বর্তমান রচনাটি।

৫. লয়-বিষয়ক চন্দ্রনাথ বসুর তৃতীয় রচনা 'আমার "স্বরচিত" লয়তত্ত্ব' সাহিত্য ১২৯৯ শ্রাবণ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ইহার উত্তরে 'নব্য লয়তত্ত্ব' প্রবন্ধ লিখিয়া উক্ত পত্রিকাতেই পাঠাইয়া দেন। এই বিষয়ে তিনি সাধনা-র ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যার 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা'য় লেখেন, '...আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা সাহিত্যেই লিখিয়া পাঠাইয়াছি।" শেষে লেখেন, "দেখিতেছি আমাদের আলোচনা ক্রমশঃ কথাকাটাকাটিতে পরিণত হইতেছে, অতএব আলোচনা এইখানেই লয় প্রাপ্ত হইলে মন্দ হয় না।" চন্দ্রনাথ এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৬. মাঘ ১২৯৯-সংখ্যা সাধনা-তে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 'সুখ না দুঃখ' নামে যে প্রবন্ধ লেখেন, রবীন্দ্রনাথ 'উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে বক্তব্য' শিরোনামে তাঁহার মতামত প্রকাশ করিয়াছেন বর্তমান রচনাটিতে।

৭. 'বেদান্তের বিদেশীয় ব্যাখ্যা' রচনাটিতে রবীন্দ্রনাথ জার্মান অধ্যাপক ডাঃ পল ডয়সেনের বেদান্তদর্শন বিষয়ক একটি প্রবন্ধ অনুবাদ করেন, শেষে 'অনুবাদকের প্রশ্ন' শিরোনামে তাঁহার বক্তব্যের সমালোচনা করিয়াছেন।

৮. ১২ আশ্বিন ১৩০৩ (২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬) তারিখে মির্জাপুর স্ট্রীটে অবস্থিত সিটি কলেজে রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রামমোহন রায়ের ৬৩তম মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণসভায় রবীন্দ্রনাথ 'রামমোহন রায়' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। 'ভারতপথিক রামমোহন রায়' (১৩৬৬) গ্রন্থে সংকলিত।

শিক্ষা

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-বিষয়ক অধিকাংশ রচনা রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বাদশ ও অষ্টাবিংশ খণ্ডে : সুলভ ষষ্ঠ ও ষোড়শ খণ্ডে সংকলিত হইয়াছে। এখানে আরও তিনটি রচনা সাময়িক পত্র হইতে সংকলন করা হইল। ইহাদের প্রকাশ-সূচী নিম্নরূপ :

১. ছাত্রদের নীতিশিক্ষা	সাধনা, মাঘ ১২৯৯
২. ছাত্রবৃত্তির পাঠ্যপুস্তক	সাধনা, ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২
৩. মুসলমান ছাত্রের বাংলা শিক্ষা	ভারতী, কার্তিক ১৩০৭

১. 'ছাত্রদের নীতিশিক্ষা' 'প্রসঙ্গ-কথা' নামে মুদ্রিত হয়, সূচীপত্রে 'ছাত্রদের নীতিশিক্ষা' নামটি পাওয়া যায়। রচনাটি স্বাক্ষরহীন, বক্তব্য ও রচনারীতির দিক দিয়া ইহাকে রবীন্দ্র-রচনা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা রাজশাহী কলেজের এক অধ্যাপকের লেখা

'ইন্দ্রিয়-সংযম' নামক একটি গ্রন্থের সমালোচনা, দৈর্ঘ্য ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য আলোচনার সুযোগ লাভের উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে উপস্থাপিত হইয়াছে।

২. 'ছাত্রবৃত্তির পাঠ্যপুস্তক' রচনাটি স্বাক্ষরহীন, বিষয়বস্তু ও ভাষাভঙ্গির বিচারে ইহাকে রবীন্দ্র-রচনা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।

৩. "গত বৎসর মুসলমান শিক্ষাসম্মিলন উপলক্ষ্যে খ্যাতনামা জমিদার শ্রীযুক্ত সৈয়দ্ নবাবআলি চৌধুরী মহাশয় বাঙ্গলা শিক্ষা সম্বন্ধে একটি উর্দ্দু প্রবন্ধ পাঠ করেন তাহারই ইংরেজী অনুবাদ ['Vernacular Education in Bengal'] সমালোচনার্থে আমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছে"— এই মন্তব্য-সহ রবীন্দ্রনাথ উক্ত ভাষণের সমালোচনা করেন 'মুসলমান ছাত্রের বাংলা শিক্ষা' প্রবন্ধটিতে।

উল্লেখ্য, রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা' বিভাগে আষাঢ় ১৩০৫-সংখ্যা ভারতী-তে কৃষ্ণভাবিনী দাস -লিখিত 'আজকালকার ছেলেরা' প্রবন্ধ (প্রদীপ, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫) এবং উক্ত পত্রিকার শ্রাবণ ১৩০৫-সংখ্যায় রাজেশ্বর গুপ্ত -সম্পাদিত 'অঞ্জলি' মাসিক পত্রিকা (জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫) সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শিক্ষা-বিষয়ক মতামত সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছেন।

সমাজ

রবীন্দ্রনাথের সমাজ-বিষয়ক বহু রচনা বিভিন্ন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়া রবীন্দ্র-রচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে উনবিংশ শতাব্দীতে লিখিত উক্ত বিষয়ের অগ্রন্থিত রচনাগুলি সংকলিত হইল। ইহাদের সাময়িক পত্রের প্রকাশ-সূচী এইরূপ :

১.	বাঙালির আশা ও নৈরাশ্য	ভারতী, মাঘ ১২৮৪
২.	ইংরাজদিগের আদব-কায়দা	ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫
৩.	নিন্দা-তত্ত্ব	ভারতী, আশ্বিন ১২৮৬
৪.	পারিবারিক দাসত্ব	ভারতী, চৈত্র ১২৮৭
৫.	জুতা-ব্যবস্থা	ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮
৬.	চীনে মরণের ব্যবসায়	ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮
৭.	নিমন্ত্রণ-সভা	ভারতী, আষাঢ় ১২৮৮
৮.	চেঁচিয়ে বলা	ভারতী, ফাল্গুন ১২৮৯
৯.	জিহ্বা আস্ফালন	ভারতী, শ্রাবণ ১২৯০
১০.	জিজ্ঞাসা ও উত্তর	ভারতী, ভাদ্র ১২৯০
১১.	সমাজ সংস্কার ও কুসংস্কার	ভারতী, আশ্বিন ১২৯০
১২.	ন্যাশনল ফণ্ড	ভারতী, কার্তিক ১২৯০
১৩.	টৌন্‌হলের তামাশা	ভারতী, পৌষ ১২৯০
১৪.	অকাল কুষ্মাণ্ড	ভারতী, চৈত্র ১২৯০
১৫.	হাতে কলমে	ভারতী, ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯১
১৬.	একটি পুরাতন কথা	ভারতী, অগ্রহায়ণ ১২৯১
১৭.	কৈফিয়ত	ভারতী, পৌষ ১২৯১
১৮.	[দুর্ভিক্ষ]	তত্ত্বকৌমুদী, জ্যৈষ্ঠ ১২৯২
১৯.	লাঠির উপর লাঠি	বালক, জ্যৈষ্ঠ ১২৯২
২০.	সত্য	বালক, চৈত্র ১২৯২
২১.	আপনি বড়ো	কল্পনা, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৪

২২.	হিন্দুদিগের জাতীয় চরিত্র ও স্বাধীনতা	রবীন্দ্রবীক্ষা ১, শ্রাবণ ১৩৮৩, রচনা : ১৮৮৮
২৩.	স্ত্রী ও পুরুষের প্রেমের বিশেষত্ব	দেশ, শারদীয় ১৩৫৩, রচনা : ১৮৮৮
২৪.	আমাদের সভ্যতায় বাহ্যিক ও মানসিকের অসামঞ্জস্য	দেশ, শারদীয় ১৩৫২, রচনা : ১৮৮৮
২৫.	সমাজে স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের প্রভাব	পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক, রচনা : ১৮৮৮
২৬.	আমাদের প্রাচীন কাব্যে ও সমাজে স্ত্রী-পুরুষ প্রেমের অভাব	দেশ, শারদীয় ১৩৫৩, রচনা : ১৮৮৮
২৭.	Chivalry	দেশ, শারদীয় ১৩৫৩, রচনা : ১৮৮৮
২৮.	নব্যবঙ্গের আন্দোলন	ভারতী ও বালক, ভাদ্র ও আশ্বিন ১২৯৬

১. 'বাঙালির আশা ও নৈরাশ্য' প্রবন্ধটি ও একই সংখ্যায় মুদ্রিত 'বঙ্গে সমাজ-বিপ্লব' রচনা দুইটিকে সজনীকান্ত দাস শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৪৬-সংখ্যায় 'রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী'তে অন্তর্ভুক্ত করিয়াও মন্তব্য করিয়াছেন, 'রচনা দুইটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সংশয় আছে'; কিন্তু তাঁহার 'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য' (১৩৬৭) গ্রন্থে এই বাক্যটি বাদ দিয়াছেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ইহাদের উল্লেখই করেন নাই। পুলিনবিহারী সেন 'রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত সাময়িক পত্র' (দেশ, শতবর্ষপূর্তি সংখ্যা ১৩৬৯) প্রবন্ধের পরিশিষ্টে প্রদত্ত 'ভারতী প্রথম বর্ষে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার সূচী'তে উক্ত রচনাদ্বয় অন্তর্ভুক্ত করিয়া প্রবন্ধ দুইটি পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন। 'বাঙালির আশা ও নৈরাশ্য' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের লেখা হইলেও 'বঙ্গে সমাজ-বিপ্লব' বিষয়ে কিছু সংশয় আছে। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ *Golden Book of Tagore* [1931]-এ 'বাঙালির আশা ও নৈরাশ্য' প্রবন্ধটিকেই তাঁহার রচনা বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। 'বঙ্গে সমাজ-বিপ্লব' প্রবন্ধটি অবশ্য এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট বিভাগে সংকলিত হইল।

২. 'ইংরাজদিগের আদব-কায়দা' প্রবন্ধটি প্রথমবার বিলাতযাত্রার আগে আমেদাবাদে অবস্থানের সময়ে লেখা। বিলাতযাত্রার প্রস্তুতি হিসাবে সেখানকার সামাজিক রীতিনীতির সহিত পরিচিত হইবার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ যে-সকল ইংরেজি গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন, তাহা অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধটি রচিত হইয়াছে ইহা মনে করা যাইতে পারে।

৩. 'নিন্দা-তত্ত্ব' প্রবন্ধটি সম্পর্কে সজনীকান্ত দাস লিখিয়াছেন, 'প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ চলতি ভাষায় ('য়ুরোপযাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্রে'র ভাষায়) লিখিত হইলেও এতৎসম্পর্কে আমি নিঃসংশয় নহি।' কিন্তু প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা : কালানুক্রমিক সূচী'-তে (দ্র রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৫) প্রবন্ধটিকে নিঃসন্দিগ্ধভাবে তালিকাভুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু কোনো যুক্তি দেখান নাই। তবু কয়েকটি কারণে রচনাটিকে রবীন্দ্রনাথের লেখা বলিয়া চিহ্নিত করা যায়। প্রথমত, সামান্য একটি বক্তব্যের ক্ষীণ সূত্র ধরিয়া কথার জাল বুনিয়া বুনিয়া একটি প্রবন্ধ তৈয়ারি করার যে-প্রবণতা তাঁহার পরবর্তীকালের 'যথার্থ দোসর', 'গোলাম চোর' প্রভৃতি রচনাগুলিতে দেখা যায়, 'নিন্দা-তত্ত্ব'-কে তাহারই পূর্বসূরী বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়ত, সমকালীন ও অল্প-কিছু পরবর্তীকালের লেখকদের মধ্যে গুরুচণ্ডালী দোষ না ঘটাইয়া চলতি ভাষায় গদ্যরচনা প্রায় বিরল এবং যে-দোষ হইতে রবীন্দ্রনাথ প্রথমাবধিই সম্পূর্ণ মুক্ত— আলোচ্য রচনাটিতে সেই বিশুদ্ধ চলতি ভাষার পরিচয় পাওয়া যায়। তৃতীয়ত, 'মেঘনাদবধ কাব্য' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে-বিরূপতার সাক্ষাৎ স্থানে-অস্থানে পাওয়া যায়, বর্তমান রচনাটিতেও তাহা উপস্থিত।

৪. 'পারিবারিক দাসত্ব' প্রবন্ধটি সম্পর্কে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সজনীকান্ত দাস লিখিয়াছিলেন, 'য়ুরোপ যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র' ধারাবাহিক ভাবে 'ভারতী'তে বাহির হয়। শেষের দিকে কোনও কোনও উগ্র মতামতের দরুন সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ লেখক রবীন্দ্রনাথকে পাদটীকায় কঠিন সমালোচনা করেন। এই প্রবন্ধটি সম্ভবত জ্যেষ্ঠে-কনিষ্ঠে মতান্তরের ফল। সদ্য বিলাতফেরত রবীন্দ্রনাথ এদেশীয় সমাজ-ব্যবস্থাকে আক্রমণ করিতে চাহিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধের পরেও সম্পাদকীয় প্রতিবাদ-মন্তব্য যোগ করেন।' ইংলন্ড হইতে লেখা একটি পত্রে [ভারতী, পৌষ ১২৮৬, পৃ. ৩৯৪-৪১১, য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র (৯)] রবীন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ ও প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁহার তৎকালীন ধারণা ব্যক্ত করিতে গিয়া লিখিয়াছিলেন, 'আমরা পারিবারিক দাসত্বকে দাসত্ব নাম দিই নে' এবং পত্রটির উপরে দীর্ঘ সম্পাদকীয় টীকা মুদ্রিত হয়— কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তর প্রকাশিত হয় নাই। বর্তমান প্রবন্ধটিই সেই প্রত্যুত্তর। ইহার উত্তরে দ্বিজেন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করেন, তাহা নিম্নে উদ্‌ধৃত হইল—

পূর্ব্বকালে চিকিৎসকেরা পুঁথির বচন অভ্রান্ত মনে করিয়া রোগ কেবল নয় রোগের আধার পর্য্যন্ত— রোগী পর্য্যন্ত বিনাশ করিতে ত্রুটি করিতেন না, লোকের যখন চক্ষু ফুটিতে লাগিল তখন হাতুড়িয়ার দল ক্রমে ক্রমে পসার করিতে আরম্ভ করিল; অব্যর্থ ঔষধির বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রের আপাদমস্তক জুড়িয়া আশ্বাস বাক্যের ঘটায় রোগীর অর্দ্ধেক রোগ নিবারণ করিতে লাগিল, উঁহারা ইঁহাদিগকে হাতুড়িয়া— ইঁহারা উঁহাদিগকে গোবৈদ্য বলিয়া উড়াইয়া দিতে লাগিলেন, কিন্তু জনসাধারণের রোগ উড়াইয়া দেওয়া তেমন সহজ ব্যাপার নহে। সমাজ-সংক্রান্ত রোগেরও ঐরূপ দুই দল চিকিৎসক দেখিতে পাওয়া যায়, এক দল চিকিৎসক পুরাতন রীতিনীতিকে অব্যর্থ ঔষধি মনে করেন আর-এক দল আপনাদের নব নব সিদ্ধান্তকে অব্যর্থ মহৌষধি মনে করেন। ফরাসিস বিদ্রোহে দুই দলেরই বিশিষ্টরূপে বল পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে কিন্তু এখনও তাহার জের চলিতেছে— তাহার সাক্ষী— সম্প্রতি হাতুড়িয়ার হাতে পড়িয়া রুশিয়াকে পতিহীন হইতে হইয়াছে। দুই দলকেই লক্ষ্য করিয়া বলা যাইতে পারে সর্বমত্যন্ত গর্হিতং। বর্তমান প্রস্তাব উপলক্ষে আমরা তাহাই বলিতে বাধ্য হইতেছি।

পারিবারিক দাসত্ব কথাটাই আমাদের কেমন কেমন ঠেকে— তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া পারিবারিক বন্ধন কথাটাই আমাদের মনের সমক্ষে বলপূর্বক দণ্ডায়মান হয়— কিন্তু তাহা বলিয়া বলকে প্রশ্রয় দেওয়া আমাদের অভিপ্রায় নহে। দুই কথাকেই যুক্তির তুলাদণ্ডে তৌল করিয়া যাহা দাঁড়াইবে তাহাই আমরা শিরোধার্য করিতে প্রস্তুত। দাসত্ব শব্দের ভাবটা কিছু গোলমেলে; ও কথা সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে; ভূতপূর্ব আমেরিকার প্রভুদের নিকট কাফ্রীদের আজ্ঞাধীনতাকে যেরূপ দাসত্ব বলিতে পারা যায়, সেনাপতির নিকট সৈন্যদিগের আজ্ঞাধীনতাকে সেরূপ দাসত্ব বলিতে পারা যায় কি না? প্রভুর নিকট একজন কিঙ্করের আজ্ঞাকারিতাকে যেমন দাসত্ব বলিতে পারা যায়— পিতামাতার নিকট পুত্রের আজ্ঞাকারিতাকে সেরূপ দাসত্ব বলিতে পারা যায় কি না? দাসত্ব কথাটা শুনিলেই মনে হয় যে, তাহার সহিত কাপুরুষত্ব জড়ানো আছে, কিন্তু ছোটো ভাই যদি দাদা যাহা বলে তাহা শুনে তাহা হইলে তাহাকে কি কাপুরুষ বলিয়া মনে হয়— কিংবা সৈন্য যদি সেনাপতির কথা শুনে তাহাকে কি কাপুরুষ বলিয়া মনে হয়, তাহা দূরে থাকুক রাম অপেক্ষা লক্ষ্মণকে আরও বেশি বীরপুরুষ বলিয়া মনে হয়। লেখকের লেখার ধরন দেখিলে হঠাৎ লোকের যাহা মনে হইতে পারে তাহা লক্ষ করিয়া আমরা উপরি-উক্ত কথাগুলি বলিলাম— কিন্তু লেখক বোধ হয় রামের নিকট লক্ষ্মণের আজ্ঞাধীনতাকে দাসত্ব বলিয়া দোষ দিতে কখনোই প্রবৃত্ত হইবেন না। কৈকেয়ীর মতন গুরুজনের নিকট রামের দাসত্বকেই লেখক দাসত্ব বলিয়া দোষারোপ করেন, কিন্তু তাহা হইলেও দাসত্ব শব্দটা শুনিবামাত্র কাপুরুষত্বের ভাব সহসা যাহা আমাদের মনে উদয় হয়, সে ভাব দূরে থাকুক তাহার ঠিক বিপরীত ভাবই আমাদের মনকে ভক্তি ও বিস্ময় -রসে

অভিভূত করে; কৈকেয়ীর সমীপে রামের আজ্ঞাকারিতা অসাধারণ বীরপুরুষের লক্ষণ বলিয়া মনে হয়। সৈন্যেরা যে সেনাপতির দাসত্ব করে, পুত্র যে পিতার দাসত্ব করে, সে দাসত্ব মহত্ত্বেরই লক্ষণ; একটি গান আছে 'ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়'— সেনাপতির দাসত্ব করিলে শত্রুর দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে হয় না, পিতার দাসত্ব করিলে অজ্ঞাত-কুলশীল যে-সে লোকের দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে হয় না; একজন জর্মান বক্তা বলিয়াছেন, Liberty I am thy slave— এ দাসত্ব যেমন, পিতার কাছে দাসত্বও সেইরূপ উচ্চ দরের দাসত্ব। এইরূপ মহত্ত্ব-সূচক দাসত্ব যিনি যত অভ্যাস করেন তিনি তত নীচত্ব-সূচক দাসত্বের হস্ত হইতে দূরে অবস্থিতি করেন— দুই দাসত্বের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। এই তো গেল শব্দের মার-প্যাঁচ— এখন আসল কথাটা কী দেখা যাক— লেখকের অভিপ্রায় এই যে, রাম কৈকেয়ীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারেন না বলিয়া কৈকেয়ীর কি কর্তব্য যে, তিনি রামকে বনে পাঠান? এখন— রামের গুরুজন বলিলে অগ্রে কৌশল্যা সুমিত্রা দশরথ বশিষ্ঠ প্রভৃতিকেই মনে পড়ে— কৈকেয়ীকে গুরুজনের ওঁচা বলিয়া মনে হয়। এ স্থলে দেখা উচিত যে, কৈকেয়ী আপনার ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছে বলিয়া সাধারণত রামের গুরুজন তাহার জন্য দায়ী নহেন। এমনি— কোথায় কোন্ গুরুজন আপনার ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছে বলিয়া সাধারণত সকল গুরুজন সে দোষে দোষী হইতে পারে না; কিন্তু লেখক বলেন সাধারণত গুরুজনদিগের স্ব স্ব ক্ষমতার অপব্যবহার করিবারই কথা— না করেন তো সে ছোটোদের পরম সৌভাগ্য। ক্ষমতার অপব্যবহার করা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ এই মূল তত্ত্বটির উপর দাঁড়াইয়া লেখক গুরুজনদিগের প্রতি ঘোরতর কটাক্ষপাত করিতেছেন, তিনি বলেন 'মনুষ্যজাতি স্বভাবতঃ ক্ষমতার অন্ধ উপাসক। যে পক্ষে ক্ষমতা সেই পক্ষে আমাদের সমবেদনা আর অসহায়ের আমরা কেহ না, এইজন্যই একজনের হাতে যথেচ্ছা ক্ষমতা থাকিলে অত্যন্ত ভয়ের বিষয়। তাহার ব্যবহারের ন্যায়ান্যায় বিচার করিবার লোক সংসারে পাওয়া যায় না, কাজে তাহাকে আর বড়ো একটা ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিতে হয় না। যাহাদের বিবেচনা করিয়া চলা বিশেষ আবশ্যক সংসারের গতিকে এমনই হইয়া দাঁড়ায় যে, তাঁহাদেরই বিবেচনা করিয়া চলিবার কম প্রবর্তনা হয়, এই গুরুজন সম্পর্কেই একবার ভাবিয়া দেখো-না। আইন যত বাঁধাবাঁধি যত কড়াক্কড় সমস্তই কি কনিষ্ঠদের উপরে না?'

এ স্থলে বক্তব্য এই যে, ক্ষমতার অপব্যবহার যেমন মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ, ছোটোদের প্রতি স্নেহও তেমনি মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ— বিশেষত ঘরের ছেলেদের প্রতি— আপনার ছেলেদের তো কথাই নাই। দুষ্ট বালকেরা অনেক জায়গায় গুরুজনদিগেরই স্নেহকে সহায় করিয়া গুরুজনদিগেরই প্রতি অবাধ্যতাচরণ করে— তাহারা মনে মনে বলে, 'হদ্দ মারিবেন নয় বকিবেন ফাঁসি তো আর দিবেন না'— গুরুজনদিগের স্নেহ তাঁহাদের প্রভুতাকে ছাপাইয়া উঠে— ইহা বলা বাহুল্য। স্নেহের বাঁধ অতিক্রম করিয়া ক্ষমতার অপব্যবহার মাল-মোকদ্দামা স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়— ওইরূপ বিশেষ বিশেষ স্থলে যাহা হয় তাহা সাধারণত সকল স্থলেই সংলগ্ন হইতে পারে না।

অদ্যাপি এমন কোনো সমাজ-তত্ত্ববিৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ যাঁহাকে না মানিতে হইয়াছে যে— সমাজ-তত্ত্বের অতি অল্পই তাঁহাদের বুদ্ধির আয়ত্তাধীন। সামাজিক সকল তত্ত্বেরই দুই দিক আছে এবং দুই দিকেই ভালো মন্দ দুই-ই আছে; এক দিকের ভালো এক দেশে শোভা পায়, আর-এক দিকের ভালো আর-এক দেশে শোভা পায়, এক দিকের ভালো এক কালে শোভা পায়, আর-এক দিকের ভালো আর-এক কালে শোভা পায়; এ ভিন্ন সকল দিকের ভালো একই দেশে একই কালে শোভা পাইবে কি সম্ভবই নহে।

ইংলন্ডে প্রভু যে দাসকে আজ্ঞা না করিয়া অনুগ্রহ করিতে বলেন তাহার ভালোর দিকটাই লেখক দেখাইয়াছেন— কিন্তু অতটা কায়দা-কানুন আমাদের দেশের সহজ-শোভন প্রকৃতির সহিত কোনো মতেই মিল খায় না— আমাদের দেশের গৃহস্থেরা চাকরবাকরদের তুই-তোকারি করে বটে কিন্তু তাহার মধ্যে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভাব দূরে থাকুক স্নেহ-বাৎসল্যেরই প্রাবল্য দৃষ্ট হয়— আমাদের

দেশের 'বাপু বাছা' শব্দ Please, thank you প্রভৃতি শব্দ অপেক্ষা হৃদয়ের গভীরতর প্রদেশ হইতে বাহির হয়; এবং সাধারণত এইরূপ দেখা যায় যে, ছেলেদের উপর পিতার কটু-কাটব্য করিবার যতটুকু অধিকার তাহার সীমা লঙ্ঘন করিয়া ভৃত্যদের প্রতি কটূক্তি করা আমাদের দেশের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ; তবে— শহর অঞ্চলের প্রকৃতিকে সাধারণত আমাদের দেশের প্রকৃতি বলিয়া গণ্য করিলে আমরা নিরুত্তর।

ভক্তি এবং অনুরাগ সম্বন্ধে লেখক যাহা বলিয়াছেন তাহাও আমাদের সংগত বোধ হয় না। পূজ্যের প্রতি অনুরাগকেই ভক্তি কহে— সমানের প্রতি অনুরাগকেই প্রেম কহে— শাসন-ভয়কে তো আর ভক্তি বলে না। মনুষ্যের স্থায়ী উন্নতি-স্পৃহাও আছে এবং ক্ষণিক আমোদ-স্পৃহাও আছে, উন্নত লোকদিগের প্রতি ভক্তিও স্বাভাবিক, সমানে সমানে প্রেমও স্বাভাবিক। নেপোলিয়নের প্রতি সৈন্যদের কেমন অনুরাগ ছিল— সে অনুরাগ একরূপ, আর বয়স্যে বয়স্যে অনুরাগ একরূপ; প্রথম প্রকারের অনুরাগের নামই ভক্তি, দ্বিতীয় প্রকার অনুরাগের নামই প্রণয়; ভক্তি-প্রকাশ করা যেমন করিয়াই হউক-না-কেন তাহাতে কিছু আইসে যায় না, কিছু না করিয়া ভক্তি প্রকাশ করা হোক, সেলাম করিয়া ভক্তি প্রকাশ করা হোক, প্রণাম করিয়া ভক্তি প্রকাশ করা হোক, যাহাই হউক-না-কেন ভক্তির পাত্রে ভক্তি ভিন্ন নীচু শ্রেণীর অনুরাগ শোভা পায় না; মনে করো ব্যাসদেব আসিয়া তোমার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার সহিত শেক্‌হ্যান্ড করিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিতে তোমার কি মনে একটুও কিন্তু হইবে না? একত্রবাসী ঘরের লোকদের মধ্যে কিছু না করিয়াও ভক্তিই বলো, আর প্রণয়ই বলো ব্যক্ত করা হইয়া থাকে; পুত্রেরা পিতাকে প্রণাম না করিয়াও ভক্তি প্রদর্শন করে, ভ্রাতারা পরস্পর আলিঙ্গন না করিয়াও সৌহার্দ্য বিস্তার করে। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি অপেক্ষা প্রেমের মূল্য অধিক বলিয়া যদি মানা যায় তবে তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে— সে কারণ অন্য কোথাও খাটে না, সে কারণ এই যে, তিনি যেমন দূর হইতে দূরতম তেমনি নিকট হইতে নিকটতম— যেমন বৃহৎ হইতে বৃহৎ তেমনি অণু হইতে অণু; কিন্তু সংসারে যে বড়ো সে বড়ো, যে ছোটো সে ছোটো— বড়ো-ছোটোর মধ্যে এইরূপ প্রাচীরের আড়াল রহিয়াছে; তাহা যদি না থাকে তবে সংসারের বৈচিত্র্য রক্ষা হইতে পারে না।

লেখক বলিয়াছেন, 'এইজন্য সকল শাস্ত্রেই লিখিয়াছে যে, গুরুজনের অবাধ্য হওয়া পাপ— কোনো শাস্ত্রেই লেখে নাই, কনিষ্ঠদের প্রতি যথেচ্ছা ব্যবহার করা পাপ।' এ কথাটি ঠিক নয়। মনু বলিয়াছেন, 'গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্যাকার্যমজানতঃ। উৎপথ প্রতিপন্নস্য ন্যায্যংভবতি শাসনং।' গুরু যদি গর্বিত কার্যাকার্য-জ্ঞানশূন্য ও বিপথগামী হন তাঁহাকেও শাসন করা উচিত। এখনও লোকপ্রবাদ আছে যে, 'দোষাবাচ্যা গুরোরপি।'

৫. 'জুতা-ব্যবস্থা' প্রবন্ধটির শিরোনামের নীচে কৌতুক করিয়া মুদ্রিত হয়, '(১৮৯০ খৃস্টাব্দে লিখিত।)' অর্থাৎ আরও দশ বৎসর পরে বাঙালি জাতির কীরূপ অবস্থা হইবে তাহারই কাল্পনিক চিত্র ইহাতে অঙ্কিত হইয়াছে। প্রবন্ধটির শেষে সম্পাদকীয় পাদটীকায় লিখিত হয়— "This evening's Englishman has discovered the secret of correctly treating the people of Bengal. It says 'Kick them first and then speak to them'" —*Indian Mirror*. যে সমগ্র জাতিকে কোনো বিজাতীয় কাগজ হাটের মধ্যে এরূপ জুতা মারিতে সাহস করে, সে জাতি উপরি-প্রকাশিত প্রবন্ধ পড়িয়া বিস্মিত হইবে না। বোধ হয়, লেখক রহস্যচ্ছলে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, কিন্তু উহা সত্যের এত কাছ ঘেঁসিয়া গিয়াছে যে বাঙালি জাতির পক্ষে উহা রহস্যাত্মক হইবে না। আজ অন্য কোনো দেশে যদি কোনো কাগজ ওইরূপ অপমানের আভাস মাত্র দিত, তাহা হইলে দেশবাসীরা তৎক্ষণাৎ নানা উপায়ে তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করিত। কিন্তু এত দিন হইতে আমরা জুতা হজম করিয়া আসিতেছি যে, আজ উহা আমাদের নিকট গুরু পাক বলিয়া ঠেকিতেছে না— সং।" মন্তব্যটি *Englishman* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 30 April 1881.

Hindoo Patriot 2 May ইহার উপর মন্তব্য করিতে গিয়া লেখে : 'This evening's Englishman has discovered the secret of correctly treating the people of Bengal. It says "KICK THEM FIRST AND THEN SPEAK TO THEM." *Age lat, pechoo bat.* It is so throughly gentlemanly to kick a whole nation before speaking to them that none can question its propriety. We congratulate the leading Anglo-Indian paper in Calcutta on having publicly laid down this sound principle of good conduct. Alas! that the churls of the nation should wince under the treatment!' উক্ত মন্তব্যটিকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন দেশীয় পত্রিকায় যে আলোড়ন চলিয়াছিল, তাহারই প্রতিক্রিয়ায় প্রবন্ধটি রচিত হয়।

৬. 'চীনে মরণের ব্যবসায়' প্রবন্ধটির ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি রবীন্দ্রনাথের মতো না হইলেও ইহা যে রবীন্দ্র-রচনা তাহার অন্যতম প্রমাণ *The Modern Review* [Vol. XXXVII, No. 5, May 1925, pp. 504-07] পত্রিকায় 'The Death Traffic' শিরোনামায় লেখক হিসাবে তাঁহার নাম দিয়া প্রবন্ধটির একটি ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ। বর্তমান প্রবন্ধটির পাদটীকায় লিখিত হইয়াছে : 'The Indo-British Opium Trade by Theodore Christlieb DD. PH. D. Translated from German by David B. Croom, M.A. প্রবন্ধ অবলম্বনে রচিত।' দীর্ঘকাল পরেও প্রবন্ধটি যে তাৎপর্য হারায় নাই, তাহা বিবৃত করিয়া অনুবাদটির সূচনায় চার্লস্‌ ফ্রিয়ার অ্যান্ডরুজ লিখিয়াছেন :

> The article which follows was written by the Poet in May, 1881, exactly forty-four years ago, for the Bengali magazine "Bharati". At Geneva, in May, 1923... Mr. John Campbell, the official representative of the Government of India, made the statement to the World Press assembled, that "*from the very beginning, the Government of India had handled the opium question with perfect honesty of purpose; and not even its most ardent opponents, including Mr. Gandhi, had ever made any reproach in that respect.*" Although called upon to withdraw the latter part of this statement, Mr. Campbell has never done so. Mahatma Gandhi has contradicted it in *Young India* : many passages have been quoted also, in contradiction, from the writings of Mr. Dadabhai Naoraji, G. K. Gokhale, Surendranath Banerjea, and others of a quite early date, as well as later expressions of opinion, but still the statement remains as it was uttered. This article, written by the Poet in Bengali when he was twenty years of age and now for the first time translated, is further convincing proof of Mr. Campbell's inaccuracy. In the original Bengali, the article takes the form of an editorial review of Dr. Christlieb's book entitled "The Indo-British Opium Trade."

৭. ১২৮৬ অগ্রহায়ণ-সংখ্যা ভারতী-তে প্রকাশিত 'য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র'-তে (দ্র য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র, ষষ্ঠ পত্র) ইংলন্ডের নিমন্ত্রণসভা-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, সেই বিষয়টি লইয়া 'নিমন্ত্রণ-সভা' প্রবন্ধটি রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। উল্লেখ করা দরকার, এই সময়ে পত্রগুলি গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইতেছে।

৮. 'চেঁচিয়ে বলা' তরুণ রবীন্দ্রনাথের একটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক প্রবন্ধ হইলেও সম্ভবত

সাময়িক উত্তেজনাপ্রসূত ইহার তীব্র ব্যঙ্গাত্মক প্রকাশভঙ্গির কারণে পূর্বোল্লিখিত 'জুতা-ব্যবস্থা' এবং অব্যবহিত পরবর্তীকালে রচিত 'জিহ্বা আস্ফালন', 'ন্যাশনল ফন্ড', 'টৌনহলের তামাশা' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলির মতো এই রচনাটিকে তিনি কোনো গ্রন্থভুক্ত করেন নাই।

৯. 'জিহ্বা আস্ফালন' রচনাটি স্বাক্ষরবিহীন। হাইকোর্টের জজ নরিস সাহেবের অভিযোগক্রমে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালত অবমাননার দায়ে দুই মাস কারাদণ্ড ভোগ করিয়া ৪ জুলাই ১৮৮৩ তারিখে মুক্তি লাভ করেন। এই বিচার ও কারাদণ্ড সেই সময়ে বাংলাদেশে ও সমগ্র ভারতে প্রচণ্ড উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহার মুক্তির দিনে নিমতলার ফ্রি চার্চ কলেজে তাঁহাকে যে সংবর্ধনা দেওয়া হয়, সেই সভায় ও পরে ১৭ জুলাই তারিখের বিরাট জনসভায় তিনি জনসাধারণকে ধৈর্য ও মিতব্যবহার অবলম্বনের উপদেশ দেন। ইহাই রবীন্দ্রনাথের বর্তমান প্রবন্ধ রচনার অব্যবহিত উপলক্ষ।

১০. 'জিজ্ঞাসা ও উত্তর' নামে একটি নূতন বিভাগ ভারতী-র বৈশাখ ১২৯০-সংখ্যা হইতে শুরু হয়। শ্রাবণ-সংখ্যায় এই বিভাগে দুইটি প্রশ্ন করা হইয়াছিল, বর্তমান সংখ্যায় ইহার উত্তর মুদ্রিত হইয়াছে। প্রথম প্রশ্ন— 'আদিশূরের সময়ে পাঁচজন কায়স্থের বাংলায় আসিবার কারণ কি'— উত্তর দিয়াছেন কৈলাসচন্দ্র সিংহ। দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল 'জাতীয়তার লক্ষণ কি?' বিভিন্ন দিক দিয়া এই প্রশ্নের যে উত্তর দেওয়া হইয়াছে তাহার রচয়িতার নাম না থাকিলেও বিভাগটি রবীন্দ্রনাথই পরিচালনা করিতেন বলিয়া ইহা তাঁহার রচনা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।

১১. ভারতী পত্রিকার আষাঢ় ১২৯০-সংখ্যায় জ্ঞানদানন্দিনী দেবী-পঠিত 'সমাজ সংস্কার ও কুসংস্কার' নামক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, ভাদ্র-সংখ্যায় 'শ্রীমতী—' তাহার একটি 'প্রতিবাদ' লেখেন। বর্তমান প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'শ্রীরঃ—' স্বাক্ষরে উভয়পক্ষের যুক্তিতর্কগুলির সারসংক্ষেপ ও বিচার করিয়া 'তৃতীয় পক্ষ' হিসাবে তাঁহার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন।

১২. সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারামুক্তির পরে ১৭ জুলাই ১৮৮৩ তারিখে কলিকাতার অনাথনাথ দেবের বাজারে একটি বিরাট জনসভা হয়। এই সভার বিবরণে সোমপ্রকাশ (৮ শ্রাবণ ১২৯০) পত্রিকা লেখে, 'প্রায় ৫।৬ হাজার লোক একত্র মিলিত হইয়া একটি সভা করিয়াছিলেন। সভাস্থলে এই প্রস্তাব হয়, ইংলণ্ডে ও ভারতে রাজনীতি সংক্রান্ত আন্দোলনার্থ ছয় লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহ করা আবশ্যক। এই প্রস্তাবটি সভার অঙ্গীকৃত ও অবধারিত হইয়াছে।' কিছুকাল পূর্বে ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য ইংরাজেরা প্রায় দেড় লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিয়াছিল। তাহাদের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়াই এই ন্যাশনাল ফান্ডের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। রবীন্দ্রনাথ 'ন্যাশনল ফন্ড' প্রবন্ধে কয়েকটি বিশেষ প্রশ্নে প্রস্তাবটির সমালোচনা ও কতকগুলি গঠনমূলক পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন।

গঠনমূলক এই পরিকল্পনা প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে অনেকদিন পরে রবীন্দ্রনাথ নিজেই একবার এই ফান্ডের নিকট হইতে সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে তাঁতের কাজ শিখাইবার ব্যবস্থা করিবার জন্য। ভারতসভার কাছে প্রেরিত সেই চিঠিটি (১০ বৈশাখ ১৩২৬) এখানে উদ্‌ধৃত হইল :

ওঁ

বিনয় সম্ভাষণ পূর্ব্বক নিবেদন—

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সংস্রবে তাঁতের কাজ শিক্ষা দিবার জন্য আমরা আয়োজন করিতেছি। শ্রীরামপুর হইতে তাঁত আনানো হইয়াছে। আমাদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নহে এই কারণে যথোচিতভাবে আমাদের সঙ্কল্পসাধনে বাধা পড়িতেছে। ন্যাশনাল ফন্ড

হইতে তাই আমরা অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিয়া আবেদনপত্র পাঠাইতেছি। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে এই জায়গাটা তাঁতের কাজের প্রধান আড্ডা ছিল। এখনো অনেক তাঁতী নিকটবর্তী গ্রামে বাস করে। এই কারণে এখানে তাঁতের শিক্ষালয় খুলিলে অনেক উপকার হইবে। আর যাই হোক ফন্ডের প্রদত্ত অর্থের কোনোপ্রকার অপব্যয় ঘটিবার আশঙ্কা নাই। আমাদের দাবী অসঙ্গত নহে মনে করিয়া ফন্ড হইতে উপযুক্ত পরিমাণে মাসিক সাহায্য দান সম্বন্ধে আপনি যদি আমাদিগকে আনুকূল্য করেন তবে আপনার নিকট আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকিব। ইতি ১০ই বৈশাখ ১৩২৬।

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—দ্রষ্টব্য : বিকাশ প্রধান, "ভারতসভা ও রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত চিঠি", 'প্রতিক্ষণ', মে ১৯৯৪, পৃ. ৬৪-৬৮। রবীন্দ্রনাথের পত্রের পাণ্ডুলিপিচিত্র এইসঙ্গে মুদ্রিত আছে।

১৩. 'টৌনহলের তামাশা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ টাউন হলে অনুষ্ঠিত বাংলার ভূম্যধিকারীদের যে সভাকে 'তামাশা' বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন, তাহা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল ১৭ নভেম্বর ১৮৮৩ তারিখে। এই সভার বিবরণ দিয়া *The Hindoo Patriot* [Nov 19] লেখে :

A grand meeting of the Central Committee of the Landholders of Bengal and Behar was held at the Town Hall on Saturday last at 3-30 p.m. Although, strictly speaking, it was a meeting of the Committee, still it was open to those interested in the land question and to sympathisers, and the attendance was unexpectedly large. There were present about six hundred picked gentlemen, representing the landed property-holders of the country, and the flowers of the native society.

The meeting was a great success. By far the most interesting feature of the meeting was the union of Europeans and Natives. Both went hand in hand in denouncing the confiscatory policy of the Government, the inequitableness of its proceedings, and its utter disregard of honesty and justice in connection with the matter. It remains to be seen what effect will this united protest of Europeans and natives have upon Her Majesty's Government both here and in England.

—প্রতিবেদনের 'union of Europeans and Natives', 'both went hand in hand' প্রভৃতি মন্তব্যই রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গপ্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়াছিল। কিছুদিন আগে জুরিসডিকশন বিল বা ইলবার্ট বিল লইয়া য়ুরোপীয় ও অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা দেশীয়দের বিরুদ্ধে যে কটূক্তির ঝড় বহাইয়া দিয়াছিল, বর্তমান প্রবন্ধটি সেই ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে পঠনীয়।

১৪. 'অকাল কুষ্মাণ্ড' প্রবন্ধটি 'সাবিত্রী লাইব্রেরীর সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে লিখিত।' ১৮ নং অক্রূর দত্ত লেনে প্রতিষ্ঠিত সাবিত্রী লাইব্রেরির ৫ম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে চন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে ১১ চৈত্র ১২৯০ (২৩ মার্চ ১৮৮৪) রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি পাঠ করেন। প্রবন্ধটি ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে 'সাবিত্রী' (১২৯৩) গ্রন্থে মুদ্রিত হয়, এখানে পত্রিকার পাঠ গ্রহণ করা হইয়াছে।

১৫. 'হাতে কলমে' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ সাবিত্রী লাইব্রেরির অন্তর্গত সাবিত্রী-সভার অধিবেশনে ৯ ভাদ্র ১২৯১ (২৪ আগস্ট ১৮৮৪) তারিখে পাঠ করেন। রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত একখণ্ড 'ভারতী'তে নীল পেনসিলে রচনাটির অনেক অংশ বর্জন-চিহ্নিত— সম্ভবত

রবীন্দ্রনাথ কোনো সময়ে প্রবন্ধটিকে গ্রন্থভুক্ত করার কথা চিন্তা করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধটিও পূর্বোল্লিখিত 'সাবিত্রী' (১২৯৩) গ্রন্থে মুদ্রিত হয়। এখানেও পত্রিকার পাঠটিই গ্রহণ করা হইয়াছে।

১৬-১৭. 'একটি পুরাতন কথা' প্রবন্ধটির বিতর্কমূলক অংশগুলি বাদ দিয়া 'সমালোচনা' (১২৯৪) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, এখানে পত্রিকার পাঠটি মুদ্রিত হইল।

শ্রাবণ ১২৯১-তে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় 'নবজীবন' ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় 'প্রচার' মাসিকপত্র প্রকাশিত হইলে বঙ্কিমচন্দ্র উভয় পত্রিকাতেই তাঁহার নব্য হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যা করিতে শুরু করেন। ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ও অন্যান্য কয়েকটি পত্রিকায় তাঁহার বক্তব্যের বিরোধিতা করা হয়। ফলে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়, রবীন্দ্রনাথও তাহাতে জড়িত হইয়া পড়েন। 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় কয়েকটি চিঠি-চাপাটির পরে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বক্তব্যের বিরোধিতা করিয়া 'একটি পুরাতন কথা' প্রবন্ধটি লিখিয়া কার্তিক ১২৯১-এর কোনো এক তারিখে আদি ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরি হলে পাঠ করেন ও সেটি অগ্রহায়ণ-সংখ্যা ভারতী-তে মুদ্রিত হয়। এই-সব সমালোচনার উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র প্রচার-এর অগ্রহায়ণ-সংখ্যায় 'আদি ব্রাহ্ম সমাজ ও "নব হিন্দু সম্প্রদায়"' -শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য সম্পর্কে কটাক্ষ করিয়া লেখেন, 'আমার বিরুদ্ধে কেহ কখন কোন কথা লিখিলে বা বক্তৃতায় বলিলে এ পর্যন্ত কোন উত্তর করি নাই। ...তবে যে এ কয় পাতা লিখিলাম, তাহার কারণ, এই রবির পিছনে একটা বড় ছায়া দেখিতেছি।' রবীন্দ্রনাথ ইহারই উত্তরে 'কৈফিয়ত' প্রবন্ধটি রচনা করেন। উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক। সম্পূর্ণ রচনাটি ইতিপূর্বে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ-প্রকাশিত 'বঙ্কিমচন্দ্র' (১৩৮৪) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তৎপূর্বে পুলিনবিহারী সেন -কর্তৃক সংকলিত 'রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী' প্রথম খণ্ডে (১৩৮০ বঙ্গাব্দ) 'সমালোচনা' গ্রন্থের বিশদ বিবরণ প্রসঙ্গে 'একটি পুরাতন কথা' ও 'কৈফিয়ৎ'— রচনাদুইটির প্রাসঙ্গিক অংশ মুদ্রিত।

১৮. '[দুর্ভিক্ষ]।' প্রবন্ধটি দুষ্প্রাপ্য তত্ত্বকৌমুদী (১ জ্যৈষ্ঠ ১৮০৭ শক) হইতে উদ্ধার করিয়া প্রশান্তকুমার পাল 'রবিজীবনী' দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন, শিরোনামহীন রচনাটি ওই গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে।

পর পর দুই বৎসর অনাবৃষ্টির ফলে ১২৯১ বঙ্গাব্দের শেষ দিকে বাঁকুড়া, বীরভূম ও বর্ধমান জেলার কিয়দংশ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়। এই কারণে ৩১ চৈত্র আদি ব্রাহ্মসমাজগৃহে বর্ষশেষ উপাসনার দিনে, 'তত্ত্বকৌমুদী'তে লেখা হইয়াছে, 'বীরভূম অঞ্চলে দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ' দান সংগ্রহের জন্য একটি সভার আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ 'আজি কাঁদে কারা ওই শুনা যায়' গানটি রচনা করেন ও 'দুর্ভিক্ষের সাহায্যপ্রার্থী হইয়া ... একটী সুন্দর প্রবন্ধ' পাঠ করেন।

১৯. বালক-পাঠ্য 'বালক' পত্রিকার সম্পাদিকা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বৈশাখ ১২৯২ সংখ্যায় ১২টি চিত্র সহযোগে 'ব্যায়াম' নামক প্রবন্ধে ফিলাডেলফিয়ার একটি স্কুলে একজন আমেরিকানের লাঠি লইয়া ব্যায়ামের অভিজ্ঞতা ও উপযোগিতা বর্ণনা করিয়াছিলেন। বর্তমান 'লাঠির উপর লাঠি' রচনায় রবীন্দ্রনাথ 'বশম্বদ শ্রীঃ-' স্বাক্ষরে (বার্ষিক সূচীতে তাঁহার নাম আছে) লঘু ভঙ্গিতে উক্ত প্রবন্ধ সম্পর্কে একটি বিতর্কের অবতারণা করেন। এই সংখ্যাতেই 'সম্পাদকের নিবেদন'-এ সম্পাদিকা তাহার যে উত্তর দেন, আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

সম্পাদকের নিবেদন

'লাঠির পরে লাঠি' লেখক আমারিই লাঠি ঘুরাইয়া আমাকেই বিলক্ষণ শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার লাঠি খেলার চমৎকার কৌশল,— তাঁহার বাক্য বিন্যাসের ঘটা, তাঁহার রসিকতার ছটা আমাদের মুখ হইতে বারংবার বাহবা বাহির করিয়াছে। আমাদের দেশের দরিদ্র বালকদের অবস্থাদি সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতা দূর করিয়া তিনি আমার পরম ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। আর 'স্কুল পালানে ছেলেরাই কবি হয়' সুকবি হইবার এই সুন্দর সংকেতটি বলিয়া দিয়া তিনি জগৎশুদ্ধ লোককে উপকৃত করিয়াছেন। লেখক আমাদের আধুনিক অবস্থার যে জীবন্ত চিত্র আঁকিয়াছেন আমি কিংবা আর কেহ যে তাহার কোনো অংশ সংশোধন করিয়া দিতে পারে এমন বোধ হয় না। তবে কি না আমার জ্ঞানস্পৃহাটা বড়োই বলবতী, তাহারি উত্তেজনায় আমি আরও কিছু শিক্ষা লাভের জন্যে লালায়িত, তাই গুটিকতক কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এই কথাগুলিতে যদি আমার অত্যন্ত অসাধারণ অজ্ঞতা বা নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ পায় তদ্দৃষ্টে লেখক আমার প্রতি ঘৃণার পরিবর্তে যেন কৃপাদৃষ্টিপাত করেন এইমাত্র প্রার্থনা। আমাদের দেশীয় লোকদের স্বভাবতই ব্যায়ামে বিরাগ ও ইয়ুরোপীয়দের তাহাতে অনুরাগ এ সম্বন্ধে লেখককেতে আমাতে কখনোই মতভেদ ছিল না। ইয়ুরোপীয়ানদের সহিত সেই প্রভেদ ঘুচাইবার জন্যে, আমাদের যে মদ মাংস খাইতেই হইবে, এমন কোনো কথা আমি কি না কোনোখানেই বলি নাই, অতএব লেখক ওই কথাটার উপরে যেরূপ আক্রোশ প্রকাশ করিয়াছেন এবং মাংস খাওয়া এ দেশীয় লোকের সাধ্যায়ত্ত কি না, ইয়ুরোপীয়দের খাদ্য আমাদের দেশে খাটে কি না খাটে এই সমস্ত বিষয় লইয়া তিনি যেরূপ ভাবিত হইয়া উঠিয়াছেন তদ্দ্বারা এই অল্প বয়সে তাঁহার এতাদৃশ দূরদৃষ্টির পরিচয় পাইয়া পরম প্রীত হইলাম।

লেখক বলিয়াছেন, 'আমাদের ব্যায়াম চর্চা কর্তব্য বোধে করিতে হইবে' আমিও তো তাহাই বলিতেছি। 'ছাত্রেরা যে খেলাধুলা আমোদপ্রমোদ ভুলিয়া ঘরে বসিয়া বিদেশী ব্যাকরণের শুষ্ক সূত্র, বীজগণিতের কঠিন আঁটি ও জ্যামিতির তীক্ষ্ণ ত্রিকোণ চতুষ্কোণ গিলিতে থাকে তাহার অবশ্যই একটা কারণ আছে।' সে কারণটি কী? তাহারা যে 'বীজগণিতের প্রেমে পড়িয়া এরূপ করে না' তাহা লেখক নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। আমার তো বোধ হয় তাহার কারণ এই যে, ছাত্রদের বিশ্বাস যে, এই কষ্টগুলি ভোগ করিলে ইহা অপেক্ষা গুরুতর কতকগুলি কষ্টের হাত এড়াইতে সক্ষম হইবার পক্ষে খুবই সম্ভাবনা আছে। এই বিশ্বাসের জোরেই তাহারা 'বিদেশী চালকড়াই ভাজা দন্তহীন মাড়ি দিয়া চিবাইতে' এবং 'বীজগণিতের কঠিন আঁটি গিলিতে' চেষ্টা পায় ও তাহাতে কৃতকার্যও হয়। বিদ্যা-শেখা-না-শেখার ফলাফল তাহাদের যেরূপ হৃদয়ংগম হইয়াছে এবং ওই বিশ্বাসটি তাহাদের হৃদয়ে যেরূপ বদ্ধমূল হইয়াছে সেইরূপ, স্বাস্থ্যের নিয়ম সকল পালন না করিলে শরীর যথোচিতরূপে বর্ধিত হয় না, অসম্পূর্ণ শরীরে মানসিক বৃত্তি সকলের যথোচিত স্ফূর্তি কখনোই হইতে পারে না, শরীর ও মন এ দুইই যথোচিতরূপে বর্ধিত এবং সুস্থ ও বলিষ্ঠ না থাকিলে এ পৃথিবীতে কোনো কাজই সুসিদ্ধ হয় না, কোনো স্থায়ী উন্নতি লাভ করা যায় না— এইগুলি যদি তাহাদের হৃদয়ংগম হয় আর, শরীর ও মনের শুভাশুভ যে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা, এই বিশ্বাসটি তাঁহাদের হৃদয়ে সেইরূপ বদ্ধমূল হয়, তাহা হইলে যেমন নীরসতা সত্ত্বেও তাঁহারা 'বীজগণিতের আঁটি গেলেন' তেমনি ব্যায়ামে বিরাগ সত্ত্বেও তাহার উপকারিতাবোধে তাঁহারা তাহা করিবেন। যখন কর্তব্যবোধে একটা কাজ করিয়া আসিতেছেন তখন কর্তব্যবোধে আর-একটা কাজ কেনই বা না করিতে পারিবেন, বিশেষত দুই কর্তব্যেরই যখন সমান গুরুত্ব? দুই কর্তব্যই বা কেন বলিতেছি, যখন শরীর সুস্থ না রাখিলে মন সুস্থ রাখা যাইতে পারে না, তখন মনের প্রতি কর্তব্য আর শরীরের প্রতি কর্তব্য দুইই তো একই কর্তব্যের সামিল হইল। ছাত্রদের শরীরের প্রতি তাচ্ছিল্য দেখিয়া মনে হয় যে, শরীর, মনের নিকটসম্বন্ধ

এখনও তাঁহাদের তাদৃশ হৃদয়ংগম হয় নাই। কিন্তু লেখক একস্থানে বলিয়াছেন যে 'ছাত্রদের বুঝিতে বাকি নাই যে ব্যায়াম চর্চায় শরীর সুস্থ হয়' তবে বোধ হয় তাহা জানিয়াও, ছ্যাক্‌ড়া গাড়ির কর্তারা তাহাদের ঘোড়াকে যেরূপ ভাবে দেখে ছাত্রেরাও তাঁহাদের শরীরটাকে সেই ভাবে দেখেন— যত কম সেবায় যত অল্পদিনের মধ্যে যত বেশি কাজ দিতে পারে ততই ভালো। যত শীঘ্র যে-কোনো প্রকারে হউক চোখে-মুখে খানিকটা বিদ্যা গুঁজিয়া পাসটা দিয়া একটা দশ-কুড়ি টাকার চাকরি জোটাইতে পারিলে হয়। বস্‌, তাহা হইলেই পার্থিব সুখের একেবারে চূড়ান্ত সীমা হইল! হইল কি? না পাসটা হইলেই চাকরিটা হইবে এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া পাসটা হইবার আগেই হয়তো বালক বিবাহ করিয়া বসিয়া আছেন, হয়তো তাঁহার দু-একটি ছেলেমেয়েও হইয়াছে। বালকের সেই বড়ো দুঃখের দশ-কুড়ি টাকার চাকরিটি হস্তগত হইতে-না-হইতেই তাঁহার মস্তকের উপরে সংসারের বোঝা চারি দিক হইতে চাপিয়া পড়িল। তিনি তখন 'হা অন্ন, হা অন্ন' করিয়া নিজেও ঝালাপালা হইতে লাগিলেন আর তাঁহার অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থাপন্ন আত্মীয়-বন্ধুদিগকেও ঝালাপালা করিয়া তুলিলেন। ছ্যাক্‌ড়া গাড়ির ঘোড়ার শরীরের প্রতি যে অত্যাচার হয় তাহার ফল কেবলমাত্র সেই ঘোড়াতেই ফলে আর তাহাতেই শেষ হয়। কিন্তু বালকের শরীরের প্রতি যে অত্যাচার হয় তাহার ফল পুরুভুজের ন্যায় বালকের প্রত্যেক শাখা-প্রশাখায় জীবন্ত হইয়া উঠে। অসম্পূর্ণরূপে বর্ধিত ও অপক্ব-শরীর বালকের সন্তান-সন্ততি কখনোই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না; সন্তানেরা ক্ষীণ কিংবা রুগ্‌ণ শরীর লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। তাহার পরে হয়তো যথাবশ্যক আহারাভাবে তাহাদের শরীরের অবস্থা মন্দ হইতে মন্দতর হইতে থাকে। এইরূপে মরিয়া বাঁচিয়া কোনোপ্রকারে মানুষ হইতে থাকে। আবার পাছে বাপের বিপুল কষ্টরাশির কোনো অংশ হইতে সন্তানটি বঞ্চিত হয় এই ভয়েই যেন বালক যত শীঘ্র হয়, ছেলের লেখাপড়া আরম্ভ করিয়া দেন, তাহাকে ধমকাইয়া, মারিয়া, রাত জাগাইয়া পাসের জন্য প্রস্তুত করেন। এই অপূর্ণ, রুগ্‌ণ, ভগ্ন শরীর লইয়া পাসটাস দিয়া ছেলে যদি বা আর কোনো কালে কখনো মাথা তুলিতে সক্ষম হয়, সে সম্ভাবনা যেন সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া দিবার জন্যেই পাস দিতে-না-দিতেই পিতা পুত্রের গলায় একটি বধূ বাঁধিয়া দেন। বালক যে হতভাগিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন স্বামীর দুঃখে, সন্তানের কষ্টে তাহার তো একদিনের তরেও চোখের জল শুকায় না। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, বালকের শরীরের প্রতি অত্যাচারের ফল শুদ্ধ একজনে বা এক পুরুষে শেষ হয় না, ক্রমিকই বিস্তৃত হইতে ও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বাঙালি বালকের জীবনের এখন এই তিনটি কাজ হইয়াছে— জন্ম, পাস, মৃত্যু। জীবনের সমস্ত কাজ সারিয়া ফেলিবার এতই যদি তাড়াতাড়ি পড়িয়া থাকে তাহা হইলে গুষ্টিশুদ্ধ দগ্ধে দগ্ধে মরা কেন, জন্মের পরেই মৃত্যুটাকে আনিলেই তো সব ল্যাঠা একেবারে চুকিয়া যায়— সব জ্বালা-যন্ত্রণার হাত চট করিয়া চিরকালের মতো এড়ানো যায়।

একটা একজামিন পাস্‌ করিয়া যৎকথঞ্চিৎ গ্রাসাচ্ছাদনের জোগাড় করিতে পারিলেই কি মনুষ্যজীবনের সার্থকতা সম্পাদন হইল? আমরা কি কেবল একজামিন পাস করিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। মনুষ্যজীবনের কি উহা অপেক্ষা উচ্চ আশা, মহৎ উদ্দেশ্য আর কিছুই নাই? সত্য বটে গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান সর্বাগ্রে প্রয়োজন, কিন্তু তাহাই বা সুসম্পন্ন হইতেছে কোথায়? আর, ওই কার্যসিদ্ধির নিমিত্তে যে উপায় অবলম্বন করা হইতেছে সে যে আত্মঘাতী উপায়!! ছেলের অন্নবস্ত্রের উপায় করিতে গিয়া, যে-শরীরকে সে অন্ন পোষণ করিবে, যে-শরীরকে সে বস্ত্র আবৃত করিবে সেই শরীরকেই যে ক্ষয় করিয়া ফেলা হইতেছে। ছেলের প্রাণ বাঁচাইতে গিয়া তাহাকে যে অতি দ্রুতপদে মরণের পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছ। বিদ্যাশিক্ষাদ্বারা ছেলের বুদ্ধিবৃত্তি বৃদ্ধি হইবে বলিয়া শীঘ্র শীঘ্র তাহার মাথার ভিতরে বিদ্যা ঠাসিয়া ঠাসিয়া সেই বুদ্ধিবৃত্তির ভিত্তিভূমিকেই যে একেবারে চাপিয়া পিষিয়া চূর্ণ করিয়া দিতেছ। এ যে গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালা!!! ইহা দেখিয়া, জানিয়া বুঝিয়া তবুও কি ইহার প্রতিকারের কোনো উপায় অবলম্বন

করিবে না? আমাদের অবস্থা মন্দ হইয়াছে বলিয়া কি মন্দকেই আমাদের অঙ্গের আভরণের মতো করিয়া দেখিব? আমাদের আশা-ভরসা, আকাঙ্ক্ষা, উদ্দেশ্যকে একেবারে গণ্ডিবদ্ধ করিয়া রাখিব, গণ্ডির বাহিরে দৃক্‌পাতও করিতে দিব না? আমরা তো আর উদ্ভিদ্ হইয়া জন্মাই নি যে, যে-অবস্থায় জন্মিয়াছি সেইখানে মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিতেই হইবে।

লেখক ব্যায়ামের উপকারিতা স্বীকার করিয়া তাহার একটি বাধা দেখাইয়াছেন— সময়ের অভাব। সময়াভাবের দুইটি কারণ দিয়াছেন : ১ম, দরিদ্রতা, ২য়, দুর্জ্ঞেয় বিদেশী ভাষা অল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্ত করিবার আবশ্যকতা। প্রথম বাধার সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহাই প্রথমে বলি, ব্যায়ামের অর্থ— শারীরিক পরিশ্রম। আমরা সচরাচর, যে-পরিশ্রম আমরা শখ করিয়া করি তাহাকে বলি ব্যায়াম। পরিশ্রমের কাজ এই যে, সমস্ত শরীরটা খানিকটা নাড়াচড়া পাওয়াতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বেশ ভালোরূপে রক্ত চলাচল হয় এবং সেইজন্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি যথোচিত পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইতে পারে। যে 'দরিদ্র বালকদের ভাতে নুন জোটে না' তাহাদের যে দুই বেলা হাঁটিয়া স্কুলে যাতায়াত করিতে হয় এ-বিষয়ে বোধ করি কাহারো কিছু মাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না, তদ্‌ব্যতীত তাহাদের অনেক সময় বাজারে যাইতে হয় ও নানাবিধ কাজকর্ম উপলক্ষে নানা স্থানে আনাগোনা করিতে হয়। দরিদ্র বালকদের দায়ে পড়িয়া হয়তো এত পরিশ্রম করিতে হয় যে, তাহাদের পক্ষে 'ব্যায়ামের' অপেক্ষা 'বিরামের' উপদেশ অধিক উপযোগী।

২য় বাধা— দুর্জ্ঞেয় বিদেশী ভাষা অল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্ত করিবার আবশ্যকতা হেতু সময়াভাব। ৯টা-১০টা বেলায় ছেলেরা স্কুলে যায়, তিন-চারিটার সময় বাড়ি আসে। ইহাতে তাহাদের প্রত্যুষে এক ঘণ্টা কাল ও সন্ধ্যার পূর্বে এক ঘণ্টা কাল ব্যায়ামের আমি তো কোনো বাধা দেখিতে পাই না। সমস্তক্ষণ স্কুলে পড়িয়া শ্রান্ত মস্তিষ্কে, পথের রৌদ্রের তাপে শীর্ণ শরীরে বিকালে বাড়ি আসিয়াই তখনই আবার পড়িতে বসিলে স্বাস্থ্যের তো হানি হয়ই, তদ্‌ব্যতীত শরীর মনের দুর্বলতাপ্রযুক্ত তৎকালে পাঠাভ্যাস অন্য সময় অপেক্ষা অধিক আয়াসসাধ্য হইয়া উঠে। স্কুল হইতে আসিবার পর খানিকটা ব্যায়াম দ্বারা শরীর-মন বেশ তাজা হইয়া উঠিলে তখন আবার পাঠাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলে সকল দিকেই মঙ্গল।

আমাদের বিদেশী ভাষায় জ্ঞান উপার্জন করিতে হয় ইহা বড়োই কষ্টকর, এ কষ্ট আমি লেখকের সহিত ঠিক সমানভাবে অনুভব করিতেছি। আমাদের পূর্বপুরুষদিগের কর্মফলস্বরূপ এই কষ্ট আমরা ভোগ করিতেছি। কিন্তু আমাদের এই একটা অসুবিধা ঘটিয়াছে, তাই একটা কষ্টভোগ করিতে হইতেছে বলিয়া সেই দুঃখে গা ঢালিয়া দিয়া শারীরিক, মানসিক উন্নতির আর সকল প্রকার উপায়ের প্রতি কি আমরা অন্ধ হইয়া থাকিব এবং এইরূপে আরও পাঁচরকম অসুবিধা, আরও পাঁচটা কষ্ট আপনাদের উপর চাপাইব? ইংরাজেরা আমাদের দেশ জয় করিয়া বলপূর্বক তাহাদের ভাষা এ-দেশে প্রচলিত করিয়াছে, সেই অভিমানে আত্মহত্যা করিয়া আমরা কি তাহার শোধ তুলিতে উদ্যত হইয়াছি? না ইংরাজদের উপর আড়ি করিয়া শরীর-মন এমন ক্ষীণ করিয়া ফেলিতে হইবে যে আর কোনোকালে তাহাদের দাসত্বশৃঙ্খল ছিঁড়িবার কোনো সম্ভাবনা না থাকে? জ্বর হইয়াছে বলিয়া কি ঔষধ-পথ্যের প্রতি তাচ্ছিল্য করিয়া বিকার পর্যন্ত টানিয়া আনিতে হইবে? এই কি উচিত? কষ্ট নিবারণের যথাসাধ্য চেষ্টা না করিয়া কেবল যদি খেদ করিয়াই কাল কাটাই, তাহা হইলে এই সমস্ত কষ্টের বোঝা আমাদের সন্তান-সন্ততির মাথায় চাপাইয়া আমরা কি পাপের ভাগী হইব না?

এখন তোমাদের— বালকদের উপরেই সমস্ত নির্ভর করিতেছে। তোমরাই আমাদের একমাত্র আশা-ভরসার স্থল। তোমরা বিদেশীদের জ্ঞানসকল সুন্দররূপে পরিপাক করিয়া স্বদেশীয় রক্তমাংসে পরিণত করো। নানা ভাষা হইতে নানা রত্নরাজি আহরণ করিয়া দুঃখিনী মাতৃভাষার অভাবসকল শীঘ্র দূর করো। তাহা হইলে বিদেশীয় ভাষায় বিদ্যা উপার্জনের কষ্ট

আর সহিতে হইবে না। যত দিন পরিবার-পোষণে সক্ষম না হইবে ততদিন পর্যন্ত পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়ো না। তাহা হইলে দরিদ্রতার দুঃখ অনেক পরিমাণে হ্রাস হইবে। যখন নববধূকে ঘরে আনিবার জন্যে মা তোমাকে অনুরোধ করিবেন, তখন তুমি মায়ের পা জড়াইয়া কাঁদিয়া বলিয়ো, মা, আমরা এই কয়জনেই অন্নবস্ত্রের ক্লেশে সারা হইতেছি এখন আবার ঘরে আরও লোক আনিয়া কেন আমাদের দুঃখ-কষ্ট বাড়াইয়া তুলিব, আর কী করিয়াই বা একটি সুকুমারী বালিকাকে আমাদের এই দারুণ দুঃখ-ক্লেশের ভাগী করিব— মা, যতদিন পর্যন্ত আমাদের জীবিকা নির্বাহোপযোগী যথেষ্ট অর্থ উপার্জনে সক্ষম না হই ততদিন তুমি, আমাকে এই অনুরোধটি করিয়ো না। মা পরম স্নেহময়ী, তিনি যখন বুঝিবেন যে, পুত্র এখন বিবাহ করিলে যথার্থই পরিবারস্থ সকলের কষ্ট বৃদ্ধি হইবে তখন তিনি আর এ-অনুরোধ করিবেন না। তোমাদের হাতে সকলই রহিয়াছে। তোমরা দলবদ্ধ, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে কোন্ মহৎ কার্য না সুসিদ্ধ হইতে পারে। তোমাদের স্বাস্থ্যের উপরেই দেশের স্বাস্থ্য নির্ভর করিতেছে— তোমাদের উন্নতি হইলেই দেশের উন্নতি হইবে— তোমাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলেই দেশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল।

তোমাদের এই-সকল কথা বলিবার, তোমাদের অনুরোধ করিবার সুযোগ পাইব বলিয়া এই 'বালক' পত্র প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি— তোমাদের মঙ্গলই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য।

—পত্রিকাটির আষাঢ় সংখ্যায় 'শ্রীকেদার-দক্ষিণেশ্বর' স্বাক্ষরে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৩-১৯৪৯) 'লাঠালাঠি' প্রবন্ধ লিখিয়া বিতর্কের উপসংহার ঘটান।

২০. 'সত্য' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ ১ বৈশাখ ১২৯৩ তারিখ মধ্যাহ্নে সিটি কলেজ গৃহে পাঠ করিয়াছিলেন, যদিও তাহার পূর্বেই ইহা চৈত্র ১২৯২-সংখ্যা 'বালক' ও ২৯ চৈত্র ১২৯২-সংখ্যা 'সঞ্জীবনী'-তে মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহা বৈশাখ ১৮০৮ শক-সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' এবং ১৬ বৈশাখ ও ১ জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা 'তত্ত্বকৌমুদী'-তেও পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল।

২১. রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর-সংবলিত 'আপনি বড়ো' প্রবন্ধটি দুষ্প্রাপ্য 'কল্পনা' পত্রিকা হইতে উদ্ধার করিয়া প্রশান্তকুমার পাল ১৩৯৪ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-সংখ্যা 'দেশ'-এ পুনর্মুদ্রিত করেন, বর্তমান পাঠটি পত্রিকা হইতে সংকলিত হইয়াছে।

বর্তমান বিভাগের ২২-২৭ সংখ্যক রচনাগুলি 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক' নামাঙ্কিত রবীন্দ্রভবনের ২৭২-সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে লিখিত হইয়াছিল, এই পাণ্ডুলিপির পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। পুলিনবিহারী সেন ইহার অন্তর্গত অনেক রচনা ১৩৫২-১৩৫৪ বঙ্গাব্দের শারদীয়া দেশ পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রবীক্ষা ১ (শ্রাবণ ১৩৮৩) সংকলনে কানাই সামন্ত অবশিষ্ট রচনাগুলি প্রকাশ করেন।

২২. দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সহিত পূর্ববর্তী একটি আলোচনার সূত্র ধরিয়া 'হিন্দুদিগের জাতীয় চরিত্র ও স্বাধীনতা' নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ একটি বিতর্কমূলক বিষয়ের অবতারণা করিয়া বাঁধা নিয়মের প্রতি হিন্দুদিগের আনুগত্যের প্রকৃতি নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হন। এই রচনাটি ১৭ নভেম্বর ১৮৮৮ (৩ অগ্রহায়ণ ১২৯৫) তারিখে লেখা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১৭ ও ১৯ নভেম্বরের দুইটি প্রস্তাবে বক্তব্যের এই অংশ সম্পর্কে তাঁহার ভিন্নমত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই সমালোচনার প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বক্তব্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন 'আমাদের সভ্যতায় বাহ্যিক ও মানসিকের অসামঞ্জস্য'-শীর্ষক বর্তমান সংকলনের ২৪-সংখ্যক রচনায়।

২৩. 'স্ত্রী ও পুরুষের প্রেমের বিশেষত্ব' রচনাটি ১৯ নভেম্বর ১৮৮৮ (৫ অগ্রহায়ণ ১২৯৫) তারিখে রচিত। এইটি 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক'-এর ২৬-সংখ্যক প্রস্তাব— ইহা লইয়াই সর্বাধিক বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। শরৎকুমারী চৌধুরানী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিতর্কে যোগ দিয়াছিলেন। 'মায়ার খেলা' রচনার

শুরু (আশ্বিন ১২৯৪) হইতে 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের অনেকগুলি কবিতার মধ্য দিয়া 'রাজা ও রানী' (চৈত্র ১২৯৫) নাট্যকাব্য রচনা পর্যন্ত প্রায় দেড় বৎসর রবীন্দ্রনাথের মন নারী ও পুরুষের প্রেমের রহস্য উদ্‌ঘাটনে ব্যাপৃত ছিল, উল্লিখিত রচনাটি ও বর্তমান বিভাগে সংকলিত ২৫-২৭ সংখ্যক প্রস্তাবে এই বিষয়েরই বিভিন্ন দিক আলোচিত হইয়াছে। ইহাদের রচনাকাল ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হইল :

২৪. 'আমাদের সভ্যতায় বাহ্যিক ও মানসিকের অসামঞ্জস্য' রচনাটি ২০ নভেম্বর ১৮৮৮ (৬ অগ্রহায়ণ ১২৯৫) তারিখে লেখা। ২২-সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

২৫. 'সমাজে স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের প্রভাব', রচনা : ২৪ নভেম্বর ১৮৮৮ (১০ অগ্রহায়ণ ১২৯৫)।

২৬. 'আমাদের প্রাচীন কাব্যে ও সমাজে প্রেমের অভাব', রচনা : ২৬ নভেম্বর ১৮৮৮ (১২ অগ্রহায়ণ ১২৯৫)।

২৭. 'Chivalry', রচনা : ২৬ নভেম্বর ১৮৮৮ (১২ অগ্রহায়ণ ১২৯৫)। এই প্রস্তাবে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন : 'Browning এর *In a Balcony* নামক নাট্যকাব্যে রাজ্ঞী দুঃখ করিতেছেন যে, কেবলমাত্র রানী হইয়া স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণতা নাই সুখ নাই, যদি একজন সামান্যতম প্রজা সমস্ত রাজসম্মান উপেক্ষা করিয়া তাহাকে ভালোবাসে তাহা হইলে যেন তাঁহার স্ত্রী-প্রকৃতি কতকটা চরিতার্থ হয়।' 'রাজা ও রানী' নাটকের সুমিত্রার মধ্যে এই ভাবনার ছায়া লক্ষিত হয়।

২৮. 'নব্যবঙ্গের আন্দোলন' রচনাটি স্বাক্ষরহীন হইলেও বার্ষিক সূচীতে রবীন্দ্রনাথের নাম আছে। প্রবন্ধটিতে সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে লেখকের নৈরাশ্যব্যঞ্জক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হইয়াছে মনে করিয়া রবীন্দ্রনাথের রচনার দ্বাদশ অনুচ্ছেদের পাদটীকায় ভাং সং (ভারতী-সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী) লিখিয়াছেন,

> লেখক আমাদের এখনকার পলিটিক্যাল আন্দোলন যেরূপ অসার মনে করেন একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখিবেন তাহা নহে। এই আন্দোলনের মধ্যে— কাজ করিবার একটি ইচ্ছা জাতীয় মহত্ত্ব লাভের দিকে অগ্রসর হইবার একটি উদ্যম প্রকাশ পাইতেছে, তবে লেখক একদিনেই যদি আমাদের শত শত বৎসরের অবনতির বিনাশ দেখিতে চান তাহা কি করিয়া পাইবেন? লেখক বলিয়াছেন, 'আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই আছেন যাঁহারা আমাদের রাজ্যশাসনতন্ত্র এবং Representative Government-এর মূল নিয়ম এবং আমাদের দেশে বর্তমানকালে তাহার উপযোগিতা ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু অবগত আছেন অথবা প্রকৃত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া তদ্‌বিষয়ে কিছু জানিতে অভিলাষী আছেন।' অবশ্য দেশের অধিকাংশ লোক যদি যোগ্য হইত তাহা হইলে তো সমস্ত গোল চুকিয়া যাইত, এরূপ পলিটিক্যাল আন্দোলনেরই বা তাহা হইলে আবশ্যক কোথা? কিন্তু আমাদের দেশে কোন্ ছার কথা য়ুরোপের কোনো দেশেই কি অধিকাংশ লোকে রাজ্যশাসনতন্ত্রের মর্মগত নিয়ম বিচার করিয়া কাজ করে? এরূপ স্থলে সর্বত্রই নেতাগণ প্রধান, তাহাদের প্রাণগত চেষ্টা, মহত্ত্বই জাতীয় উন্নতির কারণ। আমাদিগের পলিটিক্যাল নেতাগণের সকলে না হউন যখন অনেকেই তাঁহাদের উদ্দেশ্যসাধনে প্রাণগত চেষ্টা করিতেছেন, তখন কি এই আন্দোলনকে আমরা সারশূন্য বলিতে পারি? চরিত্র-মাহাত্ম্য নহিলে কোনো উন্নতি হয় না সত্য, কিন্তু ইহার দিকে আমাদের যে লক্ষ পড়িয়াছে— তাহার উজ্জ্বল অনেক প্রমাণ দেখা যাইতেছে, তাহা ছাড়া লেখকের বর্তমান প্রবন্ধই তাহার একটি প্রমাণ।— ভাং সং।

ইতিহাস

এই বিভাগের অন্তর্গত রচনাগুলির সাময়িকপত্রে প্রকাশসূচী নিম্নে সংকলিত হইল—

১.	ঝান্‌সীর রানী	ভারতী, অগ্রহায়ণ ১২৮৪
২.	কাজের লোক কে	বালক, বৈশাখ ১২৯২
৩.	গুটিকত গল্প	বালক, বৈশাখ ১২৯২
৪.	আকবর শাহের উদারতা	বালক, আষাঢ় ১২৯২
৫.	ন্যায়ধর্ম	বালক, শ্রাবণ ১২৯২
৬.	বীর গুরু	বালক, শ্রাবণ ১২৯২
৭.	শিখ-স্বাধীনতা	বালক, আশ্বিন-কার্তিক ১২৯২
৮.	ভারতবর্ষের ইতিহাস : হেমলতা দেবী	ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫
৯.	মুর্শিদাবাদ কাহিনী : নিখিলনাথ রায়	ভারতী, শ্রাবণ ১৩০৫
১০.	ঐতিহাসিক চিত্র/সূচনা	ঐতিহাসিক চিত্র, জানুয়ারি ১৮৯৯

১. 'ঝান্‌সীর রাণী' রচনাটি 'ভ' স্বাক্ষরযুক্ত, তাঁহার 'ভানু' নামের আদ্যক্ষর— সুতরাং ইহার রচয়িতার পরিচয় লইয়া কোনো সংশয় নাই। ইহা ছাড়া এতাবৎ-প্রাপ্ত সর্বপ্রাচীন রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি 'মালতীপুঁথি'-তে 'ঝান্সী রাণী' শিরোনামে একটি গদ্যরচনা পাওয়া যায়, যাহার সহিত 'ভারতী'-তে প্রকাশিত প্রবন্ধটির মধ্যবর্তী অনেক অংশের বিষয় ও ভাষার সাদৃশ্য আছে। পাণ্ডুলিপিতে রচনাটির শেষাংশ পাওয়া যায় না। ইংরেজি কোনো ইতিহাসগ্রন্থ অবলম্বনে এই অসম্পূর্ণ রচনাটি লিখিত। রচনাশেষে লেখকের প্রতিশ্রুতি আছে, তাঁহার সংগৃহীত ইতিহাস ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবেন— তাহা রক্ষিত হয় নাই।

২, ৬, ৭. এই রচনাগুলি শিখ-ইতিহাস অবলম্বনে বালকদের উপযোগী করিয়া গল্পাকারে লিখিত। Joseph Davey Cunningham -লিখিত *History of the Sikhs from the Origin of the Nation to the Battles of the Sutlej* [1849] গ্রন্থটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কথা বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়।

'বীর গুরু' প্রবন্ধ অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ জীবনের বিভিন্ন সময়ে একাধিক কবিতা রচনা করেন। শিখগুরু গোবিন্দ সিংহের নির্লোভতার দৃষ্টান্তমূলক ঘটনাটিকে অবলম্বন করিয়া তিনি ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫ তারিখে 'নিষ্ফল উপহার' কবিতাটি লেখেন ও তাহা 'মানসী' (১২৯৭) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়, পরে এই কবিতারই একটি পরিবর্তিত রূপ 'কথা' (১৩০৬) কাব্যগ্রন্থে স্থান লাভ করিয়াছে। উক্ত প্রবন্ধের শেষাংশ অবলম্বনে তিনি লেখেন 'শেষ শিক্ষা' (রচনা : ৬ কার্তিক ১৩০৬) কবিতা।

অনুরূপভাবে 'শিখ-স্বাধীনতা' প্রবন্ধের দুইটি কাহিনী অবলম্বন করিয়া তিনি 'বন্দী বীর' (রচনা : ৩০ কার্তিক ১৩০৬) ও 'প্রার্থনাতীত দান' (রচনা : ২ কার্তিক ১৩০৬) কবিতা দুইটি রচনা করেন।

৩, ৪, ৫. এই রচনাগুলির বিষয় রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সূত্রে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সবগুলিই বালকদের উপযোগী করিয়া লিখিত। উল্লেখনীয় যে, 'গুটিকত গল্প'— এর শেষ গল্পটি অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'মানী' (রচনা : ১ কার্তিক ১৩০৬) কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন, দ্রষ্টব্য 'কথা', রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড : সুলভ চতুর্থ খণ্ড।

৮-৯. হেমলতা দেবী -রচিত 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' ও নিখিলনাথ রায় -কৃত 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' গ্রন্থ দুইটি সম্পর্কে আলোচনা 'গ্রন্থ সমালোচনা' হিসাবে ভারতী-তে মুদ্রিত হইয়াছিল, ইতিহাস-বিষয়ক বলিয়া বর্তমান রচনাবলীতে এই বিভাগের অন্তর্গত করা হইল। ইহারা স্বতন্ত্র 'ইতিহাস' (১৩৬২) গ্রন্থেরও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। এইরূপ আরও দুইটি গ্রন্থসমালোচনা

'সিরাজদ্দৌলা' ও 'মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস' 'ভারতী' পত্রিকায় স্বতন্ত্র মর্যাদায় মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়া 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়া রবীন্দ্র-রচনাবলী নবম খণ্ডে : সুলভ পঞ্চম খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

১০. 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের সম্পাদনায় যে ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন হইতেছিল, তাহার 'অনুষ্ঠান পত্র' অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'প্রসঙ্গ কথা' লিখিয়াছিলেন ভাদ্র ১৩০৫-সংখ্যা 'ভারতী'-তে। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়, বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী, ৫ জানুয়ারি ১৮৯৯ (২২ পৌষ ১৩০৫)। এই সংখ্যার জন্য রবীন্দ্রনাথ 'সূচনা'টি লিখিয়া দেন।

বিজ্ঞান

বিজ্ঞান-বিষয়ক রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি রচনা এই বিভাগে সংকলিত হইল। ইহাদের সাময়িকপত্রের প্রকাশ-সূচী নিম্নরূপ—

১. সামুদ্রিক জীব	ভারতী, বৈশাখ ১২৮৫
২. দেবতায় মনুষ্যত্ব আরোপ	ভারতী, বৈশাখ ১২৮৯
৩. বৈজ্ঞানিক সংবাদ	বালক, আশ্বিন-কার্তিক ১২৯২
৪. বৈজ্ঞানিক সংবাদ : গতি নির্ণয়ের ইন্দ্রিয়, ইচ্ছামৃত্যু, মাকড়সা-সমাজে স্ত্রীজাতির গৌরব, উটপক্ষীর লাথি	সাধনা, অগ্রহায়ণ ১২৯৮
৫ বৈজ্ঞানিক সংবাদ : জীবনের শক্তি, ভূতের গল্পের প্রামাণিকতা, মানবশরীর	সাধনা, পৌষ ১২৯৮
৬. রোগশত্রু ও দেহরক্ষক সৈন্য	সাধনা, পৌষ ১২৯৮
৭. সাময়িক সার সংগ্রহ : উদয়াস্তের চন্দ্রসূর্য	সাধনা, জ্যৈষ্ঠ ১৩০০
৮. সাময়িক সার সংগ্রহ : অভ্যাসজনিত পরিবর্তন	সাধনা আষাঢ় ১৩০০
৯. সাময়িক সার সংগ্রহ : ওলাওঠার বিস্তার, ঈশ্বর	সাধনা ভাদ্র ১৩০০
১০. ভূগর্ভস্থ জল এবং বায়ুপ্রবাহ	সাধনা, আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১

১. এই রচনাটি পত্রিকায় 'সামুদ্রিক জীব/প্রথম প্রস্তাব/কীটাণু' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। রচনাশেষে 'ভ' স্বাক্ষর দেখিয়া রচয়িতাকে চিনিয়া লওয়া যায়। 'প্রথম প্রস্তাব' এইরূপ উল্লেখ হইতে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে আরও লিখিবেন বলিয়া ভাবিয়াছিলেন— কিন্তু বিলাতযাত্রার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হইয়া পড়ার জন্য আর লেখা হয় নাই।

২. 'দেবতায় মনুষ্যত্ব আরোপ' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের লেখা বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। জীবনস্মৃতি-র পাণ্ডুলিপিতে তিনি লিখিয়াছিলেন, 'সদর স্ট্রীটে বাসের সঙ্গে আমার আর-একটা কথা মনে আসে। এই সময়ে বিজ্ঞান পড়িবার জন্য আমার অত্যন্ত একটা আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল। তখন হক্‌স্‌লির রচনা হইতে জীবতত্ত্ব ও লক্‌ইয়ার, নিউকোম্ব প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে জ্যোতির্বিদ্যা নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিতাম। জীবতত্ত্ব ও জ্যোতিষ্কতত্ত্ব আমার কাছে অত্যন্ত উপাদেয় বোধ হইত।' বর্তমান প্রবন্ধটি সম্ভবত এই পাঠচর্চার ফল। তিনি হার্বার্ট স্পেনসরের রচনাবলীর অনুরাগী পাঠক ছিলেন, বর্তমান রচনাটি তাঁহার 'The Use of Anthropomorphism' প্রবন্ধ অবলম্বনে লেখা— শতপথ ব্রাহ্মণ, ভাগবত পুরাণ, গ্রীক

পুরাণ, টমাস হেনরি হাক্সলির 'The Genealogy of Animals' প্রবন্ধ প্রভৃতি হইতে উদ্‌ধৃতি দিয়া ইহাতে স্পেনসরের বক্তব্যের বিরোধিতা করা হইয়াছে। প্রবন্ধের শেষে স্পেনসরের *Data of Ethics* গ্রন্থের উল্লেখ করা হইয়াছে, ইংলন্ড হইতে ফিরিবার পথে রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থটি পড়িয়াছিলেন।

৩. 'বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বৈজ্ঞানিক সংবাদ'-এ রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত বিভিন্ন বিদেশী পত্রিকা হইতে বারোটি কৌতূহলোদ্দীপক বৈজ্ঞানিক তথ্য সংকলন করিয়া দিয়াছেন। এই পত্রিকায় বিভাগটির পুনরাবৃত্তি হয় নাই।

৪-৫. 'সাধনা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই বিভিন্ন বিদেশী পত্রিকা অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ 'বৈজ্ঞানিক সংবাদ' বিভাগটি শুরু করেন, কিন্তু পরবর্তী পৌষ সংখ্যা ছাড়া এই বিভাগের নাম দিয়া আর কোনো রচনা মুদ্রিত হয় নাই। 'মানবশরীর' রচনায় 'প্রাণ ও প্রাণী' নামক যে প্রবন্ধের উল্লেখ আছে, তাহা সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লিখিত।

৬, ১০. 'রোগশত্রু ও দেহরক্ষক সৈনা', 'ভূগর্ভস্থ জল এবং বায়ুপ্রবাহ' প্রবন্ধ দুইটি প্রকৃতপক্ষে 'বৈজ্ঞানিক সংবাদ' বিভাগেরই রচনা, আকার দীর্ঘ হওয়ার জন্য স্বতন্ত্র প্রবন্ধরূপে মুদ্রিত হইয়াছে।

৭-৯. এই রচনাগুলি 'সাময়িক সার সংগ্রহ'-এর অন্তর্ভুক্ত হইলেও বিজ্ঞান-বিষয়ক বলিয়া বর্তমান বিভাগে লওয়া হইয়াছে।

বিবিধ

বিভিন্ন বিষয়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের রচনাগুলি এই বিভাগে সংকলিত হইল। সাময়িক পত্রে ইহাদের প্রকাশের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

১. সান্ত্বনা	ভারতী, চৈত্র ১২৮৪
২. নিঃস্বার্থ প্রেম	ভারতী, কার্তিক ১২৮৭
৩. যথার্থ দোসর	ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮
৪. গোলাম-চোর	ভারতী, আষাঢ় ১২৮৮
৫. চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়	ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৮
৬. দরোয়ান	ভারতী, ভাদ্র ১২৮৮
৭. জীবন ও বর্ণমালা	ভারতী, আশ্বিন-কার্তিক ১২৮৮
৮. রেল গাড়ি	ভারতী, অগ্রহায়ণ ১২৮৮
৯. লেখা কুমারী ও ছাপা সুন্দরী	ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৯০
১০. গোঁফ এবং ডিম	ভারতী, আষাঢ় ১২৯০
১১. সত্যং শিবং সুন্দরম্‌	ভারতী, আষাঢ় ১২৯১
১২. ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী	নবজীবন, শ্রাবণ ১২৯১
১৩. পুষ্পাঞ্জলি	ভারতী, বৈশাখ ১২৯২
১৪. বিবিধ প্রসঙ্গ ১	ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৯২
১৫. বিবিধ প্রসঙ্গ ২	ভারতী, ভাদ্র ১২৯২
১৬. বর্ষার চিঠি	বালক, শ্রাবণ ১২৯২
১৭. বরফ পড়া	বালক, আশ্বিন-কার্তিক ১২৯২
১৮. শিউলিফুলের গাছ	বালক, পৌষ ১২৯২
১৯. বানরের শ্রেষ্ঠত্ব	বালক, চৈত্র ১২৯২
২০. কার্যাধ্যক্ষের নিবেদন	বালক, চৈত্র ১২৯২

২১. সৌন্দর্য ও বল	দেশ, শারদীয় ১৩৫৩, রচনা : ১২৯৫
২২. আবশ্যকের মধ্যে অধীনতার ভাব	দেশ, শারদীয় ১৩৫৩, রচনা : ১২৯৫
২৩. শরৎকাল	মানসী, আশ্বিন ১৩২০, রচনা : ১২৯৬
২৪. ছেলেবেলাকার শরৎকাল	দেশ, শারদীয় ১৩৫৪, রচনা : ১২৯৬
২৫. ইন্দুর রহস্য	রবীন্দ্রবীক্ষা ১, শ্রাবণ ১৩৮৩, রচনা : ১২৯৬
২৬. কাজ ও খেলা	দেশ, শারদীয় ১৩৫২, রচনা : ১২৯৬
২৭. [ঘানির বলদ]	রবীন্দ্রবীক্ষা ১, শ্রাবণ ১৩৮৩, রচনা : ১২৯৭
২৮. [জীবনের বুদ্‌বুদ]	রবীন্দ্রবীক্ষা ১, শ্রাবণ ১৩৮৩, রচনা : ১২৯৭
২৯. বাগান	সাধনা, অগ্রহায়ণ ১২৯৮
৩০. ঠাকুরঘর	সাধনা, শ্রাবণ ১২৯৯
৩১. নিষ্ফল চেষ্টা	ভারতী ও বালক, আশ্বিন ১২৯৯
৩২. সফলতার দৃষ্টান্ত	ভারতী ও বালক, আশ্বিন ১২৯৯
৩৩. [লেখক-জন্ম]	পকেট বুক, রচনা : ? ফাল্গুন ১২৯৯
৩৪. সম্পাদকের বিদায় গ্রহণ	ভারতী, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩০৫

১. 'সান্ত্বনা' রচনাটি 'ভ'-স্বাক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে, উহা রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়া ইহাকে চিনিতে সাহায্য করে। এইরূপ হৃদয়ভাব-মূলক রচনা রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে আরও দুই-একটি লিখিয়া থাকিতে পারেন— যেমন ভারতী-র ফাল্গুন ১২৮৪-সংখ্যায় মুদ্রিত 'বিজন চিন্তা : কল্পনা' রচনাটি— কিন্তু ইহার নিম্নে 'বিধবা' স্বাক্ষর থাকাতে রচয়িতার পরিচয় নির্দিষ্ট করা কঠিন।

২. 'নিঃস্বার্থ প্রেম' শীর্ষক চলিত ভাষায় 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র'-এর ঢঙে লেখা পত্র-প্রবন্ধটি কাহারো দৃষ্টি আকর্ষণ না করিলেও ইহাকে রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়া মনে করিবার অনেক কারণ আছে। রচনাটির মধ্যে 'ভা-' অর্থাৎ 'ভানু' শব্দটির আদ্যক্ষরের ব্যবহার এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে।

৩-৮. ভারতী-র প্রথম বর্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী একধরনের আত্মভাবনামূলক প্রবন্ধ রচনার সূচনা করিয়াছিলেন— 'যথার্থ দোসর', 'গোলাম-চোর', 'চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়', 'দরোয়ান', 'জীবন ও বর্ণমালা', এবং 'রেল গাড়ি' এই শ্রেণীরই রচনা— পরিণত রবীন্দ্রনাথের গদ্যভাষায় তাহা আরও বিচিত্র রূপ গ্রহণ করিয়াছে। ইহাদের তিনি কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই বটে, কিন্তু অন্তত 'চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়' এবং 'জীবন ও বর্ণমালা' রচনা দুইটিকে তিনি যে গ্রন্থভুক্ত করার কথা ভাবিয়াছিলেন, রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত 'ভারতী'-র একটি খণ্ডে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে— কিছু-কিছু অংশ তিনি বর্জন-চিহ্নাঙ্কিত করিয়াছিলেন। এখানে পত্রিকার সম্পূর্ণ পাঠই গৃহীত হইয়াছে।

৯. 'লেখা কুমারী ও ছাপা সুন্দরী' রচনাটি 'প্রভাতসংগীত' কাব্য প্রকাশের সহিত সম্পর্কান্বিত। কাব্যটি প্রকাশিত হয়, বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকানুযায়ী, ১১ মে ১৮৮৩ (২৯ বৈশাখ ১২৯০) তারিখে।

১০. 'গোঁফ এবং ডিম' লঘুস্বাদের এই রচনাটি 'রবীন্দ্রজীবনী'-কার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ছাড়া আর কেহ রবীন্দ্র-রচনা বলিয়া দাবি না করিলেও ভাষা ও অলস কল্পনার স্বচ্ছন্দ বিস্তার দেখিয়া ইহাকে সহজেই রবীন্দ্র-রচনা বলিয়া চিনিয়া লওয়া যায়।

১১. 'সত্যং শিবং সুন্দরম্' 'বিবিধ প্রসঙ্গ'-জাতীয় রচনা 'সৌন্দর্য ও প্রেম'-এর অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ, 'আলোচনা' (১২৯২) গ্রন্থে সংকলিত হয় নাই।

১২. 'ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী' 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'-রচয়িতার কাল্পনিক জীবনকথা। উক্ত গ্রন্থটির প্রকাশ (১ জুলাই ১৮৮৪) উপলক্ষে ইহা লিখিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

দেশীয় ও বিদেশী বহু ঐতিহাসিক ইতিহাসের সন ও তারিখ লইয়া সমকালে যে বিচিত্র গবেষণা প্রকাশ করিতেছিলেন, ইহার মধ্যে তাঁহাদের ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। ইতিপূর্বে পুলিনবিহারী সেন -সংকলিত 'রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী' প্রথম খণ্ড (১৩৮০) এবং শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় -সম্পাদিত 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণ (১৩৬৭) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

১৩. 'পুষ্পাঞ্জলি' কাদম্বরী দেবীর শোচনীয় আত্মহননের (বৈশাখ ১২৯১) পটভূমিকায় লেখা। ইহা বৈশাখ ১২৯২-সংখ্যা 'ভারতী'-তে প্রকাশিত হইলেও ইহার রচনাকাল অন্তত ভাদ্র ১২৯১-এর পূর্ববর্তী, কারণ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত 'পুষ্পাঞ্জলি'-র পাণ্ডুলিপির (অভিজ্ঞান সংখ্যা ৮৫) অন্তর্গত 'তোরা বসে গাঁথিস্ মালা' গানটি 'হায়' শিরোনামে 'ভারতী'-র ভাদ্র ১২৯১-সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল। রচনাটি সম্ভবত একটানা লেখা নয়, ডায়ারির মতো এক-এক দিনে একটি বা দুইটি করিয়া অনুচ্ছেদ, কবিতা বা গান লিখিত হইয়াছে— সবগুলিই কাদম্বরী দেবীর স্মৃতি-সুরভিত। রচনাটি রবীন্দ্র-রচনাবলী সপ্তদশ খণ্ডে : সুলভ নবম খণ্ডে 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের 'গ্রন্থপরিচয়' অংশে মুদ্রিত হইয়াছিল, বর্তমান খণ্ডে স্বতন্ত্র রচনার মূল্য দিয়া প্রকাশিত হইল।

১৪-১৫. ১২৯০ বঙ্গাব্দে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছিল বলিয়া সম্ভবত একই জাতীয় বর্তমান রচনাগুলি কোনো গ্রন্থভুক্ত হয় নাই।

১৬. যৌবনে যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধুশ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১-১৯৪০) ১৮৮৪ সালে *Phoenix* পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব লইয়া করাচি-প্রবাসী হন। 'বর্ষার চিঠি' এই পত্রাকার প্রবন্ধটি তাঁহারই উদ্দেশে রচিত। কৌতুক, বাল্যস্মৃতির রোমন্থন, কবিত্বময় কল্পনার সংমিশ্রণে উপভোগ্য এই রচনাটির স্মৃতিচারণের অংশটি 'জীবনস্মৃতি'-র কোনো কোনো বর্ণনাকে মনে করাইয়া দেয়।

১৭. ১৮৭৮ সালে ইংলন্ডে অবস্থানকালে তুষারপাতের দৃশ্য দেখার রোমাঞ্চকর প্রথম অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথ 'বরফ পড়া' রচনাটিতে বালকদের চিত্তাকর্ষক করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

১৮. 'শিউলিফুলের গাছ' অলস কবিকল্পনায় পূর্ণ একটি গদ্য রচনা।

১৯. 'বানরের শ্রেষ্ঠত্ব' একটি ব্যঙ্গরচনা, তৎকালে একশ্রেণীর বাঙালি বুদ্ধিজীবী আর্যত্বের মহিমা লইয়া যে অলীক গর্ব প্রকাশ করিতেন তাহাকেই এই রচনায় তীব্র কশাঘাত করা হইয়াছে।

২০. জ্ঞানদানন্দিনী দেবী রবীন্দ্রনাথকে কার্যাধ্যক্ষ করিয়া বালক-বালিকাদের জন্য 'বালক' পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম সম্পাদিকা বলিয়া ঘোষিত হইলেও রবীন্দ্রনাথই ছিলেন প্রকৃত সম্পাদক। এক বৎসর এই কাজ করিয়া তিনি উক্ত দায়িত্ব ত্যাগ করেন। 'কার্যাধ্যক্ষের নিবেদন' রচনাটি তাহারই কৈফিয়ত।

বর্তমান বিভাগের ২১-৩২ সংখ্যক রচনাগুলি 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক' নামাঙ্কিত রবীন্দ্রভবনের ২৭২-সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে লিখিত হইয়াছিল, এই পাণ্ডুলিপির পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। ইহার অন্তর্গত বিচিত্র-বিষয়ক রচনাগুলি এখানে সংকলিত হইয়াছে। ইহাদের রচনাকাল ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হইল—

২১. 'সৌন্দর্য ও বল', রচনা : ২১ নভেম্বর ১৮৮৮ (৭ অগ্রহায়ণ ১২৯৫)।

২২. 'আবশ্যকের মধ্যে অধীনতার ভাব', রচনা : ২১ নভেম্বর ১৮৮৮ (৭ অগ্রহায়ণ ১২৯৫)।

২৩. 'সপ্তমীপূজা। ১৮৮৯' (১ অক্টোবর : ১৬ আশ্বিন ১২৯৬)-র দিন 'শরৎকাল'-শীর্ষক একটি প্রস্তাবে রবীন্দ্রনাথ শরৎপ্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার পূর্বস্মৃতি বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার মূল ভাবনাটি অবলম্বন করিয়া তিনি পঞ্চভূত গ্রন্থের 'গদ্য ও পদ্য' প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদটি রচনা করেন (সাধনা, ফাল্গুন ১২৯৯)। পরে মূল রচনাটির ঈষৎ সংস্কার করিয়া

তিনি 'মানসী' পত্রিকার আশ্বিন ১৩২০-সংখ্যায় প্রকাশ করেন।

২৪. ৭ ও ৮ অক্টোবর ১৮৮৯ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ছেলেবেলাকার কথা' নামক দুইটি প্রস্তাব লেখেন। এই রচনা দুইটির প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ ১০ অক্টোবর (২৫ আশ্বিন ১২৯৬) 'ছেলেবেলাকার শরৎকাল' প্রস্তাবটি রচনা করেন।

২৫. 'ইন্দুর-রহস্য' রচনা : ১৬ অক্টোবর ১৮৮৯ (১ কার্তিক ১২৯৬)। এই রচনাটি সামান্য পরিবর্তিত আকারে 'সাধনা'-র ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বৈজ্ঞানিক কৌতূহল' প্রবন্ধের শেষাংশে সমীরের উক্তি হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, দ্রষ্টব্য 'পঞ্চভূত', রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড : সুলভ প্রথম খণ্ড।

২৬. 'কাজ ও খেলা' এবং 'খেলার কি কোন কার্যকারিতা নাই' নামে দুইটি প্রসঙ্গের অবতারণা করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যথাক্রমে ৮ ও ৯ অক্টোবর ১৮৮৯ তারিখে। তাঁহার বক্তব্যকে সম্প্রসারিত করিয়া 'কাজ ও খেলা' প্রস্তাবটি রবীন্দ্রনাথ লেখেন ১৭ অক্টোবর ১৮৮৯ (২ কার্তিক ১২৯৬)।

২৭-২৮. এই দুইটি রচনা ৬ এপ্রিল ১৮৯১ (২৪ চৈত্র ১২৯৭) তারিখে রচিত হয়। রচনার অভ্যন্তর হইতে শব্দগুচ্ছ সংগ্রহ করিয়া ইহাদের শিরোনাম দেওয়া হইয়াছে।

২৯-৩০. 'বাগান' ও 'ঠাকুরঘর' রচনা দুইটি সম্ভবত পত্রিকার শূন্যস্থান পূর্ণ করিবার জন্য লিখিত।

৩১-৩২. 'নিষ্ফল চেষ্টা' ও 'সফলতার দৃষ্টান্ত' হাস্যরসাত্মক এই দুইটি রচনায় রবীন্দ্রনাথ সমকালীন বাংলা গল্প ও গদ্যরচনারীতি লইয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন। একই সময়ে লিখিত ও 'সাধনা'-র ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯ সংখ্যায় প্রকাশিত 'রীতিমত নভেল' গল্পটিও একই বিষয়কে অবলম্বন করিয়াছে।

৩৩. 'লেখক-জন্ম' রচনাটি রবীন্দ্রসাহিত্যের ইতিহাসে বহুলপরিচিত 'পকেটবুক' বা 'মজুমদারপুঁথি' নামক পাণ্ডুলিপি (রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত ফোটোকপির নির্দেশক সংখ্যা ৪২৬) হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। শিরোনাম সম্পাদকমণ্ডলির দেওয়া। রচনাটিতে তারিখ নাই, আগে-পরে লিখিত পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাগুলির বিচারে আনুমানিক রচনাকাল ফাল্গুন ১২৯৯ নির্ধারণ করা হইয়াছে।

৩৪. রবীন্দ্রনাথ ১৩০৫ বঙ্গাব্দে এক বৎসরের জন্য 'ভারতী' সম্পাদনা করিয়া এই দায়িত্ব ত্যাগ করেন। 'সম্পাদকের বিদায় গ্রহণ' রচনাটিতে তাঁহার কৈফিয়ত প্রদত্ত হইয়াছে।

গ্রন্থসমালোচনা

ইংল্যান্ড হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আসিবার পর (১২৮৬।১৮৮০) রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদনাকর্মের সহিত ঘনিষ্ঠতরভাবে যুক্ত হন। এই সূত্রেই তিনি পত্রিকা-দপ্তরে সমালোচনার জন্য প্রেরিত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত আলোচনা লিখিতে আরম্ভ করেন।

রাবণ-বধ দৃশ্য কাব্য, অভিমন্যু-বধ দৃশ্য কাব্য, অভিমন্যু সম্ভব কাব্য, *The Indian Homœpathic Review*।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, ভারতী, মাঘ ১২৮৮

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত 'রাবণ-বধ দৃশ্য কাব্য' ও 'অভিমন্যু-বধ দৃশ্য কাব্য' এই দুটি গ্রন্থের সমালোচনায় পূর্বে 'ভারতী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধকাব্য' সম্বন্ধে যে-সমস্ত অভিযোগ সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছিলেন, এখানে সংক্ষেপে সেই প্রসঙ্গগুলি পুনরালোচিত। এখানে গিরিশচন্দ্রের নাট্যসংলাপের ছন্দ সম্পর্কে যে বিচার, তাহার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা লক্ষণীয়।

বর্তমান সংখ্যায় অপর দুটি সমালোচিত গ্রন্থ—

প্রসাদদাস গোস্বামী, 'অভিমন্যু সম্ভব কাব্য', B. L. Bhaduri -সম্পাদিত মাসিক পত্র *The Indian Homœopathic Review*।

আনন্দ রহো। ঐতিহাসিক উপন্যাস : গিরিশচন্দ্র ঘোষ
সীতার বনবাস। দৃশ্যকাব্য : গিরিশচন্দ্র ঘোষ
লক্ষ্মণবর্জন। দৃশ্যকাব্য : গিরিশচন্দ্র ঘোষ
মুক্তি ও সাধন সম্বন্ধে হিন্দু-শাস্ত্রের উপদেশ : বিপিনবিহারী ঘোষাল
কুসুম-কানন। প্রথম ভাগ : শ্রী কায়কোবাদ
সরলা : যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
প্রায়শ্চিত্ত : হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
আদর (প্রিয়তমার প্রতি) : কল্পনাকান্ত গুহ
উর্মিলা-কাব্য : দেবেন্দ্রনাথ সেন
নির্ঝরিণী (গীতিকাব্য), প্রথম খণ্ড : দেবেন্দ্রনাথ সেন
রাজ-উদাসীন। প্রথম স্তবক : শাক্য সিংহ ও রামমোহন রায়।
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, ভারতী, ফাল্গুন ১২৮৮

সমালোচিত এই গ্রন্থগুলির মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ সেন -রচিত 'উর্মিলা-কাব্য' ও 'নির্ঝরিণী'র আলোচনাসূত্রেই অনুমান করা যাইতে পারে, রবীন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথ সেনের মধ্যে পত্রালাপের সূচনা হয়। 'ভারতী' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ সংখ্যায় দেবেন্দ্রনাথ সেন তাঁহার 'স্মৃতি' রচনায় লিখিয়াছেন, "রবিবাবু আমার ফুলবালা কাব্য ও উর্মিলা কাব্যের পক্ষপাতী ছিলেন ও আমার 'নির্ঝরিণী' কাব্যের 'আঁখির মিলন' কবিতা তাঁহার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল।..."

জন্ স্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত : যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ
ইতালীর ইতিবৃত্ত সম্বলিত ম্যাট্‌সিনির জীবনবৃত্ত : যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ
হৃদয়োচ্ছ্বাস, বা ভারতবিষয়ক প্রবন্ধাবলি : যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ
স্যামুয়েল হানিমানের জীবনবৃত্ত : মহেন্দ্রনাথ রায়
যেমন রোগ তেমনি রোজা। প্রহসন : রাজকৃষ্ণ দত্ত
গার্হস্থ্য চিকিৎসা বিদ্যা : অম্বিকাচরণ রক্ষিত কর্তৃক সংকলিত
শার্ঙ্গধর : অম্বিকাচরণ রক্ষিত কর্তৃক অনুবাদিত
যাবনিক পরাক্রম। উপন্যাস : নীলরত্ন রায়চৌধুরী
স্বপন-সঙ্গীত। গীতিকাব্য : নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
উষাহরণ বা অপূর্ব-মিলন। গীতিনাট্য : রাধানাথ মিত্র
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, ভারতী, বৈশাখ ১২৮৯

'হৃদয়োচ্ছ্বাস, বা ভারতবিষয়ক প্রবন্ধাবলি'র বক্তব্যের সহিত তুলনীয়, ভারতী, চৈত্র ১২৮৭ সংখ্যায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'পারিবারিক দাসত্ব' প্রবন্ধের বক্তব্য।

'ভারতী' ফাল্গুন ১২৮৮ সংখ্যায় প্রকাশিত 'সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'উর্মিলা-কাব্য', 'নির্ঝরিণী'র সূত্রে উভয়ের মধ্যে যোগ স্থাপনের সম্ভাবনা যেমন অনুমিত হয়, অনুরূপভাবে বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তর 'স্বপন-সঙ্গীত' সমালোচনা সূত্রেই, অনুমান করা যাইতে পারে, রবীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথের মধ্যে যোগ স্থাপিত হইয়াছিল।

বনবালা। ঐতিহাসিক উপন্যাস : রাধানাথ মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত
হরবিলাপ : রাধানাথ মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত
কমলে কামিনী বা কুলেশ্বরী : রাধানাথ মিত্র প্রণীত ও প্রকাশিত

কল্পনা-কুসুম : কামিনীসুন্দরী দেবী
কবিতাবলী। প্রথম ভাগ : রামনারায়ণ অগস্তি
কুসুমারিন্দম : ইন্দ্রনারায়ণ পাল
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, ভারতী, ভাদ্র ১২৮৯

সমালোচক কাব্য : জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ
তৃণপুঞ্জ : জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ
শান্তি-কুসুম : বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
সুরসভা : নগেন্দ্রনাথ ঘোষ
কৈলাস-কুসুম, মণিমন্দির, পার্থ প্রসাদন, প্রমীলার পুরী
ষড়ঋতু বর্ণন কাব্য : আশুতোষ ঘোষ
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা : ভারতী, চৈত্র ১২৮৯

সিন্ধু-দূত : নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
রামধনু : সূর্যনারায়ণ ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত
ঝংকার। গীতিকাব্য : সুরেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত
উচ্ছ্বাস : বিপিনবিহারী মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, ভারতী, শ্রাবণ ১২৯০

'সিন্ধু-দূত' প্রণেতা নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' কাব্য ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকার কার্তিক ১২৮৩ সংখ্যায় সমালোচনা করেন; বস্তুত ইহাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম গ্রন্থসমালোচনা।

বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী, একবিংশ খণ্ডের (প্রকাশ ১৩৫৩) : সুলভ একাদশ খণ্ডের পরিশিষ্ট অংশে 'বাংলাভাষার স্বাভাবিক ছন্দ' শিরোনামে, শেষ অনুচ্ছেদটি বাদ দিয়া প্রকাশিত; বর্তমান রচনাবলীতে পূর্ণপাঠ গৃহীত।

সংগীত সংগ্রহ (বাউলের গাঁথা[গাথা]) দ্বিতীয় খণ্ড
স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক আপত্তি খণ্ডন : শ্রীমতী গুণময়ী
ভাষাশিক্ষা
সমালোচনা, ভারতী, ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯১

সংগীত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড সমালোচনাকালে গ্রন্থের মধ্যে আধুনিক শিক্ষিত লোকের রচিত কতকগুলি সংগীত দেখিয়া আমরা ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলাম।..."

রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড : সুলভ পঞ্চদশ খণ্ড-ভুক্ত 'বাউলের গান' বর্তমান প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

লালা গোলোকচাঁদ। পারিবারিক নাটক : সুরেশচন্দ্র বসু
দেহাত্মিক তত্ত্ব : ডাক্তার সাহা প্রণীত
প্রাপ্ত গ্রন্থ, সাধনা, ফাল্গুন ১২৯৮

সংগ্রহ : নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
লীলা : নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
রায় মহাশয় : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রবাসের পত্র : নবীনচন্দ্র সেন
অপরিচিতের পত্র : জ্ঞ-রি
প্রকৃতির শিক্ষা

দ্বারকানাথ মিত্রের জীবনী : কালীপ্রসন্ন দত্ত

সমালোচনা, সাধনা, অগ্রহায়ণ ১২৯৯

'রায় মহাশয়' উপন্যাস বিষয়ে সাধনা, মাঘ ১২৯৮ সংখ্যায় প্রকাশিত 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা'য় রবীন্দ্রনাথ পূর্বেই সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। 'সাহিত্য' পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১২৯৮ সংখ্যা হইতে 'রায় মহাশয়' উপন্যাসটি মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়। পৌষ ১২৯৮ সংখ্যা 'সাহিত্য' পত্রিকা সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাস সম্পর্কে সংক্ষেপে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। দ্রষ্টব্য, বর্তমান রচনাবলীর 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা' সংকলন অংশ।

অশোকচরিত : কৃষ্ণবিহারী সেন

পঞ্চামৃত : তারাকুমার কবিরত্ন

সমালোচনা : সাধনা, পৌষ ১২৯৯

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে, 'অশোকচরিত' রচয়িতা কৃষ্ণবিহারী সেন, কেশবচন্দ্র সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং রবীন্দ্রনাথের বন্ধুস্থানীয়। তাঁহার অকালমৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথের শোকজ্ঞাপক প্রবন্ধ "কৃষ্ণবিহারী সেন" 'সাধনা', আষাঢ় ১৩০২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

কঙ্কাবতী

সমালোচনা, সাধনা, ফাল্গুন ১২৯৯

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় -রচিত 'কঙ্কাবতী' উপন্যাসের সমালোচনা।

স্বাক্ষরহীন। বিজনবিহারী ভট্টাচার্য -সম্পাদিত 'কঙ্কাবতী' গ্রন্থে (প্রকাশ ১৩৬৭) এই রবীন্দ্র-রচনা ভূমিকারূপে সংকলিত।

ভক্তচরিতামৃত : অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়

রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবনচরিত : অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়

চরিত রত্নাবলী। প্রথম ভাগ : কালীচন্দ্র ঘোষাল

অর্থই অনর্থ। দারোগার দপ্তর : প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়

ঠগী কাহিনী : প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড : প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থ সমালোচনা, সাধনা, অগ্রহায়ণ ১৩০১

উপনিষদঃ : সীতানাথ দত্ত কৃত বঙ্গানুবাদ

সমালোচনা, সাধনা, পৌষ ১৩০১

এ-পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যানুসারে ইহা উপনিষদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচনা।

হাসি ও খেলা : যোগীন্দ্রনাথ সরকার

সাধন সপ্তকম্

নীতিশতক বা সরল পদ্যানুবাদসহ চাণক্যশ্লোক : অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত

সমালোচনা, সাধনা, মাঘ ১৩০১

'হাসি ও খেলা' প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, যোগীন্দ্রনাথ সরকার -সম্পাদিত 'গল্পসঞ্চয়' সংকলনের পরিচিতিতে রবীন্দ্রনাথ ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬ অনুরূপ প্রশংসা করেন।

দেওয়ান গোবিন্দরাম বা দুর্গোৎসব : যোগেন্দ্রনাথ সাধু -কর্তৃক প্রকাশিত

মনোরমা : কুমারকৃষ্ণ মিত্র

গ্রন্থ সমালোচনা : সাধনা, ফাল্গুন ১৩০১

'ছিন্নপত্রাবলী' গ্রন্থের ১৯০ সংখ্যক পত্রে রবীন্দ্রনাথ এই সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "...সাধনার জন্যে 'সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' এখনো বাকি আছে। দু খানা অপাঠ্য বই পড়ে তার উপরে অপ্রিয় কথা লিখতে হবে। নিতান্ত বাজে কাজ— এরকম কাজ এমন দিনে করা অন্যায়। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস-বশত ফাল্গুনের এই প্রশান্ত মধ্যাহ্নে এই নির্জন অবসরে এই নিস্তরঙ্গ

পদ্মার উপরে এই নিভৃত বোটের মধ্যে ব'সে সম্মুখে সোনার রৌদ্র সুনীল আকাশ এবং ধূসর বালুর চর নিয়ে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাধু-কর্তৃক প্রকাশিত দেওয়ান গোবিন্দরামের সমালোচনা করতে প্রবৃত্ত হতে হচ্ছে। সে বইও কেউ পড়বে না, সে সমালোচনাও কেউ পড়বে না, মাঝের থেকে আজকের এই দুর্লভ দিনটা নষ্ট হবে।"

নূর জাহান : বিপিনবিহারী ঘোষ

শুভ পরিণয়ে

গ্রন্থ সমালোচনা, সাধনা, চৈত্র ১৩০১

রঘুবংশ, দ্বিতীয় ভাগ : নবীনচন্দ্র দাস কর্তৃক অনুবাদিত

ফুলের তোড়া : অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

নীহার-বিন্দু : নিতাইসুন্দর সরকার

গ্রন্থ সমালোচনা, সাধনা, বৈশাখ ১৩০২

নির্ঝরিণী : শ্রীমতী মৃণালিনী (ঘোষ/সিংহ)

গ্রন্থ সমালোচনা, সাধনা, জ্যৈষ্ঠ ১৩০২

বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম : হারাণচন্দ্র রক্ষিত

গ্রন্থ সমালোচনা : সাধনা, আষাঢ় ১৩০২

১৮৯৪ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসে, চৈতন্য লাইব্রেরি ও বিডন স্কোয়ার লিটারেরি ক্লাব -আয়োজিত 'বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান' বিষয়ে রচনা-প্রতিযোগিতায় অন্যতম বিচারক রবীন্দ্রনাথ হারাণচন্দ্রের এই প্রবন্ধটিকে প্রাপ্ত রচনাসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া স্বর্ণপদক দান অনুমোদন করিলেও 'সাধনা'র পৃষ্ঠায় প্রবন্ধটির বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি তাঁহার সম্পাদিত 'অনুশীলন ও পুরোহিত' পত্রিকার শ্রাবণ ১৩০২ সংখ্যায় এই বিরূপ সমালোচনা করার জন্য কটাক্ষ করেন।

কবি বিদ্যাপতি ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবিবৃন্দের জীবনী : ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য

প্রসঙ্গমালা : হরনাথ বসু

মনোহর পাঠ : হরনাথ বসু

ন্যায়দর্শন : যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীর সহায়তায় কালীপ্রসন্ন ভাদুড়ি-কর্তৃক প্রকাশিত

কাতন্ত্র ব্যাকরণম্ : শ্রীনাথরাম শাস্ত্রী ও হীরাচন্দ্র নেমিচন্দ্র শ্রেষ্ঠী-সম্পাদিত।

গ্রন্থ সমালোচনা, সাধনা, ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২

সাহিত্যচিন্তা : পূর্ণচন্দ্র বসু

বামাসুন্দরী বা আদর্শ নারী : চন্দ্রকান্ত সেন

শুশ্রূষা। প্রথম ভাগ : শ্যামাচরণ দে

বাসনা : বিনোদিনী দাসী

পুষ্পাঞ্জলি : রসময় লাহা

গ্রন্থ সমালোচনা, ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫

চিন্তালহরী : চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ

ভূমিকম্প : বিপিনবিহারী ঘটক

গ্রন্থ সমালোচনা, ভারতী, শ্রাবণ ১৩০৫

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। সমন্বয় ভাষ্য, সংস্কৃতের অনুবাদ। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড : গৌরগোবিন্দ রায়

গ্রন্থ সমালোচনা, ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩০৫

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা

অগ্রহায়ণ ১২৯৮ বঙ্গাব্দ হইতে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদকতায় 'সাধনা' পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকিলেও রবীন্দ্রনাথ প্রথমাবধি এই পত্রিকার সম্পাদনাকর্মের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ইহারই সূত্রে তিনি 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা' নামে একটি নূতন বিভাগের প্রবর্তন করেন, যাহা বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে একটি অভিনব সংযোজন। এই বিভাগে সমকালীন বিভিন্ন পত্রিকার উল্লেখনীয় রচনাগুলি সম্পর্কে তিনি অম্লমধুর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করিয়া বঙ্গীয় পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের এই আদর্শ অনুসরণ করিয়া কিছুকালের মধ্যেই কয়েকটি সাময়িক পত্রিকায় এই বিভাগটির প্রবর্তন হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সম্পাদিত অন্যান্য পত্রিকাতেও পরবর্তীকালে এই বিভাগটির অনুবর্তন করিয়াছেন, দেখা যায়।

ভারতী [ও বালক], ১৫শ ভাগ, আশ্বিন ও কার্তিক [১২৯৮]

নব্যভারত, আশ্বিন ও কার্তিক [১২৯৮]

সাহিত্য, দ্বিতীয় ভাগ, আশ্বিন [১২৯৮]

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা, সাধনা, অগ্রহায়ণ ১২৯৮

'সাহিত্য' আশ্বিন ১২৯৮ সংখ্যায় মুদ্রিত কৃষ্ণভাবিনী দাসের 'শিক্ষিতা নারী' প্রবন্ধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই আলোচনার প্রসঙ্গে উভয়ের মধ্যে মতবিনিময় চলে 'সাহিত্য' পৌষ, মাঘ ১২৯৮ সংখ্যায় এবং 'সাধনা' মাঘ, ফাল্গুন ১২৯৮ সংখ্যা পর্যন্ত।

পরবর্তীকালে, আষাঢ় ১৩০৫ সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকায় 'সাময়িক সাহিত্য' বিভাগে রবীন্দ্রনাথ, কৃষ্ণভাবিনী দেবী রচিত, 'প্রদীপ' পত্রিকায় মুদ্রিত 'আজকালকার ছেলেরা' প্রবন্ধের আলোচনা করেন।

নব্যভারত, অগ্রহায়ণ [১২৯৮]

সাহিত্য, অগ্রহায়ণ [১২৯৮]

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা, সাধনা, পৌষ ১২৯৮

নব্যভারত, পৌষ [১২৯৮]

সাহিত্য, পৌষ [১২৯৮]

সাহিত্য ও বিজ্ঞান, কার্তিক [১২৯৮]

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা, সাধনা, মাঘ ১২৯৮

সাহিত্য, মাঘ [১২৯৮]

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা, সাধনা, ফাল্গুন ১২৯৮

চন্দ্রনাথ বসু -রচিত 'লয়' প্রবন্ধ কেন্দ্র করিয়া রবীন্দ্রনাথের আলোচনা বর্তমান ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই। পরবর্তীকালে 'সাধনা' পত্রিকার আষাঢ় ১২৯৯ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ স্বতন্ত্র দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন 'চন্দ্রনাথবাবুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব' শিরোনামে। বর্তমান রচনাবলীর 'ধর্ম/দর্শন' বিভাগে ইহা সংকলিত হইয়াছে।

নব্যভারত, মাঘ [১২৯৮]

সাহিত্য, ফাল্গুন [১২৯৮]

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা, সাধনা, চৈত্র ১২৯৮

'সাহিত্য' পত্রিকার আলোচ্য সংখ্যায় প্রকাশিত চন্দ্রনাথ বসুর ধারাবাহিক 'আহার' প্রবন্ধের সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মত তাঁহার পূর্বাপর অন্যান্য রচনার সহিত তুলনীয়।

নব্যভারত, চৈত্র [১২৯৮]

সাহিত্য, চৈত্র [১২৯৮]

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা, সাধনা, বৈশাখ ১২৯৯

নব্যভারত, বৈশাখ [১২৯৯]
সাহিত্য, বৈশাখ [১২৯৯]
সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা, সাধনা, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯
সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় [১২৯৯]
সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা, সাধনা, শ্রাবণ ১২৯৯

রবীন্দ্রনাথ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ১৮ আষাঢ় ১২৯৯ তারিখে এক পত্রে লিখিতেছেন, "নব্যভারত এ পর্য্যন্ত না পাওয়াতে কেবল দুই সংখ্যা সাহিত্যের সমালোচনাই পাঠিয়ে দিলুম।"

নব্যভারত, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় [১২৯৯]
সাহিত্য, শ্রাবণ [১২৯৯]
সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা, সাধনা, ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯
সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা
সমালোচনা, সাধনা, পৌষ ১৩০১
প্রদীপ, বৈশাখ [১৩০৫]
উৎসাহ, ফাল্গুন-চৈত্র [১৩০৪]
সাময়িক সাহিত্য, ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫
নব্যভারত, বৈশাখ [১৩০৫]
প্রদীপ, জ্যৈষ্ঠ [১৩০৫]
উৎসাহ, বৈশাখ [১৩০৫]
নির্মাল্য, জ্যৈষ্ঠ [১৩০৫]
সাময়িক সাহিত্য, ভারতী, আষাঢ় ১৩০৫
নব্যভারত, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় [১৩০৫]
সাহিত্য, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র [১৩০৪]
পূর্ণিমা, শ্রাবণ [১৩০৫]
প্রদীপ, আষাঢ় [১৩০৫]
অঞ্জলি, জ্যৈষ্ঠ, দ্বিতীয় সংখ্যা [১৩০৫]
সাময়িক সাহিত্য, ভারতী, শ্রাবণ ১৩০৫
সাহিত্য, বৈশাখ [১৩০৫]
প্রদীপ, শ্রাবণ [১৩০৫]
অঞ্জলি, আষাঢ় [১৩০৫]
সাময়িক সাহিত্য, ভারতী, ভাদ্র ১৩০৫
সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় [১৩০৫]
সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা [চতুর্থ ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা]
প্রদীপ, ভাদ্র [১৩০৫]
উৎসাহ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় [১৩০৫]
অঞ্জলি, শ্রাবণ [১৩০৫]
সাময়িক সাহিত্য, ভারতী, আশ্বিন ১৩০৫
সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, পঞ্চম ভাগ, তৃতীয় সংখ্যা
প্রদীপ, আশ্বিন ও কার্তিক [১৩০৫]
সাময়িক সাহিত্য, ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩০৫

সাময়িক সারসংগ্রহ

এই বিভাগটি রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'-র প্রথম সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১২৯৮ হইতে শুরু করেন, ইহাতে ইংরেজি সাময়িকপত্রের বিশিষ্ট প্রবন্ধসমূহের সারবস্তু মন্তব্য সহযোগে পরিবেশিত হইত— প্রথম দুইটি সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ একাই লিখিয়াছেন, পরবর্তী সংখ্যা হইতে বলেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেকেই বিভাগটিতে লিখিতে আরম্ভ করেন। মাঝে মাঝে কোনো কোনো সংখ্যায় ইহা মুদ্রিত হয় নাই, ফাল্গুন ১৩০১-সংখ্যা হইতে বিভাগটির নাম হয় 'আলোচনা'। বিদেশী পত্রিকার উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলির সহিত বাঙালি পাঠকের পরিচয় করাইয়া দিয়া তাঁহাদের চিত্তোৎকর্ষ-বৃদ্ধির এই পদ্ধতিটি রবীন্দ্রনাথ খুবই পছন্দ করিতেন— পরবর্তীকালে 'প্রবাসী' ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-তে তিনি শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষকগণ, নিজের কন্যাদ্বয় মাধুরীলতা ও মীরা দেবী এবং ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ হেমলতা দেবী প্রমুখদের দিয়া বিভিন্ন ইংরেজি পত্রিকা হইতে সার-সংকলন করাইয়াছেন। 'সাধনা'-র 'সাময়িক সারসংগ্রহ' বিভাগের অন্তর্ভুক্ত অনেকগুলি রচনা বিজ্ঞান-বিষয়ক বলিয়া আমরা সেগুলি 'বিজ্ঞান' বিভাগের অন্তর্গত করিয়াছি। আরও কয়েকটি রচনা রবীন্দ্র-রচনাবলীর পূর্ববর্তী খণ্ডগুলিতে লওয়া হইয়াছে বলিয়া এখানে মুদ্রিত হইল না। বর্তমান খণ্ডে গৃহীত রচনাগুলির সাময়িকপত্রে প্রকাশসূচীটি এইরূপ—

১-৪.	মণিপুরের বর্ণনা, আমেরিকার সমাজচিত্র, পৌরাণিক মহাপ্লাবন, প্রাচ্য সভ্যতার প্রাচীনত্ব	সাধনা, অগ্রহায়ণ ১২৯৮
৫-৭.	ক্ষিপ্ত রমণীসম্প্রদায়, সীমান্ত প্রদেশ ও আশ্রিতরাজ্য, ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ	সাধনা, পৌষ ১২৯৮
৮-১০.	স্ত্রী-মজুর, প্রাচীন পুঁথি উদ্ধার, ক্যাথলিক সোশ্যালিজ্‌ম	সাধনা, মাঘ ১২৯৮
১১.	আমেরিকানের রক্তপিপাসা	সাধনা, ফাল্গুন ১২৯৮
১২-১৩.	উন্নতি, সুখ দুঃখ	সাধনা, চৈত্র ১২৯৮
১৪.	সোশ্যালিজ্‌ম	সাধনা, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯
১৫.	প্রাচীন শূন্যবাদ	সাধনা, অগ্রহায়ণ ১২৯৯
১৬.	পরিবারাশ্রম	সাধনা, জ্যৈষ্ঠ ১৩০০
১৭-১৮.	মানুষসৃষ্টি, জিব্রল্টার বর্জন	সাধনা, ভাদ্র ১৩০০
১৯-২২.	পলিটিক্স, কন্‌গ্রেসে বিদ্রোহ, ভারত কৌন্সিলের স্বাধীনতা, পুলিস রেগুলেশন বিল, ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি, ধর্মপ্রচার	সাধনা, ফাল্গুন ১৩০১
২৩-২৬.	ইন্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটি, উদ্দেশ্যসংক্ষেপ ও কর্তব্যবিস্তার, হিন্দু ও মসুলমান, কন্‌গ্রেসে বিদ্রোহ, রাষ্ট্রীয় ব্যাপার	সাধনা, চৈত্র ১৩০১
২৭-২৯.	ফেরোজ শা মেটা, বেয়াদব, কথামালার একটি গল্প	সাধনা, বৈশাখ ১৩০২
৩০-৩৩.	চাবুক-পরিপাক, জাতীয় আদর্শ, অপূর্ব দেশহিতৈষিতা, কুকুরের প্রতি মুগুর	সাধনা, জ্যৈষ্ঠ ১৩০২
৩৪-৩৭.	ইংলন্ডে ও ভারতবর্ষে সমকালীন সিবিল সর্বিস পরীক্ষা, মতের আশ্চর্য ঐক্য, ইংরাজি ভাষা শিক্ষা, জাতীয় সাহিত্য	সাধনা, আষাঢ় ১৩০২

৩৮-৪৩. ভ্রম স্বীকার, চিত্রল অধিকার, ইংরাজের লোকপ্রিয়তা, ইংরাজের স্বদোষ-বাৎসল্য, ইংরাজের লোকলজ্জা, প্রাচ্য ও প্রতীচী	সাধনা, শ্রাবণ ১৩০২
৪৪-৪৭. নূতন সংস্করণ, জাতিভেদ, বিবাহে পণগ্রহণ, ইংরাজের কাপুরুষতা	সাধনা, ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২

পরিশিষ্ট

১. সারস্বত সমাজ ১	রচনা : শ্রাবণ ১২৮৯
২. সারস্বত সমাজ ২	রচনা : অগ্রহায়ণ ১২৮৯
৩. বিশেষ বিজ্ঞাপন ত্রৈমাসিক সাধনা	সাধনা, ভাদ্র ১৩০২
৪. প্রাদেশিক সভার উদ্‌বোধন	ভারতী, আষাঢ় ১৩০৫

এই রচনাগুলিকে পরিশিষ্টের অন্তর্গত করা হইয়াছে। কারণ রবীন্দ্রনাথের লেখা হইলেও এগুলি মূলত বিজ্ঞপ্তি বা বিবরণ মাত্র।

১-২. 'বাংলার সাহিত্যিকগণকে একত্র করিয়া একটি পরিষৎ স্থাপন এবং বাংলার পরিভাষা বাঁধিয়া দেওয়া ও সাধারণত সর্বপ্রকার উপায়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধন" করিবার উদ্দেশ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'সারস্বত সমাজ' নামক একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার প্রস্তাব করেন। ১ শ্রাবণ ১২৮৯ তারিখে ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সভাপতিত্বে ইহার প্রথম অধিবেশন হয়। রবীন্দ্রনাথ তাহার একটি কার্যবিবরণী 'মালতীপুঁথি' নামে পরিচিত পাণ্ডুলিপিতে লিখিয়া রাখেন। "১২৮৯ সালে শ্রাবণ মাসের প্রথম রবিবারে" অধিবেশন হয়, তারিখটি ছিল ১ শ্রাবণ, রবীন্দ্রনাথ পরে লিখিবার সময়ে ভ্রমক্রমে "২রা তারিখে" লিখিয়াছেন। এই কার্যবিবরণীটি মালতীপুঁথি-র অন্তর্ভুক্ত হইয়া 'রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা' প্রথম খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছিল। সেখান হইতে রচনাটি সংকলিত হইল।

১৭ অগ্রহায়ণ ১২৮৯ তারিখে অ্যালবার্ট হলে উক্ত সমাজের যে অধিবেশন বসে, তাহার "রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক লিপিবদ্ধ এবং শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রমোহন [নাথ] ঠাকুর মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত" একটি কার্যবিবরণী মন্মথনাথ ঘোষ 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' (১৩৩৪) গ্রন্থে উদ্‌ধৃত করিয়াছেন। সেটি এখানে 'সারস্বত সমাজ ২' শিরোনামে সংকলিত হইল।

৩. এই 'বিশেষ বিজ্ঞাপন'টি 'সাধনা' পত্রিকার ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়, কিন্তু বিভিন্ন পাঠাগারে রক্ষিত উক্ত সংখ্যার কপিগুলিতে ইহার সন্ধান পাওয়া যায় না— সম্ভবত মলাট বাদ দিয়া বাঁধাইবার ফলে ইহা বিনষ্ট হইয়াছে। রাজেন্দ্রকুমার মিত্র স্ব-সম্পাদিত 'সচিত্র খামখেয়ালী' পত্রিকার মাঘ ১৩৫৮ সংখ্যায় (১৪শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা) 'খেয়ালখাতা' নিবন্ধে ইহা উদ্‌ধৃত করেন (পৃ. ৪০২)— সেখান হইতে রচনাটি এখানে সংকলিত হইল। উল্লেখ্য, অগ্রহায়ণ ১৩০২ হইতে 'ত্রৈমাসিকপত্ররূপে' সাধনা প্রকাশিত হইবার কথা বিজ্ঞাপিত হইলেও, উহা কার্যকর হয় নাই।

৪. ৩০-৩১ মে ও ১ জুন ১৮৯৮ (১৭-১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫) তারিখে পূর্ববঙ্গের প্রধান শহর ঢাকা নগরীতে রেভারেন্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, আশুতোষ চৌধুরী প্রভৃতি যোগদান করেন। ৩০ মে সভাপতি যথারীতি ইংরেজিতে তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। 'রবীন্দ্রজীবনী'-কার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

লিখিয়াছেন, "রবীন্দ্রনাথ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ও তিনিই সভাপতির সম্ভাষণের সারমর্ম বাংলায় পাঠ করিয়াছিলেন।" বহু বৎসর পরে 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ পূর্ববর্তী বৎসরে নাটোর-সম্মেলনে বাংলাভাষা প্রবর্তনে তাঁহার প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করিয়া লেখেন, "পর বৎসরে রুগ্‌ণ শরীর নিয়ে ঢাকা-কন্‌ফারেন্‌সেও আমাকে এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল"। এই চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ-কৃত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইংরেজি ভাষণের বাংলা অনুবাদ 'প্রাদেশিক সভার উদ্‌বোধন' রচনায়। বার্ষিক সূচীতে অনুবাদক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

উনিশ শতকের বাংলা সাময়িকপত্রগুলি অনেক সময়েই রচনার সহিত লেখকের নাম প্রকাশ করিত না। কখনো কখনো মলাটে লেখকের নাম উল্লিখিত হইলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে পত্রিকাগুলি বাঁধাই করিবার সময়ে মলাট ও বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠাগুলি বাদ দেওয়ার ফলে অনেক মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে লেখকের পরিচয়টিও লুপ্ত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের অনেক রচনা এই কারণে বিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছে। বর্তমান রচনাবলীর মূল অংশে এইরূপ বিতর্কিত কিছু রচনা অভ্যন্তরীণ ও অন্যান্য তথ্যের বিচার করিয়া রবীন্দ্রনাথের লেখা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু কয়েকটি রচনার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহ হওয়া সম্ভবপর হয় নাই। সেই রচনাগুলি ইতিহাসের সূত্র রক্ষার খাতিরে বর্তমান পরিশিষ্টের অন্তর্গত করা হইল। রচনাগুলির সাময়িকপত্রে প্রকাশসূচি ও অন্যান্য তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হইল—

১.	শারদ জ্যোৎস্নায় ভগ্নহৃদয়ের গীতোচ্ছ্বাস	ভারতী, কার্তিক ১২৮৪
২.	গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, পৌষ ১৭৯৬ শক (১২৮১)
৩.	বঙ্গে সমাজ-বিপ্লব	ভারতী, মাঘ ১২৮৪
৪.	বিজন চিন্তা : কল্পনা	ভারতী, ফাল্গুন ১২৮৪
৫.	কবিতা-পুস্তক	ভারতী, ভাদ্র ১২৮৫
৬.	আবদারের আইন	সাধনা, মাঘ ১৩০১

সজনীকান্ত দাস তাঁহার 'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য' (১৩৬৭) গ্রন্থে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার সূচী তৈয়ারি করিতে গিয়া লিখিয়াছেন, 'এই তালিকাধৃত রচনাগুলিকে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং একটি দলিলে স্বীকৃতি দিয়াছেন'। রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরিত এই তালিকায় উপরে উল্লিখিত 'শারদ জ্যোৎস্নায় ভগ্নহৃদয়ের গীতোচ্ছ্বাস', 'বঙ্গে সমাজ-বিপ্লব' ও 'কবিতা-পুস্তক' রচনা তিনটি আছে।

১. 'শারদ জ্যোৎস্নায় ভগ্নহৃদয়ের গীতোচ্ছ্বাস' কবিতাটিকে তালিকাভুক্ত করিয়া সজনীকান্ত দাস মন্তব্য করিয়াছেন, 'এই কবিতাটিকে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন কিন্তু শেষ চার পংক্তিতে "ভানু" দেখিয়া রবীন্দ্রনাথকেই ইহার রচয়িতা বলিয়া মনে হয়।'

২. রবীন্দ্রনাথ-স্বাক্ষরিত সজনীকান্তের তালিকায় প্রথমেই আছে, ' "ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র" বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের প্রথমাংশ, বেদান্তবাগীশ মহাশয় -কর্তৃক সংশোধিত, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ৮ম কল্প, ৩য় ভাগ, ১৭৯৫ শকাব্দ, জ্যৈষ্ঠ হইতে কয়েক সংখ্যায়।' ১২৮০ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ যখন পিতার সহিত হিমালয়ে গিয়াছিলেন, সেই সময়ের স্মৃতিচারণ করিয়া তিনি পরবর্তীকালে 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের প্রথম পাণ্ডুলিপিতে লিখিয়াছেন, 'প্রক্টরের লিখিত সরল-পাঠ্য জ্যোতিষ গ্রন্থ হইতে তিনি আমাকে স্থানে স্থানে বুঝাইয়া দিতেন আমি তাহা বাংলায় লিখিতাম।' বিষয়টি তিনি আরও বিস্তৃত করিয়া লিখিয়াছেন 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থে, 'তিনি যা বলে যেতেন তাই মনে করে তখনকার কাঁচা হাতে আমি একটা বড় প্রবন্ধ লিখেছি। স্বাদ পেয়েছিলুম বলেই লিখেছিলুম, জীবনে এই আমার প্রথম ধারাবাহিক রচনা, আর সেটা

বৈজ্ঞানিক সংবাদ নিয়ে।' রবীন্দ্রনাথ হিমালয়ে থাকার সময়েই জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৫ শকের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-য়, 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' নামক একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়া শুরু হয়, এবং আষাঢ়, আশ্বিন, কার্তিক, পৌষ ও মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়া 'ক্রমশঃ প্রকাশ্য' অবস্থাতেই বন্ধ হইয়া যায়। এই সূত্র অনুসরণ করিয়া সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করিলে তিনি ১৫ অক্টোবর ১৯৩৯ তাঁহাকে লেখেন :

> পিতৃদেবের মুখ থেকে জ্যোতিষের যে বিদ্যাটুকু সংগ্রহ করে নিজের ভাষায় লিখে নিয়েছিলুম সেটা যে তখনকার কালে তত্ত্ববোধিনীতে ছাপা হয়েছে এই অদ্ভুত ধারণা আজ পর্যন্ত আমার মনে ছিল। এর দুটো কারণ থাকতে পারে। এক এই যে, সম্পাদক [আনন্দচন্দ্র] বেদান্তবাগীশ মহাশয় ছাপানো হবে বলে বালককে আশ্বাস দিয়েছিলেন, বালক শেষ পর্যন্ত তার প্রমাণ পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে নি। আর একটা কারণ এই হতে পারে যে, অন্য কোনো যোগ্য লেখক সেটাকে প্রকাশযোগ্য রূপে পূরণ করে নিয়েছিলেন। শেষোক্ত কারণটিই সঙ্গত বলে মনে হয়। এই উপায়ে আমার মন তৃপ্ত হয়েছিল এবং কোনো লেখকেরই নাম না থাকাতে এতে কোনো অন্যায় করা হয় নি। এ না হলে এমন দৃঢ়বদ্ধমূল সংস্কার আমার মনে থাকতে পারত না।

সজনীকান্ত এই চিঠি উদ্‌ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন, 'আমাদের মনে হয়, ইহার পর আর কাহারও মনে এ বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না।' কিন্তু তাঁহার সংশয় ছিল বলিয়াই তিনি পূর্বে লিখিয়াছিলেন, 'এ প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দিগ্ধ নহি বলিয়া নমুনা দিলাম না।' দেবেন্দ্রনাথ প্রক্টরের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া পুত্রকে জ্যোতিষ বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছিলেন, প্রসঙ্গক্রমে তিনি ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে কিছু আলোচনা করিয়া থাকিলেও তাঁহার আলোচ্য বিষয় ছিল পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদ্যা। কিন্তু 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' প্রবন্ধের লক্ষ্য একান্তভাবেই ভারতীয় জ্যোতিষ।

সেই কারণে কেহ কেহ মনে করেন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র পৌষ ১৭৯৬ শক (১২৮১) সংখ্যায় মুদ্রিত 'গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি' 'ক্রমশঃ প্রকাশ্য' প্রবন্ধটিই রবীন্দ্রনাথের সেই জ্যোতিষ-বিষয়ক রচনা। 'ক্রমশঃ প্রকাশ্য' লেখা থাকিলেও পরবর্তী কোনো সংখ্যায় ইহার কোনো কিস্তি প্রকাশিত হয় নাই। 'জীবনস্মৃতি' (১৩৬৮)-র তথ্যপঞ্জীতে সংশয়-চিহ্নিত ভাবে প্রবন্ধটির উল্লেখ করা হইয়াছে। এই-সকল কারণবশত এই প্রবন্ধটিকে পরিশিষ্টে গ্রহণ করা হইল।

৩. 'বঙ্গে সমাজ-বিপ্লব' সজনীকান্ত দাসের তালিকায় আছে। 'দেশ', রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংখ্যা ১৩৬৯-এ 'রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত সাময়িক পত্র' প্রবন্ধের পরিশিষ্টে প্রদত্ত 'ভারতী প্রথম বর্ষে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার সূচী'র অন্তর্ভুক্ত করিয়া পুলিনবিহারী সেন প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলেন। ইহার বক্তব্য ও ভাষা রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভাষা ও তাঁহার তৎকালীন আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকীয় বক্তব্যের সহিত মেলে বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে রবীন্দ্রনাথের রচনা মনে করেন না। তাছাড়া একই সংখ্যায় মুদ্রিত 'বাঙালির আশা ও নৈরাশ্য' প্রবন্ধটিকে রবীন্দ্র-রচনা বলিয়া স্বীকৃতি দিয়া এই নিবন্ধটিকে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ উপেক্ষা করিয়াছেন। সেইজন্য রচনাটিকে পরিশিষ্টে স্থান দেওয়া হইল।

৪. 'বিজন চিন্তা : কল্পনা' প্রবন্ধটির শেষে রচয়িতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে 'বিধবা' নামে, এই কারণেই আত্মভাবনামূলক এই রচনাটির প্রতি কাহারো দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু ইহাতে রবীন্দ্রনাথের সমকালীন রচনার সকল বৈশিষ্ট্যই বর্তমান বলিয়া ইহাকে পরিশিষ্টে স্থান দেওয়া হইল।

৫. 'কবিতা-পুস্তক' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উক্ত নামীয় কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা। রবীন্দ্রনাথ-স্বাক্ষরিত সজনীকান্ত দাসের তালিকায় রচনাটি অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহার যাথার্থ্য

সম্পর্কে সংশয়িত হইবার কারণ আছে। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী গ্রন্থটি প্রকাশের তারিখ ১৮ আগস্ট ১৮৭৮ (৩ ভাদ্র ১২৮৫)। যদি এই তারিখ ঠিক হয়, তবে আমেদাবাদে রবীন্দ্রনাথের কাছে বইটি প্রেরণ করা ও সেখান হইতে তাঁহার দ্বারা সমালোচিত হইয়া ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া ইহাতে স্কট, বায়রন, শেক্সপিয়র প্রভৃতি বিদেশী কবি এবং রাম বসু, হরু ঠাকুর প্রভৃতি কবিওয়ালাদের রচনার সহিত যেরূপ স্বাচ্ছন্দ্য-সহকারে তুলনামূলক আলোচনা করা হইয়াছে, এই ক্ষমতা রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত তখনও আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। মনে রাখা দরকার, এই সময়ে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী তাঁহার সঙ্গে ছিলেন না— ইঁহারই সাহায্য লইয়া তিনি 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী' গ্রন্থগুলির পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনা করিতে পারিয়াছিলেন।

ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত গ্রন্থসমালোচনটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতার উদ্‌ধৃতির ক্ষেত্রে কয়েকটি জায়গায় মুদ্রণপ্রমাদ দৃষ্ট হয়। মূল গ্রন্থে প্রকাশ অনুযায়ী কয়েকটি জায়গায় সংশোধন করা হইল :

পৃষ্ঠা। ছত্র	ভারতী	গ্রন্থ
৪৯৩। ৮	[ছত্রটি পত্রিকায় ছিল না]	চিকণ গাঁথিয়া মালা, পরিতাম হার।
৪৯৫। ১২	মরুমাঝে	মরুভূমিমাঝে
৪৯৬। ৩২	ত্রাহি মা দুর্গে	ত্রাহি মে দুর্গে

৬. এই লেখাটির বিষয়ে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করিয়াছেন : 'প্রবন্ধটি কোনো গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নাই এবং সাধনায় উহা স্বাক্ষরিত নহে। তবে বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারের 'সাধনা'য় রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি তাঁহার রচিত বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছিলেন।' এতৎসত্ত্বেও কেহ কেহ সংশয় প্রকাশ করেন যে এটির রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ নন। সেই কারণেই লেখাটি পরিশিষ্টের অন্তর্গত হইয়াছে।

স্বীকৃতি

অগ্রন্থিত রবীন্দ্ররচনা প্রকাশের কাজ ত্বরান্বিত করিবার জন্য বিশ্বভারতী একটি সম্পাদনা-সমিতি গঠন করেন। উপাচার্য শ্রীদিলীপকুমার সিংহ, কর্মসচিব শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায় এবং গ্রন্থনবিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায় -সহ এই সমিতিতে আছেন শ্রীভূদেব চৌধুরী, শ্রীভবতোষ দত্ত, শ্রীশঙ্খ ঘোষ, শ্রীউজ্জ্বলকুমার মজুমদার, শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল, শ্রীঅমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, শ্রীঅনাথনাথ দাস এবং শ্রীসুবিমল লাহিড়ী। বর্তমান খণ্ডের গ্রন্থপরিচয় প্রস্তুত করিয়াছেন শ্রীঅনাথনাথ দাস এবং শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল। সংকলন এবং প্রকাশনের কাজে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন শ্রীদিলীপকুমার হাজরা, শ্রীতুষারকান্তি সিংহ, শ্রীআশিসকুমার হাজরা এবং শ্রীঅমিত সেন।

১৪০৪

বর্ণানুক্রমিক সূচী

অকাল কুষ্মাণ্ড	...	৪০৯
অদৃষ্টের হাতে লেখা	...	১২০
অদৃষ্টের হাতে লেখা সূক্ষ্ম এক রেখা	...	১২০
অপরিচিত ভাষা ও অপরিচিত সংগীত	...	২৬১
অপূর্ব দেশহিতৈষিতা	...	৭১২
অবসাদ	...	৪৪
অভিমান ক'রে কোথায় গেলি	...	৪২
অভিলাষ	...	৩
অভ্যাসজনিত পরিবর্তন	...	৫১৮
অস্ত গেল দিনমণি। সন্ধ্যা আসি ধীরে	...	৬৪
আঁখি পানে যবে আঁখি তুলি	...	১২৪
আকব্বর শাহের উদারতা	...	৪৮৩
আকুল আহ্বান	...	৪২
আগমনী	...	৩৯
আপনি বড়ো	...	৪৫২
আব্দারের আইন	...	৭৪৬
আবশ্যকের মধ্যে অধীনতার ভাব	...	৫৮৬
আবার আবার কেন রে আমার	...	১০৭
আমাদের প্রাচীন কাব্যে ও সমাজে স্ত্রী-পুরুষ প্রেমের অভাব	...	৪৬৪
আমাদের সভ্যতায় বাহ্যিক ও মানসিকের অসামঞ্জস্য	...	৪৬১
আমার এ মনোজ্বালা	...	৫২
আমার এ মনোজ্বালা কে বুঝিবে সরলে	...	৫২
আমেরিকানের রক্তপিপাসা	...	৬৮২
আমেরিকার সমাজচিত্র	...	৬৭৪
আয় রে বাছা কোলে বসে চা' মোর মুখ-পানে	...	৭৫
আয় লো প্রমদা! নিঠুর ললনে	...	৩২
আলস্য ও সাহিত্য	...	২৫২
ইংরাজদিগের আদব-কায়দা	...	৩৫৯
ইংরাজি ভাষা শিক্ষা	...	৭১৪

ইংরাজের কাপুরুষতা	...	৭২১
ইংরাজের লোকপ্রিয়তা	...	৭১৭
ইংরাজের লোকলজ্জা	...	৭১৮
ইংরাজের স্বদোষ-বাৎসল্য	...	৭১৭
ইংলন্ডে ও ভারতবর্ষে সমকালীন সিবিল সর্বিস পরীক্ষা	...	৭১৩
ইচ্ছামৃত্যু	...	৫১১
ইন্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটি	...	৭০৩
ইন্দুর-রহস্য	...	৫৮৯
ঈশ্বর	...	৫২১
উটপক্ষীর লাথি	...	৫১২
উদয়াস্তের চন্দ্রসূর্য	...	৫১৭
উদ্দেশ্য সংক্ষেপ ও কর্তব্য বিস্তার	...	৭০৫
উন্নতি	...	৬৮৪
উপহার-গীতি	...	৫৩
এই তো আমরা দোঁহে বসে আছি কাছে কাছে	...	১২০
একটি চুম্বন দাও প্রমদা আমার	...	১০০
একটি পত্র	...	২৬৭
একটি পুরাতন কথা	...	৪২৮
একাদশী রজনী	...	৮১
এলিনোর	...	২১৭
এসো আজি সখা	...	৪৯
এসো আজি সখা বিজন পুলিনে	...	৪৯
এসো এসো এই বুকে নিবাসে তোমার	...	১০২
এসো এসো ভ্রাতৃগণ	...	৮
এসো সখি, এসো মোর কাছে	...	৬৩
এ হতভাগারে ভালো কে বাসিতে চায়	...	৫৬
ঐতিহাসিক চিত্র	...	৪৯২
ওই শুনি শূন্যপথে রথচক্রধ্বনি	...	৪৬
ও কথা বোলো না সখি	...	৫৫
ও কথা বোলো না সখি— প্রাণে লাগে ব্যথা	...	৫৫
ওরা যায়, এরা করে বাস	...	১২২
ওলাউঠার বিস্তার	...	৫২০
কই গো প্রকৃতি রানী, দেখি দেখি মুখখানি	...	৭৬
কথামালার একটি গল্প	...	৭১১
কন্‌গ্রেসে বিদ্রোহ	...	৬৯৭, ৭০৭

কবিতা-পুস্তক ...	৭৪০
কবিতার উপাদান রহস্য (Mystery) ...	২৫৬
কষ্টের জীবন ...	১০১
কাজ ও খেলা ...	৫৮৯
কাজের লোক কে ...	৪৭৭
[কাব্য] ...	২৬৫
কাব্য : স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট ...	২৪৪
কার্যাধ্যক্ষের নিবেদন ...	৫৮৫
কী হবে বলো গো সখি ...	৫৫
কী হবে বলো গো সখি ভালোবাসি অভাগারে ...	৫৫
কুক্কুরের প্রতি মুগুর ...	৭১৩
কেন গান গাই ...	৬১
কেন গান শুনাই ...	৬৩
কেমন সুন্দর আহা ঘুমায়ে রয়েছে ...	১০৪
কৈফিয়ত ...	৪৩৫
কোরো না ছলনা কোরো না ছলনা ...	১১৪
ক্যাথলিক সোশ্যালিজ্‌ম্‌ ...	৬৮২
ক্ষিপ্ত রমণীসম্প্রদায় ...	৬৭৬
গতি নির্ণয়ের ইন্দ্রিয় ...	৫১১
গভীর গভীরতম হৃদয়প্রদেশে ...	১০৫
গানগুলি মোর বিষে ঢালা ...	১২৪
গিয়াছে সে দিন, যে দিন হৃদয় ...	১১২
গিরির উরসে নবীন নিঝর ...	২৫
গুটিকত গল্প ...	৪৮০
গুরুভার মন লয়ে কত বা বেড়াবি ব'য়ে ...	৬১
গেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ ...	১৯২
গোঁফ এবং ডিম ...	৫৫৫
গোলাম-চোর ...	৫৪০
গ্রন্থসমালোচনা ...	৬০১-৬৩৪
গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি ...	৭৩৫
[ঘানির বলদ] ...	৫৯১
চন্দ্রনাথবাবুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব ...	৩১৫
চপলারে আমি অনেক ভাবিয়া ...	১১৫
চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় ...	৫৪২
চাবুক-পরিপাক ...	৭১১

চিঠি ... ৮৭
চিঠি লিখব কথা ছিল ... ৮৭
চিরস্থায়ী অধিকার ... ৭১৬
চীনে মরণের ব্যবসায় ... ৩৭৯
চেঁচিয়ে বলা ... ৩৮৮
চ্যাটার্টন— বালক-কবি ... ২১৪
ছাত্রদের নীতিশিক্ষা ... ৩৪১
ছাত্রবৃত্তির পাঠ্যপুস্তক ... ৩৪৪
ছেলেবেলাকার আহা, ঘুমঘোরে দেখেছিনু ... ৫১
ছেলেবেলাকার শরৎকাল ... ৫৮৮
ছেলেবেলা হতে বালা, যত গাঁথিয়াছি মালা ... ৫৩
জনমনোমুগ্ধকর উচ্চ অভিলাষ! ... ৩
জন্মতিথির উপহার ... ৮৬
জাগি রহে চাঁদ ... ১১০
জাগি রহে চাঁদ আকাশে যখন ... ১১০
জাতিভেদ ... ৭২০
জাতীয় আদর্শ ... ৭১২
জাতীয় সাহিত্য ... ৭১৫
জান না তো নির্ঝরিণী, আসিয়াছ কোথা হতে ... ১২২
জানি সখা অভাগীরে ভালো তুমি বাস না ... ৫৬
জিজ্ঞাসা ও উত্তর ... ৩৬৬
জিব্রল্টার বর্জন ... ৬৯৩
জিহ্বা আস্ফালন ... ৩৯২
জীবন ও বর্ণমালা ... ৫৪৮
জীবন মরণ ... ১২২
[জীবনের বুদ্‌বুদ] ... ৫৯১
জীবনের শক্তি ... ৫১৩
জুতা-ব্যবস্থা ... ৩৭৬
'জ্বল্ জ্বল্ চিতা! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ' ... ২৪
ঝড় বাদলে আবার কখন ... ৯৭
ঝান্সীর রানী ... ৪৭৩
টৌন্‌হলের তামাশা ... ৪০৭
ঠাকুরঘর ... ৫৯২
ঢাল্! ঢাল্ চাঁদ! আরো আরো ঢাল্! ... ৩০
তুমি একটি ফুলের মতো মণি ... ১২৫

দয়াময়ি, বাণি, বীণাপাণি ... ৪৪
দরোয়ান ... ৫৪৫
দামিনীর আঁখি কিবা ... ১১৮
দামু বোস আর চামু বোসে ... ৯১
দিন রাত্রি নাহি মানি ... ১১৭
দিন রাত্রি নাহি মানি, আয় তোরা আয় রে ... ১১৭
দিল্লি দরবার ... ৩৫
[দুর্ভিক্ষ] ... ৪৪১
দেখিছ না অয়ি ভারত-সাগর ... ৩৫
দেবতায় মনুষ্যত্ব আরোপ ... ৫০২
'দেশজ প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি'/(প্রত্যুত্তর) ... ২৪১
ধর্মপ্রচার ... ৭০১
ধর্ম ও ধর্মনীতির অভিব্যক্তি (Evolution) ... ৩১৫
ধর্মে ভয়, কৃতজ্ঞতা ও প্রেম ... ৪৬০
ধীরে ধীরে প্রভাত হল, আঁধার মিলায়ে গেল ... ৭৮
নববর্ষ উপলক্ষে গাজিপুরে ব্রহ্মোপাসনা/উদ্‌বোধন ... ৩১৩
নব্য ন্যায়তত্ত্ব ... ৩১৮
নব্যবঙ্গের আন্দোলন ... ৪৬৬
নর্ম্যান জাতি ও অ্যাংলো-নর্ম্যান সাহিত্য ... ১৯৮
নলিনী ... ১১৬
নিঃস্বার্থ প্রেম ... ৫৩০
নিঝর মিশিছে তটিনীর সাথে ... ১১৬
নিন্দা-তত্ত্ব ... ৩৬২
নিমন্ত্রণ-সভা ... ৩৮৪
নিষ্ফল চেষ্টা ... ৫৯৩
নীল বায়লেট নয়ন দুটি করিতেছে ঢলঢল ... ১২৪
নূতন সংস্করণ ... ৭১৯
ন্যায় ধর্ম ... ৪৮৩
ন্যাশনল ফন্ড ... ৪০২
পত্র ... ৮৩
পত্র ... ৮৫
পত্র ... ৯১
পরিবারাশ্রম ... ৬৮৯
পলিটিক্স্‌ ... ৬৯৪
পাতায় পাতায় দুলিছে শিশির ... ১১০

পার কি বলিতে কেহ ... ৫১
পার কি বলিতে কেহ কী হল এ বুকে ... ৫১
পারিবারিক দাসত্ব ... ৩৬৯
পাষাণ-হৃদয়ে কেন সঁপিনু হৃদয়? ... ৫৪
পিত্রার্কা ও লরা ... ১৮৫
পুরুষের কবিতায় স্ত্রীলোকের প্রেমের ভাব ... ৪৬০
পুলিস রেগুলেশন বিল ... ৬৯৯
পুষ্পাঞ্জলি ... ৫৬৩
পৌরাণিক মহাপ্লাবন ... ৬৭৪
প্রকৃতির খেদ [প্রথম পাঠ] ... ১৭
প্রকৃতির খেদ [দ্বিতীয় পাঠ] ... ১৪
প্রতিকূল বায়ুভরে, উর্মিময় সিন্ধু-'পরে ... ১০০
প্রথমে আশাহত হয়েছিনু ... ১২৪
প্রলাপ ১ ... ২৫
প্রলাপ ২ ... ৩০
প্রলাপ ৩ ... ৩২
প্রাচী ও প্রতীচী ... ৭১৮
প্রাচীন-পুঁথি উদ্ধার ... ৬৮১
প্রাচীন শূন্যবাদ ... ৬৮৮
প্রাচ্য সভ্যতার প্রাচীনত্ব ... ৬৭৬
প্রাদেশিক সভার উদ্‌বোধন ... ৭২৮
প্রেমতত্ত্ব ... ১১৬
ফেরোজ শা মেটা ... ৭০৮
বঙ্গে সমাজ-বিপ্লব ... ৭৩৬
বরফ পড়া ... ৫৭৯
বর্ষার চিঠি ... ৫৭৭
বলো গো বালা, আমারি তুমি ... ১১১
বসে বসে লিখলেম চিঠি ... ৮৫
বাগান ... ৫৯১
বাংলা লেখক ... ২৬৯
বাংলায় লেখা ... ২৬০
বাংলা সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা ... ২৬৪
বাঙালি কবি নয় ... ২১৯
বাঙালি কবি নয় কেন? ... ২২৭
বাঙালির আশা ও নৈরাশ্য ... ৩৫৫

বানরের শ্রেষ্ঠত্ব	...	৫৮৪
বারেক ভালোবেসে যে জন মজে	...	১২৫
বিয়াত্রিচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য	...	১৭৪
বিচ্ছেদ	...	১০০
বিজন চিন্তা : কল্পনা	...	৭৩৮
বিদায়	...	১০৪
বিদায়-চুম্বন	...	১০০
বিবাহে পণগ্রহণ	...	৭২০
বিবিধ প্রসঙ্গ ১	...	৫৬৯
বিবিধ প্রসঙ্গ ২	...	৫৭৪
বিরহ	...	৭৮
বিশেষ বিজ্ঞাপন/ত্রৈমাসিক সাধনা	...	৭২৭
বিশ্বামিত্র, বিচিত্র এ লীলা	...	১২৬
বিষ ও সুধা	...	৬৪
বিস্তারিয়া উর্মিমালা, বিধির মানস-বালা	...	১৭
বিস্তারিয়া উর্মিমালা, সুকুমারী শৈলবালা	...	১৪
বীর গুরু	...	৪৮৪
বৃদ্ধ কবি	...	১০৯
বেদান্তের বিদেশীয় ব্যাখ্যা	...	৩২২
বেয়াদব	...	৭০৯
বৈজ্ঞানিক সংবাদ	...	৫০৮
ব্যথা বড়ো বাজিয়াছে প্রাণে	...	৫৯
ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী	...	৫৫৯
ভারত কৌন্সিলের স্বাধীনতা	...	৬৯৭
ভারতী	...	৩৬
ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি	...	৭০০
ভারতবর্ষের ইতিহাস (গ্রন্থসমালোচনা)	...	৪৯০
ভালোবাসে যারে তার চিতাভস্ম-পানে	...	১২৬
ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ	...	৬৭৯
ভুজ-পাশ-বদ্ধ অ্যান্টনি	...	১২০
ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী	...	১২৯
ভূগর্ভস্থ জল এবং বায়ুপ্রবাহ	...	৫২২
ভূতের গল্পের প্রামাণিকতা	...	৫১৩
ভেবেছি কাহারো সাথে	...	৫৪
ভেবেছি কাহারো সাথে মিশিব না আর	...	৫৪

ভ্রম স্বীকার ... ৭১৬
মণিপুরের বর্ণনা ... ৬৭৩
মতের আশ্চর্য ঐক্য ... ৭১৪
মন হতে প্রেম যেতেছে শুকায়ে ... ১০৯
[মন্দিরপথবর্তিনী] ... ২৯৭
মন্দিরাভিমুখে ... ৩০০
মাকড়সা-সমাজে স্ত্রীজাতির গৌরব ... ৫১২
মাগো আমার লক্ষ্মী ... ৮৩
মানব শরীর ... ৫১৪
মানুষ কাঁদিয়া হাসে ... ১০১
মানুষসৃষ্টি ... ৬৯১
মুর্শিদাবাদ কাহিনী (গ্রন্থসমালোচনা) ... ৪৯১
মুসলমান ছাত্রের বাংলা শিক্ষা ... ৩৫০
মুসলমান মহিলা ... ৬৭৫
মেঘনাদবধ কাব্য ... ১৩১
মেঘলা শ্রাবণের বাদ্‌লা রাতি ... ৪৫
মেয়েলি ব্রত ... ২৭৮
ম্যাক্‌বেথ্‌ ... ৯৭
যথার্থ দোসর ... ৫৩৪
যাও তবে প্রিয়তম সুদূর প্রবাসে ... ১০৪
যাও তবে প্রিয়তম সুদূর সেথায় ... ১০৬
যেখানে জ্বলিছে সূর্য, উঠিছে সহস্র তারা ... ৩৭
রবীন্দ্রবাবুর পত্র ... ২৭২
রামমোহন রায় ... ৩৩০
রানী, তোর ঠোঁট দুটি মিঠি ... ১২৫
রাষ্ট্রীয় ব্যাপার ... ৭০৭
রূপসী আমার, প্রেয়সী আমার ... ১১৩
রেলগাড়ি ... ৫৫০
রোগশত্রু ও দেহরক্ষক সৈন্য ... ৫১৫
ললিত-নলিনী ... ১০২
লাঠির উপর লাঠি ... ৪৪২
লীলাময়ী নলিনী ... ১১৬
[লেখক-জন্ম] ... ৫৯৬
লেখা কুমারী ও ছাপা সুন্দরী ... ৫৫৩
শরৎকাল ... ৫৮৭

শরতে প্রকৃতি	...	৭৬
শরতের শুকতারা	...	৮১
শারদ জ্যোৎস্নায় ভগ্নহৃদয়ের গীতোচ্ছ্বাস	...	৭৩২
শারদা	...	৪৬
শিউলিফুলের গাছ	...	৫৮২
শিখ-স্বাধীনতা	...	৪৮৮
শুধাই অয়ি গো ভারতী তোমায়	...	৩৬
সংগীত	...	১০৪
সংগীত ও ভাব	...	২৮৫
সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা	...	২৯০
সখি রে— পিরীত বুঝবে কে	...	৭৯
সত্য	...	৪৪৫
সত্যং শিবং সুন্দরম্	...	৫৫৯
সন্ধ্যা	...	৫৯
সফলতার দৃষ্টান্ত	...	৫৯৪
সমাজ সংস্কার ও কুসংস্কার	...	৩৯৮
সমাজে স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের প্রভাব	...	৪৬২
সম্পাদকের বিদায় গ্রহণ	...	৫৯৬
সাকার ও নিরাকার উপাসনা	...	৩০৭
সান্ত্বনা	...	৫২৯
সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা	...	৬৩৭-৬৭০
সামুদ্রিক জীব	...	৪৯৭
সারস্বত সমাজ ১	...	৭২৫
সারস্বত সমাজ ২	...	৭২৬
সাহিত্য	...	২৫৯
সাহিত্য ও সভ্যতা	...	২৪২
'সাহিত্য'-পাঠকদের প্রতি	...	২৭২
সাহিত্যের উদ্দেশ্য	...	২৪৭
সাহিত্যের গৌরব	...	২৭৪
সাহিত্যের সৌন্দর্য	...	২৭৯
সীমান্ত প্রদেশ ও আশ্রিত রাজ্য	...	৬৭৮
সুখ দুঃখ	...	৬৮৫
[সুখ না দুঃখ] উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে বক্তব্য	...	৩২১
সুখী প্রাণ	...	১২২
সুধীরে নিশার আঁধার ভেদিয়া	...	৩৯

সুশীলা আমার, জানালার 'পরে	...	১১৪
সোশ্যালিজ্‌ম্‌	...	৬৮৬
সৌন্দর্য	...	২৫৬
সৌন্দর্য ও বল	...	৫৮৫
সৌন্দর্য সম্বন্ধে গুটিকতক ভাব	...	২৬২
স্যাক্‌সন জাতি ও অ্যাংলো স্যাক্‌সন সাহিত্য	...	১৬৪
স্ত্রী ও পুরুষের প্রেমে বিশেষত্ব	...	৪৫৮
স্ত্রী-মজুর	...	৬৭৯
স্নেহ উপহার	...	৭৫
স্নেহ-উপহার এনেছি রে দিতে	...	৮৬
স্বপ্ন দেখেছিনু প্রেমাগ্নিজ্বালায়	...	১২৩
হম সখি দারিদ নারী	...	৮০
হাতে কলমে	...	৪২০
হা নলিনী গেছে আহা কী সুখের দিন	...	১০২
হা বিধাতা— ছেলেবেলা হতেই এমন	...	৪৭
হা রে বিধি কী দারুণ অদৃষ্ট আমার	...	৫৫
হিন্দু ও মুসলমান	...	৭০৬
হিন্দুদিগের জাতীয় চরিত্র ও স্বাধীনতা	...	৪৫৫
হিন্দুমেলায় উপহার	...	১১
হিমাদ্রি শিখরে শিলাসন-'পরি	...	১১
হিমালয়	...	৩৭
হোক ভারতের জয়!	...	৮
Chivalry	...	৪৬৫
Dialogue/Literature	...	২৫৭

রবীন্দ্র রচনাবলী

অষ্টাদশ খণ্ড

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

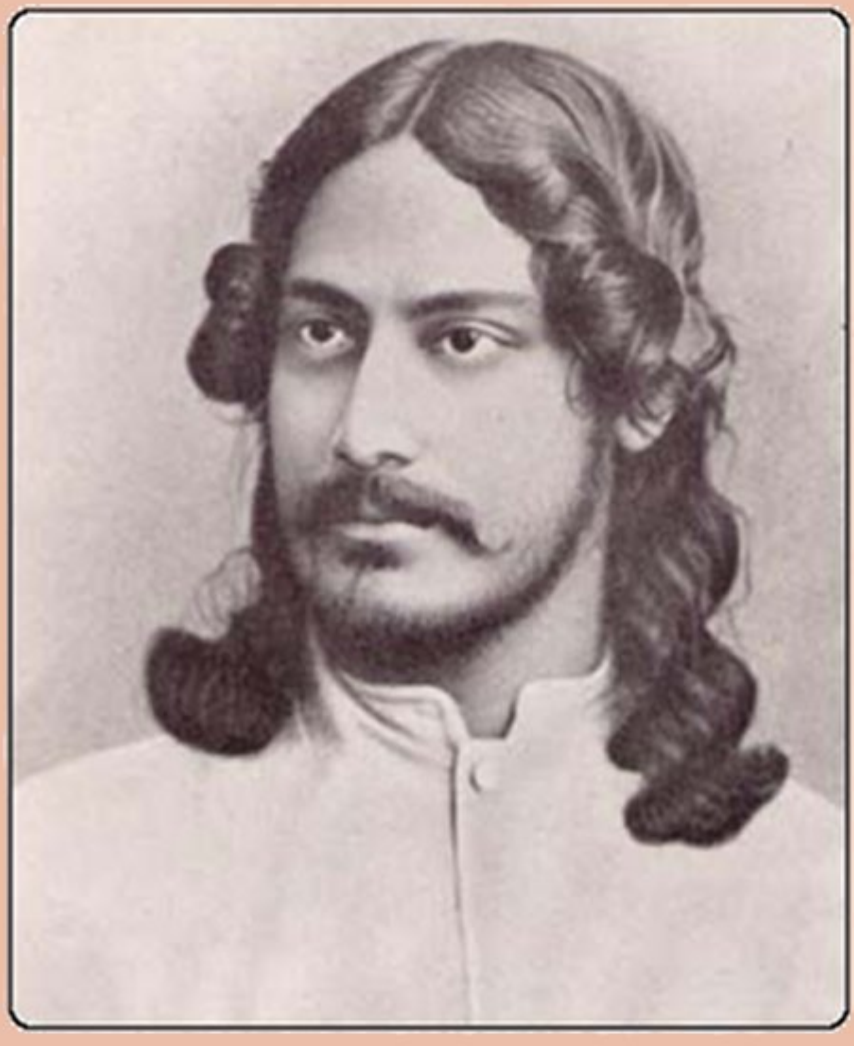

রবীন্দ্র-রচনাবলী

অষ্টাদশ খণ্ড

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

52,228.

বিশ্বভারতী
২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর গলি, কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ, ১৩৫১
মূল্য ৪॥০, ৬৸০, ৭৸০ ও ১০৲

মুদ্রাকর—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
প্রভু প্রেস, ৩০ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

সূচী

চিত্রসূচী ... ।৶৹

কবিতা ও গান

শেষ সপ্তক ... ১

সংযোজন ... ১০৫

নাটক ও প্রহসন

শেষ বর্ষণ ... ১২৫

নটীর পূজা ... ১৪৫

নটরাজ ... ১৯১

উপন্যাস ও গল্প

গল্পগুচ্ছ ... ২৫১

প্রবন্ধ

সঞ্চয় ... ৩২৭

পরিচয় ... ৪২৩

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম ... ৫৪৩

গ্রন্থ-পরিচয় ... ৫৬৭

বর্ণানুক্রমিক সূচী ... ৫৯৩

চিত্রসূচী

আমার শেষবেলাকার ঘরখানি	৩
ঘট ভরা	১১৫

কবিতা ও গান

শেষ সপ্তক

শেষ সপ্তক

এক

স্থির জেনেছিলেম, পেয়েছি তোমাকে,
মনেও হয়নি
তোমার দানের মূল্য যাচাই করার কথা।
তুমিও মূল্য করনি দাবি।
দিনের পর দিন গেল, রাতের পর রাত,
দিলে ডালি উজাড় ক'রে।
আড়চোখে চেয়ে
আনমনে নিলেম তা ভাণ্ডারে ;
পরদিনে মনে রইল না।
নববসন্তের মাধবী
যোগ দিয়েছিল তোমার দানের সঙ্গে,
শরতের পূর্ণিমা দিয়েছিল তাকে স্পর্শ।

তোমার কালো চুলের বন্যায়
আমার দুই পা ঢেকে দিয়ে বলেছিলে
"তোমাকে যা দিই
তোমার রাজকর তার চেয়ে অনেক বেশি ;
আরো দেওয়া হল না
আরো যে আমার নেই।"
বলতে বলতে তোমার চোখ এল ছলছলিয়ে।

আজ তুমি গেছ চলে,
দিনের পর দিন আসে, রাতের পর রাত,
তুমি আস না।

এতদিন পরে ভাণ্ডার খুলে
দেখছি তোমার রত্নমালা,
নিয়েছি তুলে বুকে।
যে গর্ব আমার ছিল উদাসীন
সে নুয়ে পড়েছে সেই মাটিতে
যেখানে তোমার দুটি পায়ের চিহ্ন আছে আঁকা

তোমার প্রেমের দাম দেওয়া হল বেদনায়,
হারিয়ে তাই পেলেম তোমায় পূর্ণ ক'রে।

শান্তিনিকেতন
১ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯

দুই

একদিন তুচ্ছ আলাপের ফাঁক দিয়ে
কোন্ অভাবনীয় স্মিতহাস্যে
আমার আত্মবিহ্বল যৌবনটাকে
দিলে তুমি দোলা ;
হঠাৎ চমক দিয়ে গেল তোমার মুখে
একটি অমৃতরেখা ;
আর কোনোদিন তার দেখা মেলেনি।
জোয়ারের তরঙ্গলীলায় গভীর থেকে উৎক্ষিপ্ত হল
চিরদুর্লভের একটি রত্নকণা
শতলক্ষ ঘটনার সমুদ্র-বেলায়।

এমনি এক পলকে বুকে এসে লাগে
অপরিচিত মুহূর্তের চকিত বেদনা
প্রাণের আধখোলা জালনায়
দূর বনান্ত থেকে
পথ-চলতি গানে।

অভূতপূর্বের অদৃশ্য অঙ্গুলি বিরহের মীড় লাগিয়ে যায়
হৃদয়-তারে
বৃষ্টিধারামুখর নির্জন প্রবাসে,
সন্ধ্যাযূথীর করুণ স্নিগ্ধ গন্ধে,
রেখে দিয়ে যায় কোন্ অলক্ষ্য আকস্মিক
আপন স্খলিত উত্তরীয়ের স্পর্শ।

তার পরে মনে পড়ে
একদিন সেই বিস্ময়-উন্মনা নিমেষটিকে
অকারণে অসময়ে ;
মনে পড়ে শীতের মধ্যাহ্নে,
যখন গোরুচরা শস্যরিক্ত মাঠের দিকে
চেয়ে চেয়ে বেলা যায় কেটে ;
মনে পড়ে, যখন সঙ্গহারা সায়াহ্নের অন্ধকারে
সূর্যাস্তের ওপার থেকে বেজে ওঠে
ধ্বনিহীন বীণার বেদনা।

তিন

ফুরিয়ে গেল পৌষের দিন ;
কৌতূহলী ভোরের আলো
কুয়াশার আবরণ দিলে সরিয়ে।
হঠাৎ দেখি শিশিরে-ভেজা বাতাবি গাছে
ধরেছে কচি পাতা ;
সে যেন আপনি বিস্মিত
একদিন তমসার কূলে বাল্মীকি
আপনার প্রথম নিশ্বসিত ছন্দে
চকিত হয়েছিলেন নিজে,—
তেমনি দেখলেম ওকে।

অনেকদিনকার নিঃশব্দ অবহেলা থেকে
অরুণ-আলোতে অকুণ্ঠিত বাণী এনেছে
-এই কয়টি কিশলয় ;
সে যেন সেই একটুখানি কথা
যা তুমিই বলতে পারতে,
কিন্তু না ব'লে গিয়েছ চলে।

সেদিন বসন্ত ছিল অনতিদূরে ;
তোমার আমার মাঝখানে ছিল
আধ-চেনার যবনিকা ;
কেঁপে উঠল সেটা মাঝে মাঝে ;
মাঝে মাঝে তার একটা কোণ গেল উড়ে ;
দুরন্ত হয়ে উঠল দক্ষিণ বাতাস,
তবু সরাতে পারেনি অন্তরাল।
উচ্ছৃঙ্খল অবকাশ ঘটল না ;
ঘণ্টা গেল বেজে,
সায়াহ্নে তুমি চলে গেলে অব্যক্তের অনালোকে।

চার

যৌবনের প্রান্তসীমায়
জড়িত হয়ে আছে অরুণিমার ম্লান অবশেষ ;—
যাক কেটে এর আবেশটুকু ;
সুস্পষ্টের মধ্যে জেগে উঠুক
আমার ঘোর-ভাঙা চোখ
স্মৃতিবিস্মৃতির নানা বর্ণে রঞ্জিত
দুঃখসুখের বাষ্পঘনিমা
স'রে যাক সন্ধ্যামেঘের মতো
আপনাকে উপেক্ষা ক'রে।

ঝরে-পড়া ফুলের ঘনগন্ধে আবিষ্ট আমার প্রাণ,
চারদিকে তার স্বপ্ন মৌমাছি
গুন গুন করে বেড়ায়,
কোন্ অলক্ষ্যের সৌরভে।
এই ছায়ার বেড়ায় বদ্ধ দিনগুলো থেকে
বেরিয়ে আসুক মন
শুভ্র আলোকের প্রাঞ্জলতায়।
অনিমেষ দৃষ্টি ভেসে যাক
কথাহীন ব্যথাহীন চিন্তাহীন
সৃষ্টির মহাসাগরে।

যাব লক্ষ্যহীন পথে,
সহজে দেখব সব দেখা,
শুনব সব সুর,
চলন্ত দিনরাত্রির
কলরোলের মাঝখান দিয়ে।
আপনাকে মিলিয়ে নেব
শস্যশেষ প্রান্তরের
সুদূরবিস্তীর্ণ বৈরাগ্যে।
ধ্যানকে নিবিষ্ট করব
ঐ নিস্তব্ধ শালগাছের মধ্যে
যেখানে নিমেষের অন্তরালে
সহস্রবৎসরের প্রাণ নীরবে রয়েছে সমাহিত

কাক ডাকছে তেঁতুলের ডালে,
চিল মিলিয়ে গেল রৌদ্রপাণ্ডুর সুদূর নীলিমায়।
বিলের জলে বাঁধ বেঁধে
ডিঙি নিয়ে মাছ ধরছে জেলে।
বিলের পরপারে পুরাতন গ্রামের আভাস,
ফিকে রঙের নীলাম্বরের প্রান্তে
বেগনি রঙের আঁচলা।

গাঙচিল উড়ে বেড়াচ্ছে
মাছধরা জালের উপরকার আকাশে।
মাছরাঙা স্তব্ধ বসে আছে বাঁশের খোঁটায়,
তার স্থির ছায়া নিস্তরঙ্গ জলে।
ভিজে বাতাসে শ্যাওলার ঘন স্নিগ্ধগন্ধ।

চারদিক থেকে অস্তিত্বের এই ধারা
নানা শাখায় বইছে দিনেরাত্রে।
অতি পুরাতন প্রাণের বহুদিনের নানা পণ্য নিয়ে
এই সহজ প্রবাহ,—
মানব-ইতিহাসের নূতন নূতন
ভাঙনগড়নের উপর দিয়ে
এর নিত্য যাওয়া আসা।

চঞ্চল বসন্তের অবসানে
আজ আমি অলস মনে
আকণ্ঠ ডুব দেব এই ধারার গভীরে;
এর কলধ্বনি বাজবে আমার বুকের কাছে
আমার রক্তের মৃদুতালের ছন্দে।
এর আলো ছায়ার উপর দিয়ে
ভাসতে ভাসতে চলে যাক আমার চেতনা
চিন্তাহীন তর্কহীন শাস্ত্রহীন
মৃত্যু-মহাসাগরসংগমে।

পাঁচ

বর্ষা নেমেছে প্রান্তরে অনিমন্ত্রণে;
ঘনিয়েছে সার-বাঁধা তালের চূড়ায়,
রোমাঞ্চ দিয়েছে বাঁধের কালো জলে।
বর্ষা নামে হৃদয়ের দিগন্তে
যখন পারি তাকে আহ্বান করতে।

কিছুকাল ছিলেম বিদেশে।
সেখানকার শ্রাবণের ভাষা
আমার প্রাণের ভাষার সঙ্গে মেলেনি।
তার অভিষেক হল না
আমার অন্তরপ্রাঙ্গণে।

সজল মেঘ-শ্যামলের
সঞ্চরণ থেকে বঞ্চিত জীবনে
কিছু শীর্ণতা রয়ে গেল।
বনস্পতির অঙ্গের আয়তি
ঐ তো দেয় বাড়িয়ে
বছরে বছরে;
তার কাষ্ঠফলকে চক্রচিহ্নে স্বাক্ষর যায় রেখে

তেমনি ক'রে প্রতি বছরে বর্ষার আনন্দ
আমার মজ্জার মধ্যে রসসম্পদ
কিছু যোগ করে।
প্রতিবার রঙের প্রলেপ লাগে
জীবনের পটভূমিকায়
নিবিড়তর ক'রে;
বছরে বছরে শিল্পকারের
অঙ্গুলি-মুদ্রার গুপ্ত সংকেত
অঙ্কিত হয় অন্তর-ফলকে।

নিরালায় জানলার কাছে বসেছি যখন
নিষ্কর্মা প্রহরগুলো নিঃশব্দ চরণে
কিছু দান রেখে গেছে আমার দেহলিতে;
জীবনের গুপ্ত ধনের ভাণ্ডারে
পুঞ্জিত হয়েছে বিস্মৃত মুহূর্তের সঞ্চয়।

বহু বিচিত্রের কারুকলায় চিত্রিত
এই আমার সমগ্র সত্তা
তার সমস্ত সঞ্চয় সমস্ত পরিচয় নিয়ে
কোনো যুগে কি কোনো দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে
পরিপূর্ণ অবারিত হবে ?

তার সকল তপস্যায় সে চেয়েছে
গোচরতাকে ;
বলেছে, যেমন বলে গোধূলির অস্ফুট তারা,
বলেছে, যেমন বলে নিশান্তের অরুণ আভাস,—
"এস প্রকাশ, এস।"

কবে প্রকাশ হবে পূর্ণ,
আপনি প্রত্যক্ষ হব আপনার আলোতে
বধূ যেমন সত্য ক'রে জানে আপনাকে,
সত্য ক'রে জানায়,
যখন প্রাণে জাগে তার প্রেম,
যখন দুঃখকে পারে সে গলার হার করতে,
যখন দৈন্যকে দেয় সে মহিমা,
যখন মৃত্যুতে ঘটে না তার অসমাপ্তি।

ছয়

দিনের প্রান্তে এসেছি
গোধূলির ঘাটে।
পথে পথে পাত্র ভরেছি
অনেক কিছু দিয়ে।
ভেবেছিলেম চিরপথের পাথেয় সেগুলি ;
দাম দিয়েছি কঠিন দুঃখে।

অনেক করেছি সংগ্রহ মানুষের কথার হাটে,
কিছু করেছি সঞ্চয় প্রেমের সদাব্রতে।
শেষে ভুলেছি সার্থকতার কথা,
অকারণে কুড়িয়ে বেড়ানোই হয়েছে অন্ধ অভ্যাসে বাঁধা;
ফুটো ঝুলিটার শূন্য ভরাবার জন্যে
বিশ্রাম ছিল না।

আজ সামনে যখন দেখি
ফুরিয়ে এল পথ,
পাথেয়ের অর্থ আর রইল না কিছুই।
যে প্রদীপ জ্বলেছিল মিলন-শয্যার পাশে
সেই প্রদীপ এনেছিলেম হাতে ক'রে।
তার শিখা নিবল আজ,
সেটা ভাসিয়ে দিতে হবে স্রোতে।
সামনের আকাশে জ্বলবে একলা সন্ধ্যার তারা।
যে বাঁশি বাজিয়েছি
ভোরের আলোয়, নিশীথের অন্ধকারে,
তার শেষ সুরটি বেজে থামবে
রাতের শেষ প্রহরে।

তার পরে?
যে জীবনে আলো নিবল,
সুর থামল,
সে যে এই আজকের সমস্ত কিছুর মতোই
ভরা সত্য ছিল,
সে-কথা একেবারেই ভুলবে জানি,
ভোলাই ভালো।
তবু তার আগে কোনো একদিনের জন্য
কেউ একজন
সেই শূন্যটার কাছে একটা ফুল রেখো
বসন্তের যে ফুল একদিন বেসেছি ভালো।

আমার এতদিনকার যাওয়া-আসার পথে
শুকনো পাতা ঝরেছে,
সেখানে মিলেছে আলোক ছায়া,
বৃষ্টিধারায় আমকাঁঠালের ডালে ডালে
জেগেছে শব্দের শিহরণ,
সেখানে দৈবে কারো সঙ্গে দেখা হয়েছিল
জল-ভরা ঘট নিয়ে যে চলে গিয়েছিল
চকিত পদে।

এই সামান্য ছবিটুকু
আর সব কিছু থেকে বেছে নিয়ে
কেউ একজন আপন ধ্যানের পটে এঁকো
কোনো একটি গোধূলির ধূসরমুহূর্তে।

আর বেশি কিছু নয়।
আমি আলোর প্রেমিক ;
প্রাণরঙ্গভূমিতে ছিলুম বাঁশি-বাজিয়ে।
পিছনে ফেলে যাব না একটা নীরব ছায়া
দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে।
যে পথিক অস্তসূর্যের
ম্লায়মান আলোর পথ নিয়েছে
সে তো ধুলোর হাতে উজাড় করে দিলে
সমস্ত আপনার দাবি ;
সেই ধুলোর উদাসীন বেদীটার সামনে
রেখে যেয়ো না তোমার নৈবেদ্য ;
ফিরে নিয়ে যাও অন্নের থালি,
যেখানে তাকিয়ে আছে ক্ষুধা,
যেখানে অতিথি বসে আছে দ্বারে,
যেখানে প্রহরে প্রহরে বাজছে ঘণ্টা
জীবনপ্রবাহের সঙ্গে কালপ্রবাহের
মিলের মাত্রা রেখে।

সাত

অনেক হাজার বছরের
মরু-যবনিকার আচ্ছাদন
যখন উৎক্ষিপ্ত হল,
দেখা দিল তারিখ-হারানো লোকালয়ের
বিরাট কঙ্কাল ;—
ইতিহাসের অলক্ষ্য অন্তরালে
ছিল তার জীবনক্ষেত্র।
তার মুখরিত শতাব্দী
আপনার সমস্ত কবিগান
বাণীহীন অতলে দিয়েছে বিসর্জন।
আর, যে-সব গান তখনো ছিল অঙ্কুরে, ছিল মুকুলে,
যে বিপুল সম্ভাব্য
সেদিন অনালোকে ছিল প্রচ্ছন্ন
অপ্রকাশ থেকে অপ্রকাশেই গেল মগ্ন হয়ে—
যা ছিল অপ্রজ্বল ধোঁওয়ার গোপন আচ্ছাদনে
তাও নিবল।
যা বিকাল, আর যা বিকাল না,—
দুই-ই সংসারের হাট থেকে গেল চলে
একই মূল্যের ছাপ নিয়ে।
কোথাও রইল না তার ক্ষত,
কোথাও বাজল না তার ক্ষতি।

ঐ নির্মল নিঃশব্দ আকাশে
অসংখ্য কল্প-কল্পান্তরের
হয়েছে আবর্তন।
নূতন নূতন বিশ্ব
অন্ধকারের নাড়ি ছিঁড়ে
জন্ম নিয়েছে আলোকে,

ভেসে চলেছে আলোড়িত নক্ষত্রের ফেনপুঞ্জে ;
অবশেষে যুগান্তে তারা তেমনি করেই গেছে
যেমন গেছে বর্ষণশান্ত মেঘ,
যেমন গেছে ক্ষণজীবী পতঙ্গ।

মহাকাল, সন্ন্যাসী তুমি।
তোমার অতলস্পর্শ ধ্যানের তরঙ্গ-শিখরে
উচ্ছৃত হয়ে উঠছে সৃষ্টি
আবার নেমে যাচ্ছে ধ্যানের তরঙ্গতলে।
প্রচণ্ড বেগে চলেছে ব্যক্ত অব্যক্তের চক্রনৃত্য,
তারি নিস্তব্ধ কেন্দ্রস্থলে
তুমি আছ অবিচলিত আনন্দে
হে নির্মম, দাও আমাকে তোমার ঐ সন্ন্যাসের দীক্ষা।
জীবন আর মৃত্যু, পাওয়া আর হারানোর মাঝখানে
যেখানে আছে অক্ষুব্ধ শান্তি
সেই সৃষ্টি-হোমাগ্নিশিখার অন্তরতম
স্তিমিত নিভৃতে
দাও আমাকে আশ্রয়।

১৯ চৈত্র, ১৩৪১

আট

মনে মনে দেখলুম
সেই দূর অতীত যুগের নিঃশব্দ সাধনা
যা মুখর ইতিহাসকে নিষিদ্ধ রেখেছে
আপন তপস্যার আসন থেকে।

দেখলেম দুর্গম গিরিব্রজে
কোলাহলী কৌতূহলী দৃষ্টির অন্তরালে
অসূর্যম্পশ্য নিভৃতে

ছবি আঁকছে গুণী
গুহাভিত্তির 'পরে,
যেমন অন্ধকার পটে
সৃষ্টিকার আঁকছেন বিশ্বছবি।

সেই ছবিতে ওরা আপন আনন্দকেই করেছে সত্য,
আপন পরিচয়কে করেছে উপেক্ষা,
দাম চায়নি বাইরের দিকে হাত পেতে,
নামকে দিয়েছে মুছে।
হে অনামা, হে রূপের তাপস,
প্রণাম করি তোমাদের।
নামের মায়াবন্ধন থেকে মুক্তির স্বাদ পেয়েছি
তোমাদের এই যুগান্তরের কীর্তিতে।

নাম-ক্ষালন যে পবিত্র অন্ধকারে ডুব দিয়ে
তোমাদের সাধনাকে করেছিলে নির্মল,
সেই অন্ধকারের মহিমাকে
আমি আজ বন্দনা করি।
তোমাদের নিঃশব্দ বাণী
রয়েছে এই গুহায়,
বলছে—নামের পূজার অর্ঘ্য,
ভাবীকালের খ্যাতি,
সে তো প্রেতের অন্ন;
ভোগশক্তিহীন নিরর্থকের কাছে উৎসর্গ-করা।
তার পিছনে ছুটে
সদ্য বর্তমানের অন্নপূর্ণার
পরিবেষণ এড়িয়ে যেয়ো না, মোহান্ধ।

আজ আমার দ্বারের কাছে
শজনে গাছের পাতা গেল ঝ'রে,

ডালে ডালে দেখা দিয়েছে
কচি পাতার রোমাঞ্চ ;
এখন প্রৌঢ় বসন্তের পারের খেয়া
চৈত্রমাসের মধ্যস্রোতে ;
মধ্যাহ্নের তপ্ত হাওয়ায়
গাছে গাছে দোলাদুলি ;
উড়তি ধুলোয় আকাশের নীলিমাতে
ধূসরের আভাস,
নানা পাখির কলকাকলিতে
বাতাসে আঁকছে শব্দের অস্ফুট আলপনা।

এই নিত্য-বহমান অনিত্যের স্রোতে
আত্মবিস্মৃত চলতি প্রাণের হিল্লোল ;
তার কাঁপনে আমার মন ঝলমল করছে
কৃষ্ণচূড়ার পাতার মতো।
অঞ্জলি ভরে এই তো পাচ্ছি
সদ্য মুহূর্তের দান,
এর সত্যে নেই কোনো সংশয়, কোনো বিরোধ।
যখন কোনোদিন গান করেছি রচনা,
সেও তো আপন অন্তরে
এইরকম পাতার হিল্লোল,
হাওয়ার চাঞ্চল্য,
রৌদ্রের ঝলক,
প্রকাশের হর্ষবেদনা।
সেও তো এসেছে বিনা নামের অতিথি,
ঘর-ঠিকানার পথিক।
তার যেটুকু সত্য
তা সেই মুহূর্তেই পূর্ণ হয়েছে,
তার বেশি আর বাড়বে না একটুও,
নামের পিঠে চড়ে।

বর্তমানের দিগন্তপারে
যে-কাল আমার লক্ষ্যের অতীত
সেখানে অজানা অনাত্মীয় অসংখ্যের মাঝখানে
যখন ঠেলাঠেলি চলবে
লক্ষ লক্ষ নামে নামে,
তখন তারি সঙ্গে দৈবক্রমে চলতে থাকবে
বেদনাহীন চেতনাহীন ছায়ামাত্রসার
আমারো নামটা,
ধিক থাক্ সেই কাঙাল কল্পনার মরীচিকায়।
জীবনের অল্প কয়দিনে
বিশ্বব্যাপী নামহীন আনন্দ
দিক আমাকে নিরহংকার মুক্তি।

সেই অন্ধকারকে সাধনা করি
যার মধ্যে স্তব্ধ বসে আছেন
বিশ্বচিত্রের রূপকার, যিনি নামের অতীত,
প্রকাশিত যিনি আনন্দে।

১।৪।৩৫
শান্তিনিকেতন

নয়

ভালোবেসে মন বললে—
"আমার সব রাজত্ব দিলেম তোমাকে।"
অবুঝ ইচ্ছাটা করলে অত্যুক্তি;
দিতে পারবে কেন?
সবটার নাগাল পাব কেমন ক'রে?
ও যে একটা মহাদেশ,
সাত সমুদ্রে বিচ্ছিন্ন।
ওখানে বহুদূর নিয়ে একা বিরাজ করছে
নির্বাক্ অনতিক্রমণীয়।

তার মাথা উঠেছে মেঘে-ঢাকা পাহাড়ের চূড়ায়,
তার পা নেমেছে আঁধারে-ঢাকা গহ্বরে।

এ যেন অগম্য গ্রহ এই আমার সত্তা,
বাষ্প-আবরণে ফাঁক পড়েছে কোণে কোণে,
দূরবীনের সন্ধান সেইটুকুতেই।
যাকে বলতে পারি আমার সবটা,
তার নাম দেওয়া হয়নি,
তার নকশা শেষ হবে কবে?
তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ব্যবহারের সম্পর্ক হবে কার?
নামটা রয়েছে যে-পরিচয়টুকু নিয়ে,
টুকরো-জোড়া দেওয়া তার রূপ,
অনাবিষ্কৃতের প্রান্ত থেকে সংগ্রহ-করা।

চারিদিকে ব্যর্থ ও সার্থক কামনার
আলোয় ছায়ায় বিকীর্ণ আকাশ।
সেখান থেকে নানা বেদনার রঙিন ছায়া নামে
চিত্তভূমিতে;
হাওয়ায় লাগে শীত বসন্তের ছোঁওয়া;
সেই অদৃশ্যের চঞ্চল লীলা
কার কাছেই বা স্পষ্ট হল?
ভাষার অঞ্জলিতে
কে ধরতে পারে তাকে?
জীবনভূমির এক প্রান্ত দৃঢ় হয়েছে
কর্মবৈচিত্র্যের বন্ধুরতায়,
আর এক প্রান্তে অচরিতার্থ সাধনা
বাষ্প হয়ে মেঘায়িত হল শূন্যে,
মরীচিকা হয়ে আঁকছে ছবি।

এই ব্যক্তিজগৎ মানবলোকে দেখা দিল
জন্মমৃত্যুর সংকীর্ণ সংগমস্থলে।

তার আলোকহীন প্রদেশে
বৃহৎ অগোচরতায় পুঞ্জিত আছে
আত্মবিস্মৃত শক্তি,
মূল্য পায়নি এমন মহিমা,
অনঙ্কুরিত সফলতার বীজ মাটির তলায়।
সেখানে আছে ভীরুর লজ্জা,
প্রচ্ছন্ন আত্মাবমাননা,
অখ্যাত ইতিহাস,
আছে আত্মাভিমানের
ছদ্মবেশের বহু উপকরণ,—
সেখানে নিগূঢ় নিবিড় কালিমা
অপেক্ষা করছে মৃত্যুর হাতের মার্জনা।

এই অপরিণত অপ্রকাশিত আমি,
এ কার জন্যে, এ কিসের জন্যে ?
যা নিয়ে এল কত সূচনা, কত ব্যঞ্জনা,
বহু বেদনায় বাঁধা হতে চলল যার ভাষা,
পৌঁছল না যা বাণীতে,
তার ধ্বংস হবে অকস্মাৎ নিরর্থকতার অতলে,
সইবে না সৃষ্টির এই ছেলেমানুষি।

অপ্রকাশের পর্দা টেনেই কাজ করেন গুণী ;
ফুল থাকে কুঁড়ির অবগুণ্ঠনে,
শিল্পী আড়ালে রাখেন অসমাপ্ত শিল্পপ্রয়াসকে ;
কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়,
নিষেধ আছে সমস্তটা দেখতে পাওয়ার পথে।

আমাতে তাঁর ধ্যান সম্পূর্ণ হয়নি,
তাই আমাকে বেষ্টন ক'রে এতখানি নিবিড় নিস্তব্ধতা।
তাই আমি অপ্রাপ্য, আমি অচেনা ;

অজানার ঘেরের মধ্যে এ সৃষ্টি রয়েছে তাঁরি হাতে,
কারো চোখের সামনে ধরবার সময় আসেনি,
সবাই রইল দূরে,—
যারা বললে "জানি", তারা জানল না।

২৭।৩।৩৫
শান্তিনিকেতন

দশ

মনে হয়েছিল আজ সব-কটা দুর্গ্রহ
চক্র ক'রে বসেছে দুর্মন্ত্রণায়।
অদৃষ্ট জাল ফেলে অন্তরের শেষ তলা থেকে
টেনে টেনে তুলছে নাড়ি-ছেঁড়া যন্ত্রণাকে।
মনে হয়েছিল, অন্তহীন এই দুঃখ ;
মনে হয়েছিল, পন্থহীন নৈরাশ্যের বাধায়
শেষ পর্যন্ত এমনি ক'রে
অন্ধকার হাতড়িয়ে বেড়ানো।
ভিতসুদ্ধ বাসা গেছে ডুবে,
ভাগ্যের ভাঙনের অপঘাতে

এমন সময়ে সদ্যবর্তমানের
প্রাকার ডিঙিয়ে দৃষ্টি গেল
দূর অতীতের দিগন্তলীন
বাগ্‌বাদিনীর বাণীসভায়।
যুগান্তরের ভগ্নশেষের ভিত্তিচ্ছায়ায়
ছায়ামূর্তি বাজিয়ে তুলেছে রুদ্রবীণায়
পুরাণখ্যাত কালের কোন্ নিষ্ঠুর আখ্যায়িকা।

দুঃসহ দুঃখের স্মরণতন্তু দিয়ে গাঁথা
সেই দারুণ কাহিনী।

কোন্ দুর্দাম সর্বনাশের
বজ্রঝঞ্ঝনিত মৃত্যুমাতাল দিনের
হুহুংকার,
যার আতঙ্কের কম্পনে
ঝংকৃত করছে বীণাপাণি
আপন বীণার তীব্রতম তার।

দেখতে পেলেম
কতকালের দুঃখ লজ্জা গ্লানি,
কত যুগের জ্বলংধারা মর্মনিঃস্রাব
সংহত হয়েছে,
ধরেছে দহনহীন বাণীমূর্তি
অতীতের সৃষ্টিশালায়।

আর তার বাইরে পড়ে আছে
নির্বাপিত বেদনার পর্বতপ্রমাণ ভস্মরাশি,
জ্যোতির্হীন বাক্যহীন অর্থশূন্য।

এগারো

ভোরের আলো-আঁধারে
থেকে থেকে উঠছে কোকিলের ডাক
যেন ক্ষণে ক্ষণে শব্দের আতশবাজি।
ছেঁড়া মেঘ ছড়িয়েছে আকাশে
একটু একটু সোনার লিখন নিয়ে।

হাটের দিন,
মাঠের মাঝখানকার পথে
চলেছে গোরুর গাড়ি।
কলসীতে নতুন আখের গুড়, চালের বস্তা,
গ্রামের মেয়ে কাঁখের ঝুড়িতে নিয়েছে
কচুশাক, কাঁচা আম, শজনের ডাঁটা।

ছটা বাজল ইস্কুলের ঘড়িতে।
ঐ ঘণ্টার শব্দ আর সকাল বেলাকার কাঁচা রোদ্দুরের রং
মিলে গেছে আমার মনে।
আমার ছোটো বাগানের পাঁচিলের গায়ে
বসেছি চৌকি টেনে
করবীগাছের তলায়।
পুবদিক থেকে রোদ্দুরের ছটা
বাঁকা ছায়া হানছে ঘাসের 'পরে।
বাতাসে অস্থির দোলা লেগেছে
পাশাপাশি দুটি নারকেলের শাখায়।
মনে হচ্ছে যমজ শিশুর কলরবের মতো।
কচি দাড়িম ধরেছে গাছে
চিকন সবুজের আড়ালে।

চৈত্রমাস ঠেকল এসে শেষ হপ্তায়।
আকাশে ভাসা বসন্তের নৌকায়
পাল পড়েছে ঢিলে হয়ে।
দূর্বাঘাস উপবাসে শীর্ণ;
কাঁকর-ঢালা পথের ধারে
বিলিতি মৌসুমি চারায়
ফুলগুলি রং হারিয়ে সংকুচিত।
হাওয়া দিয়েছে পশ্চিম দিক থেকে,—
বিদেশী হাওয়া চৈত্রমাসের আঙিনাতে।
গায়ে দিতে হল আবরণ অনিচ্ছায়।
বাঁধানো জলকুণ্ডে জল উঠছে শিরশিরিয়ে,
টলমল করছে নালগাছের পাতা,
লাল মাছ কটা চঞ্চল হয়ে উঠল।

নেবুঘাস ঝাঁকড়া হয়ে উঠেছে
খেলা-পাহাড়ের গায়ে।

তার মধ্যে থেকে দেখা যায়
গেরুয়া পাথরের চতুর্মুখ মূর্তি।
সে আছে প্রবহমান কালের দূর তীরে
উদাসীন ;
ঋতুর স্পর্শ লাগে না তার গায়ে।
শিল্পের ভাষা তার,
গাছপালার বাণীর সঙ্গে কোনো মিল নেই।
ধরণীর অন্তঃপুর থেকে যে শুশ্রূষা
দিনে রাতে সঞ্চারিত হচ্ছে
সমস্ত গাছের ডালে ডালে পাতায় পাতায়,
ঐ মূর্তি সেই বৃহৎ আত্মীয়তার বাইরে।
মানুষ আপন গূঢ় বাক্য অনেক কাল আগে
যক্ষের মৃত ধনের মতো
ওর মধ্যে রেখেছে নিরুদ্ধ ক'রে,
প্রকৃতির বাণীর সঙ্গে তার ব্যবহার বন্ধ।

সাতটা বাজল ঘড়িতে।
ছড়িয়ে-পড়া মেঘগুলি গেছে মিলিয়ে।
সূর্য উঠল প্রাচীরের উপরে,
ছোটো হয়ে গেল গাছের যত ছায়া।
খিড়কির দরজা দিয়ে
মেয়েটি ঢুকল বাগানে।
পিঠে দুলছে ঝালরওআলা বেণী,
হাতে কঞ্চির ছড়ি ;
চরাতে এনেছে
একজোড়া রাজহাঁস,
আর তার ছোটো ছোটো ছানাগুলিকে।
হাঁস দুটো দাম্পত্য দায়িত্বের মর্যাদায় গম্ভীর,
সকলের চেয়ে গুরুতর ঐ মেয়েটির দায়িত্ব

জীবপ্রাণের দাবি স্পন্দমান
ছোট্ট ঐ মাতৃমনের স্নেহরসে।

আজকের এই সকালটুকুকে
ইচ্ছে করেছি রেখে দিতে।
ও এসেছে অনায়াসে,
অনায়াসেই যাবে চলে।
যিনি দিলেন পাঠিয়ে
তিনি আগেই এর মূল্য দিয়েছেন শোধ ক'রে
আপন আনন্দ-ভাণ্ডার থেকে।

বারো

কেউ চেনা নয়
সব মানুষই অজানা।
চলেছে আপনার রহস্যে
আপনি একাকী।
সেখানে তার দোসর নেই।
সংসারের ছাপমারা কাঠামোয়
মানুষের সীমা দিই বানিয়ে।
সংজ্ঞার বেড়া-দেওয়া বসতির মধ্যে
বাঁধা মাইনেয় কাজ করে সে।
থাকে সাধারণের চিহ্ন নিয়ে ললাটে।

এমন সময় কোথা থেকে
ভালোবাসার বসন্ত-হাওয়া লাগে,
সীমার আড়ালটা যায় উড়ে,
বেরিয়ে পড়ে চির-অচেনা।
সামনে তাকে দেখি স্বয়ংস্বতন্ত্র, অপূর্ব, অসাধারণ,
তার জুড়ি কেউ নেই।

তার সঙ্গে যোগ দেবার বেলায়
বাঁধতে হয় গানের সেতু,
ফুলের ভাষায় করি তার অভ্যর্থনা।

চোখ বলে,
যা দেখলুম, তুমি আছ তাকে পেরিয়ে।
মন বলে
চোখে-দেখা কানে-শোনার ওপারে যে রহস্য
তুমি এসেছ সেই অগমের দূত,—
রাত্রি যেমন আসে
পৃথিবীর সামনে নক্ষত্রলোক অবারিত ক'রে।
তখন হঠাৎ দেখি আমার মধ্যেকার অচেনাকে,
তখন আপন অনুভবের
তল খুঁজে পাইনে,
সেই অনুভব
"তিলে তিলে নূতন হোয়।"

তেরো

রাস্তায় চলতে চলতে
বাউল এসে থামল
তোমার সদর দরজায়।
গাইল, "অচিন পাখি উড়ে আসে খাঁচায়" :
দেখে অবুঝ মন বলে—
অধরাকে ধরেছি।

তুমি তখন স্নানের পরে এলোচুলে
দাঁড়িয়েছিলে জানলায়।
অধরা ছিল তোমার দূরে-চাওয়া চোখের
পল্লবে,
অধরা ছিল তোমার কাঁকন-পরা নিটোল হাতের
মধুরিমায়।

ওকে ভিক্ষে দিলে পাঠিয়ে,
ও গেল চলে ;
জানলে না এইগানে তোমারই কথা।

তুমি রাগিণীর মতো আস যাও
একতারার তারে তারে।
সেই যন্ত্র তোমার রূপের খাঁচা,
দোলে বসন্তের বাতাসে।
তাকে বেড়াই বুকে ক'রে ;
ওতে রং লাগাই, ফুল কাটি
আপন মনের সঙ্গে মিলিয়ে।
যখন বেজে ওঠে, ওর রূপ যাই ভুলে,
কাঁপতে কাঁপতে ওর তার হয় অদৃশ্য
অচিন তখন বেরিয়ে আসে বিশ্বভুবনে,
খেলিয়ে যায় বনের সবুজে
মিলিয়ে যায় দোলনচাঁপার গন্ধে।

অচিন পাখি তুমি,
মিলনের খাঁচায় থাক,
নানা সাজের খাঁচা।
সেখানে বিরহ নিত্য থাকে পাখির পাখায়,
স্থকিত ওড়ার মধ্যে।
তার ঠিকানা নেই,
তার অভিসার দিগন্তের পারে
সকল দৃশ্যের বিলীনতায়।

চোদ্দো

কালো অন্ধকারের তলায়
পাখির শেষ গান গিয়েছে ডুবে।
বাতাস থমথমে,
গাছের পাতা নড়ে না,

স্বচ্ছরাত্রের তারাগুলি
যেন নেমে আসছে
পুরাতন মহানিম গাছের
ঝিল্লি-ঝংকৃত স্তব্ধ রহস্যের কাছাকাছি।

এমন সময়ে হঠাৎ আবেগে
আমার হাত ধরলে চেপে ;
বললে, "তোমাকে ভুলব না কোনোদিনই।"
দীপহীন বাতায়নে
আমার মূর্তি ছিল অস্পষ্ট,
সেই ছায়ার আবরণে
তোমার অন্তরতম আবেদনের
সংকোচ গিয়েছিল কেটে।

সেই মুহূর্তে তোমার প্রেমের অমরাবতী
ব্যাপ্ত হল অনন্ত স্মৃতির ভূমিকায়।
সেই মুহূর্তের আনন্দবেদনা
বেজে উঠল কালের বীণায়,
প্রসারিত হল আগামী জন্মজন্মান্তরে।
সেই মুহূর্তে আমার আমি
তোমার নিবিড় অনুভবের মধ্যে
পেল নিঃসীমতা।
তোমার কম্পিত কণ্ঠের বাণীটুকুতে
সার্থক হয়েছে আমার প্রাণের সাধনা,
সে পেয়েছে অমৃত।
তোমার সংসারে অসংখ্য যা-কিছু আছে
তার সবচেয়ে অত্যন্ত ক'রে আছি আমি,
অত্যন্ত বেঁচে।

এই নিমেষটুকুর বাইরে আর যা-কিছু
সে গৌণ।

এর বাইরে আছে মরণ,
একদিন রূপের আলো-জ্বালা রঙ্গমঞ্চ থেকে
সরে যাবে নেপথ্যে।
প্রত্যক্ষ সুখদুঃখের জগতে
মূর্তিমান অসংখ্যতার কাছে
আমার স্মরণচ্ছায়া মানবে পরাভব।
তোমার দ্বারের কাছে আছে যে কৃষ্ণচূড়া
যার তলায় দুবেলা জল দাও আপন হাতে,
সেও প্রধান হয়ে উঠে'
তার ডালপালার বাইরে
সরিয়ে রাখবে আমাকে
বিশ্বের বিরাট অগোচরে।
তা হ'ক,
এও গৌণ।

পনেরো

শ্রীমতী রানী দেবী কল্যাণীয়াসু

১

আমি বদল করেছি আমার বাসা।
দুটিমাত্র ছোটো ঘরে আমার আশ্রয়।
ছোটো ঘরই আমার মনের মতো।
তার কারণ বলি তোমাকে।

বড়ো ঘর বড়োর ভান করে মাত্র,
আসল বড়োকে বাইরে ঠেকিয়ে রাখে অবজ্ঞায়।
আমার ছোটো ঘর বড়োর ভান করে না।
অসীমের প্রতিযোগিতার স্পর্ধা তার নেই
ধনী ঘরের মূঢ় ছেলের মতো।

আকাশের শখ ঘরে মেটাতে চাইনে ;
তাকে পেতে চাই তার স্বস্থানে,
পেতে চাই বাইরে পূর্ণভাবে।

বেশ লাগছে।
দূর আমার কাছেই এসেছে।
জানলার পাশেই বসে বসে ভাবি —
দূর ব'লে যে পদার্থ সে সুন্দর।
মনে ভাবি সুন্দরের মধ্যেই দূর।
পরিচয়ের সীমার মধ্যে থেকেও
সুন্দর যায় সব সীমাকে এড়িয়ে
প্রয়োজনের সঙ্গে লেগে থেকেও থাকে আলগা,
প্রতিদিনের মাঝখানে থেকেও সে চিরদিনের।

মনে পড়ে এক দিন মাঠ বেয়ে চলেছিলেম
পালকিতে অপরাহ্নে ;
কাহার ছিল আটজন।
তার মধ্যে একজনকে দেখলেম
যেন কালো পাথরে কাটা দেবতার মূর্তি ;
আপন কর্মের অপমানকে প্রতিপদে সে চলছিল পেরিয়ে
ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে পাখি যেমন যায় উড়ে।
দেবতা তার সৌন্দর্যে তাকে দিয়েছেন সুদূরতার সম্মান।

এই দূর আকাশ সকল মানুষেরই অন্তরতম ;
জানলা বন্ধ, দেখতে পাইনে।
বিষয়ীর সংসার, আসক্তি তার প্রাচীর,
যাকে চায় তাকে রুদ্ধ করে কাছের বন্ধনে।
ভুলে যায় আসক্তি নষ্ট করে প্রেমকে,
আগাছা যেমন ফসলকে মারে চেপে।

আমি লিখি কবিতা, আঁকি ছবি।
দূরকে নিয়ে সেই আমার খেলা ;

দূরকে সাজাই নানা সাজে,
আকাশের কবি যেমন দিগন্তকে সাজায়
সকালে সন্ধ্যায়।

কিছু কাজ করি তাতে লাভ নেই, তাতে লোভ নেই,
তাতে আমি নেই।
যে কাজে আছে দূরের ব্যাপ্তি
তাতে প্রতিমুহূর্তে আছে আমার মহাকাশ।
এই সঙ্গে দেখি মৃত্যুর মধুর রূপ, স্তব্ধ নিঃশব্দ সুদূর,
জীবনের চারদিকে নিস্তরঙ্গ মহাসমুদ্র ;
সকল সুন্দরের মধ্যে আছে তার আসন, তার মুক্তি।

২

অন্য কথা পরে হবে।
গোড়াতেই বলে রাখি তুমি চা পাঠিয়েছ, পেয়েছি।
এতদিন খবর দিইনি সেটা আমার স্বভাবের বিশেষত্ব।
যেমন আমার ছবি আঁকা, চিঠি লেখাও তেমনি।
ঘটনার ডাকপিওনগিরি করে না সে।
নিজেরই সংবাদ সে নিজে।

জগতে রূপের আনাগোনা চলছে,
সেই সঙ্গে আমার ছবিও এক-একটি রূপ,
অজানা থেকে বেরিয়ে আসছে জানার দ্বারে।
সে প্রতিরূপ নয়।
মনের মধ্যে ভাঙাগড়া কত, কতই জোড়াতাড়া,
কিছু বা তার ঘনিয়ে ওঠে ভাবে,
কিছু বা তার ফুটে ওঠে চিত্রে ;
এতদিন এই সব আকাশবিহারীদের ধরেছি কথার ফাঁদে।

মন তখন বাতাসে ছিল কান পেতে,
যে ভাব ধ্বনি খোঁজে তারি খোঁজে।

আজকাল আছে সে চোখ মেলে।
রেখার বিশ্বে খোলা রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে, দেখবে ব'লে।
সে তাকায়, আর বলে, দেখলেম।
সংসারটা আকারের মহাযাত্রা।
কোন্ চির-জাগরূকের সামনে দিয়ে চলেছে,
তিনিও নীরবে বলছেন, দেখলেম।
আদি যুগে রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে সংকেত এল,
"খোলো আবরণ।"
বাষ্পের যবনিকা গেল উঠে,
রূপের নটীরা এল বাহির হয়ে;
ইন্দ্রের সহস্র চক্ষু, তিনি দেখলেন।
তাঁর দেখা আর তাঁর সৃষ্টি একই।
চিত্রকর তিনি।
তাঁর দেখার মহোৎসব দেশে দেশে কালে কালে।

৮।৪।৩৫
শান্তিনিকেতন

৩

অসীম আকাশে কালের তরী চলেছে
রেখার যাত্রী নিয়ে,
অন্ধকারের ভূমিকায় তাদের কেবল
আকারের নৃত্য;
নির্বাক অসীমের বাণী
বাক্যহীন সীমার ভাষায়, অন্তহীন ইঙ্গিতে।—
অমিতার আনন্দসম্পদ
ডালিতে সাজিয়ে নিয়ে চলেছে সুমিতা,
সে ভাব নয়, সে চিন্তা নয়, বাক্য নয়,
শুধু রূপ, আলো দিয়ে গড়া।

আজ আদিসৃষ্টির প্রথম মুহূর্তের ধ্বনি
পৌঁছল আমার চিত্তে,—

যে ধ্বনি অনাদি রাত্রির যবনিকা সরিয়ে দিয়ে
বলেছিল, "দেখো।"
এতকাল নিভৃতে
আপনি যা বলেছি আপনি তাই শুনেছি,
সেখান থেকে এলেম আর-এক নিভৃতে,
এখানে আপনি যা আঁকছি, দেখছি তাই আপনি।
সমস্ত বিশ্ব জুড়ে দেবতার দেখবার আসন,
আমিও বসেছি তাঁরই পাদপীঠে,
রচনা করছি দেখা।

ষোলো

শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কল্যাণীয়েষু

১

পড়েছি আজ রেখার মায়ায়।
কথা ধনীঘরের মেয়ে,
অর্থ আনে সঙ্গে করে,
মুখরার মন রাখতে চিন্তা করতে হয় বিস্তর।
রেখা অপ্রগল্‌ভা, অর্থহীনা,
তার সঙ্গে আমার যে ব্যবহার সবই নিরর্থক।
গাছের শাখায় ফুল ফোটানো ফল ধরানো,
সে কাজে আছে দায়িত্ব;
গাছের তলায় আলোছায়ার নাট-বসানো
সে আর-এক কাণ্ড।
সেইখানেই শুকনো পাতা ছড়িয়ে পড়ে,
প্রজাপতি উড়তে থাকে,
জোনাকি ঝিকমিক করে রাতের বেলা।
বনের আসরে এরা সব রেখা-বাহন
হাল্কা চালের দল,
কারো কাছে জবাবদিহি নেই।

কথা আমাকে প্রশ্রয় দেয় না, তার কঠিন শাসন;
রেখা আমার যথেচ্ছাচারে হাসে,
তর্জনী তোলে না।

কাজকর্ম পড়ে থাকে, চিঠিপত্র হারিয়ে ফেলি,
ফাঁক পেলেই ছুটে যাই রূপ-কল্পানোর অন্দরমহলে।
এমনি করে, মনের মধ্যে
অনেকদিনের যে-লক্ষ্মীছাড়া লুকিয়ে আছে
তার সাহস গেছে বেড়ে।
সে আঁকছে, ভাবছে না সংসারের ভালোমন্দ,
গ্রাহ্য করে না লোকমুখের নিন্দাপ্রশংসা।

মনটা আছে আরামে।
আমার ছবি-আঁকা কলমের মুখে
খ্যাতির লাগাম পড়েনি।
নামটা আমার খুশির উপরে
সর্দারি করতে আসেনি এখনো,
ছবি-আঁকার বুক জুড়ে
আগেভাগে নিজের আসনটা বিছিয়ে বসেনি;
ঠেলা দিয়ে দিয়ে বলছে না
"নাম রক্ষা ক'রো।"
অথচ ঐ নামটা নিজের মোটা শরীর নিয়ে
স্বয়ং কোনো কাজই করে না।
সব কীর্তির মুখ্য ভাগটা আদায় করবার জন্যে
দেউড়িতে বসিয়ে রাখে পেয়াদা;
হাজার মনিবের পিণ্ড-পাকানো
ফরমাশটাকে বেদী বানিয়ে স্তূপাকার ক'রে রাখে
কাজের ঠিক সামনে।

এখনো সেই নামটা অবজ্ঞা ক'রেই রয়েছে অনুপস্থিত ;—
আমার তুলি আছে মুক্ত
যেমন মুক্ত আজ ঋতুরাজের লেখনী।

৭ এপ্রিল, ১৯৩৪

সতেরো

শ্রীমান ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কল্যাণীয়েষু

আমার কাছে শুনতে চেয়েছ
গানের কথা ;
বলতে ভয় লাগে,
তবু কিছু বলব।

মানুষের জ্ঞান বানিয়ে নিয়েছে
আপন সার্থক ভাষা।
মানুষের বোধ অবুঝ, সে বোবা,
যেমন বোবা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।
সেই বিরাট বোবা
আপনাকে প্রকাশ করে ইঙ্গিতে,
ব্যাখ্যা করে না।
বোবা বিশ্বের আছে ভঙ্গি, আছে ছন্দ,
আছে নৃত্য আকাশে আকাশে।

অণুপরমাণু অসীম দেশে কালে
বানিয়েছে আপন আপন নাচের চক্র,
নাচছে সেই সীমায় সীমায় ;
গড়ে তুলছে অসংখ্য রূপ।
তার অন্তরে আছে বহ্নিতেজের দুর্দাম বোধ
সেই বোধ খুঁজছে আপন ব্যঞ্জনা,
ঘাসের ফুল থেকে শুরু ক'রে
আকাশের তারা পর্যন্ত।

মানুষের বোধের বেগ যখন বাঁধ মানে না,
বাহন করতে চায় কথাকে,—
তখন তার কথা হয়ে যায় বোবা,
সেই কথাটা খোঁজে ভঙ্গি, খোঁজে ইশারা,
খোঁজে নাচ, খোঁজে সুর,
দেয় আপনার অর্থকে উলটিয়ে,
নিয়মকে দেয় বাঁকা ক'রে।
মানুষ কাব্যে রচে বোবার বাণী।

মানুষের বোধ যখন বাহন করে সুরকে
তখন বিদ্যুচ্চঞ্চল পরমাণুপুঞ্জের মতোই
সুরসংঘকে বাঁধে সীমায়,
ভঙ্গি দেয় তাকে,
নাচায় তাকে বিচিত্র আবর্তনে।
সেই সীমায়-বন্দী নাচন
পায় গানে-গড়া রূপ।
সেই বোবা রূপের দল মিলতে থাকে
সৃষ্টির অন্দরমহলে,
সেখানে যত রূপের নটী আছে
ছন্দ মেলায় সকলের সঙ্গে
নূপুর-বাঁধা চাঞ্চল্যের
দোলযাত্রায়।

আমি যে জানি
এ-কথা যে-মানুষ জানায়
বাক্যে হ'ক সুরে হ'ক, রেখায় হ'ক,
সে পণ্ডিত।
আমি যে রস পাই, ব্যথা পাই,
রূপ দেখি,

এ-কথা যার প্রাণ বলে
গান তারি জন্যে,
শাস্ত্রে সে আনাড়ি হলেও
তার নাড়িতে বাজে সুর।

যদি সুযোগ পাও
কথাটা নারদমুনিকে শুধিয়ো,
ঝগড়া বাধাবার জন্যে নয়,
তত্ত্বের পার পাবার জন্যে সংজ্ঞার অতীতে।

আঠারো

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য সুহৃদ্‌বরেষু

আমরা কি সত্যই চাই শোকের অবসান?
আমাদের গর্ব আছে নিজের শোককে নিয়েও।
আমাদের অতি তীব্র বেদনাও
বহন করে না স্থায়ী সত্যকে—
সান্ত্বনা নেই এমন কথায়;
এতে আঘাত লাগে আমাদের দুঃখের অহংকারে।

জীবনটা আপন সকল সঞ্চয়
ছড়িয়ে রাখে কালের চলাচলের পথে;
তার অবিরাম-ধাবিত চাকার তলায়
গুরুতর বেদনার চিহ্নও যায়
জীর্ণ হয়ে, অস্পষ্ট হয়ে।
আমাদের প্রিয়তমের মৃত্যু
একটিমাত্র দাবি করে আমাদের কাছে
সে বলে—"মনে রেখো।"

কিন্তু সংখ্যা নেই প্রাণের দাবির,
তার আহ্বান আসে চারিদিক থেকেই
মনের কাছে;

সেই উপস্থিত কালের ভিড়ের মধ্যে
অতীতকালের একটিমাত্র আবেদন
কখন হয় অগোচর।

যদি বা তার কথাটা থাকে
তার ব্যথাটা যায় চলে।
তবু শোকের অভিমান
জীবনকে চায় বঞ্চিত করতে।
স্পর্ধা ক'রে প্রাণের দূতগুলিকে বলে—
খুলব না দ্বার।
প্রাণের ফসলখেত বিচিত্র শস্যে উর্বর,
অভিমানী শোক তারি মাঝখানে
ঘিরে রাখতে চায় শোকের দেবত্র জমি,—
সাধের মরুভূমি বানায় সেখানটাতে,
তার খাজনা দেয় না জীবনকে।
মৃত্যুর সঞ্চয়গুলি নিয়ে
কালের বিরুদ্ধে তার অভিযোগ।
সেই অভিযোগে তার হার হতে থাকে দিনে দিনে।
কিন্তু চায় না সে হার মানতে;
মনকে সমাধি দিতে চায়
তার নিজকৃত কবরে।

সকল অহংকারই বন্ধন,
কঠিন বন্ধন আপন শোকের অহংকার।
ধন জন মান সকল আসক্তিতেই মোহ,
নিবিড় মোহ আপন শোকের আসক্তিতে।

উনিশ

তখন বয়স ছিল কাঁচা ;
কতদিন মনে মনে এঁকেছি নিজের ছবি,
বুনো ঘোড়ার পিঠে সওয়ার,
জিন নেই, লাগাম নেই,
ছুটেছি ডাকাত-হানা মাঠের মাঝখান দিয়ে
ভরসন্ধ্যেবেলায় ;
ঘোড়ার খুরে উড়েছে ধুলো
ধরণী যেন পিছু ডাকছে আঁচল দুলিয়ে।
আকাশে সন্ধ্যার প্রথম তারা
দূরে মাঠের সীমানায় দেখা যায়
একটিমাত্র ব্যগ্র বিরহী আলো একটি কোন্ ঘরে
নিদ্রাহীন প্রতীক্ষায়।

যে ছিল ভাবীকালে
আগে হতে মনের মধ্যে
ফিরছিল তারি আবছায়া,
যেমন ভাবী আলোর আভাস আসে
ভোরের প্রথম কোকিল-ডাকা অন্ধকারে।

তখন অনেকখানি সংসার ছিল অজানা,
আধজানা।
তাই অপরূপের রাঙা রংটা
মনের দিগন্ত রেখেছিলে রাঙিয়ে ;
আসন্ন ভালোবাসা
এনেছিল অঘটন-ঘটনার স্বপ্ন।
তখন ভালোবাসার যে কল্পরূপ ছিল মনে
তার সঙ্গে মহাকাব্যযুগের
দুঃসাহসের আনন্দ ছিল মিলিত।

এখন অনেক খবর পেয়েছি জগতের,
মনে ঠাওরেছি
সংসারের অনেকটাই মার্কামারা খবরের
মালখানা।
মনের রসনা থেকে
অজানার স্বাদ গেছে মরে,
অনুভবে পাইনে
ভালোবাসায় সম্ভবের মধ্যে
নিয়তই অসম্ভব,
জানার মধ্যে অজানা,
কথার মধ্যে রূপকথা।
ভুলেছি প্রিয়ার মধ্যে আছে সেই নারী,
যে থাকে সাত সমুদ্রের পারে,
সেই নারী আছে বুঝি মায়ার ঘুমে,
যার জন্যে খুঁজতে হবে সোনার কাঠি।

বিশ

সেদিন আমাদের ছিল খোলা সভা
আকাশের নিচে
রাঙামাটির পথের ধারে।
ঘাসের 'পরে বসেছে সবাই।
দক্ষিণের দিকে শালের গাছ সারি সারি,
দীর্ঘ, ঋজু, পুরাতন,—
স্তব্ধ দাঁড়িয়ে,
শুক্লনবমীর মায়াকে উপেক্ষা ক'রে;—
দূরে কোকিলের ক্লান্ত কাকলিতে বনস্পতি উদাসীন
ও যেন শিবের তপোবন-দ্বারের নন্দী,
দৃঢ় নির্মম ওর ইঙ্গিত।

সভার লোকেরা বললে,—
“একটা কিছু শোনাও, কবি,
রাত গভীর হয়ে এল।”
খুললেম পুঁথিখানা,
যত পড়ে দেখি
সংকোচ লাগে মনে।
এরা এত কোমল, এত স্পর্শকাতর,
এত যত্নের ধন।
এদের কণ্ঠস্বর এত মৃদু,
এত কুণ্ঠিত।

এরা সব অন্তঃপুরিকা,
রাঙা অবগুণ্ঠন মুখের ’পরে ;
তার উপরে ফুলকাটা পাড়,
সোনার সুতোয়।
রাজহংসের গতি ওদের,
মাটিতে চলতে বাধা।
প্রাচীন কাব্যে এদের বলেছে ভীরু,
বলেছে, বরবর্ণিনী।
বন্দিনী ওরা বহু সম্মানে।
ওদের নূপুর ঝংকৃত হয় প্রাচীরঘেরা ঘরে,
অনেক দামের আস্তরণে।
বাধা পায় তারা নৈপুণ্যের বন্ধনে।
এই পথের ধারের সভায়,
আসতে পারে তারাই
সংসারের বাঁধন যাদের খসেছে,
খুলে ফেলেছে হাতের কাঁকন
মুছে ফেলেছে সিঁদুর ;
যারা ফিরবে না ঘরের মায়ায়,
যারা তীর্থযাত্রী ;

যাদের অসংকোচ অক্লান্ত গতি,
ধূলিধূসর গায়ের বসন ;
যারা পথ খুঁজে পায় আকাশের তারা দেখে ;
কোনো দায় নেই যাদের
কারো মন জুগিয়ে চলবার ;
কত রৌদ্রতপ্ত দিনে
কত অন্ধকার অর্ধরাত্রে
যাদের কণ্ঠ প্রতিধ্বনি জাগিয়েছে
অজানা শৈলগুহায়,—
জনহীন মাঠে,
পথহীন অরণ্যে।
কোথা থেকে আনব তাদের
নিন্দা প্রশংসার ফাঁদে টেনে।

উঠে দাঁড়ালেম আসন ছেড়ে।
ওরা বললে, "কোথা যাও কবি ?"
আমি বললেম,—
"যাব দুর্গমে, কঠোর নির্মমে,
নিয়ে আসব কঠিনচিত্ত উদাসীনের গান।"

একুশ

নূতন কল্পে
সৃষ্টির আরম্ভে আঁকা হল অসীম আকাশে
কালের সীমানা
আলোর বেড়া দিয়ে।
সব চেয়ে বড়ো ক্ষেত্রটি
অযুত নিযুত কোটি কোটি বৎসরের মাপে।
সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে
জ্যোতিষ্ক-পতঙ্গ দিয়েছে দেখা,
গণনায় শেষ করা যায় না।

তারা কোন্ প্রথম প্রত্যুষের আলোকে
কোন্ গুহা থেকে উড়ে বেরোল অসংখ্য,
পাখা মেলে ঘুরে বেড়াতে লাগল চক্রপথে
আকাশ থেকে আকাশে।

অব্যক্তে তারা ছিল প্রচ্ছন্ন,
ব্যক্তের মধ্যে ধেয়ে এল
মরণের ওড়া উড়তে ;—
তারা জানে না কিসের জন্যে
এই মৃত্যুর দুর্দান্ত আবেগ।

কোন্ কেন্দ্রে জ্বলছে সেই মহা আলোক
যার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়বার জন্যে
হয়েছে উন্মত্তের মতো উৎসুক।
আয়ুর অবসান খুঁজছে আয়ুহীনের অচিন্ত্য রহস্যে
একদিন আসবে কল্পসন্ধ্যা,
আলো আসবে ম্লান হয়ে,
ওড়ার বেগ হবে ক্লান্ত
পাখা যাবে খসে,
লুপ্ত হবে ওরা
চিরদিনের অদৃশ্য আলোকে।

ধরার ভূমিকায় মানব-যুগের
সীমা আঁকা হয়েছে
ছোটো মাপে
আলোক-আঁধারের পর্যায়ে
নক্ষত্রলোকের বিরাট দৃষ্টির
অগোচরে।
সেখানকার নিমেষের পরিমাণে
এখানকার সৃষ্টি ও প্রলয়।

বড়ো সীমানার মধ্যে মধ্যে
ছোটো ছোটো কালের পরিমণ্ডল
আঁকা হচ্ছে মোছা হচ্ছে।
বুদ্বুদের মতো উঠল মহেন্দজারো,
মরুবালুর সমুদ্রে, নিঃশব্দে গেল মিলিয়ে।
সুমেরিয়া, আসীরিয়া, ব্যাবিলন, মিসর,
দেখা দিল বিপুল বলে
কালের ছোটো-বেড়া-দেওয়া
ইতিহাসের রঙ্গস্থলীতে,
কাঁচা কালির লিখনের মতো
লুপ্ত হয়ে গেল
অস্পষ্ট কিছু চিহ্ন রেখে।

তাদের আকাঙ্ক্ষাগুলো ছুটেছিল পতঙ্গের মতো
অসীম দুর্লক্ষ্যের দিকে।
বীরেরা বলেছিল
অমর করবে সেই আকাঙ্ক্ষার কীর্তিপ্রতিমা;
তুলেছিল জয়স্তম্ভ।
কবিরা বলেছিল, অমর করবে
সেই আকাঙ্ক্ষার বেদনাকে,
রচেছিল মহাকবিতা।

সেই মুহূর্তে মহাকাশের অগণ্য-যোজন পত্রপটে
লেখা হচ্ছিল
ধাবমান আলোকের জ্বলদক্ষরে
সুদূর নক্ষত্রের
হোমহুতাগ্নির মন্ত্রবাণী।
সেই বাণীর একটি একটি ধ্বনির
উচ্চারণ কালের মধ্যে
ভেঙে পড়েছে যুগের জয়স্তম্ভ,

নীরব হয়েছে কবির মহাকাব্য,
বিলীন হয়েছে আত্মগৌরবে স্পর্ধিত জাতির ইতিহাস।

আজ রাত্রে আমি সেই নক্ষত্রলোকের
নিমেষহীন আলোর নিচে
আমার লতাবিতানে বসে
নমস্কার করি মহাকালকে।
অমরতার আয়োজন
শিশুর শিথিল মুষ্টিগত
খেলার সামগ্রীর মতো
ধুলায় পড়ে বাতাসে যাক উড়ে।
আমি পেয়েছি ক্ষণে ক্ষণে অমৃতভরা
মুহূর্তগুলিকে,
তার সীমা কে বিচার করবে?
তার অপরিমেয় সত্য
অযুত নিযুত বৎসরের
নক্ষত্রের পরিধির মধ্যে
ধরে না।
কল্পান্ত যখন তার সকল প্রদীপ নিবিয়ে
সৃষ্টির রঙ্গমঞ্চ দেবে অন্ধকার করে
তখনো সে থাকবে প্রলয়ের নেপথ্যে
কল্পান্তরের প্রতীক্ষায়।

বাইশ

শুরু হতেই ও আমার সঙ্গ ধরেছে,
ঐ একটা অনেক কালের বুড়ো,
আমাতে মিশিয়ে আছে এক হয়ে।
আজ আমি ওকে জানাচ্ছি—
পৃথক হব আমরা।

ও এসেছে কতলক্ষ পূর্বপুরুষের
রক্তের প্রবাহ বেয়ে ;
কত যুগের ক্ষুধা ওর, কত তৃষ্ণা ;
সে সব বেদনা বহু দিনরাত্রিকে মথিত করেছে
সুদীর্ঘ ধারাবাহী অতীত কালে ;
তাই নিয়ে ও অধিকার করে বসল
নবজাত প্রাণের এই বাহনকে,
ঐ প্রাচীন, ঐ কাঙাল।

আকাশবাণী আসে ঊর্ধ্বলোক হতে,
ওর কোলাহলে সে যায় আবিল হয়ে।
নৈবেদ্য সাজাই পূজার থালায়,
ও হাত বাড়িয়ে নেয় নিজে।

জীর্ণ করে ওকে দিনে দিনে পলে পলে,
বাসনার দহনে,
ওর জরা দিয়ে আচ্ছন্ন করে আমাকে
যে-আমি জরাহীন।
মুহূর্তে মুহূর্তে ও জিতে নিয়েছে আমার মমতা,
তাই ওকে যখন মরণে ধরে
ভয় লাগে আমার
যে-আমি মৃত্যুহীন।

আমি আজ পৃথক্ হব।
ও থাক্ ঐ খানে দ্বারের বাহিরে,
ঐ বৃদ্ধ, ঐ বুভুক্ষু।
ও ভিক্ষা করুক, ভোগ করুক,
তালি দিক্ বসে বসে
ওর ছেঁড়া চাদরখানাতে ;

জন্মমরণের মাঝখানটাতে
যে আল-বাঁধা খেতটুকু আছে
সেইখানে করুক উঞ্ছবৃত্তি।

আমি দেখব ওকে জানলায় ব'সে,
ঐ দূরপথের পথিককে,
দীর্ঘকাল ধরে যে এসেছে
বহু দেহমনের নানা পথের বাঁকে বাঁকে
মৃত্যুর নানা খেয়া পার হয়ে।
উপরের তলায় বসে দেখব ওকে
ওর নানা খেয়ালের আবেশে,
আশা-নৈরাশ্যের ওঠা-পড়ায় সুখদুঃখের আলো আঁধারে।
দেখব যেমন করে পুতুলনাচ দেখে;
হাসব মনে মনে।

মুক্ত আমি, স্বচ্ছ আমি, স্বতন্ত্র আমি,
নিত্যকালের আলো আমি,
সৃষ্টি-উৎসের আনন্দধারা আমি,
অকিঞ্চন আমি,
আমার কোনো কিছুই নেই
অহংকারের প্রাচীরে ঘেরা।

তেইশ

আজ শরতের আলোয় এই যে চেয়ে দেখি
মনে হয় এ যেন আমার প্রথম দেখা।
আমি দেখলেম নবীনকে,
প্রতিদিনের ক্লান্ত চোখ
যার দর্শন হারিয়েছে।

কল্পনা করছি,—
অনাগত যুগ থেকে
তীর্থযাত্রী আমি
ভেসে এসেছি মন্ত্রবলে।
উজান স্বপ্নের স্রোতে
পৌঁছলেম এই মুহূর্তেই
বর্তমান শতাব্দীর ঘাটে।
কেবলি তাকিয়ে আছি উৎসুক চোখে।
আপনাকে দেখছি আপনার বাইরে,—
অন্যযুগের অজানা আমি
অভ্যস্ত পরিচয়ের পরপারে।
তাই তাকে নিয়ে এত গভীর কৌতূহল
যার দিকে তাকাই
চক্ষু তাকে আঁকড়িয়ে থাকে
পুষ্পলগ্ন ভ্রমরের মতো।

আমার নগ্নচিত্ত আজ মগ্ন হয়েছে
সমস্তের মাঝে।
জনশ্রুতির মলিন হাতের দাগ লেগে
যার রূপ হয়েছে অবলুপ্ত,
যা পরেছে তুচ্ছতার মলিন চীর
তার সে জীর্ণ উত্তরীয় আজ গেল খ'সে।
দেখা দিল সে অস্তিত্বের পূর্ণ মূল্যে।
দেখা দিল সে অনির্বচনীয়তায়।
যে বোবা আজ পর্যন্ত ভাষা পায়নি
জগতের সেই অতি প্রকাণ্ড উপেক্ষিত
আমার সামনে খুলেছে তার অচল মৌন,
ভোর-হয়ে-ওঠা বিপুল রাত্রির প্রান্তে
প্রথম চঞ্চল বাণী জাগল যেন।

আমার এতকালের কাছের জগতে
আমি ভ্রমণ করতে বেরিয়েছি দূরের পথিক।
তার আধুনিকের ছিন্নতার ফাঁকে ফাঁকে
দেখা দিয়েছে চিরকালের রহস্য।
সহমরণের বধূ
বুঝি এমনি ক'রেই দেখতে পায়
মৃত্যুর ছিন্নপর্দার ভিতর দিয়ে
নূতন চোখে
চিরজীবনের অম্লান স্বরূপ।

চব্বিশ

আমার ফুলবাগানের ফুলগুলিকে
বাঁধব না আজ তোড়ায়,
রংবেরঙের সুতোগুলো থাক্,
থাক্ পড়ে ঐ জরির ঝালর।

শুনে ঘরের লোকে বলে,
"যদি না বাঁধ জড়িয়ে জড়িয়ে
ওদের ধরব কী করে,
ফুলদানিতে সাজাব কোন্ উপায়ে?"

আমি বলি,
"আজকে ওরা ছুটি-পাওয়া নটী,
ওদের উচ্চহাসি অসংযত,
ওদের এলোমেলো হেলাদোলা
বকুলবনে অপরাহ্নে,
চৈত্রমাসের পড়ন্ত রৌদ্রে।
আজ দেখো ওদের যেমন-তেমন খেলা,
শোনো ওদের যখন-তখন কলধ্বনি,
তাই নিয়ে খুশি থাকো।"

বন্ধু বললে,
"এলেম তোমার ঘরে
ভরা পেয়ালার তৃষ্ণা নিয়ে।
তুমি খ্যাপার মতো বললে,
আজকের মতো ভেঙে ফেলেছি
ছন্দের সেই পুরোনো পেয়ালাখানা।
আতিথ্যের ত্রুটি ঘটাও কেন?"

আমি বলি, "চলো না ঝরনাতলায়,
ধারা সেখানে ছুটছে আপন খেয়ালে,
কোথাও মোটা, কোথাও সরু।
কোথাও পড়ছে শিখর থেকে শিখরে,
কোথাও লুকোল গুহার মধ্যে।
তার মাঝে মাঝে মোটা পাথর
পথ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বর্বরের মতো,
মাঝে মাঝে গাছের শিকড়
কাঙালের মতো ছড়িয়েছে আঙুলগুলো,
কাকে ধরতে চায় ঐ জলের ঝিকিমিকির মধ্যে?"

সভার লোকে বললে,
"এ যে তোমার আবাধা বেণীর বাণী,
বন্দিনী সে গেল কোথায়?"
আমি বলি, "তাকে তুমি পারবে না আজ চিনতে,
তার সাতনলী হারে আজ ঝলক নেই,
চমক দিচ্ছে না চুনি-বসানো কঙ্কণে।"
ওরা বললে, "তবে মিছে কেন?
কী পাবে ওর কাছ থেকে?"

আমি বলি, "যা পাওয়া যায় গাছের ফুলে
ডালে পালায় সব মিলিয়ে।

পাতার ভিতর থেকে
তার রং দেখা যায় এখানে সেখানে,
গন্ধ পাওয়া যায় হাওয়ার ঝাপটায়।
চারদিকের খোলা বাতাসে
দেয় একটুখানি নেশা লাগিয়ে।
মুঠোয় করে ধরবার জন্যে সে নয়,
তার অসাজানো আটপহরে পরিচয়কে
অনাসক্ত হয়ে মানবার জন্যে
তার আপন স্থানে।"

পঁচিশ

পাঁচিলের এধারে
ফুলকাটা চিনের টবে
সাজানো গাছ সুসংযত।
ফুলের কেয়ারিতে
কাঁচিছাঁটা বেগনি গাছের পাড়।
পাঁচিলের গায়ে গায়ে
বন্দী-করা লতা।
এরা সব হাসে মধুর করে,
উচ্চহাস্য নেই এখানে ;
হাওয়ায় করে দোলাদুলি
কিন্তু জায়গা নেই দুরন্ত নাচের ,
এরা আভিজাত্যের সুশাসনে বাঁধা।
বাগানটাকে দেখে মনে হয়
মোগল বাদশার জেনেনা,
রাজ-আদরে অলংকৃত,
কিন্তু পাহারা চারদিকে,
চরের দৃষ্টি আছে ব্যবহারের প্রতি।

পাঁচিলের ওপারে দেখা যায়
একটি সুদীর্ঘ য়ুকলিপটাস
খাড়া উঠেছে ঊর্ধ্বে।
পাশেই দুটি তিনটি সোনাঝুরি
প্রচুর পল্লবে প্রগল্‌ভ।
নীল আকাশ অবারিত বিস্তীর্ণ
ওদের মাথার উপরে।

অনেকদিন দেখেছি অন্যমনে,
আজ হঠাৎ চোখে পড়ল
ওদের সমুন্নত স্বাধীনতা,
দেখলেম, সৌন্দর্যের মর্যাদা
আপন মুক্তিতে।
ওরা ব্রাত্য, আচারমুক্ত, ওরা সহজ;
সংযম আছে ওদের মজ্জার মধ্যে
বাইরে নেই শৃঙ্খলার বাঁধাবাঁধি।
ওদের আছে শাখার দোলন
দীর্ঘ লয়ে;
পল্লবগুচ্ছ নানা খেয়ালের;
মর্মরধ্বনি হাওয়ায় ছড়ানো।

আমার মনে লাগল ওদের ইঙ্গিত;
বললেম, "টবের কবিতাকে
রোপণ করব মাটিতে,
ওদের ডালপালা যথেচ্ছ ছড়াতে দেব
বেড়াভাঙা ছন্দের অরণ্যে।"

ছাব্বিশ

আকাশে চেয়ে দেখি
অবকাশের অন্ত নেই কোথাও।
দেশকালের সেই সুবিপুল আনুকূল্যে
তারায় তারায় নিঃশব্দ আলাপ,
তাদের দ্রুতবিচ্ছুরিত আলোক-সংকেতে
তপস্বিনী নীরবতার ধ্যান কম্পমান।

অসংখ্যের ভারে পরিকীর্ণ আমার চিত্ত;
চারদিকে আশু প্রয়োজনের কাঙালের দল;
অসীমের অবকাশকে খণ্ড খণ্ড করে
ভিড় করেছে তারা
উৎকণ্ঠ কোলাহলে।

সংকীর্ণ জীবনে আমার স্বর তাই বিজড়িত,
সত্য পৌঁছয় না অনুজ্জ্বল বাণীতে।
প্রতিদিনের অভ্যস্ত কথার
মূল্য হল দীন;
অর্থ গেল মুছে।
আমার ভাষা যেন
কুয়াশার জড়িমায় অবমানিত
হেমন্তের বেলা,
তার সুর পড়েছে চাপা।
সুস্পষ্ট প্রভাতের মতো
মন অনায়াসে মাথা তুলে বলতে পারে না-
"ভালোবাসি।"
সংকোচ লাগে কণ্ঠের কৃপণতায়।

তাই ওগো বনস্পতি,
তোমার সম্মুখে এসে বসি সকালে বিকালে,

শ্যামচ্ছায়ায় সহজ করে নিতে চাই
আমার বাণী।
দেখি চেয়ে, তোমার পল্লবস্তবক
অনায়াসে পার হয়েছে,
শাখাব্যূহের জটিলতা,
জয় করে নিয়েছে চারদিকে নিস্তব্ধ অবকাশ।
তোমার নিঃশব্দ উচ্ছ্বাস সেই উদার পথে
উত্তীর্ণ হয়ে যায়
সূর্যোদয়-মহিমার মাঝে।
সেই পথ দিয়ে দক্ষিণ বাতাসের স্রোতে
অনাদি প্রাণের মন্ত্র
তোমার নবকিসলয়ের মর্মে এসে মেলে—
বিশ্বহৃদয়ের সেই আনন্দমন্ত্র—
"ভালোবাসি।"

বিপুল ঔৎসুক্য আমাকে বহন করে নিয়ে যায়
সুদূরে;
বর্তমান মুহূর্তগুলিকে
অবলুপ্ত করে কালহীনতায়।
যেন কোন্ লোকান্তরগত চক্ষু
জন্মান্তর থেকে চেয়ে থাকে
আমার মুখের দিকে,—
চেতনাকে নিষ্কারণ বেদনায়
সকল সীমার পরপারে দেয় পাঠিয়ে।
ঊর্ধ্বলোক থেকে কানে আসে
সৃষ্টির শাশ্বতবাণী—
"ভালোবাসি।"

যেদিন যুগান্তের রাত্রি হল অবসান
আলোকের রশ্মিদূত

বিকীর্ণ করেছিল এই আদিমবাণী
আকাশে আকাশে।

সৃষ্টিযুগের প্রথম লগ্নে
প্রাণসমুদ্রের মহাপ্লাবনে
তরঙ্গে তরঙ্গে দুলেছিল এই মন্ত্র-বচন।

এই বাণীই দিনে দিনে রচনা করেছে
স্বর্ণচ্ছটায় মানসী প্রতিমা
আমার বিরহ-গগনে
অস্তসাগরের নির্জন ধূসর উপকূলে।

আজ দিনান্তের অন্ধকারে
এজন্মের যত ভাবনা যত বেদনা
নিবিড় চেতনায় সম্মিলিত হয়ে
সন্ধ্যাবেলার একলা তারার মতো
জীবনের শেষবাণীতে হ'ক উদ্ভাসিত-
"ভালোবাসি।"

সাতাশ

আমার এই ছোটো কলসিটা পেতে রাখি
ঝরনাধারার নিচে।
বসে থাকি
কোমরে আঁচল বেঁধে,
সারা সকালবেলা,
শেওলা-ঢাকা পিছল পাথরটাতে
পা ঝুলিয়ে।

এক নিমেষেই ঘট যায় ভরে
তার পরে কেবলি তার কানা ছাপিয়ে ওঠে,

জল পড়তে থাকে ফেনিয়ে ফেনিয়ে
বিনা কাজে বিনা ত্বরায় ;
ঐ যে সূর্যের আলোয়
উপচে-পড়া জলের চলে ছুটির খেলা,
আমার খেলা ঐ সঙ্গেই ছলকে ওঠে
মনের ভিতর থেকে।

সবুজ বনের মিনে-করা
উপত্যকার নীল আকাশের পেয়ালা,
তারি পাহাড়-ঘেরা কানা ছাপিয়ে
পড়ছে ঝরঝরানির শব্দ।
ভোরের ঘুমে তার ডাক শুনতে পায়
গাঁয়ের মেয়েরা।

জলের ধ্বনি
বেগনি রঙের বনের সীমানা যায় পেরিয়ে,
নেমে যায় যেখানে ঐ বুনোপাড়ার মানুষ
হাট করতে আসে,
তরাই গ্রামের রাস্তা ছেড়ে
বাঁকে বাঁকে উঠতে থাকে চড়াই পথ বেয়ে,
তার বলদের গলায়
ঝুনুঝুনু ঘণ্টা বাজে,
তার বলদের পিঠে
শুকনো কাঠের আঁটি বোঝাই-করা।

এমনি করে
প্রথম প্রহর গেল কেটে।
রাঙা ছিল সকালবেলাকার
নতুন রৌদ্রের রঙ,
উঠল সাদা হয়ে।
বক উড়ে চলেছে পাহাড় পেরিয়ে
জলার দিকে,

শঙ্খচিল উড়ছে একলা
ঘন নীলের মধ্যে,
উর্ধ্বমুখ পর্বতের উধাও চিত্তে
নিঃশব্দ জপমন্ত্রের মতো

বেলা হল,
ডাক পড়ল ঘরে।
ওরা রাগ করে বললে,
"দেরি করলি কেন ?"
চুপ করে থাকি নিরুত্তরে।
ঘট ভরতে দেরি হয় না
সে তো সবাই জানে ;
বিনাকাজে উপচে-পড়া-সময় খোওয়ানো,
তার খাপছাড়া কথা ওদের বোঝাবে কে ?

আটাশ

তুমি প্রভাতের শুকতারা
আপন পরিচয় পালটিয়ে দিয়ে -
কখনো বা তুমি দেখা দাও
গোধূলির দেহলিতে,
এই কথা বলে জ্যোতিষী।
সূর্যাস্তবেলায় মিলনের দিগন্তে
রক্ত-অবগুণ্ঠনের নিচে
শুভদৃষ্টির প্রদীপ তোমার জ্বাল
শাহানার সুরে।
সকালবেলায় বিরহের আকাশে
শূন্য বাসরঘরের খোলা দ্বারে
ভৈরবীর তানে লাগাও
বৈরাগ্যের মূর্ছনা।

সুপ্তিসমুদ্রের এপারে ওপারে
চিরজীবন
সুখদুঃখের আলোয় অন্ধকারে
মনের মধ্যে দিয়েছ
আলোকবিন্দুর স্বাক্ষর।
যখন নিভৃতপুলকে রোমাঞ্চ লেগেছে মনে
গোপনে রেখেছ তার 'পরে
সুরলোকের সম্মতি,
ইন্দ্রাণীর মালার একটি পাপড়ি,
তোমাকে এমনি করেই জেনেছি
আমাদের সকালসন্ধ্যার সোহাগিনী।

পণ্ডিত তোমাকে বলে শুক্রগ্রহ ;
বলে, আপন সুদীর্ঘ কক্ষে
তুমি বৃহৎ, তুমি বেগবান,
তুমি মহিমান্বিত ;
সূর্যবন্দনার প্রদক্ষিণপথে
তুমি পৃথিবীর সহযাত্রী,
রবিরশ্মিগ্রথিত-দিনরত্নের মালা
দুলছে তোমার কণ্ঠে।

যে মহাযুগের বিপুল ক্ষেত্রে
তোমার নিগূঢ় জগদ্ব্যাপার
সেখানে তুমি স্বতন্ত্র, সেখানে সুদূর,
সেখানে লক্ষকোটিবৎসর
আপনার জনহীন রহস্যে তুমি অবগুণ্ঠিত।
আজ আসন্ন রজনীর প্রান্তে
কবিচিত্তে যখন জাগিয়ে তুলেছ
নিঃশব্দ শান্তিবাণী

সেই মুহূর্তেই
আমাদের অজ্ঞাত ঋতুপর্যায়ের আবর্তন
তোমার জলে স্থলে বাষ্পমণ্ডলীতে
রচনা করছে সৃষ্টিবৈচিত্র্য।
তোমার সেই একেশ্বর যজ্ঞে
আমাদের নিমন্ত্রণ নেই,
আমাদের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ।

হে পণ্ডিতের গ্রহ,
তুমি জ্যোতিষের সত্য
সে-কথা মানবই,
সে সত্যের প্রমাণ আছে গণিতে।
কিন্তু এও সত্য, তার চেয়েও সত্য
যেখানে তুমি আমাদেরি
আপন শুকতারা, সন্ধ্যাতারা,
যেখানে তুমি ছোটো, তুমি সুন্দর,
যেখানে আমাদের হেমন্তের শিশিরবিন্দুর সঙ্গে তোমার তুলনা,
যেখানে শরতের শিউলি ফুলের উপমা তুমি,
যেখানে কালে কালে
প্রভাতে মানব-পথিককে
নিঃশব্দে সংকেত করেছ
জীবনযাত্রার পথের মুখে,
সন্ধ্যায় ফিরে ডেকেছ
চরম বিশ্রামে।

ঊনত্রিশ

অনেককালের একটিমাত্র দিন
কেমন করে বাঁধা পড়েছিল
একটা কোনো ছন্দে, কোনো গানে,
কোনো ছবিতে।

কালের দূত তাকে সরিয়ে রেখেছিল
চলাচলের পথের বাইরে।
যুগের ভাসান খেলায়
অনেক কিছু চলে গেল ঘাট পেরিয়ে,
সে কখন ঠেকে গিয়েছিল বাঁকের মুখে
কেউ জানতে পারেনি।

মাঘের বনে
আমের কত বোল ধরল,
কত পড়ল ঝরে;
ফাল্গুনে ফুটল পলাশ,
গাছতলার মাটি দিল ছেয়ে;
চৈত্রের রৌদ্রে আর সর্বের খেতে
কবির লড়াই লাগল যেন
মাঠে আর আকাশে।
আমার সেই আটকে-পড়া দিনটির গায়ে
কোনো ঋতুর কোনো তুলির
চিহ্ন লাগেনি।

একদা ছিলেম ঐ দিনের মাঝখানেই।
দিনটা ছিল গা ছড়িয়ে
নানা কিছুর মধ্যে;
তারা সমস্তই ঘেঁষে ছিল আশেপাশে সামনে।
তাদের দেখে গেছি সবটাই
কিন্তু চোখে পড়েনি সমস্তটা।
ভালোবেসেছি,
ভালো করে জানিনি
কতখানি বেসেছি।
অনেক গেছে ফেলাছড়া;
আনমনার রসের পেয়ালায়
বাকি ছিল কত।

সেদিনের যে পরিচয় ছিল আমার মনে
আজ দেখি তার চেহারা অন্য ছাঁদের।
কত এলোমেলো, কত যেমন-তেমন
সব গেছে মিলিয়ে।
তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়েছে যে
তাকে আজ দূরের পটে দেখছি যেন
সেদিনকার সে নববধূ।
তনু তার দেহলতা,
ধূপছায়া রঙের আঁচলটি
মাথায় উঠেছে খোঁপাটুকু ছাড়িয়ে।
ঠিকমতো সময়টি পাইনি
তাকে সব কথা বলবার,
অনেক কথা বলা হয়েছে যখন-তখন,
সে-সব বৃথা কথা।
হতে হতে বেলা গেছে চলে।

আজ দেখা দিয়েছে তার মূর্তি,—
স্তব্ধ সে দাঁড়িয়ে আছে
ছায়া-আলোর বেড়ার মধ্যে,
মনে হচ্ছে কী একটা কথা বলবে,
বলা হল না,—
ইচ্ছে করছে ফিরে যাই পাশে,
ফেরার পথ নেই।

ত্রিশ

যখন দেখা হল
তার সঙ্গে চোখে চোখে
তখন আমার প্রথম বয়েস;
সে আমাকে শুধাল,
"তুমি খুঁজে বেড়াও কাকে?"

আমি বললেম,
"বিশ্বকবি তাঁর অসীম ছড়াটা থেকে
একটা পদ ছিঁড়ে নিলেন কোন্ কৌতুকে,
ভাসিয়ে দিলেন
পৃথিবীর হাওয়ার স্রোতে,
যেখানে ভেসে বেড়ায়
ফুলের থেকে গন্ধ,
বাঁশির থেকে ধ্বনি।
ফিরছে সে মিলের পদটি পাবে ব'লে ;
তার মৌমাছির পাখায় বাজে
খুঁজে বেড়াবার নীরব গুঞ্জরণ।"

শুনে সে রইল চুপ করে
অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে।
আমার মনে লাগল ব্যথা,
বললেম, "কী ভাবছ তুমি ?"
ফুলের পাপড়ি ছিঁড়তে ছিঁড়তে সে বললে,—
"কেমন করে জানবে তাকে পেলে কিনা,
তোমার সেই অসংখ্যের মধ্যে
একটিমাত্রকে।"

আমি বললেম,
"আমি যে খুঁজে বেড়াই
সে তো আমার ছিন্ন জীবনের
সবচেয়ে গোপন কথা ;
ও-কথা হঠাৎ আপনি ধরা পড়ে
যার আপন বেদনায়,
আমি জানি
আমার গোপন মিল আছে তারি ভিতর।"

কোনো কথা সে বলল না।

কচি শ্যামল তার রঙটি;
গলায় সরু সোনার হারগাছি,
শরতের মেঘে লেগেছে
ক্ষীণ রোদের রেখা।
চোখে ছিল
একটা দিশাহারা ভয়ের চমক
পাছে কেউ পালায় তাকে না ব'লে
তার দুটি পায়ে ছিল দ্বিধা,
ঠাহর পায়নি
কোন্‌খানে সীমা
তার আঙিনাতে।

দেখা হল।
সংসারে আনাগোনার পথের পাশে
আমার প্রতীক্ষা ছিল
শুধু ঐটুকু নিয়ে।
তার পরে সে চলে গেছে।

একত্রিশ

পাড়ায় আছে ক্লাব,
আমার একতলার ঘরখানা
দিয়েছি ওদের ছেড়ে।
কাগজে পেয়েছি প্রশংসাবাদ,
ওরা মীটিং করে আমাকে পরিয়েছে মালা।

আজ আট বছর থেকে
শূন্য আমার ঘর।
আপিস থেকে ফিরে এসে দেখি
সেই ঘরের একটা ভাগে

টেবিলে পা তুলে
কেউ পড়ছে খবরের কাগজ,
কেউ খেলছে তাস,
কেউ করছে তুমুল তর্ক।
তামাকের ধোঁয়ায়
ঘনিয়ে ওঠে বদ্ধ হাওয়া,
ছাইদানিতে জমতে থাকে,
ছাই, দেশলাইকাঠি,
পোড়া সিগারেটের টুকরো।

এই প্রচুর পরিমাণ ঘোলা আলাপের
গোলমাল দিয়ে
দিনের পর দিন
আমার সন্ধ্যার শূন্যতা দিই ভরে।
আবার রাত্তির দশটার পরে
খালি হয়ে যায়
উপুড়-করা একটা উচ্ছিষ্ট অবকাশ।
বাইরে থেকে আসে ট্র্যামের শব্দ,
কোনোদিন আপন মনে শুনি
গ্রামোফোনের গান,
যে কয়টা রেকর্ড আছে
ঘুরে ফিরে তারি আবৃত্তি।

আজ ওরা কেউ আসে নি ;
গেছে হাবড়া স্টেশনে
অভ্যর্থনায় ;
কে সদ্য এনেছে
সমুদ্রপারের হাততালি
আপন নামটার সঙ্গে বেঁধে।

নিবিয়ে দিয়েছি বাতি।

যাকে বলে 'আজকাল'
অনেকদিন পরে
সেই আজকালটা, সেই প্রতিদিনের নকীব
আজ নেই সন্ধ্যায় আমার ঘরে।
আটবছর আগে
এখানে ছিল হাওয়ায়-ছড়ানো যে স্পর্শ,
চুলের যে অস্পষ্ট গন্ধ,
তারি একটা বেদনা লাগল
ঘরের সব কিছুতেই।
যেন কী শুনব বলে
রইল কান পাতা;
সেই ফুলকাটা ঢাকাওআলা
পুরোনো খালি চৌকিটা
যেন পেয়েছে কার খবর।

পিতামহের আমলের
পুরোনো মুচকুন্দ গাছ
দাঁড়িয়ে আছে জানলার সামনে
কৃষ্ণ রাতের অন্ধকারে।
রাস্তার ওপারের বাড়ি
আর এই গাছের মধ্যে যেটুকু আকাশ আছে
সেখানে দেখা যায়
জ্বলজ্বল করছে একটি তারা।
তাকিয়ে রইলেম তার দিকে চেয়ে,
টনটন করে বুকের ভিতরটা।
যুগল জীবনের জোয়ার জলে
কত সন্ধ্যায় দুলেছে ঐ তারার ছায়া।

অনেক কথার মধ্যে
মনে পড়ছে ছোট্ট একটি কথা।

সেদিন সকালে
কাগজ পড়া হয়নি কাজের ভিড়ে ;
সন্ধ্যেবেলায় সেটা নিয়ে
বসেছি এই ঘরেতেই,
এই জানলার পাশে
এই কেদারায়।
চুপি চুপি সে এল পিছনে
কাগজখানা দ্রুত কেড়ে নিল হাত থেকে।
চলল কাড়াকাড়ি
উচ্চ হাসির কলরোলে।
উদ্ধার করলুম লুঠের জিনিস,
স্পর্ধা করে আবার বসলুম পড়তে।
হঠাৎ সে নিবিয়ে দিল আলো।
আমার সেদিনকার
সেই হার-মানা অন্ধকার
আজ আমাকে সর্বাঙ্গে ধরেছে ঘিরে,
যেমন করে সে আমাকে ঘিরেছিল
ছুয়ো-দেওয়া নীরব হাসিতে ভরা
বিজয়ী তার দুই বাহু দিয়ে,
সেদিনকার সেই আলো-নেবা নির্জনে।

হঠাৎ ঝরঝরিয়ে উঠল হাওয়া
গাছের ডালে ডালে,
জানলাটা উঠল শব্দ করে,
দরজার কাছের পর্দাটা
উড়ে বেড়াতে লাগল অস্থির হয়ে।

আমি বলে উঠলেম,
"ওগো, আজ তোমার ঘরে তুমি এসেছ কি
মরণলোক থেকে
তোমার বাদামি রঙের শাড়িখানি পরে?"

একটা নিঃশ্বাস লাগল আমার গায়ে,
শুনলেম অশ্রুতবাণী,
"কার কাছে আসব ?"
আমি বললেম,
"দেখতে কি পেলে না আমাকে ?"
শুনলেম,
"পৃথিবীতে এসে
যাকে জেনেছিলেম একান্তই,
সেই আমার চিরকিশোর বঁধু
তাকে তো আর পাইনে দেখতে
এই ঘরে।"
শুধালেম, "সে কি নেই কোথাও ?"
মৃদু শান্তস্বরে বললে,
"সে আছে সেইখানেই
যেখানে আছি আমি।
আর কোথাও না।"

দরজার কাছে শুনলেম উত্তেজিত কলরব,
হাবড়া স্টেশন থেকে
ওরা ফিরেছে।

বত্রিশ

পিলসুজের উপর পিতলের প্রদীপ,
খড়কে দিয়ে উসকে দিচ্ছে থেকে থেকে।
হাতির দাঁতের মতো কোমল সাদা
পঙ্খের কাজ-করা মেজে ;
তার উপরে খান-দুয়েক মাদুর পাতা।
ছোটো ছেলেরা জড়ো হয়েছি ঘরের কোণে
মিটমিটে আলোয়।
বুড়ো মোহন সর্দার

কলপ-লাগানো চুল বাবরি-করা,
মিশকালো রং,
চোখ দুটো যেন বেরিয়ে আসছে,
শিথিল হয়েছে মাংস,
হাতের পায়ের হাড়গুলো দীর্ঘ,
কণ্ঠস্বর সরু-মোটায় ভাঙা।
রোমাঞ্চ লাগবার মতো তার পূর্ব-ইতিহাস।
বসেছে আমাদের মাঝখানে,
বলছে রোঘো ডাকাতের কথা।
আমরা সবাই গল্প আঁকড়ে বসে আছি।
দক্ষিণের হাওয়া-লাগা ঝাউডালের মতো
দুলছে মনের ভিতরটা।

খোলা জানলার সামনে দেখা যায় গলি,
একটা হলদে গ্যাসের আলোর খুঁটি
দাঁড়িয়ে আছে একচোখো ভূতের মতো।
পথের বাঁ ধারটাতে জমেছে ছায়া।
গলির মোড়ে সদর রাস্তায়
বেলফুলের মালা হেঁকে গেল মালী।
পাশের বাড়ি থেকে
কুকুর ডেকে উঠল অকারণে।
নটার ঘণ্টা বাজল দেউড়িতে।

অবাক হয়ে শুনছি রোঘোর চরিতকথা।

তত্ত্বরত্নের ছেলের পৈতে,
রোঘো বলে পাঠাল চরের মুখে,
"নমো নমো করে সারলে চলবে না ঠাকুর,
ভেবো না খরচের কথা।"
মোড়লের কাছে পত্র দেয়
পাঁচ হাজার টাকা দাবি ক'রে ব্রাহ্মণের জন্যে।

রাজার খাজনা-বাকির দায়ে
বিধবার বাড়ি যায় বিকিয়ে.
হঠাৎ দেওয়ানজির ঘরে হানা দিয়ে
দেনা শোধ ক'রে দেয় রঘু।
বলে—"অনেক গরিবকে দিয়েছ ফাঁকি,
কিছু হালকা হ'ক তার বোঝা।"

একদিন তখন মাঝরাত্তির,
ফিরছে রোঘো লুঠের মাল নিয়ে,
নদীতে তার ছিপের নৌকো
অন্ধকারে বটের ছায়ায়।
পথের মধ্যে শোনে—
পাড়োয় বিয়েবাড়িতে কান্নার ধ্বনি,
বর ফিরে চলেছে বচসা করে ;
কনের বাপ পা আঁকড়ে ধরেছে বরকর্তার।
এমন সময় পথের ধারে
ঘন বাঁশ বনের ভিতর থেকে
হাঁক উঠল, রে রে রে রে রে রে।

আকাশের তারাগুলো
যেন উঠল থরথরিয়ে।
সবাই জানে রোঘো ডাকাতের
পাঁজর-ফাটানো ডাক।
বরসুদ্ধ পালকি পড়ল পথের মধ্যে ;
বেহারা পালাবে কোথায় পায় না ভেবে।
ছুটে বেরিয়ে এল মেয়ের মা
অন্ধকারের মধ্যে উঠল তার কান্না—
"দোহাই বাবা, আমার মেয়ের জাত বাঁচাও।"
রোঘো দাঁড়াল যমদূতের মতো—
পালকি থেকে টেনে বের করলে বরকে,

বরকর্তার গালে মারল একটা প্রচণ্ড চড়,
পড়ল সে মাথা ঘুরে।

ঘরের প্রাঙ্গণে আবার শাঁখ উঠল বেজে,
জাগল হুলুধ্বনি;
দলবল নিয়ে রোঘো দাঁড়াল সভায়,
শিবের বিয়ের রাতে ভূতপ্রেতের দল যেন।
উলঙ্গপ্রায় দেহ সবার, তেলমাখা সর্বাঙ্গে,
মুখে ভুসোর কালি।
বিয়ে হল সারা।
তিন প্রহর রাতে
যাবার সময় কনেকে বললে ডাকাত
"তুমি আমার মা,
দুঃখ যদি পাও কখনো
স্মরণ ক'রো রঘুকে।"

তারপরে এসেছে যুগান্তর।
বিদ্যুতের প্রখর আলোতে
ছেলেরা আজ খবরের কাগজে
পড়ে ডাকাতির খবর।
রূপকথা-শোনা নিভৃত সন্ধ্যেবেলাগুলো
সংসার থেকে গেল চলে,
আমাদের স্মৃতি
আর নিবে-যাওয়া তেলের প্রদীপের সঙ্গে সঙ্গে।

তেত্রিশ

বাদশাহের হুকুম,—
সৈন্যদল নিয়ে এল আক্রাসায়েব খাঁ, মুজফ্‌ফর খাঁ,
মহম্মদ আমিন খাঁ,
সঙ্গে এল রাজা গোপাল সিং ভদৌরিয়া,
উদইৎ সিং বুন্দেলা।

গুরুদাসপুর ঘেরাই করল মোগল সেনা।
শিখদল আছে কেল্লার মধ্যে,
বন্দা সিং তাদের সর্দার।
ভিতরে আসে না রসদ,
বাইরে যাবার পথ সব বন্ধ।

থেকে থেকে কামানের গোলা পড়ছে
প্রাকার ডিঙিয়ে,—
চারদিকের দিক্‌সীমা পর্যন্ত
রাত্রির আকাশ মশালের আলোয় রক্তবর্ণ।

ভাণ্ডারে না রইল গম, না রইল যব,
না রইল জোয়ারি ;—
জ্বালানি কাঠ গেছে ফুরিয়ে।
কাঁচা মাংস খায় ওরা অসহ্য ক্ষুধায়,
কেউ বা খায় নিজের জঙ্ঘা থেকে মাংস কেটে।
গাছের ছাল, গাছের ডাল গুঁড়ো ক'রে
তাই দিয়ে বানায় রুটি।

নরক-যন্ত্রণায় কাটল আট মাস,
মোগলের হাতে পড়ল
গুরদাসপুর গড়।
মৃত্যুর আসর রক্তে হল আকণ্ঠ পঙ্কিল,
বন্দীরা চীৎকার করে
"ওয়াহি গুরু, ওয়াহি গুরু,"
আর শিখের মাথা স্খলিত হয়ে পড়ে
দিনের পর দিন।

নেহাল সিং বালক ;
স্বচ্ছ তরুণ সৌম্যমুখে
অন্তরের দীপ্তি পড়েছে ফুটে।

চোখে যেন স্তব্ধ আছে
সকালবেলার তীর্থযাত্রীর গান।
সুকুমার উজ্জ্বল দেহ,
দেবশিল্পী কুঁদে বের করেছে
বিদ্যুতের বাটালি দিয়ে।
বয়স তার আঠারো কি উনিশ হবে,
শালগাছের চারা,
উঠেছে ঋজু হয়ে,
তবু এখনো
হেলতে পারে দক্ষিণের হাওয়ায়।
প্রাণের অজস্রতা
দেহে মনে রয়েছে
কানায় কানায় ভরা।

বেঁধে আনলে তাকে।
সভার সমস্ত চোখ
ওর মুখে তাকাল বিস্ময়ে করুণায়।
ক্ষণেকের জন্যে
ঘাতকের খড়্গ যেন চায় বিমুখ হতে
এমন সময় রাজধানী থেকে এল দূত,
হাতে সৈয়দ আবদুল্লা খাঁয়ের
স্বাক্ষর-করা মুক্তিপত্র।

যখন খুলে দিলে তার হাতের বন্ধন,
বালক শুধাল, আমার প্রতি কেন এই বিচার?
শুনল, বিধবা মা জানিয়েছে
শিখধর্ম নয় তার ছেলের,
বলেছে, শিখেরা তাকে জোর করে রেখেছিল
বন্দী ক'রে।

ক্ষোভে লজ্জায় রক্তবর্ণ হল
বালকের মুখ।
বলে উঠল, "চাইনে প্রাণ মিথ্যার কৃপায়,
সত্যে আমার শেষ মুক্তি,
আমি শিখ।"

চৌত্রিশ

পথিক আমি।
পথ চলতে চলতে দেখেছি
পুরাণে কীর্তিত কত দেশ আজ কীর্তি-নিঃস্ব।
দেখেছি দর্পোদ্ধত প্রতাপের
অবমানিত ভগ্নশেষ,
তার বিজয় নিশান
বজ্রাঘাতে হঠাৎ স্তব্ধ অট্টহাসির মতো
গেছে উড়ে;
বিরাট অহংকার
হয়েছে সাষ্টাঙ্গে ধুলায় প্রণত,
সেই ধুলার 'পরে সন্ধ্যাবেলায়
ভিক্ষুক তার জীর্ণ কাঁথা মেলে বসে,
পথিকের শ্রান্ত পদ
সেই ধুলায় ফেলে চিহ্ন,—
অসংখ্যের নিত্য পদপাতে
সে চিহ্ন যায় লুপ্ত হয়ে।

দেখেছি সুদূর যুগান্তর
বালুর স্তরে প্রচ্ছন্ন,
যেন হঠাৎ ঝঞ্ঝার ঝাপটা লেগে
কোন্ মহাতরী
হঠাৎ ডুবল ধূসর সমুদ্রতলে,
সকল আশা নিয়ে, গান নিয়ে, স্মৃতি নিয়ে

এই অনিত্যের মাঝখান দিয়ে চলতে চলতে
অনুভব করি আমার হৃৎস্পন্দনে
অসীমের স্তব্ধতা।

পঁয়ত্রিশ

অঙ্গের বাঁধনে বাঁধাপড়া আমার প্রাণ
আকস্মিক চেতনার নিবিড়তায়
চঞ্চল হয়ে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে,
তখন কোন্ কথা জানাতে তার এত অধৈর্য।
—যে কথা দেহের অতীত।

খাঁচার পাখির কণ্ঠে যে বাণী
সে তো কেবল খাঁচারি নয়,
তার মধ্যে গোপনে আছে সুদূর অগোচরের অরণ্য-মর্মর,
আছে করুণ বিস্মৃতি।

সামনে তাকিয়ে চোখের দেখা দেখি—
এ তো কেবলি দেখার জাল-বোনা নয়।—
বসুন্ধরা তাকিয়ে থাকেন নির্নিমেষে
দেশ-পারানো কোন্ দেশের দিকে,
দিগ্বলয়ের ইঙ্গিতলীন
কোন্ কল্পলোকের অদৃশ্য সংকেতে।

দীর্ঘপথ ভালোমন্দয় বিকীর্ণ,
রাত্রিদিনের যাত্রা দুঃখসুখের বন্ধুর পথে।
শুধু কেবল পথ চলাতেই কি এ পথের লক্ষ্য?
ভিড়ের কলরব পেরিয়ে আসছে গানের আহ্বান,
তার সত্য মিলবে কোন্খানে?

মাটির তলায় সুপ্ত আছে বীজ।
তাকে স্পর্শ করে চৈত্রের তাপ,
মাঘের হিম, শ্রাবণের বৃষ্টিধারা।
অন্ধকারে সে দেখছে অভাবিতের স্বপ্ন।
স্বপ্নেই কি তার শেষ?
উষার আলোয় তার ফুলের প্রকাশ;
আজ নেই, তাই বলে কি নেই কোনোদিনই?

ছত্রিশ

শীতের রোদ্দুর।
সোনা-মেশা সবুজের ঢেউ
স্তম্ভিত হয়ে আছে সেগুন বনে।
বেগনি-ছায়ার ছোঁওয়া-লাগা
ঝুরি-নামা বৃদ্ধ বট
ডাল মেলেছে রাস্তার ওপার পর্যন্ত।
ফলসাগাছের ঝরা পাতা
হঠাৎ হাওয়ায় চমকে বেড়ায় উড়ে
ধুলোর সাঙাত হয়ে।

কাজ-ভোলা এই দিন
উধাও বলাকার মতো
লীন হয়ে চলেছে নিঃসীম নীলিমায়।
ঝাউগাছের মর্মরধ্বনিতে মিশে
মনের মধ্যে এই কথাটি উঠছে বেজে,
"আমি আছি।"

কুয়োতলার কাছে
সামান্য ঐ আমের গাছ;
সারা বছর ও থাকে আত্মবিস্মৃত,
বনের সাধারণ সবুজের আবরণে
ও থাকে ঢাকা।

এমন সময় মাঘের শেষে
হঠাৎ মাটির নিচে
শিকড়ে শিকড়ে তার শিহর লাগে,
শাখায় শাখায় মুকুলিত হয়ে ওঠে বাণী—
"আমি আছি,"
চন্দ্রসূর্যের আলো আপন ভাষায়
স্বীকার করে তার সেই ভাষা।

অলস মনের শিয়রে দাঁড়িয়ে
হাসেন অন্তর্যামী,
হঠাৎ দেন ঠেকিয়ে সোনার কাঠি
প্রিয়ার মুগ্ধ চোখের দৃষ্টি দিয়ে,
কবির গানের সুর দিয়ে
তখন যে-আমি ধূলিধূসর সামান্য দিনগুলির
মধ্যে মিলিয়ে ছিল,
সে দেখা দেয় এক নিমেষের অসামান্য আলোকে।
সে-সব দুর্মূল্য নিমেষ
কোনো রত্নভাণ্ডারে থেকে যায় কি না জানিনে;
এইটুকু জানি—
তারা এসেছে আমার আত্মবিস্মৃতির মধ্যে,
জাগিয়েছে আমার মর্মে
বিশ্বমর্মের নিত্যকালের সেই বাণী
"আমি আছি।"

সাঁইত্রিশ

বিশ্বলক্ষ্মী,
তুমি একদিন বৈশাখে
বসেছিলে দারুণ তপস্যায়
রুদ্রের চরণতলে।

তোমার তনু হল উপবাসে শীর্ণ,
পিঙ্গল তোমার কেশপাশ।

দিনে দিনে দুঃখকে তুমি দগ্ধ করলে
দুঃখেরি দহনে,
শুষ্ককে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিলে
পূজার পুণ্যধূপে।
কালোকে আলো করলে,
তেজ দিলে নিস্তেজকে,
ভোগের আবর্জনা লুপ্ত হল
ত্যাগের হোমাগ্নিতে।

দিগন্তে রুদ্রের প্রসন্নতা
ঘোষণা করলে মেঘগর্জনে,
অবনত হল দাক্ষিণ্যের মেঘপুঞ্জ
উৎকণ্ঠিতা ধরণীর দিকে।
মরুবক্ষে তৃণরাজি
শ্যাম আস্তরণ দিল পেতে,
সুন্দরের করুণ চরণ
নেমে এল তার 'পরে।

আটত্রিশ

হে যক্ষ, সেদিন প্রেম তোমাদের
বদ্ধ ছিল আপনাতেই
পদ্মকুঁড়ির মতো।
সেদিন সংকীর্ণ সংসারে
একান্তে ছিল তোমার প্রেয়সী
যুগলের নির্জন উৎসবে,
সে ঢাকা ছিল তোমার আপনাকে দিয়ে,
শ্রাবণের মেঘমালা

যেমন হারিয়ে ফেলে চাঁদকে
আপনারি আলিঙ্গনের
আচ্ছাদনে।

এমন সময়ে প্রভুর শাপ এল
বর হয়ে,
কাছে থাকার বেড়া-জাল গেল ছিঁড়ে।
খুলে গেল প্রেমের আপনাতে-বাঁধা
পাপড়িগুলি,
সে-প্রেম নিজের পূর্ণ রূপের দেখা পেল
বিশ্বের মাঝখানে।
বৃষ্টির জলে ভিজে' সন্ধ্যাবেলাকার জুঁই
তাকে দিল গন্ধের অঞ্জলি।
রেণুর ভারে মন্থর বাতাস
তাকে জানিয়ে দিল
নীপ-নিকুঞ্জের আকূতি।

সেদিন অশ্রুধৌত সৌম্য বিষাদের
দীক্ষা পেলে তুমি;
নিজের অন্তর-আঙিনায়
গড়ে তুললে অপূর্ব মূর্তিখানি
স্বর্গীয় গরিমায় কান্তিমতী।
যে ছিল নিভৃত ঘরের সঙ্গিনী
তার রসরূপটিকে আসন দিলে
অনন্তের আনন্দমন্দিরে
ছন্দের শঙ্খ বাজিয়ে।

আজ তোমার প্রেম পেয়েছে ভাষা,
আজ তুমি হয়েছ কবি,
ধ্যানোদ্ভবা প্রিয়া

বক্ষ ছেড়ে বসেছে তোমার মর্মতলে
বিরহের বীণা হাতে।
আজ সে তোমার আপন সৃষ্টি
বিশ্বের কাছে উৎসর্গ-করা

উনচল্লিশ

ওরা এসে আমাকে বলে,
কবি, মৃত্যুর কথা শুনতে চাই তোমার মুখে।
আমি বলি,
মৃত্যু যে আমার অন্তরঙ্গ,
জড়িয়ে আছে আমার দেহের সকল তন্তু।
তার ছন্দ আমার হৃৎস্পন্দনে,
আমার রক্তে তার আনন্দের প্রবাহ।
বলছে সে,—চলো চলো,
চলো বোঝা ফেলতে ফেলতে,
চলো মরতে মরতে নিমেষে নিমেষে
আমারি টানে, আমারি বেগে।
বলছে, চুপ করে বস যদি
যা-কিছু আছে সমস্তকে আঁকড়িয়ে ধরে
তবে দেখবে, তোমার জগতে
ফুল গেল বাসি হয়ে,
পাঁক দেখা দিল শুকনো নদীতে,
ম্লান হল তোমার তারার আলো।
বলছে, "থেমো না, থেমো না,
পিছনে ফিরে তাকিয়ো না,
পেরিয়ে যাও পুরোনোকে জীর্ণকে ক্লান্তকে অচলকে।
"আমি মৃত্যু-রাখাল
সৃষ্টিকে চরিয়ে চরিয়ে নিয়ে চলেছি
যুগ হতে যুগান্তরে
নব নব চারণ-ক্ষেত্রে।

"যখন বইল জীবনের ধারা
আমি এসেছি তার পিছনে পিছনে,
দিইনি তাকে কোনো গর্তে আটক থাকতে।
তীরের বাঁধন কাটিয়ে কাটিয়ে
ডাক দিয়ে নিয়ে গেছি মহাসমুদ্রে,
সে সমুদ্র আমিই।
"বর্তমান চায় বর্তিয়ে থাকতে।
সে চাপাতে চায়
তার সব বোঝা তোমার মাথায়,
বর্তমান গিলে ফেলতে চায়
তোমার সব-কিছু আপন জঠরে।
তার পরে অবিচল থাকতে চায়
আকণ্ঠপূর্ণ দানবের মতো
জাগরণহীন নিদ্রায়।
তাকেই বলে প্রলয়।
এই অনন্ত অচঞ্চল বর্তমানের হাত থেকে
আমি সৃষ্টিকে পরিত্রাণ করতে এসেছি,
অন্তহীন নব নব অনাগতে।"

চল্লিশ

পরি দ্যাবা পৃথিবী সদ্য আয়ম্
উপাতিষ্ঠে প্রথমজামৃতস্য।
—অথর্ববেদ

ঋষি কবি বলেছেন—
ঘুরলেন তিনি আকাশ পৃথিবী,
শেষকালে এসে দাঁড়ালেন
প্রথমজাত অমৃতের সম্মুখে।

কে এই প্রথমজাত অমৃত,
কী নাম দেব তাকে ?
তাকেই বলি নবীন,
সে নিত্যকালের।

কত জরা কত মৃত্যু
বারে বারে ঘিরল তাকে চারদিকে,
সেই কুয়াশার মধ্যে থেকে
বারে বারে সে বেরিয়ে এল,
প্রতিদিন ভোরবেলার আলোতে
ধ্বনিত হল তার বাণী—
"এই আমি প্রথমজাত অমৃত।"

দিন এগোতে থাকে,
তপ্ত হয়ে ওঠে বাতাস,
আকাশ আবিল হয়ে ওঠে ধুলোয়,
বৃদ্ধ সংসারের কর্কশ কোলাহল
আবর্তিত হতে থাকে
দূর হতে দূরে।

কখন দিন আসে আপন শেষপ্রান্তে,
থেমে যায় তাপ,
নেমে যায় ধুলো,
শান্ত হয় কর্কশ কণ্ঠের পরিণামহীন বচসা,
আলোর যবনিকা সরে যায়
দিক্‌সীমার অন্তরালে।

অন্তহীন নক্ষত্রলোকে,
গ্লানিহীন অন্ধকারে
জেগে ওঠে বাণী—
"এই আমি প্রথমজাত অমৃত।"

শতাব্দীর পর শতাব্দী
আপনাকে ঘোষণা করে
মানুষের তপস্যায় ;
সে-তপস্যা
ক্লান্ত হয়,
হোমাগ্নি যায় নিবে,
মন্ত্র হয় অর্থহীন,
জীর্ণ সাধনার শতছিদ্র মলিন আচ্ছাদন
ম্রিয়মাণ শতাব্দীকে ফেলে ঢেকে ।

অবশেষে কখন
শেষ সূর্যাস্তের তোরণদ্বারে
নিঃশব্দচরণে আসে
যুগান্তের রাত্রি,
অন্ধকারে জপ করে শান্তিমন্ত্র
শবাসনে সাধকের মতো ।
বহুবর্ষব্যাপী প্রহর যায় চলে,
নবযুগের প্রভাত
শুভ্র শঙ্খ হাতে
দাঁড়ায় উদয়াচলের স্বর্ণশিখরে,
দেখা যায়,
তিমিরধারায় ক্ষালন করেছে কে
ধূলিশায়ী শতাব্দীর আবর্জনা ;
ব্যাপ্ত হয়েছে অপরিসীম ক্ষমা
অন্তর্হিত অপরাধের
কলঙ্কচিহ্নের 'পরে ।
পেতেছে শান্ত জ্যোতির আসন
প্রথমজাত অমৃত ।
বালক ছিলেম,
নবীনকে তখন দেখেছি আনন্দিত চোখে

ধরণীর সবুজে,
আকাশের নীলিমায়।

দিন এগোল।
চলল জীবনযাত্রার রথ
এ-পথে ও-পথে।
ক্ষুব্ধ অন্তরের তাপতপ্ত নিঃশ্বাস
শুকনো পাতা ওড়াল দিগন্তে।
চাকার বেগে
বাতাস ধুলায় হল নিবিড়।
আকাশচর কল্পনা
উড়ে গেল মেঘের পথে,
ক্ষুধাতুর কামনা
মধ্যাহ্নের রৌদ্রে
ঘুরে বেড়াল ধরাতলে
ফলের বাগানে ফসলের খেতে
আহূত অনাহূত।
আকাশে পৃথিবীতে
এ জন্মের ভ্রমণ হল সারা
পথে বিপথে।
আজ এসে দাঁড়ালেম
প্রথমজাত অমৃতের সম্মুখে।

১ বৈশাখ, ১৩৪২
শান্তিনিকেতন

একচল্লিশ

হালকা আমার স্বভাব,
মেঘের মতো না হ'ক
গিরিনদীর মতো।

আমার মধ্যে হাসির কলরব
আজও থামল না।
বেদীর থেকে নেমে আসি,
রঙ্গমঞ্চে বসে বাঁধি নাচের গান,
তার বায়না নিয়েছি প্রভুর কাছে।
কবিতা লিখি,
তার পদে পদে ছন্দের ভঙ্গিমায়
তারুণ্য ওঠে মুখর হয়ে,
ঝিঁঝিট খাম্বাজের ঝংকার দিতে
আজো সে সংকোচ করে না।

আমি সৃষ্টিকর্তা পিতামহের
রহস্য-সখা।
তিনি অর্বাচীন নবীনদের কাছে
প্রবীণ বয়সের প্রমাণ দিতে
ভুলেই গেছেন।
তরুণের উচ্ছৃঙ্খল হাসিতে
উতরোল তাঁর কৌতুক,
তাদের উদ্দাম নৃত্যে
বাজান তিনি দ্রুততালের মৃদঙ্গ।
তাঁর বজ্রমন্দ্রিত গাম্ভীর্য মেঘমেদুর অম্বরে,
অজস্র তাঁর পরিহাস
বিকশিত কাশবনে,
শরতের অকারণ হাস্যহিল্লোলে।
তাঁর কোনো লোভ নেই
প্রধানদের কাছে মর্যাদা পাবার;
তাড়াতাড়ি কালো পাথর চাপা দেন না
চাপল্যের ঝরনার মুখে।
তাঁর বেলাভূমিতে
ভঙ্গুর সৈকতের ছেলেমানুষি
প্রতিবাদ করে না সমুদ্রের।

আমাকে চান টেনে রাখতে তাঁর বয়স্যদলে,
তাই আমার বার্ধক্যের শিরোপা
হঠাৎ নেন কেড়ে
ফেলে দেন ধুলোয়—
তার উপর দিয়ে নেচে নেচে
চলে যায় বৈরাগী
পাঁচ রঙের তালি-দেওয়া আলখাল্লা পরে।
যারা আমার মূল্য বাড়াতে চায়,
পরায় আমাকে দামি সাজ,
তাদের দিকে চেয়ে
তিনি ওঠেন হেসে,
ও সাজ আর টিঁকতে পায় না
আনমনার অনবধানে।

আমাকে তিনি চেয়েছেন
নিজের অবারিত মজলিসে,
তাই ভেবেছি যাবার বেলায় যাব
মান খুইয়ে,
কপালের তিলক মুছে,
কৌতুকে রসোল্লাসে।
এস আমার অমানী বন্ধুরা
মন্দিরা বাজিয়ে—
তোমাদের ধুলোমাখা পায়ে
যদি ঘুঙুর বাঁধা থাকে
লজ্জা পাব না।

বিয়াল্লিশ

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত প্রিয়বরেষু

তুমি গল্প জমাতে পার।
বসো তোমার কেদারায়,
ধীরে ধীরে টান দাও গুড়গুড়িতে,
উছলে ওঠে আলাপ
তোমার ভিতর থেকে
হালকা ভাষায়,
যেন নিরাসক্ত ঔৎসুক্যে,
তোমার কৌতুকে-ফেনিল মনের
কৌতূহলের উৎস থেকে।

ঘুরেছ নানা জায়গায়, নানা কাজে,
আপন দেশে, অন্য দেশে।
মনটা মেলে রেখেছিলে চারদিকে,
চোখটা ছিলে খুলে।
মানুষের যে-পরিচয়
তার আপন সহজভাবে,
যেমন-তেমন অখ্যাত ব্যাপারের ধারায়
দিনে দিনে যা গাঁথা হয়ে ওঠে,
সামান্য হলেও যাতে আছে
সত্যের ছাপ,
অকিঞ্চিৎকর হলেও যার আছে বিশেষত্ব,
সেটা এড়ায়নি তোমার দৃষ্টি।
সেইটে দেখাই সহজ নয়,
পণ্ডিতের দেখা সহজ।

শুনেছি তোমার পাঠ ছিল সায়ান্সে,
শুনেছি শাস্ত্রও পড়েছ সংস্কৃত ভাষায়;
পার্সি জবানিও জানা আছে।

গিয়েছ সমুদ্রপারে,
ভারতে রাজসরকারের
ইম্পীরিয়ল রথযাত্রায় লম্বা দড়িতে
'হেঁইয়ো' ব'লে দিতে হয়েছে টান।
অর্থনীতি রাষ্ট্রনীতি
মগজে বোঝাই হয়েছে কম নয়,
পুঁথির থেকেও কিছু,
মানুষের প্রাণযাত্রা থেকেও বিস্তর।

তবু সব-কিছু নিয়ে
তোমার যে পরিচয় মুখ্য
সে তোমার আলাপ-পরিচয়ে।
তুমি গল্প জমাতে পার।
তাই যখন-তখন দেখি,
তোমার ঘরে মানুষ লেগেই আছে,
কেউ তোমার চেয়ে বয়সে ছোটো
কেউ বয়সে বেশি।

গল্প করতে গিয়ে মাস্টারি কর না,
এই তোমার বাহাদুরি।
তুমি মানুষকে জান, মানুষকে জানাও,
জীবলীলার মানুষকে।

একে নাম দিতে পারি সাহিত্য,—
সব-কিছুর কাছে-থাকা।
তুমি জমা করেছ তোমার মনে
নানা লোকের সঙ্গ,
সেইটে দিতে পার সবাইকে
অনায়াসে,—

সেইটেকে জ্ঞানবিজ্ঞানের তকমা পরিয়ে
পণ্ডিত-পেয়াদা সাজাও না
ধমকিয়ে দিতে ভালোমানুষকে।

তোমার জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাণ্ডারটা
পূর্ণ আছে যথাস্থানেই।
সেটা বৈঠকখানাকে কোণ-ঠেসা করে রাখেনি।
যেখানে আসন পাত
গল্পের ভোজে
সেখানে ক্ষুধিতের পাতের থেকে ঠেকিয়ে রাখ
লাইব্রেরি ল্যাবরেটরিকে।

একটিমাত্র কারণ,—
মানুষের 'পরে আছে তোমার দরদ,—
যে-মানুষ চলতে চলতে হাঁপিয়ে ওঠে
সুখদুঃখের দুর্গম পথে,
বাঁধা পড়ে নানা বন্ধনে
ইচ্ছায় অনিচ্ছায়,—
যে-মানুষ বাঁচে,
যে-মানুষ মরে
অদৃষ্টের গোলকধাঁদার পাকে।
সে-মানুষ রাজাই হ'ক ভিখিরিই হ'ক
তার কথা শুনতে মানুষের অসীম আগ্রহ।

তার কথা যে-লোক পারে বলতে সহজেই
সে-ই পারে,
অন্তে পারে না।
বিশেষ এই হাল-আমলে।
আজ মানুষের জানাশোনা
তার দেখাশোনাকে
দিয়েছে আপাদমস্তক ঢেকে।

একটু ধাক্কা পেলে
তার মুখে নানা কথা অনর্গল ছিটকে পড়ে
নানা সমস্যা, নানা তর্ক,
একান্ত মানুষের আসল কথাটা
যায় খাটো হয়ে।

আজ বিপুল হল সমস্যা,
বিচিত্র হল তর্ক,
দুর্ভেদ্য হল সংশয়,—
আজকের দিনে
সেইজন্যেই এত করে বন্ধুকে খুঁজি,
মানুষের সহজ বন্ধুকে
যে গল্প জমাতে পারে।
এ দুর্দিনে
মাস্টারমশায়কেও অত্যন্ত দরকার।
তাঁর জন্যে ক্লাস আছে
পাড়ায় পাড়ায়—
প্রায়মারি, সেকেণ্ডারি।
গল্পের মজলিস জোটে দৈবাৎ।

সমুদ্রের ওপারে
একদিন ওরা গল্পের আসর খুলেছিল,
তখন ছিল অবকাশ;
ওরা ছেলেদের কাছে শুনিয়েছিল,
রবিন্‌সন্ ক্রুসো,
সকল বয়সের মানুষের কাছে
ডন্ কুইক্‌সোট্।

দুরূহ ভাবনার আঁধি লাগল
দিকে দিকে;

লোকাচারের বান ডেকে এল,
জলে স্থলে কাদায় পাঁকে
গেল ঘুলিয়ে।

অগত্যা
অধ্যাপকেরা জানিয়ে দিলে
একেই বলে গল্প।

বন্ধু,
দুঃখ জানাতে এলুম
তোমার বৈঠকে।
আজকাল-এর ছাত্রেরা দেয়
আজকাল-এর দোহাই।
আজকাল-এর মুখরতায়
তাদের অটুট বিশ্বাস।
হায় রে আজকাল
কত ডুবে গেল কালের মহাপ্লাবনে
মোটাদামের মার্কা-মারা।
পসরা নিয়ে।
যা চিরকাল-এর
তা আজ যদি বা ঢাকা পড়ে
কাল উঠবে জেগে।
তখন মানুষ আবার বলবে খুশি হয়ে,—
গল্প বলো।

তেতাল্লিশ

শ্রীমান অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী কল্যাণীয়েষু

পঁচিশে বৈশাখ চলেছে
জন্মদিনের ধারাকে বহন করে
মৃত্যুদিনের দিকে।

সেই চলতি আসনের উপর বসে
কোন্ কারিগর গাঁথছে
ছোটো ছোটো জন্মমৃত্যুর সীমানায়
নানা রবীন্দ্রনাথের একখানা মালা।

রথে চড়ে চলেছে কাল;
পদাতিক পথিক চলতে চলতে
পাত্র তুলে ধরে,
পায় কিছু পানীয়;—
পান সারা হলে
পিছিয়ে পড়ে অন্ধকারে;
চাকার তলায়
ভাঙা পাত্র ধুলায় যায় গুঁড়িয়ে।
তার পিছনে পিছনে
নতুন পাত্র নিয়ে যে আসে ছুটে,
পায় নতুন রস,
একই তার নাম,
কিন্তু সে বুঝি আর-একজন।

একদিন ছিলেম বালক।
কয়েকটি জন্মদিনের ছাঁদের মধ্যে
সেই যে-লোকটার মূর্তি হয়েছিল গড়া
তোমরা তাকে কেউ জান না।
সে সত্য ছিল যাদের জানার মধ্যে
কেউ নেই তারা।
সেই বালক না আছে আপন স্বরূপে
না আছে কারো স্মৃতিতে।
সে গেছে চলে তার ছোটো সংসারটাকে নিয়ে;
তার সেদিনকার কান্না-হাসির
প্রতিধ্বনি আসে না কোনো হাওয়ায়।

তার ভাঙা খেলনার টুকরোগুলোও
দেখিনে ধুলোর 'পরে।

সেদিন জীবনের ছোটো গবাক্ষের কাছে
সে বসে থাকত বাইরের দিকে চেয়ে।
তার বিশ্ব ছিল
সেইটুকু ফাঁকের বেষ্টনীর মধ্যে।
তার অবোধ চোখ-মেলে চাওয়া
ঠেকে যেত বাগানের পাঁচিলটাতে
সারি সারি নারকেল গাছে।
সন্ধ্যেবেলাটা রূপকথার রসে নিবিড়;
বিশ্বাস অবিশ্বাসের মাঝখানে
বেড়া ছিল না উঁচু,
মনটা এদিক থেকে ওদিকে
ডিঙিয়ে যেত অনায়াসেই।
প্রদোষের আলো-আঁধারে
বস্তুর সঙ্গে ছায়াগুলো ছিল জড়িয়ে,
দুইই ছিল একগোত্রের।

সে-কয়দিনের জন্মদিন
একটা দ্বীপ,
কিছুকাল ছিল আলোতে,
কাল-সমুদ্রের তলায় গেছে ডুবে।
ভাঁটার সময় কখনো কখনো
দেখা যায় তার পাহাড়ের চূড়া,
দেখা যায় প্রবালের রক্তিম তটরেখা।

পঁচিশে বৈশাখ তার পরে দেখা দিল
আর-এক কালান্তরে,
ফাল্গুনের প্রত্যূষে
রঙিন আভার অস্পষ্টতায়।

তরুণ যৌবনের বাউল
সুর বেঁধে নিল আপন একতারাতে,
ডেকে বেড়াল
নিরুদ্দেশ মনের মানুষকে
অনির্দেশ্য বেদনার খ্যাপা সুরে।

সেই শুনে কোনো-কোনোদিন বা
বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর আসন টলেছিল,
তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন
তাঁর কোনো কোনো দূতীকে
পলাশবনের রংমাতাল ছায়াপথে
কাজ-ভোলানো সকাল বিকালে।
তখন কানে কানে মৃদু গলায় তাদের কথা শুনেছি,
কিছু বুঝেছি কিছু বুঝিনি।
দেখেছি কালো চোখের পক্ষ্মরেখায়
জলের আভাস;
দেখেছি কম্পিত অধরে নিমীলিত বাণীর
বেদনা;
শুনেছি ক্বণিত কঙ্কণে
চঞ্চল আগ্রহের চকিত ঝংকার।

তারা রেখে গেছে আমার অজানিতে
পঁচিশে বৈশাখের
প্রথম ঘুমভাঙা প্রভাতে
নতুন ফোটা বেলফুলের মালা;
ভোরের স্বপ্ন
তারি গন্ধে ছিল বিহ্বল।

সেদিনকার জন্মদিনের কিশোর জগৎ
ছিল রূপকথার পাড়ার গায়ে-গায়েই,
জানা না-জানার সংশয়ে।

সেখানে রাজকন্যা আপন এলোচুলের আবরণে
কখনো বা ছিল ঘুমিয়ে,
কখনো বা জেগেছিল চমকে উঠে'
সোনার কাঠির পরশ লেগে।

দিন গেল।
সেই বসন্তীরঙের পঁচিশে বৈশাখের
রং-করা প্রাচীরগুলো
পড়ল ভেঙে।
যে পথে বকুলবনের পাতার দোলনে
ছায়ায় লাগত কাঁপন,
হাওয়ায় জাগত মর্মর,
বিরহী কোকিলের
কুহুরবের মিনতিতে
আতুর হত মধ্যাহ্ন,
মৌমাছির ডানায় লাগত গুঞ্জন
ফুলগন্ধের অদৃশ্য ইশারা বেয়ে,
সেই তৃণ-বিছানো বীথিকা
পৌঁছল এসে পাথরে-বাঁধানো রাজপথে।

সেদিনকার কিশোরক
সুর সেধেছিল যে-একতারায়
একে একে তাতে চড়িয়ে দিল
তারের পর নতুন তার।
সেদিন পঁচিশে বৈশাখ
আমাকে আনল ডেকে
বন্ধুর পথ দিয়ে
তরঙ্গমন্দ্রিত জনসমুদ্রতীরে।

বেলা-অবেলায়
ধ্বনিতে ধ্বনিতে গেঁথে
জাল ফেলেছি মাঝদরিয়ায় ;
কোনো মন দিয়েছে ধরা,
ছিন্ন জালের ভিতর থেকে
কেউ বা গেছে পালিয়ে।

কখনো দিন এসেছে ম্লান হয়ে,
সাধনায় এসেছে নৈরাশ্য,
গ্লানিভারে নত হয়েছে মন।
এমন সময়ে অবসাদের অপরাহ্ণে
অপ্রত্যাশিত পথে এসেছে
অমরাবতীর মর্ত্যপ্রতিমা ;
সেবাকে তারা সুন্দর করে,
তপঃক্লান্তের জন্যে তারা
আনে সুধার পাত্র ;
ভয়কে তারা অপমানিত করে
উল্লোল হাস্যের কলোচ্ছ্বাসে ;
তারা জাগিয়ে তোলে দুঃসাহসের শিখা
ভস্মে-ঢাকা অঙ্গারের থেকে ;
তারা আকাশবাণীকে ডেকে আনে
প্রকাশের তপস্যায়।
তারা আমার নিবে-আসা দীপে
জ্বালিয়ে গেছে শিখা,
শিথিল-হওয়া তারে
বেঁধে দিয়েছে সুর,
পঁচিশে বৈশাখকে
বরণমাল্য পরিয়েছে
আপন হাতে গেঁথে।

তাদের পরশমণির ছোঁওয়া
আজো আছে
আমার গানে আমার বাণীতে।

সেদিন জীবনের রণক্ষেত্রে
দিকে দিকে জেগে উঠল সংগ্রামের সংঘাত
গুরু গুরু মেঘমন্দ্রে।
একতারা ফেলে দিয়ে
কখনো বা নিতে হল ভেরী।
খর মধ্যাহ্নের তাপে
ছুটতে হল
জয়পরাজয়ের আবর্তনের মধ্যে।

পায়ে বিঁধেছে কাঁটা,
ক্ষত বক্ষে পড়েছে রক্তধারা।
নির্মম কঠোরতা মেরেছে ঢেউ
আমার নৌকার ডাইনে বাঁয়ে,
জীবনের পণ্য চেয়েছে ডুবিয়ে দিতে
নিন্দার তলায়, পঙ্কের মধ্যে।
বিদ্বেষে অনুরাগে
ঈর্ষায় মৈত্রীতে,
সংগীতে পরুষ কোলাহলে
আলোড়িত তপ্ত বাষ্পনিঃশ্বাসের মধ্য দিয়ে
আমার জগৎ গিয়েছে তার কক্ষপথে।
এই দুর্গমে, এই বিরোধ-সংক্ষোভের মধ্যে
পঁচিশে বৈশাখের প্রৌঢ় প্রহরে
তোমরা এসেছ আমার কাছে।
জেনেছ কি,
আমার প্রকাশে
অনেক আছে অসমাপ্ত

অনেক ছিন্ন বিচ্ছিন্ন
অনেক উপেক্ষিত ?

অন্তরে বাহিরে
সেই ভালো মন্দ,
স্পষ্ট অস্পষ্ট,
খ্যাত অখ্যাত,
ব্যর্থ চরিতার্থের জটিল সম্মিশ্রণের মধ্য থেকে
যে আমার মূর্তি
তোমাদের শ্রদ্ধায়, তোমাদের ভালোবাসায়,
তোমাদের ক্ষমায়
আজ প্রতিফলিত,
আজ যার সামনে এনেছ তোমাদের মালা,
তাকেই আমার পঁচিশে বৈশাখের
শেষবেলাকার পরিচয় বলে
নিলেম স্বীকার করে,
আর রেখে গেলেম তোমাদের জন্যে
আমার আশীর্বাদ।
যাবার সময় এই মানসী মূর্তি
রইল তোমাদের চিত্তে,
কালের হাতে রইল বলে
করব না অহংকার।

তার পরে দাও আমাকে ছুটি
জীবনের কালো-সাদা সূত্রে গাঁথা
সকল পরিচয়ের অন্তরালে ;
নির্জন নামহীন নিভৃতে ;
নানা সুরের নানা তারের যন্ত্রে
সুর মিলিয়ে নিতে দাও
এক চরম সংগীতের গভীরতায়।

চুয়াল্লিশ

আমার শেষবেলাকার ঘরখানি
বানিয়ে রেখে যাব মাটিতে,
তার নাম দেব শ্যামলী।
ও যখন পড়বে ভেঙে
সে হবে ঘুমিয়ে পড়ার মতো,
মাটির কোলে মিশবে মাটি ;
ভাঙা থামে নালিশ উঁচু করে
বিরোধ করবে না ধরণীর সঙ্গে ;
ফাটা দেয়ালের পাঁজর বের ক'রে
তার মধ্যে বাঁধতে দেবে না
মৃতদিনের প্রেতের বাসা।

সেই মাটিতে গাঁথব
আমার শেষ বাড়ির ভিত
যার মধ্যে সব বেদনার বিস্মৃতি,
সব কলঙ্কের মার্জনা,
যাতে সব বিকার সব বিদ্রূপকে
ঢেকে দেয় দূর্বাদলের স্নিগ্ধ সৌজন্যে ;
যার মধ্যে শত শত শতাব্দীর
রক্তলোলুপ হিংস্র নির্ঘোষ
গেছে নিঃশব্দ হয়ে।

সেই মাটির ছাদের নিচে বসব আমি
রোজ সকালে শৈশবে যা ভরেছিল
আমার গাঁটবাঁধা চাদরের কোনা
এক-একমুঠো চাঁপা আর বেল ফুলে।
মাঘের শেষে যার আমের বোল
দক্ষিণের হাওয়ায়
অলক্ষ্য দূরের দিকে ছড়িয়েছিল
ব্যথিত যৌবনের আমন্ত্রণ।

আমি ভালোবেসেছি
বাংলাদেশের মেয়েকে ;
যে-দেখায় সে আমার চোখ ভুলিয়েছে
তাতে আছে যেন এই মাটির শ্যামল অঞ্জন,
ওর কচি ধানের চিকন আভা।
তাদের কালো চোখের করুণ মাধুরীর উপমা দেখেছি
ঐ মাটির দিগন্তে
নীল বনসীমায় গোধূলির শেষ আলোটির
নিমীলনে।

প্রতিদিন আমার ঘরের সুপ্ত মাটি
সহজে উঠবে জেগে
ভোরবেলাকার সোনার কাঠির
প্রথম ছোঁওয়ায় ;
তার চোখ-জুড়ানো শ্যামলিমায়
স্মিত হাসি কোমল হয়ে ছড়িয়ে পড়বে
চৈত্ররাতের চাঁদের
নিদ্রাহারা মিতালিতে।

চিরদিন মাটি আমাকে ডেকেছে
পদ্মার ভাঙনলাগা
খাড়া পাড়ির বনঝাউবনে,
গাঙশালিকের হাজার খোপের বাসায় ;
সর্ষে-তিসির দুইরঙা খেতে
গ্রামের সরু বাঁকা পথের ধারে,
পুকুরের পাড়ির উপরে।
আমার দু-চোখ ভরে
মাটি আমায় ডাক পাঠিয়েছে
শীতের ঘুঘু ডাকা দুপুরবেলায়,
রাঙা পথের ওপারে,

যেখানে শুকনো ঘাসের হলদে মাঠে
চরে বেড়ায় দুটি-চারটি গোরু
নিরুৎসুক আলস্যে,
লেজের ঘায়ে পিঠের মাছি তাড়িয়ে।
যেখানে সাথিবিহীন
তালগাছের মাথায়
সঙ্গ-উদাসীন নিভৃত চিলের বাসা।

আজ আমি তোমার ডাকে
ধরা দিয়েছি শেষবেলায়।
এসেছি তোমার ক্ষমাস্নিগ্ধ বুকের কাছে,
যেখানে একদিন রেখেছিলে অহল্যাকে,
নবদূর্বাশ্যামলের
করুণ পদস্পর্শে
চরম মুক্তি-জাগরণের প্রতীক্ষায়,
নবজীবনের বিস্মিত প্রভাতে।

পঁয়তাল্লিশ

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী কল্যাণীয়েষু

তখন আমার আয়ুর তরণী
যৌবনের ঘাট গেছে পেরিয়ে।
যে-সব কাজ প্রবীণকে প্রাজ্ঞকে মানায়
তাই নিয়ে পাকা করছিলেম
পাকা চুলের মর্যাদা।

এমন সময়ে আমাকে ডাক দিলে
তোমার সবুজপত্রের আসরে।
আমার প্রাণে এনে দিলে পিছুডাক,
খবর দিলে
নবীনের দরবারে আমার ছুটি মেলেনি।

দ্বিধার মধ্যে মুখ ফিরালেম
পেরিয়ে-আসা পিছনের দিকে।
পর্যাপ্ত তারুণ্যের পরিপূর্ণ মূর্তি
দেখা দিল আমার চোখের সম্মুখে।
ভরা যৌবনের দিনেও
যৌবনের সংবাদ
এমন জোয়ারের বেগে এসে লাগেনি আমার লেখনীতে।
আমার মন বুঝল
যৌবনকে না ছাড়ালে
যৌবনকে যায় না পাওয়া।

আজ এসেছি জীবনের শেষ ঘাটে।
পুবের দিক থেকে হাওয়ায় আসে
পিছু ডাক,
দাঁড়াই মুখ ফিরিয়ে।
আজ সামনে দেখা দিল
এ জন্মের সমস্তটা।

যাকে ছেড়ে এলেম
তাকেই নিচ্ছি চিনে।
সরে এসে দেখছি
আমার এতকালের সুখ দুঃখের ঐ সংসার,
আর তার সঙ্গে
সংসারকে পেরিয়ে কোন্ নিরুদ্দিষ্ট।
ঋষি-কবি প্রাণপুরুষকে বলেছেন -
"ভুবন সৃষ্টি করেছ
তোমার এক অর্ধেককে দিয়ে,-
বাকি আধখানা কোথায়
তা কে জানে।"
সেই একটি-আধখানা আমার মধ্যে আজ ঠেকেছে
আপন প্রান্তরেখায়;

দুইদিকে প্রসারিত দেখি দুই বিপুল নিঃশব্দ,
দুই বিরাট আধখানা,—
তারি মাঝখানে দাঁড়িয়ে
শেষকথা ব'লে যাব—
দুঃখ পেয়েছি অনেক,
কিন্তু ভালো লেগেছে,
ভালোবেসেছি।

ছেচল্লিশ

তখন আমার বয়স ছিল সাত।
ভোরের বেলায় দেখতেম জানলা দিয়ে
অন্ধকারের উপরকার ঢাকা খুলে আসছে,
বেরিয়ে আসছে কোমল আলো
নতুন ফোটা কাঁটালিচাঁপার মতো।

বিছানা ছেড়ে চলে যেতেম বাগানে
কাক ডাকবার আগে,
পাছে বঞ্চিত হই
কম্পমান নারকেল শাখাগুলির মধ্যে
সূর্যোদয়ের মঙ্গলাচরণে।

তখন প্রতিদিনটি ছিল স্বতন্ত্র, ছিল নতুন।
যে প্রভাত পূর্বদিকের সোনার ঘাট থেকে
আলোতে স্নান করে আসত
রক্তচন্দনের তিলক এঁকে ললাটে,
সে আমার জীবনে আসত নতুন অতিথি,
হাসত আমার মুখে চেয়ে।—
আগেকার দিনের কোনো চিহ্ন ছিল না তার উত্তরীয়ে

তারপরে বয়স হল
কাজের দায় চাপল মাথার 'পরে।
দিনের পরে দিন তখন হল ঠাসাঠাসি।
তারা হারাল আপনার স্বতন্ত্র মর্যাদা।
একদিনের চিন্তা আর-একদিনে হল প্রসারিত,
একদিনের কাজ আর-একদিনে পাতল আসন।
সেই একাকার-করা সময় বিস্তৃত হতে থাকে
নতুন হতে থাকে না।
একটানা বয়েস কেবলি বেড়ে ওঠে,
ক্ষণে ক্ষণে সমে এসে
চিরদিনের ধুয়োটির কাছে
ফিরে ফিরে পায় না আপনাকে

আজ আমার প্রাচীনকে নতুন ক'রে নেবার দিন এসেছে।
ওঝাকে ডেকেছি, ভূতকে দেবে নামিয়ে।
গুণীর চিঠিখানির জন্যে
প্রতিদিন বসব এই বাগানটিতে,
তাঁর নতুন চিঠি
ঘুম-ভাঙার জানলাটার কাছে।
প্রভাত আসবে
আমার নতুন পরিচয় নিতে,
আকাশে অনিমেষ চক্ষু মেলে
আমাকে শুধাবে
"তুমি কে?"
আজকের দিনের নাম
খাটবে না কালকের দিনে।

সৈন্যদলকে দেখে সেনাপতি,
দেখে না সৈনিককে;—
দেখে আপন প্রয়োজন,
দেখে না সত্য,

দেখে না স্বতন্ত্র মানুষের
বিধাতাকৃত আশ্চর্যরূপ।
এতকাল তেমনি করে দেখেছি সৃষ্টিকে,
বন্দিদলের মতো
প্রয়োজনের এক শিকলে বাঁধা।
তার সঙ্গে বাঁধা পড়েছি
সেই বন্ধনে নিজে।

আজ নেব মুক্তি।
সামনে দেখছি সমুদ্র পেরিয়ে
নতুন পার।
তাকে জড়াতে যাব না
এ পারের বোঝার সঙ্গে
এ নৌকোয় মাল নেব না কিছুই
যাব একলা
নতুন হয়ে নতুনের কাছে।

সংযোজন

স্মৃতি-পাথেয়

একদিন কোন্ তুচ্ছ আলাপের ছিন্ন অবকাশে
সে কোন্ অভাবনীয় স্মিতহাসে
অন্যমনা আত্মভোলা
যৌবনেরে দিয়ে ঘন দোলা
মুখে তব অকস্মাৎ প্রকাশিল কী অমৃত-রেখা,
কভু যার পাই নাই দেখা,
দুর্লভ সে প্রিয়
অনির্বচনীয়।

হে মহা অপরিচিত
এক পলকের লাগি হয় সচকিত
গভীর অন্তরতর প্রাণে
কোন্ দূর বনান্তের পথিকের গানে;
সে অপূর্ব আসে ঘরে
পথহারা মুহূর্তের তরে।
বৃষ্টিধারামুখরিত নির্জন প্রবাসে
সন্ধ্যাবেলা যূথিকার সকরুণ স্নিগ্ধ গন্ধশ্বাসে,
চিত্তে রেখে দিয়ে গেল চিরস্পর্শ স্বীয়
তাহারি স্খলিত উত্তরীয়।

সে বিস্মিত ক্ষণিকেরে পড়ে মনে
কোনোদিন অকারণে ক্ষণে ক্ষণে
শীতের মধ্যাহ্নকালে গোরুচরা শস্যরিক্ত মাঠে
চেয়ে চেয়ে বেলা যবে কাটে।
সঙ্গহারা সায়াহ্নের অন্ধকারে সে স্মৃতির ছবি
সূর্যাস্তের পার হতে বাজায় পূরবী।

পেয়েছি যে-সব ধন যার মূল্য আছে
ফেলে যাই পাছে
সেই যার মূল্য নাই, জানিবে না কেও
সঙ্গে থাকে অখ্যাত পাথেয়।

শেষ সপ্তকের দুই-সংখ্যক কবিতা তুলনীয়।

বাতাবির চারা

একদিন শান্ত হলে আষাঢ়ের ধারা
বাতাবির চারা
আসন্ন-বর্ষণ কোন্ শ্রাবণ প্রভাতে
রোপণ করিলে নিজহাতে
আমার বাগানে।
বহুকাল গেল চলি ; প্রখর পৌষের অবসানে
কুহেলি ঘুচাল যবে কৌতূহলী ভোরের আলোক,
সহসা পড়িল চোখ,—
হেরিনু শিশিরে ভেজা সেই গাছে
কচিপাতা ধরিয়াছে,
যেন কী আগ্রহে
কথা কহে,
যে-কথা আপনি শুনে পুলকেতে দুলে ;
যেমন একদা কবে তমসার কূলে
সহসা বাল্মীকি মুনি
আপনার কণ্ঠ হতে আপন প্রথম ছন্দ শুনি'
আনন্দ সঘন
গভীর বিস্ময়ে নিমগন।

কোথায় আছ না-জানি এ সকালে
কী নিষ্ঠুর অন্তরালে,—

সেথা হতে কোনো সম্ভাষণ
পরশে না এ প্রান্তের নিভৃত আসন।
হেনকালে অকস্মাৎ নিঃশব্দের অবহেলা হতে
প্রকাশিল অরুণ আলোতে
এ কয়টি কিশলয়।
এরা যেন সেই কথা কয়
বলিতে পারিতে যাহা তবু না বলিয়া
চলে গেছ প্রিয়া।

সেদিন বসন্ত ছিল দূরে
আকাশ জাগেনি সুরে,
অচেনার যবনিকা কেঁপেছিল ক্ষণে ক্ষণে
তখনো যায়নি সরে দুরন্ত দক্ষিণ সমীরণে।
প্রকাশের উচ্ছৃঙ্খল অবকাশ না ঘটিতে,
পরিচয় না রটিতে,
ঘণ্টা গেল বেজে
অব্যক্তের অনালোকে সায়াহ্নে গিয়েছ সভা ত্যেজে।

তিন-সংখ্যক কবিতা তুলনীয়।

শেষ পর্ব

যেথা দূর যৌবনের প্রান্তসীমা
সেথা হতে শেষ অরুণিমা
শীর্ণপ্রায়
আজি দেখা যায়।

সেথা হতে ভেসে আসে
চৈত্রদিবসের দীর্ঘশ্বাসে
অস্ফুট মর্মর,
কোকিলের ক্লান্ত স্বর,

ক্ষীণস্রোত তটিনীর অলস কল্লোল,—
রক্তে লাগে মৃদুমন্দ দোল।

এ আবেশ মুক্ত হ'ক ;
ঘোরভাঙা চোখ
শুভ্র সুস্পষ্টের মাঝে জাগিয়া উঠুক।
রঙকরা দুঃখ সুখ
সন্ধ্যার মেঘের মতো যাক সরে
আপনারে পরিহাস করে।
মুছে যাক সেই ছবি—চেয়ে থাকা পথপানে,
কথা কানে কানে,
মৌনমুখে হাতে হাত ধরা,
রজনীগন্ধায় সাজি ভরা,
চোখে চোখে চাওয়া
দুরু দুরু বক্ষ নিয়ে আসা আর যাওয়া।

যে-খেলা আপনা সাথে সকালে বিকালে
ছায়া-অন্তরালে,
সে খেলার ঘর হতে
হল আসিবার বেলা বাহির-আলোতে।
ভাঙিব মনের বেড়া কুসুমিত কাঁটালতা ঘেরা,
যেথা স্বপনেরা
মধুগন্ধে মরে ঘুরে ঘুরে
গুন গুন সুরে।
নেব আমি বিপুল বৃহৎ
আদিম প্রাণের দেশ— তেপান্তর মাঠের সে-পথ
সাত সমুদ্রের তটে তটে
যেখানে ঘটনা ঘটে,
নাই তার দায়,
যেতে যেতে দেখা যায়, শোনা যায়,

দিনরাত্রি যায় চলে
নানা ছন্দে নানা কলরোলে।

থাক্ মোর তরে
আপক্ক ধানের খেত অঘ্রানের দীপ্ত দ্বিপ্রহরে ;
সোনার তরঙ্গদোলে
মুগ্ধ দৃষ্টি যার 'পরে ভেসে যায় চলে
কথাহীন ব্যথাহীন চিন্তাহীন সৃষ্টির সাগরে,
যেথায় অদৃশ্য সাথি লীলাভরে
সারাদিন ভাসায় প্রহর যত
খেলার নৌকার মতো।
দূরে চেয়ে রব আমি স্থির

বিস্তীর্ণ বক্ষের কাছে
যেথা শাল গাছে
সহস্র বর্ষের প্রাণ সমাহিত রয়েছে নীরবে
নিস্তব্ধ গৌরবে।
কেটে যাক আপনা-ভোলানো মোহ,
কেটে যাক আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ,
প্রতি বৎসরের আয়ু কর্তব্যের আবর্জনাভার
না করুক স্তূপাকার,—
নির্ভাবনা তর্কহীন শাস্ত্রহীন পথ বেয়ে বেয়ে
যাই চলে অর্থহীন গান গেয়ে গেয়ে।

প্রাণে আর চেতনায় এক হয়ে ক্রমে
অনায়াসে মিলে যাব মৃত্যুমহাসাগর-সংগমে,
আলো-আঁধারের দ্বন্দ্ব হয়ে ক্ষীণ
গোধূলি নিঃশব্দ রাত্রে যেমন অতলে হয় লীন।

জোড়াসাঁকো
৫ এপ্রিল, ১৯৩৪

চার-সংখ্যক কবিতা তুলনীয়।

মর্মবাণী

শিল্পীর ছবিতে যাহা মূর্তিমতী,
গানে যাহা ঝরে ঝরনায়,
সে বাণী হারায় কেন জ্যোতি,
কেন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়
মুখের কথায়
সংসারের মাঝে
নিরন্তর প্রয়োজনে জনতার কাজে ?
কেন আজ পরিপূর্ণ ভাষা দিয়ে
পৃথিবীর কানে কানে বলিতে পারিনে "প্রিয়ে
ভালোবাসি" ?
কেন আজ সুরহারা হাসি
যেন সে কুয়াশা মেলা
হেমন্তের বেলা ?

অনন্ত অম্বর
অপ্রয়োজনের সেথা অখণ্ড প্রকাণ্ড অবসর,
তারি মাঝে এক তারা অন্য তারকারে
জানাইতে পারে
আপনার কানে কানে কথা।
তপস্বিনী নীরবতা
আসন বিস্তীর্ণ যার অসংখ্য যোজন দূর ব্যেপে
অন্তরে অন্তরে উঠে কেঁপে
আলোকের নিগূঢ় সংগীতে।
খণ্ড খণ্ড দণ্ডে পলে ভারাকীর্ণ চিত্তে
নাই সেই অসীমের অবসর ;
তাই অবরুদ্ধ তার স্বর,
ক্ষীণসত্য ভাষা তার।

প্রত্যহের অভ্যস্ত কথায়
মূল্য যায় ঘুচে,
অর্থ যায় মুছে।

তাই কানে কানে
বলিতে সে নাহি জানে
সহজে প্রকাশি'
"ভালোবাসি"।
আপন হারানো বাণী, খুঁজিবারে,
বনস্পতি, আসি তব দ্বারে।
তোমার পল্লবপুঞ্জ শাখাব্যূহভার
অনায়াসে হয়ে পার
আপনার চতুর্দিকে মেলেছে নিস্তব্ধ অবকাশ।
সেথা তব নিঃশব্দ উচ্ছ্বাস
সূর্যোদয় মহিমার পানে
আপনারে মিলাইতে জানে।

অজানা সাগর পার হতে
দক্ষিণের বায়ুস্রোতে
অনাদি প্রাণের যে বারতা
তব নব কিশলয়ে রেখে যায় কানে কানে কথা,—
তোমার অন্তরতম—
সে কথা জাগুক প্রাণে মম;—
আমার ভাবনা ভরি উঠুক বিকাশি'
"ভালোবাসি"।
তোমার ছায়ায় বসে বিপুল বিরহ মোরে ঘেরে;
বর্তমান মুহূর্তেরে
অবলুপ্ত করি দেয় কালহীনতায়।
জন্মান্তর হতে যেন লোকান্তরগত আঁখি চায়
মোর মুখে।

নিষ্কারণ দুখে
পাঠাইয়া দেয় মোর চেতনারে
সকল সীমার পারে।
দীর্ঘ অভিসারপথে সংগীতের সুর
তাহারে বহিয়া চলে দূর হতে দূর।
কোথায় পাথেয় পাবে তার
ক্ষুধা পিপাসার,
এ সত্য বাণীর তরে তাই সে উদাসী
"ভালোবাসি"।
ভোর হয়েছিল যবে যুগান্তের রাতি
আলোকের রশ্মিগুলি খুঁজি সাথি
এ আদিম বাণী
করেছিল কানাকানি
গগনে গগনে।
নব সৃষ্টি যুগের লগনে
মহাপ্রাণ-সমুদ্রের কূল হতে কূলে
তরঙ্গ দিয়েছে তুলে
এ মন্ত্রবচন।
এই বাণী করেছে রচন
সুবর্ণকিরণ বর্ণে স্বপন-প্রতিমা
আমার বিরহাকাশে যেথা অস্তশিখরের সীমা।
অবসাদ-গোধূলির ধূলিজাল তারে
ঢাকিতে কি পারে?
নিবিড় সংহত করি এ-জন্মের সকল ভাবনা
সকল বেদনা
দিনান্তের অন্ধকারে মম
সন্ধ্যাতারা সম
শেষবাণী উঠুক উদ্ভাসি—
"ভালোবাসি"।

ছাব্বিশ-সংখ্যক কবিতা তুলনীয়।

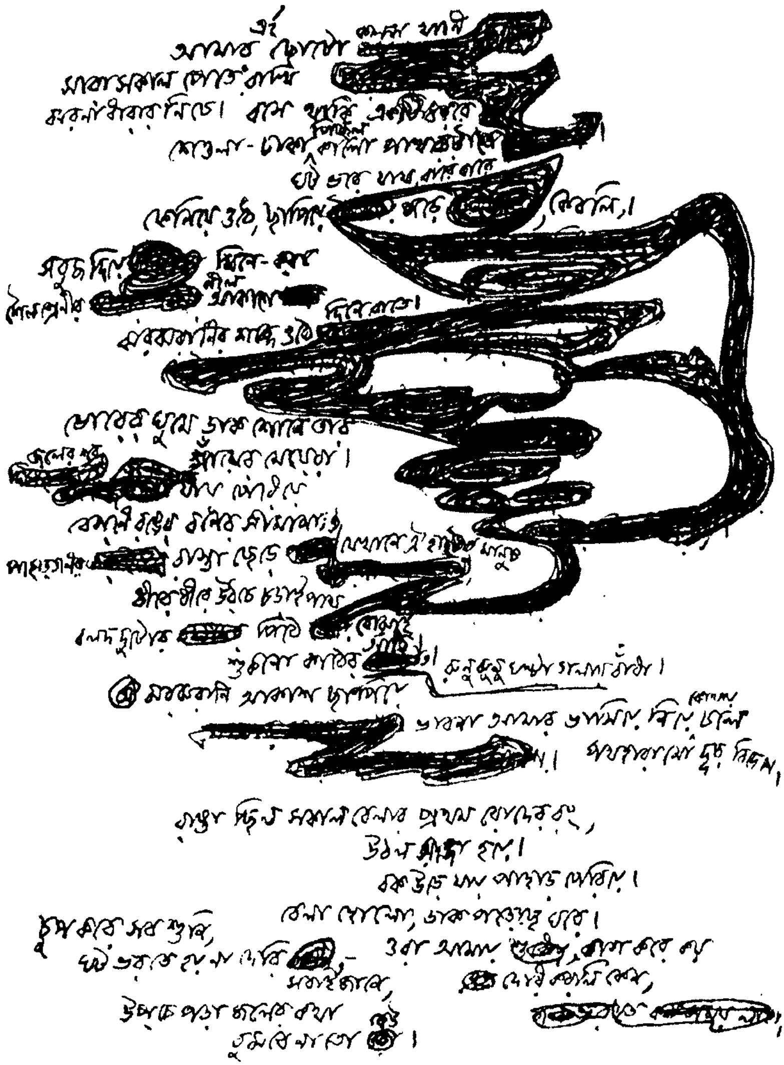

'ঘট ভরা' কবিতার পাণ্ডুলিপি

ঘট ভরা

আমার এই ছোটো কলসখানি
সারা সকাল পেতে রাখি
ঝরনাধারার নিচে।
বসে থাকি একটি ধারে
শেওলাঢাকা পিছল কালো পাথরটাতে।
ঘট ভরে যায় বারে বারে—
ফেনিয়ে ওঠে, ছাপিয়ে পড়ে কেবলি।

সবুজ দিয়ে মিনে-করা
শৈলশ্রেণীর নীল আকাশে
ঝরঝরানির শব্দ ওঠে দিনে রাতে।
ভোরের ঘুমে ডাক শোনে তার
গাঁয়ের মেয়েরা।
জলের শব্দ যায় পেরিয়ে
বেগনি রঙের বনের সীমানা,
পাহাড়তলির রাস্তা ছেড়ে
যেখানে ঐ হাটের মানুষ
ধীরে ধীরে উঠছে চড়াইপথে,
বলদ দুটোর পিঠে বোঝাই
শুকনো কাঠের আঁটি;
রুনুঝুনু ঘণ্টা গলায় বাঁধা।

ঝরঝরানি আকাশ ছাপিয়ে
ভাবনা আমার ভাসিয়ে নিয়ে কোথায় চলে
পথহারানো দূর বিদেশে।
রাঙা ছিল সকালবেলার প্রথম রোদের রং,
উঠল সাদা হয়ে।

বক উড়ে যায় পাহাড় পেরিয়ে।
বেলা হল ডাক পড়েছে ঘরে।
ওরা আমায় রাগ ক'রে কয়
"দেরি করলি কেন ?"
চুপ করে সব শুনি ;
ঘট ভরতে হয় না দেরি সবাই জানে,
উপচে-পড়া জলের কথা
বুঝবে না তো কেউ।

[আশ্বিন, ১৩৪৩]

সাতাশ-সংখ্যক কবিতা তুলনীয়।

প্রশ্ন

দেহের মধ্যে বন্দী প্রাণের ব্যাকুল চঞ্চলতা
দেহের দেহলীতে জাগায় দেহের অতীত কথা।
খাঁচার পাখি যে বাণী কয়
সে তো কেবল খাঁচারি নয়,
তারি মধ্যে করুণ ভাষায় সুদূর অগোচর
বিস্মরণের ছায়ায় আনে অরণ্য মর্মর।

চোখের দেখা নয় তো কেবল দেখারি জালবোনা,
কোন্ অলক্ষ্যে ছাড়িয়ে সে যায় সকল দেখাশোনা।
শীতের রৌদ্রে মাঠের শেষে
দেশ-হারানো কোন্ সে দেশে
বসুন্ধরা তাকিয়ে থাকে নিমেষ-হারা চোখে
দিগ্বলয়ের ইঙ্গিত-লীন উধাও কল্পলোকে।

ভালোমন্দ বকীর্ণ এই দীর্ঘ পথের বুকে
রাত্রি-দিনের যাত্রা চলে কত দুঃখে সুখে।
পথের লক্ষ্য পথ-চলাতেই
শেষ হবে কি ? আর কিছু নেই ?

দিগন্তে যার স্বর্ণ লিখন, সংগীতের আহ্বান,
নিরর্থকের গহ্বরে তার হঠাৎ অবসান ?

নানা ঋতুর ডাক পড়ে যেই মাটির গহন তলে
চৈত্রতাপে, মাঘের হিমে, শ্রাবণ বৃষ্টিজলে,
স্বপ্ন দেখে বীজ সেখানে
অভাবিতের গভীর টানে,
অন্ধকারে এই যে ধেয়ান স্বপ্নে কি তার শেষ ?
উষার আলোয় ফুলের প্রকাশ, নাই কি সে উদ্দেশ ?

১৫ নবেম্বর, ১৯৩৪

পঞ্চত্রিশ-সংখ্যক কবিতা তুলনীয়।

আমি

এই যে সবার সামান্য পথ, পায়ে হাঁটার গলি
সে পথ দিয়ে আমি চলি
সুখে দুঃখে লাভ ক্ষতিতে,
রাতের আঁধার .নের জ্যোতিতে।
প্রতি তুচ্ছ মুহূর্তেরই বর্জনা করি আমি জড়ো,
কারো চে‌ে নইকো আমি বড়ো।
চলতে পথে কখনো বা বিঁধছে কাঁটা পায়ে,
লাগছে ধুলো গায়ে
দুর্বাসনার এলোমেলো হাওয়া,
তারি মধ্যে কতই চাওয়া পাওয়া,
কতই বা হারানো,
খেয়া ধরে ঘাটে আঘাটায়
নদী পারানো।

এমনি করে দিন কেটেছে, হবে সে-দিন সারা
বেয়ে সর্বসাধারণের ধারা।

শুধাও যদি সবশেষে তার রইল কী ধন বাকি,
স্পষ্ট ভাষায় বলতে পারি তা কি।
জানি, এমন নাই কিছু যা পড়বে কারো চোখে,
স্মরণ-বিস্মরণের দোলায় দুলবে বিশ্বলোকে।
নয় সে মানিক, নয় সে সোনা,—
যায় না তারে যাচাই করা, যায় না তারে গোনা।

এই দেখো-না, শীতের রোদে দিনের স্বপ্নে বোনা
সেগুন বনে সবুজ-মেশা সোনা,
শজনে গাছে লাগল ফুলের রেশ,
হিমঝুরির হৈমন্তী পালা হয়েছে নিঃশেষ।
বেগনি ছায়ার ছোঁওয়া-লাগা স্তব্ধ বটের শাখা
ঘোর রহস্যে ঢাকা।
ফলসা গাছের ঝরা পাতা গাছের তলা জুড়ে
হঠাৎ হাওয়ায় চমকে বেড়ায় উড়ে।
গোরুর গাড়ি মেঠো পথের তলে
উড়তি ধুলোয় দিকের আঁচল ধূসর ক'রে চলে।
নীরবতার বুকের মধ্যখানে
দূর অজানার বিধুর বাঁশি ভৈরবী সুর আনে।
কাজভোলা এই দিন
নীল আকাশে পাখির মতো নিঃসীমে হয় লীন।
এরি মধ্যে আছি আমি,
সব হতে এই দামি।
কেননা আজ বুকের কাছে যায় যে জানা,
আরেকটি সেই দোসর আমি উড়িয়ে চলে বিরাট তাহার ডানা
জগতে জগতে
অন্তবিহীন ইতিহাসের পথে।

ঐ যে আমার কুয়োতলার কাছে
সামান্য ঐ আমের গাছে

কখনো বা রৌদ্র খেলায়, কভু শ্রাবণধারা,
সারা বরষ থাকে আপনহারা
সাধারণ এই অরণ্যানীর সবুজ আবরণে,
মাঘের শেষে অকারণে
ক্ষণকালের গোপন মন্ত্রবলে
গভীর মাটির তলে
শিকড়ে তার শিহর লাগে,
শাখায় শাখায় হঠাৎ বাণী জাগে,—
"আছি, আছি, এই যে আমি আছি।"
পুষ্পোচ্ছ্বাসে ধায় সে বাণী স্বর্গলোকের কাছাকাছি
দিকে দিগন্তরে।
চন্দ্র সূর্য তারার আলো তারে বরণ করে।

এমনি করেই মাঝে মাঝে সোনার কাঠি আনে
—কভু প্রিয়ার মুগ্ধ চোখে, কভু কবির গানে—
অলস মনের শিয়রেতে কে সে অন্তর্যামী;
নিবিড় সত্যে জেগে ওঠে সামান্য এই আমি।

যে আমিরে ধূসর ছায়ায় প্রতিদিনের ভিড়ের মধ্যে দেখা
সেই আমিরে এক নিমেষের আলোয় দেখি একের মধ্যে একা।
সে-সব নিমেষ রয় কি না রয় কোনোখানে,
কেউ তাহাদের জানে বা না-ই জানে,
তবু তারা জীবনে মোর দেয় তো আনি
ক্ষণে ক্ষণে পরম বাণী
অনন্তকাল যাহা বাজে
বিশ্বচরাচরের মর্মমাঝে
"আছি আমি আছি"—
যে বাণীতে উঠে নাচি
মহাগগন-সভাঙ্গনে আলোক-অপ্সরী
তারার মাল্য পরি।

ছত্রিশ-সংখ্যক কবিতা তুলনীয়।

আষাঢ়

নব বরষার দিন
বিশ্বলক্ষ্মী তুমি আজ নবীন গৌরবে সমাসীন
রিক্ত তপ্ত দিবসের নীরব প্রহরে
ধরণীর দৈন্য 'পরে
ছিলে তপস্যায় রত
রুদ্রের চরণতলে নত।
উপবাসশীর্ণ তনু, পিঙ্গল জটিল কেশপাশ,
উত্তপ্ত নিঃশ্বাস।
দুঃখেরে করিলে দগ্ধ দুঃখেরি দহনে
অহনে অহনে ;
শুষ্কেরে জ্বালায়ে তীব্র অগ্নিশিখারূপে
ভস্ম করি দিলে তারে তোমার পূজার পুণ্যধূপে।
কালোরে করিলে আলো,
নিস্তেজেরে করিলে তেজালো ;
নির্মম ত্যাগের হোমানলে
সম্ভোগের আবর্জনা লুপ্ত হয়ে গেল পলে পলে।
অবশেষে দেখা দিল রুদ্রের উদার প্রসন্নতা,
বিপুল দাক্ষিণ্যে অবনতা
উৎকণ্ঠিতা ধরণীর পানে।
নির্মল নবীন প্রাণে
অরণ্যানী।
লভিল আপন বাণী।
দেবতার বর
মুহূর্তে আকাশ ঘিরি রচিল সজল মেঘস্তর।
মরুবক্ষে তৃণরাজ
পেতে দিল আজি
শ্যাম আস্তরণ,
নেমে এল তার 'পরে সুন্দরের করুণ চরণ।

সফল তপস্যা তব
জীর্ণতারে সমর্পিল রূপ অভিনব ;
মলিন দৈন্যের লজ্জা ঘুচাইয়া
নব ধারাজলে তারে স্নাত করি দিলে মুছাইয়া
কলঙ্কের গ্লানি ;
দীপ্ততেজে নৈরাশ্যেরে হানি
উদ্বেল উৎসাহে
রিক্ত যত নদীপথ ভরি দিলে অমৃতপ্রবাহে।
জয় তব জয়
গুরুগুরু মেঘগর্জে ভরিয়া উঠিল বিশ্বময়।

সাঁইত্রিশ-সংখ্যক কবিতা তুলনীয়।

যক্ষ

হে যক্ষ তোমার প্রেম ছিল বদ্ধ কোরকের মতো,
একান্তে প্রেয়সী তব সঙ্গে যবে ছিল অনিয়ত
সংকীর্ণ ঘরের কোণে, আপন বেষ্টনে তুমি যবে
রুদ্ধ রেখেছিলে তারে দু-জনের নির্জন উৎসবে
সংসারের নিভৃত সীমায়, শ্রাবণের মেঘজাল
কৃপণের মতো যথা শশাঙ্কের রচে অন্তরাল
আপনার আলিঙ্গনে আপনি হারায়ে ফেলে তারে,
সম্পূর্ণ মহিমা তার দেখিতে পায় না একেবারে
অন্ধ মোহাবেশে। বর তুমি পেলে যবে প্রভুশাপে,
সামীপ্যের বন্ধ ছিন্ন হ'ল, বিরহের দুঃখতাপে
প্রেম হ'ল পূর্ণ বিকশিত ; জানিল সে আপনারে
বিশ্বধরিত্রীর মাঝে। নির্বাধে তাহার চারিধারে
সান্ধ্য অর্ঘ্য করে দান বৃষ্টিজলে সিক্ত বনযূথী
গন্ধের অঞ্জলি ; নীপনিকুঞ্জের জানাল আকূতি

রেণুভারে মন্থর পবন। উঠে গেল যবনিকা
আত্মবিস্মৃতির, দেখা দিল দিকে দিগন্তরে লিখা
উদার বর্ষার বাণী, যাত্রামন্ত্র বিশ্বপথিকের
মেঘধ্বজে আঁকা, দিগ্বধূ-প্রাঙ্গণ হতে নির্ভীকের
শূন্যপথে অভিসার। আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
দীক্ষা পেলে অশ্রুধৌত সৌম্য বিষাদের ; নিত্যরসে
আপনি করিলে সৃষ্টি রূপসীর অপূর্ব মুরতি
অন্তহীন গরিমায় কান্তিময়ী। এক দিন ছিল সেই সতী
গৃহের সঙ্গিনী, তারে বসাইলে ছন্দশঙ্খ রবে
অলোক-আলোকদীপ্ত অলকার অমর গৌরবে
অনন্তের আনন্দ-মন্দিরে। প্রেম তব ছিল বাক্যহীন,
আজ সে পেয়েছে তার ভাষা, আজ তার রাত্রিদিন
সংগীত তরঙ্গে আন্দোলিত। তুমি আজ হলে কবি,
মুক্ত তব দৃষ্টিপথে উদ্ঘারিত নিখিলের ছবি
শ্যামমেঘে স্নিগ্ধচ্ছায়া। বক্ষ ছাড়ি মর্মে অধ্যাসীনা
প্রিয়া তব ধ্যানোদ্ভবা লয়ে তার বিরহের বীণা।
অপরূপ রূপে রচি বিচ্ছেদের উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে
তোমার প্রেমের সৃষ্টি উৎসর্গ করিলে বিশ্বজনে।

দার্জিলিং
১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭০

আটত্রিশ-সংখ্যক কবিতা তুলনীয়।

দুঃখ যেন জাল পেতেছে

দুঃখ যেন জাল পেতেছে চারদিকে ;
চেয়ে দেখি যার দিকে
সবাই যেন দুর্‌গ্রহদের মন্ত্রণায়
গুমরে কাঁদে যন্ত্রণায়।
লাগছে মনে এই জীবনের মূল্য নেই,
আজকে দিনের চিত্তদাহের তুল্য নেই।
যেন এ দুখ অন্তহীন,
ঘরছাড়া মন ঘুরবে কেবল পন্থহীন।

এমন সময় অকস্মাৎ
মনের মধ্যে হানল চমক তড়িদ্‌ঘাত,
এক নিমেষেই ভাঙল আমার বন্ধ দ্বার,
ঘুচল হঠাৎ অন্ধকার।
সুদূর কালের দিগন্তলীন বাগ্‌বাদিনীর পেলেম সাড়া,
শিরায় শিরায় লাগল নাড়া।
যুগান্তরের ভগ্নশেষে
ভিত্তিছায়ায় ছায়ামূর্তি মুক্তকেশে
বাজায় বীণা ; পূর্বকালের কী আখ্যানে
উদার সুরের তানের তন্তু গাঁথছে গানে ;
দুঃসহ কোন্ দারুণ দুখের স্মরণ-গাঁথা
করুণ গাথা ;
দুর্দাম কোন্ সর্বনাশের ঝঞ্ঝাঘাতের
মৃত্যুমাতাল বজ্রপাতের
গর্জরবে
রক্তরঙিন যে-উৎসবে
রুদ্রদেবের ঘূর্ণিনৃত্যে উঠল মাতি
প্রলয়রাতি,

তাহারি ঘোর শঙ্কাকাঁপন বারে বারে
ঝংকারিয়া কাঁপছে বীণার তারে তারে।

জানিয়ে দিলে আমায়, অয়ি
অতীতকালের হৃদয়পদ্মে নিত্য-আসীন ছায়াময়ী,
আজকে দিনের সকল লজ্জা সকল গ্লানি
পাবে যখন তোমার বাণী,
বর্ষশতের ভাসান-খেলার নৌকা যবে
অদৃশ্যেতে মগ্ন হবে,
মর্মদহন দুঃখশিখা
হবে তখন জ্বলনবিহীন আখ্যায়িকা,
বাজবে তারা অসীম কালের নীরব গীতে
শান্ত গভীর মাধুরীতে;
ব্যথার ক্ষত মিলিয়ে যাবে নবীন ঘাসে,
মিলিয়ে যাবে সুদূর যুগের শিশুর উচ্চহাসে।

২৮ আষাঢ়, ১৩৪১

শেষ সপ্তকের দশ-সংখ্যক কবিতা তুলনীয়।

নাটক ও প্রহসন

শেষ বর্ষণ

শেষ বর্ষণ

রাজা, পারিষদবর্গ, নটরাজ, নাট্যাচার্য ও গায়ক-গায়িকা

গান আরম্ভ

রাজা। ওহে থামো তোমরা, একটু থামো। আগে ব্যাপারখানা বুঝে নিই। নটরাজ, তোমাদের পালাগানের পুঁথি একখানা হাতে দাও না।

নটরাজ। (পুঁথি দিয়া) এই নিন মহারাজ।

রাজা। তোমাদের দেশের অক্ষর ভাল বুঝতে পারিনে। কী লিখছে? "শেষবর্ষণ"।

নটরাজ। হাঁ মহারাজ।

রাজা। আচ্ছা বেশ ভালো। কিন্তু পালাটা যার লেখা সে লোকটা কোথায়?

নটরাজ। কাটা ধানের সঙ্গে সঙ্গে খেতটাকে তো কেউ ঘরে আনে না। কাব্য লিখেই কবি খালাস, তার পরে জগতে তার মতো অদরকারি আর কিছু নেই। আখের রসটা বেরিয়ে গেলে বাকি যা থাকে তাকে ঘরে রাখা চলে না। তাই সে পালিয়েছে।

রাজা। পরিহাস বলে ঠেকছে। একটু সোজা ভাষায় বলো। পালাল কেন?

নটরাজ। পাছে মহারাজ বলে বসেন, ভাব অর্থ সুর তান লয়, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না সেই ভয়ে। লোকটা বড়ো ভিতু।

রাজকবি। এ তো বড়ো কৌতুক। পাঁজিতে দেখা গেল তিথিটা পূর্ণিমা, এদিকে চাঁদ মেরেছেন দৌড়, পাছে কেউ ব'লে বসে তাঁর আলো ঝাপসা।

রাজা। তোমাদের কবিশেখরের নাম শুনেই মধুকপত্তনের রাজার কাছ থেকে তাঁর গানের দলকে আনিয়ে নিলেম, আর তিনি পালালেন?

নটরাজ। ক্ষতি হবে না, গানগুলো সুদ্ধ পালাননি। অস্তসূর্য নিজে লুকিয়েছেন কিন্তু মেঘে মেঘে রং ছড়িয়ে আছে।

রাজকবি। তুমি বুঝি সেই মেঘ? কিন্তু তোমাকে দেখাচ্ছে বড়ো সাদা।

নটরাজ। ভয় নেই, এই সাদার ভিতর থেকেই ক্রমে ক্রমে রং খুলতে থাকবে।

রাজা। কিন্তু আমার রাজবুদ্ধি, কবির বুদ্ধির সঙ্গে যদি না মেলে? আমাকে বোঝাবে কে?

নটরাজ। সে ভার আমার উপর। ইশারায় বুঝিয়ে দেব।

রাজা। আমার কাছে ইশারা চলবে না। বিদ্যুতের ইশারার চেয়ে বজ্রের বাণী স্পষ্ট, তাতে ভুল বোঝার আশঙ্কা নেই। আমি স্পষ্ট কথা চাই। পালাটা আরম্ভ হবে কী দিয়ে?

নটরাজ। বর্ষাকে আহ্বান ক'রে।

রাজা। বর্ষাকে আহ্বান? এই আশ্বিন মাসে?

রাজকবি। ঋতু-উৎসবের শবসাধনা? কবিশেখর ভূতকালকে খাড়া ক'রে তুলবেন। অদ্ভুত রসের কীর্তন।

নটরাজ। কবি বলেন, বর্ষাকে না জানলে শরৎকে চেনা যায় না। আগে আবরণ তার পরে আলো।

রাজা। (পারিষদের প্রতি) মানে কী হে?

পারিষদ। মহারাজ, আমি ওঁদের দেশের পরিচয় জানি। ওঁদের হেঁয়ালি বরঞ্চ বোঝা যায় কিন্তু যখন ব্যাখ্যা করতে বসেন তখন একেবারেই হাল ছেড়ে দিতে হয়।

রাজকবি। যেন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, টানলে আরও বাড়তে থাকে।

নটরাজ। বোঝবার কঠিন চেষ্টা করবেন না মহারাজ, তাহলেই সহজে বুঝবেন। জুঁই ফুলকে ছিঁড়ে দেখলে বোঝা যায় না, চেয়ে দেখলে বোঝা যায়। আদেশ করুন এখন বর্ষাকে ডাকি।

রাজা। রসো রসো। বর্ষাকে ডাকা কী রকম? বর্ষা তো নিজেই ডাক দিয়ে আসে।

নটরাজ। সে তো আসে বাইরের আকাশে। অন্তরের আকাশে তাকে গান গেয়ে ডেকে আনতে হয়।

রাজা। গানের সুরগুলো কি কবিশেখরের নিজেরই বাঁধা?

নটরাজ। হাঁ মহারাজ।

রাজা। এই আর এক বিপদ।

রাজকবি। নিজের অধিকারে পেয়ে কাব্যরসের হাতে কবি রাগিণীর দুর্গতি ঘটাবেন। এখন রাজার কর্তব্য গীতসরস্বতীকে কাব্যপীড়ার হাত থেকে রক্ষা করা। মহারাজ, ভোজপুরের গন্ধর্বদলকে খবর দিন না। দুই পক্ষের লড়াই বাধুক তা হলে কবির পক্ষে "শেষ বর্ষণ" নামটা সার্থক হবে।

নটরাজ। রাগিণী যতদিন কুমারী ততদিন তিনি স্বতন্ত্রা, কাব্যরসের সঙ্গে পরিণয় ঘটলেই তখন ভাবের রসকেই পতিব্রতা মেনে চলে। উলটে, রাগিণীর হুকুমে ভাব যদি

পায়ে পায়ে নাকে খত দিয়ে চলতে থাকে সেই স্ত্রৈণতা অসহ্য। অন্তত আমার দেশের চাল এ রকম নয়।

রাজা। ওহে নটরাজ, রস জিনিসটা স্পষ্ট নয়, রাগিণী জিনিসটা স্পষ্ট। রসের নাগাল যদি বা না পাই, রাগিণীটা বুঝি। তোমাদের কবি কাব্যশাসনে তাকেও যদি বেঁধে ফেলেন তা হলে তো আমার মতো লোকের মুশকিল।

নটরাজ। মহারাজ, গাঁঠছড়ার বাঁধন কি বাঁধন? সেই বাঁধনেই মিলন। তাতে উভয়েই উভয়কে বাঁধে। কথায় সুরে হয় একাত্মা।

পারিষদ। অলমতিবিস্তরেণ। তোমাদের ধর্মে যা বলে তাই করো, আমরা বীরের মতো সহ্য করব।

নটরাজ। (গায়কগায়িকাদের প্রতি) ঘনমেঘে তাঁর চরণ পড়েছে। শ্রাবণের ধারায় তাঁর বাণী কদম্বের বনে তাঁর গন্ধের অদৃশ্য উত্তরীয়। গানের আসনে তাঁকে বসাও, সুরে তিনি রূপ ধরুন, হৃদয়ে তাঁর সভা জমুক। ডাকো—

এস নীপবনে ছায়াবীথিতলে,
এস করো স্নান নবধারাজলে।
দাও আকুলিয়া ঘন কালো কেশ,
পরো দেহ ঘেরি মেঘনীল বেশ;
কাজল নয়নে যূথীমালা গলে
এস নীপবনে ছায়াবীথিতলে।
আজি ক্ষণে ক্ষণে হাসিখানি, সখী,
অধরে নয়নে উঠুক চমকি।
মল্লারগানে তব মধুস্বরে
দিক্ বাণী আনি বনমর্মরে।
ঘন বরিষনে জল-কলকলে
এস নীপবনে ছায়াবীথিতলে।

নটরাজ। মহারাজ, এখন একবার ভিতরের দিকে তাকিয়ে দেখুন, 'রজনী শাঙন ঘন, ঘন দেয়া গরজন, রিমঝিম শবদে বরিষে'।

রাজা। ভিতরের দিকে? সেই দিকের পথই তো সব চেয়ে দুর্গম।

নটরাজ। গানের স্রোতে হাল ছেড়ে দিন, সুগম হবে। অনুভব করছেন কি প্রাণের আকাশের পুব হাওয়া মুখর হয়ে উঠল। বিরহের অন্ধকার ঘনিয়েছে। ওগো

সব গীতরসিক, আকাশের বেদনার সঙ্গে হৃদয়ের রাগিণীর মিল করো। ধরো ধরো, 'ঝরে ঝর ঝর'।

ঝরে ঝর ঝর ভাদর বাদর,
বিরহকাতর শর্বরী।
ফিরিছে এ কোন অসীম রোদন
কানন কানন মর্মরি।
আমার প্রাণের রাগিণী আজি এ
গগনে গগনে উঠিল বাজিয়ে।
হৃদয় একি রে ব্যাপিল তিমিরে
সমীরে সমীরে সঞ্চরি।

নটরাজ। শ্রাবণ ঘরছাড়া উদাসী। আলুথালু তার জটা, চোখে তার বিদ্যুৎ। অশ্রান্ত ধারায় একতারায় একই সুর সে বাজিয়ে বাজিয়ে সারা হল। পথহারা তার সব কথা বলে শেষ করতে পারলে না। ওই শুনুন মহারাজ মেঘমল্লার।

কোথা যে উধাও হল মোর প্রাণ উদাসী
আজি ভরা বাদরে।
ঘন ঘন গুরু গুরু গরজিছে,
ঝরঝর নামে দিকে দিগন্তে জলধারা,
মন ছুটে শূন্যে শূন্যে অনন্তে
অশান্ত বাতাসে।

রাজা। পুব দিকটা আলো হয়ে উঠল যে, কে আসে?

নটরাজ। শ্রাবণের পূর্ণিমা।

রাজকবি। শ্রাবণের পূর্ণিমা! হাঃ হাঃ হাঃ। কালো খাপটাই দেখা যাবে, তলোয়ারটা রইবে ইশারায়।

রাজা। নটরাজ, শ্রাবণের পূর্ণিমায় পূর্ণতা কোথায়? ও তো বসন্তের পূর্ণিমা নয়।

নটরাজ। মহারাজ, বসন্তপূর্ণিমাই তো অপূর্ণ। তাতে চোখের জল নেই কেবল-মাত্র হাসি। শ্রাবণের শুক্ল রাতে হাসি বলছে আমার জিত, কান্না বলছে আমার। ফুল ফোটার সঙ্গে ফুল ঝরার মালাবদল। ওগো কলস্বরা, পূর্ণিমার ডালাটি খুলে দেখো, ও কী আনলে।

আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে কী এনেছিস বল্,
হাসির কানায় কানায় ভরা কোন্ নয়নের জল।

বাদল হাওয়ার দীর্ঘশ্বাসে
যূথীবনের বেদন আসে,
ফুল-ফোটানোর খেলায় কেন ফুল-ঝরানোর ছল।
কী আবেশ হেরি চাঁদের চোখে,
ফেরে সে কোন স্বপনলোকে।
মন বসে রয় পথের ধারে,
জানে না সে পাবে কারে,
আসা-যাওয়ার আভাস ভাসে বাতাসে চঞ্চল।

রাজা। বেশ, বেশ, এটা মধুর লাগল বটে।

নটরাজ। কিন্তু মহারাজ, কেবলমাত্র মধুর ? সেও তো অসম্পূর্ণ ?

রাজা। ওই দেখো, যেমনি আমি বলেছি মধুর অমনি তার প্রতিবাদ। তোমাদের দেশে সোজা কথার চলন নেই বুঝি ?

নটরাজ। মধুরের সঙ্গে কঠোরের মিলন হলে তবেই হয় হরপার্বতীর মিলন। সেই মিলনের গানটা ধরো।

বজ্র-মানিক দিয়ে গাঁথা
আষাঢ় তোমার মালা।
তোমার শ্যামল শোভার বুকে
বিদ্যুতেরি জ্বালা।
তোমার মন্ত্রবলে
পাষাণ গলে, ফসল ফলে,
মরু বহে আনে তোমার পায়ে ফুলের ডালা।
মরমর পাতায় পাতায়
ঝরঝর বারির রবে,
গুরু গুরু মেঘের মাদল
বাজে তোমার কী উৎসবে।
সবুজ সুধার ধারায় ধারায়
প্রাণ এনে দাও তপ্ত ধরায়,
বামে রাখ ভয়ংকরী
বন্যা মরণ-ঢালা।

রাজা। সব রকমের খ্যাপামিই তো হল। হাসির সঙ্গে কান্না, মধুরের সঙ্গে কঠোর, এখন বাকি রইল কী?

নটরাজ। বাকি আছে অকারণ উৎকণ্ঠা। কালিদাস বলেন, মেঘ দেখলে সুখী মানুষও আনমনা হয়ে যায়। এইবার সেই যে "অন্যথাবৃত্তি চেতঃ", সেই যে পথ-চেয়ে-থাকা আনমনা, তারই গান হবে। নাট্যাচার্য, ধরো হে—

পুব হাওয়াতে দেয় দোলা আজ মরি মরি।
হৃদয়-নদীর কূলে কূলে জাগে লহরী।
পথ চেয়ে তাই একলা ঘাটে
বিনা কাজে সময় কাটে,
পাল তুলে ওই আসে তোমার সুরেরই তরী।
ব্যথা আমার কূল মানে না বাধা মানে না,
পরান আমার ঘুম জানে না জাগা জানে না।
মিলবে যে আজ অকূল পানে,
তোমার গানে আমার গানে,
ভেসে যাবে রসের বানে আজ বিভাবরী।

নটরাজ। বিরহীর বেদনা রূপ ধ'রে দাঁড়াল, ঘনবর্ষার মেঘ আর ছায়া দিয়ে গড়া সজল রূপ। অশান্ত বাতাসে ওর সুর পাওয়া গেল কিন্তু ওর বাণীটি আছে তোমার কণ্ঠে, মধুরিকা।

অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে।
আজি শ্যামল মেঘের মাঝে
বাজে কার কামনা।
চলিছে ছুটিয়া অশান্ত বায়,
ক্রন্দন কার তার গানে ধ্বনিছে,
করে কে সে বিরহী বিফল সাধনা।

রাজা। আর নয় নটরাজ, বিরহের পালাটাই বড়ো বেশি হয়ে উঠল, ওজন ঠিক থাকছে না।

নটরাজ। মহারাজ, রসের ওজন আয়তনে নয়। সমস্ত গাছ একদিকে, একটি ফুল একদিকে, তবু ওজন ঠিক থাকে। অসীম অন্ধকার একদিকে, একটি তারা একদিকে, তাতেও ওজনের ভুল হয় না। ভেবে দেখুন, এ সংসারে বিরহের সরোবর চারিদিকে ছলছল করছে, মিলনপদ্মটি তারই বুকের একটি দুর্লভ ধন।

রাজকবি। তাই না হয় হল কিন্তু অশ্রুবাষ্পের কুয়াশা ঘনিয়ে দিয়ে সেই পদ্মটিকে একেবারে লুকিয়ে ফেললে তো চলবে না।

নটরাজ। মিলনের আয়োজনও আছে। খুব বড়ো মিলন, অবনীর সঙ্গে গগনের। নাট্যাচার্য একবার শুনিয়ে দাও তো।

ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে
বাদল বাতাস মাতে মালতীর গন্ধে।
উৎসবসভা মাঝে
শ্রাবণের বীণা বাজে,
শিহরে শ্যামল মাটি প্রাণের আনন্দে।
দুই কূল আকুলিয়া অধীর বিভঙ্গে
নাচন উঠিল জেগে নদীর তরঙ্গে।
কাঁপিছে বনের হিয়া
বরষনে মুখরিয়া,
বিজলি ঝলিয়া উঠে নবঘন মন্দ্রে।

রাজা। আঃ, এতক্ষণে একটু উৎসাহ লাগল। থামলে চলবে না। দেখো না, তোমাদের মাদলওআলার হাত দুটো অস্থির হয়েছে, ওকে একটু কাজ দাও।

নটরাজ। বলি ও ওস্তাদ, ওই যে দলে দলে মেঘ এসে জুটল, ওরা যে খ্যাপার মতো চলেছে। ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলো না, একেবারে মৃদঙ্গ বাজিয়ে বুক ফুলিয়ে যাত্রা জমে উঠুক না সুরে কথায় মেঘে বিদ্যুতে ঝড়ে।

পথিক মেঘের দল জোটে ঐ শ্রাবণ-গগন-অঙ্গনে।
মন রে আমার, উধাও হয়ে নিরুদ্দেশের সঙ্গ নে।
দিক-হারানো দুঃসাহসে
সকল বাঁধন পড়ুক খসে,
কিসের বাধা ঘরের কোণের শাসন-সীমা লঙ্ঘনে।
বেদনা তোর বিজুলশিখা জ্বলুক অন্তরে;
সর্বনাশের করিস সাধন বজ্র-মন্তরে।
অজানাতে করবি গাহন,
ঝড় সে পথের হবে বাহন,
শেষ করে দিস আপনারে তুই প্রলয়রাতের ক্রন্দনে।

রাজকবি। ওই রে আবার ঘুরে ফিরে এলেন সেই 'অজানা' সেই তোমার 'নিরুদ্দেশ'। মহারাজ, আর দেরি নেই, আবার কান্না নামল বলে।

নটরাজ। ঠিক ঠাউরেছ। বোধ হচ্ছে চোখের জলেরই জিত। বর্ষার রাতে সাথিহারার স্বপ্নে অজানা বন্ধু ছিলেন অন্ধকার ছায়ায় স্বপ্নের মতো ; আজ বুঝি বা শ্রাবণের প্রাতে চোখের জলে ধরা দিলেন। মধুরিকা, ভৈরবীতে করুণ সুর লাগাও, তিনি তোমার হৃদয়ে কথা কবেন।

বন্ধু, রহো রহো সাথে
আজি এ সঘন শ্রাবণপ্রাতে।
ছিলে কি মোর স্বপনে
সাথিহারা রাতে।
বন্ধু, বেলা বৃথা যায় রে
আজি এ বাদলে আকুল হাওয়ায় রে।
কথা কও মোর হৃদয়ে
হাত রাখো হাতে।

রাজা। কান্না হাসি বিরহ মিলন সব রকমই তো খণ্ড খণ্ড করে হল, এইবার বর্ষার একটা পরিপূর্ণ মূর্তি দেখাও দেখি।

নটরাজ। ভালো কথা মনে করিয়ে দিলেন মহারাজ। নাট্যাচার্য, তবে ওইটে শুরু করো।

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে,
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি-সৌরভ-রভসে,
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা,
শ্যাম গম্ভীর সরসা।
গুরু গর্জনে নীল অরণ্য শিহরে
উতলা কলাপী কেকা-কলরবে বিহরে ;
নিখিল-চিত্ত-হরষা
ঘনগৌরবে আসিছে মত্ত বরষা।
কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিক-ললনা,
জনপদবধূ তড়িৎ-চকিত-নয়না,
মালতী-মালিনী কোথা প্রিয়-পরিচারিকা,
কোথা তোরা অভিসারিকা।

ঘনঘনতলে এস ঘননীলবসনা,
ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরশনা,
আনো বীণা মনোহারিকা।
কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা।
আনো মৃদঙ্গ, মুরজ, মুরলী মধুরা,
বাজাও শঙ্খ, হুলুরব করো বধূরা,
এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিণী,
ওগো প্রিয়সুখভাগিনী।
কুঞ্জকুটিরে, অয়ি ভাবাকুললোচনা,
ভূর্জপাতায় করো নবগীত রচনা
মেঘমল্লার রাগিণী।
এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিণী।
কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভি,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পরো করবী,
কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
অঞ্জন আঁকো নয়নে।
তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া,
ভবনশিখীরে নাচাও গনিয়া গনিয়া
স্মিত-বিকসিত বয়নে;
কদম্বরেণু বিছাইয়া ফুল-শয়নে।
এসেছে বরষা, এসেছে নবীনা বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন-ভরসা,
দুলিছে পবনে সন সন বনবীথিকা,
গীতময় তরুলতিকা।
শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা,
শত শত গীত-মুখরিত বনবীথিকা।

রাজা। বাঃ, বেশ জমেছে। আমি বলি আজকের মতো বাদলের পালাই চলুক।
নটরাজ। কিন্তু মহারাজ দেখছেন না, মেঘে মেঘে পালাই-পালাই ভাব। শেষ

কেয়াফুলের গন্ধে বিদায়ের সুর ভিজে হাওয়ায় ভরে উঠল। ওই যে 'এবার আমার গেল বেলা' বলে কেতকী।

একলা বসে বাদলশেষে শুনি কত কী।
'এবার আমার গেল বেলা' বলে কেতকী।
বৃষ্টি-সারা মেঘ যে তারে
ডেকে গেল আকাশপারে,
তাই তো সে যে উদাস হল
নইলে যেত কি।
ছিল সে যে একটি ধারে বনের কিনারায়,
উঠত কেঁপে তড়িৎ-আলোর চকিত ইশারায়।
শ্রাবণ-ঘন অন্ধকারে
গন্ধ যেত অভিসারে,
সন্ধ্যাতারা আড়াল থেকে
খবর পেত কি।

রাজা। নটরাজ, বাদলকে বিদায় দেওয়া চলবে না। মনটা বেশ ভরে উঠেছে।

নটরাজ। তাহলে কবির সঙ্গে বিরোধ বাধবে। তাঁর পালায় বর্ষা এবার যাব যাব করছে।

রাজা। তুমি তো দেখি বিদ্রোহী দলের একজন, কবির কথাই মান, রাজার কথা মান না? আমি যদি বলি যেতে দেব না?

নটরাজ। তাহলে আমিও তাই বলব। কবিও তাই বলবে। ওগো রেবা, ওগো করুণিকা, বাদলের শ্যামল ছায়া কোন্ লজ্জায় পালাতে চায়?

নাট্যাচার্য। নটরাজ, ও বলছে ওর সময় গেল।

নটরাজ। গেলই বা সময়। কাজের সময় যখন যায় তখনই তো শুরু হয় অকাজের খেলা। শরতের আলো আসবে ওর সঙ্গে খেলতে। আকাশে হবে আলোয় কালোয় যুগল মিলন।

শ্যামল শোভন শ্রাবণ-ছায়া, নাই বা গেলে
সজল বিলোল আঁচল মেলে।
পুব হাওয়া কয়, 'ওর যে সময় গেল চলে',
শরৎ বলে, 'ভয় কী সময় গেল বলে,

বিনা কাজে আকাশ মাঝে কাটবে বেলা
অসময়ের খেলা খেলে"।
কালো মেঘের আর কি আছে দিন।
ও যে হল সাথিহীন।
পুব হাওয়া কয়, "কালোর এবার যাওয়াই ভালো",
শরৎ বলে, "মিলবে যুগল কালোয় আলো,
সাজবে বাদল সোনার সাজে আকাশ মাঝে
কালিমা ওর ঘুচিয়ে ফেলে"।

নটরাজ। শরতের প্রথম প্রত্যূষে ওই যে শুকতারা দেখা দিল অন্ধকারের প্রান্তে। মহারাজ দয়া করবেন, কথা কবেন না।

রাজা। নটরাজ, তুমিও তো কথা কইতে কসুর কর না।

নটরাজ। আমার কথা যে পালারই অঙ্গ।

রাজা। আর আমার হল তার বাধা। তোমার যদি হয় জলের ধারা, আমার না হয় হল নুড়ি, দুইয়ে মিলেই তো ঝরনা। সৃষ্টিতে বাধা যে প্রকাশেরই অঙ্গ। যে বিধাতা রসিকের সৃষ্টি করেছেন অরসিক তাঁরই সৃষ্টি, সেটা রসেরই প্রয়োজনে।

নটরাজ। এবার বুঝেছি আপনি ছন্দরসিক, বাধার ছলে রস নিংড়ে বের করেন। আর আমার ভয় রইল না। গীতাচার্য গান ধরো।

দেখো শুকতারা আঁখি মেলি চায়
প্রভাতের কিনারায়।
ডাক দিয়েছে রে শিউলি ফুলেরে
আয় আয় আয়।
ও যে কার লাগি জ্বালে দীপ,
কার ললাটে পরায় টিপ,
ও যে কার আগমনী গায়—
আয় আয় আয়।
জাগো জাগো, সখী,
কাহার আশায় আকাশ উঠিল পুলকি।
মালতীর বনে বনে
ওই শুন ক্ষণে ক্ষণে
কহিছে শিশিরবায়
আয় আয় আয়।

নটরাজ। ওই দেখুন শুকতারার ডাক পৃথিবীর বনে পৌঁছেছে। আকাশের আলোকের যে লিপি সেই লিপিটিকে ভাষান্তরে লিখে দিল ওই শেফালি। সে লেখার শেষ নেই, তাই বারে বারেই অশ্রান্ত ঝরা আর ফোটা। দেবতার বাণীকে যে এনেছে মর্ত্যে, তার ব্যথা কজন বোঝে? সেই করুণার গান সন্ধ্যার সুরে তোমরা ধরো।

ওগো শেফালি,
সবুজ ছায়ার প্রদোষে তুই জ্বালিস দীপালি।
তারার বাণী আকাশ থেকে
তোমার রূপে দিল এঁকে
শ্যামল পাতায় থরে থরে আখর রূপালি।
বুকের খসা গন্ধ-আঁচল রইল পাতা সে
কাননবীথির গোপন কোণের বিবশ বাতাসে।
সারাটা দিন বাটে বাটে
নানা কাজে দিবস কাটে,
আমার সাঁঝে বাজে তোমার করুণ ভূপালি।

রাজা। নটরাজ, অমন শুকতারাতে শেফালিতে ভাগ করে করে শরৎকে দেখাবে কেমন করে?

নটরাজ। আর দেরি নেই, কবি ফাঁদ পেতেছে। যে মাধুরী হাওয়ায় হাওয়ায় আভাসে ভেসে বেড়ায় সেই ছায়ারূপটিকে ধরেছে কবি আপন গানে। সেই ছায়ারূপিণীর নূপুর বাজল, কঙ্কণ চমক দিল কবির সুরে, সেই সুরটিকে তোমাদের কণ্ঠে জাগাও তো।

যে-ছায়ারে ধরব বলে করেছিলেম পণ
আজ সে মেনে নিল আমার গানেরি বন্ধন।
আকাশে যার পরশ মিলায়
শরৎ মেঘের ক্ষণিক লীলায়
আপন সুরে আজ শুনি তার নূপুরগুঞ্জন।
অলস দিনের হাওয়ায়
গন্ধখানি মেলে যেত গোপন আসাযাওয়ায়।
আজ শরতের ছায়ানটে
মোর রাগিণীর মিলন ঘটে
সেই মিলনের তালে তালে বাজায় সে কঙ্কণ।

নটরাজ। শুভ্র শান্তির মূর্তি ধরে এইবার আসুন শরৎশ্রী। সজল হাওয়ার দোল

থেমে যাক—আকাশে আলোক-শতদলের উপর তিনি চরণ রাখুন, দিকে দিগন্তে সে বিকশিত হয়ে উঠুক।

এস শরতের অমল মহিমা,
এস হে ধীরে।
চিত্ত বিকাশিবে চরণ ঘিরে।
বিরহ-তরঙ্গে অকূলে সে যে দোলে
দিবাযামিনী আকুল সমীরে।

বাদললক্ষ্মীর প্রবেশ

রাজা। ও কী হল নটরাজ, সেই বাদললক্ষ্মীই তো ফিরে এলেন; মাথায় সেই অবগুণ্ঠন। রাজার মানই তো রইল, কবি তো শরৎকে আনতে পারলেন না।

নটরাজ। চিনতে সময় লাগে মহারাজ। ভোররাত্রিকেও নিশীথরাত্রি বলে ভুল হয়। কিন্তু ভোরের পাখির কাছে কিছুই লুকোনো থাকে না; অন্ধকারের মধ্যেই সে আলোর গান গেয়ে ওঠে। বাদলের ছলনার ভিতর থেকেই কবি শরৎকে চিনেছে, তাই আমন্ত্রণের গান ধরল।

ওগো শেফালিবনের মনের কামনা,
কেন সুদূর গগনে গগনে
আছ মিলায়ে পবনে পবনে
কেন কিরণে কিরণে ঝলিয়া
যাও শিশিরে শিশিরে গলিয়া
কেন চপল আলোতে ছায়াতে
আছ লুকায়ে আপন মায়াতে
তুমি মুরতি ধরিয়া চকিতে নামো না।
আজি মাঠে মাঠে চলো বিহরি,
তৃণ উঠুক শিহরি শিহরি।
নামো তালপল্লববীজনে,
নামো জলে ছায়াছবি সৃজনে,
এস সৌরভ ভরি আঁচলে,
আঁখি আঁকিয়া সুনীল কাজলে,
মম চোখের সমুখে ক্ষণেক থামো না॥

ওগো সোনার স্বপন সাধের সাধনা।
কত আকুল হাসি ও রোদনে,
রাতে দিবসে স্বপনে বোধনে,
জ্বালি' জোনাকি প্রদীপ-মালিকা,
ভরি নিশীথ-তিমির থালিকা,
প্রাতে কুসুমের সাজি সাজায়ে,
সাঁঝে ঝিল্লি-ঝাঁঝর বাজায়ে,
কত করেছে তোমার স্তুতি-আরাধনা।
ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা।
ওই বসেছ শুভ্র আসনে
আজি নিখিলের সম্ভাষণে।
আহা শ্বেতচন্দনতিলকে
আজি তোমারে সাজায়ে দিল কে ?
আহা বরিল তোমারে কে আজি
তার দুঃখ-শয়ন তেয়াজি',
তুমি ঘুচালে কাহার বিরহ-কাঁদনা।

নটরাজ। প্রিয়দর্শিকা, সময় হয়েছে, এইবার বাদললক্ষ্মীর অবগুণ্ঠন খুলে দেখো। চিনতে পারবে সেই ছদ্মবেশিনীই শরৎপ্রতিমা। বর্ষার ধারায় যাঁর কণ্ঠ গদগদ, শিউলি-বনে তাঁরই গান, মালতী বিতানে তাঁরই বাঁশির ধ্বনি।

এবার অবগুণ্ঠন খোলো।
গহন মেঘমায়ায় বিজন বনছায়ায়
তোমার আলসে অবলুণ্ঠন সারা হল।
শিউলি-সুরভি রাতে
বিকশিত জ্যোৎস্নাতে
মৃদু মর্মর গানে তব মর্মের বাণী ব'লো।
গোপন অশ্রুজলে মিলুক শরম-হাসি—
মালতীবিতানতলে বাজুক বঁধুর বাঁশি।
শিশিরসিক্ত বায়ে
বিজড়িত আলোছায়ে
বিরহমিলনে গাঁথা নব প্রণয়দোলায় দোলো। [অবগুণ্ঠন মোচন

নটরাজ। অবগুণ্ঠন তো খুলল। কিন্তু এ কী দেখলুম। এ কি রূপ, না বাণী? এ কি আমার মনেরই মধ্যে, না আমার চোখেরই সামনে?

তোমার নাম জানিনে সুর জানি।
তুমি শরৎপ্রাতের আলোর বাণী।
সারাবেলা শিউলিবনে
আছি মগন আপন মনে,
কিসের ভুলে রেখে গেলে
আমার বুকে ব্যথার বাঁশিখানি।
আমি যা বলিতে চাই হল বলা,
ওই শিশিরে শিশিরে অশ্রুগলা।
আমি যা দেখিতে চাই প্রাণের মাঝে
সেই মুরতি এই বিরাজে,
ছায়াতে আলোতে আঁচল গাঁথা
আমার অকারণ বেদনার বীণাপাণি।

রাজা। শরৎশ্রী কাকে ইশারা করে ডাকছে? বলো তো এবার কে আসবে?

নটরাজ। উনি ডাকছেন সুন্দরকে। যা ছিল ছায়ার কুঁড়ি তা ফুটল আলোর ফুলে। গানের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখুন।

সুন্দরের প্রবেশ

কার বাঁশি নিশিভোরে বাজিল মোর প্রাণে?
ফুটে দিগন্তে অরুণ-কিরণ-কলিকা।
শরতের আলোতে সুন্দর আসে,
ধরণীর আঁখি যে শিশিরে ভাসে
হৃদয়কুঞ্জবনে মঞ্জরিল
মধুর শেফালিকা।

রাজা। নটরাজ, শরৎলক্ষ্মীর সহচরটি এরই মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠলেন কেন?

নটরাজ। শিশির শুকিয়ে যায়, শিউলি ঝরে পড়ে, আশ্বিনের সাদা মেঘ আলোয় যায় মিলিয়ে। ক্ষণিকের অতিথি স্বর্গ থেকে মর্ত্যে আসেন। কাঁদিয়ে দিয়ে চলে যান। এই যাওয়াআসায় স্বর্গমর্ত্যের মিলনপথ বিরহের ভিতর দিয়ে খুলে যায়।

হে ক্ষণিকের অতিথি,
এলে প্রভাতে কারে চাহিয়া,
ঝরা শেফালির পথ বাহিয়া।
কোন্‌ অমরার বিরহিণীরে
চাহনি ফিরে,
কার বিষাদের শিশিরনীরে
এলে নাহিয়া।
ওগো অকরুণ, কী মায়া জান,
মিলনছলে বিরহ আন।
চলেছ পথিক আলোক-যানে
আঁধারপানে,
মন-ভুলানো মোহন তানে
গান গাহিয়া।

নটরাজ। এইবার কবির বিদায় গান। বাঁশি হবে নীরব। যদি কিছু বাকি থাকে সে থাকবে স্মরণের মধ্যে।

আমার রাত পোহাল শারদ প্রাতে।
বাঁশি, তোমায় দিয়ে যাব কাহার হাতে।
তোমার বুকে বাজল ধ্বনি
বিদায়গাথা, আগমনী, কত যে,
ফাল্গুনে শ্রাবণে, কত প্রভাতে রাতে।
যে কথা কয় প্রাণের ভিতর অগোচরে
গানে গানে নিয়েছিলে চুরি করে।
সময় যে তার হল গত
নিশিশেষের তারার মতো
তারে শেষ করে দাও শিউলিফুলের মরণ সাথে।

রাজা। ও কী। একেবারে শেষ হয়ে গেল নাকি? কেবল দুদণ্ডের জন্যে গান বাঁধা হল, গান সারা হল! এত সাধনা, এত আয়োজন, এত উৎকণ্ঠা—তার পরে?

নটরাজ। 'তার পরে' প্রশ্নের উত্তর নেই সব চুপ। এই তো সৃষ্টির লীলা এ তো কৃপণের পুঁজি নয়। এ যে আনন্দের অমিতব্যয়। মুকুল ধরেও যেমন ঝরেও তেমনি। বাঁশিতে যদি গান বেজে থাকে সেই তো চরম। তার পরে? কেউ চুপ করে শোনে,

কেউ গলা ছেড়ে তর্ক করে। কেউ মনে রাখে, কেউ ভোলে, কেউ ব্যঙ্গ করে। তাতে কী আসে যায়?

গান আমার যায় ভেসে যায়,
চাসনে ফিরে দে তারে বিদায়।
সে যে দখিন হাওয়ায় মুকুল ঝরা,
ধুলার আঁচল হেলায় ভরা,
সে যে শিশিরফোঁটার মালা গাঁথা বনের আঙিনায়।
কাঁদন-হাসির আলোছায়া সারা অলস বেলা,
মেঘের গায়ে রঙের মায়া খেলার পরে খেলা
ভুলে যাওয়ার বোঝাই ভরি
গেল চলে কতই তরী
উজানবায়ে ফেরে যদি কে রয় সে আশায়।

রাজা। উত্তম হয়েছে।

রাজকবি। আরও অনেক উত্তম হতে পারত।

নটীর পূজা

১৮—১৯

নাট্যোল্লিখিত পাত্রীগণ

লোকেশ্বরী	রাজমহিষী, মহারাজ বিম্বিসারের পত্নী
মল্লিকা	মহারানী লোকেশ্বরীর সহচরী
বাসবী, নন্দা, রত্নাবলী, অজিতা, ভদ্রা	রাজকুমারীগণ
উৎপলপর্ণা	বৌদ্ধ ভিক্ষুণী
শ্রীমতী	বৌদ্ধধর্মরতা নটী
মালতী	বৌদ্ধধর্মানুরাগিণী পল্লীবালা, শ্রীমতীর সহচরী
রাজকিংকরী ও রক্ষিণীগণ	

সূচনা

ভিক্ষু উপালির প্রবেশ

গান

পূর্বগগনভাগে
    দীপ্ত হইল সুপ্রভাত
        তরুণারুণরাগে।
শুভ্র শুভ মুহূর্ত আজি
        সার্থক কর রে,
        অমৃতে ভর রে
অমিত পুণ্যভাগী কে
        জাগে, কে জাগে।

কে আছ? ভিক্ষা চাই, ভগবান বুদ্ধের নামে ভিক্ষা আমার।

নটীর প্রবেশ ও প্রণাম

শুভমস্তবতু কল্যাণম্। বৎসে, তুমি কে?

নটী। আমি এই রাজবাড়ির নটী।

উপালি। এই পুরীতে আজ একা কেবল তুমিই জেগে?

নটী। রাজকন্যারা সকলেই ঘুমিয়ে আছেন।

উপালি। ভগবান বুদ্ধের নামে ভিক্ষা চাই।

নটী। প্রভু, অনুম ত করুন, রাজকন্যাদের ডেকে আনি।

উপালি। আজ তোমারই কাছে ভিক্ষা জানাতে এসেছি।

নটী। আমি যে অভাগী। প্রভুর ভিক্ষাপাত্রে আমার দান কুণ্ঠিত হবে। কী দেব অনুমতি করুন।

উপালি। তোমার যা শ্রেষ্ঠ দান।

নটী। আমার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কী সে তো আমি জানিনে।

উপালি। না, ভগবান তোমাকে দয়া করেছেন, তিনি জানেন।

নটী। প্রভু, তাহলে তিনি স্বয়ং তুলে নিন যা আছে আমার।

উপালি। তাই নেবেন, তোমার পূজার ফুল। ঋতুরাজ বসন্ত যেমন করে পুষ্পবনের আত্মদানকে আপনিই জাগিয়ে তোলেন। তোমার সেইদিন এসেছে আমি তোমাকে জানিয়ে গেলুম। তুমি ভাগ্যবতী।

নটী। আমি অপেক্ষা করে থাকব। [প্রস্থান

রাজকন্যাদের প্রবেশ

প্রভু, ভিক্ষা নিয়ে যান। ফিরে যাবেন না, ফিরে যাবেন না। এ কী হল ? চলে গেলেন ?

রত্নাবলী। ভয় কী তোমাদের, বাসবী ? ভিক্ষা নেবার লোকের অভাব নেই— ভিক্ষা দেবার লোকই কম।

নন্দা। না রত্না, ভিক্ষা নেবার লোককেই সাধনা করে খুঁজে পেতে হয়। আজকের দিন ব্যর্থ হল। [প্রস্থান

নটীর পূজা

প্রথম অঙ্ক

মগধপ্রাসাদ কুঞ্জবনে

মহারানী লোকেশ্বরী, ভিক্ষুণী উৎপলপর্ণা

লোকেশ্বরী। মহারাজ বিম্বিসার আজ আমাকে স্মরণ করেছেন?

ভিক্ষুণী। হাঁ।

লোকেশ্বরী। আজ তাঁর অশোকচৈত্যে পূজা আয়োজনের দিন—সেইজন্যেই বুঝি?

ভিক্ষুণী। আজ বসন্তপূর্ণিমা।

লোকেশ্বরী। পূজা? কার পূজা?

ভিক্ষুণী। আজ ভগবান বুদ্ধের জন্মোৎসব—তাঁর উদ্দেশে পূজা।

লোকেশ্বরী। আর্যপুত্রকে ব'লো গিয়ে আমার সব পূজা নিঃশেষে চুকিয়ে দিয়েছি। কেউ বা ফুল দেয় দীপ দেয়—আমি আমার সংসার শূন্য করে দিয়েছি।

ভিক্ষুণী। কী বলছ মহারানী?

লোকেশ্বরী। আমার একমাত্র ছেলে, চিত্র—রাজপুত্র আমার,—তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গেল ভিক্ষু করে। তবু বলে পূজা দাও। লতার মূল কেটে দিলে তবু চায় ফুলের মঞ্জরী।

ভিক্ষুণী। যাকে দিয়েছ তাকে হারাওনি। কোলে যাকে পেয়েছিলে আজ বিশ্বে তাকেই পেয়েছ।

লোকেশ্বরী। নারী, তোমার ছেলে আছে?

ভিক্ষুণী। না।

লোকেশ্বরী। কোনোদিন ছিল?

ভিক্ষুণী। না। আমি প্রথমবয়সেই বিধবা।

লোকেশ্বরী। তাহলে চুপ করো। যে-কথা জান না সে-কথা ব'লো না।

ভিক্ষুণী। মহারানী, সত্যধর্মকে তুমিই তো রাজান্তঃপুরে সকলের প্রথমে আহ্বান করে এনেছিলে? তবে কেন আজ—

লোকেশ্বরী। আশ্চর্য—মনে আছে তো দেখি! ভেবেছিলেম সে-কথা বুঝি তোমাদের গুরু ভুলে গিয়েছেন। ভিক্ষু ধর্মরুচিকে ডাকিয়ে প্রতিদিন কল্যাণপঞ্চবিংশতিকা পাঠ করিয়ে তবে জল গ্রহণ করেছি, এক-শ ভিক্ষুকে অন্ন দিয়ে তবে ভাঙত আমার উপবাস, প্রতিবৎসর বর্ষার শেষে সমস্ত সংঘকে ত্রিচীবর বস্ত্র দেওয়া ছিল আমার ব্রত। বুদ্ধের ধর্মবৈরী দেবদত্তের উপদেশে যেদিন এখানে সকলেরই মন টলমল, একা আমি অবিচলিত নিষ্ঠায় ভগবান তথাগতকে এই উদ্যানের অশোকতলায় বসিয়ে সকলকে ধর্মতত্ত্ব শুনিয়েছি। নিষ্ঠুর, অকৃতজ্ঞ, শেষে এই পুরস্কার আমারই! যে-মহিষীরা বিদ্বেষে জ্বলেছিল, আমার অন্নে বিষ মিশিয়েছে যারা, তাদের তো কিছুই হল না, তাদের ছেলেরা তো রাজভোগে আছে।

ভিক্ষুণী। সংসারের মূল্যে ধর্মের মূল্য নয় মহারানী। সোনার দাম আর আলোর দাম কি এক?

লোকেশ্বরী। যেদিন দেবদত্তের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন কুমার অজাতশত্রু, আমি নির্বোধ সেদিন হেসেছিলেম। ভেবেছিলেম ভাঙা ভেলায় এরা সমুদ্র পার হতে চায়। দেবদত্তের শক্তির জোরে পিতা থাকতেই রাজা হবেন এই ছিল তাঁর আশা। আমি নির্ভয়ে সগর্বে বললেম, দেবদত্তের চেয়েও যে-গুরুর পুণ্যের জোর বেশি তাঁর প্রসাদে অমঙ্গল কেটে যাবে। এত বিশ্বাস ছিল আমার। ভগবান বুদ্ধকে—শাক্যসিংহকে—আনিয়ে তাঁকে দিয়ে আর্যপুত্রকে আশীর্বাদ করালেম। তবু জয় হল কার?

ভিক্ষুণী। তোমারই। সেই জয়কে অন্তর থেকে বাইরে ফিরিয়ে দিয়ো না।

লোকেশ্বরী। আমারই!

ভিক্ষুণী। নয় তো কী! পুত্রের রাজ্যলোভ দেখে মহারাজ বিম্বিসার স্বেচ্ছায় যেদিন সিংহাসন ছেড়ে দিতে পারলেন সেদিন তিনি যে রাজ্য জয় করেছিলেন—

লোকেশ্বরী। সে রাজ্য মুখের কথা, ক্ষত্রিয় রাজার পক্ষে সে বিদ্রূপ। আর আমার দিকে তাকাও দেখি। আমি আজ স্বামীসত্ত্বে বিধবা, পুত্রসত্ত্বে পুত্রহীনা, প্রাসাদের মাঝখানে থেকেও নির্বাসিতা। এটা তো মুখের কথা নয়। যারা তোমাদের ধর্ম কোনো দিন মানেনি তারা আজ আমাকে দেখে অবজ্ঞায় হেসে চলে যাচ্ছে। তোমরা যাঁকে বল শ্রীবজ্রসত্ত্ব, আজ কোথায় তিনি—পড়ুক না তাঁর বজ্র এদের মাথায়।

ভিক্ষুণী। মহারানী, এর মধ্যে সত্য আছে কোথায়। এ তো ক্ষণকালের স্বপ্ন—যাক না ওরা হেসে।

লোকেশ্বরী। স্বপ্ন বটে! তা এই স্বপ্নটা আমি চাইনে। আমি চাই অন্য স্বপ্নটা,

যাকে বলে বিত্ত, যাকে বলে পুত্র, যাকে বলে মান। সেই স্বপ্নে বিকশিত হয়ে ওইদিকে যাঁরা মাথা উঁচু করে বেড়াচ্ছেন, বলো না তাঁদের গিয়ে পুজো দিন না তাঁরা।

ভিক্ষুণী। যাই তবে।

লোকেশ্বরী। যাও, কিন্তু আমার মতো নির্বোধ নয় ওরা। ওদের কিছুই হারাবে না, সবই থাকবে,—ওরা তো বুদ্ধকে মানেনি, শাক্যসিংহের দয়া তো ওদের উপর পড়েনি, তাই বেঁচে গেল, বেঁচে গেল ওরা। অমন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? ধৈর্যের ভান করতে শিখেছ?

ভিক্ষুণী। কেমন করে বলব? এখনো ভিতরে ভিতরে ধৈর্য ভঙ্গ হয়।

লোকেশ্বরী। ধৈর্য ভঙ্গ হয় তবু মনে মনে কেবল আমাদের ক্ষমাই করছ। তোমাদের এই নীরব স্পর্ধা অসহ্য। যাও। [ভিক্ষুণীর প্রস্থানোদ্যম

শোনো শোনো, ভিক্ষুণী। চিত্র কী একটা নতুন নাম নিয়েছে। জান তুমি?

ভিক্ষুণী। জানি, কুশলশীল।

লোকেশ্বরী। যে-নামে তার মা তাকে ডেকেছে সেটা আজ তার কাছে অশুচি! তাই ফেলে দিয়ে চলে গেল।

ভিক্ষুণী। মহারানী যদি ইচ্ছা কর তাঁকে একদিন তোমার কাছে আনতে পারি।

লোকেশ্বরী। আমি ইচ্ছা করতে যাব কোন্ লজ্জায়। আর আজ তুমি আনবে তাকে আমার কাছে, যে প্রথম এনেছে তাকে এই পৃথিবীতে!

ভিক্ষুণী। তবে আদেশ করো আমি যাই।

লোকেশ্বরী। একটু থামো। তোমার সঙ্গে তার দেখা হয়?

ভিক্ষুণী। হয়।

লোকেশ্বরী। আচ্ছা, একবার না হয় তাকে—যদি সে—না, থাক্।

ভিক্ষুণী। আমি তাঁকে বলব। হয়তো তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হবে। [প্রস্থান

লোকেশ্বরী। হয়তো, হয়তো, হয়তো! নাড়ীর রক্ত দিয়ে তাকে তো পালন করেছিলাম, তার মধ্যে 'হয়তো' ছিল না। এতদিনের সেই মাতৃঋণের দাবি আজ এই একটু খানি হয়তো-য় এসে ঠেকল। একেই বলে ধর্ম! মল্লিকা।

মল্লিকার প্রবেশ

মল্লিকা। দেবী।

লোকেশ্বরী। কুমার অজাতশত্রুর সংবাদ পেলে?

মল্লিকা। পেয়েছি। দেবদত্তকে আনতে গেছেন। এ-রাজ্যে ত্রিরত্ন-পূজার কিছুই বাকি থাকবে না।

লোকেশ্বরী। ভীরু! রাজার সাহস নেই রাজত্ব করতে। বুদ্ধ-ধর্মের কত যে শক্তি তার প্রমাণ তো আমার উপর দিয়ে হয়ে গেছে। তবু ওই অপদার্থ দেবদত্তের আড়ালে না দাঁড়িয়ে এই মিথ্যাকে উপেক্ষা করতে ভরসা হল না।

মল্লিকা। মহারানী যাদের অনেক আছে তাদেরই অনেক আশঙ্কা। উনি রাজ্যেশ্বর, তাই ভয়ে ভয়ে সকল শক্তির সঙ্গেই সন্ধির চেষ্টা। বুদ্ধশিষ্যের সমাদর যখন বেশি হয়ে যায় অমনি উনি দেবদত্ত শিষ্যদের ডেকে এনে তাদের আরও বেশি সমাদর করেন। ভাগ্যকে দুই দিক থেকেই নিরাপদ করতে চান।

লোকেশ্বরী। আমার ভাগ্য একেবারে নিরাপদ। আমার কিছুই নেই, তাই মিথ্যাকে সহায় করবার দুর্বলবুদ্ধি ঘুচে গেছে।

মল্লিকা। দেবী, ভিক্ষুণী উৎপলপর্ণার মতোই তোমার এ-কথা। তিনি বলেন, লোকেশ্বরী মহারানীর ভাগ্য ভালো, মিথ্যা যে সব খোঁটায় মানুষকে বাঁধে, ভগবান মহাবোধির কৃপায় সেই সব খোঁটাই তাঁর ভেঙে গেছে।

লোকেশ্বরী। দেখো ওই সব বানানো কথা শুনলে আমার রাগ ধরে। তোমাদের অতিনির্মল ফাঁকা সত্য নিয়ে তোমরা থাকো, আমার ওই মাটিতে মাথা খুঁটি কটা আমাকে ফিরিয়ে দাও। তাহলে আবার না হয় অশোকচৈত্যে দীপ জ্বালব, এক-শ শ্রমণকে অন্ন দেব, ওদের যত মন্ত্র আছে সব একধার থেকে আবৃত্তি করিয়ে যাব। আর তা যদি না হয় তো আসুন দেবদত্ত, তা তিনি সাঁচ্চাই হ'ন আর ঝুঁটোই হ'ন। যাই, একবার প্রাসাদ শিখরে গিয়ে দেখিগে এঁরা কতদূরে। [উভয়ের প্রস্থান

বীণা হস্তে শ্রীমতীর প্রবেশ

শ্রীমতী। (লতাবিতানতলে আসন বিছাইয়া, দূরে চাহিয়া) সময় হল, এস তোমরা।

আপন মনে গান

নিশীথে কী কয়ে গেল মনে,
কী জানি কী জানি।
সে কি ঘুমে সে কি জাগরণে,
কী জানি কী জানি।

মালতীর প্রবেশ

মালতী। তুমি শ্রীমতী ?

শ্রীমতী। হাঁ গো, কেন বলো তো।

মালতী। প্রতিহারী পাঠিয়ে দিলে তোমার কাছে গান শিখতে।

শ্রীমতী। প্রাসাদে তোমাকে তো পূর্বে কখনো দেখিনি।

মালতী। নতুন এসেছি গ্রাম থেকে, আমার নাম মালতী।

শ্রীমতী। কেন এলে বাছা? সেখানে কি দিন কাটছিল না? ছিলে পূজার ফুল, দেবতা ছিলেন খুশি; হবে ভোগের মালা, উপদেবতা হাসবে। ব্যর্থ হবে তোমার বসন্ত। গান শিখতে এসেছ? এইটুকু তোমার আশা?

মালতী। সত্যি বলব? তার চেয়ে অনেক বড়ো আশা। বলতে সংকোচ হয়।

শ্রীমতী। ও, বুঝেছি। রাজরানী হবার দুরাশা। পূর্বজন্মে যদি অনেক দুষ্কৃতি করে থাক তো হতেও পার। বনের পাখি সোনার খাঁচা দেখে লোভ করে, যখন তার ডানায় চাপে দুষ্টবুদ্ধি। যাও, যাও, ফিরে যাও, এখনো সময় আছে।

মালতী। কী তুমি বলছ, দিদি, ভালো বুঝতে পারছিনে।

শ্রীমতী। আমি বলছি—

গান

বাঁধন কেন ভূষণবেশে তোরে ভোলায়,\
হায় অভাগী।\
মরণ কেন মোহন হেসে তোরে দোলায়,\
হায় অভাগী।

মালতী। তুমি আমাকে কিছুই বোঝনি। তবে স্পষ্ট করে বলি। শুনেছি একদিন ভগবান বুদ্ধ বসেছিলেন এই আরাম-বনে অশোকতলায়। মহারাজ বিম্বিসার সেইখানেই নাকি বেদী গড়ে দিয়েছেন।

শ্রীমতী। হাঁ, সত্য।

মালতী। রাজবাড়ির মেয়েরা সন্ধ্যাবেলায় সেখানে পূজা দেন।—আমার যদি সে অধিকার না থাকে আমি সেখানে ধুলা ঝাঁট দেব এই আশা করে এখানে গায়িকার দলে ভরতি হয়েছি।

শ্রীমতী। এস এস বোন, ভালো হল। রাজকন্যাদের হাতে পূজার দীপে ধোঁওয়া দেয় বেশি, আলো দেয় কম। তোমার নির্মল হাতদুখানির জন্যে অপেক্ষা ছিল। কিন্তু এ কথা তোমাকে মনে করিয়ে দিলে কে?

মালতী। কেমন করে বলব, দিদি। আজ বাতাসে বাতাসে যে আগুনের মতো কী এক মন্ত্র লেগেছে। সেদিন আমার ভাই গেল চলে। তার বয়স আঠারো। হাত ধরে জিজ্ঞাসা করলেম, "কোথায় যাচ্ছিস ভাই", সে বললে, "খুঁজতে।"

শ্রীমতী। নদীর সব ঢেউকেই সমুদ্র আজ একডাকে ডেকেছে। পূর্ণ চাঁদ উঠল।— এ কী। তোমার হাতে যে আংটি দেখি। কেমন লাগছে যে। স্বর্গের মন্দারকুঁড়ি তো ধুলোর দামে বিকিয়ে গেল না ?

মালতী। তবে খুলে বলি— তুমি সব কথা বুঝবে।

শ্রীমতী। অনেক কেঁদে বোঝবার শক্তি হয়েছে।

মালতী। তিনি ধনী, আমরা দরিদ্র। দূর থেকে চুপ করে তাঁকে দেখেছি। একদিন নিজে এসে বললেন "মালতীকে আমার ভালো লাগে।" বাবা বললেন, "মালতার সৌভাগ্য।" সব আয়োজন সারা হল যেদিন এলেন তিনি দ্বারে। বরের বেশে নয় ভিক্ষুর বেশে। কাষায়বস্ত্র, হাতে দণ্ড। বললেন, "যদি দেখা হয় তো মুক্তির পথে, এখানে নয়।"— দিদি, কিছু মনে ক'রো না— এখনো চোখে জল আসছে, মন যে ছোটো।

শ্রীমতী। চোখের জল বয়ে যাক না। মুক্তিপথের ধুলো ওই জলে মরবে।

মালতী। প্রণাম করে বললেম, "আমার তো বন্ধন ক্ষয় হয়নি। যে আংটি পরাবে কথা দিয়েছিলে সেটি দিয়ে যাও।" এই সেই আংটি। ভগবানের আরতিতে এটি যেদিন আমার হাত থেকে তাঁর পায়ে খসে পড়বে সেইদিন মুক্তির পথে দেখা হবে।

শ্রীমতী। কত মেয়ে ঘর বেঁধেছিল, আজ তারা ঘর ভাঙল। কত মেয়ে চীবর পরে পথে বেরিয়েছে, কে জানে সে কি পথের টানে, না পথিকের টানে ? কতবার হাত জোড় করে মনে মনে প্রার্থনা করি— বলি, "মহাপুরুষ, উদাসীন থেকো না। আজ ঘরে ঘরে নারীর চোখের জলে তুমিই বন্যা বইয়ে দিলে, তুমিই তাদের শান্তি দাও।" রাজবাড়ির মেয়েরা ওই আসছেন।

বাসবী নন্দা রত্নাবলী অজিতা মল্লিকা ভদ্রার প্রবেশ

বাসবী। এ মেয়েটি কে, দেখি দেখি। চুল চূড়া করে বেঁধেছে, অলকে দিয়েছে জবা। নন্দা, দেখে যাও, আকন্দের মালা দিয়ে বেণী কী করম উঁচু করে জড়িয়েছে। গলায় বুঝি কুঁচফলের হার ? শ্রীমতী, এ কোথা থেকে এল ?

শ্রীমতী। গ্রাম থেকে। ওর নাম মালতী।

রত্নাবলী। পেয়েছ একটি শিকার ! ওকে শিষ্যা করবে বুঝি ? আমাদের উদ্ধার করতে পারলে না, এখন গ্রামের মেয়ে ধরে মুক্তির ব্যবসা চালাবে !

শ্রীমতী। গ্রামের মেয়ের মুক্তির ভাবনা কী। ওখানে স্বর্গের হাতের কাজ ঢাকা পড়েনি— না ধুলায়, না মণিমাণিক্যে— স্বর্গ তাই আপনি ওদের চিনে নেয়।

রত্নাবলী। স্বর্গে যদি না যাই সেও ভালো কিন্তু তোমার উপদেশের জোরে যেতে চাইনে। গণেশের ইঁদুরের কৃপায় সিদ্ধিলাভ করতে আমার উৎসাহ নেই, বরঞ্চ যমরাজের মহিষটাকে মানতে রাজি আছি।

নন্দা। রত্না তোমার বাহন তো তৈরিই আছে,—লক্ষ্মীর পেঁচা। দেখো তো অজিতা, শ্রীমতীকে নিয়ে কেন বিদ্রূপ। ও তো উপদেশ দিতে আসে না।

বাসবী। ওর চুপ করে থাকাই তো রাশীকৃত উপদেশ। ওই দেখো না, চুপি চুপি হাসছে। ওটা কি উপদেশ হল না?

রত্নাবলী। মহৎ উপদেশ। অর্থাৎ কিনা, মধুরের দ্বারা কটুকে জয় করবে, হাস্যের দ্বারা ভাষ্যকে।

বাসবী। একটু ঝগড়া কর না কেন. শ্রীমতী? এত মধুর কি সহ্য হয়? মানুষকে লজ্জা দেওয়ার চেয়ে মানুষকে রাগিয়ে দেওয়া যে ঢের ভালো।

শ্রীমতী। ভিতরে তেমন ভালো যদি হতেম বাইরে মন্দর ভান করলে সেটা গায়ে লাগত না। কলঙ্কের ভান করা চাঁদকেই শোভা পায়। কিন্তু অমাবস্যা! সে যদি মেঘের মুখোশ পরে?

অজিতা। ওই দেখো, গ্রামের মেয়েটি অবাক হয়ে ভাবছে, রাজবাড়ির মেয়েগুলোর রসনায় রস নেই কেবল ধারই আছে। কী তোমার নাম ভুলে গেছি।

মালতী। মালতী।

অজিতা। কী ভাবছিলে বলো না।

মালতী। দিদিকে ভালোবেসেছি, তাই ব্যথা লাগছিল।

অজিতা। আমরা যাকে ভালোবাসি তাকেই ব্যথা দেবার ছল করি। রাজবাড়ির অলংকারশাস্ত্রের এই নিয়ম। মনে রেখো।

ভদ্রা। মালতী, কী একটা কথা যেন বলতে যাচ্ছিলে। বলেই ফেলো না। আমাদের তুমি কী ভাব জানতে ভারি কৌতূহল হয়।

মালতী। আমি বলতে চাচ্ছিলেম, "হাঁ গা, তোমরা নিজের কথা শুনতেই এত ভালোবাস, গান শোনবার সময় বয়ে যায়।"

সকলের উচ্চহাস্য

বাসবী। হাঁ গা, হাঁ গা। রাজবাড়ির ব্যাকরণচঞ্চুকে ডাকো, তাঁর শিক্ষা সম্বোধনের শেষ পর্যন্ত পৌঁছয়নি।

রত্নাবলী। হাঁ গা বাসবী, হাঁ গা রাজকুলমুকুটমণিমালিকা।

বাসবী। হাঁ গা রত্নাবলী, হাঁ গা ভুবনমোহনলাবণ্যকৌমুদী—ব্যাকরণের এ কী নূতন সম্পদ। সম্বোধনে হাঁ গা।

মালতী। দিদি, এঁরা কি আমার উপরে রাগ করেছেন?

নন্দা। ভয় নেই তোমার মালতী। দিগ্‌বালিকারা শিউলিবনে যখন শিল বৃষ্টি করে তখন রাগ ক'রে করে না, তাদের আদর করবার প্রথাই ওই।

অজিতা। ওই দেখো, শ্রীমতী মনে মনেই গান গেয়ে যাচ্ছে। আমাদের কথা ওর কানেই পৌঁছচ্ছে না। শ্রীমতী, গলা ছেড়ে গাও না, আমরাও যোগ দেব।

শ্রীমতীর গান

নিশীথে কী কয়ে গেল মনে,
কী জানি, কী জানি।
সে কি ঘুমে সে কি জাগরণে
কী জানি কী জানি।
নানাকাজে নানামতে
ফিরি ঘরে, ফিরি পথে
সে-কথা কি অগোচরে বাজে ক্ষণে ক্ষণে
কী জানি, কী জানি।
সে কথা কি অকারণে ব্যথিছে হৃদয়,
একি ভয়, একি জয়।
সে-কথা কি কানে কানে বারে বারে কয়
"আর নয়, আর নয়।"
সে-কথা কি নানাসুরে
বলে মোরে, "চলো দূরে,"
সে কি বাজে বুকে মম, বাজে কি গগনে,
কী জানি, কী জানি।

বাসবী। মালতী, তোমার চোখে যে জল ভরে এল। এ-গানের মধ্যে কী বুঝলে বলো তো।

মালতী। শ্রীমতী ডাক শুনেছে।

বাসবী। কার ডাক?

মালতী। যার ডাকে আমার ভাই গেল চলে। যার ডাকে আমার—

বাসবী। কে, কে তোমার?

শ্রীমতী। মালতী, বোন আমার, চুপ, আর বলিসনে। চোখ মুছে ফেল্, এ কাঁদবার জায়গা নয়।

বাসবী। শ্রীমতী, ওকে বাধা দিলে কেন? তুমি কি মনে ভাব আমরা কেবল হাসতেই জানি?

ভদ্রা। আমরা কি একেবারেই জানিনে হাসি কোন্ জায়গায় নাগাল পায় না?

মালতী। রাজকুমারী, আজ যে বাতাসে বাতাসে কথা চলছে তোমরা শোননি?

নন্দা। সকালের আলোতে পদ্মের পাপড়ি খুলে যায়, কিন্তু রাজপ্রাসাদের দেয়াল তো খোলে না।

লোকেশ্বরীর প্রবেশ। সকলের প্রণাম

লোকেশ্বরী। আমি সহ্য করতে পারছি নে। ওই শুনছ না রাস্তায় রাস্তায় স্তবের ধ্বনি—ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে, নমঃ সংঘায় মহত্তমায়। শুনলে এখনো আমার বুকের ভিতর জ্বলে ওঠে।

(কানে হাত দিয়া) আজই থামিয়ে দেওয়া চাই। এখনই, এখনই।

মল্লিকা। দেবী শান্ত হ'ন।

লোকেশ্বরী। শান্ত হব কিসে? কোন্ মন্ত্রে শান্ত করবে? সেই, নমঃ পরমশান্তায় মহাকারুণিকায়—এ মন্ত্র আর নয়, আর নয়। আমার মন্ত্র, নমো বজ্রক্রোধডাকিন্যৈ, নমঃ শ্রীবজ্রমহাকালায়। অস্ত্র দিয়ে আগুন দিয়ে রক্ত দিয়ে জগতে শান্তি আসবে। নইলে মার কোল ছেড়ে ছেলে চলে যাবে, সিংহাসন থেকে রাজমহিমা জীর্ণপত্রের মতো খসে খসে পড়বে।—তোমরা কুমারীরা এখানে কী করছ?

রত্নাবলী। (হাসিয়া) অপেক্ষা করছি উদ্ধারের। মলিন মনকে নির্মল করে এই শ্রীমতীর শিষ্যা হবার পথে একটু একটু করে এগোচ্ছি।

বাসবী। অশ্রাব্য তোমার এই অত্যুক্তি।

লোকেশ্বরী। এই নটীর শিষ্যা। শেষকালে তাই ঘটাবে, সেই ধর্মই এসেছে। পতিতা আসবে পরিত্রাণের উপদেশ নিয়ে। শ্রীমতী বুঝি আজ হঠাৎ সাধ্বী হয়ে উঠেছে। যেদিন ভগবান বুদ্ধ অশোকবনে এসেছিলেন রাজপুরীর সকলেই তাঁকে দেখতে এল, একেও দয়া করে ডাকতে পাঠিয়েছিলেম। পাপিষ্ঠা এলই না। তবু আজ নাকি ভিক্ষু উপালি রাজবাড়িতে একমাত্র ওর হাতেই ভিক্ষা নিতে আসে, রাজকুমারীদের এড়িয়ে যায়। মূঢ়ে, রাজবংশের মেয়ে হয়ে তোরা এই ধর্মকে অভ্যর্থনা করতে বসেছিস, উচ্চ আসনকে ধুলায় টেনে ফেলবার এই ধর্ম। যেখানে রাজার

প্রভাব ছিল সেখানে ভিক্ষুর প্রভাব হবে—একে ধর্ম বলিস তোরা আত্মঘাতিনীরা? উপালি তোকে কী মন্ত্র দিয়েছে উচ্চারণ কর্ দেখি নটী। দেখি কতবড়ো সাহস। পাপরসনায় পক্ষাঘাত হবে না?

শ্রীমতী। (করজোড়ে, উঠিয়া দাঁড়াইয়া)

ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে
নমো ধর্মায় তারিণে
নমঃ সংঘায় মহত্তমায় নমঃ।

লোকেশ্বরী। ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে—থাক থাক থাম থাম।

শ্রীমতী। মন্ত্রিতায় অনাথায় অনুকম্পায় যে বিভো—

লোকেশ্বরী। (বক্ষে করাঘাত করিয়া) ওরে অনাথা, অনাথা। শ্রীমতী একবার বলো তো, মহাকারুণিকো নাথো—

উভয়ে আবৃত্তি

মহাকারুণিকো নাথো হিতায় সব্বপাণিনং
পূরেত্বা পারমী সব্বা পত্তো সম্বোধিমুত্তমম্।

লোকেশ্বরী। হয়েছে, হয়েছে, থাক্ আর নয়। নমো বজ্রক্রোধডাকিন্যৈ।

অনুচরীর প্রবেশ

অনুচরী। মহারানী, এইদিকে আসুন নিভৃতে।

(জনান্তিকে) রাজকুমার চিত্র এসেছেন জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

লোকেশ্বরী। কে বলে ধর্ম মিথ্যা। পুণ্যমন্ত্রের যেমনি উচ্চারণ অমনি গেল অমঙ্গল। ওরে বিশ্বাসহীনারা, তোরা আমার দুঃখ দেখে মনে মনে হেসেছিলি। মহাকারুণিকো নাথো, তাঁর করুণার কতবড়ো শক্তি। পাথর গলে যায় এই আমি তোদের সবাইকে বলে যাচ্ছি. পাব আবার পুত্রকে, পাব আবার সিংহাসন। যারা ভগবানকে অপমান করছে দেখব তাদের দর্প কতদিন থাকে।

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি
ধম্মং সরণং গচ্ছামি
সংঘং সরণং গচ্ছামি। [বলিতে বলিতে অনুচরীসহ প্রস্থান

রত্নাবলী। মল্লিকা, হাওয়া আবার কোন্‌দিক থেকে বইল?

মল্লিকা। আজকাল আকাশ জুড়ে এ যে পাগলামির হাওয়া, এর কি গতির

স্থিরতা আছে ? হঠাৎ কাকে কোন্‌দিকে নিয়ে যায় কেউ বলতে পারে না। সেই যে কলন্দক আজ চল্লিশ বছর জুয়ো খেলে কাটালে, সে হঠাৎ শুনি নাকি ওদের অর্হৎ হয়ে উঠেছে। আবার নন্দিবর্ধন, যজ্ঞে যে সর্বস্ব দিতে পণ করলে আজ ব্রাহ্মণ দেখলে সে মারতে যায়।

রত্নাবলী। তাহলে রাজকুমার চিত্র ফিরে এলেন।

মল্লিকা। দেখো না শেষ পর্যন্ত কী হয়।

মালতী। ভগবান দয়াবতার যেদিন এখানে এসেছিলেন সেদিন শ্রীমতীদিদি তাঁকে দেখতে যাওনি, একি সত্য ?

শ্রীমতী। সত্য। তাঁকে দেখা দেওয়াই যে পূজা দেওয়া। আমি মলিন, আমার মধ্যে তো নৈবেদ্য প্রস্তুত ছিল না !

মালতী। হায় হায়, তবে কী হল দিদি।

শ্রীমতী। অত সহজে তাঁর কাছে গেলে যে যাওয়া ব্যর্থ হয়। তাঁকে কি চেয়ে দেখলেই দেখি, তাঁর কথা কানে শুনলেই কি শোনা যায় ?

রত্নাবলী। ইস, এটা আমাদের 'পরে কটাক্ষপাত হল। একটু প্রশ্রয়ের হাওয়াতেই নটীর সৌজন্যের আবরণ উড়ে যায়।

শ্রীমতী। কৃত্রিম সৌজন্যের দিন আমার গেছে। মিথ্যা স্তব করব না, স্পষ্টই বলব, তোমাদের চোখ যাঁকে দেখেছে তোমরা তাঁকে দেখনি।

রত্নাবলী। বাসবী, ভদ্রা, এই নটীর স্পর্ধা সহ্য করছ কেমন করে ?

বাসবী। বাহির থেকে সত্যকে যদি সহ্য করতে না পারি তাহলে ভিতর থেকে মিথ্যাকে সহ্য করতে হবে। শ্রীমতী আর-একবার গাও তো তোমার মন্ত্রটি, আমার মনের কাঁটাগুলোর ধার খয়ে যাক।

শ্রীমতী। ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে
নমো ধর্মায় তারিণে
নমঃ সংঘায় মহত্তমায় নমঃ।

নন্দা। ভগবানকে দেখতে গিয়েছিলেম আমরা, ভগবান নিজে এসে দেখা দিয়েছেন শ্রীমতীকে, ওর অন্তরের মধ্যে।

রত্নাবলী। বিনয় ভুলেছ নটী ! এ-কথার প্রতিবাদ করবে না ?

শ্রীমতী। কেন করব রাজকুমারী ? তিনি যদি আমারও অন্তরে পা রাখেন তাতে কি আমার গৌরব, না তাঁরই ?

বাসবী। থাক থাক মুখের কথায় কথা বেড়ে যায়। তুমি গান গাও।

শ্রীমতীর গান

তুমি কি এসেছ মোর দ্বারে
খুঁজিতে আমার আপনারে ?
তোমারি যে ডাকে
কুসুম গোপন হতে বাহিরায় নগ্ন শাখে শাখে,
সেই ডাকে ডাকো আজি তারে।
তোমারি সে-ডাকে বাধা ভোলে,
শ্যামল গোপন প্রাণ ধূলি-অবগুণ্ঠন খোলে।
সে-ডাকে তোমারি
সহসা নবীন উষা আসে হাতে আলোকের ঝারি,
দেয় সাড়া ঘন অন্ধকারে।

নেপথ্যে। ওঁ নমো রত্নত্রয়ায় বোধিসত্ত্বায় মহাসত্ত্বায় মহাকারুণিকায়।

উৎপলপর্ণার প্রবেশ

সকলে। ভগবতী, নমস্কার।

ভিক্ষুণী। ভবতু সব্বমঙ্গলং রক্‌খন্তু সব্বদেবতা
সব্ববুদ্ধানুভাবেন সদা সোত্থী ভবন্তু তে।

শ্রীমতী।

শ্রীমতী। কী আদেশ ?

ভিক্ষুণী। আজ বসন্তপূর্ণিমায় ভগবান বোধিসত্ত্বের জন্মোৎসব। অশোকবনে তাঁর আসনে পূজা-নিবেদনের ভার শ্রীমতীর উপর।

রত্নাবলী। বোধ হয় ভুল শুনলেম। কোন্ শ্রীমতীর কথা বলছেন ?

ভিক্ষুণী। এই যে, এই শ্রীমতী।

রত্নাবলী। রাজবাড়ির এই নটী ?

ভিক্ষুণী। হাঁ, এই নটী।

রত্নাবলী। স্থবিরদের কাছে উপদেশ নিয়েছেন ?

ভিক্ষুণী। তাঁদেরই এই আদেশ।

রত্নাবলী। কে তাঁরা ? নাম শুনি।

ভিক্ষুণী। একজন তো উপালি।

রত্নাবলী। উপালি তো নাপিত।

ভিক্ষুণী। সুনন্দও ব'লছেন।

রত্নাবলী। তিনি গোয়ালার ছেলে।

ভিক্ষুণী। সুনীতেরও এই আদেশ।

রত্নাবলী। তিনি নাকি জাতিতে পুক্কুস।

ভিক্ষুণী। রাজকুমারী, এঁরা জাতিতে সকলেই এক। এঁদের আভিজাত্যের সংবাদ তুমি জান না।

রত্নাবলী। নিশ্চয় জানিনে। বোধ হয় এই নটী জানে। বোধ হয় এর সঙ্গে জাতিতে বিশেষ প্রভেদ নেই। নইলে এত মমতা কেন?

ভিক্ষুণী। সে-কথা সত্য। রাজপিতা বিম্বিসার রাজগৃহ-নগরীর নির্জনবাস থেকে স্বয়ং আজ এসে ব্রতপালন করবেন। তাঁকে সংবর্ধনা করে আনিগে। [প্রস্থান

অজিতা। কোথায় চলেছ শ্রীমতী?

শ্রীমতী। অশোকবনের আসনবেদী ধৌত করতে যাব।

মালতী। দিদি আমাকে সঙ্গে নিয়ো।

নন্দা। আমিও যাব।

অজিতা। ভাবছি গেলে হয়।

বাসবী। আমিও দেখিগে, তোমাদের অনুষ্ঠানটা কী রকম।

রত্নাবলী। কী শোভা! শ্রীমতী করবে পূজার উদ্‌যোগ, তোমরা পরিচারিকার দল করবে চামরবীজন।

বাসবী। আর এখান থেকে তুমি অভিশাপের উষ্ণ নিশ্বাস ফেলবে। তাতে অশোকবনও দগ্ধ হবে না, শ্রীমতীর শান্তিও থাকবে অক্ষুণ্ণ।

রত্নাবলী ও মল্লিকা ব্যতীত আর সকলের প্রস্থান

রত্নাবলী। সইবে না! সইবে না! এ একেবারে সমস্তর বিরুদ্ধ। মল্লিকা, পুরুষ হয়ে জন্মালুম না কেন। এই কঙ্কণপরা হাতের 'পরে ধিক্‌কার হয়। যদি থাকত তলোয়ার! তুমিও তো মল্লিকা সমস্তক্ষণ চুপ করে বসে ছিলে, একটি কথাও কওনি। তুমিও কি ওই নটীর পরিচারিকার পদ কামনা কর?

মল্লিকা। করলেও পাব না। নটী আমাকে খুব চেনে।

রত্নাবলী। চুপ করে সহ্য কর কী করে বুঝতে পারিনে। ধৈর্য নিরুপায় ইতর লোকের অস্ত্র, রাজার মেয়েদের না।

মল্লিকা। আমি জানি প্রতিকার আসন্ন, তাই শক্তির অপব্যয় করিনে।

রত্নাবলী। নিশ্চিত জান ?

মল্লিকা। নিশ্চিত।

রত্নাবলী। গোপন কথা যদি হয় ব'লো না। কেবল এইটুকু জানতে চাই ওই নটী কি আজ সন্ধ্যাবেলায় পূজা করবে আর রাজকন্যারা জোড়হাতে দাঁড়িয়ে থাকবে ?

মল্লিকা। না কিছুতেই না। আমি কথা দিচ্ছি।

রত্নাবলী। রাজগৃহলক্ষ্মী তোমার বাণীকে সার্থক করুন।

দ্বিতীয় অঙ্ক

রাজোদ্যান

লোকেশ্বরী ও মল্লিকা

মল্লিকা। পুত্রের সঙ্গে তো দেখা হল মহারানী। তবে এখনো কেন—

লোকেশ্বরী। পুত্রের সঙ্গে ? পুত্র কোথায় ? এ যে মৃত্যুর চেয়ে বেশি। আগে বুঝতে পারিনি।

মল্লিকা। এমন কথা কেন বলছেন।

লোকেশ্বরী। পুত্র যখন অপুত্র হয়ে মার কাছে আসে তার মতো দুঃখ আর নেই। কী রকম করে সে চাইলে আমার দিকে। তার মা একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে—কোথাও কোনো তার চিহ্নও নেই। নিজের এতবড়ো নিঃশেষে সর্বনাশ কল্পনাও করতে পারতুম না।

মল্লিকা। রক্তমাংসের জন্মকে সম্পূর্ণ ঘুচিয়ে ফেলে এঁরা যে নির্মল নূতন জন্ম লাভ করেন।

লোকেশ্বরী। হায় রে রক্তমাংস। হায় রে অসহ্য ক্ষুধা, অসহ্য বেদনা। রক্তমাংসের তপস্যা এদের এই শূন্যের তপস্যার চেয়ে কি কিছুমাত্র কম !

মল্লিকা। কিন্তু যাই বল দেবী, তাঁকে দেখলেম, সে কী রূপ। আলো দিয়ে ধোওয়া যেন দেবমূর্তিখানি।

লোকেশ্বরী। ওই রূপ নিয়ে তার মাকে সে লজ্জা দিয়ে গেল। যে মায়ের প্রাণ আমার নাড়ীতে, যে মায়ের স্নেহ আমার হৃদয়ে, তাকে ওই রূপ ধিক্কার দিলে। যে-জন্ম তাকে দিয়েছি আমি, সে-জন্মের সঙ্গে তার এ জন্মের কেবল যে বিচ্ছেদ তা নয়, বিরোধ। দেখ্ মল্লিকা আজ খুব স্পষ্ট করে বুঝতে পারলেম এ ধর্ম পুরুষের তৈরি।

এ ধর্মে মা ছেলের পক্ষে অনাবশ্যক ; স্ত্রীকে স্বামীর প্রয়োজন নেই। যারা না পুত্র না স্বামী না ভাই সেই সব ঘরছাড়াদের একটুখানি ভিক্ষা দেবার জন্যে সমস্ত প্রাণকে শুকিয়ে ফেলে আমরা শূন্য ঘরে পড়ে থাকব! মল্লিকা, এই পুরুষের ধর্ম আমাদের মেরেছে, আমরাও একে মারব।

মল্লিকা। কিন্তু দেবী, দেখনি, মেয়েরাই যে দলে দলে চলেছে বুদ্ধকে পূজা দেবার জন্যে।

লোকেশ্বরী। মূঢ় ওরা, ভক্তি করবার ক্ষুধার ওদের অন্ত নেই। যা ওদের সব চেয়ে মারে তাকেই ওরা সব চেয়ে বেশি করে দেয়। এই মোহকে আমি প্রশ্রয় দিইনে।

মল্লিকা। মুখে বলছ, মহারানী। নিশ্চয় জানি, তোমার ওই পুত্র আজ তোমার সেবাকক্ষের দ্বার দিয়ে বেরিয়ে এসে তোমার পূজাকক্ষের দ্বার দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেছে। তোমার মানব-পুত্র কোল থেকে নেমে আজ দেবতা-পুত্র হয়ে তোমার হৃদয়ের পূজাবেদীতে চড়ে বসেছে।

লোকেশ্বরী। চুপ চুপ। বলিসনে। আমি হাত জোড় করে তাকে অনুরোধ করলেম, বললেম, "একরাত্রির জন্যে তোমার মাতার ঘরে থেকে যাও।" সে বললে, "আমার মাতার ঘরের উপরে ছাদ নেই—আছে আকাশ।" মল্লিকা, যদি মা হতিস তো বুঝতিস কতবড়ো কঠিন কথা। বজ্র দেবতার হাতের কিন্তু সে তো বজ্র। বুক বিদীর্ণ হয়ে যায়নি! সেই বিদীর্ণ বুকের ছিদ্রের ভিতর দিয়ে ওই যে রাস্তার শ্রমণদের গর্জন আমার পাঁজরগুলোর ভিতরে প্রতিধ্বনিত হয়ে বেড়াচ্ছে—বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং সরণং গচ্ছামি, সংঘং সরণং গচ্ছামি।

মল্লিকা। একি মহারানী, মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আজো আপনি যে নমস্কার করেন!

লোকেশ্বরী। ওই তো বিপদ। মল্লিকা, দুর্বলের ধর্ম মানুষকে দুর্বল করে। দুর্বল করাই এই ধর্মের উদ্দেশ্য। যত উঁচু মাথাকে সব হেঁট করে দেবে। ব্রাহ্মণকে বলবে সেবা করো, ক্ষত্রিয়কে বলবে ভিক্ষা করো। এই ধর্মের বিষ অনেকদিন স্বেচ্ছায় নিজের রক্তের মধ্যে পালন করেছি। সেইজন্যে আজ আমিই একে সব চেয়ে ভয় করি। ওই কে আসছে?

মল্লিকা। রাজকুমারী বাসবী। পূজাস্থলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছেন।

বাসবীর প্রবেশ

লোকেশ্বরী। পূজায় চলেছ?

বাসবী। হাঁ।

লোকেশ্বরী। তোমাদের তো বয়স হয়েছে।

বাসবী। আমাদের ব্যবহারে তার কি কোনো বৈলক্ষণ্য দেখছেন?

লোকেশ্বরী। শিশু! তোমরা নাকি বলে বেড়াচ্ছ, অহিংসা পরমো ধর্মঃ!

বাসবী। আমাদের চেয়ে যাঁদের বয়স অনেক বেশি তাঁরাই বলে বেড়াচ্ছেন, আমরা তো কেবল মুখে আবৃত্তি করি মাত্র।

লোকেশ্বরী। নির্বোধকে কেমন করে বোঝাব অহিংসা ইতরের ধর্ম। হিংসা ক্ষত্রিয়ের বিশাল বাহুতে মাণিক্যের অঙ্গদ, নিষ্ঠুর তেজে দীপ্যমান।

বাসবী। শক্তির কি কোমল রূপ নেই?

লোকেশ্বরী। আছে, যখন সে ডোবায়। যখন সে দৃঢ় করে বাঁধে তখন না। পর্বতকে সৃষ্টিকর্তা নির্দয় পাথর দিয়ে গড়েছেন, পাঁক দিয়ে নয়। তোমাদের গুরুর কৃপায় উপর থেকে নিচে পর্যন্ত সবই কি হবে পাঁক? রাজবাড়িতে মানুষ হয়েও এই কথাটা মানতে ঘৃণা হয় না? চুপ করে রইলে যে?

বাসবী। ভেবে দেখছি, মহারানী।

লোকেশ্বরী। ভাববার কী আছে। চোখের সামনে দেখলে তো রাজপুত্র একমুহূর্তে রাজা হতে ভুলে গেল। বলে গেল চরাচরকে দয়া করবার সাধনা করব। শোননি, বাসবী?

বাসবী। শুনেছি।

লোকেশ্বরী। তাহলে নির্দয়তা করবার গুরুতর কাজ গ্রহণ করবে কে? কেউ যদি না করে তবে বীরভোগ্যা বসুন্ধরার কী হবে গতি? যত সব মাথা-হেঁট করা উপবাসজীর্ণ ক্ষীণকণ্ঠ মন্দাগ্নিম্লান নির্জীবের হাতে তার দুর্গতির কি সীমা থাকবে? তোরা ক্ষত্রিয়ের মেয়ে, কথাটা তোদের কাছে এত নতুন ঠেকছে কেন বাসবী?

বাসবী। এই পুরানো কথাটা হঠাৎ আজ যেন একদিনে ঢাকা পড়ে গেছে বসন্তে নিষ্পত্র কিংশুকের শাখা যেমন করে ফুলে ঢেকে যায়।

লোকেশ্বরী। কখনো কখনো বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে পুরুষ আপন পৌরুষধর্ম ভুলে যায় কিন্তু নারীরা যদি তাকে সেটা ভুলতে দেয় তাহলে মরণ যে সেই নারীর। মহালতার জন্যে কি মহাবৃক্ষের দরকার নেই? সব গাছই গুল্ম হয়ে গেলে কি তার পক্ষে ভালো? বল না। মুখে যে উত্তর নেই।

বাসবী। মহাবৃক্ষ চাই বই কি।

লোকেশ্বরী। কিন্তু বনস্পতি নির্মূল করবার জন্যই এসেছেন তোমাদের গুরু। তাও যে পরশুরামের মতো কুঠার হাতে করবেন এমন শক্তি নেই। কোমল শাস্ত্রবাক্যের

পোকা তলায় তলায় লাগিয়ে দিয়ে মনুষ্যত্বের মজ্জাকে জীর্ণ করবেন, বিনা যুদ্ধে পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করে দেবেন। তাঁদেরও কাজ সারা হবে আর তোমরা রাজার মেয়েরা মাথা মুড়িয়ে ভিক্ষাপাত্র হাতে পথে পথে ফিরবে। তার আগেই যেন মর, আমার এই আশীর্বাদ। কী ভাবছ? কথাটা মনে লাগছে না?

বাসবী। ভালো করে ভেবে দেখি।

লোকেশ্বরী। ভেবে দেখবার দরকার নেই, প্রমাণ দেখো। আর্যপুত্র বিম্বিসার, ক্ষত্রিয় রাজা, রাজত্ব তো তাঁর ভোগের জিনিস নয়, তাতেই তাঁর ধর্মসাধনা। কিন্তু কোন্ মরুর ধর্ম কানে মন্ত্র দিল অমনি কত সহজেই রাজত্ব থেকে তিনি খসে পড়লেন— অস্ত্র হাতে না, রণক্ষেত্রে না, মৃত্যুর মুখে না। বাসবী, একদিন তুমিও রাজার মহিষী হবে এ আশা কি ত্যাগ করেছ?

বাসবী। কেন ত্যাগ করব?

লোকেশ্বরী। তাহলে জিজ্ঞাসা করি দয়া-মন্ত্রের হাওয়ায় যে-রাজা সিংহাসনের উপর কেবল টলমল করে. রাজদণ্ড যার হাতে শিথিল, জয়তিলক যার ললাটে ম্লান তাকে শ্রদ্ধা করে বরণ করতে পারবে?

বাসবী। না।

লোকেশ্বরী। আমার কথাটা বলি। মহারাজ বিম্বিসার সংবাদ পাঠিয়েছেন তিনি আজ আসবেন। তাঁর ইচ্ছা আমি প্রস্তুত থাকি। তোমরা ভাবছ ওঁর জন্যে সাজব! যে মানুষ রাজাও নয় ভিক্ষুও নয়, যে-মানুষ ভোগেও নেই ত্যাগেও নেই তাকে অভ্যর্থনা! কখনো না। বাসবী. তোমাকে বার বার বলছি, এই পৌরুষহীন আত্মাবমাননার ধর্মকে কিছুতে স্বীকার ক'রো না।

মল্লিকা। রাজকুমারী, কোথায় চলেছ?

বাসবী। ঘরে।

মল্লিকা। এদিকে নটী যে প্রস্তুত হয়ে এল।

বাসবী। থাক থাক। [প্রস্থান

মল্লিকা। মহারানী. শুনতে পাচ্ছ?

লোকেশ্বরী। শুনছি বই কি। বিষম কোলাহল।

মল্লিকা। নিশ্চয় এঁরা এসে পড়েছেন।

লোকেশ্বরী। কিন্তু ওই যে এখনো শুনছি, নমো—

মল্লিকা। সুর বদলেছে। 'নমো বুদ্ধায়' গর্জন আরও প্রবল হয়ে উঠেছে আঘাত পেয়েই। সঙ্গে সঙ্গে ওই শোনো—'নমঃ পিনাকহস্তায়'। আর ভয় নেই।

লোকেশ্বরী। ভাঙল রে ভাঙল। যখন সব ধুলো হয়ে যাবে তখন কে জানবে ওর মধ্যে আমার প্রাণ কতখানি দিয়েছিলেম। হায় রে, কত ভক্তি। মল্লিকা, ভাঙার কাজটা শীঘ্র হয়ে গেলে বাঁচি—ওর ভিতরটা যে আমার বুকের মধ্যে।

রত্নাবলীর প্রবেশ

রত্না, তুমিও চলেছ পূজায় ?

রত্নাবলী। ভ্রমক্রমে পূজ্যকে পূজা না করতে পারি কিন্তু অপূজ্যকে পূজা করার অপরাধ আমার দ্বারা ঘটে না।

লোকেশ্বরী। তবে কোথায় যাচ্ছ ?

রত্নাবলী। মহারানীর কাছেই এখানে এসেছি। আবেদন আছে।

লোকেশ্বরী। কী, বলো।

রত্নাবলী। ওই নটী যদি এখানে পূজার অধিকার পায় তাহলে এই অশুচি রাজবাড়িতে বাস করতে পারব না।

লোকেশ্বরী। আশ্বাস দিচ্ছি আজ এ পূজা ঘটবে না।

রত্নাবলী। আজ না হ'ক কাল ঘটবে।

লোকেশ্বরী। ভয় নেই, কন্যা, পূজাকে সমূলে উচ্ছেদ করব।

রত্নাবলী। যে অপমান সহ্য করেছি তাতেও তার প্রতিকার হবে না।

লোকেশ্বরী। তুমি রাজার কাছে অভিযোগ করলে নটীর নির্বাসন, এমন কি, প্রাণদণ্ডও হতে পারে।

রত্নাবলী। তাতে ওর গৌরব বাড়িয়ে দেওয়া হবে।

লোকেশ্বরী। তবে তোমার কী ইচ্ছা ?

রত্নাবলী। ও যেখানে পূজারিনী হয়ে পূজা করতে যাচ্ছিল সেখানেই ওকে নটী হয়ে নাচতে হবে। মল্লিকা, চুপ করে রইলে যে। তুমি কী বল ?

মল্লিকা। প্রস্তাবটা কৌতুকজনক।

লোকেশ্বরী। আমার মন সায় দিচ্ছে না রত্না।

রত্নাবলী। ওই নটীর 'পরে মহারানীর এখনো দয়া আছে দেখছি।

লোকেশ্বরী। দয়া! কুকুর দিয়ে ওর মাংস ছিঁড়ে খাওয়াতে পারি। আমার দয়া। অনেকদিন ওখানে নিজের হাতে পূজা দিয়েছি। পূজার বেদী ভেঙে পড়বে সেও সইতে পারি। কিন্তু রাজরানীর পূজার আসনে আজ নটীর চরণাঘাত!

রত্নাবলী। প্রগল্‌ভতা মাপ করবেন। ওইটুকু ব্যথাকে যদি প্রশ্রয় দেন তবে ওই ব্যথার উপরেই ভাঙা পূজার বেদী বারেবারে গড়ে উঠবে।

লোকেশ্বরী। সে-ভয় মনে একেবারে নেই তা নয়।

রত্নাবলী। মোহে পড়ে যে-মিথ্যাকে মান দিয়েছিলেন তাকে দূরে সরিয়ে দিলেই মোহ কাটে না। সেই মিথ্যাকে অপমান করুন তবে মুক্তি পাবেন।

লোকেশ্বরী। মল্লিকা, ওই শোনো। উদ্যানের উত্তর দিক থেকে শব্দ আসছে। ভেঙে ফেললে, সব ভেঙে ফেললে। ওঁ নমো—যাক যাক ভেঙে যাক।

রত্নাবলী। চলো না, মহারানী, দেখে আসি গে।

লোকেশ্বরী। যাব যাব, কিন্তু এখনো না।

রত্নাবলী। আমি দেখে আসি গে। [প্রস্থান

লোকেশ্বরী। মল্লিকা, বাঁধন ছিঁড়তে বড়ো বাজে।

মল্লিকা। তোমার চোখ দিয়ে যে জল পড়ছে।

লোকেশ্বরী। ওই শোনো না, 'জয় কালী করালী'—অস্ত্র ধ্বনিটা ক্ষীণ হয়ে এল, এ আমি সইতে পারছি নে।

মল্লিকা। বুদ্ধের ধর্মকে নির্বাসিত করলে আবার ফিরে আসবে—অন্য ধর্ম দিয়ে চাপা না দিলে শান্তি নেই। দেবদত্তের কাছে যখন নূতন মন্ত্র নেবে তখনই সান্ত্বনা পাবে।

লোকেশ্বরী। ছি ছি, ব'লো না, ব'লো না, মুখে এনো না। দেবদত্ত ক্রূর সর্প, নরকের কীট। যখন অহিংসাব্রত নিয়েছিলেম তখনো মনে মনে তাকে প্রতিদিন দগ্ধ করেছি, বিদ্ধ করেছি। আর আজ! যে-আসনে আমার সেই পরমনির্মল জ্যোতির্ভাসিত মহাগুরুকে নিজে এনে বসিয়েছি তাঁর সেই আসনেই দেবদত্তকে ডেকে আনব! (জানু পাতিয়া) ক্ষমা করো প্রভু, ক্ষমা করো। দ্বারত্রয়েণ কৃতং সর্বং অপরাধং ক্ষমতু মে প্রভো।

উঠিয়া। ভয় নেই, মল্লিকা, ভিতরে উপাসিকা আছে সে ভিতরেই থাক্, বাইরে আছে নিষ্ঠুরা, আছে রাজকুলবধূ তাকে কেউ পরাস্ত করতে পারবে না। মল্লিকা, আমার নির্জন ঘরে গিয়ে বসি গে, যখন ধুলার সমুদ্রে আমার এতকালের আরাধনার তরণী একেবারে ডুবে যাবে তখন আমাকে ডেকো। [উভয়ের প্রস্থান

ধূপ দীপ গন্ধ মাল্য মঙ্গলঘট প্রভৃতি পূজোপকরণ লইয়া রাজবাটীর একদল নারীর প্রবেশ। পুষ্পপাত্রকে ঘিরিয়া সকলে

বণ্ণ-গন্ধ-গুণোপেতং এতং কুসুমসন্ততিং
পূজয়ামি মুনিন্দস্‌স সিরি-পাদ-সরোরুহে।

প্রণাম ও শঙ্খধ্বনি। ধূপপাত্রকে ঘিরিয়া

গন্ধ-সম্ভার-যুত্তেন ধূপেনাহং সুগন্ধিনা
পূজয়ে পূজনেয্যন্তং পূজাভাজনমুত্তমং।

শঙ্খধ্বনি ও প্রণাম

শ্রীমতী প্রদীপের থালা ঘেরিয়া

ঘনসারপ্পদিত্তেন দীপেন তমধংসিনা
তিলোকদীপং সম্বুদ্ধং পূজয়ামি তমোনুদং।

শঙ্খধ্বনি ও প্রণাম। আহার্য নৈবেদ্য ঘেরিয়া

অধিবাসেতু নো ভন্তে ভোজনং পরিকপ্পিতং
অনুকম্পং উপাদায় পতিগণ্হাতুমুত্তমং।

শঙ্খধ্বনি ও প্রণাম। জানু পাতিয়া

যো সন্নিসিন্নো বরবোধিমূলে
মারং সসেনং মহতিং বিজেত্বা
সম্বোধিমাগঞ্ছি অনন্তঞাণো
লোকুত্তমো তং পণমামি বুদ্ধং।

বনের প্রবেশপথে পূজা সমাধা হল। এবার চলো স্তূপমূলে।

মালতী। কিন্তু শ্রীমতীদিদি ওই দেখো, এদিকের পথ বেড়া দিয়ে বন্ধ

শ্রীমতী। বেড়া ডিঙিয়ে যেতে পারব, চলো।

নন্দা। বোধ হচ্ছে রাজার নিষেধ।

শ্রীমতী। কিন্তু প্রভুর আদেশ আছে।

নন্দা। কী ভয়ংকর গর্জন। একি রাষ্ট্রবিপ্লব?

শ্রীমতী। গান ধরো।

গান

বাঁধন-ছেঁড়ার সাধন হবে।
ছেড়ে যাব তীর মাভৈঃ রবে।
যাঁহার হাতের বিজয়মালা
রুদ্রদাহের বহ্নিজ্বালা,
নমি নমি নমি সে ভৈরবে।
কাল-সমুদ্রে আলোর যাত্রী
শূন্যে যে ধায় দিবসরাত্রি।

ডাক এল তার তরঙ্গেরি,
বাজুক বক্ষে বজ্রভেরী
অকূল প্রাণের সে উৎসবে।

একদল অন্তঃপুররক্ষিণীর প্রবেশ

রক্ষিণী। ফেরো তোমরা এখান থেকে।

শ্রীমতী। আমরা প্রভুর পূজায় চলেছি।

রক্ষিণী। পূজা বন্ধ।

মালতী। আজ প্রভুর জন্মোৎসব।

রক্ষিণী। পূজা বন্ধ।

শ্রীমতী। এও কি সম্ভব ?

রক্ষিণী। পূজা বন্ধ। আমি আর কিছু জানিনে। দাও তোমাদের অর্ঘ্য।

[পূজার থালা প্রভৃতি ছিনাইয়া লইল

শ্রীমতী। এ কী পরীক্ষা আমার। অপরাধ কি ঘটেছে কিছু ?

উত্তমঙ্গেন বন্দেহং পাদপংসুং বরুত্তমং।
বুদ্ধে যো খলিতো দোসো বুদ্ধো খমতু তং মম।

রক্ষিণী। বন্ধ করো স্তব।

শ্রীমতী। দ্বারের কাছেই অবরোধ! প্রবেশ আমার ঘটল না ঘটল না।

মালতী। কাঁদ কেন শ্রীমতীদিদি। বিনা অর্ঘ্যে বিনা মন্ত্রে কি পূজা হয় না ? ভগবান তো আমাদের মনের ভিতরেও জন্মলাভ করেছেন।

শ্রীমতী। শুধু তাই নয় মালতী, তাঁর জন্মে আমরা সবাই জন্মেছি। আজ সবারই জন্মোৎসব।

নন্দা। শ্রীমতী, হঠাৎ একমুহূর্তে আজ এমন দুর্দিন ঘনিয়ে এল কেন ?

শ্রীমতী। দুর্দিনই যে সুদিন হয়ে ওঠবার দিন আজ। যা ভেঙেছে তা জোড়া লাগবে, যা পড়েছে তা উঠবে আবার।

অজিতা। দেখো শ্রীমতী, এখন আমার মনে হচ্ছে তোমাকে যে পূজার ভার দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে নিশ্চয় ভুল আছে। সব তাই নষ্ট হল। গোড়াতেই আমাদের বোঝা উচিত ছিল।

শ্রীমতী। আমি ভয় করিনে। জানি প্রথম থেকেই কেউ মন্দিরে দ্বার খোলা পায় না। ক্রমে যায় আগল খুলে। তবু আমার বলতে কোনো সংকোচ নেই যে, প্রভু আহ্বান করেছেন আমাকে। বাধা যাবে কেটে। আজই যাবে।

ভদ্রা। রাজার বাধাও সরাতে পারবে ?

শ্রীমতী। সেখানে রাজার রাজদণ্ড পৌঁছয় না।

রত্নাবলীর প্রবেশ

রত্নাবলী। কী বলছিলে, শুনেছি শুনেছি। তুমি রাজার বাধাও মান না এতবড়ো তোমার সাহস।

শ্রীমতী। পূজাতে রাজার বাধাই নেই।

রত্নাবলী। নেই রাজার বাধা ? সত্যি নাকি ? যেয়ো তুমি পূজা করতে, আমি দেখব দুই চোখের আশ মিটিয়ে।

শ্রীমতী। যিনি অন্তর্যামী তিনিই দেখবেন। বাহির থেকে সব সরিয়ে দিলেন, তাতে আড়াল পড়ে। এখন

বচসা মনসা চেব বন্দামেতে তথাগতে
সয়নে আসনে ঠানে গমনে চাপি সব্বদা।

রত্নাবলী। তোমার দিন এবার হয়ে এসেছে, অহংকার ঘুচবে।

শ্রীমতী। তা ঘুচবে। কিছুই বাকি থাকবে না, কিছুই না।

রত্নাবলী। এখন আমার পালা, আমি প্রস্তুত হয়ে আসছি। [প্রস্থান

ভদ্রা। কিছুই ভালো লাগছে না। বাসবী বুদ্ধিমতী, সে আগেই কোথায় সরে পড়েছে।

অজিতা। আমার কেমন ভয় করছে।

উৎপলপর্ণার প্রবেশ

নন্দা। ভগবতী, কোথায় চলেছেন ?

উৎপলপর্ণা। উপদ্রব এসেছে নগরে, ধর্ম পীড়িত, শ্রমণেরা শঙ্কিত, আমি পৌরপথে রক্ষামন্ত্র পড়তে চলেছি।

শ্রীমতী। ভগবতী, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে না ?

উৎপলপর্ণা। কেমন করে নিয়ে যাই ? তোমার উপরে যে পূজার আদেশ আছে।

শ্রীমতী। পূজার আদেশ এখনো আছে দেবী ?

উৎপলপর্ণা। সমাধান না হওয়া পর্যন্ত সে আদেশের তো অবসান নেই।

মালতী। মাত, কিন্তু রাজার বাধা আছে যে।

উৎপলপর্ণা। ভয় নেই, ধৈর্য ধরো। সে বাধা আপনিই পথ করে দেবে। [প্রস্থান

ভদ্রা। শুনছ অজিতা, রাস্তায় ও কি ক্রন্দন, না গর্জন।

নন্দা। আমার তো মনে হচ্ছে উদ্যানের ভিতরেই কারা প্রবেশ করে ভাঙচুর করছে। শ্রীমতী, শীঘ্র চলো রাজমহিষী মাতার ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিইগে। [প্রস্থান

ভদ্রা। এস অজিতা, সমস্তই যেন একটা দুঃস্বপ্ন বলে বোধ হচ্ছে।

[রাজকুমারী প্রভৃতির প্রস্থান

মালতী। দিদি, বাইরে ওই যেন মরণের কান্না শুনতে পাচ্ছি। আকাশে দেখছ ওই শিখা! নগরে আগুন লাগল বুঝি। জন্মোৎসবে এই মৃত্যুর তাণ্ডব কেন।

শ্রীমতী। মৃত্যুর সিংহদ্বার দিয়েই জন্মের জয়যাত্রা।

মালতী। মনে ভয় আসছে বলে বড়ো লজ্জা পাচ্ছি দিদি। পূজা করতে যাব ভয় নিয়ে যাব এ আমার সহ্য হচ্ছে না।

শ্রীমতী। তোর ভয় কিসের বোন।

মালতী। বিপদের ভয় না। কিছুই যে বুঝতে পারছিনে, অন্ধকার ঠেকছে; তাই ভয়।

শ্রীমতী। আপনাকে এই বাইরে দেখিসনে। আজ যাঁর অক্ষয় জন্ম তাঁর মধ্যে আপনাকে দেখ্, তোর ভয় ঘুচে যাবে।

মালতী। তুমি গান করো দিদি, আমার ভয় যাবে।

শ্রীমতীর গান

আর রেখো না আঁধারে আমায়
দেখতে দাও।
তোমার মাঝে আমার আপনারে
আমায় দেখতে দাও।
কাঁদাও যদি কাঁদাও এবার,
সুখের গ্লানি সয় না যে আর,
যাক না ধুয়ে নয়ন আমার
অশ্রুধারে,
আমায় দেখতে দাও।
জানি না তো কোন্ কালো এই ছায়া,
আপন ব'লে ভুলায় যখন
ঘনায় বিষম মায়া।
স্বপ্নভারে জমল বোঝা,
চিরজীবন শূন্য খোঁজা,

যে মোর আলো লুকিয়ে আছে
রাতের পারে
আমায় দেখতে দাও।

একজন অন্তঃপুররক্ষিণীর প্রবেশ

রক্ষিণী। শোনো, শোনো, শ্রীমতী।

মালতী। কেন নিষ্ঠুর হচ্ছ তোমরা। আর আমাদের যেতে বলো না। আমরা দুটি মেয়ে এই উদ্যানের কাছে মাটির 'পরে বসে থাকি না—তাতে তোমাদের কী ক্ষতি হবে।

রক্ষিণী। তোমাদেরই বা কী তাতে প্রয়োজন।

মালতী। ভগবান বুদ্ধ যে-উদ্যানে একদিন প্রবেশ করেছিলেন তার শেষপ্রান্তেও তাঁর পদধুলা আছে। তোমরা যদি ভিতরে না যেতে দাও তাহলে আমরা এইখানে সেই ধুলায় বসে মনের মধ্যে তাঁর জন্মোৎসব গ্রহণ করি—মন্ত্রও বলব না, অর্ঘ্যও দেব না।

রক্ষিণী। কেন বলবে না মন্ত্র। বলো, বলো। শুনতেও পাব না এত কী পাপ করেছি। অন্য রক্ষিণীরা দূরে আছে, এইবেলা আজ পুণ্যদিনে শ্রীমতী তোমার মধুর কণ্ঠ থেকে প্রভুর স্তব শুনে নিই। তুমি জেনো আমি তাঁর দাসী। যেদিন তিনি এসেছিলেন অশোকছায়ায় সেদিন আমি যে তাঁকে এই পাপচোখে দেখেছি তার পর থেকে আমার অন্তরে তিনি আছেন।

শ্রীমতী। নমো নমো বুদ্ধ দিবাকরায়
নমো নমো গোতম-চন্দিমায়,
নমো নমো নন্তগুণন্নবায়,
নমো নমো সাকিয়নন্দনায়॥

রক্ষিণী, তুমিও আমার সঙ্গে সঙ্গে বলো।

রক্ষিণী। আমার মুখে কি পুণ্যমন্ত্র বের হবে।

শ্রীমতী। ভক্তি আছে হৃদয়ে, যা বলবে তাই পুণ্য হবে। বলো
নমো নমো বুদ্ধ দিবাকরায়। [ক্রমে ক্রমে আবৃত্তি করাইয়া লইল।

রক্ষিণী। আমার বুকের বোঝা নেমে গেল শ্রীমতী, আজকের দিন আমার সার্থক

হল। যে-কথা বলতে এসেছিলেম এবার বলে নিই। তুমি এখান থেকে পালাও, আমি তোমাকে পথ করে দিচ্ছি।

শ্রীমতী। কেন।

রক্ষিণী। মহারাজ অজাতশত্রু দেবদত্তের কাছে দীক্ষা নিয়েছেন। তিনি অশোকতলে প্রভুর আসন ভেঙে দিয়েছেন।

মালতী। হায় হায় দিদি, হায় হায়, আমার দেখা হল না। আমার ভাগ্য মন্দ, ভেঙে গেল সব।

শ্রীমতী। কী বলিস মালতী। তাঁর আসন অক্ষয়। মহারাজ বিম্বিসার যা গড়েছিলেন তাই ভেঙেছে। প্রভুর আসনকে কি পাথর দিয়ে পাকা করতে হবে। ভগবানের নিজের মহিমাই তাকে রক্ষা করে।

রক্ষিণী। রাজা প্রচার করেছেন সেখানে যে-কেউ আরতি করবে, স্তবমন্ত্র পড়বে, তার প্রাণদণ্ড হবে। শ্রীমতী, তাহলে তুমি আর কী করবে এখানে।

শ্রীমতী। অপেক্ষা করে থাকব।

রক্ষিণী। কতদিন।

শ্রীমতী। যতদিন না পূজার ডাক আসে। যতদিন বেঁচে আছি ততদিনই।

রক্ষিণী। পূর্ব হতে আজ তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি শ্রীমতী।

শ্রীমতী। কিসের ক্ষমা।

রক্ষিণী। হয়তো রাজার আদেশে তোমাকেও আঘাত করতে হবে।

শ্রীমতী। ক'রো আঘাত।

রক্ষিণী। সে আঘাত হয়তো রাজবাড়ির নটীর উপরে পড়বে, কিন্তু প্রভুর ভক্ত সেবিকাকে আজও আমার প্রণাম, সেদিনও আমার প্রণাম, আমাকে ক্ষমা করো।

শ্রীমতী। আমার প্রভু আমাকে সকল আঘাত ক্ষমা করবার বর দিন। বুদ্ধো থমতু, বুদ্ধো থমতু।

অন্য রক্ষিণীর প্রবেশ

দ্বিতীয় রক্ষিণী। রোদিনী।

প্রথম রক্ষিণী। কী পাটলী।

পাটলী। ভগবতী উৎপলপর্ণাকে এরা মেরে ফেলেছে।

রোদিনী। কী সর্বনাশ!

শ্রীমতী। কে মারলে।

পাটলী। দেবদত্তের শিষ্যেরা।

রোদিনী। রক্তপাত তবে শুরু হল। তাই যদি হলই তাহলে আমাদের হাতেও অস্ত্র আছে। এ পাপ সইব না। এ যে প্রভুর সংঘকে মারলে। শ্রীমতী ক্ষমা চলবে না, অস্ত্র ধরো।

শ্রীমতী। লোভ দেখিয়ো না রোদিনী। আমি নটী, তোমার ওই তলোয়ার দেখে আমার এই নাচের হাতও চঞ্চল হয়ে উঠল।

পাটলী। তাহলে এই নাও। [তরবারি দান

শ্রীমতী। (শিহরিয়া হাত হইতে তলোয়ার পড়িয়া গেল) না, না। প্রভুর কাছ থেকে অস্ত্র পেয়েছি। চলছে আমার যুদ্ধ, মার পরাস্ত হ'ক, প্রভুর জয় হ'ক।

পাটলী। চল্ রোদিনী, ভগবতীর দেহ বহন করে নিয়ে যেতে হবে শ্মশানে।

[উভয়ের প্রস্থান

কয়েকজন রক্ষিণী সহ রত্নাবলীর প্রবেশ

রত্নাবলী। এই যে এখানেই আছে। ওকে রাজাদেশ শুনিয়ে দাও।

রক্ষিণী। মহারাজের আদেশ এই যে, তুমি নটী তোমাকে অশোকবনে নাচতে যেতে হবে।

শ্রীমতী। নাচ! আজ!

মালতী। তোমরা এ কী কথা বলছ গো। মহারাজের ভয় হল না এমন আদেশ করতে?

রত্নাবলী। ভয় হবারই তো কথা। সেই দিনই তো এসেছে। তাঁর নটীদাসীকেও ভয় করবেন রাজেশ্বর! গ্রাম্য বর্বর।

শ্রীমতী। কখন নাচ হবে?

রত্নাবলী। আজ আরতির বেলায়।

শ্রীমতী। প্রভুর আসনবেদির সামনে?

রত্নাবলী। হাঁ।

শ্রীমতী। তবে তাই হ'ক। [সকলের প্রস্থান

ভিক্ষুদের প্রবেশ ও গান

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব
ঘোর কুটিল পন্থ তার লোভজটিল বন্ধ।
নূতন তব জন্ম লাগি কাতর সব প্রাণী
কর ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন অমৃতবাণী,
বিকশিত কর প্রেমপদ্ম চির-মধুনিষ্যন্দ।

শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।
এস দানবীর দাও ত্যাগ কঠিন দীক্ষা,
মহাভিক্ষু লও সবার অহংকার ভিক্ষা।
লোক লোক ভুলুক শোক খণ্ডন কর মোহ,
উজ্জ্বল হ'ক জ্ঞান-সূর্য উদয়-সমারোহ,
প্রাণ লভুক সকল ভুবন নয়ন লভুক অন্ধ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।
ক্রন্দনময় নিখিল হৃদয় তাপদহনদীপ্ত,
বিষয়বিষ-বিকারজীর্ণ দীর্ণ অপরিতৃপ্ত।
দেশ দেশ পরিল তিলক রক্ত কলুষ গ্লানি,
তব মঙ্গলশঙ্খ আন তব দক্ষিণপাণি,
তব শুভসংগীতরাগ তব সুন্দর ছন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।

রাজোদ্যান

মালতী ও শ্রীমতী

মালতী। দিদি, শান্তি পাচ্ছিনে।

শ্রীমতী। কী হয়েছে।

মালতী। তোমাকে যখন ওরা নাচের সাজ করাতে নিয়ে গেল আমি চুপি চুপি ওই প্রাচীরের কাছে গিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে দেখলেম। দেখি ভিক্ষুণী উৎপলপর্ণার মৃতদেহ নিয়ে চলেছে আর,—

শ্রীমতী। থামলে কেন। বলো।

মালতী। রাগ করবে না দিদি? আমি বড়ো দুর্বল।

শ্রীমতী। কিছুতেই না।

মালতী। দেখলেম অন্ত্যেষ্টিমন্ত্র পড়তে পড়তে শবদেহের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিলেন।

শ্রীমতী। কে যাচ্ছিলেন।

মালতী। দূর থেকে মনে হল যেন তিনি।

শ্রীমতী। অসম্ভব নেই।

মালতী। পণ করেছিলেম, মুক্তি যতদিন না পাই তাঁকে দূর থেকেও দেখব না।

শ্রীমতী। রক্ষা করিস সেই পণ। সমুদ্রের দিকে অনিমেষ তাকিয়ে থাকলেই তো পার দেখা যায় না। দুরাশায় মনকে প্রশ্রয় দিসনে।

মালতী। তাঁকে দেখবার আশায় মনকে আকুল করছি মনে ক'রো না। ভয় হচ্ছে ওঁকে তারা মারবে তাই কাছে থাকতে চাই। পণ রাখতে পারছিনে বলে আমাকে অবজ্ঞা ক'রো না দিদি।

শ্রীমতী। আমি কি তোর ব্যথা বুঝিনে।

মালতী। তাঁকে বাঁচাতে পারব না কিন্তু মরতে তো পারব। আর পারলুম না দিদি, এবারকার মতো সব ভেঙে গেল। এ-জীবনে হবে না মুক্তি।

শ্রীমতী। যাঁর কাছে যাচ্ছিস তিনিই তোকে মুক্তি দিতে পারেন। কেননা তিনি মুক্ত। তোর কথা শুনে আজ একটা কথা বুঝতে পারলুম।

মালতী। কী বুঝলে দিদি।

শ্রীমতী। এখনো আমার মনের মধ্যে পুরানো ক্ষত চাপা আছে সে আবার ব্যথিয়ে উঠল। বন্ধনকে বাইরে থেকে যতই তাড়া করেছি ততই সে ভিতরে গিয়ে লুকিয়েছে।

মালতী। রাজবাড়িতে তোমার মতো একলা মানুষ আর কেউ নেই তাই তোমাকে ছেড়ে যেতে বড়ো কষ্ট পাচ্ছি। কিন্তু যেতে হল। যখন সময় পাবে আমার জন্যে ক্ষমার মন্ত্র প'ড়ো।

শ্রীমতী। বুদ্ধে যো খলিতো দোসো, বুদ্ধো খমতু তং মম।

মালতী। (প্রণাম করিতে করিতে) 'বুদ্ধো খমতু তং মম।' যাবার মুখে একটা গান শুনিয়ে দাও। তোমার ওই মুক্তির গানে আজ একটুও মন দিতে পারব না। একটা পথের গান গাও।

শ্রীমতীর গান

পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে।
পিছিয়ে পড়েছি আমি যাব যে কী করে।

এসেছে নিবিড় নিশি
পথরেখা গেছে মিশি',
সাড়া দাও, সাড়া দাও আঁধারের ঘোরে।
ভয় হয় পাছে ঘুরে ঘুরে
যত আমি যাই তত যাই চলে দূরে।
মনে করি আছ কাছে
তবু ভয় হয় পাছে
আমি আছি তুমি নাই কালি নিশিভোরে।

মালতী। শোনো দিদি, আবার গর্জন। দয়া নেই, কারো দয়া নেই। অনন্ত-কারুণিক বুদ্ধ তো এই পৃথিবীতেই পা দিয়েছেন তবু এখানে নরকের শিখা নিবল না। আর দেরি করতে পারিনে। প্রণাম, দিদি। মুক্তি যখন পাবে আমাকে একবার ডাক দিয়ো, একবার শেষ চেষ্টা করে দেখো।

শ্রীমতী। চল্, তোকে প্রাচীরদ্বার পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে আসিগে। [উভয়ের প্রস্থান

রত্নাবলী ও মল্লিকার প্রবেশ

রত্নাবলী। দেবদত্তের শিষ্যেরা ভিক্ষুণীকে মেরেছে। তা নিয়ে এত ভাবনা কিসের? ও তো ছিল সেই ক্ষেত্রপালের মেয়ে।

মল্লিকা। কিন্তু আজ যে ও ভিক্ষুণী।

রত্নাবলী। মন্ত্র পড়ে কি রক্ত বদল হয়?

মল্লিকা। আজকাল তো দেখছি মন্ত্রের বদল রক্তের বদলের চেয়ে ঢের বড়ো।

রত্নাবলী। রেখে দে ও-সব কথা। প্রজারা উত্তেজিত হয়েছে বলে রাজার ভাবনা! এ আমি সইতে পারিনে। তোমার ভিক্ষুধর্ম রাজধর্মকে নষ্ট করছে।

মল্লিকা। উত্তেজনার আরও একটু কারণ আছে। মহারাজ বিম্বিসার পূজার জন্য যাত্রা করে বেরিয়েছেন কিন্তু এখনো পৌঁছননি, প্রজারা সন্দেহ করছে।

রত্নাবলী। কানাকানি চলছে আমিও শুনেছি। ব্যাপারটা ভালো নয় তা মানি। কিন্তু কর্মফলের মূর্তি হাতে হাতে দেখা গেল।

মল্লিকা। কী কর্মফল দেখলে?

রত্নাবলী। মহারাজ বিম্বিসার পিতার বৈদিক ধর্মকে বিনাশ করেছেন। সে কি পিতৃহত্যার চেয়ে বেশি নয়? ব্রাহ্মণরা তো তখন থেকেই বলছে, যে যজ্ঞের আগুন উনি নিবিয়েছেন সেই ক্ষুধিত আগুন একদিন ওঁকে খাবে।

মল্লিকা। চুপ চুপ, আস্তে। জান তো, অভিশাপের ভয়ে উনি কী রকম অবসন্ন হয়ে পড়েছেন।

রত্নাবলী। কার অভিশাপ?

মল্লিকা। বুদ্ধের। মনে মনে মহারাজ ওঁকে ভারি ভয় করেন।

রত্নাবলী। বুদ্ধ তো কাউকে অভিশাপ দেন না। অভিশাপ দিতে জানে দেবদত্ত।

মল্লিকা। তাই তার এত মান। দয়ালু দেবতাকে মানুষ মুখের কথায় ফাঁকি দেয়, হিংসালু দেবতাকে দেয় দামি অর্ঘ্য।

রত্নাবলী। যে-দেবতা হিংসা করতে জানে না, তাকে উপবাসী থাকতে হয়, নখদন্তহীন বৃদ্ধ সিংহের মতো।

মল্লিকা। যাই হ'ক এই বলে যাচ্ছি, আজ সন্ধ্যেবেলায় ওই অশোকচৈত্যে পুজো হবেই।

রত্নাবলী। তা হয় হ'ক কিন্তু নাচ তার আগেই হবে এও আমি বলে দিচ্ছি।

[মল্লিকার প্রস্থান

বাসবীর প্রবেশ

বাসবী। প্রস্তুত হয়ে এলেম।

রত্নাবলী। কিসের জন্যে?

বাসবী। শোধ তুলব বলে। অনেক লজ্জা দিয়েছে ওই নটী।

রত্নাবলী। উপদেশ দিয়ে?

বাসবী। না, ভক্তি করিয়ে।

রত্নাবলী। তাই ছুরি হাতে এসেছ?

বাসবী। সেজন্যে না। রাষ্ট্রবিপ্লবের আশঙ্কা ঘটেছে। বিপদে পড়ি তো নিরস্ত্র মরব না।

রত্নাবলী। নটীর উপর শোধ তুলবে কী দিয়ে?

বাসবী। (হার দেখাইয়া) এই হার দিয়ে।

রত্নাবলী। তোমার হীরের হার!

বাসবী। বহুমূল্য অবমাননা, রাজকুলের উপযুক্ত। ও নাচবে ওর গায়ে পুরস্কার ছুঁড়ে ফেলে দেব।

রত্নাবলী। ও যদি তিরস্কার ক'রে ফিরে ফেলে দেয় তোমার গায়ে। যদি না নেয়।

বাসবী। (ছুরি দেখাইয়া) তখন এই আছে।

রত্নাবলী। শীঘ্র ডেকে আনো মহারানী লোকেশ্বরীকে, তিনি খুব আমোদ পাবেন।

বাসবী। আসবার সময় খুঁজেছিলেম তাঁকে। শুনলেম ঘরে দ্বার দিয়ে আছেন। একি রাষ্ট্রবিপ্লবের ভয়ে না স্বামীর 'পরে অভিমানে? বোঝা গেল না।

রত্নাবলী। কিন্তু আজ হবে নটীর নতিনাট্য, তাতে মহারানীর উপস্থিত থাকা চাই।

বাসবী। নটীর নতিনাট্য। নামটি বেশ বানিয়েছ।

মল্লিকার প্রবেশ

মল্লিকা। যা মনে করেছিলেম তাই ঘটেছে। রাজ্যে যেখানে যত বুদ্ধের শিষ্য আছে মহারাজ অজাতশত্রু সবাইকে ডাকতে দূত পাঠিয়েছেন। এমনি করে গ্রহপূজা চলছেই, কখনো বা শনিগ্রহ কখনো বা রবিগ্রহ।

রত্নাবলী। ভালোই হয়েছে। বুদ্ধের সব-কটি শিষ্যকেই দেবদত্তের শিষ্যদের হাতে একসঙ্গে সমর্পণ করে দিন। তাতে সময়-সংক্ষেপ হবে।

মল্লিকা। সেজন্যে নয়। ওরা রাজার হয়ে অহোরাত্র পাপমোচন মন্ত্র পড়তে আসছে। মহারাজ একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছেন।

বাসবী। তাতে কী হয়েছে?

মল্লিকা। কী আশ্চর্য। এখনো জনশ্রুতি তোমার কানে পৌঁছয়নি! সবাই অনুমান করছে, পথের মধ্যে ওরা বিম্বিসার মহারাজকে হত্যা করেছে।

বাসবী। সর্বনাশ। এ কখনো সত্য হতেই পারে না।

মল্লিকা। কিন্তু এটা সত্য যে, মহারাজকে যেন আগুনের জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। তিনি কোন্ একটা অনুশোচনায় ছটফট করে বেড়াচ্ছেন।

বাসবী। হায়, হায়, এ কী সংবাদ।

রত্নাবলী। লোকেশ্বরী মহারানী কি শুনেছেন?

মল্লিকা। অপ্রিয় সংবাদ তাঁকে যে শোনাবে তাকে তিনি দুখানা করে ফেলবেন। কেউ সাহস পাচ্ছে না।

বাসবী। সর্বনাশ হল। এতবড়ো পাপের আঘাত থেকে রাজবাড়ির কেউ বাঁচবে না। ধর্মকে নিয়ে যা খুশি করতে গেলে কি সহ্য হয়?

রত্নাবলী। ওই রে! বাসবী আবার দেখছি নটীর চেলা হবার দিকে ঝুঁকছে। ভয়ের তাড়া খেলেই ধর্মের মূঢ়তার পিছনে মানুষ লুকোতে চেষ্টা করে।

বাসবী। কখনো না। আমি কিছু ভয় করিনে। ভদ্রাকে এই খবরটা দিয়ে আসিগে।

রত্নাবলী। মিথ্যা ছুতো করে পালিয়ো না। ভয় তুমি পেয়েছ। তোমাদের এই অবসাদ দেখলে আমার বড়ো লজ্জা করে। এ কেবল নীচসংসর্গের ফল।

বাসবী। অন্যায় বলছ তুমি, আমি কিছুই ভয় করিনে।

রত্নাবলী। আচ্ছা তাহলে অশোকবনে নাচ দেখতে চলো।

বাসবী। কেন যাব না। তুমি ভাবছ আমাকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছ?

রত্নাবলী। আর দেরি নয়, মল্লিকা, শ্রীমতীকে এখনই ডাকো, সাজ হ'ক বা না হ'ক। রাজকন্যারা যদি না আসতে চায় রাজকিংকরীদের সবাইকে চাই। নইলে কৌতুক অসম্পূর্ণ থাকবে।

বাসবী। ওই যে শ্রীমতী আসছে। দেখো, দেখো, যেন চলছে স্বপ্নে। যেন মধ্যাহ্নের দীপ্ত মরীচিকা, ওর মধ্যে ও যেন একটুও নেই।

ধীরে ধীরে শ্রীমতীর প্রবেশ ও গান

হে মহাজীবন, হে মহামরণ,
লইনু শরণ, লইনু শরণ।
আঁধার প্রদীপে জ্বালাও শিখা,
পরাও, পরাও জ্যোতির টিকা,
করো হে আমার লজ্জা হরণ।

রত্নাবলী। এইদিকে পথ। আমাদের কথা কি কানে পৌঁছচ্ছে না? এই যে এইদিকে।

শ্রীমতী। পরশরতন তোমারি চরণ,
লইনু শরণ লইনু শরণ,
যা-কিছু মলিন, যা কিছু কালো
যা-কিছু বিরূপ হোক তা ভালো,
ঘুচাও ঘুচাও সব আবরণ।

রত্নাবলী। বাসবী, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? চলো।

বাসবী। না, আমি যাব না।

রত্নাবলী। কেন যাবে না?

বাসবী। তবে সত্য কথা বলি। আমি পারব না।

রত্নাবলী। ভয় করছে?

বাসবী। হাঁ ভয় করছে।

রত্নাবলী। ভয় করতে লজ্জা করছে না?

বাসবী। একটুমাত্রও না। শ্রীমতী, সেই ক্ষমার মন্ত্রটা।

শ্রীমতী। উত্তমঙ্গেন বন্দেহং পাদপংসু-বরুত্তমং
বুদ্ধে যো খলিতো দোসো বুদ্ধো খমতু তং মম।

বাসবী। বুদ্ধো খমতু তং মম, বুদ্ধো খমতু তং মম,
বুদ্ধো খমতু তং মম।

শ্রীমতীর গান

হার মানালে, ভাঙিলে অভিমান।
ক্ষীণ হাতে জ্বালা
ম্লান দীপের থালা
হল খান খান।
এবার তবে জ্বালো
আপন তারার আলো,
রঙিন ছায়ার এই গোধূলি হ'ক অবসান।
এস পারের সাথি।
বইল পথের হাওয়া, নিবল ঘরের বাতি।
আজি বিজন বাটে,
অন্ধকারের ঘাটে
সব হারানো নাটে
এনেছি এই গান।

[সকলের প্রস্থান

ভিক্ষুদের প্রবেশ ও গান

সকল কলুষ তামস হর,
জয় হ'ক তব জয়,
অমৃতবারি সিঞ্চন কর
নিখিল ভুবনময়।
মহাশান্তি মহাক্ষেম
মহাপুণ্য মহাপ্রেম।
জ্ঞানসূর্য-উদয়ভাতি
ধ্বংস করুক তিমির-রাতি।

দুঃসহ দুঃস্বপ্ন ঘাতি'
অপগত কর ভয়।
মহাশান্তি মহাক্ষেম
মহাপুণ্য মহাপ্রেম ॥
মোহমলিন অতিদুর্দিন
শঙ্কিত চিত পান্থ,
জটিল-গহন পথসংকট
সংশয় উদ্‌ভ্রান্ত।
করুণাময় মাগি শরণ
দুর্গতিভয় করহ হরণ,
দাও দুঃখবন্ধতরণ
মুক্তির পরিচয়।
মহাশান্তি মহাক্ষেম
মহাপুণ্য মহাপ্রেম।

চতুর্থ অঙ্ক

অশোকতল। ভাঙা স্তূপ। ভগ্নপ্রায় আসনবেদি

রত্নাবলী। রাজকিংকরীগণ। একদল রক্ষিণী

প্রথম কিংকরী। রাজকুমারী, আমাদের প্রাসাদের কাজে বিলম্ব হচ্ছে।

রত্নাবলী। আর একটু অপেক্ষা করো। মহারানী লোকেশ্বরী স্বয়ং এসে দেখতে চান। তিনি না এলে নাচ আরম্ভ হতে পারে না।

দ্বিতীয় কিংকরী। আপনার আদেশে এসেছি। কিন্তু অধর্মের ভয়ে মন ব্যাকুল।

তৃতীয় কিংকরী। এইখানেই প্রভুকে পূজা দিয়েছি, আজ এখানেই নটীর নাচ দেখা। ছি ছি, কেমন করে এ পাপের ক্ষালন হবে?

চতুর্থ কিংকরী। এতবড়ো বীভৎস ব্যাপার এখানে হবে জানতেম না। থাকতে পারব না আমরা, কিছুতে না।

রত্নাবলী। মন্দভাগিনী তোরা শুনিসনি, বুদ্ধের পূজা এ-রাজ্যে নিষিদ্ধ হয়েছে।

চতুর্থ কিংকরী। রাজাকে অমান্ত করা আমাদের সাধ্য নেই। ভগবানের পূজা নাই করলেম কিন্তু তাই বলে তাঁর অপমান করতে পারিনে।

প্রথম কিংকরী। রাজবাড়ির নটীর নাচ রাজকন্তা রাজবধূদেরই জন্তে। এ সভায় আমাদের কেন? চলো তোমরা, আমাদের যেখানে স্থান সেখানে যাই।

রত্নাবলী। (রক্ষিণীদের প্রতি) যেতে দিয়ো না ওদের। এইবার শীঘ্র নটীকে ডেকে নিয়ে এস।

প্রথম কিংকরী। রাজকুমারী, এ পাপ নটীকে স্পর্শ করবে না। এ পাপ তোমারই।

রত্নাবলী। তোরা ভাবিস তোদের নতুন ধর্মের নতুন-গড়া পাপকে আমি গ্রাহ্য করি।

দ্বিতীয় কিংকরী। মানুষের ভক্তিকে অপমান করা এ তো চিরকালের পাপ।

রত্নাবলী। এই নটীসাধ্বীর হাওয়া তোমাদের সবাইকে লাগল দেখছি। আমাকে পাপের ভয় দেখিয়ো না, আমি শিশু নই।

রক্ষিণী। (প্রথম কিংকরীর প্রতি) বসুমতী, আমরা শ্রীমতীকে ভক্তি করেছি কিন্তু ভুল করেছি তো। সে তো নাচতে রাজি হল।

রত্নাবলী। রাজি হবে না? রাজার আদেশকে ভয় করবে না?

রক্ষিণী। ভয় তো আমরাই করি, কিন্তু—

রত্নাবলী। নটীর পদ কি তোমাদেরও উপরে?

প্রথম কিংকরী। আমরা তো ওকে নটী বলে আর ভাবতুম না। আমরা ওর মধ্যে স্বর্গের আলো দেখেছি।

রত্নাবলী। নটী স্বর্গে গিয়েও নাচে তা জানিসনে!

রক্ষিণী। শ্রীমতীকে পাছে রাজার আদেশে আঘাত করতে হয় এই ভয় ছিল কিন্তু আজ মনে হচ্ছে রাজার আদেশের অপেক্ষা করবার দরকার নেই।

প্রথম কিংকরী। ও পাপীয়সীদের কথা থাক্। কিন্তু এই পাপদৃশ্যে দুই চোখকে কলঙ্কিত করলে আমাদের গতি হবে কী?

রত্নাবলী। এখনো নটীর সাজ শেষ হল না। দেখছ তো তোমাদের নটীসাধ্বীর সাজের আনন্দ কত।

প্রথম কিংকরী। ওই যে এল! ইস, দেখেছিস ঝলমল করছে।

দ্বিতীয় কিংকরী। পাপদেহে এক-শ বাতির আলো জালিয়েছে।

শ্রীমতীর প্রবেশ

প্রথম কিংকরী। পাপিষ্ঠা, শ্রীমতী। ভগবানের আসনের সম্মুখে, নির্লজ্জ, তুই আজ নাচবি! তোর দুখানা পা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল না এখনো?

শ্রীমতী। উপায় নেই, আদেশ আছে।

দ্বিতীয় কিংকরী। নরকে গিয়ে শতলক্ষ বৎসর ধরে জলন্ত অঙ্গারের উপরে তোকে দিনরাত নাচতে হবে এ আমি বলে দিলেম।

তৃতীয় কিংকরী। দেখো একবার। পাতকিনী আপাদমস্তক অলংকার পরেছে। প্রত্যেক অলংকারটি আগুনের বেড়ি হয়ে তোর হাড়ে মাংসে জড়িয়ে থাকবে, তোর নাড়ীতে নাড়ীতে জ্বালার স্রোত বইয়ে দেবে তা জানিস?

মল্লিকার প্রবেশ

মল্লিকা। (জনান্তিকে, রত্নাবলীকে) রাজ্যে বুদ্ধপূজার যে-নিষেধ প্রচার হয়েছিল সে আবার ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। পথে পথে দুন্দুভি বাজিয়ে তাই ঘোষণা চলছে। হয়তো এখনই এখানেও আসবে তাই-সংবাদ দিয়ে গেলেম। আরও একটি সংবাদ আছে। আজ মহারাজ অজাতশত্রু স্বয়ং এখানে এসে পূজা করবেন তার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন।

রত্নাবলী। একবার দৌড়ে যাও তাহলে মল্লিকা—শীঘ্র মহারানী লোকেশ্বরীকে ডেকে নিয়ে এস।

মল্লিকা। ওই যে তিনি আসছেন।

লোকেশ্বরীর প্রবেশ

রত্নাবলী। মহারানী, এই আপনার আসন।

লোকেশ্বরী। থামো। শ্রীমতীর সঙ্গে নিভৃতে আমার কথা আছে। (শ্রীমতাকে জনান্তিকে ডাকিয়া লইয়া) শ্রীমতী।

শ্রীমতী। কী মহারানী।

লোকেশ্বরী। এই লও, তোমার জন্যে এনেছি।

শ্রীমতী। কী এনেছেন?

লোকেশ্বরী। অমৃত।

শ্রীমতী। বুঝতে পারছিনে।

লোকেশ্বরী। বিষ। খেয়ে মরো, পরিত্রাণ পাবে।

শ্রীমতী। পরিত্রাণের আর উপায় নেই ভাবছেন?

লোকেশ্বরী। না। রত্নাবলী আগেই গিয়ে রাজার কাছ থেকে তোমার জন্তে নাচার আদেশ আনিয়েছে। সে আদেশ কিছুতেই ফিরবে না জানি।

রত্নাবলী। মহারানী, আর সময় নেই, নৃত্য আরম্ভ হ'ক।

লোকেশ্বরী। এই নে, শীঘ্র খেয়ে ফেল। এখানে মলে স্বর্গ পাবি, এখানে নাচলে যাবি অবীচি নরকে।

শ্রীমতী। সর্বাগ্রে আদেশ পালন করে নিই।

লোকেশ্বরী। নাচবি ?

শ্রীমতী। হাঁ নাচব।

লোকেশ্বরী। ভয় নেই তোর ?

শ্রীমতী। না, কিছু না।

লোকেশ্বরী। তবে তোমাকে কেউ উদ্ধার করতে পারবে না।

শ্রীমতী। যিনি উদ্ধারকর্তা তিনি ছাড়া।

রত্নাবলী। মহারানী, আর একমুহূর্ত দেরি চলবে না। বাইরে গোলমাল শুনছ না ? হয়তো বিদ্রোহীরা এখনই রাজোদ্যানে ঢুকে পড়বে। নটী, নাচ শুরু হ'ক।

শ্রীমতীর গান ও নাচ

আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো, নমো হে নমঃ
তোমায় স্মরি, হে নিরুপম,
নৃত্যরসে চিত্ত মম
উছল হয়ে বাজে।
আমার সকল দেহের আকুল রবে
মন্ত্রহারা তোমার স্তবে
ডাহিনে বামে ছন্দ নামে
নব জনমের মাঝে।
তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ
সংগীতে বিরাজে।

রত্নাবলী। এ কী রকম নাচ ? এ তো নাচের ভান। আর এই গানের অর্থ কী ?

লোকেশ্বরী। না না বাধা দিয়ো না।

শ্রীমতীর গান ও নাচ

এ কী পরম ব্যথায় পরান কাঁপায়
কাঁপন বক্ষে লাগে

শান্তিসাগরে ঢেউ খেলে যায়
সুন্দর তায় জাগে।
আমার সব চেতনা সব বেদনা
রচিল এ যে কী আরাধনা,
তোমার পায়ে মোর সাধনা
মরে না যেন লাজে।
তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ
সংগীতে বিরাজে।

রত্নাবলী। এ কী হচ্ছে? গয়নাগুলো একে একে তালে তালে ওই স্তূপের আবর্জনার মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। ওই গেল কঙ্কণ, ওই গেল কেয়ুর, ওই গেল হার। মহারানী, দেখছেন এ সমস্ত রাজবাড়ির অলংকার—এ কী অপমান! শ্রীমতী, এ আমার নিজের গায়ের অলংকার। কুড়িয়ে নিয়ে এসে মাথায় ঠেকাও, যাও এখনই।

লোকেশ্বরী। শান্ত হও, শান্ত হও। ওর দোষ নেই, এমনি করে আভরণ ফেলে দেওয়া, এই নাচের এই তো অঙ্গ। আনন্দে আমারও শরীর দুলে উঠছে। (গলা হইতে হার খুলিয়া ফেলিয়া) শ্রীমতী, থেমো না, থেমো না।

শ্রীমতীর গান ও নাচ

আমি কানন হতে তুলিনি ফুল,
মেলেনি মোরে ফল।
কলস মম শূন্যসম
ভরিনি তীর্থজল।
আমার তনু তনুতে বাঁধনহারা
হৃদয় ঢালে অধরা-ধারা,
তোমার চরণে হ'ক তা সারা
পূজার পুণ্য কাজে।
তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ
সংগীতে বিরাজে।

রত্নাবলী। এ কী রকম নাচের বিড়ম্বনা। নটীর বেশ একে একে ফেলে দিলে। দেখছ তো মহারানী, ভিতরে ভিক্ষুণীর পীতবস্ত্র। একেই কি পূজা বলে না? রঙ্গিণী, তোমরা দেখছ। মহারাজ কী দণ্ড বিধান করেছেন মনে নেই?

রক্ষিণী। শ্রীমতী তো পূজার মন্ত্র পড়েনি।

শ্রীমতী। (জানু পাতিয়া) বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি—

রক্ষিণী। (শ্রীমতীর মুখে হাত দিয়া) থাম্ থাম্ দুঃসাহসিকা, এখনো থাম্।

রত্নাবলী। রাজার আদেশ পালন করো।

শ্রীমতী। বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি

ধম্মং সরণং গচ্ছামি—

কিংকরীগণ। সর্বনাশ করিসনে শ্রীমতী, থাম্ থাম্।

রক্ষিণী। যাসনে মরণের মুখে উন্মত্তা।

দ্বিতীয় রক্ষিণী। আমি করজোড়ে মিনতি করছি আমাদের উপর দয়া করে ক্ষান্ত হ।

কিংকরীগণ। চক্ষে দেখতে পারব না, দেখতে পারব না, পালাই আমরা। [পলায়ন

রত্নাবলী। রাজার আদেশ পালন করো।

শ্রীমতী। বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি

ধম্মং সরণং গচ্ছামি

সংঘং সরণং গচ্ছামি।

লোকেশ্বরী। (জানু পাতিয়া সঙ্গে সঙ্গে)

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি

ধম্মং সরণং গচ্ছামি

সংঘং সরণং গচ্ছামি।

রক্ষিণী শ্রীমতীকে অস্ত্রাঘাত করিতেই সে আসনের উপর পড়িয়া গেল। 'ক্ষমা করো ক্ষমা করো', বলিতে বলিতে রক্ষিণীরা একে একে শ্রীমতীর পায়ের ধুলা লইল।

লোকেশ্বরী। (শ্রীমতীর মাথা কোলে লইয়া) নটী, তোর এই ভিক্ষুণীর বস্ত্র আমাকে দিয়ে গেলি। (বসনের একপ্রান্ত মাথায় ঠেকাইয়া) এ আমার।

[রত্নাবলী ধূলিতে বসিয়া পড়িল

মল্লিকা। কী ভাবছ?

রত্নাবলী। (বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আচ্ছন্ন করিয়া) এইবার আমার ভয় হচ্ছে।

প্রতিহারিণীর প্রবেশ

প্রতিহারিণী। মহারাজ অজাতশত্রু ভগবানের পূজা নিয়ে কাননদ্বারে অপেক্ষা করছেন দেবীদের সম্মতি চান।

মল্লিকা। চলো, আমি মহারাজকে দেবীদের সম্মতি জানিয়ে আসিগে। [প্রস্থান

লোকেশ্বরী। বলো তোমরা সবাই,

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।

রত্নাবলী ব্যতীত সকলে। বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।

লোকেশ্বরী। ধম্মং সরণং গচ্ছামি।

রত্নাবলী ব্যতীত সকলে। ধম্মং সরণং গচ্ছামি।

লোকেশ্বরী। সংঘং সরণং গচ্ছামি।

রত্নাবলী ব্যতীত সকলে। সংঘং সরণং গচ্ছামি।

নত্থি মে সরণং অঞ্ঞং বুদ্ধো মে সরণং বরং

এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জয়মঙ্গলং।

মল্লিকার প্রবেশ

মল্লিকা। মহারাজ এলেন না, ফিরে গেলেন।

লোকেশ্বরী। কেন?

মল্লিকা। সংবাদ শুনে তিনি ভয়ে কম্পিত হয়ে উঠলেন।

লোকেশ্বরী। কাকে তাঁর ভয়?

মল্লিকা। ওই হতপ্রাণ নটীকে।

লোকেশ্বরী। চলো পালঙ্ক নিয়ে আসি। এর দেহকে সকলে বহন করে নিয়ে যেতে হবে। [রত্নাবলী ছাড়া সকলের প্রস্থান

রত্নাবলী। (শ্রীমতীর পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম। জানু পাতিয়া বসিয়া)

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি

ধম্মং সরণং গচ্ছামি

সংঘং সরণং গচ্ছামি

নটরাজ

ঋতুরঙ্গশালা

নৃত্য গীত ও আবৃত্তি যোগে "নটরাজ" দোলপূর্ণিমার রাত্রে শান্তিনিকেতনে অভিনীত হইয়াছিল।

নটরাজের তাণ্ডবে তাঁহার এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্ত্তিত হইয়া প্রকাশ পায়, তাঁহার অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হইতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়। "নটরাজ" পালাগানের এই মর্ম্ম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নটরাজ

মুক্তিতত্ত্ব

মুক্তিতত্ত্ব শুনতে ফিরিস
তত্ত্বশিরোমণির পিছে ?
হায় রে মিছে, হায় রে মিছে

মুক্ত যিনি দেখ্‌-না তাঁরে,
আয় চলে তাঁর আপন দ্বারে,
তাঁর বাণী কি শুকনো পাতায়
হলদে রঙে লেখেন তিনি।

মরা ডালের ঝরা ফুলের
সাধন কি তাঁর মুক্তি-কূলের।
মুক্তি কি পণ্ডিতের হাটে
উক্তিরাশির বিকিকিনি।

এই নেমেছে চাঁদের হাসি
এইখানে আয় মিলবি আসি,
বীণার তারে তারণ-মন্ত্র
শিখে নে তোর কবির কাছে।

আমি নটরাজের চেলা,
চিত্তাকাশে দেখছি খেলা,
বাঁধন খোলার শিখছি সাধন
মহাকালের বিপুল নাচে।

দেখছি, ও যার অসীম বিত্ত
সুন্দর তার ত্যাগের নৃত্য,
আপনাকে তার হারিয়ে প্রকাশ
আপনাতে যার আপনি আছে।

যে-নটরাজ নাচের খেলায়
ভিতরকে তার বাইরে ফেলায়,
কবির বাণী অবাক মানি'
তারি নাচের প্রসাদ যাচে।

শুনবি রে আয়, কবির কাছে
তরুর মুক্তি ফুলের নাচে,
নদীর মুক্তি আত্মহারা
নৃত্যধারার তালে তালে।

রবির মুক্তি দেখ্ না চেয়ে
আলোক-জাগার নাচন গেয়ে,
তারার নৃত্যে শূন্য গগন
মুক্তি যে পায় কালে কালে।

প্রাণের মুক্তি মৃত্যুরথে
নূতন প্রাণের যাত্রাপথে,
জ্ঞানের মুক্তি সত্য-সুতার
নিত্য-বোনা চিন্তাজালে।

আয় তবে আয় কবির সাথে
মুক্তি-দোলের শুক্লরাতে,
জ্বলল আলো, বাজল মৃদঙ্
নটরাজের নাট্যশালে।

উদ্বোধন

মন্দিরার মন্ত্র তব বক্ষে আজি বাজে, নটরাজ,
নৃত্যমদে মত্ত করে, ভাঙে চিন্তা, ভাঙে শঙ্কা লাজ,
তুচ্ছ করে সম্মানের অভিমান, চিত্ত টেনে আনে
বিশ্বের প্রাঙ্গণতলে তব নৃত্যচ্ছন্দের সন্ধানে।
মুক্তির প্রয়াসী আমি, শাস্ত্রের জটিল তর্কজালে
যৌবন হয়েছে বন্দী বাক্যের দুর্গের অন্তরালে;
স্বচ্ছ আলোকের পথ রুদ্ধ করি ক্ষুব্ধ শুষ্ক ধূলি
আবর্তিয়া উঠে প্রাণে অন্ধতার জয়ধ্বজা তুলি
চতুর্দিকে। নটরাজ, তুমি আজ করো গো উদ্ধার
দুঃসাহসী যৌবনেরে, পদে পদে পড়ুক তোমার
চঞ্চল চরণভঙ্গি, রঙ্গেশ্বর, সকল বন্ধনে
উত্তাল নৃত্যের বেগে,—যে নৃত্যের অশান্ত স্পন্দনে
ধূলিবন্দিশালা হতে মুক্তি পায় নবশষ্পদল;
পুলকে কম্পিত হয় প্রাণের দুরন্ত কৌতূহল,
আপনারে সন্ধানিতে ছুটে যায় দূর কালপানে,
দুর্গম দেশের পথে, জন্মমরণের তালে তানে,
সৃষ্টির রহস্যদ্বারে নৃত্যের আঘাত নিত্য হানে,
যে-নৃত্যের আন্দোলনে মরুর পঞ্জরে কম্প আনে,
ক্ষুব্ধ হয় শুষ্কতার সজ্জাহীন লজ্জাহীন সাদা,
উচ্ছিন্ন করিতে চায় জড়ত্বের রুদ্ধবাক্ বাধা,
বন্ধ্যাতার অন্ধ দুঃশাসন; শ্যামলের সাধনাতে
দীক্ষা ভিক্ষা করে মরু তব পায়ে; যে নৃত্য আঘাতে
বহ্নিবাষ্প-সরোবরে ঊর্মি জাগে প্রচণ্ড চঞ্চল,
অতল আবর্তবক্ষে গ্রহনক্ষত্রের শতদল
প্রস্ফুটিয়া ফুরে নিত্যকাল; ধূমকেতু অকস্মাৎ
উড়ায় উত্তরী হাস্যবেগে, করে ক্ষিপ্র পদপাত

তোমার ডম্বরুতালে, পূজা-নৃত্য করি দেয় সারা
সূর্যের মন্দির-সিংহদ্বারে, চলে যায় লক্ষ্যহারা
গৃহশূন্য পান্থ উদাসীন।
নটরাজ, আমি তব
কবি-শিষ্য, নাটের অঙ্গনে তব মুক্তিমন্ত্র লব।
তোমার তাণ্ডবতালে কর্মের বন্ধনগ্রন্থিগুলি
ছন্দবেগে স্পন্দমান পাকে পাকে সদ্য যাবে খুলি;
সর্ব অমঙ্গল-সর্প হীনদর্প অবনম্র ফণা
আন্দোলিবে শান্ত লয়ে।
প্রভু, এই আমার বন্দনা
নৃত্যগানে অর্পিব চরণতলে, তুমি মোর গুরু,
আজিকে আনন্দে ভয়ে বক্ষ মোর করে দুরু দুরু।
পূর্ণচন্দ্রে লিপি তব, হে পূর্ণ, পাঠালে নিমন্ত্রণে
বসন্তদোলের নৃত্যে, দক্ষিণবায়ুর আলিঙ্গন,
মল্লিকার গন্ধোল্লাসে, কিংশুকের দীপ্ত রক্তাংশুকে,
বকুলের মত্ততায়, অশোকের দোদুল কৌতুকে,
বেণুবনবীথিকার নিরন্তর মর্মরে কম্পনে
ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে, আম্রমঞ্জরীর সর্বত্যাগপণে,
পলাশের গরিমায়। অবসাদে যেন অন্যমনে
তাল ভঙ্গ নাহি করি, তব নামে আমার আহ্বান
জড়ের স্তব্ধতা ভেদি উৎসারিত করে দিক গান।
আমার আহ্বান যেন অভ্রভেদী তব জটা হতে
উত্তারি আনিতে পারে নির্ঝরিত রসসুধাস্রোতে
ধরিত্রীর তপ্ত বক্ষে নৃত্যচ্ছন্দ মন্দাকিনীধারা,
ভস্ম যেন অগ্নি হয়, প্রাণ যেন পায় প্রাণহারা।

নৃত্য

গান

নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ,
ঘুচাও সকল বন্ধ হে।
সুপ্তি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও
মুক্ত সুরের ছন্দ হে।
তোমার-চরণ-পবন-পরশে
সরস্বতীর মানস সরসে
যুগে যুগে কালে কালে,
সুরে সুরে তালে তালে,
ঢেউ তুলে দাও মাতিয়ে জাগাও
অমল কমল গন্ধ হে।
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত
ভরুক চিত্ত মম।
নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ,
নৃত্যে তোমার মায়া।
বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে
কাঁপে নৃত্যের ছায়া।
তোমার বিশ্ব-নাচের দোলায়
বাঁধন পরায়, বাঁধন খোলায়,
যুগে যুগে কালে কালে,
সুরে সুরে তালে তালে ;
অন্ত কে তার সন্ধান পায়
ভাবিতে লাগায় ধন্দ হে।
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত
ভরুক চিত্ত মম।

নৃত্যের বশে সুন্দর হল
বিদ্রোহী পরমাণু ;
পদযুগ ঘিরে জ্যোতি-মঞ্জীরে
বাজিল চন্দ্রভানু ।
তব নৃত্যের প্রাণবেদনায়
বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায়,
যুগে যুগে কালে কালে
সুরে সুরে তালে তালে,
সুখে দুখে হয় তরঙ্গময়
তোমার পরমানন্দ হে ।
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত
ভরুক চিত্ত মম ।

মোর সংসারে তাণ্ডব তব,
কম্পিত জটাজালে ।
লোকে লোকে ঘুরে এসেছি তোমার
নাচের ঘূর্ণিতালে ।
ওগো সন্ন্যাসী, ওগো সুন্দর,
ওগো শংকর, হে ভয়ংকর,
যুগে যুগে কালে কালে
সুরে সুরে তালে তালে,
জীবন-মরণ নাচের ডমরু
বাজাও জলদমন্দ্র হে ।
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত
ভরুক চিত্ত মম ।

ঋতুনৃত্য

বৈশাখ

ধ্যান-নিমগ্ন নীরব নগ্ন
নিশ্চল তব চিত্ত ;
নিঃস্ব গগনে বিশ্ব ভুবনে
নিঃশেষ সব বিত্ত।
রসহীন তরু, নির্জীব মরু,
পবনে গর্জে রুদ্র ডমরু,
ঐ চারিধার করে হাহাকার
ধরাভাণ্ডার রিক্ত।
তব তপ-তাপে হেরো সবে কাঁপে,
দেবলোক হল ক্লান্ত।
ইন্দ্রের মেঘ, নাহি তার বেগ,
বরুণ করুণ শান্ত।
দুর্দিনে আনে নির্দয় বায়ু,
সংহার করে কাননের আয়ু,
ভয় হয় দেখি, নিখিল হবে কি
জড়দানবের ভৃত্য।
জাগো ফুলে ফলে নব তৃণদলে
তাপস, লোচন মেলো হে।
জাগো মানবের আশায় ভাষায়,
নাচের চরণ ফেলো হে।
জাগো ধনে ধানে, জাগো গানে গানে,
জাগো সংগ্রামে, জাগো সন্ধানে,
আশাসহারা উদাস পরানে
জাগাও উদার নৃত্য।
ভুলেছে ছন্দ, ভালোয় মন্দ
একাকার তাই হায় রে।

কদর্য তাই করিছে বড়াই,
ধরণী লজ্জা পায় রে।
পিনাকে তোমার দাও টংকার,
ভীষণে মধুরে দিক ঝংকার,
ধুলায় মিশাক যা কিছু ধুলার,
জয়ী হ'ক যাহা নিত্য।

বৈশাখ-আবাহন

গান

এস, এস, এস, হে বৈশাখ।
তাপস নিশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক।
যাক পুরাতন স্মৃতি যাক ভুলে যাওয়া গীতি,
অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক।
মুছে যাক সব গ্লানি, ঘুচে যাক জরা,
অগ্নিস্নানে দেহে প্রাণে শুচি হ'ক ধরা।
রসের আবেশরাশি শুষ্ক করি দাও আসি,
আনো, আনো, আনো তব প্রলয়ের শাঁখ,
মায়ার কুজ্ঝটি-জাল যাক দূরে যাক।

বৈশাখের প্রবেশ

গান

নমো, নমো, হে বৈরাগী।
তপোবহ্নির শিখা জ্বালো জ্বালো,
নির্বাণহীন নির্মল আলো
অন্তরে থাক্ জাগি।
নমো নমো হে বৈরাগী।

সম্বোধন

ধূসরবসন, হে বৈশাখ,
রক্তলোচন, হে নির্বাক,
শুষ্কপথের দানব দস্যু,
শুষে নিতে চাও হাসি ও অশ্রু,
ইঙ্গিতে দাও দারুণ ডাক।
স্তম্ভিত হল সে ডাকে পৃথ্বী,
ভাণ্ডারে তার কাঁপিল ভিত্তি,
শঙ্কায় তার শুকায় তালু,
অট্ট হাসিল মরুর বালু।
হুংকার সেই তপ্ত হাওয়ায়
প্রান্তর হতে প্রান্তরে ধায়,
দিগ্বধূদের নীরবে কাঁদায়,
শূন্যে শূন্যে উড়ায় ধূলি,
বিজয়পতাকা আকাশে তুলি।
দুহিয়া লয়েছ গগন-ধেনুরে,
ঝরায়ে দিয়েছ শিরীষরেণুরে
উদাস করেছ রাখাল-বেণুরে
তৃষ্ণাকরুণ সারঙ্-তানে।
শীর্ণ নদীর গেল সঞ্চয়,
ঝিরিঝিরি জল ধীরি ধীরি বয়,
আকুলিয়া উঠে কাননের ভয়
ভীরু কপোতের কাকলি গানে।
ধূসরবসন, হে বৈশাখ,
রক্তলোচন হে নির্বাক,
শুষ্ক পথের দানব দস্যু,
শুষে নিতে চাও হাসি ও অশ্রু,
ইঙ্গিতে দাও দারুণ ডাক।

গান

হৃদয় আমার, ঐ বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় আসে,
বেড়া ভাঙার মাতন নামে উদ্দাম উল্লাসে।
মোহন এল ভীষণ বেশে
আকাশ ঢাকা জটিল কেশে,
এল তোমার সাধন-ধন চরম সর্বনাশে।
বাতাসে তোর সুর ছিল না, ছিল তাপে ভরা।
পিপাসাতে বুক-ফাটা তোর শুষ্ক কঠিন ধরা।
জাগ্ রে হতাশ, আয় রে ছুটে
অবসাদের বাঁধন টুটে,
এল তোমার পথের সাথি বিপুল অট্টহাসে।

কালবৈশাখী

ডাকো বৈশাখ, কালবৈশাখী,
করো তারে লীলাসঙ্গিনী,-
কেন সন্ন্যাসী রয়েছ একাকী
আসুক প্রলয়-রঙ্গিণী।
হৃত-নিঃশ্বাস অম্বর তলে
রুদ্ধ বাতাস তাপ-শৃঙ্খলে,
ঘন ঝঞ্ঝার দিক্ ঝংকার
অন্তর তব চঞ্চলি,
মথি আসুক মর্ত্যস্বর্গ
তোমার অর্ঘ্য-অঞ্জলি

বাজায় ডমরু তব তাণ্ডবে
গুরু গুরু মেঘ-মন্দ্রিয়া,—
দিগ্বধূ যত হাহাকার রবে
দুর্দাম উঠে ক্রন্দিয়া।

গৈরিক তব জয় পতাকায়
সন্ধ্যা-রবির রং সে মাথায়,
কুঞ্জে বাজায় শাখায় শাখায়
তাল-তমালের খঞ্জনি।
সপ্ততারার লুপ্তির 'পরে
নাচে সে সুপ্তি-ভঞ্জনী॥
তপোভঙ্গের দিবে মন্ত্রণা
তব শান্তিরে তর্জিয়া,
তন্ত্র পরাবে রুদ্রবীণায়
রেখেছিলে যারে বর্জিয়া।
দিগন্তরের সঞ্চয় টুটি
অঞ্চলে মেঘ আনিবে সে লুটি—
বাজিয়া উঠিবে কল-কল্লোল
বন-পল্লবে পল্লবে,—
শ্যাম উত্তরী নির্মল করি'
সাজাবে আপন বল্লভে।

মাধুরীর ধ্যান

গান

মধ্যদিনে যবে গান
বন্ধ করে পাখি,
হে রাখাল, বেণু তব
বাজাও একাকী।
শান্ত প্রান্তরের কোণে
রুদ্র বসি তাই শোনে,
মধুরের ধ্যানাবেশে
স্বপ্নমগ্ন আঁখি;
হে রাখাল, বেণু যবে
বাজাও একাকী

সহসা উচ্ছ্বসি উঠে
ভরিয়া আকাশ
তৃষাতপ্ত বিরহের
নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস।
অম্বরপ্রান্তের দূরে
ডম্বরু গম্ভীর সুরে
জাগায় বিদ্যুৎ-ছন্দে
আসন্ন বৈশাখী।
হে রাখাল, বেণু তব
বাজাও একাকী।

পরানে কার ধেয়ান আছে জাগি,
জানি হে জানি, কঠোর বৈরাগী।
সুদূর পথে চরণ দুটি বাজে
পুরব কূলে বকুলবীথিমাঝে,
লুটায়ে-পড়া অমল-নীল সাজে
নবকেতকী-কেশর আছে লাগি।
তাহারি ধ্যান পরানে তব জাগি।

রাখাল বেণু বাজায় তরুতলে
রাগিণী তার তাহারি কথা বলে।
ভূতলে খসি পড়িছে পাতাগুলি
চলিতে পাছে চরণে লাগে ধূলি,—
কৃষ্ণচূড়া রয়েছে খেলা ভুলি
পথে তাহারে ছায়া দিবারি লাগি।
তাহারি ধ্যান পরানে আছে জাগি।

কাঁকন-ধ্বনি তপোবনের পারে
চপল বায়ে আসিছে বারে বারে,
কপোত দুটি তাঁহারি সাড়া পেয়ে
চাঁপার ডালে উঠিছে গেয়ে গেয়ে,

মরমে তব মৌনী আছে চেয়ে
আপন মাঝে তাহারি বাণী মাগি।
তাহারি ধ্যান পরানে আছে জাগি।
কঠোর, তুমি মাধুরী-সাধনাতে
মগন হয়ে রয়েছ দিনে রাতে।
নীরস কাঠে আগুন তুমি জ্বালো,
আঁধার যাহা করিবে তারে আলো,
অশুচি যাহা, যা-কিছু আছে কালো
দহিবে তারে, সুদূরে যাবে ভাগি,—
মাধুরী-ধ্যান পরানে তব জাগি।

ব্যঞ্জনা

শুনিতে কি পাস
এই যে শ্বসিছে রুদ্র শূন্যে শূন্যে সন্তপ্ত নিশ্বাস
এরি মাঝে দূরে বাজে চঞ্চলের চকিত খঞ্জনি,
মাধুরীর মঞ্জীরের মৃদুমন্দ গুঞ্জরিত ধ্বনি?
রৌদ্রদগ্ধ তপস্যার মৌনস্তব্ধ অলক্ষ্য আড়ালে
স্বপ্নে-রচা অর্চনার থালে
অর্ঘ্যমাল্য সাজ হয় সংগোপনে সুন্দরের লাগি।
মগ্ন যেথা ধেয়ানের সর্বশূন্য গহনে বৈরাগী,
সেথা কে বুভুক্ষু আসে ভিক্ষা-অন্বেষণে;
জীর্ণ পর্ণশয্যা'পরে একা রহে জাগি
কঠিনের শুষ্ক প্রাণে কোমলের পদস্পর্শ মাগি
তাপিত আকাশে
হঠাৎ নীরবে চলে আসে
একটি করুণ ক্ষীণ স্নিগ্ধ বায়ুধারা,
কে অভিসারিণী যেন পথে এসে পায় না কিনারা।

অকস্মাৎ কোমলের কমলমালার স্পর্শ লেগে
শান্তের চিত্তের প্রান্ত অহেতু উদ্বেগে
ভ্রূকুটিয়া ওঠে কালো মেঘে ;
বিদ্যুৎ বিচ্ছুরি উঠে দিগন্তের ভালে,
রোমাঞ্চ-কম্পন লাগে অশ্বত্থের ত্রস্ত ডালে ডালে ;
মুহূর্তে অম্বরবক্ষে উলঙ্গিনী শ্যামা
বাজায় বৈশাখী-সন্ধ্যা ঝঞ্ঝার দামামা,
দিগ্বিদিকে নৃত্য করে দুর্বার ক্রন্দন,
ছিন্ন ছিন্ন হয়ে যায় ঔদাসীন্য কঠোর বন্ধন।

বর্ষার প্রবেশ

গান

নমো, নমো করুণাঘন নম হে।
নয়ন স্নিগ্ধ অমৃতাঞ্জন পরশে,
জীবন পূর্ণ সুধারস বরষে,
তব দর্শন-ধন-সার্থক মন হে,
অকৃপণবর্ষণ করুণাঘন হে।

প্রত্যাশা

গান

তপের তাপের বাঁধন কাটুক
রসের বর্ষণে,
হৃদয় আমার শ্যামল-বঁধুর
করুণ স্পর্শ নে॥

ঐ কি এলে আকাশ-পারে
দিক্-ললনার প্রিয়,
চিত্তে আমার লাগল তোমার
ছায়ার উত্তরীয়

অঝোর-ঝরণ শ্রাবণজলে,
তিমির-মেদুর বনাঞ্চলে
ফুটুক সোনার কদম্বফুল
নিবিড় হর্ষণে।

মেঘের মাঝে মৃদঙ্গ তোমার
বাজিয়ে দিলে কি ও
ঐ তালেতেই মাতিয়ে আমায়
নাচিয়ে দিয়ো দিয়ো।

ভরুক গগন, ভরুক কানন
ভরুক নিখিল ধরা,
দেখুক ভুবন মিলন-স্বপন
মধুর বেদন ভরা।
পরান-ভরানো ঘন ছায়াজাল
বাহির আকাশ করুক আড়াল,
নয়ন ভুলুক বিজুলি ঝলুক
পরম দর্শনে।

আষাঢ়

কোন্ বারতার করিল প্রচার
দূর আকাশের ইঙ্গিতে
ঐরাবতের বৃংহিতে।
নিষ্ঠুর তপে আছে নিমগ্ন
ধরণী তপস্বিনী,
রুক্ষ অঙ্গ পাংশু-ধূসর,
ধ্যান-অঙ্গন শুষ্ক উষর,
নাহি সখী সঙ্গিনী :—
বুঝি আসন্ন হল তার বর,
শুনি গর্জন রথ-ঘর্ঘর,
বুঝি আসে কাঙ্ক্ষিত,

তাই চিত্ত যে হল চঞ্চল,
আঁখিপল্লব বাষ্পসজল,
তাই সে রোমাঞ্চিত।

ওগো বিরহিণী গেল দুর্দিন
দুঃখ ঘুচিবে নিঃশেষে,
মনোমাঝে যারে রুদ্ধ নয়নে
পূজিলে ধ্যানের পুষ্প চয়নে,
দেখা দিবে আজি বিশ্বে সে
ঐ বুঝি আসে আকাশে আকাশে
সমারোহ তার বিস্তারি,
বিজয়ী সে বীর, ওরে ভয়ভীতা
যাবে তোর ভয়, ওরে পিপাসিতা
তৃষা হতে দিবে নিস্তারি।
ললাটে নিপুণ পত্রলেখাটি
আঁকো কুঙ্কুম চন্দনে।
দুলাও চামেলি অলকে তোমার
কবরী রচিয়া এলো কেশভার
বেঁধে তোলো বেণীবন্ধনে।

উঠ ধূলি হতে ওগো দুঃখিনী
ছাড়ো গৈরিক উত্তরী।
নীলবসনের অঞ্চলখানি
কম্পিত বুকে লহ লহ টানি'
হাসিমুখে চাহো সুন্দরী।
বীর-মঙ্গল ঘোষুক মন্ত্র
মুখে তুলে তোর শঙ্খ নে।
কৌতুকসুখ চক্ষে ফুটুক,
বিদ্যুৎ-শিখা কম্পি উঠুক
তব চঞ্চল কঙ্কণে।

কুঞ্জকানন জাগ্রত হ'ক
আজি বন্দনা সংগীতে—
শিহর লাগুক শাখায় শাখায়,
মাতন লাগুক শিখীর পাখায়
তব নৃত্যের ভঙ্গিতে।
শ্যাম বন্ধুরে শ্যামল তৃণের
আসনে বসাবি অঙ্গনে।
রাখিবি দুয়ারে আল্‌পনা আঁকি',
চরণের তলে ধুলা দিবি ঢাকি,
টগর করবী রঙ্গনে।
গাও জয় জয়, গাও জয়গান
ঢেউ তোলো স্বরসপ্তকে,
বনপথে আসে মনোরঞ্জন,
নয়নে পরাবে প্রেম অঞ্জন,
সুধা দিবে চিরতপ্তকে।

লীলা

গান

গগনে গগনে আপনার মনে
কী খেলা তব।
তুমি কত বেশে নিমেষে নিমেষে
নিতুই নব।
জটার গভীরে লুকালে রবিরে
ছায়াপটে আঁক এ কোন্ ছবি রে।
মেঘমল্লারে কী বল আমারে
কেমনে কব।
বৈশাখী ঝড়ে সেদিনের সেই
অট্টহাসি

গুরু গুরু সুরে কোন্ দূরে দূরে
যায় যে ভাসি।
সে সোনার আলো শ্যামলে মিশাল,
শ্বেত উত্তরী আজ কেন কালো ?
লুকালে ছায়ায় মেঘের মায়ায়
কী বৈভব।

বর্ষা-মঙ্গল

ওগো সন্ন্যাসী, কী গান ঘনাল মনে।
গুরু গুরু গুরু নাচের ডমরু
বাজিল ক্ষণে ক্ষণে।
তোমার ললাটে জটিল জটার ভার
নেমে নেমে আজি পড়িছে বারম্বার,
বাদল আঁধার মাতাল তোমার হিয়া,
বাঁকা বিদ্যুৎ চোখে উঠে চমকিয়া।
চিরজনমের শ্যামলী তোমার প্রিয়া
আজি এ বিরহ-দীপন-দীপিকা
পাঠাল তোমারে এ কোন্ লিপিকা,
লিখিল নিখিল-আঁখির কাজল দিয়া,
চিরজনমের শ্যামলী তোমার প্রিয়া।

মনে পড়িল কি ঘন কালো এলোচুলে
অগুরু ধূপের গন্ধ ?
শিখি-পুচ্ছের পাখা সাথে দুলে দুলে
কাঁকন-দোলন ছন্দ ?
মনে পড়িল কি নীল নদীজলে,
ঘন শ্রাবণের ছায়া ছল ছলে
মিলি মিলি সেই জল-কলকলে
কলালাপ মৃদুমন্দ ;

স্খলিত-পায়ের চলা দ্বিধাহত,
ভীরু নয়নের পল্লব নত,
না-বলা কথার আভাসের মতো
নীলাম্বরের প্রান্ত ?
মনে পড়িছে কি কাঁখে তুলে ঝারি
তরু তলে তলে ঢেলে চলে বারি,
সেচন-শিথিল বাহু দুটি তারি
ব্যথায় আলসে ক্লান্ত ?

ওগো সন্ন্যাসী, পথ যায় ভাসি'
ঝর ঝর ধারাজলে —
তমালবনের শ্যামল তিমির তলে।
দ্যুলোক ভূলোকে দূরে দূরে বলাবলি
চিরবিরহের কথা,
বিরহিণী তার নত আঁখি ছলছলি'
নীপ-অঞ্জলি রচে বসি' গৃহকোণে,
ঢেলে ঢেলে দেয় তোমারে স্মরিয়া মনে,
ঢেলে দেয় ব্যাকুলতা।

কভু বাতায়নে অকারণে বেলা বাহি'
আতুর নয়নে দু-হাতে আঁচল ঝাঁপে।
তুমি চিত্তের অন্তরে অবগাহি'
খুঁজিয়া দেখিছ ধৈরজ নাহি নাহি,
মল্লার রাগে গর্জিয়া ওঠ গাহি',
বক্ষে তোমার অক্ষের মালা কাঁপে।
যাক যাক তব মন গলে গলে যাক,
গান ভেসে গিয়ে দূরে চলে চলে যাক,
বেদনার ধারা দুর্দাম দিশাহারা
দুখ-দুর্দিনে দুই কূল তার ছাপে।
কদম্ববন চঞ্চল ওঠে দুলি,
সেইমতো তব কম্পিত বাহু তুলি
টলমল নাচে নাচো সংসার ভুলি,
আজ সন্ন্যাসী কাজ নাই [illegible] [illegible]।

শ্রাবণ-বিদায়

গান

শ্রাবণ তুমি বাতাসে কার
আভাস পেলে ?
পথে তারি সকল বারি
দিলে ঢেলে।
কেয়া কাঁদে, যায় যায় যায়।
কদম ঝরে, হায় হায় হায়।
পুব হাওয়া কয়, ওর তো সময় নাই বাকি আর।
শরৎ বলে, যাক না সময় ভয় কিবা তার,—
কাটবে বেলা আকাশমাঝে বিনা কাজে
অসময়ের খেলা খেলে।

কালো মেঘের আর কি আছে দিন
ও যে হল সাথিহীন।
পুব হাওয়া কয়, কালোর এবার যাওয়াই ভালো,
শরৎ বলে, গেঁথে দেব কালোয় আলো।
সাজবে বাদল আকাশ মাঝে
সোনার সাজে
কালিমা ওর মুছে ফেলে।

যায় রে শ্রাবণ কবি রসবর্ষা ক্ষান্ত করি তার,
কদম্বের রেণুপুঞ্জে পদে পদে কুঞ্জবীথিকার
ছায়াঞ্চল ভরি দিল। জানি, রেখে গেল তার দান
বনের মর্মের মাঝে; দিয়ে গেল অভিষেকস্নান
সুপ্রসন্ন আলোকেরে; মহেন্দ্রের অদৃশ্য বেদীতে
ভরি গেল অর্ঘ্যপাত্র বেদনার উৎসর্গ অমৃতে;
সলিল গণ্ডূষ দিতে তটিনী সাগরতীর্থে চলে,
অঞ্জলি ভরিল তারি; ধরার নিগূঢ় বক্ষতলে

রেখে গেল তৃষ্ণার সম্বল ; অগ্নিতীক্ষ্ণ বজ্রবাণ
দিগন্তের তূণ ভরি একান্তে করিয়া গেল দান
কালবৈশাখীর তরে ; নিজ হস্তে সর্ব ম্লানতার
চিহ্ন মুছে দিয়ে গেল। আজ শুধু রহিল তাহার
রিক্তবৃষ্টি জ্যোতিঃশুভ্র মেঘে মেঘে মুক্তির লিখন,
আপন পূর্ণতাখানি নিখিলে করিল সমর্পণ।

শেষ মিনতি

গান

কেন পান্থ এ চঞ্চলতা ?
কোন্ শূন্য হতে এল কার বারতা।

যাত্রাবেলায় রুদ্ররবে
বন্ধন-ডোর ছিন্ন হবে,
ছিন্ন হবে, ছিন্ন হবে।

নয়ন কিসের প্রতীক্ষা-রত
বিদায় বিষাদে উদাসমতো,
ঘন-কুন্তলভার ললাটে নত
ক্লান্ত তড়িৎবধূ তন্দ্রাগতা।

মুক্ত আমি, রুদ্ধ দ্বারে
বন্দী করে কে আমারে।
যাই চলে যাই অন্ধকারে
ঘণ্টা বাজায় সন্ধ্যা যবে।

কেশরকীর্ণ কদম্ববনে
মর্মর মুখরিল মৃদু পবনে,
বর্ষণ-হর্ষভরা ধরণীর
বিরহ বিশঙ্কিত করুণ কথা।

ধৈর্য মানো ওগো ধৈর্য মানো,
বরমাল্য গলে তব হয়নি ম্লান,
আজো হয়নি ম্লান,
ফুল-গন্ধ-নিবেদন-বেদন-সুন্দর
মালতী তব চরণে প্রণতা।

শ্রাবণ সে যায় চলে পান্থ,
কৃশতনু ক্লান্ত,
উড়ে পড়ে উত্তরী-প্রান্ত
উত্তর-পবনে।
যূথীগুলি সকরুণ গন্ধে
আজি তারে বন্দে,
নীপবন মর্মর ছন্দে
জাগে তার স্তবনে।
শ্যামঘন তমালের কুঞ্জে
পল্লবপুঞ্জে।
আজি শেষ মল্লারে গুঞ্জে
বিচ্ছেদগীতিকা,
আজি মেঘ বর্ষণরিক্ত
নিঃশেষবিত্ত,
দিগ্‌ করি শেষ অভিষিক্ত
কিংশুকবীথিকা।

শরৎ

ধ্বনিল গগনে আকাশ-বাণীর বীন,
শিশির-বাতাসে দূরে দূরে ডাক দিল কে ?
আয় সুলগনে, আজ পথিকের দিন,
এঁকে নে ললাটে জয়যাত্রার তিলকে।

গেল খুলি গেল মেঘের ছায়ার দ্বার,
দিকে দিকে ঘোচে কালো আবরণভার,
তরুণ আলোক মুকুট পরেছে তার,
বিজয়শঙ্খ বেজে ওঠে তাই ত্রিলোকে।

শরৎ এনেছে অপরূপ রূপকথা
নিত্যকালের বালকবীরের মানসে।
নবীন রক্তে জাগায় চঞ্চলতা,
বলে,—চলো চলো, অশ্ব তোমার আনো'সে।
ধেয়ে যেতে হবে দুস্তর প্রান্তরে,
বন্দিনী কোন্ রাজকন্যার তরে,
মায়াজাল ভেদি চলো সে রুদ্ধ ঘরে,
লও কার্মুক, দানবের বুক হানো'সে।

ওরে শারদার জয়মন্ত্রের গুণে
বীর-গৌরবে পার হতে হবে সাগরে।
ইন্দ্রের শর ভরি নিতে হবে তূণে
রাক্ষসপুরী জিনে নিতে হবে, জাগো রে।
'দেবী শারদার যে প্রসাদ শিরে লয়ি'
দেব সেনাপতি কুমার দৈত্যজয়ী,
সে প্রসাদখানি দাও গো অমৃতময়ী',
এই মহা বর চরণে তাঁহার মাগো রে।

আজি আশ্বিনে স্বচ্ছ বিমল প্রাতে
শুভ্রের পায়ে অম্লান মনে নমো রে।
স্বর্গের রাখি বাঁধো দক্ষিণ হাতে
আঁধারের সাথে আলোকের মহাসমরে।
মেঘবিমুক্ত শরতের নীলাকাশ
ভুবনে ভুবনে ঘোষিল এ আশ্বাস—
হবে বিলুপ্ত মলিনের নাগপাশ,
জয়ী হবে রবি, মরিবে মরিবে তম রে।

শান্তি

গান

পাগল আজি আগল খোলে
বিদায়রজনীতে,
চরণে ওর বাঁধিবি ডোর,
কী আশা তোর চিতে।
গগনে তার মেঘ-দুয়ার ঝেঁপে,
বুকেরি ধন বুকেতে ছিল চেপে,
হিম হাওয়ায় গেল সে দ্বার কেঁপে,
এসেছে ডাক ভোরের রাগিণীতে।
শীতল হ'ক বিমল হ'ক প্রাণ,
হৃদয়ে শোক রাখুক তার দান।
যা ছিল ঘিরে শূন্যে সে মিলাল,
সে ফাঁক দিয়ে আসুক তবে আলো,
বিজনে বসি পূজাঞ্জলি ঢালো
শিশিরে ভরা শিউলি-ঝরা গীতে।

শরতের প্রবেশ

গান

নির্মল কান্ত, নমো হে নমঃ
স্নিগ্ধ সুশান্ত নমো হে নমঃ।
বন-অঙ্গনময় রবিকর-রেখা
লেপিল আলিম্পনলিপি লেখা,
আঁকিব তাহে প্রণতি মম।
নমো হে নমঃ।

শরৎ ডাকে ঘর ছাড়ানো ডাকা
কাজ ভোলানো সুরে,—
চপল করে হাঁসের ডুটি পাখা
ওড়ায় তারে দূরে।
শিউলি কুঁড়ি যেমনি ফোটে শাখে
অমনি তারে হঠাৎ ফিরে ডাকে,
পথের বাণী পাগল করে তাকে,
ধুলায় পড়ে ঝুরে।
শরৎ ডাকে ঘর-ছাড়ানো ডাকা
কাজ-খোওয়ানো সুরে।

শরৎ আজি বাজায় এ কী ছলে
পথ-ভোলানো বাঁশি।
অলস মেঘ যায়-যে দলে দলে
গগনতলে ভাসি।
নদীর ধারা অধীর হয়ে চলে
কী নেশা আজি লাগল তার জলে,
ধানের বনে বাতাস কী যে বলে
বেড়ায় ঘুরে ঘুরে।
শরৎ ডাকে ঘর-ছাড়ানো ডাকা,
কাজ-খোওয়ানো সুরে

শরৎ আজি শুভ্র আলোকেতে
মন্ত্র দিল পড়ি,
ভুবন তাই শুনিল কান পেতে
বাজে ছুটির ঘড়ি।
কাশের বনে হাসির লহরীতে
বাজিল ছুটি মর্মরিত গীতে,—

ছুটির ধ্বনি আনিল মোর চিতে
পথিক বন্ধুরে।
শরৎ ডাকে ঘর-ছাড়ানো ডাকা
কাজ খোওয়ানো সুরে।

শরতের ধ্যান

গান

আলোর অমল কমলখানি
কে ফুটালে,
নীল আকাশের ঘুম ছুটালে।
সেই তো তোমার পথের বঁধু
সেই তো।
দূর কুসুমের গন্ধ এনে খোঁজায় মধু—
এই তো।

আমার মনের ভাবনাগুলি
বাহির হল পাখা তুলি,
ঐ কমলের পথে তাদের
সেই জুটালে।
সেই তো তোমার পথের বঁধু
সেই তো।
এই আলো তার এই তো আঁধার
এই আছে এই নেই তো।

শরৎ-বাণীর বীণা বাজে
কমলদলে।
ললিত রাগের সুর ঝরে তাই
শিউলিতলে।
তাই তো বাতাস বেড়ায় মেতে
কচি ধানের সবুজ খেতে,
বনের প্রাণে মরমরানির
ঢেউ উঠালে।

শরতের বিদায়

কেন গো যাবার বেলা
গোপনে চরণ ফেলা,
যাওয়ার ছায়াটি পড়ে যে হৃদয় মাঝে,
অজানা ব্যথার তপ্ত আভাস রক্ত আকাশে বাজে।
সুদূর বিরহতাপে
বাতাসে কী যেন কাঁপে,
পাখির কণ্ঠ করুণ ক্লান্তি ভরা,
হারাই হারাই মনে করে তাই সংশয়-ম্লান ধরা।
জানিনে গহন বনে
শিউলি কী ধ্বনি শোনে,
আনমনে তার ভূষণ খসায়ে ফেলে।
মালতী আপন সব ঢেলে দেয় শেষ খেলা তার খেলে।
না হতে প্রহর শেষ
হবে কি নিরুদ্দেশ,
তোমার নয়নে এখনো রয়েছে হাসি,
বাজায়ে সোহিনী এখনো মোহিনী বাঁশি ওঠে উচ্ছ্বাসি।
এই তব আসা-যাওয়া
একি খেয়ালের হাওয়া,
মিলন পুলক তাতেও কি অবহেলা,
আজি এ বিরহ-ব্যথার বিষাদ এও কেবলি খেলা?

গান

শিউলি ফুল, শিউলি ফুল,
কেমন ভুল, এমন ভুল?
রাতের বায় কোন্ মায়ায়
আনিল হায় বনছায়ায়,
ভোরবেলায় বারে বারেই
ফিরিবারেই হলি ব্যাকুল।
কেন রে তুই উন্মনা,
নয়নে তোর হিমকণা?

কোন্ ভাষায় চাস বিদায়,
গন্ধ তোর কী জানায়,
সঙ্গে হায় পলে পলেই
দলে দলেই যায় বকুল।

বিলাপ

গান

চরণরেখা তব যে-পথে দিলে লেখি
চিহ্ন আজি তারি আপনি ঘুচালে কি ?
ছিল তো শেফালিকা
তোমারি লিপি-লিখা
তারে যে তৃণতলে আজিকে লীন দেখি
কাশের শিখা যত কাঁপিছে থরথরি,
মলিন মালতী যে পড়িছে ঝরি ঝরি।
তোমার যে-আলোকে
অমৃত দিত চোখে,
স্মরণ তারো কি গো মরণে যাবে ঠেকি ?

হেমন্তের প্রবেশ

গান

নম, নম, নম।
তুমি ক্ষুধার্তজন-শরণ্য,
অমৃত-অন্ন-ভোগ-ধন্য
করো অন্তর মম।
হেমন্তেরে বিভল করে কিসে,
চলিতে পথে হারাল কেন দিশে

যেন রে ওর আলোর স্মৃতিখানি
বিস্মৃতির বাষ্পে নিল টানি,—
কণ্ঠ তাই হারাল তার বাণী,
অশ্রু কাঁপে নয়ন অনিমিষে।
হেমন্তেরে বিভল করে কিসে।

ক্ষণেক তরে লও না ঘরে ডাকি,
যাত্রা ওর অনেক আছে বাকি।
শিশিরকণা লাগিবে পায়ে পায়ে,
রুক্ষ কেশ কাঁপিবে হিমবায়ে,
আঁধার-করা ঘনবনের ছায়ে
শুষ্ক পাতা রয়েছে পথ ঢাকি।
ক্ষণেক তরে লও না ঘরে ডাকি।

বাসা যে ওর সুদূর হিমাচলে,
শেওলা-ঝোলা তিমির গুহাতলে।
যে পথ বাহি বলাকা যায় ফিরে
সৈকতিনী নদীর তীরে তীরে,
সে পথ দিয়ে ধানের খেত ঘিরে
হিমের ভারে চলিবে পলে পলে।
যেতে যে হবে সুদূর হিমাচলে।

চলিতে পথে এল আঁধার রাতি,
নিবিয়া গেল ছিল যে ওর বাতি।
অসুর দলে গগনে রচে কারা,
তাই তো শশী হয়েছে জ্যোতিহারা,
আকাশ ঘেরি ধরিবে যত তারা
কে যেন জেলে কুহেলি-জাল পাতি।
নিবিয়া গেল ছিল যে ওর বাতি।

বধূরা যবে সাঁজের জ্যোতি জ্বাল
একটি দীপ উহারে দেওয়া ভালো।
দেবতা যারে বিঘ্ন দিয়ে হানে
তোমরা তারে বাঁচায়ো দয়া দানে
কল্যাণী গো তোদেরি কল্যাণে
ছুটিয়া যাক্ কুস্বপন কালো,—
একটি দীপ উহারে দেওয়া ভালো।

গান

শিউলি-ফোটা ফুরাল যেই শীতের বনে,
এলে যে সেই শূন্যখনে।
তাই গোপনে সাজিয়ে ডালা
দুখের সুরে বরণমালা
গাঁথি মনে মনে
শূন্য খনে।
দিনের কোলাহলে
ঢাকা সে যে রইবে হৃদয়তলে।
রাতের তারা উঠবে যবে
সুরের মালা বদল হবে
তখন তোমার সনে
মনে মনে।

হায় হেমন্তলক্ষ্মী, তোমার নয়ন কেন ঢাকা—
হিমের ঘন ঘোমটাখানি ধূমল রঙে আঁকা।
সন্ধ্যাপ্রদীপ তোমার হাতে
মলিন হেরি কুয়াশাতে,
কণ্ঠে তোমার বাণী যেন করুণ বাষ্পে মাখা।
ধরার আঁচল ভরে দিলে প্রচুর সোনার ধানে।
দিগঙ্গনার অঙ্গন আজ পূর্ণ তোমার দানে।
আপন দানের আড়ালেতে
রইলে কেন আসন পেতে,
আপনাকে এই কেমন তোমার গোপন করে রাখা।

হেমন্ত

হে হেমন্ত-লক্ষ্মী, তব চক্ষু কেন রুক্ষ চুলে ঢাকা,
ললাটের চন্দ্রলেখা অযত্নে এমন কেন ম্লান ?
হাতে তব সন্ধ্যাদীপ কেন গো আড়াল করে আন
কুয়াশায় ? কণ্ঠে বাণী কেন হেন অশ্রুবাষ্পে মাখা
গোধূলিতে আলোতে আঁধারে ? দূর হিমশৃঙ্গ ছাড়ি
ওই হেরো রাজহংসশ্রেণী, আকাশে দিয়েছে পাড়ি
উজায়ে উত্তরবায়ুস্রোত, শীতে ক্লিষ্ট ক্লান্ত পাখা
মাগিছে আতিথ্য তব জাহ্নবীর জনশূন্য তটে
প্রচ্ছন্ন কাশের বনে। প্রান্তরসীমায় ছায়াবটে
মৌনব্রত বউ-কথা-কও। গ্রামপথ আঁকাবাঁকা
বেণুতলে পান্থহীন অবলীন অকারণ ত্রাসে,
কচিৎ চকিত-ধূলি অকস্মাৎ পবন উচ্ছ্বাসে।

কেন বলো, হৈমন্তিকা, নিজেরে কুণ্ঠিত করে রাখা,
মুখের গুণ্ঠন কেন হিমের ধূমলবর্ণে আঁকা।

ভরেছ, হেমন্ত-লক্ষ্মী, ধরার অঞ্জলি পক্ব ধানে।
দিগঙ্গনে দিগঙ্গনা এসেছিল ভিক্ষার সন্ধানে
শীতরিক্ত অরণ্যের শূন্যপথে। বলেছিল ডাকি,
"কোথায় গো, অন্নপূর্ণা, ক্ষুধার্তেরে অন্ন দিবে না কি ?
শান্ত করো প্রাণের ক্রন্দন, চাও প্রসন্ন নয়ানে
ধরার ভাণ্ডার পানে।" শুনিয়া. লুকায়ে হাস্যখানি,
লুকায়ে দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণা দিয়েছ তুমি আনি,
ভূমিগর্ভে আপনার দাক্ষিণ্য ঢাকিলে সাবধানে।

স্বর্গলোক ম্লান করি প্রকাশিলে ধরার বৈভব
কোন্ মায়ামন্ত্রগুণে, দরিদ্রের বাড়ালে গৌরব।

অমরার স্বর্ণ নামে ধরণীর সোনার অঘ্রানে।
তোমার অমৃত-নৃত্য, তোমার অমৃতস্নিগ্ধ হাসি
কখন ধূলির ঘরে সঞ্চিত করিলে রাশি রাশি,
আপনার দৈন্যচ্ছলে পূর্ণ হলে আপনার দানে।

দীপালি

গান

হিমের রাতে ঐ গগনের
দীপগুলিরে
হেমন্তিকা করল গোপন
আঁচল ঘিরে।
ঘরে ঘরে ডাক পাঠাল—
"দীপালিকায় জ্বালাও আলো,
জ্বালাও আলো, আপন আলো,
সাজাও আলোয় ধরিত্রীরে।"
শূন্য এখন ফুলের বাগান,
দোয়েল কোকিল গাহে না গান,
কাশ ঝরে যায় নদীর তীরে।
যাক্ অবসাদ বিষাদ কালো,
দীপালিকায় জ্বালাও আলো,
জ্বালাও আলো, আপন আলো,
শুনাও আলোর জয়বাণীরে।
দেবতারা আজ আছে চেয়ে
জাগো ধরার ছেলে মেয়ে
আলোয় জাগাও যামিনীরে।
এল আঁধার, দিন ফুরাল,
দীপালিকায় জ্বালাও আলো,
জ্বালাও আলো, আপন আলো,
জয় করো এই তামসীরে।

শীতের উদ্বোধন

ডেকেছ আজি, এসেছি সাজি, হে মোর লীলাগুরু,
শীতের রাতে তোমার সাথে কী খেলা হবে শুরু
ভাবিয়াছিনু খেলার দিন
গোধূলি-ছায়ে হল বিলীন,
পরান মন হিমে মলিন
আড়াল তারে ঘেরি',—
এমন ক্ষণে কেন গগনে বাজিল তব ভেরী ?

উতর-বায় কারে জাগায়, কে বুঝে তার বাণী ?
অন্ধকারে কুঞ্জদ্বারে বেড়ায় কর হানি।
কাঁদিয়া কয় কানন-ভূমি —
"কী আছে মোর, কী চাহ তুমি ?
শুষ্ক শাখা যাও যে চুমি'
কাঁপাও থরথর,
জীর্ণপাতা বিদায়গাথা গাহিছে মরমর।"

বুঝেছি তব এ অভিনব ছলনাভরা খেলা,
তুলিছ ধ্বনি কী আগমনী আজি যাবার বেলা।
যৌবনেরে তুষার-ডোরে
রাখিয়াছিলে অসাড় ক'রে ;
বাহির হতে বাঁধিলে ওরে
কুয়াশা-ঘন জালে—
ভিতরে ওর ভাঙালে ঘোর নাচের তালে তালে।

নৃত্যলীলা জড়ের শিলা করুক খানখান,
মৃত্যু হতে অবাধ স্রোতে বহিয়া যাক প্রাণ
নৃত্য তব ছন্দে তারি
নিত্য ঢালে অমৃতবারি,

শঙ্খ কহে হুহুংকারি
বাঁধন সে তো মায়া,
যা-কিছু ভয়, যা-কিছু ক্ষয়, সে তো ছায়ার ছায়া।

এসেছে শীত গাহিতে গীত বসন্তেরি জয়,—
যুগের পরে যুগান্তরে মরণ করে লয়।
তাণ্ডবের ঘূর্ণিঝড়ে
শীর্ণ যাহা ঝরিয়া পড়ে,
প্রাণের জয়-তোরণ গড়ে
আনন্দের তানে,
বসন্তের যাত্রা চলে অনন্তের পানে।

বাঁধনে যারে বাঁধিতে নারে, বন্দী করি তারে
তোমার হাসি সমুচ্ছ্বাসি উঠিছে বারে বারে।
অমর আলো হারাবে না যে
ঢাকিয়া তারে আঁধার মাঝে,
নিশীথ-নাচে ডমরু বাজে
অরুণদ্বার খোলে—
জাগে মুরতি, পুরানো জ্যোতি নব উষার কোলে।

জাগুক মন, কাঁপুক বন, উড়ুক ঝরা পাতা,
উঠুক জয়, তোমারি জয়, তোমারি জয়গাথা।
ঋতুর দল নাচিয়া চলে
ভরিয়া ডালি ফুলে ও ফলে,
নৃত্য-লোল চরণতলে
মুক্তি পায় ধরা,—
ছন্দে মেতে যৌবনেতে রাঙিয়ে ওঠে জরা।

আসন্ন শীত

গান

শীতের বনে কোন্ সে কঠিন
আসবে বলে
শিউলিগুলি ভয়ে মলিন
বনের কোলে।
আমলকী ডাল সাজল কাঙাল,
খসিয়ে দিল পল্লবজাল,
কাশের হাসি হাওয়ায় ভাসি
যায় যে চলে।
সইবে না সে পাতায় ঘাসে
চঞ্চলতা,
তাই তো আপন রঙ ঘুচাল
ঝুমকো লতা।
উত্তরবায় জানায় শাসন,
পাতল তাপের শুষ্ক আসন,
সাজ খসাবার এই লীলা কার
অট্টরোলে।

শীত

ওগো শীত, ওগো শুভ্র, হে তীব্র নির্মম,
তোমার উত্তরবায়ু দুরন্ত দুর্দম
অরণ্যের বক্ষ হানে। বনস্পতি যত
থর থর কম্পমান, শীর্ষ করি নত
আদেশ-নির্ঘোষ তব মানে। 'জীর্ণতার
মোহবন্ধ ছিন্ন করো' এ বাক্য তোমার
ফিরিছে প্রচার করি জয়ডঙ্কা তব
দিকে দিকে। কুঞ্জে কুঞ্জে মৃত্যুর বিপ্লব

করিছে বিকীর্ণ শীর্ণ পর্ণ রাশি রাশি
শূন্য নগ্ন করি শাখা, নিঃশেষে বিনাশি
অকাল-পুষ্পের দুঃসাহস।
হে নির্মল,
সংশয়-উদ্বিগ্ন চিত্তে পূর্ণ করো বল।
মৃত্যু-অঞ্জলিতে ভরো অমৃতের ধারা,
ভীষণের স্পর্শঘাতে করো শঙ্কাহারা,
শূন্য করি' দাও মন; সর্বস্বান্ত ক্ষতি
অন্তরে ধরুক শান্ত উদাত্ত মুরতি,
হে বৈরাগী। অতীতের আবর্জনাভার,
সঞ্চিত লাঞ্ছনা গ্লানি শ্রান্তি ভ্রান্তি তার
সম্মার্জন করি দাও। বসন্তের কবি
শূন্যতার শুভ্র পত্রে পূর্ণতার ছবি
লেখে আসি', সে-শূন্য তোমারি আয়োজন,
সেইমতো মোর চিত্তে পূর্ণের আসন
মুক্ত করো রুদ্র-হস্তে; কুজ্ঝটিকারাশি
রাখুক পুঞ্জিত করি প্রসন্নের হাসি।
বাজুক তোমার শঙ্খ মোর বক্ষতলে
নিঃশঙ্ক দুর্জয়। কঠোর উদগ্রবলে
দুর্বলেরে করো তিরস্কার; অট্টহাসে
নিষ্ঠুর ভাগ্যেরে পরিহাসো; হিমশ্বাসে
আরাম করুক ধূলিসাৎ। হে নির্মম,
গর্বহরা, সর্বনাশা, নমো নমো নমঃ।

নৃত্য

গান

শীতের হাওয়ার লাগল নাচন
আমলকীর এই ডালে ডালে।
পাতাগুলি শিরশিরিয়ে
ঝরিয়ে দিল তালে তালে।

উড়িয়ে দেবার মাতন এসে
কাঙাল তারে করল শেষে,
তখন তাহার ফলের বাহার
রইল না আর অন্তরালে।

শূন্য করে ভরে-দেওয়া
যাহার খেলা
তারি লাগি রইনু বসে
সারা বেলা।
শীতের পরশ থেকে থেকে
যায় বুঝি ঐ ডেকে ডেকে,
সব খোওয়াবার সময় আমার
হবে কখন কোন্ সকালে।

শীতের প্রবেশ

গান

নম, নম, নম নম।
নির্দয় অতি করুণা তোমার
বন্ধু তুমি হে নির্মম,
যা কিছু জীর্ণ করিবে দীর্ণ
দণ্ড তোমার দুর্দম।

সর্বনাশার নিঃশ্বাস বায়
লাগল ভালে।
নাচল চরণ শীতের হাওয়ায়
মরণ তালে।
করব বরণ, আসুক কঠোর,
ঘুচুক অলস সুপ্তির ঘোর,
যাক ছিঁড়ে মোর বন্ধনডোর
যাবার কালে।

ভয় যেন মোর হয় খান খান
ভয়েরি ঘায়ে,
ভরে যেন প্রাণ ভেসে এসে দান
ক্ষতির বায়ে।
সংশয়ে মন না যেন ডুলাই,
মিছে শুচিতায় তারে না ভুলাই,
নির্মল হব পথের ধুলাই
লাগিলে পায়ে।

শীত যদি তুমি মোরে দাও ডাক
দাঁড়ায়ে দ্বারে—
সেই নিমেষেই যাব নির্বাক
অজানা পারে।
নাই দিল আলো নিবে-যাওয়া বাতি,
শুকনো গোলাপ ঝরা যূথী জাতী
নির্জন পথ হ'ক মোর সাথি
অন্ধকারে।

জানি জানি, শীত, আমার যে-গীত
বীণায় নাচে
তারে হরিবার কভু কি তোমার
সাধ্য আছে।
দক্ষিণ বায়ে করে যাব দান
রবিরশ্মিতে কাঁপিবে সে তান,
কুসুমে কুসুমে ফুটিবে সে গান
লতায় গাছে।

যাহা-কিছু মোর তুমি, ওগো চোর,
হরিয়া লবে,
জেনো বারেবারে ফিরে ফিরে তারে
ফিরাতে হবে।

যা কিছু ধুলায় চাহিবে চুকাতে
ধুলা সে কিছুতে নারিবে লুকাতে,
নবীন করিয়া নবীনের হাতে
সঁপিবে কবে।

স্তব

গান

হে সন্ন্যাসী,
হিমগিরি ফেলে নীচে নেমে এলে
কিসের জন্য ?
কুন্দমালতী করিছে মিনতি
হও প্রসন্ন।
যাহা কিছু ম্লান বিরস জীর্ণ
দিকে দিকে দিলে করি বিকীর্ণ,
বিচ্ছেদভারে বনচ্ছায়ারে
করে বিষন্ন ;
হও প্রসন্ন।

সাজাবে কি ডালা গাঁথিবে কি মালা
মরণসত্রে ?
তাই উত্তরী নিলে ভরি ভরি
শুকানো পত্রে ?
ধরণী যে তব তাণ্ডবে সাথি
প্রলয়বেদনা নিল বুকে পাতি,
রুদ্র এবারে বরবেশে তারে
করো গো ধন্য ;
হও প্রসন্ন।

শীতের বিদায়

তুঙ্গ তোমার ধবলশৃঙ্গশিরে
উদাসীন শীত, যেতে চাও বুঝি ফিরে ?
চিন্তা কি নাই সঁপিতে রাজ্যভার
নবীনের হাতে, চপল চিত্ত যার।
হেলায় যে-জন ফেলায় সকল তার
অমিত দানের বেগে ?

দণ্ড তোমার তার হাতে বেণু হবে,
প্রতাপের দাপ মিলাবে গানের রবে,
শাসন ভুলিয়া মিলনের উৎসবে
জাগাবে, রহিবে জেগে।

সে যে মুছে দিবে তোমার আঘাতচিহ্ন,
কঠোর বাঁধন করিবে ছিন্ন ছিন্ন।
এতদিন তুমি বনের মজ্জামাঝে
বন্দী রেখেছ যৌবনে কোন্ কাজে,
ছাড়া পেয়ে আজ কত অপরূপ সাজে
বাহিরিবে ফুলে দলে।

তব আসনের সম্মুখে যার বাণী
আবদ্ধ ছিল বহুকাল ভয় মানি'
কণ্ঠ তাহার বাতাসেরে দিবে হানি'
বিচিত্র কোলাহলে।

তোমার নিয়মে বিবর্ণ ছিল সজ্জা,
নগ্ন তরুর শাখা পেত তাই লজ্জা।
তাহার আদেশে আজি নিখিলের বেশে
নীল পীত রাঙা নানা রঙ ফিরে এসে,
আকাশের আঁখি ডুবাইবে রসাবেশে
জাগাইবে মত্ততা।

সম্পদ তুমি যার যত নিলে হরি'
তার বহুগুণ ও যে দিতে চায় ভরি,
পল্লবে যার ক্ষতি ঘটেছিল ঝরি,
ফুল পাবে সেই লতা।

ক্ষয়ের দুঃখে দীক্ষা যাহারে দিলে,
সব দিকে যার বাহুল্য ঘুচাইলে,
প্রাচুর্যে তারি হল আজি অধিকার।
দক্ষিণবায়ু এই বলে বার বার,
বাঁধন-সিদ্ধ যে-জন তাহারি দ্বার
খুলিবে সকলখানে।

কঠিন করিয়া রচিলে পাত্রখানি
রসভারে তাই হবে না তাহার হানি,
লুঠি লও ধন, মনে মনে এই জানি'
দৈন্য পুরিবে দানে।

বসন্তের প্রবেশ

গান

নম নম নম নম
তুমি সুন্দরতম।
দূর হইল দৈন্যদ্বন্দ্ব,
ছিন্ন হইল দুঃখবন্ধ
উৎসবপতি মহানন্দ
তুমি সুন্দরতম।

লুকানো রহে না বিপুল মহিমা
বিঘ্ন হয়েছে চূর্ণ,
আপনি রচিলে আপনার সীমা,
আপনি করিলে পূর্ণ।

ভরেছে পূজার সাজি,
গান উঠিয়াছে বাজি',
নাগকেশরের গন্ধরেণুতে
উড়ে চন্দনচূর্ণ।
এ কী লীলা, হে বসন্ত,
ম্লান আবরণ আড়ালে দেখালে
সব দৈন্যের অন্ত।

অমানিত মাটি, দিবে তারে মান
এসেছ তাহারি জন্য;
পথে পথে দিলে পরশের দান
ধূলিরে করিলে ধন্য।
যেথা আস তুমি বীর
জাগে তব মন্দির,
বর্ণছটায় মাতে মহাকাশ
স্তব করে মহারণ্য।
এ কী লীলা, হে বসন্ত,
অনেক ভুলায়ে নিমেষে সহসা
দেখালে আপন পন্থ।

ছিনু পথ চেয়ে বহু দুখ সয়ে,
আজ দেখি এ কী দৃশ্য,
শক্তি তোমার সুন্দর হয়ে
জিনিল কঠিন বিশ্ব।
তব পুষ্পিত তরু
জয় করি নিল মরু,
মূক চিত্তের জাগাইলে গান,
কবি হল তব শিষ্য।

এ কী লীলা, হে বসন্ত,
যা ছিল শ্রীহীন দীপ্তি-বিহীন
করিলে প্রজ্বলন্ত।

আবাহন

গান

তোমার আসন পাতব কোথায়,
হে অতিথি।
ছেয়ে গেছে শুকনো পাতায়
কাননবীথি।
ছিল ফুটে মালতী ফুল, কুন্দকলি,
উত্তরবায় লুঠ করে তায় গেল চলি,
হিমে বিবশ বনস্থলী
বিরলগীতি,
হে অতিথি।

সুর-ভোলা ঐ ধরার বাঁশি
লুটায় ভুঁয়ে,
মর্মে তাহার তোমার হাসি
দাও না ছুঁয়ে।
মাতবে আকাশ নবীন রঙের তানে তানে,
পলাশ বকুল ব্যাকুল হবে আত্মদানে,
জাগবে বনের মুগ্ধ মনে
মধুর স্মৃতি,
হে অতিথি।

বসন্ত

হে বসন্ত, হে সুন্দর, ধরণীর ধ্যান-ভরা ধন,
বৎসরের শেষে
শুধু একবার মর্ত্যে মূর্তি ধর ভুবনমোহন
নব বরবেশে।

তারি লাগি তপস্বিনী কী তপস্যা করে অনুক্ষণ,
আপনারে তপ্ত করে, ধৌত করে, ছাড়ে আভরণ,
ত্যাগের সর্বস্ব দিয়ে ফল-অর্ঘ্য করে আহরণ
তোমার উদ্দেশে।

সূর্য প্রদক্ষিণ করি' ফিরে সে পূজার নৃত্যতালে
ভক্ত উপাসিকা।
নম্র ভালে আঁকে তার প্রতিদিন উদয়াস্তকালে
রক্তরশ্মিটিকা।
সমুদ্রতরঙ্গে সদা মন্দ্রস্বরে মন্ত্র পাঠ করে,
উচ্চারে নামের শ্লোক অরণ্যের উচ্ছ্বাসে মর্মরে,
বিচ্ছেদের মরুশূন্যে স্বপ্নচ্ছবি দিকে দিগন্তরে
রচে মরীচিকা।

আবর্তিয়া ঋতুমাল্য করে জপ, করে আরাধন
দিন গুনে গুনে।
সার্থক হল যে তার বিরহের বিচিত্র সাধন
মধুর ফাল্গুনে।
হেরিনু উত্তরী তব, হে তরুণ, অরুণ আকাশে,
শুনিনু চরণধ্বনি দক্ষিণের বাতাসে বাতাসে,
মিলনমাঙ্গল্য-হোম প্রজ্জ্বলিত পলাশে পলাশে,
রক্তিম আগুনে।

তাই আজি ধরিত্রীর যত কর্ম, যত প্রয়োজন
হল অবসান।
বৃক্ষশাখা রিক্তভার, ফলে তার নিরাসক্ত মন,
খেতে নাই ধান।
বকুলে বকুলে শুধু মধুকর উঠিছে গুঞ্জরি
অকারণ আন্দোলনে চঞ্চলিছে অশোকমঞ্জরী,
কিশলয়ে কিশলয়ে নৃত্য উঠে দিবসশর্বরী
বনে জাগে গান।

হে বসন্ত, হে সুন্দর, হায় হায়, তোমার করুণা
ক্ষণকাল তরে।
মিলাইবে এ উৎসব, এই হাসি, এই দেখাশুনা
শূন্য নীলাম্বরে।
নিকুঞ্জের বর্ণচ্ছটা একদিন বিচ্ছেদবেলায়
ভেসে যাবে বৎসরান্তে রক্তসন্ধ্যাস্বপ্নের ভেলায়,
বনের মঞ্জীরধ্বনি অবসন্ন হবে নিরালায়
শ্রান্তিক্লান্তিভরে।

তোমারে করিবে বন্দী নিত্যকাল মৃত্তিকাশৃঙ্খলে
শক্তি আছে কার?
ইচ্ছায় বন্ধন লও, সে বন্ধন ইন্দ্রজাল বলে
কর অলংকার।
সে বন্ধন দোলরজ্জু, স্বর্গে মর্ত্যে দোলে ছন্দভরে,
সে বন্ধন শ্বেতপদ্ম, বাণীর মানসসরোবরে,
সে বন্ধন বীণাতন্ত্র, সুরে সুরে সংগীতনির্ঝরে
বর্ষিছে ঝংকার।

নন্দনে আনন্দ তুমি, এই মর্ত্যে, হে মর্ত্যের প্রিয়
নিত্য নাই হলে।
সুদূর মাধুর্যপানে তব স্পর্শ, অনির্বচনীয়,
দ্বার যদি খোলে,
ক্ষণে ক্ষণে সেথা আসি নিস্তব্ধ দাঁড়াবে বসুন্ধরা,
লাগিবে মন্দাররেণু শিরে তার ঊর্ধ্ব হতে ঝরা,
মাটির বিচ্ছেদপাত্র স্বর্গের উচ্ছ্বাসরসে ভরা
রবে তার কোলে।

রাগরঙ্গ

গান

রঙ লাগালে বনে বনে,
ঢেউ জাগালে সমীরণে।
আজ ভুবনের দুয়ার খোলা,
দোল দিয়েছে বনের দোলা,
কোন্ ভোলা সে ভাবে ভোলা
খেলায় প্রাঙ্গণে।

আন্ বাঁশি তোর আন্ রে,
লাগল সুরের বান রে,
বাতাসে আজ দে ছড়িয়ে
শেষ বেলাকার গান রে
সন্ধ্যাকাশের বুকফাটা সুর
বিদায় রাতি করবে মধুর,
মাতল আজি অস্তসাগর
সুরের প্লাবনে।

বসন্তের বিদায়

মুখখানি কর মলিন বিধুর
যাবার বেলা,
জানি আমি জানি সে তব মধুর
ছলের খেলা।
জানি গো বন্ধু, ফিরে আসিবাব পথে
গোপন চিহ্ন এঁকে যাবে তব রথে,
জানি তুমি তারে ভুলিবে না কোনোমতে,
যার সাথে তব হল একদিন
মিলন-মেলা।

জানি আমি যবে আঁখিজল ভরে
রসের স্নানে
মিলনের বীজ অঙ্কুর ধরে
নবীন প্রাণে।
খনে খনে এই চিরবিরহের ভান,
খনে খনে এই ভয়রোমাঞ্চ দান,
তোমার প্রণয়ে সত্য সোহাগে
মিথ্যা হেলা।

প্রার্থনা

গান

জানি তুমি ফিরে আসিবে আবার, জানি,
তবু মনে মনে প্রবোধ নাহি যে মানি।
বিদায়লগনে ধরিয়া দুয়ার
তবু যে তোমায় বলি বারবার
"ফিরে এসো, এসো, বন্ধু আমার"
বাষ্পবিভল বাণী।

যাবার বেলায় কিছু মোরে দিয়ো দিয়ো
গানের সুরেতে তব আশ্বাস, প্রিয়।
বনপথে যবে যাবে সে-ক্ষণের
হয়তো বা কিছু রবে স্মরণের,
তুলি লব সেই তব চরণের
দলিত কুসুমখানি।

অহৈতুক

গান

মনে রবে কি না রবে আমারে
সে আমার মনে নাই গো।
ক্ষণে ক্ষণে আসি তব দুয়ারে,
অকারণে গান গাই গো।
চলে যায় দিন, যতখন আছি
পথে যেতে যদি আসি কাছাকাছি
তোমার মুখের চকিত সুখের
হাসি দেখিতে যে চাই গো,
তাই অকারণে গান গাই গো।

ফাগুনের ফুল যায় ঝরিয়া
ফাগুনের অবসানে।
ক্ষণিকের মুঠি দেয় ভরিয়া,
আর কিছু নাহি জানে।
ফুরাইবে দিন, আলো হবে ক্ষীণ,
গান সারা হবে, থেমে যাবে বীন,
যতখন থাকি ভরে দিবে না কি
এ খেলারি ভেলাটাই গো।
তাই অকারণে গান গাই গো।

মনের মানুষ[১]

কত-না দিনের দেখা
কত-না রূপের মাঝে,
সে কার বিহনে একা
মন লাগে নাই কাজে।

১ এই ছন্দ চৌপদীজাতীয় নহে। ইহার যতিবিভাগ নিম্নলিখিত রূপে :
কত-না দিনের । দেখা ॥ কত-না রূপের । মাঝে ॥
সে কার বিহনে । একা ॥ মন লাগে নাই । কাজে ॥

কার নয়নের চাওয়া
পালে দিয়েছিল হাওয়া,
কার অধরের হাসি
আমার বীণায় বাজে।
কত ফাগুনের দিনে
চলেছিনু পথ চিনে,
কত শ্রাবণের রাতে
লাগে স্বপনের ছোঁওয়া।
চাওয়া-পাওয়া নিয়ে খেলা,
কেটেছিল কত বেলা,
কখনো বা পাই পাশে
কখনো বা যায় খোওয়া
শরতে এসেছে ভোরে
ফুলসাজি হাতে ক'রে,
শীতে গোধূলির বেলা
জ্বালায়েছে দীপশিখা।
কখনো করুণ সুরে
গান গেয়ে গেছে দূরে,
যেন কাননের পথে
রাগিণীর মরীচিকা।
সেই সব হাসি কাঁদা,
বাঁধন্ খোলা ও বাঁধা,
অনেক দিনের মধু,
অনেক দিনের মায়া—
আজ এক হয়ে তারা
মোরে করে মাতোয়ারা,
এক বীণারূপ ধরি
এক গানে ফেলে ছায়া।
নানা ঠাঁই ছিল নানা,
আজ তারে হল জানা,

বাহিরে সে দেখা দিত
মনের মানুষ মম—
আজ নাই আধাআধি,
ভিতর বাহির বাঁধি
এক দোলাতেই দোলে
মোর অন্তরতম।

চঞ্চল

ওরে প্রজাপতি, মায়া দিয়ে কে যে
পরশ করিল তোরে।
অস্তরবির তুলিখানি চুরি ক'রে।
বাতাসের বুকে যে-চঞ্চলের বাসা
বনে বনে তুই বহিস তাহারি ভাষা,
অপ্সরীদের দোল-খেলা ফুলরেণু
পাঠায় কে তোর দুখানি পাখায় ভ'রে

যে-গুণী তাহার কীর্তিনাশার নেশায়
চিকন রেখার লিখন শূন্যে মেশায়,
সুর বাঁধে আর সুর যে হারায় ভুলে,
গান গেয়ে চলে ভোলা রাগিণীর কূলে,
তার হারা সুর নাচের হাওয়ার বেগে
ডানাতে তোমার কখন পড়েছে ঝরে।

উৎসব

সন্ন্যাসী যে জাগিল ঐ, জাগিল ঐ, জাগিল।
হাস্যভরা দখিন বায়ে
অঙ্গ হতে দিল উড়ায়ে
শ্মশানচিতাভস্মরাশি, ভাগিল কোথা, ভাগিল।

মানসলোকে শুভ্র আলো
চূর্ণ হয়ে রঙ জাগাল,
মদির রাগ লাগিল তারে,
হৃদয়ে তার লাগিল।
আয় রে তোরা, আয় রে তোরা, আয় রে।
রঙের ধারা ঐ যে বহে যায় রে।

রঙের ঝড় উচ্ছ্বসিল গগনে,
রঙের ঢেউ রসের স্রোতে মাতিয়া ওঠে সঘনে ;—
ডাকিল বান আজি সে কোন্ কোটালে।
নাকাড়া বাজে, কানাড়া বাজে বাঁশিতে,
কান্নাধারা মিলিয়া গেছে হাসিতে,
প্রাণের মাঝে ফোয়ারা তার ছোটালে।
এসেছে হাওয়া বাণীতে দোল-দোলানো,
এসেছে পথ-ভোলানো,
এসেছে ডাক ঘরের দ্বার-খোলানো।
আয় রে তোরা, আয় রে তোরা, আয় রে।
রঙের ধারা ঐ যে বহে যায় রে।

উদয়রবি যে রাঙা রঙ রাঙায়ে
পূর্বাচলে দিয়েছে ঘুম ভাঙায়ে—
অস্তরবি সে রাঙা রসে রসিল,
চিরপ্রাণের বিজয়বাণী ঘোষিল ;
অরুণবীণা যে-সুর দিল রনিয়া
সন্ধ্যাকাশে সে সুর উঠে ঘনিয়া,
নীরব নিশীথিনীর বুকে নিখিল ধ্বনি ধ্বনিয়া।
আয় রে তোরা, আয় রে তোরা, আয় রে।
বাঁধনহারা রঙের ধারা ঐ যে বহে যায় রে।

শেষের রঙ

গান

রাঙিয়ে দিয়ে যাও গো এবার
যাবার আগে,—
আপন রাগে,
গোপন রাগে,
তরুণ হাসির অরুণ রাগে
অশ্রুজলের করুণ রাগে।
রঙ যেন মোর মর্মে লাগে,
আমার সকল কর্মে লাগে,
সন্ধ্যাদীপের আগায় লাগে,
গভীর রাতের জাগায় লাগে।

যাবার আগে যাও গো আমায়
জাগিয়ে দিয়ে
রক্তে তোমার চরণদোলা
লাগিয়ে দিয়ে।
আঁধার নিশার বক্ষে যেমন তারা জাগে,
পাষাণগুহার কক্ষে নিঝরধারা জাগে,
মেঘের বুকে যেমন মেঘের মন্দ্র জাগে,
বিশ্বনাচের কেন্দ্রে যেমন ছন্দ জাগে,
তেমনি আমায় দোল দিয়ে যাও
যাবার পথে আগিয়ে দিয়ে,
কাঁদন বাঁধন ভাগিয়ে দিয়ে।

দোল

আলোকরসে মাতাল রাতে
বাজিল কার বেণু।
দোলের হাওয়া সহসা মাতে,
ছড়ায় ফুলরেণু।

অমলরুচি মেঘের দলে
আনিল ডাকি গগনতলে,
উদাস হয়ে ওরা যে চলে
শূন্যে-চরা ধেনু।

দোলের নাচে সে বুঝি আছে
অমরাবতীপুরে ?
বাজায় বেণু বুকের কাছে,
বাজায় বেণু দূরে।
শরম ভয় সকলি ত্যেজে
মাধবী তাই আসিল সেজে,
শুধায় শুধু 'বাজায় কে যে
মধুর মধু সুরে'।

গগনে শুনি এ কী এ কথা,
কাননে কী যে দেখি !
এ কি মিলনচঞ্চলতা।
বিরহব্যথা এ কি।
আঁচল কাঁপে ধরার বুকে,
কী জানি তাহা সুখে না দুখে।
ধরিতে যারে না পারে তারে
স্বপনে দেখিছে কি।

লাগিল দোল জলে স্থলে,
জাগিল দোল বনে,
সোহাগিনীর হৃদয়তলে,
বিরহিণীর মনে।
মধুর মোরে বিধুর করে
সুদূর তার বেণুর স্বরে,
নিখিলহিয়া কিসের তরে
দুলিছে অকারণে।

আনো গো আনো ভরিয়া ডালি
করবীমালা লয়ে,
আনো গো আনো সাজায়ে থালি
কোমল কিশলয়ে।
এস গো পীত বসনে সাজি,
কোলেতে বীণা উঠুক বাজি,
ধ্যানেতে আর গানেতে আজি
যামিনী যাক বয়ে।

এস গো এস দোলবিলাসী,
বাণীতে মোর দোলো।
ছন্দে মোর চকিতে আসি
মাতিয়ে তারে তোলো।
অনেক দিন বুকের কাছে
রসের স্রোত থমকি আছে,
নাচিবে আজি তোমার নাচে
সময় তারি হল।

কিশোর, আজি তোমার দ্বারে
পরান মম জাগে।
নবীন কবে করিবে তারে
রঙিন তব রাগে।
ভাবনাগুলি বাঁধনখোলা
রচিয়া দিবে তোমার দোলা,
দাঁড়িয়ো আসি হে ভাবে-ভোলা,
আমার আঁখি আগে।

উপন্যাস ও গল্প

গল্পগুচ্ছ

গল্পগুচ্ছ

সম্পাদক

আমার স্ত্রী-বর্তমানে প্রভা সম্বন্ধে আমার কোনো চিন্তা ছিল না। তখন প্রভা অপেক্ষা প্রভার মাতাকে লইয়া কিছু অধিক ব্যস্ত ছিলাম।

তখন কেবল প্রভার খেলাটুকু হাসিটুকু দেখিয়া, তাহার আধো আধো কথা শুনিয়া এবং আদরটুকু লইয়াই তৃপ্ত থাকিতাম; যতক্ষণ ভালো লাগিত নাড়াচাড়া করিতাম, কান্না আরম্ভ করিলেই তাহার মার কোলে সমর্পণ করিয়া সত্বর অব্যাহতি লইতাম। তাহাকে যে বহু চিন্তা ও চেষ্টায় মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে, এ-কথা আমার মনে আসে নাই।

অবশেষে অকালে আমার স্ত্রীর মৃত্যু হইলে একদিন মায়ের কোল হইতে খসিয়া মেয়েটি আমার কোলের কাছে আসিয়া পড়িল, তাহাকে বুকে টানিয়া লইলাম।

কিন্তু মাতৃহীনা দুহিতাকে দ্বিগুণ স্নেহে পালন করা আমার কর্তব্য এটা আমি বেশি চিন্তা করিয়াছিলাম, না, পত্নীহীন পিতাকে পরম যত্নে রক্ষা করা তাহার কর্তব্য এইটে সে বেশি অনুভব করিয়াছিল, আমি ঠিক বুঝিতে পারি না। কিন্তু ছয় বৎসর বয়স হইতেই সে গিন্নীপনা আরম্ভ করিয়াছিল। বেশ দেখা গেল ওইটুকু মেয়ে তাহার বাবার একমাত্র অভিভাবক হইবার চেষ্টা করিতেছে।

আমি মনে মনে হাসিয়া তাহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিলাম। দেখিলাম যতই আমি অকর্মণ্য অসহায় হই ততই তাহার লাগে ভালো; দেখিলাম, আমি নিজে কাপড়টা ছাতাটা পাড়িয়া লইলে সে এমন ভাব ধারণ করে, যেন তাহার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে। বাবার মতো এতবড়ো পুতুল সে ইতিপূর্বে কখনো পায় নাই, এইজন্য বাবাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া বিছানায় শুয়াইয়া সে সমস্ত দিন বড়ো আনন্দে আছে। কেবল ধারাপাত এবং পদ্যপাঠ প্রথমভাগ অধ্যাপনের সময় আমার পিতৃত্বকে কিঞ্চিৎ সচেতন করিয়া তুলিতে হইত।

কিন্তু মাঝে মাঝে ভাবনা হইত মেয়েটিকে সৎপাত্রে বিবাহ দিতে হইলে অনেক অর্থের আবশ্যক—আমার এত টাকা কোথায়। মেয়েকে তো সাধ্যমতো লেখাপড়া শিখাইতেছি কিন্তু একটা পরিপূর্ণ মূর্খের হাতে পড়িলে তাহার কী দশা হইবে।

উপার্জনে মন দেওয়া গেল। গবর্মেণ্ট আপিসে চাকরি করিবার বয়স গেছে, অন্য আপিসে প্রবেশ করিবারও ক্ষমতা নাই। অনেক ভাবিয়া বই লিখিতে লাগিলাম।

বাঁশের নল ফুটা করিলে তাহাতে তেল রাখা যায় না, জল রাখা যায় না, তাহার ধারণাশক্তি মূলেই থাকে না; তাহাতে সংসারের কোনো কাজই হয় না, কিন্তু ফুঁ দিলে বিনা খরচে বাঁশি বাজে ভালো। আমি স্থির জানিতাম, সংসারের কোনো কাজেই যে-হতভাগ্যের বুদ্ধি খেলে না, সে নিশ্চয়ই ভালো বই লিখিবে। সেই সাহসে একখানা প্রহসন লিখিলাম, লোকে ভালো বলিল এবং রঙ্গভূমিতে অভিনয় হইয়া গেল।

সহসা যশের আস্বাদ পাইয়া এমনি বিপদ হইল, প্রহসন আর কিছুতেই ছাড়িতে পারি না। সমস্তদিন ব্যাকুল চিন্তান্বিত মুখে প্রহসন লিখিতে লাগিলাম।

প্রভা আসিয়া আদর করিয়া স্নেহসহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, নাইতে যাবে না?"

আমি হুংকার দিয়া উঠিলাম, "এখন যা, এখন যা, এখন বিরক্ত করিসনে।"

বালিকার মুখখানি বোধ করি একটি ফুৎকারে নির্বাপিত প্রদীপের মতো অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল; কখন সে অভিমানবিস্ফারিত-হৃদয়ে নীরবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল আমি জানিতেও পারি নাই।

দাসীকে তাড়াইয়া দিই, চাকরকে মারিতে যাই, ভিক্ষুক সুর করিয়া ভিক্ষা করিতে আসিলে তাহাকে লাঠি লইয়া তাড়া করি। পথপার্শ্বেই আমার ঘর হওয়াতে যখন কোনো নিরীহ পান্থ জানলার বাহির হইতে আমাকে পথ জিজ্ঞাসা করে, আমি তাহাকে জাহান্নম নামক একটা অস্থানে যাইতে অনুরোধ করি। হায়, কেহই বুঝিত না, আমি খুব একটা মজার প্রহসন লিখিতেছি।

কিন্তু যতটা মজা এবং যতটা যশ হইতেছিল সে পরিমাণে টাকা কিছুই হয় নাই। তখন টাকার কথা মনেও ছিল না। এদিকে প্রভার যোগ্য পাত্রগুলি অন্য ভদ্রলোকদের কন্যাদায় মোচন করিবার জন্য গোকুলে বাড়িতে লাগিল, আমার তাহাতে খেয়াল ছিল না।

পেটের জ্বালা না ধরিলে চৈতন্য হইত না, কিন্তু এমন সময় একটা সুযোগ জুটিয়া গেল। জাহিরগ্রামের এক জমিদার একখানি কাগজ বাহির করিয়া আমাকে তাহার বেতনভোগী সম্পাদক হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন। কাজটা স্বীকার করিলাম। দিনকতক এমনি প্রতাপের সহিত লিখিতে লাগিলাম যে, পথে বাহির হইলে লোকে আমাকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইত এবং আপনাকে মধ্যাহ্নতপনের মতো দুর্নিরীক্ষ্য বলিয়া বোধ হইত।

জাহিরগ্রামের পার্শ্বে আহিরগ্রাম। দুই গ্রামের জমিদারে ভারি দলাদলি। পূর্বে কথায় কথায় লাঠালাঠি হইত। এখন উভয় পক্ষে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট মুচলেকা দিয়া লাঠি বন্ধ করিয়াছে এবং কৃষ্ণের জীব আমাকে পূর্ববর্তী খুনি লাঠিয়ালদের স্থানে নিযুক্ত করিয়াছে। সকলেই বলিতেছে আমি পদমর্যাদা রক্ষা করিয়াছি।

আমার লেখার জ্বালায় আহিরগ্রাম আর মাথা তুলিতে পারে না। তাহাদের জাতিকুল পূর্বপুরুষের ইতিহাস সমস্ত আদ্যোপান্ত মসীলিপ্ত করিয়া দিয়াছি।

এই সময়টা ছিলাম ভালো। বেশ মোটাসোটা হইয়া উঠিলাম। মুখ সর্বদা প্রসন্ন হাস্যময় ছিল। আহিরগ্রামের পিতৃপুরুষদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এক একটা মর্মান্তিক বাক্যশেল ছাড়িতাম; আর সমস্ত জাহিরগ্রাম হাসিতে হাসিতে পাকা ফুটির মতো বিদীর্ণ হইয়া যাইত। বড়ো আনন্দে ছিলাম।

অবশেষে আহিরগ্রামও একখানা কাগজ বাহির করিল। সে কোনো কথা ঢাকিয়া বলিত না। এমনি উৎসাহের সহিত অবিমিশ্র প্রচলিত ভাষায় গাল পাড়িত যে, ছাপার অক্ষরগুলা পর্যন্ত যেন চক্ষের সমক্ষে চীৎকার করিতে থাকিত। এই জন্য দুই গ্রামের লোকেই তাহার কথা খুব স্পষ্ট বুঝিতে পারিত।

কিন্তু আমি চিরাভ্যাসবশত এমনি মজা করিয়া এত কূটকৌশল সহকারে বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিতাম যে, শত্রু মিত্র কেহই বুঝিতে পারিত না আমার কথার মর্মটা কী।

তাহার ফল হইল এই, জিত হইলেও সকলে মনে করিত আমার হার হইল। দায়ে পড়িয়া সুরুচি সম্বন্ধে একটি উপদেশ লিখিলাম। দেখিলাম ভারি ভুল করিয়াছি; কারণ, যথার্থ ভালো জিনিসকে যেমন বিদ্রূপ করিবার সুবিধা, এমন উপহাস্য বিষয়কে নহে। হনুবংশীয়েরা মনুবংশীয়দের যেমন সহজে বিদ্রূপ করিতে পারে, মনুবংশীয়েরা হনুবংশীয়দিগকে বিদ্রূপ করিয়া কখনো তেমন কৃতকার্য হইতে পারে না। সুতরাং সুরুচিকে তাহারা দন্তোন্মীলন করিয়া দেশছাড়া করিল।

আমার প্রভু আমার প্রতি আর তেমন সমাদর করেন না। সভাস্থলেও আমার কোনো সম্মান নাই। পথে বাহির হইলে লোকে গায়ে পড়িয়া আলাপ করিতে আসে না। এমন কি আমাকে দেখিয়া কেহ কেহ হাসিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ইতিমধ্যে আমার প্রহসনগুলার কথাও লোকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছে। হঠাৎ বোধ হইল, আমি যেন একটা দেশালায়ের কাঠি; মিনিটখানেক জ্বলিয়া একেবারে শেষ পর্যন্ত পুড়িয়া গিয়াছি।

মন এমনি নিরুৎসাহ হইয়া গেল মাথা খুঁড়িয়া মরিলে এক লাইন লেখা বাহির হয় না। মনে হইতে লাগিল বাঁচিয়া কোনো সুখ নাই।

প্রভা আমাকে এখন ভয় করে। বিনা আহ্বানে সহসা কাছে আসিতে সাহস করে না। সে বুঝিতে পারিয়াছে, মজার কথা লিখিতে পারে এমন বাবার চেয়ে মাটির পুতুল ঢের ভালো সঙ্গী।

একদিন দেখা গেল আমাদের আহিরগ্রামপ্রকাশ জমিদারকে ছাড়িয়া আমাকে লইয়া পড়িয়াছে। গোটাকতক অত্যন্ত কুৎসিত কথা লিখিয়াছে। আমার পরিচিত বন্ধুবান্ধবেরা একে একে সকলেই সেই কাগজখানা লইয়া হাসিতে হাসিতে আমাকে শুনাইয়া গেল। কেহ কেহ বলিল, ইহার বিষয়টা যেমনই হউক, ভাষার বাহাদুরি আছে। অর্থাৎ গালি যে দিয়াছে তাহা ভাষা দেখিলেই পরিষ্কার বুঝা যায়। সমস্ত দিন ধরিয়া বিশজনের কাছে ওই এক কথা শুনিলাম।

আমার বাসার সম্মুখে একটু বাগানের মতো ছিল। সন্ধ্যাবেলায় নিতান্ত পীড়িতচিত্তে সেইখানে একাকী বেড়াইতেছিলাম। পাখিরা নীড়ে ফিরিয়া আসিয়া যখন কলরব বন্ধ করিয়া স্বচ্ছন্দে সন্ধ্যার শান্তির মধ্যে আত্মসমর্পণ করিল, তখন বেশ বুঝিতে পারিলাম পাখিদের মধ্যে রসিক লেখকের দল নাই, এবং সুরুচি লইয়া তর্ক হয় না।

মনের মধ্যে কেবলই ভাবিতেছি কী উত্তর দেওয়া যায়। ভদ্রতার একটা বিশেষ অসুবিধা এই যে, সকল স্থানের লোকে তাহাকে বুঝিতে পারে না। অভদ্রতার ভাষা অপেক্ষাকৃত পরিচিত, তাই ভাবিতেছিলাম সেই রকম ভাবের একটা মুখের মতো জবাব লিখিতে হইবে। কিছুতেই হার মানিতে পারিব না। এমন সময়ে সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে একটি পরিচিত ক্ষুদ্র কণ্ঠের স্বর শুনিতে পাইলাম এবং তাহার পরেই আমার করতলে একটি কোমল উষ্ণ স্পর্শ অনুভব করিলাম। এত উদ্বেজিত অন্যমনস্ক ছিলাম যে, সেই মুহূর্তে সেই স্বর ও সেই স্পর্শ জানিয়াও জানিতে পারিলাম না।

কিন্তু এক মুহূর্ত পরেই সেই স্বর ধীরে ধীরে আমার কর্ণে জাগ্রত, সেই সুধাস্পর্শ আমার করতলে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। বালিকা একবার আস্তে আস্তে কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে ডাকিয়াছিল, "বাবা"। কোনো উত্তর না পাইয়া আমার দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া ধরিয়া একবার আপনার কোমল কপোলে বুলাইয়া আবার ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিয়া যাইতেছে।

বহুদিন প্রভা আমাকে এমন করিয়া ডাকে নাই এবং স্বেচ্ছাক্রমে আসিয়া আমাকে এতটুকু আদর করে নাই। তাই আজ সেই স্নেহস্পর্শে আমার হৃদয় সহসা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে ঘরে ফিরিয়া গিয়া দেখিলাম প্রভা বিছানায় শুইয়া আছে। শরীর ক্লিষ্টচ্ছবি, নয়ন ঈষৎ নিমীলিত; দিনশেষের ঝরিয়া-পড়া ফুলের মতো পড়িয়া আছে।

মাথায় হাত দিয়া দেখি অত্যন্ত উষ্ণ; উত্তপ্ত নিশ্বাস পড়িতেছে; কপালের শির দপ দপ করিতেছে।

বুঝিতে পারিলাম, বালিকা আসন্ন রোগের তাপে কাতর হইয়া পিপাসিত হৃদয়ে একবার পিতার স্নেহ পিতার আদর লইতে গিয়াছিল, পিতা তখন জাহিরপ্রকাশের জন্য খুব একটা কড়া জবাব কল্পনা করিতেছিল।

পাশে আসিয়া বসিলাম। বালিকা কোনো কথা না বলিয়া তাহার দুই জ্বরতপ্ত করতলের মধ্যে আমার হস্ত টানিয়া লইয়া তাহার উপরে কপোল রাখিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

জাহিরগ্রাম এবং আহিরগ্রামের যত কাগজ ছিল সমস্ত পুড়াইয়া ফেলিলাম। কোনো জবাব লেখা হইল না। হার মানিয়া এতসুখ কখনো হয় নাই।

বালিকার যখন মাতা মরিয়াছিল তখন তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়াছিলাম, আজ তাহার বিমাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া আবার তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া ঘরে চলিয়া গেলাম।

বৈশাখ, ১৩০০

মধ্যবর্তিনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিবারণের সংসার নিতান্তই সচরাচর রকমের, তাহাতে কাব্যরসের কোনো নামগন্ধ ছিল না। জীবনে উক্ত রসের যে কোনো আবশ্যক আছে, এমন কথা তাহার মনে কখনো উদয় হয় নাই। যেমন পরিচিত পুরাতন চটি-জোড়াটার মধ্যে পা দুটো দিব্য নিশ্চিন্তভাবে প্রবেশ করে, এই পুরাতন পৃথিবীটার মধ্যে নিবারণ সেইরূপ আপনার চিরাভ্যস্ত স্থানটি অধিকার করিয়া থাকে, সে সম্বন্ধে ভ্রমেও কোনোরূপ চিন্তা তর্ক বা তত্ত্বালোচনা করে না।

নিবারণ প্রাতঃকালে উঠিয়া গলির ধারে গৃহদ্বারে খোলাগায়ে বসিয়া অত্যন্ত নিরুদ্বিগ্নভাবে হুঁকাটি লইয়া তামাক খাইতে থাকে। পথ দিয়া লোকজন যাতায়াত করে, গাড়ি ঘোড়া চলে, বৈষ্ণব-ভিখারি গান গাহে, পুরাতন বোতল সংগ্রহকারী হাঁকিয়া চলিয়া যায়; এই সমস্ত চঞ্চল দৃশ্য মনকে লঘুভাবে ব্যাপৃত রাখে এবং যেদিন

কাঁচা আম অথবা তপসি-মাছওয়ালা আসে, সেদিন অনেক দরদাম করিয়া কিঞ্চিৎ বিশেষরূপ রন্ধনের আয়োজন হয়। তাহার পর যথাসময়ে তেল মাখিয়া স্নান করিয়া আহারান্তে দড়িতে ঝুলানো চাপকানটি পরিয়া এক ছিলিম তামাক পানের সহিত নিঃশেষপূর্বক আর একটি পান মুখে পুরিয়া, আপিসে যাত্রা করে। আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া সন্ধ্যাবেলাটা প্রতিবেশী রামলোচন ঘোষের বাড়িতে প্রশান্ত গম্ভীর ভাবে সন্ধ্যাযাপন করিয়া আহারান্তে রাত্রে শয়নগৃহে স্ত্রী হরসুন্দরীর সহিত সাক্ষাৎ হয়।

সেখানে মিত্রদের ছেলের বিবাহে আইবড় ভাত পাঠানো, নবনিযুক্ত ঝির অবাধ্যতা, ছেঁচকিবিশেষে ফোড়নবিশেষের উপযোগিতা সম্বন্ধে যে সমস্ত সংক্ষিপ্ত সমালোচনা চলে তাহা এ পর্যন্ত কোনো কবি ছন্দোবদ্ধ করেন নাই, এবং সেজন্য নিবারণের মনে কখনো ক্ষোভের উদয় হয় নাই।

ইতিমধ্যে ফাল্গুন মাসে হরসুন্দরীর সংকট পীড়া উপস্থিত হইল। জ্বর আর কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না। ডাক্তার যতই কুইনাইন দেয়, বাধাপ্রাপ্ত প্রবল স্রোতের ন্যায় জ্বরও তত ঊর্ধ্বে চড়িতে থাকে। এমনি বিশ দিন, বাইশ দিন, চল্লিশ দিন পর্যন্ত ব্যাধি চলিল।

নিবারণের আপিস বন্ধ; রামলোচনের বৈকালিক সভায় বহুকাল আর সে যায় না; কী যে করে তাহার ঠিক নাই। একবার শয়নগৃহে গিয়া রোগীর অবস্থা জানিয়া আসে, একবার বাহিরের বারান্দায় বসিয়া চিন্তিত মুখে তামাক টানিতে থাকে। দুইবেলা ডাক্তার-বৈদ্য পরিবর্তন করে এবং যে যাহা বলে সেই সেই ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাহে।

ভালোবাসার এইরূপ অব্যবস্থিত শুশ্রূষা সত্ত্বেও চল্লিশ দিনে হরসুন্দরী ব্যাধিমুক্ত হইল। কিন্তু এমনি দুর্বল এবং শীর্ণ হইয়া গেল যে, শরীরটি যেন বহুদূর হইতে অতি ক্ষীণস্বরে 'আছি' বলিয়া সাড়া দিতেছে মাত্র।

তখন বসন্তকালে দক্ষিণের হাওয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং উষ্ণ নিশীথের চন্দ্রালোকও সীমন্তিনীদের উন্মুক্ত শয়নকক্ষে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে।

হরসুন্দরীর ঘরের নিচেই প্রতিবেশীদের খিড়কির বাগান। সেটা যে বিশেষ কিছু সুদৃশ্য রমণীয় স্থান তাহা বলিতে পারি না। এক সময় কে একজন শখ করিয়া গোটাকতক ক্রোটন রোপণ করিয়াছিল, তার পরে আর সেদিকে বড়ো একটা দৃক্‌পাত করে নাই। শুষ্ক ডালের মাচার উপর কুষ্মাণ্ডলতা উঠিয়াছে; বৃদ্ধ কুলগাছের তলায় বিষম জঙ্গল; রান্নাঘরের পাশে প্রাচীর ভাঙিয়া কতকগুলো ইট জড়ো হইয়া

আছে এবং তাহারই সহিত দগ্ধাবশিষ্ট পাথুরে কয়লা এবং ছাই দিন দিন রাশীকৃত হইয়া উঠিতেছে।

কিন্তু বাতায়নতলে শয়ন করিয়া এই বাগানের দিকে চাহিয়া হরসুন্দরী প্রতিমুহূর্তে যে একটি আনন্দরস পান করিতে লাগিল, তাহার অকিঞ্চিৎকর জীবনে এমন সে আর কখনো করে নাই। গ্রীষ্মকালে স্রোতোবেগ মন্দ হইয়া ক্ষুদ্র গ্রাম্যনদীটি যখন বালুশয্যার উপরে শীর্ণ হইয়া আসে তখন সে যেমন অত্যন্ত স্বচ্ছতা লাভ করে; তখন যেমন প্রভাতের সূর্যালোক তাহার তলদেশ পর্যন্ত কম্পিত হইতে থাকে, বায়ুস্পর্শ তাহার সর্বাঙ্গ পুলকিত করিয়া তোলে, এবং আকাশের তারা তাহার স্ফটিকদর্পণের উপর সুখস্মৃতির ন্যায় অতি সুস্পষ্টভাবে প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি হরসুন্দরীর ক্ষীণ জীবনতন্তুর উপর আনন্দময়ী প্রকৃতির প্রত্যেক অঙ্গুলি যেন স্পর্শ করিতে লাগিল এবং অন্তরের মধ্যে যে একটি সংগীত উঠিতে লাগিল তাহার ঠিক ভাবটি সে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিল না।

এমন সময় তাহার স্বামী যখন পাশে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিত 'কেমন আছ', তখন তাহার চোখে যেন জল উছলিয়া উঠিত। রোগশীর্ণ মুখে তাহার চোখ দুটি অত্যন্ত বড়ো দেখায়, সেই বড়ো বড়ো প্রেমার্দ্র সকৃতজ্ঞ চোখ স্বামীর মুখের দিকে তুলিয়া শীর্ণহস্তে স্বামীর হস্ত ধরিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিত, স্বামীর অন্তরেও যেন কোথা হইতে একটা নূতন অপরিচিত আনন্দরশ্মি প্রবেশ লাভ করিত।

এই ভাবে কিছুদিন যায়। একদিন রাত্রে ভাঙা প্রাচীরের উপরিবর্তী খর্ব অশথ-গাছের কম্পমান শাখান্তরাল হইতে একখানি বৃহৎ চাঁদ উঠিতেছে এবং সন্ধ্যাবেলাকার গুমট ভাঙিয়া হঠাৎ একটা নিশাচর বাতাস জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময় নিবারণের চুলের মধ্যে অঙ্গুলি বুলাইতে বুলাইতে হরসুন্দরী কহিল, "আমাদের তো ছেলেপুলে কিছুই হইল না, তুমি আর একটি বিবাহ করো।"

হরসুন্দরী কিছুদিন হইতে এই কথা ভাবিতেছিল। মনে যখন একটা প্রবল আনন্দ, একটা বৃহৎ প্রেমের সঞ্চার হয় তখন মানুষ মনে করে আমি সব করিতে পারি। তখন হঠাৎ একটা আত্মবিসর্জনের ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে। স্রোতের উচ্ছ্বাস যেমন কঠিন তটের উপর আপনাকে সবেগে মূর্ছিত করে, তেমনি প্রেমের আবেগ, আনন্দের উচ্ছ্বাস একটা মহৎ ত্যাগ একটা বৃহৎ দুঃখের উপর আপনাকে যেন নিক্ষেপ করিতে চাহে।

সেইরূপ অবস্থায় অত্যন্ত পুলকিত চিত্তে একদিন হরসুন্দরী স্থির করিল, আমার স্বামীর জন্য আমি খুব বড়ো একটা কিছু করিব। কিন্তু হায়, যতখানি সাধ ততখানি

সাধ্য কাহার আছে। হাতের কাছে কী আছে, কী দেওয়া যায়। ঐশ্বর্য নাই, বুদ্ধি নাই, ক্ষমতা নাই, শুধু একটা প্রাণ আছে, সেটাও যদি কোথাও দিবার থাকে এখনই দিয়া ফেলি, কিন্তু তাহারই বা মূল্য কী।

আর স্বামীকে যদি দুগ্ধফেনের মতো শুভ্র, নবনীর মতো কোমল, শিশুকন্দর্পের মতো সুন্দর একটি স্নেহের পুত্তলি সন্তান দিতে পারিতাম। কিন্তু প্রাণপণে ইচ্ছা করিয়া মরিয়া গেলেও তো সে হইবে না। তখন মনে হইল, স্বামীর একটি বিবাহ দিতে হইবে। ভাবিল, স্ত্রীরা ইহাতে এত কাতর হয় কেন, এ কাজ তো কিছুই কঠিন নহে। স্বামীকে যে ভালোবাসে, সপত্নীকে ভালোবাসা তাহার পক্ষে কী এমন অসাধ্য। মনে করিয়া বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল।

প্রস্তাবটা প্রথম যখন শুনিল, নিবারণ হাসিয়া উড়াইয়া দিল, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারও কর্ণপাত করিল না। স্বামীর এই অসম্মতি এই অনিচ্ছা দেখিয়া হরসুন্দরীর বিশ্বাস এবং সুখ যতই বাড়িয়া উঠিল তাহার প্রতিজ্ঞাও ততই দৃঢ় হইতে লাগিল।

এদিকে নিবারণ যত বারংবার এই অনুরোধ শুনিল, ততই ইহার অসম্ভাব্যতা তাহার মন হইতে দূর হইল এবং গৃহদ্বারে বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে সন্তানপরিবৃত গৃহের সুখময় চিত্র তাহার মনে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল।

একদিন নিজেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া কহিল, "বুড়াবয়সে একটি কচি খুকীকে বিবাহ করিয়া আমি মানুষ করিতে পারিব না।"

হরসুন্দরী কহিল, "সেজন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না। মানুষ করিবার ভার আমার উপর রহিল।" বলিতে বলিতে এই সন্তানহীনা রমণীর মনে একটি কিশোরবয়স্কা, সুকুমারী, লজ্জাশীলা, মাতৃক্রোড় হইতে সদ্যোবিচ্যুতা নববধূর মুখচ্ছবি উদয় হইল এবং হৃদয় স্নেহে বিগলিত হইয়া গেল।

নিবারণ কহিল, "আমার আপিস আছে, কাজ আছে, তুমি আছ, কচি মেয়ের আবদার শুনিবার অবসর আমি পাইব না।"

হরসুন্দরী বারবার করিয়া কহিল, তাহার জন্য কিছুমাত্র সময় নষ্ট করিতে হইবে না এবং অবশেষে পরিহাস করিয়া কহিল, "আচ্ছা গো, তখন দেখিব কোথায় বা তোমার কাজ থাকে, কোথায় বা আমি থাকি, আর কোথায় বা তুমি থাক।"

নিবারণ সে-কথার উত্তরমাত্র দেওয়া আবশ্যক মনে করিল না, শাস্তির স্বরূপ হরসুন্দরীর কপোলে হাসিয়া তর্জনী আঘাত করিল। এই তো গেল ভূমিকা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একটি নোলকপরা অশ্রুভরা ছোটোখাটো মেয়ের সহিত নিবারণের বিবাহ হইল, তাহার নাম শৈলবালা।

নিবারণ ভাবিল, নামটি বড়ো মিষ্ট এবং মুখখানিও বেশ ঢলোঢলো। তাহার ভাবখানা, তাহার চেহারাখানি, তাহার চলাফেরা একটু বিশেষ মনোযোগ করিয়া চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু সে আর কিছুতেই হইয়া উঠে না। উল্‌টিয়া এমন ভাব দেখাইতে হয় যে, ওই তো একফোঁটা মেয়ে, উহাকে লইয়া তো বিষম বিপদে পড়িলাম, কোনোমতে পাশ কাটাইয়া আমার বয়সোচিত কর্তব্যক্ষেত্রের মধ্যে গিয়া পড়িলে যেন পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

হরসুন্দরী নিবারণের এই বিষম বিপদগ্রস্ত ভাব দেখিয়া মনে মনে বড়ো আমোদ বোধ করিত। এক একদিন হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিত, "আহা, পালাও কোথায়। ওইটুকু মেয়ে, ও তো আর তোমাকে খাইয়া ফেলিবে না।"

নিবারণ দ্বিগুণ শশব্যস্ত ভাব ধারণ করিয়া বলিত, "আরে রসো রসো, আমার একটু বিশেষ কাজ আছে।" বলিয়া যেন পালাইবার পথ পাইত না। হরসুন্দরী হাসিয়া দ্বার আটক করিয়া বলিত, আজ ফাঁকি দিতে পারিবে না। অবশেষে নিবারণ নিতান্তই নিরুপায় হইয়া কাতরভাবে বসিয়া পড়িত।

হরসুন্দরী তাহার কানের কাছে বলিত, "আহা পরের মেয়েকে ঘরে আনিয়া অমন হতশ্রদ্ধা করিতে নাই।"

এই বলিয়া শৈলবালাকে ধরিয়া নিবারণের বাম পাশে বসাইয়া দিত এবং জোর করিয়া ঘোমটা খুলিয়া ও চিবুক ধরিয়া তাহার আনত মুখ তুলিয়া নিবারণকে বলিত, "আহা কেমন চাঁদের মতো মুখখানি দেখো দেখি।"

কোনোদিন বা উভয়কে ঘরে বসাইয়া কাজ আছে বলিয়া উঠিয়া যাইত এবং বাহির হইতে ঝনাৎ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিত। নিবারণ নিশ্চয় জানিত দুটি কৌতূহলী চক্ষু কোনো-না-কোনো ছিদ্রে সংলগ্ন হইয়া আছে—অতিশয় উদাসীনভাবে পাশ ফিরিয়া নিদ্রার উপক্রম করিত, শৈলবালা ঘোমটা টানিয়া গুটিসুটি মারিয়া মুখ ফিরাইয়া একটা কোণের মধ্যে মিলাইয়া থাকিত।

অবশেষে হরসুন্দরী নিতান্ত না পারিয়া হাল ছাড়িয়া দিল, কিন্তু খুব বেশি দুঃখিত হইল না।

হরসুন্দরীর যখন হাল ছাড়িল, তখন স্বয়ং নিবারণ হাল ধরিল। এ বড়ো কৌতূহল,

এ বড়ো রহস্য। এক টুকরা হীরক পাইলে তাহাকে নানাভাবে নানাদিকে ফিরাইয়া দেখিতে ইচ্ছা করে, আর এ একটি ক্ষুদ্র সুন্দর মানুষের মন—বড়ো অপূর্ব। ইহাকে কতরকম করিয়া স্পর্শ করিয়া সোহাগ করিয়া অন্তরাল হইতে, সম্মুখ হইতে, পার্শ্ব হইতে দেখিতে হয়। কখনো একবার কানের দুলে দোল দিয়া, কখনো ঘোমটা একটুখানি টানিয়া তুলিয়া, কখনো বিদ্যুতের মতো সহসা সচকিতে, কখনো নক্ষত্রের মতো দীর্ঘকাল একদৃষ্টে নব নব সৌন্দর্যের সীমা আবিষ্কার করিতে হয়।

ম্যাক্‌মোরান্ কোম্পানির আপিসের হেডবাবু শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্রের অদৃষ্টে এমন অভিজ্ঞতা ইতিপূর্বে হয় নাই। সে যখন প্রথম বিবাহ করিয়াছিল তখন বালক ছিল, যখন যৌবন লাভ করিল তখন স্ত্রী তাহার নিকট চিরপরিচিত, বিবাহিত জীবন চিরাভ্যস্ত। হরসুন্দরীকে অবশ্যই সে ভালোবাসিত, কিন্তু কখনোই তাহার মনে ক্রমে ক্রমে প্রেমের সচেতন সঞ্চার হয় নাই।

একেবারে পাকা আম্রের মধ্যেই যে পতঙ্গ জন্মলাভ করিয়াছে, যাহাকে কোনো কালে রস অন্বেষণ করিতে হয় নাই, অল্পে অল্পে রসাস্বাদ করিতে হয় নাই, তাহাকে একবার বসন্তকালের বিকশিত পুষ্পবনের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হউক দেখি—বিকচোন্মুখ গোলাপের আধখোলা মুখটির কাছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার কী আগ্রহ। একটুকু যে সৌরভ পায়, একটুকু যে মধুর আস্বাদ লাভ করে তাহাতে তাহার কী নেশা।

নিবারণ প্রথমটা কখনো বা একটা গাউনপরা কাঁচের পুতুল কখনো বা এক শিশি এসেন্স, কখনো বা কিছু মিষ্টদ্রব্য কিনিয়া আনিয়া শৈলবালাকে গোপনে দিয়া যাইত। এমনি করিয়া একটুখানি ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হয়। অবশেষে কখন একদিন হরসুন্দরী গৃহকার্যের অবকাশে আসিয়া দ্বারের ছিদ্র দিয়া দেখিল, নিবারণ এবং শৈলবালা বসিয়া কড়ি লইয়া দশ-পঁচিশ খেলিতেছে।

বুড়াবয়সের এই খেলা বটে। নিবারণ সকালে আহারাদি করিয়া যেন আপিসে বাহির হইল কিন্তু আপিসে না গিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে। এ প্রবঞ্চনার কী আবশ্যক ছিল। হঠাৎ একটা জ্বলন্ত বজ্রশলাকা দিয়া কে যেন হরসুন্দরীর চোখ খুলিয়া দিল, সেই তীব্রতাপে চোখের জল বাষ্প হইয়া শুকাইয়া গেল।

হরসুন্দরী মনে মনে কহিল, আমিই তো উহাকে ঘরে আনিলাম, আমিই তো মিলন করাইয়া দিলাম, তবে আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার কেন—যেন আমি উহাদের সুখের কাঁটা।

হরসুন্দরী শৈলবালাকে গৃহকার্য শিখাইত। একদিন নিবারণ মুখ ফুটিয়া বলিল, "ছেলে-মানুষ, উহাকে তুমি বড়ো বেশি পরিশ্রম করাইতেছ, উহার শরীর তেমন সবল নহে।"

বড়ো একটা তীব্র উত্তর হরসুন্দরীর মুখের কাছে আসিয়াছিল ; কিন্তু কিছু বলিল না, চুপ করিয়া গেল।

সেই অবধি বউকে কোনো গৃহকার্যে হাত দিতে দিত না ; রাঁধাবাড়া দেখাশুনা সমস্ত কাজ নিজে করিত। এমন হইল, শৈলবালা আর নড়িয়া বসিতে পারে না, হরসুন্দরী দাসীর মতো তাহার সেবা করে এবং স্বামী বিদূষকের মতো তাহার মনোরঞ্জন করে। সংসারের কাজ করা, পরের দিকে তাকানো যে জীবনের কর্তব্য এ শিক্ষাই তাহার হইল না।

হরসুন্দরী যে নীরবে দাসীর মতো কাজ করিতে লাগিল তাহার মধ্যে ভারি একটা গর্ব আছে। তাহার মধ্যে ন্যূনতা এবং দীনতা নাই। সে কহিল, তোমরা দুই শিশুতে মিলিয়া খেলা করো, সংসারের সমস্ত ভার আমি লইলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হায়, আজ কোথায় সে বল, যে বলে হরসুন্দরী মনে করিয়াছিল স্বামীর জন্য চিরজীবনকাল সে আপনার প্রেমের দাবির অর্ধেক অংশ অকাতরে ছাড়িয়া দিতে পারিবে। হঠাৎ একদিন পূর্ণিমার রাত্রে জীবনে যখন জোয়ার আসে, তখন দুই কূল প্লাবিত করিয়া মানুষ মনে করে, আমার কোথাও সীমা নাই। তখন যে একটা বৃহৎ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে, জীবনের সুদীর্ঘ ভাঁটার সময় সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে তাহার সমস্ত প্রাণে টান পড়ে। হঠাৎ ঐশ্বর্যের দিনে লেখনীর এক আঁচড়ে যে দানপত্র লিখিয়া দেয়, চির দারিদ্র্যের দিনে পলে পলে তিল তিল করিয়া তাহা শোধ করিতে হয়। তখন বুঝা যায় মানুষ বড়ো দীন, হৃদয় বড়ো দুর্বল, তাহার ক্ষমতা অতি যৎসামান্য।

দীর্ঘ রোগাবসানে ক্ষীণ, রক্তহীন, পাণ্ডু কলেবরে হরসুন্দরী সেদিন শুক্ল দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো একটি শীর্ণ রেখামাত্র ছিল ; সংসারে নিতান্ত লঘু হইয়া ভাসিতেছিল। মনে হইয়াছিল আমার যেন কিছুই না হইলেও চলে। ক্রমে শরীর বলী হইয়া উঠিল, রক্তের তেজ বাড়িতে লাগিল, তখন হরসুন্দরীর মনে কোথা হইতে একদল শরিক আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহারা উচ্চৈঃস্বরে কহিল, তুমি তো ত্যাগপত্র লিখিয়া বসিয়া আছ কিন্তু আমাদের দাবি আমরা ছাড়িব না।

হরসুন্দরী যেদিন প্রথম পরিষ্কাররূপে আপন অবস্থা বুঝিতে পারিল, সেদিন নিবারণ ও শৈলবালাকে আপন শয়নগৃহ ছাড়িয়া দিয়া ভিন্ন গৃহে একাকিনী গিয়া শয়ন করিল।

আট বৎসর বয়সে বাসররাত্রে যে-শয্যায় প্রথম শয়ন করিয়াছিল, আজ সাতাশ বৎসর পরে সেই শয্যা ত্যাগ করিল। প্রদীপ নিভাইয়া দিয়া এই সধবা রমণী যখন অসহ্য হৃদয়ভার লইয়া তাহার নূতন বৈধব্যশয্যার উপরে আসিয়া পড়িল, তখন গলির অপর প্রান্তে একজন শৌখিন যুবা বেহাগ রাগিণীতে মালিনীর গান গাহিতেছিল; আর একজন বাঁয়া-তবলায় সংগত করিতেছিল এবং শ্রোতৃবন্ধুগণ সমের কাছে হাঃ-হাঃ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল।

তাহার সেই গান সেই নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নারাত্রে পার্শ্বের ঘরে মন্দ শুনাইতেছিল না। তখন বালিকা শৈলবালার ঘুমে চোখ ঢুলিয়া পড়িতেছিল, আর নিবারণ তাহার কানের কাছে মুখ রাখিয়া ধীরে ধীরে ডাকিতেছিল, সই।

লোকটা ইতিমধ্যে বঙ্কিমবাবুর চন্দ্রশেখর পড়িয়া ফেলিয়াছে এবং দুই-একজন আধুনিক কবির কাব্যও শৈলবালাকে পড়িয়া শুনাইয়াছে।

নিবারণের জীবনের নিম্নস্তরে যে একটি যৌবন-উৎস বরাবর চাপা পড়িয়া ছিল, আঘাত পাইয়া হঠাৎ বড়ো অসময়ে তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কেহই সেজন্য প্রস্তুত ছিল না, এই হেতু অকস্মাৎ তাহার বুদ্ধিশুদ্ধি এবং সংসারের সমস্ত বন্দোবস্ত উলটাপালটা হইয়া গেল। সে বেচারা কোনোকালে জানিত না মানুষের ভিতরে এমন সকল উপদ্রবজনক পদার্থ থাকে, এমন সকল দুর্দাম দুরন্ত শক্তি, যাহা সমস্ত হিসাবকিতাব শৃঙ্খলা-সামঞ্জস্য একেবারে নয়ছয় করিয়া দেয়।

কেবল নিবারণ নহে, হরসুন্দরীও একটা নূতন বেদনার পরিচয় পাইল। এ কিসের আকাঙ্ক্ষা, এ কিসের দুঃসহ যন্ত্রণা। মন এখন যাহা চায়, কখনো তো তাহা চাহেও নাই, কখনো তো তাহা পায়ও নাই। যখন ভদ্রভাবে নিবারণ নিয়মিত আপিসে যাইত, যখন নিদ্রার পূর্বে কিয়ৎকালের জন্য গয়লার হিসাব, দ্রব্যের মহার্ঘতা এবং লৌকিকতার কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা চলিত, তখন তো এই অন্তর্বিপ্লবের কোনো সূত্রপাতমাত্র ছিল না। ভালোবাসিত বটে, কিন্তু তাহার তো কোনো উজ্জ্বলতা কোনো উত্তাপ ছিল না। সে ভালোবাসা অপ্রজ্বলিত ইন্ধনের মতো ছিল মাত্র।

আজ তাহার মনে হইল, জীবনের সফলতা হইতে যেন চিরকাল কে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছে। তাহার হৃদয় যেন চিরদিন উপবাসী হইয়া আছে। তাহার এই নারীজীবন বড়ো দারিদ্র্যেই কাটিয়াছে। সে কেবল হাটবাজার পানমসলা তরিতরকারির ঝঞ্চাট লইয়াই সাতাশটা অমূল্য বৎসর দাসীবৃত্তি করিয়া কাটাইল, আর আজ জীবনের মধ্যপথে আসিয়া দেখিল তাহারই শয়নকক্ষের পার্শ্বে এক গোপন মহামহৈশ্বর্যভাণ্ডারের কুলুপ খুলিয়া একটি ক্ষুদ্র বালিকা একেবারে রাজরাজেশ্বরী হইয়া বসিল। নারী দাসী

ঘটে, কিন্তু সেই সঙ্গে নারী রানীও বটে। কিন্তু ভাগাভাগি করিয়া একজন নারী হইল দাসী, আর একজন নারী হইল রানী; তাহাতে দাসীর গৌরব গেল, রানীর সুখ রহিল না।

কারণ, শৈলবালাও নারী-জীবনের যথার্থ সুখের স্বাদ পাইল না। এত অবিশ্রাম আদর পাইল যে, ভালোবাসিবার আর মুহূর্ত অবসর রহিল না। সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হইয়া, সমুদ্রের মধ্যে আত্মবিসর্জন করিয়া বোধ করি নদীর একটি মহৎ চরিতার্থতা আছে, কিন্তু সমুদ্র যদি জোয়ারের টানে আকৃষ্ট হইয়া ক্রমাগতই নদীর উন্মুখীন হইয়া রহে, তবে নদী কেবল নিজের মধ্যেই নিজে স্ফীত হইতে থাকে। সংসার তাহার সমস্ত আদর সোহাগ লইয়া দিবারাত্রি শৈলবালার দিকে অগ্রসর হইয়া রহিল, তাহাতে শৈলবালার আত্মাদর অতিশয় উত্তুঙ্গ হইয়া উঠিতে লাগিল, সংসারের প্রতি তাহার ভালোবাসা পড়িতে পাইল না। সে জানিল, আমার জন্যই সমস্ত এবং আমি কাহার জন্যও নহি। এ অবস্থায় যথেষ্ট অহংকার আছে কিন্তু পরিতৃপ্তি কিছুই নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

একদিন ঘনঘোর মেঘ করিয়া আসিয়াছে। এমনি অন্ধকার করিয়াছে যে, ঘরের মধ্যে কাজকর্ম করা অসাধ্য। বাহিরে ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। কুলগাছের তলায় লতাগুল্মের জঙ্গল জলে প্রায় নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে এবং প্রাচীরের পার্শ্ববর্তী নালা দিয়া ঘোলা জলস্রোত কলকল শব্দে বহিয়া চলিয়াছে। হরসুন্দরী আপনার নূতন শয়নগৃহের নির্জন অন্ধকারে জানলার কাছে চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

এমন সময় নিবারণ চোরের মতো ধীরে ধীরে দ্বারের কাছে প্রবেশ করিল, ফিরিয়া যাইবে কি অগ্রসর হইবে ভাবিয়া পাইল না। হরসুন্দরী তাহা লক্ষ্য করিল কিন্তু একটি কথাও কহিল না।

তখন নিবারণ হঠাৎ একেবারে তীরের মতো হরসুন্দরীর পার্শ্বে গিয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, "গোটাকতক গহনার আবশ্যক হইয়াছে। জান তো অনেকগুলো দেনা হইয়া পড়িয়াছে, পাওনাদার বড়োই অপমান করিতেছে—কিছু বন্ধক রাখিতে হইবে—শীঘ্রই ছাড়াইয়া লইতে পারিব।"

হরসুন্দরী কোনো উত্তর দিল না, নিবারণ চোরের মতো দাঁড়াইয়া রহিল। অবশেষে পুনশ্চ কহিল, "তবে কি আজ হইবে না।"

হরসুন্দরী কহিল, "না।"

ঘরে প্রবেশ করাও যেমন শক্ত, ঘর হইতে অবিলম্বে বাহির হওয়াও তেমনি কঠিন। নিবারণ একটু এদিকে ওদিকে চাহিয়া ইতস্তত করিয়া বলিল, "তবে অন্যত্র চেষ্টা দেখিগে যাই", বলিয়া প্রস্থান করিল।

ঋণ কোথায় এবং কোথায় গহনা বন্ধক দিতে হইবে হরসুন্দরী তাহা সমস্তই বুঝিল। বুঝিল, নববধূ পূর্বরাত্রে তাহার এই হতবুদ্ধি পোষা পুরুষটিকে অত্যন্ত ঝংকার দিয়া বলিয়াছিল, "দিদির সিন্দুকভরা গহনা, আর আমি বুঝি একখানি পরিতে পারি না।"

নিবারণ চলিয়া গেলে ধীরে ধীরে উঠিয়া লোহার সিন্দুক খুলিয়া একে একে সমস্ত গহনা বাহির করিল। শৈলবালাকে ডাকিয়া প্রথমে আপনার বিবাহের বেনারসি শাড়িখানি পরাইল, তাহার পর তাহার আপাদমস্তক এক-একখানি করিয়া গহনায় ভরিয়া দিল। ভালো করিয়া চুল বাঁধিয়া দিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া দেখিল, বালিকার মুখখানি বড়ো সুমিষ্ট, একটি সদ্যঃপক্ব সুগন্ধ ফলের মতো নিটোল রসপূর্ণ। শৈলবালা যখন ঝমঝম শব্দ করিয়া চলিয়া গেল, সেই শব্দ বহুক্ষণ ধরিয়া হরসুন্দরীর শিরার রক্তের মধ্যে ঝিমঝিম করিয়া বাজিতে লাগিল। মনে মনে কহিল, আজ আর কী লইয়া তোতে আমাতে তুলনা হইবে। কিন্তু এক সময়ে আমারও তো ওই বয়স ছিল, আমিও তো অমনি যৌবনের শেষরেখা পর্যন্ত ভরিয়া উঠিয়াছিলাম, তবে আমাকে সে কথা কেহ জানায় নাই কেন। কখন সেদিন আসিল এবং কখন সেদিন গেল তাহা একবার সংবাদও পাইলাম না। কিন্তু কী গর্বে, কী গৌরবে, কী তরঙ্গ তুলিয়া শৈলবালা চলিয়াছে।

হরসুন্দরী যখন কেবলমাত্র ঘরকন্নাই জানিত তখন এই গহনাগুলি তাহার কাছে কত দামি ছিল। তখন কি নির্বোধের মতো এ সমস্ত এমন করিয়া একমুহূর্তে হাতছাড়া করিতে পারিত। এখন ঘরকন্না ছাড়া আর একটা বড়ো কিসের পরিচয় পাইয়াছে, এখন গহনার দাম ভবিষ্যতের হিসাব সমস্ত তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে।

আর শৈলবালা সোনামানিক ঝকমক করিয়া শয়নগৃহে চলিয়া গেল, একবার মুহূর্তের তরে ভাবিলও না হরসুন্দরী তাহাকে কতখানি দিল। সে জানিল চতুর্দিক হইতে সমস্ত সেবা, সমস্ত সম্পদ, সমস্ত সৌভাগ্য স্বাভাবিক নিয়মে তাহার মধ্যে আসিয়া পরিসমাপ্ত হইবে, কারণ, সে হইল শৈলবালা, সে হইল সই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এক-একজন লোক স্বপ্নাবস্থায় নির্ভীকভাবে অত্যন্ত সংকটের পথ দিয়া চলিয়া যায় মুহূর্তমাত্র চিন্তা করে না। অনেক জাগ্রত মানুষেরও তেমনি চিরস্বপ্নাবস্থা উপস্থিত হয়, কিছুমাত্র জ্ঞান থাকে না, বিপদের সংকীর্ণ পথ দিয়া নিশ্চিন্তমনে অগ্রসর হইতে থাকে, অবশেষে নিদারুণ সর্বনাশের মধ্যে গিয়া জাগ্রত হইয়া উঠে।

আমাদের ম্যাক্‌মোরান কোম্পানির হেডবাবুটিরও সেই দশা। শৈলবালা তাহার জীবনের মাঝখানে একটা প্রবল আবর্তের মতো ঘুরিতে লাগিল এবং বহুদূর হইতে বিবিধ মহার্ঘ্য পদার্থ আকৃষ্ট হইয়া তাহার মধ্যে বিলুপ্ত হইতে লাগিল। কেবল যে নিবারণের মনুষ্যত্ব এবং মাসিক বেতন, হরসুন্দরীর সুখসৌভাগ্য এবং বসনভূষণ, তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে ম্যাক্‌মোরান কোম্পানির ক্যাশ তহবিলেও গোপনে টান পড়িল। তাহার মধ্য হইতেও দুটা-একটা করিয়া তোড়া অদৃশ্য হইতে লাগিল। নিবারণ স্থির করিত আগামী মাসের বেতন হইতে আস্তে আস্তে শোধ করিয়া রাখিব। কিন্তু আগামী মাসের বেতনটি হাতে আসিবামাত্র সেই আবর্ত হইতে টান পড়ে এবং শেষ দু-আনিটি পর্যন্ত চকিতের মতো চিকমিক করিয়া বিদ্যুৎবেগে অন্তর্হিত হয়।

শেষে একদিন ধরা পড়িল। পুরুষানুক্রমের চাকুরি। সাহেব বড়ো ভালোবাসে, তহবিল পূরণ করিয়া দিবার জন্য দুইদিনমাত্র সময় দিল।

কেমন করিয়া সে ক্রমে ক্রমে আড়াই হাজার টাকার তহবিল ভাঙিয়াছে তাহা নিবারণ নিজেই বুঝিতে পারিল না। একেবারে পাগলের মতো হইয়া হরসুন্দরীর কাছে গেল, বলিল, "সর্বনাশ হইয়াছে।"

হরসুন্দরী সমস্ত শুনিয়া একেবারে পাংশুবর্ণ হইয়া গেল।

নিবারণ কহিল, "শীঘ্র গহনাগুলো বাহির করো।" হরসুন্দরী কহিল, "সে তো আমি সমস্ত ছোটোবউকে দিয়াছি।"

নিবারণ নিতান্ত শিশুর মতো অধীর হইয়া বলিতে লাগিল, "কেন দিলে ছোটো-বউকে। কেন দিলে। কে তোমাকে দিতে বলিল।"

হরসুন্দরী তাহার প্রকৃত উত্তর না দিয়া কহিল, "তাহাতে ক্ষতি কী হইয়াছে। সে তো আর জলে পড়ে নাই।"

ভীরু নিবারণ কাতরস্বরে কহিল, "তবে যদি তুমি কোনো ছুতা করিয়া তাহার কাছ হইতে বাহির করিতে পার। কিন্তু আমার মাথা খাও বলিয়ো না যে, আমি চাহিতেছি কিংবা কী জন্য চাহিতেছি।"

তখন হরসুন্দরী মর্মান্তিক বিরক্তি ও ঘৃণাভরে বলিয়া উঠিল, "এই কি তোমার ছলছুতা করিবার, সোহাগ দেখাইবার সময়। চলো।" বলিয়া স্বামীকে লইয়া ছোটোবউয়ের ঘরে প্রবেশ করিল।

ছোটোবউ কিছু বুঝিল না। সে সকল কথাতেই বলিল, "সে আমি কী জানি।" সংসারের কোনো চিন্তা যে তাহাকে কখনো ভাবিতে হইবে এমন কথা কি তাহার সহিত ছিল। সকলে আপনার ভাবনা ভাবিবে এবং সকলে মিলিয়া শৈলবালার আরাম চিন্তা করিবে, অকস্মাৎ ইহার ব্যতিক্রম হয়, এ কী ভয়ানক অন্যায়।

তখন নিবারণ শৈলবালার পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া পড়িল। শৈলবালা কেবলই বলিল, "সে আমি জানি না। আমার জিনিস আমি কেন দিব।"

নিবারণ দেখিল ওই দুর্বল ক্ষুদ্র সুন্দর সুকুমারী বালিকাটি লোহার সিন্দুকের অপেক্ষাও কঠিন। হরসুন্দরী সংকটের সময় স্বামীর এই দুর্বলতা দেখিয়া ঘৃণায় জর্জরিত হইয়া উঠিল। শৈলবালার চাবি বলপূর্বক কাড়িয়া লইতে গেল। শৈলবালা তৎক্ষণাৎ চাবির গোছা প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া পুষ্করিণীর মধ্যে ফেলিয়া দিল।

হরসুন্দরী হতবুদ্ধি স্বামীকে কহিল, "তালা ভাঙিয়া ফেলো না।"

শৈলবালা প্রশান্তমুখে বলিল, "তাহা হইলে আমি গলায় দড়ি দিয়া মরিব।"

নিবারণ কহিল, "আমি আর একটা চেষ্টা দেখিতেছি", বলিয়া এলোথেলো বেশে বাহির হইয়া গেল।

নিবারণ দুই ঘণ্টার মধ্যেই পৈতৃক বাড়ি আড়াই হাজার টাকায় বিক্রয় করিয়া আসিল।

বহুকষ্টে হাতে বেড়িটা বাঁচিল, কিন্তু চাকরি গেল। স্থাবর-জঙ্গমের মধ্যে রহিল কেবল দুটিমাত্র স্ত্রী। তাহার মধ্যে ক্লেশকাতর বালিকা স্ত্রীটি গর্ভবতী হইয়া নিতান্ত স্থাবর হইয়াই পড়িল। গলির মধ্যে একটি ছোটো স্যাঁতসেঁতে বাড়িতে এই ক্ষুদ্র পরিবার আশ্রয় গ্রহণ করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ছোটো বউয়ের অসন্তোষ এবং অসুখের আর শেষ নাই। সে কিছুতেই বুঝিতে চায় না তাহার স্বামীর ক্ষমতা নাই। ক্ষমতা নাই যদি তো বিবাহ করিল কেন।

উপরের তলায় কেবল দুটিমাত্র ঘর। একটি ঘরে নিবারণ ও শৈলবালার শয়নগৃহ। আর একটি ঘরে হরসুন্দরী থাকে। শৈলবালা খুঁতখুঁত করিয়া বলে, "আমি দিনরাত্রি শোবার ঘরে কাটাইতে পারি না।"

নিবারণ মিথ্যা আশ্বাস দিয়া বলিত, "আমি আর একটা ভালো বাড়ির সন্ধানে আছি, শীঘ্র বাড়ি বদল করিব।"

শৈলবালা বলিত, "কেন, ওই তো পাশে আর একটা ঘর আছে।"

শৈলবালা তাহার পূর্ব-প্রতিবেশিনীদের দিকে কখনো মুখ তুলিয়া চাহে নাই। নিবারণের বর্তমান দুরবস্থায় ব্যথিত হইয়া তাহারা একদিন দেখা করিতে আসিল; শৈলবালা ঘরে খিল দিয়া বসিয়া রহিল, কিছুতেই দ্বার খুলিল না। তাহারা চলিয়া গেলে রাগিয়া, কাঁদিয়া, উপবাসী থাকিয়া, হিস্টিরিয়া করিয়া পাড়া মাথায় করিল। এমনতরো উৎপাত প্রায় ঘটিতে লাগিল।

অবশেষে শৈলবালার শারীরিক সংকটের অবস্থায় গুরুতর পীড়া হইল, এমন কি, গর্ভপাত হইবার উপক্রম হইল।

নিবারণ হরসুন্দরীর দুই হাত ধরিয়া বলিল, "তুমি শৈলকে বাঁচাও।"

হরসুন্দরী দিন নাই রাত্রি নাই শৈলবালার সেবা করিতে লাগিল। তিলমাত্র ত্রুটি হইলে শৈল তাহাকে দুর্বাক্য বলিত, সে একটি উত্তরমাত্র করিত না।

শৈল কিছুতেই সাগু খাইতে চাহিত না, বাটিসুদ্ধ ছুঁড়িয়া ফেলিত, জ্বরের সময় কাচা আমের অম্বল দিয়া ভাত খাইতে চাহিত। না পাইলে রাগিয়া কাঁদিয়া অনর্থপাত করিত। হরসুন্দরী তাহাকে "লক্ষ্মী আমার," "বোন আমার," "দিদি আমার" বলিয়া শিশুর মতো ভুলাইতে চেষ্টা করিত।

কিন্তু শৈলবালা বাঁচিল না। সংসারের সমস্ত সোহাগ আদর লইয়া পরম অসুখ ও অসন্তোষে বালিকার ক্ষুদ্র অসম্পূর্ণ ব্যর্থ জীবন নষ্ট হইয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নিবারণের প্রথমে খুব একটা আঘাত লাগিল, পরক্ষণেই দেখিল তাহার একটা মস্ত বাঁধন ছিঁড়িয়া গিয়াছে। শোকের মধ্যেও হঠাৎ তাহার একটা মুক্তির আনন্দ বোধ হইল। হঠাৎ মনে হইল এতদিন তাহার বুকের উপর একটা দুঃস্বপ্ন চাপিয়া ছিল। চৈতন্য হইয়া মুহূর্তের মধ্যে জীবন নিরতিশয় লঘু হইয়া গেল। মাধবীলতাটির মতো এই যে কোমল জীবনপাশ ছিঁড়িয়া গেল, এই কি তাহার আদরের শৈলবালা। হঠাৎ নিশ্বাস টানিয়া দেখিল, না, সে তাহার উদ্বন্ধনরজ্জু।

আর তাহার চিরজীবনের সঙ্গিনী হরসুন্দরী? দেখিল, সেই তো তাহার সমস্ত সংসার একাকিনী অধিকার করিয়া তাহার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখের স্মৃতিমন্দিরের

মাঝখানে বসিয়া আছে—কিন্তু তবু মধ্যে একটা বিচ্ছেদ। ঠিক যেন একটি ক্ষুদ্র উজ্জ্বল সুন্দর নিষ্ঠুর ছুরি আসিয়া একটি হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ এবং বাম অংশের মাঝখানে বেদনাপূর্ণ বিদারণরেখা টানিয়া দিয়া গেছে।

একদিন গভীর রাত্রে সমস্ত শহর যখন নিদ্রিত, নিবারণ ধীরে ধীরে হরসুন্দরীর নিভৃত শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। নীরবে সেই পুরাতন নিয়মমতো সেই পুরাতন শয্যার দক্ষিণ অংশ গ্রহণ করিয়া শয়ন করিল। কিন্তু এবার তাহার সেই চির অধিকারের মধ্যে চোরের মতো প্রবেশ করিল।

হরসুন্দরীও একটি কথা বলিল না, নিবারণও একটি কথা বলিল না। উহারা পূর্বে যেরূপ পাশাপাশি শয়ন করিত এখনও সেইরূপ পাশাপাশি শুইল, কিন্তু ঠিক মাঝখানে একটি মৃত বালিকা শুইয়া রহিল, তাহাকে কেহ লঙ্ঘন করিতে পারিল না।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩০০

অসম্ভব কথা

এক যে ছিল রাজা।

তখন ইহার বেশি কিছু জানিবার আবশ্যক ছিল না। কোথাকার রাজা, রাজার নাম কী, এ সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া গল্পের প্রবাহ রোধ করিতাম না। রাজার নাম শিলাদিত্য কি শালিবাহন, কাশী কাঞ্চি কনোজ কোশল অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের মধ্যে ঠিক কোন্‌খানটিতে তাঁহার রাজত্ব, এ সকল ইতিহাস-ভূগোলের তর্ক আমাদের কাছে নিতান্তই তুচ্ছ ছিল,—আসল যে-কথাটি শুনিলে অন্তর পুলকিত হইয়া উঠিত এবং সমস্ত হৃদয় একমুহূর্তের মধ্যে বিদ্যুদ্‌বেগে চুম্বকের মতো আকৃষ্ট হইত সেটি হইতেছে—এক যে ছিল রাজা।

এখনকার পাঠক যেন একেবারে কোমর বাঁধিয়া বসে। গোড়াতেই ধরিয়া লয় লেখক মিথ্যা কথা বলিতেছে। সেইজন্য অত্যন্ত সেয়ানার মতো মুখ করিয়া জিজ্ঞাসা করে, "লেখকমহাশয়, তুমি যে বলিতেছ এক যে ছিল রাজা, আচ্ছা বলো দেখি কে ছিল সে রাজা।"

লেখকেরাও সেয়ানা হইয়া উঠিয়াছে; তাহারা প্রকাণ্ড প্রত্নতত্ত্ব-পণ্ডিতের মতো মুখমণ্ডল চতুর্গুণ মণ্ডলাকার করিয়া বলে, "এক যে ছিল রাজা, তাহার নাম ছিল অজাতশত্রু।"

পাঠক চোখ টিপিয়া জিজ্ঞাসা করে, "অজাতশত্রু। ভালো, কোন্ অজাতশত্রু বলো দেখি।"

লেখক অবিচলিত মুখভাব ধারণ করিয়া বলিয়া যায়, "অজাতশত্রু ছিল তিনজন। একজন খ্রীস্টজন্মের তিন সহস্র বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়া দুই বৎসর আট মাস বয়ঃক্রম কালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার জীবনের বিস্তারিত বিবরণ কোনো গ্রন্থেই পাওয়া যায় না।" অবশেষে দ্বিতীয় অজাতশত্রু সম্বন্ধে দশজন ঐতিহাসিকের দশ বিভিন্ন মত সমালোচনা শেষ করিয়া যখন গ্রন্থের নায়ক তৃতীয় অজাতশত্রু পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছায় তখন পাঠক বলিয়া উঠে, "ওরে বাস রে, কী পাণ্ডিত্য। এক গল্প শুনিতে আসিয়া কত শিক্ষাই হইল। এই লোকটাকে আর অবিশ্বাস করা যাইতে পারে না। আচ্ছা লেখকমহাশয়, তার পরে কী হইল।"

হায় রে হায়, মানুষ ঠকিতেই চায়, ঠকিতেই ভালবাসে, অথচ পাছে কেহ নির্বোধ মনে করে এ ভয়টুকুও ষোলো আনা আছে; এইজন্য প্রাণপণে সেয়ানা হইবার চেষ্টা করে। তাহার ফল হয় এই যে, সেই শেষকালটা ঠকে, কিন্তু বিস্তর আড়ম্বর করিয়া ঠকে।

ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে "প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও না, তাহা হইলে মিথ্যা জবাব শুনিতে হইবে না।" বালক সেইটি বোঝে, সে কোনো প্রশ্ন করে না। এইজন্য রূপকথার সুন্দর মিথ্যাটুকু শিশুর মতো উলঙ্গ, সত্যের মতো সরল, সদ্য উৎসারিত উৎসের মতো স্বচ্ছ; আর এখনকার দিনের সুচতুর মিথ্যা মুখোশ-পরা মিথ্যা। কোথাও যদি তিলমাত্র ছিদ্র থাকে অমনি ভিতর হইতে সমস্ত ফাঁকি ধরা পড়ে, পাঠক বিমুখ হয়, লেখক পালাইবার পথ পায় না।

শিশুকালে আমরা যথার্থ রসজ্ঞ ছিলাম, এই জন্য যখন গল্প শুনিতে বসিয়াছি, তখন জ্ঞানলাভ করিবার জন্য আমাদের তিলমাত্র আগ্রহ উপস্থিত হইত না এবং অশিক্ষিত সরল হৃদয়টি ঠিক বুঝিত আসল কথাটা কোন্‌টুকু। আর এখনকার দিনে এত বাহুল্য কথাও বকিতে হয়, এত অনাবশ্যক কথারও আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু সবশেষে সেই আসল কথাটিতে গিয়া দাঁড়ায়—এক যে ছিল রাজা।

বেশ মনে আছে সেদিন সন্ধ্যাবেলা ঝড়বৃষ্টি হইতেছিল। কলিকাতা শহর একেবারে ভাসিয়া গিয়াছিল। গলির মধ্যে একহাঁটু জল। মনে একান্ত আশা ছিল, আজ আর মাস্টার আসিবে না। কিন্তু তবু তাঁহার আসার নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভীতচিত্তে পথের দিকে চাহিয়া বারান্দায় চৌকি লইয়া বসিয়া আছি। যদি বৃষ্টি একটু থরিয়া

আসিবার উপক্রম হয় তবে একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করি, হে দেবতা আর একটুখানি। কোনোমতে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পার করিয়া দাও। তখন মনে হইত পৃথিবীতে বৃষ্টির আর কোনো আবশ্যক নাই, কেবল একটিমাত্র সন্ধ্যায় নগরপ্রান্তের একটিমাত্র ব্যাকুল বালককে মাস্টারের করাল হস্ত হইতে রক্ষা করা ছাড়া। পুরাকালে কোনো একটি নির্বাসিত যক্ষও তো মনে করিয়াছিল, আষাঢ়ে মেঘের বড়ো একটা কোনো কাজ নাই, অতএব রামগিরিশিখরের একটিমাত্র বিরহীর দুঃখকথা বিশ্ব পার হইয়া অলকার সৌধবাতায়নের কোনো একটি বিরহিণীর কাছে লইয়া যাওয়া তাহার পক্ষে কিছুমাত্র গুরুতর নহে, বিশেষত পথটি যখন এমন সুরম্য এবং তাহার হৃদয়বেদনা এমন দুঃসহ।

বালকের প্রার্থনামতে না হউক, ধূম-জ্যোতিঃ-সলিল-মরুতের বিশেষ কোনো নিয়মানুসারে বৃষ্টি ছাড়িল না। কিন্তু হায় মাস্টারও ছাড়িল না। গলির মোড়ে ঠিক সময়ে একটি পরিচিত ছাতা দেখা দিল, সমস্ত আশাবাষ্প একমুহূর্তে ফাটিয়া বাহির হইয়া আমার বুকটি যেন পঞ্জরের মধ্যে মিলাইয়া গেল। পরপীড়ন পাপের যদি যথোপযুক্ত শাস্তি থাকে তবে নিশ্চয় পরজন্মে আমি মাস্টার হইয়া এবং আমার মাস্টারমহাশয় ছাত্র হইয়া জন্মিবেন। তাহার বিরুদ্ধে কেবল একটি আপত্তি এই যে, আমাকে মাস্টারমহাশয়ের মাস্টার হইতে গেলে অতিশয় অকালে ইহসংসার হইতে বিদায় লইতে হয়, অতএব আমি তাঁহাকে অন্তরের সহিত মার্জনা করিলাম।

ছাতাটি দেখিবামাত্র ছুটিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। মা তখন দিদিমার সহিত মুখোমুখি বসিয়া প্রদীপালোকে বিন্তি খেলিতেছিলেন। ঝুপ করিয়া একপাশে শুইয়া পড়িলাম। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী হইয়াছে।" আমি মুখ হাঁড়ির মতো করিয়া কহিলাম, "আমার অসুখ করিয়াছে, আজ আর আমি মাস্টারের কাছে পড়িতে যাইব না।"

আশা করি, অপ্রাপ্তবয়স্ক কেহ আমার এ লেখা পড়িবে না, এবং স্কুলের কোনো সিলেকশন-বহিতে আমার এ লেখা উদ্ধৃত হইবে না। কারণ, আমি যে কাজ করিয়াছিলাম তাহা নীতিবিরুদ্ধ এবং সেজন্য কোনো শাস্তিও পাই নাই। বরঞ্চ আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল।

মা চাকরকে বলিয়া দিলেন, "আজ তবে থাক্‌, মাস্টারকে যেতে বলে দে।"

কিন্তু তিনি যেরূপ নিরুদ্বিগ্নভাবে বিন্তি খেলিতে লাগিলেন, তাহাতে বেশ বোঝা গেল যে মা তাঁহার পুত্রের অসুখের উৎকট লক্ষণগুলি মিলাইয়া দেখিয়া মনে মনে হাসিলেন। আমিও মনের সুখে বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া খুব হাসিলাম—আমাদের উভয়ের মন উভয়ের কাছে অগোচর রহিল না।

কিন্তু সকলেই জানেন, এ প্রকারের অসুখ অধিকক্ষণ স্থায়ী করিয়া রাখা রোগীর পক্ষে বড়োই দুষ্কর। মিনিটখানেক না যাইতে যাইতে দিদিমাকে ধরিয়া পড়িলাম, "দিদিমা, একটা গল্প বলো।" দুই-চারিবার কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। মা বলিলেন, "র'স্‌ বাছা, খেলাটা আগে শেষ করি।"

আমি কহিলাম, "না, খেলা তুমি কাল শেষ ক'রো, আজ দিদিমাকে গল্প বলতে বলো না।"

মা কাগজ ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, "যাও খুড়ি, উহার সঙ্গে এখন কে পারিবে।" মনে মনে হয়তো ভাবিলেন, আমার তো কাল মাস্টার আসিবে না, আমি কালও খেলিতে পারিব।

আমি দিদিমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া একেবারে মশারির মধ্যে বিছানার মধ্যে গিয়া উঠিলাম। প্রথমে খানিকটা পাশবালিশ জড়াইয়া, পা ছুঁড়িয়া, নড়িয়াচড়িয়া মনের আনন্দ সংবরণ করিতে গেল—তার পরে বলিলাম, "গল্প বলো।"

তখনও ঝুপ ঝুপ করিয়া বাহিরে বৃষ্টি পড়িতেছিল—দিদিমা মৃদুস্বরে আরম্ভ করিলেন—এক যে ছিল রাজা।

তাহার এক রানী। আঃ, বাঁচা গেল। সুয়ো এবং দুয়ো রানী শুনিলেই বুকটা কাঁপিয়া উঠে—বুঝিতে পারি দুয়ো হতভাগিনীর বিপদের আর বিলম্ব নাই। পূর্ব হইতে মনে বিষম একটা উৎকণ্ঠা চাপিয়া থাকে।

যখন শোনা গেল আর কোনো চিন্তার বিষয় নাই, কেবল রাজার পুত্রসন্তান হয় নাই বলিয়া রাজা ব্যাকুল হইয়া আছেন এবং দেবতার নিকট প্রার্থনা করিয়া কঠিন তপস্যা করিবার জন্য বনগমনে উদ্যত হইয়াছেন, তখন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। পুত্রসন্তান না হইলে যে, দুঃখের কোনো কারণ আছে তাহা আমি বুঝিতাম না; আমি জানিতাম যদি কিছুর জন্য বনে যাইবার কখনো আবশ্যক হয় সে কেবল মাস্টারের কাছ হইতে পালাইবার অভিপ্রায়ে।

রানী এবং একটি বালিকা কন্যা ঘরে ফেলিয়া রাজা তপস্যা করিতে চলিয়া গেলেন। এক বৎসর দুই বৎসর করিয়া ক্রমে বারো বৎসর হইয়া যায় তবু রাজার আর দেখা নাই।

এদিকে রাজকন্যা ষোড়শী হইয়া উঠিয়াছে। বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গেল কিন্তু রাজা ফিরিলেন না।

মেয়ের মুখের দিকে চায়, আর রানীর মুখে অন্নজল রুচে না। "আহা আমার এমন

সোনার মেয়ে কি চিরকাল আইবুড়ো হইয়া থাকিবে। ওগো, আমি কী কপাল করিয়াছিলাম।"

অবশেষে রানী রাজাকে অনেক অনুনয় করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি আর কিছু চাহি না, তুমি একদিন কেবল আমার ঘরে আসিয়া খাইয়া যাও।"

রাজা বলিলেন, "আচ্ছা।"

রানী তো সেদিন বহুযত্নে চৌষট্টি ব্যঞ্জন স্বহস্তে রাঁধিলেন এবং সমস্ত সোনার থালে ও রুপার বাটিতে সাজাইয়া চন্দনকাষ্ঠের পিঁড়ি পাতিয়া দিলেন। রাজকন্যা চামর হাতে করিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজা আজ বারো বৎসর পরে অন্তঃপুরে ফিরিয়া আসিয়া খাইতে বসিলেন। রাজকন্যা রূপে আলো করিয়া দাঁড়াইয়া চামর করিতে লাগিলেন।

মেয়ের মুখের দিকে চান আর রাজার খাওয়া হয় না। শেষে রানীর দিকে চাহিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ গো রানী, এমন সোনার প্রতিমা লক্ষ্মীঠাকরুনটির মতো এ মেয়েটি কে গা। এ কাহাদের মেয়ে।"

রানী কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, "হা আমার পোড়া কপাল। উহাকে চিনিতে পারিলে না? ও যে তোমারই মেয়ে।"

রাজা বড়ো আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "আমার সেই সেদিনকার এতটুকু মেয়ে আজ এত বড়োটি হইয়াছে?"

রানী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "তা আর হইবে না! বল কী, আজ বারো বৎসর হইয়া গেল।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়ের বিবাহ দাও নাই?"

রানী কহিলেন, "তুমি ঘরে নাই উহার বিবাহ কে দেয়। আমি কি নিজে পাত্র খুঁজিতে বাহির হইব।"

রাজা শুনিয়া হঠাৎ ভারি শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলিলেন, "রসো আমি কাল সকালে উঠিয়া রাজদ্বারে যাহার মুখ দেখিব তাহারই সহিত উহার বিবাহ দিয়া দিব।"

রাজকন্যা চামর করিতে লাগিলেন। তাঁহার হাতের বালাতে চুড়িতে ঠুং ঠাং শব্দ হইতে লাগিল। রাজার আহার হইয়া গেল।

পরদিন ঘুম হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিয়া রাজা দেখিলেন, একটি ব্রাহ্মণের ছেলে রাজবাড়ির বাহিরে জঙ্গল হইতে শুকনা কাঠ সংগ্রহ করিতেছে। তাহার বয়স বছর সাত-আট হইবে।

রাজা বলিলেন, ইহারই সহিত আমার মেয়ের বিবাহ দিব। রাজার হুকুম কে

লঙ্ঘন করিতে পারে, তখনই ছেলেটিকে ধরিয়া তাহার সহিত রাজকন্যার মালা বদল করিয়া দেওয়া হইল।

আমি এই জায়গাটাতে দিদিমার খুব কাছ ঘেঁষিয়া খুব নিরতিশয় ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম—তার পরে? নিজেকে সেই সাত-আট বৎসরের সৌভাগ্যবান কাঠকুড়ানে ব্রাহ্মণের ছেলের স্থলাভিষিক্ত করিতে কি একটুখানি ইচ্ছা যায় নাই। যখন সেই রাত্রে ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি পড়িতেছিল, মিট মিট করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছিল এবং গুন গুন স্বরে দিদিমা মশারির মধ্যে গল্প বলিতেছিলেন, তখন কি বালক-হৃদয়ের বিশ্বাসপরায়ণ রহস্যময় অনাবিষ্কৃত এক ক্ষুদ্র প্রান্তে এমন একটি অত্যন্ত সম্ভবপর ছবি জাগিয়া উঠে নাই য, সেও একদিন সকালবেলায় কোথায় এক র জার দেশে রাজার দরজায় কাঠ কুড়াইতেছে, হঠাৎ একটি সোনার প্রতিমা লক্ষ্মীঠাকরুনটির মতো রাজকন্যার সহিত তাহার মালা বদল হইয়া গেল; মাথায় তাহার সিঁথি, কানে তাহার দুল, গলায় তাহার কণ্ঠী, হাতে তাহার কাঁকন, কটিতে তাহার চন্দ্রহার, এবং আলতাপরা দুটি পায়ে নূপুর ঝম ঝম করিয়া বাজিতেছে।

কিন্তু আমার সেই দিদিমা যদি লেখকজন্ম ধারণ করিয়া আজকালকার সেয়ানা পাঠকদের কাছে এই গল্প বলিতেন তবে ইতিমধ্যে তাঁহাকে কত হিসাব দিতে হইত। প্রথমত রাজা যে বারো বৎসর বনে বসিয়া থাকেন এবং ততদিন রাজকন্যার বিবাহ হয় না, একবাক্যে সকলেই বলিত ইহা অসম্ভব। সেটুকুও যদি কোনো গতিকে গোল-মালে পার পাইয়া যাইত, কিন্তু কন্যার বিবাহের জায়গায় বিষম একটা কলরব উঠিত। একে তো এমন কখনো হয় না, দ্বিতীয়ত, সকলেই আশঙ্কা করিত ব্রাহ্মণের ছেলের সহিত ক্ষত্রিয়কন্যার বিবাহ ঘটাইয়া লেখক নিশ্চয়ই ফাঁকি দিয়া সমাজবিরুদ্ধ মত প্রচার করিতেছেন। কিন্তু পাঠকেরা তেমন ছেলেই নয়, তাহারা তাঁহার নাতি নয় যে সকল কথা চুপ করিয়া শুনিয়া যাইবে? তাহারা কাগজে সমালোচনা করিবে। অতএব একান্তমনে প্রার্থনা করি, দিদিমা যেন পুনর্বার দিদিমা হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন, হতভাগ্য নাতিটার মতো তাঁহাকে গ্রহদোষে যেন লেখক হইতে না হয়।

আমি একেবারে পুলকিত কম্পান্বিত হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, তারপরে?

দিদিমা বলিতে লাগিলেন, তার পরে রাজকন্যা মনের দুঃখে তাহার সেই ছোটো স্বামীটিকে লইয়া চলিয়া গেল।

অনেক দূরদেশে গিয়া একটি বৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণের ছেলেটিকে, আপনার সেই অতি ক্ষুদ্র স্বামীটিকে বড়ো যত্নে মানুষ করিতে লাগিল।

আমি একটুখানি নড়িয়া-চড়িয়া পাশবালিশ আরও একটু সবলে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলাম, তার পরে ?

দিদিমা কহিলেন, তার পরে ছেলেটি পুঁথি হাতে প্রতিদিন পাঠশালে যায়।

এমনি করিয়া গুরুমহাশয়ের কাছে নানা বিদ্যা শিখিয়া ছেলেটি ক্রমে যত বড়ো হইয়া উঠিতে লাগিল ততই তাহার সহপাঠীরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ওই যে সাতমহলা বাড়িতে তোমাকে লইয়া থাকে সেই মেয়েটি তোমার কে হয়।

ব্রাহ্মণের ছেলে তো ভাবিয়া অস্থির, কিছুতেই ঠিক করিয়া বলিতে পারে না, মেয়েটি তাহার কে হয়। একটু একটু মনে পড়ে একদিন সকালে রাজবাড়ির দ্বারের সম্মুখে শুকনা কাঠ কুড়াইতে গিয়াছিল—কিন্তু সেদিন কী একটা মস্ত গোলমালে কাঠ কুড়ানো হইল না। সে অনেক দিনের কথা, সে কি কিছু মনে আছে। এমন করিয়া চারি-পাঁচ বৎসর যায়। ছেলেটিকে রোজই তাহার সঙ্গীরা জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা ওই যে সাতমহলা বাড়িতে পরমারূপসী মেয়েটি থাকে ও তোমার কে হয়।"

ব্রাহ্মণ একদিন পাঠশালা হইতে মুখ বড়ো বিমর্ষ করিয়া আসিয়া রাজকন্যাকে কহিল, "আমাকে আমার পাঠশালার প'ড়োরা প্রতিদিন জিজ্ঞাসা করে—ওই যে সাতমহলা বাড়িতে যে পরমাসুন্দরী মেয়েটি থাকে সে তোমার কে হয়। আমি তাহার কোনো উত্তর দিতে পারি না। তুমি আমার কে হও, বলো।"

রাজকন্যা বলিল, "আজিকার দিন থাক্, সে-কথা আর একদিন বলিব।"

ব্রাহ্মণের ছেলে প্রতিদিন পাঠশালা হইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, "তুমি আমার কী হও।"

রাজকন্যা প্রতিদিন উত্তর করে, "সে-কথা আজ থাক্, আর একদিন বলিব।"

এমনি করিয়া আরও চার-পাঁচ বৎসর কাটিয়া যায়। শেষে ব্রাহ্মণ একদিন আসিয়া বড়ো রাগ করিয়া বলিল, "আজ যদি তুমি না বল তুমি আমার কে হও, তবে আমি তোমার এই সাতমহলা বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।"

তখন রাজকন্যা কহিলেন, "আচ্ছা কাল নিশ্চয়ই বলিব।"

পরদিন ব্রাহ্মণতনয় পাঠশালা হইতে ঘরে আসিয়াই রাজকন্যাকে বলিল, "আজ বলিবে বলিয়াছিলে, তবে বলো।"

রাজকন্যা বলিলেন, "আজ রাত্রে আহার করিয়া তুমি যখন শয়ন করিবে তখন বলিব।"

ব্রাহ্মণ বলিল, "আচ্ছা।" বলিয়া সূর্যাস্তের অপেক্ষায় প্রহর গনিতে লাগিল।

এদিকে রাজকন্যা সোনার পালঙ্কে একটি ধবধবে ফুলের বিছানা পাতিলেন, ঘরে সোনার প্রদীপে সুগন্ধ তেল দিয়া বাতি জ্বালাইলেন এবং চুলটি বাঁধিয়া নীলাম্বরী কাপড়টি পরিয়া সাজিয়া বসিয়া প্রহর গনিতে লাগিলেন, কখন রাত্রি আসে।

রাত্রে তাঁহার স্বামী কোনোমতে আহার শেষ করিয়া শয়নগৃহে সোনার পালঙ্কে ফুলের বিছানায় গিয়া শয়ন করিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, আজ শুনিতে পাইব এই সাতমহলা বাড়িতে যে সুন্দরীটি থাকে সে আমার কে হয়।

রাজকন্যা তাহার স্বামীর পাত্রে প্রসাদ খাইয়া ধীরে ধীরে শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। আজ বহুদিন পর প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে, সাতমহলা বাড়ির একমাত্র অধীশ্বরী আমি তোমার কে হই।

বলিতে গিয়া বিছানায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ফুলের মধ্যে সাপ ছিল, তাঁহার স্বামীকে কখন দংশন করিয়াছে। স্বামীর মৃতদেহখানি মলিন হইয়া সোনার পালঙ্কে পুষ্পশয্যায় পড়িয়া আছে।

আমার যেন বক্ষঃস্পন্দন হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। আমি রুদ্ধস্বরে বিবর্ণমুখে জিজ্ঞাসা করিলাম, তার পরে কী হইল।

দিদিমা বলিতে লাগিলেন, তার পরে—। কিন্তু সে-কথায় আর কাজ কী। সে যে আরও অসম্ভব। গল্পের প্রধান নায়ক সর্পাঘাতেই মারা গেল, তবুও তার পরে? বালক তখন জানিত না, মৃত্যুর পরেও একটা 'তারপরে' থাকিতে পারে বটে, কিন্তু সে 'তার-পরে'র উত্তর কোনো দিদিমার দিদিমাও দিতে পারে না। বিশ্বাসের বলে সাবিত্রী মৃত্যুরও অনুগমন করিয়াছিলেন। শিশুরও প্রবল বিশ্বাস। এইজন্য সে মৃত্যুর অঞ্চল ধরিয়া ফিরাইতে চায়, কিছুতেই মনে করিতে পারে না যে, তাহার মাস্টারবিহীন এক সন্ধ্যাবেলাকার এত সাধের গল্পটি হঠাৎ একটি সর্পাঘাতেই মারা গেল। কাজেই দিদিমাকে সেই মহাপরিণামের চিররুদ্ধ গৃহ হইতে গল্পটিকে আবার ফিরাইয়া আনিতে হয়। কিন্তু এত সহজে সেটি সাধন করেন, এমন অনায়াসে—কেবল হয়তো একটা কলার ভেলায় ভাসাইয়া দিয়া গুটি দুই মন্ত্র পড়িয়া মাত্র—যে সেই ঝুপ ঝুপ বৃষ্টির রাত্রে স্তিমিত প্রদীপে বালকের মনে মৃত্যুর মূর্তি অত্যন্ত অকঠোর হইয়া আসে, তাহাকে এক রাত্রের সুখনিদ্রার চেয়ে বেশি মনে হয় না। গল্প যখন ফুরাইয়া যায়, আরামে শ্রান্ত দুটি চক্ষু আপনি মুদিয়া আসে, তখনও তো শিশুর ক্ষুদ্র প্রাণটিকে একটি স্নিগ্ধ নিস্তব্ধ নিস্তরঙ্গ স্রোতের মধ্যে সুষুপ্তির ভেলায় করিয়া ভাসাইয়া দেওয়া হয়, তার পরে ভোরের বেলায় কে দুটি মায়ামন্ত্র পড়িয়া তাহাকে এই জগতের মধ্যে জাগ্রত করিয়া তোলে।

কিন্তু যাহার বিশ্বাস নাই, যে ভীরু এ সৌন্দর্যরসাস্বাদনের জন্যও এক ইঞ্চি পরিমাণ অসম্ভবকে লঙ্ঘন করিতে পরাঙ্মুখ হয়, তাহার কাছে কোনো কিছুর আর 'তার পরে' নাই, সমস্তই হঠাৎ অসময়ে এক অসমাপ্তিতে সমাপ্ত হইয়া গেছে। ছেলেবেলায় সাত সমুদ্র পার হইয়া মৃত্যুকেও লঙ্ঘন করিয়া গল্পের যেখানে যথার্থ বিরাম, সেখানে স্নেহময় সুমিষ্ট স্বরে শুনিতাম —

আমার কথাটি ফুরোল,
ন'টে গাছটি মুড়োল।

এখন বয়স হইয়াছে, এখন গল্পের ঠিক মাঝখানটাতে হঠাৎ থামিয়া গিয়া একটা নিষ্ঠুর কঠিন কণ্ঠে শুনিতে পাই—

আমার কথাটি ফুরোল না,
ন'টে গাছটি মুড়োল না।
কেন রে নটে মুড়োলিনে কেন।
তোর গরুতে—

দূর হউক গে, ওই নিরীহ প্রাণীটির নাম করিয়া কাজ নাই। আবার কে কোন্‌-দিক হইতে গায়ে পাতিয়া লইবে।

আষাঢ়, ১৩০০

শাস্তি

প্রথম পরিচ্ছেদ

দুখিরাম রুই এবং ছিদাম রুই দুই ভাই সকালে যখন দা হাতে লইয়া জন খাটিতে বাহির হইল তখন তাহাদের দুই স্ত্রীর মধ্যে বকাবকি চেঁচামেচি চলিতেছে। কিন্তু প্রকৃতির অন্যান্য নানাবিধ নিত্য কলরবের ন্যায় এই কলহ-কোলাহলও পাড়াসুদ্ধ লোকের অভ্যাস হইয়া গেছে। তীব্র কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র লোকে পরস্পরকে বলে— "ওই রে বাধিয়া গিয়াছে," অর্থাৎ যেমনটি আশা করা যায় ঠিক তেমনিটি ঘটিয়াছে, আজও স্বভাবের নিয়মের কোনোরূপ ব্যত্যয় হয় নাই। প্রভাতে পূর্বদিকে সূর্য উঠিলে যেমন কেহ তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করে না, তেমনি এই কুরিদের বাড়িতে দুই জায়ের মধ্যে যখন একটা হৈ-হৈ পড়িয়া যায় তখন তাহার কারণ নির্ণয়ের জন্য কাহারও কোনোরূপ কৌতূহলের উদ্রেক হয় না।

অবশ্য এই কোন্দল আন্দোলন প্রতিবেশীদের অপেক্ষা দুই স্বামীকে বেশি স্পর্শ করিত সন্দেহ নাই, কিন্তু সেটা তাহারা কোনোরূপ অসুবিধার মধ্যে গণ্য করিত না। তাহারা দুই ভাই যেন দীর্ঘ সংসারপথ একটা এক্কাগাড়িতে করিয়া চলিয়াছে, দুই দিকের দুই স্প্রিংবিহীন চাকার অবিশ্রাম ছড়ছড় খড়খড় শব্দটাকে জীবনরথযাত্রার একটা বিধিবিহিত নিয়মের মধ্যেই ধরিয়া লইয়াছে।

বরঞ্চ ঘরে যেদিন কোনো শব্দমাত্র নাই, সমস্ত থমথম ছমছম করিতেছে, সেদিন একটা আসন্ন অনৈসর্গিক উপদ্রবের আশঙ্কা জন্মিত, সেদিন যে কখন কী হইবে তাহা কেহ হিসাব করিয়া বলিতে পারিত না।

আমাদের গল্পের ঘটনা যেদিন আরম্ভ হইল, সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে দুই ভাই যখন জন খাটিয়া শ্রান্তদেহে ঘরে ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিল, স্তব্ধ গৃহ গমগম করিতেছে।

বাহিরেও অত্যন্ত গুমট। দুই-প্রহরের সময় খুব একপসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এখনও চারিদিকে মেঘ জমিয়া আছে। বাতাসের লেশমাত্র নাই। বর্ষায় ঘরের চারিদিকে জঙ্গল এবং আগাছাগুলা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে, সেখান হইতে এবং জলমগ্ন পাটের খেত হইতে সিক্ত উদ্ভিজ্জের ঘন গন্ধবাষ্প চতুর্দিকে একটি নিশ্চল প্রাচীরের মতো জমাট হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। গোয়ালের পশ্চাদ্বর্তী ডোবার মধ্য হইতে ভেক ডাকিতেছে এবং ঝিল্লিরবে সন্ধ্যার নিস্তব্ধ আকাশ একেবারে পরিপূর্ণ।

অদূরে বর্ষার পদ্মা নবমেঘচ্ছায়ায় বড়ো স্থির ভয়ংকর ভাব ধারণ করিয়া চলিয়াছে। শস্যক্ষেত্রের অধিকাংশই ভাঙিয়া লোকালয়ের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। এমন কি ভাঙনের ধারে দুই-চারিটা আম-কাঁঠালগাছের শিকড় বাহির হইয়া দেখা দিয়াছে, যেন তাহাদের নিরুপায় মুষ্টির প্রসারিত অঙ্গুলিগুলি শূন্যে একটা-কিছু অন্তিম অবলম্বন আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছে।

দুখিরাম এবং ছিদাম সেদিন জমিদারের কাছারি-ঘরে কাজ করিতে গিয়াছিল। ওপারের চরে জলিধান পাকিয়াছে। বর্ষায় চর ভাসিয়া যাইবার পূর্বেই ধান কাটিয়া লইবার জন্য দেশের দরিদ্র লোক মাত্রেই কেহ বা নিজের খেতে, কেহ বা পাট খাটিতে নিযুক্ত হইয়াছে; কেবল কাছারি হইতে পেয়াদা আসিয়া এই দুই ভাইকে জবরদস্তি করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। কাছারি-ঘরে চাল ভেদ করিয়া স্থানে স্থানে জল পড়িতেছিল তাহাই সারিয়া দিতে এবং গোটাকতক ঝাঁপ নির্মাণ করিতে তাহারা সমস্তদিন খাটিয়াছে। বাড়ি আসিতে পায় নাই, কাছারি হইতেই কিঞ্চিৎ জলপান খাইয়াছে। মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিতেও ভিজিতে হইয়াছে,—উচিতমতো পাওনা মজুরি পায় নাই, এবং

তাহার পরিবর্তে যে-সকল অন্যায় কটু কথা শুনিতে হইয়াছে, সে তাহাদের পাওনার অনেক অতিরিক্ত।

পথের কাদা এবং জল ভাঙিয়া সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দুই ভাই দেখিল, ছোটো জা চন্দরা ভূমিতে অঞ্চল পাতিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া আছে,—আজিকার এই মেঘলা দিনের মতো সে-ও মধ্যাহ্নে প্রচুর অশ্রুবর্ষণপূর্বক সায়াহ্নের কাছাকাছি ক্ষান্ত দিয়া অত্যন্ত গুমট করিয়া আছে, আর বড়ো জা রাধা মুখটা মস্ত করিয়া দাওয়ায় বসিয়া ছিল—তাহার দেড় বৎসরের ছোটো ছেলেটি কাঁদিতেছিল, দুই ভাই যখন প্রবেশ করিল, দেখিল উলঙ্গ শিশু প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে চিৎ হইয়া পড়িয়া ঘুমাইয়া আছে।

ক্ষুধিত দুখিরাম আর কালবিলম্ব না করিয়া বলিল, "ভাত দে।"

বড়ো বউ বারুদের বস্তায় স্ফুলিঙ্গপাতের মতো একমুহূর্তেই তীব্র কণ্ঠস্বর আকাশ-পরিমাণ করিয়া উঠিল, "ভাত কোথায় যে ভাত দিব। তুই কি চাল দিয়া গিয়াছিলি। আমি কি নিজে রোজগার করিয়া আনিব।"

সারাদিনের শ্রান্তি ও লাঞ্ছনার পর অন্নহীন নিরানন্দ অন্ধকার ঘরে প্রজ্বলিত ক্ষুধানলে গৃহিণীর রুক্ষবচন বিশেষত শেষ কথাটার গোপন কুৎসিত শ্লেষ দুখিরামের হঠাৎ কেমন একেবারেই অসহ্য হইয়া উঠিল। ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় গম্ভীর গর্জনে বলিয়া উঠিল, "কী বললি।" বলিয়া মুহূর্তের মধ্যে দা লইয়া কিছু না ভাবিয়া একেবারে স্ত্রীর মাথায় বসাইয়া দিল। রাধা তাহার ছোটো জায়ের কোলের কাছে পড়িয়া গেল এবং মৃত্যু হইতে মুহূর্ত বিলম্ব হইল না।

চন্দরা রক্তসিক্ত বস্ত্রে "কী হল গো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ছিদাম তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। দুখিরাম দা ফেলিয়া মুখে হাত দিয়া হতবুদ্ধির মতো ভূমিতে বসিয়া পড়িল। ছেলেটা জাগিয়া উঠিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বাহিরে তখন পরিপূর্ণ শান্তি। রাখালবালক গোরু লইয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিতেছে। পরপারের চরে যাহারা নূতনপক্ক ধান কাটিতে গিয়াছিল, তাহারা পাঁচ-সাতজনে এক-একটি ছোটো নৌকায় এপারে ফিরিয়া পরিশ্রমের পুরস্কার দুই-চারি আঁটি ধান মাথায় লইয়া প্রায় সকলেই নিজ নিজ ঘরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

চক্রবর্তীদের বাড়ির রামলোচন খুড়ো গ্রামের ডাকঘরে চিঠি দিয়া ঘরে ফিরিয়া নিশ্চিন্তমনে চুপচাপ তামাক খাইতেছিলেন। হঠাৎ মনে পড়িল, তাঁহার কোর্ফা প্রজা দুখির অনেক টাকা খাজনা বাকি; আজ কিয়দংশ শোধ করিবে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। এতক্ষণে তাহারা বাড়ি ফিরিয়াছে স্থির করিয়া চাদরটা কাঁধে ফেলিয়া ছাতা লইয়া বাহির হইলেন।

কুরিদের বাড়িতে ঢুকিয়া তাঁহার গা ছম ছম করিয়া উঠিল। দেখিলেন ঘরে প্রদীপ জ্বালা হয় নাই। অন্ধকার দাওয়ায় দুই-চারিটা অন্ধকার মূর্তি অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। রহিয়া রহিয়া দাওয়ার এক কোণ হইতে একটা অস্ফুট রোদন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে—এবং ছেলেটা যত মা মা বলিয়া কাঁদিয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেছে ছিদাম তাহার মুখ চাপিয়া ধরিতেছে।

রামলোচন কিছু ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দুখি, আছিস নাকি।"

দুখি এতক্ষণ প্রস্তরমূর্তির মতো নিশ্চল হইয়া বসিয়া ছিল, তাহার নাম ধরিয়া ডাকিবামাত্র একেবারে অবোধ বালকের মতো উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ছিদাম তাড়াতাড়ি দাওয়া হইতে অঙ্গনে নামিয়া চক্রবর্তীর নিকটে আসিল। চক্রবর্তী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাগীরা বুঝি ঝগড়া করিয়া বসিয়া আছে? আজ তো সমস্তদিনই চীৎকার শুনিয়াছি।"

এতক্ষণ ছিদাম কিংকর্তব্য কিছুই ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই। নানা অসম্ভব গল্প তাহার মাথায় উঠিতেছিল। আপাতত স্থির করিয়াছিল, রাত্রি কিঞ্চিৎ অধিক হইলে মৃতদেহ কোথাও সরাইয়া ফেলিবে। ইতিমধ্যে যে চক্রবর্তী আসিয়া উপস্থিত হইবে এ সে মনেও করে নাই। ফস করিয়া কোনো উত্তর জোগাইল না। বলিয়া ফেলিল, "হাঁ, আজ খুব ঝগড়া হইয়া গিয়াছে।"

চক্রবর্তী দাওয়ার দিকে অগ্রসর হইবার উপক্রম করিয়া বলিল, "কিন্তু সে জন্য দুখি কাঁদে কেন রে।"

ছিদাম দেখিল আর রক্ষা হয় না, হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "ঝগড়া করিয়া ছোটোবউ বড়ো বউয়ের মাথায় এক দায়ের কোপ বসাইয়া দিয়াছে।"

উপস্থিত বিপদ ছাড়া যে আর কোনো বিপদ থাকিতে পারে এ-কথা সহজে মনে হয় না। ছিদাম তখন ভাবিতেছিল, ভীষণ সত্যের হাত হইতে কী করিয়া রক্ষা পাইব। মিথ্যা যে তদপেক্ষা ভীষণ হইতে পারে তাহা তাহার জ্ঞান হইল না। রামলোচনের প্রশ্ন শুনিবামাত্র তাহার মাথায় তৎক্ষণাৎ একটা উত্তর জোগাইল এবং তৎক্ষণাৎ বলিয়া ফেলিল।

রামলোচন চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "অ্যাঁ! বলিস কী! মরে নাই তো!"

ছিদাম কহিল, "মরিয়াছে।" বলিয়া চক্রবর্তীর পা জড়াইয়া ধরিল।

চক্রবর্তী পালাইবার পথ পায় না। ভাবিল, রাম রাম, সন্ধ্যাবেলায় এ কী বিপদেই পড়িলাম। আদালতে সাক্ষ্য দিতে দিতেই প্রাণ বাহির হইয়া পড়িবে। ছিদাম

কিছুতেই তাঁহার পা ছাড়িল না, কহিল, "দাদাঠাকুর, এখন আমার বউকে বাঁচাইবার কী উপায় করি।"

মামলামোকদ্দমার পরামর্শে রামলোচন সমস্ত গ্রামের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি একটু ভাবিয়া বলিলেন, "দেখ্‌ ইহার এক উপায় আছে। তুই এখনই থানায় ছুটিয়া যা—বল্‌গে, তোর বড়ো ভাই দুখি সন্ধ্যাবেলায় ঘরে আসিয়া ভাত চাহিয়াছিল, ভাত প্রস্তুত ছিল না বলিয়া স্ত্রীর মাথায় দা বসাইয়া দিয়াছে। আমি নিশ্চয় বলিতেছি এ-কথা বলিলে ছুঁড়িটা বাঁচিয়া যাইবে।"

ছিদামের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিল, উঠিয়া কহিল, "ঠাকুর, বউ গেলে বউ পাইব, কিন্তু আমার ভাই ফাঁসি গেলে আর তো ভাই পাইব না।" কিন্তু যখন নিজের স্ত্রীর নামে দোষারোপ করিয়াছিল তখন এ সকল কথা ভাবে নাই। তাড়াতাড়িতে একটা কাজ করিয়া ফেলিয়াছে, এখন অলক্ষিতভাবে মন আপনার পক্ষে যুক্তি এবং প্রবোধ সঞ্চয় করিতেছে।

চক্রবর্তীও কথাটা যুক্তিসংগত বোধ করিলেন, কহিলেন, "তবে যেমনটি ঘটিয়াছে তাই বলিস, সকল দিক রক্ষা করা অসম্ভব।"

বলিয়া রামলোচন অবিলম্বে প্রস্থান করিল এবং দেখিতে দেখিতে গ্রামে রাষ্ট্র হইল যে, কুরিদের বাড়ির চন্দরা রাগারাগি করিয়া তাহার বড়ো জায়ের মাথায় দা বসাইয়া দিয়াছে।

বাঁধ ভাঙিলে যেমন জল আসে গ্রামের মধ্যে তেমনি হুহুঃ শব্দে পুলিস আসিয়া পড়িল; অপরাধী এবং নিরপরাধী সকলেই বিষম উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছিদাম ভাবিল, যে পথ কাটিয়া ফেলিয়াছে সেই পথেই চলিতে হইবে। সে চক্রবর্তীর কাছে নিজমুখে এক কথা বলিয়া ফেলিয়াছে সে-কথা গাঁসুদ্ধ রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে, এখন আবার আর-একটা কিছু প্রকাশ হইয়া পড়িলে কী জানি কী হইতে কী হইয়া পড়িবে সে নিজেই কিছু ভাবিয়া পাইল না। মনে করিল কোনোমতে সে-কথাটা রক্ষা করিয়া তাহার সহিত আর পাঁচটা গল্প জুড়িয়া স্ত্রীকে রক্ষা করা ছাড়া আর কোনো পথ নাই।

ছিদাম তাহার স্ত্রী চন্দরাকে অপরাধ নিজ স্কন্ধে লইবার জন্য অনুরোধ করিল। সে তো একেবারে বজ্রাহত হইয়া গেল। ছিদাম তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, "যাহা

বলিতেছি তাই কয় তোর কোনো ভয় নাই, আমরা তোকে বাঁচাইয়া দিব"—আশ্বাস দিল বটে কিন্তু গলা শুকাইল, মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল।

চন্দরার বয়স সতেরো-আঠারোর অধিক হইবে না। মুখখানি হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল শরীরটি অনতিদীর্ঘ আঁটসাঁট সুস্থসবল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এমন একটি সৌষ্ঠব আছে যে, চলিতে ফিরিতে নড়িতে চড়িতে দেহের কোথাও যেন কিছু বাধে না। একখানি নূতন-তৈরি নৌকার মতো; বেশ ছোটো এবং সুডোল, অত্যন্ত সহজে সরে এবং তাহার কোথাও কোনো গ্রন্থি শিথিল হইয়া যায় নাই। পৃথিবীর সকল বিষয়েই তাহার একটা কৌতুক এবং কৌতূহল আছে; পাড়ায় গল্প করিতে যাইতে ভালোবাসে; এবং কুম্ভকক্ষে ঘাটে যাইতে আসিতে দুই অঙ্গুলি দিয়া ঘোমটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া উজ্জ্বল চঞ্চল ঘনকৃষ্ণ চোখ দুটি দিয়া পথের মধ্যে দর্শনযোগ্য যাহা কিছু সমস্ত দেখিয়া লয়।

বড়োবউ ছিল ঠিক ইহার উলটা; অত্যন্ত এলোমেলো ঢিলেঢালা অগোছালো। মাথার কাপড়, কোলের শিশু, ঘরকন্নার কাজ কিছুই সে সামলাইতে পারিত না। হাতে বিশেষ একটা কিছু কাজও নাই অথচ কোনো কালে যেন সে অবসর করিয়া উঠিতে পারে না। ছোটো জা তাহাকে অধিক কিছু কথা বলিত না, মৃদুস্বরে দুই-একটা তীক্ষ্ণ দংশন করিত, আর সে হাউ হাউ দাউ দাউ করিয়া রাগিয়া মাগিয়া বকিয়া ঝকিয়া সারা হইত এবং পাড়াসুদ্ধ অস্থির করিয়া তুলিত।

এই দুই জুড়ি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও স্বভাবের একটা আশ্চর্য ঐক্য ছিল। দুখিরাম মানুষটা কিছু বৃহদায়তনের—হাড়গুলা খুব চওড়া, নাসিকা খর্ব, দুটি চক্ষু এই দৃশ্যমান সংসারকে যেন ভালো করিয়া বোঝে না, অথচ ইহাকে কোনোরূপ প্রশ্ন করিতেও যায় না। এমন নিরীহ অথচ ভীষণ, এমন সবল অথচ নিরুপায় মানুষ অতি দুর্লভ।

আর ছিদামকে একখানি চকচকে কালো পাথরে কে যেন বহুযত্নে কুঁদিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। লেশমাত্র বাহুল্যবর্জিত এবং কোথাও যেন কিছু টোল খায় নাই। প্রত্যেক অঙ্গটি বলের সহিত নৈপুণ্যের সহিত মিশিয়া অত্যন্ত সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। নদীর উচ্চপাড় হইতে লাফাইয়া পড়ুক, লগি দিয়া নৌকা ঠেলুক, বাঁশগাছে চড়িয়া বাছিয়া বাছিয়া কঞ্চি কাটিয়া আনুক, সকল কাজেই তাহার একটি পরিমিত পারিপাট্য, একটি অবলীলাকৃত শোভা প্রকাশ পায়। বড়ো বড়ো কালো চুল তেল দিয়া কপাল হইতে যত্নে আঁচড়াইয়া তুলিয়া কাঁধে আনিয়া ফেলিয়াছে - বেশভূষা-সাজসজ্জায় বিলক্ষণ একটু যত্ন আছে।

অপরাপর গ্রামবধূদিগের সৌন্দর্যের প্রতি যদিও তাহার উদাসীন দৃষ্টি ছিল না, এবং তাহাদের চক্ষে আপনাকে মনোরম করিয়া তুলিবার ইচ্ছাও তাহার যথেষ্ট ছিল—তবু

ছিদাম তাহার যুবতী স্ত্রীকে একটু বিশেষ ভালোবাসিত। উভয়ে ঝগড়াও হইত, ভাবও হইত, কেহ কাহাকেও পরাস্ত করিতে পারিত না। আর একটি কারণে উভয়ের মধ্যে বন্ধন কিছু সুদৃঢ় ছিল। ছিদাম মনে করিত চন্দরা যেরূপ চটুল চঞ্চল প্রকৃতির স্ত্রীলোক তাহাকে যথেষ্ট বিশ্বাস নাই, আর চন্দরা মনে করিত আমার স্বামীটির চতুর্দিকেই দৃষ্টি, তাহাকে কিছু কষাকষি করিয়া না বাঁধিলে কোন্‌দিন হাতছাড়া হইতে আটক নাই।

উপস্থিত ঘটনা ঘটিবার কিছুকাল পূর্বে হইতে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ভারি একটা গোলযোগ চলিতেছিল। চন্দরা দেখিয়াছিল তাহার স্বামী কাজের ওজর করিয়া মাঝে মাঝে দূরে চলিয়া যায়, এমন কি দুই-একদিন অতীত করিয়া আসে, অথচ কিছু উপার্জন করিয়া আনে না। লক্ষণ মন্দ দেখিয়া সে-ও কিছু বাড়াবাড়ি দেখাইতে লাগিল। যখন-তখন ঘাটে যাইতে আরম্ভ করিল এবং পাড়া পর্যটন করিয়া আসিয়া কাশী মজুমদারের মেজো ছেলেটির প্রচুর ব্যাখ্যা করিতে লাগিল।

ছিদামের দিন এবং রাত্রিগুলির মধ্যে কে যেন বিষ মিশাইয়া দিল। কাজেকর্মে কোথাও একদণ্ড গিয়া সুস্থির হইতে পারে না। একদিন ভাজকে আসিয়া ভারি ভর্ৎসনা করিল। সে হাত নাড়িয়া ঝংকার দিয়া অনুপস্থিত মৃত পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ও মেয়ে ঝড়ের আগে ছোটে উহাকে আমি সামলাইব! আমি জানি ও কোন্‌দিন কী সর্বনাশ করিয়া বসিবে।"

চন্দরা পাশের ঘর হইতে আসিয়া আস্তে আস্তে কহিল, "কেন দিদি তোমার এত ভয় কিসের।" এই দুই জায়ে বিষম দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল।

ছিদাম চোখ পাকাইয়া বলিল, "এবার যদি কখনো শুনি তুই একলা ঘাটে গিয়াছিস তোর হাড় গুঁড়াইয়া দিব।"

চন্দরা বলিল, "তাহা হইলে তো হাড় জুড়ায়।" বলিয়া তৎক্ষণাৎ বাহিরে যাইবার উপক্রম করিল।

ছিদাম এক লম্ফে তাহার চুল ধরিয়া টানিয়া ঘরে পুরিয়া বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

কর্মস্থান হইতে সন্ধ্যাবেলায় ফিরিয়া আসিয়া দেখে ঘর খোলা, ঘরে কেহ নাই। চন্দরা তিনটে গ্রাম ছাড়াইয়া একেবারে তাহার মামার বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

ছিদাম সেখান হইতে বহুকষ্টে অনেক সাধ্যসাধনায় তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিল, কিন্তু এবার পরাস্ত মানিল। দেখিল এক অঞ্জলি পারদকে মুষ্টির মধ্যে শক্ত করিয়া ধরা যেমন দুঃসাধ্য এই মুষ্টিমেয় স্ত্রীটুকুকেও কঠিন করিয়া ধরিয়া রাখা তেমনি অসম্ভব— ও যেন দশ আঙুলের ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

আর কোনো জবরদস্তি করিল না,—কিন্তু বড়ো অশান্তিতে বাস করিতে লাগিল। তাহার এই চঞ্চলা যুবতী স্ত্রীর প্রতি সদাশঙ্কিত ভালোবাসা উগ্র একটা বেদনার মতো বিষম টনটনে হইয়া উঠিল। এমন কি, এক-একবার মনে হইত এ যদি মরিয়া যায় তবে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া একটুখানি শান্তিলাভ করিতে পারি। মানুষের উপরে মানুষের যতটা ঈর্ষা হয় যমের উপরে এতটা নহে।

এমন সময় ঘরে সেই বিপদ ঘটিল।

চন্দরাকে যখন তাহার স্বামী খুন স্বীকার করিয়া লইতে কহিল, সে স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিল; তাহার কালো দুটি চক্ষু কালো অগ্নির ন্যায় নীরবে তাহার স্বামীকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তাহার সমস্ত শরীর মন যেন ক্রমেই সংকুচিত হইয়া স্বামীরাক্ষসের হাত হইতে বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা একান্ত বিমুখ হইয়া দাঁড়াইল।

ছিদাম আশ্বাস দিল, "তোমার কিছু ভয় নাই।" বলিয়া পুলিসের কাছে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কী বলিতে হইবে বারবার শিখাইয়া দিল। চন্দরা সে সমস্ত দীর্ঘ কাহিনী কিছুই শুনিল না, কাঠের মূর্তি হইয়া বসিয়া রহিল।

সমস্ত কাজেই ছিদামের উপর দুখিরামের একমাত্র নির্ভর। ছিদাম যখন চন্দরার উপর দোষারোপ করিতে বলিল, দুখি বলিল, "তাহা হইলে বউমার কী হইবে।" ছিদাম কহিল, "উহাকে আমি বাঁচাইয়া দিব।" বৃহৎকায় দুখিরাম নিশ্চিন্ত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ছিদাম তাহার স্ত্রীকে শিখাইয়া দিয়াছিল যে, তুই বলিস বড়ো জা আমাকে বঁটি লইয়া মারিতে আসিয়াছিল, আমি তাহাকে দা লইয়া ঠেকাইতে গিয়া হঠাৎ কেমন করিয়া লাগিয়া গিয়াছে। এ-সমস্তই রামলোচনের রচিত। ইহার অনুকূলে যে যে অলংকার এবং প্রমাণ প্রয়োগের আবশ্যক তাহাও সে বিস্তারিতভাবে ছিদামকে শিখাইয়াছিল।

পুলিস আসিয়া তদন্ত করিতে লাগিল। চন্দরাই যে তাহার বড়ো জাকে খুন করিয়াছে গ্রামের সকল লোকের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। সকল সাক্ষীর দ্বারাই সেইরূপ প্রমাণ হইল। পুলিস যখন চন্দরাকে প্রশ্ন করিল, চন্দরা কহিল, "হাঁ আমি খুন করিয়াছি।"

কেন খুন করিয়াছ।

আমি তাহাকে দেখিতে পারিতাম না।

কোনো বচসা হইয়াছিল ?

না।

সে তোমাকে প্রথমে মারিতে আসিয়াছিল ?

না।

তোমার প্রতি কোনো অত্যাচার করিয়াছিল ?

না।

এইরূপ উত্তর শুনিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল।

ছিদাম তো একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল। কহিল, "উনি ঠিক কথা বলিতেছেন না। বড়োবউ প্রথমে—"

দারোগা খুব এক তাড়া দিয়া তাহাকে থামাইয়া দিল। অবশেষে তাহাকে বিধিমতে জেরা করিয়া বার বার সে-ই একই উত্তর পাইল—বড়োবউয়ের দিক হইতে কোনোরূপ আক্রমণ চন্দরা কিছুতেই স্বীকার করিল না।

এমন একগুঁয়ে মেয়েও তো দেখা যায় না। একেবারে প্রাণপণে ফাঁসিকাষ্ঠের দিকে ঝুঁকিয়াছে, কিছুতেই তাহাকে টানিয়া রাখা যায় না। এ কী নিদারুণ অভিমান। চন্দরা মনে মনে স্বামীকে বলিতেছে, আমি তোমাকে ছাড়িয়া আমার এই নবযৌবন লইয়া ফাঁসিকাঠকে বরণ করিলাম—আমার ইহজন্মের শেষবন্ধন তাহার সহিত।

বন্দিনী হইয়া চন্দরা, একটি নিরীহ ক্ষুদ্র চঞ্চল কৌতুকপ্রিয় গ্রামবধূ, চিরপরিচিত গ্রামের পথ দিয়া, রথতলা দিয়া, হাটের মধ্য দিয়া, ঘাটের প্রান্ত দিয়া, মজুমদারদের বাড়ির সম্মুখ দিয়া, পোস্টাপিস এবং ইস্কুলঘরের পার্শ্ব দিয়া, সমস্ত পরিচিত লোকের চক্ষের উপর দিয়া কলঙ্কের ছাপ লইয়া চিরকালের মতো গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। একপাল ছেলে পিছন পিছন চলিল এবং গ্রামের মেয়েরা, তাহার সইসাঙাতরা কেহ কেহ ঘোমটার ফাঁক দিয়া, কেহ দ্বারের প্রান্ত হইতে, কেহ বা গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া পুলিস-চালিত চন্দরাকে দেখিয়া লজ্জায় ঘৃণায় ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেও চন্দরা দোষ স্বীকার করিল। এবং খুনের সময় বড়োবউ যে তাহার প্রতি কোনোরূপ অত্যাচার করিয়াছিল তাহা প্রকাশ হইল না।

কিন্তু সেদিন ছিদাম সাক্ষ্যস্থলে আসিয়াই একেবারে কাঁদিয়া জোড়হস্তে কহিল, "দোহাই হুজুর, আমার স্ত্রীর কোনো দোষ নাই।" হাকিম ধমক দিয়া তাহার উচ্ছ্বাস নিবারণ করিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, সে একে একে সত্য ঘটনা প্রকাশ করিল।

হাকিম তাহার কথা বিশ্বাস করিলেন না। কারণ, প্রধান বিশ্বস্ত ভদ্রসাক্ষী

রামলোচন কহিল, "খুনের অনতিবিলম্বেই আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলাম। সাক্ষী ছিদাম আমার নিকট সমস্ত স্বীকার করিয়া আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, 'বউকে কী করিয়া উদ্ধার করিব আমাকে যুক্তি দিন।' আমি ভালো মন্দ কিছুই বলিলাম না। সাক্ষী আমাকে বলিল, আমি যদি বলি আমার বড়ো ভাই ভাত চাহিয়া ভাত পায় নাই বলিয়া রাগের মাথায় স্ত্রীকে মারিয়াছে, তাহা হইলে সে কি রক্ষা পাইবে।' আমি কহিলাম, 'খবরদার হারামজাদা, আদালতে একবর্ণও মিথ্যা বলিস না—এতবড়ো মহাপাপ আর নাই' ইত্যাদি।

রামলোচন প্রথমে চন্দরাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশে অনেকগুলা গল্প বানাইয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু যখন দেখিল, চন্দরা নিজে বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন ভাবিল, ওরে বাপ রে শেষকালে কি মিথ্যা সাক্ষ্যের দায়ে পড়িব। যেটুকু জানি সেটুকু বলা ভালো, এই মনে করিয়া রামলোচন যাহা জানে তাহাই বলিল। বরঞ্চ তাহার চেয়েও কিছু বেশি বলিতে ছাড়িল না।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সেশনে চালান দিলেন।

ইতিমধ্যে চাষবাস হাটবাজার হাসিকান্না পৃথিবীর সমস্ত কাজ চলিতে লাগিল। এবং পূর্ব পূর্ব বৎসরের মতো নবীন ধান্যক্ষেত্রে শ্রাবণের অবিরল বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতে লাগিল।

পুলিস আসামী এবং সাক্ষী লইয়া আদালতে হাজির। সম্মুখবর্তী মুন্সেফের কোর্টে বিস্তর লোক নিজ নিজ মোকদ্দমার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। রন্ধনশালার পশ্চাদ্বর্তী একটি ডোবার অংশ-বিভাগ লইয়া কলিকাতা হইতে এক উকিল আসিয়াছে এবং তদুপলক্ষে বাদীর পক্ষে উনচল্লিশজন সাক্ষী উপস্থিত আছে। কতশত লোক আপন আপন কড়াগণ্ডা হিসাবের চুলচেরা মীমাংসা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আসিয়াছে, জগতে আপাতত তদপেক্ষা গুরুতর আর কিছুই উপস্থিত নাই এইরূপ তাহাদের ধারণা। ছিদাম বাতায়ন হইতে এই অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত প্রতিদিনের পৃথিবীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে, সমস্তই স্বপ্নের মতো বোধ হইতেছে। কম্পাউণ্ডের বৃহৎ বটগাছ হইতে একটি কোকিল ডাকিতেছে—তাহাদের কোনোরূপ আইন-আদালত নাই।

চন্দরা জজের কাছে কহিল, "ওগো সাহেব, এক কথা আর বারবার কতবার করিয়া বলিব।"

জজসাহেব তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "তুমি যে অপরাধ স্বীকার করিতেছ তাহার শাস্তি কী জানো?"

চন্দরা কহিল, "না।"

জজসাহেব কহিলেন, "তাহার শাস্তি ফাঁসি।"

চন্দরা কহিল, "ওগো তোমার পায়ে পড়ি. তাই দাওনা সাহেব। তোমাদের যাহা খুশি করো, আমার তো আর সহ্য হয় না।"

যখন ছিদামকে আদালতে উপস্থিত করিল, চন্দরা মুখ ফিরাইল। জজ কহিলেন, "সাক্ষীর দিকে চাহিয়া বলো এ তোমার কে হয়।"

চন্দরা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কহিল, "ও আমার স্বামী হয়।"

প্রশ্ন হইল—ও তোমাকে ভালোবাসে না ?

উত্তর। উঃ ভারি ভালোবাসে।

প্রশ্ন। তুমি উহাকে ভালোবাস না ?

উত্তর। খুব ভালোবাসি।

ছিদামকে যখন প্রশ্ন হইল, ছিদাম কহিল, "আমি খুন করিয়াছি।"

প্রশ্ন। কেন।

ছিদাম। ভাত চাহিয়াছিলাম বড়োবউ ভাত দেয় নাই।

দুখিরাম সাক্ষ্য দিতে আসিয়া, মূর্ছিত হইয়া পড়িল। মূর্ছাভঙ্গের পর উত্তর করিল, "সাহেব, খুন আমি করিয়াছি।"

কেন।

ভাত চাহিয়াছিলাম ভাত দেয় নাই।

বিস্তর জেরা করিয়া এবং অন্যান্য সাক্ষ্য শুনিয়া জজসাহেব স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, ঘরের স্ত্রীলোককে ফাঁসির অপমান হইতে বাঁচাইবার জন্য ইহারা দুই ভাই অপরাধ স্বীকার করিতেছে। কিন্তু চন্দরা পুলিস হইতে সেশন আদালত পর্যন্ত বরাবর এককথা বলিয়া আসিতেছে, তাহার কথার তিলমাত্র নড়চড় হয় নাই। দুইজন উকিল স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে প্রাণদণ্ড হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু অবশেষে তাহার নিকট পরাস্ত মানিয়াছে।

যেদিন একরত্তি বয়সে একটি কালোকোলো ছোটোখাটো মেয়ে তাহার গোলগাল মুখটি লইয়া খেলার পুতুল ফেলিয়া বাপের ঘর হইতে শ্বশুরঘরে আসিল, সেদিন রাত্রে শুভলগ্নের সময় আজিকার দিনের কথা কে কল্পনা করিতে পারিত। তাহার বাপ মরিবার সময় এই বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল যে, যাহা হউক আমার মেয়েটির একটি সদ্গতি করিয়া গেলাম।

জেলখানায় ফাঁসির পূর্বে দয়ালু সিভিল সার্জন চন্দরাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কাহাকেও দেখিতে ইচ্ছা কর ?"

চন্দরা কহিল, "একবার আমার মাকে দেখিতে চাই।"

ডাক্তার কহিল "তোমার স্বামী তোমাকে দেখিতে চায়, তাহাকে কি ডাকিয়া আনিব।"

চন্দরা কহিল, "মরণ।—"

শ্রাবণ, ১৩০০

একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প

গল্প বলিতে হইবে? কিন্তু আর তো পারি না। এখন এই পরিশ্রান্ত অক্ষম ব্যক্তিটিকে ছুটি দিতে হইবে।

এ পদ আমাকে কে দিল বলা কঠিন। ক্রমে ক্রমে একে একে তোমরা পাঁচজন আসিয়া আমার চারিদিকে কখন জড়ো হইলে, এবং কেন যে তোমরা আমাকে এত অনুগ্রহ করিলে এবং আমার কাছে এত প্রত্যাশা করিলে, তাহা বলা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। অবশ্যই সে তোমাদের নিজগুণে; শুভাদৃষ্টক্রমে আমার প্রতি সহসা তোমাদের অনুগ্রহ উদয় হইয়াছিল। এবং যাহাতে সে অনুগ্রহ রক্ষা হয় সাধ্যমতো সে চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই।

কিন্তু পাঁচজনের অব্যক্ত অ নির্দিষ্ট সম্মতিক্রমে যে কার্যভার আমার প্রতি অর্পিত হইয়া পড়িয়াছে আমি তাহার যোগ্য নহি। ক্ষমতা আছে কি না তাহা লইয়া বিনয় বা অহংকার করিতে চাহি না কিন্তু প্রধান কারণ এই যে, বিধাতা আমাকে নির্জনচর জীবরূপেই গঠিত করিয়াছিলেন। খ্যাতি যশ জনতার উপযোগী করিয়া আমার গাত্রে কঠিন চর্মাবরণ দিয়া দেন নাই; তাঁহার এই বিধান ছিল যে, যদি তুমি আত্মরক্ষা করিতে চাও তো একটু নিরালার মধ্যে বাস করিয়ো। চিত্তও সেই নিরালা বাসস্থানটুকুর জন্য সর্বদাই উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে। কিন্তু পিতামহ অদৃষ্ট পরিহাস করিয়াই হউক অথবা ভুল বুঝিয়াই হউক, আমাকে একটি বিপুল জনসমাজের মধ্যে উত্তীর্ণ করিয়া এক্ষণে মুখে কাপড় দিয়া হাস্য করিতেছেন; আমি তাঁহার সেই হাস্যে যোগ দিবার চেষ্টা করিতেছি কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিতেছি না।

পলায়ন করাও আমার কর্তব্য বলিয়া মনে হয় না। সৈন্যদলের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছে যাহারা স্বভাবতই যুদ্ধের অপেক্ষা শান্তির মধ্যেই অধিকতর স্ফূর্তি পাইতে পারিত কিন্তু যখন সে নিজের এবং পরের ভ্রমক্রমে যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে আসিয়া

দাঁড়াইয়াছে তখন হঠাৎ দল ভাঙিয়া পলায়ন করা তাহাকে শোভা পায় না। অদৃষ্ট সুবিবেচনাপূর্বক প্রাণিগণকে যথাসাধ্য কর্মে নিয়োগ করেন না, কিন্তু তথাপি নিযুক্ত কার্য দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করা মানুষের কর্তব্য।

তোমরা আবশ্যক বোধ করিলে আমার নিকট আসিয়া থাক, এবং সম্মান দেখাইতেও ত্রুটি কর না। আবশ্যক অতীত হইয়া গেলে সেবকাধমের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া কিছু আত্মগৌরব অনুভব করিবারও চেষ্টা করিয়া থাক। পৃথিবীতে সাধারণত ইহাই স্বাভাবিক এবং এই কারণেই "সাধারণ" নামক একটি অকৃতজ্ঞ অব্যবস্থিতচিত্ত রাজাকে তাহার অনুচরবর্গ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে না কিন্তু অনুগ্রহ-নিগ্রহের দিকে তাকাইলে সকল সময় কাজ করা হইয়া উঠে না। নিরপেক্ষ হইয়া কাজ না করিলে কাজের গৌরব আর থাকে না।

অতএব যদি কিছু শুনিতে ইচ্ছা করিয়া আসিয়া থাক তো কিছু শুনাইব। শ্রান্তি মানিব না এবং উৎসাহেরও প্রত্যাশা করিব না।

আজ কিন্তু অতি ক্ষুদ্র এবং পৃথিবীর অত্যন্ত পুরাতন একটি গল্প মনে পড়িতেছে। মনোহর না হইলেও সংক্ষেপবশত শুনিতে ধৈর্যচ্যুতি না হইবার সম্ভাবনা।

পৃথিবীর একটি মহানদীর তীরে একটি মহারণ্য ছিল। সেই অরণ্যে এবং সেই নদীতীরে এক কাঠঠোকরা এবং একটি কাদাখোঁচা পক্ষী বাস করিত।

ধরাতলে কীট যখন সুলভ ছিল তখন ক্ষুধানিবৃত্তিপূর্বক সন্তুষ্টচিত্তে উভয়ে ধরাধামের যশোকীর্তন করিয়া পুষ্টকলেবরে বিচরণ করিত।

কালক্রমে দৈবযোগে পৃথিবীতে কীট দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল।

তখন নদীতীরস্থ কাদাখোঁচা শাখাসীন কাঠঠোকরাকে কহিল, "ভাই কাঠঠোকরা, বাহির হইতে অনেকের নিকট এই পৃথিবী নবীন শ্যামল সুন্দর বলিয়া মনে হয় কিন্তু আমি দেখিতেছি ইহা আদ্যোপান্ত জীর্ণ।"

শাখাসীন কাঠঠোকরা নদীতটস্থ কাদাখোঁচাকে বলিল, "ভাই কাদাখোঁচা, অনেকে এই অরণ্যকে সতেজ শোভন বলিয়া বিশ্বাস করে, কিন্তু আমি বলিতেছি ইহা একেবারে অন্তঃসারবিহীন।"

তখন উভয়ে মিলিয়া তাহাই প্রমাণ করিয়া দিতে কৃতসংকল্প হইল। কাদাখোঁচা নদীতীরে লম্ফ দিয়া, পৃথিবীর কোমল কর্দমে অনবরতই চঞ্চু বিদ্ধ করিয়া বসুন্ধরার জীর্ণতা নির্দেশ করিতে লাগিল এবং কাঠঠোকরা বনস্পতির কঠিন শাখায় বারংবার চঞ্চু আঘাত করিয়া অরণ্যের অন্তঃশূন্যতা প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইল।

বিধিবিড়ম্বনায় উক্ত দুই অধ্যবসায়ী পক্ষী সংগীতবিদ্যায় বঞ্চিত। অতএব কোকিল যখন ধরাতলে নব নব বসন্তসমাগম পঞ্চম স্বরে ঘোষণা করিতে লাগিল, এবং শ্যামা যখন অরণ্যে নব নব প্রভাতোদয় কীর্তন করিতে নিযুক্ত রহিল, তখন এই দুই ক্ষুধিত অসন্তুষ্ট মূক পক্ষী অশ্রান্ত উৎসাহে আপন প্রতিজ্ঞা পালন করিতে লাগিল।

এ গল্প তোমাদের ভালো লাগিল না? ভালো লাগিবার কথা নহে। কিন্তু ইহার সর্বাপেক্ষা মহৎ গুণ এই যে, পাঁচ-সাত প্যারাগ্রাফেই সম্পূর্ণ।

এই গল্পটা যে পুরাতন তাহাও তোমাদের মনে হইতেছে না? তাহার কারণ পৃথিবীর ভাগ্যদোষে এ গল্প অতিপুরাতন হইয়াও চিরকাল নূতন রহিয়া গেল। বহুদিন হইতেই অকৃতজ্ঞ কাঠঠোকরা পৃথিবীর দৃঢ় কঠিন অমর মহত্ত্বের উপর ঠক ঠক শব্দে চঞ্চুপাত করিতেছে, এবং কাদাখোঁচা পৃথিবীর সরস উর্বর কোমলত্বের মধ্যে খচ খচ শব্দে চঞ্চু বিদ্ধ করিতেছে—আজও তাহার শেষ হইল না, মনের আক্ষেপ এখনও রহিয়া গেল।

গল্পটার মধ্যে সুখদুঃখের কথা কী আছে জিজ্ঞাসা করিতেছ? ইহার মধ্যে দুঃখের কথাও আছে সুখের কথাও আছে। দুঃখের কথা এই যে, পৃথিবী যতই উদার এবং অরণ্য যতই মহৎ হউক, ক্ষুদ্র চঞ্চু আপনার উপযুক্ত খাদ্য না পাইবামাত্র তাহাদিগকে আঘাত করিয়া আসিতেছে। এবং সুখের বিষয় এই যে, তথাপি শত সহস্র বৎসর পৃথিবী নবীন এবং অরণ্য শ্যামল রহিয়াছে। যদি কেহ মরে তো সে ওই দুটি বিদ্বেষ-বিষজর্জর হতভাগ্য বিহঙ্গ, এবং জগতে কেহ সে সংবাদ জানিতেও পায় না।

তোমরা এ গল্পের মধ্যে মাথামুণ্ডু অর্থ কী আছে কিছু বুঝিতে পার নাই? তাৎপর্য বিশেষ কিছুই জটিল নহে, হয়তো কিঞ্চিৎ বয়সপ্রাপ্ত হইলেই বুঝিতে পারিবে।

যাহাই হউক সর্বসুদ্ধ জিনিসটা তোমাদের উপযুক্ত হয় নাই?

তাহার তো কোনো সন্দেহমাত্র নাই।

ভাদ্র, ১৩০০

সমাপ্তি

প্রথম পরিচ্ছেদ

অপূর্বকৃষ্ণ বি. এ. পাস করিয়া কলিকাতা হইতে দেশে ফিরিয়া আসিতেছেন।

নদীটি ক্ষুদ্র। বর্ষা অন্তে প্রায় শুকাইয়া যায়। এখন শ্রাবণের শেষে জলে ভরিয়া উঠিয়া একেবারে গ্রামের বেড়া ও বাঁশঝাড়ের তলদেশ চুম্বন করিয়া চলিয়াছে।

বহুদিন ঘন বর্ষার পরে আজ মেঘমুক্ত আকাশে রৌদ্র দেখা দিয়াছে।

নৌকায় আসীন অপূর্বকৃষ্ণের মনের ভিতরকার একখানি ছবি যদি দেখিতে পাইতাম তবে দেখিতাম সেখানেও এই যুবকের মানস-নদী নববর্ষায় কূলে কূলে ভরিয়া আলোকে জলজল এবং বাতাসে ছলছল করিয়া উঠিতেছে।

নৌকা যথাস্থানে ঘাটে আসিয়া লাগিল। নদীতীর হইতে অপূর্বদের বাড়ির পাকা ছাদ গাছের অন্তরাল দিয়া দেখা যাইতেছে। অপূর্বের আগমন-সংবাদ বাড়ির কেহ জানিত না সেইজন্য ঘাটে লোক আসে নাই। মাঝি ব্যাগ লইতে উদ্যত হইলে অপূর্ব তাহাকে নিবারণ করিয়া নিজেই ব্যাগ হাতে লইয়া আনন্দভরে তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িল।

নামিবামাত্র, তীরে ছিল পিছল, ব্যাগসমেত অপূর্ব কাদায় পড়িয়া গেল। যেমন পড়া, অমনি,—কোথা হইতে এক সুমিষ্ট উচ্চকণ্ঠে তরল হাস্যলহরী উচ্ছ্বসিত হইয়া নিকটবর্তী অশথগাছের পাখিগুলিকে সচকিত করিয়া দিল।

অপূর্ব অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি আত্মসংবরণ করিয়া চাহিয়া দেখিল। দেখিল, তীরে মহাজনের নৌকা হইতে নূতন ইঁট রাশীকৃত করিয়া নামাইয়া রাখা হইয়াছে, তাহারই উপরে বসিয়া একটি মেয়ে হাস্যবেগে এখনই শতধা হইয়া যাইবে এমনি মনে হইতেছে।

অপূর্ব চিনিতে পারিল তাহাদেরই নূতন প্রতিবেশিনীর মেয়ে মৃন্ময়ী। দূরে বড়ো নদীর ধারে ইহাদের বাড়ি ছিল, সেখানে নদীর ভাঙনে দেশ ত্যাগ করিয়া বছর দুই-তিন হইল এই গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছে।

এই মেয়েটির অখ্যাতির কথা অনেক শুনিতে পাওয়া যায়। পুরুষ গ্রামবাসীরা স্নেহভরে ইহাকে পাগলী বলে, কিন্তু গ্রামের গৃহিণীরা ইহার উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবে সর্বদা ভীত চিন্তিত শঙ্কান্বিত। গ্রামের যত ছেলেদের সহিতই ইহার খেলা; সমবয়সী মেয়েদের প্রতি অবজ্ঞার সীমা নাই। শিশুরাজ্যে এই মেয়েটি একটি ছোটোখাটো বর্গির উপদ্রব বলিলেই হয়।

বাপের আদরের মেয়ে ছিল, সেইজন্য ইহার এতটা দুর্দান্ত প্রতাপ। এই সম্বন্ধে বন্ধুদের নিকট মৃন্ময়ীর মা স্বামীর বিরুদ্ধে সর্বদা অভিযোগ করিতে ছাড়িত না, অথচ বাপ ইহাকে ভালোবাসে, বাপ কাছে থাকিলে মৃন্ময়ীর চোখের অশ্রুবিন্দু তাহার অন্তরে বড়োই বাজিত ইহাই মনে করিয়া প্রবাসী স্বামীকে স্মরণপূর্বক মৃন্ময়ীর মা মেয়েকে কিছুতেই কাঁদাইতে পারিত না।

মৃন্ময়ী দেখিতে শ্যামবর্ণ। ছোটো কোঁকড়া চুল পিঠ পর্যন্ত পড়িয়াছে। ঠিক যেন বালকের মতো মুখের ভাব। মস্ত মস্ত দুটি কালো চক্ষুতে না আছে লজ্জা, না আছে ভয়, না আছে হাবভাবলীলার লেশমাত্র। শরীর দীর্ঘ পরিপুষ্ট সুস্থ সবল, কিন্তু তাহার বয়স অধিক কি অল্প সে প্রশ্ন কাহারও মনে উদয় হয় না; যদি হইত, তবে এখনও অবিবাহিত আছে বলিয়া লোকে তাহার পিতামাতাকে নিন্দা করিত। গ্রামে বিদেশী জমিদারের নৌকা কালক্রমে যেদিন ঘাটে আসিয়া লাগে সেদিন গ্রামের লোকেরা সম্ভ্রমে শশব্যস্ত হইয়া উঠে, ঘাটের মেয়েদের মুখ-রঙ্গভূমিতে অকস্মাৎ নাসাগ্রভাগ পর্যন্ত যবনিকাপতন হয়, কিন্তু মৃন্ময়ী কোথা হইতে একটা উলঙ্গ শিশুকে কোলে লইয়া কোঁকড়া চুলগুলি পিঠে দোলাইয়া ছুটিয়া ঘাটে আসিয়া উপস্থিত। যে দেশে ব্যাধ নাই বিপদ নাই সেই দেশের হরিণশিশুর মতো নির্ভীক কৌতূহলে দাঁড়াইয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে থাকে, অবশেষে আপন দলের বালকসঙ্গীদের নিকট ফিরিয়া গিয়া এই নবাগত প্রাণীর আচারব্যবহার সম্বন্ধে বিস্তর বাহুল্য বর্ণনা করে।

আমাদের অপূর্ব ইতিপূর্বে ছুটি উপলক্ষে বাড়ি আসিয়া এই বন্ধনবিহীন বালিকাটিকে দুই-চারিবার দেখিয়াছে এবং অবকাশের সময়, এমন কি, অনবকাশের সময়ও ইহার সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছে। পৃথিবীতে অনেক মুখ চোখে পড়ে কিন্তু এক একটি মুখ বলাকহা নাই একেবারে মনের মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। সে কেবল সৌন্দর্যের জন্য নহে, আর একটা কী গুণ আছে। সে গুণটি বোধ করি স্বচ্ছতা। অধিকাংশ মুখের মধ্যেই মনুষ্যপ্রকৃতিটি আপনাকে পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করিতে পারে না; যে-মুখে সেই অন্তরগুহাবাসী রহস্যময় লোকটি অবাধে বাহির হইয়া দেখা দেয়, সে মুখ সহস্রের মধ্যে চোখে পড়ে এবং এক পলকে মনে মুদ্রিত হইয়া যায়। এই বালিকার মুখে চোখে একটি দুরন্ত অবাধ্য নারীপ্রকৃতি উন্মুক্ত বেগবান অরণ্যমৃগের মতো সর্বদা দেখা দেয়, খেলা করে, সেইজন্য এই জীবনচঞ্চল মুখখানি একবার দেখিলে আর সহজে ভোলা যায় না।

পাঠকদিগকে বলা বাহুল্য, মৃন্ময়ীর কৌতুকহাস্যধ্বনি যতই সুমিষ্ট হউক দুর্ভাগা অপূর্বর পক্ষে কিঞ্চিৎ ক্লেশদায়ক হইয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি মাঝির হাতে ব্যাগ সমর্পণ করিয়া রক্তিমমুখে দ্রুতবেগে গৃহ অভিমুখে চলিতে লাগিল।

আয়োজনটি অতি সুন্দর হইয়াছিল। নদীর তীর, গাছের ছায়া, পাখির গান, প্রভাতের রৌদ্র, কুড়ি বৎসর বয়স ; অবশ্য ইটের স্তূপটা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে, কিন্তু যে ব্যক্তি তাহার উপর বসিয়া ছিল সে এই শুষ্ক কঠিন আসনের প্রতিও একটি মনোরম শ্রী বিস্তার করিয়াছিল। হায়, এমন দৃশ্যের মধ্যে প্রথম পদক্ষেপমাত্রেই যে সমস্ত কবিত্ব প্রহসনে পরিণত হয় ইহা অপেক্ষা অদৃষ্টের নিষ্ঠুরতা আর কী হইতে পারে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেই ইষ্টকশিখর হইতে প্রবহমান হাস্যধ্বনি শুনিতে শুনিতে চাদরে ও ব্যাগে কাদা মাখিয়া গাছের ছায়া দিয়া অপূর্ব বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইল।

অকস্মাৎ পুত্রের আগমনে তাহার বিধবা মাতা পুলকিত হইয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ ক্ষীর-দধি-রুইমাছের সন্ধানে দূরে নিকটে লোক দৌড়িল এবং পাড়াপ্রতিবেশীর মধ্যেও একটা আন্দোলন উপস্থিত হইল।

আহারান্তে মা অপূর্বর বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। অপূর্ব সেজন্য প্রস্তুত হইয়া ছিল। কারণ প্রস্তাব অনেক পূর্বেই ছিল, কিন্তু পুত্র নব্যতন্ত্রের নূতন ধুয়া ধরিয়া জেদ করিয়া বসিয়া ছিল যে, বি এ. পাস না করিয়া বিবাহ করিব না। এতকাল জননী সেইজন্য অপেক্ষা করিয়া ছিলেন, অতএব এখন আর কোনো ওজর করা মিথ্যা। অপূর্ব কহিল, "আগে পাত্রী দেখা হউক, তাহার পর স্থির হইবে।" মা কহিলেন, "পাত্রী দেখা হইয়াছে, সেজন্য তোকে ভাবিতে হইবে না।" অপূর্ব ওই ভাবনাটা নিজে ভাবিতে প্রস্তুত হইল এবং কহিল, "মেয়ে না দেখিয়া বিবাহ করিতে পারিব না।" মা ভাবিলেন, এমন সৃষ্টিছাড়া কথাও কখনো শোনা যায় নাই, কিন্তু সম্মত হইলেন।

সে-রাত্রে অপূর্ব প্রদীপ নিবাইয়া বিছানায় শয়ন করিলে পর বর্ষানিশীথের সমস্ত শব্দ এবং সমস্ত নিস্তব্ধতার পরপ্রান্ত হইতে বিজন বিনিদ্র শয্যায় একটি উচ্ছ্বসিত উচ্চ মধুর কণ্ঠের হাস্যধ্বনি তাহার কানে আসিয়া ক্রমাগত বাজিতে লাগিল। মন নিজেকে কেবলই এই বলিয়া পীড়া দিতে লাগিল যে, সকালবেলাকার সেই পদস্খলনটা যেন কোনো একটা উপায়ে সংশোধন করিয়া লওয়া উচিত। বালিকা জানিল না যে, আমি অপূর্বকৃষ্ণ অনেক বিদ্যা উপার্জন করিয়াছি, কলিকাতায় বহুকাল যাপন করিয়া আসিয়াছি, দৈবাৎ পিছলে পা দিয়া কাদায় পড়িয়া গেলেও আমি উপহাস্য উপেক্ষণীয় একজন যে-সে গ্রাম্য যুবক নহি।

পরদিন অপূর্ব কনে দেখিতে যাইবে। অধিক দূরে নহে, পাড়াতেই তাহাদের বাড়ি। একটু বিশেষ যত্নপূর্বক সাজ করিল। ধুতি ও চাদর ছাড়িয়া সিল্কের চাপকান

জোব্বা, মাথায় একটা গোলাকার পাগড়ি, এবং বার্নিশকরা একজোড়া জুতা পায়ে দিয়া সিল্কের ছাতা হস্তে প্রাতঃকালে বাহির হইল।

সম্ভাবিত শ্বশুরবাড়িতে পদার্পণ করিবামাত্র মহা সমারোহ-সমাদরের ঘটা পড়িয়া গেল। অবশেষে যথাকালে কম্পিতহৃদয় মেয়েটিকে ঝাড়িয়া মুছিয়া রং করিয়া খোঁপায় রাংতা জড়াইয়া একখানি পাতলা রঙিন কাপড়ে মুড়িয়া বরের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করা হইল। সে এক কোণে নীরবে মাথা প্রায় হাঁটুর কাছে ঠেকাইয়া বসিয়া রহিল এবং এক প্রৌঢ়া দাসী তাহাকে সাহস দিবার জন্য পশ্চাতে উপস্থিত রহিল। কনের এক বালক ভাই তাহাদের পরিবারের মধ্যে এই এক নূতন অনধিকার প্রবেশোদ্যত লোকটির পাগড়ি, ঘড়ির চেন এবং নবোদ্গত শ্মশ্রু একমনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অপূর্ব কিয়ৎকাল গোঁফে তা দিয়া অবশেষে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কী পড়।" বসনভূষণাচ্ছন্ন লজ্জাস্তূপের নিকট হইতে তাহার কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। দুই-তিনবার প্রশ্ন এবং প্রৌঢ়া দাসীর নিকট হইতে পৃষ্ঠদেশে বিস্তর উৎসাহজনক করতাড়নের পর বালিকা মৃদুস্বরে একনিঃশ্বাসে অত্যন্ত দ্রুত বলিয়া গেল, চারুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ, ব্যাকরণসার প্রথম ভাগ, ভূগোলবিবরণ, পাটিগণিত, ভারতবর্ষের ইতিহাস। এমন সময় বহির্দেশে একটা অশান্ত গতির ধুপধাপ শব্দ শোনা গেল এবং মুহূর্তের মধ্যে দৌড়িয়া হাঁপাইয়া পিঠের চুল দোলাইয়া মৃন্ময়ী ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। অপূর্বকৃষ্ণের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া একেবারে কনের ভাই রাখালের হাত ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল। রাখাল তখন আপন পর্যবেক্ষণশক্তির চর্চায় একান্তমনে নিযুক্ত ছিল, সে কিছুতেই উঠিতে চাহিল না। দাসীটি তাহার সংযত কণ্ঠস্বরের মৃদুতা রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যথাসাধ্য তীব্রভাবে মৃন্ময়ীকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। অপূর্বকৃষ্ণ আপনার সমস্ত গাম্ভীর্য এবং গৌরব একত্র করিয়া পাগড়িপরা মস্তকে অভ্রভেদী হইয়া বসিয়া রহিল এবং পেটের কাছে ঘড়ির চেন নাড়িতে লাগিল। অবশেষে সঙ্গীটিকে কিছুতেই বিচলিত করিতে না পারিয়া তাহার পিঠে একটা সশব্দ চপেটাঘাত করিয়া এবং চট করিয়া কনের মাথার ঘোমটা টানিয়া খুলিয়া দিয়া ঝড়ের মতো মৃন্ময়ী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। দাসীটি গুমরিয়া গর্জন করিতে লাগিল এবং ভগ্নীর অকস্মাৎ অবগুণ্ঠন মোচনে রাখাল খিল খিল শব্দে হাসিতে আরম্ভ করিল। নিজের পৃষ্ঠের প্রবল চপেটাঘাতটি সে অন্যায় প্রাপ্য মনে করিল না, কারণ, এরূপ দেনা পাওনা তাহাদের মধ্যে সর্বদাই চলিতেছে। এমন কি, পূর্বে মৃন্ময়ীর চুল কাঁধ ছাড়াইয়া পিঠের মাঝামাঝি আসিয়া পড়িত; রাখালই একদিন হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তাহার ঝুঁটির মধ্যে কাঁচি চালাইয়া দেয়। মৃন্ময়ী তখন অত্যন্ত রাগ করিয়া তাহার হাত হইতে

কাঁচিটি কাড়িয়া লইয়া নিজের অবশিষ্ট পশ্চাতের চুল ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে নির্দয়ভাবে কাটিয়া ফেলিল, তাহার কোঁকড়া চুলের স্তবকগুলি শাখাচ্যুত কালো আঙুরের স্তূপের মতো গুচ্ছ গুচ্ছ মাটিতে পড়িয়া গেল। উভয়ের মধ্যে এরূপ শাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল।

অতঃপর এই নীরব পরীক্ষাসভা আর অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। পিণ্ডাকার কন্যাটি কোনোমতে পুনশ্চ দীর্ঘাকার হইয়া দাসী সহকারে অন্তঃপুরে চলিয়া গেল। অপূর্ব পরম গম্ভীরভাবে বিরল গুম্ফরেখায় তা দিতে দিতে উঠিয়া ঘরের বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল। দ্বারের নিকটে গিয়া দেখে, বার্নিশ-করা নূতন জুতাজোড়াটি যেখানে ছিল সেখানে নাই, এবং কোথায় আছে তাহাও বহুচেষ্টায় অবধারণ করা গেল না।

বাড়ির লোক সকলেই বিষম বিব্রত হইয়া উঠিল এবং অপরাধীর উদ্দেশে গালি ও ভর্ৎসনা অজস্র বর্ষিত হইতে লাগিল। অনেক খোঁজ করিয়া অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া বাড়ির কর্তার পুরাতন ছিন্ন ঢিলা চটিজোড়াটা পরিয়া প্যান্টলুন চাপকান পাগড়ি সমেত সুসজ্জিত অপূর্ব কর্দমাক্ত গ্রামপথে অত্যন্ত সাবধানে চলিতে লাগিল।

পুষ্করিণীর ধারে নির্জন পথপ্রান্তে আবার হঠাৎ সেই উচ্চকণ্ঠের অজস্র হাস্য-কলোচ্ছ্বাস। যেন তরুপল্লবের মধ্য হইতে কৌতুকপ্রিয়া বনদেবী অপূর্বর ওই অসংগত চটিজুতাজোড়ার দিকে চাহিয়া হঠাৎ আর হাসি ধারণ করিয়া রাখিতে পারিল না।

অপূর্ব অপ্রতিভভাবে থমকিয়া দাঁড়াইয়া ইতস্তত নিরীক্ষণ করিতেছে এমন সময় ঘন বন হইতে বাহির হইয়া একটি নির্লজ্জ অপরাধিনী তাহার সম্মুখে নূতন জুতাজোড়াটি রাখিয়াই পলায়নোদ্যত হইল। অপূর্ব দ্রুতবেগে দুই হাত ধরিয়া তাহাকে বন্দী করিয়া ফেলিল।

মৃন্ময়ী আঁকিয়া বাঁকিয়া হাত ছাড়াইয়া পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। কোঁকড়া চুলে বেষ্টিত তাহার পরিপুষ্ট সহাস্য দুষ্ট মুখখানির উপরে শাখান্তরালচ্যুত সূর্য-কিরণ আসিয়া পড়িল। রৌদ্রোজ্জ্বল নির্মল চঞ্চল নির্ঝরিণীর দিকে অবনত হইয়া কৌতূহলী পথিক যেমন নিবিষ্টদৃষ্টিতে তাহার তলদেশ দেখিতে থাকে, অপূর্ব তেমনি করিয়া গভীর গম্ভীর নেত্রে মৃন্ময়ীর ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত মুখের উপর, তড়িত্তরল দুটি চক্ষুর মধ্যে চাহিয়া দেখিল এবং অত্যন্ত ধীরে ধীরে মুষ্টি শিথিল করিয়া যেন যথাকর্তব্য অসম্পন্ন রাখিয়া বন্দিনীকে ছাড়িয়া দিল। অপূর্ব যদি রাগ করিয়া মৃন্ময়ীকে ধরিয়া মারিত তাহা হইলে সে কিছুই আশ্চর্য হইত না, কিন্তু নির্জন পথের মধ্যে এই অপরূপ নীরব শাস্তির সে কোনো অর্থ বুঝিতে পারিল না।

নৃত্যময়ী প্রকৃতির নূপুরনিক্কণের ন্যায় চঞ্চল হাস্যধ্বনিটি সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া বাজিতে লাগিল এবং চিন্তানিমগ্ন অপূর্বকৃষ্ণ অত্যন্ত ধীরপদক্ষেপে বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অপূর্ব সমস্তদিন নানা ছুতা করিয়া অন্তঃপুরে মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল না। বাহিরে নিমন্ত্রণ ছিল, খাইয়া আসিল। অপূর্বর মতো এমন একজন কৃতবিদ্য গম্ভীর ভাবুক লোক একটি সামান্য অশিক্ষিতা বালিকার কাছে আপনার লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিবার, আপনার আন্তরিক মাহাত্ম্যের পরিপূর্ণ পরিচয় দিবার জন্য কেন যে এতটা বেশি উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিবে তাহা বুঝা কঠিন। একটি পাড়াগাঁয়ের চঞ্চল মেয়ে তাঁহাকে সামান্য লোক মনে করিলই বা। সে যদি মুহূর্তকালের জন্য তাঁহাকে হাস্যাস্পদ করিয়া তার পর তাঁহার অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া রাখাল নামক একটি নির্বোধ নিরক্ষর বালকের সহিত খেলা করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করে তাহাতেই বা তাঁহার ক্ষতি কী। তাহার কাছে প্রমাণ করিবার আবশ্যক কী যে, তিনি বিশ্বদীপ নামক মাসিক পত্রে গ্রন্থ সমালোচনা করিয়া থাকেন, এবং তাঁহার তোরঙ্গের মধ্যে এসেন্স, জুতা, রুবিনির ক্যাম্ফর, রঙিন চিঠির কাগজ এবং "হারমোনিয়ম শিক্ষা" বহির সঙ্গে একখানি পরিপূর্ণ খাতা নিশীথের গর্ভে ভাবী উষার ন্যায় প্রকাশের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। কিন্তু মনকে বুঝানো কঠিন এবং এই পল্লিবাসিনী চঞ্চলা মেয়েটির কাছে শ্রীযুক্ত অপূর্বকৃষ্ণ রায় বি. এ কিছুতেই পরাভব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে।

সন্ধ্যার সময়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে মা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন রে অপু, মেয়ে কেমন দেখলি। পছন্দ হয় তো?"

অপূর্ব কিঞ্চিৎ অপ্রতিভভাবে কহিল, "মেয়ে দেখেছি মা, ওর মধ্যে একটিকে আমার পছন্দ হয়েছে।"

মা আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, "তুই আবার কটি মেয়ে দেখলি!"

অবশেষে অনেক ইতস্ততর পর প্রকাশ পাইল প্রতিবেশিনী শরতের মেয়ে মৃন্ময়ীকে তাঁহার ছেলে পছন্দ করিয়াছে। এত লেখাপড়া শিখিয়া এমনি ছেলের পছন্দ!

প্রথমে অপূর্বর পক্ষে অনেকটা পরিমাণ লজ্জা ছিল, অবশেষে মা যখন প্রবল আপত্তি করিতে লাগিলেন তখন তাহার লজ্জা ভাঙিয়া গেল। সে রোখের মাথায় বলিয়া বসিল, মৃন্ময়ীকে ছাড়া আর কাহাকেও বিবাহ করিব না। অন্য জড়পুত্তলি মেয়েটিকে সে যতই কল্পনা করিতে লাগিল ততই বিবাহ-সম্বন্ধে তাহার বিষম বিতৃষ্ণার উদ্রেক হইল।

দুই-তিনদিন উভয়পক্ষে মান-অভিমান, অনাহার-অনিদ্রার পর অপূর্বই জয়ী হইল। মা মনকে বোঝাইলেন যে, মৃন্ময়ী ছেলেমানুষ এবং মৃন্ময়ীর মা উপযুক্ত শিক্ষাদানে

অসমর্থ, বিবাহের পর তাঁহার হাতে পড়িলেই তাহার স্বভাবের পরিবর্তন হইবে। এবং ক্রমশ ইহাও বিশ্বাস করিলেন যে, মৃন্ময়ীর মুখখানি সুন্দর। কিন্তু তখনই আবার তাহার খর্ব কেশরাশি তাঁহার কল্পনাপথে উদিত হইয়া হৃদয় নৈরাশ্যে পূর্ণ করিতে লাগিল. তথাপি আশা করিলেন, দৃঢ় করিয়া চুল বাঁধিয়া এবং জবজবে করিয়া তেল লেপিয়া কালে এ ত্রুটিও সংশোধন হইতে পারিবে।

পাড়ার লোকে সকলেই অপূর্বর এই পছন্দটিকে অপূর্ব-পছন্দ বলিয়া নামকরণ করিল। পাগলী মৃন্ময়ীকে অনেকেই ভালোবাসিত কিন্তু তাই বলিয়া নিজের পুত্রের বিবাহযোগ্যা বলিয়া কেহ মনে করিত না।

মৃন্ময়ীর বাপ ঈশান মজুমদারকে যথাকালে সংবাদ দেওয়া হইল। সে কোনো একটি স্টীমার কোম্পানির কেরানিরূপে দূরে নদীতীরবর্তী একটি ক্ষুদ্র স্টেশনে একটি ছোটো টিনের ছাদবিশিষ্ট কুটিরে মাল ওঠানো-নাবানো এবং টিকিট বিক্রয়কার্যে নিযুক্ত ছিল।

তাহার মৃন্ময়ীর বিবাহপ্রস্তাবে দুই চক্ষু বহিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহার মধ্যে কতখানি দুঃখ এবং কতখানি আনন্দ ছিল পরিমাণ করিয়া বলিবার কোনো উপায় নাই।

কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ঈশান হেড আপিসের সাহেবের নিকট ছুটি প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত দিল। সাহেব উপলক্ষটা নিতান্তই তুচ্ছজ্ঞান করিয়া ছুটি নামঞ্জুর করিয়া দিলেন। তখন, পূজার সময় এক সপ্তাহ ছুটি পাইবার সম্ভাবনা জানাইয়া সে পর্যন্ত বিবাহ স্থগিত রাখিবার জন্য দেশে চিঠি লিখিয়া দিল, কিন্তু অপূর্বর মা কহিল, এই মাসে দিন ভালো আছে আর বিলম্ব করিতে পারিব না।

উভয়তই প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইলে পর ব্যথিতহৃদয় ঈশান আর কোনো আপত্তি না করিয়া পূর্বমতো মাল ওজন এবং টিকিট বিক্রয় করিতে লাগিল।

অতঃপর মৃন্ময়ীর মা এবং পল্লীর যত বর্ষীয়সীগণ সকলে মিলিয়া ভাবী কর্তব্য সম্বন্ধে মৃন্ময়ীকে অহর্নিশি উপদেশ দিতে লাগিল। ক্রীড়াসক্তি, দ্রুতগমন, উচ্চহাস্য, বালকদিগের সহিত আলাপ এবং ক্ষুধা অনুসারে ভোজন সম্বন্ধে সকলেই নিষেধ-পরামর্শ দিয়া বিবাহটাকে বিভীষিকারূপে প্রতিপন্ন করিতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইল। উৎকণ্ঠিত শঙ্কিতহৃদয় মৃন্ময়ী মনে করিল তাহার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং তদবসানে ফাঁসির হুকুম হইয়াছে।

সে দুষ্ট পোনি ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকাইয়া পিছু হটিয়া বলিয়া বসিল, "আমি বিবাহ করিব না।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কিন্তু তথাপি বিবাহ করিতে হইল।

তার পরে শিক্ষা আরম্ভ হইল। একরাত্রির মধ্যে মৃন্ময়ীর সমস্ত পৃথিবী অপূর্বর মার অন্তঃপুরে আসিয়া আবদ্ধ হইয়া গেল।

শাশুড়ী সংশোধনকার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। অত্যন্ত কঠিন মুখ করিয়া কহিলেন, "দেখো বাছা, তুমি কিছু আর কচি খুকী নও, আমাদের ঘরে অমন বেহায়াপনা করিলে চলিবে না।"

শাশুড়ী যে-ভাবে বলিলেন মৃন্ময়ী সেভাবে কথাটা গ্রহণ করিল না। সে ভাবিল এঘরে যদি না চলে তবে বুঝি অন্যত্র যাইতে হইবে। অপরাহ্ণে তাহাকে আর দেখা গেল না। কোথায় গেল কোথায় গেল খোঁজ পড়িল। অবশেষে বিশ্বাসঘাতক রাখাল তাহাকে তাহার গোপন স্থান হইতে ধরাইয়া দিল। সে বটতলায় রাধাকান্ত ঠাকুরের পরিত্যক্ত ভাঙা রথের মধ্যে গিয়া বসিয়া ছিল।

শাশুড়ী, মা এবং পাড়ার সমস্ত হিতৈষিণীগণ মৃন্ময়ীকে যেরূপ লাঞ্ছনা করিল তাহা পাঠকগণ এবং পাঠিকাগণ সহজেই কল্পনা করিতে পারিবেন।

রাত্রে ঘন মেঘ করিয়া ঝুপ ঝুপ শব্দে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। অপূর্বকৃষ্ণ বিছানার মধ্যে অতি ধীরে ধীরে মৃন্ময়ীর কাছে ঈষৎ অগ্রসর হইয়া তাহার কানে কানে মৃদুস্বরে কহিল, "মৃন্ময়ী, তুমি আমাকে ভালোবাস না?"

মৃন্ময়ী সতেজে বলিয়া উঠিল, "না। আমি তোমাকে কক্‌খনোই ভালোবাসব না।" তাহার যত রাগ এবং যত শাস্তিবিধান সমস্তই পুঞ্জীভূত বজ্রের ন্যায় অপূর্বর মাথার উপর নিক্ষেপ করিল।

অপূর্ব ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, "কেন, আমি তোমার কাছে কী দোষ করেছি।" মৃন্ময়ী কহিল, "তুমি আমাকে বিয়ে করলে কেন।"

এ অপরাধের সন্তোষজনক কৈফিয়ত দেওয়া কঠিন। কিন্তু অপূর্ব মনে মনে কহিল, যেমন করিয়া হউক এই দুর্বাধ্য মনটিকে বশ করিতে হইবে।

পরদিন শাশুড়ী মৃন্ময়ীর বিদ্রোহী ভাবের সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া তাহাকে ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিল। সে নূতন পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মতো প্রথম অনেকক্ষণ ঘরের মধ্যে ধড়ফড় করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অবশেষে কোথাও পালাইবার কোনো পথ না দেখিয়া নিষ্ফল ক্রোধে বিছানার চাদরখানা দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়া কুটিকুটি করিয়া ফেলিল, এবং মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া মনে মনে বাবাকে ডাকিতে ডাকিতে কাঁদিতে লাগিল।

এমন সময়ে ধীরে ধীরে কে তাহার পাশে আসিয়া বসিল। সস্নেহে তাহার ধূলিলুণ্ঠিত চুলগুলি কপোলের উপর হইতে তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিল। মৃন্ময়ী সবলে মাথা নাড়িয়া তাহার হাত সরাইয়া দিল। অপূর্ব কানের কাছে মুখ নত করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "আমি লুকিয়ে দরজা খুলে দিয়েছি। এস আমরা খিড়কির বাগানে পালিয়ে যাই।" মৃন্ময়ী প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া সতেজে সরোদনে কহিল, "না।" অপূর্ব তাহার চিবুক ধরিয়া মুখ তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "একবার দেখো কে এসেছে।" রাখাল ভূপতিত মৃন্ময়ীর দিকে চাহিয়া হতবুদ্ধির ন্যায় দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। মৃন্ময়ী মুখ না তুলিয়া অপূর্বর হাত ঠেলিয়া দিল। অপূর্ব কহিল, "রাখাল তোমার সঙ্গে খেলা করতে এসেছে, খেলতে যাবে?" সে বিরক্তি-উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিল, "না।" রাখালও সুবিধা নয় বুঝিয়া কোনোমতে ঘর হইতে পালাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। অপূর্ব চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মৃন্ময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল, তখন অপূর্ব পা টিপিয়া বাহির হইয়া দ্বারে শিকল দিয়া চলিয়া গেল।

তাহার পরদিন মৃন্ময়ী বাপের কাছ হইতে এক পত্র পাইল। তিনি তাঁহার প্রাণ-প্রতিমা মৃন্ময়ীর বিবাহের সময় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই বলিয়া বিলাপ করিয়া নবদম্পতীকে অন্তরের আশীর্বাদ পাঠাইয়াছেন।

মৃন্ময়ী শাশুড়ীকে গিয়া কহিল, "আমি বাবার কাছে যাব।" শাশুড়ী অকস্মাৎ এই অসম্ভব প্রার্থনায় তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া উঠিলেন। "কোথায় ওর বাপ থাকে তার ঠিকানা নেই, বলে বাবার কাছে যাব। অনাসৃষ্টি আবদার।" সে উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল। আপনার ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিতান্ত হতাশ্বাস ব্যক্তি যেমন করিয়া দেবতার কাছে প্রার্থনা করে তেমনি করিয়া বলিতে লাগিল, "বাবা, আমাকে তুমি নিয়ে যাও। এখানে আমার কেউ নেই। এখানে থাকলে আমি বাঁচব না।"

গভীর রাত্রে তাহার স্বামী নিদ্রিত হইলে ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া মৃন্ময়ী গৃহের বাহির হইল। যদিও এক-একবার মেঘ করিয়া আসিতেছিল তথাপি জ্যোৎস্নারাত্রে পথ দেখিবার মতো আলোক যথেষ্ট ছিল। বাপের কাছে যাইতে হইলে কোন্ পথ অবলম্বন করিতে হইবে মৃন্ময়ী তাহার কিছুই জানিত না। কেবল তাহার মনের বিশ্বাস ছিল, যে-পথ দিয়া ডাকের পত্রবাহক 'রানার'গণ চলে সেই পথ দিয়া পৃথিবীর সমস্ত ঠিকানায় যাওয়া যায়। মৃন্ময়ী সেই ডাকের পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। চলিতে চলিতে শরীর শ্রান্ত হইয়া আসিল, রাত্রিও প্রায় শেষ হইল। বনের মধ্যে যখন উসখুস করিয়া অনিশ্চিত সুরে দুটো-একটা পাখি ডাকিবার উপক্রম করিতেছে অথচ নিঃসংশয়ে সময় নির্ণয় করিতে না পারিয়া ইতস্তত করিতেছে তখন মৃন্ময়ী পথের শেষে নদীর ধারে একটা

বৃহৎ বাজারের মতো স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অতঃপর কোন্‌দিকে যাইতে হইবে ভাবিতেছে এমন সময় পরিচিত ঝমঝম শব্দ শুনিতে পাইল। চিঠির থলে কাঁধে করিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ডাকের রানার আসিয়া উপস্থিত হইল। মৃন্ময়ী তাড়াতাড়ি তাহার কাছে গিয়া কাতর শ্রান্তস্বরে কহিল, "কুশীগঞ্জে আমি বাবার কাছে যাব, আমাকে তুমি সঙ্গে নিয়ে চলো না।" সে কহিল, "কুশীগঞ্জ কোথায় আমি জানিনে।" এই বলিয়া ঘাটে বাঁধা ডাকনৌকার মাঝিকে জাগাইয়া দিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। তাহার দয়া করিবার বা প্রশ্ন করিবার সময় নাই।

দেখিতে দেখিতে হাট এবং বাজার সজাগ হইয়া উঠিল। মৃন্ময়ী ঘাটে নামিয়া একজন মাঝিকে ডাকিয়া কহিল, "মাঝি, আমাকে কুশীগঞ্জে নিয়ে যাবে?" মাঝি তাহার উত্তর দিবার পূর্বেই পাশের নৌকা হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "আরে কে ও? মিনু মা, তুমি এখানে কোথা থেকে।" মৃন্ময়ী উচ্ছ্বসিত ব্যগ্রতার সহিত বলিয়া উঠিল, "বনমালী, আমি কুশীগঞ্জে বাবার কাছে যাব, আমাকে তোর নৌকায় নিয়ে চল্‌।" বনমালী তাহাদের গ্রামের মাঝি; সে এই উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি বালিকাটিকে বিলক্ষণ চিনিত, সে কহিল, "বাবার কাছে যাবে? সে তো বেশ কথা। চলো, আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।" মৃন্ময়ী নৌকায় উঠিল।

মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল। মেঘ করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ভাদ্রমাসের পূর্ণ নদী ফুলিয়া ফুলিয়া নৌকা দোলাইতে লাগিল, মৃন্ময়ীর সমস্ত শরীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া আসিল; অঞ্চল পাতিয়া সে নৌকার মধ্যে শয়ন করিল এবং এই দুরন্ত বালিকা নদী-দোলায় প্রকৃতির স্নেহপালিত শান্ত শিশুটির মতো অকাতরে ঘুমাইতে লাগিল।

জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, সে তাহার শ্বশুরবাড়িতে খাটে শুইয়া আছে। তাহাকে জাগ্রত দেখিয়া ঝি বকিতে আরম্ভ করিল। ঝির কণ্ঠস্বরে শাশুড়ী আসিয়া অত্যন্ত কঠিন কঠিন করিয়া বলিতে লাগিলেন। মৃন্ময়ী বিস্ফারিতনেত্রে নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল অবশেষে তিনি যখন তাহার বাপের শিক্ষাদোষের উপর কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, তখন মৃন্ময়ী দ্রুতপদে পাশের ঘরে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে শিকল বন্ধ করিয়া দিল।

অপূর্ব লজ্জার মাথা খাইয়া মাকে আসিয়া বলিল, "মা, বউকে দুই-একদিনের জন্যে একবার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে দোষ কী।"

মা অপূর্বকে 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি' ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন, এবং দেশে এত মেয়ে থাকিতে বাছিয়া বাছিয়া এই অস্থিদাহকারী দস্যু-মেয়েকে ঘরে আনার জন্য তাহাকে যথেষ্ট গঞ্জনা করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সেদিন সমস্তদিন বাহিরে ঝড়বৃষ্টি এবং ঘরের মধ্যেও অনুরূপ দুর্যোগ চলিতে লাগিল।

তাহার পরদিন গভীর রাত্রে অপূর্ব মৃন্ময়ীকে ধীরে ধীরে জাগ্রত করিয়া কহিল, "মৃন্ময়ী, তোমার বাবার কাছে যাবে ?"

মৃন্ময়ী সবেগে অপূর্বর হাত চাপিয়া ধরিয়া সচকিত হইয়া কহিল, "যাব।"

অপূর্ব চুপিচুপি কহিল. "তবে এস আমরা দুজনে আস্তে আস্তে পালিয়ে যাই। আমি ঘাটে নৌকা ঠিক করে রেখেছি।"

মৃন্ময়ী অত্যন্ত সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। তাহার পর তাড়াতাড়ি উঠিয়া কাপড় ছাড়িয়া বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। অপূর্ব তাহার মাতার চিন্তা দূর করিবার জন্য একখানি পত্র রাখিয়া দুইজনে বাহির হইল।

মৃন্ময়ী সেই অন্ধকার রাত্রে জনশূন্য নিস্তব্ধ নির্জন গ্রামপথে এই প্রথম স্বেচ্ছায় আন্তরিক নির্ভরের সহিত স্বামীর হাত ধরিল ; তাহার হৃদয়ের আনন্দ উদ্বেগ সেই সুকোমল স্পর্শযোগে তাহার স্বামীর শিরার মধ্যে সঞ্চারিত হইতে লাগিল।

নৌকা সেই রাত্রেই ছাড়িয়া দিল। অশান্ত হর্ষোচ্ছ্বাস সত্বেও অনতিবিলম্বেই মৃন্ময়ী ঘুমাইয়া পড়িল। পরদিন কী মুক্তি, কী আনন্দ। দুইধারে কত গ্রাম বাজার শস্যক্ষেত্র বন, দুইধারে কত নৌকা যাতায়াত করিতেছে। মৃন্ময়ী প্রত্যেক তুচ্ছ বিষয়ে স্বামীকে সহস্রবার করিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল। ওই নৌকায় কী আছে, উহারা কোথা হইতে আসিয়াছে, এই জায়গার নাম কী, এমন সকল প্রশ্ন যাহার উত্তর অপূর্ব কোনো কলেজের বহিতে পায় নাই এবং যাহা তাহার কলিকাতার অভিজ্ঞতায় কুলাইয়া উঠে না। বন্ধুগণ শুনিয়া লজ্জিত হইবেন, অপূর্ব এই সকল প্রশ্নের প্রত্যেকটারই উত্তর করিয়াছিল এবং অধিকাংশ উত্তরের সহিত সত্যের ঐক্য হয় নাই। যথা, সে তিলের নৌকাকে তিসির নৌকা, পাঁচবেড়েকে রায়নগর এবং মুনসেফের আদালতকে জমিদারি কাছারি বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত বোধ করে নাই! এবং এই সমস্ত ভ্রান্ত উত্তরে বিশ্বস্তহৃদয় প্রশ্নকারিণীর সন্তোষের তিলমাত্র ব্যাঘাত জন্মায় নাই।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় নৌকা কুশীগঞ্জে গিয়া পৌঁছিল। টিনের ঘরে একখানি ময়লা চৌকা-কাঁচের লণ্ঠনে তেলের বাতি জ্বালাইয়া ছোটো ডেস্কের উপর একখানি চামড়ায় বাঁধা মস্ত খাতা রাখিয়া গা-খোলা ঈশানচন্দ্র টুলের উপর বসিয়া হিসাব লিখিতেছিলেন। এমন সময় নবদম্পতী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মৃন্ময়ী ডাকিল, "বাবা"। সে ঘরে এমন কণ্ঠধ্বনি এমন করিয়া কখনো ধ্বনিত হয় নাই।

ঈশানের চোখ দিয়া দরদর করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। সে কী বলিবে, কী করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। তাহার মেয়ে এবং জামাই যেন সাম্রাজ্যের যুবরাজ এবং যুবরাজমহিষী; এই সমস্ত পাটের বস্তার মধ্যে তাহাদের উপযুক্ত সিংহাসন কেমন করিয়া নির্মিত হইতে পারে ইহাই যেন তাহার দিশাহারা বুদ্ধি ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না।

তাহার পর আহারের ব্যাপার—সেও এক চিন্তা। দরিদ্র কেরানি নিজ হস্তে ডাল ভাতে ভাত পাক করিয়া খায়—আজ এই এমন আনন্দের দিনে সে কী করিবে, কী খাওয়াইবে। মৃন্ময়ী কহিল, “বাবা, আজ আমরা সকলে মিলিয়া রাঁধিব।” অপূর্ব এই প্রস্তাবে সাতিশয় উৎসাহ প্রকাশ করিল।

ঘরের মধ্যে স্থানাভাব, লোকাভাব, অন্নাভাব, কিন্তু ক্ষুদ্র ছিদ্র হইতে ফোয়ারা যেমন চতুর্গুণ বেগে উত্থিত হয় তেমনি দরিদ্র্যের সংকীর্ণ মুখ হইতে আনন্দ পরিপূর্ণ ধারায় উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল।

এমনি করিয়া তিন দিন কাটিল। দুইবেলা নিয়মিত স্টীমার আসিয়া লাগে, কত লোক, কত কোলাহল; সন্ধ্যাবেলায় নদীতীর একেবারে নির্জন হইয়া যায়, তখন কী অবাধ স্বাধীনতা। এবং তিন জনে মিলিয়া নানাপ্রকার জোগাড় করিয়া, ভুল করিয়া, এক করিতে আর-এক করিয়া তুলিয়া রাঁধাবাড়া। তাহার পরে মৃন্ময়ীর বলয়ঝংকৃত স্নেহহস্তের পরিবেশনে শ্বশুর জামাতার একত্রে আহার এবং গৃহিণীপনার সহস্র ত্রুটি প্রদর্শনপূর্বক মৃন্ময়ীকে পরিহাস ও তাহা লইয়া বালিকার আনন্দকলহ এবং মৌখিক অভিমান। অবশেষে অপূর্ব জানাইল আর অধিক দিন থাকা উচিত হয় না। মৃন্ময়ী করুণস্বরে আরও কিছু দিন সময় প্রার্থনা করিল। ঈশান কহিল, “কাজ নাই।”

বিদায়ের দিন কন্যাকে বুকের কাছে টানিয়া তাহার মাথায় হাত রাখিয়া অশ্রুগদ্‌গদ-কণ্ঠে ঈশান কহিল, “মা, তুমি শ্বশুরঘর উজ্জ্বল করিয়া লক্ষ্মী হইয়া থাকিয়ো। কেহ যেন আমার মিনুর কোনো দোষ না ধরিতে পারে।”

মৃন্ময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর সহিত বিদায় হইল। এবং ঈশান সেই দ্বিগুণ নিরানন্দ সংকীর্ণ ঘরের মধ্যে ফিরিয়া গিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস নিয়মিত মাল ওজন করিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এই অপরাধিযুগল গৃহে ফিরিয়া আসিলে মা অত্যন্ত গম্ভীরভাবে রহিলেন, কোনো কথাই কহিলেন না। কাহারও ব্যবহারের প্রতি এমন কোনো দোষারোপ করিলেন

না যাহা সে ক্ষালন করিতে চেষ্টা করিতে পারে। এই নীরব অভিযোগ নিস্তব্ধ অভিমান লৌহভারের মতো সমস্ত ঘরকন্নার উপর অটলভাবে চাপিয়া রহিল।

অবশেষে অসহ্য হইয়া উঠিলে অপূর্ব আসিয়া কহিল, "মা, কালেজ খুলেছে, এখন আমাকে আইন পড়তে যেতে হবে।"

মা উদাসীন ভাবে কহিলেন, "বউয়ের কী করবে।"

অপূর্ব কহিল, "বউ এখানেই থাক্।"

মা কহিলেন, "না বাপু, কাজ নাই। তুমি তাকে তোমার সঙ্গেই নিয়ে যাও।" সচরাচর মা অপূর্বকে তুই সম্ভাষণ করিয়া থাকেন।

অপূর্ব অভিমানক্ষুণ্ণস্বরে কহিল, "আচ্ছা।"

কলিকাতা যাইবার আয়োজন পড়িয়া গেল। যাইবার আগের রাত্রে অপূর্ব বিছানায় আসিয়া দেখিল, মৃন্ময়ী কাঁদিতেছে।

হঠাৎ তাহার মনে আঘাত লাগিল। বিষণ্ণকণ্ঠে কহিল, "মৃন্ময়ী. আমার সঙ্গে কলকাতায় যেতে তোমার ইচ্ছে করছে না?"

মৃন্ময়ী কহিল, "না।"

অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমাকে ভালোবাস না?" এ-প্রশ্নের কোনো উত্তর পাইল না। অনেক সময় এই প্রশ্নটির উত্তর অতিশয় সহজ কিন্তু আবার এক-একসময় ইহার মধ্যে মনস্তত্ত্বঘটিত এত জটিলতার সংস্রব থাকে যে, বালিকার নিকট হইতে তাহার উত্তর প্রত্যাশা করা যায় না।

অপূর্ব প্রশ্ন করিল, "রাখালকে ছেড়ে যেতে তোমার মন কেমন করছে?"

মৃন্ময়ী অনায়াসে উত্তর করিল, "হাঁ।"

বালক রাখালের প্রতি এই বি. এ পরীক্ষোত্তীর্ণ কৃতবিদ্য যুবকের সূচির মতো অতি-সূক্ষ্ম অথচ অতি সুতীক্ষ্ণ ঈর্ষার উদয় হইল। কহিল, "আমি অনেককাল আর বাড়ি আসতে পাব না।" এই সংবাদ সম্বন্ধে মৃন্ময়ীর কোনো বক্তব্য ছিল না। "বোধ হয় দু-বৎসর কিংবা তারও বেশি হতে পারে।" মৃন্ময়ী আদেশ করিল "তুমি ফিরে আসবার সময় রাখালের জন্যে একটা তিনমুখো রজাসের ছুরি কিনে নিয়ে এসো।"

অপূর্ব শয়ান অবস্থা হইতে ঈষৎ উত্থিত হইয়া কহিল, "তুমি তাহলে এইখানেই থাকবে?"

মৃন্ময়ী কহিল, "হাঁ, আমি মায়ের কাছে গিয়ে থাকব।"

অপূর্ব নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "আচ্ছা, তাই থেকো। যতদিন না তুমি আমাকে আসবার জন্যে চিঠি লিখবে, আমি আসব না। খুব খুশি হলে?"

মৃন্ময়ী এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বাহুল্য বোধ করিয়া ঘুমাইতে লাগিল। কিন্তু অপূর্বর ঘুম হইল না, বালিশ উঁচু করিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়া রহিল।

অনেক রাত্রে হঠাৎ চাঁদ উঠিয়া চাঁদের আলো বিছানার উপর আসিয়া পড়িল। অপূর্ব সেই আলোকে মৃন্ময়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল। চাহিয়া চাহিয়া মনে হইল যেন রাজকন্যাকে কে রুপার কাঠি ছোঁয়াইয়া অচেতন করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। একবার কেবল সোনার কাঠি পাইলেই এই নিদ্রিত আত্মাটিকে জাগাইয়া তুলিয়া মালা বদল করিয়া লওয়া যায়। রুপার কাঠি হাস্য, আর সোনার কাঠি অশ্রুজল।

ভোরের বেলায় অপূর্ব মৃন্ময়ীকে জাগাইয়া দিল—কহিল, "মৃন্ময়ী, আমার যাইবার সময় হইয়াছে। চলো তোমাকে তোমার মার বাড়ি রাখিয়া আসি।"

মৃন্ময়ী শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে অপূর্ব তাহার দুই হাত ধরিয়া কহিল, "এখন আমার একটি প্রার্থনা আছে। আমি অনেক সময় তোমার অনেক সাহায্য করিয়াছি আজ যাইবার সময় তাহার একটি পুরস্কার দিবে?"

মৃন্ময়ী বিস্মিত হইয়া কহিল, "কী।"

অপূর্ব কহিল, "তুমি ইচ্ছা করিয়া ভালোবাসিয়া আমাকে একটি চুম্বন দাও।"

অপূর্বর এই অদ্ভুত প্রার্থনা এবং গম্ভীর মুখভাব দেখিয়া মৃন্ময়ী হাসিয়া উঠিল। হাস্য সংবরণ করিয়া মুখ বাড়াইয়া চুম্বন করিতে উদ্যত হইল – কাছাকাছি গিয়া আর পারিল না, খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল এমন দুইবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে নিরস্ত হইয়া মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। শাসনচ্ছলে অপূর্ব তাহার কর্ণমূল ধরিয়া নাড়িয়া দিল।

অপূর্বর বড়ো কঠিন পণ। দস্যুবৃত্তি করিয়া কাড়িয়া লুটিয়া লওয়া সে আত্মাবমাননা মনে করে। সে দেবতার ন্যায় সগৌরবে থাকিয়া স্বেচ্ছানীত উপহার চায়, নিজের হাতে কিছুই তুলিয়া লইবে না।

মৃন্ময়ী আর হাসিল না। তাহাকে প্রত্যুষের আলোকে নির্জন পথ দিয়া তাহার মার বাড়ি রাখিয়া অপূর্ব গৃহে আসিয়া মাতাকে কহিল, "ভাবিয়া দেখিলাম, বউকে আমার সঙ্গে কলিকাতায় লইয়া গেলে আমার পড়াশুনার ব্যাঘাত হইবে, সেখানে উহারও কেহ সঙ্গিনী নাই। তুমি তো তাহাকে এ বাড়িতে রাখিতে চাও না, আমি তাই তাহার মার বাড়িতেই রাখিয়া আসিলাম।"

সুগভীর অভিমানের মধ্যে মাতাপুত্রের বিচ্ছেদ হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মার বাড়িতে আসিয়া মৃন্ময়ী দেখিল কিছুতেই আর মন লাগিতেছে না। সে বাড়ির আগাগোড়া যেন বদল হইয়া গেছে। সময় আর কাটে না। কী করিবে কোথায় যাইবে কাহার সহিত দেখা করিবে ভাবিয়া পাইল না।

মৃন্ময়ীর হঠাৎ মনে হইল যেন সমস্ত গৃহে এবং সমস্ত গ্রামে কেহ লোক নাই। যেন মধ্যাহ্নে সূর্যগ্রহণ হইল। কিছুতেই বুঝিতে পারিল না, আজ কলিকাতায় চলিয়া যাইবার জন্য এত প্রাণপণ ইচ্ছা করিতেছে, কাল রাত্রে এই ইচ্ছা কোথায় ছিল; কাল সে জানিত না যে, জীবনের যে-অংশ পরিহার করিয়া যাইবার জন্য এত মন-কেমন করিতেছিল তৎপূর্বেই তাহার সম্পূর্ণ স্বাদ-পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। গাছের পক্কপত্রের ন্যায় আজ সেই বৃন্তচ্যুত অতীত জীবনটাকে ইচ্ছাপূর্বক অনায়াসে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিল।

গল্পে শুনা যায়, নিপুণ অস্ত্রকার এমন সূক্ষ্ম তরবারি নির্মাণ করিতে পারে যে, তদ্দারা মানুষকে দ্বিখণ্ড করিলেও সে জানিতে পারে না, অবশেষে নাড়া দিলে দুই অর্ধখণ্ড ভিন্ন হইয়া যায়। বিধাতার তরবারি সেইরূপ সূক্ষ্ম, কখন তিনি মৃন্ময়ীর বাল্য ও যৌবনের মাঝখানে আঘাত করিয়াছিলেন সে জানিতে পারে নাই; আজ কেমন করিয়া নাড়া পাইয়া বাল্য-অংশ যৌবন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িল এবং মৃন্ময়ী বিস্মিত হইয়া ব্যথিত হইয়া চাহিয়া রহিল।

মাতৃগৃহে তাহার সেই পুরাতন শয়নগৃহকে আর আপনার বলিয়া মনে হইল না, সেখানে যে থাকিত সে হঠাৎ আর নাই। এখন হৃদয়ের সমস্ত স্মৃতি সেই আর একটা বাড়ি, আর একটা ঘর, আর একটা শয্যার কাছে গুনগুন করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

মৃন্ময়ীকে আর কেহ বাহিরে দেখিতে পাইল না। তাহার হাস্যধ্বনি আর শুনা যায় না। রাখাল তাহাকে দেখিলে ভয় করে। খেলার কথা মনেও আসে না।

মৃন্ময়ী মাকে বলিল, "মা, আমাকে শ্বশুরবাড়ি রেখে আয়।"

এদিকে, বিদায়কালীন পুত্রের বিষণ্ন মুখ স্মরণ করিয়া অপূর্বর মার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। সে যে রাগ করিয়া বউকে বেহানের বাড়ি রাখিয়া আসিয়াছে ইহা তাঁহার মনে বড়োই বিঁধিতে লাগিল।

হেনকালে একদিন মাথায় কাপড় দিয়া মৃন্ময়ী ম্লানমুখে শাশুড়ীর পায়ের কাছে পড়িয়া প্রণাম করিল। শাশুড়ী তৎক্ষণাৎ ছলছলনেত্রে তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। মুহূর্তের মধ্যে উভয়ের মিলন হইয়া গেল। শাশুড়ী বধূর মুখের দিকে চাহিয়া আশ্চর্য

হইয়া গেলেন। সে মৃন্ময়ী আর নাই। এমন পরিবর্তন সাধারণত সকলের সম্ভব নহে। বৃহৎ পরিবর্তনের জন্য বৃহৎ বলের আবশ্যক।

শাশুড়ী স্থির করিয়াছিলেন, মৃন্ময়ীর দোষগুলি একটি একটি করিয়া সংশোধন করিবেন, কিন্তু আর একজন অদৃশ্য সংশোধনকর্তা একটি অজ্ঞাত সংক্ষেপ উপায় অবলম্বন করিয়া মৃন্ময়ীকে যেন নূতন জন্ম পরিগ্রহ করাইয়া দিলেন।

এখন শাশুড়ীকেও মৃন্ময়ী বুঝিতে পারিল, শাশুড়ীও মৃন্ময়ীকে চিনিতে পারিলেন; তরুর সহিত শাখাপ্রশাখার যেরূপ মিল, সমস্ত ঘরকন্না তেমনি পরস্পর অখণ্ডসম্মিলিত হইয়া গেল।

এই যে একটি গম্ভীর স্নিগ্ধ বিশাল রমণীপ্রকৃতি মৃন্ময়ীর সমস্ত শরীরে ও সমস্ত অন্তরে রেখায় রেখায় ভরিয়া ভরিয়া উঠিল ইহাতে তাহাকে যেন বেদনা দিতে লাগিল। প্রথম-আষাঢ়ের শ্যামসজল নবমেঘের মতো তাহার হৃদয়ে একটি অশ্রুপূর্ণ বিস্তীর্ণ অভিমানের সঞ্চার হইল। সেই অভিমান তাহার চোখের ছায়াময় সুদীর্ঘ পল্লবের উপর আর একটি গভীরতর ছায়া নিক্ষেপ করিল। সে মনে মনে বলিতে লাগিল, আমি আমাকে বুঝিতে পারি নাই বলিয়া তুমি আমাকে বুঝিলে না কেন। তুমি আমাকে শাস্তি দিলে না কেন। তোমার ইচ্ছানুসারে আমাকে চালনা করাইলে না কেন। আমি রাক্ষসী যখন তোমার সঙ্গে কলিকাতায় যাইতে চাহিলাম না, তুমি আমাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গেলে না কেন। তুমি আমার কথা শুনিলে কেন, আমার অনুরোধ মানিলে কেন, আমার অবাধ্যতা সহিলে কেন।

তাহার পর, অপূর্ব যেদিন প্রভাতে পুষ্করিণীতীরের নির্জন পথে তাহাকে বন্দী করিয়া কিছু না বলিয়া একবার কেবল তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল সেই পুষ্করিণী সেই পথ সেই তরুতল সেই প্রভাতের রৌদ্র এবং সেই হৃদয়ভারাবনত গভীর দৃষ্টি তাহার মনে পড়িল এবং হঠাৎ সে তাহার সমস্ত অর্থ বুঝিতে পারিল। তাহার পর সেই বিদায়ের দিনের যে চুম্বন অপূর্বর মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, সেই অসম্পূর্ণ চুম্বন এখন মরুমরীচিকাভিমুখী তৃষার্ত পাখির ন্যায় ক্রমাগত সেই অতীত অবসরের দিকে ধাবিত হইতে লাগিল, কিছুতেই তাহার আর পিপাসা মিটিল না। এখন থাকিয়া থাকিয়' মনে কেবল উদয় হয়, আহা অমুক সময়টিতে যদি এমন করিতাম, অমুক প্রশ্নের যদি এই উত্তর দিতাম, তখন যদি এমন হইত।

অপূর্বর মনে এই বলিয়া ক্ষোভ জন্মিয়াছিল যে, মৃন্ময়ী আমার সম্পূর্ণ পরিচয় পায় নাই; মৃন্ময়ীও আজ বসিয়া বসিয়া ভাবে, তিনি আমাকে কী মনে করিলেন, কী বুঝিয়া গেলেন। অপূর্ব তাহাকে যে দুরন্ত চপল অবিবেচক নির্বোধ বালিকা বলিয়া

জানিল, পরিপূর্ণ হৃদয়ামৃতধারায় প্রেমপিপাসা মিটাইতে সক্ষম রমণী বলিয়া পরিচয় পাইল না ইহাতেই সে পরিতাপে লজ্জায় ধিক্কারে পীড়িত হইতে লাগিল। চুম্বনের এবং সোহাগের সে ঋণগুলি অপূর্বর মাথার বালিশের উপর পরিশোধ করিতে লাগিল। এমনি-ভাবে কতদিন কাটিল।

অপূর্ব বলিয়া গিয়াছিল, তুমি চিঠি না লিখিলে আমি বাড়ি ফিরিব না। মৃন্ময়ী তাহাই স্মরণ করিয়া একদিন ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া চিঠি লিখিতে বসিল। অপূর্ব তাহাকে যে সোনালি পাড় দেওয়া রঙিন কাগজ দিয়াছিল তাহাই বাহির করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। খুব যত্ন করিয়া ধরিয়া লাইন বাঁকা করিয়া অঙ্গুলিতে কালি মাখিয়া অক্ষর ছোটো বড়ো করিয়া উপরে কোনো সম্বোধন না করিয়া একেবারে লিখিল তুমি আমাকে চিঠি লেখ না কেন। তুমি কেমন আছ, আর তুমি বাড়ি এসো। আর কী বলিবার আছে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। আসল বক্তব্য কথা সবগুলিই বলা হইয়া গেল বটে, কিন্তু মনুষ্যসমাজে মনের ভাব আর একটু বাহুল্য করিয়া প্রকাশ করা আবশ্যক। মৃন্ময়ীও তাহা বুঝিল; এইজন্য আরও অনেকক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া আর কয়েকটি নূতন কথা যোগ করিয়া দিল—এইবার তুমি আমাকে চিঠি লিখো, আর কেমন আছ লিখো, আর বাড়ি এসো, মা ভালো আছেন, বিশু পুঁটি ভালো আছে, কাল আমাদের কালো গোরুর বাছুর হয়েছে। এই বলিয়া চিঠি শেষ করিল। চিঠি লেফাফায় মুড়িয়া প্রত্যেক অক্ষরটির উপর একটি ফোঁটা করিয়া মনের ভালোবাসা দিয়া লিখিল, শ্রীযুক্ত বাবু অপূর্বকৃষ্ট রায়। ভালোবাসা যতই দিক, তবু লাইন সোজা, অক্ষর সুছাঁদ এবং বানান শুদ্ধ হইল না।

লেফাফায় নামটুকু ব্যতীত আরও যে কিছু লেখা আবশ্যক মৃন্ময়ীর তাহা জানা ছিল না। পাছে শাশুড়ী অথবা আর কাহারও দৃষ্টিপথে পড়ে সেই লজ্জায় চিঠিখানি একটি বিশ্বস্ত দাসীর হাত দিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিল।

বলা বাহুল্য এ পত্রের কোনো ফল হইল না, অপূর্ব বাড়ি আসিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মা দেখিলেন ছুটি হইল তবু অপূর্ব বাড়ি আসিল না। মনে করিলেন এখনও সে তাঁহার উপর রাগ করিয়া আছে।

মৃন্ময়ীও স্থির করিল অপূর্ব তাহার উপর বিরক্ত হইয়া আছে, তখন আপনার চিঠি-খানি মনে করিয়া সে লজ্জায় মরিয়া যাইতে লাগিল। সে চিঠিখানা যে কত তুচ্ছ, তাহাতে যে কোনো কথাই লেখা হয় নাই, তাহার মনের ভাব যে কিছুই প্রকাশ করা

হয় নাই, সেটা পাঠ করিয়া অপূর্ব যে মৃন্ময়ীকে আরও ছেলেমানুষ মনে করিতেছে; মনে মনে আরও অবজ্ঞা করিতেছে, ইহা ভাবিয়া সে শরবিদ্ধের ন্যায় অন্তরে অন্তরে ছটফট করিতে লাগিল। দাসীকে বার বার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে চিঠিখানা তুই কি তাকে দিয়ে এসেছিস।" দাসী তাহাকে সহস্রবার আশ্বাস দিয়া কহিল, "হাঁ গো, আমি নিজের হাতে বাক্সের মধ্যে ফেলে দিয়েছি, বাবু তা এতদিনে কোন্‌কালে পেয়েছে।"

অবশেষে অপূর্বর মা একদিন মৃন্ময়ীকে ডাকিয়া কহিলেন, "বউমা, অপু অনেকদিন তো বাড়ি এল না, তাই মনে করছি কলকাতায় গিয়ে তাকে দেখে আসিগে। তুমি সঙ্গে যাবে?" মৃন্ময়ী সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল এবং ঘরের মধ্যে আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া বিছানার উপর পড়িয়া বালিশখানা বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া হাসিয়া নড়িয়া চড়িয়া মনের আবেগ উন্মুক্ত করিয়া দিল; তাহার পর ক্রমে গম্ভীর হইয়া বিষণ্ণ হইয়া আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অপূর্বকে কোনো খবর না দিয়া এই দুটি অনুতপ্তা রমণী তাহার প্রসন্নতা ভিক্ষা করিবার জন্য কলিকাতায় যাত্রা করিল। অপূর্বর মা সেখানে তাঁহার জামাইবাড়িতে গিয়া উঠিলেন।

সেদিন মৃন্ময়ীর পত্রের প্রত্যাশায় নিরাশ হইয়া সন্ধ্যাবেলায় অপূর্ব প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া নিজেই তাহাকে পত্র লিখিতে বসিয়াছে। কোনো কথাই পছন্দমতো হইতেছে না। এমন একটা সম্বোধন খুঁজিতেছে যাহাতে ভালোবাসাও প্রকাশ হয় অথচ অভিমানও ব্যক্ত করে; কথা না পাইয়া মাতৃভাষার উপর অশ্রদ্ধা দৃঢ়তর হইতেছে। এমন সময় ভগ্নীপতির নিকট হইতে পত্র পাইল মা আসিয়াছেন, শীঘ্র আসিবে এবং রাত্রে এইখানেই আহারাদি করিবে। সংবাদ সমস্ত ভালো।—শেষ আশ্বাস সত্ত্বেও অপূর্ব অমঙ্গলশঙ্কায় বিমর্ষ হইয়া উঠিল। অবিলম্বে ভগ্নীর বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল।

সাক্ষাৎমাত্রই মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, সব ভালো তো।" মা কহিলেন, "সব ভালো। তুই ছুটিতে বাড়ি গেলি না, তাই আমি তোকে নিতে এসেছি।"

অপূর্ব কহিল, "সেজন্য এত কষ্ট করিয়া আসিবার কী আবশ্যক ছিল; আইন পরীক্ষার পড়াশুনা" ইত্যাদি।

আহারের সময় ভগ্নী জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, এবার বউকে তোমার সঙ্গে আনলে না কেন।"

দাদা গম্ভীরভাবে কহিতে লাগিল, "আইনের পড়াশুনা" ইত্যাদি।

ভগ্নীপতি হাসিয়া কহিল, "ও-সমস্ত মিথ্যা ওজর। আমাদের ভয়ে আনতে সাহস হয় না।"

ভগ্নী কহিল, "ভয়ংকর লোকটাই বটে। ছেলেমানুষ হঠাৎ দেখলে আচমকা আঁৎকে উঠতে পারে।"

এই ভাবে হাস্যপরিহাস চলিতে লাগিল, কিন্তু অপূর্ব অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া রহিল। কোনো কথা তাহার ভালো লাগিতেছিল না। তাহার মনে হইতেছিল, সেই যখন মা কলিকাতায় আসিলেন তখন মৃন্ময়ী ইচ্ছা করিলে অনায়াসে তাঁহার সহিত আসিতে পারিত। বোধ হয়, মা তাহাকে সঙ্গে আনিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সম্মত হয় নাই। এ-সম্বন্ধে সংকোচবশত মাকে কোনো প্রশ্ন করিতে পারিল না—সমস্ত মানবজীবন এবং বিশ্বরচনাটা আগাগোড়া ভ্রান্তিসংকুল বলিয়া বোধ হইল।

আহারান্তে প্রবলবেগে বাতাস উঠিয়া বিষম বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

ভগ্নী কহিল, "দাদা, আজ আমাদের এইখানেই থেকে যাও।"

দাদা কহিল, "না বাড়ি যেতে হবে; কাজ আছে।"

ভগ্নীপতি কহিল, "রাত্রে তোমার আবার এত কাজ কিসের। এখানে একরাত্রি থেকে গেলে তোমার তো কারও কাছে জবাবদিহি করতে হবে না, তোমার ভাবনা কী।"

অনেক পীড়াপীড়ির পর বিস্তর অনিচ্ছাসত্ত্বে অপূর্ব সে-রাত্রি থাকিয়া যাইতে সম্মত হইল।

ভগ্নী কহিল, "দাদা তোমাকে শ্রান্ত দেখাচ্ছে, তুমি আর দেরি ক'রো না, চলো শুতে চলো।"

অপূর্বরও সেই ইচ্ছা। শয্যাতলে অন্ধকারের মধ্যে একলা হইতে পারিলে বাঁচে, কথার উত্তরপ্রত্যুত্তর করিতে ভালো লাগিতেছে না।

শয়নগৃহের দ্বারে আসিয়া দেখিল ঘর অন্ধকার। ভগ্নী কহিল. "বাতাসে আলো নিবে গেছে দেখছি, তা আলো এনে দেব কি দাদা।"

অপূর্ব কহিল, "না দরকার নেই, আমি রাত্রে আলো রাখিনে।"

ভগ্নী চলিয়া গেলে অপূর্ব অন্ধকারে সাবধানে খাটের অভিমুখে গেল।

খাটে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইতেছে এমন সময়ে হঠাৎ বলয়নিক্কণশব্দে একটি সুকোমল বাহুপাশ তাহাকে সুকঠিন বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিল এবং একটি পুষ্পপুটতুল্য ওষ্ঠাধর দস্যুর মতো আসিয়া পড়িয়া অবিরল অশ্রুজলসিক্ত আবেগপূর্ণ চুম্বনে তাহাকে বিস্ময় প্রকাশের অবসর দিল না। অপূর্ব প্রথমে চমকিয়া উঠিল তাহার পর বুঝিতে পারিল অনেকদিনের একটি হাস্যবাধায় অসম্পন্ন চেষ্টা আজ অশ্রুজলধারায় সমাপ্ত হইল।

আশ্বিন, ১৩০০

সমস্যাপূরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঝিঁকড়াকোটার কৃষ্ণগোপাল সরকার জ্যেষ্ঠপুত্রের প্রতি জমিদারি এবং সংসারের ভার দিয়া কাশী চলিয়া গেলেন। দেশের যত অনাথ দরিদ্র লোক তাঁহার জন্য হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল এমন বদান্যতা, এমন ধর্মনিষ্ঠতা কলিযুগে দেখা যায় না, এই কথা সকলেই বলিতে লাগিল।

তাঁহার পুত্র বিপিনবিহারী আজকালকার একজন সুশিক্ষিত বি-এ। দাড়ি রাখেন, চশমা পরেন, কাহারও সহিত বড়ো একটা মিশেন না। অতিশয় সচ্চরিত্র—এমন কি, তামাকটি পর্যন্ত খান না, তাস পর্যন্ত খেলেন না। অত্যন্ত ভালোমানুষের মতো চেহারা, কিন্তু লোকটা ভারি কড়াক্কড়।

তাঁহার প্রজারা শীঘ্রই তাহা অনুভব করিতে পারিল। বুড়াকর্তার কাছে রক্ষা ছিল কিন্তু ইঁহার কাছে কোনো ছুতায় দেনা খাজনার এক পয়সা রেয়াত পাইবার প্রত্যাশা নাই। নির্দিষ্ট সময়েরও একদিন এদিক-ওদিক হইতে পায় না।

বিপিনবিহারী হাতে কাজ লইয়াই দেখিলেন তাঁহার বাপ বিস্তর ব্রাহ্মণকে জমি বিনা খাজনায় ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং খাজনা যে কত লোককে কমি দিয়াছেন তাহার আর সংখ্যা নাই। তাঁহার কাছে কেহ একটা কিছু প্রার্থনা করিলে তিনি তাহা পূর্ণ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না—সেটা তাঁহার একটা দুর্বলতা ছিল।

বিপিনবিহারী কহিলেন, এ কখনোই হইতে পারে না; অর্ধেক জমিদারি আমি লাখেরাজ ছাড়িয়া দিতে পারি না। তাঁহার মনে নিম্নলিখিত দুই যুক্তির উদয় হইল।

প্রথমত, যে-সকল অকর্মণ্য লোক ঘরে বসিয়া এইসব জমির উপস্বত্ব ভোগ করিয়া স্ফীত হইতেছে তাহারা অধিকাংশই অপদার্থ এবং দয়ার অযোগ্য। এরূপ দানে দেশে কেবল আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

দ্বিতীয়ত, তাঁহার পিতৃ-পিতামহের সময়ের অপেক্ষা এখন জীবিকা অত্যন্ত দুর্লভ এবং দুর্মূল্য হইয়া পড়িয়াছে। অভাব অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এখন একজন ভদ্রলোকের আত্মসম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলিতে পূর্বাপেক্ষা চারগুণ খরচ পড়ে। অতএব তাঁহার পিতা যেরূপ নিশ্চিন্তমনে দুই হস্তে সমস্ত বিলাইয়া ছড়াইয়া গিয়াছেন এখন আর তাহা করিলে চলিবে না, বরঞ্চ সেগুলি কুড়াইয়া বাড়াইয়া আবার ঘরে আনিবার চেষ্টা করা কর্তব্য।

কর্তব্যবুদ্ধি তাঁহাকে যাহা বলিল তিনি তাহাই করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি একটা প্রিন্সিপ্‌ল্‌ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন।

ঘর হইতে যাহা বাহির হইয়াছিল, আবার তাহা অল্পে অল্পে ঘরে ফিরিতে লাগিল। পিতার অতি অল্প দানই তিনি বাহাল রাখিলেন, এবং যাহা রাখিলেন তাহাও যাহাতে চিরস্থায়ী দানের স্বরূপে গণ্য না হয় এমন উপায় করিলেন।

কৃষ্ণগোপাল কাশীতে থাকিয়া পত্রযোগে প্রজাদিগের ক্রন্দন শুনিতে পাইলেন—এমন কি, কেহ কেহ তাঁহার নিকটে গিয়াও কাঁদিয়া পড়িল। কৃষ্ণগোপাল বিপিনবিহারীকে পত্র লিখিলেন যে, কাজটা গর্হিত হইতেছে।

বিপিনবিহারী উত্তরে লিখিলেন যে, পূর্বে যেমন দান করা যাইত তেমনি পাওনা নানাপ্রকারের ছিল। তখন জমিদার এবং প্রজা উভয় পক্ষের মধ্যেই দানপ্রতিদান ছিল। সম্প্রতি নূতন নূতন আইন হইয়া ন্যায্য খাজনা ছাড়া অন্য পাঁচরকম পাওনা একেবারে বন্ধ হইয়াছে এবং কেবলমাত্র খাজনা আদায় করা ছাড়া জমিদারের অন্যান্য গৌরবজনক অধিকারও উঠিয়া গিয়াছে—অতএব এখনকার দিনে যদি আমি আমার ন্যায্য পাওনার দিকে কঠিন দৃষ্টি না রাখি তবে আর থাকে কী। এখন প্রজাও আমাকে অতিরিক্ত কিছু দিবে না আমিও তাহাকে অতিরিক্ত কিছু দিব না—এখন আমাদের মধ্যে কেবলমাত্র দেনাপাওনার সম্পর্ক। দানখয়রাত করিতে গেলে ফতুর হইতে হইবে, বিষয় রক্ষা এবং কুলসম্ভ্রম রক্ষা করা দুরূহ হইয়া পড়িবে।

কৃষ্ণগোপাল সময়ের এতাধিক পরিবর্তনে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া উঠিতেন এবং ভাবিতেন এখনকার ছেলেরা এখনকার কালের উপযোগী কাজ করিতেছে আমাদের সেকালের নিয়ম এখন খাটিবে না। আমি দূরে বসিয়া ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে তাহারা বলিবে, তবে তোমার বিষয় তুমি ফিরিয়া লও, আমরা ইহা রাখিতে পারিব না। কাজ কী বাপু, এ কয়েকটা দিন কোনোমতে হরিনাম করিয়া কাটাইয়া দিতে পারিলে বাঁচি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এই ভাবে কাজ চলিতে লাগিল। অনেক মকদ্দমা মামলা হাঙ্গামা ফেসাদ করিয়া বিপিনবিহারী সমস্তই প্রায় একপ্রকার মনের মতো গুছাইয়া লইলেন।

অনেক প্রজাই ভয়ক্রমে বশ্যতা স্বীকার করিল, কেবল মির্জা বিবির পুত্র অছিমদ্দি বিশ্বাস কিছুতেই বাগ মানিল না।

বিপিনবিহারীর আক্রোশও তাহার উপরে সব চেয়ে বেশি। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্র

একটা অর্থ বোঝা যায় কিন্তু এই মুসলমান-সন্তান যে কী হিসাবে এতটা জমি নিষ্কর ও স্বল্পকরে উপভোগ করে বুঝা যায় না। একটা সামান্য যবন বিধবার ছেলে গ্রামের ছাত্রবৃত্তি স্কুলে দুই ছত্র লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে কিন্তু আপনার সৌভাগ্যগর্বে সে যেন কাহাকেও গ্রাহ্য করে না।

বিপিন পুরাতন কর্মচারীদের কাছে জানিতে পারিলেন কর্তার আমল হইতে বাস্তবিক ইহারা বহুকাল অনুগ্রহ পাইয়া আসিতেছে। কিন্তু এ অনুগ্রহের কোনো বিশেষ কারণ তাহারা নির্ণয় করিতে পারে না। বোধ করি অনাথা বিধবা নিজ দুঃখ জানাইয়া কর্তার দয়া উদ্রেক করিয়াছিল।

কিন্তু বিপিনের নিকট এই অনুগ্রহ সর্বাপেক্ষা অযোগ্য বলিয়া প্রতিভাত হইল। বিশেষত ইহাদের পূর্বেকার দরিদ্র অবস্থা বিপিন দেখেন নাই, এখন ইহাদের সচ্ছলতার বাড়াবাড়ি এবং অপর্যাপ্ত দম্ভ দেখিয়া বিপিনের মনে হইত ইহারা যেন তাঁহার দয়াদুর্বল সরল পিতাকে ঠকাইয়া তাঁহাদের বিষয়ের এক অংশ চুরি করিয়া লইয়াছে।

অছিমদ্দিও উদ্ধত প্রকৃতির যুবক। সে বলিল, প্রাণ যাইবে তবু আমার অধিকারের এক তিল ছাড়িয়া দিব না। উভয় পক্ষে ভারি যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল।

অছিমদ্দির বিধবা মাতা ছেলেকে বার বার করিয়া বুঝাইল, জমিদারের সহিত কাজিয়া করিয়া কাজ নাই, এতদিন যাঁহার অনুগ্রহে জীবন কাটিল তাঁহার অনুগ্রহের 'পরে নির্ভর করাই কর্তব্য, জমিদারের প্রার্থনামতো কিছু ছাড়িয়া দেওয়া যাক।

অছিমদ্দি কহিল, "মা, তুমি এ-সকল বিষয় কিছুই বোঝ না।"

মকদ্দমায় অছিমদ্দি একে একে হারিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু যতই হার হইতে লাগিল, ততই তাহার জিদ বাড়িয়া উঠিল। তাহার সর্বস্বের জন্য সে সর্বস্বই পণ করিয়া বসিল।

মির্জা বিবি একদিন বৈকালে বাগানের তরিতরকারি কিঞ্চিৎ উপহার লইয়া গোপনে বিপিনবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিল। বৃদ্ধা যেন তাহার সকরুণ মাতৃদৃষ্টির দ্বারা সস্নেহে বিপিনের সর্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া কহিল, "তুমি আমার বাপ, আল্লা তোমার ভাল করুন। বাবা, অছিমকে তুমি নষ্ট করিয়ো না, ইহাতে তোমার ধর্ম হইবে না। তাহাকে আমি তোমার হস্তেই সমর্পণ করিলাম—তাহাকে নিতান্তই অবশ্যপ্রতিপাল্য একটি অকর্মণ্য ছোটো ভাইয়ের মতো গ্রহণ করো—সে তোমার অসীম ঐশ্বর্যের ক্ষুদ্র এককণা পাইয়াছে বলিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়ো না বাপ।"

অধিক বয়সের স্বাভাবিক প্রগল্‌ভতাবশত বুড়ী তাঁহার সহিত ঘরকন্না পাতাইতে আসিয়াছে দেখিয়া বিপিন ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিল। কহিল, "তুমি মেয়েমানুষ,

এ সমস্ত কথা বোঝ না। যদি কিছু জানাইবার থাকে তোমার ছেলেকে পাঠাইয়া দিয়ো।”

মির্জা বিবি নিজের ছেলে এবং পরের ছেলে উভয়ের কাছেই শুনিল, সে এ বিষয় কিছুই বোঝে না। আল্লার নাম স্মরণ করিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বিধবা ঘরে ফিরিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মকদ্দমা ফৌজদারি হইতে দেওয়ানি, দেওয়ানি হইতে জেলা-আদালত, জেলা-আদালত হইতে হাইকোর্ট পর্যন্ত চলিল। বৎসর দেড়েক এমনি করিয়া কাটিয়া গেল। অছিমদ্দি যখন দেনার মধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়াছে তখন আপিল-আদালতে তাহার আংশিক জয় সাব্যস্ত হইল।

কিন্তু ডাঙার বাঘের মুখ হইতে যেটুকু বাঁচিল জলের কুমির তাহার প্রতি আক্রমণ করিল। মহাজন সময় বুঝিয়া ডিক্রীজারি করিল। অছিমদ্দির যথাসর্বস্ব নিলাম হইবার দিন স্থির হইল।

সেদিন সোমবার, হাটের দিন। ছোটো একটা নদীর ধারে হাট। বর্ষাকালে নদী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কতক নৌকায় এবং কতক ডাঙায় কেনাবেচা চলিতেছে, কলরবের অন্ত নাই। পণ্যদ্রব্যের মধ্যে এই আষাঢ় মাসে কাঁঠালের আমদানিই সব চেয়ে বেশি, ইলিশ মাছও যথেষ্ট। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে; অনেক বিক্রেতা বৃষ্টির আশঙ্কায় বাঁশ পুতিয়া তাহার উপর একটা কাপড় খাটাইয়া দিয়াছে।

অছিমদ্দিও হাট করিতে আসিয়াছে—কিন্তু তাহার হাতে একটি পয়সাও নাই, এবং তাহাকে আজকাল কেহ ধারেও বিক্রয় করে না। সে একটি কাটারি এবং একটি পিতলের থালা হাতে করিয়া আসিয়াছে, বন্ধক রাখিয়া ধার করিবে।

বিপিনবাবু বিকালের দিকে হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন, সঙ্গে দুই-তিনজন লাঠিহস্তে পাইক চলিয়াছে। কলরবে আকৃষ্ট হইয়া তিনি একবার হাট দেখিতে ইচ্ছুক হইলেন।

হাটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বারী কলুকে কৌতূহলবশত তাহার আয়ব্যয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছিলেন, এমন সময় অছিমদ্দি কাটারি তুলিয়া বাঘের মতো গর্জন করিয়া বিপিনবাবুর প্রতি ছুটিয়া আসিল। হাটের লোক তাহাকে অর্ধপথে ধরিয়া তৎক্ষণাৎ নিরস্ত্র করিয়া ফেলিল—অবিলম্বে তাহাকে পুলিসের হস্তে অর্পণ করা হইল এবং আবার হাটে যেমন কেনাবেচা চলিতেছিল চলিতে লাগিল।

বিপিনবাবু এই ঘটনায় মনে মনে যে খুশি হন নাই তাহা বলা যায় না। আমরা যাহাকে শিকার করিতে চাহি সে যে আমাদিগকে থাবা মারিতে আসিবে এরূপ বজ্জাতি এবং বে-আদবি অসহ্য। যাহা হউক, বেটা যেরূপ বদ্‌মায়েস সেইরূপ তাহার উচিত শাস্তি হইবে।

বিপিনের অন্তঃপুরের মেয়েরা আজিকার ঘটনা শুনিয়া কণ্টকিত হইয়া উঠিলেন। সকলেই বলিলেন, মাগো, কোথাকার বজ্জাত হারামজাদা বেটা। তাহার উচিত শাস্তির সম্ভাবনায় তাঁহারা অনেকটা সান্ত্বনা লাভ করিলেন।

এদিকে সেই সন্ধ্যাবেলায় বিধবার অন্নহীন পুত্রহীন গৃহ মৃত্যুর অপেক্ষাও অন্ধকার হইয়া গেল। এই ব্যাপারটা সকলেই ভুলিয়া গেল, আহারাদি করিল, শয়ন করিল, নিদ্রা দিল,—কেবল একটি বৃদ্ধার কাছে পৃথিবীর সমস্ত ঘটনার মধ্যে এইটেই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হইয়া উঠিল, অথচ ইহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সমস্ত পৃথিবীতে আর কেহই নাই, কেবল দীপহীন কুটিরপ্রান্তে কয়েকখানি জীর্ণ অস্থি এবং একটি হতাশ্বাস ভীত হৃদয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইতিমধ্যে দিন তিনেক অতিবাহিত হইয়া গেছে। কাল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বিচারের দিন নির্দিষ্ট হইয়াছে। বিপিনকেও সাক্ষ্য দিতে যাইতে হইবে। ইতিপূর্বে জমিদারকে কখনো সাক্ষ্যমঞ্চে দাঁড়াইতে হয় নাই - কিন্তু বিপিনের ইহাতে কোনো আপত্তি নাই।

পরদিন যথাসময়ে পাগড়ি পরিয়া ঘড়ির চেন ঝুলাইয়া পালকি চড়িয়া মহাসমারোহে বিপিনবাবু কাছারিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এজলাসে আজ আর লোক ধরে না। এতবড়ো হুজুক আদালতে অনেকদিন ঘটে নাই।

যখন মকদ্দমা উঠিতে আর বড়ো বিলম্ব নাই, এমন সময় একজন বরকন্দাজ আসিয়া বিপিনবাবুর কানে কানে কী একটা কথা বলিয়া দিল—তিনি তটস্থ হইয়া আবশ্যক আছে বলিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, কিছু দূরে এক বটতলায় তাঁহার বৃদ্ধ পিতা দাঁড়াইয়া আছেন। খালি পা, গায়ে একখানি নামাবলি, হাতে হরিনামের মালা, কৃশ শরীরটি যেন স্নিগ্ধ জ্যোতির্ময়। ললাট হইতে একটি শান্ত করুণা বিশ্বে বিকীর্ণ হইতেছে।

বিপিন চাপকান জোব্বা এবং আঁট প্যান্টলুন লইয়া কষ্টে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মাথার পাগড়িটি নাসাপ্রান্তে নামিয়া আসিল, ঘড়িটি জেব হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

সেগুলি শশব্যস্তে সারিয়া লইয়া পিতাকে নিকটবর্তী উকিলের বাসায় প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিলেন।

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, "না, আমার যাহা বক্তব্য আমি এইখানেই বলিয়া লই।"

বিপিনের অনুচরগণ কৌতূহলী লোকদিগকে দূরে ঠেলিয়া রাখিল।

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, "অছিম যাহাতে খালাস পায় সেই চেষ্টা করিতে হইবে এবং উহার যে সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছ তাহা ফিরাইয়া দিবে।"

বিপিন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইজন্যই আপনি কাশী হইতে এতদূরে আসিয়াছেন? উহাদের 'পরে আপনার এত অধিক অনুগ্রহ কেন।"

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, "সে-কথা শুনিয়া তোমার লাভ কী হইবে বাপু।"

বিপিন ছাড়িলেন না—কহিলেন, "অযোগ্যতা বিচার করিয়া কত লোকের কত দান ফিরাইয়া লইয়াছি, তাহার মধ্যে কত ব্রাহ্মণও ছিল, আপনি তাহার কিছুতে হস্তক্ষেপ করেন নাই, আর এই মুসলমান-সন্তানের জন্য আপনার এতদূর পর্যন্ত অধ্যবসায়! আজ এত কাণ্ড করিয়া অবশেষে যদি অছিমকে খালাস দিতে এবং সমস্ত ফিরাইয়া দিতে হয় তো লোকের কাছে কী বলিব।"

কৃষ্ণগোপাল কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। অবশেষে দ্রুতকম্পিত অঙ্গুলিতে মালা ফিরাইতে ফিরাইতে কিঞ্চিৎ কম্পিতস্বরে কহিলেন, "লোকের কাছে যদি সমস্ত খুলিয়া বলা আবশ্যক মনে কর তো বলিয়ো, অছিমদ্দিন তোমার ভাই হয়, আমার পুত্র।"

বিপিন চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "যবনীর গর্ভে?"

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, "হাঁ বাপু।"

বিপিন অনেকক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া কহিলেন, "সে সব কথা পরে হইবে এখন আপনি ঘরে চলুন।"

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, "না, আমি তো আর গৃহে প্রবেশ করিব না। আমি এখনই এখান হইতে ফিরিয়া চলিলাম। এখন তোমার ধর্মে যাহা উচিত বোধ হয় করিয়ো" বলিয়া আশীর্বাদ করিয়া অশ্রুনিরোধপূর্বক কম্পিতকলেবরে ফিরিয়া চলিলেন।

বিপিন কী বলিবে কী করিবে ভাবিয়া পাইল না। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু এটুকু তাহার মনে উদয় হইল, সে-কালের ধর্মনিষ্ঠা এইরূপই বটে। শিক্ষা এবং চরিত্রে আপনাকে আপনার পিতার চেয়ে ঢের শ্রেষ্ঠ বোধ হইল। স্থির করিলেন, একটা প্রিন্সিপল্ না থাকার এই ফল।

আদালতে যখন ফিরিলেন, দেখিলেন শীর্ণ ক্লিষ্ট শুষ্ক শ্বেতওষ্ঠাধর দীপ্তনেত্র অছিম দুই

পাহারাওয়ালার হস্তে বন্দী হইয়া একখানি মলিন চাদর পরিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে বিপিনের ভ্রাতা।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত বিপিনের বন্ধুত্ব ছিল। মকদ্দমা একপ্রকার গোলমাল করিয়া ফাঁসিয়া গেল। এবং অছিমও অল্পদিনের মধ্যে পূর্বাবস্থা ফিরিয়া পাইল। কিন্তু তাহার কারণ সে-ও বুঝিতে পারিল না, অন্য লোকেও আশ্চর্য হইয়া গেল।

মকদ্দমার সময় কৃষ্ণগোপাল আসিয়াছিলেন সে-কথা রাষ্ট্র হইতে বিলম্ব হইল না। সকলেই নানা কথা কানাকানি করিতে লাগিল।

সূক্ষ্মবুদ্ধি উকিলেরা ব্যাপারটা সমস্তই অনুমান করিয়া লইল। রামতারণ উকিলকে কৃষ্ণগোপাল নিজের খরচে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়াছিলেন। সে বরাবরই সন্দেহ করিত, কিন্তু এতদিনে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিল যে, ভালো করিয়া অনুসন্ধান করিলে সকল সাধুই ধরা পড়ে। যিনি যত মালা জপুন পৃথিবীতে আমার মতোই সব বেটা। সংসারে সাধু অসাধুর মধ্যে প্রভেদ এই যে, সাধুরা কপট আর অসাধুরা অকপট। যাহা হউক কৃষ্ণগোপালের জগদ্বিখ্যাত দয়াধর্মমহত্ব সমস্তই যে কাপট্য ইহাই স্থির করিয়া রামতারণের যেন এতদিনকার একটা দুর্বোধ সমস্যার পূরণ হইল এবং কী যুক্তি অনুসারে জানি না, তাহাতে কৃতজ্ঞতার বোঝাও যেন স্কন্ধ হইতে লঘু হইয়া গেল। ভারি আরাম পাইল।

অগ্রহায়ণ, ১৩০০

খাতা

লিখিতে শিখিয়া অবধি উমা বিষম উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে। বাড়ির প্রত্যেক ঘরের দেয়ালে কয়লা দিয়া বাঁকা লাইন কাটিয়া বড়ো বড়ো কাঁচা অক্ষরে কেবলই লিখিতেছে—জল পড়ে, পাতা নড়ে।

তাহার বউঠাকুরানীর বালিশের নিচে 'হরিদাসের গুপ্তকথা' ছিল, সেটা সন্ধান করিয়া বাহির করিয়া তাহার পাতায় পাতায় পেনসিল দিয়া লিখিয়াছে—কালো জল, লাল ফুল।

বাড়ির সর্বদাব্যবহার্য নূতন পঞ্জিকা হইতে অধিকাংশ তিথিনক্ষত্র খুব বড়ো বড়ো অক্ষরে একপ্রকার লুপ্ত করিয়া দিয়াছে।

বাবার দৈনিক হিসাবের খাতায় জমাখরচের মাঝখানে লিখিয়া রাখিয়াছে—লেখাপড়া করে যেই গাড়িঘোড়া চড়ে সেই।

এ প্রকার সাহিত্যচর্চায় এ পর্যন্ত সে কোনোপ্রকার বাধা পায় নাই, অবশেষে একদিন একটা গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটিল।

উমার দাদা গোবিন্দলাল দেখিতে অত্যন্ত নিরীহ, কিন্তু সে খবরের কাগজে সর্বদাই লিখিয়া থাকে। তাহার কথাবার্তা শুনিলে তাহার আত্মীয়স্বজন কিংবা তাহার পরিচিত প্রতিবেশীরা কেহ তাহাকে চিন্তাশীল বলিয়া কখনো সন্দেহ করে না। এবং বাস্তবিকও সে যে কোনো বিষয়ে কখনো চিন্তা করে এমন অপবাদ তাহাকে দেওয়া যায় না, কিন্তু সে লেখে; এবং বাংলার অধিকাংশ পাঠকের সঙ্গে তার মতের সম্পূর্ণ ঐক্য হয়।

শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর মধ্যে কতকগুলি গুরুতর ভ্রম প্রচলিত আছে, সেগুলি গোবিন্দলাল যুক্তির কোনো সাহায্য অবলম্বন না করিয়াও কেবলমাত্র রোমাঞ্চজনক ভাষার প্রভাবে সতেজে খণ্ডনপূর্বক একটি উপাদেয় প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিল।

উমা একদিন নির্জন দ্বিপ্রহরে দাদার কালিকলম লইয়া সেই প্রবন্ধটির উপরে বড়ো বড়ো করিয়া লিখিল—গোপাল বড়ো ভালো ছেলে, তাহাকে যাহা দেওয়া যায় সে তাহাই খায়।

গোপাল বলিতে সে যে গোবিন্দলালের প্রবন্ধ-পাঠকদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছিল তাহা আমার বিশ্বাস হয় না, কিন্তু দাদার ক্রোধের সীমা ছিল না। প্রথমে তাহাকে মারিল, অবশেষে তাহার একটি স্বল্পাবশিষ্ট পেনসিল, আদ্যোপান্ত মসীলিপ্ত একটি ভোঁতা কলম, তাহার বহুযত্নসঞ্চিত যৎসামান্য লেখ্যোপকরণের পুঁজি কাড়িয়া লইল। অপমানিতা বালিকা তাহার এতাদৃশ গুরুতর লাঞ্ছনার কারণ সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিয়া ঘরের কোণে বসিয়া ব্যথিতহৃদয়ে কাঁদিতে লাগিল।

শাসনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে পর গোবিন্দলাল কিঞ্চিৎ অনুতপ্তচিত্তে উমাকে তাহার লুণ্ঠিত সামগ্রীগুলি ফিরাইয়া দিল এবং উপরন্তু একখানি লাইন-টানা ভালো বাঁধানো খাতা দিয়া বালিকার হৃদয়বেদনা দূর করিবার চেষ্টা করিল।

উমার বয়স তখন সাত বৎসর। এখন হইতে এই খাতাটি রাত্রিকালে উমার বালিশের নিচে ও দিনের বেলা সর্বদা তাহার কক্ষে ক্রোড়ে বিরাজ করিতে লাগিল।

ছোটো বেণীটি বাঁধিয়া ঝি সঙ্গে করিয়া যখন সে গ্রামের বালিকাবিদ্যালয়ে পড়িতে যাইত খাতাটি সঙ্গে সঙ্গে যাইত। দেখিয়া মেয়েদের কাহারও বিস্ময়, কাহারও লোভ, কাহারও বা দ্বেষ হইত।

প্রথম বৎসরে অতি যত্ন করিয়া খাতায় লিখিল—পাখি সব করে রব, রাতি

পোহাইল। শয়নগৃহের মেঝের উপরে বসিয়া খাতাটি আঁকড়িয়া ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে সুর করিয়া পড়িত এবং লিখিত। এমনি করিয়া অনেক গদ্য পদ্য সংগ্রহ হইল।

দ্বিতীয় বৎসরে মধ্যে মধ্যে দুটি-একটি স্বাধীন রচনা দেখা দিতে লাগিল; অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত সারবান—ভূমিকা নাই, উপসংহার নাই। দুটা-একটা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

খাতায় কথামালার ব্যাঘ্র ও বকের গল্পটা যেখানে কাপি করা আছে, তাহার নিচে এক জায়গায় একটা লাইন পাওয়া গেল, সেটা কথামালা কিংবা বর্তমান বঙ্গসাহিত্যের আর কোথাও ইতিপূর্বে দেখা যায় নাই। সে লাইনটি এই—যশিকে আমি খুব ভালোবাসি।

কেহ না মনে করেন আমি এইবার একটা প্রেমের গল্প বানাইতে বসিয়াছি। যশি পাড়ার কোনো একাদশ কিংবা দ্বাদশবর্ষীয় বালক নহে। বাড়ির একটি পুরাতন দাসী, তাহার প্রকৃত নাম যশোদা।

কিন্তু যশির প্রতি বালিকার প্রকৃত মনোভাব কী এই এক কথা হইতে তাহার কোনো দৃঢ় প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে যিনি বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস লিখিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি এই খাতাতেই দু-পাতা অন্তরে পূর্বোক্ত কথাটির সুস্পষ্ট প্রতিবাদ দেখিতে পাইবেন।

এমন একটা-আধটা নয়, উমার রচনায় পদে পদে পরস্পরবিরোধিতা দোষ লক্ষিত হয়। একস্থলে দেখা গেল—হরির সঙ্গে জন্মের মতো আড়ি। (হরিচরণ নয়, হরিদাসী, বিদ্যালয়ের সহপাঠিকা।) তার অনতিদূরেই এমন কথা আছে যাহা হইতে সহজেই বিশ্বাস জন্মে যে, হরির মতো প্রাণের বন্ধু তাহার আর ত্রিভুবনে নাই।

তাহার পরবৎসরে বালিকার বয়স যখন নয় বৎসর, তখন একদিন সকালবেলা হইতে তাহাদের বাড়িতে সানাই বাজিতে লাগিল। উমার বিবাহ। বরটির নাম প্যারীমোহন, গোবিন্দলালের সহযোগী লেখক। বয়স যদিও অধিক নয় এবং লেখাপড়া কিঞ্চিৎ শেখা আছে, তথাপি নব্যভাব তার মনে কিছুমাত্র প্রবেশ করিতে পারে নাই। এইজন্য পাড়ার লোকেরা তাকে ধন্য ধন্য করিত এবং গোবিন্দলাল তাহার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইতে পারে নাই।

উমা বেনারসি শাড়ি পরিয়া ঘোমটায় ক্ষুদ্র মুখখানি আবৃত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শ্বশুরবাড়ি গেল। মা বলিয়া দিলেন, "বাছা, শাশুড়ীর কথা মানিয়া চলিস, ঘরকন্নার কাজ করিস, লেখাপড়া লইয়া থাকিসনে।"

গোবিন্দলাল বলিয়া দিলেন, "দেখিস, সেখানে দেয়ালে আঁচড় কাটিয়া বেড়াসনে; সে

তেমন বাড়ি নয়। আর প্যারীমোহনের কোনো লেখার উপরে খবরদার কলম চালাসনে।"

বালিকার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তখন বুঝিতে পারিল, সে যেখানে যাইতেছে, সেখানে কেহ তাহাকে মার্জনা করিবে না। এবং তাহারা কাহাকে দোষ বলে, অপরাধ বলে, ত্রুটি বলে, তাহা অনেক ভর্ৎসনার পর অনেকদিনে শিখিয়া লইতে হইবে।

সেদিন সকালেও সানাই বাজিতেছিল। কিন্তু সেই ঘোমটা এবং বেনারসি শাড়ি এবং অলংকারে মণ্ডিত ক্ষুদ্র বালিকার কম্পিত হৃদয়টুকুর মধ্যে কী হইতেছিল তাহা ভালো করিয়া বোঝে এমন একজনও সেই লোকারণ্যের মধ্যে ছিল কি না সন্দেহ।

যশিও উমার সঙ্গে গেল। কিছুদিন থাকিয়া উমাকে শ্বশুরবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সে চলিয়া আসিবে এমনি কথা ছিল।

স্নেহশীলা যশি অনেক বিবেচনা করিয়া উমার খাতাটি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। এই খাতাটি তাহার পিতৃভবনের একটি অংশ; তাহার অতিক্ষণিক জন্মগৃহবাসের স্নেহময় স্মৃতিচিহ্ন; পিতামাতার অঙ্কস্থলীর একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, অত্যন্ত বাঁকাচোরা কাঁচা অক্ষরে লেখা। তাহার এই অকাল গৃহিণীপনার মধ্যে বালিকাস্বভাবরোচক একটুখানি স্নেহমধুর স্বাধীনতার আস্বাদ।

শ্বশুরবাড়ি গিয়া প্রথম কিছুদিন সে কিছুই লেখে নাই, সময়ও পায় নাই। অবশেষে কিছুদিন পরে যশি তাহার পূর্বস্থানে চলিয়া গেল।

সেদিন উমা দুপুরবেলা শয়নগৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া টিনের বাক্স হইতে খাতাটি বাহির করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে লিখিল—যশি বাড়ি চলে গেছে আমিও মার কাছে যাব।

আজকাল চারুপাঠ এবং বোধোদয় হইতে কিছু কাপি করিবার অবসর নাই, বোধ করি তেমন ইচ্ছাও নাই। সুতরাং আজকাল বালিকার সংক্ষিপ্ত রচনার মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ বিচ্ছেদ নাই। পূর্বোক্ত পদটির পরেই দেখা যায় লেখা আছে—দাদা যদি একবার বাড়ি নিয়ে যায় তাহলে দাদার লেখা আর কখনো খারাপ করে দেব না।

শুনা যায়, উমার পিতা উমাকে প্রায় মাঝে মাঝে বাড়ি আনিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু গোবিন্দলাল প্যারীমোহনের সঙ্গে যোগ দিয়া তাঁহার প্রতিবন্ধক হয়।

গোবিন্দলাল বলে, এখন উমার পতিভক্তি শিক্ষার সময়, এখন তাহাকে মাঝে মাঝে পতিগৃহ হইতে পুরাতন পিতৃস্নেহের মধ্যে আনয়ন করিলে তাহার মনকে অনর্থক বিক্ষিপ্ত করিয়া দেওয়া হয়। এই বিষয়ে সে উপদেশে বিদ্রূপে জড়িত এমন

সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছিল যে, তাহার একমতবর্তী সকল পাঠকেই উক্ত রচনার অকাট্য সত্য সম্পূর্ণ স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারে নাই।

লোকমুখে সেই কথা শুনিয়াই উমা তাহার খাতায় লিখিয়াছিল—দাদা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে একবার তোমাদের ঘরে নিয়ে যাও, আমি তোমাকে আর কখনো রাগাব না।

একদিন উমা দ্বার রুদ্ধ করিয়া এমনি কী একটা অর্থহীন তুচ্ছ কথা খাতায় লিখিতেছিল। তাহার ননদ তিলকমঞ্জরীর অত্যন্ত কৌতূহল হইল—সে ভাবিল বউদিদি মাঝে মাঝে দরজা বন্ধ করিয়া কী করে দেখিতে হইবে। দ্বারের ছিদ্র দিয়া দেখিল লিখিতেছে। দেখিয়া অবাক। তাহাদের অন্তঃপুরে কখনোই সরস্বতীর এরূপ গোপন সমাগম হয় নাই।

তাহার ছোটো কনকমঞ্জরী, সে-ও আসিয়া একবার উঁকি মারিয়া দেখিল।

তাহার ছোটো অনঙ্গমঞ্জরী, সে-ও পদাঙ্গুলির উপর ভর দিয়া বহুকষ্টে ছিদ্রপথ দিয়া রুদ্ধগৃহের রহস্য ভেদ করিয়া লইল।

উমা লিখিতে লিখিতে সহসা গৃহের বাহিরে তিনটি পরিচিত কণ্ঠের খিলখিল হাসি শুনিতে পাইল। ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল, খাতাটি তাড়াতাড়ি বাক্সে বন্ধ করিয়া লজ্জায় ভয়ে বিছানায় মুখ লুকাইয়া পড়িয়া রহিল।

প্যারীমোহন এই সংবাদ অবগত হইয়া বিশেষ চিন্তিত হইল। পড়াশুনা আরম্ভ হইলেই নভেল-নাটকের আমদানি হইবে এবং গৃহধর্ম রক্ষা করা দায় হইয়া

তা ছাড়া বিশেষ চিন্তা দ্বারা এ বিষয়ে সে একটি অতি সূক্ষ্মতত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছিল। সে বলিত, স্ত্রীশক্তি এবং পুংশক্তি উভয় শক্তির সম্মিলনে পবিত্র দাম্পত্যশক্তির উদ্ভব হয়; কিন্তু লেখাপড়া শিক্ষার দ্বারা যদি স্ত্রীশক্তি পরাভূত হইয়া একান্ত পুংশক্তির প্রাদুর্ভাব হয়, তবে পুংশক্তির সহিত পুংশক্তির প্রতিঘাতে এমন একটি প্রলয়শক্তির উৎপত্তি হয় যদ্দ্বারা দাম্পত্যশক্তি বিনাশশক্তির মধ্যে বিলীনসত্তা লাভ করে, সুতরাং রমণী বিধবা হয়। এ পর্যন্ত এ তত্ত্বের কেহ প্রতিবাদ করিতে পারে নাই।

প্যারীমোহন সন্ধ্যাকালে ঘরে আসিয়া উমাকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিল এবং কিঞ্চিৎ উপহাসও করিল—বলিল, "শামলা ফরমাশ দিতে হইবে, গিন্নী কানে কলম গুঁজিয়া আপিসে যাইবেন।"

উমা ভালো বুঝিতে পারিল না। প্যারীমোহনের প্রবন্ধ সে কখনো পড়ে নাই এই জন্য তাহার এখনও ততদূর রসবোধ জন্মে নাই। কিন্তু সে মনে মনে একান্ত

সংকুচিত হইয়া গেল—মনে হইল পৃথিবী দ্বিধা হইলে তবে সে লজ্জা রক্ষা করিতে পারে।

বহুদিন আর সে লেখে নাই। কিন্তু একদিন শরৎকালের প্রভাতে একটি গায়িকা ভিখারিনী আগমনীর গান গাহিতেছিল। উমা জানালার গরাদের উপর মুখ রাখিয়া চুপ করিয়া শুনিতেছিল। একে শরৎকালের রৌদ্রে ছেলেবেলাকার সকল কথা মনে পড়ে, তাহার উপরে আগমনীর গান শুনিয়া সে আর থাকিতে পারিল না।

উমা গান গাহিতে পারিত না ; কিন্তু লিখিতে শিখিয়া অবধি এমনি তাহার অভ্যাস হইয়াছে যে, একটা গান শুনিলেই সেটা লিখিয়া লইয়া গান গাহিতে না পারার খেদ মিটাইত। আজ কাঙালি গাহিতেছিল—

"পুরবাসী বলে উমার মা,
তোর হারা তারা এল ওই।
শুনে পাগলিনীপ্রায়, অমনি রানী ধায়,
কই উমা বলি কই।
কেঁদে রানী বলে, আমার উমা এলে,
একবার আয় মা, একবার আয় মা,
একবার আয় মা করি কোলে।
অমনি দুবাহু পসারি, মায়ের গলা ধরি
অভিমানে কাঁদি রানীরে বলে—
কই মেয়ে বলে আনতে গিয়েছিলে।"

অভিমানে উমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া চোখে জল ভরিয়া গেল। গোপনে গায়িকাকে ডাকিয়া গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া বিচিত্র বানানে এই গানটি খাতায় লিখিতে আরম্ভ করিল।

তিলকমঞ্জরী, কনকমঞ্জরী এবং অনঙ্গমঞ্জরী সেই ছিদ্রযোগে সমস্ত দেখিল এবং সহসা করতালি দিয়া বলিয়া উঠিল, "বউদিদি, কী করছ আমরা সমস্ত দেখেছি।"

তখন উমা তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া কাতরস্বরে বলিতে লাগিল, "লক্ষ্মী ভাই, কাউকে বলিসনে ভাই, তোদের দুটি পায়ে পড়ি ভাই—আমি আর করব না, আমি আর লিখব না।"

অবশেষে উমা দেখিল, তিলকমঞ্জরী তাহার খাতাটির প্রতি লক্ষ্য করিতেছে। তখন সে ছুটিয়া গিয়া খাতাটি বক্ষে চাপিয়া ধরিল। ননদীরা অনেক বল প্রয়োগ করিয়া সেটা কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল, কৃতকার্য না হইয়া অনঙ্গ দাদাকে ডাকিয়া আনিল।

প্যারীমোহন আসিয়া গম্ভীরভাবে খাটে বসিল। মেঘমন্দ্রস্বরে বলিল, "খাতা দাও।" আদেশ পালন হইল না দেখিয়া আরও দুই-এক সুর গলা নামাইয়া কহিল, "দাও।"

বালিকা খাতাটি বক্ষে ধরিয়া একান্ত অনুনয়দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। যখন দেখিল প্যারীমোহন খাতা কাড়িয়া লইবার জন্য উঠিয়াছে, তখন সেটা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া দুই বাহুতে মুখ ঢাকিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

প্যারীমোহন খাতাটি লইয়া বালিকার লেখাগুলি উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে লাগিল; শুনিয়া উমা পৃথিবীকে উত্তরোত্তর গাঢ়তর আলিঙ্গনে বদ্ধ করিতে লাগিল; এবং অপর তিনটি বালিকা-শ্রোতা খিল খিল করিয়া হাসিয়া অস্থির হইল।

সেই হইতে উমা আর সে খাতা পায় নাই। প্যারীমোহনেরও সূক্ষ্মতত্ত্বকণ্টকিত বিবিধ প্রবন্ধপূর্ণ একখানি খাতা ছিল কিন্তু সেটি কাড়িয়া লইয়া ধ্বংস করে এমন মানব-হিতৈষী কেহ ছিল না।

প্রবন্ধ

সঞ্চয়

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

মহাশয়ের নামে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়া

তাঁহার প্রতি আমার হৃদয়ের

গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন

করিলাম।

১৮—৪২

সঞ্চয়

রোগীর নববর্ষ

আমার রোগশয্যার উপর নববৎসর আসিল। নববৎসরের এমন নবীন মূর্তি অনেক দিন দেখি নাই।

একটু দূরে আসিয়া না দাঁড়াইতে পারিলে কোনো বড়ো জিনিসকে ঠিক বড়ো করিয়া দেখা যায় না। যখন বিষয়ের সঙ্গে জড়িত হইয়া থাকি তখন নিজের পরিমাণেই সকল জিনিসকে খাটো করিয়া লই। তাহা না করিলে প্রতিদিনের কাজ চলে না। মানুষের ইতিহাসে যত বড়ো মহৎ ঘটনাই ঘটুক না নিজের পেটের ক্ষুধাকে উপস্থিতমতো যদি একান্ত করিয়া না দেখা যায় তবে বাঁচাই শক্ত হয়। যে মজুর কোদাল হাতে মাটি খুঁড়িতেছে সে লোক মনেও ভাবে না যে সেই মুহূর্তেই রাজা-মহারাজার মন্ত্রণাসভায় রাজ্যসাম্রাজ্যের ব্যবস্থা লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। অনাদি অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ যত বড়োই হ'ক, তবু মানুষের কাছে এক মুহূর্তের বর্তমান তাহার চেয়ে ছোটো নয়। এই জন্য এই সমস্ত ছোটো ছোটো নিমেষগুলির বোঝা মানুষের কাছে যত ভারি এমন যুগ-যুগান্তরের ভার নহে;—এই জন্য তাহার চোখের সামনে এই নিমেষের পর্দাটাই সকলের চেয়ে মোটা;—যুগ-যুগান্তরের প্রসারের মধ্যে এই পর্দার স্থূলতা ক্ষয় হইয়া যাইতে থাকে। বিজ্ঞানে পড়া যায় পৃথিবীর গায়ের কাছের বাতাসের আচ্ছাদনটা যত ঘন, এমন তাহার দূরের আচ্ছাদন নহে,—পৃথিবীর নিচের টানে ও উপরের চাপে তাহার আবরণ এমন নিবিড় হইয়া উঠে। আমাদেরও তাই। যত আমাদের কাছের দিকে, ততই আমাদের নিজের টানে ও পরের চাপে আমাদের মনের উপরকার পর্দা অত্যন্ত বেশি নিরেট হইয়া দাঁড়ায়।

শাস্ত্রে তাই বলে আমাদের সমস্ত আবরণ আসক্তিরই অর্থাৎ আকর্ষণেরই রচনা। নিজের দিকে যতই টান দিব নিজের উপরকার ঢাকাটাকে ততই ঘন করিয়া তুলিব। এই টান হালকা হইলে তবেই পর্দা ফাঁক হইয়া যায়।

দেখিতেছি রুগ্‌ণ শরীরের দুর্বলতায় এই টানের গ্রন্থিটাকে খানিকটা আলগা করিয়া দিয়াছে। নিজের চারিদিকে যেন অনেকখানি ফাঁকা ঠেকিতেছে। কিছু একটা করিতেই হইবে, ফল একটা পাইতেই হইবে, আমার হাতে কাজ আছে আমি না হইলে তাহা সম্পন্নই হইবে না এই চিন্তায় নিজেকে একটুও অবসর দেওয়া ঘটে না, অবসরটাকে যেন

অপরাধ বলিয়া মনে হয়। কর্তব্যের যে অন্ত নাই, জগৎসংসারের দাবির যে বিরাম নাই; এই জন্য যতক্ষণ শক্তি থাকে ততক্ষণ সমস্ত মন কাজের দিকে ছটফট করিতে থাকে। এই টানাটানি যতই প্রবল হইয়া উঠে ততই নিজের অন্তরের ও বাহিরের মাঝখানে সেই স্বচ্ছ অবকাশটি ঘুচিয়া যায়—যাহা না থাকিলে সকল জিনিসকে যথা-পরিমাণে সত্য আকারে দেখা যায় না। বিশ্বজগৎ অনন্ত আকাশের উপরে আছে বলিয়াই, অর্থাৎ তাহা খানিকটা করিয়া আছে ও অনেকটা করিয়া নাই বলিয়াই তাহার ছোটো বড়ো নানা আকৃতি আয়তন লইয়া তাহাকে এমন বিচিত্র করিয়া দেখিতেছি। কিন্তু জগৎ যদি আকাশে না থাকিয়া একেবারে আমাদের চোখের উপরে চাপিয়া থাকিত—তাহা হইলে ছোটোও যা বড়োও তা, বাঁকাও যেমন সোজাও তেমন।

তেমনি যখন শরীর সবল ছিল তখন অবকাশটাকে একেবারে নিঃশেষে বাদ দিবার আয়োজন করিয়াছিলাম। কেবল কাজ এবং কাজের চিন্তা; কেবল অন্তবিহীন দায়িত্বের নিবিড় ঠেসাঠেসির মাঝখানে চাপা পড়িয়া নিজেকে এবং জগৎকে স্পষ্ট করিয়া ও সত্য করিয়া দেখিবার সুযোগ যেন একেবারে হারাইয়াছিলাম। কর্তব্যপরতা যত মহৎ জিনিস হ'ক, সে যখন অত্যাচারী হইয়া উঠে তখন সে আপনি বড়ো হইয়া উঠিয়া মানুষকে খাটো করিয়া দেয়। সেটা একটা বিপরীত ব্যাপার। মানুষের আত্মা মানুষের কাজের চেয়ে বড়ো।

এমন সময় শরীর যখন বাঁকিয়া বসিল, বলিল, আমি কোনোমতেই কাজ করিব না তখন দায়িত্বের বাঁধন কাটিয়া গেল। তখন টানাটানিতে ঢিল পড়িতেই কাজের নিবিড়তা আলগা হইয়া আসিল—মনের চারিদিকের আকাশে আলো এবং হাওয়া বহিতে লাগিল। তখন দেখা গেল আমি কাজের মানুষ একথাটা যত সত্য, তাহার চেয়ে ঢের বড়ো সত্য আমি মানুষ। সেই বড়ো সত্যটির কাছেই জগৎ সম্পূর্ণ হইয়া দেখা দেয়— বিশ্ববীণা সুন্দর হইয়া বাজে—সমস্ত রূপরসগন্ধ আমার কাছে স্বীকার করে যে "তোমারই মন পাইবার জন্য আমরা বিশ্বের প্রাঙ্গণে মুখ তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছি।"

আমার কর্মক্ষেত্রকে আমি ক্ষুদ্র বলিয়া নিন্দা করিতে চাই না কিন্তু আমার রোগশয্যা আজ দিগন্তপ্রসারিত আকাশের নীলিমাকে অধিকার করিয়া বিস্তীর্ণ হইয়াছে। আজ আমি আপিসের চৌকিতে আসীন নই, আমি বিরাটের ক্রোড়ে শয়ান। সেইখানে সেই অপরিসীম অবকাশের মাঝখানে আজ আমার নববর্ষের অভ্যুদয় হইল—মৃত্যুর পরিপূর্ণতা যে কী সুগভীর আমি যেন আজ তাহার আস্বাদন পাইলাম। আজ নববর্ষ অতলস্পর্শ মৃত্যুর সুনীল শীতল সুবিপুল অবকাশপূর্ণ স্তব্ধতার মাঝখানে জীবনের পদ্মটিকে যেন বিকশিত করিয়া ধরিয়া দেখাইল।

তাই তো আজ বসন্তশেষের সমস্ত ফুলগন্ধ একেবারে আমার মনের উপরে আসিয়া এমন করিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে। তাই তো আমার খোলা জানালা পার হইয়া বিশ্ব-আকাশের অতিথিরা এমন অসংকোচে আমার ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। আলো যে ওই অন্তরীক্ষে কী সুন্দর করিয়া দাঁড়াইয়াছে, আর পৃথিবী ওই তার পায়ের নীচে আঁচল বিছাইয়া কী নিবিড় হর্ষে পুলকিত হইয়া পড়িয়া আছে তাহা যেন এত কাল দেখি নাই। এই আজ আমি যাহা দেখিতেছি এ যে মৃত্যুর পটে আঁকা জীবনের ছবি : যেখানে বৃহৎ, যেখানে বিরাম, যেখানে নিস্তব্ধ পূর্ণতা, তাহারই উপরে দেখিতেছি এই সুন্দরী চঞ্চলতার অবিরাম নূপুরনিক্কণ, তাহার নানা রঙের আঁচলখানির এই উচ্ছ্বসিত ঘূর্ণ্যগতি।

আমি দেখিতেছি বাহিরের দরজায় লক্ষ লক্ষ চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা আলো হাতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আমি দেখিতেছি মানুষের ইতিহাসে জন্ম-মৃত্যু উত্থান-পতন ঘাত-প্রতিঘাত উচ্চকলরবে উতলা হইয়া ফিরিতেছে—কিন্তু সেও তো ওই বাহিরের প্রাঙ্গণে। আমি দেখিতেছি ওই যে রাজার বাড়ি তাহাতে মহলের পর মহল উঠিয়াছে, তাহার চূড়ার উপরে নিশান মেঘ ভেদ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে সে আর চোখে দেখা যায় না। কিন্তু চাবি যখন লাগিল, দ্বার যখন খুলিল—ভিতর বাড়িতে একি দেখা যায়! সেখানে আলোয় তো চোখ ঠিকরিয়া পড়ে না, সেখানে সৈন্যসামন্তে ঘর জুড়িয়া তো দাঁড়ায় নাই! সেখানে মণি নাই মানিক নাই, সেখানে চন্দ্রাতপে তো মুক্তার ঝালর ঝুলিতেছে না। সেখানে ছেলেরা ধুলাবালি ছড়াইয়া নির্ভয়ে খেলা করিতেছে, তাহাতে দাগ পড়িবে এমন রাজআস্তরণ তো কোথাও বিছানো নাই। সেখানে যুবকযুবতীরা মালা বদল করিবে বলিয়া আঁচল ভরিয়া ফুল তুলিয়াছে কিন্তু রাজোদ্যানের মালী আসিয়া তো কিছুমাত্র হাঁকডাক করিতেছে না। বৃদ্ধ সেখানে কর্মশালার বহু কালিমাচিহ্নিত অনেক দিনের জীর্ণ কাপড়খানা ছাড়িয়া ফেলিয়া পট্টবসন পরিতেছে, কোথাও তো কোনো নিষেধ দেখি না। ইহাই আশ্চর্য যে এত ঐশ্বর্য এত প্রতাপের মাঝখানটিতে সমস্ত এমন সহজ, এমন আপন! ইহাই আশ্চর্য, পা তুলিতে ভয় হয় না, হাত তুলিতে হাত কাঁপে না। ইহাই আশ্চর্য যে এমন অভেদ্য রহস্যময় জ্যোতির্ময় লোকলোকান্তরের মাঝখানে এই অতি ক্ষুদ্র মানুষের জন্মমৃত্যু সুখদুঃখ খেলাধুলা কিছুমাত্র ছোটো নয়, সামান্য নয়, অসংগত নয়—সে জন্য কেহ তাহাকে একটুও লজ্জা দিতেছে না। সবাই বলিতেছে তোমার ওইটুকু খেলা, ওইটুকু হাসিকান্নার জন্যই এত আয়োজন—ইহার যতটুকুই তুমি গ্রহণ করিতে পার ততটুকুই সে তোমারই ;—যতদূর পর্যন্ত তুমি দেখিতেছ সে তোমারই দুই চক্ষুর ধন,—যতদূর পর্যন্ত তোমার মন দিয়া বেড়িয়া লইতে পার সে

তোমারই মনের সম্পত্তি। তাই এত বড়ো জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে আমার গৌরব ঘুচিল না—ইহার অন্তবিহীন ভারে আমার মাথা এতটুকুও নত হইল না।

কিন্তু ইহাও বাহিরে। আরও ভিতরে যাও—সেখানেই সকলের চেয়ে আশ্চর্য। সেইখানেই ধরা পড়ে, কৌটার মধ্যে কৌটা, তাহার মাঝখানে যে রত্নটি সেই তো প্রেম। কৌটার বোঝা বহিতে পারি না কিন্তু সেই প্রেমটুকু এমনি যে, তাহাকে গলার হার গাঁথিয়া বুকের কাছে অনায়াসে ঝুলাইয়া রাখিতে পারি। প্রকাণ্ড এই জগৎব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে বড়ো নিভৃতে ওই একটি প্রেম আছে—চারিদিকে সূর্যতারা ছুটাছুটি করিতেছে, তাহার মাঝখানকার স্তব্ধতার মধ্যে ওই প্রেম; চারিদিকে সপ্তলোকের ভাঙাগড়া চলিতেছে, তাহারই মাঝখানকার পূর্ণতার মধ্যে ওই প্রেম। ওই প্রেমের মূল্যে ছোটোও যে সে বড়ো, ওই প্রেমের টানে বড়োও যে সে ছোটো। ওই প্রেমই তো ছোটোর সমস্ত লজ্জাকে আপনার মধ্যে টানিয়া লইয়াছে, বড়োর সমস্ত প্রতাপকে আপনার মধ্যে আচ্ছন্ন করিয়াছে, ওই প্রেমের নিকেতনের মধ্যে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাই বিশ্বজগতের সমস্ত সুর আমারই ভাষাতে গান করিতেছে—সেখানে একি কাণ্ড! সেখানে নির্জন রাত্রির অন্ধকারে রজনীগন্ধার উন্মুখ গুচ্ছ হইতে যে গন্ধ আসিতেছে সে কি সত্যই আমারই কাছে নিঃশব্দচরণে দূত আসিল! এও কি বিশ্বাস করিতে পারি! হাঁ সত্যই। একেবারেই বিশ্বাস করিতে পারিতাম না মাঝখানে যদি প্রেম না থাকিত। সেই তো অসম্ভবকে সম্ভব করিল। সেই তো এতবড়ো জগতের মাঝখানেও এত ছোটোকে বড়ো করিয়া তুলিল। বাহিরের কোনো উপকরণ তাহার যে আবশ্যক হয় না, সে যে আপনারই আনন্দে ছোটোকে গৌরব দান করিতে পারে।

এই জন্যই তো ছোটোকে তাহার এতই দরকার। নইলে সে আপনার আনন্দের পরিমাণ পাইবে কী করিয়া? ছোটোর কাছে সে আপনার অসীম বৃহত্ত্বকে বিকাইয়া দিয়াছে; ইহাতেই তাহার আপনার পরিচয়, ইহাতেই তাহার আনন্দের পরিমাণ। সেই জন্যই এমন স্পর্ধা করিয়া বলিতেছি, এই তারাখচিত আকাশের নীচে, এই পুষ্পবিকশিত বসন্তের বনে, এই তরঙ্গমুখরিত সমুদ্র-বেলায় ছোটোর কাছে বড়ো আসিতেছেন। জগতে সমস্ত শক্তির আন্দোলন, সমস্ত নিয়মের বন্ধন, সমস্ত অসংখ্য কাজের মাঝখানে এই আনন্দের লীলাটিই সকলের চেয়ে গভীর, সকলের চেয়ে সত্য। ইহা অতি ছোটো হইয়াও ছোটো নহে, ইহাকে কিছুতেই আচ্ছন্ন করিতে পারিল না। দেশকালের মধ্যে তাহার বিহার; প্রত্যেক তিলপরিমাণ দেশকে ও পলপরিমাণ কালকে অসীমত্বে উদ্ভাসিত করা তাহার স্বভাব;—আর, আমার এই ক্ষুদ্র আমি টুকুকে নানা আড়ালের ভিতর দিয়া নিবিড় সুখেদুঃখে আপন করিয়া লওয়া তাহার পরিপূর্ণতা।

জগতের গভীর মাঝখানটিতে এই যেখানে সমস্ত একেবারেই সহজ, যেখানে বিশ্বের বিপুল বোঝা আপনার সমস্ত ভার নামাইয়া দিয়াছে, সত্য যেখানে সুন্দর, শক্তি যেখানে প্রেম, সেইখানে একেবারে সহজ হইয়া বসিবার জন্য আজ নববর্ষের দিনে ডাক আসিল। যেদিকে প্রয়াস, যেদিকে যুদ্ধ সেই সংসার তো আছেই—কিন্তু সেইখানেই কি দিন খাটিয়া দিন-মজুরি লইতে হইবে? সেই খানেই কি চরম দেনাপাওনা? এই বিপুল হাটের বাহিরে নিখিল ভুবনের নিভৃত ঘরটির মধ্যে একটি জায়গা আছে যেখানে হিসাবকিতাব নাই, যেখানে আপনাকে অনায়াসে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিতে পারাই মহত্তম লাভ, যেখানে ফলাফলের তর্ক নাই, বেতন নাই কেবল আনন্দ আছে; কর্মই যেখানে সকলের চেয়ে প্রবল নহে, প্রভু যেখানে প্রিয়—সেখানে একবার যাইতে হইবে, একেবারে ঘরের বেশ পরিয়া, হাসিমুখ করিয়া। নহিলে প্রাণপণ চেষ্টায় কেবলই আপনাকে আপনি জীর্ণ করিয়া আর কতদিন এমন করিয়া চলিবে? নিজের মধ্যে অন্ন নাই গো অন্ন নাই—অমৃতহস্ত হইতে অন্ন গ্রহণ করিতে হইবে। সে অন্ন উপার্জনের অন্ন নয়, সে প্রেমের অন্ন—হাত খালি করিয়া দিয়া অঞ্জলি পাতিয়া চাহিতে পারিলেই হয়। সহজ হইয়া সেইখানে চল্—আজ নববর্ষের পাখি সেই ডাক ডাকিতেছে, বেলফুলের গন্ধ সেই সহজ কথাটিকে বাতাসে অযাচিত ছড়াইয়া দিতেছে। নববর্ষ যে সহজ কথাটি জানাইবার জন্য প্রতিবৎসর দেখা দিয়া যায়, রোগের শয্যায় কাজ ছিল না বলিয়া সেই কথাটি আজ স্তব্ধ হইয়া শুনিবার সময় পাইলাম—আজ প্রভাতের আলোকের এই নিমন্ত্রণ-পত্রটিকে প্রণাম করিয়া মাথায় করিয়া গ্রহণ করি।

১৩১৯

রূপ ও অরূপ

জগৎ বলিয়া আমরা যাহা জানিতেছি সেই জানাটাকে আমাদের দেশে মায়া বলে। বস্তুত তাহার মধ্যে যে একটা মায়ার ভাব আছে তাহা কেবল তত্ত্বজ্ঞান বলে না আধুনিক বিজ্ঞানও বলিয়া থাকে। কোনো জিনিস বস্তুত স্থির নাই, তাহার সমস্ত অণু পরমাণু নিয়ত কম্পমান অথচ জানিবার বেলায় এবং ব্যবহারকালে আমরা তাহাকে স্থির বলিয়াই জানিতেছি। নিবিড়তম বস্তুও জালের মতো ছিদ্রবিশিষ্ট অথচ জানিবার বেলায় তাহাকে আমরা অচ্ছিদ্র বলিয়াই জানি। স্ফটিক জিনিসটা যে কঠিন জিনিস তাহা দুর্যোধন একদিন ঠেকিয়া শিখিয়াছিলেন অথচ আলোকের কাছে যেন সে জিনিসটা একেবারে নাই বলিলেই হয়। এদিকে যে মহাপ্রবল আকর্ষণ সূর্য হইতে পৃথিবী ও পৃথিবী হইতে সূর্যে

প্রসারিত, যাহা লক্ষ কোটি হাতির বলকে পরাস্ত করে আমরা তাহার ভিতর দিয়া চলিতেছি কিন্তু মাকড়সার জালটুকুর মতোও তাহা আমাদের গায়ে ঠেকিতেছে না। আমাদের সম্বন্ধে যেটা আছে এবং যেটা নাই অস্তিত্বরাজ্যে যমজ ভাইয়ের মতো তাহারা হয়তো উভয়েই পরমাত্মীয় ; তাহাদের মাঝখানে হয়তো একেবারেই ভেদ নাই। বস্তুমাত্রই একদিক থেকে দেখিতে গেলে বাষ্প—সেই বাষ্প ঘন হইয়া আছে বলিয়াই তাহাকে দৃঢ় আকারে বদ্ধ করিয়া প্রত্যক্ষ দেখি কিন্তু উত্তাপের তাড়ায় তাহা আলগা হইয়া গেলেই মরীচিকার মতো তাহা ক্রমশই দৃষ্টির অগোচর হইবার উপক্রম করিতে থাকে। বস্তুত হিমালয় পর্বতের উপরকার মেঘের সহিত হিমালয়ের প্রভেদকে আমরা গুরুতর বলি বটে কিন্তু সেই গুরুতরত্ব ভাবিয়া দেখিলেই লঘু হইয়া পড়ে। মেঘ যেমন অদৃশ্য বাষ্পের চেয়ে নিবিড়তর, হিমালয়ও সেইরূপ মেঘের চেয়ে নিবিড়তর।

তার পর কালের ভিতর দিয়া দেখো সমস্ত জিনিসই প্রবহমান। তাই আমাদের দেশে বিশ্বকে জগৎ বলে—সংসার বলে ; তাহা মুহূর্তকাল স্থির নাই, তাহা কেবলই চলিতেছে, সরিতেছে।

যাহা কেবলই চলে, সরে, তাহার রূপ দেখি কী করিয়া ? রূপের মধ্যে তো একটা স্থিরত্ব আছে। যাহা চলিতেছে, তাহাকে, যেন চলিতেছে না, এমন ভাবে না দেখিলে আমরা দেখিতেই পাই না। লাটিম যখন দ্রুতবেগে ঘুরিতেছে তখন আমরা তাহাকে স্থির দেখি। মাটি ভেদ করিয়া যে অঙ্কুরটি বাহির হইয়াছে প্রতি নিমেষেই তাহার পরিবর্তন হইতেছে বলিয়াই তাহার পরিণতি ঘটে। কিন্তু যখন তাহার দিকে তাকাই সে কিছু মাত্র ব্যস্ততা দেখায় না ; যেন অনন্তকাল সে এই রকম অঙ্কুর হইয়াই খুশি থাকিবে, যেন তাহার বাড়িয়া উঠিবার কোনো মতলবই নাই। আমরা তাহাকে পরিবর্তনের ভাবে দেখি না, স্থিতির ভাবেই দেখি।

এই পৃথিবীকে আমরা ক্ষুদ্রকালের মধ্যে বদ্ধ করিয়া দেখিতেছি বলিয়াই ইহাকে ধ্রুব বলিয়া বর্ণনা করিতেছি—ধরণী আমাদের কাছে ধৈর্যের প্রতিমা। কিন্তু বৃহৎকালের মধ্যে ইহাকে দেখিতে গেলে ইহার ধ্রুবরূপ আর দেখি না তখন ইহার বহুরূপী মূর্তি ক্রমেই ব্যাপ্ত হইতে হইতে এমন হইয়া আসে যে, আমাদের ধারণার অগোচর হইয়া যায়। আমরা বীজকে ক্ষুদ্রকালের মধ্যে বীজরূপে দেখিতেছি কিন্তু বৃহৎকালে তাহাকে দেখিতে গেলে তাহা গাছ হইয়া অরণ্য-পরম্পরার মধ্য দিয়া নানা বিচিত্ররূপে ধাবিত হইয়া পাথুরে কয়লার খনি হইয়া আগুনে পুড়িয়া ধোঁয়া হইয়া ছাই হইয়া ক্রমে যে কী হইয়া যায় তাহার আর উদ্দেশ পাওয়াই শক্ত।

আমরা ক্ষণকালের মধ্যে বদ্ধ করিয়া ধরিয়া যাহাকে জমাট করিয়া দেখি বস্তুত

তাহার সে রূপ নাই কেননা সত্যই তাহা বদ্ধ হইয়া নাই এবং ক্ষণকালেই তাহার শেষ নহে। আমরা দেখিবার জন্য জানিবার জন্য তাহাকে স্থির করিয়া স্বতন্ত্র করিয়া তাহাকে যে নাম দিতেছি সে নাম তাহার চিরকালের সত্য নাম নহে। এই জন্যই আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি জানিতেছি বলিয়া স্থির করিয়াছি তাহাকে মায়া বলা হইয়াছে। নাম ও রূপ যে শাশ্বত নহে একথা আমাদের দেশের চাষারাও বলিয়া থাকে।

কিন্তু গতিকে এই যে স্থিতির মধ্য দিয়া আমরা জানি এই স্থিতির তত্ত্বটা তো আমাদের নিজের গড়া নহে। আমাদের গড়িবার ক্ষমতা কিসের? অতএব, গতিই সত্য, স্থিতি সত্য নহে, একথা বলিলে চলিবে কেন? বস্তুত সত্যকেই আমরা ধ্রুব বলিয়া থাকি, নিত্য বলিয়া থাকি। সমস্ত চঞ্চলতার মাঝখানে একটি স্থিতি আছে বলিয়া সেই বিধৃতিসূত্রে আমরা যাহা কিছু জানিতেছি নহিলে সেই জানার বালাইমাত্র থাকিত না—যাহাকে মায়া বলিতেছি তাহাকে মায়াই বলিতে পারিতাম না যদি কোনোখানে সত্যের উপলব্ধি না থাকিত।

সেই সত্যকে লক্ষ্য করিয়াই উপনিষৎ বলিতেছেন—

"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্তা অহোরাত্রাণ্যর্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি।"

সেই নিত্য পুরুষের প্রশাসনে, হে গার্গি নিমেষ মুহূর্ত অহোরাত্র অর্ধমাস মাস ঋতু সংবৎসর সকল বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

অর্থাৎ এই সমস্ত নিমেষ মুহূর্তগুলিকে আমরা একদিকে দেখিতেছি চলিতেছে কিন্তু আর একদিকে দেখিতেছি তাহা একটি নিরবচ্ছিন্নতাসূত্রে বিধৃত হইয়া আছে। এই জন্যই কাল বিশ্বচরাচরকে ছিন্ন ছিন্ন করিয়া যাইতেছে না, তাহাকে সর্বত্র জুড়িয়া গাঁথিয়া চলিতেছে। তাহা জগৎকে চকমকি ঠোকা স্ফুলিঙ্গপরম্পরার মতো নিক্ষেপ করিতেছে না, আদ্যন্ত যোগযুক্ত শিখার মতো প্রকাশ করিতেছে। তাহা যদি না হইত তবে আমরা মুহূর্তকালকেও জানিতাম না। কারণ আমরা এক মুহূর্তকে অন্য মুহূর্তের সঙ্গে যোগেই জানিতে পারি বিচ্ছিন্নতাকে জানাই যায় না। এই যোগের তত্ত্বই স্থিতির তত্ত্ব। এইখানেই সত্য, এইখানেই নিত্য।

যাহা অনন্ত সত্য, অর্থাৎ অনন্ত স্থিতি, তাহা অনন্ত গতির মধ্যেই আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। এই জন্য সকল প্রকাশের মধ্যেই দুই দিক আছে। তাহা একদিকে বদ্ধ, নতুবা প্রকাশই হয় না, আর একদিকে মুক্ত, নতুবা অনন্তের প্রকাশ হইতে পারে না। একদিকে তাহা হইয়াছে আর একদিকে তাহার হওয়া শেষ হয় নাই, তাই সে কেবলই চলিতেছে। এই জন্যই জগৎ জগৎ, সংসার সংসার। এই জন্য

কোনো বিশেষরূপ আপনাকে চরমভাবে বদ্ধ করে না—যদি করিত তবে সে অনন্তের প্রকাশকে বাধা দিত।

তাই যাঁহারা অনন্তের সাধনা করেন, যাঁহারা সত্যকে উপলব্ধি করিতে চান, তাঁহাদিগকে বারবার একথা চিন্তা করিতে হয়, চারিদিকে যাহা কিছু দেখিতেছি জানিতেছি ইহাই চরম নহে, স্বতন্ত্র নহে, কোনো মুহূর্তেই ইহা আপনাকে আপনি পূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিতেছে না · যদি তাহা করিত তবে ইহারা প্রত্যেকে স্বয়ম্ভু স্বপ্রকাশ হইয়া স্থির হইয়া থাকিত। ইহারা অন্তহীন গতি দ্বারা যে অন্তহীন স্থিতিকে নির্দেশ করিতেছে সেইখানেই আমাদের চিত্তের চরম আশ্রয় চরম আনন্দ।

অতএব আধ্যাত্মিক সাধনা কখনোই রূপের সাধনা হইতে পারে না। তাহা সমস্ত রূপের ভিতর দিয়া চঞ্চল রূপের বন্ধন অতিক্রম করিয়া ধ্রুব সত্যের দিকে চলিতে চেষ্টা করে। ইন্দ্রিয়গোচর যে কোনো বস্তু আপনাকেই চরম বলিয়া স্বতন্ত্র বলিয়া ভান করিতেছে, সাধক তাহার সেই ভানের আবরণ ভেদ করিয়া পরম পদার্থকে দেখিতে চায়। ভেদ করিতেই পারিত না যদি এই সমস্ত নাম রূপের আবরণ চিরন্তন হইত। যদি ইহারা অবিশ্রাম প্রবহমান ভাবে নিয়তই আপনার বেড়া আপনিই ভাঙিয়া না চলিত তবে ইহারা ছাড়া আর কিছুর জন্য কোনো চিন্তাও মানুষের মনে মুহূর্তকালের জন্য স্থান পাইত না তবে ইহাদিগকেই সত্য জানিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতাম—তবে বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান এই সমস্ত অচল প্রত্যক্ষ সত্যের ভীষণ শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়া একেবারে মূক হইয়া মূর্ছিত হইয়া থাকিত। ইহার পিছনে কিছুই দেখিতে পাইত না। কিন্তু সমস্ত খণ্ড বস্তু কেবলই চলিতেছে বলিয়াই, সারি সারি দাঁড়াইয়া পথ রোধ করিয়া নাই বলিয়াই আমরা অখণ্ড সত্যের, অক্ষয় পুরুষের সন্ধান পাইতেছি। সেই সত্যকে জানিয়া সেই পুরুষের কাছেই আপনার সমস্তকে নিবেদন করিয়া দেওয়াই আধ্যাত্মিক সাধনা। সুতরাং তাহা সত্যের দিক হইতে রূপের দিকে কোনো মতে উজান পথে চলিতে পারে না।

এই তো আধ্যাত্মিক সাধনা। শিল্প-সাহিত্যের সাধনাটা কী? এই সাধনায় মানুষের চিত্ত আপনাকে বাহিরে রূপ দিয়া সেই রূপের ভিতর হইতে পুনশ্চ আপনাকেই ফিরিয়া দেখিতেছে।

সৌন্দর্যের মধ্যে আনন্দ আপনাকেই বাহিরে দেখিতে পায় - সেইজন্যই সৌন্দর্যের গৌরব। মানুষ আপনার সৌন্দর্য-সৃষ্টির মধ্যে আপনারই আনন্দময় স্বরূপকে দেখিতে পায়—শিল্পীর শিল্পে কবির কাব্যে মানুষের সেইজন্যই এত অনুরাগ। শিল্পে সাহিত্যে মানুষ কেবলই যদি বাহিরের রূপকেই দেখিত আপনাকে না দেখিত তবে সে শিল্প-সাহিত্য তাহার পক্ষে একেবারে ব্যর্থ হইত।

এই জন্যই শিল্প-সাহিত্যে ভাবব্যঞ্জনার (suggestiveness) এত আদর। এই ভাবব্যঞ্জনার দ্বারা রূপ আপনার একান্ত ব্যক্ততা যথাসম্ভব পরিহার করে বলিয়াই অব্যক্তের অভিমুখে আপনাকে বিলীন করে বলিয়াই মানুষের হৃদয় তাহার দ্বারা প্রতিহত হয় না। রাজোদ্যানের সিংহদ্বারটা কেমন? তাহা যতই অভ্রভেদী হ'ক, তাহার কারুনৈপুণ্য যতই থাক, তবু সে বলে না আমাতে আসিয়াই সমস্ত পথ শেষ হইল। আসল গন্তব্য স্থানটি যে তাহাকে অতিক্রম করিয়াই আছে এই কথাই তাহার জানাইবার কথা। এই জন্য সেই তোরণ কঠিন পাথর দিয়া যত দৃঢ় করিয়াই তৈরি হউক না কেন, সে আপনার মধ্যে অনেকখানি ফাঁক রাখিয়া দেয়। বস্তুত সেই ফাঁকটাকেই প্রকাশ করিবার জন্য সে খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে যতটা আছে তাহার চেয়ে নাই অনেক বেশি। তাহার সেই "নাই" অংশটাকে যদি সে একেবারে ভরাট করিয়া দেয় তবে সিংহোদ্যানের পথ একেবারেই বন্ধ। তবে তাহার মতো নিষ্ঠুর বাধা আর নাই। তবে সে দেয়াল হইয়া উঠে এবং যাহারা মূঢ় তাহারা মনে করে এইটেই দেখিবার জিনিস, ইহার পশ্চাতে আর কিছুই নাই; এবং যাহারা সন্ধান জানে তাহারা ইহাকে অতি স্থূল একটা মূর্তিমান বাহুল্য জানিয়া অন্যত্র পথ খুঁজিতে বাহির হয়। রূপমাত্রই এইরূপ সিংহদ্বার। সে আপনার ফাঁকটা লইয়াই গৌরব করিতে পারে। সে আপনাকেই নির্দেশ করিলে বঞ্চনা করে, পথ নির্দেশ করিলেই সত্য কথা বলে। সে ভূমাকে দেখাইবে, আনন্দকে প্রকাশ করিবে, কী শিল্প সাহিত্যে কী জগৎ-সৃষ্টিতে এই তাহার একমাত্র কাজ। কিন্তু সে প্রায় মাঝে মাঝে দুরাকাঙ্ক্ষাগ্রস্ত দাসের মতো আপনার প্রভুর সিংহাসনে চড়িয়া বসিবার আয়োজন করে। তখন তাহার সেই স্পর্ধায় আমরা যদি যোগ দিই তবে বিপদ ঘটে—তখন তাহাকে নষ্ট করিয়া ফেলাই তাহার সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য—তা সে যতই প্রিয় হ'ক, এমন কি, সে যদি আমার নিজেরই অহংরূপটা হয় তবুও। বস্তুত রূপ যাহা তাহাকে তাহার চেয়ে বড়ো করিয়া জানিলেই সেই বড়োকে হারানো হয়।

মানুষের সাহিত্য শিল্পকলায় হৃদয়ের ভাব রূপে ধরা দেয় বটে কিন্তু রূপে বদ্ধ হয় না। এই জন্য সে কেবলই নব নব রূপের প্রবাহ সৃষ্টি করিতে থাকে। তাই প্রতিভাকে বলে "নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি।" প্রতিভা রূপের মধ্যে চিত্তকে ব্যক্ত করে কিন্তু বন্দী করে না—এই জন্য নব নব উন্মেষের শক্তি তাহার থাকা চাই।

মনে করা যাক পূর্ণিমা রাত্রির শুভ্র সৌন্দর্য দেখিয়া কোনো কবি বর্ণনা করিতেছেন যে, সুরলোকে নীলকান্তমণিময় প্রাঙ্গণে সুরাঙ্গনারা নন্দনের নবমল্লিকায় ফুলশয্যা রচনা করিতেছেন। এই বর্ণনা যখন আমরা পড়ি তখন আমরা জানি পূর্ণিমা রাত্রিসম্বন্ধে

এই কথাটা একেবারে শেষ কথা নহে—অসংখ্য ব্যক্ত ও অব্যক্ত কথার মধ্যে এ একটা কথা ;—এই উপমাটিকে গ্রহণ করার দ্বারা অন্য অগণ্য উপমার পথ বন্ধ করা হয় না, বরঞ্চ পথকে প্রশস্তই করা হয়।

কিন্তু যদি আলংকারিক বলপূর্বক নিয়ম করিয়া দেন যে, পূর্ণিমা রাত্রি সম্বন্ধে সমস্ত মানবসাহিত্যে এই একটিমাত্র উপমা ছাড়া আর কোনো উপমাই হইতে পারে না—যদি কেহ বলে, কোনো দেবতা রাত্রে স্বপ্ন দিয়াছেন যে এই রূপই পূর্ণিমার সত্য রূপ—এই রূপকেই কেবল ধ্যান করিতে হইবে, প্রকাশ করিতে হইবে, কাব্যে পুরাণে এই রূপেরই আলোচনা করিতে হইবে, তবে পূর্ণিমা সম্বন্ধে সাহিত্যের দ্বার রুদ্ধ হইয়া যাইবে। তবে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে এরূপ চরম উপমার দৌরাত্ম্য একেবারে অসহ্য—কারণ ইহা মিথ্যা। যতক্ষণ ইহা চরম ছিল না ততক্ষণই ইহা সত্য ছিল। বস্তুত এই কথাটাই সত্য যে পূর্ণিমা সম্বন্ধে নিত্য নব নব রূপে মানুষের আনন্দ আপনাকেই প্রকাশ করে। কোনো বিশেষ একটিমাত্র রূপই যদি সত্য হয় তবে সেই আনন্দই মিথ্যা হইয়া যায়। জগৎ-সৃষ্টিতেও যেমন সৃষ্টিকর্তার আনন্দ কোনো একটিমাত্র রূপে আপনাকে চিরকাল বদ্ধ করিয়া শেষ করিয়া ফেলে নাই,—অনাদিকাল হইতে তাহার নব নব বিকাশ চলিয়া আসিতেছে, তেমনি সাহিত্যশিল্প সৃষ্টিতেও মানুষের আনন্দ কোনো একটিমাত্র উপমায় বর্ণনায় আপনাকে চিরকালের মতো বন্দী করিয়া থামিয়া যায় নাই, সে কেবলই নব নব প্রকাশের মধ্যে লীলা করিতেছে। কারণ, রূপ জিনিসটা কোনো কালে বলিতে পারিবে না যে, আমি এইখানেই থামিয়া দাঁড়াইলাম, আমিই শেষ—সে যদি চলিতে না পারে তবে তাহাকে বিকৃত হইয়া মরিতে হইবে। বাতি যেমন ছাই হইতে হইতে শিখাকে প্রকাশ করে, রূপ তেমনি কেবলই আপনাকে লোপ করিতে করিতে একটি শক্তিকে আনন্দকে প্রকাশ করিতে থাকে। বাতি যদি নিজে অক্ষয় হইতে চায় তবে শিখাকেই গোপন করে—রূপ যদি আপনাকেই ধ্রুব করিতে চায় তবে সত্যকে অস্বীকার করা ছাড়া তাহার উপায় নাই। এইজন্য রূপের অনিত্যতাই রূপের সার্থকতা, তাহাই তাহার গৌরব। রূপ নিত্য হইবার চেষ্টা করিলেই ভয়ংকর উৎপাত হইয়া ওঠে। সুরের অমৃত অসুর পান করিলে স্বর্গলোকের বিপদ তখন বিধাতার হাতে তাহার অপঘাত মৃত্যু ঘটে। পৃথিবীতে ধর্মে কর্মে সমাজে সাহিত্যে শিল্পে সকল বিষয়েই আমরা ইহার প্রমাণ পাই। মানুষের ইতিহাসে যত কিছু ভীষণ বিপ্লব ঘটিয়াছে তাহার মূলেই রূপের এই অসাধু চেষ্টা আছে। রূপ যখনই একান্ত হইয়া উঠিতে চায় তখনই তাহাকে রূপান্তরিত করিয়া মানুষ তাহার অত্যাচার হইতে মনুষ্যত্বকে বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণ লড়াই করিতে প্রবৃত্ত হয়।

বর্তমানকালে আমাদের শিক্ষিত লোকেরা যখন প্রতিমাপূজার সমর্থন করেন তখন তাঁহারা বলেন প্রতিমা জিনিসটা আর কিছুই নহে, উহা ভাবকে রূপ দেওয়া। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যে বৃত্তি শিল্পসাহিত্যের সৃষ্টি করে ইহাও সেই বৃত্তির কাজ। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে কথাটা সত্য নহে। দেবমূর্তিকে উপাসক কখনোই সাহিত্য হিসাবে দেখেন না। কারণ, সাহিত্যে আমরা কল্পনাকে মুক্তি দিবার জন্যই রূপের সৃষ্টি করি দেবমূর্তিতে আমরা কল্পনাকে বদ্ধ করিবার জন্যই চেষ্টা করিয়া থাকি। আমরা কল্পনাকে তখনই কল্পনা বলিয়া জানি যখন তাহার প্রবাহ থাকে, যখন তাহা এক হইতে আর-একের দিকে চলে, যখন তাহার সীমা কঠিন থাকে না; তখনই কল্পনা আপনার সত্য কাজ করে। সে কাজটি কী, না, সত্যের অনন্ত রূপকে নির্দেশ করা। কল্পনা যখন থামিয়া গিয়া কেবলমাত্র একটি রূপের মধ্যে একান্তভাবে দেহধারণ করে তখন সে আপনার সেই রূপকেই দেখায়, রূপের অতীতকে অনন্ত সত্যকে আর দেখায় না। সেইজন্য বিশ্বজগতের বিচিত্র ও নিত্যপ্রবাহিত রূপের চির-পরিবর্তনশীল অন্তহীন প্রকাশের মধ্যেই আমরা অনন্তের আনন্দকে মূর্তিমান দেখিতে পাই। জগতের রূপ কারাপ্রাচীরের মতো অটল অচল হইয়া আমাদিগকে ঘিরিয়া থাকিলে কখনোই তাহার মধ্যে আমরা অনন্তের আনন্দকে জানিবার অবকাশমাত্র পাইতাম না। কিন্তু যখনই আমরা বিশেষ দেবমূর্তিকে পূজা করি তখনই সেই রূপের প্রতি আমরা চরমসত্যতা আরোপ করি। রূপের স্বাভাবিক পরিবর্তনশীল ধর্মকে লোপ করিয়া দিই রূপকে তেমন করিয়া দেখিবামাত্রই তাহাকে মিথ্যা করিয়া দেওয়া হয়, সেই মিথ্যার দ্বারা কখনোই সত্যের পূজা হইতে পারে না।

তবে কেন কোনো কোনো বিদেশী ভাবুকের মুখে আমরা প্রতিমা-পূজার সম্বন্ধে ভাবের কথা শুনিতে পাই? তাহার কারণ তাঁহারা ভাবুক, তাঁহারা পূজক নহেন। তাঁহারা যতক্ষণ ভাবুকের দৃষ্টিতে কোনো মূর্তিকে দেখিতেছেন ততক্ষণ তাঁহারা চরম করিয়া দেখিতেছেন না। একজন খ্রীস্টানও তাঁহার কাব্যে সরস্বতীর বন্দনা করিতে পারেন; কারণ সরস্বতী তাঁহার কাছে ভাবের প্রকাশমাত্র - গ্রীসের এথেনীও তাঁহার কাছে যেমন, সরস্বতীও তেমনি। কিন্তু সরস্বতীর যাঁহারা পূজক তাঁহারা এই বিশেষ মূর্তিকেই বিশেষভাবে অবলম্বন করিয়াছেন, জ্ঞানস্বরূপ অনন্তের এই একটিমাত্র রূপকেই তাঁহারা চরম করিয়া দেখিতেছেন—তাঁহাদের ধারণাকে তাঁহাদের ভক্তিকে এই বিশেষ রূপের বন্ধন হইতে তাঁহারা মুক্ত করিতেই পারেন না।

এই বন্ধন মানুষকে এতদূর পর্যন্ত বন্দী করে যে, শুনা যায় শক্তি-উপাসক কোনো একজন বিখ্যাত ভক্ত মহাত্মা আলিপুর পশুশালায় সিংহকে বিশেষ করিয়া দেখিবার জন্য

অতিশয় ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছিলেন—কেননা "সিংহ মায়ের বাহন"। শক্তিকে সিংহরূপে কল্পনা করিতে দোষ নাই—কিন্তু সিংহকেই শক্তিরূপে যদি দেখি তবে কল্পনার মহত্ত্বই চলিয়া যায়। কারণ, যে কল্পনা সিংহকে শক্তির প্রতিরূপ করিয়া দেখায় সেই কল্পনা সিংহে আসিয়া শেষ হয় না বলিয়াই আমরা তাহার রূপ-উদ্ভাবনকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি—যদি তাহা কোনো এক জায়গায় আসিয়া বদ্ধ হয় তবে তাহা মিথ্যা, তবে তাহা মানুষের শত্রু।

যাহা স্বভাবতই প্রবহমান তাহাকে কোনো একটা জায়গায় রুদ্ধ করিবামাত্র তাহা যে মিথ্যা হইয়া উঠিতে থাকে সমাজে তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। আচার জিনিসটা অনেক স্থলেই সেই বন্ধন-আকার ধারণ করে। তাহার সময় উত্তীর্ণ হইলেও অভ্যাসের আসক্তিবশত আমরা তাহাকে ছাড়িয়া দিতে চাই না। যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য চলা এবং চালানো, এক সময়ে তাহাকেই আমরা খোঁটার মতো ব্যবহার করি, অথচ মনে করি যেন তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতেছে।

একটা উদাহরণ দিই। জগতে বৈষম্য আছে। বস্তুত বৈষম্য সৃষ্টির মূলতত্ত্ব। কিন্তু সেই বৈষম্য ধ্রুব নহে। পৃথিবীতে ধনমান বিদ্যাক্ষমতা একজায়গায় স্থির নাই, তাহা আবর্তিত হইতেছে। আজ যে ছোটো কাল সে বড়ো, আজ যে ধনী কাল সে দরিদ্র। বৈষম্যের এই চলাচল আছে বলিয়াই মানবসমাজে স্বাস্থ্য আছে। কেননা বৈষম্য না থাকিলে গতিই থাকে না—উঁচু-নিচু না থাকিলে নদী চলে না, বাতাসে তাপের পার্থক্য না থাকিলে বাতাস বহে না। যাহা চলে না এবং যাহা সচল পদার্থের সঙ্গে যোগ রাখে না তাহা দূষিত হইতে থাকে। অতএব, মানবসমাজে উচ্চ নীচ আছেই, থাকিবেই এবং থাকিলেই ভালো, একথা মানিতে হইবে।

কিন্তু এই বৈষম্যের চলাচলকে যদি বাঁধ দিয়া বাঁধিয়া ফেলি, যদি একশ্রেণীর লোককে পুরুষানুক্রমে মাথায় করিয়া রাখিব এবং আর এক শ্রেণীকে পায়ের তলায় ফেলিব এই বাঁধা নিয়ম একেবারে পাকা করিয়া দিই তবে বৈষম্যের প্রকৃতিগত উদ্দেশ্যই একেবারে মাটি করিয়া ফেলি। যে বৈষম্য চাকার মতো আবর্তিত হয় না, সে বৈষম্য নিদারুণ ভারে মানুষকে চাপিয়া রাখে, তাহা মানুষকে অগ্রসর করে না। জগতে বৈষম্য ততক্ষণ সত্য যতক্ষণ তাহা চলে, যতক্ষণ তাহা মুক্ত—জগতে লক্ষ্মী যতক্ষণ চঞ্চলা ততক্ষণ তিনি কল্যাণদায়িনী। লক্ষ্মীকে এক জায়গায় চিরকাল বাঁধিতে গেলেই তিনি অলক্ষ্মী হইয়া উঠেন। কারণ, চঞ্চলতার দ্বারাই লক্ষ্মী বৈষম্যের মধ্যে সাম্যকে আনেন। দুঃখী চিরদিন দুঃখী নয়, সুখী চিরদিন সুখী নয়—এইখানেই সুখীতে দুঃখীতে সাম্য আছে। সুখ দুঃখের এই চলাচল আছে বলিয়াই সুখ দুঃখের দ্বন্দ্বে মানুষের মঙ্গল ঘটে।

তাই বলিতেছি, সত্যকে, সুন্দরকে, মঙ্গলকে, যে রূপ যে সৃষ্টি ব্যক্ত করিতে থাকে তাহা বদ্ধরূপ নহে, তাহা একরূপ নহে, তাহা প্রবহমান এবং তাহা বহু। এই সত্যসুন্দর মঙ্গলের প্রকাশকে যখনই আমরা বিশেষ দেশে কালে পাত্রে বিশেষ আকারে বা আচারে বদ্ধ করিতে চাই তখনই তাহা সত্যসুন্দর মঙ্গলকে বাধাগ্রস্ত করিয়া মানবসমাজে দুর্গতি আনয়ন করে। রূপমাত্রের মধ্যেই যে একটি মায়া আছে, অর্থাৎ যে চঞ্চলতা অনিত্যতা আছে, যে অনিত্যতাই সেই রূপকে সত্য ও সৌন্দর্য দান করে, যে অনিত্যতাই তাহার প্রাণ, সেই কল্যাণময়ী অনিত্যতাকে কী সংসারে, কী ধর্মসমাজে, কী শিল্পসাহিত্যে, প্রথার পিঞ্জরে অচল করিয়া বাঁধিতে গেলে আমরা কেবল বন্ধনকেই লাভ করি, গতিকে একেবারেই হারাইয়া ফেলি। এই গতিকে যদি হারাই তবে শিকলে বাঁধা পাখি যেমন আকাশকে হারায় তেমনি আমরা অনন্তের উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত হই সুতরাং সত্যের চিরমুক্ত পথ রুদ্ধ হইয়া যায় এবং চারিদিক হইতে নানা অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়া অসংখ্য প্রমাদ আমাদিগকে মায়াবী নিশাচরের মতো আক্রমণ করিতে থাকে। স্তব্ধ হইয়া জড়বৎ পড়িয়া থাকিয়া আমাদিগকে তাহা সহ্য করিতে হয়।

১৩১৮

নামকরণ

এই আনন্দরূপিণী কন্যাটি একদিন কোথা হইতে তাহার মায়ের কোলে আসিয়া চক্ষু মেলিল। তখন তাহার গায়ে কাপড় ছিল না, দেহে বল ছিল না, মুখে কথা ছিল না, কিন্তু সে পৃথিবীতে পা দিয়াই এক মুহূর্তে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর আপনার প্রবল দাবি জানাইয়া দিল। সে বলিল আমার এই জল, আমার এই মাটি, আমার এই চন্দ্র সূর্য গ্রহতারকা। এত বড়ো জগৎচরাচরের মধ্যে এই অতি ক্ষুদ্র মানবিকাটি নূতন আসিয়াছে বলিয়া কোনো দ্বিধা সংকোচ সে দেখাইল না। এখানে যেন তাহার চির কালের অধিকার আছে, যেন চিরকালের পরিচয়।

বড়লোকের কাছ হইতে ভালোরকমের পরিচয়পত্র সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারিলে নূতন জায়গার রাজপ্রাসাদে আদর অভ্যর্থনা পাইবার পথ পরিষ্কার হইয়া যায়। এই মেয়েটিও যেদিন প্রথম এই পৃথিবীতে আসিল উহার ছোটো মুঠির মধ্যে একখানি অদৃশ্য

১৮৩৩ শক ৩রা ফাল্গুন বৃহস্পতিবার শান্তিনিকেতন আশ্রমে শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্তীর কন্যার নামকরণ উপলক্ষ্যে কথিত বক্তৃতার সারমর্ম।

পরিচয়পত্র ছিল। সকলের চেয়ে যিনি বড়ো তিনিই নিজের নামসইকরা একখানি চিঠি ইহার হাতে দিয়াছিলেন তাহাতে লেখা ছিল, এই লোকটি আমার নিতান্ত পরিচিত, তোমরা যদি ইহাকে যত্ন কর তবে আমি খুশি হইব।

তাহার পরে কাহার সাধ্য ইহার দ্বার রোধ করে। সমস্ত পৃথিবী তখনই বলিয়া উঠিল, এস, এস, আমি তোমাকে বুকে করিয়া রাখিব—দূর আকাশের তারাগুলি পর্যন্ত ইহাকে হাসিয়া অভ্যর্থনা করিল—বলিল, তুমি আমাদেরই একজন। বসন্তের ফুল বলিল, আমি তোমার জন্য ফলের আয়োজন করিতেছি; বর্ষার মেঘ বলিল, তোমার জন্য অভিষেকের জল নির্মল করিয়া রাখিলাম।

এমনি করিয়া জন্মের আরম্ভেই প্রকৃতির বিশ্বদরবারের দরজা খুলিয়া গেল। মা বাপের যে স্নেহ সেও প্রকৃতি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। শিশুর কান্না যেমনি আপনাকে ঘোষণা করিল অমনি সেই মুহূর্তেই জলস্থল আকাশ সেই মুহূর্তেই মা বাপের প্রাণ সাড়া দিল, তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইল না।

কিন্তু আরও একটি জন্ম ইহার বাকি আছে, এবার ইহাকে মানবসমাজের মধ্যে জন্ম লইতে হইবে। নামকরণের দিনই সেই জন্মের দিন। একদিন রূপের দেহ ধরিয়া এই কন্যা প্রকৃতির ক্ষেত্রে আসিয়াছিল, আজ নামের দেহ ধরিয়া এই কন্যা সমাজের ক্ষেত্রে প্রথম পদার্পণ করিল। জন্মমাত্রে পিতামাতা এই শিশুকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে, কিন্তু এ যদি কেবলই ইহার পিতামাতারই হইত তবে ইহার আর নামের দরকার হইত না, তবে ইহাকে নিত্য নূতন নূতন নামে ডাকিলেও কাহারও ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না। কিন্তু এ মেয়েটি নাকি শুধু পিতামাতার নহে, এ নাকি সমস্ত মানবসমাজের, সমস্ত মানুষের জ্ঞান প্রেম কর্মের বিপুল ভাণ্ডার নাকি ইহার জন্য প্রস্তুত আছে, সেইজন্য মানবসমাজ ইহাকে একটি নামদেহ দিয়া আপনার করিয়া লইতে চায়।

মানুষের যে শ্রেষ্ঠরূপ যে মঙ্গলরূপ তাহা এই নামদেহটির দ্বারাই আপনাকে চিহ্নিত করে। এই নামকরণের মধ্যে সমস্ত মানবসমাজের একটি আশা আছে, একটি আশীর্বাদ আছে—এই নামটি যেন নষ্ট না হয় ম্লান না হয়, এই নামটি যেন ধন্য হয়, এই নামটি যেন মাধুর্যে ও পবিত্রতায় মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অমরতা লাভ করে। যখন ইহার রূপের দেহটি একদিন বিদায় লইবে তখনও ইহার নামের দেহটি মানবসমাজের মর্মস্থানটিতে যেন উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করে।

আমরা সকলে মিলিয়া এই কন্যাটির নাম দিয়াছি, অমিতা। অমিতা বলিতে বুঝায় এই যে, যাহার সীমা নাই। এই নামটি তো ব্যর্থ নহে। আমরা যেখানে মানুষের সীমা দেখিতেছি সেইখানেই তো তাহার সীমা নাই। এই যে কলভাষিণী কন্যাটি

জানে না যে আজ আমরা ইহাকে লইয়াই আনন্দ করিতেছি, জানে না বাহিরে কী ঘটিতেছে, জানে না ইহার নিজের মধ্যে কী আছে—এই অপরিস্ফুটতার মধ্যেই তো ইহার সীমা নহে। এই কন্যাটি যখন একদিন রমণীরূপে বিকসিত হইয়া উঠিবে তখনই কি এ আপনার চরমকে লাভ করিবে? তখনও এই মেয়েটি নিজেকে যাহা বলিয়া জানিবে এ কি তাহার চেয়েও অনেক বড়ো নহে! মানুষের মধ্যে এই যে একটি অপরিমেয়তা আছে যাহা তাহার সীমাকে কেবলই অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে তাহাই কি তাহার সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ পরিচয় নহে? মানুষ যেদিন নিজের মধ্যে আপনার এই সত্য পরিচয়টি জানিতে পারে সেই দিনই সে ক্ষুদ্রতার জাল ছেদন করিবার শক্তি পায়, সেই দিনই সে উপস্থিত স্বার্থকে লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করে না, সেই দিনই সে চিরন্তন মঙ্গলকেই আপনার বলিয়া বরণ করিয়া লয়। যে মহাপুরুষেরা মানুষকে সত্য করিয়া চিনিয়াছেন তাঁহারা তো আমাদের মর্ত্য বলিয়া জানেন না, তাঁহারা আমাদের ডাক দিয়া বলেন, তোমরা "অমৃতস্য পুত্রাঃ।"

আমরা অমিতা নামে সেই অমৃতের পুত্রীকেই আমাদের সমাজে আহ্বান করিলাম। এই নামটি ইহাকে আপন মানবজন্মের মহত্ত্ব চিরদিন স্মরণ করাইয়া দিক আমরা ইহাকে এই আশীর্বাদ করি।

আমাদের দেশে নামকরণের সঙ্গে আর একটি কাজ আছে সেটি অন্নপ্রাশন। দুটির মধ্যে গভীর একটি যোগ রহিয়াছে। শিশু যে দিন একমাত্র মায়ের কোল অধিকার করিয়া ছিল সেদিন তাহার অন্ন ছিল মাতৃস্তন্য। সে অন্ন কাহাকেও প্রস্তুত করিতে হয় নাই—সে একেবারে তাহার একলার জিনিস, তাহাতে আর কাহারও অংশ ছিল না। আজ সে নাম দেহ ধরিয়া মানুষের সমাজে আসিল তাই আজ তাহার মুখে মানবসাধারণের অন্নকণাটি উঠিল। সমস্ত পৃথিবীতে সমস্ত মানুষের পাতে পাতে যে অন্নের পরিবেষণ চলিতেছে তাহারই প্রথম অংশ এই কন্যাটি আজ লাভ করিল। এই অন্ন সমস্ত সমাজে মিলিয়া প্রস্তুত করিয়াছে—কোন্ দেশে কোন্ চাষা রৌদ্রবৃষ্টি মাথায় করিয়া চাষ করিয়াছে, কোন্ বাহক ইহা বহন করিয়াছে, কোন্ মহাজন ইহাকে হাটে আনিয়াছে, কোন্ ক্রেতা ইহা ক্রয় করিয়াছে, কোন্ পাচক ইহা রন্ধন করিয়াছে, তবে এই কন্যার মুখে ইহা উঠিল। এই মেয়েটি আজ মানবসমাজে প্রথম আতিথ্য লইতে আসিয়াছে, এই জন্য সমাজ আপনার অন্ন ইহার মুখে তুলিয়া দিয়া অতিথিসৎকার করিল। এই অন্নটি ইহার মুখে তুলিয়া দেওয়ার মধ্যে মস্ত একটি কথা আছে। মানুষ ইহার দ্বারাই জানাইল আমার যাহা কিছু আছে তাহাতে তোমার অংশ আমি স্বীকার করিলাম। আমার জ্ঞানীরা যাহা জানিয়াছেন তুমি তাহা জানিবে,

আমার মহাপুরুষেরা যে তপস্যা করিয়াছেন তুমি তাহার ফল পাইবে, আমার বীরেরা যে জীবন দিয়াছেন তাহাতে তোমার জীবন পূর্ণ হইয়া উঠিবে, আমার কর্মীরা যে পথ নির্মাণ করিয়াছেন তাহাতে তোমার জীবনযাত্রা অব্যাহত হইবে। এই শিশু কিছুই না জানিয়া আজ একটি মহৎ অধিকার লাভ করিল—অদ্যকার এই শুভদিনটি তাহার সমস্ত জীবনে চিরদিন সার্থক হইয়া উঠিতে থাক্।

অদ্য আমরা ইহাই অনুভব করিতেছি মানুষের জন্মক্ষেত্র কেবল একটিমাত্র নহে, তাহা কেবল প্রকৃতির ক্ষেত্র নহে, তাহা মঙ্গলের ক্ষেত্র। তাহা কেবল জীবলোক নহে তাহা স্নেহলোক, তাহা আনন্দলোক। প্রকৃতির ক্ষেত্রটিকে চোখে দেখিতে পাই, তাহা জলেস্থলে ফলেফুলে সর্বত্রই প্রত্যক্ষ—অথচ তাহাই মানুষের সর্বাপেক্ষা সত্য আশ্রয় নহে। যে জ্ঞান, যে প্রেম, যে কল্যাণ অদৃশ্য হইয়া আপনার বিপুল সৃষ্টিকে বিস্তার করিয়া চলিয়াছে—সেই জ্ঞানপ্রেম-কল্যাণের চিন্ময় আনন্দময় জগৎই মানুষের যথার্থ জগৎ। এই জগতের মধ্যেই মানুষ যথার্থ জন্মলাভ করে বলিয়াই সে একটি আশ্চর্য সত্তাকে আপনার পিতা বলিয়া অনুভব করিয়াছে, যে সত্তা অনির্বচনীয়। এমন একটি সত্যকেই পরম সত্য বলিয়াছে যাহাকে চিন্তা করিতে গিয়া মন ফিরিয়া আসে। এইজন্যই এই শিশুর জন্মদিনে মানুষ জলস্থলঅগ্নিবায়ুর কাছে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে নাই, জলস্থলঅগ্নিবায়ুর অন্তরে শক্তিরূপে যিনি অদৃশ্য বিরাজমান, তাঁহাকেই প্রণাম করিয়াছে। সেইজন্যই আজ এই শিশুর নামকরণের দিনে মানুষ মানবসমাজকে অর্ঘ্য সাজাইয়া পূজা করে নাই কিন্তু যিনি মানবসমাজের অন্তরে প্রীতিরূপে কল্যাণরূপে অধিষ্ঠিত তাঁহারই আশীর্বাদ সে প্রার্থনা করিতেছে। বড়ো আশ্চর্য মানুষের এই উপলব্ধি এই পূজা, বড়ো আশ্চর্য মানুষের এই অধ্যাত্মলোকে জন্ম, বড়ো আশ্চর্য মানুষের এই দৃশ্য জগতের অন্তর্বর্তী অদৃশ্য নিকেতন। মানুষের ক্ষুধাতৃষ্ণা আশ্চর্য নহে, মানুষের ধনমান লইয়া কাড়াকাড়ি আশ্চর্য নহে, কিন্তু বড়ো আশ্চর্য—জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের পর্বে পর্বে মানুষের সেই অদৃশ্যকে পূজ্য বলিয়া প্রণাম, সেই অনন্তকে আপন বলিয়া আহ্বান। অদ্য এই শিশুটিকে নাম দিবার বেলায় মানুষ সকল নামরূপের আধার ও সকল নাম-রূপের অতীতকে আপনার এই নিতান্ত ঘরের কাজে এমন করিয়া আমন্ত্রণ করিতে ভরসা পাইল ইহাতেই মানুষ সমস্ত জীবসমাজের মধ্যে কৃতকৃতার্থ হইল,—ধন্য হইল এই কন্যাটি, এবং ধন্য হইলাম আমরা।

১৩১৮

ধর্মের নবযুগ

সংসারের ব্যবহারে প্রতিদিন আমরা ছোটো ছোটো সীমার মধ্যে আপনাকে রুদ্ধ করিয়া থাকি। এমন অবস্থায় মানুষ স্বার্থপরভাবে কাজ করে, গ্রাম্যভাবে চিন্তা করে, ও সংকীর্ণ সংস্কারের অনুসরণ করিয়া অত্যন্ত অনুদারভাবে নিজের রাগদ্বেষকে প্রচার করে। এইজন্যই দিনের মধ্যে অন্তত একবার করিয়াও নিজেকে অসীমের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেখিবার উপদেশ আছে। অন্তত একবার করিয়াও এ কথা বুঝিতে হইবে যে কোনো ভৌগোলিক ভূমিখণ্ডেই আমার চিরকালের দেশ নহে, সমস্ত ভূর্ভুবঃ স্বঃ আমার বিরাট আশ্রয়; অন্তত একবার করিয়াও অন্তরের মধ্যে এই কথাটিকে ধ্যান করিয়া লইতে হইবে যে, আমার ধীশক্তি আমার চৈতন্য কোনো একটা কলের জিনিসের মতো আমার মধ্যেই উৎপন্ন ও আমার মধ্যেই বদ্ধ নহে, জগদ্ব্যাপী ও জগতের অতীত অনন্ত চৈতন্য হইতেই তাহা প্রতিমুহূর্তে আমার মধ্যে বিকীর্ণ হইতেছে।

এইরূপে নিজেকে যেমন সমস্ত আবরণ হইতে মুক্তি দিয়া সত্য করিয়া দেখিতে হইবে নিজের ধর্মকেও তেমনি করিয়া তাহার সত্য আধারের মধ্যে দেখিবার সাধনা করা চাই। আমাদের ধর্মকেও যখন সংসারে আমরা প্রতিদিন ব্যবহার করিতে থাকি তখন কেবলই তাহাকে নিজের নানাপ্রকার ক্ষুদ্রতার দ্বারা বিজড়িত করিয়া ফেলি। মুখে যাহাই বলি না কেন, ভিতরে ভিতরে তাহাকে আমাদের সমাজের ধর্ম আমাদের সম্প্রদায়ের ধর্ম করিয়া ফেলি। সেই ধর্মসম্বন্ধে আমাদের সমস্ত চিন্তা সাম্প্রদায়িক সংস্কারের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া উঠে। অন্যান্য বৈষয়িক ব্যাপারের ন্যায় আমাদের ধর্ম, আমাদের আত্মাভিমান বা দলীয় অভিমানের উপলক্ষ্য হইয়া পড়ে; ভেদবুদ্ধি নানাপ্রকার ছদ্মবেশ ধরিয়া জাগিতে থাকে; এবং আমরা নিজের ধর্মকে লইয়া অন্যান্য দলের সহিত প্রতিযোগিতার উত্তেজনায় হারজিতের ঘোড়দৌড় খেলিয়া থাকি। এই সমস্ত ক্ষুদ্রতা যে আমাদেরই স্বভাব, তাহা যে আমাদের ধর্মের স্বভাব নহে সে কথা আমরা ক্রমে ক্রমে ভুলিয়া যাই এবং একদিন আমাদের ধর্মের উপরেই আমাদের নিজের সংকীর্ণতা আরোপ করিয়া তাহাই লইয়া গৌরব করিতে লজ্জা বোধ করি না।

এইজন্যই আমাদের ধর্মকে অন্তত বৎসরের মধ্যে একদিনও আমাদের স্বরচিত সমাজের বেষ্টন হইতে মুক্তি দিয়া সমস্ত মানুষের মধ্যে তাহার নিত্য প্রতিষ্ঠায় তাহার সত্য আশ্রয়ে প্রত্যক্ষ করিয়া দেখিতে হইবে; দেখিতে হইবে, সকল মানুষের মধ্যেই তাহার সামঞ্জস্য আছে কিনা, কোথাও তাহার বাধা আছে কিনা—বুঝিতে হইবে তাহা সেই পরিমাণেই সত্য যে পরিমাণে তাহা সকল মানুষেরই।

কিছুকাল হইতে মানুষের সভ্যতার মধ্যে একটা খুব বড়ো রকমের পরিবর্তন দেখা দিতেছে—তাহার মধ্যে সমুদ্র হইতে যেন একটা জোয়ার আসিয়াছে। একদিন ছিল যখন প্রত্যেক জাতিই ন্যূনাধিক পরিমাণে আপনার গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া বসিয়া ছিল। নিজের সঙ্গে সমস্ত মানবেরই যে একটা গূঢ়গভীর যোগ আছে ইহা সে বুঝিতই না। সমস্ত মানুষকে জানার ভিতর দিয়াই যে নিজেকে সত্য করিয়া জানা যায় একথা সে স্বীকার করিতেই পারিত না। সে এই কথা মনে করিয়া নিজের চৌকিতে খাড়া হইয়া মাথা তুলিয়া বসিয়াছিল যে, তাহার জাতি, তাহার সমাজ, তাহার ধর্ম যেন ঈশ্বরের বিশেষ সৃষ্টি এবং চরম সৃষ্টি—অন্য জাতি, ধর্ম, সমাজের সঙ্গে তাহার মিল নাই এবং মিল থাকিতেই পারে না। স্বধর্মে এবং পরধর্মে যেন একটা অটল অলঙ্ঘ্য ব্যবধান।

এদিকে তখন বিজ্ঞান বাহিরের বিষয়ে আমাদের জ্ঞানের বেড়া ভাঙিয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই একটা মস্ত ভুল সে আমাদের একে একে ঘুচাইতে লাগিল যে, জগতে কোনো বস্তুই নিজের বিশেষত্বের ঘেরের মধ্যে একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া নাই। বাহিরে তাহার বিশেষত্ব আমরা যেমনই দেখি না কেন, কতকগুলি গূঢ় নিয়মের ঐক্য-জালে সে ব্রহ্মাণ্ডের দূরতম অণু-পরমাণুর সহিত নাড়ির বাঁধনে বাঁধা। এই বৃহৎ বিশ্বগোষ্ঠীর গোপন কুলজিখানি সন্ধান করিয়া দেখিতে গেলে তখনই ধরা পড়িয়া যায় যে যিনি আপনাকে যত বড়ো কুলীন বলিয়াই মনে করুন না কেন গোত্র সকলেরই এক। এইজন্য বিশ্বের কোনো একটি কিছুর তত্ত্ব সত্য করিয়া জানিতে গেলে সবকটির সঙ্গে তাহাকে বাজাইয়া দেখিতে হয়। বিজ্ঞান সেই উপায় ধরিয়া সত্যের পরখ করিতে লাগিয়া গেছে।

কিন্তু ভেদবুদ্ধি সহজে মরিতে চায় না। কেননা জন্মকাল হইতে আমরা ভেদটাকেই চোখে দেখিতেছি, সেইটেই আমাদের বুদ্ধির সকলের চেয়ে পুরাতন অভ্যাস। তাই মানুষ বলিতে লাগিল জড়পর্যায়ে যেমনই হ'ক না কেন, জীবপর্যায়ে বিজ্ঞানের ঐক্যতত্ত্ব খাটে না; পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন জীবের ভিন্ন ভিন্ন বংশ; এবং মানুষ, আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত, সকল জীব হইতে একেবারেই পৃথক। কিন্তু বিজ্ঞান এই অভিমানের সীমানাটুকুকেও বজায় রাখিতে দিল না; জীবের সঙ্গে জীবের কোথাও বা নিকট কোথাও বা দূর কুটুম্বিতার সম্পর্ক আছে এ সংবাদটিও প্রকাশ হইয়া পড়িল।

এদিকে মানবসমাজে যাহারা পরস্পরকে একেবারে নিঃসম্পর্ক বলিয়া সমুদ্রের ভিন্ন ভিন্ন পারে স্বতন্ত্র হইয়া বসিয়া ছিল, ভাষাতত্ত্বের স্তরে স্তরে তাহাদের পুরাতন সম্বন্ধ উদ্‌ঘাটিত হইতে আরম্ভ হইল। তাহাদের ধর্ম ও সামাজিক ইতিহাসের নানা শাখা

প্রশাখায় উজান বাহিয়া মানুষের সন্ধান অবশেষে এক দূর গঙ্গোত্রীতে এক মূল প্রস্রবণের কাছে উপনীত হইতে লাগিল।

এইরূপে জড়ে জীবে সর্বত্রই একের সঙ্গে আরের যোগ এমনি সুদূরবিস্তৃত এমনি বিচিত্র করিয়া প্রত্যহ প্রকাশ হইতেছে; যেখানেই সেই যোগের সীমা আমরা স্থাপন করিতেছি সেইখানেই সেই সীমা এমন করিয়া লুপ্ত হইয়া যাইতেছে যে, মানুষের সকল জ্ঞানকেই আজ পরস্পর তুলনার দ্বারা তৌল-করিয়া দেখিবার উদ্‌যোগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। দেহগঠনের তুলনা, ভাষার তুলনা, সমাজের তুলনা, ধর্মের তুলনা,— সমস্তই তুলনা।- সত্যের বিচারসভায় আজ জগৎ জুড়িয়া সাক্ষীর তলব পড়িয়াছে; আজ একের সংবাদ আরের মুখে না পাইলে প্রমাণ সংশয়াপন্ন হইতেছে; নিজের পক্ষের কথা একমাত্র যে নিজের জবানিতেই বলে, যে বলে আমার শাস্ত্র আমার মধ্যেই, আমার তত্ত্ব আমাতেই পরিসমাপ্ত, আমি আর কারও ধার ধারি না— তৎক্ষণাৎ তাহাকে অবিশ্বাস করিতে কেহ মুহূর্তকাল দ্বিধা করে না।

তবেই দেখা যাইতেছে মানুষ যেদিকটাতে অতি দীর্ঘকাল বাঁধা ছিল আজ যেন একেবারে তাহার বিপরীত দিকে আসিয়া পড়িয়াছে। এতদিন সে নিশ্চয় জানিত যে, সে খাঁচার পাখি, আজ জানিতে পারিয়াছে সে আকাশের পাখি। এতকাল তাহার চিন্তা, ভাব ও জীবনযাত্রার সমস্ত ব্যবস্থাই ওই খাঁচার লৌহশলাকাগুলার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই রচিত হইয়াছিল। আজ তাহা লইয়া আর কাজ চলে না। সেই আগেকার মতো ভাবিতে গেলে সেই রকম করিয়া কাজ করিতে বসিলে সে আর সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পায় না। অথচ অনেক দিনের অভ্যাস অস্থিমজ্জায় গাঁথা হইয়া রহিয়াছে। সেইজন্যই মানুষের মনকে ও ব্যবহারকে আজ বহুতর অসংগতি অত্যন্ত পীড়া দিতেছে। পুরাতনের আসবাবগুলা আজ তাহার পক্ষে বিষম বোঝা হইয়া উঠিয়াছে, অথচ এত দিন তাহাকে এত মূল্য দিয়া আসিয়াছে যে তাহাকে ফেলিতে মন সরিতেছে না; সেগুলা যে অনাবশ্যক নহে, তাহারা যে চিরকালই সমান মূল্যবান এই কথাই প্রাণপণে নানাপ্রকার সুযুক্তি ও কুযুক্তির দ্বারা সে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছে।

যতদিন খাঁচায় ছিল ততদিন সে দৃঢ়রূপেই জানিত তাহার বাসা চিরকালের জন্যই কোনো এক বুদ্ধিমান পুরুষ বহুকাল হইল বাঁধিয়া দিয়াছে; আর কোনো প্রকার বাসা একেবারে হইতে পারে না, নিজের শক্তিতে তো নহেই;—সে জানিত তাহার প্রতিদিনের খাদ্য-পানীয় কোনো একজন বুদ্ধিমান পুরুষ চিরকালের জন্য বরাদ্দ করিয়া দিয়াছে, অন্য আর কোনো প্রকার খাদ্য সম্ভবপরই নহে, বিশেষত নিজের চেষ্টায় স্বাধীনভাবে অন্নপানের সন্ধানের মতো নিষিদ্ধ তাহার পক্ষে আর কিছুই নাই। এই নির্দিষ্ট

খাঁচার মধ্য দিয়া যেটুকু আকাশ দেখা যাইতেছে তাহার বাহিরেও যে বিধাতার সৃষ্টি আছে একথা একেবারেই অশ্রদ্ধেয় এবং সীমাকে লঙ্ঘন করার চেষ্টামাত্রই গুরুতর অপরাধ।

আধুনিক পৃথিবীতে সেই পুরাতন ধর্মের সহিত নূতন বোধের বিরোধ খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সে এমন একটি ধর্মকে চাহিতেছে যাহা কোনো একটি বিশেষ জাতির বিশেষ কালের বিশেষ ধর্ম নহে; যাহাকে কতকগুলি বাহ্য পূজাপদ্ধতির দ্বারা বিশেষ রূপের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলা হয় নাই; মানুষের চিত্ত যতদূরই প্রসারিত হউক যে ধর্ম কোনো দিকেই তাহাকে বাধা দিবে না, বরঞ্চ সকল দিকেই তাহাকে মহানের দিকে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিবে। মানুষের জ্ঞান আজ যে মুক্তির ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সেইখানকার উপযোগী হৃদয়বোধকে এবং ধর্মকে না পাইলে তাহার জীবন সংগীতের সুর মিলিবে না, এবং কেবলই তাল কাটিতে থাকিবে।

আজ মানুষের জ্ঞানের সম্মুখে সমস্ত কাল জুড়িয়া, সমস্ত আকাশ জুড়িয়া একটি চিরধাবমান মহাযাত্রার লীলা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে—সমস্তই চলিতেছে সমস্তই কেবল উন্মেষিত হইয়া উঠিতেছে। প্রকাশ কোনো জায়গাতেই স্থির হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে নাই, এক মুহূর্ত তাহার বিরাম নাই; অপরিস্ফুটতা হইতে পরিস্ফুটতার অভিমুখে কেবলই সে আপনার অগণ্য পাপড়িকে একটি একটি করিয়া খুলিয়া দিকে দিকে প্রসারিত করিয়া দিতেছে। এই পরমাশ্চর্য নিত্যবহমান প্রকাশব্যাপারে মানুষ যে কবে বাহির হইল তাহা কে জানে—সে যে কোন্ বাষ্পসমুদ্র পার হইয়া কোন্ প্রাণরহস্যের উপকূলে আসিয়া উত্তীর্ণ হইল তাহার ঠিকানা নাই। যুগে যুগে বন্দরে বন্দরে তাহার তরী লাগিয়াছিল, সে কেবলই আপনার পণ্যের মূল্য বাড়াইয়া অগ্রসর হইয়াছে; কেবলই "শঙ্খের বদলে মুকুতা," স্থূলের বদলে সূক্ষ্মটিকে সংগ্রহ করিয়া ধনপতি হইয়া উঠিয়াছে এ সংবাদ আজ আর তাহার অগোচর নাই। এইজন্য যাত্রার গানই আজ তাহার গান, এইজন্য সমুদ্রের আনন্দই আজ তাহার মনকে উৎসুক করিয়া তুলিয়াছে। একথা আজ সে কোনোমতেই মনে করিতে পারিতেছে না যে, নোঙরের শিকলে মরিচা পড়াইয়া হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া চুপ করিয়া কূলে পড়িয়া থাকাই তাহার সনাতন সত্যধর্ম! বাতাস আজ তাহাকে উতলা করিতেছে, বলিতেছে, ওরে মহাকালের যাত্রী, সবকটা পাল তুলিয়া দে,—ধ্রুব নক্ষত্র আজ তাহার চোখের সম্মুখে জ্যোতির্ময় তর্জনী তুলিয়াছে, বলিতেছে, ওরে দ্বিধাকাতর, ভয় নাই অগ্রসর হইতে থাক্। আজ পৃথিবীর মানুষ সেই কর্ণধারকেই ডাকিতেছে—যিনি তাঁহার পুরাতন গুরুভার নোঙরটাকে গভীর পঙ্কতল হইতে তুলিয়া আনন্দচঞ্চল তরঙ্গের পথে হাল ধরিয়া বসিবেন।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে এই বাংলাদেশে আজ প্রায় শতবৎসর পূর্বে রামমোহন রায় পৃথিবীর সেই বাধামুক্ত ধর্মের পালটাকেই ঈশ্বরের প্রসাদবায়ুর সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া ধরিয়াছেন। ইহাও আশ্চর্যের বিষয় যে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগ, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের ঐক্য, তখন পৃথিবীর অন্য কোথাও মানবের মনে পরিস্ফুট হইয়া প্রকাশ পায় নাই। সেদিন রামমোহন রায় যেন সমস্ত পৃথিবীর বেদনাকে হৃদয়ে লইয়া পৃথিবীর ধর্মকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিলেন।

তিনি যে সময়ে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন এদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম আচ্ছন্ন হইয়াছিল। তিনি মূর্তিপূজার মধ্যেই জন্মিয়াছিলেন এবং তাহারই মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু এই বহুকালব্যাপী সংস্কার ও দেশব্যাপী অভ্যাসের নিবিড়তার মধ্যে থাকিয়াও এই বিপুল এবং প্রবল এবং প্রাচীন সমাজের মধ্যে কেবল একলা রামমোহন মূর্তিপূজাকে কোনোমতেই স্বীকার করিতে পারিলেন না। তাহার কারণ এই, তিনি আপনার হৃদয়ের মধ্যে বিশ্বমানবের হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মূর্তিপূজা সেই অবস্থারই পূজা যে অবস্থায় মানুষ বিশেষ দেশকে বিশেষ জাতিকে বিশেষ বিধিনিষেধসকলকে বিশ্বের সহিত অত্যন্ত পৃথক করিয়া দেখে;—যখন সে বলে যাহাতে আমারই বিশেষ দীক্ষা তাহাতে আমারই বিশেষ মঙ্গল; যখন সে বলে আমার এই সমস্ত বিশেষ শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে বাহিরের আর কাহারও প্রবেশ করিয়া ফল নাই এবং প্রবেশ করিতে দিবই না। "তবে বাহিরের লোকের কী গতি হইবে" এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে মানুষ উত্তর দেয় পুরাকাল ধরিয়া সেই বাহিরের লোকের যে বিশেষ শিক্ষাদীক্ষা চলিয়া আসিতেছে তাহাতেই অচলভাবে আবদ্ধ থাকিলেই তাহার পক্ষে শ্রেয়; অর্থাৎ যে সময়ে মানুষের মনের এইরূপ বিশ্বাস যে, বিদ্যায় মানুষের সর্বত্র অধিকার, বাণিজ্যে মানুষের সর্বত্র অধিকার, কেবলমাত্র ধর্মেই মানুষ এমনি চিরন্তনরূপে বিভক্ত যে সেখানে পরস্পরের মধ্যে যাতায়াতের কোনো পথ নাই; সেখানে মানুষের ভক্তির আশ্রয় পৃথক, মানুষের মুক্তির পথ পৃথক, পূজার মন্ত্র পৃথক; আর সর্বত্রই স্বভাবের আকর্ষণেই হউক আর প্রবলের শাসনের দ্বারাই হউক মানুষের এক হইয়া মিলিবার আশা আছে, উপায় আছে; এমন কি নানাজাতির লোক পাশাপাশি দাঁড়াইয়া যুদ্ধের নাম করিয়া নিদারুণ নরহত্যার ব্যাপারেও গৌরবের সহিত সম্মিলিত হইতে পারে, কেবলমাত্র ধর্মের ক্ষেত্রেই মানুষ দেশবিদেশ স্বজাতি বিজাতি ভুলিয়া আপন পূজাসনের পার্শ্বে পরস্পরকে আহ্বান করিতে পারিবে না। বস্তুত মূর্তিপূজা সেইরূপ কালেরই পূজা—যখন মানুষ বিশ্বের পরমদেবতাকে একটি কোনো বিশেষ রূপে একটি কোনো বিশেষ স্থানে আবদ্ধ করিয়া তাহাকেই বিশেষ মহাপুণ্যফলের আকর বলিয়া নির্দেশ

করিয়াছে অথচ সেই মহাপুণ্যের দ্বারকে সমস্ত মানুষের কাছে উন্মুক্ত করে নাই, সেখানে বিশেষ সমাজে জন্মগ্রহণ ছাড়া প্রবেশের অন্য কোনো উপায় রাখা হয় নাই; মূর্তিপূজা সেই সময়েরই—যখন পাঁচসাত ক্রোশ দূরের লোক বিদেশী, পরদেশের লোক ম্লেচ্ছ, পরসমাজের লোক অশুচি, এবং নিজের দলের লোক ছাড়া আর সকলেই অনধিকারী—এক কথায় যখন ধর্ম আপন ঈশ্বরকে সংকুচিত করিয়া সমস্ত মানুষকে সংকুচিত করিয়াছে এবং জগতে যাহা সকলের চেয়ে বিশ্বজনীন তাহাকে সকলের চেয়ে গ্রাম্য করিয়া ফেলিয়াছে। সংস্কার যতই সংকীর্ণ হয় তাহা মানুষকে ততই আঁট করিয়া ধরে, তাহাকে ত্যাগ করিয়া বাহির হওয়া ততই অত্যন্ত কঠিন হয়;—যাহারা অলংকারকে নিরতিশয় পিনদ্ধ করিয়া পরে তাহাদের এই অলংকার ইহজন্মে তাহারা আর বর্জন করিতে পারে না, সে তাহাদের দেহচর্মের মধ্যে একেবারে কাটিয়া বসিয়া যায়। সেইরূপ ধর্মের সংস্কারকে সংকীর্ণ করিলে তাহা চিরশৃঙ্খলের মতো মানুষকে চাপিয়া ধরে,—মানুষের সমস্ত আয়তন যখন বাড়িতেছে তখন সেই ধর্ম আর বাড়ে না, রক্তচলাচলকে বন্ধ করিয়া অঙ্গকে সে কৃশ করিয়াই রাখিয়া দেয়, মৃত্যু পর্যন্ত তাহার হাত হইতে নিস্তার পাওয়াই কঠিন হয়। সেই অতি কঠিন সংকীর্ণ ধর্মের প্রাচীন বন্ধনকে রামমোহন রায় যে কোনোমতেই আপনার আশ্রয় বলিয়া কল্পনা করিতে পারেন নাই তাহার কারণ এই যে, তিনি সহজেই বুঝিয়াছিলেন, যে সত্যের ক্ষুধায় মানুষ ধর্মকে প্রার্থনা করে সে সত্য ব্যক্তিগত নহে, জাতিগত নহে, তাহা সর্বগত। তিনি বাল্যকাল হইতেই অনুভব করিয়াছিলেন যে, যে দেবতা সর্বদেশে সর্বকালে সকল মানুষের দেবতা না হইতে পারেন, অর্থাৎ যিনি আমার কল্পনাকে তৃপ্ত করেন অন্যের কল্পনাকে বাধা দেন, যিনি আমার অভ্যাসকে আকর্ষণ করেন অন্যের অভ্যাসকে পীড়িত করেন তিনি আমারও দেবতা হইতে পারেন না, কারণ সকল মানুষের সঙ্গে যোগ কোনোখানে বিচ্ছিন্ন করিয়া মানুষের পক্ষে পূর্ণ সত্য হওয়া একেবারেই সম্ভব হয় না এবং এই পূর্ণ সত্যই ধর্মের সত্য।

আমাদের একটি পরম সৌভাগ্য এই ছিল যে, মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্মের মহোচ্চ আদর্শ একদিকে আমাদের দেশে যেমন বাধাগ্রস্ত হইয়াছিল তেমনি আর একদিকে তাহাকে উপলব্ধি করিবার সুযোগ আমাদের দেশে যেমন সহজ হইয়াছিল জগতের আর কোথাও তেমন ছিল না। একদিন আমাদের দেশে সাধকেরা ব্রহ্মকে যেমন আশ্চর্য উদার করিয়া দেখিয়াছিলেন এমন আর কোনো দেশেই দেখে নাই। তাঁহাদের সেই ব্রহ্মোপলব্ধি একেবারে মধ্যাহ্নগগনের সূর্যের মতো অত্যুজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল, দেশকালপাত্রগত সংস্কারের লেশমাত্র বাষ্প তাহাকে কোথাও স্পর্শ করে নাই। সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম যিনি, তাঁহারই মধ্যে মানবচিত্তের এরূপ পরিপূর্ণ আনন্দময় মুক্তির

বার্তা এমন সুগভীর রহস্যময় বাণীতে অথচ এমন শিশুর মতো অকৃত্রিম সরল ভাষায় উপনিষদ্‌ ছাড়া আর কোথায় ব্যক্ত হইয়াছে? আজ মানুষের বিজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান যতদূরই অগ্রসর হইতেছে, সেই সনাতন ব্রহ্মোপলব্ধির মধ্যে তাহার অন্তরে বাহিরে কোনো বাধাই পাইতেছে না। তাহা মানুষের সমস্ত জ্ঞানভক্তিকর্মকে পূর্ণ সামঞ্জস্যের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে, কোথাও তাহাকে পীড়িত করে না, সমস্তকেই সে উত্তরোত্তর ভূমার দিকেই আকর্ষণ করিতে থাকে, কোথাও তাহাকে কোনো সাময়িক সংকোচের দোহাই দিয়া মাথা হেঁট করিতে বলে না।

কিন্তু এই ব্রহ্ম তো কেবল জ্ঞানের ব্রহ্ম নহেন—রসো বৈ সঃ—তিনি আনন্দরূপং অমৃতরূপং। ব্রহ্মই যে রসস্বরূপ, এবং—এষোঽস্য পরম আনন্দঃ—ইনিই আত্মার পরম আনন্দ, আমাদের দেশের সেই চিরলব্ধ সত্যটিকে যদি এই নূতন যুগে নূতন করিয়া সপ্রমাণ করিতে না পারি তবে ব্রহ্মজ্ঞানকে তো আমরা ধর্ম বলিয়া মানুষের হাতে দিতে পারিব না—ব্রহ্মজ্ঞানী তো ব্রহ্মের ভক্ত নহেন। রস ছাড়া তো আর কিছুই মিলাইতে পারে না ভক্তি ছাড়া তো আর কিছুই বাঁধিতে পারে না। জীবনে যখন আত্মবিরোধ ঘটে, যখন হৃদয়ের এক তারের সঙ্গে আর এক তারের অসামঞ্জস্যের বেসুর কর্কশ হইয়া উঠে তখন কেবলমাত্র বুঝাইয়া কোনো ফল পাওয়া যায় না—মজাইয়া দিতে না পারিলে দ্বন্দ্ব মিটে না।

ব্রহ্ম যে সত্যস্বরূপ তাহা যেমন বিশ্বসত্যের মধ্যে জানি, তিনি যে জ্ঞানস্বরূপ তাহা যেমন আত্মজ্ঞানের মধ্যে বুঝিতে পারি, তেমনি তিনি যে রসস্বরূপ তাহা কেবলমাত্র ভক্তের আনন্দের মধ্যেই দেখিতে পাই। ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাসে সে দেখা আমরা দেখিয়াছি এবং সে দেখা আমাদিগকে দেখাইয়া চলিতে হইবে।

ব্রাহ্মসমাজে আমরা একদিন দেখিয়াছি ঐশ্বর্যের আড়ম্বরের মধ্যে, পূজার্চনা ক্রিয়া-কর্মের মহাসমারোহের মাঝখানে বিলাসলালিত তরুণ যুবকের মন ব্রহ্মের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

তাহার পরে দেখিয়াছি সেই ব্রহ্মের আনন্দেই সাংসারিক ক্ষতি-বিপদকে তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই, আত্মীয়স্বজনের বিচ্ছেদ ও সমাজের বিরোধকে ভয় করেন নাই; দেখিয়াছি চিরদিনই তিনি তাঁহার জীবনের চিরবরণীয় দেবতার এই অপরূপ বিশ্বমন্দিরের প্রাঙ্গণতলে তাঁহার মস্তককে নত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং তাঁহার আয়ুর অবসানকাল-পর্যন্ত তাঁহার প্রিয়তমের বিকশিত আনন্দকুঞ্জচ্ছায়ায় বুলবুলের মতো প্রহরে প্রহরে গান করিয়া কাটাইয়াছেন।

এমনি করিয়াই তো আমাদের নবযুগের ধর্মের রসস্বরূপকে আমরা নিশ্চিত সত্য

করিয়া দেখিতেছি। কোনো বাহ্যমূর্তিতে নহে, কোনো ক্ষণকালীন কল্পনায় নহে— একেবারে মানুষের অন্তরতম আত্মার মধ্যেই সেই আনন্দরূপকে অমৃতরূপকে অখণ্ড করিয়া অসন্দিগ্ধ করিয়া দেখিতেছি।

বস্তুত পরমাত্মাকে এই আত্মার মধ্যে দেখার জন্যই মানুষের চিত্ত অপেক্ষা করিতেছে। কেননা আত্মার সঙ্গেই আত্মার স্বাভাবিক যোগ সকলের চেয়ে সত্য; সেইখানেই মানুষের গভীরতম মিল। আর সর্বত্র নানাপ্রকার বাধা। বাহিরের অচারবিচারঅনুষ্ঠান কল্পনাকাহিনীতে পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যের অন্ত নাই; কিন্তু মানুষের আত্মায় আত্মায় এক হইয়া আছে—সেইখানেই যখন পরমাত্মাকে দেখি তখন সমস্ত মানবাত্মার মধ্যে তাঁহাকে দেখি, কোনো বিশেষ জাতিকুল-সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখি না।

সেইজন্যই আজ উৎসবের দিনে সেই রসস্বরূপের নিকট আমাদের যে প্রার্থনা তাহা ব্যক্তিগত প্রার্থনা নহে, তাহা আমাদের আত্মার প্রার্থনা, অর্থাৎ তাহা একই কালে সমস্ত মানবাত্মার প্রার্থনা। হে বিশ্বমানবের দেবতা, হে বিশ্বসমাজের বিধাতা, একথা যেন আমরা একদিনের জন্যও না ভুলি যে, আমার পূজা সমস্ত মানুষের পূজারই অঙ্গ, আমার হৃদয়ের নৈবেদ্য সমস্ত মানবহৃদয়ের নৈবেদ্যেরই একটি অর্ঘ্য। হে অন্তর্যামী, আমার অন্তরের বাহিরের, আমার গোচর অগোচর যত কিছু পাপ যত কিছু অপরাধ এই কারণেই অসহ্য যে আমি তাহার দ্বারা সমস্ত মানুষকেই বঞ্চনা করিতেছি, আমার সে সকল বন্ধন সমস্ত মানুষেরই মুক্তির অন্তরায়, আমার নিজের নিজত্বের চেয়ে যে বড়ো মহত্ত্ব আমার উপর তুমি অর্পণ করিয়াছ আমার সমস্ত পাপ তাহাকেই স্পর্শ করিতেছে; এইজন্যই পাপ এত নিদারুণ, এত ঘৃণ্য; তাহাকে আমরা যত গোপনই করি তাহা গোপনের নহে, কোন্ একটি সুগভীর যোগের ভিতর দিয়া তাহা সমস্ত মানুষকে গিয়া আঘাত করিতেছে, সমস্ত মানুষের তপস্যাকেই ম্লান করিয়া দিতেছে। হে ধর্মরাজ, নিজের যতটুকু সাধ্য তাহার দ্বারা সর্বমানবের ধর্মকে উজ্জ্বল করিতে হইবে, বন্ধনকে মোচন করিতে হইবে, সংশয়কে দূর করিতে হইবে। মানবের অন্তরাত্মার অন্তর্গূঢ় এই চির-সংকল্পটিকে তুমি বীর্যের দ্বারা প্রবল করো, পুণ্যের দ্বারা নির্মল করো, তাহার চারিদিক হইতে সমস্ত ভয়সংকোচের জাল ছিন্ন করিয়া দাও, তাহার সম্মুখ হইতে সমস্ত স্বার্থের বিঘ্ন ভগ্ন করিয়া দাও। এ যুগ, সমস্ত মানুষে মানুষে কাঁধে কাঁধে মিলাইয়া হাতে হাতে ধরিয়া, যাত্রা করিবার যুগ। তোমার হুকুম আসিয়াছে চলিতে হইবে। আর একটুও বিলম্ব না। অনেক দিন মানুষের ধর্মবোধ নানা বন্ধনে বদ্ধ হইয়া নিশ্চল হইয়া পড়িয়া ছিল। সেই ঘোর নিশ্চলতার রাত্রি আজ প্রভাত হইয়াছে। তাই আজ দশদিকে তোমার

আহ্বানভেরী বাজিয়া উঠিল। অনেক দিন বাতাস এমনি স্তব্ধ হইয়া ছিল যে মনে হইয়াছিল সমস্ত আকাশ যেন মূর্ছিত; গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ে নাই, ঘাসের আগাটি পর্যন্ত কাঁপে নাই;—আজ ঝড় আসিয়া পড়িল; আজ শুষ্ক পাতা উড়িবে, আজ সঞ্চিত ধূলি দূর হইয়া যাইবে। আজ অনেকদিনের অনেক প্রিয়বন্ধনপাশ ছিন্ন হইবে সেজন্য মন কুণ্ঠিত না হউক। ঘরের, সমাজের, দেশের যে সমস্ত বেড়া-আড়ালগুলাকেই মুক্তির চেয়ে বেশি আপন বলিয়া তাহাদিগকে লইয়া অহংকার করিয়া আসিয়াছি সে সমস্তকে ঝড়ের মুখের খড়কুটার মতো শূন্যে বিসর্জন দিতে হইবে সেজন্য মন প্রস্তুত হউক! সত্যের ছদ্মবেশপরা প্রবল অসত্যের সঙ্গে, ধর্মের উপাধিধারী প্রাচীন অমঙ্গলের সঙ্গে আজ লড়াই করিতে হইবে সেজন্য মনের সমস্ত শক্তি পূর্ণবেগে জাগ্রত হউক! আজ বেদনার দিন আসিল, কেননা আজ চেতনার দিন,—সেজন্য আজ কাপুরুষের মতো নিরানন্দ হইলে চলিবে না; আজ ত্যাগের দিন আসিল, কেননা আজ চলিবার দিন, আজ কেবলই পিছনের দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকিলে দিন বহিয়া যাইবে আজ কৃপণের মতো রুদ্ধ সঞ্চয়ের উপর বুক দিয়া পড়িয়া থাকিলে ঐশ্বর্যের অধিকার হারাইতে থাকিব। ভীরু, আজ লোকভয়কেই ধর্মভয়ের স্থানে যদি বরণ কর তবে এমন মহাদিন ব্যর্থ হইবে;—আজ নিন্দাকেই ভূষণ, আজ অপ্রিয়কেই প্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে। আজ অনেক খসিবে, ঝরিবে, ভাঙিবে, ক্ষয় হইয়া যাইবে;—নিশ্চয় মনে করিয়াছিলাম যেদিকে পর্দা সেদিকে হঠাৎ আলোক প্রকাশ হইবে; নিশ্চয় মনে করিয়াছিলাম যেদিকে প্রাচীর সেদিকে হঠাৎ পথ বাহির হইয়া পড়িবে। হে যুগান্তবিধাতা, আজ তোমার প্রলয়-লীলায় ক্ষণে ক্ষণে দিগন্তপট বিদীর্ণ করিয়া কতই অভাবনীয় প্রকাশ হইতে থাকিবে, বীর্যবান আনন্দের সহিত আমরা তাহার প্রতীক্ষা করিব;—মানুষের চিত্তসাগরের অতলস্পর্শ রহস্য আজ উন্মথিত হইয়া জ্ঞানে কর্মে ত্যাগে ধর্মে কত কত অত্যাশ্চর্য অজেয় শক্তি প্রকাশমান হইয়া উঠিবে, তাহাকে জয়শঙ্খধ্বনির সঙ্গে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য আমাদের সমস্ত দ্বারবাতায়ন অসংকোচে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিব। হে অনন্তশক্তি, আমাদের হিসাব তোমার হিসাব নহে,—তুমি অক্ষমকে সক্ষম কর, অচলকে সচল কর, অসম্ভবকে সম্ভব কর এবং মোহমুগ্ধকে যখন তুমি উদ্বোধিত কর তখন তাহার দৃষ্টির সম্মুখে তুমি যে কোন্ অমৃতলোকের তোরণ-দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দাও তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না—এই কথা নিশ্চয় জানিয়া আমরা যেন আনন্দে অমর হইয়া উঠি, এবং আমাদের যাহা কিছু আছে সমস্তই পণ করিয়া, ভূমার পথে নিখিল মানবের বিজয়যাত্রায় যেন সম্পূর্ণ নির্ভয়ে যোগদান করিতে পারি।

জয় জয় জয় হে, জয় বিশ্বেশ্বর,
মানবভাগ্যবিধাতা!

১৩১৮

ধর্মের অর্থ

মানুষের উপর একটা মস্ত সমস্যার মীমাংসাভার পড়িয়াছে। তাহার একটা বড়োর দিক আছে, একটা ছোটোর দিক আছে। দুইয়ের মধ্যে একটা ছেদ আছে, অথচ যোগও আছে। এই ছেদটাকেও রাখিতে হইবে অথচ যোগটাকেও বাড়াইতে হইবে। ছোটো থাকিয়াও তাহাকে বড়ো হইয়া উঠিতে হইবে। এই মীমাংসা করিতে গিয়া মানুষ নানা রকম চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতেছে কখনো সে ছোটোটাকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিতে চায়, কখনো বড়োটাকে স্বপ্ন বলিয়া আমল দিতে চায় না। এই দুইয়ের সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টাই তাহার সকল চেষ্টার মূল। এই সামঞ্জস্য যদি না করিতে পারা যায় তবে ছোটোরও কোনো অর্থ থাকে না, বড়োটিও নিরর্থক হইয়া পড়ে।

প্রথমে ধরা যাক আমাদের এই শরীরটাকে। এটি একটি ছোটো পদার্থ। ইহার বাহিরে একটি প্রকাণ্ড বড়ো পদার্থ আছে, সেটি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। আমরা অন্যমনস্ক হইয়া এই শরীরটাকে একটা স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া মনে করি। যেন এ শরীর আপনার মধ্যে আপনি সম্পূর্ণ। কিন্তু তেমন করিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে এ শরীরের কোনো অর্থই খুঁজিয়া পাই না। আপনাকে লইয়া এ শরীর করিবে কী? থাকিবে কোথায়? আপনার মধ্যে এই শরীরের প্রয়োজন নাই সমাপ্তি নাই।

বস্তুত আমাদের এই শরীরে যে স্বাতন্ত্র্যটুকু আছে, সে আপনাকে লইয়া আপনি থাকিতে পারে না। বৃহৎ বিশ্বশরীরের সঙ্গে যে পরিমাণে তাহার মিল হয় সেই পরিমাণে তাহার অর্থ পাওয়া যায়। গর্ভের ভ্রূণ যে নাক কান হাত পা লইয়া আছে গর্ভের বাহিরেই তাহার সার্থকতা। এইজন্য জন্মগ্রহণের পর হইতেই চোখের সঙ্গে আকাশব্যাপী আলোর, কানের সঙ্গে বাতাসব্যাপী শব্দের, হাত পায়ের সঙ্গে চারিদিকের নানাবিধ বিষয়ের, সকলের চেয়ে যেটি ভালো যোগ সেইটি সাধন করিবার জন্য মানুষের কেবলই চেষ্টা চলিতেছে। এই বড়ো শরীরটির সঙ্গে পূর্ণভাবে মিলিবে ইহাই ছোটো শরীরের একান্ত সাধনা—অথচ আপনার ভেদটুকু যদি না রাখে তাহা হইলে সে মিলনের কোনো অর্থই থাকে না। আমার চোখ আলো হইবে না, চোখরূপে থাকিয়া আলো পাইবে, দেহ পৃথিবী হইবে না, দেহরূপে থাকিয়া পৃথিবীকে উপলব্ধি করিবে, ইহাই তাহার সমস্যা।

বিরাট বিশ্বদেহের সঙ্গে আমাদের ছোটো শরীরটি সকল দিক দিয়া এই যে আপনার যোগ অনুভব করিবার চেষ্টা করিতেছে এ কি তাহার প্রয়োজনের চেষ্টা? পাছে

অন্ধকারে কোথাও খোঁচা লাগে এইজন্যই কি চোখ দেখিতে চেষ্টা করে? পাছে বিপদের পদধ্বনি না জানিতে পারিয়া দুঃখ ঘটে এইজন্যই কি কান উৎসুক হইয়া থাকে?

অবশ্য প্রয়োজন আছে বটে কিন্তু প্রয়োজনের চেয়ে বেশি জিনিস একটা আছে— প্রয়োজন তাহার অন্তর্ভূত। সেটা আর কিছু নহে, পূর্ণতার আনন্দ। চোখ আলোর মধ্যেই পূর্ণ হয়, কান শব্দের অনুভূতিতেই সার্থক হয়। যখন আমাদের শরীরে চোখ কান ফোটেও নাই তখনও সেই পূর্ণতার নিগূঢ় ইচ্ছাই এই চোখ কানকে বিকশিত করিবার জন্য অশ্রান্ত চেষ্টা করিয়াছে। মায়ের কোলে শুইয়া শুইয়া যে শিশু কথা কহিবার চেষ্টায় কলস্বরে আকাশকে পুলকিত করিয়া তুলিতেছে কথা কহিবার প্রয়োজন যে কী তাহা সে কিছুই জানে না। কিন্তু কথা কহার মধ্যে যে পূর্ণতা, সেই পূর্ণতা দূর হইতেই তাহাকে আনন্দআহ্বান পাঠাইতেছে, সেই আনন্দে সে বারবার নানা শব্দ উচ্চারণ করিয়া কিছুতেই ক্লান্ত হইতেছে না।

তেমনি করিয়াই আমাদের এই ছোটো শরীরটির দিকে বিরাট বিশ্ব-শরীরের একটি আনন্দের টান কাজ করিতেছে। ইহা পূর্ণতার আকর্ষণ, সেইজন্য যেখানে আমাদের কোনো প্রয়োজন নাই সেখানেও আমাদের শক্তি ছুটিয়া যাইতে চায়। গ্রহে চন্দ্রে তারায় কী আছে তাহা দেখিবার জন্য মানুষ রাত্রির পর রাত্রি জাগিতে শ্রান্ত হয় না। যেখানে তাহার প্রয়োজনক্ষেত্র সেখান হইতে অনেক দূরে মানুষ আপনার ইন্দ্রিয়বোধকে দূত পাঠাইতেছে। যাহাকে সহজে দেখা যায় না তাহাকে দেখিবার জন্য দূরবীন অণুবীক্ষণের শক্তি কেবলই সে বাড়াইয়া চলিয়াছে—এমনি করিয়া মানুষ নিজের চক্ষুকে বিশ্বব্যাপী করিয়া তুলিতেছে; যেখানে সহজে যাওয়া যায় না সেখানে যাইবার জন্য নব নব যানবাহনের কেবলই সে সৃষ্টি করিতেছে; এমনি করিয়া মানুষ আপনার হাত পাকে বিশ্বে প্রসারিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। জলস্থল আকাশের সঙ্গে আপনার যোগ অবারিত করিবার উদ্‌যোগ কত কাল হইতে চলিয়াছে। জলস্থল আকাশের পথ দিয়া সমস্ত জগৎ মানুষের চোখ কান হাত পাকে কেবলই যে ডাক দিতেছে। বিরাটের এই নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য মানুষ পৃথিবীতে পদার্পণের পরমুহূর্ত হইতেই আজ পর্যন্ত কেবলই দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর, প্রশস্ত হইতে প্রশস্ততর করিয়া পথ তৈরি করিতে লাগিয়াছে। বিরাটের সেই নিমন্ত্রণ প্রয়োজনের নিমন্ত্রণ নহে, তাহা মিলনের নিমন্ত্রণ, আনন্দের নিমন্ত্রণ; তাহা ক্ষুদ্র শরীরের সহিত বৃহৎ শরীরের পরিণয়ের নিমন্ত্রণ; এই পরিণয়ে প্রেমও আছে সংসারযাত্রাও আছে, আনন্দও আছে প্রয়োজনও আছে; কিন্তু এই মিলনের মূলমন্ত্র আনন্দেরই মন্ত্র।

শুধু চোখ কান হাত পা লইয়া মানুষ নয়। তাহার একটা মানসিক কলেবর আছে। নানা প্রকারের বৃত্তি প্রবৃত্তি সেই কলেবরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। এই সব মনের বৃত্তি লইয়া আপনার মনটিকে যে নিতান্তই কেবল আপনার করিয়া সকল হইতে তফাত করিয়া রাখিব তাহার জো নাই। ওই বৃত্তিগুলাই আপনার বাহিরে ছুটিবার জন্য মনকে লইয়া কেবলই টানাটানি করিতেছে। মন একটি বৃহৎ মনোলোকের সঙ্গে যতদূর পারে পূর্ণরূপে মিলিতে চাহিতেছে। নহিলে তাহার স্নেহপ্রেম দয়ামায়া, এমন কি ক্রোধ দ্বেষ লোভ হিংসারও কোনো অর্থই থাকে না। সকল মানুষের মন বলিয়া একটি খুব বড়ো মনের সঙ্গে সে আপনার ভালো রকম মিল করিতে চায়। সেইজন্য কত কাল হইতে সে যে কত রকমের পরিবারতন্ত্র সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রতন্ত্র গড়িয়া তুলিতেছে তাহার ঠিকানা নাই। যেখানে বাধিয়া যায় সেখানে তাহাকে আবার ভাঙিয়া ফেলিতে হয়, গড়িয়া তুলিতে হয়, এইজন্যই কত বিপ্লব কত রক্তপাতের মধ্য দিয়া তাহাকে পথ চলিতে হইয়াছে। বৃহৎ মনঃশরীরের সঙ্গে আপনার মনটিকে বেশ ভালোরকম করিয়া মিলাইয়া লইতে না পারিলে মানুষ বাঁচে না। যে পরিমাণে তাহার ভালো রকম করিয়া মিল ঘটে সেই পরিমাণেই তাহার পূর্ণতা। যে ব্যবস্থায় তাহার মিল অসম্পূর্ণ হয় ও কেবলই ভেদ ঘটিতে থাকে সেই ব্যবস্থায় তাহার দুর্গতি। এখানেও প্রয়োজনের প্রেরণা মূল প্রেরণা এবং সর্বোচ্চ প্রেরণা নহে। মানুষ পরিবারের বাহিরে প্রতিবেশী, প্রতিবেশীর বাহিরে দেশ, দেশের বাহিরে বিশ্বমানবসমাজের দিকে আপন চিত্তবিস্তারের যে চেষ্টা করিতেছে এ তাহার প্রয়োজনের আপিসযাত্রা নহে, এ তাহার অভিসারযাত্রা। ছোটো হৃদয়টির প্রতি বড়ো হৃদয়ের একটি ডাক আছে। সে ডাক এক মুহূর্ত থামিয়া নাই। সেই ডাক শুনিয়া আমাদের হৃদয় বাহির হইয়াছে সে খবরও আমরা সকল সময়ে জানিতে পারি না। রাত্রি অন্ধকার হইয়া আসে, ঝড়ের মেঘ ঘনাইয়া উঠে, বারবার পথ হারাইয়া যায়, পা কাটিয়া গিয়া মাটির উপর রক্তচিহ্ন পড়িতে থাকে তবু সে চলে; পথের মাঝে মাঝে সে বসিয়া পড়ে বটে কিন্তু সেখানেই চিরকাল বসিয়া থাকিতে পারে না, আবার উঠিয়া আবার তাহাকে অগ্রসর হইতে হয়।

এই যে মানুষের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, নানা ইন্দ্রিয়বোধ, তাহার নানা বৃত্তিপ্রবৃত্তি, এ সমস্তই মানুষকে কেবলই বিচিত্রের মধ্যে বিস্তারের দিকে লইয়া চলিয়াছে। এই বিচিত্রের শেষ কোথায়? এই বিস্তারের অন্ত কল্পনা করিব কোন্‌খানে? শুনিয়াছি সেকেন্দর শা একদিন জয়োৎসাহে উন্মত্ত হইয়া চিন্তা করিয়াছিলেন জিতিয়া লইবার জন্য দ্বিতীয় আর একটা পৃথিবী তিনি পাইবেন কোথায়? কিন্তু মানুষের চিত্তকে কোনোদিন এমন বিষম দুশ্চিন্তায় আসিয়া ঠেকিতে হইবে না যে, তাহার অধিকার বিস্তারের স্থান

আর নাই। কোনো দিন সে বিমর্ষ হইয়া বলিবে না যে, সে তাহার ব্যাপ্তির শেষ সীমায় আসিয়া বেকার হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু মানুষের পক্ষে কেবলই কি এই গণনাহীন বৈচিত্র্যের মধ্যে বিরামহীন ব্যাপ্তিই আছে? কোনোখানেই তাহার পৌঁছানো নাই? অন্তহীন বহু কেবলই কি তাহাকে এক হইতে দুই, দুই হইতে তিনের সিঁড়ি বাহিয়া লইয়া চলিবে—সে সিঁড়ি কোথাও যাইবার নাম করিবে না?

এ কখনো হইতেই পারে না। আমরা জগতে এই একটি কাণ্ড দেখি - গম্যস্থানকে আমরা পদে পদেই পাইতেছি। বস্তুত আমরা গম্যস্থানেই আসিয়া রহিয়াছি—আমরা গম্যস্থানের মধ্যেই চলিতেছি। অর্থাৎ যা আমরা পাইবার তা আমরা পাইয়া বসিয়াছি, এখন সেই প্যাওয়ারই পরিচয় চলিতেছে। যেন আমরা রাজবাড়িতে আসিয়াছি—কিন্তু কেবল আসিলেই তো হইল না—তাহার কত মহল কত ঐশ্বর্য কে তাহার গণনা করিতে পারে? এখন তাই দেখিয়া দেখিয়া বেড়াইতেছি। এই জন্য একটু করিয়া যাহা দেখিতেছি তাহাতেই সমস্ত রাজপ্রাসাদের পরিচয় পাইতেছি। ইহাকে তো পথে চলা বলে না। পথে কেবল আশা থাকে, আস্বাদন থাকে না। আবার যে পথ অনন্ত সেখানে আশাই বা থাকিবে কেমন করিয়া?

তাই আমি বলিতেছি আমাদের কেহ পথে বাহির করে নাই—আমরা ঘরেই আছি। সে ঘর এমন ঘর যে, তাহার বারাণ্ডায় ছাতে দালানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাকে আর শেষ করিতে পারি না অথচ সর্বত্রই তাহার শেষ; সর্বত্রই তাহা ঘর, কোথাও তাহা পথ নহে।

এ রাজবাড়ির এই তো কাণ্ড, ইহার কোথাও শেষ নাই অথচ ইহার সর্বত্রই শেষ। ইহার মধ্যে সমাপ্তি এবং ব্যাপ্তি একেবারে গায়ে গায়ে লাগিয়া আছে। এই জন্য এখানে কোনোখানে আমরা বসিয়া থাকি না অথচ প্রত্যেক পদেই আমরা আশ্রয় পাই। মাটি ফুঁড়িয়া যখন অঙ্কুর বাহির হইল তখন সেইখানেই আমাদের চোখ বিশ্রাম করিতে পারে। অঙ্কুর যখন বড়ো গাছ হইল তখন সেখানেও আমাদের মন দাঁড়াইয়া দেখে। গাছে যখন ফুল ধরে তখন ফুলেও আমাদের তৃপ্তি। ফুল হইতে যখন ফল জন্মে তখন তাহাতেও আমাদের লাভ। কোনো জিনিস সম্পূর্ণ শেষ হইলে তবেই তাহার সম্বন্ধে আমরা পূর্ণতাকে পাইব আমাদের এমন দুরদৃষ্ট নহে—পূর্ণতাকে আমরা পর্বে পর্বে পাইয়াই চলিয়াছি। তাই বলিতেছিলাম ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই আমরা পরিসমাপ্তির স্বাদ পাইতে থাকি সেইজন্যই ব্যাপ্তি আনন্দময়—নহিলে তাহার মতো দুঃখকর আর কিছুই হইতে পারে না।

ব্যাপ্তি এবং সমাপ্তি এই যে দুটি তত্ত্ব সর্বত্র একসঙ্গেই বিরাজ করিতেছে আমাদের

মধ্যেও নিশ্চয় ইহার পরিচয় আছে। আমরাও নিশ্চয় আপনাকে উপলব্ধি করিবার জন্ত অনন্ত জীবনের প্রান্তে পৌছিবার দুরাশায় অপেক্ষা করিতেছি না। এ কথা বলিতেছি না যে, এখনও যখন আমার সমস্ত নিঃশেষে চুকিয়া বুকিয়া যায় নাই তখন আমি আপনাকে জানিতেছি না। বস্তুত আমার মধ্যে একদিকে চলা, এবং আর একদিকে পৌছানো, একদিকে বহু, আর একদিকে এক, একসঙ্গেই রহিয়াছে, নহিলে অস্তিত্বের মতো বিভীষিকা আর কিছুই থাকিত না। একদিকে আমার বিচিত্র শক্তি বাহিরের বিচিত্রের দিকে চলিয়াছে, আর একদিকে আমার আনন্দ ভিতরের একের দিকে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে।

এই যেখানে মানুষের আপনার আনন্দ—এইখানেই মানুষের পর্যাপ্তি, এইখানেই মানুষ বড়ো। এইখান হইতেই গতি লইয়া মানুষের সমস্ত শক্তি বাহিরে চলিয়াছে এবং বাহির হইতে পুনরায় তাহারা এইখানেই অর্ঘ্য আহরণ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে।

বাহির হইতে যখন দেখি তখন বলি মানুষ নিঃশ্বাস লইয়া বাঁচিতেছে, মানুষ আহার করিয়া বাঁচিতেছে, রক্ত চলাচলে মানুষ বাঁচিয়া আছে। এমন করিয়া কত আর বলিব ? বলিতে গিয়া তালিকা শেষ হয় না। তখন দেখি শরীরের অণুতে অণুতে রসে রক্তে অস্থিমজ্জাস্নায়ুপেশীতে ফর্দ কেবল বাড়িয়া চলিতেই থাকে। তাহার পরে যখন প্রাণের হিসাব শেষ পর্যন্ত মিলাইতে গিয়া আলোকে উত্তাপে বাতাসে জলে মাটিতে আসিয়া পৌছাই, যখন প্রাকৃত বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক শক্তিরহস্তের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হই, তখন একেবারে হাল ছাড়িয়া দেওয়া ছাড়া উপায় নাই।

এমন করিয়া অন্তহীনতার খাতায় কেবলই পাতা উলটাইয়া শ্রান্ত হইয়া মরিতে হয়। কিন্তু বাহির হইতে প্রাণের ভিতর বাড়িতে গিয়া যখন প্রবেশ করি তখন কেবল একটি কথা বলি, প্রাণের আনন্দে মানুষ বাঁচিয়া আছে আর কিছু বলিবার দরকার হয় না। এই প্রাণের আনন্দেই আমরা নিশ্বাস লইতেছি, খাইতেছি, দেহ রচনা করিতেছি, বাড়িতেছি। বাঁচিয়া থাকিব এই প্রবল আনন্দময় ইচ্ছাতেই আমাদের সমস্ত শক্তি সচেষ্ট হইয়া বিশ্বময় ছুটিয়া চলিতেছে। প্রাণের আনন্দেই জীবপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে ; প্রাণের নিগূঢ় আনন্দে প্রাণীরা জগতের নানা স্পর্শের তানে আপনার স্নায়ুর তারগুলিকে কেবলই বিচিত্রতর করিয়া বাঁধিয়া তুলিতেছে। বাঁচিয়া থাকিতে চাই এই ইচ্ছা সন্তানসন্ততিকে জন্ম দিতেছে, রক্ষা করিতেছে, চারিদিকের পরিবেষ্টনের সঙ্গে উত্তরোত্তর আপনার সর্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য সাধন করিতেছে।

এমন কি, বাঁচিয়া থাকিব এই আনন্দেই জীব মৃত্যুকেও স্বীকার করিতেছে। সে লড়াই করিয়া প্রাণের আনন্দেই প্রাণ দিতেছে। কর্মী মউমাছিরা আপনাকে অঙ্গহীন

করিতেছে কেন? সমস্ত মউচাকের প্রজাদের প্রাণের সমগ্রতার আনন্দ তাহাদিগকে ত্যাগ-স্বীকারে প্রবৃত্ত করিতেছে। দেশের জন্য মানুষ যে অকাতরে যুদ্ধ করিয়া মরিতেছে তাহার মূলে এই প্রাণেরই আনন্দ। সমস্ত দেশের প্রাণকে সে বড়ো করিয়া জানিতে চায়— সেই ইচ্ছার জোরেই সেই আনন্দের শক্তিতেই সে আপনাকেও বিসর্জন করিতে পারে।

তাই আমি বলিতেছিলাম মূলে দৃষ্টিপাত করিতে গেলে দেখা যায় প্রাণের আনন্দই বাঁচিয়া থাকিবার নানা শক্তিকে নানা দিকে প্রেরণ করে। শুধু তাই নয়, সেই নানা শক্তি নানা দিক হইতে নানা উপকরণ সংগ্রহ করিয়া এই আনন্দেই ফিরিয়া আসিতেছে এবং তাহারই ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। প্রাণের এই শক্তি যেমন প্রাণের ব্যাপ্তির দিক, প্রাণের এই আনন্দ তেমনি প্রাণের সমাপ্তির দিক।

যেমন গানের তান। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, তান জিনিসটা একটা নিয়মহীন উচ্ছৃঙ্খলতা নহে; তাহার মধ্যে তালমানলয় রহিয়াছে; তাহার মধ্যে স্বর-বিন্যাসের অতি কঠিন নিয়ম আছে; সেই নিয়মের মূলে স্বরতত্ত্বের গণিতশাস্ত্রসম্মত একটা দুরূহ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আছে; শুধু তাই নয়, যে কণ্ঠ বা বাদ্যযন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া এই তান চলিতেছে তাহারও নিয়মের শেষ নাই; সেই নিয়মগুলি কার্যকারণের বিশ্বব্যাপী শৃঙ্খলকে আশ্রয় করিয়া কোন্ অসীমের মধ্যে যে চলিয়া গিয়াছে তাহার কেহ কিনারা পায় না। অতএব বাহিরের দিক হইতে যদি কেহ বলে এই তানগুলি অন্তহীন নিয়ম-শৃঙ্খলকে আশ্রয় করিয়াই বিস্তীর্ণ হইতেছে তবে সে একরকম করিয়া বলা যায় সন্দেহ নাই কিন্তু তাহাতে আসল কথাটি বাদ পড়িয়া যায়। মূলের কথাটি এই যে, গায়কের চিত্ত হইতে গানের আনন্দই বিচিত্র তানের মধ্যে প্রসারিত হইতেছে। যেখানে সেই আনন্দ দুর্বল, শক্তিও সেখানে ক্ষীণ।

গানের এই তানগুলি গানের আনন্দ হইতে যেমন নানা ধারায় উৎসারিত হইতে থাকে, তেমনি তাহারা সেই আনন্দের মধ্যেই ফিরিয়া আসে। বস্তুত এই তানগুলি বাহিরে ছোটে কিন্তু গানের ভিতরকারই আনন্দকে তাহারা ভরিয়া তোলে। তাহারা মূল হইতে বাহির হইতে থাকে কিন্তু তাহাতে মূলের ক্ষয় হয় না, মূলের মূল্য বাড়িয়াই উঠে।

কিন্তু যদি এই আনন্দের সঙ্গে তানের যোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় তাহা হইলে উলটাই হয়। তাহা হইলে তানের দ্বারা গান কেবল দুর্বল হইতেই থাকে। সে তানে নিয়ম যতই জটিল ও বিশুদ্ধ থাক না কেন গানকে সে কিছুই রস দেয় না, তাহা হইতে সে কেবল হরণ করিয়াই চলে।

যে গায়ক আপনার মধ্যে এই গানের মূল আনন্দে গিয়া পৌঁছিয়াছে গান সম্বন্ধে সে মুক্তিলাভ করিয়াছে। সে সমাপ্তিতে পৌঁছিয়াছে। তখন তাহার গলায় যে তান খেলে তাহার মধ্যে আর চিন্তা নাই, চেষ্টা নাই, ভয় নাই। যাহা দুঃসাধ্য তাহা আপনি ঘটিতে থাকে। তাহাকে আর নিয়মের অনুসরণ করিতে হয় না, নিয়ম আপনি তাহার অনুগত হইয়া চলে। তানসেন আপনার মধ্যে সেই গানের আনন্দলোকটিকে পাইয়াছিলেন। ইহাই ঐশ্বর্যলোক; এখানে অভাব পূরণ হইতেছে, ভিক্ষা করিয়া নয়, হরণ করিয়া নয়, আপনারই ভিতর হইতে। তানসেন এই জায়গায় আসিয়া গান সম্বন্ধে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন বলিতে এ কথা বুঝায় না যে, তাঁহার গানে তাহার পর হইতে নিয়মের বন্ধন আর ছিল না;—তাহা সম্পূর্ণ ই ছিল, তাহার লেশমাত্র ত্রুটি ছিল না—কিন্তু তিনি সমস্ত নিয়মের মূলে আপনার অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া নিয়মের প্রভু হইয়া বসিয়াছিলেন—তিনি একেকে পাইয়াছিলেন বলিয়াই অসংখ্য বহু আপনি তাঁহার কাছে ধরা দিয়াছিল। এই আনন্দলোকটিকে আবিষ্কার করিতে পারিলেই কাব্য সম্বন্ধে কবি, কর্ম সম্বন্ধে কর্মী মুক্তিলাভ করে। কবির কাব্য কর্মীর কর্ম তখন স্বাভাবিক হইয়া যায়।

যাহা আপনার ভাব হইতে উঠে তাহাই স্বাভাবিক—তাহার মধ্যে অন্যের তাড়না নাই, তাহাতে নিজেরই প্রেরণা। যে কর্ম আমার স্বাভাবিক সেই কর্মেই আমি আপনার সত্য পরিচয় দিই।

কিন্তু এখানে আমরা যথেষ্ট ভুল করিয়া থাকি। এই ঠিক আপনটিকে পাওয়া যে কাহাকে বলে তাহা বুঝা শক্ত। যখন মনে করিতেছি অমুক কাজটা আমি আপনি করিতেছি অন্তর্যামী দেখিতেছেন তাহা অন্যের নকল করিয়া করিতেছি—কিংবা কোনো বাহিরের বিষয়ের প্রবল আকর্ষণে একঝোঁকা প্রবৃত্তির জোরে করিতেছি।

এই যে বাহিরের টানে প্রবৃত্তির জোরে কাজ করা ইহাও মানুষের সত্যতম স্বভাব নহে। বস্তুত ইহা জড়ের ধর্ম। যেমন নীচের টানে পাথর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, সে প্রবল বেগে গড়াইয়া পড়ে ইহাও সেইরূপ। এই জড়ধর্মকে খাটাইয়া প্রকৃতি আপনার কাজ চালাইয়া লইতেছে। এই জড়ধর্মের জোরে অগ্নি জ্বলিতেছে, সূর্য তাপ দিতেছে, বায়ু বহিতেছে, কোথাও তাহার আর নিষ্কৃতি নাই। ইহা শাসনের কাজ। এই জন্যেই উপনিষদ বলিয়াছেন—

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ,
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।

অগ্নিকে জ্বলিতেই হইবে, মেঘকে বর্ষণ করিতেই হইবে, বায়ুকে বহিতেই হইবে এবং

মৃত্যুকে পৃথিবীসুদ্ধ লোকে মিলিয়া গালি দিলেও তাহার কাজ তাহাকে শেষ করিতেই হইবে।

মানুষের প্রবৃত্তির মধ্যে এইরূপ জড়ধর্ম আছে। মানুষকে সে কানে ধরিয়া কাজ করাইয়া লয়। মানুষকে প্রকৃতি এইখানে তাহার অন্যান্য জড়বস্তুর শামিল করিয়া লইয়া জোর করিয়া আপন প্রয়োজন আদায় করিয়া থাকে।

কিন্তু মানুষ যদি সম্পূর্ণই জড় হইত তাহা হইলে কোথাও তাহার বাধিত না সে পাথরের মত অগত্যা গড়াইত, জলের মত অগত্যা বহিয়া যাইত এ সম্বন্ধে কোনো নালিশটিও করিত না।

মানুষ কিন্তু নালিশ করে। প্রবৃত্তি যে তাহাকে কানে ধরিয়া সংসারক্ষেত্রে খাটাইয়া লয় ইহার বিরুদ্ধে তাহার আপত্তি আজও থামিল না। সে আজও কাঁদিতেছে—

তারা, কোন্ অপরাধে দীর্ঘ মেয়াদে
সংসার-গারদে থাকি বল্।

সে ভিতরে ভিতরে এই কথাটা অনুভব করিতেছে যে, আমি যে কাজ করিতেছি সে গারদের মধ্যে কয়েদির কাজ—প্রবৃত্তিপেয়াদার তাড়নায় খাটিয়া মরিতেছি।

কিন্তু সে ভিতরে জানে এমন করিয়া অভাবের তাড়নায় প্রবৃত্তির প্রেরণায় কাজ করাই তাহার চরম ধর্ম নহে। তাহার মধ্যে এমন কিছু একটি আছে যাহা মুক্ত, যাহা আপনার আনন্দেই আপনাতে পর্যাপ্ত, দেশকালের দ্বারা যাহার পরিমাপ হয় না, জরামৃত্যুর দ্বারা যাহা অভিভূত হয় না। আপনার সেই সত্য পরিচয় সেই নিত্য পরিচয়টি লাভ করিবার জন্যই তাহার চরম বেদনা।

পূর্বেই আমি বলিয়াছি, কবি আপন কবিত্বশক্তির মধ্যে, কর্মী আপন কর্মশক্তির মধ্যে সমস্তের মূলগত আপনাকে লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছে। সেই ভিতরকার আপনাকে যতই সে লাভ করে ততই কবির কাব্য অমর হইয়া উঠে; সে তখন বাহিরের অক্ষরগনা কাব্য হয় না; ততই কর্মীর কর্ম অমর হইয়া উঠে, সে তখন যন্ত্রচালিতবৎ কর্ম হয় না। কারণ প্রত্যেকের এই আপন পদার্থটি আনন্দময়,—এইখানেই স্বত-উৎসারিত আনন্দের প্রস্রবণ।

এইজন্যই শাস্ত্রে বলে—

সর্বং পরবশং দুঃখং সর্বমাত্মবশং সুখম্।

যাহা কিছু পরবশ তাহাই দুঃখ, যাহা কিছু আত্মবশ তাহাই সুখ।

অর্থাৎ মানুষের সুখ তাহার আপনের মধ্যে—আর দুঃখ তাহার আপন হইতে ভ্রষ্টতায়।

এত বড়ো কথাটাকে ভুল বুঝিলে চলিবে না। যখন বলিতেছি সুখ মানুষের আপনের মধ্যে, তখন ইহা বলিতেছি না যে, সুখ তাহার স্বার্থসাধনের মধ্যে। স্বার্থপরতার দ্বারা মানুষ ইহাই প্রমাণ করে যে, সে যথার্থ আপনার স্বাদটি পায় নাই, তাই সে অর্থকেই এমন চরম করিয়া এমন একান্ত করিয়া দেখে। অর্থকেই যখন সে আপনার চেয়ে বড়ো বলিয়া জানে তখন অর্থই তাহাকে ঘুরাইয়া মারে, তাহাকে দুঃখ হইতে দুঃখে লইয়া যায়—তখনই সে পরবশতার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত হইয়া উঠে।

প্রতিদিনই আমরা ইহার প্রমাণ পাইয়া থাকি। যে ব্যক্তি স্বার্থপর তাহাকে আপনার অর্থ ত্যাগ করিতে হয়—কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই দায়ে পড়িয়া অর্থেরই জন্য সে অর্থ ত্যাগ করে—সেই তাহার প্রয়োজনের ত্যাগ দুঃখের ত্যাগ। কেননা, সেই ত্যাগের মূলে একটা তাড়না আছে, অর্থাৎ পরবশতা আছে। অভাবের উৎপীড়ন হইতে বাঁচিবার জন্যই তাহাকে ব্যয় করিতে হয়। কিন্তু এক একটা সময় উপস্থিত হয় যখন সে খুশি হইয়া খরচ করিয়া ফেলে। তাহার পুত্র জন্মিয়াছে খবর পাইয়া সে তাহার গায়ের দামি শালখানা তখনই দিয়া ফেলে। ইহা একপ্রকার অকারণ দেওয়া, কেননা কোনো প্রয়োজনই তাঁহাকে দিতে বাধ্য করিতেছে না। এই যে দান ইহা কেবল আপনার আনন্দের প্রাচুর্যকে প্রকাশ করিবার দান। আমার আপন আনন্দই আমার আপনার পক্ষে যথেষ্ট এই কথাটাকে স্পষ্ট করিয়া বলিবার জন্য ওই শালখানা দিয়া ফেলিতে হয়। এই আনন্দের জোরে মানুষ একেবারে গভীরতম এমন একটি আপনাকে গিয়া স্পর্শ করে যাহাকে পাওয়া তাহার অত্যন্ত বড়ো পাওয়া। সেই তাহার আপনটি কাহারও তাঁবেদার নহে, সে জগতের সমস্ত শাল দোশালার চেয়ে অনেক বড়ো এইজন্য চকিতের মতো মানুষ তাহার দেখা যেই পায় অমনি বাহিরের ওই শালটার দাম একেবারে কমিয়া যায়। যখন মানুষের আনন্দ না থাকে, যখন মানুষ আপনাকে না দেখে, তখন ওই শালটা একেবারে হাজার টাকা ওজনের বোঝা হইয়া তাহাকে দ্বিতীয় চর্মের মতো সর্বাঙ্গে চাপিয়া ধরে—তাহাকে সরাইয়া দেওয়া শক্ত হইয়া উঠে। তখন ওই শালটার কাছে পরবশতা স্বীকার করিতে হয়।

এমনি করিয়া মানুষ ক্ষণে ক্ষণে কিছু কিছু করিয়া আপনাকে দেখিতে পায়। মাঝে মাঝে এমন এক একটা আনন্দের হাওয়া দেয় যখন তাহার বাহিরের ভারি ভারি পর্দাগুলাকে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য উড়াইয়া ফেলে। তখন বিপরীত কাণ্ড ঘটে,—কৃপণ যে সেও ব্যয় করে, বিলাসী যে সেও দুঃখ স্বীকার করে, ভীরু যে সেও প্রাণ বিসর্জন করিতে কুণ্ঠিত হয় না। তখন যে নিয়মে সংসার চলিতেছে সেই নিয়মকে মানুষ এক মুহূর্তে লঙ্ঘন করে। সেইরূপ অবস্থায় মানুষের ইতিহাসে হঠাৎ এমন একটা যুগান্তর

উপস্থিত হয়—পূর্বেকার সমস্ত খাতা মিলাইয়া যাহার কোনো প্রকার হিসাব পাওয়া যায় না। কেমন করিয়া পাইবে? স্বার্থের প্রয়োজনের হিসাবের সঙ্গে আত্মার আনন্দের হিসাব কোনোমতেই মেলানো যায় না—কেননা সেই যথার্থ আপনার মধ্যে গিয়া পৌঁছিলে মানুষ হঠাৎ দেখিতে পায়, খরচই সেখানে জমা, দুঃখই সেখানে সুখ।

এমনি করিয়া মাঝে মাঝে মানুষ এমন একটি আপনাকে দেখিতে পায়, বাহিরের সমস্তেরই চেয়ে যে বড়ো। কেন বড়ো? কেননা সে আপনার মধ্যেই আপনি সমাপ্ত। তাহাতে গুনিতে হয় না, মাপিতে হয় না—সমস্ত গনা এবং মাপা তাহা হইতেই আরম্ভ এবং তাহাতে আসিয়াই শেষ হয়। ক্ষতি তাহার কাছে ক্ষতি নহে, মৃত্যু তাহার কাছে মৃত্যু নহে, ভয় তাহার বাহিরে এবং দুঃখের আঘাত তাহার তারে আনন্দের সুর বাজাইয়া তোলে।

এই যাহাকে মানুষ ক্ষণে ক্ষণে কিছু কিছু করিয়া পায়—যাহাকে কখনো কখনো কোনো একটা দিক দিয়া সে পায়—যাহাকে পাইবামাত্র তাহার শক্তি স্বাভাবিক হয়, দুঃসাধ্য সুসাধ্য হয়, তাহার কর্ম আনন্দের কর্ম হইয়া উঠে; যাহাকে পাইলে তাহার উপর হইতে বাহিরের সমস্ত চাপ যেন সরিয়া যায়, সে আপনার মধ্যেই আপনার একটি পর্যাপ্তি দেখিতে পায় তাহার মধ্যেই মানুষ আপনার সত্য পরিচয় উপলব্ধি করে। সেই উপলব্ধি মানুষের মধ্যে অন্তরতমভাবে আছে বলিয়াই প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হইয়া প্রকৃতির প্রেরণায় সে যে সকল কাজ করে সে কাজকে সে গারদের কাজ বলে। অথচ প্রকৃতি যে নিতান্তই জবরদস্তি করিয়া বেগার খাটাইয়া লয় তাহা নহে—সে আপনার কাজ উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে বেতনটিও শোধ করে, প্রত্যেক চরিতার্থতার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু সুখও বাঁটিয়া দেয়। সেই সুখের বেতনটির প্রলোভনে আমরা অনেক সময় ছুটির পরেও খাটিয়া থাকি, পেট ভরিলেও খাইতে ছাড়ি না। কিন্তু হাজার হইলে তবু মাহিনা খাইয়া খাটুনিকেও আমরা দাসত্ব বলি—আমরা এ চাকরি ছাড়িতেও পারি না তবু বলি হাড় মাটি হইল, ছাড়িতে পারিলে বাঁচি। সংসারে এই যে আমরা খাটি—সকল দুঃখ সত্ত্বেও ইহার মাহিনা পাই—ইহাতে সুখ আছে, লোভ আছে। তবু মানুষের প্রাণ রহিয়া রহিয়া কাঁদিয়া উঠে এবং বলে—

তারা, কোন্ অপরাধে দীর্ঘ মেয়াদে
সংসারগারদে থাকি বল্।

এমন কথা সে যে বলে, বেতন খাইয়াও তাহার যে পুরা সুখ নাই তাহার কারণ এই যে, সে জানে তাহার মধ্যে প্রভুত্বের একটি স্বাধীন সম্পদ আছে—সে জন্মদাস নহে—সমস্ত প্রলোভনসত্ত্বেও দাসত্ব তাহার পক্ষে স্বাভাবিক নয়—প্রকৃতির দাসত্বে তাহার

অভাবটাই প্রকাশ পায় স্বভাবটা নহে। স্বভাবতই সে প্রভু; সে বলে আমি নিজের আনন্দে চলিব, আমার নিজের কাজের বেতন আমার নিজেরই মধ্যে—বাহিরের স্তুতি বা লাভ, বা প্রবৃত্তি-চরিতার্থতার মধ্যে নহে। যেখানে সে প্রভু, যেখানে সে আপনার আনন্দে আপনি বিরাজমান, সেইখানেই সে আপনাকে দেখিতে চায়; সেজন্য সে দুঃখ কষ্ট ত্যাগ মৃত্যুকেও স্বীকার করিতে পারে। সেজন্য রাজপুত্র রাজ্য ছাড়িয়া বনে যায়—পণ্ডিত আপনার ন্যায়শাস্ত্রের বোঝা ফেলিয়া দিয়া শিশুর মত সরল হইয়া পথে পথে নৃত্য করিয়া বেড়ায়।

এই জন্যই মানুষ এই একটি আশ্চর্য কথা বলে, আমি মুক্তি চাই। কী হইতে সে মুক্তি চায়? না, যাহা কিছু সে চাহিতেছে তাহা হইতেই সে মুক্তি চায়। সে বলে আমাকে বাসনা হইতে মুক্ত করো—আমি দাসপুত্র নই অতএব আমাকে ওই বেতন-চাওয়া হইতে নিষ্কৃতি দাও। যদি সে নিশ্চয় না জানিত যে বেতন না চাহিলেও তাহার চলে, নিজের মধ্যেই তাহার নিজের সম্পদ আছে এ বিশ্বাস যদি তাহার অন্তরতম বিশ্বাস না হইত তবে সে চাকরির গারদকে গারদ বলিয়াই জানিত না—তবে এ প্রার্থনা তাহার মুখে নিতান্তই পাগলামির মতো শুনাইত যে আমি মুক্তি চাই। বস্তুত আমাদের বেতন যখন বাহিরে তখনই আমরা চাকরি করি কিন্তু আমাদের বেতন যখন আমাদের নিজেরই মধ্যে, অর্থাৎ যখন আমরা ধনী তখন আমরা চাকরিতে ইস্তফা দিয়া আসি।

চাকরি করি না বটে কিন্তু কর্ম করি না, এমন কথা বলিতে পারি না। কর্ম বরঞ্চ বাড়িয়া যায়। যে চিত্রকর চিত্ররচনাশক্তির মধ্যে আপনাকে পাইয়াছে—যাহাকে আর নকল করিয়া ছবি আঁকিতে হয় না, পুঁথির নিয়ম মিলাইয়া যাহাকে তুলি টানিতে হয় না, নিয়ম যাহার স্বাধীন আনন্দের অনুগত—ছবি আঁকার দুঃখ তাহার নাই, তাই বলিয়া ছবি আঁকাই তাহার বন্ধ এমন কথা কেহ বলিতে পারে না। বরঞ্চ উলটা। ছবি আঁকার কাজে আপনাকে সে আর বিশ্রাম দিতে চায় না। বেতন দিয়া এত খাটুনি কাহাকেও খাটানো যায় না।

ইহার কারণ এই যে, এখানে চিত্রকর কর্মের একেবারে মূলে তাহার পর্যাপ্তির দিকে গিয়া পৌঁছিয়াছে। বেতন কর্মের মূল নহে, আনন্দই কর্মের মূল—বেতনের দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে আমরা সেই আনন্দকেই আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করি। গঙ্গা হইতে যেমন আমরা পাইপে করিয়া কলের জল আনি, বেতন তেমনি করিয়াই আনন্দকেই ঠেলা দিয়া তাহার একাংশ হইতে শক্তির সম্বল সঞ্চয় করিয়া আনে। কিন্তু কলের জলে আমরা ঝাঁপ দিতে পারি না, তাঁহার হাওয়া খাইতে পারি না, তাহার তরঙ্গলীলা দেখিতে পাই না—তা ছাড়া কেবল কাজের সময়টিতেই সে খোলা থাকে—অপব্যয়ের

ভয়ে কৃপণের মতো প্রয়োজনের পরেই তাহাকে বন্ধ করিয়া দিতে হয়, তাহার পরে কল বিগড়াইতেও আটক নাই।

কিন্তু আনন্দের মূল গঙ্গায় গিয়া পৌঁছিলে দেখিতে পাই সেখানে কর্মের অবিরাম স্রোত বিপুল তরঙ্গে আপনি বহিয়া যাইতেছে, লোহার কল অগ্নিচক্ষু রাঙা করিয়া তাহাকে তাড়না করিতেছে না। সেই জলের ধারা পাইপের ধারার চেয়ে অনেক প্রবল, অনেক প্রশস্ত, অনেক গভীর। শুধু তাই নয়—কলের পাইপ-নিঃসৃত কাজে কাজই আছে কিন্তু সৌন্দর্য নাই, আরাম নাই—আনন্দের গঙ্গায় কাজের অফুরান প্রবাহের সঙ্গে নিরন্তর সৌন্দর্য ও আরাম অনায়াসে বিকীর্ণ হইতেছে।

তাই বলিতেছিলাম চিত্রকর যখন সত্য আপনার মধ্যে সকল কর্মের মূলে গিয়া উত্তীর্ণ হয়, আনন্দে গিয়া পৌঁছে, তখন তাহার চিত্র আঁকার কর্মের আর অবধি থাকে না। বস্তুত তখন তাহার কর্মের দ্বারাই আনন্দের পরিমাপ হইতে থাকে, দুঃখের দ্বারাই তাহার সুখের গভীরতা বুঝিতে পারি। এই জন্যই কার্লাইল বলিয়াছেন—অসীম দুঃখ স্বীকার করিবার শক্তিকে বলে প্রতিভা। প্রতিভা সেই শক্তিকেই বলে, যে শক্তির মূল আপনারই আনন্দের মধ্যে; বাহিরের নিয়ম বা তাড়না বা প্রলোভনের মধ্যে নহে। প্রতিভার দ্বারা মানুষ সেই আপনাকেই পায় বলিয়া কর্মের মূল আনন্দ-প্রস্রবণটিকে পায়; সেই আনন্দকেই পায় বলিয়া কোনো দুঃখ তাহাকে আর দুঃখ দিতে পারে না। কারণ প্রাণ যেমন আপনিই খাদ্যকে প্রাণ করিয়া লয়, আনন্দ তেমনি আপনিই দুঃখকে আনন্দ করিয়া তোলে।

এতক্ষণ যাহা বলিতে চেষ্টা করিতেছি তাহা কথাটা এই যে, যেখানে আপনার সমাপ্তি সেই আপনাকে মানুষ পাইতে চাহিতেছে, আপনার মধ্যে দাঁড়াইতে চাহিতেছে, কারণ সেইখানেই তাহার স্থিতি, সেইখানেই তাহার আনন্দ। সেই তাহার স্বাধীন আপনার সঙ্গেই তাহার সংসারকে তাহার সমস্ত কর্মকে যোজনা করিতে চাহিতেছে। সেখান হইতে যে পরিমাণে সে বিচ্ছিন্ন হয় সেই পরিমাণেই কর্ম তাহার বন্ধন, সংসার তাহার কারাগার। সেখানকার সঙ্গে পূর্ণযোগে কর্মই মানুষের মুক্তি, সংসারই মানুষের অমৃতধাম।

এইবার আর একবার গোড়ার কথায় যাইতে হইবে। আমরা বলিয়াছিলাম, মানুষের সমস্যা এই যে, ছোটোকে বড়োর সঙ্গে মিলাইবার ভার তাহার উপর। আমরা দেখিয়াছি তাহার ছোটো শরীরের সার্থকতা বিশ্বশরীরের মধ্যে, তাহার ছোটো মনের সার্থকতা বিশ্বমানবমনের মধ্যে। 'এই শরীর মনের দিক্ মানুষের ব্যাপ্তির দিক্। আমরা ইহাও দেখিয়াছি শুদ্ধমাত্র এই আমাদের ব্যাপ্তির দিকে আমরা

প্রকৃতির অধীন, আমরা বিশ্বব্যাপী অনন্ত নিয়মপরম্পরার দ্বারা চালিত,—এখানে আমাদের পূর্ণ সুখ নাই, এখানে বাহিরের তাড়নাই আমাদিগকে কাজ করায়। আমাদের মধ্যে যেখানে একটি সমাপ্তির দিক আছে, যে পরিমাণে সেইখানকার সঙ্গে আমাদের এই ব্যাপ্তির যোগসাধন হইতে থাকিবে সেই পরিমাণেই আমাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতে থাকিবে। তখন আমার শরীর আমারই বশীভূত শরীর, আমার মন আমারই বশীভূত মন হইয়া উঠিবে। তখন সর্বমাত্মবশং সুখম্। তখন আমার শরীর মনের বহু বিচিত্র নিয়ম আমার এক আনন্দের অনুগত হইয়া সুন্দর হইয়া উঠিবে। তাহার বহুত্বের দুঃসহ ভার একের মধ্যে বিন্যস্ত হইয়া সহজ হইয়া যাইবে।

কিন্তু যেখানে তাহার সমাপ্তির দিক্, যেখানে তাহার সমগ্র একের দিক্ সখানেও কি তাহার সমস্যাটি নাই?

আছে বই কী। সেখানেও মানুষের আপন, আপনার চেয়ে বড়ো আপনার সঙ্গে মিলিতে চাহিতেছে। মানুষ যখনই আত্মবশ হইয়া আপনার আনন্দকে পায় তখনই বড়ো আনন্দকে সর্বত্র দেখিতে পায়। সেই বড়ো আত্মাকে দেখাই আত্মার স্বভাব, সেই বড়ো আনন্দকে জানাই আত্মানন্দের সহজ প্রকৃতি। মানুষের শরীর বড়ো শরীরকে সহজে দেখিয়াছে, মানুষের মন বড়ো মনকে সহজে দেখিয়াছে, মানুষের আত্মা বড়ো আত্মাকে সহজে দেখে।

এইখানে পৌঁছানো, এইখানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যে চেষ্টা তাহাকেই আমরা ধর্ম বলি। বস্তুত ইহাই মানবের ধর্ম; মানুষের ইহাই স্বভাব, ইহাই তাহার সত্যতম চেষ্টা। বীরের ধর্ম বীরত্ব, রাজার ধর্ম রাজত্ব—মানুষের ধর্ম ধর্মই—তাহাকে আর কোনো নাম দিবার দরকার করে না। মানুষের সকল কর্মের মধ্যে সকল সৃষ্টির মধ্যে এই ধর্ম কাজ করিতেছে। অন্য সকল কাজের উদ্দেশ্য হাতে হাতে বোঝা যায়—ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাই, শীত নিবারণের জন্য পরি কিন্তু ধর্মের উদ্দেশ্যকে তেমন করিয়া চোখে আঙুল দিয়া বুঝাইয়া দিবার জো নাই। কেননা, তাহা কোনো সাময়িক অভাবের জন্য নহে, তাহা মানুষের যাহা কিছু সমস্তের গভীরতম মূলগত। এইজন্য কোনো বিশেষ মানুষ তাহাকে ক্ষণকালের জন্য ভুলিতে পারে, কোনো বিশেষ বুদ্ধিমান তর্কের দিক্ হইতে তাহাকে অস্বীকার করিতে পারে—কিন্তু সমস্ত মানুষ তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে না। মানুষের ইতিহাসে মানুষের সকল প্রয়োজনের মধ্যে, তাহার সমস্ত কাড়াকাড়ি মারামারি তাহার সমস্ত ব্যস্ততার মাঝখানে এই ধর্ম রহিয়াই গিয়াছে;—তাহা অন্নপান নহে, বসনভূষণ নহে, খ্যাতিপ্রতিপত্তি নহে, তাহা এমন কিছুই নহে যাহাকে বাদ দিলে মানুষের আবশ্যকের হিসাবে একটু কিছু গরমিল হয়; তাহাকে বাদ

দিলেও শস্য ফলে, বৃষ্টি পড়ে, আগুন জলে, নদী বহে ; তাহাকে বাদ দিয়া পশুপক্ষীর কোনো অসুবিধাই ঘটে না ; কিন্তু মানুষ তাহাকে বাদ দিতে পারিল না। কেননা, ধর্মকে কেমন করিয়া ছাড়িবে ? প্রয়োজন থাক্ আর নাই থাক্ অগ্নি তাহার তাপধর্মকে ছাড়িতে পারে না, কারণ তাহাই তাহার স্বভাব। বাহির হইতে দেখিলে বলা যায় অগ্নি কাঠকে চাহিতেছে কিন্তু ভিতরের সত্য কথা এই যে, অগ্নি আপন স্বভাবকে সার্থক করিতে চাহিতেছে—সে জ্বলিতে চায় ইহাই তার স্বভাব—এইজন্য কখনো কাঠ, কখনো খড়, কখনো আর কিছুকে সে আত্মসাৎ করিতেছে ; সে দিক দিয়া তাহার উপকরণের তালিকার অন্ত পাওয়া যায় না কিন্তু মূল কথাটি এই যে, সে আপনার স্বভাবকেই পূর্ণ করিতে চাহিতেছে। যখন তাহার উজ্জ্বল শিখাটি দেখা যায় না কেবল কৃষ্ণবর্ণ ধূমই উঠিতে থাকে, তখন সেই চাওয়া তাহার মধ্যে আছে ; যখন সে ভস্মাচ্ছন্ন হইয়া বিলুপ্তপ্রায় হইয়া থাকে তখনও সেই চাওয়া তাহার মধ্যে নির্বাপিত হয় না। কারণ তাহাই তাহার ধর্ম। মানুষেরও সকলের চেয়ে বড়ো চাওয়াটি তাহার ধর্ম। ইহাই তাহার আপনাকে পরম আপনের মধ্যে চাওয়া। অন্য সকল চাওয়ার হিসাব দেওয়া যায়, কারণ, তাহার হিসাব বাহিরে, কিন্তু এই চাওয়াটির হিসাব দেওয়া যায় না, কারণ ইহার হিসাব তাহার আপনারই মধ্যে। এই জন্য তর্কে ইহাকে অস্বীকার করা অত্যন্ত সহজ কিন্তু মূলে ইহাকে অস্বীকার করা একেবারে অসম্ভব। এই জন্যই শাস্ত্রে বলে, ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্। এ তত্ত্ব বাহিরে নাই, এ তত্ত্ব অন্তরের মধ্যে সকলের মূলে নিহিত। সেইজন্য আমাদের তর্কবিতর্কের উপর, স্বীকার-অস্বীকারের উপর ইহার নির্ভর নহে। ইহা আছেই। মানুষের একটা প্রয়োজন আজ মিটিতেছে আর একটা প্রয়োজন কাল মিটিতেছে, যেটা মিটিতেছে সেটা চুকিয়া যাইতেছে—কিন্তু তাহার স্বভাবের চরম চেষ্টা রহিয়াছেই। অবশ্য এ প্রশ্ন মনে উদয় হওয়া অসম্ভব নয় যে, ইহাই যদি মানুষের স্বভাব হয় তবে ইহার বিপরীত আমরা মনুষ্যসমাজে দেখি কেন ? চলিবার চেষ্টাই শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক, তবু তো দেখি শিশু চলিতে পারে না। সে বারংবার পড়িয়া যায়। কিন্তু এই অক্ষমতা হইতে এই পড়িয়া যাওয়া হইতেই আমরা তাহার স্বভাব বিচার করি না। বরঞ্চ এই কথাই আমরা বলি যে শিশু যে বারবার করিয়া পড়িতেছে আঘাত পাইতেছে তবু চলিবার চেষ্টা ত্যাগ করিতেছে না ইহার কারণ চলাই তাহার স্বভাব—সেই স্বভাবের প্রেরণাতেই সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে, সমস্ত আত্মবিরোধের মধ্যে, তাহার চলার চেষ্টা রহিয়া গিয়াছে। শিশু যখন মাটিতে গড়াইতেছে, যখন পৃথিবীর আকর্ষণ কেবলই তাহাকে নিচে টানিয়া টানিয়া ফেলিতেছে তখনও তাহার স্বভাব এই প্রকৃতির আকর্ষণকে কাটাইয়া উঠিতে

চাহিতেছে—সে আপনার শরীরের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব চায়—টলিয়া টলিয়া পড়িতে চায় না ;—ইহা তাহার পক্ষে প্রাকৃতিক নহে, ইহা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। এইজন্য প্রকৃতি যখন তাহাকে ধুলায় টানিয়া ফেলিতে চায় তখন তাহার স্বভাব তাহাকে উপরে টানিয়া রাখিতে চাহে। সমস্ত টলিয়া পড়ার মধ্যে এই স্বভাব তাহাকে কিছুতেই ছাড়ে না।

আমাদের ধর্ম আমাদের সেইরূপ স্বভাব। প্রকৃতির উপরে সকল দিক হইতে আমাদিগকে খাড়া করিয়া তুলিবার জন্য সে কেবলই চেষ্টা করিতেছে—যখন ধুলায় লুটাইয়া তাহাকে অস্বীকার করিতেছি তখনও অন্তরের মধ্যে সে আছে। সে বলিতেছে আপনার স্থিতিকে পাইতেই হইবে, তাহা হইলেই গতিকে পাইবে—দাঁড়াইতে পারিলেই চলিতে পারিবে। আপনাকে পাইলেই সমস্তকে মূলে গিয়া পাইবে। তখন তোমার সমস্ত জীবন প্রাকৃতিক হইবে না, স্বাভাবিক হইবে। স্বভাবে যখন তুমি প্রতিষ্ঠিত হইবে প্রকৃতি তখন তোমার অনুগত হইবে। তখনই তোমার ধর্ম সার্থক হইবে—তখনই তুমি তোমার চরিতার্থতাকে পাইবে।

এই চরিতার্থতার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করিয়া মানুষ বাহির হইতে যাহা কিছু পাইতেছে তাহাতেই তাহার অন্তরতম ইচ্ছা মাথা নাড়িয়া বলিতেছে—যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্। এই চরিতার্থতা হইতে, এই পরিসমাপ্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সে যাহা কিছু দেখিতেছে তাহার মধ্যে সে মৃত্যুকেই দেখিতেছে—কেবল বিচ্ছেদ, কেবল অবসান ; প্রয়োজন আছে তাহার আয়োজন পাই না, আয়োজন আছে তাহার প্রয়োজন চলিয়া যায়। এ যে মৃত্যুকে দেখা, ইহার অর্থ, নিরর্থকতাকে দেখা। মানুষ ইচ্ছা করিল, কাজ করিল, সুখ দুঃখ ভোগ করিল, তাহার পর মরিয়া গেল। সেইখানে মৃত্যুকে যখন দেখি তখন মানুষের জীবনের সমস্ত ইচ্ছা সমস্ত কাজের অর্থকে আর দেখিতে পাই না। তাহার দীর্ঘকালের জীবন মুহূর্তকালে মৃত্যুর মধ্যে হঠাৎ মিথ্যা হইয়া গেল।

পদে পদে এই মৃত্যুকে দেখা, এই অর্থহীনতাকে দেখা তো কখনোই সত্য দেখা নহে। অর্থাৎ ইহা কেবল বাহিরের দেখা ; ভিতরের দেখা নহে ; ইহাই যদি সত্য হইত তবে মিথ্যাই সত্য হইত—তাহা কখনোই সম্ভব হইতে পারে না। জীবনের কার্য ও বিশ্বের ব্যাপ্তির মধ্যে একটি পরমার্থকে দেখিতেই হইবে। মুখে যতই বলি না কেন, কোনো অর্থ নাই ; যতই বলি না কাজ কেবল কাজকে জন্ম দিয়াই চলিয়াছে তাহার কোনো পরিণাম নাই, ব্যাপ্তি কেবলই দেশে কালে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহার সঙ্গে দেশকালাতীত সুগভীর পরিসমাপ্তির কোনোই যোগ নাই মন কোনোমতেই তাহাতে সায় দিতে পারে না।

দ্বারী দরজার কাছে বসিয়া তুলসীদাসের রামায়ণ সুর করিয়া পড়িতেছে। আমি তাহার ভাষা বুঝি না। আমার কেবলই মনে হয়, একটার পর আর একটা শব্দ চলিয়া চলিয়া যাইতেছে; তাহাদের কোনো সম্বন্ধ জানি না। ইহাই মৃত্যুর রূপ; ইহাই অর্থহীনতা। ইহাতে কেবল পীড়া দেয়। যখন ভাষা বুঝি, যখন অর্থ পাই, তখন বিচ্ছিন্ন শব্দগুলিকে আর শুনি না—তখন অর্থের অনবচ্ছিন্ন ঐক্যধারাকে দেখি, তখন অখণ্ড অমৃতকে পাই, তখন দুঃখ চলিয়া যায়। তুলসীদাসের রামায়ণে অর্থের অমৃত শব্দের খণ্ডতাকে পূর্ণ করিয়া দেখাইতেছে। সেই পূর্ণটিকে দেখাই তুলসীদাসের রামায়ণ পড়িবার চরম উদ্দেশ্য—যতক্ষণ সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইবে ততক্ষণ প্রত্যেক শব্দই কেবল আমাদিগকে দুঃখ দিবে। ততক্ষণ পাঠকের মন কেবলই বলিতে থাকিবে, অবিশ্রাম শব্দের পর শব্দ লইয়া আমি কী করিব—অমৃত যদি না পাই তবে ইহাতে আমার কিসের প্রয়োজন।

আমাদেরও সেই কান্না। আমরা যখন কেবলই অন্তহীন ব্যাপ্তির গম্যহীন পথে চলি তখন প্রত্যেক পদক্ষেপ নিরর্থক হইয়া আমাদিগকে কষ্ট দেয়—একটি পরিপূর্ণ পরিসমাপ্তির সঙ্গে যোগ করিয়া যখন তাহাকে দেখি তখনই তাহার সমস্ত ব্যর্থতা দূর হইয়া যায়। তখন প্রতিপদেই আমাদিগকে আনন্দ দিতে থাকে। তখন মৃত্যুই আমাদের কাছে মিথ্যা হইয়া যায়। তখন এক অখণ্ড অমৃতে জগৎকে এবং জীবনকে আদ্যন্ত পরিপূর্ণ দেখিয়া আমাদের সমস্ত দারিদ্র্যের অবসান হয়। তখন সা রি গা মা-র অরণ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া মরি না—রাগিণীর পরিপূর্ণ রসের সমগ্রতায় নিমগ্ন হইয়া আশ্রয় লাভ করি।

পৃথিবী জুড়িয়া নানা দেশে নানা কালে নানা জাতির নানা ইতিহাসে মানুষ এই রাগিণী শিখিতেছে। যে এক অখণ্ড পরিপূর্ণ আনন্দ হইতে বিশ্বজগৎ নব নব তানের মতো কেবলই আকাশ হইতে আকাশে বিস্তীর্ণ হইতেছে—সেই আনন্দ-রাগিণী মানুষ সাধিতেছে। ওস্তাদের ঘরে তাহার জন্ম, পিতার কাছে তাহার শিক্ষা। পিতার অনাদি বীণাযন্ত্রের সঙ্গে সে সুর মিলাইতেছে। সেই একের সুরে যতই তাহার সুর মিলিতে থাকে, সেই একের আনন্দে যতই তাহার আনন্দ নিরবচ্ছিন্ন হইয়া উঠিতে থাকে, বহুর তানমানের মধ্যে ততই তাহার বিঘ্ন কাটিয়া যায়, দুঃখ দূর হয়—বহুকে ততই সে আনন্দের লীলা বলিয়া দেখে; বহুর মধ্যে তাহার ক্লান্তি আর থাকে না, সমস্তের সামঞ্জস্যকে সে একের মধ্যে লাভ করিয়া বিক্ষেপের হাত হইতে রক্ষা পায়। ধর্ম সেই সংগীতশালা যেখানে পিতা তাঁহার পুত্রকে গান শিখাইতেছেন, পরমাত্মা হইতে আত্মার সুর সঞ্চারিত হইতেছে। এই সংগীতশালায় যে সর্বত্রই সংগীত পরিপূর্ণ হইয়া

উঠিতেছে তাহা নহে। সুর মিলিতেছে না, তাল কাটিয়া যাইতেছে; এই বেসুর বেতালকে সুরে তালে সংশোধন করিয়া লইবার দুঃখ অত্যন্ত কঠোর; সেই কঠোর দুঃখে কতবার তার ছিঁড়িয়া যায়, আবার তার সারিয়া লইতে হয়। সকলের এক রকমের ভুল নহে, সকলের একজাতীয় বাধা নহে, কাহারও বা সুরে দোষ আছে, কাহারও বা তালে, কেহ বা সুর তাল উভয়েই কাঁচা; এইজন্য সাধনা স্বতন্ত্র। কিন্তু লক্ষ্য একই। সকলকেই সেই এক বিশুদ্ধ সুরে যন্ত্র বাঁধিয়া, এক বিশুদ্ধ রাগিণী আলাপ করিয়া, এক বিশুদ্ধ আনন্দের মধ্যে মুক্তিলাভ করিতে হইবে, যেখানে পিতার সঙ্গে পুত্রের, গুরুর সঙ্গে শিষ্যের যন্ত্রে যন্ত্রে কণ্ঠে কণ্ঠে হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিয়া গিয়া যোগের সার্থকতা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

১৩১৮

ধর্মশিক্ষা

বালকবালিকাদিগকে গোড়া হইতেই ধর্মশিক্ষা কেমন করিয়া দেওয়া যাইতে পারে এ তর্ক আজকাল খ্রীস্টান মহাদেশে খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এবং বোধ করি কতকটা একই কারণে এ চিন্তা আমাদের দেশেও জাগ্রত হইবার উপক্রম করিতেছে। ব্রাহ্ম-সমাজে এই ধর্মশিক্ষার কিরূপ আয়োজন হইতে পারে সেই বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য বন্ধুগণ আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন।

ধর্মসম্বন্ধে আমাদের অধিকাংশ লোকের একটা সংকট এই দেখিতে পাই যে, আমাদের একটা মোটামুটি সংস্কার আছে যে, ধর্ম জিনিসটা প্রার্থনীয় অথচ তাহার প্রার্থনাটা আমাদের জীবনে সত্য হইয়া উঠে নাই। এইজন্য তাহা আমরা চাহিও বটে কিন্তু যতদূর সম্ভব সস্তায় পাইতে চাই—সকল প্রয়োজনের শেষে উদ্‌বৃত্তটুকু দিয়া কাজ সারিয়া লইবার চেষ্টা করি।

সস্তা জিনিস পৃথিবীতে অনেক আছে তাহাদিগকে অল্প চেষ্টাতেই পাওয়া যায় কিন্তু মূল্যবান জিনিস কী করিয়া বিনামূল্যে পাওয়া যাইতে পারে এ কথা যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিতে আসে তবে বুঝিতে হইবে সে ব্যক্তি সিঁধ কাটিবার বা জাল করিবার পরামর্শ চাহে; সে জানে উপার্জনের বড়ো রাস্তাটা প্রশস্ত এবং সেই বড়ো রাস্তাটা ধরিয়াই জগতের মহাজনেরা চিরকাল মহাজনি করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু সেই রাস্তায় চলিবার মতো সময় দিতে বা পাথেয় খরচ করিতে সে রাজি নহে।

তাই ধর্মশিক্ষাসম্বন্ধে আমরা সত্যই কিরূপ পরামর্শ চাহিতেছি সেটা একটু ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখা দরকার। কারণ, গীতায় বলিয়াছেন, আমাদের ভাবনাটা যেরূপ তাহার সিদ্ধিও সেইরূপ হইয়া থাকে। আমাদের ভাবনাটা কী? যদি এমন কথা আমাদের মনে থাকে যে, যেমন যাহা আছে এমনিই সমস্ত থাকিবে, তাহাকে বেশি কিছু নাড়াচাড়া করিব না অথচ তাহাকেই পূর্ণভাবে সফল করিয়া তুলিব, তবে পিতলকে সোনা করিয়া তুলিবার আশা দেওয়া যে সকল চতুর লোকের ব্যবসায় তাহাদেরই শরণাপন্ন হইতে হয়।

কিন্তু এমন অবস্থা আছে যখন ধর্মশিক্ষা নিতান্তই সহজ। একেবারে নিশ্বাসগ্রহণের মতোই সহজ। তবে কিনা যদি কোথাও বাধা ঘটে তবে নিশ্বাসগ্রহণ এমনি কঠিন হইতে পারে যে বড়ো বড়ো ডাক্তারেরা হাল ছাড়িয়া দেয়। যখনই মানুষ বলে আমার নিশ্বাস লওয়ার প্রয়োজন ঘটিয়াছে তখনই বুঝিতে হইবে ব্যাপারটা শক্ত বটে।

ধর্মসম্বন্ধেও সেইরূপ। সমাজে যখন ধর্মের বোধ যে কারণেই হউক উজ্জ্বল হয়, তখন স্বভাবতই সমাজের লোক ধর্মের জন্য সকলের চেয়ে বড়ো ত্যাগ করিতে থাকে—তখন ধর্মের জন্য মানুষের চেষ্টা চারিদিকেই নানা আকারে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে থাকে—তখন দেশের ধর্মমন্দির ধনীর ধনের অধিকাংশকে এবং শিল্পীর শিল্পের শ্রেষ্ঠ প্রয়াসকে অনায়াসে আকর্ষণ করিয়া আনে—তখন ধর্ম যে কত বড়ো জিনিস তাহা সমাজের ছেলেমেয়েদের বুঝাইবার জন্য কোনো প্রকার তাড়না করিবার দরকার হয় না। সেই সমাজে অনেকেই আপনিই ধর্মসাধনার কঠোরতাকে আনন্দের সহিত বরণ করিয়া লইতে পারে। আমাদের দেশের ইতিহাস অনুসরণ করিলে এরূপ সমাজের আদর্শকে নিতান্ত কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

ধর্ম যেখানে পরিব্যাপ্ত ধর্মশিক্ষা সেইখানেই স্বাভাবিক। কিন্তু যেখানে তাহা জীবন-যাত্রার কেবল একটা অংশমাত্র সেখানে মন্ত্রীরা বসিয়া যতই মন্ত্রণা করুক না কেন ধর্ম-শিক্ষা যে কেমন করিয়া যথার্থরূপে দেওয়া যাইতে পারে ভাবিয়া তাহার কিনারা পাওয়া যায় না।

পৃথিবীর প্রায় সকল সমাজেই আধুনিকদের যে দশা ব্রাহ্মসমাজেও তাহাই লক্ষিত হইতেছে। আমাদের বুদ্ধির এবং ইচ্ছার টান বাহিরের দিকেই এত অত্যন্ত যে অন্তরের দিকে রিক্ততা আসিয়াছে। এই অসামঞ্জস্য যে কী নিদারুণ তাহা উপলব্ধি করিবার অবকাশই পাই না—বাহিরের দিকে ছুটিয়া চলিবার মত্ততা দিনরাত্রি আমাদিগকে দৌড় করাইতেছে। এমন কি, আমাদের ধর্মসমাজসম্বন্ধীয় চেষ্টাগুলিও নিরন্তর ব্যস্ততাময় উত্তেজনা-পরম্পরার আকার ধারণ করিতেছে। অন্তরের দিকে একটুও তাকাইবার

যদি অবসর পাইতাম তবে দেখিতাম তাহা গ্রীষ্মকালের বালুকাবিস্তীর্ণ নদীর মতো— সেখানে অগভীর ধর্মবোধ আমাদের জীবনযাত্রার নিতান্ত একপাশে আসিয়া ঠেকিয়াছে; তাহাকে আমরা অধিক জায়গা ছাড়িয়া দিতে চাই না। আমরা নবযুগের মানুষ, আমাদের জীবনযাত্রায় সরলতা নাই; আমাদের ভোগের আয়োজন প্রচুর এবং তাহার অভিমানও অত্যন্ত প্রবল; ধর্ম আমাদের অনেকের পক্ষেই সামাজিকতার একটা অঙ্গমাত্র। এমন কি, সমাজে এমন লোক দেখিয়াছি যাঁহারা যথার্থ ধর্মনিষ্ঠাকে চিত্তের দুর্বলতা বলিয়া অন্তরের সহিত অবজ্ঞা করিয়া থাকেন।

এইরূপে ধর্মকে যদি আমাদের জীবনের এককোণে সরাইয়া রাখি, অথচ এই অবস্থায় ছেলেমেয়েদের জন্য ধর্মশিক্ষা কী করিয়া অল্পমাত্রায় ভদ্রতারক্ষার পরিমাণে বরাদ্দ করা যাইতে পারে সে কথা চিন্তা করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠি তবে সেই উদ্বেগ অত্যন্ত সহজে কী উপায়ে নিবারণ করা যাইতে পারে তাহা বলা অত্যন্ত কঠিন। তবু, বর্তমান অবস্থাকে স্বীকার করিয়া লইয়াই ব্যবস্থা চিন্তা করিতে হইবে। অতএব এ সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা করিয়া দেখা কর্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

এক সময়ে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই শিক্ষাব্যাপারটা ধর্মাচার্যগণের হাতে ছিল। তখন রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে এমন একটা অনিশ্চয়তা ছিল যে, দেশের সর্বসাধারণে দীর্ঘকাল শান্তি ভোগ করিবার অবসর পাইত না। এইজন্য জাতিগত সমস্ত বিদ্যা ও ধর্মকে অবিচ্ছিন্নভাবে রক্ষা করিবার জন্য স্বভাবতই এমন একটি বিশেষ শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছিল যাহার প্রতি ধর্মালোচনা ও শাস্ত্রালোচনা ছাড়া আর কোনোপ্রকার সামাজিক দাবি ছিল না; তাহার জীবিকার ভারও সমাজ গ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং এই শ্রেণীর লোকেরাই সমাজের শিক্ষক ছিলেন। তখন শিক্ষার বিষয় ছিল সংকীর্ণ, শিক্ষার্থীও ছিল অল্প, এবং শিক্ষকের দলও ছিল একটি সংকীর্ণ সীমায় বদ্ধ। এই কারণে শিক্ষাসমস্যা তখন বিশেষ জটিল ছিল না, তাই তখনকার ধর্মশিক্ষা ও অন্যান্য শিক্ষা অনায়াসে একত্র মিলিত হইয়াছিল।

এখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। রাষ্ট্রব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের শিক্ষালাভের ইচ্ছা চেষ্টা ও সুযোগ প্রশস্ত হইয়া উঠিতেছে, সেই সঙ্গে বিদ্যার শাখা-প্রশাখাও চারিদিকে অবাধে বাড়িয়া চলিয়াছে। এখন কেবল ধর্মযাজকগণের রেখাঙ্কিত গণ্ডির ভিতর সমস্ত শিক্ষাব্যাপার বদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহিতেছে না।

তবু সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও পুরাতন প্রথা সহজে মরিতে চায় না। তাই বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষা কোনোমতে এ পর্যন্ত ধর্মশিক্ষার সঙ্গে ন্যূনাধিক পরিমাণে জড়িত হইয়া চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু সমস্ত য়ুরোপখণ্ডেই আজ তাহাদের বিচ্ছেদ-

সাধনের জন্য তুমুল চেষ্টা চলিতেছে। এই বিচ্ছেদকে কোনোমতেই স্বাভাবিক বলিতে পারি না কিন্তু তবু বিশেষ কারণে ইহা অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে।

কেননা, সেখানকার ইতিহাসে ইহা দেখা গিয়াছে যে, একদিন যে ধর্মসম্প্রদায় দেশের বিদ্যাকে পালন করিয়া আসিয়াছে, পরে তাহারাই সে বিদ্যাকে বাধা দিবার সর্বপ্রধান হেতু হইয়া উঠিল। কারণ বিদ্যা যতই বাড়িয়া উঠিতে থাকে ততই সে প্রচলিত ধর্মশাস্ত্রের সনাতন সীমাকে চারিদিকেই অতিক্রম করিতে উদ্যত হয়। শুধু যে বিশ্বতত্ত্ব ও ইতিহাসসম্বন্ধেই সে ধর্মশাস্ত্রের বেড়া ভাঙিতে বসে তাহা নহে, মানুষের চারিত্রনীতিগত নূতন উপলব্ধির সঙ্গেও প্রাচীন শাস্ত্রানুশাসনের আগাগোড়া মিল থাকে না।

এমন অবস্থায় হয় ধর্মশাস্ত্রকে নিজের ভ্রান্তি কবুল করিতে হয়, নয় বিদ্রোহী বিদ্যা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে ;—উভয়ের এক অন্নে থাকা আর সম্ভবপর হয় না।

কিন্তু ধর্মশাস্ত্র যদি স্বীকার করে যে, কোনো অংশে তাহার জ্ঞান অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত তবে তাহার প্রতিষ্ঠাই চলিয়া যায়। কারণ, সে বিশুদ্ধ দৈববাণী এবং তাহার সমস্ত দলিল ও পরোয়ানার উপর স্বয়ং সর্বজ্ঞ দেবতার সীলমোহরের স্বাক্ষর আছে এই বলিয়াই সে আপন শাসন পাকা করিয়া আসিয়াছে। বিদ্যা তখন বিশ্বেশ্বরের বিশ্বশাস্ত্রকে সাক্ষী মানে আর ধর্মসম্প্রদায় তাহাদের সনাতন ধর্মশাস্ত্রকে সাক্ষী খাড়া করিয়া তোলে—উভয়ের সাক্ষ্যে এমনি বিপরীত অমিল ঘটিতে থাকে যে, ধর্মশাস্ত্র ও বিশ্বশাস্ত্র যে একই দেবতার বাণী এ কথা আর টেঁকে না এবং এ অবস্থায় ধর্মশিক্ষা ও বিদ্যাশিক্ষাকে জোর করিয়া মিলাইয়া রাখিতে গেলে হয় মূঢ়তাকে নয় কপটতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

প্রথম কিছুদিন মারিয়া কাটিয়া বাঁধিয়া পুড়াইয়া একঘরে করিয়া বিদ্যার দলকে চিরকেলে দাঁড়ে বসাইয়া চিরদিন আপনার পুরাতন বুলি বলাইবার জন্য ধর্মের দল উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল কিন্তু বিদ্যার পক্ষ যতই প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল ধর্মের পক্ষ ততই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যার দ্বারা আপনার বুলিকে বৈজ্ঞানিক বুলির সঙ্গে অভিন্ন প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা শুরু করিয়া দিল। এখন এমন একটা অসামঞ্জস্য আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে বর্তমান কালে য়ুরোপে রাজা বা সমাজ ধর্মবিশ্বাসকে কঠোর শাসনে আটে-ঘাটে বাঁধিয়া রাখিবার আশা একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছে। এইজন্যই পাশ্চাত্যদেশে প্রায় সর্বত্রই বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে ধর্মশিক্ষার যোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইবার আয়োজন চলিতেছে। এইজন্য সেখানে সন্তানদিগকে বিনা ধর্মশিক্ষায় মানুষ করিয়া তোলা ভালো কি মন্দ সে তর্ক কিছুতেই মিটিতে চাহিতেছে না।

আমাদের দেশেও আধুনিক কালে সে সমস্যা ক্রমশই দুরূহ হইয়া উঠিতেছে।

কেননা বিদ্যাশিক্ষার দ্বারাতেই আমাদের ধর্মবিশ্বাস শিথিল হইয়া পড়িতেছে। উভয়ের মধ্যে এক জায়গায় বিরোধ ঘটিয়াছে। কারণ আমাদের দেশেও স্মৃতিতত্ত্ব ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতি অধিকাংশ বিদ্যাই পৌরাণিক ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্গত। দেবদেবীদের কাহিনীর সঙ্গে তাহারা এমন করিয়া জড়িত যে, কোনোপ্রকার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার সাহায্যেও তাহাদিগকে পৃথক্‌ করা অসম্ভব বলিলেই হয়। যখনই আমাদের দেশের আধুনিক ধর্মাচার্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাদ্বারা পৌরাণিক কাহিনীর সত্যতা প্রমাণ করিতে বসেন তখনই তাঁহারা বিপদকে উপস্থিতমতো ঠেকাইতে গিয়া তাহাকে বদ্ধমূল করিয়া দেন। কারণ বিজ্ঞানকে যদি একবার বিচারক বলিয়া মানেন তবে কেবলমাত্র ওকালতির জোরে চিরদিন মকদ্দমায় জিত হইবার আশা নাই। বরাহ অবতার যে সত্যসত্যই বরাহবিশেষ নহে তাহা ভূকম্পশক্তির রূপকমাত্র এ কথা বলাও যা আর ধর্মবিশ্বাসের শাস্ত্রীয় ভিত্তিকে কোনোপ্রকারে ভদ্রতা রক্ষা করিয়া বিদায় করাও তা। কেবলমাত্র শাস্ত্রলিখিত মত ও কাহিনীগুলি নহে শাস্ত্রীয় সামাজিক অনুশাসনগুলিকেও আধুনিক কালের বুদ্ধি অভিজ্ঞতা ও অবস্থান্তরের সহিত সংগতরূপে মিলাইয়া তোলাও একেবারে অসাধ্য। অতএব বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সামাজিক আচারকে আমরা কোনো মতেই শাস্ত্রসীমার মধ্যে খাপ খাওয়াইয়া রাখিতে পারিব না। এমন অবস্থায় আমাদের দেশেও প্রচলিত ধর্মশিক্ষার সহিত অন্য শিক্ষার প্রাণান্তিক বিরোধ ঘটিতে বাধ্য এবং আমাদের জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে সেরূপ বিরোধ ঘটিতেছেই। এই জন্য এ দেশে হিন্দু-বিদ্যালয়সম্বন্ধীয় নূতন যে সকল উদ্‌যোগ চলিতেছে তাহার প্রধান চিন্তা এই যে, বিদ্যাশিক্ষার মাঝখানে ধর্মশিক্ষাকে স্থান দেওয়া যায় কী করিয়া।

আধুনিক কালের জ্ঞান বিজ্ঞান ও মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ আদর্শের সহিত প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের যে বিরোধ ঘটিয়াছে তাহার উল্লেখ করিলাম। কিন্তু সেই বিরোধের কথাটা যদি ছাড়িয়া দিই; যদি শিথিলভাবে চিন্তা ও অন্ধভাবে বিশ্বাস করাটাকে দোষ বলিয়া গণ্য না করি, যদি সত্যকে যথাযথরূপে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা ও অভ্যাসকে আমাদের প্রকৃতিতে সুদৃঢ় করিয়া তোলা মনুষ্যত্ব লাভের পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক বলিয়া মনে না হয় তবে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে এইরূপ বাঁধা ধর্মশাস্ত্রের একটা সুবিধা আছে। ধর্মসম্বন্ধে বালকদিগকে কী শিখাইব, কেমন করিয়া শিখাইব তাহা লইয়া বেশি কিছু ভাবিতে হয় না, তাহাদের বুদ্ধিবিচারকে উদ্বোধিত করিবার প্রয়োজন হয় না, এমন কি, না করারই প্রয়োজন হয়; কতকগুলি নির্দিষ্ট মত কাহিনী ও আচারকে ধ্রুব সত্য বলিয়া তাহাদের মনে সংস্কার বদ্ধ করিয়া দিলেই যথোচিত ধর্মশিক্ষা দেওয়া হইল বলিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

বস্তুত ব্রাহ্মসমাজে ধর্মশিক্ষাসম্বন্ধে যে সমস্যা দাঁড়াইয়াছে তাহা এইখানেই। আমরা মানুষের মনকে বাঁধিব কী দিয়া? তাহাকে ব্যাপৃত করিব কিরূপে, তাহাকে আকর্ষণ করিব কী উপায়ে? যেমন কেবলমাত্র বৃষ্টি বর্ষণ হইলেই তাহাকে সম্পূর্ণ কাজে লাগানো যায় না, তাহাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য নানাপ্রকার পাকা ব্যবস্থা থাকা চাই তেমনি কেবলমাত্র ধর্মবক্তৃতায় যদি বা ক্ষণকালের জন্য মনকে একটু ভিজায় কিন্তু তাহা গড়াইয়া চলিয়া যায়, মধ্যাহ্নের পিপাসায়, গৃহদাহের দুর্বিপাকে তাহাকে খুঁজিয়া পাই না। তা ছাড়া মন জিনিসটা কতকটা জলের মতো, তাহাকে কেবল একদিকে চাপিয়া ধরিলেই ধরা যায় না, তাহাকে সকল দিক দিয়া ঘিরিয়া ধরিতে হয়।

কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে মানুষের মনকে নানা দিক দিয়া আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া ধরিবার বাঁধা পদ্ধতি নাই। তাই আমরা কেবলই আক্ষেপ করিয়া থাকি ছেলেদের মন যে আলগা হইয়া খসিয়া খসিয়া যাইতেছে। তথাপি এই প্রকার অনির্দিষ্টতার যে অসুবিধা আছে তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে কিন্তু সাম্প্রদায়িক অতি-নির্দিষ্টতার যে সাংঘাতিক অকল্যাণ তাহা স্বীকার করা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

ব্রাহ্মধর্মের ভিতরকার এই অনির্দিষ্টতাকে যথাসম্ভব দূর করিয়া তাহাকে এক জায়গায় চিরন্তনরূপে স্থির রাখিবার জন্য আজকাল ব্রাহ্মসমাজের কেহ কেহ ব্রাহ্মধর্মকে একটি ধর্মতত্ত্ব একটি বিশেষ ফিলজফি বলিতে ইচ্ছা করেন। ইহার মধ্যে কতটুকু দ্বৈত, কতটুকু অদ্বৈত,কতটুকু দ্বৈতাদ্বৈত ; ইহার মধ্যে শংকরের প্রভাব কতটা, কতটা কাণ্টের, কতটা হেগেল বা গ্রীনের তাহা একেবারে পাকা করিয়া একটা কোনো বিশেষ তত্ত্বকেই চিরকালের মতো ব্রাহ্মধর্ম নাম দিয়া সমাপ্ত করিয়া দিবার জন্য তাঁহারা উদ্যত হইয়াছেন। বস্তুত ব্রাহ্মসমাজের প্রতি যাঁহাদের শ্রদ্ধা নাই তাঁহারা অনেকেই এই কথা বলিয়াই ব্রাহ্মধর্মকে নিন্দা করিয়াছেন যে, উহা ধর্মই নহে উহা একটা ফিলজফি মাত্র ; ইঁহারা সেই কলঙ্ককেই গৌরব বলিয়া বরণ করিয়া লইতে চাহেন।

অথচ ইহা আমরা স্পষ্টই প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, ব্রাহ্মধর্ম অন্যান্য বিশ্বজনীন ধর্মেরই ন্যায় ভক্তের জীবনকে আশ্রয় করিয়াই ইতিহাসে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহা কোনো ধর্মবিদ্যালয়ের টেক্স্টবুককমিটির সংকলিত সামগ্রী নহে এবং ইহা গ্রন্থের পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদে পরিচ্ছিন্ন হইয়া কোনো দপ্তরির হাতে মজবুত করিয়া বাঁধাই হইয়া যায় নাই।

যাহা জীবনের সামগ্রী তাহা বাড়িবে, তাহা চলিবে। একটা পাথরকে দেখাইয়া বলিতে পার ইহাকে যেমনটি দেখিতেছ ইহা তেমনই কিন্তু একটা বীজ সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। তাহার মধ্যে এই একটি আশ্চর্য রহস্য আছে যে, সে যেমনটি সে তাহার চেয়ে অনেক বড়ো। এই রহস্যকে যদি অনির্দিষ্টতা বলিয়া নিন্দা কর, তবে ইহাকে

জাঁতায় ফেলিয়া পেষ—ইহার জীবধর্মকে নষ্ট করিয়া ফেল। কিন্তু যিনি যাহাই বলুন ব্রাহ্মধর্ম কোনো একটি বিশেষ নির্দিষ্ট সুপ্রণালীবদ্ধ তত্ত্ববিদ্যা নহে। কারণ, আমরা ইহাকে ভক্তের জীবনউৎস হইতে উৎসারিত হইতে দেখিয়াছি। তাহা ডোবা নহে, বাঁধানো সরোবর নহে, তাহা কালের ক্ষেত্রে ধাবিত নদী - তাহার রূপ প্রবহমান রূপ তাহা বাধাহীন বেগে নব নব যুগকে আপন অমৃতধারা পান করাইয়া চলিবে,—নব নব হেগেল ও গ্রীন তাহার মধ্যে নব নব পাথরের ঘাট বাঁধাইয়া দিতে থাকিবে, - কিন্তু সে সকল ঘাটকেও তাহা বহুদূরে ছাড়াইয়া চলিবে—কোনো স্পর্ধিত তত্ত্বজ্ঞানীকে সে এমন কথা কদাচ বলিতে দিবে না যে ইহাই তাহার শেষ তত্ত্ব। কোনো দর্শনতত্ত্ব এই ধর্মকে একেবারে বাঁধিয়া ফেলিবার জন্য যদি ইহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফাঁস লইয়া ছোটে তবে এ কথা তাহাকে মনে রাখিতে হইবে যে, যদি ইহাকে বন্দী করিতে হয় তবে তাহার আগে ইহাকে বধ করিতে হইবে।

তাই যদি হইল তবে ব্রাহ্মধর্মের ভাবাত্মক লক্ষণটি কী ? তাহা একটা মোটা কথা, তাহা অনন্তের ক্ষুধাবোধ, অনন্তের রসবোধ। এই অনন্তের জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করিয়া যিনি যেরূপ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, কারণ এরূপ ব্যাখ্যা চিরকালই চলিবে, এ রহস্যের অন্ত পাওয়া যাইবে না ; কিন্তু আসল কথা এই যে রামমোহন রায় হইতে কেশবচন্দ্র সেন পর্যন্ত সকলেরই জীবনে আমরা এই অনন্তের ক্ষুধাবোধের আনন্দ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। দেশের প্রচলিত আচার ও ধর্মবিশ্বাস যে তাঁহাদের জ্ঞানকে আঘাত দিয়াছে তাহা নহে, তাঁহাদের প্রাণকে আঘাত দিয়াছে।

কিন্তু ব্রাহ্মধর্মকে কয়েকজন মানুষের জীবনের মধ্য দিয়া দেখিতে গেলেও তাহাকে ছোটো করিয়া দেখা হইবে। বস্তুত ইহা মানব-ইতিহাসের সামগ্রী। মানুষ আপনার গভীরতম অভাব মোচনের জন্য নিয়ত যে গূঢ় চেষ্টা করিতেছে ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টির মধ্যে আমরা তাহারই পরিচয় পাই। মানুষ যতবারই কৃত্রিম আচারপদ্ধতির দ্বারা অনন্তকে ছোটো করিয়া আপনার সুবিধার মতো করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছে ততবারই সে সোনা ফেলিয়া আঁচলে গ্রন্থি বাঁধিয়াছে। আমি একবার অত্যন্ত অদ্ভুত এই একটা স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম যে, মা তাহার কোলের ছেলেটিকে সর্বত্র অতি সহজে বহন করিবার সুবিধা করিতে গিয়া তাহার মুণ্ডটা কাটিয়া লইয়াছিল। ইহা স্বপ্ন বটে কিন্তু মানুষ এমন কাজ করিয়া থাকে। আইডিয়াকে সহজসাধ্য করিবার জন্য সে তাহার মাথা কাটিয়া তাহাকে দিব্য সংক্ষিপ্ত করিয়া লয় ইহাতে মুণ্ডটাকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ আয়ত্ত করা যায় বটে কিন্তু প্রাণটাকেই বাদ দিতে হয়। এমনি করিয়া মানুষ যেটাকে সব চেয়ে বেশি চায় সেইটে হইতেই আপনাকে সব চেয়ে বেশি ফাঁকি দিতে থাকে।

এইরূপ অবস্থায় মানুষের মধ্যে দুই দল হইয়া পড়ে। এক দল আপনার সাধনার সামগ্রীকে খেলার সামগ্রী করিয়া সেই খেলাটাকেই সিদ্ধি মনে করে—আর এক দল ইহাদের খেলার বিঘ্ন না করিয়া অতিদূরে নিভৃতে গিয়া আপনার সাধনার বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করে।

কিন্তু এমন করিয়া কখনোই চিরদিন চলে না। যখন চারিদিক অচেতন, সমস্ত দ্বার রুদ্ধ, সমস্ত দীপ নির্বাপিত, অভাব যখন এতই অধিক যে অভাববোধ চলিয়া গিয়াছে, বাধা যখন এত নিবিড় যে মানুষ তাহাকে আপনার আশ্রয় বলিয়া অবলম্বন করিয়া ধরে, সেই সময়েই অভাবনীয়রূপে প্রতিকারের দূত কোথা হইতে দ্বারে আসিয়া দাঁড়ায় তাহা বুঝিতেই পারি না। তাহাকে কেহ প্রত্যাশা করে না, কেহ চিনে না, সকলেই তাহাকে শত্রু বলিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে। এদেশে একদিন যখন রাশীকৃত প্রাণহীন সংস্কারের বাধা অনন্তের বোধকে আচ্ছন্ন করিয়া ধরিয়াছিল; মানুষের জীবনযাত্রাকে তুচ্ছ ও সমাজকে শতখণ্ড করিয়া তুলিয়াছিল; মনুষ্যত্বকে যখন আমরা সংকীর্ণ গ্রাম্যতার মধ্যেই আবদ্ধ করিয়া দেখিতেছিলাম; বিশ্বব্যাপারের কোথাও যখন আমরা একের অমোঘ নিয়ম দেখি নাই, কেবল দশের উৎপাতই কল্পনা করিতেছিলাম; উন্মত্তের দুঃস্বপ্নের মতো যখন সমস্ত জগৎকে বিচিত্র বিভীষিকায় পরিপূর্ণ দেখিতেছিলাম এবং কেবলই মন্ত্রতন্ত্র তাগাতাবিজ শান্তিস্বস্ত্যয়ন মানত ও বলিদানের দ্বারা ভীষণ শত্রুকল্পিত সংসারে কোনোমতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলাম; এইরূপে যখন চিন্তায় ভীরুতা, কর্মে দৌর্বল্য, ব্যবহারে সংকোচ এবং আচারে মূঢ়তা সমস্ত দেশের পৌরুষকে শতদীর্ণ করিয়া অপমানের রসাতলে আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছিল—সেই সময়ে বাহিরের বিশ্ব হইতে আমাদের জীর্ণ প্রাচীরের উপরে একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগিল, সেই আঘাতে যাঁহারা জাগিয়া উঠিলেন তাঁহারা একমুহূর্তেই নিদারুণ বেদনার সহিত বুঝিতে পারিলেন কিসের অভাব এখানে, কিসের এই অন্ধকার এই জড়তা এই অপমান, কিসের এই জীবিত-মৃত্যুর আনন্দহীন সর্বব্যাপী অবসাদ! এখানে আকাশ খণ্ডিত, আলোক নিষিদ্ধ, অনন্তের প্রাণসমীরণ প্রতিহত; এখানে নিখিলের সহিত অবাধ যোগ সহস্র কৃত্রিমতার প্রাচীরে প্রতিরুদ্ধ। তাঁহাদের সমস্ত প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, ভূমাকে চাই, ভূমাকে চাই।

এই কান্নাই সমস্ত মানুষের কান্না। পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ কোথাও বা আপনার বহু প্রাচীন অভ্যাসের আবরণের দ্বারা আপনার মঙ্গলকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে, কোথাও বা সে আপনার নানা রচনার দ্বারা সঞ্চয়ের দ্বারা কেবলই আপনাকে বড়ো করিতে গিয়া আপনার চেয়ে বড়োকে হারাইয়া ফেলিতেছে। কোথাও বা সে

নিষ্ক্রিয়ভাবে জড়তার দ্বারা কোথাও বা সে সক্রিয়ভাবে প্রয়াসের দ্বারাই মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতাকে বিস্মৃত হইয়া বসিয়াছে।

এই বিস্মৃতির গভীর তলদেশ হইতে আপনাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা, ইহাই আমরা ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাসের আরম্ভেই দেখিতে পাই। মানুষের সমস্ত বোধকেই অনন্তের বোধের মধ্যে উদ্বোধিত করিয়া তুলিবার প্রয়াসই ব্রাহ্মধর্মের সাধনারূপে প্রকাশ পাইয়াছে। সেই জন্যই আমরা দেখিতে পাইলাম, রামমোহন রায়ের জীবনের কর্মক্ষেত্র সমস্ত মনুষ্যত্ব। রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, সকল দিকেই তাঁহার চিত্ত পূর্ণবেগে ধাবিত হইয়াছে। কেবলমাত্র কর্মশক্তির স্বাভাবিক প্রাচুর্যই তাহার মূল প্রেরণা নহে—ব্রহ্মের বোধ তাঁহার সমস্ত শক্তিকে অধিকার করিয়াছিল। সেই বোধের মধ্য দিয়া তিনি মানুষকে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই মানুষকে সকল দিকেই এমন বড়ো করিয়া এমন সত্য করিয়া দেখিয়াছিলেন; সেই জন্যই তাঁহার দৃষ্টি সমস্ত সংস্কারের বেষ্টন ছাড়াইয়া গিয়াছিল; সেই জন্য কেবল যে তিনি স্বদেশের চিত্তশক্তির বন্ধনমোচন কামনা করিয়াছিলেন তাহা নহে, মানুষ যেখানেই কোনো মহৎ অধিকার লাভ করিয়া আপনার মুক্তির ক্ষেত্রকে বড়ো করিতে পারিয়াছে সেইখানেই তিনি তৃপ্তিবোধ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজে, আরম্ভে এবং আজ পর্যন্ত এই সত্যকেই আমরা সকলের চেয়ে বড়ো করিয়া দেখিতেছি। কোনো বিশেষ শাস্ত্র, বিশেষ মন্দির, বিশেষ দর্শনতন্ত্র বা পূজাপদ্ধতি যদি এই মুক্ত সত্যের স্থান নিজে অধিকার করিয়া লইতে চেষ্টা করে তবে তাহা ব্রাহ্মধর্মের স্বভাববিরুদ্ধ হইবে। আমরা মানুষের জীবনের মধ্যেই এই সত্যকে নিশ্চিতরূপে প্রত্যক্ষ করিব যে, অনন্তবোধের আলোকে সমস্তকে দেখা এবং অনন্তবোধের প্রেরণায় সমস্ত কাজ করা ইহাই মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ সিদ্ধি—ইহাই মানুষের সত্যধর্ম।

ধর্মশিক্ষা কেমন করিয়া দেওয়া যাইবে তাহা আলোচনার পূর্বে আমরা কাহাকে ধর্ম বলি তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝিয়া দেখা আবশ্যক বলিয়া এত কথা বলিতে হইল। এ কথা স্থির জানিতে হইবে যে, বাঁধা বচন মুখস্থ করা বা বাঁধা আচার অভ্যাস করা আমাদের ধর্মশিক্ষা নহে। অতএব ইহার যে অসুবিধা আছে তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। অন্যান্য সাম্প্রদায়িক ধর্মে অন্য প্রণালীতে কতকগুলি সহজ সুযোগ আছে এ কথা চিন্তা করিয়া আমাদিগকে বিচলিত হইলে চলিবে না। কারণ সত্যের জায়গায় সহজকে বসাইয়া লাভ কী? সোনার চেয়ে যে ধুলা সহজ!

যাহা হউক এ কথা নিশ্চিত সত্য যে, স্বাস্থ্য যেমন সমস্ত শরীরকে জুড়িয়া আছে, ধর্ম তেমনি মানুষের সমগ্র-প্রকৃতিগত।

স্বাস্থ্যকে টাকা পয়সার মতো হাতে তুলিয়া দেওয়া যায় না কিন্তু আনুকূল্যের দ্বারা ভিতরের দিক হইতে তাহাকে জাগাইয়া তোলা যায়। তেমনি মানুষের প্রকৃতিনিহিত এই অনন্তের বোধকে তাহার এই ধর্ম-প্রবৃত্তিকে ইতিহাস ভূগোল অঙ্কের মতো ইস্কুল-কমিটির শাসনাধীনে সমর্পণ করা যায় না; ইন্‌স্পেক্টরের তদন্তজালে তাহার উন্নতির পরিমাণ ধরা পড়ে না, এবং পরীক্ষকের নীল পেন্সিলের মার্কা দ্বারা তাহার ফলাফল চিহ্নিত হওয়া অসম্ভব; কেবল সর্বপ্রকার অনুকূল অবস্থার মধ্যে রাখিয়া তাহার সর্বাঙ্গীণ পরিণতি সাধন করা যাইতে পারে, তাহাকে বাঁধা নিয়মে বিদ্যালয়ে দেওয়া-নেওয়ার ব্যবসায়ের জিনিস করা যাইতে পারে না।

সাধকেরা আপনারাই বলিয়াছেন তাঁহাকে পাইবার পথ, "ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।" অর্থাৎ এটা কোনোমতেই পঠন পাঠনের ব্যাপার নহে। কিন্তু কেমন করিয়া সাধকেরা এই পূর্ণতার উপলব্ধিতে গিয়া উপনীত হইয়াছেন তাহা আজ পর্যন্ত কোনো মহাপুরুষ আমাদিগকে বলিয়া দিতে পারেন নাই। তাঁহারা কেবল বলেন, বেদাহমেতম্‌, আমি জানিয়াছি, আমি পাইয়াছি। তাঁহারা বলেন, য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি যাঁহারা ইঁহাকে জানেন, তাঁহারাই অমৃত হন। কেমন করিয়া যে তাঁহারা ইঁহাকে জানেন সে অভিজ্ঞতা এতই অন্তরতম যে, তাহা তাঁহাদের নিজেদেরই গোচর নহে। সে রহস্য যদি তাঁহারা প্রকাশ করিয়া দিতে পারিতেন তবে ধর্মশিক্ষা লইয়া আজ কোনোরূপ তর্কই থাকিত না।

অথচ ঈশ্বরের বোধ কেমন করিয়া পূর্ণভাবে উদ্বোধিত করা যাইতে পারে এরূপ প্রশ্ন করিলে কোনো কোনো মহাত্মা অত্যন্ত বাঁধা প্রণালীর উপদেশ দিয়াছেন তাহাও দেখা গিয়াছে। একদিকে যেমন একদল মহাপুরুষ বলিয়াছেন, চিত্তকে শুদ্ধ করো, পাপকে দমন করো, ঈশ্বরের বোধ অন্তরের সামগ্রী, অতএব অন্তরকেই আপন আন্তরিক চেষ্টায় উদ্বোধিত করিয়া তোলো, অপরদিকে তেমনি আর এক দল বিশেষ বিশেষ বাহ্যপ্রক্রিয়ার কথাও বলিয়াছেন। কেহবা বলেন, যজ্ঞ করো, কেহবা বলেন বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করিয়া বিশেষ মূর্তিকে ধ্যান করো, এমন কি, কেহ বা বলেন মাদক পদার্থের দ্বার অথবা অন্য নানা উপায়ে শারীরিক উত্তেজনার সাহায্যে মনকে তাড়না করিয়া দ্রুতবেগে সিদ্ধিলাভের দিকে অগ্রসর হইতে থাকো।

এমনি করিয়া যখনই চেষ্টাকে বাহিরের দিকে বিক্ষিপ্ত করিবার উপদেশ দেওয়া হয় তখনই প্রমাদের পথ খুলিয়া দেওয়া হয়। তখনই মিথ্যাকে ঠেকাইয়া রাখা যায় না, কল্পনাকে সংযত করা অসাধ্য হয়, তখনই মানুষের বিশ্বাসমুগ্ধতা লুব্ধ হইয়া উঠিয়া কোথাও আপনার সীমা দেখিতে পায় না; মানুষ আপনাকে ভোলায়, অন্যকে ভোলায়;

সম্ভব-অসম্ভবের ভেদ বিলুপ্ত হইয়া ধর্মসাধনার ব্যাপার বিচিত্র মূঢ়তায় একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠে।

অথচ যাহারা এইরূপ উপদেশ দেন তাঁহারা অনেকেই সাধু ও সাধক। তাঁহারা যে ইচ্ছা করিয়া লোকের মনকে মোহের পথে লইয়া যান তাহা নহে কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁহাদের ভুল করিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। কারণ, পাওয়া এক জিনিস, আর সেই পাওয়া ব্যাপারটাকে বিশ্লেষণ করিয়া জানা আর এক জিনিস।

মনে করো আহার পরিপাক করিবার শক্তি আমার অসামান্য; আমাকে যদি কোনো বেচারা অজীর্ণপীড়িত রোগী আসিয়া প্রশ্ন করে তুমি কেমন করিয়া এতটা পরিমাণ খাদ্য ও অখাদ্য বিনাদুঃখে হজম করিতে পার তবে আমি হয়তো সরল বিশ্বাসে তাহাকে বলিয়া দিতে পারি যে আহারের পর আমি দুই খণ্ড কাঁচা সুপারি মুখে দিয়া বর্মাদেশজাত একটা করিয়া আস্ত চুরুট নিঃশেষে ছাই করিয়া থাকি ইহাতেই আমার সমস্ত হজম হইয়া যায়। আসলে আমি যে এতৎসত্ত্বেও হজম করিয়া থাকি তাহা আমি নিজেই জানি না; এমন কি, যে অভ্যাসকে আমি আমার পরিপাকের সহায় বলিয়া কল্পনা করিয়া লইয়াছি কোনো দিন যদি তাহার অভাব ঘটে তবে আমার নিজেরই মনে হইতে থাকে যে, আজ বুঝি পাকযন্ত্রটা তেমন বেশ উৎসাহের সহিত কাজ করিতেছে না।

শুনা যায় কবিতা লিখিবার সময় বিখ্যাত জর্মান কবি শিলার পচা আপেল তাঁহার ডেস্কের মধ্যে রাখিতেন। তাঁহার পক্ষে ইহার উগ্র গন্ধ হয়তো একটা উত্তেজনার কাজ করিত। তাঁহার শিষ্য যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত আপনি কী করিয়া এমন ভালো কবিতা লেখেন তবে তিনি আর কোনো প্রকাশযোগ্য কারণ ঠাহর করিতে না পারিয়া ওই পচা আপেলটাকেই হয়তো উপায় বলিয়া নির্দেশ করিতেও পারিতেন। এ স্থলে, তিনি যত বড়ো কবি হউন না কেন, তাঁহার বাক্যকেই যে কবিত্বচর্চার উপায় সম্বন্ধে বেদবাক্য বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এমন কথা নাই। এরূপস্থলে তাঁহাকে যদি মুখের সামনে বলি তুমি কবিতাই লিখিতে পার তাই বলিয়া তাহার উপায় সম্বন্ধে কী জান, তবে তাঁহাকে কবি হিসাবে অশ্রদ্ধা করা হয় না। বস্তুত স্বাভাবিক প্রতিভাবশতই যাহারা কোনো একটা জিনিস পায় পাওয়ার প্রণালীটা তাহাদেরই কাছে সব চেয়ে বেশি বিলুপ্ত হইয়া থাকে।

যেমন ব্যক্তিগত অভ্যাসের কথা বলিলাম তেমনি এমন অনেক অভ্যাস আছে যাহা কৌলিক বা স্বাদেশিক। সেই সকল অভ্যাসমাত্রেই যে শক্তির সঞ্চার করে তাহা নহে; এমন কি, তাহারা শক্তিকে বহিরাশ্রিত করিয়া চিরদুর্বল করিয়া রাখে। অনেক মহা-পুরুষ এইরূপ দেশপ্রচলিত অভ্যাসকে অমঙ্গলের হেতু বলিয়া আঘাত করিয়া থাকেন,

আবার কেহ কেহ সংস্কারের প্রভাবে তাহার অবলম্বন ত্যাগ করেন নাই তাহাও দেখা যায়। শেষোক্ত সাধকেরা যে নিজের প্রতিভাগুণে এই সকল অভ্যাসের বাধা অতিক্রম করিয়াও আসল জায়গায় গিয়া পৌঁছিয়াছেন তাহা সকল সময়ে নিজেরাও বুঝেন না, এবং কখনো বা মনে করেন এখন আমার পক্ষে এই সকল বাহ্য প্রক্রিয়া বাহুল্য হইলেও গোড়ায় ইহার প্রয়োজন ছিল। ইহার ফল হয় এই, যাহাদের স্বাভাবিক শক্তি নাই তাহারা কেবলমাত্র এই অভ্যাসগুলিকেই অবলম্বন করিয়া কল্পনা করে যে আমরা সার্থকতালাভ করিয়াছি; তাহারা অহংকৃত ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠে এবং যেখানে তাহাদের অভ্যাসের সামগ্রী না দেখিতে পায় সেখানে যে সত্য আছে এ কথা মনে করিতেই পারে না, কারণ, তাহাদের কাছে এই সকল বাহ্য অভ্যাস এবং সত্য এক হইয়া গেছে।

যে সকল জিনিসের মূল কারণ বাহিরের অভ্যাস নহে, অন্তরের বিকাশ, তাহাদের সম্বন্ধে কোনো কৃত্রিম প্রণালী থাকিতে পারে না, কিন্তু স্বাভাবিক আনুকূল্য আছে। ধর্মবোধ জিনিসটাকে যদি আমরা কোনো একটা সাম্প্রদায়িক ফ্যাশান বা ভদ্রতার আসবাব বলিয়া গণ্য না করি, যদি তাহাকে মানুষের সর্বাঙ্গীণ চরম সার্থকতা বলিয়াই জানি, তবে প্রথম হইতেই বালকবালিকাদের মনকে ধর্মবোধে উদ্বোধিত করিয়া তুলিবার উপযুক্ত স্থান এবং অবকাশ থাকা আবশ্যক এ কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে; অর্থাৎ চারিদিকে সেই রকমের হাওয়া আলো আকাশটা থাকা চাই যাহাতে নিশ্বাস লইতেই প্রাণসঞ্চার হয় এবং আপনা হইতেই চিত্ত বড়ো হইয়া উঠিতে থাকে।

নিজের বাড়িতে যদি সেই অনুকূল অবস্থা পাওয়া যায় তবে তো কথাই নাই। অর্থাৎ সেখানে যদি বৈষয়িকতাই নিজের মূর্তিকে সকলের চেয়ে প্রবল করিয়া না বসিয়া থাকে, যদি অর্থই সেখানে পরমার্থ না হয়, যদি গৃহস্বামী নিজেকেই নিজের সংসারের স্বামী বলিয়া প্রতিষ্ঠিত না করিয়া থাকেন, যদি তিনি বিশ্বের মঙ্গলময় স্বামীকেই বাক্যে ও ব্যবহারে মানিয়া চলেন, যদি সকল প্রকার সাময়িক ঘটনাকে নিজের রাগদ্বেষের নিক্তিতে তৌল না করিয়া, ভূমার মধ্যে স্থাপিত করিয়া যথাসাধ্য তাহাদিগকে বিচার ও যথোচিত-ভাবে তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন, তবে সেইখানেই ছেলেমেয়েদের শিক্ষার স্থান বটে।

এরূপ সুযোগ সকল ঘরে নাই সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ঘরে নাই আর বাহিরে আছে এ কথা বলিলেই বা চলিবে কেন? এ সব দুর্লভ জিনিস তো আবশ্যক বুঝিয়া ফরমাশ দিয়া তৈরি করা যায় না। সে কথা সত্য। কিন্তু আবশ্যকতা যদি

থাকে এবং তাহার বোধ যদি জাগে তবে আপনিই যে সে আপনার পথ করিতে থাকিবে। সেই পথ করার কাজ আরম্ভ হইয়াছে; আমরা ইচ্ছা করিতেছি, আমরা সন্ধান করিতেছি, আমরা চেষ্টা করিতেছি। আমরা যাহা চাই আমাদের মনের মধ্যে তাহার একটা আদর্শ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমরা যখনই বলিতেছি ব্রাহ্মসমাজের ছেলেরা ধর্মশিক্ষার একটা কেন্দ্র একটা যথার্থ আশ্রয় যথার্থভাবে পাইতেছে না তখনই সে জিনিসটা যে কেমনতরো হইতে পারে তাহার একটা আভাস আমাদের মনে জাগিতেছে।

বস্তুত ব্রাহ্মসমাজে আমরা দেবমন্দির চাই না, বাহ্য আচার অনুষ্ঠান চাই না আমরা আশ্রম চাই। অর্থাৎ যেখানে বিশ্বপ্রকৃতির নির্মল সৌন্দর্য এবং মানুষের চিত্তের পবিত্র সাধনা একত্র মিলিত হইয়া একটি যোগাসন রচনা করিতেছে এমন আশ্রম। বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবের আত্মা যুক্ত হইয়াই আমাদের দেবমন্দির স্থাপন করে এবং স্বার্থবন্ধনহীন মঙ্গলকর্মই আমাদের পূজানুষ্ঠান। এমন কি কোনো একটি স্থান আমরা পাইব না যেখানে শান্তং শিবমদ্বৈতম্ বিশ্বপ্রকৃতিকে এবং মানুষকে, সুন্দরকে এবং মঙ্গলকে এক করিয়া দিয়া প্রাত্যহিক জীবনের কাজে ও পরিবেষ্টনে মানুষের হৃদয়ে সহজে অবাধে প্রত্যক্ষ হইতেছেন? সেই জায়গাটি যদি পাওয়া যায় তবে সেইখানেই ধর্মশিক্ষা হইবে। কেননা পূর্বেই বলিয়াছি ধর্মসাধনার হাওয়ার মধ্যে স্বভাবের গূঢ় নিয়মেই ধর্মশিক্ষা হইতে পারে, সকল প্রকার কৃত্রিম উপায় তাহাকে বিকৃত করে ও বাধা দেয়।

আমি জানি যাঁহারা সকল বিষয়কেই শ্রেণীবিভক্ত ও নামাঙ্কিত করিয়া সংক্ষেপে সরাসরি বিচার করিতে ভালোবাসেন তাঁহারা বলিবেন, এটা তো এ কালের কথা হইল না। এ যে দেখি মধ্যযুগের Monasticism অর্থাৎ মঠাশ্রয়ী ব্যবস্থা। ইহাতে সংসারের সঙ্গে সাধকজীবনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা হয়, ইহাতে মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করা হয়, ইহা কোনোমতেই চলিবে না।

অন্য কোনো এককালে যে জিনিসটা ছিল এবং যাহা তাহার চরমে আসিয়া মরিয়াছে তাহার নকল করিতে বলা যে পাগলামি সে কথা আমি খুবই স্বীকার করি। বর্বরদের ধনুর্বাণ যতই মনোহর হউক তাহাতে এখনকার কালের যোদ্ধার কাজ চলে না।

কিন্তু অসভ্যযুগের যুদ্ধপ্রবৃত্তির উপকরণ সভ্যযুগে যদি বা অনাদৃত হয় কিন্তু সেই যুদ্ধের-প্রবৃত্তিটা তো আছে। তাহা যতক্ষণ লুপ্ত না হয় ততক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন যুগের যুদ্ধ-ব্যাপারের মধ্যে একটা প্রণালীগত সাদৃশ্য থাকিবেই। অতএব যুদ্ধ করিতে হইলেই ব্যাপারটা তখনকার কাল হইতে একেবারে উলটা রকমের কিছু হইতে পারিবে না। এখনও সেকালেরই মতো সৈন্য লইয়া দল বাঁধিতে এবং দুইপক্ষে হানাহানি করিতে হইবে।

মানুষের মনের যে ইচ্ছা পূর্বে একদিন ধর্মসাধন উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ আকার ধারণ করিয়াছিল, সেই ইচ্ছা যদি আজও প্রবল হইয়া উঠে তবে তাহারও সাধনোপায়, নকল না করিয়াও অনেকটা সেই পূর্ব আকার লইবে। এখনকার কালের উপযোগী বলিয়া ইহার একটা স্বাতন্ত্র্যও থাকিবে এবং চিরকালীন সত্যের প্রকাশ বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন কালের সহিত ইহার মিলও থাকিবে। অতএব মৃত পিতার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে বলিয়াই ছেলেকে যেমন শ্মশানে দাহ করাটা কর্তব্য নহে তেমনি সত্যের নূতন প্রকাশচেষ্টা তাহার পুরাতন চেষ্টার সঙ্গে কোনো অংশে মেলে বলিয়াই তাহাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করিতে ব্যস্ত হওয়াটাকে সংগত বলিতে পারি না।

অথচ আমরা অনুকরণচ্ছলে অনেক জিনিস গ্রহণ করি যাহার সংগতি বিচার করি না। যদি বলা গেল এটা বর্তমানকালীন তবেই যেন তাহার পক্ষে সব কথা বলা হইল। কিন্তু যাহা তোমার বর্তমান তাহা যে আমার বর্তমান নহে সে কথা চিন্তা করিতে চাই না। এই জন্যই যদি বলা যায় আমরা যথাসম্ভব গির্জার মতো একটা পদার্থ গড়িয়া তুলিব তবে আমাদের মনে মস্ত এই একটা সান্ত্বনা আসে যে আমরা বর্তমানের সঙ্গে ঠিক তাল রাখিয়া চলিতেছি—অথচ গির্জার হাজার বছরের ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের কোনো যোগই নাই। কিন্তু যে সকল ব্যবস্থা আমাদের স্বদেশীয়, যাহা আমাদের জাতির প্রকৃতিগত তাহাকে আমরা অন্য দেশের ইতিহাসের মধ্যে স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়া মাথা নাড়িয়া বলি—"না, ইহা চলিবে না। ইহা মডার্ন্ নহে।" মনের এমন অবস্থা মানুষের যখন জন্মায় তখন সে আধুনিকতা নামক অপরূপ পদার্থকে গুরু করিয়া তাহার নিকট হইতে কতকগুলা বাঁধা মন্ত্রকে কানে লয় এবং সত্যকে পরিত্যাগ করে।

আমি এখানে কেবল একটা কাল্পনিক প্রসঙ্গ লইয়া তর্ক করিতেছি না। আপনারা সকলেই জানেন আমার পূজনীয় পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বোলপুরের উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে যুগল সপ্তপর্ণচ্ছায়াতলে যেখানে একদিন তাঁহার নিভৃত সাধনার বেদী নির্মাণ করিয়াছিলেন সেইখানে তিনি একটি আশ্রম স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এই আশ্রমের প্রতি কেবল যে তাঁহার একটি গভীর প্রীতি ছিল তাহা নহে, ইহার প্রতি তাঁহার একটি সুদৃঢ় শ্রদ্ধা ছিল। যদিও সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত এই স্থান প্রায় শূন্যই পড়িয়া ছিল তথাপি তাঁহার মনে লেশমাত্র সংশয় ছিল না যে ইহার মধ্যে একটি গভীর সার্থকতা আছে। সেই সার্থকতা তিনি চক্ষে না দেখিলেও তাহার প্রতি তাঁহার পূর্ণ নির্ভর ছিল। তিনি জানিতেন, ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে ব্যস্ততা নাই কিন্তু অমোঘতা আছে।

একদিন এই আশ্রমে বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব যখন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল

তখন পরমোৎসাহে তিনি সম্মতি দিলেন। এতদিন আশ্রম এই বিদ্যালয়ের জন্যই যে অপেক্ষা করিতেছিল তাহা তিনি অনুভব করিলেন। ছেলেদের মনকে মানুষ করিয়া তুলিবার ভারই এই আশ্রমের উপর। কারণ, মা যখন সন্তানকে অন্ন দেন তখন একদিকে তাহা অন্ন, আর এক দিকে তাহা তাঁহার হৃদয়। এই অন্নের সঙ্গে তাঁহার হৃদয় সম্মিলিত হইয়াই তাহা অমৃত হইয়া উঠে। আশ্রমও বালকদিগকে যে বিদ্যা-অন্ন দিবে তাহা হোটেলের অন্ন ইস্কুলের বিদ্যা নহে—তাহার সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের একটি প্রাণরস একটি অমৃতরস অলক্ষ্যে মিলিত হইয়া তাহাদের চিত্তকে আপনি পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে থাকিবে।

ইহা কেবল আশামাত্র নহে, বস্তুত ইহাই আমরা ঘটিতে দেখিয়াছি। শিক্ষকদের উপদেশ অনুশাসন নিতান্ত স্থূলভাবে কাজ করে এবং তাহার অধিকাংশই উগ্র ঔষধের মতো কেবল যে ব্যর্থ হয় তাহা নহে অনিষ্টই করিতে থাকে। কিন্তু এই আশ্রমের অলক্ষ্য ক্রিয়া অত্যন্ত গভীর এবং স্বাভাবিক। কেহ মনে করিবেন না আমি এখানে কোনো অলৌকিক শক্তির উল্লেখ করিতেছি। এখানে যে একজন সাধক সাধনা করিয়াছেন এবং সেই সাধনার আনন্দই যে এই আশ্রমকে মানুষের চিরদিনের সামগ্রী করিয়া তুলিবার জন্য এখনও নিযুক্ত আছে তাহা এখানকার সর্বত্রই নানা আকারে প্রকাশমান। বর্তমান আশ্রমবাসী আমরা সেই প্রকাশকে অহরহ নানাবিধ প্রকারে বাধা দিয়াও তাহাকে আচ্ছন্ন করিতে পারি নাই। সেই প্রকাশটি কেবল বালকদের নহে, শিক্ষকদের মনেও প্রতিনিয়ত অগোচরে কাজ করিয়া চলিয়াছে। এই স্থানটি যে নিতান্ত একটি বিদ্যালয়মাত্র নহে, ইহা যে আশ্রম, কেবলমাত্র এই ভাবটিরই প্রবলতা বড়ো সামান্য নহে।

ইহা দেখা গিয়াছে যতদিন পর্যন্ত মনে করিয়াছিলাম, আমরাই বালকদিগকে শিক্ষা দিব আমরাই তাহাদের উপকার করিব, ততদিন আমরা নিতান্তই সামান্য কাজ করিয়াছি। ততদিন যত যন্ত্রই গড়িয়া তুলিয়াছি তত যন্ত্রই ভাঙিয়া ফেলিতে হইয়াছে। এখনও যন্ত্র গড়িবার উৎসাহ আমাদের একেবারে যায় নাই, কেননা এখনও ভিতরের জিনিসটি বেশ করিয়া ভরিয়া উঠে নাই। কিন্তু তবুও যখন হইতে এই ভাবনাটা আমাদের মনে ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল যে আপনারই শূন্যতাকে পূর্ণ করিতে হইবে; আমরাই এখানে পাইতে আসিয়াছি; এখানে বালকদের সাধনার এবং আমাদের সাধনার একই সমতল আসন; এখানে গুরুশিষ্য সকলেই একই ইস্কুলে সেই মহাগুরুর ক্লাসে ভরতি হইয়াছি; তখন হইতে ফল যেন আপনি ফলিয়া উঠিল, কাজের শৃঙ্খলা আপনি ঘটিতে লাগিল। এখনও আমাদের যাহা কিছু নিষ্ফলতা সে এখানেই—যেখানেই আমরা মনে করি আমরা দিব অন্যে নিবে, সাধনা কেবল ছাত্রদের

এবং আমরা তাহার চালক ও নিয়ন্তা, সেইখানেই আমরা কোনো সত্য পদার্থ দিতে পারি না, সেইখানেই আমরা নিজের অপরাধ অন্যের স্কন্ধে চাপাই এবং প্রাণের অভাব কলের দ্বারা পূরণ করিতে চেষ্টা করি।

নিজেদের এই অভিজ্ঞতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া একথা আমাকে বিশেষভাবে বলিতে হইবে যে, আমরা অন্যকে ধর্মশিক্ষা দিব এই বাক্যই যেখানে প্রবল সেখানে ধর্মশিক্ষা কখনোই সহজ হইবে না। যেমন, অন্যকে দৃষ্টিশক্তি দিব বলিয়া দীপশিখা ব্যস্ত হইয়া বেড়ায় না, নিজে সে যে পরিমাণে উজ্জ্বল হইয়া উঠে সেই পরিমাণে স্বভাবতই অন্যের দৃষ্টিকে সাহায্য করে। ধর্মও সেই প্রকারের জিনিস, তাহা আলোর মতো; তাহার পাওয়া এবং দেওয়া একই কথা, তাহা একেবারে একসঙ্গেই ঘটে। এইজন্যই ধর্মশিক্ষার ইস্কুল নাই, তাহার আশ্রম আছে,—যেখানে মানুষের ধর্মসাধনা অহোরাত্র প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে, যেখানে সকল কর্মই ধর্মকর্মের অঙ্গরূপে অনুষ্ঠিত হইতেছে সেইখানেই স্বভাবের নিয়মে ধর্মবোধের উদ্বোধন হয়। এইজন্য সকল শাস্ত্রেই সঙ্গকেই ধর্মলাভের সর্বপ্রধান উপায় বলা হইয়াছে। এই সঙ্গ জিনিসটিকে, এই সাধকদের জীবনের সাধনাকে, যদি আমরা কোনো একটি বিশেষ অনুকূল স্থানে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারি, তাহা যদি স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া ছড়াইয়া না থাকে তবে এই পুঞ্জীভূত শক্তিকে আমরা মানব-সমাজের উচ্চতম ব্যবহারে লাগাইতে পারি।

এ দেশে একদিন তপোবনের এইরূপ ব্যবহারই ছিল, সেখানে সাধনা ও শিক্ষা একত্র মিলিত হইয়াছিল বলিয়া, সেখানে পাওয়া এবং দেওয়ার কাজ অতি সহজে নিয়ত অনুষ্ঠিত হইতেছিল বলিয়াই তপোবন হৃৎপিণ্ডের মতো সমস্ত সমাজের মর্মস্থান অধিকার করিয়া তাহার প্রাণকে শোধন পরিচালন এবং রক্ষা করিয়াছে। বৌদ্ধ বিহারেরও সেই কাজ ছিল। সেখানে পাওয়া এবং দেওয়া অবিচ্ছিন্ন হইয়া বিরাজ করিতেছিল।

এইখানে স্বভাবতই শ্রোতাদের মনে এই প্রশ্ন উঠিবে যে তবে পূর্বে যে আশ্রমটির কথা বলা হইয়াছে সেখানে কি সাধকদের সমাগমে একটি পরিপূর্ণ ধর্মজীবনের শতদল পদ্ম বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে?

না, তাহা হয় নাই। আমরা যাহারা সেখানে সমবেত হইয়াছি আমাদের লক্ষ্য এক নহে এবং তাহা যে নির্বিশেষে উচ্চ এমন কথাও বলিতে পারি না। আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধা যে গভীর এবং ধ্রুব তাহা নহে এবং তাহা আশাও করি না। আমরা যাহাকে উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাম দিয়া থাকি অর্থাৎ সাংসারিক উন্নতি ও খ্যাতিপ্রতিপত্তির ইচ্ছা, তাহা আমাদের মনে খুবই উচ্চ হইয়া আছে, সকলের চেয়ে উচ্চ আকাঙ্ক্ষাকে উচ্চে স্থাপন করিতে পারি নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও একথা আমি দৃঢ় করিয়া বলিব সেই আশ্রমের যে

আহ্বান তাহা সেই শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্ যিনি তাঁহারই আহ্বান। আমরা যে যাহা মনে করিয়া আসি না কেন, তিনিই ডাকিতেছেন এবং সে ডাক এক মুহূর্তের জন্ত থামিয়া নাই। আমরা কোনো কলরবে সেই অনবচ্ছিন্ন মঙ্গল-শঙ্খধ্বনিকে ঢাকিয়া ফেলিতে পারিতেছি না—তাহা সকলের উচ্চে বাজিতেছে, তাহার সুগম্ভীর স্বরতরঙ্গ সেখানকার তরুশ্রেণীর পল্লবে পল্লবে স্পন্দিত হইতেছে, এবং সেখানকার নির্মল আকাশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া তাহার আলোককে পুলকিত ও অন্ধকারকে নিস্তব্ধ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে।

সাধকদের জন্ত অপেক্ষা করিতে হয়; তাঁহারা যখন আসিবেন তখন আসিবেন; তাঁহারা সকলেই কিছু গেরুয়া পরিয়া মাথায় তিলক কাটিয়া আসিবেন না—তাঁহারা এমন দীনবেশে নিঃশব্দে আসিবেন যে তাঁহাদের আগমন-বার্তা জানিতেও পারিব না।—কিন্তু ইতিমধ্যে ওই যে সাধনার আহ্বানটি ইহাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো সম্পদ। এই ভূমার আহ্বানের একেবারেই মাঝখানে আশ্রমবাসীদিগকে বাস করিতে হইতেছে। সেই একাগ্র ধ্বনি তাহাদের বিমুখ কর্ণের বধিরতাকে দিনে দিনে ভেদ করিতেছে। সে তাহাদের শুষ্ক হৃদয়ের কঠিনতম স্তরের মধ্যেও অগোচরে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে রসসঞ্চার করিতেছে।

এমন কথা আমি একদিন কোনো বন্ধুর কাছে শুনিয়াছিলাম যে, জনতা হইতে দূরে একটা নিভৃত বেষ্টনের মধ্যে যে জীবনযাত্রা, তাহার মধ্যে একটা শৌখিনতা আছে, তাহার মধ্যে পুরাপুরি সত্য নাই, সুতরাং এখানকার যে শিক্ষা তাহা সম্পূর্ণ কাজের শিক্ষা নহে। কোনো কাল্পনিক আশ্রম সম্বন্ধে একথা খাটিতে পারে কিন্তু আমাদের এই আধুনিক আশ্রমটি সম্বন্ধে একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

সত্য বটে শহরে জনতার অভাব নাই কিন্তু সেই জনতার সঙ্গে সত্যকার যোগ আছে কয়জন মানুষের? সে জনতা একহিসাবে ছায়াবাজির ছায়ার মতো। নগরে গৃহস্থ তরঙ্গিত জনতাসমুদ্রের মধ্যে বেষ্টিত হইয়া এক একটি রবিনসন ক্রুসোর মতো আপনার প্রাইভেটিকে লইয়া নিরালায় দিন কাটাইতে থাকেন। এতবড়ো জনময় নির্জনতা কোথায় পাওয়া যাইবে?

কিন্তু এক-শ দু-শ মানুষকে এক আশ্রয়ে লইয়া দিনযাপন করাকে কোনোমতেই নির্জন বাস বলা চলে না। এই যে এক-শ দু-শ মানুষ ইহারা দূরের মানুষ নহে; ইহারা পথের পথিক নহে; ইচ্ছা করিলাম ইহাদের সঙ্গ লইলাম আর ইচ্ছা না হইল তো আপনার ঘরের কোণে আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলাম এমনটি হইবার জো নাই; এই এক-শ দু-শ মানুষের দিনরাত্রির সমস্ত প্রয়োজনের প্রত্যেক তুচ্ছ অংশটির সম্বন্ধেও

চিন্তা করিতে হইবে ; ইহাদের সমস্ত সুখদুঃখ সুবিধা-অসুবিধাকে আপনার করিয়া লইতে হইবে—ইহাকেই কি বলে মানুষের সঙ্গ এড়াইয়া দায়িত্ব কাটাইয়া শৌখিন শান্তির মধ্যে একটা বেড়া-দেওয়া পারমার্থিকতার দুর্বল সাধনা ?

আমার সেই বন্ধু হয়তো বলিবেন, নির্জনতার কথা ছাড়িয়া দাও—কিন্তু সংসারে যেখানে চারিদিকেই ভালো-মন্দর তরঙ্গ কেবলই উঠা-পড়া করিতেছে সেইখানেই ঠিক সত্যভাবে ভালোকে চিনাইয়া দিবার সুযোগ পাওয়া যায়। কাঁটার পরিচয় যেখানে নাই সেখানে কাঁটা বাঁচাইয়া চলিবার শিক্ষা হইবে কেমন করিয়া ? কাঁটাবনের গোলাপটাই সত্যকার গোলাপ—আর বারবার অতি যত্নে চোলাই করিয়া লওয়া সাধুতার গোলাপি আতর একটা নবাবি জিনিস।

হায়, সাধুতার এই নিষ্কণ্টক আতরটি কোন্ দোকানে মেলে তাহা নিশ্চয় জানি না কিন্তু আমাদের আশ্রমে যে তাহার কারবার নাই তাহা নিজের দিকে তাকাইলেই বুঝিতে পারি। কাব্যে পুরাণে সর্বত্রই তপোবনের আদর্শটি অত্যুজ্জ্বল বর্ণনায় বিরাজ করে কিন্তু তবু সেই বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে বহুতর মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ ঘন ঘন উঁকি মারিতেছে। মানুষের আদর্শও যেমন সত্য, সেই আদর্শের ব্যাঘাতও তেমনি সত্য—যাহারা সেই ব্যাঘাতের ভিতর দিয়াই চোখ মেলিয়া আদর্শকে দেখিতে না পারে, চোখ বুজিয়া স্বপ্ন দেখা ছাড়া তাহাদের আর গতি নাই।

আমরা যে আশ্রমের কথা বলিতেছি, সেখানে লোকালয়ের অন্য বিভাগেরই মতো মন্দের জন্য সিংহদ্বার খোলাই আছে। শয়তানকে সেখানে সকল সময়ে সাপের মতো ছদ্মবেশে প্রবেশ করিতে হয় না—সে দিব্য ভদ্রলোকেরই মতো মাথা তুলিয়া যাতায়াত করে। সেখানে সংসারের নানা দাবি, বৈষয়িকতার নানা আড়ম্বর, প্রবৃত্তির নানা চাঞ্চল্য এবং অহং-পুরুষের নানা উদ্ধত মূর্তি সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ লোকালয়ে বরঞ্চ তাহারা তেমন করিয়া চোখেই পড়ে না—কারণ ভালোমন্দ সেখানে একপ্রকার আপস করিয়া মিলিয়া-মিশিয়াই থাকে—এখানে তাহাদের মাঝখানে একটা বিচ্ছেদ আছে বলিয়াই মন্দটা এখানে খুব করিয়া দেখা দেয়।

তাই যদি হইল তবে আর হইল কী ? বন্ধুরা বলিবেন, যদি সেখানে জনতার চাপ লোকালয়ের চেয়ে কম না হইয়া বরঞ্চ বেশিই হয় এবং মন্দকেই যদি সেখান হইতে নিঃশেষে ছাঁকিয়া ফেলিবার আশা না করিতে পার এবং যদি সেখানকার আশ্রমবাসীরা সংসারের সাধারণ লোকেরই মতো মাঝারি রকমেরই মানুষ হন তবে সেই প্রকার স্থানই যে বালক-বালিকাদের ধর্মশিক্ষার অনুকূল স্থান তাহা কেমন করিয়া বলিবে ?

এ সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহা এই,—কবিকল্পনার দ্বারা আগাগোড়া মনোরম

করিয়া যে একটা আকাশকুসুমখচিত আশ্রম গড়া যায় না এ কথাটা আমাকে খুব স্পষ্ট করিয়াই বলিতে হইতেছে—কারণ আমার মতো লোকের মুখে কোনো প্রস্তাব শুনিলেই সেটাকে নিরতিশয় ভাবুকতা বলিয়া শ্রোতারা সন্দেহ করিতে পারেন। আশ্রম বলিতে আমি যে কোনো একটা অদ্ভুত অসম্ভব স্বপ্নসুলভ পদার্থের কল্পনা করিতেছি তাহা নহে। সকল স্থূলদেহধারীর সঙ্গেই তাঁহার স্থূল দেহের ঐক্য আছে একথা আমি বারংবার স্বীকার করিব। কেবল যেখানে তাহার সূক্ষ্ম জায়গাটি সেইখানেই তাহার স্বাতন্ত্র্য। সে স্বাতন্ত্র্য সেইখানেই, যেখানে তাহার মাঝখানে একটি আদর্শ বিরাজ করিতেছে। সে আদর্শটি সাধারণ সংসারের আদর্শ নহে, সে আদর্শ আশ্রমের আদর্শ—তাহা বাসনার দিকে নয় সাধনার দিকেই নিয়ত লক্ষ্য নির্দেশ করিতেছে। এই আশ্রম যদি বা পাঁকের মধ্যেও ফুটিয়া থাকে তবু ভূমার দিকে তাহার মুখ তুলিয়াছে, সে আপনাকে যদি বা ছাড়িতে না পারিয়া থাকে তবু আপনাকে কেবলই ছাড়াইতে চাহিতেছে; সে যেখানে দাঁড়াইয়া আছে সেইখানেই তাহার পরিচয় নয়, সে যেখানে দৃষ্টি রাখিয়াছে সেইখানেই তাহার প্রকাশ। তাহার সকলের ঊর্ধ্বে যে সাধনার শিখাটি জ্বলিতেছে তাহাই তাহার সর্বোচ্চ সত্য।

কিন্তু কেনই বা বড়ো কথাটাকে গোপন করিব? কেনই বা কেবল কেজো লোকদের মন জোগাইবার জন্য ভিতরকার আসল রসটিকে আড়াল করিয়া রাখিব? এই প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্বে আমি অসংকোচে বলিব, আশ্রম বলিতেই আমাদের মনের সামনে যে ছবিটি জাগে যে ভাবটি ভরিয়া উঠে তাহা আমাদের সমস্ত হৃদয়কে হরণ করে। তাহার কারণ, শুদ্ধমাত্র এ নহে যে, তাহা আমাদের জাতির অনেক যুগের ধ্যানের ধন, সাধনার সৃষ্টি—তাহার গভীর কারণ এই, আমাদের সমস্তের সঙ্গে তাহার ভারি একটি সংগতি দেখিতে পাই, এইজন্যই তাহাকে এমন সত্য এমন সুন্দর বলিয়া ঠেকে। বিধাতার কাছে আমরা যে দান পাইয়াছি তাহাকে অস্বীকার করিব কেমন করিয়া? আমরা তো ঘন মেঘের কালিমালিপ্ত আকাশের নিচে জন্মগ্রহণ করি নাই, শীতের নিষ্ঠুর পীড়ন আমাদিগকে তো রুদ্ধ ঘরের মধ্যে তাড়না করিয়া বদ্ধ করে নাই; আকাশ যে আমাদের কাছে তাহার বিরাট বক্ষপট উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে; আলোক যে কোনোখানে কিছুমাত্র কার্পণ্য রাখিল না; সূর্যোদয় যে ভক্তির পুষ্পাঞ্জলির মতো আকাশে উঠে এবং সূর্যাস্ত যে ভক্তের প্রণামের মতো দিগন্তে নীরবে অবনমিত হয়; কী উদার নদীর ধারা, কী নির্জন গম্ভীর তাহার প্রসারিত তট; অবারিত মাঠ রুদ্রের যোগাসনের মতো স্থির হইয়া পড়িয়া আছে। কিন্তু তবু সে যেন বিষ্ণুর বাহন মহাবিহঙ্গমের মতো তাহার দিগন্তজোড়া পাখা মেলিয়া দিয়া কোন্ অনন্তের অভিমুখে উড়িয়া চলিয়াছে সেখানে তাহার গতিকে আর

লক্ষ্য করা যাইতেছে না; এখানে তরুতল আমাদিগকে আতিথ্য করে, ভূমিশয্যা আমাদিগকে আহ্বান করে, আতপ্তবায়ু আমাদিগকে বসন পরাইয়া রাখিয়াছে; আমাদের দেশে এ সমস্তই যে সত্য, চিরকালের সত্য;—পৃথিবীতে নানা জাতির মধ্যে যখন সৌভাগ্য ভাগ করা হইতেছিল তখন এই সমস্ত যে আমাদের ভাগে পড়িয়াছিল—তবু আমাদের জীবনের সাধনায় ইহাদের কোনো ব্যবহারই করিব না? এত বড়ো সম্পদ আমাদের চেতনার বহির্দ্বারে অনাদৃত হইয়া পড়িয়া থাকিবে? আমরাই তো জগৎ-প্রকৃতির সঙ্গে মানবপ্রকৃতির মিলন ঘটাইয়া চিত্তের বোধকে সর্বানুভূ, ধর্মের সাধনাকে বিশ্বব্যাপী করিয়া তুলিব, সেইজন্যই এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। সেইজন্যই আমাদের দুই চক্ষুর মধ্যে এমন একটি সুগভীর দৃষ্টি যাহা রূপের মধ্যে অরূপকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য স্নিগ্ধ শান্ত অচঞ্চল হইয়া রহিয়াছে—সেইজন্যই অনন্তের বাঁশির সুর এমনি করিয়া আমাদের প্রাণের মধ্যে পৌঁছে যে সেই অনন্তকে আমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়া ছুঁইবার জন্য, তাহাকে ঘরে বাহিরে চিন্তায় কল্পনায় সেবায় রসভোগে স্নানে আহারে কর্মে ও বিশ্রামে বিচিত্র প্রকারে ব্যবহার করিবার জন্য আমরা কত কাল ধরিয়া কত দিক দিয়া কত কত পথে কত কত চেষ্টা করিতেছি তাহার অন্ত নাই। সেইজন্য ভারতবর্ষের আশ্রম ভারতবর্ষের জীবনকে এমন করিয়া অধিকার করিয়াছে—আমাদের কাব্যপুরাণকে এমন করিয়া আবিষ্ট করিয়া ধরিয়াছে—সেইজন্যই ভারতবর্ষের যে দান আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে অক্ষয় হইয়া আছে এই আশ্রমেই তাহার উদ্ভব। না হয় আজ যেকালে আমরা জন্মিয়াছি তাহাকে আধুনিক কাল বলা হয় এবং যে শতাব্দী ছুটিয়া চলিতেছে তাহা বিংশ শতাব্দী বলিয়া আদর পাইতেছে কিন্তু তাই বলিয়া বিধাতার অতি পুরাতন দান আজ নূতন কালের ভারতবর্ষে কি একেবারে নিঃশেষ হইয়া গেল, তিনি কি আমাদের নির্মল আকাশের উন্মুক্ততায় একেবারে কুলুপ লাগাইয়া দিলেন? না হয়, আমরা কয়জন এই শহরের পোষ্যপুত্র হইয়া তাহার পথের প্রাঙ্গণটাকে খুব বড়ো মনে করিতেছি কিন্তু যে মাতার আমরা সন্তান সেই প্রকৃতি কি ভারতবর্ষ হইতে তাহার দিগন্তবিস্তীর্ণ শ্যামাঞ্চলটি তুলিয়া লইয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন? তাহা যদি সত্য না হয় তবে আমাদের দেশের বাহিরের ও অন্তরের প্রকৃতিকে নির্বাসিত করিয়া সকল বিষয়ে সর্বতোভাবে অন্য দেশের ইতিহাসকে অনুসরণ করিয়া চলাকেই মঙ্গলের পথ বলিয়া মানিয়া লইতে পারিব না।

শান্তিনিকেতন আশ্রমের বিদ্যালয়টির সহিত আমার জীবনের একাদশবর্ষ জড়িত হইয়াছে অতএব তাহার সফলতার কথা প্রকাশ করাতে সেটাকে আপনারা আমার নিরবচ্ছিন্ন অহমিকা বলিয়া মনে করিতে পারেন। সেই আশঙ্কা সত্ত্বেও আমি

আপনাদের কাছে শিক্ষা সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা বিবৃত করিলাম; কারণ আনুমানিক কথার কোনো মূল্য নাই এবং সকল অপবাদ স্বীকার করিয়াও সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে হইবে। অতএব আমি সবিনয়ে অথচ অসংশয় বিশ্বাসের দৃঢ়তার সঙ্গেই বলিতেছি যে, যে ধর্ম কোনো প্রকার রূপকল্পনা বা বাহ্য প্রক্রিয়াকে সাধনার বাধা ও মানুষের বুদ্ধি ও চরিত্রের পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়াই মনে করে, সাময়িক বক্তৃতা বা উপদেশের দ্বারা সে ধর্ম মানুষের চিত্তকে সম্পূর্ণ অধিকার করিতে পারিবে না। সে ধর্মের পক্ষে এমন সকল আশ্রমের প্রয়োজন, যেখানে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনের যোগ ব্যবধানবিহীন ও যেখানে তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে মানুষের আত্মীয় সম্বন্ধ স্বাভাবিক; যেখানে ভোগের আকর্ষণ ও উপকরণবাহুল্য নিত্যই মানুষের মনকে ক্ষুব্ধ করিতেছে না; সাধনা যেখানে কেবলমাত্র ধ্যানের মধ্যেই বিলীন না হইয়া ত্যাগে ও মঙ্গলকর্মে নিয়তই প্রকাশ পাইতেছে; কোনো সংকীর্ণ দেশকালপাত্রের দ্বারা কর্তব্য-বুদ্ধিকে খণ্ডিত না করিয়া যেখানে, বিশ্বজনীন মঙ্গলের শ্রেষ্ঠতম আদর্শকেই মনের মধ্যে গ্রহণ করিবার অনুশাসন গভীরভাবে বিরাজ করিতেছে; যেখানে পরস্পরের প্রতি ব্যবহারে শ্রদ্ধার চর্চা হইতেছে, জ্ঞানের আলোচনায় উদারতার ব্যাপ্তি হইতেছে এবং সকল দেশের মহাপুরুষদের চরিত স্মরণ করিয়া ভক্তির সাধনায় মন রসাভিষিক্ত হইয়া উঠিতেছে; যথানে সংকীর্ণ বৈরাগ্যের কঠোরতার দ্বারা মানুষের সরল আনন্দকে বাধাগ্রস্ত করা হইতেছে না ও সংযমকে আশ্রয় করিয়া স্বাধীনতার উল্লাসই সর্বদা প্রকাশ-মান হইয়া উঠিতেছে; যেখানে সূর্যোদয় সূর্যাস্ত ও নৈশ আকাশে জ্যোতিষ্কসভার নীরব মহিমা প্রতিদিন ব্যর্থ হইতেছে না, এবং প্রকৃতির ঋতু-উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আনন্দসংগীত একসুরে বাজিয়া উঠিতেছে; যেখানে বালকগণের অধিকার কেবলমাত্র খেলা ও শিক্ষার মধ্যে বদ্ধ নহে,—তাহারা নানা প্রকারে কল্যাণভার লইয়া কর্তৃত্বগৌরবের সহিত প্রতিদিনের জীবনচেষ্টার দ্বারা আশ্রমকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছে এবং যেখানে ছোটো-বড়ো বালকবৃদ্ধ সকলেই একাসনে বসিয়া নতশিরে বিশ্বজননীর প্রসন্ন হস্ত হইতে জীবনের প্রতিদিনের এবং চিরদিনের অন্ন গ্রহণ করিতেছে।

১৩১৮

ধর্মের অধিকার

যে-সকল মহাপুরুষের বাণী জগতে আজও অমর হইয়া আছে তাঁহারা কেহই মানুষের মন জোগাইয়া কথা কহিতে চেষ্টা করেন নাই। তাঁহারা জানিতেন মানুষ আপনার মনের চেয়েও অনেক বড়ো—অর্থাৎ মানুষ আপনাকে যাহা মনে করে সেই-খানেই তাহার সমাপ্তি নহে। এই জন্য তাঁহারা একেবারে মানুষের রাজদরবারে আপনার দূত প্রেরণ করিয়াছেন, বাহিরের দেউড়িতে দ্বারীকে মিষ্টবাক্যে ভুলাইয়া কাজ উদ্ধারের সহজ উপায় সন্ধান করিয়া কাজ নষ্ট করেন নাই।

তাঁহারা এমন সব কথা বলিয়াছেন যাহা বলিতে কেহ সাহস করে না, এবং সংসারের কাজকর্মের মধ্যে যাহা শুনিবামাত্র মানুষ বিরক্ত হইয়া উঠে, বলিয়া বসে এসব কথা কোনো কাজের কথাই নহে। কিন্তু কত বড়ো বড়ো কাজের কথা কালের স্রোতে বুদ্‌বুদের মতো ফেনাইয়া উঠিল এবং ভাসিতে ভাসিতে ফাটিয়া বিলীন হইয়া গেল, আর যত অসম্ভবই সম্ভব হইল, অভাবনীয়ই সত্য হইল, বুদ্ধিমানের মন্ত্রণা নহে কিন্তু পাগলের পাগলামিই যুগে যুগে মানুষের অন্তরে বাহিরে, তাহার চিন্তায় কর্মে, তাহার দর্শনে সাহিত্যে কত নব নব সৃষ্টিবিকাশ করিয়া চলিল তাহার আর অন্ত নাই। তাঁহাদের সেইসকল অদ্ভুত কথা ঠেকাইতে গিয়াও কোনোমতেই ঠেকানো যায় না, তাহাকে মারিতে চেষ্টা করিলেই আরও অমর হইয়া উঠে, তাহাকে পোড়াইলে সে উজ্জ্বল হয়, তাহাকে পুঁতিয়া ফেলিলে সে অঙ্কুরিত হইয়া দেখা দেয়, তাহাকে সবলে বাধা দিতে গিয়াই আরও নিবিড় করিয়া গ্রহণ করিতে হয়—এবং যেন মন্ত্রের বলে কেমন করিয়া দেখিতে দেখিতে নিজের অগোচরে, এমন কি, নিজের অনিচ্ছায়, সেই সকল বাণীর বেদনায় ভাবুক লোকের ভাবের রং বদল হইতে থাকে, কাজের লোকের কাজের সুর ফিরিয়া যায়।

মহাপুরুষেরা মানুষকে অকুণ্ঠিত কণ্ঠে অসাধ্য সাধনেরই উপদেশ দিয়াছেন। মানুষ যেখানেই একটা কোনো বাধায় আসিয়া ঠেকিয়াছে এবং মনে করিয়াছে ইহাই তাহার চরম আশ্রয়, এবং সেইখানেই আপনার শাস্ত্রকে প্রথাকে একেবারে নিশ্ছিদ্ররূপে পাকা করিয়া সনাতন বাসা বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে—সেইখানেই মহাপুরুষেরা আসিয়া গণ্ডি মুছিয়াছেন, বেড়া ভাঙিয়াছেন—বলিয়াছেন, পথ এখনও বাকি, পাথেয় এখনও শেষ হয় নাই, যে অমৃতভবন তোমার আপন ঘর তোমার চরমলোক সে তোমাদের এই মিস্ত্রির হাতের গড়া পাথরের দেওয়াল দিয়া প্রস্তুত নহে, তাহা পরিবর্তিত হয় কিন্তু ভাঙে না, তাহা আশ্রয় দেয় কিন্তু আবদ্ধ করে না, তাহা নির্মিত হয় না বিকশিত হয়, সঞ্চিত

হয় না সঞ্চারিত হয়, তাহা কৌশলের কারুকার্য নহে তাহা অক্ষয় জীবনের অক্লান্ত সৃষ্টি। মানুষ বলে সেই পথযাত্রা আমার অসাধ্য, কেননা আমি দুর্বল আমি শ্রান্ত; তাঁহারা বলেন এইখানে স্থির হইয়া থাকাই তোমার অসাধ্য, কেননা তুমি মানুষ, তুমি মহৎ, তুমি অমৃতের পুত্র, ভূমাকে ছাড়া কোথাও তোমার সন্তোষ নাই।

যে ব্যক্তি ছোটো সে বিশ্বসংসারকে অসংখ্য বাধার রাজ্য বলিয়াই জানে, বাধামাত্রই তাহার দৃষ্টিকে বিলুপ্ত করে ও তাহার আশাকে প্রতিহত করিয়া দেয় এই জন্য সে সত্যকে জানে না, বাধাকেই সত্য বলিয়া জানে। যে ব্যক্তি বড়ো তিনি সমস্ত বাধাকে ছাড়াইয়া একেবারেই সত্যকে দেখিতে পান। এইজন্য ছোটোর সঙ্গে বড়োর কথার একেবারে এতই বৈপরীত্য। এইজন্য সকলেই যখন একবাক্যে বলিতেছে আমরা কেবল অন্ধকার দেখিতেছি তখনও তিনি জোরের সঙ্গে বলিতে পারেন—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

সমস্ত অন্ধকারকে ছাড়াইয়া আমি তাঁহাকেই জানিতেছি যিনি মহান্ পুরুষ, যিনি জ্যোতির্ময়।

এইজন্য যখন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, অধর্মই আমাকে বাঁচাইতে পারে এই মনে করিয়া হাজার হাজার লোক জালজালিয়াতি মারামারি কাড়াকাড়ির দিকে দলে দলে ছুটিয়া চলিয়াছে তখনও তাঁহারা অসংকোচে এমন কথা বলেন যে, স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ—অতি অল্পমাত্র ধর্মও মহাভয় হইতে ত্রাণ করিতে পারে; যখন দেখা যাইতেছে সৎকর্ম পদে পদে বাধাগ্রস্ত, তাহা মূঢ়তার জড়ত্বপুঞ্জে প্রতিহত, প্রবলের অত্যাচারে প্রপীড়িত, বাহিরে তাহার দারিদ্র্য সর্বপ্রকারেই প্রত্যক্ষ তখনও তাঁহারা অসংশয়ে বলেন, সর্ষপপরিমাণ বিশ্বাস পর্বতপরিমাণ বাধাকে জয় করিতে পারে। তাঁহারা কিছুমাত্র হাতে রাখিয়া কথা বলেন না, মানুষকে খাটো মনে করিয়া সত্যকে তাহার কাছে খাটো করিয়া ধরেন না; তাঁহারা অসত্যের আস্ফালনকে একেবারেই অবজ্ঞা করিয়া বলেন, সত্যমেব জয়তে—এবং সংসারকেই যে-সকল লোক অহোরাত্র সত্য বলিয়া পাক খাইয়া ফিরিতেছে, তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঘোষণা করেন—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মই সত্য। যাহাকে চোখে দেখিতেছি, স্পর্শ করিতেছি, যাহাকে জ্ঞানের শেষ বিষয় বলিয়া মনে করিতেছি সত্যকে তাহার চেয়েও তাঁহারাই বড়ো করিয়া দেখাইয়াছেন মানুষের মধ্যে যাঁহারা বড়ো হইয়া জন্মিয়াছেন।

তাঁহাদের যাহা অনুশাসন তাহাও শুনিতে অত্যন্ত অসম্ভব। সংসারে যে লোকটি যেমন তাহাকে ঠিক তেমনি করিয়া দেখো এ পরামর্শটি নিতান্ত সহজ নহে কিন্তু এখানেই তাঁহারা দাঁড়ি টানেন নাই, তাঁহারা বলিয়াছেন আপনার মতো করিয়াই সকলকে দেখো। তাহার কারণ এই আত্মপরের ভেদ যেখানে সেইখানেই তাঁহাদের দৃষ্টি ঠেকিয়া যায় নাই

আত্মপরের মিল যেখানে সেইখানেই তাঁহারা বিহার করিতেছেন। শত্রুকে ক্ষমা করিবে একথা বলিলে যথেষ্ট বলা হইল কিন্তু তাঁহারা সে কথাও ছাড়াইয়া বলিয়াছেন শত্রুকেও প্রীতিদান করিবে যেমন করিয়া চন্দনতরু আঘাতকারীকেও সুগন্ধ দান করে। তাহার কারণ এই প্রেমের মধ্যেই তাঁহারা সত্যকে পূর্ণ করিয়া দেখিয়াছেন, এইজন্য স্বভাবতই সে-পর্যন্ত না গিয়া তাঁহারা থামিতে পারেন না। তুমি বড়ো হও, ভালো হও এই কথাই মানুষের পক্ষে কম কথা নয় কিন্তু তাঁহারা একেবারে বলিয়া বসেন—

শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ।

শর যেমন লক্ষ্যের মধ্যে একেবারে নিবিষ্ট হইয়া যায় তেমনি করিয়া তন্ময় হইয়া ব্রহ্মের মধ্যে প্রবেশ করো।

ব্রহ্মই পরিপূর্ণ সত্য এবং তাঁহাকেই পূর্ণভাবে পাইতে হইবে এই কথাটিকে খাটো করিয়া বলা তাঁহাদের কর্ম নহে—তাই তাঁহারা স্পষ্ট করিয়াই বলেন যে, তাঁহাকে না জানিয়া যে মানুষ কেবল জপ তপ করিয়াই কাটায় অন্তবদেবাস্য তদ্‌ভবতি, তাহার সে সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়—তাঁহাকে না জানিয়াই যে ব্যক্তি ইহলোক হইতে অপসৃত হয়, স কৃপণঃ—সে কৃপাপাত্র।

অতএব ইহা দেখা যাইতেছে, মানুষের মধ্যে যাঁহারা সকলের বড়ো তাঁহারা সেইখানকার কথাই বলিতেছেন যাহা সকলের চরম। কোনো প্রয়োজনের দিকে তাকাইয়া সে সত্যকে তাঁহারা ছোটো করেন না। সেই চরম লক্ষ্যকেই অসংশয়ে সুস্পষ্টরূপে সকল সত্যের পরম সত্য বলিয়া স্বীকার না করিলে মানুষকে আত্ম-অবিশ্বাসী ও ভীরু করিয়া রাখা হয়; বাধার ওপারে যে সত্য আছে তাহার কথাই তাহাকে বড়ো করিয়া না শুনাইয়া বাধাটার উপরেই যদি ঝোঁক দেওয়া হয় তবে সে অবস্থায় মানুষ সেই বাধার সঙ্গেই আপস করিয়াই বাসা বাঁধে এবং সত্যকেই আয়ত্তের অতীত বলিয়া ব্যবহারের বাহিরে নির্বাসিত করিয়া দেয়।

কিন্তু মানবগুরুগণ যে পরম লাভ, যে অসাধ্যসাধনের কথা বলেন তাহাকেই তাঁহারা মানুষের ধর্ম বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ তাহাই মানুষের পরিপূর্ণ স্বভাব, তাহাই মানুষের সত্য। যেমনি লোভ হইবে অমনি কাড়িয়া খাইবে মানুষের মধ্যে এমন একটা প্রবৃত্তি আছে সে কথা অস্বীকার করি না কিন্তু তবু ইহাকে আমরা মানুষের ধর্ম অর্থাৎ মানুষের সত্যকার স্বভাব বলি না। লোভ হইলেও লোভ দমন করিবে, পরের অন্ন কাড়িয়া খাইবে না, একথা বলিলেও কম বলা হয় না—কিন্তু তবু এখানেও মানুষ থামিতে পারে না। সে বলিয়াছে, ক্ষুধিতকে নিজের অন্ন দান করিবে, ইহাই মানুষের ধর্ম, ইহাই মানুষের পুণ্য, অর্থাৎ তাহার পূর্ণতা। অথচ লোকসংখ্যা গণনা করিয়া যদি ওজনদরে মানুষের ধর্ম বিচার করিতে হয় তবে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে নিজের অন্ন পরকে দান

করা মানুষের ধর্ম নহে; কেননা অনেক-লোকই পরের অন্ন কাড়িবার বাধাহীন সুযোগ পাইলে নিজেকে সার্থক মনে করে। তবু আজ পর্যন্ত মানুষ একথা বলিতে কুন্ঠিত হয় নাই যে দয়াই ধর্ম, দানই পুণ্য।

কিন্তু মানুষের পক্ষে যাহা সত্য মানুষের পক্ষে তাহাই যে সহজ তাহা নহে। তবেই দেখা যাইতেছে সহজকেই আপনার ধর্ম বলিয়া মানিয়া লইয়া মানুষ আরাম পাইতে চায় না, এবং যে-কোনো দুর্বলচিত্ত সহজকেই আপনার ধর্ম বলিয়াছে এবং ধর্মকে আপনার সুবিধামত সহজ করিয়া লইয়াছে তাহার আর দুর্গতির অন্ত থাকে না। আপন ধর্মের পথকে মানুষ বলিয়াছে—ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। দুঃখকে মানুষ মনুষ্যত্বের বাহন বলিয়া গণ্য করিয়া লইয়াছে এবং সুখকেই সে সুখ বলে নাই, বলিয়াছে—ভূমৈব সুখম্।

এই জন্যই এই বড়ো একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখা যায় যে, যাঁহারা মানুষকে অসাধ্য-সাধনের উপদেশ দিয়াছেন, যাঁহাদের কথা শুনিলেই হঠাৎ মনে হয় ইহা কোনোমতেই বিশ্বাস করিবার মতো নহে, মানুষ তাঁহাদিগকেই শ্রদ্ধা করে অর্থাৎ বিশ্বাস করে। তাহার কারণ মহত্ত্বই মানুষের আত্মার ধর্ম; সে মুখে যাহাই বলুক শেষকালে দেখা যায় সে বড়োকেই যথার্থ বিশ্বাস করে। সহজের উপরেই তাহার বস্তুত শ্রদ্ধা নাই; অসাধ্য-সাধনকেই সে সত্য সাধনা বলিয়া জানে; সেই পথের পথিককেই সে সর্বোচ্চ সম্মান না দিয়া কোনোমতেই থাকিতে পারে না।

যাঁহারা মানুষকে দুর্গম পথে ডাকেন, মানুষ তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করে, কেননা মানুষকে তাঁহারা শ্রদ্ধা করেন। তাঁহারা মানুষকে দীনাত্মা বলিয়া অবজ্ঞা করেন না। বাহিরে তাঁহারা মানুষের যত দুর্বলতা যত মূঢ়তাই দেখুন না কেন তবুও তাঁহারা নিশ্চয় জানেন যথার্থত মানুষ হীনশক্তি নহে—তাহার শক্তিহীনতা নিতান্তই একটা বাহিরের জিনিস; সেটাকে মায়া বলিলেই হয়। এই জন্য তাঁহারা যখন শ্রদ্ধা করিয়া মানুষকে বড়ো পথে ডাকেন তখন মানুষ আপনার মায়াকে ত্যাগ করিয়া সত্যকে চিনিতে পারে, মানুষ নিজের মাহাত্ম্য দেখিতে পায় এবং নিজের সেই সত্যস্বরূপে বিশ্বাস করিবামাত্র সে অসাধ্যসাধন করিতে পারে। তখন সে বিস্মিত হইয়া দেখে ভয় তাহাকে ভয় দেখাইতেছে না, দুঃখ তাহাকে দুঃখ দিতেছে না, বাধা তাহাকে পরাভূত করিতেছে না, এমন কি, নিষ্ফলতাও তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিতেছে না। তখন সে হঠাৎ দেখিতে পায় ত্যাগ তাহার পক্ষে সহজ, ক্লেশ তাহার পক্ষে আনন্দময়, এবং মৃত্যু তাহার পক্ষে অমৃতের সোপান।

বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্যদিগকে উপদেশ দিবার কালে এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে, মানুষের মনে কামনা অত্যন্ত বেশি প্রবল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহার চেয়েও প্রবল

পদার্থ আমাদের আছে; সত্যের পিপাসা যদি আমাদের রিপুর চেয়ে প্রবলতর না হইত তবে আমাদের মধ্যে কেই বা ধর্মের পথে চলিতে পারিত।

মানুষের প্রতি এত বড়ো শ্রদ্ধার কথা এত বড়ো আশার কথা সকলে বলিতে পারে না। কামনার আঘাতে মানুষ বারবার স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, কেবল ইহাই বড়ো করিয়া তাহার চোখে পড়ে যে ছোটো; কিন্তু তৎসত্ত্বেও সত্যের আকর্ষণে মানুষ যে পাশবতার দিক হইতে মনুষ্যত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছে এইটেই বড়ো করিয়া দেখিতে পান তিনিই যিনি বড়ো। এই জন্য তিনিই মানুষকে বারংবার নির্ভয়ে ক্ষমা করিতে পারেন, তিনিই মানুষের জন্য আশা করিতে পারেন, তিনিই মানুষকে সকলের চেয়ে বড়ো কথাটি শুনাইতে আসেন, তিনিই মানুষকে সকলের চেয়ে বড়ো অধিকার দিতে কুণ্ঠিত হন না। তিনি কৃপণের ন্যায় মানুষকে ওজন করিয়া অনুগ্রহ দান করেন না, এবং বলেন না তাহাই তাহার বুদ্ধি ও শক্তির পক্ষে যথেষ্ট,—প্রিয়তম বন্ধুর ন্যায় তিনি আপন চিরজীবনের সর্বোচ্চ সাধনের ধন তাহার নিকট সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত উৎসর্গ করেন, জানেন সে তাহার যোগ্য। সে যে কত বড়ো যোগ্য তাহা সে নিজে তেমন করিয়া জানে না, তিনি যেমন করিয়া জানেন।

মানুষ বলে, জানি, আমরা পারি না—মহাপুরুষ বলেন, জানি, তোমরা পার। মানুষ বলে, যাহা সাধ্য এমন একটা ধর্ম খাড়া করো; মহাপুরুষ বলেন, যাহা ধর্ম তাহা নিশ্চয়ই তোমাদের সাধ্য। মানুষের সমস্ত শক্তির উপরে তাঁহারা দাবি করেন—কেননা সমস্ত অশক্তির পরিচয়কে অতিক্রম করিয়াও তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন তাহার শক্তি আছে।

অতএব ধর্মেই মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। ধর্ম মানুষের উপরে যে পরিমাণে দাবি করে সেই অনুসারে মানুষ আপনাকে চেনে। কোনো লোক রাজার ছেলে হইয়াও হয়তো আপনাকে ভুলিয়া থাকিতে পারে তবুও দেশের লোকের দিক হইতে একটা তাগিদ থাকা চাই। তাহার পৈতৃক গৌরব তাহাকে স্মরণ করাইতেই হইবে, তাহাকে লজ্জা দিতে হইবে, এমন কি, তাহাকে দণ্ড দেওয়া আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু তাহাকে চাষা বলিয়া মিথ্যা ভুলাইয়া সমস্তাকে দিব্য সহজ করিয়া দিলে চলিবে না; সে চাষার মতো প্রত্যহ ব্যবহার করিলেও সত্য তাহার সম্মুখে স্থির রাখিতে হইবে। তেমনি ধর্ম কেবলই মানুষকে বলিতেছে, তুমি অমৃতের পুত্র, ইহাই সত্য; ব্যবহারত মানুষের স্খলন পদে পদে হইতেছে তবু ধর্ম তাহার সত্য পরিচয়কে উচ্চে ধরিয়া রাখিতেছে; মানুষ বলিতে যে কতখানি বুঝায় ধর্ম তাহা কোনোমতেই মানুষকে ভুলিতে দিবে না; ইহাই তাহার সর্বপ্রধান কাজ।

ব্যাধি মানুষের শরীরের স্বভাব নহে তবু ব্যাধি মানুষকে ধরে। কিন্তু তখন

মানুষের শরীরের প্রকৃতি ভিতরের দিক হইতে ব্যাধিকে তাড়াইবার নানাপ্রকার উপায় করিতে থাকে। যতক্ষণ মস্তিষ্ক ঠিক থাকে ততক্ষণ এই সংগ্রামে ভয় বেশি নাই কিন্তু যখন মস্তিষ্ককেই ব্যাধিশত্রু পরাভূত করে তখনই ব্যাধি সকলের চেয়ে নিদারুণ হইয়া উঠে কারণ তখন বাহিরের দিক হইতে চিকিৎসকের চেষ্টা যতই প্রবল হউক ভিতরের দিকের শ্রেষ্ঠ সহায়টি দুর্বল হইয়া পড়ে। মস্তিষ্ক যেমন শরীরে, ধর্ম তেমনি মানবসমাজে। এই ধর্মের আদর্শই নিয়ত ভিতরে ভিতরে মানবপ্রকৃতিকে তাহার সমস্ত বিকৃতির সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়া রাখে কিন্তু যে পরম দুর্দিনে এই ধর্মের আদর্শকেই বিকৃতি আক্রমণ করে সেদিন বাহিরের নিয়ম সংযম আচার অনুষ্ঠান পুলিস ও রাষ্ট্রবিধি যতই প্রবল হউক না কেন সমাজপ্রকৃতিকে দুর্গতি হইতে বাঁচাইয়া রাখিবে কে? এই জন্য দুর্বলতার দোহাই দিয়া ইচ্ছাপূর্বক ধর্মকে দুর্বল করার মতো আত্মঘাতকতা আর কিছুই হইতে পারে না, কারণ, দুর্বলতার দিনেই বাঁচিবার একমাত্র উপায় ধর্মের বল।

আমাদের দেশে সকলের চেয়ে নিদারুণ দুর্ভাগ্য এই যে, মানুষের দুর্বলতার মাপে ধর্মকে সুবিধামতো খাটো করিয়া ফেলা যাইতে পারে এই অদ্ভুত বিশ্বাস আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে। আমরা এ কথা অসংকোচে বলিয়া থাকি, যাহার শক্তি কম তাহার জন্য ধর্মকে ছাঁটিয়া ছোটো করিতে দোষ নাই, এমন কি, তাহাই কর্তব্য।

ধর্মের প্রতি যদি শ্রদ্ধা থাকে তবে এমন কথা কি বলা যায়? প্রয়োজন অনুসারে আমরা তাহাকে ছোটো বড়ো করিব! ধর্ম তো জীবনহীন জড় পদার্থ নহে; তাহার উপরে ফরমাশমতো অনায়াসে দরজির কাঁচি বা ছুতারের করাত তো চলে না। এ কথা তো কেহ বলে না যে, শিশুটি ক্ষুদ্র বলিয়া মাকেও চারিদিক হইতে কাটিয়া কম করিয়া ফেলো। মা তো শিশুর গায়ের জামার সঙ্গে তুলনীয় নহেন। প্রথমত মাকে কাটিতে গেলেই মারিয়া ফেলা হইবে, দ্বিতীয়ত অখণ্ড সমগ্র মাতাই বড়ো সন্তানের পক্ষে যেমন আবশ্যক ছোটো সন্তানটির পক্ষেও তেমনি আবশ্যক—তাঁহাকে কম করিলে বড়োও যেমন বঞ্চিত হইবে, ছোটোও তেমনি বঞ্চিত হইবে। ধর্ম কি মানুষের মাতার মতোই নহে?

আমি জানি আমাকে এই প্রশ্ন করা হইবে সকল মানুষেরই কি বুদ্ধি ও প্রকৃতি একই রকমের? সকলেই কি ধর্মকে একই ভাবে বোঝে? না, সকলের এক নহে; ছোটো বড়ো উঁচু নিচু জগতে আছে। অতএব সত্যকে আমরা সকলেই সমান দূর পর্যন্ত পাইয়াছি একথা বলিতে পারি না। আমাদের শক্তি পরিমিত; কিন্তু যতদূর বড়ো করিয়া সত্যকে পাইয়াছি তাহার চেয়েও সে ছোটো এ মিথ্যা কথা তো ক্ষণকালের জন্যও আমরা কাহারও খাতিরে বলিতে পারি না। গ্যালিলিও যে জ্যোতিষ্কতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা তখনকার কালের প্রচলিত খ্রীস্টানধর্মের সঙ্গে খাপ খায় নাই— তাই

বলিয়া একথা বলা কি শোভা পাইত যে, খ্রীস্টান বেচারার পক্ষে মিথ্যা জ্যোতির্বিদ্যাই সত্য? তাহাকে কি এই উপদেশ দেওয়া চলিত যে, তুমি খ্রীস্টান অতএব তোমার উচিত তোমার উপযোগী একটা বিশেষ জ্যোতিষকেই একান্ত শ্রদ্ধার সহিত বরণ করা?

কিন্তু তাই বলিয়া গ্যালিলিওই কি জ্যোতিষের চরমে গিয়াছেন? তাহা নহে। তবুও তাহা সত্যের দিকে যাওয়া। সেখান হইতেও অগ্রসর হও কিন্তু কোনো কারণেই পিছু হটা আর চলিবে না; যদি হঠিতে থাকি তবে সত্যের উলটা দিকে চলা হইবে সুতরাং তাহার শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। তেমনি ধর্ম সম্বন্ধে একটিমাত্র লোকের বোধও যদি দেশের সকল লোকের বোধকে ছাড়াইয়া গিয়া থাকে তবে তাহাই সমস্ত দেশের লোকের ধর্ম, কারণ তাহাই দেশের সর্বোচ্চ সত্য। অন্য লোকে তাহা গ্রহণ করিতে রাজি হইবে না, তাহা বুঝিতে বিলম্ব করিবে; কিন্তু তুমি যদি বুঝিয়া থাক তবে তোমাকে সকল লোকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতে হইবে, ইহাই সত্য এবং ইহা সকল লোকেরই সত্য, কেবল একলা আমার সত্য নহে। কেহ যদি জড়ভাবে বলিতে থাকে ইহা আমি বুঝিতে পারিব না তবে তোমাকে জোর করিয়াই বলিতে হইবে, তুমি বুঝিতে পারিবে, কারণ ইহা সত্য এবং সত্যকে গ্রহণ করাই মানুষের ধর্ম।

ইতিহাসে আমরা কী দেখিলাম? আমরা দেখিয়াছি, বুদ্ধদেব যখন সত্যকে পাইয়াছি বলিয়া উপলব্ধি করিলেন, তখন তিনি বুঝিলেন আমার ভিতর দিয়া সমস্ত মানুষ এই সত্য পাইবার অধিকারী হইয়াছে। তখন তিনি ভিন্ন ভিন্ন লোকের শক্তির পরিমাপ করিয়া সত্যের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে মিথ্যার খাদ মিশাইতে লাগিলেন না। তাঁহার মতো অদ্ভুত শক্তিমান পুরুষ বহুকাল একাগ্রচিন্তার পর যে সত্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন তাহা যে সকল মানুষেরই নয় এ কথা তিনি এক মুহূর্তের জন্যও কল্পনা করেন নাই। অথচ সকল মানুষ তাহাকে শ্রদ্ধা করে নাই, অনেকে তাহা বুদ্ধির দোষে বিকৃতও করিয়াছে। তৎসত্ত্বেও একথা নিশ্চিত সত্য যে, ধর্মকে হিসাব করিয়া ক্ষুদ্র করা কোনোমতেই চলে না—যে তাহাকে যে পরিমাণে মানুক আর না মানুক, সেই যে একমাত্র মাননীয় এই কথা বলিয়া তাহাকে সকলের সামনে পূর্ণভাবে ধরিয়া রাখিতে হইবে। বাপকে সকল ছেলে সমান শ্রদ্ধা করে না এবং অনেক ছেলে তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াও থাকে তাই বলিয়া ছেলেদিগকে শ্রেণীবিভক্ত করিয়া এমন কথা বলা চলে না যে, তোমার বাপ বারো আনা, তোমার বাপ সিকি, এবং তোমার বাপ বাপই নহে, তুমি একটা গাছের ডালকে বাপ বলিয়া গ্রহণ করো— এবং এইরূপে অধিকার ভেদে তোমরা বাপের সঙ্গে ভিন্নরূপে ব্যবহার করিতে থাকো; তাহা হইলেই তোমাদের সন্তানধর্ম পালন করা হইবে। বস্তুত পিতার তারতম্য নাই; তাঁহার সম্বন্ধে

সন্তানদের হৃদয়ের ও ব্যবহারের যদি তারতম্য থাকে তবে সেই অনুসারে তাহাদিগকে ভালো বলিব বা মন্দ বলিব, একথা কখনোই বলিব না তুমি যখন এইটুকু মাত্র পার তখন এইটুকুই তোমার পক্ষে ভালো।

সকলেই জানেন যিশু যখন বাহ্যঅনুষ্ঠানপ্রধান ধর্মকে নিন্দা করিয়া আধ্যাত্মিক ধর্মের বার্তা ঘোষণা করিলেন তখন য়িহুদিরা তাহা গ্রহণ করে নাই। তবু তিনি নিজের গুটিকয়েক অনুবর্তীমাত্রকেই লইয়া সত্যধর্মকে নিখিল মানবের ধর্ম বলিয়াই প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি একথা বলেন নাই, এ ধর্ম যাহারা বুঝিতে পারিতেছে তাহাদেরই, যাহারা পারিতেছে না তাহাদের নহে। মহম্মদের আবির্ভাবকালে পৌত্তলিক আরবীয়েরা যে তাঁহার একেশ্বরবাদ সহজে গ্রহণ করিয়াছিল তাহা নহে, তাই বলিয়া তিনি তাহাদিগকে ডাকিয়া বলেন নাই, তোমাদের পক্ষে যাহা সহজ তাহাই তোমাদের ধর্ম, তোমরা বাপ দাদা ধরিয়া যাহা মানিয়া আসিয়াছ তাহাই তোমাদের সত্য। তিনি এমন অদ্ভুত অসত্য বলেন নাই যে, যাহাকে দশজনে মিলিয়া বিশ্বাস করা যায় তাহাই সত্য, যাহাকে দশজনে মিলিয়া পালন করা যায় তাহাই ধর্ম। একথা বলিলে উপস্থিত আপদ মিটিত কিন্তু চিরকালের বিপদ বাড়িয়া চলিত।

একথা বলাই বাহুল্য, উপস্থিতমতো মানুষ যাহা পারে সেইখানেই তাহার সীমা নহে। তাহা যদি হইত তবে যুগযুগান্তর ধরিয়া মানুষ মউমাছির মতো একই রকম মউচাক তৈরি করিয়া চলিত। বস্তুত অবিচলিত সনাতন প্রথার বড়াই যদি কেহ করিতে পারে তবে সে পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ, মানুষ নহে। আরও বেশি বড়াই যদি কেহ করিতে পারে তবে সে ধুলামাটিপাথর। মানুষ কোনো একটা জায়গায় আসিয়া হাল ছাড়িয়া চোখ বুজিয়া সীমাকে মানিতে চায় না বলিয়াই সে মানুষ। মানুষের এই যে কেবলই আরও-র দিকে গতি, ভূমার দিকে টান এইখানেই তাহার শ্রেয়। এই শ্রেয়কে রক্ষা করিবার ইহাকে কেবলই স্মরণ করাইবার ভার তাহার ধর্মের প্রতি। এইজন্যই মানুষের চিত্ত তাহার কল্যাণকে যত সুদূর পর্যন্ত চিন্তা করিতে পারে তত সুদূরেই আপনার ধর্মকে প্রহরীর মতো বসাইয়া রাখিয়াছে—সেই মানবচেতনার একেবারে দিগন্তে দাঁড়াইয়া ধর্ম মানুষকে অনন্তের দিকে নিয়ত আহ্বান করিতেছে।

মানুষের শক্তির মধ্যে দুটা দিক আছে, একটা দিকের নাম "পারে" এবং আর একটা দিকের নাম "পারিবে"। "পারে"র দিকটাই মানুষের সহজ, আর "পারিবে"র দিকটাতেই তাহার তপস্যা। ধর্ম মানুষের এই "পারিবে"র সর্বোচ্চ শিখরে দাঁড়াইয়া তাহার সমস্ত "পারে"কে নিয়ত টান দিতেছে তাহাকে বিশ্রাম করিতে দিতেছে না, তাহাকে কোনো একটা উপস্থিত সামান্য লাভের মধ্যে সন্তুষ্ট থাকিতে দিতেছে না।

এইরূপে মানুষের সমস্ত "পারে" যখন সেই "পারিবে"র দ্বারা অধিকৃত হইয়া সম্মুখের দিকে চলিতে থাকে তখনই মানুষ বীর—তখনই সে সত্যভাবে আত্মাকে লাভ করে। কিন্তু "পারিবে"র দিকে এই আকর্ষণ যাহারা সহিতে পারে না, যাহারা নিজেকে মূঢ় ও অক্ষম বলিয়া কল্পনা করে, তাহারা ধর্মকে বলে আমি যেখানে আছি সেইখানে তুমিও নামিয়া এস। তাহার পরে ধর্মকে একবার সেই সহজসাধ্যের সমতলক্ষেত্রে টানিয়া আনিতে পারিলে তখন তাহাকে বড়ো বড়ো পাথর চাপা দিয়া অত্যন্ত সনাতনভাবে জীবিত সমাধি দিয়া রাখিতে চায় এবং মনে করে ফাঁকি দিয়া ধর্মকে পাইলাম এবং তাহাকে একেবারে ঘরের দরজার কাছে চিরকালের মতো বাঁধিয়া রাখিয়া পুত্রপৌত্রাদি-ক্রমে ভোগ দখল করিতে থাকিলাম। তাহারা ধর্মকে বন্দী করিয়া নিজেরাই অচল হইয়া বসে, ধর্মকে দুর্বল করিয়া নিজেরা হীনবীর্য হইয়া পড়ে, এবং ধর্মকে প্রাণহীন করিয়া নিজেরা পলে পলে মরিতে থাকে; তাহাদের সমাজ কেবলই বাহ্য আচারে অনুষ্ঠানে অন্ধসংস্কারে এবং কাল্পনিক বিভীষিকার কুজ্ঝটিকায় দশদিকে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।

বস্তুত ধর্ম যখন মানুষকে অসাধ্যসাধন করিতে বলে তখনই তাহা মানুষের শিরোধার্য হইয়া উঠে, আর যখনই সে মানুষের প্রবৃত্তির সঙ্গে কোনোমতে বন্ধুত্ব রাখিবার জন্য কানে কানে পরামর্শ দেয় যে তুমি যাহা পার তাহাই তোমার শ্রেয়, অথবা দশজনে যাহা করিয়া আসিতেছে তাহাতেই নির্বিচারে যোগ দেওয়াই তোমার পুণ্য, ধর্ম তখন আমাদের প্রবৃত্তির চেয়েও নিচে নামিয়া যায়। প্রবৃত্তির সঙ্গে বোঝাপড়া করিতে এবং লোকাচারের সঙ্গে আপস করিয়া গলাগলি করিতে আসিলেই ধর্ম আপনার উপরের জায়গাটি আর রাখিতে পারে না; একেবারেই তাহার জাতি নষ্ট হয়।

আমাদের দেশের বর্তমান সমাজে ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের সমাজে পুণ্যকে সস্তা করিবার জন্য বলিয়াছে, কোনো বিশেষ তিথিনক্ষত্রে কোনো বিশেষ জলের ধারায় স্নান করিলে কেবল নিজের নহে, বহুসহস্র পূর্বপুরুষের সমস্ত পাপ ক্ষালিত হইয়া যায়। পাপ দূর করিবার এতবড়ো সহজ উপায়ের কথাটা বিশ্বাস করিতে অত্যন্ত লোভ হয় সন্দেহ নাই, সুতরাং মানুষ তাহার ধর্মশাস্ত্রের এই কথায় আপনাকে কিছু-পরিমাণে ভুলায় কিন্তু সম্পূর্ণ ভুলানো তাহার পক্ষেও অসাধ্য। একজন বিধবা রমণী একবার মধ্যরাত্রে চন্দ্রগ্রহণের পরে পীড়িত শরীর লইয়া যখন গঙ্গাস্নানে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন আমি তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, "আপনি কি একথা সত্যই বিশ্বাস করিতে পারেন যে পাপ জিনিসটাকে ধূলামাটির মতো জল দিয়া ধুইয়া ফেলা সম্ভব? অথচ অকারণে আপনার শরীর-ধর্মের বিরুদ্ধে এই যে পাপ করিতে যাইতেছেন ইহার ফল কি

আপনাকে পাইতে হইবে না? তিনি বলিলেন, "বাবা, এ তো সহজ কথা, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা বেশ বুঝি কিন্তু তবু ধর্মে যাহা বলে তাহা পালন না করিতে যে ভরসা পাই না।" একথার অর্থ এই যে, সেই রমণীর স্বাভাবিক বুদ্ধি তাঁহার ধর্মবিশ্বাসের উপরে উঠিয়া আছে।

আর একটা দৃষ্টান্ত দেখো। একাদশীর দিনে বিধবাকে নির্জল উপবাস করিতে হইবে ইহা আমাদের দেশে লোকাচারসম্মত অথবা শাস্ত্রানুগত ধর্মানুশাসন। ইহার মধ্যে যে নিদারুণ নিষ্ঠুরতা আছে স্বভাবত আমাদের প্রকৃতিতে তাহা বর্তমান নাই। একথা কখনোই সত্য নহে স্ত্রীলোককে ক্ষুধাপিপাসায় পীড়িত করিতে আমরা সহজে দুঃখ পাই না। তবে কেন হতভাগিনীদিগকে আমরা ইচ্ছা করিয়া দুঃখ দিই এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে আর কোনো যুক্তিসংগত উত্তর খুঁজিয়া পাই না, কেবল এই কথাই বলিতে হয় আমাদের ধর্মে বলে বিধবাদিগকে একাদশীর দিনে ক্ষুধার অন্ন ও পিপাসার জল দিতে পারিবে না, এমন কি, মরিবার মুখে রোগের ঔষধ পর্যন্ত সেবন করানো নিষেধ। এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে আমাদের ধর্ম আমাদের সহজবুদ্ধির চেয়ে অনেক নিচে নামিয়া গেছে।

ইহা আমি অনেকবার দেখিয়াছি, ছেলেরা স্বভাবতই তাহাদের সহপাঠী বন্ধুদিগকে জাতিবর্ণ লইয়া ঘৃণা করে না—কখনোই তাহারা আপনাকে হীনবর্ণ বন্ধু অপেক্ষা কোনো অংশে শ্রেষ্ঠ মনে করিতে পারে না, কারণ অনেক স্থলেই শ্রেষ্ঠতা জাতিবর্ণের অপেক্ষা রাখে না তাহা তাহারা প্রত্যহই প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছে, তথাপি আহার কালে তাহারা হীনবর্ণ বন্ধুর লেশমাত্র সংস্পর্শ পরিহার্য মনে করে। এমন ঘটনা ঘটিতে দেখা গিয়াছে যে রান্নাঘরের বাহিরের দাওয়ার উপরে একটা ঘুড়ি পড়িয়াছিল—সেই ঘুড়িটা তুলিয়া লইবার জন্য একজন পতিত জাতির ছেলে ক্ষণকালের জন্য দাওয়ায় পদক্ষেপ করিয়াছিল বলিয়া রান্নাঘরের সমস্ত ভাত ফেলা গিয়াছিল, অথচ সেই দাওয়ায় সর্বদাই কুকুর যাতায়াত করে তাহাতে অন্ন অপবিত্র হয় না। এই আচরণের মধ্যে যে পরিমাণ অতিঅসহ্য মানবঘৃণা আছে, তত পরিমাণ ঘৃণা কি যথার্থই আমাদের অন্তরতর প্রকৃতির মধ্যে বর্তমান? এতটা মানবঘৃণা আমাদের জাতির মনে স্বভাবতই আছে একথা আমি তো স্বীকার করিতে পারি না। বস্তুত এখানে স্পষ্টই আমাদের ধর্ম আমাদের হৃদয়ের চেয়ে অনেক নিচে পড়িয়া গিয়াছে।

এইরূপে মানুষ ধর্মকে যখন আপনার চেয়েও নিচে নামাইয়া দেয় তখন সে নিজের সহজ মনুষ্যত্বও যে কতদূর পর্যন্ত বিস্মৃত হয় তাহার একটি নিষ্ঠুর দৃষ্টান্ত আমার মনে যেন আগুন দিয়া চিরকালের মতো দাগিয়া রহিয়া গিয়াছে। আমি জানি একজন বিদেশী

রোগী পথিক পল্লীগ্রামের পথের ধারে তিনদিন ধরিয়া অনাশ্রয়ে পড়িয়া তিল তিল করিয়া মরিয়াছে, ঠিক সেই সময়েই মস্ত একটা পুণ্যস্নানের তিথি পড়িয়াছিল—হাজার হাজার নরনারী কয়দিন ধরিয়া পুণ্যকামনায় সেই পথ দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে একজনও বলে নাই এই মুমূর্ষুকে ঘরে লইয়া গিয়া বাঁচাইয়া তুলিবার চেষ্টা করি এবং তাহাতেই আমার পুণ্য। সকলেই মনে মনে বলিয়াছে, জানি না ও কোথাকার লোক, ওর কী জাত—শেষকালে কি ঘরে লইয়া গিয়া প্রায়শ্চিত্তের দায়ে পড়িব? মানুষের স্বাভাবিক দয়া যদি আপনার কাজ করিতে যায় তবে ধর্মের রক্ষকস্বরূপে সমাজ তাহাকে দণ্ড দিবে। এখানে ধর্ম যে মানুষের হৃদয়প্রকৃতির চেয়েও অনেক নিচে নামিয়া বসিয়াছে।

আমি পল্লীগ্রামে গিয়া দেখিয়া আসিলাম সেখানে নমশূদ্রদের ক্ষেত্র অন্য জাতিতে চাষ করে না, তাহাদের ধান কাটে না, তাহাদের ঘর তৈরি করিয়া দেয় না—অর্থাৎ পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে মানুষের কাছে মানুষ যে সহযোগিতা দাবি করিতে পারে আমাদের সমাজ ইহাদিগকে তাহারও অযোগ্য বলিয়াছে;—বিনা অপরাধে আমরা ইহাদের জীবনযাত্রাকে দুরূহ ও দুঃসহ করিয়া তুলিয়া জন্মকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইহাদিগকে প্রতিদিনই দণ্ড দিতেছি। অথচ মানুষকে এরূপ নিতান্তই অকারণে নির্যাতন করা কি আমাদের স্বভাবসিদ্ধ? আমরা নিজে যাহাদের নিকট হইতে যথেষ্ট পরিমাণে সেবা ও সাহায্য লইতে দ্বিধা করি না তাহাদিগকে সকল প্রকার সহায়তা হইতে বঞ্চিত করাকেই আমাদের ন্যায়বুদ্ধি কি সত্যই সংগত বলিতে পারে? কখনোই না। কিন্তু মানুষকে এইরূপ অন্যায় অবজ্ঞা করিতে আমাদের ধর্মই উপদেশ দিতেছে, আমাদের প্রকৃতি নয়। আমাদের হৃদয় দুর্বল বলিয়াই যে আমরা এইরূপ অবিচার করি তাহা নহে, ইহাই আমাদের কর্তব্য এবং ইহাই না করা আমাদের স্খলন বলিয়া করিয়া থাকি। আমাদের ধর্মই আমাদের প্রকৃতির নিচে নামিয়া অন্যায়ে আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে—শুভবুদ্ধির নাম লইয়া দেশের নর-নারীকে শত শত বৎসর ধরিয়া এমন নির্দয়ভাবে এমন অন্ধ মূঢ়ের মতো পীড়ন করিয়া চলিয়াছে!

আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর লোক তর্ক করিয়া থাকেন যে, জাতিভেদ তো য়ুরোপেও আছে; সেখানেও তো অভিজাতবংশের লোক সহজে নীচবংশের সঙ্গে একত্রে পানাহার করিতে চান না। ইহাদের একথা অস্বীকার করা যায় না। মানুষের মনে অভিমান বলিয়া একটা প্রবৃত্তি আছে, সেইটেকে অবলম্বন করিয়া মানুষের ভেদবুদ্ধি উদ্ধত হইয়া ওঠে ইহা সত্য,—কিন্তু ধর্ম স্বয়ং কি সেই অভিমানটার সঙ্গেই আপস করিয়া তাহার সঙ্গে একাসনে আসিয়া বসিবে? ধর্ম কি

আপনার সিংহাসনে বসিয়া এই অভিমানের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে না? চোর তো সকল দেশেই চুরি করিয়া থাকে কিন্তু আমাদের সমাজে যে ম্যাজিস্ট্রেটসুদ্ধ তাহার সঙ্গে যোগ দিয়া চোরকেই আপনার পেয়াদা বলিয়া স্বহস্তে তাহাকে নিজের সোনার চাপরাস পরাইয়া দিতেছে! কোনোকালে বিচার পাইব কোথায়, কোনোমতে রক্ষা পাইব কাহার কাছে?

এরূপ অদ্ভুত তর্ক আমাদের মুখেই শোনা যায় যে, যাহারা তামসিক প্রকৃতির লোক, মদমাংস যাহারা খাইবেই এবং পাশবতা যাহাদের স্বভাবসিদ্ধ, ধর্মের সম্মতিদ্বারা যদি তাহাদের পাশবতাকে নির্দিষ্টপরিমাণে স্বীকার করা যায়—যদি বলা যায় এইরূপ বিশেষ-ভাবে মদমাংস খাওয়া ও চরিত্রকে কলুষিত করা তোমাদের পক্ষে ধর্ম, তবে তাহাতে দোষ নাই, বরং ভালোই। এরূপ তর্কের সীমা যে কোন্‌খানে তাহা ভাবিয়াই পাওয়া যায় না। মানুষের মধ্যে এমনতরো স্বভাবপাপিষ্ঠ অমানুষ দেখা যায় নরহত্যায় যাহারা আনন্দ বোধ করে। এই শ্রেণীর লোকের জন্য ঠগিধর্মকেই ধর্ম বলিয়া বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত একথাও বোধ হয় আমাদের মুখে বাধিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ঠিক নিজের গলাটা তাহাদের ফাঁসের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত না হয়।

ধর্ম সম্বন্ধে সত্য সম্বন্ধে মানুষের উচ্চাধিকার নিম্নাধিকার একবার কোথাও স্বীকার করিতে আরম্ভ করিলেই মানুষ যে-মহাতরী লইয়া জীবনসমুদ্রে পাড়ি দিতেছে তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙিয়া ছোটো ছোটো ভেলা তৈরি করা হয় তাহাতে মহাসমুদ্রের যাত্রা আর চলে না, তীরের কাছে থাকিয়া হাঁটুজলে খেলা করা চলে মাত্র। কিন্তু যাহারা কেবল খেলিবেই, কোনোদিন যাত্রা করিবেই না, তাহারা খড়কুটা যাহা খুশি লইয়া আপনার খেলনা তৈরি করুক না—তাহাদের জড়তার খাতিরে অমূল্য ধর্মতরীকে টুকরা করিয়াই কি চিরদিনের মতো সর্বনাশ ঘটাইতে হইবে?

একথা আবার বলিতেছি, ধর্ম মানুষের পূর্ণ শক্তির অকুণ্ঠিত বাণী, তাহার মধ্যে কোনো দ্বিধা নাই। সে মানুষকে মূঢ় বলিয়া স্বীকার করে না দুর্বল বলিয়া অবজ্ঞা করে না। সেই তো মানুষকে ডাক দিয়া বলিতেছে, তুমি অজয়, তুমি অশোক, তুমি অভয়, তুমি অমৃত। সেই ধর্মের বলেই মানুষ যাহা পারে নাই তাহা পারিতেছে, যাহা হইয়া উঠিবে বলিয়া কোনোদিন স্বপ্নেও মনে করে নাই একদিন তাহাই হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু এই ধর্মের মুখ দিয়াই মানুষ যদি মানুষকে এমন কথা কেবলই বলাইতে থাকে যে, "তুমি মূঢ়, তুমি বুঝিবে না," তবে তাহার মূঢ়তা ঘুচাইবে কে, যদি বলায় "তুমি অক্ষম, তুমি পারিবে না," তবে তাহাকে শক্তি দান করে জগতে এমন সাধ্য আর কাহার আছে?

আমাদের দেশে বহুকাল হইতে তাহাই ঘটিয়াছে। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোককেই আমাদের ধর্মশাসন স্বয়ং বলিয়া আসিয়াছে পূর্ণ সত্যে তোমার অধিকার নাই; অসম্পূর্ণেই তুমি সন্তুষ্ট হইয়া থাকো। কতশত লোক পিতা পিতামহ ধরিয়া এই কথা শুনিয়া আসিয়াছে মন্ত্রে তোমাদের দরকার নাই, পূজায় তোমাদের প্রয়োজন নাই, দেবমন্দিরে তোমাদের প্রবেশ নাই; তোমাদের কাছে ধর্মের দাবি, তোমাদের ক্ষুদ্র সাধ্যের পরিমাণে, যৎকিঞ্চিৎ মাত্র। তোমরা স্থূলকে লইয়াই থাকো চিত্তকে অধিক উচ্চে তুলিতে হইবে না, যেখানে আছ ওইখানেই নিচে পড়িয়া থাকিয়া সহজে তোমরা ধর্মের ফললাভ করিতে পারিবে।

অথচ হীনতম মানুষেরও একটিমাত্র সম্মানের স্থান আছে ধর্মের দিকে—তাহার জানা উচিত সেইখানেই তাহার অধিকারের কোনো সংকোচ নাই। রাজা বল, পণ্ডিত বল, অভিজাত বল, সংসারের ক্ষেত্রেই তাহাদের যত কিছু প্রতাপ প্রভুত্ব—ধর্মের ক্ষেত্রে দীনহীন মূর্খেরও অধিকার কোনো কৃত্রিম শাসনের দ্বারা সংকীর্ণ করিবার ভার কোনো মানুষের উপর নাই। ধর্মই মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো আশা—সেইখানেই তাহার মুক্তি, কেননা সেই খানেই তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ, সেইখানেই তাহার অন্তহীন সম্ভাব্যতা, ক্ষুদ্র বর্তমানের সমস্ত সংকোচ সেইখানেই ঘুচিতে পারে। অতএব সংসারের দিকে, জন্ম বা যোগ্যতার প্রতি চাহিয়া মানুষের স্বত্বকে যতই খণ্ডিত কর না, ধর্মের দিকে কোনো মানুষের জন্য কোনো বাধা সৃষ্টি করিতে পারে এতবড়ো স্পর্ধিত অধিকার কোনো পরমজ্ঞানী পুরুষের কোনো চক্রবর্তী সম্রাটের নাই।

ধর্মের অধিকার বিচার করিয়া তাহার সীমা নির্দেশ করিয়া দিতে পার তুমি কে, যে, তোমার সেই অলৌকিক শক্তি আছে! তুমি কি অন্তর্যামী? মানুষের মুক্তির ভার তুমি গ্রহণ করিবার অহংকার রাখ? তুমি লোকসমাজ তুমি লৌকিক ব্যবহারেও আপনাকে সামলাইতে পার না, কত তোমার পরাভব, কত তোমার বিকৃতি, কত তোমার প্রলোভন তুমিই তোমার অত্যাচারের লাঠিটাকে ধর্মের নামে গিল্টি করিয়া ধর্মরাজের স্থান জুড়িয়া বসিতে চাও! তাই করিয়া আজ শত শত বৎসর ধরিয়া এতবড়ো একটি সমগ্র জাতিকে তুমি মর্মে মর্মে শৃঙ্খলিত করিয়া তাহাকে পরাধীনতার অন্ধকূপের মধ্যে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়া দিয়াছ তাহার আর উদ্ধারের পথ রাখ নাই। যাহা ক্ষুদ্র, যাহা স্থূল, যাহা অসত্য, যাহা অবিশ্বাস্য তাহাকেও দেশকালপাত্র অনুসারে ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া কী প্রকাণ্ড, কী অসংগত, কী অসংলগ্ন জঞ্জালের ভয়ংকর বোঝা মানুষের মাথার উপরে আজ শত শত বৎসর ধরিয়া চাপাইয়া রাখিয়াছ! সেই ভগ্নমেরুদণ্ড নিষ্পেষিতপৌরুষ নতমস্তক মানুষ প্রশ্ন করিতেও জানে না, প্রশ্ন করিলেও

তাহার উত্তর কোথাও নাই—কেবল বিভীষিকার তাড়নায় এবং কাল্পনিক প্রলোভনের ব্যর্থ আশ্বাসে তাহাকে চালনা করিয়া যাইতেছে; চারিদিক হইতেই আকাশে তর্জনী উঠিতেছে এবং এই আদেশ নানা পরুষকণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে, যাহা বলিতেছি তাহাই মানিয়া যাও, কেননা তুমি মূঢ় তুমি বুঝিবে না; যাহা পাঁচজনে করিতেছে তাহাই করিয়া যাও, কেননা তুমি অক্ষম; সহস্র বৎসরের পূর্ববর্তীকালের সহিত তোমাকে আপাদমস্তক শতসহস্র সূত্রে একেবারে বাঁধিয়া রাখিয়াছি, কেননা নূতন করিয়া নিজের কল্যাণচিন্তা করিবার শক্তিমাত্র তোমার নাই। নিষেধজর্জরিত চিরকাপুরুষ নির্মাণ করিবার এত বড়ো সর্বদেশব্যাপী ভয়ংকর লৌহযন্ত্র ইতিহাসে আর কোথাও কি কেহ সৃষ্টি করিয়াছে—এবং সেই মনুষ্যত্ব চূর্ণ করিবার যন্ত্রকে আর কোনো দেশে কি ধর্মের পবিত্র উপাধিতে আখ্যাত করা হইয়াছে?

দুর্গতি তো প্রত্যক্ষ, আর তো কোনো যুক্তির প্রয়োজন দেখি না, কিন্তু সেই প্রত্যক্ষকে চোখ মেলিয়া দেখিব না, চোখ বুজিয়া কি কেবল তর্কই করিব। আমাদের দেশে ব্রহ্মের ধ্যানে পূজার্চনায় যে বহুবিচিত্র স্থূলতার প্রচার হইয়াছে তর্ককালে তাহাকে আমরা চরম বলিয়া মানি না। আমরা বলিয়া থাকি, যে মানুষ আধ্যাত্মিকতার যে অবস্থায় আছে এ দেশে তাহার জন্য সেই প্রকার আশ্রয় গড়িয়া দেওয়া হইয়াছে; এইরূপে প্রত্যেকে নিজ নিজ আশ্রয়ে থাকিয়া ক্রমশ স্বতই উচ্চতর অবস্থার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু জানিতে চাই অনন্ত কালের অসংখ্য মানুষের প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার জন্য সেরূপ উপযুক্ত আশ্রয় গড়িতে পারে এমন সাধ্য কাহার! সমস্ত বিচিত্রতাকেই স্থান দিবে, বাধা দিবে না, এতবড়ো বিশ্বকর্মা মানবসমাজে কে আছে?

বস্তুত মানুষের অসীম বৈচিত্র্যকে যাহারা সত্যই মানে তাহারা মানুষের জন্য অসীম স্থানকেই ছাড়িয়া রাখে। ক্ষেত্র যেখানে মুক্ত, বৈচিত্র্য সেখানে আপনি অবাধে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে। এই জন্যই যে-সমাজে জাগ্রত ও নিদ্রিতকালের সমস্ত ব্যাপারই একেবারে পাকা করিয়া বাঁধা সেখানে মানুষের চরিত্র আপন স্বাতন্ত্র্যে দৃঢ় হইয়া উঠিতে পারে না, সকলেই একছাঁচে গড়া নির্জীব ভালোমানুষটি হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও সে কথা খাটে। মানুষের সমস্ত চিন্তাকে কল্পনাকে পর্যন্ত যদি অবিচলিত স্থূল আকারে একেবারে বাঁধিয়া ফেলা যায়, যদি তাহাকে বলা যায় অসীমকে তুমি কেবল এই একটিমাত্র বা কয়টিমাত্র বিশেষ রূপেই চিন্তা করিতে থাকো তবে সেই উপায়ে সত্যই কি মানুষের স্বাভাবিক বৈচিত্র্যকে আশ্রয় দেওয়া হয়, তাহার চিরধাবমান পরিণতিপ্রবাহকে সাহায্য করা হয়? ইহাতে তাহার আধ্যাত্মিক বিকাশকে কি বদ্ধ

করাই হয় না, আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে তাহাকে কৃত্রিম উপায়ে মূঢ় ও পঙ্গু করিয়াই রাখা হয় না ?

এই যে এক সুবিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নানাজাতির নানালোক শিশুকাল হইতে বার্ধক্য পর্যন্ত নানা অবস্থার মধ্য দিয়া চিন্তা করিতেছে, কল্পনা করিতেছে, কর্ম করিতেছে ইহারা যদি একই জগতের মধ্যে সকলে ছাড়া না পাইত, যদি একদল প্রবলপ্রতাপশালী বুদ্ধিমান ব্যক্তি মন্ত্রণা করিয়া বলিত ইহাদের প্রত্যেকের জন্য এবং প্রত্যেকের প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার জন্য স্বতন্ত্র করিয়া ছোটো ছোটো জগৎ একেবারে পাকা করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া যাইবে তবে কি সেই হতভাগ্যদের উপকার করা হইত ? মানবচিত্তের চিরবিচিত্র অভিব্যক্তিকে কোনো কৃত্রিম সৃষ্টির মধ্যে চিরদিনের মতো আটক করা যাইতে পারে একথা যিনি কল্পনাও করিতে পারেন তিনি বিশ্বের অমিত্র। ছোটো হইতে বড়ো, অবোধ হইতে সুবোধ পর্যন্ত সকলেই এই একই অসীম জগতে বাস করিতেছে বলিয়াই প্রত্যেকেই আপন বুদ্ধি ও প্রকৃতি অনুসারে ইহার মধ্য হইতে আপন শক্তির পরিমাণ পুরা প্রাপ্য আদায় করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। সেই জন্যই শিশু যখন কিশোর বয়সে পৌছিতেছে তখন তাহাকে তাহার শৈশবজগৎটা বলপূর্বক ভাঙিয়া ফেলিয়া একটা বিপ্লব ঘটাইতে হইতেছে না। তাহার বুদ্ধি বাড়িল, শক্তি বাড়িল, জ্ঞান বাড়িল তবু তাহাকে নূতন জগতের সন্ধানে ছুটাছুটি করিয়া মরিতে হইল না। নিতান্ত অর্বাচীন মূঢ় এবং বুদ্ধিতে বৃহস্পতি সকলেরই পক্ষে এই একই সুবৃহৎ জগৎ। কিন্তু নিজের উপস্থিত প্রয়োজন বা মূঢ়তাবশতঃ মানুষ যেখানেই মানুষের বৈচিত্র্যকে শ্রেণীবিভক্ত করিয়া প্রত্যেকের অধিকারকে সনাতন করিয়া তুলিতে চাহিয়াছে সেইখানেই হয় মনুষ্যত্বকে বিনাশ করিয়াছে, নয়, ভয়ংকর বিদ্রোহ ও বিপ্লবকে আসন্ন করিয়া তুলিয়াছে। কোনো মতেই কোনো বুদ্ধিমানই মানুষের প্রকৃতিকে সজীব রাখিয়া তাহাকে চিরদিনের মতো সনাতন বন্ধনে বাঁধিতে পারেই না। মানুষকে না মারিয়া তাহাকে গোর দেওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নহে। মানুষের বুদ্ধিকে যদি থামাইয়া রাখিতে চাও তবে তাহার বুদ্ধিকে বিনষ্ট করো, তাহার জীবনের চাঞ্চল্যকে যদি কোনো একটা সুদূর অতীতের সুগভীর কূপের তলদেশে নিমগ্ন করিয়া রাখিতে চাও তবে তাহাকে নির্জীব করিয়া ফেলো। নিজের উপস্থিত প্রয়োজনে অবিবেকী হইয়া উঠিলে মানুষ তো মানুষকে এইরূপ নির্মমভাবে পঙ্গু করিতেই চায় ; সেই জন্যই তো মানুষ নির্লজ্জ ভাষায় এমন কথা বলে যে, আপামর সকলকেই যদি শিক্ষা দেওয়া হয় তবে আমরা আর চাকর পাইব না ; স্ত্রীলোককে যদি বিদ্যাদান করা যায় তবে তাহাকে দিয়া আর বাটনা বাটানো চলিবে না ; প্রজাদিগকে যদি অবাধে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া যায় তবে তাহারা নিজের সংকীর্ণ অবস্থায়

সন্তুষ্ট থাকিতে পারিবে না। বস্তুত এ কথা নিশ্চিত সত্য, মানুষকে কৃত্রিমশাসনে বাঁধিয়া খর্ব করিতে না পারিলে কোনো মতেই তাহাকে একই স্থানে চিরকালের মতো স্থির রাখিতে পারিবে না। অতএব যদি কেহ মনে করেন ধর্মকেও মানুষের অন্যান্য শত শত নাগপাশবন্ধনের মতো অন্যতম বন্ধন করিয়া তাহার দ্বারা মানুষের বুদ্ধিকে, বিশ্বাসকে, আচরণকে চিরদিনের মতো একই জায়গায় বাঁধিয়া ফেলিয়া সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকাই শ্রেয়, তবে তাঁহার কর্তব্য হইবে আহারে বিহারে নিদ্রায় জাগরণে শতসহস্র নিষেধের দ্বারা বিভীষিকা দ্বারা প্রলোভনের দ্বারা এবং অসংযত কাল্পনিকতার দ্বারা মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখা। সে মানুষকে জ্ঞানে কর্মে কোথাও যেন মুক্তির স্বাদ না দেওয়া হয়; ক্ষুদ্র বিষয়েও তাহার রুচি যেন বন্দী থাকে সামান্য ব্যাপারেও তাহার ইচ্ছা যেন ছাড়া না পায়, কোনো মঙ্গলচিন্তায় সে যেন নিজের বুদ্ধিবিচারকে খাটাইতে না পারে এবং বাহ্যিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক কোনো দিকেই সে যেন সমুদ্রপার হইবার কোনো সুযোগ না পায়, প্রাচীনতম শাস্ত্রের নোঙরে সে যেন কঠিনতম আচারের শৃঙ্খলে অবিচলিত হইয়া একই পাথরে বাঁধানো ঘাটে বাঁধা পড়িয়া থাকে। ১

কিন্তু তার্কিকের সহিত তর্ক করিতে গিয়া আমি হয়তো নিজের দেশের প্রতি অবিচার করিতেছি। এই যে দেখা যাইতেছে আমাদের ধর্মচিন্তায় স্থূলতা এবং আমাদের ধর্মকর্মে মূঢ়তা নানা রূপ ধরিয়া আজ সমস্ত দেশকে পর্দার উপর পর্দা ফেলিয়া বহুস্তরের অন্ধতায় আচ্ছন্ন করিয়াছে ইহা কোনো একদল বিশেষ বুদ্ধিমানে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া ঘটায় নাই। যদিও আমরা অহংকার করিয়া বলি ইহা আমাদের বহুদূরদর্শী পূর্বপুরুষদের জ্ঞানকৃত কিন্তু তাহা সত্য হইতেই পারে না— বস্তুত ইহা আমাদের অজ্ঞানকৃত। আমাদের দেশের ইতিহাসের বিশেষ অবস্থায় বিশেষ কারণে

১. এ কথার উত্তরে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন অধিকারভেদ চিরন্তন নহে, তাহা সাধনার অবস্থাভেদ মাত্র। কিন্তু আমাদের যে সমাজে বর্ণবিশেষের পক্ষে ধর্মের উচ্চতম অধিকার মুক্ত ও অন্যান্য বর্ণের পক্ষে তাহা রুদ্ধ সেখানে কি এমন কথা বলা চলে? একে তো প্রত্যেক মানুষের অধিকার কোনো কৃত্রিম নিয়মে কেহই স্থির করিয়া দিতেই পারে না তৎসত্ত্বে যদিবা দেখিতাম সমাজে সেই চেষ্টা সজীব হইয়া আছে, যদি দেখিতাম কখনো বা ব্রাহ্মণ শূদ্র হইয়া যাইতেছে ও শূদ্র ব্রাহ্মণ হইয়া উঠিতেছে তাহা হইলেও অন্তত ইহা বুঝিতে পারিতাম এখানে মানুষের অধিকারলাভ তাহার ব্যক্তিগত ক্ষমতার উপরেই নির্ভর করিতেছে। আমাদের দেশে সমাজের এবং ধর্মের অধিকারভেদ হয়তো এককালে সচল ও সজীবভাবে ছিল—কিন্তু যখনই তাহা সচলতা হারাইয়াছে তখনই তাহা আমাদের পথের বাধা হইয়াছে, যখনই তাহা আমাদের জীবনের সঙ্গে বাড়িয়া উঠিতেছে না তখনই তাহা আমাদের জীবনের গতিকে অবরুদ্ধ করিতেছে। এ কথা এখানে স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক পুরাকালে আর্যসমাজ কী নিয়মে চলিত তাহা এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে।

বিপাকে পড়িয়া এইরূপ ঘটিয়া উঠিয়াছে। এ কথা কখনোই সত্য নহে যে, আমরা অধিকারভেদ চিন্তা করিয়া মানুষের বুদ্ধির ওজনমতো ভিন্ন অবস্থার উপযোগী পূজার্চনা ও আচারপদ্ধতি সৃষ্টি করিয়াছি। আমাদের ঘাড়ে আসিয়া যাহা চাপিয়া পড়িয়াছে তাহাই আমরা বহন করিয়া লইয়াছি। ভারতবর্ষে আর্যেরা সংখ্যায় অল্প ছিলেন। তাঁহারা আপনার ধর্মকে সভ্যতাকে চিরদিন অবিমিশ্রভাবে নিজেদের প্রকৃতির পথে অভিব্যক্ত করিয়া তুলিতে পারেন নাই। পদে পদেই নানা অনুন্নত জাতির সহিত তাঁহাদের সংঘাত বাধিয়াছিল, তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিতে করিতেও তাহাদের সঙ্গে তাঁহাদের মিশ্রণ ঘটিতেছিল, পুরাণে ইতিহাসে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। এমনি করিয়া একদিন ভারতবর্ষীয় আর্যজাতির ঐক্যধারা বিভক্ত ও বিমিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। নানা নিকৃষ্ট জাতির নানা পূজাপদ্ধতি আচারসংস্কার কথাকাহিনী তাঁহাদের সমাজের ক্ষেত্রে জোর করিয়াই স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। অত্যন্ত বীভৎস নিষ্ঠুর অনার্য ও কুৎসিত সামগ্রীকেও ঠেকাইয়া রাখা সম্ভবপর হয় নাই। এই সমস্ত বহুবিচিত্র অসংলগ্ন স্তূপকে লইয়া আর্যশিল্পী কোনো একটা কিছু খাড়া করিয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহা অসাধ্য। যাহাদের মধ্যে সত্যকার মিল নাই, কৌশলে তাহাদের মিল করা যায় না। সমাজের মধ্যে যাহা কিছু স্রোতের বেগে আসিয়া পড়িয়াছে সমাজ যদি তাহাকেই সম্মতি দিতে বাধ্য হয় তবে সমাজের যাহা শ্রেষ্ঠ তাহার আর স্থান থাকে না। কাঁটাগাছকে পালন করিবার ভার যদি কৃষকের উপর চাপাইয়া দেওয়া হয় তবে শস্যকে রক্ষা করা অসাধ্য হয়। কাঁটাগাছের সঙ্গে শস্যের যে স্বাভাবিক বিরোধ আছে তাহার সমন্বয় সাধন করিতে পারে এমন কৃষক কোথায়! তাই আজ আমরা যেখানকার যত আগাছাকেই স্বীকার করিয়াছি; জঙ্গলে সমস্ত খেত একেবারে নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে;—সেই সমস্ত আগাছার মধ্যে বহু শতাব্দী ধরিয়া ঠেলাঠেলি চাপাচাপি চলিতেছে, আজ যাহা প্রবল, কাল তাহা দুর্বল হইতেছে, আজ যাহা স্থান পাইতেছে কাল তাহা স্থান পাইতেছে না, আবার এই ভিড়ের মধ্যে কোথা হইতে বাতাসে বাহিরের বীজ উড়িয়া আসিয়া ক্ষেত্রের কোন্ এক কোণে রাতারাতি আর একটা অদ্ভুত উদ্ভিদকে ভুঁই ফুড়িয়া তুলিতেছে। এখানে আর সমস্ত জঞ্জালই অবাধে প্রবেশ করিতে পারে, একমাত্র নিষেধ কেবল কৃষকের নিড়ানির বেলাতেই; যাহা কিছু হইতেছে সমস্তই প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মে হইতেছে;—পিতামহেরা এককালে সত্যের যে বীজ ছড়াইয়াছিলেন তাহার শস্য কোথায় চাপা পড়িয়াছে সে আর দেখা যায় না।—কেহ যদি সেই শস্যের দিকে তাকাইয়া জঙ্গলে হাত দিতে যায় তবে ক্ষেত্রপাল একেবারে লাঠি হাতে হাঁ হাঁ করিয়া

ছুটিয়া আসে, বলে, এই অর্বাচীনটা আমার সনাতন খেত নষ্ট করিতে আসিয়াছে। এই সমস্ত নানা জাতির বোঝা ও নানা কালের আবর্জনাকে লইয়া নির্বিচারে আমরা কেবলই একটা প্রকাণ্ড মোট বাঁধিতে বাঁধিতেই চলিয়াছি এবং সেই উত্তরোত্তর সঞ্চীয়মান উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট নূতন পুরাতন আর্য ও অনার্য অসম্বদ্ধতাকে হিন্দুধর্ম নামক এক নামে অভিহিত করিয়া এই সমস্তটাকেই আমাদের চিরকালীন জিনিস বলিয়া গৌরব করিতেছি ;—ইহার ভয়ংকর ভারে আমাদের জাতি কত যুগযুগান্তর ধরিয়া ধূলি-লুণ্ঠিত, কোনোমতেই সে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না ; এই বিমিশ্রিত বিপুল বোঝাটাই তাহার জীবনের সর্বোচ্চ সম্পদ বলিয়া তাহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে ; এই বোঝাকে কোনো দিকে কিছুমাত্র হ্রাস করিতে গেলেই সেটাকে সে অধর্ম বলিয়া প্রাণপণে বাধা দিতে থাকে ; এবং দুর্গতির মধ্যে ডুবিতে ডুবিতেও আজ সেই জাতির শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিরা গর্ব করিতে থাকেন যে, ধর্মের এমন অদ্ভুত বৈচিত্র্য জগতের আর কোথাও নাই, অন্ধসংস্কারের এরূপ বাধাহীন একাধিপত্য আর কোনো সমাজে দেখা যায় না, সকল প্রকার মুগ্ধ বিশ্বাসের এরূপ প্রশস্ত ক্ষেত্র মানবের ইতিহাসে আর কোথাও প্রস্তুত হয় নাই, এবং পরস্পরের মধ্যে এত ভেদ এত পার্থক্যকে আর কোথাও এমন করিয়া চিরদিন বিভক্ত করিয়া রাখা সম্ভবপর নহে—অতএব বিশ্ব-সংসারে একমাত্র হিন্দুসমাজেই উচ্চ নীচ সমান নির্বিচারে স্থান পাইয়াছে।

কিন্তু বিচারই মানুষের ধর্ম। উচ্চ ও নীচ, শ্রেয় ও প্রেয়, ধর্ম ও স্বভাবের মধ্যে তাহাকে বাছাই করিয়া লইতেই হইবে। সবই সে রাখিতে পারিবে না—সেরূপ চেষ্টা করিতে গেলে তাহার আত্মরক্ষাই হইবে না। স্থূলতম তামসিকতাই বলে যাহা যেমন আছে তাহা তেমনিই থাক, যাহা বিনাশের যোগ্য তাহাকেও এই তামসিকতাই সনাতন বলিয়া আঁকড়িয়া থাকিতে চায় এবং যাহা তাহাকে একই স্থানে পড়িয়া থাকিতে বলে তাহাকেই সে আপনার ধর্ম বলিয়া সম্মান করে।

মানুষ নিয়ত আপনার সর্বশ্রেষ্ঠকেই প্রকাশ করিবে ইহাই তাহার সাধনার লক্ষ্য। যাহা আপনি আসিয়া জমিয়াছে তাহাকে নহে, যাহা হাজার বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছে তাহাকেও নহে। নিজের এই সর্বশ্রেষ্ঠকেই নিয়ত প্রকাশ করিবার যে শক্তি, সেই শক্তি তাহার ধর্মই তাহাকে দান করে। এই কারণে মানুষ আপন ধর্মের আদর্শকে আপন তপস্যার সর্বশেষে, আপন শ্রেষ্ঠতার চরমেই স্থাপন করিয়া থাকে। কিন্তু মানুষ যদি বিপদে পড়িয়া বা মোহে ডুবিয়া ধর্মকেই নামাইয়া বসে তবে নিজের সবচেয়ে সাংঘাতিক বিপদ ঘটায়, তবে ধর্মের মতো সর্বনেশে ভার তাহার পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না। যাহাকে উপরে রাখিলে উপরে টানে, তাহাকে নিচে রাখিলে সে

নিচেই টানিয়া লয়। অতএব ধর্মকে কোনো জাতি যদি নীতির দিকে না বসাইয়া রীতির দিকে বসায়, বুদ্ধির দিকে না বসাইয়া সংস্কারের দিকেই বসায়, অন্তরের দিকে আসন না দিয়া যদি বাহ্য অনুষ্ঠানে তাহাকে বদ্ধ করে এবং ধর্মের উপরেই দেশকাল-পাত্রের ভার না দিয়া দেশকালপাত্রের হাতেই ধর্মকে হাত পা বাঁধিয়া নির্মমভাবে সমর্পণ করিয়া বসে; ধর্মেরই দোহাই দিয়া কোনো জাতি যদি মানুষকে পৃথক করিতে থাকে, এক শ্রেণীর অভিমানকে আর এক শ্রেণীর মাথার উপরে চাপাইয়া দেয় এবং মানুষের চরমতম আশা ও পরমতম অধিকারকে সংকুচিত ও শতখণ্ড করিয়া ফেলে; তবে সে-জাতিকে হীনতার অপমান হইতে রক্ষা করিতে পারে এমন কোনো সভা-সমিতি কন্‌গ্রেস কন্‌ফারেন্স্‌, এমন কোনো বাণিজ্য-ব্যবসায়ের উন্নতি, এমন কোনো রাষ্ট্রনৈতিক ইন্দ্রজাল বিশ্বজগতে নাই। সে জাতি এক সংকট হইতে উদ্ধার পাইলে আর এক সংকটে আসিয়া পড়িবে এবং এক প্রবলপক্ষ তাহাকে অনুগ্রহপূর্বক সম্মান-দান করিলে আর এক প্রবলপক্ষ অগ্রসর হইয়া তাহাকে লাঞ্ছনা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না; যে আপনার সর্বোচ্চকেই সর্বোচ্চ সম্মান না দেয় সে কখনোই উচ্চাসন পাইবে না। ইহাতে কোনো সন্দেহমাত্র নাই যে, ধর্মের বিকারেই গ্রীস মরিয়াছে, ধর্মের বিকারেই রোম বিলুপ্ত হইয়াছে এবং আমাদের দুর্গতির কারণ আমাদের ধর্মের মধ্যে ছাড়া আর কোথাও নাই। এবং ইহাতেও কোনো সন্দেহমাত্র নাই যে, যদি উদ্ধার ইচ্ছা করি তবে কোনো বাহিরের দিকে তাকাইয়া কোনো ফল নাই, কোনো উপস্থিত বাহ্য সুবিধার সুযোগ করিয়া কোনো লাভ নাই;—রক্ষার উপায়কে কেবলই বাহিরে খুঁজিতে যাওয়া দুর্বল আত্মার মূঢ়তা;—ইহাই ধ্রুব সত্য যে, ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।

১৩১৮

আমার জগৎ

পৃথিবীর রাত্রিটি যেন তার এলোচুল, পিঠ-ছাপিয়ে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত নেমে পড়েছে। কিন্তু সৌরজগৎলক্ষ্মীর শুভ্রললাটে একটি কৃষ্ণতিলও সে নয়। ওই তারাগুলির মধ্যে যে-খুশি সেই আপন শাড়ির একটি খুঁট দিয়ে এই কালিমার কণাটুকু মুছে নিলেও তার আঁচলে যেটুকু দাগ লাগবে তা অতি বড়ো নিন্দুকের চোখেও পড়বে না।

এ যেন আলোক মায়ের কোলের কালো শিশু, সবে জন্ম নিয়েছে। লক্ষ লক্ষ তারা অনিমেষে তার এই ধরণী-দোলার শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে। তারা একটু নড়ে না পাছে এর ঘুম ভেঙে যায়।

আমার বৈজ্ঞানিক বন্ধুর আর সইল না। তিনি বললেন, তুমি কোন্ সাবেককালের ওয়েটিং রুমের আরাম-কেদারায় পড়ে নিদ্রা দিচ্ছ ওদিকে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের রেলগাড়িটা যে বাঁশি বাজিয়ে ছুট দিয়েছে। তারাগুলো নড়ে না এটা তোমার কেমন কথা? একেবারে নিছক কবিত্ব!

আমার বলবার ইচ্ছা ছিল, তারাগুলো যে নড়ে এটা তোমার নিছক বৈজ্ঞানিকত্ব। কিন্তু সময় এমনি খারাপ ওটা জয়ধ্বনির মতোই শোনাবে।

আমার কবিত্বকলঙ্কটুকু স্বীকার করেই নেওয়া গেল। এই কবিত্বের কালিমা পৃথিবীর রাত্রিটুকুরই মতো। এর শিয়রের কাছে বিজ্ঞানের জগজ্জয়ী আলো দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু সে এর গায়ে হাত তোলে না। স্নেহ ক'রে বলে, আহা স্বপ্ন দেখুক।

আমার কথাটা হচ্ছে এই যে, স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি তারাগুলো চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। এর উপরে তো তর্ক চলে না।

বিজ্ঞান বলে, তুমি অত্যন্ত বেশি দূরে আছ বলেই দেখছ তারাগুলো স্থির। কিন্তু সেটা সত্য নয়।

আমি বলি, তুমি অত্যন্ত বেশি কাছে উঁকি মারছ বলেই বলছ ওরা চলছে। কিন্তু সেটা সত্য নয়।

বিজ্ঞান চোখ পাকিয়ে বলে, সে কেমন কথা?

আমিও চোখ পাকিয়ে জবাব দিই, কাছের পক্ষ নিয়ে তুমি যদি দূরকে গাল দিতে পার তবে দূরের পক্ষ নিয়ে আমিই বা কাছকে গাল দেব না কেন?

বিজ্ঞান বলে, যখন দুই পক্ষ একেবারে উলটো কথা বলে তখন ওদের মধ্যে এক পক্ষকেই মানতে হয়।

আমি বলি, তুমি তা তো মান না। পৃথিবীকে গোলাকার বলবার বেলায় তুমি অনায়াসে দূরের দোহাই পাড়। তখন বল, কাছে আছি বলেই পৃথিবীটাকে সমতল বলে ভ্রম হয়। তখন তোমার তর্ক এই যে কাছে থেকে কেবল অংশকে দেখা যায়, দূরে না দাঁড়ালে সমগ্রকে দেখা যায় না। তোমার এ কথাটায় সায় দিতে রাজি আছি। এই জন্যই তো আপনার সম্বন্ধে মানুষের মিথ্যা অহংকার। কেননা আপনি অত্যন্ত কাছে। শাস্ত্রে তাই বলে, আপনাকে যে লোক অন্যের মধ্যে দেখে সেই সত্য দেখে— অর্থাৎ আপনার থেকে দূরে না গেলে আপনার গোলাকার বিশ্বরূপ দেখা যায় না।

দূরকে যদি এতটা খাতিরই কর তবে কোন্ মুখে বলবে, তারাগুলো ছুটোছুটি ক'রে মরছে? মধ্যাহ্নসূর্যকে চোখে দেখতে গেলে কালো কাচের মধ্য দিয়ে দেখতে হয়। বিশ্বলোকের জ্যোতির্ময় দুর্দর্শরূপকে আমরা সমগ্রভাবে দেখব বলেই পৃথিবী এই কালো

রাত্রিটাকে আমাদের চোখের উপর ধরেছেন। তার মধ্যে দিয়ে কী দেখি? সমস্ত শান্ত, নীরব। এত শান্ত, এত নীরব যে আমাদের হাউই, তুবড়ি, তারাবাজিগুলো তাদের মুখের সামনে উপহাস করে আসতে ভয় করে না।

আমরা যখন সমস্ত তারাকে পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযোগে মিলিয়ে দেখছি তখন দেখছি তারা অবিচলিত স্থির। তখন তারা যেন গজমুক্তার সাতনলী হার। জ্যোতির্বিদ্যা যখন এই সম্বন্ধসূত্রকে বিচ্ছিন্ন ক'রে কোনো তারাকে দেখে তখন দেখতে পায় সে চলছে—তখন হার-ছেঁড়া মুক্তা টলটল করে গড়িয়ে বেড়ায়।

এখন মুশকিল এই, বিশ্বাস করি কাকে? বিশ্বতারা অন্ধকার সাক্ষ্যমঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে যে সাক্ষ্য দিচ্ছে তার ভাষা নিতান্ত সরল—একবার কেবল চোখ মেলে তার দিকে তাকালেই হয়, আর কিছুই করতে হয় না। আবার যখন দু-একটা তারা তাদের বিশ্বাসন থেকে নিচে নেমে এসে গণিতশাস্ত্রের গুহার মধ্যে ঢুকে কানে কানে কী সব বলে যায় তখন দেখি সে আবার আর এক কথা। যারা স্বদলের সম্বন্ধ ছেড়ে এসে পুলিস ম্যাজিস্ট্রেটের প্রাইভেট কামরায় ঢুকে সমস্ত দলের একজোট সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে গোপন সংবাদ ফাঁস করে দেবার ভান করে সেই সমস্ত অ্যাপ্রুভারদেরই যে পরম সত্যবাদী বলে গণ্য করতেই হবে এমন কথা নেই।

কিন্তু এই সমস্ত অ্যাপ্রুভাররা বিস্তারিত খবর দিয়ে থাকে। বিস্তারিত খবরের জোর বড়ো বেশি। সমস্ত পৃথিবী বলছে আমি গোলাকার, কিন্তু আমার পায়ের তলার মাটি বলছে আমি সমতল। পায়ের তলার মাটির জোর বেশি, কেননা সে যেটুকু বলে সে একেবারে তন্ন তন্ন করে বলে। পায়ের তলার মাটির কাছ থেকে পাই তথ্য, অর্থাৎ কেবল তথাকার খবর, বিশ্বপৃথিবীর কাছ থেকে পাই সত্য, অর্থাৎ সমস্তটার খবর।

আমার কথাটা এই যে কোনোটাকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। আমাদের যে দুইই চাই। তথ্য না হলেও আমাদের কাজকর্ম বন্ধ, সত্য না হলেও আমাদের পরিত্রাণ নেই। নিকট এবং দূর, এই দুই নিয়েই আমাদের যত কিছু কারবার। এমন অবস্থায় এদের কারও প্রতি যদি মিথ্যার কলঙ্ক আরোপ করি তবে সেটা আমাদের নিজের গায়েই লাগে।

অতএব যদি বলা যায়, আমার দূরের ক্ষেত্রে তারা স্থির আছে, আর আমার নিকটের ক্ষেত্রে তারা দৌড়োচ্ছে তাতে দোষ কী? নিকটকে বাদ দিয়ে দূর, এবং দূরকে বাদ দিয়ে নিকট যে একটা ভয়ংকর কবন্ধ। দূর এবং নিকট এরা দুইজনে দুই বিভিন্ন তথ্যের মালিক কিন্তু এরা দুজনেই কি এক সত্যের অধীন নয়?

সেই জন্যেই উপনিষৎ বলেছেন—

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।

তিনি চলেন এবং তিনি চলেন না, তিনি দূরে এবং তিনি নিকটে এ দুইই এক সঙ্গে সত্য। অংশকেও মানি, সমস্তকেও মানি; কিন্তু সমগ্রবিহীন অংশ ঘোর অন্ধকার এবং অংশবিহীন সমগ্র আরও ঘোর অন্ধকার।

এখনকার কালের পণ্ডিতেরা বলতে চান, চলা ছাড়া আর কিছুই নেই, ধ্রুবত্বটা আমাদের বিদ্যার সৃষ্টি মায়া। অর্থাৎ জগৎটা চলছে কিন্তু আমাদের জ্ঞানেতে আমরা তাকে একটা স্থিরত্বের কাঠামোর মধ্যে দাঁড় করিয়ে দেখছি নইলে দেখা ব'লে জানা ব'লে পদার্থটা থাকতই না—অতএব চলাটাই সত্য এবং স্থিরত্বটা বিদ্যার মায়া। আবার আর-এককালের পণ্ডিত বলেছিলেন, ধ্রুব ছাড়া আর কিছুই নেই, চঞ্চলতাটা অবিদ্যার সৃষ্টি। পণ্ডিতেরা যতক্ষণ এক পক্ষের ওকালতি করবেন ততক্ষণ তাঁদের মধ্যে লড়াইয়ের অন্ত থাকবে না। কিন্তু সরলবুদ্ধি জানে, চলাও সত্য, থামাও সত্য। অংশ, যেটা নিকটবর্তী, সেটা চলছে; সমগ্র, যেটা দূরবর্তী, সেটা স্থির রয়েছে।

এ সম্বন্ধে একটা উপমা আমি পূর্বেই ব্যবহার করেছি, এখনও ব্যবহার করব। গাইয়ে যখন গান করে তখন তার গাওয়াটা প্রতি মুহূর্তে চলতে থাকে। কিন্তু সমগ্র গানটা সকল মুহূর্তকে ছাড়িয়ে স্থির হয়ে আছে। যেটা কোনো গাওয়ার মধ্যেই চলে না সেটা গানই নয়, যেটা কোনো গানের মধ্যে স্থিরপ্রতিষ্ঠ হতে না পারে তাকে গাওয়াই বলা যেতে পারে না। গানে ও গাওয়ায় মিলে যে সত্য সেই তো—

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।

সে চলেও বটে চলে নাও বটে, সে দূরেও বটে নিকটেও বটে।

যদি এই পাতাটিকে অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখি তবে একে ব্যাপ্ত আকাশে দেখা হয়। সেই আকাশকে যতই ব্যাপ্ত করতে থাকব ততই ওই পাতার আকার আয়তন বাড়তে বাড়তে ক্রমেই সে সূক্ষ্ম হয়ে ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে যাবে। ঘন আকাশে যা আমার কাছে পাতা, ব্যাপ্ত আকাশে তা আমার কাছে নেই বললেই হয়।

এই তো গেল দেশ। তার পরে কাল। যদি এমন হতে পারত যে আমি যে কালটাতে আছি সেটা যেমন আছে তেমনিই থাকত অথচ গাছের ওই পাতাটার সম্বন্ধে এক মাসকে এক মিনিটে ঠেসে দিতে পারতুম তবে পাতা হওয়ার পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে পাতা হওয়ার পরবর্তী অবস্থা পর্যন্ত এমনি হুস করে দৌড় দিত যে আমি ওকে প্রায় দেখতে পেতুম না। জগতের যে সব পদার্থ আমাদের কাল থেকে অত্যন্ত ভিন্ন কালে চলছে তারা আমাদের চারদিকে থাকলেও তাদের দেখতেই পাচ্ছিনে এমন হওয়া অসম্ভব নয়।

একটা দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা আর একটু স্পষ্ট হবে। গণিত সম্বন্ধে এমন অসামান্য শক্তিশালী লোকের কথা শোনা গেছে যাঁরা বহুসময়সাধ্য দুরূহ অঙ্ক এক মুহূর্তে গণনা করে দিতে পারেন। গণনা সম্বন্ধে তাঁদের চিত্ত যে কালকে আশ্রয় ক'রে আছে আমাদের চেয়ে সেটা বহু দ্রুত কাল—সেই জন্যে যে পদ্ধতির ভিতর দিয়ে তাঁরা অঙ্কফলের মধ্যে গিয়ে উত্তীর্ণ হন সেটা আমরা দেখতেই পাইনে এমন কি তাঁরা নিজেরাই দেখতে পান না।

আমার মনে আছে, একদিন দিনের বেলা আমি অল্পক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছিলেম। আমি সেই সময়ের মধ্যে একটা দীর্ঘকালের স্বপ্ন দেখেছিলেম। আমার ভ্রম হল আমি অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি। আমার পাশের লোককে জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেল আমি পাঁচ মিনিটের বেশি ঘুমোইনি। আমার স্বপ্নের ভিতরকার সময়ের সঙ্গে আমার স্বপ্নের বাহিরের সময়ের পার্থক্য ছিল। আমি যদি একই সময়ে এই দুই কাল সম্বন্ধে সচেতন থাকতুম তাহলে হয় স্বপ্ন এত দ্রুতবেগে মনের মধ্যে চলে যেত যে, তাকে চেনা শক্ত হত, নয় তো সেই স্বপ্নবর্তীকালের রেলগাড়িতে ক'রে চলে যাওয়ার দরুন স্বপ্নের বাইরের জগৎটা রেলগাড়ির বাইরের দৃশ্যের মতো বেগে পিছিয়ে যেতে থাকত; তার কোনো একটা জিনিসের উপর চোখ রাখা যেত না। অর্থাৎ স্বভাবত যার গতি নেই সেও গতি প্রাপ্ত হত।

যে ঘোড়া দৌড়োচ্ছে তার সম্বন্ধে এক মিনিটকে যদি দশঘণ্টা করতে পারি তাহলে দেখব তার পা উঠছেই না। ঘাস প্রতিমুহূর্তে বাড়ছে অথচ আমরা তা দেখতেই পাচ্ছিনে। ব্যাপক কালের মধ্যে ঘাসের হিসাব নিয়ে তবে আমরা জানতে পারি ঘাস বাড়ছে। সেই ব্যাপক কাল যদি আমাদের আয়ত্তের চেয়ে বেশি হত তাহলে ঘাস আমাদের পক্ষে পাহাড় পর্বতের মতোই অচল হত।

অতএব আমাদের মন যে কালের তালে চলছে তারই বেগ অনুসারে আমরা দেখছি বটগাছটা দাঁড়িয়ে আছে এবং নদীটা চলছে। কালের পরিবর্তন হলে হয়তো দেখতুম বটগাছটা চলছে কিংবা নদীটা নিস্তব্ধ।

তাহলেই দেখা যাচ্ছে, আমরা যাকে জগৎ বলছি সেটা আমাদের জ্ঞানের যোগে ছাড়া হতেই পারে না। যখন আমরা পাহাড় পর্বত সূর্য চন্দ্র দেখি তখন আমাদের সহজেই মনে হয় বাইরে যা আছে আমরা তাই দেখছি। যেন আমার মন আয়নামাত্র। কিন্তু আমার মন আয়না নয়, তা সৃষ্টির প্রধান উপকরণ। আমি যে মুহূর্তে দেখছি সেই মুহূর্তে সেই দেখার যোগে সৃষ্টি হচ্ছে। যতগুলি মন ততগুলি সৃষ্টি। অন্য কোনো অবস্থায় মনের প্রকৃতি যদি অন্য রকম হয় তবে সৃষ্টিও অন্য রকম হবে।

আমার মন ইন্দ্রিয়যোগে ঘন দেশের জিনিসকে একরকম দেখে, ব্যাপক দেশের জিনিসকে অন্য রকম দেখে, দ্রুতকালের গতিতে এক রকম দেখে, মন্দকালের গতিতে অন্য রকম দেখে—এই প্রভেদ অনুসারে সৃষ্টির বিচিত্রতা। আকাশে লক্ষকোটি ক্রোশ পরিমাণ দেশকে যখন সে এক হাত আধ হাতের মধ্যে দেখে তখন দেখে তারাগুলি কাছাকাছি এবং স্থির। আমার মন কেবল যে আকাশের তারাগুলিকে দেখছে তা নয়, লোহার পরমাণুকেও নিবিড় এবং স্থির দেখছে—যদি লোহাকে সে ব্যাপ্ত আকাশে দেখত তাহলে দেখত তার পরমাণুগুলি স্বতন্ত্র হয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে। এই বিচিত্র দেশকালের ভিতর দিয়ে দেখাই হচ্ছে সৃষ্টির লীলা দেখা। সেই জন্যেই লোহা হচ্ছে লোহা, জল হচ্ছে জল, মেঘ হচ্ছে মেঘ।

কিন্তু বিজ্ঞান ঘড়ির কাঁটার কাল এবং গজকাঠির মাপ দিয়ে সমস্তকে দেখতে চায়। দেশকালের এক আদর্শ দিয়ে সমস্ত সৃষ্টিকে সে বিচার করে। কিন্তু এই এক আদর্শ সৃষ্টির আদর্শই নয়। সুতরাং বিজ্ঞান সৃষ্টিকে বিশ্লিষ্ট ক'রে ফেলে। অবশেষে অণু পরমাণুর ভিতর দিয়ে এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছোয় যেখানে সৃষ্টিই নেই। কারণ সৃষ্টি তো অণু পরমাণু নয়—দেশকালের বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে আমাদের মন যা দেখছে তাই সৃষ্টি। ঈথর পদার্থের কম্পনমাত্র সৃষ্টি নয় আলোকের অনুভূতিই সৃষ্টি। আমার বোধকে বাদ দিয়ে যুক্তি দ্বারা যা দেখছি তাই প্রলয়, আর বোধের দ্বারা যা দেখছি তাই সৃষ্টি।

বৈজ্ঞানিক বন্ধু তাড়া করে এলেন ব'লে। তিনি বলবেন, বিজ্ঞান থেকে আমরা বহুকষ্টে বোধকে খেদিয়ে রাখি—কারণ আমার বোধ এক কথা বলে, তোমার বোধ আর-এক কথা বলে। আমার বোধ এখন এক কথা বলে, তখন আর এক কথা বলে।

আমি বলি ওই তো হল সৃষ্টিতত্ত্ব। সৃষ্টি তো কলের সৃষ্টি নয় সে যে মনের সৃষ্টি। মনকে বাদ দিয়ে সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা, আর রামকে বাদ দিয়ে রামায়ণ গান একই কথা।

বৈজ্ঞানিক বলবেন—এক এক মন এক এক রকমের সৃষ্টি যদি ক'রে বসে তাহলে সেটা যে অনাসৃষ্টি হয়ে দাঁড়ায়।

আমি বলি,—তা তো হয়নি। হাজার লক্ষ মনের যোগে হাজার লক্ষ সৃষ্টি কিন্তু তবুও তো দেখি সেই বৈচিত্র্যসত্ত্বেও তাদের পরস্পরের যোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি। তাই তো তোমার কথা আমি বুঝি, আমার কথা তুমি বোঝ।

তার কারণ হচ্ছে, আমার এক-টুকরো মন যদি বস্তুত কেবল আমারই হত তাহলে

মনের সঙ্গে মনের কোনো যোগই থাকত না। মন পদার্থটা জগদ্ব্যাপী। আমার মধ্যে সেটা বদ্ধ হয়েছে বলেই যে সেটা খণ্ডিত তা নয়। সেই জন্যেই সকল মনের ভিতর দিয়েই একটা ঐক্যতত্ত্ব আছে। তা না হলে মানুষের সমাজ গড়ত না মানুষের ইতিহাসের কোনো অর্থ থাকত না।

বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা করছেন, এই মন পদার্থটা কী শুনি।

আমি উত্তর করি যে, তোমার ঈথর-পদার্থের চেয়ে কম আশ্চর্য এবং অনির্বচনীয় নয়। অসীম যেখানে সীমাকে গ্রহণ করেছেন সেইটে হল মনের দিক। সেই দিকেই দেশকাল; সেই দিকেই রূপরসগন্ধ ; সেই দিকেই বহু। সেই দিকেই তাঁর প্রকাশ।

বৈজ্ঞানিক বলেন, অসীমের সীমা এসব কথা কবি যখন আলোচনা করেন তখন কি কবিরাজ ডাকা আবশ্যক হয় না ?

আমার উত্তর এই যে, এ আলোচনা নতুন নয়। পুরাতন নজির আছে। খ্যাপার বংশ সনাতনকাল থেকে চলে আসছে। তাই পুরাতন ঋষি বলছেন—

অন্ধং তমঃপ্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।

যে লোক অনন্তকে বাদ দিয়ে অন্তের উপাসনা করে সে অন্ধকারে ডোবে। আর যে অন্তকে বাদ দিয়ে অনন্তের উপাসনা করে সে আরও বেশি অন্ধকারে ডোবে।

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।

অন্তকে অনন্তকে যে একত্র ক'রে জানে সেই অন্তের মধ্য দিয়ে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয় আর অনন্তের মধ্যে অমৃতকে পায়।

তাই বলে সীমা ও অসীমের ভেদ একেবারেই ঘুচিয়ে দেখাই যে দেখা তাও নয় সে কথাও আছে। তাঁরা বলছেন অন্ত এবং অনন্তের পার্থক্যও আছে। পার্থক্য যদি না থাকে তবে সৃষ্টি হয় কী করে ? আবার যদি বিরোধ থাকে তাহলেই বা সৃষ্টি হয় কী করে ? সেই জন্যে অসীম যেখানে সীমায় আপনাকে সংকুচিত করেছেন সেইখানেই তাঁর সৃষ্টি সেইখানেই তাঁর বহুত্ব—কিন্তু তাতে তাঁর অসীমতাকে তিনি ত্যাগ করেননি।

নিজের অস্তিত্বটার কথা চিন্তা করলে একথা বোঝা সহজ হবে। আমি আমার চলাফেরা কথাবার্তায় প্রতি মুহূর্তে নিজেকে প্রকাশ করছি—সেই প্রকাশ আমার আপনাকে আপনার সৃষ্টি। কিন্তু সেই প্রকাশের মধ্যে আমি যেমন আছি তেমনি সেই প্রকাশকে বহুগুণে আমি অতিক্রম ক'রে আছি। আমার এক কোটিতে অন্ত

আর এক কোটিতে অনন্ত। আমার অব্যক্ত-আমি আমার ব্যক্ত-আমির যোগে সত্য। আমার ব্যক্ত-আমি আমার অব্যক্ত-আমির যোগে সত্য।

তার পরে কথা এই যে, তবে এই আমিটা কোথা থেকে আসে। সেটাও আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব নয়। অসীম যেখানে আপনাকে সীমায় সংহত করেছেন সেখানেই অহংকার। সোঽহমস্মি। সেখানেই তিনি হচ্ছেন আমি আছি। অসীমের বাণী, অর্থাৎ সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশই হচ্ছে, অহমস্মি। আমি আছি। যেখানেই হওয়ার পালা আরম্ভ হল সেখানেই আমির পালা। সমস্ত সীমার মধ্যেই অসীম বলছেন, অহমস্মি। আমি আছি, এইটেই হচ্ছে সৃষ্টির ভাষা।

এই এক আমি-আছিই লক্ষ লক্ষ আমি-আছিতে ছড়িয়ে পড়েছেন—তবু তার সীমা নেই। যদিচ আমার আমি-আছি সেই মহা আমি-আছির প্রকাশ কিন্তু তাই বলে একথা বলাও চলে না যে এই প্রকাশেই তাঁর প্রকাশ সমাপ্ত। তিনি আমার আমি আছির মধ্যেও যেমন আছেন তেমনি আমার আমি-আছিকে অতিক্রম করেও আছেন। সেই জন্যেই অগণ্য আমি-আছির মধ্যে যোগের পথ রয়েছে। সেই জন্যেই উপনিষৎ বলেছেন,—সর্বভূতের মধ্যে যে লোক আত্মাকে এবং আত্মার মধ্যে যে লোক সর্বভূতকে জানে সে আর গোপন থাকতে পারে না। আপনাকে সেই জানে না যে লোক আপনাকে কেবল আপনি বলেই জানে, অন্যকেও যে আপন বলে জানে না।

তত্ত্বজ্ঞানে আমার কোনো অধিকার নেই—আমি সেদিক থেকে কিছু বলছিও নে। আমি সেই মূঢ় যে মানুষ বিচিত্রকে বিশ্বাস করে, বিশ্বকে সন্দেহ করে না। আমি নিজের প্রকৃতির ভিতর থেকেই জানি দূরও সত্য নিকটও সত্য, স্থিতিও সত্য গতিও সত্য। অণু পরমাণু যুক্তির দ্বারা বিশ্লিষ্ট এবং ইন্দ্রিয় মনের আশ্রয় থেকে একেবারে ভ্রষ্ট হতে হতে ক্রমে আকার আয়তনের অতীত হয়ে প্রলয় সাগরের তীরে এসে দাঁড়ায় সেটা আমার কাছে বিস্ময়কর বা মনোহর বোধ হয় না। রূপই আমার কাছে আশ্চর্য, রসই আমার কাছে মনোহর। সকলের চেয়ে আশ্চর্য এই যে আকারের ফোয়ারা নিরাকারের হৃদয় থেকে নিত্যকাল উৎসারিত হয়ে কিছুতেই ফুরোতে চাচ্ছে না। আমি এই দেখেছি যেদিন আমার হৃদয় প্রেমে পূর্ণ হয়ে ওঠে সেদিন সূর্যালোকের উজ্জ্বলতা বেড়ে ওঠে, সেদিন চন্দ্রালোকের মাধুর্য ঘনীভূত হয় সেদিন সমস্ত জগতের সুর এবং তাল নতুন তানে নতুন লয়ে বাজতে থাকে—তার থেকেই বুঝতে পারি, জগৎ আমার মন দিয়ে আমার হৃদয় দিয়ে ওতপ্রোত। যে দুইয়ের যোগে সৃষ্টি হয় তার মধ্যে এক হচ্ছে আমার হৃদয় মন। আমি যখন বর্ষার গান গেয়েছি তখন সেই মেঘমল্লারে জগতের সমস্ত বর্ষার অশ্রুপাতধ্বনি নবতর ভাষা এবং অপূর্ব বেদনায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে,

চিত্রকরের চিত্র, এবং কবির কাব্যে বিশ্বরহস্য নূতন রূপ এবং নূতন বেশ ধরে দেখা দিয়েছে—তার থেকেই জেনেছি এই জগতের জল স্থল আকাশ আমার হৃদয়ের তন্তু দিয়ে বোনা, নইলে আমার ভাষার সঙ্গে এর ভাষার কোনো যোগই থাকত না; গান মিথ্যা হত, কবিত্ব মিথ্যা হত, বিশ্বও যেমন বোবা হয়ে থাকত আমার হৃদয়কেও তেমনি বোবা করে রাখত। কবি এবং গুণীদের কাজই এই যে, যারা ভুলে আছে তাদের মনে করিয়ে দেওয়া যে, জগৎটা আমি, জগৎটা আমার, ওটা রেডিয়ো-চাঞ্চল্য-মাত্র নয়। তত্ত্বজ্ঞান যা বলছে সে এক কথা, বিজ্ঞান যা বলছে সে এক কথা, কিন্তু কবি বলছে আমার হৃদয়মনের তারে ওস্তাদ বীণা বাজাচ্ছেন সেই তো এই বিশ্বসংগীত নইলে কিছুই বাজত না। বীণার তার একটি নয়—লক্ষ তারে লক্ষ সুর কিন্তু সুরে সুরে বিরোধ নেই। এই হৃদয়মনের বীণাযন্ত্রটি জড়যন্ত্র নয়, এ যে প্রাণবান—এই জন্য এ যে কেবল বাঁধা সুর বাজিয়ে যাচ্ছে তা নয়; এর সুর এগিয়ে চলছে, এর সপ্তক বদল হচ্ছে, এর তার বেড়ে যাচ্ছে, একে নিয়ে যে জগৎ সৃষ্টি হচ্ছে সে কোথাও স্থির হয়ে নেই; কোথাও গিয়ে সে থামবে না; মহারসিক আপন রস দিয়ে চিরকাল এর কাছ থেকে নব রস আদায় করে নেবেন, এর সমস্ত সুখ সমস্ত দুঃখ সার্থক করে তুলবেন। আমি ধন্য যে, আমি পান্থশালায় বাস করছিনে, রাজপ্রাসাদের এক কামরাতেও আমার বাস নির্দিষ্ট হয়নি। এমন জগতে আমার স্থান, আমার আপনাকে দিয়ে যার সৃষ্টি; সেই জন্যই এ কেবল পঞ্চভূত বা চৌষট্টিভূতের আড্ডা নয়, এ আমার হৃদয়ের কুলায়, এ আমার প্রাণের লীলাভবন, আমার প্রেমের মিলনতীর্থ।

১৩২১

পরিচয়

পরিচয়

ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা

সমস্ত বিশ্বব্যাপারের মধ্যেই একটা নিশ্বাস ও প্রশ্বাস, নিমেষ ও উন্মেষ, নিদ্রা ও জাগরণের পালা আছে; একবার ভিতরের দিকে একবার বহিরের দিকে নামা উঠার ছন্দ নিয়তই চলিতেছে। থামা এবং চলার অবিরত যোগেই বিশ্বের গতিক্রিয়া সম্পাদিত। বিজ্ঞান বলে, বস্তুমাত্রই সছিদ্র, অর্থাৎ "আছে" এবং "নাই" এই দুইয়ের সমষ্টিতেই তাহার অস্তিত্ব। এই আলোক ও অন্ধকার, প্রকাশ ও অপ্রকাশ এমনি ছন্দে ছন্দে যতি রাখিয়া চলিতেছে যে, তাহাতে সৃষ্টিকে বিচ্ছিন্ন করিতেছে না, তাহাকে তালে তালে অগ্রসর করিতেছে।

ঘড়ির ফলকটার উপরে মিনিটের কাঁটা ও ঘণ্টার কাঁটার দিকে তাকাইলে মনে হয় তাহা অবাধে একটানা চলিয়াছে কিংবা চলিতেছেই না। কিন্তু সেকেণ্ডের কাঁটা লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় তাহা টিকটিক করিয়া লাফ দিয়া দিয়া চলিতেছে। দোলনদণ্ডটা যে একবার বামে থামিয়া দক্ষিণে যায়, আবার দক্ষিণে থামিয়া বামে আসে তাহা ওই সেকেণ্ডের তালে লয়েই ধরা পড়ে। বিশ্বব্যাপারে আমরা ওই মিনিটের কাঁটা ঘড়ির কাঁটাটাকেই দেখি কিন্তু যদি তাহার অণুপরিমাণ কালের সেকেণ্ডের কাঁটাটাকে দেখিতে পাইতাম তবে দেখিতাম বিশ্ব নিমেষে নিমেষে থামিতেছে ও চলিতেছে—তাহার একটানা তানের মধ্যে পলকে পলকে লয় পড়িতেছে। সৃষ্টির দ্বন্দ্বদোলকটির এক প্রান্তে হাঁ অন্য প্রান্তে না, একপ্রান্তে এক অন্য প্রান্তে দুই, একপ্রান্তে আকর্ষণ অন্য প্রান্তে বিকর্ষণ, একপ্রান্তে কেন্দ্রের অভিমুখী ও অন্য প্রান্তে কেন্দ্রের প্রতিমুখী শক্তি। তর্কশাস্ত্রে এই বিরোধকে মিলাইবার জন্য আমরা কত মতবাদের অসাধ্য ব্যায়ামে প্রবৃত্ত, কিন্তু সৃষ্টিশাস্ত্রে ইহারা সহজেই মিলিত হইয়া বিশ্বরহস্যকে অনির্বচনীয় করিয়া তুলিতেছে।

শক্তি জিনিসটা যদি একলা থাকে তবে সে নিজের একঝোঁকা জোরে কেবল একটা দীর্ঘ লাইন ধরিয়া ভীষণ উদ্ধতবেগে সোজা চলিতে থাকে, ডাইনে বাঁয়ে ভ্রূক্ষেপমাত্র করে না; কিন্তু শক্তিকে জগতে একাধিপত্য দেওয়া হয় নাই বলিয়াই, বরাবর তাহাকে জুড়িতে জোড়া হইয়াছে বলিয়াই, দুইয়ের উলটাটানে বিশ্বের সকল জিনিসই নম্র হইয়া

গোল হইয়া সুসম্পূর্ণ হইতে পারিয়াছে। সোজা লাইনের সমাপ্তিহীনতা, সোজা লাইনের অতি তীব্র তীক্ষ্ণ কৃশতা বিশ্বপ্রকৃতির নহে; গোল আকারের সুন্দর পরিপুষ্ট পরিসমাপ্তিই বিশ্বের স্বভাবগত। এই এক শক্তির একাগ্র সোজা রেখায় সৃষ্টি হয় না— তাহা কেবল ভেদ করিতে পারে, কিন্তু কোনো কিছুকেই ধরিতে পারে না, বেড়িতে পারে না, তাহা একেবারে রিক্ত, তাহা প্রলয়েরই রেখা; রুদ্রের প্রলয়পিনাকের মতো তাহাতে কেবল একই সুর, তাহাতে সংগীত নাই; এই অন্য শক্তি একক হইয়া উঠিলেই তাহা বিনাশের কারণ হইয়া উঠে। দুই শক্তির যোগেই বিশ্বের যত কিছু ছন্দ। আমাদের এই জগৎকাব্য মিত্রাক্ষর—পদে পদে তাহার জুড়িজুড়ি মিল।

বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে এই ছন্দটি যত স্পষ্ট এবং বাধাহীন, মানবপ্রকৃতির মধ্যে তেমন নহে। সেখানেও এই সংকোচন ও প্রসারণের তত্ত্বটি আছে—কিন্তু তাহার সামঞ্জস্যটিকে আমরা সহজে রাখিতে পারি না। বিশ্বের গানে তালটি সহজ, মানুষের গানে তালটি বহু সাধনার সামগ্রী। আমরা অনেক সময়ে দ্বন্দ্বের এক প্রান্তে আসিয়া এমনি ঝুঁকিয়া পড়ি যে অন্য প্রান্তে ফিরিতে বিলম্ব হয় তখন তাল কাটিয়া যায়, প্রাণপণে ত্রুটি সারিয়া লইতে গলদ্ঘর্ম হইয়া উঠিতে হয়। একদিকে আত্ম একদিকে পর, একদিকে অর্জন একদিকে বর্জন, একদিকে সংযম একদিকে স্বাধীনতা, একদিকে আচার একদিকে বিচার মানুষকে টানিতেছে; এই দুই টানার তাল বাঁচাইয়া সমে আসিয়া পৌঁছিতে শেখাই মনুষ্যত্বের শিক্ষা; এই তাল-অভ্যাসের ইতিহাসই মানুষের ইতিহাস। ভারতবর্ষে সেই তালের সাধনায় ছবিটিকে স্পষ্ট করিয়া দেখিবার সুযোগ আছে।

গ্রীস রোম ব্যাবিলন প্রভৃতি সমস্ত পুরাতন মহাসভ্যতার গোড়াতেই একটা জাতি-সংঘাত আছে। এই জাতিসংঘাতের বেগেই মানুষ পরের ভিতর দিয়া আপনার ভিতরে পুরামাত্রায় জাগিয়া উঠে। এইরূপ সংঘাতেই মানুষ রূঢ়িক হইতে যৌগিক বিকাশ লাভ করে এবং তাহাকেই বলে সভ্যতা।

পর্দা উঠিবামাত্র ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রথমাঙ্কেই আমরা আর্য-অনার্যের প্রচণ্ড জাতিসংঘাত দেখিতে পাই। এই সংঘাতের প্রথম প্রবলবেগে অনার্যের প্রতি আর্যের যে বিদ্বেষ জাগিয়াছিল তাহারই ধাক্কায় আর্যেরা নিজের মধ্যে নিজে সংহত হইতে পারিল।

এইরূপ সংহত হইবার অপেক্ষা ছিল। কারণ, ভারতবর্ষে আর্যেরা কালে কালে ও দলে দলে প্রবেশ করিতেছিলেন। তাঁহাদের সকলেরই গোত্র, দেবতা ও মন্ত্র যে একই ছিল তাহা নহে। বাহির হইতে যদি একটা প্রবল আঘাত তাঁহাদিগকে বাধা না দিত তবে এই আর্য উপনিবেশ দেখিতে দেখিতে নানা শাখা প্রতিশাখায় সম্পূর্ণ বিভক্ত হইয়া

বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইত। তাহারা আপনাদিগকে এক বলিয়া জানিতে পারিত না। আপনাদের সামান্য বাহ্য ভেদগুলিকেই বড়ো করিয়া দেখিত। পরের সঙ্গে লড়াই করিতে গিয়াই আর্যেরা আপনাকে আপন বলিয়া উপলব্ধি করিলেন।

বিশ্বের সকল পদার্থের মতো সংঘাত পদার্থেরও দুই প্রান্ত আছে—তাহার একপ্রান্তে বিচ্ছেদ, আর এক প্রান্তে মিলন। তাই এই সংঘাতের প্রথম অবস্থায় স্ববর্ণের ভেদরক্ষার দিকে আর্যদের যে আত্মসংকোচন জন্মিয়াছিল সেইখানেই ইতিহাস চিরকাল থামিয়া থাকিতে পারে না। বিশ্বছন্দ-তত্ত্বের নিয়মে আত্মপ্রসারণের পথে মিলনের দিকে ইতিহাসকে একদিন ফিরিতে হইয়াছিল।

অনার্যদের সহিত বিরোধের দিনে আর্যসমাজে যাঁহারা বীর ছিলেন, জানি না তাঁহারা কে। তাঁহাদের চরিতকাহিনী ভারতবর্ষের মহাকাব্যে কই তেমন করিয়া তো বর্ণিত হয় নাই। হয়তো জনমেজয়ের সর্পসত্রের কথার মধ্যে একটা প্রচণ্ড প্রাচীন যুদ্ধ-ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে। পুরুষানুক্রমিক শত্রুতার প্রতিহিংসা সাধনের জন্য সর্প-উপাসক অনার্য নাগজাতিকে একেবারে ধ্বংস করিবার জন্য জনমেজয় নিদারুণ উদ্‌যোগ করিয়াছিলেন এই পুরাণকথায় তাহা ব্যক্ত হইয়াছে বটে তবু এই রাজা ইতিহাসে তো কোনো বিশেষ গৌরব লাভ করেন নাই।

কিন্তু অনার্যদের সহিত আর্যদের মিলন ঘটাইবার অধ্যবসায়ে যিনি সফলতা লাভ করিয়াছিলেন তিনি আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে অবতার বলিয়া পূজা পাইয়া আসিতেছেন।

আর্য অনার্যের যোগবন্ধন তখনকার কালের যে একটি মহা উদ্‌যোগের অঙ্গ, রামায়ণ-কাহিনীতে সেই উদ্‌যোগের নেতারূপে আমরা তিনজন ক্ষত্রিয়ের নাম দেখিতে পাই। জনক, বিশ্বামিত্র ও রামচন্দ্র। এই তিন জনের মধ্যে কেবল মাত্র একটা ব্যক্তিগত যোগ নহে একটা এক অভিপ্রায়ের যোগ দেখা যায়। বুঝিতে পারি রামচন্দ্রের জীবনের কাজে বিশ্বামিত্র দীক্ষাদাতা—এবং বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের সম্মুখে যে লক্ষ্যস্থাপন করিয়াছিলেন তাহা তিনি জনক রাজার নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন।

এই জনক, বিশ্বামিত্র ও রামচন্দ্র যে পরস্পরের সমসাময়িক ছিলেন সে কথা হয়তো বা কালগত ইতিহাসের দিক দিয়া সত্য নহে, কিন্তু ভাবগত ইতিহাসের দিক দিয়া এই তিন ব্যক্তি পরস্পরের নিকটবর্তী। আকাশের যুগ্মনক্ষত্রগুলিকে কাছে হইতে দেখিতে গেলে মাঝখানকার ব্যবধানে তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখায়—তাহারা যে জোড়া তাহা দূর হইতে সহজেই দেখা যায়। জাতীয় ইতিহাসের আকাশেও এইরূপ অনেক জোড়া নক্ষত্র আছে, কালের ব্যবধানের দিক দিয়া দেখিতে গেলে তাহাদের ঐক্য

হারাইয়া যায়—কিন্তু আভ্যন্তরিক যোগের আকর্ষণে তাহারা এক হইয়া মিলিয়াছে। জনক বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের যোগও যদি সেইরূপ কালের যোগ না হইয়া ভাবের যোগ হয় তবে তাহা আশ্চর্য নহে।

এইরূপ ভাবগত ইতিহাসে ব্যক্তি ক্রমে ভাবের স্থান অধিকার করে। ব্রিটিশ পুরাণ-কথায় যেমন রাজা আর্থার। তিনি জাতির মনে ব্যক্তিরূপ ত্যাগ করিয়া ভাবরূপ ধারণ করিয়াছেন। জনক ও বিশ্বামিত্র সেইরূপ আর্য ইতিহাসগত একটি বিশেষ ভাবের রূপক হইয়া উঠিয়াছেন, রাজা আর্থার মধ্যযুগের য়ুরোপীয় ক্ষত্রিয়দের একটি বিশেষ খ্রীস্টীয় আদর্শদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাহাকেই জয়যুক্ত করিবার জন্য বিরুদ্ধ পক্ষের সহিত লড়াই করিতেছেন এই যেমন দেখি, তেমনি ভারতে একদিন ক্ষত্রিয়দল ধর্মে এবং আচরণে একটি বিশেষ উচ্চ আদর্শকে উদ্ভাবিত করিয়া তুলিয়া বিরোধিদলের সহিত দীর্ঘকাল ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ভারতীয় ইতিহাসে তাহার আভাস পাওয়া যায়। এই সংগ্রামে ব্রাহ্মণেরাই যে তাঁহাদের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিলেন তাহারও প্রমাণ আছে।

তখনকার কালের নবক্ষত্রিয়দলের এই ভাবটা কী, তাহার পুরা-পুরি সমস্তটা জানা এখন অসম্ভব, কেননা বিপ্লবের জয় পরাজয়ের পরে আবার যখন সকল পক্ষের মধ্যে একটা রফা হইয়া গেল তখন সমাজের মধ্যে বিরোধের বিষয়গুলি আর পৃথক হইয়া রহিল না এবং ক্ষতচিহ্নগুলি যত শীঘ্র জোড়া লাগিতে পারে তাহারই চেষ্টা চলিতে লাগিল। তখন নূতন দলের আদর্শকে ব্রাহ্মণেরা স্বীকার করিয়া লইয়া পুনরায় আপন স্থান গ্রহণ করিলেন।

তথাপি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে আদর্শের প্রভেদ কোন্ পথ দিয়া কী আকারে ঘটিয়াছিল তাহার একটা আভাস পাওয়া যায়। যজ্ঞবিধিগুলি কৌলিকবিদ্যা। এক এক কুলের আর্যদলের মধ্যে এক একটি কুলপতিকে আশ্রয় করিয়া বিশেষ বিশেষ স্তবমন্ত্র ও দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার বিধিবিধান রক্ষিত ছিল। যাঁহারা এই সমস্ত ভালো করিয়া জানিতেন পৌরোহিত্যে তাঁহাদেরই বিশেষ যশ ও ধনলাভের সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং এই ধর্মকার্য একটা বৃত্তি হইয়া উঠিয়াছিল এবং কৃপণের ধনের মতো ইহা সকলের পক্ষে সুগম ছিল না। এই সমস্ত মন্ত্র ও যজ্ঞানুষ্ঠানের বিচিত্র বিধি বিশেষরূপে আয়ত্ত ও তাহা প্রয়োগ করিবার ভার স্বভাবতই একটি বিশেষ শ্রেণীর উপর ছিল। আত্মরক্ষা যুদ্ধবিগ্রহ ও দেশ-অধিকারে যাঁহাদিগকে নিয়ত নিযুক্ত থাকিতে হইবে তাঁহারা এই কাজের ভার লইতে পারেন না, কারণ ইহা দীর্ঘকাল অধ্যয়ন ও অভ্যাস সাপেক্ষ। কোনো এক শ্রেণী এই সমস্তকে রক্ষা করিবার ভার

যদি না লন তবে কৌলিকসূত্র ছিন্ন হইয়া যায় এবং পিতৃপিতামহদের সহিত যোগধারা নষ্ট হইয়া সমাজ শৃঙ্খলাভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। এই কারণে যখন সমাজের একশ্রেণী যুদ্ধ প্রভৃতি উপলক্ষ্যে নব নব অধ্যবসায়ে নিযুক্ত তখন আর-এক শ্রেণী বংশের প্রাচীন ধর্ম এবং সমস্ত স্মরণীয় ব্যাপারকে বিশুদ্ধ ও অবিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিবার জন্যই বিশেষভাবে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু যখনই বিশেষ শ্রেণীর উপর এইরূপ কাজের ভার পড়ে তখনই সমস্ত জাতির চিত্তবিকাশের সঙ্গে তাহার ধর্মবিকাশের সমতানতায় একটা বাধা পড়িয়া যায়। কারণ সেই বিশেষ শ্রেণী ধর্মবিধিগুলিকে বাঁধের মতো এক জায়গায় দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া রাখেন সুতরাং সমস্ত জাতির মনের অগ্রসরগতির সঙ্গে তাহার সামঞ্জস্য থাকে না। ক্রমে ক্রমে অলক্ষ্যভাবে এই সামঞ্জস্য এতদূর পর্যন্ত নষ্ট হইয়া যায় যে, অবশেষে একটা বিপ্লব ব্যতীত সমন্বয়সাধনের উপায় পাওয়া যায় না। এইরূপে একদা ব্রাহ্মণেরা যখন আর্যদের চিরাগত প্রথা ও পূজাপদ্ধতিকে আগলাইয়া বসিয়াছিলেন, যখন সেই সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডকে ক্রমশই তাঁহারা কেবল জটিল ও বিস্তারিত করিয়া তুলিতেছিলেন তখন ক্ষত্রিয়েরা সর্বপ্রকার প্রাকৃতিক ও মানুষিক বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে করিতে জয়োল্লাসে অগ্রসর হইয়া চলিতেছিলেন। এইজন্যই তখন আর্যদের মধ্যে প্রধান মিলনের ক্ষেত্র ছিল ক্ষত্রিয়সমাজ। শত্রুর সহিত যুদ্ধে যাহারা এক হইয়া প্রাণ দেয় তাহাদের মতো এমন মিলন আর কাহারও হইতে পারে না। মৃত্যুর সম্মুখে যাহারা একত্র হয় তাহারা পরস্পরের অনৈক্যকে বড়ো করিয়া দেখিতে পারে না। অপর পক্ষে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে মন্ত্র দেবতা ও যজ্ঞকার্যের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ব্যবসায় ক্ষত্রিয়ের নহে, তাঁহারা মানবের বন্ধুরদুর্গম জীবনক্ষেত্রে নব নব ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে মানুষ, এই কারণে প্রথামূলক বাহ্যানুষ্ঠানগত ভেদের বোধটা ক্ষত্রিয়ের মনে তেমন সুদৃঢ় হইয়া উঠিতে পারে না। অতএব আত্মরক্ষা ও উপনিবেশ বিস্তারের উপলক্ষ্যে সমস্ত আর্যদলের মধ্যকার ঐক্যসূত্রটি ছিল ক্ষত্রিয়দের হাতে। এইরূপে একদিন ক্ষত্রিয়েরাই সমস্ত অনৈক্যের অভ্যন্তরে একই যে সত্যপদার্থ ইহা অনুভব করিয়াছিলেন। এইজন্য ব্রহ্মবিদ্যা বিশেষভাবে ক্ষত্রিয়ের বিদ্যা হইয়া উঠিয়া ঋক্‌ যজুঃ সাম প্রভৃতিকে অপরাবিদ্যা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে এবং ব্রাহ্মণ কর্তৃক সযত্নে রক্ষিত হোম যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্মকাণ্ডকে নিষ্ফল বলিয়া পরিত্যাগ করিতে চাহিয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যায় একদিন পুরাতনের সহিত নূতনের বিরোধ বাধিয়াছিল।

সমাজে যখন একটা বড়ো ভাব সংক্রামকরূপে দেখা দেয় তখন তাহা একান্তভাবে কোনো গণ্ডিকে মানে না। আর্যজাতির নিজেদের মধ্যে একটা ঐক্যবোধ যতই

পরিস্ফুট হইয়া উঠিল ততই সমাজের সর্বত্রই এই অনুভূতি সঞ্চারিত হইতে লাগিল যে, দেবতারা নামে নানা কিন্তু সত্যে এক ;—অতএব বিশেষ দেবতাকে বিশেষ স্তব ও বিশেষ বিধিতে সন্তুষ্ট করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া যায় এই ধারণা সমাজের সর্বত্রই ক্ষয় হইয়া দলভেদে উপাসনাভেদ স্বভাবতই ঘুচিবার চেষ্টা করিল। তথাপি ইহা সত্য যে বিশেষভাবে ক্ষত্রিয়ের মধ্যেই ব্রহ্মবিদ্যা অনুকূল আশ্রয় লাভ করিয়াছিল এবং সেইজন্যই ব্রহ্মবিদ্যা রাজবিদ্যা নাম গ্রহণ করিয়াছে।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে এই প্রভেদটি সামান্য নহে। ইহা একেবারে বাহিরের দিক ও অন্তরের দিকের ভেদ। বাহিরের দিকে যখন আমরা দৃষ্টি রাখি তখনই আমরা কেবলই বহুকে ও বিচিত্রকে দেখিতে পাই, অন্তরে যখন দেখি তখনই একের দেখা পাওয়া যায়। যখন আমরা বাহ্যশক্তিকেই দেবতা বলিয়া জানিয়াছি তখন মন্ত্রতন্ত্র ও নানা বাহ্য প্রক্রিয়ার দ্বারা তাহাদিগকে বাহির হইতে বিশেষভাবে আপনাদের পক্ষভুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এইজন্য বাহিরের বহু শক্তিই যখন দেবতা তখন বাহিরের নানা অনুষ্ঠানই আমাদের ধর্মকার্য এবং এই অনুষ্ঠানের প্রভেদ ও তাহারই গূঢ়শক্তি-অনুসারেই ফলের তারতম্য কল্পনা।

এইরূপে সমাজে যে আদর্শের ভেদ হইয়া গেল, সেই আদর্শভেদের মূর্তিপরিগ্রহ-স্বরূপে আমরা দুই দেবতাকে দেখিতে পাই। প্রাচীন বৈদিক মন্ত্রতন্ত্র ক্রিয়াকাণ্ডের দেবতা ব্রহ্মা এবং নব্যদলের দেবতা বিষ্ণু। ব্রহ্মার চারি মুখ চারি বেদ—তাহা চির-কালের মতো ধ্যানরত স্থির ;—আর বিষ্ণুর চারি ক্রিয়াশীল হস্ত কেবলই নব নব ক্ষেত্রে মঙ্গলকে ঘোষিত করিতেছে, ঐক্যচক্রকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে, শাসনকে প্রচারিত করিতেছে এবং সৌন্দর্যকে বিকাশিত করিয়া তুলিতেছে।

দেবতারা যখন বাহিরে থাকেন, যখন মানুষের আত্মার সঙ্গে তাঁহাদের আত্মীয়তার সম্বন্ধ অনুভূত না হয় তখন তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের কেবল কামনার সম্বন্ধ ও ভয়ের সম্বন্ধ। তখন তাঁহাদিগকে স্তবে বশ করিয়া আমরা হিরণ্য চাই গো চাই, আয়ু চাই, শত্রুপরাভব চাই ; যাগযজ্ঞ-অনুষ্ঠানের ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতায় তাঁহারা অপ্রসন্ন হইলে আমাদের অনিষ্ট করিবেন এই আশঙ্কা তখন আমাদিগকে অভিভূত করিয়া রাখে। এই কামনা এবং ভয়ের পূজা বাহ্য পূজা, ইহা পরের পূজা। দেবতা যখন অন্তরের ধন হইয়া উঠেন তখনই অন্তরের পূজা আরম্ভ হয়—সেই পূজাই ভক্তির পূজা।

ভারতবর্ষের ব্রহ্মবিদ্যার মধ্যে আমরা দুইটি ধারা দেখিতে পাই, নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্ম, অভেদ ও ভেদাভেদ। এই ব্রহ্মবিদ্যা কখনো একের দিকে সম্পূর্ণ ঝুঁকিয়াছে, কখনো দুইকে মানিয়া সেই দুইয়ের মধ্যেই এককে দেখিয়াছে। দুইকে না মানিলে

পূজা হয় না, আবার দুইয়ের মধ্যে এককে না মানিলে ভক্তি হয় না। দ্বৈতবাদী য়িহুদিদের দূরবর্তী দেবতা ভয়ের দেবতা, শাসনের দেবতা, নিয়মের দেবতা। সেই দেবতা নূতন টেস্টামেন্টে যখন মানবের সঙ্গে এক হইয়া মিশিয়া আত্মীয়তা স্বীকার করিলেন তখনই তিনি প্রেমের দেবতা ভক্তির দেবতা হইলেন। বৈদিক দেবতা যখন মানুষ হইতে পৃথক তখন তাঁহার পূজা চলিতে পারে কিন্তু পরমাত্মা ও জীবাত্মা যখন আনন্দের অচিন্ত্যরহস্যলীলায় এক হইয়াও দুই, দুই হইয়াও এক, তখনই সেই অন্তরতম দেবতাকে ভক্তি করা চলে। এই জন্য ব্রহ্মবিদ্যার আনুষঙ্গিকরূপেই ভারতবর্ষে প্রেম-ভক্তির ধর্ম আরম্ভ হয়। এই ভক্তিধর্মের দেবতাই বিষ্ণু।

বিপ্লবের অবসানে বৈষ্ণবধর্মকে ব্রাহ্মণেরা আপন করিয়া লইয়াছেন কিন্তু গোড়ায় যে তাহা করেন নাই তাহার কিছু কিছু প্রমাণ এখনও অবশিষ্ট আছে। বিষ্ণুর বক্ষে ব্রাহ্মণ ভৃগু পদাঘাত করিয়াছিলেন এই কাহিনীর মধ্যে একটি বিরোধের ইতিহাস সংহৃত হইয়া আছে। এই ভৃগু যজ্ঞকর্তা ও যজ্ঞফলভাগীদের আদর্শরূপে বেদে কথিত আছেন। ভারতবর্ষে পূজার আসনে ব্রহ্মার স্থানকে সংকীর্ণ করিয়া বিষ্ণুই যখন তাহা অধিকার করিলেন—বহুপল্লবিত যাগযজ্ঞ-ক্রিয়াকাণ্ডের যুগকে পশ্চাতে ফেলিয়া ভক্তি-ধর্মের যুগ যখন ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইল তখন সেই সন্ধিক্ষণে একটা বড়ো ঝড় আসিয়াছিল। আসিবারই কথা। এই বিচিত্র ক্রিয়াকাণ্ডের অধিকার যাঁহাদের হাতে, এবং সেই অধিকার লইয়া যাঁহারা সমাজে একটি বিশেষ আদর পাইয়াছিলেন, তাঁহারা সহজে তাহার বেড়া ভাঙিতে দেন নাই।

এই ভক্তির বৈষ্ণবধর্ম যে বিশেষভাবে ক্ষত্রিয়ের প্রবর্তিত ধর্ম, তাহার একটি প্রমাণ একদা ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে এই ধর্মের গুরুরূপে দেখিতে পাই—এবং তাঁহার উপদেশের মধ্যে বৈদিক মন্ত্র ও আচারের বিরুদ্ধে আঘাতেরও পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার দ্বিতীয় প্রমাণ এই—প্রাচীন ভারতের পুরাণে যে দুইজন মানবকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছে তাঁহারা দুইজনেই ক্ষত্রিয়—একজন শ্রীকৃষ্ণ, আর একজন শ্রীরামচন্দ্র। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় ক্ষত্রিয়দলের এই ভক্তিধর্ম, যেমন শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ তেমনি রামচন্দ্রের জীবনের দ্বারাও বিশেষভাবে প্রচারলাভ করিয়াছিল।

বৃত্তিগত ভেদ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে এই চিত্তগত ভেদ এমন একটা সীমায় আসিয়া দাঁড়াইল যখন বিচ্ছেদের বিদারণ-রেখা দিয়া সামাজিক বিপ্লবের অগ্নি-উচ্ছ্বাস উদ্গিরিত হইতে আরম্ভ করিল। বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রের কাহিনীর মধ্যে এই বিপ্লবের ইতিহাস নিবদ্ধ হইয়া আছে।

এই বিপ্লবের ইতিহাসে ব্রাহ্মণপক্ষ বশিষ্ঠ নামটিকে ও ক্ষত্রিয়পক্ষ বিশ্বামিত্র নামটিকে

আশ্রয় করিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মাত্রই যে পরস্পরের বিরুদ্ধ দলে যোগ দিয়াছে তাহা নহে। এমন অনেক রাজা ছিলেন যাঁহারা ব্রাহ্মণদের সপক্ষে ছিলেন। কথিত আছে ব্রাহ্মণের বিদ্যা বিশ্বামিত্রের দ্বারা পীড়িত হইয়া রোদন করিতেছিল, হরিশ্চন্দ্র তাহাদিগকে রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; অবশেষে রাজ্য সম্পদ সমস্ত হারাইয়া বিশ্বামিত্রের কাছে তাঁহাকে সম্পূর্ণ হার মানিতে হইয়াছিল।

এরূপ দৃষ্টান্ত আরও আছে। প্রাচীনকালের এই মহাবিপ্লবের আর যে একজন প্রধান নেতা শ্রীকৃষ্ণ কর্মকাণ্ডের নিরর্থকতা হইতে সমাজকে মুক্তি দিতে দাঁড়াইয়াছিলেন তিনি একদিন পাণ্ডবদের সাহায্যে জরাসন্ধকে বধ করেন। সেই জরাসন্ধ রাজা তখনকার ক্ষত্রিয়দলের শত্রু-পক্ষ ছিলেন। তিনি বিস্তর ক্ষত্রিয় রাজাকে বন্দী ও পীড়িত করিয়াছিলেন। ভীমার্জুনকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহার পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন তখন তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধরিতে হইয়াছিল। এই ব্রাহ্মণ-পক্ষপাতী ক্ষত্রবিদ্বেষী রাজাকে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের দ্বারা যে বধ করাইয়াছিলেন এটা একটা খাপছাড়া ঘটনামাত্র নহে। শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া তখন দুই দল হইয়াছিল। সেই দুই দলকে সমাজের মধ্যে এক করিবার চেষ্টায় যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন তখন শিশুপাল বিরুদ্ধদলের মুখপাত্র হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে অপমান করেন। এই যজ্ঞে সমস্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, সমস্ত আচার্য ও রাজার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকেই সর্বপ্রধান বলিয়া অর্ঘ্য দেওয়া হইয়াছিল। এই যজ্ঞে তিনি ব্রাহ্মণের পদক্ষালনের জন্য নিযুক্ত ছিলেন পরবর্তীকালের সেই অত্যুক্তির প্রয়াসেই পুরাকালীন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিরোধের ইতিহাস স্পষ্ট দেখা যায়। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের গোড়ায় এই সামাজিক বিবাদ। তাহার একদিকে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ, অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণের বিপক্ষ। বিরুদ্ধপক্ষে সেনাপতিদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন ব্রাহ্মণ দ্রোণ—কৃপ ও অশ্বত্থামাও বড়ো সামান্য ছিলেন না।

অতএব দেখা যাইতেছে, গোড়ায় ভারতবর্ষের দুই মহাকাব্যেরই মূল বিষয় ছিল সেই প্রাচীন সমাজবিপ্লব। অর্থাৎ সমাজের ভিতরকার পুরাতন ও নূতনের বিরোধ। রামায়ণের কালে রামচন্দ্র নূতন দলের পক্ষ লইয়াছিলেন তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। বশিষ্ঠের সনাতন ধর্মই ছিল রামের কুলধর্ম, বশিষ্ঠবংশই ছিল তাঁহাদের চিরপুরাতন পুরোহিত-বংশ, তথাপি অল্পবয়সেই রামচন্দ্র সেই বশিষ্ঠের বিরুদ্ধপক্ষ বিশ্বামিত্রের অনুসরণ করিয়াছিলেন। বস্তুত বিশ্বামিত্র রামকে তাঁহার পৈতৃক অধিকার হইতে ছিনাইয়া লইয়াছিলেন। রাম যে পন্থা লইয়াছিলেন তাহাতে দশরথের সম্মতি ছিল না, কিন্তু বিশ্বামিত্রের প্রবল প্রভাবের কাছে তাঁহার আপত্তি টিকিতে পারে নাই। পরবর্তীকালে এই কাব্য যখন জাতীয়সমাজে বৃহৎ ইতিহাসের স্মৃতিকে কোনো এক রাজবংশের

পারিবারিক ঘরের কথা করিয়া আনিয়াছিল তখনই দুর্বলচিত্ত বৃদ্ধ রাজার অদ্ভুত স্ত্রৈণতাকেই রামের বনবাসের কারণ বলিয়া রটাইয়াছে।

রামচন্দ্র যে নব্যপন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন ইতিহাসে তাহার আর এক প্রমাণ আছে। একদা যে ব্রাহ্মণ ভৃগু বিষ্ণুর বক্ষে পদাঘাত করিয়াছিলেন তাঁহারই বংশোদ্ভব পরশুরামের ব্রত ছিল ক্ষত্রিয়বিনাশ। রামচন্দ্র ক্ষত্রিয়ের এই দুর্ধর্ষ শত্রুকে নিরস্ত্র করিয়াছিলেন। এই নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণবীরকে বধ না করিয়া তিনি তাঁহাকে যে বশ করিয়াছিলেন তাহাতে অনুমান করা যায়, ঐক্যসাধনব্রত গ্রহণ করিয়া রামচন্দ্র তাহার প্রথম পর্বেই কতক বীর্যবলে কতক ক্ষমাগুণে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিরোধভঞ্জন করিয়াছিলেন। রামের জীবনের সকল কার্যেই এই উদার বীর্যবান সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিশ্বামিত্রই রামচন্দ্রকে জনকের গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন এবং এই বিশ্বামিত্রের নেতৃত্বেই রামচন্দ্র জনকের ভূকর্ষণজাত কন্যাকে ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত ইতিহাসকে ঘটনামূলক বলিয়া গণ্য করিবার কোনো প্রয়োজন নাই, আমি ইহাকে ভাবমূলক বলিয়া মনে করি। ইহার মধ্যে হয়তো তথ্য খুঁজিলে ঠকিব কিন্তু সত্য খুঁজিলে পাওয়া যাইবে।

মূল কথা এই, জনক ক্ষত্রিয় রাজার আদর্শ ছিলেন। ব্রহ্মবিদ্যা তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া বিকাশলাভ করিয়াছিল। এ বিদ্যা কেবল মাত্র তাঁহার জ্ঞানের বিষয় ছিল না; এ বিদ্যা তাঁহার সমস্ত জীবনে রূপ গ্রহণ করিয়াছিল; তিনি তাঁহার রাজ্যসংসারের বিচিত্র কর্মের কেন্দ্রস্থলে এই ব্রহ্মজ্ঞানকে অবিচলিত করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন ইতিহাসে তাহা কীর্তিত হইয়াছে। চরমতম জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনের ছোটো বড়ো সমস্ত কর্মের আশ্চর্য যোগসাধন ইহাই ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয়দের সর্বোচ্চ কীর্তি। আমাদের দেশে যাঁহারা ক্ষত্রিয়ের অগ্রণী ছিলেন তাঁহারা ত্যাগকেই ভোগের পরিণাম করিয়া কর্মকে মুক্তিলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন।

এই জনক একদিকে ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন, আর এক দিকে স্বহস্তে হলচালন করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই জানিতে পারি কৃষিবিস্তারের দ্বারা আর্যসভ্যতা বিস্তার করা ক্ষত্রিয়দের একটি ব্রতের মধ্যে ছিল। একদিন পশুপালন আর্যদের বিশেষ উপজীবিকা ছিল। এই ধেনুই অরণ্যাশ্রমবাসী ব্রাহ্মণদের প্রধান সম্পদ বলিয়া গণ্য হইত। বনভূমিতে গোচারণ সহজ; তপোবনে যাহারা শিষ্যরূপে উপনীত হইত গুরুর গোপালনে নিযুক্ত থাকা তাহাদের প্রধান কাজ ছিল।

অবশেষে একদিন রণজয়ী ক্ষত্রিয়েরা আর্যাবর্ত হইতে অরণ্যবাধা অপসারিত করিয়া পশুসম্পদের স্থলে কৃষিসম্পদকে প্রবল করিয়া তুলিলেন। আমেরিকায় য়ুরোপীয়

ঔপনিবেশিকগণ যখন অরণ্যের উচ্ছেদ করিয়া কৃষিবিস্তারের ক্ষেত্র প্রশস্ত করিতেছিলেন তখন যেমন মৃগয়াজীবী আরণ্যকগণ পদে পদে তাঁহাদিগকে বাধা দিতেছিল— ভারতবর্ষেও সেরূপ আরণ্যকদের সহিত কৃষকদের বিরোধে কৃষিব্যাপার কেবলই বিঘ্নসংকুল হইয়া উঠিয়াছিল। যাঁহারা অরণ্যের মধ্যে কৃষিক্ষেত্র উন্মুক্ত করিতে যাইবেন তাঁহাদের কাজ সহজ ছিল না। জনক মিথিলার রাজা ছিলেন—ইহা হইতেই জানা যায় আর্যাবর্তের পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত আর্য উপনিবেশ আপনার সীমায় আসিয়া ঠেকিয়াছিল। তখন দুর্গম বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণভাগে অরণ্য অক্ষত ছিল এবং দ্রাবিড়সভ্যতা সেই দিকেই প্রবল হইয়া আর্যদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছিল। রাবণ বীরপরাক্রমে ইন্দ্র প্রভৃতি বেদের দেবতাকে পরাস্ত করিয়া আর্যদের যজ্ঞের বিঘ্ন ঘটাইয়া নিজের দেবতা শিবকে জয়ী করিয়াছিলেন। যুদ্ধজয়ে স্বকীয় দলের দেবতার প্রভাব প্রকাশ পায় পৃথিবীতে সকল সমাজেরই বিশেষ অবস্থায় এই বিশ্বাস দৃঢ় থাকে—কোনো পক্ষের পরাভবে সে পক্ষের দেবতারই পরাভব গণ্য হয়। রাবণ আর্যদেবতাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন এই যে লোকশ্রুতি আমাদের দেশে প্রচলিত আছে ইহার অর্থই এই যে, তাঁহার রাজত্বকালে তিনি বৈদিক দেবতার উপাসকদিগকে বারংবার পরাভূত করিয়াছিলেন।

এমন অবস্থায় সেই শিবের হরধনু ভাঙিবে কে একদিন এই এক প্রশ্ন আর্যসমাজে উঠিয়াছিল। শিবোপাসকদের প্রভাবকে নিরস্ত করিয়া যিনি দক্ষিণখণ্ডে আর্যদের কৃষিবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন তিনিই যথার্থ ভাবে ক্ষত্রিয়ের আদর্শ জনকরাজার অমানুষিক মানসকন্যার সহিত পরিণীত হইবেন। বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে সেই হরধনু ভঙ্গ করিবার দুঃসাধ্য পরীক্ষায় লইয়া গিয়াছিলেন। রাম যখন বনের মধ্যে গিয়া কোনো কোনো প্রবল দুর্ধর্ষ শৈববীরকে নিহত করিলেন তখনই তিনি হরধনু ভঙ্গের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং তখনই তিনি সীতাকে অর্থাৎ হলচালন-রেখাকে বহন করিয়া লইবার অধিকারী হইতে পারিলেন। তখনকার অনেক বীর রাজাই এই সীতাকে গ্রহণ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা হরধনু ভাঙিতে পারেন নাই, এইজন্য রাজর্ষি জনকের কন্যাকে লাভ করিবার গৌরব হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই দুঃসাধ্য ব্রতের অধিকারী কে হইবেন, ক্ষত্রিয় তপস্বিগণ সেই সন্ধান হইতে বিরত হন নাই। একদা বিশ্বামিত্রের সেই সন্ধান রামচন্দ্রের মধ্যে আসিয়া সার্থক হইল।

বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রামচন্দ্র যখন বাহির হইলেন তখন তরুণ বয়সেই তিনি তাঁহার জীবনের তিনটি বড়ো বড়ো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রথম, তিনি শৈব রাক্ষসদিগকে পরাস্ত করিয়া হরধনু ভঙ্গ করিয়াছিলেন; দ্বিতীয়, যে ভূমি হলচালনের

অযোগ্যরূপে অহল্যা হইয়া পাষাণ হইয়া পড়িয়া ছিল, ও সেই কারণে দক্ষিণাপথের প্রথম অগ্রগামীদের মধ্যে অন্যতম ঋষি গৌতম যে ভূমিকে একদা গ্রহণ করিয়াও অবশেষে অভিশপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াতে যাহা দীর্ঘকাল ব্যর্থ পড়িয়াছিল, রামচন্দ্র সেই কঠিন পাথরকেও সজীব করিয়া তুলিয়া আপন কৃষিনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন;[১] তৃতীয়, ক্ষত্রিয়দলের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণদের যে বিদ্বেষ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল তাহাকেও এই ক্ষত্রঋষি বিশ্বামিত্রের শিষ্য আপন ভুজবলে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

অকস্মাৎ যৌবরাজ্য-অভিষেকে বাধা পড়িয়া রামচন্দ্রের যে নির্বাসন ঘটিল তাহার মধ্যে সম্ভবত তখনকার দুই প্রবল পক্ষের বিরোধ সূচিত হইয়াছে। রামের বিরুদ্ধে যে একটি দল ছিল তাহা নিঃসন্দেহ অত্যন্ত প্রবল—এবং স্বভাবতই অন্তঃপুরের মহিষীদের প্রতি তাহার বিশেষ প্রভাব ছিল। বৃদ্ধ দশরথ ইহাকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই এই জন্য একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার প্রিয়তম বীর পুত্রকেও তিনি নির্বাসনে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই নির্বাসনে রামের বীরত্বের সহায় হইলেন লক্ষ্মণ ও তাঁহার জীবনের সঙ্গিনী হইলেন সীতা অর্থাৎ তাঁহার সেই ব্রত। এই সীতাকেই তিনি নানা বাধা ও নানা শত্রুর আক্রমণ হইতে বাঁচাইয়া বন হইতে বনান্তরে ঋষিদের আশ্রম ও রাক্ষসদের আবাসের মধ্য দিয়া অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন।

আর্য অনার্যের বিরোধকে বিদ্বেষের দ্বারা জাগ্রত রাখিয়া যুদ্ধের দ্বারা নিধনের দ্বারা তাহার সমাধানের প্রয়াস অন্তহীন দুশ্চেষ্টা। প্রেমের দ্বারা মিলনের দ্বারা ভিতরের দিক হইতে ইহার মীমাংসা হইলেই এত বড়ো বৃহৎ ব্যাপারও সহজ হইয়া যায়। কিন্তু ভিতরের মিলন জিনিসটা তো ইচ্ছা করিলেই হয় না। ধর্ম যখন বাহিরের জিনিস হয়, নিজের দেবতা যখন নিজের বিষয়সম্পত্তির মতো অত্যন্ত স্বকীয় হইয়া থাকে তখন মানুষের মনের মধ্যকার ভেদ কিছুতেই ঘুচিতে চায় না। জ্যু-দের সঙ্গে জেন্টাইলদের মিলনের কোনো সেতু ছিল না। কেননা জ্যু-রা জিহোভাকে বিশেষভাবে আপনাদের জাতীয় সম্পত্তি বলিয়াই জানিত এবং এই জিহোভার সমস্ত অনুশাসন, তাঁহার আদিষ্ট সমস্ত বিধিনিষেধ বিশেষভাবে জ্যু-জাতিরই পালনীয় এইরূপ তাহাদের ধারণা ছিল। তেমনি আর্য দেবতা ও আর্য-বিধিবিধান যখন বিশেষ জাতিগতভাবে সংকীর্ণ ছিল তখন আর্য অনার্যের পরস্পর সংঘাত, এক পক্ষের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ছাড়া, কিছুতেই মিটিতে পারিত না। কিন্তু ক্ষত্রিয়দের মধ্যে দেবতার ধারণা যখন বিশ্বজনীন হইয়া উঠিল—

১. অল্পদিন হইল "রাক্ষস-রহস্য" নামক একটি স্বাধীনচিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ আমি পাণ্ডুলিপি আকারে দেখিতে পাই, তাহার মধ্যেই "অহল্যা" শব্দটির এই তাৎপর্যব্যাখ্যা আমি দেখিলাম। লেখক আপনার নাম প্রকাশ করেন নাই—তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

বাহিরের ভেদ বিভেদ একান্ত সত্য নহে এই জ্ঞানের দ্বারা মানুষের কল্পনা হইতে দৈব বিভীষিকাসকল যখন চলিয়া গেল তখনই আর্য অনার্যের মধ্যে সত্যকার মিলনের সেতু স্থাপিত হওয়া সম্ভবপর হইল। তখনই বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মের দেবতা অন্তরের ভক্তির দেবতা হইয়া উঠিলেন এবং কোনো বিশেষ শাস্ত্র ও শিক্ষা ও জাতির মধ্যে তিনি আবদ্ধ হইয়া রহিলেন না।

ক্ষত্রিয় রামচন্দ্র একদিন গুহক চণ্ডালকে আপন মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এই জনশ্রুতি আজ পর্যন্ত তাঁহার আশ্চর্য উদারতার পরিচয় বলিয়া চলিয়া আসিয়াছে। পরবর্তী যুগের সমাজ উত্তরকাণ্ডে তাঁহার এই চরিতের মাহাত্ম্য বিলুপ্ত করিতে চাহিয়াছে; শূদ্র তপস্বীকে তিনি বধদণ্ড দিয়াছিলেন এই অপবাদ রামচন্দ্রের উপরে আরোপ করিয়া পরবর্তী সমাজরক্ষকের দল রামচরিতের দৃষ্টান্তকে স্বপক্ষে আনিবার চেষ্টা করিয়াছে। যে সীতাকে রামচন্দ্র সুখে দুঃখে রক্ষা করিয়াছেন ও প্রাণপণে শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন সমাজের প্রতি কর্তব্যের অনুরোধে তাহাকেও তিনি বিনা অপরাধে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন উত্তরকাণ্ডের এই কাহিনীসৃষ্টির দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় আর্যজাতির বীরশ্রেষ্ঠ আদর্শচরিত্ররূপে পূজ্য রামচন্দ্রের জীবনীকে একদা সামাজিক আচাররক্ষার অনুকূল করিয়া বর্ণনা করিবার বিশেষ চেষ্টা জন্মিয়াছিল। রামচরিতের মধ্যে যে একটি সমাজ-বিপ্লবের ইতিহাস ছিল পরবর্তীকালে যথাসম্ভব তাহার চিহ্ন মুছিয়া ফেলিয়া তাহাকে নব্যকালের সামাজিক আদর্শের অনুগত করা হইয়াছিল। সেই সময়েই রামের চরিতকে গৃহধর্মের ও সমাজধর্মের আশ্রয়রূপে প্রচার করিবার চেষ্টা জাগিয়াছিল এবং রামচন্দ্র যে একদা তাঁহার স্বজাতিকে বিদ্বেষের সংকোচ হইতে প্রেমের প্রসারণের দিকে লইয়া গিয়াছিলেন ও সেই নীতির দ্বারা একটি বিষম সমস্যার সমাধান করিয়া সমস্ত জাতির নিকট চিরকালের মতো বরণীয় হইয়াছিলেন সে কথাটা সরিয়া গিয়াছে এবং ক্রমে ইহাই দাঁড়াইয়াছে যে তিনি শাস্ত্রানুমোদিত গার্হস্থ্যের আশ্রয় ও লোকানুমোদিত আচারের রক্ষক। ইহার মধ্যে অদ্ভুত ব্যাপার এই, এককালে যে রামচন্দ্র ধর্মনীতি ও কৃষিবিদ্যাকে নূতন পথে চালনা করিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁহারই চরিতকে সমাজ পুরাতন বিধিবন্ধনের অনুকূল করিয়া ব্যবহার করিয়াছে। একদিন সমাজে যিনি গতির পক্ষে বীর্য প্রকাশ করিয়াছিলেন আর একদিন সমাজ তাঁহাকেই স্থিতির পক্ষে বীর বলিয়া প্রচার করিয়াছে। বস্তুত রামচন্দ্রের জীবনের কার্যে এই গতিস্থিতির সামঞ্জস্য ঘটিয়াছিল বলিয়াই এইরূপ হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে।

তৎসত্ত্বেও এ কথা ভারতবর্ষ ভুলিতে পারে নাই যে তিনি চণ্ডালের মিতা, বানরের দেবতা, বিভীষণের বন্ধু ছিলেন। তিনি শত্রুকে ক্ষয় করিয়াছিলেন এ তাঁহার গৌরব

নহে তিনি শত্রুকে আপন করিয়াছিলেন। তিনি আচারের নিষেধকে, সামাজিক বিদ্বেষের বাধাকে অতিক্রম করিয়াছিলেন; তিনি আর্য অনার্যের মধ্যে প্রীতির সেতু বন্ধন করিয়া দিয়াছিলেন।

নৃতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় বর্বর জাতির অনেকেরই মধ্যে এক একটি বিশেষ জন্তু পবিত্র বলিয়া পূজিত হয়। অনেক সময়ে তাহারা আপনাদিগকে সেই জন্তুর বংশধর বলিয়া গণ্য করে। সেই জন্তুর নামেই তাহারা আখ্যাত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে এইরূপে নাগবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। কিষ্কিন্ধ্যায় রামচন্দ্র যে অনার্য-দলকে বশ করিয়াছিলেন তাহারাও যে এইরূপ কারণেই বানর বলিয়া পরিচিত তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল তো বানর নহে রামচন্দ্রের দলে ভল্লুকও ছিল। বানর যদি অবজ্ঞাসূচক আখ্যা হইত তবে ভল্লুকের কোনো অর্থ পাওয়া যায় না।

রামচন্দ্র এই যে বানরদিগকে বশ করিয়াছিলেন তাহা রাজনীতির দ্বারা নহে, ভক্তিধর্মের দ্বারা। এইরূপে তিনি হনুমানের ভক্তি পাইয়া দেবতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যায়, যে-কোনো মহাত্মাই বাহ্যধর্মের স্থলে ভক্তিধর্মকে জাগাইয়াছেন তিনি স্বয়ং পূজা লাভ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ, খ্রীস্ট, মহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতি তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। শিখ, সুফি, কবিরপন্থী প্রভৃতি সর্বত্রই দেখিতে পাই, ভক্তি যাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায় অনুবর্তীদের কাছে তাঁহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হন। ভগবানের সহিত ভক্তের অন্তরতম যোগ উদ্‌ঘাটন করিতে গিয়া তাঁহারাও যেন দেবত্বের সহিত মনুষ্যত্বের ভেদসীমা অতিক্রম করিয়া থাকেন। এইরূপে হনুমান ও বিভীষণ রামচন্দ্রের উপাসক ও ভক্ত বৈষ্ণবরূপে খ্যাত হইয়াছেন।

রামচন্দ্র ধর্মের দ্বারাই অনার্যদিগকে জয় করিয়া তাহাদের ভক্তি অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি বাহুবলে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া রাজ্যবিস্তার করেন নাই। দক্ষিণে তিনি কৃষিস্থিতিমূলক সভ্যতা ও ভক্তিমূলক একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি সেই যে বীজ রোপণ করিয়া আসিয়াছিলেন বহু শতাব্দী পরেও ভারতবর্ষ তাহার ফল লাভ করিয়াছিল। এই দাক্ষিণাত্যে ক্রমে দারুণ শৈবধর্মও ভক্তিধর্মের রূপ গ্রহণ করিল এবং একদা এই দাক্ষিণাত্য হইতেই ব্রহ্মবিদ্যার এক ধারায় ভক্তিস্রোত ও আর-এক ধারায় অদ্বৈতজ্ঞান উচ্ছ্বসিত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিয়া দিল।

আমরা আর্যদের ইতিহাসে সংকোচ ও প্রসারণের এই একটি রূপ দেখিলাম। মানুষের একদিকে তাহার বিশেষত্ব আর একদিকে তাহার বিশ্বত্ব এই দুই দিকের টানই ভারতবর্ষে যেমন করিয়া কাজ করিয়াছে তাহা যদি আমরা আলোচনা করিয়া না দেখি তবে ভারতবর্ষকে আমরা চিনিতেই পারিব না। একদিন তাহার এই আত্মরক্ষণ শক্তির দিকে

ছিল ব্রাহ্মণ, আত্মপ্রসারণ শক্তির দিকে ছিল ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় যখন অগ্রসর হইয়াছে তখন ব্রাহ্মণ তাহাকে বাধা দিয়াছে কিন্তু বাধা অতিক্রম করিয়াও ক্ষত্রিয় যখন সমাজকে বিস্তারের দিকে লইয়া গিয়াছে তখন ব্রাহ্মণ পুনরায় নূতনকে আপন পুরাতনের সঙ্গে বাঁধিয়া সমস্তটাকে আপন করিয়া লইয়া আবার একটা সীমা বাঁধিয়া লইয়াছে। য়ুরোপীয়েরা যখন ভারতবর্ষে চিরদিন ব্রাহ্মণদের এই কাজটির আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা এমনি ভাবে করিয়াছেন যেন এই ব্যাপারটা ব্রাহ্মণ নামক একটি বিশেষ ব্যবসায়ী দলের চাতুরী। তাঁহারা ইহা ভুলিয়া যান যে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের যথার্থ জাতিগত ভেদ নাই, তাহারা একই জাতির দুই স্বাভাবিক শক্তি। ইংলণ্ডে সমস্ত ইংরেজ জাতি লিবারাল ও কন্সারভেটিভ এই দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া রাষ্ট্রনীতিকে চালনা করিতেছে— ক্ষমতা লাভের জন্য এই দুই শাখার প্রতিযোগিতার মধ্যে বিবাদও আছে, কৌশলও আছে, এমন কি, ঘুষ এবং অন্যায়ও আছে, তথাপি এই দুই সম্প্রদায়কে যেমন দুই স্বতন্ত্র বিরুদ্ধ পক্ষের মতো করিয়া দেখিলে ভুল দেখা হয়—বস্তুত তাহারা প্রকৃতির আকর্ষণ ও বিকর্ষণ-শক্তির মতো বাহিরে দেখিতে বিরুদ্ধ কিন্তু অন্তরে একই সৃজনশক্তির এ-পিঠ ও-পিঠ, তেমনি ভারতবর্ষে সমাজের স্বাভাবিক স্থিতি ও গতি-শক্তি দুই শ্রেণীকে অবলম্বন করিয়া ইতিহাসকে সৃষ্টি করিয়াছে—কোনো পক্ষেই তাহা কৃত্রিম নহে।

তবে দেখা গিয়াছে বটে ভারতবর্ষে এই স্থিতি ও গতি-শক্তির সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই সমস্ত বিরোধের পর ব্রাহ্মণই এখানকার সমাজে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণের বিশেষ চাতুর্যই তাহার কারণ এমন অদ্ভুত কথা ইতিহাসবিরুদ্ধ কথা। তাহার প্রকৃত কারণ ভারতবর্ষের বিশেষ অবস্থার মধ্যেই রহিয়াছে। ভারতবর্ষে যে জাতি-সংঘাত ঘটিয়াছে তাহা অত্যন্ত বিরুদ্ধ জাতির সংঘাত। তাহাদের মধ্যে বর্ণের ও আদর্শের ভেদ এতই গুরুতর যে এই প্রবল বিরুদ্ধতার আঘাতে ভারতবর্ষের আত্ম-রক্ষণীশক্তিই বলবান হইয়া উঠিয়াছে। এখানে আত্মপ্রসারণের দিকে চলিতে গেলে আপনাকে হারাইবার সম্ভাবনা ছিল বলিয়া সমাজের সতর্কতাবৃত্তি পদে পদে আপনাকে জাগ্রত রাখিয়াছে।

তুষারাবৃত আল্‌প্‌স্‌ গিরিমালার শিখরে যে দুঃসাহসিকেরা আরোহণ করিতে চেষ্টা করে, তাহারা আপনাকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া বাঁধিয়া অগ্রসর হয়—তাহারা চলিতে চলিতে আপনাকে বাঁধে, বাঁধিতে বাঁধিতে চলে—সেখানে চলিবার উপায় স্বভাবতই এই প্রণালী অবলম্বন করে, তাহা চালকদের কৌশল নহে। বন্দিশালায় যে বন্ধনে স্থির করিয়া রাখে দুর্গম পথে সেই বন্ধনই গতির সহায়। ভারতবর্ষেও সমাজ কেবলই দড়িদড়া লইয়া আপনাকে বাঁধিতে বাঁধিতে চলিয়াছে কেননা নিজের পথে অগ্রসর

হওয়া অপেক্ষা পিছলিয়া অন্তের পথে নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা তাহার সম্পূর্ণ ছিল। এই জন্যই ভারতবর্ষে স্বভাবের নিয়মে আত্মরক্ষণীশক্তি আত্মপ্রসারণী শক্তির অপেক্ষা বড়ো হইয়া উঠিয়াছে।

রামচন্দ্রের জীবন আলোচনায় আমরা ইহাই দেখিলাম যে ক্ষত্রিয়েরা একদিন ধর্মকে এমন একটা ঐক্যের দিকে পাইয়াছিলেন যাহাতে অনার্যদের সহিত বিরুদ্ধতাকে তাঁহারা মিলননীতির দ্বারাই সহজে অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন। দুই পক্ষের চিরন্তন প্রাণান্তিক সংগ্রাম কখনো কোনো সমাজের পক্ষে হিতকর হইতে পারে না—হয় এক পক্ষকে মারিতে, নয় দুই পক্ষকে মিলিতে হইবে। ভারতবর্ষে একদা ধর্মকে আশ্রয় করিয়া সেই মিলনের কাজ আরম্ভ হইয়াছিল। প্রথমে এই ধর্ম ও এই মিলননীতি বাধা পাইয়াছিল কিন্তু অবশেষে ব্রাহ্মণেরা ইহাকে স্বীকার করিয়া আত্মসাৎ করিয়া লইলেন।

আর্যে অনার্যে যখন অল্প অল্প করিয়া যোগ স্থাপন হইতেছে তখন অনার্যদের ধর্মের সঙ্গেও বোঝাপড়া করার প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। এই সময়ে অনার্যদের দেবতা শিবের সঙ্গে আর্যউপাসকদের একটা বিরোধ চলিতেছিল, এবং সেই বিরোধে কখনো আর্যেরা কখনো অনার্যেরা জয়ী হইতেছিল। কৃষ্ণের অনুবর্তী অর্জুন কিরাতদের দেবতা শিবের কাছে একদিন হার মানিয়াছিলেন। শিবভক্ত বাণ-অসুরের কন্যা উষাকে কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ হরণ করিয়াছিলেন—এই সংগ্রামে কৃষ্ণ জয়ী হইয়াছিলেন। বৈদিক যজ্ঞে অনার্য শিবকে দেবতা বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই, সেই উপলক্ষ্যে শিবের অনার্য অনুচরগণ যজ্ঞ নষ্ট করিয়াছিল। অবশেষে শিবকে বৈদিক রুদ্রের সহিত মিলাইয়া একদিন তাঁহাকে আপন করিয়া লইয়া আর্য অনার্যের এই ধর্মবিরোধ মিটাইতে হইয়াছিল। তথাপি দেবতা যখন অনেক হইয়া পড়েন তখন তাঁহাদের মধ্যে কে বড়ো কে ছোটো সে বিবাদ সহজে মিটিতে চায় না। তাই মহাভারতে রুদ্রের সহিত বিষ্ণুর সংগ্রামের উল্লেখ আছে—সেই সংগ্রামে রুদ্র বিষ্ণুকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।

মহাভারত আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় বিরোধের মধ্য দিয়াও আর্যদের সহিত অনার্যদের রক্তের মিলন ও ধর্মের মিলন ঘটিতেছিল। এইরূপে যতই বর্ণসংকর ও ধর্মসংকর উৎপন্ন হইতে লাগিল ততই সমাজের আত্মরক্ষণীশক্তি বারংবার সীমানির্ণয় করিয়া আপনাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়াছে। যাহাকে ত্যাগ করিতে পারে নাই তাহাকে গ্রহণ করিয়া বাঁধ বাঁধিয়া দিয়াছে। মনুতে বর্ণসংকরের বিরুদ্ধে যে চেষ্টা আছে এবং তাহাতে মূর্তি-পূজা-ব্যবসায়ী দেবল ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে যে ঘৃণা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায় রক্তে ও ধর্মে অনার্যদের মিশ্রণকে গ্রহণ করিয়াও তাহাকে বাধা দিবার

প্রয়াস কোনো দিন নিরস্ত হয় নাই। এইরূপে প্রসারণের পরমুহূর্তেই সংকোচন আপনাকে বারংবার অত্যন্ত কঠিন করিয়া তুলিয়াছে।

একদিন ইহারই একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া ভারতবর্ষের দুই ক্ষত্রিয় রাজসন্ন্যাসীকে আশ্রয় করিয়া প্রচণ্ডশক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। ধর্মনীতি যে একটা সত্য পদার্থ, তাহা যে সামাজিক নিয়মমাত্র নহে—সেই ধর্মনীতিকে আশ্রয় করিয়াই যে মানুষ মুক্তি পায়, সামাজিক বাহ্য প্রথাপালনের দ্বারা নহে, এই ধর্মনীতি যে মানুষের সহিত মানুষের কোনো ভেদকে চিরন্তন সত্য বলিয়া গণ্য করিতে পারে না ক্ষত্রিয় তাপস বুদ্ধ ও মহাবীর সেই মুক্তির বার্তাই ভারতবর্ষে প্রচার করিয়াছিলেন। আশ্চর্য এই যে তাহা দেখিতে দেখিতে জাতির চিরন্তন সংস্কার ও বাধা অতিক্রম করিয়া সমস্ত দেশকে অধিকার করিয়া লইল। এইবার অতি দীর্ঘকাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয়গুরুর প্রভাব ব্রাহ্মণের শক্তিকে একেবারে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল।

সেটা সম্পূর্ণ ভালো হইয়াছিল এমন কথা কোনোমতেই বলিতে পারি না। এইরূপ একপক্ষের ঐকান্তিকতায় জাতি প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারে না, তাহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইতে বাধ্য। এই কারণেই বৌদ্ধযুগ ভারতবর্ষকে তাহার সমস্ত সংস্কারজাল হইতে মুক্ত করিতে গিয়া যেরূপ সংস্কারজালে বদ্ধ করিয়া দিয়াছে এমন আর কোনোকালেই করে নাই। এতদিন ভারতবর্ষে আর্য অনার্যের যে মিলন ঘটিতেছিল তাহার মধ্যে পদে পদে একটা সংযম ছিল- মাঝে মাঝে বাঁধ বাঁধিয়া প্রলয়স্রোতকে ঠেকাইয়া রাখা হইতেছিল। আর্যজাতি অনার্যের কাছ হইতে যাহা কিছু গ্রহণ করিতেছিল তাহাকে আর্য করিয়া লইয়া আপন প্রকৃতির অনুগত করিয়া লইতেছিল—এমনি করিয়া ধীরে ধীরে একটি প্রাণবান জাতীয় কলেবর গড়িয়া আর্যে অনার্যে একটি আন্তরিক সংশ্রব ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিতেছিল। নিশ্চয়ই সেই মিলন-ব্যাপারের মাঝখানে কোনো এক সময়ে বাঁধা-বাঁধি ও বাহ্যিকতার মাত্রা অত্যন্ত বেশি হইয়া পড়িয়াছিল, নহিলে এত বড়ো বিপ্লব উৎপন্ন হইতেই পারিত না এবং সে বিপ্লব কোনো সৈন্যবল আশ্রয় না করিয়া কেবলমাত্র ধর্মবলে সমস্ত দেশকে এমন করিয়া আচ্ছন্ন করিতে পারিত না। নিশ্চয়ই তৎপূর্বে সমাজের শ্রেণীতে শ্রেণীতে ও মানুষের অন্তরে বাহিরে বৃহৎ একটা বিচ্ছেদ ঘটিয়া স্বাস্থ্যকর সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু ইহার প্রতিক্রিয়াও তেমনি প্রবল হইয়া একেবারে সমাজের ভিত্তিতে গিয়া আঘাত করিল। রোগের আক্রমণও যেমন নিদারুণ, চিকিৎসার আক্রমণও তেমনি সংঘাতিক হইয়া প্রকাশ পাইল।

অবশেষে একদিন এই বৌদ্ধপ্রভাবের বন্যা যখন সরিয়া গেল তখন দেখা গেল সমাজের সমস্ত বেড়াগুলা ভাঙিয়া গিয়াছে। যে একটি ব্যবস্থার ভিতর দিয়া ভারতবর্ষের

জাতিবৈচিত্র্য ঐক্যলাভের চেষ্টা করিতেছিল সেই ব্যবস্থাটা ভূমিসাৎ হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম ঐক্যের চেষ্টাতেই ঐক্য নষ্ট করিয়াছে। ভারতবর্ষে সমস্ত অনৈক্যগুলি অবাধে মাথা তুলিয়া উঠিতে লাগিল—যাহা বাগান ছিল তাহা জঙ্গল হইয়া উঠিল।

তাহার প্রধান কারণ এই, একদিন ভারতসমাজে কখনো ব্রাহ্মণ কখনো ক্ষত্রিয় যখন প্রাধান্য লাভ করিতেছিলেন তখনও উভয়ের ভিতরকার একটা জাতিগত ঐক্য ছিল। এইজন্য তখনকার জাতি-রচনাকার্য আর্যদের হাতেই ছিল। কিন্তু বৌদ্ধপ্রভাবের সময় কেবল ভারতবর্ষের ভিতরকার অনার্যেরা নহে ভারতবর্ষের বাহির হইতেও অনার্যদের সমাগম হইয়া তাহারা এমন একটি প্রবলতা লাভ করিল যে আর্যদের সহিত তাহাদের সুবিহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিল। যতদিন বৌদ্ধধর্মের বল ছিল ততদিন এই অসামঞ্জস্য অস্বাস্থ্য আকারে প্রকাশ পায় নাই কিন্তু বৌদ্ধধর্ম যখন দুর্বল হইয়া পড়িল তখন তাহা নানা অদ্ভুত অসংগতিরূপে অবাধে সমস্ত দেশকে একেবারে ছাইয়া ফেলিল।

অনার্যেরা এখন সমস্ত বাধা ভেদ করিয়া একেবারে সমাজের মাঝখানে আসিয়া বসিয়াছে সুতরাং এখন তাহাদের সহিত ভেদ ও মিলন বাহিরের নহে তাহা একেবারে সমাজের ভিতরের কথা হইয়া পড়িল।

এই বৌদ্ধপ্লাবনে আর্যসমাজে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণসম্প্রদায় আপনাকে স্বতন্ত্র রাখিতে পারিয়াছিল কারণ আর্যজাতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ভার চিরকাল ব্রাহ্মণের হাতে ছিল। যখন ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগের মধ্যাহ্ন তখনও ধর্মসমাজে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ এ ভেদ বিলুপ্ত হয় নাই। কিন্তু তখন সমাজে আর সমস্ত ভেদই লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। তখন ক্ষত্রিয়েরা জনসাধারণের সঙ্গে অনেক পরিমাণে মিলাইয়া গিয়াছিল।

অনার্যের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে ক্ষত্রিয়ের প্রায় কোনো বাধা ছিল না তাহা পুরাণে স্পষ্টই দেখা যায়। এই জন্য দেখা যায় বৌদ্ধযুগের পরবর্তী অধিকাংশ রাজবংশ ক্ষত্রিয়বংশ নহে।

এদিকে শক হুন প্রভৃতি বিদেশীয় অনার্যগণ দলে দলে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া সমাজের মধ্যে অবাধে মিশিয়া যাইতে লাগিল—বৌদ্ধধর্মের কাটা খাল দিয়া এই সমস্ত বন্যার জল নানা শাখায় একেবারে সমাজের মর্মস্থলে প্রবেশ করিল। কারণ, বাধা দিবার ব্যবস্থাটা তখন সমাজ-প্রকৃতির মধ্যে দুর্বল। এইরূপে ধর্মেকর্মে অনার্যসংমিশ্রণ অত্যন্ত প্রবল হওয়াতে সর্বপ্রকার অদ্ভুত উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে যখন কোনো সংগতির সূত্র রহিল না তখনই সমাজের অন্তরস্থিত আর্যপ্রকৃতি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিল। আর্যপ্রকৃতি নিজেকে

হারাইয়া ফেলিয়াছিল বলিয়াই নিজেকে সুস্পষ্টরূপে আবিষ্কার করিবার জন্য তাহার একটা চেষ্টা উদ্যত হইয়া উঠিল।

আমরা কী এবং কোন্ জিনিসটা আমাদের—চারিদিকের বিপুল বিশ্লিষ্টতার ভিতর হইতে এইটেকে উদ্ধার করিবার একটা মহাযুগ আসিল। সেই যুগেই ভারতবর্ষ আপনাকে ভারতবর্ষ বলিয়া সীমাচিহ্নিত করিল। তৎপূর্বে বৌদ্ধসমাজের যোগে ভারতবর্ষ পৃথিবীতে এত দূরদূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে সে আপনার কলেবরটাকে সুস্পষ্ট করিয়া দেখিতেই পাইতেছিল না। এইজন্য আর্য জনশ্রুতিতে প্রচলিত কোনো পুরাতন চক্রবর্তী সম্রাটের রাজ্যসীমার মধ্যে ভারতবর্ষ আপনার ভৌগোলিক সত্তাকে নির্দিষ্ট করিয়া লইল। তাহার পরে, সামাজিক প্রলয়ঝড়ে আপনার ছিন্নবিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত সূত্রগুলিকে খুঁজিয়া লইয়া জোড়া দিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। এই সময়েই সংগ্রহ-কর্তাদের কাজ দেশের প্রধান কাজ হইল। তখনকার যিনি ব্যাস, নূতন রচনা তাঁহার কাজ নহে পুরাতন সংগ্রহেই তিনি নিযুক্ত। এই ব্যাস একব্যক্তি না হইতে পারেন কিন্তু ইনি সমাজের একই শক্তি। কোথায় আর্যসমাজের স্থিরপ্রতিষ্ঠা ইনি তাহাই খুঁজিয়া একত্র করিতে লাগিলেন।

সেই চেষ্টার বশে ব্যাস বেদ সংগ্রহ করিলেন। যথার্থ বৈদিককালে মন্ত্র ও যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রণালীগুলিকে সমাজ যত্ন করিয়া শিখিয়াছে ও রাখিয়াছে, তবু তখন তাহা শিক্ষণীয় বিদ্যামাত্র ছিল এবং সে বিদ্যাকেও সকলে পরাবিদ্যা বলিয়া মানিত না।

কিন্তু একদিন বিশ্লিষ্ট সমাজকে বাঁধিয়া তুলিবার জন্য এমন একটি পুরাতন শাস্ত্রকে মাঝখানে দাঁড় করাইবার দরকার হইয়াছিল যাহার সম্বন্ধে নানা লোক নানা প্রকার তর্ক করিতে পারিবে না—যাহা আর্যসমাজের সর্বপুরাতন বাণী; যাহাকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিয়া বিচিত্র বিরুদ্ধসম্প্রদায়ও এক হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে। এই জন্য বেদ যদিচ প্রাত্যহিক ব্যবহার হইতে তখন অনেক দূরবর্তী হইয়া পড়িয়াছিল তথাপি দূরের জিনিস বলিয়াই তাহাকে দূর হইতে মান্য করা সকলের পক্ষে সহজ হইয়াছিল। আসল কথা, যে জাতি বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল কোনো একটি দৃঢ়নিশ্চল কেন্দ্রকে স্বীকার না করিলে তাহার পরিধি নির্ণয় কঠিন হয়। তাহার পরে আর্যসমাজে যত কিছু জনশ্রুতি খণ্ড খণ্ড আকারে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাদিগকেও একত্র করিয়া মহাভারত নামে সংকলিত করা হইল।

যেমন একটি কেন্দ্রের প্রয়োজন, তেমনি একটি ধারাবাহিক পরিধিসূত্রও তো চাই—সেই পরিধিসূত্রই ইতিহাস। তাই ব্যাসের আর এক কাজ হইল ইতিহাস সংগ্রহ করা। আর্যসমাজের যত কিছু জনশ্রুতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাদিগকে তিনি এক

করিয়াছেন। শুধু জনশ্রুতি নহে, আর্যসমাজে প্রচলিত সমস্ত বিশ্বাস, তর্কবিতর্ক ও চারিত্রনীতিকেও তিনি এই সঙ্গে এক করিয়া একটি জাতির সমগ্রতার এক বিরাট মূর্তি এক জায়গায় খাড়া করিলেন। ইহার নাম দিলেন মহাভারত। এই নামের মধ্যেই তখনকার আর্যজাতির একটি ঐক্য উপলব্ধির চেষ্টা বিশেষভাবে প্রকাশ পাইতেছে। আধুনিক পাশ্চাত্য সংজ্ঞা অনুসারে মহাভারত ইতিহাস না হইতে পারে কিন্তু ইহা যথার্থ ই আর্যদের ইতিহাস। ইহা কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচিত ইতিহাস নহে, ইহা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিবৃত্তান্ত। কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি এইসমস্ত জনশ্রুতিকে গলাইয়া পোড়াইয়া বিশ্লিষ্ট করিয়া ইহা হইতে তথ্যমূলক ইতিহাস রচনা করিবার চেষ্টা করিত তবে আর্যসমাজের ইতিহাসের সত্য স্বরূপটি আমরা দেখিতে পাইতাম না। মহাভারত সংগ্রহের দিনে আর্যজাতির ইতিহাস আর্যজাতির স্মৃতিপটে যেরূপ রেখায় আঁকা ছিল, তাহার মধ্যে কিছু বা স্পষ্ট কিছু বা লুপ্ত, কিছু বা সুসংগত কিছু বা পরস্পরবিরুদ্ধ, মহাভারতে সেই সমস্তেরই প্রতিলিপি একত্র করিয়া রক্ষিত হইয়াছে।

এই মহাভারতে কেবল যে নির্বিচারে জনশ্রুতি সংকলন করা হইয়াছে তাহাও নহে। আতস-কাচের একপিঠে যেমন ব্যাপ্ত সূর্যালোক এবং আর একপিঠে যেমন তাহারই সংহত দীপ্তিরশ্মি, মহাভারতেও তেমনি একদিকে ব্যাপক জনশ্রুতিরাশি আর একদিকে তাহারই সমস্তটির একটি সংহত জ্যোতি—সেই জ্যোতিটিই ভগবদ্‌গীতা। জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির যে সমন্বয়যোগ তাহাই সমস্ত ভারতইতিহাসের চরমতত্ত্ব। নিঃসন্দেহই পৃথিবীর সকল জাতিই আপন ইতিহাসের ভিতর দিয়া কোনো সমস্যার মীমাংসা কোনো তত্ত্ব-নির্ণয় করিতেছে, ইতিহাসের ভিতর দিয়া মানুষের চিত্ত কোনো একটি চরম সত্যকে সন্ধান ও লাভ করিতেছে—নিজের এই সন্ধানকে ও সত্যকে সকল জাতি স্পষ্ট করিয়া জানে না, অনেকে মনে করে পথের ইতিহাসই ইতিহাস, মূল অভিপ্রায় ও চরম গম্যস্থান বলিয়া কিছুই নাই। কিন্তু ভারতবর্ষ একদিন আপনার সমস্ত ইতিহাসের একটি চরম-তত্ত্বকে দেখিয়াছিল। মানুষের ইতিহাসের জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম অনেক সময়ে স্বতন্ত্র-ভাবে, এমন কি পরস্পর বিরুদ্ধভাবে আপনার পথে চলে; সেই বিরোধের বিপ্লব ভারতবর্ষে খুব করিয়াই ঘটিয়াছে বলিয়াই এক জায়গায় তাহার সমন্বয়টিকে স্পষ্ট করিয়া সে দেখিতে পাইয়াছে। মানুষের সকল চেষ্টাই কোনখানে আসিয়া অবিরোধে মিলিতে পারে মহাভারত সকল পথের চৌমাথায় সেই চরম লক্ষ্যের আলোকটি জ্বালাইয়া ধরিয়াছে। তাহাই গীতা। এই গীতার মধ্যে য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা লজিকগত অসংগতি দেখিতে পান। ইহাতে সাংখ্য, বেদান্ত এবং যোগকে যে একত্রে স্থান দেওয়া হইয়াছে

তাঁহারা মনে করেন সেটা একটা জোড়াতাড়া ব্যাপার—অর্থাৎ তাঁহাদের মতে ইহার মূলটি সাংখ্য ও যোগ, বেদান্তটি তাহার পরবর্তী কোনো সম্প্রদায়ের দ্বারা যোজনা করা। হইতেও পারে মূল ভগবদ্‌গীতা ভারতবর্ষের সাংখ্য ও যোগতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া উপদিষ্ট, কিন্তু মহাভারতসংকলনের যুগে সেই মূলের বিশুদ্ধতা-রক্ষাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না—সমস্ত জাতির চিত্তকে সমগ্র করিয়া এক করিয়া দেখাই তখনকার সাধনা ছিল। অতএব যে গ্রন্থে তত্ত্বের সহিত জীবনকে মিলাইয়া মানুষের কর্তব্যপথ নির্দেশ করা হইয়াছে সে গ্রন্থে বেদান্ততত্ত্বকে তাঁহারা বাদ দিতে পারেন নাই। সাংখ্যই হউক যোগই হউক বেদান্তই হউক সকল তত্ত্বেরই কেন্দ্রস্থলে একই বস্তু আছেন, তিনি কেবলমাত্র জ্ঞান বা ভক্তি বা কর্মের আশ্রয় নহেন, তিনি পরিপূর্ণ মানবজীবনের পরমাগতি, তাঁহাতে আসিয়া না মিলিলে কোনো কথাই সত্যে আসিয়া পৌঁছিতে পারে না ; অতএব ভারতচিত্তের সমস্ত প্রয়াসকেই সেই এক মূল সত্যের মধ্যে এক করিয়া দেখাই মহাভারতের দেখা। তাই মহাভারতের এই গীতার মধ্যে লজিকের ঐক্যতত্ত্ব সম্পূর্ণ না থাকিতেও পারে কিন্তু তাহার মধ্যে বৃহৎ একটি জাতীয় জীবনের অনির্বচনীয় ঐক্যতত্ত্ব আছে। তাহার স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতা, সংগতি ও অসংগতির মধ্যে গভীরতম এই একটি উপলব্ধি দেখা যায় যে, সমস্তকে লইয়াই সত্য, অতএব এক জায়গায় মিল আছেই। এমন কি, গীতায় যজ্ঞকেও সাধনাক্ষেত্রে স্থান দিয়াছে। কিন্তু গীতায় যজ্ঞ-ব্যাপার এমন একটি বড় ভাব পাইয়াছে যাহাতে তাহার সংকীর্ণতা ঘুচিয়া সে একটি বিশ্বের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। যে সকল ক্রিয়াকলাপে মানুষ আত্মশক্তির দ্বারা বিশ্বশক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া তোলে তাহাই মানুষের যজ্ঞ। গীতাকার যদি এখনকার কালের লোক হইতেন তবে সমস্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিক অধ্যবসায়ের মধ্যে তিনি মানুষের সেই যজ্ঞকে দেখিতে পাইতেন। যেমন জ্ঞানের দ্বারা অনন্ত জ্ঞানের সঙ্গে যোগ, কর্মের দ্বারা অনন্ত মঙ্গলের সঙ্গে যোগ, ভক্তির দ্বারা অনন্ত ইচ্ছার সঙ্গে যোগ, তেমনি যজ্ঞের দ্বারা অনন্ত শক্তির সঙ্গে আমাদের যোগ—এইরূপে গীতায় ভূমার সঙ্গে মানুষের সকল প্রকারের যোগকেই সম্পূর্ণ করিয়া দেখাইয়াছেন—একদা যজ্ঞকাণ্ডের দ্বারা মানুষের যে চেষ্টা বিশ্বশক্তির সিংহদ্বারে আঘাত করিতেছিল গীতা তাহাকেও সত্য বলিয়া দেখিয়াছেন।

এইরূপে ইতিহাসের নানা বিক্ষিপ্ততার মধ্য হইতে তখনকার কালের প্রতিভা যেমন একটি মূলসূত্র খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিল তেমনি বেদের মধ্য হইতেও তাহা একটি সূত্র উদ্ধার করিয়াছিল তাহাই ব্রহ্মসূত্র। তখনকার ব্যাসের এও একটি কীর্তি। তিনি যেমন একদিকে ব্যষ্টিকে রাখিয়াছেন আর-একদিকে তেমনি সমষ্টিকেও

প্রত্যক্ষগোচর করিয়াছেন ; তাঁহার সংকলন কেবল আয়োজনমাত্র নহে তাহা সংযোজন, শুধু সঞ্চয় নহে তাহা পরিচয়। সমস্ত বেদের নানা পথের ভিতর দিয়া মানুষের চিত্তের একটি সন্ধান ও একটি লক্ষ্য দেখিতে পাওয়া যায়—তাহাই বেদান্ত। তাহার মধ্যে একটি দ্বৈতেরও দিক আছে একটি অদ্বৈতেরও দিক আছে কারণ এই দুইটি দিক ব্যতীত কোনো একটি দিকও সত্য হইতে পারে না। লজিক ইহার কোনো সমন্বয় পায় না, এইজন্য যেখানে ইহার সমন্বয় সেখানে ইহাকে অনির্বচনীয় বলা হয়। ব্যাসের ব্রহ্মসূত্রে এই দ্বৈত অদ্বৈত দুই দিককেই রক্ষা করা হইয়াছে। এই জন্য পরবর্তীকালে এই একই ব্রহ্মসূত্রকে লজিক নানা বাদ বিবাদে বিভক্ত করিতে পারিয়াছে। ফলত ব্রহ্মসূত্রে আর্যধর্মের মূলতত্ত্বটি দ্বারা সমস্ত আর্যধর্মশাস্ত্রকে এক আলোকে আলোকিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কেবল আর্যধর্ম কেন সমস্ত মানবের ধর্মের ইহাই এক আলোক।

এইরূপে নানা বিরুদ্ধতার দ্বারা পীড়িত আর্যপ্রকৃতি একদিন আপনার সীমা নির্ণয় করিয়া আপনার মূল ঐক্যটি লাভ করিবার জন্য একান্ত যত্নে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহার লক্ষণ স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। তাই, আর্য জাতির বিধিনিষেধগুলি যাহা কেবল স্মৃতিরূপে নানাস্থানে ছড়াইয়া ছিল এই সময়ে তাহাও সংগৃহীত হইয়া লিপিবদ্ধ হইতে লাগিল।

আমরা এই যে মহাভারতের কথা এখানে আলোচনা করিলাম ইহাকে কেহ যেন কালগত যুগ না মনে করেন—ইহা ভাবগত যুগ—অর্থাৎ আমরা কোনো একটি সংকীর্ণ কালে ইহাকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করিতে পারি না। বৌদ্ধযুগের যথার্থ আরম্ভ কবে তাহা সুস্পষ্টরূপে বলা অসম্ভব—শাক্যসিংহের বহু পূর্বেই যে তাহার আয়োজন চলিতেছিল এবং তাঁহার পূর্বেও যে অন্য বুদ্ধ ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা একটি ভাবের ধারাপরম্পরা যাহা গৌতমবুদ্ধে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল। মহাভারতের যুগও তেমনি কবে আরম্ভ তাহা স্থির করিয়া বলিলে ভুল বলা হইবে। পূর্বেই বলিয়াছি সমাজের মধ্যে ছড়ানো ও কুড়ানো এক সঙ্গেই চলিতেছে। যেমন পূর্ব-মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা। ইহা যে পুরাতন পক্ষ ও নূতন পক্ষের বোঝাপড়া তাহাতে সন্দেহ নাই। একপক্ষ বলিতেছেন যেসকল মন্ত্র ও কর্মকাণ্ড চলিয়া আসিয়াছে তাহা অনাদি, তাহার বিশেষ গুণবশতই তাহার দ্বারাই চরমসিদ্ধি লাভ করা যায়। অপর পক্ষ বলিতেছেন জ্ঞান ব্যতীত আর কোনো উপায়ে মুক্তি নাই। যে দুই গ্রন্থ আশ্রয় করিয়া এই দুই মত বর্তমানে প্রচলিত আছে তাহার রচনাকাল যখনই হউক এই মতদ্বৈধ যে অতি পুরাতন তাহা নিঃসন্দেহ। এইরূপ আর্যসমাজের যে উদ্যম আপনার সামগ্রীগুলিকে বিশেষভাবে

সংগৃহীত ও শ্রেণীবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং যাহা সুদীর্ঘকাল ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ সংকলন করিয়া স্বজাতির প্রাচীন পথটিকে চিহ্নিত করিয়া আসিয়াছে তাহা বিশেষ কোনো সময়ে সীমাবদ্ধ নহে। আর্য অনার্যের চিরন্তন সংমিশ্রণের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষের এই দুই বিরুদ্ধ শক্তি চিরকালই কাজ করিয়া আসিয়াছে; ইহাই আমাদের বক্তব্য।

একথা কেহ যেন না মনে করেন যে অনার্যেরা আমাদিগকে দিবার মত কোনো জিনিস দেয় নাই। বস্তুত প্রাচীন দ্রাবিড়গণ সভ্যতায় হীন ছিল না। তাহাদের সহযোগে হিন্দুসভ্যতা, রূপে বিচিত্র, ও রসে গভীর হইয়াছে। দ্রাবিড় তত্ত্বজ্ঞানী ছিল না কিন্তু কল্পনা করিতে, গান করিতে এবং গড়িতে পারিত। কলাবিদ্যায় তাহারা নিপুণ ছিল এবং তাহাদের গণেশ দেবতার বধূ ছিল কলাবধূ। আর্যদের বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে দ্রাবিড়ের রসপ্রবণতা ও রূপোদ্ভাবনী শক্তির সংমিশ্রণ-চেষ্টায় একটি বিচিত্র সামগ্রী গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহা সম্পূর্ণ আর্যও নহে সম্পূর্ণ অনার্যও নহে, তাহাই হিন্দু। এই দুই বিরুদ্ধের নিরন্তর সমন্বয়প্রয়াসে ভারতবর্ষ একটি আশ্চর্য সামগ্রী পাইয়াছে। তাহা অনন্তকে অন্তের মধ্যে উপলব্ধি করিতে শিখিয়াছে এবং ভূমাকে প্রাত্যহিক জীবনের সমস্ত তুচ্ছতার মধ্যেও প্রত্যক্ষ করিবার অধিকার লাভ করিয়াছে। এই কারণেই ভারতবর্ষে এই দুই বিরুদ্ধ যেখানে না মেলে সেখানে মূঢ়তা ও অন্ধ সংস্কারের আর অন্ত থাকে না; যেখানে মেলে সেখানে অনন্তের অন্তহীন রসরূপ আপনাকে অবাধে সর্বত্র উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়। এই কারণেই ভারতবর্ষ এমন একটি জিনিস পাইয়াছে যাহাকে ঠিকমত ব্যবহার করা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে, এবং ঠিকমত ব্যবহার করিতে না পারিলে যাহা জাতির জীবনকে মূঢ়তার ভারে ধূলিলুণ্ঠিত করিয়া দেয়। আর্য ও দ্রাবিড়ের এই চিত্তবৃত্তির বিরুদ্ধতার সম্মিলন যেখানে সিদ্ধ হইয়াছে সেখানে সৌন্দর্য জাগিয়াছে, যেখানে হওয়া সম্ভবপর হয় নাই সেখানে কদর্যতার সীমা দেখি না। একথাও মনে রাখিতে হইবে শুধু দ্রাবিড় নহে, বর্বর অনার্যদের সামগ্রীও একদিন দ্বার খোলা পাইয়া অসংকোচে আর্যসমাজে প্রবেশলাভ করিয়াছে। এই অনধিকার প্রবেশের বেদনাবোধ বহুকাল ধরিয়া আমাদের সমাজে সুতীব্র হইয়া ছিল।

যুদ্ধ এখন বাহিরে নহে যুদ্ধ এখন দেহের মধ্যে—কেননা অস্ত্র এখন শরীরের মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছে, শত্রু এখন ঘরের ভিতরে। আর্য সভ্যতার পক্ষে ব্রাহ্মণ এখন একমাত্র। এই জন্য এই সময়ে বেদ যেমন অভ্রান্ত ধর্মশাস্ত্ররূপে সমাজস্থিতির সেতু হইয়া দাঁড়াইল, ব্রাহ্মণও সেইরূপ সমাজে সর্বোচ্চ পূজ্যপদ গ্রহণের চেষ্টা করিতে লাগিল। তখনকার পুরাণে ইতিহাসে কাব্যে সর্বত্রই এই চেষ্টা এমনি প্রবল আকারে পুনঃপুন

প্রকাশ পাইতেছে যে, স্পষ্টই বুঝা যায় যে তাহা একটা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে প্রয়াস, তাহা উজানস্রোতে গুণটানা, এইজন্য গুণবন্ধন অনেকগুলি এবং কঠিন টানের বিরামমাত্র নাই। ব্রাহ্মণের এই চেষ্টাকে কোনো একটি সম্প্রদায়বিশেষের স্বার্থসাধন ও ক্ষমতা-লাভের চেষ্টা মনে করিলে ইতিহাসকে সংকীর্ণ ও মিথ্যা করিয়া দেখা হয়। এ চেষ্টা তখনকার সংকটগ্রস্ত আর্যজাতির অন্তরের চেষ্টা। ইহা আত্মরক্ষার প্রাণপণ প্রযত্ন। তখন সমস্ত সমাজের লোকের মনে ব্রাহ্মণের প্রভাবকে সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ করিয়া তুলিতে না পারিলে যাহা চারিদিকে ভাঙিয়া পড়িতেছিল তাহাকে জুড়িয়া তুলিবার কোনো উপায় ছিল না।

এই অবস্থায় ব্রাহ্মণদের দুইটি কাজ হইল। এক, পূর্বধারাকে রক্ষা করা, আর এক, নূতনকে তাহার সহিত মিলাইয়া লওয়া। জীবনীপ্রক্রিয়ার এই দুইটি কাজই তখন অত্যন্ত বাধাগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই ব্রাহ্মণের ক্ষমতা ও অধিকারকে এমন অপরিমিত করিয়া তুলিতে হইয়াছিল। অনার্যদেবতাকে বেদের প্রাচীন মঞ্চে তুলিয়া লওয়া হইল, বৈদিক রুদ্র উপাধি গ্রহণ করিয়া শিব আর্য-দেবতার দলে স্থান পাইলেন। এইরূপে ভারতবর্ষে সামাজিক মিলন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে রূপ গ্রহণ করিল। ব্রহ্মায় আর্যসমাজের আরম্ভকাল, বিষ্ণুতে মধ্যাহ্নকাল, এবং শিবে তাহার শেষ পরিণতির রূপ রহিল।

শিব যদিচ রুদ্রনামে আর্যসমাজে প্রবেশ করিলেন তথাপি তাঁহার মধ্যে আর্য ও অনার্য এই দুই মূর্তিই স্বতন্ত্র হইয়া রহিল। আর্যের দিকে তিনি যোগীশ্বর, কামকে ভস্ম করিয়া নির্বাণের আনন্দে নিমগ্ন, তাঁহার দিগ্‌বাস সন্ন্যাসীর ত্যাগের লক্ষণ; অনার্যের দিকে তিনি বীভৎস, রক্তাক্ত গজাজিনধারী গঞ্জিকা ও ভাং ধুতুরায় উন্মত্ত। আর্যের দিকে তিনি বুদ্ধেরই প্রতিরূপ এবং সেই রূপেই তিনি সর্বত্র সহজেই বুদ্ধমন্দিরসকল অধিকার করিতেছেন; অন্যদিকে তিনি ভূত প্রেত প্রভৃতি শ্মশানচর সমস্ত বিভীষিকা এবং সর্পপূজা, বৃষপূজা, বৃক্ষপূজা, লিঙ্গপূজা প্রভৃতি আত্মসাৎ করিয়া সমাজের অন্তর্গত অনার্যদের সমস্ত তামসিক উপাসনাকে আশ্রয় দান করিতেছেন। একদিকে প্রবৃত্তিকে শান্ত করিয়া নির্জনে ধ্যানে জপে তাঁহার সাধনা; অন্যদিকে চড়কপূজা প্রভৃতি ব্যাপারে নিজেকে প্রমত্ত করিয়া তুলিয়া ও শরীরকে নানা প্রকারে ক্লেশে উত্তেজিত করিয়া নিদারুণভাবে তাঁহার আরাধনা।

এইরূপে আর্য অনার্যের ধারা গঙ্গাযমুনার মতো একত্র হইল তবু তাহার দুই রং পাশাপাশি রহিয়া গেল। এইরূপে বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যেও কৃষ্ণের নামকে আশ্রয় করিয়া যেসমস্ত কাহিনী প্রবেশ করিল তাহা পাণ্ডবসখা ভাগবতধর্মপ্রবর্তক বীরশ্রেষ্ঠ দ্বারকা-পুরীর শ্রীকৃষ্ণের কথা নহে। বৈষ্ণব ধর্মের একদিকে ভগবদ্‌গীতার বিশুদ্ধ অবিমিশ্র

উচ্চ ধর্মতত্ত্ব রহিল, আর-একদিকে অনার্য আভীর গোপজাতির লোকপ্রচলিত দেবলীলার বিচিত্র কথা তাহার সহিত যুক্ত হইল। শৈবধর্মকে আশ্রয় করিয়া যে জিনিসগুলি মিলিত হইল তাহা নিরাভরণ এবং নিদারুণ; তাহার শান্তি এবং তাহার মত্ততা তাহার স্থাণুবৎ অচল স্থিতি এবং তাহার উদ্দাম তাণ্ডবনৃত্য উভয়ই বিনাশের ভাবসূত্রটিকে আশ্রয় করিয়া গাঁথা পড়িল। বাহিরের দিকে তাহা আসক্তিবন্ধন ছেদন ও মৃত্যু, অন্তরের দিকে তাহা একের মধ্যে বিলয়—ইহাই আর্য-সভ্যতার অদ্বৈতসূত্র। ইহাই নেতি নেতির দিক—ত্যাগ ইহার আভরণ, শ্মশানেই ইহার বাস। বৈষ্ণব ধর্মকে আশ্রয় করিয়া লোকপ্রচলিত যে পুরাণকাহিনী আর্যসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহার মধ্যে প্রেমের, সৌন্দর্যের এবং যৌবনের লীলা; প্রলয়পিনাকের স্থলে সেখানে বাঁশির ধ্বনি; ভূতপ্রেতের স্থলে সেখানে গোপিনীদের বিলাস; সেখানে বৃন্দাবনের চিরবসন্ত এবং গোলোকধামের চির-ঐশ্বর্য; এইখানে আর্যসভ্যতার দ্বৈতসূত্র।

একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক। এই যে আভীরসম্প্রদায়-প্রচলিত কৃষ্ণকথা বৈষ্ণবধর্মের সহিত মিশিয়া গিয়াছে তাহার কারণ এই যে, এখানে পরস্পর মিশিবার একটি সত্যপথ ছিল। নায়ক নায়িকার সম্বন্ধকে জীব ও ভগবানের সম্বন্ধের রূপক ভাবে পৃথিবীর নানাস্থানেই মানুষ স্বীকার করিয়াছে। আর্যবৈষ্ণব ভক্তির এই তত্ত্বটিকে অনার্যদের কাহিনীর সঙ্গে মিলিত করিয়া সেইসমস্ত কাহিনীকে একটি উচ্চতম সত্যের মধ্যে উত্তীর্ণ করিয়া লইল। অনার্যের চিত্তে যাহা কেবল রসমাদকতারূপে ছিল আর্য তাহাকে সত্যের মধ্যে নিত্যপ্রতিষ্ঠ করিয়া দেখিল—তাহা কেবল বিশেষ জাতির বিশেষ একটি পুরাণকথারূপে রহিল না, তাহা সমস্ত মানবের একটি চিরন্তন আধ্যাত্মিক সত্যের রূপকরূপে প্রকাশ পাইল। আর্য এবং দ্রাবিড়ের সম্মিলনে এইরূপে হিন্দুসভ্যতায় সত্যের সহিত রূপের বিচিত্র সম্মিলন ঘটিয়া আসিয়াছে—এইখানে জ্ঞানের সহিত রসের, একের সহিত বিচিত্রের অন্তরতর সংযোগ ঘটিয়াছে।

আর্যসমাজের মূলে পিতৃশাসনতন্ত্র, অনার্যসমাজের মূলে মাতৃশাসনতন্ত্র। এইজন্য বেদে স্ত্রীদেবতার প্রাধান্য নাই। আর্যসমাজে অনার্যপ্রভাবের সঙ্গে এই স্ত্রীদেবতাদের প্রাদুর্ভাব ঘটিতে লাগিল। তাহা লইয়াও যে সমাজে বিস্তর বিরোধ ঘটিয়াছে প্রাকৃত সাহিত্যে তাহার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। এই দেবীতন্ত্রের মধ্যেও একদিকে হৈমবতী উমার সুশোভনা আর্যমূর্তি অন্যদিকে করালী কালিকার কপালমালিনী বিবসনা অনার্যমূর্তি।

কিন্তু সমস্ত অনার্য অনৈক্যকে তাহার সমস্ত কল্পনাকাহিনী আচার ও পূজাপদ্ধতি লইয়া আর্যভাবের ঐক্যসূত্রে আদ্যোপান্ত মিলিত করিয়া তোলা কোনোমতেই সম্ভবপর

হয় না—তাহার সমস্তটাকেই রক্ষা করিতে গেলে তাহার মধ্যে শত সহস্র অসংগতি থাকিয়া যায়। এইসমস্ত অসংগতির কোনোপ্রকার সমন্বয় হয় না—কেবল কালক্রমে তাহা অভ্যস্ত হইয়া যায় মাত্র। এই অভ্যাসের মধ্যে অসংগতিগুলি একত্র থাকে, তাহাদের মিলিত করিবার প্রয়োজনবোধও চলিয়া যায়। তখন ধীরে ধীরে এই নীতিই সমাজে প্রবল হইয়া উঠে যে, যাহার যেরূপ শক্তি ও প্রবৃত্তি সে সেইরূপ পূজা আচার লইয়াই থাক্। ইহা একপ্রকার হাল ছাড়িয়া দেওয়া নীতি। যখন বিরুদ্ধগুলিকে পাশে রাখিতেই হইবে অথচ কোনো মতেই মিলাইতে পারা যাইবে না, তখন এই কথা ছাড়া অন্য কথা হইতেই পারে না।

এইরূপে বৌদ্ধযুগের প্রলয়াবসানে বিপর্যস্ত সমাজের নূতন পুরাতন সমস্ত বিচ্ছিন্ন পদার্থ লইয়া ব্রাহ্মণ যেমন করিয়া পারে সেগুলিকে সাজাইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে বসিল। এমন অবস্থায় স্বভাবতই শৃঙ্খল অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠে। যাহারা স্বতই স্বতন্ত্র, যাহারা নানা জাতির নানা কালের সামগ্রী, তাহাদিগকে এক করিয়া বাঁধিতে গেলে বাঁধন অত্যন্ত আঁট করিয়া রাখিতে হয়—তাহারা জীবনধর্মের নিয়ম অনুসারে আপনার যোগ আপনিই সাধন করে না।

ভারতবর্ষে ইতিহাসের আরম্ভযুগে যখন আর্য অনার্যে যুদ্ধ চলিতেছিল তখন দুই পক্ষের মধ্যে একটা প্রবল বিরোধ ছিল। এই প্রকার বিরোধের মধ্যেও এক প্রকারের সমকক্ষতা থাকে। মানুষ যাহার সঙ্গে লড়াই করে তাহাকে তীব্রভাবে দ্বেষ করিতে পারে কিন্তু তাহাকে মনের সঙ্গে অবজ্ঞা করিতে পারে না। এই জন্য ক্ষত্রিয়েরা অনার্যের সহিত যেমন লড়াই করিয়াছে তেমনি তাহাদের সহিত মিলিতও হইয়াছে। মহাভারতে ক্ষত্রিয়দের বিবাহের ফর্দ ধরিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

কিন্তু ইতিহাসের পরবর্তী যুগে যখন আর-একদিন অনার্য বিরোধ তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল অনার্যেরা তখন আর বাহিরে নাই তাহারা একেবারে ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং তখন যুদ্ধ করিবার দিন আর নাই। এই জন্য সেই অবস্থায় বিদ্বেষ একান্ত একটা ঘৃণার আকার ধরিয়াছিল। এই ঘৃণাই তখন অস্ত্র। ঘৃণার দ্বারা মানুষকে কেবল যে দূরে ঠেকাইয়া রাখা যায় তাহা নহে, যাহাকে সকল প্রকারে ঘৃণা করা যায় তাহারও মন আপনি খাটো হইয়া আসে ; সেও আপনার হীনতার সংকোচে সমাজের মধ্যে কুণ্ঠিত হইয়া থাকে ; যেখানে সে থাকে সেখানে সে কোনোরূপ অধিকার দাবি করে না। এইরূপ যখন সমাজের একভাগ আপনাকে নিকৃষ্ট বলিয়াই স্বীকার করিয়া লয় এবং আর-একভাগ আপনার আধিপত্যে কোনো বাধাই পায় না—তখন নিচে সে যতই অবনত হয় উপরে যে থাকে সেও ততই নামিয়া পড়িতে থাকে। ভারতবর্ষে

আত্মপ্রসারণের দিনে যে অনার্যবিদ্বেষ ছিল এবং আত্মসংকোচনের দিনে যে অনার্যবিদ্বেষ জাগিল উহার মধ্যে অত্যন্ত প্রভেদ। প্রথম বিদ্বেষের সমতলটানে মনুষ্যত্ব খাড়া থাকে দ্বিতীয় বিদ্বেষের নিচের টানে মনুষ্যত্ব নামিয়া যায়। যাহাকে মারি সে যখন ফিরিয়া মারে তখন মানুষের মঙ্গল, যাহাকে মারি সে যখন নীরবে সে মার মাথা পাতিয়া লয় তখন বড়ো দুর্গতি। বেদে অনার্যদের প্রতি যে বিদ্বেষ প্রকাশ আছে তাহার মধ্যে পৌরুষ দেখিতে পাই, মনুসংহিতায় শূদ্রের প্রতি যে একান্ত অন্যায় ও নিষ্ঠুর অবজ্ঞা দেখা যায় তাহার মধ্যে কাপুরুষতারই লক্ষণ ফুটিয়াছে। মানুষের ইতিহাসে সর্বত্রই এইরূপ ঘটে। যেখানেই কোনো একপক্ষ সম্পূর্ণ একেশ্বর হয়, যেখানেই তাহার সমকক্ষ ও প্রতিপক্ষ কেহই থাকে না, সেখানেই কেবল বন্ধনের পর বন্ধনের দিন আসে, সেখানেই একেশ্বর প্রভু নিজের প্রতাপকে সকল দিক হইতেই সম্পূর্ণ বাধাহীনরূপে নিরাপদ করিতে গিয়া নিজের প্রতাপই নত করিয়া ফেলে। বস্তুত মানুষ যেখানেই মানুষকে ঘৃণা করিবার অপ্রতিহত অধিকার পায় সেখানে যে মাদক বিষ তাহার প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করে তেমন নিদারুণ বিষ মানুষের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না। আর্য ও অনার্য, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, য়ুরোপীয় ও এসিয়াটিক, আমেরিকান ও নিগ্রো, যেখানেই এই দুর্ঘটনা ঘটে সেখানেই দুই পক্ষের কাপুরুষতা পুঞ্জীভূত হইয়া মানুষের সর্বনাশকে ঘনাইয়া আনে। বরং শত্রুতা শ্রেয়, কিন্তু ঘৃণা ভয়ংকর।

ব্রাহ্মণ একদিন সমস্ত ভারতবর্ষীয় সমাজের একেশ্বর হইয়া উঠিল এবং সমাজবিধি সকলকে অত্যন্ত কঠিন করিয়া বাঁধিল। ইতিহাসে অত্যন্ত প্রসারণের যুগের পর অত্যন্ত সংকোচনের যুগ স্বভাবতই ঘটিল।

বিপদ হইল এই যে, পূর্বে সমাজে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই শক্তি ছিল। এই দুই শক্তির বিরুদ্ধতার যোগে সমাজের গতি মধ্যপথে নিয়ন্ত্রিত হইতেছিল; এখন সমাজে সেই ক্ষত্রিয়শক্তি আর কাজ করিল না। সমাজের অনার্যশক্তি ব্রাহ্মণশক্তির প্রতিযোগীরূপে দাঁড়াইতে পারিল না—ব্রাহ্মণ তাহাকে অবজ্ঞার সহিত স্বীকার করিয়া লইয়া আপন পরাভবের উপরেও জয়স্তম্ভ স্থাপিত করিল।

এদিকে বাহির হইতে যে বীর জাতি এক সময়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া রাজপুত নামে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত সিংহাসনগুলিই অধিকার করিয়া লইয়াছে, ব্রাহ্মণগণ অন্যান্য অনার্যদের ন্যায় তাহাদিগকেও স্বীকার করিয়া লইয়া একটি কৃত্রিম ক্ষত্রিয় জাতির সৃষ্টি করিল। এই ক্ষত্রিয়গণ বুদ্ধিপ্রকৃতিতে ব্রাহ্মণদের সমকক্ষ নহে। ইহারা প্রাচীন আর্য ক্ষত্রিয়দের ন্যায় সমাজের সৃষ্টিকার্যে আপন প্রতিভা প্রয়োগ করিতে পারে নাই, ইহারা সাহস ও বাহুবল লইয়া ব্রাহ্মণশক্তির সহায় ও অনুবর্তী হইয়া বন্ধনকে দৃঢ় করিবার দিকেই সম্পূর্ণ যোগ দিল।

এরূপ অবস্থায় কখনোই সমাজের ওজন ঠিক থাকিতে পারে না। আত্মপ্রসারের পথ একেবারে অবরুদ্ধ হইয়া একমাত্র আত্মরক্ষণীশক্তি সংকোচের দিকেই যখন পাকের পর পাক জড়াইয়া চলে তখন জাতির প্রতিভা স্ফূর্তি পাইতে পারে না। কারণ সমাজের এই বন্ধন একটা কৃত্রিম পদার্থ; এইরূপ শিকল দিয়া বাঁধার দ্বারা কখনো কলেবর গঠিত হয় না। ইহাতে কেবলই বংশানুক্রমে জাতির মধ্যে কালের ধর্মই জাগে ও জীবনের ধর্মই হ্রাস পায়; এরূপ জাতি চিন্তায় ও কর্মে কর্তৃত্বভাবের অযোগ্য হইয়া পরাধীনতার জন্যই সর্বতোভাবে প্রস্তুত হইতে থাকে। আর্যইতিহাসের প্রথম যুগে যখন সমাজের অভ্যাস-প্রবণতা বিস্তর বাহিরের জিনিস জমাইয়া তুলিয়া চলিবার পথ বন্ধ করিয়া দিতেছিল তখন সমাজের চিত্তবৃত্তি তাহার মধ্যে দিয়া ঐক্যের পথ সন্ধান করিয়া এই বহুর বাধা হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়াছিল। আজও সমাজে তেমনি আর একদিন আসিয়াছে। আজ বাহিরের জিনিস আরও অনেক বেশি এবং আরও অনেক অসংগত। তাহা আমাদের জাতির চিত্তকে ভারগ্রস্ত করিয়া দিতেছে। অথচ সমাজে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া যে একমাত্র শক্তি আধিপত্য করিতেছে তাহা রক্ষণীশক্তি। তাহা যা-কিছু আছে তাহাকেই রাখিয়াছে, যাহা ভাঙিয়া পড়িতেছে তাহাকেও জমাইতেছে, যাহা উড়িয়া আসিয়া পড়িতেছে তাহাকেও কুড়াইতেছে। জাতির জীবনের গতিকে এইসকল অভ্যাসের জড়সঞ্চয় পদে পদে বাধা না দিয়া থাকিতে পারে না; ইহা মানুষের চিন্তাকে সংকীর্ণ ও কর্মকে সংরুদ্ধ করিবেই;—সেই দুর্গতি হইতে বাঁচাইবার জন্য এইকালেই সকলের চেয়ে সেই চিত্তশক্তিরই প্রয়োজন হইয়াছে যাহা জটিলতার মধ্য হইতে সরলকে, বাহ্যিকতার মধ্য হইতে অন্তরকে এবং বিচ্ছিন্নতার মধ্য হইতে এককে বাধামুক্ত করিয়া বাহির করিবে। অথচ আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এই চিত্তশক্তিকেই অপরাধী করিয়া তাহাকে সমাজ হাজার শিকলে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু তবু এই বন্ধনজর্জর চিত্ত একেবারে চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। সমাজের একান্ত আত্ম-সংকোচনের অচৈতন্যের মধ্যেও তাহার আত্মপ্রসারণের উদ্বোধনচেষ্টা ক্ষণে ক্ষণে যুঝিয়াছে, ভারতবর্ষের মধ্য যুগে তাহার দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। নানক কবির প্রভৃতি গুরুগণ সেই চেষ্টাকেই আকার দিয়াছেন। কবিরের রচনা ও জীবন আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত বাহ্য আবর্জনাকে ভেদ করিয়া তাহার অন্তরের শ্রেষ্ঠ সামগ্রীকেই ভারতবর্ষের সত্যসাধনা বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার পন্থীকে বিশেষরূপে ভারতপন্থী বলা হইয়াছে। বিপুল বিক্ষিপ্ততা ও অসংলগ্নতার মধ্যে ভারত যে কোন্ নিভৃতে সত্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন তাহা যেন ধ্যানযোগে তিনি সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন। সেই মধ্যযুগে পরে পরে বারবার সেইরূপ গুরুরই অভ্যুদয়

হইয়াছে—তাঁহাদের একমাত্র চেষ্টা এই ছিল যাহা বোঝা হইয়া উঠিয়াছে তাহাকেই সোজা করিয়া তোলা। ইঁহারাই লোকাচার, শাস্ত্রবিধি, ও সমস্ত চিরাভ্যাসের রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত করিয়া সত্য ভারতকে তাহার বাহ্য বেষ্টনের অন্তঃপুরে জাগাইয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন।

সেই যুগের এখনও অবসান হয় নাই, সেই চেষ্টা এখনও চলিতেছে। এই চেষ্টাকে কেহ রোধ করিতে পারিবে না; কারণ ভারতবর্ষের ইতিহাসে আমরা প্রাচীনকাল হইতেই দেখিয়াছি, জড়ত্বের বিরুদ্ধে তাহার চিত্ত বরাবরই যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে;—ভারতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাহার উপনিষদ, তাহার গীতা, তাহার বিশ্বপ্রেমমূলক বৌদ্ধধর্ম সমস্তই এই মহাযুদ্ধে জয়লব্ধ সামগ্রী; তাহার শ্রীকৃষ্ণ তাহার শ্রীরামচন্দ্র এই মহাযুদ্ধেরই অধিনায়ক; আমাদের চিরদিনের সেই মুক্তিপ্রিয় ভারতবর্ষ বহুকালের জড়ত্বের নানা বোঝাকে মাথায় লইয়া একই জায়গায় শতাব্দীর পর শতাব্দী নিশ্চল পড়িয়া থাকিবে ইহা কখনোই তাহার প্রকৃতিগত নহে। ইহা তাহার দেহ নহে, ইহা তাহার জীবনের আনন্দ নহে, ইহা তাহার বাহিরের দায়।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, বহুর মধ্যে আপনাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলা ভারতবর্ষের স্বভাব নহে, সে এককে পাইতে চায় বলিয়া বাহুল্যকে একের মধ্যে সংযত করাই ভারতের সাধনা! ভারতের অন্তরতম সত্যপ্রকৃতিই ভারতকে এই সমস্ত নিরর্থক বাহুল্যের ভীষণ বোঝা হইতে বাঁচাইবেই! তাহার ইতিহাস তাহার পথকে যতই অসাধ্যরূপে বাধাসংকুল করিয়া তুলুক না, তাহার প্রতিভা নিজের শক্তিতে এই পর্বত-প্রমাণ বিঘ্নব্যূহ ভেদ করিয়াই বাহির হইয়া যাইবে—যত বড়ো সমস্যা তত বড়োই তাহার তপস্যা হইবে। যাহা কালে কালে জমিয়া উঠিয়াছে তাহারই মধ্যে হাল ছাড়িয়া ডুবিয়া পড়িয়া ভারতবর্ষের চিরদিনের সাধনা এমন করিয়া চিরকালের মতো হার মানিবে না। এরূপ হার মানা যে মৃত্যুর পথ। যাহা যেখানে আসিয়া পড়িয়াছে তাহা যদি শুদ্ধমাত্র সেখানে পড়িয়াই থাকিত তবে সে অসুবিধা কোনো মতে সহ্য করা যাইত—কিন্তু তাহাকে যে খোরাক দিতে হয়। জাতিমাত্রেরই শক্তি পরিমিত—সে এমন কথা যদি বলে যে, যাহা আছে এবং যাহা আসে সমস্তকেই আমি নির্বিচারে পুষিব তবে এত রক্তশোষণে তাহার শক্তি ক্ষয় না হইয়া থাকিতে পারে না। যে সমাজ নিকৃষ্টকে বহন ও পোষণ করিতেছে উৎকৃষ্টকে সে উপবাসী রাখিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। মূঢ়ের জন্য মূঢ়তা, দুর্বলের জন্য দুর্বলতা. অনার্যের জন্য বীভৎসতা সমাজে রক্ষা করা কর্তব্য এ কথা কানে শুনিতে মন্দ লাগে না কিন্তু জাতির প্রাণভাণ্ডার হইতে যখন তাহার খাদ্য জোগাইতে হয় তখন জাতির যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ প্রত্যহই তাহার ভাগ

নষ্ট হয় এবং প্রত্যহই জাতির বুদ্ধি দুর্বল ও বীর্য মৃতপ্রায় হইয়া আসে। নীচের প্রতি যাহা প্রশ্রয় উচ্চের প্রতি তাহাই বঞ্চনা;—কখনোই তাহাকে ঔদার্য বলা যাইতে পারে না; ইহাই তামসিকতা—এবং এই তামসিকতা কখনোই ভারতবর্ষের সত্য সামগ্রী নহে।

ঘোরতর দুর্যোগের নিশীথ অন্ধকারেও এই তামসিকতার মধ্যে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া পড়িয়া থাকে নাই। যে সমস্ত অদ্ভুত দুঃস্বপ্নভার তাহার বুক চাপিয়া নিশ্বাস রোধ করিবার উপক্রম করিয়াছে তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া সরল সত্যের মধ্যে জাগিয়া উঠিবার জন্য তাহার অভিভূত চৈতন্যও ক্ষণে ক্ষণে একান্ত চেষ্টা করিয়াছে। আজ আমরা যে-কালের মধ্যে বাস করিতেছি সে কালকে বাহির হইতে সুস্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই না; তবু অনুভব করিতেছি ভারতবর্ষ আপনার সত্যকে, এককে, সামঞ্জস্যকে ফিরিয়া পাইবার জন্য উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে। নদীতে বাঁধের উপর বাঁধ পড়িয়াছিল, কতকাল হইতে তাহাতে আর স্রোত খেলিতেছিল না, আজ কোথায় তাহার প্রাচীর ভাঙিয়াছে—তাই আজ এই স্থির জলে আবার যেন মহাসমুদ্রের সংস্রব পাইয়াছি, আবার যেন বিশ্বের জোয়ার ভাটার আনাগোনা আরম্ভ হইয়াছে। এখনই দেখা যাইতেছে আমাদের সমস্ত নব্য উদ্‌যোগ সজীবহৃৎপিণ্ডচালিত রক্তস্রোতের মতো একবার বিশ্বের দিকে ছুটিতেছে একবার আপনার দিকে ফিরিতেছে, একবার সার্বজাতিকতা তাহাকে ঘরছাড়া করিতেছে একবার স্বাজাতিকতা তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিতেছে। একবার সে সর্বস্বের প্রতি লোভ করিয়া নিজস্বকে ছাড়িতে চাহিতেছে, আবার সে দেখিতেছে নিজস্বকে ছাড়িয়া রিক্ত হইলে কেবল নিজস্বই হারানো হয় সর্বস্বকে পাওয়া যায় না। জীবনের কাজ আরম্ভ হইবার এই তো লক্ষণ। এমনি করিয়া দুই ধাক্কার মধ্যে পড়িয়া মাঝখানের সত্য পথটি আমাদের জাতীয় জীবনে চিহ্নিত হইয়া যাইবে এবং এই কথা উপলব্ধি করিব যে স্বজাতির মধ্য দিয়াই সর্বজাতিকে ও সর্বজাতির মধ্য দিয়াই স্বজাতিকে সত্যরূপে পাওয়া যায়,—এই কথা নিশ্চিতরূপেই বুঝিব যে আপনাকে ত্যাগ করিয়া পরকে চাহিতে যাওয়া যেমন নিষ্ফল ভিক্ষুকতা, পরকে ত্যাগ করিয়া আপনাকে কুঞ্চিত করিয়া রাখা তেমনি দারিদ্র্যের চরম দুর্গতি।

১৩১৮

আত্মপরিচয়

আমাদের পরিচয়ের একটা ভাগ আছে, যাহা একেবারে পাকা— আমার ইচ্ছা অনুসারে যাহার কোনো নড়চড় হইবার জো নাই। তাহার আর একটা ভাগ আছে যাহা আমার স্বোপার্জিত— আমার বিদ্যা ব্যবহার ব্যবসায় বিশ্বাস অনুসারে যাহা আমি বিশেষ করিয়া লাভ করি এবং যাহার পরিবর্তন ঘটা অসম্ভব নহে। যেমন মানুষের প্রকৃতি; তাহার একটা দিক আছে যাহা মানুষের চিরন্তন, সেইটেই তাহার ভিত্তি,— সেইখানে সে উদ্ভিদ ও পশুর সঙ্গে স্বতন্ত্র, কিন্তু তাহার প্রকৃতির আর একটা দিক আছে যেখানে সে আপনাকে আপনি বিশেষভাবে গড়িয়া তুলিতে পারে— সেইখানেই একজন মানুষের সঙ্গে আর একজন মানুষের স্বাতন্ত্র্য।

মানুষের প্রকৃতির মধ্যে সবই যদি চিরন্তন হয়, কিছুই যদি তাহার নিজে গড়িয়া লইবার না থাকে, আপনার মধ্যে কোথাও যদি সে আপনার ইচ্ছা খাটাইবার জায়গা না পায় তবে তো সে মাটির ঢেলা। আবার যদি তাহার অতীতকালের কোনো একটা চিরন্তন ধারা না থাকে তাহার সমস্তই যদি আকস্মিক হয় কিংবা নিজের ইচ্ছা অনুসারেই আগাগোড়া আপনাকে যদি তাহার রচনা করিতে হয় তবে সে একটা পাগলামি, একটা আকাশকুসুম।

মানুষের এই প্রকৃতি অনুসারেই মানুষের পরিচয়। তাহার খানিকটা পাকা খানিকটা কাঁচা, তাহার এক জায়গায় ইচ্ছা খাটে না আর এক জায়গায় ইচ্ছারই সৃজনশালা। মানুষের সমস্ত পরিচয়ই যদি পাকা হয় অথবা তাহার সমস্তই যদি কাঁচা হয় তবে দুইই তাহার পক্ষে বিপদ।

আমি যে আমারই পরিবারের মানুষ সে আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। আমার পরিবারের কেহ বা মাতাল, কেহ বা বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে আসিয়া ঠেকিয়া গেল এবং লোকসমাজেও উচ্চশ্রেণীতে গণ্য হইল না। এই কারণেই আমি আমার পারিবারিক পরিচয়টাকে একেবারে চাপিয়া যাইতে পারি কিন্তু তাহা হইলে সত্যকে চাপা দেওয়া হইবে।

কিংবা হয়তো আমাদের পরিবারে পুরুষানুক্রমে কেহ কখনো হাবড়ার পুল পার হয় নাই কিংবা দুইদিন অন্তর গরম জলে স্নান করিয়া আসিয়াছে, তাই বলিয়া আমিও যে পুল পার হইব না কিংবা স্নানসম্বন্ধে আমাকে কার্পণ্য করিতেই হইবে একথা মানা যায় না।

অবশ্য, আমার সাত পুরুষে যাহা ঘটে নাই অষ্টমপুরুষে আমি যদি তাহাই করিয়া বসি, যদি হাবড়ার পুল পার হইয়া যাই তবে আমার বংশের সমস্ত মাসীপিসী ও খুড়ো-জ্যেঠার দল নিশ্চয়ই বিস্ফারিত চক্ষুতারকা ললাটের দিকে তুলিয়া বলিবে, "তুই অমুক গোষ্ঠীতে জন্মিয়াও পুল পারাপারি করিতে শুরু করিয়াছিস! ইহাও আমাদিগকে চক্ষে দেখিতে হইল!" চাই কি লজ্জায় ক্ষোভে তাঁহাদের এমন ইচ্ছাও হইতে পারে আমি পুলের অপর পারেই বরাবর থাকিয়া যাই কিন্তু তবু আমি যে সেই গোষ্ঠীরই ছেলে সে পরিচয়টা পাকা। মা মাসীরা রাগ করিয়া তাহা স্বীকার না করিলেও পাকা, আমি নিজে অভিমান করিয়া তাহা অস্বীকার করিলেও পাকা। বস্তুত পূর্ব-পুরুষগত যোগটা নিত্য, কিন্তু চলাফেরাসম্বন্ধে অভ্যাসটা নিত্য নহে।

আমাদের দেশে বর্তমানকালে, কী বলিয়া আপনার পরিচয় দিব তাহা লইয়া অন্তত ব্রাহ্মসমাজে একটা তর্ক উঠিয়াছে। অথচ এ তর্কটা রামমোহন রায়ের মনের মধ্যে একেবারেই ছিল না দেখিতে পাই। এদিকে তিনি সমাজপ্রচলিত বিশ্বাস ও পূজার্চনা ছাড়িয়াছেন, কোরান পড়িতেছেন, বাইবেল হইতে সত্যধর্মের সারসংগ্রহ করিতেছেন, অ্যাডাম সাহেবকে দলে টানিয়া ব্রহ্মসভা স্থাপন করিয়াছেন; সমাজে নিন্দায় কান পাতিবার জো নাই, তাঁহাকে সকলেই বিধর্মী বলিয়া গালি দিতেছে, এমন কি যদি কোনো নিরাপদ সুযোগ মিলিত তবে তাঁহাকে মারিয়া ফেলিতে পারে এমন লোকের অভাব ছিল না,—কিন্তু কী বলিয়া আপনার পরিচয় দিব সে বিষয়ে তাঁহার মনে কোনো দিন লেশমাত্র সংশয় ওঠে নাই। কারণ হাজার হাজার লোকে তাঁহাকে অহিন্দু বলিলেও তিনি হিন্দু এ সত্য যখন লোপ পাইবার নয় তখন এ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া সময় নষ্ট করিবার কোনো দরকার ছিল না।

বর্তমানকালে আমরা কেহ কেহ এই লইয়া চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমরা যে কী, সে লইয়া আমাদের মনে একটা সন্দেহ জন্মিয়াছে। আমরা বলিতেছি আমরা আর কিছু নই আমরা ব্রাহ্ম। কিন্তু সেটা তো একটা নূতন পরিচয় হইল। সে পরিচয়ের শিকড় তো বেশি দূর যায় না আমি হয়তো কেবলমাত্র গতকল্য ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষা লইয়া প্রবেশ করিয়াছি। ইহার চেয়ে পুরাতন ও পাকা পরিচয়ের ভিত্তি আমার কিছুই নাই? অতীতকাল হইতে প্রবাহিত কোনো একটা নিত্য লক্ষণ কি আমার মধ্যে একেবারেই বর্তায় নাই?

এরূপ কখনো সম্ভবই হইতে পারে না। অতীতকে লোপ করিয়া দিই এমন সাধ্যই আমার নাই; সুতরাং সেই অতীতের পরিচয় আমার ইচ্ছার উপর লেশমাত্র নির্ভর করিতেছে না।

কথা এই, সেই আমার অতীতের পরিচয়ে আমি হয়তো গৌরব বোধ করিতে না পারি। সেটা দুঃখের বিষয়। কিন্তু এইরূপ যে-সকল গৌরব পৈতৃক তাহার ভাগ-বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে বিধাতা আমাদের সম্মতি লন না, এই সকল সৃষ্টিকার্যে কোনোরূপ ভোটের প্রথাও নাই। আমরা কেহ বা জর্মনির সম্রাটবংশে জন্মিয়াছি আবার কাহারও বা এমন বংশে জন্ম—ইতিহাসের পাতায় সোনালি অক্ষরে বা কালো অক্ষরে যাহার কোনো উল্লেখমাত্র নাই। ইহাকে জন্মান্তরের কর্মফল বলিয়াও কথঞ্চিৎ সান্ত্বনালাভ করিতে পারি অথবা এ সম্বন্ধে কোনো গভীর তত্ত্বালোচনার চেষ্টা না করিয়া ইহাকে সহজে স্বীকার করিয়া গেলেও বিশেষ কোনো ক্ষতি নাই।

অতএব, আমি হিন্দু এ কথা বলিলে যদি নিতান্তই কোনো লজ্জার কারণ থাকে তবে সে লজ্জা আমাকে নিঃশব্দে হজম করিতেই হইবে। কারণ, বিধাতার বিরুদ্ধে নালিশ করিতে হইলে সেই আপিলআদালতের জজ পাইব কোথায়?

ব্রাহ্মসমাজের কেহ কেহ এ সম্বন্ধে এইরূপ তর্ক করেন যে, হিন্দু বলিয়া নিজের পরিচয় দিলে মুসলমানের সঙ্গে আমার যোগ অস্বীকার করা হয়, তাহাতে ঔদার্যের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে।

বস্তুত পরিচয়মাত্রেরই এই অসুবিধা আছে। এমন কি, যদি আমি বলি আমি কিছুই না, তবে যে বলে আমি কিছুই, তাহার সঙ্গে পার্থক্য ঘটে; হয়তো সেই সূত্রেই তাহার সঙ্গে আমার মারামারি লাঠালাঠি বাধিয়া যাইতে পারে। আমি যাহা এবং আমি যাহা নই এই দুইয়ের মধ্যে একটা বিচ্ছেদ আছে—পরিচয়মাত্রই সেই বিচ্ছেদেরই পরিচয়।

এই বিচ্ছেদের মধ্যে হয়তো কোনো একপক্ষের অপ্রিয়তার কারণ আছে। আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াই হয়তো কোনো একজন বা একদল লোক আমার প্রতি খড়্গহস্ত হইতে পারে। এটা যদি আমি বাঞ্ছনীয় না মনে করি তবে আমার সাধ্যমতো আমার তরফ হইতে অপ্রিয়তার কারণ দূর করিতে চেষ্টা করাই আমার কর্তব্য—যদি এটা কোনো সংগত ও উচিত কারণের উপর নির্ভর না করে, যদি অন্ধসংস্কারমাত্র হয়, তবে আমার নামের সঙ্গে সঙ্গে এই অহেতুক বিদ্বেষটুকুকেও আমার বহন করিতে হইবে। আমি রবীন্দ্রনাথ নই বলিয়া শান্তিস্থাপনের প্রয়াসকে কেহই প্রশংসা করিতে পারিবে না।

ইহার উত্তরে তর্ক উঠিবে, ওটা তুমি ব্যক্তিবিশেষের কথা বলিলে। নিজের ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও অসুবিধা স্বতন্ত্র কথা—কিন্তু একটা বড়ো জাতির বা সম্প্রদায়ের সমস্ত দায় আমারই স্বকৃত নহে সুতরাং যদি তাহা অপ্রিয় হয় তবে তাহা আমি নিঃসংকোচে বর্জন করিতে পারি।

আচ্ছা বেশ, মনে করা যাক, ইংরেজ এবং আইরিশ; ইংরেজের বিরুদ্ধে আইরিশের হয়তো একটা বিদ্বেষের ভাব আছে এবং তাহার কারণটার জন্য কোনো একজন বিশেষ ইংরেজ ব্যক্তিগতভাবে বিশেষরূপে দায়ী নহে; তাহার পূর্বপিতামহেরা আইরিশের প্রতি অন্যায় করিয়াছে এবং সম্ভবত এখনও অধিকাংশ ইংরেজ সেই অন্যায়ের সম্পূর্ণ প্রতিকার করিতে অনিচ্ছুক। এমন স্থলে যে ইংরেজ আইরিশের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন তিনি আইরিশকে ঠাণ্ডা করিয়া দিবার জন্য বলেন না আমি ইংরেজ নই; তিনি বাক্যে ও ব্যবহারে জানাইতে থাকেন তোমার প্রতি আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। বস্তুত এরূপ স্থলে স্বজাতির অধিকাংশের বিরুদ্ধে আইরিশের পক্ষ লওয়াতে স্বজাতির নিকট হইতে দণ্ডভোগ করিতে হইবে, তাঁহাকে সকলে গালি দিবে, তাঁহাকে Little Englander-এর দলভুক্ত ও স্বজাতির গৌরবনাশক বলিয়া সকলে নিন্দা করিবে, কিন্তু তবু এ কথা তাঁহাকে বলা সাজিবে না, আমি ইংরেজ নহি।

তেমনি হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের যদি বিরোধ থাকে, তবে আমি হিন্দু নই বলিয়া সে বিরোধ মিটাইবার ইচ্ছা করাটা অত্যন্ত সহজ পরামর্শ বলিয়া শোনায় কিন্তু তাহা সত্য পরামর্শ নহে। এই জন্যই সে পরামর্শে সত্য ফল পাওয়া যায় না। কারণ, আমি হিন্দু নই বলিলে হিন্দু মুসলমানের বিরোধটা যেমন তেমনই থাকিয়া যায়, কেবল আমিই একলা তাহা হইতে পাশ কাটাইয়া আসি।

এস্থলে অপর পক্ষে বলিবেন, আমাদের আসল বাধা ধর্ম লইয়া। হিন্দুসমাজ যাহাকে আপনার ধর্ম বলে আমরা তাহাকে আপনার ধর্ম বলিতে পারি না। অতএব আমরা ব্রাহ্ম বলিয়া নিজের পরিচয় দিলেই সমস্ত গোল চুকিয়া যায়; তাহার দ্বারা দুই কাজই হয়। এক, হিন্দুর যে ধর্ম আমার বিশ্বাসবিরুদ্ধ তাহাকে অস্বীকার করা হয় এবং যে ধর্মকে আমি জগতে শ্রেষ্ঠধর্ম বলিয়া জানি তাহাকেও স্বীকার করিতে পারি।

এ সম্বন্ধে ভাবিবার কথা এই যে, হিন্দু বলিলে আমি আমার যে পরিচয় দিই, ব্রাহ্ম বলিলে সম্পূর্ণ তাহার অনুরূপ পরিচয় দেওয়া হয় না, সুতরাং একটি আর একটির স্থান গ্রহণ করিতে পারে না। যদি কাহাকে জিজ্ঞাসা করা যায়, "তুমি কি চৌধুরিবংশীয়" আর সে, যদি তাহার উত্তর দেয়, "না আমি দপ্তরির কাজ করি," তবে প্রশ্নোত্তরের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য হয় না। হইতে পারে চৌধুরিবংশের কেহ আজ পর্যন্ত দপ্তরির কাজ করে নাই, তাই বলিয়া তুমি দপ্তরি হইলেই যে চৌধুরি হইতে পারিবেই না এমন কথা হইতে পারে না।

তেমনি, অন্তকার দিনে হিন্দুসমাজ যাহাকে আপনার ধর্ম বলিয়া স্থির করিয়াছে

তাহাই যে তাহার নিত্য লক্ষণ তাহা কখনোই সত্য নহে। এ সম্বন্ধে বৈদিককাল হইতে অদ্য পর্যন্তের ইতিহাস হইতে নজির সংগ্রহ করিয়া পাণ্ডিত্যের অবতারণা করিতে ইচ্ছাই করি না। আমি একটা সাধারণতত্ত্বস্বরূপেই বলিতে চাই, কোনো বিশেষ ধর্মমত ও কোনো বিশেষ আচার কোনো জাতির নিত্য লক্ষণ হইতেই পারে না। হাঁসের পক্ষে জলে সাঁতার যেমন, মানুষের পক্ষে বিশেষ ধর্মমত কখনোই সেরূপ নহে। ধর্মমত জড় পদার্থ নহে—মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি অবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার বিকাশ আছে—এই জন্য ধর্ম কোনো জাতির অবিচলিত নিত্য পরিচয় হইতেই পারে না। এই জন্য যদিচ সাধারণত সমস্ত ইংরেজের ধর্ম খ্রীস্টানধর্ম, এবং সেই ধর্মমতের উপরেই তাহার সমাজ-বিধি প্রধানত প্রতিষ্ঠিত তথাপি একজন ইংরেজ বৌদ্ধ হইয়া গেলে তাহার যত অসুবিধাই হউক তবু সে ইংরেজই থাকে।

তেমনি ব্রাহ্মধর্ম আপাতত আমার ধর্ম হইতে পারে, কিন্তু কাল আমি প্রটেস্টাণ্ট পরশু রোম্যানক্যাথলিক এবং তাহার পর দিনে আমি বৈষ্ণব হইতে পারি, তাঁহাতে কোনো বাধা নাই, অতএব সে পরিচয় আমার সাময়িক পরিচয়,—কিন্তু জাতির দিক দিয়া আমি অতীতের ইতিহাসে এক জায়গায় বাঁধা পড়িয়াছি, সেই সুবৃহৎকালব্যাপী সত্যকে নড়াইতে পারি এমন সাধ্য আমার নাই।

হিন্দুরা একথা বলে বটে আমার ধর্মটা অটল; এবং অন্য ধর্ম গ্রহণ করিলে তাহারা আমাকে অহিন্দু বলিয়া ত্যাগ করে। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি তাহাদের এই আচরণ আমার হিন্দু পরিচয়কে স্পর্শমাত্র করিতে পারে না। অনেক দিন পর্যন্ত হিন্দুমাত্রই বৈদ্যমতে ও মুসলমান হাকিমিমতে আপনাদের চিকিৎসা করিয়া আসিয়াছে। এমন কি, এমন নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবা থাকিতে পারেন যিনি ডাক্তারি ঔষধ স্পর্শ করেন না। তথাপি অভিজ্ঞতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুজাতির চিকিৎসা-প্রণালী বিস্তার লাভ করিয়াছে। আজও ইহা লইয়া অনেকে আক্ষেপ প্রকাশ করিতেছেন যে বিদেশী চিকিৎসা আমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক এবং ইহাতে আমাদের শরীর জীর্ণ হইয়া গেল, দেশ উজাড় হইবার জো হইল কিন্তু তবু কুইনীনমিকশ্চার যে অহিন্দু এমন কথা কোনো তত্ত্বব্যাখ্যার দ্বারা আজও প্রমাণের চেষ্টা হয় নাই। ডাক্তারের ভিজিটে এবং ঔষধের উগ্র উপদ্রবে যদি আমি ধনেপ্রাণে মরি তবু আমি হিন্দু এ কথা অস্বীকার করা চলিবে না। অথচ হিন্দু আয়ুর্বেদের প্রথম অধ্যায় হইতে শেষ পর্যন্ত খুঁজিলে ঔষধতালিকার মধ্যে কুইনীনের নাম পাওয়া যাইবে না।

এই যেমন শরীরের কথা বলিলাম, তেমনি, শরীরের চেয়ে বড়ো জিনিসেরও কথা বলা যায়। কারণ, শরীর রক্ষাই তো মানুষের একমাত্র নহে, তাহার যে প্রকৃতি ধর্মকে

আশ্রয় করিয়া সুস্থ ও বলিষ্ঠ থাকে তাহাকেও বাঁচাইয়া চলিতেই হইবে। সমাজের অধিকাংশ লোকের এমন মত হইতে পারে যে, তাহাকে বাঁচাইয়া চলিবার উপযোগী ধর্ম আয়ুর্বেদ আমাদের দেশে এমনই সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে যে, সে সম্বন্ধে কাহারও কোনো কথা চলিতে পারে না। এটা তো একটা বিশ্বাসমাত্র, এরূপ বিশ্বাস সত্যও হইতে পারে মিথ্যাও হইতে পারে, অতএব যে লোকের প্রাণ লইয়া কথা সে যদি নিজের বিশ্বাস লইয়া অন্য কোনো একটা পন্থা অবলম্বন করে তবে গায়ের জোরে তাহাকে নিরস্ত করিতে পারি কিন্তু সত্যের জোরে পারি না। গায়ের জোরের তো যুক্তি নাই। পুলিস দারোগা যদি ঘুষ লইয়া বলপূর্বক অন্যায় করে তবে দুর্বল বলিয়া আমি সেটাকে হয়তো মানিতে বাধ্য হইতে পারি কিন্তু সেইটেকেই রাজ্যশাসনতন্ত্রের চরম সত্য বলিয়া কেন স্বীকার করিব? তেমনি হিন্দুসমাজ যদি ধোবানাপিত বন্ধ করিবার ভয় দেখাইয়া আমাকে বলে অমুক বিশেষ ধর্মটাকেই তোমার মানিতে হইবে কারণ এইটেই হিন্দুধর্ম—তবে যদি ভয় পাই তবে ব্যবহারে মানিয়া যাইব কিন্তু সেইটেই যে হিন্দুসমাজের চরম সত্য ইহা কোনোক্রমেই বলা চলিবে না। যাহা কোনো সভ্য সমাজেরই চরম সত্য নহে তাহা হিন্দুসমাজেরও নহে, ইহা কোটি কোটি বিরুদ্ধবাদীর মুখের উপরেই বলা যায়—কারণ, ইহাই সত্য।

হিন্দুসমাজের ইতিহাসেও ধর্মবিশ্বাসের অচলতা আমরা দেখি নাই। এখানে পরে পরে যত ধর্মবিপ্লব ঘটিয়াছে এমন আর কোথাও ঘটে নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে-সকল দেবতা ও পূজা আর্যসমাজের নহে তাহাও হিন্দুসমাজে চলিয়া গিয়াছে—সংখ্যাহিসাবে তাহারাই সব চেয়ে প্রবল। ভারতবর্ষে উপাসকসম্প্রদায়সম্বন্ধে যে কোনো বই পড়িলেই আমরা দেখিতে পাইব হিন্দুসমাজে ধর্মাচরণের কেবল যে বৈচিত্র্য আছে তাহা নহে, তাহারা পাশাপাশি আছে, ইহা ছাড়া তাহাদের পরস্পরের আর কোনো ঐক্যসূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যদি কাহাকেও জিজ্ঞাসা করি, কোন্ ধর্ম হিন্দুর ধর্ম, যেটা না মানিলে তুমি আমাকে হিন্দু বলিয়া স্বীকার করিবে না? তখন এই উত্তর পাওয়া যায়, যে-কোনো ধর্মই কিছুকাল ধরিয়া যে-কোনো সম্প্রদায়ে হিন্দুধর্ম বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ধর্মের এমনতরো জড়সংজ্ঞা আর হইতেই পারে না। যাহা শ্রেয়, বা যাহার আন্তরিক কোনো সৌন্দর্য বা পবিত্রতা আছে তাহাই ধর্ম, এমন কোনো কথা নাই;—স্তূপের মধ্যে কিছুকাল যাহা পড়িয়া আছে তাহাই ধর্ম—তাহা যদি বীভৎস হয়, যদি তাহাতে সাধারণ ধর্মনীতির সংযম নষ্ট হইতে থাকে তথাপি তাহাও ধর্ম। এমন উত্তর যতগুলি লোকে মিলিয়াই দিক্ না কেন তথাপি তাহাকে আমি আমার সমাজের পক্ষের সত্য উত্তর বলিয়া কোনোমতেই গ্রহণ করিব না। কেননা, লোক গণনা করিয়া ওজন দরে বা গজের মাপে সত্যের মূল্যনির্ণয় হয় না।

নানাপ্রকার অনার্য ও বীভৎস ধর্ম কেবলমাত্র কালক্রমে আমাদের সমাজে যদি স্থান পাইয়া থাকে তবে যে-ধর্মকে আমার জ্ঞান বুদ্ধি ও ভক্তির সাধনায় আমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, সেই ধর্মদীক্ষার দ্বারা আমি হিন্দুসমাজের মধ্যে আমার সত্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হইব এতবড়ো অন্যায় আমরা কখনোই মানিতে পারিব না। ইহা অন্যায়, সুতরাং ইহা হিন্দুসমাজের অথবা কোনো সমাজেরই নহে।

প্রশ্ন এই, হিন্দুসমাজ যদি জড়ভাবে ভালোমন্দ সকলপ্রকার ধর্মকেই পিণ্ডাকার করিয়া রাখে এবং যদি কোনো নূতন উচ্চ আদর্শকে প্রবেশে বাধা দেয় তবে এই সমাজকে তোমার সমাজ বলিয়া স্বীকার করিবার দরকার কী? ইহার একটা উত্তর পূর্বেই দিয়াছি—তাহা এই যে, ঐতিহাসিক দিক দিয়া আমি যে হিন্দু এ সম্বন্ধে আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনো তর্কই নাই।

এ সম্বন্ধে আরও একটা বলিবার আছে। তোমার পিতা যেখানে অন্যায় করেন সেখানে তাহার প্রতিকার ও প্রায়শ্চিত্তের ভার তোমারই উপরে। তোমাকে পিতৃঋণ শোধ করিতেই হইবে—পিতাকে আমার পিতা নয় বলিয়া তোমার ভাইদের উপর সমস্ত বোঝা চাপাইয়া পর হইয়া দাঁড়াইয়া সমস্যাকে সোজা করিয়া তোলা সত্যাচরণ নহে। তুমি বলিবে, প্রতিকারের চেষ্টা বাহির হইতে পররূপেই করিব—পুত্ররূপে নয়। কেন? কেন বলিবে না, যে পাপ আমাদেরই সে পাপ আমরা প্রত্যেকে ক্ষালন করিব?

জিজ্ঞাসা করি, হিন্দুসমাজকে অস্বীকার করিয়া আমরা যে-কোনো সম্প্রদায়কেই তাহার স্থলে বরণ করি না কেন সে সম্প্রদায়ের সমষ্টিগত দায় কি সম্প্রদায়ের প্রত্যেককেই গ্রহণ করিতে হয় না? যদি কখনো দেখিতে পাই ব্রাহ্মসমাজে বিলাসিতার প্রচার ও ধনের পূজা অত্যন্ত বেশি চলিতেছে, যদি দেখি সেখানে ধর্মনিষ্ঠা হ্রাস হইয়া আসিতেছে তবে এ কথা কখনোই বলি না যে যাহারা ধনের উপাসক ও ধর্মে উদাসীন তাহারাই প্রকৃত ব্রাহ্ম, কারণ সংখ্যায় তাহারাই অধিক, অতএব আমাকে অন্য নাম লইয়া অন্য আর-একটা সমাজ স্থাপন করিতে হইবে। তখন এই কথাই আমরা বলি এবং ইহা বলাই সাজে যে, যাঁহারা সত্যধর্ম বাক্যে ও ব্যবহারে পালন করিয়া থাকেন তাঁহারাই যথার্থ আমাদের সমাজের লোক;—তাঁহাদের যদি কর্তৃত্ব না-ও থাকে ভোটসংখ্যা গণনায় তাঁহারা যদি নগণ্য হন তথাপি তাঁহাদেরই উপদেশে ও দৃষ্টান্তে এই সমাজের উদ্ধার হইবে।

পূর্বেই বলিয়াছি সত্য ওজনদরে বা গজের মাপে বিক্রয় হয় না—তাহা ছোটো হইলেও তাহা বড়ো। পর্বতপরিমাণ খড়বিচালি স্ফুলিঙ্গপরিমাণ আগুনের চেয়ে

দেখিতেই বড়ো কিন্তু আসলে বড়ো নহে। সমস্ত শেজের মধ্যে যেখানে সলিতার সূচ্যগ্র পরিমাণ মুখটিতে আলো জ্বলিতেছে সেইখানেই সমস্ত শেজটার সার্থকতা। তেলের নিম্নভাগে অনেকখানি জল আছে তাহার পরিমাণ যতই হউক সেইটেকে আসল জিনিস বলিবার কোনো হেতু নাই। সকল সমাজেই সমস্ত সমাজপ্রদীপের আলোটুকু যাঁহারা জ্বালাইয়া আছেন তাঁহারা সংখ্যাহিসাবে নহে সত্যহিসাবে সে সমাজে অগ্রগণ্য। তাঁহারা দগ্ধ হইতেছেন, আপনাকে তাঁহারা নিমেষে নিমেষে ত্যাগই করিতেছেন তবু তাঁহাদের শিখা সমাজে সকলের চেয়ে উচ্চে—সমাজে তাঁহারাই সজীব, তাঁহারাই দীপ্যমান।

অতএব, যদি এমন কথা সত্যই আমার মনে হয় যে, আমি যে ধর্মকে আশ্রয় করিয়াছি তাহাই সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তবে এই কথা আমাকে নিশ্চয় বলিতে হইবে এই ধর্মই আমার সমাজের ধর্ম। সমাজের মধ্যে যে-কোনো ব্যক্তি যে-কোনো বিষয়েই সত্যকে পায় তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই সেই সমাজ সিদ্ধিলাভ করে। ইস্কুলের নব্বই জনের মধ্যে নয়জন যদি পাস করে তবে সেই নয়জনের মধ্যেই ইস্কুল সার্থক। একদিন বঙ্গসাহিত্যে একমাত্র মাইকেল মধুসূদনের মধ্যে সমস্ত বাংলা কাব্যসাহিত্যের সাধনা সিদ্ধ হইয়াছিল। তখনকার অধিকাংশ বাঙালিপাঠকে উপহাস পরিহাস করুক আর যাহাই করুক তথাপি মেঘনাদবধকাব্য বাংলা সাহিত্যেরই শ্রেষ্ঠকাব্য। এইরূপ সকল বিষয়েই। রামমোহন রায় তাঁহার চারিদিকের বর্তমান অবস্থা হইতে যত উচ্চেই উঠিয়াছেন সমস্ত হিন্দুসমাজকে তিনি তত উচ্চেই তুলিয়াছেন। একথা কোনো মতেই বলিতে পারিব না যে তিনি হিন্দু নহেন, কেননা অন্যান্য অনেক হিন্দু তাঁহার চেয়ে অনেক নিচে ছিল, এবং নিচে থাকিয়া তাঁহাকে গালি পাড়িয়াছে। কেন বলিতে পারিব না? কেননা একথা সত্য নহে। কেননা তিনি যে নিশ্চিতই হিন্দু ছিলেন—অতএব তাঁহার মহত্ত্ব হইতে কখনোই হিন্দুসমাজ বঞ্চিত হইতে পারিবে না—হিন্দু-সমাজের বহুশত লক্ষ লোক যদি এক হইয়া স্বয়ং এজন্য বিধাতার কাছে দরখাস্ত করে তথাপি পারিবে না। শেক্‌স্‌পীয়র নিউটনের প্রতিভা অসাধারণ হইলেও তাহা যেমন সাধারণ ইংরেজের সামগ্রী তেমনি রামমোহনের মত যদি সত্য হয় তবে তাহা সাধারণ হিন্দু-সমাজেরই সত্য মত।

অতএব, যদি সমস্ত বিপুল হিন্দুসমাজের মধ্যে কেবল মাত্র আমার সম্প্রদায়ই সত্যধর্মকে পালন করিতেছে ইহাই সত্য হয় তবে এই সম্প্রদায়কেই আশ্রয় করিয়া সমস্ত হিন্দুসমাজ সত্যকে রক্ষা করিতেছে—তবে অপরিসীম অন্ধকারের মধ্যে একমাত্র এই পূর্বপ্রান্তে সমস্ত সমাজেরই অরুণোদয় হইয়াছে। আমি সেই রাত্রির অন্ধকার

হইতে অরুণোদয়কে ভিন্ন কোঠায় স্বতন্ত্র করিয়া রাখিব না। বস্তুত ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাব সমস্ত হিন্দুসমাজেরই ইতিহাসের একটি অঙ্গ। হিন্দুসমাজেরই নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে তাহারই বিশেষ একটি মর্মান্তিক প্রয়োজনবোধের ভিতর দিয়া তাহারই আন্তরিক শক্তির উদ্যমে এই সমাজ উদ্বোধিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ আকস্মিক অদ্ভুত একটা খাপছাড়া কাণ্ড নহে। যেখানে তাহার উদ্ভব সেখানকার সমগ্রের সহিত তাহার গভীরতম জীবনের যোগ আছে। বীজকে বিদীর্ণ করিয়া গাছ বাহির হয় বলিয়াই সে গাছ বীজের পক্ষে একটা বিরুদ্ধ উৎপাত নহে। হিন্দুসমাজের বহুস্তরবদ্ধ কঠিন আবরণ একদা ভেদ করিয়া সতেজে ব্রাহ্মসমাজ মাথা তুলিয়াছিল বলিয়া তাহা হিন্দু-সমাজের বিরুদ্ধ নহে, ভিতর হইতে যে অন্তর্যামী কাজ করিতেছেন তিনি জানেন তাহা হিন্দুসমাজেরই পরিণাম।

আমি জানি এ কথায় ব্রাহ্মসমাজের কেহ কেহ বিরক্ত হইয়া বলিবেন,—না, আমরা ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুসমাজের সামগ্রী বলিতে পারিব না, তাহা বিশ্বের সামগ্রী। বিশ্বের সামগ্রী নয় তো কী? কিন্তু বিশ্বের সামগ্রী তো কাল্পনিক আকাশ-কুসুমের মতো শূন্যে ফুটিয়া থাকে না—তাহা তো দেশ কালকে আশ্রয় করে, তাহার তো বিশেষ নামরূপ আছে। গোলাপ ফুল তো বিশ্বেরই ধন, তাহার সুগন্ধ তাহার সৌন্দর্য তো সমস্ত বিশ্বের আনন্দেরই অঙ্গ, কিন্তু তবু গোলাপফুল তো বিশেষভাবে গোলাপগাছেরই ইতিহাসের সামগ্রী, তাহা তো অশ্বত্থগাছের নহে। পৃথিবীতে সকল জাতিরই ইতিহাস আপনার বিশেষত্বের ভিতর দিয়া বিশ্বের ইতিহাসকেই প্রকাশ করিতেছে। নহিলে তাহা নিছক পাগলামি হইয়া উঠিত,—নহিলে একজাতির সিদ্ধি আর একজাতির কোনোপ্রকার ব্যবহারেই লাগিতে পারিত না। ইংরেজের ইতিহাসে লড়াই কাটাকাটি মারামারি কী হইয়াছে, তাহার কোন্ রাজা কত বৎসর রাজত্ব করিয়াছে এবং সে রাজাকে কে কবে সিংহাসনচ্যুত করিল এ সমস্ত তাহারই ইতিহাসের বিশেষ কাঠখড়—কিন্তু এই সমস্ত কাঠখড় দিয়া সে যদি এমন কিছুই গড়িয়া না থাকে যাহা মানবচিত্তের মধ্যে দেব-সিংহাসন গ্রহণ করিতে পারে তবে ইংরেজের ইতিহাস একেবারেই ব্যর্থ হইয়াছে। বস্তুত বিশ্বের চিত্তশক্তির কোনো একটা দিব্যরূপ ইংরেজের ইতিহাসের মধ্য দিয়া আপনাকেই অপূর্ব করিয়া ব্যক্ত করিতেছে।

হিন্দুর ইতিহাসেও সে চেষ্টার বিরাম নাই। বিশ্বসত্যের প্রকাশশক্তি হিন্দুর ইতিহাসেও ব্যর্থ হয় নাই; সমস্ত বাধা-বিরোধও এই শক্তিরই লীলা। সেই হিন্দু-ইতিহাসের অন্তরে যে বিশ্বচিত্ত আপন সৃজনকার্যে নিযুক্ত আছেন ব্রাহ্মসমাজ কি বর্তমানযুগে তাহারই সৃষ্টিবিকাশ নহে? ইহা কি রামমোহন রায় বা আর দুই একজন

মানুষ আপন খেয়ালমতো আপন ঘরে বসিয়া গড়িয়াছেন? ব্রাহ্মসমাজ এই যে ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে হিন্দুসমাজের মাঝখানে মাথা তুলিয়া বিশ্বের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিল ইহার কি একেবারে কোনো মানেই নাই—ইহা কি বিশ্ববিধাতার দ্যূতক্রীড়াঘরে পাশাখেলার দান পড়া? মানুষের ইতিহাসকে আমি তো এমন খামখেয়ালির সৃষ্টিরূপে সৃষ্টিছাড়া করিয়া দেখিতে পারি না। ব্রাহ্মসমাজকে তাই আমি হিন্দুসমাজের ইতিহাসেরই একটি স্বাভাবিক বিকাশ বলিয়া দেখি। এই বিকাশ হিন্দুসমাজের একটি বিশ্বজনীন বিকাশ। হিন্দুসমাজের এই বিকাশটিকে আমরা কয়জনে দল বাঁধিয়া ঘিরিয়া লইয়া ইহাকে আমাদের বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের বিশেষ একটা গৌরবের জিনিস বলিয়া চারিদিক হইতে তাহাকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র করিয়া তুলিব এবং মুখে বলিব এইরূপেই আমরা তাহার প্রতি পরম ঔদার্য আরোপ করিতেছি—একথা আমি কোনোমতেই স্বীকার করিতে পারিব না।

অন্যপক্ষে আমাকে বলিবেন ভাবের দিক্‌ হইতে এ সমস্ত কথা শুনিতে বেশ লাগে কিন্তু কাজের বেলা কী করা যায়? ব্রাহ্মসমাজ তো কেবলমাত্র একটা ভাবের ক্ষেত্র নহে—তাহাকে জীবনের প্রতিদিনের ব্যবহারে লাগাইতে হইবে, তখন হিন্দুসমাজের সহিত তাহার মিল করিব কেমন করিয়া?

ইহার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, হিন্দুসমাজ বলিতে যদি এমন একটা পাষাণখণ্ড কল্পনা কর যাহা আজ যে অবস্থায় আছে তাহাতেই সম্পূর্ণ পরিসমাপ্ত তবে তাহার সঙ্গে কোনো সজীব মানুষের কোনোপ্রকার কারবারই চলিতে পারে না—তবে সেই পাথর দিয়া কেবলমাত্র মৃত মানবচিত্তের গোর দেওয়াই চলিতে পারে। আমাদের বর্তমান সমাজ যে কারণে যত নিশ্চল হইয়াই পড়ুক না, তথাপি তাহা সেরূপ পাথরের স্তূপ নহে। আজ, যে বিষয়ে তাহার যাহা কিছু মত ও আচরণ নির্দিষ্ট হইয়া আছে তাহাই তাহার চরম সম্পূর্ণতা নহে—অর্থাৎ সে মরে নাই। অতএব বর্তমান হিন্দুসমাজের সমস্ত বাঁধা মত ও আচারের সঙ্গে নিজের সমস্ত মত ও আচারকে নিঃশেষে মিলাইতে পারিলে তবেই নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে পারির একথা সত্য নহে। আমাদেরই মত ও আচারের পরিণতি ও পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই সমাজের পরিণতি ও পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। আমাদের মধ্যে কোনো বদল হইলেই আমরা যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তখনই নিজেকে সমাজের বহির্ভূক্ত বলিয়া বর্ণনা করি তবে সমাজের বদল হইবে কী করিয়া?

একথা স্বীকার করি, সমাজ একটা বিরাট কলেবর। ব্যক্তিবিশেষের পরিণতির সমান তালে সে তখনই-তখনই অগ্রসর হইয়া চলে না। তাহার নড়িতে বিলম্ব হয়

এবং সেরূপ বিলম্ব হওয়াই কল্যাণকর। অতএব সেই সমাজের সঙ্গে যখন ব্যক্তি-বিশেষের অমিল শুরু হয় তখন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে তাহা সুখকর নহে। সেই কারণে তখন তাড়াতাড়ি সমাজকে অস্বীকার করার একটা ঝোঁক আসিতেও পারে। কিন্তু যেখানে মানুষ অনেকের সঙ্গে সত্যসম্বন্ধে যুক্ত সেখানে সেই অনেকের মুক্তিতেই তাহার মুক্তি। একলা হইয়া প্রথমটা একটু আরাম বোধ হয় কিন্তু তাহার পরেই দেখা যায় যে, যে-অনেককে ছাড়িয়া দূরে আসিয়াছি দূরে আসিয়াছি বলিয়াই তাহার টান ক্রমশ প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে। যে আমারই, তাহাকে, সঙ্গে থাকিয়া উদ্ধার করিলেই, যথার্থ নিজে উদ্ধার পাওয়া যায়—তাহাকে যদি স্বতন্ত্র নিচে ফেলিয়া রাখি তবে একদিন সেও আমাকে সেই নিচেই মিলাইয়া লইবে; কারণ, আমি যতই অস্বীকার করি না কেন তাহার সঙ্গে আমার নানাদিকে নানা মিলনের যোগসূত্র আছে—সেগুলি বহুকালের সত্য পদার্থ। অতএব সমস্ত বাধা সমস্ত অসুবিধা স্বীকার করিয়াই আমার সমস্ত পরিবেষ্টনের মধ্যে আমার সাধনাকে প্রবর্তিত ও সিদ্ধিকে স্থাপিত করিতেই হইবে। না করিলে কখনোই তাহার সর্বাঙ্গীণতা হইবে না—সে দিনেদিনে নিঃসন্দেহই কৃশ ও প্রাণ-হীন হইয়া পড়িবে, তাহার পরিপোষণের উপযোগী বিচিত্র রস সে কখনোই লাভ করিতে পারিবে না।

অতএব আমি যাহা উচিত মনে করিতেছি তাহাই করিব, কিন্তু একথা কখনোই বলিব না যে, সমাজের মধ্যে থাকিয়া কর্তব্যপালন চলিবে না। একথা জোর করিয়াই বলিব যাহা কর্তব্য তাহা সমস্ত সমাজেরই কর্তব্য। এই কথাই বলিব, হিন্দুসমাজের কর্তব্য আমিই পালন করিতেছি।

হিন্দুসমাজের কর্তব্য কী? যাহা ধর্ম তাহাই পালন করা। অর্থাৎ যাহাতে সকলের মঙ্গল তাহারই অনুষ্ঠান করা। কেমন করিয়া জানিব কিসে সকলের মঙ্গল? বিচার ও পরীক্ষা ছাড়া তাহা জানিবার অন্য কোনো উপায়ই নাই। বিচারবুদ্ধিটা মানুষের আছে এইজন্যই। সমাজের মঙ্গলসাধনে, মানুষের কর্তব্যনিরূপণে সেই বুদ্ধি একেবারেই খাটাইতে দিব না এমন পণ যদি করি তবে সমাজের সর্বনাশের পথ করা হয়। কেননা সর্বদা হিতসাধনের চিন্তা ও চেষ্টাকে জাগ্রত রাখিলেই তবে সেই বিচারবুদ্ধি নিজের শক্তিপ্রয়োগ করিয়া সবল হইয়া উঠিতে পারে এবং তবেই, কালে কালে সমাজে স্বভাবতই যে সমস্ত আবর্জনা জমে, যে সমস্ত অভ্যাস ক্রমশই জড়ধর্ম প্রাপ্ত হইয়া উন্নতির পথরোধ করিয়া দেয়, তাহাদিগকে কাটাইয়া তুলিবার শক্তি সমাজের মধ্যে সর্বদা প্রস্তুত হইয়া থাকে। অতএব ভ্রম ও বিপদের আশঙ্কা করিয়া সমাজকে চিরকাল চিন্তাহীন চেষ্টাহীন শিশু করিয়া রাখিলে কিছুতেই তাহার কল্যাণ হইতে পারে না।

একথা যখন নিশ্চিত তখন নিজের দৃষ্টান্ত ও শক্তিদ্বারাই সমাজের মধ্যে এই মঙ্গল-চেষ্টাকে সজীব রাখা নিতান্তই আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য। যাহা ভালো মনে করি তাহা করিবার জন্য কখনোই সমাজ ত্যাগ করিব না।

আমি দৃষ্টান্তস্বরূপে বলিতেছি, জাতিভেদ। যদি জাতিভেদকে অন্যায় মনে করি তবে তাহা নিশ্চয়ই সমস্ত হিন্দুসমাজের পক্ষে অন্যায়—অতএব তাহাই যথার্থ অহিন্দু। কোনো অন্যায় কোনো সমাজেরই পক্ষে নিত্য লক্ষণ হইতেই পারে না। যাহা অন্যায় তাহা ভ্রম, তাহা স্খলন, সুতরাং তাহাকে কোনো সমাজেরই চিরপরিণাম বলিয়া গণ্য করা একপ্রকার নাস্তিকতা। আগুনের ধর্মই যেমন দাহ, অন্যায় কোনো সমাজেরই সেরূপ ধর্ম হইতেই পারে না। অতএব হিন্দু থাকিতে গেলে আমাকে অন্যায় করিতে হইবে অধর্ম করিতে হইবে একথা আমি মুখে উচ্চারণ করিতে চাই না। সকল সমাজেই বিশেষ কালে কতকগুলি মনুষ্যত্বের বিশেষ বাধা প্রকাশ পায়। যে সকল ইংরেজ মহাত্মারা জাতিনির্বিচারে সকল মানুষের প্রতিই ন্যায়াচরণের পক্ষপাতী, যাঁহারা সকল জাতিরই নিজের বিশেষ শক্তিকে নিজ নিজ পন্থায় স্বাধীনতার মধ্যে পূর্ণ বিকশিত দেখিতে ইচ্ছা করেন—তাঁহারা অনেকে আক্ষেপ করিতেছেন বর্তমানে ইংরেজজাতির মধ্যে সেই উদার ন্যায়পরতার, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তার, সেই মানবপ্রেমের খর্বতা ঘটিয়াছে—কিন্তু তাই বলিয়াই এই দুর্গতিকে তাঁহারা নিত্য বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করিয়া লইতে পারেন না। তাই তাঁহারা ইহারই মাঝখানে থাকিয়া নিজের উদার আদর্শকে সমস্ত বিদ্রূপ ও বিরোধের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—তাঁহারা স্বজাতির বাহিরে নূতন একটা জাতির সৃষ্টি করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসেন নাই।

তেমনি, জাতিভেদকে যদি হিন্দুসমাজের অনিষ্টকর বলিয়া জানি তবে তাহাকেই আমি অহিন্দু বলিয়া জানিব এবং হিন্দুসমাজের মাঝখানে থাকিয়াই তাহার সঙ্গে লড়াই করিব। ছেলেমেয়ের অসবর্ণ বিবাহ দিতে আমি কুণ্ঠিত হইব না এবং তাহাকেই আমি নিজে হইতে অহিন্দুবিবাহ বলিব না—কারণ বস্তুত আমার মতানুসারে তাহাই হিন্দুবিবাহনীতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ। যদি এমন হয় যে, হিন্দুসমাজের পক্ষে জাতিভেদ ভালোই, কেবলমাত্র আমাদের কয়েকজনের পক্ষেই তাহার অসুবিধা বা অনিষ্ট আছে তবেই এই ক্ষেত্রে আমার পক্ষে স্বতন্ত্র হওয়া শোভা পায় নতুবা কদাচ নহে।

হিন্দুসমাজে কোনো কালেই অসবর্ণ বিবাহ ছিল না এ কথা সত্য নহে, কোনো কালেই অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত হইতে পারে না ইহাও সত্য নহে—হিন্দুসমাজের সমস্ত অতীত ভবিষ্যৎকে বাদ দিয়া যে সমাজ, সেই বর্তমান সমাজকেই একমাত্র সত্য বলিয়া তাহার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া তাহার সঙ্গে আত্মীয়তা অস্বীকার করিয়া দূরে চলিয়া যাওয়াকে আমি ধর্মসংগত বলিয়া কখনোই মনে করি না।

অপর পক্ষ বলিবেন আচ্ছা বেশ, বর্তমানের কথাই ধরা যাক, আমি যদি জাতিভেদ না মানিতেই চাই তবে এ সমাজে কাজকর্ম করিব কাহার সঙ্গে? উত্তর, এখনও যাহাদের সঙ্গে করিতেছ। অর্থাৎ যাহারা জাতিভেদ মানে না।

তবেই তো সেই সূত্রে একটা স্বতন্ত্র সমাজ গড়িয়া উঠিল। না, ইহা স্বতন্ত্র সমাজ নহে ইহা সম্প্রদায় মাত্র। পূর্বেই বলিয়াছি সমাজের স্থান সম্প্রদায় জুড়িতে পারে না। আমি হিন্দুসমাজে জন্মিয়াছি এবং ব্রাহ্ম সম্প্রদায়কে গ্রহণ করিয়াছি—ইচ্ছা করিলে আমি অন্য সম্প্রদায়ে যাইতে পারি কিন্তু অন্য সমাজে যাইব কী করিয়া? সে সমাজের ইতিহাস তো আমার নহে। গাছের ফল এক ঝাঁকা হইতে অন্য ঝাঁকায় যাইতে পারে কিন্তু এক শাখা হইতে অন্য শাখায় ফলিবে কী করিয়া?

তবে কি মুসলমান অথবা খ্রীস্টান সম্প্রদায়ে যোগ দিলেও তুমি হিন্দু থাকিতে পার? নিশ্চয়ই পারি। ইহার মধ্যে পারাপারির তর্কমাত্রই নাই। হিন্দুসমাজের লোকেরা কী বলে সে কথায় কান দিতে আমরা বাধ্য নই কিন্তু ইহা সত্য যে কালীচরণ বাঁড়ুজ্যে মশায় হিন্দু খ্রীস্টান ছিলেন, তাঁহার পূর্বে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর হিন্দু খ্রীস্টান ছিলেন, তাঁহারও পূর্বে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু খ্রীস্টান ছিলেন। অর্থাৎ তাঁহারা জাতিতে হিন্দু, ধর্মে খ্রীস্টান। খ্রীস্টান তাঁহাদের রং, হিন্দুই তাঁহাদের বস্তু। বাংলাদেশে হাজার হাজার মুসলমান আছে, হিন্দুরা অহর্নিশি তাহাদিগকে হিন্দু নও হিন্দু নও বলিয়াছে এবং তাহারাও নিজেদিগকে হিন্দু নই হিন্দু নই শুনাইয়া আসিয়াছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহারা প্রকৃতই হিন্দুমুসলমান। কোনো হিন্দু পরিবারে এক ভাই খ্রীস্টান এক ভাই মুসলমান ও এক ভাই বৈষ্ণব এক পিতামাতার স্নেহে একত্র বাস করিতেছে এই কথা কল্পনা করা কখনোই দুঃসাধ্য নহে বরঞ্চ ইহাই কল্পনা করা সহজ—কারণ ইহাই যথার্থ সত্য, সুতরাং মঙ্গল এবং সুন্দর। এখন যে অবস্থাটা আছে তাহা সত্য নহে তাহা সত্যের বাধা—তাহাকেই আমি সমাজের দুঃস্বপ্ন বলিয়া মনে করি এই কারণে তাহাই জটিল, তাহাই অদ্ভুত অসংগত, তাহাই মানবধর্মের বিরুদ্ধ।

হিন্দু শব্দে এবং মুসলমান শব্দে একই পর্যায়ের পরিচয়কে বুঝায় না। মুসলমান একটি বিশেষ ধর্ম কিন্তু হিন্দু কোনো বিশেষ ধর্ম নহে। হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি জাতিগত পরিণাম। ইহা মানুষের শরীর মন হৃদয়ের নানা বিচিত্র ব্যাপারকে বহু সুদূর শতাব্দী হইতে এক আকাশ, এক আলোক, এক ভৌগোলিক নদনদী অরণ্য-পর্বতের মধ্য দিয়া, অন্তর ও বাহিরের বহুবিধ ঘাতপ্রতিঘাতপরম্পরার একই ইতিহাসের ধারা দিয়া আজ আমাদের মধ্যে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে। কালীচরণ বাঁড়ুজ্যে, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রীস্টান হইয়াছিলেন বলিয়াই এই

সুগভীর ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন কী করিয়া? জাতি জিনিসটা মতের চেয়ে অনেক বড়ো এবং অনেক অন্তরতর; মত পরিবর্তন হইলে জাতির পরিবর্তন হয় না। ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তিসম্বন্ধে কোনো একটা পৌরাণিক মতকে যখন আমি বিশ্বাস করিতাম তখনও আমি যে জাতি ছিলাম, তৎসম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক মত যখন বিশ্বাস করি তখনও আমি সেই জাতি। যদিচ আজ ব্রহ্মাণ্ডকে আমি কোনো অণ্ডবিশেষ বলিয়া মনে করি না ইহা জানিতে পারিলে এবং সুযোগ পাইলে আমার প্রপিতামহ এই প্রকার অদ্ভুত নব্যতায় নিঃসন্দেহ আমার কান মলিয়া দিতেন।

কিন্তু চীনের মুসলমানও মুসলমান, পারস্যেরও তাই, আফ্রিকারও তদ্রূপ। যদিচ চীনের মুসলমানসম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না তথাপি এ কথা জোর করিয়াই বলিতে পারি যে, বাঙালি মুসলমানের সঙ্গে তাহাদের ধর্মমতের অনেকটা হয়তো মেলে কিন্তু অন্য অসংখ্য বিষয়েই মেলে না। এমন কি, ধর্মমতেরও মোটামুটি বিষয়ে মেলে কিন্তু সূক্ষ্ম বিষয়ে মেলে না। অথচ হাজার হাজার বিষয়ে তাহার স্বজাতি কন্‌ফ্যুসীয় অথবা বৌদ্ধের সঙ্গে তাহার মিল আছে। পারস্যে চীনের মতো কোনো প্রাচীনতর ধর্মমত নাই বলিলেই হয়। মুসলমান বিজেতার প্রভাবে সমস্ত দেশে এক মুসলমান ধর্মই স্থাপিত হইয়াছে তথাপি পারস্যে মুসলমান ধর্ম সেখানকার পুরাতন জাতিগত প্রকৃতির মধ্যে পড়িয়া নানা বৈচিত্র্য লাভ করিতেছে—আজ পর্যন্ত কেহ তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতেছে না।

ভারতবর্ষেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে না। এখানেও আমার জাতি-প্রকৃতি আমার মতবিশেষের চেয়ে অনেক ব্যাপক। হিন্দুসমাজের মধ্যেই তাহার হাজার দৃষ্টান্ত আছে। যে সকল আচার আমাদের শাস্ত্রে এবং প্রথায় অহিন্দু বলিয়া গণ্য ছিল আজ কত হিন্দু তাহা প্রকাশ্যেই লঙ্ঘন করিয়া চলিয়াছে; কত লোককে আমরা জানি যাঁহারা সভায় বক্তৃতা দিবার ও কাগজে প্রবন্ধ লিখিবার বেলায় আচারের স্খলন লেশমাত্র সহ্য করিতে পারেন না অথচ যাঁহাদের পানাহারের তালিকা দেখিলে মনু ও পরাশর নিশ্চয়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিবেন এবং রঘুনন্দন আনন্দিত হইবেন না। তাঁহাদের প্রবন্ধের মত অথবা তাঁহাদের ব্যাবহারিক মত, কোনো মতের ভিত্তিতেই তাঁহাদের হিন্দুত্ব প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহার ভিত্তি আরও গভীর। সেই জন্যই হিন্দুসমাজে আজ যাঁহারা আচার মানেন না, নিমন্ত্রণ রক্ষায় যাঁহারা ভাটপাড়ার বিধান রক্ষা করেন না, এবং গুরু বাড়ি আসিলে গুরুতর কাজের ভিড়ে যাঁহাদের অনবসর ঘটে, তাঁহারাও স্বচ্ছন্দে হিন্দু বলিয়া গণ্য হইতেছেন। তাহার একমাত্র কারণ এ নয় যে হিন্দুসমাজ দুর্বল—তাহার প্রধান কারণ এই যে, সমস্ত বাঁধাবাঁধির মধ্যেও হিন্দুসমাজ একপ্রকার অর্ধচেতন

ভাবে অনুভব করিতে পারে যে, বাহিরের এই সমস্ত পরিবর্তন হাজার হইলেও তবু বাহিরের—যথার্থ হিন্দুত্বের সীমা এইটুকুর মধ্যে কখনোই বদ্ধ নহে।

যে কথাটা সংকীর্ণ বর্তমানের উপস্থিত অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া বৃহৎভাবে সত্য, অনেক পাকা লোকেরা তাহার উপরে কোনো আস্থাই রাখেন না। তাঁহারা মনে করেন এ সমস্ত নিছক আইডিয়া। মনে করেন. করুন কিন্তু আমাদের সমাজে আজ এই আইডিয়ার প্রয়োজনই সকলের চেয়ে বড়ো প্রয়োজন। এখানে জড়ত্বের আয়োজন যথেষ্ট আছে যাহা পড়িয়া থাকে, বিচার করে না, যাহা অভ্যাসমাত্র, যাহা নড়িতে চায় না তাহা এখানে যথেষ্ট আছে,- এখানে কেবল সেই তত্ত্বেরই অভাব দেখিতেছি, যাহা সৃষ্টি করে, পরিবর্তন করে, অগ্রসর করে, যাহা বিচিত্রকে অন্তরের দিক হইতে মিলাইয়া এক করিয়া দেয়। হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে সেই আইডিয়াকেই জন্ম দিয়াছে, যাহা তাহাকে উদ্বোধিত করিবে; যাহা তাহাকে চিন্তা করাইবে, চেষ্টা করাইবে, সন্ধান করাইবে; যাহা তাহার নিজের ভিতরকার সমস্ত অনৈক্যকে সত্যের বন্ধনে এক করিয়া বাঁধিয়া তুলিবার সাধনা করিবে, যাহা জগতের সমস্ত প্রাণশক্তির সঙ্গে তাহার প্রাণ-ক্রিয়ার যোগসাধন করিয়া দিবে। এই যে আইডিয়া, এই যে সৃজনশক্তি, চিত্তশক্তি, সত্যগ্রহণের সাধনা, এই যে প্রাণচেষ্টার প্রবল বিকাশ, যাহা ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে আকার গ্রহণ করিয়া উঠিয়াছে তাহাকে আমরা হিন্দুসমাজের বলিয়া অস্বীকার করিব? যেন আমরাই তাহার মালেক, আমরাই তাহার জন্মদাতা। হিন্দুসমাজের এই নিজেরই ইতিহাসগত প্রাণগত সৃষ্টি হইতে আমরা হিন্দুসমাজকেই বঞ্চিত করিতে চাহিব? আমরা হঠাৎ এত বড়ো অন্যায় কথা বলিয়া বসিব যে, যাহা নিশ্চল, যাহা বাধা, যাহা প্রাণহীন তাহাই হিন্দুসমাজের, আর যাহা তাহার আইডিয়া, তাহার মানসরূপ, তাহার মুক্তির সাধনা, তাহাই হিন্দু-সমাজের নহে, তাহাই বিশ্বের সরকারি জিনিস। এমন করিয়া হিন্দুসমাজের সত্যকে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টাই কি ব্রাহ্মসমাজের চেষ্টা?

এতদূর পর্যন্ত আসিয়াও আমার শ্রোতা বা পাঠক যদি একজনও বাকি থাকেন, তবে তিনি নিশ্চয় আমাকে শেষ এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন যদি জাতিভেদ না মানিয়াও হিন্দুত্ব থাকে, যদি মুসলমান খ্রীস্টান হইয়াও হিন্দুত্ব না যায় তবে হিন্দুত্বটা কী? কী দেখিলে হিন্দুকে চিনিতে পারি?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যদি আমি বাধ্য হই তবে নিশ্চয়ই তিনিও বাধ্য। হিন্দুত্ব কী—ইহার যে-কোনো উত্তরই তিনি দিন না, বিশাল হিন্দুসমাজের মধ্যে কোথাও না কোথাও তাহার প্রতিবাদ আছে। শেষকালে তাঁহাকে এই কথাই বলিতে হইবে, যে সম্প্রদায় কিছুদিন ধরিয়া যে ধর্ম এবং যে আচারকেই হিন্দু বলিয়া মানিয়া আসিয়াছে

তাহাই তাহার পক্ষে হিন্দুত্ব এবং তাহার ব্যতিক্রম তাহার পক্ষেই হিন্দুত্বের ব্যতিক্রম। এই কারণে যাহাতে বাংলার হিন্দুত্ব দূষিত হয় তাহাতে পাঞ্জাবের হিন্দুত্ব দূষিত হয় না, যাহা দ্রাবিড়ের হিন্দুর পক্ষে অগৌরবের বিষয় নহে তাহা কান্যকুব্জের হিন্দুর পক্ষে লজ্জাজনক।

বাহিরের দিক হইতে হিন্দুকে বিচার করিতে গেলেই এত বড়ো একটা অদ্ভুত কথা বলিয়া বসিতে হয়। কিন্তু বাহিরের দিক হইতেই এইরূপ বিচার করাটাই অবিচার;— সেই অবিচারটা হিন্দুসমাজ স্বয়ং নিজের প্রতি নিজে প্রয়োগ করিয়া থাকে বলিয়াই যে সেটা তাহার যথার্থ প্রাপ্য একথা আমি স্বীকার করি না। আমি নিজেকে নিজে যাহা বলিয়া জানি তাহা যে প্রায়ই সত্য হয় না একথা কাহারও অগোচর নাই।

মানুষের গভীরতম ঐক্যটি যেখানে, সেখানে কোনো সংজ্ঞা পৌঁছিতে পারে না— কারণ সেই ঐক্যটি জড়বস্তু নহে তাহা জীবনধর্মী। সুতরাং তাহার মধ্যে যেমন একটা স্থিতি আছে তেমনি একটা গতিও আছে। কেবল মাত্র স্থিতির দিকে যখন সংজ্ঞাকে খাড়া করিতে যাই তখন তাহার গতির ইতিহাস তাহার প্রতিবাদ করে - কেবলমাত্র গতির উপরে সংজ্ঞাকে স্থাপন করাই যায় না, সেখানে সে পা রাখিবার জায়গাই পায় না।

এই জন্যই জীবনের দ্বারা আমরা জীবনকে জানিতে পারি কিন্তু সংজ্ঞার দ্বারা তাহাকে বাঁধিতে পারি না। ইংরেজের লক্ষণ কী, যদি সংজ্ঞা নির্দেশের দ্বারা বলিতে হয় তবে বলিতেই পারিব না—এক ইংরেজের সঙ্গে আর এক ইংরেজের বাধিবে— এক যুগের ইংরেজের সঙ্গে আর এক যুগের ইংরেজের মিল পাইব না। তখন কেবল-মাত্র এই একটা মোটা কথা বলিতে পারিব যে, এক বিশেষ ভূখণ্ড ও বিশেষ ইতিহাসের মধ্যে এই যে জাতি সুদীর্ঘকাল ধরিয়া মানুষ হইয়াছে এই জাতি আপন ব্যক্তিগত কালগত সমস্ত বৈচিত্র্য লইয়াও এক ইংরেজজাতি। ইহাদের মধ্যে যে খ্রীস্টান সেও ইংরেজ, যে কালীকে মানিতে চায় সেও ইংরেজ; যে পরজাতির উপরে নিজের আধিপত্যকে প্রবল করিয়া তোলাকেই দেশহিতৈষিতা বলে সেও ইংরেজ এবং যে এইরূপে অন্য জাতির প্রতি প্রভুত্বচেষ্টা দ্বারা স্বজাতির চরিত্রনাশ হয় বলিয়া উৎকণ্ঠিত হয় সেও ইংরেজ,—যে ইংরেজ নিজেদের মধ্যে কাহাকেও বিধর্মী বলিয়া পুড়াইয়া মারিয়াছে সেও ইংরেজ এবং যে লোক সেই বিধর্মকেই সত্যধর্ম বলিয়া পুড়িয়া মরিয়াছে সেও ইংরেজ। তুমি বলিবে ইহারা সকলেই আপনাকে ইংরেজ বলিয়া মনে করে সেই-খানেই ইহাদের যোগ; কিন্তু শুধু তাই নয়, মনে করিবার একটা ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে; ইহারা যে যোগসম্বন্ধে প্রত্যেকে সচেতন তাহারই একটি যোগের জাল আছে।

সেই জালটিতে সকল বৈচিত্র্য বাঁধা পড়িয়াছে। এই ঐক্যজালের সূত্রগুলি এত সূক্ষ্ম যে তাহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করাই যায় না অথচ তাহা স্থূলবন্ধনের চেয়ে দৃঢ়।

আমাদের মধ্যেও তেমনি একটি ঐক্যজাল আছে। জানিয়া এবং না জানিয়াও তাহা আমাদের সকলকে বাঁধিয়াছে। আমার জানা ও স্বীকার করার উপরেই তাহার সত্যতা নির্ভর করে না। কিন্তু তথাপি আমি যদি তাহাকে জানি ও স্বীকার করি তবে তাহাতে আমারও জোর বাড়ে তাহারও জোর বাড়ে। এই বৃহৎ ঐক্যজালের মহত্ত্ব নষ্ট করিয়া তাহাকে যদি মূঢ়তার ফাঁদ করিয়া তুলি তবে সত্যকে খর্ব করার যে শাস্তি তাহাই আমাকে ভোগ করিতে হইবে। যদি বলি, যে লোক দক্ষিণ শিয়রে মাথা করিয়া শোয় সেই হিন্দু, যে অমুকটা খায় না এবং অমুককে ছোঁয় না সেই হিন্দু, যে লোক আট বছরের মেয়েকে বিবাহ দেয় এবং সবর্ণে বিবাহ করে সেই হিন্দু তবে বড়ো সত্যকে ছোটো করিয়া আমরা দুর্বল হইব, ব্যর্থ হইব, নষ্ট হইব।

এই জন্যই, যে আমি হিন্দুসমাজে জন্মিয়াছি সেই আমার এ কথা নিশ্চয়রূপে জানা কর্তব্য, জ্ঞানে ভাবে কর্মে যাহা কিছু আমার শ্রেষ্ঠ তাহা একলা আমার নহে, তাহা একলা আমার সম্প্রদায়েরও নহে তাহা আমার সমস্ত সমাজের। আমার মধ্য দিয়া আমার সমস্ত সমাজ তপস্যা করিতেছে—সেই তপস্যার ফলকে আমি সেই সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারি না। মানুষকে বাদ দিয়া কোনো সমাজ নাই, এবং যাহারা মানুষের শ্রেষ্ঠ তাহারাই মানুষের প্রতিনিধি, তাহাদের দ্বারাই সমস্ত মানুষের বিচার হয়। আজ আমাদের সম্প্রদায়ই যদি জ্ঞানে ও আচরণে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া থাকে তবে আমাদের সম্প্রদায়ের দ্বারাই ইতিহাসে সমস্ত হিন্দুসমাজের বিচার হইবে এবং সে বিচার সত্য বিচারই হইবে। অতএব হিন্দুসমাজের দশজন যদি আমাকে হিন্দু না বলে এবং সেই সঙ্গে আমিও যদি আমাকে হিন্দু না বলি তবে সে বলামাত্রের দ্বারা তাহা কখনোই সত্য হইবে না। সুতরাং ইহাতে আমাদের কোনো পক্ষেরই কোনো ইষ্ট নাই। আমরা যে-ধর্মকে গ্রহণ করিয়াছি তাহা বিশ্বজনীন তথাপি তাহা হিন্দুরই ধর্ম। এই বিশ্বধর্মকে আমরা হিন্দুর চিত্ত দিয়াই চিন্তা করিয়াছি, হিন্দুর চিত্ত দিয়াই গ্রহণ করিয়াছি। শুধু ব্রহ্মের নামের মধ্যে নহে, ব্রহ্মের ধারণার মধ্যে নহে, আমাদের ব্রহ্মের উপাসনার মধ্যেও একটি গভীর বিশেষত্ব আছেই—এই বিশেষত্বের মধ্যে বহুশতবৎসরের হিন্দুর দর্শন, হিন্দুর ভক্তিতত্ত্ব, হিন্দুর যোগসাধনা, হিন্দুর অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, হিন্দুর ধ্যানদৃষ্টির বিশেষত্ব ওতপ্রোতভাবে মিলিত হইয়া আছে। আছে বলিয়াই তাহা বিশেষ ভাবে উপাদেয়, আছে বলিয়াই পৃথিবীতে তাহার বিশেষ মূল্য আছে। আছে বলিয়াই সত্যের এই রূপটিকে—এই রসটিকে মানুষ কেবল এখান হইতে পাইতে পারে। ব্রাহ্ম

সমাজের সাধনাকে আমরা অন্ধ অহংকারে নূতন বলিতেছি কিন্তু তাহার চেয়েও অনেক বেশি সত্য অহংকারে বলিব ইহা আমাদেরই ভিতরকার চিরন্তন—নবযুগে নববসন্তে সেই আমাদের চিরপুরাতনেরই নূতন বিকাশ হইয়াছে। য়ুরোপে খ্রীস্টান ধর্ম সেখানকার মানুষের কর্মশক্তি হইতে একটি বিশ্বসত্যের বিশেষ রূপ লাভ করিয়াছে। সেইজন্য খ্রীস্টানধর্ম নিউটেস্টামেন্টের শাস্ত্রলিখিত ধর্ম নহে ইহা য়ুরোপীয় জাতির সমস্ত ইতিহাসের মধ্য দিয়া পরিপুষ্ট জীবনের ধর্ম; একদিকে তাহা য়ুরোপের অন্তরতম চিরন্তন, অন্য দিকে তাহা সকলের। হিন্দুসমাজের মধ্যেও আজ যদি কোনো সত্যের জন্ম ও প্রচার হয় তবে তাহা কোনোক্রমেই হিন্দুসমাজের বাহিরের জিনিস হইতেই পারে না,—যদি তাহা আমাদের চিরদিনের জীবন হইতে জীবন না পাইয়া থাকে, যদি সেইখান হইতেই তাহার স্তন্যরস না জুটিয়া থাকে, আমাদের বৃহৎ সমাজের চিত্তবৃত্তি যদি ধাত্রীর মতো তাহার সেবা না করিয়া থাকে তবে কেবল আমাদের হিন্দুসমাজে নহে পৃথিবীর কোনো সমাজেই এই পথের ধারের কুড়াইয়া পাওয়া জিনিস শ্রদ্ধার যোগ্য হয় নাই—তবে ইহা কৃত্রিম, ইহা অস্বাভাবিক, তবে সত্যের চির অধিকারসম্বন্ধে এই দরিদ্রের কোনো নিজের বিশেষ দলিল দেখাইবার নাই, তবে ইহা কেবল ক্ষণকালের সম্প্রদায়ের, ইহা চিরকালের মানবসমাজের নহে।

আমি জানি কোনো কোনো ব্রাহ্ম এমন বলিয়া থাকেন, আমি হিন্দুর কাছে যাহা পাইয়াছি, খ্রীস্টানের কাছে তাহার চেয়ে কম পাই নাই—এমন কি, হয়তো তাঁহারা মনে করেন তাহার চেয়ে বেশি পাইয়াছেন। ইহার একমাত্র কারণ, বাহির হইতে যাহা পাই তাহাকেই আমরা পাওয়া বলিয়া জানিতে পারি—কেননা, তাহাকে চেষ্টা করিয়া পাইতে হয় এবং তাহার প্রত্যেক অংশকে অনুভব করিয়া করিয়া পাই। এই জন্য বেতনের চেয়ে মানুষ সামান্য উপরি পাওনায় বেশি খুশি হইয়া উঠে। আমরা হিন্দু বলিয়া যাহা পাইয়াছি তাহা আমাদের রক্তে মাংসে অস্থিমজ্জায়, তাহা আমাদের মানস-প্রকৃতির তন্তুতে তন্তুতে জড়িত হইয়া আছে বলিয়াই তাহাকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে পাই না তাহাকে লাভ বলিয়া মনেই করি না—এই জন্য ইংরেজি পাঠশালায় পড়া মুখস্থ করিয়া যাহা অগভীরভাবে অল্পপরিমাণে ও ক্ষণস্থায়ীরূপেও পাই তাহাকেও আমরা বেশি না মনে করিয়া থাকিতে পারি না। মাথার ভারকে আমরা ভারী বলিয়া জানি না, কিন্তু মাথার উপরকার পাগড়িটাকে একটা কিছু বলিয়া স্পষ্ট বোঝা যায়, তাই বলিয়া এ কথা বলা সাজে না যে, মাথা বলিয়া জিনিসটা নাই পাগড়িটা আছে; সে পাগড়ি বহুমূল্য রত্নমাণিক্যজড়িত হইলেও এমন কথা বলা সাজে না। সেই জন্য আমরা বিদেশ হইতে যাহা পাইয়াছি দিনরাত্রি তাহাকে লইয়া ধ্যান করিলে এবং প্রচার

করিলেও, তাহাকে আমরা সকলের উচ্চে চড়াইয়া রাখিয়া দিলেও, আমার অগোচরে আমার প্রকৃতির গভীরতার মধ্যে নিঃশব্দে আমার চিরন্তন সামগ্রীগুলি আপন নিত্যস্থান অধিকার করিয়া থাকে। উর্দু ভাষায় যতই পারসি এবং আরবি শব্দ থাক্ না তবু ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ জানেন তাহা ভারতবর্ষীয় গৌড়ীয় ভাষারই এক শ্রেণী;—ভাষার প্রকৃতিগত যে কাঠামোটাই তাহার নিত্যসামগ্রী, যে কাঠামোকে অবলম্বন করিয়া সৃষ্টির কাজ চলে সেটা বিদেশী সামগ্রীতে আদ্যোপান্ত সমাচ্ছন্ন হইয়া তবুও গৌড়ীয়। আমাদের দেশের ঘোরতর বিদেশীভাবাপন্নও যদি উপযুক্ত তত্ত্ববিদের হাতে পড়েন তবে তাঁহার চিরকালের স্বজাতীয় কাঠামোটা নিশ্চয়ই তাঁহার প্রচুর আবরণ আচ্ছাদনের ভিতর হইতে ধরা পড়িয়া যায়।

যে আপনাকে পর করে সে পরকে আপনার করে না, যে আপন ঘরকে অস্বীকার করে কখনোই বিশ্ব তাহার ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করিতে আসে না; নিজের পদরক্ষার স্থানটুকুকে পরিত্যাগ করার দ্বারাই যে চরাচরের বিরাট ক্ষেত্রকে অধিকার করা যায় এ কথা কখনোই শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না।

১৩১৯

হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়

আজকালকার দিনে পৃথিবী জুড়িয়া আনাগোনা মেলামেশা চলিতেছে। মানুষের নানা জাতি নানা উপলক্ষ্যে পরস্পরের পরিচয় লাভ করিতেছে। অতএব ভিন্ন ভিন্ন জাতির স্বাতন্ত্র্য ঘুচিয়া গিয়া পরস্পর মিলিয়া যাইবার সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে একথা মনে করা যাইতে পারিত।

কিন্তু আশ্চর্য এই, বাহিরের দিকে দরজা যতই খুলিতেছে, প্রাচীর যতই ভাঙিতেছে, মানুষের জাতিগুলির স্বাতন্ত্র্যবোধ ততই যেন আরও প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এক সময় মনে হইত মিলিবার উপায় ছিল না বলিয়াই মানুষেরা পৃথক হইয়া আছে কিন্তু এখন মিলিবার বাধা সকল যথাসম্ভব দূর হইয়াও দেখা যাইতেছে পার্থক্য দূর হইতেছে না।

য়ুরোপের যে সকল রাজ্যে খণ্ড খণ্ড জাতিরা একপ্রকার মিলিয়া ছিল এখন তাহারা প্রত্যেকেই আপন স্বতন্ত্র আসন গ্রহণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। নরোয়ে সুইডেনে ভাগ হইয়া গিয়াছে। আয়র্লণ্ড আপনার স্বতন্ত্র অধিকার লাভের জন্য বহু দিন হইতে অশ্রান্ত চেষ্টা করিতেছে। এমন কি, আপনার বিশেষ ভাষা, বিশেষ সাহিত্যকে

আইরিশরা জাগাইয়া তুলিবার প্রস্তাব করিতেছে। ওয়েল্‌স্‌বাসীদের মধ্যেও সে চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। বেল্‌জিয়মে এতদিন একমাত্র ফরাসি ভাষার প্রাধান্য প্রবল ছিল; আজ ফ্লেমিশরা নিজের ভাষার স্বাতন্ত্র্যকে জয়ী করিবার জন্য উৎসাহিত হইয়াছে; অস্ট্রিয়া রাজ্যে বহুবিধ ছোটো ছোটো জাতি একসঙ্গে বাস করিয়া আসিতেছে—তাহাদিগকে এক করিয়া মিলাইয়া ফেলিবার সম্ভাবনা আজ স্পষ্টই দুরপরাহত হইয়াছে। রুশিয়া আজ ফিনদিগকে আত্মসাৎ করিবার জন্য বিপুল বল প্রয়োগ করিতেছে বটে কিন্তু দেখিতেছে গেলা যত সহজ পরিপাক করা তত সহজ নহে। তুরস্ক সাম্রাজ্যে যে নানা জাতি বাস করিতেছে বহু রক্তপাতেও তাহাদের ভেদচিহ্ন বিলুপ্ত হইতে চাহিতেছে না।

ইংলণ্ডে হঠাৎ একটা ইম্পীরিয়ালিজ্‌মের ঢেউ উঠিয়াছিল। সমুদ্রপারের সমুদয় উপনিবেশগুলিকে এক সাম্রাজ্যতন্ত্রে বাঁধিয়া ফেলিয়া একটা বিরাট কলেবর ধারণ করিবার প্রলোভন ইংলণ্ডের চিত্তে প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। এবারে উপনিবেশগুলির কর্তৃপক্ষেরা মিলিয়া ইংলণ্ডে যে এক মহাসমিতি বসিয়াছিল তাহাতে যতগুলি বন্ধনের প্রস্তাব হইয়াছে তাহার কোনোটাই টিঁকিতে পারে নাই। সাম্রাজ্যকে এককেন্দ্রগত করিবার খাতিরে যেখানেই উপনিবেশগুলির স্বাতন্ত্র্য হানি হইবার লেশমাত্র আশঙ্কা দেখা দিয়াছে সেইখানেই প্রবল আপত্তি উঠিয়াছে।

একান্ত মিলনেই যে সবলতা এবং বৃহৎ হইলেই যে মহৎ হওয়া যায় একথা এখনকার কথা নহে। আসল কথা, পার্থক্য যেখানে সত্য, সেখানে সুবিধার খাতিরে, বড়ো দল বাঁধিবার প্রলোভনে তাহাকে চোখ বুজিয়া লোপ করিবার চেষ্টা করিলে সত্য তাহাতে সম্মতি দিতে চায় না। চাপা-দেওয়া পার্থক্য ভয়ানক একটা উৎপাতক পদার্থ, তাহা কোনো-না-কোনো সময়ে ধাক্কা পাইলে হঠাৎ ফাটিয়া এবং ফাটাইয়া একটা বিপ্লব বাধাইয়া তোলে। যাহারা বস্তুতই পৃথক, তাহাদের পার্থক্যকে সম্মান করাই মিলন-রক্ষার সদুপায়।

আপনার পার্থক্য যখন মানুষ যথার্থভাবে উপলব্ধি করে তখনই সে বড়ো হইয়া উঠিতে চেষ্টা করে। আপনার পার্থক্যের প্রতি যাহার কোনো মমতা নাই সেই হাল ছাড়িয়া দিয়া দশের সঙ্গে মিশিয়া একাকার হইয়া যায়। নিদ্রিত মানুষের মধ্যে প্রভেদ থাকে না—জাগিয়া উঠিলেই প্রত্যেকের ভিন্নতা নানা প্রকারে আপনাকে ঘোষণা করে। বিকাশের অর্থ ই ঐক্যের মধ্যে পার্থক্যের বিকাশ। বীজের মধ্যে বৈচিত্র্য নাই। কুঁড়ির মধ্যের সমস্ত পাপড়ি ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলিয়া এক হইয়া থাকে—যখন তাহাদের ভেদ ঘটে তখনই ফুল বিকশিত হইয়া উঠে। প্রত্যেক পাপড়ি ভিন্ন ভিন্ন মুখে আপন পথে আপনাকে যখন পূর্ণ করিয়া তোলে তখনই ফুল সার্থক হয়। আজ

পরস্পরের সংঘাতে সমস্ত পৃথিবীতেই একটা জাগরণ সঞ্চারিত হইয়াছে বলিয়া বিকাশের অনিবার্য নিয়মে মনুষ্য-সমাজের স্বাভাবিক পার্থক্যগুলি আত্মরক্ষার জন্য চতুর্দিকে সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আপনাকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিয়া অন্যের সঙ্গে একেবারে মিলিয়া গিয়া যে বড়ো হওয়া তাহাকে কোনো জাগ্রৎসত্তা বড়ো হওয়া মনে করিতেই পারে না। যে ছোটো সেও যখনই আপনার সত্যকার স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে তখনই সেটিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণ করে—ইহাই প্রাণের ধর্ম। বস্তুত সে ছোটো হইয়াও বাঁচিতে চায়, বড়ো হইয়া মরিতে চায় না।

ফিনরা যদি কোনো ক্রমে রুশ হইয়া যাইতে পারে তবে অনেক উৎপাত হইতে তাহারা পরিত্রাণ পায়—তবে একটি বড়ো জাতির শামিল হইয়া গিয়া ছোটোত্বর সমস্ত দুঃখ একেবারে দূর হইয়া যায়। কোনো একটা নেশনের মধ্যে কোনো প্রকার দ্বিধা থাকিলেই তাহাতে বলক্ষয় করে এই আশঙ্কায় ফিনল্যাণ্ডকে রাশিয়ার সঙ্গে বলপূর্বক অভিন্ন করিয়া দেওয়াই রুশের অভিপ্রায়। কিন্তু ফিনল্যাণ্ডের ভিন্নতা যে একটা সত্য-পদার্থ; রাশিয়ার সুবিধার কাছে সে আপনাকে বলি দিতে চায় না। এই ভিন্নতাকে যথোচিত উপায়ে বশ করিতে চেষ্টা করা চলে, এক করিতে চেষ্টা করা হত্যা করার মতো অন্যায়। আয়র্লণ্ডকে লইয়াও ইংলণ্ডের সেই সংকট। সেখানে সুবিধার সঙ্গে সত্যের লড়াই চলিতেছে। আজ পৃথিবীর নানা স্থানেই যে এই সমস্যা দেখা যাইতেছে তাহার একমাত্র কারণ সমস্ত পৃথিবীতেই একটা প্রাণের বেগ সঞ্চারিত হইয়াছে।

আমাদের বাংলা দেশের সমাজের মধ্যে সম্প্রতি যে ছোটোখাটো একটি বিপ্লব দেখা দিয়াছে তাহারও মূল কথাটি সেই একই। ইতিপূর্বে এ দেশে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুই মোটা ভাগ ছিল। ব্রাহ্মণ ছিল উপরে, আর সকলেই ছিল তলায় পড়িয়া।

কিন্তু যখনই নানা কারণে আমাদের দেশের মধ্যে একটা উদ্বোধন উপস্থিত হইল তখনই অব্রাহ্মণ জাতিরা শূদ্র শ্রেণীর এক-সমতল হীনতার মধ্যে একাকার হইয়া থাকিতে রাজি হইল না। কায়স্থ আপনার যে একটি বিশেষত্ব অনুভব করিতেছে তাহাতে সে আপনাকে শূদ্রত্বের মধ্যে বিলুপ্ত করিয়া রাখিতে পারে না। তাহার হীনতা সত্য নহে। সুতরাং সামাজিক শ্রেণীবন্ধনের অতি প্রাচীন সুবিধাকে সে চিরকাল মানিবে কেমন করিয়া? ইহাতে দেশাচার যদি বিরুদ্ধ হয় তবে দেশাচারকে পরাভূত হইতেই হইবে। আমাদের দেশের সকল জাতির মধ্যেই এই বিপ্লব ব্যাপ্ত হইবে। কেননা, মূর্ছাবস্থা ঘুচিলেই মানুষ সত্যকে অনুভব করে; সত্যকে অনুভব করিবামাত্র সে কোনো কৃত্রিম সুবিধার দাসত্ববন্ধন স্বীকার করিতে পারে না, বরঞ্চ সে অসুবিধা ও অশান্তিকেও বরণ করিয়া লইতে রাজি হয়।

ইহার ফল কী? ইহার ফল এই যে, স্বাতন্ত্র্যের গৌরববোধ জন্মিলেই মানুষ দুঃখ স্বীকার করিয়াও আপনাকে বড়ো করিয়া তুলিতে চাহিবে। বড়ো হইয়া উঠিলে তখনই পরস্পরের মিলন সত্যকার সামগ্রী হইবে। দীনতার মিলন, অধীনতার মিলন, এবং দায়ে পড়িয়া মিলন গোঁজামিলন মাত্র।

মনে আছে আমারই কোনো ব্যাকরণঘটিত প্রবন্ধ লইয়া একবার সাহিত্যপরিষৎ সভায় এমন একটি আলোচনা উঠিয়াছিল যে, বাংলা ভাষাকে যতদূর সম্ভব সংস্কৃতের মতো করিয়া তোলা উচিত—কারণ, তাহা হইলে গুজরাটি মারাঠা সকলেরই পক্ষে বাংলা ভাষা সুগম হইবে।

অবশ্য একথা স্বীকার করিতেই হইবে বাংলা ভাষার যে একটি নিজত্ব আছে অন্য দেশবাসীর পক্ষে বাংলা ভাষা বুঝিবার সেইটেই প্রধান বাধা। অথচ বাংলা ভাষার যাহা কিছু শক্তি যাহা কিছু সৌন্দর্য সমস্তই তাহার সেই নিজত্ব লইয়া। আজ ভারতের পশ্চিমতমপ্রান্তবাসী গুজরাটি বাংলা পড়িয়া বাংলা সাহিত্য নিজের ভাষায় অনুবাদ করিতেছে। ইহার কারণ এ নয় যে বাংলা ভাষাটা সংস্কৃতের কৃত্রিম ছাঁচেঢালা সর্বপ্রকার বিশেষত্ব-বর্জিত সহজ ভাষা। সাঁওতাল যদি বাঙালি পাঠকের কাছে তাহার লেখা চলিত হইবে আশা করিয়া নিজের ভাষা হইতে সমস্ত সাঁওতালিত্ব বর্জন করে তবেই কি তাহার সাহিত্য আমাদের কাছে আদর পাইবে? কেবল ওই বাধাটুকু দূর করার পথ চাহিয়াই কি আমাদের মিলন প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছে?

অতএব, বাঙালি বাংলা ভাষার বিশেষত্ব অবলম্বন করিয়াই সাহিত্যের যদি উন্নতি করে তবেই হিন্দিভাষীদের সঙ্গে তাহার বড়ো রকমের মিল হইবে। সে যদি হিন্দুস্থানীদের সঙ্গে সস্তায় ভাব করিয়া লইবার জন্য হিন্দির ছাঁদে বাংলা লিখিতে থাকে তবে বাংলা সাহিত্য অধঃপাতে যাইবে এবং কোনো হিন্দুস্থানী তাহার দিকে দৃক্‌পাতও করিবে না। আমার বেশ মনে আছে অনেকদিন পূর্বে একজন বিশেষ বুদ্ধিমান শিক্ষিত ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছিলেন, "বাংলা সাহিত্য যতই উন্নতিলাভ করিতেছে ততই তাহা আমাদের জাতীয় মিলনের পক্ষে অন্তরায় হইয়া উঠিতেছে। কারণ এ সাহিত্য যদি শ্রেষ্ঠতা লাভ করে তবে ইহা মরিতে চাহিবে না—এবং ইহাকে অবলম্বন করিয়া শেষ পর্যন্ত বাংলা ভাষা মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিবে। এমন অবস্থায় ভারতবর্ষে ভাষার ঐক্যসাধনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বাধা দিবে বাংলা ভাষা। অতএব বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ভারতবর্ষের পক্ষে মঙ্গলকর নহে।" সকল প্রকার ভেদকে ঢেঁকিতে কুটিয়া একটা পিণ্ডাকার পদার্থ গড়িয়া তোলাই জাতীয় উন্নতির চরম পরিণাম, তখনকার দিনে ইহাই সকল লোকের মনে জাগিতেছিল। কিন্তু আসল কথা বিশেষত্ব বিসর্জন করিয়া

যে সুবিধা তাহা দু-দিনের ফাঁকি—বিশেষত্বকেই মহত্বে লইয়া গিয়া যে সুবিধা তাহাই সত্য।

আমাদের দেশে ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ঐক্যলাভের চেষ্টা যখনই প্রবল হইল, অর্থাৎ যখনই নিজের সত্তা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষভাবে চেতনার উদ্রেক হইল তখনই আমরা ইচ্ছা করিলাম বটে মুসলমানদিগকেও আমাদের সঙ্গে এক করিয়া লই, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারিলাম না। এক করিয়া লইতে পারিলে আমাদের সুবিধা হইতে পারিত বটে, কিন্তু সুবিধা হইলেই যে এক করা যায় তাহা নহে। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে একটি সত্য পার্থক্য আছে তাহা ফাঁকি দিয়া উড়াইয়া দিবার জো নাই। প্রয়োজনসাধনের আগ্রহবশত সেই পার্থক্যকে যদি আমরা না মানি তবে সেও আমাদের প্রয়োজনকে মানিবে না।

হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সকল দিক দিয়া একটা সত্যকার ঐক্য জন্মে নাই বলিয়াই রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদিগকে এক করিয়া তুলিবার চেষ্টায় সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সূত্রপাত হইল। এই সন্দেহকে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। আমরা মুসলমানকে যখন আহ্বান করিয়াছি তখন তাহাকে কাজ উদ্ধারের সহায় বলিয়া ডাকিয়াছি, আপন বলিয়া ডাকি নাই। যদি কখনো দেখি তাহাকে কাজের জন্য আর দরকার নাই তবে তাহাকে অনাবশ্যক বলিয়া পিছনে ঠেলিতে আমাদের বাধিবে না। তাহাকে যথার্থ আমাদের সঙ্গী বলিয়া অনুভব করি নাই, আনুষঙ্গিক বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। যেখানে দুইপক্ষের মধ্যে অসামঞ্জস্য আছে সেখানে যদি তাহারা শরিক হয়, তবে কেবল ততদিন পর্যন্ত তাহাদের বন্ধন থাকে যতদিন বাহিরের কোনো বাধা অতিক্রমের জন্য তাহাদের একত্র থাকা আবশ্যক হয়,—সে আবশ্যকটা অতীত হইলেই ভাগবাঁটোয়ারার বেলায় উভয় পক্ষেই ফাঁকি চলিতে থাকে।

মুসলমান এই সন্দেহটি মনে লইয়া আমাদের ডাকে সাড়া দেয় নাই। আমরা দুই পক্ষ একত্র থাকিলে মোটের উপর লাভের অঙ্ক বেশি হইবে বটে, কিন্তু লাভের অংশ তাহার পক্ষে বেশি হইবে কি না, মুসলমানের সেইটেই বিবেচ্য। অতএব মুসলমানের এ কথা বলা অসংগত নহে যে আমি যদি পৃথক থাকিয়াই বড়ো হইতে পারি তবেই তাহাতে আমার লাভ।

কিছুকাল পূর্বে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এই স্বাতন্ত্র্য-অনুভূতি তীব্র ছিল না। আমরা এমন এক রকম করিয়া মিলিয়া ছিলাম যে আমাদের মধ্যেকার ভিন্নতাটা চোখে পড়িত না। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য-অনুভূতির অভাবটা একটা অ-ভাবমাত্র, ইহা ভাবাত্মক নহে। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে সত্যকার অভেদ ছিল বলিয়াই যে, ভেদ সম্বন্ধে আমরা অচেতন

ছিলাম তাহা নহে—আমাদের মধ্যে প্রাণশক্তির অভাব ঘটিয়াছিল বলিয়াই একটা নিশ্চেতনতায় আমাদিগকে অভিভূত করিয়াছিল। একটা দিন আসিল যখন হিন্দু আপন হিন্দুত্ব লইয়া গৌরব করিতে উদ্যত হইল। তখন মুসলমান যদি হিন্দুর গৌরব মানিয়া লইয়া নিজেরা চুপচাপ পড়িয়া থাকিত তবে হিন্দু খুব খুশি হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু যে কারণে হিন্দুর হিন্দুত্ব উগ্র হইয়া উঠিল সেই কারণেই মুসলমানের মুসলমানি মাথা তুলিয়া উঠিল। এখন সে মুসলমানরূপেই প্রবল হইতে চায়, হিন্দুর সঙ্গে মিশিয়া গিয়া প্রবল হইতে চায় না।

এখন জগৎ জুড়িয়া সমস্যা এ নহে যে, কী করিয়া ভেদ ঘুচাইয়া এক হইব—কিন্তু কী করিয়া ভেদ রক্ষা করিয়াই মিলন হইবে। সে কাজটা কঠিন—কারণ, সেখানে কোনো প্রকার ফাঁকি চলে না, সেখানে পরস্পরকে পরস্পরের জায়গা ছাড়িয়া দিতে হয়। সেটা সহজ নহে, কিন্তু যেটা সহজ সেটা সাধ্য নহে ; পরিণামের দিকে চাহিলে দেখা যায় যেটা কঠিন সেটাই সহজ।

আজ আমাদের দেশে মুসলমান স্বতন্ত্র থাকিয়া নিজের উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিতেছে। তাহা আমাদের পক্ষে যতই অপ্রিয় এবং তাহাতে আপাতত আমাদের যতই অসুবিধা হউক, একদিন পরস্পরের যথার্থ মিলনসাধনের ইহাই প্রকৃত উপায়। ধনী না হইলে দান করা কষ্টকর ; মানুষ যখন আপনাকে বড়ো করে তখনই আপনাকে ত্যাগ করিতে পারে। যত দিন তাহার অভাব ও ক্ষুদ্রতা ততদিনই তাহার ঈর্ষা ও বিরোধ। ততদিন যদি সে আর কাহারও সঙ্গে মেলে তবে দায়ে পড়িয়া মেলে—সে মিলন কৃত্রিম মিলন। ছোটো বলিয়া আত্মলোপ করাটা অকল্যাণ, বড়ো হইয়া আত্ম-বিসর্জন করাটাই শ্রেয়।

আধুনিক কালের শিক্ষার প্রতি সময় থাকিতে মনোযোগ না করায় ভারতবর্ষের মুসলমান হিন্দুর চেয়ে অনেক বিষয়ে পিছাইয়া পড়িয়াছে। সেখানে তাহাকে সমান হইয়া লইতে হইবে। এই বৈষম্যটি দূর করিবার জন্য মুসলমান সকল বিষয়েই হিন্দুর চেয়ে বেশি দাবি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের এই দাবিতে আমাদের আন্তরিক সম্মতি থাকাই উচিত। পদ-মান-শিক্ষায় তাহারা হিন্দুর সমান হইয়া উঠে ইহা হিন্দুরই পক্ষে মঙ্গলকর।

বস্তুত বাহির হইতে যেটুকু পাওয়া যাইতে পারে, যাহা অন্যের নিকট প্রার্থনা করিয়া পাওয়া যায় তাহার একটা সীমা আছেই। সে সীমা হিন্দু ও মুসলমানের কাছে প্রায় সমান। সেই সীমায় যতদিন পর্যন্ত না পৌঁছানো যায় ততদিন মনে একটা আশা থাকে বুঝি সীমা নাই, বুঝি এই পথেই পরমার্থ লাভ করা যায়। তখনই সেই পথের পাথের

কার একটু বেশি জুটিয়াছে কার একটু কম, তাই লইয়া পরস্পর ঘোরতর ঈর্ষা বিরোধ ঘটিতে থাকে।

কিন্তু খানিকটা দূরে গিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, নিজের গুণে ও শক্তিতেই আমরা নিজের স্থায়ী মঙ্গল সাধন করিতে পারি। যোগ্যতা লাভ ছাড়া অধিকার লাভের অন্য কোনো পথ নাই। এই কথাটা বুঝিবার সময় যত অবিলম্বে ঘটে ততই শ্রেয়। অতএব অন্যের আনুকূল্যলাভের যদি কোনো স্বতন্ত্র সিধা রাস্তা মুসলমান আবিষ্কার করিয়া থাকে তবে সে পথে তাহাদের গতি অব্যাহত হউক। সেখানে তাহাদের প্রাপ্যের ভাগ আমাদের চেয়ে পরিমাণে বেশি হইতেছে বলিয়া অহরহ কলহ করিবার ক্ষুদ্রতা যেন আমাদের না থাকে। পদ-মানের রাস্তা মুসলমানের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে সুগম হওয়াই উচিত—সে রাস্তায় শেষ গম্যস্থানে পৌঁছিতে তাহাদের কোনো বিলম্ব না হয় ইহাই যেন আমরা প্রসন্নমনে কামনা করি।

কিন্তু এই যে বাহ্য অবস্থার বৈষম্য ইহার পরে আমি বেশি ঝোঁক দিতে চাই না—ইহা ঘুচিয়া যাওয়া কিছুই শক্ত নহে। যে কথা লইয়া এই প্রবন্ধে আলোচনা করিতেছি তাহা সত্যকার স্বাতন্ত্র্য। সে স্বাতন্ত্র্যকে বিলুপ্ত করা আত্মহত্যা করারই সমান।

আমার নিশ্চয় বিশ্বাস, নিজেদের স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি উদ্‌যোগ লইয়া মুসলমানেরা যে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব যদি কিছু থাকে তবে সেটা স্থায়ী ও সত্য পদার্থ নহে। ইহার মধ্যে সত্য পদার্থ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি। মুসলমান নিজের প্রকৃতিতেই মহৎ হইয়া উঠিবে এই ইচ্ছাই মুসলমানের সত্য ইচ্ছা।

এইরূপ বিচিত্র স্বাতন্ত্র্যকে প্রবল হইয়া উঠিতে দেখিলে আমাদের মনে প্রথমে একটা ভয় হয়। মনে হয় স্বাতন্ত্র্যের যে যে অংশে আজ বিরুদ্ধতা দেখিতেছি সেইগুলাই প্রশ্রয় পাইয়া অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবে, এবং তাহা হইলে মানুষের মধ্যে পরস্পরের প্রতিকূলতা ভয়ংকর উগ্র হইয়া উঠিবে।

একদা সেই আশঙ্কার কাল ছিল। তখন এক এক জাতি আপনার মধ্যেই আবদ্ধ থাকিয়া আপনার বিশেষত্বকে অপরিমিতরূপে বাড়াইয়া চলিত। সমস্ত মানুষের পক্ষে সে একটা ব্যাধি ও অকল্যাণের রূপ ধারণ করিত।

এখন সেরূপ ঘটা সম্পূর্ণ সম্ভবপর নহে। এখন আমরা প্রত্যেক মানুষেই সকল মানুষের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন এত বড়ো কোণ কেহই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে না, যেখানে অসংগতরূপে অবাধে একঝোঁকা রকম বাড় বাড়িয়া একটা অদ্ভুত সৃষ্টি ঘটিতে পারে।

এখনকার কালের যে দীক্ষা তাহাতে প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য সকল জাতিরই যোগ আছে কেবল নিজের শাস্ত্র পড়িয়া পণ্ডিত হইবার আশা কেহ করিতে পারে না। অন্তত এই দিকেই মানুষের চেষ্টার গতি দেখা যাইতেছে; বিদ্যা এখন জ্ঞানের একটি বিশ্বযজ্ঞ হইয়া উঠিতেছে—সে সমস্ত মানুষের চিত্ত-সম্মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছে।

মানুষের এই বৃহৎ চেষ্টাই আজ মুসলমানের দ্বারে এবং হিন্দুর দ্বারে আঘাত করিতেছে। আমরা এতদিন পুরাপুরি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা পাইতেছিলাম। এ শিক্ষা যখন এদেশে প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল তখন সকল প্রকার প্রাচ্যবিদ্যার প্রতি তাহার অবজ্ঞা ছিল। আজ পর্যন্ত সেই অবজ্ঞার মধ্যে আমরাও বাড়িয়া উঠিয়াছি। তাহাতে মাতা সরস্বতীর ঘরে গৃহবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে! তাঁহার পূর্বমহলের সন্তানেরা পশ্চিম মহলের দিকে জানালা বন্ধ করিয়াছে এবং পশ্চিম মহলের সন্তানেরা পুবে হাওয়াকে জঙ্গলের অস্বাস্থ্যকর হাওয়া জ্ঞান করিয়া তাহার একটু আভাবেই কান পর্যন্ত মুড়ি দিয়া বসিয়াছেন।

ইতিমধ্যে ক্রমশই সময়ের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সর্বত্রই প্রাচ্য বিদ্যার অনাদর দূর হইতেছে। মানবের জ্ঞানের বিকাশে তাহারও প্রয়োজন সামান্য নহে সে পরিচয় প্রতিদিন পাওয়া যাইতেছে।

অথচ, আমাদের বিদ্যাশিক্ষার বরাদ্দ সেই পূর্বের মতোই রহিয়া গিয়াছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল আমাদেরই বিদ্যার উপযুক্ত স্থান নাই। হিন্দুমুসলমানশাস্ত্র অধ্যয়নে একজন জর্মান ছাত্রের যে সুবিধা আছে আমাদের সে সুবিধা নাই। এরূপ অসম্পূর্ণ শিক্ষালাভে আমাদের ক্ষতি করিতেছে সে বোধ যে আমাদের মনে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা এখনকারই কালের ধর্মবশত; আমরা যদি কেবল পশ্চিমের পড়া পাখি হইয়া শেখা বুলি আওড়াই তবে তাহাতে রাস্তার লোকের ক্ষণকালীন বিস্ময় ও কৌতুক উৎপাদন করিবে মাত্র, পৃথিবীর তাহাতে কোনো লাভ নাই। আমরা নিজের বাণীকে লাভ করিব, সমস্ত মানব আমাদের কাছে এই প্রত্যাশা করিতেছে।

সেই প্রত্যাশা যদি পূর্ণ করিতে না পারি তবে মানুষের কাছে আমাদের কোনো সম্মান নাই। এই সম্মানলাভের জন্য প্রস্তুত হইবার আহ্বান আসিতেছে। তাহারই আয়োজন করিবার উদ্‌যোগ আমাদিগকে করিতে হইবে।

অল্পদিন হইতে আমাদের দেশে বিদ্যাশিক্ষার উপায় ও প্রণালী পরিবর্তনের যে চেষ্টা চলিতেছে সেই চেষ্টার মূলে আমাদের এই আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে। চেষ্টা যে ভালো করিয়া সফলতা লাভ করিতে পারিতেছে না তাহারও মূল কারণ আমাদের এতকালের অসম্পূর্ণ শিক্ষা। আমরা যাহা ঠিক মতো পাই নাই তাহা দিতে চেষ্টা করিয়াও দিতে পারিতেছি না।

আমাদের স্বজাতির এমন কোনো একটি বিশিষ্টতা আছে যাহা মূল্যবান, একথা সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা করেন এমন লোকও আছেন, তাঁহাদের কথা আমি একেবারেই ছাড়িয়া দিতেছি।

এই বিশিষ্টতাকে স্বীকার করেন অথচ ব্যবহারের বেলায় তাহাকে ন্যূনাধিক অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন এমন লোকের সংখ্যা অল্প নহে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে হয়তো আহ্নিকতর্পণও করেন এবং শাস্ত্রালাপেও পটু কিন্তু জাতীয় আদর্শকে তাঁহারা অত্যন্ত আংশিকভাবে গ্রহণ করেন এবং মুখে যতটা করেন কাজে ততটা করেন না। ইঁহারা নিজেরা যে বিদ্যালয়ে পড়া মুখস্থ করিয়া আসিয়াছেন তাহাকে বেশিদূর ছাড়াইয়া যাইতে ভরসা করেন না।

আর একদল আছেন তাঁহারা স্বজাতির বিশিষ্টতা লইয়া গৌরব করেন কিন্তু এই বিশিষ্টতাকে তাঁহারা অত্যন্ত সংকীর্ণ করিয়া দেখিয়া থাকেন। যাহা প্রচলিত তাহাকেই তাঁহারা বড়ো আসন দেন, যাহা চিরন্তন তাহাকে নহে। আমাদের দুর্গতির দিনে যে বিকৃতিগুলি অসংগত হইয়া উঠিয়া সমস্ত মানুষের সঙ্গে আমাদের বিরোধ ঘটাইয়াছে, খণ্ড খণ্ড করিয়া আমাদিগকে দুর্বল করিয়াছে, এবং ইতিহাসে বারবার করিয়া কেবলই আমাদের মাথা হেঁট করিয়া দিতেছে, তাঁহারা তাহাদিগকেই আমাদের বিশেষত্ব বলিয়া তাহাদের প্রতি নানাপ্রকার কাল্পনিক গুণের আরোপ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইঁহারা কালের আবর্জনাকেই স্বজাতির প্রকৃত পরিচয় মনে করিয়া তাহাকেই চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টা করিবেন এবং দূষিত বাষ্পের আলেয়া-আলোককেই চন্দ্রসূর্যের চেয়ে সনাতন বলিয়া সম্মান করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

অতএব যাঁহারা স্বতন্ত্রভাবে হিন্দু বা মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকে ভয় করেন তাঁহাদের ভয়ের কোনো কারণ নাই এমন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও একথা জোর করিয়া বলিতে হইবে যে, যে শিক্ষার মধ্যে প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য সকল বিদ্যারই সমাবেশ হইতেছে সে শিক্ষা কখনোই চিরদিন কোনো একান্ত আতিশয্যের দিকে প্রশ্রয় লাভ করিতে পারিবে না। যাহারা স্বতন্ত্র তাহারা পরস্পর পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইলে তবেই তাহাদের বাড়াবাড়ি কাটিয়া যায় ও তাহাদের সত্যটি যথার্থভাবে প্রকাশ পায়। নিজের ঘরে বসিয়া ইচ্ছামতো যিনি যতবড়ো খুশি নিজের আসন প্রস্তুত করিতে পারেন, কিন্তু পাঁচজনের সভার মধ্যে আসিয়া পড়িলে স্বতই নিজের উপযুক্ত আসনটি স্থির হইয়া যায়। হিন্দু বা মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি বিশ্বকে স্থান দেওয়া হয় তবে সেই সঙ্গে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে স্থান দিলে কোনো বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে না। ইহাতেই বস্তুত স্বাতন্ত্র্যের যথার্থ মূল্য নির্ধারিত হইয়া যাইবে।

এ পর্যন্ত আমরা পাশ্চাত্য শাস্ত্রসকলকে যে প্রকার বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক ও যুক্তিমূলক প্রণালীর দ্বারা বিচার করিয়া আসিতেছি নিজেদের শাস্ত্রগুলিকে সেরূপ করিতেছি না। যেন জগতে আর সর্বত্রই অভিব্যক্তির নিয়ম কাজ করিয়া আসিয়াছে, কেবল ভারতবর্ষেই সে প্রবেশ করিতে পারে নাই- এখানে সমস্তই অনাদি এবং ইতিহাসের অতীত। এখানে কোনো দেবতা ব্যাকরণ, কোনো দেবতা রসায়ন, কোনো দেবতা আয়ুর্বেদ আস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন কোনো দেবতার মুখ-হস্ত-পদ হইতে একেবারেই চারি বর্ণ বাহির হইয়া আসিয়াছে সমস্তই ঋষি ও দেবতায় মিলিয়া এক মুহূর্তেই খাড়া করিয়া দিয়াছেন। ইহার উপরে আর কাহারও কোনো কথা চলিতেই পারে না। সেই জন্যই ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় অদ্ভুত অনৈসর্গিক ঘটনা বর্ণনায় আমাদের লেখনীর লজ্জা বোধ হয় না—শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও ইহার পরিচয় প্রতিদিনই পাওয়া যায়। আমাদের সামাজিক আচার ব্যবহারেও বুদ্ধিবিচারের কোনো অধিকার নাই কেন আমরা একটা কিছু করি বা করি না তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করাই অসংগত। কেননা কার্যকারণের নিয়ম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই খাটিবে না—সকল কারণ শাস্ত্রবচনের মধ্যে নিহিত। এই জন্য সমুদ্রযাত্রা ভালো কি মন্দ, শাস্ত্র খুলিয়া তাহার নির্ণয় হইবে, এবং কোন্ ব্যক্তি ঘরে ঢুকিলে হুঁকার জল ফেলিতে হইবে পণ্ডিতমহাশয় তাহার বিধান দিবেন। কেন যে একজনের ছোঁয়া দুধ বা খেজুর রস বা গুড় খাইলে অপরাধ নাই, জল খাইলেই অপরাধ—কেন যে যবনের প্রস্তুত মদ খাইলে জাত যায় না, অন্ন খাইলেই জাত যায় এসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে ধোবা নাপিত বন্ধ করিয়াই মুখ বন্ধ করিয়া দিতে হয়।

শিক্ষিত সমাজেও যে এমন অদ্ভুত অসংগত ব্যবহার চলিতেছে তাহার একটা কারণ আমার এই মনে হয়, পাশ্চাত্যশাস্ত্র আমরা বিদ্যালয়ে শিখিয়া থাকি এবং প্রাচ্য-শাস্ত্র আমরা ইস্কুলের কাপড় ছাড়িয়া অন্যত্র অন্য অবস্থার মধ্যে শিক্ষা করি। এই জন্য উভয়ের সম্বন্ধে আমাদের মনের ভাবের একটা ভেদ ঘটিয়া যায়—অনায়াসেই মনে করিতে পারি বুদ্ধির নিয়ম কেবল এক জায়গায় খাটে - অন্য জায়গায় বড়ো জোর কেবল ব্যাকরণের নিয়মই খাটিতে পারে। উভয়কেই এক বিদ্যামন্দিরে এক শিক্ষার অঙ্গ করিয়া দেখিলে আমাদের এই মোহ কাটিয়া যাইবার উপায় হইবে।

কিন্তু আধুনিক শিক্ষিত সমাজেই এই ভাবটা বাড়িয়া উঠিতেছে কেন, এ প্রশ্ন স্বতই মনে উদিত হয়। শিক্ষা পাইলে বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি লোকের অনাস্থা জন্মে বলিয়াই যে এমনটা ঘটে তাহা আমি মনে করি না। আমি পূর্বেই ইহার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আমাদের স্বাতন্ত্র্য-অভিমানটা প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এই অভিমানের প্রথম জোয়ারে বড়ো একটা বিচার থাকে না, কেবল জোরই থাকে। বিশেষত এতদিন আমরা আমাদের যাহা কিছু সমস্তকেই নির্বিচারে অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি—আজ তাহার প্রবল প্রতিক্রিয়ার অবস্থায় আমরা মাঝে মাঝে বৈজ্ঞানিক বিচারের ভান করি, কিন্তু তাহা নির্বিচারেরও বাড়া।

এই তীব্র অভিমানের আবিলতা কখনোই চিরদিন টিঁকিতে পারে না—এই প্রতিক্রিয়ার ঘাত প্রতিঘাত শান্ত হইয়া আসিবেই তখন ঘর হইতে এবং বাহির হইতে সত্যকে গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সহজ হইবে।

হিন্দুসমাজের পূর্ণ বিকাশের মূর্তি আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ ব্যাপার নহে। সুতরাং হিন্দু কী করিয়াছে ও কী করিতে পারে সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণা দুর্বল ও অস্পষ্ট। এখন আমরা যেটাকে চোখে দেখিতেছি সেইটেই আমাদের কাছে প্রবল। তাহা যে নানারূপে হিন্দুর যথার্থ প্রকৃতি ও শক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া তাহাকে বিনাশ করিতেছে একথা মনে করা আমাদের পক্ষে কঠিন। পাঁজিতে যে সংক্রান্তির ছবি দেখা যায় আমাদের কাছে হিন্দু সভ্যতার মূর্তিটা সেই রকম। সে কেবলই যেন স্নান করিতেছে, জপ করিতেছে, এবং ব্রত উপবাসে কৃশ হইয়া জগতে সমস্ত কিছুর সংস্পর্শ পরিহার করিয়া অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে এক পাশে দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু একদিন এই হিন্দু সভ্যতা সজীব ছিল, তখন সে সমুদ্র পার হইয়াছে, উপনিবেশ বাঁধিয়াছে, দিগ্‌বিজয় করিয়াছে, দিয়াছে এবং নিয়াছে; তখন তাহার শিল্প ছিল, বাণিজ্য ছিল, তাহার কর্মপ্রবাহ ব্যাপক ও বেগবান ছিল; তখন তাহার ইতিহাসে নব নব মতের অভ্যুত্থান, সমাজবিপ্লব ও ধর্মবিপ্লবের স্থান ছিল; তখন তাহার স্ত্রীসমাজেও বীরত্ব, বিদ্যা ও তপস্যা ছিল; তখন তাহার আচার ব্যবহার যে চিরকালের মতো লোহার ছাঁচে ঢালাই করা ছিল না মহাভারত পড়িলে পাতায় পাতায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই বৃহৎ বিচিত্র, জীবনের-বেগে-চঞ্চল, জাগ্রত চিত্তবৃত্তির তাড়নায় নব নব অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হিন্দু সমাজ—যে সমাজ ভুলের ভিতর দিয়া সত্যে চলিয়াছিল; পরীক্ষার ভিতর দিয়া সিদ্ধান্তে ও সাধনার ভিতর দিয়া সিদ্ধিতে উত্তীর্ণ হইতেছিল; যাহা শ্লোকসংহিতার জটিল রজ্জুতে বাঁধা কলের পুত্তলীর মতো একই নির্জীব নাট্য প্রতিদিন পুনরাবৃত্তি করিয়া চলিতেছিল না;—বৌদ্ধ যে সমাজের অঙ্গ, জৈন যে সমাজের অংশ; মুসলমান ও খ্রীস্টানেরা যে সমাজের অন্তর্গত হইতে পারিত; যে সমাজের এক মহাপুরুষ একদা অনার্যদিগকে মিত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর এক মহাপুরুষ কর্মের আদর্শকে বৈদিক যাগযজ্ঞের সংকীর্ণতা হইতে উদ্ধার করিয়া উদার মনুষ্যত্বের ক্ষেত্রে মুক্তিদান করিয়া

ছিলেন এবং ধর্মকে বাহ্য অনুষ্ঠানের বিধিনিষেধের মধ্যে আবদ্ধ না করিয়া তাহাকে ভক্তি ও জ্ঞানের প্রশস্ত পথে সর্বলোকের সুগম করিয়া দিয়াছিলেন ; সেই সমাজকে আজ আমরা হিন্দুসমাজ বলিয়া স্বীকার করিতেই চাই না ;—যাহা চলিতেছে না তাহাকে আমরা হিন্দুসমাজ বলি ;—প্রাণের ধর্মকে আমরা হিন্দুসমাজের ধর্ম বলিয়া মানিই না, কারণ, প্রাণের ধর্ম বিকাশের ধর্ম, পরিবর্তনের ধর্ম, তাহা নিয়ত গ্রহণ বর্জনের ধর্ম।

এই জন্যই মনে আশঙ্কা হয় যাঁহারা হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে উদ্‌যোগী, তাঁহারা কিরূপ হিন্দুত্বের ধারণা লইয়া এই কার্যে প্রবৃত্ত? কিন্তু সেই আশঙ্কামাত্রেই নিরস্ত হওয়াকে আমি শ্রেয়স্কর মনে করি না। কারণ, হিন্দুত্বের ধারণাকে তো আমরা নষ্ট করিতে চাই না, হিন্দুত্বের ধারণাকে আমরা বড়ো করিয়া তুলিতে চাই। তাহাকে চালনা করিতে দিলে আপনি সে বড়ো হইবার দিকে যাইবেই—তাহাকে গর্তের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিলেই তাহার ক্ষুদ্রতা ও বিকৃতি অনিবার্য। বিশ্ববিদ্যালয় সেই চালনার ক্ষেত্র—কারণ সেখানে বুদ্ধিরই ক্রিয়া, সেখানে চিত্তকে সচেতন করারই আয়োজন। সেই চেতনার স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকিলে আপনিই তাহা ধীরে ধীরে জড় সংস্কারের সংকীর্ণতাকে ক্ষয় করিয়া আপনাকে প্রশস্ত করিয়া তুলিবেই। মানুষের মনের উপর আমি পুরা বিশ্বাস রাখি ; ভুল লইয়াও যদি আরম্ভ করিতে হয় সেও ভালো, কিন্তু আরম্ভ করিতেই হইবে, নতুবা ভুল কাটিবে না। ছাড়া পাইলে সে চলিবেই। এই জন্য যে-সমাজে অচলতাকেই পরমার্থ বলিয়া জ্ঞান করে সে-সমাজ অচেতনতাকেই আপনার সহায় জানে এবং সর্বাগ্রে মানুষের মন জিনিসকেই অহিফেন খাওয়াইয়া বিহ্বল করিয়া রাখে। সে এমন সকল ব্যবস্থা করে যাহাতে মন কোথাও বাহির হইতে পায় না, বাধা-নিয়মে একেবারে বদ্ধ হইয়া থাকে, সন্দেহ করিতে ভয় করে, চিন্তা করিতেই ভুলিয়া যায়। কিন্তু কোনো বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য যেমনই হ'ক মনকে তো সে বাঁধিয়া ফেলিতে পারিবে না, কারণ, মনকে চলিতে দেওয়াই তাহার কাজ। অতএব যদি হিন্দু সত্যই মনে করে শাস্ত্রশ্লোকের দ্বারা চিরকালের মতো দৃঢ়বদ্ধ জড়নিশ্চলতাই হিন্দুর প্রকৃত বিশেষত্ব—তবে সেই বিশেষত্ব রক্ষা করিতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্বতোভাবে দূরে পরিহার করাই তাহার পক্ষে কর্তব্য হইবে। বিচারহীন আচারকে মানুষ করিবার ভার যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর দেওয়া হয় তবে ডাইনের হাতে পুত্র সমর্পণ করা হইবে।

কিন্তু যাঁহারা সত্যই বিশ্বাস করেন, হিন্দুত্বের মধ্যে কোনো গতিবিধি নাই—তাহা স্থাবর পদার্থ—বর্তমানকালের প্রবল আঘাতে পাছে সে লেশমাত্র বিচলিত হয়, পাছে তাহার স্থাবরধর্মের তিলমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় এই জন্য তাহাকে নিবিড় করিয়া বাঁধিয়া

রাখাই হিন্দুস্তানের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য--তাঁহারা মানুষের চিত্তকে প্রাচীর ঘেরিয়া বন্দিশালায় পরিণত করিবার প্রস্তাব না করিয়া বিশ্ববিদ্যার হাওয়া বহিবার জন্য তাহার চারিদিকে বড়ো বড়ো দরজা ফুটাইবার উদ্‌যোগ যে করিতেছেন ইহা ভ্রমক্রমে অবিবেচনাবশতই করিতেছেন, তাহা সত্য নহে। আসল কথা, মানুষ মুখে যাহা বলে তাহাই যে তাহার সত্য বিশ্বাস তাহা সকল সময়ে ঠিক নহে। তাহার অন্তরতম সহজবোধের মধ্যে অনেক সময় এই বাহ্যবিশ্বাসের একটা প্রতিবাদ বাস করে। বিশেষত যে সময়ে দেশে প্রাচীন সংস্কারের সঙ্গে নূতন উপলব্ধির দ্বন্দ্ব চলিতেছে সেই ঋতুপরিবর্তনের সন্ধিকালে আমরা মুখে যাহা বলি সেটাকেই আমাদের অন্তরের প্রকৃত পরিচয় বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। ফাল্গুন মাসে মাঝে মাঝে বসন্তের চেহারা বদল হইয়া গিয়া হঠাৎ উত্তরে হাওয়া বহিতে থাকে, তখন পৌষ মাস ফিরিয়া আসিল বলিয়া ভ্রম হয়, তবু একথা জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে উত্তরে হাওয়া ফাল্গুনের অন্তরের হাওয়া নহে। আমের যে বোল ধরিয়াছে, নব কিশলয়ে যে চিক্কণ তরুণতা দেখিতেছি, তাহাতেই ভিতরকার সত্য সংবাদটা প্রকাশ হইয়া পড়ে। আমাদেরও দেশের মধ্যে প্রাণের হাওয়াই বহিয়াছে—এই হাওয়া বহিয়াছে বলিয়াই আমাদের জড়তা ভাঙিয়াছে এবং গলা ছাড়িয়া বলিতেছি যাহা আছে তাহাকে রাখিয়া দিব। একথা ভুলিতেছি যাহা যেখানে যেমন আছে তাহাকে সেখানে তেমনি করিয়া ফেলিয়া রাখিতে যদি চাই তবে কোনো চেষ্টা না করাই তাহার পন্থা। খেতের মধ্যে আগাছাকে প্রবল করিয়া তুলিবার জন্য কেহ চাষ করিয়া মই চালাইবার কথা বলে না। চেষ্টা করিতে গেলেই সেই নাড়াচাড়াতেই ক্ষয়ের কার্য পরিবর্তনের কার্য দ্রুতবেগে অগ্রসর হইবেই। নিজের মধ্যে যে সঞ্জীবনীশক্তি অনুভব করিতেছি, মনে করিতেছি সেই সঞ্জীবনীশক্তি প্রয়োগ করিয়াই মৃতকে রক্ষা করিব। কিন্তু জীবনীশক্তির ধর্মই এই, তাহা মৃতকে প্রবলবেগে মারিতে থাকে এবং যেখানে জীবনের কোনো আভাস আছে সেইখানেই আপনাকে প্রয়োগ করে। কোনো জিনিসকে স্থির করিয়া রাখা তাহার কাজ নহে—যে জিনিস বাড়িতে পারে তাহাকে সে বাড়াইয়া তুলিবে, আর যাহার বাড় ফুরাইয়াছে তাহাকে সে ধ্বংস করিয়া অপসারিত করিয়া দিবে। কিছুতেই সে স্থির রাখিবে না। তাই বলিতেছিলাম আমাদের মধ্যে জীবনীশক্তির আবির্ভাব হইয়া আমাদিগকে নানা চেষ্টায় প্রবৃত্ত করিতেছে—এই কথাই এখনকার দিনের সকলের চেয়ে বড়ো সত্য—তাহা মৃত্যুকে চিরস্থায়ী করিবার পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছে ইহাই বড়ো কথা নহে—ইহা তাহার একটা ক্ষণিক লীলা মাত্র।

শ্রীযুক্ত গোখেলের প্রাথমিক শিক্ষার অবশ্যপ্রবর্তনের বিল সম্বন্ধে কোনো কোনো

শিক্ষিত লোক এমন কথা বলিতেছেন যে, আধুনিক শিক্ষায় আমাদের তো মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছে আবার দেশের জনসাধারণেরও কি বিপদ ঘটাইব? যাঁহারা এই কথা বলিতেছেন তাঁহারা নিজের ছেলেকে আধুনিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিতে ক্ষান্ত হইতেছেন না। এরূপ অদ্ভুত আত্মবিরোধ কেন দেখিতেছি? ইহা যে কপটাচার তাহা নহে। ইহা আর কিছু নয়,—অন্তরে নব বিশ্বাসের বসন্ত আসিয়াছে, মুখে পুরাতন সংস্কারের হাওয়া মরে নাই। সেই জন্য আমরা যাহা করিবার তাহা করিতে বসিয়াছি অথচ বলিতেছি আর এক কালের কথা। আধুনিক শিক্ষায় যে চঞ্চলতা আনিয়াছে সেই চঞ্চলতা সত্ত্বেও তাহার মঙ্গলকে আমরা মনের মধ্যে উপলব্ধি করিয়াছি। তাহাতে যে বিপদ আছে সেই বিপদকেও আমরা স্বীকার করিয়া লইয়াছি। নিরাপদ মৃত্যুকে আর আমরা বরণ করিতে রাজি নই: সেই জন্য জীবনের সমস্ত দায় সমস্ত পীড়াকেও মাথায় করিয়া লইবার জন্য আজ আমরা বীরের মতো প্রস্তুত হইতেছি। জানি উলটপালট হইবে, জানি বিস্তর ভুল করিব, জানি কোনো পুরাতন ব্যবস্থাকে নাড়া দিতে গেলেই প্রথমে দীর্ঘকাল বিশৃঙ্খলতার নানা দুঃখ ভোগ করিতে হইবে—চিরসঞ্চিত ধুলার হাত হইতে ঘরকে মুক্ত করিবার জন্য ঝাঁট দিতে গেলে প্রথমটা সেই ধুলাই খুব প্রচুর পরিমাণে ভোগ করিতে হইবে – এই সমস্ত অসুবিধা ও দুঃখ বিপদের আশঙ্কা নিশ্চয় জানি তথাপি আমাদের অন্তরের ভিতরকার নূতন প্রাণের আবেগ আমাদিগকে তো স্থির থাকিতে দিতেছে না। আমরা বাঁচিব, আমরা অচল হইয়া পড়িয়া থাকিব না,—এই ভিতরের কথাটাই আমাদের মুখের সমস্ত কথাকে বারংবার সবেগে ছাপাইয়া উঠিতেছে।

জাগরণের প্রথম মুহূর্তে আমরা আপনাকে অনুভব করি, পরক্ষণেই চারিদিকের সমস্তকে অনুভব করিতে থাকি। আমাদের জাতীয় উদ্বোধনের প্রথম আরম্ভেই আমরা যদি নিজেদের পার্থক্যকেই প্রবলভাবে উপলব্ধি করিতে পারি তবে ভয়ের কারণ নাই—সেই জাগরণই চারিদিকের বৃহৎ উপলব্ধিকেও উন্মেষিত করিয়া তুলিবে। আমরা নিজেকে পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্তকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিব।

আজ সমস্ত পৃথিবীতেই একদিকে যেমন দেখিতেছি প্রত্যেক জাতিই নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য প্রাণপণ করিতেছে, কোনো মতেই অন্য জাতির সঙ্গে বিলীন হইতে চাহিতেছে না, তেমনি দেখিতেছি প্রত্যেক জাতিই বৃহৎ মানবসমাজের সঙ্গে আপনার যোগ অনুভব করিতেছে। সেই অনুভূতির বলে সকল জাতিই আজ নিজেদের সেই সকল বিকট বিশেষত্ব বিসর্জন দিতেছে—যাহা অসংগত অদ্ভুতরূপে তাহার একান্ত নিজের—যাহা সমস্ত মানুষের বুদ্ধিকে রুচিকে ধর্মকে আঘাত করে—যাহা কারাগারের প্রাচীরের মতো, বিশ্বের দিকে যাহার বাহির হইবার বা প্রবেশ করিবার কোনো প্রকার পথই

নাই। আজ প্রত্যেক জাতিই তাহার নিজের সমস্ত সম্পদকে বিশ্বের বাজারে যাচাই করিবার জন্য আনিতেছে। তাহার নিজত্বকে কেবল তাহার নিজের কাছে চোখ বুজিয়া বড়ো করিয়া তুলিয়া তাহার কোনো তৃপ্তি নাই, তাহার নিজত্বকে কেবল নিজের ঘরে ঢাক পিটাইয়া ঘোষণা করিয়া তাহার কোনো গৌরব নাই—তাহার নিজত্বকে সমস্ত জগতের অলংকার করিয়া তুলিবে তাহার অন্তরের মধ্যে এই প্রেরণা আসিয়াছে। আজ যে দিন আসিয়াছে আজ আমরা কেহই গ্রাম্যতাকেই জাতীয়তা বলিয়া অহংকার করিতে পারিব না। আমাদের যে-সকল আচার ব্যবহার সংস্কার আমাদিগকে ক্ষুদ্র করিয়া পৃথক করিয়াছে, যে সকল থাকাতে কেবলই আমাদের সকলদিকে বাধাই বাড়িয়া উঠিয়াছে, ভ্রমণে বাধা, গ্রহণে বাধা, দানে বাধা, চিন্তায় বাধা, কর্মে বাধা—সেই সমস্ত কৃত্রিম বিঘ্ন ব্যাঘাতকে দূর করিতেই হইবে—নহিলে মানবের রাজধানীতে আমাদের লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না। একথা আমরা মুখে স্বীকার করি আর না করি, অন্তরের মধ্যে ইহা আমরা বুঝিয়াছি। আমাদের সেই জিনিসকেই আমরা নানা উপায়ে খুঁজিতেছি যাহা বিশ্বের আদরের ধন যাহা কেবলমাত্র ঘরগড়া আচার অনুষ্ঠান নহে। সেইটেকে লাভ করিলেই আমরা যথার্থভাবে রক্ষা পাইব—কারণ, তখন সমস্ত জগৎ নিজের গরজে আমাদিগকে রক্ষা করিবে। এই ইচ্ছা আমাদের অন্তরের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে বলিয়াই আমরা আর কোণে বসিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আজ আমরা যে-সকল প্রতিষ্ঠানের পত্তন করিতেছি তাহার মধ্যে একই কালে আমাদের স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং বিশ্ববোধ দুই প্রকাশ পাইতেছে। নতুবা আর পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের কল্পনাও আমাদের কাছে নিতান্ত অদ্ভুত বোধ হইত। এখনও একদল লোক আছেন যাঁহাদের কাছে ইহার অসংগতি পীড়াজনক বলিয়া ঠেকে। তাঁহারা এই মনে করিয়া গৌরব বোধ করেন যে হিন্দু এবং বিশ্বের মধ্যে বিরোধ আছে—তাই হিন্দু নানাপ্রকারে আটঘাট বাঁধিয়া অহোরাত্র বিশ্বের সংস্রব ঠেকাইয়া রাখিতেই চায়; অতএব হিন্দু টোল হইতে পারে, হিন্দু চতুষ্পাঠী হইতে পারে, কিন্তু হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই পারে না—তাহা সোনার পাথরবাটি। কিন্তু এই দল যে কেবল কমিয়া আসিতেছে তাহা নহে, ইঁহাদেরও নিজেদের ঘরের আচরণ দেখিলে বোঝা যায় ইঁহারা যে কথাকে বিশ্বাস করিতেছেন বলিয়া বিশ্বাস করেন, গভীরভাবে, এমন কি, নিজের অগোচরে তাহাকে বিশ্বাস করেন না।

যেমন করিয়াই হউক আমাদের দেশের মর্মাধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে আমরা চিরকাল মন্দিরের অন্ধকার কোণে বসাইয়া রাখিতে পারিব না। আজ রথযাত্রার দিন আসিয়াছে—বিশ্বের রাজপথে, মানুষের সুখদুঃখ ও আদান-প্রদানের পণ্যবীথিকায় তিনি বাহির

হইয়াছেন। আজ আমরা তাঁহার রথ নিজেদের সাধ্য অনুসারে যে যেমন করিয়াই তৈরি করি না—কেহ বা বেশি মূল্যের উপাদান দিয়া, কেহ বা অল্প মূল্যের—চলিতে চলিতে কাহারও বা রথ পথের মধ্যেই ভাঙিয়া পড়ে, কাহারও বা বৎসরের পর বৎসর টি'কিয়া থাকে—কিন্তু আসল কথাটা এই যে শুভলগ্নে রথের সময় আসিয়াছে। কোন্ রথ কোন্ পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিবে তাহা আগে থাকিতে হিসাব করিয়া বলিতে পারি না—কিন্তু আমাদের বড়োদিন আসিয়াছে—আমাদের সকলের চেয়ে যাহা মূল্যবান পদার্থ তাহা আজ আর কেবলমাত্র পুরোহিতের বিধি-নিষেধের আড়ালে ধূপ-দীপের ঘনঘোর বাষ্পের মধ্যে গোপন থাকিবে না আজ বিশ্বের আলোকে আমাদের যিনি বরেণ্য তিনি বিশ্বের বরেণ্যরূপে সকলের কাছে গোচর হইবেন। তাহারই একটি রথ নির্মাণের কথা আজ আলোচনা করিয়াছি; ইহার পরিণাম কী তাহা নিশ্চয় জানি না, কিন্তু ইহার মধ্যে সকলের চেয়ে আনন্দের কথা এই যে, এই রথ বিশ্বের পথে চলিয়াছে, প্রকাশের পথে বাহির হইয়াছে,—সেই আনন্দের আবেগেই আমরা সকলে মিলিয়া জয়ধ্বনি করিয়া ইহার দড়ি ধরিতে ছুটিয়াছি।

কিন্তু আমি বেশ দেখিতে পাইতেছি যাঁহারা কাজের লোক তাঁহারা এই সমস্ত ভাবের কথায় বিরক্ত হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় নাম ধরিয়া যে জিনিসটা তৈরি হইয়া উঠিতেছে কাজের দিক দিয়া তাহাকে বিচার করিয়া দেখো। হিন্দু নাম দিলেই হিন্দুত্বের গৌরব হয় না, এবং বিশ্ববিদ্যালয় নামেই চারিদিকে বিশ্ববিদ্যার ফোয়ারা খুলিয়া যায় না। বিদ্যার দৌড় এখনও আমাদের যতটা আছে তখনও তাহার চেয়ে যে বেশি দূর হইবে এ পর্যন্ত তাহার তো কোনো প্রমাণ দেখি না; তাহার পরে কমিটি ও নিয়মাবলীর শান-বাঁধানো মেজের কোন্ ছিদ্র দিয়া যে হিন্দুর হিন্দুত্ব শতদল বিকশিত হইয়া উঠিবে তাহাও অনুমান করা কঠিন।

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, কুম্ভকার মূর্তি গড়িবার আরম্ভে কাদা লইয়া যে তালটা পাকায় সেটাকে দেখিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলে চলিবে না। একেবারেই এক মুহূর্তেই আমাদের মনের মতো কিছুই হইবে না। এ কথা বিশেষরূপে মনে রাখা দরকার যে, মনের মতো কিছু যে হয় না, তাহার প্রধান দোষ মনেরই, উপকরণের নহে। যে অক্ষম সে মনে করে সুযোগ পায় না বলিয়াই সে অক্ষম। কিন্তু বাহিরের সুযোগ যখন জোটে তখন সে দেখিতে পায় পূর্ণ শক্তিতে ইচ্ছা করিতে পারে না বলিয়াই সে অক্ষম। যাহার ইচ্ছার জোর আছে সে অল্প একটু সূত্র পাইলেই নিজের ইচ্ছাকে সার্থক করিয়া তোলে। আমাদের হতভাগ্য দেশেই আমরা প্রতিদিন এই কথা শুনিতে পাই, এই জায়গাটাতে আমার মতের সঙ্গে মিলিল না অতএব আমি

ইহাকে ত্যাগ করিব—এইখানটাতে আমার মনের মতো হয় নাই অতএব আমি ইহার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখিব না। বিধাতার আদুরে ছেলে হইয়া আমরা একেবারেই ষোলো আনা সুবিধা এবং রেখায় রেখায় মনের মিল দাবি করিয়া থাকি—তাহার কিছু ব্যত্যয় হইলেই অভিমানের অন্ত থাকে না। ইচ্ছাশক্তি যাহার দুর্বল ও সংকল্প যাহার অপরিস্ফুট তাহারই দুর্দশা। যখন যেটুকু সুযোগ পাই তাহাকেই ইচ্ছার জোরে সম্পূর্ণ করিব, নিজের মন দিয়া মনের মতো করিয়া তুলিব—একদিনে না হয় বহুদিনে, একলা না হয় দল বাঁধিয়া, জীবনে না হয় জীবনের অন্তে—এই কথা বলিবার জোর নাই বলিয়াই আমরা সকল উদ্‌যোগের আরম্ভেই কেবল খুঁতখুঁত করিতে বসিয়া যাই, নিজের অন্তরের দুর্বলতার পাপকে বাহিরের ঘাড়ে চাপাইয়া দূরে দাঁড়াইয়া ভারি একটা শ্রেষ্ঠতার বড়াই করিয়া থাকি। যেটুকু পাইয়াছি তাহাই যথেষ্ট, বাকি সমস্তই আমার নিজের হাতে, ইহাই পুরুষের কথা। যদি ইহাই নিশ্চয় জানি যে আমার মতই সত্য মত—তবে সেই মত গোড়াতেই গ্রাহ্য হয় নাই বলিয়া তখনই গোসাঘরে গিয়া দ্বার রোধ করিয়া বসিব না—সেই মতকে জয়ী করিয়া তুলিবই বলিয়া কোমর বাঁধিয়া লাগিতে হইবে। এ কথা নিশ্চয় সত্য, কোনো বিশেষ প্রতিষ্ঠানের দ্বারাই আমরা পরমার্থ লাভ করিব না—কেননা কলে মানুষ তৈরি হয় না। আমাদের মধ্যে যদি মনুষ্যত্ব থাকে তবেই প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে আমাদের মনোরথ সিদ্ধি হইবে। হিন্দুর হিন্দুত্বকে যদি আমরা স্পষ্ট করিয়া না বুঝি তবে হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় হইলেই বুঝিব তাহা নহে—যদি তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝি তবে বাহিরে তাহার প্রতিকূলতা যত প্রবলই থাক সমস্ত ভেদ করিয়া আমাদের সেই উপলব্ধি আমাদের কাজের মধ্যে আকার ধারণ করিবেই। এই জন্যই হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় কী ভাবে আরম্ভ হইতেছে, কিরূপে দেহ ধারণ করিতেছে, সে সম্বন্ধে মনে কোনো প্রকার সংশয় রাখিতে চাহি না। সংশয় যদি থাকে তবে সে যেন নিজের সম্বন্ধেই থাকে; সাবধান যদি হইতে হয় তবে নিজের অন্তরের দিকেই হইতে হইবে। কিন্তু আমার মনে কোনো দ্বিধা নাই। কেননা আলাদিনের প্রদীপ পাইয়াছি বলিয়া আমি উল্লাস করিতেছি না, রাতারাতি একটা মস্ত ফল লাভ করিব বলিয়াও আশা করি না। আমি দেখিতেছি আমাদের চিত্ত জাগ্রত হইয়াছে। মানুষের সেই চিত্তকে আমি বিশ্বাস করি—সে ভুল করিলেও নির্ভুল যন্ত্রের চেয়ে আমি তাহাকে শ্রদ্ধা করি। আমাদের সেই জাগ্রৎ চিত্ত যে-কোনো কাজে প্রবৃত্ত হইতেছে সেই আমাদের যথার্থ কাজ—চিত্তের বিকাশ যতই পূর্ণ হইতে থাকিবে কাজের বিকাশও ততই সত্য হইয়া উঠিবে। সেই সমস্ত কাজই আমাদের জীবনের সঙ্গী—আমাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা বাড়িয়া চলিবে—তাহাদের সংশোধন হইবে, তাহাদের বিস্তার হইবে;

বাধার ভিতর দিয়াই তাহারা প্রবল হইবে, সংকোচের ভিতর দিয়াই তাহারা পরিস্ফুর্ত হইবে এবং ভ্রমের ভিতর দিয়াই সত্যের মধ্যে সার্থক হইয়া উঠিবে।

১৩১৮

ভগিনী নিবেদিতা

ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা হয় তখন তিনি অল্পদিনমাত্র ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। আমি ভাবিয়াছিলাম সাধারণত ইংরেজ মিশনরি মহিলারা যেমন হইয়া থাকেন ইনিও সেই শ্রেণীর লোক, কেবল ইঁহার ধর্মসম্প্রদায় স্বতন্ত্র।

সেই ধারণা আমার মনে ছিল বলিয়া আমার কন্যাকে শিক্ষা দিবার ভার লইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কী শিক্ষা দিতে চাও? আমি বলিলাম, ইংরেজি এবং সাধারণত ইংরেজি ভাষা অবলম্বন করিয়া যে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। তিনি বলিলেন, বাহির হইতে কোনো একটা শিক্ষা গিলাইয়া দিয়া লাভ কী? জাতিগত নৈপুণ্য ও ব্যক্তিগত বিশেষ ক্ষমতারূপে মানুষের ভিতরে যে জিনিসটা আছে তাহাকে জাগাইয়া তোলাই আমি যথার্থ শিক্ষা মনে করি। বাঁধা নিয়মের বিদেশী শিক্ষার দ্বারা সেটাকে চাপা দেওয়া আমার কাছে ভালো বোধ হয় না।

মোটের উপর তাঁহার সেই মতের সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য ছিল না। কিন্তু কেমন করিয়া মানুষের ঠিক স্বকীয় শক্তি ও কৌলিক প্রেরণাকে শিশুর চিত্তে একেবারে অঙ্কুরেই আবিষ্কার করা যায় এবং তাহাকে এমন করিয়া জাগ্রত করা যায় যাহাতে তাহার নিজের গভীর বিশেষত্ব সার্বভৌমিক শিক্ষার সঙ্গে ব্যাপকভাবে সুসংগত হইয়া উঠিতে পারে তাহার উপায় তো জানি না। কোনো অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন গুরু এ কাজ নিজের সহজবোধ হইতে করিতেও পারেন, কিন্তু ইহা তো সাধারণ শিক্ষকের কর্ম নহে। কাজেই আমরা প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়া মোটা রকমে কাজ চালাই। তাহাতে অন্ধকারে ঢেলা মারা হয়—তাহাতে অনেক ঢেলা অপব্যয় হয়, এবং অনেক ঢেলা ভুল জায়গায় লাগিয়া ছাত্র বেচারাকে আহত করে। মানুষের মতো চিত্তবিশিষ্ট পদার্থকে লইয়া এমনতরো পাইকারি ভাবে ব্যবহার করিতে গেলে প্রভূত লোকসান হইবেই সন্দেহ নাই, কিন্তু সমাজে সর্বত্র তাহা প্রতিদিনই হইতেছে।

যদিচ আমার মনে সংশয় ছিল, এরূপ শিক্ষা দিবার শক্তি তাঁহার আছে কি না, তবু আমি তাঁহাকে বলিলাম, আচ্ছা বেশ আপনার নিজের প্রণালীমতোই কাজ করিবেন, আমি কোনো প্রকার ফরমাশ করিতে চাই না। বোধ করি ক্ষণকালের জন্য তাঁহার মন অনুকূল হইয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই বলিলেন, না, আমার এ কাজ নহে। বাগবাজারের একটি বিশেষ গলির কাছে তিনি আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন—সেখানে তিনি পাড়ার মেয়েদের মাঝখানে থাকিয়া শিক্ষা দিবেন তাহা নহে, শিক্ষা জাগাইয়া তুলিবেন। মিশনরির মতো মাথা গণনা করিয়া দলবৃদ্ধি করিবার সুযোগকে, কোনো একটি পরিবারের মধ্যে নিজের প্রভাব বিস্তারের উপলক্ষ্যকে, তিনি অবজ্ঞা করিয়া পরিহার করিলেন।

তাহার পরে মাঝে মাঝে নানাদিক্‌ দিয়া তাঁহার পরিচয়-লাভের অবসর আমার ঘটিয়াছিল। তাঁহার প্রবল শক্তি আমি অনুভব করিয়াছিলাম কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বুঝিয়াছিলাম তাঁহার পথ আমার চলিবার পথ নহে। তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভা ছিল, সেই সঙ্গে তাঁহার আর একটি জিনিস ছিল, সেটি তাঁহার যোদ্ধৃত্ব। তাঁহার বল ছিল এবং সেই বল তিনি অন্যের জীবনের উপর একান্ত বেগে প্রয়োগ করিতেন—মনকে পরাভূত করিয়া অধিকার করিয়া লইবার একটা বিপুল উৎসাহ তাঁহার মধ্যে কাজ করিত। যেখানে তাঁহাকে মানিয়া চলা অসম্ভব সেখানে তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া চলা কঠিন ছিল। অন্তত আমি নিজের দিক দিয়া বলিতে পারি তাঁহার সঙ্গে আমার মিলনের নানা অবকাশ ঘটিলেও এক জায়গায় অন্তরের মধ্যে আমি গভীর বাধা অনুভব করিতাম। সে যে ঠিক মতের অনৈক্যের বাধা তাহা নহে, সে যেন একটা বলবান আক্রমণের বাধা।

আজ এই কথা আমি অসংকোচে প্রকাশ করিতেছি তাহার কারণ এই যে, একদিকে তিনি আমার চিত্তকে প্রতিহত করা সত্ত্বেও আর একদিকে তাঁহার কাছ হইতে যেমন উপকার পাইয়াছি এমন আর কাহারও কাছ হইতে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার সহিত পরিচয়ের পর হইতে এমন বারংবার ঘটিয়াছে, যখন তাঁহার চরিত স্মরণ করিয়া ও তাঁহার প্রতি গভীর ভক্তি অনুভব করিয়া আমি প্রচুর বল পাইয়াছি।

নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য শক্তি আর কোনো মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই। সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মধ্যে যেন কোনো প্রকার বাধাই ছিল না। তাঁহার শরীর, তাঁহার আশৈশব য়ুরোপীয় অভ্যাস, তাঁহার আত্মীয় স্বজনের স্নেহমমতা, তাঁহার স্বদেশীয় সমাজের উপেক্ষা এবং যাহাদের জন্য তিনি প্রাণ সমর্পণ

করিয়াছেন তাহাদের ঔদাসীন্য, দুর্বলতা ও ত্যাগস্বীকারের অভাব কিছুতেই তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে পারে নাই। মানুষের সত্যরূপ, চিৎস্বরূপ যে কী, তাহা যে তাঁহাকে জানিয়াছে সে দেখিয়াছে। মানুষের আন্তরিক সত্তা সর্বপ্রকার স্থূল আবরণকে একেবারে মিথ্যা করিয়া দিয়া কিরূপ অপ্রতিহত তেজে প্রকাশ পাইতে পারে তাহা দেখিতে পাওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা। ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে মানুষের সেই অপরাহত মাহাত্ম্যকে সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।

পৃথিবীতে সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস আমরা যাহা কিছু পাই তাহা বিনামূল্যেই পাইয়া থাকি, তাহার জন্য দরদস্তুর করিতে হয় না। মূল্য চুকাইতে হয় না বলিয়াই জিনিসটা যে কত বড়ো তাহা আমরা সম্পূর্ণ বুঝিতেই পারি না। ভগিনী নিবেদিতা আমাদিগকে যে জীবন দিয়া গিয়াছেন তাহা অতি মহৎজীবন;—তাঁহার দিক হইতে তিনি কিছুমাত্র ফাঁকি দেন নাই;—প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তেই আপনার যাহা সকলের শ্রেষ্ঠ, আপনার যাহা মহত্তম, তাহাই তিনি দান করিয়াছেন, সে জন্য মানুষ যত প্রকার কৃচ্ছ্রসাধন করিতে পারে সমস্তই তিনি স্বীকার করিয়াছেন। এই কেবল তাঁহার পণ ছিল যাহা একেবারে খাঁটি তাহাই তিনি দিবেন - নিজেকে তাহার সঙ্গে একটুও মিশাইবেন না—নিজের ক্ষুধাতৃষ্ণা, লাভলোকসান, খ্যাতিপ্রতিপত্তি কিছু না—ভয় না, সংকোচ না, আরাম না, বিশ্রাম না।

এই যে এতবড়ো আত্মবিসর্জন আমরা ঘরে বসিয়া পাইয়াছি ইহাকে আমরা যে অংশে লঘু করিয়া দেখিব সেই অংশেই বঞ্চিত হইব, পাইয়াও আমাদের পাওয়া ঘটিবে না। এই আত্মবিসর্জনকে অত্যন্ত অসংকোচে নিতান্তই আমাদের প্রাপ্য বলিয়া অচেতনভাবে গ্রহণ করিলে চলিবে না। ইহার পশ্চাতে কত বড়ো একটা শক্তি, ইহার সঙ্গে কী বুদ্ধি, কী হৃদয়, কী ত্যাগ, প্রতিভার কী জ্যোতির্ময় অন্তর্দৃষ্টি আছে তাহা আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে।

যদি তাহা উপলব্ধি করি তবে আমাদের গর্ব দূর হইয়া যাইবে। কিন্তু এখনও আমরা গর্ব করিতেছি। তিনি যে আপনার জীবনকে এমন করিয়া দান করিয়াছেন সেদিক দিয়া তাঁহার মাহাত্ম্যকে আমরা যে পরিমাণে মনের মধ্যে গ্রহণ করিতেছি না, সে পরিমাণে এই ত্যাগস্বীকারকে আমাদের গর্ব করিবার উপকরণ করিয়া লইয়াছি। আমরা বলিতেছি তিনি অন্তরে হিন্দু ছিলেন, অতএব আমরা হিন্দুরা বড়ো কম লোক নই। তাঁহার যে আত্মনিবেদন তাহাতে আমাদেরই ধর্ম ও সমাজের মহত্ত্ব। এমনি করিয়া আমরা নিজের দিকের দাবিকেই যত বড়ো করিয়া লইতেছি তাঁহার দিকের দানকে ততই খর্ব করিতেছি।

বস্তুত তিনি কী পরিমাণে হিন্দু ছিলেন তাহা আলোচনা করিয়া দেখিতে গেলে নানা জায়গায় বাধা পাইতে হইবে—অর্থাৎ—আমরা হিন্দুয়ানির যে ক্ষেত্রে আছি তিনিও ঠিক সেই ক্ষেত্রেই ছিলেন একথা আমি সত্য বলিয়া মনে করি না। তিনি হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজকে যে ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখিতেন—তাহার শাস্ত্রীয় অপৌরুষেয় অটল বেড়া ভেদ করিয়া যেরূপ সংস্কারমুক্ত চিত্তে তাহাকে নানা পরিবর্তন ও অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া চিন্তা ও কল্পনার দ্বারা অনুসরণ করিতেন, আমরা যদি সে পন্থা অবলম্বন করি তবে বর্তমানকালে যাহাকে সর্বসাধারণে হিন্দুয়ানি বলিয়া থাকে তাহার ভিত্তিই ভাঙিয়া যায়। ঐতিহাসিক যুক্তিকে যদি পৌরাণিক উক্তির চেয়ে বড়ো করিয়া তুলি তবে তাহাতে সত্য নির্ণয় হইতে পারে কিন্তু নির্বিচার বিশ্বাসের পক্ষে তাহা অনুকূল নহে।

যেমনই হউক, তিনি হিন্দু ছিলেন বলিয়া নহে, তিনি মহৎ ছিলেন বলিয়াই আমাদের প্রণম্য। তিনি আমাদেরই মতন ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ভক্তি করিব তাহা নহে, তিনি আমাদের চেয়ে বড়ো ছিলেন বলিয়াই তিনি আমাদের ভক্তির যোগ্য। সেই দিক দিয়া যদি তাঁহার চরিত আলোচনা করি তবে, হিন্দুত্বের নহে, মনুষ্যত্বের গৌরবে আমরা গৌরবান্বিত হইব।

তাঁহার জীবনে সকলের চেয়ে যেটা চক্ষে পড়ে সেটা এই যে, তিনি যেমন গভীরভাবে ভাবুক তেমনি প্রবলভাবে কর্মী ছিলেন। কর্মের মধ্যে একটা অসম্পূর্ণতা আছেই—কেননা তাহাকে বাধার মধ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতে হয়—সেই বাধার নানা ক্ষতচিহ্ন তাহার সৃষ্টির মধ্যে থাকিয়া যায়। কিন্তু ভাব জিনিসটা অক্ষুণ্ণ অক্ষত। এই জন্য যাহারা ভাববিলাসী তাহারা কর্মকে অবজ্ঞা করে অথবা ভয় করিয়া থাকে। তেমনি আবার বিশুদ্ধ কেজো লোক আছে তাহারা ভাবের ধার ধারে না, তাহারা কর্মের কাছ হইতে খুব বড়ো জিনিস দাবি করে না বলিয়া কর্মের কোনো অসম্পূর্ণতা তাহাদের হৃদয়কে আঘাত করিতে পারে না।

কিন্তু ভাবুকতা যেখানে বিলাসমাত্র নহে, সেখানে তাহা সত্য, এবং কর্ম যেখানে প্রচুর উদ্যমের প্রকাশ বা সাংসারিক প্রয়োজনের সাধনামাত্র নহে, যেখানে তাহা ভাবেরই সৃষ্টি, সেখানে তুচ্ছও কেমন বড়ো হইয়া উঠে এবং অসম্পূর্ণতাও মেঘপ্রতিহত সূর্যের বর্ণচ্ছটার মতো কিরূপ সৌন্দর্যে প্রকাশমান হয় তাহা ভগিনী নিবেদিতার কর্ম যাঁহারা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন তাঁহারা বুঝিয়াছেন।

ভগিনী নিবেদিতা যে-সকল কাজে নিযুক্ত ছিলেন তাহার কোনোটারই আয়তন বড়ো ছিল না, তাহার সকলগুলিরই আরম্ভ ক্ষুদ্র। নিজের মধ্যে যেখানে বিশ্বাস কম,

সেখানেই দেখিয়াছি বাহিরের বড়ো আয়তনে সান্ত্বনা লাভ করিবার একটা ক্ষুধা থাকে। ভগিনী নিবেদিতার পক্ষে তাহা একেবারে সম্ভবপর ছিল না। তাহার প্রধান কারণ এই যে তিনি অত্যন্ত খাঁটি ছিলেন। যেটুকু সত্য তাহাই তাঁহার পক্ষে একেবারে যথেষ্ট ছিল, তাহাকে আকারে বড়ো করিয়া দেখাইবার জন্য তিনি লেশমাত্র প্রয়োজন বোধ করিতেন না, এবং তেমন করিয়া বড়ো করিয়া দেখাইতে হইলে যে-সকল মিথ্যা মিশাল দিতে হয় তাহা তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন।

এই জন্যই এই একটি আশ্চর্য দৃশ্য দেখা গেল, যাঁহার অসামান্য শিক্ষা ও প্রতিভা তিনি এক গলির কোণে এমন কর্মক্ষেত্র বাছিয়া লইলেন যাহা পৃথিবীর লোকের চোখে পড়িবার মতো একেবারেই নহে। বিশাল বিশ্বপ্রকৃতি যেমন তাহার সমস্ত বিপুল শক্তি লইয়া মাটির নিচেকার অতি ক্ষুদ্র একটি বীজকে পালন করিতে অবজ্ঞা করে না এও সেইরূপ। তাঁহার এই কাজটিকে তিনি বাহিরে কোনোদিন ঘোষণা করেন নাই এবং আমাদের কাহারও নিকট হইতে কোনোদিন ইহার জন্য তিনি অর্থসাহায্য প্রত্যাশাও করেন নাই। তিনি যে ইহার ব্যয় বহন করিয়াছেন তাহা চাঁদার টাকা হইতে নহে, উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে নহে, একেবারেই উদরান্নের অংশ হইতে।

তাঁহার শক্তি অল্প বলিয়াই যে তাঁহার অনুষ্ঠান ক্ষুদ্র ইহা সত্য নহে।

একথা মনে রাখিতে হইবে ভগিনী নিবেদিতার যে ক্ষমতা ছিল তাহাতে তিনি নিজের দেশে অনায়াসেই প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিতেন। তাঁহার যে-কোনো স্বদেশীয়ের নিকটসংস্রবে তিনি আসিয়াছিলেন সকলেই তাঁহার প্রবল চিত্তশক্তিকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। দেশের লোকের নিকট যে খ্যাতি তিনি জয় করিয়া লইতে পারিতেন সেদিকে তিনি দৃক্‌পাতও করেন নাই।

তাহার পর এদেশের লোকের মনে আপনার ক্ষমতা বিস্তার করিয়া এখানেও তিনি যে একটা প্রধান স্থান অধিকার করিয়া লইবেন সে ইচ্ছাও তাঁহার মনকে লুব্ধ করে নাই। অন্য য়ুরোপীয়কেও দেখা গিয়াছে ভারতবর্ষের কাজকে তাঁহারা নিজের জীবনের কাজ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন কিন্তু তাঁহারা নিজেকে সকলের উপরে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন—তাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্বক আপনাকে দান করিতে পারেন নাই তাঁহাদের দানের মধ্যে এক জায়গায় আমাদের প্রতি অনুগ্রহ আছে। কিন্তু শ্রদ্ধয়া দেয়ম্, অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্। কারণ, দক্ষিণ হস্তের দানের উপকারকে বাম হস্তের অবজ্ঞা অপহরণ করিয়া লয়।

কিন্তু ভগিনী নিবেদিতা একান্ত ভালোবাসিয়া সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে ভারতবর্ষে দান করিয়াছিলেন, তিনি নিজেকে কিছুমাত্র হাতে রাখেন নাই। অথচ

নিতান্ত মৃদুস্বভাবের লোক ছিলেন বলিয়াই যে নিতান্ত দুর্বলভাবে তিনি আপনাকে বিলুপ্ত করিয়াছিলেন তাহা নহে। পূর্বেই এ কথার আভাস দিয়াছি, তাঁহার মধ্যে একটা দুর্দান্ত জোর ছিল, এবং সে জোর যে কাহারও প্রতি প্রয়োগ করিতেন না তাহাও নহে। তিনি যাহা চাহিতেন তাহা সমস্ত মন প্রাণ দিয়াই চাহিতেন এবং ভিন্ন মতে বা প্রকৃতিতে যখন তাহা বাধা পাইত তখন তাঁহার অসহিষ্ণুতাও যথেষ্ট উগ্র হইয়া উঠিত। তাঁহার এই পাশ্চাত্ত্য-স্বভাবসুলভ প্রতাপের প্রবলতা কোনো অনিষ্ট করিত না তাহা আমি মনে করি না—কারণ, যাহা মানুষকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করে তাহাই মানুষের শত্রু—তৎসত্ত্বেও বলিতেছি, তাঁহার উদার মহত্ত্ব তাঁহার উদগ্র প্রবলতাকে অনেক দূরে ছাড়াইয়া গিয়াছিল। তিনি যাহা ভালো মনে করিতেন তাহাকেই জয়ী করিবার জন্য তাঁহার সমস্ত জোর দিয়া লড়াই করিতেন, সেই জয়গৌরব নিজে লইবার লোভ তাঁহার লেশমাত্র ছিল না। দল বাঁধিয়া দলপতি হইয়া উঠা তাঁহার পক্ষে কিছুই কঠিন ছিল না, কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে দলপতির চেয়ে অনেক উচ্চ আসন দিয়াছিলেন, আপনার ভিতরকার সেই সত্যের আসন হইতে নামিয়া তিনি হাটের মধ্যে মাচা বাঁধেন নাই। এদেশে তিনি তাঁহার জীবন রাখিয়া গিয়াছেন কিন্তু দল রাখিয়া যান নাই।

অথচ তাহার কারণ এ নয় যে, তাঁহার মধ্যে রুচিগত বা বুদ্ধিগত আভিজাত্যের অভিমান ছিল;—তিনি জনসাধারণকে অবজ্ঞা করিতেন বলিয়াই যে তাহাদের নেতার পদের জন্য উমেদারি করেন নাই তাহা নহে। জনসাধারণকে হৃদয় দান করা যে কত বড়ো সত্য জিনিস তাহা তাঁহাকে দেখিয়াই আমরা শিখিয়াছি। জনসাধারণের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে আমাদের যে বোধ তাহা পুঁথিগত—এসম্বন্ধে আমাদের বোধ কর্তব্যবুদ্ধির চেয়ে গভীরতায় প্রবেশ করে নাই। কিন্তু মা যেমন ছেলেকে সুস্পষ্ট করিয়া জানেন, ভগিনী নিবেদিতা জনসাধারণকে তেমনি প্রত্যক্ষ সত্তারূপে উপলব্ধি করিতেন। তিনি এই বৃহৎ ভাবকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মতোই ভালোবাসিতেন। তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত বেদনার দ্বারা তিনি এই "পীপ্‌ল"কে এই জনসাধারণকে আবৃত করিয়া ধরিয়াছিলেন। এ যদি একটিমাত্র শিশু হইত তবে ইহাকে তিনি আপনার কোলের উপর রাখিয়া আপনার জীবন দিয়া মানুষ করিতে পারিতেন।

বস্তুত তিনি ছিলেন লোকমাতা। যে মাতৃভাব পরিবারের বাহিরের একটি সমগ্র দেশের উপরে আপনাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে তাহার মূর্তি তো ইতিপূর্বে আমরা দেখি নাই। এসম্বন্ধে পুরুষের যে কর্তব্যবোধ তাহার কিছু কিছু আভাস পাইয়াছি, কিন্তু রমণীর যে পরিপূর্ণ মমত্ববোধ তাহা প্রত্যক্ষ করি নাই। তিনি যখন বলিতেন Our people তখন তাহার মধ্যে যে একান্ত আত্মীয়তার সুরটি লাগিত আমাদের কাহারও

কণ্ঠে তেমনটি তো লাগে না। ভগিনী নিবেদিতা দেশের মানুষকে যেমন সত্য করিয়া ভালোবাসিতেন তাহা যে দেখিয়াছে সে নিশ্চয়ই ইহা বুঝিয়াছে যে, দেশের লোককে আমরা হয়তো সময় দিই, অর্থ দিই, এমন কি, জীবনও দিই কিন্তু তাহাকে হৃদয় দিতে পারি নাই—তাহাকে তেমন অত্যন্ত সত্য করিয়া নিকটে করিয়া জানিবার শক্তি আমরা লাভ করি নাই।

আমরা যখন দেশ বা বিশ্বমানব বা ওইরূপ কোনো একটা সমষ্টিগত সত্তাকে মনের মধ্যে দেখিতে চেষ্টা করি তখন তাহাকে যে অত্যন্ত অস্পষ্ট করিয়া দেখি তাহার কারণ আছে। আমরা এইরূপ বৃহৎ ব্যাপক সত্তাকে কেবলমাত্র মন দিয়াই দেখিতে চাই, চোখ দিয়া দেখি না। যে লোক দেশের প্রত্যেক লোকের মধ্যে সমগ্র দেশকে দেখিতে পায় না, সে মুখে যাহাই বলুক দেশকে যথার্থভাবে দেখে না। ভগিনী নিবেদিতাকে দেখিয়াছি তিনি লোকসাধারণকে দেখিতেন, স্পর্শ করিতেন, শুদ্ধমাত্র তাহাকে মনে মনে ভাবিতেন না। তিনি গণ্ডগ্রামের কুটীরবাসিনী একজন সামান্য মুসলমানরমণীকে যেরূপ অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সহিত সম্ভাষণ করিয়াছেন দেখিয়াছি, সামান্য লোকের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে—কারণ ক্ষুদ্র মানুষের মধ্যে বৃহৎ মানুষকে প্রত্যক্ষ করিবার সেই দৃষ্টি, সে অতি অসাধারণ। সেই দৃষ্টি তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত সহজ ছিল বলিয়াই এতদিন ভারতবর্ষের এত নিকটে বাস করিয়া তাঁহার শ্রদ্ধা ক্ষয় হয় নাই।

লোকসাধারণ ভগিনী নিবেদিতার হৃদয়ের ধন ছিল বলিয়াই তিনি কেবল দূর হইতে তাহাদের উপকার করিয়া অনুগ্রহ করিতেন না। তিনি তাহাদের সংস্রব চাহিতেন, তাহাদিগকে সর্বতোভাবে জানিবার জন্য তিনি তাঁহার সমস্ত মনকে তাহাদের দিকে প্রসারিত করিয়া দিতেন। তিনি তাহাদের ধর্মকর্ম কথাকাহিনী পূজাপদ্ধতি শিল্পসাহিত্য তাহাদের জীবনযাত্রার সমস্ত বৃত্তান্ত কেবল বুদ্ধি দিয়া নয় আন্তরিক মমতা দিয়া গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে যাহা কিছু ভালো যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু নিত্য পদার্থ আছে তাহাকেই তিনি একান্ত আগ্রহের সঙ্গে খুঁজিয়াছেন। মানুষের প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা এবং একটি গভীর মাতৃস্নেহবশতই তিনি এই ভালোটিকে বিশ্বাস করিতেন এবং ইহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেন। এই আগ্রহের বেগে কখনো তিনি ভুল করেন নাই তাহা নয়, কিন্তু শ্রদ্ধার গুণে তিনি যে সত্য উদ্ধার করিয়াছেন সমস্ত ভুল তার কাছে তুচ্ছ। যাঁহারা ভালো শিক্ষক তাঁহারা সকলেই জানেন শিশুর স্বভাবের মধ্যেই প্রকৃতি একটি শিক্ষা করিবার সহজ প্রবৃত্তি নিহিত করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন; শিশুদের চঞ্চলতা, অস্থির কৌতূহল, তাহাদের খেলাধুলা সমস্তই প্রাকৃতিক শিক্ষাপ্রণালী; জনসাধারণের মধ্যে সেই প্রকারের একটি

শিশুত্ব আছে। এই জন্ত জনসাধারণ নিজেকে শিক্ষা দিবার ও সান্ত্বনা দিবার নানা প্রকার সহজ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। ছেলেদের ছেলেমানুষি যেমন নিরর্থক নহে— তেমনি জনসাধারণের নানাপ্রকার সংস্কার ও প্রথা নিরবচ্ছিন্ন মূঢ়তা নহে—তাহা আপনাকে নানা প্রকারে শিক্ষা দিবার জন্ত জনসাধারণের অন্তর্নিহিত চেষ্টা—তাহাই তাহাদের স্বাভাবিক শিক্ষার পথ। মাতৃহৃদয়া নিবেদিতা জনসাধারণের এই সমস্ত আচার-ব্যবহারকে সেই দিক হইতে দেখিতেন। এই জন্ত সেই সকলের প্রতি তাঁহার ভারি একটা স্নেহ ছিল। তাহার সমস্ত বাহ্যরূঢ়তা ভেদ করিয়া তাহার মধ্যে মানব-প্রকৃতির চিরন্তন গূঢ় অভিপ্রায় তিনি দেখিতে পাইতেন।

লোকসাধারণের প্রতি তাঁহার এই যে মাতৃস্নেহ তাহা একদিকে যেমন সকরুণ ও সুকোমল আর একদিকে তেমনি শাবকবেষ্টিত বাঘিনীর মতো প্রচণ্ড। বাহির হইতে নির্মমভাবে কেহ ইহাদিগকে কিছু নিন্দা করিবে সে তিনি সহিতে পারিতেন না, অথবা যেখানে রাজার কোনো অন্তায় অবিচার ইহাদিগকে আঘাত করিতে উদ্যত হইত সেখানে তাঁহার তেজ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত। কত লোকের কাছে হইতে তিনি কত নীচতা বিশ্বাসঘাতকতা সহ্য করিয়াছেন, কত লোক তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়াছে, তাঁহার অতি সামান্ত সম্বল হইতে কত নিতান্ত অযোগ্যলোকের অসংগত আবদার তিনি রক্ষা করিয়াছেন, সমস্তই তিনি অকাতরে সহ্য করিয়াছেন; কেবল তাঁহার একমাত্র ভয় এই ছিল পাছে তাঁহার নিকটতম বন্ধুরাও এই সকল হীনতার দৃষ্টান্তে তাঁহার "পীপ্‌ল"দের প্রতি অবিচার করে। ইহাদের যাহা কিছু ভালো তাহা যেমন তিনি দেখিতে চেষ্টা করিতেন তেমনি অনাত্মীয়ের অশ্রদ্ধাদৃষ্টিপাত হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্ত তিনি যেন তাঁহার সমস্ত ব্যথিত মাতৃহৃদয় দিয়া ইহাদিগকে আবৃত করিতে চাহিতেন। তাহার কারণ এ নয় যে সত্য গোপন করাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু তাহার কারণ এই যে, তিনি জানিতেন অশ্রদ্ধার দ্বারা ইহাদিগকে অপমান করা অত্যন্ত সহজ এবং স্থূলদৃষ্টি লোকের পক্ষে তাহাই সম্ভব কিন্তু ইহাদের অন্তঃপুরের মধ্যে যেখানে লক্ষ্মী বাস করিতেছেন সেখানে তো এই সকল শ্রদ্ধাহীন লোকের প্রবেশের অধিকার নাই এই জন্তই তিনি এই সকল বিদেশীয় দিঙ্‌নাগদের "স্থূলহস্তাবলেপ" হইতে তাঁহার এই আপন লোকদিগকে রক্ষা করিবার জন্ত এমন ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন, এবং আমাদের দেশের যেসকল লোক বিদেশীর কাছে এই দীনতা জানাইতে যায় যে, আমাদের কিছুই নাই এবং তোমরাই আমাদের একমাত্র আশাভরসা, তাহাদিগকে তিনি তাঁহার তীব্ররোষের বজ্রশিখার দ্বারা বিদ্ধ করিতে চাহিতেন।

এমন য়ুরোপীয়ের কথা শোনা যায় যাঁহারা আমাদের শাস্ত্র পড়িয়া, বেদান্ত

আলোচনা করিয়া, আমাদের কোনো সাধুসজ্জনের চরিত্রে বা আলাপে আকৃষ্ট হইয়া ভারতবর্ষের প্রতি ভক্তি লইয়া আমাদের নিকটে আসিয়াছেন; অবশেষে দিনে দিনে সেই ভক্তি বিসর্জন দিয়া রিক্তহস্তে দেশে ফিরিয়াছেন। তাঁহারা শাস্ত্রে যাহা পড়িয়াছেন সাধুচরিতে যাহা দেখিয়াছেন সমস্ত দেশের দৈন্য ও অসম্পূর্ণতার আবরণ ভেদ করিয়া তাহা দেখিতে পান নাই। তাঁহাদের যে ভক্তি সে মোহমাত্র, সেই মোহ অন্ধকারেই টিঁকিয়া থাকে, আলোকে আসিলে মরিতে বিলম্ব করে না।

কিন্তু ভগিনী নিবেদিতার যে শ্রদ্ধা তাহা সত্যপদার্থ, তাহা মোহ নহে তাহা মানুষের মধ্যে দর্শনশাস্ত্রের শ্লোক খুঁজিত না, তাহা বাহিরের সমস্ত আবরণ ভেদ করিয়া মর্মস্থানে পৌঁছিয়া একেবারে মনুষ্যত্বকে স্পর্শ করিত। এই জন্য অত্যন্ত দীন অবস্থার মধ্যেও আমাদের দেশকে দেখিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। সমস্ত দৈন্যই তাঁহার স্নেহকে উদ্বোধিত করিয়াছে, অবজ্ঞাকে নহে। আমাদের আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা, বেশভূষা, আমাদের প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপ একজন য়ুরোপীয়কে যে কিরূপ অসহ্যভাবে আঘাত করে তাহা আমরা ঠিকমতো বুঝিতেই পারি না, এই জন্য আমাদের প্রতি তাহাদের রূঢ়তাকে আমরা সম্পূর্ণ অহেতুক বলিয়া মনে করি। কিন্তু ছোটো ছোটো রুচি, অভ্যাস ও সংস্কারের বাধা যে কত বড়ো বাধা তাহা একটু বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি, কারণ, নিজেদের দেশের ভিন্ন শ্রেণী ও ভিন্ন জাতির সম্বন্ধে আমাদের মনেও সেটা অত্যন্ত প্রচুর পরিমাণেই আছে। বেড়ার বাধার চেয়ে ছোটো ছোটো কাঁটার বাধা বড়ো কম নহে। অতএব এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে ভগিনী নিবেদিতা কলিকাতার বাঙালিপাড়ার এক গলিতে একেবারে আমাদের ঘরের মধ্যে আসিয়া যে বাস করিতেছিলেন তাহার দিনে রাত্রে প্রতি মুহূর্তে বিচিত্র বেদনার ইতিহাস প্রচ্ছন্ন ছিল। একপ্রকার স্থূলরুচির মানুষ আছে তাহাদিগকে অল্প কিছুতেই স্পর্শ করে না—তাহাদের অচেতনতাই তাহাদিগকে অনেক আঘাত হইতে রক্ষা করে। ভগিনী নিবেদিতা একেবারেই তেমন মানুষ ছিলেন না। সকল দিকেই তাঁহার বোধশক্তি সূক্ষ্ম এবং প্রবল ছিল; রুচির বেদনা তাঁহার পক্ষে অল্প বেদনা নহে; ঘরে বাহিরে আমাদের অসাড়তা, শৈথিল্য, অপরিচ্ছন্নতা, আমাদের অব্যবস্থা ও সকল প্রকার চেষ্টার অভাব, যাহা পদে পদে আমাদের তামসিকতার পরিচয় দেয় তাহা প্রত্যহই তাঁহাকে তীব্র পীড়া দিয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু সেইখানেই তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। সকলের চেয়ে কঠিন পরীক্ষা এই যে প্রতিমুহূর্তের পরীক্ষা, ইহাতে তিনি জয়ী হইয়াছিলেন।

শিবের প্রতি সতীর সত্যকার প্রেম ছিল বলিয়াই তিনি অর্ধাশনে অনশনে অগ্নিতাপ

সহ্য করিয়া আপনার অত্যন্ত সুকুমার দেহ ও চিত্তকে কঠিন তপস্যায় সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই সতী নিবেদিতাও দিনের পর দিন যে তপস্যা করিয়াছিলেন তাহার কঠোরতা অসহ্য ছিল—তিনিও অনেকদিন অর্ধাশন অনশন স্বীকার করিয়াছেন, তিনি গলির মধ্যে যে বাড়ির মধ্যে বাস করিতেন সেখানে বাতাসের অভাবে গ্রীষ্মের তাপে বীতনিদ্র হইয়া রাত কাটাইয়াছেন, তবু ডাক্তার ও বান্ধবদের সনির্বন্ধ অনুরোধেও সে বাড়ি পরিত্যাগ করেন নাই; এবং আশৈশব তাঁহার সমস্ত সংস্কার ও অভ্যাসকে মুহূর্তে মুহূর্তে পীড়িত করিয়া তিনি প্রফুল্লচিত্তে দিন যাপন করিয়াছেন—ইহা যে সম্ভব হইয়াছে এবং এই সমস্ত স্বীকার করিয়াও শেষ পর্যন্ত তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ হয় নাই তাহার একমাত্র কারণ, ভারতবর্ষের মঙ্গলের প্রতি তাঁহার প্রীতি একান্ত সত্য ছিল, তাহা মোহ ছিল না; মানুষের মধ্যে যে শিব আছেন সেই শিবকেই এই সতী সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এই মানুষের অন্তর-কৈলাসের শিবকেই যিনি আপন স্বামীরূপে লাভ করিতে চান তাঁহার সাধনার মতো এমন কঠিন সাধনা আর কার আছে?

একদিন স্বয়ং মহেশ্বর ছদ্মবেশে তপঃপরায়ণা সতীর কাছে আসিয়া বলিয়াছিলেন, হে সাধ্বী, তুমি যাঁহার জন্য তপস্যা করিতেছ তিনি কি তোমার মতো রূপসীর এত কৃচ্ছ্রসাধনের যোগ্য? তিনি যে দরিদ্র, বৃদ্ধ, বিরূপ, তাঁহার যে আচার অদ্ভুত। তপস্বিনী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, তুমি যাহা বলিতেছ সমস্তই সত্য হইতে পারে, তথাপি তাঁহারই মধ্যে আমার সমস্ত মন "ভাবৈকরস" হইয়া স্থির রহিয়াছে।

শিবের মধ্যেই যে সতীর মন ভাবের রস পাইয়াছে তিনি কি বাহিরের ধনযৌবন রূপ ও আচারের মধ্যে তৃপ্তি খুঁজিতে পারেন? ভগিনী নিবেদিতার মন সেই অনন্তদুর্লভ সুগভীর ভাবের রসে চিরদিন পূর্ণ ছিল। এই জন্যই তিনি দরিদ্রের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং বাহির হইতে যাঁহার রূপের অভাব দেখিয়া রুচিবিলাসীরা ঘৃণা করিয়া দূরে চলিয়া যায় তিনি তাঁহারই রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারই কণ্ঠে নিজের অমর জীবনের শুভ্র বরমাল্য সমর্পণ করিয়াছিলেন।

আমরা আমাদের চোখের সামনে সতীর এই যে তপস্যা দেখিলাম তাহাতে আমাদের বিশ্বাসের জড়তা যেন দূর করিয়া দেয়—যেন এই কথাটিকে নিঃসংশয় সত্যরূপে জানিতে পারি যে মানুষের মধ্যে শিব আছেন, দরিদ্রের জীর্ণকুটীরে এবং হীনবর্ণের উপেক্ষিত পল্লীর মধ্যেও তাঁহার দেবলোক প্রসারিত এবং যে ব্যক্তি সমস্ত দারিদ্র্য বিরূপতা ও কদাচারের বাহ্য আবরণ ভেদ করিয়া এই পরমৈশ্বর্যময় পরমসুন্দরকে ভাবের দিব্য দৃষ্টিতে একবার দেখিতে পাইয়াছেন তিনি মানুষের এই অন্তরতম আত্মাকে পুত্র হইতে

প্রিয় বিত্ত হইতে প্রিয় এবং যাহা কিছু আছে সকল হইতেই প্রিয় বলিয়া বরণ করিয়া লন।[1] তিনি ভয়কে অতিক্রম করেন, স্বার্থকে জয় করেন, আরামকে তুচ্ছ করেন, সংস্কারবন্ধনকে ছিন্ন করিয়া ফেলেন এবং আপনার দিকে মুহূর্তকালের জন্য দৃক্‌পাতমাত্র করেন না।

১৩১৮

শিক্ষার বাহন

প্রয়োজনের দিক হইতে দেখিলে বিদ্যায় মানুষের কত প্রয়োজন সে কথা বলা বাহুল্য। অথচ সেদিক দিয়া আলোচনা করিতে গেলে তর্ক ওঠে। চাষিকে বিদ্যা শিখাইলে তার চাষ করিবার শক্তি কমে কি না, স্ত্রীলোককে বিদ্যা শিখাইলে তার হরিভক্তি ও পতিভক্তির ব্যাঘাত হয় কি না এ-সব সন্দেহের কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু দিনের আলোকে আমরা কাজের প্রয়োজনের চেয়ে আরও বড়ো করিয়া দেখিতে পারি, সে হইতেছে জাগার প্রয়োজন। এবং তার চেয়ে আরও বড়ো কথা, এই আলোতে মানুষ মেলে, অন্ধকারে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়।

জ্ঞান মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো ঐক্য। বাংলা দেশের এক কোণে যে ছেলে পড়াশুনা করিয়াছে তার সঙ্গে য়ুরোপের প্রান্তের শিক্ষিত মানুষের মিল অনেক বেশি সত্য, তার দুয়ারের পাশের মূর্খ প্রতিবেশীর চেয়ে।

জ্ঞানে মানুষের সঙ্গে মানুষের এই যে জগৎজোড়া মিল বাহির হইয়া পড়ে, যে মিল দেশভেদ ও কালভেদকে ছাড়াইয়া যায়—সেই মিলের পরম প্রয়োজনের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক কিন্তু সেই মিলের যে পরম আনন্দ তাহা হইতে কোনো মানুষকেই কোনো কারণেই বঞ্চিত করিবার কথা মনেই করা যায় না।

সেই জ্ঞানের প্রদীপ এই ভারতবর্ষে কত বহু দূরে দূরে এবং কত মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে সে কথা ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি ভারতবাসীর পক্ষে সেই পরম যোগের পথ কত সংকীর্ণ, যে যোগ জ্ঞানের যোগ, যে যোগে সমস্ত পৃথিবীর লোক আজ মিলিত হইবার সাধনা করিতেছে।

যাহা হউক, বিদ্যাশিক্ষার উপায় ভারতবর্ষে কিছু কিছু হইয়াছে। কিন্তু বিদ্যা-

[1] তদেতৎ প্রেয়ঃপুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।

বিস্তারের বাধা এখানে মস্ত বেশি। নদী দেশের একধার দিয়া চলে, বৃষ্টি আকাশ জুড়িয়া হয়। তাই ফসলের সব চেয়ে বড়ো বন্ধু বৃষ্টি, নদী তার অনেক নীচে; শুধু তাই নয়, এই বৃষ্টিধারার উপরেই নদীজলের গভীরতা, বেগ এবং স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

আমাদের দেশে যাঁরা বজ্রহাতে ইন্দ্রপদে বসিয়া আছেন, তাঁদের সহস্রচক্ষু, কিন্তু বিদ্যার এই বর্ষণের বেলায় অন্ততঃ তার ৯৯০টা চক্ষু নিদ্রা দেয়। গর্জনের বেলায় অট্টহাস্যের বিদ্যুৎ বিকাশ করিয়া বলেন, বাবুগুলার বিদ্যা একটা অদ্ভুত জিনিস,—তার খোসার কাছে তলতল করে তার আঁঠির কাছে পাক ধরে না। যেন এটা বাবুসম্প্রদায়ের প্রকৃতিগত। কিন্তু বাবুদের বিদ্যাটাকে যে প্রণালীতে জাগ দেওয়া হয় সেই প্রণালীতেই আমাদের উপরওয়ালাদের বিদ্যাটাকেও যদি পাকানোর চেষ্টা করা যাইত তবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রমাণ হইত যে, যে-বিদ্যার উপরে ব্যাপক শিক্ষার সূর্যালোকের তা লাগে না তার এমনি দশাই হয়।

জবাবে কেহ কেহ বলেন, পশ্চিম যখন পশ্চিমেই ছিল পূর্বদেশের ঘাড়ে আসিয়া পড়ে নাই তখন তোমাদের টোলে চতুষ্পাঠীতে যে তর্কশাস্ত্রের প্যাঁচ কষা এবং ব্যাকরণ-সূত্রের জাল বোনা চলিত সেও তো অত্যন্ত কুনোরকমের বিদ্যা। একথা মানি, কিন্তু বিদ্যার যে অংশটা নির্জলা পাণ্ডিত্য সে অংশ সকল দেশেই পঙ্গু এবং কুণো; পশ্চিমেও পেডান্ট্রি মরিতে চায় না। তবে কিনা যে দেশ দুর্গতিগ্রস্ত সেখানে বিদ্যার বল কমিয়া গিয়া বিদ্যার কায়দাটাই বড়ো হইয়া ওঠে। তবু একথা মানিতে হইবে তখনকার দিনের পাণ্ডিত্যটাই তর্কচঞ্চু ও ন্যায়পঞ্চাননদের মগজের কোণে কোণে বদ্ধ ছিল বটে কিন্তু তখনকার কালের বিদ্যাটা সমাজের নাড়িতে নাড়িতে সজীব ও সবল হইয়া বহিত। কি গ্রামের নিরক্ষর চাষি, কি অন্তঃপুরের স্ত্রীলোক সকলেরই মন নানা উপায়ে এই বিদ্যার সেচ পাইত। সুতরাং এ জিনিসের মধ্যে অন্য অভাব অসম্পূর্ণতা যাই থাক্ ইহা নিজের মধ্যে সুসংগত ছিল।

কিন্তু আমাদের বিলাতি বিদ্যাটা কেমন ইস্কুলের জিনিস হইয়া সাইনবোর্ডে টাঙানো থাকে, আমাদের জীবনের ভিতরের সামগ্রী হইয়া যায় না। তাই পশ্চিমের শিক্ষায় যে ভালো জিনিস আছে তার অনেকখানি আমাদের নোটবুকেই আছে; সে কি চিন্তায়, কি কাজে ফলিয়া উঠিতে চায় না।

আমাদের দেশে আধুনিক পণ্ডিত বলেন, ইহার একমাত্র কারণ জিনিসটা বিদেশী। একথা মানি না। যা সত্য তার জিয়োগ্রাফি নাই। ভারতবর্ষও একদিন যে সত্যের দীপ জ্বালিয়াছে তা পশ্চিম মহাদেশকেও উজ্জ্বল করিবে, এ যদি না হয় তবে ওটা আলোই নয়। বস্তুত যদি এমন কোনো ভালো থাকে যা একমাত্র ভারতবর্ষেরই ভালো

তবে তা ভালোই নয় একথা জোর করিয়া বলিব। যদি ভারতের দেবতা ভারতেরই হন তবে তিনি আমাদের স্বর্গের পথ বন্ধ করিবেন কারণ স্বর্গ বিশ্বদেবতার।

আসল কথা, আধুনিক শিক্ষা তার বাহন পায় নাই—তার চলাফেরার পথ খোলসা হইতেছে না। এখনকার দিনে সার্বজনীন শিক্ষা সকল সভ্য দেশেই মানিয়া লওয়া হইয়াছে যে, কারণেই হউক আমাদের দেশে এটা চলিল না। মহাত্মা গোখলে এই লইয়া লড়িয়াছিলেন। শুনিয়াছি দেশের মধ্যে বাংলা দেশের কাছ হইতেই তিনি সব চেয়ে বাধা পাইয়াছেন। বাংলা দেশে শুভবুদ্ধির ক্ষেত্রে আজকাল হঠাৎ সকল দিক হইতেই একটা অদ্ভুত মহামারীর হাওয়া বহিয়াছে। ভূতের পা পিছন দিকে, বাংলা দেশে সামাজিক সকল চেষ্টারই পা পিছনে ফিরিয়াছে। আমরা ঠিক করিয়াছি সংসারে চলিবার পথে আমরা পিছন মুখে চলিব কেবল রাষ্ট্রীয় সাধনার আকাশে উড়িবার পথে আমরা সামনের দিকে উড়িব, আমাদের পা যেদিকে আমাদের ডানা ঠিক তার উলটো দিকে গজাইবে।

যে সার্বজনীন শিক্ষা দেশের উচ্চশিক্ষার শিকড়ে রস জোগাইবে কোথাও তার সাড়া পাওয়া গেল না, তার উপরে আবার আর এক উপসর্গ জুটিয়াছে। একদিকে আসবাব বাড়াইয়া অন্যদিকে স্থান কমাইয়া আমাদের সংকীর্ণ উচ্চশিক্ষার আয়তনকে আরও সংকীর্ণ করা হইতেছে। ছাত্রের অভাব ঘটুক কিন্তু সরঞ্জামের অভাব না ঘটে সেদিকে কড়া দৃষ্টি।

কাগজে দেখিলাম সেদিন বেহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত গাড়িতে গিয়া ছোটোলাট বলিয়াছেন যে, যারা বলে ইমারতের বাহুল্যে আমরা শিক্ষার সম্বল খর্ব করি তারা অবুঝ, কেননা শিক্ষা তো কেবল জ্ঞান লাভ নয়, ভালো ঘরে বসিয়া পড়াশুনা করাও একটা শিক্ষা,—ক্লাসে বড়ো অধ্যাপকের চেয়ে বড়ো দেয়ালটা বেশি বই কম দরকারি নয়।

মানুষের পক্ষে অন্নেরও দরকার থালারও দরকার একথা মানি কিন্তু গরিবের ভাগ্যে অন্ন যেখানে যথেষ্ট মিলিতেছে না সেখানে থালা সম্বন্ধে একটু কষাকষি করাই দরকার। যখন দেখিব ভারত জুড়িয়া বিদ্যার অন্নসত্র খোলা হইয়াছে তখন অন্নপূর্ণার কাছে সোনার থালা দাবি করিবার দিন আসিবে। আমাদের জীবনযাত্রা গরিবের অথচ আমাদের শিক্ষার বাহ্যাড়ম্বরটা যদি ধনীর চালে হয় তবে টাকা ফুঁকিয়া দিয়া টাকার থলি তৈরি করার মতো হইবে।

আঙিনায় মাদুর বিছাইয়া আমরা আসর জমাইতে পারি, কলা পাতায় আমাদের ধনীর যজ্ঞের ভোজও চলে। আমাদের দেশের নমস্য যাঁরা তাঁদের অধিকাংশই খ'ড়ো

ঘরে মানুষ,—এদেশে লক্ষ্মীর কাছ হইতে ধার না লইলে সরস্বতীর আসনের দাম কমিবে একথা আমাদের কাছে চলিবে না।

পূর্বদেশে জীবনসমস্যার সমাধান আমাদের নিজের প্রণালীতেই করিতে হইয়াছে। আমরা অশনে বসনে যতদূর পারি বস্তুভার কমাইয়াছি। এ বিষয়ে এখানকার জল হাওয়া হাতে ধরিয়া আমাদের হাতে খড়ি দিয়াছে। ঘরের দেয়াল আমাদের পক্ষে তত আবশ্যক নয় যতটা আবশ্যক দেয়ালের ফাঁক; আমাদের গায়ের কাপড়ের অনেকটা অংশই তাঁতির তাঁতের চেয়ে আকাশের সূর্যকিরণেই বোনা হইতেছে; আহারের যে অংশটা দেহের উত্তাপ সঞ্চারের জন্য তার অনেকটার বরাত পাকশালার ও পাকযন্ত্রের 'পরে নয়, দেবতার 'পরে। দেশের প্রাকৃতিক এই সুযোগ জীবনযাত্রায় খাটাইয়া আমাদের স্বভাবটা এক রকম দাঁড়াইয়া গেছে—শিক্ষাব্যবস্থায় সেই স্বভাবকে অমান্য করিলে বিশেষ লাভ আছে এমন তো আমার মনে হয় না।

গাছতলায় মাঠের মধ্যে আমার এক বিদ্যালয় আছে। সে বিদ্যালয়টি তপোবনের শকুন্তলারই মতো—অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈঃ—অবশ্য ইনস্পেক্টরের কররুহ। মৈত্রেয়ী যেমন যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিয়াছিলেন তিনি উপকরণ চান না, অমৃতকে চান,—এই বিদ্যালয়ের হইয়া আমার সেই কামনা ছিল। এইখানে ছোটোলাটের সঙ্গে একটা খুব গোড়ার কথায় আমাদের হয়তো অমিল আছে—এবং এইখানটায় আমরাও তাঁকে উপদেশ দিবার অধিকার রাখি। সত্যকে গভীর করিয়া দেখিলে দেখা যায়—উপকরণের একটা সীমা আছে যেখানে অমৃতের সঙ্গে তার বিরোধ বাধে। মেদ যেখানে প্রচুর, মজ্জা সেখানে দুর্বল।

দৈন্য জিনিসটাকে আমি বড়ো বলি না। সেটা তামসিক। কিন্তু অনাড়ম্বর, বিলাসীর ভোগসামগ্রীর চেয়ে দামে বেশি, তাহা সাত্ত্বিক। আমি সেই অনাড়ম্বরের কথা বলিতেছি যাহা পূর্ণতারই একটি ভাব, যাহা আড়ম্বরের অভাবমাত্র নহে। সেই ভাবের যেদিন আবির্ভাব হইবে সেদিন সভ্যতার আকাশ হইতে বস্তুকুয়াশার বিস্তর কলুষ দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যাইবে! সেই ভাবের অভাব আছে বলিয়া যে-সব জিনিস প্রত্যেক মানুষের পক্ষে একান্ত আবশ্যক তাহা দুর্মূল্য ও দুর্ভর হইতেছে; গান বাজনা, আহার বিহার, আমোদ আহ্লাদ, শিক্ষা দীক্ষা, রাজ্যশাসন, আইন আদালত সভ্য দেশে সমস্তই অতি জটিল, সমস্তই মানুষের বাহিরের ও ভিতরের প্রভূত জায়গা জুড়িয়া বসে; এই বোঝার অধিকাংশই অনাবশ্যক—এই বিপুল ভার বহনে মানুষের জোর প্রকাশ পায় বটে ক্ষমতা প্রকাশ পায় না। এইজন্য বর্তমান সভ্যতাকে যে-দেবতা বাহির হইতে দেখিতেছেন তিনি দেখিতেছেন ইহা অপটু দৈত্যের সাঁতার দেওয়ার মতো, তার

হাত-পা ছোঁড়ায় জল ঘুলাইয়া ফেনাইয়া উঠিতেছে ;—সে জানেও না এত বেশি হাঁসফাঁস করার যথার্থ প্রয়োজন নাই। মুশকিল এই যে দৈত্যটার দৃঢ় বিশ্বাস যে প্রচণ্ড জোরে হাত পা ছোঁড়াটারই একটা বিশেষ মূল্য আছে। যেদিন পূর্ণতার সরল সত্য সভ্যতার অন্তরের মধ্যে আবির্ভূত হইবে সেদিন পাশ্চাত্ত্য বৈঠকখানার দেয়াল হইতে জাপানি পাখা, চীন-বাসন, হরিণের শিং, বাঘের চামড়া,—তার এ কোণ ও কোণ হইতে বিচিত্র নিরর্থকতা দুঃস্বপ্নের মতো ছুটিয়া যাইবে ; মেয়েদের মাথার টুপিগুলা হইতে মরা পাখি, পাখির পালক, নকল ফুল পাতা এবং রাশিরাশি অদ্ভুত জঞ্জাল খসিয়া পড়িবে ; তাদের সাজ-সজ্জার অমিতাচার বর্বরতার পুরাতত্ত্বে স্থান পাইবে, যে-সব পাঁচতলা দশতলা বাড়ি আকাশের আলোর দিকে ঘুষি তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে তারা লজ্জায় মাথা হেঁট করিবে ; শিক্ষা বল, কর্ম বল, ভোগ বল, সহজ হইয়া ওঠাকেই আপনার শক্তির সত্য পরিচয় বলিয়া গণ্য করিবে ; এবং মানুষের অন্তরপ্রকৃতি বাহিরের দাসরাজাদের রাজত্ব কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে পায়ের তলায় বসাইয়া রাখিবে। একদিন পশ্চিমের মৈত্রেয়ীকেও বলিতে হইবে, যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্।

সে কবে হইবে ঠিক জানি না। ততদিন ঘাড় হেঁট করিয়া আমাদিগকে উপদেশ শুনিতে হইবে যে, প্রভূত আসবাবের মধ্যে বড়ো বাড়ির উচ্চতলায় বসিয়া শিক্ষাই উচ্চশিক্ষা। কারণ মাটির তলাটাই মানুষের প্রাইমারি, ওইটেই প্রাথমিক ; ইঁটের কোটা যত বড়ো হাঁ করিয়া হাই তুলিবে বিদ্যা ততই উপরে উঠিতে থাকিবে।

একদা বন্ধুরা আমার সেই মেঠো বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটা কালেজ জুড়িবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু একদিন আমাদের দেশের যে উচ্চশিক্ষা তরুতলকে অশ্রদ্ধা করে নাই আজ তাকে তৃণাসন দেখাইলে সে কি সহিতে পারিবে? সে যে ধনী পশ্চিমের পোষ্যপুত্র, বিলিতি বাপের কায়দায় সে বাপকেও ছাড়াইয়া চলিতে চায়। যতই বলি না কেন, শিক্ষাটাকে যতদূর পারি উচ্চেই রাখিব, কায়দাটাকে আমাদের মতো করিতে দাও—সে কথায় কেহ কান দেয় না। বলে কি না, ওই কায়দাটাই তো শিক্ষা, তাই তোমাদের ভালোর জন্যেই ওই কায়দাটাকে যথাসাধ্য দুঃসাধ্য করিয়া তুলিব। কাজেই আমাকে বলিতে হইল, অন্তঃকরণকেই আমি বড়ো বলিয়া মানি, উপকরণকে তার চেয়েও বড়ো বলিয়া মানিব না।

উপকরণ যে অংশে অন্তঃকরণের অনুচর সে অংশে তাকে অমান্য করা দীনতা একথা জানি। কিন্তু সেই সামঞ্জস্যটাকে য়ুরোপ এখনও বাহির করিতে পারে নাই ; বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে। আমাদের নিজের মতে আমাদিগকেও সেই চেষ্টা করিতে কেন পাকা নিয়ম করিয়া বাধা দেওয়া হইবে? প্রয়োজনকে খর্ব না করিয়াও

সমস্তটাকেও সাদাসিধা করিয়া তুলিব সে আমাদের নিজের স্বভাব ও নিজের গরজ অনুসারে। শিক্ষার বিষয়কে আমরা অন্য জায়গা হইতে লইতে পারি কিন্তু মেজাজটাকে সুদ্ধ লইতে সে যে বিষম জুলুম।

পূর্বেই বলিয়াছি, পশ্চিমের পোষ্যপুত্র তার বিলিতি বাপকেও ছাড়াইয়া চলে। আমেরিকায় দেখিলাম, স্টেটের সাহায্যে কত বড়ো বড়ো বিদ্যালয় চলিতেছে যেখানে ছাত্রদের বেতন নাই বলিলেই হয়। য়ুরোপেও দরিদ্র ছাত্রদের জন্য সুলভ শিক্ষার অনেক উপায় আছে। কেবল গরিব বলিয়াই আমাদের দেশের শিক্ষা আমাদের সামর্থ্যের তুলনায় পশ্চিমের চেয়ে এত বেশি দুর্মূল্য হইল? অথচ এই ভারতবর্ষেই একদিন বিদ্যা টাকা লইয়া বেচা কেনা হইত না।

দেশকে শিক্ষা দেওয়া স্টেটের গরজ ইহা তো অন্যত্র দেখিয়াছি। এই জন্য য়ুরোপে জাপানে আমেরিকায় শিক্ষায় কৃপণতা নাই। কেবলমাত্র আমাদের গরিব দেশেই শিক্ষাকে দুর্মূল্য ও দুর্লভ করিয়া তোলাতেই দেশের বিশেষ মঙ্গল—এ কথা উচ্চাসনে বসিয়া যত উচ্চস্বরে বলা হইবে বেসুর ততই উচ্চ সপ্তকে উঠিবে। মাতার স্তন্যকে দুর্মূল্য করিয়া তোলাই উচিত, এমন কথা যদি স্বয়ং লর্ড কার্জনও শপথ করিয়া বলিতেন তবু আমরা বিশ্বাস করিতাম না যে শিশুর প্রতি করুণায় রাত্রে তাঁর ঘুম হয় না।

বয়স বাড়িতে বাড়িতে শিশুর ওজন বাড়িবে এই তো স্বাস্থ্যের লক্ষণ। সমান থাকিলেও ভালো নয়, কমিতে থাকিলে ভাবনার কথা। তেমনি, আমাদের দেশে যেখানে শিক্ষার অধিকাংশ জমিই পতিত আছে সেখানে বছরে বছরে ছাত্রসংখ্যা বাড়িবে হিতৈষীরা এই প্রত্যাশা করে। সমান থাকিলে সেটা দোষের, আর সংখ্যা যদি কমে তো বুঝিব, পাল্লাটা মরণের দিকে ঝুঁকিয়াছে। বাংলা দেশে ছাত্রসংখ্যা কমিল। সে জন্যে শিক্ষাবিভাগে উদ্বেগ নাই। এই উপলক্ষ্যে একটি ইংরেজি কাগজে লিখিয়াছে,—এই তো দেখি লেখাপড়ায় বাঙালির শখ আপনিই কমিয়াছে—যদি গোখলের অবশ্যশিক্ষা এখানে চলিত তবে তো অনিচ্ছুকের 'পরে জুলুম করাই হইত।

এ সব কথা নির্মমের কথা। নিজের জাতের সম্বন্ধে এমন কথা কেহ এমন অনায়াসে বলিতে পারে না। আজ ইংলণ্ডে যদি দেখা যাইত লোকের মনে শিক্ষার শখ আপনিই কমিয়া আসিতেছে তবে নিশ্চয়ই এই সব লোকই উৎকণ্ঠিত হইয়া লিখিত যে কৃত্রিম উপায়েও শিক্ষার উত্তেজনা বাড়াইয়া তোলা উচিত।

নিজের জাতির 'পরে যে দরদ বাঙালির 'পরেও ইংরেজের সেই দরদ হইবে এমন আশা করিতেও লজ্জা বোধ করি। কিন্তু জাতিপ্রেমের সমস্ত দাবি মিটাইয়াও মনুষ্য-প্রেমের হিসাবে কিছু প্রাপ্য বাকি থাকে। ধর্মবুদ্ধির বর্তমান অবস্থায় স্বজাতির জন্য

প্রতাপ, ঐশ্বর্য প্রভৃতি অনেক দুর্লভ জিনিস অন্যকে বঞ্চিত করিয়াও লোকে কামনা করে কিন্তু এখনও এমন কিছু আছে যা খুব কম করিয়াও সকল মানুষেরই জন্য কামনা করা যায়। আমরা কোনো দেশের সম্বন্ধেই এমন কথা বলিতে পারি না যে, সেখানকার স্বাস্থ্য যখন আপনিই কমিয়া আসিতেছে তখন সে দেশের জন্য ডাক্তার খরচটা বাদ দিয়া অন্ত্যেষ্টিসংকারেরই আয়োজনটা পাকা করা উচিত।

তবে কি না, এ কথাও কবুল করিতে হইবে, স্বজাতি সম্বন্ধে আমাদের নিজের মনে শুভবুদ্ধি যথেষ্ট সজাগ নয় বলিয়াই বাহিরের লোক আমাদের অন্নবস্ত্র বিদ্যাবুদ্ধির মূল্য খুব কম করিয়া দেখে। দেশের অন্ন, দেশের বিদ্যা, দেশের স্বাস্থ্য আমরা তেমন করিয়া চাই নাই। পরের কাছে চাহিয়াছি, নিজের কাছে নহে। ওজর করিয়া বলি আমাদের সাধ্য কম, কিন্তু আমাদের সাধনা তার চেয়েও অনেক কম।

দেশের দাম আমাদের নিজের কাছে যত, অন্যের কাছে তার চেয়ে বেশি দাবি করিলে সে এক রকম ঠকানো হয়। ইহাতে বড়ো কেহ ঠকেও না। কেবল চিনা-বাজারের দোকানদারের মতো করিয়া পরের কাছে দর চড়াইয়া সময় নষ্ট করিয়া থাকি। তাতে যে পরিমাণে সময় যায় সে পরিমাণে লাভ হয় না। এতকাল রাষ্ট্রীয় হাটে সেই দোকানদারি করিয়া আসিয়াছি; যে জিনিসের জন্য নিজে যত দাম দিয়াছি বা দিতে রাজি তার চেয়ে অনেক বড়ো দাম হাঁকিয়া খুব একটা হট্টগোল করিয়া কাটাইলাম।

শিক্ষার জন্য আমরা আবদার করিয়াছি, গরজ করি নাই। শিক্ষাবিস্তারে আমাদের গা নাই। তার মানে শিক্ষার ভোজে নিজেরা বসিয়া যাইব, পাতের প্রসাদটুকু পর্যন্ত আর কোনো ক্ষুধিত পায় বা না পায় সেদিকে খেয়ালই নাই। এমন কথা যারা বলে, নিম্নসাধারণের জন্য যথেষ্ট শিক্ষার দরকার নাই, তাতে তাদের ক্ষতিই করিবে, তারা কর্তৃপক্ষদের কাছ হইতে একথা শুনিবার অধিকারী যে, বাঙালির পক্ষে বেশি শিক্ষা অনাবশ্যক, এমন কি, অনিষ্টকর।—জনসাধারণকে লেখাপড়া শিখাইলে আমাদের চাকর জুটিবে না একথা যদি সত্য হয় তবে আমরা লেখাপড়া শিখিলে আমাদেরও দাস্যভাবের ব্যাঘাত হইবে এ আশঙ্কাও মিথ্যা নহে।

এ সম্বন্ধে নিজের মনের ভাবটা ঠিকমত যাচাই করিতে হইলে দুটো একটা দৃষ্টান্ত দেখা দরকার। আমরা বেঙ্গল প্রোভিন্‌শ্যাল কনফারেন্স নামে একটা রাষ্ট্রসভার সৃষ্টি করিয়াছি। সেটা প্রাদেশিক, তার প্রধান উদ্দেশ্য বাংলার অভাব ও অভিযোগ সম্বন্ধে সকলে মিলিয়া আলোচনা করিয়া বাঙালির চোখ ফুটাইয়া দেওয়া। বহুকাল পর্যন্ত এই নিতান্ত সাদা কথাটা কিছুতেই আমাদের মনে আসে নাই যে, তা করিতে হইলে বাংলা ভাষায় আলোচনা করা চাই। তার কারণ, দেশের লোককে দেশের লোক

বলিয়া সমস্ত চৈতন্য দিয়া আমরা বুঝি না। এই জন্যই দেশের পুরা দাম দেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। যা চাহিতেছি তা পেট ভরিয়া পাই না তার কারণ এ নয় যে, দাতা প্রসন্নমনে দিতেছে না—তার কারণ এই যে, আমরা সত্যমনে চাহিতেছি না।

বিদ্যাবিস্তারের কথাটা যখন ঠিকমতো মন দিয়া দেখি তখন তার সর্বপ্রধান বাধাটা এই দেখিতে পাই যে, তার বাহনটা ইংরেজি। বিদেশী মাল জাহাজে করিয়া শহরের ঘাট পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতে পারে কিন্তু সেই জাহাজটাতে করিয়াই দেশের হাটে হাটে আমদানি রপ্তানি করাইবার দুরাশা মিথ্যা। যদি বিলিতি জাহাজটাকেই কায়মনে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাই তবে ব্যবসা শহরেই আটকা পড়িয়া থাকিবে।

এ পর্যন্ত এ অসুবিধাটাকে আমাদের অসুখ বোধ হয় নাই। কেননা মুখে যাই বলি মনের মধ্যে এই শহরটাকেই দেশ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম। দাক্ষিণ্য যখন খুব বেশি হয় তখন এই পর্যন্ত বলি, আচ্ছা বেশ, খুব গোড়ার দিকের মোটা শিক্ষাটা বাংলা ভাষায় দেওয়া চলিবে কিন্তু সে যদি উচ্চশিক্ষার দিকে হাত বাড়ায় তবে গমিষ্যত্যুপহাস্যতাম্।

আমাদের এই ভীরুতা কি চিরদিনই থাকিয়া যাইবে? ভরসা করিয়া এটুকু কোনোদিন বলিতে পারিব না যে, উচ্চশিক্ষাকে আমাদের দেশের ভাষায় দেশের জিনিস করিয়া লইতে হইবে? পশ্চিম হইতে যা কিছু শিখিবার আছে জাপান তা দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশে ছড়াইয়া দিল, তার প্রধান কারণ, এই শিক্ষাকে তারা দেশী ভাষার আধারে বাঁধাই করিতে পারিয়াছে।

অথচ জাপানি ভাষার ধারণাশক্তি আমাদের ভাষার চেয়ে বেশি নয়। নূতন কথা সৃষ্টি করিবার শক্তি আমাদের ভাষায় অপরিসীম। তা ছাড়া য়ুরোপের বুদ্ধিবৃত্তির আকার প্রকার যতটা আমাদের সঙ্গে মেলে এমন জাপানির সঙ্গে নয়। কিন্তু উদ্‌যোগী পুরুষসিংহ কেবলমাত্র লক্ষ্মীকে পায় না সরস্বতীকেও পায়। জাপান জোর করিয়া বলিল য়ুরোপের বিদ্যাকে নিজের বাণীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিব। যেমন বলা তেমনি করা, তেমনি তার ফললাভ। আমরা ভরসা করিয়া এ পর্যন্ত বলিতেই পারিলাম না যে, বাংলাভাষাতেই আমরা উচ্চশিক্ষা দিব এবং দেওয়া যায়, এবং দিলে তবেই বিদ্যার ফসল দেশ জুড়িয়া ফলিবে।

আমাদের ভরসা এতই কম যে ইস্কুল কালেজের বাহিরে আমরা যে-সব লোকশিক্ষার আয়োজন করিয়াছি সেখানেও বাংলা ভাষার প্রবেশ নিষেধ। বিজ্ঞানশিক্ষাবিস্তারের জন্য দেশের লোকের চাঁদায় বহুকাল হইতে শহরে এক বিজ্ঞান সভা খাড়া

দাঁড়াইয়া আছে। প্রাচ্যদেশের কোনো কোনো রাজার মতো গৌরবনাশের ভয়ে জনসাধারণের কাছে সে বাহির হইতেই চায় না। বরং অচল হইয়া থাকিবে তবু কিছুতে সে বাংলা বলিবে না। ও যেন বাঙালির চাঁদা দিয়া বাঁধানো পাকা ভিতের উপর বাঙালির অক্ষমতা ও ঔদাসীন্যের স্মরণস্তম্ভের মতো স্থাণু হইয়া আছে। কথাও বলে না, নড়েও না। উহাকে ভুলিতেও পারি না, উহাকে মনে রাখাও শক্ত। ওজর এই যে, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা অসম্ভব। ওটা অক্ষমের ভীরুর ওজর। কঠিন বই কি, সেই জন্যেই কঠোর সংকল্প চাই। একবার ভাবিয়া দেখুন, একে ইংরেজি তাতে সায়ান্স, তার উপরে, দেশে যে-সকল বিজ্ঞানবিশারদ আছেন তাঁরা জগদ্বিখ্যাত হইতে পারেন কিন্তু দেশের কোণে এই যে একটুখানি বিজ্ঞানের নীড় দেশের লোক বাঁধিয়া দিয়াছে এখানে তাঁদের কলাও জায়গা নাই এমন অবস্থায় এই পদার্থটা বঙ্গসাগরের তলায় যদি ডুব মারিয়া বসে তবে ইহার সাহায্যে সেখানকার মৎস্যশাবকের বৈজ্ঞানিক উন্নতি আমাদের বাঙালির ছেলের চেয়ে যে কিছুমাত্র কম হইতে পারে এমন অপবাদ দিতে পারিব না।

মাতৃভাষা বাংলা বলিয়াই কি বাঙালিকে দণ্ড দিতেই হইবে? এই অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য সে চিরকাল অজ্ঞান হইয়াই থাক্—সমস্ত বাঙালির প্রতি কয়জন শিক্ষিত বাঙালির এই রায়ই কি বহাল রহিল? যে বেচারা বাংলা বলে সেই কি আধুনিক মনুসংহিতার শূদ্র? তার কানে উচ্চশিক্ষার মন্ত্র চলিবে না? মাতৃভাষা হইতে ইংরেজি ভাষার মধ্যে জন্ম লইয়া তবেই আমরা দ্বিজ হই?

বলা বাহুল্য ইংরেজি আমাদের শেখা চাইই—শুধু পেটের জন্য নয়। কেবল ইংরেজি কেন? ফরাসি জার্মান শিখিলে আরও ভালো। সেই সঙ্গে এ কথা বলাও বাহুল্য অধিকাংশ বাঙালি ইংরেজি শিখিবে না। সেই লক্ষ লক্ষ বাংলাভাষীদের জন্য বিদ্যার অনশন কিংবা অর্ধাশনই ব্যবস্থা, এ কথা কোন্‌মুখে বলা যায়।

দেশে বিদ্যাশিক্ষার যে বড়ো কারখানা আছে তার কলের চাকার অল্পমাত্র বদল করিতে গেলেই বিস্তর হাতুড়ি-পেটাপেটি করিতে হয়—সে খুব শক্ত হাতের কর্ম। আশু মুখুজ্যে মশায় ওরই মধ্যে এক-জায়গায় একটুখানি বাংলা হাতল জুড়িয়া দিয়াছেন।

তিনি যেটুকু করিয়াছেন তার ভিতরকার কথা এই,—বাঙালির ছেলে ইংরেজি বিদ্যায় যতই পাকা হ'ক বাংলা না শিখিলে তার শিক্ষা পুরা হইবে না। কিন্তু এ তো গেল যারা ইংরেজি জানে তাদেরই বিদ্যাকে চৌকশ করিবার ব্যবস্থা। আর, যারা বাংলা জানে ইংরেজি জানে না, বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় কি তাদের মুখে তাকাইবে না? এত বড়ো অস্বাভাবিক নির্মমতা ভারতবর্ষের বাহিরে আর কোথাও আছে?

আমাকে লোকে বলিবে শুধু কবিত্ব করিলে চলিবে না—একটা প্র্যাক্‌টিক্যাল পরামর্শ দাও, অত্যন্ত বেশি আশা করাটা কিছু নয়। অত্যন্ত বেশি আশা চুলোয় যাক, লেশমাত্র আশা না করিয়াই অধিকাংশ পরামর্শ দিতে হয়। কিছু করিবার এবং হইবার আগে ক্ষেত্রটাতে দৃষ্টি তো পড়ুক। কোনোমতে মনটা যদি একটু উসখুস করিয়া ওঠে তাহলেই আপাতত যথেষ্ট। এমন কি, লোকে যদি গালি দেয় এবং মারিতে আসে তাহলেও বুঝি, যে, একটা বেশ উত্তম-মধ্যম ফল পাওয়া গেল।

অতএব পরামর্শে নামা যাক।

আজকাল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা প্রশস্ত পরিমণ্ডল তৈরি হইয়া উঠিতেছে। একদিন মোটের উপর ইহা একজামিন পাশের কুস্তির আখড়া ছিল। এখন আখড়ার বাহিরেও ল্যাঙটটার উপর ভদ্রবেশ ঢাকা দিয়া একটু হাঁফ ছাড়িবার জায়গা করা হইয়াছে। কিছুদিন হইতে দেখিতেছি বিদেশ হইতে বড়ো বড়ো অধ্যাপকেরা আসিয়া উপদেশ দিতেছেন,—এবং আমাদের দেশের মনীষীদেরও এখানে আসন পড়িতেছে। শুনিয়াছি বিশ্ববিদ্যালয়ের এইটুকু ভদ্রতাও আশু মুখুজ্যে মশায়ের কল্যাণে ঘটিয়াছে।

আমি এই বলি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন বাড়িটার ভিতরের আঙিনায় যেমন চলিতেছে চলুক,—কেবল তার এই বাহিরের প্রাঙ্গণটাতে যেখানে আম্‌দরবারের নূতন বৈঠক বসিল সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাটাকে যদি সমস্ত বাঙালির জিনিস করিয়া তোলা যায় তাতে বাধাটা কী? আহূত যারা তারা ভিতর বাড়িতেই বসুক—আর রবাহূত যারা তারা বাহিরে পাত পাড়িয়া বসিয়া যাক না। তাদের জন্ত বিলিতি টেবিল না হয় না রইল, দিশি কলাপাত মন্দ কী? তাদের একেবারে দরোয়ান দিয়া ধাক্কা মারিয়া বিদায় করিয়া দিলে কি এ যজ্ঞে কল্যাণ হইবে? অভিশাপ লাগিবে না কি?

এমনি করিয়া বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি এবং বাংলা ভাষার ধারা যদি গঙ্গাযমুনার মতো মিলিয়া যায় তবে বাঙালি শিক্ষার্থীর পক্ষে এটা একটা তীর্থস্থান হইবে। দুই স্রোতের সাদা এবং কালো রেখার বিভাগ থাকিবে বটে কিন্তু তারা এক সঙ্গে বহিয়া চলিবে। ইহাতেই দেশের শিক্ষা যথার্থ বিস্তীর্ণ হইবে, গম্ভীর হইবে, সত্য হইয়া উঠিবে।

শহরে যদি একটিমাত্র বড়ো রাস্তা থাকে তবে সে পথে বিষম ঠেলাঠেলি পড়ে। শহর-সংস্কারের প্রস্তাবের সময় রাস্তা বাড়াইয়া ভিড়কে ভাগ করিয়া দিবার চেষ্টা হয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝখানে আর একটি সদর রাস্তা খুলিয়া দিলে ঠেলাঠেলি নিশ্চয় কমিবে।

বিদ্যালয়ের কাজে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা তাতে দেখিয়াছি একদল ছেলে স্বভাবতই ভাষাশিক্ষায় অপটু। ইংরেজি ভাষা কায়দা করিতে না পারিয়া যদি বা তারা কোনোমতে এন্ট্রেন্সের দেউড়িটা তরিয়া যায় – উপরের সিঁড়ি ভাঙিবার বেলাতেই চিত হইয়া পড়ে।

এমনতরো দুর্গতির অনেকগুলা কারণ আছে। এক তো যে-ছেলের মাতৃভাষা বাংলা তার পক্ষে ইংরেজি ভাষার মতো বালাই আর নাই। ও যেন বিলিতি তলোয়ারের খাপের মধ্যে দিশি খাঁড়া ভরিবার ব্যায়াম। তার পরে গোড়ার দিকে ভালো শিক্ষকের কাছে ভালো নিয়মে ইংরেজি শিখিবার সুযোগ অল্প ছেলেরই হয়,—গরিবের ছেলের তো হয়ই না। তাই অনেক স্থলেই বিশল্যকরণীর পরিচয় ঘটে না বলিয়া আস্ত গন্ধমাদন বহিতে হয় ;—ভাষা আয়ত্ত হয় না বলিয়া গোটা ইংরেজি বই মুখস্থ করা ছাড়া উপায় থাকে না। অসামান্য স্মৃতিশক্তির জোরে যে ভাগ্যবানরা এমনতরো কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ড করিতে পারে তারা শেষ পর্যন্ত উদ্ধার পাইয়া যায় – কিন্তু যাদের মেধা সাধারণ মানুষের মাপে প্রমাণসই তাদের কাছে এতটা আশা করাই যায় না। তারা এই রুদ্ধ ভাষার ফাঁকের মধ্য দিয়া গলিয়া পার হইতেও পারে না, ডিঙাইয়া পার হওয়াও তাহাদের পক্ষে অসাধ্য।

এখন কথাটা এই, এই যে-সব বাঙালির ছেলে স্বাভাবিক বা আকস্মিক কারণে ইংরেজি ভাষা দখল করিতে পারিল না তারা কি এমন কিছু মারাত্মক অপরাধ করিয়াছে যেজন্য তারা বিদ্যামন্দির হইতে যাবজ্জীবন আণ্ডামানে চালান হইবার যোগ্য? ইংলণ্ডে একদিন ছিল যখন সামান্য কলাটা মুলাটা চুরি করিলেও মানুষের ফাঁসি হইতে পারিত—কিন্তু এ যে তার চেয়েও কড়া আইন। এ যে চুরি করিতে পারে না বলিয়াই ফাঁসি কেননা মুখস্থ করিয়া পাস করাই তো চৌর্যবৃত্তি। যে ছেলে পরীক্ষাশালায় গোপনে বই লইয়া যায় তাকে খেদাইয়া দেওয়া হয়; আর যে ছেলে তার চেয়েও লুকাইয়া লয়, অর্থাৎ চাদরের মধ্যে না লইয়া মগজের মধ্যে লইয়া যায় সেই বা কম কী করিল? সভ্যতার নিয়ম অনুসারে মানুষের স্মরণশক্তির মহলটা ছাপাখানায় অধিকার করিয়াছে। অতএব যারা বই মুখস্থ করিয়া পাস করে তারা অসভ্যরকমে চুরি করে অথচ সভ্যতার যুগে পুরস্কার পাইবে তারাই?

যাই হ'ক ভাগ্যক্রমে যারা পার হইল তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে চাই না। কিন্তু যারা পার হইল না তাদের পক্ষে হাবড়ার পুলটাই না হয় দু-ফাঁক হইল, কিন্তু কোনোরকমের সরকারি খেয়াও কি তাদের কপালে জুটিবে না? স্টীমার না হয় তো পানসি?

ভালোমতো ইংরেজি শিখিতে পারিল না এমন ঢের ঢের ভালো ছেলে বাংলাদেশে আছে। তাদের শিখিবার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমকে একেবারে গোড়ার দিকেই আটক করিয়া দিয়া দেশের শক্তির কি প্রভূত অপব্যয় করা হইতেছে না?

আমার প্রশ্ন এই, প্রেপারেটরি ক্লাস পর্যন্ত একরকম পড়াইয়া তার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের মোড়টার কাছে যদি ইংরেজি বাংলা দুটো বড়ো রাস্তা খুলিয়া দেওয়া যায় তা হইলে কি নানাপ্রকারে সুবিধা হয় না? এক তো ভিড়ের চাপ কিছু কমেই, দ্বিতীয়ত শিক্ষার বিস্তার অনেক বাড়ে।

ইংরেজি রাস্তাটার দিকেই বেশি লোক ঝুঁকিবে তা জানি; এবং দুটো রাস্তার চলাচল ঠিক সহজ অবস্থায় পৌঁছিতে কিছু সময়ও লাগিবে। রাজভাষার দর বেশি সুতরাং আদরও বেশি। কেবল চাকরির বাজারে নয়, বিবাহের বাজারেও বরের মূল্যবৃদ্ধি ওই রাস্তাটাতেই। তাই হ'ক—বাংলা ভাষা অনাদর সহিতে রাজি, কিন্তু অকৃতার্থতা সহ্য করা কঠিন। ভাগ্যমন্তের ছেলে ধাত্রীস্তন্যে মোটাসোটা হইয়া উঠুক না কিন্তু গরিবের ছেলেকে তার মাতৃস্তন্য হইতে বঞ্চিত করা কেন?

অনেকদিন হইতে অনেক মার খাইয়াছি বলিয়া সাবধানে কথা বলিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। তবু অভ্যাসদোষে বেফাঁস কথা আপনি বাহির হইয়া পড়ে। আমার তো মনে হয়, গোড়ায় কথাটা আমি বেশ কৌশলেই পাড়িয়াছিলাম। নিজেকে বুঝাইয়াছিলাম গোপাল অতি সুবোধ ছেলে, তাকে কম খাইতে দিলেও সে চেঁচামেচি করে না। তাই মৃদুস্বরে শুরু করিয়াছিলাম আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বহিরঙ্গনে যে একটা বক্তৃতার বৈঠক বসিয়াছে তারই এককোণে বাংলার একটা আসন পাতিলে জায়গায় কুলাইয়া যাইবে। এ কথাটা গোপালের মতোই কথা হইয়াছিল; ইহাতে অভিভাবকেরা যদি বা নারাজ হন তবু বিরক্ত হইবেন না।

কিন্তু গোপালের সুবুদ্ধির চেয়ে যখন তার ক্ষুধা বাড়িয়া ওঠে তখন তার সুর আপনি চড়িতে থাকে; আমার প্রস্তাবটা অনেকখানি বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। তার ফল প্রস্তাবের পক্ষেও সাংঘাতিক হইতে পারে, প্রস্তাবকের পক্ষেও সেটা নূতন নয়। শুনিয়াছি আমাদের দেশে শিশুমৃত্যুসংখ্যা খুব বেশি। এ দেশে শতকরা একশ পঁচিশটা প্রস্তাব আঁতুড় ঘরেই মরে। আর সাংঘাতিক মার এ বয়সে এত খাইয়াছি যে, ও জিনিসটাকে সাংঘাতিক বলিয়া একেবারেই বিশ্বাস করি না।

আমি জানি তর্ক এই উঠিবে তুমি বাংলা ভাষার যোগে উচ্চশিক্ষা দিতে চাও কিন্তু বাংলাভাষায় উঁচুদরের শিক্ষাগ্রন্থ কই? নাই সে কথা মানি কিন্তু শিক্ষা না চলিলে শিক্ষাগ্রন্থ হয় কী উপায়ে? শিক্ষাগ্রন্থ বাগানের গাছ নয় যে, শৌখিন লোকে শখ

করিয়া তার কেয়ারি করিবে,—কিংবা সে আগাছাও নয় যে, মাঠে বাটে নিজের ফুলকে নিজেই কণ্টকিত হইয়া উঠিবে! শিক্ষাকে যদি শিক্ষাগ্রন্থের জন্য বসিয়া থাকিতে হয় তবে পাতার জোগাড় আগে হওয়া চাই তার পরে গাছের পালা এবং ফুলের পথ চাহিয়া নদীকে মাথায় হাত দিয়া পড়িতে হইবে।

বাংলায় উচ্চঅঙ্গের শিক্ষাগ্রন্থ বাহির হইতেছে না এটা যদি আক্ষেপের বিষয় হয় তবে তার প্রতিকারের একমাত্র উপায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় উচ্চঅঙ্গের শিক্ষা প্রচলন করা। বঙ্গসাহিত্যপরিষৎ কিছুকাল হইতে এই কাজের গোড়াপত্তনের চেষ্টা করিতেছেন। পরিভাষা রচনা ও সংকলনের ভার পরিষৎ লইয়াছেন, কিছু কিছু করিয়াওছেন। তাঁদের কাজ ঢিমা চালে চলিতেছে বা অচল হইয়া আছে বলিয়া নালিশ করি। কিন্তু তুপাও যে চলিয়াছে এইটেই আশ্চর্য। দেশে এই পরিভাষা তৈরির তাগিদ কোথায়? ইহার ব্যবহারের প্রয়োজন বা সুযোগ কই? দেশে টাকা চলিবে না অথচ টাঁকশাল চলিতেই থাকিবে এমন আবদার করি কোন্ লজ্জায়?

যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনোদিন বাংলাশিক্ষার রাস্তা খুলিয়া যায় তবে তখন এই বঙ্গসাহিত্যপরিষদের দিন আসিবে। এখন রাস্তা নাই তাই সে হুঁচট খাইতে খাইতে চলে, তখন চার-ঘোড়ার গাড়ি বাহির করিবে। আজ আক্ষেপের কথা এই যে, আমাদের উপায় আছে, উপকরণ আছে,—ক্ষেত্র নাই। বাংলার যজ্ঞে আমরা অন্নসত্র খুলিতে পারি। এই তো সব আছেন আমাদের জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ, মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী এবং আরও অনেক এই শ্রেণীর নামজাদা ও প্রচ্ছন্ননামা বাঙালি। অথচ যে-সব বাঙালি কেবল বাংলা জানে তাদের উপবাস কোনোদিন ঘুচিবে না? তারা এঁদের লইয়া গৌরব করিবে কিন্তু লইয়া ব্যবহার করিতে পারিবে না? বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসাদে বরঞ্চ সাতসমুদ্র পার হইয়া বিদেশী ছেলে এঁদের কাছে শিক্ষা লইয়া যাইতে পারে কেবল বাংলা দেশের যে ছাত্র বাংলা জানে এঁদের কাছে বসিয়া শিক্ষা লইবার অধিকার তাদের নাই!

জার্মানিতে ফ্রান্সে আমেরিকায় জাপানে যে সকল আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় জাগিয়া উঠিয়াছে তাদের মূল উদ্দেশ্য সমস্ত দেশের চিত্তকে মানুষ করা। দেশকে তারা সৃষ্টি করিয়া চলিতেছে। বীজ হইতে অঙ্কুরকে, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষকে তারা মুক্তিদান করিতেছে। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে চিত্তশক্তিকে উদ্‌ঘাটিত করিতেছে।

দেশের এই মনকে মানুষ করা কোনোমতেই পরের ভাষায় সম্ভবপর নহে। আমরা লাভ করিব কিন্তু সে লাভ আমাদের ভাষাকে পূর্ণ করিবে না, আমরা চিন্তা করিব কিন্তু সে চিন্তার বাহিরে আমাদের ভাষা পড়িয়া থাকিবে, আমাদের মন বাড়িয়া চলিবে

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাষা বাড়িতে থাকিবে না, সমস্ত শিক্ষাকে অকৃতার্থ করিবার এমন উপায় আর কী হইতে পারে।

তার ফল হইয়াছে, উচ্চঅঙ্গের শিক্ষা যদি বা আমরা পাই, উচ্চ অঙ্গের চিন্তা আমরা করি না। কারণ চিন্তার স্বাভাবিক বাহন আমাদের ভাষা। বিদ্যালয়ের বাহিরে আসিয়া পোশাকি ভাষাটা আমরা ছাড়িয়া ফেলি, সেই সঙ্গে তার পকেটে যা কিছু সঞ্চয় থাকে তা আলনায় ঝোলানো থাকে,—তার পরে আমাদের চিরদিনের আটপৌরে ভাষায় আমরা গল্প করি, গুজব করি, রাজাউজির মারি, তর্জমা করি, চুরি করি এবং খবরের কাগজে অশ্রাব্য কাপুরুষতার বিস্তার করিয়া থাকি। এ সত্ত্বেও আমাদের দেশে বাংলার সাহিত্যের উন্নতি হইতেছে না এমন কথা বলি না কিন্তু এ সাহিত্যে উপবাসের লক্ষণ যথেষ্ট দেখিতে পাই। যেমন, এমন রোগী দেখা যায়, যে খায় প্রচুর অথচ তার হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তেমনি দেখি আমরা যতটা শিক্ষা করিতেছি তার সমস্তটা আমাদের সাহিত্যের সর্বাঙ্গে পোষণ সঞ্চার করিতেছে না। খাদ্যের সঙ্গে আমাদের প্রাণের সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ হইতেছে না। তার প্রধান কারণ আমরা নিজের ভাষার রসনা দিয়া খাই না, আমাদের কলে করিয়া খাওয়ানো হয়, তাতে আমাদের পেট ভরতি করে, দেহপূর্তি করে না।

সকলেই জানেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচে তৈরি। ওই বিদ্যালয়টি পরীক্ষায় পাস করা ডিগ্রীধারীদের নামের উপর মার্কা মারিবার একটা বড়ো-গোছের সীলমোহর। মানুষকে তৈরি করা নয়, মানুষ চিহ্নিত করা তার কাজ। মানুষকে হাটের মাল করিয়া তার বাজার-দর দাগিয়া দিয়া ব্যবসাদারির সহায়তা সে করিয়াছে।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও আমরা সেই ডিগ্রীর টাঁকশালার ছাপ লওয়াকেই বিদ্যালাভ বলিয়া গণ্য করিয়াছি। ইহা আমাদের অভ্যাস হইয়া গেছে। আমরা বিদ্যা পাই বা না পাই বিদ্যালয়ের একটা ছাঁচ পাইয়াছি। আমাদের মুশকিল এই যে, আমরা চিরদিন ছাঁচের উপাসক। ছাঁচে ঢালাই-করা রীতিনীতি চালচলনকেই নানা আকারে পূজার অর্ঘ্য দিয়া এই ছাঁচ-দেবীর প্রতি অচলা ভক্তি আমাদের মজ্জাগত। সেইজন্য ছাঁচে-ঢালা বিদ্যাটাকে আমরা দেবীর বরদান বলিয়া মাথায় করিয়া লই—ইহার চেয়ে বড়ো কিছু আছে এ কথা মনে করাও আমাদের পক্ষে শক্ত।

তাই বলিতেছি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের যদি একটা বাংলা অঙ্গের সৃষ্টি হয় তার প্রতি বাঙালি অভিভাবকদের প্রসন্ন দৃষ্টি পড়িবে কি না সন্দেহ। তবে কি না, ইংরেজি চালুনির ফাঁক দিয়া যারা গড়িয়া পড়িতেছে এমন ছেলে এখানে পাওয়া যাইবে। কিন্তু আমার মনে হয় তার চেয়ে একটা বড়ো সুবিধার কথা আছে।

সে সুবিধাটি এই যে, এই অংশেই বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনভাবে ও স্বাভাবিকরূপে নিজেকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতে পারিবে। তার একটা কারণ, এই অংশের শিক্ষা অনেকটা পরিমাণে বাজার-দরের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবে। আমাদের অনেককেই ব্যবসার খাতিরে জীবিকার দায়ে ডিগ্রী লইতেই হয়—কিন্তু সে পথ যাদের অগত্যা বন্ধ কিংবা যারা শিক্ষার জন্যই শিখিতে চাহিবে তারাই এই বাংলা বিভাগে আকৃষ্ট হইবে। শুধু তাই নয় যারা দায়ে পড়িয়া ডিগ্রী লইতেছে তারাও অবকাশমতো বাংলা ভাষার টানে এই বিভাগে আনাগোনা করিতে ছাড়িবে না। কারণ, দুদিন না যাইতেই দেখা যাইবে এই বিভাগেই আমাদের দেশের অধ্যাপকদের প্রতিভার বিকাশ হইবে। এখন যাঁরা কেবল ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দ ও নোটের ধুলা উড়াইয়া আঁধি লাগাইয়া দেন তাঁরাই সেদিন ধারাবর্ষণে বাংলার তৃষিত চিত্ত জুড়াইয়া দিবেন।

এমনি করিয়া যাহা সজীব তাহা ক্রমে কলকে আচ্ছন্ন করিয়া নিজের স্বাভাবিক সফলতাকে প্রমাণ করিয়া তুলিবে। একদিন ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি নিজের ইংরেজি লেখার অভিমানে বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করিয়াছিল, কিন্তু কোথা হইতে নব বাংলা-সাহিত্যের ছোটো একটি অঙ্কুর বাংলার হৃদয়ের ভিতর হইতে গজাইয়া উঠিল ;—তখন তার ক্ষুদ্রতাকে তার দুর্বলতাকে পরিহাস করা সহজ ছিল ; কিন্তু সে যে সজীব, ছোটো হইলেও উপেক্ষার সামগ্রী নয় ; আজ সে মাথা তুলিয়া বাঙালির ইংরেজি রচনাকে অবজ্ঞা করিবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছে। অথচ বাংলা সাহিত্যের কোনো পরিচয় কোনো আদর রাজদ্বারে ছিল না—আমাদের মতো অধীন জাতির পক্ষে সেই প্রলোভনের অভাব কম অভাব নয়—বাহিরের সেই সমস্ত অনাদরকে গণ্য না করিয়া বিলাতি বাজারের যাচনদারের দৃষ্টির বাহিরে কেবলমাত্র নিজের প্রাণের আনন্দেই সে আজ পৃথিবীতে চিরপ্রতিষ্ঠা লাভের যোগ্য হইতেছে। এতদিন ধরিয়া আমাদের সাহিত্যিকেরা যদি ইংরেজি কপিবুক নকল করিয়া আসিতেন তাহা হইলে জগতে যে প্রভূত আবর্জনার সৃষ্টি হইত তাহা কল্পনা করিলেও গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে।

এতদিন ধরিয়া ইংরেজি বিদ্যার যে কলটা চলিতেছে সেটাকে মিস্ত্রিখানার যোগে বদল করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। তার দুটো কারণ আছে, এক, কলটা একটা বিশেষ ছাঁচে গড়া, একেবারে গোড়া হইতে সে ছাঁচ বদল করা সোজা কথা নয়। দ্বিতীয়ত, এই ছাঁচের প্রতি ছাঁচ উপাসকদের ভক্তি এত সুদৃঢ় যে, আমরা ন্যাশনাল কলেজই করি আর হিন্দু য়ুনিভার্সিটিই করি আমাদের মন কিছুতেই ওই ছাঁচের মুঠা হইতে মুক্তি পায় না। ইহার সংস্কারের একটিমাত্র উপায় আছে এই ছাঁচের পাশে একটা সজীব জিনিসকে অল্প একটু স্থান দেওয়া। তাহা হইলে সে তর্ক না করিয়া

বিরোধ না করিয়া কলকে আচ্ছন্ন করিয়া একদিন মাথা তুলিয়া উঠিবে এবং কল যখন আকাশে ধোঁয়া উড়াইয়া ঘর্ঘর শব্দে হাটের জন্ম মালের বস্তা উদ্‌গার করিতে থাকিবে তখন এই বনস্পতি নিঃশব্দে দেশকে ফল দিবে, ছায়া দিবে এবং দেশের সমস্ত কলভাষী বিহঙ্গদলকে নিজের শাখায় শাখায় আশ্রয়দান করিবে।

কিন্তু ওই কলটার সঙ্গে রফা করিবার কথাই বা কেন বলা? ওটা দেশের আপিস আদালত, পুলিসের থানা, জেলখানা, পাগলাগারদ, জাহাজের জেটি, পাটের কল প্রভৃতি আধুনিক সভ্যতার আসবাবের সামিল হইয়া থাক না। আমাদের দেশ যেখানে ফল চাহিতেছে ছায়া চাহিতেছে সেখানে কোঠাবাড়িগুলা ছাড়িয়া একবার মাটির দিকেই নামিয়া আসি না কেন? গুরুর চারিদিকে শিষ্য আসিয়া যেমন স্বভাবের নিয়মে বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি করিয়া তোলে, বৈদিককালে যেমন ছিল তপোবন, বৌদ্ধকালে যেমন ছিল নালন্দা, তক্ষশিলা—ভারতের দুর্গতির দিনেও যেমন করিয়া টোল চতুষ্পাঠী দেশের প্রাণ হইতে প্রাণ লইয়া দেশকে প্রাণ দিয়া রাখিয়াছিল তেমনি করিয়াই বিশ্ববিদ্যালয়কে জীবনের দ্বারা জীবলোকে সৃষ্টি করিয়া তুলিবার কথাই সাহস করিয়া বলা যাক্ না কেন?

সৃষ্টির প্রথম মন্ত্র—"আমরা চাই!" এই মন্ত্র কি দেশের চিত্তকুহর হইতে একেবারেই শুনা যাইতেছে না? দেশের যাঁরা আচার্য, যাঁরা সন্ধান করিতেছেন, সাধনা করিতেছেন, ধ্যান করিতেছেন, তাঁরা কি এই মন্ত্রে শিষ্যদের কাছে আসিয়া মিলিবেন না? বাষ্প যেমন মেঘে মেলে, মেঘ যেমন ধারাবর্ষণে ধরণীকে অভিষিক্ত করে তেমনি করিয়া কবে তাঁরা একত্র মিলিবেন, কবে তাঁদের সাধনা মাতৃভাষায় গলিয়া পড়িয়া মাতৃভূমিকে তৃষ্ণার জলে ও ক্ষুধার অন্নে পূর্ণ করিয়া তুলিবে?

আমার এই শেষ কথাটি কেজো কথা নহে, ইহা কল্পনা। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেজো কথায় কেবল জোড়াতাড়া চলিয়াছে, সৃষ্টি হইয়াছে কল্পনায়।

১৩২২

ছবির অঙ্গ

এক বলিলেন বহু হইব, এমনি করিয়া সৃষ্টি হইল—আমাদের সৃষ্টিতত্ত্বে এই কথা বলে।

একের মধ্যে ভেদ ঘটিয়া তবে রূপ আসিয়া পড়িল। তাহা হইলে রূপের মধ্যে দুইটি পরিচয় থাকা চাই, বহুর পরিচয়, যেখানে ভেদ; এবং একের পরিচয়, যেখানে মিল।

জগতে রূপের মধ্যে আমরা কেবল সীমা নয় সংযম দেখি। সীমাটা অন্য সকলের সঙ্গে নিজেকে তফাত করিয়া, আর সংযমটা অন্য সমস্তের সঙ্গে রফা করিয়া। রূপ একদিকে আপনাকে মানিতেছে, আর একদিকে অন্য সমস্তকে মানিতেছে তবেই সে টিঁকিতেছে।

তাই উপনিষৎ বলিয়াছেন, সূর্য ও চন্দ্র, দ্যুলোক ও ভূলোক, একের শাসনে বিধৃত। সূর্য ও চন্দ্র দ্যুলোক ভূলোক আপন-আপন সীমায় খণ্ডিত ও বহু—কিন্তু তবু তার মধ্যে কোথায় এককে দেখিতেছি? যেখানে প্রত্যেকে আপন-আপন ওজন রাখিয়া চলিতেছে; যেখানে প্রত্যেকে সংযমের শাসনে নিয়ন্ত্রিত।

ভেদের দ্বারা বহুর জন্ম কিন্তু মিলের দ্বারা বহুর রক্ষা। যেখানে অনেককে টিঁকিতে হইবে সেখানে প্রত্যেককে আপন পরিমাণটি রাখিয়া আপন ওজন বাঁচাইয়া চলিতে হয়। জগৎ সৃষ্টিতে সমস্ত রূপের মধ্যে অর্থাৎ সীমার মধ্যে পরিমাণের যে সংযম সেই সংযমই মঙ্গল সেই সংযমই সুন্দর। শিব যে যতী।

আমরা যখন সৈন্যদলকে চলিতে দেখি তখন একদিকে দেখি প্রত্যেকে আপন সীমার দ্বারা স্বতন্ত্র আর একদিকে দেখি প্রত্যেকে একটি নির্দিষ্ট মাপ রাখিয়া ওজন রাখিয়া চলিতেছে। সেইখানেই সেই পরিমাণের সুষমার ভিতর দিয়া জানি ইহাদের ভেদের মধ্যেও একটি এক প্রকাশ পাইতেছে। সেই এক যতই পরিস্ফুট এই সৈন্যদল ততই সত্য। বহু যখন এলোমেলো হইয়া ভিড় করিয়া পরস্পরকে ঠেলাঠেলি ও অবশেষে পরস্পরকে পায়ের তলায় দলাদলি করিয়া চলে তখন বহুকেই দেখি, এককে দেখিতে পাই না, অর্থাৎ তখন সীমাকেই দেখি ভূমাকে দেখি না—অথচ এই ভূমার রূপই কল্যাণরূপ, আনন্দরূপ।

নিছক বহু কি জ্ঞানে কি প্রেমে কি কর্মে মানুষকে ক্লেশ দেয়, ক্লান্ত করে,—এই জন্য মানুষ আপনার সমস্ত জানায় চাওয়ায় পাওয়ায় করায় বহুর ভিতরকার এককে খুঁজিতেছে নহিলে তার মন মানে না, তার সুখ থাকে না, তার প্রাণ বাঁচে না। মানুষ তার বিজ্ঞানে বহুর মধ্যে যখন এককে পায় তখন নিয়মকে পায়, দর্শনে বহুর মধ্যে যখন এককে পায় তখন তত্ত্বকে পায়, সাহিত্যে শিল্পে বহুর মধ্যে যখন এককে পায় তখন সৌন্দর্যকে পায়. সমাজে বহুর মধ্যে যখন এককে পায় তখন কল্যাণকে পায়। এমনি করিয়া মানুষ বহুকে লইয়া তপস্যা করিতেছে এককে পাইবার জন্য।

এই গেল আমার ভূমিকা। তার পরে, আমাদের শিল্প-শাস্ত্র চিত্রকলা সম্বন্ধে কী বলিতেছে বুঝিয়া দেখা যাক।

সেই শাস্ত্রে বলে, ছবির ছয় অঙ্গ। রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য ও বর্ণিকাভঙ্গ।

"রূপভেদাঃ"—ভেদ লইয়া শুরু। গোড়ায় বলিয়াছি ভেদেই রূপের সৃষ্টি। প্রথমেই রূপ আপনার বহু বৈচিত্র্য লইয়াই আমাদের চোখে পড়ে। তাই ছবির আরম্ভ হইল রূপের ভেদে—একের সীমা হইতে আরের সীমার পার্থক্যে।

কিন্তু শুধু ভেদে কেবল বৈষম্যই দেখা যায়। তার সঙ্গে যদি সুষমাকে না দেখানো যায় তবে চিত্রকলা তো ভূতের কীর্তন হইয়া উঠে। জগতের সৃষ্টিকার্যে বৈষম্য এবং সৌষম্য রূপে রূপে একেবারে গায়ে গায়ে লাগিয়া আছে; আমাদের সৃষ্টিকার্যে যদি তার সেটা অন্যথা ঘটে তবে সেটা সৃষ্টিই হয় না, অনাসৃষ্টি হয়।

বাতাস যখন স্তব্ধ তখন তাহা আগাগোড়া এক হইয়া আছে। সেই এককে বীণার তার দিয়া আঘাত করো তাহা ভাঙিয়া বহু হইয়া যাইবে। এই বহুর মধ্যে ধ্বনিগুলি যখন পরস্পর পরস্পরের ওজন মানিয়া চলে তখন তাহা সংগীত, তখনই একের সহিত অন্যের সুনিয়ত যোগ—তখনই সমস্ত বহু তাহার বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া একই সংগীত প্রকাশ করে। ধ্বনি এখানে রূপ, এবং ধ্বনির সুষমা যাহা সুর তাহাই প্রমাণ। ধ্বনির মধ্যে ভেদ, সুরের মধ্যে এক।

এইজন্য শাস্ত্রে ছবির ছয় অঙ্গের গোড়াতে যেখানে "রূপভেদ" আছে সেইখানেই তার সঙ্গে সঙ্গে "প্রমাণানি" অর্থাৎ পরিমাণ জিনিসটাকে একেবারে যমক করিয়া সাজাইয়াছে। ইহাতে বুঝিতেছি ভেদ নইলে মিল হয় না এই জন্যই ভেদ, ভেদের জন্য ভেদ নহে; সীমা নহিলে সুন্দর হয় না এই জন্যই সীমা, নহিলে আপনাতেই সীমার সার্থকতা নাই, ছবিতে এই কথাটাই জানাইতে হইবে। রূপটাকে তার পরিমাণে দাঁড় করানো চাই। কেননা আপনার সত্য মাপে যে চলিল অর্থাৎ চারিদিকের মাপের সঙ্গে যার খাপ খাইল সেই হইল সুন্দর। প্রমাণ মানে না যে রূপ সেই কুরূপ, তাহা সমগ্রের বিরোধী।

রূপের রাজ্যে যেমন জ্ঞানের রাজ্যেও তেমনি। প্রমাণ মানে না যে যুক্তি সেই তো কুযুক্তি। অর্থাৎ সমস্তের মাপকাঠিতে যার মাপে কমিবেশি হইল, সমস্তের তুলাদণ্ডে যার ওজনের গরমিল হইল সেই তো মিথ্যা বলিয়া ধরা পড়িল। শুধু আপনার মধ্যেই আপনি তো কেহ সত্য হইতে পারে না, তাই যুক্তিশাস্ত্রে প্রমাণ করার মানে অন্যকে দিয়া একেকে মাপা। তাই দেখি সত্য এবং সুন্দরের একই ধর্ম। একদিকে তাহা রূপের বিশিষ্টতায় চারিদিক হইতে পৃথক ও আপনার মধ্যে বিচিত্র, আর-একদিকে তাহা প্রমাণের সুষমায় চারিদিকের সঙ্গে ও আপনার মধ্যে সামঞ্জস্যে মিলিত। তাই যারা গভীর করিয়া বুঝিয়াছে তারা বলিয়াছে সত্যই সুন্দর, সুন্দরই সত্য।

ছবির ছয় অঙ্গের গোড়ার কথা হইল রূপভেদাঃ প্রমাণানি। কিন্তু এটা তো হইল বহিরঙ্গ—একটা অন্তরঙ্গও তো আছে।

কেননা, মানুষ তো শুধু চোখ দিয়া দেখে না, চোখের পিছনে তার মনটা আছে। চোখ ঠিক যেটি দেখিতেছে মন যে তারই প্রতিবিম্বটুকু দেখিতেছে তাহা নহে। চোখের উচ্ছিষ্টেই মন মানুষ এ কথা মানা চলিবে না—চোখের ছবিতে মন আপনার ছবি জুড়িয়া দেয় তবেই সে ছবি মানুষের কাছে সম্পূর্ণ হইয়া ওঠে।

তাই শাস্ত্র "রূপভেদাঃ প্রমাণানি"তে ষড়ঙ্গের বহিরঙ্গ সারিয়া অন্তরঙ্গের কথায় বলিতেছেন—"ভাবলাবণ্য যোজনং"—চেহারার সঙ্গে ভাব ও লাবণ্য যোগ করিতে হইবে—চোখের কাজের উপরে মনের কাজ ফলাইতে হইবে; কেননা শুধু কারু কাজটা সামান্য, চিত্র করা চাই—চিত্রের প্রধান কাজই চিৎকে দিয়া।

ভাব বলিতে কী বুঝায় তাহা আমাদের এক রকম সহজে জানা আছে। এই জন্যই তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টায় যাহা বলা হইবে তাহাই বুঝা শক্ত হইবে। স্ফটিক যেমন অনেকগুলা কোণ লইয়া দানা বাঁধিয়া দাঁড়ায় তেমনি "ভাব" কথাটা অনেকগুলা অর্থকে মিলাইয়া দানা বাঁধিয়াছে। এ সকল কথায় মুশকিল এই যে, ইহাদের সব অর্থ আমরা সকল সময়ে পুরাভাবে ব্যবহার করি না, দরকার মতো ইহাদের অর্থচ্ছটাকে ভিন্ন পর্যায়ে সাজাইয়া এবং কিছু কিছু বাদসাদ দিয়া নানা কাজে লাগাই। ভাব বলিতে feelings, ভাব বলিতে idea, ভাব বলিতে characteristics, ভাব বলিতে suggestion, এমন আরও কত কী আছে।

এখানে ভাব বলিতে বুঝাইতেছে অন্তরের রূপ। আমার একটা ভাব তোমার একটা ভাব; সেইভাবে আমি আমার মতো, তুমি তোমার মতো। রূপের ভেদ যেমন বাহিরের ভেদ, ভাবের ভেদ তেমনি অন্তরের ভেদ।

রূপের ভেদ সম্বন্ধে যে কথা বলা হইয়াছে ভাবের ভেদ সম্বন্ধেও সেই কথাই খাটে। অর্থাৎ কেবল যদি তাহা এক-রোখা হইয়া ভেদকেই প্রকাশ করিতে থাকে তবে তাহা বীভৎস হইয়া উঠে। তাহা লইয়া সৃষ্টি হয় না, প্রলয়ই হয়। ভাব যখন আপন সত্য ওজন মানে অর্থাৎ আপনার চারিদিককে মানে, বিশ্বকে মানে, তখনই তাহা মধুর। রূপের ওজন যেমন তাহার প্রমাণ, ভাবের ওজন তেমনি তাহার লাবণ্য।

কেহ যেন না মনে করেন ভাব কথাটা কেবল মানুষের সম্বন্ধেই খাটে। মানুষের মন অচেতন পদার্থের মধ্যেও একটা অন্তরের পদার্থ দেখে। সেই পদার্থটা সেই অচেতনের মধ্যে বস্তুতই আছে কিংবা আমাদের মন সেটাকে সেইখানে আরোপ করে সে হইল তত্ত্বশাস্ত্রের তর্ক, আমার তাহাতে প্রয়োজন নাই। এইটুকু মানিলেই হইল স্বভাবতই মানুষের মন সকল জিনিসকেই মনের জিনিস করিয়া লইতে চায়।

তাই আমরা যখন একটা ছবি দেখি তখন এই প্রশ্ন করি এই ছবির ভাবটা কী?

অর্থাৎ ইহাতে তো হাতের কাজের নৈপুণ্য দেখিলাম, চোখে দেখার বৈচিত্র্য দেখিলাম, কিন্তু ইহার মধ্যে চিত্তের কোন্ রূপ দেখা যাইতেছে—ইহার ভিতর হইতে মন মনের কাছে কোন্ লিপি পাঠাইতেছে? দেখিলাম একটা গাছ—কিন্তু গাছ তো ঢের দেখিয়াছি, এ গাছের অন্তরের কথাটা কী, অথবা যে আঁকিল গাছের মধ্য দিয়া তার অন্তরের কথাটা কী সেটা যদি না পাইলাম তবে গাছ আঁকিয়া লাভ কিসের? অবশ্য উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের বইয়ে যদি গাছের নমুনা দিতে হয় তবে সে আলাদা কথা। কেননা সেখানে সেটা চিত্র নয় সেটা দৃষ্টান্ত।

শুধু-রূপ শুধু-ভাব কেবল আমাদের গোচর হয় মাত্র। "আমাকে দেখো" "আমাকে জানো" তাহাদের দাবি এই পর্যন্ত। কিন্তু "আমাকে রাখো" এ দাবি করিতে হইলে আরও কিছু চাই। মনের আম-দরবারে আপন-আপন রূপ লইয়া ভাব লইয়া নানা জিনিস হাজির হয়, মন তাহাদের কাহাকেও বলে, "বসো," কাহাকেও বলে "আচ্ছা যাও"।

যাহারা আর্টিস্ট তাহাদের লক্ষ্য এই যে, তাহাদের সৃষ্ট পদার্থ মনের দরবারে নিত্য আসন পাইবে। যে সব গুণীর সৃষ্টিতে রূপ আপনার প্রমাণে, ভাব আপনার লাবণ্যে, প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে তাহারাই ক্লাসিক হইয়াছে, তাহারাই নিত্য হইয়াছে।

অতএব চিত্রকলায় ওস্তাদের ওস্তাদি, রূপে ও ভাবে তেমন নয়, যেমন প্রমাণে ও লাবণ্যে। এই সত্য-ওজনের আন্দাজটি পুঁথিগত বিদ্যায় পাইবার জো নাই। ইহাতে স্বাভাবিক প্রতিভার দরকার। দৈহিক ওজনবোধটি স্বাভাবিক হইয়া উঠিলে তবেই চলা সহজ হয়। তবেই নূতন নূতন বাধায়, পথের নূতন নূতন আঁকেবাঁকে আমরা দেহের গতিটাকে অনায়াসে বাহিরের অবস্থার সঙ্গে তানে লয়ে মিলাইয়া চলিতে পারি। এই ওজনবোধ একেবারে ভিতরের জিনিস যদি না হয় তবে রেলগাড়ির মতো একই বাঁধা রাস্তায় কলের টানে চলিতে হয়, এক ইঞ্চি ডাইনে বাঁয়ে হেলিলেই সর্বনাশ। তেমনি রূপ ও ভাবের সম্বন্ধে যার ওজনবোধ অন্তরের জিনিস সে "নব-নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি"র পথে কলাসৃষ্টিকে চালাইতে পারে। যার সে বোধ নাই সে ভয়ে ভয়ে একই বাঁধা রাস্তায় ঠিক এক লাইনে চলিয়া প'টো হইয়া কারিগর হইয়া ওঠে, সে সীমার সঙ্গে সীমার নূতন সম্বন্ধ জমাইতে পারে না। এই জন্য নূতন সম্বন্ধমাত্রকে সে বাঘের মতো দেখে।

যাহা হউক এতক্ষণ ছবির ষড়ঙ্গের আমরা চুটি অঙ্গ দেখিলাম, বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ। এইবার পঞ্চম অঙ্গে বাহির ও ভিতর যে-কোঠায় এক হইয়া মিলিয়াছে তাহার কথা আলোচনা করা যাক। সেটার নাম "সাদৃশ্যং"। নকল করিয়া যে সাদৃশ্য মেলে এতক্ষণে সেই কথাটা আসিয়া পড়িল এমন যদি কেহ মনে করেন তবে শাস্ত্রবাক্য তাঁহার

পক্ষে বৃথা হইল। ঘোড়াগোরুকে ঘোড়াগোরু করিয়া আঁকিবার জন্য রেখা প্রমাণ ভাব লাবণ্যের এত বড়ো উদ্‌যোগপর্ব কেন? তাহা হইলে এমন কথাও কেহ মনে করিতে পারেন উত্তর-গোগৃহে গোরু-চুরি কাণ্ডের জন্যই উদ্‌যোগ পর্ব, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের জন্য নহে।

সাদৃশ্যের দুইটা দিক আছে। একটা, রূপের সঙ্গে রূপের সাদৃশ্য; আর-একটা ভাবের সঙ্গে রূপের সাদৃশ্য। একটা বাহিরের, একটা ভিতরের। দুটাই দরকার। কিন্তু সাদৃশ্যকে মুখ্যভাবে বাহিরের বলিয়া ধরিয়া লইলে চলিবে না।

যখনই রেখা ও প্রমাণের কথা ছাড়াইয়া ভাব লাবণ্যের কথা পাড়া হইয়াছে তখনই বোঝা গিয়াছে গুণীর মনে যে ছবিটি আছে সে প্রধানত রেখার ছবি নহে তাহা রসের ছবি। তাহার মধ্যে এমন একটি অনির্বচনীয়তা আছে যাহা প্রকৃতিতে নাই। অন্তরের সেই অমৃতরসের ভাবচ্ছবিকে বাহিরে দৃশ্যমান করিতে পারিলে তবেই রসের সহিত রূপের সাদৃশ্য পাওয়া যায়, তবেই অন্তরের সহিত বাহিরের মিল হয়। অদৃশ্য তবেই দৃশ্যে আপনার প্রতিরূপ দেখে। নানারকম চিত্রবিচিত্র করা গেল, নৈপুণ্যের অন্ত রহিল না, কিন্তু ভিতরের রসের ছবির সঙ্গে বাহিরের রূপের ছবির সাদৃশ্য রহিল না; রেখাভেদ ও প্রমাণের সঙ্গে ভাব ও লাবণ্যের জোড় মিলিল না;—হয়তো রেখার দিকে ত্রুটি রহিল নয়তো ভাবের দিকে—পরস্পর পরস্পরের সদৃশ হইল না। বরও আসিল কনেও আসিল, কিন্তু অশুভ লগ্নে মিলনের মন্ত্র ব্যর্থ হইয়া গেল। মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ, বাহিরের লোক হয়তো পেট ভরিয়া সন্দেশ খাইয়া খুব জয়ধ্বনি করিল কিন্তু অন্তরের খবর যে জানে সে বুঝিল সব মাটি হইয়াছে! চোখ-ভোলানো চাতুরীতেই বেশি লোক মজে, কিন্তু, রূপের সঙ্গে রসের সাদৃশ্যবোধ যার আছে, চোখের আড়ে তাকাইলেই যে-লোক বুঝিতে পারে রসটি রূপের মধ্যে ঠিক আপনার চেহারা পাইয়াছে কিনা, সেই তো রসিক। বাতাস যেমন সূর্যের কিরণকে চারিদিকে ছড়াইয়া দিবার কাজ করে তেমনি গুণীর সৃষ্ট কলাসৌন্দর্যকে লোকালয়ের সর্বত্র ছড়াইয়া দিবার ভার এই রসিকের উপর। কেননা যে ভরপুর করিয়া পাইয়াছে সে স্বভাবতই না দিয়া থাকিতে পারে না,—সে জানে তস্মৈ যন্ন দীয়তে। সর্বত্র এবং সকল কালেই মানুষ এই মধ্যস্থকে মানে! ইহারা ভাবলোকের ব্যাঙ্কের কর্তা—এরা নানাদিক হইতে নানা ডিপজিটের টাকা পায় - সে টাকা বন্ধ করিয়া রাখিবার জন্য নহে;—সংসারে নানা কারবারে নানা লোক টাকা খাটাইতে চায়, তাহাদের নিজের মূলধন যথেষ্ট নাই—এই ব্যাঙ্কার নহিলে তাহাদের কাজ বন্ধ।

এমনি করিয়া রূপের ভেদ প্রমাণে বাঁধা পড়িল, ভাবের বেগ লাবণ্যে সংযত হইল, ভাবের সঙ্গে রূপের সাদৃশ্য পটের উপর সুসম্পূর্ণ হইয়া ভিতরে বাহিরে পুরাপুরি মিল হইয়া গেল - এই তো সব চুকিল। ইহার পর আর বাকি রহিল কী?

কিন্তু আমাদের শিল্পশাস্ত্রের বচন এখনও যে ফুরাইল না! স্বয়ং দ্রৌপদীকে সে ছাড়াইয়া গেল। পাঁচ পার হইয়া যে ছয়ে আসিয়া ঠেকিল সেটা বর্ণিকাভঙ্গং— রঙের ভঙ্গিমা।

এইখানে বিষম খটকা লাগিল। আমার পাশে এক গুণী বসিয়া আছেন তাঁরই কাছ হইতে এই শ্লোকটি পাইয়াছি। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, রূপ, অর্থাৎ রেখার কারবার যেটা ষড়ঙ্গের গোড়াতেই আছে আর এই রঙের ভঙ্গি যেটা তার সকলের শেষে স্থান পাইল চিত্রকলায় এ দুটোর প্রাধান্য তুলনায় কার কত?

তিনি বলিলেন, বলা শক্ত।

তাঁর পক্ষে শক্ত বই কি? দুটির পরেই যে তাঁর অন্তরের টান, এমন স্থলে নিরাসক্ত মনে বিচার করিতে বসা তাঁর দ্বারা চলিবে না। আমি অব্যবসায়ী, অতএব বাহির হইতে ঠাহর করিয়া দেখা আমার পক্ষে সহজ।

রং আর রেখা এই দুই লইয়াই পৃথিবীর সকল রূপ আমাদের চোখে পড়ে। ইহার মধ্যে রেখাটাতেই রূপের সীমা টানিয়া দেয়। এই সীমার নির্দেশই ছবির প্রধান জিনিস। অনির্দিষ্টতা গানে আছে, গন্ধে আছে কিন্তু ছবিতে থাকিতে পারে না।

এই জন্যই কেবল রেখাপাতের দ্বারা ছবি হইতে পারে কিন্তু কেবল বর্ণপাতের দ্বারা ছবি হইতে পারে না। বর্ণটা রেখার আনুষঙ্গিক।

সাদার উপরে কালোর দাগ এই হইল ছবির গোড়া। আমরা সৃষ্টিতে যাহা চোখে দেখিতেছি তাহা অসীম আলোকের সাদার উপরকার সসীম-দাগ। এই দাগটা আলোর বিরুদ্ধ তাই আলোর উপরে ফুটিয়া উঠে। আলোর উলটা কালো, আলোর বুকের উপরে ইহার বিহার।

কালো আপনাকে আপনি দেখাইতে পারে না। স্বয়ং সে শুধু অন্ধকার, দোয়াতের কালির মতো। সাদার উপর যেই সে দাগ কাটে অমনি সেই মিলনে সে দেখা দেয়। সাদা আলোকের পটটি বৈচিত্র্যহীন ও স্থির, তার উপরে কালো রেখাটি বিচিত্রনৃত্যে ছন্দে ছন্দে ছবি হইয়া উঠিতেছে। শুভ্র ও নিস্তব্ধ অসীম রজতগিরিনিভ, তারই বুকের উপর কালীর পদক্ষেপ চঞ্চল হইয়া সীমায় সীমায় রেখায় রেখায় ছবির পরে ছবির ছাপ মারিতেছে। কালীরেখার সেই নৃত্যের ছন্দটি লইয়া চিত্রকলার রূপভেদাঃ প্রমাণানি। নৃত্যের বিচিত্র বিক্ষেপগুলি রূপের ভেদ, আর তার ছন্দের তালটিই প্রমাণ।

আলো আর কালো অর্থাৎ আলো আর না-আলোর দ্বন্দ্ব খুবই একান্ত। রংগুলি তারই মাঝখানে মধ্যস্থতা করে। ইহারা যেন বীণায় আলাপের মীড়—এই মীড়ের দ্বারা সুর যেন সুরের অতীতকে পর্দায় পর্দায় ইশারায় দেখাইয়া দেয়—ভঙ্গিতে ভঙ্গিতে

সুর আপনাকে অতিক্রম করিয়া চলে। তেমনি রঙের ভঙ্গি দিয়া রেখা আপনাকে অতিক্রম করে; রেখা যেন অরেখার দিকে আপন ইশারা চালাইতে থাকে। রেখা জিনিসটা সুনির্দিষ্ট,—আর রং জিনিসটা নির্দিষ্ট অনির্দিষ্টের সেতু, তাহা সাদা কালোর মাঝখানকার নানা টানের মীড়। সীমার বাঁধনে বাঁধা কালো রেখার তারটাকে সাদা যেন খুব তীব্র করিয়া আপনার দিকে টানিতেছে, কালো তাই কড়ি হইতে অতি-কোমলের ভিতর দিয়া রঙে রঙে অসীমকে স্পর্শ করিয়া চলিয়াছে। তাই বলিতেছি রং জিনিসটা রেখা এবং অরেখার মাঝখানের সমস্ত ভঙ্গি। রেখা ও অরেখার মিলনে যে ছবির সৃষ্টি সেই ছবিতে এই মধ্যস্থের প্রয়োজন। অরেখ সাদার বুকের উপর যেখানে রেখা-কালীর নৃত্য সেখানে এই রংগুলি যোগিনী। শাস্ত্রে ইহাদের নাম সকলের শেষে থাকিলেও ইহাদের কাজ নেহাত কম নয়।

পূর্বেই বলিয়াছি সাদার উপর শুধু-রেখার ছবি হয়, কিন্তু সাদার উপর শুধু-রঙে ছবি হয় না। তার কারণ রং জিনিসটা মধ্যস্থ—দুই পক্ষের মাঝখানে ছাড়া কোনো স্বতন্ত্র জায়গায় তার অর্থ ই থাকে না।

এই গেল বর্ণিকাভঙ্গ।

এই ছবির ছয় অঙ্গের সঙ্গে কবিতার কিরূপ মিল আছে তাহা দেখাইলেই কথাটা বোঝা হয়তো সহজ হইবে।

ছবির স্থূল উপাদান যেমন রেখা তেমনি কবিতার স্থূল উপাদান হইল বাণী। সৈন্যদলের চালের মতো সেই বাণীর চালে একটা ওজন একটা প্রমাণ আছে—তাহাই ছন্দ। এই বাণী ও বাণীর প্রমাণ বাহিরের অঙ্গ, ভিতরের অঙ্গ ভাব ও মাধুর্য।

এই বাহিরের সঙ্গে ভিতরকে মিলাইতে হইবে। বাহিরের কথাগুলি ভিতরের ভাবের সদৃশ হওয়া চাই; তাহা হইলেই সমস্তটায় মিলিয়া কবির কাব্য কবির কল্পনার সাদৃশ্য লাভ করিবে।

বহিঃসাদৃশ্য, অর্থাৎ রূপের সঙ্গে রূপের সাদৃশ্য, অর্থাৎ যেটাকে দেখা যায় সেইটাকে ঠিকঠাক করিয়া বর্ণনা করা কবিতার প্রধান জিনিস নহে। তাহা কবিতার লক্ষ্য নহে উপলক্ষ্য মাত্র। এইজন্য বর্ণনামাত্রই যে-কবিতার পরিণাম, রসিকেরা তাঁহাকে উঁচুদরের কবিতা বলিয়া গণ্য করেন না। বাহিরকে ভিতরের করিয়া দেখা ও ভিতরকে বাহিরের রূপে ব্যক্ত করা ইহাই কবিতা এবং সমস্ত আর্টেরই লক্ষ্য।

সৃষ্টিকর্তা একেবারেই আপন পরিপূর্ণতা হইতে সৃষ্টি করিতেছেন তাঁর আর-কোনো উপসর্গ নাই। কিন্তু বাহিরের সৃষ্টি মানুষের ভিতরের তারে ঘা দিয়া যখন একটা মানস পদার্থকে জন্ম দেয়, যখন একটা রসের সুর বাজায় তখনই সে আর থাকিতে পারে না,

বাহিরে সৃষ্ট হইবার কামনা করে। ইহাই মানুষের সকল সৃষ্টির গোড়ার কথা। এই জন্যই মানুষের সৃষ্টিতে ভিতর বাহিরের ঘাত প্রতিঘাত। এই জন্য মানুষের সৃষ্টিতে বাহিরের জগতের আধিপত্য আছে। কিন্তু একাধিপত্য যদি থাকে, যদি প্রকৃতির ধামা-ধরা হওয়াই কোনো আর্টিস্টের কাজ হয় তবে তার দ্বারা সৃষ্টিই হয় না। শরীর বাহিরের খাবার খায় বটে কিন্তু তাহাকে অবিকৃত বমন করিবে বলিয়া নয়। নিজের মধ্যে তাহার বিকার জন্মাইয়া তাহাকে নিজের করিয়া লইবে বলিয়া। তখন সেই খাদ্য একদিকে রসরক্তরূপে বাহ্য আকার, আর-এক দিকে শক্তি স্বাস্থ্য সৌন্দর্যরূপে আন্তর আকার ধারণ করে। ইহাই শরীরের সৃষ্টিকার্য। মনের সৃষ্টিকার্যও এমনি-তরো। তাহা বাহিরের বিশ্বকে বিকারের দ্বারা যখন আপনার করিয়া লয় তখন সেই মানস পদার্থটা একদিকে বাক্য রেখা সুর প্রভৃতি বাহ্য আকার, অন্যদিকে সৌন্দর্য শক্তি প্রভৃতি আন্তর আকার ধারণ করে। ইহাই মনের সৃষ্টি—যাহা দেখিলাম অবিকল তাহাই দেখানো সৃষ্টি নহে।

তারপরে, ছবিতে যেমন বর্ণিকাভঙ্গ কবিতায় তেমনি ব্যঞ্জনা (suggestive-ness)। এই ব্যঞ্জনার দ্বারা কথা আপনার অর্থকে পার হইয়া যায়। যাহা বলে তার চেয়ে বেশি বলে। এই ব্যঞ্জনা ব্যক্ত ও অব্যক্তর মাঝখানকার মীড়। কবির কাব্যে এই ব্যঞ্জনা বাণীর নির্দিষ্ট অর্থের দ্বারা নহে, বাণীর অনির্দিষ্ট ভঙ্গির দ্বারা, অর্থাৎ বাণীর রেখার দ্বারা নহে, তাহার রঙের দ্বারা সৃষ্ট হয়।

আসল কথা, সকল প্রকৃত আর্টেই একটা বাহিরের উপকরণ, আর একটা চিত্তের উপকরণ থাকা চাই—অর্থাৎ একটা রূপ, আর একটা ভাব। সেই উপকরণকে সংযমের দ্বারা বাঁধিয়া গড়িতে হয়; বাহিরের বাঁধন প্রমাণ, ভিতরের বাঁধন লাবণ্য। তার পরে সেই ভিতর বাহিরের উপকরণকে মিলাইতে হইবে কিসের জন্য? সাদৃশ্যের জন্য। কিসের সঙ্গে সাদৃশ্য? না, ধ্যানরূপের সঙ্গে কল্পরূপের সঙ্গে সাদৃশ্য। বাহিরের রূপের সঙ্গে সাদৃশ্যই যদি মুখ্য লক্ষ্য হয় তবে ভাব ও লাবণ্য কেবল যে অনাবশ্যক হয় তাহা নহে, তাহা বিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়। এই সাদৃশ্যটিকে ব্যঞ্জনার রঙে রঙাইতে পারিলে সোনায় সোহাগা—কারণ তখন তাহা সাদৃশ্যের চেয়ে বড়ো হইয়া ওঠে,—তখন তাহা কতটা যে বলিতেছে তাহা স্বয়ং রচয়িতাও জানে না—তখন সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি তাহার সংকল্পকেও ছাড়াইয়া যায়।

অতএব, দেখা যাইতেছে ছবির যে ছয় অঙ্গ, সমস্ত আর্টের অর্থাৎ আনন্দরূপেরই তাই।

১৩২২

সোনার কাঠি

রূপকথায় আছে, রাক্ষসের জাদুতে রাজকন্যা ঘুমিয়ে আছেন। যে পুরীতে আছেন সে সোনার পুরী, যে পালঙ্কে শুয়েছেন সে সোনার পালঙ্ক; সোনা মানিকের অলংকারে তাঁর গা ভরা। কিন্তু কড়াক্কড় পাহারা, পাছে কোনো সুযোগে বাহিরের থেকে কেউ এসে তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। তাতে দোষ কী? দোষ এই যে, চেতনার অধিকার যে বড়ো। সচেতনকে যদি বলা যায় তুমি কেবল এইটুকুর মধ্যেই চিরকাল থাকবে, তার এক পা বাইরে যাবে না, তাহলে তার চৈতন্যকে অপমান করা হয়। ঘুম পাড়িয়ে রাখার সুবিধা এই যে তাতে দেহের প্রাণটা টি'কে থাকে কিন্তু মনের বেগটা হয় একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, নয় সে অদ্ভুত স্বপ্নের পথহীন ও লক্ষ্যহীন অন্ধলোকে বিচরণ করে।

আমাদের দেশের গীতিকলার দশাটা এই রকম। সে মোহ-রাক্ষসের হাতে পড়ে বহুকাল থেকে ঘুমিয়ে আছে। যে ঘরটুকু যে পালঙ্কটুকুর মধ্যে এই সুন্দরীর স্থিতি তার ঐশ্বর্যের সীমা নেই; চারিদিকে কারুকার্য, সে কত সূক্ষ্ম কত বিচিত্র! সেই চেড়ির দল, যাদের নাম ওস্তাদি, তাদের চোখে ঘুম নেই; তারা শত শত বছর ধরে সমস্ত আসা যাওয়ার পথ আগলে বসে আছে, পাছে বাহির থেকে কোনো আগন্তুক এসে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়।

তাতে ফল হয়েছে এই যে, যে কালটা চলছে রাজকন্যা তার গলায় মালা দিতে পারেনি, প্রতিদিনের নূতন নূতন ব্যবহারে তার কোনো যোগ নেই। সে আপনার সৌন্দর্যের মধ্যে বন্দী, ঐশ্বর্যের মধ্যে অচল।

কিন্তু তার যত ঐশ্বর্য যত সৌন্দর্যই থাক তার গতিশক্তি যদি না থাকে তাহলে চলতি কাল তার ভার বহন করতে রাজি হয় না। একদিন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পালঙ্কের উপর অচলাকে শুইয়ে রেখে সে আপন পথে চলে যায়—তখন কালের সঙ্গে কলার বিচ্ছেদ ঘটে। তাতে কালেরও দারিদ্র্য, কলারও বৈকল্য।

আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি আমাদের দেশে গান জিনিসটা চলছে না। ওস্তাদরা বলছেন, গান জিনিসটা তো চলবার জন্যে হয় নি, সে বৈঠকে বসে থাকবে তোমরা এসে সমের কাছে খুব জোরে মাথা নেড়ে যাবে; কিন্তু মুশকিল এই যে, আমাদের বৈঠকখানার যুগ চলে গেছে, এখন আমরা যেখানে একটু বিশ্রাম করতে পাই সে মুসাফিরখানায়। যা কিছু স্থির হয়ে আছে তার খাতিরে আমরা স্থির হয়ে থাকতে পারব না। আমরা যে নদী বেয়ে চলছি সে নদী চলছে, যদি নৌকোটা না চলে তবে খুব দামি নৌকো হলেও তাকে ত্যাগ করে যেতে হবে।

সংসারে স্থাবর অস্থাবর দুই জাতের মানুষ আছে অতএব বর্তমান অবস্থাটা ভালো কি মন্দ তা নিয়ে মতভেদ থাকবেই। কিন্তু মত নিয়ে করব কী? যেখানে একদিন ডাঙা ছিল সেখানে আজ যদি জল হয়েই থাকে তবে সেখানকার পক্ষে দামি চৌঘুড়ির চেয়ে কলার ভেলাটাও যে ভালো।

পঞ্চাশ বছর আগে একদিন ছিল যখন বড়ো বড়ো গাইয়ে বাজিয়ে দূরদেশ থেকে কলকাতা শহরে আসত। ধনীদের ঘরে মজলিস বসত, ঠিক সমে মাথা নড়তে পারে এমন মাথা গুনতিতে নেহাত কম ছিল না। এখন আমাদের শহরে বক্তৃতাসভার অভাব নেই, কিন্তু গানের মজলিস বন্ধ হয়ে গেছে। সমস্ত তানমানলয় সমেত বৈঠকি গান পুরোপুরি বরদাস্ত করতে পারে এত বড়ো মজবুত লোক এখনকার যুবকদের মধ্যে প্রায় দেখাই যায় না।

চর্চা নেই বলে জবাব দিলে আমি শুনব না। মন নেই বলেই চর্চা নেই। আকবরের রাজত্ব গেছে এ কথা আমাদের মানতেই হবে। খুব ভালো রাজত্ব, কিন্তু কী করা যাবে—সে নেই। অথচ গানেতেই যে সে রাজত্ব বহাল থাকবে একথা বললে অন্যায় হবে। আমি বলছিনে আকবরের আমলের গান লুপ্ত হয়ে যাবে—কিন্তু এখনকার কালের সঙ্গে যোগ রেখে তাকে টিঁকতে হবে—সে যে বর্তমান কালের মুখ বন্ধ করে দিয়ে নিজেরই পুনরাবৃত্তিকে অন্তহীন করে তুলবে তা হতেই পারবে না।

সাহিত্যের দিক থেকে উদাহরণ দিলে আমার কথাটা স্পষ্ট হবে। আজ পর্যন্ত আমাদের সাহিত্যে যদি কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, মনসার ভাসানের পুনরাবৃত্তি নিয়ত চলতে থাকত তাহলে কী হত? পনেরো আনা লোক সাহিত্য পড়া ছেড়েই দিত। বাংলার সকল গল্পই যদি বাসবদত্তা কাদম্বরীর ছাঁচে ঢালা হত তাহলে জাতে ঠেলার ভয় দেখিয়ে সে গল্প পড়াতে হত।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী কাদম্বরীর আমি নিন্দা করছিনে। সাহিত্যের শোভাযাত্রার মধ্যে চিরকালই তাদের একটা স্থান আছে কিন্তু যাত্রাপথের সমস্তটা জুড়ে তারাই যদি আড্ডা করে বসে, তাহলে সে পথটাই মাটি, আর তাদের আসরে কেবল তাকিয়া পড়ে থাকবে, মানুষ থাকবে না।

বঙ্কিম আনলেন সাতসমুদ্রপারের রাজপুত্রকে আমাদের সাহিত্য রাজকন্যার পালঙ্কের শিয়রে। তিনি যেমনি ঠেকালেন সোনার কাঠি, অমনি সেই বিজয়-বসন্ত লয়লামজনুর হাতির দাঁতে বাঁধানো পালঙ্কের উপর রাজকন্যা নড়ে উঠলেন। চলতিকালের সঙ্গে তাঁর মালা বদল হয়ে গেল, তার পর থেকে তাঁকে আজ ঠেকিয়ে রাখে কে?

যারা মনুষ্যত্বের চেয়ে কৌলীন্যকে বড়ো করে মানে তারা বলবে ওই রাজপুত্রটা

যে বিদেশী। তারা এখন বলে, এ সমস্তই ভুয়ো ; বস্তুতন্ত্র যদি কিছু থাকে তো সে ওই কবিকঙ্কণ চণ্ডী, কেননা এ আমাদের খাঁটি মাল। তাদের কথাই যদি সত্য হয় তাহলে এ কথা বলতেই হবে নিছক খাঁটি বস্তুতন্ত্রকে মানুষ পছন্দ করে না। মানুষ তাকেই চায় যা বস্তু হয়ে বাস্তু গেড়ে বসে না, যা তার প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে চলে, যা তাকে মুক্তির স্বাদ দেয়।

বিদেশের সোনার কাঠি যে জিনিসকে মুক্তি দিয়েছে সে তো বিদেশী নয়—সে যে আমাদের আপন প্রাণ। তার ফল হয়েছে এই যে, যে বাংলাভাষাকে ও সাহিত্যকে একদিন আধুনিকের দল ছুঁতে চাইত না এখন তাকে নিয়ে সকলেই ব্যবহার করছে ও গৌরব করছে। অথচ যদি ঠাহর করে দেখি তবে দেখতে পাব গদ্যে পদ্যে সকল জায়গাতেই সাহিত্যের চালচলন সাবেক কালের সঙ্গে সম্পূর্ণ বদলে গেছে। যাঁরা তাকে জাতিচ্যুত বলে নিন্দা করেন ব্যবহার করবার বেলা তাকে তাঁরা বর্জন করতে পারেন না।

সমুদ্রপারের রাজপুত্র এসে মানুষের মনকে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে জাগিয়ে দেয় এটা তার ইতিহাসে চিরদিন ঘটে আসছে। আপনার পূর্ণ শক্তি পাবার জন্যে বৈষম্যের আঘাতের অপেক্ষা তাকে করতেই হয়। কোনো সভ্যতাই একা আপনাকে আপনি সৃষ্টি করেনি। গ্রীসের সভ্যতার গোড়ায় অন্য সভ্যতা ছিল এবং গ্রীস বরাবর ইজিপ্ট ও এশিয়া থেকে ধাক্কা খেয়ে এসেছে। ভারতবর্ষে দ্রাবিড় মনের সঙ্গে আর্য সংঘাত ও ও সম্মিলন ভারতসভ্যতা সৃষ্টির মূল উপকরণ, তার উপরে গ্রীস রোম পারস্য তাকে কেবলই নাড়া দিয়েছে। য়ুরোপীয় সভ্যতায় যে সব যুগকে পুনর্জন্মের যুগ বলে সে সমস্তই অন্য দেশ ও অন্য কালের সংঘাতের যুগ। মানুষের মন বাহির হতে নাড়া পেলে তবে আপনার অন্তরকে সত্যভাবে লাভ করে এবং তার পরিচয় পাওয়া যায় যখন দেখি সে আপনার বাহিরের জীর্ণ বেড়াগুলোকে ভেঙে আপনার অধিকার বিস্তার করছে। এই অধিকার বিস্তারকে একদল লোক দোষ দেয়, বলে ওতে আমরা নিজেকে হারালুম—তারা জানে না নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া নিজেকে হারিয়ে যাওয়া নয় - কারণ বৃদ্ধি মাত্রই নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া।

সম্প্রতি আমাদের দেশে চিত্রকলার যে নবজীবন লাভের লক্ষণ দেখছি তার মূলেও সেই সাগরপারের রাজপুত্রের সোনার কাঠি আছে। কাঠি ছোঁওয়ার প্রথম অবস্থায় ঘুমের ঘোরটা যখন সম্পূর্ণ কাটে না, তখন আমরা নিজের শক্তি পুরোপুরি অনুভব করিনে, তখন অনুকরণটাই বড়ো হয়ে ওঠে, কিন্তু ঘোর কেটে গেলেই আমরা নিজের জোরে চলতে পারি। সেই নিজের জোরে চলার একটা লক্ষণ এই যে তখন আমরা পরের পথেও নিজের শক্তিতে চলতে পারি। পথ নানা ; অভিপ্রায়টি আমার, শক্তিটি আমার।

যদি পথের বৈচিত্র্য রুদ্ধ করি, যদি একই বাঁধা পথ থাকে, তাহলে অভিপ্রায়ের স্বাধীনতা থাকে না—তাহলে কলের চাকার মতো চলতে হয়। সেই কলের চাকার পথটাকে চাকার স্বকীয় পথ বলে গৌরব করার মতো অদ্ভুত প্রহসন আর জগতে নেই।

আমাদের সাহিত্যে চিত্রে সমুদ্রপারের রাজপুত্র এসে পৌঁচেছে। কিন্তু সংগীতে পৌঁছোয়নি। সেই জন্যেই আজও সংগীত জাগতে দেরি করছে। অথচ আমাদের জীবন জেগে উঠেছে। সেই জন্যে সংগীতের বেড়া টলমল করছে। এ কথা বলতে পারব না, আধুনিকের দল গান একেবারে বর্জন করেছে। কিন্তু তারা যে গান ব্যবহার করছে, যে গানে আনন্দ পাচ্ছে সে গান জাত-খোয়ানো গান। তার শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার নেই। কীর্তনে বাউলে বৈঠকে মিলিয়ে যে জিনিস আজ তৈরি হয়ে উঠছে সে আচার-ভ্রষ্ট। তাকে ওস্তাদের দল নিন্দা করছে। তার মধ্যে নিন্দনীয়তা নিশ্চয়ই অনেক আছে। কিন্তু অনিন্দনীয়তাই যে সব চেয়ে বড়ো গুণ তা নয়। প্রাণশক্তি শিবের মতো অনেক বিষ হজম করে ফেলে। লোকের ভালো লাগছে, সবাই শুনতে চাচ্ছে, শুনতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ছে না,—এটা কম কথা নয়। অর্থাৎ গানের পঙ্গুতা ঘুচল, চলতে শুরু করল। প্রথম চালটা সর্বাঙ্গসুন্দর নয়, তার অনেক ভঙ্গি হাস্যকর এবং কুশ্রী—কিন্তু সব চেয়ে আশার কথা যে, চলতে শুরু করেছে—সে বাঁধন মানছে না। প্রাণের সঙ্গে সম্বন্ধই যে তার সব চেয়ে বড়ো সম্বন্ধ, প্রথার সঙ্গে সম্বন্ধটা নয়, এই কথাটা এখন-কার এই গানের গোলমেলে হাওয়ার মধ্যে বেজে উঠেছে। ওস্তাদের কারদানিতে আর তাকে বেঁধে রাখতে পারবে না।

দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সুরের মধ্যে ইংরেজি সুরের স্পর্শ লেগেছে বলে কেউ কেউ তাকে হিন্দুসংগীত থেকে বহিষ্কৃত করতে চান। যদি দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দুসংগীতে বিদেশী সোনার কাঠি ছুঁইয়ে থাকেন তবে সরস্বতী নিশ্চয়ই তাঁকে আশীর্বাদ করবেন। হিঁদুসংগীত বলে যদি কোনো পদার্থ থাকে তবে সে আপনার জাত বাঁচিয়ে চলুক; কারণ তার প্রাণ নেই, তার জাতই আছে। হিন্দুসংগীতের কোনো ভয় নেই—বিদেশের সংস্রবে সে আপনাকে বড়ো করেই পাবে। চিত্তের সঙ্গে চিত্তের সংঘাত আজ লেগেছে—সেই সংঘাতে সত্য উজ্জ্বল হবে না, নষ্টই হবে, এমন আশঙ্কা যে ভীরু করে, যে মনে করে সত্যকে সে নিজের মাতামহীর জীর্ণ কাঁথা আড়াল করে ঘিরে রাখলে তবেই সত্য টি কে থাকবে, আজকের দিনে সে যত আস্ফালনই করুক তাকে পথ ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হবে। কারণ, সত্য হিঁদুর সত্য নয়, পল্তের করে ফোঁটা ফোঁটা পুঁথির বিধান খাইয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় না। চারদিক থেকে মানুষের নাড়া খেলেই সে আপনার শক্তিকে প্রকাশ করতে পারে।

১৩২২

কৃপণতা

দেশের কাজে যারা টাকা সংগ্রহ করিয়া ফিরিতেছেন তাঁদের কেহ কেহ আক্ষেপ করিতেছিলেন যে, টাকা কেহ সহজে দিতে চাহেন না. এমন কি, যাঁদের আছে এবং যাঁরা দেশানুরাগের আড়ম্বর করিতে ছাড়েন না, তাঁরাও।

ঘটনা তো এই কিন্তু কারণটা কী খুঁজিয়া বাহির করা চাই। রেলগাড়ির পয়লা দোসরা শ্রেণীর কামরার দরজা বাহিরের দিকে টানিয়া খুলিতে গিয়া যে ব্যক্তি হয়রান হইয়াছে তাকে এটা দেখাইয়া দেওয়া যাইতে পারে যে, দরজা হয় বাহিরের দিকে খোলে, নয় ভিতরের দিকে। দুই দিকেই সমান খোলে এমন দরজা বিরল।

আমাদের দেশে ধনের দরজাটা বহুকাল হইতে এমন করিয়া বানানো যে, সে ভিতরের দিকের ধাক্কাতেই খোলে। আজ তাকে বাহিরের দিকে টান দিবার দরকার হইয়াছে কিন্তু দরকারের খাতিরে কলকব্জা তো একেবারে একদিনেই বদল করা যায় না। সামাজিক মিস্ত্রিটা বুড়ো, কানে কম শোনে, তাকে তাগিদ দিতে গেলেই গরম হইয়া ওঠে।

মানুষের শক্তির মধ্যে একটা বাড়তির ভাগ আছে। সেই শক্তি মানুষের নিজের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি। জন্তুর শক্তি পরিমিত বলিয়াই তারা কিছু সৃষ্টি করে না, মানুষের শক্তি পরিমিতের বেশি বলিয়াই তারা সেই বাড়তির ভাগ লইয়া আপনার সভ্যতা সৃষ্টি করিতে থাকে।

কোনো একটি দেশের সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে এই কথাটি ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, সেখানে মানুষ আপন বাড়তি অংশ দিয়া কী সৃষ্টি করিয়াছে, অর্থাৎ জাতির ঐশ্বর্য আপন বসতির জন্য কোন্ ইমারত বানাইয়া তুলিতেছে?

ইংলণ্ডে দেখিতে পাই সেখানকার মানুষ নিজের প্রয়োজনটুকু সারিয়া বহু যুগ হইতে ব্যয় করিয়া আসিতেছে রাষ্ট্রনৈতিক স্বাতন্ত্র্য গড়িয়া তুলিতে এবং তাকে জাগাইয়া রাখিতে।

আমাদের দেশের শক্তির অতিরিক্ত অংশ আমরা খরচ করিয়া আসিতেছি রাষ্ট্রতন্ত্রের জন্য নয়, পরিবারতন্ত্রের জন্য। আমাদের শিক্ষাদীক্ষা ধর্মকর্ম এই পরিবারতন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া নিজেকে প্রকাশ করিতেছে।

আমাদের দেশে এমন অতি অল্পলোকই আছে যার অধিকাংশ সামর্থ্য প্রতিদিন আপন পরিবারের জন্য ব্যয় করিতে না হয়। উমেদারির দুঃখে ও অপমানে আমাদের

তরুণ যুবকদের চোখের গোড়ায় কালি পড়িল, মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল, কিসের জন্য? নিজের প্রয়োজনটুকুর জন্য তো নয়। বাপ মা বৃদ্ধ, ভাইকটিকে পড়াইতে হইবে, দুটি বোনের বিবাহ বাকি, বিধবা বোন তার মেয়ে লইয়া তাদের বাড়িতেই থাকে, আর আর যত অনাথ অপোগণ্ডের দল আছে অন্য কোথাও তাদের আত্মীয় বলিয়া স্বীকার করেই না।

এদিকে জীবনযাত্রার চাল বাড়িয়া গেছে, জিনিসপত্রের দাম বেশি, চাকরির ক্ষেত্র সংকীর্ণ, ব্যবসাবুদ্ধির কোনো চর্চাই হয় নাই। কাঁধের জোর কমিল, বোঝার ভার বাড়িল, এই বোঝা দেশের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত। চাপ এত বেশি যে, নিজের ঘাড়ের কথাটা ছাড়া আর কোনো কথায় পুরা মন দিতে পারা যায় না। উঞ্ছবৃত্তি করি, লাথিঝাঁটা খাই, কন্যার পিতার গলায় ছুরি দিই, নিজেকে সকল রকমে হীন করিয়া সংসারের দাবি মেটাই।

রেলে ইস্টিমারে যখন দেশের সামগ্রীকে দূরে ছড়াইয়া দিত না, বাহিরের পৃথিবীর সঙ্গে আমদানি রপ্তানি একপ্রকার বন্ধ ছিল আমাদের সমাজের ব্যবস্থা তখনকার দিনের। তখন ছিল বাঁধের ভিতরকার বিধি। এখন বাঁধ ভাঙিয়াছে, বিধি ভাঙে নাই।

সমাজের দাবি তখন কলাও ছিল। সে দাবি যে কেবল পরিবারের বৃহৎ পরিধির দ্বারা প্রকাশ পাইত তাহা নহে—পরিবারের ক্রিয়াকর্মেও তার দাবি কম ছিল না। সেই সমস্ত ক্রিয়াকর্ম পালপার্বণ আত্মীয় প্রতিবেশী অনাহূত রবাহূত সকলকে লইয়া। তখন জিনিসপত্র সস্তা, চালচলন সাদা, এই জন্য ওজন যেখানে কম আয়তন সেখানে বেশি হইলে অসহ্য হইত না।

এদিকে সময় বদলাইয়াছে কিন্তু সমাজের দাবি আজও খাটো হয় নাই। তাই জন্মমৃত্যুবিবাহ প্রভৃতি সকল রকম পারিবারিক ঘটনাই সমাজের লোকের পক্ষে বিষম দুর্ভাবনার কারণ হইল। এর উপর নিত্যনৈমিত্তিকের নানাপ্রকার বোঝা চাপানোই রহিয়াছে।

এমন উপদেশ দিয়া থাকি পূর্বের মতো সাদাচালে চলিতেই বা দোষ কী? কিন্তু মানবচরিত্র শুধু উপদেশে চলে না,—এ তো ব্যোমযান নয় যে উপদেশের গ্যাসে তার পেট ভরিয়া দিলেই সে উধাও হইয়া চলিবে। দেশকালের টান বিষম টান। যখন দেশে কালে অসন্তোষের উপাদান অল্প ছিল, তখন সন্তোষ মানুষের সহজ ছিল। আজ-কাল আমাদের আর্থিক অবস্থার চেয়ে ঐশ্বর্যের দৃষ্টান্ত অনেক বেশি বড়ো হইয়াছে। ঠিক যেন এমন একটা জমিতে আসিয়া পড়িয়াছি যেখানে আমাদের পায়ের জোরের

চেয়ে জমির ঢাল অনেক বেশি,—সেখানে স্থির দাঁড়াইয়া থাকা শক্ত, অথচ চলিতে গেলে সুস্থভাবে চলার চেয়ে পড়িয়া মরার সম্ভাবনাই বেশি।

বিশ্বপৃথিবীর ঐশ্বর্য ছাতা জুতা থেকে আরম্ভ করিয়া গাড়ি বাড়ি পর্যন্ত নানা জিনিষে নানা মূর্তিতে আমাদের চোখের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে,- দেশের ছেলেবুড়ো সকলের মনে আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিমুহূর্তে বাড়াইয়া তুলিতেছে। সকলেই আপন সাধ্যমতো সেই আকাঙ্ক্ষার অনুযায়ী আয়োজন করিতেছে। ক্রিয়াকর্ম যা কিছু করি না কেন সেই সর্বজনীন আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাল রাখিয়া করিতে হইবে। লোক ডাকিয়া খাওয়াইব কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগেকার রসনাটা এখন নাই একথা ভুলিবার জো কী!

বিলাতে প্রত্যেক মানুষের উপর এই চাপ নাই। যতক্ষণ বিবাহ না করে ততক্ষণ সে স্বাধীন, বিবাহ করিলেও তার ভার আমাদের চেয়ে অনেক কম। কাজেই তার শক্তির উদ্বৃত্ত অংশ অনেকখানি নিজের হাতে থাকে। সেটা অনেকে নিজের ভোগে লাগায় সন্দেহ নাই। কিন্তু মানুষ যে-হেতুক মানুষ এই জন্য সে নিজেকে নিজের মধ্যেই নিঃশেষ করিতে পারে না। পরের জন্য খরচ করা তার ধর্ম। নিজের বাড়তি শক্তি যে অন্যকে না দেয়, সেই শক্তি দিয়া সে নিজেকে নষ্ট করে, সে পেটুকের মতো আহারের দ্বারাই আপনাকে সংহার করে। এমনতরো আত্মঘাতকগুলো পয়মাল হইয়া বাকি যারা থাকে তাদের লইয়াই সমাজ। বিলাতে সেই সমাজে সাধারণের দায় বহন করে, আমাদের দেশে পরিবারের দায়।

এদিকে নূতন শিক্ষায় আমাদের মনের মধ্যে এমন একটা কর্তব্যবুদ্ধি জাগিয়া উঠিতেছে যেটা একালের জিনিস। লোকহিতের ক্ষেত্র আমাদের মনের কাছে আজ দূরব্যাপী—দেশবোধ বলিয়া একটা বড়ো রকমের বোধ আমাদের মনে জাগিয়াছে। কাজেই বন্যা কিংবা দুর্ভিক্ষে লোকসাধারণ যখন আমাদের দ্বারে আসিয়া দাঁড়ায় তখন খালিহাতে তাকে বিদায় করা আমাদের পক্ষে কঠিন। কিন্তু কুল রাখাই আমাদের বরাবরের অভ্যাস, শ্যাম রাখিতে গেলে বাধে। নিজের সংসারের জন্য টাকা আনা, টাকা জমানো, টাকা খরচ করা আমাদের মজ্জাগত; সেটাকে বজায় রাখিয়া বাহিরের বড়ো দাবিকে মানা দুঃসাধ্য। মোমবাতির দুই মুখেই শিখা জ্বালানো চলে না। বাছুর যে গাভীর দুধ পেট ভরিয়া খাইয়া বসে সে গাভী গোয়ালার ভাঁড় ভরতি করিতে পারে না;—বিশেষত তার চরিয়া খাবার মাঠ যদি প্রায় লোপ পাইয়া থাকে।

পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের আর্থিক অবস্থার চেয়ে আমাদের ঐশ্বর্যের দৃষ্টান্ত বড়ো হইয়াছে। তার ফল হইয়াছে জীবনযাত্রাটা আমাদের পক্ষে প্রায় মরণযাত্রা হইয়া উঠিয়াছে। নিজের সম্বলে ভদ্রতারক্ষা করিবার শক্তি অল্পলোকের আছে, অনেকে

ভিক্ষা করে, অনেকে ধার করে, হাতে কিছু জমাইতে পারে এমন হাত তো প্রায় দেখি না। এই জন্য এখনকার কালের ভোগের আদর্শ আমাদের পক্ষে দুঃখভোগের আদর্শ।

ঠিক এই কারণেই নূতনকালের ত্যাগের আদর্শটা আমাদের শক্তিকে বহুদূরে ছাড়াইয়া গেছে। কেননা, আমাদের ব্যবস্থাটা পারিবারিক, আমাদের আদর্শটা সার্বজনীন। ক্রমাগতই ধার করিয়া ভিক্ষা করিয়া এই আদর্শটাকে ঠেলাঠেলি করিয়া চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে। যেটাকে আদর্শ বলিয়া গণ্য করিয়াছি সেটাকে ভালো করিয়া পালন করিতে অক্ষম হওয়াই চারিত্রনৈতিক হিসাবে দেউলে হওয়া। তাই, ভোগের দিক দিয়া যেমন আমাদের দেউলে অবস্থা ত্যাগের দিক দিয়াও তাই। এই জন্যই চাঁদা তুলিতে, বড়োলোকের স্মৃতি রক্ষা করিতে, বড়ো ব্যবসা খুলিতে, লোক-হিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে গিয়া নিজেকে ধিক্‌কার দিতেছি ও বাহিরের লোকের কাছে নিন্দা সহিতেছি।

আমাদের জন্মভূমি সুজলা সুফলা, চাষ করিয়া ফসল পাইতে কষ্ট নাই। এই জন্যই এমন এক সময় ছিল, যখন কৃষিমূলক সমাজে পরিবারবৃদ্ধিকে লোকবলবৃদ্ধি বলিয়া গণ্য করিত। কিন্তু এমনতরো বৃহৎ পরিবারকে একত্র করিতে হইলে তাহার বিধিবিধানের বাঁধন পাকা হওয়া চাই, এবং কর্তাকে নির্বিচারে না মানিয়া চলিলে চলে না। এই কারণে এমন সমাজে জন্মিবামাত্র বাঁধা নিয়মে জড়িত হইতে হয়। দানধ্যান পুণ্যকর্ম প্রভৃতি সমস্তই নিয়মে বদ্ধ; যারা ঘনিষ্ঠভাবে একত্র থাকিবে তাদের মধ্যে যাতে কর্তব্যের আদর্শের বিরোধ না ঘটে, অর্থাৎ নিজে চিন্তা না করিয়া যাতে একজন ঠিক অন্যজনের মতোই চোখ বুজিয়া চলিতে পারে সেই ভাবের যত বিধিবিধান।

প্রকৃতির প্রশ্রয় যেখানে কম, যেখানে মানুষের প্রয়োজন বেশি অথচ ধরণীর দাক্ষিণ্য বেশি নয় সেখানে বৃহৎ পরিবার মানুষের বলবৃদ্ধি করে না, ভারবৃদ্ধিই করে। চাষের উপলক্ষ্যে মানুষকে যেখানে এক জায়গায় স্থির হইয়া বসিতে হয় সেইখানেই মানুষের ঘনিষ্ঠতার সম্বন্ধ চারিদিকে অনেক ডালপালা ছড়াইবার জায়গা এবং সময় পায়। যারা লুঠপাট করে, পশু চরাইয়া বেড়ায়, দূর-দেশ হইতে অন্ন সংগ্রহ করে তারা যতটা পারে ভারমুক্ত হইয়া থাকে। তারা বাঁধা-নিয়মের মধ্যে আটকা পড়ে না; তারা নূতন নূতন দুঃসাহসিকতার মধ্যে ছুটিয়া গিয়া নূতন নূতন কাজের নিয়ম আপন বুদ্ধিতে উদ্ভাবিত করে। এই চিরকালের অভ্যাস ইঁহাদের রক্তমজ্জার মধ্যে আছে বলিয়াই সমাজ-বন্ধনের মধ্যেও ব্যক্তির স্বাধীনতা যত কম খর্ব হয় ইঁহারা কেবলই তার চেষ্টা করিতে থাকে। রাজা থাক কিন্তু কিসে রাজার ভার না থাকে এই ইঁহাদের সাধনা, ধন আছে

কিন্তু কিসে তাহা দরিদ্রের বুকের উপর চাপিয়া না বসে এই তপস্তায় তারা আজও নিবৃত্ত হয় নাই।

এমনি করিয়া ব্যক্তি যেখানে মুক্ত সেখানে তার আয়ও মুক্ত, তার ব্যয়ও মুক্ত। সেখানে যদি কোনো জাতি দেশহিত বা লোকহিত ব্রত গ্রহণ করে তবে তার বাধা নাই। সেখানে সমস্ত মানুষ আপনাদের ইতিহাসকে আপনাদের শক্তিতেই গড়িয়া তুলিতেছে, বাহিরের ঠেলা বা বিধাতার মারকে তারা শিরোধার্য করিয়া লইতেছে না। পুঁথি তাহাদের বুদ্ধিকে চাপা দিবার যত চেষ্টা করে তারা ততই তাহা কাটিয়া বাহির হইতে চায়। জ্ঞান ধর্ম ও শক্তিকে কেবলই স্বাধীন অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী করিবার প্রয়াসই তাদের ইতিহাস।

আর পরিবারতন্ত্র জাতির ইতিহাস বাঁধনের পর বাঁধনকে স্বীকার করিয়া লওয়া। যতবারই মুক্তির লক্ষণ দেখা দেয় ততবারই নূতন শৃঙ্খলকে সৃষ্টি করা বা পুরাতন শৃঙ্খলকে আঁটিয়া দেওয়াই তার জাতীয় সাধনা। আজ পর্যন্ত ইতিহাসের সেই প্রক্রিয়া চলিতেছে। নীতিধর্মকর্ম সম্বন্ধে আমরা আমাদের কৃত্রিম ও সংকীর্ণ বাঁধন কাটিবার জন্য যেই একবার করিয়া সচেতন হইয়া উঠি অমনি আমাদের অভিভাবক আমাদের বাপ-দাদার আফিমের কৌটা হইতে আফিমের বড়ি বাহির করিয়া আমাদের খাওয়াইয়া দেয়, তার পরে আবার সনাতন স্বপ্নের পালা।

যাই হ'ক, ঘরের মধ্যে বাঁধনকে আমরা মানি। সেই পবিত্র বাঁধন-দেবতার পূজা যথাসর্বস্ব দিয়া জোগাইয়া থাকি এবং তার কাছে কেবলই নরবলি দিয়া আসিতেছি। এমন অবস্থায় দেশহিত সম্বন্ধে আমাদের কৃপণতাকে পশ্চিম দেশের আদর্শ অনুসারে বিচার করিবার সময় আসে নাই। সর্বদেশের সঙ্গে অবাধ যোগবশত দেশে একটা আর্থিক পরিবর্তন ঘটিতেছে এবং সেই যোগবশতই আমাদের আইডিয়ালেরও পরিবর্তন ঘটিতেছে। যতদিন পর্যন্ত এই পরিবর্তন পরিণতি লাভ করিয়া সমস্ত সমাজকে আপন মাপে গড়িয়া না লয় ততদিন দোটানায় পড়িয়া পদে পদে আমাদিগকে নানা ব্যর্থতা ভোগ করিতে হইবে। ততদিন এমন কথা প্রায়ই শুনিতে হইবে, আমরা মুখে বলি এক, কাজে করি আর, আমাদের যতকিছু ত্যাগ সে কেবল বক্তৃতায় বচনত্যাগ। কিন্তু আমরা যে স্বভাবতই ত্যাগে কৃপণ এত বড়ো কলঙ্ক আমাদের প্রতি আরোপ করিবার বেলায় এই কথাটা ভাবিয়া দেখা উচিত যে, পরিবারের প্রতি দায়িত্ব রক্ষা করিতে গিয়া এই বৃহৎ দেশের প্রায় প্রত্যেক লোক প্রায় প্রত্যহ যে দুঃসহ ত্যাগ স্বীকার করিতেছে জগতে কোথাও তার তুলনা নাই।

নূতন আদর্শ লইয়া আমরা যে কী পর্যন্ত টানাটানিতে পড়িয়াছি তার একটা প্রমাণ

এই যে, আমাদের দেশের একদল শিক্ষক আমাদের সন্ন্যাসী হইতে বলিতেছেন। গৃহের বন্ধন আমাদের সমস্ত বুদ্ধিকে ও শক্তিকে এমন করিয়া পরাহত করিয়া রাখে যে, হিতব্রত সত্যভাবে গ্রহণ করিতে হইলে সে বন্ধন একেবারে ছেদন করিতে হইবে এ কথা না বলিয়া উপায় নাই। বর্তমান কালের আদর্শ আমাদের যে-সব যুবকদের মনে আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে তারা দেখিতে পাই সেই আগুনে স্বভাবতই আপন পারিবারিক দায়িত্ববন্ধন জ্বালাইয়া দিয়াছে।

এমন করিয়া যারা মুক্ত হইল তারা দেশের দুঃখ দারিদ্র্য মোচন করিতে চলিয়াছে কোন্ পথে? তারা দুঃখের সমুদ্রকে ব্লটিং কাগজ দিয়া শুষিয়া লইবার কাজে লাগিয়াছে বলিয়া মনে হয়। আজকাল "সেবা" কথাটাকে খুব বড়ো অক্ষরে লিখিতেছি ও সেবকের তকমাটাকে খুব উজ্জ্বল করিয়া গিলটি করিলাম।

কিন্তু ফুটা কলস ক্রমাগতই কত ভরতি করিব? কেবলমাত্র সেবা করিয়া চাঁদা দিয়া দেশের দুঃখ দূর হইবে কেমন করিয়া? দেশে বর্তমান দারিদ্র্যের মূল কোথায়, কোথায় এমন ছিদ্র যেখান দিয়া সমস্ত সঞ্চয় গলিয়া পড়িতেছে, আমাদের রক্তের মধ্যে কোথায় সেই নিরুদ্যমের বিষ যাতে আমরা কোনোমতেই আপনাকে বাঁচাইয়া তুলিতে উৎসাহ পাই না সেটা ভাবিয়া দেখা এবং সেইখানে প্রতিকার-চেষ্টা আমাদের প্রধান কাজ।

অনেকে মনে করেন দারিদ্র্য জিনিসটা কোনো একটা ব্যবস্থার দোষে বা অভাবে ঘটে। কেহ বলেন যৌথ কারবার চলিলে দেশে টাকা আপনিই গড়াইয়া আসিবে, কেহ বলেন ব্যবসায়ে সমবায়-প্রণালীই দেশে দুঃখ-নিবারণের একমাত্র উপায়। যেন এই রকমের কোনো-না-কোনো একটা প্যাঁচা আছে যা লক্ষ্মীকে আপনিই উড়াইয়া আনে।

য়ুরোপে আমাদের নজির আছে। সেখানে ধনী কেমন করিয়া ধনী হইল, নির্ধন কেমন করিয়া নির্ধনতার সঙ্গে দল বাঁধিয়া লড়াই করিতেছে সে আমরা জানি। সেই উপায়গুলিই যে আমাদেরও উপায় এই কথাটা সহজেই মনে আসে।

কিন্তু আসল কথাটাই আমরা ভুলি। ঐশ্বর্য বা দারিদ্র্যের মূলটা উপায়ের মধ্যে নয়, আমাদের মানসপ্রকৃতির মধ্যে। হাতটা যদি তৈরি হয় তবে হাতিয়ারটা জোগানো শক্ত হয় না। যারা একটা বিশেষ উদ্দেশ্যকে মনের মধ্যে চিন্তা করিয়া মিলিতে পারে তারা স্বভাবতই বাণিজ্যেও মেলে অন্য সমস্ত প্রয়োজনের কাজেও মেলে। যারা কেবলমাত্র প্রথার বন্ধনে তাল পাকাইয়া মিলিয়া থাকে, যাহাদিগকে মিলনের প্রণালী নিজেকে উদ্ভাবন করিতে হয় না, কতকগুলো নিয়মকে চোখ বুজিয়া মানিয়া যাইতে হয় তারা কোনোদিন কোনো অভিপ্রায় মনে লইয়া নিজের সাধনায় মিলিতে পারে না। যেখানে

তাদের বাপদাদার শাসন নাই সেখানে তারা কেবলই ভুল করে, অন্যায় করে, বিবাদ করে,—সেখানে তাদের ঈর্ষা, তাদের লোভ, তাদের অবিবেচনা। তাদের নিষ্ঠা পিতামহের প্রতি ; উদ্দেশ্যের প্রতি নয়। কেননা চিরদিন যারা মুক্ত তারা উদ্দেশ্যকে মানে, যারা মুক্ত নয় তারা অভ্যাসকে মানে।

এই কারণেই পরিবারের বাহিরে কোনো বড়ো রকমের যোগ আমাদের প্রকৃতির ভিতর দিয়া আজও সম্পূর্ণ সত্য হইয়া ওঠে নাই। অথচ এই পারিবারিক যোগটুকুর উপর ভর দিয়া আজিকার দিনের পৃথিবীতে আমাদের প্রাণরক্ষা বা মানরক্ষা প্রায় অসম্ভব। আমরা নদীতে গ্রামের ঘাটে ঘাটে যে নৌকা বাহিয়া এতদিন আরামে কাটাইয়া দিলাম, এখন সেই নৌকা সমুদ্রে আসিয়া পড়িল। আজ এই নৌকাটাই আমাদের পরম বিপদ।

নৌকাটা যেখানে ঢেউয়ের ঘায়ে সর্বদাই টলমল করিতেছে সেখানে আমাদের স্বভাবের ভীরুতা ঘুচিবে কেমন করিয়া? প্রতি কথায় প্রতি হাওয়ায় যে আমাদের বুক দুরদুর করিয়া ওঠে। আমরা নূতন নূতন্ পথে নূতন নূতন পরীক্ষায় চলিব কোন্ ভরসায়?

সকলের চেয়ে সর্বনাশ এই যে, এই বহুযুগসঞ্চিত ভীরুতা আমাদিগকে মুক্তভাবে চিন্তা করিতে দিতেছে না। এই কথাই বলিতেছে তোমাদের বাপদাদা চিন্তা করেন নাই, মানিয়া চলিয়াছেন, দোহাই তোমাদের, তোমরাও চিন্তা করিয়ো না, মানিয়া চলো।

তারপরে সেই মানিয়া চলিতে চলিতে দুঃখে দারিদ্র্যে অজ্ঞানে অস্বাস্থ্যে যখন ঘর বোঝাই হইয়া উঠিল তখন সেবাধর্মই প্রচার কর আর চাঁদার খাতাই বাহির কর মরণ হইতে কেহ বাঁচাইতে পারিবে না।

১৩২২

আষাঢ়

ঋতুতে ঋতুতে যে ভেদ সে কেবল বর্ণের ভেদ নহে, বৃত্তিরও ভেদ বটে। মাঝে মাঝে বর্ণসংকর দেখা দেয়—জ্যৈষ্ঠের পিঙ্গল জটা শ্রাবণের মেঘস্তূপে নীল হইয়া উঠে, ফাল্গুনের শ্যামলতায় বৃদ্ধ পৌষ আপনার পীত রেখা পুনরায় চালাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রকৃতির ধর্মরাজ্যে এ সমস্ত বিপর্যয় টেঁকে না।

গ্রীষ্মকে ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে। সমস্ত রসবাহুল্য দমন করিয়া, জঞ্জাল মারিয়া তপস্যার আগুন জ্বালিয়া সে নিবৃত্তিমার্গের মন্ত্রসাধন করে। সাবিত্রী-মন্ত্র জপ করিতে

করিতে কখনো বা সে নিশ্বাস ধারণ করিয়া রাখে, তখন গুমটে গাছের পাতা নড়ে না; আবার যখন সে রুদ্ধ নিশ্বাস ছাড়িয়া দেয় তখন পৃথিবী কাঁপিয়া উঠে। ইহার আহারের আয়োজনটা প্রধানত ফলাহার।

বর্ষাকে ক্ষত্রিয় বলিলে দোষ হয় না। তাহার নকিব আগে আগে গুরুগুরু শব্দে দামামা বাজাইতে বাজাইতে আসে,—মেঘের পাগড়ি পরিয়া পশ্চাতে সে নিজে আসিয়া দেখা দেয়। অল্পে তাহার সন্তোষ নাই। দিগ্বিজয় করাই তাহার কাজ। লড়াই করিয়া সমস্ত আকাশটা দখল করিয়া সে দিক্‌চক্রবর্তী হইয়া বসে। তমালতালী-বনরাজির নীলতম প্রান্ত হইতে তাহার রথের ঘর্ঘরধ্বনি শোনা যায়, তাহার বাঁকা তলোয়ারখানা ক্ষণে ক্ষণে কোষ হইতে বাহির হইয়া দিগ্‌বক্ষ বিদীর্ণ করিতে থাকে, আর তাহার তূণ হইতে বরুণ-বাণ আর নিঃশেষ হইতে চায় না। এদিকে তাহার পাদপীঠের উপর সবুজ কিংখাবের আস্তরণ বিছানো, মাথার উপরে ঘনপল্লবশ্যামল চন্দ্রাতপে সোনার কদম্বের ঝালর ঝুলিতেছে, আর বন্দিনী পূর্বদিগ্‌বধূ পাশে দাঁড়াইয়া অশ্রুনয়নে তাহাকে কেতকীগন্ধবারিসিক্ত পাখা বীজন করিবার সময় আপন বিদ্যুন্মণিজড়িত কঙ্কণখানি ঝলকিয়া তুলিতেছে।

আর শীতটা বৈশ্য। তাহার পাকা ধান কাটাই-মাড়াইয়ের আয়োজনে চারিটি প্রহর ব্যস্ত, কলাই যব ছোলার প্রচুর আশ্বাসে ধরণীর ডালা পরিপূর্ণ। প্রাঙ্গণে গোলা ভরিয়া উঠিয়াছে, গোষ্ঠে গোরুর পাল রোমন্থ করিতেছে, ঘাটে ঘাটে নৌকা বোঝাই হইল, পথে পথে ভারে মন্থর হইয়া গাড়ি চলিয়াছে; আর ঘরে ঘরে নবান্ন এবং পিঠাপার্বণের উদ্‌যোগে ঢেঁকিশালা মুখরিত।

এই তিনটেই প্রধান বর্ণ। আর শূদ্র যদি বল সে শরৎ ও বসন্ত। একজন শীতের, আর একজন গ্রীষ্মের তলপি বহিয়া আনে। মানুষের সঙ্গে এইখানে প্রকৃতির তফাত। প্রকৃতির ব্যবস্থায় যেখানে সেবা সেখানেই সৌন্দর্য, যেখানে নম্রতা সেইখানেই গৌরব। তাহার সভায় শূদ্র যে, সে ক্ষুদ্র নহে, ভার যে বহন করে সমস্ত আভরণ তাহারই। তাই তো শরতের নীল পাগড়ির উপরে সোনার কলকা বসন্তের সুগন্ধ পীত উত্তরীয়খানি ফুলকাটা। ইহারা যে-পাদুকা পরিয়া ধরণী-পথে বিচরণ করে তাহা রং-বেরঙের সূত্রশিল্পে বুটিদার; ইহাদের অঙ্গদে কুণ্ডলে অঙ্গুরীয়ে জহরতের সীমা নাই।

এই তো পাঁচটার হিসাব পাওয়া গেল। লোকে কিন্তু ছয়টা ঋতুর কথাই বলিয়া থাকে। ওটা নেহাত জোড় মিলাইবার জন্য। তাহারা জানে না বেজোড় লইয়াই প্রকৃতির যত বাহার। ৩৬৫ দিনকে দুই দিয়া ভাগ করো—৩৬ পর্যন্ত বেশ মেলে কিন্তু

সব-শেষের ওই ছোট্টো পাঁচ-টি কিছুতেই বাগ মানিতে চায় না। দুইয়ে দুইয়ে মিল হইয়া গেলে সে মিল থামিয়া যায়, অলস হইয়া পড়ে। এই জন্য কোথা হইতে একটা তিন আসিয়া সেটাকে নাড়া দিয়া তাহার যত রকম সংগীত সমস্তটা বাজাইয়া তোলে। বিশ্বসভায় অমিল-শয়তানটা এই কাজ করিবার জন্যই আছে,—সে মিলের স্বর্গপুরীকে কোনোমতেই ঘুমাইয়া পড়িতে দিবে না ;—সেই তো নৃত্যপরা উর্বশীর নূপুরে ক্ষণে ক্ষণে তাল কাটাইয়া দেয় সেই বেতালটি সামলাইবার সময়েই সুরসভায় তালের রস উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

ছয় ঋতু গণনার একটা কারণ আছে। বৈশ্যকে তিন বর্ণের মধ্যে সব নীচে ফেলিলেও উহারই পরিমাণ বেশি। সমাজের নীচের বড়ো ভিত্তি ওই বৈশ্য। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে সংবৎসরের প্রধান বিভাগ শরৎ হইতে শীত। বৎসরের পূর্ণ পরিণতি ওইখানে। ফসলের গোপন আয়োজন সকল-ঋতুতেই কিন্তু ফসলের প্রকাশ হয় ওই সময়েই। এই জন্য বৎসরের এই ভাগটাকে মানুষ বিস্তারিত করিয়া দেখে। এই অংশেই বাল্য যৌবন বার্ধক্যের তিন মূর্তিতে বৎসরের সফলতা মানুষের কাছে প্রত্যক্ষ হয়। শরতে তাহা চোখ জুড়াইয়া নবীন বেশে দেখা দেয়, হেমন্তে তাহা মাঠ ভরিয়া প্রবীণ শোভায় পাকে, আর শীতে তাহা ঘর ভরিয়া পরিণত রূপে সঞ্চিত হয়।

শরৎ হেমন্ত-শীতকে মানুষ এক বলিয়া ধরিতে পারিত কিন্তু আপনার লাভটাকে সে থাকে-থাকে ভাগ করিয়া দেখিতে ভালোবাসে। তাহার স্পৃহনীয় জিনিস একটি হইলেও সেটাকে অনেকখানি করিয়া নাড়াচাড়া করাতেই সুখ। একখানা নোটে কেবলমাত্র সুবিধা, কিন্তু সারিবন্দি তোড়ায় যথার্থ মনের তৃপ্তি। এই জন্য ঋতুর যে অংশে তাহার লাভ সেই অংশে মানুষ ভাগ বাড়াইয়াছে। শরৎ-হেমন্ত-শীতে মানুষের ফসলের ভাণ্ডার, সেইজন্য সেখানে তাহার তিন মহল ; ওইখানে তাহার গৃহলক্ষ্মী। আর যেখানে আছেন বনলক্ষ্মী সেখানে দুই মহল,—বসন্ত ও গ্রীষ্ম। ওইখানে তাহার ফলের ভাণ্ডার, বনভোজনের ব্যবস্থা। ফাল্গুনে বোল ধরিল, জ্যৈষ্ঠে তাহা পাকিয়া উঠিল। বসন্তে ঘ্রাণ গ্রহণ, আর গ্রীষ্মে স্বাদ গ্রহণ।

ঋতুর মধ্যে বর্ষাই কেবল একা একমাত্র। তাহার জুড়ি নাই। গ্রীষ্মের সঙ্গে তাহার মিল হয় না ;—গ্রীষ্ম দরিদ্র, সে ধনী। শরতের সঙ্গেও তাহার মিল হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। কেননা শরৎ তাহারই সমস্ত সম্পত্তি নিলাম করাইয়া নিজের নদীনালা মাঠঘাটে বেনামি করিয়া রাখিয়াছে। যে ঋণী সে কৃতজ্ঞ নহে।

মানুষ বর্ষাকে খণ্ড করিয়া দেখে নাই ; কেননা বর্ষা-ঋতুটা মানুষের সংসারব্যবস্থার

সঙ্গে কোনোদিক দিয়া জড়াইয়া পড়ে নাই। তাহার দাক্ষিণ্যের উপর সমস্ত বছরের ফল-ফসল নির্ভর করে কিন্তু সে ধনী তেমন নয় যে নিজের দানের কথাটা রটনা করিয়া দিবে। শরতের মতো মাঠে ঘাটে পত্রে পত্রে সে আপনার বদান্যতা ঘোষণা করে না। প্রত্যক্ষভাবে দেনা-পাওনার সম্পর্ক নাই বলিয়া মানুষ ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া বর্ষার সঙ্গে ব্যবহার করিয়া থাকে। বস্তুত বর্ষার যা-কিছু প্রধান ফল তাহা গ্রীষ্মেরই ফলাহার ভাণ্ডারের উদ্বৃত্ত।

এই জন্য বর্ষা-ঋতুটা বিশেষভাবে কবির ঋতু। কেননা কবি গীতার উপদেশকে ছাড়াইয়া গেছে। তাহার কর্মেও অধিকার নাই; ফলেও অধিকার নাই। তাহার কেবলমাত্র অধিকার ছুটিতে;—কর্ম হইতে ছুটি, ফল হইতে ছুটি।

বর্ষা ঋতুটাতে ফলের চেষ্টা অল্প এবং বর্ষার সমস্ত ব্যবস্থা কর্মের প্রতিকূল। এই জন্য বর্ষায় হৃদয়টা ছাড়া পায়। ব্যাকরণে হৃদয় যে লিঙ্গই হউক, আমাদের প্রকৃতির মধ্যে সে যে স্ত্রীজাতীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। এই জন্য কাজ-কর্মের আপিসে বা লাভ লোকসানের বাজারে সে আপনার পালকির বাহির হইতে পারে না। সেখানে সে পর্দা-নশিন।

বাবুরা যখন পূজার ছুটিতে আপনাদের কাজের সংসার হইতে দূরে পশ্চিমে হাওয়া খাইতে যান, তখন ঘরের বধূর পর্দা উঠিয়া যায়। বর্ষায় আমাদের হৃদয়-বধূর পর্দা থাকে না। বাদলার কর্মহীন বেলায় সে যে কোথায় বাহির হইয়া পড়ে তাহাকে ধরিয়া রাখা দায় হয়। একদিন পয়লা আষাঢ়ে উজ্জয়িনীর কবি তাহাকে রামগিরি হইতে অলকায়, মর্ত্য হইতে কৈলাস পর্যন্ত অনুসরণ করিয়াছেন।

বর্ষায় হৃদয়ের বাধা-ব্যবধান চলিয়া যায় বলিয়াই সে সময়টা বিরহী বিরহিণীর পক্ষে বড়ো সহজ সময় নয়। তখন হৃদয় আপনার সমস্ত বেদনার দাবি লইয়া সম্মুখে আসে। এদিক ওদিকে আপিসের পেয়াদা থাকিলে সে অনেকটা চুপ করিয়া থাকে কিন্তু এখন তাহাকে থামাইয়া রাখে কে?

বিশ্বব্যাপারে মস্ত একটা ডিপার্টমেন্ট আছে, সেটা বিনা কাজের। সেটা পাব্লিক ওআর্কস ডিপার্টমেন্টের বিপরীত। সেখানে যে-সমস্ত কাণ্ড ঘটে সে একেবারে বেহিসাবি। সরকারি হিসাবপরিদর্শক হতাশ হইয়া সেখানকার খাতাপত্র পরীক্ষা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে। মনে করো, খামখা এত বড়ো আকাশটার আগাগোড়া নীল তুলি বুলাইবার কোনো দরকার ছিল না—এই শব্দহীন শূন্যটাকে বর্ণহীন করিয়া রাখিলে সে তো কোনো নালিশ চালাইত না। তাহার পরে, অরণ্যে প্রান্তরে লক্ষ লক্ষ ফুল একবেলা ফুটিয়া আর-একবেলা ঝরিয়া যাইতেছে, তাহাদের বোঁটা হইতে পাতার ডগা

পর্যন্ত এত যে কারিগরি সেই অজস্র অপব্যয়ের জন্য কাহারও কাছে কি কোনো জবাবদিহি নাই? আমাদের শক্তির পক্ষে এ সমস্তই ছেলেখেলা, কোনো ব্যবহারে লাগে না; আমাদের বুদ্ধির পক্ষে এ সমস্তই মায়া, ইহার মধ্যে কোনো বাস্তবতা নাই।

আশ্চর্য এই যে, এই নিষ্প্রয়োজনের জায়গাটাই হৃদয়ের জায়গা। এই জন্য ফলের চেয়ে ফুলেই তাহার তৃপ্তি। ফল কিছু কম সুন্দর নয়, কিন্তু ফলের প্রয়োজনীয়তাটা এমন একটা জিনিস যাহা লোভীর ভিড় জমায়; বুদ্ধি-বিবেচনা আসিয়া সেটা দাবি করে; সেই জন্য ঘোমটা টানিয়া হৃদয়কে সেখান হইতে একটু সরিয়া দাঁড়াইতে হয়। তাই দেখা যায় তাম্রবর্ণ পাকা আমের ভারে গাছের ডালগুলি নত হইয়া পড়িলে বিরহিণীর রসনায় যে রসের উত্তেজনা উপস্থিত হয় সেটা গীতিকাব্যের বিষয় নহে। সেটা অত্যন্ত বাস্তব, সেটার মধ্যে যে প্রয়োজন আছে তাহা টাকা-আনা-পাইয়ের মধ্যে বাঁধা যাইতে পারে।

বর্ষা-ঋতু নিষ্প্রয়োজনের ঋতু। অর্থাৎ তাহার সংগীতে তাহার সমারোহে, তাহার অন্ধকারে তাহার দীপ্তিতে, তাহার চাঞ্চল্যে তাহার গাম্ভীর্যে তাহার সমস্ত প্রয়োজন কোথায় ঢাকা পড়িয়া গেছে। এই ঋতু ছুটির ঋতু। তাই ভারতবর্ষে বর্ষায় ছিল ছুটি— কেননা ভারতবর্ষে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একটা বোঝাপড়া ছিল। ঋতুগুলি তাহার দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া দর্শন না পাইয়া ফিরিত না। তাহার হৃদয়ের মধ্যে ঋতুর অভ্যর্থনা চলিত।

ভারতবর্ষের প্রত্যেক ঋতুরই একটা না একটা উৎসব আছে। কিন্তু কোন্ ঋতু যে নিতান্ত বিনা-কারণে তাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে তাহা যদি দেখিতে চাও তবে সংগীতের মধ্যে সন্ধান করো। কেননা সংগীতেই হৃদয়ের ভিতরকার কথাটা ফাঁস হইয়া পড়ে।

বলিতে গেলে ঋতুর রাগরাগিণী কেবল বর্ষার আছে আর বসন্তের। সংগীত-শাস্ত্রের মধ্যে সকল ঋতুরই জন্য কিছু কিছু সুরের বরাদ্দ থাকা সম্ভব—কিন্তু সেটা কেবল শাস্ত্রগত। ব্যবহারে দেখিতে পাই বসন্তের জন্য আছে বসন্ত আর বাহার—আর বর্ষার জন্য মেঘ, মল্লার, দেশ, এবং আরও বিস্তর। সংগীতের পাড়ায় ভোট লইলে বর্ষারই হয় জিত।

শরতে হেমন্তে ভরা-মাঠ ভরা-নদীতে মন নাচিয়া ওঠে; তখন উৎসবেরও অন্ত নাই, কিন্তু রাগিণীতে তাহার প্রকাশ রহিল না কেন? তাহার প্রধান কারণ, ওই ঋতুতে বাস্তব ব্যস্ত হইয়া আসিয়া মাঠঘাট জুড়িয়া বসে। বাস্তবের সভায় সংগীত মুজরা দিতে আসে না—যেখানে অখণ্ড অবকাশ সেখানেই সে সেলাম করিয়া বসিয়া যায়।

যাহারা বস্তুর কারবার করিয়া থাকে তাহারা যেটাকে অবস্তু ও শূন্য বলিয়া মনে করে সেটা কম জিনিস নয়। লোকালয়ের হাটে ভূমি বিক্রি হয়, আকাশ বিক্রি হয় না। কিন্তু পৃথিবীর বস্তু-পিণ্ডকে ঘেরিয়া যে বায়ুমণ্ডল আছে, জ্যোতির্লোক হইতে আলোকের দূত সেই পথ দিয়াই আনাগোনা করে। পৃথিবীর সমস্ত লাবণ্য ওই বায়ু-মণ্ডলে। ওইখানেই তাহার জীবন। ভূমি ধ্রুব, তাহা ভারি, তাহার একটা হিসাব পাওয়া যায়। কিন্তু বায়ুমণ্ডলে যে কত পাগলামি তাহা বিজ্ঞ লোকের অগোচর নাই। তাহার মেজাজ কে বোঝে? পৃথিবীর সমস্ত প্রয়োজন ধূলির উপরে, কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত সংগীত ওই শূন্যে,—যেখানে তাহার অপরিচ্ছিন্ন অবকাশ।

মানুষের চিত্তের চারিদিকেও একটি বিশাল আকাশের বায়ু-মণ্ডল আছে। সেইখানেই তাহার নানারঙের খেয়াল ভাসিতেছে; সেইখানেই অনন্ত তাহার হাতে আলোকের রাখি বাঁধিতে আসে; সেইখানেই ঝড়বৃষ্টি, সেইখানেই উনপঞ্চাশ বায়ুর উন্মত্ততা, সেখানকার কোনো হিসাব পাওয়া যায় না। মানুষের যে অতিচৈতন্যলোকে অভাবনীয়ের লীলা চলিতেছে সেখানে যে-সব অকেজো লোক আনাগোনা রাখিতে চায় তাহারা মাটিকে মান্য করে বটে কিন্তু বিপুল অবকাশের মধ্যেই তাহাদের বিহার। সেখানকার ভাষাই সংগীত। এই সংগীতে বাস্তবলোকে বিশেষ কী কাজ হয় জানি না— কিন্তু ইহারই কম্পমান পক্ষের আঘাত-বেগে অতিচৈতন্যলোকের সিংহদ্বার খুলিয়া যায়।

মানুষের ভাষার দিকে একবার তাকাও। ওই ভাষাতে মানুষের প্রকাশ; সেই জন্যে উহার মধ্যে এত রহস্য। শব্দের বস্তুটা হইতেছে তাহার অর্থ। মানুষ যদি কেবলমাত্র হইত বাস্তব, তবে তাহার ভাষার শব্দে নিছক অর্থ ছাড়া আর কিছুই থাকিত না। তবে তাহার শব্দ কেবলমাত্র খবর দিত,—সুর দিত না। কিন্তু বিস্তর শব্দ আছে যাহার অর্থপিণ্ডের চারিদিকে আকাশের অবকাশ আছে, একটা বায়ু-মণ্ডল আছে। তাহারা যেটুকু জানায় তাহারা তাহার চেয়ে অনেক বেশি—তাহাদের ইশারা তাহাদের বাণীর চেয়ে বড়ো। ইহাদের পরিচয় তদ্ধিত প্রত্যয়ে নহে, চিত্তপ্রত্যয়ে। এই সমস্ত অবকাশওয়ালা কথা লইয়া অবকাশ-বিহারী কবিদের কারবার। এই অবকাশের বায়ু-মণ্ডলেই নানা রঙিন আলোর রং ফলাইবার সুযোগ—এই ফাঁকটাতেই ছন্দগুলি নানা ভঙ্গিতে হিল্লোলিত হয়।

এই সমস্ত অবকাশবহুল রঙিন শব্দ যদি না থাকিত তবে বুদ্ধির কোনো ক্ষতি হইত না কিন্তু হৃদয় যে বিনা প্রকাশে বুক ফাটিয়া মরিত। অনির্বচনীয়কে লইয়া তাহার প্রধান কারবার; এই জন্য অর্থে তাহার অতি সামান্য প্রয়োজন। বুদ্ধির দরকার

গতিতে, কিন্তু হৃদয়ের দরকার নৃত্যে। গতির লক্ষ্য—একাগ্র হইয়া লাভ করা, নৃত্যের লক্ষ্য—বিচিত্র হইয়া প্রকাশ করা। ভিড়ের মধ্যে ভিড়িয়াও চলা যায় কিন্তু ভিড়ের মধ্যে নৃত্য করা যায় না। নৃত্যের চারিদিকে অবকাশ চাই। এই জন্য হৃদয় অবকাশ দাবি করে। বুদ্ধিমান তাহার সেই দাবিটাকে অবাস্তব এবং তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দেয়।

আমি বৈজ্ঞানিক নহি কিন্তু অনেকদিন ছন্দ লইয়া ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া ছন্দের তত্ত্বটা কিছু বুঝি বলিয়া মনে হয়। আমি জানি ছন্দের যে অংশটাকে যতি বলে অর্থাৎ যেটা ফাঁকা, অর্থাৎ ছন্দের বস্তুঅংশ যেখানে নাই সেইখানেই ছন্দের প্রাণ—পৃথিবীর প্রাণটা যেমন মাটিতে নহে, তাহার বাতাসেই। ইংরেজিতে যতিকে বলে pause—কিন্তু pause শব্দে অভাব সূচনা করে, যতি সেই অভাব নহে। সমস্ত ছন্দের ভাবটাই ওই যতির মধ্যে—কারণ যতি ছন্দকে নিরস্ত করে না নিয়মিত করে। ছন্দ যেখানে যেখানে থামে সেইখানেই তাহার ইশারা ফুটিয়া উঠে, সেইখানেই সে নিশ্বাস ছাড়িয়া আপনার পরিচয় দিয়া বাঁচে।

এই প্রমাণটি হইতে আমি বিশ্বাস করি বিশ্বরচনায় কেবলই যে-সমস্ত যতি দেখা যায় সেইখানে শূন্যতা নাই, সেইখানেই বিশ্বের প্রাণ কাজ করিতেছে। শুনিয়াছি অণু পরমাণুর মধ্যে কেবলই ছিদ্র,—আমি নিশ্চয় জানি সেই ছিদ্রগুলির মধ্যেই বিরাটের অবস্থান। ছিদ্রগুলিই মুখ্য, বস্তুগুলিই গৌণ। যাহাকে শূন্য বলি বস্তুগুলি তাহারই অশ্রান্ত লীলা। সেই শূন্যই তাহাদিগকে আকার দিতেছে, গতি দিতেছে, প্রাণ দিতেছে। আকর্ষণ-বিকর্ষণ তো সেই শূন্যেরই কুস্তির প্যাঁচ। জগতের বস্তুব্যাপার সেই শূন্যের, সেই মহাযতির, পরিচয়। এই বিপুল বিচ্ছেদের ভিতর দিয়াই জগতের সমস্ত যোগ-সাধন হইতেছে—অণুর সঙ্গে অণুর, পৃথিবীর সঙ্গে সূর্যের, নক্ষত্রের সঙ্গে নক্ষত্রের। সেই বিচ্ছেদমহাসমুদ্রের মধ্যে মানুষ ভাসিতেছে বলিয়াই মানুষের শক্তি, মানুষের জ্ঞান, মানুষের প্রেম, মানুষের যত কিছু লীলাখেলা। এই মহাবিচ্ছেদ যদি বস্তুতে নিরেট হইয়া ভরিয়া যায় তবে একেবারে নিবিড় একটানা মৃত্যু।

মৃত্যু আর কিছু নহে বস্তু যখন আপনার অবকাশকে হারায় তখন তাহাই মৃত্যু। বস্তু তখন যেটুকু কেবলমাত্র সেটুকুই, তার বেশি নয়। প্রাণ সেই মহা-অবকাশ—যাহাকে অবলম্বন করিয়া বস্তু আপনাকে কেবলই আপনি ছাড়াইয়া চলিতে পারে।

বস্তু-বাদীরা মনে করে অবকাশটা নিশ্চল কিন্তু যাহারা অবকাশরসের রসিক তাহারা জানে বস্তুটাই নিশ্চল, অবকাশই তাহাকে গতি দেয়। রণক্ষেত্রে সৈন্যের অবকাশ

নাই; তাহারা কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া ব্যূহরচনা করিয়া চলিয়াছে, তাহারা মনে ভাবে আমরাই যুদ্ধ করিতেছি। কিন্তু যে-সেনাপতি অবকাশে নিমগ্ন হইয়া দূর হইতে স্তব্ধভাবে দেখিতেছে, সৈন্যদের সমস্ত চলা তাহারই মধ্যে। নিশ্চলের যে ভয়ংকর চলা তাহার রুদ্রবেগ যদি দেখিতে চাও তবে দেখো ওই নক্ষত্রমণ্ডলীর আবর্তনে, দেখো যুগ-যুগান্তরের তাণ্ডব নৃত্যে। যে নাচিতেছে না তাহারই নাচ এই সকল চঞ্চলতায়।

এত কথা যে বলিতে হইল তাহার কারণ, কবিশেখর কালিদাস যে আষাঢ়কে আপনার মন্দাক্রান্তাচ্ছন্দের অম্লান মালাটি পরাইয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন তাহাকে ব্যস্ত-লোকেরা "আষাঢ়ে" বলিয়া অবজ্ঞা করে। তাহারা মনে করে যে মেঘাবগুণ্ঠিত বর্ষণ-মঞ্জীর-মুখর মাসটি সকল কাজের বাহির, ইহার ছায়াবৃত প্রহরগুলির পসরায় কেবল বাজে কথার পণ্য। অন্যায় মনে করে না। সকল কাজের-বাহিরের যে দলটি যে অহৈতুকী স্বর্গসভায় আসন লইয়া বাজে-কথার অমৃত পান করিতেছে, কিশোর আষাঢ় যদি আপন আলোল কুন্তলে নবমালতীর মালা জড়াইয়া সেই সভার নীলকান্তমণির পেয়ালা ভরিবার ভার লইয়া থাকে, তবে স্বাগত, হে নবঘনশ্যাম, আমরা তোমাকে অভিবাদন করি। এস এস জগতের যত অকর্মণ্য, এস এস ভাবের ভাবুক, রসের রসিক,—আষাঢ়ের মৃদঙ্গ ওই বাজিল, এস সমস্ত খ্যাপার দল, তোমাদের নাচের ডাক পড়িয়াছে। বিশ্বের চির-বিরহবেদনার অশ্রু-উৎস আজ খুলিয়া গেল, আজ তাহা আর মানা মানিল না। এস গো অভিসারিকা, কাজের সংসারে কপাট পড়িয়াছে, হাটের পথে লোক নাই, চকিত বিদ্যুতের আলোকে আজ যাত্রায় বাহির হইবে—জাতীপুষ্প-সুগন্ধি বনান্ত হইতে সজল বাতাসে আহ্বান আসিল—কোন্ ছায়াবিতানে বসিয়া আছে বহুযুগের চিরজাগ্রত প্রতীক্ষা!

১৩২১

শরৎ

ইংরেজের সাহিত্যে শরৎ প্রৌঢ়। তার যৌবনের টান সবটা আলগা হয় নাই, ওদিকে তাকে মরণের টান ধরিয়াছে; এখনও সব চুকিয়া যায় নাই কেবল সব ঝরিয়া যাইতেছে।

একজন আধুনিক ইংরেজ কবি শরৎকে সম্ভাষণ করিয়া বলিতেছেন, "তোমার ওই শীতের আশঙ্কাকুল গাছগুলাকে কেমন যেন আজ ভূতের মতো দেখাইতেছে; হায় রে, তোমার ওই কুঞ্জবনের ভাঙা হাট, তোমার ওই ভিজা পাতার বিবাগি হইয়া বাহির

হওয়া ! যা অতীত এবং যা আগামী তাদের বিষণ্ণ বাসরশয্যা তুমি রচিয়াছ। যা-কিছু ম্রিয়মাণ তুমি তাদেরই বাণী, যত-কিছু গতস্ব শোচনা তুমি তারই অধিদেবতা।”

কিন্তু এ শরৎ আমাদের শরৎ একেবারেই নয়, আমাদের শরতের নীল চোখের পাতা দেউলে-হওয়া যৌবনের চোখের জলে ভিজিয়া ওঠে নাই। আমার কাছে আমাদের শরৎ শিশুর মূর্তি ধরিয়া আসে। সে একেবারে নবীন। বর্ষার গর্ভ হইতে এইমাত্র জন্ম লইয়া ধরণী-ধাত্রীর কোলে শুইয়া সে হাসিতেছে।

তার কাঁচা দেহখানি ; সকালে শিউলিফুলের গন্ধটি সেই কচিগায়ের গন্ধের মতো। আকাশে আলোকে গাছেপালায় যা-কিছু রং দেখিতেছি সে তো প্রাণেরই রং, একেবারে তাজা।

প্রাণের একটি রং আছে। তা ইন্দ্রধনুর গাঁঠ হইতে চুরি করা লাল নীল সবুজ হল্‌দে প্রভৃতি কোনো বিশেষ রং নয় ; তা কোমলতার রং। সেই রং দেখিতে পাই ঘাসে পাতায়, আর দেখি মানুষের গায়ে। জন্তুর কঠিন চর্মের উপরে সেই প্রাণের রং ভালো করিয়া ফুটিয়া ওঠে নাই সেই লজ্জায় প্রকৃতি তাকে রং-বেরঙের লোমের ঢাকা দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছে। মানুষের গা-টিকে প্রকৃতি অনাবৃত করিয়া চুম্বন করিতেছে।

যাকে বাড়িতে হইবে তাকে কড়া হইলে চলিবে না, প্রাণ সেইজন্য কোমল। প্রাণ জিনিসটা অপূর্ণতার মধ্যে পূর্ণতার ব্যঞ্জনা। সেই ব্যঞ্জনা যেই শেষ হইয়া যায় অর্থাৎ যখন যা আছে কেবলমাত্র তাই আছে, তার চেয়ে আরও-কিছুর আভাস নাই তখন মৃত্যুতে সমস্তটা কড়া হইয়া ওঠে, তখন লাল নীল সকল রকম রংই থাকিতে পারে কেবল প্রাণের রং থাকে না।

শরতের রংটি প্রাণের রং। অর্থাৎ তাহা কাঁচা, বড়ো নরম। রৌদ্রটি কাঁচা সোনা, সবুজটি কচি, নীলটি তাজা। এইজন্য শরতে নাড়া দেয় আমাদের প্রাণকে, যেমন বর্ষায় নাড়া দেয় আমাদের ভিতরমহলের হৃদয়কে, যেমন বসন্তে নাড়া দেয় আমাদের বাহির-মহলের যৌবনকে।

বলিতেছিলাম শরতের মধ্যে শিশুর ভাব। তার, এই-হাসি, এই-কান্না। সেই হাসিকান্নার মধ্যে কার্যকারণের গভীরতা নাই, তাহা এমনি হালকাভাবে আসে এবং যায় যে, কোথাও তার পায়ের দাগটুকু পড়ে না, জলের ঢেউয়ের উপরটাতে আলোছায়া ভাইবোনের মতো যেমন কেবলই দুরন্তপনা করে অথচ কোনো চিহ্ন রাখে না।

ছেলেদের হাসিকান্না প্রাণের জিনিস, হৃদয়ের জিনিস নহে। প্রাণ জিনিসটা ছিপের নৌকার মতো ছুটিয়া চলে তাতে মাল বোঝাই নাই ; সেই ছুটিয়া-চলা প্রাণের হাসি-কান্নার ভার কম। হৃদয় জিনিসটা বোঝাই নৌকা, সে ধরিয়া রাখে, ভরিয়া রাখে,—

তার হাসিকান্না চলিতে চলিতে ঝরাইয়া ফেলিবার মতো নয়। যেমন ঝরনা, সে ছুটিয়া চলিতেছে বলিয়াই ঝলমল করিয়া উঠিতেছে। তার মধ্যে ছায়া আলোর কোনো বাসা নাই, বিশ্রাম নাই। কিন্তু এই ঝরনাই উপত্যকায় যে সরোবরে গিয়া পড়িয়াছে, সেখানে আলো যেন তলায় ডুব দিতে চায়, সেখানে ছায়া জলের গভীর অন্তরঙ্গ হইয়া উঠে। সেখানে স্তব্ধতার ধ্যানের আসন।

কিন্তু প্রাণের কোথাও আসন নাই, তাকে চলিতেই হইবে, তাই শরতের হাসিকান্না কেবল আমাদের প্রাণপ্রবাহের উপরে ঝিকিমিকি করিতে থাকে, যেখানে আমাদের দীর্ঘনিশ্বাসের বাসা সেই গভীরে গিয়া সে আটকা পড়ে না। তাই দেখি শরতের রৌদ্রের দিকে তাকাইয়া মনটা কেবল চলি চলি করে, বর্ষার মতো সে অভিসারের চলা নয়, সে অভিমানের চলা।

বর্ষায় যেমন আকাশের দিকে চোখ যায় শরতে তেমনি মাটির দিকে। আকাশ-প্রাঙ্গণ হইতে তখন সভায় আস্তরণখানা গুটাইয়া লওয়া হইতেছে, এখন সভার জায়গা হইয়াছে মাটির উপরে। একেবারে মাঠের এক পার হইতে আর এক পার পর্যন্ত সবুজে ছাইয়া গেল, সেদিক হইতে আর চোখ ফেরানো যায় না।

শিশুটি কোল জুড়িয়া বসিয়াছে সেইজন্যই মায়ের কোলের দিকে এমন করিয়া চোখ পড়ে। নবীন প্রাণের শোভায় ধরণীর কোল আজ এমন ভরা। শরৎ বড়ো বড়ো গাছের ঋতু নয়, শরৎ ফসলখেতের ঋতু। এই ফসলের খেত একেবারে মাটির কোলের জিনিস। আজ মাটির যত আদর সেইখানেই হিল্লোলিত, বনস্পতি দাদারা একধারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া তাই দেখিতেছে।

এই ধান, এই ইক্ষু, এরা যে ছোটো, এরা যে অল্পকালের জন্য আসে, ইহাদের যত শোভা যত আনন্দ সেই দুদিনের মধ্যে ঘনাইয়া তুলিতে হয়। সূর্যের আলো ইহাদের জন্য যেন পথের ধারের পানসত্রের মতো—ইহারা তাড়াতাড়ি গণ্ডূষ ভরিয়া সূর্যকিরণ পান করিয়া লইয়াই চলিয়া যায়—বনস্পতির মতো জল বাতাস মাটিতে ইহাদের অন্নপানের বাঁধা বরাদ্দ নাই; ইহারা পৃথিবীতে কেবল আতিথ্যই পাইল, আবাস পাইল না। শরৎ পৃথিবীর এই সব ছোটোদের এই সব ক্ষণজীবীদের ক্ষণিক উৎসবের ঋতু। ইহারা যখন আসে তখন কোল ভরিয়া আসে, যখন চলিয়া যায় তখন শূন্য প্রান্তরটা শূন্য আকাশের নিচে হা হা করিতে থাকে। ইহারা পৃথিবীর সবুজ মেঘ, হঠাৎ দেখিতে দেখিতে ঘনাইয়া ওঠে, তার পরে প্রচুর ধারায় আপন বর্ষণ সারিয়া দিয়া চলিয়া যায়, কোথাও নিজের কোনো দাবি দাওয়ার দলিল রাখে না।

আমরা তাই বলিতে পারি, হে শরৎ তুমি শিশিরাশ্রু ফেলিতে ফেলিতে গত এবং

আগতের ক্ষণিক মিলনশয্যা পাতিয়াছ। যে বর্তমানটুকুর জন্য অতীতের চতুর্দোলা দ্বারের কাছে অপেক্ষা করিয়া আছে, তুমি তারই মুখচুম্বন করিতেছ, তোমার হাসিতে চোখের জল গড়াইয়া পড়িতেছে।

মাটির কন্যার আগমনীর গান এই তো সেদিন বাজিল। মেঘের নন্দীভৃঙ্গী শিঙা বাজাইতে বাজাইতে গৌরী শারদাকে এই কিছু দিন হইল ধরা-জননীর কোলে রাখিয়া গেছে। কিন্তু বিজয়ার গান বাজিতে আর তো দেরি নাই; শ্মশানবাসী পাগলটা এল বলিয়া,—তাকে তো ফিরাইয়া দিবার জো নাই;—হাসির চন্দ্রকলা তার ললাটে লাগিয়া আছে, কিন্তু তার জটায় জটায় কান্নার মন্দাকিনী।

শেষকালে দেখি ওই পশ্চিমের শরৎ আর এই পূর্বদেশের শরৎ একই জায়গায় আসিয়া অবসান হয়—সেই দশমী রাত্রির বিজয়ার গানে। পশ্চিমের কবি শরতের দিকে তাকাইয়া গাহিতেছেন, "বসন্ত তার উৎসবের সাজ বৃথা সাজাইল, তোমার নিঃশব্দ ইঙ্গিতে পাতার পর পাতা খসিতে খসিতে সোনার বৎসর আজ মাটিতে মিশিয়া মাটি হইল যে!"—তিনি বলিতেছেন, "ফাল্গুনের মধ্যে মিলন-পিপাসিনীর যে রস-ব্যাকুলতা তাহা শান্ত হইয়াছে, জ্যৈষ্ঠের মধ্যে তপ্ত-নিশ্বাস-বিক্ষুব্ধ যে হৃৎস্পন্দন তাহা স্তব্ধ হইয়াছে। ঝড়ের মাতনে লণ্ডভণ্ড অরণ্যের গায়ন সভায় তোমার ঝ'ড়ো বাতাসের দল তাহাদের প্রেতলোকের রুদ্রবীণায় তার চড়াইতেছে তোমারই মৃত্যুশোকের বিলাপগান গাহিবে বলিয়া। তোমার বিনাশের শ্রী তোমার সৌন্দর্যের বেদনা ক্রমে সুতীব্র হইয়া উঠিল, হে বিলীয়মান মহিমার প্রতিরূপ!"

কিন্তু তবুও পশ্চিমে যে শরৎ, বাষ্পের ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া আসে, আর আমাদের ঘরে যে শরৎ মেঘের ঘোমটা সরাইয়া পৃথিবীর দিকে হাসি মুখখানি নামাইয়া দেখা দেয়, তাদের দুইয়ের মধ্যে রূপের এবং ভাবের তফাত আছে। আমাদের শরতে আগমনীটাই ধুয়া। সেই ধুয়াতেই বিজয়ার গানের মধ্যেও উৎসবের তান লাগিল। আমাদের শরতে বিচ্ছেদ-বেদনার ভিতরেও একটা কথা লাগিয়া আছে যে, বারে বারে নূতন করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে বলিয়াই চলিয়া যায়—তাই ধরার আঙিনায় আগমনী-গানের আর অন্ত নাই। যে লইয়া যায় সেই আবার ফিরাইয়া আনে। তাই সকল উৎসবের মধ্যে বড়ো উৎসব এই হারাইয়া ফিরিয়া পাওয়ার উৎসব।

কিন্তু পশ্চিমে শরতের গানে দেখি পাইয়া হারানোর কথা। তাই কবি গাহিতেছেন, "তোমার আবির্ভাবই তোমার তিরোভাব। যাত্রা এবং বিদায় এই তোমার ধুয়া, তোমার জীবনটাই মরণের আড়ম্বর; আর তোমার সমারোহের পরম পূর্ণতার মধ্যেও তুমি মায়া, তুমি স্বপ্ন।"

১৩২২

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম

একটু বাদলার হাওয়া দিয়াছে কি, অমনি আমাদের গলি ছাপাইয়া সদর রাস্তা পর্যন্ত বন্যা বহিয়া যায়, পথিকের জুতাজোড়াটা ছাতার মতোই শিরোধার্য হইয়া ওঠে, এবং অন্তত এই গলি-চর জীবেরা উভচর জীবের চেয়ে জীবনযাত্রায় যোগ্যতর নয় শিশুকাল হইতে আমাদের বারান্দা হইতে এইটে বছর বছর লক্ষ্য করিতে করিতে আমার চুল পাকিয়া গেল।

ইহার মধ্যে প্রায় ষাট বছর পার হইল। তখন বাষ্প ছিল কলীয় যুগের প্রধান বাহন, এখন বিদ্যুৎ তাহাকে কটাক্ষ করিয়া হাসিতে শুরু করিয়াছে; তখন পরমাণুতত্ত্ব পৌঁছিয়াছিল অদৃশ্যে, এখন তাহা অভাব্য হইয়া উঠিল; ওদিকে মরিবার কালের পিঁপড়ার মতো মানুষ আকাশে পাখা মেলিয়াছে, একদিন এই আকাশেরও ভাগবখরা লইয়া শরিকদের মধ্যে মামলা চলিবে অ্যাটর্নি তার দিন গনিতেছেন; চীনের মানুষ একরাত্রে তাদের সনাতন টিকি কাটিয়া সাফ করিল, এবং জাপান কালসাগরে এমন এক বিপর্যয় লাফ মারিল যে, পঞ্চাশ বছরে পাঁচশ বছর পার হইয়া গেল। কিন্তু বর্ষার জলধারা সম্বন্ধে আমাদের রাস্তার আতিথেয়তা যেমন ছিল তেমনিই আছে। যখন কন্‌গ্রেসের ক অক্ষরেরও পত্তন হয় নাই তখনও এই পথের পথিকবধূদের বর্ষার গান ছিল—

কতকাল পরে পদচারি করে
দুখসাগর সাঁতরি পার হবে?

আর আজ যখন হোমরুলের পাকা ফলটা প্রায় আমাদের গোঁফের কাছে ঝুলিয়া পড়িল আজও সেই একই গান—মেঘমল্লার-রাগেণ, যতিতালাভ্যাং।

ছেলেবেলা হইতেই কাণ্ডটা দেখিয়া আসিতেছি সুতরাং ব্যাপারটা আমাদের কাছে অভাবনীয় নয়। যা অভাবনীয় নয় তা লইয়া কেহ ভাবনাই করে না। আমরাও ভাবনা করি নাই, সহ্যই করিয়াছি। কিন্তু চিঠিতে যে-কথাটা অমনিতে চোখ এড়াইয়া যায় সেটার নিচে লাইন কাটা দেখিলে যেমন বিশেষ করিয়া মনে লাগে, আমাদের রাস্তার জলাশয়তার নিচে তেমনি জোড়া লাইন কাটা দেখিয়া, শুধু মনটার মধ্যে নয় আমাদের গাড়ির চাকাতেও, ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগিল; বর্ষাও নামিয়াছে ট্রামলাইনের মেরামতও শুরু। যার আরম্ভ আছে তার শেষও আছে শাস্ত্রে এই কথা বলে, কিন্তু ট্রাম-ওয়ালাদের অন্যায় শাস্ত্রে মেরামতের আর শেষ দেখি না। তাই এবার লাইন কাটার

সহযোগে যখন চিৎপুর রোডে জগস্রোতের সঙ্গে জনস্রোতের দ্বন্দ্ব দেখিয়া দেহমন আর্দ্র হইতে লাগিল তখন অনেকদিন পরে গভীরভাবে ভাবিতে লাগিলাম, সহ্য করি কেন?

সহ্য না করিলে যে চলে এবং না করিলেই যে ভালো চলে চৌরঙ্গি অঞ্চলে একবার পা বাড়াইলেই তা বোঝা যায়। একই শহর, একই ম্যুনিসিপালিটি, কেবল তফাতটা এই, আমাদের সয় ওদের সয় না। যদি চৌরঙ্গি রাস্তার পনেরো আনার হিস্‌সা ট্র্যামেরই থাকিত, এবং রাস্তা উৎখাত করিয়া লাইন মেরামত এমন সুমধুর গজগমনে চলিত আজ তবে ট্র্যাম কোম্পানির দিনে আহার রাত্রে নিদ্রা থাকিত না।

আমাদের নিরীহ ভালোমানুষটি বলেন, "সে কী কথা! আমাদের একটু অসুবিধা হইবে বলিয়াই কি ট্র্যামের রাস্তা মেরামত হইবে না?"

"হইবে বই কি! কিন্তু এমন আশ্চর্য সুস্থ মেজাজে এবং দীর্ঘ মেয়াদে নয়।"

নিরীহ ভালোমানুষটি বলেন, "সে কি সম্ভব?"

যা হইতেছে তার চেয়ে আরও ভালো হইতে পারে এই ভরসা ভালোমানুষদের নাই বলিয়াই অহরহ চক্ষের জলে তাদের বক্ষ ভাসে এবং তাদের পথঘাটেরও প্রায় সেই দশা। এমনি করিয়া দুঃখকে আমরা সর্বাঙ্গে মাখি এবং ভাঙা পিপের আলকাতরার মতো সেটাকে দেশের চারদিকে গড়াইয়া ছড়াইয়া পড়িতে দিই।

কথাটা শুনিতে ছোটো, কিন্তু আসলে ছোটো নয়। কোথাও আমাদেরই কোনো কর্তৃত্ব আছে এটা আমরা কিছুতেই পুরামাত্রায় বুঝিলাম না। বইয়ে পড়িয়াছি, মাছ ছিল কাঁচের টবের মধ্যে; সে অনেক মাথা খুঁড়িয়া অবশেষে বুঝিল যে কাঁচটা জল নয়। তার পরে সে বড়ো জলাশয়ে ছাড়া পাইল, তবু তার এটা বুঝিতে সাহস হইল না যে, জলটা কাচ নয়; তাই সে একটুখানি জায়গাতেই ঘুরিতে লাগিল। ওই মাথা ঠুকিবার ভয়টা আমাদেরও হাড়েমাসে জড়ানো, তাই যেখানে সাঁতার চলিতে পারে সেখানেও মন চলে না। অভিমন্যু মায়ের গর্ভেই ব্যূহে প্রবেশ করিবার বিদ্যা শিখিল, বাহির হইবার বিদ্যা শিখিল না, তাই সে সর্বাঙ্গে সপ্তরথীর মারটা খাইয়াছে। আমরাও জন্মিবার পূর্ব হইতেই বাঁধা-পড়িবার বিদ্যাটাই শিখিলাম, গাঁঠ-খুলিবার বিদ্যাটা নয়; তার পর জন্ম-মাত্রই বুদ্ধিটা হইতে শুরু করিয়া চলাফেরাটা পর্যন্ত পাকে পাকে জড়াইলাম, আর সেই হইতেই জগতে যেখানে যত রথী আছে, এমন কি পদাতিক পর্যন্ত সকলের মার খাইয়া মরিতেছি। মানুষকে, পুঁথিকে, ইশারাকে, গণ্ডিকে বিনাবাক্যে পুরুষে পুরুষে মানিয়া চলাই এমনি আমাদের অভ্যস্ত যে, জগতে কোথাও যে আমাদের কর্তৃত্ব আছে তাহা চোখের সামনে সশরীরে উপস্থিত হইলেও কোনো মতেই ঠাহর হয় না, এমন কি, বিলাতি চশমা পরিলেও না।

মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো কথাটাই এই যে, কর্তৃত্বের অধিকারই মনুষ্যত্বের অধিকার। নানা মন্ত্রে, নানা শ্লোকে, নানা বিধিবিধানে এই কথাটা যে-দেশে চাপা পড়িল, বিচারে পাছে এতটুকু ভুল হয় এই জন্য যে-দেশে মানুষ আচারে আপনাকে আষ্টেপিষ্টে বাঁধে, চলিতে গেলে পাছে দূরে গিয়া পড়ে এইজন্য নিজের পথ নিজেই ভাঙিয়া দেয়, সেই দেশে ধর্মের দোহাই দিয়া মানুষকে নিজের 'পরে অপরিসীম অশ্রদ্ধা করিতে শেখানো হয় এবং সেই দেশে দাস তৈরি করিবার জন্য সকলের চেয়ে বড়ো কারখানা খোলা হইয়াছে।

আমাদের রাজপুরুষেরাও শাস্ত্রীয় গাম্ভীর্যের সঙ্গে এই কথাই বলিয়া থাকেন, "তোমরা ভুল করিবে, তোমরা পারিবে না, অতএব তোমাদের হাতে কর্তৃত্ব দেওয়া চলিবে না।"

আর যাই হ'ক, মনু-পরাশরের এই আওয়াজটা ইংরেজি গলায় ভারি বেসুর বাজে, তাই আমরা তাঁদের যে-উত্তরটা দিই সেটা তাঁদেরই সহজ সুরের কথা। আমরা বলি, ভুল করাটা তেমন সর্বনাশ নয় স্বাধীনকর্তৃত্ব না পাওয়াটা যেমন। ভুল করিবার স্বাধীনতা থাকিলে তবেই সত্যকে পাইবার স্বাধীনতা থাকে। নিখুঁত নির্ভুল হইবার আশায় যদি নিরঙ্কুশ নির্জীব হইতে হয় তবে তার চেয়ে না হয় ভুলই করিলাম।

আমাদের বলিবার আরও কথা আছে। কর্তৃপক্ষদের এ-কথাও স্মরণ করাইতে পারি যে, আজ তোমরা আত্মকর্তৃত্বের মোটর গাড়ি চালাইতেছ কিন্তু একদিন রাত-থাকিতে যখন গোরুর গাড়িতে যাত্রা শুরু হইয়াছিল তখন খালখন্দর মধ্য দিয়া চাকা দুটোর আর্তনাদ ঠিক জয়ধ্বনির মতো শোনাইত না। পার্লামেন্ট বরাবরই ডাইনে বাঁয়ে প্রবল ঝাঁকানি খাইয়া এক নজির হইতে আর এক নজিরের লাইন কাটিতে কাটিতে আসিয়াছে, গোড়াগুড়িই স্টীমরোলার-টানা পাকা রাস্তা পায় নাই। কত ঘুষঘাষ, ঘুষাঘুষি, দলাদলি, অবিচার এবং অব্যবস্থার মধ্য দিয়া সে হেলিয়া হেলিয়া চলিয়াছে। কখনো রাজা, কখনো গির্জা, কখনো জমিদার, কখনো বা মদওয়ালারও স্বার্থ বহিয়াছে। এমন এক সময় ছিল সদস্যেরা যখন জরিমানা ও শাসনের ভয়েই পার্লামেন্টে হাজির হইত। আর গলদের কথা যদি বল, কবেকার কালে সেই আয়ার্লণ্ড আমেরিকার সম্বন্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া আজকের দিনে বোয়ার যুদ্ধ এবং ডার্ডানেলিস মেসোপোটেমিয়া পর্যন্ত গলদের লম্বা ফর্দ দেওয়া যায়; ভারতবিভাগের ফর্দটাও নেহাত ছোটো নয়—কিন্তু সেটার কথায় কাজ নাই। আমেরিকার রাষ্ট্রতন্ত্রে কুবের দেবতার চরগুলি যে-সকল কুকীর্তি করে সেগুলো সামান্য নয়। ড্রেফুসের নির্যাতন উপলক্ষ্যে ফ্রান্সের রাষ্ট্রতন্ত্রে সৈনিক-প্রাধান্যের যে অন্যায় প্রকাশ পাইয়াছিল তাহাতে রিপুর অক্ষশক্তিরই তো হাত দেখা যায়।

এ-সকল সত্ত্বেও আজকের দিনে এ-কথায় কারও মনে সন্দেহ লেশমাত্র নাই যে, আত্মকর্তৃত্বের চির-সচলতার বেগেই মানুষ ভুলের মধ্য দিয়াই ভুলকে কাটায়, অন্যায়ের গর্তে ঘাড়মোড় ভাঙিয়া পড়িয়াও ঠেলাঠেলি করিয়া উপরে ওঠে। এইজন্য মানুষকে পিছমোড়া বাঁধিয়া তার মুখে পায়সান্ন তুলিয়া দেওয়ার চেয়ে তাকে স্বাধীনভাবে অন্ন উপার্জনের চেষ্টায় উপবাসী হইতে দেওয়াও ভালো।

এর চেয়েও একটা বড়ো কথা আমাদের বলিবার আছে,—সে এই যে, রাষ্ট্রীয় আত্মকর্তৃত্বে কেবল যে সুব্যবস্থা বা দায়িত্ববোধ জন্মে তা নয়, মানুষের মনের আয়তন বড়ো হয়। কেবল পল্লীসমাজে বা ছোটোছোটো সামাজিক শ্রেণীবিভাগে যাদের মন বদ্ধ, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অধিকার পাইলে তবেই মানুষকে বড়ো পরিধির মধ্যে দেখিবার তারা সুযোগ পায়। এই সুযোগের অভাবে প্রত্যেক মানুষ মানুষ-হিসাবে ছোটো হইয়া থাকে। এই অবস্থায় সে যখন মনুষ্যত্বের বৃহৎ ভূমিকার উপরে আপন জীবনকে না ছড়াইয়া দেখে তখন তার চিন্তা তার শক্তি তার আশাভরসা সমস্তই ছোটো হইয়া যায়। মানুষের এই আত্মার খর্বতা তার প্রাণনাশের চেয়ে ঢের বেশি বড়ো অমঙ্গল। "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।" অতএব ভুলচুকের সমস্ত আশঙ্কা মানিয়া লইয়াও আমরা আত্মকর্তৃত্ব চাই। আমরা পড়িতে পড়িতে চলিব—দোহাই তোমার, আমাদের এই পড়ার দিকেই তাকাইয়া আমাদের চলার দিকে বাধা দিয়ো না।

এই জবাবই সত্য জবাব। যদি নাছোড়বান্দা হইয়া কেনো একগুঁয়ে মানুষ এই জবাব দিয়া কর্তৃপক্ষকে বেজার করিয়া তোলে তবে সেদিক হইতে সে ইন্‌টার্নড্‌ হইতে পারে কিন্তু এদিক হইতে বাহবা পায়। অথচ ঠিক এই জবাবটাই যদি আমাদের সমাজকর্তাদের কাছে দাখিল করি, যদি বলি "তোমরা বল, যুগটা কলি, আমাদের বুদ্ধিটা কম, স্বাধীন বিচারে আমাদের ভুল হয়, স্বাধীন ব্যবহারে আমরা অপরাধ করি, অতএব মগজটাকে অগ্রাহ্য করিয়া পুঁথিটাকে শিরোধার্য করিবার জন্যই আমাদের নতশিরটা তৈরি, কিন্তু এতবড়ো অপমানের কথা আমরা মানিব না," তবে চণ্ডী-মণ্ডপের চক্ষু রাঙা হইয়া ওঠে এবং সমাজকর্তা তখনই সামাজিক ইন্‌টার্নমেন্ট এর হুকুম জারি করেন। যাঁরা পোলিটিকাল আকাশে উড়িবার জন্য পাখা ঝটপট করেন তাঁরাই সামাজিক দাঁড়ের উপর পা-দুটোকে শক্ত শিকলে জড়াইয়া রাখেন।

আসল কথা নৌকাটাকে ডাইনে চালাইবার জন্যও যে হাল, বাঁয়ে চালাইবার জন্যও সেই হাল। একটা মূলকথা আছে সেইটেকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই সমাজেও মানুষ সত্য হয়, রাষ্ট্রব্যাপারেও মানুষ সত্য হয়। সেই মূলকথাটার ধারণা লইয়াই চিৎপুরের সঙ্গে চৌরঙ্গির তফাত। চিতপুর একেবারেই ঠিক করিয়া আছে যে, সমস্তই

উপরওয়ালার হাতে। তাই সে নিজের হাত খালি করিয়া চিত হইয়া রহিল। চৌরঙ্গি বলে, কিছুতে আমাদের হাত নাই এ-যদি সত্যই হইত তবে আমাদের হাত দুটোই থাকিত না। উপরওয়ালার হাতের সঙ্গে আমাদের হাতের একটা অবিচ্ছিন্ন যোগ আছে চৌরঙ্গি এই কথা মানে বলিয়াই জগৎটাকে হাত করিয়াছে, আর চিতপুর তাহা মানে না বলিয়াই জগৎটাকে হাতছাড়া করিয়া দুই চক্ষুর তারা উলটাইয়া শিবনেত্র হইয়া রহিল।

আমাদের ঘরগড়া কুনো নিয়মকেই সব চেয়ে বড়ো মনে করিতে হইলে চোখ বুজিতে হয়। চোখ চাহিলে দেখি, বিশ্বের আগাগোড়া একটা বৃহৎ নিয়ম আছে। নিজের চেষ্টায় সেই নিয়মকে দখল করাই শক্তিলাভ সমৃদ্ধিলাভ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ—এই নিশ্চিত বোধটাই বর্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার পাকা ভিত। ব্যক্তিবিশেষের সফলতা কোনো বিশেষ বিধানে নয়, বিশ্ববিধানে—এইটে শক্ত করিয়া জানাতেই শক্তির ক্ষেত্রে য়ুরোপের এতবড়ো মুক্তি।

আমরা কিন্তু দুই হাত উলটাইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিতেছি—কর্তার ইচ্ছা কর্ম। সেই কর্তাটিকে—ঘরের বাপদাদা, বা পুলিসের দারোগা, বা পাণ্ডা পুরোহিত, বা স্মৃতিরত্ন, বা শীতলা মনসা ওলাবিবি দক্ষিণরায়, শনি মঙ্গল রাহু কেতু—প্রভৃতি হাজার রকম নাম দিয়া নিজের শক্তিকে হাজার টুকরা করিয়া আকাশে উড়াইয়া দিই।

কালেজি পাঠক বলিবেন—আমরা তো এ-সব মানি না। আমরা তো বসন্তর টিকা লই; ওলাউঠা হইলে নুনের জলের পিচকিরি লইবার আয়োজন করি; এমন কি, মশাবাহিনী ম্যালেরিয়াকে আজও আমরা দেবী বলিয়া খাড়া করি নাই, তাকে আমরা কীটস্য কীট বলিয়াই গণ্য করি; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রভরা তাবিজটাকে পেটভরা পিলের উপর ঝুলাইয়া রাখি।

মুখে কোন্‌টাকে মানি বা নাই মানি তাতে কিছু আসে যায় না কিন্তু ওই মানার বিষে আমাদের মনের ভিতরটা জর্জরিত। এই মানসিক কাপুরুষতার ভিত্তি একটা চরাচরব্যাপী অনিশ্চিত ভয়ের উপর। অখণ্ড বিশ্বনিয়মের মধ্যে প্রকাশিত অখণ্ড বিশ্বশক্তিকে মানি না বলিয়াই হাজার রকম ভয়ের কল্পনায় বুদ্ধিটাকে আগেভাগে বরখাস্ত করিয়া বসি। ভয় কেবলই বলে, কী জানি, কাজ কী। ভয় জিনিসটাই এই রকম। আমাদের রাজপুরুষদের মধ্যেও দেখি, রাজ্যশাসনের কোনো একটা ছিদ্র দিয়া ভয় ঢুকিলেই তারা পাশ্চাত্ত্য স্বধর্মকেই ভুলিয়া যায়—যে ধ্রুব আইন তাদের শক্তির ধ্রুব নির্ভর তারই উপর চোখ বুজিয়া কুড়াল চালাইতে থাকে। তখন ন্যায় রক্ষার উপর ভরসা চলিয়া যায়, প্রেস্টিজ রক্ষাকে তার চেয়ে বড়ো মনে করে—এবং বিধাতার উপর

ঠেকা দিয়া ভাবে প্রজার চোখের জলটাকে গায়ের জোরে আণ্ডামানে পাঠাইতে পারিলেই তাদের পক্ষে লঙ্কার ধোঁয়াটাকে মনোরম করা যায়। এইটেই তো বিশ্ব-বিধানের প্রতি অবিশ্বাস, নিজের বিশেষ বিধানের প্রতি ভরসা। এর মূলে ছোটো ভয়, কিংবা ছোটো লোভ, কিংবা কাজকে সোজা করিবার অতি ছোটো চাতুরী। আমরাও অন্ধভয়ের তাড়ায় মনুষ্যধর্মটাকে বিসর্জন দিতে রাজি। ব্যতিব্যস্ত হইয়া, যেখানে যা-কিছু আছে এবং নাই, সমস্তকেই জোড়হাত করিয়া মানিতে লাগিয়াছি। তাই আমরা জীববিজ্ঞান বা বস্তুবিজ্ঞানই পড়ি আর রাষ্ট্রতন্ত্রের ইতিহাসে পরীক্ষাই পাস করি, "কর্তার ইচ্ছা কর্ম" এই বীজমন্ত্রটাকে মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারি না। তাই, যদিচ আমাদের একালের ভাগ্যে দেশে অনেকগুলি দশের কাজের পত্তন হইয়াছে তবু আমাদের সেকালের ভাগ্যে সেই দশের কাজ একের কাজ হইয়া উঠিবার জন্য কেবলই ঠেলা মারিতে থাকে। কোথা হইতে খামকা একটা-না-একটা কর্তা ফুঁড়িয়া ওঠে। তার একমাত্র কারণ, যে দশের কথা হইতেছে তারা ওঠে বসে, খায় দায়, বিবাহ ও চিতারোহণ করে এবং পরকালে পিণ্ড লইতে হাত বাড়ায় কর্তার ইচ্ছায়; কিসে পাপ কিসে পুণ্য, কে ঘরে ঢুকিলে হুঁকার জল ফেলিতে হইবে, ক-হাত ঘেরের কুয়ার জলে স্নান করা যায়, ভোক্তার ধর্মরক্ষার পক্ষে ময়রার হাতের লুচিরই বা কী গুণ রুটিরই বা কী, ম্লেচ্ছের তৈরি মদেরই বা কী আর ম্লেচ্ছের ছোঁয়া জলেরই বা কী, কর্তার ইচ্ছার উপর বরাত দিয়া সে-বিচার তারা চিরকালের মতো সারিয়া রাখিয়াছে। যদি বলি পানি-পাঁড়ে নোংরা ঘটি ডুবাইয়া যে-জল বালতিতে লইয়া ফিরিতেছে সেটা পানের অযোগ্য, আর পানি মিঞা ফিলটার হইতে যে-জল আনিল সেটাই শুচি ও স্বাস্থ্যকর, তবে উত্তর শুনিব, ওটা তো তুচ্ছ যুক্তির কথা, কিন্তু ওটা তো কর্তার ইচ্ছা নয়। যদি বলি, নাই হইল কর্তার ইচ্ছা, তবে নিমন্ত্রণ বন্ধ। শুধু অতিথিসংকার নয়, অন্ত্যেষ্টিসংকার পর্যন্ত অচল। এত নিষ্ঠুর জবরদস্তি যারা যাদের অতি সামান্য খাওয়াছোঁওয়ার অধিকার পর্যন্ত পদে পদে ঠেকানো হয়, এবং সেটাকে যারা কল্যাণ বলিয়াই মানে তারা রাষ্ট্রব্যাপারে অবাধ অধিকার দাবি করিবার বেলায় সংকোচ বোধ করে না কেন?

যখন আপন শক্তির মূলধন লইয়া জনসাধারণের কারবার না চলে তখন সকল ব্যাপারেই মানুষ দৈবের কাছে, গ্রহের কাছে, পরের কাছে হাত পাতিয়া ভয়ে ভয়ে কাটায়। এই ভাবটার বর্ণনা যদি কোথাও খুব স্পষ্ট করিয়া ফুটিয়া থাকে তাহা বাংলার প্রাচীন মঙ্গলকাব্যে। চাঁদ সদাগরের মনের আদর্শ মহৎ তাই যে-দেবতাকে নিকৃষ্ট বলিয়া কিছুতে সে মানিতে চায় নাই বহুদুঃখে তারই শক্তির কাছে তাকে হার মানিতে হইল। এই যে শক্তি, এর সঙ্গে জ্ঞান বা ন্যায়ধর্মের যোগ নাই। মানিবার পাত্র বড়ই

যথেচ্ছাচারী ততই সে ভয়ংকর, ততই তার কাছে নতিস্তুতি। বিশ্বকর্তৃত্বের এই ধারণার সঙ্গে তখনকার রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের যোগ ছিল। কবিকঙ্কণের ভূমিকাতেই তার খবর মেলে। আইন নাই, বিচার নাই, জোর যার মুলুক তার; প্রবলের অত্যাচারে বাধা দিবার কোনো বৈধ পথ নাই; দুর্বলের একমাত্র উপায় স্তবস্তুতি, ঘুষঘাষ এবং অবশেষে পলায়ন। দেবচরিত্র-কল্পনাতেও যেমন, সমাজেও তেমন, রাষ্ট্রতন্ত্রেও সেইরূপ।

অথচ একদিন উপনিষদে বিধাতার কথা বলা হইয়াছিল, যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। অর্থাৎ তাঁর বিধান যথাতথ, তাহা এলোমেলো নয় এবং সে-বিধান শাশ্বত কালের। তাহা নিত্যকাল হইতে এবং নিত্যকালের জন্য বিহিত, তাহা মুহূর্তে মুহূর্তে নূতন নূতন খেয়াল নয়। সুতরাং সেই নিত্যবিধানকে আমরা প্রত্যেকেই জ্ঞানের দ্বারা বুঝিয়া কর্মের দ্বারা আপন করিয়া লইতে পারি। তাকে যতই পাইব ততই নূতন নূতন বাধা কাটাইয়া চলিব। কেননা, যে-বিধানে নিত্যতা আছে কোথাও সে একেবারে ঠেকিয়া যাইতে পারে না, বাধা সে অতিক্রম করিবেই। এই নিত্য এবং যথাতথ বিধানকে যথাতথরূপে জানাই বিজ্ঞান। সেই বিজ্ঞানের জোরে য়ুরোপের মনে এতবড়ো একটা ভরসা জন্মিয়াছে যে, সে বলিতেছে, ম্যালেরিয়াকে বিদায় করিবই, কোনো রোগকেই টিঁকিতে দিব না, জ্ঞানের অভাব অন্নের অভাব লোকালয় হইতে দূর হইবেই, মানুষের ঘরে যে-কেহ জন্মিবে সকলেই দেহে মনে সুস্থ সবল হইবে এবং রাষ্ট্রতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সহিত বিশ্বকল্যাণের সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে।

আধ্যাত্মিক অর্থে ভারতবর্ষ একদিন বলিয়াছিল, অবিদ্যাই বন্ধন, মুক্তি জ্ঞানে; সত্যকে পাওয়াতেই আমাদের পরিত্রাণ। অসত্য কাকে বলে? নিজেকে একান্ত বিচ্ছিন্ন করিয়া জানাই অসত্য। সর্বভূতের সঙ্গে আত্মার মিল জানিয়া পরমাত্মার সঙ্গে আধ্যাত্মিক যোগটিকে জানাই সত্য জানা। এতবড়ো সত্যকে মনে আনিতে পারা যে কী পরমাশ্চর্য ব্যাপার তা আজ আমরা বুঝিতেই পারিব না।

এদিকে আধিভৌতিক ক্ষেত্রে য়ুরোপ যে-মুক্তির সাধনা করিতেছে তারও মূল কথাটা এই একই। এখানেও দেখা যায় অবিদ্যাই বন্ধন, সত্যকে পাওয়াতেই মুক্তি। সেই বৈজ্ঞানিক সত্য মানুষের মনকে বিচ্ছিন্নতা হইতে বিশ্বব্যাপিকতায় লইয়া যাইতেছে এবং সেই পথে মানুষের বিশেষ শক্তিকে বিশ্বশক্তির সহিত যোগযুক্ত করিতেছে।

ভারতে ক্রমে ঋষিদের যুগ, অর্থাৎ গৃহস্থ তাপসদের যুগ গেল; ক্রমে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর যুগ আসিল। ভারতবর্ষ যে মহাসত্য পাইয়াছিল তাহাকে জীবনের ব্যবহারের পথ হইতে তফাত করিয়া দিল। বলিল, সন্ন্যাসী হইলে তবেই মুক্তির সাধনা সম্ভবপর হয়।

তার ফলে এদেশে বিদ্যার সঙ্গে অবিদ্যার একটা আপস হইয়া গেছে; বিষয়বিভাগের মতো উভয়ের মহল-বিভাগ হইয়া মাঝখানে একটা দেয়াল উঠিল। সংসারে তাই ধর্মে কর্মে আচারে বিচারে যত সংকীর্ণতা যত স্থূলতা যত মূঢ়তাই থাক উচ্চতম সত্যের দিক হইতে তার প্রতিবাদ নাই, এমন কি, সমর্থন আছে। গাছতলায় বসিয়া জ্ঞানী বলিতেছে, "যে-মানুষ আপনাকে সর্বভূতের মধ্যে ও সর্বভূতকে আপনার মধ্যে এক করিয়া দেখিয়াছে সেই সত্যকে দেখিয়াছে," অমনি সংসারী ভক্তিতে গলিয়া তার ভিক্ষার ঝুলি ভরিয়া দিল। ওদিকে সংসারী তার দরদালানে বসিয়া বলিতেছে, "যে-বেটা সর্বভূতকে যতদূর সম্ভব তফাতে রাখিয়া না চলিয়াছে তার ধোবানাপিত বন্ধ," আর জ্ঞানী আসিয়া তার মাথায় পায়ের ধুলা দিয়া আশীর্বাদ করিয়া গেল, "বাবা বাঁচিয়া থাকো।" এইজন্যই এদেশে কর্মসংসারে বিচ্ছিন্নতা জড়তা পদে পদে বাড়িয়া চলিল, কোথাও তাকে বাধা দিবার কিছু নাই। এইজন্যই শত শত বছর ধরিয়া কর্মসংসারে আমাদের এত অপমান, এত হার।

য়ুরোপে ঠিক ইহার উলটা। য়ুরোপের সত্যসাধনার ক্ষেত্র কেবল জ্ঞানে নহে ব্যবহারে। সেখানে রাজ্যে সমাজে যে কোনো খুঁত দেখা যায় এই সত্যের আলোতে সকলে মিলিয়া তার বিচার, এই সত্যের সাহায্যে সকলে মিলিয়া তার সংশোধন। এইজন্য সেই সত্য যে-শক্তি যে-মুক্তি দিতেছে সমস্ত মানুষের তাহাতে অধিকার, তাহা সকল মানুষকে আশা দেয়, সাহস দেয়—তাহার বিকাশ তন্ত্রমন্ত্রের কুয়াশায় ঢাকা নয়, মুক্ত আলোকে সকলের সামনে তাহা বাড়িয়া উঠিতেছে, এবং সকলকেই বাড়াইয়া তুলিতেছে।

এই যে কর্মসংসারে শত শত বছর ধরিয়া অপমানটা সহিলাম সেটা আমাদের কাছে দেখা দিয়াছে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার আকারে। যেখানে ব্যথা সেইখানেই হাত পড়ে। এইজন্যই যে-য়ুরোপীয় জাতি প্রভুত্ব পাইল তাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার দিকেই আমাদের সমস্ত মন গেল। আমরা আর সব কথা ভুলিয়া কেবলমাত্র এই কথাই বলিতেছি যে, ভারতের শাসনতন্ত্রের সঙ্গে আমাদের ইচ্ছার যোগসাধন হ'ক—উপর হইতে যেমন-খুশি নিয়ম হানিলে আর আমরা বিনা খুশিতে সে-নিয়ম মানিব এমনটা না হয়। কর্তৃত্বকে কাঁধে চাপাইলেই বোঝা হইয়া ওঠে, ওটাকে এমন একটা চাকাওয়ালা ঠেলাগাড়ির উপর নামানো হ'ক যেটাকে আমরাও নিজের হাতে ঠেলিতে পারি।

আজকের দিনে এই প্রার্থনা পৃথিবীর সব দেশেই জাগিয়া উঠিয়াছে যে, বাহিরের কর্তার সম্পূর্ণ একতরফা শাসন হইতে মানুষ ছুটি লইবে। এই প্রার্থনায় আমরা যে

যোগ দিয়াছি তাহা কালের ধর্মে—না যদি দিতাম, যদি বলিতাম রাষ্ট্রব্যাপারে আমরা চিরকালই কর্তাভজা, সেটা আমাদের পক্ষে নিতান্ত লজ্জার কথা হইত। অন্তত একটা কাটল দিয়াও সত্য আমাদের কাছে দেখা দিতেছে, এটাও শুভলক্ষণ।

সত্য দেখা দিল বলিয়াই আজ এতটা জোর করিয়া বলিতেছি যে, দেশের যে-আত্মাভিমানে আমাদের শক্তিকে সম্মুখের দিকে ঠেলা দিতেছে তাকে বলি সাধু, কিন্তু যে-আত্মাভিমান পিছনের দিকের অচল-খোঁটায় আমাদের বলির পাঁঠার মতো বাঁধিতে চায় তাকে বলি ধিক! এই আত্মাভিমানে বাহিরের দিকে মুখ করিয়া বলিতেছি, রাষ্ট্রতন্ত্রের কর্তৃত্বসভায় আমাদের আসন পাতা চাই, আবার সেই অভিমানেই ঘরের দিকে মুখ ফিরাইয়া হাঁকিয়া বলিতেছি, "খবরদার, ধর্মতন্ত্রে, সমাজতন্ত্রে এমন কি ব্যক্তি-গত ব্যবহারে কর্তার হুকুম ছাড়া এক পা চলিবে না"—ইহাকেই বলি হিন্দুয়ানির পুনরুজ্জীবন। দেশাভিমানের তরফ হইতে আমাদের উপর হুকুম আসিল, আমাদের এক চোখ জাগিবে আর এক চোখ ঘুমাইবে। এমন হুকুম তামিল করাই দায়।

বিধাতার শাস্তিতে আমাদের পিঠের উপর যখন বেত পড়িল তখন দেশাভিমান ধড়ফড় করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওপড়াও ওই বেতবনটাকে।" ভুলিয়া গেছে বেতবনটা গেলেও বাঁশবনটা আছে। অপরাধ বেতেও নাই বাঁশেও নাই, আছে আপনার মধ্যেই। অপরাধটা এই যে সত্যের জায়গায় আমরা কর্তাকে মানি, চোখের চেয়ে চোখের ঠুলিকে শ্রদ্ধা করাই আমাদের চিরাভ্যাস। যতদিন এমনি চলিবে ততদিন কোনো-না-কোনো ঝোপে-ঝাড়ে বেতবন আমাদের জন্য অমর হইয়া থাকিবে।

সমাজের সকল বিভাগেই ধর্মতন্ত্রের শাসন এক সময়ে য়ুরোপেও প্রবল ছিল। তারই বেড়-জালটাকে কাটিয়া যখন বাহির হইল তখন হইতেই সেখানকার জনসাধারণ আত্মকর্তৃত্বের পথে যথেষ্ট লম্বা করিয়া পা ফেলিতে পারিল। ইংরেজের দ্বৈপায়নতা ইংরেজের পক্ষে একটা বড়ো সুযোগ ছিল। কেননা য়ুরোপীয় ধর্মতন্ত্রের প্রধান আসন রোমে। সেই রোমের পূর্ণপ্রভাব অস্বীকার করা বিচ্ছিন্ন ইংলণ্ডের পক্ষে কঠিন হয় নাই। ধর্মতন্ত্র বলিতে যা বোঝায় ইংলণ্ডে আজও তার কোনো চিহ্ন নাই, এমন কথা বলি না। কিন্তু বড়োঘরের গৃহিণী বিধবা হইলে যেমন হয় তার অবস্থা তেমনি। একসময়ে যাদের কাছে সে নথ-নাড়া দিয়াছে, ন্যায়ে অন্যায়ে আজ তাদেরই মন জোগাইয়া চলে; পাশের ঘরে তার বাসের জায়গা, খোরপোশের জন্য সামান্য কিছু মাসহারা বরাদ্দ। হালের ছেলেরা পূর্বস্মরণমতো বুড়িকে হপ্তায় হপ্তায় প্রণাম করে বটে কিন্তু মান্য করে না। এই গৃহিণীর দাবরাব যদি পূর্বের মতো থাকিত তবে ছেলেমেয়েদের কারও আজ টুঁ শব্দ করিবার জো থাকিত না।

ইংলণ্ড এই বুড়ির শাসন অনেকদিন হইল কাটাইয়াছে কিন্তু স্পেন এখনও সম্পূর্ণ কাটায় নাই। একদিন স্পেনের পালে খুব জোর হাওয়া লাগিয়াছিল; সেদিন পৃথিবীর ঘাটে আঘাটায় সে আপনার জয়ধ্বজা উড়াইল। কিন্তু তার হালটার দিকে সেই বুড়ি বসিয়া ছিল, তাই আজ সে একেবারে পিছাইয়া পড়িয়াছে। প্রথম দমেই সে এতটা দৌড় দিল তবু একটু পরেই সে যে আর দম রাখিতে পারিল না, তার কারণ কী। তার কারণ, বুড়িটা বরাবর ছিল তার কাঁধে চড়িয়া। অনেকদিন আগেই সেদিন স্পেনের হাঁপের লক্ষণ দেখা যায় যেদিন ইংরেজের সঙ্গে স্পেনের রাজা ফিলিপের নৌযুদ্ধ বাধিল। সে-দিন হঠাৎ ধরা পড়িল স্পেনের ধর্মবিশ্বাসও যেমন সনাতন প্রথায় বাঁধা তার নৌযুদ্ধ-বিদ্যাও তেমনি। ইংরেজের যুদ্ধজাহাজ চঞ্চল জলহাওয়ার নিয়মকে ভালো করিয়া বুঝিয়া লইয়াছিল কিন্তু স্পেনীয়দের যুদ্ধজাহাজ নিজের অচল বাঁধি নিয়মকে ছাড়িতে পারে নাই। যার নৈপুণ্য বেশি, তার কৌলীন্য যেমনি থাক, সে ইংরেজ-যুদ্ধজাহাজের সর্দার হইতে পারিত কিন্তু কুলীন ছাড়া স্পেনীয় রণতরীর পতিপদে কারও অধিকার ছিল না।

আজ য়ুরোপের ছোটোবড়ো যে-কোনো দেশেই জনসাধারণ মাথা তুলিতে পারিয়াছে, সর্বত্রই ধর্মতন্ত্রের অন্ধ কর্তৃত্ব আলগা হইয়া মানুষ নিজেকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছে। গণসমাজে যেখানে এই শ্রদ্ধা নাই—যেমন রাশিয়ায়—সেখানকার সমাজ বেওয়ারিস ক্ষেত্রের মতো নানা কর্তার কাঁটাগাছে জঙ্গল হইয়া ওঠে। সেখানে একালের পেয়াদা হইতে সেকালের পুঁথি পর্যন্ত সকলেই মনুষ্যত্বের কান মলিয়া অন্যায় খাজনা আদায় করে।

মনে রাখা দরকার, ধর্ম আর ধর্মতন্ত্র এক জিনিস নয়। ও যেন আগুন আর ছাই। ধর্মতন্ত্রের কাছে ধর্ম যখন খাটো হয় তখন নদীর বালি নদীর জলের উপর মোড়লি করিতে থাকে। তখন স্রোত চলে না, মরুভূমি ধুধু করে। তার উপরে, সেই অচলতাটাকে লইয়াই মানুষ যখন বুক ফোলায় তখন গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকং।

ধর্ম বলে, মানুষকে যদি শ্রদ্ধা না কর তবে অপমানিত ও অপমানকারী কারও কল্যাণ হয় না। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, মানুষকে নির্দয়ভাবে অশ্রদ্ধা করিবার বিস্তারিত নিয়মাবলী যদি নিখুঁত করিয়া না মান তবে ধর্মভ্রষ্ট হইবে। ধর্ম বলে, জীবকে নিরর্থক কষ্ট যে দেয় সে আত্মাকেই হনন করে। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, যত অসহ্য কষ্টই হ'ক্, বিধবা মেয়ের মুখে যে বাপ মা বিশেষ তিথিতে অন্নজল তুলিয়া দেয় সে পাপকে লালন করে। ধর্ম বলে, অনুশোচনা ও কল্যাণকর্মের দ্বারা অন্তরে বাহিরে পাপের শোধন। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, গ্রহণের দিনে বিশেষ জলে ডুব দিলে, কেবল নিজের নয়, চোদ্দপুরুষের

পাপ উদ্ধার। ধর্ম বলে, সাগরগিরি পার হইয়া পৃথিবীটাকে দেখিয়া লও, তাতেই মনের বিকাশ। ধর্মতন্ত্র বলে, সমুদ্র যদি পারাপার কর তবে খুব লম্বা করিয়া নাকে খত দিতে হইবে। ধর্ম বলে, যে মানুষ যথার্থ মানুষ সে যে-ঘরেই জন্মাক পূজনীয়। ধর্মতন্ত্র বলে, যে মানুষ ব্রাহ্মণ সে যতবড়ো অভাজনই হ'ক মাথায় পা তুলিবার যোগ্য। অর্থাৎ মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্মতন্ত্র।

আমি জানি একদিন একজন রাজা কলিকাতায় আর-এক রাজার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। বাড়ি যাঁর তিনি কালেজে পাস-করা সুশিক্ষিত। অতিথি যখন দেখা সারিয়া গাড়িতে উঠিবেন এমন সময় বাড়ি যাঁর তিনি রাজার কাপড় ধরিয়া টানিলেন, বলিলেন, "আপনার মুখে পান!" গাড়ি যার তিনি দায়ে পড়িয়া মুখের পান ফেলিলেন, কেননা সারথি মুসলমান। এ-কথা জিজ্ঞাসা করিবার অধিকারই নাই "সারথি যেই হ'ক মুখের পান ফেলা যায় কেন?" ধর্মবুদ্ধিতে বা কর্মবুদ্ধিতে কোথাও কিছুমাত্র আটক না খাইলেও গাড়িতে বসিয়া স্বচ্ছন্দে পান খাইবার স্বাধীনতাটুকু যে দেশের মানুষ অনায়াসে বর্জন করিতে প্রস্তুত সে-দেশের লোক স্বাধীনতার অন্ত্যেষ্টি সংকার করিয়াছে। অথচ দেখি যারা গোড়ায় কোপ দেয় তারাই আগায় জল ঢালিবার জন্য ব্যস্ত।

নিষ্ঠা পদার্থের একটা শোভা আছে। কোনো কোনো বিদেশী এদেশে আসিয়া সেই শোভার ব্যাখ্যা করেন। এটাকে বাহির হইতে তাঁরা সেইভাবেই দেখেন একজন আর্টিস্ট পুরানো ভাঙা বাড়ির চিত্রযোগ্যতা যেমন করিয়া দেখে, তার বাসযোগ্যতার খবর লয় না। স্নানযাত্রার পরবে বরিশাল হইতে কলিকাতায় আসিতে গঙ্গাস্নানের যাত্রী দেখিয়াছি, তার বেশির ভাগ স্ত্রীলোক। স্টীমারের ঘাটে ঘাটে, রেলওয়ের স্টেশনে স্টেশনে তাদের কষ্টের অপমানের সীমা ছিল না। বাহিরের দিক হইতে এই ব্যাকুল সহিষ্ণুতার সৌন্দর্য আছে। কিন্তু আমাদের দেশের অন্তর্যামী এই অন্ধ নিষ্ঠার সৌন্দর্যকে গ্রহণ করেন নাই। তিনি পুরস্কার দিলেন না, শাস্তিই দিলেন। দুঃখ বাড়িতেই চলিল। এই মেয়েরা মানত-স্বস্ত্যয়নের বেড়ার মধ্যে যে সব ছেলে মানুষ করিয়াছে ইহকালের সমস্ত বস্তুর কাছেই তারা মাথা হেঁট করিল এবং পরকালের সমস্ত ছায়ার কাছেই তারা মাথা খুঁড়িতে লাগিল। নিজের কাজের বাধাকে রাস্তার বাঁকে বাঁকে গাড়িয়া দেওয়াই এদের কাজ, এবং নিজের উন্নতির অন্তরায়কে আকাশপরিমাণ উঁচু করিয়া তোলাকেই এরা বলে উন্নতি। সত্যের জন্য মানুষ কষ্ট সহিবে এইটেই সুন্দর। কানা-বুদ্ধি কিম্বা খোঁড়া-শক্তির হাত হইতে মানুষ লেশমাত্র কষ্ট যদি সয় তবে সেটা কুদৃশ্য। কারণ, বিধাতা আমাদের সব চেয়ে বড়ো যে-সম্পদ দিয়াছেন—

ত্যাগ-স্বীকারের বীরত্ব—এই কষ্ট তারই বেহিসাবি বাজে খরচ। আজ তারই নিকাশ আমাদের চলিতেছে—ইহার ঋণের ফর্দটাই মোটা। চোখের সামনে দেখিয়াছি হাজার হাজার মেয়েপুরুষ পুণ্যের সন্ধানে যে-পথ দিয়া স্নানে চলিয়াছে ঠিক তারই ধারে মাটিতে পড়িয়া একটি বিদেশী রোগী মরিল, সে কোন্ জাতের মানুষ জানা ছিল না বলিয়া কেহ তাহাকে ছুঁইল না। এই তো ঋণদায়ে দেউলিয়ার লক্ষণ। এই কষ্টসহিষ্ণু পুণ্যকামীদের নিষ্ঠা দেখিতে সুন্দর কিন্তু ইহার লোকসান সর্বনেশে। যে-অন্ধতা মানুষকে পুণ্যের জন্য জলে স্নান করিতে ছোটায় সেই অন্ধতাই তাকে অজানা মুমূর্ষুর সেবায় নিরস্ত করে। একলব্য পরম নিষ্ঠুর দ্রোণাচার্যকে তার বুড়া আঙুল কাটিয়া দিল, কিন্তু এই অন্ধ নিষ্ঠার দ্বারা সে নিজের চিরজীবনের তপস্যাফল হইতে তার সমস্ত আপন জনকে বঞ্চিত করিয়াছে। এই যে মূঢ় নিষ্ঠার নিরতিশয় নিষ্ফলতা, বিধাতা ইহাকে সমাদর করেন না—কেননা ইহা তাঁর দানের অবমাননা। গয়াতীর্থে দেখা গেছে, যে-পাণ্ডার না আছে বিদ্যা, না আছে চরিত্র, ধনী স্ত্রীলোক রাশি রাশি টাকা ঢালিয়া দিয়া তার পা পূজা করিয়াছে। সেই সময়ে তার ভক্তিবিহ্বলতা ভাবুকের চোখে সুন্দর কিন্তু এই অবিচলিত নিষ্ঠা, এই অপরিমিত বদান্যতা কি সত্য দয়ার পথে এই স্ত্রীলোককে এক-পা অগ্রসর করিয়াছে। ইহার উত্তর এই যে, তবু তো সে টাকাটা খরচ করিতেছে; সে যদি পাণ্ডাকে পবিত্র বলিয়া না মানিত তবে টাকা খরচ করিতই না, কিম্বা নিজের জন্য করিত। সে-কথা ঠিক,—কিন্তু তার একটা মস্ত লাভ হইত এই যে, সেই খরচ-না-করাটাকে কিম্বা নিজের জন্য খরচ-করাটাকে সে ধর্ম বলিয়া নিজেকে ভোলাইত না,—এই মোহের দাসত্ব হইতে তার মন মুক্ত থাকিত। মনের এই মুক্তির অভাবেই দেশের শক্তি বাহিরে আসিতে পারিতেছে না। কেননা যাকে চোখ বুজিয়া চালানো অভ্যাস করানো হইয়াছে, চোখ খুলিয়া চলিতে তার পা কাঁপে, অনুগত দাসের মতো যে কেবল মনিবের জন্যই প্রাণ দিতে শিখিয়াছে, আপনি প্রভু হইয়া স্বেচ্ছায় ন্যায়ধর্মের জন্য প্রাণ দেওয়া তার পক্ষে অসাধ্য।

এই জন্যই আমাদের পাড়াগাঁয়ে অন্ন জল স্বাস্থ্য শিক্ষা আনন্দ সমস্ত আজ ভাঁটার মুখে। আত্মশক্তি না জাগাইতে পারিলে পল্লীবাসীর উদ্ধার নাই—এই কথা মনে করিয়া, নিজের কল্যাণ নিজে করিবার শক্তিকে একটা বিশেষ পাড়ায় জাগাইবার চেষ্টা করিলাম। একদিন পাড়ায় আগুন লাগিল; কাছে কোথাও এক ফোঁটা জল নাই; পাড়ার লোক দাঁড়াইয়া 'হায় হায়' করিতেছে। আমি তাদের বলিলাম, "নিজের মজুরি দিয়া যদি তোমরা পাড়ায় একটা কুয়ো খুঁড়িয়া দাও আমি তার বাঁধাইবার খরচা দিব।" তারা ভাবিল, পুণ্য হইবে ওই সেয়ানা লোকটার, আর তার মজুরি জোগাইব

আমরা, এটা ফাঁকি। সে কুয়ো খোঁড়া হইল না, জলের কষ্ট রহিয়া গেল, আর আগুনের সেখানে বাঁধা নিমন্ত্রণ।

এই যে অটল দুর্দশা, এর কারণ,—গ্রামের যা-কিছু পূর্তকার্য তা এ-পর্যন্ত পুণ্যের প্রলোভনে ঘটিয়াছে। তাই মানুষের সকল অভাবই পূরণ করিবার বরাত হয় বিধাতার 'পরে, নয় কোনো আগন্তুকের উপর। পুণ্যের উমেদার যদি উপস্থিত না থাকে তবে এরা জল না-খাইয়া মরিয়া গেলেও নিজের হাতে এক কোদাল মাটিও কাটিবে না। কেননা এরা এখনও সেই বুড়ির কোল থেকে নামে নাই যে-বুড়ি এদের জাতিকুল ধর্মকর্ম ভালোমন্দ শোওয়াবসা সমস্তই বাহির হইতে বাঁধিয়া দিয়াছে। ইহাদের দোষ দিতে পারি না, কেননা বুড়ি এদের মনটাকেই আফিম খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইয়াছে। কিন্তু অবাক হইতে হয় যখন দেখি, এখনকার কালের শিক্ষিত যুবকেরা, এমন কি, কালেজের তরুণ ছাত্রেরাও এই বুড়িতন্ত্রের গুণ গাহিতেছেন। ভারতবর্ষকে সনাতন ধাত্রীর কাঁধে চড়িতে দেখিয়া ইহাদের ভারি গর্ব; বলেন, ওটা বড়ো উচ্চ জায়গা, ওখান হইতে পা মাটিতেই পড়ে না; বলেন, ওই কাঁধে থাকিয়াই আত্মকর্তৃত্বের রাজদণ্ড হাতে ধরিলে বড়ো শোভা হইবে।

অথচ স্পষ্ট দেখি, দুঃখের পর দুঃখ, দুর্ভিক্ষের পর দুর্ভিক্ষ; যমলোকের যতগুলি চর আছে সবগুলিই আমাদের ঘরে ঘরে বাসা লইল। বাঘে ডাকাতে তাড়া করিলেও যেমন আমাদের অস্ত্র তুলিবার হুকুম নাই তেমনি এই অমঙ্গলগুলো লাফ দিয়া যখন ঘাড়ের উপর দাঁত বসাইতে আসে তখন দেখি সামাজিক বন্দুকের পাস নাই। ইহাদিগকে খেদাইবার অস্ত্র জ্ঞানের অস্ত্র, বিচারবুদ্ধির অস্ত্র। বুড়ির শাসনের প্রতি যাঁদের ভক্তি অটল তাঁরা বলেন, "ওই অস্ত্রটা কি আমাদের একেবারে নাই? আমরাও সায়ান্স শিখিব এবং যতটা পারি খাটাইব।" অস্ত্র একেবারে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় কিন্তু অস্ত্র-পাসের আইনটা বিষম কড়া। অস্ত্র ব্যবহার করিতে দিয়াও যতটা না-দিতে পারা যায় তারই উপর ষোলো আনা ঝোঁক। ব্যবহারের গণ্ডি এতই, তার একটু এদিক-ওদিক হইলেই এত দুর্জয় কানমলা, সমস্ত গুরুপুরোহিত তাগাতাবিজ সংস্কৃত শ্লোক ও মেয়েলি মন্ত্র এত ভয়ে ভয়ে সাবধানে বাঁচাইয়া চলিতে হয় যে, ডাকাত পড়িলে ডাকাতের চেয়ে অনভ্যাসের বন্দুকটা লইয়াই ফাঁপরে পড়িতে হয়।

যাই হ'ক, পায়ের বেড়িটা অক্ষয় হ'ক বলিয়াই যখন আশীর্বাদ করা হইল তখন দয়ালু লোক এ-কথাও বলিতে বাধ্য যে, মানুষদের কাঁধে করিয়া বেড়াইতে প্রস্তুত হও। যত রাজ্যের জাতের বেড়া, আচারের বেড়া মেরামত করিয়া পাকা করাই যদি পুনরুজ্জীবন হয়, যদি এমনি করিয়া জীবনের ক্ষেত্রকে বাধাগ্রস্ত ও বুদ্ধির ক্ষেত্রকে সংকীর্ণ

করাই আমাদের গৌরবের কথা হয় তবে সেই সঙ্গে এ-কথাও বলিতে হয়, এই অক্ষমদের দুই বেলা লালন করিবার জন্য দল বাঁধো। কিন্তু দুই বিপরীত কূলকে এক সঙ্গে বাঁচাইবার সাধ্য কোনো শক্তিমানেরই নাই। তৃষার্তের ঘড়াঘটি সমস্ত চুরমার করিবে, তার পরে চালুনি দিয়া জল আনিতে ঘন ঘন ঘাটে-ঘরে আনাগোনা, এ আবদার বিধাতার সহ্য হয় না।

অনেকে বলেন, এদেশে পদে পদে এত দুঃখদারিদ্র্য, তার মূল কারণ এখানকার সম্পূর্ণ শাসনভার পরজাতির উপর। কথাটাকে বিচার করিয়া দেখা দরকার।

ইংরেজ-রাষ্ট্রনীতির মূলতত্ত্বই রাষ্ট্রতন্ত্রের সঙ্গে প্রজাদের শক্তির যোগ। এই রাষ্ট্রতন্ত্র চিরদিনই একতরফা আধিপত্যের বুকে শেল হানিয়াছে, এ-কথা আমাদের কাছেও কিছুমাত্র ঢাকা নাই। এই কথাই সরকারি বিদ্যালয়ে আমরা সদরে বসিয়া পড়ি, শিখি, এবং পড়িয়া এগজামিন পাস করি। এ-কথাটাকে এখন আমাদের কাছ হইতে ফিরাইয়া লইবার আর উপায় নাই।

কন্‌গ্রেস বল, লীগ বল, এ-সমস্তর মূলই এইখানে। যেমন য়ুরোপীয় সায়ান্সে আমাদের সকলেরই অধিকারটা সেই সায়ান্সেরই প্রকৃতিগত, তেমনি ইংরেজ-রাষ্ট্রতন্ত্রে ভারতের প্রজার আপন অধিকার সেই রাষ্ট্রনীতিরই জীবনধর্মের মধ্যেই। কোনো একজন বা দশজন বা পাঁচশজন ইংরেজ বলিতে পারে, ভারতীয় ছাত্রকে সায়ান্স শিখিবার সুযোগটা না দেওয়াই ভালো, কিন্তু সায়ান্স সেই পাঁচশ ইংরেজের কণ্ঠকে লজ্জা দিয়া বজ্রস্বরে বলিবে, "এস তোমরা, তোমাদের বর্ণ যেমনি হ'ক, তোমাদের দেশ যেখানেই থাক, আমাকে গ্রহণ করিয়া শক্তি লাভ করো।" তেমনি কোনো দশজন বা দশহাজারজন ইংরেজ রাজসভার মঞ্চে বা খবরের কাগজের স্তম্ভে চড়িয়া বলিতেও পারে যে, ভারতশাসনতন্ত্রে ভারতীয় প্রজার কর্তৃত্বকে নানাপ্রকারে প্রবেশে বাধা দেওয়াই ভালো, কিন্তু সেই দশহাজার ইংরেজের মন্ত্রণাকে তিরস্কার করিয়া ইংরেজের রাষ্ট্রনীতি বজ্রস্বরে বলিতেছে, "এস তোমরা, তোমাদের বর্ণ যেমনি হ'ক, তোমাদের দেশ যেখানেই থাক, ভারতশাসনতন্ত্রে ভারতীয় প্রজার আপন অধিকার আছে, তাহা গ্রহণ করো।"

কিন্তু ইংরেজের রাষ্ট্রনীতি আমাদের বেলায় খাটে না, এমন একটা কড়া জবাব শুনিবার আশঙ্কা আছে। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ যেমন বলিয়াছিল উচ্চতর জ্ঞানে ধর্মে কর্মে শূদ্রের অধিকার নাই, এও সেই রকমের কথা। কিন্তু ব্রাহ্মণ এই অধিকারভেদের ব্যবস্থাটাকে আগাগোড়া পাকা করিয়া গাঁথিয়াছিল—যাহাকে বাহিরে পঙ্গু করিবে তার মনকেও পঙ্গু করিয়াছিল। জ্ঞানের দিকে গোড়া কাটা পড়িলেই কর্মের দিকে ডালপালা

আপনি শুকাইয়া যায়। শূদ্রের সেই জ্ঞানের শিকড়টা কাটিতেই আর বেশি কিছু করিতে হয় নাই; তার পর হইতে তার মাথাটা আপনিই হুইয়া পড়িয়া ব্রাহ্মণের পদরজে আসিয়া ঠেকিয়া রহিল। ইংরেজ আমাদের জ্ঞানের দ্বার বন্ধ করে নাই, অথচ সেইটেই মুক্তির সিংহদ্বার। রাজপুরুষেরা সেজন্য বোধ করি মনে মনে আপসোস করেন এবং আস্তে আস্তে বিদ্যালয়ের দুটো-একটা জানলাদরজাও বন্ধ করিবার গতিক দেখি.—কিন্তু তবু একথা তাঁরা কোনোদিন একেবারে ভুলিতে পারিবেন না যে, সুবিধার খাতিরে নিজের মনুষ্যত্বকে আঘাত করিলে ফলে সেটা আত্মহত্যার মতোই হয়।

ভারতশাসনে আমাদের ন্যায্য অধিকারটা ইংরেজের মনস্তত্ত্বের মধ্যেই নিহিত—এই আশার কথাটাকে যদি আমাদের শক্তি দিয়া ধরিতে পারি তবে ইহার জন্য বিস্তর দুঃখ সহা, ত্যাগ করা. আমাদের পক্ষে সহজ হয়। যদি আমাদের দুর্বল অভ্যাসে বলিয়া বসি, কর্তার ইচ্ছা কর্ম, ওর আর নড়চড় নাই, তবে যে সুগভীর নৈরাশ্য আসে, তার দুই রকমের প্রকাশ দেখিতে পাই—হয় গোপনে চক্রান্ত করিয়া. আকস্মিক উপদ্রবের বিস্তার করিতে থাকি, নয় ঘরের কোণে বসিয়া পরস্পরের কানে-কানে বলি, অমুক লাটসাহেব ভালো কিম্বা মন্দ, অমুক ব্যক্তি মন্ত্রিসভায় সচিব থাকিতে আমাদের কল্যাণ নাই, মর্লি সাহেব ভারতসচিব হইলে হয়তো আমাদের সুদিন হইবে, নয়তো আমাদের ভাগ্যে এই বিড়াল বনে গিয়া বনবিড়াল হইয়া উঠিবে। অর্থাৎ নৈরাশ্যে, হয় আমাদের মাটির তলায় সুরঙ্গের মধ্যে ঠেলিয়া শক্তির বিকার ঘটায়, নয় গৃহকোণের বৈঠকে বসাইয়া শক্তির ব্যর্থতা সৃষ্টি করে; হয় উন্মাদ করিয়া তোলে, নয় হাবা করিয়া রাখে।

কিন্তু মনুষ্যত্বকে অবিশ্বাস করিব না; এমন জোরের সঙ্গে চলিব, যেন ইংরেজ-রাষ্ট্রনীতির মধ্যে কেবল শক্তিই সত্য নহে, নীতি তার চেয়ে বড়ো সত্য। প্রতিদিন তার বিরুদ্ধতা দেখিব; দেখিব স্বার্থপরতা, ক্ষমতাপ্রিয়তা, লোভ, ক্রোধ, ভয় ও অহংকার সমস্তরই লীলা চলিতেছে; কিন্তু মানুষের এই রিপুগুলো সেইখানেই আমাদের মারে যেখানে আমাদের অন্তরেও রিপু আছে, যেখানে আমরাও ক্ষুদ্র ভয়ে ভীত, ক্ষুদ্র লোভে লুব্ধ, যেখানে আমাদের পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা বিদ্বেষ অবিশ্বাস। যেখানে আমরা বড়ো, আমরা বীর, আমরা ত্যাগী তপস্বী শ্রদ্ধাবান, সেখানে অন্যপক্ষে যাহা মহৎ তার সঙ্গে আমাদের সত্য যোগ হয়; সেখানে অন্য পক্ষের রিপুর মার খাইয়াও তবু আমরা জয়ী হই, বাহিরে না হইলেও অন্তরে। আমরা যদি ভিতু হই, ছোটো হই, তবে ইংরেজ-গবর্মেণ্টের নীতিকে খাটো করিয়া তার রিপুটাকেই প্রবল করিব। যেখানে দুই পক্ষ লইয়া কারবার সেখানে দুই পক্ষের শক্তির যোগেই শক্তির উৎকর্ষ, দুই পক্ষের দুর্বলতার যোগে চরম দুর্বলতা। অব্রাহ্মণ যখনই জোড়হাতে অধিকারহীনতা মানিয়া লইল,

ব্রাহ্মণের অধঃপতনের গর্তটা তখনই গভীর করিয়া খোঁড়া হইল। সবল দুর্বলের পক্ষে যতবড়ো শত্রু, দুর্বল সবলের পক্ষে তার চেয়ে কম বড়ো শত্রু নয়।

একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ-রাজপুরুষ আমাকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা প্রায়ই বল, পুলিস তোমাদের 'পরে অত্যাচার করে, আমিও তা অবিশ্বাস করি না, কিন্তু তোমরা তো তার প্রমাণ দাও না।" বলা বাহুল্য, পুলিসের সঙ্গে লাঠালাঠি মারামারি করো, একথা তিনি বলেন না। কিন্তু অন্যায়ের সঙ্গে লড়াই তো গায়ের জোরে নয়, সে তো তেজের লড়াই, সে তেজ কর্তব্যবুদ্ধির। দেশকে নিরন্তর পীড়ন হইতে বাঁচাইবার জন্য একদল লোকের তো বুকের পাটা থাকা চাই, অন্যায়কে তারা প্রাণপণে প্রমাণ করিবে, পুনঃপুনঃ ঘোষণা করিবে। জানি, পুলিসের একজন চৌকিদারও একজন মানুষমাত্র নয়, সে একটা প্রকাণ্ড শক্তি। একটি পুলিসের পেয়াদাকে বাঁচাইবার জন্য মকদ্দমায় গবর্মেণ্টের হাজার হাজার টাকা খরচ হয়। অর্থাৎ আদালত-মহাসমুদ্র পার হইবার বেলায় পেয়াদার জন্য সরকারি স্টীমার, আর গরিব ফরিয়াদিকে তুফানে সাঁতার দিয়া পার হইতে হইবে, একখানা কলার ভেলাও নাই। এ যেন একরকম স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া, "বাপু, মার যদি খাও তবে নিঃশব্দে মরাটাই অতীব স্বাস্থ্যকর।" এর পরে আর হাত পা চলে না। প্রেস্টিজ! ওটা যে আমাদের অনেকদিনের চেনা লোক। ওই তো কর্তা, ওই তো আমাদের কবিকঙ্কণের চণ্ডী, ওই তো বেহুলাকাব্যের মনসা, ন্যায় ধর্ম সকলের উপরে ওকেই তো পূজা দিতে হইবে, নহিলে হাড় গুঁড়া হইয়া যাইবে! অতএব—

যা দেবী রাজ্যশাসনে
প্রেস্টিজ-রূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ
নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।

কিন্তু ইহাই তো অবিদ্যা, ইহাই তো মায়া। যেটা স্থূলচোখে প্রতীয়মান হইতেছে তাই কি সত্য? আসল সত্য, আমাকে লইয়াই গবর্মেণ্ট। এই সত্য সমস্ত রাজপুরুষের চেয়ে বড়ো। এই সত্যের উপরই ইংরেজ বলী—সেই বল আমারও বল। ইংরেজ-গবর্মেণ্টও এই সত্যকে হারায়, যদি এই সত্যের বল আমার মধ্যেও না থাকে। আমি যদি ভীরু হই, ইংরেজ রাষ্ট্রতন্ত্রের নীতিতত্ত্বে আমার যদি শ্রদ্ধা না থাকে, তবে পুলিস অত্যাচার করিবেই, ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে সুবিচার কঠিন হইবেই, প্রেস্টিজ দেবতা নরবলি দাবি করিতেই থাকিবে এবং ইংরেজের শাসন ইংরেজের চিরকালীন ঐতিহাসিক ধর্মের প্রতিবাদ করিবে।

এ-কথার উত্তরে শুনিব "রাষ্ট্রতন্ত্রে নীতিই শক্তির চেয়ে সত্য এই কথাটাকে পারমার্থিক ভাবে মানা চলে কিন্তু ব্যবহারিকভাবে মানিতে গেলে বিপদ আছে, অতএব হয় গোপনে পরম-নিঃশব্দ গরম-পন্থা—নয়তো প্রেস অ্যাক্টের মুখ-থাবার নিচে পরম-নিঃশব্দ নরম-পন্থা।"

"হাঁ, বিপদ আছে বই কি, তবু জ্ঞানে যা সত্য ব্যবহারেও তাকে সত্য করিব।"

"কিন্তু আমাদের দেশের লোকেই ভয়ে কিংবা লোভে ন্যায়ের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে না বিরুদ্ধেই দিবে।"

"এ-কথাও ঠিক। তবু সত্যকে মানিয়া চলিতে হইবে।"

"কিন্তু আমাদের দেশের লোকেই প্রশংসা কিংবা পুরস্কারের লোভে ঝোপের মধ্য হইতে আমার মাথায় বাড়ি মারিবে।"

"একথাও ঠিক। তবুও সত্যকে মানিতে হইবে।"

"এতটা কি আশা করা যায়?"

হাঁ, এতটাই আশা করিতে হইবে, ইহার একটুকুও কম নয়। গবর্মেন্টের কাছ হইতেও আমরা বড়ো দাবিই করিব কিন্তু নিজেদের কাছ হইতে তার চেয়ে আরও বড়ো দাবি করিতে হইবে, নহিলে অন্য দাবি টিঁকিবে না। এ-কথা মানি, সকল মানুষই বলিষ্ঠ হয় না এবং অনেক মানুষই দুর্বল; কিন্তু সকল বড়ো দেশেই প্রত্যেকদিনই অনেকগুলি করিয়া মানুষ জন্মেন যাঁরা সকল মানুষের প্রতিনিধি—যাঁরা সকলের দুঃখকে আপনি বহেন, সকলের পথকে আপনি কাটেন, যাঁরা সমস্ত বিরুদ্ধতার মধ্যেও মনুষ্যত্বকে বিশ্বাস করেন এবং ব্যর্থতার গভীরতম অন্ধকারের পূর্ব প্রান্তে অরুণোদয়ের প্রতীক্ষায় জাগিয়া থাকেন। তাঁরা অবিশ্বাসীর সমস্ত পরিহাসকে উপেক্ষা করিয়া জোরের সঙ্গে বলেন—

"স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"

অর্থাৎ কেন্দ্রস্থলে যদি স্বল্পমাত্রও ধর্ম থাকে তবে পরিধির দিকে রাশি রাশি ভয়কেও ভয় করিবার দরকার নাই। রাষ্ট্রতন্ত্রে নীতি যদি কোনোখানেও থাকে তবে তাহাকেই নমস্কার—ভীতিকে নয়। ধর্ম আছে, অতএব মরা পর্যন্ত মানিয়াও তাহাকে মানিতে হইবে।

মনে করো ছেলের শক্ত ব্যামো। সেজন্য দূর হইতে স্বয়ং ইংরেজ সিভিল সার্জনকে আনিয়াছি। খরচ বড়ো কম করি নাই। যদি হঠাৎ দেখি তিনি মন্ত্র পড়িয়া মারিয়া-ধরিয়া ভূতের ওঝার মতো বিষম ঝাড়াঝুড়ি শুরু করিলেন, রোগীর আত্মাপুরুষ ত্রাহি ত্রাহি করিতে লাগিল তবে ডাক্তারকে জোর করিয়াই বলিব, "দোহাই সাহেব, ভূত ঝাড়াইবেন না, চিকিৎসা করুন।" তিনি চোখ রাঙাইয়া বলিতে পারেন, "তুমি কে হে। আমি

ডাক্তার যাই করি না তাই ডাক্তারি।" ভয়ে যদি বুদ্ধি দমিয়া না যায় তবে তাঁকে আমার একথা বলিবার অধিকার আছে "যে ডাক্তারি-তত্ত্ব লইয়া তুমি ডাক্তার আমি তাকে তোমার চেয়ে বড়ো বলিয়াই জানি, তার মূল্যেই তোমার মূল্য।"

এই যে অধিকার এর সকলের চেয়ে বড়ো জোর ওই ডাক্তার সম্প্রদায়েরই ডাক্তারি-শাস্ত্রে এবং ধর্মনীতির মধ্যে। ডাক্তার যতই আস্ফালন করুক এই বিজ্ঞান এবং নীতির দোহাই মানিলে লজ্জা না পাইয়া সে থাকিতেই পারে না। এমন কি, রাগের মুখে সে আমাকে ঘুষিও মারিতে পারে—কিন্তু তবু আস্তে আস্তে আমার সেলাম এবং সেলামিটি পকেটে করিয়া গাড়িতে বসার চেয়ে এই ঘুষির মূল্য বড়ো। এই ঘুষিতে সে আমাকে যত মারে নিজেকে তার চেয়ে বেশি মারে। তাই বলিতেছি, যে-কথাটা ইংরেজের কথা নয় কেবলমাত্র ইংরেজ আমলাদের কথা, সে-কথায় যদি আমরা সায় না দিই তবে আজ দুঃখ ঘটিতে পারে কিন্তু কাল দুঃখ কাটিবে।

দেড়-শ বছর ভারতে ইংরেজ-শাসনের পর আজ এমন কথা শোনা গেল, মাদ্রাজ গবর্মেণ্ট ভালোমন্দ যাই করুক বাংলা দেশে তা লইয়া দীর্ঘনিশ্বাসটি ফেলিবার অধিকার বাঙালির নাই। এত দিন এই জানিতাম, ইংরেজের অখণ্ড শাসনে মাদ্রাজ বাংলা পাঞ্জাব মারাঠা ভিতরে বাহিরে এক হইয়া উঠিতেছে এই গৌরবই ইংরেজ সাম্রাজ্যের মুকুটের কোহিনুর মণি। বেলজিয়ম ও ফ্রান্সের দুর্গতিকে আপন দুর্গতি মনে করিয়া ইংরেজ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে ছুটিয়াছে, সমুদ্রের পশ্চিম পারে যখন এই বার্তা তখন সমুদ্রের পূর্ব পারে এমন নীতি কি একদিনও খাটিবে যে, মাদ্রাজের ভালোমন্দ সুখ-দুঃখে বাঙালির কোনো মাথাব্যথা নাই? এমন হুকুম কি আমরা মাথা হেঁট করিয়া মানিব? এ-কথা কি নিশ্চয় জানি না যে, মুখে এই হুকুম যত জোরেই হাঁকা হউক অন্তরে ইহার পিছনে মস্ত একটা লজ্জা আছে? ইংরেজের সেই অন্যায়ের গোপন লজ্জা আর আমাদের মনুষ্যত্বের প্রকাশ্য সাহস—এই দুয়ের মধ্যে মিল করিতে হইবে। ইংরেজ ভারতের কাছে সত্যে বদ্ধ; ইংরেজ য়ুরোপীয় সভ্যতার দায়িত্ব বহিয়া এই পূর্ব দেশে আসিয়াছে; সেই সভ্যতার বাণীই তাহার প্রতিশ্রুতি-বাণী। সেই দলিলকেই আমরা সব চেয়ে বড়ো দলিল করিয়া তুলিব,—এ-কথা তাকে কখনোই বলিতে দিব না যে, ভারতবর্ষকে আমরা টুকরা টুকরা করিয়া মাছকাটা করিবার জন্যই সমুদ্র পার হইয়া আসিয়াছি।

যে-জাতি কোনো বড় সম্পদ পাইয়াছে সে তাহা দেশে দেশে দিকে দিকে দান করিবার জন্যই পাইয়াছে। যদি সে কৃপণতা করে তবে সে নিজেকেই বঞ্চিত করিবে। য়ুরোপের প্রধান সম্পদ বিজ্ঞান এবং জনসাধারণের ঐক্যবোধ ও আত্মকর্তৃত্ব লাভ। এই সম্পদ এই শক্তি ভারতকে দিবার মহৎ দায়িত্বই ভারতে ইংরেজ-শাসনের বিধিদত্ত

রাজ-পরোয়ানা। এই কথা শাসনকর্তাদের স্মরণ করাইবার ভার আমাদের উপরেও আছে। কারণ, দুই পক্ষের যোগ না হইলে বিস্মৃতি ও বিকার ঘটে।

ইংরেজ নিজের ইতিহাসের দোহাই দিয়া এমন কথা বলিতে পারে—"জনসাধারণের আত্মকর্তৃত্বটি যে একটি মস্ত জিনিস তা আমরা নানা বিপ্লবের মধ্য দিয়া তবে বুঝিয়াছি এবং নানা সাধনার মধ্য দিয়া তবে সেটাকে গড়িয়া তুলিয়াছি।" এ-কথা মানি। জগতে এক-এক অগ্রগামী দল এক-এক বিশেষ সত্যকে আবিষ্কার করে। সেই আবিষ্কারের গোড়ায় অনেক ভুল, অনেক দুঃখ, অনেক ত্যাগ আছে। কিন্তু তার ফল যারা পায় তাহাদিগকে সেই ভুল সেই দুঃখের সমস্ত লম্বা রাস্তাটা মাড়াইতে হয় না। দেখিলাম, বাঙালির ছেলে আমেরিকায় গিয়া হাতে-কলমে এঞ্জিন গড়িল এবং তার তত্ত্বও শিখিয়া লইল কিন্তু আগুনে কাংলি চড়ানো হইতে শুরু করিয়া স্টীম এঞ্জিনের সমস্ত ঐতিহাসিক পালা যদি তাকে সারিতে হইত তবে সত্যযুগের পরমায়ু নহিলে তার কুলাইত না। য়ুরোপে যাহা গজাইয়া উঠিতে বহুযুগের রৌদ্র বৃষ্টি ঝড় বাতাস লাগিল জাপানে তাহা শিকড় সুদ্ধ পুঁতিবার বেলায় বেশি সময় লাগে নাই। আমাদের চরিত্রে ও অভ্যাসে যদি কর্তৃশক্তির বিশেষ অভাব ঘটিয়া থাকে তবে আমাদেরই বিশেষ দরকার কর্তৃত্বের চর্চা। ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে কিছু নাই এটা যদি গোড়া হইতেই ধরিয়া লও তবে তার মধ্যে কিছু যে আছে সেই আবিষ্কার কোনো কালেই হইবে না। আত্মকর্তৃত্বের সুযোগ দিয়া আমাদের ভিতরকার নূতন নূতন শক্তি আবিষ্কারের পথ খুলিয়া দাও—সেটাকে রোধ করিয়া রাখিয়া যদি আমাদের অবজ্ঞা কর এবং বিশ্বের কাছে চিরদিন অবজ্ঞাভাজন করিয়া রাখ তবে তার চেয়ে পরম শত্রুতা আর কিছু হইতেই পারে না। ডাইনে বাঁয়ে দু-পা বাড়াইলেই যার মাথা ঠক করিয়া দেয়ালে গিয়া ঠেকে তার মনে কখনো কি সেই বড়ো আশা টিঁকিতেই পারে যার জোরে মানুষ সকল বিভাগে আপন মহত্ত্বকে প্রাণ দিয়াও সপ্রমাণ করে?

দেখিয়াছি, ইতিহাসে যখন প্রভাত হয় সূর্য তখন পূর্বদিকে ওঠে বটে কিন্তু সেই সঙ্গেই উত্তরে দক্ষিণে পশ্চিমেও আলো ছড়াইয়া পড়ে। এক-এক ইঞ্চি করিয়া ধাপে ধাপে যদি জাতির উন্নতি হইত তবে মহাকালকেও হার মানিতে হইত। মানুষ আগে সম্পূর্ণ যোগ্য হইবে তার পরে সুযোগ পাইবে এই কথাটাই যদি সত্য হয় তবে পৃথিবীতে কোনো জাতিই আজ স্বাধীনতার যোগ্য হয় নাই। ডিমক্রেসির দেমাক করিতেছ! কিন্তু য়ুরোপের জনসাধারণের মধ্যে আজও প্রচুর বীভৎসতা আছে—সে-সব কুৎসার কথা ঘাঁটিতে ইচ্ছা করে না। যদি কোনো কর্ণধার বলিত এই সমস্ত যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ডিমক্রেসি তার কোনো অধিকার পাইবে না তবে বীভৎসতা তো থাকিতই, আবার সেই পাপে স্বাভাবিক প্রতিকারের উপায়ও চলিয়া যাইত।

তেমনি আমাদের সমাজে, আমাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারণায়, দুর্বলতা যথেষ্ট আছে সে-কথা ঢাকিতে চাহিলেও ঢাকা পড়িবে না। তবু আমরা আত্মকর্তৃত্ব চাই। অন্ধকার ঘরে এককোণের বাতিটা মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে বলিয়া যে আর-এককোণের বাতি জ্বালাইবার দাবি নাই এ কাজের কথা নয়। যে-দিকের যে সলতে দিয়াই হ'ক আলো জ্বালাই চাই। আজ মনুষ্যত্বের দেয়ালি মহোৎসবে কোনো দেশই তার সব বাতি পুরা জ্বালাইয়া উঠিতে পারে নাই—তবু উৎসব চলিতেছে। আমাদের ঘরের বাতিটা কিছুকাল হইতে নিবিয়া গেছে—তোমাদের শিখা হইতে যদি ওটাকে জ্বালাইয়া লইতে যাই তবে তা লইয়া রাগারাগি করা কল্যাণের নহে। কেননা, ইহাতে তোমাদের আলো কমিবে না, এবং উৎসবের আলো বাড়িয়া উঠিবে।

উৎসবের দেবতা আজ আমাদিগকে ভিতর হইতে ডাকিতেছেন। পাণ্ডা কি আমাদের নিষেধ করিয়া ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে? সে যে কেবল ধনী যজমানকেই দেখিলে গদগদ হইয়া ওঠে, ক্যানাডা অস্ট্রেলিয়ার নামে যে স্টেশন পর্যন্ত ছুটিয়া যায়—আর গরিবের বেলায় তার ব্যবহার উলটা—এটা তো সহিবে না, দেবতা যে দেখিতেছেন। ইহাতে স্বয়ং অন্তর্যামী যদি লজ্জারূপে অন্তরে দেখা না দেন, তবে ক্রোধরূপে বাহির হইতে দেখা দিবেন।

কিন্তু আশার কারণটা উহাদের মধ্যে আছে, আমাদের মধ্যেও আছে। বাঙালিকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমি জানি আমাদের যুবকদের যৌবনধর্ম কখনোই চিরদিন ধারকরা বার্ধক্যের মুখোশ পরিয়া বিজ্ঞ সাজিবে না। আবার আমরা ইংরেজের মধ্যেও এমন মহাত্মা বিস্তর দেখিলাম যাঁরা স্বজাতির কাছে লাঞ্ছনা সহিয়াও ইংরেজ ইতিহাসবৃক্ষের অমৃত ফলটি ভারতবাসীর অধিকারে আনিবার জন্য উৎসুক। আমাদের তরফেও আমরা তেমনি মানুষের মতো মানুষ চাই যাঁরা বাহির হইতে দুঃখ এবং স্বজনদের নিকট হইতে ধিক্‌কার সহিতে প্রস্তুত। যাঁরা বিফলতার আশঙ্কাকে অতিক্রম করিয়াও মনুষ্যত্ব প্রকাশ করিবার জন্য ব্যগ্র।

ভারতের জরাবিহীন জাগ্রত ভগবান আজ আমাদের আত্মাকে আহ্বান করিতেছেন, যে আত্মা অপরিমেয়, যে আত্মা অপরাজিত, অমৃতলোকে যাহার অনন্ত অধিকার, অথচ যে আত্মা আজ অন্ধ প্রথা ও প্রভুত্বের অপমানে ধুলায় মুখ লুকাইয়া। আঘাতের পর আঘাত বেদনার পর বেদনা দিয়া তিনি ডাকিতেছেন, আত্মানং বিদ্ধি। আপনাকে জানো।

আজ আমরা সম্মুখে দেখিলাম বৃহৎ এই মানুষের পৃথিবী, মহৎ এই মানুষের ইতিহাস। মানুষের মধ্যে ভূমাকে আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি; শক্তির রথে চড়িয়া

তিনি মহাকালের রাজপথে চলিয়াছেন, রোগ তাপ বিপদ মৃত্যু কিছুতেই তাঁহাকে বাধা দিতে পারিল না, বিশ্বপ্রকৃতি বরমাল্যে তাঁহাকে বরণ করিয়া লইল, জ্ঞানের জ্যোতির্ময় তিলকে তাঁর উচ্চললাট মহোজ্জ্বল, অতিদূর ভবিষ্যতের শিখরচূড়া হইতে তাঁর জন্য আগমনীর প্রভাত রাগিণী বাজিতেছে।" সেই ভূমা আজ আমার মধ্যেও আপনার আসন খুঁজিতেছেন। ওরে অকাল-জরা-জর্জরিত, আত্ম অবিশ্বাসী ভীরু, অসত্যভারাবনত মূঢ়, আজ ঘরের লোকদের লইয়া ক্ষুদ্র ঈর্ষ্যায় ক্ষুদ্র বিদ্বেষে কলহ করিবার দিন নয়, আজ তুচ্ছ আশা তুচ্ছ পদমানের জন্য কাঙালের মতো কাড়াকাড়ি করিবার সময় গেছে, আজ সেই মিথ্যা অহংকার দিয়া নিজেকে ভুলাইয়া রাখিব না, যে অহংকার কেবল আপন গৃহ-কোণের অন্ধকারেই লালিত হইয়া স্পর্ধা করে, বিরাট বিশ্বসভার সম্মুখে যাহা উপহসিত লজ্জিত। অন্যকে অপবাদ দিয়া আত্মপ্রসাদলাভের চেষ্টা অক্ষমের চিত্তবিনোদন, আমাদের তাহাতে কাজ নাই। যুগে যুগে আমাদের পুঞ্জ পুঞ্জ অপরাধ জমিয়া উঠিল, তাহার ভারে আমাদের পৌরুষ দলিত, আমাদের বিচারবুদ্ধি মুমূর্ষু,—সেই বহু শতাব্দীর আবর্জনা আজ সবলে সতেজে তিরস্কৃত করিবার দিন। সম্মুখে চলিবার প্রবলতম বাধা আমাদের পশ্চাতে; আমাদের অতীত তাহার সম্মোহনবাণ দিয়া আমাদের ভবিষ্যৎকে আক্রমণ করিয়াছে; তাহার ধূলিপুঞ্জে শুষ্কপত্রে সে আজিকার নূতন যুগের প্রভাতসূর্যকে ম্লান করিল, নবনব অধ্যবসায়শীল আমাদের যৌবনধর্মকে অভিভূত করিয়া দিল, আজ নির্মম বলে আমাদের সেই পিঠের দিকটাকে মুক্তি দিতে হইবে তবেই নিত্যসম্মুখগামী মহৎ মনুষ্যত্বের সহিত যোগ দিয়া আমরা অসীম ব্যর্থতার লজ্জা হইতে বাঁচিব, সেই মনুষ্যত্ব যে মৃত্যুঞ্জয়ী, যে চিরজাগরূক চিরসন্ধানরত, যে বিশ্বকর্মার দক্ষিণ হস্ত, জ্ঞানজ্যোতিরা-লোকিত সত্যের পথে যে চিরযাত্রী, যুগযুগের নবনব তোরণদ্বারে যাহার জয়ধ্বনি উচ্ছ্বসিত হইয়া দেশদেশান্তরে প্রতিধ্বনিত।

বাহিরের দুঃখ শ্রাবণের ধারার মতো আমাদের মাথার উপর নিরন্তর বর্ষিত হইয়াছে, অহরহ এই দুঃখভোগের যে তামসিক অশুচিতা, আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তাহার প্রায়শ্চিত্ত কোথায়? নিজের মধ্যে নিজের ইচ্ছায় দুঃখকে বরণ করিয়া। সেই দুঃখই পবিত্র হোমাগ্নি,—সেই আগুনে পাপ পুড়িবে, মূঢ়তা বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবে, জড়তা ছাই হইয়া মাটিতে মিশাইবে। এস প্রভু, তুমি দীনের প্রভু নও। আমাদের মধ্যে যে অদীন, যে অমর, যে প্রভু, যে ঈশ্বর আছে, হে মহেশ্বর তুমি তাহারই প্রভু—ডাকো আজ তাহাকে তোমার রাজসিংহাসনের দক্ষিণপার্শ্বে। দীন লজ্জিত হউক, দাস লাঞ্ছিত হউক, মূঢ় তিরস্কৃত হইয়া চির-নির্বাসন গ্রহণ করুক।

১৩২৪

গ্রন্থপরিচয়

[রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশের তারিখ ও গ্রন্থ-সংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য গ্রন্থপরিচয়ে সংকলিত হইল। এই খণ্ডে মুদ্রিত কোনো কোনো রচনা সম্বন্ধে কবির নিজের মন্তব্যও মুদ্রিত হইল। পূর্ণতর তথ্যসংগ্রহ সর্বশেষ খণ্ডে একটি পঞ্জীতে সংকলিত হইবে।]

শেষ সপ্তক

শেষ সপ্তক ১৩৪২ সালের ২৫ বৈশাখ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

শেষ সপ্তকের ১৫ সংখ্যক কবিতাবলীর সহিত পথে ও পথের প্রান্তে গ্রন্থে প্রকাশিত শ্রীমতী রানী মহলানবিশকে লিখিত ২৬ ও ২৭ সংখ্যক পত্র তুলনীয়; এই কবিতাগুলিকে ঐ চিঠি দুটিরই কাব্যরূপ বলা যাইতে পারে।

পথে ও পথের প্রান্তে, ২৬। তুলনীয় শেষ সপ্তক ১৫।১

আমি আবার ঘর বদল করেছি। এই উদয়নের বাড়িতেই। বাড়িটার নাম উদয়ন, সেকথা জানিয়ে দেওয়া ভালো। উত্তরের দিকে দুটি ছোটো ঘর। এই রকম ছোটো ঘর আমি ভালোবাসি, তার কারণ তোমাকে বলি। ঘরটাই যদি বড়ো হয় তবে বাহিরটা থেকে দূরে পড়া যায়। বস্তুত বড়ো ঘরেই মানুষকে বেশি আবদ্ধ করে। তার মধ্যেই তার মনটা আসন ছড়িয়ে বসে, বাহিরটা বড্ড বেশি বাইরে সরে দাঁড়ায়। এই ছোটো ঘরে ঠিক আমার বাসের পক্ষে যতটুকু দরকার তার বেশি কিছুই নেই। সেখানে খাট আছে টেবিল আছে চৌকি আছে; সেই আসবাবের সঙ্গে একখণ্ড আকাশকে জড়িত ক'রে রেখে আকাশের শখ ঘরেই মেটাতে চাইনে। আকাশকে পেতে চাই তার স্বস্থানে বাইরে; পূর্ণভাবে বিশুদ্ধভাবে। দেয়ালের ভিতরে যে আকাশকে বেঁধে রাখা হয় তাকে আমি ছেড়ে দেবামাত্রই সে আমার যথার্থ কাছে এসে দাঁড়ায়। একেবারেই আমার বসবার চৌকির অনতিদূরে, আমার জানলার গা ঘেঁষে। তার কাজ হচ্ছে মনকে ছুটি দেওয়া; সে যদি নিজে যথেষ্ট ছুটি না পায়, মনকে ছুটি দিতে পারে না। এইবার আমার ঘরে-আকাশে যথার্থ মিল হয়েছে—বেশ লাগছে। চেয়ে দেখি যতদূর-দেখা যায়, আবার পরক্ষণেই আমার ডেস্কের মধ্যে চোখ ফিরিয়ে আনতে দেরি হয় না। জানলার কাছে বসে বসে প্রায়ই ভাবি, দূর ব'লে একটা পদার্থ আছে, সে বড়ো সুন্দর। বস্তুত সুন্দরের মধ্যে একটি দূরত্ব আছে, নিকট তার স্থূল হস্ত

নিয়ে তাকে যেন নাগাল পায় না। সুন্দর আমাদের সমস্ত দিগন্ত ছাড়িয়ে যায়, তাই সে আমাদের প্রয়োজনের সঙ্গে সংলগ্ন থাকলেও আমাদের প্রয়োজনের অতীত। আমাদের নিজের ব্যক্তিগত জীবনেও এই দূর পদার্থকে যদি না রাখতে পারি তাহলে আমাদের ছুটি নেই, তাহলে সমস্ত অসুন্দর হয়ে পড়ে। যারা বিষয়কর্মে অত্যন্ত নিবিষ্ট, তাদের জীবনে নিকট আছে দূর নেই। কেননা স্বার্থ জিনিসটা মানুষের অত্যন্ত বেশি কাছের জিনিস, তার আসক্তি দেয়ালের মতো। আপন দেয়ালকে মানুষ ভালোবাসে, কেননা, দেয়াল আমারই, আর কারো নয়। সেই ভালোবাসা যখন একান্ত হয়ে ওঠে তখন মানুষ ভুলে যায় যে, যা আমার অতীত তা কত আনন্দময় হতে পারে, তার প্রতি ভালোবাসার আর তুলনা হয় না।

কর্ম যখন বিষয়কর্ম না হয়, তখন সেই কর্ম মানুষকে দূরের স্বাদ দেয়, দূরের বাঁশি বাজায়। কবিতা লিখি, ছবি আঁকি, তার মধ্যে প্রয়োজনের অতীত দূরের আকাশ আছে বলেই এত ভালোবাসি, তাতে এমন মগ্ন হতে পারি। সেই সঙ্গে আজকাল আমার বিদ্যালয়ের কাজ যোগ দিয়েছে— এরকম কাজে মনের মুক্তি। এ কাজের ক্ষেত্র নিকটের ক্ষেত্র নয়। দেশকালে বহুদূর বিস্তীর্ণ; অব্যবহিত নিজের কাছে থেকে কতদূরে চলে গেছে তার ঠিকানা নেই; তাই এর জন্য ত্যাগ করা সহজ, এর জন্যে কাজ করতে ক্লান্তি নেই। সেইজন্য আজকাল আমি আমার মধ্যে যেন বহুদূরকে দেখি, আমি এখন আমার কাছে থাকিনে। আমার চোখের সামনে যেমন এই আকাশ, আমার চিন্তার মধ্যে সেই আকাশ, আমার চেষ্টা উড়ে চলেছে সেই আকাশে। এই রকমের কাজে অনেকে জড়িত হয়ে থাকে ব্যক্তিগত ক্ষমতা পাবার জন্যে; এমন উদার কাজও তাদের পক্ষে বন্ধন, মুক্তির ক্ষেত্রেও তারা ইন্‌টার্নড। আমার কাজে আমি ক্ষমতা চাইনে, আমার নিজের দিকের কিছুই চাইনে, কাজের মধ্যে আমি বিরাট বাহিরকে চাই, দূরকে চাই— "আমি সুদূরের পিয়াসী।" বস্তুত বাহির থেকে দেখলে আজকাল আমার লেশমাত্র সময় নেই, কিন্তু ভিতর থেকে দেখলে প্রত্যেক মুহূর্তই আমার অবকাশ। নিজের দিকে কোনো ফল পাব একথা যখনি ভুলি তখনি দেখতে পাই কর্মের মতো ছুটি আর নেই। কর্মহীন শুধু ছুটিতে মুক্তি পাইনে, কেননা সে ছুটিও নিজেকে নিয়েই। ইতি ৬ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫

পথে ও পথের প্রান্তে ২৭। তুলনীয় শেষ সপ্তক ১৫।২।৩

অন্য কথা পরে হবে, গোড়াতেই বলে রাখি তুমি যে চা পাঠিয়েছিলে সেটা খুব ভালো। এতদিন যে লিখিনি সেটা আমার স্বভাবের বিশেষত্ববশত। যেমন আমার

ছবি আঁকা তেমনি আমার চিঠি লেখা। একটা যা হয় কিছু মাথায় আসে সেটা লিখে ফেলি, প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় ছোটো বড়ো যে-সব খবর জেগে ওঠে তার সঙ্গে কোনো যোগ নেই। আমার ছবিও ঐ রকম। যা হয় কোনো একটা রূপ মনের মধ্যে হঠাৎ দেখতে পাই, চারদিকের কোনো কিছুর সঙ্গে তার সাদৃশ্য বা সংলগ্নতা থাক্ বা না থাক্। আমাদের ভিতরের দিকে সর্বদা একটা ভাঙাগড়া চলাফেরা জোড়াতাড়া চলছেই; কিছু বা ভাব, কিছু বা ছবি নানারকম চেহারা ধরছে— তারই সঙ্গে আমার কলমের কারবার। এর আগে আমার মন আকাশে কান পেতে ছিল, বাতাস থেকে সুর আসত, কথা শুনতে পেত, আজকাল সে আছে চোখ মেলে রূপের রাজ্যে, রেখার ভিড়ের মধ্যে। গাছপালার দিকে তাকাই, তাদের অত্যন্ত দেখতে পাই— স্পষ্ট বুঝতে পারি জগৎটা আকারের মহাযাত্রা। আমার কলমেও আসতে চায় সেই আকারের লীলা। আবেগ নয়, ভাব নয়, চিন্তা নয়, রূপের সমাবেশ। আশ্চর্য এই যে তাতে গভীর আনন্দ। ভারি নেশা। আজকাল রেখায় আমাকে পেয়ে বসেছে। তার হাত ছাড়াতে পারছিনে। কেবলি তার পরিচয় পাচ্ছি নতুন নতুন ভঙ্গীর মধ্যে দিয়ে। তার রহস্যের অন্ত নেই। যে বিধাতা ছবি আঁকেন এতদিন পরে তাঁর মনের কথা জানতে পারছি। অসীম অব্যক্ত, রেখায় রেখায় আপন নতুন নতুন সীমা রচনা করছেন— আয়তনে সেই সীমা কিন্তু বৈচিত্র্যে সে অন্তহীন। আর কিছু নয়, সুনির্দিষ্টতাতেই যথার্থ সম্পূর্ণতা। অমিতা যখন সুমিতাকে পায় তখন সে চরিতার্থ হয়। ছবিতে যে আনন্দ, সে হচ্ছে সুপরিমিতির আনন্দ, রেখার সংযমে সুনির্দিষ্টকে সুস্পষ্ট করে দেখি— মন বলে ওঠে, নিশ্চিত দেখতে পেলুম— তা সে যাকেই দেখি না কেন, একটুকরো পাথর, একটা গাধা, একটা কাঁটাগাছ, একজন বুড়ি, যাই হোক। নিশ্চিত দেখতে পাই যেখানেই, সেখানেই অসীমকে স্পর্শ করি, আনন্দিত হয়ে উঠি। তাই ব'লে এ কথা ভুললে চলবে না যে তোমার চা খুব ভালো লেগেছে। ইতি
১৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫

শেষ সপ্তকের অনেকগুলি কবিতার ছন্দোবদ্ধ রূপ, বা রূপান্তর বিভিন্ন সাময়িক পত্রে বা পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়। শ্রীকানাই সামন্ত এই রূপান্তরগুলি সংকলন করিয়া দিয়াছেন। সংযোজন অংশে সেগুলি মুদ্রিত হইল।

এই প্রসঙ্গে শেষ সপ্তকের তেইশ ও চৌত্রিশ সংখ্যক কবিতার সঙ্গে প্রান্তিক (১৩৪৪) গ্রন্থের পনেরো ও ষোলো সংখ্যক কবিতা তুলনীয়। কবিতা দুইটি নিচে মুদ্রিত হইল।

প্রান্তিক ১৫ ॥ তুলনীয় শেষ সপ্তক ২৩

অবরুদ্ধ ছিল বায়ু; দৈত্যসম পুঞ্জ মেঘভার
ছায়ার প্রহরীব্যূহে ঘিরে ছিল সূর্যের দুয়ার;

অভিভূত আলোকের মূর্ছাতুর ম্লান অসম্মানে
দিগন্ত আছিল বাষ্পাকুল। যেন চেয়ে ভূমিপানে
অবসাদে অবনত ক্ষীণশ্বাস চির প্রাচীনতা
স্তব্ধ হয়ে আছে বসে দীর্ঘকাল, ভুলে গেছে কথা,
ক্লান্তিভারে আঁখিপাতা বন্ধপ্রায়।
শূন্যে হেনকালে
জয়শঙ্খ উঠিল বাজিয়া। চন্দনতিলক ভালে
শরৎ উঠিল হেসে চমকিত গগন-প্রাঙ্গণে;
পল্লবে পল্লবে কাঁপি বনলক্ষ্মী কিঙ্কিণী কঙ্কণে
বিচ্ছুরিল দিকে দিকে জ্যোতিষ্কণা। আজি হেরি চোখে
কোন্ অনির্বচনীয় নবীনেরে তরুণ আলোকে।
যেন আমি তীর্থযাত্রী অতিদূর ভাবীকাল হতে
মন্ত্রবলে এসেছি ভাসিয়া। উজান স্বপ্নের স্রোতে
অকস্মাৎ উত্তরিনু বর্তমান শতাব্দীর ঘাটে
যেন এই মুহূর্তেই। চেয়ে চেয়ে বেলা মোর কাটে।
আপনারে দেখি আমি আপন বাহিরে, যেন আমি
অপর যুগের কোনো অজানিত, সদ্য গেছে নামি
সত্তা হতে প্রত্যহের আচ্ছাদন; অক্লান্ত বিস্ময়
যার পানে চক্ষু মেলি তারে যেন আঁকড়িয়া রয়
পুষ্পলগ্ন ভ্রমরের মতো। এই তো ছুটির কাল,
সর্ব দেহমন হতে ছিন্ন হল অভ্যাসের জাল,
নগ্ন চিত্ত মগ্ন হল সমস্তের মাঝে। মনে ভাবি,
পুরানোর দুর্গদ্বারে মৃত্যু যেন খুলে দিল চাবি,
নূতন বাহিরি' এল; তুচ্ছতার জীর্ণ উত্তরীয়
ঘুচাল সে; অস্তিত্বের পূর্ণ মূল্যে কী অভাবনীয়
প্রকাশিল তার স্পর্শে, রজনীর মৌন সুবিপুল
প্রভাতের গানে সে মিশায়ে দিল; কালো তার চুল
পশ্চিমদিগন্তপারে নামহীন বন-নীলিমায়
বিস্তারিল রহস্য নিবিড়।
আজি মুক্তিমন্ত্র গায়

আমার বক্ষের মাঝে দূরের পথিকচিত্ত মম,
সংসারযাত্রার প্রান্তে সহমরণের বধূসম ॥

প্রান্তিক ১৬ ॥ তুলনীয় শেষ সপ্তক ৩৪

পথিক দেখেছি আমি পুরাণে কীর্তিত কত দেশ
কীর্তি-নিঃস্ব আজি ; দেখেছি অবমানিত ভগ্নশেষ
দর্পোদ্ধত প্রতাপের ; অন্তর্হিত বিজয়-নিশান
বজ্রাঘাতে স্তব্ধ যেন অট্টহাসি ; বিরাট সম্মান
সাষ্টাঙ্গে সে ধুলায় প্রণত, যে ধুলার পরে মেলে
সন্ধ্যাবেলা ভিক্ষু জীর্ণ কাঁথা, যে ধুলায় চিহ্ন ফেলে
শ্রান্ত পদ পথিকের, পুনঃ সেই চিহ্ন লোপ করে
অসংখ্যের নিত্য পদপাতে। দেখিলাম বালুস্তরে
প্রচ্ছন্ন সুদূর যুগান্তর, ধূসর সমুদ্রতলে
যেন মগ্ন মহাতরী অকস্মাৎ ঝঞ্ঝাবর্তবলে
লয়ে তার সব ভাষা, সর্ব দিনরজনীর আশা,
মুখরিত ক্ষুধাতৃষ্ণা, বাসনা-প্রদীপ্ত ভালোবাসা।
তবু করি অনুভব বসি' এই অনিত্যের বুকে
অসীমের হৃৎস্পন্দন তরঙ্গিছে মোর দুঃখে সুখে ॥

শেষ সপ্তকের সাতাশ-সংখ্যক কবিতার অন্য একটি রূপ সংযোজন অংশে (ঘট ভরা, পৃ ১১৫) মুদ্রিত হইয়াছে। পাণ্ডুলিপি হইতে অন্য একটি পাঠ নিচে মুদ্রিত হইল :

আমার এই ছোটো কলস পেতে রাখি
ঝরনাধারার নিচে।
সকালবেলায় বসে থাকি
শেওলা-ঢাকা পিছল কালো পাথরটাতে
পা ঝুলিয়ে।
ঘট ভরে যায় এক নিমেষে,
ফেনিয়ে ওঠে ছলছলিয়ে,
ছাপিয়ে পড়ে বারে বারে,
সেই খেলা ওর আমার মনের খেলা।

সবুজ দিয়ে মিনে-করা
পাহাড়গুলির নীল আকাশে
ঝর্‌ঝরানি উছলে ওঠে দিনেরাতে।
ভোরের ঘুমে ডাক শোনে তার
গাঁয়ের মেয়েরা।

জলের ধ্বনি যায় পেরিয়ে
বেগ্‌নি রঙের বনের সীমানা
যেখানে ঐ বুনো পাড়ার হাটের মানুষ
তরাই গ্রামের রাস্তা ছেড়ে
ধীরে ধীরে উঠছে চড়াই পথে,
বলদের পিঠে বোঝাই
শুক্‌নো কাঠের আঁটি ;
রুমুঝুমু ঘণ্টা গলায় বাঁধা।

প্রথম প্রহর গেল কেটে।
রাঙা ছিল সকালবেলার
নতুন রোদের রঙ,
উঠল সাদা হয়ে।
বক উড়ে যায় পেরিয়ে পাহাড়
জলার দিকে।

বেলা হল, ডাক পড়েছে ঘরে।
ওরা আমায় রাগ করে কয়,
"দেরি করলি কেন।"
চুপ ক'রে সব শুনি।
ঘট ভরতে হয় না দেরি,
সবাই জানে,—
উপচে-পড়া জলের কথা
বুঝবে না তো ওরা।

শেষ বর্ষণ

শেষ বর্ষণ ১৩৩২ সালে রচিত হয়। ঐ সালের ভাদ্র মাসে ইহা মঞ্চস্থ হওয়া উপলক্ষ্যে ঐ নামে যে পুস্তিকা প্রকাশিত হয় তাহাতে শুধু নাট্যে ব্যবহৃত গানগুলিই মুদ্রিত হইয়াছিল, কথাবস্তু প্রকাশিত হয় নাই; পরে ঋতু-উৎসব (১৩৩৩) গ্রন্থে কথা ও গানসহ শেষ বর্ষণের সম্পূর্ণ নাট্যরূপটি প্রকাশিত হয়।

নটীর পূজা

নটীর পূজা ১৩৩৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

একই আখ্যানবস্তু অবলম্বনে কথা ও কাহিনীর পূজারিনী কবিতাও লিখিত হইয়াছিল।

১৩৩৩ সালে ২৫ বৈশাখ সায়ংকালে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে নটীর পূজার প্রথম অভিনয়ের সময় এই নাটকে উপালি-চরিত্র ছিল না, উপালি-চরিত্র সংবলিত সূচনা অংশও গ্রন্থের প্রথম মুদ্রণে ছিল না। ১৩৩৩ সালের ১৪ মাঘ কলিকাতায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে দ্বিতীয় অভিনয়ের সময় ঐ অংশ যোজিত হয়; উপালির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ অভিনয় করিয়াছিলেন। এই সময়ে মুদ্রিত অভিনয়পত্রীতে সূচনা ও নিম্নোদ্ধৃত ভূমিকা প্রকাশিত হয়, ঐ পত্রীতে নাট্যবিষয়সারও মুদ্রিত আছে। সূচনা অংশ দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়া আসিতেছে।

ভূমিকা

অজাতশত্রু পিতৃসিংহাসনে লোভ প্রকাশ করিতেছেন জানিয়া মহারাজ বিম্বিসার স্বেচ্ছায় রাজ্যভার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া নগরী হইতে দূরে বাস করিতেছেন।

একদা রাজোদ্যানে ভগবান বুদ্ধ অশোকতরুচ্ছায়ায় আসন গ্রহণ করিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন সেইখানে বুদ্ধভক্ত বিম্বিসার চৈত্য স্থাপন করিয়া রাজকন্যাদিগকে বেদীমূলে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে অর্ঘ্য আহরণ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন।

রাজমহিষী লোকেশ্বরী তাঁহার স্বামীর রাজ্যত্যাগে ও তাঁহার পুত্র চিত্রের সন্ন্যাসগ্রহণে ক্ষুব্ধ হইয়া বুদ্ধ-অনুশাসিত ধর্মের প্রতি বিমুখ হইয়াছেন।

নটরাজ

নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা ১৩৩৩ সালে রচিত ও শান্তিনিকেতনে প্রথম অভিনীত হয় এবং ১৩৩৪ সালের আষাঢ় সংখ্যা বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়। ১৩৩৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে

কলিকাতায় ঋতুরঙ্গ নামে ইহা অভিনীত হয়; অভিনয়পত্রী হইতে দেখা যায়, ইহার কবিতাংশ সম্পূর্ণ নূতন। ১৩৩৪ সালের পৌষ সংখ্যা মাসিক বসুমতীতে ঋতুরঙ্গ মুদ্রিত হয়।

১৩৩৮ সালে প্রকাশিত বনবাণী গ্রন্থে, বিচিত্রায় মুদ্রিত নটরাজ ও মাসিক বসুমতীতে মুদ্রিত ঋতুরঙ্গ একত্রীভূত ও পুনঃসজ্জিত হইয়া নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা নামে সংকলিত হয়। বনবাণীর এই অংশটিই বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। বিচিত্রায় প্রকাশিত নটরাজের শেষ কবিতা "শেষ মধু" এই নূতন পাঠের অন্তর্গত হয় নাই; উক্ত কবিতাটি তৎপূর্বেই মহুয়ার অন্তর্গত হয়।

"কেন পান্থ এ চঞ্চলতা" (পৃ. ২১৫) গানটির নিম্নমুদ্রিত পাঠান্তর বিচিত্রায় পাওয়া যায়; গান হিসাবে এই পাঠান্তর সুপ্রচলিত নহে (গীতবিতান ২য় সং, ২য় খণ্ড পৃ. ১৯৩)।

কেন পান্থ এ চঞ্চলতা।
শূন্য গগনে পাও কার বারতা ?
নয়ন অতন্দ্র প্রতীক্ষারত
কেন উদ্‌ভ্রান্ত অশান্ত-মতো,
কুন্তলপুঞ্জ অযত্নে নত
ক্লান্ত তড়িৎ-বধূ তন্দ্রাগতা।
ধৈর্য ধরো, সখা, ধৈর্য ধরো,
দুঃখে মাধুরী হোক মধুরতর;
হেরো গন্ধ নিবেদন বেদন সুন্দর
মল্লিকা চরণতলে প্রণতা।

"চরণরেখা তব" (পৃ. ২২২) গানটির বিচিত্রায় মুদ্রিত পূর্বপাঠ প্রকাশিত নিম্নে মুদ্রিত হইল :

চরণরেখা তব যে পথে দিলে লেখি
চিহ্ন আজি তারি আপনি ঘুচালে কি ?
অশোকরেণুগুলি
রাঙাল যার ধূলি
তারে যে তৃণতলে আজিকে লীন দেখি ?
ফুরায় ফুল ফোটা পাখিও গান ভোলে
দখিন বায়ু সেও উদাসী যায় চলে।

তবুও কি ভরি তারে
অমৃত ছিল না রে?
স্মরণ তারো কি গো মরণে যাবে ঠেকি?

মূলতঃ গানটি বসন্ত-বিদায়ের "বিলাপ"রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল— অভিনয়োপলক্ষ্যে একবার গানটি শরৎ-বিদায়ের "বিলাপ" রূপে পরিবর্তিত হয়। উপরে উদ্ধৃত পাঠটিই গান হিসাবে সুপ্রচলিত (গীতবিতান ২য় সং, ২য় খণ্ড পৃ. ২৪৭)।

শেষ বর্ষণের অন্তর্গত "শ্যামল শোভন শ্রাবণ-ছায়া" (পৃ ১৩৬) গানটিকে, নটরাজের "শ্রাবণ-বিদায়" (পৃ ২১৪) গানটির পাঠান্তর বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

"দোল" (পৃ ২৪৬) কবিতাটির গীত-রূপ "ওগো কিশোর আজি" গীতবিতানে (২য় সং, ২য় খণ্ড, পৃ ৮৭) দ্রষ্টব্য।

গল্পগুচ্ছ

বর্তমান খণ্ডে প্রকাশিত আটটি গল্পের প্রথম সাতটি ১৩০০ সালের সাধনায় প্রকাশিত হইয়াছিল; নিম্নে বিস্তারিত সূচী মুদ্রিত হইল।

সম্পাদক	বৈশাখ ১৩০০
মধ্যবর্তিনী	জ্যৈষ্ঠ ১৩০০
অসম্ভব কথা	আষাঢ় ১৩০০
শাস্তি	শ্রাবণ ১৩০০
একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প	ভাদ্র ১৩০০
সমাপ্তি	আশ্বিন কার্তিক ১৩০০
সমস্যাপূরণ	অগ্রহায়ণ ১৩০০

খাতা গল্পটি কোনো সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল কি না এখনো জানা যায় নাই। শনিবারের চিঠিতে (চৈত্র ১৩৪৬) প্রকাশিত "রবীন্দ্র রচনাপঞ্জী"তে লিখিত হইয়াছে, এ গল্পটি সম্ভবত হিতবাদীতে (১২৯৮) মুদ্রিত হইয়াছিল। হিতবাদী বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। এই গল্পটি সাময়িকে প্রকাশ অনুসারে সাজানো যায় নাই, গ্রন্থাকারে প্রকাশের তারিখ অবলম্বনে ('ছোট গল্প', ফাল্গুন ১৩০০) বর্তমান খণ্ডে উহা মুদ্রিত হইল।

সম্পাদক ও সমস্যাপূরণ 'ছোট গল্প' (ফাল্গুন ১৩০০) পুস্তকে; অসম্ভব কথা 'বিচিত্র গল্প' প্রথম ভাগে (১৩০১); একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প 'বিচিত্র গল্প' দ্বিতীয়

ভাগে (১৩০১); এবং মধ্যবর্তিনী, শাস্তি ও সমাপ্তি 'কথা-চতুষ্টয়' (১৩০১) পুস্তকে প্রথম গ্রন্থান্তর্ভুক্ত হয়।

সঞ্চয়

সঞ্চয় ১৩২৩ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

এই গ্রন্থে-মুদ্রিত প্রবন্ধাবলীর সাময়িক পত্রে প্রকাশের সূচী নিম্নে মুদ্রিত হইল:

রোগীর নববর্ষ	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯
রূপ ও অরূপ	প্রবাসী পৌষ ১৩১৮
নামকরণ	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা চৈত্র ১৩১৮
ধর্মের নবযুগ	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা; ভারতী ফাল্গুন ১৩১৮
ধর্মের অর্থ	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আশ্বিন কার্তিক ১৩১৮
ধর্মশিক্ষা	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা মাঘ ১৩১৮
ধর্মের অধিকার	প্রবাসী ফাল্গুন ১৩১৮
আমার জগৎ	সবুজ পত্র আশ্বিন ১৩২১

ধর্মের নবযুগ মাঘোৎসব উপলক্ষে ১১ মাঘ ১৩১৮ মহর্ষি-ভবনে পঠিত হয়।

ধর্মের অর্থ ভাদ্রোৎসব উপলক্ষ্যে ৪ ভাদ্র ১৩১৮ সায়ংকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে পঠিত হয়।

ধর্মশিক্ষা কলিকাতা সিটি কলেজে অনুষ্ঠিত একেশ্বরবাদীগণের সম্মিলনে ২৭ ডিসেম্বর ১৯১১ সায়ংকালে পঠিত হয়।

ধর্মের অধিকার মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ১২ মাঘ ১৩১৮ সায়ংকালে পঠিত হয়।

নামকরণ রচনার উপলক্ষ্যাদি প্রবন্ধের পাদটীকায় উল্লিখিত হইয়াছে।

পরিচয়

পরিচয় ১৩২৩ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

এই গ্রন্থে মুদ্রিত প্রবন্ধাবলীর সাময়িক পত্রে প্রকাশের সূচী নিম্নে মুদ্রিত হইল:

ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা	প্রবাসী বৈশাখ ১৩১৯
আত্মপরিচয়	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বৈশাখ ১৩১৯
হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়	প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩১৮

ভগিনী নিবেদিতা	প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩১৮
শিক্ষার বাহন	সবুজ পত্র পৌষ ১৩২২
ছবির অঙ্গ	সবুজ পত্র আষাঢ় ১৩২২
সোনার কাঠি	সবুজ পত্র জ্যৈষ্ঠ ১৩২২
কৃপণতা	সবুজ পত্র ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২২
আষাঢ়	সবুজ পত্র আষাঢ় ১৩২১
শরৎ	সবুজ পত্র ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২২

ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা ৪ চৈত্র ১৩১৮ তারিখে ওভারটুন হলে পঠিত হয়। এই প্রবন্ধ পঠিত ও প্রবাসীতে প্রকাশিত হইলে সাময়িক পত্রে নানারূপ আলোচনা হয়; রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যে মন্তব্য প্রকাশ করেন তাহা নিম্নে মুদ্রিত হইল :

"ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা"

বিগত বৈশাখের প্রবাসীতে শ্রীমান রবীন্দ্রনাথের পর্যালোচিত "ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা" পাঠ করিয়া আমার মনে হইল যে, প্রাচীন ভারতের রহস্যপূর্ণ ইতিহাসের নানারঙের বহিরাবরণের মধ্য হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া তাহার ভিতরের কথাটি যাহা এতদিন সহস্র চেষ্টা করিয়াও আলোকাভাবে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারিয়া উঠিতেছিল না, এইবার তাহার সে চেষ্টা বাঞ্ছানুরূপ সাফল্য লাভ করিবে তাহার অরুণোদয় দেখা দিয়াছে; তবে যে, চতুর্দিকে কর্কশ কা কা ধ্বনি হইতেছে—রজনী-প্রভাতের সমসমকালে তাহা হইবারই কথা। এতদিনের ধস্তাধস্তির পরে ভারতে প্রকৃত ইতিহাসের এই যে একটা সম্ভবমতো পাকা রকমের গোড়াপত্তন হইল, ইহা বঙ্গ-সরস্বতীর ভক্ত সন্তানদিগের কত না আনন্দের বিষয়। গোড়াপত্তন হইয়াছে যেরূপ সুন্দর, তাহার উপরে তদনুরূপ ভিত গাঁথিয়া তুলিতে হইলে আরো নানাপ্রকার ইষ্টক প্রস্তর এবং মালমশলার জোগাড় করা আবশ্যক, তা ছাড়া পুরাতন ইতিহাস-ভারতীর নূতন দেবালয়ের নির্মাণকার্যে বাছা-বাছা কারিকরদিগের সমবেত চেষ্টা কেন্দ্রীভূত হওয়া আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের নূতন প্রবন্ধটির সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন আপাতত যাহা আমার মনে উত্থিত হইতেছে তাহা সংক্ষেপে এই :

মহাদেবের আদিম পীঠস্থান দক্ষিণ অঞ্চলে কি উত্তর অঞ্চলে ?

রবীন্দ্রনাথের লেখার আভাসে আমার এইরূপ মনে হয় যে, তাঁহার মতে মহাদেবের আদিম পীঠস্থান দক্ষিণ অঞ্চলে। তিনি যাহা আঁচিয়াছেন তাহা একেবারেই অমূলক

বলিয়া উড়াইয়া দিবার কথা নহে, যেহেতু বাস্তবিকই রাক্ষসাদি ক্রূর জাতিদিগের মধ্যে বিষ্ণুর স্নিগ্ধমূর্তি উপাস্য দেবতার আদর্শ পদবীতে স্থান পাইবার অনুপযুক্ত। দুর্দান্ত রাক্ষস জাতিদিগের মনোরাজ্যের সিংহাসন শিবের রুদ্রমূর্তিরই উপযুক্ত অধিষ্ঠান-মঞ্চ। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও আমরা দেখিতে পাই যে, একদিক যেমন রক্ষঃ আর একদিকে তেমনি যক্ষ। প্রাচীন ভারতের দক্ষিণ অঞ্চল যেমন রক্ষদিগের দলবলের প্রধান সংগমস্থান (headquarters) ছিল—উত্তর অঞ্চল তেমনি যক্ষদিগের দলবলের প্রধান সংগমস্থান ছিল। ভারতবর্ষীয় আর্যদিগের চক্ষে দক্ষিণের দ্রাবিড়াদি জাতিরা যেমন রাক্ষস-বানরাদি মূর্তি ধারণ করিয়াছিল, উত্তরের মোগলাদি জাতিরা তেমনি যক্ষকিন্নরাদি মূর্তি ধারণ করিয়াছিল—ইহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। বিকটাকার বিষয়ে দক্ষিণের রক্ষ এবং উত্তরের যক্ষের মধ্যে যেমন মিল আছে, কিম্ভূতকিমাকার বিষয়ে তেমনি দক্ষিণের বানর এবং উত্তরের কিন্নরের সঙ্গে মিল আছে।

এখন কথা হইতেছে এই যে, যক্ষদিগের রাজধানীতে কুবেরপুরীতে মহাদেবের অধিষ্ঠানের কথা কাব্যপুরাণাদি শাস্ত্রে ভূয়োভূয় উল্লিখিত হইয়াছে। তাছাড়া কৈলাস-শিখর মহাদেবের প্রধান পীঠস্থান।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পাঠে একটি বিষয়ে আমার চক্ষু ফুটিয়াছে; সে-বিষয়টি এই যে, জনক রাজা যে কেবল ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন তাহা নহে, সেই সঙ্গে তিনি ভারতে কৃষিকার্য প্রবর্তনের প্রধান নেতা ছিলেন; আর তাঁহার গুরু ছিলেন বিশ্বামিত্র। পক্ষান্তরে দেখিতে পাই যে, হিমালয় প্রদেশের কিরাত জাতিরা ব্যাধবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করিত—তাহারা কৃষিকার্যের ধারই ধারিত না। কিরাত জাতি মোগল এবং তাতারদিগের সহোদর জাতি ইহা বলা বাহুল্য। এটাও দেখিতেছি যে, হিমালয়ের উপত্যকায় মহাদেব অর্জুনকে কিরাতবেশে দেখা দিয়াছিলেন। মহাদেব কিরাতদিগের দলে মিশিয়া কিরাত হইয়াছিলেন। মহাদেব পশুহন্তাও বটেন, পশুপতিও বটেন। মহাদেব যে অংশে কিরাতদিগের ইষ্টদেবতা ছিলেন, সেই অংশে তিনি পশুহন্তা; আর, যে অংশে তিনি খাস মোগলদিগের ইষ্টদেবতা ছিলেন, সেই অংশে তিনি পশুপতি। পুরাকালের মোগল এবং তাতার জাতিরা জীবিকালাভের একমাত্র উপায় জানিত পশুপালন, তা বই, কৃষিকার্যের ক অক্ষরও তাহারা জানিত না—ইহা সকলেরই জানা কথা। তবেই হইতেছে যে, মোগল এবং তাতার জাতিরা—সংক্ষেপে যক্ষেরা—একপ্রকার পশুপতির দল ছিল; সুতরাং পশুপতি মহাদেব বিশিষ্টরূপে তাহাদেরই দেবতা হওয়া উচিত; আর, পুরাণাদিকে যদি শাস্ত্র বলিয়া মানিতে হয়, তবে ছিলেনও তিনি তাই। যক্ষরাজ কুবেরের রূপ ছিল অনার্যোচিত; আর, তিনি

ধনপতি নামে বিখ্যাত। প্রাচীন ভারতে ধন-শব্দে বিশিষ্টরূপে গোমেষাদি পশুধনই বুঝাইত। ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, পশুজীবী মোগল তাতার প্রভৃতি জাতিরাই প্রাচীন ভারতের আর্যদিগের ইতিহাসে যক্ষনাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। কি পশুহন্তা কিরাত জাতি, কি পশুপালক মোগল জাতি, উভয়েই কৃষিকার্য বিষয়ে সমান অনভিজ্ঞ ছিল। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ধনুর্ভঙ্গের ব্যাপারটিকে কোন্ প্রকার বিঘ্নভঙ্গ বলিব? কিরাতদিগের পশুঘাতী ধনুর্ভঙ্গ বলিব? না রাক্ষসদিগের বিষদাঁত ভঙ্গ বলিব? আমার বোধ হয়, প্রাচীনকালে ভারতের উত্তর-দক্ষিণের মধ্যে একটা ঐতিহাসিক যোগ-সেতু বর্তমান ছিল; কেননা লঙ্কাপুরী প্রথমে কুবেরের ছিল, পরে তাহা রাবণ বলপূর্বক হস্তগত করিয়াছিল। রাবণ এবং কুবের যে একই পিতার পুত্রদ্বয় ইহা কাহারো অবিদিত নাই।

এ সম্বন্ধে আর একটি কথা আমার বলিবার আছে—সেটাও বিবেচ্য। কথাটি এই :

নেপাল প্রদেশে বুদ্ধমন্দির এবং শিবমন্দির পাশাপাশি অবস্থিতি করে। গুর্খারাও শৈবধর্মাবলম্বী। খুব সম্ভব যে, বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাবকালে বৌদ্ধসাধকেরা হিমালয় প্রদেশে নির্জনে যোগসাধন এবং তপস্যা করিতেন। উমা যেমন উপনিষদের সুনির্মলা ব্রহ্মবিদ্যা, পার্বতী তেমনি তন্ত্রশাস্ত্রের বিভীষিকাময়ী দশমহাবিদ্যা। ভক্তের দেবতা যেমন বিষ্ণু, যোগীতপস্বীদিগের দেবতা তেমনি মহাদেব। বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাবকালে বৌদ্ধ সাধকেরা বিশিষ্টরূপে যোগীতপস্বী ছিলেন। মহাদেব সেই সকল পর্বতবাসী বৌদ্ধ যোগীতপস্বীদিগের আদর্শ-প্রতিমা—এরূপ মনে হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। কয়েক বৎসর পূর্বে 'বৌদ্ধধর্ম এবং আর্যধর্মের ঘাতপ্রতিঘাত' নামক পুস্তিকায় এই বিষয়টির সম্বন্ধে আমি যাহা সবিস্তরে লিখিয়াছি তাহা সংক্ষেপে এই :

পৌরাণিক শাস্ত্রকারেরা আশ্চর্য নূতন প্রণালীতে বৌদ্ধ বিপ্লবের প্রতিবিধানচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বৌদ্ধ যোগীতপস্বীদিগকে আর্য যোগীতপস্বীদিগের দলে টানিয়া লইলেন, আর, মহাদেবকে সেই সকল অবৈদিক যোগীতপস্বীদিগের ইষ্টদেবতার পদবীতে আসন গ্রহণ করাইলেন। পাছে লোকে মনে করে, যোগীশ্বর মহাদেব বুদ্ধেরই আর এক অবতার—এই আশঙ্কায় পৌরাণিক শাস্ত্রকারেরা তাঁহার গলায় পৈতা দিয়া তাঁহাকে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ করিয়া গড়িয়া লইলেন।

রবীন্দ্রনাথের মোট কথাটির সহিত আমার মতের একটুও অনৈক্য নাই। যে দু-একটি কথা আমি উপরে ইঙ্গিত করিলাম তাহার সহিত ভারতের ইতিহাস-ধারার কথাগুলির সমন্বয় মতে প্রবন্ধটির অঙ্গপূরণ করা হইলে ভালো হয় —ইহাই আমার

মনোগত অভিপ্রায়। আমার বিশ্বাস এই যে, এই সমন্বয়কার্যটি রবীন্দ্রনাথ মনে করিলেই ঈশ্বরপ্রসাদে সর্বাঙ্গসুন্দররূপে সুনিষ্পন্ন করিতে পারেন।[১]

আত্মপরিচয় প্রবন্ধ ছাত্রসমাজের অধিবেশনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে পঠিত হয়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পত্রিকা তত্ত্বকৌমুদী এই প্রবন্ধে বিবৃত মতের প্রতিবাদ করেন, রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ব্রাহ্ম প্রবন্ধে তাহার প্রত্যুত্তর দেন·

হিন্দু ব্রাহ্ম

"আত্মপরিচয়" নামক প্রবন্ধে আমরা এই কথাটি বলিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, হিন্দু ব্রাহ্মরা হিন্দুই, অর্থাৎ যে ব্যক্তি হিন্দু সে ব্রাহ্ম হইলেও হিন্দু, ব্রাহ্ম না হইলেও হিন্দু। ইহাতে তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় লিখিতেছেন যে, যেহেতু আদি ব্রাহ্মসমাজ সামাজিক বিষয়ে "উন্নতিশীল" ব্রাহ্মসমাজের অপেক্ষা অনেক পশ্চাতে পড়িয়াছেন "তখন সমগ্র ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু কি না, এ কথা বিচার করিবার অধিকার আদি ব্রাহ্মসমাজের কাহারও নাই। উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ হিন্দুত্বের সংকীর্ণ গণ্ডী অনেককাল অতিক্রম করিয়াছেন।"[২]

পরস্পরের উন্নতির তারতম্যসম্বন্ধে আমরা কোনো কথাই কহিব না, কারণ ইহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। কিন্তু সমগ্র হিন্দুসমাজের পক্ষে যাহা অন্যায় তাহা যে ব্রাহ্মসমাজের পক্ষেও অন্যায় অন্তত এ কথাটা আমাদিগকে কর্তব্যের অনুরোধে বলিতে হইবে।

নিশ্চয়ই আমাদের অনেক কুসংস্কার আছে। যেমন যেমন তাহা বুঝিতে পারিব তেমনি তাহার বন্ধন কাটাইয়া উঠিব এইরূপ আশা করি— কিন্তু আমাদের এরূপ সংস্কার আদৌ নাই যে, বিচার করিয়া সত্য নির্ণয় করিবার অধিকার কেবল কোনো বিশেষ উপাধি দ্বারা চিহ্নিত সমাজের লোকেরই আছে অন্য সমাজের লোকের নাই। যদিচ আমি আদি ব্রাহ্মসমাজের সভ্য তথাপি ঈশ্বর আমার চিন্তা করিবার শক্তি সম্পূর্ণ অপহরণ করেন নাই; এবং কে হিন্দু ও কে হিন্দু নয় ইহা আমার পক্ষে বিচার করিবার অধিকার যদিচ "উন্নতিশীল" সম্পাদক মহাশয় কাড়িয়া লইতে চান তথাপি মনুষ্যত্বের সকল মহৎ অধিকারই আমরা যাঁহার কাছ হইতে পাইয়াছি তিনি এ সম্বন্ধে আমাদের কাহাকেও কোনো বাধা দিয়াছেন বলিয়া আমরা আদি ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা বিশ্বাস করি না।

১ প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩১৯

২ "আদি সমাজ ও উন্নতিশীল ব্রাহ্মসমাজ", তত্ত্ব-কৌমুদী, ১ বৈশাখ ১৩১৯

উপবীতচিহ্নের দ্বারা সমাজে অধিকারভেদ নির্দিষ্ট হয় বলিয়া যাঁহারা উপবীত-ধারণকে নিন্দা করেন তাঁহারা কি এ কথা চিন্তা করিবেন না যে, অদৃশ্য উপবীত দৃশ্য উপবীতের চেয়ে অনেকগুণে দৃঢ়? "উন্নতিশীল ব্রাহ্ম" নামের পৈতাটা উচ্চ করিয়া তুলিয়া ধরিয়া তত্ত্বকৌমুদীর সম্পাদক মহাশয় যে জাত্যভিমান, যে কৌলীন্যগর্ব প্রকাশ করিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করি, তাহা কি সর্বপ্রকার কুসংস্কারবর্জিত?

উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ কেবলমাত্র উন্নতিশীলতার বেগে হিন্দুত্বের সংকীর্ণ গণ্ডী অনেক কাল হইল কাটাইয়াছেন বলিয়া সম্পাদক মহাশয় গৌরব প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু যে গণ্ডী আমাদের স্বরচিত ও কৃত্রিম নহে তাহা আমরা কাটাইতে পারি না। যেমন আমার একটা দেহের গণ্ডী আছে। এই গণ্ডীকে আশ্রয় করিয়া আমি একটি বিশেষ স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছি; এই স্বাতন্ত্র্য যদি আমার উন্নতির প্রতিকূল ও আমার অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় তবে বিশ্বের সহিত একাকার হইবার চেষ্টায় পঞ্চত্বলাভ ছাড়া আমার অন্য কোনো গতি থাকে না।

গণ্ডীর পরে গণ্ডী, চক্রের পরে চক্র কাটিয়া বিধাতা এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। পৃথিবীর গণ্ডী পৃথিবীর, সূর্যের গণ্ডী সূর্যের, তৃণের গণ্ডী তৃণের, মানুষের গণ্ডী মানুষের। স্বাভাবিক গণ্ডীর বিরুদ্ধে লড়াই করাই যে উন্নতিশীলতার লক্ষণ এ কথা মনে করি না।

আবার আমাদের স্বরচিত গণ্ডীও আছে। কেননা, বিধাতার সৃষ্টিকার্যেও যেমন মানুষের সৃষ্টিকার্যেও তেমনি – গণ্ডী দিয়া দিয়াই গড়িয়া তুলিতে হয়। মানুষের ঘরবাড়ি একটা গণ্ডী, তাহার পরিবার একটা গণ্ডী, তাহার ব্যবসায় একটা গণ্ডী। প্রত্যেক গণ্ডীর মধ্যে বিশিষ্টতা আছে, সেই বিশিষ্টতার দ্বারা মানুষ আপন ঘরে আপন পরিবারে আপন ব্যবসায়ে স্বতন্ত্র। এমন কি সামান্য ছাতাজুতা ঘটিবাটিও সরকারী নহে, এবং কেহ তাহাকে সরকারী করিবার চেষ্টা করিলেই থানায় খবর দিতে হয়।

তাই যদি হইল তবে সর্বজনীনতা বলিয়া একটা পদার্থ কি একেবারেই আকাশ-কুসুম? যদি সকলপ্রকার গণ্ডীকে, সকলপ্রকার বিশিষ্টতাকে একেবারে অস্বীকার করাকেই সর্বজনীনতা বলে তবে সর্বজনীনতা বস্তুতই আকাশকুসুম সন্দেহ নাই। ভাইকে মানি না কিন্তু ভ্রাতৃভাবকে মানি, এ কথাটাও যেমন তেমনি সর্বজনকে বিশেষ বলিয়া মানি না একটা নির্বিশেষ সর্বজনীনতাকে মানি ইহাও সেইরূপ মাথা-নেই-তার-মাথা-ব্যথা। প্রত্যেকের বিশিষ্টতা আছে বলিয়াই সেই অগণ্য বিশিষ্টতার মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি করার সাধনা সর্বজনীনতা—নতুবা তাহার কোনো প্রয়োজন নাই। বিশিষ্টতাকে স্বীকার করা যে কুসংস্কার এইরূপ সৃষ্টিছাড়া কথাই অন্ধ সংস্কার। অতএব হিন্দুত্বের

সংকীর্ণ গণ্ডী কাটাইয়া যাওয়াকে উন্নতিশীলতা বা কোনো শীলতাই বলে না, তাহা একটা ব্যর্থবাক্য উচ্চারণ মাত্র।

ভূতের বিশ্বাস পৃথিবীতে সকল জাতির মধ্যেই ন্যূনাধিক পরিমাণে আছে;—যখন বলা যায় আমি এই ভূতের বিশ্বাসের কুসংস্কার কাটাইয়াছি তখন এমন কথা বলা হয় না যে আমি মনুষ্যত্বের সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়াছি।

তেমনি হিন্দুসমাজে যে কুসংস্কার প্রচলিত আছে যদি কোনো হিন্দু সে সংস্কার কাটাইয়া থাকেন তবে তাঁহাকে কুসংস্কারহীন হিন্দু বলিব, অহিন্দু বলিব না। কুসংস্কারই হিন্দুর স্থায়ী পরিচয় এমন অদ্ভুত কথা কোনোমতেই বলা চলে না। এ কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে, অন্ধসংস্কার মানুষের সকল জাতির মধ্যেই আছে কিন্তু বিধাতার রাজ্যে অন্ধসংস্কারের স্বভাবই এই যে তাহা নিত্য নহে; বস্তুত এই জন্যই উন্নতিশীল হওয়া সম্ভব, এবং এই জন্যই আদি ব্রাহ্মসমাজের অথবা অন্য যে কোনো সম্প্রদায়ের মানুষ যতই মূঢ় ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হই না তৎসত্ত্বেও আমরা উন্নতিশীল, কারণ, আমরাও মানুষ। তাই যদি না হইবে তবে পৃথিবীতে ধর্মসংস্কারকের মতো উন্মত্ত পাগল আর তো কেহই নাই। সত্যমেব জয়তে, এই বাণী বিশ্বচরাচরে কেবল হিন্দুসমাজেই অসত্য, বিশ্ববিধাতা কেবল এই হিন্দুসমাজেই পরাস্ত হইয়া হাল ছাড়িয়াছেন—অসাধারণ উন্নতিলাভ করিলেও এমন কথা বলিতে পারিব না। অতএব হিন্দুসমাজের প্রচলিত ভ্রম ও অন্ধসংস্কার বর্জন করার দ্বারাই যদি আমরা অহিন্দু হই তবে শিশু রাম কথা কহিতে শিখিলেই শ্যাম হইয়া যায় এ কথাটা বলা চলে। তাহাকে বালক রাম বা যুবক রাম বা সুবুদ্ধি রাম বল তাহাতে কোনো বাধা নাই কিন্তু তাহাকে রামই বলিব না এমন পণ করিলে মানুষের নিত্যই নূতন নামকরণ করিয়া চলিতে হয়।

যাঁহারা আমার প্রবন্ধ ভালো করিয়া না পড়িয়াই বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন তাঁহাদের ভাবখানা এই যে, "তুমি আমাকে হিন্দু বলিতেছ তবেই তো বলা হইতেছে আমি পৌত্তলিক, আমি জাতিভেদ মানি আমি ইত্যাদি ইত্যাদি; তুমি নিজের সম্বন্ধে এমন কথা বলিতে পার, কেননা, তুমি কুসংস্কারাপন্ন, তুমি সাধারণ বা নববিধান ব্রাহ্মসমাজের নও, তোমার পিতা এমন কাজ করিয়াছেন, তিনি এমন কথা বলিয়াছেন ইত্যাদি ইত্যাদি।"

বস্তুত আমার পিতা যদি অত্যন্ত সংকীর্ণ সংস্কারের অনুদার প্রকৃতির লোক ছিলেন ইহাই প্রকৃত সত্য হয় তবে আমার পিতাকে আমি তো পিতারূপে ত্যাগ করিতে পারিব না। যদিও বা আমার কোনো একটা অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় তাহা আমার ইচ্ছার মধ্যেও

উদয় হয় তথাপি তাহা আমার সাধ্যের মধ্যে নাই। আমারই পিতার সন্তান যে আমি, এ গণ্ডী বিধাতার গণ্ডী। সুখের বিষয় এই যে, এই গণ্ডী স্বীকার করিয়াও আমি সর্বজনীন হইতে পারি, এমন কি, কোনো একদিন হঠাৎ কায়ক্লেশে উন্নতিশীল হইয়া উঠাও আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব নহে। হিন্দুত্বের গণ্ডীর মধ্যেও বিধাতার সেই বিধান আছে বলিয়াই তাহা নানা পরিণতির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে এবং এখনও হইবে,—হিন্দুসমাজের মধ্যেও সেই সত্যস্বরূপ বিধাতার বিধান কাজ করে বলিয়াই এই সমাজেই আজ আমরা রামমোহন রায়ের অভ্যুদয় দেখিলাম। ইহাতেও কি বিধাতার উপরে বিশ্বাস জন্মে না, সত্য বিধানের প্রতি নির্ভর বাড়ে না? হিন্দুসমাজে ভ্রম আছে, অন্ধসংস্কার আছে, সবই আছে মানি কিন্তু তাহার চেয়ে বেশি করিয়া মানি হিন্দুসমাজেও সত্য আছেন, মঙ্গল আছেন, ব্রহ্ম আছেন। হিন্দুসমাজের মধ্যে আমি সেই সত্যের দিকে মঙ্গলের দিকে ব্রহ্মের দিকে দাঁড়াইব ইহাই যেন আমার সংকল্প হয়। সাধক যাঁহারা তাঁহারা সকল সমাজেই সত্যের দিকেই নিজের জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহারই অভিমুখে সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেন। যেখানে অসত্যের অজ্ঞানের প্রভাব বেশি সেইখানেই সত্যকে তাঁহারা দেখেন ও সত্যকে তাঁহারা দেখান, ইহাই তাঁহাদের ব্রত। দুর্গতির মধ্যে যে সমাজ উপনীত হইয়াছে তাহাকে তাঁহারা ত্যাগ করেন না, কারণ তাঁহাদের এই বিশ্বাস অটল যে দুর্গতি কখনোই নিত্য হইতে পারে না এবং যিনি পরমাগতি তিনি দুর্গতির মধ্যেই আপনাকে একদা পূর্ণতমরূপে প্রকাশ করেন। বস্তুত যথার্থ প্রেমের সাধনা, শক্তির সাধনা, সেইখানেই সেই দুর্যোগে সেই দুর্দিনে। আমাদের আত্মাভিমান সেখান হইতে দূরে যাইতে চায়, আমাদের সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা তাহার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া বিমুখ হইয়া থাকে, কিন্তু সেই ঘৃণাই বিশ্বজনীনতার লক্ষণ নহে—কিন্তু যে দুর্গতিগ্রস্ত তাহাকেই আপন বলিয়া স্বীকার করার মধ্যেই যথার্থ সর্বজনীনতা আছে। কারণ, সর্বজনীনতা কেবল একটা বস্তুবিহীন বাক্য মাত্র নহে, তাহা অহংকৃত আত্মপরিচয়ের একটা স্বরচিত উপাধি মাত্র নহে; তাহা প্রেমের জিনিস, এই জন্যই তাহা সত্য। সেই প্রেম সকলের চেয়ে নীচের মধ্যে আপনাকে বদ্ধ করিয়াও সকলের চেয়ে উচ্চে আপনার স্থান লাভ করিয়া থাকে; সীমার মধ্যে বাস করিয়াও প্রতিমুহূর্তে সেই সীমাকে অতিক্রম করিয়া বিরাজ করে।

ব্রাহ্মধর্ম হিন্দু-ইতিহাসের একটি বিকাশ, এই কথা আমরা বলিয়াছি। অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্ম যতবড়োই সর্বজনীন ধর্ম হউক না, বিধাতার সৃষ্টির নিয়ম তাহাকেও মানিতে হয়, নতুবা তাহা সত্যই হইতে পারে না। অতএব বিশেষ দেশে ও বিশেষ কালে তাহার উদয় হইয়াছে ব্রাহ্মধর্মের এই ঐতিহাসিক বন্ধনটুকু স্বীকার করিতে

লজ্জা বা ক্ষোভের কোনো কারণ থাকিতে পারে না। যদি ইতিহাসকে মানি, যদি হিন্দু-ইতিহাসের মধ্যে ব্রাহ্মধর্মের প্রকাশরূপ ঘটনাকেই একেবারে অস্বীকার করিয়া না বসি তবে সেই ঐতিহাসিক ঘটনাটার সুস্পষ্ট অর্থই এই যে, হিন্দুর প্রকৃতির মধ্যে ও অবস্থার মধ্যে এমন কতকগুলি সমাবেশ আছে যাহাতে এই ধর্ম এইপ্রকার রূপ লইয়া এইখানেই ব্যক্ত হইতে পারিয়াছে।

হিন্দু-ইতিহাসের মধ্যে এই যে ব্রাহ্মধর্মের প্রকাশ, ইহার কারণরূপে নানা শক্তির খেলা থাকিতে পারে। হয়ত বিদেশের আঘাত তাহার মধ্যে একটা কারণ। অর্ধরাত্রে ভূমিকম্পে আমাকে জাগাইয়াছিল, তাই বলিয়া জাগরণটা ভূমিকম্পের নহে সেটা আমারই জাগরণ। যদি ইহাই প্রকৃত সত্য হয় যে, কোরাণ পুরাণ বাইবেল বৌদ্ধশাস্ত্র এবং দেশদেশান্তরের যত কিছু ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মসমাজ আছে সকলে একত্রে মিলিয়া তিলোত্তমার সৃষ্টির ন্যায় এই ব্রাহ্মধর্মকে সৃষ্টি করিয়া থাকে তথাপি এইরূপ অদ্ভুত সৃষ্টি যদি হিন্দুর ইতিহাসেই সম্ভবপর হইয়া থাকে তবে তাহা হিন্দুরই। সূর্যের আলোক সূর্যেই সম্ভবপর হইয়াছে,—কেহ কেহ বলেন সূর্য অসংখ্য উল্কাপিণ্ডকে নিরন্তর আত্মসাৎ করিয়া সেই আলোকের সঞ্চয় রক্ষা করিতেছে; তাহা সত্যও হইতে পারে, নাও হইতে পারে, তথাপি এই আলোক সূর্যেরই। আমি শাক খাইয়া ফল খাইয়া দুধ মাছ ভাত খাইয়া প্রাণধারণ করিতেছি বটে তাই বলিয়া আমার প্রাণকে আমারই প্রাণ বলিয়া স্বীকার না করিয়া ঐ শাকভাতকেই স্বীকার করিলে কি অত্যন্ত ঔদার্য প্রকাশ করা হয়? প্রত্যেক ধর্মেরই উৎপত্তি সম্বন্ধে তর্ক আছে। কেহ বলেন, খ্রীস্টানধর্ম বৌদ্ধধর্ম হইতে চুরি, কেহ বলেন বৈষ্ণবধর্ম খ্রীস্টানধর্ম হইতে চুরি, এমনতর আরো অনেক বাদবিবাদ আছে—তেমনি হয়তো কালক্রমে কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ করিয়া দেখাইবেন ব্রাহ্মধর্ম জগতের সকল ধর্মের চোরাইমালের ভাণ্ডার। কিন্তু উৎপত্তিঘটিত সমস্ত বাদবিবাদ সত্ত্বেও খ্রীস্টানধর্ম খ্রীস্টানধর্মই, বৈষ্ণবধর্ম বৈষ্ণবধর্মই। খ্রীস্টানধর্ম যদি বৌদ্ধধর্মকে আত্মসাৎ করিয়া থাকে, বৈষ্ণবধর্ম যদি খ্রীস্টানধর্মকে আত্মসাৎ করিয়া থাকে, তবে তাহাতে তাহার অস্তিত্ব লোপ হয় নাই, তাহার গৌরব খর্ব হয় নাই। অনাত্মকে গ্রহণ করিয়া আত্মীয়ে পরিণত করিবার শক্তিই জীবনের শক্তি—অনাত্মের মধ্যে আত্মবিশেষত্ব বিলুপ্ত করিয়া দেওয়াই মৃত্যুর লক্ষণ। অতএব যেমন করিয়াই বিচার করি, হিন্দুর ইতিহাসে ব্রাহ্মধর্মের বিকাশ স্বদেশীয় বিদেশীয় যত কিছু কারণপরম্পরা অবলম্বন করিয়াই দেখা দিক্ না তথাপি তাহা হিন্দুরই সামগ্রী। এই ইতিহাস আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে না—ইহা আমার প্রিয় হইলেও, সত্য অপ্রিয় হইলেও সত্য। কিন্তু সকলের চেয়ে

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তত্ত্বকৌমুদী-সম্পাদক মহাশয় আমার উক্তি স্বীকার করিয়াও আমার প্রবন্ধের প্রতি বিরুদ্ধভাব ধারণ করিয়াছেন। তিনি একজায়গায় স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, "ব্রাহ্মধর্ম কেবল যে হিন্দুদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে তাহা নহে, ব্রাহ্মগণ কেবল যে হিন্দুবংশোদ্ভব ব্যক্তিগণের মধ্যেই অবস্থিত থাকিবেন তাহা নহে, সর্বদেশের লোক এই উদার ধর্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন।"[১] আমি তো সর্বদেশের লোককে ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য ব্রাহ্মধর্মের দরজায় কুলুপ লাগাইতে চেষ্টা করি নাই। হিন্দুও যে ব্রাহ্ম হইতে পারেন এই কথাই আমি বলিয়াছিলাম, কিন্তু "ব্রাহ্মধর্ম কেবল হিন্দুদের মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে" এমন অদ্ভুত কথা আমি কোনোদিন বলি নাই।

তত্ত্বকৌমুদী-সম্পাদক মহাশয় প্রশ্ন করিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজে যে সকল য়িহুদী মুসলমান য়ুরোপীয় আশ্রয় লইতেছেন তাঁহারা কি নিজেদের হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবেন?[২] পরিচয় নানা প্রকারের আছে—কোনোটা সংকীর্ণ কোনোটা ব্যাপক। আমি ব্রাহ্ম বলিয়া আপনার পরিচয় দিলেই যে আমাকে হিন্দু পরিচয়ও গ্রহণ করিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। একজন ইংরেজ যে-অংশে ব্রাহ্ম কেবল সেই অংশেই হিন্দুর সহিত তাঁহার দেনাপাওনার একটা যোগ থাকিয়া গেল; তাহাতে তাঁহার লজ্জার কারণ কিছুই নাই। আমরা হিন্দু হইয়াও ইংরেজি সাহিত্যে আনন্দ পাই, য়ুরোপীয় চিকিৎসায় প্রাণ বাঁচাই, রেলগাড়িতে অসংকোচে চড়ি, টেলিগ্রাফে খবর পাঠাইয়া দিই—চিন্তামাত্র করি না তাহা আমাদের পিতৃপুরুষের উদ্ভাবিত সামগ্রী কি না। এইরূপে প্রতিদিনই দেখিতেছি বিশেষ মানবজাতির কীর্তিই সর্বসাধারণ মানবজাতির সম্পদ।

বেদান্তদর্শনকে ভারতবর্ষীয় দর্শন বলিয়া সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়াও তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করাতে জর্মন পণ্ডিত ডয়সনের যদি জর্মনত্বে কোনো বাধা না ঘটাইয়া থাকে তবে ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দু ইতিহাসের সামগ্রী বলিয়া স্বীকার করিয়াও তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে মুসলমানের বা ইংরেজের বা য়িহুদির লেশমাত্র বাধা কেন থাকিবে? সত্যকে কি মানুষ এমনি করিয়াই গ্রহণ করিতেছে না? প্লেটোর রচনা কি গ্রীসের সীমার বাহিরে অস্পৃশ্য? আরিস্টটলের দর্শন কি মুসলমান জ্ঞানী কোনোদিন সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই এবং সেই গ্রহণ করিবার শক্তি দ্বারাই কি তাঁহার গৌরবহানি হইয়াছিল? বস্তুত ব্রাহ্মধর্ম বিশেষভাবে হিন্দুর চিত্তের সমস্ত রস লইয়া বিকশিত হইয়াছে বলিয়াই অহিন্দুর পক্ষে তাহার উপাদেয়তা বাড়িয়াছে নতুবা

১ "ব্রাহ্মধর্মের মূল মত ও অবান্তর বিষয়", তত্ত্ব-কৌমুদী ১ বৈশাখ ১৩২১

২ "হিন্দু কি?" তত্ত্ব-কৌমুদী ১৬ চৈত্র ১৩১৮

জগৎসংসারে তাহা নিতান্তই বাহুল্য হইয়া থাকিত, তাহা একটা পুনরাবৃত্তিমাত্র হইত, তাহার মধ্যে বিধাতার কোনো বিশেষ বিধান প্রকাশ হইতে পারিত না।

তত্ত্বকৌমুদীর সম্পাদক মহাশয় অনাবশ্যক উত্তেজনার সহিত বারংবার বলিয়াছেন, খ্রীস্ট, মহম্মদ, থিওডোর পার্কার, মার্টিন লুথর, ম্যার্টিনো সকলেই আমাদের গুরু।[১] তিনি তালিকা আরো অনেক বাড়াইয়া দিতে পারেন। তিনি যাহা বলিতেছেন তাহার সংক্ষেপ তাৎপর্য এই যে, মানবসমাজের মধ্যে যে-দেশে যে-জাতির মধ্যে যে কেহ যে-কোনো সত্য আবিষ্কার ও প্রচার করিয়াছেন তিনি সেই বিষয়েই নিখিলমানবের গুরু। ইহাই সম্ভবপর বলিয়া আমরা সত্যকে অপরের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হই না। কিন্তু এই কথা কেবল পরের বেলাই খাটিবে নিজের বেলা খাটিবে না? খ্রীস্টানের সত্য মুসলমানের সত্য আমি গ্রহণ করিতে পারি কিন্তু আমার সত্য আমার বলিয়াই পাছে খ্রীস্টান ও মুসলমান গ্রহণ না করে এই কারণেই তাহা আমার সত্য নয় এমন কথা বলিতে হইবে? বাম হাতের দিকে সত্যকে মানিব আর ডান হাতের দিকে তাহাকে মানিব না? লইবার বেলা এক কথা আর দিবার বেলা তাহার বিপরীত?

সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন, সব ধর্মই যদি হিন্দুধর্ম হইতে পারে, যদি হিন্দুর বিশেষ ধর্ম কী তাহা আমরা না জানি তবে তো নিজেকে হিন্দু বলাও যা আর সাদা চেকে স্বাক্ষর করাও তা।[২] সকল জাতির মধ্যেই তো সাদা চেকের ফাঁকা জায়গা আছে। কোনো ইংরেজ যদি এরূপ মত প্রকাশ করে যে জাতিভেদ ভালো অথবা জেনেনা প্রথা স্ত্রীপ্রকৃতির পক্ষে যথার্থ অনুকূল তথাপি যে ইংরেজ ইংরেজ তাহার সকল বিষয়ে সকল মতই একেবারে অবিচলিতরূপে পাকা করিয়া স্থির হইয়া বসিয়াছে বলিয়াই প্রত্যেক ইংরেজ আপনাকে ইংরেজ বলিবার অধিকার পাইয়াছে ইহাই কি সত্য? প্রত্যেক ইংরেজের হাতেই সাদা চেকের খাতা আছে তাহাতে তাহার আপনাকে ইংরেজ বলিবার কোনো বাধা ঘটে নাই। সেইরূপ আমরা দেখাইয়াছি হিন্দু কোনো বিশেষ নির্দিষ্ট ধর্মের বা মতের পরিচায়ক নহে কিন্তু সেইজন্যই যদি হিন্দু বলিয়া কিছুই না থাকে তবে মানুষ বলিয়াও কিছু থাকে না, তবে কেহ বলিয়াও কেহ নাই। আমি যে একজন বিশেষনামধারী ব্যক্তি, আমার ব্যক্তিত্ব আশ্রয় করিয়া অসংখ্য পরিবর্তন প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে,—ছেলেবেলা হইতে আজ পর্যন্ত আমি কত ভুল বুঝিয়াছি ও সে ভুল ছাড়িয়াছি, কত মত লইয়াছি ও বিসর্জন দিয়াছি, শিক্ষক মহাশয়ের দ্বারা কাটাকুটি-করা আমার রাশি রাশি এক্সের্সাইজ বহির সঙ্গে আর আমার অদ্যকার

১ "ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম", তত্ত্ব-কৌমুদী : বৈশাখ ১৩১৯

২ "সাদা কাগজে স্বাক্ষর", তত্ত্ব-কৌমুদী ১ বৈশাখ ১৩১৯

শিক্ষার একেবারে আকাশ-পাতাল প্রভেদ, আশৈশবকাল হইতে আজ পর্যন্ত নিজের সমস্ত খুঁটিনাটি যদি বিচার করিয়া দেখি তো দেখিব, মতে ভাবে কর্মে আত্মবিরোধের আর অন্ত নাই কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেই সমস্ত বিরোধ ও অনৈক্যগুলিও একটি গভীরতম ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে ; সেই সূত্রটি আচ্ছন্ন, তাহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া নির্দেশ করা কঠিন ;—অনৈক্যের পরম্পরাটাই বাহিরে প্রকাশমান—তবু যে লোক দেখিতেছে সে এই অনৈক্যের মালাকেও মালা বলিয়া দেখিতেছে - সে প্রতিদিনের ভূরি ভূরি বিচ্ছেদের মধ্যেও আমাকে বিচ্ছিন্ন পদার্থ বলিয়া ভ্রম করিতেছে না। অতএব, যেমন সকল জাতিরই, যেমন সকল মানুষেরই, তেমনি হিন্দুরও ইতিহাসে মতের ধর্মের আচারের পরিবর্তনহীন অবিচলিত ঐক্য নাই, সেরূপ ঐক্য থাকিতে পারে না, এবং না থাকাই মঙ্গল। সেইরূপ নিশ্চল ঐক্য আছে বলিয়া যাঁহারা গৌরব বোধ করেন তাঁহাদের সেই গৌরববোধ কাল্পনিক—সেরূপ ঐক্য নাই বলিয়া যদি কেহ অবজ্ঞা প্রকাশ করেন তবে তাঁহাদের সেই অবজ্ঞাও একেবারে অযৌক্তিক।

ভারতবর্ষে হিন্দুজাতির সহস্র বিচ্ছিন্নতার মাঝখানে যে এক প্রবল শক্তি গভীর ভাবে কাজ করিতেছে সেই শক্তি আর্যের সঙ্গে অনার্যকে রক্তে রক্তে মিলাইয়া দিয়াছে, সেই শক্তি শক হূন এবং গ্রীক উপনিবেশগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে, সেই শক্তি শত শত ধর্মমত ও আচারকে আপনার মধ্যে স্থান দিয়াছে এবং সেই শক্তিই সকল ধর্মের অনৈক্যের ভিতর দিয়া অনন্ত সত্যের একটি সুমহৎ ঐক্যকে উপলব্ধি করিবার সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহার কার্যক্ষেত্র অতি বৃহৎ তাহার উপকরণ অতি বিপুল বলিয়াই তাহার বাধাও পর্বতপ্রমাণ - কিন্তু এই বাধাই তাহার নিত্য নহে ; সে মহত্তম সত্যকে চায় বলিয়াই গুরুতর ভ্রান্তির সহিত পদে পদে তাহাকে লড়াই করিতে হইতেছে ; সে যে সামঞ্জস্যকে ঘটাইয়া তুলিবার দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে লইয়াছে তাহা সংকীর্ণ নহে বলিয়াই তাহার অনৈক্যভারে সুদীর্ঘ পথ সে এমন পীড়িত হইয়া চলিয়াছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই অনৈক্যরাশিই তাহার চরম সঞ্চয় নহে। আজ যদি এই হিন্দুর ইতিহাসের সমস্ত শিক্ষার ভিতর দিয়া আমরা কোনো একটি ঐক্যের উপলব্ধিকে পাইয়া থাকি তবে অকৃতজ্ঞের মতো কি আমরা এমন কথা বলিতে পারি যে, সাধনা যাহার সিদ্ধি তাহার নহে ; এতদিনের দায়-বহনটা রহিল হিন্দুর, আর সেই দায়-শোধের অঙ্কটা কেবলমাত্র আমাদের সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্র খাতায় জমা করিয়া লইব এবং তাহাকেই নাম দিব অসাম্প্রদায়িকতা ? যেখানেই হিন্দু-ইতিহাসের সফলতা সেইখানেই আমি তাড়াতাড়ি সকলকে ঠেলিয়া ঠুলিয়া সকল হিন্দুর সঙ্গে পৃথক হইয়া নিজের আসনটা চৌকা করিয়া পাতিয়া লইয়া চারিদিকে সাম্প্রদায়িকতার বেড়া তুলিয়া দিব এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতে থাকিব, এস

খ্রীস্টান, এস মুসলমান, এস য়িহুদী, আমরা ব্রহ্মনামের সদাব্রত খুলিয়াছি, কিন্তু এই সদাব্রতের আয়োজনটি হিন্দুর নহে, ইহা কেবল আমাদেরই এই কয়জনের ; ইহার মধ্যে অতীতের কোনো সাধনা নাই, চিরন্তনকালের ঐতিহাসিক পরীক্ষাশালার কোনো ছাপ নাই, মানবসমাজে সত্যমাত্রই বিধাতার স্বহস্তস্বাক্ষরিত যে একটি বিশেষ দেশ-কালের পরিচয় লইয়া আসে ইহার মধ্যে সেই স্বাক্ষর নাই, সেই পরিচয় নাই—এই যে আমাদের ভাবাবেগ, এই যে আমাদের আইডিয়াল, কবন্ধের মতো ইহার মুণ্ড নাই কেবল দেহ আছে, ইহার বিশেষত্ব নাই কেবল বিশ্বত্ব আছে ; ইহা নিজের পায়ের তলার আশ্রয়কে মাটি বলিয়া অবজ্ঞা করে এবং শূন্যের উপর দাঁড়াইয়া জগৎকে আলিঙ্গন করিতে চায়, তাহাও নিজের হাত দিয়া নহে পাছে সেই নিজত্বের দ্বারা বিশ্বজনীনতার খর্বতা ঘটে।[১] —তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯

হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় প্রবন্ধটি চৈতন্য লাইব্রেরির অধিবেশন উপলক্ষ্যে রিপন কলেজে ২৯ অক্টোবর ১৯১১ তারিখে পঠিত হয়।

শিক্ষার বাহন ২৪ অগ্রহায়ণ ১৩২২ তারিখে রামমোহন লাইব্রেরিতে পঠিত হয়।

মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার প্রস্তাব রবীন্দ্রনাথের এই নূতন নহে, ১২৯৯ সালে "শিক্ষার হেরফের"[২] রচনার সময় হইতে তিনি এ-বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন ; এবং ১৩৪০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত "বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ"[৩] ও "শিক্ষার বিকিরণ"[৩] প্রবন্ধে ও ১৩৪৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক পদবী-সম্মান বিতরণ-সভায় পঠিত "ছাত্র-সম্ভাষণ"[৩] প্রবন্ধেও, প্রসঙ্গক্রমে এ-বিষয়ে মনোবেদনা জ্ঞাপন করেন ; ১৩৪৩ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত শিক্ষা-সপ্তাহে পঠিত "শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ"[৩] প্রবন্ধেও দেশের শিক্ষাব্যবস্থার কর্তৃপক্ষের নিকট একই আবেদন জানাইয়া গিয়াছেন। শিক্ষার বাহন প্রবন্ধে তিনি যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন "বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন বাড়িটার ভিতরের আঙিনায় যেমন চলিতেছে চলুক,— কেবল তার এই বাহিরের প্রাঙ্গণটাতে...

১ আলোচ্য বিষয়টি লইয়া ১৩১৮ ও ১৩১৯ সালের তত্ত্ব-কৌমুদীতে আরও কয়েকটি সম্পাদকীয় মন্তব্য ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৩১৯ জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর "ব্রাহ্ম হিন্দু কি অহিন্দু" প্রবন্ধে, ব্রাহ্মগণ হিন্দু, এই মত সমর্থন করেন। ১৩২১ সালের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রসঙ্গক্রমে বিষয়টি পুনরুত্থাপিত করেন, তাঁহার আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের মত সমর্থিত হয় ; তাহার অনুবৃত্তিরূপ ঐ সালের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও তত্ত্ব-কৌমুদীতে এ-বিষয়ে অনেক বাদপ্রতিবাদ প্রকাশিত হয় ; গুরুচরণ মহলানবিশ, সুকুমার রায়চৌধুরী প্রভৃতি অজিতকুমারের প্রতিবাদ করেন।

২ রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড ; ঐ খণ্ডে 'শিক্ষা'র গ্রন্থপরিচয়ও দ্রষ্টব্য।

৩ 'শিক্ষা,' ১৩৫১ সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাটাকে যদি সমস্ত বাঙালির জিনিস করিয়া তোলা যায় তাতে বাধাটা কী?...প্রেপারেটরি ক্লাস পর্যন্ত একরকম পড়াইয়া তার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের মোড়টার কাছে যদি ইংরেজি বাংলা দুটো বড়ো রাস্তা খুলিয়া দেওয়া যায় তা হইলে কি নানা প্রকারে সুবিধা হয় না?" শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ প্রবন্ধেও তদনুরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি বঙ্গের তদানীন্তন শিক্ষাসচিব আজিজুল হক মহাশয়কে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন নিচে তাহা অংশত মুদ্রিত হইল।

আমার আর একটি প্রস্তাব আমাদের শিক্ষা-বিভাগের সম্মুখে আমি উপস্থিত করতে চাই। দেশের যে-সকল পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা নানাকারণে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত, তাদের জন্যে ছোটোবড়ো প্রাদেশিক শহরগুলিতে যদি পরীক্ষা-কেন্দ্র স্থাপন করা যায় তবে অনেকেই অবসরমতো ঘরে বসে নিজেকে শিক্ষিত করতে উৎসাহিত হবে। নিম্নতন থেকে উচ্চতন পর্ব পর্যন্ত তাদের পাঠ্যবিষয় নির্দিষ্ট ক'রে তাদের পাঠ্যপুস্তক বেঁধে দিলে সুবিহিতভাবে তাদের শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হতে পারবে। এই পরীক্ষার যোগে যে-সকল উপাধির অধিকার পাওয়া যাবে, সমাজের দিক থেকে তার সম্মান ও জীবিকার দিক থেকে তার প্রয়োজনীয়তার মূল্য আছে। তাই আশা করা যায়, দেশব্যাপী পরীক্ষার্থীর দেয় অর্থ থেকে অনায়াসে এর ব্যয় নির্বাহ হবে। এই উপলক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়ে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যাবিস্তারের উপাদান বেড়ে যাবে এবং এতে করে বিস্তর লেখকের জীবিকার উপায় নির্ধারিত হবে। একদা বিশ্বভারতী থেকে এই কর্তব্য গ্রহণ করবার সংকল্প মনে উদয় হয়েছিল কিন্তু দরিদ্রের মনোরথ মনের বাইরে অচল। তা ছাড়া রাজসরকারের উপাধিই জীবনযাত্রায় কর্ণধার।

"বাংলা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারেও" ইতিপূর্বে শিক্ষার বিকিরণ প্রবন্ধে তিনি অনুরূপ "আবেদন উপস্থিত" করিয়াছিলেন :

মস্তিষ্কের সঙ্গে স্নায়ুজালের অবিচ্ছিন্ন যোগ সমস্ত দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। বিশ্ব-বিদ্যালয়কে সেই মস্তিষ্কের স্থান নিয়ে স্নায়ুতন্ত্র প্রেরণ করতে হবে দেশের সর্বদেহে। প্রশ্ন এই কেমন করে করা যেতে পারে। তার উত্তরে আমার প্রস্তাব এই যে একটা পরীক্ষার বেড়াজাল দেশ জুড়ে পাতা হোক। এমন সহজ ও ব্যাপকভাবে তার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ইস্কুল-কলেজের বাইরে থেকেও দেশে পরীক্ষাপাঠ্য বইগুলি স্বেচ্ছায় আয়ত্ত করবার উৎসাহ জন্মে। অন্তঃপুরের মেয়েরা কিংবা পুরুষদের যারা নানা বাধায় বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না, তারা অবকাশকালে নিজের চেষ্টায় অশিক্ষার লজ্জা নিবারণ করছে এইটি দেখবার উদ্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় জেলায় জেলায় পরীক্ষার কেন্দ্র

স্থাপন করতে পারে। বহু বিষয় একত্র জড়িত ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি দেওয়া হয়, এ ক্ষেত্রে উপাধি দেবার উপলক্ষ্যে সে-রকম বহুলতার প্রয়োজন নেই।

বিশ্ববিদ্যালয় বা গবর্নমেণ্ট হইতে এইরূপ পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা হয় নাই বলিয়া, রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তনায় বিশ্বভারতী লোকশিক্ষাসংসদ যথাশক্তি দেশের বিভিন্ন স্থানে এইরূপ পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিতে থাকেন, এই কাজ এখনো চলিতেছে।

পরিচয় গ্রন্থের বর্তমানে প্রচলিত দ্বিতীয় সংস্করণে অনেক পূর্বতন প্রবন্ধ বর্জিত ও নূতন প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; রচনাবলীতে প্রথম সংস্করণের প্রবন্ধসূচী অনুসৃত হইল।

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম

কর্তার ইচ্ছায় ১৩২৪ সালের ভাদ্র মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত হয় এবং ঐ বৎসরেই (২২ আগস্ট ১৯১৭) পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তৎপূর্বে উহা কলিকাতা রামমোহন লাইব্রেরিতে (৪ আগস্ট ১৯১৭) ও ভূপেন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে আলফ্রেড থিয়েটার গৃহে পঠিত হয়।

এই বৎসর আষাঢ় মাসে, ভারতবর্ষে আত্মশাসন-প্রবর্তনচেষ্টার ফলে, "নির্বাসিত, অবরুদ্ধ বা নজরবন্দী শত শত বাঙালীর ন্যায় শ্রীমতী অ্যানী বেসাণ্ট ও তাঁহার দুই জন সহকারীর স্বাধীনতা লুপ্ত"[১] হয়। "কথা হয় যে, টাউন হলে এক সভায় প্রতিবাদ করা হইবে, এবং তথায় বঙ্গের সব জেলার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিবেন। গবর্নমেণ্ট পক্ষ হইতে মিঃ কামিং ও কলিকাতার পুলিশ কমিশনার এই সভার কয়েকজন উদ্যোক্তাকে ডাকিয়া এই জানাইয়াছিলেন যে, বাংলা গবর্নমেণ্ট টাউন-হলে এই সভা হইতে দিবেন না; কেবল মান্দ্রাজ গবর্নমেণ্টের একটি কাজের প্রতিবাদ করিবার জন্য গবর্নমেণ্ট সভা হইতে দিতে পারেন না; অন্য প্রদেশে যাহা হইতেছে, তাহার প্রতিবাদ বা আলোচনা বাংলা গবর্নমেণ্ট বঙ্গে হইতে দিতে পারেন না[২], কেহ সভা করিয়া প্রতিবাদাদি করিলে

১ প্রবাসী, ভাদ্র ১৩২৪, বিবিধ প্রসঙ্গ, "প্রতিবাদের অধিকার"।

২ দ্রষ্টব্য পৃ. ৫৬২ :

"দেড়শ বছর ভারতে ইংরেজ-শাসনের পর আজ এমন কথা শোনা গেল মান্দ্রাজ গবর্মেণ্ট ভালোমন্দ যাই করুক বাংলাদেশে তা লইয়া দীর্ঘনিশ্বাসটি ফেলিবার অধিকার বাঙালির নাই। এতদিন এই জানিতাম ইংরেজের অখণ্ড শাসনে মান্দ্রাজ বাংলা পাঞ্জাব মারাঠা ভিতরে বাহিরে এক হইয়া উঠিতেছে এই গৌরবই ইংরেজ সাম্রাজ্যের মুকুটের কোহিনুর মণি। বেলজিয়ম ও ফ্রান্সের দুর্গতিকে আপন দুর্গতি মনে করিয়া ইংরেজ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে ছুটিয়াছে, সমুদ্রের পশ্চিমপারে যখন এই বার্তা তখন সমুদ্রের পূর্বপারে এমন নীতি কি একদিনও খাটিবে যে, মান্দ্রাজের ভালোমন্দ সুখদুঃখে বাঙালির কোনো মাথাব্যথা নাই? এমন হুকুম কি আমরা মাথা হেঁট করিয়া মানিব?"

গবর্নমেন্ট তাহাদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করিবেন।"[১] এইরূপ অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধ পাঠ করিয়া রাষ্ট্রিক ও সামাজিক আত্মকর্তৃত্ব ও মুক্তির প্রসঙ্গ আলোচনা করেন; জনশ্রুতি, এইজন্য তাঁহার গ্রেপ্তার হইবার সম্ভাবনাও ঘটিয়াছিল।

"যখন বঙ্গের গবর্নর টাউনহলে শ্রীমতী বেসান্টের স্বাধীনতালোপের প্রতিবাদ করিতে দিবেন না বলিয়া হুকুম জারি করেন, তখন বাক্যস্ফূর্তি "রাজনীতি-ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশ" ("novice in politics") রবীন্দ্রনাথেরই হইয়াছিল, তখন তিনিই রামমোহন লাইব্রেরিতে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম পড়িয়া বঙ্গের ভীতিবিহ্বল নীরবতা ভঙ্গ করিয়াছিলেন, বঙ্গের রাজনৈতিক মহারথীরা করেন নাই।"[২]

"দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী" গানটি এই সময় রচিত ও রামমোহন লাইব্রেরির সভায় সর্বপ্রথম সাধারণ্যে গীত হয়; গানটি প্রবাসীতে "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম" প্রবন্ধের অনুবৃত্তিরূপে প্রথম প্রকাশিত হয়।

জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, সম্ভবত এই প্রবন্ধে বিবৃত সমাজ-সংক্রান্ত মতামত-প্রসঙ্গে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পত্রব্যবহার করেন; তদুত্তরে রবীন্দ্রনাথ যে চিঠি লেখেন নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল :

আপনার পত্রখানি পড়িয়া আনন্দিত হইলাম। কিছুদিন হইতে বাংলাদেশের যুবকদের ভাবগতিক দেখিয়া বড়োই হতাশ হইতেছিলাম। স্বদেশভক্তির নাম লইয়া বিচারবুদ্ধির অন্ধতা সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে। এমন কি আমার এই বিদ্যালয়ে অল্পবয়সের যে-সব ছাত্র আসে তারাও এমন একটা বিরুদ্ধ বুদ্ধি লইয়া আসে যে হার মানিতে হয়। যে মূঢ়তা স্বাভাবিক তার প্রতিকার আছে। কিন্তু যে মূঢ়তা কৃত্রিম— যাহা জোর করিয়া কোমর বাঁধিয়া সর্বত্র তাল ঠুকিয়া বেড়ায়, তার সঙ্গে পারিয়া ওঠা দায়। আমি একরকম হাল ছাড়িবার চেষ্টাতেই ছিলাম, এমন সময় এই বক্তৃতার তাগিদ আসিল। আর যাই হোক একটা দেখিলাম, রাক্ষসটাকে যত প্রকাণ্ড প্রবল বলিয়া মনে হইত উহার জোর তত্টা নয়। উহার আয়তন বড়ো, কিন্তু ভিতরটা ভুয়ো। একটু ধাক্কা মারিলেই দেখি টলমল করিয়া উঠে। সুতরাং যে পর্যন্ত না কাত হইয়া পড়ে মাঝে মাঝে ধাক্কা মারিবার সংকল্প রহিল। দূর হইতে আপনাদের উৎসাহবাণী কাজে লাগিবে। ইতি ৬ ভাদ্র ১৩২৪

১ প্রবাসী, ভাদ্র ১৩২৫, বিবিধ প্রসঙ্গ, "প্রতিবাদের অধিকার"।

২ প্রবাসী, কার্তিক, ১৩২৪, বিবিধ প্রসঙ্গ, "রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব"।

সংশোধন : অষ্টাদশ খণ্ড

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮৯	২৫	মৃত্তুদিনের	মৃত্যুদিনের
১৩৫	১০	করো নবগীত	নবগীত করো
৫০৬	২০	রইল	রহিল
৩১	১০ ও ১১	ছত্রের মধ্যে '২' সংখ্যা বসিবে।	
১১৭	১২ ও ১৩	মুদ্রণকালে অক্ষর ভাঙিয়াছে। ছত্র দুইটি যথাক্রমে হইবে : রাতের আঁধার দিনের জ্যোতিতে। প্রতি তুচ্ছ মুহূর্তেরই আবর্জনা করি আমি জুড়ো,	

বর্ণানুক্রমিক সূচী

অঙ্গের বাঁধনে বাঁধাপড়া ... ৭৩
অনেককালের একটিমাত্র দিন ... ৫৮
অনেক হাজার বছরের ... ১৩
অন্য কথা পরে হবে ... ৩০
অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে ... ১৩২
অসম্ভব কথা ... ২৭০
অসীম আকাশে কালের তরী ... ৩১
অহৈতুক ... ২৪২
আকাশে চেয়ে দেখি .. ৫২
আজ শরতের আলোয় ... ৪৬
আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে ... ১৩০
আত্মপরিচয় ... ৪৫২
আবাহন ... ২৩৭
আমরা কি সত্যই চাই ... ৩৬
আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো ... ১৮৭
আমার এই ছোটো কলসখানি ... ১১৫
আমার এই ছোটো কলসিটা ... ৫৪
আমার কাছে শুনতে চেয়েছ ... ৩৪
আমার জগৎ ... ৪১১
আমার ফুলবাগানের ... ৪৮
আমার রাত পোহাল ... ১৪২
আমার শেষবেলাকার ঘরখানি .. ৯১
আমি ... ১১৭
আমি কানন হতে ... ১৮৮
আমি বদল করেছি ... ২৮
আর রেখো না আঁধারে ... ১৭৩
আলোকরসে মাতাল রাতে ... ২৪৬

আলোর অমল কমলখানি	...	২২০
আষাঢ়	...	১২০, ২০৯, ৫৩১
আসন্ন শীত	...	২২৯
উৎসব	...	২৪৪
উদ্বোধন	...	১৯৭
ঋষি কবি বলেছেন	...	৭৯
এই যে সবার সামান্য পথ	...	১১৭
একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প	...	২৮৯
একদিন কোন্ তুচ্ছ আলাপের	...	১০৭
একদিন তুচ্ছ আলাপের	...	৪
একদিন শান্ত হলে	...	১০৮
একলা বসে বাদলশেষে	...	১৩৬
এ কী পরম ব্যথায়	...	১৮৭
এবার অবগুণ্ঠন খোলো	...	১৪০
এস, এস, এস, হে বৈশাখ	...	২০২
এস নীপবনে	...	১২৯
এস শরতের অমল মহিমা	...	১৩৯
ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব	...	১৩৪
ওগো শীত, ওগো শুভ্র	...	২২৯
ওগো শেফালিবনের মনের কামনা	...	১৩৯
ওগো সন্ন্যাসী, কী গান	...	২১২
ওরা এসে আমাকে বলে	...	৭৮
ওরে প্রজাপতি, মায়া দিয়ে	...	২৪৪
ওলো শেফালি	...	১৩৮
কত-না দিনের দেখা	...	২৪২
কর্তার ইচ্ছায় কর্ম	...	৫৪৩
কার বাঁশি নিশিভোরে	...	১৪১
কালবৈশাখী	...	২০৪
কালো অন্ধকারের তলায়	...	২৬
কৃপণতা	...	৫২৫

কেউ চেনা নয়	...	২৪
কেন গো যাবার বেলা	...	২২১
কেন পান্থ এ চঞ্চলতা	...	২১৫
কোথা যে উধাও হল	...	১৩০
কোন্ বারতায় করিল প্রচার	...	২০৯
খাতা	...	৩১৭
গগনে গগনে আপনার মনে	...	২১১
গান আমার যায়	...	১৪৩
ঘট ভরা	...	১১৫
চঞ্চল	...	২৪৪
চরণরেখা তব	...	২২২
ছবির অঙ্গ	...	৫১২
জানি তুমি ফিরে আসিবে	...	২৪১
ঝরে ঝর ঝর	..	১৩০
ডাকো বৈশাখ কালবৈশাখী	...	২০৪
ডেকেছ আজি, এসেছি সাজি	...	২২৭
তখন আমার আয়ুর তরণী	...	৯৯
তখন আমার বয়স ছিল	...	১০১
তখন বয়স ছিল কাঁচা	...	৩৮
তপের তাপের বাঁধন	...	২০৮
তুঙ্গ তোমার ধবল-শৃঙ্গশিরে	...	২৩৪
তুমি কি এসেছ মোর	...	১৬২
তুমি গল্প জমাতে পার	...	৮৫
তুমি প্রভাতের শুকতারা	...	৫৬
তোমার আসন পাতব কোথায়	...	২৩৭
তোমার নাম জানিনে	...	১৪১
দিনের প্রান্তে এসেছি	...	১০
দীপালি	...	২২৬
দুঃখ যেন জাল পেতেছে চারদিকে	...	১২৩
দেখো শুকতারা	...	১৩৭

দেহের মধ্যে বন্দী প্রাণের	...	১১৬
দোল	...	২৪৬
ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে	...	১৩৩
ধর্মশিক্ষা	...	৩৭২
ধর্মের অধিকার	...	৩৯৩
ধর্মের অর্থ	...	৩৫৬
ধর্মের নবযুগ	...	৫৪৭
ধূসরবসন, হে বৈশাখ	...	২০৩
ধ্যান-নিমগ্ন নীরব নগ্ন	...	২০১
ধ্বনিল গগনে আকাশ-বাণীর	...	২১৬
নব বরষার দিন	...	১২০
নম, নম, নম। তুমি ক্ষুধার্ত	...	২২২
নম নম নম নম তুমি সুন্দরতম	...	২৩৫
নম, নম, নম, নম। নির্দয় অতি	...	২৩১
নমো, নমো করুণাঘন	...	২০৮
নমো, নমো, হে বৈরাগী	...	২০২
নামকরণ	...	৩৪৩
নির্মল কান্ত নমো হে নমঃ	...	২১৮
নিশীথে কী কয়ে গেল	...	১৫৮
নূতন কল্পে সৃষ্টির আরম্ভে	...	৪১
নৃত্য	...	১৯৯, ২৩০
নৃত্যের তালে তালে	...	১৯৯
পঁচিশে বৈশাখ চলেছে	...	৮৯
পড়েছি আজ রেখার মায়ায়	...	৩২
পথিক আমি	...	৭২
পথিক মেঘের দল জোটে	...	১৩৩
পথে যেতে ডেকেছিল	...	১৭৮
পরানে কার ধেয়ান আছে	...	২০৬
পাগল আজি আগল খোলে	...	২১৮
পাঁচিলের এধারে	...	৫৭

পাড়ায় আছে ক্লাব	...	৬২
পিলসুজের উপর পিতলের প্রদীপ	...	৬৬
পুব হাওয়াতে দেয় দোলা	...	১৩২
পুরবাসী বলে উমার মা	...	৩২২
পূর্বগগনভাগে	...	১৪৯
প্রত্যাশা	...	২০৮
প্রশ্ন	...	১১৬
প্রার্থনা	...	২৪১
ফুরিয়ে গেল পৌষের দিন	...	৫
বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা	...	১৩১
বন্ধু, রহো রহো সাথে	...	১৩৪
বর্ষা নেমেছে প্রান্তরে	...	৮
বর্ষা-মঙ্গল	...	২১২
বসন্ত	...	২৩৭
বসন্তের বিদায়	...	২৪০
বাতাবির চারা	...	১০৮
বাদশাহের হুকুম	...	৬৯
বাঁধন কেন ভূষণবেশে	...	১৫৫
বাঁধন-ছেঁড়ার সাধন হবে	...	১৭০
বিলাপ	...	২২২
বিশ্বলক্ষ্মী, তুমি একদিন	...	৭৫
বৈশাখ	...	২০১
বৈশাখ-আবাহন	...	২০২
ব্যঞ্জনা	...	২০৭
ভগিনী নিবেদিতা	...	৪৮৭
ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা	...	৪২৩
ভালোবেসে মন বললে	...	১৭
ভোরের আলো-আঁধারে	...	২১
মধ্যদিনে যবে গান	...	২০৫
মধ্যবর্তিনী	...	২৫৭

মনে মনে দেখলুম	...	১৪
মনে রবে কি না রবে	...	২৪২
মনের মানুষ	...	২৪২
মনে হয়েছিল আজ	...	২০
মন্দিরার মন্ত্র তব	...	১৯৭
মর্মবাণী	...	১১২
মুক্তিতত্ত্ব	...	১৯৫
মুক্তিতত্ত্ব শুনতে ফিরিস	...	১৯৫
মাধুরীর ধ্যান	...	২০৫
মুখখানি কর মলিন বিধুর	...	২৪০
যক্ষ	...	১২১
যখন দেখা হল	...	৬০
যায় রে শ্রাবণ কবি	...	২১৪
যে ছায়ারে ধরব বলে	...	১৩৮
যেথা দূর যৌবনের	...	১০৯
যৌবনের প্রান্তসীমায়	...	৬
রঙ লাগালে বনে বনে	...	২৪০
রাগরঙ্গ	...	২৪০
রাঙিয়ে দিয়ে যাও গো	...	২৪৬
রাস্তায় চলতে চলতে	...	২৫
রূপ ও অরূপ	...	৩৩৫
রোগীর নববর্ষ	...	৩৩১
লীলা	...	২১১
লুকানো রহে না বিপুল মহিমা	...	২৩৫
শরৎ	...	২১৬, ৫৩৮
শরৎ ডাকে ঘর-ছাড়ানো ডাকা	...	২১৯
শরতের ধ্যান	...	২২০
শরতের বিদায়	...	২২১
শান্তি	...	২১৮
শান্তি	...	২৭৮

শিউলি-ফোটা ফুরাল যেই	…	২২৪
শিক্ষার বাহন	…	৪৯৭
শীত	…	২২৯
শীতের উদ্বোধন	…	২২৭
শীতের বনে কোন্ সে কঠিন	…	২২৯
শীতের বিদায়	…	২৩৪
শীতের রোদ্দুর	…	৭৪
শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন	…	২৩০
শিল্পীর ছবিতে যাহা	…	১১২
শুনিতে কি পাস	…	২০৭
শুরু হতেই ও আমার সঙ্গ ধরেছে	…	৪৪
শেষ পর্ব	…	১০৯
শেষ মিনতি	…	২১৫
শেষের রঙ	…	২৪৬
শ্যামল শোভন শ্রাবণ-ছায়া	…	১৩৬
শ্রাবণ, তুমি বাতাসে কার	…	২১৪
শ্রাবণ-বিদায়	…	২১৪
শ্রাবণ সে যায় চলে পান্থ	…	২১৬
সকল কলুষ তামস হর	…	১৮৩
সন্ন্যাসী যে জাগিল ঐ	…	২৪৪
সমস্যাপূরণ	…	৩১১
সমাপ্তি	…	২৯২
সম্পাদক	…	২৫১
সম্বোধন	…	২০৩
সেদিন আমাদের ছিল খোলা সভা	…	৩৯
সোনার কাঠি	…	৫২১
স্তব	…	২৩৩
স্থির জেনেছিলেম	…	৩
স্মৃতি-পাথেয়	…	১০৭

হায় হেমন্তলক্ষ্মী, তোমার	...	২২৪
হার মানালে	...	১৮৩
হালকা আমার স্বভাব	...	৮২
হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়	...	৪৭০
হিন্দু ব্রাহ্ম	...	৫৮০
হিমের রাতে ঐ গগনের	...	২২৬
হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী	...	১৭৬
হৃদয় আমার, ঐ বুঝি	...	২০৪
হে ক্ষণিকের অতিথি	...	১৪২
হে বসন্ত, হে সুন্দর	...	২৩৭
হেমন্ত	...	২২৫
হে মহাজীবন	...	১৮২
হে যক্ষ তোমার প্রেম	...	১২১
হে যক্ষ, সেদিন	...	৭৬
হে সন্ন্যাসী, হিমগিরি ফেলে	...	২৩৩
হে হেমন্ত-লক্ষ্মী, তব	...	২২৫

রবীন্দ্র রচনাবলী

ঊনবিংশ খণ্ড

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

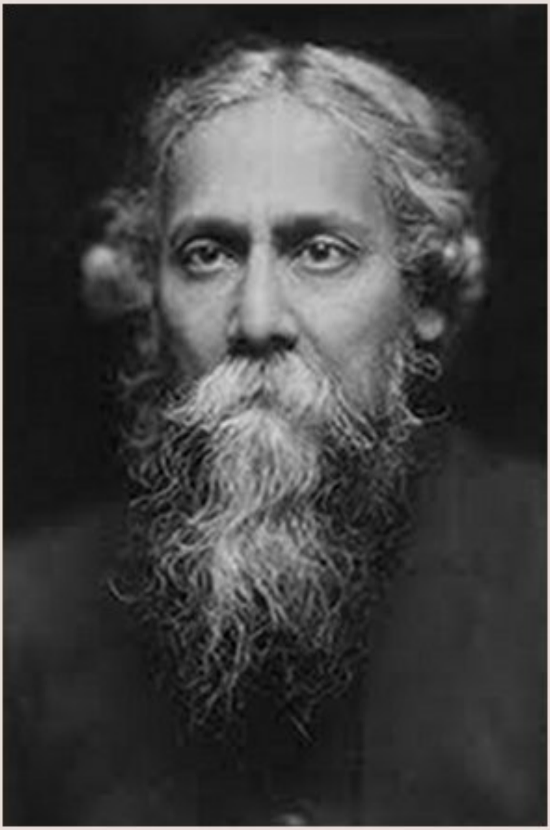

রবীন্দ্র-রচনাবলী

ঊনবিংশ খণ্ড

VISVA—BHARATI
184286
LIBRARY.

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা

প্রকাশ ২৫ বৈশাখ ১৩৫২
পুনর্মুদ্রণ ভাদ্র ১৩৬৩
আশ্বিন ১৩৭৫ : ১৮৯০ শক

মূল্য : কাগজের-মলাট বারো টাকা
রেক্সিন-বাঁধাই পনেরো টাকা

© বিশ্বভারতী ১৯৬৮

প্রকাশক বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন । কলিকাতা ৭
মুদ্রক শ্রীত্রিদিবেশ বসু
কে. পি. বসু প্রিণ্টিং ওআর্ক্‌স্‌
১১ মহেন্দ্র গোস্বামী লেন । কলিকাতা ৬
২'১

সূচী

চিত্রসূচী	৷৵০
কবিতা ও গান	
বীথিকা	৩
নাটক ও প্রহসন	
শেষরক্ষা	১২৭
উপন্যাস ও গল্প	
গল্পগুচ্ছ	২০৩
প্রবন্ধ	
জাপানযাত্রী	২৯১
যাত্রী : পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি	৩৬৩
জাভাযাত্রীর পত্র	৪৫১
গ্রন্থপরিচয়	৫২৭
বর্ণানুক্রমিক সূচী	৫৩৫

চিত্রসূচী

রবীন্দ্রনাথ	৫
জাপানে রবীন্দ্রনাথ	২৯৪
মহিলাবিদ্যাপীঠে রবীন্দ্রনাথ	২৯৫
বোরোবুদুরে রবীন্দ্রনাথ	৪৫২, ৪৫৩

কবিতা ও গান

বীথিকা

বীথিকা

অতীতের ছায়া

মহা অতীতের সাথে আজ আমি করেছি মিতালি—
দিবালোক-অবসানে তারালোক জ্বালি
ধ্যানে যেথা বসেছে সে
রূপহীন দেশে ;
যেথা অস্তসূর্য হতে নিয়ে রক্তরাগ
গুহাচিত্রে করিছে সজাগ
তার তুলি
ম্রিয়মাণ জীবনের লুপ্ত রেখাগুলি ;
নিমীলিত বসন্তের ক্লান্তগন্ধে যেখানে সে
গাঁথিয়া অদৃশ্যমালা পরিছে নিবিড় কালোকেশে ;
যেখানে তাহার কণ্ঠহারে
দুলায়েছে সারে সারে
প্রাচীন শতাব্দীগুলি শান্ত-চিত্তদহন বেদনা
মাণিক্যের কণা।
সেথা বসে আছি কাজ ভুলে
অস্তাচলমূলে
ছায়াবীথিকায়।
রূপময় বিশ্বধারা অবলুপ্তপ্রায়
গোধূলিধূসর আবরণে,
অতীতের শূন্য তার স্পর্শ মেলিতেছে মোর মনে।
এ শূন্য তো মরুমাত্র নয়,
এ যে চিত্তময় ;

বর্তমান যেতে যেতে এই শূন্যে যায় ভ'রে রেখে
আপন অন্তর থেকে
অসংখ্য স্বপন ;
অতীত এ শূন্য দিয়ে করিছে বপন
বস্তুহীন সৃষ্টি যত,
নিত্যকাল-মাঝে তারি ফলশস্য ফলিছে নিয়ত।
আলোড়িত এই শূন্য যুগে যুগে উঠিয়াছে জ্বলি,
ভরিয়াছে জ্যোতির অঞ্জলি।
বসে আছি নির্নিমেষ চোখে
অতীতের সেই ধ্যানলোকে—
নিঃশব্দ তিমিরতটে জীবনের বিস্মৃত রাতির।

হে অতীত,
শান্ত তুমি নির্বাণ-বাতির
অন্ধকারে,
সুখদুঃখনিষ্কৃতির পারে।
শিল্পী তুমি, আঁধারের ভূমিকায়
নিভৃতে রচিছ সৃষ্টি নিরাসক্ত নির্মম কলায়,
স্মরণে ও বিস্মরণে বিগলিত বর্ণ দিয়া লিখা
বর্ণিতেছ আখ্যায়িকা ;
পুরাতন ছায়াপথে নূতন তারার মতো
উজ্জ্বলি উঠিছে কত,
কত তার নিভাইছ একেবারে
যুগান্তের অশান্ত ফুৎকারে।
আজ আমি তোমার দোসর,
আশ্রয় নিতেছি সেথা যেথা আছে মহা-অগোচর।
তব অধিকার আজি দিনে দিনে ব্যাপ্ত হয়ে আসে
আমার আয়ুর ইতিহাসে।
সেথা তব সৃষ্টির মন্দিরদ্বারে
আমার রচনাশালা স্থাপন করেছি একধারে

তোমারি বিহারবনে ছায়াবীথিকায়।
ঘুচিল কর্মের দায়,
ক্লান্ত হল লোকমুখে খ্যাতির আগ্রহ;
দুঃখ যত সয়েছি দুঃসহ
তাপ তার করি অপগত
মূর্তি তারে দিব নানামতো
আপনার মনে মনে।
কলকোলাহলশান্ত জনশূন্য তোমার প্রাঙ্গণে,
যেখানে মিটেছে দ্বন্দ্ব মন্দ ও ভালোয়,
তারার আলোয়
সেখানে তোমার পাশে আমার আসন পাতা—
কর্মহীন আমি সেথা বন্ধহীন সৃষ্টির বিধাতা।

৩১ জুলাই-২ অগস্ট ১৯৩৫
শান্তিনিকেতন

মাটি

বাঁখারির বেড়া-দেওয়া ভূমি; হেথা করি ঘোরাফেরা
সারাক্ষণ আমি-দিয়ে ঘেরা
বর্তমানে।
মন জানে
এ মাটি আমারি,
যেমন এ শালতরুসারি
বাঁধে নিজ তলবীথি শিকড়ের গভীর বিস্তারে
দূর শতাব্দীর অধিকারে।
হেথা কৃষ্ণচূড়াশাখে ঝরে শ্রাবণের বারি
সে যেন আমারি—
ভোরে ঘুমভাঙা আলো, রাত্রে তারাজ্বালা অন্ধকার,
যেন সে আমারি আপনার
এ মাটির সীমাটুকু-মাঝে।

আমার সকল খেলা, সব কাজে,
এ ভূমি জড়িত আছে শাশ্বতের যেন সে লিখন।
হঠাৎ চমক ভাঙে নিশীথে যখন
সপ্তর্ষির চিরন্তন দৃষ্টিতলে,
ধ্যানে দেখি, কালের যাত্রীর দল চলে
যুগে যুগান্তরে।
এই ভূমিখণ্ড-'পরে
তারা এল, তারা গেল কত।
তারাও আমারি মতো
এ মাটি নিয়েছে ঘেরি—
জেনেছিল, একান্ত এ তাহাদেরি।
কেহ আর্য কেহ বা অনার্য তারা,
কত জাতি নামহীন, ইতিহাসহারা।
কেহ হোমাগ্নিতে হেথা দিয়েছিল হবির অঞ্জলি,
কেহ বা দিয়েছে নরবলি।
এ মাটিতে একদিন যাহাদের সুপ্তচোখে
জাগরণ এনেছিল অরুণ-আলোকে
বিলুপ্ত তাদের ভাষা।
পরে পরে যারা বেঁধেছিল বাসা,
সুখে দুঃখে জীবনের রসধারা
মাটির পাত্রের মতো প্রতি ক্ষণে ভরেছিল যারা
এ ভূমিতে,
এরে তারা পারিল না কোনো চিহ্ন দিতে।

আসে যায়
ঋতুর পর্যায়,
আবর্তিত অন্তহীন
রাত্রি আর দিন;
মেঘরৌদ্র এর 'পরে
ছায়ার খেলেনা নিয়ে খেলা করে

আদিকাল হতে।
কালস্রোতে
আগন্তুক এসেছি হেথায়
সত্য কিম্বা দ্বাপরে ত্রেতায়
যেখানে পড়ে নি লেখা
রাজকীয় স্বাক্ষরের একটিও স্থায়ী রেখা।

হায় আমি,
হায় রে ভূস্বামী,
এখানে তুলিছ বেড়া— উপাড়িছ হেথা যেই তৃণ
এ মাটিতে সে-ই রবে লীন
পুনঃ পুনঃ বৎসরে বৎসরে। তারপরে!—
এই ধূলি রবে পড়ি আমি-শূন্য চিরকাল-তরে।

২ অগস্ট ১৯৩৫
শান্তিনিকেতন

দুজন

সূর্যাস্তদিগন্ত হতে বর্ণচ্ছটা উঠেছে উচ্ছ্বাসি।
দুজনে বসেছে পাশাপাশি।
সমস্ত শরীরে মনে লইতেছে টানি
আকাশের বাণী।
চোখেতে পলক নাই, মুখে নাই কথা,
স্তব্ধ চঞ্চলতা।
একদিন যুগলের যাত্রা হয়েছিল শুরু,
বক্ষ করেছিল দুরু দুরু
অনির্বচনীয় সুখে।
বর্তমান মুহূর্তের দৃষ্টির সম্মুখে
তাদের মিলনগ্রন্থি হয়েছিল বাঁধা।
সে-মুহূর্ত পরিপূর্ণ; নাহি তাহে বাধা,

দ্বন্দ্ব নাই, নাই ভয়,
নাইকো সংশয়।
সে-মুহূর্ত বাঁশির গানের মতো ;
অসীমতা তার কেন্দ্রে রয়েছে সংহত।
সে-মুহূর্ত উৎসের মতন ;
একটি সংকীর্ণ মহাক্ষণ
উচ্ছলিত দেয় ঢেলে আপনার সবকিছু দান।
সে সম্পদ দেখা দেয় লয়ে নৃত্য, লয়ে গান,
লয়ে সূর্যালোকভরা হাসি,
ফেনিল কল্লোল রাশি রাশি।
সে-মুহূর্তধারা
ক্রমে আজ হল হারা
সুদূরের মাঝে।
সে-সুদূরে বাজে
মহাসমুদ্রের গাথা।
সেইখানে আছে পাতা
বিরাটের মহাসন কালের প্রাঙ্গণে।
সর্ব দুঃখ, সর্ব সুখ মেলে সেথা প্রকাণ্ড মিলনে।
সেথা আকাশের পটে
অস্ত-উদয়ের শৈলতটে
রবিচ্ছবি আঁকিল যে অপরূপ মায়া
তারি সঙ্গে গাঁথা পড়ে রজনীর ছায়া।
সেথা আজ যাত্রী দুইজনে
শান্ত হয়ে চেয়ে আছে সুদূর গগনে।
কিছুতে বুঝিতে নাহি পারে
কেন বারে বারে
দুই চক্ষু ভরে ওঠে জলে।
ভাবনার সুগভীর তলে
ভাবনার অতীত যে-ভাষা
করিয়াছে বাসা

অকথিত কোন্ কথা
কী বারতা
কাঁপাইছে বক্ষের পঞ্জরে।
বিশ্বের বৃহৎ বাণী লেখা আছে যে মায়া-অক্ষরে,
তার মধ্যে কতটুকু শ্লোকে
ওদের মিলনলিপি, চিহ্ন তার পড়েছে কি চোখে!

২৫ জুলাই ১৯৩২
[শান্তিনিকেতন]

রাত্রিরূপিণী

হে রাত্রিরূপিণী,
আলো জ্বালো একবার ভালো করে চিনি।
দিন যার ক্লান্ত হল তারি লাগি কী এনেছ বর,
জানাক তা তব মৃদু স্বর।
তোমার নিশ্বাসে
ভাবনা ভরিল মোর সৌরভ-আভাসে।
বুঝিবা বক্ষের কাছে
ঢাকা আছে
রজনীগন্ধার ডালি!
বুঝিবা এনেছ জ্বালি
প্রচ্ছন্ন ললাটনেত্রে সন্ধ্যার সঙ্গিনীহীন তারা—
গোপন আলোক তারি, ওগো বাক্যহারা,
পড়েছে তোমার মৌন-'পরে—
এনেছে গভীর হাসি করুণ অধরে
বিষাদের মতো শান্ত স্থির।
দিবসে সুতীব্র আলো, বিক্ষিপ্ত সমীর,
নিরন্তর আন্দোলন,
অনুক্ষণ
দ্বন্দ্ব-আলোড়িত কোলাহল।

তুমি এসো অচঞ্চল,
এসো স্নিগ্ধ আবির্ভাব,
তোমারি অঞ্চলতলে লুপ্ত হোক যত ক্ষতি লাভ।
তোমার স্তব্ধতাখানি
দাও টানি
অধীর উদ্‌ভ্রান্ত মনে।
যে অনাদি নিঃশব্দতা সৃষ্টির প্রাঙ্গণে
বহ্নিদীপ্ত উদ্যমের মত্ততার জ্বর
শান্ত করি করে তারে সংযত সুন্দর,
সে গম্ভীর শান্তি আনো তব আলিঙ্গনে
ক্ষুব্ধ এ জীবনে।
তব প্রেমে
চিত্তে মোর যাক থেমে
অন্তহীন প্রয়াসের লক্ষ্যহীন চাঞ্চল্যের মোহ,
দুরাশার দুরন্ত বিদ্রোহ।
সপ্তর্ষির তপোবনে হোমহুতাশন হতে
আনো তব দীপ্ত শিখা। তাহারি আলোতে
নির্জনের উৎসব-আলোক
পুণ্য হবে, সেইক্ষণে আমাদের শুভদৃষ্টি হোক।
অপ্রমত্ত মিলনের মন্ত্র সুগম্ভীর
মন্দ্রিত করুক আজি রজনীর তিমিরমন্দির।

৭ মাঘ ১৩৩৮

ধ্যান

কাল চলে আসিয়াছি, কোনো কথা বলি নি তোমারে।
শেষ করে দিনু একেবারে
আশা নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব, ক্ষুব্ধ কামনার
দুঃসহ ধিক্কার।

বিরহের বিষণ্ণ আকাশে
সন্ধ্যা হয়ে আসে।
তোমারে নিরখি ধ্যানে সব হতে স্বতন্ত্র করিয়া
অনন্তে ধরিয়া।
নাই সৃষ্টিধারা,
নাই রবি শশী গ্রহতারা;
বায়ু স্তব্ধ আছে,
দিগন্তে একটি রেখা আঁকে নাই গাছে।
নাইকো জনতা,
নাই কানাকানি কথা।
নাই সময়ের পদধ্বনি
নিরন্ত মুহূর্ত স্থির, দণ্ড পল কিছুই না গণি।
নাই আলো, নাই অন্ধকার—
আমি নাই, গ্রন্থি নাই তোমার আমার।
নাই সুখ দুঃখ ভয়, আকাঙ্ক্ষা বিলুপ্ত হল সব—
আকাশে নিস্তব্ধ এক শান্ত অনুভব।
তোমাতে সমস্ত লীন, তুমি আছ একা—
আমি-হীন চিত্তমাঝে একান্ত তোমারে শুধু দেখা।

৩ জুলাই [১৯৩২]

কৈশোরিকা

হে কৈশোরের প্রিয়া,
ভোরবেলাকার আলোক-আঁধার-লাগা
চলেছিলে তুমি আধঘুমো-আধজাগা
মোর জীবনের ঘন বনপথ দিয়া।
ছায়ায় ছায়ায় আমি ফিরিতাম একা,
দেখি দেখি করি শুধু হয়েছিল দেখা
চকিত পায়ের চলার ইশারাখানি।

চুলের গন্ধে ফুলের গন্ধে মিলে
পিছে পিছে তব বাতাসে চিহ্ন দিলে
বাসনার রেখা টানি।

প্রভাত উঠিল ফুটি;
অরুণরাঙিমা দিগন্তে গেল ঘুচে,
শিশিরের কণা কুঁড়ি হতে গেল মুছে,
গাহিল কুঞ্জে কপোতকপোতী দুটি।
ছায়াবীথি হতে বাহিরে আসিলে ধীরে
ভরা জোয়ারের উচ্ছল নদীতীরে—
প্রাণকল্লোলে মুখর পল্লিবাটে।
আমি কহিলাম, "তোমাতে আমাতে চলো,
তরুণ রৌদ্র জলে করে ঝলোমলো—
নৌকা রয়েছে ঘাটে।"

স্রোতে চলে তরী ভাসি।
জীবনের-স্মৃতি-সঞ্চয়-করা তরী
দিনরজনীর সুখে দুখে গেছে ভরি,
আছে গানে-গাঁথা কত কান্না ও হাসি।
পেলব প্রাণের প্রথম পশরা নিয়ে
সে তরণী-'পরে পা ফেলেছ তুমি প্রিয়ে,
পাশাপাশি সেথা খেয়েছি ঢেউয়ের দোলা।
কখনো বা কথা কয়েছিলে কানে কানে,
কখনো বা মুখে ছলোছলো দুনয়ানে
চেয়েছিলে ভাষা-ভোলা।

বাতাস লাগিল পালে;
ভাঁটার বেলায় তরী যবে যায় থেমে
অচেনা পুলিনে কবে গিয়েছিলে নেমে
মলিন ছায়ায় ধূসর গোধূলিকালে।

আবার রচিলে নব কুহকের পালা,
সাজালে ডালিতে নূতন বরণমালা,
নয়নে আনিলে নূতন চেনার হাসি।
কোন্ সাগরের অধীর জোয়ার লেগে
আবার নদীর নাড়ী নেচে ওঠে বেগে,
আবার চলিনু ভাসি।

তুমি ভেসে চল সাথে।
চিররূপখানি নবরূপে আসে প্রাণে;
নানা পরশের মাধুরীর মাঝখানে
তোমারি সে হাত মিলেছে আমার হাতে।
গোপন গভীর রহস্তে অবিরত
ঋতুতে ঋতুতে সুরের ফসল কত
ফলায়ে তুলেছ বিস্মিত মোর গীতে।
শুকতারা তব কয়েছিল যে কথারে
সন্ধ্যার আলো সোনায় গলায় তারে
সকরুণ পূরবীতে।

চিনি, নাহি চিনি তবু।
প্রতি দিবসের সংসারমাঝে তুমি
স্পর্শ করিয়া আছ যে-মর্তভূমি
তার আবরণ খসে পড়ে যদি কভু,
তখন তোমার মুরতি দীপ্তিমতী
প্রকাশ করিবে আপন অমরাবতী
সকল কালের বিরহের মহাকাশে।
তাহারি বেদনা কত কীর্তির স্তূপে
উচ্ছ্রিত হয়ে ওঠে অসংখ্য রূপে
পুরুষের ইতিহাসে।

হে কৈশোরের প্রিয়া,
এ জনমে তুমি নব জীবনের দ্বারে

কোন্ পার হতে এনে দিলে মোর পারে
অনাদি যুগের চিরমানবীর হিয়া।
দেশের কালের অতীত যে মহাদূর,
তোমার কণ্ঠে শুনেছি তাহারি সুর—
বাক্য সেথায় নত হয় পরাভবে।
অসীমের দূতী, ভরে এনেছিলে ডালা
পরাতে আমারে নন্দন-ফুলমালা
অপূর্ব গৌরবে।

৯ মাঘ ১৩৪০

সত্যরূপ

অন্ধকারে জানি না কে এল কোথা হতে—
মনে হল তুমি;
রাতের লতা-বিতান তারার আলোতে
উঠিল কুসুমি।
সাক্ষ্য আর কিছু নাই, আছে শুধু একটি স্বাক্ষর,
প্রভাত-আলোক তলে মগ্ন হলে প্রসুপ্ত প্রহর
পড়িব তখন।
ততক্ষণ পূর্ণ করি থাক্ মোর নিস্তব্ধ অন্তর
তোমার স্মরণ।

কত লোক ভিড় করে জীবনের পথে
উড়াইয়া ধূলি;
কত যে পতাকা ওড়ে কত রাজপথে
আকাশ আকুলি।
প্রহরে প্রহরে যাত্রী ধেয়ে চলে খেয়ার উদ্দেশে—
অতিথি আশ্রয় মাগে শ্রান্তদেহে মোর দ্বারে এসে
দিন-অবসানে,
দূরের কাহিনী বলে, তার পরে রজনীর শেষে
যায় দূরপানে।

মায়ার আবর্ত রচে আসায় যাওয়ায়
চঞ্চল সংসারে।
ছায়ার তরঙ্গ যেন ধাইছে হাওয়ায়
ভাঁটায় জোয়ারে।
উর্ধ্বকণ্ঠে ডাকে কেহ, স্তব্ধ কেহ ঘরে এসে বসে—
প্রত্যহের জানাশোনা, তবু তারা দিবসে দিবসে
পরিচয়হীন।
এই কুজ্ঝটিকালোকে লুপ্ত হয়ে স্বপ্নের তামসে
কাটে জীর্ণ দিন।

সন্ধ্যার নৈঃশব্দ্য উঠে সহসা শিহরি;
না কহিয়া কথা
কখন যে আস কাছে, দাও ছিন্ন করি
মোর অস্পষ্টতা।
তখন বুঝিতে পারি, আছি আমি একান্তই আছি
মহাকালদেবতার অন্তরের অতি কাছাকাছি
মহেন্দ্রমন্দিরে;
জাগ্রত জীবনলক্ষ্মী পরায় আপন মাল্যগাছি
উন্নমিত শিরে।

তখনি বুঝিতে পারি, বিশ্বের মহিমা
উচ্ছ্বসিয়া উঠি
রাখিল সত্তায় মোর রচি নিজ সীমা
আপন দেউটি
সৃষ্টির প্রাঙ্গণতলে চেতনার দীপশ্রেণী-মাঝে
সে দীপে জ্বলেছে শিখা উৎসবের ঘোষণার কাজে;
সেই তো বাখানে,
অনির্বচনীয় প্রেম অন্তহীন বিস্ময়ে বিরাজে
দেহে মনে প্রাণে।

৫ শ্রাবণ ১৩৪০

প্রত্যর্পণ

কবির রচনা তব মন্দিরে
জ্বালে ছন্দের ধূপ।
সে মায়াবাষ্পে আকার লভিল
তোমার ভাবের রূপ।
লভিলে হে নারী, তনুর অতীত তনু,
পরশ-এড়ানো সে যেন ইন্দ্রধনু
নানা রশ্মিতে রাঙা ;
পেলে রসধারা অমর বাণীর
অমৃতপাত্র-ভাঙা।

কামনা তোমার বহে নিয়ে যায়
কামনার পরপারে।
সুদূরে তোমার আসন রচিয়া
ফাঁকি দেয় আপনারে।
ধ্যানপ্রতিমারে স্বপ্নরেখায় আঁকে,
অপরূপ অবগুণ্ঠনে তারে ঢাকে,
অজানা করিয়া তোলে।
আবরণ তার ঘুচাতে না চায়
স্বপ্ন ভাঙিবে ব'লে।

ঐ যে মুরতি হয়েছে ভূষিত
মুগ্ধ মনের দানে,
আমার প্রাণের নিশ্বাসতাপে
ভরিয়া উঠিল প্রাণে ;
এর মাঝে এল কিসের শক্তি সে যে,
দাঁড়াল সমুখে হোমহুতাশন-তেজে,
পেল সে পরশমণি।
নয়নে তাহার জাগিল কেমনে
জাদুমন্ত্রের ধ্বনি।

যে দান পেয়েছে তার বেশি দান
ফিরে দিলে সে কবিরে।
গোপনে জাগালে সুরের বেদনা
বাজে বীণা যে গভীরে।
প্রিয়-হাত হতে পর পুষ্পের হার,
দয়িতের গলে কর তুমি আরবার
দানের মাল্যদান।
নিজেরে সঁপিলে প্রিয়ের মূল্যে
করিয়া মূল্যবান।

১৯৩২ ?

আদিতম

কে আমার ভাষাহীন অন্তরে
চিত্তের মেঘলোকে সন্তরে,
বক্ষের কাছে থাকে তবুও সে রয় দূরে,
থাকে অশ্রুত সুরে।
ভাবি বসে, গাব আমি তারি গান—
চুপ করে থাকি সারা দিনমান,
অকথিত আবেগের ব্যথা সই।
মন বলে, কথা কই কথা কই!

চঞ্চল শোণিতে যে
সত্তার ক্রন্দন ধ্বনিতেছে
অর্থ কী জানি তাহা,
আদিতম আদিমের বাণী তাহা।
ভেদ করি ঝঞ্ঝার আলোড়ন
ছেদ করি বাষ্পের আবরণ
চুম্বিল ধরাতল যে আলোক,
স্বর্গের সে বালক

কানে তার বলে গেছে যে কথাটি
তারি স্মৃতি আজো ধরণীর মাটি
দিকে দিকে বিকাশিছে ঘাসে ঘাসে—
তারি পানে চেয়ে চেয়ে
সেই সুর কানে আসে।

প্রাণের প্রথমতম কম্পন
অশথের মজ্জায় করিতেছে বিচরণ,
তারি সেই ঝংকার ধ্বনিহীন—
আকাশের বক্ষেতে কেঁপে ওঠে নিশিদিন ;
মোর শিরা তন্তুতে বাজে তাই ;
সুগভীর চেতনার মাঝে তাই
নর্তন জেগে ওঠে অদৃশ্য ভঙ্গীতে
অরণ্যমর্মর-সংগীতে।

ওই তরু ওই লতা ওরা সবে
মুখরিত কুসুমে ও পল্লবে—
সেই মহাবাণীময় গহন মৌনতলে
নির্বাক স্থলে জলে
শুনি আদি ওংকার,
শুনি মূক গুঞ্জন অগোচর চেতনার।
ধরণীর ধূলি হতে তারার সীমার কাছে
কথাহারা যে ভুবন ব্যাপিয়াছে
তার মাঝে নিই স্থান,
চেয়ে-থাকা দুই চোখে বাজে ধ্বনিহীন গান।

৮ বৈশাখ ১৩৪১

[শান্তিনিকেতন]

পাঠিকা

বহিছে হাওয়া উতল বেগে,
আকাশ ঢাকা সজল মেঘে,
ধ্বনিয়া উঠে কেকা।
করি নি কাজ, পরি নি বেশ,
গিয়েছে বেলা বাঁধি নি কেশ,
পড়ি তোমারি লেখা।

ওগো আমারি কবি,
তোমারে আমি জানি নে কভু,
তোমার বাণী আঁকিছে তবু
অলস মনে অজানা তব ছবি।
বাদলছায়া হায় গো মরি,
বেদনা দিয়ে তুলেছ ভরি,
নয়ন মম করিছে ছলোছলো।
হিয়ার মাঝে কী কথা তুমি বল!

কোথায় কবে আছিলে জাগি,
বিরহ তব কাহার লাগি,
কোন্ সে তব প্রিয়া!
ইন্দ্র তুমি, তোমার শচী—
জানি তাহারে তুলেছ রচি
আপন মায়া দিয়া।

ওগো আমার কবি,
ছন্দ বুকে যতই বাজে
ততই সেই মুরতিমাঝে
জানি না কেন আমারে আমি লভি।

নারীহৃদয়-যমুনাতীরে
চিরদিনের সোহাগিনীরে
চিরকালের শুনাও স্তবগান।
বিনা কারণে দুলিয়া ওঠে প্রাণ।

নাই বা তার শুনিনু নাম,
কভু তাহারে না দেখিলাম,
কিসের ক্ষতি তায়।
প্রিয়ারে তব যে নাহি জানে
জানে সে তারে তোমার গানে
আপন চেতনায়।

ওগো আমার কবি,
সুদূর তব ফাগুন-রাতি
রক্তে মোর উঠিল মাতি,
চিত্তে মোর উঠিছে পল্লবি।
জেনেছ যারে তাহারো মাঝে
অজানা যেই সে-ই বিরাজে,
আমি যে সেই অজানাদের দলে।
তোমার মালা এল আমার গলে।

বৃষ্টিভেজা যে ফুলহার
শ্রাবণসাঁঝে তব প্রিয়ার
বেণীটি ছিল ঘেরি,
গন্ধ তারি স্বপ্নসম
লাগিছে মনে, যেন সে মম
বিগত জনমেরি।

ওগো আমার কবি,
জান না, তুমি মৃদু কী তানে
আমারি এই লতাবিতানে
শুনায়েছিলে করুণ ভৈরবী।

ঘটে নি যাহা আজ কপালে
ঘটেছে যেন সে কোন্ কালে,
আপনভোলা যেন তোমার গীতি
বহিছে তারি গভীর বিস্মৃতি।

বৈশাখ ১৩৪১
[শান্তিনিকেতন]

ছায়াছবি

একটি দিন পড়িছে মনে মোর।
উষার নিল মুকুট কাড়ি
শ্রাবণ ঘনঘোর ;
বাদলবেলা বাজায়ে দিল তুরী,
প্রহরগুলি ঢাকিয়া মুখ
করিল আলো চুরি।
সকাল হতে অবিশ্রামে
ধারাপতনশব্দ নামে,
পরদা দিল টানি,
সংসারের নানা ধ্বনিরে
করিল একখানি।

প্রবল বরিষনে
পাংশু হল দিকের মুখ,
আকাশ যেন নিরুৎসুক,
নদীপারের নীলিমা ছায়
পাণ্ডু আবরণে।
কর্মদিন হারাল সীমা,
হারাল পরিমাণ,
বিনা কারণে ব্যথিত হিয়া
উঠিল গাহি গুঞ্জরিয়া

বিদ্যাপতি-রচিত সেই
ভরা-বাদর গান।

ছিলাম এই কুলায়ে বসি
আপন মন-গড়া,
হঠাৎ মনে পড়িল তবে
এখনি বুঝি সময় হবে,
ছাত্রীটিরে দিতে হবে যে পড়া।
থামায়ে গান চাহিনু পশ্চাতে ;
ভীরু সে মেয়ে কখন এসে
নীরব পায়ে দুয়ার ঘেঁষে
দাঁড়িয়ে আছে খাতা ও বহি হাতে।

করিনু পাঠ শুরু।
কপোল তার ঈষৎ রাঙা,
গলাটি আজ কেমন ভাঙা,
বক্ষ বুঝি করিছে দুরু দুরু।
কেবলি যায় ভুলে,
অন্যমনে রয়েছে যেন
বইয়ের পাতা খুলে।
কহিনু তারে, আজকে পড়া থাক।
সে শুধু মুখে তুলিয়া আঁখি
চাহিল নির্বাক্‌।

তুচ্ছ এই ঘটনাটুকু,
ভাবি নি ফিরে তারে।
গিয়েছে তার ছায়ামুরতি
কালের খেয়াপারে।
স্তব্ধ আজি বাদলবেলা,
নদীতে নাহি ঢেউ,

অলসমনে বসিয়া আছি
ঘরেতে নেই কেউ।
হঠাৎ দেখি চিত্তপটে চেয়ে,
সেই যে ভীরু মেয়ে
মনের কোণে কখন গেছে আঁকি
অবর্ষিত অশ্রুভরা
ডাগর দুটি আঁখি।

৪ আষাঢ় ১৩৪২
[চন্দননগর]

নিমন্ত্রণ

মনে পড়ে, যেন এককালে লিখিতাম
চিঠিতে তোমারে প্রেয়সী অথবা প্রিয়ে।
একালের দিনে শুধু বুঝি লেখে নাম—
থাক সে কথায়, লিখি বিনা নাম দিয়ে।
তুমি দাবি কর কবিতা আমার কাছে
মিল মিলাইয়া দুরূহ ছন্দে লেখা,
আমার কাব্য তোমার দুয়ারে যাচে
নম্র চোখের কম্প্র কাজলরেখা।
সহজ ভাষায় কথাটা বলাই শ্রেয়—
যে-কোনো ছুতায় চলে এসো মোর ডাকে,
সময় ফুরোলে আবার ফিরিয়া যেয়ো,
বোসো মুখোমুখি যদি অবসর থাকে।
গৌরবরন তোমার চরণমূলে
ফলসাবরন শাড়িটি ঘেরিবে ভালো ;
বসনপ্রান্ত সীমন্তে রেখো তুলে,
কপোলপ্রান্তে সরু পাড় ঘন কালো।

একগুছি চুল বায়ু-উচ্ছ্বাসে কাঁপা
ললাটের ধারে থাকে যেন অশাসনে।
ডাহিন অলকে একটি দোলনচাঁপা
দুলিয়া উঠুক গ্রীবাভঙ্গীর সনে।
বৈকালে গাঁথা যূথীমুকুলের মালা
কণ্ঠের তাপে ফুটিয়া উঠিবে সাঁঝে;
দূরে থাকিতেই গোপনগন্ধ-ঢালা
সুখসংবাদ মেলিবে হৃদয়মাঝে।
এই সুযোগেতে একটুকু দিই খোঁটা—
আমারি দেওয়া সে ছোট্ট চুনির দুল,
রক্তে জমানো যেন অশ্রুর ফোঁটা,
কতদিন সেটা পরিতে করেছ ভুল।

আরেকটা কথা বলে রাখি এইখানে,
কাব্যে সে কথা হবে না মানানসই,
সুর দিয়ে সেটা গাহিব না কোনো গানে—
তুচ্ছ শোনাবে, তবু সে তুচ্ছ কই।
একালে চলে না সোনার প্রদীপ আনা,
সোনার বীণাও নহে আয়ত্তগত।
বেতের ডালায় রেশমি-রুমাল-টানা
অরুণবরন আম এনো গোটাকত।
গন্ধ জাতীয় ভোজ্যও কিছু দিয়ো,
পদ্যে তাদের মিল খুঁজে পাওয়া দায়।
তা হোক, তবুও লেখকের তারা প্রিয়;
জেনো, বাসনার সেরা বাসা রসনায়।
ওই দেখো, ওটা আধুনিকতার ভূত
মুখেতে জোগায় স্থূলতার জয়ভাষা;
জানি, অমরার পথহারা কোনো দূত
জঠরগুহায় নাহি করে যাওয়া-আসা।

তথাপি পষ্ট বলিতে নাহি তো দোষ
যে কথা কবির গভীর মনের কথা—
উদরবিভাগে দৈহিক পরিতোষ
সঙ্গী জোটায় মানসিক মধুরতা।
শোভন হাতের সন্দেশ, পানতোয়া,
মাছমাংসের পোলাও ইত্যাদিও
যবে দেখা দেয় সেবামাধুর্যে-ছোঁওয়া
তখন সে হয় কী অনির্বচনীয়!
বুঝি অনুমানে, চোখে কৌতুক ঝলে;
ভাবিছ বসিয়া সহাস-ওষ্ঠাধরা,
এ সমস্তই কবিতার কৌশলে
মৃদুসংকেতে মোটা ফরমাশ করা।
আচ্ছা, না-হয় ইঙ্গিত শুনে হেসো;
বরদানে, দেবী, না-হয় হইবে বাম;
খালি হাতে যদি আস তবে তাই এসো,
সে দুটি হাতেরও কিছু কম নহে দাম!

সেই কথা ভালো, তুমি চলে এসো একা,
বাতাসে তোমার আভাস যেন গো থাকে;
স্তব্ধ প্রহরে দুজনে বিজনে দেখা,
সন্ধ্যাতারাটি শিরীষডালের ফাঁকে।
তার পরে যদি ফিরে যাও ধীরে ধীরে
ভুলে ফেলে যেয়ো তোমার যূথীর মালা;
ইমন বাজিবে বক্ষের শিরে শিরে,
তার পরে হবে কাব্য লেখার পালা।
যত লিখে যাই ততই ভাবনা আসে,
লেফাফার 'পরে কার নাম দিতে হবে;
মনে মনে ভাবি গভীর দীর্ঘশ্বাসে,
কোন্ দূর যুগে তারিখ ইহার কবে।

মনে ছবি আসে—ঝিকমিকি বেলা হল,
বাগানের ঘাটে গা ধুয়েছ তাড়াতাড়ি ;
কচি মুখখানি, বয়স তখন ষোলো ;
তনু দেহখানি ঘেরিয়াছে ডুরে শাড়ি।
কুঙ্কুমফোঁটা ভুরুসংগমে কিবা,
শ্বেতকরবীর গুচ্ছ কর্ণমূলে ;
পিছন হইতে দেখিনু কোমল গ্রীবা
লোভন হয়েছে রেশমচিকন চুলে।
তাম্রথালায় গোড়ে মালাখানি গেঁথে
সিক্ত রুমালে যত্নে রেখেছ ঢাকি ;
ছায়া-হেলা ছাদে মাদুর দিয়েছ পেতে—
কার কথা ভেবে বসে আছ জানি না কি !
আজি এই চিঠি লিখিছে তো সেই কবি ;
গোধূলির ছায়া ঘনায় বিজন ঘরে,
দেয়ালে ঝুলিছে সেদিনের ছায়াছবি—
শব্দটি নেই, ঘড়ি টিক্‌টিক্ করে।
ওই তো তোমার হিসাবের ছেঁড়া পাতা,
দেরাজের কোণে পড়ে আছে আধুলিটি।
কতদিন হল গিয়েছ, ভাবিব না তা,
শুধু রচি বসে নিমন্ত্রণের চিঠি।
মনে আসে, তুমি পুব-জানালার ধারে
পশমের গুটি কোলে নিয়ে আছ বসে ;
উৎসুক চোখে বুঝি আশা কর কারে,
আলগা আঁচল মাটিতে পড়েছে খসে।
অর্ধেক ছাদে রৌদ্র নেমেছে বেঁকে,
বাকি অর্ধেক ছায়াখানি দিয়ে ছাওয়া ;
পাঁচিলের গায়ে চীনের টবের থেকে
চামেলি ফুলের গন্ধ আনিছে হাওয়া।
এ চিঠির নেই জবাব দেবার দায়,
আপাতত এটা দেরাজে দিলেম রেখে।

পার যদি এসো শব্দবিহীন পায়,
চোখ টিপে ধোরো হঠাৎ পিছন থেকে।
আকাশে চুলের গন্ধটি দিয়ো পাতি,
এনো সচকিত কাঁকনের রিনিরিনি,
আনিয়ো মধুর স্বপ্নসঘন রাতি,
আনিয়ো গভীর আলস্যঘন দিন।
তোমাতে আমাতে মিলিত নিবিড় একা—
স্থির আনন্দ, মৌন মাধুরী ধারা,
মুগ্ধ প্রহর ভরিয়া তোমারে দেখা,
তব করতল মোর করতলে হারা।

১৪ জুন ১৯৩৫
চন্দননগর

ছুটির লেখা

এ লেখা মোর শূন্যদ্বীপের সৈকততীর,
তাকিয়ে থাকে দৃষ্টি-অতীত পারের পানে।
উদ্দেশহীন জোয়ার-ভাঁটায় অস্থির নীর
শামুক ঝিনুক যা-খুশি তাই ভাসিয়ে আনে
এ লেখা নয় বিরাট সভার শ্রোতার লাগি,
রিক্ত ঘরে একলা এ যে দিন কাটাবার ;
আটপহুরে কাপড়টা তার ধুলায় দাগি,
বড়ো ঘরের নেমন্তন্নে নয় পাঠাবার।
বয়ঃসন্ধিকালের যেন বালিকাটি,
ভাব্‌নাগুলো উড়ো-উড়ো আপনাভোলা।
অযতনের সঙ্গী তাহার ধুলোমাটি,
বাহির-পানে পথের দিকে দুয়ার খোলা।
আলস্যে তার পা ছড়ানো মেঝের উপর,
ললাটে তার রুক্ষ কেশের অবহেলা।

নাইকো খেয়াল কখন সকাল পেরোয় দুপুর
　　রেশমি ডানায় যায় চলে তার হালকা বেলা।
চিনতে যদি চাও তাহারে এসো তবে,
　　দ্বারের ফাঁকে দাঁড়িয়ে থেকো আমার পিছু।
শুধাও যদি প্রশ্ন কোনো তাকিয়ে রবে
　　বোকার মতন— বলার কথা নেই-যে কিছু।
ধুলোয় লোটে রাঙাপাড়ের আঁচলখানা,
　　দুই চোখে তার নীল আকাশের সুদূর ছুটি;
কানে কানে কে কথা কয় যায় না জানা,
　　মুখের 'পরে কে রাখে তার নয়নদুটি।
মর্মরিত শ্যামল বনের কাঁপন থেকে
　　চমকে নামে আলোর কণা আলগা চুলে;
তাকিয়ে দেখে নদীর রেখা চলছে বেঁকে—
　　দোয়েল-ডাকা ঝাউয়ের শাখা উঠছে দুলে।
সম্মুখে তার বাগান-কোণায় কামিনী ফুল
　　আনন্দিত অপব্যয়ে পাপড়ি ছড়ায়।
বেড়ার ধারে বেগনিগুচ্ছে ফুল্ল জারুল
　　দখিন-হাওয়ার সোহাগেতে শাখা নড়ায়।
তরুণ রৌদ্রে তপ্ত মাটির মৃদুশ্বাসে
　　তুলসীঝোপের গন্ধটুকু ঢুকছে ঘরে।
খামখেয়ালি একটা ভ্রমর আশে-পাশে
　　গুঞ্জরিয়া যায় উড়ে কোন্ বনান্তরে।
পাঠশালা সে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এড়ায়,
　　শেখার মতো কোনো কিছুই হয় নি শেখা;
আলোছায়ায় ছন্দ তাহার খেলিয়ে বেড়ায়
　　আলুথালু অবকাশের অবুঝ লেখা।
সবুজ সোনা নীলের মায়া ঘিরল তাকে;
　　শুকনো ঘাসের গন্ধ আসে জানলা ঘুরে;
পাতার শব্দে, জলের শব্দে, পাখির ডাকে
　　প্রহরটি তার আঁকাজোকা নানান সুরে।

সব নিয়ে যে দেখল তারে পায় সে দেখা
বিশ্বমাঝে ধুলার 'পরে অলজ্জিত—
নইলে সে তো মেঠো পথে নীরব একা
শিথিলবেশে অনাদরে অসজ্জিত।

৬ জুন ১৯৩৫
চন্দননগর

নাট্যশেষ

১

দূর অতীতের পানে পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলাম;
হেরিতেছি যাত্রী দলে দলে। জানি সবাকার নাম,
চিনি সকলেরে। আজ বুঝিয়াছি, পশ্চিম-আলোতে
ছায়া ওরা। নটরূপে এসেছে নেপথ্যলোক হতে
দেহ-ছদ্মসাজে; সংসারের ছায়ানাট্য অন্তহীন,
সেথায় আপন পাঠ আবৃত্তি করিয়া রাত্রিদিন
কাটাইল; সূত্রধার অদৃষ্টের আভাসে আদেশে
চালাইল নিজ নিজ পালা, কভু কেঁদে কভু হেসে
নানা ভঙ্গী নানা ভাবে। শেষে অভিনয় হলে সারা,
দেহবেশ ফেলে দিয়ে নেপথ্যে অদৃশ্যে হল হারা।

যে খেলা খেলিতে এল হয়তো কোথাও তার আছে
নাট্যগত অর্থ কোনোরূপ, বিশ্বমহাকবি-কাছে
প্রকাশিত। নটনটী রঙ্গসাজে ছিল যতক্ষণ
সত্য বলে জেনেছিল প্রত্যহের হাসি ও ক্রন্দন,
উত্থানপতন বেদনার। অবশেষে যবনিকা
নেমে গেল; নিবে গেল একে একে প্রদীপের শিখা;
ম্লান হল অঙ্গরাগ; বিচিত্র চাঞ্চল্য গেল থেমে;
যে নিস্তব্ধ অন্ধকারে রঙ্গমঞ্চ হতে গেল নেমে

স্তুতি নিন্দা সেথায় সমান, ভেদহীন মন্দ ভালো,
দুঃখসুখভঙ্গী অর্থহীন, তুল্য অন্ধকার আলো,
লুপ্ত লজ্জাভয়ের ব্যঞ্জনা। যুদ্ধে উদ্ধারিয়া সীতা
পরক্ষণে প্রিয়হস্ত রচিতে বসিল তার চিতা;
সে পালার অবসানে নিঃশেষে হয়েছে নিরর্থক
সে দুঃসহ দুঃখদাহ— শুধু তারে কবির নাটক
কাব্যডোরে বাঁধিয়াছে, শুধু তারে ঘোষিতেছে গান,
শিল্পের কলায় শুধু রচে তাহা আনন্দের দান।

২

জনশূন্য ভাঙাঘাটে আজি বৃদ্ধ বটচ্ছায়াতলে
গোধূলির শেষ আলো আষাঢ়ে ধূসর নদীজলে
মগ্ন হল। ওপারের লোকালয় মরীচিকাসম
চক্ষে ভাসে। একা বসে দেখিতেছি মনে মনে, মম
দূর আপনার ছবি নাট্যের প্রথম অঙ্কভাগে
কালের লীলায়। সেদিনের সদ্য-জাগা চক্ষে জাগে
অস্পষ্ট কী প্রত্যাশার অরুণিম প্রথম উন্মেষ;
সম্মুখে সে চলেছিল, না জানিয়া শেষের উদ্দেশ,
নেপথ্যের প্রেরণায়। জানা না-জানার মধ্যসেতু
নিত্য পার হতেছিল কিছু তার না বুঝিয়া হেতু।
অকস্মাৎ পথমাঝে কে তারে ভেটিল একদিন,
দুই অজানার মাঝে দেশকাল হইল বিলীন
সীমাহীন নিমেষেই; পরিব্যাপ্ত হল জানাশোনা
জীবনের দিগন্ত পারায়ে। ছায়ায়-আলোয়-বোনা
আতপ্ত ফাল্গুনদিনে মর্মরিত চাঞ্চল্যের স্রোতে
কুঞ্জপথে মেলিল সে স্ফুরিত অঞ্চলতল হতে
কনকচাঁপার আভা। গন্ধে শিহরিয়া গেল হাওয়া
শিথিল কেশের স্পর্শে। দুজনে করিল আসাযাওয়া
অজানা অধীরতায়।

সহসা রাত্রে সে গেল চলি
যে রাত্রি হয় না কভু ভোর। অদৃষ্টের যে অঞ্জলি
এনেছিল সুধা, নিল ফিরে। সেই যুগ হল গত
চৈত্রশেষে অরণ্যের মাধবীর সুগন্ধের মতো।
তখন সেদিন ছিল সবচেয়ে সত্য এ ভুবনে,
সমস্ত বিশ্বের যন্ত্র বাঁধিত সে আপন বেদনে
আনন্দ ও বিষাদের সুরে। সেই সুখ দুঃখ তার
জোনাকির খেলা মাত্র, যারা সীমাহীন অন্ধকার
পূর্ণ করে চুমকির কাজে বিঁধে আলোকের সূচি;
সে রাত্রি অক্ষত থাকে, বিনা চিহ্নে আলো যায় ঘুচি।
সে ভাঙা যুগের 'পরে কবিতার অরণ্যলতায়
ফুটিছে ছন্দের ফুল, দোলে তারা গানের কথায়।
সেদিন আজিকে ছবি হৃদয়ের অজন্তাগুহাতে
অন্ধকার ভিত্তিপটে; ঐক্য তার বিশ্বশিল্প-সাথে।

[আষাঢ় ১৩৪২
চন্দননগর]

বিহ্বলতা

অপরিচিতের দেখা বিকশিত ফুলের উৎসবে
পল্লবের সমারোহে।
মনে পড়ে, সেই আর কবে
দেখেছিনু শুধু ক্ষণকাল।
খর সূর্যকরতাপে
নিষ্ঠুর বৈশাখবেলা ধরণীরে রুদ্র অভিশাপে
বন্দী করেছিল তৃষ্ণাজালে।
শুষ্ক তরু,
ম্লান বন,
অবসন্ন পিককণ্ঠ,
শীর্ণচ্ছায়া অরণ্য নির্জন।

সেই তীব্র আলোকেতে দেখিলাম দীপ্ত মূর্তি তার—
জ্বালাময় আঁখি,
বর্ণচ্ছটাহীন বেশ,
নির্বিকার
মুখচ্ছবি।
বিরলপল্লব স্তব্ধ বনবীথি-'পরে
নিঃশব্দ মধ্যাহ্নবেলা দূর হতে মুক্তকণ্ঠ স্বরে
করেছি বন্দনা।
জানি, সে না-শোনা সুর গেছে ভেসে
শূন্যতলে।
সেও ভালো, তবু সে তো তাহারি উদ্দেশে
একদা অর্পিয়াছিনু স্পষ্টবাণী, সত্য নমস্কার,
অসংকোচে পূজা-অর্ঘ্য
—সেই জানি গৌরব আমার।
আজ ক্ষুব্ধ ফাল্গুনের কলস্বরে মত্ততাহিল্লোলে
মদির আকাশ।
আজি মোর এ অশান্ত চিত্ত দোলে
উদ্‌ভ্রান্ত পবনবেগে।
আজ তারে যে বিহ্বল চোখে
হেরিলাম, সে যে হায় পুষ্পরেণু-আবিল আলোকে
মাধুর্যের ইন্দ্রজালে রাঙা।
পাই নাই শান্ত অবসর
চিনিবারে, চেনাবারে।
কোনো কথা বলা হল না যে,
মোহমুগ্ধ ব্যর্থতার সে বেদনা চিত্তে মোর বাজে।

ফাল্গুন ১৩৩৮ ?

শ্যামলা

হে শ্যামলা, চিত্তের গহনে আছ চুপ,
মুখে তব সুদূরের রূপ
পড়িয়াছে ধরা
সন্ধ্যার আকাশসম সকল-চঞ্চল চিন্তা-হরা।
আঁকা দেখি দৃষ্টিতে তোমার
সমুদ্রের পরপার,
গোধূলিপ্রান্তরপ্রান্তে ঘন কালো রেখাখানি ;
অধরে তোমার বীণাপাণি
রেখে দিয়ে বীণা তাঁর
নিশীথের রাগিণীতে দিতেছেন নিঃশব্দ ঝংকার।
অগীত সে সুর
মনে এনে দেয় কোন্ হিমাদ্রির শিখরে সুদূর
হিমঘন তপস্যায় স্তব্ধলীন
নির্ঝরের ধ্যান বাণীহীন।
জলভারনত মেঘে
তমালবনের 'পরে আছে লেগে
সকরুণ ছায়া সুগম্ভীর—
তোমার ললাট-'পরে সেই মায়া রহিয়াছে স্থির।

ক্লান্ত-অশ্রু রাধিকার বিরহের স্মৃতির গভীরে
স্বপ্নময়ী যে যমুনা বহে ধীরে
শান্তধারা
কলশব্দহারা
তাহারি বিষাদ কেন
অতল গাম্ভীর্য ল'য়ে তোমার মাঝারে হেরি যেন।

শ্রাবণে অপরাজিতা, চেয়ে দেখি তারে
আঁখি ডুবে যায় একেবারে—

ছোটো পত্রপুটে তার নীলিমা রয়েছে ভরপুর,
দিগন্তের শৈলতটে অরণ্যের সুর
বাজে তাহে, সেই দূর আকাশের বাণী
এনেছে আমার চিত্তে তোমার নির্বাক্ মুখখানি।

২৯ জুলাই ১৯৩২

পোড়োবাড়ি

সেদিন তোমার মোহ লেগে
আনন্দের বেদনায় চিত্ত ছিল জেগে;
প্রতিদিন প্রভাতে পড়িত মনে,
তুমি আছ এ ভুবনে।
পুকুরে বাঁধানো ঘাটে স্নিগ্ধ অশথের মূলে
বসে আছ এলোচুলে,
আলোছায়া পড়েছে আঁচলে তব—
প্রতিদিন মোর কাছে এ যেন সংবাদ অভিনব।
তোমার শয়নঘরে ফুলদানি,
সকালে দিতাম আনি
নাগকেশরের পুষ্পভার
অলক্ষ্যে তোমার।
প্রতিদিন দেখা হত, তবু কোনো ছলে
চিঠি রেখে আসিতাম বালিশের তলে।
সেদিনের আকাশেতে তোমার নয়ন দুটি কালো
আলোরে করিত আরো আলো।
সেদিনের বাতাসেতে তোমার সুগন্ধ কেশপাশ
নন্দনের আনিত নিশ্বাস।

অনেক বৎসর গেল, দিন গণি নহে তার মাপ—
তারে জীর্ণ করিয়াছে ব্যর্থতার তীব্র পরিতাপ।

নির্মম ভাগ্যের হাতে লেখা
বঞ্চনার কালো কালো রেখা
বিকৃত স্মৃতির পটে নিরর্থক করেছে ছবিরে।
আলোহীন গানহীন হৃদয়ের গহন গভীরে
সেদিনের কথাগুলি
দুর্লক্ষণ বাদুড়ের মতো আছে ঝুলি।

আজ যদি তুমি এস কোথা তব ঠাঁই,
সে তুমি তো নাই।
আজিকার দিন
তোমারে এড়ায়ে যাবে পরিচয়হীন।
তোমার সেকাল আজি ভাঙাচোরা যেন পোড়োবাড়ি
লক্ষ্মী যারে গেছে ছাড়ি;
ভূতে-পাওয়া ঘর
ভিত জুড়ে আছে যেথা দেহহীন ডর।
আগাছায় পথ রুদ্ধ, আঙিনায় মনসার ঝোপ,
তুলসীর মঞ্চখানি হয়ে গেছে লোপ।
বিনাশের গন্ধ ওঠে, দুর্গ্রহের শাপ,
দুঃস্বপ্নের নিঃশব্দ বিলাপ।

৩ অগস্ট ১৯৩২

মৌন

কেন চুপ করে আছি, কেন কথা নাই,
শুধাইছ তাই।
কথা দিয়ে ডেকে আনি যারে
দেবতারে,
বাহির দ্বারের কাছে এসে
ফিরে যায় হেসে।

মৌনের বিলপ্ত শক্তিপাশে
ধরা দিয়ে আপনি যে আসে
আসে পরিপূর্ণতায়
হৃদয়ের গভীর গুহায়।

অধীর আহ্বানে রবাহূত
প্রসাদের মূল্য হয় চ্যুত।
স্বর্গ হতে বর, সেও আনে অসম্মান
ভিক্ষার সমান।
ক্ষুব্ধ বাণী যবে শান্ত হয়ে আসে
দৈববাণী নামে সেই অবকাশে।
নীরব আমার পূজা তাই,
স্তবগান নাই;
আর্দ্র স্বরে ঊর্ধ্বপানে চেয়ে নাহি ডাকে,
স্তব্ধ হয়ে থাকে।

হিমাদ্রিশিখরে নিত্যনীরবতা তার
ব্যাপ্ত করি রহে চারি ধার;
নির্লিপ্ত সে সুদূরতা বাক্যহীন বিশাল আহ্বান
আকাশে আকাশে দেয় টান,
মেঘপুঞ্জ কোথা থেকে
অবারিত অভিষেকে
অজস্র সহস্রধারে
পুণ্য করে তারে।
না-কওয়ার না-চাওয়ার সেই সাধনায় হয়ে লীন
সার্থক শান্তিতে যাক দিন।

১৮।১।৩৪

ভুল

সহসা তুমি করেছ ভুল গানে,
বেধেছে লয় তানে,
স্খলিত পদে হয়েছে তাল ভাঙা—
শরমে তাই মলিন মুখ নত,
দাঁড়ালে থতমতো,
তাপিত দুটি কপোল হল রাঙা।
নয়নকোণ করিছে ছলোছলো
শুধালে তবু কথা কিছু না বল,
অধর থরো থরো,
আবেগভরে বুকের 'পরে মালাটি চেপে ধর।

অবমানিতা, জান না তুমি নিজে
মাধুরী এল কী যে
বেদনাভরা ত্রুটির মাঝখানে।
নিখুঁত শোভা নিরতিশয় তেজে
অপরাজেয় সে যে
পূর্ণ নিজে নিজেরই সম্মানে।
একটুখানি দোষের ফাঁক দিয়ে
হৃদয়ে আজি নিয়ে এসেছ, প্রিয়ে,
করুণ পরিচয়—
শরৎপ্রাতে আলোর সাথে ছায়ার পরিণয়।

তৃষিত হয়ে ওইটুকুরই লাগি
আছিল মন জাগি,
বুঝিতে তাহা পারি নি এতদিন।
গৌরবের গিরিশিখর-'পরে
ছিলে যে সমাদরে
তুষারসম শুভ্র সুকঠিন।

নামিলে নিয়ে অশ্রুজলধারা
ধূসর ম্লান আপন-মান-হারা
আমারো ক্ষমা চাহি—
তখনি জানি আমারি তুমি, নাহি গো দ্বিধা নাহি।

এখন আমি পেয়েছি অধিকার
তোমার বেদনার
অংশ নিতে আমার বেদনায়।
আজিকে সব ব্যাঘাত টুটে
জীবনে মোর উঠিল ফুটে
শরম তব পরম করুণায়।
অকুণ্ঠিত দিনের আলো
টেনেছে মুখে ঘোমটা কালো ;
আমার সাধনাতে
এল তোমার প্রদোষবেলা সাঁঝের তারা হাতে।

৬ বৈশাখ ১৩৪১

ব্যর্থ মিলন

বুঝিলাম, এ মিলন ঝড়ের মিলন,
কাছে এনে দূরে দিল ঠেলি।
ক্ষুব্ধ মন
যতই ধরিতে চায়, বিরুদ্ধ আঘাতে
তোমারে হারায় হতাশ্বাস।
তব হাতে
দাক্ষিণ্য যে নাই, শুধু শিথিল পরশে
করিছে কৃপণ কৃপা। কর্তব্যের বশে
যে-দান করিলে তার মূল্য অপহরি
লুকায়ে রাখিলে কোথা,
আমি খুঁজে মরি

পাই নে নাগাল। শরতের মেঘ তুমি
ছায়া মাত্র দিয়ে ভেসে যাও
—মরুভূমি
শূন্য-পানে চেয়ে থাকে, পিপাসা তাহার
সমস্ত হৃদয় ব্যাপি করে হাহাকার।

ভয় করিয়ো না মোরে।
এ করুণাকণা
রেখো মনে— ভুল করে মনে করিয়ো না
দস্যু আমি, লোভেতে নিষ্ঠুর।
জেনো মোরে
প্রেমের তাপস।
সুকঠোর ব্রত ধ'রে
করিব সাধনা,
আশাহীন ক্ষোভহীন
বহ্নিতপ্ত ধ্যানাসনে রব রাত্রিদিন।
ছাড়িয়া দিলাম হাত।
যদি কভু হয়
তপস্যা সার্থক, তবে পাইব হৃদয়।
না-ও যদি ঘটে, তবে আশাচঞ্চলতা
দাহিয়া হইবে শান্ত। সেও সফলতা।

১৩৩৮?

অপরাধিনী

অপরাধ যদি ক'রে থাক
কেন ঢাক
মিথ্যা মোর কাছে।
শাসনের দণ্ড সে কি এই হাতে আছে

যে হাতে তোমার কণ্ঠে পরায়েছি বরণের হার।
শাস্তি এ আমার।
ভাগ্যেরে করেছি জয়
এ বিশ্বাসে মনে মনে ছিলাম নির্ভয়।
আলস্যে কি ভেবেছিনু তাই—
সাধনার আয়োজনে আর মোর প্রয়োজন নাই।

রুষ্ট ভাগ্য ভেঙে দিল অহংকার।
যা ঘটিল তাই আমি করিনু স্বীকার।
ক্ষমা করো মোরে।
আপনারে রেখেছিনু কারাগার ক'রে
তোমারে ঘিরিয়া,
পীড়িয়াছি ফিরিয়া ফিরিয়া
দিনে রাতে।
কখনো অজ্ঞাতে
যেখানে বেদনা তব সেখানে দিয়েছি মোর ভার।
বিষম দুঃসহ বোঝা এ ভালোবাসার
সেখানে দিয়েছি চেপে ভালোবাসা নেই যেখানেতে।
বসেছি আসন পেতে
যেখানে স্থানের টানাটানি।

হায় জানি,
কী ব্যথা কঠোর!
এ প্রেমের কারাগারে মোর
যন্ত্রণায় জাগি
সুরঙ্গ কেটেছ যদি পরিত্রাণ লাগি
দোষ দিব কারে।
শান্তি তো পেয়েছ তুমি এতদিন সেই রুদ্ধদ্বারে।
সে শাস্তির হোক অবসান।
আজ হতে মোর শাস্তি শুরু হবে, বিধির বিধান।

[২ ফাল্গুন ১৩৩৮]

বিচ্ছেদ

তোমাদের দুজনের মাঝে আছে কল্পনার বাধা ;
হল্‌ না সহজ পথ বাঁধা
স্বপ্নের গহনে।
মনে মনে
ডাক দাও পরস্পরে সঙ্গহীন কত দিনে রাতে ;
তবু ঘটিল না কোন্‌ সামান্য ব্যাঘাতে
মুখোমুখি দেখা।
দুজনে রহিলে একা
কাছে কাছে থেকে ;
তুচ্ছ, তবু অলঙ্ঘ্য সে দোঁহারে রহিল যাহা ঢেকে।

বিচ্ছেদের অবকাশ হতে
বায়ুস্রোতে
ভেসে আসে মধুমঞ্জরীর গন্ধশ্বাস ;
চৈত্রের আকাশ
রৌদ্রে দেয় বৈরাগীর বিভাসের তান ;
আসে দোয়েলের গান ;
দিগন্তরে পথিকের বাঁশি যায় শোনা।
উভয়ের আনাগোনা
আভাসেতে দেখা যায় ক্ষণে ক্ষণে
চকিত নয়নে।
পদধ্বনি শোনা যায়
শুষ্কপত্রপরিকীর্ণ বনবীথিকায়।

তোমাদের ভাগ্য আছে চেয়ে অনুক্ষণ
কখন দোঁহার মাঝে একজন
উঠিবে সাহস ক'রে—
বলিবে, 'যে মায়াডোরে

বন্দী হয়ে দূরে ছিনু এতদিন
ছিন্ন হোক, সে তো সত্যহীন।
লও বক্ষে দুবাহু বাড়ায়ে ;
সম্মুখে যাহারে চাও পিছনেই আছে-সে দাঁড়ায়ে।'

১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০
দার্জিলিং

বিদ্রোহী

পর্বতের অন্ত প্রান্তে ঝর্ঝরিয়া ঝরে রাত্রিদিন
নির্ঝরিণী ;
এ মরুপ্রান্তের তৃষ্ণা হল শান্তিহীন
পলাতকা মাধুর্যের কলস্বরে।
শুধু ওই ধ্বনি
তৃষিত চিত্তের যেন বিদ্যুতে খচিত বজ্রমণি
বেদনায় দোলে বক্ষে।
কৌতুকচ্ছুরিত হাস্য তার
মর্মের শিরায় মোর তীব্রবেগে করিছে বিস্তার
জ্বালাময় নৃত্যস্রোত।
ওই ধ্বনি আমার স্বপন
চঞ্চলিতে চাহে তার বঞ্চনায়।
মূঢ়ের মতন
ভুলিব না তাহে কভু।
জানিব মানিব নিঃসংশয়
দুর্লভেরে মিলিবে না ;
করিব কঠোর বীর্যে জয়
ব্যর্থ দুরাশারে মোর।
চিরজন্ম দিব অভিশাপ
দয়ারিক্ত দুর্গমেরে।

আশাহারা বিচ্ছেদের তাপ ;
দুঃসহ দাহনে তার দীপ্ত করি হানিব বিদ্রোহ
অকিঞ্চন অদৃষ্টেরে।
পুষিব না ভিক্ষুকের মোহ।

৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২
চন্দননগর

আসন্ন রাতি

এল আহ্বান, ওরে তুই ত্বরা কর্‌।
শীতের সন্ধ্যা সাজায় বাসরঘর।
কালপুরুষের বিপুল মহাঙ্গন
বিছালো আলিম্পন,
অন্তরে তোর আসন্ন রাতি
জাগায় শঙ্খরব—
অস্তশৈলপাদমূলে তার
প্রসারিল অনুভব।

বিরহশয়ন বিছানো হেথায়,
কে যেন আসিল চোখে দেখা নাহি যায়।
অতীতদিনের বনের স্মরণ আনে
ম্রিয়মাণ মৃদু সৌরভটুকু প্রাণে।
গাঁথা হয়েছিল যে মাধবীহার
মধুপূর্ণিমারাতে
কণ্ঠ জড়ালো পরশবিহীন
নির্বাক্ বেদনাতে।

মিলনদিনের প্রদীপের মালা
পুলকিত রাতে যত হয়েছিল জ্বালা,
আজি আঁধারের অতল গহনে হায়া
স্বপ্ন রচিছে তারা।

ফাল্গুনবনমর্মর-সনে
মিলিত যে কানাকানি
আজি হৃদয়ের স্পন্দনে কাঁপে
তাহার স্তব্ধ বাণী।

কী নামে ডাকিব, কোন্ কথা কব,
হে বধূ, ধেয়ানে আঁকিব কী ছবি তব।
চিরজীবনের পুঞ্জিত সুখদুখ
কেন আজি উৎসুক!
উৎসবহীন কৃষ্ণপক্ষে
আমার বক্ষোমাঝে
শুনিতেছে কে সে কার উদ্দেশে
সাহানায় বাঁশি বাজে।

আজ বুঝি তোর ঘরে, ওরে মন,
গত বসন্তরজনীর আগমন।
বিপরীত পথে উত্তর বায়ু বেয়ে
এল সে তোমারে চেয়ে।
অবগুণ্ঠিত নিরলংকার
তাহার মূর্তিখানি
হৃদয়ে ছোঁয়ালো শেষ পরশের
তুষারশীতল পাণি।

৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪

গীতচ্ছবি

তুমি যবে গান কর অলৌকিক গীতমূর্তি তব
ছাড়ি তব অঙ্গসীমা আমার অন্তরে অভিনব
ধরে রূপ, যজ্ঞ হতে উঠে আসে যেন যাজ্ঞসেনী—
ললাটে সন্ধ্যার তারা, পিঠে জ্যোতির্বিজড়িত বেণী,

চোখে নন্দনের স্বপ্ন, অধরের কথাহীন ভাষা
মিলায় গগনে মৌন নীলিমায়, কী সুধাপিপাসা
অমরার মরীচিকা রচে তব তনুদেহ ঘিরে।
অনাদিবীণায় বাজে যে রাগিণী গভীরে গম্ভীরে
সৃষ্টিতে প্রস্ফুটি উঠে পুষ্পে পুষ্পে, তারায় তারায়,
উত্তুঙ্গ পর্বতশৃঙ্গে, নির্ঝরের দুর্দম ধারায়,
জন্মমরণের দোলে ছন্দ দেয় হাসিক্রন্দনের,
সে অনাদি সুর নামে তব সুরে, দেহবন্ধনের
পাশ দেয় মুক্ত করি, বাধাহীন চৈতন্য এ মম
নিঃশব্দে প্রবেশ করে নিখিলের সে অন্তরতম
প্রাণের রহস্যলোকে— যেখানে বিদ্যুৎ-স্পন্দছায়া
করিছে রূপের খেলা, পরিতেছে ক্ষণিকের কায়া,
আবার ত্যজিয়া দেহ ধরিতেছে মানসী আকৃতি—
সেই তো কবির কাব্য, সেই তো তোমার কণ্ঠে গীতি।

৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২
চন্দননগর

ছবি

একলা বসে, হেরো, তোমার ছবি
এঁকেছি আজ বসন্তী রঙ দিয়া—
খোঁপার ফুলে একটি মধুলোভী
মৌমাছি ওই গুঞ্জরে বন্দিয়া।
সমুখ-পানে বালুতটের তলে
শীর্ণ নদী শান্ত ধারায় চলে,
বেণুচ্ছায়া তোমার চেলাঞ্চলে
উঠিছে স্পন্দিয়া।

মগ্ন তোমার স্নিগ্ধ নয়ন দুটি
ছায়ায় ছন্ন অরণ্য-অঙ্গনে

প্রজাপতির দল যেখানে জুটি
রঙ ছড়ালো প্রফুল্ল রঙ্গনে।
তপ্ত হাওয়ায় শিথিলমঞ্জরি
গোলকচাঁপা একটি দুটি করি
পায়ের কাছে পড়ছে ঝরি ঝরি
তোমারে নন্দিয়া।
ঘাটের ধারে কম্পিত ঝাউশাখে
দোয়েল দোলে সংগীতে চঞ্চলি—
আকাশ ঢালে পাতার ফাঁকে ফাঁকে
তোমার কোলে সুবর্ণ-অঞ্জলি।
বনের পথে কে যায় চলি দূরে,
বাঁশির ব্যথা পিছন-ফেরা সুরে
তোমায় ঘিরে হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে
ফিরিছে ক্রন্দিয়া।

১৭ বৈশাখ ১৩৩৮

প্রণতি

প্রণাম আমি পাঠানু গানে
উদয়গিরিশিখর-পানে
অস্তমহাসাগরতট হতে—
নবজীবনযাত্রাকালে
সেখান হতে লেগেছে ভালে
আশিসখানি অরুণ-আলোস্রোতে।
প্রথম সেই প্রভাত-দিনে
পড়েছি বাঁধা ধরার ঋণে,
কিছু কি তার দিয়েছি শোধ করি ?
চিররাতের তোরণে থেকে
বিদায়বাণী গেলেম রেখে
নানা রঙের বাষ্পলিপি ভরি।

বেসেছি ভালো এই ধরারে,
মুগ্ধ চোখে দেখেছি তারে
ফুলের দিনে দিয়েছি রচি গান ;
সে গানে মোর জড়ানো প্রীতি,
সে গানে মোর রহুক স্মৃতি,
আর যা আছে হউক অবসান।
রোদের বেলা ছায়ার বেলা
করেছি সুখদুখের খেলা,
সে খেলাঘর মিলাবে মায়াসম ;
অনেক তৃষা, অনেক ক্ষুধা,
তাহারি মাঝে পেয়েছি সুধা—
উদয়গিরি প্রণাম লহো মম।

বরষ আসে বরষশেষে,
প্রবাহে তারি যায় রে ভেসে
বাঁধিতে যারে চেয়েছি চিরতরে।
বারে বারেই ঋতুর ডালি
পূর্ণ হয়ে হয়েছে খালি
মমতাহীন সৃষ্টিলীলাভরে।
এ মোর দেহ-পেয়ালাখানা
উঠেছে ভরি কানায় কানা
রঙিন রসধারায় অনুপম।
একটুকুও দয়া না মানি
ফেলায়ে দেবে, জানি তা জানি,
উদয়গিরি তবুও নমোনম।

কখনো তার গিয়েছে ছিঁড়ে,
কখনো নানা সুরের ভিড়ে
রাগিণী মোর পড়েছে আধো চাপা।

ফাল্গুনের আমন্ত্রণে
জেগেছে কুঁড়ি গভীর বনে,
পড়েছে ঝরি চৈত্রবায়ে-কাঁপা।
অনেক দিনে অনেক দিয়ে
ভেঙেছে কত গড়িতে গিয়ে,
ভাঙন হল চরম প্রিয়তম;
সাজাতে পূজা করি নি ত্রুটি,
ব্যর্থ হলে নিলেম ছুটি—
উদয়গিরি, প্রণাম লহো মম।

[৭-১০ এপ্রিল ১৯৩৪]

উদাসীন

তোমারে ডাকিনু যবে কুঞ্জবনে
তখনো আমের বনে গন্ধ ছিল।
জানি না কী লাগি ছিলে অন্যমনে,
তোমার দুয়ার কেন বন্ধ ছিল।
একদিন শাখা ভরি এল ফলগুচ্ছ,
ভরা অঞ্জলি মোর করি গেলে তুচ্ছ,
পূর্ণতা-পানে আঁখি অন্ধ ছিল।

বৈশাখে অকরুণ দারুণ ঝড়ে
সোনার বরন ফল খসিয়া পড়ে।
কহিনু, 'ধুলায় লোটে মোর যত অর্ঘ্য,
তব করতলে যেন পায় তার স্বর্গ।'
হায় রে, তখনো মনে দ্বন্দ্ব ছিল।

তোমার সন্ধ্যা ছিল প্রদীপহীনা,
আঁধারে দুয়ারে তব বাজানু বীণা।

তারার আলোক-সাথে মিলি মোর চিত্ত
ঝংকৃত তারে তারে করেছিল নৃত্য,
তোমার হৃদয় নিস্পন্দ ছিল।

তন্দ্রাবিহীন নীড়ে ব্যাকুল পাখি
হারায়ে কাহারে বৃথা মরিল ডাকি।
প্রহর অতীত হল, কেটে গেল লগ্ন,
একা ঘরে তুমি ঔদাস্যে নিমগ্ন,
তখনো দিগঞ্চলে চন্দ্র ছিল।

কে বোঝে কাহার মন! অবোধ হিয়া
দিতে চেয়েছিল বাণী নিঃশেষিয়া।
আশা ছিল, কিছু বুঝি আছে অতিরিক্ত
অতীতের স্মৃতিখানি অশ্রুতে সিক্ত—
বুঝিবা নূপুরে কিছু ছন্দ ছিল।

উষার চরণতলে মলিন শশী
রজনীর হার হতে পড়িল খসি।
বীণার বিলাপ কিছু দিয়েছে কি সঙ্গ,
নিদ্রার তটতলে তুলেছে তরঙ্গ,
স্বপ্নেও কিছু কি আনন্দ ছিল।

৯ শ্রাবণ ১৩৪১
শান্তিনিকেতন

দানমহিমা

নির্ঝরিণী অকারণ অবারণ সুখে
নীরসেরে ঠেলা দিয়ে চলে তৃষিতের অভিমুখে—
নিত্য অফুরান
আপনারে করে দান।

সরোবর প্রশান্ত নিশ্চল—
বাহিরেতে নিস্তরঙ্গ, অন্তরেতে নিস্তব্ধ নিস্তল।
চির-অতিথির মতো মহাবট আছে তীরে;
ভূরিপায়ী মূল তার অদৃশ্য গভীরে
অনিঃশেষ রস করে পান,
অজস্র পল্লবে তার করে স্তবগান।

তোমারে তেমনি দেখি নির্বিকল
অপ্রমত্ত পূর্ণতায়, হে প্রেয়সী, আছ অচঞ্চল।
তুমি কর বরদান দেবীসম ধীর আবির্ভাবে
নিরাসক্ত দাক্ষিণ্যের গম্ভীর প্রভাবে।
তোমার সামীপ্য সেই
নিত্য চারি দিকে আকাশেই
প্রকাশিত আত্মমহিমায়
প্রশান্ত প্রভায়।
তুমি আছ কাছে,
সে আত্মবিস্মৃত কৃপা— চিত্ত তাহে পরিতৃপ্ত আছে।
ঐশ্বর্যরহস্য যাহা তোমাতে বিরাজে
একই কালে ধন সেই, দান সেই— ভেদ নেই মাঝে।

৪ অগস্ট ১৯৩২

ঈষৎ দয়া

চক্ষে তোমার কিছু বা করুণা ভাসে,
ওষ্ঠ তোমার কিছু কৌতুকে হাসে,
মৌনে তোমার কিছু লাগে মৃদু সুর।
আলো-আঁধারের বন্ধনে আমি বাঁধা,
আশানিরাশায় হৃদয়ে নিত্য ধাঁধা,
সঙ্গ যা পাই তারি মাঝে রহে দূর।

নির্মম হতে কুণ্ঠিত হও মনে ;
অনুকম্পার কিঞ্চিৎ কম্পনে
　　ক্ষণিকের তরে ছলকে কণিক সুধা।
ভাণ্ডার হতে কিছু এনে দাও খুঁজি,
অন্তরে তাহা ফিরাইয়া লও বুঝি,
　　বাহিরের ভোজে হৃদয়ে গুমরে ক্ষুধা।

ওগো মল্লিকা, তব ফাল্গুনরাতি
অজস্র দানে আপনি উঠে যে মাতি,
　　সে দাক্ষিণ্য দক্ষিণবায়ু-ভরে।
তার সম্পদ সারা অরণ্য ভরি—
গন্ধের ভারে মন্থর উত্তরী
　　কুঞ্জে কুঞ্জে লুণ্ঠিত ধূলি-'পরে।

উত্তরবায়ু আমি ভিক্ষুকসম
হিমনিশ্বাসে জানাই মিনতি মম
　　শুষ্ক শাখার বীথিকারে চঞ্চলি।
অকিঞ্চনের রোদনে ধেয়ান টুটে,
কৃপণ দয়ায় কচিৎ একটি ফুটে
　　অবগুণ্ঠিত অকাল পুষ্পকলি।

যত মনে ভাবি, রাখি তারে সঞ্চিয়া,
ছিঁড়িয়া কাড়িয়া লয় মোরে বঞ্চিয়া
　　প্রলয়প্রবাহে ঝ'রে-পড়া যত পাতা।
বিস্ময় লাগে আশাতীত সেই দানে,
ক্ষীণ সৌরভে ক্ষণগৌরব আনে—
　　বরণমালা হয় না তাহাতে গাঁথা।

১০।১।৩৪

ক্ষণিক

চৈত্রের রাতে যে মাধবীমঞ্জরী
ঝরে গেল, তারে কেন লও সাজি ভরি।
সে শুধিছে তার ধুলার চরম দেনা,
আজ বাদে কাল যাবে না তো তারে চেনা।
মরুপথে যেতে পিপাসার সম্বল
গাগরি হইতে চলকিয়া পড়ে জল,
সে জলে বালুতে ফল কি ফলাতে পার?
সে জলে কি তাপ মিটিবে কখনো কারো?
যাহা দেওয়া নহে, যাহা শুধু অপচয়,
তারে নিতে গেলে নেওয়া অনর্থ হয়।
ক্ষতির ধনেরে ক্ষয় হতে দেওয়া ভালো,
কুড়াতে কুড়াতে শুকায়ে সে হয় কালো।
হায় গো ভাগ্য, ক্ষণিক করুণাভরে
যে হাসি যে ভাষা ছড়ায়েছ অনাদরে,
বক্ষে তাহারে সঞ্চয় করে রাখি—
ধুলা ছাড়া তার কিছুই রয় না বাকি।
নিমেষে নিমেষে ফুরায় যাহার দিন
চিরকাল কেন বহিব তাহার ঋণ?
যাহা ভুলিবার তাহা নহে তুলিবার,
স্বপ্নের ফুলে কে গাঁথে গলার হার!
প্রতি পলকের নানা দেনাপাওনায়
চলতি মেঘের রঙ বুলাইয়া যায়
জীবনের স্রোতে; চলতরঙ্গতলে
ছায়ার লেখন আঁকিয়া মুছিয়া চলে
শিল্পের মায়া— নির্মম তার তুলি
আপনার ধন আপনি সে যায় ভুলি;
বিস্মৃতিপটে চিরবিচিত্র ছবি
লিখিয়া চলেছে ছায়া-আলোকের কবি।

হাসিকান্নার নিত্য ভাসান-খেলা
বহিয়া চলেছে বিধাতার অবহেলা।
নহে সে কৃপণ, রাখিতে যতন নাই,
খেলাপথে তার বিঘ্ন জমে না তাই।
মানো সেই লীলা, যাহা যায় যাহা আসে
পথ ছাড়ো তারে অকাতরে অনায়াসে।
আছে তবু নাই, তাই নাহি তার ভার;
ছেড়ে যেতে হবে, তাই তো মূল্য তার।
স্বর্গ হইতে যে সুধা নিত্য ঝরে
সে শুধু পথের, নহে সে ঘরের তরে।
তুমি ভরি লবে ক্ষণিকের অঞ্জলি,
স্রোতের প্রবাহ চিরদিন যাবে চলি।

২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

রূপকার

ওরা কি কিছু বোঝে
যাহারা আনাগোনার পথে
ফেরে কত কী খোঁজে?
হেলায় ওরা দেখিয়া যায় এসে বাহির দ্বারে;
জীবনপ্রতিমারে
জীবন দিয়ে গড়িছে গুণী, স্বপন দিয়ে নহে।
ওরা তো কথা কহে,
সে-সব কথা মূল্যবান জানি,
তবু সে নহে বাণী।

রাতের পরে কেটেছে দুখরাত,
দিনের পরে দিন,
দারুণ তাপে করেছে তনু ক্ষীণ।

স্বষ্টিকারী বজ্রপাণি যে বিধি নির্মম,
বহ্নিতুলিসম
কল্পনা সে দখিন হাতে যার,
সব-খোয়ানো দীক্ষা তারি নিঠুর সাধনার
নিয়েছে ও যে প্রাণে ;
নিজেরে ও কি বাঁচাতে কভু জানে ?

হায় রে রূপকার,
নাহয় কারো করো নি উপকার—
আপন দায়ে করেছ তুমি নিজেরে অবসান,
সে লাগি কভু চেয়ো না প্রতিদান।
পাঁজরভাঙা কঠিন বেদনার
অংশ নেবে শকতি হেন, বাসনা হেন কার !
বিধাতা যবে এসেছে দ্বারে গিয়েছে কর হানি,
জাগে নি তবু, শোনে নি ডাক যারা,
সে প্রেম তারা কেমনে দিবে আনি
যে প্রেম সবহারা—
করুণ চোখে যে প্রেম দেখে ভুল,
সকল ত্রুটি জানে,
তবু যে অনুকূল,
শ্রদ্ধা যার তবু না হার মানে।
কখনো যারা দেয় নি হাতে হাত,
মর্মমাঝে করে নি আঁখিপাত,
প্রবল প্রেরণায়
দিল না আপনায়,
তাহারা কহে কথা,
ছড়ায় পথে বাধা ও বিফলতা,
করে না ক্ষমা কভু—
তুমি তাদের ক্ষমা করিয়ো তবু।

হায় গো রূপকার,
ভরিয়া দিয়ো জীবন-উপহার।
চুকিয়ে দিয়ো তোমার দেয়,
রিক্ত হাতে চলিয়া যেয়ো,
কোয়ো না দাবি ফলের অধিকার।
জানিয়ো মনে চিরজীবন সহায়হীন কাজে
একটি সাথি আছেন হিয়ামাঝে;
তাপস তিনি, তিনিও সদা একা,
তাঁহার কাজ ধ্যানের রূপ বাহিরে মেলে দেখা।

১০ এপ্রিল ১৯৩৪

মেঘমালা

আসে অবগুণ্ঠিতা প্রভাতের অরুণ দুকূলে
শৈলতটমূলে,
আত্মদান অর্ঘ্য আনে পায়।
তপস্বীর ধ্যান ভেঙে যায়,
গিরিরাজ কঠোরতা যায় ভুলি,
চরণের প্রান্ত হতে বক্ষে লয় তুলি
সজল তরুণ মেঘমালা।
কল্যাণে ভরিয়া উঠে মিলনের পালা।
অচলে চঞ্চলে লীলা,
সুকঠিন শিলা
মত্ত হয় রসে।
উদার দাক্ষিণ্য তার বিগলিত নির্ঝরে বরষে,
গায় কলোচ্ছল গান।
সে দাক্ষিণ্য গোপনের দান
এ মেঘমালারই।

এ বর্ষণ তারি
পর্বতের বাণী হয়ে উঠে জেগে—
নৃত্যবন্যাবেগে
বাধাবিঘ্ন চূর্ণ ক'রে
তরঙ্গের নৃত্যসাথে যুক্ত হয় অনন্ত সাগরে।
নির্মমের তপস্যা টুটিয়া
চলিল ছুটিয়া
দেশে দেশে প্রাণের প্রবাহ,
জয়ের উৎসাহ—
শ্যামলের মঙ্গল-উৎসবে
আকাশে বাজিল বীণা অনাহত রবে।
লঘুসুকুমার স্পর্শ ধীরে ধীরে
রুদ্রসন্ন্যাসীর স্তব্ধ নিরুদ্ধ শক্তিরে
দিল ছাড়া ; সৌন্দর্যের বীর্যবলে
স্বর্গেরে করিয়া জয় মুক্ত করি দিল ধরাতলে।

৫ অগস্ট ১৯৩৫
শান্তিনিকেতন

প্রাণের ডাক

সুদূর আকাশে ওড়ে চিল,
উড়ে ফেরে কাক,
বারে বারে ভোরের কোকিল
ঘন দেয় ডাক।
জলাশয় কোন্ গ্রামপারে,
বক উড়ে যায় তারি ধারে,
ডাকাডাকি করে শালিখেরা।
প্রয়োজন থাক্ নাই থাক্
যে যাহারে খুশি দেয় ডাক,
যেথাসেথা করে চলাফেরা।

উছল প্রাণের চঞ্চলতা
　　　আপনারে নিয়ে।
অস্তিত্বের আনন্দ ও ব্যথা
　　　উঠিছে ফেনিয়ে।
জোয়ার লেগেছে জাগরণে—
কলোল্লাস তাই অকারণে,
　　　মুখরতা তাই দিকে দিকে।
ঘাসে ঘাসে পাতায় পাতায়
কী মদিরা গোপনে মাতায়,
　　　অধীরা করেছে ধরণীকে।

নিভৃতে পৃথক কোরো নাকো
　　　তুমি আপনারে।
ভাবনার বেড়া বেঁধে রাখ
　　　কেন চারি ধারে।
প্রাণের উল্লাস অহেতুক
রক্তে তব হোক-না উৎসুক,
　　　খুলে রাখো অনিমেষ চোখ;
ফেলো জাল চারি দিক ঘিরে,
যাহা পাও টেনে লও তীরে
　　　ঝিনুক শামুক যাই হোক।

হয়তো বা কোনো কাজ নাই,
　　　ওঠো তবু ওঠো;
বৃথা হোক তবুও বৃথাই
　　　পথ-পানে ছোটো।
মাটির হৃদয়খানি ব্যেপে
প্রাণের কাঁপন ওঠে কেঁপে,
　　　কেবল পরশ তার লহো

আজি এই চৈত্রের প্রভাতে
আছ তুমি সকলের সাথে,
এ কথাটি মনে প্রাণে কহো।

৭ এপ্রিল ১৯৩৪
জোড়াসাঁকো

দেবদারু

দেবদারু, তুমি মহাবাণী
দিয়েছ মৌনের বক্ষে প্রাণমন্ত্র আনি—
যে প্রাণ নিস্তব্ধ ছিল মরুদুর্গতলে
প্রস্তরশৃঙ্খলে
কোটি কোটি যুগযুগান্তরে।
যে প্রথম যুগে তুমি দেখা দিলে নির্জন প্রান্তরে,
রুদ্ধ অগ্নিতেজের উচ্ছ্বাস
উদ্‌ঘাটন করি দিল ভবিষ্যের ইতিহাস—
জীবের কঠিন দ্বন্দ্ব অন্তহীন,
দুঃখে সুখে যুদ্ধ রাত্রিদিন,
জ্বেলে ক্ষোভহুতাশন
অন্তরবিবরে যাহা সর্পসম করে আন্দোলন
শিখার রসনা
অশান্ত বাসনা।
স্নিগ্ধ স্তব্ধ রূপে
শ্যামল শান্তিতে তুমি চুপে চুপে
ধরণীর রঙ্গভূমে রচি দিলে কী ভূমিকা—
তারি মাঝে প্রাণীর হৃদয়রক্তে লিখা
মহানাট্য জীবনমৃত্যুর,
কঠিন নিষ্ঠুর
দুর্গম পথের দুঃসাহস।

যে পতাকা ঊর্ধ্ব-পানে তুলেছিলে নিরলস,
বলো কে জানিত, তাহা নিরন্তর যুদ্ধের পতাকা,
সৌম্যকান্তি-দিয়ে-ঢাকা!
কে জানিত, আজ আমি এ-জন্মের জীবন মন্থিয়া
যে বাণী উদ্ধার করি চলেছি গ্রন্থিয়া
দিনে দিনে আমার আয়ুতে
সে যুগের বসন্তবায়ুতে
প্রথম নীরব মন্ত্র তারি
ভাষাহারা মর্মরেতে দিয়েছ বিস্তারি
তুমি, বনস্পতি,
মোর জ্যোতিবন্দনায় জন্মপূর্ব প্রথম প্রণতি!

২৬ চৈত্র ১৩৩৯

কবি

এতদিনে বুঝিলাম, এ হৃদয় মরু না,
ঋতুপতি তার প্রতি আজো করে করুণা।
মাঘ মাসে শুরু হল অনুকূল করদান,
অন্তরে কোন্ মায়ামন্তরে বরদান।
ফাল্গুনে কুসুমিতা কী মাধুরী তরুণা,
পলাশবীথিকা কার অনুরাগে অরুণা।

নীরবে করবী যবে আশা দিল হতাশে
ভুলেও তোলে নি মোর বয়সের কথা সে।
ওই দেখো অশোকের শ্যামঘন আঙিনায়
কৃপণতা কিছু নাই কুসুমের রাঙিমায়।
সৌরভগরবিনী তারামণি লতা সে
আমার ললাট-'পরে কেন অবনতা সে।

চম্পকতরু মোরে প্রিয়সখা জানে যে,
গন্ধের ইঙ্গিতে কাছে তাই টানে যে।
মধুকরবন্দিত নন্দিত সহকার
মুকুলিত নতশাখে মুখে চাহে কহো কার।
ছায়াতলে মোর সাথে কথা কানে কানে যে,
দোয়েল মিলায় তান সে আমারি গানে যে।

পিকরবে সাড়া যবে দেয় পিকবনিতা
কবির ভাষায় সে যে চায় তারি ভণিতা।
বোবা দক্ষিণ-হাওয়া ফেরে হেথাসেথা হায়,
আমি না রহিলে, বলো, কথা দেবে কে তাহায়
পুষ্পচয়িনী বধূ কিংকিণীকণিতা,
অকথিতা বাণী তার কার সুরে ধ্বনিতা।

৮ কার্তিক ১৩৩৮
[দার্জিলিং]

ছন্দোমাধুরী

পাষাণে-বাঁধা কঠোর পথ
চলেছে তাহে কালের রথ,
ঘুরিছে তার মমতাহীন চাকা
বিরোধ উঠে ঘর্ঘরিয়া,
বাতাস উঠে জর্জরিয়া
তৃষ্ণাভরা তপ্তবালু-ঢাকা।
নিঠুর লোভ জগৎ ব্যেপে
দুর্বলেরে মারিছে চেপে,
মথিয়া তুলে হিংসাহলাহল।
অর্থহীন কিসের তরে
এ কাড়াকাড়ি ধুলার 'পরে
লজ্জাহীন বেসুর কোলাহল!

হতাশ হয়ে যেদিকে চাহি
কোথাও কোনো উপায় নাহি,
মানুষরূপে দাঁড়ায় বিভীষিকা।
করুণাহীন দারুণ ঝড়ে
দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে
অন্যায়ের প্রলয়ানলশিখা।

সহসা দেখি, সুন্দর হে,
কে দূতী তব বারতা বহে
ব্যাঘাত-মাঝে অকালে অস্থানে।
ছুটিয়া আসে গহন হতে
আত্মহারা উছল স্রোতে
রসের ধারা মরুভূমির পানে।
ছন্দভাঙা হাটের মাঝে
তরল তালে নূপুর বাজে,
বাতাসে যেন আকাশবাণী ফুটে।
কর্কশেরে নৃত্য হানি
ছন্দোময়ী মূর্তিখানি
ঘূর্ণিবেগে আবর্তিয়া উঠে।
ভরিয়া ঘট অমৃত আনে,
সে কথা সে কি আপনি জানে—
এনেছে বহি সীমাহীনের ভাষা।
প্রবল এই মিথ্যারাশি,
তারেও ঠেলি উঠেছে হাসি
অবলারূপে চিরকালের আশা।

১১ চৈত্র ১৩৩৮

বিরোধ

এ সংসারে আছে বহু অপরাধ,
হেন অপবাদ
যখন ঘোষণা কর উচ্চ হতে উষ্ণ উচ্চারণে,
ভাবি মনে মনে,
ক্রোধের উত্তাপ তার
তোমার আপন অহংকার।
মন্দ ও ভালোর দ্বন্দ্ব, কে না জানে চিরকাল আছে
সৃষ্টির মর্মের কাছে।
না যদি সে রহে বিশ্ব ঘেরি
বিরুদ্ধ নির্ঘাতবেগে বাজে না শ্রেষ্ঠের জয়ভেরী।

বিধাতার 'পরে মিথ্যা আনিয়ো না অভিযোগ
মৃত্যুদুঃখ কর যবে ভোগ;
মনে জেনো, মৃত্যুর মূল্যেই করি ক্রয়
এ জীবনে দুর্মূল্য যা, অমর্ত যা, যা-কিছু অক্ষয়।
ভাঙনের আক্রমণ
সৃষ্টিকর্তা মানুষেরে আহ্বান করিছে অনুক্ষণ।
দুর্গমের বক্ষে থাকে দয়াহীন শ্রেয়,
রুদ্রতীর্থযাত্রীর পাথেয়।

বহুভাগ্য সেই
জন্মিয়াছি এমন বিশ্বেই
নির্দোষ যা নয়।
দুঃখ লজ্জা ভয়
ছিন্ন সূত্রে জটিল গ্রন্থিতে
রচনার সামঞ্জস্য পদে পদে রয়েছে খণ্ডিতে।

এই ত্রুটি দেখেছি যখন
শুনি নি কি সেই সঙ্গে বিশ্বব্যাপী গভীর ক্রন্দন
যুগে যুগে উচ্ছ্বসিতে থাকে ;
দেখি নি কি আর্তচিত্ত উদ্‌বোধিয়া রাখে
মানুষের ইতিবৃত্ত বেদনায় নিত্য আন্দোলনে।

উৎপীড়িত সেই জাগরণে
তন্দ্রাহীন যে-মহিমা যাত্রা করে রাত্রির আঁধারে
নমস্কার জানাই তাহারে।
নানা নামে আসিছে সে নানা অস্ত্র হাতে
কণ্টকিত অসম্মান অবাধে দলিয়া পদপাতে—
মরণেরে হানি—
প্রলয়ের পান্থ সেই, রক্তে মোর তাহারে আহ্বানি।

শ্রাবণ ১৩৪২
শান্তিনিকেতন

রাতের দান

পথের শেষে নিবিয়া আসে আলো,
গানের বেলা আজ ফুরালো
কী নিয়ে তবে কাটিবে তব সন্ধ্যা।

রাত্রি নহে বন্ধ্যা,
অন্ধকারে না-দেখা ফুল ফুটায়ে তোলে সে যে—
দিনের অতি নিঠুর খর তেজে
যে-ফুল ফুটিল না,
যাহার মধুকণা
বনভূমির প্রত্যাশাতে গোপনে ছিল বলে
গিয়েছে কবে আকাশপথে চলে
তোমার উপবনের মৌমাছি
কৃপণ বনবীথিকাতলে বৃথা করুণা যাচি।

আঁধারে-ফোটা সে-ফুল নহে ঘরেতে আনিবার,
সে-ফুলদলে গাঁথিবে না তো হার;
সে শুধু বুকে আনে
গন্ধে ঢাকা নিভৃত অনুমানে
দিনের ঘন জনতামাঝে হারানো আঁখিখানি,
মৌনে-ডোবা বাণী;
সে শুধু আনে পাই নি যারে তাহারি পরিচিতি,
ঘটে নি যাহা ব্যাকুল তারি স্মৃতি।

স্বপনে-ঘেরা সুদূর তারা নিশার ডালি-ভরা
দিয়েছে দেখা, দেয় নি তবু ধরা;
রাতের ফুল দূরের ধ্যানে তেমনি কথা কবে,
অনধিগত সার্থকতা বুঝাবে অনুভবে,
না-জানা সেই না-ছোঁওয়া সেই পথের শেষ দান
বিদায়বেলা ভরিবে তব প্রাণ।

১৯ আষাঢ় ১৩৪১

নব পরিচয়

জন্ম মোর বহি যবে
খেয়ার তরী এল ভবে
যে-আমি এল সে-তরীখানি বেয়ে,
ভাবিয়াছিনু বারে বারে
প্রথম হতে জানি তারে,
পরিচিত সে পুরানো সবচেয়ে।

হঠাৎ যবে হেনকালে
আবেশকুহেলিকাজালে
অরুণরেখা ছিদ্র দেয় আনি

আমার নব পরিচয়
　　চমকি উঠে মনোময়—
　　　　নূতন সে যে, নূতন তারে জানি।

বসন্তের ভরাস্রোতে
　　এসেছিল সে কোথা হতে
　　　　বহিয়া চিরযৌবনেরি ডালি।
অনন্তের হোমানলে
　　যে-যজ্ঞের শিখা জ্বলে,
　　　　সে-শিখা হতে এনেছে দীপ জ্বালি।

মিলিয়া যায় তারি সাথে
　　আশ্বিনেরি নবপ্রাতে
　　　　শিউলিবনে আলোটি যাহা পড়ে,
শব্দহীন কলরোলে
　　সে-নাচ তারি বুকে দোলে
　　　　যে-নাচ লাগে বৈশাখের ঝড়ে।

এ-সংসারে সব সীমা
　　ছাড়ায়ে গেছে যে-মহিমা
　　　　ব্যাপিয়া আছে অতীতে অনাগতে,
মরণ করি অভিভব
　　আছেন চির যে-মানব
　　　　নিজেরে দেখি সে-পথিকের পথে।

সংসারের ঢেউখেলা
　　সহজে করি অবহেলা
　　　　রাজহংস চলেছে যেন ভেসে—
সিক্ত নাহি করে তারে,
　　মুক্ত রাখে পাখাটারে,
　　　　ঊর্ধ্বশিরে পড়িছে আলো এসে।

আনন্দিত মন আজি
কী সংগীতে উঠে বাজি,
বিশ্ববীণা পেয়েছি যেন বুকে।
সকল লাভ, সব ক্ষতি,
তুচ্ছ আজি হল অতি
দুঃখ সুখ ভুলে যাওয়ার সুখে।

২৯ এপ্রিল ১৯৩৪
শান্তিনিকেতন

মরণমাতা

মরণমাতা, এই যে কচি প্রাণ,
বুকের এ যে দুলাল তব, তোমারি এ যে দান।
ধুলায় যবে নয়ন আঁধা,
জড়ের স্তূপে বিপুল বাধা,
তখন দেখি তোমারি কোলে নবীন শোভমান।

নবদিনের জাগরণের ধন,
গোপনে তারে লালন করে তিমির-আবরণ।
পরদাঢাকা তোমার রথে
বহিয়া আন প্রকাশপথে
নূতন আশা, নূতন ভাষা, নূতন আয়োজন।

চলে যে যায় চাহে না আর পিছু,
তোমারি হাতে সঁপিয়া যায় যা ছিল তার কিছু।
তাহাই লয়ে মন্ত্র পড়ি
নূতন যুগ তোল যে গড়ি—
নূতন ভালোমন্দ কত, নূতন উঁচুনিচু।

রোধিয়া পথ আমি না রব থামি;
প্রাণের স্রোত অবাধে চলে তোমারি অনুগামী।

নিখিলধারায় সে স্রোত বাহি
ভাঙিয়া সীমা চলিতে চাহি,
অচলরূপে রব না বাঁধা অবিচলিত আমি।

সহজে আমি মানিব অবসান,
ভাবী শিশুর জনমমাঝে নিজেরে দিব দান।
আজি রাতের যে-ফুলগুলি
জীবনে মম উঠিল দুলি
ঝরুক তারা কালি প্রাতের ফুলেরে দিতে প্রাণ।

৪ মাঘ ১৩৩৮

মাতা

কুয়াশার জাল
আবরি রেখেছে প্রাতঃকাল—
সেইমতো ছিনু আমি কতদিন
আত্মপরিচয়হীন।
অস্পষ্ট স্বপ্নের মতো করেছিনু অনুভব
কুমারীচাঞ্চল্যতলে আছিল যে সঞ্চিত গৌরব,
যে নিরুদ্ধ আলোকের মুক্তির আভাস,
অনাগত দেবতার আসন্ন আশ্বাস,
পুষ্পকোরকের বক্ষে অগোচর ফলের মতন।
তুই কোলে এলি যবে অমূল্য রতন,
অপূর্ব প্রভাতরবি,
আশার অতীত যেন প্রত্যাশার ছবি—
লভিলাম আপনার পূর্ণতারে
কাঙাল সংসারে।

প্রাণের রহস্য সুগভীর
অন্তরগুহায় ছিল স্থির,

সে আজ বাহির হল দেহ লয়ে উন্মুক্ত আলোতে
অন্ধকার হতে ;
সুদীর্ঘকালের পথে
চলিল সুদূর ভবিষ্যতে।
যে আনন্দ আজি মোর শিরায় শিরায় বহে
গৃহের কোণের তাহা নহে।
আমার হৃদয় আজি পান্থশালা,
প্রাঙ্গণে হয়েছে দীপ জ্বালা।
হেথা কারে ডেকে আনিলাম
অনাদিকালের পান্থ কিছুকাল করিবে বিশ্রাম।
এ বিশ্বের যাত্রী যারা চলে অসীমের পানে
আকাশে আকাশে নৃত্যগানে—
আমার শিশুর মুখে কলকোলাহলে
সে-যাত্রীর গান আমি শুনিব এ বক্ষতলে।
অতিশয় নিকটের, দূরের তবু এ—
আপন অন্তরে এল, আপনার নহে তো কভু এ।
বন্ধনে দিয়েছে ধরা শুধু ছিন্ন করিতে বন্ধন ;
আনন্দের ছন্দ টুটে উচ্ছ্বসিছে এ মোর ক্রন্দন।
জননীর
এ বেদনা, বিশ্বধরণীর
সে যে আপনার ধন—
না পারে রাখিতে নিজে, নিখিলেরে করে নিবেদন।

৮ অগস্ট ১৯৩২
বরানগর

কাঠবিড়ালি

কাঠবিড়ালির ছানাদুটি
আঁচলতলায় ঢাকা,
পায় সে কোমল করুণ হাতে
পরশ সুধামাখা।

এই দেখাটি দেখে এলেম
ক্ষণকালের মাঝে,
সেই থেকে আজ আমার মনে
সুরের মতো বাজে।
চাঁপাগাছের আড়াল থেকে
একলা সাঁঝের তারা
একটুখানি ক্ষীণ মাধুরী
জাগায় যেমনধারা,
তরল কলধ্বনি যেমন
বাজে জলের পাকে
গ্রামের ধারে বিজন ঘাটে
ছোটো নদীর বাঁকে,
লেবুর ডালে খুশি যেমন
প্রথম জেগে ওঠে
একটু যখন গন্ধ নিয়ে
একটি কুঁড়ি ফোটে,
দুপুর বেলায় পাখি যেমন—
দেখতে না পাই যাকে—
ঘন ছায়ায় সমস্ত দিন
মৃদুল সুরে ডাকে,
তেমনিতরো ঐ ছবিটির
মধুরসের কণা
ক্ষণকালের তরে আমায়
করেছে আনমনা।
দুঃখসুখের বোঝা নিয়ে
চলি আপন মনে,
তখন জীবন-পথের ধারে
গোপন কোণে কোণে
হঠাৎ দেখি চিরাভ্যাসের
অন্তরালের কাছে

লক্ষ্মীদেবীর মালার থেকে
ছিন্ন পড়ে আছে
ধূলির সঙ্গে মিলিয়ে গিয়ে
টুকরো রতন কত—
আজকে আমার এই দেখাটি
দেখি তারির মতো।

২২ আষাঢ় ১৩৪১
শান্তিনিকেতন

সাঁওতাল মেয়ে

যায় আসে সাঁওতাল মেয়ে
শিমুলগাছের তলে কাঁকরবিছানো পথ বেয়ে।
মোটা শাড়ি আঁট করে ঘিরে আছে তনু কালো দেহ।
বিধাতার ভোলা-মন কারিগর কেহ
কোন্ কালো পাখিটিরে গড়িতে গড়িতে
শ্রাবণের মেঘে ও তড়িতে
উপাদান খুঁজি
ওই নারী রচিয়াছে বুঝি।
ওর দুটি পাখা
ভিতরে অদৃশ্য আছে ঢাকা,
লঘু পায়ে মিলে গেছে চলা আর ওড়া।
নিটোল দু হাতে তার সাদারাঙা কয় জোড়া
গালা-ঢালা চুড়ি,
মাথায় মাটিতে-ভরা ঝুড়ি,
যাওয়া-আসা করে বারবার।
আঁচলের প্রান্ত তার
লাল রেখা দুলাইয়া
পলাশের স্পর্শমায়া আকাশেতে দেয় বুলাইয়া।

পউষের পালা হল শেষ,
উত্তর বাতাসে লাগে দক্ষিণের কচিৎ আবেশ।
হিমঝুরি শাখা-'পরে
চিকন চঞ্চল পাতা ঝলমল করে
শীতের রোদ্দুরে।
পাণ্ডুনীল আকাশেতে চিল উড়ে যায় বহুদূরে।
আমলকীতলা ছেয়ে খসে পড়ে ফল,
জোটে সেথা ছেলেদের দল।
আঁকাবাঁকা বনপথে আলোছায়া-গাঁথা,
অকস্মাৎ ঘুরে ঘুরে ওড়ে ঝরা পাতা
সচকিত হাওয়ার খেয়ালে।
ঝোপের আড়ালে
গলাফোলা গিরগিটি স্তব্ধ আছে ঘাসে।
ঝুড়ি নিয়ে বারবার সাঁওতাল মেয়ে যায় আসে।

আমার মাটির ঘরখানা
আরম্ভ হয়েছে গড়া, মজুর জুটেছে তার নানা।
ধীরে ধীরে ভিত তোলে গেঁথে
রৌদ্রে পিঠ পেতে।

মাঝে মাঝে
সুদূরে রেলের বাঁশি বাজে;
প্রহর চলিয়া যায়, বেলা পড়ে আসে,
ঢং ঢং ঘণ্টাধ্বনি জেগে ওঠে দিগন্ত-আকাশে।
আমি দেখি চেয়ে,
ঈষৎ সংকোচে ভাবি— এ কিশোরী মেয়ে
পল্লীকোণে যে ঘরের তরে
করিয়াছে প্রস্ফুটিত দেহে ও অন্তরে
নারীর সহজ শক্তি আত্মনিবেদনপরা
শুশ্রূষার স্নিগ্ধসুধা-ভরা,

আমি তারে লাগিয়েছি কেনা কাজে করিতে মজুরি—
মূল্যে যার অসম্মান সেই শক্তি করি চুরি
পয়সার দিয়ে সিঁধকাঠি।
সাঁওতাল মেয়ে ওই ঝুড়ি ভরে নিয়ে আসে মাটি।

৪ মাঘ ১৩৪১
শান্তিনিকেতন

মিলনযাত্রা

চন্দনধূপের গন্ধ ঠাকুরদালান হতে আসে,
শান-বাঁধা আঙিনার একপাশে
শিউলির তল
আচ্ছন্ন হতেছে অবিরল
ফুলের সর্বস্বনিবেদনে।
গৃহিণীর মৃতদেহ বাহির-প্রাঙ্গণে
আনিয়াছে বহি;
বিলাপের গুঞ্জরণ স্ফীত হয়ে ওঠে রহি রহি;
শরতের সোনালি প্রভাতে
যে আলোছায়াতে
খচিত হয়েছে ফুলবন
মৃতদেহ-আবরণ
আশ্বিনের সেই ছায়া-আলো
অসংকোচে সহজে সাজালো।

জয়লক্ষ্মী এ ঘরের বিধবা ঘরনী
আসন্ন মরণকালে দুহিতারে কহিলেন, 'মণি,
আগুনের সিংহদ্বারে চলেছি যে দেশে
যাব সেথা বিবাহের বেশে।
আমারে পরায়ে দিয়ো লাল চেলিখানি,
সীমন্তে সিঁদুর দিয়ো টানি।'

যে উজ্জ্বল সাজে
একদিন নববধূ এসেছিল এ গৃহের মাঝে,
পার হয়েছিল যে দুয়ার,
উত্তীর্ণ হল সে আরবার
সেই দ্বার সেই বেশে
ষাট বৎসরের শেষে।
এই দ্বার দিয়ে আর কভু
এ সংসারে ফিরিবে না সংসারের একচ্ছত্র প্রভু।
অক্ষুণ্ণ শাসনদণ্ড ত্রস্ত হল তার,
ধনে জনে আছিল যে অবারিত অধিকার
আজি তার অর্থ কী যে!
যে আসনে বসিত সে তারো চেয়ে মিথ্যা হল নিজে।
প্রিয়মিলনের মনোরথে
পরলোক-অভিসার-পথে
রমণীর এই চিরপ্রস্থানের ক্ষণে
পড়িছে আরেক দিন মনে।

আশ্বিনের শেষভাগে চলেছে পূজার আয়োজন;
দাসদাসী-কলকণ্ঠ-মুখরিত এ ভবন
উৎসবের উচ্ছল জোয়ারে
ক্ষুব্ধ চারি ধারে।
এ বাড়ির ছোটো ছেলে অনুকূল পড়ে এম. এ. ক্লাসে,
এসেছে পূজার অবকাশে।
শোভনদর্শন যুবা, সবচেয়ে প্রিয় জননীর,
বউদিদিমণ্ডলীর
প্রশ্রয়ভাজন।
পূজার উদ্‌যোগে মেশে তারো লাগি পূজার সাজন।

একদা বাড়ির কর্তা স্নেহভরে
পিতৃমাতৃহীন মেয়ে প্রমিতারে এনেছিল ঘরে

বন্ধুঘর হতে ; তখন বয়স তার ছিল ছয়,
এ বাড়িতে পেল সে আশ্রয়
আত্মীয়ের মতো।
অনুদাদা কতদিন তারে কত
কাঁদায়েছে অত্যাচারে।
বালক-রাজারে
যত সে জোগাত অর্ঘ্য ততই দৌরাত্ম্য যেত বেড়ে ;
সন্থবাঁধা খোঁপাখানি নেড়ে
হঠাৎ এলায়ে দিত চুল
অনুকূল ;
চুরি করে খাতা খুলে
পেন্সিলের দাগ দিয়ে লজ্জা দিত বানানের ভুলে।
গৃহিণী হাসিত দেখি দুজনের এ ছেলেমানুষি—
কভু রাগ, কভু খুশি,
কভু ঘোর অভিমানে পরস্পর এড়াইয়া চলা,
দীর্ঘকাল বন্ধ কথা বলা।

বহুদিন গেল তার পর।
প্রমির বয়স আজ আঠারো বছর।

হেনকালে একদা প্রভাতে
গৃহিণীর হাতে
চুপি চুপি ভৃত্য দিল আনি
রঙিন কাগজে লেখা পত্র একখানি।
অনুকূল লিখেছিল প্রমিতারে
বিবাহপ্রস্তাব করি তারে।
বলেছিল, 'মায়ের সম্মতি
অসম্ভব অতি।
জাতের অমিল নিয়ে এ সংসারে
ঠেকিবে আচারে।

কথা যদি দাও, প্রমি, চুপি চুপি তবে
মোদের মিলন হবে
আইনের বলে।'

দুর্বিষহ ক্রোধানলে
জয়লক্ষ্মী তীব্র উঠে দহি।
দেওয়ানকে দিল কহি,
'এ মুহূর্তে প্রমিতারে
দূর করি দাও একেবারে।'

ছুটিয়া মাতারে এসে বলে অনুকূল,
'করিয়ো না ভুল;
অপরাধ নাই প্রমিতার,
সম্মতি পাই নি আজো তার।
কর্ত্রী তুমি এ সংসারে;
তাই বলে অবিচারে
নিরাশ্রয় করি দিবে অনাথারে, হেন অধিকার
নাই নাই, নাইকো তোমার।
এই ঘরে ঠাঁই দিল পিতা ওরে,
তারি জোরে
হেথা ওর স্থান
তোমারি সমান।
বিনা অপরাধে
কী স্বত্বে তাড়াবে ওরে মিথ্যা পরিবাদে।'

ঈর্ষাবিদ্বেষের বহ্নি দিল মাতৃমন ছেয়ে—
ওইটুকু মেয়ে
আমার সোনার ছেলে পর করে,
আগুন লাগিয়ে দেয় কচি হাতে এ প্রাচীন ঘরে!
অপরাধ! অনুকূল ওরে ভালোবাসে এই ঢের,
সীমা নেই এ অপরাধের।

যত তর্ক কর তুমি, যে যুক্তি দাও-না
ইহার পাওনা
ওই মেয়েটাকে হবে মেটাতে সত্বর।
আমারি এ ঘর,
আমারি এ ধনজন
আমারি শাসন,
আর কারো নয়,
আজই আমি দেব তার পরিচয়।

প্রমিতা যাবার বেলা ঘরে দিয়ে দ্বার
খুলে দিল সব অলংকার।
পরিল মিলের শাড়ি মোটাসুতা-বোনা।
কানে ছিল সোনা,
কোনো জন্মদিনে তার
স্বর্গীয় কর্তার উপহার,
বাক্সে তুলি রাখিল শয্যায়।
ঘোমটায় সারামুখ ঢাকিল লজ্জায়।

যবে, হতে গেল পার
সদরের দ্বার,
কোথা হতে অকস্মাৎ
অনুকূল পাশে এসে ধরিল তাহার হাত
কৌতূহলী দাসদাসী সবলে ঠেলিয়া সবাকারে;
কহিল সে, ‘এই দ্বারে
এতদিনে মুক্ত হল এইবার
মিলনযাত্রার পথ প্রমিতার।
যে শুনিতে চাও শোনো,
মোরা দোঁহে ফিরিব না এ দ্বারে কখনো।’

৫ ভাদ্র ১৩৪২
শান্তিনিকেতন

অন্তরতম

আপন মনে যে কামনার চলেছি পিছুপিছু
নহে সে বেশি কিছু।
মরুভূমিতে করেছি আনাগোনা—
তৃষিত হিয়া চেয়েছে যাহা নহে সে হীরা সোনা,
পর্ণপুটে একটু শুধু জল,
উৎসতটে খেজুরবনে ক্ষণিক ছায়াতল।
সেইটুকুতে বিরোধ ঘোচে জীবন মরণের,
বিরাম জোটে শ্রান্ত চরণের।
হাটের হাওয়া ধুলায় ভরপুর,
তাহার কোলাহলের তলে একটুখানি সুর
সকল হতে দুর্লভ তা তবু সে নহে বেশি;
বৈশাখের তাপের শেষাশেষি
আকাশ-চাওয়া শুষ্ক মাটি-'পরে
হঠাৎ-ভেসে-আসা মেঘের ক্ষণকালের তরে
এক পশলা বৃষ্টিবরিষন,
দুঃস্বপন বক্ষে যবে শ্বাস নিরোধ করে
জাগিয়ে-দেওয়া করুণ পরশন;
এইটুকুরই অভাব গুরুভার,
না জেনে তবু ইহারই লাগি হৃদয়ে হাহাকার।
অনেক দুরাশারে
সাধনা করে পেয়েছি তবু ফেলিয়া গেছি তারে।
যে পাওয়া শুধু রক্তে নাচে, স্বপ্নে যাহা গাঁথা,
ছন্দে যার হল আসন পাতা,
খ্যাতিস্মৃতির পাষাণপটে রাখে না যাহা রেখা,
ফাল্গুনের সাঁঝতারায় কাহিনী যার লেখা,
সে ভাষা মোর বাঁশিই শুধু জানে—
এই যা দান গিয়েছে মিশে গভীরতর প্রাণে,

করি নি যার আশা,
যাহার লাগি বাঁধি নি কোনো বাসা,
বাহিরে যার নাইকো ভার, যায় না দেখা যারে,
বেদনা তারি ব্যাপিয়া মোর নিখিল আপনারে।

৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪
শান্তিনিকেতন

বনস্পতি

কোথা হতে পেলে তুমি অতি পুরাতন
এ যৌবন,
হে তরু প্রবীণ,
প্রতিদিন
জরাকে ঝরাও তুমি কী নিগূঢ় তেজে—
প্রতিদিন আস তুমি সেজে
সদ্য জীবনের মহিমায়।
প্রাচীনের সমুদ্রসীমায়
নবীন প্রভাত তার অক্লান্ত কিরণে
তোমাতে জাগায় লীলা নিরন্তর শ্যামলে হিরণে।
দিনে দিনে পথিকের দল
ক্লিষ্টপদতল
তব ছায়াবীথি দিয়ে রাত্রি-পানে ধায় নিরুদ্দেশ;
আর তো ফেরে না তারা, যাত্রা করে শেষ।
তোমার নিশ্চল যাত্রা নব নব পল্লব-উদ্‌গমে,
ঋতুর গতির ভঙ্গে পুষ্পের উদ্যমে।
প্রাণের নির্ঝরলীলা স্তব্ধ রূপান্তরে
দিগন্তেরে পুলকিত করে।
তপোবনবালকের মতো
আবৃত্তি করিছ তুমি ফিরে ফিরে অবিরত
সঞ্জীবন-সামমন্ত্র-গাথা।

তোমার পুরানো পাতা
মাটিরে করিছে প্রত্যর্পণ
মাটির যা মর্তধন ;
মৃত্যুভার সঁপিছে মৃত্যুরে
মর্মরিত আনন্দের সুরে ।
সেইক্ষণে নবকিশলয়
রবিকর হতে করে জয়
প্রচ্ছন্ন আলোক,
অমর অশোক
সৃষ্টির প্রথম বাণী ;
বায়ু হতে লয় টানি
চিরপ্রবাহিত
নৃত্যের অমৃত ।

২ অগস্ট ১৯৩২

ভীষণ

বনস্পতি, তুমি যে ভীষণ,
ক্ষণে ক্ষণে আজিও তা মানে মোর মন ।
প্রকাণ্ড মাহাত্ম্যবলে জিনেছিলে ধরা একদিন
যে আদি অরণ্যযুগে, আজি তাহা ক্ষীণ ।
মানুষের-বশ-মানা এই-যে তোমায় আজ দেখি,
তোমার আপন রূপ এ কি ?
আমার বিধান দিয়ে বেঁধেছি তোমারে
আমার বাসার চারি ধারে ।
ছায়া তব রেখেছি সংযমে ।
দাঁড়ায়ে রয়েছ স্তব্ধ জনতাসংগমে
হাটের পথের ধারে ।
নম্র পত্রভারে
কিংকরের মতো
আছ মোর বিলাসের অনুগত ।

লীলাকাননের মাপে
তোমারে করেছি খর্ব। মৃদু কলালাপে
কর চিত্তবিনোদন,
এ ভাষা কি তোমার আপন ?

একদিন এসেছিলে আদিবনভূমে ;
জীবলোক মগ্ন ঘুমে—
তখনো মেলে নি চোখ,
দেখে নি আলোক।
সমুদ্রের তীরে তীরে শাখায় মিলায়ে শাখা
ধরার কঙ্কাল দিলে ঢাকা।
ছায়ায় বুনিয়া ছায়া স্তরে স্তরে
সবুজ মেঘের মতো ব্যাপ্ত হলে দিকে দিগন্তরে।
লতায় গুল্মেতে ঘন, মৃতগাছ-শুষ্কপাতা-ভরা,
আলোহীন পথহীন ধরা।
অরণ্যের আর্দ্রগন্ধে নিবিড় বাতাস
যেন রুদ্ধশ্বাস
চলিতে না পারে।
সিন্ধুর তরঙ্গধ্বনি অন্ধকারে
গুমরিয়া উঠিতেছে জনশূন্য বিশ্বের বিলাপে।
ভূমিকম্পে বনস্থলী কাঁপে ;
প্রচণ্ড নির্ঘোষে
বহু তরুভার বহি বহুদূর মাটি যায় ধ্বসে
গভীর পঙ্কের তলে।
সেদিনের অন্ধ যুগে পীড়িত সে জলে স্থলে
তুমি তুলেছিলে মাথা।
বলিতে বল্কলে তব গাঁথা
সে ভীষণ যুগের আভাস।

যেথা তব আদিবাস
সে অরণ্যে একদিন মানুষ পশিল যবে
দেখা দিয়েছিলে তুমি ভীতিরূপে তার অনুভবে।
হে তুমি অমিত-আয়ু, তোমার উদ্দেশে
স্তবগান করেছে সে।
বাঁকাচোরা শাখা তব কত কী সংকেতে
অন্ধকারে শঙ্কা রেখেছিল পেতে।
বিকৃত বিরূপ মূর্তি মনে মনে দেখেছিল তারা
তোমার দুর্গমে দিশাহারা।

আদিম সে আরণ্যক ভয়
রক্তে নিয়ে এসেছিনু আজিও সে কথা মনে হয়।
বটের জটিল মূল আঁকাবাঁকা নেমে গেছে জলে—
মসীকৃষ্ণ ছায়াতলে
দৃষ্টি মোর চলে যেত ভয়ের কৌতুকে,
দুরুদুরু বুকে
ফিরাতেম নয়ন তখনি।
যে মূর্তি দেখেছি সেথা শুনেছি যে ধ্বনি
সে তো নহে আজিকার।
বহু লক্ষ বর্ষ আগে সৃষ্টি সে তোমার।
হে ভীষণ বনস্পতি,
সেদিন যে নতি
মন্ত্র পড়ি দিয়েছি তোমারে,
আমার চৈতন্যতলে আজিও তা আছে এক ধারে।

২ অগস্ট ১৯৩২

সন্ন্যাসী

হে সন্ন্যাসী, হে গম্ভীর, মহেশ্বর,
মন্দাকিনী প্রসারিল কত-না নির্ঝর
তোমারে বেষ্টন করি নৃত্যজালে।

তব উচ্চভালে
উৎক্ষিপ্ত শীকরবাষ্পে বাঁকা ইন্দ্রধনু
রহে তব শুভ্রতনু
বর্ণে বর্ণে বিচিত্র করিয়া।
কলহাস্যে মুখরিয়া
উদ্ধত নন্দীর রুষ্ট তর্জনীরে করে পরিহাস,
ক্ষণে ক্ষণে করে তব তপোনাশ ;
নাহি মনে ভয়,
দূরে নাহি রয়,
দুর্বার দুরন্ত তারা শাসন না মানে,
তোমারে আপন সাথি জানে।
সকল নিয়মবন্ধহারা
আপন অধীর ছন্দে তোমারে নাচাতে চায় তারা
বাহু তব ধরি।
তুমি মনে মনে হাসো ভৃঙ্গীর ভ্রূকুটি লক্ষ করি।
এদের প্রশ্রয় দিলে, তাই যত দুর্দামের দল
চরাচর ঘেরি ঘেরি করিছে উন্মত্ত কোলাহল
সমুদ্রতরঙ্গতালে, অরণ্যের দোলে,
যৌবনের উদ্‌বেল কল্লোলে।
আনে চাঞ্চল্যের অর্ঘ্য নিরন্তর তব শান্তি নাশি—
এই তো তোমার পূজা জানো তাহা হে ধীর সন্ন্যাসী।

৩ অগস্ট ১৯৩২

হরিণী

হে হরিণী,
আকাশ লইবে জিনি
কেন তব এ অধ্যবসায় ?
সুদূরের অভ্রপটে অগম্যেরে দেখা যায়,
কালো চোখে পড়ে তার স্বপ্নরূপ লিখা ;

একি মরীচিকা,
পিপাসার স্বরচিত মোহ,
একি আপনার সাথে আপন বিদ্রোহ ?
নিজের দুঃসহ সঙ্গ হতে
ছুটে যেতে চাও কোনো নূতন আলোতে—
নিকটের সংকীর্ণতা করি ছেদ,
দিগন্তের নব নব যবনিকা করি দিয়া ভেদ।
আছ বিচ্ছেদের পারে ;
যারে তুমি জান নাই, রক্তে তুমি চিনিয়াছ যারে,
সে যে ডাক দিয়ে গেছে যুগে যুগে যত হরিণীরে
বনে মাঠে গিরিতটে নদীতীরে—
জানায়েছে অপূর্ব বারতা
কত শত বসন্তের আত্মবিহ্বলতা।
তারি লাগি বিশ্বভোলা মহা-অভিসার
হয়েছে দুর্বার,
অদৃশ্যেরে সন্ধানের তরে
দাঁড়ায়েছ স্পর্ধাভরে,
একান্ত উৎসুক তব প্রাণ
আকাশেরে করে ঘ্রাণ—
কর্ণ করিয়াছে খাড়া,
বাতাসে বাতাসে আজি অশ্রুত বাণীর পায় সাড়া।

১ অগস্ট ১৯৩২

গোধূলি

প্রাসাদভবনে নীচের তলায়
সারাদিন কতমতো
গৃহের সেবায় নিয়ত রয়েছ রত।
সেথা তুমি তব গৃহসীমানায়
বহু মানুষের সনে
শত গাঁঠে বাঁধা কর্মের বন্ধনে।

দিনশেষে আসে গোধূলির বেলা
ধূসর রক্তরাগে
ঘরের কোণায় দীপ জ্বালাবার আগে ;
নীড়ে-ফেরা কাক দিয়ে শেষ ডাক
উড়িল আকাশতলে,
শেষ-আলো-আভা মিলায় নদীর জলে ।
হাওয়া থেমে যায় বনের শাখায়
আঁধার জড়ায়ে ধরে ;
নির্জন ছায়া কাঁপে ঝিল্লির স্বরে ।

তখন একাকী সব কাজ রাখি
প্রাসাদ-ছাদের ধারে
দাঁড়াও যখন নীরব অন্ধকারে
জানি না তখন কী যে নাম তব,
চেনা তুমি নহ আর,
কোনো বন্ধনে নহ তুমি বাঁধিবার ।
সেই ক্ষণকাল তব সঙ্গিনী
সুদূর সন্ধ্যাতারা,
সেই ক্ষণকাল তুমি পরিচয়হারা ।
দিবসরাত্রির সীমা মিলে যায় ;
নেমে এস তারপরে,
ঘরের প্রদীপ আবার জ্বালাও ঘরে ।

১৪ মাঘ [১৩৩৮]

বাধা

পূর্ণ করি নারী তার জীবনের থালি
প্রিয়ের চরণে প্রেম নিঃশেষিয়া দিতে গেল ঢালি,
ব্যর্থ হল পথ-খোঁজা—
কহিল, 'হে ভগবান, নিষ্ঠুর যে এ অর্ঘ্যের বোঝা ;

আমার দিবস রাত্রি অসহ্য পেষণে
একান্ত পীড়িত আর্ত ; তাই সান্ত্বনার অন্বেষণে
এসেছি তোমার দ্বারে— এ প্রেম তুমিই লও প্রভু !'
'লও লও' বারবার ডেকে বলে, তবু
দিতে পারে না যে তাকে
কৃপণের ধন-সম শিরা আঁকড়িয়া থাকে।

যেমন তুষাররাশি গিরিশিরে লগ্ন রহে,
কিছুতে স্রোত না বহে,
আপন নিষ্ফল কঠিনতা
দেয় তারে ব্যথা,
তেমনি সে নারী
নিশ্চল-হৃদয়ভারে-ভারী
কেঁদে বলে, 'কী ধনে আমার প্রেম দামী
সে যদি না বুঝেছিল, তুমি অন্তর্যামী,
তুমিও কি এরে চিনিবে না ?
মানবজন্মের সব দেনা
শোধ করি লও, প্রভু, আমার সর্বস্ব রত্ন নিয়ে।
তুমি যে প্রেমের লোভী মিথ্যা কথা কি এ !'

'লও লও' যত বলে খোলে না যে তার
হৃদয়ের দ্বার।
সারাদিন মন্দিরা বাজায়ে করে গান,
'লও তুমি লও ভগবান !'

৩ অগস্ট ১৯৩২

দুই সখী

দুজন সখীরে
দূর হতে দেখেছিনু অজানার তীরে।

জানি নে কাদের ঘর ; দ্বার খোলা আকাশের পানে,
দিনান্তে কহিতেছিল কী কথা কে জানে।
এক নিমিষেতে
অপরিচয়ের দেখা চলে যেতে যেতে
উপরের দিকে চেয়ে।
দুটি মেয়ে
যেন দুটি আলোকণা
আমার মনের পথে ছায়াতলে করিল রচনা
ক্ষণতরে আকাশের বাণী,
অর্থ তার নাহি জানি।

যাহারা ওদের চেনে,
নাম জানে, কাছে লয় টেনে,
একসাথে দিন যাপে,
প্রত্যহের বিচিত্র আলাপে
ওদের বেঁধেছে তারা ছোটো করে
পরিচয়ডোরে।

সত্য নয়
ঘরের ভিত্তিতে ঘেরা সেই পরিচয়।
যাবে দিন,
সে জানা কোথায় হবে লীন
বন্ধহীন অনন্তের বক্ষতলে উঠিয়াছে জেগে
কী নিশ্বাসবেগে
যুগলতরঙ্গসম।
অসীম কালের মাঝে ওরা অনুপম,
ওরা অনুদ্দেশ,
কোথায় ওদের শেষ
ঘরের মানুষ জানে সে কি ?
নিত্যের চিত্তের পটে ক্ষণিকের চিত্র গেনু দেখি—

আশ্চর্য সে লেখা,
সে তুলির রেখা
যুগযুগান্তর-মাঝে একবার দেখা দিল নিজে—
জানি নে তাহার পরে কী যে।

[১৩৩৯]

পথিক

তুমি আছ বসি তোমার ঘরের দ্বারে
ছোটো তব সংসারে।
মনখানি যবে ধায় বাহিরের পানে
ভিতরে আবার টানে।
বাঁধনবিহীন দূর
বাজাইয়া যায় সুর,
বেদনার ছায়া পড়ে তব আঁখি'পরে—
নিশ্বাস ফেলি মন্দগমন ফিরে চলে যাও ঘরে।

আমি-যে পথিক চলিয়াছি পথ বেয়ে
দূরের আকাশে চেয়ে;
তোমার ঘরের ছায়া পড়ে পথপাশে,
সে ছায়া হৃদয়ে আসে।
যত দূরে পথ যাক
শুনি বাঁধনের ডাক,
ক্ষণেকের তরে পিছনে আমায় টানে—
নিশ্বাস ফেলি ত্বরিতগমন চলি সম্মুখপানে।

উদার আকাশে আমার মুক্তি দেখি
মন তব কাঁদিছে কি?
এ মুক্তিপথে তুমি পেতে চাও ছাড়া,
দুয়ারে লেগেছে নাড়া।

বাঁধনে বাঁধনে টানি
রচিলে আসনখানি,
দেখিনু তোমার আপন সৃষ্টি তাই—
শূন্যতা ছাড়ি সুন্দরে তব আমার মুক্তি চাই।

৩ অগস্ট ১৯৩২

অপ্রকাশ

মুক্ত হও হে সুন্দরী!
ছিন্ন করো রঙিন কুয়াশা,
অবনত দৃষ্টির আবেশ,
এই অবরুদ্ধ ভাষা,
এই অবগুণ্ঠিত প্রকাশ।
সযত্ন লজ্জার ছায়া
তোমারে বেষ্টন করি জড়ায়েছে অস্পষ্টের মায়া
শতপাকে,
মোহ দিয়ে সৌন্দর্যেরে করেছে আবিল;
অপ্রকাশে হয়েছ অশুচি।
তাই তোমারে নিখিল
রেখেছে সরায়ে কোণে।
ব্যক্ত করিবার দীনতায়
নিজেরে হারালে তুমি,
প্রদোষের জ্যোতিঃক্ষীণতায়
দেখিতে পেলে না আজো আপনারে উদার আলোকে—
বিশ্বেরে দেখ নি, ভীরু, কোনোদিন বাধাহীন চোখে
উচ্চশির করি।
স্বরচিত সংকোচে কাটাও দিন,
আত্ম-অপমানে চিত্ত দীপ্তিহীন, তাই পুণ্যহীন।
বিকশিত স্থলপদ্ম পবিত্র সে, মুক্ত তার হাসি,
পূজায় পেয়েছে স্থান আপনারে সম্পূর্ণ বিকাশি।

ছায়াচ্ছন্ন যে লজ্জায় প্রকাশের দীপ্তি ফেলে মুছি,
সত্তার ঘোষণাবাণী স্তব্ধ করে,
জেনো সে অশুচি।
ঊর্ধ্বশাখা বনস্পতি যে ছায়ারে দিয়েছে আশ্রয়
তার সাথে আলোর মিত্রতা,
সমুন্নত সে বিনয়।
মাটিতে লুটিয়ে গুল্ম সর্ব অঙ্গ ছায়াপুঞ্জ করি,
তলে গুপ্ত গহ্বরেতে কীটের নিবাস।
হে সুন্দরী,
মুক্ত করো অসম্মান, তব অপ্রকাশ আবরণ।
হে বন্দিনী, বন্ধনেরে কোরো না কৃত্রিম আভরণ।
সজ্জিত লজ্জার খাঁচা, সেথায় আত্মার অবসাদ
অর্ধেক বাধায় সেথা ভোগের বাড়ায়ে দিতে স্বাদ
ভোগীর বাড়াতে গর্ব খর্ব করিয়ো না আপনারে
খণ্ডিত জীবন লয়ে আচ্ছন্ন চিত্তের অন্ধকারে।

৬ মাঘ [১৩৩৮]

দুর্ভাগিনী

তোমার সম্মুখে এসে, দুর্ভাগিনী, দাঁড়াই যখন
নত হয় মন।
যেন ভয় লাগে
প্রলয়ের আরম্ভেতে স্তব্ধতার আগে।
এ কী দুঃখভার,
কী বিপুল বিষাদের স্তম্ভিত নীরন্ধ্র অন্ধকার
ব্যাপ্ত করে আছে তব সমস্ত জগৎ
তব ভূত ভবিষ্যৎ!
প্রকাণ্ড এ নিষ্ফলতা,
অভ্রভেদী ব্যথা
দাবদগ্ধ পর্বতের মতো

খররৌদ্রে রয়েছে উন্নত
লয়ে নগ্ন কালো কালো শিলাস্তূপ
ভীষণ বিরূপ।

সব সান্ত্বনার শেষে সব পথ একেবারে
মিলেছে শূন্যের অন্ধকারে ;
ফিরিছ বিশ্রামহারা ঘুরে ঘুরে,
খুঁজিছ কাছের বিশ্ব মুহূর্তে যা চলে গেল দূরে ;
খুঁজিছ বুকের ধন, সে আর তো নেই,
বুকের পাথর হল মুহূর্তেই।
চিরচেনা ছিল চোখে চোখে,
অকস্মাৎ মিলাল অপরিচিত লোকে।
দেবতা যেখানে ছিল সেথা জ্বালাইতে গেলে ধূপ,
সেখানে বিদ্রূপ।

সর্বশূন্যতার ধারে
জীবনের পোড়ো ঘরে অবরুদ্ধ দ্বারে
দাও নাড়া ;
ভিতরে কে দিবে সাড়া ?
মূর্ছাতুর আঁধারের উঠিছে নিশ্বাস।
ভাঙা বিশ্বে পড়ে আছে ভেঙে-পড়া বিপুল বিশ্বাস।
তার কাছে নত হয় শির
চরম বেদনাশৈলে ঊর্ধ্বচূড় যাহার মন্দির।

মনে হয়, বেদনার মহেশ্বরী
তোমার জীবন ভরি
দুষ্করতপস্যামগ্ন, মহাবিরহিণী
মহাদুঃখে করিছেন ঋণী
চিরদয়িতেরে।
তোমারে সরালো শত ফেরে
বিশ্ব হতে বৈরাগ্যের অন্তরাল।

দেশকাল
রয়েছে বাহিরে।
তুমি স্থির সীমাহীন নৈরাশ্যের তীরে
নির্বাক অপার নির্বাসনে।
অশ্রুহীন তোমার নয়নে
অবিশ্রাম প্রশ্ন জাগে যেন—
কেন, ওগো কেন!

৬ অগস্ট ১৯৩২
[জোড়াসাঁকো]

গরবিনী

কে গো তুমি গরবিনী, সাবধানে থাকো দূরে দূরে,
মর্তধূলি'পরে ঘৃণা বাজে তব নূপুরে নূপুরে।
তুমি যে অসাধারণ, তীব্র একা তুমি,
আকাশকুসুমসম অসংসক্ত রয়েছ কুসুমি।
বাহিরের প্রসাধনে যত্নে তুমি শুচি;
অকলঙ্ক তোমার কৃত্রিম রুচি;
সর্বদা সংশয়ে থাকো পাছে কোথা হতে
হতভাগ্য কালো কীট পড়ে তব দীপের আলোতে
স্ফটিকেতে-ঢাকা।
অসামান্য সমাদরে আঁকা
তোমার জীবন
কৃপণের-কক্ষে-রাখা ছবির মতন
বহুমূল্য যবনিকা-অন্তরালে;
ওগো অভাগিনী নারী, এই ছিল তোমার কপালে—
আপন প্রহরী তুমি, নিজে তুমি আপন বন্ধন।

আমি সাধারণ।

এ ধরাতলের
নির্বিচার স্পর্শ সকলের
দেহে মোর বহে যায়, লাগে মোর মনে—
সেই বলে বলী আমি, স্বত্ব মোর সকল ভুবনে।
মুক্ত আমি ধূলিতলে,
মুক্ত আমি অনাদৃত মলিনের দলে।
যত চিহ্ন লাগে দেহে, অশঙ্কিত প্রাণের শক্তিতে
শুদ্ধ হয়ে যায় সে চকিতে।

সম্মুখে আমার দেখো শালবন,
সে যে সাধারণ।
সবার একান্ত কাছে
আপনাবিস্মৃত হয়ে আছে।
মধ্যাহ্নবাতাসে
শুষ্ক পাতা ঘুরাইয়া ধূলির আবর্ত ছুটে আসে—
শাখা তার অনায়াসে দেয় নাড়া,
পাতায় পাতায় তার কৌতুকের পড়ে সাড়া।
তবু সে অম্লান শুচি, নির্মল নিশ্বাসে
চৈত্রের আকাশে
বাতাস পবিত্র করে সুগন্ধবীজনে।
অসংকোচ ছায়া তার প্রসারিত সর্বসাধারণে।
সহজে নির্মল সে যে
দ্বিধাহীন জীবনের তেজে।

আমি সাধারণ।
তরুর মতন আমি, নদীর মতন।
মাটির বুকের কাছে থাকি ;
আলোরে ললাটে লই ডাকি
যে আলোক উচ্চনীচ ইতরের—
বাহিরের ভিতরের।

সমস্ত পৃথিবী তুমি অবজ্ঞায় করেছ অশুচি,
গরবিনী, তাই সেই শক্তি গেছে ঘুচি
আপনার অন্তরে রহিতে অমলিনা—
হায়, তুমি নিখিলের আশীর্বাদহীনা।

৪ অগস্ট ১৯৩২

প্রলয়

আকাশের দূরত্ব যে, চোখে তারে দূর বলে জানি,
মনে তারে দূর নাহি মানি।
কালের দূরত্ব সেও যত কেন হোক-না নিষ্ঠুর
তবু সে দুঃসহ নহে দূর।
আঁধারের দূরত্বই কাছে থেকে রচে ব্যবধান,
চেতনা আবিষ্ট করে, তার হাতে নাই পরিত্রাণ
শুধু এই মাত্র নয়—
সে-যে সৃষ্টি করে নিত্য ভয়।
ছায়া দিয়ে রচি তুলে আঁকাবাঁকা দীর্ঘ উপছায়া,
জানারে অজানা করে— ঘেরে তারে অর্থহীনা মায়া।
পথ লুপ্ত করে দিয়ে যে পথের করে সে নির্দেশ
নাই তার শেষ।
সে পথ ভুলায়ে লয় দিনে দিনে দূর হতে দূরে
ধ্রুবতারাহীন অন্ধপুরে।

অগ্নিবন্যা বিস্তারিয়া যে প্রলয় আনে মহাকাল,
চন্দ্রসূর্য লুপ্ত করে আবর্তে-ঘূর্ণিত জটাজাল,
দিব্য দীপ্তিচ্ছটায় সে সাজে,
বজ্রের ঝঞ্ঝনামন্দ্রে বক্ষে তার রুদ্রবীণা বাজে।
যে বিশ্বে বেদনা হানে তাহারি দাহনে করে তার
পবিত্র সংস্কার।
জীর্ণ জগতের ভস্ম যুগান্তের প্রচণ্ড নিশ্বাসে
লুপ্ত হয় ঝঞ্ঝার বাতাসে।

অবশেষে তপস্বীর তপস্যাবহ্নির শিখা হতে
নবসৃষ্টি উঠে আসে নিরঞ্জন নবীন আলোতে।

দানব বিলুপ্তি আনে, আঁধারের পঙ্কিল বুদ্‌বুদে
নিখিলের সৃষ্টি দেয় মুদে;
কণ্ঠ দেয় রুদ্ধ করি, বাণী হতে ছিন্ন করে সুর,
ভাষা হতে অর্থ করে দূর;
উদয়দিগন্তমুখে চাপা দেয় ঘন কালো আঁধি,
প্রেমেরে সে ফেলে বাঁধি
সংশয়ের ডোরে;
ভক্তিপাত্র শূন্য করি শ্রদ্ধার অমৃত লয় হরে।
মূক অন্ধ মৃত্তিকার স্তর,
জগদ্দল শিলা দিয়ে রচে সেথা মুক্তির কবর।

১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

কলুষিত

শ্যামল প্রাণের উৎস হতে
অবারিত পুণ্যস্রোতে
ধৌত হয় এ বিশ্বধরণী
দিবসরজনী।
হে নগরী, আপনারে বঞ্চিত করেছ সেই স্নানে,
রচিয়াছ আবরণ কঠিন পাষাণে।
আছ নিত্য মলিন অশুচি,
তোমার ললাট হতে গেছে ঘুচি
প্রকৃতির স্বহস্তের লিখা
আশীর্বাদটিকা।
ঊষা দিব্যদীপ্তিহারা
তোমার দিগন্তে এসে। রজনীর তারা
তোমার আকাশচ্যুত জাতিচ্যুত, নষ্ট মন্ত্র তার,
বিক্ষুব্ধ নিদ্রার

আলোড়নে ধ্যান তার অস্বচ্ছ আবিল,
হারালো সে মিল
পূজাগন্ধী নন্দনের পারিজাত-সাথে
শান্তিহীন রাতে।

হেথা সুন্দরের কোলে
স্বর্গের বীণার সুর ভ্রষ্ট হল বলে
উদ্ধত হয়েছে ঊর্ধ্বে বীভৎসের কোলাহল,
কৃত্রিমের কারাগারে বন্দীদল
গর্বভরে
শৃঙ্খলের পূজা করে।
দ্বেষ ঈর্ষা কুৎসার কলুষে
আলোহীন অন্তরের গুহাতলে হেথা রাখে পুষে
ইতরের অহংকার—
গোপন দংশন তার;
অশ্লীল তাহার ক্লিন্ন ভাষা
সৌজন্যসংযমনাশা।
দুর্গন্ধ পঙ্কের দিয়ে দাগা
মুখোশের অন্তরালে করে শ্লাঘা;
সুরঙ্গ খনন করে,
ব্যাপি দেয় নিন্দা ক্ষতি প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে;
এই নিয়ে হাটে বাটে বাঁকা কটাক্ষের
ব্যঙ্গভঙ্গী, চতুর বাক্যের
কুটিল উল্লাস,
ক্রূর পরিহাস।

এর চেয়ে আরণ্যক তীব্র হিংসা সেও
শতগুণে শ্রেয়।
ছদ্মবেশ-অপগত
শক্তির সরল তেজে সমুদ্যত দাবাগ্নির মতো

প্রচণ্ডনির্ঘোষ ;
নির্মল তাহার রোষ,
তার নির্দয়তা
বীরত্বের মাহাত্ম্যে উন্নতা।
প্রাণশক্তি তার মাঝে
অক্ষুণ্ন বিরাজে।
স্বাস্থ্যহীন বীর্যহীন যে হীনতা ধ্বংসের বাহন
গর্তখোদা ক্রিমিগণ
তারি অনুচর,
অতি ক্ষুদ্র তাই তারা অতি ভয়ংকর ;
অগোচরে আনে মহামারী,
শনির কলির দন্ত সর্বনাশ তারি।

মন মোর কেঁদে আজ উঠে জাগি
প্রবল মৃত্যুর লাগি।
রুদ্র, জটাবন্ধ হতে করো মুক্ত বিরাট প্লাবন,
নীচতার ক্লেদপঙ্ক করো রক্ষা ভীষণ ! পাবন !
তাণ্ডবনৃত্যের ভরে
দুর্বলের যে গ্লানিরে চূর্ণ কর যুগে যুগান্তরে,
কাপুরুষ নির্জীবের সে নির্লজ্জ অপমানগুলি
বিলুপ্ত করিয়া দিক উৎক্ষিপ্ত তোমার পদধূলি।

১৪ ভাদ্র ১৩৪২
শান্তিনিকেতন

অভ্যুদয়

শত শত লোক চলে
শত শত পথে।
তারি মাঝে কোথা কোন্ রথে
সে আসিছে যার আজি নব অভ্যুদয়

দিক্‌লক্ষ্মী গাহিল না জয় ;
আজো রাজটিকা
ললাটে হল না তার লিখা ।
নাই অস্ত্র, নাই সৈন্যদল,
অস্ফুট তাহার বাণী, কণ্ঠে নাহি বল ।
সে কি নিজে জানে
আসিছে সে কী লাগিয়া,
আসে কোনখানে !
যুগের প্রচ্ছন্ন আশা করিছে রচনা
তার অভ্যর্থনা
কোন্ ভবিষ্যতে—
কোন্ অলক্ষিত পথে
আসিতেছে অর্ঘ্যভার !
আকাশে ধ্বনিছে বারম্বার—
'মুখ তোলো,
আবরণ খোলো
হে বিজয়ী, হে নির্ভীক,
হে মহাপথিক—
তোমার চরণক্ষেপ পথে পথে দিকে দিকে
মুক্তির সংকেতচিহ্ন
যাক লিখে লিখে ।'

বর্ষশেষ ১৩৩৯

প্রতীক্ষা

গান

আজি বরষনমুখরিত
শ্রাবণরাতি।
স্মৃতিবেদনার মালা
একেলা গাঁথি ।

আজি কোন্ ভুলে ভুলি
আঁধার ঘরেতে রাখি
দুয়ার খুলি—
মনে হয়, বুঝি আসিবে সে
মোর দুখরজনীর
মরমসাথি।

আসিছে সে ধারাজলে সুর লাগায়ে,
নীপবনে পুলক জাগায়ে।
যদিও বা নাহি আসে
তবু বৃথা আশ্বাসে
মিলন-আসনখানি
রয়েছি পাতি।

২১ শ্রাবণ ১৩৪২
শান্তিনিকেতন

নুটু

রমাদেবীর মৃত্যু উপলক্ষে

ফাল্গুনের পূর্ণিমার আমন্ত্রণ পল্লবে পল্লবে
এখনি মুখর হল অধীর মর্মরকলরবে।
বৎসে, তুমি বৎসরে বৎসরে
সাড়া তারি দিতে মধুস্বরে,
আমাদের দূত হয়ে তোমার কণ্ঠের কলগান
উৎসবের পুষ্পাসনে বসন্তেরে করেছে আহ্বান।

নিষ্ঠুর শীতের দিনে গেলে তুমি রুগ্ন তনু বয়ে
আমাদের সকলের উৎকণ্ঠিত আশীর্বাদ লয়ে।
আশা করেছিনু মনে মনে—
নববসন্তের আগমনে
ফিরিয়া আসিবে যবে লবে আপনার চিরস্থান,
কাননলক্ষ্মীরে তুমি করিবে আনন্দ-অর্ঘ্যদান।

এবার দক্ষিণবায়ু দুঃখের নিশ্বাস এল বহে ;
তুমি তো এলে না ফিরে ; এ আশ্রম তোমার বিরহে
বীথিকার ছায়ায় আলোকে
সুগভীর পরিব্যাপ্ত শোকে
কহিছে নির্বাক্‌বাণী বৈরাগ্যকরুণ ক্লান্ত সুরে,
তাহারি রণনধ্বনি প্রান্তরে বাজিছে দূরে দূরে।

শিশুকাল হতে হেথা সুখে-দুঃখে-ভরা দিন-রাত
করেছে তোমার প্রাণে বিচিত্র বর্ণের রেখাপাত।
কাশের মঞ্জরী -শুভ্র দিশা,
নিস্তব্ধ মালতী-ঝরা নিশা,
প্রশান্ত শিউলি-ফোটা প্রভাত শিশিরে-ছলোছলো,
দিগন্ত-চমক-দেওয়া সূর্যাস্তের রশ্মি জ্বলোজ্বলো।

এখনো তেমনি হেথা আসিবে দিনের পরে দিন,
তবুও সে আজ হতে চিরকাল রবে তুমি-হীন।
বসে আমাদের মাঝখানে
কভু যে তোমার গানে গানে
ভরিবে না সুখসন্ধ্যা, মনে হয়, অসম্ভব অতি—
বর্ষে বর্ষে দিনে দিনে প্রমাণ করিবে সেই ক্ষতি।

বারে বারে নিতে তুমি গীতিস্রোতে কবি-আশীর্বাণী,
তাহারে আপন পাত্রে প্রণামে ফিরায়ে দিতে আনি।
জীবনের দেওয়া-নেওয়া সেই
ঘুচিল অন্তিম নিমেষেই—
স্নেহোজ্জ্বল কল্যাণের সে সম্বন্ধ তোমার আমার
গানের নির্মাল্য -সাথে নিয়ে গেলে মরণের পার।

হায় হায়, এত প্রিয়, এতই দুর্লভ যে সঞ্চয়
একদিনে অকস্মাৎ তারো যে ঘটিতে পারে লয়!
হে অসীম, তব বক্ষোমাঝে
তার ব্যথা কিছুই না বাজে,

সৃষ্টির নেপথ্যে সেও আছে তব দৃষ্টির ছায়ায়—
স্তব্ধবীণা রঙ্গগৃহে মোরা বৃথা করি 'হায় হায়'।

হে বৎসে, যা দিয়েছিলে আমাদের আনন্দভাণ্ডারে
তারি স্মৃতিরূপে তুমি বিরাজ করিবে চারিধারে।
আমাদের আশ্রম-উৎসব
যখনি জাগাবে গীতরব
তখনি তাহার মাঝে অশ্রুত তোমার কণ্ঠস্বর
অশ্রুর আভাস দিয়ে অভিষিক্ত করিবে অন্তর।

১৮ মাঘ ১৩৪১
[শান্তিনিকেতন]

বাদলসন্ধ্যা

গান

জানি জানি, তুমি এসেছ এ পথে
মনের ভুলে।
তাই হোক তবে, তাই হোক, দ্বার
দিলেম খুলে।
এসেছ তুমি তো বিনা আভরণে,
মুখর নূপুর বাজে না চরণে,
তাই হোক তবে, তাই হোক, এসো
সহজ মনে।

ঐ তো মালতী ঝরে পড়ে যায়
মোর আঙিনায়,
শিথিল কবরী সাজাতে তোমার
লও-না তুলে।
নাহয় সহসা এসেছ এ পথে
মনের ভুলে।

কোনো আয়োজন নাই একেবারে,
সুর বাঁধা নাই এ বীণার তারে,
তাই হোক তবে, এসো হৃদয়ের
মৌনপারে।

ঝর ঝর বারি ঝরে বনমাঝে,
আমারি মনের সুর ঐ বাজে,
উতলা হাওয়ার তালে তালে মন
উঠিছে দুলে।
নাহয় সহসা এসেছ এ পথে
মনের ভুলে।

২৩ শ্রাবণ ১৩৪২
শান্তিনিকেতন

জয়ী

রূপহীন, বর্ণহীন, চিরস্তব্ধ, নাই শব্দ সুর,
মহাতৃষ্ণা মরুতলে মেলিয়াছে আসন মৃত্যুর ;
সে মহানৈঃশব্দ্য-মাঝে বেজে ওঠে মানবের বাণী
'বাধা নাহি মানি'।

আস্ফালিছে লক্ষ লোল ফেনজিহ্বা নিষ্ঠুর নীলিমা—
তরঙ্গতাণ্ডবী মৃত্যু, কোথা তার নাহি হেরি সীমা ;
সে রুদ্র সমুদ্রতটে ধ্বনিতেছে মানবের বাণী
'বাধা নাহি মানি'।

আদিতম যুগ হতে অন্তহীন অন্ধকারপথে
আবর্তিছে বহ্নিচক্র কোটি কোটি নক্ষত্রের রথে ;
দুর্গম রহস্য ভেদি সেথা উঠে মানবের বাণী
'বাধা নাহি মানি'।

অণুতম অণুকণা আকাশে আকাশে নিত্যকাল
বর্ষিয়া বিদ্যুৎবিন্দু রচিছে রূপের ইন্দ্রজাল ;
নিরুদ্ধ প্রবেশদ্বারে উঠে সেথা মানবের বাণী
'বাধা নাহি মানি' ।

চিত্তের গহনে যেথা দুরন্ত কামনা লোভ ক্রোধ
আত্মঘাতী মত্ততায় করিছে মুক্তির দ্বার রোধ
অন্ধতার অন্ধকারে উঠে সেথা মানবের বাণী
'বাধা নাহি মানি' ।

বাদলরাত্রি

গান

কী বেদনা মোর জান সে কি তুমি, জান,
ওগো মিতা মোর, অনেক দূরের মিতা—
আজি এ নিবিড় তিমিরযামিনী
বিদ্যুৎ-সচকিতা ।
বাদল বাতাস ব্যেপে
হৃদয় উঠিছে কেঁপে,
ওগো, সে কি তুমি জান !
উৎসুক এই দুখজাগরণ,
এ কি হবে হায় বৃথা !

ওগো মিতা মোর, অনেক দূরের মিতা,
আমার ভবনদ্বারে
রোপণ করিলে যারে
সজল হাওয়ার করুণ পরশে
সে মালতী বিকশিতা—
ওগো, সে কি তুমি জান !

তুমি যার সুর দিয়েছিলে বাঁধি
মোর কোলে আজ উঠিছে সে কাঁদি,
ওগো, সে কি তুমি জান !
সেই যে তোমার বীণা সে কি বিস্মৃতা,
ওগো মিতা, মোর অনেক দূরের মিতা !

২৮ শ্রাবণ ১৩৪২
শান্তিনিকেতন

পত্র

অবকাশ ঘোরতর অল্প,
অতএব কবে লিখি গল্প !
সময়টা বিনা কাজে ন্যস্ত,
তা নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত।
তাই ছেড়ে দিতে হল শেষটা
কলমের ব্যবহার-চেষ্টা।
সারাবেলা চেয়ে থাকি শূন্যে,
বুঝি গতজন্মের পুণ্যে
পায় মোর উদাসীন চিত্ত
রূপে রূপে অরূপের বিত্ত।
নাই তার সঞ্চয়তৃষ্ণা,
নষ্ট করাতে তার নিষ্ঠা।
মৌমাছি-স্বভাবটা পায় নাই,
ভবিষ্যতের কোনো দায় নাই।
ভ্রমর যেমন মধু নিচ্ছে
যখন যেমন তার ইচ্ছে।
অকিঞ্চনের মতো কুঞ্জে
নিত্য আলসরস ভুঞ্জে।
মৌচাক রচে না কী জন্যে—
ব্যর্থ বলিয়া তারে অন্যে

গাল দিক, খেদ নাই তা নিয়ে।
জীবনটা চলেছে সে বানিয়ে
আলোতে বাতাসে আর গন্ধে
আপন পাখা-নাড়ার ছন্দে।
জগতের উপকার করতে
চায় না সে প্রাণপণে মরতে,
কিম্বা সে নিজের শ্রীবৃদ্ধির
টিকি দেখিল না আজো সিদ্ধির।
কভু যার পায় নাই তত্ত্ব
তারি গুণগান নিয়ে মত্ত।
যাহা-কিছু হয় নাই পষ্ট,
যা দিয়েছে না-পাওয়ার কষ্ট,
যা রয়েছে অভ্যাসের বস্তু,
তারেই সে বলিয়াছে 'অস্তু'।
যাহা নহে গণনায় গণ্য
তারি রসে হয়েছে সে ধন্য।
তবে কেন চাও তারে আনতে
পাব্‌লিশরের চক্রান্তে।
যে রবি চলেছে আজ অস্তে
দেবে সমালোচকের হস্তে?
বসে আছি, প্রলয়ের পথ-কার
কবে করিবেন তার সৎকার।
নিশীথিনী নেবে তারে বাহুতে,
তার আগে খাবে কেন রাহুতে?
কলমটা তবে আজ তোলা থাক,
স্তুতিনিন্দার দোলে দোলা থাক।

আজি শুধু ধরণীর স্পর্শ
এনে দিক অন্তিম হর্ষ।
বোবা তরুলতিকার বাক্য
দিক তারে অসীমের সাক্ষ্য।

অভ্যাগত

গান

মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম
অন্তবিহীন পথ
আসিতে তোমার দ্বারে,
মরুতীর হতে সুধাশ্যামলিম পারে।
পথ হতে আমি গাঁথিয়া এনেছি
সিক্ত যূথীর মালা
সকরুণ নিবেদনের গন্ধ -ঢালা,
লজ্জা দিয়ো না তারে।

সজল মেঘের ছায়া ঘনাইছে
বনে বনে,
পথ-হারানোর বাজিছে বেদনা
সমীরণে।
দূর হতে আমি দেখেছি তোমার
ঐ বাতায়নতলে
নিভৃতে প্রদীপ জ্বলে—
আমার এ আঁখি উৎসুক পাখি
ঝড়ের অন্ধকারে।

২১ শ্রাবণ ১৩৪২
শান্তিনিকেতন

মাটিতে-আলোতে

আরবার কোলে এল শরতের
শুভ্র দেবশিশু, মরতের
সবুজ কুটীরে। আরবার বুঝিতেছি মনে—
বৈকুণ্ঠের সুর যবে বেজে ওঠে মর্তের গগনে

মাটির বাঁশিতে, চিরন্তন রচে খেলাঘর
অনিত্যের প্রাঙ্গণের 'পর,
তখন সে সম্মিলিত লীলারস তারি
ভরে নিই যতটুকু পারি
আমার বাণীর পাত্রে, ছন্দের আনন্দে তারে
বহে নিই চেতনার শেষ পারে,
বাক্য আর বাক্যহীন
সত্যে আর স্বপ্নে হয় লীন।

দ্যুলোকে ভূলোকে মিলে শ্যামলে সোনায়
মন্ত্র রেখে দিয়ে গেছে বর্ষে বর্ষে আঁখির কোণায় ;
তাই প্রিয়মুখে
চক্ষু যে পরশটুকু পায়, তার দুঃখে সুখে
লাগে সুধা, লাগে সুর ;
তার মাঝে সে রহস্য সুমধুর
অনুভব করি
যাহা সুগভীর আছে ভরি
কচি ধানখেতে—
রিক্ত প্রান্তরের শেষে অরণ্যের নীলিম সংকেতে,
আমলকীপল্লবের পেলব উল্লাসে,
মঞ্জরিত কাশে,
অপরাহ্নকাল
তুলিয়া গেরুয়াবর্ণ পাল
পাণ্ডুপীত বালুতট বেয়ে বেয়ে
যায় ধেয়ে
তন্বী তরী গতির বিদ্যুতে
হেলে পড়ে যে রহস্য সে ভঙ্গীটুকুতে,
চটুল দোয়েল পাখি সবুজেতে চমক ঘটায়
কালো আর সাদার ছটায়

অকস্মাৎ ধায় দ্রুত শিরীষের উচ্চ শাখা-পানে
চকিত সে ওড়াটিতে যে রহস্য বিজড়িত গানে।

হে প্রেয়সী, এ জীবনে
তোমারে হেরিয়াছিনু যে নয়নে
সে নহে কেবলমাত্র দেখার ইন্দ্রিয়,
সেখানে জ্বেলেছে দীপ বিশ্বের অন্তরতম প্রিয়।
আঁখিতারা সুন্দরের পরশমণির মায়া -ভরা,
দৃষ্টি মোর সে তো সৃষ্টি-করা।
তোমার যে সত্তাখানি প্রকাশিলে মোর বেদনায়
কিছু জানা কিছু না-জানায়,
যারে লয়ে আলো আর মাটিতে মিতালি,
আমার ছন্দের ডালি
উৎসর্গ করেছি তারে বারে বারে—
সেই উপহারে
পেয়েছে আপন অর্ঘ্য ধরণীর সকল সুন্দর।
আমার অন্তর
রচিয়াছে নিভৃত কুলায়
স্বর্গের-সোহাগে-ধন্য পবিত্র ধূলায়।

২৫ অগস্ট ১৯৩৫
শান্তিনিকেতন

মুক্তি

জয় করেছিনু মন তাহা বুঝি নাই,
চলে গেনু তাই
নতশিরে।
মনে ক্ষীণ আশা ছিল ডাকিবে সে ফিরে।
মানিল না হার,
আমারে করিল অস্বীকার।

বাহিরে রহিনু খাড়া
কিছুকাল, না পেলেম সাড়া।
তোরণদ্বারের কাছে
চাঁপাগাছে
দক্ষিণ বাতাসে থরথরি
অন্ধকারে পাতাগুলি উঠিল মর্মরি।
দাঁড়ালেম পথপাশে,
ঊর্ধ্বে বাতায়ন-পানে তাকালেম ব্যর্থ কী আশ্বাসে।
দেখিনু নিবানো বাতি—
আত্মগুপ্ত অহংকৃত রাতি
কক্ষ হতে পথিকেরে হানিছে ভ্রূকুটি।
এ কথা ভাবি নি মনে, অন্ধকারে ভূমিতলে লুটি
হয়তো সে করিতেছে খান খান
তীব্রঘাতে আপনার অভিমান।
দূর হতে দূরে গেনু সরে
প্রত্যাখ্যানলাঞ্ছনার বোঝা বক্ষে ধরে।
চরের বালুতে ঠেকা
পরিত্যক্ত তরীসম রহিল সে একা।

আশ্বিনের ভোরবেলা চেয়ে দেখি পথে যেতে যেতে
ক্ষীণ কুয়াশায় ঢাকা কচিধানখেতে
দাঁড়িয়ে রয়েছে বক,
দিগন্তে মেঘের গুচ্ছে দুলিয়াছে উষার অলক।
সহসা উঠিল বলি হৃদয় আমার,
দেখিলাম যাহা দেখিবার
নির্মল আলোকে
মোহমুক্ত চোখে।
কামনার যে পিঞ্জরে শান্তিহীন
অবরুদ্ধ ছিনু এতদিন

নিষ্ঠুর আঘাতে তার
ভেঙে গেছে দ্বার—
নিরন্তর আকাঙ্ক্ষার এসেছি বাহিরে
সীমাহীন বৈরাগ্যের তীরে।
আপনারে শীর্ণ করি
দিবসশর্বরী
ছিনু জাগি
মুষ্টিভিক্ষা লাগি।
উন্মুক্ত বাতাসে
খাঁচার পাখির গান ছাড়া আজি পেয়েছে আকাশে।

সহসা দেখিনু প্রাতে
যে আমারে মুক্তি দিল আপনার হাতে
সে আজো রয়েছে পড়ি
আমারি সে ভেঙে-পড়া পিঞ্জর আঁকড়ি।

২০ ভাদ্র ১৩৪২
[শান্তিনিকেতন]

দুঃখী

দুঃখী তুমি একা,
যেতে যেতে কটাক্ষেতে পেলে দেখা—
হোথা দুটি নরনারী নববসন্তের কুঞ্জবনে
দক্ষিণ পবনে।
বুঝি মনে হল, যেন চারিধার
সঙ্গীহীন তোমারেই দিতেছে ধিক্কার।
মনে হল, রোমাঞ্চিত অরণ্যের কিশলয়
এ তোমার নয়।
ঘনপুঞ্জ অশোকমঞ্জরী
বাতাসের আন্দোলনে ঝরি ঝরি

প্রহরে প্রহরে
যে নৃত্যের তরে
বিছাইছে আস্তরণ বনবীথিময়,
সে তোমার নয়।
ফাল্গুনের এই ছন্দ, এই গান,
এই মাধুর্যের দান,
যুগে যুগান্তরে
শুধু মধুরের তরে
কমলার আশীর্বাদ করিছে সঞ্চয়,
সে তোমার নয়।
অপর্যাপ্ত ঐশ্বর্যের মাঝখান দিয়া
অকিঞ্চনহিয়া
চলিয়াছ দিনরাতি,
নাই সাথি,
পাথেয় সম্বল নাই প্রাণে,
শুধু কানে
চারি দিক হতে সবে কয়—
'এ তোমার নয়'।

তবু মনে রেখো, হে পথিক,
দুর্ভাগ্য তোমার চেয়ে অনেক অধিক
আছে ভবে।
দুই জনে পাশাপাশি যবে
রহে একা তার চেয়ে একা কিছু নাই এ ভুবনে।
দুজনার অসংলগ্ন মনে
ছিদ্রময় যৌবনের তরী
অশ্রুর তরঙ্গে ওঠে ভরি—
বসন্তের রসরাশি সেও হয় দারুণ দুর্বহ,
যুগলের নিঃসঙ্গতা নিষ্ঠুর বিরহ।

তুমি একা, রিক্ত তব চিত্তাকাশে কোনো বিঘ্ন নাই;
সেথা পায় ঠাঁই
পান্থ মেঘদল—
লয়ে রবিরশ্মি লয়ে অশ্রুজল
ক্ষণিকের স্বপ্নস্বর্গ করিয়া রচনা
অস্তসমুদ্রের পারে ভেসে তারা যায় অন্যমনা।
চেয়ে দেখো, দোঁহে যারা হোথা আছে
কাছে-কাছে
তবু যাহাদের মাঝে
অন্তহীন বিচ্ছেদ বিরাজে—
কুসুমিত এ বসন্ত, এ আকাশ, এই বন,
খাঁচার মতন
রুদ্ধদ্বার, নাহি কহে কথা—
তারাও ওদের কাছে হারালো অপূর্ব অসীমতা।
দুজনের জীবনের মিলিত অঞ্জলি,
তাহারি শিথিল ফাঁকে দুজনের বিশ্ব পড়ে গলি।

৬ আষাঢ় ১৩৪০
দার্জিলিং

মূল্য

আমি এ পথের ধারে
একা রই—
যেতে যেতে যাহা-কিছু ফেলে রেখে গেছ মোর দ্বারে
মূল্য তার হোক না যতই
তাহে মোর দেনা
পরিশোধ কখনো হবে না।

দেব ব'লে যাহা কভু দেওয়া নাহি যায়,
চেয়ে যাহা কেহ নাহি পায়,

যে ধনের ভাণ্ডারের চাবি আছে
অন্তর্যামী কোন্ গুপ্ত দেবতার কাছে
কেহ নাহি জানে—
আগন্তুক, অকস্মাৎ সে দুর্লভ দানে
ভরিল তোমার হাত অন্যমনে পথে যাতায়াতে।

পড়ে ছিল গাছের তলাতে
দৈবাৎ বাতাসে ফল,
ক্ষুধার সম্বল।
অযাচিত সে সুযোগে খুশি হয়ে একটুকু হেসো ;
তার বেশি দিতে যদি এসো,
তবে জেনো মূল্য নেই
মূল্য তার সেই।

দূরে যাও, ভুলে যাও ভালো সেও—
তাহারে কোরো না হেয়
দানস্বীকারের ছলে
দাতার উদ্দেশে কিছু রেখে ধূলিতলে।

৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫
[শান্তিনিকেতন]

ঋতু-অবসান

একদা বসন্তে মোর বনশাখে যবে
মুকুলে পল্লবে
উদ্‌বারিত আনন্দের আমন্ত্রণ
গন্ধে বর্ণে দিল ব্যাপি ফাল্গুনের পবন গগন,
সেদিন এসেছে যারা বীথিকায়—
কেহ এল কুণ্ঠিত দ্বিধায় ;
চটুল চরণ কারো তৃণে তৃণে বাঁকিয়া বাঁকিয়া
নির্দয় দলনচিহ্ন গিয়েছে আঁকিয়া

অসংকোচ নূপুরঝংকারে,
কটাক্ষের খরধারে
উচ্চহাস্য করেছে শাণিত ;
কেহ বা করেছে ম্লান অমানিত
অকারণ সংশয়েতে আপনারে
অবগুণ্ঠনের অন্ধকারে ;
কেহ তারা নিয়েছিল তুলি
গোপনে ছায়ায় ফিরি তরুতলে ঝরা ফুলগুলি ;
কেহ ছিন্ন করি
তুলেছিল মাধবীমঞ্জরী,
কিছু তার পথে পথে ফেলেছে ছড়ায়ে,
কিছু তার বেণীতে জড়ায়ে
অন্যমনে গেছে চলে গুন্‌গুন্‌ গানে।

আজি এ ঋতুর অবসানে
ছায়াঘন বীথি মোর নিস্তব্ধ নির্জন ;
মৌমাছির মধু-আহরণ
হল সারা ;
সমীরণ গন্ধহারা
তৃণে তৃণে ফেলিছে নিশ্বাস।
পাতার আড়াল ভরি একে একে পেতেছে প্রকাশ
অচঞ্চল ফলগুচ্ছ যত,
শাখা অবনত।
নিয়ে সাজি
কোথা তারা গেল আজি—
গোধূলিছায়াতে হল লীন
যারা এসেছিল একদিন
কলরবে কান্না ও হাসিতে
দিতে আর নিতে।

আজি লয়ে মোর দানভার
ভরিয়াছি নিভৃত অন্তর আপনার—
অপ্রগল্‌ভ গূঢ় সার্থকতা
নাহি জানে কথা।
নিশীথ যেমন স্তব্ধ নিষুপ্ত ভুবনে
আপনার মনে
আপনার তারাগুলি
কোন্‌ বিরাটের পায়ে ধরিয়াছে তুলি
নাহি জানে আপনি সে—
সুদূর প্রভাত-পানে চাহিয়া রয়েছে নির্নিমেষে।

১৯ ভাদ্র ১৩৪২
[শান্তিনিকেতন]

নমস্কার

প্রভু,
সৃষ্টিতে তব আনন্দ আছে
মমত্ব নাই তবু,
ভাঙায় গড়ায় সমান তোমার লীলা।
তব নির্ঝরধারা
যে বারতা বহি সাগরের পানে
চলেছে আত্মহারা
প্রতিবাদ তারি করিছে তোমার শিলা।
দোঁহার এ দুই বাণী,
ওগো উদাসীন, আপনার মনে
সমান নিতেছ মানি—
সকল বিরোধ তাই তো তোমায়
চরমে হারায় বাণী।

বর্তমানের ছবি
দেখি যবে, দেখি, নাচে তার বুকে
ভৈরব ভৈরবী।
তুমি কী দেখিছ তুমিই তা জানো
নিত্যকালের কবি—
কোন্ কালিমার সমুদ্রকূলে
উদয়াচলের রবি।

বুঝিছে মন্দ ভালো।
তোমার অসীম দৃষ্টিক্ষেত্রে
কালো সে রয় না কালো।
অঙ্গার সে তো তোমার চক্ষে
ছদ্মবেশের আলো।

দুঃখ লজ্জা ভয়
ব্যাপিয়া চলেছে উগ্র যাতনা
মানববিশ্বময়;
সেই বেদনায় লভিছে জন্ম
বীরের বিপুল জয়।
হে কঠোর, তুমি সম্মান দাও,
দাও না তো প্রশ্রয়।

তপ্ত পাত্র ভরি
প্রসাদ তোমার রুদ্র জ্বালায়
দিয়েছ অগ্রসরি—
যে আছে দীপ্ত তেজের পিপাসু
নিক তাহা পান করি।

নিঠুর পীড়নে যাঁর
তন্দ্রাবিহীন কঠিন দণ্ডে
মথিছে অন্ধকার,

তুলিছে আলোড়ি অমৃতজ্যোতি,
তাঁহারে নমস্কার।

৩ অগস্ট ১৯৩৫
শান্তিনিকেতন

আশ্বিনে

আকাশ আজিকে নির্মলতম নীল,
উজ্জ্বল আজি চাঁপার বরন আলো;
সবুজে সোনায় ভূলোকে দ্যুলোকে মিল
দূরে-চাওয়া মোর নয়নে লেগেছে ভালো।
ঘাসে ঝ'রে-পড়া শিউলির সৌরভে
মন-কেমনের বেদনা বাতাসে লাগে।
মালতীবিতানে শালিকের কলরবে
কাজ-ছাড়া-পাওয়া ছুটির আভাস জাগে।
এমনি শরতে ছেলেবেলাকার দেশে
রূপকথাটির নবীন রাজার ছেলে
বাহিরে ছুটিতে কী জানি কী উদ্দেশে
এপারের চিরপরিচিত ঘর ফেলে।
আজি মোর মনে সে রূপকথার মায়া
ঘনায়ে উঠিছে চাহিয়া আকাশ-পানে;
তেপান্তরের সুদূর আলোকছায়া
ছড়ায়ে পড়িল ঘরছাড়া মোর প্রাণে।
মন বলে, 'ওগো অজানা বন্ধু, তব
সন্ধানে আমি সমুদ্রে দিব পাড়ি।
ব্যথিত হৃদয়ে পরশরতন লব
চিরসঞ্চিত দৈন্যের বোঝা ছাড়ি।
দিন গেছে মোর, বৃথা বয়ে গেছে রাতি,
বসন্ত গেছে দ্বারে দিয়ে মিছে নাড়া;
খুঁজে পাই নাই শূন্য ঘরের সাথি—
বকুলগন্ধে দিয়েছিল বুঝি সাড়া।

আজি আশ্বিনে প্রিয়-ইঙ্গিত-সম
নেমে আসে বাণী করুণকিরণ-ঢালা—
চিরজীবনের হারানো বন্ধু মম,
এবার এসেছে তোমারে খোঁজার পালা।'

৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫
শান্তিনিকেতন

নিঃস্ব

কী আশা নিয়ে এসেছ হেথা উৎসবের দল।
অশোকতরুতল
অতিথি লাগি রাখে নি আয়োজন।
হায় সে নির্ধন
শুকানো গাছে আকাশে শাখা তুলি
কাঙালসম মেলেছে অঙ্গুলি;
সুরসভার অপ্সরার চরণঘাত মাগি
রয়েছে বৃথা জাগি।

আরেকদিন এসেছ যবে সেদিন ফুলে ফুলে
যৌবনের তুফান দিল তুলে।
দখিনবায়ে তরুণ ফাল্গুনে
শ্যামল বনবল্লভের পায়ের ধ্বনি শুনে
পল্লবের আসন দিল পাতি;
মর্মরিত প্রলাপবাণী কহিল সারারাতি।

যেয়ো না ফিরে, একটু তবু বোসো,
নিভৃত তার প্রাঙ্গণেতে এসেছ যদি— বোসো।
ব্যাকুলতার নীরব আবেদনে
যে দিন গেছে সে দিনখানি জাগায়ে তোলো মনে।
যে দান মৃদু হেসে
কিশোর করে নিয়েছ তুলি, পরেছ কালো কেশে,

তাহারি ছবি স্মরিয়ো মোর শুকানো শাখা-আগে
প্রভাতবেলা নবীনারুণরাগে।
সেদিনকার গানের থেকে চয়ন করি কথা
ভরিয়া তোলো আজি এ নীরবতা।

২৭ ভাদ্র ১৩৪২
শান্তিনিকেতন

দেবতা

দেবতা মানবলোকে ধরা দিতে চায়
মানবের অনিত্য লীলায়।
মাঝে মাঝে দেখি তাই—
আমি যেন নাই,
ঝংকৃত বীণার তন্তসম দেহখানা
হয় যেন অদৃশ্য অজানা;
আকাশের অতিদূর সূক্ষ্ম নীলিমায়
সংগীতে হারায়ে যায়;
নিবিড় আনন্দরূপে
পল্লবের স্তূপে
আমলকীবীথিকার গাছে গাছে
ব্যাপ্ত হয় শরতের আলোকের নাচে।
প্রেয়সীর প্রেমে
প্রত্যহের ধূলি-আবরণ যায় নেমে
দৃষ্টি হতে, শ্রুতি হতে;
স্বর্গসুধাস্রোতে
ধৌত হয় নিখিলগগন—
যাহা দেখি যাহা শুনি তাহা যে একান্ত অতুলন।
মর্তের অমৃতরসে দেবতার রুচি
পাই যেন আপনাতে, সীমা হতে সীমা যায় ঘুচি।

দেবসেনাপতি
নিয়ে আসে আপনার দিব্যজ্যোতি
যখন মরণপণে হানি অমঙ্গল।
ত্যাগের বিপুল বল
কোথা হতে বক্ষে আসে ;
অনায়াসে
দাঁড়াই উপেক্ষা করি প্রচণ্ড অন্যায়ে
অকুণ্ঠিত সর্বস্বের ব্যয়ে।
তখন মৃত্যুর বক্ষ হতে
দেবতা বাহিরি আসে অমৃত-আলোতে ;
তখন তাহার পরিচয়
মর্তলোকে অমর্তেরে করি তোলে অক্ষুন্ন অক্ষয়

২৬ শ্রাবণ ১৩৪২
শান্তিনিকেতন

শেষ

বহি লয়ে অতীতের সকল বেদনা,
ক্লান্তি লয়ে, গ্লানি লয়ে, লয়ে মুহূর্তের আবর্জনা,
লয়ে প্রীতি,
লয়ে সুখস্মৃতি,
আলিঙ্গন ধীরে ধীরে শিথিল করিয়া
এই দেহ যেতেছে সরিয়া
মোর কাছ হতে।
সেই রিক্ত অবকাশ যে আলোতে
পূর্ণ হয়ে আসে
অনাসক্ত আনন্দ-উল্লাসে
নির্মল পরশ তার
খুলি দিল গত রজনীর দ্বার।

নবজীবনের রেখা
আলোরূপে প্রথম দিতেছে দেখা ;
কোনো চিহ্ন পড়ে নাই তাহে,
কোনো ভার ; ভাসিতেছে সত্তার প্রবাহে
সৃষ্টির আদিমতারা-সম
এ চৈতন্য মম।
ক্ষোভ তার নাই দুঃখে সুখে ;
যাত্রার আরম্ভ তার নাহি জানি কোন্ লক্ষ্যমুখে।
পিছনের ডাক
আসিতেছে শীর্ণ হয়ে ; সম্মুখেতে নিস্তব্ধ নির্বাক্
ভবিষ্যৎ জ্যোতির্ময়
অশোক অভয়,
স্বাক্ষর লিখিল তাহে সূর্য অস্তগামী।
যে মন্ত্র উদাত্ত সুরে উঠে শূন্যে সেই মন্ত্র— 'আমি'।

৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫
শান্তিনিকেতন

জাগরণ

দেহে মনে সুপ্তি যবে করে ভর
সহসা চৈতন্যলোকে আনে কল্পান্তর,
জাগ্রত জগৎ চলে যায়
মিথ্যার কোঠায়।
তখন নিদ্রার শূন্য ভরি
স্বপ্নসৃষ্টি শুরু হয়, ধ্রুব সত্য তারে মনে করি।
সেও ভেঙে যায় যবে
পুনর্বার জেগে উঠি অন্য এক ভবে ;
তখনি তাহারে সত্য বলি,
নিশ্চিত স্বপ্নের রূপ অনিশ্চিতে কোথা যায় চলি।

তাই ভাবি মনে,
যদি এ জীবন মোর গাঁথা থাকে মায়ার স্বপনে,
মৃত্যুর আঘাতে জেগে উঠে
আজিকার এ জগৎ অকস্মাৎ যায় টুটে,
সবকিছু অন্য-এক অর্থে দেখি—
চিত্ত মোর চমকিয়া সত্য বলি তারে জানিবে কি ?
সহসা কি উদিবে স্মরণে
ইহাই জাগ্রত সত্য অন্যকালে ছিল তার মনে ?

২৯ ভাদ্র ১৩৪২
শান্তিনিকেতন

নাটক ও প্রহসন

শেষরক্ষা

নাটকের পাত্রগণ

চন্দ্রকান্ত	ক্ষান্তমণি
বিনোদ	ইন্দু
গদাই	কমল
নিবারণ	বুড়ি
শিব	ঠাকুরদাসী
ভৃত্য	
নলিনাক্ষ	
শ্রীপতি	
ভূপতি	
দরজি	
ললিত	

শেষরক্ষা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নিবারণবাবুর বাসা

ক্ষান্তমণি ও ইন্দু

ক্ষান্তমণি। কী আর বলব আমি তোকে, আমার তো হাড় জ্বালাতন। আমার ঘরে যতগুলো লোক জোটে সব চেয়ে লক্ষ্মীছাড়া হচ্ছে ঐ বিনোদ।

ইন্দু। সেইজন্যেই লক্ষ্মীদের মহলে সব চেয়ে তার পসার ভারী— লক্ষ্মী যে ছাড়ে লক্ষ্মী তারই পিছনে পিছনে ছোটে।

ক্ষান্তমণি। কেন ভাই, তোর ওকে পছন্দ নাকি?

ইন্দু। আরেকটু হলেই হতে পারত। কিন্তু সে ফাঁড়া কেটে গেছে।

ক্ষান্তমণি। কী ক'রে কাটল?

ইন্দু। দিদি আগেই তাকে পছন্দ করে বসে আছে। আমাকে আর সময় দিলে না।

ক্ষান্তমণি। বলিস কী! কমল নাকি? সে ওকে দেখলে কখন?

ইন্দু। দেখে নি। সেইটেই তো বিপদ। শব্দভেদী বাণের কথা রামায়ণে শোন নি?

ক্ষান্তমণি। শুনেছি।

ইন্দু। সব চেয়ে শক্ত বাণ হল সেইটে। শব্দের রাস্তা বেয়ে কখন এসে বুকে বেঁধে, কেউ দেখতেই পায় না।

ক্ষান্তমণি। একটু ভাই, বুঝিয়ে বল্। তোদের মতো আমার অত পড়াশুনো নেই।

ইন্দু। সেইটেতেই তোমার রক্ষে। নইলে কেবল পড়াশোনার জোরেই মরণ হতে পারত, দেখাশোনার দরকার হত না। তোমার বিনোদবাবু যে কবি তা জান না!

ক্ষান্তমণি। তা হোক-না কবি, হয়েছে কী?

ইন্দু। কমলদিদি ওর বই লুকিয়ে পড়ে। সেইটেই খারাপ লক্ষণ। বিনোদ-বাবুর 'আঙুরলতা' বইখানা ওর বালিশের নীচে থাকে। আর তাঁর 'কাননকুসুমিকা' রেখেছে ধোবার বাড়ির হিসেবের খাতার তলায়।

ক্ষান্তমণি। কিন্তু ওর মুখে তো বিনোদবাবুর নামও শুনি নি।

ইন্দু। নামটা বুকের মধ্যে বাসা করেছে, তাই মুখে বের হতে চায় না।

ক্ষান্তমণি। কী যে বলিস, বুঝতে পারি নে— ওর লেখায় এমন কী মন্ত্র আছে বল্‌ তো। আমাকে একটু নমুনা দে দেখি।

ইন্দু। তবে শোনো—

রসনায় ভাষা নাই, থাকি চুপে চুপে,
অন্তরে জোগায় সে যে বাণী।
সময় পায় না আঁখি মজিবারে রূপে,
গোপনে স্বপনে তারে জানি।

ক্ষান্তমণি। হায় রে, কী শব্দভেদী বাণেরই নমুনা!

ইন্দু। কমলদিদি খাতায় লিখে রেখেছে, এই ওর জপের মন্ত্র। শব্দভেদী বাণের যে জোর কত তা প্রত্যক্ষ দেখতে চাও?

ক্ষান্তমণি। চাই বৈকি, জেনে রাখা ভালো।

ইন্দু। (নেপথ্যে চাহিয়া) দিদি! দিদি!

সেলাই হাতে কমলের প্রবেশ

কমল। কেন? হয়েছে কী?

ইন্দু। এখনো বিশেষ কিছু হয় নি, কিন্তু হতে কতক্ষণ? বিধাতা আমাদের চেয়েও পর্দানশীন, আড়ালে বসে বসে তোমার সাধের স্বপ্নকে মূর্তি দিচ্ছেন।

কমল। সে খবর দেবার জন্যে তোমায় ডাকাডাকি করতে হবে না।

ইন্দু। তা জানি ভাই, খবর পাকা হলে বিধাতা আপনিই দূত পাঠিয়ে দেবেন। আমি সেজন্যে ভাবিও নি। সখীপরিষদে আমাকে গান গাইতে ধরেছে। স্বরলিপি থেকে তুমি যে নতুন গানটি শিখেছ আমাকে শিখিয়ে দাও। ক্ষান্তদিদিও সেইজন্যে বসে আছেন— আমি জানি, তোমার গান উনি চন্দ্রবাবুর চটি জুতোর আওয়াজের প্রায় সমতুল্য বলেই জানেন।

ক্ষান্তমণি। ইন্দুর কথা শোনো একবার! এ আবার আমি কবে বললুম!

ইন্দু। তা হলে সমতুল্য বলাটা ভুল হয়েছে, তার চেয়ে নাহয় কিছু নীরসই হল। সে তর্ক পরে হবে, তুমি গান গাও।

কমল। গান

ডাকিল মোরে জাগার সাথি।
প্রাণের মাঝে বিভাস বাজে,
প্রভাত হল আঁধার রাতি।
বাজায় বাঁশি তন্দ্রাভাঙা,
ছড়ায় তারি বসন রাঙা,
ফুলের বাসে এই বাতাসে
কী মায়াখানি দিয়েছে গাঁথি।
গোপনতম অন্তরে কী
লেখনরেখা দিয়েছে লেখি!
মন তো তারি নাম জানে না,
রূপ আজিও নয় যে চেনা,
বেদনা মম বিছায়ে দিয়ে
রেখেছি তারি আসন পাতি।

ইন্দু। ক্ষান্তদিদি, ঐ চেয়ে দেখো, বাণ পৌঁচেছে!

ক্ষান্তমণি। কোথায়?

ইন্দু। আমাদের এই গলির আকাশ পার হয়ে, ঠেকেছে গিয়ে তোমাদের বাড়ির ঐ দরজাতে।

ক্ষান্তমণি। ইন্দু, তুই স্বপ্ন দেখছিস নাকি?

ইন্দু। ঐ দেখো-না, তোমাদের বন্ধ দরজার খড়্‌খড়ে খুলে গেছে।

ক্ষান্তমণি। তা তো দেখছি।

ইন্দু। কমলদিদি, বুঝতে পেরেছ?

কমল। আঃ, কী যে বকিস তার ঠিক নেই।

ইন্দু। ঐ খোলা খড়্‌খড়ির ফাঁক দিয়ে কবিকুঞ্জবনের দীর্ঘনিশ্বাস উচ্ছ্বসিত। ঐ খড়্‌খড়ির পিছনে একটা ধড়্‌ফড়ানি দেখতে পাচ্ছ?

কমল। কিসের ধড়্‌ফড়ানি?

ইন্দু। সেই খবরটাই তো চোখের আড়ালে রয়ে গেল।

গান

হায় রে,
ওরে যায় না কি জানা!
নয়ন ওরে খুঁজে বেড়ায়,
পায় না ঠিকানা।
অলখ পথেই যাওয়া-আসা,
শুনি চরণধ্বনির ভাষা,
গন্ধে শুধু হাওয়ায় হাওয়ায়
রইল নিশানা।
কেমন ক'রে জানাই তারে,
বসে আছি পথের ধারে।
প্রাণে এল সন্ধ্যাবেলা
আলোয় ছায়ায় রঙিন খেলা,
ঝ'রে-পড়া বকুলদলে
বিছায় বিছানা।

ক্ষান্তমণি। ওলো ইন্দু, দেখ দেখ খড়্‌খড়ে আরো ফাঁক হয়ে উঠল যে!

ইন্দু। এবার তুমি যদি গান ধর তা হলে দেয়ালসুদ্ধ ফাঁক হয়ে যাবে!

ক্ষান্তমণি। আর ঠাট্টা করতে হবে না, যাঃ। তোর কথা শুনে ভেবেছিলুম, একা কমলই বুঝি শব্দভেদী বাণের তীরন্দাজ। বিধাতা কি তোদের সকলেরই গলায় বাণ বোঝাই করেছেন! হাতের কাছে এত বিপদ জমা হয়ে আছে, এ তো জানতুম না।

ইন্দু। সৃষ্টিকর্তা সংকল্প করেছেন পুরুষমেধ যজ্ঞ করতে— তারি সহায়তায় নারীদের ডাক পড়েছে। সবাই ছুটে আসছে, কেউ কণ্ঠ নিয়ে, কেউ কটাক্ষ নিয়ে; কারো বা কুটিল হাস্য, কারো বা কুঞ্চিত কেশকলাপ; কারো বা সর্ষের তেল ও লঙ্কার বাটনা-যোগে বুক-জ্বালানি রান্না।

ক্ষান্তমণি। কিন্তু তোদের সব বাণই কি ঐ একটা খড়্‌খড়ে দিয়ে গলবে নাকি?

ইন্দু। কবির হৃদয়টা দরাজ, বড়ো বোনের পাকা হাত আর ছোটো বোনের কাঁচা হাত কারো লক্ষ্যই ফসকায় না।

ক্ষান্তমণি। তা যেন হল, তার পরে অংশ নিয়ে তোদের মামলা বাধবে না?

ইন্দু। তাই তো বলে রেখেছি, আমি দাবি করব না।

কমল। এত নিঃস্বার্থ হবার দরকার কী?

ইন্দু। কমলদিদি, জীবনের অঙ্কশাস্ত্রে পুরুষরা আছে গুণের কোঠায়, মেয়েরা ভাগের কোঠায়। ওদের বেলায় দুইয়ের দ্বারা হয় দ্বিগুণ, আমাদের বেলায় দুইয়ের দ্বারা হয় দুভাগ। তাই তোমাকে রাস্তা ছেড়ে দিয়েছি— নইলে দুই বোনে মিলে ঐ খড়্‌খড়েটার কব্‌জা এতদিনে ঝর্‌ঝরে করে দিতুম।

কমল। কেন, রাস্তা কি আমি ছাড়তে জানি নে?

ইন্দু। আমি ওঁর কবিতাবিছানো রাস্তায় এক পা চলতে পারব না। মানেই বুঝতে পারি নে— হুঁচট খেয়ে মরব।

ক্ষান্তমণি। তোরা দুজনে মিলে রফানিষ্পত্তি করে নে, আমার কাজ আছে, যাই।

ইন্দু। বেলা গিয়েছে, এখন আবার তোমার কাজ?

ক্ষান্তমণি। যত বেকারের দল, কখন কী খেয়াল যায় ঠিক নেই। হয়তো হঠাৎ হুকুম হবে, তপ্‌সি মাছ ভাজা চাই; নয়তো কড়াইশুটির কচুরি, নয়তো হাঁসের ডিমের বড়া।

ইন্দু। একটু দাঁড়াও, আমরাও যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে কর্মবিভাগ করে নেব। আমরা লাগব চেখে দেখবার কঠিন কাজে। কমলদিদি, ঐ দেখো, খড়্‌খড়েটা লুব্ধ চকোরের চঞ্চুর মতো এখনো হাঁ করে রয়েছে। দেখে দুঃখ হচ্ছে।

কমল। এত দয়া যদি তো সুধা তুমিই ঢালো-না। আমি চললুম।

ইন্দু। না, দিদি।

গান

যাবার বেলা শেষ কথাটি যাও বলে,
কোন্‌খানে যে মন লুকানো দাও বলে।
চপল লীলা ছলনাভরে
বেদনখানি আড়াল করে,
যে বাণী তব হয় নি বলা নাও বলে।

হাসির বাণে হেনেছ কত শ্লেষকথা,
নয়নজলে ভরো গো আজি শেষকথা।
হায় রে অভিমানিনী নারী,
বিরহ হল দ্বিগুণ ভারী
দানের ডালি ফিরায়ে নিতে চাও বলে।

আচ্ছা ভাই, ক্ষান্তদিদি, ঐ খড়্‌খড়ের পিছনে কোন্ মানুষটি বসে আছে আন্দাজ করো দেখি। চন্দরবাবু?

ক্ষান্তমণি। না, ভাই, তার আর যাই দোষ থাক, তোদের শব্দভেদী বাণ তাকে পৌঁছয় না, সে আমি খুব দেখে নিয়েছি।

ইন্দু। অর্থাৎ, আমাদের চন্দ্রের যা কলঙ্ক সেটা কেবল মুখের উপরে, তার জ্যোৎস্নায় কোনো দাগ পড়ে না। তোমাদের লক্ষ্মীছাড়া দলে আর কে আছে নাম করো দেখি।

ক্ষান্তমণি। আর-একজন আছে, তার নাম গদাই।

ইন্দু। আরে, ছি ছি, ছি ছি! অমন নাম যার তার খড়্খড়ে চিরদিন যেন বোজা থাকে।

ক্ষান্তমণি। নাম শুনেই যে তোর—

ইন্দু। নামের দাম কম নয় দিদি। ভেবে দেখো তো, দৈবদুর্যোগে গদাই যদি 'কাননকুসুমিকা'র কবি হত তা হলে কবির নাম জপ করবার সময় দিদি কী মুশকিলেই পড়ত। ভক্তি হত না, সুতরাং মুক্তিও পেত না।

কমল। দিদির মুক্তির জন্যে তোমাকে অত ভাবতে হবে না। এখন নিজের কথা চিন্তা করবার সময় হয়েছে।

ইন্দু। সেইজন্যেই তো নাম বাছাই করতে লেগে গেছি। সময় নষ্ট করতে চাই নে। আমার স্বয়ম্বরসভায় নিমন্ত্রণের ফর্দ থেকে গদাই নামটা কাটা পড়ল।

কমল। তা হলে এইবেলা তোমার পছন্দসই নামের একটা ফর্দ করা যাক। কুমুদ কিরকম?

ইন্দু। চলে যায়।

কমল। নিকুঞ্জ?

ইন্দু। চলতেও পারে, কিন্তু উপবাসের মুখে, অর্থাৎ দ্বাদশী তিথিতে।

কমল। পরিমল?

ইন্দু। মালাবদলের সময় নাম-বদল করতে হবে, সে হবে ইন্দু আমি হব পরিমল। যা হোক এগুলো চলতেও পারে— কিন্তু গদাই? নৈব নৈব চ।

ক্ষান্ত। কী যে পাগলামি করছিস ইন্দু! চল্, আমার কাজ আছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

চন্দ্রবাবুর বাসা

চন্দ্র। ভাই বিনদা, তোমাকে দেখে বোধ হচ্ছে, আজ তোমার ভালোমন্দ একটা-কিছু হল বলে, কিম্বা হয়েই বসেছে।

বিনোদ। তাই নাকি?

চন্দ্রকান্ত। আজ তোমার দৃষ্টিটা ছুটেছে যেন কোন্ মায়ামৃগীর পিছু পিছু। গেছে তার পথ হারিয়ে! ওহে, আজকের হাওয়ায় তোমার গায়ে কারো ছোঁয়াচ লাগছে নাকি?

বিনোদ। কিসে ঠাওরালে?

চন্দ্রকান্ত। মুখের ভাবে।

বিনোদ। ভাবটা কিরকম দেখছ?

চন্দ্রকান্ত। যেন ইন্দ্রধনু উঠেছে আকাশে, আর তারই ছায়াটা শিউরে উঠছে নদীর ঢেউয়ে।

বিনোদ। বলে যাও।

চন্দ্রকান্ত। যেন আষাঢ়-সন্ধ্যাবেলায় জুঁইগাছের গাঁঠে গাঁঠে কুঁড়ি ধরল বলে, আর দেরি নেই।

বিনোদ। আরো কিছু আছে?

চন্দ্রকান্ত। যেন—

নব জলধরে বিজুরী-রেহা
দ্বন্দ্ব পসারি গেলি।

বিনোদ। থামলে কেন, বলে যাও।

চন্দ্রকান্ত। যেন বাঁশিটি আজ ঠেকেছে এসে গুণীর অধরে। সত্যি করে বল্ ভাই, লুকোস্ নে আমার কাছে।

বিনোদ। তা হতে পারে। একটা কোন্ ইশারা আজ গোধূলিতে উড়ে বেড়াচ্ছে, তাকে কিছুতে ধরতে পারছি নে।

চন্দ্রকান্ত। ইশারা উড়ে বেড়াচ্ছে! সেটা প্রজাপতির ডানায় নাকি?

বিনোদ। যেন অন্ধ মৌমাছির কাছে রজনীগন্ধার গন্ধের ইশারা।

চন্দ্রকান্ত। হায় হায়, হাওয়াটা কোন্ দিক থেকে বইছে, তার ঠিকানাই পেলে না?

বিনোদ। পোস্ট-আপিসের ঠিকানাটা পাওয়া শক্ত নয় চন্দরদা! কিন্তু স্বর্ণরেণু কোথায় আছে লুকিয়ে সেই ঠিকানাটাই—

চন্দ্রকান্ত। সর্বনাশ করলে! এরই মধ্যে স্বর্ণের কথাটা মনে এসেছে? সাদা ভাষায় ওর মানে হচ্ছে পণের টাকা— তোমার রজনীগন্ধার গন্ধটা তা হলে ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীটের দিক থেকেই এল বুঝি?

বিনোদ। ছি ছি চন্দ্র, এমন কথাটাও তোমার মুখ দিয়ে বেরোল! আমি তুচ্ছ টাকার কথাই কি ভাবছি?

চন্দ্রকান্ত। আজকালকার দিনে কোন্‌টা তুচ্ছ, কন্যাটা না পণটা, তার হিসেব করা শক্ত নয়। যুবকরা তো সোনার মৃগ দেখেই ছোটে, সীতা পড়ে থাকেন পশ্চাতে।

বিনোদ। যুবক যে কে, সে কি তার বয়স গুণে বের করতে হবে, আর সোনার রেণু যে কাকে বলে সে কি বুঝবে তার ভরি ওজন করে ?

চন্দ্রকান্ত। এটা বেশ বলেছ, তোমার কবিতায় লিখে ফেলো হে, কথাটা আজ বাদে কাল হারিয়ে না যায়। আমার একটা লাইন মনে এল, তুমি কবি, তার পাদপূরণ করে দাও দেখি—

ও ভোলা মন, বল্‌ দেখি ভাই,
কোন্‌ সোনা তোর সোনা।

বিনোদ। কেনাবেচার দেনালেনায়
যায় না তারে গোনা।

চন্দ্রকান্ত। ভ্যালা মোর দাদা ! আচ্ছা, আর-এক লাইন—

ও ভোলা মন, বল্‌ সে সোনা
কেমন করে গলে।

বিনোদ। গলে বুকের দুখের তাপে,
গলে চোখের জলে।

চন্দ্রকান্ত। বহুৎ আচ্ছা ! আর-এক লাইন—

ও ভোলা মন, সেই সোনা তোর
কোন্‌ খনিতে পাই ?

বিনোদ। সেই বিধাতার খেয়ালে যার
ঠিক-ঠিকানা নাই।

চন্দ্রকান্ত। ক্যা বাৎ। আচ্ছা, আর-এক লাইন—

ও ভোলা মন, সোনার সে ধন
রাখবি কেমন করে ?

বিনোদ। রাখব তারে ধ্যানের মাঝে
মনের মধ্যে ভরে।

চন্দ্রকান্ত। বাস্‌, আর দরকার নেই, ফুল্‌ মার্ক পেয়েছ— পাস্‌ড্‌ উইথ্‌ অনার্স। আর ভয় নেই, সন্ধানে বেরিয়ে পড়া যাক—

সোনার স্বপন ধরুক-না রূপ
অপরূপের হাটে।

সোনার বাঁশি বাজাও, রসিক,
রসের নবীন নাটে।

বিনোদ। চন্দরদা, কে বলে তুমি কবি নও?

চন্দ্রকান্ত। ছায়ায় পড়ে গেছি ভাই, চন্দ্রগ্রহণ লেগেছে— তোমরা না থাকলে আমিও কবি বলে চলে যেতে পারতুম, কবিসম্রাট নাও যদি হতুম অন্তত কবি-তালুকদার হওয়া অসম্ভব ছিল না। দেখেছি, প্রাণের ভিতরটাতে মাঝে মাঝে রস উছলে ওঠে, কিন্তু তার ধারাটা মাসিকপত্র পর্যন্ত পৌঁছয় না।

বিনোদ। ঘরে আছে রসসমুদ্র, সেইখানেই লুপ্ত হয়ে যায়!

চন্দ্রকান্ত। এক্‌সেলেন্ট্‌। কবি না হলে এই গূঢ় খবর আন্দাজ করতে পারত কে বলো। ঐ যে আসছে আমাদের মেডিকাল্‌ স্টুডেন্ট্‌।

গদাইয়ের প্রবেশ

চন্দ্রকান্ত। এই যে, গদাই! শরীরতত্ত্ব ছেড়ে হঠাৎ কবির দরবারে যে? তোমার বাবা জানলে যে শিউরে উঠবেন।

গদাই। না ভাই, প্যাথলজি স্টাডি করবার পক্ষে তোদের সংসর্গটা একেবারেই ব্যর্থ নয়। তোদের হৃদয়টা যে সর্বদাই আইঢাই করছে, সেটা অজীর্ণ রোগের একটি নামান্তর তা জানিস? বেশ ভালো করে আহারটি করলে এবং সেটি হজম করতে পারলে কবিত্বরোগ কাছে ঘেঁষতে পারে না। আধ-পেটা করে খাও, অম্বলের ব্যামোটি বাধাও, আর অমনি কোথায় আকাশের চাঁদ, কোথায় দক্ষিণের বাতাস, কোথায় কোকিলপক্ষীর ডাক, এই নিয়ে প্রাণ আনচান করতে থাকে; জানলার কাছে বসে বসে মনে হয় কী যেন চাও, যা চাও সেটি যে বাই-কার্বোনেট্‌-অফ-সোডা তা কিছুতেই বুঝতে পার না।

চন্দ্রকান্ত। হৃদ্‌যন্ত্রটির বাসা পাকযন্ত্রের ঠিক উপরেই, এ কথা কবিরা মানে না, কিন্তু কবিরাজরা মানে।

গদাই। ঐ যে যাকে ভালোবাসা বল সেটা যে শুদ্ধ একটা স্নায়ুর ব্যামো, তার আর সন্দেহ নাই। আমার বিশ্বাস অন্যান্য ব্যামোর মতো তারও একটা ওষুধ বের হবে।

চন্দ্রকান্ত। হবে বৈকি। কাগজে বিজ্ঞাপন বেরোবে— 'হৃদয়-বেদনার জন্য অতি উত্তম মালিশ, উত্তম মালিশ, উত্তম মালিশ! বিরহনিবারণী বটিকা; রাত্রে একটি সকালে একটি সেবন করিলে বিরহভার একেবারে নিঃশেষে অবসান।'

আচ্ছা, ভাই বিনু, এক কথায় বলে দে দেখি কিরকম মেয়ে তোর পছন্দ।

বিনোদ। আমি কিরকম চাই জান? যাকে কিছু বোঝবার জো নেই। যাকে ধরতে গেলে পালিয়ে যায়, পালাতে গেলে যে ধরে টেনে নিয়ে আসে।

চন্দ্রকান্ত। বুঝেছি। যে কোনো কালেই পুরোনো হবে না। মনের কথা টেনে বলেছ ভাই! পাওয়া শক্ত। আমরা ভুক্তভোগী, জানি কিনা, বিয়ে করলেই মেয়েগুলো দুদিনেই বহুকেলে পড়া পুঁথির মতো হয়ে আসে; মলাটটা আধখানা ছিঁড়ে ঢল্‌ঢল্‌ করছে, পাতাগুলো দাগি হয়ে খুলে আসছে, কোথায় সে আঁটসাঁট বাঁধুনি, কোথায় সে সোনার জলের ছাপ! আচ্ছা, সে যেন হল, আর চেহারা কেমন?

বিনোদ। ছিপ্‌ছিপে, মাটির সঙ্গে অতি অল্পই সম্পর্ক, যেন সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব।

চন্দ্রকান্ত। আর বেশি বলতে হবে না, বুঝে নিয়েছি। তুমি চাও পদ্যের মতো চোদ্দটি অক্ষরে বাঁধাছাঁদা, চলতে ফিরতে ছন্দটি রেখে চলে; এ দিকে মল্লিনাথ, ভরত শিরোমণি, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন তার টিকে-ভাষ্য করে থই পায় না। বুঝেছ বিন্‌দা, চাইলেই তো পাওয়া যায় না—

বিনোদ। কেন, তোমার কপালে তো মন্দ জোটে নি।

চন্দ্রকান্ত। মন্দ বলতে সাহস করি নে, কিন্তু ভাই, সে গদ্য, তাতে ছাঁদ নেই, ঢিল কলমে লেখা।

গদাই। আর ছাঁদে কাজ নেই ভাই! আবার তোমার কিরকম ছাঁদ সেটাও তো দেখতে হবে।

চন্দ্রকান্ত। তোরা বুঝবি নে, গদাই, ভিতরে গীতগোবিন্দের অল্প একটু আমেজ আছে; সুযোগ ঘটলে ললিতলবঙ্গলতার সঙ্গে ছন্দের মিল হতেও পারত। চাঁদের আলোয় মুখের দিকে চেয়ে বেলফুলের মালা হাতে প্রেয়সী যদি বলত—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল

নেহাত অসহ্য হত না। প্রেয়সী সর্বদা এসেও থাকেন, কিছুই যে বলেন না এত বড়ো বদনাম দিতে পারব না। কিন্তু বাক্যগুলো, বিশেষত তার সুরটা এমনটি হয় না—

গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

গদাই। দেখো চন্দরদা, বিয়ে করবার প্রসঙ্গে পছন্দ করার কথাটা একেবারেই খাটে না। বিয়েটা হল মনোথিইজ্‌ম্ আর পছন্দটা হল পলিথিইজ্‌ম্। দুটোর থিওলজি একেবারে উল্‌টো। বিয়ের ডেফিনিশনই হচ্ছে জন্মের মতো পছন্দ-বায়ুটাকে

খতম করে দেওয়া। তেত্রিশ কোটিকে একের মধ্যে নিঃশেষে বিসর্জন করা।

[পাশের বাড়ি হইতে গানের শব্দ

বিনোদ। ঐ শোনো, গান।

গদাই। কার গান হে?

চন্দ্রকান্ত। চুপ করে খানিকটা শোনোই-না। পরে পরিচয় দেব।

নেপথ্যে গান

কাছে যবে ছিল, পাশে
হল না যাওয়া।
চলে যবে গেল, তারি
লাগিল হাওয়া।
যবে ঘাটে ছিল নেয়ে
তারে দেখি নাই চেয়ে,
দূর হতে শুনি স্রোতে
তরণী বাওয়া।

যেখানে হল না খেলা
সে খেলাঘরে
আজি নিশিদিন মন
কেমন করে।
হারানো দিনের ভাষা
স্বপ্নে আজি বাঁধে বাসা,
আজ শুধু আঁখিজলে
পিছনে চাওয়া।

চন্দ্রকান্ত। বিন্‌দা, আজকাল রাধিকার দলই বাঁশি বাজাতে শিখেছে, কলির কৃষ্ণগুলোকে বাসা থেকে পথে বের করবে। দেখো-না নাড়ীটা বেশ একটু দ্রুত চলছে।

বিনোদ। চন্দ্র, আজ কী করব ভাবছিলুম, একটা মতলব মাথায় এসেছে।

চন্দ্রকান্ত। কী বলো দেখি।

বিনোদ। চলো, যে মেয়েটি গান গায় ওর সঙ্গে আজই আমার বিয়ের সম্বন্ধ করে আসি গে।

১৭॥১০

চন্দ্রকান্ত। বল কী!

বিনোদ। আর তো বসে বসে ভালো লাগছে না।

চন্দ্রকান্ত। কিন্তু দেখাশুনা তো করবে, আলাপ-পরিচয় তো করতে হবে? আমরা বিয়ে করেছিলুম চোখ বুজে বড়ি গেলার মতো, মুখে স্বাদ পেলুম না, পেটের মধ্যে পৌঁছে খুব কষে ক্রিয়া করতে লাগল, কিন্তু তোদের তা তো চলবে না।

বিনোদ। না, তাকে দেখতে চাই নে। আমি ঐ গানরূপটিকে বরণ করব।

চন্দ্রকান্ত। বিনু, এ কথাটা তোর মুখেও একটু বাড়াবাড়ি শোনাচ্ছে। তার চেয়ে একটা গ্রামোফোন কেন্-না? এ যে ভাই মানুষ, দেখেশুনে নেওয়া ভালো।

বিনোদ। মানুষকে কি চোখ চাইলেই দেখা যায়? তুমিও যেমন! রাখো জীবনটা বাজি, চোখ বুজে দান তুলে নাও, তার পরে হয় রাজা নয় ফকির; একেই তো বলে খেলা।

চন্দ্রকান্ত। উঃ! কী সাহস! তোমার কথা শুনলে আমার মরচে-পড়া বুকেও ঝলক মারে, ফের আর-একটা বিয়ে করতে ইচ্ছে করে। না দেখে বিয়ে তো আমরাও করেছি, কিন্তু এমনতরো মরিয়া করে তোলে নি।

গদাই। তা বলি, যদি বিয়ে করতে হয় নিজে না দেখে বিয়ে করাই ভালো। ডাক্তারের পক্ষে নিজের চিকিৎসা করাটা কিছু নয়। মেয়েটি কে বলো তো হে চন্দরদা।

চন্দ্রকান্ত। আমাদের নিবারণবাবুর বাড়িতে থাকেন, নাম কমলমুখী। আদিত্য-বাবু আর নিবারণবাবু পরম বন্ধু ছিলেন। আদিত্য মরবার সময় মেয়েটিকে নিবারণ-বাবুর হাতে সমর্পণ করে দিয়ে গেছেন।

গদাই। তুমি তোমার প্রতিবেশিনীকে আগে থাকতেই দেখ নি তো?

চন্দ্রকান্ত। আমার কি আর আশে পাশে দৃষ্টি দেবার জো আছে! আমার এ দুটি চক্ষুই একেবারে দস্তখতি সীলমোহর করা, অন্ হার্ ম্যাজিস্টিস্ সার্ভিস্। তবে শুনেছি বটে, দেখতে ভালো এবং স্বভাবটিও ভালো।

গদাই। আচ্ছা, এখন তা হলে আমরা কেউ দেখব না, একেবারে সেই বিবাহের রাত্রে চমক লাগবে।

চন্দ্রকান্ত। তোমরা একটু বোসো ভাই, আমি অমনি চট করে চাদরটা পরে আসি। এই পাশের ঘরেই।

[প্রস্থান

পাশের ঘরে

চন্দ্রকান্ত ও ক্ষান্তমণি

চন্দ্রকান্ত। বড়োবউ, ও বড়োবউ! চাবিটা দাও দেখি।

ক্ষান্তমণি। কেন জীবনসর্বস্ব নয়নমণি, দাসীকে কেন মনে পড়ল?

চন্দ্রকান্ত। ও আবার কি! যাত্রার দল খুলবে নাকি? আপাতত একটা সাফ দেখে চাদর বের করে দাও দেখি, এখনি বেরোতে হবে—

ক্ষান্তমণি। (অগ্রসর হইয়া) আদর চাই! প্রিয়তম, তা আদর করছি।

চন্দ্রকান্ত। (পশ্চাতে হঠিয়া) আরে, ছি ছি ছি! ও কী ও!

ক্ষান্তমণি। নাথ, বেলফুলের মালা গেঁথে রেখেছি, এখন কেবল চাঁদ উঠলেই হয়—

চন্দ্রকান্ত। ও! গুণবর্ণনা আড়াল থেকে সমস্ত শোনা হয়েছে দেখছি। বড়ো-বউ, কাজটা ভালো হয় নি। ওটা বিধাতার অভিপ্রায় নয়। তিনি মানুষের শ্রবণশক্তির একটা সীমা ঠিক করে দিয়েছেন, তার কারণই হচ্ছে পাছে অসাক্ষাতে যে কথাগুলো হয় তাও মানুষ শুনতে পায়; তা হলে পৃথিবীতে বন্ধুত্ব বল, আত্মীয়তা বল, কিছুই টিকতে পারে না।

ক্ষান্তমণি। ঢের হয়েছে গোঁসাইঠাকুর, আর ধর্মোপদেশ দিতে হবে না। আমাকে তোমার পছন্দ হয় না, না?

চন্দ্রকান্ত। কে বললে পছন্দ হয় না?

ক্ষান্তমণি। আমি গদ্য, আমি পদ্য নই, আমি শোলোক পড়ি নে, আমি বেলফুলের মালা পরাই নে—

চন্দ্রকান্ত। আমি গললগ্নীকৃতবস্ত্র হয়ে বলছি, দোহাই তোমার, তুমি শোলোক পোড়ো না, তুমি মালা পরিয়ো না, ওগুলো সবাইকে মানায় না—

ক্ষান্তমণি। কী বললে?

চন্দ্রকান্ত। আমি বললুম যে, বেলফুলের মালা আমাকে মানায় না, তার চেয়ে সাফ চাদরে ঢের বেশি শোভা হয়— পরীক্ষা করে দেখো।

ক্ষান্তমণি। যাও যাও, আর ঠাট্টা ভালো লাগে না।

চন্দ্রকান্ত। (নিকটে আসিয়া) কথাটা বুঝলে না ভাই? কেবল রাগই করলে! শোনো, বুঝিয়ে দিচ্ছি—

ভালোবাসার থার্মোমিটারে তিন মাত্রার উত্তাপ আছে। মানুষ যখন বলে 'ভালো-বাসি নে' সেটা হল ৯৫ ডিগ্রি, যাকে বলে সাবনর্মাল। যখন বলে 'ভালোবাসি' সেটা হল

নাইন্টিএইট পয়েন্ট ফোর, ডাক্তাররা তাকে বলে নর্মাল, তাতে একেবারে কোনো বিপদ নেই। কিন্তু প্রেমজ্বর যখন ১০৫ ছাড়িয়ে গেছে তখন রুগি আদর করে বলতে শুরু করেছে 'পোড়ারমুখি', তখন চন্দ্রবদনীটা একেবারে সাফ ছেড়ে দিয়েছে। যারা প্রবীণ ডাক্তার তারা বলে এইটেই হল মরণের লক্ষণ। বড়োবউ, নিশ্চয় জেনো, বন্ধুমহলে আমিও যখন প্রলাপ বকি, তোমাকে যা না বলবার তাই বলি, তখন সেটা প্রণয়ের ডিলিরিয়ম, তখন বাঁধা আদরের ভাষায় একেবারে কুলোয় না ; গাল দিতে না পারলে ভালোবাসার ইস্টিমের চাপে বুক ফেটে যায়, বিশ্রী রকমের অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। নাড়ী রসস্থ হলে তাতে ভাষা যে কিরকম এলোমেলো হয়ে ওঠে, তা সেই ডাক্তারই বোঝে রসবোধের যে একেবারে এম্. ডি.।

ক্ষান্তমণি। রক্ষে করো, আমার অত ডাক্তারি জানা নেই।

চন্দ্রকান্ত। সে তো ব্যবহারেই বুঝতে পারি নইলে লয়াল্‌টিকে সিডিশন বলে সন্দেহ করবে কেন। কিন্তু নিশ্চয় রুগির দশা তোমাকেও মাঝে মাঝে ধরে। আচ্ছা, কলতলায় দাঁড়িয়ে তুমি কখনো পদ্মঠাকুরঝিকে বলো নি— আমার এমনি কপাল যে বিয়ে করে ইস্তিক সুখ কাকে বলে একদিনের তরে জানলুম না? আমার কানে যদি সে কথা আসত তা হলে আনন্দে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত।

ক্ষান্তমণি। আমি পদ্মঠাকুরঝিকে কখ্‌খনো অমন কথা বলি নি।

চন্দ্রকান্ত। আচ্ছা, তা হলে সাফ চাদরটা এনে দাও।

ক্ষান্তমণি। (চাদর আনিয়া দিয়া) তুমি বাইরে বেরোচ্ছ যদি, চুলগুলো কাগের বাসার মতো করে বেরিয়ো না। একটু বোসো, তোমার চুল ঠিক করে দিই।

[চিরুনি ব্রুস লইয়া আঁচড়াইতে প্রবৃত্ত

চন্দ্রকান্ত। হয়েছে, হয়েছে।

ক্ষান্তমণি। না হয় নি, একদণ্ড মাথা স্থির করে রাখো দেখি।

চন্দ্রকান্ত। তোমার সামনে আমার মাথার ঠিক থাকে না, দেখতে দেখতে ঘুরে যায়—

ক্ষান্তমণি। অত ঠাট্টায় কাজ কী! নাহয় আমার রূপ নেই, গুণ নেই— একটা ললিতলবঙ্গলতা খোঁজ করে আনো গে, আমি চললুম।

[চিরুনি ব্রুস ফেলিয়া দ্রুত প্রস্থান

চন্দ্রকান্ত। এখন আর সময় নেই, ফিরে এসে রাগ ভাঙাতে হবে।

বিনোদ (নেপথ্য হইতে)। ওহে, আর কতক্ষণ বসিয়ে রাখবে? তোমাদের প্রেমাভিনয় সাঙ্গ হল কি?

চন্দ্রকান্ত। এইমাত্র যবনিকাপতন হয়ে গেল। হৃদয়বিদারক ট্রাজেডি। [প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

নিবারণের বাড়ি

নিবারণ ও শিবচরণ

নিবারণ। তবে তাই ঠিক রইল? এখন আমার ইন্দুমতীকে তোমার গদাইয়ের পছন্দ হলে হয়।

শিবচরণ। সে বেটার আবার পছন্দ কী! বিয়েটা তো আগে হয়ে যাক্‌, তার পর পছন্দ সময়মতো পরে করলেই হবে।

নিবারণ। না ভাই, কালের যেরকম গতি সেই অনুসারেই চলতে হয়।

শিবচরণ। তা হোক-না কালের গতি, অসম্ভব কখনো সম্ভব হতে পারে না। একটু ভেবেই দেখো-না, যে ছোঁড়া পূর্বে একবারও বিবাহ করে নি সে স্ত্রী চিনবে কী করে? পাট না চিনলে পাটের দালালি করা যায় না, আর স্ত্রীলোক কি পাটের চেয়ে সিধে জিনিস? আজ পঁয়ত্রিশ বৎসর হল আমি গদাইয়ের মাকে বিবাহ করেছি, তার থেকে পাঁচটা বৎসর বাদ দাও, তিনি গত হয়েছেন সে আজ বছর পাঁচেকের কথা হবে, যা হোক তিরিশটা বৎসর তাঁকে নিয়ে চালিয়ে এসেছি, আমি আমার ছেলের বউ পছন্দ করতে পারব না আর সে ছোঁড়া ভূমিষ্ঠ হয়েই আমার চেয়ে পেকে উঠল? তবে যদি তোমার মেয়ের কোনো ধনুর্ভঙ্গ পণ থাকে, আমার গদাইকে যাচিয়ে নিতে চান, সে আলাদা কথা।

নিবারণ। নাঃ, আমার মেয়ে কোনো আপত্তিই করবে না, তাকে যা বলব সে তাই শুনবে। আর-একটি কথা তোমাকে বলা উচিত। আমার মেয়েটির কিছু বয়স হয়েছে।

শিবচরণ। আমিও তাই চাই। ঘরে যদি গিন্নি থাকতেন তা হলে বউমা ছোটো হলে ক্ষতি ছিল না। এখন এই বুড়োটাকে যত্ন করে আর ছেলেটাকে কড়া শাসনে রাখতে পারে, এমন একটি মেয়ে না হলে সংসারটি গেল।

নিবারণ। তা হলে তোমার একটি অভিভাবকের নিতান্ত দরকার দেখছি।

শিবচরণ। হাঁ ভাই, মা ইন্দুকে বোলো আমার গদাইয়ের ঘরে এলে এই বুড়ো নাবালকটিকে প্রতিপালনের ভার তাঁকেই নিতে হবে। তখন দেখব তিনি কেমন মা।

নিবারণ। তা ইন্দুর সে অভ্যাস আছে। বহুকাল একটি আস্ত বুড়ো বাপ তারই

হাতে পড়েছে। দেখতেই তো পাচ্ছ, ভাই, খাইয়েদাইয়ে বেশ একরকম ভালো অবস্থাতেই রেখেছে।

শিবচরণ। তাই তো। তাঁর হাতের কাজটিকে দেখে তারিফ করতে হয়। যা হোক, আজ তবে আসি। গুটিদুয়েক রোগী এখনো মরতে বাকি আছে।

[প্রস্থান

ইন্দুমতীর প্রবেশ

ইন্দু। ও বুড়োটি কে এসেছিল বাবা ?

নিবারণ। কেন মা 'বুড়ো বুড়ো' করছিস— তোর বাবাও তো বুড়ো।

ইন্দু। (নিবারণের পাকা চুলের মধ্যে হাত বুলাইয়া) তুমি তো আমাদের আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ো, তোমার সঙ্গে কার তুলনা ? কিন্তু ওকে তো কখনো দেখি নি।

নিবারণ। ওর সঙ্গে ক্রমে খুবই পরিচয় হবে—

ইন্দু। আমি খুব পরিচয় করতে চাই নে।

নিবারণ। তোর এ বাবা পুরোনো ঝর্‌ঝরে হয়ে এসেছে, একবার বাবা বদল করে দেখবি নে ইন্দু ?

ইন্দু। তবে আমি চললুম।

নিবারণ। না না, শোন্‌-না। তোরই যেন বাবার দরকার নেই, আমার একটি বাপের পদ খালি আছে— তাই আমি একটি সন্ধান করে বের করেছি মা।

ইন্দু। তুমি কী বকছ বুঝতে পারছি নে।

নিবারণ। নাঃ, তুমি আমার তেমনি হাবা মেয়ে কিনা। সব বুঝতে পেরেছিস, কেবল দুষ্টুমি !

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। তিনটি বাবু এসেছে দেখা করতে।

ইন্দু। তাদের যেতে বলে দে। সকাল থেকে কেবলই বাবু আসছে।

নিবারণ। না না, ভদ্রলোক এসেছে, দেখা করা চাই।

ইন্দু। তোমার যে নাবার সময় হয়েছে।

নিবারণ। একবার শুনে নিই কী জন্যে এসেছেন, বেশি দেরি হবে না।

ইন্দু। তুমি একবার গল্প পেলে আর উঠতে চাইবে না, আবার কালকের মতো খেতে দেরি করবে। আচ্ছা, আমি ঐ পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে রইলুম, পাঁচ মিনিট বাদে ডেকে পাঠাব।

নিবারণ। তোর শাসনের জ্বালায় আমি আর বাঁচি নে। চাণক্যের শ্লোক জানিস তো? প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রে মিত্রবদাচরেৎ। তা আমার কি সে বয়স পেরোয় নি?

[ইন্দুর প্রস্থান

নিবারণ। (ভৃত্যের প্রতি) বাবুদের ডেকে নিয়ে আয়।

চন্দ্রকান্ত বিনোদবিহারী ও গদাইয়ের প্রবেশ

নিবারণ। এই যে চন্দ্রবাবু! আসতে আজ্ঞা হোক। আপনারা সকলে বসুন। ওরে, তামাক দিয়ে যা।

চন্দ্রকান্ত। আজ্ঞে না, তামাক থাক্।

নিবারণ। তা, ভালো আছেন চন্দ্রবাবু?

চন্দ্রকান্ত। আজ্ঞে হাঁ, আপনার আশীর্বাদে একরকম আছি ভালো।

নিবারণ। আপনাদের কোথায় থাকা হয়?

বিনোদ। আমরা কলকাতাতেই থাকি।

চন্দ্রকান্ত। মহাশয়ের কাছে আমাদের একটি প্রস্তাব আছে।

নিবারণ। (শশব্যস্ত হইয়া) কী বলুন।

চন্দ্রকান্ত। মহাশয়ের ঘরে আদিত্যবাবুর যে অবিবাহিত কন্যাটি আছেন তাঁর জন্যে একটি সংপাত্র পাওয়া গেছে। যদি অভিপ্রায় করেন—

নিবারণ। অতি উত্তম কথা। পাত্রটি কে?

চন্দ্রকান্ত। বিনোদবিহারীবাবুর নাম শুনেছেন বোধ করি।

নিবারণ। বিলক্ষণ! তা আর শুনি নি! তিনি আমাদের দেশের একজন প্রধান লেখক। 'জ্ঞানরত্নাকর' তো তাঁরি লেখা?

চন্দ্রকান্ত। আজ্ঞে না। সে বৈকুণ্ঠ বসাক বলে একটি লোকের লেখা।

নিবারণ। তাই বটে। আমার ভুল হয়েছে। তবে 'প্রবোধলহরী'? আমি ঐ দুটোতে বরাবর ভুল করে থাকি।

চন্দ্রকান্ত। আজ্ঞে না। 'প্রবোধলহরী' তাঁর লেখা নয়। সেটা কার বলতে পারি নে।

নিবারণ। তবে তাঁর একখানা বইয়ের নাম করুন দেখি।

চন্দ্রকান্ত। 'কাননকুসুমিকা' দেখেছেন কী?

নিবারণ। 'কাননকুসুমিকা'! না, দেখি নি। নামটি অতি সুললিত। বাংলা

বই কবে সেই বাল্যকালে পড়তেম। তখন অবশ্যই 'কাননকুসুমিকা' পড়ে থাকব, স্মরণ হচ্ছে না। তা বিনোদবাবুর পুত্রের বয়স কত হবে, ক'টি পাস করেছেন তিনি ?

চন্দ্রকান্ত। মশায় ভুল করছেন। বিনোদবাবুর বয়স অতি অল্প। তিনি এম. এ. পাস করে সম্প্রতি বি. এল. উত্তীর্ণ হয়েছেন। বিবাহ হয় নি। তাঁরই কথা মহাশয়কে বলছিলুম। তা আপনার কাছে প্রকাশ করে বলাই ভালো, এই এঁর নাম বিনোদবাবু।

নিবারণ। আপনি বিনোদবাবু! আজ আমার কী সৌভাগ্য! আমি মেয়েদের কাছে শুনেছি আপনি দিব্যি লিখতে পারেন।

চন্দ্রকান্ত। তা এঁর সঙ্গে আপনার ভাইঝির বিবাহ দিতে যদি আপত্তি না থাকে—

নিবারণ। আপত্তি! আমার পরম সৌভাগ্য।

চন্দ্রকান্ত। তা হলে এ সম্বন্ধে যা যা স্থির করবার আছে কাল এসে মহাশয়ের সঙ্গে কথা হবে।

নিবারণ। যে আজ্ঞে। কিন্তু একটা কথা বলে রাখি— মেয়েটির বাপ টাকাকড়ি কিছু রেখে যেতে পারেন নি। তবে এই পর্যন্ত বলতে পারি, এমন লক্ষ্মী মেয়ে আর পাবেন না।

চন্দ্রকান্ত। তবে অনুমতি হয় তো এখন আসি।

নিবারণ। এত শীঘ্র যাবেন ? বলেন কী! আর-একটু বসুন-না।

চন্দ্রকান্ত। আপনার এখনো নাওয়া খাওয়া হয় নি—

নিবারণ। সে এখন ঢের সময় আছে। বেলা তো সবে—

চন্দ্রকান্ত। আজ্ঞে বেলা নিতান্ত কম হয় নি। এখন যদি আজ্ঞা করেন তো উঠি।

নিবারণ। তবে আসুন। দেখুন চন্দরবাবু, মতি হালদারের ঐ যে কুসুমকানন না কী বইখানা বললেন ওটা লিখে দিয়ে যাবেন তো।

চন্দ্রকান্ত। কাননকুসুমিকা ? বইখানা পাঠিয়ে দেব, কিন্তু সেটা মতি হালদারের নয়।

নিবারণ। তবে থাক। বরঞ্চ বিনোদবাবুর একখানা প্রবোধলহরী যদি থাকে তো একবার—

চন্দ্রকান্ত প্রবোধলহরী তো—

বিনোদ। আঃ, থামো-না! তা, যে আজ্ঞে, আমিই পাঠিয়ে দেব। আমার প্রবোধলহরী, বারবেলাকথন, তিথিদোষখণ্ডন, প্রায়শ্চিত্তবিধি এবং নূতন পঞ্জিকা আপনাকে পাঠিয়ে দেব।

নিবারণ। দেখুন, বিনোদবাবুর একখানি ফোটোগ্রাফ পাওয়া যায় কি ? তা হলে কমলকে একবার—

চন্দ্রকান্ত। ফোটোগ্রাফ সঙ্গেই এনেছি, কিন্তু এতে আমাদের তিন জনেরই ছবি আছে।

নিবারণ। তা হোক, ছবিটি দিব্যি উঠেছে, এতেই কাজ চলবে।

চন্দ্রকান্ত। তা হলে আজ্ঞা হয় তো আসি।

[প্রস্থান

নিবারণ। নাঃ, লোকটার বিদ্যে আছে। বাঁচা গেল, একটি মনের মতো সৎপাত্র পাওয়া গেল। কমলের জন্য আমার বড়ো ভাবনা ছিল।

ইন্দুর প্রবেশ

ইন্দু। বাবা, তোমার হল ?

নিবারণ। ও ইন্দু, তুই তো দেখলি নে— তোরা সেই যে বিনোদবাবুর লেখার এত প্রশংসা করিস, তিনি আজ এসেছিলেন।

ইন্দু। আমার তো খেয়েদেয়ে আর কাজ নেই, তোমার এখানে যত রাজ্যির অকেজো লোক এসে জোটে আর আমি আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের দেখি! আচ্ছা বাবা, চন্দ্রবাবু বিনোদবাবু ছাড়া আর একটি যে লোক এসেছিল— বদ্‌-চেহারা লক্ষ্মীছাড়ার মতো দেখতে, চোখে চশমা-পরা, সে কে ?

নিবারণ। তুই যে বলছিলি আড়াল থেকে দেখিস নে ? বদ্‌-চেহারা আবার কার দেখলি ? বাবুটি তো দিব্যি ফুটফুটে কার্তিকের মতো দেখতে। তাঁর নামটি কী জিজ্ঞাসা করা হয় নি।

ইন্দু। তাকে আবার ভালো দেখতে হল ? দিনে দিনে তোমার কী যে পছন্দ হচ্ছে বাবা! এখন নাইতে চলো।—

[নিবারণের প্রস্থান

নাঃ, ওঁর নামটা জানতে হচ্ছে। নিশ্চয় ক্ষান্তদিদি বলতে পারবেন।— বাবা, শোনো শোনো। [নিবারণের পুনঃপ্রবেশ

ওরা তোমাকে বিনোদবাবুর একটা ফোটোগ্রাফ দিয়ে গেল না ?

নিবারণ। হাঁ, এতে তিন বন্ধুরই ছবি আছে।

ইন্দু। তাতে ক্ষতি নেই। ওটা আমাকে দাও-না, আমি দিদিকে দেখাব।

নিবারণ। ভেবেছিলুম, আমি নিজে দেখাব।

ইন্দু। না বাবা, আমি দেখাব, বেশ মজা হবে।

নিবারণ। এই নে মা, কিন্তু ওকে নিয়ে বেশি ঠাট্টা করিস নে।

ইন্দু। বাবা, আমার সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা বাস করছে, আর যাই হোক ঠাট্টায় ওর আর বিপদের আশঙ্কা নেই।

[নিবারণের প্রস্থান

ইন্দু। কমলদিদি, কমলদিদি।

কমলের প্রবেশ

কমল। কী ইন্দু?

ইন্দু। আর দেরি কোরো না।

কমল। কেন, কী করতে হবে বল্-না।

ইন্দু। এখন কাব্যশাস্ত্রমতে কমলকে বিকশিত হয়ে উঠতে হবে।

কমল। কেন বল্ তো।

ইন্দু। খড়্খড়ের ফাঁক দিয়ে যাঁর অরুণরেখার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল সেই দিনমণি উঠে পড়েছেন তোমার ভাগ্যগগনে।

কমল। তুই খবর পেলি কোথা থেকে?

ইন্দু। স্বয়ং দিনমণির কাছ থেকে।

কমল। একটু স্পষ্ট ভাষায় কথা ক।

ইন্দু। আমার চেয়ে ঢের বেশি অস্পষ্ট ভাষায় যিনি কাব্য রচনা করেন সেই কবি স্বয়ং এই ঘরে পরিদৃশ্যমান হয়েছিলেন।

কমল। কী কারণে?

ইন্দু। তোমার উপর করক্ষেপ করবার দাবি জানিয়ে যেতে। এতদিন যিনি ছিলেন তোমার কানের শোনা, এখন তিনি হবেন তোমার নয়নের মণি, বাবার কাছে স্বয়ং দরবার জানিয়ে গেছেন। তোমার মনের মানুষ এখন থেকে তোমারই কোণের মানুষ হবার উমেদার, কথাবার্তা ঠিকঠাক হয়ে গেছে। সুখবর কিনা বলো, দিদি!

কমল। এখনো বলবার সময় হয় নি।

ইন্দু। বলিস কী ভাই! কাব্যের চেয়ে কবির দাম বেশি নয়?

কমল। দামের তুলনা করব কী করে? দুটো জিনিস এক জাতের নয়, যেমন মধু আর মধুকর।

ইন্দু। সে কথা মানি, যেমন বাঁশ আর বাঁশি। বাঁশি যেরকম করে বাজে বাঁশ ঠিক তার বিপরীত ভাবে অন্তরে বাহিরে বাজতে পারে। তা হলে কী করা কর্তব্য এই-বেলা বলো। এখনো সময় আছে। নাহয় বাবাকে বলে আসি যে, কাব্যের মধ্যে

শুধু কথার মিল চাই, সেটাতে ভুল হলেও চলে ; কিন্তু কবির মধ্যে চাই প্রাণের মিল, সেটাতে ভুল হলে সাংঘাতিক। কাজ নেই দিদি, স্বয়ং দেখে শুনে পছন্দ করে নাও। ছবিটা দেখে তার ভূমিকা করতে পারো।

কমল। এর মধ্যে তো একজন দেখছি চন্দরবাবু।

ইন্দু। বাকি দুজনের মধ্যে কে বিনোদবাবু আন্দাজ কর্ দেখি। এর মধ্যে কেই বা কোকিল কেই বা কাক, কেই বা কবি কেই বা অকবি বল্ দেখি।

কমল। তোর মতন এমন সূক্ষ্ম দৃষ্টি আমার নেই ভাই!

ইন্দু। আচ্ছা এই নে, তোর ডেস্কের উপর রাখ্, চেয়ে দেখতে দেখতে ভক্তের ধ্যানদৃষ্টিতে সত্য আপনি প্রকাশিত হবে। দময়ন্তী ছজনের মধ্যে নলকে চিনে নিয়েছিলেন, তোর তো কেবল দুজন।

কমল। অত চিন্তায় অত ধ্যানে আমার দরকার নেই।

ইন্দু। বলিস কী দিদি?

কমল। আমি তো স্বয়ম্বরা হতে যাচ্ছি নে বোন! তা আমার আবার পছন্দ! দুটো-একটা কাপড়চোপড় ছাড়া জীবনের ক'টা জিনিসই বা নিজের পছন্দ অনুসারে পাওয়া গেছে? আপনাকেই আপনি পছন্দ করে নিতে পারি নি।

ইন্দু। তুই ভাই, কথায় কথায় বড়ো বেশি গম্ভীর হয়ে পড়িস। বিনোদের কাছে যদি অমনি করে থাকিস তা হলে সে তোর সঙ্গে প্রেমালাপ করতে সাহস করবে না।

কমল। সেজন্য নাহয় তুই নিযুক্ত থাকিস।

ইন্দু। তা হলে যে তোর গাম্ভীর্য আরো সাতগুণ বেড়ে যাবে। দেখ্ ভাই, তুই তো একটা পোষা কবি হাতে পেলি, এবার তাকে দিয়ে তোর নিজের নামে কবিতা লিখিয়ে নিস, যতক্ষণ পছন্দ না হয় ছাড়িস নে। নিজের নামে কবিতা দেখলে কিরকম লাগে, কে জানে।

কমল। মনে হয়, আমার নাম করে আর কাকে লিখছে। তোর যদি শখ থাকে আমি তোর নামে একটা লিখিয়ে নেব।

ইন্দু। তুই কেন, সে আমি নিজে ক'রে নেব। আমাদের যে সম্পর্ক আমি যে কান ধরে লিখিয়ে নিতে পারি। তুমি তো তা পারবে না। আপাতত ছবিটা তোর কাছে রাখ্।

কমল। ছবিতে আমার দরকার নেই।

ইন্দু। নেই দরকার? তবে ওটা আমার রইল? সর্বস্ব ত্যাগ করলে?

কমল। কেন বল্ দেখি। এত উৎসাহ কেন তোর?

ইন্দু। সেদিন নাম খুঁজছিলুম, রূপও তো খুঁজতে হবে। এই ছবির মধ্যে যদি নামে রূপে মিল হয়ে যায়?

কমল। অর্থাৎ?

ইন্দু। অর্থাৎ (গদাইয়ের ছবি দেখাইয়া) এর নাম যদি গদাই না হয়, যদি কুমুদ কিম্বা পরিমল, কিম্বা কিশলয়, কিম্বা কোকনদ, কিম্বা কপিঞ্জল হয়ে দাঁড়ায়?

কমল। তা হলেই চুকে যাবে?

ইন্দু। একেবারে চুকে না যাক, মিউজিয়মে একটা প্রথম স্পেসিমেন্‌ পাওয়া যাবে তো?

কমল। আচ্ছা, তোর স্পেসিমেন্‌ জমা কর্‌— আপাতত তোর চুল বেঁধে দিই গে চল্‌।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চন্দ্রের অন্তঃপুর

ক্ষান্তমণি ও ইন্দুমতী

ইন্দু। তোমার স্বামী আদর করেই ঠাট্টা করে, সে কি আর সত্যি!

ক্ষান্তমণি। না ভাই, ঠাট্টা কি সত্যি ঠিক বুঝতে পারি নে। আর সত্যি হবারই বা আটক কী? নিজে তো জানি নিজের গুণ কত।

ইন্দু। তোমার স্বামীর আবার তেমনি সব বন্ধু জুটেছে, তারাই পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলে তাঁর মন উতলা করে দেয়। বিশেষ সেদিন বিনোদবাবু আর তোমার স্বামীর সঙ্গে আর-একটি কে বাবু আমাদের বাড়িতে গিয়েছিল, তাকে দেখে আমার আদবে ভালো লাগল না। লোকটা কে ভাই?

ক্ষান্তমণি। কী জানি ভাই! বন্ধু একটি-আধটি তো নয়, সবগুলোকে আবার চিনিও নে।

ইন্দু। এই দেখ্‌-না তার ছবি। (কাপড় খুঁজিয়া) এ কী হল! এই যাঃ, কোথায় ফেললুম!

ক্ষান্তমণি। কী ফেললি ?

ইন্দু। ফোটোগ্রাফ।

ক্ষান্তমণি। কার ?

ইন্দু। বিনোদবাবুর। নিশ্চয় তোমাদের এই গলি পার হয়ে আসবার সময় রাস্তায় পড়ে গেছে। আমি যাই খুঁজে আনি গে।

ক্ষান্তমণি। ছি ছি, রাস্তার মাঝে ছবি খুঁজতে গিয়ে লোক দাঁড় করিয়ে দিবি যে! সে ছবির এতই কিসের কদর ?

ইন্দু। হায় হায়, দিদি যদি কেঁদে-কেটে অনর্থপাত করে ?

ক্ষান্তমণি। তোর দিদি ? কমল ?

ইন্দু। হাঁ গো, তার হৃদয় তো পাষাণ নয়, সে যে বড়ো কোমল, কী জানি, আজ থেকে যদি সে হাঙ্গার স্ট্রাইক শুরু করে ?

ক্ষান্তমণি। সে আবার কী ?

ইন্দু। যাকে সংস্কৃত ভাষায় বলে প্রায়োপবেশন।

ক্ষান্তমণি। আর জ্বালাস নে, বাংলা ভাষায় কী বলে তাই বল্‌-না।

ইন্দু। তাকে বলে উপোস ক'রে মরা।

ক্ষান্তমণি। আমি যেন কমলকে জানি নে— তুই হলেও বা সম্ভব হত। কেন ভাই, আসল জিনিস্ যখন ধরা দিয়েছে তখন ছবিটার এত খোঁজ কেন ?

ইন্দু। আসল জিনিসকে ডেস্কে বসিয়ে রাখা যায় না, দেরাজে বন্ধ করা চলে না। আসল জিনিসের মেজাজের ঠিক নেই— বেশি খিদে পেলে ভালোবাসার কথা তার মনে থাকে না, বেশি ভালোবাসা পেলে অস্থির করে তোলে— কিন্তু—

ক্ষান্তমণি। আচ্ছা আচ্ছা, তোর সেই 'কিন্তু' এত বেশি দুর্লভ নয়।

ইন্দু। ক্ষান্তদিদি, তোমার সেই বন্ধু তিনটির মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তিটি কে বলো-না।

ক্ষান্তমণি। খুব সম্ভব গদাই। সে ওদের সঙ্গে প্রায়ই থাকে বটে।

ইন্দু। বাজি রাখতে পারি, সে গদাই নয়। তার নাম যদি গদাই হয় তা হলে আমার নাম মাতঙ্গিনী।

ক্ষান্তমণি। তা হলে ললিত।

ইন্দু। এই এতক্ষণে নামটা পাওয়া গেল। ললিত তার আর সন্দেহ নেই।

ক্ষান্তমণি। চেহারাটা সুন্দর তো ?

ইন্দু। সুন্দর বৈকি।

ক্ষান্তমণি। পাতলা, চোখে চশমা আছে ?

ইন্দু। হাঁ হাঁ, চশমা আছে। আর, সব কথাতেই মুচকে মুচকে হাসে।

ক্ষান্তমণি। তবে আমাদের ললিত চাটুজ্জে, তাতে আর সন্দেহ নেই।

ইন্দু। ললিত চাটুজ্জে না হয়ে যায় না। বাজি রাখতে পারি।

ক্ষান্তমণি। কলুটোলার নৃত্যকালী চাটুজ্জের ছেলে। ছোকরাটি কিন্তু মন্দ নয় ভাই। এম. এ. পাস করে জলপানি পাচ্ছে।

ইন্দু। জলপানি পাবার মতোই চেহারা বটে। তা ওদের ঘরে স্ত্রী পুত্র পরিবার কেউ নেই নাকি? লক্ষ্মীছাড়ার মতো টো টো করে বেড়ায় কেন?

ক্ষান্তমণি। স্ত্রী পুত্র থেকেই বা কী হয়? ওর তো তবু নেই। বলে যে, রোজগার না ক'রে বিয়ে করবে না।

ইন্দু। জানিস, ক্ষান্তদিদি, ওদের তিন জনের ছবিতে যেন তিন কাল মূর্তিমান। চন্দ্রবাবু অতীত, বিনোদবাবু বর্তমান, আর ললিতবাবু ভাবী।

ক্ষান্তমণি। ভাবী? কার ভাবী লো?

ইন্দু। সে কথাটা রইল ভবিষ্যতের গর্ভে।

ক্ষান্তমণি। দেখ্ ভাই ইন্দু, তোকে সত্যি করে বলি। তোরা তো আমাকে বঙ্কিমবাবুর বইগুলো পড়ালি, ভেবেছিলুম একটুও বুঝতে পারব না— কিন্তু বেশ লাগছে।

ইন্দু। এই দেখ্, মুশকিলে ফেললি তো। তোর মনটা এখন আয়েষা হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু ওজনমতো জগৎসিংহ পাবি কোথা?

ক্ষান্তমণি। তা বলিস নে ইন্দু। আমি যেরকম মাপের আয়েষা সেরকম মাপের জগৎসিংহও ঘরে মজুদ আছে। কিন্তু—

ইন্দু। চাল-চলনটা দোরস্ত হয় নি। মনে মনে আয়েষা হয়েছ, ব্যবহারে আয়েষাগিরি করে উঠতে পারছ না।

ক্ষান্তমণি। কতকটা তাই বটে।

ইন্দু। প্র্যাক্‌টিকাল্ এডুকেশন্‌টা হয় নি আর-কি। কিছু দিন প্র্যাক্‌টিস্ চাই।

ক্ষান্তমণি। তোর ইংরিজি আমি বুঝতে পারি নে, ভাই।

ইন্দু। আমার বক্তব্য হচ্ছে, বঙ্কিমের কাছে মন্ত্র পেয়েছ, আমার কাছ থেকে তার সাধনা পেতে হবে।

ক্ষান্তমণি। তোমার কাছ থেকে?

ইন্দু। আমার কাছ থেকে হলেই নিরাপদ হবে। মনুসংহিতার সঙ্গে বঙ্কিমবাবুর মিল রক্ষা করেই আমি তোমাকে শিক্ষা দেব। আজ এখনি হোক হাতে-খড়ি। আচ্ছা, এক কাজ করা যাক। মনে করো, আমি চন্দ্রবাবু, আপিস থেকে ফিরে এসেছি, খিদেয় প্রাণ

বেরিয়ে যাচ্ছে— তার পর তুমি কী করবে বলো দেখি। রোসো ভাই, চন্দ্রবাবুর ঐ চাপকান আর শামলাটা পরে নিই, নইলে আমাকে চন্দ্রবাবু মনে হবে না।

[আপিসের বেশ পরিধান ও ক্ষান্তর উচ্চহাস্য

ক্ষান্তমণি, স্বামীর প্রতি পরিহাস অত্যন্ত গর্হিত কার্য। পতিব্রতা রমণী কদাপি উচ্চহাস্য করেন না। কোনো কারণে হাস্য অনিবার্য হইলে সাধ্বী স্ত্রী প্রথমে স্বামীর অনুমতি লইয়া পরে বদনে অঞ্চল দিয়া নয়ন নত করিয়া ঈষৎ স্মিতহাস্য হাসিতে পারেন। এই গেল মনুসংহিতা, এবার এসো নবীন কবির গীতিকাব্যে। আমি আপিস থেকে ফিরে এসেছি, এখন তোমার কী কর্তব্য বলো।

ক্ষান্তমণি। প্রথমে তোমার চাপকানটি এবং শামলাটি খুলে দিই, তার পরে জলখাবার—

ইন্দু। নাঃ, তোমার কিছু শিক্ষা হয় নি। আচ্ছা, তুমি তবে চন্দ্রবাবু সাজো, আমি তোমার স্ত্রী সাজছি—

ক্ষান্তমণি। না ভাই, সে আমি পারব না—

ইন্দু। আচ্ছা, তবে আর-একবার চেষ্টা করো। বড়োবউ, চাপকানটা খুলে আমার ধুতি-চাদরটা এনে দাও তো।

ক্ষান্তমণি। (উঠিয়া) এই দিচ্ছি।

ইন্দু। ও কী করছ! তুমি ওইখানে হাতের উপর মাথা রেখে বসে থাকো— বলো, 'নাথ, আজ সন্ধেবেলায় কী সুন্দর বাতাস দিচ্ছে! আজ আর কিছুতে মন লাগছে না, ইচ্ছে করছে পাখি হয়ে উড়ে যাই।'

ক্ষান্তমণি। (যথাশিক্ষিত) নাথ, আজ সন্ধেবেলায় কী সুন্দর বাতাস দিচ্ছে! আজ আর কিছুতে মন লাগছে না, ইচ্ছে করছে পাখি হয়ে উড়ে যাই।

ইন্দু। কোথায় উড়ে যাবে? তার আগে আমায় লুচি দিয়ে যাও, ভারি খিদে পেয়েছে—

ক্ষান্তমণি। (তাড়াতাড়ি উঠিয়া) এই দিচ্ছি—

ইন্দু। এই দেখো, সব মাটি করলে। অস্থানে মনুসংহিতা এসে পড়ে। তুমি যেমন ছিলে তেমনি থাকো, বলো, 'লুচি? কই, লুচি তো আজ ভাজি নি। মনে ছিল না। আচ্ছা, লুচি কাল হবে এখন। আজ, এসো, এখানে এই মধুর বাতাসে বসে—'

চন্দ্র (নেপথ্য হইতে)। বড়োবউ!

ইন্দু। ঐ চন্দ্রবাবু আসছেন! আমাকে দেখতে পেয়েছেন বোধ হল। তুমি বোলো তো ভাই, বাগবাজারের চৌধুরীদের কাদম্বিনী। আমার পরিচয় দিয়ো না, লক্ষ্মীটি, মাথা খাও।

[পলায়ন

পাশের ঘর

গদাই আসীন। চাপকান-শামলাপরা ইন্দুর ছুটিয়া প্রবেশ

গদাই। একি!

ইন্দু। ও মা, এ যে সেই ললিতবাবু! আর তো পালাবার পথ নেই। (সামলাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে চাপকান-শামলা খুলিয়া গদাইয়ের প্রতি) তোমার বাবুর এই শামলা আর এই চাপকান। সাবধান করে রেখো, হারিয়ো না। আর শীগগির দেখে এসো দেখি, বাগবাজারের চৌধুরীবাবুদের বাড়ি থেকে পালকি এসেছে কিনা।

গদাই। (হাসিয়া) যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান

ইন্দু। ছি ছি! ললিতবাবু কী মনে করলেন! যা হোক, আমাকে তো চেনেন না। ভাগ্যিস, হঠাৎ বুদ্ধি জোগালো, বাগবাজারের চৌধুরীদের নাম করে দিলুম। চন্দ্রবাবুর এ বাসাটিও হয়েছে তেমনি। অন্দর বাহির সব এক। এখন আমি কোন্ দিক দিয়ে পালাই? ওই আবার আসছে। মানুষটি তো ভালো নয়।

গদাইয়ের প্রবেশ

গদাই। ঠাকরুন, পালকি তো আসে নি। এখন কী আজ্ঞা করেন?

ইন্দু। এখন তুমি তোমার কাজে যেতে পারো। না, না, এ যে তোমার মনিব এ দিকে আসছেন। ওঁকে আমার খবর দেবার কোনো দরকার নেই, আমার পালকি নিশ্চয় এসেছে। [প্রস্থান

গদাই। কী চমৎকার! আর কী উপস্থিত বুদ্ধি! বা বা! আমাকে হঠাৎ একদম চাকর বানিয়ে দিয়ে গেল— সেও আমার পরম ভাগ্যি। বাঙালির ছেলে চাকরি করতেই জন্মেছি, কিন্তু এমন মনিব কি অদৃষ্টে জুটবে? নির্লজ্জতাও ওকে কেমন শোভা পেয়েছে! আহা, এই শামলা আর এই চাপকান চন্দরকে ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে না। বাগবাজারের চৌধুরী! সন্ধান নিতে হচ্ছে।

চন্দ্রের প্রবেশ

চন্দ্রকান্ত। তুমি এ ঘরে ছিলে নাকি? তবে তো দেখেছ?

গদাই। চক্ষু থাকলেই দেখতে হয়— কিন্তু কে বলো দেখি।

চন্দ্রকান্ত। বাগবাজারের চৌধুরীদের মেয়ে কাদম্বিনী। আমার স্ত্রীর একটি বন্ধু।

গদাই। ওর স্বামী বোধ করি স্বাধীনতাওয়ালা?

চন্দ্রকান্ত। ওঁর আবার স্বামী কোথায় ?

গদাই। মরেছে বুঝি ? আপদ গেছে। কিন্তু বিধবার মতো বেশ তো—

চন্দ্রকান্ত। বিধবা নয় হে— কুমারী। যদি হঠাৎ স্নায়ুর ব্যামো ঘটে থাকে তো বলো, ঘটকালি করি।

গদাই। তেমন স্নায়ু হলে এতদিনে গলায় দড়ি দিয়ে মরতুম।

চন্দ্রকান্ত। তা হলে চলো, একবার বিনোদকে দেখে আসা যাক। তার বিশ্বাস, সে ভারি একটা অসমসাহসিক কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়েছে, তাই একেবারে সপ্তমে চড়ে রয়েছে— যেন তার পূর্বে বঙ্গদেশে বাপ-পিতামহর আমল থেকে বিবাহ কেউ করে নি !

গদাই। মেয়েমানুষকে বিয়ে করতে হবে, তার আবার ভয় কিসের ?

চন্দ্রকান্ত। বলো কী গদাই ? বিধাতার আশীর্বাদে জন্মালুম পুরুষ হয়ে, কী জানি কার শাপে বিয়ে করতে গেলুম মেয়েমানুষকে, এ কি কম সাহসের কথা ? গদাই, যেয়ো না হে ! তোমাকে দরকার আছে, এখনি আসছি। [প্রস্থান

গদাই। (পকেট হইতে নোটবুক ও পেন্সিল বাহির করিয়া) আর তো পারছি নে। মাথার ভিতরটা যেরকম ঘুলিয়ে গেছে, আজ বোধ হয় একটা দুষ্কর্ম করব। কবিতা লিখে ফেলব। বুদ্ধি পরিষ্কার থাকলে কবিতার ব্যাক্‌টিরিয়া জন্মাতেই পারে না। চিত্তের অবস্থাটা খুব অস্বাস্থ্যকর হওয়া চাই। আজ আমার মগজের ভিতরে ঐ কীটাণুগুলি কেবলই চোদ্দ অক্ষর খুঁজে কিলবিল করে বেড়াচ্ছে। [লিখিতে প্রবৃত্ত

কাদম্বিনী যেমনি আমায় প্রথম দেখিলে,
কেমন করে ভৃত্য বলে তখনি চিনিলে।

ভাবটা নতুন রকমের হয়েছে, কিন্তু হতভাগা ছন্দটাকে বাগাতে পারছি নে। (গণনা করিয়া) প্রথম লাইনটা হয়েছে যোলো, দ্বিতীয়টা হয়েছে পনেরো। কিন্তু কাকে ফেলে কাকে রাখি। (চিন্তা) ‘আমায়’-কে ‘আমা’ বললে কেমন শোনায় ? কাদম্বিনী যেমনি আমা প্রথম দেখিলে— কানে তো নেহাত খারাপ ঠেকছে না। তবুও একটা অক্ষর বেশি থাকে। কাদম্বিনীর ‘নী’টা কেটে যদি সংক্ষেপ করে দেওয়া যায় ? পুরো নামের চেয়ে সে তো আরো আদরের শুনতে হবে। কাদম্বি— না, ঠিক শোনাচ্ছে না। কদম্ব— ঠিক হয়েছে—

কদম্ব যেমনি আমা প্রথম দেখিলে,
কেমন করে ভৃত্য বলে তখনি চিনিলে।

উ হুঁ, ও হচ্ছে না। ‘কেমন করে’ কথাটাকে তো কমাবার জো নেই। ‘কেমন করিয়া’— তাতে আরো একটা অক্ষর বেড়ে যায়। ‘তখনি চিনিলে’র জায়গায়

'তৎক্ষণাৎ চিনিলে' বসিয়ে দিতে পারি, কিন্তু সুবিধে হয় না। দূর হোক গে! ছন্দে লেখাটা বর্বরতা। যে সময় পুরুষমানুষ কানে কুণ্ডল, হাতে অঙ্গদ পরত, পদ্য জিনিসটা সেই যুগের; ডিমক্রাটিক যুগের জন্যে গদ্য। হওয়া উচিত ছিল— 'বলি ও কাদম্বিনী, যেমনি আমার উপর নজর পড়ল অমনি আমাকে গোলাম বলে চিনে নিলে কেমন করে খুলে বলো তো।' এর মধ্যে বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার সীলমোহরের ছাপ নেই— একেবারে খাস শ্রীযুক্ত গদাইচন্দ্রের গোমুখী-বিনির্গত।

শিবচরণের প্রবেশ

শিবচরণ। কী হচ্ছে গদাই?

গদাই। আজ্ঞে, ফিজিয়লজির নোটগুলো একবার দেখে নিচ্ছি।

শিবচরণ। ফিজিয়লজির কোন্ জায়গাটাতে আছ?

গদাই। হার্টের ফাংশন্ নিয়ে।

শিবচরণ। দেখি তোমার নোটবইটা। আমি তোমাকে হয়তো কিছু—

গদাই। আজ্ঞে, এ একেবারে লেটেস্ট্ থিওরি নিয়ে— বোধ হয় মাসখানেক হল এর ডিস্কভারি হয়েছে। এখনো সকলে জানে না।

শিবচরণ। সত্যি নাকি? আমি আবার চশমাটা আনি নি। সব্জেক্ট্টা ইণ্টারেস্টিং, পরে শুনে নেব তোর কাছ থেকে। কিন্তু, এখানে করছিস কী?

গদাই। একজামিনটা খুব কাছে এসেছে— চন্দ্রবাবুর বাসাটা নিরিবিলি আছে, তাই এখানে—

শিবচরণ। দেখো বাপু, একটা কথা আছে। তোমার বয়স হয়েছে, তাই আমি তোমার জন্যে একটি কন্যা ঠিক করেছি।

গদাই। (স্বগত) কী সর্বনাশ!

শিবচরণ। নিবারণবাবুকে জান বোধ করি—

গদাই। আজ্ঞে হাঁ, জানি।

শিবচরণ। তাঁরই কন্যা ইন্দুমতী। মেয়েটি দেখতে শুনতে ভালো, বয়সেও তোমার যোগ্য। দিনও একরকম স্থির।

গদাই। একেবারে স্থির করেছেন? কিন্তু এখন তো হতে পারে না।

শিবচরণ। কেন বাপু?

গদাই। একজামিন কাছে এসেছে—

শিবচরণ। তা হোক-না একজামিন। বউমাকে বাপের বাড়ি রেখে দেব, একজামিন হয়ে গেলে ঘরে আনা যাবে।

গদাই। ডাক্তারিটা পাস না করেই কি—

শিবচরণ। কেন বাপু, তোমার সঙ্গে তো একটা শক্ত ব্যায়রামের বিয়ে দিচ্ছি নে। মানুষ ডাক্তারি না জেনেও বিয়ে করে। কিন্তু, আপত্তিটা কিসের জন্যে ?

গদাই। উপার্জনক্ষম না হয়ে বিয়ে করাটা—

শিবচরণ। উপার্জন ? আমি কি তোমাকে আমার বিষয় থেকে বঞ্চিত করতে যাচ্ছি ? তুমি কি সাহেব হয়েছ যে, বিয়ে করেই স্বাধীন ঘরকন্না করতে যাবে ?

[গদাই নিরুত্তর

তোমার হল কী ! বিয়ে করবে, তার আবার এত ভাবনা কী ! আমি কি তোমার ফাঁসির হুকুম দিলুম !

গদাই। বাবা, আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে এখন বিয়ে করতে অনুরোধ করবেন না।

শিবচরণ। (সরোষে) অনুরোধ কী বেটা ! হুকুম করব। আমি বলছি, তোকে বিয়ে করতেই হবে।

গদাই। আমাকে মাপ করুন, আমি এখন কিছুতেই বিয়ে করতে পারব না।

শিবচরণ। (উচ্চস্বরে) কেন পারবি নে ! তোর বাপ পিতামহ, তোর চৌদ্দপুরুষ বরাবর বিয়ে করে এসেছে, আর তুই বেটা দু পাতা ইংরিজি উলটে আর বিয়ে করতে পারবি নে !

গদাই। আমি মিনতি করে বলছি বাবা, একেবারে মর্মান্তিক অনিচ্ছে না থাকলে আমি কখনোই এ প্রস্তাবে—

শিবচরণ। তুমি বেটা আমার বংশে জন্মগ্রহণ করে হঠাৎ একদিনে এত বড়ো বৈরাগী হয়ে উঠলে কোথা থেকে। এমন সৃষ্টিছাড়া অনিচ্ছেটা হল কেন, সেটা তো শোনা আবশ্যক।

গদাই। আচ্ছা, আমি মাসিমাকে সব কথা বলব, আপনি তাঁর কাছে জানতে পারবেন।

শিবচরণ। আচ্ছা। [প্রস্থান

গদাই। আমার ছন্দ মিল ভাব সমস্ত ঘুলিয়ে গেল ; এখন যে আর এক লাইনও মাথায় আসবে এমন সম্ভাবনা দেখি নে।

চন্দ্রের প্রবেশ

চন্দ্রকান্ত। আজ বিনোদের বিয়ে, মনে আছে তো গদাই ?

গদাই। তাই তো, ভুলে গিয়েছিলুম বটে।

চন্দ্রকান্ত। তোমার স্মরণশক্তির যেরকম অবস্থা দেখছি, একজামিনের পক্ষে সুবিধে নয়। এইখানে বৈঠক হবে, চলো ওদের ধরে নিয়ে আসিগে।

গদাই। আজ শরীরটা তেমন ভালো ঠেকছে না, আজ থাক্—

চন্দ্রকান্ত। বিনোদের বিয়েটা তো বছরের মধ্যে সদাসর্বদা হবে না গদাই! যা হবার আজই চুকে যাবে। অতএব আজ তোমাকে ছাড়ছি নে, চলো।

গদাই। চলো। [প্রস্থান

ক্ষান্তমণি ও ইন্দুর প্রবেশ

ইন্দু। বর তো তোমাদের এখান থেকেই বেরোবেন? তাঁর তিন কুলে আর কেউ নেই নাকি?

ক্ষান্তমণি। বাপ-মা নেই বটে, কিন্তু শুনেছি দেশে পিসি-মাসি সব আছে— তাদের খবরও দেয় নি। বলে যে, বিয়ে করছি, হাট বসাচ্ছি নে তো। আবার বলে কী, এ তো আর শুম্ভ-নিশুম্ভর যুদ্ধ না, কেবল দুটিমাত্র প্রাণীর বিয়ে, এত শোর-শরাবৎ লোক-লস্করের দরকার কী?

ইন্দু। একবার আমাদের হাতে পড়ুক-না, দুটিমাত্র প্রাণীর বিয়ে যে কিরকম ধুন্দুমার ব্যাপার, তা তাঁকে একরকম মোটামুটি বুঝিয়ে দেব।— আজ যে তুমি বাইরের ঘরে?

ক্ষান্তমণি। এই ঘরে সব বরযাত্রী জুটবে। দেখ-না ভাই, ঘরের অবস্থাখানা। তারা আসবার আগে একটুখানি গুছিয়ে নেবার চেষ্টায় আছি।

ইন্দু। তোমার একলার কর্ম নয়, এসো ভাই, দুজনে এ জঞ্জাল সাফ করা যাক্। এগুলো দরকারি নাকি?

ক্ষান্তমণি। কিচ্ছু না। যত রাজ্যির পুরোনো খবরের কাগজ জুটেছে। কাগজগুলো যেখানে পড়া হয়ে যায় সেইখানেই পড়ে থাকে।

ইন্দু। এগুলো?

ক্ষান্তমণি। এগুলো মকদ্দমার কাগজ— হারাতে পারলে বাঁচেন বোধ হয়। কেন যে হারায় না তাও তো বুঝতে পারি নে। কতকগুলো গদির নীচে গোঁজা, কতক আলমারির মাথায়, কতক ময়লা চাপকানের পকেটে। যখন কোনোটার দরকার পড়ে বাড়ি মাথায় করে বেড়ান, আঁস্তাকুড় থেকে আর বাড়ির ছাত পর্যন্ত এমন জায়গা নেই যেখানে না খুঁজতে হয়।

ইন্দু। এর সঙ্গে যে ইংরেজি নভেলও আছে— তারও আবার পাতা ছেঁড়া! কতকগুলো চিঠি— এ কি দরকারি!

ক্ষান্তমণি। ওর মধ্যে দরকারি আছে অ-দরকারিও আছে, কিচ্ছু বলবার জো নেই। খুব গোপনীয়ও আছে, সেগুলো চারি দিকে ছড়ানো। খুব বেশি দরকারি চিঠি সাবধান করে রাখবার জন্যে বইয়ের মধ্যে গুঁজে রাখা হয়, সে আর কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যায় না।

ইন্দু। এ-সব কী। কতকগুলো লেখা, কতকগুলো প্রুফ, খালি দেশালাইয়ের বাক্স, কাননকুসুমিকা, কাগজের পুঁটুলির মধ্যে ছাতাধরা মসলা, একখানা তোয়ালে, গোটাকতক দাবার ঘুঁটি, একটি ইস্কাবনের গোলাম, ছাতার বাঁট— এ চাবির গোছা ফেলে দিলে বোধ হয় চলবে না ?

ক্ষান্তমণি। এই দেখো ! এই চাবির মধ্যে ওঁর যথাসর্বস্ব। আজ সকালে একবার খোঁজ পড়েছিল, কোথাও সন্ধান না পেয়ে শেষে উমাপতিদের বাড়ি থেকে সতেরোটা টাকা ধার করে নিয়ে এলেন। দাও তো ভাই, এ চাবি ওঁকে সহজে দেওয়া হবে না। ওই ভাই, ওরা আসছে, চলো ও ঘরে পালাই। [প্রস্থান

বিনোদ চন্দ্রকান্ত গদাই নলিনাক্ষ শ্রীপতি ভূপতির প্রবেশ

বিনোদ। (টোপর পরিয়া) সঙ তো সাজলাম, এখন তোমরা পাঁচ জনে মিলে হাততালি দাও— উৎসাহ হোক, মনটা দমে যাচ্ছে।

চন্দ্রকান্ত। এরই মধ্যে ? এখনো তো রঙ্গমঞ্চে চড় নি ?

বিনোদ। আচ্ছা চন্দর, অভিনয়ে আমার পার্ট কী হবে বুঝিয়ে দাও দেখি।

চন্দ্রকান্ত। মহারানীর বিদূষক।

বিনোদ। সাজটিও যথোপযুক্ত হয়েছে। ইংরেজ রাজাদের যে ফুল্‌গুলো ছিল তাদেরও টুপিটা এই টোপরের মতো।

চন্দ্রকান্ত। সেজের বাতি নিবিয়ে দেবার ঠোঙাগুলোরও ওইরকম চেহারা। এই পঁচিশটা বৎসরের যত-কিছু শিক্ষাদীক্ষা, যত-কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা— ভারতের ঐক্য, বাণিজ্যের উন্নতি, সমাজের সংস্কার, সাহেবের ছেলে পিটোনো প্রভৃতি যে-সকল উঁচু উঁচু ভাবের পলতে মগজের ঘি খেয়ে খুব উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠেছিল সেগুলো ওই টোপর চাপা পড়ে একদম নিবে যাবে।

শ্রীপতি। চন্দরদা, তুমি তো বিয়ে করেছ, বলো-না কী করতে হবে। হাঁ করে সবাই মিলে দাঁড়িয়ে থাকলে কি 'বিয়ে-বিয়ে' মনে হয় ?

চন্দ্রকান্ত। সে তো ভাই, স্টোন্‌-এজ্‌, আইস্‌-এজের কথা। সে যুগে না ছিল পূর্বরাগের কোমলতা, না ছিল অপূর্ব অনুরাগের উত্তাপ। কেবল বিবাহের যিনি আদ্যাশক্তি সেই মহামায়াই আজও আছেন অন্তরে-বাহিরে, আর সমস্তই ভুলেছি।

ভূপতি। শ্যালীর হাতের কানমলা ?

চন্দ্রকান্ত। হায় পোড়াকপাল! শ্যালী থাকলে তবু বিবাহের সংকীর্ণতা অনেকটা কাটে, ওরই মধ্যে একটুখানি পাশ ফেরবার জায়গা পাওয়া যায়— শ্বশুরমশায় একেবারে কড়ায় গণ্ডায় ওজন করে দিয়েছেন, সিকি পয়সার ফাউ দেন নি।

বিনোদ। বাস্তবিক বর পছন্দ করবার সময় যেমন জিজ্ঞাসা করে কটি পাস আছে, কনে পছন্দ করবার সময় তেমনি খোঁজ নেওয়া উচিত কটি ভগিনী আছে।

চন্দ্রকান্ত। চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। ঠিক বিয়ের দিনটিতে বুঝি চৈতন্য হল ? নিতান্ত বঞ্চিত হবে না ; তোমার কপালে একটি আছে, নামটি হচ্ছে ইন্দুমতী।

গদাই। (স্বগত) যাঁকে আমার স্কন্ধের উপর উদ্যত করা হয়েছে— সর্বনাশ আর-কি।

শ্রীপতি। বিনোদ, একটুখানি বোসো।

বিনোদ। না ভাই, তা হলে আর উঠতে পারব না, মনটা দেহের উপর যেন পাথরের কাগজচাপা হয়ে চেপে রাখবে।

ভূপতি। এসো তবে, বর কনের উদ্দেশে থ্রী চিয়ার্‌স্‌ দিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক। হিপ্‌ হিপ্‌ হুরে—

চন্দ্রকান্ত। দেখো, আমার প্রিয়বন্ধুর বিয়েতে আমি কখনোই এরকম অনাচার হতে দেব না ; শুভকর্মে অমন বিদেশী শেয়াল-ডাক ডেকো না। তার চেয়ে সবাই মিলে উলু দেবার চেষ্টা করো-না।

নলিনাক্ষ। এই তবে আমাদের অবিবাহিত বন্ধুত্বের শেষ মিলন। জীবনস্রোতে তুমি এক দিকে যাবে, আমি এক দিকে যাব। প্রার্থনা করি তুমি সুখে থাকো। কিন্তু মুহূর্তের জন্যে ভেবে দেখো বিনু, এই মরুময় জগতে তুমি কোথায় যাচ্ছ—

চন্দ্রকান্ত। বিনু, তুই বল্‌, মা, আমি তোমার জন্যে দাসী আনতে যাচ্ছি। তা হলে কনকাঞ্জলিটা হয়ে যায়।

শ্রীপতি। এইবার তবে উলু আরম্ভ হোক। [সকলে উলুর চেষ্টা ও প্রস্থান

ইন্দু ও ক্ষান্তমণির প্রবেশ

ক্ষান্তমণি। শুনলি তো ভাই, আমার কর্তাটির মধুর কথাগুলি ?

ইন্দু। কেন ভাই, আমার তো মন্দ লাগে নি।

ক্ষান্তমণি। তোর মন্দ লাগবে কেন ? তোর তো আর বাজে নি। যার বেজেছে সেই জানে—

ইন্দু। তুমি যে একেবারে ঠাট্টা সইতে পার না। তোমার স্বামী কিন্তু ভাই তোমাকে সত্যি ভালোবাসে। দিনকতক বাপের বাড়ি গিয়ে বরং পরীক্ষা করে দেখো-না—

ক্ষান্তমণি। তাই একবার ইচ্ছা করে, কিন্তু জানি থাকতে পারব না। তা যা হোক, এখন তোদের ওখানে যাই। ওরা তো বউবাজারের রাস্তা ঘুরে যাবে, সে এখনো ঢের দেরি আছে।

ইন্দু। তুমি এগোও ভাই, তোমার স্বামীর এই বইগুলি গুছিয়ে দিয়ে যাই।

[ক্ষান্তর প্রস্থান

ললিতবাবু তাঁর এই খাতাটা ফেলে গেছেন। এটা না দেখে আমি যাচ্ছি নে। (খাতা খুলিয়া) ওমা! এ যে কবিতা। কাদম্বিনীর প্রতি। আ মরণ। সে পোড়ারমুখি আবার কে।

জল দিবে অথবা বজ্র, ওগো কাদম্বিনী,
হতভাগ্য চাতক তাই ভাবিছে দিনরজনী।

ভারি যে অবস্থা খারাপ! জলও না, বজ্রও না, হতভাগ্য চাতকের জন্যে কবিরাজের তেলের দরকার।

আর কিছু দাও বা না-দাও, অয়ি অবলে সরলে,
বাঁচি সেই হাসিভরা মুখ আর-একবার দেখিলে।

আহাহাহা! অবলে সরলে! পুরুষগুলো ভারি বোকা! মনে করলে, ওঁর প্রতি ভারি অনুগ্রহ করে সে হেসে গেল। হাসতে না কি সিকি পয়সা খরচ হয়। কই আমাদের কাছে তো কোনো কাদম্বিনী সাত পুরুষে এমন করে হাসতে আসে না! অবলে সরলে! সত্যি বাপু, মেয়ে জাতটাই ভালো নয়। এত ছলও জানে। ছি ছি! এ কবিতাও তেমনি। আমি যদি কাদম্বিনী হতুম তো এমন পুরুষের মুখ দেখতুম না। যে লোক চোদ্দটা অক্ষর সামলে চলতে পারে না তার সঙ্গে আবার প্রণয়! এ খাতা আমি ছিঁড়ে ফেলব; পৃথিবীর একটা উপকার করব; কাদম্বিনীর দেমাক বাড়তে দেব না।

পুরুষের বেশে হরিলে পুরুষের মন,
এবার নারীবেশে কেড়ে নিয়ে যাও জীবন মরণ।

এর মানে কী!

কদম্ব যেমনি আমা প্রথম দেখিলে,
কেমন করে ভৃত্য বলে তখনি চিনিলে!

ওমা! ওমা! ওমা! এ যে আমারই কথা। এইবার বুঝেছি, পোড়ারমুখি

কাদম্বিনী কে! (হাস্য) তাই বলি, এমন করে কাকে লিখলেন! ওমা, কত কথাই বলেছেন। আর-একবার ভালো করে সমস্তটা পড়ি। কিন্তু কী চমৎকার হাতের অক্ষর! একেবারে যেন মুক্তো বসিয়ে গেছে। [নীরবে পাঠ

পশ্চাৎ হইতে খাতা অন্বেষণে গদাইয়ের প্রবেশ

কিন্তু ছন্দ থাক্ না-থাক্ পড়তে তো কিছুই খারাপ হয় নি। সত্যি, ছন্দ নেই বলে আরো মনের সরল ভাবটা ঠিক যেন প্রকাশ হয়েছে। আমার বেশ লাগছে। আমার বোধ হয় ছেলেদের প্রথম ভাঙা কথা যেমন মিষ্টি লাগে কবিদের প্রথম ভাঙা ছন্দ তেমনি মিষ্টি। (খাতা বুকে চাপিয়া) এ খাতা আমি নিয়ে যাব। এ তো আমাকেই লিখেছেন। আমার এমনি আনন্দ হচ্ছে। (প্রস্থানোদ্যম। পশ্চাতে ফিরিয়া গদাইকে দেখিয়া) ওমা! (মুখ আচ্ছাদন)

গদাই। ঠাকরুন, আমি একখানা খাতা খুঁজতে এসেছিলুম।

[ইন্দুমতীর দ্রুত পলায়ন

জন্ম জন্ম কেবলই আমার খাতাই হারাক। কবিতার বদলে যা পেয়েছি কালিদাস তাঁর কুমারসম্ভব শকুন্তলা বাঁধা রেখে এমন জিনিস পায় না!

[মহা উল্লাসে প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বাগবাজারের রাস্তা

গদাই। আহা, এই বাড়িটা আমার শরীর থেকে আমার মনটুকুকে যেন শুষে নিচ্ছে, ব্লটিং যেমন কাগজ থেকে কালি শুষে নেয়। কিন্তু কোন্ দিকে সে থাকে এ পর্যন্ত কিছুই সন্ধান করতে পারলুম না। ঐ যে পশ্চিমের জানলার ভিতর দিয়ে একটা সাদা কাপড়ের মতন যেন দেখা গেল না? না, ও তো নয়, ও তো একজন দাসী দেখছি। ও কী করছে? একটা ভিজে শাড়ি শুকুতে দিচ্ছে। বোধ হয় তাঁরই শাড়ি। আহা, নাগাল পেলে একবার স্পর্শ করে নিতুম। তা হলে এতক্ষণে তাঁর স্নান হল। পিঠের উপরে ভিজে চুল ফেলে সাফ কাপড়টি পরে এখন কী করছেন!

[এই বাড়ির চৌকাঠ পার হইতে হুঁচট খাইয়া একজন বুড়ির কক্ষ হইতে তরকারির ঝুড়ি পড়িয়া গেল।]

গদাই। (ছুটিয়া নিকটে গিয়া ধরিয়া উঠাইয়া) আহাহাহা, কী তোমার নাম গো?

বুড়ি। আমার নাম ঠাকুরদাসী, এই বাড়ির ঝি।

গদাই। এই বাড়ির ঝি! আহা, লাগে নি তো?

বুড়ি। না, কিছু লাগে নি।

গদাই। আলুগুলো সব যে ছড়িয়ে পড়েছে। রোসো, কুড়িয়ে দিচ্ছি। তুমি বুঝি এই বাড়ির ঝি!

বুড়ি। হাঁ বাবু।

গদাই। চৌধুরীদের বাড়ির ঝি?

বুড়ি। হাঁ গো, গঙ্গামাধব চৌধুরী।

গদাই। আহাহা, ভাঁড়টা উলটে গিয়ে তেল যে সব গড়িয়ে গেছে। তোমার দিদিঠাকরুন হয়তো রাগ করবেন।

বুড়ি। না, দিদিঠাকরুন কথাটি কবেন না, কিন্তু গিন্নি মা—

গদাই। কথাটি কবেন না। আহা! (দীর্ঘনিশ্বাস) তা এক কাজ করো। এই টাকাটি দিচ্ছি, নাহয় বাজার থেকে তেল কিনে আনো, আমি ততক্ষণ তোমার তরকারি আগলাচ্ছি। তোমার দিদিঠাকরুন বুঝি কথাটি কবেন না, অ্যাঁ ঠাকুরদাসী?

বুড়ি। তিনি বড়ো লক্ষ্মী।

গদাই। লক্ষ্মী! আহা, তা তোমার দিদিঠাকরুন কী খেতে ভালোবাসেন বলো দেখি।

বুড়ি। ছাতাওয়ালা গলির মোড়ে ভক্ত ফুলুরিওয়ালা গরম গরম বেগ্‌নি ভেজে দেয়, তাই দিয়ে আমের আচার দিয়ে খেতে তাঁর খুব শখ।

গদাই। বটে! তা এই নাও, ঠাকুরদাসী, একটাকার বেগ্‌নি কিনে আনো তো।

বুড়ি। একটাকার বেগ্‌নি! সে যে অনেক হবে।

গদাই। তা হোক, নাহয় কিছু বেশিই হল।

বুড়ি। তা আমি কিনে নাহয় আনব পরে, তুমি এই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকবে কতক্ষণ।

গদাই। তাতে ক্ষতি নেই, ওটা আমার একটা শখ।

বুড়ি। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা!

গদাই। না, না, ঐ যে তোমার বেগ্‌নি— ঐ যে তুমি বললে না—

বুড়ি। নাহয় দিদিঠাকরুনকে বেগ্‌নি খাওয়াব, তাই ব'লে কি—

গদাই। আমি এইরকম খাওয়াতে বড়ো ভালোবাসি, ওটা আমার একটা বাতিক বললেই হয়। বিশেষত গরম গরম বেগ্‌নি। বেগ্‌নির ঝুড়ি চক্ষে দেখে তবে নড়ব।

বুড়ি। তা হলে দাঁড়াও, দেরি করব না। [প্রস্থান

মোড়ক হস্তে এক ব্যক্তির প্রবেশ

ঐ ব্যক্তি। সরকারমশায় বুঝি ?

গদাই। কেন বলো তো।

ঐ ব্যক্তি। এই বাড়ির কোন্‌ মাঠাকরুন সাত জোড়া সিল্কের মোজা রিফু করতে আমাদের দোকানে পাঠিয়েছিলেন, সেগুলি এনেছি।

গদাই। অ্যাঃ, পায়ের মোজা ! ঐ জন্যেই তো এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। দাও দাও।

দরজি। দামটা নগদ চুকিয়ে দিতে হবে।

গদাই। কত ?

দরজি। আড়াই টাকা।

গদাই। এই নিয়ে যাও। তোমার রেট তো খুব শস্তা হে ! [দরজির প্রস্থান হায় হায়, আজ কী শুভক্ষণেই বেরিয়েছিলুম ! (বুকের কাছে চাপিয়া) সেই পা দুখানির অদৃশ্য চলন দিয়ে দলন দিয়ে এই মোজার ফাঁকগুলি ভরা। আহাহা, গা শিউরে উঠছে, কবিতা লিখতে ইচ্ছে করছে—

ওগো শূন্য মোজা—

মেলানো বড়ো শক্ত। এই সময়ে থাকত বিন্‌দা !—

আমার শূন্য হৃদয়ের মতো, ওগো শূন্য মোজা,
অনুপস্থিত কোন্‌ দুটি চরণ
সদাই করিতেছ খোঁজা।

কথা আসছে। কিন্তু ঘুলিয়ে যাচ্ছে—

বিনা পায়েই প্রাণের ভিতরে
চলে গিয়েছ সোজা।

আইডিয়াটা ওরিজিনাল্‌।

তিনটে লাইন হল, সাত জোড়া মোজা আছে ; ঠিক সপ্তপদীর নম্বর। আরো চারটে লাইন চাই। (উপরতলার বারান্দার দিকে চাহিয়া) অনুদ্দেশকে উদ্দেশ করে এই লাইনগুলি আবৃত্তি করতে ইচ্ছে করছে— য়ুরোপের ট্রুবেডোরদের মতো।

(আপন মনে) আমার শূন্য হৃদয়ের মতো, ওগো শূন্য মোজা,
অনুপস্থিত কোন্ দুটি চরণ সদাই করিছ খোঁজা ?

কিন্তু আর তো মিল দেখছি নে, এক আছে 'মুসলমানের রোজা'— মোজাকে বললে দোষ নেই যে ঈদের দিনে প্রতিপদের চাঁদ। না না, ওতে আমার লেখার ক্লাসিক্যাল গ্রেসটা চলে যাবে। তা ছাড়া দিন খারাপ, হয়তো সামান্য মোজার জন্যে শান্তিভঙ্গ হতেও পারে— ওটা থাক্।

নেপথ্যে। হিঁয়া রোখো।

শিবচরণের প্রবেশ

শিবচরণ। বেটার তব্ হুঁশ নেই। দেখো-না, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখো-না। যেন খিদে পেয়েছে, এই বাড়ির ইঁটকাঠগুলো গিলে খাবে। ছোঁড়ার হল কী! খাঁচার পাখির দিকে বেড়াল যেমন তাকিয়ে থাকে তেমনি করে উপরের দিকে তাকিয়ে আছে। হতভাগা কালেজে যাবার নাম করে রোজ বাগবাজারে এসে ঘুর ঘুর করে। (নিকটে আসিয়া) বাপু, মেডিকেল কালেজটা কোন্‌দিকে একবার দেখিয়ে দাও দেখি!

গদাই। কী সর্বনাশ! এ যে বাবা!

শিবচরণ। শুনছ? কালেজ কোন্-দিকে? তোমার অ্যানাটমির নোট কি ঐ দেয়ালের গায়ে লেখা আছে? তোমার সমস্ত ডাক্তারিশাস্ত্র কি ঐ জানলায় গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে?

[গদাই নিরুত্তর

মুখে কথা নেই যে! লক্ষ্মীছাড়া, এই তোর এক্‌জামিন! এইখানে তোর মেডিকেল কালেজ!

গদাই। খেয়েই কালেজে গেলে আমার অসুখ করে, তাই একটুখানি বেড়িয়ে নিয়ে—

শিবচরণ। বাগবাজারে তুমি হাওয়া খেতে এস? শহরে আর কোথাও বিশুদ্ধ বায়ু নেই! এ তোমার দার্জিলিং সিমলে পাহাড়! বাগবাজারের হাওয়া খেয়ে খেয়ে আজকাল যে চেহারা বেরিয়েছে, একবার আয়নাতে দেখা হয় কি? আমি বলি ছোঁড়াটা এক্‌জামিনের তাড়াতেই শুকিয়ে যাচ্ছে, তোমাকে যে ভূতে তাড়া করে বাগবাজারে ঘোরাচ্ছে তা তো জানতুম না!

গদাই। আজকাল বেশি পড়তে হয় বলে রোজ খানিকটা করে এক্সেসাইজ্ করে নিই—

শিবচরণ। রাস্তার ধারে কাঠের পুতুলের মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে তোমার এক্সেসাইজ্‌ হয়, বাড়িতে তোমার দাঁড়াবারও জায়গা নেই!

গদাই। অনেকটা চলে এসে শ্রান্ত হয়েছিলুম, তাই একটু বিশ্রাম করা যাচ্ছিল।

শিবচরণ। শ্রান্ত হয়েছিস, তবে ওঠ্‌ আমার গাড়িতে। যা, এখনি কালেজে যা। গেরস্তর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে শ্রান্তি দূর করতে হবে না।

গদাই। সে কী কথা! আপনি কী করে যাবেন?

শিবচরণ। আমি যেমন করে হোক যাব, তুই এখন গাড়িতে ওঠ্‌। ওঠ্‌ বলছি।

গদাই। অনেকটা জিরিয়ে নিয়েছি, এখন আমি অনায়াসে হেঁটে যেতে পারব।

শিবচরণ। না, সে হবে না— তুই ওঠ্‌, আমি দেখে যাই—

গদাই। আপনার যে ভারি কষ্ট হবে।

শিবচরণ। সেজন্য তোকে কিছু ভাবতে হবে না, তুই ওঠ্‌ গাড়িতে। এ ঝুড়িটা কিসের। তুই কি বাগবাজারে তরকারি ফেরি করে বেড়াস নাকি?

গদাই। তাই তো, ওটা তরকারিই তো বটে। কী আশ্চর্য! কেমন করে এল! এ তো মুলো দেখছি, নটেশাকও আছে। এক কাজ করি বাবা— গেরস্তর জিনিস, ঘরের ভিতরে পৌঁছে দিয়ে আসি-না।

শিবচরণ। আর তোমার পরোপকার করতে হবে না। এ ঝুড়ির কিনারা আমি করে দিচ্ছি, তুই এখন গাড়িতে ওঠ।

গদাই। (স্বগত) সর্বনাশ! বুড়িটা এর মধ্যে বেগ্‌নি নিয়ে উপস্থিত না হলে বাঁচি। আজ সকাল বেলাটা বেশ জমে আসছিল, মাটি করে দিলে। সাত জোড়া মোজা নিয়ে করি কী! কাল দোকানদার সেজে ফিরিয়ে দিতে হবে।

শিবচরণ। তোর হাতে ওটা কিসের মোড়ক রে?

গদাই। আজ্ঞে ওটা—

শিবচরণ। দেখি না। (হাত টানিয়া লইয়া) এ কী ব্যাপার!

গদাই। আজ্ঞে, উপহার দেবার জন্যে।

শিবচরণ। কাকে উপহার দিবি?

গদাই। আমার একটি ক্লাস-ফ্রেণ্ড্‌—

শিবচরণ। ক্লাস্‌-ফ্রেণ্ড্‌কে মেয়েদের মোজা দিবি!

গদাই। তার বিয়ে হচ্ছে কিনা, তাই—

শিবচরণ। তাই, কার অনেক দিনের পরা পুরোনো ময়লা মোজা তাকে দিবি? তাও আবার সাত জোড়া!

গদাই। সেকেণ্ড্ হ্যাণ্ড্ নিলেম থেকে শস্তায় কিনেছি, আপনার কাছে থেকে টাকা চাইতে ভয় করে।

শিবচরণ। চাইলেই পেতিস কিনা! ফিরিয়ে দে। ছি ছি! ঐ নোংরা মোজা-গুলো নিয়ে বেড়াচ্ছিস। কী জানি কোন্ ব্যামোর ছোঁয়াচ আছে ওর মধ্যে—

গদাই। আমারও সে ভয় আছে বাবা, ছোঁয়াচ যে কোথায় কী থাকে কিছু বলবার জো নেই। এখনো ফিরিয়ে দিতে পারব, কালই না হয়—

শিবচরণ। সেই ভালো। এই নে, তোকে দেড় টাকা দিচ্ছি— পাকপ্রণালী দু খণ্ড কিনে তাকে দিস। এখন গাড়িতে ওঠ্। (সহিসের প্রতি) দেখ্, একেবারে সেই পটলডাঙার কালেজে নিয়ে যাবি, কোথাও থামাবি নে।

গদাই। (জনান্তিকে সহিসের প্রতি) মির্জাপুর চন্দ্রবাবুর বাসায় চল্, তোদের এক টাকা বকশিশ দেব, ছুটে চল্। [প্রস্থান

শিবচরণ। আজ আর রুগি দেখা হল না। আমার সকাল বেলাটা মাটি করে দিলে। [প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

চন্দ্রকান্তের বাসা

চন্দ্রকান্ত। নাঃ, এ আগাগোড়া কেবল ছেলেমানুষি করা হয়েছে। আমার এমন অনুতাপ হচ্ছে! মনে হচ্ছে যেন আমিই এ সমস্ত কাণ্ডটি ঘটিয়েছি। ইদিকে এত কল্পনা, এত কবিত্ব, এত মাতামাতি, আর বিয়ের দু দিন না যেতে যেতেই কিছু আর মনে ধরছে না।

গদাইয়ের প্রবেশ

গদাই। কী হচ্ছে চন্দরদা?

চন্দ্রকান্ত। না গদাই, তোরা আর বিয়েথাওয়া করিস নে।

গদাই। কেন বলো দেখি। তোমার ঘাড়ে ম্যাল্‌থসের ভূত চাপল নাকি?

চন্দ্রকান্ত। এখনকার ছেলেরা তোরা মেয়েমানুষকে বিয়ে করবার যোগ্য নোস। তোরা কেবল লম্বাচওড়া কথা কবি আর কবিতা লিখবি, তাতে যে পৃথিবীর কী উপকার হবে ভগবান জানেন।

গদাই। কবিতা লিখে পৃথিবীর কী উপকার হয় বলা শক্ত, কিন্তু এক-এক সময় নিজের কাজে লেগে যায় সন্দেহ নেই। যা হোক, এত রাগ কেন?

চন্দ্রকান্ত। শুনেছ তো সমস্তই! আমাদের বিনুর তাঁর স্ত্রীকে পছন্দ হচ্ছে না।

গদাই। বাস্তবিক, এরকম গুরুতর ব্যাপার নিয়ে খেলা করাটা ভালো হয় নি।

চন্দ্রকান্ত। বিনুটা যে এত অপদার্থ তা কি জানতুম! একটা স্ত্রীলোককে ভালোবাসার ক্ষমতাটুকুও নেই।

গদাই। আমি জানি, কবিতা লেখার চেয়েও সেটা সহজ কাজ।

চন্দ্রকান্ত। আমি ওর মুখদর্শন করছি নে।

গদাই। তুমি তাকে ছাড়লে সে যে নেহাত অধঃপাতে যাবে।

চন্দ্রকান্ত। না, তার সঙ্গে কিছুতেই মিশছি নে, পায়ে এসে ধরে পড়লেও না। তুমি ঠিক বলেছিলে গদাই, আজকাল সবাই যাকে ভালোবাসা বলে সেটা একটা স্নায়ুর ব্যামো— হঠাৎ চিড়িক মেরে আসে, তার পরে ছেড়ে যেতেও তর সয় না।

গদাই। সে-সব বিজ্ঞানশাস্ত্রের কথা পরে হবে, আপাতত আমার একটা কাজ করে দিতে হচ্ছে।

চন্দ্রকান্ত। যে কাজ বল তাতেই রাজি আছি, কিন্তু ঘটকালি আর করছি নে।

গদাই। ঐ ঘটকালিই করতে হবে।

চন্দ্রকান্ত। (ব্যগ্রভাবে) কী রকম শুনি।

গদাই। বাগবাজারের চৌধুরীদের বাড়ির কাদম্বিনী, তার সঙ্গে আমার—

চন্দ্রকান্ত। (উচ্চস্বরে) গদাই, তোমারও কবিত্ব। তবে তোমারও স্নায়ু বলে একটা বালাই আছে।

গদাই। তা আছে ভাই। বোধ হয়, একটু বেশি পরিমাণেই আছে। অবস্থা এমনি হয়েছে যে শিগগির আমার একটা সদ্গতি না করলে -

চন্দ্রকান্ত। বুঝেছি। কিন্তু গদাই, আর স্ত্রীহত্যার পাতকে আমাকে লিপ্ত করিস নে।

গদাই। কিছু ভেবো না ভাই। পাপ করেছে বিনোদ, তার রিডেম্প্‌শন্ আমার দ্বারা।

চন্দ্রকান্ত। ভ্যালা মোর দাদা! আমি এক্ষুনি যাচ্ছি। চাদরখানা নিয়ে আসি। অমনি বড়োবউয়ের পরামর্শ টাও জানা ভালো। [প্রস্থান

অনতিবিলম্বে ছুটিয়া আসিয়া

চন্দ্রকান্ত। বড়োবউ রাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেছে। তোদের সংসর্গ

লাভ করতে আসি, আর হারাই আমার স্ত্রীর সংসর্গ— আমার ঘটল মুক্তার বদলে শুক্তা।

বিনোদের প্রবেশ

বিনোদ। চন্দরদা, তুমি আমার উপর রাগ করে চলে এলে ভাই! আমি আর থাকতে পারলুম না।

চন্দ্রকান্ত। না ভাই, তোদের উপর কি রাগ করতে পারি? তবে দুঃখ হয়েছিল তা স্বীকার করি।

বিনোদ। কী করব চন্দরদা! আমি এত চেষ্টা করছি কিছুতেই পেরে উঠছি নে—

চন্দ্রকান্ত। কেন বল্ দেখি। ওর মধ্যে শক্তটা কী? মেয়েমানুষকে ভালোবাসতে পারিস নে।

বিনোদ। চন্দরদা, কী জানি ভাই বিয়ে না করাটাই মুখস্থ হয়ে গেছে।

চন্দ্রকান্ত। তোর পায়ে পড়ি বিনু, তুই আমার গা ছুঁয়ে বল্, নিদেন আমার খাতিরে তোর স্ত্রীকে ভালোবাসবি। মনে কর্, তুই আমার বোনকে বিয়ে করেছিস।

বিনোদ। চন্দরদা, যাকেই হোক, বিয়ে যে করেছি সেটা বুঝতে তো বাকি নেই। মুশকিল হয়েছে সেটা কিছু অধিক পরিমাণেই বুঝতে পারছি। তার প্রধান কারণ টাকার টানাটানি। যতদিন একলা রাজত্ব করেছিলেম অমর্যাদা ছিল না। আর-একটিকে পাশে বসাবামাত্র দেখি, ভাঙা সিংহাসন মড়্‌মড়্ করে উঠছে। আজ অভাবগুলো চার দিক থেকে বড়ো বেআব্রু হয়ে দেখা দিল— সেটা কি ভালো লাগে?

গদাই। তুমি বলতে চাও, তোমার ভালোবাসার অভাব নেই, অভাব কেবল টাকার?

বিনোদ। ভালোবাসা আছে বলেই তো বুঝতে পারছি, যথেষ্ট টাকা নেই। পাত্র যে ফুটো সেটা ধরা পড়ল যখন তাতে সুধা ঢালা গেল। ঝাঁঝরি দিয়ে মধু খেতে গিয়ে সমস্ত গা যে যায় ভেসে। হালকা ছিলুম, দারিদ্র্যের উপর দিয়ে সাঁতার কেটে গেছি, আর-একজনকে কাঁধে নেবামাত্র তার তলার দিকে তলাচ্ছি— যেখানটাতে পাঁক।

গদাই। বিনোদ, তোমার কবিতা যেমন তোমার ব্যবহারটাও তেমনি, একেবারে দুর্বোধ।

বিনোদ। রেগেছ বলেই সহজ কথাটা বুঝতে পারছ না। ভেবে দেখো-না, আমার ছিল এক মামুলি ছাতা, রোদবৃষ্টির দুঃখ ভোগ করতে হয় নি, এমন সময় হিসেবের ভুলে

ডেকে আনলুম ছাতার আর-এক শরিক— আজ আমার কাঁধেও জল পড়ছে, তার কাঁধেও। জিনিসটা ঘোরতর অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠেছে।

গদাই। কিন্তু ভুলটা তো তোমারই।

বিনোদ। ভুলটা হচ্ছে ভুল, আর অ-ভুলটা হচ্ছে অ-ভুল, তা সে আমারই হোক আর তোমারই হোক। মোজাটা হচ্ছে মোজা, পাগড়িটা হচ্ছে পাগড়ি। ভুল করে মোজাটাকে যদি পাগড়ি করেই পরি তা হলে আমি ভুল করেছি বলেই মোজাটা কি পাগড়ি হয়ে উঠবে।

গদাই। (স্বগত) সর্বনাশ! এ আবার হঠাৎ মোজার কথা তোলে কেন? খবর পেয়েছে নাকি? সেদিন যখন মোজাজোড়া মাথায় জড়িয়ে বসেছিলুম হয়তো কোথা দিয়ে দেখে থাকবে। (প্রকাশ্যে) ওহে মোজা নিয়ে ভুল করলেও তাতে মোজার বুক ফাটে না, বড়োজোর সেলাই ফেঁসে যেতে পারে। কিন্তু মানুষকে নিয়ে ভুল করে তার পরে ঐ যাঃ বলে সরে দাঁড়ালে তো চলে না।

চন্দ্রকান্ত। বকাবকি করে লাভ কী গদাই? এখন বলো বিনোদ, কর্তব্য কী।

বিনোদ। আমি তাঁকে তাঁর বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি।

চন্দ্রকান্ত। তুমি নিজে চেষ্টা করে? না তিনি রাগ করে গেছেন?

বিনোদ। না, আমি তাঁকে একরকম বুঝিয়ে দিলুম—

চন্দ্রকান্ত। যে, এখানে তিনি টিকতে পারবেন না। তুমি সব পার বিনু। আজ আমার মনটা কিছু অস্থির আছে, আজ আর থাকতে পারছি নে। [প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

নিবারণের বাসা

ইন্দু ও কমল

কমল। না ভাই ইন্দু, ওরকম করে তুই বলিস নে।

ইন্দু। কিরকম করে বলতে হবে? বলতে হবে, স্ত্রীর ভরটুকুও সইতে পারেন না, বিনোদবিহারী এত বড়োই শৌখিন কবি! তাঁর বড়োজোর সহ্য হয় ফিকে চাঁদের আলো, কিম্বা ঝরা ফুলের গন্ধ। আমি ভাবছি তোর মতো মেয়েকেও সইতে পারল না ওর রুচিটি এতই ফিন্‌ফিনে, আর তুই যে ওর মতো পুরুষকেও সহ্য করতে পারছিস তোর রুচিকে বাহাদুরি দিই।

কমল। তুই বুঝিস নে ইন্দু, ওরা যে পুরুষমানুষ। আমাদের এক ভাব, ওদের আর-এক ভাব। মেয়েমানুষের ভালোবাসা সবুর করতে পারে না, বিধাতা তার হাতে সে অবসর দেন নি। পুরুষ অনেক ঠেকে, অনেক ঘা খেয়ে, তার পরে ভালোবাসতে শেখে; ততদিন পৃথিবী সবুর করে থাকে, কাজের ব্যাঘাত হয় না।

ইন্দু। ইস! কী সব নবাব! আচ্ছা দিদি, তুই কি বলিস গদাই গয়লার সঙ্গে আজই যদি আমার বিয়ে হয় অমনি কাল ভোর থেকেই তাড়াতাড়ি তার চরণদুটো ধরে সেবা করতে বসে যাব— মনে করব, ইনি আমার চিরকালের গয়লা, পূর্বজন্মের গয়লা, বিধাতা একে এবং এর অন্য গোরুগুলিকে গোয়ালসুদ্ধ আমারই হাতে সমর্পণ করে দিয়েছেন।

কমল। ইন্দু, তুই কী যে বকিস আমি তোর সঙ্গে পেরে উঠি নে। গদাই গয়লাকে তুই বিয়ে করতে যাবি কেন, সে একে গয়লা, তাতে আবার তার দুই বিয়ে।

ইন্দু। আচ্ছা না হয় গদাই গয়লা না হল— পৃথিবীতে গদাইচন্দ্রের তো অভাব নেই।

কমল। তা তোর অদৃষ্টে যদি কোনো গদাই থাকে তা হলে অবিশ্যি তাকে ভালোবাসবি—

ইন্দু। কক্‌খনো বাসব না। আচ্ছা, তুমি দেখো। বিয়ে করেছি বলেই যে অমনি তার পরদিন থেকে গদাই গদাই করে গদগদ হয়ে বেড়াব, আমাকে তেমন মেয়ে পাও নি। আমি দিদি, তোর মতন না ভাই!

কমল। আসল জানিস, ইন্দু? ওদের না হলে আমাদের চলতে পারে, কিন্তু আমাদের না হলে পুরুষমানুষের চলে না, সেইজন্যে ওদের আমরা ভালোবাসি।

নিবারণের প্রবেশ

নিবারণ। মা, তোমাকে দেখলে আমি চোখের জল রাখতে পারি নে। আমার মার কাছে আমি অপরাধী। তোমার কাছে আমার দাঁড়ানো উচিত হয় না।

কমল। কাকা, আপনি অমন করে বলবেন না, আমার অদৃষ্টে যা ছিল তাই হয়েছে—

ইন্দু। বাবা, আসলে যার অপরাধ তাকে কিছু না বলে তার অপরাধ তোমরা পাঁচজনে কেন ভাগ করে নিচ্ছ, আমি তো বুঝতে পারি নে।

নিবারণ। থাক্ মা, সে সব আলোচনা থাক্— এখন একটা কাজের কথা বলি। কমল মন দিয়ে শোনো। তোমাকে এতদিন গরিবের মেয়ে বলে পরিচয় দিয়ে এসেছি,

সে কথাটা ঠিক নয়। তোমার বাপের সম্পত্তি নিতান্ত সামান্য ছিল না, আমারই হাতে সে-সমস্ত আছে। ইতিমধ্যে অনেক টাকা জমেছে এবং সুদেও বেড়েছে; তোমার কুড়ি বছর বয়স হলে তবে তোমার পাবার কথা। সময় হয়েছে, এখন নাও তোমার বিষয়। সেই টানে হয়তো স্বামীও এসে পড়বে।

কমল। কাকা, তাঁকে আপনি এ সংবাদ দেবেন না। কথাটা যাতে কেউ টের না পায়, আপনাকে তাই করতে হবে।

নিবারণ। কেন বলো দেখি মা?

কমল। একটু কারণ আছে। সমস্তটা ভেবে আপনাকে পরে বলব।

নিবারণ। আচ্ছা। [প্রস্থান

ইন্দু। তোর মতলবটা কী আমাকে বল্ তো।

কমল। আমি আর-একটা বাড়ি নিয়ে ছদ্মবেশে ওঁর কাছে অন্য স্ত্রীলোক বলে পরিচয় দেব।

ইন্দু। সে তো বেশ হবে ভাই! ওরা ঠিক নিজের স্ত্রীকে ভালোবেসে সুখ পায় না। কিন্তু বরাবর রাখতে পারবি তো?

কমল। বরাবর রাখবার ইচ্ছে তো আমার নেই, বোন—

ইন্দু। ফের আবার একদিন স্বামী-স্ত্রী সাজতে হবে নাকি?

কমল। হাঁ, ভাই, যতদিন যবনিকাপতন না হয়। ওই শিবচরণবাবু বোধ হয় আসছেন, চলো পালাই। [উভয়ের প্রস্থান

গদাই ও শিবচরণের প্রবেশ

শিবচরণ। দেখ্, নিবারণকে আজ শেষ কথা বলব বলেই এখানে এসেছি। এখন তোর মনের কথাটা স্পষ্ট করেই বল্।

গদাই। আমি তো সব কথাই স্পষ্ট করেই বলেছি। বিয়ে করবার কথায় এখন মন দিতেই পারছি নে।

শিবচরণ। এই বুড়ো বয়সে তুই যে একটা সামান্য বিষয়ে আমাকে এত দুঃখ দিবি, তা কে জানত!

গদাই। বাবা, এটা কি সামান্য বিষয় হল!

শিবচরণ। আরে বাপু, সামান্য না তো কী? বিয়ে করা বৈ তো নয়! রাস্তার মুটে-মজুরগুলোও যে বিয়ে করছে। ওতে তো খুব বেশি বুদ্ধি খরচ করতে হয় না, বরঞ্চ কিছু টাকা খরচ আছে, তা সেও বাপমায়ে জোগায়। তুই এমন বুদ্ধিমান ছেলে, এতগুলো পাস করে শেষকালে এইখানে এসে ঠেকল!

গদাই। আপনি তো সব শুনেছেন, আমি তো বিয়ে করতে অসম্মত নই—

শিবচরণ। আরে তাতেই তো আমার বুঝতে আরো গোল বেধেছে। যদি বিয়ে করতেই আপত্তি না থাকে, তবে না-হয় একটাকে না করে আর-একটাকেই করলি। নিবারণকে কথা দিয়েছি, আমি তার কাছে মুখ দেখাই কী করে?

গদাই। নিবারণবাবুকে ভালো করে বুঝিয়ে বললেই সব—

শিবচরণ। আরে, আমি নিজে বুঝতে পারি নে, নিবারণকে বোঝাব কী? আমি যদি তোর মাকে বিয়ে না ক'রে তোর মাসিকে বিয়ে করবার প্রস্তাব মুখে আনতুম, তা হলে তোর ঠাকুরদাদা কি আমার দুখানা হাড় একত্র রাখত? পড়েছিস ভালো মানুষের হাতে—

গদাই। শুনেছি, আমার ঠাকুরদামশায়ের মেজাজ ভালো ছিল না—

শিবচরণ। কী বলিস বেটা! মেজাজ ভালো ছিল না! তোর বাবার চেয়ে তিনশো গুণে ভালো ছিল। কিছু বলি নে ব'লে, বটে! সে যা হোক, এখন যা হয় একটা কথা ঠিক করেই বল্।

গদাই। আমি তো বরাবর এক কথাই বলে আসছি।

শিবচরণ। (সরোষে) তুই তো বলছিস এক কথা! আমিই কি এক কথার বেশি বলছি? মাঝের থেকে কথা যে আপনিই দুটো হয়ে যাচ্ছে। আমি এখন নিবারণকে বলি কী! তা সে যা হোক, তুই তা হলে নিবারণের মেয়ে ইন্দুমতীকে কিছুতেই বিয়ে করবি নে? যা বলবি এক কথা বল্।

গদাই। কিছুতেই না, বাবা।

শিবচরণ। একমাত্র বাগবাজারের কাদম্বিনীকেই বিয়ে করবি? ঠিক করে বলিস। এক কথা!

গদাই। সেইরকমই স্থির করেছি—

শিবচরণ। বড়ো উত্তম কাজ করেছ— এখন আমি নিবারণকে কী বলব?

গদাই। বলবেন, আপনার অবাধ্য ছেলে তাঁর কন্যা ইন্দুমতীর যোগ্য নয়।

শিবচরণ। কোথাকার নির্লজ্জ! আমাকে আর তোর শেখাতে হবে না। কী বলতে হবে তা আমি বিলক্ষণ জানি। তবে ওর আর কিছুতেই নড়চড় হবে না? এক কথা—

গদাই। না বাবা, সেজন্যে আপনি ভাববেন না।

শিবচরণ। আরে মলো! আমি সেইজন্যেই ভেবে মরছি আর-কী! আমি ভাবছি নিবারণকে বলি কী।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সুসজ্জিত গৃহ

বিনোদ। এরা বেছে বেছে এত দেশ থাকতে আমাকে উকিল পাকড়ালে কী ক'রে আমি তাই ভাবছি। আমার অদৃষ্ট ভালো বলতে হবে। এখন টিকতে পারলে হয়।

ঘোমটা পরিয়া কমলের প্রবেশ

বিনোদ। (স্বগত) আহা, মুখটি দেখতে পেলে বেশ হত! (প্রকাশ্যে) আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?

কমল। হাঁ। আপনি বোধ হয় আমার অবস্থা সবই জানেন।

বিনোদ। কিছু-কিছু শুনেছি। (স্বগত) গলাটা যে তারই মতন শোনাচ্ছে। সব মেয়েরই গলা প্রায় একরকম দেখছি। কিন্তু তার চেয়ে কত মিষ্টি!

কমল। সে কথা থাক্। আমার যা-কিছু সমস্তর কর্তৃত্বভার আপনাকে নিতে হবে।

বিনোদ। আপনি যে আমাকে এত বড়ো বিশ্বাসের যোগ্য মনে করলেন, এতেই আমাকে যোগ্যতা দেবে। আপনার বিশ্বাসই আমাকে মানুষ করে তুলবে।

কমল। আপনাকে আর বেশিক্ষণ আবদ্ধ করে রাখতে চাই নে, আপনার বোধ করি অনেক কাজ আছে—

বিনোদ। না না, সেজন্যে আপনি ভাববেন না। আমার সহস্র কাজ থাকলেও সমস্ত পরিত্যাগ করে আমি—

কমল। কাল পয়লা তারিখ, কাল থেকে তা হলে আমার কর্মচারীদের কাছ থেকে আপনি বুঝে-পড়ে নিন। নিবারণবাবু এখনি আসবেন, তিনি এলে তাঁর কাছ থেকেও অনেকটা জেনেশুনে নিতে পারবেন।

বিনোদ। নিবারণবাবু!

কমল। আপনি তাঁকে চেনেন বোধ হয়, কারণ, তিনিই প্রথমে আপনার জন্যে আমার কাছে অনুরোধ করে দিয়েছেন।

বিনোদ। (স্বগত) ছি ছি ছি, বড়ো লজ্জা বোধ হচ্ছে। আমি কালই আমার স্ত্রীকে ঘরে নিয়ে আসব। এখন তো আমার কোনো অভাব নেই।

কমল। আপনি বরঞ্চ নীচের ঘরে একটু অপেক্ষা করুন, নিবারণবাবু এলেই খবর পাঠিয়ে দেব। আর-একটা কথা, আমি যে কাল আপনাকে চিঠিতে জানিয়েছি, আপনার বন্ধু ললিত চাটুজ্জেকে একবার এখানে আনতে, সেটার কিছু ব্যবস্থা হয়েছে?

বিনোদ। সব ঠিক আছে। তিনি এলেন ব'লে, আর দেরি নেই।

কমল। তবে আমি আসি।

[প্রস্থান

বিনোদ। হায় হায়, এতটাই যখন বিশ্বাস করলেন তখন কেবল আর তিন ইঞ্চি পরিমাণ বিশ্বাস ক'রে ঘোমটা খুললে বাঁচা যেত, তা হলেই চোখদুটি দেখতে পেতুম। কিন্তু নিবারণবাবুকে নিয়ে কী করা যায়। [প্রস্থান

নিবারণ ও কমলমুখীর প্রবেশ

কমল। আমার জন্যে আপনি আর কিছু ভাববেন না। এখন ইন্দুর এই গোলটা চুকে গেলেই বাঁচা যায়।

নিবারণ। তাই তো মা, আমাকে ভারি ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে। আমি এ দিকে শিবু ডাক্তারের সঙ্গে কথাবার্তা একরকম স্থির করে বসে আছি, এখন তাকেই বা কী বলি, ললিত চাটুজ্জেকেই বা কোথায় পাওয়া যায়, আর সে বিয়ে করতে রাজি হয় কি না তাই বা কে জানে।

কমল। সেজন্যে ভাববেন না কাকা! আমাদের ইন্দুকে চোখে দেখলে বিয়ে করতে নারাজ হবে, এমন ছেলে কেউ জন্মায় নি।

নিবারণ। ওদের দেখাশোনা হয় কী করে?

কমল। সে আমি সব ঠিক করেছি।

নিবারণ। তুমি কী করে ঠিক করলে মা?

কমল। আমি ওঁকে বলে দিয়েছি, ওঁর বন্ধু ললিতবাবুকে এখানে নিয়ে আসবেন। তার পর একটা উপায় করা যাবে।

নিবারণ। তা সব যেন হল, আমি ভাবছি শিবুকে কী বলব।

কমল। ওই উনি আসছেন। আমি তবে যাই। [প্রস্থান

বিনোদের প্রবেশ

বিনোদ। এই যে, আমি আপনার কথাই ভাবছিলুম।

নিবারণ। কেন বাপু, আমি তো তোমার মক্কেল নই।

বিনোদ। আজ্ঞে, আমাকে লজ্জা দেবেন না— আপনি বুঝতেই পারছেন—

নিবারণ। না বাপু, আমি কিছুই বুঝতে পারি নে। আমরা সেকালের লোক।

বিনোদ। আমার স্ত্রী আপনার ওখানে আছেন—

নিবারণ। তা অবশ্য— তাকে তো আমরা ত্যাগ করতে পারি নে।

বিনোদ। আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে তাঁকে যদি আমার ওখানে পাঠিয়ে দেন—

নিবারণ। বাপু, আবার কেন পালকি-ভাড়াটা লাগাবে?

বিনোদ। আপনারা আমাকে কিছু ভুল বুঝছেন। আমার অবস্থা খারাপ ছিল বলেই আমার স্ত্রীকে—তা যাই হোক—তাঁকে ত্যাগ করবার অভিপ্রায় ছিল না। এখন আপনারই অনুগ্রহে তো— তা এখন তো অনায়াসে—

নিবারণ। বাপু, এ তো তোমার পোষা পাখি নয়। সে যে সহজে তোমার ওখানে যেতে রাজি হবে, এমন আমার বোধ হয় না।

বিনোদ। আপনি অনুমতি দিলে আমি নিজে গিয়ে তাঁকে অনুনয় বিনয় করে নিয়ে আসতে পারি।

নিবারণ। আচ্ছা, সে বিষয় বিবেচনা করে পরে বলব। [প্রস্থান

বিনোদ। বুড়োও তো কম একগুঁয়ে নয় দেখছি। যা হোক এ পর্যন্ত রানীকে কিছু বলে নি বোধ হয়।

চন্দ্রকান্তের প্রবেশ

বিনোদ। কী হে চন্দর! তুমি এখানে যে!

চন্দ্রকান্ত। নিবারণবাবু এই বাড়িতে কী কাজে এসেছেন শুনলুম। আজ তাঁরই ওখানে আমার খাওয়ার পালা পড়েছে, বুড়ো ভুলে গেছেন কি না খবর নিতে এসেছি। খিদে পেয়েছে। তুমিও বুঝি নিবারণবাবুর খোঁজে এখানে এসেছ?

বিনোদ। সে কথা পরে হবে। কিন্তু, তুমি পালা করে খাচ্ছ, তার মানে তো বুঝতে পারছি নে চন্দরদা!

চন্দ্রকান্ত। আর ভাই, মহা বিপদে পড়েছি।

বিনোদ। কেন, কী হয়েছে?

চন্দ্রকান্ত। কী জানি ভাই, কখন তোদের সাক্ষাতে কথায় কথায় কী কতকগুলো মিছে কথা বলেছিলুম, তাই শুনে ব্রাহ্মণী বাপের বাড়ি এমনি গা-ঢাকা হয়েছেন যে, কিছুতেই তাঁর আর নাগাল পাচ্ছি নে।

বিনোদ। বলো কী দাদা! তোমার বাড়িতে তো এ দণ্ডবিধি পূর্বে প্রচলিত ছিল না।

চন্দ্রকান্ত। না ভাই, কালক্রমে কতই যে হচ্ছে, কিছু বুঝতে পারছি নে।

বিনোদ। এখন তা হলে তোমার ছুটি চলছে বলো। জীবনে এই বোধ হয় ডোমেস্‌টিক সার্ভিসে তোমার প্রথম ফার্লো।

চন্দ্রকান্ত। হাঁ রে, কিন্তু উইদাউট পে। বিনু, আমার দুঃখ তোরা বুঝতেই পারবি নে। তুই সেদিন বলছিলি, বিয়ে না করাটাই তোর মুখস্থ হয়ে গেছে। আমার ঠিক তার উলটো। ওই স্ত্রীটিকে এমনই বিশ্রী অভ্যেস করে ফেলেছি যে, হঠাৎ বুকের হাড়-কখানা খসে গেলে যেমন একদম খালি ঠেকে, ওই স্ত্রীটি আড়াল হলেই তেমনি জগৎটা যেন ফাটা বেলুনের মতো চুপসে যায়।

বিনোদ। এখন উপায় কী?

চন্দ্রকান্ত। মনে করছি, আমি উলটে রাগ করব। আমিও ঘর ছেড়ে তোর এখানেই থাকব। আমার বন্ধুদের মধ্যে তোকেই সে সবচেয়ে বেশি ভয় করে। তার বিশ্বাস, তুই আমার মাথাটি খেয়েছিস!

বিনোদ। তা বেশ কথা। কিন্তু আমাকে যে আবার শ্বশুরবাড়ি যেতে হচ্ছে।

চন্দ্রকান্ত। কার শ্বশুরবাড়ি?

বিনোদ। আমার নিজের, আবার কার।

চন্দ্রকান্ত। (সানন্দে বিনুর পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া) সত্যি বলছিস বিনু?

বিনোদ। স্ত্রীকে আনতে চলেছি, নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়ার মতো থাকতে আর ইচ্ছে করছে না।

চন্দ্রকান্ত। কিন্তু, এতদিন তোর এ আক্কেল ছিল কোথায়? যতকাল আমার সংসর্গে ছিলি এমন সব সৎসংকল্পের প্রসঙ্গ তো শুনতে পাই নি, দুদিন আমার দেখা পাস নি আর তোর ধর্মবুদ্ধি এতদূর পরিষ্কার হয়ে এল?

বিনোদ। কিন্তু, চন্দরদা, বিপদ কী হয়েছে জান? নিবারণবাবুর যে-রকম মেজাজ দেখলুম, সহজে কমলকে আমার কাছে পাঠাতে রাজি হবেন না। তুমি তো তাঁর ওখানে খেতে যাচ্ছ, আমার হয়ে একটু ওকালতি করতে হবে।

চন্দ্রকান্ত। নিশ্চয় করব। কিন্তু, ওরা যে বললে নিবারণবাবু এখানে এসেছেন।

বিনোদ। এই খানিকক্ষণ হল তিনি চলে গেছেন, তুমি আর দেরি কোরো না।

[প্রস্থান

ইন্দু ও কমলের প্রবেশ

কমল। তোর জ্বালায় তো আর বাঁচি নে ইন্দু! তুই আবার এ কী জটা পাকিয়ে বসে আছিস! ললিতবাবুর কাছে তোকে কাদম্বিনী বলে উল্লেখ করতে হবে নাকি?

ইন্দু। তা কী করব দিদি! কাদম্বিনী না বললে যদি সে না চিনতে পারে তা হলে ইন্দু বলে পরিচয় দিয়ে লাভটা কী?

কমল। ইতিমধ্যে তুই এত কাণ্ড কখন করে তুললি, তা তো জানি নে। একটা যে আস্ত নাটক বানিয়ে বসেছিস!

ইন্দু। তোমার বিনোদবাবুকে বোলো, তিনি লিখে ফেলবেন এখন, তার পর মেট্রপলিটান থিয়েটারে অভিনয় দেখতে যাব। ওই ভাই, তোমার বিনোদবাবু আসছেন, আমি পালাই। [প্রস্থান

বিনোদের প্রবেশ

বিনোদ। মহারানী, আমার বন্ধু এলে কোথায় তাঁকে বসাব?

কমল। এই ঘরেই বসাবেন।

বিনোদ। ললিতের সঙ্গে আপনার যে বন্ধুর বিবাহ স্থির করতে হবে তাঁর নামটি কী?

কমল। কাদম্বিনী— বাগবাজারের চৌধুরীদের মেয়ে।

বিনোদ। আপনি যখন আদেশ করছেন আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। কিন্তু ললিতের কথা আমি কিছুই বলতে পারি নে। সে যে এ-সব প্রস্তাবে আমাদের কারো কথায় কর্ণপাত করবে, এমন বোধ হয় না।

কমল। আপনাকে সেজন্যে বোধ হয় বেশি চেষ্টা করতেও হবে না— কাদম্বিনীর নাম শুনলেই তিনি আর বড়ো আপত্তি করবেন না।

বিনোদ। তা হলে তো আর কথাই নেই।

কমল। মাপ করেন যদি, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।

বিনোদ। এখনি। (স্বগত) স্ত্রীর কথা না তুললে বাঁচি।

কমল। আপনার স্ত্রী নেই কি?

বিনোদ। কেন বলুন দেখি? স্ত্রীর কথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন?

কমল। আপনি তো অনুগ্রহ করে এই বাড়িতেই বাস করছেন, তা, আপনার স্ত্রীকে আমি আমার সঙ্গিনীর মতো করে রাখতে চাই। অবিশ্যি, যদি আপনার কোনো আপত্তি না থাকে।

বিনোদ। আপত্তি! কোনো আপত্তিই থাকতে পারে না। এ তো আমার সৌভাগ্যের কথা!

কমল। আজ সন্ধ্যার সময় তাঁকে আনতে পারেন না?

বিনোদ। আমি বিশেষ চেষ্টা করব। [কমলের প্রস্থান

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। একটি সাহেব বাবু এসেছেন।

বিনোদ। এইখানেই ডেকে নিয়ে আয়।

সাহেবি বেশে ললিতের প্রবেশ

ললিত। (শেক্‌হ্যাণ্ড করিয়া) Well! How goes the world? ভালো তো?

বিনোদ। একরকম ভালোয়-মন্দয়। তোমার কীরকম চলছে?

ললিত। Pretty well! জানো? I am going in for studentship next year.

বিনোদ। ওহে, আর কতদিন এক্‌জামিন দিয়ে মরবে? বিয়েথাওয়া করতে হবে না নাকি? এ দিকে যৌবনটা যে ভাঁটিয়ে গেল।

ললিত। Hallo! You seem to have queer ideas on the subject. কেবল যৌবনটুকু নিয়ে one can't marry. I suppose first of all you must get a girl whom you—

বিনোদ। আহা, তা তো বটেই। আমি কি বলছি, তুমি তোমার নিজের হাত-পাগুলোকে বিয়ে করবে। অবিশ্যি, মেয়ে একটি আছে।

ললিত। I know that! একটি কেন? মেয়ে there is enough and to spare! কিন্তু তা নিয়ে তো কথা হচ্ছে না।

বিনোদ। আহা, তোমাকে নিয়ে তো ভালো বিপদে পড়া গেল। পৃথিবীর সমস্ত কন্যাদায় তোমাকে হরণ করতে হবে না। কিন্তু যদি একটি বেশ সুন্দরী সুশিক্ষিত বয়ঃপ্রাপ্ত মেয়ে তোমাকে দেওয়া যায়, তা হলে কী বলো?

ললিত। I admire your cheek বিনু! তুমি wife select করবে আর আমি marry করব! I don't see any rhyme or reason in such co-operation. পোলিটিক্যাল ইকনমিতে division of labour আছে, কিন্তু there is no such thing in marriage.

বিনোদ। তা বেশ তো, তুমি দেখো, তার পরে পছন্দ না হয় বিয়ে কোরো না।

ললিত। My dear fellow, you are very kind, কিন্তু আমি বলি কী, you need not bother yourself about my happiness, আমার বিশ্বাস, আমি যদি কখনো কোনো girl কে love করি, I will love her without your help এবং তার পরে যখন বিয়ে করব you'll get your invitation in due form.

বিনোদ। আচ্ছা ললিত, যদি সে মেয়েটির নাম শুনলেই তোমার পছন্দ হয়?

ললিত। The idea! নাম শুনে পছন্দ! যদি মেয়েটিকে বাদ দিয়ে simply নামটিকে বিয়ে করতে বল, that's a safe proposition.

বিনোদ। আগে শোনো, তার পর যা বলতে হয় বোলো— মেয়েটির নাম— কাদম্বিনী।

ললিত। কাদম্বিনী! She may be all that is nice and good, কিন্তু I must confess, তার নাম নিয়ে তাকে congratulate করা যায় না। যদি তার নামটাই তার best qualification হয় তা হলে I should try my luck in some other quarter.

বিনোদ। (স্বগত) এর মানে কী! তবে যে রানী বললেন, কাদম্বিনীর নাম শুনলেই লাফিয়ে উঠবে! দূর হোক গে। একে খাওয়ানোটাই বাজে খরচ হল— আবার এই ম্লেচ্ছটার সঙ্গে আরো আমাকে নিদেন দু ঘণ্টা কাটাতে হবে দেখছি।

ললিত। I say, it's infernally hot here—চলো না বারান্দায় গিয়ে বসা যাক।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কমলমুখীর অন্তঃপুর

কমল ও ইন্দু

ইন্দু। দিদি, আর বলিস নে দিদি, আর বলিস নে। পুরুষমানুষকে আমি চিনেছি। তুই বাবাকে বলিস, আমি কাউকে বিয়ে করব না।

কমল। তুই ললিতবাবু থেকে সব পুরুষ চিনলি কী করে ইন্দু?

ইন্দু। আমি জানি, ওরা কেবল কবিতায় ভালোবাসে, তা ছন্দ মিলুক আর না মিলুক।

ছি ছি! ছি ছি দিদি, আমার এমনি লজ্জা করছে! ইচ্ছে করছে মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে মিশে যাই। কাদম্বিনীকে সে চেনে না? মিথ্যেবাদী! কাদম্বিনীর নামে কবিতা লিখেছে, সে খাতা এখনো আমার কাছে আছে।

কমল। যা হয়ে গেছে তা নিয়ে ভেবে আর কী করবি? এখন কাকা যাকে বলছেন, তাকে বিয়ে কর। [ইন্দুমতীর প্রস্থান

নিবারণের প্রবেশ

নিবারণ। কী করি বলো তো মা। ললিত চাটুজ্জে যা বলেছে সে তো সব শুনেছ। সে বিনোদকে কেবল মারতে বাকি রেখেছে। অপমান যা হবার তা হয়েছে—

কমল। না কাকা, তার কাছে ইন্দুর নাম করা হয় নি। আপনার মেয়ের কথা হচ্ছে, তাও সে জানে না।

নিবারণ। ইদিকে আবার শিবুকে কথা দিয়েছি, তাকেই বা কী বলি। তুমি মা, ইন্দুকে ব'লে ক'য়ে ওদের দুজনের দেখা করিয়ে দিতে পার তো ভালো হয়।

কমল। গদাইয়ের মনের ইচ্ছে কী সেটাও তো জানতে হবে কাকা। আবার কি এইরকম একটি কাণ্ড বাধানো ভালো?

নিবারণ। সে আমি তার বাপের কাছে শুনেছি। সে বলে আমি উপার্জন না করে বিয়ে করব না। সে তো আমার মেয়েকে কখনো চক্ষে দেখে নি। একবার দেখলে ওসব কথা ছেড়ে দেবে।

কমল। তা, ইন্দুকে আমি সম্মত করাতে পারব। [নিবারণের প্রস্থান

ইন্দুর প্রবেশ

কমল। লক্ষ্মী দিদি আমার, আমার একটি অনুরোধ তোর রাখতে হবে।

ইন্দু। কী, বল্‌-না ভাই!

কমল। একবার গদাইবাবুর সঙ্গে তুই দেখা কর্‌।

ইন্দু। কেন দিদি, তাতে আমার কী প্রায়শ্চিত্তটা হবে?

কমল। তোর যখন যা ইচ্ছে তাই করেছিস ইন্দু, কাকা তাতে বাধা দেন নি। আজ কাকার একটি অনুরোধ রাখবি নে?

ইন্দু। রাখব ভাই, তিনি যা বলবেন তাই শুনব।

কমল। তবে চল্‌, তোর চুলটা একটু ভালো করে দিই। নিজের উপরে এতটা অযত্ন করিস্‌ নে। [প্রস্থান

গদাইয়ের প্রবেশ

গদাই। চন্দর যখন পীড়াপীড়ি করছে তা নাহয় একবার ইন্দুমতীর সঙ্গে দেখা করাই যাক। শুনেছি তিনি বেশ বুদ্ধিমতী সুশিক্ষিতা মেয়ে— তাঁকে আমার অবস্থা বুঝিয়ে বললে তিনি নিজেই আমাকে বিবাহ করতে অসম্মত হবেন। তা হলে আমার ঘাড় থেকে দায়টা যাবে— বাবাও আর পীড়াপীড়ি করবেন না।

মুখে ঘোমটা টানিয়া ইন্দুমতীর প্রবেশ

ইন্দু। (স্বগত) বাবা যখন বলছেন তখন দেখা করতেই হবে, কিন্তু কারো অনুরোধে তো পছন্দ হয় না। বাবা কখনোই আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দেবেন না।

গদাই। (নতশিরে ইন্দুর প্রতি) আমাদের মা-বাপ আমাদের পরস্পরের বিবাহের জন্যে পীড়াপীড়ি করছেন, কিন্তু আপনি যদি ক্ষমা করেন তো আপনাকে একটি কথা বলি—

ইন্দু। একি! এ যে ললিতবাবু! (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) ললিতবাবু, আপনাকে বিবাহের জন্যে যাঁরা পীড়াপীড়ি করছেন তাঁদের আপনি জানাবেন, বিবাহ এক পক্ষের সম্মতিতে হয় না। আমাকে আপনার বিবাহের কথা বলে কেন অপমান করছেন?

গদাই। একি! এ যে কাদম্বিনী! (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আপনি এখানে আমি তা জানতুম না। আমি মনে করেছিলুম, নিবারণবাবুর কন্যা ইন্দুমতীর সঙ্গে আমি কথা কচ্ছি— কিন্তু আমার যে এমন সৌভাগ্য হবে—

ইন্দু। ললিতবাবু, আপনার সৌভাগ্য আপনি মনে মনে রেখে দেবেন, সে কথা আমার কাছে প্রচার করবার দরকার দেখি নে।

গদাই। আপনি কাকে ললিতবাবু বলছেন? ললিতবাবু বারান্দায় বিনোদের সঙ্গে গল্প করছেন— যদি আবশ্যক থাকে তাঁকে ডেকে নিয়ে আসি।

ইন্দু। না না, তাঁকে ডাকতে হবে না। আপনি তা হলে কে!

গদাই। এর মধ্যেই ভুলে গেলেন? চন্দ্রবাবুর বাসায় আপনি নিজে আমাকে চাকরি দিয়েছেন, আমি তৎক্ষণাৎ তা মাথায় করে নিয়েছি— ইতিমধ্যে বরখাস্ত হবার মতো কোনো অপরাধ করি নি তো।

ইন্দু। আপনার নাম কি ললিতবাবু নয়?

গদাই। যদি পছন্দ করেন তো ওই নামই শিরোধার্য করে নিতে পারি, কিন্তু বাপ-মায়ে আদর করে আমার নাম রেখেছিলেন গদাই।

ইন্দু। গদাই!— ছি ছি, এ কথা আমি আগে জানতে পারলুম না কেন!

গদাই। তা হলে কি চাকরি দিতেন না? এখন কী আদেশ করেন?

ইন্দু। আমি আদেশ করছি, ভবিষ্যতে যখন কবিতা লিখবেন কাদম্বিনীর পরিবর্তে ইন্দুমতী নামটি ব্যবহার করবেন আর ছন্দ মিলিয়ে লিখবেন।

গদাই। দুটোই যে আমার পক্ষে সমান অসাধ্য।

ইন্দু। আচ্ছা, ছন্দ মেলাবার ভার আমি নিজেই নেব এখন, নামটা আপনি বদলে নেবেন—

গদাই। এমন নিষ্ঠুর আদেশ কেন করছেন? চোদ্দটা অক্ষরের জায়গায় সতেরোটা বসানো কি এমনি গুরুতর অপরাধ যে সেজন্যে ভৃত্যকে একেবারে—

ইন্দু। না, সে অপরাধ আমি সহস্রবার মার্জনা করতে পারি, কিন্তু ইন্দুমতীকে কাদম্বিনী বলে ভুল করলে আমার সহ্য হবে না—

গদাই। আপনার নাম তবে—

ইন্দু। ইন্দুমতী।

গদাই। হায় হায়, এতদিন কী ভুলটাই করেছি! বাগবাজারের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি, বাবা আমাকে উঠতে বসতে দু-বেলা বাপান্ত করেছেন, তার উপরে কাদম্বিনী নামটা ছন্দের ভিতর পুরতে মাথা-ভাঙাভাঙি করতে হয়েছে।—

(মৃদুস্বরে) যেমনি আমায় ইন্দু প্রথম দেখিলে
কেমন করে চকোর বলে তখনি চিনিলে—

কিম্বা

কেমন করে চাকর বলে তখনি চিনিলে—

আহা, সে কেমন হত!

ইন্দু। তবে এখন ভ্রমসংশোধন করুন—এই নিন আপনার খাতা। আমি চললুম। [প্রস্থান

গদাই। (উচ্চস্বরে) শুনে যান, আপনারও বোধ হচ্ছে যেন একটা ভ্রম হয়েছিল—সেটাও অনুগ্রহ করে সংশোধন করে নেবেন— সুবিধে আছে, আপনাকে সেইসঙ্গে ছন্দ বদলাতে হবে না।— হায় রে, সেই মোজার কবিতাটা যে অপরাধের বোঝা হয়ে আমার অ্যানাটমির নোট-বইটা চেপে রইল। মেজর অপারেশন করলেও যে ওটাকে ছাঁটা যাবে না। আর সেই রিফু-করা মোজা ক-জোড়া। আজও যে প্রাণ ধরে সেগুলো ফিরিয়ে দিতে পারি নি। তার উপরে সেদিন থেকে ভক্ত ফুলুরিওয়ালার তেলে-ভাজা বেগ্‌নি খেয়ে খেয়ে অম্লশূল হবার জো হল। ঠাকুরদাদীকে খুঁজে বের করতে হবে। সে বুড়িটাকে— ইচ্ছে করছে— থাক্‌, সে আর বলে কাজ নেই।

নিবারণের প্রবেশ

নিবারণ। দেখো বাপু, শিবু আমার বাল্যকালের বন্ধু— আমার বড়ো ইচ্ছে, তাঁর সঙ্গে আমার একটা পারিবারিক বন্ধন হয়। এখন তোমাদের ইচ্ছের উপরেই সমস্ত নির্ভর করছে।

গদাই। আমার ইচ্ছের জন্যে আপনি কিছু ভাববেন না, আপনার আদেশ পেলেই আমি কৃতার্থ হই।

নিবারণ। (স্বগত) যা মনে করেছিলুম তাই। বুড়ো বাপ মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করে যা করতে না পারলে, একবার ইন্দুকে দেখবামাত্র সমস্ত ঠিক হয়ে গেল। বুড়োরাই শাস্ত্র মেনে চলে, যুবাদের শাস্ত্রই এক আলাদা। (প্রকাশ্যে) তা বাপু, তোমার কথা শুনে বড়ো আনন্দ হল। তা হলে একবার আমার মেয়েকে তার মতটা জিজ্ঞাসা করে আসি। তোমরা শিক্ষিত লোক, বুঝতেই পার, বয়ঃপ্রাপ্ত মেয়ে, তার সম্মতি না নিয়ে তাকে বিবাহ দেওয়া যায় না।

গদাই। তা অবশ্য।

নিবারণ। তা হলে আমি একবার আসি। চন্দ্রবাবুদের এই ঘরে ডেকে দিয়ে যাই। [প্রস্থান

শিবচরণের প্রবেশ

শিবচরণ। তুই এখানে বসে রয়েছিস, আমি তোকে পৃথিবী-সুদ্ধ খুঁজে বেড়াচ্ছি।

গদাই। কেন বাবা ?

শিবচরণ। তোকে যে আজ তারা দেখতে আসবে।

গদাই। কারা ?

শিবচরণ। বাগবাজারের চৌধুরীরা।

গদাই। কেন !

শিবচরণ। কেন ! না দেখে-শুনে অমনি ফস করে বিয়ে হয়ে যাবে ? তোর বুঝি আর সবুর সইছে না ?

গদাই। বিয়ে কার সঙ্গে হবে ?

শিবচরণ। ভয় নেই রে বাপু, তুই যাকে চাস তারই সঙ্গে হবে। আমার ছেলে হয়ে তুই যে এত টাকা চিনেছিস, তা তো জানতুম না। তা সেই বাগবাজারের ট্যাকশালের সঙ্গেই তোর বিয়ে স্থির করে এসেছি।

গদাই। সে কী বাবা! আপনার মতের বিরুদ্ধে আমি বিয়ে করতে চাই নে— বিশেষ আপনি নিবারণবাবুকে কথা দিয়েছেন—

শিবচরণ। (অনেকক্ষণ হাঁ করিয়া গদাইয়ের মুখের দিকে নিরীক্ষণ) তুই খেপেছিস না আমি খেপেছি, আমাকে কে বুঝিয়ে দেবে! কথাটা একটু পরিষ্কার করে বল্, আমি ভালো করে বুঝি।

গদাই। আমি সে চৌধুরীদের মেয়ে বিয়ে করব না।

শিবচরণ। চৌধুরীদের মেয়ে বিয়ে করবি নে! তবে কাকে করবি?

গদাই। নিবারণবাবুর মেয়ে ইন্দুমতীকে।

শিবচরণ। (উচ্চস্বরে) কী! হতভাগা পাজি লক্ষ্মীছাড়া বেটা! যখন ইন্দুমতীর সঙ্গে সম্বন্ধ করি তখন বলিস কাদম্বিনীকে বিয়ে করবি আবার যখন কাদম্বিনীর সঙ্গে সম্বন্ধ করি তখন বলিস ইন্দুমতীকে বিয়ে করবি— তুই তোর বুড়ো বাপকে একবার বাগবাজার একবার মির্জাপুর খেপিয়ে নিয়ে, নাচিয়ে নিয়ে বেড়াতে চাস!

গদাই। আমাকে মাপ করো বাবা, আমার একটা মস্ত ভুল হয়ে গিয়েছিল—

শিবচরণ। ভুল কী রে বেটা, তোর সেই বাগবাজারে বিয়ে করতেই হবে। তাদের কোনো পুরুষে চিনি নে, আমি নিজে গিয়ে তাদের স্তুতি মিনতি করে এলুম যেন আমারই কন্যাদায় হয়েছে। তার পরে যখন সমস্ত ঠিকঠাক হয়ে গেল, আজ তারা আশীর্বাদ করতে আসবে, তখন বলে কি না 'বিয়ে করব না'! আমি এখন চৌধুরীদের বলি কী?

চন্দ্রকান্তের প্রবেশ

চন্দ্রকান্ত। (গদাইয়ের প্রতি) সমস্ত শুনলুম। ভালো একটি গোল বাধিয়েছ যাহোক।— এই যে ডাক্তারবাবু, ভালো আছেন তো?

শিবচরণ। ভালো আর থাকতে দিলে কই। এই দেখো-না চন্দর, ওর নিজেরই কথামত একটি পাত্রী স্থির করলুম, যখন সমস্ত ঠিক হয়ে গেল তখন বলে কি না 'তাকে বিয়ে করব না'। আমি এখন চৌধুরীদের বলি কী?

গদাই। বাবা, তুমি তাদের একটু বুঝিয়ে বললেই—

শিবচরণ। তোমার মাথা! তাদের বোঝাতে হবে, আমার ভীমরতি ধরেছে আর আমার ছেলেটি আস্ত খেপা— তা তাদের বুঝতে বিলম্ব হবে না।

চন্দ্রকান্ত। আপনি কিছু ভাববেন না। সে মেয়েটির আর একটি পাত্র জুটিয়ে দিলেই হবে।

শিবচরণ। সে তেমন মেয়েই নয়। তার টাকা আছে ঢের, কিন্তু চেহারা দেখে পাত্র এগোয় না। আমার বংশের এই অকাল কুষ্মাণ্ডের মতো এত বড়ো বাঁদর দ্বিতীয় আর কোথায় পাবে যে তাকে বিয়ে করতে রাজি হবে।

চন্দ্রকান্ত। সে আমার উপর ভার রইল। আমি সমস্ত ঠিকঠাক করে দেব। এখন নিশ্চিন্ত মনে নিবারণবাবুর মেয়ের সঙ্গে বিবাহ স্থির করুন।

শিবচরণ। যদি পার চন্দর, তো বড়ো উপকার হয়। এই বাগবাজারের হাত থেকে মানে মানে নিস্তার পেলে বাঁচি। এ দিকে আমি নিবারণের কাছে মুখ দেখাতে পারছি নে, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি।

চন্দ্রকান্ত। সেজন্যে কোনো ভাবনা নেই। আমি প্রায় অর্ধেক কাজ গুছিয়ে এসে তবে আপনাকে বলছি। এখন বাকিটুকু সেরে আসি। [প্রস্থান

নিবারণের প্রবেশ

শিবচরণ। আরে এসো ভাই, এসো।

নিবারণ। ভালো আছ ভাই? যা হোক শিবু, কথা তো স্থির?

শিবচরণ। সে তো বরাবরই স্থির আছে, এখন তোমার মরজি হলেই হয়।

নিবারণ। আমারও তো সমস্ত ঠিক হয়ে আছে, এখন হয়ে গেলেই চুকে যায়।

শিবচরণ। তবে আর কি, দিনক্ষণ দেখে—

নিবারণ। সে-সব কথা পরে হবে— এখন কিছু মিষ্টিমুখ করবে চলো।

শিবচরণ। না ভাই, আমার অভ্যাস নেই, এখন থাক্— অসময়ে খেয়েছি কি আর আমার মাথা ধরেছে—

নিবারণ। না না, সে হবে না, কিছু খেতে হচ্ছে। বাপু, তুমিও এসো।

[প্রস্থান

কমল ও ইন্দুর প্রবেশ

কমল। ছি ছি, ইন্দু, তুই কী কাণ্ডটাই করলি বল্ দেখি?

ইন্দু। তা বেশ করেছি। ভাই, পরে গোল বাধার চেয়ে আগে গোল চুকে যাওয়া ভালো।

কমল। এখন পুরুষ জাতটাকে কী রকম লাগছে।

ইন্দু। মন্দ না ভাই, একরকম চলনসই।

কমল। তুই যে বলেছিলি ইন্দু, গদাই গয়লাকে তুই কক্খনো বিয়ে করবি নে!

ইন্দু। না ভাই, গদাই নামটি খারাপ নয়, তা তোমরা যাই বল। তোমার

কল্লোলকুমার, লাবণ্যকিশোর, কাকলীকণ্ঠ, স্মিতমোহনের চেয়ে সহস্র গুণে ভালো। গদাই নামটি খুব আদরের নাম, অথচ পুরুষমানুষকে বেশ মানায়। রাগ করিস নে দিদি, তোর বিনোদের চেয়ে ঢের ভালো—

কমল। কী হিসেবে ভালো শুনি।

ইন্দু। বিনোদবিহারী নামটা বাণভট্টের কাদম্বরীতেই চলে, আঠারো-গজি সমাসের মধ্যে। গদাই বেশ সাদাসিধে, ওর মধ্যে বোপদেবের হস্তক্ষেপ করবার জো নেই। আমি তোমাকে নিশ্চয় বলছি, মা দুর্গা কার্তিকের চেয়ে গণেশকেই বেশি ভালোবাসেন। গদাই নামটি আমার গদাইগণেশ, তোমার বিনোদকার্তিকের চেয়ে ভালো।

কমল। কিন্তু যখন বই ছাপাবে, বইয়ে ও নাম তো মানাবে না।

ইন্দু। আমি তো ছাপতে দেব না, খাতাখানি আগে আটক করে রাখব। আমার ততটুকু বুদ্ধি আছে দিদি!

কমল। তা, যে নমুনা দেখিয়েছিলি! তোর সেটুকু বুদ্ধি আছে জানি, কিন্তু শুনেছি বিয়ে করলে স্বামীর লেখা সম্বন্ধে মত বদলাতে হয়।

ইন্দু। আমার তো তার দরকার হবে না। আমার কবি কেবল আমারই কবি, পৃথিবীতে তাঁর কেবল একটিমাত্র পাঠক।

কমল। ছাপবার খরচ বেঁচে যাবে—

ইন্দু। সবাই তাঁর কবিত্বের প্রশংসা করলে আমার প্রশংসার মূল্য থাকবে না।

কমল। সবাই প্রশংসা করবে, ওই আশঙ্কাটা তোকে করতে হবে না। যা হোক, তোর গয়লাটিকে তোর পছন্দ হয়েছে, তা নিয়ে তোর সঙ্গে ঝগড়া করতে চাই নে। তাকে নিয়ে তুই চিরকাল সুখে থাক বোন! তোর গোয়াল দিনে দিনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক।

ইন্দু। ওই বিনোদবাবু আসছেন। মুখটা ভারি বিমর্ষ দেখছি।

[ইন্দুর প্রস্থান

বিনোদের প্রবেশ

কমল। তাঁকে এনেছেন?

বিনোদ। তিনি তাঁর বাপের বাড়ি গেছেন, তাঁকে আনবার তেমন সুবিধে হচ্ছে না।

কমল। আমার বোধ হচ্ছে, তিনি যে আমার সঙ্গিনীভাবে এখানে থাকেন সেটা আপনার আন্তরিক ইচ্ছে নয়।

বিনোদ। আপনাকে আমি বলতে পারি নে, তিনি এখানে আপনার কাছে থাকলে আমি কত সুখী হই। আপনার দৃষ্টান্তে তাঁর কত শিক্ষা হয়।

কমল। আমার দৃষ্টান্ত হয়তো তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। শুনেছি আপনি তাঁকে অল্পদিন হল বিবাহ করেছেন, হয়তো তাঁকে ভালো করে জানেন না।

বিনোদ। তা বটে। কিন্তু যদিও তিনি আমার স্ত্রী তবু এ কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে, আপনার সঙ্গে তাঁর তুলনা হতে পারে না।

কমল। ও কথা বলবেন না। আপনি হয়তো জানেন না, আমি তাঁকে বাল্যকাল হতে চিনি। তাঁর চেয়ে আমি যে কোনো অংশে শ্রেষ্ঠ এমন বোধ হয় না।

বিনোদ। আপনি তাঁকে চেনেন?

কমল। খুব ভালোরকম চিনি।

বিনোদ। আমার সম্বন্ধে তিনি আপনার কাছে কোনো কথা বলেছেন?

কমল। কিছু না। কেবল বলেছেন, তিনি আপনার ভালোবাসার যোগ্য নন। আপনাকে সুখী করতে না পেরে এবং আপনার ভালোবাসা না পেয়ে তাঁর সমস্ত জীবনটা ব্যর্থ হয়ে আছে।

বিনোদ। এ তাঁর ভারি ভ্রম। তবে আপনার কাছে স্পষ্ট স্বীকার করি, আমিই তাঁর ভালোবাসার যোগ্য নই। আমি তাঁর প্রতি বড়ো অন্যায় করেছি, কিন্তু সে তাঁকে ভালোবাসি নে ব'লে নয়।

কমল। তবে আর-একটি সংবাদ আপনাকে দিই। আপনার স্ত্রীকে আমি এখানে আনিয়ে রেখেছি।

বিনোদ। (আগ্রহে) কোথায় আছেন তিনি, আমার সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দিন।

কমল। তিনি ভয় করছেন পাছে আপনি তাঁকে ক্ষমা না করেন—যদি অভয় দেন—

বিনোদ। বলেন কী, আমি তাঁকে ক্ষমা করব! তিনি যদি আমাকে ক্ষমা করতে পারেন—

কমল। তিনি কোনোকালেই আপনাকে অপরাধী করেন নি, সেজন্যে আপনি ভাববেন না—

বিনোদ। তবে এত মিনতি করছি, তিনি আমাকে দেখা দিচ্ছেন না কেন?

কমল। আপনি সত্যিই যে তাঁর দেখা চান, এ জানতে পারলে তিনি একমুহূর্ত গোপনে থাকতেন না। তবে নিতান্ত যদি সেই পোড়ার মুখ দেখতে চান তো দেখুন।

[মুখ উদ্‌ঘাটন

বিনোদ। আপনি! তুমি! কমল! আমাকে মাপ করলে!

ইন্দুর প্রবেশ

ইন্দু। মাপ করিস নে দিদি! আগে উপযুক্ত শাস্তি হোক, তার পরে মাপ।

বিনোদ। তা হলে অপরাধীকে আর-একবার বাসরঘরে আপনার হাতে সমর্পণ করতে হয়।

ইন্দু। দেখেছিস ভাই, কত বড়ো নির্লজ্জ! এরই মধ্যে মুখে কথা ফুটেছে। ওঁদের একটু আদর দিয়েছিস কি, আর ওঁদের সামলে রাখবার জো নেই। মেয়েমানুষের হাতে পড়েই ওঁদের উপযুক্ত শাসন হয় না। যদি নিজের জাতের সঙ্গে ঘরকন্না করতে হত তা হলে দেখতুম ওঁদের এত আদর থাকত কোথায়!

বিনোদ। তা হলে ভূ-ভার-হরণের জন্যে মাঝে মাঝে অবতারের আবশ্যক হত না; পরস্পরকে কেটেকুটে সংসারটা অনেকটা সংক্ষেপ করে আনতে পারতুম।

ইন্দু। গান

এবার মিলন-হাওয়ায় হাওয়ায় হেলতে হবে।
ধরা দেবার খেলা এবার খেলতে হবে।
ওগো পথিক, পথের টানে
চলেছিলে মরণ-পানে—
আঙিনাতে আসন এবার মেলতে হবে।

মাধবিকার কুঁড়িগুলি আনো তুলে,
মালতিকার মালা গাঁথো নবীন ফুলে।
স্বপ্নস্রোতে ভিড়বি পারে,
বাঁধবি দুজন দুই জনারে—
সেই মায়াজাল হৃদয় ঘিরে ফেলতে হবে।

ইন্দু। এখন কবিসম্রাট, এর একটা জবাব দিতে হবে তোমাকে।

বিনোদ। এখনি? হাতে হাতে?

ইন্দু। হাঁ, এখুনি।

বিনোদ। আচ্ছা, দুটো মিনিট সময় দাও। [নোটবই লইয়া লিখিতে প্রবৃত্ত

কমল। এ আবার তুই কী খেলা বের করলি ইন্দু!

ইন্দু। কমলদিদি, তুমি যে-খেলা খেলে নিলে এ তার চেয়ে অনেক বেশি নিরাপদ। উনি বাঁধছেন কাব্য, তুমি বেঁধেছ কবিকে।

কমল। ওগো শিকারী, তুমি আর কথা কোয়ো না। তোমার নিজের কবিটির কাহিনী ভুলে গেছ বুঝি? একবার তাকে হল অস্বীকার, আবার হল স্বীকার— মানুষটাকে কি কম নাকাল করা হয়েছে!

ইন্দু। আমার অকবিটিকে আমি কবি বানিয়েছি, এর বেশি কিছু না— কিন্তু তোমার মানুষটি আদিতে ছিলেন কবি, মধ্যে হলেন অকবি, আবার অন্তে উলটো রথে ফিরছেন কবিত্বে, এ কী কম কথা! আমাদের কমল অধিকারীর এই পালাটির নাম দিয়েছি কবি-জগন্নাথের রথযাত্রা। মন্দির থেকে বেরোনো, আবার মন্দিরে ফিরিয়ে আনা। দু দিন বাদেই দেখবি, থিয়েটার-ওয়ালারা ঝুলোঝুলি করবে এটা অভিনয় করবার জন্যে।— লেখা হল কবিবর?

বিনোদ। হয়েছে। [ইন্দু ও কমলে মিলিয়া নোটবই লইয়া মনে মনে পাঠ

ইন্দু। পাকা আম নিঙড়োলে রসের সঙ্গে আঁটি বেরিয়ে আসে, এও যে তাই।

বিনোদ। অর্থাৎ?

ইন্দু। অর্থাৎ, এ তো শুধু কাব্যরস নয়, এ যে রসতত্ত্ব। দিদি, তোমার এ কবিটি যে-সে কবি নয়— কাব্যকুঞ্জবনে এই মানুষটি নারিকেলজাতীয়। তোমার ভাগ্যে শাঁসও জুটবে, রসও জুটবে!

কমল। আর তোর ভাগ্যে ইন্দু?

ইন্দু। শুধু ছোবড়া।

বিনোদ। ছি ছি ভাই, আমার মধ্যে এমন রসের সংকীর্ণতা দেখলে কোথায়?

ইন্দু। কবিবর, সংকীর্ণতার দর বেশি, ঔদার্যেই সস্তা করে। হীরের টুকরো সংকীর্ণ, পাথরের চাঁই মস্ত। আমরা চাই, তুমি একলা আমার দিদির কণ্ঠহারে একটিমাত্র মধ্যমণি হয়ে থাকো— সরকারি হোটেলের রান্নাঘরে মস্ত শিলনোড়ার কাজে বিশ্বজনীন হয়ে না ওঠো।

বিনোদ। তাই সই, কিন্তু ওই যে গানটা তৈরি করলেম ওটাকে সুরের হারে গেঁথে একলা তোমার কণ্ঠে কি স্থান দেবে না?

ইন্দু। আচ্ছা, আজ তোমার গুড কন্‌ডাক্টের প্রাইজ স্বরূপে এই অনুগ্রহ করতে রাজি আছি। কোন্‌ সুর তোমার পছন্দ বলো।

বিনোদ। তোমার পছন্দেই আমার পছন্দ।

ইন্দু। আচ্ছা, সখা, তবে শ্রবণ করো।

গান

লুকালে বলেই খুঁজে বাহির-করা।
ধরা যদি দিতে তবে যেত না ধরা।

পাওয়া ধন আনমনে
হারাই যে অযতনে,
হারাধন পেলে সে যে হৃদয়-ভরা।

আপনি যে কাছে এল দূরে সে আছে,
কাছে যে টানিয়া আনে সে আসে কাছে।
দূরে বারি যায় চ'লে,
লুকায় মেঘের কোলে,
তাই সে ধরায় ফেরে পিপাসাহরা।

কমল। ওই ক্ষান্তদিদি আসছেন। (বিনোদের প্রতি) তোমার সাক্ষাতে উনি বেরোবেন না।

[বিনোদের প্রস্থান

ক্ষান্তমণির প্রবেশ

ক্ষান্তমণি। তা বেশ হয়েছে ভাই, বেশ হয়েছে। এই বুঝি তোর নতুন বাড়ি। এ যে রাজার ঐশ্বর্য! তা বেশ হয়েছে। এখন তোর স্বামী ধরা দিলেই আর কোনো খেদ থাকে না।

ইন্দু। সে বুঝি আর বাকি আছে? স্বামী রত্নটিকে আগে-ভাগে ভাঁড়ারে পুরেছেন।

ক্ষান্তমণি। আহা, তা বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে। কমলের মতো এমন লক্ষ্মীমেয়ে কি কখনো অসুখী হতে পারে?

ইন্দু। ক্ষান্তদিদি, তুমি যে ভর-সন্ধের সময় ঘরকন্না ফেলে এখানে ছুটে এসেছ?

ক্ষান্তমণি। আর ভাই, ঘরকন্না! আমি দু দিন বাপের বাড়ি গিয়েছিলুম, এই ওঁর আর সহ্য হল না। রাগ ক'রে ঘর ছেড়ে, শুনলুম, তোদের এই বাড়িতে এসে রয়েছেন। তা, ভাই, বিয়ে করেছি বলেই কি বাপ মা একেবারে পর হয়ে গেছে? দু দিন সেখানে থাকতে পাব না? যা হোক, খবরটা পেয়ে চলে আসতে হল।

ইন্দু। আবার তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে বুঝি?

ক্ষান্তমণি। তা, ভাই, একলা তো আর ঘরকন্না হয় না। ওদের যে চাই, ওদের যে নইলে নয়। নইলে আমার কি সাধ ওদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখি?

ইন্দু। ওই যে ওঁরা আসছেন। এসো এই পাশের ঘরে। [প্রস্থান

শিবচরণ গদাই নিবারণ ও চন্দ্রকান্তের প্রবেশ

চন্দ্রকান্ত। সমস্ত ঠিক হয়ে গেছে।

শিবচরণ। কী হল বলো দেখি।

চন্দ্রকান্ত। ললিতের সঙ্গে কাদম্বিনীর বিবাহ স্থির হয়ে গেল।

শিবচরণ। সে কী! সে যে বিবাহ করবে না শুনলুম?

চন্দ্রকান্ত। সহধর্মিণীকে না। বিয়ে করছে টাকা-কল্পলতিকাকে; সে ওকে সাতপাকে ঘিরে বিলেত যাবার পাথেয়-পুষ্পবৃষ্টি করবে। যা হোক, এখন আর-একবার আমাদের গদাইবাবুর মত নেওয়া উচিত— ইতিমধ্যে যদি আবার বদল হয়ে থাকে।

শিবচরণ। (ব্যস্তভাবে) না না, আর মত বদলাতে সময় দেওয়া হবে না। তার পূর্বেই আমরা পাঁচজনে প'ড়ে চেপেচুপে ধ'রে কোনো গতিকে ওর বিয়েটা দিয়ে দিতে হচ্ছে। চলো গদাই, অনেক আয়োজন করবার আছে।

(নিবারণের প্রতি) তবে চললেম ভাই!

নিবারণ। এসো।— [গদাই ও শিবচরণের প্রস্থান

চন্দরবাবু, আপনার তো খাওয়া হল না, কেবল ঘুরে ঘুরেই অস্থির হলেন— একটু বসুন, আপনার জন্যে জলখাবারের আয়োজন করে আসি গে। [প্রস্থান

ক্ষান্তমণির প্রবেশ

ক্ষান্তমণি। এখন বাড়ি যেতে হবে না কী?

চন্দ্রকান্ত। (দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া) নাঃ, আমি এখানে বেশ আছি।

ক্ষান্তমণি। তা তো দেখতে পাচ্ছি। তা চিরকাল এইখানেই কাটাবে নাকি?

চন্দ্রকান্ত। বিনুর সঙ্গে আমার তো সেইরকমই কথা হয়েছে।

ক্ষান্তমণি। বিনু তোমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কিনা! বিনুর সঙ্গে কথা হয়েছে! এখন ঢের হয়েছে, চলো।

চন্দ্রকান্ত। (জিব কাটিয়া, মাথা নাড়িয়া) সে কি হয়। বন্ধুমানুষকে কথা দিয়েছি, এখন কি সে ভাঙতে পারি।

ক্ষান্তমণি। আমার ঘাট হয়েছে, আমাকে মাপ করো তুমি। আমি আর কখনো বাপের বাড়ি গিয়ে থাকব না। তা তোমার তো অযত্ন হয় নি— আমি তো সেখান থেকে সমস্ত রেঁধে তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছি।

চন্দ্রকান্ত। বড়োবউ, আমি কি তোমার রান্নার জন্যে তোমাকে বিয়ে করেছিলুম?

যে-বৎসর তোমার সঙ্গে অভাগার শুভবিবাহ হয় সে-বৎসর কলকাতা শহরে কি রাঁধুনি বামুনের মড়ক হয়েছিল ?

ক্ষান্তমণি। আমি বলছি, আমার একশোবার ঘাট হয়েছে, আমাকে মাপ করো, আমি আর কখনো এমন কাজ করব না। এখন তুমি ঘরে চলো।

চন্দ্রকান্ত। তবে একটু বোসো। নিবারণবাবু আমার জলখাবারের ব্যবস্থা করতে গেছেন— উপস্থিত ত্যাগ করে যাওয়াটা শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

ক্ষান্তমণি। আমি সেখানে সব ঠিক করে রেখেছি, তুমি এখনি চলো।

চন্দ্রকান্ত। বলো কী, নিবারণবাবু—

বন্ধুগণ। (নেপথ্য হইতে)। চন্দরদা !

ক্ষান্তমণি। ওই রে, আবার ওরা আসছে ! ওদের হাতে পড়লে আর তোমার রক্ষে নেই।

চন্দ্রকান্ত। ওদের হাতে তুমি আমি দু জনে পড়ার চেয়ে একজন পড়া ভালো। শাস্ত্রে লিখছে : সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ, অতএব এ স্থলে অর্ধাঙ্গের সরাই ভালো।

ক্ষান্তমণি। তোমার ওই বন্ধুগুলোর জ্বালায় আমি কি মাথামোড় খুঁড়ে মরব।

[প্রস্থান

বিনোদ গদাই ও নলিনাক্ষের প্রবেশ

চন্দ্রকান্ত। কেমন মনে হচ্ছে বিনু ?

বিনোদ। সে আর কী বলব, দাদা !

চন্দ্রকান্ত। গদাই, তোর স্নায়ুরোগের বর্তমান লক্ষণটা কী বল্ দেখি।

গদাই। অত্যন্ত সাংঘাতিক। ইচ্ছে করছে, দিগ্‌বিদিকে নেচে বেড়াই।

চন্দ্রকান্ত। ভাই, নাচতে হয় তো দিকে নেচো, আর বিদিকে নেচো না। পূর্বে তোমার যেরকম দিগ্‌ভ্রম হয়েছিল, কোথায় মির্জাপুর— কোথায় বাগবাজার !

গদাই। এখন ঠিক পথেই চলেছি, যাচ্ছি বাসরঘরের দিকে ; এই যে সামনেই।

[প্রস্থান

চন্দ্রকান্ত। সদ্‌দৃষ্টান্ত দেখে আমারও ঠিক পথে যাবার ইচ্ছে প্রবল হল। এখানেও আহার তৈরি, ঘরেও আহার প্রস্তুত— কিন্তু ঘরের দিকে ডবল টান পড়েছে।

বিনোদ। ওহে চন্দরদা, চুপ চুপ !

চন্দ্রকান্ত। কেন হে ?

বিনোদ। ওই-যে সুর বেজে উঠল বাসরঘর থেকে।

চন্দ্রকান্ত। তাই তো, বিপদ কাছে আসছে। ছিল গলির ও পারে, এখন এল পাশের ঘরে— ক্রমে আরো কাছে আসবে।

বিনোদ। চন্দরদা, বেরসিকের মতো কথা বোলো না, বিপদ আরো বেশি ছিল যখন সেটা গলির ও পারে ছিল— যতই কাছে আসছে ততই হৃদয় ভেঙে যাবার আশঙ্কা কমছে।

নেপথ্যে গান

মুখ-পানে চেয়ে দেখি, ভয় হয় মনে,
ফিরেছ কি ফের নাই বুঝিব কেমনে
আসন দিয়েছি পাতি, মালিকা রেখেছি গাঁথি,
বিফল হল কি তাহা ভাবি খনে খনে।

গোধূলিলগনে পাখি ফিরে আসে নীড়ে,
ধানে-ভরা তরীখানি ঘাটে এসে ভিড়ে।
আজো কি খোঁজার শেষে
ফেরো নি আপন দেশে,
বিরামবিহীন তৃষা জ্বলে কি নয়নে?

চন্দ্রকান্ত। ওরে বিনু, এখনো মামলা চোকে নি, প্রিভিকৌন্সিলে নালিশ চলছে। তোর তরফের কৌঁসুলির কোনো জবাব তৈরি আছে? 'প্লীড্ গিল্‌টি' নাকি।

বিনোদ। একরকম তাই। কিন্তু দাদা, আমাদের মোটা কণ্ঠে কথা জোটে তো সুর জোটে না।

চন্দ্র। তা হোক, হার মানতে পারব না। আচ্ছা, দে দেখি কথাটা; কোনোমতে সবাই মিলে চেঁচামেচি করে চালিয়ে দিতে পারব।

বিনোদ। এই যে, আমার বইয়ে ছাপানো আছে।

চন্দ্রকান্ত। ধন্য কবি, ধন্য— নিদেন কালের উপযুক্ত সকল রকম বটিকা আগে থাকতেই তৈরি করে রেখেছ! কাফি সুরে ঠিক লাগবে—

গান

জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না,
হায় ভীরু প্রেম, হায় রে!

আশার আলোয় তবুও ভরসা পায় না,
মুখে হাসি তবু চোখে জল না শুকায় রে!
বিরহের দাহ আজি হল যদি সারা,
ঝরিল মিলনরসের শ্রাবণধারা,
তবুও এমন গোপন বেদনতাপে
অকারণ দুখে পরান কেন দুখায় রে?

যদি বা ভেঙেছে ক্ষণিক মোহের ভুল
এখনো প্রাণে কি যাবে না মানের মূল?
যাহা খুঁজিবার সাঙ্গ হল তো খোঁজা,
যাহা বুঝিবার শেষ হয়ে গেল বোঝা,
তবু কেন হেন সংশয়ঘনছায়ে
মনের কথাটি নীরব মনে লুকায় রে?

তৃতীয় দৃশ্য

বাসরঘরের বাহিরে

লোকারণ্য। শঙ্খ। হুলুধ্বনি। সানাই

নিবারণ ও শিবচরণ

নিবারণ। কানাই! ও কানাই! কী করি বলো দেখি! কানাই গেল কোথায়?

শিবচরণ। তুমি ব্যস্ত হোয়ো না ভাই! এ ব্যস্ত হবার কাজ নয়। আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি। তুমি পাত পাড়া হল কি না দেখে এসো দেখি।

ভৃত্য। বাবু, আসন এসে পৌঁচেছে, সেগুলো রাখি কোথায়?

নিবারণ। এসেছে! বাঁচা গেছে। তা সেগুলো ছাতে—

শিবচরণ। ব্যস্ত হচ্ছ কেন দাদা! কী হয়েছে বলো দেখি। কী রে বেটা, তুই হাঁ করিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন? কাজকর্ম কিছু হাতে নেই নাকি?

ভৃত্য। আসন এসেছে, সেগুলো রাখি কোথায় তাই জিজ্ঞাসা করছি।

শিবচরণ। আমার মাথায়! একটু গুছিয়েগাছিয়ে নিজের বুদ্ধিতে কাজ করা, তা তোদের দ্বারা হবে না। চল্, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ওরে বাতিগুলো যে এখনো

জ্বালালে না। এখানে কোনো কাজেরই একটা বিলিব্যবস্থা নেই— সমস্ত বেবন্দোবস্ত। নিবারণ, ভাই, তুমি একটু ঠাণ্ডা হয়ে বোসো দেখি— ব্যস্ত হয়ে বেড়ালে কোনো কাজই হয় না। আঃ, বেটাদের কেবল ফাঁকি! বেহারা বেটারা সব পালিয়েছে দেখছি, আচ্ছা করে তাদের কানমলা না দিলে—

নিবারণ। পালিয়েছে নাকি! কী করা যায়?

শিবচরণ। ব্যস্ত হোয়ো না ভাই— সব ঠিক হয়ে যাবে। বড়ো বড়ো ক্রিয়া-কর্মের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখা ভারি দরকার। কিন্তু এই রেধো বেটার সঙ্গে তো আর পারি নে! আমি তাকে পইপই করে বললুম 'তুমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে লুচি ভাজিয়ো', কিন্তু কাল থেকে হতভাগা বেটার চুলের টিকি দেখবার জো নেই! লুচি যেন কিছু কম পড়েছে বোধ হচ্ছে।

নিবারণ। বলো কী শিবু! তা হলে তো সর্বনাশ!

শিবচরণ। ভয় কী দাদা! তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, সে আমি করে নিচ্ছি। একবার রাঁধুর দেখা পেলে হয়, আচ্ছা করে শুনিয়ে দিতে হবে।

চন্দ্রকান্ত বিনোদ প্রভৃতির প্রবেশ

নিবারণ। আহার প্রস্তুত চন্দ্রবাবু, কিছু খাবেন চলুন।

চন্দ্রকান্ত। আমাদের পরে হবে, আগে সকলের হোক।

শিবচরণ। না না, একে একে সব হয়ে যাক। চলো চন্দর, তোমাদের খাইয়ে আনি গে। নিবারণ, তুমি কিছু ব্যস্ত হোয়ো না, আমি সব ঠিক করে নিচ্ছি। কিন্তু, লুচিটা কিছু কম পড়বে বোধ হচ্ছে।

নিবারণ। তা হলে কী হবে শিবু!

শিবচরণ। ওই দেখো! মিছিমিছি ভাব কেন? সে সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন কেবল সন্দেশগুলো এসে পৌঁছলে বাঁচি। আমার তো বোধ হচ্ছে, ময়রা বেটা বায়না নিয়ে ফাঁকি দিলে।

নিবারণ। বলো কী ভাই!

শিবচরণ। ব্যস্ত হোয়ো না। আমি সব দেখে শুনে নিচ্ছি।

[শিবচরণ ও নিবারণের প্রস্থান

চন্দ্রকান্ত। ওরে বিনু, খাবার লোভে চলেছিস বুঝি?

বিনোদ। কেন, তোমার লোভ একেবারে নেই নাকি?

চন্দ্রকান্ত। কাজ আছে যে।

বিনোদ। কাজ তো ফতে হয়ে গেছে, আবার কী ?

চন্দ্রকান্ত। যে কাজ হয়ে গেছে সে তো ব্যক্তিগত। এখন লড়াই বাকি আছে হিউম্যানিটির জন্যে।

বিনোদ। বাস্ রে, এই অর্ধেক রাত্তিরে শেষকালে হিউম্যানিটি নিয়ে পড়তে হবে ?

চন্দ্রকান্ত। হিউম্যানিটির জন্যে যত ষড়যন্ত্র সে তো অর্ধেক রাত্তিরেই।

বিনোদ। কোন্ দুঃসাধ্য কাজ করতে হবে বলো শুনি।

চন্দ্রকান্ত। বাসরঘরের রুদ্ধ দুর্গ আজ আমরা স্টর্ম্ করব।

বিনোদ। আমরা ভীরু, সামান্য পুরুষজাত মাত্র— আমাদের দ্বারা কি এত বড়ো বিপ্লব ঘটতে পারবে।

চন্দ্রকান্ত। নিজেকে ক্ষুদ্র জ্ঞান কোরো না বিনোদ! ভেবে দেখো, ত্রেতাযুগে যারা সেতুবন্ধন করেছিল জীব হিসাবে তারাও যে আমাদের চেয়ে খুব বেশি শ্রেষ্ঠ ছিল তার প্রমাণ নেই— এমন-কি, এক-আধটা বাহ্য বাহুল্য ছাড়া অনেক বিষয়েই মিল ছিল; মহৎ লক্ষ্য হৃদয়ে রেখে তারাও হেঁটে সমুদ্র পার হল। আর, আমাদের কেবলমাত্র এই দরজাটুকু পার হতে হবে। এতকাল এই বাসরঘরের সামনে স্ত্রীপুরুষের যে বিচ্ছেদসমুদ্র বিরাজ করেছে কেবল একটিমাত্র মহাবীর বরবেশে সেটা লঙ্ঘন করবার অধিকারী; কিষ্কিন্ধ্যার বাকি সকলকেই এ পারে পড়ে থাকতে হয়, এই অগৌরব যদি আমরা মোচন করতে না পারি তা হলে ধিক্ আমাদের পৌরুষ!

বিনোদ। হিয়ার হিয়ার!

চন্দ্রকান্ত। এতদিন সেখানে কেবল ভুজমৃণালের শাসনই বলবান ছিল। আজ বঙ্গোপসাগরের উত্তর তীর থেকে হিমালয়ের দক্ষিণপ্রান্ত পর্যন্ত সকল পুরুষে এককণ্ঠে বলো দেখি, 'নাহি কি বল এ ভুজ-অর্গলে ?'

বিনোদ। আছে আছে!

চন্দ্রকান্ত। নবযুগে পুরুষদের কারখানাঘর-আফিসঘরের সামনে ফেমিনিজ্‌ম্‌এর আক্রমণ চলছে, আজ বাসরঘরের সামনে আমরা ম্যাস্কুলিনিজ্‌ম্ প্রচার করব। আমরা যুগান্তরের পাইওনিয়ার।

বিনোদ। জয়, পুরুষজাতিকী জয়!

চন্দ্রকান্ত। অত্যাচারকারিণীদের সিংহাসন আজ বিচলিত হোক। আবার বলো, জয় পুরুষজাতিকী জয়। গদাই, গদাই, গদাই, গদাধর, ভীরু, ট্রেটর্, এসো তুমি, খোলো রুদ্ধদ্বার, ভাঙো পুরুষজাতির অপমানের বাধা।

বিনোদ। চন্দরদা, ওকে স্পেশ্যাল্ কন্‌শেসন্ দিয়ে এরা কিনে নিয়েছে— ডিভাইড অ্যাণ্ড্ রুল্ পলিসি। ওকে সহজে পাওয়া যাবে না।

চন্দ্রকান্ত। সে কিছুতেই হচ্ছে না। আজ অসম্মানিত পুরুষজাতির আহ্বান তার মুগ্ধ হৃদয়ে গিয়ে পৌঁছবেই। গদাই! গদাধর! বিশ্বাসঘাতক! স্বজাতিবিদ্রোহী কাপুরুষ!

গদাই ইন্দু ও কমলের প্রবেশ

কমল। এখানে দাঁড়িয়ে আপনারা করছেন কী?

চন্দ্রকান্ত। সিডিশন্।

ইন্দু। আপনাদের সাহস তো কম নয়!

চন্দ্রকান্ত। শর্‌ট্‌হ্যাণ্ড্-লিখিয়ে রিপোর্টার কেউ উপস্থিত ছিল না, তাই ভাষাটা হয়তো কিছু অসংযত হয়েছিল। আর কিছুই নয়, আমরা বলছিলুম, 'ভাগ্যদেবীগণ, রুদ্ধদ্বার খোলো— পাপীদের ক্ষমা করবার প্রত্যক্ষ আনন্দটা ভোগ করে নাও, তাতে স্বর্গেরও গৌরব, মর্তেরও পরিত্রাণ।'

ইন্দু। যারা ক্ষমা করবার যোগ্য তাদের তো ক্ষমা হয়ে গেছে।

চন্দ্রকান্ত। এত বড়ো নিষ্ঠুর কথাটা বলতে পারলেন দয়াময়ী? দেবী, আমিই কি পাপিষ্ঠতম? এদের দুজনের চেয়েও অধম?

ইন্দু। তিনি আপনাকে উদ্ধারের আশা ছেড়ে দিয়েছেন।

চন্দ্রকান্ত। দেবী, সেটা কি তাঁর পক্ষে আমার চেয়ে কম শোচনীয়? যিনি তারিণী তাঁর জন্যে যদি একটা বাঁধা পাপীর বরাদ্দ না থাকে তবে তো একেবারে বেকার তিনি। যাকে বলে, আন্‌এম্‌প্লয়্‌মেণ্ট্ প্রব্লেম্! বড়োবউ, তোমার অনুপস্থিতিতে যদি দৈবাৎ আমার সংশোধন হয়ে যায়, যদি তোমার জন্যে সবুর করতে না পারি, যদি পরিত্রাণের দোসরা পথ জুটে যায়, তা হলে সেটাতে কি তোমারই যশ না আমারই!

ক্ষান্তমণির প্রবেশ

ক্ষান্তমণি। আঃ, কী মিছেমিছি চেঁচাচ্ছ!

চন্দ্রকান্ত। মিছেমিছি নয় দেবী! পৃথিবীসুদ্ধ লোক চেঁচাচ্ছে পরিত্রাণের দরবারে —কেউ-বা ধর্মে, কেউ-বা কর্মে, কেউ-বা পলিটিক্‌সে, আর আমিই যদি চুপ করে থাকব তা হলে নিতান্তই ঠকব যে। এই দুটি ভাগ্যবানদের দিকে তাকিয়ে আমি আর থাকতে পারলুম না। একটু চেঁচিয়েছি, ফলও পেয়েছি— এখন যবনিকাপতনের পূর্বে দয়াময়ীদের বন্দনাটা সেরে নিই।

গান। প্রথমে চন্দ্রকান্ত পরে সকলে মিলিয়া

বাউলের সুর

যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেছে
সেই আমাদের ভালো।
আমাদের এই আঁধার ঘরে
সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালো।
কেউ-বা অতি জ্বলজ্বল, কেউ-বা ম্লান ছলছল—
কেউ-বা কিছু দহন করে, কেউ-বা স্নিগ্ধ আলো।
নূতন প্রেমে নূতন বধূ আগাগোড়া কেবল মধু,
পুরাতনে অম্ল-মধুর— একটুকু ঝাঁঝালো।
বাক্য যখন বিদায় করে চক্ষু এসে পায়ে ধরে,
রাগের সঙ্গে অনুরাগে সমান ভাগে ঢালো।
আমরা তৃষ্ণা তোমরা সুধা,
তোমরা তৃপ্তি আমরা ক্ষুধা,
তোমার কথা বলতে কবির কথা ফুরালো।
যে মূর্তি নয়নে জাগে সবই আমার ভালো লাগে—
কেউ-বা দিব্যি গৌরবরন, কেউ-বা দিব্যি কালো।

উপন্যাস ও গল্প

গল্পগুচ্ছ

অনধিকার প্রবেশ

একদা প্রাতঃকালে পথের ধারে দাঁড়াইয়া এক বালক আর-এক বালকের সহিত একটি অসমসাহসিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বাজি রাখিয়াছিল। ঠাকুরবাড়ির মাধবীবিতান হইতে ফুল তুলিয়া আনিতে পারিবে কি না, ইহাই লইয়া তর্ক। একটি বালক বলিল 'পারিব', আর-একটি বালক বলিল 'কখনোই পারিবে না'।

কাজটি শুনিতে সহজ অথচ করিতে কেন সহজ নহে তাহার বৃত্তান্ত আর-একটু বিস্তারিত করিয়া বলা আবশ্যক।

পরলোকগত মাধবচন্দ্র তর্কবাচস্পতির বিধবা স্ত্রী জয়কালী দেবী এই রাধানাথ জীউর মন্দিরের অধিকারিণী। অধ্যাপক মহাশয় টোলে যে তর্কবাচস্পতি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন পত্নীর নিকটে একদিনের জন্যও সে উপাধি সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে উপাধির সার্থকতা ঘটিয়াছিল, কারণ, তর্ক এবং বাক্য সমস্তই তাঁহার পত্নীর অংশে পড়িয়াছিল, তিনি পতিরূপে তাহার সম্পূর্ণ ফলভোগ করিয়াছিলেন।

সত্যের অনুরোধে বলিতে হইবে জয়কালী অধিক কথা কহিতেন না কিন্তু অনেক সময় দুটি কথায়, এমন-কি, নীরবে অতি বড়ো প্রবল মুখবেগও বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন।

জয়কালী দীর্ঘাকার দৃঢ়শরীর তীক্ষ্ণনাসা প্রখরবুদ্ধি স্ত্রীলোক। তাঁহার স্বামী বর্তমানে তাঁহাদের দেবোত্তর সম্পত্তি নষ্ট হইবার জো হইয়াছিল। বিধবা তাহার সমস্ত বাকি বকেয়া আদায়, সীমাসরহদ্দ স্থির এবং বহুকালের বেদখল উদ্ধার করিয়া সমস্ত পরিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাপ্য হইতে কেহ তাঁহাকে এক কড়ি বঞ্চিত করিতে পারিত না।

এই স্ত্রীলোকটির প্রকৃতির মধ্যে বহুল পরিমাণে পৌরুষের অংশ থাকাতে তাঁহার যথার্থ সঙ্গী কেহ ছিল না। স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে ভয় করিত। পরনিন্দা, ছোটো কথা বা নাকি কান্না তাঁহার অসহ্য ছিল। পুরুষেরাও তাঁহাকে ভয় করিত ; কারণ, পল্লীবাসী

ভদ্রপুরুষদের চণ্ডীমণ্ডপগত অগাধ আলস্যকে তিনি একপ্রকার নীরব ঘৃণাপূর্ণ তীক্ষ্ণ কটাক্ষের দ্বারা ধিক্কার করিয়া যাইতে পারিতেন যাহা তাহাদের স্থূল জড়ত্ব ভেদ করিয়াও অন্তরে প্রবেশ করিত।

প্রবলরূপে ঘৃণা করিবার এবং সে ঘৃণা প্রবলরূপে প্রকাশ করিবার অসাধারণ ক্ষমতা এই প্রৌঢ়া বিধবাটির ছিল। বিচারে যাহাকে অপরাধী করিতেন তাহাকে তিনি কথায় এবং বিনা কথায়, ভাবে এবং ভঙ্গীতে একেবারে দগ্ধ করিয়া যাইতে পারিতেন।

পল্লীর সমস্ত ক্রিয়াকর্মে বিপদে সম্পদে তাঁহার নিরলস হস্ত ছিল। সর্বত্রই তিনি নিজের একটি গৌরবের স্থান বিনা চেষ্টায় অতি সহজেই অধিকার করিয়া লইতেন। যেখানে তিনি উপস্থিত থাকিতেন সেখানে তিনিই যে সকলের প্রধানপদে, সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের অথবা উপস্থিত কোনো ব্যক্তির মনে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিত না।

রোগীর সেবায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন, কিন্তু রোগী তাঁহাকে যমেরই মতো ভয় করিত। পথ্য বা নিয়মের লেশমাত্র লঙ্ঘন হইলে তাঁহার ক্রোধানল রোগের তাপ অপেক্ষা রোগীকে অধিক উত্তপ্ত করিয়া তুলিত।

এই দীর্ঘাকার কঠিন বিধবাটি বিধাতার কঠোর নিয়মদণ্ডের ন্যায় পল্লীর মস্তকের উপর উদ্যত ছিলেন; কেহ তাঁহাকে ভালোবাসিতে অথবা অবহেলা করিতে সাহস করিত না। পল্লীর সকলের সঙ্গেই তাঁহার যোগ ছিল অথচ তাঁহার মতো অত্যন্ত একাকিনী কেহ ছিল না।

বিধবা নিঃসন্তান ছিলেন। পিতৃমাতৃহীন দুইটি ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার গৃহে মানুষ হইত। পুরুষ অভিভাবক অভাবে তাহাদের যে কোনো প্রকার শাসন ছিল না এবং স্নেহান্ধ পিসিমার আদরে তাহারা যে নষ্ট হইয়া যাইতেছিল এমন কথা কেহ বলিতে পারিত না। তাহাদের মধ্যে বড়োটির বয়স আঠারো হইয়াছিল। মাঝে মাঝে তাহার বিবাহের প্রস্তাবও আসিত এবং পরিণয়বন্ধন সম্বন্ধে বালকটির চিত্তও উদাসীন ছিল না। কিন্তু পিসিমা তাহার সেই সুখবাসনায় একদিনের জন্যও প্রশ্রয় দেন নাই। অন্য স্ত্রীলোকের ন্যায় কিশোর নবদম্পতির নব প্রেমোদ্গমদৃশ্য তাঁহার কল্পনায় অত্যন্ত উপভোগ্য মনোরম বলিয়া প্রতীত হইত না। বরং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বিবাহ করিয়া অন্য ভদ্র গৃহস্থের ন্যায় আলস্যভরে ঘরে বসিয়া পত্নীর আদরে প্রতিদিন স্ফীত হইতে থাকিবে, এ সম্ভাবনা তাঁহার নিকট নিরতিশয় হেয় বলিয়া প্রতীত হইত। তিনি কঠিন ভাবে বলিতেন, পুলিন আগে উপার্জন করিতে আরম্ভ করুক, তার পরে বধূ ঘরে আনিবে। পিসিমার মুখের সেই কঠোর বাক্যে প্রতিবেশিনীদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত।

ঠাকুরবাড়িটি জয়কালীর সর্বাপেক্ষা যত্নের ধন ছিল। ঠাকুরের শয়ন বসন স্নানাহারের

তিলমাত্র ত্রুটি হইতে পারিত না। পূজক ব্রাহ্মণ দুটি দেবতার অপেক্ষা এই একটি মানবীকে অনেক বেশি ভয় করিত। পূর্বে এক সময় ছিল যখন দেবতার বরাদ্দ দেবতা পুরা পাইতেন না। কারণ, পূজক ঠাকুরের আর-একটি পূজার প্রতিমা গোপন মন্দিরে ছিল; তাহার নাম ছিল নিস্তারিণী। গোপনে ঘৃত দুগ্ধ ছানা ময়দার নৈবেদ্য স্বর্গে নরকে ভাগাভাগি হইয়া যাইত। কিন্তু আজকাল জয়কালীর শাসনে পূজার ষোলো আনা অংশই ঠাকুরের ভোগে আসিতেছে, উপদেবতাগণকে অন্যত্র জীবিকার অন্য উপায় অন্বেষণ করিতে হইয়াছে।

বিধবার যত্নে ঠাকুরবাড়ির প্রাঙ্গণটি পরিষ্কার তকৃতক্ করিতেছে— কোথাও একটি তৃণমাত্র নাই। একপার্শ্বে মঞ্চ অবলম্বন করিয়া মাধবীলতা উঠিয়াছে, তাহার শুষ্কপত্র পড়িবামাত্র জয়কালী তাহা তুলিয়া লইয়া বাহিরে ফেলিয়া দেন। ঠাকুরবাড়িতে পারিপাট্য পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইলে বিধবা তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। পাড়ার ছেলেরা পূর্বে লুকাচুরি খেলা উপলক্ষে এই প্রাঙ্গণের প্রান্তে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিত এবং মধ্যে মধ্যে পাড়ার ছাগশিশু আসিয়া মাধবীলতার বল্কলাংশ কিছু কিছু ভক্ষণ করিয়া যাইত। এখন আর সে সুযোগ নাই। পর্বকাল ব্যতীত অন্য দিনে ছেলেরা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে পাইত না এবং ক্ষুধাতুর ছাগশিশুকে দণ্ডাঘাত খাইয়াই দ্বারের নিকট হইতে তারস্বরে আপন অজ-জননীকে আহ্বান করিতে করিতে ফিরিতে হইত।

অনাচারী ব্যক্তি পরমাত্মীয় হইলেও দেবালয়ের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে পাইত না। জয়কালীর একটি যবনকরপক্ব-কুক্কুটমাংস-লোলুপ ভগিনীপতি আত্মীয়সন্দর্শন উপলক্ষে গ্রামে উপস্থিত হইয়া মন্দির-অঙ্গনে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন, জয়কালী তাহাতে ত্বরিত ও তীব্র আপত্তি প্রকাশ করাতে সহোদরা ভগিনীর সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল। এই দেবালয় সম্বন্ধে বিধবার এতই অতিরিক্ত অনাবশ্যক সতর্কতা ছিল যে, সাধারণের নিকট তাহা অনেকটা বাতুলতারূপে প্রতীয়মান হইত।

জয়কালী আর-সর্বত্রই কঠিন উন্নত স্বতন্ত্র, কেবল এই মন্দিরের সম্মুখে তিনি পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এই বিগ্রহটির নিকট তিনি একান্তরূপে জননী, পত্নী, দাসী— ইহার কাছে তিনি সতর্ক, সুকোমল, সুন্দর এবং সম্পূর্ণ অবনম্র। এই প্রস্তরের মন্দির এবং প্রস্তরের মূর্তিটি তাঁহার নিগূঢ় নারীস্বভাবের একমাত্র চরিতার্থতার বিষয় ছিল। ইহাই তাঁহার স্বামী, পুত্র, তাঁহার সমস্ত সংসার।

ইহা হইতেই পাঠকেরা বুঝিবেন, যে-বালকটি মন্দিরপ্রাঙ্গণ হইতে মাধবীমঞ্জরী আহরণ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল তাহার সাহসের সীমা ছিল না। সে জয়কালীর

কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র নলিন। সে তাহার পিসিমাকে ভালো করিয়াই জানিত, তথাপি তাহার দুর্দান্ত প্রকৃতি শাসনের বশ হয় নাই। যেখানে বিপদ সেখানেই তাহার একটা আকর্ষণ ছিল, এবং যেখানে শাসন সেখানেই লঙ্ঘন করিবার জন্য তাহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া থাকিত। জনশ্রুতি আছে, বাল্যকালে তাহার পিসিমার স্বভাবটিও এইরূপ ছিল।

জয়কালী তখন মাতৃস্নেহমিশ্রিত ভক্তির সহিত ঠাকুরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দালানে বসিয়া একমনে মালা জপিতেছিলেন।

বালকটি নিঃশব্দপদে পশ্চাৎ হইতে আসিয়া মাধবীতলায় দাঁড়াইল। দেখিল, নিম্নশাখার ফুলগুলি পূজার জন্য নিঃশেষিত হইয়াছে। তখন অতি ধীরে ধীরে সাবধানে মঞ্চে আরোহণ করিল। উচ্চশাখায় দুটি-একটি বিকচোন্মুখ কুঁড়ি দেখিয়া যেমন সে শরীর এবং বাহু প্রসারিত করিয়া তুলিতে যাইবে অমনি সেই প্রবল চেষ্টার ভরে জীর্ণ মঞ্চ সশব্দে ভাঙিয়া পড়িল। আশ্রিত লতা এবং বালক একত্রে ভূমিসাৎ হইল।

জয়কালী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রটির কীর্তি দেখিলেন, সবলে বাহু ধরিয়া তাহাকে মাটি হইতে তুলিলেন। আঘাত তাহার যথেষ্ট লাগিয়াছিল, কিন্তু সে আঘাতকে শাস্তি বলা যায় না, কারণ, তাহা অজ্ঞান জড়ের আঘাত। সেইজন্য পতিত বালকের ব্যথিত দেহে জয়কালীর সজ্ঞান শাস্তি মুহুর্মুহু সবলে বর্ষিত হইতে লাগিল। বালক একবিন্দু অশ্রুপাত না করিয়া নীরবে সহ্য করিল। তখন তাহার পিসিমা তাহাকে টানিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে রুদ্ধ করিলেন। তাহার সেদিনকার বৈকালিক আহার নিষিদ্ধ হইল।

আহার বন্ধ হইল শুনিয়া দাসী মোক্ষদা কাতরকণ্ঠে ছলছলনেত্রে বালককে ক্ষমা করিতে অনুনয় করিল। জয়কালীর হৃদয় গলিল না। ঠাকুরানীর অজ্ঞাতসারে গোপনে ক্ষুধিত বালককে কেহ যে খাদ্য দিবে, বাড়িতে এমন দুঃসাহসিক কেহ ছিল না।

বিধবা মঞ্চসংস্কারের জন্য লোক ডাকিতে পাঠাইয়া পুনর্বার মালাহস্তে দালানে আসিয়া বসিলেন। মোক্ষদা কিছুক্ষণ পরে সভয়ে নিকটে আসিয়া কহিল, "ঠাকুরমা, কাকাবাবু ক্ষুধায় কাঁদিতেছেন, তাঁহাকে কিছু দুধ আনিয়া দিব কি?"

জয়কালী অবিচলিত মুখে কহিলেন, "না।" মোক্ষদা ফিরিয়া গেল। অদূরবর্তী কুটীরের কক্ষ হইতে নলিনের করুণ ক্রন্দন ক্রমে ক্রোধের গর্জনে পরিণত হইয়া উঠিল— অবশেষে অনেক ক্ষণ পরে তাহার কাতরতার শ্রান্ত উচ্ছ্বাস থাকিয়া থাকিয়া জপনিরতা পিসিমার কানে আসিয়া ধ্বনিত হইতে লাগিল।

নলিনের আর্তকণ্ঠ যখন পরিশ্রান্ত ও মৌনপ্রায় হইয়া আসিয়াছে এমন সময় আর-একটি জীবের ভীত কাতরধ্বনি নিকটে ধ্বনিত হইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে ধাবমান

মনুষ্যের দূরবর্তী চীৎকারশব্দ মিশ্রিত হইয়া মন্দিরের সম্মুখস্থ পথে একটা তুমুল কলরব উত্থিত হইল।

সহসা প্রাঙ্গণের মধ্যে একটা পদশব্দ শোনা গেল। জয়কালী পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন, ভূপর্যন্ত মাধবীলতা আন্দোলিত হইতেছে।

সরোষকণ্ঠে ডাকিলেন, "নলিন!"

কেহ উত্তর দিল না। বুঝিলেন, অবাধ্য নলিন বন্দীশালা হইতে কোনোক্রমে পলায়ন করিয়া পুনরায় তাঁহাকে রাগাইতে আসিয়াছে।

তখন অত্যন্ত কঠিনভাবে অধরের উপরে ওষ্ঠ চাপিয়া বিধবা প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিলেন।

লতাকুঞ্জের নিকট পুনরায় ডাকিলেন, "নলিন!"

উত্তর পাইলেন না। শাখা তুলিয়া দেখিলেন, একটা অত্যন্ত মলিন শূকর প্রাণভয়ে ঘন পল্লবের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে।

যে লতাবিতান এই ইষ্টকপ্রাচীরের মধ্যে বৃন্দাবিপিনের সংক্ষিপ্ত প্রতিরূপ, যাহার বিকশিত কুসুমমঞ্জরীর সৌরভ গোপীবৃন্দের সুগন্ধি নিশ্বাস স্মরণ করাইয়া দেয় এবং কালিন্দীতীরবর্তী সুখবিহারের সৌন্দর্যস্বপ্ন জাগ্রত করিয়া তোলে— বিধবার সেই প্রাণাধিক যত্নের সুপবিত্র নন্দনভূমিতে অকস্মাৎ এই বীভৎস ব্যাপার ঘটিল।

পূজারি ব্রাহ্মণ লাঠি হস্তে তাড়া করিয়া আসিল।

জয়কালী তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া তাহাকে নিষেধ করিলেন এবং দ্রুতবেগে ভিতর হইতে মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

অনতিকাল পরেই সুরাপানে-উন্মত্ত ডোমের দল মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া তাহাদের বলির পশুর জন্য চীৎকার করিতে লাগিল।

জয়কালী রুদ্ধদ্বারের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "যা বেটারা, ফিরে যা! আমার মন্দির অপবিত্র করিস্‌ নে।"

ডোমের দল ফিরিয়া গেল। জয়কালী ঠাকুরানী যে তাঁহার রাধানাথ জীউর মন্দিরের মধ্যে অশুচি জন্তুকে আশ্রয় দিবেন, ইহা তাহারা প্রায় প্রত্যক্ষ দেখিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিল না।

এই সামান্য ঘটনায় নিখিল জগতের সর্বজীবের মহাদেবতা পরম প্রসন্ন হইলেন কিন্তু ক্ষুদ্র পল্লীর সমাজনামধারী অতি ক্ষুদ্র দেবতাটি নিরতিশয় সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

শ্রাবণ ১৩০১

মেঘ ও রৌদ্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্বদিনে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আজ ক্ষান্তবর্ষণ প্রাতঃকালে ম্লান রৌদ্র ও খণ্ড মেঘে মিলিয়া পরিপক্বপ্রায় আউশ ধানের ক্ষেত্রের উপর পর্যায়ক্রমে আপন আপন সুদীর্ঘ তুলি বুলাইয়া যাইতেছিল; সুবিস্তৃত শ্যাম চিত্রপট একবার আলোকের স্পর্শে উজ্জ্বল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিতেছিল আবার পরক্ষণেই ছায়াপ্রলেপে গাঢ় স্নিগ্ধতায় অঙ্কিত হইতেছিল।

যখন সমস্ত আকাশরঙ্গভূমিতে মেঘ এবং রৌদ্র, দুইটি মাত্র অভিনেতা, আপন আপন অংশ অভিনয় করিতেছিল তখন নিম্নে সংসাররঙ্গভূমিতে কত স্থানে কত অভিনয় চলেতেছিল তাহার আর সংখ্যা নাই।

আমরা যেখানে একটি ক্ষুদ্র জীবননাট্যের পট উত্তোলন করিলাম সেখানে গ্রামে পথের ধারে একটি বাড়ি দেখা যাইতেছে। বাহিরের একটি মাত্র ঘর পাকা, এবং সেই ঘরের দুই পার্শ্ব দিয়া জীর্ণপ্রায় ইষ্টকের প্রাচীর গুটিকতক মাটির ঘর বেষ্টন করিয়া আছে। পথ হইতে গরাদের জানলা দিয়া দেখা যাইতেছে, একটি যুবাপুরুষ খালি গায়ে তক্তপোশে বসিয়া বামহস্তে ক্ষণে ক্ষণে তালপাতার পাখা লইয়া গ্রীষ্ম এবং মশক দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং দক্ষিণ হস্তে বই লইয়া পাঠে নিবিষ্ট আছেন।

বাহিরে গ্রামের পথে একটি ডুরে-কাপড়-পরা বালিকা আঁচলে গুটিকতক কালো-জাম লইয়া একে একে নিঃশেষ করিতে করিতে উক্ত গরাদে-দেওয়া জানলার সম্মুখ দিয়া বারংবার যাতায়াত করিতেছিল। মুখের ভাবে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছিল, ভিতরে যে মানুষটি তক্তপোশে বসিয়া বই পড়িতেছে তাহার সহিত বালিকার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে —এবং কোনোমতে সে তাহার মনোযোগ আকর্ষণপূর্বক তাহাকে নীরবে অবজ্ঞাভরে জানাইয়া যাইতে চাহে যে, 'সম্প্রতি কালোজাম খাইতে আমি অত্যন্ত ব্যস্ত আছি, তোমাকে আমি গ্রাহ্যমাত্র করি না।'

দুর্ভাগ্যক্রমে, ঘরের ভিতরকার অধ্যয়নশীল পুরুষটি চক্ষে কম দেখেন, দূর হইতে বালিকার নীরব উপেক্ষা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। বালিকাও তাহা জানিত সুতরাং অনেক ক্ষণ নিষ্ফল আনাগোনার পর নীরব উপেক্ষার পরিবর্তে কালোজামের আঁটি ব্যবহার করিতে হইল। অন্ধের নিকটে অভিমানের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা এতই দুরূহ।

যখন ক্ষণে ক্ষণে দুই-চারিটা কঠিন আঁটি যেন দৈবক্রমে বিক্ষিপ্ত হইয়া কাঠের

দরজার উপর ঠক্‌ করিয়া শব্দ করিয়া উঠিল তখন পাঠরত পুরুষটি মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখিল। মায়াবিনী বালিকা তাহা জানিতে পারিয়া দ্বিগুণ নিবিষ্টভাবে অঞ্চল হইতে দংশনযোগ্য সুপক্ক কালোজাম নির্বাচন করিতে প্রবৃত্ত হইল। পুরুষটি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিশেষ চেষ্টাসহকারে নিরীক্ষণপূর্বক বালিকাকে চিনিতে পারিল এবং বই রাখিয়া জানলার কাছে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাস্যমুখে ডাকিল, "গিরিবালা!"

গিরিবালা অবিচলিত ভাবে নিজের অঞ্চলের মধ্যে জামপরীক্ষাকার্যে সম্পূর্ণ অভিনিবিষ্ট থাকিয়া মৃদুগমনে আপন-মনে এক-এক পা করিয়া চলিতে লাগিল।

তখন ক্ষীণদৃষ্টি যুবাপুরুষের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, কোনো-একটি অজ্ঞানকৃত অপরাধের দণ্ডবিধান হইতেছে। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া কহিলেন, "কই, আজ আমাকে জাম দিলে না?" গিরিবালা সে কথা কানে না আনিয়া বহু অন্বেষণ ও পরীক্ষায় একটি জাম মনোনীত করিয়া অত্যন্ত নিশ্চিন্তমনে খাইতে আরম্ভ করিল।

এই জামগুলি গিরিবালাদের বাগানের জাম এবং যুবাপুরুষের দৈনিক বরাদ্দ। কী জানি, সে কথা কিছুতেই আজ গিরিবালার স্মরণ হইল না, তাহার ব্যবহারে প্রকাশ পাইল যে, এগুলি সে একমাত্র নিজের জন্যই আহরণ করিয়াছে। কিন্তু নিজের বাগান হইতে ফল পাড়িয়া পরের দরজার সম্মুখে আসিয়া ঘটা করিয়া খাইবার কী অর্থ পরিষ্কার বুঝা গেল না। তখন পুরুষটি কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিল। গিরিবালা প্রথমটা আঁকিয়া বাঁকিয়া হাত ছাড়াইয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিল, তাহার পরে সহসা অশ্রুজলে ভাসিয়া কাঁদিয়া উঠিল, এবং আঁচলের জাম ভূতলে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

সকালবেলাকার চঞ্চল রৌদ্র এবং চঞ্চল মেঘ বৈকালে শান্ত ও শ্রান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে। শুভ্র স্ফীত মেঘ আকাশের প্রান্তভাগে স্তূপাকার হইয়া পড়িয়া আছে এবং অপরাহ্নের অবসন্নপ্রায় আলোক গাছের পাতায়, পুষ্করিণীর জলে এবং বর্ষাস্নাত প্রকৃতির প্রত্যেক অঙ্গে প্রত্যঙ্গে ঝিক্‌ঝিক্‌ করিতেছে। আবার সেই বালিকাটিকে সেই গরাদের জানলার সম্মুখে দেখা যাইতেছে এবং ঘরের মধ্যে সেই যুবা পুরুষটি বসিয়া আছে। প্রভেদের মধ্যে এবেলা বালিকার অঞ্চলে জাম নাই এবং যুবকের হস্তেও বই নাই। তদপেক্ষা গুরুতর এবং নিগূঢ় প্রভেদও কিছু কিছু ছিল।

এবেলাও বালিকা কী বিশেষ আবশ্যকে সেই বিশেষ স্থানে আসিয়া ইতস্তত করিতেছে বলা কঠিন। আর যাহাই আবশ্যক থাক্‌, ঘরের ভিতরকার মানুষটির সহিত আলাপ করিবার যে আবশ্যক আছে ইহা কোনোমতেই বালিকার ব্যবহারে প্রকাশ

পায় না। বরঞ্চ বোধ হইল সে দেখিতে আসিয়াছে, সকালবেলায় যে জামগুলা ফেলিয়া গেছে বিকালবেলায় তাহার কোনোটার অঙ্কুর বাহির হইয়াছে কি না।

কিন্তু অঙ্কুর না বাহির হইবার অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি গুরুতর কারণ এই ছিল যে, ফলগুলি সম্প্রতি যুবকের সম্মুখে তক্তপোশের উপর রাশীকৃত ছিল; এবং বালিকা যখন ক্ষণে ক্ষণে অবনত হইয়া কোনো একটা অনির্দেশ্য কাল্পনিক পদার্থের অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিল তখন যুবক মনের হাস্য গোপন করিয়া অত্যন্ত গম্ভীরভাবে একটি একটি জাম নির্বাচন করিয়া সযত্নে আহার করিতেছিল। অবশেষে যখন দুটো-একটা আঁটি দৈবক্রমে বালিকার পায়ের কাছে, এমন-কি, পায়ের উপরে আসিয়া পড়িল তখন গিরিবালা বুঝিতে পারিল, যুবক বালিকার অভিমানের প্রতিশোধ লইতেছে। কিন্তু এই কি উচিত! যখন সে আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়টুকুর সমস্ত গর্ব বিসর্জন দিয়া আত্মসমর্পণ করিবার অবসর খুঁজিতেছে তখন কি তাহার সেই অত্যন্ত দুরূহ পথে বাধা দেওয়া নিষ্ঠুরতা নহে। ধরা দিতে আসিয়াছে, এই কথাটা ধরা পড়িয়া বালিকা যখন ক্রমশ আরক্তিম হইয়া পলায়নের পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিল তখন যুবক বাহিরে আসিয়া তাহার হাত ধরিল।

সকালবেলাকার মতো এবেলাও বালিকা আঁকিয়া বাঁকিয়া হাত ছাড়াইয়া পালাইবার বহু চেষ্টা করিল, কিন্তু কাঁদিল না। বরঞ্চ রক্তবর্ণ হইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া উৎপীড়নকারীর পৃষ্ঠদেশে মুখ লুকাইয়া প্রচুর পরিমাণে হাসিতে লাগিল এবং যেন কেবলমাত্র বাহ্য আকর্ষণে নীত হইয়া পরাভূত বন্দীভাবে লৌহগরাদেবেষ্টিত কারাগারের মধ্যে প্রবেশ করিল।

আকাশে মেঘরৌদ্রের খেলা যেমন সামান্য, ধরাপ্রান্তে এই দুটি প্রাণীর খেলাও তেমনি সামান্য, তেমনি ক্ষণস্থায়ী। আবার আকাশে মেঘরৌদ্রের খেলা যেমন সামান্য নহে এবং খেলা নহে কিন্তু খেলার মতো দেখিতে মাত্র, তেমনি এই দুটি অখ্যাতনামা মনুষ্যের একটি কর্মহীন বর্ষাদিনের ক্ষুদ্র ইতিহাস সংসারের শত শত ঘটনার মধ্যে তুচ্ছ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে কিন্তু ইহা তুচ্ছ নহে। যে বৃদ্ধ বিরাট অদৃষ্ট অবিচলিত গম্ভীরমুখে অনন্তকাল ধরিয়া যুগের সহিত যুগান্তর গাঁথিয়া তুলিতেছে সেই বৃদ্ধই বালিকার এই সকালবিকালের তুচ্ছ হাসিকান্নার মধ্যে জীবনব্যাপী সুখদুঃখের বীজ অঙ্কুরিত করিয়া তুলিতেছিল। তথাপি বালিকার এই অকারণ অভিমান বড়োই অর্থহীন বলিয়া বোধ হইল। কেবল দর্শকের কাছে নহে, এই ক্ষুদ্র নাট্যের প্রধান পাত্র উক্ত যুবকের নিকটেও। এই বালিকা কেন যে একদিন বা রাগ করে, একদিন বা অপরিমিত স্নেহ প্রকাশ করিতে থাকে, কোনোদিন বা দৈনিক বরাদ্দ বাড়াইয়া

দেয়, কোনোদিন বা দৈনিক বরাদ্দ একেবারেই বন্ধ করে, তাহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া সহজ নহে। এক-একদিন সে যেন তাহার সমস্ত কল্পনা ভাবনা এবং নৈপুণ্য একত্র করিয়া যুবকের সন্তোষসাধনে প্রবৃত্ত হয়, আবার এক-একদিন তাহার সমস্ত ক্ষুদ্র শক্তি তাহার সমস্ত কাঠিন্য একত্র সংহত করিয়া তাঁহাকে আঘাত করিতে চেষ্টা করে। বেদনা দিতে না পারিলে তাহার কাঠিন্য দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠে; কৃতকার্য হইলে সে কাঠিন্য অনুতাপের অশ্রুজলে শতধা বিগলিত হইয়া অজস্র স্নেহধারায় প্রবাহিত হইতে থাকে।

এই তুচ্ছ মেঘরৌদ্র-খেলার প্রথম তুচ্ছ ইতিহাস পরপরিচ্ছেদে সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গ্রামের মধ্যে আর সকলেই দলাদলি, চক্রান্ত, ইক্ষুর চাষ, মিথ্যা মকদ্দমা এবং পাটের কারবার লইয়া থাকিত, ভাবের আলোচনা এবং সাহিত্যচর্চা করিত কেবল শশিভূষণ এবং গিরিবালা।

ইহাতে কাহারো ঔৎসুক্য বা উৎকণ্ঠার কোনো বিষয় নাই। কারণ, গিরিবালার বয়স দশ এবং শশিভূষণ একটি সদ্যবিকশিত এম. এ. বি. এল.। উভয়ে প্রতিবেশী মাত্র।

গিরিবালার পিতা হরকুমার এককালে নিজগ্রামের পত্তনিদার ছিলেন। এখন দুরবস্থায় পড়িয়া সমস্ত বিক্রয় করিয়া তাঁহাদের বিদেশী জমিদারের নায়েবি পদ গ্রহণ করিয়াছেন। যে পরগনায় তাঁহাদের বাস সেই পরগনারই নায়েবি, সুতরাং তাঁহাকে জন্মস্থান হইতে নড়িতে হয় না।

শশিভূষণ এম. এ. পাস করিয়া আইনপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন কিন্তু কিছুতেই কোনো কর্মে ভিড়িলেন না। লোকের সঙ্গে মেশা বা সভাস্থলে দুটো কথা বলা, সেও তাঁহার দ্বারা হইয়া উঠে না। চোখে কম দেখেন বলিয়া চেনা লোককে চিনিতে পারেন না এবং সেই কারণেই ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দৃষ্টিপাত করিতে হয়, লোকে সেটাকে ঔদ্ধত্য বলিয়া বিবেচনা করে।

কলিকাতায় জনসমুদ্রের মধ্যে আপন-মনে একলা থাকা শোভা পায় কিন্তু পল্লীগ্রামে সেটা বিশেষ স্পর্ধার মতো দেখিতে হয়। শশিভূষণের বাপ যখন বিস্তর চেষ্টায় পরাস্ত হইয়া অবশেষে তাঁহার অকর্মণ্য পুত্রটিকে পল্লীতে তাঁহাদের সামান্য বিষয়রক্ষাকার্যে নিয়োগ করিলেন তখন শশিভূষণকে পল্লীবাসীদের নিকট হইতে বিস্তর উৎপীড়ন উপহাস এবং লাঞ্ছনা সহিতে হইয়াছিল। লাঞ্ছনার আরো একটা কারণ ছিল; শান্তিপ্রিয়

শশিভূষণ বিবাহ করিতে সম্মত ছিলেন না— কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতাগণ তাঁহার এই অনিচ্ছাকে দুঃসহ অহংকার জ্ঞান করিয়া কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিতেন না।

শশিভূষণের উপর যতই উপদ্রব হইতে লাগিল শশিভূষণ ততই আপন বিবরের মধ্যে অদৃশ্য হইতে লাগিলেন। একটি কোণের ঘরে তক্তপোশের উপর কতকগুলি বাঁধানো ইংরাজি বই লইয়া বসিয়া থাকিতেন; যখন যেটা ইচ্ছা হইত পাঠ করিতেন, এই তো ছিল তাঁর কাজ, বিষয় কী করিয়া রক্ষা হইত তাহা বিষয়ই জানে।

এবং পূর্বেই আভাসে বলা গিয়াছে, মানুষের মধ্যে তাঁহার সম্পর্ক ছিল কেবল গিরি-বালার সহিত।

গিরিবালার ভাইরা ইস্কুলে যাইত এবং ফিরিয়া আসিয়া মূঢ় ভগ্নীটিকে কোনোদিন জিজ্ঞাসা করিত, পৃথিবীর আকার কিরূপ; কোনোদিন বা প্রশ্ন করিত, সূর্য বড়ো না পৃথিবী বড়ো— সে যখন ভুল বলিত তখন তাহার প্রতি বিপুল অবজ্ঞা দেখাইয়া ভ্রম সংশোধন করিত। সূর্য পৃথিবী অপেক্ষা বৃহৎ, এ মতটা যদি গিরিবালার নিকট প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইত এবং সেই সন্দেহ যদি সে সাহস করিয়া প্রকাশ করিত, তবে তাহার ভাইরা তাহাকে দ্বিগুণ উপেক্ষাভরে কহিত, "ইস্! আমাদের বইয়ে লেখা আছে আর তুই—"

ছাপার বইয়ে এমন কথা লেখা আছে শুনিয়া গিরিবালা সম্পূর্ণ নিরুত্তর হইয়া যাইত, দ্বিতীয় আর-কোনো প্রমাণ তাহার নিকট আবশ্যক বোধ হইত না।

কিন্তু তাহার মনে মনে বড়ো ইচ্ছা করিত, সেও দাদাদের মতো বই লইয়া পড়ে। কোনো-কোনোদিন সে আপন ঘরে বসিয়া কোনো-একটা বই খুলিয়া বিড় বিড় করিয়া পড়ার ভান করিত এবং অনর্গল পাতা উলটাইয়া যাইত। ছাপার কালো কালো ছোটো ছোটো অপরিচিত অক্ষরগুলি কী যেন এক মহারহস্যশালার সিংহদ্বারে দলে দলে সার বাঁধিয়া স্কন্ধের উপরে ইকার ঐকার রেফ উঁচাইয়া পাহারা দিত, গিরিবালার কোনো প্রশ্নের কোনোই উত্তর করিত না। কথামালা তাহার ব্যাঘ্র শৃগাল অশ্ব গর্দভের একটি কথাও কৌতূহলকাতর বালিকার নিকট ফাঁস করিত না এবং আখ্যানমঞ্জরী তাহার সমস্ত আখ্যানগুলি লইয়া মৌনব্রতের মতো নীরবে চাহিয়া থাকিত।

গিরিবালা তাহার ভাইদের নিকট পড়া শিখিবার প্রস্তাব করিয়াছিল কিন্তু তাহার ভাইরা সে কথায় কর্ণপাতমাত্র করে নাই। একমাত্র শশিভূষণ তাহার সহায় ছিল।

গিরিবালার নিকট কথামালা এবং আখ্যানমঞ্জরী যেমন দুর্ভেদ্য রহস্যপূর্ণ ছিল শশিভূষণও প্রথম প্রথম অনেকটা সেইরূপ ছিল। লোহার গরাদে দেওয়া রাস্তার ধারের ছোটো বসিবার ঘরটিতে যুবক একাকী তক্তপোশের উপর পুস্তকে পরিবৃত

হইয়া বসিয়া থাকিত। গিরিবালা গরাদে ধরিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া এই নতপৃষ্ঠ পাঠনিবিষ্ট অদ্ভুত লোকটিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত, পুস্তকের সংখ্যা তুলনা করিয়া মনে মনে স্থির করিত, শশিভূষণ তাহার ভাইদের অপেক্ষা অনেক বেশি বিদ্বান। তদপেক্ষা বিস্ময়জনক ব্যাপার তাহার নিকট আর কিছুই ছিল না। কথামালা প্রভৃতি পৃথিবীর প্রধান প্রধান পাঠ্যপুস্তকগুলি শশিভূষণ যে নিঃশেষপূর্বক পাঠ করিয়া ফেলিয়াছে, এ বিষয়ে তাহার সন্দেহমাত্র ছিল না। এইজন্য, শশিভূষণ যখন পুস্তকের পাত উলটাইত সে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া তাহার জ্ঞানের অবধি নির্ণয় করিতে পারিত না।

অবশেষে এই বিস্ময়মগ্ন বালিকাটি ক্ষীণদৃষ্টি শশিভূষণেরও মনোযোগ আকর্ষণ করিল। শশিভূষণ একদিন একটা ঝক্‌ঝকে বাঁধানো বই খুলিয়া বলিল, "গিরিবালা, ছবি দেখবি আয়।" গিরিবালা তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া পালাইয়া গেল।

কিন্তু পরদিন সে পুনর্বার ডুরে কাপড় পরিয়া সেই গরাদের বাহিরে দাঁড়াইয়া সেইরূপ গম্ভীর মৌন মনোযোগের সহিত শশিভূষণের অধ্যয়নকার্য নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল। শশিভূষণ সেদিনও ডাকিল এবং সেদিনও সে বেণী দুলাইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া পালাইল।

এইরূপে তাহাদের পরিচয়ের সূত্রপাত হইয়া ক্রমে কখন ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিল এবং কখন যে বালিকা গরাদের বাহির হইতে শশিভূষণের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার তক্তপোশের উপর বাঁধানো পুস্তকস্তূপের মধ্যে স্থান পাইল, ঠিক সে তারিখটা নির্ণয় করিয়া দিতে ঐতিহাসিক গবেষণার আবশ্যক।

শশিভূষণের নিকট গিরিবালার লেখাপড়ার চর্চা আরম্ভ হইল। শুনিয়া সকলে হাসিবেন, এই মাস্টারটি তাহার ক্ষুদ্র ছাত্রীকে কেবল যে অক্ষর, বানান এবং ব্যাকরণ শিখাইত তাহা নহে— অনেক বড়ো বড়ো কাব্য তর্জমা করিয়া শুনাইত এবং তাহার মতামত জিজ্ঞাসা করিত। বালিকা কী বুঝিত তাহা অন্তর্যামীই জানেন, কিন্তু তাহার ভালো লাগিত তাহাতে সন্দেহ নাই। সে বোঝা না-বোঝায় মিশাইয়া আপন বাল্য-হৃদয়ে নানা অপরূপ কল্পনাচিত্র আঁকিয়া লইত। নীরবে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মন দিয়া শুনিত, মাঝে মাঝে এক-একটা অত্যন্ত অসংগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত এবং কখনো কখনো অকস্মাৎ একটা অসংলগ্ন প্রসঙ্গান্তরে গিয়া উপনীত হইত। শশিভূষণ তাহাতে কখনো কিছু বাধা দিত না— বড়ো বড়ো কাব্য সম্বন্ধে এই অতিক্ষুদ্র সমালোচকের নিন্দা প্রশংসা টীকা ভাষ্য শুনিয়া সে বিশেষ আনন্দ লাভ করিত। সমস্ত পল্লীর মধ্যে এই গিরিবালাই তাহার একমাত্র সমজদার বন্ধু।

গিরিবালার সহিত শশিভূষণের প্রথম পরিচয় যখন, তখন গিরির বয়স আট ছিল,

এখন তাহার বয়স দশ হইয়াছে। এই দুই বৎসরে সে ইংরাজি ও বাংলা বর্ণমালা শিখিয়া দুই-চারিটা সহজ বই পড়িয়া ফেলিয়াছে। এবং শশিভূষণের পক্ষেও পল্লীগ্রাম এই দুই বৎসর নিতান্ত সঙ্গবিহীন বিরস বলিয়া বোধ হয় নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কিন্তু গিরিবালার বাপ হরকুমারের সহিত শশিভূষণের ভালোরূপ বনিবনাও হয় নাই। হরকুমার প্রথম প্রথম এই এম. এ. বি এলের নিকট মকদ্দমা মামলা সম্বন্ধে পরামর্শ লইতে আসিত। এম. এ. বি এল. তাহাতে বড়ো-একটা মনোযোগ করিত না এবং আইনবিদ্যা সম্বন্ধে নায়েবের নিকট আপন অজ্ঞতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইত না। নায়েব সেটাকে নিতান্তই ছল মনে করিত। এমনভাবে বছর দুয়েক কাটিল।

সম্প্রতি একটা অবাধ্য প্রজাকে শাসন করা আবশ্যক হইয়াছে। নায়েব মহাশয় তাহার নামে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ভিন্ন ভিন্ন অপরাধ ও দাবিতে নালিশ রুজু করিয়া দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া পরামর্শের জন্য শশিভূষণকে কিছু বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেন। শশিভূষণ পরামর্শ দেওয়া দূরে থাক, শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে হরকুমারকে এমন গুটিদুই-চারি কথা বলিলেন যাহা তাঁহার কিছুমাত্র মিষ্ট বোধ হইল না।

এ দিকে আবার প্রজার নামে একটি মকদ্দমাতেও হরকুমার জিতিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা হইল শশিভূষণ উক্ত হতভাগ্য প্রজার সহায় ছিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, এমন লোককে গ্রাম হইতে অবিলম্বে তাড়াইতে হইবে।

শশিভূষণ দেখিলেন, তাঁহার খেতের মধ্যে গোরু প্রবেশ করে, তাঁহার কলাইয়ের খোলায় আগুন লাগিয়া যায়, তাঁহার সীমানা লইয়া বিবাদ বাধে, তাঁহার প্রজারা সহজে খাজনা দেয় না এবং উলটিয়া তাঁহার নামে মিথ্যা মকদ্দমা আনিবার উপক্রম করে— এমন-কি, সন্ধ্যার সময় পথে বাহির হইলে তাঁহাকে মারিবে এবং রাত্রে তাঁহার বসতবাটীতে আগুন লাগাইয়া দিবে, এমন-সকল জনশ্রুতিও শোনা যাইতে লাগিল।

অবশেষে শান্তিপ্রিয় নিরীহ প্রকৃতি শশিভূষণ গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় পালাইবার আয়োজন করিলেন।

যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময়ে গ্রামে জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের তাঁবু পড়িল। বরকন্দাজ কন্‌স্টেবল খানসামা কুকুর ঘোড়া সহিস মেথরে সমস্ত গ্রাম চঞ্চল হইয়া উঠিল। ছেলের দল ব্যাঘ্রের অনুবর্তী শৃগালের পালের ন্যায় সাহেবের আড্ডার নিকটে শঙ্কিত কৌতূহল সহকারে ঘুরিতে লাগিল।

নায়েব মহাশয় যথারীতি আতিথ্য শিরে খরচ লিখিয়া সাহেবের মুর্গি আণ্ডা ঘৃত দুগ্ধ জোগাইতে লাগিলেন। জয়েণ্ট সাহেবের যে পরিমাণে খাদ্য আবশ্যক নায়েব মহাশয় তদপেক্ষা অনেক বেশি অক্ষুণ্ণচিত্তে সরবরাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রাতঃকালে সাহেবের মেথর আসিয়া যখন সাহেবের কুকুরের জন্য একেবারে চার সের ঘৃত আদেশ করিয়া বসিল তখন দুর্গ্রহবশত সেটা তাঁহার সহ্য হইল না— মেথরকে উপদেশ দিলেন যে, সাহেবের কুত্তা যদিচ দেশি কুকুরের অপেক্ষা অনেকটা ঘি বিনা পরিতাপে হজম করিতে পারে তথাপি এতাধিক পরিমাণে স্নেহপদার্থ তাহার স্বাস্থ্যের পক্ষে কল্যাণজনক নহে। তাহাকে ঘি দিলেন না।

মেথর গিয়া সাহেবকে জানাইল যে, কুকুরের জন্য মাংস কোথায় পাওয়া যাইতে পারে ইহাই সে নায়েবের নিকট সন্ধান লইতে গিয়াছিল কিন্তু সে জাতিতে মেথর বলিয়া নায়েব অবজ্ঞাপূর্বক তাহাকে সর্বলোকসমক্ষে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে, এমন-কি, সাহেবের প্রতিও উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

একে ব্রাহ্মণের জাত্যভিমান সাহেবলোকের সহজেই অসহ্য বোধ হয়, তাহার উপর তাঁহার মেথরকে অপমান করিতে সাহস করিয়াছে, ইহাতে ধৈর্য রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ চাপরাসিকে আদেশ করিলেন, "বোলাও নায়েবকো।"

নায়েব কম্পান্বিতকলেবরে দুর্গানাম জপ করিতে করিতে সাহেবের তাম্বুর সম্মুখে খাড়া হইলেন। সাহেব তাম্বু হইতে মচ্‌মচ্‌ শব্দে বাহির হইয়া আসিয়া নায়েবকে উচ্চকণ্ঠে বিজাতীয় উচ্চারণে জিজ্ঞাসা করিলেন,"টুমি কী কারণ বশটো আমার মেঠরকে ডুর করিয়াছে ?"

হরকুমার শশব্যস্ত হইয়া করজোড়ে জানাইলেন, সাহেবের মেথরকে দূর করিতে পারেন এমন স্পর্ধা কখনোই তাঁহার সম্ভবে না ; তবে কি না কুকুরের জন্য একেবারে চারি সের ঘি চাহিয়া বসাতে প্রথমে তিনি উক্ত চতুষ্পদের মঙ্গলার্থে মৃদুভাবে আপত্তি প্রকাশ করিয়া পরে ঘৃত সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লোক পাঠাইয়াছেন।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহাকে পাঠানো হইয়াছে এবং কোথায় পাঠানো হইয়াছে।

হরকুমার তৎক্ষণাৎ যেমন মুখে আসিল নাম করিয়া দিলেন। সেই সেই নামীয় লোকগণ সেই সেই গ্রামে ঘৃত আনিবার জন্য গিয়াছে কি না সন্ধান করিতে অতি সত্বর লোক পাঠাইয়া দিয়া সাহেব নায়েবকে তাম্বুতে বসাইয়া রাখিলেন।

দূতগণ অপরাহ্ণে ফিরিয়া আসিয়া সাহেবকে জানাইল, ঘৃত সংগ্রহের জন্য কেহ কোথাও যায় নাই। নায়েবের সমস্ত কথাই মিথ্যা এবং মেথর যে সত্য বলিয়াছে তাহাতে আর হাকিমের সন্দেহ রহিল না। তখন জয়েণ্ট সাহেব ক্রোধে গর্জন করিয়া মেথরকে ডাকিয়া কহিলেন, "এই শ্যালকের কর্ণ ধরিয়া তাম্বুর চারিধারে ঘোড়দৌড় করাও।" মেথর আর কালবিলম্ব না করিয়া চতুর্দিকে লোকারণ্যের মধ্যে সাহেবের আদেশ পালন করিল।

দেখিতে দেখিতে কথাটা ঘরে ঘরে রাষ্ট্র হইয়া গেল, হরকুমার গৃহে আসিয়া আহার ত্যাগ করিয়া মুমূর্ষুবৎ পড়িয়া রহিলেন।

জমিদারি কার্য উপলক্ষে নায়েবের শত্রু বিস্তর ছিল; তাহারা এই ঘটনায় অত্যন্ত আনন্দলাভ করিল কিন্তু কলিকাতায়-গমনোদ্যত শশিভূষণ যখন এই সংবাদ শুনিলেন তখন তাঁহার সর্বাঙ্গের রক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি তাঁহার নিদ্রা হইল না।

পরদিন প্রাতে তিনি হরকুমারের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলেন; হরকুমার তাঁহার হাত ধরিয়া ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। শশিভূষণ কহিলেন, "সাহেবের নামে মানহানির মকদ্দমা আনিতে হইবে, আমি তোমার উকিল হইয়া লড়িব।"

স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নামে মকদ্দমা আনিতে হইবে শুনিয়া হরকুমার প্রথমটা ভীত হইয়া উঠিলেন; শশিভূষণ কিছুতেই ছাড়িলেন না।

হরকুমার বিবেচনা করিতে সময় লইলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন কথাটা চারি দিকে রাষ্ট্র হইয়াছে এবং শত্রুগণ আনন্দ প্রকাশ করিতেছে তখন তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, শশিভূষণের শরণাপন্ন হইলেন, কহিলেন, "বাপু, শুনিলাম তুমি অকারণে কলিকাতায় যাইবার আয়োজন করিতেছ, সে তো কিছুতেই হইতে পারিবে না। তোমার মতো একজন লোক গ্রামে থাকিলে আমাদের সাহস কত থাকে। যাহা হউক আমাকে এই ঘোর অপমান হইতে উদ্ধার করিতে হইবে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যে শশিভূষণ চিরকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে নিভৃত নির্জনতার মধ্যে আপনাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন তিনি আজ আদালতে আসিয়া হাজির হইলেন। ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার নালিশ শুনিয়া তাঁহাকে প্রাইভেট কামরার মধ্যে ডাকিয়া লইয়া

অত্যন্ত খাতির করিয়া কহিলেন, “শশীবাবু, এ মকদ্দমাটা গোপনে মিটমাট করিয়া ফেলিলে ভালো হয় না কি।”

শশীবাবু টেবিলের উপরিস্থিত একখানি আইন গ্রন্থের মলাটের উপর তাঁহার কুঞ্চিতভ্রূ ক্ষীণ দৃষ্টি অত্যন্ত নিবিষ্টভাবে রক্ষা করিয়া কহিলেন, “আমার মক্কেলকে আমি এরূপ পরামর্শ দিতে পারি না। তিনি প্রকাশ্যভাবে অপমানিত হইয়াছেন, গোপনে ইহার মিটমাট হইবে কী করিয়া।”

সাহেব দুইচারি কথা কহিয়া বুঝিলেন, এই স্বল্পভাষী স্বল্পদৃষ্টি লোকটিকে সহজে বিচলিত করা সম্ভব নহে, কহিলেন, “অল্‌রাইট্‌ বাবু, দেখা যাউক কতদূর কী হয়।”

এই বলিয়া ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মকদ্দমার দিন ফিরাইয়া দিয়া মফস্বলভ্রমণে বাহির হইলেন।

এ দিকে জয়েণ্ট সাহেব জমিদারকে পত্র লিখিলেন, “তোমার নায়েব আমার ভৃত্যদিগকে অপমান করিয়া আমার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে, আশা করি, তুমি ইহার সমুচিত প্রতিকার করিবে।”

জমিদার শশব্যস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ হরকুমারকে তলব করিলেন। নায়েব আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। জমিদার অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন, “সাহেবের মেথর যখন চারি সের ঘি চাহিল তুমি বিনা বাক্যব্যয়ে তৎক্ষণাৎ কেন দিলে না। তোমার কি বাপের কড়ি লাগিত।”

হরকুমার অস্বীকার করিতে পারিলেন না যে, ইহাতে তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তির কোনোরূপ ক্ষতি হইত না। নতশিরে অপরাধ স্বীকার করিয়া কহিলেন, “আমার গ্রহ মন্দ তাই এমন দুর্বুদ্ধি ঘটিয়াছিল।”

জমিদার কহিলেন, “তাহার পর আবার সাহেবের নামে নালিশ করিতে তোমাকে কে বলিল।”

হরকুমার কহিলেন, “ধর্মাবতার, নালিশ করিবার ইচ্ছা আমার ছিল না ; ওই আমাদের গ্রামের শশী, তাহার কোথাও কোনো মকদ্দমা জোটে না, সে ছোঁড়া নিতান্ত জোর করিয়া প্রায় আমার সম্মতি না লইয়াই এই হাঙ্গামা বাধাইয়া বসিয়াছে।”

শুনিয়া জমিদার শশিভূষণের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। বুঝিলেন, লোকটা অপদার্থ নব্য উকিল, কোনো ছুতায় একটা হুজুক তুলিয়া সাধারণের সমক্ষে পরিচিত হইবার চেষ্টায় আছে। নায়েবকে হুকুম করিয়া দিলেন, মকদ্দমা তুলিয়া লইয়া যেন অবিলম্বে ছোটো বড়ো ম্যাজিস্ট্রেট যুগলকে ঠাণ্ডা করা হয়।

নায়েব সাহেবের জন্য কিঞ্চিৎ ফলমূল শীতলভোগ উপহার লইয়া জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের

বাসায় গিয়া হাজির হইলেন। সাহেবকে জানাইলেন, সাহেবের নামে মকদ্দমা করা তাঁহার আদৌ স্বভাববিরুদ্ধ; কেবল শশিভূষণ নামে গ্রামের একটি অজাতশ্মশ্রু অপোগণ্ড অর্বাচীন উকিল তাঁহাকে একপ্রকার না জানাইয়াই এইরূপ স্পর্ধার কাজ করিয়াছে। সাহেব শশিভূষণের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত এবং নায়েবের প্রতি বড়ো সন্তুষ্ট হইলেন, এবং কহিলেন রাগের মাথায় নায়েববাবুকে 'ডণ্ড বিঢান' করিয়া তিনি 'ডুঃখিট্' আছেন। সাহেব বাংলা ভাষার পরীক্ষায় সম্প্রতি পুরস্কার লাভ করিয়া সাধারণের সহিত সাধুভাষায় বাক্যালাপ করিয়া থাকেন।

নায়েব কহিলেন, মা-বাপ কখনো-বা রাগ করিয়া শাস্তিও দিয়া থাকেন কখনো-বা আদর করিয়া কোলেও টানিয়া লন, ইহাতে সন্তানের বা মা-বাপের দুঃখের কোনো কারণ নাই।

অতঃপর জয়েণ্ট্‌ সাহেবের সমস্ত ভৃত্যবর্গকে যথাযোগ্য পারিতোষিক দিয়া হরকুমার মফস্বলে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সহিত দেখা করিতে গেলেন। ম্যাজিস্ট্রেট তাহার মুখে শশিভূষণের স্পর্ধার কথা শুনিয়া কহিলেন, "আমিও আশ্চর্য হইতেছিলাম যে, নায়েব বাবুকে বরাবর ভালো লোক বলিয়াই জানিতাম, তিনি যে সর্বাগ্রে আমাকে জানাইয়া গোপনে মিটমাট না করিয়া হঠাৎ মকদ্দমা আনিবেন, এ কী অসম্ভব ব্যাপার! এখন সমস্ত বুঝিতে পারিতেছি।"

অবশেষে নায়েবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, শশী কন্‌গ্রেসে যোগ দিয়াছে কি না। নায়েব অম্লানমুখে বলিলেন, হাঁ।

সাহেব তাঁহার সাহেবি বুদ্ধিতে স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, এ সমস্তই কন্‌গ্রেসের চাল। একটা পাকচক্র বাধাইয়া অমৃতবাজারে প্রবন্ধ লিখিয়া গবর্মেণ্টের সহিত খিটিমিটি করিবার জন্য কন্‌গ্রেসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেলাগণ লুক্কায়িতভাবে চতুর্দিকে অবসর অনুসন্ধান করিতেছে। এই-সকল ক্ষুদ্র কণ্টকগণকে একদমে দলন করিয়া ফেলিবার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের হস্তে অধিকতর সরাসরি ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই বলিয়া সাহেব ভারতবর্ষীয় গবর্মেণ্টকে অত্যন্ত দুর্বল গবর্মেণ্ট বলিয়া মনে মনে ধিক্কার দিলেন। কিন্তু কন্‌গ্রেসওয়ালা শশিভূষণের নাম ম্যাজিস্ট্রেটের মনে রহিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সংসারে বড়ো বড়ো ব্যাপারগুলি যখন প্রবলভাবে গর্জাইয়া উঠিতে থাকে তখন ছোটো ছোটো ব্যাপারগুলিও ক্ষুধিত ক্ষুদ্র শিকড়জাল লইয়া জগতের উপর আপন দাবি বিস্তার করিতে ছাড়ে না।

শশিভূষণ যখন এই ম্যাজিস্ট্রেটের হাঙ্গামা লইয়া বিশেষ ব্যস্ত, যখন বিস্তৃত পুঁথিপত্র হইতে আইন উদ্ধার করিতেছেন, মনে মনে বক্তৃতায় শাণ দিতেছেন, কল্পনায় সাক্ষীকে জেরা করিতে বসিয়া গিয়াছেন ও প্রকাণ্ড আদালতের লোকারণ্যদৃশ্য এবং এই যুদ্ধপর্বের ভাবী পর্বাধ্যায়গুলি মনে আনিয়া ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত ও ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিতেছেন, তখন তাঁহার ক্ষুদ্র ছাত্রীটি তাহার ছিন্নপ্রায় চারুপাঠ ও মসীবিচিত্র লিখিবার খাতা, বাগান হইতে কখনো ফুল, কখনো ফল, মাতৃভাণ্ডার হইতে কোনোদিন আচার, কোনোদিন নারিকেলের মিষ্টান্ন, কোনোদিন পাতায়-মোড়া কেতকীকেশরসুগন্ধি গৃহনির্মিত খয়ের আনিয়া নিয়মিত সময়ে তাঁহার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইত।

প্রথম দিনকতক দেখিল, শশিভূষণ একখানা চিত্রহীন প্রকাণ্ড কঠোরমূর্তি গ্রন্থ খুলিয়া অন্যমনস্কভাবে পাত উল্টাইতেছেন, সেটা যে মনোযোগ দিয়া পাঠ করিতেছেন তাহাও বোধ হইল না। অন্য সময়ে শশিভূষণ যে-সকল গ্রন্থ পড়িতেন, তাহার মধ্য হইতে কোনো না কোনো অংশ গিরিবালাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু ওই স্থূলকায় কালো মলাটের পুস্তক হইতে গিরিবালাকে শুনাইবার যোগ্য কি দুটো কথাও ছিল না। তা না থাক্, তাই বলিয়া ওই বইখানা কি এতই বড়ো, আর গিরিবালা কি এতই ছোটো।

প্রথমটা, গুরুর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য গিরিবালা সুর করিয়া, বানান করিয়া, বেণীসমেত দেহের উত্তরার্ধ সবেগে দুলাইতে দুলাইতে উচ্চৈঃস্বরে আপনিই পড়া আরম্ভ করিয়া দিল। দেখিল তাহাতে বিশেষ ফল হইল না। কালো মোটা বইখানার উপর মনে মনে অত্যন্ত চটিয়া গেল। ওটাকে একটা কুৎসিত কঠোর নিষ্ঠুর মানুষের মতো করিয়া দেখিতে লাগিল। ওই বইখানা যে গিরিবালাকে বালিকা বলিয়া সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে তাহা যেন তাহার প্রত্যেক দুর্বোধ পাতা দুষ্ট মানুষের মুখের মতো আকার ধারণ করিয়া নীরবে প্রকাশ করিতে লাগিল। সেই বইখানা যদি কোনো চোরে চুরি করিয়া লইয়া যাইত, তবে সেই চোরকে সে তাহার মাতৃভাণ্ডারের সমস্ত কেয়াখয়ের চুরি করিয়া পুরস্কার দিতে পারিত। সেই বইখানার বিনাশের জন্য সে মনে মনে দেবতার নিকট যে-সকল অসংগত ও অসম্ভব প্রার্থনা করিয়াছিল তাহা দেবতারা শুনেন নাই এবং পাঠকদিগকেও শুনাইবার কোনো আবশ্যক দেখি না।

তখন ব্যথিতহৃদয় বালিকা দুই-একদিন চারুপাঠ হস্তে গুরুগৃহে গমন বন্ধ করিল। এবং সেই দুই-একদিন পরে এই বিচ্ছেদের ফল পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য সে অন্য ছলে শশিভূষণের গৃহসম্মুখবর্তী পথে আসিয়া কটাক্ষপাত করিয়া দেখিল, শশিভূষণ সেই কালো বইখানা ফেলিয়া একাকী দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া লোহার গরাদেগুলার প্রতি বিজাতীয় ভাষায় বক্তৃতা প্রয়োগ করিতেছেন। বোধ করি, বিচারকের মন কেমন

করিয়া গলাইবেন এই লোহাগুলার উপর তাহার পরীক্ষা হইতেছে। সংসারে অনভিজ্ঞ গ্রন্থবিহারী শশিভূষণের ধারণা ছিল যে, পুরাকালে ডিমস্থিনীস, সিসিরো, বার্ক, শেরিডন প্রভৃতি বাগ্মীগণ বাক্যবলে যে-সকল অসামান্য কার্য করিয়া গিয়াছেন— যেরূপ শব্দভেদী শরবর্ষণে অন্যায়কে ছিন্নভিন্ন, অত্যাচারকে লাঞ্ছিত এবং অহংকারকে ধূলিশায়ী করিয়া দিয়াছেন, আজিকার দোকানদারির দিনেও তাহা অসম্ভব নহে। প্রভুত্বমদগর্বিত উদ্ধত ইংরাজকে কেমন করিয়া তিনি জগৎসমক্ষে লজ্জিত ও অনুতপ্ত করিবেন, তিলকুচি গ্রামের জীর্ণ ক্ষুদ্র গৃহে দাঁড়াইয়া শশিভূষণ তাহারই চর্চা করিতেছিলেন। আকাশের দেবতারা শুনিয়া হাসিয়াছিলেন কি তাঁহাদের দেবচক্ষু অশ্রুসিক্ত হইতেছিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

সুতরাং সেদিন গিরিবালা তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িল না; সেদিন বালিকার অঞ্চলে জাম ছিল না; পূর্বে একবার জামের আঁটি ধরা পড়িয়া অবধি ওই ফল সম্বন্ধে সে অত্যন্ত সংকুচিত ছিল। এমন-কি, শশিভূষণ যদি কোনোদিন নিরীহ ভাবে জিজ্ঞাসা করিত 'গিরি, আজ জাম নেই?' সে সেটাকে গূঢ় উপহাস জ্ঞান করিয়া সক্ষোভে 'যাঃও' বলিয়া তর্জন করিয়া পলায়নের উপক্রম করিত। জামের আঁটির অভাবে আজ তাহাকে একটা কৌশল অবলম্বন করিতে হইল। সহসা দূরের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বালিকা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "স্বর্ণ ভাই, তুই যাস নে, আমি এখনি যাচ্ছি।"

পুরুষ পাঠক মনে করিতে পারেন যে, কথাটা স্বর্ণলতা নামক কোনো দূরবর্তিনী সঙ্গিনীকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত, কিন্তু পাঠিকারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন দূরে কেহই ছিল না, লক্ষ্য অত্যন্ত নিকট। কিন্তু হায়, অন্ধ পুরুষের প্রতি সে লক্ষ ভ্রষ্ট হইয়া গেল। শশিভূষণ যে শুনিতে পান নাই তাহা নহে, তিনি তাহার মর্ম গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি মনে করিলেন, বালিকা সত্যই ক্রীড়ার জন্য উৎসুক— এবং সেদিন তাহাকে খেলা হইতে অধ্যয়নে আকর্ষণ করিয়া আনিতে তাঁহার অধ্যবসায় ছিল না, কারণ তিনিও সেদিন কোনো কোনো হৃদয়ের দিকে লক্ষ করিয়া তীক্ষ্ণ শর সন্ধান করিতেছিলেন। বালিকার ক্ষুদ্র হস্তের সামান্য লক্ষ্য যেমন ব্যর্থ হইয়াছিল তাঁহার শিক্ষিত হস্তের মহৎ লক্ষ্যও সেইরূপ ব্যর্থ হইয়াছিল, পাঠকেরা সে সংবাদ পূর্বেই অবগত হইয়াছেন।

জামের আঁটির একটা গুণ এই যে, একে একে অনেকগুলি নিক্ষেপ করা যায়, চারিটি নিষ্ফল হইলে অন্তত পঞ্চমটি ঠিক স্থানে গিয়া লাগিতে পারে। কিন্তু স্বর্ণ হাজার কাল্পনিক হউক, তাহাকে 'এখনি যাচ্ছি' আশা দিয়া অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা যায় না। থাকিলে স্বর্ণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে লোকের স্বভাবতই সন্দেহ জন্মিতে পারে। সুতরাং

সে উপায়টি যখন নিষ্ফল হইল তখন গিরিবালাকে অবিলম্বে চলিয়া যাইতে হইল। তথাপি, স্বর্ণনাম্নী কোনো দূরস্থিত সহচরীর সঙ্গ লাভ করিবার অভিলাষ আন্তরিক হইলে যেরূপ সবেগে উৎসাহের সহিত পাদচারণা করা স্বাভাবিক হইত, গিরিবালার গতিতে তাহা লক্ষিত হইল না। সে যেন তাহার পৃষ্ঠ দিয়া অনুভব করিবার চেষ্টা করিতেছিল পশ্চাতে কেহ আসিতেছে কি না; যখন নিশ্চয় বুঝিল কেহ আসিতেছে না তখন আশার শেষতম ক্ষীণতম ভগ্নাংশটুকু লইয়া একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, এবং কাহাকেও না দেখিয়া সেই ক্ষুদ্র আশাটুকু এবং শিথিলপত্র চারুপাঠখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া পথে ছড়াইয়া দিল। শশিভূষণ তাহাকে যে-বিদ্যাটুকু দিয়াছে সেটুকু যদি সে কোনো মতে ফিরাইয়া দিতে পারিত তবে বোধ হয় পরিত্যাজ্য জামের আঁটির মতো সে-সমস্তই শশিভূষণের দ্বারের সম্মুখে সশব্দে নিক্ষেপ করিয়া দিয়া চলিয়া আসিত। বালিকা প্রতিজ্ঞা করিল, দ্বিতীয়বার শশিভূষণের সহিত দেখা হইবার পূর্বেই সে সমস্ত পড়াশুনা ভুলিয়া যাইবে, তিনি যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন তাহার কোনোটিরই উত্তর দিতে পারিবে না! একটি— একটি— একটিরও না! তখন! তখন শশিভূষণ অত্যন্ত জব্দ হইবে।

গিরিবালার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। পড়া ভুলিয়া গেলে শশিভূষণের যে কিরূপ তীব্র অনুতাপের কারণ হইবে তাহা মনে করিয়া সে পীড়িত হৃদয়ে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিল, এবং কেবলমাত্র শশিভূষণের দোষে বিস্মৃতশিক্ষা সেই হতভাগিনী ভবিষ্যৎ গিরিবালাকে কল্পনা করিয়া তাহার নিজের প্রতি করুণারস উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। আকাশে মেঘ করিতে লাগিল; বর্ষাকালে এমন মেঘ প্রতিদিন করিয়া থাকে। গিরিবালা পথের প্রান্তে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল; এমন অকারণ কান্না প্রতিদিন কত বালিকা কাঁদিয়া থাকে! উহার মধ্যে লক্ষ্য করিবার বিষয় কিছুই ছিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শশিভূষণের আইন সম্বন্ধীয় গবেষণা এবং বক্তৃতাচর্চা কী কারণে ব্যর্থ হইয়া গেল তাহা পাঠকদের অগোচর নাই। ম্যাজিস্ট্রেটের নামে মকদ্দমা অকস্মাৎ মিটিয়া গেল। হরকুমার তাঁহাদের জেলার বেঞ্চে অনরারি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন। একখানা মলিন চাপকান ও তৈলাক্ত পাগড়ি পরিয়া হরকুমার আজকাল প্রায়ই জেলায় গিয়া সাহেব-সুবাদিগকে নিয়মিত সেলাম করিয়া আসেন।

শশিভূষণের সেই কালো মোটা বইখানার প্রতি এতদিন পরে গিরিবালার অভিশাপ ফলিতে আরম্ভ করিল, সে একটি অন্ধকার কোণে নির্বাসিত হইয়া অনাদৃত বিস্মৃতভাবে

ধূলিস্তরসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু তাহার অনাদর দেখিয়া যে বালিকা আনন্দ লাভ করিবে সেই গিরিবালা কোথায়।

শশিভূষণ যেদিন প্রথম আইনের গ্রন্থ বন্ধ করিয়া বসিলেন সেই দিনই হঠাৎ বুঝিতে পারিলেন, গিরিবালা আসে নাই। তখন একে একে এই কয়দিনের ইতিহাস অল্পে অল্পে তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। মনে পড়িতে লাগিল, একদিন উজ্জ্বল প্রভাতে গিরিবালা অঞ্চল ভরিয়া নববর্ষার আর্দ্র বকুলফুল আনিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়াও যখন তিনি গ্রন্থ হইতে দৃষ্টি তুলিলেন না, তখন তাহার উচ্ছ্বাসে সহসা বাধা পড়িল। সে তাহার অঞ্চলবিদ্ধ একটা সুঁচস্‌তা বাহির করিয়া নতশিরে একটি একটি করিয়া ফুল লইয়া মালা গাঁথিতে লাগিল— মালা অত্যন্ত ধীরে ধীরে গাঁথিল, অনেক বিলম্বে শেষ হইল, বেলা হইয়া আসিল, গিরিবালার ঘরে ফিরিবার সময় হইল, তথাপি শশিভূষণের পড়া শেষ হইল না। গিরিবালা মালাটা তক্তপোশের উপর রাখিয়া ম্লানভাবে চলিয়া গেল। মনে পড়িল, তাহার অভিমান প্রতিদিন কেমন করিয়া ঘনীভূত হইয়া উঠিল; কবে হইতে সে তাঁহার ঘরে প্রবেশ না করিয়া ঘরের সম্মুখবর্তী পথে মধ্যে মধ্যে দেখা দিত এবং চলিয়া যাইত; অবশেষে কবে হইতে বালিকা সেই পথে আসাও বন্ধ করিয়াছে, সেও তো আজ কিছুদিন হইল। গিরিবালার অভিমান তো এতদিন স্থায়ী হয় না। শশিভূষণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হতবুদ্ধি হতকর্মের মতো দেয়ালে পিঠ দিয়া বসিয়া রহিলেন। ক্ষুদ্র ছাত্রীটি না আসাতে তাঁহার পাঠ্যগ্রন্থগুলি নিতান্ত বিস্বাদ হইয়া আসিল। বই টানিয়া টানিয়া লইয়া দুই-চারিপাতা পড়িয়া ফেলিয়া দিতে হয়। লিখিতে লিখিতে ক্ষণে ক্ষণে সচকিতে পথের দিকে দ্বারের অভিমুখে প্রতীক্ষাপূর্ণ দৃষ্টি বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে এবং লেখা ভঙ্গ হয়।

শশিভূষণের আশঙ্কা হইল, গিরিবালার অসুখ হইয়া থাকিবে। গোপনে সন্ধান লইয়া জানিলেন, সে আশঙ্কা অমূলক। গিরিবালা আজকাল আর ঘর হইতে বাহির হয় না। তাহার জন্য পাত্র স্থির হইয়াছে।

গিরি যেদিন চারুপাঠের ছিন্নখণ্ডে গ্রামের পঙ্কিল পথ বিকীর্ণ করিয়াছিল তাহার পরদিন প্রত্যূষে ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিচিত্র উপহার সংগ্রহ করিয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিল। অতিশয় গ্রীষ্ম হওয়াতে নিদ্রাহীন রাত্রি অতিবাহন করিয়া হরকুমার ভোরবেলা হইতে বাহিরে বসিয়া গা খুলিয়া তামাক খাইতেছিলেন। গিরিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাচ্ছিস।" গিরি কহিল, "শশিদাদার বাড়ি।" হরকুমার ধমক দিয়া কহিলেন, "শশিদাদার বাড়ি যেতে হবে না, ঘরে যা!" এই বলিয়া আসন্ন-শ্বশুরগৃহবাস বয়ঃপ্রাপ্তকন্যার লজ্জার অভাব সম্বন্ধে বিস্তর তিরস্কার করিলেন। সেই

দিন হইতে তাহার বাহিরে আসা বন্ধ হইয়াছে। এবার আর তাহার অভিমান ভঙ্গ করিবার অবসর জুটিল না। আমসত্ত্ব, কেয়াখয়ের এবং জারকনেবু ভাণ্ডারের যথাস্থানে ফিরিয়া গেল। বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, বকুলফুল ঝরিতে লাগিল, গাছ ভরিয়া পেয়ারা পাকিয়া উঠিল এবং শাখাস্খলিত পক্ষীচঞ্চুক্ষত সুপক্ব কালোজামে তরুতল প্রতিদিন সমাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। হায়, সেই ছিন্নপ্রায় চারুপাঠখানিও আর নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গ্রামে গিরিবালার বিবাহে যেদিন সানাই বাজিতেছিল সেদিন অনিমন্ত্রিত শশিভূষণ নৌকা ক'রিয়া কলিকাতা অভিমুখে চলিতেছিলেন।

মকদ্দমা উঠাইয়া লওয়া অবধি হরকুমার শশীকে বিষচক্ষে দেখিতেন। কারণ, তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, শশী তাঁহাকে নিশ্চয় ঘৃণা করিতেছে। শশীর মুখে চোখে ব্যবহারে তিনি তাহার সহস্র কাল্পনিক নিদর্শন দেখিতে লাগিলেন। গ্রামের সকল লোকই তাঁহার অপমানবৃত্তান্ত ক্রমশ বিস্মৃত হইতেছে, কেবল শশিভূষণ একাকী সেই দুঃস্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে মনে করিয়া তিনি তাহাকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তাঁহার অন্তঃকরণের মধ্যে একটুখানি সলজ্জ সংকোচ এবং সেই সঙ্গে প্রবল আক্রোশের সঞ্চার হইত। শশীকে গ্রামছাড়া করিতে হইবে বলিয়া হরকুমার প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন।

শশিভূষণের মতো লোককে গ্রামছাড়া করা কাজটা তেমন দুরূহ নহে। নায়েব মহাশয়ের অভিপ্রায় অনতিবিলম্বে সফল হইল। একদিন সকালবেলা পুস্তকের বোঝা এবং গুটিদুইচার টিনের বাক্স সঙ্গে লইয়া শশী নৌকায় চড়িলেন। গ্রামের সহিত তাঁহার যে একটি সুখের বন্ধন ছিল সেও আজ সমারোহ সহকারে ছিন্ন হইতেছে। সুকোমল বন্ধনটি যে কত দৃঢ়ভাবে তাঁহার হৃদয়কে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছিল তাহা তিনি পূর্বে সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারেন নাই। আজ যখন নৌকা ছাড়িয়া দিল, গ্রামের বৃক্ষ-চূড়াগুলি অস্পষ্ট এবং উৎসবের বাদ্যধ্বনি ক্ষীণতর হইয়া আসিল, তখন সহসা অশ্রুবাষ্পে হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিয়া তাঁহার কণ্ঠরোধ করিয়া ধরিল, রক্তোচ্ছ্বাসবেগে কপালের শিরাগুলা টন্ টন্ করিতে লাগিল এবং জগৎসংসারের সমস্ত দৃশ্য ছায়ানির্মিত মায়ামরীচিকার মতো অত্যন্ত অস্পষ্ট প্রতিভাত হইল।

প্রতিকূল বাতাস অতিশয় বেগে বহিতেছিল, সেই জন্য স্রোত অনুকূল হইলেও নৌকা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। এমন সময়ে নদীর মধ্যে এক কাণ্ড ঘটিল যাহাতে শশিভূষণের যাত্রার ব্যাঘাত করিয়া দিল।

স্টেশন ঘাট হইতে সদর মহকুমা পর্যন্ত একটি নূতন স্টিমার লাইন সম্প্রতি খুলিয়াছে। সেই স্টিমারটি সশব্দে পক্ষ সঞ্চালন করিয়া ঢেউ তুলিয়া উজানে আসিতেছিল। জাহাজে নূতন লাইনের অল্পবয়স্ক ম্যানেজার সাহেব এবং অল্পসংখ্যক যাত্রী ছিল। যাত্রীদের মধ্যে শশিভূষণের গ্রাম হইতেও কেহ কেহ উঠিয়াছিল।

একটি মহাজনের নৌকা কিছুদূর হইতে এই স্টিমারের সহিত পাল্লা দিয়া আসিতে চেষ্টা করিতেছিল, আবার মাঝে মাঝে ধরি ধরি করিতেছিল, আবার মাঝে মাঝে পশ্চাতে পড়িতেছিল। মাঝির ক্রমশ রোখ চাপিয়া গেল। সে প্রথম পালের উপর দ্বিতীয় পাল এবং দ্বিতীয় পালের উপরে ক্ষুদ্র তৃতীয় পালটা পর্যন্ত তুলিয়া দিল। বাতাসের বেগে সুদীর্ঘ মাস্তুল সম্মুখে আনত হইয়া পড়িল, এবং বিদীর্ণ তরঙ্গরাশি অট্টকলস্বরে নৌকার দুই পার্শ্বে উন্মত্তভাবে নৃত্য করিতে লাগিল। নৌকা তখন ছিন্নবল্‌গা অশ্বের ন্যায় ছুটিয়া চলিল। একস্থানে স্টিমারের পথ কিঞ্চিৎ বাঁকা ছিল, সেইখানে সংক্ষিপ্ততর পথ অবলম্বন করিয়া নৌকা স্টিমারকে ছাড়াইয়া গেল। ম্যানেজার সাহেব আগ্রহভরে রেলের উপর ঝুঁকিয়া নৌকার এই প্রতিযোগিতা দেখিতেছিল। যখন নৌকা তাহার পূর্ণতম বেগ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং স্টিমারকে হাতদুয়েক ছাড়াইয়া গিয়াছে এমনসময়ে সাহেব হঠাৎ একটা বন্দুক তুলিয়া স্ফীত পাল লক্ষ্য করিয়া আওয়াজ করিয়া দিল। এক মুহূর্তে পাল ফাটিয়া গেল, নৌকা ডুবিয়া গেল, স্টিমার নদীর বাঁকের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ম্যানেজার কেন যে এমন করিল তাহা বলা কঠিন। ইংরাজনন্দনের মনের ভাব আমরা বাঙালি হইয়া ঠিক বুঝিতে পারি না। হয়তো দিশি পালের প্রতিযোগিতা সে সহ্য করিতে পারে নাই, হয়তো একটা স্ফীত বিস্তীর্ণ পদার্থ বন্দুকের গুলির দ্বারা চক্ষের পলকে বিদীর্ণ করিবার একটা হিংস্র প্রলোভন আছে, হয়তো এই গর্বিত নৌকাটার বস্ত্রখণ্ডের মধ্যে গুটিকয়েক ফুটা করিয়া নিমেষের মধ্যে ইহার নৌকালীলা সমাপ্ত করিয়া দিবার মধ্যে একটা প্রবল পৈশাচিক হাস্যরস আছে; নিশ্চয় জানি না। কিন্তু ইহা নিশ্চয়, ইংরাজের মনের ভিতরে একটুখানি বিশ্বাস ছিল যে, এই রসিকতাটুকু করার দরুন সে কোনোরূপ শাস্তির দায়িক নহে— এবং ধারণা ছিল, যাহাদের নৌকা গেল এবং সম্ভবত প্রাণ সংশয়, তাহারা মানুষের মধ্যেই গণ্য হইতে পারে না।

সাহেব যখন বন্দুক তুলিয়া গুলি করিল এবং নৌকা ডুবিয়া গেল তখন শশিভূষণের পান্সি ঘটনাস্থলের নিকটবর্তী হইয়াছে। শেষোক্ত ব্যাপারটি শশিভূষণ প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন। তাড়াতাড়ি নৌকা লইয়া গিয়া মাঝি এবং মাল্লাদিগকে উদ্ধার করিলেন। কেবল এক ব্যক্তি ভিতরে বসিয়া রন্ধনের জন্য মশলা পিষিতেছিল, তাহাকে আর দেখা গেল না। বর্ষার নদী খরবেগে বহিয়া চলিল।

শশিভূষণের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে উত্তপ্ত রক্ত ফুটিতে লাগিল। আইন অত্যন্ত মন্দগতি— সে একটা বৃহৎ জটিল লৌহযন্ত্রের মতো; তৌল করিয়া সে প্রমাণ গ্রহণ করে এবং নির্বিকার ভাবে সে শাস্তি বিভাগ করিয়া দেয়, তাহার মধ্যে মানবহৃদয়ের উত্তাপ নাই। কিন্তু ক্ষুধার সহিত ভোজন, ইচ্ছার সহিত উপভোগ ও রোষের সহিত শাস্তিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া শশিভূষণের নিকট সমান অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইল। অনেক অপরাধ আছে যাহা প্রত্যক্ষ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ নিজ হস্তে তাহার শাস্তিবিধান না করিলে অন্তর্যামী বিধাতাপুরুষ যেন অন্তরের মধ্যে থাকিয়া প্রত্যক্ষকারীকে দগ্ধ করিতে থাকেন। তখন আইনের কথা স্মরণ করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে হৃদয় লজ্জা বোধ করে। কিন্তু কলের আইন এবং কলের জাহাজ ম্যানেজারটিকে শশিভূষণের নিকট হইতে দূরে লইয়া গেল। তাহাতে জগতের আর আর কী উপকার হইয়াছিল বলিতে পারি না কিন্তু সে যাত্রায় নিঃসন্দেহ শশিভূষণের ভারতবর্ষীয় প্লীহা রক্ষা পাইয়াছিল।

মাঝিমাল্লা যাহারা বাঁচিল তাহাদিগকে লইয়া শশী গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। নৌকায় পাট বোঝাই ছিল, সেই পাট উদ্ধারের জন্য লোক নিযুক্ত করিয়া দিলেন এবং মাঝিকে ম্যানেজারের বিরুদ্ধে পুলিসে দরখাস্ত দিতে অনুরোধ করিলেন।

মাঝি কিছুতেই সম্মত হয় না। সে বলিল, নৌকা তো মজিয়াছে, এক্ষণে নিজেকে মজাইতে পারিব না। প্রথমত, পুলিসকে দর্শনি দিতে হইবে; তাহার পর কাজকর্ম আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া আদালতে আদালতে ঘুরিতে হইবে; তাহার পর সাহেবের নামে নালিশ করিয়া কী বিপাকে পড়িতে হইবে ও কী ফল লাভ হইবে তাহা ভগবান জানেন। অবশেষে সে যখন জানিল, শশিভূষণ নিজে উকিল, আদালতখরচা তিনিই বহন করিবেন এবং মকদ্দমায় ভবিষ্যতে খেসারত পাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে তখন রাজি হইল। কিন্তু শশিভূষণের গ্রামের লোক যাহারা স্টিমারে উপস্থিত ছিল তাহারা কিছুতেই সাক্ষ্য দিতে চাহিল না। তাহারা শশিভূষণকে কহিল, "মহাশয়, আমরা কিছুই দেখি নাই; আমরা জাহাজের পশ্চাৎ ভাগে ছিলাম, কলের ঘট্‌ঘট্‌ এবং জলের কল্‌কল্‌ শব্দে সেখান হইতে বন্দুকের আওয়াজ শুনিবারও কোনো সম্ভাবনা ছিল না।"

দেশের লোককে আন্তরিক ধিক্কার দিয়া শশিভূষণ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট মকদ্দমা চালাইলেন।

সাক্ষীর কোনো আবশ্যক হইল না। ম্যানেজার স্বীকার করিল যে, সে বন্দুক ছুঁড়িয়াছিল। কহিল, আকাশে এক ঝাঁক বক উড়িতেছিল, তাহাদেরই প্রতি লক্ষ করা হইয়াছিল। স্টিমার তখন পূর্ণবেগে চলিতেছিল এবং সেই মুহূর্তেই নদীর বাঁকের

অন্তরালে প্রবেশ করিয়াছিল। সুতরাং সে জানিতেও পারে নাই, কাক মরিল, কি বক মরিল, কি নৌকাটা ডুবিল। অন্তরীক্ষে এবং পৃথিবীতে এত শিকারের জিনিস আছে যে, কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক 'ডার্টি র‍্যাগ' অর্থাৎ মলিন বস্ত্রখণ্ডের উপর সিকিপয়সা দামেরও ছিটাগুলি অপব্যয় করিতে পারে না।

বেকসুর খালাস পাইয়া ম্যানেজার সাহেব চুরট ফুঁকিতে ফুঁকিতে ক্লাবে হুইস্‌ট্‌ খেলিতে গেল; যে লোকটা নৌকার মধ্যে মশলা পিষিতেছিল নয় মাইল তফাতে তাহার মৃতদেহ ডাঙায় আসিয়া লাগিল এবং শশিভূষণ চিত্তদাহ লইয়া আপন গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন।

যেদিন ফিরিয়া আসিলেন, সেদিন নৌকা সাজাইয়া গিরিবালাকে শ্বশুরবাড়ি লইয়া যাইতেছে। যদিও তাঁহাকে কেহ ডাকে নাই তথাপি শশিভূষণ ধীরে ধীরে নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘাটে লোকের ভিড় ছিল সেখানে না গিয়া কিছু দূরে অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইলেন। নৌকা ঘাট ছাড়িয়া যখন তাঁহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল তখন চকিতের মতো একবার দেখিতে পাইলেন, মাথায় ঘোমটা টানিয়া নববধূ নতশিরে বসিয়া আছে। অনেক দিন হইতে গিরিবালার আশা ছিল যে, গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্বে কোনোমতে একবার শশিভূষণের সহিত সাক্ষাৎ হইবে কিন্তু আজ সে জানিতেও পারিল না যে, তাহার গুরু অনতিদূরে তীরে দাঁড়াইয়া আছেন। একবার সে মুখ তুলিয়াও দেখিল না, কেবল নিঃশব্দ রোদনে তাহার দুই কপোল বাহিয়া অশ্রুজল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

নৌকা ক্রমশ দূরে চলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। জলের উপর প্রভাতের রৌদ্র ঝিক্‌ঝিক্ করিতে লাগিল, নিকটের আম্রশাখায় একটা পাপিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মুহুর্মুহু গান গাহিয়া মনের আবেগ কিছুতেই নিঃশেষ করিতে পারিল না, খেয়া নৌকা লোক বোঝাই লইয়া পারাপার হইতে লাগিল, মেয়েরা ঘাটে জল লইতে আসিয়া উচ্চ কলস্বরে গিরির শ্বশুরালয়যাত্রার আলোচনা তুলিল, শশিভূষণ চশমা খুলিয়া চোখ মুছিয়া সেই পথের ধারে সেই গরাদের মধ্যে সেই ক্ষুদ্র গৃহে গিয়া প্রবেশ করিলেন। হঠাৎ একবার মনে হইল যেন গিরিবালার কণ্ঠ শুনিতে পাইলেন! 'শশিদাদা!'—কোথায় রে কোথায়? কোথাও না! সে গৃহে না, সে পথে না, সে গ্রামে না— তাঁহার অশ্রুজলাভিষিক্ত অন্তরের মাঝখানটিতে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শশিভূষণ পুনরায় জিনিসপত্র বাঁধিয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কলিকাতায় কোনো কাজ নাই, সেখানে যাওয়ার কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নাই ; সেইজন্য রেলপথে না গিয়া বরাবর নদীপথে যাওয়াই স্থির করিলেন।

তখন পূর্ণবর্ষায় বাংলাদেশের চারি দিকেই ছোটো বড়ো আঁকাবাঁকা সহস্র জলময় জাল বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সরস শ্যামল বঙ্গভূমির শিরা-উপশিরাগুলি পরিপূর্ণ হইয়া তরুলতা তৃণগুল্ম ঝোপঝাড় ধান পাট ইক্ষুতে দশ দিকে উন্মত্ত যৌবনের প্রাচুর্য যেন একেবারে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে।

শশিভূষণের নৌকা সেই-সমস্ত সংকীর্ণ বক্র জলস্রোতের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল। জল তখন তীরের সহিত সমতল হইয়া গিয়াছে। কাশবন শরবন এবং স্থানে স্থানে শস্যক্ষেত্র জলমগ্ন হইয়াছে। গ্রামের বেড়া, বাঁশঝাড় ও আমবাগান একেবারে জলের অব্যবহিত ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে— দেবকন্যারা যেন বাংলাদেশের তরুমূলবর্তী আলবালগুলি জলসেচনে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

যাত্রার আরম্ভকালে স্নানচিক্কণ বনশ্রী রৌদ্রে উজ্জ্বল হাস্যময় ছিল, অনতিবিলম্বেই মেঘ করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তখন যে দিকে দৃষ্টি পড়ে সেই দিকই বিষণ্ণ এবং অপরিচ্ছন্ন দেখাইতে লাগিল। বন্যার সময়ে গোরুগুলি যেমন জলবেষ্টিত মলিন পঙ্কিল সংকীর্ণ গোষ্ঠপ্রাঙ্গণের মধ্যে ভিড় করিয়া করুণনেত্রে সহিষ্ণুভাবে দাঁড়াইয়া শ্রাবণের ধারাবর্ষণে ভিজিতে থাকে, বাংলাদেশ আপনার কর্দমপিচ্ছিল ঘনসিক্ত রুদ্ধ জঙ্গলের মধ্যে মূকবিষণ্ণমুখে সেইরূপ পীড়িতভাবে অবিশ্রাম ভিজিতে লাগিল। চাষিরা টোকা মাথায় দিয়া বাহির হইয়াছে ; স্ত্রীলোকেরা ভিজিতে ভিজিতে বাদলার শীতল বায়ুতে সংকুচিত হইয়া কুটির হইতে কুটিরান্তরে গৃহকার্যে যাতায়াত করিতেছে ও পিছল ঘাটে অত্যন্ত সাবধানে পা ফেলিয়া সিক্তবস্ত্রে জল তুলিতেছে, এবং গৃহস্থ পুরুষেরা দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছে, নিতান্ত কাজের দায় থাকিলে কোমরে চাদর জড়াইয়া জুতা-হস্তে ছাতি-মাথায় বাহির হইতেছে— অবলা রমণীর মস্তকে ছাতি এই রৌদ্রদগ্ধ বর্ষাপ্লাবিত বঙ্গদেশের সনাতন পবিত্র প্রথার মধ্যে নাই।

বৃষ্টি যখন কিছুতেই থামে না তখন রুদ্ধ নৌকার মধ্যে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া শশিভূষণ পুনশ্চ রেলপথে যাওয়াই স্থির করিলেন। এক জায়গায় একটা প্রশস্ত মোহানার মতো জায়গায় আসিয়া শশিভূষণ নৌকা বাঁধিয়া আহারের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

খোঁড়ার পা খানায় পড়ে— সে কেবল খানার দোষে নয়, খোঁড়ার পাটারও পড়িবার দিকে একটু বিশেষ ঝোঁক আছে। শশিভূষণ সেদিন তাহার একটা প্রমাণ দিলেন।

দুই নদীর মোহানার মুখে বাঁশ বাঁধিয়া জেলেরা প্রকাণ্ড জাল পাতিয়াছে। কেবল একপার্শ্বে নৌকা চলাচলের স্থান রাখিয়াছে। বহুকাল হইতে তাহারা এ কার্য করিয়া থাকে এবং সেজন্য খাজনাও দেয়। দুর্ভাগ্যক্রমে এ বৎসর এই পথে হঠাৎ জেলার পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাহাদুরের শুভাগমন হইয়াছে। তাঁহার বোট আসিতে দেখিয়া জেলেরা পূর্ব হইতে পার্শ্ববর্তী পথ নির্দেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সাবধান করিয়া দিল। কিন্তু মনুষ্যরচিত কোনো বাধাকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া ঘুরিয়া যাওয়া সাহেবের মাঝির অভ্যাস নাই। সে সেই জালের উপর দিয়াই বোট চালাইয়া দিল। জাল অবনত হইয়া বোটকে পথ ছাড়িয়া দিল, কিন্তু তাহার হাল বাধিয়া গেল। কিঞ্চিৎ বিলম্বে এবং চেষ্টায় হাল ছাড়াইয়া লইতে হইল।

পুলিস সাহেব অত্যন্ত গরম এবং রক্তবর্ণ হইয়া বোট বাঁধিলেন। তাঁহার মূর্তি দেখিয়াই জেলে চারটে উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। সাহেব তাঁহার মাল্লাদিগকে জাল কাটিয়া ফেলিতে আদেশ করিলেন। তাহারা সেই সাত-আট শত টাকার বৃহৎ জাল কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল।

জালের উপর ঝাল ঝাড়িয়া অবশেষে জেলেদিগকে ধরিয়া আনিবার আদেশ হইল। কন্‌স্টেবল্‌ পলাতক জেলে চারিটির সন্ধান না পাইয়া যে চারি জনকে হাতের কাছে পাইল তাহাদিগকে ধরিয়া আনিল। তাহারা আপনাদিগকে নিরপরাধ বলিয়া জোড়হস্তে কাকুতিমিনতি করিতে লাগিল। পুলিসবাহাদুর যখন সেই বন্দীদিগকে সঙ্গে লইবার হুকুম দিতেছেন, এমন সময় চশমাপরা শশিভূষণ তাড়াতাড়ি একখানা জামা পরিয়া তাহার বোতাম না লাগাইয়া চটিজুতা চট্‌চট্‌ করিতে করিতে উর্ধ্বশ্বাসে পুলিসের বোটের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কম্পিতস্বরে কহিলেন, "সার, জেলের জাল ছিঁড়িবার এবং এই চারি জন লোককে উৎপীড়ন করিবার তোমার কোনো অধিকার নাই।"

পুলিসের বড়ো কর্তা তাঁহাকে হিন্দিভাষায় একটা বিশেষ অসম্মানের কথা বলিবা-মাত্র তিনি এক মুহূর্তে কিঞ্চিৎ উচ্চ ডাঙা হইতে বোটের মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়াই একেবারে সাহেবের উপরে আপনাকে নিক্ষেপ করিলেন। বালকের মতো, পাগলের মতো মারিতে লাগিলেন।

তাহার পর কী হইল তিনি জানেন না। পুলিসের থানার মধ্যে যখন জাগিয়া উঠিলেন তখন, বলিতে সংকোচ বোধ হয়, যেরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হইলেন তাহাতে মানসিক সম্মান অথবা শারীরিক আরাম বোধ করিলেন না।

নবম পরিচ্ছেদ

শশিভূষণের বাপ উকিল ব্যারিস্টার লাগাইয়া প্রথমত শশীকে হাজত হইতে জামিনে খালাস করিলেন। তাহার পরে মকদ্দমার জোগাড় চলিতে লাগিল।

যে-সকল জেলের জাল নষ্ট হইয়াছে তাহারা শশিভূষণের এক পরগনার অন্তর্গত, এক জমিদারের অধীন। বিপদের সময় কখনো কখনো শশীর নিকটে তাহারা আইনের পরামর্শ লইতেও আসিত। যাহাদিগকে সাহেব বোটে ধরিয়া আনিয়াছিলেন তাহারাও শশিভূষণের অপরিচিত নহে।

শশী তাহাদিগকে সাক্ষী মানিবেন বলিয়া ডাকাইয়া আনিলেন। তাহারা ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিল। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার লইয়া যাহাদিগকে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে হয় পুলিসের সহিত বিবাদ করিলে তাহারা কোথায় গিয়া নিষ্কৃতি পাইবে। একটার অধিক প্রাণ কাহার শরীরে আছে। যাহা লোকসান হইবার তাহা তো হইয়াছে, এখন আবার সাক্ষীর সপিনা ধরাইয়া এ কী মুশকিল। সকলে বলিল, "ঠাকুর, তুমি তো আমাদিগকে বিষম ফেসাদে ফেলিলে!"

বিস্তর বলা-কহার পর তাহারা সত্যকথা বলিতে স্বীকার করিল।

ইতিমধ্যে হরকুমার যেদিন বেঞ্চের কর্মোপলক্ষে জেলার সাহেবদিগকে সেলাম করিতে গেলেন পুলিস সাহেব হাসিয়া কহিলেন, "নায়েববাবু, শুনিতেছি তোমার প্রজারা পুলিসের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত হইয়াছে।"

নায়েব সচকিত হইয়া কহিলেন, "হাঁ! এও কি কখনো সম্ভব হয়। অপবিত্র জন্তুজাত পুত্রদিগের অস্থিতে এত ক্ষমতা!"

সংবাদপত্র-পাঠকেরা অবগত আছেন, মকদ্দমায় শশিভূষণের পক্ষ কিছুতেই টিঁকিতে পারিল না।

জেলেরা একে একে আসিয়া কহিল, পুলিস সাহেব তাহাদের জাল কাটিয়া দেন নাই, বোটে ডাকিয়া তাহাদের নাম ধাম লিখিয়া লইতেছিলেন।

কেবল তাহাই নহে, তাঁহার দেশস্থ গুটিচারেক পরিচিত লোক সাক্ষ্য দিল যে, তাহারা সে সময়ে ঘটনাস্থলে বিবাহের বরযাত্র উপলক্ষে উপস্থিত ছিল। শশিভূষণ যে অকারণে অগ্রসর হইয়া পুলিসের পাহারাওয়ালাদের প্রতি উপদ্রব করিয়াছে, তাহা তাহারা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে।

শশিভূষণ স্বীকার করিলেন যে, গালি খাইয়া বোটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি সাহেবকে মারিয়াছেন। কিন্তু জাল কাটিয়া দেওয়া ও জেলেদের প্রতি উপদ্রবই তাহার মূল কারণ।

এরূপ অবস্থায় যে বিচারে শশিভূষণ শাস্তি পাইলেন তাহাকে অন্যায় বলা যাইতে পারে না। তবে শাস্তিটা কিছু গুরুতর হইল। তিন-চারিটা অভিযোগ, আঘাত, অনধিকার প্রবেশ, পুলিসের কর্তব্যে ব্যাঘাত ইত্যাদি, সব ক'টাই তাঁহার বিরুদ্ধে পুরা প্রমাণ হইল।

শশিভূষণ তাঁহার সেই ক্ষুদ্র গৃহে তাঁহার প্রিয় পাঠ্যগ্রন্থগুলি ফেলিয়া পাঁচ বৎসর জেল খাটিতে গেলেন। তাঁহার বাপ আপিল করিতে উদ্যত হইলে তাঁহাকে শশিভূষণ বারংবার নিষেধ করিলেন; কহিলেন, "জেল ভালো! লোহার বেড়ি মিথ্যা কথা বলে না, কিন্তু জেলের বাহিরে যে স্বাধীনতা আছে সে আমাদিগকে প্রতারণা করিয়া বিপদে ফেলে। আর, যদি সৎসঙ্গের কথা বল তো, জেলের মধ্যে মিথ্যাবাদী কৃতঘ্ন কাপুরুষের সংখ্যা অল্প, কারণ স্থান পরিমিত— বাহিরে অনেক বেশি।"

দশম পরিচ্ছেদ

শশিভূষণের জেলে প্রবেশ করিবার অনতিকাল পরেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল। তাঁহার আর বড়ো কেহ ছিল না। এক ভাই বহুকাল হইতে সেন্‌ট্রাল প্রভিন্সে কাজ করিতেন, দেশে আসা তাঁহার বড়ো ঘটিয়া উঠিত না, সেইখানেই তিনি বাড়ি তৈয়ারি করিয়া সপরিবারে স্থায়ী হইয়া বসিয়াছিলেন। দেশে বিষয়সম্পত্তি যাহা ছিল নায়েব হরকুমার তাহার অধিকাংশ নানা কৌশলে আত্মসাৎ করিলেন।

জেলের মধ্যে অধিকাংশ কয়েদিকে যে পরিমাণে দুঃখ ভোগ করিতে হয় দৈববিপাকে শশিভূষণকে তদপেক্ষা অনেক বেশি সহ্য করিতে হইয়াছিল। তথাপি দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল।

আবার একদা বর্ষার দিনে জীর্ণ শরীর ও শূন্য হৃদয় লইয়া শশিভূষণ কারাপ্রাচীরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। স্বাধীনতা পাইলেন, কিন্তু তাহা ছাড়া কারার বাহিরে তাঁহার আর-কেহ অথবা আর-কিছু ছিল না। গৃহহীন আত্মীয়হীন সমাজহীন কেবল তাঁহার একলাটির পক্ষে এত বড়ো জগৎ সংসার অত্যন্ত ঢিলা বলিয়া ঠেকিতে লাগিল।

জীবনযাত্রার বিচ্ছিন্ন সূত্র আবার কোথা হইতে আরম্ভ করিবেন, এই কথা ভাবিতেছেন এমন সময়ে এক বৃহৎ জুড়ি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। একজন ভৃত্য নামিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নাম শশিভূষণবাবু?"

তিনি কহিলেন, "হাঁ।"

সে তৎক্ষণাৎ গাড়ির দরজা খুলিয়া তাঁহার প্রবেশের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইল।

তিনি আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে কোথায় যাইতে হইবে।"

সে কহিল, "আমার প্রভু আপনাকে ডাকিয়াছেন।"

পথিকদের কৌতূহলদৃষ্টিপাত অসহ্য বোধ হওয়াতে তিনি সেখানে আর অধিক বাদানুবাদ না করিয়া গাড়িতে উঠিয়া পড়িলেন। ভাবিলেন, নিশ্চয় ইহার মধ্যে একটা কিছু ভ্রম আছে। কিন্তু একটা কোনো দিকে তো চলিতে হইবে— নাহয় এমনি করিয়া ভ্রম দিয়াই এই নূতন জীবনের ভূমিকা আরম্ভ হউক।

সেদিনও মেঘ এবং রৌদ্র আকাশময় পরস্পরকে শিকার করিয়া ফিরিতেছিল; পথের প্রান্তবর্তী বর্ষার জলপ্লাবিত গাঢ়শ্যাম শস্যক্ষেত্র চঞ্চল ছায়ালোকে বিচিত্র হইয়া উঠিতেছিল। হাটের কাছে একটা বৃহৎ রথ পড়িয়া ছিল এবং তাহার অদূরবর্তী মুদির দোকানে একদল বৈষ্ণব ভিক্ষুক গুপিযন্ত্র ও খোলকরতাল যোগে গান গাহিতেছিল—

এসো এসো ফিরে এসো— নাথ হে, ফিরে এসো!
আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত, বঁধু হে, ফিরে এসো!

গাড়ি অগ্রসর হইয়া চলিল, গানের পদ ক্রমে দূর হইতে দূরতর হইয়া কানে প্রবেশ করিতে লাগিল—

ওগো নিঠুর, ফিরে এসো হে! আমার করুণ কোমল, এসো!
ওগো সজলজলদস্নিগ্ধকান্ত সুন্দর, ফিরে এসো!

গানের কথা ক্রমে ক্ষীণতর অস্ফুটতর হইয়া আসিল, আর বুঝা গেল না। কিন্তু গানের ছন্দে শশিভূষণের হৃদয়ে একটা আন্দোলন তুলিয়া দিল, তিনি আপন মনে গুন্‌গুন্ করিয়া পদের পর পদ রচনা করিয়া যোজনা করিয়া চলিলেন, কিছুতে যেন থামিতে পারিলেন না—

আমার নিতি-সুখ, ফিরে এসো! আমার চিরদুখ, ফিরে এসো!
আমার সব-সুখ-দুখ-মন্থন-ধন, অন্তরে ফিরে এসো!
আমার চিরবাঞ্ছিত, এসো! আমার চিতসঞ্চিত, এসো!
ওহে চঞ্চল, হে চিরন্তন, ভুজবন্ধনে ফিরে এসো!
আমার বক্ষে ফিরিয়া এসো, আমার চক্ষে ফিরিয়া এসো,
আমার শয়নে স্বপনে বসনে ভূষণে নিখিল ভুবনে এসো!
আমার মুখের হাসিতে এসো হে,
আমার চোখের সলিলে এসো!
আমার আদরে, আমার ছলনে,
আমার অভিমানে ফিরে এসো!

আমার সর্বস্মরণে এসো, আমার সর্বভরমে এসো—
আমার ধরম করম সোহাগ শরম জনম মরণে এসো !

গাড়ি যখন একটি প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি দ্বিতল অট্টালিকার সম্মুখে থামিল তখন শশিভূষণের গান থামিল।

তিনি কোনো প্রশ্ন না করিয়া ভৃত্যের নির্দেশক্রমে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

যে ঘরে আসিয়া বসিলেন সে ঘরের চারি দিকেই বড়ো বড়ো কাচের আলমারিতে বিচিত্র বর্ণের বিচিত্র মলাটের সারি সারি বই সাজানো। সেই দৃশ্য দেখিবামাত্র তাঁহার পুরাতন জীবন দ্বিতীয়বার কারামুক্ত হইয়া বাহির হইল। এই সোনার জলে অঙ্কিত নানা বর্ণে রঞ্জিত বইগুলি আনন্দলোকের মধ্যে প্রবেশ করিবার সুপরিচিত রত্নখচিত সিংহদ্বারের মতো তাঁহার নিকটে প্রতিভাত হইল।

টেবিলের উপরেও কী কতকগুলি ছিল। শশিভূষণ তাঁহার ক্ষীণদৃষ্টি লইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিলেন, একখানি বিদীর্ণ শ্লেট, তাহার উপরে গুটিকয়েক পুরাতন খাতা, একখানি ছিন্নপ্রায় ধারাপাত, কথামালা এবং একখানি কাশীরামদাসের মহাভারত।

শ্লেটের কাঠের ফ্রেমের উপর শশিভূষণের হস্তাক্ষরে কালি দিয়া খুব মোটা করিয়া লেখা— গিরিবালা দেবী। খাতা ও বইগুলির উপরেও ওই এক হস্তাক্ষরে এক নাম লিখিত।

শশিভূষণ কোথায় আসিয়াছেন, বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার বক্ষের মধ্যে রক্তস্রোত তরঙ্গিত হইয়া উঠিল। মুক্ত বাতায়ন দিয়া বাহিরে চাহিলেন— সেখানে কী চক্ষে পড়িল। সেই ক্ষুদ্র গরাদে-দেওয়া ঘর, সেই অসমতল গ্রাম্যপথ, সেই ডুরে-কাপড়-পরা ছোটো মেয়েটি। এবং সেই আপনার শান্তিময় নিশ্চিন্ত নিভৃত জীবনযাত্রা।

সেদিনকার সেই সুখের জীবন কিছুই অসামান্য বা অত্যধিক নহে ; দিনের পর দিন ক্ষুদ্র কাজে ক্ষুদ্র সুখে অজ্ঞাতসারে কাটিয়া যাইত, এবং তাঁহার নিজের অধ্যয়নকার্যের মধ্যে একটি বালিকা ছাত্রীর অধ্যাপনকার্য তুচ্ছ ঘটনার মধ্যেই গণ্য ছিল ; কিন্তু গ্রামপ্রান্তের সেই নির্জন দিনযাপন, সেই ক্ষুদ্র শান্তি, সেই ক্ষুদ্র সুখ, সেই ক্ষুদ্র বালিকার ক্ষুদ্র মুখখানি সমস্তই যেন স্বর্গের মতো দেশকালের বহির্ভূত এবং আয়ত্তের অতীতরূপে কেবল আকাঙ্ক্ষারাজ্যের কল্পনাছায়ার মধ্যে বিরাজ করিতে লাগিল। সেদিনকার সেই-সমস্ত ছবি এবং স্মৃতি আজিকার এই বর্ষাম্লান প্রভাতের আলোকের সহিত এবং মনের মধ্যে মৃদুগুঞ্জিত সেই কীর্তনের গানের সহিত জড়িত মিশ্রিত হইয়া একপ্রকার সংগীতময় জ্যোতির্ময় অপূর্বরূপ ধারণ করিল। সেই জঙ্গলে বেষ্টিত কর্দমাক্ত সংকীর্ণ গ্রামপথের মধ্যে সেই অনাদৃত ব্যথিত বালিকার অভিমানমলিন মুখের শেষ স্মৃতিটি যেন বিধাতাবিরচিত

এক অসাধারণ আশ্চর্য অপরূপ অতি-গভীর অতি-বেদনাপরিপূর্ণ স্বর্গীয় চিত্রের মতো তাঁহার মানসপটে প্রতিফলিত হইয়া উঠিল। তাহারই সঙ্গে কীর্তনের করুণ সুর বাজিতে লাগিল এবং মনে হইল যেন সেই পল্লীবালিকার মুখে সমস্ত বিশ্বহৃদয়ের এক অনির্বচনীয় দুঃখ আপনার ছায়া নিক্ষেপ করিয়াছে। শশিভূষণ দুই বাহুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া সেই টেবিলের উপর সেই শ্লেট বহি খাতার উপর মুখ রাখিয়া অনেক কাল পরে অনেক দিনের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পরে মৃদু শব্দে সচকিত হইয়া মুখ তুলিয়া দেখিলেন। তাঁহার সম্মুখে রুপার থালায় ফলমূলমিষ্টান্ন রাখিয়া গিরিবালা অদূরে দাঁড়াইয়া নীরবে অপেক্ষা করিতেছিল। তিনি মস্তক তুলিতেই নিরাভরণা শুভ্রবসনা বিধবাবেশধারিণী গিরিবালা তাঁহাকে নতজানু হইয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল।

বিধবা উঠিয়া দাঁড়াইয়া যখন শীর্ণমুখ ম্লানবর্ণ ভগ্নশরীর শশিভূষণের দিকে সকরুণ স্নিগ্ধনেত্রে চাহিয়া দেখিল, তখন তাহার দুই চক্ষু ঝরিয়া দুই কপোল বাহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল।

শশিভূষণ তাহাকে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু ভাষা খুঁজিয়া পাইলেন না; নিরুদ্ধ অশ্রুবাষ্প তাঁহার বাক্যপথ সবলে অবরোধ করিল, কথা এবং অশ্রু উভয়েই নিরুপায়ভাবে হৃদয়ের মুখে কণ্ঠের দ্বারে বদ্ধ হইয়া রহিল। সেই কীর্তনের দল ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে করিতে অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া গাহিতে লাগিল— এসো এসো হে!

আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১

প্রায়শ্চিত্ত

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্বর্গ ও মর্তের মাঝখানে একটা অনির্দেশ্য অরাজক স্থান আছে যেখানে ত্রিশঙ্কু রাজা ভাসিয়া বেড়াইতেছেন, যেখানে আকাশকুসুমের অজস্র আবাদ হইয়া থাকে। সেই বায়ুদুর্গবেষ্টিত মহাদেশের নাম 'হইলে-হইতে-পারিত'। যাঁহারা মহৎ কার্য করিয়া অমরতা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা ধন্য হইয়াছেন, যাঁহারা সামান্য ক্ষমতা লইয়া সাধারণ মানবের মধ্যে সাধারণভাবে সংসারের প্রাত্যহিক কর্তব্যসাধনে সহায়তা করিতেছেন তাঁহারাও ধন্য; কিন্তু যাঁহারা অদৃষ্টের ভ্রমক্রমে হঠাৎ দুয়ের মাঝখানে

পড়িয়াছেন তাঁহাদের আর কোনো উপায় নাই। তাঁহারা একটা কিছু হইলে হইতে পারিতেন কিন্তু সেই কারণেই তাঁহাদের পক্ষে কিছু-একটা হওয়া সর্বাপেক্ষা অসম্ভব।

আমাদের অনাথবন্ধু সেই মধ্যদেশবিলম্বিত বিধিবিড়ম্বিত যুবক। সকলেরই বিশ্বাস, তিনি ইচ্ছা করিলে সকল বিষয়েই কৃতকার্য হইতে পারিতেন। কিন্তু কোনো কালে তিনি ইচ্ছাও করিলেন না এবং কোনো বিষয়ে তিনি কৃতকার্যও হইলেন না, এবং সকলের বিশ্বাস তাঁহার প্রতি অটল রহিয়া গেল। সকলে বলিল, তিনি পরীক্ষায় ফার্স্ট্‌ হইবেন; তিনি আর পরীক্ষা দিলেন না। সকলের বিশ্বাস চাকরিতে প্রবিষ্ট হইলে যে কোনো ডিপার্ট্‌মেণ্টের উচ্চতম স্থান তিনি অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারিবেন; তিনি কোনো চাকরিই গ্রহণ করিলেন না। সাধারণ লোকের প্রতি তাঁহার বিশেষ অবজ্ঞা, কারণ তাহারা অত্যন্ত সামান্য; অসাধারণ লোকের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না, কারণ মনে করিলেই তিনি তাহাদের অপেক্ষা অসাধারণতর হইতে পারিতেন।

অনাথবন্ধুর সমস্ত খ্যাতিপ্রতিপত্তি সুখসম্পদসৌভাগ্য দেশকালাতীত অনসম্ভবতার ভাণ্ডারে নিহিত ছিল, বিধাতা কেবল বাস্তবরাজ্যে তাঁহাকে একটি ধনী শ্বশুর এবং একটি সুশীলা স্ত্রী দান করিয়াছিলেন। স্ত্রীর নাম বিন্ধ্যবাসিনী।

স্ত্রীর নামটি অনাথবন্ধু পছন্দ করেন নাই এবং স্ত্রীটিকেও রূপে গুণে তিনি আপন যোগ্য জ্ঞান করিতেন না, কিন্তু বিন্ধ্যবাসিনীর মনে স্বামীসৌভাগ্য গর্বের সীমা ছিল না। সকল স্ত্রীর সকল স্বামীর অপেক্ষা তাঁহার স্বামী যে সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, এ সম্বন্ধে তাঁহার কোনো সন্দেহ ছিল না এবং তাঁহার স্বামীরও কোনো সন্দেহ ছিল না, এবং সাধারণের ধারণাও এই বিশ্বাসের অনুকূল ছিল।

এই স্বামীগর্ব পাছে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়, এজন্য বিন্ধ্যবাসিনী সর্বদাই সশঙ্কিত ছিলেন। তিনি যদি আপন হৃদয়ের অভ্রভেদী অটল ভক্তিপর্বতের উচ্চতম শিখরের উপরে এই স্বামীটিকে অধিরোহণ করাইয়া তাঁহাকে মূঢ় মর্তলোকের সমস্ত কটাক্ষপাত হইতে দূরে রক্ষা করিতে পারিতেন, তবে নিশ্চিন্তচিত্তে পতিপূজায় জীবন উৎসর্গ করিতেন। কিন্তু জড়জগতে কেবলমাত্র ভক্তির দ্বারা ভক্তিভাজনকে ঊর্ধ্বে তুলিয়া রাখা যায় না এবং অনাথবন্ধুকেও পুরুষের আদর্শ বলিয়া মানে না এমন প্রাণী সংসারে বিরল নহে। এই জন্য বিন্ধ্যবাসিনীকে অনেক দুঃখ পাইতে হইয়াছে।

অনাথবন্ধু যখন কালেজে পড়িতেন তখন শ্বশুরালয়েই বাস করিতেন। পরীক্ষার সময় আসিল, পরীক্ষা দিলেন না, এবং তাহার পরবৎসর কালেজ ছাড়িয়া দিলেন।

এই ঘটনায় সর্বসাধারণের সমক্ষে বিন্ধ্যবাসিনী অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। রাত্রে মৃদুস্বরে অনাথবন্ধুকে বলিলেন, "পরীক্ষাটা দিলেই ভালো হত।"

অনাথবন্ধু অবজ্ঞাভরে হাসিয়া কহিলেন, "পরীক্ষা দিলেই কি চতুর্ভুজ হয় না কি। আমাদের কেদারও তো পরীক্ষায় পাস হইয়াছে!"

বিন্ধ্যবাসিনী সান্ত্বনা লাভ করিলেন। দেশের অনেক গো-গর্দভ যে-পরীক্ষায় পাস করিতেছে সে-পরীক্ষা দিয়া অনাথবন্ধুর গৌরব কী আর বাড়িবে!

প্রতিবেশিনী কমলা তাহার বাল্যসখী বিন্দিকে আনন্দ-সহকারে খবর দিতে আসিল যে, তাহার ভাই রমেশ এবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জলপানি পাইতেছে। শুনিয়া বিন্ধ্যবাসিনী অকারণে মনে করিল, কমলার এই আনন্দ বিশুদ্ধ আনন্দ নহে, ইহার মধ্যে তাহার স্বামীর প্রতি কিঞ্চিৎ গূঢ় শ্লেষ আছে। এইজন্য সখীর উল্লাসে উল্লাস প্রকাশ না করিয়া বরং গায়ে পড়িয়া কিঞ্চিৎ ঝগড়ার সুরে শুনাইয়া দিল যে, এল্. এ. পরীক্ষা একটা পরীক্ষার মধ্যেই গণ্য নহে: এমন-কি, বিলাতের কোনো কালেজে বি. এ.র নীচে পরীক্ষাই নাই। বলা বাহুল্য, এসমস্ত সংবাদ এবং যুক্তি বিন্ধ্য স্বামীর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছে।

কমলা সুখসংবাদ দিতে আসিয়া সহসা পরমপ্রিয়তমা প্রাণসখীর নিকট হইতে এরূপ আঘাত পাইয়া প্রথমটা কিছু বিস্মিত হইল। কিন্তু, সেও না কি স্ত্রীজাতীয় মনুষ্য, এই জন্য মুহূর্তকালের মধ্যেই বিন্ধ্যবাসিনীর মনের ভাব বুঝিতে পারিল এবং ভ্রাতার অপমানে তৎক্ষণাৎ তাহারও রসনাগ্রে একবিন্দু তীব্র বিষ সঞ্চারিত হইল; সে বলিল, "আমরা তো, ভাই, বিলাতও যাই নাই, সাহেব স্বামীকেও বিবাহ করি নাই, অত খবর কোথায় পাইব। মূর্খ মেয়েমানুষ, মোটামুটি এই বুঝি যে, বাঙালির ছেলেকে কালেজে এল. এ. দিতে হয়; তাও তো, ভাই, সকলে পারে না।" অত্যন্ত নিরীহ সুমিষ্ট এবং বন্ধুভাবে এই কথাগুলি বলিয়া কমলা চলিয়া আসিল, কলহবিমুখ বিন্ধ্য নিরুত্তরে সহ্য করিল এবং ঘরে প্রবেশ করিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল।

অল্পকালের মধ্যে আর-একটি ঘটনা ঘটিল। একটি দূরস্থ ধনী কুটুম্ব কিয়ৎকালের জন্য কলিকাতায় আসিয়া বিন্ধ্যবাসিনীর পিত্রালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তদুপলক্ষে তাহার পিতা রাজকুমার বাবুর বাড়িতে বিশেষ একটা সমারোহ পড়িয়া গেল। জামাই-বাবু বাহিরের যে বড়ো বৈঠকখানাটি অধিকার করিয়া থাকিতেন নব-অভ্যাগতদের বিশেষ সমাদরের জন্য সেই ঘরটি ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাকে মামাবাবুর ঘরে কিছুদিনের জন্য আশ্রয় লইতে অনুরোধ করা হইল।

এই ঘটনায় অনাথবন্ধুর অভিমান উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। প্রথমত, স্ত্রীর নিকটে গিয়া তাহার পিতৃনিন্দা করিয়া তাহাকে কাঁদাইয়া দিয়া শ্বশুরের উপর প্রতিশোধ তুলিলেন। তাহার পরে অনাহার প্রভৃতি অন্যান্য প্রবল উপায়ে অভিমান প্রকাশের

উপক্রম করিলেন। তাহা দেখিয়া বিন্ধ্যবাসিনী নিরতিশয় লজ্জিত হইল। তাহার মনে যে একটি সহজ আত্মসম্ভ্রমবোধ ছিল তাহা হইতেই সে বুঝিল, এরূপস্থলে সর্বসমক্ষে অভিমান প্রকাশ করার মতো লজ্জাকর আত্মাবমাননা আর কিছুই নাই। হাতে পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া বহু কষ্টে সে তাহার স্বামীকে ক্ষান্ত করিয়া রাখিল।

বিন্ধ্য অবিবেচক ছিল না, এইজন্য সে তাহার পিতামাতার প্রতি কোনো দোষারোপ করিল না; সে বুঝিল, ঘটনাটি সামান্য ও স্বাভাবিক। কিন্তু, এ কথাও তাহার মনে হইল যে, তাহার স্বামী শ্বশুরালয়ে বাস করিয়া কুটুম্বের আদর হইতে বঞ্চিত হইতেছেন।

সেই দিন হইতে প্রতিদিন সে তাহার স্বামীকে বলিতে লাগিল, "আমাকে তোমাদের ঘরে লইয়া চলো; আমি আর এখানে থাকিব না।"

অনাথবন্ধুর মনে অহংকার যথেষ্ট ছিল কিন্তু আত্মসম্ভ্রমবোধ ছিল না। তাঁহার নিজ গৃহের দারিদ্র্যের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করিতে কিছুতেই তাঁহার অভিরুচি হইল না। তখন তাঁহার স্ত্রী কিছু দৃঢ়তা প্রকাশ করিয়া কহিল, "তুমি যদি না যাও তো আমি একলাই যাইব।"

অনাথবন্ধু মনে মনে বিরক্ত হইয়া তাঁহার স্ত্রীকে কলিকাতার বাহিরে দূর ক্ষুদ্র পল্লীতে তাঁহাদের মৃত্তিকানির্মিত খোড়ো ঘরে লইয়া যাইবার উদ্‌যোগ করিলেন। যাত্রাকালে রাজকুমার বাবু এবং তাঁহার স্ত্রী কন্যাকে আরো কিছুকাল পিতৃগৃহে থাকিয়া যাইবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন; কন্যা নীরবে নতশিরে গম্ভীরমুখে বসিয়া মৌনভাবে জানাইয়া দিল, না, সে হইতে পারিবে না।

তাহার সহসা এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া পিতামাতার সন্দেহ হইল যে, অজ্ঞাতসারে বোধ করি কোনোরূপে তাহাকে আঘাত দেওয়া হইয়াছে। রাজকুমার বাবু ব্যথিতচিত্তে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, আমাদের কোনো অজ্ঞানকৃত আচরণে তোমার মনে কি ব্যথা লাগিয়াছে।"

বিন্ধ্যবাসিনী তাহার পিতার মুখের দিকে করুণ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া কহিল, "এক মুহূর্তের জন্যও নহে। তোমাদের এখানে বড়ো সুখে বড়ো আদরে আমার দিন গিয়াছে।" বলিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু তাহার সংকল্প অটল রহিল।

বাপ মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিলেন, যত স্নেহে যত আদরেই মানুষ কর, বিবাহ দিলেই মেয়ে পর হইয়া যায়।

অবশেষে অশ্রুনেত্রে সকলের নিকট বিদায় লইয়া আপন আজন্মকালের স্নেহমণ্ডিত পিতৃগৃহ এবং পরিজন ও সঙ্গিনীগণকে ছাড়িয়া বিন্ধ্যবাসিনী পালকিতে আরোহণ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কলিকাতার ধনীগৃহে এবং পল্লীগ্রামের গৃহস্থঘরে বিস্তর প্রভেদ। কিন্তু, বিন্ধ্যবাসিনী একদিনের জন্যও ভাবে অথবা আচরণে অসন্তোষ প্রকাশ করিল না। প্রফুল্লচিত্তে গৃহকার্যে শাশুড়ির সহায়তা করিতে লাগিল। তাহাদের দরিদ্র অবস্থা জানিয়া পিতা নিজ ব্যয়ে কন্যার সহিত একটি দাসী পাঠাইয়াছিলেন। বিন্ধ্যবাসিনী স্বামীগৃহে পৌঁছিয়াই তাহাকে বিদায় করিয়া দিল। তাহার শ্বশুরঘরের দারিদ্র্য দেখিয়া বড়োমানুষের ঘরের দাসী প্রতি মুহূর্তে মনে মনে নাসাগ্র আকুঞ্চিত করিতে থাকিবে, এ আশঙ্কাও তাহার অসহ্য বোধ হইল।

শাশুড়ি স্নেহবশত বিন্ধ্যকে শ্রমসাধ্য কার্য হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিতেন কিন্তু বিন্ধ্য নিরলস অশ্রান্তভাবে প্রসন্নমুখে সকল কার্যে যোগ দিয়া শাশুড়ির হৃদয় অধিকার করিয়া লইল, এবং পল্লীরমণীগণ তাহার গুণে মুগ্ধ হইয়া গেল।

কিন্তু, ইহার ফল সম্পূর্ণ সন্তোষজনক হইল না। কারণ, বিশ্বনিয়ম 'নীতিবোধ প্রথমভাগে'র ন্যায় সাধুভাষায় রচিত সরল উপদেশাবলী নহে। নিষ্ঠুর বিদ্রূপপ্রিয় শয়তান মাঝখানে আসিয়া সমস্ত নীতিসূত্রগুলিকে ঘাঁটিয়া জট পাকাইয়া দিয়াছে। তাই ভালো কাজে সকল সময়ে উপস্থিতমতো বিশুদ্ধ ভালো ফল ঘটে না, হঠাৎ একটা গোল বাধিয়া ওঠে।

অনাথবন্ধুর দুইটি ছোটো এবং একটি বড়ো ভাই ছিল। বড়ো ভাই বিদেশে চাকরি করিয়া যে গুটিপঞ্চাশেক টাকা উপার্জন করিতেন, তাহাতেই তাহাদের সংসার চলিত এবং ছোটো দুটি ভাইয়ের বিদ্যাশিক্ষা হইত।

বলা বাহুল্য, আজকালকার দিনে মাসিক পঞ্চাশ টাকায় সংসারের শ্রীবৃদ্ধিসাধন অসম্ভব কিন্তু বড়ো ভাইয়ের স্ত্রী শ্যামাশঙ্করীর গরিমাবৃদ্ধির পক্ষে উহাই যথেষ্ট ছিল। স্বামী সম্বৎসরকাল কাজ করিতেন, এইজন্য স্ত্রী সম্বৎসরকাল বিশ্রামের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কাজকর্ম কিছুই করিতেন না অথচ এমন ভাবে চলিতেন যেন তিনি কেবলমাত্র তাঁহার উপার্জনক্ষম স্বামীটির স্ত্রী হইয়াই সমস্ত সংসারটাকে পরম বাধিত করিয়াছেন।

বিন্ধ্যবাসিনী যখন শ্বশুরবাড়ি আসিয়া গৃহলক্ষ্মীর ন্যায় অহর্নিশি ঘরের কাজে প্রবৃত্ত হইল তখন শ্যামাশঙ্করীর সংকীর্ণ অন্তঃকরণটুকু কে যেন কষিয়া আঁটিয়া ধরিতে লাগিল। তাহার কারণ বোঝা শক্ত। বোধ করি বড়োবউ মনে করিলেন, মেজোবউ বড়ো ঘরের মেয়ে হইয়া কেবল লোক দেখাইবার জন্য ঘরকন্নার নীচ কাজে নিযুক্ত হইয়াছে, উহাতে

কেবল তাঁহাকে লোকের চক্ষে অপদস্থ করা হইতেছে। যে কারণেই হউক, মাসিক পঞ্চাশ টাকার স্ত্রী কিছুতেই ধনীবংশের কন্যাকে সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি তাহার নম্রতার মধ্যে অসহ্য দেমাকের লক্ষণ দেখিতে পাইলেন।

এদিকে অনাথবন্ধু পল্লীতে আসিয়া লাইব্রেরি স্থাপন করিলেন; দশ-বিশজন স্কুলের ছাত্র জড়ো করিয়া সভাপতি হইয়া খবরের কাগজে টেলিগ্রাম প্রেরণ করিতে লাগিলেন; এমন-কি, কোনো কোনো ইংরাজি সংবাদপত্রের বিশেষ সংবাদদাতা হইয়া গ্রামের লোকদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন। কিন্তু, দরিদ্র সংসারে একপয়সা আনিলেন না, বরঞ্চ বাজে খরচ অনেক হইতে লাগিল।

একটা কোনো চাকরি লইবার জন্য বিন্ধ্যবাসিনী তাঁহাকে সর্বদাই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। তিনি কান দিলেন না। স্ত্রীকে বলিলেন, তাঁহার উপযুক্ত চাকরি আছে বটে কিন্তু পক্ষপাতী ইংরাজ গবর্মেণ্ট সে সকল পদে বড়ো বড়ো ইংরাজকে নিযুক্ত করে, বাঙালি হাজার যোগ্য হইলেও তাহার কোনো আশা নাই।

শ্যামাশঙ্করী তাঁহার দেবর এবং মেঝো জা'র প্রতি লক্ষ্যে এবং অলক্ষ্যে সর্বদাই বাক্য-বিষ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। গর্বভরে নিজেদের দারিদ্র্য আস্ফালন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমরা গরিব মানুষ, বড়ো মানুষের মেয়ে এবং বড়ো মানুষের জামাইকে পোষণ করিব কেমন করিয়া। সেখানে তো বেশ ছিলেন, কোনো দুঃখ ছিল না—এখানে ডালভাত খাইয়া এত কষ্ট কি সহ্য হইবে।"

শাশুড়ি বড়োবউকে ভয় করিতেন, তিনি দুর্বলের পক্ষ অবলম্বন করিয়া কোনো কথা বলিতে সাহস করিতেন না। মেজোবউও মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনের ডালভাত এবং তদীয় স্ত্রীর বাক্যঝাল খাইয়া নীরবে পরিপাক করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে বড়ো ভাই ছুটিতে কিছুদিনের জন্য ঘরে আসিয়া স্ত্রীর নিকট হইতে অনেক উদ্দীপনাপূর্ণ ওজোগুণসম্পন্ন বক্তৃতা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে নিদ্রার ব্যাঘাত যখন প্রতি রাত্রেই গুরুতর হইয়া উঠিতে লাগিল তখন একদিন অনাথবন্ধুকে ডাকিয়া শান্তভাবে স্নেহের সহিত কহিলেন, "তোমার একটা চাকরির চেষ্টা দেখা উচিত, কেবল আমি একলা সংসার চালাইব কী করিয়া।"

অনাথবন্ধু পদাহত সর্পের ন্যায় গর্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, দুই বেলা দুই মুষ্টি অত্যন্ত অখাদ্য মোটা ভাতের 'পর এত খোটা সহ্য হয় না। তৎক্ষণাৎ স্ত্রীকে লইয়া শ্বশুরবাড়ি যাইতে সংকল্প করিলেন।

কিন্তু, স্ত্রী কিছুতেই সম্মত হইল না। তাহার মতে ভাইয়ের অন্ন এবং ভাজের গালিতে কনিষ্ঠের পারিবারিক অধিকার আছে কিন্তু শ্বশুরের আশ্রয়ে বড়ো লজ্জা।

বিন্ধ্যবাসিনী শ্বশুরবাড়িতে দীনহীনের মতো নত হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু বাপের বাড়িতে সে আপন মর্যাদা রক্ষা করিয়া মাথা তুলিয়া চলিতে চায়।

এমন সময় গ্রামের এন্‌ট্রেন্‌স্‌স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের পদ খালি হইল। অনাথবন্ধুর দাদা এবং বিন্ধ্যবাসিনী উভয়েই তাঁহাকে এই কাজটি গ্রহণ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেন। তাহাতেও হিতে বিপরীত হইল। নিজের ভাই এবং একমাত্র ধর্মপত্নী যে তাঁহাকে এমন একটা অত্যন্ত তুচ্ছ কাজের যোগ্য বলিয়া মনে করিতে পারেন, ইহাতে তাঁহার মনে দুর্জয় অভিমানের সঞ্চার হইল এবং সংসারের ও সমস্ত কাজকর্মের প্রতি পূর্বাপেক্ষা চতুর্গুণ বৈরাগ্য জন্মিয়া গেল।

তখন আবার দাদা তাঁহার হাতে ধরিয়া, মিনতি করিয়া, তাঁহাকে অনেক করিয়া ঠাণ্ডা করিলেন। সকলেই মনে করিলেন, ইহাকে আর কোনো কথা বলিয়া কাজ নাই, এ এখন কোনো প্রকারে ঘরে টিকিয়া গেলেই ঘরের সৌভাগ্য।

ছুটি অন্তে দাদা কর্মক্ষেত্রে চলিয়া গেলেন; শ্যামাশঙ্করী রুদ্ধ আক্রোশে মুখখানা গোলাকার করিয়া তুলিয়া একটা বৃহৎ কুদর্শনচক্র নির্মাণ করিয়া রহিলেন। অনাথবন্ধু বিন্ধ্যবাসিনীকে আসিয়া কহিলেন, "আজকাল বিলাতে না গেলে কোনো ভদ্র চাকরি পাওয়া যায় না। আমি বিলাতে যাইতে মনস্থ করিতেছি, তুমি তোমার বাবার কাছ হইতে কোনো ছুতায় কিছু অর্থ সংগ্রহ করো।"

এক তো বিলাত যাইবার কথা শুনিয়া বিন্ধ্যর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল; তাহার পরে পিতার কাছে কী করিয়া অর্থ ভিক্ষা করিতে যাইবে, তাহা সে মনে করিতে পারিল না এবং মনে করিতে গিয়া লজ্জায় মরিয়া গেল।

শ্বশুরের কাছে নিজমুখে টাকা চাহিতেও অনাথবন্ধুর অহংকারে বাধা দিল অথচ বাপের কাছ হইতে কন্যা কেন যে ছলে অথবা বলে অর্থ আকর্ষণ করিয়া না আনিবে তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। ইহা লইয়া অনাথ অনেক রাগারাগি করিলেন এবং মর্মপীড়িত বিন্ধ্যবাসিনীকে বিস্তর অশ্রুপাত করিতে হইল।

এমন করিয়া কিছুদিন সাংসারিক অভাবে এবং মনের কষ্টে কাটিয়া গেল; অবশেষে শরৎকালে পূজা নিকটবর্তী হইল। কন্যা এবং জামাতাকে সাদরে আহ্বান করিয়া আনিবার জন্য রাজকুমার বাবু বহু সমারোহে যানবাহনাদি প্রেরণ করিলেন। এক বৎসর পরে কন্যা স্বামীসহ পুনরায় পিতৃভবনে প্রবেশ করিল। ধনী কুটুম্বের যে আদর তাঁহার অসহ্য হইয়াছিল, জামাতা এবার তদপেক্ষা অনেক বেশি আদর পাইলেন। বিন্ধ্যবাসিনীও অনেককাল পরে মাথার অবগুণ্ঠন ঘুচাইয়া অহর্নিশি স্বজনস্নেহে ও উৎসবতরঙ্গে আন্দোলিত হইতে লাগিল।

আজ ষষ্ঠী। কাল সপ্তমীপূজা আরম্ভ হইবে। ব্যস্ততা এবং কোলাহলের সীমা নাই। দূর এবং নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয়পরিজনে অট্টালিকার প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ একেবারে পরিপূর্ণ।

সে রাত্রে বড়ো শ্রান্ত হইয়া বিন্ধ্যবাসিনী শয়ন করিল। পূর্বে যে ঘরে শয়ন করিত এ সে ঘর নহে; এবার বিশেষ আদর করিয়া মা জামাতাকে তাঁহার নিজের ঘর ছাড়িয়া দিয়াছেন। অনাথবন্ধু কখন শয়ন করিতে আসিলেন তাহা বিন্ধ্য জানিতেও পারিল না। সে তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিল।

খুব ভোরের বেলা হইতে শানাই বাজিতে লাগিল। কিন্তু, ক্লান্তদেহ বিন্ধ্যবাসিনীর নিদ্রাভঙ্গ হইল না। কমল এবং ভুবন দুই সখী বিন্ধ্যর শয়নদ্বারে আড়ি পাতিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া অবশেষে পরিহাসপূর্বক বাহির হইতে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল; তখন বিন্ধ্য তাড়াতাড়ি জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, তাহার স্বামী কখন উঠিয়া গিয়াছেন সে জানিতে পারে নাই। লজ্জিত হইয়া শয্যা ছাড়িয়া নামিয়া দেখিল, তাহার মাতার লোহার সিন্দুক খোলা এবং তাহার মধ্যে তাহার বাপের যে ক্যাশবাক্সটি থাকিত, সেটিও নাই।

তখন মনে পড়িল, কাল সন্ধ্যাবেলায় মায়ের চাবির গোচ্ছা হারাইয়া গিয়া বাড়িতে খুব একটা গোলযোগ পড়িয়া গিয়াছিল। সেই চাবি চুরি করিয়া কোনো একটি চোর এই কাজ করিয়াছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। তখন হঠাৎ আশঙ্কা হইল, পাছে সেই চোর তাহার স্বামীকে কোনোরূপ আঘাত করিয়া থাকে। বুকটা ধড়াস্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। বিছানার নীচে খুঁজিতে গিয়া দেখিল, খাটের পায়ের কাছে তাহার মায়ের চাবির গোচ্ছার নীচে একটি চিঠি চাপা রহিয়াছে।

চিঠি তাহার স্বামীর হস্তাক্ষরে লেখা। খুলিয়া পড়িয়া জানিল, তাহার স্বামী তাহার কোনো এক বন্ধুর সাহায্যে বিলাতে যাইবার জাহাজভাড়া সংগ্রহ করিয়াছে, এক্ষণে সেখানকার খরচপত্র চালাইবার অন্য কোনো উপায় ভাবিয়া না পাওয়াতে গতরাত্রে শ্বশুরের অর্থ অপহরণ করিয়া বারান্দাসংলগ্ন কাঠের সিঁড়ি দিয়া অন্দরের বাগানে নামিয়া প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া পলায়ন করিয়াছে। অদ্যই প্রত্যুষে জাহাজ ছাড়িয়া দিয়াছে।

পত্রখানা পাঠ করিয়া বিন্ধ্যবাসিনীর শরীরের সমস্ত রক্ত হিম হইয়া গেল। সেইখানেই খাটের খুরা ধরিয়া সে বসিয়া পড়িল। তাহার দেহের অভ্যন্তরে কর্ণকুহরের মধ্যে নিস্তব্ধ মৃত্যুরজনীর ঝিল্লিধ্বনির মতো একটা শব্দ হইতে লাগিল। তাহারই উপরে প্রাঙ্গণ হইতে প্রতিবেশীদের বাড়ি হইতে এবং দূর অট্টালিকা হইতে, বহুতর শানাই বহুতর সুরে তান ধরিল। সমস্ত বঙ্গদেশ তখন আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

শরতের উৎসবহাস্যরঞ্জিত রৌদ্র সকৌতুকে শয়নগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। এত বেলা হইল তথাপি উৎসবের দিনে দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া ভুবন ও কমল উচ্চহাস্যে উপহাস করিতে করিতে গুম্ গুম্ শব্দে দ্বারে কিল মারিতে লাগিল। তাহাতেও কোনো সাড়া না পাইয়া কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া ঊর্ধ্বকণ্ঠে "বিন্দী" "বিন্দী" করিয়া ডাকিতে লাগিল।

বিন্ধ্যবাসিনী ভগ্নরুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "যাচ্ছি ; তোরা এখন যা।"

তাহারা সখীর পীড়া আশঙ্কা করিয়া মাকে ডাকিয়া আনিল। মা আসিয়া কহিলেন, "বিন্দু, কী হয়েছে মা, এখনো দ্বার বন্ধ কেন!"

বিন্ধ্য উচ্ছ্বসিত অশ্রু সংবরণ করিয়া কহিল, "একবার বাবাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসো।"

মা অত্যন্ত ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ রাজকুমার বাবুকে সঙ্গে করিয়া দ্বারে আসিলেন। বিন্ধ্য দ্বার খুলিয়া তাঁহাদিগকে ঘরে আনিয়া তাড়াতাড়ি বন্ধ করিয়া দিল।

তখন বিন্ধ্য ভূমিতে পড়িয়া তাহার বাপের পা ধরিয়া বক্ষ শতধা বিদীর্ণ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "বাবা! আমাকে মাপ করো, আমি তোমার সিন্দুক হইতে টাকা চুরি করিয়াছি।"

তাঁহারা অবাক হইয়া বিছানায় বসিয়া পড়িলেন। বিন্ধ্য বলিল, তাহার স্বামীকে বিলাতে পাঠাইবার জন্য সে এই কাজ করিয়াছে।

তাহার বাপ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের কাছে চাহিস নাই কেন।"

বিন্ধ্যবাসিনী কহিল, "পাছে বিলাত যাইতে তোমরা বাধা দেও।"

রাজকুমার বাবু অত্যন্ত রাগ করিলেন। মা কাঁদিতে লাগিলেন, মেয়ে কাঁদিতে লাগিল এবং কলিকাতার চতুর্দিক হইতে বিচিত্র সুরে আনন্দের বাদ্য বাজিতে লাগিল।

যে বিন্ধ্য বাপের কাছেও কখনো অর্থ প্রার্থনা করিতে পারে নাই এবং যে স্ত্রী স্বামীর লেশমাত্র অসম্মান পরমাত্মীয়ের নিকট হইতেও গোপন করিবার জন্য প্রাণপণ করিতে পারিত, আজ একেবারে উৎসবের জনতার মধ্যে তাহার পত্নী-অভিমান, তাহার দুহিতৃসম্ভ্রম, তাহার আত্মমর্যাদা, চূর্ণ হইয়া প্রিয় এবং অপ্রিয়, পরিচিত এবং অপরিচিত সকলের পদতলে ধূলির মতো লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। পূর্ব হইতে পরামর্শ করিয়া, ষড়যন্ত্রপূর্বক চাবি চুরি করিয়া, স্ত্রীর সাহায্যে রাতারাতি অর্থ অপহরণপূর্বক অনাথবন্ধু বিলাতে পলায়ন করিয়াছে, এ কথা লইয়া আত্মীয়কুটুম্বপরিপূর্ণ বাড়িতে একটা ঢী ঢী পড়িয়া গেল। দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ভুবন কমল এবং আরো অনেক স্বজন-প্রতিবেশী দাসদাসী সমস্ত শুনিয়াছিল। রুদ্ধদ্বার জামাতৃগৃহে উৎকণ্ঠিত কর্তাগৃহিণীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সকলেই কৌতূহলে এবং আশঙ্কায় ব্যগ্র হইয়া আসিয়াছিল।

বিন্ধ্যবাসিনী কাহাকেও মুখ দেখাইল না। দ্বার রুদ্ধ করিয়া অনাহারে বিছানায় পড়িয়া রহিল। তাহার সেই শোকে কেহ দুঃখ অনুভব করিল না। ষড়যন্ত্রকারিণীর দুষ্টবুদ্ধিতে সকলেই বিস্মিত হইল। সকলেই ভাবিল, বিন্ধ্যর চরিত্র এতদিন অবসরাভাবে অপ্রকাশিত ছিল। নিরানন্দ গৃহে পূজার উৎসব কোনো প্রকারে সম্পন্ন হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অপমান এবং অবসাদে অবনত হইয়া বিন্ধ্য শ্বশুরবাড়ি ফিরিয়া আসিল। সেখানে পুত্রবিচ্ছেদকাতরা বিধবা শাশুড়ির সহিত পতিবিরহবিধুরা বধূর ঘনিষ্ঠতর যোগ স্থাপিত হইল। উভয়ে পরস্পর নিকটবর্তী হইয়া নীরব শোকের ছায়াতলে সুগভীর সহিষ্ণুতার সহিত সংসারের সমস্ত তুচ্ছতম কার্যগুলি পর্যন্ত স্বহস্তে সম্পন্ন করিয়া যাইতে লাগিল। শাশুড়ি যে পরিমাণে কাছে আসিল পিতামাতা সেই পরিমাণে দূরে চলিয়া গেল। বিন্ধ্য মনে মনে অনুভব করিল, "শাশুড়ি দরিদ্র আমিও দরিদ্র, আমরা এক দুঃখবন্ধনে বদ্ধ। পিতামাতা ঐশ্বর্যশালী, তাঁহারা আমাদের অবস্থা হইতে অনেক দূরে।" একে দরিদ্র বলিয়া বিন্ধ্য তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক দূরবর্তী, তাহাতে আবার চুরি স্বীকার করিয়া সে আরো অনেক নীচে পড়িয়া গিয়াছে। স্নেহসম্পর্কের বন্ধন এত অধিক পার্থক্যভার বহন করিতে পারে কিনা কে জানে।

অনাথবন্ধু বিলাত গিয়া প্রথম প্রথম স্ত্রীকে রীতিমতো চিঠিপত্র লিখিতেন। কিন্তু, ক্রমেই চিঠি বিরল হইয়া আসিল এবং পত্রের মধ্যে একটা অবহেলার ভাব অলক্ষিত-ভাবে প্রকাশ হইতে লাগিল। তাঁহার অশিক্ষিতা গৃহকার্যরতা স্ত্রীর অপেক্ষা বিদ্যাবুদ্ধি রূপগুণ সর্ব বিষয়েই শ্রেষ্ঠতর অনেক ইংরাজকন্যা অনাথবন্ধুকে সুযোগ্য সুবুদ্ধি এবং সুরূপ বলিয়া সমাদর করিত; এমন অবস্থায় অনাথবন্ধু আপনার একবস্ত্রপরিহিতা অবগুণ্ঠনবতী অগৌরবর্ণা স্ত্রীকে কোনো অংশেই আপনার সমযোগ্য জ্ঞান করিবেন না, ইহা বিচিত্র নহে।

কিন্তু, তথাপি যখন অর্থের অনটন হইল তখন এই নিরুপায় বাঙালির মেয়েকেই টেলিগ্রাফ করিতে তাঁহার সংকোচ বোধ হইল না। এবং এই বাঙালির মেয়েই দুই হাতে কেবল দুইগাছি কাঁচের চুড়ি রাখিয়া গায়ের সমস্ত গহনা বেচিয়া টাকা পাঠাইতে লাগিল। পাড়াগাঁয়ে নিরাপদে রক্ষা করিবার উপযুক্ত স্থান নাই বলিয়া তাহার সমস্ত বহুমূল্য গহনাগুলি পিতৃগৃহে ছিল। স্বামীর কুটুম্বভবনে নিমন্ত্রণে যাইবার ছল করিয়া নানা উপলক্ষে বিন্ধ্যবাসিনী একে একে সকল গহনাই আনাইয়া লইল। অবশেষে

হাতের বালা, রুপার চুড়ি, বেনারসি শাড়ি এবং শাল পর্যন্ত বিক্রয় শেষ করিয়া বিস্তর বিনীত অনুনয়পূর্বক মাথার দিব্য দিয়া অশ্রুজলে পত্রের প্রত্যেক অক্ষর পংক্তি বিকৃত করিয়া বিন্ধ্য স্বামীকে ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করিল।

স্বামী চুল খাটো করিয়া, দাড়ি কামাইয়া কোট্‌প্যান্ট্‌লুন্ পরিয়া, ব্যারিস্টার হইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং হোটেলে আশ্রয় লইলেন। পিতৃগৃহে বাস করা অসম্ভব— প্রথমত উপযুক্ত স্থান নাই, দ্বিতীয়ত পল্লীবাসী দরিদ্র গৃহস্থ জাতি নষ্ট হইলে একেবারে নিরুপায় হইয়া পড়ে। শ্বশুরগণ আচারনিষ্ঠ পরম হিন্দু, তাঁহারাও জাতিচ্যুতকে আশ্রয় দিতে পারেন না।

অর্থাভাবে অতি শীঘ্রই হোটেল হইতে বাসায় নামিতে হইল। সে বাসায় তিনি স্ত্রীকে আনিতে প্রস্তুত নহেন। বিলাত হইতে আসিয়া স্ত্রী এবং মাতার সহিত কেবল দিন দুই-তিন দিনের বেলায় দেখা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত আর সাক্ষাৎ হয় নাই।

দুইটি শোকার্তা রমণীর কেবল এক সান্ত্বনা ছিল যে, অনাথবন্ধু স্বদেশে আত্মীয়বর্গের নিকটবর্তী স্থানে আছেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে অনাথবন্ধুর অসামান্য ব্যারিস্টারি কীর্তিতে তাহাদের মনে গর্বের সীমা রহিল না। বিন্ধ্যবাসিনী আপনাকে যশস্বী স্বামীর অযোগ্য স্ত্রী বলিয়া ধিক্কার দিতে লাগিল, পুনশ্চ অযোগ্য বলিয়াই স্বামীর অহংকার অধিক করিয়া অনুভব করিল। সে দুঃখে পীড়িত এবং গর্বে বিস্ফারিত হইল। ম্লেচ্ছ আচার সে ঘৃণা করে, তবু স্বামীকে দেখিয়া মনে মনে কহিল, "আজকাল ঢের লোক তো সাহেব হয়, কিন্তু এমন তো কাহাকেও মানায় না— একেবারে ঠিক যেন বিলাতি সাহেব! বাঙালি বলিয়া চিনিবার যো নাই!"

বাসাখরচ যখন অচল হইয়া আসিল; যখন অনাথবন্ধু মনের ক্ষোভে স্থির করিলেন, অভিশপ্ত ভারতবর্ষে গুণের সমাদর নাই এবং তাঁহার স্বব্যবসায়ীগণ ঈর্ষাবশত তাঁহার উন্নতিপথে গোপনে বাধা স্থাপন করিতেছে; যখন তাঁহার খানার ডিশে আমিষ অপেক্ষা উদ্ভিজ্জের পরিমাণ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, দগ্ধকুক্কুটের সম্মানকর স্থান ভর্জিত চিংড়ি একচেটে করিবার উপক্রম করিল, বেশভূষার চিক্কণতা এবং ক্ষৌরমসৃণ মুখের গর্বোজ্জ্বল জ্যোতি ম্লান হইয়া আসিল; যখন সুতীব্র নিখাদে-বাঁধা জীবনতন্ত্রী ক্রমশ সকরুণ কড়ি মধ্যমের দিকে নামিয়া আসিতে লাগিল— এমন সময় রাজকুমার বাবুর পরিবারে এক গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটিয়া অনাথবন্ধুর সংকটসংকুল জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনয়ন করিল। একদা গঙ্গাতীরবর্তী মাতুলালয় হইতে নৌকাযোগে ফিরিবার সময় রাজকুমার বাবুর একমাত্র পুত্র হরকুমার স্টিমারের সংঘাতে স্ত্রী এবং বালক পুত্র সহ জলমগ্ন হইয়া

প্রাণত্যাগ করে। এই ঘটনায় রাজকুমারের বংশে কন্যা বিন্ধ্যবাসিনী ব্যতীত আর কেহ রহিল না।

নিদারুণ শোকের কথঞ্চিৎ উপশম হইলে পরে রাজকুমার বাবু অনাথবন্ধুকে গিয়া অনুনয় করিয়া কহিলেন, "বাবা, তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতে উঠিতে হইবে। তোমরা ব্যতীত আমার আর কেহ নাই।"

অনাথবন্ধু উৎসাহসহকারে সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তিনি মনে করিলেন, যে সকল বার্-লাইব্রেরি-বিহারী স্বদেশীয় ব্যারিস্টারগণ তাঁহাকে ঈর্ষা করে এবং তাঁহার অসামান্য ধীশক্তির প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রকাশ করে না, এই উপায়ে তাহাদের প্রতি প্রতিশোধ লওয়া হইবে।

রাজকুমার বাবু পণ্ডিতদিগের বিধান লইলেন। তাঁহারা বলিলেন, অনাথবন্ধু যদি গোমাংস না খাইয়া থাকে তবে তাহাকে জাতে তুলিবার উপায় আছে।

বিদেশে যদিচ উক্ত নিষিদ্ধ চতুষ্পদ তাঁহার প্রিয় খাদ্যশ্রেণীর মধ্যে ভুক্ত হইত, তথাপি তাহা অস্বীকার করিতে তিনি কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিলেন না। প্রিয় বন্ধুদের নিকট কহিলেন, "সমাজ যখন স্বেচ্ছাপূর্বক মিথ্যা কথা শুনিতে চাহে তখন একটা মুখের কথায় তাহাকে বাধিত করিতে দোষ দেখি না। যে রসনা গোরু খাইয়াছে সে রসনাকে গোময় এবং মিথ্যা কথা নামক দুটো কদর্য পদার্থ দ্বারা বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া আমাদের আধুনিক সমাজের নিয়ম; আমি সে নিয়ম লঙ্ঘন করিতে চাহি না।"

প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে উঠিবার একটা শুভদিন নির্দিষ্ট হইল। ইতিমধ্যে অনাথবন্ধু কেবল যে ধুতিচাদর পরিলেন তাহা নহে, তর্ক এবং উপদেশের দ্বারা বিলাতি সমাজের গালে কালি এবং হিন্দুসমাজের গালে চুন লেপন করিতে লাগিলেন। যে শুনিল সকলেই খুশি হইয়া উঠিল।

আনন্দে গর্বে বিন্ধ্যবাসিনীর প্রীতিসুধাসিক্ত কোমল হৃদয়টি সর্বত্র উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। সে মনে মনে কহিল, "বিলাত হইতে যিনিই আসেন একেবারে আস্ত বিলাতি সাহেব হইয়া আসেন, দেখিয়া বাঙালি বলিয়া চিনিবার যো থাকে না, কিন্তু আমার স্বামী একেবারে অবিকৃতভাবে ফিরিয়াছেন বরঞ্চ তাঁহার হিন্দুধর্মে ভক্তি পূর্বাপেক্ষা আরো অনেক বাড়িয়া উঠিয়াছে।"

যথানির্দিষ্ট দিনে ব্রাহ্মণপণ্ডিতে রাজকুমার বাবুর ঘর ভরিয়া গেল। অর্থব্যয়ের কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। আহার এবং বিদায়ের আয়োজন যথোচিত হইয়াছিল।

অন্তঃপুরেও সমারোহের সীমা ছিল না। নিমন্ত্রিত পরিজনবর্গের পরিবেশন ও পরিচর্যায় সমস্ত প্রকোষ্ঠ ও প্রাঙ্গণ সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। সেই ঘোরতর কোলাহল

এবং কর্মরাশির মধ্যে বিন্ধ্যবাসিনী প্রফুল্লমুখে শারদরৌদ্ররঞ্জিত প্রভাতবায়ুবাহিত লঘু মেঘখণ্ডের মতো আনন্দে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। আজিকার দিনের সমস্ত বিশ্বব্যাপারের প্রধান নায়ক তাহার স্বামী। আজ যেন সমস্ত বঙ্গভূমি একটি মাত্র রঙ্গভূমি হইয়াছে এবং যবনিকা উদ্‌ঘাটনপূর্বক একমাত্র অনাথবন্ধুকে বিস্মিত বিশ্বদর্শকের নিকট প্রদর্শন করাইতেছে। প্রায়শ্চিত্ত যে অপরাধস্বীকার তাহা নহে, এ যেন অনুগ্রহপ্রকাশ। অনাথ বিলাত হইতে ফিরিয়া হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিয়া হিন্দুসমাজকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন। এবং সেই গৌরবচ্ছটা সমস্ত দেশ হইতে সহস্র রশ্মিতে বিচ্ছুরিত হইয়া বিন্ধ্যবাসিনীর প্রেমপ্রমুদিত মুখের উপরে অপরূপ মহিমাজ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে। এতদিনকার তুচ্ছ জীবনের সমস্ত দুঃখ এবং ক্ষুদ্র অপমান দূর হইয়া সে আজ তাহার পরিপূর্ণ পিতৃগৃহে সমস্ত আত্মীয়স্বজনের সমক্ষে উন্নতমস্তকে গৌরবের আসনে আরোহণ করিল। স্বামীর মহত্ত্ব আজ অযোগ্য স্ত্রীকে বিশ্বসংসারের নিকট সম্মানাস্পদ করিয়া তুলিল।

অনুষ্ঠান সমাধা হইয়াছে। অনাথবন্ধু জাতে উঠিয়াছেন। অভ্যাগত আত্মীয় ও ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সহিত একাসনে বসিয়া তৃপ্তিপূর্বক আহার শেষ করিয়াছেন।

আত্মীয়েরা জামাতাকে দেখিবার জন্য অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। জামাতা সুস্থচিত্তে তাম্বূল চর্বণ করিতে করিতে প্রসন্নহাস্যমুখে আলস্যমন্থরগমনে ভূমিলুণ্ঠ্যমান চাদরে অন্তঃপুরে যাত্রা করিলেন।

আহারান্তে ব্রাহ্মণগণের দক্ষিণার আয়োজন হইতেছে এবং ইত্যবসরে তাঁহারা সভাস্থলে বসিয়া তুমুল কলহসহকারে পাণ্ডিত্য বিস্তার করিতেছেন। কর্তা রাজকুমার বাবু ক্ষণকাল বিশ্রাম উপলক্ষে সেই কোলাহলাকুল পণ্ডিতসভায় বসিয়া স্মৃতির তর্ক শুনিতেছেন, এমন সময় দ্বারবান গৃহস্বামীর হস্তে এক কার্ড দিয়া খবর দিল, "এক সাহেবলোগ্‌কা মেম আয়া।"

রাজকুমার বাবু চমৎকৃত হইয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই কার্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, তাহাতে ইংরাজিতে লেখা রহিয়াছে—মিসেস্ অনাথবন্ধু সরকার। অর্থাৎ, অনাথবন্ধু সরকারের স্ত্রী।

রাজকুমার বাবু অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া কিছুতেই এই সামান্য একটি শব্দের অর্থগ্রহ করিতে পারিলেন না। এমন সময়ে বিলাত হইতে সদ্যঃপ্রত্যাগতা আরক্তকপোলা আতাম্রকুন্তলা আনীললোচনা দুগ্ধফেনশুভ্রা হরিণলঘুগামিনী ইংরাজমহিলা স্বয়ং সভাস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়া প্রত্যেকের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরিচিত প্রিয়মুখ দেখিতে পাইলেন না। অকস্মাৎ মেমকে দেখিয়া সংহিতার সমস্ত তর্ক থামিয়া সভাস্থল শ্মশানের ন্যায় গভীর নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

এমন সময়ে ভূমিলুণ্ঠ্যমান চাদর লইয়া অলসমন্থরগামী অনাথবন্ধু রঙ্গভূমিতে আসিয়া পুনঃপ্রবেশ করিলেন। এবং মুহূর্তের মধ্যেই ইংরাজমহিলা ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া তাঁহার তাম্বূলরাগরক্ত ওষ্ঠাধরে দাম্পত্যের মিলনচুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিলেন।

সেদিন সভাস্থলে সংহিতার তর্ক আর উত্থাপিত হইতে পারিল না।

অগ্রহায়ণ ১৩০১

বিচারক

প্রথম পরিচ্ছেদ

অনেক অবস্থান্তরের পর অবশেষে গতযৌবনা ক্ষীরোদা যে পুরুষের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিল সেও যখন তাহাকে জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া গেল, তখন অন্নমুষ্টির জন্য দ্বিতীয় আশ্রয় অন্বেষণের চেষ্টা করিতে তাহার অত্যন্ত ধিক্‌কার বোধ হইল।

যৌবনের শেষে শুভ্র শরৎকালের ন্যায় একটি গভীর প্রশান্ত প্রগাঢ় সুন্দর বয়স আসে যখন জীবনের ফল ফলিবার এবং শস্য পাকিবার সময়। তখন আর উদ্দাম যৌবনের বসন্তচঞ্চলতা শোভা পায় না। ততদিনে সংসারের মাঝখানে আমাদের ঘর বাঁধা এক-প্রকার সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে; অনেক ভালোমন্দ, অনেক সুখদুঃখ, জীবনের মধ্যে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া অন্তরের মানুষটিকে পরিণত করিয়া তুলিয়াছে; আমাদের আয়ত্তের অতীত কুহকিনী দুরাশার কল্পনালোক হইতে সমস্ত উদ্‌ভ্রান্ত বাসনাকে প্রত্যাহরণ করিয়া আপন ক্ষুদ্র ক্ষমতার গৃহপ্রাচীরমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি; তখন নূতন প্রণয়ের মুগ্ধদৃষ্টি আর আকর্ষণ করা যায় না, কিন্তু পুরাতন লোকের কাছে মানুষ আরো প্রিয়তর হইয়া উঠে। তখন যৌবনলাবণ্য অল্পে অল্পে বিশীর্ণ হইয়া আসিতে থাকে, কিন্তু জরাবিহীন অন্তর-প্রকৃতি বহুকালের সহবাসক্রমে মুখে চক্ষে যেন স্ফুটতর রূপে অঙ্কিত হইয়া যায়, হাসিটি দৃষ্টিপাতটি কণ্ঠস্বরটি ভিতরকার মানুষটির দ্বারা ওতপ্রোত হইয়া উঠে। যাহা কিছু পাই নাই তাহার আশা ছাড়িয়া, যাহারা ত্যাগ করিয়া গিয়াছে তাহাদের জন্য শোক সমাপ্ত করিয়া, যাহারা বঞ্চনা করিয়াছে তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া— যাহারা কাছে আসিয়াছে, ভালোবাসিয়াছে, সংসারের সমস্ত ঝড়ঝঞ্ঝা শোকতাপ বিচ্ছেদের মধ্যে যে কয়টি প্রাণী নিকটে অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহাদিগকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া সুনিশ্চিত সুপরীক্ষিত

চিরপরিচিতগণের প্রীতিপরিবেষ্টনের মধ্যে নিরাপদ নীড় রচনা করিয়া তাহারই মধ্যে সমস্ত চেষ্টার অবসান এবং সমস্ত আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি লাভ করা যায়। যৌবনের সেই স্নিগ্ধ সায়াহ্নে জীবনের সেই শান্তিপর্বেও যাহাকে নূতন সঞ্চয়, নূতন পরিচয়, নূতন বন্ধনের বৃথা আশ্বাসে নূতন চেষ্টায় ধাবিত হইতে হয়— তখনো যাহার বিশ্রামের জন্য শয্যা রচিত হয় নাই, যাহার গৃহপ্রত্যাবর্তনের জন্য সন্ধ্যাদীপ প্রজ্জ্বলিত হয় নাই, সংসারে তাহার মতো শোচনীয় আর কেহ নাই।

ক্ষীরোদা তাহার যৌবনের প্রান্তসীমায় যেদিন প্রাতঃকালে জাগিয়া উঠিয়া দেখিল তাহার প্রণয়ী পূর্বরাত্রে তাহার সমস্ত অলংকার ও অর্থ অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে, বাড়িভাড়া দিবে এমন সঞ্চয় নাই— তিন বৎসরের শিশু পুত্রটিকে দুধ আনিয়া খাওয়াইবে এমন সংগতি নাই— যখন সে ভাবিয়া দেখিল, তাহার জীবনের আটত্রিশ বৎসরে সে একটি লোককেও আপনার করিতে পারে নাই, একটি ঘরের প্রান্তেও বাঁচিবার ও মরিবার অধিকার প্রাপ্ত হয় নাই; যখন তাহার মনে পড়িল, আবার আজ অশ্রুজল মুছিয়া দুই চক্ষে অঞ্জন পরিতে হইবে, অধরে ও কপোলে অলক্তরাগ চিত্রিত করিতে হইবে, জীর্ণ যৌবনকে বিচিত্র ছলনায় আচ্ছন্ন করিয়া হাস্যমুখে অসীম ধৈর্য সহকারে নূতন হৃদয় হরণের জন্য নূতন মায়াপাশ বিস্তার করিতে হইবে; তখন সে ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভূমিতে লুটাইয়া বারংবার কঠিন মেঝের উপর মাথা খুঁড়িতে লাগিল— সমস্ত দিন অনাহারে মুমূর্ষুর মতো পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিল। দীপহীন গৃহকোণে অন্ধকার ঘনীভূত হইতে লাগিল। দৈবক্রমে একজন পুরাতন প্রণয়ী আসিয়া 'ক্ষীরো ক্ষীরো' শব্দে দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। ক্ষীরোদা অকস্মাৎ দ্বার খুলিয়া ঝাঁটাহস্তে বাঘিনীর মতো গর্জন করিয়া ছুটিয়া আসিল; রসপিপাসু যুবকটি অনতিবিলম্বে পলায়নের পথ অবলম্বন করিল।

ছেলেটা ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া খাটের নীচে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সেই গোলমালে জাগিয়া উঠিয়া অন্ধকারের মধ্য হইতে ভগ্নকাতর কণ্ঠে 'মা মা' করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তখন ক্ষীরোদা সেই রোরুদ্যমান শিশুকে প্রাণপণে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বিদ্যুদ্‌বেগে ছুটিয়া নিকটবর্তী কূপের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

শব্দ শুনিয়া আলো হস্তে প্রতিবেশীগণ কূপের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্ষীরোদা এবং শিশুকে তুলিতে বিলম্ব হইল না। ক্ষীরোদা তখন অচেতন এবং শিশুটি মরিয়া গেছে।

হাঁসপাতালে গিয়া ক্ষীরোদা আরোগ্য লাভ করিল। হত্যাপরাধে ম্যাজিস্ট্রেট তাহাকে সেসনে চালান করিয়া দিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জজ মোহিতমোহন দত্ত স্ট্যাটুটরি সিভিলিয়ান। তাঁহার কঠিন বিচারে ক্ষীরোদার ফাঁসির হুকুম হইল। হতভাগিনীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া উকিলগণ তাহাকে বাঁচাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইলেন না। জজ তাহাকে তিলমাত্র দয়ার পাত্রী বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না।

না পারিবার কারণ আছে; একদিকে তিনি হিন্দুমহিলাগণকে দেবী আখ্যা দিয়া থাকেন, অপরদিকে স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার আন্তরিক অবিশ্বাস। তাঁহার মত এই যে, রমণীগণ কুলবন্ধন ছেদন করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে, শাসন তিলমাত্র শিথিল হইলেই সমাজপিঞ্জরে একটি কুলনারীও অবশিষ্ট থাকিবে না।

তাঁহার এরূপ বিশ্বাসেরও কারণ আছে। সে কারণ জানিতে গেলে মোহিতের যৌবন-ইতিহাসের কিয়দংশ আলোচনা করিতে হয়।

মোহিত যখন কালেজে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়িতেন তখন আকারে এবং আচারে এখনকার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকারের মানুষ ছিলেন। এখন মোহিতের সম্মুখে টাক, পশ্চাতে টিকি, মুণ্ডিত মুখে প্রতিদিন প্রাতঃকালে খরক্ষুরধারে গুম্ফশ্মশ্রুর অঙ্কুর উচ্ছেদ হইয়া থাকে; কিন্তু তখন তিনি সোনার চশমায় গোঁফদাড়িতে এবং সাহেবি ধরনের কেশবিন্যাসে উনবিংশ শতাব্দীর নূতনসংস্করণ কার্তিকটির মতো ছিলেন। বেশভূষায় বিশেষ মনোযোগ ছিল, মদ্যমাংসে অরুচি ছিল না এবং আনুষঙ্গিক আরো দুটো-একটা উপসর্গ ছিল।

অদূরে একঘর গৃহস্থ বাস করিত। তাহাদের হেমশশী বলিয়া এক বিধবা কন্যা ছিল। তাহার বয়স অধিক হইবে না। চৌদ্দ হইতে পনেরোয় পড়িবে।

সমুদ্র হইতে বনরাজিনীলা তটভূমি যেমন রমণীয় স্বপ্নবৎ চিত্রবৎ মনে হয় এমন তীরের উপর উঠিয়া হয় না। বৈধব্যের বেষ্টন-অন্তরালে হেমশশী সংসার হইতে যেটুকু দূরে পড়িয়াছিল সেই দূরত্বের বিচ্ছেদবশত সংসারটা অহার কাছে পরপারবর্তী পরমরহস্যময় প্রমোদবনের মতো ঠেকিত। সে জানিত না এই জগৎ-যন্ত্রটার কল-কারখানা অত্যন্ত জটিল এবং লৌহকঠিন— সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, সংশয়ে সংকটে ও নৈরাশ্যে পরিতাপে বিমিশ্রিত। তাহার মনে হইত, সংসারযাত্রা কলনাদিনী নির্ঝরিণীর স্বচ্ছ জলপ্রবাহের মতো সহজ, সম্মুখবর্তী সুন্দর পৃথিবীর সকল পথগুলিই প্রশস্ত ও সরল, সুখ কেবল তাহার বাতায়নের বাহিরে এবং তৃপ্তিহীন আকাঙ্ক্ষা কেবল তাহার বক্ষপঞ্জরবর্তী স্পন্দিত পরিতপ্ত কোমল হৃদয়টুকুর অভ্যন্তরে। বিশেষত, তখন তাহার

অন্তরাকাশের দূর দিগন্ত হইতে একটা যৌবনসমীরণ উচ্ছ্বসিত হইয়া বিশ্বসংসারকে বিচিত্র বাসন্তী শ্রীতে বিভূষিত করিয়া দিয়াছিল; সমস্ত নীলাম্বর তাহারই হৃদয়হিল্লোলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং পৃথিবী যেন তাহারই সুগন্ধ মর্মকোষের চতুর্দিকে রক্তপদ্মের কোমল পাপড়িগুলির মতো স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়া ছিল।

ঘরে তাহার বাপ মা এবং দুটি ছোটো ভাই ছাড়া আর কেহ ছিল না। ভাই দুটি সকাল সকাল খাইয়া ইস্কুলে যাইত, আবার ইস্কুল হইতে আসিয়া আহারান্তে সন্ধ্যার পর পাড়ার নাইট-ইস্কুলে পাঠ অভ্যাস করিতে গমন করিত। বাপ সামান্য বেতন পাইতেন, ঘরে মাস্টার রাখিবার সামর্থ্য ছিল না।

কাজের অবসরে হেম তাহার নির্জন ঘরের বাতায়নে আসিয়া বসিত। একদৃষ্টে রাজপথের লোকচলাচল দেখিত; ফেরিওয়ালা করুণ উচ্চস্বরে হাঁকিয়া যাইত, তাহাই শুনিত; এবং মনে করিত পথিকেরা সুখী, ভিক্ষুকেরাও স্বাধীন, এবং ফেরিওয়ালা যে জীবিকার জন্য সুকঠিন প্রয়াসে প্রবৃত্ত তাহা নহে— উহারা যেন এই লোকচলাচলের সুখরঙ্গভূমিতে অন্যতম অভিনেতা মাত্র।

আর, সকালে বিকালে সন্ধ্যাবেলায় পরিপাটি-বেশধারী গর্বোদ্ধত স্ফীতবক্ষ মোহিতমোহনকে দেখিতে পাইত। দেখিয়া তাহাকে সর্বসৌভাগ্যসম্পন্ন পুরুষশ্রেষ্ঠ মহেন্দ্রের মতো মনে হইত। মনে হইত, ঐ উন্নতমস্তক সুবেশ সুন্দর যুবকটির সব আছে এবং উহাকে সব দেওয়া যাইতে পারে। বালিকা যেমন পুতুলকে সজীব মানুষ করিয়া খেলা করে, বিধবা তেমনি মোহিতকে মনে মনে সকল প্রকার মহিমায় মণ্ডিত করিয়া তাহাকে দেবতা গড়িয়া খেলা করিত।

এক-একদিন সন্ধ্যার সময় দেখিতে পাইত, মোহিতের ঘর আলোকে উজ্জ্বল, নর্তকীর নূপুরনিক্কণ এবং বামাকণ্ঠের সংগীতধ্বনিতে মুখরিত। সেদিন সে ভিত্তিস্থিত চঞ্চল ছায়াগুলির দিকে চাহিয়া চাহিয়া বিনিদ্র সতৃষ্ণ নেত্রে দীর্ঘ রাত্রি জাগিয়া বসিয়া কাটাইত। তাহার ব্যথিত পীড়িত হৃৎপিণ্ড পিঞ্জরের পক্ষীর মতো বক্ষপঞ্জরের উপর দুর্দান্ত আবেগে আঘাত করিতে থাকিত।

সে কি তাহার কৃত্রিম দেবতাটিকে বিলাসমত্ততার জন্য মনে মনে ভর্ৎসনা করিত, নিন্দা করিত? তাহা নহে। অগ্নি যেমন পতঙ্গকে নক্ষত্রলোকের প্রলোভন দেখাইয়া আকর্ষণ করে, মোহিতের সেই আলোকিত গীতবাদ্যবিক্ষুব্ধ প্রমোদমদিরোচ্ছ্বসিত কক্ষটি হেমশশীকে সেইরূপ স্বর্গমরীচিকা দেখাইয়া আকর্ষণ করিত। সে গভীর রাত্রে একাকিনী জাগিয়া বসিয়া সেই অদূর বাতায়নের আলোক ও ছায়া ও সংগীত এবং আপন মনের আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনা লইয়া একটি মায়ারাজ্য গড়িয়া তুলিত, এবং আপন মানস-

পুত্তলিকাকে সেই মায়াপুরীর মাঝখানে বসাইয়া বিস্মিত বিমুগ্ধনেত্রে নিরীক্ষণ করিত, এবং আপন জীবন-যৌবন সুখ-দুঃখ ইহকাল-পরকাল সমস্তই বাসনার অঙ্গারে ধূপের মতো পুড়াইয়া সেই নির্জন নিস্তব্ধ মন্দিরে তাহার পূজা করিত। সে জানিত না তাহার সম্মুখবর্তী ঐ হর্ম্যবাতায়নের অভ্যন্তরে ঐ তরঙ্গিত প্রমোদপ্রবাহের মধ্যে এক নিরতিশয় ক্লান্তি গ্লানি পঙ্কিলতা বীভৎস ক্ষুধা এবং প্রাণক্ষয়কর দাহ আছে। ঐ বীতনিদ্র নিশাচর আলোকের মধ্যে যে এক হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার কুটিলহাস্য প্রলয়ক্রীড়া করিতে থাকে, বিধবা দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইত না।

হেম আপন নির্জন বাতায়নে বসিয়া তাহার এই মায়াস্বর্গ এবং কল্পিত দেবতাটিকে লইয়া চিরজীবন স্বপ্নাবেশে কাটাইয়া দিতে পারিত, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দেবতা অনুগ্রহ করিলেন এবং স্বর্গ নিকটবর্তী হইতে লাগিল। স্বর্গ যখন একেবারে পৃথিবীকে আসিয়া স্পর্শ করিল তখন স্বর্গও ভাঙিয়া গেল এবং যে ব্যক্তি এতদিন একলা বসিয়া স্বর্গ গড়িয়াছিল সেও ভাঙিয়া ধূলিসাৎ হইল।

এই বাতায়নবাসিনী মুগ্ধ বালিকাটির প্রতি কখন মোহিতের লালায়িত দৃষ্টি পড়িল, কখন তাহাকে 'বিনোদচন্দ্র' নামক মিথ্যা স্বাক্ষরে বারংবার পত্র লিখিয়া অবশেষে একখানি সশঙ্ক উৎকণ্ঠিত অশুদ্ধ বানান ও উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগপূর্ণ উত্তর পাইল, এবং তাহার পর কিছুদিন ঘাতপ্রতিঘাতে উল্লাসে-সংকোচে সন্দেহে সম্ভ্রমে আশায়-আশঙ্কায় কেমন করিয়া ঝড় বহিতে লাগিল, তাহার পরে প্রলয়সুখোন্মত্ততায় সমস্ত জগৎ সংসার বিধবার চারি দিকে কেমন করিয়া ঘুরিতে লাগিল, এবং ঘুরিতে ঘুরিতে ঘূর্ণনবেগে সমস্ত জগৎ অমূলক ছায়ার মতো কেমন করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল, এবং অবশেষে কখন একদিন অকস্মাৎ সেই ঘূর্ণ্যমান সংসারচক্র হইতে বেগে বিচ্ছিন্ন হইয়া রমণী অতি দূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল, সে সকল বিবরণ বিস্তারিত করিয়া বলিবার আবশ্যক দেখি না।

একদিন গভীর রাত্রে পিতা মাতা ভ্রাতা এবং গৃহ ছাড়িয়া হেমশশী বিনোদচন্দ্র-ছদ্মনামধারী মোহিতের সহিত এক গাড়িতে উঠিয়া বসিল। দেবপ্রতিমা যখন তাহার সমস্ত মাটি এবং খড় এবং রাংতার গহনা লইয়া তাহার পার্শ্বে আসিয়া সংলগ্ন হইল তখন সে লজ্জায় ধিক্কারে মাটিতে মিশিয়া গেল।

অবশেষে গাড়ি যখন ছাড়িয়া দিল তখন সে কাঁদিয়া মোহিতের পায়ে ধরিল, বলিল, "ওগো, পায়ে পড়ি আমাকে আমার বাড়ি রেখে এসো।" মোহিত শশব্যস্ত হইয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল; গাড়ি দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল।

জলনিমগ্ন মরণাপন্ন ব্যক্তির যেমন মুহূর্তের মধ্যে জীবনের সমস্ত ঘটনাবলী স্পষ্ট মনে পড়ে, তেমনি সেই দ্বাররুদ্ধ গাড়ির গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে হেমশশীর মনে পড়িতে লাগিল,

প্রতিদিন আহারের সময় তাহার বাপ তাহাকে সম্মুখে না লইয়া খাইতে বসিতেন না; মনে পড়িল, তাহার সর্বকনিষ্ঠ ভাইটি ইস্কুল হইতে আসিয়া তাহার দিদির হাতে খাইতে ভালোবাসে; মনে পড়িল, সকালে সে তাহার মায়ের সহিত পান সাজিতে বসিত এবং বিকালে মা তাহার চুল বাঁধিয়া দিতেন। ঘরের প্রত্যেক ক্ষুদ্র কোণ এবং দিনের প্রত্যেক ক্ষুদ্র কাজটি তাহার মনের সম্মুখে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিতে লাগিল। তখন তাহার নিভৃত জীবন এবং ক্ষুদ্র সংসারটিকেই স্বর্গ বলিয়া মনে হইল। সেই পানসাজা, চুলবাঁধা, পিতার আহারস্থলে পাখা-করা, ছুটির দিনে মধ্যাহ্ননিদ্রার সময় তাঁহার পাকাচুল তুলিয়া দেওয়া, ভাইদের দৌরাত্ম্য সহ্য করা— এ সমস্তই তাহার কাছে পরম শান্তিপূর্ণ দুর্লভ সুখের মতো বোধ হইতে লাগিল; বুঝিতে পারিল না, এসব থাকিতে সংসারে আর কোন্ সুখের আবশ্যক আছে।

মনে হইতে লাগিল, পৃথিবীতে ঘরে ঘরে সমস্ত কুলকন্যারা এখন গভীর সুষুপ্তিতে নিমগ্ন। সেই আপনার ঘরে আপনার শয্যাটির মধ্যে নিস্তব্ধ রাত্রের নিশ্চিন্ত নিদ্রা যে কত সুখের, তাহা ইতিপূর্বে কেন সে বুঝিতে পারে নাই। ঘরের মেয়েরা কাল সকাল-বেলায় ঘরের মধ্যে জাগিয়া উঠিবে, নিঃসংকোচ নিত্যকর্মের মধ্যে প্রবৃত্ত হইবে, আর গৃহচ্যুতা হেমশশীর এই নিদ্রাহীন রাত্রি কোনখানে গিয়া প্রভাত হইবে এবং সেই নিরানন্দ প্রভাতে তাহাদের সেই গলির ধারের ছোটোখাটো ঘরকন্নাটির উপর যখন সকালবেলাকার চিরপরিচিত শান্তিময় হাস্যপূর্ণ রৌদ্রটি আসিয়া পতিত হইবে তখন সেখানে সহসা কী লজ্জা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে— কী লাঞ্ছনা, কী হাহাকার জাগ্রত হইয়া উঠিবে!

হেম হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া কাঁদিয়া মরিতে লাগিল; সকরুণ অনুনয়সহকারে বলিতে লাগিল, "এখনো রাত আছে। আমার মা, আমার দুটি ভাই, এখনো জাগে নাই; এখনো আমাকে ফিরাইয়া রাখিয়া আইস।" কিন্তু, তাহার দেবতা কর্ণপাত করিল না; এক দ্বিতীয় শ্রেণীর চক্রশব্দমুখরিত রথে চড়াইয়া তাহাকে তাহার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গলোকাভিমুখে লইয়া চলিল।

ইহার অনতিকাল পরেই দেবতা এবং স্বর্গ পুনশ্চ আর-একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর জীর্ণরথে চড়িয়া আর-এক পথে প্রস্থান করিলেন— রমণী আকণ্ঠ পঙ্কের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া রহিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মোহিতমোহনের পূর্ব ইতিহাস হইতে এই একটিমাত্র ঘটনা উল্লেখ করিলাম। রচনা পাছে 'একঘেয়ে' হইয়া উঠে এইজন্য অন্যগুলি বলিলাম না।

এখন সে-সকল পুরাতন কথা উত্থাপন করিবার আবশ্যকও নাই। এখন সেই বিনোদচন্দ্র নাম স্মরণ করিয়া রাখে, এমন কোনো লোক জগতে আছে কিনা সন্দেহ। এখন মোহিত শুদ্ধাচারী হইয়াছেন, তিনি আহ্নিকতর্পণ করেন এবং সর্বদাই শাস্ত্রালোচনা করিয়া থাকেন। নিজের ছোটো ছোটো ছেলেদিগকেও যোগাভ্যাস করাইতেছেন এবং বাড়ির মেয়েদিগকে সূর্য চন্দ্র মরুদ্গণের দুষ্প্রবেশ্য অন্তঃপুরে প্রবল শাসনে রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু, এককালে তিনি একাধিক রমণীর প্রতি অপরাধ করিয়াছিলেন বলিয়া আজ রমণীর সর্বপ্রকার সামাজিক অপরাধের কঠিনতম দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন।

ক্ষীরোদার ফাঁসির হুকুম দেওয়ার দুই-এক দিন পরে ভোজনবিলাসী মোহিত জেলখানার বাগান হইতে মনোমতো তরিতরকারি সংগ্রহ করিতে গিয়াছেন। ক্ষীরোদা তাহার পতিত জীবনের সমস্ত অপরাধ স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছে কি না জানিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল হইল। বন্দিনীশালায় প্রবেশ করিলেন।

দূর হইতে খুব একটা কলহের ধ্বনি শুনিতে পাইতেছিলেন। ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন ক্ষীরোদা প্রহরীর সহিত ভারি ঝগড়া বাধাইয়াছে। মোহিত মনে মনে হাসিলেন; ভাবিলেন, স্ত্রীলোকের স্বভাবই এমনি বটে! মৃত্যু সন্নিকট তবু ঝগড়া করিতে ছাড়িবে না। ইহারা বোধ করি যমালয়ে গিয়া যমদূতের সহিত কোন্দল করে।

মোহিত ভাবিলেন, যথোচিত ভর্ৎসনা ও উপদেশের দ্বারা এখনো ইহার অন্তরে অনুতাপের উদ্রেক করা উচিত। সেই সাধু উদ্দেশ্যে তিনি ক্ষীরোদার নিকটবর্তী হইবামাত্র ক্ষীরোদা সকরুণস্বরে করজোড়ে কহিল, "ওগো জজ্‌বাবু, দোহাই তোমার! উহাকে বলো, আমার আংটি ফিরাইয়া দেয়।"

প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, ক্ষীরোদার মাথার চুলের মধ্যে একটি আংটি লুকানো ছিল— দৈবাৎ প্রহরীর চোখে পড়াতে সে সেটি কাড়িয়া লইয়াছে।

মোহিত আবার মনে মনে হাসিলেন। আজ বাদে কাল ফাঁসিকাষ্ঠে আরোহণ করিবে, তবু আংটির মায়া ছাড়িতে পারে না; গহনাই মেয়েদের সর্বস্ব!

প্রহরীকে কহিলেন, "কই, আংটি দেখি।" প্রহরী তাঁহার হাতে আংটি দিল।

তিনি হঠাৎ যেন জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে লইলেন, এমনি চমকিয়া উঠিলেন। আংটির

একদিকে হাতির দাঁতের উপর তেলের রঙে আঁকা একটি গুম্ফশ্মশ্রুশোভিত যুবকের অতি ক্ষুদ্র ছবি বসানো আছে এবং অপরদিকে সোনার গায়ে খোদা রহিয়াছে— বিনোদচন্দ্র।

তখন মোহিত আংটি হইতে মুখ তুলিয়া একবার ক্ষীরোদার মুখের দিকে ভালো করিয়া চাহিলেন। চব্বিশ বৎসর পূর্বেকার আর-একটি অশ্রুসজল প্রীতিসুকোমল সলজ্জশঙ্কিত মুখ মনে পড়িল ; সে মুখের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে।

মোহিত আর-একবার সোনার আংটির দিকে চাহিলেন এবং তাহার পরে যখন ধীরে ধীরে মুখ তুলিলেন তখন তাঁহার সম্মুখে কলঙ্কিনী পতিতা রমণী একটি ক্ষুদ্র স্বর্ণাঙ্গুরীয়কের উজ্জ্বল প্রভায় স্বর্ণময়ী দেবীপ্রতিমার মতো উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

পৌষ ১৩০১

নিশীথে

"ডাক্তার! ডাক্তার!"

জ্বালাতন করিল! এই অর্ধেক রাত্রে—

চোখ মেলিয়া দেখি আমাদের জমিদার দক্ষিণাচরণ বাবু। ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পিঠভাঙা চৌকিটা টানিয়া আনিয়া তাঁহাকে বসিতে দিলাম এবং উদ্‌বিগ্নভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। ঘড়িতে দেখি, তখন রাত্রি আড়াইটা।

দক্ষিণাচরণ বাবু বিবর্ণমুখে বিস্ফারিত নেত্রে কহিলেন, "আজ রাত্রে আবার সেইরূপ উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে— তোমার ঔষধ কোনো কাজে লাগিল না।"

আমি কিঞ্চিৎ সসংকোচে বলিলাম, "আপনি বোধ করি মদের মাত্রা আবার বাড়াইয়াছেন।"

দক্ষিণাচরণ বাবু অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "ওটা তোমার ভারি ভ্রম। মদ নহে; আদ্যোপান্ত বিবরণ না শুনিলে তুমি আসল কারণটা অনুমান করিতে পারিবে না।"

কুলুঙ্গির মধ্যে ক্ষুদ্র টিনের ডিবায় ম্লানভাবে কেরোসিন জ্বলিতেছিল, আমি তাহা উস্কাইয়া দিলাম; একটুখানি আলো জাগিয়া উঠিল এবং অনেকখানি ধোঁয়া বাহির হইতে লাগিল। কোঁচাখানা গায়ের উপর টানিয়া একখানা খবরের-কাগজ-পাতা প্যাক্‌বাক্সের উপর বসিলাম। দক্ষিণাচরণ বাবু বলিতে লাগিলেন—

আমার প্রথমপক্ষের স্ত্রীর মতো এমন গৃহিণী অতি দুর্লভ ছিল। কিন্তু আমার তখন বয়স বেশি ছিল না, সহজেই রসাধিক্য ছিল, তাহার উপর আবার কাব্যশাস্ত্রটা ভালো করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলাম, তাই অবিমিশ্র গৃহিণীপণায় মন উঠিত না। কালিদাসের সেই শ্লোকটা প্রায় মনে উদয় হইত—

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।

কিন্তু আমার গৃহিণীর কাছে ললিত কলাবিধির কোনো উপদেশ খাটিত না এবং সখী-ভাবে প্রণয়সম্ভাষণ করিতে গেলে তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। গঙ্গার স্রোতে যেমন ইন্দ্রের ঐরাবত নাকাল হইয়াছিল তেমনি তাঁহার হাসির মুখে বড়ো বড়ো কাব্যের টুকরা এবং ভালো ভালো আদরের সম্ভাষণ মুহূর্তের মধ্যে অপদস্থ হইয়া ভাসিয়া যাইত। তাঁহার হাসিবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল।

তাহার পর, আজ বছর চারেক হইল আমাকে সাংঘাতিক রোগে ধরিল। ওষ্ঠব্রণ হইয়া জ্বরবিকার হইয়া, মরিবার দাখিল হইলাম। বাঁচিবার আশা ছিল না। একদিন এমন হইল যে, ডাক্তারে জবাব দিয়া গেল। এমন সময় আমার এক আত্মীয় কোথা হইতে এক ব্রহ্মচারী আনিয়া উপস্থিত করিল; সে গব্য ঘৃতের সহিত একটা শিকড় বাঁটিয়া আমাকে খাওয়াইয়া দিল। ঔষধের গুণেই হউক বা অদৃষ্টক্রমেই হউক সে-যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম।

রোগের সময় আমার স্ত্রী অহর্নিশি এক মুহূর্তের জন্য বিশ্রাম করেন নাই। সেই কটা দিন একটি অবলা স্ত্রীলোক, মানুষের সামান্য শক্তি লইয়া প্রাণপণ ব্যাকুলতার সহিত, দ্বারে সমাগত যমদূতগুলার সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত প্রেম, সমস্ত হৃদয়, সমস্ত যত্ন দিয়া আমার এই অযোগ্য প্রাণটাকে যেন বক্ষের শিশুর মতো দুই হস্তে ঝাঁপিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন। আহার ছিল না, নিদ্রা ছিল না, জগতের আর-কোনো-কিছুর প্রতিই দৃষ্টি ছিল না।

যম তখন পরাহত ব্যাঘ্রের ন্যায় আমাকে তাঁহার কবল হইতে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু, যাইবার সময় আমার স্ত্রীকে একটা প্রবল থাবা মারিয়া গেলেন।

আমার স্ত্রী তখন গর্ভবতী ছিলেন, অনতিকাল পরে এক মৃত সন্তান প্রসব করিলেন। তাহার পর হইতেই তাঁহার নানাপ্রকার জটিল ব্যামোর সূত্রপাত হইল। তখন আমি তাঁহার সেবা আরম্ভ করিয়া দিলাম। তাহাতে তিনি বিব্রত হইয়া উঠিলেন। বলিতে লাগিলেন, "আঃ, করো কী! লোকে বলিবে কী! অমন করিয়া দিনরাত্রি তুমি আমার ঘরে যাতায়াত করিয়ো না।"

যেন নিজে পাখা খাইতেছি, এইরূপ ভান করিয়া রাত্রে যদি তাঁহাকে তাঁহার জ্বরের সময় পাখা করিতে যাইতাম তো ভারি একটা কাড়াকাড়ি ব্যাপার পড়িয়া যাইত। কোনোদিন যদি তাঁহার শুশ্রূষা উপলক্ষে আমার আহারের নিয়মিত সময় দশ মিনিট উত্তীর্ণ হইয়া যাইত, তবে সেও নানাপ্রকার অনুনয় অনুরোধ অনুযোগের কারণ হইয়া দাঁড়াইত। স্বল্পমাত্র সেবা করিতে গেলে হিতে বিপরীত হইয়া উঠিত। তিনি বলিতেন, "পুরুষমানুষের অতটা বাড়াবাড়ি ভালো নয়।"

আমাদের সেই বরানগরের বাড়িটি বোধ করি তুমি দেখিয়াছ। বাড়ির সামনেই বাগান এবং বাগানের সম্মুখেই গঙ্গা বহিতেছে। আমাদের শোবার ঘরের নীচেই দক্ষিণের দিকে খানিকটা জমি মেহেদির বেড়া দিয়া ঘিরিয়া আমার স্ত্রী নিজের মনের মতো একটুকরা বাগান বানাইয়াছিলেন। সমস্ত বাগানটির মধ্যে সেই খণ্ডটিই অত্যন্ত সাদাসিধা এবং নিতান্ত দিশি। অর্থাৎ, তাহার মধ্যে গন্ধের অপেক্ষা বর্ণের বাহার, ফুলের অপেক্ষা পাতার বৈচিত্র্য ছিল না, এবং টবের মধ্যে অকিঞ্চিৎকর উদ্ভিজ্জের পার্শ্বে কাঠি অবলম্বন করিয়া কাগজে নির্মিত লাটিন নামের জয়ধ্বজা উড়িত না। বেল, জুঁই, গোলাপ, গন্ধরাজ, করবী এবং রজনীগন্ধারই প্রাদুর্ভাব কিছু বেশি। প্রকাণ্ড একটা বকুলগাছের তলা সাদা মার্বল পাথর দিয়া বাঁধানো ছিল। সুস্থ অবস্থায় তিনি নিজে দাঁড়াইয়া দুইবেলা তাহা ধুইয়া সাফ করাইয়া রাখিতেন। গ্রীষ্মকালে কাজের অবকাশে সন্ধ্যার সময় সেই তাঁহার বসিবার স্থান ছিল। সেখান হইতে গঙ্গা দেখা যাইত কিন্তু গঙ্গা হইতে কুঠির পানসির বাবুরা তাঁহাকে দেখিতে পাইত না।

অনেকদিন শয্যাগত থাকিয়া একদিন চৈত্রের শুক্লপক্ষ সন্ধ্যায় তিনি কহিলেন, "ঘরে বন্ধ থাকিয়া আমার প্রাণ কেমন করিতেছে; আজ একবার আমার সেই বাগানে গিয়া বসিব।"

আমি তাঁহাকে বহু যত্নে ধরিয়া ধীরে ধীরে সেই বকুলতলের প্রস্তরবেদিকায় লইয়া গিয়া শয়ন করাইয়া দিলাম। আমারই জানুর উপরে তাঁহার মাথাটি তুলিয়া রাখিতে পারিতাম কিন্তু জানি, সেটাকে তিনি অদ্ভুত আচরণ বলিয়া গণ্য করিবেন, তাই একটি বালিশ আনিয়া তাঁহার মাথার তলায় রাখিলাম।

দুটি-একটি করিয়া প্রস্ফুট বকুল ফুল ঝরিতে লাগিল এবং শাখান্তরাল হইতে ছায়াঙ্কিত জ্যোৎস্না তাঁহার শীর্ণ মুখের উপর আসিয়া পড়িল। চারি দিক শান্ত নিস্তব্ধ; সেই ঘনগন্ধপূর্ণ ছায়ান্ধকারে একপার্শ্বে নীরবে বসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আমার চোখে জল আসিল।

আমি ধীরে ধীরে কাছের গোড়ায় আসিয়া দুই হস্তে তাঁহার একটি উত্তপ্ত শীর্ণ হাত

তুলিয়া লইলাম। তিনি তাহাতে কোনো আপত্তি করিলেন না। কিছুক্ষণ এইরূপ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া আমার হৃদয় কেমন উদ্‌বেলিত হইয়া উঠিল, আমি বলিয়া উঠিলাম, "তোমার ভালোবাসা আমি কোনোকালে ভুলিব না।"

তখনি বুঝিলাম, কথাটা বলিবার কোনো আবশ্যক ছিল না। আমার স্ত্রী হাসিয়া উঠিলেন। সে হাসিতে লজ্জা ছিল, সুখ ছিল এবং কিঞ্চিৎ অবিশ্বাস ছিল এবং উহার মধ্যে অনেকটা পরিমাণে পরিহাসের তীব্রতাও ছিল। প্রতিবাদস্বরূপে একটি কথামাত্র না বলিয়া কেবল তাঁহার সেই হাসির দ্বারা জানাইলেন, "কোনোকালে ভুলিবে না, ইহা কখনো সম্ভব নহে এবং আমি তাহা প্রত্যাশাও করি না।"

ঐ সুমিষ্ট সুতীক্ষ্ণ হাসির ভয়েই আমি কখনো আমার স্ত্রীর সঙ্গে রীতিমতো প্রেমালাপ করিতে সাহস করি নাই। অসাক্ষাতে যে-সকল কথা মনে উদয় হইত, তাঁহার সম্মুখে গেলেই সেগুলাকে নিতান্ত বাজে কথা বলিয়া বোধ হইত। ছাপার অক্ষরে যে-সব কথা পড়িলে দুই চক্ষু বাহিয়া দর দর ধারায় জল পড়িতে থাকে সেই-গুলা মুখে বলিতে গেলে কেন যে হাস্যের উদ্রেক করে, এ পর্যন্ত বুঝিতে পারিলাম না।

বাদপ্রতিবাদ কথায় চলে কিন্তু হাসির উপরে তর্ক চলে না, কাজেই চুপ করিয়া যাইতে হইল। জ্যোৎস্না উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল, একটা কোকিল ক্রমাগতই কুহু কুহু ডাকিয়া অস্থির হইয়া গেল। আমি বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এমন জ্যোৎস্না-রাত্রেও কি পিকবধূ বধির হইয়া আছে।

বহু চিকিৎসায় আমার স্ত্রীর রোগ-উপশমের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। ডাক্তার বলিল, "একবার বায়ু পরিবর্তন করিয়া দেখিলে ভালো হয়।" আমি স্ত্রীকে লইয়া এলাহাবাদে গেলাম।

এইখানে দক্ষিণাবাবু হঠাৎ থমকিয়া চুপ করিলেন। সন্দিগ্ধভাবে আমার মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর দুই হাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া ভাবিতে লাগিলেন। আমিও চুপ করিয়া রহিলাম। কুলুঙ্গিতে কেরোসিন মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতে লাগিল এবং নিস্তব্ধ ঘরে মশার ভন্‌ভন্‌ শব্দ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। হঠাৎ মৌন ভঙ্গ করিয়া দক্ষিণাবাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন—

সেখানে হারান ডাক্তার আমার স্ত্রীকে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে অনেককাল একভাবে কাটাইয়া ডাক্তারও বলিলেন, আমিও বুঝিলাম এবং আমার স্ত্রীও বুঝিলেন যে, তাঁহার ব্যামো সারিবার নহে। তাঁহাকে চিররুগ্ন হইয়াই কাটাইতে হইবে।

তখন একদিন আমার স্ত্রী আমাকে বলিলেন, "যখন ব্যামোও সারিবে না এবং শীঘ্র আমার মরিবার আশাও নাই তখন আর-কতদিন এই জীবন্মৃতকে লইয়া কাটাইবে। তুমি আর-একটা বিবাহ করো।"

এটা যেন কেবল একটা সুযুক্তি এবং সদ্‌বিবেচনার কথা— ইহার মধ্যে যে, ভারি একটা মহত্ত্ব বীরত্ব বা অসামান্য কিছু আছে, এমন ভাব তাঁহার লেশমাত্র ছিল না।

এইবার আমার হাসিবার পালা ছিল। কিন্তু, আমার কি তেমন করিয়া হাসিবার ক্ষমতা আছে। আমি উপন্যাসের প্রধান নায়কের ন্যায় গম্ভীর সমুচ্চভাবে বলিতে লাগিলাম, "যতদিন এই দেহে জীবন আছে—"

তিনি বাধা দিয়া কহিলেন, "নাও নাও! আর বলিতে হইবে না। তোমার কথা শুনিয়া আমি আর বাঁচি না!"

আমি পরাজয় স্বীকার না করিয়া বলিলাম, "এ জীবনে আর-কাহাকেও ভালো-বাসিতে পারিব না।"

শুনিয়া আমার স্ত্রী ভারি হাসিয়া উঠিলেন। তখন আমাকে ক্ষান্ত হইতে হইল।

জানি না, তখন নিজের কাছেও কখনো স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছি কি না কিন্তু এখন বুঝিতে পারিতেছি, এই আরোগ্য-আশাহীন সেবাকার্যে আমি মনে মনে পরিশ্রান্ত হইয়া গিয়াছিলাম। এ কার্যে যে ভঙ্গ দিব, এমন কল্পনাও আমার মনে ছিল না; অথচ, চিরজীবন এই চিররুগ্নকে লইয়া যাপন করিতে হইবে, এ কল্পনাও আমার নিকট পীড়াজনক হইয়াছিল। হায়, প্রথম যৌবনকালে যখন সম্মুখে তাকাইয়াছিলাম তখন প্রেমের কুহকে, সুখের আশ্বাসে, সৌন্দর্যের মরীচিকায় সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবন প্রফুল্ল দেখাইতেছিল। আজ হইতে শেষ পর্যন্ত কেবলই আশাহীন সুদীর্ঘ সতৃষ্ণ মরুভূমি।

আমার সেবার মধ্যে সেই আন্তরিক শ্রান্তি নিশ্চয় তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন। তখন জানিতাম না কিন্তু এখন সন্দেহমাত্র নাই যে, তিনি আমাকে যুক্তাক্ষরহীন প্রথমভাগ শিশুশিক্ষার মতো অতি সহজে বুঝিতেন। সেইজন্য যখন উপন্যাসের নায়ক সাজিয়া গম্ভীরভাবে তাঁহার নিকট কবিত্ব ফলাইতে যাইতাম তিনি এমন সুগভীর স্নেহ অথচ অনিবার্য কৌতুকের সহিত হাসিয়া উঠিতেন। আমার নিজের অগোচর অন্তরের কথাও অন্তর্যামীর ন্যায় তিনি সমস্তই জানিতেন, এ কথা মনে করিলে আজও লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে।

হারান ডাক্তার আমাদের স্বজাতীয়। তাঁহার বাড়িতে আমার প্রায়ই নিমন্ত্রণ থাকিত। কিছুদিন যাতায়াতের পর ডাক্তার তাঁহার মেয়েটির সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। মেয়েটি অবিবাহিত; তাহার বয়স পনেরো হইবে। ডাক্তার

বলেন, তিনি মনের মতো পাত্র পান নাই বলিয়া বিবাহ দেন নাই। কিন্তু বাহিরের লোকের কাছে গুজব শুনিতাম— মেয়েটির কুলের দোষ ছিল।

কিন্তু, আর কোনো দোষ ছিল না। যেমন সুরূপ তেমনি সুশিক্ষা। সেইজন্য মাঝে মাঝে এক-একদিন তাঁহার সহিত নানা কথার আলোচনা করিতে করিতে আমার বাড়ি ফিরিতে রাত হইত, আমার স্ত্রীকে ঔষধ খাওয়াইবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইত। তিনি জানিতেন, আমি হারান ডাক্তরের বাড়ি গিয়াছি কিন্তু বিলম্বের কারণ একদিনও আমাকে জিজ্ঞাসাও করেন নাই।

মরুভূমির মধ্যে আর-একবার মরীচিকা দেখিতে লাগিলাম। তৃষ্ণা যখন বুক পর্যন্ত তখন চোখের সামনে কূলপরিপূর্ণ স্বচ্ছ জল ছলছল ঢলঢল করিতে লাগিল। তখন মনকে প্রাণপণে টানিয়া আর ফিরাইতে পারিলাম না।

রোগীর ঘর আমার কাছে দ্বিগুণ নিরানন্দ হইয়া উঠিল। তখন প্রায়ই শুশ্রূষা করিবার এবং ঔষধ খাওয়াইবার নিয়ম ভঙ্গ হইতে লাগিল।

হারান ডাক্তার আমাকে প্রায় মাঝে মাঝে বলিতেন, যাহাদের রোগ আরোগ্য হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই, তাহাদের পক্ষে মৃত্যুই ভালো ; কারণ, বাঁচিয়া তাহাদের নিজেরও সুখ নাই, অন্যেরও অসুখ। কথাটা সাধারণভবে বলিতে দোষ নাই, তথাপি আমার স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া এমন প্রসঙ্গ উত্থাপন করা তাঁহার উচিত হয় নাই। কিন্তু, মানুষের জীবনমৃত্যু সম্বন্ধে ডাক্তারদের মন এমন অসাড় যে, তাহারা ঠিক আমাদের মনের অবস্থা বুঝিতে পারে না।

হঠাৎ একদিন পাশের ঘর হইতে শুনিতে পাইলাম, আমার স্ত্রী হারানবাবুকে বলিতেছেন, "ডাক্তার, কতকগুলা মিথ্যা ঔষধ গিলাইয়া ডাক্তারখানার দেনা বাড়াইতেছ কেন। আমার প্রাণটাই যখন একটা ব্যামো, তখন এমন একটা ওষুধ দাও যাহাতে শীঘ্র এই প্রাণটা যায়।"

ডাক্তার বলিলেন, "ছি, এমন কথা বলিবেন না।"

কথাটা শুনিয়া হঠাৎ আমার বক্ষে বড়ো আঘাত লাগিল। ডাক্তার চলিয়া গেলে আমার স্ত্রীর ঘরে গিয়া তাঁহার শয্যাপ্রান্তে বসিলাম, তাঁহার কপালে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলাম। তিনি কহিলেন, "এ ঘর বড়ো গরম, তুমি বাহিরে যাও। তোমার বেড়াইতে যাইবার সময় হইয়াছে। খানিকটা না বেড়াইয়া আসিলে আবার রাত্রে তোমার ক্ষুধা হইবে না।"

বেড়াইতে যাওয়ার অর্থ ডাক্তারের বাড়ি যাওয়া। আমিই তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলাম, ক্ষুধাসঞ্চারের পক্ষে খানিকটা বেড়াইয়া আসা বিশেষ আবশ্যক। এখন নিশ্চয় বলিতে

পারি, তিনি প্রতিদিনই আমার এই ছলনাটুকু বুঝিতেন। আমি নির্বোধ, মনে করিতাম তিনি নির্বোধ।

এই বলিয়া দক্ষিণাচরণ বাবু অনেকক্ষণ করতলে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। অবশেষে কহিলেন, "আমাকে একগ্লাস জল আনিয়া দাও।" জল খাইয়া বলিতে লাগিলেন—

একদিন ডাক্তারবাবুর কন্যা মনোরমা আমার স্ত্রীকে দেখিতে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। জানি না, কী কারণে তাঁহার সে প্রস্তাব আমার ভালো লাগিল না। কিন্তু, প্রতিবাদ করিবার কোনো হেতু ছিল না। তিনি একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেদিন আমার স্ত্রীর বেদনা অন্য দিনের অপেক্ষা কিছু বাড়িয়া উঠিয়াছিল। যেদিন তাঁহার ব্যথা বাড়ে সেদিন তিনি অত্যন্ত স্থির নিস্তব্ধ হইয়া থাকেন; কেবল মাঝে মাঝে মুষ্টি বদ্ধ হইতে থাকে এবং মুখ নীল হইয়া আসে, তাহাতেই তাঁহার যন্ত্রণা বুঝা যায়। ঘরে কোনো সাড়া ছিল না, আমি শয্যাপ্রান্তে চুপ করিয়া বসিয়া ছিলাম; সেদিন আমাকে বেড়াইতে যাইতে অনুরোধ করেন এমন সামর্থ্য তাঁহার ছিল না কিংবা হয়তো বড়ো কষ্টের সময় আমি কাছে থাকি, এমন ইচ্ছা তাঁহার মনে মনে ছিল। চোখে লাগিবে বলিয়া কেরোসিনের আলোটা দ্বারের পার্শ্বে ছিল। ঘর অন্ধকার এবং নিস্তব্ধ। কেবল এক-একবার যন্ত্রণার কিঞ্চিৎ উপশমে আমার স্ত্রীর গভীর দীর্ঘনিশ্বাস শুনা যাইতেছিল।

এমন সময়ে মনোরমা ঘরের প্রবেশদ্বারে দাঁড়াইলেন। বিপরীত দিক হইতে কেরোসিনের আলো আসিয়া তাঁহার মুখের উপর পড়িল। আলো-আঁধারে লাগিয়া তিনি কিছুক্ষণ ঘরের কিছুই দেখিতে না পাইয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিতে লাগিলেন।

আমার স্ত্রী চমকিয়া আমার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কে!"— তাঁহার সেই দুর্বল অবস্থায় হঠাৎ অচেনা লোক দেখিয়া ভয় পাইয়া আমাকে দুই-তিনবার অস্ফুটস্বরে প্রশ্ন করিলেন, "ও কে! ও কে গো!"

আমার কেমন দুর্বুদ্ধি হইল আমি প্রথমেই বলিয়া ফেলিলাম, "আমি চিনি না।" বলিবামাত্রই কে যেন আমাকে কশাঘাত করিল। পরের মুহূর্তেই বলিলাম, "ওঃ, আমাদের ডাক্তারবাবুর কন্যা!"

স্ত্রী একবার আমার মুখের দিকে চাহিলেন; আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে পারিলাম না। পরক্ষণেই তিনি ক্ষীণস্বরে অভ্যাগতকে বলিলেন, "আপনি আসুন।" আমাকে বলিলেন, "আলোটা ধরো।"

মনোরমা ঘরে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার সহিত রোগিণীর অল্পস্বল্প আলাপ চলিতে লাগিল। এমন সময় ডাক্তারবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তিনি তাঁহার ডাক্তারখানা হইতে দুই শিশি ওষুধ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সেই দুটি শিশি বাহির করিয়া আমার স্ত্রীকে বলিলেন, "এই নীল শিশিটা মালিশ করিবার, আর এইটি খাইবার। দেখিবেন, দুইটাতে মিলাইবেন না, এ ওষুধটা ভারি বিষ।"

আমাকেও একবার সতর্ক করিয়া দিয়া ঔষধ দুটি শয্যাপার্শ্ববর্তী টেবিলে রাখিয়া দিলেন। বিদায় লইবার সময় ডাক্তার তাঁহার কন্যাকে ডাকিলেন।

মনোরমা কহিলেন, "বাবা, আমি থাকি না কেন। সঙ্গে স্ত্রীলোক কেহ নাই, ইঁহাকে সেবা করিবে কে?"

আমার স্ত্রী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; বলিলেন, "না, না, আপনি কষ্ট করিবেন না। পুরানো ঝি আছে, সে আমাকে মায়ের মতো যত্ন করে।"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, "উনি মা-লক্ষ্মী, চিরকাল পরের সেবা করিয়া আসিয়াছেন, অন্যের সেবা সহিতে পারেন না।"

কন্যাকে লইয়া ডাক্তার গমনের উদ্‌যোগ করিতেছেন এমন সময় আমার স্ত্রী বলিলেন, "ডাক্তারবাবু, ইনি এই বদ্ধঘরে অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন, ইঁহাকে একবার বাহিরে বেড়াইয়া লইয়া আসিতে পারেন?"

ডাক্তারবাবু আমাকে কহিলেন, "আসুন-না, আপনাকে নদীর ধার হইয়া একবার বেড়াইয়া আনি।"

আমি ঈষৎ আপত্তি দেখাইয়া অনতিবিলম্বে সম্মত হইলাম। ডাক্তারবাবু যাইবার সময় দুই শিশি ঔষধ সম্বন্ধে আবার আমার স্ত্রীকে সতর্ক করিয়া দিলেন।

সেদিন ডাক্তারের বাড়িতেই আহার করিলাম। ফিরিয়া আসিতে রাত হইল। আসিয়া দেখি আমার স্ত্রী ছট্‌ফট্ করিতেছেন। অনুতাপে বিদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার কি ব্যথা বাড়িয়াছে।"

তিনি উত্তর করিতে পারিলেন না, নীরবে আমার মুখের দিকে চাহিলেন। তখন তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়াছে।

আমি তৎক্ষণাৎ সেই রাত্রেই ডাক্তারকে ডাকাইয়া আনিলাম।

ডাক্তার প্রথমটা আসিয়া অনেকক্ষণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অবশেষে

জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই ব্যাথাটা কি বাড়িয়া উঠিয়াছে। ঔষধটা একবার মালিশ করিলে হয় না?"

বলিয়া শিশিটা টেবিল হইতে লইয়া দেখিলেন, সেটা খালি।

আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,"আপনি কি ভুল করিয়া এই ওষুধটা খাইয়াছেন?"

আমার স্ত্রী ঘাড় নাড়িয়া নীরবে জানাইলেন, "হাঁ।"

ডাক্তার তৎক্ষণাৎ গাড়ি করিয়া তাঁহার বাড়ি হইতে পাম্প্ আনিতে ছুটিলেন। আমি অর্ধমূর্ছিতের ন্যায় আমার স্ত্রীর বিছানার উপর গিয়া পড়িলাম।

তখন, মাতা তাহার পীড়িত শিশুকে যেমন করিয়া সান্ত্বনা করে তেমনি করিয়া তিনি আমার মাথা তাঁহার বক্ষের কাছে টানিয়া লইয়া দুই হস্তের স্পর্শে আমাকে তাঁহার মনের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কেবল তাঁহার সেই করুণ স্পর্শের দ্বারাই আমাকে বারংবার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "শোক করিয়ো না, ভালোই হইয়াছে, তুমি সুখী হইবে, এবং সেই মনে করিয়া আমি সুখে মরিলাম।"

ডাক্তার যখন ফিরিলেন, তখন জীবনের সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রীর সকল যন্ত্রণার অবসান হইয়াছে।

দক্ষিণাচরণ আর-একবার জল খাইয়া বলিলেন, "উঃ, বড়ো গরম!" বলিয়া দ্রুত বাহির হইয়া বারকয়েক বারান্দায় পায়চারি করিয়া আসিয়া বসিলেন। বেশ বোঝা গেল, তিনি বলিতে চাহেন না কিন্তু আমি যেন জাদু করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কথা কাড়িয়া লইতেছি। আবার আরম্ভ করিলেন—

মনোরমাকে বিবাহ করিয়া দেশে ফিরিলাম।

মনোরমা তাহার পিতার সম্মতিক্রমে আমাকে বিবাহ করিল; কিন্তু আমি যখন তাহাকে আদরের কথা বলিতাম, প্রেমালাপ করিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিবার চেষ্টা করিতাম, সে হাসিত না, গম্ভীর হইয়া থাকিত। তাহার মনের কোথায় কোন্‌খানে কী খটকা লাগিয়া গিয়াছিল, আমি কেমন করিয়া বুঝিব?

এইসময় আমার মদ খাইবার নেশা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল।

একদিন প্রথম শরতের সন্ধ্যায় মনোরমাকে লইয়া আমাদের বরানগরের বাগানে বেড়াইতেছি। ছম্‌ছমে অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। পাখিদের বাসায় ডানা ঝাড়িবার শব্দটুকুও নাই। কেবল বেড়াইবার পথের দুইধারে ঘনছায়াবৃত ঝাউগাছ বাতাসে সশব্দে কাঁপিতেছিল।

শ্রান্তি বোধ করিতেই মনোরমা সেই বকুলতলায় শুভ্র পাথরের বেদীর উপর আসিয়া নিজের দুই বাহুর উপর মাথা রাখিয়া শয়ন করিল। আমিও কাছে আসিয়া বসিলাম।

সেখানে অন্ধকার আরো ঘনীভূত; যতটুকু আকাশ দেখা যাইতেছে একেবারে তারায় আচ্ছন্ন; তরুতলের ঝিল্লিধ্বনি যেন অনন্তগগনবক্ষচ্যুত নিঃশব্দতার নিম্নপ্রান্তে একটি শব্দের সরু পাড় বুনিয়া দিতেছে।

সেদিনও বৈকালে আমি কিছু মদ খাইয়াছিলাম, মনটা বেশ একটু তরলাবস্থায় ছিল। অন্ধকার যখন চোখে সহিয়া আসিল তখন বনচ্ছায়াতলে পাণ্ডুর বর্ণে অঙ্কিত সেই শিথিল-অঞ্চল শ্রান্তকায় রমণীর আবছায়া মূর্তিটি আমার মনে এক অনিবার্য আবেগের সঞ্চার করিল। মনে হইল, ও যেন একটি ছায়া, ওকে যেন কিছুতেই দুই বাহু দিয়া ধরিতে পারিব না।

এমন সময় অন্ধকার ঝাউগাছের শিখরদেশে যেন আগুন ধরিয়া উঠিল; তাহার পরে কৃষ্ণপক্ষের জীর্ণপ্রান্ত হলুদবর্ণ চাঁদ ধীরে ধীরে গাছের মাথার উপরকার আকাশে আরোহণ করিল; সাদা পাথরের উপর সাদা শাড়িপরা সেই শ্রান্তশয়ান রমণীর মুখের উপর জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িল। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। কাছে আসিয়া দুই হাতে তাহার হাতটি তুলিয়া ধরিয়া কহিলাম, "মনোরমা, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না, কিন্তু তোমাকে আমি ভালোবাসি। তোমাকে আমি কোনোকালে ভুলিতে পারিব না।"

কথাটা বলিবামাত্র চমকিয়া উঠিলাম; মনে পড়িল, ঠিক এই কথাটা আর একদিন আর কাহাকেও বলিয়াছি! এবং সেই মুহূর্তেই বকুলগাছের শাখার উপর দিয়া ঝাউগাছের মাথার উপর দিয়া, কৃষ্ণপক্ষের পীতবর্ণ ভাঙা চাঁদের নীচে দিয়া গঙ্গার পূর্বপার হইতে গঙ্গার সুদূর পশ্চিম পার পর্যন্ত হাহা— হাহা— হাহা— করিয়া অতি দ্রুতবেগে একটা হাসি বহিয়া গেল। সেটা মর্মভেদী হাসি কি অভ্রভেদী হাহাকার, বলিতে পারি না। আমি তদ্দণ্ডেই পাথরের বেদীর উপর হইতে মূর্ছিত হইয়া নীচে পড়িয়া গেলাম।

মূর্ছাভঙ্গে দেখিলাম, আমার ঘরে বিছানায় শুইয়া আছি। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার হঠাৎ এমন হইল কেন?"

আমি কাঁপিয়া উঠিয়া বলিলাম, "শুনিতে পাও নাই, সমস্ত আকাশ ভরিয়া হাহা করিয়া একটা হাসি বহিয়া গেল?"

স্ত্রী হাসিয়া কহিলেন, "সে বুঝি হাসি? সার বাঁধিয়া দীর্ঘ একঝাঁক পাখি উড়িয়া গেল, তাহাদেরই পাখার শব্দ শুনিয়াছিলাম। তুমি এত অল্পেই ভয় পাও?"

দিনের বেলায় স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, পাখির ঝাঁক উড়িবার শব্দই বটে, এই সময়ে উত্তরদেশ হইতে হংসশ্রেণী নদীর চরে চরিবার জন্য আসিতেছে। কিন্তু সন্ধ্যা হইলে সে বিশ্বাস রাখিতে পারিতাম না। তখন মনে হইত, চারি দিকে সমস্ত অন্ধকার ভরিয়া ঘন হাসি জমা হইয়া রহিয়াছে, সামান্য একটা উপলক্ষে হঠাৎ আকাশ ভরিয়া অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিবে। অবশেষে এমন হইল, সন্ধ্যার পর মনোরমার সহিত একটা কথা বলিতে আমার সাহস হইত না।

তখন আমাদের বরানগরের বাড়ি ছাড়িয়া মনোরমাকে লইয়া বোটে করিয়া বাহির হইলাম। অগ্রহায়ণ মাসে নদীর বাতাসে সমস্ত ভয় চলিয়া গেল। কয়দিন বড়ো সুখে ছিলাম। চারি দিকের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া মনোরমাও যেন তাহার হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার অনেকদিন পরে ধীরে ধীরে আমার নিকট খুলিতে লাগিল।

গঙ্গা ছাড়াইয়া খ'ড়ে ছাড়াইয়া অবশেষে পদ্মায় আসিয়া পৌঁছিলাম। ভয়ংকরী পদ্মা তখন হেমন্তের বিবরলীন ভুজঙ্গিনীর মতো কৃশ নির্জীবভাবে সুদীর্ঘ শীতনিদ্রায় নিবিষ্ট ছিল। উত্তর পারে জনশূন্য তৃণশূন্য দিগন্তপ্রসারিত বালির চর ধূ ধূ করিতেছে, এবং দক্ষিণের উচ্চ পাড়ের উপর গ্রামের আমবাগানগুলি এই রাক্ষসী নদীর নিতান্ত মুখের কাছে জোড়হস্তে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে; পদ্মা ঘুমের ঘোরে এক-একবার পাশ ফিরিতেছে এবং বিদীর্ণ তটভূমি ঝুপ্ ঝাপ্ করিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে।

এইখানে বেড়াইবার সুবিধা দেখিয়া বোট বাঁধিলাম।

একদিন আমরা দুই জনে বেড়াইতে বেড়াইতে বহুদূরে চলিয়া গেলাম। সূর্যাস্তের স্বর্ণচ্ছায়া মিলাইয়া যাইতেই শুক্লপক্ষের নির্মল চন্দ্রালোক দেখিতে দেখিতে ফুটিয়া উঠিল। সেই অন্তহীন শুভ্র বালির চরের উপর যখন অজস্র অবারিত উচ্ছ্বসিত জ্যোৎস্না একেবারে আকাশের সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হইয়া গেল, তখন মনে হইল যেন জনশূন্য চন্দ্রালোকের অসীম স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে কেবল আমরা দুই জনে ভ্রমণ করিতেছি। একটি লাল শাল মনোরমার মাথার উপর হইতে নামিয়া তাহার মুখখানি বেষ্টন করিয়া তাহার শরীরটি আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। নিস্তব্ধতা যখন নিবিড় হইয়া আসিল, কেবল একটি সীমাহীন দিশাহীন শুভ্রতা এবং শূন্যতা ছাড়া যখন আর কিছুই রহিল না, তখন মনোরমা ধীরে ধীরে হাতটি বাহির করিয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিল; অত্যন্ত কাছে আসিয়া সে যেন তাহার সমস্ত শরীরমন জীবনযৌবন আমার উপর বিন্যস্ত করিয়া নিতান্ত নির্ভর করিয়া দাঁড়াইল। পুলকিত উদ্‌বেলিত হৃদয়ে মনে করিলাম, ঘরের মধ্যে কি যথেষ্ট ভালোবাসা যায়। এইরূপ অনাবৃত অবারিত অনন্ত আকাশ নহিলে কি দুটি মানুষকে কোথাও ধরে। তখন মনে হইল, আমাদের ঘর নাই, দ্বার নাই, কোথাও ফিরিবার নাই, এমনি

করিয়া হাতে হাতে ধরিয়া গম্যহীন পথে উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণে চন্দ্রালোকিত শূন্যতার উপর দিয়া অবারিত ভাবে চলিয়া যাইব।

এইরূপে চলিতে চলিতে এক জায়গায় আসিয়া দেখিলাম, সেই বালুকারাশির মাঝখানে অদূরে একটি জলাশয়ের মতো হইয়াছে— পদ্মা সরিয়া যাওয়ার পর সেইখানে জল বাধিয়া আছে।

সেই মরুবালুকাবেষ্টিত নিস্তরঙ্গ নিষুপ্ত নিশ্চল জলটুকুর উপরে একটি সুদীর্ঘ জ্যোৎস্নার রেখা মূর্ছিতভাবে পড়িয়া আছে। সেই জায়গাটাতে আসিয়া আমরা দুই জনে দাঁড়াইলাম— মনোরমা কী ভাবিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল, তাহার মাথার উপর হইতে শালটা হঠাৎ খসিয়া পড়িল। আমি তাহার সেই জ্যোৎস্নাবিকশিত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া চুম্বন করিলাম।

সেইসময় সেই জনমানবশূন্য নিঃসঙ্গ মরুভূমির মধ্যে গম্ভীরস্বরে কে তিনবার বলিয়া উঠিল, "ও কে? ও কে? ও কে?"

আমি চমকিয়া উঠিলাম, আমার স্ত্রীও কাঁপিয়া উঠিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আমরা দুই জনেই বুঝিলাম, এই শব্দ মানুষিক নহে, অমানুষিকও নহে— চরবিহারী জলচর পাখির ডাক। হঠাৎ এত রাত্রে তাহাদের নিরাপদ নিভৃত নিবাসের কাছে লোকসমাগম দেখিয়া চকিত হইয়া উঠিয়াছে।

সেই ভয়ের চমক খাইয়া আমরা দুই জনেই তাড়াতাড়ি বোটে ফিরিলাম। রাত্রে বিছানায় আসিয়া শুইলাম; শ্রান্তশরীরে মনোরমা অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িল। তখন অন্ধকারে কে একজন আমার মশারির কাছে দাঁড়াইয়া সুষুপ্ত মনোরমার দিকে একটিমাত্র দীর্ঘ শীর্ণ অস্থিসার অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া যেন আমার কানে কানে অত্যন্ত চুপিচুপি অস্ফুটকণ্ঠে কেবলই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "ও কে? ও কে? ও কে গো?"

তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেশালাই জ্বালাইয়া বাতি ধরাইলাম। সেই মুহূর্তেই ছায়ামূর্তি মিলাইয়া গিয়া, আমার মশারি কাঁপাইয়া, বোট দুলাইয়া, আমার সমস্ত ঘর্মাক্ত শরীরের রক্ত হিম করিয়া দিয়া হাহা—হাহা—হাহা করিয়া একটা হাসি অন্ধকার রাত্রির ভিতর দিয়া বহিয়া চলিয়া গেল। পদ্মা পার হইল, পদ্মার চর পার হইল, তাহার পরবর্তী সমস্ত সুপ্ত দেশ গ্রাম নগর পার হইয়া গেল— যেন তাহা চিরকাল ধরিয়া দেশদেশান্তর লোকলোকান্তর পার হইয়া ক্রমশ ক্ষীণ ক্ষীণতর ক্ষীণতম হইয়া অসীম সুদূরে চলিয়া যাইতেছে; ক্রমে যেন তাহা জন্মমৃত্যুর দেশ ছাড়াইয়া গেল, ক্রমে তাহা যেন সূচির অগ্রভাগের ন্যায় ক্ষীণতম হইয়া আসিল, এত ক্ষীণ শব্দ কখনো শুনি নাই, কল্পনা করি নাই; আমার মাথার মধ্যে যেন অনন্ত আকাশ রহিয়াছে এবং সেই শব্দ যতই দূরে

যাইতেছে কিছুতেই আমার মস্তিষ্কের সীমা ছাড়াইতে পারিতেছে না; অবশেষে যখন একান্ত অসহ্য হইয়া আসিল তখন ভাবিলাম, আলো নিবাইয়া না দিলে ঘুমাইতে পারিব না। যেমন আলো নিবাইয়া শুইলাম অমনি আমার মশারির পাশে, আমার কানের কাছে, অন্ধকারে আবার সেই অবরুদ্ধ স্বর বলিয়া উঠিল, "ও কে, ও কে, ও কে গো।" আমার বুকের রক্তের ঠিক সমান তালে ক্রমাগতই ধ্বনিত হইতে লাগিল, "ও কে, ও কে, ও কে গো। ও কে, ও কে, ও কে গো।" সেই গভীর রাত্রে নিস্তব্ধ বোটের মধ্যে আমার গোলাকার ঘড়িটাও সজীব হইয়া উঠিয়া তাহার ঘণ্টার কাঁটা মনোরমার দিকে প্রসারিত করিয়া শেলফের উপর হইতে তালে তালে বলিতে লাগিল, "ও কে, ও কে, ও কে গো! ও কে, ও কে, ও কে গো!"

বলিতে বলিতে দক্ষিণাবাবু পাংশুবর্ণ হইয়া আসিলেন, তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। আমি তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলাম, "একটু জল খান।" এমন সময় হঠাৎ আমার কেরোসিনের শিখাটা দপ দপ করিতে করিতে নিবিয়া গেল। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, বাহিরে আলো হইয়াছে। কাক ডাকিয়া উঠিল। দোয়েল শিশ দিতে লাগিল। আমার বাড়ির সম্মুখবর্তী পথে একটা মহিষের গাড়ির ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ জাগিয়া উঠিল। তখন দক্ষিণাবাবুর মুখের ভাব একেবারে বদল হইয়া গেল। ভয়ের কিছুমাত্র চিহ্ন রহিল না। রাত্রির কুহকে, কাল্পনিক শঙ্কার মত্ততায় আমার কাছে যে এত কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন সেজন্য যেন অত্যন্ত লজ্জিত এবং আমার উপর আন্তরিক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। শিষ্টসম্ভাষণমাত্র না করিয়া অকস্মাৎ উঠিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন।

সেইদিনই অর্ধরাত্রে আবার আমার দ্বারে আসিয়া ঘা পড়িল, "ডাক্তার! ডাক্তার!"

মাঘ ১৩০১

আপদ

সন্ধ্যার দিকে ঝড় ক্রমশ প্রবল হইতে লাগিল। বৃষ্টির ঝাপট, বজ্রের শব্দ এবং বিদ্যুতের ঝিকমিকিতে আকাশে যেন সুরাসুরের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। কালো কালো মেঘগুলো মহাপ্রলয়ের জয়পতাকার মতো দিগ্‌বিদিকে উড়িতে আরম্ভ করিল, গঙ্গার এপারে ওপারে বিদ্রোহী ঢেউগুলো কলশব্দে নৃত্য জুড়িয়া দিল, এবং বাগানের বড়ো বড়ো গাছগুলো সমস্ত শাখা ঝট্‌পট্‌ করিয়া হাহুতাশ সহকারে দক্ষিণে বামে লুটোপুটি করিতে লাগিল।

তখন চন্দননগরের বাগানবাড়িতে একটি দীপালোকিত রুদ্ধ কক্ষে খাটের সম্মুখবর্তী নীচের বিছানায় বসিয়া স্ত্রী-পুরুষে কথাবার্তা চলিতেছিল।

শরৎবাবু বলিতেছিলেন, "আর কিছুদিন থাকিলেই তোমার শরীর সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিবে, তখন আমরা দেশে ফিরিতে পারিব।"

কিরণময়ী বলিতেছিলেন, "আমার শরীর সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিয়াছে, এখন দেশে ফিরিলে কোনো ক্ষতি হইবে না।"

বিবাহিত ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, কথাটা যত সংক্ষেপে রিপোর্ট করিলাম তত সংক্ষেপে শেষ হয় নাই। বিষয়টি বিশেষ দুরূহ নয়, তথাপি বাদপ্রতিবাদ কিছুতেই মীমাংসার দিকে অগ্রসর হইতেছিল না; কর্ণহীন নৌকার মতো ক্রমাগতই ঘুর খাইয়া মরিতেছিল; অবশেষে অশ্রুতরঙ্গে ডুবি হইবার সম্ভাবনা দেখা দিল।

শরৎ কহিলেন, "ডাক্তার বলিতেছে, আর কিছুদিন থাকিয়া গেলে ভালো হয়।"

কিরণ কহিলেন, "তোমার ডাক্তার তো সব জানে!"

শরৎ কহিলেন, "জান তো, এই সময়ে দেশে নানাপ্রকার ব্যামোর প্রাদুর্ভাব হয়, অতএব আর মাস দুয়েক কাটাইয়া গেলেই ভালো হয়।"

কিরণ কহিলেন, "এখানে এখন বুঝি কোথাও কাহারো কোনো ব্যামো হয় না!"

পূর্ব ইতিহাসটা এই। কিরণকে তাহার ঘরের এবং পাড়ার সকলেই ভালোবাসে, এমন-কি, শাশুড়ি পর্যন্ত। সেই কিরণের যখন কঠিন পীড়া হইল তখন সকলেই চিন্তিত হইয়া উঠিল, এবং ডাক্তার যখন বায়ুপরিবর্তনের প্রস্তাব করিল, তখন গৃহ এবং কাজকর্ম ছাড়িয়া প্রবাসে যাইতে তাহার স্বামী এবং শাশুড়ি কোনো আপত্তি করিলেন না। যদিও গ্রামের বিবেচক প্রাজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই, বায়ুপরিবর্তনে আরোগ্যের আশা করা এবং স্ত্রীর জন্য এতটা হুলস্থুল করিয়া তোলা, নব্য স্ত্রৈণতার একটা নির্লজ্জ আতিশয্য বলিয়া স্থির করিলেন এবং প্রশ্ন করিলেন, ইতিপূর্বে কি কাহারো স্ত্রীর কঠিন পীড়া হয় নাই, শরৎ যেখানে যাওয়া স্থির করিয়াছেন সেখানে কি মানুষরা অমর, এবং এমন কোনো দেশ আছে কি যে অদৃষ্টের লিপি সফল হয় না— তথাপি শরৎ এবং তাঁহার মা সে-সকল কথায় কর্ণপাত করিলেন না; তখন গ্রামের সমস্ত সমবেত বিজ্ঞতার অপেক্ষা তাঁহাদের হৃদয়লক্ষ্মী কিরণের প্রাণটুকু তাঁহাদের নিকট গুরুতর বোধ হইল। প্রিয়ব্যক্তির বিপদে মানুষের এরূপ মোহ ঘটিয়া থাকে।

শরৎ চন্দননগরের বাগানে আসিয়া বাস করিতেছেন, এবং কিরণও রোগমুক্ত হইয়াছেন, কেবল শরীর এখনো সম্পূর্ণ সবল হয় নাই। তাঁহার মুখে চক্ষে একটি

সকরুণ কৃশতা অঙ্কিত হইয়া আছে, যাহা দেখিলে হৃৎকম্পসহ মনে উদয় হয়, আহা বড়ো রক্ষা পাইয়াছে!

কিন্তু কিরণের স্বভাবটা সঙ্গপ্রিয়, আমোদপ্রিয়। এখানে একলা আর ভালো লাগিতেছে না; তাহার ঘরের কাজ নাই, পাড়ার সঙ্গিনী নাই; কেবল সমস্ত দিন আপনার রুগ্ন শরীরটাকে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে মন যায় না। ঘণ্টায় ঘণ্টায় দাগ মাপিয়া ঔষধ খাও, তাপ দাও, পথ্য পালন করো, ইহাতে বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছে; আজ ঝড়ের সন্ধ্যাবেলায় রুদ্ধগৃহে স্বামীস্ত্রীতে তাহাই লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল।

কিরণ যতক্ষণ উত্তর দিতেছিল ততক্ষণ উভয়পক্ষে সমকক্ষভাবে দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিতেছিল, কিন্তু অবশেষে কিরণ যখন নিরুত্তর হইয়া বিনা প্রতিবাদে শরতের দিক হইতে ঈষৎ বিমুখ হইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বসিল তখন দুর্বল নিরুপায় পুরুষটির আর কোনো অস্ত্র রহিল না। পরাভব স্বীকার করিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় বাহির হইতে বেহারা উচ্চৈঃস্বরে কী একটা নিবেদন করিল।

শরৎ উঠিয়া দ্বার খুলিয়া শুনিলেন, নৌকাডুবি হইয়া একটি ব্রাহ্মণবালক সাঁতার দিয়া তাঁহাদের বাগানে আসিয়া উঠিয়াছে।

শুনিয়া কিরণের মান-অভিমান দূর হইয়া গেল, তৎক্ষণাৎ আলনা হইতে শুষ্কবস্ত্র বাহির করিয়া দিলেন এবং শীঘ্র একবাটি দুধ গরম করিয়া ব্রাহ্মণের ছেলেকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

ছেলেটির লম্বা চুল, বড়ো বড়ো চোখ, গোঁফের রেখা এখনো উঠে নাই। কিরণ তাহাকে নিজে থাকিয়া ভোজন করাইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

শুনিলেন, সে যাত্রার দলের ছোকরা, তাহার নাম নীলকান্ত। তাহারা নিকটবর্তী সিংহবাবুদের বাড়ি যাত্রার জন্য আহূত হইয়াছিল; ইতিমধ্যে নৌকাডুবি হইয়া তাহাদের দলের লোকের কী গতি হইল কে জানে; সে ভালো সাঁতার জানিত, কোনোমতে প্রাণরক্ষা করিয়াছে।

ছেলেটি এইখানেই রহিয়া গেল। আর একটু হইলেই সে মারা পড়িত, এই মনে করিয়া তাহার প্রতি কিরণের অত্যন্ত দয়ার উদ্রেক হইল।

শরৎ মনে করিলেন, হইল ভালো, কিরণ একটা নূতন কাজ হাতে পাইলেন, এখন কিছুকাল এইভাবেই কাটিয়া যাইবে। ব্রাহ্মণবালকের কল্যাণে পুণ্যসঞ্চয়ের প্রত্যাশায় শাশুড়িও প্রসন্নতা লাভ করিলেন। এবং অধিকারী মহাশয় ও যমরাজের হাত হইতে সহসা এই ধনীপরিবারের হাতে বদলি হইয়া নীলকান্ত বিশেষ আরাম বোধ করিল।

কিন্তু অনতিবিলম্বে শরৎ এবং তাহার মাতার মত পরিবর্তন হইতে লাগিল। তাঁহারা ভাবিলেন, আর আবশ্যক নাই, এখন এই ছেলেটাকে বিদায় করিতে পারিলে আপদ যায়।

নীলকান্ত গোপনে শরতের গুড়গুড়িতে ফড়্ ফড়্ শব্দে তামাক টানিতে আরম্ভ করিল। বৃষ্টির দিনে অম্লানবদনে তাঁহার শখের সিল্কের ছাতাটি মাথায় দিয়া নববন্ধুসঞ্চয়-চেষ্টায় পল্লীতে পর্যটন করিতে লাগিল। কোথাকার একটা মলিন গ্রাম্য কুক্কুরকে আদর দিয়া এমনি স্পর্ধিত করিয়া তুলিল যে, সে অনাহূত শরতের সুসজ্জিত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নির্মল জাজিমের উপর পদপল্লবচতুষ্টয়ের ধূলিরেখায় আপন শুভাগমন-সংবাদ স্থায়ীভাবে মুদ্রিত করিয়া আসিতে লাগিল। নীলকান্তের চতুর্দিকে দেখিতে দেখিতে একটি সুবৃহৎ ভক্তশিশুসম্প্রদায় গঠিত হইয়া উঠিল, এবং সে-বৎসর গ্রামের আম্রকাননে কচি আম পাকিয়া উঠিবার অবসর পাইল না।

কিরণ এই ছেলেটিকে বড়ো বেশি আদর দিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। শরৎ এবং শরতের মা সে বিষয়ে তাঁহাকে অনেক নিষেধ করিতেন, কিন্তু তিনি তাহা মানিতেন না। শরতের পুরাতন জামা মোজা এবং নূতন ধুতি চাদর জুতা পরাইয়া তিনি তাহাকে বাবু সাজাইয়া তুলিলেন। মাঝে মাঝে যখন তখন তাহাকে ডাকিয়া লইয়া তাঁহার স্নেহ এবং কৌতুক উভয়ই চরিতার্থ হইত। কিরণ সহাস্যমুখে পানের বাটা পাশে রাখিয়া খাটের উপর বসিতেন, দাসী তাঁহার ভিজে এলোচুল চিরিয়া চিরিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া শুকাইয়া দিত এবং নীলকান্ত নীচে দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া নলদময়ন্তীর পালা অভিনয় করিত— এইরূপে দীর্ঘ মধ্যাহ্ন অত্যন্ত শীঘ্র কাটিয়া যাইত। কিরণ শরৎকে তাঁহার সহিত একাসনে দর্শকশ্রেণীভুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু শরৎ অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন এবং শরতের সম্মুখে নীলকান্তের প্রতিভাও সম্পূর্ণ স্ফূর্তি পাইত না। শাশুড়ি এক একদিন ঠাকুর-দেবতার নাম শুনিবার আশায় আকৃষ্ট হইয়া আসিতেন কিন্তু অবিলম্বে তাঁহার চিরাভ্যস্ত মধ্যাহ্নকালীন নিদ্রাবেশ ভক্তিকে অভিভূত এবং তাঁহাকে শয্যাশায়ী করিয়া দিত।

শরতের কাছ হইতে কান্‌মলা চড়টা চাপড়টা নীলকান্তের অদৃষ্টে প্রায়ই জুটিত; কিন্তু তদপেক্ষা কঠিনতর শাসনপ্রণালীতে আজন্ম অভ্যস্ত থাকাতে সেটা তাহার নিকট অপমান বা বেদনাজনক বোধ হইত না। নীলকান্তের দৃঢ় ধারণা ছিল যে, পৃথিবীর জলস্থলবিভাগের ন্যায় মানবজন্মটা আহার এবং প্রহারে বিভক্ত; প্রহারের অংশটাই অধিক।

নীলকান্তের ঠিক কত বয়স নির্ণয় করিয়া বলা কঠিন; যদি চোদ্দ-পনেরো হয় তবে

বয়সের অপেক্ষা মুখ অনেক পাকিয়াছে বলিতে হইবে, যদি সতেরো আঠারো হয় তবে বয়সের অনুরূপ পাক ধরে নাই। হয় সে অকালপক্ক, নয় সে অকাল-অপক্ক।

আসল কথা এই, সে অতি অল্প বয়সেই যাত্রার দলে ঢুকিয়া রাধিকা, দময়ন্তী, সীতা এবং বিদ্যার সখী সাজিত। অধিকারীর আবশ্যকমতো বিধাতার বরে খানিক দূর পর্যন্ত বাড়িয়া তাহার বাড় থামিয়া গেল। তাহাকে সকলে ছোটোই দেখিত, আপনাকেও সে ছোটোই জ্ঞান করিত, বয়সের উপযুক্ত সম্মান সে কাহারো কাছে পাইত না। এই সকল স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক কারণ-প্রভাবে সতেরো বৎসর বয়সের সময় তাহাকে অনতিপক্ক সতেরোর অপেক্ষা অতিপরিপক্ক চোদ্দর মতো দেখাইত। গোঁফের রেখা না উঠাতে এই ভ্রম আরো দৃঢ়মূল হইয়াছিল। তামাকের ধোঁয়া লাগিয়াই হউক, বা বয়সানুচিত ভাষা প্রয়োগবশতই হউক, নীলকান্তের ঠোঁটের কাছটা কিছু বেশি পাকা বোধ হইত, কিন্তু তাহার বৃহৎ তারাবিশিষ্ট দুইটি চক্ষের মধ্যে একটা সারল্য এবং তারুণ্য ছিল। অনুমান করি, নীলকান্তের ভিতরটা স্বভাবত কাঁচা, কিন্তু যাত্রার দলের তা' লাগিয়া উপরিভাগে পক্কতার লক্ষণ দেখা দিয়াছে।

শরৎবাবুর আশ্রয়ে চন্দননগরের বাগানে বাস করিতে করিতে নীলকান্তের উপর স্বভাবের নিয়ম অব্যাহতভাবে আপন কাজ করিতে লাগিল। সে এতদিন যে একটা বয়ঃসন্ধিস্থলে অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘকাল থামিয়া ছিল এখানে আসিয়া সেটা কখন একসময় নিঃশব্দে পার হইয়া গেল। তাহার সতেরো-আঠারো বৎসরের বয়ঃক্রম বেশ সম্পূর্ণভাবে পরিণত হইয়া উঠিল।

তাহার সে পরিবর্তন বাহির হইতে কাহারো চোখে পড়িল না কিন্তু তাহার প্রথম লক্ষণ এই যে, যখন কিরণ নীলকান্তের প্রতি বালকযোগ্য ব্যবহার করিতেন সে মনে মনে লজ্জিত এবং ব্যথিত হইত। একদিন আমোদপ্রিয় কিরণ তাহাকে স্ত্রীবেশে সখী সাজিবার কথা বলিয়াছিলেন, সে-কথাটা অকস্মাৎ তাহার বড়োই কষ্টদায়ক লাগিল অথচ তাহার উপযুক্ত কারণ খুঁজিয়া পাইল না। আজকাল তাহাকে যাত্রার অনুকরণ করিতে ডাকিলেই সে অদৃশ্য হইয়া যাইত। সে যে একটা লক্ষ্মীছাড়া যাত্রার দলের ছোকরার অপেক্ষা অধিক কিছু নয় এ কথা কিছুতে তাহার মনে লইত না।

এমন-কি, সে বাড়ির সরকারের নিকট কিছু কিছু করিয়া লেখাপড়া শিখিবার সংকল্প করিল। কিন্তু বউঠাকরুনের স্নেহভাজন বলিয়া নীলকান্তকে সরকার দুই চক্ষে দেখিতে পারিত না, এবং মনের একাগ্রতা রক্ষা করিয়া পড়াশুনা কোনোকালে অভ্যাস না থাকাতে অক্ষরগুলো তাহার চোখের সামনে দিয়া ভাসিয়া যাইত। গঙ্গার ধারে চাঁপাতলায় গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়া কোলের উপর বই খুলিয়া সে দীর্ঘকাল বসিয়া

থাকিত; জল ছল্‌ ছল্‌ করিত, নৌকা ভাসিয়া যাইত, শাখার উপরে চঞ্চল অন্যমনস্ক পাখি কিচ্‌মিচ্‌ শব্দে স্বগত উক্তি প্রকাশ করিত, নীলকান্ত বইয়ের পাতায় চক্ষু রাখিয়া কী ভাবিত সেই জানে অথবা সেও জানে না। একটা কথা হইতে কিছুতেই আর-একটা কথায় গিয়া পৌঁছিতে পারিত না, অথচ বই পড়িতেছি মনে করিয়া তাহার ভারি একটা আত্মগৌরব উপস্থিত হইত। সামনে দিয়া যখন একটা নৌকা যাইত তখন সে আরো অধিক আড়ম্বরের সহিত বইখানা তুলিয়া বিড়্‌ বিড়্‌ করিয়া পড়ার ভান করিত; দর্শক চলিয়া গেলে সে আর পড়ার উৎসাহ রক্ষা করিতে পারিত না।

পূর্বে সে অভ্যস্ত গানগুলো যন্ত্রের মতো যথানিয়মে গাহিয়া যাইত, এখন সেই গানের সুরগুলো তাহার মনে এক অপূর্ব চাঞ্চল্য সঞ্চার করে। গানের কথা অতি যৎসামান্য, তুচ্ছ অনুপ্রাসে পরিপূর্ণ, তাহার অর্থও নীলকান্তের নিকট সম্যক বোধগম্য নহে, কিন্তু যখন সে গাহিত—

ওরে রাজহংস, জন্মি দ্বিজবংশে
এমন নৃশংস কেন হলি রে—
বল্‌ কী জন্যে, এ অরণ্যে,
রাজকন্যের প্রাণসংশয় করিলি রে—

তখন সে যেন সহসা লোকান্তরে জন্মান্তরে উপনীত হইত; তখন চারি দিকের অভ্যস্ত জগৎটা এবং তাহার তুচ্ছ জীবনটা গানে তর্জমা হইয়া একটা নূতন চেহারা ধারণ করিত। রাজহংস এবং রাজকন্যার কথা হইতে তাহার মনে এক অপরূপ ছবির আভাস জাগিয়া উঠিত, সে আপনাকে কী মনে করিত স্পষ্ট করিয়া বলা যায় না, কিন্তু যাত্রার দলের পিতৃ-মাতৃহীন ছোকরা বলিয়া ভুলিয়া যাইত। নিতান্ত অকিঞ্চনের ঘরের হতভাগ্য মলিন শিশু যখন সন্ধ্যাশয্যায় শুইয়া রাজপুত্র রাজকন্যা এবং সাত রাজার ধন মানিকের কথা শোনে, তখন সেই ক্ষীণদীপালোকিত জীর্ণ গৃহকোণের অন্ধকারে তাহার মনটা সমস্ত দারিদ্র্য ও হীনতার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া এক সর্বসম্ভব রূপকথার রাজ্যে একটা নূতন রূপ, উজ্জ্বল বেশ এবং অপ্রতিহত ক্ষমতা ধারণ করে; সেইরূপ গানের সুরের মধ্যে এই যাত্রার দলের ছেলেটি আপনাকে এবং আপনার জগৎটিকে একটি নবীন আকারে সৃজন করিয়া তুলিত— জলের ধ্বনি, পাতার শব্দ, পাখির ডাক এবং যে লক্ষ্মী এই লক্ষ্মীছাড়াকে আশ্রয় দিয়াছেন তাঁহার সহাস্য স্নেহমুখচ্ছবি, তাঁহার কল্যাণমণ্ডিত বলয়বেষ্টিত বাহু দুইখানি এবং দুর্লভ সুন্দর পুষ্পদলকোমল রক্তিম চরণযুগল কী এক মায়ামন্ত্রবলে রাগিণীর মধ্যে রূপান্তরিত হইয়া যাইত। আবার একসময় এই গীতিমরীচিকা কোথায় অপসারিত হইত, যাত্রার দলের নীলকান্ত ঝাঁকড়া

চুল লইয়া প্রকাশ পাইত, আমবাগানের অধ্যক্ষ প্রতিবেশীর অভিযোগক্রমে শরৎ আসিয়া তাহার গালে ঠাস ঠাস করিয়া চড় কষাইয়া দিতেন, এবং বালক-ভক্তমণ্ডলীর অধিনায়ক হইয়া নীলকান্ত জলে স্থলে এবং তরুশাখাগ্রে নব নব উপদ্রব সৃজন করিতে বাহির হইত।

ইতিমধ্যে শরতের ভাই সতীশ কলিকাতা কলেজের ছুটিতে বাগানে আসিয়া আশ্রয় লইল। কিরণ ভারি খুশি হইলেন, তাঁহার হাতে আর-একটি কাজ জুটিল; উপবেশনে আহারে আচ্ছাদনে সমবয়স্ক ঠাকুরপোর প্রতি পরিহাসপাশ বিস্তার করিতে লাগিলেন। কখনো হাতে সিঁদুর মাখিয়া তাহার চোখ টিপিয়া ধরেন, কখনো তাহার জামার পিঠে বাঁদর লিখিয়া রাখেন, কখনো ঝনাৎ করিয়া বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সুললিত উচ্চহাস্যে পলায়ন করেন। সতীশও ছাড়িবার পাত্র নহে; সে তাঁহার চাবি চুরি করিয়া, তাঁহার পানের মধ্যে লঙ্কা পুরিয়া, অলক্ষিতে খাটের খুরার সহিত তাঁহার আঁচল বাঁধিয়া প্রতিশোধ তুলিতে থাকে। এইরূপে উভয়ে সমস্তদিন তর্জন ধাবন হাস্য, এমন-কি, মাঝে মাঝে কলহ, ক্রন্দন, সাধাসাধি এবং পুনরায় শান্তিস্থাপন চলিতে লাগিল।

নীলকান্তকে কী ভূতে পাইল কে জানে। সে কী উপলক্ষ করিয়া কাহার সহিত বিবাদ করিবে ভাবিয়া পায় না, অথচ তাহার মন তীব্র তিক্তরসে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সে তাহার ভক্ত বালকগুলিকে অন্যায়রূপে কাঁদাইতে লাগিল, তাহার সেই পোষা দিশি কুকুরটাকে অকারণে লাথি মারিয়া কেঁই কেঁই শব্দে নভোমণ্ডল ধ্বনিত করিয়া তুলিল, এমন-কি, পথে ভ্রমণের সময় সবেগে ছড়ি মারিয়া আগাছাগুলার শাখাচ্ছেদন করিয়া চলিতে লাগিল।

যাহারা ভালো খাইতে পারে, তাহাদিগকে সম্মুখে বসিয়া খাওয়াইতে কিরণ অত্যন্ত ভালোবাসেন। ভালো খাইবার ক্ষমতাটা নীলকান্তের ছিল, সুখাদ্য দ্রব্য পুনঃপুনঃ খাইবার অনুরোধ তাহার নিকট কদাচ ব্যর্থ হইত না। এই জন্য কিরণ প্রায় তাহাকে ডাকিয়া লইয়া নিজে থাকিয়া খাওয়াইতেন, এবং এই ব্রাহ্মণবালকের তৃপ্তিপূর্বক আহার দেখিয়া তিনি বিশেষ সুখ অনুভব করিতেন। সতীশ আসার পরে অনবসরবশত নীলকান্তের আহারস্থলে প্রায় মাঝে মাঝে কিরণকে অনুপস্থিত থাকিতে হইত; পূর্বে এরূপ ঘটনায় তাহার ভোজনের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইত না, সে সর্বশেষে দুধের বাটি ধুইয়া তাহার জলসুদ্ধ খাইয়া তবে উঠিত— কিন্তু আজকাল কিরণ নিজে ডাকিয়া না খাওয়াইলে তাহার বক্ষ ব্যথিত, তাহার মুখ বিস্বাদ হইয়া উঠিত, না খাইয়া উঠিয়া পড়িত; বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে দাসীকে বলিয়া যাইত, আমার ক্ষুধা নাই। মনে করিত, কিরণ সংবাদ পাইয়া এখনি অনুতপ্তচিত্তে তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইবেন, এবং খাইবার জন্য

বারংবার অনুরোধ করিবেন, সে তথাপি কিছুতেই সে অনুরোধ পালন করিবে না, বলিবে, আমার ক্ষুধা নাই। কিন্তু কিরণকে কেহ সংবাদও দেয় না, কিরণ তাহাকে ডাকিয়াও পাঠান না; খাবার যাহা থাকে দাসী খাইয়া ফেলে। তখন সে আপন শয়নগৃহের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া অন্ধকার বিছানার উপর পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া ফাঁপিয়া ফাঁপিয়া মুখের উপর সবলে বালিশ চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে থাকে; কিন্তু কী তাহার নালিশ, কাহার উপরে তাহার দাবি, কে তাহাকে সান্ত্বনা করিতে আসিবে! যখন কেহই আসে না, তখন স্নেহময়ী বিশ্বধাত্রী নিদ্রা আসিয়া ধীরে ধীরে কোমলকরস্পর্শে এই মাতৃহীন ব্যথিত বালকের অভিমান শান্ত করিয়া দেন।

নীলকান্তের দৃঢ় ধারণা হইল, সতীশ কিরণের কাছে তাহার নামে সর্বদাই লাগায়; যেদিন কিরণ কোনো কারণে গম্ভীর হইয়া থাকিতেন সেদিন নীলকান্ত মনে করিত, সতীশের চক্রান্তে কিরণ তাহারই উপর রাগ করিয়া আছেন।

এখন হইতে নীলকান্ত একমনে তীব্র আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সর্বদাই দেবতার নিকট প্রার্থনা করে, "আর-জন্মে আমি যেন সতীশ হই এবং সতীশ যেন আমি হয়।" সে জানিত, ব্রাহ্মণের একান্ত মনের অভিশাপ কখনো নিষ্ফল হয় না, এই জন্য সে মনে মনে সতীশকে ব্রহ্মতেজে দগ্ধ করিতে গিয়া নিজে দগ্ধ হইতে থাকিত, এবং উপরের তলা হইতে সতীশ ও তাহার বউঠাকুরানীর উচ্ছ্বসিত উচ্চহাস্যমিশ্রিত পরিহাসকলরব শুনিতে পাইত।

নীলকান্ত স্পষ্টত সতীশের কোনোরূপ শত্রুতা করিতে সাহস করিত না, কিন্তু সুযোগমতো তাহার ছোটোখাটো অসুবিধা ঘটাইয়া প্রীতিলাভ করিত। ঘাটের সোপানে সাবান রাখিয়া সতীশ যখন গঙ্গায় নামিয়া ডুব দিতে আরম্ভ করিত তখন নীলকান্ত ফস্ করিয়া আসিয়া সাবান চুরি করিয়া লইত; সতীশ যথাকালে সাবানের সন্ধানে আসিয়া দেখিত, সাবান নাই। একদিন নাহিতে নাহিতে হঠাৎ দেখিল তাহার বিশেষ শখের চিকনের-কাজ-করা জামাটি গঙ্গার জলে ভাসিয়া যাইতেছে; ভাবিল, হাওয়ায় উড়িয়া গেছে, কিন্তু হাওয়াটা কোন্ দিক হইতে বহিল তাহা কেহ জানে না।

একদিন সতীশকে আমোদ দিবার জন্য কিরণ নীলকান্তকে ডাকিয়া তাহাকে যাত্রার গান গাহিতে বলিলেন, নীলকান্ত নিরুত্তর হইয়া রহিল; কিরণ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর আবার কী হল রে।" নীলকান্ত তাহার জবাব দিল না। কিরণ পুনশ্চ বলিলেন, "সেই গানটা গা-না।" "সে আমি ভুলে গেছি" বলিয়া নীলকান্ত চলিয়া গেল।

অবশেষে কিরণের দেশে ফিরিবার সময় হইল। সকলেই প্রস্তুত হইতে লাগিল; সতীশও সঙ্গে যাইবে। কিন্তু নীলকান্তকে কেহ কোনো কথাই বলে না। সে সঙ্গে যাইবে কি থাকিবে, সে প্রশ্নমাত্র কাহারো মনে উদয় হয় না।

কিরণ নীলকান্তকে সঙ্গে লইবার প্রস্তাব করিলেন। তাহাতে শাশুড়ি স্বামী এবং দেবর সকলেই একবাক্যে আপত্তি করিয়া উঠিলেন, কিরণও তাঁহার সংকল্প ত্যাগ করিলেন। অবশেষে যাত্রার দুই দিন আগে ব্রাহ্মণবালককে ডাকিয়া কিরণ তাহাকে স্নেহবাক্যে স্বদেশে যাইতে উপদেশ করিলেন।

সে উপরি উপরি কয়দিন অবহেলার পর মিষ্টবাক্য শুনিতে পাইয়া আর থাকিতে পারিল না, একেবারে কাঁদিয়া উঠিল। কিরণেরও চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠিল; যাহাকে চিরকাল কাছে রাখা যাইবে না তাহাকে কিছুদিন আদর দিয়া তাহার মায়া বসিতে দেওয়া ভালো হয় নাই বলিয়া কিরণের মনে বড়ো অনুতাপ উপস্থিত হইল।

সতীশ কাছে উপস্থিত ছিল; সে অতবড়ো ছেলের কান্না দেখিয়া ভারি বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আরে মোলো, কথা নাই বার্তা নাই, একেবারে কাঁদিয়াই অস্থির!"

কিরণ এই কঠোর উক্তির জন্য সতীশকে ভর্ৎসনা করিলেন। সতীশ কহিল, "তুমি বোঝ না বউদিদি, তুমি সকলকেই বড়ো বেশি বিশ্বাস করো; কোথাকার কে তাহার ঠিক নাই, এখানে আসিয়া দিব্য রাজার হালে আছে। আবার পুনর্মূষিক হইবার আশঙ্কায় আজ মায়াকান্না জুড়িয়াছে— ও বেশ জানে যে, দুফোঁটা চোখের জল ফেলিলেই তুমি গলিয়া যাইবে।"

নীলকান্ত তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল; কিন্তু তাহার মনটা সতীশের কাল্পনিক মূর্তিকে ছুরি হইয়া কাটিতে লাগিল, ছুঁচ হইয়া বিঁধিতে লাগিল, আগুন হইয়া জ্বালাইতে লাগিল, কিন্তু প্রকৃত সতীশের গায়ে একটি চিহ্নমাত্র বসিল না, কেবল তাহারই মর্মস্থল হইতে রক্তপাত হইতে লাগিল।

কলিকাতা হইতে সতীশ একটি শৌখিন দোয়াতদান কিনিয়া আনিয়াছিল, তাহাতে দুই পাশে দুই ঝিনুকের নৌকার উপর দোয়াত বসানো এবং মাঝে একটা জর্মন্‌ রৌপ্যের হাঁস উন্মুক্ত চঞ্চুপুটে কলম লইয়া পাখা মেলিয়া বসিয়া আছে, সেটির প্রতি সতীশের অত্যন্ত যত্ন ছিল; প্রায় সে মাঝে মাঝে সিল্কের রুমাল দিয়া অতি সযত্নে সেটি ঝাড়পোঁচ করিত। কিরণ প্রায়ই পরিহাস করিয়া সেই রৌপ্যহংসের চঞ্চু-অগ্রভাগে অঙ্গুলির আঘাত করিয়া বলিতেন "ওরে রাজহংস, জন্মি দ্বিজবংশে এমন নৃশংস কেন হলি রে" এবং ইহাই উপলক্ষ করিয়া দেবরে তাঁহাতে হাস্যকৌতুকে বাগযুদ্ধ চলিত।

স্বদেশযাত্রার আগের দিন সকালবেলায় সে জিনিসটা খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। কিরণ হাসিয়া কহিলেন, "ঠাকুরপো, তোমার রাজহংস তোমার দময়ন্তীর অন্বেষণে উড়িয়াছে।"

কিন্তু সতীশ অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিল। নীলকান্তই যে সেটা চুরি করিয়াছে সে-বিষয়ে তাহার সন্দেহমাত্র রহিল না— গতকল্য সন্ধ্যার সময় তাহাকে সতীশের ঘরের কাছে ঘুর ঘুর করিতে দেখিয়াছে, এমন সাক্ষীও পাওয়া গেল।

সতীশের সম্মুখে অপরাধী আনীত হইল। সেখানে কিরণও উপস্থিত ছিলেন। সতীশ একেবারেই তাহাকে বলিয়া উঠিলেন, "তুই আমার দোয়াত চুরি করে কোথায় রেখেছিস, এনে দে।"

নীলকান্ত নানা অপরাধে এবং বিনা অপরাধেও শরতের কাছে অনেক মার খাইয়াছে এবং বরাবর প্রফুল্লচিত্তে তাহা বহন করিয়াছে। কিন্তু কিরণের সম্মুখে যখন তাহার নামে দোয়াত চুরির অপবাদ আসিল, তখন তাহার বড়ো বড়ো দুই চোখ আগুনের মতো জ্বলিতে লাগিল; তাহার বুকের কাছটা ফুলিয়া কণ্ঠের কাছে ঠেলিয়া উঠিল; সতীশ আর একটা কথা বলিলেই সে তাহার দুই হাতের দশ নখ লইয়া ক্রুদ্ধ বিড়ালশাবকের মতো সতীশের উপর গিয়া পড়িত।

তখন কিরণ তাহাকে পাশের ঘরে ডাকিয়া লইয়া মৃদুমিষ্টস্বরে বলিলেন, "নীলু, যদি সেই দোয়াতটা নিয়ে থাকিস আমাকে আস্তে আস্তে দিয়ে যা, তোকে কেউ কিছু বলবে না।"

তখন নীলকান্তের চোখ ফাটিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল, অবশেষে সে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কিরণ বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "নীলকান্ত কখনোই চুরি করে নি।"

শরৎ এবং সতীশ উভয়েই বলিতে লাগিলেন, "নিশ্চয়, নীলকান্ত ছাড়া আর কেহই চুরি করে নি।"

কিরণ সবলে বলিলেন, "কখনোই না।"

শরৎ নীলকান্তকে ডাকিয়া সওয়াল করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিরণ বলিলেন, "না, উহাকে এই চুরি সম্বন্ধে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে না।"

সতীশ কহিলেন, "উহার ঘর এবং বাক্স খুঁজিয়া দেখা উচিত।"

কিরণ বলিলেন, "তাহা যদি কর, তাহা হইলে তোমার সঙ্গে আমার জন্মশোধ আড়ি হইবে। নির্দোষীর প্রতি কোনোরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিতে পাইবে না।"

বলিতে বলিতে তাঁহার চোখের পাতা দুই ফোঁটা জলে ভিজিয়া উঠিল। তাহার

পর সেই দুটি করুণ চক্ষুর অশ্রুজলের দোহাই মানিয়া নীলকান্তের প্রতি আর কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করা হইল না।

নিরীহ আশ্রিত বালকের প্রতি এইরূপ অত্যাচারে কিরণের মনে অত্যন্ত দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি ভালো দুইজোড়া ফরাশডাঙার ধুতিচাদর, দুইটি জামা, একজোড়া নূতন জুতা এবং একটি দশ টাকার নোট লইয়া সন্ধ্যাবেলায় নীলকান্তের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, নীলকান্তকে না বলিয়া সেই স্নেহ-উপহারগুলি আস্তে আস্তে তাহার বাক্সর মধ্যে রাখিয়া আসিবেন। টিনের বাক্সটিও তাঁহার দত্ত।

আঁচল হইতে চাবির গোচ্ছা লইয়া নিঃশব্দে সেই বাক্স খুলিলেন। কিন্তু তাঁহার উপহারগুলি ধরাইতে পারিলেন না। বাক্সর মধ্যে লাটাই, কঞ্চি, কাঁচা আম কাটিবার জন্য ঘষা ঝিনুক, ভাঙা গ্লাসের তলা প্রভৃতি নানা জাতীয় পদার্থ স্তূপাকারে রক্ষিত।

কিরণ ভাবিলেন, বাক্সটি ভালো করিয়া গুছাইয়া তাহার মধ্যে সকল জিনিস ধরাইতে পারিবেন। সেই উদ্দেশে বাক্সটি খালি করিতে লাগিলেন। প্রথমে লাটাই লাঠিম ছুরি ছড়ি প্রভৃতি বাহির হইতে লাগিল; তাহার পরে খানকয়েক ময়লা এবং কাচা কাপড় বাহির হইল, তাহার পরে সকলের নীচে হঠাৎ সতীশের সেই বহুযত্নের রাজহংসশোভিত দোয়াতদানটি বাহির হইয়া আসিল।

কিরণ আশ্চর্য হইয়া আরক্তিমমুখে অনেকক্ষণ সেটি হাতে করিয়া লইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে কখন নীলকান্ত পশ্চাৎ হইতে ঘরে প্রবেশ করিল তিনি তাহা জানিতেও পারিলেন না। নীলকান্ত সমস্তই দেখিল, মনে করিল, কিরণ স্বয়ং চোরের মতো তাহার চুরি ধরিতে আসিয়াছেন এবং তাহার চুরিও ধরা পড়িয়াছে। সে যে সামান্য চোরের মতো লোভে পড়িয়া চুরি করে নাই, সে যে কেবল প্রতিহিংসাসাধনের জন্য এ কাজ করিয়াছে, সে যে ঐ জিনিসটা গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিবে বলিয়াই ঠিক করিয়াছিল, কেবল এক মুহূর্তের দুর্বলতাবশত ফেলিয়া না দিয়া নিজের বাক্সর মধ্যে পুরিয়াছে, সে-সকল কথা সে কেমন করিয়া বুঝাইবে। সে চোর নয়, সে চোর নয়! তবে সে কী। কেমন করিয়া বলিবে সে কী। সে চুরি করিয়াছে কিন্তু সে চোর নহে। কিরণ যে তাহাকে চোর বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন, এ নিষ্ঠুর অন্যায় সে কিছুতেই বুঝাইতেও পারিবে না, বহন করিতেও পারিবে না।

কিরণ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সেই দোয়াতদানটা বাক্সর ভিতরে রাখিলেন। চোরের মতো তাহার উপরে ময়লা কাপড় চাপা দিলেন, তাহার উপরে বালকের লাটাই

লাঠি লাঠিম ঝিনুক কাঁচের টুকরা প্রভৃতি সমস্তই রাখিলেন এবং সর্বোপরি তাঁহার উপহারগুলি ও দশ টাকার নোটটি সাজাইয়া রাখিলেন।

কিন্তু পরের দিন সেই ব্রাহ্মণবালকের কোনো উদ্দেশ পাওয়া গেল না। গ্রামের লোকেরা বলিল, তাহাকে দেখে নাই; পুলিস বলিল, তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। তখন শরৎ বলিলেন, "এইবার নীলকান্তের বাক্সটা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক্।"

কিরণ জেদ করিয়া বলিলেন, "সে কিছুতেই হইবে না।"

বলিয়া বাক্সটি আপন ঘরে আনাইয়া দোয়াতটি বাহির করিয়া গোপনে গঙ্গার জলে ফেলিয়া আসিলেন।

শরৎ সপরিবারে দেশে চলিয়া গেলেন; বাগান একদিনে শূন্য হইয়া গেল। কেবল নীলকান্তের সেই পোষা গ্রাম্য কুকুরটা আহার ত্যাগ করিয়া নদীর ধারে ধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ফাল্গুন ১৩০১

দিদি

প্রথম পরিচ্ছেদ

পল্লীবাসিনী কোনো এক হতভাগিনীর অন্যায়কারী অত্যাচারী স্বামীর দুষ্কৃতিসকল সবিস্তারে বর্ণনপূর্বক প্রতিবেশিনী তারা অত্যন্ত সংক্ষেপে নিজের রায় প্রকাশ করিয়া কহিল, "এমন স্বামীর মুখে আগুন।"

শুনিয়া জয়গোপালবাবুর স্ত্রী শশী অত্যন্ত পীড়া অনুভব করিলেন— স্বামীজাতির মুখে চুরটের আগুন ছাড়া অন্য কোনো প্রকার আগুন কোনো অবস্থাতেই কামনা করা স্ত্রীজাতিকে শোভা পায় না।

অতএব এ সম্বন্ধে তিনি কিঞ্চিৎ সংকোচ প্রকাশ করাতে কঠিনহৃদয় তারা দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত কহিল, "এমন স্বামী থাকার চেয়ে সাতজন্ম বিধবা হওয়া ভালো।" এই বলিয়া সে সভাভঙ্গ করিয়া চলিয়া গেল।

শশী মনে মনে কহিল, স্বামীর এমন কোনো অপরাধ কল্পনা করিতে পারি না, যাহাতে তাঁহার প্রতি মনের ভাব এত কঠিন হইয়া উঠিতে পারে। এই কথা মনের মধ্যে আলোচনা করিতে করিতেই তাহার কোমল হৃদয়ের সমস্ত প্রীতিরস তাহার প্রবাসী স্বামীর অভিমুখে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; শয্যাতলে তাহার স্বামী যে অংশে শয়ন করিত

সেই অংশের উপর বাহু প্রসারণ করিয়া পড়িয়া শূন্য বালিশকে চুম্বন করিল, বালিশের মধ্যে স্বামীর মাথার আঘ্রাণ অনুভব করিল এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া কাঠের বাক্স হইতে স্বামীর একখানি বহুকালের লুপ্তপ্রায় ফোটোগ্রাফ এবং হাতের লেখা চিঠিগুলি বাহির করিয়া বসিল। সেদিনকার নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন এইরূপে নিভৃত কক্ষে নির্জন চিন্তায় পুরাতন স্মৃতিতে এবং বিষাদের অশ্রুজলে কাটিয়া গেল।

শশিকলা এবং জয়গোপালের যে নবদাম্পত্য তাহা নহে। বাল্যকালে বিবাহ হইয়াছিল, ইতিমধ্যে সন্তানাদিও হইয়াছে। উভয়ে বহুকাল একত্রে অবস্থান করিয়া নিতান্ত সহজ সাধারণ ভাবেই দিন কাটিয়াছে। কোনো পক্ষেই অপরিমিত প্রেমোচ্ছ্বাসের কোনো লক্ষণ দেখা যায় নাই। প্রায় ষোল বৎসর একাদিক্রমে অবিচ্ছেদে যাপন করিয়া হঠাৎ কর্মবশে তাহার স্বামী বিদেশে চলিয়া যাওয়ার পর শশীর মনে একটা প্রবল প্রেমাবেগ জাগ্রত হইয়া উঠিল। বিরহের দ্বারা বন্ধনে যতই টান পড়িল কোমল হৃদয়ে প্রেমের ফাঁস ততই শক্ত করিয়া আঁটিয়া ধরিল; ঢিলা অবস্থায় যাহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারে নাই এখন তাহার বেদনা টন্‌টন্‌ করিতে লাগিল।

তাই আজ এতদিন পরে এত বয়সে ছেলের মা হইয়া শশী বসন্তমধ্যাহ্নে নির্জন ঘরে বিরহশয্যায় উন্মেষিতযৌবনা নববধূর সুখস্বপ্ন দেখিতে লাগিল। যে প্রেম অজ্ঞাতভাবে জীবনের সম্মুখ দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে সহসা আজ তাহারই কলগীতিশব্দে জাগ্রত হইয়া মনে মনে তাহারই উজান বাহিয়া দুই তীরে বহুদূরে অনেক সোনার পুরী অনেক কুঞ্জবন দেখিতে লাগিল— কিন্তু সেই অতীত সুখসম্ভাবনার মধ্যে এখন আর পদার্পণ করিবার স্থান নাই। মনে করিতে লাগিল, "এইবার যখন স্বামীকে নিকটে পাইব তখন জীবনকে নীরস এবং বসন্তকে নিষ্ফল হইতে দিব না।" কতদিন কতবার তুচ্ছ তর্কে সামান্য কলহে স্বামীর প্রতি সে উপদ্রব করিয়াছে; আজ অনুতপ্তচিত্তে একান্ত মনে সংকল্প করিল, আর কখনোই সে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিবে না, স্বামীর ইচ্ছায় বাধা দিবে না, স্বামীর আদেশ পালন করিবে, প্রীতিপূর্ণ নম্র হৃদয়ে স্বামীর ভালোমন্দ সমস্ত আচরণ সহ্য করিবে— কারণ, স্বামী সর্বস্ব, স্বামী প্রিয়তম, স্বামী দেবতা।

অনেকদিন পর্যন্ত শশিকলা তাহার পিতামাতার একমাত্র আদরের কন্যা ছিল। সেই জন্য জয়গোপাল যদিও সামান্য চাকরি করিত, তবু ভবিষ্যতের জন্য তাহার কিছুমাত্র ভাবনা ছিল না। পল্লীগ্রামে রাজভোগে থাকিবার পক্ষে তাহার শ্বশুরের যথেষ্ট সম্পত্তি ছিল।

এমন সময় নিতান্ত অকালে প্রায় বৃদ্ধবয়সে শশিকলার পিতা কালীপ্রসন্নের একটি পুত্রসন্তান জন্মিল। সত্য কথা বলিতে কি, পিতামাতার এইরূপ অনপেক্ষিত অসংগত

অন্যায় আচরণে শশী মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল; জয়গোপালও সবিশেষ প্রীতিলাভ করে নাই।

অধিক বয়সের ছেলেটির প্রতি পিতামাতার স্নেহ অত্যন্ত ঘনীভূত হইয়া উঠিল। এই নবাগত, ক্ষুদ্রকায়, স্তন্যপিপাসু, নিদ্রাতুর শ্যালকটি অজ্ঞাতসারে দুই দুর্বল হস্তের অতি ক্ষুদ্র বদ্ধমুষ্টির মধ্যে জয়গোপালের সমস্ত আশাভরসা যখন অপহরণ করিয়া বসিল, তখন সে আসামের চা বাগানে এক চাকরি লইল।

নিকটবর্তী স্থানে চাকরির সন্ধান করিতে সকলেই তাহাকে পীড়াপীড়ি করিয়াছিল— কিন্তু সর্বসাধারণের উপর রাগ করিয়াই হউক অথবা চা-বাগানে দ্রুত বাড়িয়া উঠিবার কোনো উপায় জানিয়াই হউক, জয়গোপাল কাহারো কথায় কর্ণপাত করিল না; শশীকে সন্তানসহ তাহার বাপের বাড়ি রাখিয়া সে আসামে চলিয়া গেল। বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর এই প্রথম বিচ্ছেদ।

এই ঘটনায় শিশু ভ্রাতাটির প্রতি শশিকলার ভারি রাগ হইল। যে মনের আক্ষেপ মুখ ফুটিয়া বলিবার জো নাই তাহারই আক্রোশটা সব চেয়ে বেশি হয়। ক্ষুদ্র ব্যক্তিটি আরামে স্তনপান করিতে ও চক্ষু মুদিয়া নিদ্রা দিতে লাগিল এবং তাহার বড়ো ভগিনীটি— দুধ গরম, ভাত ঠাণ্ডা, ছেলের ইস্কুলে যাওয়ার দেরি প্রভৃতি নানা উপলক্ষে নিশিদিন মান অভিমান করিয়া অস্থির হইল এবং অস্থির করিয়া তুলিল।

অল্প দিনের মধ্যেই ছেলেটির মার মৃত্যু হইল; মরিবার পূর্বে জননী তাঁহার কন্যার হাতে শিশুপুত্রটিকে সমর্পণ করিয়া দিয়া গেলেন।

তখন অনতিবিলম্বেই সেই মাতৃহীন ছেলেটি অনায়াসেই তাহার দিদির হৃদয় অধিকার করিয়া লইল। হুহুংকার শব্দপূর্বক সে যখন তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পরম আগ্রহের সহিত দন্তহীন ক্ষুদ্র মুখের মধ্যে তাহার মুখ চক্ষু নাসিকা সমস্তটা গ্রাস করিবার চেষ্টা করিত, ক্ষুদ্র মুষ্টির মধ্যে তাহার কেশগুচ্ছ লইয়া কিছুতেই দখল ছাড়িতে চাহিত না, সূর্যোদয় হইবার পূর্বেই জাগিয়া উঠিয়া গড়াইয়া তাহার গায়ের কাছে আসিয়া কোমল স্পর্শে তাহাকে পুলকিত করিয়া মহাকলরব আরম্ভ করিয়া দিত; যখন ক্রমে সে তাহাকে জিজি এবং জিজিমা বলিয়া ডাকিতে লাগিল, এবং কাজকর্ম ও অবসরের সময় নিষিদ্ধ কার্য করিয়া, নিষিদ্ধ খাদ্য খাইয়া, নিষিদ্ধ স্থানে গমনপূর্বক তাহার প্রতি বিধিমতো উপদ্রব আরম্ভ করিয়া দিল, তখন শশী আর থাকিতে পারিল না। এই স্বেচ্ছাচারী ক্ষুদ্র অত্যাচারীর নিকটে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া দিল। ছেলেটির মা ছিল না বলিয়া, তাহার প্রতি তাহার আধিপত্য ঢের বেশি হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছেলেটির নাম হইল নীলমণি। তাহার বয়স যখন দুই বৎসর তখন তাহার পিতার কঠিন পীড়া হইল। অতি শীঘ্র চলিয়া আসিবার জন্য জয়গোপালের নিকট পত্র গেল। জয়গোপাল যখন বহু চেষ্টায় ছুটি লইয়া আসিয়া পৌঁছিল তখন কালীপ্রসন্নের মৃত্যুকাল উপস্থিত।

মৃত্যুর পূর্বে কালীপ্রসন্ন নাবালক ছেলেটির তত্ত্বাবধানের ভার জয়গোপালের প্রতি অর্পণ করিয়া তাঁহার বিষয়ের সিকি অংশ কন্যার নামে লিখিয়া দিলেন।

সুতরাং বিষয়রক্ষার জন্য জয়গোপালকে কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আসিতে হইল।

অনেকদিনের পরে স্বামীস্ত্রীর পুনর্মিলন হইল। একটা জড়পদার্থ ভাঙিয়া গেলে আবার ঠিক তাহার খাঁজে খাঁজে মিলাইয়া দেওয়া যায়, কিন্তু দুটি মানুষকে যেখানে বিচ্ছিন্ন করা হয় দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর আর ঠিক সেখানে রেখায় রেখায় মেলে না। কারণ, মন জিনিসটা সজীব পদার্থ, নিমেষে নিমেষে তাহার পরিণতি এবং পরিবর্তন।

শশীর পক্ষে এই নূতন মিলনে নূতন ভাবের সঞ্চার হইল। সে যেন তাহার স্বামীকে ফিরিয়া বিবাহ করিল। পুরাতন দাম্পত্যের মধ্যে চিরাভ্যাসবশত যে এক অসাড়তা জন্মিয়া গিয়াছিল, বিরহের আকর্ষণে তাহা অপসৃত হইয়া সে তাহার স্বামীকে যেন পূর্বাপেক্ষা সম্পূর্ণতর ভাবে প্রাপ্ত হইল ; মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যেমন দিনই আসুক, যতদিনই যাক, স্বামীর প্রতি এই দীপ্ত প্রেমের উজ্জ্বলতাকে কখনোই ম্লান হইতে দিব না।

নূতন মিলনে জয়গোপালের মনের অবস্থাটা অন্যরূপ। পূর্বে যখন উভয়ে অবিচ্ছেদে একত্রে ছিল, যখন স্ত্রীর সহিত তাহার সমস্ত স্বার্থের এবং বিচিত্র অভ্যাসের ঐক্যবন্ধন ছিল, স্ত্রী তখন জীবনের একটি নিত্য সত্য হইয়াছিল— তাহাকে বাদ দিতে গেলে দৈনিক অভ্যাসজালের মধ্যে সহসা অনেকখানি ফাঁক পড়িত। এইজন্য বিদেশে গিয়া জয়গোপাল প্রথম প্রথম অগাধ জলের মধ্যে পড়িয়াছিল। কিন্তু ক্রমে তাহার সেই অভ্যাসবিচ্ছেদের মধ্যে নূতন অভ্যাসের তালি লাগিয়া গেল।

কেবল তাহাই নহে। পূর্বে নিতান্ত নিশ্চেষ্ট নিশ্চিন্তভাবে তাহার দিন কাটিয়া যাইত। মাঝে দুই বৎসর অবস্থা-উন্নতি-চেষ্টা তাহার মনে এমন প্রবলভাবে জাগিয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার মনের সম্মুখে আর কিছুই ছিল না। এই নূতন নেশার তীব্রতার তুলনায় তাহার পূর্বজীবন বস্তুহীন ছায়ার মতো দেখাইতে লাগিল। স্ত্রীলোকের প্রকৃতিতে প্রধান পরিবর্তন ঘটায় প্রেম, এবং পুরুষের ঘটায় দুশ্চেষ্টা।

জয়গোপাল দুই বৎসর পরে আসিয়া অবিকল তাহার পূর্ব স্ত্রীটিকে ফিরিয়া পাইল না। তাহার স্ত্রীর জীবনে শিশু শ্যালকটি একটা নূতন পরিসর বৃদ্ধি করিয়াছে। এই অংশটি তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিচিত, এই অংশে স্ত্রীর সহিত তাহার কোনো যোগ নাই। স্ত্রী তাহাকে আপনার এই শিশুস্নেহের ভাগ দিবার অনেক চেষ্টা করিত, কিন্তু ঠিক কৃতকার্য হইত কি না বলিতে পারি না।

শশী নীলমণিকে কোলে করিয়া আনিয়া হাস্যমুখে তাহার স্বামীর সম্মুখে ধরিত— নীলমণি প্রাণপণে শশীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কাঁধে মুখ লুকাইত, কোনো প্রকার কুটুম্বিতার খাতির মানিত না। শশীর ইচ্ছা, তাহার এই ক্ষুদ্র ভ্রাতাটির যত প্রকার মন ভুলাইবার বিদ্যা আয়ত্ত আছে, সবগুলি জয়গোপালের নিকট প্রকাশ হয়; কিন্তু জয়গোপালও সেজন্য বিশেষ আগ্রহ অনুভব করিত না এবং শিশুটিও বিশেষ উৎসাহ দেখাইত না। জয়গোপাল কিছুতেই বুঝিতে পারিত না, এই কৃশকায় বৃহৎমস্তক গম্ভীরমুখ শ্যামবর্ণ ছেলেটার মধ্যে এমন কী আছে যেজন্য তাহার প্রতি এতটা স্নেহের অপব্যয় করা হইতেছে।

ভালোবাসার ভাবগতিক মেয়েরা খুব চট করিয়া বোঝে। শশী অবিলম্বেই বুঝিল, জয়গোপাল নীলমণির প্রতি বিশেষ অনুরক্ত নহে। তখন ভাইটিকে সে বিশেষ সাবধানে আড়াল করিয়া রাখিত— স্বামীর স্নেহহীন বিরাগদৃষ্টি হইতে তাহাকে তফাতে রাখিতে চেষ্টা করিত। এইরূপে ছেলেটি তাহার গোপন যত্নের ধন, তাহার একলার স্নেহের সামগ্রী হইয়া উঠিল। সকলেই জানেন, স্নেহ যত গোপনের, যত নির্জনের হয় ততই প্রবল হইতে থাকে।

নীলমণি কাঁদিলে জয়গোপাল অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিত, এই জন্য শশী তাহাকে তাড়াতাড়ি বুকের মধ্যে চাপিয়া সমস্ত প্রাণ দিয়া, বুক দিয়া, তাহার কান্না থামাইবার চেষ্টা করিত— বিশেষত, নীলমণির কান্নায় যদি রাত্রে তাহার স্বামীর ঘুমের ব্যাঘাত হইত এবং স্বামী এই ক্রন্দনপরায়ণ ছেলেটার প্রতি অত্যন্ত হিংস্রভাবে ঘৃণা প্রকাশপূর্বক জর্জর চিত্তে গর্জন করিয়া উঠিত তখন শশী যেন অপরাধিনীর মতো সংকুচিত শশব্যস্ত হইয়া পড়িত; তৎক্ষণাৎ তাহাকে কোলে করিয়া দূরে লইয়া গিয়া একান্ত সানুনয় স্নেহের স্বরে 'সোনা আমার, ধন আমার, মানিক আমার' বলিয়া ঘুম পাড়াইতে থাকিত।

ছেলেতে ছেলেতে নানা উপলক্ষে ঝগড়া বিবাদ হইয়াই থাকে। পূর্বে এরূপ স্থলে শশী নিজের ছেলেদের দণ্ড দিয়া ভাইয়ের পক্ষ অবলম্বন করিত, কারণ, তাহার মা ছিল না। এখন বিচারকের সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডবিধির পরিবর্তন হইল। এখন সর্বদাই নিরপরাধে এবং অবিচারে নীলমণিকে কঠিন দণ্ড ভোগ করিতে হইত। সেই অন্যায়

শশীর বক্ষে শেলের মতো বাজিত ; তাই সে দণ্ডিত ভ্রাতাকে ঘরে লইয়া গিয়া তাহাকে মিষ্ট দিয়া, খেলেনা দিয়া, আদর করিয়া, চুমো খাইয়া শিশুর আহত হৃদয়ে যথাসাধ্য সান্ত্বনা-বিধান করিবার চেষ্টা করিত।

ফলত দেখা গেল, শশী নীলমণিকে যতই ভালোবাসে জয়গোপাল নীলমণির প্রতি ততই বিরক্ত হয়, আবার জয়গোপাল নীলমণির প্রতি যতই বিরাগ প্রকাশ করে শশী তাহাকে ততই স্নেহসুধায় অভিষিক্ত করিয়া দিতে থাকে।

জয়গোপাল লোকটা কখনো তাহার স্ত্রীর প্রতি কোনোরূপ কঠোর ব্যবহার করে না এবং শশী নীরবে নম্রভাবে প্রীতির সহিত তাহার স্বামীর সেবা করিয়া থাকে ; কেবল এই নীলমণিকে লইয়া ভিতরে ভিতরে উভয়ে উভয়কে অহরহ আঘাত দিতে লাগিল।

এইরূপ নীরব দ্বন্দ্বের গোপন আঘাতপ্রতিঘাত প্রকাশ্য বিবাদের অপেক্ষা ঢের বেশি দুঃসহ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নীলমণির সমস্ত শরীরের মধ্যে মাথাটাই সর্বপ্রধান ছিল। দেখিলে মনে হইত, বিধাতা যেন একটা সরু কাঠির মধ্যে ফুঁ দিয়া তাহার ডগার উপরে একটা বড়ো বুদ্বুদ্ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ডাক্তাররাও মাঝে মাঝে আশঙ্কা প্রকাশ করিত, ছেলেটি এইরূপ বুদ্বুদের মতোই ক্ষণভঙ্গুর ক্ষণস্থায়ী হইবে। অনেকদিন পর্যন্ত সে কথা কহিতে এবং চলিতে শেখে নাই। তাহার বিষণ্ন গম্ভীর মুখ দেখিয়া বোধ হইত, তাহার পিতামাতা তাঁহাদের অধিক বয়সের সমস্ত চিন্তাভার এই ক্ষুদ্র শিশুর মাথার উপরে চাপাইয়া দিয়া গেছেন।

দিদির যত্নে ও সেবায় নীলমণি তাহার বিপদের কাল উত্তীর্ণ হইয়া ছয় বৎসরে পা দিল।

কার্তিক মাসে ভাইফোঁটার দিনে নূতন জামা চাদর এবং একখানি লালপেড়ে ধুতি পরাইয়া বাবু সাজাইয়া নীলমণিকে শশী ভাইফোঁটা দিতেছেন এমন সময়ে পূর্বোক্ত স্পষ্টভাষিণী প্রতিবেশিনী তারা আসিয়া কথায় কথায় শশীর সহিত ঝগড়া বাধাইয়া দিল।

সে কহিল, গোপনে ভাইয়ের সর্বনাশ করিয়া ঘটা করিয়া ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিবার কোনো ফল নাই।

শুনিয়া শশী বিস্ময়ে ক্রোধে বেদনায় বজ্রাহত হইল। অবশেষে শুনিতে পাইল, তাহারা স্বামীস্ত্রীতে পরামর্শ করিয়া নাবালক নীলমণির সম্পত্তি খাজনার দায়ে নিলাম করাইয়া তাহার স্বামীর পিসতুতো ভাইয়ের নামে বেনামি করিয়া কিনিতেছে।

শুনিয়া শশী অভিশাপ দিল, যাহারা এতবড়ো মিথ্যা কথা রটনা করিতে পারে তাহাদের মুখে কুষ্ঠ হউক।

এই বলিয়া সরোদনে স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া জনশ্রুতির কথা তাহাকে জানাইল।

জয়গোপাল কহিল, "আজকালকার দিনে কাহাকেও বিশ্বাস করিবার জো নাই। উপেন আমার আপন পিসতুতো ভাই, তাহার উপরে বিষয়ের ভার দিয়া আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলাম— সে কখন গোপনে খাজনা বাকি ফেলিয়া মহল হাসিলপুর নিজে কিনিয়া লইয়াছে, আমি জানিতেও পারি নাই।"

শশী আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "নালিশ করিবে না?"

জয়গোপাল কহিল, "ভাইয়ের নামে নালিশ করি কী করিয়া। এবং নালিশ করিয়াও তো কোনো ফল নাই, কেবল অর্থ নষ্ট।"

স্বামীর কথা বিশ্বাস করা শশীর পরম কর্তব্য, কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না। তখন এই সুখের সংসার, এই প্রেমের গার্হস্থ্য সহসা তাহার নিকট অত্যন্ত বিকট বীভৎস আকার ধারণ করিয়া দেখা দিল। যে সংসারকে আপনার পরম আশ্রয় বলিয়া মনে হইত, হঠাৎ দেখিল, সে একটা নিষ্ঠুর স্বার্থের ফাঁদ— তাহাদের দুটি ভাইবোনকে চারি দিক হইতে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। সে একা স্ত্রীলোক, অসহায় নীলমণিকে কেমন করিয়া রক্ষা করিবে ভাবিয়া কূলকিনারা পাইল না। যতই চিন্তা করিতে লাগিল ততই ভয়ে এবং ঘৃণায় এবং বিপন্ন বালক ভ্রাতাটির প্রতি অপরিসীম স্নেহে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, সে যদি উপায় জানিত তবে লাটসাহেবের নিকট নিবেদন করিয়া, এমন-কি, মহারানীর নিকট পত্র লিখিয়া তাহার ভাইয়ের সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিত। মহারানী কখনোই নীলমণির বার্ষিক সাত শো আটান্ন টাকা মুনফার হাসিলপুর মহল বিক্রয় হইতে দিতেন না।

এইরূপে শশী যখন একেবারে মহারানীর নিকট দরবার করিয়া তাহার পিসতুতো দেবরকে সম্পূর্ণ জব্দ করিয়া দিবার উপায় চিন্তা করিতেছে তখন হঠাৎ নীলমণির জ্বর আসিয়া আক্ষেপ-সহকারে মূর্ছা হইতে লাগিল।

জয়গোপাল এক গ্রাম্য নেটিভ ডাক্তারকে ডাকিল। শশী ভালো ডাক্তারের জন্য অনুরোধ করাতে জয়গোপাল বলিল, "কেন, মতিলাল মন্দ ডাক্তার কী!"

শশী তখন তাঁহার পায়ে পড়িল, মাথার দিব্য দিল; জয়গোপাল বলিল, "আচ্ছা, শহর হইতে ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইতেছি।"

শশী নীলমণিকে কোলে করিয়া, বুকে করিয়া পড়িয়া রহিল। নীলমণিও তাহাকে

একদণ্ড চোখের আড়াল হইতে দেয় না ; পাছে ফাঁকি দিয়া পালায় এই ভয়ে তাহাকে জড়াইয়া থাকে, এমন-কি, ঘুমাইয়া পড়িলেও আঁচলটি ছাড়ে না।

সমস্ত দিন এমনি ভাবে কাটিলে সন্ধ্যার পর জয়গোপাল আসিয়া বলিল, "শহরে ডাক্তারবাবুকে পাওয়া গেল না, তিনি দূরে কোথায় রোগী দেখিতে গিয়াছেন।" ইহাও বলিল, "মকদ্দমা-উপলক্ষে আমাকে আজই অন্যত্র যাইতে হইতেছে ; আমি মতিলালকে বলিয়া গেলাম, সে নিয়মিত আসিয়া রোগী দেখিয়া যাইবে।"

রাত্রে নীলমণি ঘুমের ঘোরে প্রলাপ বকিল। প্রাতঃকালেই শশী কিছুমাত্র বিচার না করিয়া রোগী ভ্রাতাকে লইয়া নৌকা চড়িয়া একেবারে শহরে গিয়া ডাক্তারের বাড়ি উপস্থিত হইল। ডাক্তার বাড়িতেই আছেন, শহর ছাড়িয়া কোথাও যান নাই। ভদ্র-স্ত্রীলোক দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বাসা ঠিক করিয়া একটি প্রাচীনা বিধবার তত্ত্বাবধানে শশীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন এবং ছেলেটির চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন।

পরদিনই জয়গোপাল আসিয়া উপস্থিত। ক্রোধে অগ্নিমূর্তি হইয়া স্ত্রীকে তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত ফিরিতে অনুমতি করিল।

স্ত্রী কহিল, "আমাকে যদি কাটিয়া ফেল তবু আমি এখন ফিরিব না ; তোমরা আমার নীলমণিকে মারিয়া ফেলিতে চাও ; উহার মা নাই, বাপ নাই, আমি ছাড়া উহার আর কেহ নাই, আমি উহাকে রক্ষা করিব।"

জয়গোপাল রাগিয়া কহিল, "তবে এইখানেই থাকো, তুমি আর আমার ঘরে ফিরিয়ো না।"

শশী তখন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়া কহিল, "ঘর তোমার কী ! আমার ভাইয়েরই তো ঘর।"

জয়গোপাল কহিল, "আচ্ছা, সে দেখা যাইবে !"

পাড়ার লোকে এই ঘটনায় কিছুদিন খুব আন্দোলন করিতে লাগিল। প্রতিবেশিনী তারা কহিল, "স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করিতে হয় ঘরে বসিয়া কর্-না, বাপু ; ঘর ছাড়িয়া যাইবার আবশ্যক কী। হাজার হউক, স্বামী তো বটে।"

সঙ্গে যাহা টাকা ছিল সমস্ত খরচ করিয়া, গহনাপত্র বেচিয়া শশী তাহার ভাইকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিল। তখন সে খবর পাইল, দ্বারিগ্রামে তাহাদের যে বড়ো জোত ছিল, যে জোতের উপরে তাহাদের বাড়ি, নানারূপে যাহার আয় প্রায় বার্ষিক দেড়হাজার টাকা হইবে, সেই জোতটি জমিদারের সহিত যোগ করিয়া জয়গোপাল নিজের নামে খারিজ করিয়া লইয়াছে। এখন বিষয়টি সমস্তই তাহাদের, তাহার ভাইয়ের নহে।

ব্যামো হইতে সারিয়া উঠিয়া নীলমণি করুণস্বরে বলিতে লাগিল, "দিদি, বাড়ি

চলো।" সেখানে তাহার সঙ্গী ভাগিনেয়দের জন্য তাহার মন-কেমন করিতেছে। তাই বারংবার বলিল, "দিদি, আমাদের সেই ঘরে চলো-না, দিদি!" শুনিয়া দিদি কেবলই কাঁদিতে লাগিল। "আমাদের ঘর আর কোথায়!"

কিন্তু কেবল কাঁদিয়া কোনো ফল নাই, তখন পৃথিবীতে দিদি ছাড়া তাহার ভাইয়ের আর কেহ ছিল না। ইহা ভাবিয়া চোখের জল মুছিয়া শশী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তারিণীবাবুর অন্তঃপুরে গিয়া তাঁহার স্ত্রীকে ধরিল।

ডেপুটিবাবু জয়গোপালকে চিনিতেন। ভদ্রঘরের স্ত্রী ঘরের বাহির হইয়া বিষয়-সম্পত্তি লইয়া স্বামীর সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে চাহে, ইহাতে শশীর প্রতি তিনি বিশেষ বিরক্ত হইলেন। তাহাকে ভুলাইয়া রাখিয়া তৎক্ষণাৎ জয়গোপালকে পত্র লিখিলেন। জয়গোপাল শ্যালকসহ তাহার স্ত্রীকে বলপূর্বক নৌকায় তুলিয়া বাড়ি লইয়া গিয়া উপস্থিত করিল।

স্বামিস্ত্রীতে দ্বিতীয় বিচ্ছেদের পর পুনশ্চ এই দ্বিতীয়বার মিলন হইল। প্রজাপতির নির্বন্ধ!

অনেকদিন পরে ঘরে ফিরিয়া পুরাতন সহচরদিগকে পাইয়া নীলমণি বড়ো আনন্দে খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার সেই নিশ্চিন্ত আনন্দ দেখিয়া অন্তরে অন্তরে শশীর হৃদয় বিদীর্ণ হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শীতকালে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মফঃস্বল পর্যবেক্ষণে বাহির হইয়া শিকারসন্ধানে গ্রামের মধ্যে তাঁবু ফেলিয়াছেন। গ্রামের পথে সাহেবের সঙ্গে নীলমণির সাক্ষাৎ হয়। অন্য বালকেরা তাঁহাকে দেখিয়া চাণক্যশ্লোকের কিঞ্চিৎ পরিবর্তনপূর্বক নখী দন্তী শৃঙ্গী প্রভৃতির সহিত সাহেবকেও যোগ করিয়া যথেষ্ট দূরে সরিয়া গেল। কিন্তু, সুগম্ভীর-প্রকৃতি নীলমণি অটল কৌতূহলের সহিত প্রশান্তভাবে সাহেবকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল।

সাহেব সকৌতুকে কাছে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি পাঠশালায় পড়?"

বালক নীরবে মাথা নাড়িয়া জানাইল, "হাঁ।"

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোন্ পুস্তক পড়িয়া থাক?"

নীলমণি পুস্তক শব্দের অর্থ না বুঝিয়া নিস্তব্ধভাবে ম্যাজিস্ট্রেটের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সহিত এই পরিচয়ের কথা নীলমণি অত্যন্ত উৎসাহের সহিত তাহার দিদির নিকট বর্ণনা করিল।

মধ্যাহ্নে চাপকান প্যান্টলুন পাগড়ি পরিয়া জয়গোপাল ম্যাজিস্ট্রেটকে সেলাম করিতে গিয়াছে। অর্থী প্রত্যর্থী চাপরাশি কনস্টেবলে চারি দিক লোকারণ্য। সাহেব গরমের ভয়ে তাম্বুর বাহিরে খোলা ছায়ায় ক্যাম্প টেবিল পাতিয়া বসিয়াছেন এবং জয়গোপালকে চৌকিতে বসাইয়া তাহাকে স্থানীয় অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। জয়গোপাল তাহার গ্রামবাসী সর্বসাধারণের সমক্ষে এই গৌরবের আসন অধিকার করিয়া মনে মনে স্ফীত হইতেছিল এবং মনে করিতেছিল, 'এই সময়ে চক্রবর্তীরা এবং নন্দীরা কেহ আসিয়া দেখিয়া যায় তো বেশ হয়!'

এমন সময় নীলমণিকে সঙ্গে করিয়া অবগুণ্ঠনাবৃত একটি স্ত্রীলোক একেবারে ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "সাহেব, তোমার হাতে আমার এই অনাথ ভাইটিকে সমর্পণ করিলাম, তুমি ইহাকে রক্ষা করো।"

সাহেব তাঁহার সেই পূর্বপরিচিত বৃহৎমস্তক গম্ভীরপ্রকৃতি বালকটিকে দেখিয়া এবং স্ত্রীলোকটিকে ভদ্রস্ত্রীলোক বলিয়া অনুমান করিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, "আপনি তাঁবুতে প্রবেশ করুন।"

স্ত্রীলোকটি কহিল, "আমার যাহা বলিবার আছে আমি এইখানেই বলিব।"

জয়গোপাল বিবর্ণমুখে ছট্ফট্ করিতে লাগিল। কৌতূহলী গ্রামের লোকেরা পরম কৌতুক অনুভব করিয়া চারি দিকে ঘেঁষিয়া আসিবার উপক্রম করিল। সাহেব বেত উঁচাইবামাত্র সকলে দৌড় দিল।

তখন শশী তাহার ভ্রাতার হাত ধরিয়া সেই পিতৃমাতৃহীন বালকের সমস্ত ইতিহাস আদ্যোপান্ত বলিয়া গেল। জয়গোপাল মধ্যে মধ্যে বাধা দিবার উপক্রম করাতে ম্যাজিস্ট্রেট রক্তবর্ণ মুখে গর্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "চুপ রও!" এবং বেত্রাগ্র দ্বারা তাহাকে চৌকি ছাড়িয়া সম্মুখে দাঁড়াইতে নির্দেশ করিয়া দিলেন।

জয়গোপাল মনে মনে শশীর প্রতি গর্জন করিতে করিতে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নীলমণি দিদির অত্যন্ত কাছে ঘেঁষিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল।

শশীর কথা শেষ হইলে ম্যাজিস্ট্রেট জয়গোপালকে গুটিকতক প্রশ্ন করিলেন এবং তাহার উত্তর শুনিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শশীকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, "বাছা, এ মকর্দমা যদিও আমার কাছে উঠিতে পারে না তথাপি তুমি নিশ্চিন্ত থাকো— এ-সম্বন্ধে যাহা কর্তব্য আমি করিব। তুমি তোমার ভাইটিকে লইয়া নির্ভয়ে বাড়ি ফিরিয়া যাইতে পার।"

শশী কহিল, "সাহেব, যতদিন নিজের বাড়ি ও না ফিরিয়া পায়, ততদিন আমার ভাইকে বাড়ি লইয়া যাইতে আমি সাহস করি না। এখন নীলমণিকে তুমি নিজের কাছে না রাখিলে ইহাকে কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না।"

সাহেব কহিলেন, "তুমি কোথায় যাইবে?"

শশী কহিল, "আমি আমার স্বামীর ঘরে ফিরিয়া যাইব, আমার কোনো ভাবনা নাই।"

সাহেব ঈষৎ হাসিয়া অগত্যা এই গলায়-মাদুলি-পরা কৃশকায় শ্যামবর্ণ গম্ভীর প্রশান্ত মৃদুস্বভাব বাঙালির ছেলেটিকে সঙ্গে লইতে রাজি হইলেন।

তখন শশী বিদায় লইবার সময় বালক তাহার আঁচল চাপিয়া ধরিল। সাহেব কহিলেন, "বাবা, তোমার কোনো ভয় নেই— এসো।"

ঘোমটার মধ্য হইতে অবিরল অশ্রু মোচন করিতে করিতে শশী কহিল, "লক্ষ্মী ভাই, যা, ভাই— আবার তোর দিদির সঙ্গে দেখা হবে।"

এই বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া কোনোমতে আপন অঞ্চল ছাড়াইয়া তাড়াতাড়ি সে চলিয়া গেল; অমনি সাহেব নীলমণিকে বাম হস্তের দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরিলেন, সে 'দিদি গো, দিদি' করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল— শশী একবার ফিরিয়া চাহিয়া দূর হইতে প্রসারিত দক্ষিণ হস্তে তাহার প্রতি নীরবে সান্ত্বনা প্রেরণ করিয়া বিদীর্ণ হৃদয়ে চলিয়া গেল।

আবার সেই বহুকালের চিরপরিচিত পুরাতন ঘরে স্বামীস্ত্রীর মিলন হইল। প্রজাপতির নির্বন্ধ!

কিন্তু, এ মিলন অধিকদিন স্থায়ী হইল না। কারণ, ইহার অনতিকাল পরেই একদিন প্রাতঃকালে গ্রামবাসীগণ সংবাদ পাইল যে, রাত্রে শশী ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া মরিয়াছে এবং রাত্রেই তাহার দাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেছে।

কেহ এ সম্বন্ধে কোনো কথা বলিল না। কেবল সেই প্রতিবেশিনী তারা মাঝে মাঝে গর্জন করিয়া উঠিতে চাহিত, সকলে 'চুপ্ চুপ্' করিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিত।

বিদায়কালে শশী ভাইকে কথা দিয়া গিয়াছিল, আবার দেখা হইবে। সে কথা কোন্‌খানে রক্ষা হইয়াছে জানি না।

চৈত্র ১৩০১

প্রবন্ধ

জাপানযাত্রী

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

মহিলাবিদ্যাপীঠে রবীন্দ্রনাথ

কারুইজাওআ. জাপান, ১৯১৬

জাপানযাত্রী

বোম্বাই থেকে যতবার যাত্রা করেছি জাহাজ চলতে দেরি করে নি। কলকাতার জাহাজে যাত্রার আগের রাত্রে গিয়ে বসে থাকতে হয়। এটা ভালো লাগে না। কেননা, যাত্রা করবার মানেই মনের মধ্যে চলার বেগ সঞ্চয় করা। মন যখন চলবার মুখে তখন তাকে দাঁড় করিয়ে রাখা, তার এক শক্তির সঙ্গে তার আর-এক শক্তির লড়াই বাধানো। মানুষ যখন ঘরের মধ্যে জমিয়ে বসে আছে তখন বিদায়ের আয়োজনটা এইজন্যেই কষ্টকর; কেননা, থাকার সঙ্গে যাওয়ার সন্ধিস্থলটা মনের পক্ষে মুশকিলের জায়গা— সেখানে তাকে দুই উলটো দিক সামলাতে হয়, সে একরকমের কঠিন ব্যায়াম।

বাড়ির লোকেরা সকলেই জাহাজে চড়িয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে গেল, বন্ধুরা ফুলের মালা গলায় পরিয়ে দিয়ে বিদায় দিলে, কিন্তু জাহাজ চললো না। অর্থাৎ, যারা থাকবার তারাই গেল, আর যেটা চলবার সেটাই স্থির হয়ে রইল; বাড়ি গেল সরে, আর তরী রইল দাঁড়িয়ে।

বিদায়মাত্রেরই একটা ব্যথা আছে; সে ব্যথাটার প্রধান কারণ এই, জীবনে যা-কিছুকে সব-চেয়ে নির্দিষ্ট করে পাওয়া গেছে তাকে অনির্দিষ্টের আড়ালে সমর্পণ করে যাওয়া। তার বদলে হাতে হাতে আর-একটা কিছুকে পাওয়া না গেলে এই শূন্যতাটাই মনের মধ্যে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। সেই পাওনাটা হচ্ছে অনির্দিষ্টকে ক্রমে ক্রমে নির্দিষ্টের ভাণ্ডারের মধ্যে পেয়ে চলতে থাকা। অপরিচয়কে ক্রমে ক্রমে পরিচয়ের কোঠার মধ্যে ভুক্ত করে নিতে থাকা। সেইজন্যে যাত্রার মধ্যে যে দুঃখ আছে চলাটাই হচ্ছে তার ওষুধ। কিন্তু, যাত্রা করলুম অথচ চললুম না, এটা সহ্য করা শক্ত।

অচল জাহাজের ক্যাবিন হচ্ছে বন্ধনদশার দ্বিগুণ-চোলাই-করা কড়া আরক। জাহাজ চলে বলেই তার কামরার সংকীর্ণতাকে আমরা ক্ষমা করি। কিন্তু, জাহাজ যখন স্থির থাকে তখন ক্যাবিনে স্থির থাকা, মৃত্যুর ঢাকনাটার নীচে আবার গোরের ঢাকনার মতো।

ডেকের উপরেই শোবার ব্যবস্থা করা গেল। ইতিপূর্বে অনেকবার জাহাজে চড়েছি, অনেক কাপ্তেনের সঙ্গে ব্যবহার করেছি। আমাদের এই জাপানি কাপ্তেনের একটু বিশেষত্ব আছে। মেলামেশায় ভালোমানুষিতে হঠাৎ মনে হয় ঘোরো লোকের মতো। মনে হয়, এঁকে অনুরোধ করে যা-খুশি তাই করা যেতে পারে; কিন্তু কাজের বেলায় দেখা যায় নিয়মের লেশমাত্র নড়চড় হবার জো নেই। আমাদের সহযাত্রী ইংরেজ বন্ধু ডেকের উপরে তাঁর ক্যাবিনের গদি আনবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষের ঘাড় নড়ল, সে ঘটে উঠল না। সকালে ব্রেকফাস্টের সময় তিনি যে-টেবিলে বসেছিলেন সেখানে পাখা ছিল না; আমাদের টেবিলে জায়গা ছিল, সেই দেখে তিনি আমাদের টেবিলে বসবার ইচ্ছা জানালেন। অনুরোধটা সামান্য, কিন্তু কাপ্তেন বললেন, এ-বেলাকার মতো বন্দোবস্ত হয়ে গেছে, ডিনারের সময় দেখা যাবে। আমাদের টেবিলে চৌকি খালি রইল, কিন্তু তবু নিয়মের ব্যত্যয় হল না। বেশ বোঝা যাচ্ছে অতি অল্পমাত্রও ঢিলেঢালা কিছু হতে পারবে না।

রাত্রে বাইরে শোওয়া গেল, কিন্তু এ কেমনতরো বাইরে? জাহাজের মাস্তুলে মাস্তুলে আকাশটা যেন ভীষ্মের মতো শরশয্যায় শুয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করছে। কোথাও শূন্যরাজ্যের ফাঁকা নেই। অথচ বস্তুরাজ্যের স্পষ্টতাও নেই। জাহাজের আলোগুলো মস্ত একটা আয়তনের সূচনা করেছে, কিন্তু কোনো আকারকে দেখতে দিচ্ছে না।

কোনো একটি কবিতায় প্রকাশ করেছিলুম যে আমি নিশীথরাত্রির সভাকবি। আমার বরাবর এ কথাই মনে হয় যে, দিনের বেলাটা মর্তলোকের, আর রাত্রিবেলাটা সুরলোকের। মানুষ ভয় পায়, মানুষ কাজকর্ম করে, মানুষ তার পায়ের কাছের পথটা স্পষ্ট করে দেখতে চায়, এইজন্যে এতবড়ো একটা আলো জ্বালতে হয়েছে। দেবতার ভয় নেই, দেবতার কাজ নিঃশব্দে গোপনে, দেবতার চলার সঙ্গে স্তব্ধতার কোনো বিরোধ নেই, এইজন্যেই অসীম অন্ধকার দেবসভার আস্তরণ। দেবতা রাত্রেই আমাদের বাতায়নে এসে দেখা দেন।

কিন্তু, মানুষের কারখানা যখন আলো জ্বালিয়ে সেই রাত্রিকেও অধিকার করতে চায় তখন কেবল যে মানুষই ক্লিষ্ট হয় তা নয়, দেবতাকেও ক্লিষ্ট করে তোলে। আমরা যখন থেকে বাতি জ্বেলে রাত জেগে এগ্‌জামিন পাস করতে প্রবৃত্ত হয়েছি তখন থেকে সূর্যের আলোয় সুস্পষ্ট নির্দিষ্ট নিজের সীমানা লঙ্ঘন করতে লেগেছি, তখন থেকেই সুর-মানবের যুদ্ধ বেধেছে। মানুষের কারখানা-ঘরের চিমনিগুলো ফুঁ দিয়ে দিয়ে নিজের অন্তরের কালিকে দ্যুলোকে বিস্তার করছে, সে অপরাধ তেমন গুরুতর নয়— কেননা, দিনটা মানুষের নিজের, তার মুখে সে কালি মাখালেও দেবতা

তা নিয়ে নালিশ করবেন না। কিন্তু, রাত্রির অখণ্ড অন্ধকারকে মানুষ যখন নিজের আলো দিয়ে ফুটো করে দেয় তখন দেবতার অধিকারে সে হস্তক্ষেপ করে। সে যেন নিজের দখল অতিক্রম করে আলোকের খুঁটি গেড়ে দেবলোকে আপন সীমানা চিহ্নিত করতে চায়।

সেদিন রাত্রে গঙ্গার উপরে সেই দেববিদ্রোহের বিপুল আয়োজন দেখতে পেলুম। তাই মানুষের ক্লান্তির উপর সুরলোকের শান্তির আশীর্বাদ দেখা গেল না। মানুষ বলতে চাচ্ছে, আমিও দেবতার মতো, আমার ক্লান্তি নেই। কিন্তু সেটা মিথ্যা কথা, এইজন্যে সে চারি দিকের শান্তি নষ্ট করছে। এইজন্যে অন্ধকারকেও সে অশুচি করে তুলেছে।

দিন আলোকের দ্বারা আবিল, অন্ধকারই পরম নির্মল। অন্ধকার রাত্রি সমুদ্রের মতো ; তা অঞ্জনের মতো কালো, কিন্তু তবু নিরঞ্জন। আর দিন নদীর মতো ; তা কালো নয়, কিন্তু পঙ্কিল। রাত্রির সেই অতলস্পর্শ অন্ধকারকেও সেদিন সেই খিদিরপুরের জেটির উপর মলিন দেখলুম। মনে হল, দেবতা স্বয়ং মুখ মলিন করে রয়েছেন।

এমনি খারাপ লেগেছিল এডেনের বন্দরে। সেখানে মানুষের হাতে বন্দী হয়ে সমুদ্রও কলুষিত। জলের উপরে তেল ভাসছে, মানুষের আবর্জনাকে স্বয়ং সমুদ্রও বিলুপ্ত করতে পারছে না। সেই রাত্রে জাহাজের ডেকের উপর শুয়ে অসীম রাত্রিকেও যখন কলঙ্কিত দেখলুম তখন মনে হল, একদিন ইন্দ্রলোক দানবের আক্রমণে পীড়িত হয়ে ব্রহ্মার কাছে নালিশ জানিয়েছিলেন— আজ মানবের অত্যাচার থেকে দেবতাদের কোন্ রুদ্র রক্ষা করবেন।

২

জাহাজ ছেড়ে দিলে। মধুর বহিছে বায়ু, ভেসে চলি রঙ্গে।

কিন্তু এর রঙ্গটা কেবলমাত্র ভেসে চলার মধ্যেই নয়। ভেসে চলার একটি বিশেষ দৃষ্টি ও সেই বিশেষ দৃষ্টির বিশেষ রস আছে। যখন হেঁটে চলি তখন কোনো অখণ্ড ছবি চোখে পড়ে না। ভেসে চলার মধ্যে দুই বিরোধের পূর্ণ সামঞ্জস্য হয়েছে— বসেও আছি, চলছিও। সেইজন্যে চলার কাজ হচ্ছে, অথচ চলার কাজে মনকে লাগাতে হচ্ছে না। তাই মন যা সামনে দেখছে তাকে পূর্ণ করে দেখছে। জল-স্থল-আকাশের সমস্তকে এক করে মিলিয়ে দেখতে পাচ্ছে।

ভেসে চলার মধ্যে দিয়ে দেখার আর একটা গুণ হচ্ছে এই যে, তা মনোযোগকে জাগ্রত করে, কিন্তু মনোযোগকে বদ্ধ করে না। না দেখতে পেলেও চলত, কোনো অসুবিধে হত না, পথ ভুলতুম না, গর্তয় পড়তুম না। এইজন্যে ভেসে চলার দেখাটা

হচ্ছে নিতান্তই দায়িত্ববিহীন দেখা ; দেখাটাই তার চরম লক্ষ্য, এইজন্তেই এই দেখাটা এমন বৃহৎ, এমন আনন্দময়।

এতদিনে এইটুকু বোঝা গেছে যে, মানুষ নিজের দাসত্ব করতে বাধ্য, কিন্তু নিজের সম্বন্ধেও দায়ে-পড়া কাজে তার প্রীতি নেই। যখন চলাটাকেই লক্ষ্য করে পায়চারি করি তখন সেটা বেশ ; কিন্তু যখন কোথাও পৌছবার দিকে লক্ষ্য করে চলতে হয় তখন সেই চলার বাধ্যতা থেকে মুক্তি পাওয়ার শক্তিতেই মানুষের সম্পদ প্রকাশ পায়। ধন জিনিসটার মানেই এই, তাতে মানুষের প্রয়োজন কমায় না কিন্তু নিজের প্রয়োজন সম্বন্ধে তার নিজের বাধ্যতা কমিয়ে দেয়। খাওয়া-পরা দেওয়া-নেওয়ার দরকার তাকে মেটাতেই হয়, কিন্তু তার বাইরে যেখানে তার উদ্‌বৃত্ত সেইখানেই মানুষ মুক্ত, সেইখানেই সে বিশুদ্ধ নিজের পরিচয় পায়। সেইজন্তেই ঘটিবাটি প্রভৃতি দরকারি জিনিসকেও মানুষ সুন্দর করে গড়ে তুলতে চায় ; কারণ, ঘটিবাটির উপযোগিতা মানুষের প্রয়োজনের পরিচয় মাত্র কিন্তু তার সৌন্দর্যে মানুষের নিজেরই রুচির, নিজেরই আনন্দের পরিচয়। ঘটিবাটির উপযোগিতা বলছে, মানুষের দায় আছে ; ঘটিবাটির সৌন্দর্য বলছে, মানুষের আত্মা আছে।

আমার না হলেও চলত, কেবল আমি ইচ্ছা করে করছি এই যে মুক্ত কর্তৃত্বের ও মুক্ত ভোক্তৃত্বের অভিমান, যে অভিমান বিশ্বস্রষ্টার এবং বিশ্বরাজ্যেশ্বরের, সেই অভিমানই মানুষের সাহিত্যে এবং আর্টে। এই রাজ্যটি মুক্ত মানুষের রাজ্য, এখানে জীবনযাত্রার দায়িত্ব নেই।

আজ সকালে যে প্রকৃতি সবুজ পাড়-দেওয়া গেরুয়া নদীর শাড়ি প'রে আমার সামনে দাঁড়িয়েছে আমি তাকে দেখছি। এখানে আমি বিশুদ্ধ দ্রষ্টা। এই দ্রষ্টা আমিটি যদি নিজেকে ভাষায় বা রেখায় প্রকাশ করত তা হলে সেইটেই হত সাহিত্য, সেইটেই হত আর্ট। খামকা বিরক্ত হয়ে এমন কথা কেউ বলতে পারে, "তুমি দেখছ তাতে আমার গরজ কী। তাতে আমার পেটও ভরবে না, আমার ম্যালেরিয়াও ঘুচবে না, তাতে আমার ফসল-খেতে বেশি করে ফসল ধরবার উপায় হবে না।" ঠিক কথা। আমি যে দেখছি এতে তোমার কোনো গরজ নেই। অথচ আমি যে শুদ্ধমাত্র দ্রষ্টা, এ সম্বন্ধে বস্তুতই যদি তুমি উদাসীন হও তা হলে জগতে আর্ট এবং সাহিত্য-সৃষ্টির কোনো মানে থাকে না।

আমাকে তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পার, "আজ এতক্ষণ ধরে তুমি যে লেখাটা লিখছ ওটাকে কী বলবে। সাহিত্য, না তত্ত্বালোচনা ?"

নাই বললুম তত্ত্বালোচনা। তত্ত্বালোচনায় যে-ব্যক্তি আলোচনা করে সে প্রধান নয়,

তত্ত্বটাই প্রধান। সাহিত্যে সেই ব্যক্তিটাই প্রধান, তত্ত্বটা উপলক্ষ। এই যে সাদা মেঘের ছিটে-দেওয়া নীল আকাশের নীচে শ্যামল-ঐশ্বর্যময়ী ধরণীর আঙিনার সামনে দিয়ে সন্ন্যাসী জলের স্রোত উদাসী হয়ে চলেছে, তার মাঝখানে প্রধানত প্রকাশ পাচ্ছে দ্রষ্টা আমি। যদি ভূতত্ত্ব বা ভূবৃত্তান্ত প্রকাশ করতে হত তা হলে এই আমিকে সরে দাঁড়াতে হত। কিন্তু, এক আমির পক্ষে আর-এক আমির অহেতুক প্রয়োজন আছে, এইজন্য সময় পেলেই আমরা ভূতত্ত্বকে সরিয়ে রেখে সেই আমির সন্ধান করি।

তেমনি করেই কেবলমাত্র দৃশ্যের মধ্যে নয়, ভাবের মধ্যেও যে ভেসে চলেছে সেও সেই দ্রষ্টা আমি। সেখানে যা বলছে সেটা উপলক্ষ, যে বলছে সেই লক্ষ্য। বাহিরের বিশ্বের রূপধারার দিকেও আমি যেমন তাকাতে তাকাতে চলেছি, আমার অন্তরের চিন্তাধারা ভাবধারার দিকেও আমি তেমনি চিত্তদৃষ্টি দিয়ে তাকাতে তাকাতে চলেছি। এই ধারা কোনো বিশেষ কর্মের বিশেষ প্রয়োজনের সূত্রে বিধৃত নয়। এই ধারা প্রধানত লজিকের দ্বারাও গাঁথা নয়, এর গ্রন্থনসূত্র মুখ্যত আমি। সেইজন্যে আমি কেয়ারমাত্র করি নে, সাহিত্য সম্বন্ধে বক্ষ্যমাণ রচনাটিকে লোক পাকা কথা ব'লে গ্রহণ করবে কি না। বিশ্বলোকে এবং চিত্তলোকে 'আমি দেখছি' এই অনাবশ্যক আনন্দের কথাটা বলাই হচ্ছে আমার কাজ। এই কথাটা যদি ঠিক করে বলতে পারি তা হলে অন্য সকল আমির দলও বিনা প্রয়োজনে খুশি হয়ে উঠবে।

উপনিষদে লিখছে, এক-ডালে দুই পাখি আছে, তার মধ্যে এক পাখি খায় আর-এক পাখি দেখে। যে-পাখি দেখছে তারই আনন্দ বড়ো আনন্দ; কেননা, তার সে বিশুদ্ধ আনন্দ, মুক্ত আনন্দ। মানুষের নিজের মধ্যেই এই দুই পাখি আছে। এক পাখির প্রয়োজন আছে, আর-এক পাখির প্রয়োজন নেই। এক পাখি ভোগ করে, আর-এক পাখি দেখে। যে-পাখি ভোগ করে সে নির্মাণ করে, যে-পাখি দেখে সে সৃষ্টি করে। নির্মাণ করা মানে মাপে তৈরি করা, অর্থাৎ যেটা তৈরি হচ্ছে সেইটেই চরম নয়, সেইটেকে অন্য কিছুর মাপে তৈরি করা— নিজের প্রয়োজনের মাপে বা অন্যের প্রয়োজনের মাপে। আর, সৃষ্টি করা অন্য কোনো-কিছুর মাপের অপেক্ষা করে না, সে হচ্ছে নিজেকে সর্জন করা, নিজেকেই প্রকাশ করা। এইজন্য ভোগী পাখি যে সমস্ত উপকরণ নিয়ে কাজ করছে তা প্রধানত বাইরের উপকরণ, আর দ্রষ্টা পাখির উপকরণ হচ্ছে আমি-পদার্থ। এই আমির প্রকাশই সাহিত্য, আর্ট। তার মধ্যে কোনো দায়ই নেই, কর্তব্যের দায়ও না।

পৃথিবীতে সব-চেয়ে বড়ো রহস্য— দেখবার বস্তুটি নয়, যে দেখে সেই মানুষটি। এই রহস্য আপনি আপনার ইয়ত্তা পাচ্ছে না; হাজার হাজার অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে

আপনাকে দেখতে চেষ্টা করছে। যা-কিছু ঘটছে এবং যা-কিছু ঘটতে পারে, সমস্তর ভিতর দিয়ে নিজেকে বাজিয়ে দেখছে।

এই যে আমার এক আমি, এ বহুর মধ্যে দিয়ে চ'লে চ'লে নিজেকে নিত্য উপলব্ধি করতে থাকে। বহুর সঙ্গে মানুষের সেই একের মিলনজাত রসের উপলব্ধিই হচ্ছে সাহিত্যের সামগ্রী। অর্থাৎ, দৃষ্ট বস্তু নয়, দ্রষ্টা আমিই তার লক্ষ্য।

তোসামারু জাহাজ
২০ বৈশাখ ১৩২৩

৩

বৃহস্পতিবার বিকেলে সমুদ্রের মোহানায় পাইলট নেবে গেল। এর কিছু আগে থাকতেই সমুদ্রের রূপ দেখা দিয়েছে। তার কূলের বেড়ি খসে গেছে। কিন্তু, এখনো তার মাটির রঙ ঘোচে নি। পৃথিবীর চেয়ে আকাশের সঙ্গেই যে তার আত্মীয়তা বেশি, সে-কথা এখনো প্রকাশ হয় নি; কেবল দেখা গেল জলে আকাশে এক-দিগন্তের মালা বদল করেছে। যে ঢেউ দিয়েছে নদীর ঢেউয়ের ছন্দের মতো তার ছোটো ছোটো পদ-বিভাগ নয়; এ যেন মন্দাক্রান্তা, কিন্তু এখনো সমুদ্রের শার্দূলবিক্রীড়িত শুরু হয় নি।

আমাদের জাহাজের নীচের তলার ডেকে অনেকগুলি ডেক্-প্যাসেঞ্জার; তাদের অধিকাংশ মাদ্রাজি, এবং তারা প্রায় সকলেই রেঙ্গুনে যাচ্ছে। তাদের 'পরে এই জাহাজের লোকের ব্যবহারে কিছুমাত্র কঠোরতা নেই, তারা বেশ স্বচ্ছন্দে আছে। জাহাজের ভাণ্ডার থেকে তারা প্রত্যেকে একখানি করে ছবি আঁকা কাগজের পাখা পেয়ে ভারি খুশি হয়েছে।

এরা অনেকেই হিন্দু, সুতরাং এদের পথের কষ্ট ঘোচানো কারো সাধ্য নয়। কোনো-মতে আখ চিবিয়ে, চিঁড়ে খেয়ে এদের দিন যাচ্ছে। একটা জিনিস ভারি চোখে লাগে, সে হচ্ছে এই যে, এরা মোটের উপর পরিষ্কার— কিন্তু সেটা কেবল বিধানের গণ্ডির মধ্যে, বিধানের বাইরে এদের নোংরা হবার কোনো বাধা নেই। আখ চিবিয়ে তার ছিবড়ে অতি সহজেই সমুদ্রে ফেলে দেওয়া যায়, কিন্তু সেটুকু কষ্ট নেওয়া এদের বিধানে নেই— যেখানে বসে খাচ্ছে তার নেহাত কাছে ছিবড়ে ফেলছে, এমনি করে চারি দিকে কত আবর্জনা যে জমে উঠছে তাতে এদের ভ্রূক্ষেপ নেই; সব-চেয়ে আমাকে পীড়া দেয় যখন দেখি থুথু ফেলা সম্বন্ধে এরা বিচার করে না। অথচ, বিধান অনুসারে শুচিতা রক্ষা করবার বেলায় নিতান্ত সামান্য বিষয়েও এরা অসামান্য রকম কষ্ট স্বীকার করে।

আচারকে শক্ত করে তুললে বিচারকে ঢিলে করতেই হয়। বাইরে থেকে মানুষকে বাঁধলে মানুষ আপনাকে আপনি বাঁধবার শক্তি হারায়।

এদের মধ্যে কয়েকজন মুসলমান আছে; পরিষ্কার হওয়া সম্বন্ধে তারা যে বিশেষ সতর্ক তা নয়, কিন্তু পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে তাদের ভারি সতর্কতা। ভালো কাপড়টি প'রে টুপিটি বাগিয়ে তারা সর্বদা প্রস্তুত থাকতে চায়। একটুমাত্র পরিচয় হলেই অথবা না হলেও তারা দেখা হলেই প্রসন্নমুখে সেলাম করে। বোঝা যায়, তারা বাইরের সংসারটাকে মানে। কেবলমাত্র নিজের জাতের গণ্ডির মধ্যে যারা থাকে তাদের কাছে সেই গণ্ডির বাইরেকার লোকালয় নিতান্ত ফিকে। তাদের সমস্ত বাঁধাবাঁধি জাতরক্ষার বন্ধন। মুসলমান জাতে বাঁধা নয় ব'লে বাহিরের সংসারের সঙ্গে তার ব্যবহারের বাঁধাবাঁধি আছে। এইজন্যে আদবকায়দা মুসলমানের। আদবকায়দা হচ্ছে সমস্ত মানুষের সঙ্গে ব্যবহারের সাধারণ নিয়ম। মনুতে পাওয়া যায়, মা মাসি মামা পিসের সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করতে হবে, গুরুজনের গুরুত্বের মাত্রা কার কতদূর, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের মধ্যে পরস্পরের ব্যবহার কী রকম হবে, কিন্তু সাধারণভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার কী রকম হওয়া উচিত তার বিধান নেই। এইজন্যে সম্পর্কবিচার ও জাতি-বিচারের বাইরে মানুষের সঙ্গে ভদ্রতা রক্ষার জন্যে, পশ্চিম-ভারত মুসলমানের কাছ থেকে সেলাম শিক্ষা করেছে। কেননা, প্রণাম-নমস্কারের সমস্ত বিধি কেবল জাতের মধ্যেই খাটে। বাহিরের সংসারটাকে ইতিপূর্বে আমরা অস্বীকার করে চলেছিলুম বলেই সাজসজ্জা সম্বন্ধে পরিচ্ছন্নতা, হয় আমরা মুসলমানের কাছ থেকে নিয়েছি নয় ইংরেজের কাছ থেকে নিচ্ছি; ওটাতে আমাদের আরাম নেই। সেইজন্যে ভদ্রতার সাজ সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত আমাদের পাকাপাকি কিছুই ঠিক হল না। বাঙালি ভদ্রসভায় সাজসজ্জার যে এমন অদ্ভুত বৈচিত্র্য, তার কারণই এই। সব সাজই আমাদের সাজ। আমাদের নিজের সাজ, মণ্ডলীর ভিতরকার সাজ; সুতরাং বাহিরের সংসারের হিসাবে সেটা বিবসন বললেই হয়— অন্তঃপুরের মেয়েদের বসনটা যেরকম, অর্থাৎ দিগ বসনের সুন্দর অনুকরণ। বাইরের লোকের সঙ্গে আমরা ভাই খুড়ো দিদি মাসি প্রভৃতি কোনো-একটা সম্পর্ক পাতাবার জন্যে ব্যস্ত থাকি; নইলে আমরা থই পাই নে। হয় অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা নয় অত্যন্ত দূরত্ব, এর মাঝখানে যে একটা প্রকাণ্ড জায়গা আছে সেটা আজও আমাদের ভালো করে আয়ত্ত হয় নি। এমন-কি, সেখানকার বিধিবন্ধনকে আমরা হৃদ্যতার অভাব বলে নিন্দা করি। এ কথা ভুলে যাই, যে-সব মানুষকে হৃদয় দিতে পারি নে তাদেরও কিছু দেবার আছে। এই দানটাকে আমরা কৃত্রিম বলে গাল দিই, কিন্তু জাতের কৃত্রিম খাঁচার মধ্যে মানুষ ব'লেই এই সাধারণ আদবকায়দাকে আমাদের

কৃত্রিম বলে ঠেকে। বস্তুত, ঘরের মানুষকে আত্মীয় ব'লে এবং তার বাইরের মানুষকে আপন সমাজের ব'লে এবং তারও বাইরের মানুষকে মানবসমাজের ব'লে স্বীকার করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। হৃদয়ের বন্ধন, শিষ্টাচারের বন্ধন, এবং আদবকায়দার বন্ধন— এই তিনই মানুষের প্রকৃতিগত।

কাপ্তেন বলে রেখেছেন, আজ সন্ধ্যাবেলায় ঝড় হবে, ব্যারোমিটার নাবছে। কিন্তু, শান্ত আকাশে সূর্য অস্ত গেল। বাতাসে যে পরিমাণ বেগ থাকলে তাকে মন্দপবন বলে, অর্থাৎ যুবতীর মন্দগমনের সঙ্গে কবিরা তুলনা করতে পারে, এ তার চেয়ে বেশি; কিন্তু ঢেউগুলোকে নিয়ে রুদ্রতালের করতাল বাজাবার মতো আসর জমে নি, যেটুকু খোলের বোল দিচ্ছে তাতে ঝড়ের গৌরচন্দ্রিকা বলেও মনে হয় নি। মনে করলুম, মানুষের কুষ্ঠির মতো বাতাসের কুষ্ঠি গণনার সঙ্গে ঠিক মেলে না, এ যাত্রা ঝড়ের ফাঁড়া কেটে গেল। তাই পাইলটের হাতে আমাদের ডাঙার চিঠিপত্র সমর্পণ করে দিয়ে প্রসন্ন সমুদ্রকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে ডেক-চেয়ার টেনে নিয়ে পশ্চিমমুখো হয়ে বসলুম।

হোলির রাত্রে হিন্দুস্থানি দরোয়ানদের খচমচির মতো বাতাসের লয়টা ক্রমেই দ্রুত হয়ে উঠল। জলের উপর সূর্যাস্তের আলপনা-আঁকা আসনটি আচ্ছন্ন ক'রে নীলাম্বরীর ঘোমটা-পরা সন্ধ্যা এসে বসল। আকাশে তখনো মেঘ নেই, আকাশসমুদ্রের ফেনার মতোই ছায়াপথ জল্‌জল্‌ করতে লাগল।

ডেকের উপর বিছানা করে যখন শুলুম তখন বাতাসে এবং জলে বেশ একটা কবির লড়াই চলছে; একদিকে সোঁ সোঁ শব্দে তান লাগিয়েছে, আর-একদিকে ছল্‌ ছল্‌ শব্দে জবাব দিচ্ছে, কিন্তু ঝড়ের পালা বলে মনে হল না। আকাশের তারাদের সঙ্গে চোখোচোখি করে কখন এক সময়ে চোখ বুজে এল।

রাত্রে স্বপ্ন দেখলুম, আমি যেন মৃত্যু সম্বন্ধে কোনো একটি বেদমন্ত্র আবৃত্তি করে সেইটে কাকে বুঝিয়ে বলছি। আশ্চর্য তার রচনা, যেন একটা বিপুল আর্তস্বরের মতো, অথচ তার মধ্যে মরণের একটা বিরাট বৈরাগ্য আছে। এই মন্ত্রের মাঝখানে জেগে উঠে দেখি, আকাশ এবং জল তখন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। সমুদ্র চামুণ্ডার মতো ফেনার জিব মেলে প্রচণ্ড অট্টহাস্যে নৃত্য করছে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, মেঘগুলো মরিয়া হয়ে উঠেছে, যেন তাদের কাণ্ড-জ্ঞান নেই— বলছে, যা থাকে কপালে। আর, জলে যে বিষম গর্জন উঠছে তাতে মনের ভাবনাও যেন শোনা যায় না, এমনি বোধ হতে লাগল। মাল্লারা ছোটো ছোটো লণ্ঠন হাতে ব্যস্ত হয়ে এদিকে ওদিকে চলাচল করছে, কিন্তু নিঃশব্দে। মাঝে মাঝে এঞ্জিনের প্রতি কর্ণধারের সংকেত-ঘণ্টাধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

এবার বিছানায় শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু, বাইরে জল বাতাসের গর্জন আর আমার মনের মধ্যে সেই স্বপ্নলব্ধ মরণমন্ত্র ক্রমাগত বাজতে লাগল। আমার ঘুমের সঙ্গে জাগরণ ঠিক যেন ওই ঝড় এবং ঢেউয়ের মতোই এলোমেলো মাতামাতি করতে থাকল, ঘুমোচ্ছি কি জেগে আছি বুঝতে পারছি নে।

রাগী মানুষ কথা কইতে না পারলে যেমন ফুলে ফুলে ওঠে, সকাল-বেলাকার মেঘগুলোকে তেমনি বোধ হল। বাতাস কেবলই শ ষ স, এবং জল কেবলই বাকি অন্তস্থ বর্ণ য র ল ব হ নিয়ে চণ্ডীপাঠ বাধিয়ে দিলে, আর মেঘগুলো জটা দুলিয়ে ভ্রূকুটি করে বেড়াতে লাগল। অবশেষে মেঘের বাণী জলধারায় নেবে পড়ল। নারদের বীণাধ্বনিতে বিষ্ণু গঙ্গাধারায় বিগলিত হয়েছিলেন একবার, আমার সেই পৌরাণিক কথা মনে এসেছিল। কিন্তু, এ কোন্ নারদ প্রলয়বীণা বাজাচ্ছে। এর সঙ্গে নন্দীভৃঙ্গীর যে মিল দেখি, আর ওদিকে বিষ্ণুর সঙ্গে রুদ্রের প্রভেদ ঘুচে গেছে।

এ-পর্যন্ত জাহাজের নিত্যক্রিয়া একরকম চলে যাচ্ছে, এমন-কি, আমাদের প্রাতরাশেরও ব্যাঘাত হল না। কাপ্তেনের মুখে কোনো উদ্‌বেগ নেই। তিনি বললেন, এই সময়টাতে এমন একটু-আধটু হয়ে থাকে; আমরা যেমন যৌবনের চাঞ্চল্য দেখে বলে থাকি, ওটা বয়সের ধর্ম।

ক্যাবিনের মধ্যে থাকলে ঝুমঝুমির ভিতরকার কড়াইগুলোর মতো নাড়া খেতে হবে, তার চেয়ে খোলাখুলি ঝড়ের সঙ্গে মোকাবিলা করাই ভালো। আমরা শাল কম্বল মুড়ি দিয়ে জাহাজের ডেকের উপর গিয়েই বসলুম। ঝড়ের ঝাপট পশ্চিম দিক থেকে আসছে, সেইজন্যে পূর্বদিকের ডেকে বসা দুঃসাধ্য ছিল না।

ঝড় ক্রমেই বেড়ে চলল। মেঘের সঙ্গে ঢেউয়ের সঙ্গে কোনো ভেদ রইল না। সমুদ্রের সে নীল রঙ নেই, চারি দিক ঝাপসা বিবর্ণ। ছেলেবেলার আরব্য-উপন্যাসে পড়েছিলুম, জেলের জালে যে ঘড়া উঠেছিল তার ঢাকনা খুলতেই তার ভিতর থেকে ধোঁয়ার মতো পাকিয়ে পাকিয়ে প্রকাণ্ড দৈত্য বেরিয়ে পড়ল। আমার মনে হল, সমুদ্রের নীল ঢাকনাটা কে খুলে ফেলেছে, আর ভিতর থেকে ধোঁয়ার মতো লাখো লাখো দৈত্য পরস্পর ঠেলাঠেলি করতে করতে আকাশে উঠে পড়ছে।

জাপানি মাল্লারা ছুটোছুটি করছে কিন্তু তাদের মুখে হাসি লেগেই আছে। তাদের ভাব দেখে মনে হয়, সমুদ্র যেন অট্টহাস্যে জাহাজটাকে ঠাট্টা করছে মাত্র; পশ্চিম দিকের ডেকের দরজা প্রভৃতি সমস্ত বন্ধ তবু সে-সব বাধা ভেদ করে এক একবার জলের ঢেউ হুড়মুড় করে এসে পড়ছে, আর তাই দেখে ওরা হো হো করে উঠছে। কাপ্তেন আমাদের বারবার বললেন, ছোটো ঝড়, সামান্য ঝড়। একসময় আমাদের

স্টুয়ার্ড্ এসে টেবিলের উপর আঙুল দিয়ে এঁকে ঝড়ের খাতিরে জাহাজের কী রকম পথ বদল হয়েছে, সেইটে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলে। ইতিমধ্যে বৃষ্টির ঝাপটা লেগে শাল কম্বল সমস্ত ভিজে শীতে কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েছে; আর কোথাও সুবিধা না দেখে কাপ্তেনের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলুম। কাপ্তেনের যে কোনো উৎকণ্ঠা আছে, বাইরে থেকে তার কোনো লক্ষণ দেখতে পেলুম না।

ঘরে আর বসে থাকতে পারলুম না। ভিজে শাল মুড়ি দিয়ে আবার বাইরে এসে বসলুম। এত তুফানেও যে আমাদের ডেকের উপর আছড়ে আছড়ে ফেলছে না তার কারণ, জাহাজ আকণ্ঠ বোঝাই। ভিতরে যার পদার্থ নেই তার মতো দোলায়িত অবস্থা আমাদের জাহাজের নয়। মৃত্যুর কথা অনেকবার মনে হল। চারি দিকেই তো মৃত্যু, দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত মৃত্যু; আমার প্রাণ এর মধ্যে এতটুকু। এই অতি ছোটো-টার উপরেই কি সমস্ত আস্থা রাখব, আর এই এতবড়োটাকে কিছু বিশ্বাস করব না?—বড়োর উপরে ভরসা রাখাই ভালো।

ডেকে বসে থাকা আর চলছে না। নীচে নাবতে গিয়ে দেখি সিঁড়ি পর্যন্ত জুড়ে সমস্ত রাস্তা ঠেসে ভর্তি করে ডেক-প্যাসেঞ্জার বসে। বহু কষ্টে তাদের ভিতর দিয়ে পথ করে ক্যাবিনের মধ্যে গিয়ে শুয়ে পড়লুম। এইবার সমস্ত শরীর মন ঘুলিয়ে উঠল। মনে হল, দেহের সঙ্গে প্রাণের আর বনতি হচ্ছে না; দুধ মথন করলে মাখনটা যেরকম ছিন্ন হয়ে আসে প্রাণটা যেন তেমনি হয়ে এসেছে। জাহাজের উপরকার দোলা সহ্য করা যায়, জাহাজের ভিতরকার দোলা সহ্য করা শক্ত। কাঁকরের উপর দিয়ে চলা আর জুতার ভিতরে কাঁকর নিয়ে চলার যে তফাত, এ যেন তেমনি। একটাতে মার আছে বন্ধন নেই, আর একটাতে বেঁধে মার।

ক্যাবিনে শুয়ে শুয়ে শুনতে পেলুম, ডেকের উপর কী যেন হুড়মুড় করে ভেঙে ভেঙে পড়ছে। ক্যাবিনের মধ্যে হাওয়া আসবার জন্যে যে ফানেলগুলো ডেকের উপর হাঁ করে নিশ্বাস নেয়, ঢাকা দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ঢেউয়ের প্রবল চোটে তার ভিতর দিয়েও ঝলকে ঝলকে ক্যাবিনের মধ্যে জল এসে পড়ছে। বাইরে উনপঞ্চাশ বায়ুর নৃত্য, অথচ ক্যাবিনের মধ্যে গুমট। একটা ইলেকট্রিক পাখা চলছে তাতে তাপটা যেন গায়ের উপর ঘুরে ঘুরে লেজের ঝাপটা দিতে লাগল।

হঠাৎ মনে হয়, এ একেবারে অসহ্য। কিন্তু, মানুষের মধ্যে শরীর-মন-প্রাণের চেয়েও বড়ো একটা সত্তা আছে। ঝড়ের আকাশের উপরেও যেমন শান্ত আকাশ, তুফানের সমুদ্রের নীচে যেমন শান্ত সমুদ্র, সেই আকাশ সেই সমুদ্রই যেমন বড়ো, মানুষের অন্তরের গভীরে এবং সমুচ্চে সেইরকম একটি বিরাট শান্ত পুরুষ আছে— বিপদ এবং

দুঃখের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখলে তাকে পাওয়া যায়— দুঃখ তার পায়ের তলায়, মৃত্যু তাকে স্পর্শ করে না।

সন্ধ্যার সময় ঝড় থেমে গেল। উপরে গিয়ে দেখি, জাহাজটা সমুদ্রের কাছে এতক্ষণ ধরে যে চড়চাপড় খেয়েছে তার অনেক চিহ্ন আছে। কাপ্তেনের ঘরের একটা প্রাচীর ভেঙে গিয়ে তাঁর আসবাবপত্র সমস্ত ভিজে গেছে। একটা বাঁধা লাইফ-বোট জখম হয়েছে। ডেকে প্যাসেঞ্জারদের একটা ঘর এবং ভাণ্ডারের একটা অংশ ভেঙে পড়েছে। জাপানি মাল্লারা এমন-সকল কাজে প্রবৃত্ত ছিল যাতে প্রাণসংশয় ছিল। জাহাজ যে বারবার আসন্ন সংকটের সঙ্গে লড়াই করেছে তার একটা স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল— জাহাজের ডেকের উপর কর্কের তৈরি সাঁতার দেবার জামাগুলো সাজানো। এক-সময়ে এগুলো বের করবার কথা কাপ্তেনের মনে এসেছিল। কিন্তু, এই ঝড়ের পালার মধ্যে সব-চেয়ে স্পষ্ট করে আমার মনে পড়ছে জাপানি মাল্লাদের হাসি।

শনিবার দিনে আকাশ প্রসন্ন কিন্তু সমুদ্রের আক্ষেপ এখনো ঘোচে নি। আশ্চর্য এই, ঝড়ের সময় জাহাজ এমন দোলে নি ঝড়ের পর যেমন তার দোলা। কালকেকার উৎপাতকে কিছুতেই যেন সে ক্ষমা করতে পারছে না, ক্রমাগতই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছে। শরীরের অবস্থাটাও অনেকটা সেইরকম; ঝড়ের সময় সে একরকম শক্ত ছিল কিন্তু পরের দিন ভুলতে পারছে না, তার উপর দিয়ে ঝড় গিয়েছে।

আজ রবিবার। জলের রঙ ফিকে হয়ে উঠেছে। এতদিন পরে আকাশে একটি পাখি দেখতে পেলুম— এই পাখিগুলিই পৃথিবীর বাণী আকাশে বহন করে নিয়ে যায়; আকাশ দেয় তার আলো, পৃথিবী দেয় তার গান। সমুদ্রের যা-কিছু গান সে কেবল তার নিজের ঢেউয়ের— তার কোলে জীব আছে যথেষ্ট, পৃথিবীর চেয়ে অনেক বেশি, কিন্তু তাদের কারো কণ্ঠে সুর নেই; সেই অসংখ্য বোবা জীবের হয়ে সমুদ্র নিজেই কথা কচ্ছে। ডাঙার জীবেরা প্রধানত শব্দের দ্বারাই মনের ভাব প্রকাশ করে, জলচরদের ভাষা হচ্ছে গতি। সমুদ্র হচ্ছে নৃত্যলোক, আর পৃথিবী হচ্ছে শব্দলোক।

আজ বিকেলে চারটে-পাঁচটার সময় রেঙ্গুনে পৌঁছবার কথা। মঙ্গলবার থেকে শনিবার পর্যন্ত পৃথিবীতে নানা খবর চলাচল করছিল, আমাদের জন্যে সেগুলো সমস্ত জমে রয়েছে; বাণিজ্যের ধনের মতো নয় প্রতিদিন যার হিসাব চলছে, কোম্পানির কাগজের মতো অগোচরে যার সুদ জমছে।

২৪ বৈশাখ ১৩২৩

৪

২৪শে বৈশাখ অপরাহ্ণে রেঙ্গুনে এসে পৌঁছনো গেল।

চোখের পিছনে চেয়ে দেখার একটা পাকযন্ত্র আছে, সেইখানে দেখাগুলো বেশ করে হজম হয়ে না গেলে সেটাকে নিজের করে দেখানো যায় না। তা নাই বা দেখানো গেল, এমন কথা কেউ বলতে পারেন। যেখানে যাওয়া গেছে সেখানকার মোটামুটি বিবরণ দিতে দোষ কী।

দোষ না থাকতে পারে, কিন্তু আমার অভ্যাস অন্যরকম। আমি টুকে যেতে টেঁকে যেতে পারি নে। কখনো কখনো নোট নিতে ও রিপোর্ট দিতে অনুরুদ্ধ হয়েছি, কিন্তু সে-সমস্ত টুকরো কথা আমার মনের মুঠোর ফাঁক দিয়ে গলে ছড়িয়ে পড়ে যায়। প্রত্যক্ষটা একবার আমার মনের নেপথ্যে অপ্রত্যক্ষ হয়ে গিয়ে তার পরে যখন প্রকাশের মঞ্চে এসে দাঁড়ায় তখনই তার সঙ্গে আমার ব্যবহার।

ছুটতে ছুটতে তাড়াতাড়ি দেখে দেখে বেড়ানো আমার পক্ষে ক্লান্তিকর এবং নিষ্ফল। অতএব আমার কাছ থেকে বেশ ভদ্ররকম ভ্রমণবৃত্তান্ত তোমরা পাবে না। আদালতে সত্যপাঠ করে আমি সাক্ষী দিতে পারি যে রেঙ্গুন নামক এক শহরে আমি এসেছিলুম; কিন্তু যে আদালতে আরো বড়ো রকমের সত্যপাঠ করতে হয় সেখানে আমাকে বলতেই হবে, রেঙ্গুনে এসে পৌঁছই নি।

এমন হতেও পারে, রেঙ্গুন শহরটা খুব একটা সত্য বস্তু নয়। রাস্তাগুলি সোজা, চওড়া, পরিষ্কার; বাড়িগুলি তক্‌তক্‌ করছে; রাস্তায় ঘাটে মাদ্রাজি, পাঞ্জাবি, গুজরাটি ঘুরে বেড়াচ্ছে; তার মধ্যে হঠাৎ কোথাও যখন রঙিন রেশমের কাপড়-পরা ব্রহ্মদেশের পুরুষ বা মেয়ে দেখতে পাই তখন মনে হয়, এরাই বুঝি বিদেশী। আসল কথা, গঙ্গার পুলটা যেমন গঙ্গার নয় বরঞ্চ সেটা গঙ্গার গলার ফাঁসি, রেঙ্গুন শহরটা তেমনি ব্রহ্মদেশের শহর নয়, ওটা যেন সমস্ত দেশের প্রতিবাদের মতো।

প্রথমত, ইরাবতী নদী দিয়ে শহরের কাছাকাছি যখন আসছি তখন ব্রহ্মদেশের প্রথম পরিচয়টা কী। দেখি, তীরে বড়ো বড়ো সব কেরোসিন তেলের কারখানা লম্বা লম্বা চিমনি আকাশে তুলে দিয়ে ঠিক যেন চিত হয়ে পড়ে বর্মা চুরুট খাচ্ছে। তার পরে যত এগোতে থাকি, দেশ-বিদেশের জাহাজের ভিড়। তার পর যখন ঘাটে এসে পৌঁছই তখন তট বলে পদার্থ দেখা যায় না— সারি সারি জেটিগুলো যেন বিকটাকার লোহার জোঁকের মতো ব্রহ্মদেশের গায়ে একেবারে ছেঁকে ধরেছে। তার পরে আপিস-আদালত দোকান-বাজারের মধ্যে দিয়ে আমার বাঙালি বন্ধুদের বাড়িতে গিয়ে উঠলুম; কোনো ফাঁক দিয়ে ব্রহ্মদেশের কোনো চেহারাই দেখতে পেলুম না। মনে হল, রেঙ্গুন ব্রহ্মদেশের ম্যাপে

আছে কিন্তু দেশে নেই। অর্থাৎ, এ শহর দেশের মাটি থেকে গাছের মতো ওঠে নি, এ শহর কালের স্রোতে ফেনার মতো ভেসেছে, সুতরাং এর পক্ষে এ জায়গাও যেমন অন্য জায়গাও তেমনি।

আসল কথা, পৃথিবীতে যে-সব শহর সত্য তা মানুষের মমতার দ্বারা তৈরি হয়ে উঠেছে। দিল্লি বল, আগ্রা বল, কাশী বল, মানুষের আনন্দ তাকে সৃষ্টি করে তুলেছে। কিন্তু বাণিজ্যলক্ষ্মী নির্মম, তার পায়ের নীচে মানুষের মানস-সরোবরের সৌন্দর্যশতদল ফোটে না। মানুষের দিকে সে তাকায় না, সে কেবল দ্রব্যকে চায়; যন্ত্র তার বাহন। গঙ্গা দিয়ে যখন আমাদের জাহাজ আসছিল তখন বাণিজ্যশ্রীর নির্লজ্জ নির্দয়তা নদীর দুই ধারে দেখতে দেখতে এসেছি। ওর মনে প্রীতি নেই ব'লেই বাংলাদেশের এমন সুন্দর গঙ্গার ধারকে এত অনায়াসে নষ্ট করতে পেরেছে।

আমি মনে করি, আমার পরম সৌভাগ্য এই যে, কদর্যতার লৌহবন্যা যখন কলকাতার কাছাকাছি দুই তীরকে, মেটেবুরুজ থেকে হুগলী পর্যন্ত, গ্রাস করবার জন্যে ছুটে আসছিল আমি তার আগেই জন্মেছি। তখনো গঙ্গার ঘাটগুলি গ্রামের স্নিগ্ধ বাহুর মতো গঙ্গাকে বুকের কাছে আপন ক'রে ধরে রেখেছিল, কুঠির নৌকাগুলি তখনো সন্ধ্যাবেলায় তীরে তীরে ঘাটে ঘাটে ঘরের লোকগুলিকে ঘরে ঘরে ফিরিয়ে আনত। একদিকে দেশের হৃদয়ের ধারা, আর-একদিকে দেশের এই নদীর ধারা, এর মাঝখানে কোনো কঠিন কুৎসিত বিচ্ছেদ এসে দাঁড়ায় নি।

তখনো কলকাতার আশেপাশে বাংলাদেশের যথার্থ রূপটিকে দুই চোখ ভরে দেখবার কোনো বাধা ছিল না। সেইজন্যেই কলকাতা আধুনিক শহর হলেও কোকিলশিশুর মতো তার পালনকর্ত্রীর নীড়কে একেবারে রিক্ত করে অধিকার করে নি। কিন্তু তার পরে বাণিজ্যসভ্যতা যতই প্রবল হয়ে উঠতে লাগল ততই দেশের রূপ আচ্ছন্ন হতে চলল। এখন কলকাতা বাংলাদেশকে আপনার চারি দিক থেকে নির্বাসিত করে দিচ্ছে। দেশ ও কালের লড়াইয়ে দেশের শ্যামল শোভা পরাভূত হল, কালের করাল মূর্তিই লোহার দাঁত নখ মেলে কালো নিশ্বাস ছাড়তে লাগল।

এক সময়ে মানুষ বলেছিল, বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ। তখন মানুষ লক্ষ্মীর যে-পরিচয় পেয়েছিল সে তো কেবল ঐশ্বর্যে নয়, তাঁর সৌন্দর্যে। তার কারণ, বাণিজ্যের সঙ্গে তখন মনুষ্যত্বের বিচ্ছেদ ঘটে নি। তাঁতের সঙ্গে তাঁতির, কামারের হাতুড়ির সঙ্গে কামারের হাতের, কারিগরের সঙ্গে তার কারুকার্যের মনের মিল ছিল। এইজন্যে বাণিজ্যের ভিতর দিয়ে মানুষের হৃদয় আপনাকে ঐশ্বর্যে বিচিত্র ক'রে সুন্দর ক'রে ব্যক্ত করত। নইলে লক্ষ্মী তার পদ্মাসন পেতেন কোথা থেকে। যখন থেকে কল হল

বাণিজ্যের বাহন তখন থেকে বাণিজ্য হল শ্রীহীন। প্রাচীন ভেনিসের সঙ্গে আধুনিক ম্যাঞ্চেস্টরের তুলনা করলেই তফাতটা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাবে। ভেনিসে সৌন্দর্যে এবং ঐশ্বর্যে মানুষ আপনারই পরিচয় দিয়েছে, ম্যাঞ্চেস্টরে মানুষ সব দিকে আপনাকে খর্ব করে আপনার কলের পরিচয় দিয়েছে। এইজন্য কল-বাহন বাণিজ্য যেখানেই গেছে সেখানেই আপনার কালিমায় কদর্যতায় নির্মমতায় একটা লোলুপতার মহামারী সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তীর্ণ করে দিচ্ছে। তাই নিয়ে কাটাকাটি-হানাহানির আর অন্ত নেই; তাই নিয়ে অসত্যে লোকালয় কলঙ্কিত এবং রক্তপাতে ধরাতল পঙ্কিল হয়ে উঠল। অন্নপূর্ণা আজ হয়েছেন কালী; তাঁর অন্নপরিবেশনের হাতা আজ হয়েছে রক্তপান করবার খর্পর। তাঁর স্মিতহাস্য আজ অট্টহাস্যে ভীষণ হল। যাই হোক, আমার বলবার কথা এই যে, বাণিজ্য মানুষকে প্রকাশ করে না, মানুষকে প্রচ্ছন্ন করে।

তাই বলছি, রেঙ্গুন তো দেখলুম কিন্তু সে কেবল চোখের দেখা, সে দেখার মধ্যে কোনো পরিচয় নেই; সেখান থেকে আমার বাঙালি বন্ধুদের আতিথ্যের স্মৃতি নিয়ে এসেছি, কিন্তু ব্রহ্মদেশের হাত থেকে কোনো দক্ষিণা আনতে পারি নি। কথাটা হয়তো একটু অত্যুক্তি হয়ে পড়ল। আধুনিকতার এই প্রাচীরের মধ্যে দেশের একটা গবাক্ষ হঠাৎ একটু খোলা পেয়েছিলুম। সোমবার দিন সকালে আমার বন্ধুরা এখানকার বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দিরে নিয়ে গেলেন।

এতক্ষণে একটা-কিছু দেখতে পেলুম। এতক্ষণ যার মধ্যে ছিলুম সে একটা অ্যাব্‌সট্রাক্‌শন, সে একটা অবিচ্ছিন্ন পদার্থ। সে একটা শহর, কিন্তু কোনো-একটা শহরই নয়। এখন যা দেখছি তার নিজেরই একটা বিশেষ চেহারা আছে। তাই সমস্ত মন খুশি হয়ে সজাগ হয়ে উঠল। আধুনিক বাঙালির ঘরে মাঝে মাঝে খুব ফ্যাশানওয়ালা মেয়ে দেখতে পাই; তারা খুব গট্‌গট্‌ করে চলে, খুব চট্‌পট্‌ করে ইংরেজি কয়; দেখে মস্ত একটা অভাব মনে বাজে; মনে হয় ফ্যাশানটাকেই বড়ো করে দেখছি, বাঙালির মেয়েটিকে নয়; এমন সময় হঠাৎ ফ্যাশানজালমুক্ত সরল সুন্দর স্নিগ্ধ বাঙালি-ঘরের কল্যাণীকে দেখলে তখনই বুঝতে পারি, এ তো মরীচিকা নয়, স্বচ্ছ গভীর সরোবরের মতো এর মধ্যে একটি তৃষাহরণ পূর্ণতা আপন পদ্মবনের পাড়টি নিয়ে টলটল করছে। মন্দিরের মধ্যে ঢুকতেই আমার মনে তেমনি একটি আনন্দের চমক লাগল; মনে হল, যাই হোক-না কেন, এটা ফাঁকা নয়, যেটুকু চোখে পড়ছে এ তার চেয়ে আরো অনেক বেশি। সমস্ত রেঙ্গুন শহরটা এর কাছে ছোটো হয়ে গেল; বহুকালের বৃহৎ ব্রহ্মদেশ এই মন্দিরটুকুর মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করলে।

প্রথমেই বাইরের প্রখর আলোর থেকে একটি পুরাতন কালের পরিণত ছায়ার মধ্যে

এসে প্রবেশ করলুম। থাকে থাকে প্রশস্ত সিঁড়ি উঠে চলেছে; তার উপরে আচ্ছাদন। এই সিঁড়ির দুই ধারে ফল ফুল বাতি, পূজার অর্ঘ্য বিক্রি চলছে। যারা বেচছে তারা অধিকাংশই ব্রহ্মীয় মেয়ে। ফুলের রঙের সঙ্গে তাদের রেশমের কাপড়ের রঙের মিল হয়ে মন্দিরের ছায়াটি সূর্যাস্তের আকাশের মতো বিচিত্র হয়ে উঠেছে। কেনাবেচার কোনো নিষেধ নেই, মুসলমান দোকানদারেরা বিলাতি মনিহারির দোকান খুলে বসে গেছে। মাছমাংসেরও বিচার নেই, চারি দিকে খাওয়াদাওয়া ঘরকন্না চলছে। সংসারের সঙ্গে মন্দিরের সঙ্গে ভেদমাত্র নেই, একেবারে মাখামাখি। কেবল, হাট-বাজারে যেরকম গোলমাল, এখানে তা দেখা গেল না। চারি দিক নিরালা নয়, অথচ নিভৃত; স্তব্ধ নয়, শান্ত। আমাদের সঙ্গে ব্রহ্মদেশীয় একজন ব্যারিস্টার ছিলেন, এই মন্দিরসোপানে মাছমাংস কেনাবেচা এবং খাওয়া চলছে, এর কারণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন, "বুদ্ধ আমাদের উপদেশ দিয়েছেন, তিনি বলে দিয়েছেন— কিসে মানুষের কল্যাণ, কিসে তার বন্ধন , তিনি তো জোর করে কারো ভালো করতে চান নি; বাহিরের শাসনে কল্যাণ নেই, অন্তরের ইচ্ছাতেই মুক্তি; এইজন্যে আমাদের সমাজে বা মন্দিরে আচার সম্বন্ধে জবরদস্তি নেই।"

সিঁড়ি বেয়ে উপরে যেখানে গেলুম সেখানে খোলা জায়গা, তারই নানা স্থানে নানারকমের মন্দির। সে মন্দিরে গাম্ভীর্য নেই, কারুকার্যের ঠেসাঠেসি ভিড়, সমস্ত যেন ছেলেমানুষের খেলনার মতো। এমন অদ্ভুত পাঁচমিশালি ব্যাপার আর কোথাও দেখা যায় না— এ যেন ছেলে-ভুলোনো ছড়ার মতো; তার ছন্দটা একটানা বটে, কিন্তু তার মধ্যে যা-খুশি-তাই এসে পড়েছে, ভাবের পরস্পর-সামঞ্জস্যের কোনো দরকার নেই। বহুকালের পুরাতন শিল্পের সঙ্গে এখনকার কালের নিতান্ত সস্তাদরের তুচ্ছতা একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন। ভাবের অসংগতি বলে যে কোনো পদার্থ আছে, এরা তা যেন একেবারে জানেই না। আমাদের কলকাতায় বড়োমানুষের ছেলের বিবাহযাত্রায় রাস্তা দিয়ে যেমন সকল রকমের অদ্ভুত অসামঞ্জস্যের বন্যা বয়ে যায়, কেবলমাত্র পুঞ্জীকরণটাই তার লক্ষ্য, সজ্জীকরণ নয়, এও সেইরকম। এক ঘরে অনেকগুলো ছেলে থাকলে যেমন তারা গোলমাল করে, সেই গোলমাল করাতেই তাদের আনন্দ - এই মন্দিরের সাজসজ্জা, প্রতিমা, নৈবেদ্য, সমস্ত যেন সেইরকম ছেলেমানুষের উৎসব; তার মধ্যে অর্থ নেই, শব্দ আছে। মন্দিরের ওই সোনা-বাঁধানো পিতল-বাঁধানো চূড়াগুলি ব্রহ্মদেশের ছেলেমেয়েদের আনন্দের উচ্চহাস্যমিশ্রিত হো হো শব্দ— আকাশে ঢেউ খেলিয়ে উঠছে। এদের যেন বিচার করবার, গম্ভীর হবার বয়স হয় নি। এখানকার এই রঙিন মেয়েরাই সব-চেয়ে চোখে পড়ে। এদেশের শাখাপ্রশাখা ভরে এরা যেন

ফুল ফুটে রয়েছে। ভুঁইচাঁপার মতো এরাই দেশের সমস্ত— আর কিছু চোখে পড়ে না।

লোকের কাছে শুনতে পাই এখানকার পুরুষেরা অলস ও আরামপ্রিয়, অন্য দেশের পুরুষের কাজ প্রায় সমস্তই এখানে মেয়েরা করে থাকে। হঠাৎ মনে আসে, এটা বুঝি মেয়েদের উপরে জুলুম করা হয়েছে। কিন্তু, ফলে তো তার উলটোই দেখতে পাচ্ছি— এই কাজকর্মের হিল্লোলে মেয়েরা আরো যেন বেশি করে বিকশিত হয়ে উঠেছে। কেবল বাইরে বেরতে পারাই যে মুক্তি তা নয়, অবাধে কাজ করতে পাওয়া মানুষের পক্ষে তার চেয়ে বড়ো মুক্তি। পরাধীনতাই সব চেয়ে বড়ো বন্ধন নয়, কাজের সংকীর্ণতাই হচ্ছে সব চেয়ে কঠোর খাঁচা।

এখানকার মেয়েরা সেই খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে এমন পূর্ণতা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তারা নিজের অস্তিত্ব নিয়ে নিজের কাছে সংকুচিত হয়ে নেই; রমণীর লাবণ্যে যেমন তারা প্রেয়সী, শক্তির মুক্তিগৌরবে তেমনি তারা মহীয়সী। কাজেই যে মেয়েদের যথার্থ শ্রী দেয়, সাঁওতাল মেয়েদের দেখে তা আমি প্রথম বুঝতে পেরেছিলুম। তারা কঠোর পরিশ্রম করে, কিন্তু কারিগর যেমন কঠিন আঘাতে মূর্তিটিকে সুব্যক্ত করে তোলে তেমনি এই পরিশ্রমের আঘাতেই এই সাঁওতাল মেয়েদের দেহ এমন নিটোল, এমন সুব্যক্ত হয়ে ওঠে; তাদের সকল প্রকার গতিভঙ্গিতে এমন একটা মুক্তির মহিমা প্রকাশ পায়। কবি কীটস্ বলেছেন, সত্যই সুন্দর। অর্থাৎ, সত্যের বাধামুক্ত সুসম্পূর্ণতাতেই সৌন্দর্য। সত্য মুক্তি লাভ করলে আপনিই সুন্দর হয়ে প্রকাশ পায়। প্রকাশের পূর্ণতাই সৌন্দর্য, এই কথাটাই আমি উপনিষদের এই বাণীতে অনুভব করি— আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি; অনন্তস্বরূপ যেখানে প্রকাশ পাচ্ছেন, সেইখানেই তাঁর অমৃতরূপ, আনন্দরূপ। মানুষ ভয়ে লোভে ঈর্ষায় মূঢ়তায় প্রয়োজনের সংকীর্ণতায় এই প্রকাশকে আচ্ছন্ন করে, বিকৃত করে; এবং সেই বিকৃতিকেই অনেকসময় বড়ো নাম দিয়ে বিশেষ ভাবে আদর করে থাকে।

তোসামারু জাহাজ

২৭ বৈশাখ ১৩২৩

৫

২৯ বৈশাখ। বিকেলের দিকে যখন পিনাঙের বন্দরে ঢুকছি, আমাদের সঙ্গে যে-বালকটি এসেছে, তার নাম মুকুল, সে বলে উঠল, "ইস্কুলে একদিন পিনাঙ সিঙাপুর মুখস্ত করে মরেছি, এ সেই পিনাঙ।" তখন আমার মনে হল, ইস্কুলের ম্যাপে পিনাঙ দেখা

যেমন সহজ ছিল, এ তার চেয়ে বেশি শক্ত নয়। তখন মাস্টার ম্যাপে আঙুল বুলিয়ে দেশ দেখাতেন, এ হচ্ছে জাহাজ বুলিয়ে দেখানো।

এরকম ভ্রমণের মধ্যে 'বস্তুতন্ত্রতা' খুব সামান্য। বসে বসে স্বপ্ন দেখবার মতো। না করছি চেষ্টা, না করছি চিন্তা, চোখের সামনে আপনা-আপনি সব জেগে উঠছে। এই-সব দেশ বের করতে, এর পথ ঠিক করে রাখতে, এর রাস্তাঘাট পাকা করে তুলতে, অনেক মানুষকে অনেক ভ্রমণ এবং অনেক দুঃসাহস করতে হয়েছে; আমরা সেই সমস্ত ভ্রমণ ও দুঃসাহসের বোতলে-ভরা মোরব্বা উপভোগ করছি যেন। এতে কোনো কাঁটা নেই, খোসা নেই, আঁটি নেই; কেবল শাঁসটুকু আছে, আর তার সঙ্গে যতটা সম্ভব চিনি মেশানো। অকূল সমুদ্র ফুলে ফুলে উঠছে, দিগন্তের পর দিগন্তের পর্দা উঠে উঠে যাচ্ছে, দুর্গমতার একটা প্রকাণ্ড মূর্তি চোখে দেখতে পাচ্ছি; অথচ আলিপুরে খাঁচার-সিংহটার মতো তাকে দেখে আমোদ বোধ করছি; ভীষণও মনোহর হয়ে দেখা দিচ্ছে।

আরব্য উপন্যাসে আলাদিনের প্রদীপের কথা যখন পড়েছিলুম তখন সেটাকে ভারি লোভনীয় মনে হয়েছিল। এ তো সেই প্রদীপেরই মায়া। জলের উপরে স্থলের উপরে সেই প্রদীপটা ঘষছে, আর অদৃশ্য দৃশ্য হচ্ছে, দূর নিকটে এসে পড়ছে। আমরা এক জায়গায় বসে আছি, আর জায়গাগুলোই আমাদের সামনে এসে পড়ছে।

কিন্তু মানুষ ফলটাকেই যে মুখ্যভাবে চায় তা নয়, ফলিয়ে তোলানোটাই তার সব-চেয়ে বড়ো জিনিস। সেইজন্যে, এই যে ভ্রমণ করছি এর মধ্যে মন একটা অভাব অনুভব করছে, সেটি হচ্ছে এই যে আমরা ভ্রমণ করছি নে। সমুদ্রপথে আসতে আসতে মাঝে মাঝে দূরে দূরে এক-একটা পাহাড় দেখা দিচ্ছিল, আগাগোড়া গাছে ঢাকা; ঠিক যেন কোন্ দানবলোকের প্রকাণ্ড জন্তু তার কোঁকড়া সবুজ রোঁয়া নিয়ে সমুদ্রের ধারে ঝিমোতে ঝিমোতে রোদ পোয়াচ্ছে; মুকুল তাই দেখে বললে, ওইখানে নেবে যেতে ইচ্ছা করে। ওই ইচ্ছাটা হচ্ছে সত্যকার ভ্রমণ করবার ইচ্ছা। অন্য কর্তৃক দেখিয়ে দেওয়ার বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে নিজে দেখার ইচ্ছা। ওই পাহাড়ওয়ালা ছোটো ছোটো দ্বীপগুলোর নাম জানি নে, ইস্কুলের ম্যাপে ওগুলোকে মুখস্ত করতে হয় নি; দূর থেকে দেখে মনে হয়, ওরা একেবারে তাজা রয়েছে, সার্কুলেটিং লাইব্রেরির বইগুলোর মতো মানুষের হাতে হাতে ফিরে নানা চিহ্নে চিহ্নিত হয়ে যায় নি; সেইজন্যে মনকে টানে। অন্যের পরে মানুষের বড়ো ঈর্ষা। যাকে আর কেউ পায় নি মানুষ তাকে পেতে চায়। তাতে যে পাওয়ার পরিমাণ বাড়ে তা নয়, কিন্তু পাওয়ার অভিমান বাড়ে।

সূর্য যখন অস্ত যাচ্ছে তখন পিনাঙের বন্দরে জাহাজ এসে পৌঁছল। মনে হল,

বড়ো সুন্দর এই পৃথিবী। জলের সঙ্গে স্থলের যেন প্রেমের মিলন দেখলুম। ধরণী তার দুই বাহু মেলে সমুদ্রকে আলিঙ্গন করছে। মেঘের ভিতর দিয়ে নীলাভ পাহাড়-গুলির উপরে যে একটি সুকোমল আলো পড়েছে সে যেন অতি সূক্ষ্ম সোনালি রঙের ওড়নার মতো; তাতে বধূর মুখ ঢেকেছে না প্রকাশ করছে, তা বলা যায় না। জলে স্থলে আকাশে মিলে এখানে সন্ধ্যাবেলাকার স্বর্ণতোরণের থেকে স্বর্গীয় নহবত বাজতে লাগল।

পালতোলা সমুদ্রের নৌকাগুলির মতো মানুষের সুন্দর সৃষ্টি অতি অল্পই আছে। যেখানে প্রকৃতির ছন্দে লয়ে মানুষকে চলতে হয়েছে সেখানে মানুষের সৃষ্টি সুন্দর না হয়ে থাকতে পারে না। নৌকোকে জলবাতাসের সঙ্গে সন্ধি করতে হয়েছে, এইজন্যেই জল বাতাসের শ্রীটুকু সে পেয়েছে। কল যেখানে নিজের জোরে প্রকৃতিকে উপেক্ষা করতে পারে সেখানেই সেই ঔদ্ধত্যে মানুষের রচনা কুশ্রী হয়ে উঠতে লজ্জামাত্র করে না। কলের জাহাজে পালের জাহাজের চেয়ে সুবিধা আছে, কিন্তু সৌন্দর্য নেই। জাহাজ যখন আস্তে আস্তে বন্দরের গা ঘেঁষে এল, যখন প্রকৃতির চেয়ে মানুষের দুশ্চেষ্টা বড়ো হয়ে দেখা দিল, কলের চিমনিগুলো প্রকৃতির বাঁকা ভঙ্গিমার উপর তার সোজা আঁচড় কাটতে লাগল, তখন দেখতে পেলুম মানুষের রিপু জগতে কী কুশ্রীতাই সৃষ্টি করছে। সমুদ্রের তীরে তীরে, বন্দরে বন্দরে, মানুষের লোভ কদর্য ভঙ্গিতে স্বর্গকে ব্যঙ্গ করছে— এমনি করেই নিজেকে স্বর্গ থেকে নির্বাসিত করে দিচ্ছে।

তোসামারু। পিনাঙ বন্দর

৬

২রা জ্যৈষ্ঠ। উপরে আকাশ, নীচে সমুদ্র। দিনে রাত্রে আমাদের দুই চক্ষুর বরাদ্দ এর বেশি নয়। আমাদের চোখদুটো মা-পৃথিবীর আদর পেয়ে পেটুক হয়ে গেছে। তার পাতে নানা রকমের জোগান দেওয়া চাই। তার অধিকাংশই সে স্পর্শও করে না, ফেলা যায়। কত যে নষ্ট হচ্ছে বলা যায় না, দেখবার জিনিস অতিরিক্ত পরিমাণে পাই বলেই দেখবার জিনিস সম্পূর্ণ করে দেখি নে। এইজন্যে মাঝে মাঝে আমাদের পেটুক চোখের পক্ষে এই রকমের উপবাস ভালো।

আমাদের সামনে মস্ত দুটো ভোজের থালা, আকাশ আর সাগর। অভ্যাসদোষে প্রথমটা মনে হয়, এ দুটো বুঝি একেবারে শূন্য থালা। তার পর দুই-এক দিন লঙ্ঘনের পর ক্ষুধা একটু বাড়লেই তখন দেখতে পাই, যা আছে তা নেহাত কম নয়। মেঘ

ক্রমাগত নতুন নতুন রঙে সরস হয়ে আসছে, আলো ক্ষণে ক্ষণে নতুন নতুন স্বাদে আকাশকে এবং জলকে পূর্ণ করে তুলছে।

আমরা দিনরাত পৃথিবীর কোলে কাঁখে থাকি বলেই আকাশের দিকে তাকাই নে, আকাশের দিগ্‌বসনকে বলি উলঙ্গতা। যখন দীর্ঘকাল ওই আকাশের সঙ্গে মুখোমুখি করে থাকতে হয়, তখন তার পরিচয়ের বিচিত্রতায় অবাক হয়ে থাকি। ওখানে মেঘে মেঘে রূপের এবং রঙের অহেতুক বিকাশ। এ যেন গানের আলাপের মতো, রূপ-রঙের রাগরাগিণীর আলাপ চলছে— তাল নেই, আকার-আয়তনের বাঁধাবাঁধি নেই, কোনো অর্থবিশিষ্ট বাণী নেই, কেবলমাত্র মুক্ত সুরের লীলা। সেইসঙ্গে সমুদ্রের অপ্সরনৃত্য ও মুক্ত ছন্দের নাচ। তার মৃদঙ্গে যে বোল বাজছে তার ছন্দ এমন বিপুল যে, তার লয় খুঁজে পাওয়া যায় না। তাতে নৃত্যের উল্লাস আছে, অথচ নৃত্যের নিয়ম নেই।

এই বিরাট রঙ্গশালায় আকাশ এবং সমুদ্রের যে-রঙ্গ সেইটি দেখবার শক্তি ক্রমে আমাদের বেড়ে ওঠে। জগতে যা-কিছু মহান, তার চারি দিকে একটা বিরলতা আছে, তার পটভূমিকা (background) সাদাসিধে। সে আপনাকে দেখাবার জন্যে আর কিছুর সাহায্য নিতে চায় না। নিশীথের নক্ষত্রসভা অসীম অন্ধকারের অবকাশের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে। এই সমুদ্র-আকাশের যে বৃহৎ প্রকাশ সেও বহু-উপকরণের দ্বারা আপন মর্যাদা নষ্ট করে না। এরা হল জগতের বড়ো ওস্তাদ, ছলাকলায় আমাদের মন ভোলাতে এরা অবজ্ঞা করে। মনকে শ্রদ্ধাপূর্বক আপন হতে অগ্রসর হয়ে এদের কাছে যেতে হয়। মন যখন নানা ভোগে জীর্ণ হয়ে অলস এবং 'অন্যথাবৃত্তি' হয়ে থাকে তখন এই ওস্তাদের আলাপ তার পক্ষে অত্যন্ত ফাঁকা।

আমাদের সুবিধে হয়েছে, সামনে আমাদের আর কিছু নেই। অন্যবারে যখন বিলিতি যাত্রী-জাহাজে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছি তখন যাত্রীরাই ছিল এক দৃশ্য। তারা নাচে গানে খেলায় গোলেমালে অনন্তকে আচ্ছন্ন করে রাখত। এক মুহূর্তও তারা ফাঁকা ফেলে রাখতে চাইত না। তার উপরে সাজসজ্জা, কায়দাকানুনের উপসর্গ ছিল। এখানে জাহাজের ডেকের সঙ্গে সমুদ্র-আকাশের কোনো প্রতিযোগিতা নেই। যাত্রীর সংখ্যা অতি সামান্য, আমরাই চারজন; বাকি দু-তিনজন ধীর প্রকৃতির লোক। তার পরে, ঢিলাঢালা বেশেই ঘুমচ্ছি, জাগছি, খেতে যাচ্ছি, কারো কোনো আপত্তি নেই; তার প্রধান কারণ, এমন কোনো মহিলা নেই আমাদের অপরিচ্ছন্নতায় যাঁর অসম্ভ্রম হতে পারে।

এইজন্যেই প্রতিদিন আমরা বুঝতে পারছি, জগতে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত সামান্য ব্যাপার নয়, তার অভ্যর্থনার জন্যে স্বর্গে মর্তে রাজকীয় সমারোহ। প্রভাতে পৃথিবী

তার ঘোমটা খুলে দাঁড়ায়, তার বাণী নানা সুরে জেগে ওঠে; সন্ধ্যায় স্বর্গলোকের যবনিকা উঠে যায়, এবং দ্যুলোক আপন জ্যোতি-রোমাঞ্চিত নিঃশব্দতার দ্বারা পৃথিবীর সম্ভাষণে উত্তর দেয়। স্বর্গমর্তের এই মুখোমুখি আলাপ যে কত গম্ভীর এবং কত মহীয়ান, এই আকাশ ও সমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তা আমরা বুঝতে পারি।

দিগন্ত থেকে দেখতে পাই, মেঘগুলো নানা ভঙ্গিতে আকাশে উঠে চলেছে, যেন সৃষ্টিকর্তার আঙিনার আকার-ফোয়ারার মুখ খুলে গেছে। বস্তু প্রায় কিছুই নেই, কেবল আকৃতি, কোনোটার সঙ্গে কোনোটার মিল নেই। নানা রকমের আকার— কেবল সোজা লাইন নেই। সোজা লাইনটা মানুষের হাতের কাজের। তার ঘরের দেওয়ালে, তার কারখানাঘরের চিমনিতে মানুষের জয়স্তম্ভ একেবারে সোজা খাড়া। বাঁকা রেখা জীবনের রেখা, মানুষ সহজে তাকে আয়ত্ত করতে পারে না। সোজা রেখা জড় রেখা, সে সহজেই মানুষের শাসন মানে; সে মানুষের বোঝা বয়, মানুষের অত্যাচার সয়।

যেমন আকৃতির হরির লুঠ, তেমনি রঙের। রঙ যে কত রকম হতে পারে, তার সীমা নেই। রঙের তান উঠছে, তানের উপর তান; তাদের মিলও যেমন, তাদের অমিলও তেমনি; তারা বিরুদ্ধ নয়, অথচ বিচিত্র। রঙের সমারোহেও যেমন প্রকৃতির বিলাস, রঙের শান্তিতেও তেমনি। সূর্যাস্তের মুহূর্তে পশ্চিম আকাশ যেখানে রঙের ঐশ্বর্য পাগলের মতো দুই হাতে বিনা প্রয়োজনে ছড়িয়ে দিচ্ছে সেও যেমন আশ্চর্য, পূর্ব আকাশে যেখানে শান্তি এবং সংযম, সেখানেও রঙের পেলবতা, কোমলতা, অপরিমেয় গভীরতা তেমনি আশ্চর্য। প্রকৃতির হাতে অপর্যাপ্তও যেমন মহৎ হতে পারে, পর্যাপ্তও তেমনি। সূর্যাস্তে সূর্যোদয়ে প্রকৃতি আপনার ডাইনে বাঁয়ে একই কালে সেটা দেখিয়ে দেয়; তার খেয়াল আর ধ্রুপদ একই সঙ্গে বাজতে থাকে, অথচ কেউ কারো মহিমাকে আঘাত করে না।

তার পরে, রঙের আভায় আভায় জল যে কত বিচিত্র কথাই বলতে পারে তা কেমন করে বর্ণনা করব। সে তার জলতরঙ্গে রঙের যে গৎ বাজাতে থাকে, তাতে সুরের চেয়ে শ্রুতি অসংখ্য। আকাশ যে-সময়ে তার প্রশান্ত স্তব্ধতার উপর রঙের মহতোমহীয়ানকে দেখায় সমুদ্র সেইসময় তার ছোটো ছোটো লহরীর কম্পনে রঙের অণোরণীয়ানকে দেখাতে থাকে, তখন আশ্চর্যের অন্ত পাওয়া যায় না।

সমুদ্র-আকাশের গীতিনাট্যলীলায় রুদ্রের প্রকাশ কী রকম দেখা গেছে, সে পূর্বেই বলেছি। আবার কালও তিনি তাঁর ডমরু বাজিয়ে অট্টহাস্যে আর এক ভঙ্গিতে দেখা দিয়ে গেলেন। সকালে আকাশ জুড়ে নীল মেঘ এবং ধোঁয়ালো মেঘ স্তরে স্তরে পাকিয়ে

পাকিয়ে ফুলে ফুলে উঠল। মুষলধারে বৃষ্টি। বিদ্যুৎ আমাদের জাহাজের চার দিকে তার তলোয়ার খেলিয়ে বেড়াতে লাগল। তার পিছনে পিছনে বজ্রের গর্জন। একটা বজ্র ঠিক আমাদের সামনে জলের উপর পড়ল, জল থেকে একটা বাষ্পরেখা সাপের মতো ফোঁস করে উঠল। আর-একটা বজ্র পড়ল আমাদের সামনেকার মাস্তুলে। রুদ্র যেন সুইট্‌জার্‌ল্যাণ্ডের ইতিহাসবিশ্রুত বীর উইলিয়ম টেলের মতো তাঁর অদ্ভুত ধনুর্বিদ্যার পরিচয় দিয়ে গেলেন, মাস্তুলের ডগাটায় তাঁর বাণ লাগল, আমাদের স্পর্শ করল না। এই ঝড়ে আমাদের সঙ্গী আর-একটা জাহাজের প্রধান মাস্তুল বজ্রে বিদীর্ণ হয়েছে শুনলুম। মানুষ যে বাঁচে এই আশ্চর্য।

৭

এই কয়দিন আকাশ এবং সমুদ্রের দিকে চোখ ভরে দেখছি আর মনে হচ্ছে, অনন্তের রঙ তো শুভ্র নয়, তা কালো কিম্বা নীল। এই আকাশ খানিক দূর পর্যন্ত আকাশ অর্থাৎ প্রকাশ, ততটা সে সাদা। তার পরে সে অব্যক্ত, সেইখান থেকে সে নীল। আলো যতদূর সীমার রাজ্য সেই পর্যন্ত; তার পরেই অসীম অন্ধকার। সেই অসীম অন্ধকারের বুকের উপরে এই পৃথিবীর আলোকময় দিনটুকু যেন কৌস্তুভমণির হার দুলছে।

এই প্রকাশের জগৎ, এই গৌরাঙ্গী, তার বিচিত্র রঙের সাজ প'রে অভিসারে চলেছে— ওই কালোর দিকে, ওই অনির্বচনীয় অব্যক্তর দিকে। বাঁধা নিয়মের মধ্যে বাঁধা থাকাতেই তার মরণ— সে কুলকেই সর্বস্ব করে চুপ করে বসে থাকতে পারে না, সে কুল খুইয়ে বেরিয়ে পড়েছে। এই বেরিয়ে যাওয়া বিপদের যাত্রা; পথে কাঁটা, পথে সাপ, পথে ঝড় বৃষ্টি— সমস্তকে অতিক্রম করে, বিপদকে উপেক্ষা করে সে যে চলেছে, সে কেবল ওই অব্যক্ত অসীমের টানে। অব্যক্তর দিকে, 'আরো'র দিকে প্রকাশের এই কুল-খোয়ানো অভিসারযাত্রা— প্রলয়ের ভিতর দিয়ে, বিপ্লবের কাঁটাপথে পদে পদে রক্তের চিহ্ন এঁকে।

কিন্তু কেন চলে, কোন্ দিকে চলে, ওদিকে তো পথের চিহ্ন নেই, কিছু তো দেখতে পাওয়া যায় না? না, দেখা যায় না, সব অব্যক্ত কিন্তু শূন্য তো নয়; কেননা, ওই দিক থেকেই বাঁশির সুর আসছে। আমাদের চলা, এ চোখে দেখে চলা নয়, এ সুরের টানে চলা। যেটুকু চোখে দেখে চলি সে তো বুদ্ধিমানের চলা, তার হিসাব আছে, তার প্রমাণ আছে; সে ঘুরে ঘুরে কুলের মধ্যেই চলা। সে চলায় কিছুই এগোয় না। আর যেটুকু বাঁশি শুনে পাগল হয়ে চলি, যে-চলায় মরা-বাঁচা জ্ঞান থাকে না, সেই পাগলের

চলাতেই জগৎ এগিয়ে চলেছে। সেই চলাকে নিন্দার ভিতর দিয়ে, বাধার ভিতর দিয়ে চলতে হয়; কোনো নজির মানতে গেলেই তাকে থমকে দাঁড়াতে হয়। তার এই চলার বিরুদ্ধে হাজাররকম যুক্তি আছে, সে-যুক্তি তর্কের দ্বারা খণ্ডন করা যায় না। তার এই চলার কেবল একটিমাত্র কৈফিয়ত আছে— সে বলছে, ওই অন্ধকারের ভিতর দিয়ে বাঁশি আমাকে ডাকছে। নইলে কেউ কি সাধ করে আপনার সীমা ডিঙিয়ে যেতে পারে।

যে দিক থেকে ওই মনোহরণ অন্ধকারের বাঁশি বাজছে ওই দিকেই মানুষের সমস্ত আরাধনা, সমস্ত কাব্য, সমস্ত শিল্পকলা, সমস্ত বীরত্ব, সমস্ত আত্মত্যাগ মুখ ফিরিয়ে আছে; ওই দিকে চেয়েই মানুষ রাজ্যসুখ জলাঞ্জলি দিয়ে বিবাগি হয়ে বেরিয়ে গেছে, মরণকে মাথায় করে নিয়েছে। ওই কালোকে দেখে মানুষ ভুলেছে। ওই কালোর বাঁশিতেই মানুষকে উত্তরমেরু দক্ষিণমেরুতে টানে, অনুবীক্ষণ দূরবীক্ষণের রাস্তা বেয়ে মানুষের মন দুর্গমের পথে ঘুরে বেড়ায়, বারবার মরতে মরতে সমুদ্রপারের পথ বের করে, বারবার মরতে মরতে আকাশপারের ডানা মেলতে থাকে।

মানুষের মধ্যে যে-সব মহাজাতি কুলত্যাগিনী তারাই এগচ্ছে, ভয়ের ভিতর থেকে অভয়ে, বিপদের ভিতর দিয়ে সম্পদে। যারা সর্বনাশা কালোর বাঁশি শুনতে পেলে না তারা কেবল পুঁথির নজর জড়ো করে কূল আঁকড়ে বসে রইল, তারা কেবল শাসন মানতেই আছে। তারা কেন বৃথা এই আনন্দলোকে জন্মেছে যেখানে সীমা কাটিয়ে অসীমের সঙ্গে নিত্যলীলাই হচ্ছে জীবনযাত্রা, যেখানে বিধানকে ভাসিয়ে দিতে থাকাই হচ্ছে বিধি।

আবার উলটো দিক থেকে দেখলে দেখতে পাই, ওই কালো অনন্ত আসছেন তাঁর আপনার শুভ্র জ্যোতির্ময়ী আনন্দমূর্তির দিকে। অসীমের সাধনা এই সুন্দরীর জন্যে, সেইজন্যেই তাঁর বাঁশি বিরাট অন্ধকারের ভিতর দিয়ে এমন ব্যাকুল হয়ে বাজছে; অসীমের সাধনা এই সুন্দরীকে নূতন নূতন মালায় নূতন করে সাজাচ্ছে। ওই কালো এই রূপসীকে এক মুহূর্ত বুকের থেকে নামিয়ে রাখতে পারেন না, কেননা, এ যে তাঁর পরমা সম্পদ। ছোটোর জন্যে বড়োর এই সাধনা যে কী অসীম, তা ফুলের পাপড়িতে পাপড়িতে পাখির পাখায় পাখায়, মেঘের রঙে রঙে মানুষের হৃদয়ের অপরূপ লাবণ্যে মুহূর্তে মুহূর্তে ধরা পড়েছে। রেখায় রেখায়, রঙে রঙে, রসে রসে তৃপ্তির আর শেষ নেই। এই আনন্দ কিসের।— অব্যক্ত যে ব্যক্তর মধ্যে কেবলই আপনাকে প্রকাশ করছেন, আপনাকে ত্যাগ করে করে ফিরে পাচ্ছেন।

এই অব্যক্ত কেবলই যদি না-মাত্র শূন্যমাত্র হতেন তা হলে প্রকাশের কোনো

অর্থই থাকত না, তা হলে বিজ্ঞানের অভিব্যক্তি কেবল একটা শব্দমাত্র হত। ব্যক্ত যদি অব্যক্তেরই প্রকাশ না হত তা হলে যা-কিছু আছে তা নিশ্চল হয়ে থাকত, কেবলই আরো-কিছুর দিকে আপনাকে নূতন করে তুলত না। এই আরো-কিছুর দিকেই সমস্ত জগতের আনন্দ কেন। এই অজানা আরো-কিছুর বাঁশি শুনেই সে কূল ত্যাগ করে কেন। ওই দিকে শূন্য নয় ব'লেই, ওই দিকেই সে পূর্ণকে অনুভব করে ব'লেই। সেইজন্যই উপনিষদ বলেছেন— ভূমৈব সুখং, ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। সেইজন্যই তো সৃষ্টির এই লীলা দেখছি, আলো এগিয়ে চলেছে অন্ধকারের অকূলে, অন্ধকার নেমে আসছে আলোর কূলে। আলোর মন ভুলেছে কালোয়, কালোর মন ভুলেছে আলোয়।

মানুষ যখন জগৎকে না-এর দিক থেকে দেখে, তখন তার রূপক একেবারে উলটে যায়। প্রকাশের একটা উলটো পিঠ আছে, সে হচ্ছে প্রলয়। মৃত্যুর ভিতর দিয়ে ছাড়া প্রাণের বিকাশ হতেই পারে না। হয়ে-ওঠার মধ্যে দুটো জিনিস থাকাই চাই— যাওয়া এবং হওয়া। হওয়াটাই হচ্ছে মুখ্য, যাওয়াটাই গৌণ।

কিন্তু মানুষ যদি উলটো পিঠেই চোখ রাখে, বলে, সবই যাচ্ছে, কিছুই থাকছে না; বলে, জগৎ বিনাশেরই প্রতিরূপ, সমস্তই মায়া, যা-কিছু দেখছি এ-সমস্তই 'না'; তা হলে এই প্রকাশের রূপকেই সে কালো ক'রে, ভয়ংকর ক'রে দেখে; তখন সে দেখে, এই কালো কোথাও এগচ্ছে না, কেবল বিনাশের বেশে নৃত্য করছে। আর, অনন্ত রয়েছেন আপনাতে আপনি নির্লিপ্ত, এই কালিমা তাঁর বুকের উপর মৃত্যুর ছায়ার মতো চঞ্চল হয়ে বেড়াচ্ছে, কিন্তু স্তব্ধকে স্পর্শ করতে পারছে না। এই কালো দৃশ্যত আছে, কিন্তু বস্তুত নেই; আর যিনি কেবলমাত্র আছেন তিনি স্থির, ওই প্রলয়রূপিণী না-থাকা তাঁকে লেশমাত্র বিক্ষুব্ধ করে না। এখানে আলোর সঙ্গে কালোর সেই সম্বন্ধ, থাকার সঙ্গে না-থাকার যে সম্বন্ধ। কালোর সঙ্গে আলোর আনন্দের লীলা নেই; এখানে যোগের অর্থ হচ্ছে প্রেমের যোগ নয়, জ্ঞানের যোগ। দুইয়ের যোগে এক নয়, একের মধ্যেই এক। মিলনে এক নয়, প্রলয়ে এক।

কথাটাকে আর-একটু পরিষ্কার করবার চেষ্টা করি।

একজন লোক ব্যাবসা করছে। সে লোক করছে কী। তার মূলধনকে অর্থাৎ পাওয়া-সম্পদকে সে মুনফা অর্থাৎ না-পাওয়া সম্পদের দিকে প্রেরণ করছে। পাওয়া-সম্পদটা সীমাবদ্ধ ও ব্যক্ত, না-পাওয়া সম্পদটা অসীম ও অব্যক্ত। পাওয়া-সম্পদ সমস্ত বিপদ স্বীকার করে না-পাওয়া সম্পদের অভিসারে চলেছে। না-পাওয়া সম্পদ অদৃশ্য ও অলব্ধ বটে কিন্তু তার বাঁশি বাজছে, সেই বাঁশি ভূমার বাঁশি। যে-বণিক সেই বাঁশি শোনে সে আপন ব্যাঙ্কে-জমানো কোম্পানি-কাগজের কূল ত্যাগ ক'রে সাগর গিরি

ডিঙিয়ে বেরিয়ে পড়ে। এখানে কী দেখছি। না, পাওয়া-সম্পদের সঙ্গে না-পাওয়া সম্পদের একটি লাভের যোগ আছে। এই যোগে উভয়ত আনন্দ। কেননা, এই যোগে পাওয়া না-পাওয়াকে পাচ্ছে, এবং না-পাওয়া পাওয়ার মধ্যে ক্রমাগত আপনাকেই পাচ্ছে।

কিন্তু মনে করা যাক, একজন ভীতু লোক বণিকের খাতায় ওই খরচের দিকের হিসাবটাই দেখছে। বণিক কেবলই আপনার পাওয়া টাকা খরচ করেই চলেছে, তার অন্ত নেই। তার গা শিউরে ওঠে। সে বলে, এই তো প্রলয়! খরচের হিসাবের কালো অঙ্কগুলো রক্তলোলুপ রসনা তুলিয়ে কেবলই যে নৃত্য করছে। যা খরচ, অর্থাৎ বস্তুত যা নেই, তাই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অঙ্ক-বস্তুর আকার ধরে খাতা জুড়ে বেড়ে বেড়েই চলেছে। একেই তো বলে মায়া। বণিক মুগ্ধ হয়ে এই মায়া-অঙ্কটার চির-দীর্ঘায়মান শৃঙ্খল কাটাতে পারছে না। এ-স্থলে মুক্তিটা কী। না, ওই সচল অঙ্কগুলোকে একেবারে লোপ করে দিয়ে খাতার নিশ্চল নির্বিকার শুভ্র কাগজের মধ্যে নিরাপদ ও নিরঞ্জন হয়ে স্থিরত্ব লাভ করা। দেওয়া ও পাওয়ার মধ্যে যে একটি আনন্দময় সম্বন্ধ আছে যে-সম্বন্ধ থাকার দরুন মানুষ দুঃসাহসের পথে যাত্রা ক'রে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জয়লাভ করে, ভীতু মানুষ তাকে দেখতে পায় না। তাই বলে—

মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা।

চীন সমুদ্র। তোসামারু
৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩

৮

শুনেছিলুম, পারস্যের রাজা যখন ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন তখন হাতে খাওয়ার প্রসঙ্গে-তিনি ইংরেজকে বলেছিলেন, "কাঁটাচামচ দিয়ে খেতে গিয়ে তোমরা খাওয়ার একটা আনন্দ থেকে বঞ্চিত হও।" যারা ঘটকের হাত দিয়ে বিয়ে করে তারা কোর্টশিপের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। হাত দিয়ে স্পর্শ করেই খাবারের সঙ্গে কোর্টশিপ আরম্ভ হয়। আঙুলের ডগা দিয়েই স্বাদগ্রহণের শুরু।

আমার তেমনি জাহাজ থেকেই জাপানের স্বাদ শুরু হয়েছে। যদি ফরাসি জাহাজে করে জাপানে যেতুম তা হলে আঙুলের ডগা দিয়ে পরিচয় আরম্ভ হত না।

এর আগে অনেকবার বিলিতি জাহাজে করে সমুদ্রযাত্রা করেছি, তার সঙ্গে এই জাহাজের বিস্তর তফাত। সে সব জাহাজের কাপ্তেন ঘোরতর কাপ্তেন। যাত্রীদের

সঙ্গে খাওয়াদাওয়া হাসিতামাশা যে তার বন্ধ তা নয়; কিন্তু কাপ্তেনিটা খুব টকটকে রাঙা। এত জাহাজে আমি ঘুরেছি, তার মধ্যে কোনো কাপ্তেনকেই আমার মনে পড়ে না। কেননা, তারা কেবলমাত্র জাহাজের অঙ্গ। জাহাজ-চালানোর মাঝখান দিয়ে তাদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ।

হতে পারে আমি যদি য়ুরোপীয় হতুম তা হলে তারা যে কাপ্তেন ছাড়াও আর কিছু, তারা যে মানুষ, এটা আমার অনুভব করতে বিশেষ বাধা হত না। কিন্তু, এ জাহাজেও আমি বিদেশী; একজন য়ুরোপীয়ের পক্ষেও আমি যা একজন জাপানির পক্ষেও আমি তাই।

এ জাহাজে চড়ে অবধি দেখতে পাচ্ছি, আমাদের কাপ্তেনের কাপ্তেনিটা কিছুমাত্র লক্ষ্যগোচর নয়, একেবারেই সহজ মানুষ। যাঁরা তাঁর নিম্নতর কর্মচারী তাঁদের সঙ্গে তাঁর কর্মের সম্বন্ধ এবং দূরত্ব আছে, কিন্তু যাত্রীদের সঙ্গে কিছুমাত্র নেই। ঘোরতর ঝড়ঝাপটের মধ্যেও তাঁর ঘরে গেছি; দিব্যি সহজ ভাব। কথায় বার্তায় ব্যবহারে তাঁর সঙ্গে আমাদের যে জমে গিয়েছে, সে কাপ্তেন-হিসাবে নয়, মানুষ-হিসাবে। এ যাত্রা আমাদের শেষ হয়ে যাবে, তাঁর সঙ্গে জাহাজ-চলার সম্বন্ধ আমাদের ঘুচে যাবে, কিন্তু তাঁকে আমাদের মনে থাকবে।

আমাদের ক্যাবিনের যে স্টুয়ার্ড্ আছে সেও দেখি তার কাজকর্মের সীমাটুকুর মধ্যেই শক্ত হয়ে থাকে না। আমরা আপনাদের মধ্যে কথাবার্তা কচ্ছি তার মাঝখানে এসে সেও ভাঙা ইংরাজিতে যোগ দিতে বাধা বোধ করে না। মুকুল ছবি আঁকছে, সে এসে খাতা চেয়ে নিয়ে তার মধ্যে ছবি আঁকতে লেগে গেল।

আমাদের জাহাজের যিনি খাজাঞ্চি তিনি একদিন এসে আমাকে বললেন, "আমার মনে অনেক বিষয়ে প্রশ্ন আসে, তোমার সঙ্গে তার বিচার করতে ইচ্ছে করি; কিন্তু আমি ইংরাজি এত কম জানি যে, মুখে মুখে আলোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি যদি কিছু না মনে কর তবে আমি মাঝে মাঝে কাগজে আমার প্রশ্ন লিখে এনে দেব, তুমি অবসরমতো সংক্ষেপে দু-চার কথায় তার উত্তর লিখে দিয়ো।" তার পর থেকে রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ কী, এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার প্রশ্নোত্তর চলছে।

অন্য কোনো জাহাজের খাজাঞ্চি এই সব প্রশ্ন নিয়ে যে মাথা বকায়, কিম্বা নিজের কাজকর্মের মাঝখানে এরকম উপসর্গের সৃষ্টি করে, এরকম আমি মনে করতে পারি নে। এদের দেখে আমার মনে হয়, এরা নূতনজাগ্রত জাতি— এরা সমস্তই নূতন করে জানতে, নূতন করে ভাবতে উৎসুক। ছেলেরা নতুন জিনিস দেখলে যেমন ব্যগ্র হয়ে ওঠে, আইডিয়া সম্বন্ধে এদের যেন সেইরকম ভাব।

তা ছাড়া আর-একটা বিশেষত্ব এই যে, এক পক্ষে জাহাজের যাত্রী আর-এক পক্ষে জাহাজের কর্মচারী, এর মাঝখানকার গণ্ডিটা তেমন শক্ত নয়। আমি যে এই খাতাঙ্কির প্রশ্নের উত্তর লিখতে বসব, এ কথা মনে করতে তার কিছু বাধে নি— আমি দুটো কথা শুনতে চাই, তুমি দুটো কথা বলবে; এতে বিঘ্ন কী আছে। মানুষের উপর মানুষের যে একটি দাবি আছে সেই দাবিটা সরলভাবে উপস্থিত করলে মনের মধ্যে আপনি সাড়া দেয়, তাই আমি খুশি হয়ে আমার সাধ্যমতো এই আলোচনায় যোগ দিয়েছি।

আর-একটা জিনিস আমার বিশেষ করে চোখে লাগছে। মুকুল বালকমাত্র, সে ডেকের প্যাসেঞ্জার। কিন্তু, জাহাজের কর্মচারীরা তার সঙ্গে অবাধে বন্ধুত্ব করছে। কী করে জাহাজ চালায়, কী করে সমুদ্রে পথ নির্ণয় করে, কী করে গ্রহনক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করতে হয়, কাজ করতে করতে তারা এই সমস্ত তাকে বোঝায়। তা ছাড়া নিজেদের কাজকর্ম আশাভরসার কথাও ওর সঙ্গে হয়। মুকুলের শখ গেল, জাহাজের এঞ্জিনের ব্যাপার দেখবে। ওকে কাল রাত্রি এগারোটার সময় জাহাজের পাতালপুরীর মধ্যে নিয়ে গিয়ে এক ঘণ্টা ধরে সমস্ত দেখিয়ে আনলে।

কাজের সম্বন্ধের ভিতর দিয়েও মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্বন্ধ, এইটেই বোধ হয় আমাদের পূর্বদেশের জিনিস। পশ্চিমদেশ কাজকে খুব শক্ত করে খাড়া করে রাখে, সেখানে মানবসম্বন্ধের দাবি ঘেঁষতে পারে না। তাতে কাজ খুব পাকা হয় সন্দেহ নেই। আমি ভেবেছিলুম, জাপান তো য়ুরোপের কাছ থেকে কাজের দীক্ষা গ্রহণ করেছে, অতএব তার কাজের গণ্ডিও বোধ হয় পাকা। কিন্তু, এই জাপানি জাহাজে কাজ দেখতে পাচ্ছি, কাজের গণ্ডিগুলোকে দেখতে পাচ্ছি নে। মনে হচ্ছে, যেন আপনার বাড়িতে আছি, কোম্পানির জাহাজে নেই। অথচ, ধোওয়া মাজা প্রভৃতি জাহাজের নিত্যকর্মের কোনো খুঁত নেই।

প্রাচ্যদেশে মানবসমাজের সম্বন্ধগুলি বিচিত্র এবং গভীর। পূর্বপুরুষ যাঁরা মারা গিয়েছেন তাঁদের সঙ্গেও আমাদের সম্বন্ধ ছিন্ন হয় না। আমাদের আত্মীয়তার জাল বহুবিস্তৃত। এই নানা সম্বন্ধের নানা দাবি মেটানো আমাদের চিরাভ্যস্ত, সেইজন্যে তাতে আমাদের আনন্দ। আমাদের ভৃত্যেরাও কেবল বেতনের নয়, আত্মীয়তার দাবি করে। সেইজন্যে যেখানে আমাদের কোনো দাবি চলে না, যেখানে কাজ অত্যন্ত খাড়া, সেখানে আমাদের প্রকৃতি কষ্ট পায়। অনেক সময়ে ইংরেজ মনিবের সঙ্গে বাঙালি কর্মচারীর যে বোঝাপড়ার অভাব ঘটে তার কারণ এই— ইংরেজ কর্তা বাঙালি কর্মচারীর দাবি বুঝতে পারে না, বাঙালি কর্মচারী ইংরেজ কর্তার কাজের কড়া শাসন বুঝতে

পারে না। কর্মশালার কর্তা যে কেবলমাত্র কর্তা হবে তা নয়, মা-বাপ হবে, বাঙালি কর্মচারী চিরকালের অভ্যাসবশত এইটে প্রত্যাশা করে; যখন বাধা পায় তখন আশ্চর্য হয়, এবং মনে মনে মনিবকে দোষ না দিয়ে থাকতে পারে না। ইংরেজ কাজের দাবিকে মানতে অভ্যস্ত, বাঙালি মানুষের দাবিকে মানতে অভ্যস্ত; এইজন্যে উভয় পক্ষে ঠিকমতো মিটমাট হতে চায় না।

কিন্তু, কাজের সম্বন্ধ এবং মানুষের সম্বন্ধ এ দুইয়ের বিচ্ছেদ না হয়ে সামঞ্জস্য হওয়াটাই দরকার, এ কথা না মনে করে থাকা যায় না। কেমন করে সামঞ্জস্য হতে পারে, বাইরে থেকে তার কোনো বাঁধা নিয়ম ঠিক করে দেওয়া যায় না। সত্যকার সামঞ্জস্য প্রকৃতির ভিতর থেকে ঘটে। আমাদের দেশে প্রকৃতির এই ভিতরকার সামঞ্জস্য ঘটে ওঠা কঠিন, কেননা, যাঁরা আমাদের কাজের কর্তা তাঁদের নিয়ম অনুসারেই আমরা কাজ চালাতে বাধ্য।

জাপানে প্রাচ্যমন পাশ্চাত্যের কাছ থেকে কাজের শিক্ষালাভ করেছে, কিন্তু কাজের কর্তা তারা নিজেই। এইজন্যে মনের ভিতরে একটা আশা হয় যে, জাপানে হয়তো পাশ্চাত্য কাজের সঙ্গে প্রাচ্যভাবের একটা সামঞ্জস্য ঘটে উঠতে পারে। যদি সেটা ঘটে, তবে সেইটেই পূর্ণতার আদর্শ হবে। শিক্ষার প্রথম অবস্থায় অনুকরণের ঝাঁজটা যখন কড়া থাকে তখন বিধিবিধান সম্বন্ধে ছাত্র গুরুর চেয়ে আরো কড়া হয়; কিন্তু ভিতরকার প্রকৃতি আস্তে আস্তে আপনার কাজ করতে থাকে, এবং শিক্ষার কড়া অংশগুলোকে নিজের জারক রসে গলিয়ে আপন করে নেয়। এই জীর্ণ করে নেওয়ার কাজটা একটু সময়সাধ্য। এইজন্যেই পশ্চিমের শিক্ষা জাপানে কী আকার ধারণ করবে, সেটা স্পষ্ট করে দেখবার সময় এখনো হয় নি। সম্ভবত, এখন আমরা প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বিস্তর অসামঞ্জস্য দেখতে পাব, যেটা কুশ্রী। আমাদের দেশেও পদে পদে তা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু, প্রকৃতির কাজই হচ্ছে অসামঞ্জস্যগুলোকে মিটিয়ে দেওয়া। জাপানে সেই কাজ চলছে সন্দেহ নেই। অন্তত, এই জাহাজটুকুর মধ্যে আমি তো এই দুই ভাবের মিলনের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি।

৯

২রা জ্যৈষ্ঠে আমাদের জাহাজ সিঙাপুরে এসে পৌঁছল। অনতিকাল পরেই একজন জাপানি যুবক আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন; তিনি এখানকার একটি জাপানি কাগজের সম্পাদক; তিনি আমাকে বললেন, তাঁদের জাপানের সব-চেয়ে বড়ো দৈনিকপত্রের সম্পাদকের কাছ থেকে তাঁরা তার পেয়েছেন যে আমি জাপানে যাচ্ছি; সেই সম্পাদক আমার কাছ থেকে একটি বক্তৃতা আদায় করবার জন্যে অনুরোধ

করেছেন। আমি বললুম, জাপানে না পৌঁছে আমি এ বিষয়ে আমার সম্মতি জানাতে পারব না। তখনকার মতো এইটুকুতেই মিটে গেল। আমাদের যুবক ইংরেজ বন্ধু পিয়ার্সন এবং মুকুল শহর দেখতে বেরিয়ে গেলেন। জাহাজ একেবারে ঘাটে লেগেছে। এই জাহাজের ঘাটের চেয়ে কুশ্রী বিভীষিকা আর নেই— এরই মধ্যে ঘন মেঘ করে বাদলা দেখা দিলে। বিকট ঘড়্ ঘড়্ শব্দে জাহাজ থেকে মাল ওঠানো নাবানো চলতে লাগল। আমি কুঁড়ে মানুষ, কোমর বেঁধে শহর দেখতে বেরনো আমার ধাতে নেই। আমি সেই বিষম গোলমালের সাইক্লোনের মধ্যে ডেক-এ বসে মনকে কোনোমতে শান্ত করে রাখবার জন্যে লিখতে বসে গেলুম।

খানিক বাদে কাপ্তেন এসে খবর দিলেন যে, একজন জাপানি মহিলা আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। আমি লেখা বন্ধ ক'রে একটি ইংরাজি-বেশ পরা জাপানি মহিলার সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হলুম। তিনিও সেই জাপানি সম্পাদকের পক্ষ নিয়ে বক্তৃতা করবার জন্যে আমাকে অনুরোধ করতে লাগলেন। আমি বহু কষ্টে সে অনুরোধ কাটালুম। তখন তিনি বললেন, "আপনি যদি একটু শহর বেড়িয়ে আসতে ইচ্ছা করেন তো আপনাকে সব দেখিয়ে আনতে পারি।" তখন সেই বস্তা তোলার নিরন্তর শব্দ আমার মনটাকে জাঁতার মতো পিষছিল, কোথাও পালাতে পারলে বাঁচি; সুতরাং আমাকে বেশি পীড়াপীড়ি করতে হল না। সেই মহিলাটির মোটর গাড়িতে ক'রে শহর ছাড়িয়ে রবার গাছের আবাদের ভিতর দিয়ে, উঁচু-নিচু পাহাড়ের পথে অনেকটা দূর ঘুরে এলুম। জমি ঢেউ-খেলানো, ঘাস ঘন সবুজ, রাস্তার পাশ দিয়ে একটি ঘোলা জলের স্রোত কল্‌কল্ করে এঁকে বেঁকে ছুটে চলেছে, জলের মাঝে মাঝে আঁটিবাঁধা কাটা বেত ভিজছে। রাস্তার দুই ধারে সব বাগানবাড়ি। পথে ঘাটে চীনেই বেশি; এখানকার সকল কাজেই তারা আছে।

গাড়ি শহরের মধ্যে যখন এল, মহিলাটি তাঁর জাপানি জিনিসের দোকানে আমাকে নিয়ে গেলেন। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে; মনে মনে ভাবছি, জাহাজে আমাদের সন্ধ্যাবেলাকার খাবার সময় হয়ে এল; কিন্তু সেখানে সেই শব্দের ঝড়ে বস্তা তোলপাড় করছে কল্পনা ক'রে কোনোমতেই ফিরতে মন লাগছিল না। মহিলাটি একটি ছোটো ঘরের মধ্যে বসিয়ে, আমাকে ও আমার সঙ্গী ইংরাজটিকে থালায় ফল সাজিয়ে খেতে অনুরোধ করলেন। ফল খাওয়া হলে পর তিনি আস্তে আস্তে অনুরোধ করলেন, যদি আপত্তি না থাকে তিনি আমাদের হোটেলে খাইয়ে আনতে ইচ্ছা করেন। তাঁর এ অনুরোধও আমরা লঙ্ঘন করি নি। রাত্রি প্রায় দশটার সময় তিনি আমাদের জাহাজে পৌঁছিয়ে দিয়ে বিদায় নিয়ে গেলেন।

এই রমণীর ইতিহাসে কিছু বিশেষত্ব আছে। এঁর স্বামী জাপানে আইনব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু সে ব্যবসায় যথেষ্ট লাভজনক ছিল না। তাই আয়ব্যয়ের সামঞ্জস্য হাওয়া কঠিন হয়ে উঠছিল। স্ত্রীই স্বামীকে প্রস্তাব করলেন, "এসো আমরা একটা কিছু ব্যাবসা করি।" স্বামী প্রথমে তাতে নারাজ ছিলেন। তিনি বললেন, "আমাদের বংশে ব্যাবসা তো কেউ করে নি, ওটা আমাদের পক্ষে একটা হীন কাজ।" শেষকালে স্ত্রীর অনুরোধে রাজি হয়ে জাপান থেকে দুজনে মিলে সিঙাপুরে এসে দোকান খুললেন। সে আজ আঠারো বৎসর হল। আত্মীয়বন্ধু সকলেই একবাক্যে বললে, এইবার এরা মজল। এই স্ত্রীলোকটির পরিশ্রমে, নৈপুণ্যে এবং লোকের সঙ্গে ব্যবহারকুশলতায়, ক্রমশই ব্যবসায়ের উন্নতি হতে লাগল। গত বৎসরে এঁর স্বামীর মৃত্যু হয়েছে; এখন এঁকে একলাই সমস্ত কাজ চালাতে হচ্ছে।

বস্তুত, এই ব্যবসাটি এই স্ত্রীলোকেরই নিজের হাতে তৈরি। আমি যে-কথা বলছিলুম এই ব্যবসায়ে তারই প্রমাণ দেখতে পাই। মানুষের মন বোঝা এবং মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করা স্ত্রীলোকের স্বভাবসিদ্ধ; এই মেয়েটির মধ্যে আমরাই তার পরিচয় পেয়েছি। তার পরে, কর্মকুশলতা মেয়েদের স্বাভাবিক। পুরুষ স্বভাবত কুঁড়ে, দায়ে পড়ে তাদের কাজ করতে হয়। মেয়েদের মধ্যে একটা প্রাণের প্রাচুর্য আছে যার স্বাভাবিক বিকাশ হচ্ছে কর্মপরতা। কর্মের সমস্ত খুঁটিনাটি যে কেবল ওরা সহ্য করতে পারে তা নয়, তাতে ওরা আনন্দ পায়। তা ছাড়া দেনাপাওনা সম্বন্ধে ওরা সাবধানী। এইজন্যে, যে-সব কাজে দৈহিক বা মানসিক সাহসিকতার দরকার হয় না সে-সব কাজ মেয়েরা পুরুষের চেয়ে ঢের ভালো করে করতে পারে, এই আমার বিশ্বাস। স্বামী যেখানে সংসার ছারখার করেছে সেখানে স্বামীর অবর্তমানে স্ত্রীর হাতে সংসার পড়ে সমস্ত সুশৃঙ্খলায় রক্ষা পেয়েছে, আমাদের দেশে তার বিস্তর প্রমাণ আছে। শুনেছি, ফ্রান্সের মেয়েরাও ব্যবসায়ে আপনাদের কর্মনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে। যে-সব কাজে উদ্ভাবনার দরকার নেই, যে-সব কাজে পটুতা পরিশ্রম ও লোকের সঙ্গে ব্যবহারই সব-চেয়ে দরকার, সে-সব কাজ মেয়েদের।

৩রা জ্যৈষ্ঠ সকালে আমাদের জাহাজ ছাড়লে। ঠিক এই ছাড়বার সময় একটি বিড়াল জলের মধ্যে পড়ে গেল। তখন সমস্ত ব্যস্ততা ঘুচে গিয়ে, ওই বিড়ালকে বাঁচানোই প্রধান কাজ হয়ে উঠল। নানা উপায়ে নানা কৌশলে তাকে জল থেকে উঠিয়ে তবে জাহাজ ছাড়লে। এতে জাহাজ ছাড়ার নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেল। এইটিতে আমাকে বড়ো আনন্দ দিয়েছে।

চীন সমুদ্র

তোসামারু জাহাজ

৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩

১০

সমুদ্রের উপর দিয়ে আমাদের দিনগুলি ভেসে চলেছে পালের নৌকার মতো। সে নৌকা কোনো ঘাটে যাবার নৌকা নয়, তাতে কোনো বোঝাই নেই। কেবলমাত্র ঢেউয়ের সঙ্গে, বাতাসের সঙ্গে, আকাশের সঙ্গে কোলাকুলি করতে তারা বেরিয়েছে। মানুষের লোকালয় মানুষের বিশ্বের প্রতিদ্বন্দ্বী। সেই লোকালয়ের দাবি মিটিয়ে সময় পাওয়া যায় না, বিশ্বের নিমন্ত্রণ আর রাখতেই পারি নে। চাঁদ যেমন তার একটা মুখ সূর্যের দিকে ফিরিয়ে রেখেছে, তার আর-একটা মুখ অন্ধকার, তেমনি লোকালয়ের প্রচণ্ড টানে মানুষের সেই দিকের পিঠটাতেই চেতনার সমস্ত আলো খেলছে, অন্য একটা দিক আমরা ভুলেই গেছি; বিশ্ব যে মানুষের কতখানি, সে আমাদের খেয়ালেই আসে না।

সত্যকে যেদিকে ভুলি কেবল যে সেই দিকেই লোকসান তা নয়, সে লোকসান সকল দিকেই। বিশ্বকে মানুষ যে পরিমাণে যতখানি বাদ দিয়ে চলে তার লোকালয়ের তাপ এবং কলুষ সেই পরিমাণে ততখানি বেড়ে ওঠে। সেইজন্যেই ক্ষণে ক্ষণে মানুষের একেবারে উলটোদিকে টান আসে। সে বলে, "বৈরাগ্যমেবাভয়ং"— বৈরাগ্যের কোনো বালাই নেই। সে ব'লে বসে, সংসার কারাগার; মুক্তি খুঁজতে, শান্তি খুঁজতে সে বনে পর্বতে সমুদ্রতীরে ছুটে যায়। মানুষ সংসারের সঙ্গে বিশ্বের বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে বলেই বড়ো করে প্রাণের নিশ্বাস নেবার জন্যে তাকে সংসার ছেড়ে বিশ্বের দিকে যেতে হয়। এতবড়ো অদ্ভুত কথা তাই মানুষকে বলতে হয়েছে— মানুষের মুক্তির রাস্তা মানুষের কাছ থেকে দূরে।

লোকালয়ের মধ্যে যখন থাকি অবকাশ জিনিসটাকে তখন ভরাই। কেননা, লোকালয় জিনিসটা একটা নিরেট জিনিস, তার মধ্যে ফাঁকমাত্রই ফাঁকা। সেই ফাঁকটাকে কোনোমতে চাপা দেবার জন্যে আমাদের মদ চাই, তাস পাশা চাই, রাজা-উজির মারা চাই— নইলে সময় কাটে না। অর্থাৎ সময়টাকে আমরা চাই নে, সময়টাকে আমরা বাদ দিতে চাই।

কিন্তু, অবকাশ হচ্ছে বিরাটের সিংহাসন। অসীম অবকাশের মধ্যে বিশ্বের প্রতিষ্ঠা। বৃহৎ যেখানে আছে অবকাশ সেখানে ফাঁকা নয়, একেবারে পরিপূর্ণ। সংসারের মধ্যে যেখানে বৃহৎকে আমরা রাখি নি সেখানে অবকাশ এমন ফাঁকা; বিশ্বে যেখানে বৃহৎ বিরাজমান সেখানে অবকাশ এমন গভীরভাবে মনোহর। গায়ে কাপড় না থাকলে মানুষের যেমন লজ্জা সংসারে অবকাশ আমাদের তেমনি লজ্জা দেয়; কেননা,

ওটা কিনা শূন্য তাই ওকে আমরা বলি জড়তা, আলস্য— কিন্তু, সত্যকার সন্ন্যাসীর পক্ষে অবকাশে লজ্জা নেই, কেননা, তার অবকাশ পূর্ণতা, সেখানে উলঙ্গতা নেই।

এ কেমনতরো? যেমন প্রবন্ধ এবং গান। প্রবন্ধে কথা যেখানে থামে সেখানে কেবলমাত্র ফাঁকা। গানে কথা যেখানে থামে সেখানে সুরে ভরাট। বস্তুত, সুর যতই বৃহৎ হয়, ততই কথার অবকাশ বেশি থাকা চাই। গায়কের সার্থকতা কথার ফাঁকে, লেখকের সার্থকতা কথার ঝাঁকে।

আমরা লোকালয়ের মানুষ এই যে জাহাজে করে চলছি, এইবার আমরা কিছু-দিনের জন্যে বিশ্বের দিকে মুখ ফেরাতে পেরেছি। সৃষ্টির যে পিঠে অনেকের ঠেলাঠেলি ভিড় সেদিক থেকে যে-পিঠে একের আসন সেদিকে এসেছি। দেখতে পাচ্ছি, এই যে নীল আকাশ এবং নীল সমুদ্রের বিপুল অবকাশ এ যেন অমৃতের পূর্ণ ঘট।

অমৃত— সে যে শুভ্র আলোর মতো পরিপূর্ণ এক। শুভ্র আলোয় বহুবর্ণচ্ছটা একে মিলেছে, অমৃতরসের তেমনি বহুরস একে নিবিড়। জগতে এই এক আলো যেমন নানাবর্ণে বিচিত্র, সংসারে তেমনি এই এক রসই নানা রসে বিভক্ত। এইজন্যে, অনেককে সত্য করে জানতে হলে সেই এককে সঙ্গে সঙ্গে জানতে হয়। গাছ থেকে যে-ডাল কাটা হয়েছে সে-ডালের ভার মানুষকে বইতে হয়; গাছে যে-ডাল আছে সে ডাল মানুষের ভার বইতে পারে। এক থেকে বিচ্ছিন্ন যে অনেক তারই ভার মানুষের পক্ষে বোঝা; একের মধ্যে বিধৃত যে অনেক সেই তো মানুষকে সম্পূর্ণ আশ্রয় দিতে পারে।

সংসারে একদিকে আবশ্যকের ভিড়, অন্যদিকে অনাবশ্যকের। আবশ্যকের দায় আমাদের বহন করতেই হবে, তাতে আপত্তি করলে চলবে না। যেমন ঘরে থাকতে হলে দেয়াল না হলে চলে না, এও তেমনি। কিন্তু সবটাই তো দেয়াল নয়। অন্তত খানিকটা করে জানলা থাকে, সেই ফাঁক দিয়ে আমরা আকাশের সঙ্গে আত্মীয়তা রক্ষা করি। কিন্তু, সংসারে দেখতে পাই, লোকে ওই জানলাটুকু সইতে পারে না। ওই ফাঁকটুকু ভরিয়ে দেবার জন্যে যতরকম সাংসারিক অনাবশ্যকের সৃষ্টি। ওই জানলাটার উপর বাজে কাজ, বাজে চিঠি, বাজে সভা, বাজে বক্তৃতা, বাজে হাঁসফাঁস্ মেরে দিয়ে দশে মিলে ওই ফাঁকটাকে একেবারে বুজিয়ে ফেলা হয়। নারকেলের ছিবড়ের মতো, এই অনাবশ্যকের পরিমাণটাই বেশি। ঘরে বাইরে, ধর্মে কর্মে, আমোদে আহ্লাদে, সকল বিষয়েই এরই অধিকার সব-চেয়ে বড়ো; এর কাজই হচ্ছে ফাঁক বুজিয়ে বেড়ানো।

কিন্তু, কথা ছিল ফাঁক বোজাব না, কেননা, ফাঁকের ভিতর দিয়ে ছাড়া পূর্ণকে পাওয়া যায় না। ফাঁকের ভিতর দিয়েই আলো আসে, হাওয়া আসে। কিন্তু, আলো হাওয়া

আকাশ যে মানুষের তৈরি জিনিস নয়, তাই লোকালয় পারতপক্ষে তাদের জন্যে জায়গা রাখতে চায় না— তাই আবশ্যক বাদে যেটুকু নিরালা থাকে সেটুকু অনাবশ্যক দিয়ে ঠেসে ভরতি করে দেয়। এমনি করে মানুষ আপনার দিনগুলোকে তো নিরেট করে তুলেইছে, রাত্রিটাকেও যতখানি পারে ভরাট করে দেয়। ঠিক যেন কলকাতার ম্যুনিসিপ্যালিটির আইন। যেখানে যত পুকুর আছে বুজিয়ে ফেলতে হবে, রাবিশ দিয়ে হোক, যেমন করে হোক। এমন-কি, গঙ্গাকেও যতখানি পারা যায় পুল-চাপা, জেটি-চাপা, জাহাজ-চাপা দিয়ে গলা টিপে মারবার চেষ্টা। ছেলেবেলাকার কলকাতা মনে পড়ে; ওই পুকুরগুলোই ছিল আকাশের স্যাঙাত, শহরের মধ্যে ওইখানটাতে দ্যুলোক এই ভূলোকে একটুখানি পা ফেলবার জায়গা পেত, ওইখানেই আকাশের আলোকের আতিথ্য করবার জন্য পৃথিবী আপন জলের আসনগুলি পেতে রেখেছিল।

আবশ্যকের একটা সুবিধা এই যে তার একটা সীমা আছে। সে সম্পূর্ণ বেতালা হতে পারে না; সে দশটা-চারটেকে স্বীকার করে, তার পার্বণের ছুটি আছে, সে রবিবারকে মানে, পারতপক্ষে রাত্রিকে সে ইলেকট্রিক লাইট দিয়ে একেবারে হেসে উড়িয়ে দিতে চায় না। কেননা, সে যেটুকু সময় নেয় আয়ু দিয়ে, অর্থ দিয়ে তার দাম চুকিয়ে দিতে হয়; সহজে কেউ তার অপব্যয় করতে পারে না। কিন্তু, অনাবশ্যকের তালমানের বোধ নেই; সে সময়কে উড়িয়ে দেয় অসময়কে টিঁকতে দেয় না। সে সদর রাস্তা দিয়ে ঢোকে, খিরকির রাস্তা দিয়ে ঢোকে, আবার জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ে। সে কাজের সময় দরজায় ঘা মারে, ছুটির সময় হুড়্‌মুড়্‌ করে আসে, রাত্রে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। তার কাজ নেই ব'লেই তার ব্যস্ততা আরো বেশি।

আবশ্যক কাজের পরিমাণ আছে, অনাবশ্যক কাজের পরিমাণ নেই; এইজন্যে অপরিমেয়ের আসনটি ওই লক্ষ্মীছাড়াই জুড়ে বসে, ওকে ঠেলে ওঠানো দায় হয়। তখনই মনে হয়, দেশ ছেড়ে পালাই, সন্ন্যাসী হয়ে বেরই, সংসারে আর টেঁকা যায় না!

যাক্‌, যেমনি বেরিয়ে পড়েছি অমনি বুঝতে পেরেছি, বিরাট বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যে আনন্দের সম্বন্ধ সেটাকে দিনরাত অস্বীকার করে কোনো বাহাদুরি নেই। এই যে ঠেলাঠেলি ঠেসাঠেসি নেই অথচ সমস্ত কানায় কানায় ভরা, এইখানকার দর্পণটিতে যেন নিজের মুখের ছায়া দেখতে পেলুম। 'আমি আছি' এই কথাটা গলির মধ্যে, ঘরবাড়ির মধ্যে ভারি ভেঙে চুরে বিকৃত হয়ে দেখা দেয়। এই কথাটাকে এই সমুদ্রের উপর আকাশের উপর সম্পূর্ণ ছড়িয়ে দিয়ে দেখলে তবে তার মানে বুঝতে পারি; তখন আবশ্যককে ছাড়িয়ে, অনাবশ্যককে পেরিয়ে আনন্দলোকে তার অভ্যর্থনা দেখতে পাই; তখন স্পষ্ট করে বুঝি, ঋষি কেন মানুষদের অমৃতস্য পুত্রাঃ ব'লে আহ্বান করেছিলেন।

১১

সেই খিদিরপুরের ঘাট থেকে আরম্ভ করে আর এই হংকঙের ঘাট পর্যন্ত, বন্দরে বন্দরে বাণিজ্যের চেহারা দেখে আসছি। সে যে কী প্রকাণ্ড, এমন ক'রে তাকে চোখে না দেখলে বোঝা যায় না। শুধু প্রকাণ্ড নয়, সে একটা জবড়জঙ্গ ব্যাপার। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে ব্যাধের আহারের যে বর্ণনা আছে – সে এক-এক গ্রাসে এক-এক তাল গিলছে, তার ভোজন উৎকট, তার শব্দ উৎকট, এও সেইরকম; এই বাণিজ্যব্যাধটাও হাঁসফাঁস করতে করতে এক-এক পিণ্ড মুখে যা পুরছে, সে দেখে ভয় হয়। তার বিরাম নেই, আর তার শব্দই বা কী। লোহার হাত দিয়ে মুখে তুলছে, লোহার দাঁত দিয়ে চিবচ্ছে, লোহার পাকযন্ত্রে চিরপ্রদীপ্ত জঠরানলে হজম করছে এবং লোহার শিরা উপ-শিরার ভিতর দিয়ে তার জগৎজোড়া কলেবরের সর্বত্র সোনার রক্তস্রোত চালান করে দিচ্ছে।

একে দেখে মনে হয় যে, এ একটা জন্তু, এ যেন পৃথিবীর প্রথম যুগের দানব-জন্তুগুলোর মতো। কেবলমাত্র তার লেজের আয়তন দেখলেই শরীর আঁতকে ওঠে। তার পরে, সে জলচর হবে, কি স্থলচর হবে, কি পাখি হবে, এখনো তা স্পষ্ট ঠিক হয় নি; সে খানিকটা সরীসৃপের মতো, খানিকটা বাদুড়ের মতো, খানিকটা গণ্ডারের মতো। অঙ্গসৌষ্ঠব বলতে যা বোঝায় তা তার কোথাও কিছুমাত্র নেই। তার গায়ের চামড়া ভয়ংকর স্থূল; তার থাবা যেখানে পড়ে সেখানে পৃথিবীর গায়ের কোমল সবুজ চামড়া উঠে গিয়ে একেবারে তার হাড় বেরিয়ে পড়ে; চলবার সময় তার বৃহৎ বিরূপ লেজটা যখন নড়তে থাকে তখন তার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে সংঘর্ষ হয়ে এমন আওয়াজ হতে থাকে যে, দিগঙ্গনারা মূর্ছিত হয়ে পড়ে। তার পরে, কেবলমাত্র তার এই বিপুল দেহটা রক্ষা করবার জন্যে এত রাশি রাশি খাদ্য তার দরকার হয় যে, ধরিত্রী ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে। সে যে কেবলমাত্র খাবা খাবা জিনিস খাচ্ছে তা নয়, সে মানুষ খাচ্ছে— স্ত্রী পুরুষ ছেলে কিছুই সে বিচার করে না।

কিন্তু, জগতের সেই প্রথম যুগের দানব-জন্তুগুলো টি'কল না। তাদের অপরিমিত বিপুলতাই পদে পদে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষি দেওয়াতে, বিধাতার আদালতে তাদের প্রাণদণ্ডের বিধান হল। সৌষ্ঠব জিনিসটা কেবলমাত্র সৌন্দর্যের প্রমাণ দেয় না, উপযোগিতারও প্রমাণ দেয়। হাঁসফাঁসটা যখন অত্যন্ত বেশি চোখে পড়ে, আয়তনটার মধ্যে যখন কেবলমাত্র শক্তি দেখি, শ্রী দেখি নে, তখন বেশ বুঝতে পারা যায়, বিশ্বের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য নেই; বিশ্বশক্তির সঙ্গে তার শক্তির নিরন্তর সংঘর্ষ হতে হতে একদিন তাকে হার মেনে হাল ছেড়ে তলিয়ে যেতে হবেই। প্রকৃতির গৃহিণীপনা

কখনই কদর্য অমিতাচারকে অধিক দিন সইতে পারে না; তার ঝাঁটা এসে পড়ল বলে। বাণিজ্যদানবটা নিজের বিরূপতায়, নিজের প্রকাণ্ড ভারের মধ্যে নিজের প্রাণদণ্ড বহন করছে। একদিন আসছে যখন তার লোহার কঙ্কালগুলোকে আমাদের যুগের স্তরের মধ্যে থেকে আবিষ্কার ক'রে পুরাতত্ত্ববিদ্‌রা এই সর্বভুক দানবটার অদ্ভুত বিষমতা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করবে।

প্রাণীজগতে মানুষের যে যোগ্যতা, সে তার দেহের প্রাচুর্য নিয়ে নয়। মানুষের চামড়া নরম, তার গায়ের জোর অল্প, তার ইন্দ্রিয়শক্তিও পশুদের চেয়ে কম বই বেশি নয়। কিন্তু, সে এমন একটি বল পেয়েছে যা চোখে দেখা যায় না, যা জায়গা জোড়ে না, যা কোনো স্থানের উপর ভর না করেও সমস্ত জগতে আপন অধিকার বিস্তার করছে। মানুষের মধ্যে দেহপরিধি দৃশ্যজগৎ থেকে সরে গিয়ে অদৃশ্যের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছে। বাইবেলে আছে, যে নম্র সেই পৃথিবীকে অধিকার করবে; তার মানেই হচ্ছে, নম্রতার শক্তি বাইরে নয়, ভিতরে— সে যত কম আঘাত দেয় ততই সে জয়ী হয়। সে রণক্ষেত্রে লড়াই করে না; অদৃশ্যলোকে বিশ্বশক্তির সঙ্গে সন্ধি করে সে জয়ী হয়।

বাণিজ্যদানবকেও একদিন তার দানবলীলা সংবরণ করে মানব হতে হবে। আজ এই বাণিজ্যের মস্তিষ্ক কম, ওর হৃদয় তো একেবারেই নেই; সেইজন্যে পৃথিবীতে ও কেবল আপনার ভার বাড়িয়ে চলেছে। কেবলমাত্র প্রাণপণ শক্তিতে আপনার আয়তনকে বিস্তীর্ণতর করে করেই ও জিততে চাচ্ছে। কিন্তু, একদিন যে জয়ী হবে তার আকার ছোটো, তার কর্মপ্রণালী সহজ; মানুষের হৃদয়কে, সৌন্দর্যবোধকে, ধর্মবুদ্ধিকে সে মানে; সে নম্র, সে সুশ্রী, সে কদর্যভাবে লুব্ধ নয়; তার প্রতিষ্ঠা অন্তরের সুব্যবস্থায়, বাইরের আয়তনে না; সে কাউকে বঞ্চিত ক'রে বড়ো নয়, সে সকলের সঙ্গে সন্ধি ক'রে বড়ো। আজকের দিনে পৃথিবীতে মানুষের সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে এই বাণিজ্যের অনুষ্ঠান সব চেয়ে কুশ্রী; আপন ভারের দ্বারা পৃথিবীকে সে ক্লান্ত করছে, আপন শব্দের দ্বারা পৃথিবীকে বধির করছে, আপন আবর্জনার দ্বারা পৃথিবীকে মলিন করছে, আপন লোভের দ্বারা পৃথিবীকে আহত করছে। এই যে পৃথিবীব্যাপী কুশ্রীতা, এই যে বিদ্রোহ— রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ এবং মানবহৃদয়ের বিরুদ্ধে— এই যে লোভকে বিশ্বের রাজসিংহাসনে বসিয়ে তার কাছে দাসখত লিখে দেওয়া, এ প্রতিদিনই মানুষের শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্বকে আঘাত করছেই, তার সন্দেহ নেই। মুনফার নেশায় উন্মত্ত হয়ে এই বিশ্বব্যাপী দ্যূতক্রীড়ায় মানুষ নিজেকে পণ রেখে কতদিন খেলা চালাবে? এ খেলা ভাঙতেই হবে। যে-খেলায় মানুষ লাভ করবার লোভে নিজেকে লোকসান করে চলেছে, সে কখনোই চলবে না।

৯ই জ্যৈষ্ঠ। মেঘ বৃষ্টি বাদল কুয়াশায় আকাশ ঝাপসা হয়ে আছে ; হংকং বন্দরের পাহাড়গুলো দেখা দিয়েছে, তাদের গা বেয়ে বেয়ে ঝরনা ঝরে পড়ছে। মনে হচ্ছে, দৈত্যের দল সমুদ্রে ডুব দিয়ে তাদের ভিজে মাথা জলের উপর তুলেছে, তাদের জটা বেয়ে দাড়ি বেয়ে জল ঝরছে। এণ্ড্রুজ সাহেব বলছেন, দৃশ্যটা যেন পাহাড়-ঘেরা স্কট্‌ল্যাণ্ডের হ্রদের মতো ; তেমনিতরো ঘন সবুজ বেঁটে বেঁটে পাহাড়, তেমনিতরো ভিজে কম্বলের মতো আকাশের মেঘ, তেমনিতরো কুয়াশার ন্যাতা বুলিয়ে অল্প অল্প মুছে ফেলা জলস্থলের মূর্তি। কাল সমস্ত রাত বৃষ্টি বাতাস গিয়েছে ; কাল বিছানা আমার ভার বহন করে নি, আমিই বিছানাটাকে বহন করে ডেকের এধার থেকে ওধারে আশ্রয় খুঁজে খুঁজে ফিরেছি। রাত যখন সাড়ে দুপুর হবে, তখন এই বাদলের সঙ্গে মিথ্যা বিরোধ করবার চেষ্টা না করে তাকে প্রসন্ন মনে মেনে নেবার জন্যে প্রস্তুত হলুম। এক-ধারে দাঁড়িয়ে ওই বাদলার সঙ্গে তান মিলিয়েই গান ধরলুম— শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে। এমনি করে ফিরে ফিরে অনেকগুলো গান গাইলুম, বানিয়ে বানিয়ে একটা নতুন গানও তৈরি করলুম, কিন্তু বাদলের সঙ্গে কবির লড়াইয়ে এই মর্ত-বাসীকেই হার মানতে হল। আমি অতো দম পাব কোথায়, আর আমার কবিত্বের বাতিক যতই প্রবল হোক-না, বায়ুবলে আকশের সঙ্গে পেরে উঠব কেন।

কাল রাত্রেই জাহাজের বন্দরে পৌঁছবার কথা ছিল, কিন্তু এইখানটায় সমুদ্রবাহী জলের স্রোত প্রবল হয়ে উঠল এবং বাতাসও বিরুদ্ধ ছিল, তাই পদে পদে দেরি হতে লাগল। জায়গাটাও সংকীর্ণ ও সংকটময়। কাপ্তেন সমস্ত রাত জাহাজের উপরতলায় গিয়ে সাবধানে পথের হিসাব করে চলেছেন। আজ সকালেও মেঘবৃষ্টির বিরাম নেই। সূর্য দেখা দিল না, তাই পথ ঠিক করা কঠিন। মাঝে মাঝে ঘণ্টা বেজে উঠছে, এঞ্জিন থেমে যাচ্ছে, নাবিকের দ্বিধা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। আজ সকালে আহারের টেবিলে কাপ্তেনকে দেখা গেল না। কাল রাত দুপুরের সময় কাপ্তেন একবার কেবল বর্ষাতি পরে নেমে এসে আমাকে বলে গেলেন, ডেকের কোনো দিকেই শোবার সুবিধা হবে না, কেননা, বাতাসের বদল হচ্ছে।

এর মধ্যে একটি ব্যাপার দেখে আমার মনে বড়ো আনন্দ হয়েছিল। জাহাজের উপর থেকে একটা দড়িবাঁধা চামড়ার চোঙে করে মাঝে মাঝে সমুদ্রের জল তোলা হয়। কাল বিকেলে এক সময় মুকুলের হঠাৎ জানতে ইচ্ছা হল, এর কারণটা কী। সে তখনই উপরতলায় উঠে গেল। এই উপরতলাতেই জাহাজের হালের চাকা, এবং এখানেই পথনির্ণয়ের সমস্ত যন্ত্র। এখানে যাত্রীদের যাওয়া নিষেধ। মুকুল যখন গেল তখন তৃতীয় অফিসর কাজে নিযুক্ত। মুকুল তাঁকে প্রশ্ন করতেই তিনি ওকে বোঝাতে

শুরু করলেন। সমুদ্রের মধ্যে অনেকগুলি স্রোতের ধারা বইছে, তাদের উত্তাপের পরিমাণ স্বতন্ত্র। মাঝে মাঝে সমুদ্রের জল তুলে তাপমান দিয়ে পরীক্ষা করে সেই ধারাপথ নির্ণয় করা দরকার। সেই ধারার ম্যাপ বের করে তাদের গতিবেগের সঙ্গে জাহাজের গতিবেগের কী রকম কাটাকাটি হচ্ছে, তাই তিনি মুকুলকে বোঝাতে লাগলেন। তাতেও যখন সুবিধা হল না, তখন বোর্ডে খড়ি দিয়ে এঁকে ব্যাপারটাকে যথাসম্ভব সরল করে দিলেন।

কোনো বিলিতি জাহাজে মুকুলের পক্ষে এটা কোনোমতেই সম্ভবপর হত না; সেখানে মুকুলকে অত্যন্ত সোজা করেই বুঝিয়ে দিত যে, ও জায়গায় তার নিষেধ। মোটের উপরে জাপানি অফিসরের সৌজন্য, কাজের নিয়মবিরুদ্ধ। কিন্তু পূর্বেই বলেছি, এই জাপানি জাহাজে কাজের নিয়মের ফাঁক দিয়ে মানুষের গতিবিধি আছে। অথচ নিয়মটা চাপা পড়ে যায় নি, তাও বারবার দেখেছি। জাহাজ যখন বন্দরে স্থির ছিল, যখন উপরতলার কাজ বন্ধ, তখন সেখানে বসে কাজ করবার জন্যে আমি কাপ্তেনের সম্মতি পেয়েছিলুম। সেদিন পিয়ার্সন সাহেব দুজন ইংরেজ আলাপীকে জাহাজে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ডেকের উপর মাল তোলার শব্দে এগুজ সাহেব বিরক্ত হয়ে হঠাৎ প্রস্তাব করলেন, উপরের তলায় যাওয়া যাক। আমি সম্মতির জন্য প্রধান অফিসরকে জিজ্ঞাসা করলুম; তিনি তখনই বললেন, "না।" নিয়ে গেলে কাজের ক্ষতি হত না, কেননা, কাজ তখন বন্ধ ছিল। কিন্তু নিয়মভঙ্গের একটা সীমা আছে, সে সীমা বন্ধুর পক্ষে যেখানে অপরিচিতের পক্ষে সেখানে না। উপরের তলা ব্যবহারের সম্মতিতেও আমি যেমন খুশি হয়েছিলুম, তার বাধাতেও তেমনি খুশি হলুম। স্পষ্ট দেখতে পেলুম, এর মধ্যে দাক্ষিণ্য আছে, কিন্তু দুর্বলতা নেই।

বন্দরে পৌঁছবামাত্র জাপান থেকে কয়েকখানি অভ্যর্থনার টেলিগ্রাম ও পত্র পাওয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে প্রধান অফিসর এসে আমাকে বললেন, এ-যাত্রায় আমাদের সাঙ্ঘাই যাওয়া হল না, একেবারে এখান থেকে জাপান যাওয়া হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কেন। তিনি বললেন, জাপানবাসীরা আপনাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে, তাই আমাদের সদর আপিস থেকে টেলিগ্রামে আদেশ এসেছে, অন্য বন্দরে বিলম্ব না করে চলে যেতে। সাঙ্ঘাইয়ের সমস্ত মাল আমরা এইখানেই নামিয়ে দেব, অন্য জাহাজে করে সেখানে যাবে।

এই খবরটি আমার পক্ষে যতই গৌরবজনক হোক, এখানে লেখবার দরকার ছিল না। কিন্তু আমার লেখবার কারণ হচ্ছে এই যে, এই ব্যাপারের একটু বিশেষত্ব আছে; সেটা আলোচ্য। সেটা পুনশ্চ ওই একই কথা। অর্থাৎ ব্যাবসার দাবি

সচরাচর যে-পাথরের পাঁচিল খাড়া করে আত্মরক্ষা করে, এখানে তার মধ্যে দিয়েও মানবসম্বন্ধের আনাগোনার পথ আছে। এবং সে পথ কম প্রশস্ত নয়।

জাহাজ এখানে দিন দুয়েক থাকবে। সেই দুদিনের জন্যে শহরে নেবে হোটেলে থাকবার প্রস্তাব আমার মনে নিলে না। আমার মতো কুঁড়ে মানুষের পক্ষে আরামের চেয়ে বিরাম ভালো ; আমি বলি, সুখের ল্যাঠা অনেক, সোয়াস্তির বালাই নেই। আমি মাল তোলা-নামার উপদ্রব স্বীকার করেও জাহাজে রয়ে গেলুম। সেজন্যে আমার যে বকশিস মেলে নি, তা নয়।

প্রথমেই চোখে পড়ল জাহাজের ঘাটে চীনা মজুরদের কাজ। তাদের একটা করে নীল পায়জামা পরা এবং গা খোলা। এমন শরীরও কোথাও দেখি নি, এমন কাজও না। একেবারে প্রাণসার দেহ, লেশমাত্র বাহুল্য নেই। কাজের তালে তালে সমস্ত শরীরের মাংসপেশী কেবলই ঢেউ খেলাচ্ছে। এরা বড়ো বড়ো বোঝাকে এমন সহজে এবং এমন দ্রুত আয়ত্ত করছে যে সে দেখে আনন্দ হয়। মাথা থেকে পা পর্যন্ত কোথাও অনিচ্ছা, অবসাদ বা জড়ত্বের লেশমাত্র লক্ষণ দেখা গেল না। বাইরে থেকে তাদের তাড়া দেবার কোনো দরকার নেই। তাদের দেহের বীণাযন্ত্র থেকে কাজ যেন সংগীতের মতো বেজে উঠছে। জাহাজের ঘাটে মাল তোলা-নামার কাজ দেখতে যে আমার এত আনন্দ হবে, এ কথা আমি পূর্বে মনে করতে পারতুম না। পূর্ণ শক্তির কাজ বড়ো সুন্দর ; তার প্রত্যেক আঘাতে আঘাতে শরীরকে সুন্দর করতে থাকে, এবং সেই শরীরও কাজকে সুন্দর করে তোলে। এইখানে কাজের কাব্য এবং মানুষের শরীরের ছন্দ আমার সামনে বিস্তীর্ণ হয়ে দেখা দিলে। এ কথা জোর করে বলতে পারি, ওদের দেহের চেয়ে কোনো স্ত্রীলোকের দেহ সুন্দর হতে পারে না, কেননা, শক্তির সঙ্গে সুষমার এমন নিখুঁত সংগতি মেয়েদের শরীরে নিশ্চয়ই দুর্লভ। আমাদের জাহাজের ঠিক সামনেই আর-একটা জাহাজে বিকেল বেলায় কাজকর্মের পর সমস্ত চীনা মাল্লা জাহাজের ডেকের উপর কাপড় খুলে ফেলে স্নান করছিল ; মানুষের শরীরের যে কী স্বর্গীয় শোভা তা আমি এমন করে আর কোনোদিন দেখতে পাই নি।

কাজের শক্তি, কাজের নৈপুণ্য এবং কাজের আনন্দকে এমন পুঞ্জীভূতভাবে একত্র দেখতে পেয়ে আমি মনে মনে বুঝতে পারলুম, এই বৃহৎ জাতির মধ্যে কতখানি ক্ষমতা সমস্ত দেশ জুড়ে সঞ্চিত হচ্ছে। এখানে মানুষ পূর্ণপরিমাণে নিজেকে প্রয়োগ করবার জন্যে বহুকাল থেকে প্রস্তুত হচ্ছে। যে সাধনায় মানুষ আপনাকে আপনি ষোলো-আনা ব্যবহার করবার শক্তি পায়, তার কৃপণতা ঘুচে যায়, নিজেকে নিজে কোনো অংশে ফাঁকি দেয় না, সে যে মস্ত সাধনা। চীন সুদীর্ঘকাল সেই সাধনায় পূর্ণভাবে কাজ

করতে শিখেছে, সেই কাজের মধ্যেই তার নিজের শক্তি উদারভাবে আপনার মুক্তি এবং আনন্দ পাচ্ছে—এ একটি পরিপূর্ণতার ছবি। চীনের এই শক্তি আছে বলেই আমেরিকা চীনকে ভয় করেছে ; কাজের উদ্যমে চীনকে সে জিততে পারে না, গায়ের জোরে তাকে ঠেকিয়ে রাখতে চায়।

এই এতবড়ো একটা শক্তি যখন আপনার আধুনিক কালের বাহনকে পাবে, অর্থাৎ যখন বিজ্ঞান তার আয়ত্ত হবে, তখন পৃথিবীতে তাকে বাধা দিতে পারে এমন কোন্ শক্তি আছে ? তখন তার কর্মের প্রতিভার সঙ্গে তার উপকরণের যোগসাধন হবে। এখন যে-সব জাতি পৃথিবীর সম্পদ ভোগ করছে তারা চীনের সেই অভ্যুত্থানকে ভয় করে, সেই দিনকে তারা ঠেকিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু, যে জাতির যেদিকে যতখানি বড়ো হবার শক্তি আছে, সেদিকে তাকে ততখানি বড়ো হয়ে উঠতে দিতে বাধা দেওয়া যে-স্বজাতিপূজা থেকে জন্মেছে তার মতো এমন সর্বনেশে পূজা জগতে আর কিছুই নেই। এমন বর্বর জাতির কথা শোনা যায় যারা নিজের দেশের দেবতার কাছে পরদেশের মানুষকে বলি দেয় ; আধুনিক কালের স্বজাতীয়তা তার চেয়ে অনেক বেশি ভয়ানক জিনিস, সে নিজের ক্ষুধার জন্যে এক-একটা জাতিকে-জাতি দেশকে-দেশ দাবি করে।

আমাদের জাহাজের বাঁ পাশে চীনের নৌকার দল। সেই নৌকাগুলিতে স্বামী স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ে সকলে মিলে বাস করছে এবং কাজ করছে। কাজের এই ছবিই আমার কাছে সকলের চেয়ে সুন্দর লাগল। কাজের এই মূর্তিই চরম মূর্তি, একদিন এরই জয় হবে। না যদি হয়, বাণিজ্যদানব যদি মানুষের ঘর-করনা স্বাধীনতা সমস্তই গ্রাস ক'রে চলতে থাকে, এবং বৃহৎ এক দাসসম্প্রদায়কে সৃষ্টি করে তুলে তারই সাহায্যে অল্প কয়জনের আরাম এবং স্বার্থ সাধন করতে থাকে, তা হলে পৃথিবী রসাতলে যাবে। এদের মেয়ে পুরুষ ছেলে সকলে মিলে কাজ করবার এই ছবি দেখে আমার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল। ভারতবর্ষে এই ছবি কবে দেখতে পাব ? সেখানে মানুষ আপনার বারো-আনাকে ফাঁকি দিয়ে কাটাচ্ছে। এমন সব নিয়মের জাল, যাতে মানুষ কেবলই বেধে-বেধে গিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে পড়েই নিজের অধিকাংশ শক্তির বাজে খরচ করে এবং বাকি অধিকাংশকে কাজে খাটাতে পারে না— এমন বিপুল জটিলতা এবং জড়তার সমাবেশ পৃথিবীর আর কোথাও নেই। চারি দিকে কেবলই জাতির সঙ্গে জাতির বিচ্ছেদ, নিয়মের সঙ্গে কাজের বিরোধ, আচারধর্মের সঙ্গে কালধর্মের দ্বন্দ্ব।

চীন সমুদ্র

তোসামারু জাহাজ

১২

১৬ই জ্যৈষ্ঠ। আজ জাহাজ জাপানের 'কোবে' বন্দরে পৌছবে। কয়দিন বৃষ্টি-বাদলের বিরাম নেই। মাঝে মাঝে জাপানের ছোটো ছোটো দ্বীপ আকাশের দিকে পাহাড় তুলে সমুদ্রযাত্রীদের ইশারা করছে, কিন্তু বৃষ্টিতে কুয়াশাতে সমস্ত ঝাপসা; বাদলার হাওয়ায় সর্দিকাশি হয়ে গলা ভেঙে গেলে তার আওয়াজ যেরকম হয়ে থাকে, ওই দ্বীপগুলোর সেইরকম ঘোরতর সর্দির আওয়াজের চেহারা। বৃষ্টির ছাট এবং ভিজে হাওয়ার তাড়া এড়াবার জন্যে ডেকের এধার থেকে ওধারে চৌকি টেনে নিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি।

আমাদের সঙ্গে যে জাপানি যাত্রী দেশে ফিরছেন তিনি আজ ভোরেই তাঁর ক্যাবিন ছেড়ে একবার ডেকের উপর উঠে এসেছেন, জাপানের প্রথম অভ্যর্থনা গ্রহণ করবার জন্যে। তখন কেবল একটি মাত্র ছোটো নীলাভ পাহাড় মানসসরোবরের মস্ত একটি নীল পদ্মের কুঁড়িটির মতো জলের উপরে জেগে রয়েছে। তিনি স্থির নেত্রে এইটুকু কেবল দেখে নীচে নেবে গেলেন; তাঁর সেই চোখে ওই পাহাড়টুকুকে দেখা আমাদের শক্তিতে নেই— আমরা দেখছি নূতনকে, তিনি দেখছেন তাঁর চিরন্তনকে; আমরা অনেক তুচ্ছকে বাদ দিয়ে দিয়ে দেখছি, তিনি ছোটো বড়ো সমস্তকেই তাঁর এক বিরাটের অঙ্গ করে দেখছেন; এইজন্যেই ছোটোও তাঁর কাছে বড়ো, ভাঙাও তাঁর কাছে জোড়া, অনেক তাঁর কাছে এক। এই দৃষ্টিই সত্য দৃষ্টি।

জাহাজ যখন একেবারে বন্দরে এসে পৌছল তখন মেঘ কেটে গিয়ে সূর্য উঠেছে। বড়ো বড়ো জাপানি অপ্সরা নৌকা আকাশে পাল উড়িয়ে দিয়ে, যেখানে বরুণদেবের সভাপ্রাঙ্গণে সূর্যদেবের নিমন্ত্রণ হয়েছে, সেইখানে নৃত্য করছে। প্রকৃতির নাট্যমঞ্চে বাদলার যবনিকা উঠে গিয়েছে; ভাবলুম, এইবার ডেকের উপরে রাজার হালে বসে সমুদ্রের তীরে জাপানের প্রথম প্রবেশটা ভালো করে দেখে নিই।

কিন্তু, সে কি হবার জো আছে। নিজের নামের উপমা গ্রহণ করতে যদি কোনো অপরাধ না থাকে তা হলে বলি, আমার আকাশের মিতা যখন খালাস পেয়েছেন তখন আমার পালা আরম্ভ হল। আমার চারি দিকে একটু কোথাও ফাঁক দেখতে পেলুম না। খবরের কাগজের চর তাদের প্রশ্ন এবং তাদের ক্যামেরা নিয়ে আমাকে আচ্ছন্ন করে দিলে।

কোবে শহরে অনেকগুলি ভারতবর্ষীয় বণিক আছেন, তার মধ্যে বাঙালির ছিটে-ফোঁটাও কিছু পাওয়া যায়। আমি হংকং শহরে পৌঁছেই এই ভারতবাসীদের টেলিগ্রাম পেয়েছিলুম, তাঁরাই আমার আতিথ্যের ব্যবস্থা করেছেন। তাঁরা জাহাজে গিয়ে আমাকে

ধরলেন। ওদিকে জাপানের বিখ্যাত চিত্রকর টাইক্কন এসে উপস্থিত। ইনি যখন ভারতবর্ষে গিয়েছিলেন, আমাদের বাড়িতে ছিলেন। কাট্সটাকেও দেখা গেল, ইনিও আমাদের চিত্রকর বন্ধু। সেই সঙ্গে সানো এসে উপস্থিত, ইনি এককালে আমাদের শান্তিনিকেতন আশ্রমে জুজুৎসু ব্যায়ামের শিক্ষক ছিলেন। এর মধ্যে কাওয়াগুচিরও দর্শন পাওয়া গেল। এটা বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, আমাদের নিজের ভাবনা আর ভাবতে হবে না। কিন্তু দেখতে পেলুম, সেই ভাবনার ভার অনেকে মিলে যখন গ্রহণ করেন তখন ভাবনার আর অন্ত থাকে না। আমাদের প্রয়োজন অল্প, কিন্তু আয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশি হয়ে উঠল। জাপানি পক্ষ থেকে তাঁদের ঘরে নিয়ে যাবার জন্যে আমাকে টানাটানি করতে লাগলেন, কিন্তু ভারতবাসীর আমন্ত্রণ আমি পূর্বেই গ্রহণ করেছি। এই নিয়ে বিষম একটা সংকট উপস্থিত হল। কোনো পক্ষই হার মানতে চান না। বাদ বিতণ্ডা বচসা চলতে লাগল। আবার, এরই সঙ্গে সঙ্গে সেই খবরের কাগজের চরের দল আমার চারি দিকে পাক খেয়ে বেড়াতে লাগল। দেশ ছাড়বার মুখে বঙ্গসাগরে পেয়েছিলুম বাতাসের সাইক্লোন, এখানে জাপানের ঘাটে এসে পৌঁছেই পেলুম মানুষের সাইক্লোন। দুটোর মধ্যে যদি বাছাই করতেই হয়, আমি প্রথমটাই পছন্দ করি। খ্যাতি জিনিসের বিপদ এই যে, তার মধ্যে যতটুকু আমার দরকার কেবলমাত্র সেইটুকু গ্রহণ করেই নিষ্কৃতি নেই, তার চেয়ে অনেক বেশি নিতে হয়; সেই বেশিটুকুর বোঝা বিষম বোঝা। অনাবৃষ্টি এবং অতিবৃষ্টির মধ্যে কোন্‌টা যে ফসলের পক্ষে বেশি মুশকিল জানি নে।

এখানকার একজন প্রধান গুজরাটি বণিক মোরারজি, তাঁরই বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছি। সেই সব খবরের কাগজের অনুচররা এখানে এসেও উপস্থিত। বহুকষ্টে ব্যূহ ভেদ করে বেরোতে পেরেছি।

এই উৎপাতটা আশা করি নি। জাপান যে নতুন মদ পান করেছে এই খবরের কাগজের ফেনিলতা তারই একটা অঙ্গ। এত ফেনা আমেরিকাতেও দেখি নি। এই জিনিসটা কেবলমাত্র কথার হাওয়ার বুদ্‌বুদপুঞ্জ— এতে কারো সত্যকার প্রয়োজনও দেখি নে, আমোদও বুঝি নে; এতে কেবলমাত্র পাত্রটার মাথা শূন্যতায় ভরতি করে দেয়, মাদকতার ছবিটাকে কেবল চোখের সামনে প্রকাশ করে। এই মাতলামিটাই আমাকে সব-চেয়ে পীড়া দেয়। যাক্‌গে।

মোরারজির বাড়িতে আহারে আলাপে অভ্যর্থনায় কাল রাত্তিরটা কেটেছে। এখানকার ঘরকন্নার মধ্যে প্রবেশ করে সব-চেয়ে চোখে পড়ে জাপানি দাসী! মাথায় একখানা ফুলে-ওঠা খোঁপা, গালদুটো ফুলো ফুলো, চোখদুটো ছোটো, নাকের একটুখানি অপ্রতুলতা, কাপড় বেশ সুন্দর, পায়ে খড়ের চটি— কবিরা সৌন্দর্যের যে-রকম বর্ণনা

করে থাকেন তার সঙ্গে অনৈক্য ঢের, অথচ মোটের উপর দেখতে ভালো লাগে; যেন মানুষের সঙ্গে পুতুলের সঙ্গে, মাংসের সঙ্গে মোমের সঙ্গে মিশিয়ে একটা পদার্থ; আর সমস্ত শরীরে ক্ষিপ্রতা, নৈপুণ্য, বলিষ্ঠতা। গৃহস্বামী বলেন, এরা যেমন কাজের, তেমনি এরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমি আমার অভ্যাসবশত ভোরে উঠে জানলার বাইরে চেয়ে দেখলুম, প্রতিবেশীদের বাড়িতে ঘরকন্নার হিল্লোল তখন জাগতে আরম্ভ করেছে— সেই হিল্লোল মেয়েদের হিল্লোল। ঘরে ঘরে এই মেয়েদের কাজের ঢেউ এমন বিচিত্র বৃহৎ এবং প্রবল ক'রে সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু, এটা দেখলেই বোঝা যায়, এমন স্বাভাবিক আর কিছু নেই। দেহযাত্রা জিনিসটার ভার আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত মেয়েদেরই হাতে; এই দেহযাত্রার আয়োজন উদ্যোগ মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক এবং সুন্দর। কাজের এই নিয়ত তৎপরতায় মেয়েদের স্বভাব যথার্থ মুক্তি পায় ব'লে শ্রীলাভ করে। বিলাসের জড়তায় কিম্বা যে-কারণেই হোক, মেয়েরা যেখানে এই কর্মপরতা থেকে বঞ্চিত সেখানে তাদের বিকার উপস্থিত হয়, তাদের দেহমনের সৌন্দর্য-হানি হতে থাকে, এবং তাদের যথার্থ আনন্দের ব্যাঘাত ঘটে। এই যে এখানে সমস্তক্ষণ ঘরে ঘরে ক্ষিপ্রবেগে মেয়েদের হাতের কাজের স্রোত অবিরত বইছে এ আমার দেখতে ভারি সুন্দর লাগছে। মাঝে মাঝে পাশের ঘর থেকে এদের গলার আওয়াজ এবং হাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছি, আর মনে মনে ভাবছি, মেয়েদের কথা ও হাসি সকল দেশেই সমান। অর্থাৎ সে যেন স্রোতের জলের উপরকার আলোর মতো একটা ঝিকিমিকি ব্যাপার, জীবনচাঞ্চল্যের অহেতুক লীলা।

কোবে

১৩

নতুনকে দেখতে হলে, মনকে একটু বিশেষ করে বাতি জালাতে হয়। পুরোনোকে দেখতে হলে, ভালো করে চোখ মেলতেই হয় না। সেইজন্যে নতুনকে যত শীঘ্র পারে দেখে নিয়ে, মন আপনার অতিরিক্ত বাতিগুলো নিবিয়ে ফেলে। খরচ বাঁচাতে চায়, মনোযোগকে উসকে রাখতে চায় না।

মুকুল আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল, "দেশে থাকতে বই প'ড়ে, ছবি দেখে জাপানকে যেরকম বিশেষভাবে নতুন বলে মনে হত, এখানে কেন তা হচ্ছে না।" তার কারণই এই। রেঙ্গুন থেকে আরম্ভ করে সিঙাপুর, হংকং দিয়ে আসতে আসতে মনের নতুন দেখার বিশেষ আয়োজনটুকু ক্রমে ক্রমে ফুরিয়ে আসে। যখন বিদেশী সমুদ্রের এ কোণে ও কোণে ন্যাড়া ন্যাড়া পাহাড়গুলো উঁকি মারতে থাকে তখন বলতে থাকি বাঃ! তখন

মুকুল বলে, ওইখানে নেবে গিয়ে থাকতে বেশ মজা ! ও মনে করে, এই নতুনকে প্রথম দেখার উত্তেজনা বুঝি চিরদিনই থাকবে ; ওখানে ওই ছোটো ছোটো পাহাড়গুলোর সঙ্গে গলা-ধরাধরি করে সমুদ্র বুঝি চিরদিনই এই নতুন ভাষায় কানাকানি করে ; যেন ওইখানে পৌঁছলে পরে সমুদ্রের চঞ্চলনীল, আকাশের শান্তনীল আর ওই পাহাড়গুলোর ঝাপসা-নীল ছাড়া আর কিছুর দরকারই হয় না। তার পরে, বিরল ক্রমে অবিরল হতে লাগল, ক্ষণে ক্ষণে আমাদের জাহাজ এক-একটা দ্বীপের গা ঘেঁষে চলল ; তখন দেখি দূরবীন টেবিলের উপরে অনাদরে পড়ে থাকে, মন আর সাড়া দেয় না। যখন দেখবার সামগ্রী বেড়ে ওঠে তখন দেখাটাই কমে যায়। নতুনকে ভোগ ক'রে ক'রে নতুনের খিদে ক্রমেই মরে যায়।

হপ্তাখানেক জাপানে আছি কিন্তু মনে হচ্ছে, যেন অনেক দিন আছি। তার মানে, পথঘাট, গাছপালা, লোকজনের যেটুকু নতুন সেটুকু তেমন গভীর নয়, তাদের মধ্যে যেটা পুরোনো সেইটেই পরিমাণে বেশি। অফুরান নতুন কোথাও নেই ; অর্থাৎ, যার সঙ্গে আমাদের চিরপরিচিত খাপ খায় না, জগতে এমন অসংগত কিছুই নেই। প্রথমে ধাঁ করে চোখে পড়ে, যেগুলো হঠাৎ আমাদের মনের অভ্যাসের সঙ্গে মেলে না। তার পরে পুরোনোর সঙ্গে নতুনের যে যে অংশের রঙে মেলে, চেহারায় কাছাকাছি আসে, মন তাড়াতাড়ি সেইগুলোকে পাশাপাশি সাজিয়ে নিয়ে তাদের সঙ্গে ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়। তাস খেলতে বসে আমরা হাতে কাগজ পেলে রঙ এবং মূল্য -অনুসারে তাদের পরে পরে সাজিয়ে নিই ; এও সেইরকম। শুধু তো নতুনকে দেখে যাওয়া নয়, তাঁর সঙ্গে যে ব্যবহার করতে হবে ; কাজেই মন তাকে নিজের পুরোনো কাঠামোর মধ্যে যত শীঘ্র পারে গুছিয়ে নেয়। যেই গোছানো হয় তখন দেখতে পাই, তত বেশি নতুন নয় যতটা গোড়ায় মনে হয়েছিল ; আসলে পুরোনো, ভঙ্গিটাই নতুন।

তারপরে আর-এক মুশকিল হয়েছে এই যে, দেখতে পাচ্ছি, পৃথিবীর সকল সভ্য জাতই বর্তমান কালের ছাঁচে ঢালাই হয়ে একই রকম চেহারা অথবা চেহারার অভাব ধারণ করেছে। আমার এই জানলায় বসে কোবে শহরের দিকে তাকিয়ে এই যা দেখছি এ তো লোহার জাপান, এ তো রক্তমাংসের নয়। একদিকে আমার জানলা, আর-একদিকে সমুদ্র, এর মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা শহর। চীনেরা যেরকম বিকটমূর্তি ড্র্যাগন আঁকে— সেইরকম। আঁকাবাঁকা বিপুল দেহ নিয়ে সে যেন সবুজ পৃথিবীটিকে খেয়ে ফেলেছে। গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি লোহার চালগুলো ঠিক যেন তারই পিঠের আঁশের মতো রৌদ্রে ঝক্‌ঝক্ করছে। বড়ো কঠিন, বড়ো কুৎসিৎ— এই দরকার-নামক দৈত্যটা। প্রকৃতির মধ্যে মানুষের যে অন্ন আছে তা ফলে শস্যে বিচিত্র এবং সুন্দর ; কিন্তু সেই অন্নকে যখন

গ্রাস করতে যাই তখন তাকে তাল পাকিয়ে একটা পিণ্ড করে তুলি ; তখন বিশেষত্বকে দরকারের চাপে পিষে ফেলি। কোবে শহরের পিঠের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি, মানুষের দরকার পদার্থটা স্বভাবের বিচিত্রতাকে একাকার করে দিয়েছে। মানুষের দরকার আছে, এই কথাটাই ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে, হাঁ করতে করতে, পৃথিবীর অধিকাংশকে গ্রাস করে ফেলছে। প্রকৃতিও কেবল দরকারের সামগ্রী, মানুষও কেবল দরকারের মানুষ হয়ে আসছে।

যেদিন থেকে কলকাতা ছেড়ে বেরিয়েছি, ঘাটে ঘাটে দেশে দেশে এইটেই খুব বড়ো করে দেখতে পাচ্ছি। মানুষের দরকার মানুষের পূর্ণতাকে যে কতখানি ছাড়িয়ে যাচ্ছে, এর আগে কোনো দিন আমি সেটা এমন স্পষ্ট করে দেখতে পাই নি। এক সময়ে মানুষ এই দরকারকে ছোটো করে দেখেছিল। ব্যাবসাকে তারা নীচের জায়গা দিয়েছিল ; টাকা রোজগার করাটাকে সম্মান করে নি। দেবপূজা ক'রে, বিদ্যাদান ক'রে, আনন্দ দান ক'রে যারা টাকা নিয়েছে মানুষ তাদের ঘৃণা করেছে। কিন্তু আজকাল জীবনযাত্রা এতই বেশি দুঃসাধ্য, এবং টাকার আয়তন ও শক্তি এতই বেশি বড়ো হয়ে উঠেছে যে, দরকার এবং দরকারের বাহনগুলোকে মানুষ আর ঘৃণা করতে সাহস করে না। এখন মানুষ আপনার সকল জিনিসেরই মূল্যের পরিমাণ টাকা দিয়ে বিচার করতে লজ্জা করে না। এতে করে মানুষের প্রকৃতির বদল হয়ে আসছে— জীবনের লক্ষ্য এবং গৌরব, অন্তর থেকে বাইরের দিকে, আনন্দ থেকে প্রয়োজনের দিকে অত্যন্ত ঝুঁকে পড়ছে। মানুষ ক্রমাগত নিজেকে বিক্রি করতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করছে না। ক্রমশই সমাজের এমন একটা বদল হয়ে আসছে যে, টাকাই মানুষের যোগ্যতারূপে প্রকাশ পাচ্ছে। অথচ, এটা কেবল দায়ে পড়ে ঘটছে, প্রকৃতপক্ষে এটা সত্য নয়। তাই, এক সময়ে যে-মানুষ মনুষ্যত্বের খাতিরে টাকাকে অবজ্ঞা করতে জানত এখন সে টাকার খাতিরে মনুষ্যত্বকে অবজ্ঞা করছে। রাজ্যতন্ত্রে, সমাজতন্ত্রে, ঘরে বাইরে, সর্বত্রই তার পরিচয় কুৎসিত হয়ে উঠছে। কিন্তু, বীভৎসতাকে দেখতে পাচ্ছি নে, কেননা, লোভে দুই চোখ আচ্ছন্ন।

জাপানে শহরের চেহারায় জাপানিত্ব বিশেষ নেই, মানুষের সাজসজ্জা থেকেও জাপান ক্রমশ বিদায় নিচ্ছে। অর্থাৎ, জাপান ঘরের পোশাক ছেড়ে আপিসের পোশাক ধরেছে। আজকাল পৃথিবী জোড়া একটা আপিস-রাজ্য বিস্তীর্ণ হয়েছে, সেটা কোনো বিশেষ দেশ নয়। যেহেতু আপিসের সৃষ্টি আধুনিক য়ুরোপ থেকে, সেইজন্যে এর বেশ আধুনিক য়ুরোপের। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে এই বেশে মানুষের বা দেশের পরিচয় দেয় না, আপিস-রাজ্যের পরিচয় দেয়। আমাদের দেশেও ডাক্তার বলছে, "আমার ওই হ্যাট-

কোটের দরকার আছে।" আইনজীবীও তাই বলছে, বণিকও তাই বলছে। এমনি করেই দরকার জিনিসটা বেড়ে চলতে চলতে সমস্ত পৃথিবীকে কুৎসিৎভাবে একাকার করে দিচ্ছে।

এইজন্যে জাপানের শহরের রাস্তায় বেরলেই প্রধানভাবে চোখে পড়ে জাপানের মেয়েরা। তখন বুঝতে পারি, এরাই জাপানের ঘর, জাপানের দেশ। এরা আপিসের নয়। কারো কারো কাছে শুনতে পাই, জাপানের মেয়েরা এখানকার পুরুষের কাছ থেকে সম্মান পায় না। সে-কথা সত্য কি মিথ্যা জানি নে, কিন্তু একটা সম্মান আছে সেটা বাইরে থেকে দেওয়া নয়, সেটা নিজের ভিতরকার। এখানকার মেয়েরাই জাপানের বেশে জাপানের সম্মানরক্ষার ভার নিয়েছে। ওরা দরকারকেই সকলের চেয়ে বড়ো করে খাতির করে নি, সেইজন্যেই ওরা নয়নমনের আনন্দ।

একটা জিনিস এখানে পথে ঘাটে চোখে পড়ে। রাস্তায় লোকের ভিড় আছে, কিন্তু গোলমাল একেবারে নেই। এরা যেন চেঁচাতে জানে না, লোকে বলে জাপানের ছেলেরা সুদ্ধ কাঁদে না। আমি এপর্যন্ত একটি ছেলেকেও কাঁদতে দেখি নি। পথে মোটরে করে যাবার সময়ে মাঝে মাঝে যেখানে ঠেলাগাড়ি প্রভৃতি বাধা এসে পড়ে, সেখানে মোটরের চালক শান্তভাবে অপেক্ষা করে; গাল দেয় না, হাঁকাহাঁকি করে না। পথের মধ্যে হঠাৎ একটা বাইসিক্‌ল্‌ মোটরের উপরে এসে পড়বার উপক্রম করলে, আমাদের দেশের চালক এ অবস্থায় বাইসিক্‌ল্‌-আরোহীকে অনাবশ্যক গাল না দিয়ে থাকতে পারত না। এ লোকটা ভ্রূক্ষেপমাত্র করলে না। এখানকার বাঙালিদের কাছে শুনতে পেলুম যে, রাস্তায় দুই বাইসিক্‌লে, কিম্বা গাড়ির সঙ্গে বাইসিক্‌লের ঠোকাঠুকি হয়ে যখন রক্তপাত হয়ে যায়, তখনো উভয় পক্ষ চেঁচামেচি গালমন্দ না করে গায়ের ধুলো ঝেড়ে চলে যায়।

আমার কাছে মনে হয়, এইটেই জাপানের শক্তির মূল কারণ। জাপানি বাজে চেঁচামেচি ঝগড়াঝাঁটি করে নিজের বলক্ষয় করে না। প্রাণশক্তির বাজে খরচ নেই ব'লে প্রয়োজনের সময় টানাটানি পড়ে না। শরীর মনের এই শান্তি ও সহিষ্ণুতা ওদের স্বজাতীয় সাধনার একটা অঙ্গ। শোকে দুঃখে আঘাতে উত্তেজনায়, ওরা নিজেকে সংযত করতে জানে। সেইজন্যেই বিদেশের লোকেরা প্রায় বলে, জাপানিকে বোঝা যায় না, ওরা অত্যন্ত বেশি গূঢ়। এর কারণই হচ্ছে, এরা নিজেকে সর্বদা ফুটো দিয়ে ফাঁক দিয়ে গ'লে পড়তে দেয় না।

এই যে নিজের প্রকাশকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করতে থাকা, এ ওদের কবিতাতেও দেখা যায়। তিন লাইনের কাব্য জগতের আর কোথাও নেই। এই তিন লাইনই

ওদের কবি, পাঠক, উভয়ের পক্ষেই যথেষ্ট। সেইজন্যেই এখানে এসে অবধি, রাস্তায় কেউ গান গাচ্ছে, এ আমি শুনি নি। এদের হৃদয় ঝরনার জলের মতো শব্দ করে না, সরোবরের জলের মতো স্তব্ধ। এপর্যন্ত ওদের যত কবিতা শুনেছি সবগুলিই হচ্ছে ছবি দেখার কবিতা, গান গাওয়ার কবিতা নয়। হৃদয়ের দাহ এবং ক্ষোভ প্রাণকে খরচ করে, এদের সেই খরচ কম। এদের অন্তরের সমস্ত প্রকাশ সৌন্দর্যবোধে। সৌন্দর্যবোধ জিনিসটা স্বার্থনিরপেক্ষ। ফুল, পাখি, চাঁদ, এদের নিয়ে আমাদের কাঁদাকাটা নেই। এদের সঙ্গে আমাদের নিছক সৌন্দর্যভোগের সম্বন্ধ— এরা আমাদের কোথাও মারে না, কিছু কাড়ে না, এদের দ্বারা আমাদের জীবনে কোথাও ক্ষয় ঘটে না। সেইজন্যেই তিন লাইনেই এদের কুলোয়, এবং কল্পনাটাতেও এরা শান্তির ব্যাঘাত করে না।

এদের দুটো বিখ্যাত পুরোনো কবিতার নমুনা দেখলে আমার কথাটা স্পষ্ট হবে :

পুরোনো পুকুর,
ব্যাঙের লাফ,
জলের শব্দ।

বাস! আর দরকার নেই। জাপানি পাঠকের মনটা চোখে ভরা। পুরোনো পুকুর মানুষের পরিত্যক্ত, নিস্তব্ধ, অন্ধকার। তার মধ্যে একটা ব্যাঙ লাফিয়ে পড়তেই শব্দটা শোনা গেল। শোনা গেল— এতে বোঝা যাবে পুকুরটা কী রকম স্তব্ধ। এই পুরোনো পুকুরের ছবিটা কী ভাবে মনের মধ্যে এঁকে নিতে হবে সেইটুকু কেবল কবি ইশারা করে দিলে; তার বেশি একেবারে অনাবশ্যক।

আর-একটা কবিতা :

পচা ডাল,
একটা কাক,
শরৎকাল।

আর বেশি না! শরৎকালে গাছের ডালে পাতা নেই, দুই-একটা ডাল পচে গেছে, তার উপরে কাক ব'সে। শীতের দেশে শরৎকালটা হচ্ছে গাছের পাতা ঝরে যাবার, ফুল পড়ে যাবার, কুয়াশায় আকাশ ম্লান হবার কাল— এই কালটা মৃত্যুর ভাব মনে আনে। পচা ডালে কালো কাক বসে আছে, এইটুকুতেই পাঠক শরৎকালের সমস্ত রিক্ততা ও ম্লানতার ছবি মনের সামনে দেখতে পায়। কবি কেবল সূত্রপাত করে দিয়েই সরে দাঁড়ায়। তাকে যে অত অল্পের মধ্যেই সরে যেতে হয় তার কারণ এই যে, জাপানি পাঠকের চেহারা দেখার মানসিক শক্তিটা প্রবল।

এইখানে একটা কবিতার নমুনা দিই, যেটা চোখে দেখার চেয়ে বড়ো :

স্বর্গ এবং মর্ত হচ্ছে ফুল,
দেবতারা এবং বুদ্ধ হচ্ছেন ফুল—
মানুষের হৃদয় হচ্ছে ফুলের অন্তরাত্মা।

আমার মনে হয়, এই কবিতাটিতে জাপানের সঙ্গে ভারতবর্ষের মিল হয়েছে। জাপান স্বর্গমর্তকে বিকশিত ফুলের মতো সুন্দর করে দেখছে ; ভারতবর্ষ বলছে, এই যে এক বৃন্তে দুই ফুল, স্বর্গ এবং মর্ত, দেবতা এবং বুদ্ধ— মানুষের হৃদয় যদি না থাকত তবে এ ফুল কেবলমাত্র বাইরের জিনিস হত— এই সুন্দরের সৌন্দর্যটিই হচ্ছে মানুষের হৃদয়ের মধ্যে।

যাই হোক, এই কবিতাগুলির মধ্যে কেবল যে বাক্‌সংযম তা নয়, এর মধ্যে ভাবের সংযম। এই ভাবের সংযমকে হৃদয়ের চাঞ্চল্য কোথাও ক্ষুব্ধ করছে না। আমাদের মনে হয়, এইটেতে জাপানের একটা গভীর পরিচয় আছে। এক কথায় বলতে গেলে, একে বলা যেতে পারে হৃদয়ের মিতব্যয়িতা।

মানুষের একটা ইন্দ্রিয়শক্তিকে খর্ব করে আর-একটাকে বাড়ানো চলে, এ আমরা দেখেছি। সৌন্দর্যবোধ এবং হৃদয়াবেগ, এ দুটোই হৃদয়বৃত্তি। আবেগের বোধ এবং প্রকাশকে খর্ব ক'রে সৌন্দর্যের বোধ এবং প্রকাশকে প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়ে তোলা যেতে পারে— এখানে এসে অবধি এই কথাটা আমার মনে হয়েছে। হৃদয়োচ্ছ্বাস আমাদের দেশে এবং অন্যত্র বিস্তর দেখেছি, সেইটে এখানে চোখে পড়ে না। সৌন্দর্যের অনুভূতি এখানে এত বেশি করে এবং এমন সর্বত্র দেখতে পাই যে স্পষ্টই বুঝতে পারি যে, এটা এমন একটা বিশেষ বোধ যা আমরা ঠিক বুঝতে পারি নে। এ যেন কুকুরের ঘ্রাণশক্তি ও মৌমাছির দিক্‌বোধের মতো, আমাদের উপলব্ধির অতীত। এখানে যে-লোক অত্যন্ত গরিব সেও প্রতিদিন নিজের পেটের ক্ষুধাকে বঞ্চনা ক'রেও এক-আধ পয়সার ফুল না কিনে বাঁচে না। এদের চোখের ক্ষুধা এদের পেটের ক্ষুধার চেয়ে কম নয়।

কাল দুজন জাপানি মেয়ে এসে আমাকে এ দেশের ফুল সাজানোর বিদ্যা দেখিয়ে গেল। এর মধ্যে কত আয়োজন, কত চিন্তা কত নৈপুণ্য আছে, তার ঠিকানা নেই। প্রত্যেক পাতা এবং প্রত্যেক ডালটির উপর মন দিতে হয়। চোখে দেখার ছন্দ এবং সংগীত যে এদের কাছে কত প্রবলভাবে সুগোচর, কাল আমি ওই দুজন জাপানি মেয়ের কাজ দেখে বুঝতে পারছিলুম।

একটা বইয়ে পড়ছিলুম, প্রাচীনকালে বিখ্যাত যোদ্ধা যাঁরা ছিলেন, তাঁরা অবকাশ-কালে এই ফুল সাজাবার বিদ্যার আলোচনা করতেন। তাঁদের ধারণা ছিল, এতে

তাঁদের রণদক্ষতা ও বীরত্বের উন্নতি হয়। এর থেকেই বুঝতে পারবে, জাপানি নিজের এই সৌন্দর্য-অনুভূতিকে শৌখিন জিনিস বলে মনে করে না ; ওরা জানে, গভীরভাবে এতে মানুষের শক্তিবৃদ্ধি হয়। এই শক্তিবৃদ্ধির মূল কারণটা হচ্ছে শান্তি ; যে-সৌন্দর্যের আনন্দ নিরাসক্ত আনন্দ তাতে জীবনের ক্ষয় নিবারণ করে, এবং যে-উত্তেজনা-প্রবণতায় মানুষের মনোবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তিকে মেঘাচ্ছন্ন করে তোলে এই সৌন্দর্যবোধ তাকে পরিশান্ত করে।

সেদিন একজন ধনী জাপানি তাঁর বাড়িতে চা-পান-অনুষ্ঠানে আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তোমরা ওকাকুরার Book of Tea পড়েছ, তাতে এই অনুষ্ঠানের বর্ণনা আছে। সেদিন এই অনুষ্ঠান দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, জাপানির পক্ষে এটা ধর্মানুষ্ঠানের তুল্য। এ ওদের একটা জাতীয় সাধনা। ওরা কোন্ আইডিয়ালকে লক্ষ্য করছে, এর থেকে তা বেশ বোঝা যায়।

কোবে থেকে দীর্ঘ পথ মোটরযানে করে গিয়ে প্রথমেই একটি বাগানে প্রবেশ করলুম— সে বাগান ছায়াতে সৌন্দর্যে এবং শান্তিতে একেবারে নিবিড়ভাবে পূর্ণ। বাগান জিনিসটা যে কী, তা এরা জানে ; কতকগুলো কাঁকর ফেলে আর গাছ পুঁতে মাটির উপরে জিয়োমেট্রি কষাকেই যে বাগান করা বলে না, তা জাপানি-বাগানে ঢুকলেই বোঝা যায় ; জাপানি চোখ এবং হাত দুই-ই প্রকৃতির কাছ থেকে সৌন্দর্যের দীক্ষালাভ করেছে, যেমন ওরা দেখতে জানে তেমনি ওরা গড়তে জানে। ছায়াপথ দিয়ে গিয়ে এক জায়গায় গাছের তলায় গর্ত-করা একটা পাথরের মধ্যে স্বচ্ছ জল আছে, সেই জলে আমরা প্রত্যেকে হাত মুখ ধুলুম। তার পরে, একটি ছোট্ট ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বেঞ্চির উপরে ছোটো ছোটো গোল গোল খড়ের আসন পেতে দিলে তার উপরে আমরা বসলুম। নিয়ম হচ্ছে এইখানে কিছুকাল নীরব হয়ে বসে থাকতে হয়। গৃহস্বামীর সঙ্গে যাবামাত্রই দেখা হয় না। মনকে শান্ত করে স্থির করবার জন্যে ক্রমে ক্রমে নিমন্ত্রণ ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। আস্তে আস্তে দুটো তিনটে ঘরের মধ্যে বিশ্রাম করতে করতে, শেষে আসল জায়গায় যাওয়া গেল। সমস্ত ঘরই নিস্তব্ধ, যেন চিরপ্রদোষের ছায়াবৃত ; কারো মুখে কথা নেই। মনের উপর এই ছায়াঘন নিঃশব্দ নিস্তব্ধতার সম্মোহন ঘনিয়ে উঠতে থাকে। অবশেষে ধীরে ধীরে গৃহস্বামী এসে নমস্কারের দ্বারা আমাদের অভ্যর্থনা করলেন।

ঘরগুলিতে আসবাব নেই বললেই হয়, অথচ মনে হয় যেন এ-সমস্ত ঘর কী একটাতে পূর্ণ, গম্‌গম্ করছে। একটিমাত্র ছবি কিম্বা একটিমাত্র পাত্র কোথাও আছে। নিমন্ত্রিতেরা সেইটি বহুযত্নে দেখে দেখে নীরবে তৃপ্তিলাভ করেন। যে-জিনিস যথার্থ

সুন্দর তার চারি দিকে মস্ত একটি বিরলতার অবকাশ থাকা চাই। ভালো জিনিসগুলিকে ঘেঁষাঘেঁষি করে রাখা তাদের অপমান করা— সে যেন সতী স্ত্রীকে সতীনের ঘর করতে দেওয়ার মতো। ক্রমে ক্রমে অপেক্ষা ক'রে ক'রে, স্তব্ধতা ও নিঃশব্দতার দ্বারা মনের ক্ষুধাকে জাগ্রত ক'রে তুলে, তার পরে এইরকম দুটি-একটি ভালো জিনিস দেখালে সে যে কী উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, এখানে এসে তা স্পষ্ট বুঝতে পারলুম। আমার মনে পড়ল, শান্তিনিকেতন আশ্রমে যখন আমি এক-একদিন এক-একটি গান তৈরি করে সকলকে শোনাতুম, তখন সকলেরই কাছে সেই গান তার হৃদয় সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত করে দিত। অথচ সেই সব গানকেই তোড়া বেঁধে কলকাতায় এনে যখন বান্ধবসভায় ধরেছি, তখন তারা আপনার যথার্থ শ্রীকে আবৃত করে রেখেছে। তার মানেই কলকাতার বাড়িতে গানের চারি দিকে ফাঁকা নেই— সমস্ত লোকজন, ঘরবাড়ি কাজকর্ম, গোলমাল, তার ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়েছে। যে-আকাশের মধ্যে তার ঠিক অর্থটি বোঝা যায়, সেই আকাশ নেই।

তার পরে গৃহস্বামী এসে বললেন, চা তৈরি এবং পরিবেশনের ভার বিশেষ কারণে তিনি তাঁর মেয়ের উপরে দিয়েছেন। তাঁর মেয়ে এসে নমস্কার ক'রে চা তৈরিতে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁর প্রবেশ থেকে আরম্ভ করে চা তৈরির প্রত্যেক অঙ্গ যেন কবিতার ছন্দের মতো। ধোওয়া মোছা, আগুনজ্বালা, চা-দানির ঢাকা খোলা, গরম জলের পাত্র নামানো, পেয়ালায় চা ঢালা, অতিথির সম্মুখে এগিয়ে দেওয়া, সমস্ত এমন সংযম এবং সৌন্দর্যে মণ্ডিত যে, সে না দেখলে বোঝা যায় না। এই চা-পানের প্রত্যেক আসবাবটি দুর্লভ এবং সুন্দর। অতিথির কর্তব্য হচ্ছে, এই পাত্রগুলিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একান্ত মনোযোগ দিয়ে দেখা। প্রত্যেক পাত্রের স্বতন্ত্র নাম এবং ইতিহাস। কত যে তার যত্ন, সে বলা যায় না।

সমস্ত ব্যাপারটা এই। শরীরকে মনকে একান্ত সংযত করে নিরাসক্ত প্রশান্ত মনে সৌন্দর্যকে নিজের প্রকৃতির মধ্যে গ্রহণ করা। ভোগীর ভোগোন্মাদ নয়; কোথাও লেশমাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা বা অমিতাচার নেই; মনের উপরতলায় সর্বদা যেখানে নানা স্বার্থের আঘাতে, নানা প্রয়োজনের হাওয়ায়, কেবলই ঢেউ উঠছে, তার থেকে দূরে সৌন্দর্যের গভীরতার মধ্যে নিজেকে সমাহিত করে দেওয়াই হচ্ছে এই চা-পান অনুষ্ঠানের তাৎপর্য।

এর থেকে বোঝা যায়, জাপানের যে-সৌন্দর্যবোধ সে তার একটা সাধনা, একটা প্রবল শক্তি। বিলাস জিনিসটা অন্তরে বাহিরে কেবল খরচ করায়, তাতেই দুর্বল করে। কিন্তু, বিশুদ্ধ সৌন্দর্যবোধ মানুষের মনকে স্বার্থ এবং বস্তুর সংঘাত থেকে রক্ষা

করে। সেইজন্যেই জাপানির মনে এই সৌন্দর্যরসবোধ পৌরুষের সঙ্গে মিলিত হতে পেরেছে।

এই উপলক্ষে আর-একটি কথা বলবার আছে। এখানে মেয়ে-পুরুষের সামীপ্যের মধ্যে কোনো গ্লানি দেখতে পাই নে; অন্যত্র মেয়ে-পুরুষের মাঝখানে যে একটা লজ্জা-সংকোচের আবিলতা আছে, এখানে তা নেই। মনে হয়, এদের মধ্যে মোহের একটা আবরণ যেন কম। তার প্রধান কারণ, জাপানে স্ত্রী-পুরুষেরা একত্রে বিবস্ত্র হয়ে স্নান করার প্রথা আছে। এই প্রথার মধ্যে যে লেশমাত্র কলুষ নেই তার প্রমাণ এই—নিকটতম আত্মীয়েরাও এতে মনে কোনো বাধা অনুভব করে না। এমনি ক'রে এখানে স্ত্রী পুরুষের দেহ পরস্পরের দৃষ্টিতে কোনো মায়াকে পালন করে না। দেহ সম্বন্ধে উভয় পক্ষের মন খুব স্বাভাবিক। অন্য দেশের কলুষদৃষ্টি ও দুষ্টবুদ্ধির খাতিরে আজকাল শহরে এই নিয়ম উঠে যাচ্ছে। কিন্তু, পাড়াগাঁয়ে এখনো এই নিয়ম চলিত আছে। পৃথিবীতে যত সভ্য দেশ আছে তার মধ্যে কেবল জাপান মানুষের দেহ সম্বন্ধে যে মোহমুক্ত, এটা আমার কাছে খুব একটা বড়ো জিনিস বলে মনে হয়।

অথচ আশ্চর্য এই যে, জাপানের ছবিতে উলঙ্গ স্ত্রীমূর্তি কোথাও দেখা যায় না। উলঙ্গতার গোপনীয়তা ওদের মনে রহস্যজাল বিস্তার করে নি ব'লেই এটা সম্ভবপর হয়েছে। আরো একটা জিনিস দেখতে পাই। এখানে মেয়েদের কাপড়ের মধ্যে নিজেকে স্ত্রীলোক বলে বিজ্ঞাপন দেবার কিছুমাত্র চেষ্টা নাই। প্রায় সর্বত্রই মেয়েদের বেশের মধ্যে এমন কিছু ভঙ্গি থাকে যাতে বোঝা যায়, তারা বিশেষভাবে পুরুষের মোহদৃষ্টির প্রতি দাবি রেখেছে। এখানকার মেয়েদের কাপড় সুন্দর, কিন্তু সে কাপড়ে দেহের পরিচয়কে ইঙ্গিতের দ্বারা দেখাবার কোনো চেষ্টা নেই। জাপানিদের মধ্যে চরিত্রদৌর্বল্য যে কোথাও নেই তা আমি বলছি নে, কিন্তু স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধকে ঘিরে তুলে প্রায় সকল সভ্যদেশেই মানুষ যে একটা কৃত্রিম মোহপরিবেষ্টন রচনা করেছে জাপানির মধ্যে অন্তত তার একটা আয়োজন কম বলে মনে হল এবং অন্তত সেই পরিমাণে এখানে স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ স্বাভাবিক এবং মোহমুক্ত।

আর একটি জিনিস আমাকে বড়ো আনন্দ দেয়, সে হচ্ছে জাপানের ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে। রাস্তায় ঘাটে সর্বত্র এত বেশি পরিমাণে এত ছোটো ছেলেমেয়ে আমি আর কোথাও দেখি নি। আমার মনে হল, যে-কারণে জাপানিরা ফুল ভালোবাসে সেই কারণেই ওরা শিশু ভালোবাসে। শিশুর ভালোবাসায় কোনো কৃত্রিম মোহ নেই—আমরা ওদের ফুলের মতোই নিঃস্বার্থ নিরাসক্তভাবে ভালোবাসতে পারি।

কাল সকালেই ভারতবর্ষের ডাক যাবে, এবং আমরাও টোকিও যাত্রা করব।

একটি কথা তোমরা মনে রেখো— আমি যেমন যেমন দেখছি তেমনি তেমনি লিখে চলেছি। এ কেবল একটা নতুন দেশের উপর চোখ বুলিয়ে যাবার ইতিহাস মাত্র। এর মধ্যে থেকে তোমরা কেউ যদি অধিক পরিমাণে, এমন-কি, অল্প পরিমাণেও 'বস্তুতন্ত্রতা' দাবি কর তো নিরাশ হবে। আমার এই চিঠিগুলি জাপানের ভূবৃত্তান্তরূপে পাঠ্যসমিতি নির্বাচন করবেন না, নিশ্চয় জানি। জাপান সম্বন্ধে আমি যা কিছু মতামত প্রকাশ করে চলেছি তার মধ্যে জাপান কিছু পরিমাণে আছে, আমিও কিছু পরিমাণে আছি, এইটে তোমরা যদি মনে নিয়ে পড় তা হলেই ঠকবে না। ভুল বলব না, এমন আমার প্রতিজ্ঞা নয়; যা মনে হচ্ছে বলব, এই আমার মতলব।

২২শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩

কোবে

১৪

যেমন যেমন দেখছি তেমনি তেমনি লিখে যাওয়া আর সম্ভব নয়। পূর্বেই লিখেছি, জাপানিরা বেশি ছবি দেয়ালে টাঙায় না, গৃহসজ্জায় ঘর ভরে ফেলে না। যা তাদের কাছে রমণীয় তা তারা অল্প করে দেখে; দেখা সম্বন্ধে এরা যথার্থ ভোগী বলেই দেখা সম্বন্ধে এদের পেটুকতা নেই। এরা জানে, অল্প করে না দেখলে পূর্ণ পরিমাণে দেখা হয় না। জাপান-দেখা সম্বন্ধেও আমার তাই ঘটছে; দেখবার জিনিস একেবারে হুড়মুড় করে চার দিক থেকে চোখের উপর চেপে পড়ছে, তাই প্রত্যেকটিকে সুস্পষ্ট করে সম্পূর্ণ করে দেখা এখন আর সম্ভব হয় না। এখন, কিছু রেখে কিছু বাদ দিয়ে চলতে হবে।

এখানে এসেই আদর অভ্যর্থনার সাইক্লোনের মধ্যে পড়ে গেছি; সেই সঙ্গে খবরের কাগজের চরেরা চারি দিকে তুফান লাগিয়ে দিয়েছে। এদের ফাঁক দিয়ে যে জাপানের আর কিছু দেখব, এমন আশা ছিল না। জাহাজে এরা ছেঁকে ধরে, রাস্তায় এরা সঙ্গে সঙ্গে চলে, ঘরের মধ্যে এরা ঢুকে পড়তে সংকোচ করে না।

এই কৌতূহলীর ভিড় ঠেলতে ঠেলতে, অবশেষে টোকিও শহরে এসে পৌঁছনো গেল। এখানে আমাদের চিত্রকর বন্ধু য়োকোয়ামা টাইক্কানের বাড়িতে এসে আশ্রয় পেলুম। এখন থেকে ক্রমে জাপানের অন্তরের পরিচয় পেতে আরম্ভ করা গেল।

প্রথমেই জুতো জোড়াটাকে বাড়ির দরজার কাছে ত্যাগ করতে হল। বুঝলুম, জুতো জোড়াটা রাস্তার, পা জিনিসটাই ঘরের। ধুলো জিনিসটাও দেখলুম এদের ঘরের নয়, সেটা বাইরের পৃথিবীর। বাড়ির ভিতরকার সমস্ত ঘর এবং পথ মাদুর

দিয়ে মোড়া, সেই মাছুরের নীচে শক্ত খড়ের গদি ; তাই এদের ঘরের মধ্যে যেমন পায়ের ধুলো পড়ে না তেমনি পায়ের শব্দও হয় না। দরজাগুলো ঠেলা দরজা, বাতাসে যে ধড়াধ্বড় পড়বে এমন সম্ভাবনা নেই।

আর-একটা ব্যাপার এই— এদের বাড়ি জিনিসটা অত্যন্ত অধিক নয়। দেয়াল, কড়ি, বরগা, জানলা, দরজা, যতদূর পরিমিত হতে পারে তাই। অর্থাৎ, বাড়িটা মানুষকে ছাড়িয়ে যায় নি, সম্পূর্ণ তার আয়ত্তের মধ্যে। একে মাজা-ঘষা ধোওয়া-মোছা দুঃসাধ্য নয়।

তার পরে, ঘরে যেটুকু দরকার তা ছাড়া আর কিছু নেই। ঘরের দেয়াল-মেঝে সমস্ত যেমন পরিষ্কার তেমনি ঘরের ফাঁকটুকুও যেন তক্‌তক্‌ করছে ; তার মধ্যে বাজে জিনিসের চিহ্নমাত্র পড়ে নি। মস্ত সুবিধে এই যে, এদের মধ্যে যাদের সাবেক চাল আছে তারা চৌকি টেবিল একেবারে ব্যবহার করে না। সকলেই জানে, চৌকি টেবিলগুলো জীব নয় বটে কিন্তু তারা হাত-পা-ওয়ালা। যখন তাদের কোনো দরকার নেই তখনো তারা দরকারের অপেক্ষায় হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে। অতিথিরা আসছে যাচ্ছে, কিন্তু অতিথিদের এই খাপগুলি জায়গা জুড়েই আছে। এখানে ঘরের মেঝের উপরে মানুষ বসে, সুতরাং যখন তারা চলে যায় তখন ঘরের আকাশে তারা কোনো বাধা রেখে যায় না। ঘরের একধারে মাছুর নেই, সেখানে পালিশ-করা কাষ্ঠখণ্ড ঝক্‌ঝক্‌ করছে, সেইদিকের দেয়ালে একটি ছবি ঝুলছে, এবং সেই ছবির সামনে সেই তক্তাটির উপর একটি ফুলদানির উপরে ফুল সাজানো। ওই যে ছবিটি আছে ওটা আড়ম্বরের জন্যে নয়, ওটা দেখবার জন্যে। সেইজন্যে যাতে ওর গা ঘেঁষে কেউ না বসতে পারে, যাতে ওর সামনে যথেষ্ট পরিমাণে অব্যাহত অবকাশ থাকে, তারই ব্যবস্থা রয়েছে। সুন্দর জিনিসকে যে এরা কত শ্রদ্ধা করে, এর থেকেই তা বোঝা যায়। ফুল-সাজানোও তেমনি। অন্যত্র নানা ফুল ও পাতাকে ঠেসে একটা তোড়ার মধ্যে বেঁধে ফেলে— ঠিক যেমন করে বারুণীযোগের সময় তৃতীয়শ্রেণীর যাত্রীদের এক গাড়িতে ভরতি করে দেওয়া হয়, তেমনি— কিন্তু এখানে ফুলের প্রতি সে অত্যাচার হবার জো নেই ; ওদের জন্যে থার্ডক্লাসের গাড়ি নয়, ওদের জন্যে রিজার্ভ-করা সেলুন। ফুলের সঙ্গে ব্যবহারে এদের না আছে দড়াদড়ি, না আছে ঠেলাঠেলি, না আছে হট্টগোল।

ভোরের বেলা উঠে জানলার কাছে আসন পেতে যখন বসলুম তখন বুঝলুম, জাপানিরা কেবল যে শিল্পকলায় ওস্তাদ তা নয়, মানুষের জীবনযাত্রাকে এরা একটি কলাবিদ্যার মতো আয়ত্ত করেছে। এরা এটুকু জানে যে-জিনিসের মূল্য আছে, গৌরব আছে, তার জন্যে যথেষ্ট জায়গা ছেড়ে দেওয়া চাই। পূর্ণতার জন্যে রিক্ততা সব-চেয়ে

দরকারি। বস্তুবাহুল্য জীবনবিকাশের প্রধান বাধা। এই সমস্ত বাড়িটির মধ্যে কোথাও একটি কোণেও একটু অনাদর নেই, অনাবশ্যকতা নেই। চোখকে মিছিমিছি কোনো জিনিস আঘাত করছে না, কানকে বাজে কোনো শব্দ বিরক্ত করছে না। মানুষের মন নিজেকে যতখানি ছড়াতে চায় ততখানি ছড়াতে পারে, পদে পদে জিনিসপত্রের উপরে ঠোকর খেয়ে পড়ে না।

যেখানে চারি দিকে এলোমেলো, ছড়াছড়ি, নানা জঞ্জাল, নানা আওয়াজ, সেখানে যে প্রতি মুহূর্তেই আমাদের জীবনের এবং মনের শক্তিক্ষয় হচ্ছে সে আমরা অভ্যাসবশত বুঝতে পারি নে। আমাদের চারি দিকে যা-কিছু আছে সমস্তই আমাদের প্রাণমনের কাছে কিছু-না-কিছু আদায় করছেই। যে-সব জিনিস অদরকারি এবং অসুন্দর তারা আমাদের কিছুই দেয় না, কেবল আমাদের কাছে থেকে নিতে থাকে। এমনি করে নিশিদিন আমাদের যা ক্ষয় হচ্ছে, সেটাতে আমাদের শক্তির কম অপব্যয় হচ্ছে না।

সেদিন সকালবেলায় মনে হল, আমার মন যেন কানায় কানায় ভরে উঠেছে। এতদিন যেরকম করে মনের শক্তি বহন করেছি সে যেন চালুনিতে জল ধরা, কেবল গোলমালের ছিদ্র দিয়ে সমস্ত বেরিয়ে গেছে; আর, এখানে এ যেন ঘটের ব্যবস্থা। আমাদের দেশের ক্রিয়াকর্মের কথা মনে হল। কী প্রচুর অপব্যয়। কেবলমাত্র জিনিসপত্রের গণ্ডগোল নয়— মানুষের কী চেঁচামেচি, ছুটোছুটি, গলা-ভাঙাভাঙি। আমাদের নিজের বাড়ির কথা মনে হল। বাঁকাচোরা উঁচুনিচু রাস্তার উপর দিয়ে গোরুর গাড়ি চলার মতো সেখানকার জীবনযাত্রা। যতটা চলছে তার চেয়ে আওয়াজ হচ্ছে ঢের বেশি। দরোয়ান হাঁক দিচ্ছে, বেহারাদের ছেলেরা চেঁচামেচি করছে, মেথরদের মহলে ঘোরতর ঝগড়া বেধে গেছে, মারোয়াড়ি প্রতিবেশিনীরা চীৎকার শব্দে একঘেয়ে গান ধরেছে, তার আর অন্তই নেই। আর, ঘরের ভিতরে নানা জিনিসপত্রের ব্যবস্থা এবং অব্যবস্থা— তার বোঝা কি কম। সেই বোঝা কি কেবল ঘরের মেঝে বহন করছে। তা নয়, প্রতি ক্ষণেই আমাদের মন বহন করছে। যা গোছালো তার বোঝা কম, যা অগোছালো তার বোঝা আরো বেশি, এই যা তফাত। যেখানে একটা দেশের সমস্ত লোকই কম চেঁচায়, কম জিনিস ব্যবহার করে, ব্যবস্থাপূর্বক কাজ করতে যাদের আশ্চর্য দক্ষতা, সমস্ত দেশ জুড়ে তাদের যে কতখানি শক্তি জমে উঠছে তার কি হিসেব আছে।

জাপানিরা যে রাগ করে না তা নয়, কিন্তু সকলের কাছেই একবাক্যে শুনেছি, এরা ঝগড়া করে না। এদের গালাগালির অভিধানে একটিমাত্র কথা আছে—বোকা—তার ঊর্ধ্বে এদের ভাষা পৌঁছয় না! ঘোরতর রাগারাগি মনান্তর হয়ে গেল, পাশের

ঘরে তার টুঁ শব্দ পৌঁছল না, এইটি হচ্ছে জাপানি রীতি। শোকদুঃখ সম্বন্ধেও এই-রকম স্তব্ধতা।

এদের জীবনযাত্রায় এই রিক্ততা, বিরলতা, মিতাচার কেবলমাত্র যদি অভাবাত্মক-হত তা হলে সেটাকে প্রশংসা করবার কোনো হেতু থাকত না। কিন্তু, এই তো দেখছি— এরা ঝগড়া করে না বটে অথচ প্রয়োজনের সময় প্রাণ দিতে, প্রাণ নিতে এরা পিছপাও হয় না। জিনিসপত্রের ব্যবহারে এদের সংযম, কিন্তু জিনিসপত্রের প্রতি প্রভুত্ব এদের তো কম নয়। সকল বিষয়েই এদের যেমন শক্তি তেমনি নৈপুণ্য, তেমনি সৌন্দর্যবোধ।

এ সম্বন্ধে যখন আমি এদের প্রশংসা করেছি, তখন এদের অনেকের কাছেই শুনেছি যে, "এটা আমরা বৌদ্ধধর্মের প্রসাদে পেয়েছি। অর্থাৎ, বৌদ্ধধর্মের একদিকে সংযম আর-একদিকে মৈত্রী, এই যে সামঞ্জস্যের সাধনা আছে এতেই আমরা মিতাচারের দ্বারাই অমিত শক্তির অধিকার পাই। বৌদ্ধধর্ম যে মধ্যপথের ধর্ম।"

শুনে আমার লজ্জা বোধ হয়। বৌদ্ধধর্ম তো আমাদের দেশেও ছিল, কিন্তু আমাদের জীবনযাত্রাকে তো এমন আশ্চর্য ও সুন্দর সামঞ্জস্যে বেঁধে তুলতে পারে নি। আমাদের কল্পনায় ও কাজে এমনতরো প্রভূত আতিশয্য, ঔদাসীন্য, উচ্ছৃঙ্খলতা কোথা থেকে এল।

একদিন জাপানি নাচ দেখে এলুম। মনে হল, এ যেন দেহভঙ্গির সংগীত। এই সংগীত আমাদের দেশের বীণার আলাপ। অর্থাৎ, পদে পদে মীড়। ভঙ্গিবৈচিত্র্যের পরস্পরের মাঝখানে কোনো ফাঁক নেই কিম্বা কোথাও জোড়ের চিহ্ন দেখা যায় না; সমস্ত দেহ পুষ্পিত লতার মতো একসঙ্গে দুলতে দুলতে সৌন্দর্যের পুষ্পবৃষ্টি করছে। খাঁটি য়ুরোপীয় নাচ অর্ধনারীশ্বরের মতো, আধখানা ব্যায়াম, আধখানা নাচ; তার মধ্যে লম্ফঝম্প, ঘুরপাক, আকাশকে লক্ষ্য করে লাথি-ছোঁড়াছুঁড়ি আছে। জাপানি নাচ একেবারে পরিপূর্ণ নাচ। তার সজ্জার মধ্যেও লেশমাত্র উলঙ্গতা নেই। অন্য দেশের নাচে দেহের সৌন্দর্যলীলার সঙ্গে দেহের লালসা মিশ্রিত। এখানে নাচের কোনো ভঙ্গির মধ্যে লালসার ইশারামাত্র দেখা গেল না। আমার কাছে তার প্রধান কারণ এই বোধ হয় যে, সৌন্দর্যপ্রিয়তা জাপানির মনে এমন সত্য যে তার মধ্যে কোনোরকমের মিশল তাদের দরকার হয় না এবং সহ্য হয় না।

কিন্তু, এদের সংগীতটা আমার মনে হল বড়ো বেশি দূর এগোয় নি। বোধ হয় চোখ আর কান, এই দুইয়ের উৎকর্ষ একসঙ্গে ঘটে না। মনের শক্তিস্রোত যদি এর কোনো একটা রাস্তা দিয়ে অত্যন্ত বেশি আনাগোনা করে তা হলে অন্য রাস্তাটায় তার

ধারা অগভীর হয়। ছবি জিনিসটা হচ্ছে অবনীর, গান জিনিসটা গগনের। অসীম যেখানে সীমার মধ্যে সেখানে ছবি; অসীম যেখানে সীমাহীনতায় সেখানে গান। রূপ-রাজ্যের কলা ছবি, অপরূপ রাজ্যের কলা গান। কবিতা উভচর, ছবির মধ্যেও চলে, গানের মধ্যেও ওড়ে। কেননা, কবিতার উপকরণ হচ্ছে ভাষা। ভাষার একটা দিকে অর্থ, আর-একটা দিকে সুর; এই অর্থের যোগে ছবি গড়ে ওঠে, সুরের যোগে গান।

জাপানি রূপরাজ্যের সমস্ত দখল করেছে। যা-কিছু চোখে পড়ে তার কোথাও জাপানির আলস্য নেই, অনাদর নেই; তার সর্বত্রই সে একেবারে পরিপূর্ণতার সাধনা করেছে। অন্য দেশে গুণী এবং রসিকের মধ্যেই রূপরসের যে-বোধ দেখতে পাওয়া যায় এ দেশে সমস্ত জাতের মধ্যে তাই ছড়িয়ে পড়েছে। য়ুরোপে সর্বজনীন বিদ্যা-শিক্ষা আছে, সর্বজনীন সৈনিকতার চর্চাও সেখানে অনেক জায়গায় প্রচলিত, কিন্তু এমনতরো সর্বজনীন রসবোধের সাধনা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এখানে দেশের সমস্ত লোক সুন্দরের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

তাতে কি এরা বিলাসী হয়েছে। অকর্মণ্য হয়েছে? জীবনের কঠিন সমস্যা ভেদ করতে এরা কি উদাসীন কিম্বা অক্ষম হয়েছে।— ঠিক তার উলটো; এরা এই সৌন্দর্যসাধনা থেকেই মিতাচার শিখেছে; এই সৌন্দর্যসাধনা থেকেই এরা বীর্য এবং কর্মনৈপুণ্য লাভ করেছে। আমাদের দেশে একদল লোক আছে তারা মনে করে, শুষ্কতাই বুঝি পৌরুষ, এবং কর্তব্যের পথে চলবার সদুপায় হচ্ছে রসের উপবাস— তারা জগতের আনন্দকে মুড়িয়ে ফেলাকেই জগতের ভালো করা মনে করে।

য়ুরোপে যখন গেছি তখন তাদের কলকারখানা, তাদের কাজের ভিড়, তাদের ঐশ্বর্য এবং প্রতাপ খুব করে চোখে পড়েছে এবং মনকে অভিভূত করেছে। তবু, "এহ বাহ্য"। কিন্তু, জাপানে আধুনিকতার ছদ্মবেশ ভেদ করে যা চোখে পড়ে, সে হচ্ছে মানুষের হৃদয়ের সৃষ্টি। সে অহংকার নয়, আড়ম্বর নয়, সে পূজা। প্রতাপ নিজেকে প্রচার করে; এইজন্যে যতদূর পারে বস্তুর আয়তনকে বাড়িয়ে তুলে আর-সমস্তকে তার কাছে নত করতে চায়। কিন্তু, পূজা আপনার চেয়ে বড়োকে প্রচার করে; এইজন্যে তার আয়োজন সুন্দর এবং খাঁটি, কেবলমাত্র মস্ত এবং অনেক নয়। জাপান আপনার ঘরে বাইরে সর্বত্র সুন্দরের কাছে আপন অর্ঘ্য নিবেদন করে দিচ্ছে। এ দেশে আসবা-মাত্র সকলের চেয়ে বড়ো বাণী যা কানে এসে পৌঁছয় সে হচ্ছে, "আমার ভালো লাগল, আমি ভালোবাসলুম।" এই কথাটি দেশসুদ্ধ সকলের মনে উদয় হওয়া সহজ নয়, এবং সকলের বাণীতে প্রকাশ হওয়া আরো শক্ত। এখানে কিন্তু প্রকাশ হয়েছে।

প্রত্যেক ছোটো জিনিসে, ছোটো ব্যবহারে সেই আনন্দের পরিচয় পাই। সেই আনন্দ ভোগের আনন্দ নয়, পূজার আনন্দ। সুন্দরের প্রতি এমন আন্তরিক সম্ভ্রম অন্য কোথাও দেখি নি। এমন সাবধানে, যত্নে, এমন শুচিতা রক্ষা ক'রে সৌন্দর্যের সঙ্গে ব্যবহার করতে অন্য কোনো জাতি শেখে নি। যা এদের ভালো লাগে তার সামনে এরা শব্দ করে না। সংযমই প্রচুরতার পরিচয় এবং স্তব্ধতাই গভীরতাকে প্রকাশ করে, এরা সেটা অন্তরের ভিতর থেকে বুঝেছে। এবং এরা বলে, সেই আন্তরিক বোধশক্তি এরা বৌদ্ধধর্মের সাধনা থেকে পেয়েছে। এরা স্থির হয়ে শক্তিকে নিরোধ করতে পেরেছে বলেই সেই অক্ষুণ্ণ শক্তি এদের দৃষ্টিকে বিশুদ্ধ এবং বোধকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

পূর্বেই বলেছি, প্রতাপের পরিচয়ে মন অভিভূত হয়, কিন্তু এখানে যে পূজার পরিচয় দেখি তাতে মন অভিভবের অপমান অনুভব করে না। মন আনন্দিত হয়, ঈর্ষান্বিত হয় না। কেননা, পূজা যে আপনার চেয়ে বড়োকে প্রকাশ করে, সেই বড়োর কাছে সকলেই আনন্দমনে নত হতে পারে, মনে কোথাও বাজে না। দিল্লিতে যেখানে প্রাচীন হিন্দুরাজার কীর্তিকলার বুকের মাঝখানে কুতুবমিনার অহংকারের মুষলের মতো খাড়া হয়ে আছে সেখানে সেই ঔদ্ধত্য মানুষের মনকে পীড়া দেয়; কিম্বা কাশীতে যেখানে হিন্দুর পূজাকে অপমানিত করবার জন্যে আরঙজীব মসজিদ স্থাপন করেছে সেখানে না দেখি শ্রীকে, না দেখি কল্যাণকে। কিন্তু, যখন তাজমহলের সামনে গিয়ে দাঁড়াই তখন এ তর্ক মনে আসে না যে, এটা হিন্দুর কীর্তি না মুসলমানের কীর্তি। তখন একে মানুষের কীর্তি বলেই হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করি।

জাপানের যেটা শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সেটা অহংকারের প্রকাশ নয়, আত্মনিবেদনের প্রকাশ, সেইজন্যে এই প্রকাশ মানুষকে আহ্বান করে, আঘাত করে না। এইজন্যে জাপানে যেখানে এই ভাবের বিরোধ দেখি সেখানে মনের মধ্যে বিশেষ পীড়া বোধ করি। চীনের সঙ্গে নৌযুদ্ধে জাপান জয়লাভ করেছিল— সেই জয়ের চিহ্নগুলিকে কাঁটার মতো দেশের চার দিকে পুঁতে রাখা যে বর্বরতা, সেটা যে অসুন্দর, সে-কথা জাপানের বোঝা উচিত ছিল। প্রয়োজনের খাতিরে অনেক ক্রূর কর্ম মানুষকে করতে হয়, কিন্তু সেগুলোকে ভুলতে পারাই মনুষ্যত্ব। মানুষের যা চিরস্মরণীয়, যার জন্যে মানুষ মন্দির করে, মঠ করে, সে তো হিংসা নয়।

আমরা অনেক আচার, অনেক আসবাব য়ুরোপের কাছ থেকে নিয়েছি— সব সময়ে প্রয়োজনের খাতিরে নয়, কেবলমাত্র সেগুলো য়ুরোপীয় বলেই। য়ুরোপের কাছে আমাদের মনের এই যে পরাভব ঘটেছে অভ্যাসবশত সেজন্যে আমরা লজ্জা করতেও

ভুলে গেছি। য়ুরোপের যত বিদ্যা আছে সবই যে আমাদের শেখবার, এ কথা মানি ; কিন্তু যত ব্যবহার আছে সবই যে আমাদের নেবার, এ কথা আমি মানি নে। তবু, যা নেবার যোগ্য জিনিস তা সব দেশ থেকেই নিতে হবে, এ কথা বলতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু সেইজন্যেই, জাপানে যে-সব ভারতবাসী এসেছে তাদের সম্বন্ধে একটা কথা আমি বুঝতে পারি নে। দেখতে পাই, তারা তো য়ুরোপের নানা অনাবশ্যক নানা কুশ্রী জিনিসও নকল করেছে ; কিন্তু তারা কি জাপানের কোনো জিনিসই চোখে দেখতে পায় না। তারা এখান থেকে যে-সব বিদ্যা শেখে সেও য়ুরোপের বিদ্যা, এবং যাদের কিছুমাত্র আর্থিক বা অন্য-রকম সুবিধা আছে তারা কোনোমতে এখান থেকে আমেরিকায় দৌড় দিতে চায়। কিন্তু যে-সব বিদ্যা এবং আচার ও আসবাব জাপানের সম্পূর্ণ নিজের, তার মধ্যে কি আমরা গ্রহণ করবার জিনিস কিছুই দেখি নে।

আমি নিজের কথা বলতে পারি, আমাদের জীবনযাত্রার উপযোগী জিনিস আমরা এখান থেকে যত নিতে পারি এমন য়ুরোপ থেকে নয়। তা ছাড়া জীবনযাত্রার রীতি যদি আমরা অসংকোচে জাপানের কাছ থেকে শিখে নিতে পারতুম, তা হলে আমাদের ঘরদুয়ার এবং ব্যবহার শুচি হত, সুন্দর হত, সংযত হত। জাপান ভারতবর্ষ থেকে যা পেয়েছে তাতে আজ ভারতবর্ষকে লজ্জা দিচ্ছে ; কিন্তু দুঃখ এই যে, সেই লজ্জা অনুভব করবার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের যত লজ্জা সমস্ত কেবল য়ুরোপের কাছে ; তাই য়ুরোপের ছেঁড়া কাপড় কুড়িয়ে কুড়িয়ে তালি-দেওয়া অদ্ভুত আবরণে আমরা লজ্জা রক্ষা করতে চাই। এদিকে জাপানপ্রবাসী ভারতবাসীরা বলে, জাপান আমাদের এসিয়াবাসী ব'লে অবজ্ঞা করে ; অথচ আমরাও জাপানকে এমনি অবজ্ঞা করি যে, তার আতিথ্য গ্রহণ করেও প্রকৃত জাপানকে চক্ষেও দেখি নে ; জাপানের ভিতর দিয়ে বিকৃত য়ুরোপকেই কেবল দেখি। জাপানকে যদি দেখতে পেতুম তা হলে আমাদের ঘর থেকে অনেক কুশ্রীতা, অশুচিতা, অব্যবস্থা, অসংযম আজ দূরে চলে যেত।

বাংলাদেশে আজ শিল্পকলার নূতন অভ্যুদয় হয়েছে, আমি সেই শিল্পীদের জাপানে আহ্বান করছি। নকল করবার জন্যে নয়, শিক্ষা করবার জন্যে। শিল্প জিনিসটা যে কত বড়ো জিনিস, সমস্ত জাতির সেটা যে কত বড়ো সম্পদ, কেবলমাত্র শৌখিনতাকে সে যে কতদূর পর্যন্ত ছাড়িয়ে গেছে— তার মধ্যে জ্ঞানীর জ্ঞান, ভক্তের ভক্তি, রসিকের রসবোধ যে কত গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছে, তা এখানে এলে তবে স্পষ্ট বোঝা যায়।

টোকিওতে আমি যে-শিল্পীবন্ধুর বাড়িতে ছিলুম সেই টাইকানের নাম পূর্বেই বলেছি ; ছেলেমানুষের মতো তাঁর সরলতা, তাঁর হাসি তাঁর চারি দিককে হাসিয়ে রেখে

দিয়েছে। প্রসন্ন তাঁর মুখ, উদার তাঁর হৃদয়, মধুর তাঁর স্বভাব। যতদিন তাঁর বাড়িতে ছিলুম, আমি জানতেই পারি নি তিনি কত বড়ো শিল্পী। ইতিমধ্যে য়োকোহামায় একজন ধনী এবং রসজ্ঞ ব্যক্তির আমরা আতিথ্য লাভ করেছি। তাঁর এই বাগানটি নন্দনবনের মতো এবং তিনিও সকল বিষয়ে এখানকারই যোগ্য। তাঁর নাম হারা। তাঁর কাছে শুনলুম, য়োকোয়ামা টাইকান এবং তানজান শিমোমুরা আধুনিক জাপানের দুই সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী। তাঁরা আধুনিক য়ুরোপের নকল করেন না, প্রাচীন জাপানেরও না। তাঁরা প্রথার বন্ধন থেকে জাপানের শিল্পকে মুক্তি দিয়েছেন। হারার বাড়িতে টাইকানের ছবি যখন প্রথম দেখলুম, আশ্চর্য হয়ে গেলুম। তাতে না আছে বাহুল্য, না আছে শৌখিনতা। তাতে যেমন একটা জোর আছে তেমনি সংযম। বিষয়টা এই— চীনের একজন প্রাচীন কালের কবি ভাবে ভোর হয়ে চলেছে; তার পিছনে একজন বালক একটি বীণাযন্ত্র বহু যত্নে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে, তাতে তার নেই; তার পিছনে একটি বাঁকা উইলো গাছ। জাপানে তিনভাগওয়ালা যে খাড়া পর্দার প্রচলন আছে সেই রেশমের পর্দার উপর আঁকা; মস্ত পর্দা এবং প্রকাণ্ড ছবি। প্রত্যেক রেখা প্রাণে ভরা। এর মধ্যে ছোটোখাটো কিম্বা জবড়জঙ্গ কিছুই নেই; যেমন উদার তেমনি গভীর, তেমনি আয়াসহীন। নৈপুণ্যের কথা একেবারে মনেই হয় না; নানা রঙ নানা রেখার সমাবেশ নেই; দেখবামাত্র মনে হয় খুব বড়ো এবং খুব সত্য। তার পরে তাঁর ভূদৃশ্যচিত্র দেখলুম। একটি ছবি— পটের উচ্চপ্রান্তে একখানি পূর্ণ চাঁদ, মাঝখানে একটি নৌকা, নীচের প্রান্তে দুটো দেওদার গাছের ডাল দেখা যাচ্ছে; আর কিছু না, জলের কোনো রেখা পর্যন্ত নেই। জ্যোৎস্নার আলোয় স্থির জল কেবলমাত্র বিস্তীর্ণ শুভ্রতা— এটা যে জল সে কেবলমাত্র ওই নৌকো আছে বলেই বোঝা যাচ্ছে; আর, এই সর্বব্যাপী বিপুল জ্যোৎস্নাকে ফলিয়ে তোলবার জন্যে যত কিছু কালিমা সে কেবলই ওই দুটো পাইন গাছের ডালে। ওস্তাদ এমন একটা জিনিসকে আঁকতে চেয়েছেন যার রূপ নেই, যা বৃহৎ এবং নিস্তব্ধ— জ্যোৎস্নারাত্রি— অতলস্পর্শ তার নিঃশব্দতা। কিন্তু, আমি যদি তাঁর সব ছবির বিস্তারিত বর্ণনা করতে যাই তা হলে আমার কাগজও ফুরোবে, সময়েও কুলোবে না। হারা সান সবশেষে নিয়ে গেলেন একটি লম্বা সংকীর্ণ ঘরে সেখানে এক-দিকের প্রায় সমস্ত দেয়াল জুড়ে একটি খাড়া পর্দা দাঁড়িয়ে। এই পর্দায় শিমোমুরার আঁকা একটি প্রকাণ্ড ছবি। শীতের পরে প্রথম বসন্ত এসেছে; প্লাম গাছের ডালে একটাও পাতা নেই, সাদা সাদা ফুল ধরেছে, ফুলের পাপড়ি ঝরে ঝরে পড়ছে; বৃহৎ পর্দার এক প্রান্তে দিগন্তের কাছে রক্তবর্ণ সূর্য দেখা দিয়েছে, পর্দার অপর প্রান্তে প্লাম গাছের রিক্ত

ডালের আড়ালে দেখা যাচ্ছে একটি অন্ধ হাতজোড় করে সূর্যের বন্দনায় রত। একটি অন্ধ, এক গাছ, এক সূর্য, আর সোনায়-ঢালা এক সুবৃহৎ আকাশ; এমন ছবি আমি কখনো দেখি নি। উপনিষদের সেই প্রার্থনাবাণী যেন রূপ ধরে আমার কাছে দেখা দিলে— তমসো মা জ্যোতির্গময়। কেবল অন্ধ মানুষের নয় অন্ধ প্রকৃতির এই প্রার্থনা, তমসো মা জ্যোতির্গময়— সেই প্লাম গাছের একাগ্র প্রসারিত শাখাপ্রশাখার ভিতর দিয়ে জ্যোতির্লোকের দিকে উঠছে। অথচ, আলোয় আলোময়— তারি মাঝখানে অন্ধের প্রার্থনা।

কাল শিমোমুরার আর-একটা ছবি দেখলুম। পটের আয়তন তো ছোটো, অথচ ছবির বিষয় বিচিত্র। সাধক তার ঘরের মধ্যে বসে ধ্যান করছে; তার সমস্ত রিপুগুলি তাকে চারি দিকে আক্রমণ করেছে। অর্ধেক মানুষ অর্ধেক জন্তুর মতো তাদের আকার, অত্যন্ত কুৎসিত, তাদের কেউ বা খুব সমারোহ করে আসছে, কেউ বা আড়ালে আবডালে উঁকিঝুঁকি মারছে। কিন্তু, তবু এরা সবাই বাইরেই আছে; ঘরের ভিতরে তার সামনে সকলের চেয়ে তার বড়ো রিপু বসে আছে; তার মূর্তি ঠিক বুদ্ধের মতো। কিন্তু, লক্ষ্য করে দেখলেই দেখা যায়, সে সাঁচ্চা বুদ্ধ নয়— স্থূল তার দেহ, মুখে তার বাঁকা হাসি। সে কপট আত্মম্ভরিতা, পবিত্র রূপ ধরে এই সাধককে বঞ্চিত করছে। এ হচ্ছে আধ্যাত্মিক অহমিকা, শুচি এবং সুগম্ভীর মুক্তস্বরূপ বুদ্ধের ছদ্মবেশ ধরে আছে; একেই চেনা শক্ত, এই হচ্ছে অন্তরতম রিপু, অন্য কদর্য রিপুরা বাইরের। এইখানে দেবতাকে উপলক্ষ করে মানুষ আপনার প্রবৃত্তিকে পূজা করছে।

আমরা যাঁর আশ্রয়ে আছি, সেই হারা সান গুণী এবং গুণজ্ঞ। তিনি রসে হাস্যে ঔদার্যে পরিপূর্ণ। সমুদ্রের ধারে, পাহাড়ের গায়ে, তাঁর এই পরম সুন্দর বাগানটি সর্বসাধারণের জন্যে নিত্যই উদ্‌ঘাটিত। মাঝে মাঝে বিশ্রামগৃহ আছে; যে-খুশি সেখানে এসে চা খেতে পারে। একটা খুব লম্বা ঘর আছে, সেখানে যারা বনভোজন করতে চায় তাদের জন্যে ব্যবস্থা আছে। হারা সানের মধ্যে কৃপণতাও নেই, আড়ম্বরও নেই, অথচ তাঁর চার দিকে সমারোহ আছে। মূঢ় ধনাভিমানীর মতো তিনি মূল্যবান জিনিসকে কেবলমাত্র সংগ্রহ করে রাখেন না; তার মূল্য তিনি বোঝেন, তার মূল্য তিনি দেন, এবং তার কাছে তিনি সম্ভ্রমে আপনাকে নত করতে জানেন।

১৫

এশিয়ার মধ্যে জাপানই এই কথাটি একদিন হঠাৎ অনুভব করলে যে, য়ুরোপ যে-শক্তিতে পৃথিবীতে সর্বজয়ী হয়ে উঠেছে একমাত্র সেই শক্তির দ্বারাই তাকে ঠেকানো

যায়। নইলে তার চাকার নীচে পড়তেই হবে এবং একবার পড়লে কোনোকালে আর ওঠবার উপায় থাকবে না।

এই কথাটি যেমনি তার মাথায় ঢুকল অমনি সে আর এক মুহূর্ত দেরি করলে না। কয়েক বৎসরের মধ্যেই য়ুরোপের শক্তিকে আত্মসাৎ করে নিলে। য়ুরোপের কামান বন্দুক, কুচ-কাওয়াজ, কল-কারখানা, আপিস-আদালত, আইন-কানুন যেন কোন্ আলাদিনের প্রদীপের জাদুতে পশ্চিমলোক থেকে পূর্বলোকে একেবারে আস্ত উপড়ে এনে বসিয়ে দিলে। নতুন শিক্ষাকে ক্রমে ক্রমে সইয়ে নেওয়া, বাড়িয়ে তোলা নয়; তাকে ছেলের মতো শৈশব থেকে যৌবনে মানুষ করে তোলা নয়— তাকে জামাইয়ের মতো একোবারে পূর্ণ যৌবনে ঘরের মধ্যে বরণ করে নেওয়া। বৃদ্ধ বনস্পতিকে এক জায়গা থেকে তুলে আর-এক জায়গায় রোপণ করবার বিদ্যা জাপানের মালীরা জানে; য়ুরোপের শিক্ষাকেও তারা তেমনি করেই তার সমস্ত জটিল শিকড় এবং বিপুল ডালপালা সমেত নিজের দেশের মাটিতে এক রাত্রির মধ্যেই খাড়া করে দিলে। শুধু যে তার পাতা ঝরে পড়ল না তা নয়, পরদিন থেকেই তার ফল ধরতে লাগল। প্রথম কিছুদিন ওরা য়ুরোপ থেকে শিক্ষকের দল ভাড়া করে এনেছিল। অতি অল্পকালের মধ্যেই তাদের প্রায় সমস্ত সরিয়ে দিয়ে, হালে এবং দাঁড়ে নিজেরাই বসে গেছে— কেবল পালটা এমন আড় ক'রে ধরেছে যাতে পশ্চিমের হাওয়াটা তার উপরে পুরো এসে লাগে।

ইতিহাসে এতবড়ো আশ্চর্য ঘটনা আর কখনো হয় নি। কারণ, ইতিহাস তো যাত্রার পালা গান করা নয় যে, ষোলো বছরের ছোকরাকে পাকা গোঁপদাড়ি পরিয়ে দিলেই সেই মুহূর্তে তাকে নারদমুনি করে তোলা যেতে পারে। শুধু য়ুরোপের অস্ত্র ধার করলেই যদি য়ুরোপ হওয়া যেত, তা হলে আফগানিস্থানেরও ভাবনা ছিল না। কিন্তু, য়ুরোপের আসবাবগুলো ঠিকমতো ব্যবহার করবার মতো মনোবৃত্তি জাপান এক নিমেষেই কেমন করে গড়ে তুললে, সেইটেই বোঝা শক্ত।

সুতরাং এ-কথা মানতেই হবে, এ জিনিস তাকে গোড়া থেকে গড়তে হয় নি, ওটা তার একরকম গড়াই ছিল। সেইজন্যেই যেমনি তার চৈতন্য হল অমনি তার প্রস্তুত হতে বিলম্ব হল না। তার যা-কিছু বাধা ছিল সেটা বাইরের; অর্থাৎ, একটা নতুন জিনিসকে বুঝে পড়ে আয়ত্ত করে নিতে যেটুকু বাধা সেইটুকু মাত্র; তার নিজের অন্তরে কোনো বিরোধের বাধা ছিল না।

পৃথিবীতে মোটামুটি দুরকম জাতের মন আছে— এক স্থাবর, আর-এক জঙ্গম। এই মানসিক স্থাবর-জঙ্গমতার মধ্যে একটা ঐকান্তিক ভেদ আছে, এমন কথা বলতে

চাই নে। স্থাবরকেও দায়ে পড়ে চলতে হয়, জঙ্গমকেও দায়ে পড়ে দাঁড়াতে হয়। কিন্তু স্থাবরের লয় বিলম্বিত, আর জঙ্গমের লয় দ্রুত।

জাপানের মনটাই ছিল স্বভাবত জঙ্গম; লম্বা লম্বা দশকুশি তালের গাম্ভারি চাল তার নয়। এইজন্যে সে এক দৌড়ে দু-তিন শো বছর হু হু করে পেরিয়ে গেল। আমাদের মতো যারা দুর্ভাগ্যের বোঝা নিয়ে হাজার বছর পথের ধারে বটতলায় শুয়ে গড়িয়ে কাটিয়ে দিচ্ছে, তারা অভিমান করে বলে, "ওরা ভারি হালকা, আমাদের মতো গাম্ভীর্য থাকলে ওরা এমন বিশ্রীরকম দৌড়ধাপ করতে পারত না। সাঁচ্চা জিনিস কখনো এত শীঘ্র গড়ে উঠতে পারে না।"

আমরা যাই বলি-না কেন, চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, এশিয়ার এই প্রান্তবাসী জাত য়ুরোপীয় সভ্যতার সমস্ত জটিল ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ জোরের সঙ্গে এবং নৈপুণ্যের সঙ্গে ব্যবহার করতে পারছে। এর একমাত্র কারণ, এরা যে কেবল ব্যবস্থা-টাকেই নিয়েছে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে মনটাকেও পেয়েছে। নইলে পদে পদে অস্ত্রের সঙ্গে অস্ত্রীর বিষম ঠোকাঠুকি বেধে যেত; নইলে ওদের শিক্ষার সঙ্গে দীক্ষার লড়াই কিছুতেই মিটত না, এবং বর্ম ওদের দেহটাকে পিষে দিত।

মনের যে-জঙ্গমতার জোরে ওরা আধুনিক কালের প্রবল প্রবাহের সঙ্গে নিজের গতিকে এত সহজে মিলিয়ে দিতে পেরেছে সেটা জাপানি পেয়েছে কোথা থেকে।

জাপানিদের মধ্যে একটা প্রবাদ আছে যে, ওরা মিশ্র জাতি। ওরা একেবারে খাস মঙ্গোলীয় নয়। এমন-কি, ওদের বিশ্বাস ওদের সঙ্গে আর্যরক্তেরও মিশ্রণ ঘটেছে। জাপানিদের মধ্যে মঙ্গোলীয় এবং ভারতীয় দুই ছাঁদেরই মুখ দেখতে পাই, এবং ওদের মধ্যে বর্ণেরও বৈচিত্র্য যথেষ্ট আছে। আমার চিত্রকর বন্ধু টাইক্কানকে বাঙালি কাপড় পরিয়ে দিলে, তাঁকে কেউ জাপানি বলে সন্দেহ করবে না। এমন আরো অনেককে দেখেছি।

যে-জাতির মধ্যে বর্ণসংকরতা খুব বেশি ঘটেছে তার মনটা এক ছাঁচে ঢালাই হয়ে যায় না। প্রকৃতিবৈচিত্র্যের সংঘাতে তার মনটা চলনশীল হয়ে থাকে। এই চলনশীলতায় মানুষকে অগ্রসর করে, এ কথা বলাই বাহুল্য।

রক্তের অবিমিশ্রতা কোথাও যদি দেখতে চাই, তা হলে বর্বর জাতির মধ্যে যেতে হয়। তারা পরকে ভয় করেছে, তারা অল্পপরিসর আশ্রয়ের মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে নিজের জাতকে স্বতন্ত্র রেখেছে। তাই, আদিম অস্ট্রেলিয় জাতির আদিমতা আর ঘুচল না; আফ্রিকার মধ্যদেশে কালের গতি বন্ধ বললেই হয়।

কিন্তু, গ্রীস পৃথিবীর এমন একটা জায়গায় ছিল যেখানে একদিকে এশিয়া, একদিকে

ইজিপ্ট, একদিকে য়ুরোপের মহাদেশ তার সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে তাকে আলোড়িত করেছে। গ্রীকেরা অবিমিশ্র জাতি ছিল না, রোমকেরাও না। ভারতবর্ষেও অনার্যে আর্যে যে মিশ্রণ ঘটেছিল সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই।

জাপানিকেও দেখলে মনে হয়, তারা এক ধাতুতে গড়া নয়। পৃথিবীর অধিকাংশ জাতিই মিথ্যা করেও আপনার রক্তের অবিমিশ্রতা নিয়ে গর্ব করে; জাপানের মনে এই অভিমান কিছুমাত্র নেই। জাপানিদের সঙ্গে ভারতীয় জাতির মিশ্রণ হয়েছে, এ কথার আলোচনা তাদের কাগজে দেখেছি এবং তা নিয়ে কোনো পাঠক কিছুমাত্র বিচলিত হয় নি। শুধু তাই নয়, চিত্রকলা প্রভৃতি সম্বন্ধে ভারতবর্ষের কাছে তারা যে ঋণী সে কথা আমরা একেবারেই ভুলে গেছি, কিন্তু জাপানিরা এই ঋণ স্বীকার করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না।

বস্তুত, ঋণ তারাই গোপন করতে চেষ্টা করে— ঋণ যাদের হাতে ঋণই রয়ে গেছে, ধন হয়ে ওঠে নি। ভারতের কাছ থেকে জাপান যদি কিছু নিয়ে থাকে সেটা সম্পূর্ণ তার আপন সম্পত্তি হয়েছে। যে-জাতির মনের মধ্যে চলন-ধর্ম প্রবল সেই জাতিই পরের সম্পদকে নিজের সম্পদ করে নিতে পারে। যার মন স্থাবর বাইরের জিনিস তার পক্ষে বিষম ভার হয়ে ওঠে; কারণ, তার নিজের অচল অস্তিত্বই তার পক্ষে প্রকাণ্ড একটা বোঝা।

কেবলমাত্র জাতিসংকরতা নয়, স্থানসংকীর্ণতা জাপানের পক্ষে একটা মস্ত সুবিধা হয়েছে। ছোটো জায়গাটি সমস্ত জাতির মিলনের পক্ষে পুটপাকের কাজ করেছে। বিচিত্র উপকরণ ভালোরকম করে গলে মিশে বেশ নিবিড় হয়ে উঠেছে। চীন বা ভারতবর্ষের মতো বিস্তীর্ণ জায়গায় বৈচিত্র্য কেবল বিভক্ত হয়ে উঠতে চেষ্টা করে, সংহত হতে চায় না।

প্রাচীনকালে গ্রীস রোম এবং আধুনিক কালে ইংলণ্ড সংকীর্ণ স্থানের মধ্যে সম্মিলিত হয়ে বিস্তীর্ণ স্থানকে অধিকার করতে পেরেছে। আজকের দিনে এশিয়ার মধ্যে জাপানের সেই সুবিধা। একদিকে তার মানসপ্রকৃতির মধ্যে চিরকালই চলন-ধর্ম আছে, যে জন্য চীন কোরিয়া প্রভৃতি প্রতিবেশীর কাছ থেকে জাপান তার সভ্যতার সমস্ত উপকরণ অনায়াসে আত্মসাৎ করতে পেরেছে; আর-একদিকে অল্পপরিসর জায়গায় সমস্ত জাতি অতি সহজেই এক ভাবে ভাবিত, এক প্রাণে অনুপ্রাণিত হতে পেরেছে। তাই যে-মুহূর্তে জাপানের মস্তিষ্কের মধ্যে এই চিন্তা স্থান পেলে যে আত্মরক্ষার জন্যে য়ুরোপের কাছ থেকে তাকে দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে সেই মুহূর্তে জাপানের সমস্ত কলেবরের মধ্যে অনুকূল চেষ্টা জাগ্রত হয়ে উঠল।

য়ুরোপের সভ্যতা একান্তভাবে জঙ্গম মনের সভ্যতা, তা স্থাবর মনের সভ্যতা নয়। এই সভ্যতা ক্রমাগতই নূতন চিন্তা, নূতন চেষ্টা, নূতন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে বিপ্লব-তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায় পক্ষবিস্তার করে উড়ে চলেছে। এশিয়ার মধ্যে একমাত্র জাপানের মনে সেই স্বাভাবিক চলনধর্ম থাকাতেই জাপান সহজেই য়ুরোপের ক্ষিপ্রতালে চলতে পেরেছে এবং তাতে করে তাকে প্রলয়ের আঘাত সইতে হয় নি। কারণ, উপকরণ সে যা-কিছু পাচ্ছে তার দ্বারা সে সৃষ্টি করছে; সুতরাং নিজের বর্ধিষ্ণু জীবনের সঙ্গে এ-সমস্তকে সে মিলিয়ে নিতে পারছে। এই সমস্ত নতুন জিনিস যে তার মধ্যে কোথাও কিছু বাধা পাচ্ছে না, তা নয়, কিন্তু সচলতার বেগেই সেই বাধা ক্ষয় হয়ে চলেছে। প্রথম প্রথম যা অসংগত অদ্ভুত হয়ে দেখা দিচ্ছে ক্রমে ক্রমে তার পরিবর্তন ঘটে সুসংগতি জেগে উঠছে। একদিন যে-অনাবশ্যককে সে গ্রহণ করেছে আর-একদিন সেটাকে ত্যাগ করছে; একদিন যে আপন জিনিসকে পরের হাটে সে খুইয়েছে আর-একদিন সেটাকে আবার ফিরে নিচ্ছে। এই তার সংশোধনের প্রক্রিয়া এখনো নিত্য তার মধ্যে চলছে। যে-বিকৃতি মৃত্যুর তাকেই ভয় করতে হয়; যে-বিকৃতি প্রাণের লীলাবৈচিত্র্যে হঠাৎ এক-এক সময়ে দেখা দেয় প্রাণ আপনি তাকে সামলে নিয়ে নিজের সমে এসে দাঁড়াতে পারে।

আমি যখন জাপানে ছিলুম তখন একটা কথা বারবার আমার মনে এসেছে। আমি অনুভব করছিলুম, ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙালির সঙ্গে জাপানির এক জায়গায় যেন মিল আছে। আমাদের এই বৃহৎ দেশের মধ্যে বাঙালিই সব প্রথমে নূতনকে গ্রহণ করেছে, এবং এখনো নূতনকে গ্রহণ ও উদ্ভাবন করবার মতো তার চিত্তের নমনীয়তা আছে।

তার একটা কারণ, বাঙালির মধ্যে রক্তের অনেক মিশল ঘটেছে; এমন মিশ্রণ ভারতের আর কোথাও হয়েছে কিনা সন্দেহ। তার পরে, বাঙালি ভারতের যে প্রান্তে বাস করে সেখানে বহুকাল ভারতের অন্য প্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। বাংলা ছিল পাণ্ডববর্জিত দেশ। বাংলা একদিন দীর্ঘকাল বৌদ্ধপ্রভাবে অথবা অন্য যে কারণেই হোক আচারভ্রষ্ট হয়ে নিতান্ত একঘরে হয়েছিল, তাতে করে তার একটা সংকীর্ণ স্বাতন্ত্র্য ঘটেছিল; এই কারণেই বাঙালির চিত্ত অপেক্ষাকৃত বন্ধনমুক্ত, এবং নূতন শিক্ষা গ্রহণ করা বাঙালির পক্ষে যত সহজ হয়েছিল এমন ভারতবর্ষের অন্য কোনো দেশের পক্ষে হয় নি। য়ুরোপীয় সভ্যতার পূর্ণ দীক্ষা জাপানের মতো আমাদের পক্ষে অবাধ নয়; পরের কৃপণ হস্ত থেকে আমরা যেটুকু পাই তার বেশি আমাদের পক্ষে দুর্লভ। কিন্তু, য়ুরোপীয় শিক্ষা আমাদের দেশে যদি সম্পূর্ণ সুগম হত তা হলে কোনো

সন্দেহ নেই, বাঙালি সকল দিক থেকেই তা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করত। আজ নানা দিক থেকে বিদ্যাশিক্ষা আমাদের পক্ষে ক্রমশই দুর্মূল্য হয়ে উঠছে, তবু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকীর্ণ প্রবেশদ্বারে বাঙালির ছেলে প্রতিদিন মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করে মরছে। বস্তুত, ভারতের অন্য সকল প্রদেশের চেয়ে বাংলাদেশে যে-একটা অসন্তোষের লক্ষণ অত্যন্ত প্রবল দেখা যায় তার একমাত্র কারণ, আমাদের প্রতিহত গতি। যা কিছু ইংরেজি তার দিকে বাঙালির উদ্‌বোধিত চিত্ত একান্ত প্রবলবেগে ছুটেছিল; ইংরেজের অত্যন্ত কাছে যাবার জন্যে আমরা প্রস্তুত হয়েছিলুম— এ সম্বন্ধে সকলরকম সংস্কারের বাধা লঙ্ঘন করবার জন্যে বাঙালিই সর্বপ্রথমে উদ্যত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু, এইখানে ইংরেজের কাছেই যখন বাধা পেল তখন বাঙালির মনে যে প্রচণ্ড অভিমান জেগে উঠল সেটা হচ্ছে তার অনুরাগেরই বিকার।

এই অভিমানই আজ নবযুগের শিক্ষাকে গ্রহণ করবার পক্ষে বাঙালির মনে সকলের চেয়ে বড়ো অন্তরায় হয়ে উঠেছে। আজ আমরা যে-সকল কূটতর্ক ও মিথ্যা যুক্তি দ্বারা পশ্চিমের প্রভাবকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করবার চেষ্টা করছি সেটা আমাদের স্বাভাবিক নয়। এইজন্যেই সেটা এমন সুতীব্র, সেটা ব্যাধির প্রকোপের মতো পীড়ার দ্বারা এমন করে আমাদের সচেতন করে তুলেছে।

বাঙালির মনের এই প্রবল বিরোধের মধ্যেও তার চলনধর্মই প্রকাশ পায়। কিন্তু, বিরোধ কখনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। বিরোধে দৃষ্টি কলুষিত ও শক্তি বিকৃত হয়ে যায়। যত বড়ো বেদনাই আমাদের মনে থাক্‌, এ কথা আমাদের ভুললে চলবে না যে, পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনের সিংহদ্বার উদ্‌ঘাটনের ভার বাঙালির উপরেই পড়েছে। এইজন্যেই বাংলার নবযুগের প্রথম পথপ্রবর্তক রামমোহন রায়। পশ্চিমকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে তিনি ভীরুতা করেন নি, কেননা, পূর্বের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অটল ছিল। তিনি যে-পশ্চিমকে দেখতে পেয়েছিলেন সে তো শস্ত্রধারী পশ্চিম নয়, বাণিজ্যজীবী পশ্চিম নয়, সে হচ্ছে জ্ঞানে-প্রাণে-উদ্ভাসিত পশ্চিম।

জাপান য়ুরোপের কাছ থেকে কর্মের দীক্ষা আর অস্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করেছে। তার কাছ থেকে বিজ্ঞানের শিক্ষাও সে লাভ করতে বসেছে। কিন্তু, আমি যতটা দেখেছি তাতে আমার মনে হয়, য়ুরোপের সঙ্গে জাপানের একটা অন্তরতর জায়গায় অনৈক্য আছে। যে গূঢ় ভিত্তির উপরে য়ুরোপের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত সেটা আধ্যাত্মিক। সেটা কেবলমাত্র কর্মনৈপুণ্য নয়, সেটা তার নৈতিক আদর্শ। এইখানে জাপানের সঙ্গে য়ুরোপের মূলগত প্রভেদ। মনুষ্যত্বের যে-সাধনা অমৃতলোককে মানে এবং সেই অভিমুখে চলতে থাকে, যে-সাধনা কেবলমাত্র সামাজিক ব্যবস্থার অঙ্গ নয়, যে-সাধনা

সাংসারিক প্রয়োজন বা স্বজাতিগত স্বার্থকেও অতিক্রম ক'রে আপনার লক্ষ্য স্থাপন করেছে, সেই সাধনার ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে য়ুরোপের মিল যত সহজ জাপানের সঙ্গে তার মিল তত সহজ নয়। জাপানি সভ্যতার সৌধ এক-মহলা— সেই হচ্ছে তার সমস্ত শক্তি এবং দক্ষতার নিকেতন। সেখানকার ভাণ্ডারে সব-চেয়ে বড়ো জিনিস যা সঞ্চিত হয় সে হচ্ছে কৃতকর্মতা ; সেখানকার মন্দিরে সব-চেয়ে বড়ো দেবতা স্বাদেশিক স্বার্থ। জাপান তাই সমস্ত য়ুরোপের মধ্যে সহজেই আধুনিক জর্মনির শক্তি-উপাসক নবীন দার্শনিকদের কাছ থেকে মন্ত্র গ্রহণ করতে পেরেছে ; নীট্‌ঝের গ্রন্থ তাদের কাছে সব-চেয়ে সমাদৃত। তাই আজ পর্যন্ত জাপান ভালো করে স্থির করতেই পারলে না— কোনো ধর্মে তার প্রয়োজন আছে কিনা, এবং ধর্মটা কী। কিছুদিন এমনও তার সংকল্প ছিল যে, সে খৃস্টানধর্ম গ্রহণ করবে। তখন তার বিশ্বাস ছিল যে, য়ুরোপ যে ধর্মকে আশ্রয় করেছে সেই ধর্ম হয়তো তাকে শক্তি দিয়েছে, অতএব খৃস্টানিকে কামান-বন্দুকের সঙ্গে সঙ্গেই সংগ্রহ করা দরকার হবে। কিন্তু, আধুনিক য়ুরোপে শক্তি-উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে কিছুকাল থেকে এই কথাটা ছড়িয়ে পড়েছে যে, খৃস্টানধর্ম স্বভাব-দুর্বলের ধর্ম, তা বীরের ধর্ম নয়। য়ুরোপ বলতে শুরু করেছিল, যে-মানুষ ক্ষীণ তারই স্বার্থ নম্রতা ক্ষমা ও ত্যাগধর্ম প্রচার করা। সংসারে যারা পরাজিত সে-ধর্মে তাদেরই সুবিধা ; সংসারে যারা জয়শীল সে-ধর্মে তাদের বাধা। এই কথাটা জাপানের মনে সহজেই লেগেছে। এইজন্যে জাপানের রাজশক্তি আজ মানুষের ধর্মবুদ্ধিকে অবজ্ঞা করছে। এই অবজ্ঞা আর-কোনো দেশে চলতে পারত না ; কিন্তু জাপানে চলতে পারছে তার কারণ জাপানে এই বোধের বিকাশ ছিল না এবং সেই বোধের অভাব নিয়েই জাপান আজ গর্ব বোধ করছে— সে জানছে, পরকালের দাবি থেকে সে মুক্ত, এইজন্যই ইহকালে সে জয়ী হবে।

জাপানের কর্তৃপক্ষেরা যে ধর্মকে বিশেষরূপে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন সে হচ্ছে শিন্তো ধর্ম। তার কারণ, এই ধর্ম কেবলমাত্র সংস্কারমূলক, আধ্যাত্মিকতামূলক নয়। এই ধর্ম রাজাকে এবং পূর্বপুরুষদের দেবতা ব'লে মানে। সুতরাং স্বদেশাসক্তিকে সুতীব্র করে তোলবার উপায়-রূপে এই সংস্কারকে ব্যবহার করা যেতে পারে।

কিন্তু, য়ুরোপীয় সভ্যতা মঙ্গোলীয় সভ্যতার মতো এক-মহলা নয়। তার একটি অন্তরমহল আছে। সে অনেক দিন থেকেই কিংডম্‌ অব্‌ হেভ্‌নকে স্বীকার করে আসছে। সেখানে নম্র যে সে জয়ী হয় ; পর যে সে আপনার চেয়ে বেশি হয়ে ওঠে। কৃতকর্মতা নয়, পরমার্থই সেখানে চরম সম্পদ। অনন্তের ক্ষেত্রে সংসার সেখানে আপনার সত্য মূল্য লাভ করে।

য়ুরোপীয় সভ্যতার এই অন্তরমহলের দ্বার কখনো কখনো বন্ধ হয়ে যায়, কখনো কখনো সেখানকার দীপ জ্বলে না। তা হোক, কিন্তু এ মহলের পাকা ভিত ; বাইরের কামান গোলা এর দেয়াল ভাঙতে পারবে না ; শেষ পর্যন্তই এ টি঻কে থাকবে এবং এইখানেই সভ্যতার সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে।

আমাদের সঙ্গে য়ুরোপের আর-কোথাও যদি মিল না থাকে, এই বড়ো জায়গায় মিল আছে। আমরা অন্তরতর মানুষকে মানি— তাকে বাইরের মানুষের চেয়ে বেশি মানি। যে জন্ম মানুষের দ্বিতীয় জন্ম, তার মুক্তির জন্ম, তার জন্যে আমরা বেদনা অনুভব করি। এই জায়গায়, মানুষের এই অন্তরমহলে য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের যাতায়াতের একটা পথচিহ্ন দেখতে পাই। এই অন্তরমহলে মানুষের যে-মিলন সেই মিলনই সত্য মিলন। এই মিলনের দ্বার উদ্‌ঘাটন করবার কাজে বাঙালির আহ্বান আছে, তার অনেক চিহ্ন অনেকদিন থেকেই দেখা যাচ্ছে।

যাত্রী

পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি

১৭॥২৪

পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি

হারুনা-মারু জাহাজ

২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪

সকাল আটটা। আকাশে ঘন মেঘ, দিগন্ত বৃষ্টিতে ঝাপসা, বাদলার হাওয়া খুঁতখুঁতে ছেলের মতো কিছুতেই শান্ত হতে চাচ্ছে না। বন্দরের শানবাঁধানো বাঁধের ওপারে দুরন্ত সমুদ্র লাফিয়ে লাফিয়ে গর্জে উঠছে, কাকে যেন ঝুঁটি ধরে পেড়ে ফেলতে চায়, নাগাল পায় না। স্বপ্নের আক্রোশে সমস্ত মনটা যেমন বুকের কাছে গুমরে ঠেলে ঠেলে উঠতে থাকে, আর রুদ্ধকণ্ঠের বদ্ধবাণী কান্না হয়ে হা হা করে ফেটে পড়তে চায়, ওই ফেনিয়ে-ওঠা বোবার গর্জন শুনে বৃষ্টিধারায়-পাণ্ডুবর্ণ সমুদ্রকে তেমনি বোধ হচ্ছে একটা অতলস্পর্শ অক্ষম ক্ষোভের দুঃস্বপ্ন।

যাত্রার মুখে এইরকম দুর্যোগকে কুলক্ষণ বলে মনটা ম্লান হয়ে যায়। আমাদের বুদ্ধিটা পাকা, সে একেলে, লক্ষণ-অলক্ষণ মানে না ; আমাদের রক্তটা কাঁচা, সে আদিম-কালের— তার ভয়ভাবনাগুলো তর্কবিচারকে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে ঝেঁকে ওঠে, ওই পাথরের বেড়ার ওপারের অবুঝ ঢেউগুলোরই মতো। বুদ্ধি আপন যুক্তির কেল্লার মধ্যে বিশ্ব-প্রকৃতির যতরকম ভাষাহীন আভাস-ইঙ্গিতের স্পর্শ থেকে সরে বসে থাকে। রক্ত থাকে আপন বুদ্ধির বেড়ার বাইরে ; তার উপর মেঘের ছায়া পড়ে, ঢেউয়ের দোলা লাগে ; বাতাসের বাঁশিতে তাকে নাচায়, আলো-আঁধারের ইশারা থেকে সে কত কী মানে বের করে ; আকাশে যখন অপ্রসন্নতা তখন তার আর শান্তি নেই।

অনেকবার দূরদেশে যাত্রা করেছি, মনের নোঙরটা তুলতে খুব বেশি টানাটানি করতে হয় নি। এবার সে কিছু যেন জোরে ডাঙা আঁকড়ে আছে। তার থেকে বোধ হচ্ছে, এতদিন পরে আমার বয়স হয়েছে। না-চলতে চাওয়া প্রাণের কৃপণতা, সঞ্চয় কম হলে খরচ করতে সংকোচ হয়।

তবু মনে জানি, ঘাটের থেকে কিছু দূরে গেলেই এই পিছুটানের বাঁধন খসে যাবে। তরুণ পথিক বেরিয়ে আসবে রাজপথে। এই তরুণ একদিন গান গেয়েছিল, "আমি

চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী।" আজই সেই গান কি উজান হাওয়ায় ফিরে গেল। সাগরপারে যে-অপরিচিতা আছে তার অবগুণ্ঠন মোচন করবার জন্যে কি কোনো উৎকণ্ঠা নেই।

কিছুদিন আগে চীন থেকে আমার কাছে নিমন্ত্রণ এসেছিল। সেখানকার লোকে আমার কাছ থেকে কিছু শুনতে চেয়েছিল— কোনো পাকা কথা। অর্থাৎ, সে নিমন্ত্রণ প্রবীণকে নিমন্ত্রণ।

দক্ষিণ আমেরিকা থেকে এবার আমার নিমন্ত্রণ এল, তাদের শতবার্ষিক উৎসবে যোগ দেবার জন্যে। তাই হালকা হয়ে চলেছি, আমাকে প্রবীণ সাজতে হবে না। বক্তৃতা যত করি তার কুয়াশার মধ্যে আমি আপনি ঢাকা পড়ে যাই। সে তো আমার কবির পরিচয় নয়।

গুটির থেকে প্রজাপতি বেরয় তার নিজের স্বভাবে। গুটির থেকে রেশমের সুতো বেরতে থাকে বস্তুতত্ত্ববিদের টানাটানিতে। তখন থেকে প্রজাপতির অবস্থা শোকাবহ। আমার মাঝবয়স পেরিয়ে গেলে পর আমি আমেরিকার যুক্তরাজ্যে গেলুম; সেখানে আমাকে ধরে-বেঁধে বক্তৃতা করালে, তবে ছাড়লে। তার পর থেকে হিতকথার আসরে আমার আনাগোনার আর অন্ত নেই। আমার কবির পরিচয়টা গৌণ হয়ে গেল। পঞ্চাশ বছর কাটিয়েছিলুম সংসারের বেদরকারি মহলে বেসরকারি ভাবে; মনুর মতে যখন বনে যাবার সময় তখন হাজির হতে হল দরকারের দরবারে। সভা সমিতি আমার কাছে সরকারি কাজ আদায় করতে লেগে গেল। এতেই বোধ হচ্ছে, আমার শনির দশা।

কবি হন বা কলাবিৎ হন তাঁরা লোকের ফরমাশ টেনে আনেন— রাজার ফরমাশ, প্রভুর ফরমাশ, বহুপ্রভুর সমাবেশরূপী সাধারণের ফরমাশ। ফরমাশের আক্রমণ থেকে তাঁদের সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি নেই। তার একটা কারণ, অন্দরে তাঁরা মানেন সরস্বতীকে, সদরে তাঁদের মেনে চলতে হয় লক্ষ্মীকে। সরস্বতী ডাক দেন অমৃতভাণ্ডারে, লক্ষ্মী ডাক দেন অন্নের ভাণ্ডারে। শ্বেতপদ্মের অমরাবতী আর সোনার পদ্মের অলকাপুরী ঠিক পাশা-পাশি নেই। উভয়ত্রই যাদের ট্যাক্সো দিতে হয়, এক জায়গায় খুশি হয়ে, আরেক জায়গায় দায়ে প'ড়ে, তাদের বড়ো মুশকিল। জীবিকা অর্জনের দিকে সময় দিলে ভিতরমহলের কাজ চলে না। যেখানে ট্রামের লাইন বসাতে হবে সেখানে ফুলের বাগানের আশা করা মিথ্যে। এই কারণে ফুলবাগানের সঙ্গে আপিসের রাস্তার একটি আপস হয়েছে এই যে, মালি জোগাবে ফুল আর ট্রামলাইনের মালেক জোগাবে অন্ন। দুর্ভাগ্যক্রমে যে-মানুষ অন্ন জোগায় মর্তলোকে তার প্রতাপ বেশি। কারণ, ফুলের শখ পেটের জ্বালার সঙ্গে জবরদস্তিতে সমকক্ষ নয়।

শুধু কেবল অন্ন-বস্ত্র আশ্রয়ের সুযোগটাই বড়ো কথা নয়। ধনীদের যে-টাকা তার জন্যে তাদের নিজের ঘরেই লোহার সিন্দুক আছে, কিন্তু গুণীদের যে-কীর্তি তার খনি যেখানেই থাক্ তার আধার তো তাদের নিজের মনের মধ্যেই নয়। সে-কীর্তি সকল কালের, সকল মানুষের। এইজন্য তার এমন একটি জায়গা পাওয়া চাই যেখান থেকে সকল দেশকালের সে গোচর হতে পারে। বিক্রমাদিত্যের রাজসভার মঞ্চের উপর যে-কবি ছিলেন সেদিনকার ভারতবর্ষে তিনি সকল রসিকমণ্ডলীর সামনে দাঁড়াতে পেরেছিলেন; গোড়াতেই তাঁর প্রকাশ আচ্ছন্ন হয় নি। প্রাচীনকালে অনেক ভালো কবির ভালো কাব্যও দৈবক্রমে এইরকম উঁচু ডাঙাতে আশ্রয় পায় নি ব'লে কালের বন্যাস্রোতে ভেসে গেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এ কথা মনে রাখতে হবে, যাঁরা যথার্থ গুণী তাঁরা একটি সহজ কবচ নিয়ে পৃথিবীতে আসেন। ফরমাশ তাঁদের গায়ে এসে পড়ে, কিন্তু মর্মে এসে বিদ্ধ হয় না। এইজন্যেই তাঁরা মারা যান না, ভাবীকালের জন্যে টিঁকে থাকেন। লোভে প'ড়ে ফরমাশ যারা সম্পূর্ণ স্বীকার করে নেয় তারা তখনই বাঁচে, পরে মরে। আজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অনেকগুলিকেই কালের ভাঙাকুলো থেকে খুঁটে বের করবার জো নেই। তাঁরা রাজার ফরমাশ পুরোপুরি খেটেছিলেন, এইজন্যে তখন হাতে হাতে তাঁদের নগদ পাওনা নিশ্চয়ই আর-সকলের চেয়ে বেশি ছিল। কিন্তু, কালিদাস ফরমাশ খাটতে অপটু ছিলেন বলে দিঙ্‌নাগের স্থূল হস্তের মার তাঁকে বিস্তর খেতে হয়েছিল। তাঁকেও দায়ে পড়ে মাঝে মাঝে ফরমাশ খাটতে হয়েছে, তার প্রমাণ পাই মালবিকাগ্নিমিত্রে। যে দুই তিনটি কাব্যে কালিদাস রাজাকে মুখে বলেছিলেন "যে আদেশ, মহারাজ। যা বলছেন তা-ই করব" অথচ সম্পূর্ণ আরেকটা কিছু করেছেন, সেইগুলির জোরেই সেদিনকার রাজসভার অবসানে তাঁর কীর্তিকলাপের অন্ত্যেষ্টিসংকার হয়ে যায় নি— চিরদিনের রসিকসভায় তাঁর প্রবেশ অবারিত হয়েছে।

মানুষের কাজের দুটো ক্ষেত্র আছে— একটা প্রয়োজনের, আর-একটা লীলার। প্রয়োজনের তাগিদ সমস্তই বাইরের থেকে, অভাবের থেকে; লীলার তাগিদ ভিতর থেকে, ভাবের থেকে। বাইরের ফরমাশে এই প্রয়োজনের আসর সরগরম হয়ে ওঠে, ভিতরের ফরমাশে লীলার আসর জমে। আজকের দিনে জনসাধারণ জেগে উঠেছে; তার ক্ষুধা বিরাট, তার দাবি বিস্তর। সেই বহুরসনাধারী জীব তার বহুতরো ফরমাশে মানবসংসারকে রাত্রিদিন উদ্যত করে রেখেছে; কত তার আস্‌বাব আয়োজন, পাইক বরকন্দাজ, কাড়া-নাকড়া-ঢাকঢোলের তুমুল কলরব— তার "চাই চাই" শব্দের গর্জনে স্বর্গমর্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। এই গর্জনটা লীলার আসরেও প্রবেশ করে দাবি প্রচার

করতে থাকে যে, "তোমাদের বীণা, তোমাদের মৃদঙ্গও আমাদের জয়যাত্রার ব্যাণ্ডের সঙ্গে মিলে আমাদের কল্লোলকে ঘনীভূত করে তুলুক।" সেজন্যে সে খুব বড়ো মজুরি আর জাঁকালো শিরোপা দিতেও রাজি আছে। আগেকার রাজসভার চেয়ে সে হাঁকও দেয় বেশি দামও দেয় বেশি। সেইজন্যে ঢাকির পক্ষে এ সময়টা সুসময়, কিন্তু বীণকারের পক্ষে নয়। ওস্তাদ হাত জোড় করে বলে, "তোমাদের হট্টগোলের কাজে আমার স্থান নেই; অতএব বরঞ্চ আমি চুপ করে থাকতে রাজি আছি, বীণাটা গলায় বেঁধে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে মরতেও রাজি আছি, কিন্তু আমাকে তোমাদের সদররাস্তায় গড়ের বাদ্যের দলে ডেকো না। কেননা, আমার উপরওয়ালার কাছ থেকে তাঁর গানের আসরের জন্যে পূর্ব হতেই বায়না পেয়ে বসে আছি।" এতে জনসাধারণ নানাপ্রকার কটু সম্ভাষণ করে, সে বলে, "তুমি লোকহিত মান না, দেশহিত মান না, কেবল আপন খেয়ালকেই মান।" বীণকার বলতে চেষ্টা করে, "আমি আমার খেয়ালকেও মানি নে, তোমার গরজকেও মানি নে, আমার উপরওয়ালাকে মানি।" সহস্ররসনাধারী গর্জন করে বলে ওঠে, "চুপ!"

জনসাধারণ বলতে যে প্রকাণ্ড জীবকে বোঝায় স্বভাবতই তার প্রয়োজন প্রবল এবং প্রভূত। এইজন্যে স্বভাবতই প্রয়োজনসাধনের দাম তার কাছে অনেক বেশি, লীলাকে সে অবজ্ঞা করে। ক্ষুধার সময়ে বকুলের চেয়ে বার্তাকুর দাম বেশি হয়। সেজন্যে ক্ষুধাতুরকে দোষ দিই নে; কিন্তু বকুলকে যখন বার্তাকুর পদ গ্রহণ করবার জন্যে ফরমাশ আসে তখন সেই ফরমাশকেই দোষ দিই। বিধাতা ক্ষুধাতুরের দেশেও বকুল ফুটিয়েছেন, এতে বকুলের কোনো হাত নেই। তার একটিমাত্র দায়িত্ব আছে এই যে, যেখানে যা-ই ঘটুক, তাকে কারো দরকার থাক্‌ বা না থাক্‌, তাকে বকুল হয়ে উঠতেই হবে; ঝরে পড়ে তো পড়বে, মালায় গাঁথা হয়তো তা-ই সই। এই কথাটাকেই গীতা বলেছেন, "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।" দেখা গেছে, স্বধর্মে জগতে খুব মহৎ লোকেরও নিধন হয়েছে, কিন্তু সে নিধন বাইরের, স্বধর্ম ভিতরের দিক থেকে তাঁকে বাঁচিয়েছে। আর এও দেখা গেছে, পরধর্মে খুব ক্ষুদ্র লোকেও হঠাৎ বড়ো হয়ে উঠেছে, কিন্তু তার নিধন ভিতরের থেকে, যাকে উপনিষদ্‌ বলেন "মহতী বিনষ্টিঃ"।

যে-ব্যক্তি ছোটো তারও স্বধর্ম বলে একটি সম্পদ আছে। তার সেই ছোটো কৌটোটির মধ্যেই সেই স্বধর্মের সম্পদটিকে রক্ষা করে সে পরিত্রাণ পায়। ইতিহাসে তার নাম থাকে না, হয়তো তার বদনাম থাকতেও পারে, কিন্তু তার অন্তর্যামীর খাস-দরবারে তার নাম থেকে যায়। লোভে পড়ে স্বধর্ম বিকিয়ে দিয়ে সে যদি পরধর্মের

ডঙ্কা বাজাতে যায় তবে হাটে বাজারে তার নাম হবে। কিন্তু, তার প্রভুর দরবার থেকে তার নাম খোওয়া যাবে।

এই ভূমিকার মধ্যে আমার নিজের কৈফিয়ত আছে। কখনো অপরাধ করি নি তা নয়। সেই অপরাধের লোকসান ও পরিতাপ তীব্র বেদনায় অনুভব করেছি ব'লেই সাবধান হই। ঝড়ের সময় ধ্রুবতারাকে দেখা যায় না ব'লে দিক্‌ভ্রম হয়। এক এক সময়ে বাহিরের কল্লোলে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে স্বধর্মের বাণী স্পষ্ট করে শোনা যায় না। তখন 'কর্তব্য' নামক দশমুখ-উচ্চারিত একটা শব্দের হুঙ্কারে মন অভিভূত হয়ে যায়; ভুলে যাই যে, কর্তব্য বলে একটা অবচ্ছিন্ন পদার্থ নেই, আমার 'কর্তব্য'ই হচ্ছে আমার পক্ষে কর্তব্য। গাড়ির চলাটা হচ্ছে একটা সাধারণ কর্তব্য, কিন্তু ঘোরতর প্রয়োজনের সময়েও ঘোড়া যদি বলে "আমি সারথির কর্তব্য করব", বা চাকা বলে "ঘোড়ার কর্তব্য করব", তবে সেই কর্তব্যই ভয়াবহ হয়ে ওঠে। ডিমক্রেসির যুগে এই উড়ে-পড়া পড়ে-পাওয়া কর্তব্যের ভয়াবহতা চারি দিকে দেখতে পাই। মানবসংসার চলবে, তার চলাই চাই; কিন্তু তার চলার রথের নানা অঙ্গ— কর্মীরাও একরকম করে তাকে চালাচ্ছে, গুণীরাও একরকম ক'রে তাকে চালাচ্ছে, উভয়ের স্বানুবর্তিতাতেই পরস্পরের সহায়তা এবং সমগ্র রথের গতিবেগ, উভয়ের কর্ম একাকার হয়ে গেলেই মোট কর্মটাই পঙ্গু হয়ে যায়।

এই উপলক্ষে একটি কথা আমার মনে পড়ছে। তখন লোকমান্য টিলক বেঁচে ছিলেন। তিনি তাঁর কোনো এক দূতের যোগে আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে বলে পাঠিয়েছিলেন, আমাকে য়ুরোপে যেতে হবে। সে সময়ে নন্‌-কো-অপারেশন আরম্ভ হয় নি বটে কিন্তু পোলিটিকাল আন্দোলনের তুফান বইছে। আমি বললুম, "রাষ্ট্রিক আন্দোলনের কাজে যোগ দিয়ে আমি য়ুরোপে যেতে পারব না।" তিনি বলে পাঠালেন, আমি রাষ্ট্রিক চর্চায় থাকি, এ তাঁর অভিপ্রায়বিরুদ্ধ। ভারতবর্ষের যে-বাণী আমি প্রচার করতে পারি সেই বাণী বহন করাই আমার পক্ষে সত্য কাজ, এবং সেই সত্য কাজের দ্বারাই আমি ভারতের সত্য সেবা করতে পারি। আমি জানতুম, জনসাধারণ টিলককে পোলিটিকাল নেতারূপেই বরণ করেছিল এবং সেই কাজেই তাঁকে টাকা দিয়েছিল। এইজন্য আমি তাঁর পঞ্চাশহাজার টাকা গ্রহণ করতে পারি নি। তার পরে, বোম্বাই-শহরে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি আমাকে পুনশ্চ বললেন, "রাষ্ট্রনীতিক ব্যাপার থেকে নিজেকে পৃথক রাখলে তবেই আপনি নিজের কাজ সুতরাং দেশের কাজ করতে পারবেন; এর চেয়ে বড়ো আর কিছু আপনার কাছে প্রত্যাশাই করি নি।" আমি বুঝতে পারলুম, টিলক যে গীতার ভাষ্য করেছিলেন সে কাজের অধিকার তাঁর ছিল; সেই অধিকার মহৎ অধিকার।

অনেক ধনী আছে যারা নিজের ভোগেই নিজের অর্থের ব্যয় ও অপব্যয় করে থাকে। সাধারণের দাবি তাদের ভোগের তহবিলে যদি ভাঙন ধরাতে পারে তাতে দুঃখের কথা কিছুই নেই। অবকাশ পদার্থটা হচ্ছে সময়ধন— সংসারী এই ধনটাকে নিজের ঘরসংসারের চিন্তায় ও কাজে লাগায়, আর কুঁড়ে যে সে কোনো কাজেই লাগায় না। এই সংসারী বা কুঁড়ের অবকাশের উপর লোকহিতের দোহাই দিয়ে উপদ্রব করলে দোষের হয় না। আমার অবকাশের অনেকটা অংশ আমি কুঁড়েমিতেই খাটাই, বাইরে থেকে কেউ কেউ এমন সন্দেহ করে। এ কথাটা জানে না যে, কুঁড়েমিটাই আমার কাজের প্রধান অঙ্গ। পেয়ালার যতটা চীনেমাটি দিয়ে গড়া ততটাই তার প্রধান অংশ নয়, বস্তুত সেটাই তার গৌণ; যতটা তার ফাঁক ততটাই তার মুখ্য অংশ। ওই ফাঁকটাই রসে ভরতি হয়, পোড়া চীনেমাটি উপলক্ষ মাত্র। ঘরের খুঁটিটা যেমন, গাছ ঠিক তেমন জিনিস নয়। অর্থাৎ, সে কেবলমাত্র নিজের তলাটার মাটিতেই দাঁড়িয়ে থাকে না। তার দৃশ্যমান গুঁড়ি যতটুকু মাটি জুড়ে থাকে তার অদৃশ্য শিকড় তার চেয়ে অনেক বেশি মাটি অধিকার করে ব'লেই গাছটা রসের জোগান পায়। আমাদের কাজও সেই গাছের মতো; ফাঁকা অবকাশের তলা থেকে গোপনে সে রস আদায় করে নেয়। দশে মিলে তার সেই বিধিদত্ত অবকাশের লাখেরাজের উপর যদি খাজনা বসায় তা হলে তার সেই কাজটাকেই নিঃস্ব করা হতে থাকে। এইজন্যেই দেশের সমস্ত সাময়িক পত্রে হরির লুঠের জোগান দেবার জন্যে অন্য কোনো দেশেই কবিকে নিয়ে এমনতরো টানাহেঁচড়া করে না।

আমাদের দেশের গার্হস্থ্য ব্যাকরণে যাঁরা কর্তা তাঁদের প্রধান পরিচয় ক্রিয়াকর্মে। লোকে তাঁদের দশকর্মা বলে। সেই গার্হস্থ্যে আবার এমন সব লোক আছে যারা অকর্মা; তারা কেবল ফাইফরমাশ খাটে। কাজের চেয়ে অকাজে তাদের বেশি দরকার। অর্থাৎ, তাস খেলবার যখন জুড়ি না জোটে তখন তাদের ডাক পড়ে, আর দূর-সম্পর্কের জ্যাঠাইমার গঙ্গাযাত্রার সময় তারাই প্রধান সহায়।

আমাদের শাস্ত্রে গৃহস্থ-আশ্রমের উপর আরণ্য-আশ্রমের বিধি। বর্তমানকালে এই শেষের আশ্রম বাদ পড়েছে; আরণ্য-আশ্রম নেই, কিন্তু তার জায়গা জুড়েছে সাধারণ্য-আশ্রম। এখন দেশে আরণ্যক পাওয়া যায় না, কিন্তু সাধারণ্যকের সংখ্যা কম নয়। তাঁরা পাব্লিক নামক বৃহৎ সংসারের ঘোরতর সংসারী।

শেষোক্ত সংসারেও দুই দলের লোক আছেন। একদল দশকর্মা, আর-একদল অকর্মা; যাঁদের ইংরেজিতে লীডার বলে আমি তাঁদের বলতে চাই কর্তাব্যক্তি। কেউ বা বড়ো-কর্তা, কেউ বা মেজো-কর্তা, কেউ বা ছোটো-কর্তা। এই কর্তারা নিত্য-সভা,

নৈমিত্তিক-সভা, যুদ্ধ-সভা, শ্রাদ্ধ-সভা প্রভৃতিতেই সর্বদাই ব্যস্ত; তা ছাড়া আছে সাময়িক পত্র, অসাময়িক পত্র, চাঁদার খাতা, বার্ষিক বিবরণী। আর, যাঁরা এই সাধারণ্য আশ্রমের কর্তাব্যক্তি নন, ক্রিয়াকর্ম তাঁদের অধীন নয়, তাঁরা থাকেন চ-বৈ-তু-হি নিয়ে; যত রকম জোড়াতাড়া দেওয়ার কাজে তাঁদের ডাক; হঠাৎ ফাঁক পড়লে সেই ফাঁক উপস্থিতমতো তাঁরা পূরণ করে থাকেন। তাঁরা ভলান্টিয়ারি করেন, চৌকি সাজান, চাঁদা সাধেন, করতালিঘাতে সভার উৎসাহবৃদ্ধি করেন, কখনো বা অপঘাতে সভার অকাল-সমাপ্তি-সাধনেও যোগ দেন।

পাব্লিক শহরে কর্তৃপদ হাটে ঘাটে মেলে না, আর সাবধানে তাদের ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু অব্যয় পদের ছড়াছড়ি— এই জন্যে অব্যয়ের অপব্যয় সর্বদাই ঘটে। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ ছন্দপূরণের কাজে তাদের অস্থানে তলব পড়ে; তাতে মাত্রা রক্ষা হয় এই মাত্র, তার বেশি কিছু না; যেন কুলীনকন্যার কলাগাছের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া।

বর্তমান বয়সে আমার জীবনের প্রধান সংকট এই যে, যদিচ স্বভাবত আমি আরণ্যক তবু আমার কর্মস্থানের কুগ্রহ সকৌতুকে আমাকে সাধারণ্যক করে দাঁড় করিয়েছেন। দীর্ঘকাল আমার জীবন কেটেছে কোণে, কাব্যরচনায়; কখন একসময় বিধাতার খেয়ালের খেয়া আমাকে পৌঁছে দিয়েছে জনতার ঘাটে— এখন অকাব্যসাধনে আমার দিন কাটছে। এখন আমি পাব্লিকের কর্মক্ষেত্রে। কিন্তু হাঁস যখন চলে তখন তার নড়বড়ে চলন দেখেই বোঝা যায় তার পায়ের তেলো ডাঙায় চলবার জন্যে নয়, জলে সাঁতার দেবার জন্যেই। তেমনি পাব্লিক ক্ষেত্রে আমার পদচারণভঙ্গি আমার অভ্যাস-দোষে অথবা বিধাতার রচনাগুণে আজ পর্যন্ত বেশ সুসংগত হয় নি।

এখানে কর্তৃপদে আমার যোগ্যতা নেই, যাকে অব্যয়পদ বলেছি তার কাজেও পদে পদে বিপদ ঘটে। ভলান্টিয়ারি করবার বয়স গেছে; দুর্দিনের তাড়নায় চাঁদার খাতা নিয়ে ধনপতিদের অর্গলবদ্ধ দ্বারে অনর্গল ঘুরে বেড়াতে হয়, তাতে অর্থপাত যা হয় তার চেয়ে অশ্রুপাত হয় অনেক বেশি। তার পরে, গ্রন্থের ভূমিকা লেখবার জন্যে অনুরোধ আসে; গ্রন্থকার অভিমতের দাবি করে গ্রন্থ পাঠান; কেউ বা অনাবশ্যক পত্র লেখেন, ভিতরে মাশুল দিয়ে দেন জবাব লেখবার জন্যে আমাকে দায়ী করবার উদ্দেশ্যে; নবপ্রসূত কুমারকুমারীদের পিতামাতারা তাঁদের সন্তানদের জন্যে অভূতপূর্ব নূতন নাম চেয়ে পাঠান; সম্পাদকের তাগিদ আছে; পরিণয়োৎসুক যুবকদের জন্যে নূতন-রচিত গান চাই; কী উপায়ে নোবেলপ্রাইজ অর্জন করতে হয় সে সম্বন্ধে পরামর্শের আবেদন আসে; দেশের হিতচেষ্টায় পত্রলেখকের সঙ্গে কেন আমার মতের কিছুমাত্র পার্থক্য

ঘটে তার জবাবদিহির জন্যে সাক্রোশ তলব পড়ে। এই-সমস্ত উত্তেজনায় প্রতিনিয়ত যে সকল কর্ম জমিয়ে তুলছি আবর্জনামোচনে কালের সম্মার্জনী সুপটু বলেই বিধাতার কাছে সেজন্যে মার্জনা আশা করি। সভাকর্তৃত্বের কাজেও মাঝে মাঝে আমার ডাক পড়ে। যখন একান্ত কাব্যরসে নিমগ্ন ছিলুম তখন এ বিপদ আমার ছিল না। রাখালকে কেউ ভুলেও রাজসিংহাসনে আমন্ত্রণ করে না, এইজন্যেই বটতলায় সে বাঁশি বাজাবার সময় পায়। কিন্তু, যদি দৈবাৎ কেউ করে বসে, তা হলে পাঁচনিকে রাজদণ্ডের কাজে লাগাতে গিয়ে রাখালি এবং রাজত্ব দুয়েরই বিঘ্ন ঘটে। কাব্যসরস্বতীর সেবক হয়ে গোলেমালে আজ গণপতির দরবারের তকমা পরে বসেছি; তার ফলে কাব্যসরস্বতী আমাকে প্রায় জবাব দিয়েছেন, আর গণপতির বাহনটি আমার সকল কাজেরই ছিদ্র অন্বেষণ করছেন।

ফরমাশের শরশয্যাশায়ী হবার ইচ্ছা আমার কেন নেই, সেই কথাটা এই উপলক্ষে জানালুম। যেখানে দশে মিলে কাজ সেখানে আমার অবকাশের সব গোরু বাছুর বেচে খাজনা জোগাবার তলবে কেন আমি সিভিল অথবা আন্‌সিভিল ডিস্‌-ওবিডিয়েন্সের নীতি অবলম্বন করতে চেষ্টা করি তার একটা কৈফিয়ত দেওয়া গেল। সব সময়ে অনুরোধ উপরোধ এড়িয়ে উঠতে পারি নি, তার কারণ আমার স্বভাব দুর্বল। পৃথিবীতে যাঁরা বড়োলোক তাঁরা রাশভারি শক্তলোক; মহৎ সম্পদ অর্জন করবার লক্ষ্যপথে যথাযোগ্য স্থানে যথোচিত দৃঢ়তার সঙ্গে "না" বলবার ক্ষমতাই তাঁদের পাথেয়। মহৎ সম্পদকে রক্ষা করবার উপলক্ষে রাশভারি লোকেরা "না"-মন্ত্রের গণ্ডিটা নিজের চারি দিকে ঠিক জায়গায় মোটা করে টেনে দিতে পারেন। আমার সে মহত্ত্ব নেই, পেরে উঠি নে; হাঁ-না দুই নৌকার উপর পা দিয়ে দুলতে দুলতে হঠাৎ অগাধ জলের মধ্যে গিয়ে পড়ি। তাই একান্ত মনে আজ প্রার্থনা করি, "ওগো না-নৌকোর নাবিক, আমাকে জোরের সঙ্গে তোমার নৌকোয় টেনে নিয়ে একেবারে মাঝদরিয়ায় পাড়ি দাও— অকাজের ঘাটে আমার তলব আছে, দোটানায় পড়ে যেন বেলা বয়ে না যায়!"

২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪

কাল সমস্ত দিন জাহাজ মাল বোঝাই করছিল। রাত্রে যখন ছাড়ল তখন বাতাসের আক্ষেপ কিছু শান্ত। কিন্তু, তখনো মেঘগুলো দল পাকিয়ে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে। আজ সকালে একখানা ভিজে অন্ধকারে আকাশ ঢাকা। এবার আলোকের অভিনন্দন পেলুম না। শরীরমনও ক্লান্ত।

জাহাজটা তীর থেকে যেন একটুকরো সংসার ছিন্ন করে নিয়ে ভেসে চলেছে।

ডাঙায় মানুষে মানুষে ফাঁক থাকবার অবকাশ আছে ; এখানে জায়গা অল্প, ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকতে হয়। কিন্তু, তবু পরস্পর পরিচয় কত কঠিন। প্রত্যেকবার জাহাজে ওঠবার আগে এই চিন্তাটি মনকে পীড়া দেয়, এই নৈকট্যের দূরত্ব, এই সঙ্গবিহীন সাহচর্য।

আদিম অবস্থায় মানুষ যে-বাসা বাঁধে তার দেয়াল পাতলা ; তার ছিটে বেড়ায় যথেষ্ট ফাঁক, ঝাঁপটা ঠেলে ফেলে ঘরে ঢোকা সহজ। কালক্রমে বাসা বাঁধবার নৈপুণ্য তার যতই বেড়ে ওঠে, ততই ইটকাঠ লোহাপাথরে ঘরের দেয়াল পাকা হয়ে ওঠে, দরজা হয় মজবুত। তার মধ্যে মনের অভ্যেসগুলো হয়ে যায় পাঁচিলে ঘেরা। খাওয়া-পরা শোওয়া-বসা সব-কিছুর জন্যই আড়ালের দরকার হয়। এই আড়ালটা সভ্যতার সর্বপ্রধান অঙ্গ। এইটেকে রচনা ও রক্ষা করতে বিস্তর খরচ লাগছে। ঘর-বাহিরের মাঝখানে মানুষের সহজ-চলাচলের রাস্তায় পদে-পদে নিষেধ।

প্রত্যেক মানুষের একটা সহজ বেড়ার দরকার আছে, নইলে ভিড়ের টানে দশের সঙ্গে মিশে গেলে নিজের বিশেষত্বের সম্পদ ব্যর্থ হয়ে যায়। নিজেকে বিচ্ছিন্ন না করলে নিজেকে প্রকাশ করাই যায় না। বীজ আপনাকে প্রকাশ করবার জন্যই মাটির ভিতরে আড়াল খোঁজে ; ফল আপনাকে পরিণত করবার জন্যেই বাহিরের দিকে একটা খোসার পর্দা টেনে দেয়। বর্বর অবস্থায় মানুষের ব্যক্তিগত বিশেষত্বের জোর থাকে না, তার কাজও থাকে কম। এইজন্যেই ব্যক্তি বিশেষের গোপনতার পরিবেষ্টন সৃষ্ট হয়ে ওঠে তার সভ্যতার উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে।

কিন্তু, এই বেড়া জিনিসটার আত্মপ্রাধান্যবোধ ক্রমেই অতিমাত্র বাড়তে থাকে। তখন মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনে যে একান্ত প্রয়োজন আছে, সেটা বাধাগ্রস্ত হয়ে অনভ্যস্ত হয়ে ওঠে। সেই আতিশয্যটাই হল বিপদ।

এই মারাত্মক বিপদটা কোন্ অবস্থায় ঘটে। ভোগের আদর্শ অপরিমিত বেড়ে উঠে মানুষের যখন বিস্তর উপকরণের প্রয়োজন, যখন অন্যের জন্যে তার সময় ও সম্বল খরচ করবার বেলায় বিস্তর হিসেব করা অনিবার্য, যখন তার জীবিকার উপাদান উৎপাদন করবার জন্যে প্রভূত আয়োজন চাই, তখন তার সভ্যতার বাহন-বাহিনীর বিপুলতায় তার লোকালয় অতি প্রকাণ্ড হয়ে ওঠে। জনতার পরিমিত আয়তনেই মানুষের মধ্যে আত্মীয়তার ঐক্য সম্ভবপর। তাই পল্লীর অধিবাসীরা কেবল যে একত্র হয় তা নয়, তারা এক হয়। শহরের অতিবৃহৎ জনসমাবেশ আপন অতিবিস্তীর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এক-আত্মীয়তার রক্তস্রোত সঞ্চারিত করবার উপযুক্ত হৃৎপিণ্ড তৈরি করে উঠতে পারে না। প্রকাণ্ড জনসজ্ঘ কাজ চালাবারই যোগ্য, আত্মীয়তা

চালাবার নয়। কারখানা ঘরে হাজার লোকের মজুরি দরকার, পরিবারের মধ্যে হাজার লোকের জটলা হলে তাকে আর গৃহ বলে না। যন্ত্রের মিলন যেখানে সেখানে অনেক লোক, আর অন্তরের মিলন যেখানে সেখানে লোকসংখ্যা কম। তাই শহর মানুষকে বাহিরের দিকে কাছে টানে, অন্তরের দিকে ফাঁক ফাঁক করে রাখে।

আমরা আজন্মকাল সেই দেয়াল-কোটরে ভাগে ভাগে বিভক্ত সভ্য মানুষ। হঠাৎ এসে ঠেসাঠেসি করে মিলেছি এক জাহাজে। মেলবার অভ্যেস মনের মধ্যে নেই। তীর্থে যারা দল বেঁধে রাস্তায় চলে মিলতে তাদের সময় লাগে না; তারা গাঁয়ের লোক, মেলাই তাদের অভ্যেস। সার্থবাহ যারা মরুর মধ্য দিয়ে উটে চড়ে চলে তারাও মনকে নীরব আড়ালের বুর্‌খা দিয়ে ঢেকে চলে না; তাদের সভ্যতা ইঁট-পাথরে অমিলকে পাকা করে গেঁথে তোলে নি। কিন্তু, স্টীমারের যাত্রী, রেলগাড়ির প্যাসেঞ্জার বাড়ি থেকে যখন বেরিয়ে আসে তাদের দেয়ালগুলোর সূক্ষ্ম শরীর তাদের সঙ্গে সঙ্গেই চলতে থাকে।

তাই দেখি, শহরের কলেজে-পড়া ছেলে হঠাৎ দেশাত্মবোধের তাড়ায় যখন খামকা পল্লীর উপকার করতে ছোটে তখন তারা পল্লীবাসীর পাশে এসেও কাছে আসতে পারে না। তারা বেড়ার ভিতর দিয়ে কথা কয়, পল্লীর কানে বাজে যেন আরবি আওড়াচ্ছে।

যা হোক, যদিও শহরে সভ্যতার পাকে আমাদেরকেও খুব কষে টান দিয়েছে, তবু মনের গ্রাম্য অভ্যেস এখনো যায় নি। সময়কে বলতে আরম্ভ করেছি, মূল্যবান, কিন্তু কেউ যদি সে-মূল্য গ্রাহ্য না করে তাকে ঠেকিয়ে রাখবার কোনো ব্যবস্থা আজও তৈরি হয় নি। আমাদের আগন্তুকবর্গ অভিমন্যুর মতো অতি সহজেই ঘরে প্রবেশ করতে জানেন, কিন্তু নির্গমনের পথ যে তাঁরা জানেন সে তাঁদের ব্যবহারে বোঝা যায় না। অত্যন্ত বেগার লোককেও যদি বলা যায়, “কাজ আছে”, সে বলে “ঈস! লোকটা ভারি অহংকারী”। অর্থাৎ, তোমার কাজটা আমাকে দেখা দেওয়ার চেয়েও মহার্ঘ, এ কথা মনে করা স্পর্ধা।

অসুস্থ শরীরে একদিন আমার তিন-তলার ঘরে অর্ধশয়ান অবস্থায় একটা লেখায় নিযুক্ত আছি। আমি নিতান্তই মৃদুস্বভাবের মানুষ ব'লেই আমার সেই অন্দরের ঘরটাকেও আমার বন্ধু, অনতিবন্ধু ও অবন্ধুরা দুর্গম বলে গণ্য করেন না। এইটুকুমাত্র সুবিধা যে, পথটা পুরবাসীদের সকলেরই জানা নেই। খবর এল, একটি ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন। অস্বাস্থ্য বা ব্যস্ততার ওজরকে আমাদের ভদ্রলোকেরা শ্রদ্ধা করেন না, তাই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে লেখা বন্ধ করে নীচে গেলুম। দেখি, একজন কাঁচা-

বয়সের যুবক; হঠাৎ তার চাদরের অজ্ঞাতবাস থেকে একটা মোটা-গোছের খাতা বেরল। বুঝলুম, আমারই আপন সম্প্রদায়ের লোক। কবিকিশোর একটুখানি হেসে আমাকে বললে, "একটা অপেরা লিখেছি।" আমার মুখে বোধ হয় একটা পাংশুবর্ণ ছায়া পড়ে থাকবে, তাই হয়তো আশ্বাস দেবার জন্যে বলে উঠল, "আপনাকে আর কিছুই করতে হবে না, কেবল গানের কথাগুলোতে সুর বসিয়ে দেবেন, সবসুদ্ধ পঁচিশটা গান।" কাতর হয়ে বললুম, "সময় কই!" কবি বললে, "আপনার কতটুকুই বা সময় লাগবে। গান-পিছু বড়ো-জোর আধ ঘণ্টাই হোক।" সময় সম্বন্ধে এর মনের ঔদার্য দেখে হতাশ হয়ে বললুম, "আমার শরীর অসুস্থ।" অপেরা-রচয়িতা বললে, "আপনার শরীর অসুস্থ, এর উপরে আর কী বলব! কিন্তু যদি—"। বুঝলুম প্রবীণ ডাক্তারের সার্টিফিকেট আনলেও নবীন কবি বিচলিত হবে না। কোনো একজন ইংরেজ গ্রন্থকারের ঘরে এই নাট্যের অবতারণা হলে কোন্ ফৌজদারিতে তার যবনিকাপতন হত, সে-কথা মনে করলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

মানুষের ঘরে "দরওয়াজা বন্ধ্" এ কথাটিও কটু, আর তার ঘরে কোথাও পর্দা নেই এটাও বর্বরতা। মধ্যম পন্থাটাই দেখি সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। দুই বিরুদ্ধ শক্তির সমন্বয়েই সৃষ্টি, তাদের একান্ত বিচ্ছেদেই প্রলয়, মানুষ নিজের ব্যবহারক্ষেত্রে এইটেই কেবলই ভোলে আর মার খেয়ে মরে।

সূর্যের উদয়াস্ত আজও বাদলার ছায়ায় ঢাকা পড়ে রইল। মেঘের থলিটার মধ্যে কৃপণ আকাশ তার সমস্ত সোনার আলো এঁটে বন্ধ করে রেখেছে।

২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪

আজ ক্ষণে ক্ষণে রৌদ্র উঁকি মারছে, কিন্তু সে যেন তার গারদের গরাদের ভিতর থেকে। তার সংকোচ এখনো ঘুচল না। বাদল-রাজের কালো-উর্দি-পরা মেঘগুলো দিকে দিকে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।

আচ্ছন্ন সূর্যের আলোয় আমার চৈতন্যের স্রোতস্বিনীতে যেন ভাঁটা পড়ে গেছে। জোয়ার আসবে রৌদ্রের সঙ্গে সঙ্গে।

পশ্চিমে, বিশেষত আমেরিকায় দেখেছি, বাপমায়ের সঙ্গে অধিকাংশ বয়স্ক ছেলে-মেয়ের নাড়ীর টান ঘুচে গেছে। আমাদের দেশে শেষ পর্যন্তই সেটা থাকে। তেমনিই দেখেছি, সূর্যের সঙ্গে মানুষের প্রাণের যোগ সে-দেশে তেমন যেন অন্তরঙ্গভাবে অনুভব করে না। সেই বিরলরৌদ্রের দেশে তারা ঘরে সূর্যের আলো ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে যখন পর্দা, কখনো বা অর্ধেক কখনো বা সম্পূর্ণ নামিয়ে দেয় তখন সেটাকে আমি ঔদ্ধত্য বলে মনে করি।

প্রাণের যোগ নয়তো কী। সূর্যের আলোর ধারা তো আমাদের নাড়ীতে নাড়ীতে বইছে। আমাদের প্রাণমন, আমাদের রূপরস, সবই তো উৎসরূপে রয়েছে ওই মহা-জ্যোতিষ্কের মধ্যে। সৌরজগতের সমস্ত ভাবীকাল একদিন তো পরিকীর্ণ হয়ে ছিল ওরই বহ্নিবাষ্পের মধ্যে। আমার দেহের কোষে কোষে ওই তেজই তো শরীরী, আমার ভাবনার তরঙ্গে তরঙ্গে ওই আলোই তো প্রবহমান। বাহিরে ওই আলোরই বর্ণচ্ছটায় মেঘে মেঘে পত্রে পুষ্পে পৃথিবীর রূপ বিচিত্র; অন্তরে ওই তেজই মানসভাব ধারণ করে আমাদের চিন্তায় ভাবনায় বেদনায় রাগে অনুরাগে রঞ্জিত। সেই এক জ্যোতিরই এত রঙ, এত রূপ, এত ভাব, এত রস। ওই যে-জ্যোতি আঙুরের গুচ্ছে গুচ্ছে এক-এক চুমুক মদ হয়ে সঞ্চিত সেই জ্যোতিই তো আমার গানে গানে সুর হয়ে পুঞ্জিত হল। এখনই আমার চিত্ত হতে এই যে চিন্তা ভাষার ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে, সে কি সেই জ্যোতিরই একটি চঞ্চল চিন্ময়স্বরূপ নয় যে-জ্যোতি বনস্পতির শাখায় শাখায় স্তব্ধ ওঙ্কারধ্বনির মতো সংহত হয়ে আছে।

হে সূর্য, তোমারই তেজের উৎসের কাছে পৃথিবীর অন্তর্গূঢ় প্রার্থনা ঘাস হয়ে, গাছ হয়ে আকাশে উঠছে, বলছে, জয় হোক! বলছে, অপাবৃণু, ঢাকা খুলে দাও! এই ঢাকা-খোলাই তার প্রাণের লীলা, এই ঢাকা-খোলাই তার ফুলফলের বিকাশ। অপাবৃণু, এই প্রার্থনারই নির্ঝরধারা আদিম জীবাণু থেকে যাত্রা করে আজ মানুষের মধ্যে এসে উপস্থিত, প্রাণের ঘাট পেরিয়ে চিত্তের ঘাটে পাড়ি দিয়ে চলল। আমি তোমার দিকে বাহু তুলে বলছি, হে পূষন্, হে পরিপূর্ণ, অপাবৃণু, তোমার হিরণ্ময় পাত্রের আবরণ খোলো, আমার মধ্যে যে গুহাহিত সত্য তোমার মধ্যে তার অবারিত জ্যোতিঃস্বরূপ দেখে নিই। আমার পরিচয় আলোকে আলোকে উদ্‌ঘাটিত হোক।

২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪

আজ মেঘ সম্পূর্ণ কেটে গেছে। আলোকের দাক্ষিণ্য আজ আকাশে বিস্তীর্ণ, রৌদ্রচকিত সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে আজ আমন্ত্রণের ইঙ্গিত। সুরলোকের আতিথ্য থেকে আজ একটুও বঞ্চিত হতে ইচ্ছা করছে না।

আজকের দিনে কি ডায়ারি লিখতে একটুও মন সরে। ডায়ারি লেখাটা কৃপণের কাজ। প্রতিদিন থেকে ছোটোবড়ো কিছুই নষ্ট না হোক, সমস্তই কুড়িয়ে-কুড়িয়ে রাখি, এই ইচ্ছে ওতে প্রকাশ পায়। কৃপণ এগতে চায় না। আগলাতে চায়।

বিধাতা আমাকে মস্ত একটি বর দিয়েছেন, সে হচ্ছে আমার অসামান্য বিস্মরণ-শক্তি। সংবাদের ভাণ্ডারঘরের জিম্মে তিনি আমার হাতে দেন নি। প্রহরীর কাজ আমার নয়; আমাকে আমার মনিব প্রহরে প্রহরে ভুলে যাবার অধিকার দিয়েছেন।

ভুলে যেতে দেওয়া যদি হারিয়ে যেতে দেওয়া হত তা হলে তিনি তেমন বিষম ভুল করতেন না। বসন্ত বারে বারেই তার ফুলের সমারোহ ভুলে গিয়ে শূন্যসাজি হাতে অন্যমনস্ক হয়ে উত্তরের দিকে চলে যায়; সেই ভুলের ফাঁকা রাস্তা দিয়েই ফুলের দল তাদের নবজন্মের সিংহদ্বার খোলা পায়। আমার চৈতন্যের উপরের তলায় আমি এত বেশি ভুলি যে, তাতে আমার প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় ভারি অসুবিধা হয়। কিন্তু, আমার ভোলা সামগ্রীগুলো চৈতন্যের রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে নীচের তলায় নেপথ্যে এসে জড়ো হয়; সেখানে নতুন-নতুন বেশপরিবর্তনের সুযোগ ঘটে। আমার মনটাকে বিধাতা নাট্যশালা করতে ইচ্ছা করেছেন, তাকে তিনি জাদুঘর বানাতে চান না। তাই, জমা করে পাওয়া আমার লোকসান, হারিয়ে হারিয়ে পাওয়াই আমার লাভ। এই হারিয়ে-যাওয়ার ভিতর দিয়ে এক যখন আর সেজে এসে হাজির হয় তখন তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি-ওয়ালা বৈজ্ঞানিক যদি সওয়ালজবাব করতে শুরু করে, তা হলে মুশকিল। তখন বিশ্লেষণের চোটে বেরিয়ে পড়তে পারে, যেটাকে নতুন বলছি সেটা পুরোনো, যেটাকে আমার বলছি সেটা আর-কারো। কিন্তু, সৃষ্টির তো এই লীলা, এই জন্যেই তো তাকে মায়া বলে। কড়া পাহারা বসিয়ে শিশিরবিন্দুর যদি আঁচল ঝাড়া দেওয়া যায় তা হলে বেরিয়ে পড়বে দুটো অদ্ভুত বাষ্প, তাদের নাম যেমন কর্কশ তাদের মেজাজও তেমনি রাগী। কিন্তু, শিশির তবুও স্নিগ্ধ শিশির, তবুও সে মিলনের অশ্রুজলের মতোই মধুর।

কথায় কথায় কথা বেড়ে যায়। বলতে যাচ্ছিলুম, ডায়ারি লেখাটা আমার স্বভাব-সংগত নয়। আমি ভোলানাথের চেলা, ঝুলি বোঝাই করে আমি তথ্য সংগ্রহ করি নে। আমার জলাশয়ের যে-জলটাকে অন্যমনস্ক হয়ে উবে যেতে দিই সেইটেই অদৃশ্য শূন্যপথে মেঘ হয়ে আকাশে জমে, নইলে আমার বর্ষণ বন্ধ।

তা ছাড়া, আমার ব্যক্তিগত জীবনের সব সত্যকেই আমি একটিমাত্র সরকারি বাটখারা দিয়ে ওজন করতে চাই নে। কিন্তু, বিশেষ ঘটনার বিশেষ তুলাদণ্ড তৈরি হয়ে উঠতে সময় লাগে। ঘটনা যখনই ঘটে তখনই সেটাকে পাওয়া যায় না। তখন সরকারি পরিমাপের আদর্শ যেটাকে দেখায় ভারী সেটাই হয়তো হালকা, যেটাকে বুঝি হালকা সেটাই হয়তো ভারী। দীর্ঘকালে আনুষঙ্গিক অনেক বাজে জিনিস ভুলে যাওয়ার ভিতর দিয়েই বিশেষ জিনিসের বিশেষ ওজন পাওয়া যায়।

যারা জীবনচরিত লেখে তারা সমসাময়িক খাতাপত্র থেকে অতিবিশ্বাসযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করে লেখে; সেই অচল সংবাদগুলো নিজেকে না কমাতে না বাড়াতে পারে। অথচ, আমাদের প্রাণপুরুষ তার তথ্যগুলোকে পদে পদে বাড়িয়ে-কমিয়েই

এগিয়ে চলেছে। অতিবিশ্বাসযোগ্য তথ্য স্তূপাকার করে তা দিয়ে স্মরণস্তম্ভ হতে পারে, কিন্তু জীবনচরিত হবে কী করে। জীবনচরিত থেকে যদি বিস্মরণধর্মী জীবনটাই বাদ পড়ে তা হলে মৃতচরিতের কবরটাকে নিয়ে হবে কী। আমি যদি বোকামি করে প্রতিদিনের ডায়ারি লিখে যেতুম তা হলে তাতে করে হত আমার নিজের স্বাক্ষরে আমার নিজের জীবনের প্রতিবাদ। তা হলে আমার দৈনিক জীবনের সাক্ষ্য আমার সমগ্র-জীবনের সত্যকে মাটি করে দিত।

যে-যুগে রিপোর্টার ছিল না, মানুষ খবরের কাগজ বের করে নি, তখন মানুষের ভুলে যাবার স্বাভাবিক শক্তি কোনো কৃত্রিম বাধা পেত না। তাই তখনকার কালের মধ্যে থেকেই মানুষ আপন চিরস্মরণীয় মহাপুরুষদের পেয়েছে। এখন হতে আমরা তথ্য কুড়ুনে তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিচারকদের হাত থেকে প্রতিদিনের মানুষকে পাব, চিরদিনের মানুষকে সহজে পাব না। বিস্মরণের বৃহৎ ভিতরের উপর স্থাপিত মহাসিংহাসনেই কেবল যাঁদের ধরে, সর্বসাধারণের ঠাসাঠাসি ভিড়ে তাঁদের জন্যে জায়গা হবে না। এখন ক্যামেরাওয়ালা, ডায়ারিওয়ালা, নোটটুকনেওয়ালা অত্যন্ত সতর্ক হয়ে চারি দিকেই মাচা বেঁধে ব'সে।

ছেলেবেলায় আমাদের অন্তঃপুরের যে-বাগানে বিশ্বপ্রকৃতি প্রত্যহই এক-একটি সূর্যোদয়কে তার নীল থালায় সাজিয়ে এক-একটি বিশেষ উপহারের মতো আমার পুলকিত হৃদয়ের মাঝখানে রেখে দিয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসত, ভয় আছে, একদিন আমার কোনো ভাবী চরিতকার ক্যামেরা হাতে সেই বাগানের ফোটোগ্রাফ নিতে আসবে। সে অরসিক জানবেই না, সে-বাগান সেইখানেই যেখানে আছে ইদেনের আদিম স্বর্গোদ্যান। বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের প্রতি উদাসীন আর্টিস্ট সেই স্বর্গে যেতেও পারে, কিন্তু কোনো ক্যামেরাওয়ালার সাধ্য নেই সেখানে প্রবেশ করে— দ্বারে দেবদূত দাঁড়িয়ে আছে জ্যোতির্ময় খড়্গ হাতে।

এত বুদ্ধি যদি আমার, আর এত ভয়, তবে কেন ডায়ারি লিখতে বসেছি। সে-কথা কাল বলব।

২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪

যখন কলম্বোতে এসে পৌঁছলুম বৃষ্টিতে দিগদিগন্তর ভেসে যাচ্ছে। গৃহস্থের ঘরে যেদিন শোকের কান্না, যেদিন লোকসানের আলোড়ন, সেদিন তার বাড়িতে আগন্তুকদের অধিকার থাকে না। কলম্বোর অশান্ত আকাশের আতিথ্য সেদিন আমার কাছে তেমনি সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল ; মনটা নিজেকে বেশ মেলে দিয়ে বসবার জায়গা পাচ্ছিল না। বাহির জগতের প্রথম গেটটার কাছেই অভ্যর্থনায় ঔদার্যের অভাব দেখে মনে

হল, আমার নিমন্ত্রণের ভূমিকাতেই কোন্ কুগ্রহ এমন করে কালি ঢেলে দিলে। দরজাটা খোলা থাকলে হবে কী, নিমন্ত্রণকর্তার মুখে যে হাসি নেই।

এমন সময়ে এই বিমর্ষ দিনের বিমুখতার মধ্যে একটি বাঙালি ঘরের বালিকার একখানি চিঠি পাওয়া গেল। এই বালিকাই কিছুকাল পূর্বে আমার শিলঙবাসের একটি পদ্যময় বর্ণনার জরুরি দাবি করে তাড়া দিয়েছিল। সে দাবি আমি অগ্রাহ্য করি নি। এবার সে আমার এই প্রবাসযাত্রায় মঙ্গলকামনা জানিয়েছে। মনে হল, বাঙালি মেয়ের এই শুভ-ইচ্ছা আমার আজকের দিনের এই বদ্‌মেজাজি ভাগ্যটাকে অনুকূল করে তুলবে।

পুরুষের আছে বীর্য আর মেয়েদের আছে মাধুর্য, এ কথাটা সব দেশেই প্রচলিত। আমরা তার সঙ্গে আরো একটা কথা যোগ করেছি, আমরা বলি মেয়েদের মধ্যে মঙ্গল। অনুষ্ঠানের যে সকল আয়োজন, যে সকল চিহ্ন শুভ সূচনা করে, আমাদের দেশে তার ভার মেয়েদের উপর। নারীশক্তিতে আমরা মধুরের সঙ্গে মঙ্গলের মিলন অনুভব করি। প্রবাসে যাত্রায় বাপের চেয়ে মায়ের আশীর্বাদের জোর বেশি ব'লে জানি। মনে হয়, যেন ঘরের ভিতর থেকে মেয়েদের প্রার্থনা নিয়ত উঠছে দেবতার কাছে, ধূপপাত্র থেকে সুগন্ধি ধূপের ধোঁয়ার মতো। সে-প্রার্থনা তাদের সিঁদুরের ফোঁটায়, তাদের কঙ্কণে, তাদের উলুধ্বনি-শঙ্খধ্বনিতে, তাদের ব্যক্ত এবং অব্যক্ত ইচ্ছায়। ভাইয়ের কপালে মেয়েরাই দেয় ভাইফোঁটা। আমরা জানি, সাবিত্রীই মৃত্যুর হাত থেকে স্বামীকে ফিরিয়েছিল। নারীর প্রেমে পুরুষের কেবল যে আনন্দ তা নয়, তার কল্যাণ।

তার মানে, আমরা একরকম ক'রে এই বুঝেছি, প্রেম জিনিসটা কেবল যে একটা হৃদয়ের ভাব তা নয়, সে একটা শক্তি, যেমন শক্তি বিশ্বের ভারাকর্ষণ। সর্বত্রই সে আছে। মেয়েদের প্রেম সেই বিশ্বশক্তিকে সহজে নাড়া দিতে পারে। বিষ্ণুর প্রকৃতিতে যে প্রেমের শক্তি বিশ্বকে পালন করছে সেই শক্তিই তো লক্ষ্মী, বিষ্ণুর প্রেয়সী। লক্ষ্মী সম্বন্ধে আমাদের মনে যে ভাবকল্পনা আছে তাকে আমরা প্রত্যক্ষ দেখি নারীর আদর্শে।

লক্ষ্মীতে সৌন্দর্য হচ্ছে পরিপূর্ণতার লক্ষণ। সৃষ্টিতে যতক্ষণ দ্বিধা থাকে ততক্ষণ সুন্দর দেখা দেয় না। সামঞ্জস্য যখন সম্পূর্ণ হয় তখনই সুন্দরের আবির্ভাব।

পুরুষের কর্মপথে এখনো তার সন্ধানচেষ্টার শেষ হয় নি। কোনো কালেই হবে না। অজানার মধ্যে কেবলই সে পথ খনন করছে, কোনো পরিণামের প্রান্তে এসে আজও সে অবকাশ পেলে না। পুরুষের প্রকৃতিতে সৃষ্টিকর্তার তুলি আপন শেষ রেখাটা টানে নি। পুরুষকে অসম্পূর্ণই থাকতে হবে।

নারীপ্রকৃতি আপনার স্থিতিতে প্রতিষ্ঠ। সার্থকতার সন্ধানে তাকে দুর্গম পথে

ছুটতে হয় না। জীবপ্রকৃতির একটা বিশেষ অভিপ্রায় তার মধ্যে চরম পরিণতি পেয়েছে। সে জীবধাত্রী, জীবপালিনী; তার সম্বন্ধে প্রকৃতির কোনো দ্বিধা নেই। প্রাণসৃষ্টি প্রাণপালন ও প্রাণতোষণের বিচিত্র ঐশ্বর্য তার দেহে মনে পর্যাপ্ত। এই প্রাণসৃষ্টি-বিভাগে পুরুষের প্রয়োজন অত্যল্প, এইজন্যে প্রকৃতির একটা প্রবল তাগিদ থেকে পুরুষ মুক্ত। প্রাণের ক্ষেত্রে ছুটি পেয়েছে ব'লেই চিত্তক্ষেত্রে সে আপন সৃষ্টি-কার্যের পত্তন করতে পারলে। সাহিত্যে কলায় বিজ্ঞানে দর্শনে ধর্মে বিধিব্যবস্থায় মিলিয়ে যাকে আমরা সভ্যতা বলি সে হল প্রাণপ্রকৃতির পালাতক ছেলে পুরুষের সৃষ্টি।

তানের বেগে চঞ্চল গান তার সুরসত্তের প্রবাহ বহন করে ছোটবার সময় যেমন নিজের কল্যাণের জন্যেই একটা মূল লয়ের মূল সুরের স্থিতির দিকে সর্বদাই ভিতরে ভিতরে লক্ষ্য রাখে, তেমনি গতিবেগমত্ত পুরুষের চলমান সৃষ্টি সর্বদাই স্থিতির একটা মূল সুরকে কানে রাখতে চায়; পুরুষের শক্তি তার অসমাপ্ত সাধনার ভার বহন ক'রে চলবার সময় সুন্দরের প্রবর্তনার অপেক্ষা রাখে। সেই স্থিতির ফুলই হচ্ছে নারীর মাধুর্য, সেই স্থিতির ফলই হচ্ছে নারীর মাঙ্গল্য, সেই স্থিতির সুরই হচ্ছে নারীর শ্রীসৌন্দর্য।

নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায় তা হলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে। তখন মানুষ আপনার সৃষ্ট যন্ত্রের আঘাতে কেবলই পীড়া দেয়, পীড়িত হয়।

এই ভাবটা আমার রক্তকরবী নাটকের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। যক্ষপুরে পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে আনছে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য সেখান থেকে নির্বাসিত। সেখানে জটিলতার জালে আপনাকে আপনি জড়িত করে মানুষ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই সে ভুলেছে সোনার চেয়ে আনন্দের দাম বেশি; ভুলেছে, প্রতাপের মধ্যে পূর্ণতা নেই, প্রেমের মধ্যেই পূর্ণতা। সেখানে মানুষকে দাস করে রাখবার প্রকাণ্ড আয়োজনে মানুষ নিজেকেই নিজে বন্দী করেছে।

এমন সময়ে সেখানে নারী এল, নন্দিনী এল; প্রাণের বেগ এসে পড়ল যন্ত্রের উপর; প্রেমের আবেগ আঘাত করতে লাগল লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধনজালকে। তখন সেই নারী-শক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনায় কী করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল, এই নাটকে তাই বর্ণিত আছে।

যে কথাটা বলতে শুরু করেছিলুম সে হচ্ছে এই যে পুরুষের অধ্যবসায়ের কোথাও

সমাপ্তি নেই, এইজন্যেই সুসমাপ্তির সুধারসের জন্যে তার অধ্যবসায়ের মধ্যে একটা প্রবল তৃষ্ণা আছে। মেয়েদের হৃদয়ের মাধুর্য এই রসই তাকে পান করায়। পুরুষের সংসারে কেবলই চিন্তার দ্বন্দ্ব, সংশয়ের দোলা, তর্কের সংঘাত, ভাঙাগড়ার আবর্তন— এই নিরন্তর প্রয়াসে তার ক্ষুব্ধ দোলায়িত চিত্ত প্রাণলোকের সরল পরিপূর্ণতার জন্যে ভিতরে ভিতরে উৎসুক হয়ে থাকে। মেয়েদের মধ্যে সেই প্রাণের লীলা। বাতাসে লতার আন্দোলনের মতো, বসন্তের নিকুঞ্জে ফুল ফোটবার মতোই এই লীলা সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত; চিন্তাক্লিষ্ট চিত্তের পক্ষে পূর্ণতার এই প্রাণময়ী মূর্তি নিরতিশয় রমণীয়। এই সুসমাপ্তির সৌন্দর্য, এই প্রাণের সহজ বিকাশ পুরুষের মনে কেবল যে তৃপ্তি আনে তা নয়, তাকে বল দেয়, তার সৃষ্টিকে অভাবনীয় রূপে উদ্‌ঘাটিত করে দিতে থাকে। আমাদের দেশে এইজন্যে পুরুষের সাধনায় মেয়েকে শক্তি বলে স্বীকার করে। কর্মের প্রকাশ্য ক্ষেত্রে এই শক্তিকে দেখি নে; ফুলকে দেখি প্রত্যক্ষ কিন্তু যে গূঢ় শক্তিতে সেই ফুল ফোটায় তাকে কোথাও ধরা-ছোঁওয়া যায় না। পুরুষের কীর্তিতে মেয়ের শক্তি তেমনি নিগূঢ়।

২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪

যে মেয়েটি আমাকে শুভ-ইচ্ছা জানিয়ে চিঠি লিখেছিল তার চিঠিতে একটি অনুরোধ ছিল, "আপনি ডায়ারি লিখবেন।" তখনই জবাব দিলুম, "না, ডায়ারি লিখব না।" কিন্তু, মুখ দিয়ে একটা কথা বেরিয়ে গেছে ব'লেই যে সেই কথাটা অটল সত্যের গৌরব লাভ করবে এতবড়ো অহংকার আমার নেই।

তার পর চব্বিশে তারিখে জাহাজে উঠলুম। বাদলার হাওয়া আরো যেন রেগে উঠল; সে যেন একটা অদৃশ্য প্রকাণ্ড সাপের মতো জাহাজটার উপর ক্ষণে-ক্ষণে-ছোবল মেরে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। যখন দেখলুম দুর্দৈবের ধাক্কায় মনটা হার মানবার উপক্রম করছে তখন তেড়ে উঠে বললুম, "না, ডায়ারি লিখবই।" কিন্তু, লেখবার আছে কী। কিছুই না, যা-তা লিখতে হবে। সকল লেখার সেরা হচ্ছে যা-তা লেখা। যথেচ্ছাচারের অধিকার রাজার অধিকার।

বিশেষ কোনো-একজনকে চিঠি লেখবার একটা প্রচ্ছন্ন বীথিকা যদি সামনে পাওয়া যেত তা হলে তারই নিভৃতছায়ার ভিতর দিয়ে আমার নিরুদ্দেশ বাণীকে অভিসারে পাঠাতুম। কিন্তু সে বীথিকা আজ নেই। তাই অপরিচিত ক্যাবিনে আলো জেলে নিজের কাছেই নিজে বকতে বসলুম। আলাপের এই অদ্বৈতরূপ আমার পছন্দসই নয়। সংসারে যখন মনের মতো দ্বৈত দুর্লভ হয়ে ওঠে তখনই মানুষ অদ্বৈতসাধনায়

মনকে ভুলিয়ে রাখতে চায়। কারণ, সকলের চেয়ে দুর্বিপাক হচ্ছে অ-মনের মতো দ্বৈত।

হারুনা-মারু জাহাজ
৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪

আমার ডায়ারিতে মেয়ে-পুরুষের কথা নিয়ে যে আলোচনা ছিল সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেছে এই যে, "আচ্ছা বোঝা গেল যে, প্রাণের টানে মেয়ে আটকা পড়েছে আর পুরুষ ছুটেছে মনের তাড়ায়। তার পরে, তারা যে প্রেমে মেলে সেটা কি ঠিক একজাতের।"

গোড়াতেই বলে রাখা ভালো যে, প্রাণই বল আর মনই বল, মেয়ে কিম্বা পুরুষের একেবারে নিজস্ব দখলে নেই। অবস্থাগতিকে পক্ষভেদে একটা মুখ্য, অন্যটা গৌণ।

মন জিনিসটা প্রাণের ঘরেই মানুষ, প্রাণের অন্ন খেয়ে; সেই জন্যেই অন্তরে অন্তরে তার একটা অকৃতজ্ঞতা আছে। প্রাণের আনুগত্য ছাড়িয়ে একাধিপত্য করবার জন্যে সে প্রায় মাঝে মাঝে আস্ফালন করে। এই বিদ্রোহটা ভিতরে ভিতরে কম বেশি পরিমাণে প্রায় সব পুরুষের মধ্যেই আছে। প্রাণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্যে তার কিছু-না-কিছু কসরত এবং কুচকাওয়াজ চলছেই। খামকা প্রাণটাকে ক্লিষ্ট করবার, বিপন্ন করবার লোভ পুরুষের। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার শখটা পুরুষের; তার একমাত্র কারণ ঘরের খাওয়াতে তাকে প্রাণের শাসন মানতে হয় কিন্তু বনের মোষ তাড়ানোতে, প্রাণের প্রতি তার যে রাজভক্তি নেই, এইটে প্রচার করবার একটা উপলক্ষ জোটে— সেটাকে সে পৌরুষ মনে করে। পুরুষ যুদ্ধ করে এসেছে সব সময়ে যে প্রয়োজন আছে বলে তা নয়, কেবল স্পর্ধা ক'রে এইটে দেখাবার জন্যে যে, প্রাণের তাগিদকে সে গ্রাহ্যই করে না। এই জন্যে যুদ্ধ করার মতো এত বড়ো একটা গোঁয়ারের কাজকে পুরুষ চিরকালই অত্যন্ত বেশি সমাদর করেছে; তার কারণ এ নয় যে, হিংসা করাটাকে সে ভালো মনে করে; তার কারণ এই যে, নানাপ্রকার লোভের ও ভয়ের বন্ধনে প্রাণ তাঁকে বেঁধে রাখবার যে বিস্তৃত আয়োজন করে রেখেছে সেইটেকে সে বিনা প্রয়োজনেও অস্বীকার করতে পারলে গর্ব বোধ করে। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের একটি শিশু বালক আছে, তাকে দেখি, আমাদের বাড়িতে যে জায়গাটা স্থিতির পক্ষে সবচেয়ে অযোগ্য, পৃথিবীর ভারাকর্ষণশক্তিটাকে অশ্রদ্ধা জানানো ছাড়া যেখানে ওঠবার আর কোনো হেতুই নেই, সেইখানেই সে চড়ে বসে আছে। মাঝে মাঝে ভারাকর্ষণশক্তিও তাকে ছেড়ে কথা কয় নি, কিন্তু তবু তাকে দমিয়ে দিতে পারলে না। এমনি করে বিদ্রোহে সে হাত পাকাচ্ছে আর কি।

মনে আছে, ছেলেবেলায় আমাদের তেতালার ছাদের সংকীর্ণ কার্নিসটার উপর দিয়ে চলে যাওয়াটাকে উঁচুদরের খেলা বলে মনে করতুম। ভয় করত না বলে নয়, ভয় করত বলেই। ভয় নামক প্রাণের পাহারাওয়ালাটা ঠিক সেই মোড়ের মাথায় দেখা দিত বলেই তাকে ব্যঙ্গ করাটা মজা বলে মনে হত।

পুরুষের মধ্যে এই যে কাণ্ডটা হয়, এ সমস্তই মনের চক্রান্তে। সে বলে, "প্রাণের সঙ্গে আমার নন্‌-কো-অপারেশন যতই পাকা হবে ততই আমার মুক্তি হবে সহজ।" কেন রে বাপু, প্রাণ তোমার কী অপরাধটা করেছে, আর এই মুক্তি নিয়েই বা করবে কী। মন বলে, "আমি অশেষের রাজ্যে সন্ধান করতে বেরব, আমি দুঃসাধ্যের সাধনা করব, দুর্গমের বাধা কাটিয়ে দিয়ে দুর্লভকে উদ্ধার করে আনব। আমি একটু নড়ে বসতে গেলেই যে-দুঃশাসন নানারকম ভয় দেখিয়ে আমাকে পিছমোড়া করে বাঁধতে আসে তাকে আমি সম্পূর্ণ হার মানাব তবে ছাড়ব।" তাই পুরুষ তপস্বী বলে বসে, "না খেয়েই বা বাঁচা যাবে না কেন। নিশ্বাস বন্ধ করলেই যে মরতে হবে, এমন কী কথা আছে।" শুধু তাই নয়, এর চেয়েও শক্ত কথা বলে; বলে, "মেয়েদের মুখ দেখব না। তারা প্রকৃতির গুপ্তচর, প্রাণরাজত্বের যতসব দাস সংগ্রহ করবার তারাই আড়কাঠি।" যে সব পুরুষ তপস্বী নয় শুনে তারাও বলে, "বাহবা।"

প্রকৃতিস্থ অবস্থায় সাধারণত কোনো মেয়ের দল বলে না, পুরুষকে সম্পূর্ণ বর্জন করাটাই তাদের জীবনের চরম এবং মহোচ্চ লক্ষ্য। সম্প্রতি কোথাও কোথাও কখনো এমন কথার আভাস শোনা যায়, কিন্তু সেটা হল আস্ফালন। প্রাণের রাজ্যে মেয়েদের যে চিরকেলে স্থান আছে সেখানকার বন্দরের নোঙর ছিঁড়ে মনটাকে নিয়ে তারা নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, এমন কথা দুই-একজন মেয়ে বলতেও পারে; কারণ, যাত্রারম্ভে ভাগ্যদেবতা যখন জীবনের সম্বল স্ত্রীপুরুষের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে দেয় তখন প্যাক করবার সময় কিছু যে উলটোপালটা হয় না, তা নয়।

আসল কথা হচ্ছে, প্রকৃতির ব্যবস্থায় মেয়েরা একটা জায়গা পাকা করে পেয়েছে, পুরুষরা তা পায় নি। পুরুষকে চিরদিন জায়গা খুঁজতে হবে। খুঁজতে খুঁজতে সে কত নতুনেরই সন্ধান পাচ্ছে কিন্তু চরমের আহ্বান তাকে থামতে দিচ্ছে না, বলছে, "আরো এগিয়ে এসো।"

একজায়গায় এসে যে পৌঁচেছে তার একরকমের আয়োজন, আর যাকে চলতে হবে তার আর-একরকমের। এ তো হওয়াই চাই। স্থিতি যে পেয়েছে বসে বসে ক্রমে ক্রমে চারি দিকের সঙ্গে আপন সম্বন্ধকে সে সত্য করতে, পূর্ণ করতে চেষ্টা করে। কেননা, সম্বন্ধ সত্য হলে তবেই তার মধ্যে মুক্তি পাওয়া যায়। যার সঙ্গে ঘর করতে

হচ্ছে তার সঙ্গে যদি কেবলই খিটিমিটি বাধতে থাকে তা হলে তার মতো জীবনের বাধা আর কিছু নেই। যদি ভালোবাসা হয় তা হলেই তার সঙ্গে সম্বন্ধের মধ্যে মুক্তি ঘটে। সে মুক্তি বাইরের সমস্ত দুঃখ-অভাবের উপর জয়ী হয়। এইজন্যেই মেয়ের জীবনে সকলের চেয়ে বড়ো সার্থকতা হচ্ছে প্রেমে। এই প্রেমে সে স্থিতির বন্ধনরূপ ঘুচিয়ে দেয়; বাইরের অবস্থার সমস্ত শাসনকে ছাড়িয়ে যেতে পারে।

মুক্তি না হলে কর্ম হতে পারে কিন্তু সৃষ্টি হতে পারে না। মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে চরমশক্তি হচ্ছে সৃষ্টিশক্তি। মানুষের সত্যকার আশ্রয় হচ্ছে আপনার সৃষ্টির মধ্যে; তার থেকে দৈন্যবশত যে বঞ্চিত সে 'পরাবসথশায়ী'। মেয়েকেও সৃষ্টি করতে হবে, তবে সে আপনার বাসা পাবে। তার পক্ষে এই সৃষ্টি প্রেমের দ্বারাই সম্ভব। যে-পুরুষসন্ন্যাসী নিজের কৃচ্ছ্রসাধনের প্রবল দম্ভে মনে করে যে, যেহেতু মেয়েরা সংসারে থাকে এই জন্যে তাদের মুক্তি নেই, সে সত্যকে জানে না। যে মেয়ের মধ্যে সত্য আছে সে আপন বন্ধনকে স্বীকার করেই প্রেমের দ্বারা তাকে অতিক্রম করে; বন্ধনকে ত্যাগ করার চেয়ে এই মুক্তি বড়ো। সব মেয়েই যে তার জীবনের সার্থকতা পায় তা নয়; সব পুরুষই কি পায়। অনুরাগের সত্যশক্তি সব মেয়ের নেই, বৈরাগ্যের সত্যশক্তি সব পুরুষে মেলে না।

কিন্তু, অন্তত আমাদের দেশে দেখা যায়, পুরুষ সাধক সংসারকে বন্ধনশালা বলেই জানে; তার থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে বহুদূরে পালিয়ে যাওয়াকেই মুক্তির উপায় মনে করে। তার মানে, আমরা যাকে সংসার বলি স্বভাবত সেটা পুরুষের সৃষ্টিক্ষেত্র নয়। এইজন্যে সেখানে পুরুষের মন ছাড়া পায় না। মেয়েরা যখনই মাতৃত্বের অধিকার পেয়েছে তখনই এমন-সকল হৃদয়বৃত্তি পেয়েছে যাতে করে সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধস্থাপন তাদের পক্ষে সহজ হতে পারে। এই জন্যে যে-মেয়ের মধ্যে সেই হৃদয়বৃত্তির উৎকর্ষ আছে সে আপনার ঘরসংসারকে সৃষ্টি করে তোলে। এ সৃষ্টি তেমনই যেমন সৃষ্টি কাব্য, যেমন সৃষ্টি সংগীত, যেমন সৃষ্টি রাজ্যসাম্রাজ্য। এতে কত সুবুদ্ধি, কত নৈপুণ্য, কত ত্যাগ, কত আত্মসংযম পরিপূর্ণভাবে সম্মিলিত হয়ে অপরূপ সুসংগতি লাভ করেছে। বিচিত্রের এই সম্মিলন একটি অখণ্ডরূপের ঐক্য পেয়েছে; তাকেই বলে সৃষ্টি। এই কারণেই ঘরকন্নায় মেয়েদের এত একান্ত প্রয়োজন; নির্ভরের জন্যে নয়, আরামের জন্যে নয়, ভোগের জন্যে নয়— মুক্তির জন্যে। কেননা, আত্মপ্রকাশের পূর্ণতাতেই মুক্তি।

পূর্বেই বলেছি, মেয়েদের এই সৃষ্টির কেন্দ্রগত জ্যোতির উৎস হচ্ছে প্রেম। এই প্রেম নিজের স্ফূর্তির জন্যে, সার্থকতার জন্যে, যাকে চায় সেই জিনিসটি হচ্ছে মানুষের সঙ্গ। প্রেমের সৃষ্টিক্ষেত্র নিঃসঙ্গ নির্জনে হতেই পারে না, সে ক্ষেত্র সংসারে। ব্রহ্মার

সৃষ্টিক্ষেত্র হতে পারে শূন্যে, কিন্তু বিষ্ণুর শক্তি খাটে লোকজগতে। নারী সেই বিষ্ণুর শক্তি, তার সৃষ্টিতে ব্যক্তিবিশেষের প্রাধান্য ; ব্যক্তিবিশেষের তুচ্ছতাও প্রেমের কাছে মূল্যবান। ব্যক্তিবিশেষের ছোটোবড়ো বিচিত্র দাবির সমস্ত খুঁটিনাটিতে সেই প্রেমের আত্মদানশক্তি নিজেকে বহুধারায় উন্মুক্ত করে। ব্যক্তিবিশেষের সেই নানা ক্ষুধার নানা চাওয়া মেয়ের প্রেমের উদ্যমকে কেবলই জাগিয়ে রেখে দেয়। যে পুরুষ আপন দাবিকে ছোটো করে সে খুব ভালো লোক হতে পারে, কিন্তু মেয়েকে সে পীড়া দেয়, অপূর্ণ করে রাখে। এই জন্যে দেখা যায়, যে পুরুষ দৌরাত্ম্য করে বেশি মেয়ের ভালোবাসা সেই পায় বেশি।

নারীর প্রেম যে পুরুষকে চায় তাকে প্রত্যক্ষ চায়, তাকে নিরন্তর নানা আকারে বেষ্টন করবার জন্যে সে ব্যাকুল। মাঝখানে ব্যবধানের শূন্যতাকে সে সইতে পারে না। মেয়েরাই যথার্থ অভিসারিকা। যেমন করেই হোক, যত দুর্গমই হোক, বিচ্ছেদ পার হবার জন্য তাদের সমস্ত প্রাণ ছটফট করতে থাকে। এই জন্যেই সাধনারত পুরুষ মেয়ের এই নিবিড় সঙ্গবন্ধনের টান এড়িয়ে অতি নিরাপদ দূরত্বের মধ্যে পালাতে ইচ্ছা করে।

পূর্বেই বলেছি, আপন পূর্ণতার জন্যে প্রেম ব্যক্তিবিশেষকে চায়। এই ব্যক্তিবিশেষ জিনিসটি অত্যন্ত বাস্তব জিনিস। তাকে পেতে গেলে তার সমস্ত তুচ্ছ খুঁটিনাটির কোনোটাকে বাদ দেওয়া চলে না, তার দোষ ত্রুটিকেও মেনে নিতে হয়। ব্যক্তিরূপের উপর ভাবের আবরণ টেনে দিয়ে তাকে অপরূপ করে তোলা প্রেমের পক্ষে অনাবশ্যক। অভাবকে অসম্পূর্ণতাকে প্রেম কামনা করে, নইলে তার নিজের সম্পূর্ণতা সফল হবে কিসে।

দেবতার মনের ভাব ঠিকমতো জানি বলে অভিমান রাখি নে কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কার্তিকের চেয়ে গণেশের 'পরে দুর্গার স্নেহ বেশি। এমন-কি, লম্বোদরের অতি অযোগ্য ক্ষুদ্র বাহনটার 'পরে কার্তিকের খোশপোশাকি ময়ূর লোভদৃষ্টি দেয় বলে তার পেখমের অপরূপ সৌন্দর্য সত্ত্বেও তার উপরে তিনি বিরক্ত ; ওই দীনাত্মা ইঁদুরটা যখন তাঁর ভাণ্ডারে ঢুকে তাঁর ভাঁড়গুলোর গায়ে সিঁধ কাটতে থাকে তখন হেসে তিনি তাকে ক্ষমা করেন। শাস্ত্রনীতিজ্ঞ পুরুষবর নন্দী বলে, "মা, তুমি ওকে শাসন কর না, ও বড়ো প্রশ্রয় পাচ্ছে।" দেবী স্নিগ্ধকণ্ঠে বলেন, "আহা, চুরি করে খাওয়াই যে ওর স্বধর্ম, তা ওর দোষ কী! ও যে চোরের দাঁত নিয়েই জন্মেছে, সে কি বৃথা হবে।"

বাক্যের অপূর্ণতাকে সংগীত যেমন আপন রসে পূর্ণ করে তোলে, প্রেম তেমনি সুযোগ্যতার অপেক্ষা করে না, অযোগ্যতার ফাঁকের মধ্যে সে নিজেকে ঢেলে দেবার সুযোগ পায়।

মেয়েদের সৃষ্টির আলো যেমন এই প্রেম তেমনি পুরুষের সৃষ্টির আলো কল্পনাবৃত্তি।

পুরুষের চিত্ত আপন ধ্যানের দৃষ্টি দিয়ে দেখে, আপন ধ্যানের শক্তি দিয়ে গড়ে তোলে। We are the dreamers of dreams— এ কথা পুরুষের কথা। পুরুষের ধ্যানই মানুষের ইতিহাসে নানা কীর্তির মধ্যে নিরন্তর রূপপরিগ্রহ করছে। এই ধ্যান সমগ্রকে দেখতে চায় বলেই বিশেষের অতিবাহুল্যকে বর্জন করে; যে সমস্ত বাজে খুঁটিনাটি নিয়ে বিশেষ সেইগুলো সমগ্রতার পথে বাধার মতো জমে ওঠে। নারীর সৃষ্টি ঘরে, এই জন্যে সব-কিছুকেই সে যত্ন করে জমিয়ে রাখতে পারে; তার ধৈর্য বেশি কেননা, তার ধারণার জায়গাটা বড়ো। পুরুষের সৃষ্টি পথে পথে, এই জন্যে সব-কিছুর ভার লাঘব করে দিয়ে সমগ্রকে সে পেতে ও রাখতে চায়। এই সমগ্রের তৃষ্ণা, এই সমগ্রের দৃষ্টি, নির্মম পুরুষের কত শত কীর্তিকে বহুব্যয়, বহুত্যাগ, বহু পীড়নের উপর স্থাপিত করেছে। পুরুষ অমিতব্যয়ী, সে দুঃসাহসিক লোকসানের ভিতর দিয়ে লাভ করতে কুণ্ঠিত হয় না। কারণ, তার ধ্যান সমস্ত লোকসানকে পেরিয়ে সমগ্র লাভটাকে সুস্পষ্ট দেখে; ছোটো ছোটো ক্ষতি তার কাছে নগণ্য হয়ে যায়। পুরুষের কল্পনাবৃত্তির সাহস এত অত্যন্ত বেশি তার কারণ, স্থিতির ক্ষেত্রে স্থির হয়ে বসে বিচিত্রের সহস্র খুঁটিনাটিকে মমত্বের আঁকড়ি দিয়ে জড়িয়ে ধরবার দীর্ঘ সময় তার কখনো ছিল না। এই জন্যে সৃষ্টির প্রয়োজনে প্রলয় করতে তার দ্বিধা নেই।

মোট কথা বাস্তবের মধ্যে যেসব বিশেষের বাহুল্য আছে তাকে বাদ দিয়ে পুরুষ একের সম্পূর্ণতা খোঁজে। এই জন্যেই অধ্যাত্মরাজ্যে পুরুষেরই তপস্যা; এই জন্যে সন্ন্যাসের সাধনায় এত পুরুষের এত আগ্রহ। এবং এই জন্যেই ভাবরাজ্যে পুরুষের সৃষ্টি এত বেশি উৎকর্ষ এবং জ্ঞানরাজ্যে এত বেশি সম্পদ লাভ করেছে।

পুরুষের এই সমগ্রতার পিপাসা তার প্রেমেও প্রকাশ পায়। সে যখন কোনো মেয়েকে ভালোবাসে তখন তাকে একটি সম্পূর্ণ অখণ্ডতায় দেখতে চায় আপনার চিত্তের দৃষ্টি দিয়ে, ভাবের দৃষ্টি দিয়ে। পুরুষের কাব্যে বারবার তার পরিচয় পাওয়া যায়। শেলির এপিসিকীডিয়ন্‌ পড়ে দেখো। মেয়েরা এ কথা জানে। পুরুষের এই প্রার্থনা মেয়েদের বিশেষ করে সৃষ্টি করতে থাকে। কেননা, প্রার্থনার বেগ, প্রার্থনার তাপ, মানুষের সংসারে সৃষ্টির একটা প্রধান শক্তি। আমরা কী চাইব সেটা যদি ঠিকমতো ধরতে পারি তা হলে আমরা কী পাব সেটা নিয়ে ভাবতে হয় না। পুরুষেরা একরকম ক'রে চেয়ে চেয়ে মেয়েদের একরকম করে গড়ে তুলেছে। মেয়েরা আপনার জীবনে এত জায়গায় এত পর্দা খাটায় এই জন্যে; আপনার থেকে সে কত কী বাদ দিয়ে চলে। আমরা বলি লজ্জা স্ত্রীলোকের ভূষণ। তার মানে, লজ্জা হচ্ছে সেই বৃত্তি যাতে করে মেয়েরা আপনার বাস্তবের বাহুল্যকে সরিয়ে রাখে; মেয়ের রাজ্যে এই

জন্তে মস্ত একটা অগোচরতার ব্যবস্থা আছে। সে আপনার এতখানি বাকি রেখেছে যা পুরুষ আপনার মন দিয়ে পুরিয়ে নিতে পারে। সে আপনার খাওয়া-শোওয়া, চাল-চলন, বাসনা-সাধনা, সমস্ত থেকেই অতিবাস্তবের প্রত্যক্ষতা এতটা পরিমাণে ঢাকা দেয় যাতে পুরুষের ভাবের মধ্যে তার ছবি সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে বাধা না পায়।

মেয়েদের সঙ্গে পুরুষের ব্যবহারে সম্পূর্ণ এর উলটো দিকটাও দেখা যায়। পুরুষ কখনো কখনো এমন কাণ্ড করে যেন নারীর মধ্যে অনির্বচনীয়তার কোনো আভাস নেই, যেন তার মাটির প্রদীপে কোনো আলোই জ্বলে নি; তখন লুব্ধ দাঁত দিয়ে তাকে সে আখের মতো চিবিয়ে আবর্জনার মধ্যে ফেলে দেয়। সাত্ত্বিকের ঠিক উলটোপিঠেই থাকে তামসিক, পূর্ণিমারই অন্ত পারে অমাবস্যা। রাস্তার এ দিকটাতে যে সত্য থাকে ঠিক তার সামনের দিকেই তার বিপরীতের বাসা। কেউ সাক্ষ্য দেয় বাঘেরই অস্তিত্বের। সেই একই কারণে মেয়ে সংসারস্থিতির লক্ষ্মী, আবার সংসার ছারখার করবার প্রলয়ংকরীও তার মতো কেউ নেই।

যা হোক, এটা দেখা যাচ্ছে, সর্বত্রই সর্বকালেই মেয়ে নিজের চার দিকেই একটা বিচিত্র চিত্রখচিত বেড়ার দুরত্ব তৈরি করে রেখেছে। দুর্গমকে পার হবার জন্তে পুরুষের যে স্বাভাবিক অধ্যবসায় আছে সেইটেকে যতটা পারে সে জাগরূক করে রাখে। পড়ে-পাওয়া জিনিস মূল্যবান হলেও তাতে পুরুষের তৃপ্তি নেই; যাকে সে জয় করে পায় তাকেই সে যথার্থ পায় বলে জানে; কেননা, জয় করে পাওয়া হচ্ছে মন দিয়ে পাওয়া। এই জন্তে অনেক ছল-যুদ্ধের আয়োজনে মেয়েদের সময় কাটে।

নীতিনিপুণ বলে বসবে, এই মায়া তো ভালো নয়। পুরুষ নিজেই চিরকাল ধরে দাবি করলে এই মায়াকে; এই মায়াসৃষ্টির বড়ো বড়ো উপকরণ সে জুগিয়ে দিলে নিজের কল্পরাজ্য থেকে; কবিরা চিত্রীরা মিলে নারীর চার দিকে রঙবেরঙের মায়ামণ্ডল আপন ইচ্ছায় বানিয়ে দিলে— অবশেষে এই মায়ার কাছে পরাভবশঙ্কায় ত্রস্ত সাধুসজ্জন মেয়েজাতকে মায়াবিনী বলে গাল দিতে লেগেছে; তার মায়াদুর্গের উপরে বহুকাল থেকে তারা নীরস শ্লোকের শতঘ্নী বর্ষণ করছে, কোথাও দাগ পড়ছে না।

যারা বাস্তবের উপাসক তারা অনেকে বলে, মেয়েরা অবাস্তবের কুয়াশা দিয়ে নিজেকে ঢেকে ফেলেছে— এ-সমস্তর ভিতর থেকে একেবারে খাঁটি সত্য মেয়েটিকে উদ্ধার করা চাই। তাদের মতে, সাহিত্যে শিল্পে সব জায়গাতেই এই অবাস্তব মেয়ের ভূতের উপদ্রব অত্যন্ত বেশি। এরা মনে করে, মায়া থেকে ছাড়িয়ে নিলেই বাস্তব সত্যকে পাওয়া যাবে।

কিন্তু, বাস্তব সত্য বলে কোনো জিনিস কি সৃষ্টিতে আছে। সে সত্য যদি বা

থাকে তবে এমন সম্পূর্ণ নির্বিকার মন কোথায় পাওয়া যাবে যার মধ্যে তার বিশুদ্ধ প্রতিবিম্ব পড়তে পারে! মায়াই তো সৃষ্টি; সেই সৃষ্টিকেই যদি অবাস্তব বল তা হলে অনাসৃষ্টি আছে কোন্ চুলোয়? তার নাগাল পাবে কোন্ পণ্ডিত?

নানা ছলা কলায় হাবে ভাবে সাজে-সজ্জায় নারী নিজের চার দিকে যে একটি রঙিন রহস্য সৃষ্টি করে তুলেছে সেই আবরণটা ছাড়িয়ে নিয়ে দেখাই তাকে সত্য দেখা, এ কথা মানি নে। গোলাপ ফুলের মায়ার পর্দাটা তুলে ফেলে তাকে কার্বন নাইট্রোজেন বলে দেখা যেমন সত্য দেখা নয়, এও তেমনি। তুমি বাস্তববাদী বলবে, গোলাপ ফুলের মায়া অকৃত্রিম, মেয়ের মায়া কৃত্রিম। একেবারেই বাজে কথা। মেয়ে নিজের হাতে রং বেঁটে যখন তার কাপড় রাঙায় তখন তার হাতের গোপনে সেই প্রকৃতিই থাকে যে প্রকৃতি সকলের অগোচরে প্রজাপতির পাখায় নিজের অদৃশ্য তুলি বুলিয়ে দেয়। প্রাণের রাজ্যে মায়ার খেলা কত বর্ণে গন্ধে রসে, কত লুকোচুরিতে, আভাসে ইশারায় দিনরাত প্রকাশ পাচ্ছে। প্রকৃতির সেই-সকল নিত্য অথচ অনিত্য চঞ্চলতায়, সেই-সব নিরর্থক হাব-ভাবেই তো বিশ্বের সৌন্দর্য। চিরপলাতকের এই চিরপরিবর্তনশীল লীলা থেকে বাদ দিয়ে যে অতি সারবান ভারবান নিশ্চল ধুলোমাটি লোহাপাথরের পিণ্ডটা বাকি থাকে তাকেই তুমি বাস্তবসত্য বল না-কি। বসনে ভূষণে, আড়ালে আবডালে, দ্বিধায় দ্বন্দ্বে, ভাবে ভঙ্গীতে মেয়ে তো মায়াবিনীই বটে। তার মায়ার জগতে সে ইন্দ্রজাল বিস্তার করেছে— যেমন মায়া যেমন ইন্দ্রজাল জলে স্থলে, ফুলে ফলে, সমুদ্র পর্বতে, ঝড়ে বন্যায়।

যাই হোক্, এই মায়াবিনীই চাঁদের সঙ্গে, ফুলের সঙ্গে, নববর্ষার মেঘের সঙ্গে, কলনৃত্যভঙ্গিনী নদীর সঙ্গে মিলে পুরুষের সামনে এসে দাঁড়াল। এই নারী একটা বাস্তবের পিণ্ডমাত্র নয়; এর মধ্যে কলাসৃষ্টির একটা তত্ত্ব আছে; অগোচর একটি নিয়মের বাঁধনে ছন্দের ভঙ্গীতে সে রচিত; সে একটি অনির্বচনীয় সুসমাপ্তির মূর্তি। নানা বাজে খুঁটিনাটিকে সে মধুর নৈপুণ্যে সরিয়ে দিয়েছে; সাজে-সজ্জায় চালে চলনে নানা ব্যঞ্জনা দিয়ে নিজেকে সে বস্তুলোকের প্রত্যন্তদেশে রসলোকের অধিবাসিনী করে দাঁড় করিয়েছে। "কাজ করে থাকি" এই কথাটা জানিয়ে পুরুষ হাত খালি রেখেছে; মেয়ে সেই হাতে কাঁকন পরে জানিয়েছে, "আমি তো কাজ করি নে, আমি সেবা করি।" সেবা হল হৃদয়ের সৃষ্টি, শক্তির চালনা নয়। যে রাস্তায় চলবে সেই রাস্তাটাকে খুব স্পষ্ট করে নিরীক্ষণ করবার জন্যে পুরুষ তার চোখদুটো খুলে রেখেছে, ওটাকে সে গম্ভীর ভাষায় বলে দর্শনেন্দ্রিয়। মেয়ে সেই চোখে একটু কাজলের রেখা টেনে দিয়ে বলেছে, চোখ দিয়ে বাইরের জিনিস দেখা যায় এইটেই চরম কথা নয়— চোখের ভিতরেও দেখবার জিনিস আছে, হৃদয়ের বিচিত্র মায়া।

অন্তরে বাহিরে হৃদয়ের রাগরঞ্জিত লীলা নিয়ে পুরুষের জগতে নারী মূর্তিমতী কলা-লক্ষ্মী হয়ে এল। রস যেখানে রূপ গ্রহণ করে সেই কলামূর্তির গুণ হচ্ছে এই যে, তার রূপ তাকে অচল বাঁধনে বাঁধে না। খবরের কাগজের সংবাদ-লেখা প্যারাগ্রাফে ছন্দ নেই, রস নেই, সেই জন্যে সে একেবারে নিরেট, সে যা সে তাই মাত্র। মন তার মধ্যে ছুটি পায় না। ভালো কবিতা যে রূপ গ্রহণ করে সে রূপ নির্দিষ্ট হয়েও অনির্দিষ্ট, পাঠকের স্বাতন্ত্র্যকে সে হাঁকিয়ে দেয় না। মনে আছে, বহুকাল হল, রোগশয্যায় কালিদাসের কাব্য আগাগোড়া সমস্ত পড়েছিলুম। যে আনন্দ পেলুম সে তো আবৃত্তির আনন্দ নয়, সৃষ্টির আনন্দ। সেই কাব্যে আমার মন আপন বিশেষ স্বত্ব উপলব্ধি করবার বাধা পেল না। বেশ বুঝলুম, এ সব কাব্য আমি যে রকম করে পড়লুম দ্বিতীয় আর-কেউ তেমন করে পড়ে নি।

মেয়ের মধ্যেও পুরুষের কল্পনা তেমনি করেই আপন মুক্তি পায়। নারীর চারি দিকে যে-পরিমণ্ডল আছে তা অনির্বচনীয়তার ব্যঞ্জনা দিয়ে তৈরি; পুরুষের কল্পনা সেখানে আপনার রসের রং, আপনার ভাবের রূপ মিলিয়ে দিতে কঠিন বাধা পায় না। অর্থাৎ, সেখানে তার নিজের সৃষ্টি চলে, এই জন্যে তার বিশেষ আনন্দ। মোহমুক্ত মানুষ তাই দেখে হাসে; কিন্তু মোহমুক্ত মানুষের কাছে সৃষ্টি ব'লে কোনো বালাই নেই, সে প্রলয়ের মধ্যে বাস করে।

পূর্বেই বলেছি, মেয়ের প্রেম পুরুষের সমস্ত খুঁটিনাটি দোষত্রুটি সমেত বিশেষত্বকে প্রত্যক্ষ করে পেতে চায়। সঙ্গ তার নিতান্তই চাই। পুরুষও আপনাকে লুকিয়ে রাখে নি, ঢেকে রাখে নি; সে অত্যন্ত অসজ্জিত এলোমেলো আটপৌরে ভাবেই মেয়ের ভালোবাসার কাছে আগাগোড়া নিজেকে ফেলে রেখে দিয়েছে, এতেই মেয়ে যথার্থ সঙ্গ পায়, আনন্দ পায়।

কিন্তু, পুরুষের পক্ষে মেয়ে আপনার সঙ্গে সঙ্গেই একটা দূরত্ব নিয়ে আসে; তার মধ্যে খানিকটা পরিমাণে নিষেধ আছে, ঢাকা আছে। ফোটোগ্রাফের মধ্যে সব আছে, কিন্তু আর্টিস্টের ছবির মধ্যে সব নেই; এই জন্যে তাতে যে ফাঁকা থাকে সেইখানে রসজ্ঞের মন কাজ করতে পারে। সেইরকমের ফাঁকাটুকু মেয়েদের একটা সম্পদ, সেটা সম্পূর্ণ লুপ্ত করতে নেই। বিয়াত্রিচে দান্তের কল্পনাকে যেখানে তরঙ্গিত করে তুলেছে সেখানে বস্তুত একটি অসীম বিরহ। দান্তের হৃদয় আপনার পূর্ণচন্দ্রকে পেয়েছিল বিচ্ছেদের দূর আকাশে। চণ্ডীদাসের সঙ্গে রজকিনী রামীর হয়তো বাইরের বিচ্ছেদ ছিল না, কিন্তু কবি যেখানে তাকে ডেকে বলছে,

> তুমি বেদবাদিনী, হরের ঘরনী,
>
> তুমি সে নয়নের তারা—

সেখানে রজকিনী রামী কোন্ দূরে চলে গেছে তার ঠিক নেই। হোক-না সে নয়নের তারা তবুও যে নারী বেদবাদিনী, হরের ঘরনী, সে আছে বিরহলোকে। সেখানে তার সঙ্গ নেই, ভাব আছে। নারীর প্রেমে মিলনের গান বাজে, পুরুষের প্রেমে বিচ্ছেদের বেদনা।

২রা অক্টোবর ১৯২৪

আমি বলছিলুম, মেয়েরা পর্দানশিন। যে কৃত্রিম পর্দা দিয়ে কৃপণ পুরুষ তাদের অদৃশ্য করে লুকিয়ে রাখে আমি সেই বর্বর পর্দাটার কথা বলছি নে; নিজেকে সুসমাপ্তভাবে প্রকাশ করবার জন্যেই তারা যে সব আবরণকে সহজপটুত্বে আভরণ করে তুলেছে আমি তার কথাই বলছি। এই যে নিজের দেহকে, গৃহকে, আচরণকে, মনকে নানা বর্ণ দিয়ে, ভঙ্গী দিয়ে, সংযম দিয়ে, অনুষ্ঠান দিয়ে, নিজের বিচিত্র একটি বেষ্টনকে তারা সুসজ্জিত করতে পেরেছে, এর কারণ, তারা স্থিতির অবকাশ পেয়েছে। স্থিতির মূল্যই হচ্ছে তার আবরণের ঐশ্বর্যে, তার চারি দিকের দাক্ষিণ্যে, তার আভাসে, ব্যঞ্জনায়, তার হাতে যে সময় আছে সেই সময়টার মনোহর বৈচিত্র্যে। সবুরে মেওরা ফলে, কেননা, মেওয়া যে প্রাণের জিনিস, কলের ফরমাশে তাকে তাড়াহুড়ো করে গড়ে তোলা যায় না। সেই বহুমূল্য সবুরটা হচ্ছে স্থিতির ঘরের জিনিস। এই সবুরটাকে যদি সরস এবং সফল করতে না পারা গেল তবে তার মতো আপদ আর নেই। মরুভূমি অনাবৃত, তার অবকাশের অভাব নেই অথচ সেই অবকাশ রিক্ত; এই কঠিন নগ্নতা পীড়া দেয়। কিন্তু, যেখানে পোড়ো জমি পোড়ো হয়ে নেই সেখানে সে ফসলে ঢাকা, ফুলে বিচিত্র; সেখানে তার সবুজ ওড়না বাতাসে দুলে উঠছে। যে পথিক পথে চলে সেখানেই সে পায় তার তৃষ্ণার জল, ক্ষুধার অন্ন, তার আরামের ছায়া, ক্লান্তির শুশ্রূষা। সেখানকার স্থিতির পূর্ণতাই তার গতির সহায়; অবারিত মরুভূমি সবচেয়ে বাধা। নারী স্বভাবতই যে স্থিতি পেয়েছে বসে বসে ধীরে ধীরে সেই স্থিতিকে রাঙিয়ে তুলে আপন হৃদয়রসে রসিয়ে নিয়ে তাই দিয়ে আপন বুকের কাঁচলি আপন মুখের ঘোমটা বানিয়েছে। এই ঢাকাতেই সে আপনার ঐশ্বর্য প্রকাশ করেছে পুষ্পপল্লবের আবরণেই যেমন লতার ঐশ্বর্য।

কিন্তু হঠাৎ আজকাল পাশ্চাত্যসমাজে শুনতে পাচ্ছি, নারী বলছে, "আমি মায়ার আবরণ রাখব না, পুরুষের সঙ্গে ব্যবধান ঘুচিয়ে দেব। আমি হব বিজ্ঞানের চাঁদ; তার চারি দিকে বায়ুমণ্ডল নেই, মেঘ নেই, রং নেই, কোমল শ্যামলের চঞ্চল বিচিত্রতা

নেই, তার কালো কালো ক্ষতগুলোর উপরে পর্দা নেই, আমিও হব তেমনি। এতদিন যাকে বলে এসেছি লজ্জা, যাকে বলে এসেছি শ্রী, আজ তাতে আমার পরাভব ঘটছে; সে সব বাধা বর্জন করব। পুরুষের চালে তার সমান তালে পা ফেলে তার সমান রাস্তায় চলব।" এমন কথা যে একদল স্ত্রীলোকের মুখ দিয়ে বের হল, এটা সম্ভব হল কী করে। এতে বোঝা যায়, পুরুষের প্রকৃতির মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছে। মেয়েকে সে চাচ্ছে না। এমন নয় যে সে হঠাৎ সন্ন্যাসী হয়ে উঠেছে; ঠিক তার উলটো— সে হয়েছে বিষয়ী; মেয়েকে সে কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিতে চায়; কড়ায় গণ্ডায় যার হিসাব মেলে না তাকে সে মনে করে বাজে জিনিস, তাকে সে মনে করে ঠকা। সে বলে, "আমি চোখ খুলে সব স্পষ্ট করে তন্ন তন্ন করে দেখব।" অর্থাৎ, ধ্যানের দেখায় যা মনকে ভরিয়ে তোলে সেটাকে সে জানে ফাঁকি। কিন্তু, পুরুষের সংসারে সত্যকার মেয়ে তো কেবলমাত্র চোখের দেখার নয়, সে তো ধ্যানের জিনিসও বটে। সে যে শরীরী অশরীরী দু'য়ে মিলিয়ে, পৃথিবী যেমন নিজের মাটি ধুলো এবং নিজের চার দিকের অসীম আকাশ ও বায়ুমণ্ডল মিলিয়ে। মেয়ের যা অশরীরী তা যে শরীরী মেয়েকে ঘিরে আছে; তার ওজন নেই, কিন্তু তার বর্ণ আছে, ভঙ্গী আছে; তা ঢাকে অথচ তা প্রকাশ করে।

পাশ্চাত্য সভ্যতায় যারা উন্নতির বড়াই করে, তারা বলবে, এই মেয়েলির প্রতি অসহিষ্ণুতায় চলার উৎসাহ প্রকাশ পায়। আমার মনে হয়, এটাই থামবার পূর্বলক্ষণ। চলার ছন্দই থাকে না যদি স্থিতির সঙ্গে তার সমস্ত আপস একেবারে মিটে যায়। গাড়িটার ঘোড়াও চলছে, সারথিও চলছে, যাত্রীরাও চলছে, গাড়ির জোড় খুলে গিয়ে তার অংশপ্রত্যংশগুলোও চলছে, একে তো চলা বলে না; এ হচ্ছে মরণোন্মুখ চলার উন্মত্ত প্রলাপ, সাংঘাতিক থামার ভূমিকা। মেয়েরা সমাজের চলাকেই স্থিতির ছন্দ দেয়— সে ছন্দ সুন্দর।

একদল মেয়ে বলতে শুরু করেছে যে, "মেয়ে হওয়াতে আমাদের অগৌরব, আমাদের ক্ষতি। অর্থাৎ, আমাদের আত্মপ্রকাশের ধারায় পুরুষের সঙ্গে প্রভেদটাতে পীড়া পাচ্ছি।" এর থেকে বোধ হচ্ছে, একদিন যে পুরুষ সাধক ছিল এখন সে হয়েছে বণিক। বণিক বাইরের দিকে যদিবা চলে, অন্তরের দিকে আপনার সঞ্চয়ের বোঝার কাছে সতর্ক হয়ে পড়ে আছে। তার স্থিতি সারবান কিন্তু সুন্দর নয়। তার কারণ, মানুষের সম্বন্ধকে হৃদয়মাধুর্যে সত্য ক'রে পূর্ণ ক'রে তোলা তার স্থিতির ধর্ম নয়; ধনসঞ্চয়ের তলায় মানুষের সম্বন্ধকে চাপা দিয়ে চ্যাপটা করে দেওয়াই হয়েছে তার কাজ। সুতরাং, সে যে কেবল চলে না তা নয়, আপন স্থিতিকে ভারগ্রস্ত নীরস নির্মম

অসুন্দর করে। অঙ্কের কোঠার মধ্যে যাকে ধরে না তাকে সে আবর্জনার মধ্যে ফেলে দেয়।

পুরুষ একদিন ছিল মিস্টিক্, ছিল অতল রসের ডুবারি, ছিল ধ্যানী। এখন সে হয়েছে মেয়েদের মতোই সংসারী। কেবল প্রভেদ এই যে, তার সংসারে আলো নেই, বাতাস নেই, আকাশ নেই; বস্তুপিণ্ডে সমস্ত নিরেট। সে ভারি ব্যস্ত। এই ব্যস্ততার মধ্যে সেই আকাশ সে পায় না যে আকাশে আপন কল্পনাকে রূপে রসে মুক্তি দিতে পারে।

আজকালকার কবি আপন কাব্যে, শিল্পী আপন কারুতে, অনির্বচনীয়কে সুন্দরকে অবজ্ঞা প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে। এটা কি পৌরুষের উলটো নয়। পুরুষই তো চিরদিন সুন্দরের কাছ থেকে আপন শক্তির জয়মাল্য কামনা করেছে। মিস্টিক্ পুরুষ তার ধ্যানশক্তিতে, তার ফলাসক্তিবিহীন সাধনায়, বাস্তবের আবরণ একটার পর একটা যতই মোচন করেছে ততই রসের লোকে, অধ্যাত্মলোকে সে ভূমার পরিচয় পেয়েছে। আজ কেবলই সে থলির পর থলির মুখ বাঁধছে, সিন্দুকের পর সিন্দুকে তালা লাগাচ্ছে; আজ তার সে মুক্তি নেই যে মুক্তির মধ্যে সুন্দর আপন সিংহাসন রচনা করে। তাই তার মেয়েরা বলছে, "আমরা পুরুষ সাজব।" তাই তার কাব্যসরস্বতী বলছে, বীণার তারগুলোকে যত্ন করে না বাঁধলে যে-সুরটা ঝন্‌ঝন্ করতে থাকে সেইটেই খাঁটি বাস্তবের সুর, উপেক্ষার উচ্ছৃঙ্খল দুরন্তপনায় রূপের মধ্যে যে বিপর্যয় যে ছিন্নভিন্নতা ঘটে সেইটেই আর্ট।

দিন চলে গেল। ভুলে ছিলুম যে, সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে চলেছি। মন চলেছিল আপন রাস্তায়, এক ভাবনা থেকে আর-এক ভাবনায়। চলেছিল বললে বেশি বলা হয়। উট যেমন বোঝা পিঠে নিয়ে মরুর মধ্যে পথ আন্দাজ করে চলে এ তেমন চলা নয়; এ যেন পথের খেয়াল না রেখে ভেসে যাওয়া, কোনো বিশেষ ঘাটের কাছে বায়না না নিয়ে শুধু-শুধু বেরিয়ে পড়া, কথাগুলোকে নিজের চেষ্টায় চালনা না ক'রে দিকের হিসেব না রেখে তাদের আপনার ঝোঁকে চলতে দেওয়া। তার সুবিধা হচ্ছে এই যে, কথাগুলো নিজেরাই হয় বক্তা, আর মনটা হয় শ্রোতা। মন তখন অন্যকে কিছু দেবার কথা ভাবে না, নিজের কাছ থেকে নিজে পায়। মনের ভূগোলে অনাবিষ্কৃতের আর অন্ত নেই। সে-সব জায়গায় পৌঁছে দেবার পথগুলো সবই নদীর মতো, অর্থাৎ সে পথ নিজে চলে ব'লেই চালায়; তারই স্রোতে মন আপনাকে ভাসিয়ে দিতে পারলে নিজের মধ্যে অপরিচিতের পরিচয় পেতে থাকে। আর্যাবর্তের বুকের উপর দিয়ে যে গঙ্গা চলে গেছে সেই তো ভারতবর্ষের অপরিচিত পূর্বের সঙ্গে অপরিচিত

পশ্চিমকে সহজেই মুখোমুখি করে দিয়েছিল। তেমনি যে মানুষের মনের মাঝখান দিয়ে চলতি নদী থাকে সে মানুষ আপনার কাছ থেকে আপনি শিক্ষা করবার সুযোগ পায়। আমার মনে সেই নদীটা আছে। তারই ডাকে ছেলেবেলায় আমি ইস্কুল পালিয়েছিলুম। যে-সব জ্ঞান শিখে শিখতে হয় তার বিস্তর অভাব রয়ে গেল কিন্তু অন্যদিকে ক্ষতিপূরণ হয়েছে। সেজন্যে আমার মনের ভিতরকার ভাগীরথীকে আমি প্রণাম করি।

বাইরে ডেকে এসে দাঁড়ালুম। তখন সূর্য অল্পক্ষণ আগেই অস্ত গেছে। শান্ত সমুদ্র, মৃদু বাতাসটা যেন মুখচোরা। জল ঝিল্‌মিল্‌ করছে। পশ্চিমদিক্‌প্রান্তে দু-একটা মেঘের টুকরো সোনার ধারায় অভিষিক্ত হয়ে স্থির হয়ে পড়ে আছে। আর-একটু উপরে তৃতীয়ার চাঁদের কণা। সেখানকার আকাশে তখনো সন্ধ্যার ঘোর লাগে নি; দিনের সভা যদিও ভেঙে গেছে, তবু সেখানে তার সাদা জাজিমখানা পাতা। চাঁদটাকে দেখে মনে হচ্ছে, যেন অসময়ে অজায়গায় এসে পড়েছে। যেন একদেশের রাজপুত্র আর-এক রাজার দেশে হঠাৎ উপস্থিত, যথোচিত অভ্যর্থনার আয়োজন হয় নি, তার নিজের অনুচর তারাগুলো পিছিয়ে পড়েছে। এদিকে ঠিক সেই সময়ে পশ্চিম আকাশের সমস্ত সোনার মশাল, সমস্ত সমারোহ, সূর্যের অস্তযাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত; ওই চাঁদটুকুকে কেউ দেখতেই পাচ্ছে না।

এই জনশূন্য সমুদ্র ও আকাশের সঙ্গমস্থলে পশ্চিমদিগন্তে একখানি ছবি দেখলুম। অল্প কয়েকটি রেখা, অল্প কিছু উপকরণ; আকাশ এবং সমুদ্রের নীলের ভিতর দিয়ে অবসানদিনের শেষ আলো যেন তার শেষ কথাটি কোনো একটা জায়গায় রেখে যাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে বেরিয়ে আসতে চায়, কিন্তু উদাস শূন্যের মধ্যে ধরে রাখবার জায়গা কোথাও না পেয়ে ম্লান হয়ে পড়ছে— এই ভাবটিই যেন সেই ছবিটির ভাব।

ডেকের ওপর স্তব্ধ দাঁড়িয়ে শান্ত একটি গভীরতার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে আমি যা দেখলুম তাকে আমি বিশেষ অর্থেই ছবি বলছি, যাকে বলে দৃশ্য এ তা নয়। অর্থাৎ, এর মধ্যে যা-কিছুর সমাবেশ হয়েছে কেউ যেন সেগুলিকে বিশেষভাবে বেছে নিয়ে পরস্পরকে মিলিয়ে, একটি সম্পূর্ণতার মধ্যে সাজিয়ে ধরেছে। এমন একটি সরল গভীর মহৎ সম্পূর্ণতার ছবি কলকাতার আকাশে একমুহূর্তে এমন সমগ্র হয়ে আমার কাছে হয়তো দেখা দিত না। এখানে চারি দিকের এই বিপুল রিক্ততার মাঝখানে এই ছবিটি এমন একান্ত এক হয়ে উঠে আমার কাছে প্রকাশ পেলে। একে সম্পূর্ণ করে দেখবার জন্যে এতবড়ো আকাশ এবং এত গভীর স্তব্ধতার দরকার ছিল।

জাপানের কথা আমার মনে পড়ে। ঘরের মধ্যে একেবারে কোনো আসবাব নেই একটি দেয়ালে একখানি ছবি ঝুলছে। ওই ছবি আমার সমস্ত চোখ একা

অধিকার ক'রে ; চারি পাশে কোথাও চিত্তবিক্ষেপ করবার মতো কিছুই নেই। রিক্ততার আকাশে তার সমস্ত অর্থটি জ্যোতির্ময় হয়ে প্রকাশ পায়। ঘরে যদি নানা জিনিস ভিড় করত তবে তাদের মধ্যে এই ছবি থাকত একটি আসবাবমাত্র হয়ে, তার ছবির মাহাত্ম্য ম্লান হত, সে আপনার সব কথা বলতে পারত না।

কাব্য সংগীত প্রভৃতি অন্য-সমস্ত রসসৃষ্টিও এইরকম বস্তুবাহুল্যবিরল রিক্ততার অপেক্ষা রাখে। তাদের চারি দিকে যদি অবকাশ না থাকে তা হলে সম্পূর্ণ মূর্তিতে তাদের দেখা যায় না। আজকালকার দিনে সেই অবকাশ নেই, তাই এখনকার লোকে সাহিত্য বা কলাসৃষ্টির সম্পূর্ণতা থেকে বঞ্চিত। তারা রস চায় না, মদ চায় ; আনন্দ চায় না, আমোদ চায়। চিত্তের জাগরণটা তাদের কাছে শূন্য, তারা চায় চমকলাগা। ভিড়ের ঠেলাঠেলির মধ্যে অন্যমনস্কের মন যদি কাব্যকে গানকে পেতে হয় তা হলে তার খুব আড়ম্বরের ঘটা করা দরকার। কিন্তু, সে আড়ম্বরে শ্রোতার কানটাকেই পাওয়া যায় মাত্র, ভিতরের রসের কথাটা আরো বেশি করে ঢাকাই পড়ে। কারণ, সরলতা স্বচ্ছতা আর্টের যথার্থ আভরণ। যেখানে কোলাহল বেশি, ভিড় বৃহৎ, মন নানা-কিছুতে বিক্ষিপ্ত, আর্ট সেখানে কসরত দেখাবার প্রলোভনে মজে, আপনাকে দেখাতে ভুলে যায়। আড়ম্বর জিনিসটা একটা চীৎকার ; যেখানে গোলমালের অন্ত নেই সেখানে তাকে গোচর হয়ে ওঠবার জন্যে চীৎকার করতে হয় ; সেই চীৎকারটাকেই ভিড়ের লোক শক্তির লক্ষণ জেনে পুলকিত হয়ে ওঠে। কিন্তু, আর্ট তো চীৎকার নয়, তার গভীরতম পরিচয় হচ্ছে তার আত্মসংবরণে। আর্ট বরঞ্চ ঠেলা খেয়ে চুপ করে যেতে রাজি আছে, কিন্তু ঠেলা মেরে পালোয়ানি করার মতো লজ্জা তার আর নেই। হায় রে লোকের মন, তোমাকে খুশি করবার জন্যে রামচন্দ্র একদিন সীতাকে বিসর্জন দিয়েছিলেন ; তোমাকে ভোলাবার জন্যেই আর্ট আজ আপনার শ্রী ও হ্রী বিসর্জন দিয়ে নৃত্য ভুলে পাঁয়তারা মেরে বেড়াচ্ছে।

হারুনা-মারু জাহাজ

৩রা অক্টোবর ১৯২৪

এখনো সূর্য ওঠে নি। আলোকের অবতরণিকা পূর্ব আকাশে। জল স্থির হয়ে আছে সিংহবাহিনীর পায়ের তলাকার সিংহের মতো। সূর্যোদয়ের এই আগমনীর মধ্যে মজে গিয়ে আমার মুখে হঠাৎ ছন্দে-গাঁথা এই কথাটা আপনিই ভেসে উঠল—

হে ধরণী, কেন প্রতিদিন
তৃপ্তিহীন
একই লিপি পড় বারে বারে।

বুঝতে পারলুম আমার কোনো একটি আগন্তুক কবিতা মনের মধ্যে এসে পৌঁছবার আগেই তার ধুয়োটা এসে পৌঁচেছে। এইরকমের ধুয়ো অনেক সময়ে উড়ো বীজের মতো মনে এসে পড়ে, কিন্তু সব সময়ে তাকে এমন স্পষ্ট করে দেখতে পাওয়া যায় না।

সমুদ্রের দূর তীরে যে ধরণী আপনার নানা-রঙ আঁচলখানি বিছিয়ে দিয়ে পুবের দিকে মুখ করে একলা বসে আছে, ছবির মতো দেখতে পেলুম, তার কোলের উপর একখানি চিঠি পড়ল খসে কোন্ উপরের থেকে। সেই চিঠিখানি বুকের কাছে তুলে ধরে সে একমনে পড়তে বসে গেল; তালতমালের নিবিড় বনচ্ছায়া পিছনে রইল এলিয়ে, নুয়ে-পড়া মাথার থেকে ছড়িয়ে-পড়া এলোচুল।

আমার কবিতার ধুয়ো বলছে, প্রতিদিন সেই একই চিঠি। সেই একখানির বেশি আর দরকার নেই; সেই ওর যথেষ্ট। সে এত বড়ো, তাই সে এত সরল। সেই একখানিতেই সব আকাশ এমন সহজে ভরে গেছে।

ধরণী পাঠ করছে কত যুগ থেকে। সেই পাঠ-করাটা আমি মনে মনে চেয়ে দেখছি। সুরলোকের বাণী পৃথিবীর বুকের ভিতর দিয়ে, কণ্ঠের ভিতর দিয়ে, রূপে রূপে বিচিত্র হয়ে উঠল। বনে বনে হল গাছ, ফুলে ফুলে হল গন্ধ, প্রাণে প্রাণে হল নিশ্বসিত। একটি চিঠির সেই একটি মাত্র কথা, সেই আলো। সেই সুন্দর, সেই ভীষণ; সেই হাসির ঝিলিকে ঝিকিমিকি, সেই কান্নার কাঁপনে ছলছল।

এই চিঠি-পড়াটাই সৃষ্টির স্রোত;—যে দিচ্ছে আর যে পাচ্ছে সেই দুজনের কথা এতে মিলেছে, সেই মিলনেই রূপের ঢেউ। সেই মিলনের জায়গাটা হচ্ছে বিচ্ছেদ। কেননা, দূর-নিকটের ভেদ না ঘটলে স্রোত বয় না, চিঠি চলে না। সৃষ্টি-উৎসের মুখে কী-একটা কাণ্ড আছে,—সে এক ধারাকে দুই-ধারায় ভাগ করে। বীজ ছিল নিতান্ত এক, তাকে দ্বিধা করে দিয়ে দুখানি কচি পাতা বেরল, তখনই সেই বীজ পেল তার বাণী; নইলে সে বোবা, নইলে সে কৃপণ, আপন ঐশ্বর্য আপনি ভোগ করতে জানে না। জীব ছিল একা, বিদীর্ণ হয়ে স্ত্রী-পুরুষে সে দুই হয়ে গেল। তখনই তার সেই বিভাগের ফাঁকের মধ্যে বসল তার ডাকবিভাগ। ডাকের পর ডাক, তার অন্ত নেই।—বিচ্ছেদের এই ফাঁক একটা বড়ো সম্পদ; এ নইলে সব চুপ, সব বন্ধ। এই ফাঁকটার বুকের ভিতর দিয়ে একটা অপেক্ষার ব্যথা, একটা আকাঙ্ক্ষার টান, টন্‌টন্ করে উঠল; দিতে-চাওয়ার আর পেতে-চাওয়ার উত্তর-প্রত্যুত্তর এ-পারে ও-পারে চালাচালি হতে লাগল। এতেই দুলে উঠল সৃষ্টিতরঙ্গ, বিচলিত হল ঋতুপর্যায়, কখনো বা গ্রীষ্মের তপস্যা, কখনো বর্ষার প্লাবন, কখনো বা শীতের সংকোচ, কখনো বা বসন্তের দাক্ষিণ্য। একে

যদি যায় বল তো দোষ নেই, কেননা, এই চিঠিলিখনের অক্ষরে আবছায়া, ভাষায় ইশারা ; এর আবির্ভাব-তিরোভাবের পুরো মানে সব সময়ে বোঝা যায় না। যাকে চোখে দেখা যায় না সেই উত্তাপ কখন আকাশপথ থেকে মাটির আড়ালে চলে যায় ; মনে ভাবি, একেবারেই গেল বুঝি। কিছু কাল যায়, একদিন দেখি, মাটির পর্দা ফাঁক করে দিয়ে একটি অঙ্কুর উপরের দিকে কোন্-এক আর-জন্মের চেনা-মুখ খুঁজছে। যে উত্তাপটা ফেরার হয়েছে ব'লে সেদিন রব উঠল সেই তো মাটির তলার অন্ধকারে সেঁধিয়ে কোন্ ঘুমিয়ে-পড়া বীজের দরজায় বসে বসে ঘা দিচ্ছিল। এমনি করেই কত অদৃশ্য ইশারার উত্তাপ এক-হৃদয়ের থেকে আর-এক হৃদয়ের ফাঁকে ফাঁকে কোন্ চোরকোঠায় গিয়ে ঢোকে, সেখানে কার সঙ্গে কী কানাকানি করে জানি নে, তার পরে কিছুদিন বাদে একটি নবীন বাণী পর্দার বাইরে এসে বলে "এসেছি"।

আমার সহযাত্রী বন্ধু আমার ডায়ারি প'ড়ে বললেন, "তুমি ধরণীর চিঠি-পড়ায় আর মানুষের চিঠি-পড়ায় মিশিয়ে দিয়ে একটা যেন কী গোল পাকিয়েছ। কালিদাসের মেঘদূতে বিরহী-বিরহিণীর বেদনাটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। তোমার এই লেখায় কোন্খানে রূপক কোন্খানে সাদা কথা বোঝা শক্ত হয়ে উঠেছে।" আমি বললুম, কালিদাস যে মেঘদূত কাব্য লিখেছেন সেটাও বিশ্বের কথা। নইলে তার একপ্রান্তে নির্বাসিত যক্ষ রামগিরিতে, আর-একপ্রান্তে বিরহিণী কেন অলকাপুরীতে। স্বর্গমর্তের এই বিরহই তো সকল সৃষ্টিতে। এই মন্দাক্রান্তাছন্দেই তো বিশ্বের গান বেজে উঠছে। বিচ্ছেদের ফাঁকের ভিতর দিয়ে অণু-পরমাণু নিত্যই যে অদৃশ্য চিঠি চালাচালি করে সেই চিঠিই সৃষ্টির বাণী। স্ত্রীপুরুষের মাঝখানেও, চোখে চোখেই হোক, কানে কানেই হোক, মনে মনেই হোক, আর কাগজে-পত্রেই হোক, যে চিঠি চলে সেও ওই বিশ্বচিঠিরই একটি বিশেষ রূপ।

৫ই অক্টোবর ১৯২৪

মানুষের আয়ুতে ষাটের কোঠা অস্তদিগন্তের দিকে হেলে-পড়া। অর্থাৎ, উদয়ের দিগন্তটা এই সময়ে সামনে এসে পড়ে, পূর্বে পশ্চিমে মুখোমুখি হয়।

জীবনের মাঝমহলে, যে কালটাকে বলে পরিণত বয়স, সেই সময়ে অনেক বড়ো বড়ো সংকল্প, অনেক কঠিন সাধনা অনেক মস্ত লাভ, অনেক মস্ত লোকসান এসে জমেছিল। সব জড়িয়ে ভেবেছি, এইবার আসা গেল পাকা-পরিচয়ের কিনারাটাতে। সেই সময়ে কেউ যদি হঠাৎ এসে জিজ্ঞাসা করত "তোমার বয়স কত।" তা হলে আমার গোড়ার দিকের ছত্রিশটা বছর সরিয়ে রেখে বলতুম, আমি হচ্ছি বাকিটুকু। অর্থাৎ,

আমার বয়স হচ্ছে কুড়ির শেষদিকের সাতাশ। এই পাকা সাতাশের রকম-সকম দেখে গম্ভীর লোকে খুশি হল। তারা কেউ বললে "নেতা হও", কেউ বললে "সভাপতি হও", কেউ বললে "উপদেশ দাও।" আবার কেউ বা বললে, "দেশটাকে মাটি করতে বসেছ।" অর্থাৎ, স্বীকার করলে দেশটাকে মাটি করে দেবার মতো অসামান্য ক্ষমতা আমার আছে।

এমন সময়ে বাটে পড়লুম। একদিন বিকেলবেলায় সামনের বাড়ির ছাতে দেখি, দশ-বারো বছরের একটি ছেলে খালি-গায়ে যা-খুশি করে বেড়াচ্ছে। ঠিক সেই সময়ে চা খেতে-খেতে একটা জরুরি কথা ভাবছি।

ভাবনাটা একদমে এক-লাইন থেকে আর-এক লাইনে চলে গেল। হঠাৎ নিতান্ত এই একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা মনে উঠল যে, ওই ছেলেটা এই অপরাহ্নের আকাশের সঙ্গে একেবারে সম্পূর্ণ মিশ খেয়ে গেছে; কোনো একটা অন্যমনস্কতার ঠেলায় বিশ্ব-পৃথিবীর সঙ্গে ওর জোড় ভেঙে যায় নি। সমস্ত দিগ্‌দিগন্তরকে ওই ছেলে তার সর্বাঙ্গ দিয়ে পেয়েছে, দিগম্বর শিবের মতো। কিসে যেন একটা ধাক্কা দিয়ে আমাকে মনে করিয়ে দিলে যে, অমনি করেই নগ্ন হয়ে সমস্তর মধ্যে মগ্ন হয়ে নিখিলের আঙিনায় আমিও একদিন এসে দাঁড়িয়েছিলুম। মনে হল, সেটা কম কথা নয়। অর্থাৎ, আজও যদি বিশ্বের স্পর্শ প্রত্যক্ষ প্রাণের মধ্যে তেমনি করে এসে লাগত তা হলে ঠকতুম না। তা হলে আমার জীবন-ইতিহাসের মধ্যযুগে অকালে যুগান্তর-অবতারণার যে সব আয়োজন করা গেছে তার ভার আমার চেয়ে যোগ্যতর লোকের হাতেই পড়ত, আর বাদশাই কুঁড়ের সিংহাসনটা আমি স্থায়ীরূপে দখল করে বসবার সময় পেতুম। সেই কুঁড়েমির ঐশ্বর্য আমি যে একলা ভোগ করতুম তা নয়, এই রসের রসিক যারা তাদের জন্যে ভাণ্ডারের দ্বার খুলে দিয়ে বলা যেত, পীয়তাং ভুজ্যতাম্‌।

চায়ের পাত্রটা ভুলে গিয়ে ভাবতে লাগলুম, যে পুলকটাতে আজ মন আবিষ্ট হয়েছে সেটার কথা সবাইকে বুঝিয়ে বলি কী করে। বয়স যখন ছত্রিশের নীচে ছিল তখন বলা-ই আমার কাজ ছিল, বুঝিয়ে বলার ধার ধারতুম না। কেননা, তখন তেপান্তর মাঠের মাঝখানটাতে আমার ঘোড়া ছুটছে, যারা না বুঝে কিছুতেই ছাড়ে না তারা আমার ঠিকানা পায় নি। আজ পনেরো-ষোলো বিশ-পঁচিশ আশি-পঁচাশি প্রভৃতি নানা-বয়সের প্রাচীন লোকের ঠেসাঠেসি ভিড়ের মধ্যে এসে পড়েছি। ওদের বোঝাব কী করে, এই দুর্ভাবনা এখন ভুলে থাকাই শক্ত। মুশকিল এই যে, পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ আছে, মশা আছে, পুলিস্ আছে, স্বরাজ পররাজ বৈরাজ্য নৈরাজ্যের ভাবনা আছে, এরই মধ্যে ওই গাখোলা ছেলেটা দিনের শেষ প্রহরের বেকার বেলাতে ছাদের উপরে ঘুরে

বেড়ায়। আকাশের আলিঙ্গনে-বাঁধা ওই ভোলা মন ছেলেটিতে একটি নিত্যকালের কথা আছে, সে আমি শুনেছি, কিন্তু সে আমি ভাষায় কেমন করে স্পষ্ট করে তুলব।

আজ মনে হচ্ছে, ওই ছেলেটার কথা আমারই খুব ভিতরের কথা, গোলেমালে অনেক কাল তার দিকে চোখ পড়ে নি। বারো বছরের সেই নিত্য-ভোলা ইস্কুল-পালানো লক্ষ্মী-ছাড়াটা গাম্ভীর্যের নিবিড় ছায়ায় কোথায় লুকিয়ে লুকিয়ে খেলা করছিল। এখন ভাবনা ধরিয়ে দিলে, আমার আসল পরিচয় কোন্ দিকটায়। সেই আরম্ভ-বেলাকার সাতাশের দিকে, না, শেষ-বেলাকার?

দায়িত্বের বোঝা মাথায় করে ষাটের আরম্ভে একবার আমেরিকায় গিয়েছিলুম। তখন য়ুরোপের যুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে, কিন্তু তারই নেশায় তখনো আমেরিকার চোখ যে রকম রক্তবর্ণ য়ুরোপেরও এমন নয়। তার উপর তখন ইংরেজ নানা উপায়ে আমেরিকার শ্রবণেন্দ্রিয়ের পথ জুড়ে নিজের ভেঁপুটা বাজাচ্ছে। ডিমক্রাসির গুণ এই যে, নিজে ভাববার না আছে তার উদ্যম, না আছে তার শক্তি। যে চতুর লোক, কানে মন্ত্র দেবার ব্যবস্থা আয়ত্ত করেছে সে নিজের ভাবনা তাকে ভাবায়। ঠিক এখনকার খবর জানি নে, তখন ইংরেজ আমেরিকার বিপুলকায় ডিমক্রাসিকে কানে ধরে নিজের ভাবনা ভাবাচ্ছিল। সেই কানে মন্ত্র দেবার যন্ত্রটা আমার বিরুদ্ধে তার চাকা চালিয়ে দিলে। ভয় ছিল পাছে, আমি ইংরেজের অপযশ রটাই। তার আগেই জালিয়ানওয়ালাবাগের ব্যাপার ঘটেছিল।

যাই হোক, যে কয়টা মাস আমেরিকায় কাটিয়েছি, হাওয়ার মধ্যে যেন একটা বিরোধের ঠেলা ছিল। ভাবুক যেখানেই আছে সেখানেই মানুষের আপনার দেশ, কোনো দেশে সেই ভাবুকতার স্রোতে যখন কমতি পড়ে তখন পদে পদে পাঁকের বাধায় বিদেশী পথিককে গ্লানি দেয়। যেদিন ভাবুকতার ঔদার্য থেকে রিক্ত আমেরিকাকে দেখলুম সেদিন দেখি সে ভয়ংকর ধনী, ভয়ংকর কেজো, সিদ্ধির নেশায় তার দুই চক্ষু রক্তবর্ণ। তারই পাশে দাঁড়িয়ে নিজের দিকে চেয়ে দেখি, আমি নিতান্ত কাঁচা, জন্ম-গরিব, একেবারে অস্থিতে-মজ্জাতে বেহিসাবি। এও বুঝলুম, এ জগতে কাঁচা মানুষের খুব একটা পাকা জায়গা আছে, চিরকেলে জায়গা। ষাট বছরে পৌঁছে হঠাৎ দেখলুম, সেই জায়গাটা দূরে ফেলে এসেছি।

যতই বুঝতে পারি ততই দেখতে পাই, পাকা দেয়ালগুলোই মায়া, পাথরের কেল্লাই কয়েদখানা। মন কাঁদছে, মরবার আগে গাখোলা ছেলের জগতে আর-একবার শেষ ছেলেখেলা খেলে নিতে, দায়িত্ববিহীন খেলা। আর, কিশোর বয়সে যারা আমাকে কাঁদিয়েছিল, হাসিয়েছিল, আমার কাছ থেকে আমার গান লুঠ করে নিয়ে ছড়িয়ে

ফেলেছিল, আমার মনের কৃতজ্ঞতা তাদের দিকে ছুটল। তারা মস্ত বড়ো কিছুই নয়; তারা দেখা দিয়েছে কেউ বা বনের ছায়ায়, কেউ বা নদীর ধারে, কেউ বা ঘরের কোণে, কেউ বা পথের বাঁকে। তারা স্থায়ী কীর্তি রাখবার দল নয়, ক্ষমতার ক্ষয়বৃদ্ধি নিয়ে তাদের ভাবনাই নেই; তারা চলতে চলতে দুটো কথা বলেছে, সব কথা বলবার সময় পায় নি; তারা কালস্রোতের মাঝখানে বাঁধ বাঁধবার চেষ্টা করে নি, তারই ঢেউয়ের উপর নৃত্য করে চলে গেছে, তারই কলস্বরে সুর মিলিয়ে; হেসে চলে গেছে, তারই আলোর ঝিলিমিলির-মতো। তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললুম, "আমার জীবনে যাতে সত্যিকার ফসল ফলিয়েছে সেই আলোর, সেই উত্তাপের দূত তোমরাই। প্রণাম তোমাদের। তোমাদের অনেকেই এসেছিল ক্ষণকালের জন্য, আধো-স্বপ্ন, আধো-জাগার ভোরবেলায় শুকতারার মতো। প্রভাত না হতেই অস্ত গেল।" মধ্যাহ্নে মনে হল তারা তুচ্ছ; বোধ হল, তাদের ভুলেই গেছি। তার পরে সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন নক্ষত্রলোক সমস্ত আকাশ জুড়ে আমার মুখের দিকে চাইল তখন জানলুম, সেই ক্ষণিকা তো ক্ষণিকা নয়, তারাই চিরকালের; ভোরের স্বপ্নে বা সন্ধ্যাবেলার স্বপ্নাবেশে জানতে না-জানতে তারা যার কপালে একটুখানি আলোর টিপ পরিয়ে দিয়ে যায় তাদের সৌভাগ্যের সীমা নেই। তাই মন বলছে, একদিন যারা ছোটো হয়ে এসেছিল আজ আমি যেন ছোটো হয়ে তাদের কাছে আর-একবার যাবার অধিকার পাই; যারা ক্ষণকালের ভান করে এসেছিল, বিদায় নেবার দিনে আর-একবার যেন তারা আমাকে বলে "তোমাকে চিনেছি"; আমি যেন বলি "তোমাদের চিনলুম"।

৭ই অক্টোবর ১৯২৪

একজন অপরিচিত যুবকের সঙ্গে একদিন এক-মোটরে নিমন্ত্রণসভায় যাচ্ছিলুম। তিনি আমাকে কথাপ্রসঙ্গে খবর দিলেন যে, আজকাল পদ্য আকারে যে-সব রচনা করছি সেগুলি লোকে তেমন পছন্দ করছে না। যারা পছন্দ করছে না তাদের সুযোগ্য প্রতিনিধিস্বরূপে তিনি উল্লেখ করলেন তাঁর কোনো কোনো আত্মীয়ের কথা, সেই আত্মীয়েরা কবি; আর, যে সব পদ্যরচনা লোকে পছন্দ করে না তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন আমার গানগুলো আর আমার 'শিশু ভোলানাথ' নামক আধুনিক কাব্যগ্রন্থ। তিনি বললেন, আমার বন্ধুরাও আশঙ্কা করছেন আমার কাব্য লেখবার শক্তি ক্রমেই ম্লান হয়ে আসছে।

কালের ধর্মই এই। মর্তলোকে বসন্তঋতু চিরকাল থাকে না। মানুষের ক্ষমতার ক্ষয় আছে, অবসান আছে। যদি কখনো কিছু দিয়ে থাকি, তবে মূল্য দেবার সময়

তারই হিসাবটা স্মরণ করা ভালো। রাত্রিশেষে দীপের আলো নেববার সময় যখন সে তার শিখার পাখাতে বার-কতক শেষ ঝাপটা দিয়ে লীলা সাঙ্গ করে, তখন আশা দিয়ে নিরাশ করবার দাবিতে প্রদীপের নামে নালিশ করাটা বৈধ নয়। দাবিটাই যার বেহিসাবি দাবি অপূরণ হবার হিসাবটাতেও তার ভুল থাকবেই। পঁচানব্বই বছর বয়সে একটা মানুষ ফস্‌ করে মারা গেল বলে চিকিৎসাশাস্ত্রটাকে ধিক্কার দেওয়া বৃথা বাক্যব্যয়। অতএব, কেউ যদি বলে আমার বয়স যতই বাড়ছে আমার আয়ু ততই কমে যাচ্ছে, তা হলে তাকে আমি নিন্দুক বলি নে, বড়ো জোর এই বলি যে, লোকটা বাজে কথা এমনভাবে বলে যেন সেটা দৈববাণী। কালক্রমে আমার ক্ষমতা হ্রাস হয়ে যাচ্ছে, এই বিধিলিপি নিয়ে যুবক হোক, বৃদ্ধ হোক, কবি হোক, অকবি হোক, কারো সঙ্গে তকরার করার চেয়ে তৎক্ষণ একটা গান লেখা ভালো মনে করি, তা সেটা পছন্দসই হোক আর না হোক। এমন-কি, সেই অবসরে 'শিশু ভোলানাথ'-এর জাতের কবিতা যদি লিখতে পারি, তা হলেও মনটা খুশি থাকে। কারণটা কী বলে রাখি।

আজ-নাগাদ প্রায় পনেরো-ষোলো বছর ধরে খুব কষে গানই লিখছি। লোক-রঞ্জনের জন্যে নয়, কেননা, পাঠকেরা লেখায় ক্ষমতার পরিচয় খোঁজে। ছোটো ছোটো একটু একটু গানে ক্ষমতার কায়দা দেখাবার মতো জায়গাই নেই। কবিত্বকে যদি রীতিমতো তাল ঠুকে বেড়াতেই হয় তা হলে অন্তত একটা বড়ো আখড়া চাই। তা ছাড়া গান জিনিসে বেশি বোঝাই সয় না; যারা মালের ওজন ক'রে দরের যাচাই করে, তারা এরকম দশ-বারো লাইনের হালকা কবিতার বাজার মাড়াতে চায় না। তবু আমি এই কয় বছরে এত গান লিখেছি যে, অন্তত সংখ্যা হিসাবে লম্বা দৌড়ের বাজিতে আমি বোধ হয় পয়লা নম্বরের পুরস্কার পেতে পারি।

আর-একটা কথা বলে রাখি, গান লিখতে যেমন আমার নিবিড় আনন্দ হয় এমন আর কিছুতে হয় না। এমন নেশায় ধরে যে, তখন গুরুতর কাজের গুরুত্ব একেবারে চলে যায়, বড়ো বড়ো দায়িত্বের ভারাকর্ষণটা হঠাৎ লোপ পায়, কর্তব্যের দাবিগুলোকে মন এক-ধার থেকে নামঞ্জুর করে দেয়।

এর কারণ হচ্ছে, বিশ্বকর্মার লীলাখেলার স্রোতটার মধ্যে হঠাৎ পড়ে গেলে শুকনো ডাঙার কথাটা একেবারেই মনে থাকে-না। শরতের গাছতলা শিউলি ফুলের অপব্যয়ে ছেয়ে গেল, নিকেশ নেবার কোনো কথাই কেউ বলে না। যা হল কেবল তাই দেখেই বলি, যথেষ্ট হয়েছে। ঘোর গরমে ঘাসগুলো শুকিয়ে সব হলদে হয়ে গেল; বর্ষার প্রথম পসলা বৃষ্টি হয়ে যাবার পরেই হঠাৎ দেখি, ঘাসে অতি ছোটো ছোটো

বেগনি ফুলে হলদে ফুলে মাতামাতি। কে দেখে কে না দেখে তার খেয়াল নেই। এটা হল রূপের লীলা, কেবলমাত্র হয়ে ওঠাতেই আনন্দ। এই মেঠো ফুলের একটি মঞ্জরী তুলে ধরে আমি বলি, বাহবা। কেন বলি। ও তো খাবার জিনিস নয়, বেচবার জিনিস নয়, লোহার সিন্দুকে তালা বন্ধ করে রাখবার জিনিস নয়। তবে ওতে আমি কী দেখলুম যাতে আমার মন বললে "সাবাস"। বস্তু দেখলুম? বস্তু তো একটা মাটির ঢেলার মধ্যে ওর চেয়ে অনেক বেশি আছে। তবে? আমি দেখলুম, রূপ। সে কথাটার অর্থ কী। রূপ ছাড়া আর কোনোই অর্থ নেই। রূপ শুধু বলে, "এই দেখো, আমি হয়ে উঠেছি।" যদি আমার মন সায় দিয়ে বলে "তাই তো বটে, তুমি হয়েছ, তুমি আছ" আর এই বলেই যদি সে চুপ করে যায়, তা হলেই সে রূপ দেখলে; হয়ে-ওঠাকেই চরম বলে জানলে। কিন্তু, সজনে ফুল যখন অরূপসমুদ্রে রূপের ঢেউ তুলে দিয়ে বলে "এই দেখো আমি আছি", তখন তার কথাটা না বুঝে আমি যদি গোঁয়ারের মতো বলে বসি "কেন আছ"— তার মুখ থেকে যদি অত্যন্ত মিথ্যে জবাব আদায় করে নিই, যদি তাকে দিয়ে বলাই "তুমি খাবে বলেই আছি", তা হলে রূপের চরম রহস্যটা দেখা হল না। একটি ছোট্টো মেয়ে কোথা থেকে আমার যাত্রাপথে জুটে গেছে। তার বয়স আড়াই বছর। তার মধ্যে প্রাণের আনন্দ টলমল করে ওঠে, কত মধুর প্রলাপে, কত মন-ভোলানো ভঙ্গীতে; আমার মন বলে, "মস্ত একটা পাওনা আমি পেলুম।" কী যে পেলুম তাকে হিসাবের অঙ্কে ছ'কে নেবার জো নেই। আর-কিছু নয়, একটি বিশেষ হয়ে-ওঠাকেই আমি চরম করে দেখলুম। ওই ছোট্ট মেয়ের হয়ে-ওঠাই আমার পরম লাভ। ও আমার ঘর ঝাঁট দেয় না, রান্না করে না, তাতে ওর ওই হয়ে-ওঠার হিসাবটাতে কিছুই কম পড়ছে না। বৈজ্ঞানিক এর হয়তো একটা মোটা কৈফিয়ত দেবে, বলবে, "জীবজগতে বংশরক্ষাটাই সবচেয়ে বড়ো দরকার; ছোটো মেয়েকে সুন্দর না লাগলে সেই দরকারটাতে বাধা পড়ে।" মোটা কৈফিয়তটাকে আমি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করি নে, কিন্তু তার উপরেও একটা সূক্ষ্ম তত্ত্ব আছে যার কোনো কৈফিয়ত নেই। একটা ফলের ডালি দেখলে মন খুশি হয়ে ওঠে, আর মাছের ঝোলের পাত্র দেখলে যারা নিরামিষাশী নয় তাদের মন খুশি হতে পারে; আহারের প্রয়োজনটা উভয়তই আছে; সুতরাং খুশির একটা মোটা কৈফিয়ত উভয়তই পাওয়া যায়। তৎসত্ত্বেও ফলের ডালিতে এমন একটি বিশেষ খুশি আছে যা কোনো কৈফিয়ত তলবই করে না। সেইখানে ওই একটি মাত্র কথা, ফলগুলি বলছে "আমি আছি"— আর আমার মন বলে, সেইটেই আমার লাভ। আমার জীবনযাত্রার এই আড়াই বছরের ক্ষুদ্রতমা সহচরীটিও মানবের বংশরক্ষার কৈফিয়ত দাখিল করেও এমন কিছু বাকি রাখে যেটা বিশ্বের মর্মকুহর হতে

উত্থিত ওঙ্কারধ্বনিরই সুর। বিশ্ব বলছে ওঁ; বলছে, হাঁ; বলছে, অয়মহং ভোঃ, এই-যে আমি। ওই মেয়েটিও সেই ওঁ, সেই হাঁ, সেই এই-যে আমি। সত্তাকে সত্তা বলেই যেখানে মানি সেখানে তার মধ্যে আমি সেই খুশিকেই দেখি যে খুশি আমার নিজের মধ্যে চরমরূপে রয়েছে। দাসের মধ্যে সেই খুশিকে দেখি নে বলেই দাসত্ব এত ভয়ংকর মিথ্যে, আর মিথ্যে বলেই এত ভয়ংকর তার পীড়া।

সৃষ্টির মূলে এই লীলা, নিরন্তর এই রূপের প্রকাশ। সেই প্রকাশের অহৈতুক আনন্দে যখন যোগ দিতে পারি তখন সৃষ্টির মূল আনন্দে গিয়ে মন পৌঁছয়। সেই মূল আনন্দ আপনাতেই আপনি পর্যাপ্ত, কারো কাছে তার কোনো জবাবদিহি নেই।

ছোটো ছেলে ধুলোমাটি কাটাকুটো নিয়ে সারাবেলা বসে বসে একটা কিছু গড়ছে। বৈজ্ঞানিকের মোটা কৈফিয়ত হচ্ছে এই যে, গড়বার শক্তি তার জীবনযাত্রার সহায়, সেই শক্তির চালনা চাই। এ কৈফিয়ত স্বীকার করে নিলুম; তবুও কথাটার মূলের দিকে অনেকখানি বাকি থাকে। গোড়াকার কথা হচ্ছে এই যে, তার সৃষ্টিকর্তা মন বলে "হোক", "Let there be"— সেই বাণীকে বহন করে ধুলোমাটি কুটোকাটি সকলেই বলে ওঠে, "এই দেখো হয়েছে।"

এই হওয়ার অনেকখানিই আছে শিশুর কল্পনায়। সামনে যখন তার একটা ঢিবি তখন কল্পনা বলছে, "এই তো আমার রূপকথার রাজপুত্রের কেল্লা।" তার ওই ধুলোর স্তূপের ইশারার ভিতর দিয়ে শিশু সেই কেল্লার সত্তা মনে স্পষ্ট অনুভব করছে; এই অনুভূতিতেই তার আনন্দ। গড়বার শক্তিকে প্রকাশ করছি বলে আনন্দ নয়, কেননা, সে শক্তি এ ক্ষেত্রে বিশেষ প্রকাশ পাচ্ছে না। একটি রূপবিশেষকে চিত্তে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ব'লে আনন্দ। সেই রূপটাকে শেষলক্ষ্য করে দেখাই হচ্ছে সৃষ্টিকে দেখা; তার আনন্দই সৃষ্টির মূল আনন্দ।

গান জিনিসটা নিছক সৃষ্টিলীলা। ইন্দ্রধনু যেমন বৃষ্টি আর রৌদ্রের জাদু, আকাশের দুটো খামখেয়ালি মেজাজ-দিয়ে গড়া তোরণ, একটি অপূর্ব মুহূর্তকাল সেই তোরণের নীচে দিয়ে জয়যাত্রা করবে। হয়ে গেল এই খেলা, মুহূর্তটি তার রঙিন উত্তরীয় উড়িয়ে দিয়ে চলে গেল— তার বেশি আর কিছু নয়। মেজাজের এই রঙিন খেলাই হচ্ছে গীতিকাব্য। ওই ইন্দ্রধনুর কবিটিকে পাকড়াও করে যদি জিজ্ঞাসা করা যেত "এটার মানে কী হল" সাফ জবাব পাওয়া যেত "কিছুই না"। "তবে?" "আমার খুশি।" রূপেতেই খুশি— সৃষ্টির সব প্রশ্নের এই হল শেষ উত্তর।

এই খুশির খেলাঘরে রূপের খেলা দেখে আমাদের মন ছুটি পায় বস্তুর মোহ থেকে; একেবারে পৌঁছয় আনন্দে, এমন কিছুতে যার ভার নেই, যার মাপ নেই, যা অনির্বচনীয়।

সেদিন সমুদ্রের মাঝে পশ্চিম আকাশে, 'ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতে' গড়া সূর্যাস্তের একখানি রূপসৃষ্টি দেখলুম। আমার যে পাকাবুদ্ধি সোনার খনির মুনফা গোনে সে বোকার মতো চুপ করে রইল, আর আমার যে কাঁচা মনটা বললে "দেখেছি" সে স্পষ্ট বুঝতে পারলে সোনার খনির মুনফাটাই মরীচিকা আর যার আবির্ভাবকে ক্ষণকালের জন্যে ওই চিহ্নহীন সমুদ্রে নামহীন আকাশে দেখা গেল তারই মধ্যে চিরকালের অফুরান ঐশ্বর্য, সেই হচ্ছে অরূপের মহাপ্রাঙ্গণে রূপের নিত্যলীলা।

সৃষ্টির অন্তরতম এই অহৈতুক লীলার রসটিকে যখন মন পেতে চায় তখনই বাদশাহি বেকারের মতো সে গান লিখতে বসে। চারখানি পাপড়ি নিয়ে একটি ছোটো জুঁই-ফুলের মতো একটুখানি গান যখন সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে তখন সেই মহা-খেলাঘরের মেজের উপরেই তার জন্যে জায়গা করা হয় যেখানে যুগ যুগ ধরে গ্রহনক্ষত্রের খেলা হচ্ছে। সেখানে যুগ আর মুহূর্ত একই, সেখানে সূর্য আর সূর্যমণি ফুলে অভেদাত্মা, সেখানে সাঁঝসকালে মেঘে মেঘে যে রাগরাগিণী আমার গানের সঙ্গে তার অন্তরের মিল আছে।

আজ পনেরো-ষোলো বছর ধরে কর্তব্যবুদ্ধি আমাকে নানা ভাবনা নানা ব্যস্ততার মধ্যে জোরে টেনে নিয়ে ফেলে আমার কাছ থেকে কষে কাজ আদায় করে নিচ্ছে। এখানকার সকল কাজই মোটা কৈফিয়তের অপেক্ষা রাখে। খোঁচা দিয়ে দিয়ে কেবলই জিজ্ঞাসা করে, "ফল হবে কি।" সেইজন্যে যার ফরমাশ কৈফিয়তের সীমানা পেরিয়ে আপন বেদরকারি পাওনা দাবি করে ভিতরে-ভিতরে সে আমাকে কেবলই প্রশ্ন করতে থাকে, "তুমি কবি, চির-ছুটির পরোয়ানা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছ, তার করলে কী। কাজের ভিড়ের টানাটানিতে পড়ে একেবারেই জাত খুইয়ে বোসো না।" নিশ্চয় ওরই এই তাগিদেই আমাকে গান লেখায়; হট্টগোলের মধ্যেও নিজের পরিচয়টা বজায় রাখবার জন্যে, লোকরঞ্জনের জন্যে নয়। কর্তব্যবুদ্ধি তার কীর্তি ফেঁদে গম্ভীরকণ্ঠে বলে, "পৃথিবীতে আমি সবচেয়ে গুরুতর।" তাই আমার ভিতরকার বিধিদত্ত ছুটির খেয়াল বাঁশি বাজিয়ে বলে, "পৃথিবীতে আমিই সবচেয়ে লঘুতম।" লঘু নয় তো কী! সেই জন্যে সব জায়গাতেই হাওয়ায় হাওয়ায় তার পাখা চলে, তার রঙ-বেরঙের পাখা। ইমারতের মোটা ভিত ফেঁদে সময়ের সদ্‌ব্যয় করা তার জাত-ব্যাবসা নয়; সে লক্ষ্মীছাড়া ঘুরে বেড়ায় ফাঁকির পথে, যে পথে রঙের ঝরনা রসের ধারা ঝরে ঝরে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে বিপুল একটা বাজেখরচের মতো।

আমার কেজো পরিচয়টার প্রতি ঈর্ষা ক'রে অবজ্ঞা ক'রে আমার অকেজো পরিচয়টা আমাকে যখন-তখন গান লিখিয়ে লিখিয়ে নিজের দলিল ঠিক করে রাখছে। যখন বিরুদ্ধপক্ষে মাতব্বর সাক্ষী এসে জোটে, তখনই নিজের দাবির দলিল খুব বড়ো করে

ভুলতে হয়। যতদিন ধরে এক পক্ষে আমার কাজের রোকড় খুব মোটা হয়ে উঠছে ততদিন ধরেই অন্যপক্ষে আমার ছুটির নথিও অসম্ভব-রকম ভারী হয়ে উঠল। এই যে দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ চলছে, এটা আমার অন্তরের খাস-কামরায়। আমি আসলে কোন্ পক্ষের, সেইটের বিচার নিয়ে আমারই কাছে নালিশ।

তার পরে কথাটা এই যে, ওই 'শিশু ভোলানাথ'-এর কবিতাগুলো খামকা কেন লিখতে বসেছিলুম। সেও লোকরঞ্জনের জন্যে নয়, নিতান্ত নিজের গরজে।

পূর্বেই বলেছি, কিছুকাল আমেরিকার প্রৌঢ়তার মরুপারে ঘোরতর কার্যপটুতার পাথরের দুর্গে আটকা পড়েছিলুম। সেদিন খুব স্পষ্ট বুঝেছিলুম, জমিয়ে তোলবার মতো এত বড়ো মিথ্যে ব্যাপার জগতে আর কিছুই নেই। এই জমাবার জমাদারটা বিশ্বের চিরচঞ্চলতাকে বাধা দেবার স্পর্ধা করে; কিন্তু কিছুই থাকবে না, আজ বাদে কাল সব সাফ হয়ে যাবে। যে স্রোতের ঘূর্ণিপাকে এক-এক জায়গায় এই-সব বস্তুর পিণ্ড-গুলোকে স্তূপাকার করে দিয়ে গেছে সেই স্রোতেরই অবিরত বেগে ঠেলে ঠেলে সমস্ত ভাসিয়ে নীল সমুদ্রে নিয়ে যাবে— পৃথিবীর বক্ষ সুস্থ হবে। পৃথিবীতে সৃষ্টির যে লীলা-শক্তি আছে সে যে নির্লোভ, সে নিরাসক্ত, সে অকৃপণ; সে কিছু জমতে দেয় না, কেননা, জমার জঞ্জালে তার সৃষ্টির পথ আটকায়; সে যে নিত্যনূতনের নিরন্তর প্রকাশের জন্যে তার অবকাশকে নির্মল করে রেখে দিতে চায়। লোভী মানুষ কোথা থেকে জঞ্জাল জড়ো ক'রে সেইগুলোকে আগলে রাখবার জন্যে নিগড়বদ্ধ লক্ষ লক্ষ দাসকে দিয়ে প্রকাণ্ড সব ভাণ্ডার তৈরি করে তুলছে। সেই ধ্বংসশাপগ্রস্ত ভাণ্ডারের কারাগারে জড়বস্তুপুঞ্জের অন্ধকারে বাসা বেঁধে সঞ্চয়গর্বের ঔদ্ধত্যে মহাকালকে কৃপণটা বিদ্রূপ করছে; এ বিদ্রূপ মহাকাল কখনোই সইবে না। আকাশের উপর দিয়ে যেমন ধুলানিবিড় আঁধি ক্ষণকালের জন্যে সূর্যকে পরাভূত করে দিয়ে তার পরে নিজের দৌরাত্ম্যের কোনো চিহ্ন না রেখে চলে যায়, এসব তেমনি করেই শূন্যের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

কিছুকালের জন্যে আমি এই বস্তু-উদ্গারের অন্ধযন্ত্রের মুখে এই বস্তুসঞ্চয়ের অন্ধ-ভাণ্ডারে বদ্ধ হয়ে আতিথ্যহীন সন্দেহের বিষবাষ্পে শ্বাসরুদ্ধপ্রায় অবস্থায় কাটিয়েছিলুম। তখন আমি এই ঘন দেয়ালের বাইরের রাস্তা থেকে চিরপথিকের পায়ের শব্দ শুনতে পেতুম। সেই শব্দের ছন্দই যে আমার রক্তের মধ্যে বাজে, আমার ধ্যানের মধ্যে ধ্বনিত হয়। আমি সেদিন স্পষ্ট বুঝেছিলুম, আমি ওই পথিকের সহচর।

আমেরিকার বস্তুগ্রাস থেকে বেরিয়ে এসেই 'শিশু ভোলানাথ' লিখতে বসেছিলুম। বন্দী যেমন ফাঁক পেলেই ছুটে আসে সমুদ্রের ধারে হাওয়া খেতে, তেমনি করে।

দেয়ালের মধ্যে কিছুকাল সম্পূর্ণ আটকা পড়লে তবেই মানুষ স্পষ্ট করে আবিষ্কার করে, তার চিত্তের জন্যে এত বড়ো আকাশেরই ফাঁকাটা দরকার। প্রবীণের কেল্লার মধ্যে আটকা পড়ে সেদিন আমি তেমনি করেই আবিষ্কার করেছিলুম, অন্তরের মধ্যে যে শিশু আছে তারই খেলার ক্ষেত্র লোকে-লোকান্তরে বিস্তৃত। এইজন্যে কল্পনায় সেই শিশু-লীলার মধ্যে ডুব দিলুম, সেই শিশুলীলার তরঙ্গে সাঁতার কাটলুম, মনটাকে স্নিগ্ধ করবার জন্যে, নির্মল করবার জন্যে, মুক্ত করবার জন্যে।

এ কথাটার এতক্ষণ ধরে আলোচনা করছি এইজন্যে যে, যে লীলালোকে জীবন-যাত্রা শুরু করেছিলুম, সে লীলাক্ষেত্রে জীবনের প্রথম অংশ অনেকটা কেটে গেল, সেই-খানেই জীবনটার উপসংহার করবার উদ্‌বেগে কিছুকাল থেকেই মনের মধ্যে একটা মন-কেমন-করার হাওয়া বইছে। একদা পদ্মার ধারে আকাশের পারে সংসারের পথে যারা আমার সঙ্গী ছিল তারা বলছে, সেদিনকার পালা সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায় নি, বিদায়ের গোধূলিবেলায় সেই আরম্ভের কথাগুলো সাঙ্গ করে যেতে হবে। সেইজন্যেই সকাল-বেলাকার মল্লিকা সন্ধ্যাবেলাকার রজনীগন্ধা হয়ে তার গন্ধের দূত পাঠাচ্ছে। বলছে, "তোমার খ্যাতি তোমাকে না টানুক, তোমার কীর্তি তোমাকে না বাঁধুক, তোমার গান তোমাকে পথের পথিক ক'রে তোমাকে শেষযাত্রায় রওনা করে দিক। প্রথম বয়সের বাতায়নে বসে তুমি তোমার দূরের বঁধুর উত্তরীয়ের সুগন্ধি হাওয়া পেয়েছিলে। শেষ-বয়সের পথে বেরিয়ে গোধূলিরাগের রাঙা আলোতে তোমার সেই দূরের বঁধুর সন্ধানে নির্ভয়ে চলে যাও। লোকের ডাকাডাকি শুনো না। সুর যে দিক থেকে আসছে সেই দিকে কান পাতো— আর সেই দিকেই ডানা মেলে দাও সাগরপারের লীলালোকের আকাশপথে। যাবার বেলায় কবুল করে যাও যে, তুমি কোনো কাজের নও, তুমি অস্থায়ীদের দলে।"

ক্রাকোভিয়া জাহাজ
৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৫

মার্সেল্‌স্‌ বন্দরে নেমে রেলে চড়লেম। পশ্চিমদেশের একটা পরিচয় পেলেম ভোজন-কামরায়। আকাশে গ্রহমালার আবর্তনের মতো থালার পর থালা ঘুরে আসছে, আর ভোজের পর ভোজ্য।

ঘরের দাবি পথের উপর চলে না। ঘরে আছে সময়ের অবসর, ঘরে আছে স্থানের অবকাশ। সেখানে জীবনযাত্রার আয়োজনের ভার বেশি করে জমে ওঠবার বাধা নেই। কিন্তু, চলতি পথে উপকরণভার যথাসম্ভব হালকা করাই সাধারণ লোকের

পক্ষে সংগত। হরিণের শিঙ বটগাছের ডাল-আবডালের মতো অত অধিক, অত বড়ো, অত ভারী হলে সেটা জঙ্গম প্রাণীর পক্ষে বেহিসাবি হয়।

চিরকাল, বিশেষত পূর্বকালে, রাজা-রাজড়া আমীর-ওমরাওরা ভোগের ও ঐশ্বর্যের বোঝাকে সর্বত্র সকল অবস্থাতেই ভরপুরভাবে টেনে বেড়িয়েছে। সংসারের উপর তাদের আবদার অত্যন্ত বেশি। সে আবদার সংসার মেনে নিয়েছে, কেননা, এদের সংখ্যা তেমন বেশি নয়। রেলগাড়ির ভোজনশালায় থালার সংখ্যা, ভোজ্যের পরিমাণ ও বৈচিত্র্য, পরিচর্যার ব্যবস্থা, এত বাহুল্যময় যে, পূর্বকালের রাজকীয় সম্প্রদায়ই পথিক-অবস্থাতেও তা দাবি করতে পারত। এখন জনসাধারণের সকলের জন্যে এই আয়োজন।

ভোগের এত বড়ো বাহুল্যে সকল মানুষেরই অধিকার আছে, এই কথাটার আকর্ষণ অতি ভয়ানক। এই আকর্ষণে দেশজোড়া মানুষের সিঁধকাঠি বিশ্বভাণ্ডারের দেয়াল ফুটো করতে উদ্যত হয়। লুব্ধ সভ্যতার এই উপদ্রব সর্বনেশে।

যেটা বাহুল্য তাতে ছোটো বড়ো কোনো মানুষের কোনো অধিকার নেই, এই কথাটা গত যুদ্ধের সময় ইংলণ্ড ফ্রান্স জর্মনি প্রভৃতি যুদ্ধরত দেশকে অনেকদিন ধরেই স্বীকার করতে হল। তখন তারা আপনার সহজ আয়োজনের অনুপাতে নিজের ভোগকে সংযত করেছিল। তখন তারা বুঝেছিল, মানুষের আসল প্রয়োজনের ভার খুব বেশি নয়। যুদ্ধ-অবসানে সে কথাটা ভুলতে দেরি হয় নি।

অনতিপ্রয়োজনীয়কে প্রয়োজনীয় করে তোলা যখন দেশসুদ্ধ সকল লোকেরই নিত্য সাধনা হয় তখন বিশ্বব্যাপী দস্যুবৃত্তি অপরিহার্য হয়ে ওঠে। লোকসংখ্যাবৃদ্ধির সমস্যা নিয়ে পাশ্চাত্যেরা অনেকেই উদ্‌বেগ প্রকাশ করে থাকেন। সমস্যাটি কঠিন হবার প্রধান কারণ হচ্ছে, সর্বসাধারণেরই ভোগবাহুল্যের প্রতি দাবি। এত বড়ো ব্যাপক দাবি মেটাতে গেলে ধর্মরক্ষা করা চলে না, মানুষকে মানুষপীড়ক হতেই হয়। সেই পীড়ন-কার্যে ভালো করে হাত পাকানো হয় দূরস্থ অনাত্মীয় জাতির উপর দিয়ে। এর বিপদ এই যে, জীবনক্ষেত্রের যে কিনারাতেই ধর্মবুদ্ধিতে আগুন লাগানো হোক-না, সে আগুন সেইখানেই থেমে থাকে না। ভোগী স্বভাবতই যে নিষ্ঠুরতার সাধনা করে তার সীমা নেই, কারণ, আত্মম্ভরিতা কোথাও এসে বলতে জানে না, "এইবার বস্ হয়েছে।" বস্তুগত আয়োজনের অসংগত বাহুল্যকেই যে সভ্যতার প্রধান লক্ষণ বলে মানা হয় সে সভ্যতা অগত্যাই নরভুক্। নররক্তশোষণের বিশ্বব্যাপী চর্চা একদিন আত্মহত্যায় ঠেকবেই, এতে আর সন্দেহ করা চলে না।

রেলগাড়ির ভোজনশালায় একদিকে যেমন দেখা গেল ভোগের বাহুল্য, আর-এক-দিকে তেমনি দেখলেম কর্মের গতিবেগ। সময় অল্প, আরোহী অনেক, ভোজ্যের

বৈচিত্র্য প্রচুর, ভোজের-উপকরণ বিস্তর— তাই পরিবেশনকর্মের অভ্যাস অতি আশ্চর্য দ্রুত হয়ে উঠেছে। পরিবেশনের যন্ত্রটাতে খুবই প্রবল জোরে দম দেওয়া হয়েছে। যেটা এই পরিবেশনে দেখা গেল পাশ্চাত্যের সমস্ত কর্মচালনার মধ্যেই সেই ক্ষিপ্রবেগ।

যে যন্ত্র বাহিরের ব্যবহারের জন্য তার গতির ছন্দ দম দিয়ে অনেকদূর পর্যন্ত বাড়িয়ে তোলা চলে। কিন্তু আমাদের প্রাণের, আমাদের হৃদয়ের ছন্দের একটা স্বাভাবিক লয় আছে; তার উপরে দ্রুত প্রয়োজনের জবরদস্তি খাটে না। দ্রুত-চলাই যে দ্রুত-এগনো সে কথা সত্য হতে পারে কলের গাড়ির পক্ষে, মানুষের পক্ষে না। মানুষের চলার সঙ্গে হওয়া আছে; সেই চলাতে হওয়াতে মিল ক'রে চলাই মানুষের চলা, কলের গাড়ির সে উপসর্গ নেই। আপিসের তাগিদে মুহূর্তের মধ্যে এক গ্রাসের জায়গায় চার গ্রাস খাওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু, সেই চার গ্রাস ঘড়ি ধরে হজম করা কলের মনিবের হুকুমে হতে পারে না। গ্রামোফোনের কান যদি মলে দেওয়া যায় তবে যে গান গাইতে চার মিনিট লেগেছিল তাকে শুনতে আধ মিনিটের বেশি না লাগতে পারে, কিন্তু সংগীত হয়ে ওঠে চীৎকার। রসভোগ করবার জন্যে রসনার নিজের একটা নির্ধারিত সময় আছে; সন্দেশকে যদি কুইনিনের বড়ির মতো টপ্‌ করে গেলা যায় তা হলে বস্তুটাকে পাওয়া যায়, বস্তুর রস পাওয়া যায় না। তীরবেগে বাইসিক্‌ল্‌ ছুটিয়ে যদি পদাতিক বন্ধুর চাদর ধরি তা হলে বাইসিক্‌লের জয়পতাকা হাতে আসবে, কিন্তু বন্ধুকে বুকে পাবার উপায় সেটা নয়; কলের বেগ বাইরের দরকারে কাজে লাগে, অন্তরের দাবি মেটাবার বেলায় অন্তরের ছন্দ না মানলে চলে না।

বাইরের বেগ অন্তরের ছন্দকে অত্যন্ত বেশি পেরোয় কখন। যখন বাহ্য প্রয়োজনের বড়ো বাড় বাড়ে। তখন মানুষ পড়ে পিছিয়ে, কলের সঙ্গে সে তাল রাখতে পারে না। য়ুরোপে সেই মানুষ-ব্যক্তিটি দিনে দিনে বহু দূরে পড়ে গেল; কল গেল এগিয়ে; তাকেই সেখানকার লোকে বলে অগ্রসরতা, প্রোগ্রেস্‌।

সিদ্ধি, যাকে ইংরেজিতে বলে সাক্‌সেস্‌, তার বাহন যত দৌড়ে চলে ততই ফল পায়। য়ুরোপের দেশে দেশে রাষ্ট্রনীতির যুদ্ধনীতির বাণিজ্যনীতির তুমুল ঘোড়-দৌড় চলছে জলে স্থলে আকাশে। সেখানে বাহ্য প্রয়োজনের গরজ অত্যন্ত বেশি হয়ে উঠল, তাই মনুষ্যত্বের ডাক শুনে কেউ সবুর করতে পারছে না। বীভৎস সর্বভুক্‌ পেটুকতার উদ্যোগে পলিটিক্‌স্‌ নিয়ত ব্যস্ত। তার গাঁট-কাটা ব্যবসায়ের পরিধি পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে। পূর্বকালে যুদ্ধবিগ্রহের পদ্ধতিতে ধর্মবুদ্ধি যেখানে মাঝে মাঝে বাধা খাড়া করে রেখেছিল, ডিপ্লমাসি সেখানে আজ লাফ-মারা হার্ড্‌ল্‌ রেস্‌ খেলে চলেছে। সবুর সয় না যে! বিষবায়ুবাণ যুদ্ধের অস্ত্ররূপে যখন এক পক্ষ

ব্যবহার করলে তখন অন্য পক্ষ ধর্মবুদ্ধির দোহাই পাড়লে। আজ সকল পক্ষই বিষের সন্ধানে উঠে পড়ে লেগেছে; যুদ্ধকালে নিরস্ত্র পুরবাসীদের প্রতি আকাশ থেকে অগ্নিবাণ বর্ষণ নিয়ে প্রথমে শোনা গেল ধর্মবুদ্ধির নিন্দাবাণী। আজ দেখি, ধার্মিকেরা স্বয়ং সামান্য কারণে পল্লীবাসীদের প্রতি কথায় কথায় পাপবজ্র সন্ধান করছে। গত যুদ্ধের সময় শত্রুর সম্বন্ধে নানা উপায়ে সজ্ঞানে সচেষ্টভাবে সত্যগোপন ও মিথ্যা-প্রচারের শয়তানি অস্ত্র ব্যবহার প্রকাণ্ডভাবে চলল। যুদ্ধ থেমেছে কিন্তু সেই শয়তানি আজও থামে নি। এমন-কি, অক্ষম ভারতবর্ষকেও প্রবলের প্রপাগাণ্ডা রেয়াত করে না। এই সব নীতি হচ্ছে সবুর-না-করা নীতি; এরা হল পাপের দ্রুত চাল; এরা প্রতি পদেই বাহিরে জিতছে বটে কিন্তু সে জিত অন্তরের মানুষকে হারিয়ে দিয়ে। মানুষ আজ নিজের মাথা থেকে জয়মাল্য খুলে নিয়ে কলের গলায় পরিয়ে দিলে। রসাতল থেকে দানব বলছে, "বাহবা!"—

রথীরে কহিল গৃহী উৎকণ্ঠায় ঊর্ধ্বস্বরে ডাকি,
"থামো, থামো কোথা তুমি রুদ্রবেগে রথ যাও হাঁকি,
সম্মুখে আমার গৃহ।"
                    রথী কহে, "ওই মোর পথ,
ঘুরে গেলে দেরি হবে, বাধা ভেঙে সিধা যাবে রথ।"
গৃহী কহে, "নিদারুণ ত্বরা দেখে মোর ডর লাগে—
কোথা যেতে হবে বলো।"
                    রথী কহে, "যেতে হবে আগে।"
"কোন্‌খানে" শুধাইল।
                    রথী বলে, "কোনোখানে নহে,
শুধু আগে।"
        "কোন্‌ তীর্থে, কোন্‌ সে মন্দিরে" গৃহী কহে।
"কোথাও না, শুধু আগে।"
                    "কোন্‌ বন্ধু সাথে হবে দেখা।"
"কারো সাথে নহে, যাব সব আগে আমি মাত্র একা।"
ঘর্ঘরিত রথবেগ গৃহভিত্তি করি দিল গ্রাস;
হাহাকারে, অভিশাপে, ধূলিজালে ক্ষুভিল বাতাস
সন্ধ্যার আকাশে! আঁধারের দীপ্ত সিংহদ্বার-বাগে
রক্তবর্ণ অস্তপথে ছোটে রথ লক্ষ্যশূন্য আগে।

ক্রাকোভিয়া জাহাজ
৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৫

ক

বিষয়ী লোক শতদলের পাপড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে একটি একটি করে জমা করে আর বলে, "পেয়েছি!" তার সঞ্চয় মিথ্যে। সংশয়ী লোক শতদলের পাপড়ি একটি একটি করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে তাকে কেটে কুটে নিঙরে মুচড়ে বলে, "পাই নি!" অর্থাৎ, সে উলটো দিকে চেয়ে বল্লে, "নেই।" রসিক লোক সেই শতদলের দিকে "আশ্চর্যবৎ পশ্যতি"। এই আশ্চর্যের মানে হল পেয়েছি পাই-নি দুই-ই সত্য। প্রেমিক বললে, "লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু, তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।" অর্থাৎ, বললে লক্ষযুগের পাওয়া অল্পকালের মধ্যেই পেয়েছি আবার সেই সঙ্গেই লক্ষযুগের না-পাওয়াও লেগেই রইল। সময়টা যে আপেক্ষিক, রসের ভাষায় সে কথাটা অনেকদিন থেকে বলা চলছে, বিজ্ঞানের ভাষায় আজ বলা হল।

যখন ছোটো ছিলেম, মনে পড়ে, বিশ্বজগৎ আমার কাছে প্রতিদিন অন্ধকার রাত্রির গর্ভ থেকে নূতন দেহ ধরে জন্ম নিত। পরিচয় আর অপরিচয় আমার মনের মধ্যে এক হয়ে মিলেছিল। আর সেই শিশুকাল পথিকের কাল। তখন পথের শেষের দিকে লক্ষ্য খুঁজি নি, পথের আশেপাশে চেয়ে চেয়ে চলছি, যেন কোন্ আবছায়ার ভিতর থেকে আচমকা দেখা দেবে একটা "কী জানি", একটা "হয়তো"। বারান্দার কোণে খানিকটা ধুলো জড়ো করে আতার বিচি পুঁতে রোজ জল দিয়েছি। আজ যেটা আছে বীজ কাল সেটা হবে গাছ, ছেলেবেলায় সে একটা মস্ত "কী জানি"র দলে ছিল। সেই কী-জানিকে দেখাই সত্য দেখা। সত্যের দিকে চেয়ে যে বলে "জানি" সেও তাকে হারায়, যে বলে "জানি নে" সেও করে ভুল, আমাদের ঋষিরা এই বলেন। যে বলে "খুব জানি" সেই অবোধ সোনা ফেলে চাদরের গ্রন্থিকে পাওয়া মনে করে, যে বলে "কিছুই জানি নে" সে তো চাদরটাকে সুদ্ধ খুইয়ে বসে। আমি ঈশোপনিষদের এই মানেই বুঝি। "জানি না" যখন "জানি"র আঁচলে গাঁঠছড়া বেঁধে দেখা দেয় তখন মন বলে, "ধন্য হলেম।" পেয়েছি মনে করার মতো হারানো আর নেই।

খ

এই জন্যেই ভারতবর্ষকে ইংরেজ যেমন করে হারিয়েছে এমন আর য়ুরোপের কোনো জাত নয়। ভারতবর্ষের মধ্যে যে একটা চিরকেলে রহস্য আছে সেটা তার কাছ থেকে সরে গেল। তার ফৌজের গাঁঠের মধ্যে যে বস্তুটাকে কষে বাঁধতে পারলে সেইটেকেই

সে সম্পূর্ণ ভারতবর্ষ বলে বুক ফুলিয়ে গরীয়ান হয়ে বসে রইল। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তার বিস্ময় নেই, অবজ্ঞা যথেষ্ট আছে। রাষ্ট্রীয় স্বার্থের বাইরে ইংরেজ ভারত সম্বন্ধে যত অল্প আলোচনা করেছে এমন ফ্রান্স করে নি, জর্মনি করে নি। পোলিটিশনের চশমার বাইরে ভারতবর্ষ ইংরেজজাতির গোচরে আছে, এ কথাটা তার দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিক কাগজ পড়ে দেখলে বোঝা যায় না।

এর একমাত্র কারণ, ভারতবর্ষে ইংরেজের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। প্রয়োজন-সাধনের দেখা নিছক পাওয়ারই দেখা, তার মধ্যে না-পাওয়ার আমেজ নেই। এই জন্যেই একে সত্যের দেখা বলা যায় না। এই দেখায় সত্য নেই বলেই তাতে বিস্ময় নেই, শ্রদ্ধা নেই।

প্রয়োজনের সম্বন্ধ হচ্ছে কেবলই গ্রহণের সম্বন্ধ; তাতে লোভ আছে, আনন্দ নেই। সত্যের সম্বন্ধ হচ্ছে পাওয়া এবং দেওয়ার মিলিত সম্বন্ধ; কেননা, আনন্দই মন খুলে দিতে জানে। এই কারণেই দেখতে পাই; ভারতবর্ষের প্রতি ইংরেজের ব্যক্তিগত বদান্যতার অদ্ভুত অভাব। এ কথা নিয়ে নালিশ করা বৃথা, এইটেই স্বাভাবিক। ইংরেজের লোভ যে ভারতবর্ষকে পেয়েছে ইংরেজের আত্মা সেই ভারতবর্ষকে হারিয়েছে। এই-জন্যেই ভারতবর্ষে ইংরেজের লাভ, ভারতবর্ষে ইংরেজের গর্ব, ভারতবর্ষে ইংরেজের ক্লেশ। এইজন্যে ভারতবর্ষকে স্বাস্থ্য দেওয়া, শিক্ষা দেওয়া, মুক্তি দেওয়া সম্বন্ধে ইংরেজের ত্যাগ দুঃসাধ্য কিন্তু শাস্তি দেওয়া সম্বন্ধে ইংরেজের ক্রোধ অত্যন্ত সহজ। ইংরেজ-ধুনী বাংলা-দেশের রক্ত-নেংড়ানো পাটের বাজারে শতকরা চার-পাঁচশো টাকা মুনফা শুষে নিয়েও যে দেশের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে এক পয়সাও ফিরিয়ে দেয় না, তার দুর্ভিক্ষে বন্যায় মারী-মড়কে যার কড়ে আঙুলের প্রান্তও বিচলিত হয় না, যখন সেই শিক্ষাহীন স্বাস্থ্যহীন উপবাসক্লিষ্ট বাংলাদেশের বুকের উপর পুলিসের জাঁতা বসিয়ে রক্তচক্ষু কর্তৃপক্ষ কড়া আইন পাস করেন তখন সেই বিলাসী ধনী স্ফীত মুনফার উপর আরামের আসন পেতে বাহবা দিতে থাকে; বলে, "এই তো পাকা চালে ভারতশাসন।"

এইটেই স্বাভাবিক। কেননা, ওই ধনী বাংলাদেশকে একেবারেই দেখতে পায় নি, তার মোটা মুনফার ওপারে বাংলাদেশ আড়ালে পড়ে গেছে। বাংলাদেশের প্রাণের নিকেতনে যেখানে ক্ষুধাতৃষ্ণার কান্না, বাংলাদেশের হৃদয়ের মাঝখানে যেখানে তার সুখ-দুঃখের বাসা, সেখানে মানুষের প্রতি মানুষের মৈত্রীর একটা বড়ো রাস্তা আছে, সেখানে ধর্মবুদ্ধির বড়ো দাবি বিষয়বুদ্ধির গরজের চেয়ে বেশি, এ কথা জানবার ও ভাববার মতো তার সময়ও নেই শ্রদ্ধাও নেই। তাই যখনই দেখে দরোয়ানির ব্যবস্থা কঠোরতর করা হচ্ছে তখনই মুনফা-বৎসলেরা পুলকিত হয়ে ওঠে। ল অ্যাণ্ড্ অর্ডার রক্ষা হচ্ছে

দরোয়ানিতন্ত্র, পালোয়ানের পালা ; সিম্প্যাথি অ্যাণ্ড রেস্পেক্ট্ হচ্ছে ধর্মতন্ত্র, মানুষের নীতি।

অবিচার করতে চাই নে, রাজ্যশাসন মাত্রেই ল অ্যাণ্ড অর্ডার চাই। নিতান্ত স্নেহপ্রেমের এলাকাতেও কানমলার বরাদ্দ থাকে। রাজ্যে ছটফটানি বৃদ্ধি হলে সাধারণ দণ্ডবিধি অসাধারণ অবৈধ হয়ে উঠলেও দোষ দিই নে। একপক্ষে দুরন্তপনা ঘটলে অন্যপক্ষে দৌরাত্ম্য ঘটা শক্তিমানের পক্ষে গৌরবের বিষয় না হলেও সেটাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে। আসল কথা, কোনো শাসনতন্ত্রকে বিচার করতে হলে সমগ্র রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃতি বিচার করা চাই। যদি দেখা যায়, দেশের সকল মহলেই দরোয়ানের ঠেসাঠেসি ভিড়, অথচ তৃষ্ণায় যখন ছাতি ফাটছে, ম্যালেরিয়ায় যখন নাড়ী ছেড়ে যায়, তখন জনপ্রাণীর সাড়া নেই— যখন দেখি দরোয়ানের তকমা শিরোপা বকশিশ বাহবা সম্বন্ধে দাক্ষিণ্যের অজস্রতা, কোতোয়ালি থেকে শুরু করে দেওয়ানি ফৌজদারি কোনো বিভাগের কারো দুঃখ গায়ে সয় না, কারো আবদার ব্যর্থ হতে চায় না অথচ ঘরের ছেলের প্রাণ যখন কণ্ঠাগত তখন আত্মনির্ভর সম্বন্ধে সৎপরামর্শ ছাড়া আর কোনো কথা নেই— অর্থাৎ গলায় যখন ফাঁস তখন দুর্গানাম স্মরণ করা ছাড়া আর কোনো উপদেশ যেখান থেকে মেলে না সেখানে পরিমাণের অসংগতিতেই দরোয়ানটাকে যমদূত বলে সহজেই মনে হয়। যে পাকা বাড়িটাতে সুহৃদ্ সহায় আত্মীয়ের চেয়ে পাহারাওয়ালার প্রভাবই বেশি সেই জায়গাটাকেই তো চলতি ভাষায় জেলখানা বলে থাকে। বাগানে তো ইচ্ছে করেই লোকে কাঁটাগাছের বেড়া দেয়, সে কি আমরা জানি নে। কিন্তু, যেখানে কাঁটাগাছেরই যত আদর, ফুলগাছ শুকিয়ে মরে গেল, সে-বাগানে আমাদের মনে যদি উৎসাহ না হয় তা হলে মালী সেটাকে আমাদের অবিবেচনা মনে করে কেন। যদি শাসনকর্তা জিজ্ঞাসা করেন "তোমরা কি চাও না দেশে ল অ্যাণ্ড অর্ডার থাকে", আমি বলি, "খুবই চাই, কিন্তু লাইফ অ্যাণ্ড মাইণ্ড তার চেয়ে কম মূল্যবান নয়।" মানদণ্ডের একটা পাল্লায় বিশ পঁচিশ মণ বাটখারা চাপানো দোষের নয়, অন্য পাল্লাটাতে যে-মাল চাপানো হয় তাতে যদি আমাদের নিজের স্বত্ব কিছু থাকে। কিন্তু যখন দেখি এ-পক্ষের দিকটাতেই যত রাজ্যের ইঁটপাথর, আর মালের পনেরো আনাই হল অন্য পক্ষের দিকে, তখন ফৌজে-পুলিসে-গড়া মানদণ্ডটা অপমানদণ্ড বলেই ঠেকে। নালিশ আমাদের পুলিসের বিরুদ্ধে নয়, নালিশ আমাদের এই ওজনের বিরুদ্ধে ; নালিশ— আগুন জ্বলে ব'লে নয়, রান্না চড়ানো হয় না ব'লে। বিশেষত, সেই আগুনের বিল যখন আমাদেরই চোকাতে হয়। চুলিতে কাঠের খরচটাই এতে সর্বনেশে হয়ে ওঠে যে হাঁড়িতে চাল ডাল জোগাবার কড়ি বাকি থাকে না। সেই

অবস্থায় যখন পেটের জ্বালায় চোখে জল আসে তখন যদি কর্তা রাগ করে বলেন "তবে কি চুলোতে আগুন জ্বালব না", ভয়ে ভয়ে বলি, "জ্বালবে বই কি, কিন্তু ওটা-যে চিতার আগুন হয়ে উঠল।"

যে-দুঃখের কথাটা বলছি এটা জগৎ জুড়ে আজ ছড়িয়ে পড়েছে; আজ মুনফার আড়ালে মানুষের জ্যোতির্ময় সত্য রাহুগ্রস্ত। এইজন্যেই মানুষের প্রতি কঠিন ব্যবহার করা, তাকে বঞ্চনা করা, এত সহজ হল। তাই পাশ্চাত্যে পলিটিক্‌সই মানুষের সকল চেষ্টার সর্বোচ্চ চূড়া দখল করে বসেছে। অর্থাৎ, মানুষের ফুলে-ওঠা পকেটের তলায় মানুষের চুপসে-যাওয়া হৃদয় পড়েছে চাপা। সর্বভুক্‌ পেটুকতার এমন বিস্তৃত আয়োজন পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনো দিন এমন কুৎসিত আকারে দেখা দেয় নি।

গ

আমাদের রিপু সত্যের সম্পূর্ণ মূর্তিকে আচ্ছন্ন করে। কামে আমরা মাংসই দেখি, আত্মাকে দেখি নে; লোভে আমরা বস্তুই দেখি, মানুষকে দেখি নে; অহংকারে আমরা আপনাকেই দেখি, অন্যকে দেখি নে। একটা রিপু আছে যা এদের মতো উগ্র নয়, যা ফাঁকা। তাকে বলে মোহ; সে হচ্ছে জড়তা, অসাড়তা। আমাদের চৈতন্যের আলো ম্লান করে দিয়ে সে সত্যকে আবৃত করে। সে বিঘ্ন নয়, সে আবরণ। অভ্যাস অনেক সময় সেই মোহরূপে আমাদের মনকে আবিষ্ট করে।

কুয়াশায় পৃথিবীর বস্তুকে নষ্ট করে না, তার আকাশকে লুপ্ত করে। অসীমকে অগোচর করে দেয়। অভ্যাসের মোহ মনের সেই কুয়াশা। অনির্বচনীয়কে সে আড়াল করে, বিস্ময়রসকে সে শুকিয়ে ফেলে। তাতে সত্য পদার্থের গুরুত্ব কমে না, তার গৌরব কমে যায়। আমাদের মন তখন সত্যের অভ্যর্থনা করতে পারে না। বিস্ময় হচ্ছে সত্যের অভ্যর্থনা।

ডাক্তার বলে, প্রতিদিন একই অভ্যস্ত খাওয়া পরিপাকের পক্ষে অনুকূল নয়। ভোজ্য সম্বন্ধে রসনার বিস্ময় না থাকলে দেহ তাকে গ্রহণ করতে আলস্য করে। শিশু-ছাত্রদের একই ক্লাসে একই সময়ে একই বিষয় শিক্ষার পুনরাবৃত্তি করানোতেই তাদের শিক্ষার আগ্রহ ঘুচিয়ে দেওয়া হয়।

প্রাণের স্বভাবই চির-উৎসুক। প্রকৃতি তাকে ক্ষণে ক্ষণে আকস্মিকের স্পর্শে চঞ্চল করে রাখে। এমন-কি, এই আকস্মিক যদি দুঃখ আকারেও আসে তাতেও চিত্তের বড়ো রকমের উদ্‌বোধন ঘটে। সীমার অতীত যা আকস্মিক হচ্ছে তারই দূত; অভাবনীয়ের বার্তা নিয়ে সে আসে, চেতনাকে জড়ত্ব থেকে মুক্তি দেয়।

আমাদের দেশে তীর্থযাত্রা ধর্মসাধনার একটি প্রধান অঙ্গ। দেবতাকে যখন অভ্যাসের পর্দায় ঘিরে রাখে তখন আমরা সেই পর্দাকেই পূজা করি। যাদের মন স্বভাবতই বিষয়ী, ধর্মচর্চাতেও যারা বস্তুকে বেশি দাম দেয়, তারা দেবতার চেয়ে পর্দাকেই বেশি শ্রদ্ধা করে।

তীর্থযাত্রায় সেই পর্দা ঠেলে দিয়ে মন পথে বেরিয়ে পড়ে। তখন প্রতিদিনের সীমাবদ্ধ জানাকে চিরদিনের অসীম অজানার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা সহজ হয়। প্রতিদিন ও চিরদিনের সংগমস্থলেই সত্যের মন্দির।

এবারে তাই পথের দুই পাশে চাইতে চাইতে বেরিয়েছিলুম। অভ্যাসের জগতে যাকে দেখেও দেখি নে, মন জেগে উঠে বললে, সেই চির-অপরিচিত হয়তো কোথায় অজানা ফুলের মালা প'রে অজানা তারার রাত্রে দেখা দেবে। অভ্যাস বলে ওঠে, "সে নেই গো নেই, সে মরীচিকা।" গভীর বাইরেকার বিশ্ব বলে, "আছে বইকি, তাকিয়ে দেখো। দেখা হয়ে চুকেছে মনে ক'রে দেখা বন্ধ কর, তাই তো দেখা হয় না।" তখন ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়, "দেখা হল বুঝি।" পথিকের প্রাণের উদ্‌বোধন সেই কী-জানি। সেই কী-জানির উদ্দেশে গান লিখেছি। জীবনের সকল নৈরাশ্য, সকল বিড়ম্বনা, সকল তুচ্ছতার অবসাদ অতিক্রম করেও সেই কী-জানির আভাস আলোতে-ছায়াতে ঝল্‌মল্‌ করে উঠছে, পথিক তারই চমক নেবার জন্যে তার জানা ঘরের কোণ ফেলে পথে বেরিয়েছে।

ক্রাকোভিয়া জাহাজ
১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৫

বৈষ্ণবী আমাকে বলেছিল, "কার বাড়িতে বৈরাগীর কখন অন্ন জোটে তার ঠিকানা নেই ; সে-অন্নে নিজের জোর দাবি খাটে না, তাই তো বুঝি এ অন্ন তিনিই জুগিয়ে দিলেন।" এই কথাই কাল বলেছিলেম, বাঁধা পাওয়ায় পাওয়ার সত্য ম্লান হয়ে যায়। না-পাওয়ার রসটা তাকে ঘিরে থাকে না। ভোগের মধ্যে কেবলমাত্রই পাওয়া, পশুর পাওয়া ; আর সম্ভোগের মধ্যে পাওয়া না-পাওয়া দুই-ই মিলেছে, সে হল মানুষের।

ছেলেবেলা হতেই বিধাতার পাকা বাসা থেকে বিধাতা আমাকে পথে বের করে দিয়েছেন। অকিঞ্চন বৈরাগীর মতো অন্তরের রাস্তায় একা চলতে চলতে মনের অন্ন যখন-তখন হঠাৎ পেয়েছি। আপন-মনে কেবলই কথা বলে গেছি, সেই হল লক্ষ্মীছাড়ার চাল। বলতে বলতে এমন কিছু শুনতে পাওয়া যায় যা পূর্বে শুনি নি। বন্যার স্রোতে যখন জোয়ার আসে তখন কোন্‌ গুহার ভিতরকার অজানা সামগ্রী ভেসে

ভেসে ঘাটে এসে লাগে। মনে হয় না, তাতে আমার বাঁধা বরাদ্দের জোর আছে। সেই আচমকা পাওয়ার বিস্ময়ই তাকে উজ্জ্বল করে তোলে, উল্কা যেমন হঠাৎ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এসে আগুন হয়ে ওঠে।

পৃথিবীতে আমার প্রেয়সীদের মধ্যে যিনি সর্বকনিষ্ঠ তাঁর বয়স তিন। ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলে যেতে তাঁর এক মুহূর্ত বিরাম নেই। শ্রোতা যারা তারা উপলক্ষ; বস্তুত কথাগুলো নিজেকেই নিজে শোনানো; যেমন বাষ্পরাশি ঘুরতে ঘুরতে গ্রহতারা-রূপে দানা বেঁধে ওঠে তেমনি কথা-বলার বেগে আপনিই তার সজাগ মনে চিন্তার সৃষ্টি হতে থাকে। বাইরে থেকে মাস্টারের বাচালতা যদি এই স্রোতকে ঠেকায় তা হলে তার আপন চিন্তাধারার সহজ পথ বন্ধ হয়ে যায়। শিশুর পক্ষে অতিমাত্রায় পুঁথিগত বিদ্যাটা ভাবনার স্বাভাবিক গতিকে আটকিয়ে দেওয়া। বিশ্বপ্রকৃতি দিনরাত্রি কথা কইছে, সেই কথা যখন শিশুর মনকে কথা কওয়ায় তখন তার সেই আপন কথাই তার সব চেয়ে ভালো শিক্ষাপ্রণালী। মাস্টার নিজে কথা বলে, আর ছেলেকে বলে "চুপ"। শিশুর চুপ-করা মনের উপর বাইরের কথা বোঝার মতো এসে পড়ে, খাদ্যের মতো নয়। যে-শিশুশিক্ষাবিভাগে মাস্টারের গলাই শোনা যায়, শিশুরা থাকে নীরব, সেখানে আমি বুঝি মরুভূমির উপর শিলবৃষ্টি হচ্ছে।

যাই হোক, মাস্টারের হাতে বেশি দিন ছিলেম না বলে আমি যা-কিছু শিখেছি সে কেবল বলতে-বলতে। বাইরে থেকেও কথা শুনেছি, বই পড়েছি; সে কোনোদিনই সঞ্চয় করবার মতো শোনা নয়, মুখস্থ করবার মতো পড়া নয়। কিছু-একটা বিশেষ ক'রে শেখবার জন্যে আমার মনের ধারার মধ্যে কোথাও বাঁধ বাঁধি নি। তাই সেই ধারার মধ্যে যা এসে পড়ে তা কেবলই চলাচল করে, ঠাঁই বদল করতে করতে বিচিত্র আকারে তারা মেলে মেশে। এই মনোধারার মধ্যে রচনার ঘূর্ণি যখন জাগে তখন কোথা হতে কোন্ সব ভাসা কথা কোন্ প্রসঙ্গমূর্তি ধরে এসে পড়ে তা কি আমি জানি।

অনেকে হয়তো ভাবেন, ইচ্ছা করলেই বিশেষ বিষয় অবলম্বন করে আমি বিশেষভাবে বলতে বা লিখতে পারি। যাঁরা পাকা বক্তা বা পাকা লেখক তাঁরা পারেন; আমি পারি নে। যার আছে গোয়াল, ফরমাশ করলেই বিশেষ বাঁধা গোরুটাকে বেছে এনে সে দুইতে পারে। আর যার আছে অরণ্য, যে-গোরুটা যখন এসে পড়ে তাকে নিয়েই তার উপস্থিতমত কারবার। আশু মুখুজ্জে মশায় বললেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করতে হবে। তখন তো ভয়ে ভয়ে বললেম, আচ্ছা। তার পরে যখন জিজ্ঞাসা করলেন বিষয়টা কী, তখন চোখ বুজে বলে দিলেম, সাহিত্য সম্বন্ধে। সাহিত্য সম্বন্ধে কী যে বলব আগেভাগে তা জানবার শক্তিই ছিল না। একটা অন্ধ ভরসা ছিল যে, বলতে

বলতেই বিষয় গড়ে উঠবে। তিনদিন ধরে বকেছিলেম। শুনেছি অনেক অধ্যাপকের পছন্দ হল না। বিষয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় দুইয়েরই মর্যাদা রাখতে পারি নি। তাঁদের দোষ নেই, সভাস্থলে যখন এসে দাঁড়ালেম তখন মনের মধ্যে বিষয় বলে কোনো বালাই ছিল না। বিষয় নিয়েই যাঁদের প্রতিদিনের কারবার বিষয়হীনের অকিঞ্চনতা তাঁদের কাছে ফস্ করে ধরা পড়ে গেল।

এবার ইটালিতে মিলান শহরে আমাকে বক্তৃতা দিতে হয়েছিল। অধ্যাপক ফর্মিকি বারবার জিজ্ঞাসা করলেন, বিষয়টা কী? কী করে তাঁকে বলি যে, যে-অন্তর্যামী তা জানেন তাঁকে প্রশ্ন করলে জবাব দেন না। তাঁর ইচ্ছা ছিল, যদি একটা চুম্বক পাওয়া যায় তবে আগেই সেটা তর্জমা করে ছাপিয়ে রাখবেন। আমি বলি, সর্বনাশ! বিষয় যখন দেখা দেবে চুম্বক তার পরেই সম্ভব। ফল ধরবার আগেই তার আঁঠি খুঁজে পাই কী উপায়ে। বক্তৃতা সম্বন্ধে আমার ভদ্র অভ্যাস নেই, আমার অভ্যাস লক্ষ্মীছাড়া। ভেবে বলতে পারি নে, বলতে বলতে ভাবি, মৌমাছির পাখা যেমন উড়তে গিয়ে গুন্‌গুন্ করে। সুতরাং, অধ্যাপক হবার আশা আমার নেই, এমন-কি, ছাত্র হবারও ক্ষমতার অভাব।

এমনি করে দৈবক্রমে বৈরাগীর তত্ত্বকথাটা বুঝে নিয়েছি। যারা বিষয়ী তারা বিশ্বকে বাদ দিয়ে বিশেষকে খোঁজে। যারা বৈরাগী তারা পথে চলতে চলতেই বিশ্বের সঙ্গে মিলিয়ে বিশেষকে চিনে নেয়। উপরি-পাওনা ছাড়া তাদের কোনো বাঁধাপাওনাই নেই। বিশ্বপ্রকৃতি স্বয়ং যে এই লক্ষ্যহীন বৈরাগী— চলতে চলতেই তার যা-কিছু পাওয়া। জড়ের রাস্তায় চলতে চলতে সে হঠাৎ পেয়েছে প্রাণকে, প্রাণের রাস্তায় চলতে চলতে সে হঠাৎ পেয়েছে মানুষকে। চলা বন্ধ করে যদি সে জমাতে থাকে তা হলেই সৃষ্টি হয়ে ওঠে জঞ্জাল। তখনই প্রলয়ের ঝাঁটার তলব পড়ে।

বিশ্বের মধ্যে একটা দিক আছে যেটা তার স্থাবর বস্তুর অর্থাৎ বিষয়সম্পত্তির দিক নয়; যেটা তার চলচ্চিত্তের নিত্য প্রকাশের দিক। যেখানে আলো ছায়া সুর, যেখানে নৃত্য গীত বর্ণ গন্ধ, যেখানে আভাস ইঙ্গিত। যেখানে বিশ্ববাউলের একতারার ঝংকার পথের বাঁকে বাঁকে বেজে বেজে ওঠে, যেখানে সেই বৈরাগীর উত্তরীয়ের গেরুয়া রং বাতাসে বাতাসে ঢেউ খেলিয়ে উড়ে যায়। মানুষের ভিতরকার বৈরাগীও আপন কাব্যে গানে ছবিতে তারই জবাব দিতে দিতে পথে চলে, তেমনিতরোই গানের নাচের রূপের রসের ভঙ্গীতে। বিষয়ী লোক আপন খাতাঞ্চিখানায় বসে যখন তা শোনে তখন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, "বিষয়টা কী। এতে মুনফা কী আছে। এতে কী প্রমাণ করে।" অধরকে ধরার জায়গা সে খোঁজে তার মুখবাঁধা থলিতে, তার চামড়াবাঁধানো খাতায়। নিজের মনটা যখন বৈরাগী হয় নি তখন বিশ্ববৈরাগীর বাণী কোনো কাজে লাগে না।

তাই দেখেছি, খোলা রাস্তার বাঁশিতে হঠাৎ-হাওয়ায় যে গান বনের মর্মরে নদীর কল্লোলের সঙ্গে সঙ্গে বেজেছে, যে-গান ভোরের শুকতারার পিছে পিছে অরুণ-আলোর পথ দিয়ে চলে গেল, শহরের দরবারে ঝাড়লণ্ঠনের আলোতে তারা ঠাঁই পেল না; ওস্তাদেরা বললে "এ কিছুই না", প্রবীণেরা বললে "এর মানে নেই"! কিছু নয়ই তো বটে; কোনো মানে নেই, সে-কথা খাঁটি; সোনার মতো নিকষে কষা যায় না, পাটের বস্তার মতো দাঁড়িপাল্লায় ওজন চলে না। কিন্তু, বৈরাগী জানে, অধর রসেই ওর রস। কতবার ভাবি গান তো এসেছে গলায় কিন্তু শোনাবার লগ্ন রচনা করতে তো পারি নে; কান যদি-বা খোলা থাকে আন্‌মনার মন পাওয়া যাবে কোথায়। সে-মন যদি তার গদি ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে পারে তবেই-তো যা বলা যায় না তাই সে শুনবে, যা জানা যায় না তাই সে বুঝবে।

ক্রাকোভিয়া জাহাজ
১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৫

জন্মকাল থেকে আমাকে একখানা নির্জন নিঃসঙ্গতার ভেলার মধ্যে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তীরে দেখতে পাচ্ছি লোকালয়ের আলো, জনতার কোলাহল; ক্ষণে ক্ষণে ঘাটেও নামতে হয়েছে, কিন্তু কোনোখানে জমিয়ে বসতে পারি নি। বন্ধুরা ভাবে তাদের এড়িয়ে গেলুম; শত্রুরা ভাবে, অহংকারেই দূরে দূরে থাকি। যে-ভাগ্যদেবতা বরাবর আমাকে সরিয়ে সরিয়ে নিয়ে গেল, পাল গোটাতে সময় দিলে না, রশি যতবার ডাঙার খোঁটায় বেঁধেছি টান মেরে ছিঁড়ে দিয়েছে, সে কোনো কৈফিয়ত দিলে না।

সুখদুঃখের হিসাবনিকাশ নিয়ে ভাগ্যের সঙ্গে তকরার করে লাভ নেই। যা হয়েছে তার একটা হেতু আছে, সেই হেতুর উপর রাগ করলে হাওয়ার উপরেই রাগতে হয়। ঘড়া রাগ করে ঠং ঠং শব্দে যদি বলে "আমাকে শূন্য করে গড়েছে কেন", তার জবাব হচ্ছে, "তোমাকে শূন্য করবে বলেই ঘড়া করে নি, ঘড়া করবে বলেই শূন্য করেছে।" ঘড়ার শূন্যতা পূর্ণতারই অপেক্ষায়। আমার একলা-আকাশের ফাঁকটাকে ভরতি করতে হবে, সেই প্রত্যাশাটা আমার সঙ্গে সঙ্গে লেগে আছে। দৈবের এই দাবিটিই আমার সম্মান; একে রক্ষা করতে হলে পুরাপুরি দাম দিতে হবে।

তাই শূন্য আকাশে একলা বসে ভাগ্যনির্দিষ্ট কাজ করে থাকি। তাতেই আমার হওয়ার অর্থটা বুঝি, কাজেই আনন্দও পাই। বাঁশির ফাঁকটা যখন সুরে ভরে ওঠে তখন তার আর-কোনো নালিশ থাকে না।

শরীরে মনে প্রাণের দক্ষিণ হাওয়া যখন জোরে বয় তখন আত্মপ্রকাশের দাক্ষিণ্যেই

আমার যথেষ্ট পুরস্কার মেলে। কিন্তু যখন ক্লান্তি আসে, যখন পথ ও পাথেয় দুই-ই যায় কমে অথচ সামনে পথটা দেখতে পাই সুদীর্ঘ, তখন ছেলেবেলা থেকে যে-ঘর বাঁধবার সময় পাই নি সেই ঘরের কথা মন জিজ্ঞাসা করতে থাকে। তখনই আকাশের তারা ছেড়ে দীপের আলোর দিকে চোখ পড়ে। জীবলোকে ছোটো ছোটো মাধুরীর দৃশ্য যা তীরের থেকে দেখা দিয়ে সরে সরে গিয়েছে, চোখের উপরকার আলো ম্লান হয়ে এলে সেই অন্ধকারে তাদের ছবি ফুটে ওঠে; তখন বুঝতে পারি, সেই-সব ক্ষণিকের দেখা প্রত্যেকেই মনের মধ্যে কিছু-না-কিছু ডাক দিয়ে গেছে। তখন মনে হয়, বড়ো বড়ো কীর্তি গড়ে তোলাই-যে বড়ো কথা তা নয়, পৃথিবীতে যে-প্রাণের যজ্ঞ সম্পন্ন করবার জন্যে নিমন্ত্রণ পেয়েছি তাতে উৎসবের ছোটো পেয়ালাগুলি রসে ভরে তোলা শুনতে সহজ, আসলে দুঃসাধ্য।

এবারে ক্লান্ত দুর্বল শরীর নিয়ে বেরিয়েছিলুম। তাই, অন্তরে যে-নারীপ্রকৃতি অন্তঃপুর-চারিণী হয়ে বাস করে ক্ষণে ক্ষণে সে আপন ঘরের দাবি জানাবার সময় পেয়েছিল। এই দাবির মধ্যে আমার পক্ষে কেবল যে আরামের লোভ তা নয়, সার্থকতার আশাও রয়েছে। জীবনপথের শেষদিকে বিশ্বলক্ষ্মীর আতিথ্যের জন্যে শ্রান্ত চিত্তের যে ঔৎসুক্য সে কেবল শক্তির অপচয় নিবারণের আগ্রহে, পাথেয় পূর্ণ করে নেবার জন্যে। কাজের হুকুম এখনো মাথার উপর অথচ উদ্যম এখন নিস্তেজ, মন তাই প্রাণশক্তির ভাণ্ডারীর খোঁজ করে। শুষ্ক তপস্যার পিছনে কোথায় আছে অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার।

দিনের আলো যখন নিবে আসছে, সামনের অন্ধকারে যখন সন্ধ্যার তারা দেখা দিল, যখন জীবনযাত্রার বোঝা খালাস করে অনেকখানি বাদ দিয়ে অল্প-কিছু বেছে নেবার জন্যে মনকে তৈরি হতে হচ্ছে, তখন কোন্‌টা রেখে কোন্‌টা নেবার জন্যে মনের ব্যগ্রতা আমি তাই লক্ষ্য করে দেখছি। সমস্ত দিন প্রাণপণ চেষ্টায় যা-কিছু সে জমিয়েছিল, গড়ে তুলেছিল, সংসারের হাটে যদি তার কিছু দাম থাকে তবে তা সেইখানেই থাক্‌, যারা আগলে রাখতে চায় তারাই তার খবরদারি করুক; রইল টাকা, রইল খ্যাতি, রইল কীর্তি, রইল পড়ে বাইরে; গোধূলির আঁধার যতই নিবিড় হয়ে আসছে ততই তারা ছায়া হয়ে এল; তারা মিলিয়ে গেল মেঘের গায়ে সূর্যাস্তের বর্ণচ্ছটার সঙ্গে। কিন্তু, যে-অনাদি অন্ধকারের বুকের ভিতর থেকে একদিন এই পৃথিবীতে বেরিয়ে এসেছি সেখানকার প্রচ্ছন্ন উৎস থেকে উৎসারিত জলধারা ক্ষণে ক্ষণে আমার যাত্রাপথের পাশে পাশে মধুর কলস্বরে দেখা দিয়ে আমার তৃষ্ণা মিটিয়েছে, আমার তাপ জুড়িয়েছে, আমার ধুলো ধুয়ে দিয়েছে, সেই তীর্থের জল ভরে রইল আমার স্মৃতির পাত্রখানি। সেই অন্ধকার অপরিসীমের হৃদয়কন্দর থেকে বারবার যে-বাঁশির ধ্বনি আমার প্রাণে এসে

পৌঁচেছিল, কত মিলনে, কত বিরহে, কত কান্নায়, কত হাসিতে ; শরতের ভোরবেলায়, বসন্তের সায়াহ্নে, বর্ষার নিশীথরাত্রে ; কত ধ্যানের শান্তিতে, পূজার আত্মনিবেদনে, দুঃখের গভীরতায় ; কত দানে, কত গ্রহণে, কত ত্যাগে, কত সেবায়— তারা আমার দিনের পথে সুর হয়ে বেজেছিল, আজ তারাই আমার রাত্রের পথে দীপ হয়ে জ্বলে উঠছে। সেই অন্ধকারের ঝরনা থেকেই আমার জীবনের অভিষেক, সেই অন্ধকারের নিস্তব্ধতার মধ্যে আমার মৃত্যুর আমন্ত্রণ ; আজ আমি তাকে বলতে পারব, হে চির-প্রচ্ছন্ন, আমার মধ্যে যা-কিছু তুমি তোমার গভীরের ভিতর থেকে তারার মতো প্রকাশ করেছ রূপে ও বাণীতে, তাতেই নিত্যকালের অমৃত ; আমি খুঁজে খুঁজে পাথর কুড়িয়ে কুড়িয়ে কীর্তির যে-জয়স্তম্ভ গেঁথেছি, কালস্রোতের ভাঙনের উপরে তার ভিত। সেই-জন্যেই আজ গোধূলির ধূসর আলোয় একলা বসে ভাবছিলুম, রঙিন রসের অক্ষরে লেখা যে-লিপি তোমার কাছ থেকে ক্ষণে ক্ষণে এসেছিল ভালো করে তা পড়া হয় নি, ব্যস্ত ছিলুম। তার মধ্যে নিমন্ত্রণ ছিল। কোথায়। কারখানাঘরে নয়, খাতাঞ্চিখানায় নয়, ছোটো ছোটো কোণে যেখানে ধরণীর ছোটো সুখগুলি লুকানো। তাই আজ পিছন ফিরে তাকিয়ে মনে মনে ভেবে দেখছি, কতবার বঞ্চিত হলুম। জনতার জয়ধ্বনির ডাকে কতবার অন্যমনে গভীর নিভৃতের পাশ দিয়ে চলে এসেছি ; মায়ামৃগের অনুসরণে কতবার সরল সুন্দরের দিকে চোখ পড়ল না। জীবনপথে আশে পাশে সুধার-কণা-ভরা যে বিনামূল্যের ফলগুলি পাতার আড়ালে ঢাকা ছিল, তাদের এড়িয়ে উপবাসী হয়ে চলে এসেছি বলেই এত শ্রান্তি, এত অবসাদ। প্রভাত যেখান থেকে আপন পেয়ালা আলোতে ভরে নেয়, রাত্রি যার আঙিনায় বসে প্রাণের ছিন্ন সূত্রগুলি বারে বারে জুড়ে তোলে, ওই লুকিয়ে-থাকা ছোটো ফলগুলি সেই মহান্ধকারেরই রহস্য-গর্ভ থেকে রস পেয়ে ফলে উঠছে, সেই অন্ধকার— যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ।

ক্রাকোভিয়া জাহাজ
১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৫

বাংলা ভাষায় প্রেম অর্থে দুটো শব্দের চল আছে ; ভালোলাগা আর ভালোবাসা। এই দুটো শব্দে আছে প্রেমসমুদ্রের দুই উলটোপারের ঠিকানা। যেখানে ভালোলাগা সেখানে ভালো আমাকে লাগে, যেখানে ভালোবাসা সেখানে ভালো অন্যকে বাসি। আবেগের মুখটা যখন নিজের দিকে তখন ভালোলাগা, যখন অন্যের দিকে তখন ভালোবাসা। ভালোলাগায় ভোগের তৃপ্তি, ভালোবাসায় ত্যাগের সাধন।

সংস্কৃত ভাষায় অনুভব বলতে যা বুঝি তার খাঁটি বাংলা প্রতিশব্দ একদিন ছিল।

এতবড়ো একটা চলতি ব্যবহারের কথা হারালো কোন্ ভাগ্যদোষে বলতে পারি নে। এমন দিন ছিল যখন লাজবাসা ভয়বাসা বলতে বোঝাত লজ্জা অনুভব করা, ভয় অনুভব করা। এখন বলি, লজ্জা পাওয়া, ভয় পাওয়া। কিল খাওয়া, গাল খাওয়া, যেমন ভাষার বিকার— লজ্জা পাওয়া, ভয় পাওয়াও তেমনি।

কারো 'পরে আমাদের অনুভব যখন সম্পূর্ণ ভালো হয়ে ওঠে, ভালো-ভাবায় ভালো-ইচ্ছায় মন কানায় কানায় ভরতি হয় তখন তাকেই বলি ভালোবাসা। পূর্ণ উৎকর্ষের ভাবকেই বলা যায় ভালো। স্বাস্থ্য যেমন প্রাণের পূর্ণতা, সৌন্দর্য যেমন রূপের পূর্ণতা, সত্য যেমন জ্ঞানের পূর্ণতা, ভালোবাসা তেমনি অনুভূতির পূর্ণতা। ইংরেজিতে গুড্ ফীলিং বলে এ তা নয়, একে বলা যেতে পারে পারফেক্ট্ ফীলিং।

শুভ-ইচ্ছার পূর্ণতা হচ্ছে নৈতিক, তার ক্রিয়া ব্যবহারের উপর ; ভালোবাসার পূর্ণতা আত্মিক, সে হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিস্বরূপের (personalityর) পরম প্রকাশ ; শুভ-ইচ্ছা অন্ধকারে যষ্টি, প্রেম অন্ধকারে চাঁদ। মায়ের স্নেহ মায়ের শুভ-ইচ্ছা মাত্র নয়, তা তাঁর পূর্ণতার ঐশ্বর্য। তা অন্নের মতো নয়, তা অমৃতের মতো। এই অনুভূতির পূর্ণতা একটি শক্তি। ভালোবাসার বিষয়ের মধ্যে অসীমকে বোধ করবার শক্তি ; ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে অপরিমেয়কে দেখতে পাওয়া এবং স্বীকার করাই অপরিমেয়কে সীমার মন্দিরে জাগিয়ে তোলবার শক্তি।

নিজের অস্তিত্বের মূল্য যে-মানুষ ছোটো করে দেখে আত্ম-অবিশ্বাসের অবসাদেই সে নিজের সম্পদ উদ্‌ঘাটিত করতে ভরসা পায় না। বিশ্ব আপনার সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রত্যেক মানুষকে গ্রহণ ও ধারণ করে, মানুষের অন্তরে এই মস্ত সত্যটির অনুভব হচ্ছে প্রেম। ব্যক্তিবিশেষকে সে ডাক দিয়ে বলে, "তুমি কারোর চেয়ে কম নও, তোমার মধ্যে এমন মূল্য আছে যার জন্যে প্রাণ দেওয়া চলে।" মানুষ যেখানে আপন সীমা টেনে দিয়ে নিজেকে সাধারণের সামিল করে অলস হয়ে বসে থাকে প্রেম ব্যক্তিবিশেষের সেই সাধারণ সীমাকে মানে না, তাকে অর্ঘ্য দিয়ে বলে, "তোমার কপালে আমি তিলক দিয়েছি, তুমি অসাধারণ।" সূর্যের আলো বৃষ্টির জল যেমন নির্বিচারে সর্বত্রই মাটির জড়তা ও দৈন্য অস্বীকার করে, মরুকে বারবার স্পর্শ করে, তাকে শ্যামলতায় পুলকিত করে তোলে, যে-ভূমি রিক্ত তারও সফলতার জন্যে যেমন তাদের নিরন্তর প্রতীক্ষা, তার কাছেও যেমন পূর্ণতার দাবি, মানুষের সমাজে প্রেম তেমনি সব জায়গাতেই অসীম প্রত্যাশা জাগিয়ে রাখে। ব্যক্তিকে সে যে মূল্য দেয় সে মূল্য মহিমার মূল্য। অন্তর্নিহিত এই মহিমার আশ্বাসে মানুষের সৃষ্টিশক্তি নানাদিকে পূর্ণ হয়ে ওঠে ; তার কর্মের ক্লান্তি দূর হয়ে যায়।

এই ব্যক্তিগত প্রেমের বাহন নারী। ইতিহাসের অপ্রকাশিত লিখন যদি বের করা

যেত তা হলে দেখতে পেতেম নারীর প্রেমের প্রেরণা মানুষের সমাজে কী কাজ করেছে। শক্তির যে-ক্রিয়া উদ্যত চেষ্টারূপে চঞ্চল আমরা তাকেই শক্তির প্রকাশরূপে দেখি, কিন্তু যে-ক্রিয়া গূঢ় উদ্দীপনারূপে পরিব্যাপ্ত তার কথা মনেই আনি নে। বিস্ময়ের কথা এই যে, বিশ্বের স্ত্রীপ্রকৃতিকেই ভারতবর্ষ শক্তি বলে জেনেছে।

সকলেই জানে, এই শক্তিরই বিকারের মতো এমন সর্বনেশে বিপদ আর কিছুই নেই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীমের হৃদয়ের মধ্যে অদৃশ্য থেকে দ্রৌপদী তাঁকে বল জুগিয়েছেন। বীর আণ্টনির হৃদয় অধিকার করে ক্লিওপাট্রা তাঁর বল হরণ করে নিল। সত্যবানকে মৃত্যুর মুখ থেকে উদ্ধার করেন সাবিত্রী, কিন্তু কত নারী পুরুষের সত্য নষ্ট করে তাকে মৃত্যুর মুখে নিয়ে গেছে তার সংখ্যা নেই।

তাই তো গোড়ায় বলেছি, প্রেমের দুই বিরুদ্ধ পার আছে। এক পারে চোরাবালি, আর-এক পারে ফসলের খেত। এক পারে ভালোলাগার দৌরাত্ম্য, অন্য পারে ভালোবাসার আমন্ত্রণ। মাতৃস্নেহের মধ্যেও এই দুই জাতের প্রেম। একটাতে প্রধানত আসক্তি নিজের পরিতৃপ্তি খোঁজে; সেই অন্ধ মাতৃস্নেহ আমাদের দেশে বিস্তর দেখতে পাই। তাতে সন্তানকে বড়ো ক'রে না তুলে তাকে অভিভূত করে। তাতে কোনো পক্ষেরই কল্যাণ নেই। যে-প্রেম ত্যাগের দ্বারা মানুষকে মুক্তি দিতে জানে না পরন্তু ত্যাগের বিনিময়ে মানুষকে আত্মসাৎ করতে চায় সে-প্রেম তো রিপু। এক পক্ষকে ক্ষুধার দাহে সে দগ্ধ করে, অন্য পক্ষকে লালায়িত আসক্তি দ্বারা লেহন করে জীর্ণ করে দেয়। এই মাতৃলালনপাশের পরিবেষ্টনের মধ্যে যারা চির-অবরুদ্ধ আমাদের দেশে তাদের সংখ্যা বিস্তর; তাদের শৈশব আর ছাড়তে চায় না। আসক্তি-পরায়ণ মাতার মূঢ় আদেশপালনের অনর্থ বহন করে অপমানের মধ্যে অভাবের মধ্যে চিরজীবনের মতো মাথা হেঁট হয়ে গেছে, এমন-সকল বয়স্ক নাবালকের দল আমাদের দেশে ঘরে ঘরে। আমাদের দেশে মাতার ক্রোড়রাজত্ববিস্তারে পৌরুষের যত হানি হয়েছে এমন বিদেশি শাসনের হাতকড়ির নির্মমতার দ্বারাও হয় নি।

স্ত্রীপুরুষের প্রেমেও সেই একই কথা। নারীর প্রেম পুরুষকে পূর্ণশক্তিতে জাগ্রত করতে পারে; কিন্তু সে-প্রেম যদি শুক্লপক্ষের না হয়ে কৃষ্ণপক্ষের হয় তবে তার মালিন্যের আর তুলনা নেই। পুরুষের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ তপস্যায়; নারীর প্রেমে ত্যাগধর্ম সেবাধর্ম সেই তপস্যারই সুরে সুর-মেলানো; এই দুয়ের যোগে পরস্পরের দীপ্তি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নারীর প্রেমে আর-এক সুরও বাজতে পারে, মদনধনুর জ্যায়ের টঙ্কার— সে মুক্তির সুর না, সে বন্ধনের সংগীত। তাতে তপস্যা ভাঙে, শিবের ক্রোধানল উদ্দীপ্ত হয়।

কেন বলি, পুরুষের ধর্ম তপস্যা। কারণ, জীবলোকের কাজে প্রকৃতি তাকে নারীর

তুলনায় অনেক পরিমাণে অবকাশ দিয়েছে। সেই অবকাশটাকে নষ্ট করলেই তার সবচেয়ে ফাঁকি। পুরুষ সেই অবকাশকে আপন সাধনার ক্ষেত্র করেছে বলেই মানুষের উৎকর্ষ জৈব প্রকৃতির সীমানা অনেক দূরে ছাড়িয়ে গেল। প্রকৃতির দাবি থেকে মুক্তি নিয়েই পুরুষ জ্ঞানকে ধ্যানকে শক্তিকে অসীমের মধ্যে অনুসরণ করে চলছে। সেইজন্যে পুরুষের সাধনায় চিরকালই প্রকৃতির সঙ্গে বিরুদ্ধতা আছে। নারীর প্রেম যেখানে এই বিরোধের সমন্বয় করে দেয়, কঠোর জ্ঞানের বেদিপ্রাঙ্গণে সে যখন পূজামাধুর্যের আসন রচনা করে— পুরুষের মুক্তিকে যখন সে লুপ্ত করে না, তাকে সুন্দর করে তোলে— তার পথকে অবরুদ্ধ করে না, পথের পাথেয় জুগিয়ে দেয়— ভোগবতীর জলে ডুবিয়ে দেয় না, সুরধুনীর জলে স্নান করায়— তখন বৈরাগ্যের সঙ্গে অনুরাগের, হরের সঙ্গে পার্বতীর, শুভপরিণয় সার্থক হয়।

বিচ্ছেদের ভিতর দিয়েই শক্তি কাজ করবার ক্ষেত্র পায়। চাঁদ ও পৃথিবীর মাঝখানে যে-বিরহ আছে তারই অবকাশে পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রকে চাঁদ কথা কওয়ায়। স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের মাঝে বিধাতা একটি দূরত্ব রেখে দিয়েছেন। এই দূরত্বের ফাঁকটাই কেবলই সেবায় ক্ষমায় বীর্যে সৌন্দর্যে কল্যাণে ভরে ওঠে; এইখানেই সীমায় অসীমে শুভদৃষ্টি। জৈবক্ষেত্রে প্রকৃতির অধিকারের মধ্যে মানুষের অনেক সৃষ্টি আছে, কিন্তু চিত্তক্ষেত্রে তার সৃষ্টির অন্ত নেই। চিত্তের মহাকাশ স্থূল আসক্তির দ্বারা জমাট হয়ে না গেলে তবেই সেই সৃষ্টির কাজ সহজ হয়। দীপশিখাকে দুই হাতে আঁকড়ে ধরে যে-মাতাল বেশি করে পেতে চায়, সে নিজেও পোড়ে, আলোটিকেও নিবিয়ে দেয়।

মুক্ত অবকাশের মধ্যে পুরুষ মুক্তিসাধনার যে-মন্দির বহুদিনের তপস্যায় গেঁথে তুলেছে পূজারিনী নারী সেইখানে প্রেমের প্রদীপ জ্বালবার ভার পেল। সে-কথা যদি সে ভুলে যায়, দেবতার নৈবেদ্যকে যদি সে মাংসের হাটে বেচতে কুণ্ঠিত না হয়, তা হলে মর্তের মর্মস্থানে যে-অমরাবতী আছে তার পরাভব ঘটে; পুরুষ যায় প্রমত্ততার রসাতলে, আর নারীর হৃদয়ে যে রসের পাত্র আছে তা ভেঙে গিয়ে সে-রস ধুলাকে পঙ্কিল করে।

ক্রাকোভিয়া
১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৫

ফুলের মধ্যে যে-আনন্দ সে প্রধানত ফলের প্রত্যাশার আনন্দ, এটা অত্যন্ত মোটা কথা। বিশ্বসৃষ্টিতে দেখতে পাই সৃষ্টিতেই আনন্দ, হওয়াটাই চরম কথা। তার ফুলেও আছে হওয়া, ফলেও আছে হওয়া। ফুলটা হল উপায় আর ফলটা হল উদ্দেশ্য, তাই বলে উভয়ের মধ্যে মূল্যের কোনো ভেদ দেখতে পাই নে।

আমার তিন বছরের প্রিয়সখী, যাকে নাম দিয়েছি নন্দিনী, তার হওয়ার উদ্দেশ্য কী এ প্রশ্নের কোনো জবাব-তলবের কথা মনে আসে না। সে-যে কুলরক্ষার সেতু, সে-যে পিণ্ড-জোগানের হেতু, সে-যে কোনো এক ভাবীকালে প্রজনার্থং মহাভাগা, এ-সব হল শাস্ত্রসংগত বিজ্ঞানসম্মত মূল্যের কথা। ফলের দরে ফুলের বিচার ব্যাবসাদারের। কিন্তু, ভগবান তো সৃষ্টির ব্যাবসা ফাঁদেন নি। তাঁর সৃষ্টি একেবারেই বাজে খরচ; অর্থাৎ, আয় করবার জন্যে খরচ করা নয়, এইজন্যই আয়োজনে প্রয়োজনে সমান হয়ে মিশে গেছে। এইজন্য যে-শিশু জীবলোকের প্রয়োজনসাধনের পক্ষে অপূর্ণ, সেই তিন বছরের শিশুর অপূর্ণতাই সৃষ্টির আনন্দগৌরবে পূর্ণ। আমি তো দেখি বিশ্ব-রচনায় মুখ্যের চেয়ে গৌণটাই বড়ো। ফুলের রঙের মুখ্য কথাটা হতে পারে পতঙ্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করা; গৌণ কথাটা হচ্ছে সৌন্দর্য। মানুষ যখন ফুলের বাগান করে তখন সেই গৌণের সম্পদই সে খোঁজে। বস্তুত, গৌণ নিয়েই মানুষের সভ্যতা। মানুষ কবি যখন প্রেয়সীর মুখের একটি তিলের জন্য সমরখন্দ বোখারা পণ করতে বসে তখন সে প্রজনার্থং মহাভাগার কথা মনেই রাখে না। এই বে-হিসাবি সৃষ্টিতে বে-হিসাবি আনন্দরূপকেই সে সৃষ্টির ঐশ্বর্য বলে জানে।

প্রাণীসংসারে জৈবপ্রকৃতিই সকলের গোড়ায় আপন ভিত ফেঁদে, জাজিম পেতে, আলো জেলে, পৃথিবীর ভাণ্ডার থেকে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র মালমসলা নিজের ব্যবহারের জন্য সংগ্রহ করে নিয়ে সংসার পেতে বসেছিল। ভোরের বেলায় সে মুখ্য জায়গাটা দখল করে বসল। তারই বচন হচ্ছে, সা ভার্যা যা প্রজাবতী। অর্থাৎ, যদি কাজে লাগল তবেই তার দাম।

চিৎপ্রকৃতি এসে জুটলেন কিছু দেরিতে। তাই, জৈবপ্রকৃতির আশ্রয়ে তাঁকে পরাভূত হতে হল। পুরানো পথে পুরানো ঘাটে পুরানো কালের মালমসলা নিয়েই সে ফাঁদলে তার নিজের ব্যাবসা। তখন সে সাবেক আমলের মুখ্য থেকে হাল আমলের গৌণ ফলিয়ে তুলতে বসল। আহারকে করে তুললে ভোজ, শব্দকে করে তুললে বাণী, কান্নাকে করে তুললে কাব্য। মুখ্যভাবে যেটা ছিল আঘাত গৌণভাবে সেটা হল আবেদন; যেটা ছিল বন্দিনীর শৃঙ্খল, সেটা হল বধূর কঙ্কণ; যেটা ছিল ভয় সেটা হল ভক্তি; যেটা ছিল দাসত্ব সেটা হল আত্মনিবেদন। যারা উপরের স্তরের চেয়ে নীচের স্তরকে বিশ্বাস করে বেশি তারা মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করতে গেলেই পুরাতন তাম্রশাসন বেরিয়ে পড়ে। বৈজ্ঞানিকের চশমায় ধরা পড়ে যে, খেতের মালিক জৈবপ্রকৃতি; অতএব ফসলের অধিকার নির্ণয় করতে গেলে বৈজ্ঞানিকের কাছে চিৎপ্রকৃতির দাবি অগ্রাহ্য হয়ে আসে। আপিলে সে যতই

বলে "প্রণালী আমার, প্ল্যান আমার, হাললাঙল আমার, চাষ আমার" কিছুতেই অপ্রমাণ করতে পারে না যে, মাটির তলাকার তাম্রশাসনে মোটা অক্ষরে খোদা আছে 'জৈবপ্রকৃতি'। মোটা অক্ষরের উপরে বিচারকের নজরও পড়ে বেশি। কাজেই রায় যখন বেরয় তখন পাকা প্রমাণসহ প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, সাবেক আমলের ভূতই বর্তমান আমলে ভগবান সেজে এসেছে।

জৈবপ্রকৃতিতে শিশুর একটা অর্থ আছে। সেই অর্থটাকেই যদি সম্পূর্ণ বলে স্বীকার করে নিই তা হলে বলতে হয়, মাছের ছানার সঙ্গে মানুষের শিশুর কোনো প্রভেদ নেই। অর্থাৎ, তার একমাত্র অর্থ বংশবৃদ্ধি।

কিন্তু, চিৎপ্রকৃতি সেই অর্থটাকে নিয়ে যখন আপনার চিন্ময় জিনিস করে তুললে, তখন তাকে চোর বদনাম দিয়ে মূলকেই মালেক স্বীকার করি যদি তা হলে শেক্‌স্‌-পিয়ারেরও মাল থানায় আটক করতে হয়। মসলা আর মাল তো একই জিনিস নয়; মাটির মালেক যদি হয় ভূপতি ভাঁড়ের মালেক তো কুমোর।

আমাদের চিত্ত শিশুর মধ্যে সৃষ্টির অহৈতুক আনন্দটি দেখতে পায়। বয়স্ক মানুষের মধ্যে উদ্দেশ্য-উপায়-ঘটিত নানা তর্ক আছে; কেউ বা কাজের কেউ বা অকাজের, কারো বা অর্থ আছে কারো বা নেই। কিন্তু শিশুকে যখন দেখি তখন কোনো প্রত্যাশার দ্বারা আচ্ছন্ন করে দেখি নে। সে-যে আছে, এই সত্যটাই বিশুদ্ধ-ভাবে আমাদের মনকে টানে। সেই অপরিণত মানুষটির মধ্যে একটি পূর্ণতার ছবি দেখা দেয়। শিশুর মধ্যে মানুষের প্রাণময় রূপটি স্বচ্ছ অনাবিল আকাশে সুপ্রত্যক্ষ। নানা কৃত্রিম সংস্কারের ষড়যন্ত্রে তার সহজ আত্মপ্রকাশে একটুও দ্বিধা ঘটিয়ে দেয় না। প্রাণের বেগে নন্দিনী যে-রকম সহজে নেচেকুঁদে গোলমাল করে বেড়ায় আমি যদি তা করতে যাই, তা হলে যে-প্রভূত সংস্কারের পরিমণ্ডল আমাকে নিবিড় করে ঘিরে আছে সে-সুদ্ধ নড়্‌চড়্‌ করতে থাকে, সেটা একটা অসংগত ব্যাপার হয়ে ওঠে। শিশু যা-তা নিয়ে যেমন-তেমন করে খেলে, তাতেই খেলার বিশুদ্ধ রূপটি দেখি। খেলার উপকরণের কৃত্রিম মূল্য, খেলার লক্ষ্যের কৃত্রিম উত্তেজনা, তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে না। নন্দিনী যখন লুব্ধভাবে কমলালেবু খায় তখন সেই অসংকোচ লোভটিকে সুন্দর ঠেকে। সহজ প্রাণের রসবোধের সঙ্গে কমলালেবুর যে মধুর সম্বন্ধ, ভদ্রতার কোনো বিধানের দ্বারা সেটা ক্ষুণ্ন হয় নি। ঝগড়ু-বেহারাটার প্রতি নন্দিনীর যে বন্ধুত্বের টান সেটা দেখতে ভালো লাগে, কেননা, যে-কোনো দুই মানুষের মধ্যে এই সম্বন্ধটি সত্য হওয়ার কোনো বাধা থাকা উচিত না। কিন্তু, সামাজিক ভেদবুদ্ধির নানা অভ্যস্ত সংস্কারকে যেমনি আমি স্বীকার করেছি অমনি ঝগড়ু-বেহারার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা আমার পক্ষে

দুঃসাধ্য হয়েছে ; অথচ এমন ভদ্রবেশধারীকে আমি সমকক্ষভাবে অনায়াসে গ্রহণ করতে পারি যার মনুষ্যত্বের আন্তরিক মূল্য ঝগড়ুর চেয়ে অনেক কম। জাহাজে তার সমবয়স্ক য়ুরোপীয় বালিকার সঙ্গে নন্দিনীর ঝগড়াও হয়, ভাবও হয়, পরস্পরের মধ্যে সম্পত্তির বিনিময়ও চলছে। য়ুরোপীয় পুরুষযাত্রীর সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার মাথা-নাড়ানাড়ি হয়ে থাকে, শরীরের স্বাস্থ্য ও আবহাওয়া নিয়ে বাজে কথা বলাবলিও হয় ; সংস্কারের বেড়া ডিঙিয়ে তার বেশি আর সহজে এগোতে পারি নে। সহজ মানুষের সত্যটি সামাজিক মানুষের কুয়াশায় ঢেকে রেখে দেয়। অর্থাৎ আমরা নানা অবান্তর তথ্যের অস্বচ্ছতার মধ্যে বাস করি। শিশুর জীবনের যে সত্য তার সঙ্গে অবান্তরের মিশোল নেই। তাই, তার দিকে যখন চেয়ে দেখবার অবকাশ পাই তখন প্রাণলীলার প্রত্যক্ষ স্বরূপটি দেখি ; তাতে সংস্কারভারে পীড়িত চিন্তাক্লিষ্ট মন গভীর তৃপ্তি পায়।

শিশুর মধ্যে আমরা মুক্তির সহজ ছবি দেখতে পাই। মুক্তি বলতে কী বোঝায়। প্রকাশের পূর্ণতা। ভগবান সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তরছলে ঋষি একটি চরম কথা বলেছেন : স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি। স্বে মহিম্নি। সেই ভগবান কিসের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। তার উত্তর, নিজের মহিমাতেই। অর্থাৎ, তিনি স্বপ্রকাশ। শিশুরও সেই কথা। সে আপনাতে আপনি পরিব্যক্ত। তাকে দেখে আমাদের যে-আনন্দ সে তার বাধামুক্ত সহজ প্রকাশে। য়ুরোপে আজকাল চিত্রকলার ইতিহাসে একটা বিপ্লব এসেছে, দেখতে পাই। এতকাল ধরে এই ছবি-আঁকার চার দিকে— হিন্দুস্থানি গানের তানকর্তবের মতো —যে-সমস্ত প্রভূত ওস্তাদি জমে উঠেছিল আজ সকলে বুঝেছে, তার বারো-আনাই অবান্তর। তা সুঠাম হতে পারে, কোনো-না-কোনো কারণে মনোহর হতেও পারে, তার আড়ম্বর-বাহুল্যে বিশেষ-একটা শক্তিসম্পদও প্রকাশ করতে পারে, অর্থাৎ ঝড়ের মেঘের মতো তার আশ্চর্য রঙের ঘটা থাকতে পারে, কিন্তু আসল যে জিনিসটি পড়েছে ঢাকা সে হচ্ছে সরল সত্যের সূর্য, যাকে স্বচ্ছ আকাশে তার আপন নির্মল মহিমায় দেখে বিশ্ব আনন্দিত হয়।

গান বল, চিত্র বল, কাব্য বল, ওস্তাদি প্রথমে নম্রশিরে, মোগল দরবারে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মতো, তাদের পিছনে থাকে। কিন্তু, যেহেতু প্রভুর চেয়ে সেবকের পাগড়ির রং কড়া, তার তকমার চোখ-ধাঁধানি বেশি, এই কারণে তারা ভিড়ের উৎসাহ যতই পায় ততই পিছন ছেড়ে সামনে এসে জমে যায়। যথার্থ আর্ট তখন হার মানে, তার স্বাধীনতা চলে যায়। যথার্থ আর্টের মধ্যে সহজ প্রাণ আছে বলেই তার বৃদ্ধি আছে, গতি আছে ; কিন্তু, যেহেতু কারুনৈপুণ্যটা অলংকার, যেহেতু তাতে প্রাণের

ধর্ম নেই, তাই তাকে প্রবল হতে দিলেই আভরণ হয়ে ওঠে শৃঙ্খল ; তখন সে আর্টের স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে বদ্ধ করে দেয়, তার গতি রোধ করে। তখন যেটা বাহাদুরি করতে থাকে সেটা আত্মিক নয়, সেটা বৈষয়িক ; অর্থাৎ, তার মধ্যে প্রাণগত বৃদ্ধি নেই, বস্তুগত সঞ্চয় আছে। তাই আমাদের হিন্দুস্থানি গানে বৃদ্ধি দেখতে পাই নে। তানসেন প্রভৃতির অক্ষয় কমণ্ডলু থেকে যে-ধারা প্রবাহিত হয়েছিল ওস্তাদ প্রভৃতি জহ্নুমুনি কারদানি দিয়ে সেটি গিলে খেয়ে বসে আছে। মোট কথা, সত্যের রসরূপটি সুন্দর ও সরল করে প্রকাশ করা যে-কলাবিদ্যার কাজ অবান্তরের জঞ্জাল তার সবচেয়ে শত্রু। মহারণ্যের শ্বাস রুদ্ধ করে দেয় মহাজঙ্গল।

আধুনিক কলারসজ্ঞ বলছেন, আদিকালের মানুষ তার অশিক্ষিতপটুত্বে বিরলরেখায় যে-রকম সাদাসিধে ছবি আঁকত, ছবির সেই গোড়াকার ছাঁদের মধ্যে ফিরে না গেলে এই অবান্তরভারপীড়িত আর্টের উদ্ধার নেই। মানুষ বারবার শিশু হয়ে জন্মায় বলেই সত্যের সংস্কারবর্জিত সরলরূপের আদর্শ চিরন্তন হয়ে আছে ; আর্টকেও তেমনি শিশুজন্ম নিয়ে অতি-অলংকারের বন্ধনপাশ থেকে বারে বারে মুক্তি পেতে হবে।

এই অবান্তরবর্জন কি শুধু আর্টেরই পরিত্রাণ। আজকের দিনের ভারজর্জর সভ্যতারও এই পথে মুক্তি। মুক্তি যে সংগ্রহের বাহুল্যে নয়, ভোগের প্রাচুর্যে নয়, মুক্তি যে আত্মপ্রকাশের সত্যতায়, আজকের দিনে এই কথাই মানুষকে বারবার স্মরণ করাতে হবে। কেননা, আজ মানুষ যেরকম বন্ধনজালে জড়িত, এমন কোনো দিনই ছিল না।

লোভমোহের বন্ধন থেকে মানুষ কবেই বা মুক্ত ছিল। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির সাধনা ছিল সজাগ। বৈষয়িকতার বেড়ায় তখন ফাঁক ছিল ; সেই ফাঁকের ভিতর দিয়ে সত্যের আলো আসত বলে সেই আলোর প্রতি কোনো দিন বিশ্বাস যায় নি। আজ জটিল অবান্তরকে অতিক্রম করে সরল চিরন্তনকে অন্তরের সঙ্গে স্বীকার করবার সাহস মানুষের চলে গেছে।

আজ কত পণ্ডিত তথ্যের গভীর অন্ধকূপে ঢুকে টুকরো-টুকরো সংবাদের কণা খুঁটে খুঁটে জমাচ্ছেন। য়ুরোপে যখন বিদ্বেষের কলুষে আকাশ আবিল তখন এই-সকল পণ্ডিতদেরও মন দেখি বিষাক্ত। সত্যসাধনার যে-উদার বৈরাগ্য ক্ষুদ্রতা থেকে ভেদবুদ্ধি থেকে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, তাঁরা তার আহ্বান শুনতে পান নি। তার প্রধান কারণ, জ্ঞানসাধনায় উপরের দিকে খাড়া হয়ে মানুষের যে-মাথা একদিন বিশ্ব-দেখা দেখত আজ সেই মাথা নীচে ঝুঁকে পড়ে দিনরাত টুকরো-দেখা দেখছে।

ভারতের মধ্যযুগে যখন কবীর দাদূ প্রভৃতি সাধুদের আবির্ভাব হয়েছিল তখন

ভারতের সুখের দিন না। তখন রাষ্ট্রনৈতিক ভাঙাগড়ায় দেশের অবস্থার কেবলই উলটপালট চলছিল। তখন শুধু অর্থ বিরোধ নয়, ধর্মবিরোধের তীব্রতাও খুব প্রবল। যখন অন্তরে বাহিরে নানা বেদনা সেই অস্থিরতার কালে স্বভাবত মানুষের মন ছোটো হয়, তখন রিপুর সংঘাতে রিপু্ জেগে ওঠে। তখন বর্তমানের ছায়াটাই কালো হয়ে নিত্যকালের আলো আচ্ছন্ন করে, কাছের কান্নাই বিশ্বের সকল বাণী ছাপিয়ে কানে বাজে। কিন্তু, সেই বড়ো কৃপণ সময়েই তাঁরা মানুষের ভেদের চেয়ে ঐক্যকে সত্য করে দেখেছিলেন। কেননা, তাঁরা সকলেই ছিলেন কবি, কেউ পণ্ডিত ছিলেন না। শব্দের জালে তাঁদের মন জড়িয়ে যায় নি, তথ্যের খুঁটিনাটির মধ্যে উঞ্ছবৃত্তি করতে তাঁরা বিরত ছিলেন। তাই, হিন্দুমুসলমানের অতিপ্রত্যক্ষ বিরোধ ও বিদ্বেষবুদ্ধির মধ্যে থেকেও তাদের মনুষ্যত্বের অন্তরে একের আবির্ভাব তাঁরা বিনা বাধায় স্পষ্ট করে দেখেছিলেন। সেই দেখাতেই দেখার মুক্তি।

এর থেকেই বুঝতে পারি, তখনো মানুষ শিশুর নবজন্ম নিয়ে সত্যের মুক্তিরাজ্যে সহজে সঞ্চরণ করবার অবকাশ ও অধিকার হারায় নি। এইজন্যেই আকবরের মতো সম্রাটের আবির্ভাব তখন সম্ভবপর হয়েছিল, এইজন্যেই যখন ভ্রাতৃরক্তপঙ্কিল পথে অওরংজেব গোঁড়ামির কঠোর শাসন বিস্তার করেছিলেন তখন্ তাঁরই ভাই দারাশিকো সংস্কারবর্জিত অসাম্প্রদায়িক সত্যসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তখন বড়ো দুঃখের দিনেও মানুষের পথ ছিল সহজ। আজ সে-পথ বড়ো দুর্গম। এখনকার দিনে প্রবীণেরা পথের প্রত্যেক কাঁকর গুনে বাধারই হিসাবকে প্রকাণ্ড করে তোলে; মৃত্যুঞ্জয় মানবাত্মার অপরাহত শক্তিকে তারা উপস্থিতের ছোটো ছোটো বিরুদ্ধসাক্ষ্যের জোরে অবজ্ঞা করে। তাই, তারা এত কৃপণ, এত সন্দিগ্ধ, এত নিষ্ঠুর, এত আত্মম্ভরি। বিশ্বাস যার নেই সে কখনো সৃষ্টি করতে পারে না, সে কেবলই সংগ্রহ করতে পারে; অবশেষে এই সংগ্রহ নিয়েই যত মারামারি কাটাকাটি।

আজকের এই বিশ্বাসহীন আনন্দহীন অন্ধযুগ কবির বাণীকে প্রার্থনা করছে এই কথা শোনাবার জন্যে যে, আত্মম্ভরিতায় বন্ধন, আত্মপ্রকাশেই মুক্তি; আত্মম্ভরিতায় জড় বস্তুরাশির জটিলতা, আত্মপ্রকাশে বিরলভূষণ সত্যের সরল রূপ।

হারুনা-মারু জাহাজ থেকে নেমে প্যারিসে কয়েক দিন মাত্র ভূমিমাতার শুশ্রূষা ভোগ করতে পেরেছিলাম। হঠাৎ খবর এল, যথাসময়ে পেরুতে পৌঁছতে হলে অবিলম্বে জাহাজ ধরা চাই। তাড়াতাড়ি শেরবুর্‌গ্-বন্দর থেকে আণ্ডেস্ জাহাজে উঠে

পড়লুম। লম্বায় চওড়ায় জাহাজটা খুব মস্ত কিন্তু আমার শরীরের বর্তমান অবস্থায় আরামের পক্ষে যে-সব সুবিধার প্রয়োজন ছিল, তা পাওয়া গেল না। জাপানি জাহাজে আতিথ্যের প্রচুর দাক্ষিণ্যে আমার অভ্যাসটাও কিছু খারাপ করে দিয়েছিল। সেইজন্যে এখানে ক্যাবিনে প্রবেশ করেই মনটা অপ্রসন্ন হল। কিন্তু, যেটা অনিবার্য নিজের গরজেই মন তার সঙ্গে যত শীঘ্র পারে রফা করে নিতে চায়। অত্যন্ত দুষ্পাচ্য জিনিসও পেটে পড়লে পাকযন্ত্র হাল ছেড়ে দিয়ে জারকরস প্রয়োগ বন্ধ করে না। মনেরও জারকরস আছে; অনভ্যস্ত কোনো দুঃখকে হজম করে নিয়ে তাকে সে আপনার অভ্যস্ত বিশ্বের সামিল করে নিশ্চিন্ত হতে চায়। অসুবিধাগুলো একরকম সহ্য হয়ে এল, আর দিনের-পর-দিন চরকার একঘেয়ে সুতো কাটার মতো একটানে চলতে লাগল।

বিষুবরেখা পার হয়ে চলেছি, এমন সময় হঠাৎ কখন শরীর গেল বিগড়ে; বিছানা ছাড়া গতি রইল না। ক্যাবিন জিনিসটাই একটা স্থায়ী ব্যাধি, ইন্দ্রিয়গুলো যদি তার সঙ্গে যোগ দিয়ে জুলুম শুরু করে তা হলে পুলিসের আকস্মিক বন্ধনের বিরুদ্ধে আদালতে পর্যন্ত আপিল বন্ধ হয়, কোথাও কিছুই সান্ত্বনা থাকে না। শান্তিহীন দিন আর নিদ্রাহীন রাত আমাকে পিঠমোড়া করে শিকল কষতে লাগল। বিদ্রোহের চেষ্টা করতে গেলে শাসনের পরিমাণ বাড়তেই থাকে। রোগ-গারদের দারোগা আমার বুকের উপর দুর্বলতার বিষম একটা বোঝা চাপিয়ে রেখে দিলে; মাঝে মাঝে মনে হত, এটা স্বয়ং যমরাজের পায়ের চাপ। দুঃখের অত্যাচার যখন অতিমাত্রায় চ'ড়ে ওঠে তখন তাকে পরাভূত করতে পারি নে; কিন্তু, তাকে অবজ্ঞা করবার অধিকার তো কেউ কাড়তে পারে না— আমার হাতে তার একটা উপায় আছে, সে হচ্ছে কবিতা-লেখা। তার বিষয়টা যা-ই হোক-না কেন, লেখাটাই দুঃখের বিরুদ্ধে সিডিশন-বিশেষ। সিডিশনের দ্বারা প্রতাপশালীর বিশেষ অনিষ্ট হয় না, তাতে পীড়িত চিত্তের আত্মসম্ভ্রম রক্ষা হয়।

আমি সেই কাজে লাগলুম, বিছানায় পড়ে পড়ে কবিতা লেখা চলল। ব্যাধিটা-যে ঠিক কী তা নিশ্চিত বলতে পারি নে, কেবল এই জানি, সে একটা অনির্বচনীয় পীড়া। সে-পীড়া শুধু আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে নয়, ক্যাবিনের সমস্ত আসবাবপত্রের মধ্যে সর্বত্র সঞ্চারিত— আমি আর আমার ক্যাবিন সমস্তটা মিলে যেন একটা অখণ্ড রুগ্নতা।

এমনতরো অসুখের সময় স্বভাবতই দেশের জন্যে ব্যাকুলতা জন্মে। ক্যাবিনের জঠরের মধ্যে দিবারাত্রি জীর্ণ হতে হতে আমারও মন ভারতবর্ষের আকাশের উদ্দেশে উৎসুক হয়ে উঠল। কিন্তু, অন্ধ উত্তাপের পরিমাণ বেড়ে বেড়ে ক্রমে যেমন তা

আলোকিত হয়, দুঃখের তেমনি পরিমাণভেদে প্রকাশভেদ হয়ে থাকে। যে-দুঃখ প্রথমে কারাগারের মতো বিশ্ব থেকে পৃথক করে মনকে কেবলমাত্র নিজের ব্যথার মধ্যেই বদ্ধ করে, সেই দুঃখেরই বেগ বাড়তে বাড়তে অবশেষে অবরোধ ভেঙে পড়ে এবং বিশ্বের দুঃখসমুদ্রের কোটালের বানকে অন্তরে প্রবেশ করবার পথ ছেড়ে দেয়। তখন নিজের ক্ষণিক ছোটো দুঃখটা মানুষের চিরকালীন বড়ো দুঃখের সামনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায়; তার ছট্‌ফটানি চলে যায়। তখন দুঃখের দণ্ডটা একটা দীপ্ত আনন্দের মশাল হয়ে জ্বলে ওঠে। প্রলয়কে ভয় যেই না-করা যায় অমনি দুঃখবীণার সুর বাঁধা সাঙ্গ হয়। গোড়ায় ওই সুর-বাঁধবার সময়টাই হচ্ছে বড়ো কর্কশ, কেননা, তখনো যে দ্বন্দ্ব ঘোচে নি। এই অভিজ্ঞতার সাহায্যে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের অবস্থা কল্পনা করতে পারি। বোধ হয়, প্রথম অবস্থায় ভয়ে ভরসায় যতক্ষণ টানাটানি চলতে থাকে ততক্ষণ ভারি কষ্ট। যতক্ষণ ভীষণকেই একমাত্র করে দেখি নে, যতক্ষণ তাকে অতিক্রম করেও জীবনের চিরপরিচিত ক্ষেত্রটা দেখা যায়, ততক্ষণ সেই দ্বন্দ্বের টানে ভয় কিছুতেই ছাড়তে চায় না। অবশেষে তাপের তীব্রতা বাড়তে বাড়তে রুদ্র যখন অদ্বিতীয় হয়ে দেখা দেন, প্রলয়ের গর্জন তখন সংগীত হয়ে ওঠে; তখন তার সঙ্গে নির্বিচারে সম্পূর্ণভাবে যোগ দেবার নিরতিশয় আগ্রহে মরিয়া করে তোলে। মৃত্যুকে তখন সত্য বলে জেনে গ্রহণ করি; তার একটা পূর্ণাত্মক রূপ দেখতে পাই বলে তার শূন্যাত্মকতার ভয় চলে যায়।

কয়দিন রুদ্ধকক্ষে সংকীর্ণ শয্যায় পড়ে পড়ে মৃত্যুকে খুব কাছে দেখতে পেয়েছিলাম, মনে হয়েছিল প্রাণকে বহন করবার যোগ্য শক্তি আমার শেষ হয়ে গেছে। এই অবস্থায় প্রথম ইচ্ছার ধাক্কাটা ছিল দেশের আকাশে প্রাণটাকে মুক্ত করে দেওয়া। ক্রমে সেই ইচ্ছার বন্ধন শিথিল হয়ে এল। তখন মৃত্যুর পূর্বেই ঘরের বাইরে নিয়ে যাবার যে-প্রথা আমাদের দেশে আছে, তার অর্থটা মনে জেগে উঠল। ঘরের ভিতরকার সমস্ত অভ্যস্ত জিনিস হচ্ছে প্রাণের বন্ধনজাল। তারা সকলে মিলে মৃত্যুকে তীব্রভাবে প্রতিবাদ করতে থাকে। জীবনের শেষ ক্ষণে মনের মধ্যে এই দ্বন্দ্বের কোলাহল যদি জেগে ওঠে তবে তাতেই বেসুর কর্কশ হয়; মৃত্যুর সম্পূর্ণ সংগীত শুনতে পাই নে, মৃত্যুকে সত্য বলে স্বীকার করে নেবার আনন্দ চলে যায়।

বহুকাল হল আমি যখন প্রথম কাশীতে গিয়েছিলাম তখন মৃত্যুকালের যে-একটি মনোহর দৃশ্য চোখে পড়েছিল, তা আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না। ঠিক মনে নেই, বোধ করি তখন শরৎকাল; নির্মল আকাশ থেকে প্রভাতসূর্য জীবধাত্রী বসুন্ধরাকে আলোকে অভিষিক্ত করে দিয়েছে। এপারের লোকালয়ের বিচিত্র চাঞ্চল্য,

ওপারের প্রান্তরের সুদূরবিস্তীর্ণ নিস্তব্ধতা, মাঝখানে জলধারা— সমস্তকে দেবতার পরশমণি ছোঁয়ানো হল। নদীর ঠিক মাঝখানে দেখি একটি ডিঙি নৌকা খরস্রোতে ছুটে চলেছে। আকাশের দিকে মুখ করে মুমূর্ষু শুক্ক হয়ে শুয়ে আছে, তারই মাথার কাছে করতাল বাজিয়ে উচ্চস্বরে কীর্তন চলছে। নিখিল বিশ্বের বক্ষের মাঝে মৃত্যুর যে-পরম আহ্বান, আমার কাছে তারই সুগম্ভীর সুরে আকাশ পূর্ণ হয়ে উঠল। যেখানে তার আসন সেখানে তার শান্তরূপ দেখতে পেলে মৃত্যু যে কত সুন্দর, তা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়। ঘরের মধ্যে সমস্তই তাকে উচ্চৈঃস্বরে অস্বীকার করে; সেইজন্য সেখানকার খাটপালঙ সিন্দুক চৌকি দেওয়াল কড়ি বরগা, সেখানকার প্রাত্যহিক ক্ষুধাতৃষ্ণা কর্ম ও বিশ্রামের ছোটোখাটো সমস্ত দাবিতে মুখর চঞ্চল ঘরকরনার ব্যস্ততার মাঝখানে সমস্ত ভিড় ঠেলে, সমস্ত আপত্তি অতিক্রম ক'রে, মৃত্যু যখন চিরন্তনের লিপি হাতে নিয়ে প্রবেশ করে তখন তাকে দস্যু বলে ভ্রম হয়; তখন তার হাতে মানুষ আত্মসমর্পণ করবার আনন্দ পায় না। মৃত্যু বাঁধন ছিন্ন করে দেবে, এইটেই কুৎসিত। আপনি বাঁধন আলগা করে দিয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে তার হাত ধরব, এইটেই সুন্দর।

হিন্দু কাশীকে পৃথিবীর বাহিরের স্থান বলেই বিশ্বাস করে। তার কাছে কাশীর ভৌগোলিক সীমানা একটা মায়া, পরমার্থত সেখানে নিখিল বিশ্বের পরিচয়, সেখানে বিশ্বেশ্বরের আসন। অতএব, বিশেষ দেশবাসীর কাছে বিশেষ দেশের যে আকর্ষণবেগ তার প্রাণকে সেখানকার মাটি জল আকাশের সঙ্গে নানা বিশেষ সূত্রে বাঁধে, কাশীর মধ্যে যেন পৃথিবীর সেই বিশেষ দেশগত বন্ধনও নেই। অতএব, যথার্থ হিন্দুর কানে মৃত্যুর মুক্তিবাণী কাশীতে বিশুদ্ধ সুরে প্রবেশ করে।

বর্তমান যুগে ন্যাশনাল বৈষয়িকতা বিশ্বব্যাপী হয়ে স্বদেশগত অহমিকাকে সুতীব্র-ভাবে প্রবল করে তুলেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই সংঘ-আশ্রিত অতি প্রকাণ্ডকায় রিপুই বর্তমান যুগের সমস্ত দুঃখ ও বন্ধনের কারণ। তাই, সেদিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমার মনে হল, আমিও যেন মুক্তির তীর্থক্ষেত্রে মরতে পারি; শেষ মুহূর্তে যেন বলতে পারি, সকল দেশই আমার এক দেশ, সর্বত্রই এক বিশ্বেশ্বরের মন্দির, সকল দেশের মধ্য দিয়েই এক মানবপ্রাণের পবিত্র জাহ্নবীধারা এক মহাসমুদ্রের অভিমুখে নিত্যকাল প্রবাহিত।

ক্রাকোভিয়া স্টিমার
১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৫

পূর্বেই বলেছি, নন্দিনী তার নাম, তিন বছর তার বয়স, সে তৃতীয়ার চাঁদটুকুর মতো। আধুনিক নবেল পড়বার সময় তার এখনো হয় নি। ঘুম-পাড়াবার আগে তাকে গল্প শোনাবার লোক চাই। তাই, যে-আমি এতকাল জনসাধারণকে ঘুম পাড়াবার বায়না নিয়েছিলুম, দায়ে পড়ে সেই-আমার পদবৃদ্ধি হল। আজকাল এই ক্ষুদ্র মহারানীর শয্যাপার্শ্বে আমার তলব হচ্ছে।

কাল রাত্রে আহার সেরে জাহাজের কামরায় এসে বসেছি। হুকুম হল, "দাদামশায়, বাঘের গল্প বলো।" আমি কবি ভবভূতির মতো বিনয় করে বললুম, "আমার সমযোগ্য লোক হয়তো জাহাজে এক-আধজন মিলতেও পারে, কারণ, যাত্রী অনেক এবং বিপুলা চ তরণী।" কিন্তু, নিষ্কৃতি পেলুম না। তখন শুরু করে দিলুম—

এক যে ছিল বাঘ,
তার সর্ব অঙ্গে দাগ।
আয়নাতে তাই হঠাৎ দেখে
হল বিষম রাগ।
ঝগড়ুকে সেই বললে ডেকে,
"এখ্‌খনি তুই ভাগ,
যা চলে তুই প্রাগ্‌,
সাবান যদি না মেলে তো
যাস হাজারিবাগ।"

বীণাপাণির কৃপা এইখানে এসে থেমে গেল, ছড়া আর এগোল না। তখন ছন্দের বেড়া ডিঙিয়ে গদ্যের মধ্যে নেমে পড়লুম। পাঠক নিশ্চয় বুঝতে পারছেন গল্পের মূল ধারাটা হচ্ছে, বাঘের সর্বাঙ্গীণ কলঙ্কমোচনের জন্যে সাবান-অন্বেষণের দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে ঝগড়ু-নামধারী বেহারার যাত্রা।

কথা উঠবে, ঝগড়ুর তাগিদটা কিসের। দয়ারও নয়, মৈত্রীরও নয়, ভয়ের তাগিদ। বাঘ শাসিয়েছিল, সাবান না আনতে পারলে তার কান ছিঁড়ে নেবে। এতে বাস্তব-বিলাসীরা আশ্বস্ত হবেন, বুঝবেন, তা হলে গল্পটা নেহাত আজগুবি নয়।

প্রথমে দেখাতে হল, পাথেয় এবং সাবানের মূল্যের জন্যে কী অসম্ভব উপায়ে ঝগড়ু একেবারে পাঁচ তিন নয় সাত দশ পয়সা সংগ্রহ করলে। টেঁকে গুঁজে গোরুর গাড়ি করে সে বৃহস্পতিবারের বারবেলায় চেকোস্লোভাকিয়ায় রওনা হল। বোলপুরের কাছে

ধোবাপাড়ার রাস্তায় আসতেই থামকা একটা ব্রাউন রঙের গাধা সাদারঙের গোরুটার গা চেটে দিলে। বর্ণভেদে শ্রদ্ধাবান গোরুটা জাতিচ্যুতির ক্ষোভে গাড়িটা উলটিয়ে দিয়ে বন্ধনমুক্তভাবে চার পা তুলে সংসার ত্যাগ করে যাওয়াতে, সেই অপঘাতে ঝগড়ুর পা ভেঙে তাকে রাস্তায় পড়ে থাকতে হল। বেলা বয়ে যায়, দূর থেকে ক্ষণে-ক্ষণে বাঘের ডাকও শোনা যাচ্ছে। এখন হতভাগার কান বাঁচে কী করে। এমন সময় ঝুড়িকাঁখে জোড়াসাঁকোর মোক্ষদা চলেছে হাটে লাউশাক কিনতে। ঝগড়ু বললে, "মোক্ষদা, ও মোক্ষদা, তোমার ঝুড়িতে করে আমাকে ইস্টিশনে পৌঁছিয়ে দাও।" মোক্ষদা যদি তখনই দয়া করে সহজে রাজি হত, তা হলে বাস্তবওয়ালার মতে সেটা বিশ্বাসযোগ্য হত না। তাই দেখাতে হল, ঝগড়ু যখন টেঁকের থেকে দু-পয়সা নগদ দেবে কবুল করলে তখনই মোক্ষদা তাকে ঝুড়িতে তুলে নিলে। আশা করেছিলুম, গল্পের এই সন্ধিস্থলে এসে পৌঁছোবার পূর্বেই শ্রোত্রীর ঘুম আসবে। তার পরে, কাল আবার যদি আমাকে ধরে তা হলে উপসংহারে দেখাতে হবে, ভালোমানুষ ঝগড়ুর কানের তো কোনো অপচয় হলই না, বরঞ্চ পূর্বের চেয়ে এই প্রত্যঙ্গটা দীর্ঘতর হয়ে উঠে কানের বানানে দন্ত্য 'ন'কে মাত্রাছাড়া মূর্ধন্য 'ণ'য়ে খাড়া করে তোলবার পক্ষে সাক্ষ্য দিলে। কেবল কাটা গেল ওই দুষ্ট বাঘের লেজটা। সংসারে ধর্মের পুরস্কার ও অধর্মের তিরস্কার -মূলক উপদেশের সাহায্যে কলুষিত বঙ্গসাহিত্যে স্বাস্থ্যকর হাওয়া বইয়ে দেবার ইচ্ছাটাও আমার মনে ছিল।

কিন্তু, গল্পের গোড়ায় নন্দিনীর চোখে যে-একটু ঘুমের আবেশ ছিল সেটা কেটে গিয়ে তার দৃষ্টি শরৎকালের আকাশের মতো জ্বল্‌জ্বল্ করতে লাগল। ভয়ে হোক, ভক্তিতে হোক, বাঘ যদি বা ঝগড়ুর কানটা ছেড়ে দিতে রাজি হয়, নন্দিনী গল্পটাকে ছাড়তে কিছুতেই রাজি হল না। অবশেষে দুই-চার জন আত্মীয়স্বজনের মধ্যস্থতায় কাল রাত্রির মতো ছুটি পেয়েছি।

আর্টিস্ট বললেন, গল্পের প্রবাহে নানারকম ভেসে-আসা ছবি ওর মনকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে রাখছিল। তা হলেই তর্ক ওঠে, ছবির এমন কী গুণ আছে যাতে ঔৎসুক্য জাগিয়ে রাখে। কোনো দৃশ্য যখন বিশেষ করে আমাদের চোখ ভোলায় তখন কেন আমরা বলি, যেন ছবিটি।

মুখ্যত ছবির গুণ হচ্ছে দৃশ্যতা। তাকে আহার করা নয়, ব্যবহার করা নয়, তাকে দেখা ছাড়া আর কোনো লক্ষ্যই নেই। তা হলেই বলতে হবে, যাকে আমরা পুরোপুরি দেখতে পাই তাকে আমাদের ভালো লাগে। যাকে উদাসীনভাবে দেখি তাকে পুরো দেখি নে; যাকে প্রয়োজনের প্রসঙ্গে দেখি তাকেও না; যাকে দেখার জন্যেই দেখি

তাকেই দেখতে পাই। বোলপুরের রাস্তায় গোরু, গাধা, গাড়ি উলটে খগড়ুর পা-ভাঙা প্রভৃতি দৃশ্যের দাম কিসেরই বা। চলতি ভাষায় যাকে মনোহর বলে এ তো তা নয়। কিন্তু, গল্পের বেগে তারা মনের সামনে এসে হাজির হচ্ছিল; শিশুর মন তাদের প্রত্যেককেই স্বীকার করে নিয়ে বললে, "হাঁ, এরা আছে।" এই বলে স্বহস্তে এদের কপালে অস্তিত্বগৌরবের টীকা পরিয়ে দিলে। এই দৃশ্যগুলি গল্প-বলার বেষ্টনীর মধ্যে একটি বিশেষ ঐক্য লাভ করেছিল। বিশ্বের ছাড়া-ছাড়া সমস্ত ছড়ানো তথ্যের অস্পষ্টতা থেকে স্বতন্ত্র হয়ে তারা সুনির্দিষ্ট হয়ে উঠেছিল। এই জোরে তারা কেবলই দাবি করতে লাগল "আমাকে দেখো!" সুতরাং, নন্দিনীর চোখের ঘুম আর টিঁকল না।

কবি বল, চিত্রী বল, আপনার রচনার মধ্যে সে কী চায়। সে বিশেষকে চায়। বাতাসে যে-অঙ্গারবাষ্প সাধারণভাবে আছে গাছ তাকে আত্মসাৎ ক'রে আপন ডালে-পালায় ফলে ফুলে আপন ছন্দে রঙে অত্যন্ত বিশেষ করে যখন তোলে, তখনই তাতে সৃষ্টিলীলা প্রকাশ পায়। নীহারিকায় জ্যোতির্বাষ্প একটা একাকার ব্যাপার, নক্ষত্র-আকারে বিশেষত্ব লাভ করায় তার সার্থকতা। মানুষের সৃষ্টিচেষ্টাও সেইরকম অনির্দিষ্ট সাধারণ থেকে সুনির্দিষ্ট বিশেষকে জাগাবার চেষ্টা। আমাদের মনের মধ্যে নানা হৃদয়াবেগ ঘুরে বেড়ায়। ছন্দে সুরে কথায় যখন সে বিশেষ হয়ে ওঠে তখন সে হয় কাব্য, সে হয় গান। হৃদয়াবেগকে প্রকাশ করা হল বলেই-যে আনন্দ তা নয়। তাকে বিশিষ্টতা দেওয়া হল বলেই আনন্দ। সেই বিশিষ্টতার উৎকর্ষেই তার উৎকর্ষ। মানুষের যে-কোনো রচনা সেই উৎকর্ষ পেয়েছে তাকেই আর্ট-সৃষ্টিরূপে দেখি; সেই একান্ত দেখাতেই আনন্দ।

ইংরেজি ভাষায় ক্যারেকটার শব্দের একটা অর্থ, স্বভাব, নৈতিক চরিত্র; আর-একটা অর্থ, চরিত্ররূপ। অর্থাৎ, এমন কতকগুলি গুণের এমন সমাবেশ যাতে এই সমাবেশটি বিশেষভাবে লক্ষ্যগোচর হয়। পূর্বেই বলেছি, এইরকম বিশেষ গোচরতাই আর্টের ধর্ম। নাট্যে কাব্যে চিত্রে নৈতিক সদ্‌গুণের চেয়ে এই ক্যারেক্‌টারের মূল্য বেশি।

সৃষ্টির দিকে বিশেষত্ব এই তো আছে ক্যারেক্‌টার, সৃষ্টিকর্তার দিকে বিশেষত্ব প্রতিভায়। সেটা হচ্ছে দৃষ্টির বিশেষত্ব, অনুভূতির বিশেষত্ব, রচনার বিশেষত্ব নিয়ে। ভক্ত সমুদ্র-পর্বত-অরণ্যে সৃষ্টিকর্তার একটি স্বরূপ দেখতে পান, তাতেই সে-দৃশ্যগুলি বিশেষভাবে তাঁর অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। রূপকারের রচনাতেও তেমনি করেই স্রষ্টাব্যক্তিটি আপন প্রতিভার স্বরূপ দিয়ে আপন সৃষ্টির রূপটিকে দ্রষ্টাব্যক্তিটির কাছে সুনির্দিষ্ট করে দেয়। তাতে যে-আনন্দ পাই সে সৌন্দর্যের বা স্বার্থবুদ্ধির শুভবুদ্ধির আনন্দ নয়, বিশেষকে ব্যক্ত দেখার আনন্দ। আমার ভিতরকার ব্যক্তি সেই পরিব্যক্তিতে নিজেরই

বিস্তার দেখে। বস্তুতত্ত্ব (physics) সমস্ত বস্তুর মধ্যে সাধারণ, সেটা হল বিজ্ঞানের ; আর, চেহারা পদার্থটা বিশেষের, সেটা হল আর্টের। বিশেষের বেড়া ভাঙতে ভাঙতে বিজ্ঞান যখন ব্যাপককে পায় তখন তার সার্থকতা ; আর, ব্যাপকের পর্দাটা তুলে ধরে আর্ট যখন বিশেষকে পায় তখন সে হয় খুশি।

সুন্দর সেই বিশেষের কোঠায় এসে পড়ে তো ভালো, নইলে সুন্দর বলেই তার গুমোর নেই। আর্টের এলেকায় সাহেবপাড়ার সরকারি বাগানের স্থান নেই, আছে চিৎপুর রোডের। সরকারি বাগানের অনেক সদ্‌গুণ আছে, তাকে সুন্দর বললে লক্ষণে মেলে ; সে-বাগানে সাধারণ উপকার আছে, কিন্তু বিশেষ স্বাদ নেই। চিৎপুর রোডের স্বাদ আছে, উপকার নেই বললেই হয়। কলকাতার ইডেন-গার্ডেন ফোটো-গ্রাফের অন্ত্যজ পংক্তিতে স্থান পেতে পারে, কিন্তু চিৎপুর রোডের পংক্তি আর্টের অভিজাতবর্গের কোঠায়। কুলীনের মেয়ের মতোই চিৎপুর রোড আর্টিস্টের তুলিতে আপন পর্যায় পাবার জন্যে আজ পর্যন্ত অপেক্ষা করে আছে। কোনো কালে না-ও যদি পায় তবু তার কৌলীন্য ঘুচবে না !

হেডমাস্টার তাঁর ইস্কুলের সবচেয়ে শিষ্টশান্ত অধ্যয়নরত ভালো ছেলেটির প্রতি তর্জনী নির্দেশ করে তাকে আমাদের দৃষ্টান্তগোচর করে রাখবার চেষ্টা করেন। কিন্তু, তর্জনীর জোরেও আমরা তাকে স্পষ্ট দেখতে পাই নে। যাকে খুবই দেখতে পাওয়া যায় সে হেডমাস্টারের আদর্শ ছেলে নয়, ছাত্রবৃত্তি তার কপালে প্রায়ই জোটে না। সেটা ডানপিটে ইস্কুলপালানো ছেলে, আপন প্রাণপূর্ণ বিশেষত্ব দ্বারা সে খুবই স্ব-প্রকাশ। ব্যবহারের দিক থেকে তাকে অবজ্ঞা করা চলে, কিন্তু প্রয়োজননিরপেক্ষ প্রকাশের দিক থেকে সে-ছেলে সেরা ছেলে। সে হেডমাস্টারের বর্জনীয়, কিন্তু আর্টিস্টবিধাতার বরণীয়। চরিত্রনীতিবিলাসী ঐতিহাসিক তাঁর মহাভারতে যুধিষ্ঠিরকে ধর্মরাজ নাম দিয়ে সদ্‌গুণের উচ্চ পীঠের উপর দাঁড় করিয়ে সর্বদা আমাদের চোখের উপর ধরে রেখেছেন, কিন্তু তবু যুধিষ্ঠির স্পষ্ট করে চোখে পড়েন না ; আর চরিত্রচিত্র-বিলাসী কবি তাঁর ভীমসেনকে নানা অবিবেচনা ও অসংযমের অপবাদে লাঞ্ছিত করেও আমাদের কাছে সুস্পষ্ট করে তুলেছেন। যারা সত্য কথা বলতে ভয় করে না তারা স্বীকার করবেই যে, সর্বগুণের যুধিষ্ঠিরকে ফেলে দোষগুণে-জড়িত ভীমসেনকেই তারা ভালোবাসে। তার একমাত্র কারণ, ভীমসেন সুস্পষ্ট। শেক্‌স্‌পিয়রের ফল্‌স্‌টাফ্‌ও স্বাস্থ্যকর দৃষ্টান্ত বলে সমাজে আদরণীয় নয়, স্পষ্ট প্রত্যক্ষ বলেই সাহিত্যে আদরণীয়। রামচন্দ্রের ভক্তদের আমি ভয় করি ; তাই খুব চুপিচুপি বলছি, সাহিত্যে রামের চেয়ে লক্ষ্মণ বড়ো। বাল্মীকিকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি নিশ্চয়ই মানবেন যে, রামকে তিনি ভালো বলেন, কিন্তু লক্ষ্মণকে তিনি ভালোবাসেন।

আমরা হাজার প্রমাণ দেখাতে পারি যে, আর্টে আমরা গুণবানকে চাই নে, রূপবানকে চাই। এখানে রূপবান বলতে সুন্দরকে বলছি নে। রূপের স্পষ্টতায় যে সুপ্রত্যক্ষ সেই রূপবান। শ্রীমন্ত সদাগরের চেয়ে রূপবান ভাঁড়ুদত্ত। বিষবৃক্ষে অনেক নামজাদা নায়কনায়িকা আছেন, অনেক সাধু লেখক তাদের চরিত্র বিচার করেছেন, তার উপরে আমি আর কিছু বলতে চাই নে, কেবল এইটুকু বলে রাখি, বিষবৃক্ষে হীরা রূপবান। হীরা আমাদের ঘুমোতে দেয় না, সে সুন্দর বলে নয়, গুণবান বলে নয়, রূপবান বলে; সাধারণ অস্পষ্টতার মাঝখানে সে বিশেষ বলে সুপ্রত্যক্ষ বলে।

এ কথা মানতে হবে, চলতি ভাষায় যাকে সুন্দর বলে তাকে নিয়ে কবি কিম্বা রূপকার আপনাদের রচনায় খুব ব্যবহার করে থাকেন। তার প্রধান কারণ, সৌন্দর্য হচ্ছে একটা বিশিষ্টতা। জীবনের পথে চলতে চলতে অগণ্য বস্তুর ভিড়কে আমরা পাশ কাটিয়ে যাই। সুন্দর হঠাৎ বলে ওঠে, "চেয়ে দেখো।" প্রতিদিন হাজার হাজার জিনিসকে যা না বলি তাকে তাই বলি; বলি, "তুমি আছ।" ওইটেই হল আসল কথা। সে-যে নিশ্চিত আছে, এই বার্তাটাই তার সৌন্দর্য আমার কাছে উপস্থিত করলে। সে-যে সৎ, এইটে একান্ত উপলব্ধি করতে পারলুম বলেই সে এত আনন্দ দিলে। শিশুর কাছে তার খেলার জিনিস মহার্ঘ্য বলেই দামি নয়, সুন্দর বলেই প্রিয় নয়। আপন কল্পনাশক্তি দিয়ে তাকে স্পষ্ট উপলব্ধি করে বলেই ছেঁড়া নেকড়ায় তৈরি হলেও সে তার কাছে সত্য, এবং সত্য বলেই আনন্দময়; কারণ, সত্যের রসই হচ্ছে আনন্দ।

এক রকমের গায়ে-পড়া সৌন্দর্য আছে যা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সঙ্গে যোগ দিয়ে অতি-লালিত্যগুণে সহজে আমাদের মন ভোলায়। চোর যেমন দ্বারীকে ঘুষ দিয়ে চুরি করতে ঘরে ঢোকে। সেইজন্যে যে-আর্ট আভিজাত্যের গৌরব করে সে-আর্ট এই সৌন্দর্যকে আমল দিতেই চায় না। একজাতের বাইজিমহলে চলতি খেলো সংগীত তার হালকা চালের সুরতালের উত্তেজনায় সাধারণ লোকের মনে নেশা ধরিয়ে দেয়। বড়ো ওস্তাদেরা এই নেশাধরানো কানভোলানো ফাঁকিকে অত্যন্ত অবজ্ঞা করেন। তাতে তাঁরা সাধারণ লোকের শস্তা বকশিশ থেকে বঞ্চিত হওয়াকেই পুরস্কার বলে মেনে নেন। তাঁরা যে বিশিষ্টতাকে আর্টের সম্পদ বলে জানেন সে-বিশিষ্টতা প্রলোভননিরপেক্ষ উৎকর্ষ। তাকে দেখাতে গেলে যেমন সাধনা, তাকে পেতে গেলেও তেমনি সাধনা চাই। এইজন্যেই তার মূল্য। নিরলংকার হতে তার ভয় নেই। সরলতার অভাবকে, আড়ম্বরকে সে ইতর বলে ঘৃণা করে। সুললিত বলে নিজের পরিচয় দিতে সে লজ্জা বোধ করে, সুসংগত বলেই তার গৌরব।

গীতায় আছে, কর্মের বিশুদ্ধ মুক্তরূপ হচ্ছে তার নিষ্কামরূপ। অর্থাৎ, ত্যাগের দ্বারা

নয়, বৈরাগ্যের দ্বারাই কর্মের বন্ধন চলে যায়। তেমনি ভোগেরও বিশুদ্ধরূপ আছে, সেই রূপটি পেতে গেলে বৈরাগ্য চাই। বলতে হয়, মা গৃধঃ, লোভ কোরো না। সৌন্দর্য-ভোগ মনকে জাগাবে, এইটেই তার স্বধর্ম; তা না করে মনকে যখন সে ভোলাতে বসে তখন সে আপনার জাত খোয়ায়, তখন সে হয়ে যায় নীচ। উচ্চ-অঙ্গের আর্ট এই নীচতা থেকে বহু যত্নে আপনাকে বাঁচাতে চায়। লোভীর ভিড় তাড়াবার জন্যে সে অনেক সময়ে কঠোরকে দ্বারের কাছে বসিয়ে রাখে, এমন-কি, অনেক সময় কিছু বিশ্রী, কিছু বেসুর তার রচনার সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। কেননা, তার সাহস আছে; সে জানে, যে-বিশিষ্টতা আর্টের প্রাণ তার সঙ্গে গায়ে পড়ে মিষ্টি মিশোল করবার কোনো দরকার নেই। উমার হৃদয় পাবার জন্যে শিবকে কন্দর্প সাজতে হয় নি।

বিশেষকে দেখবার আর-একটা কৌশল আছে, সে হচ্ছে নূতনত্ব। অতিপরিচয়ের আবরণে বিশেষ ঢাকা পড়ে, এইজন্যে অনভ্যস্তকেই বিশেষ বলে খাড়া করবার দিকে দুর্বল আর্টিস্টের প্রলোভন আসতে পারে। এই প্রলোভন আর্টিস্টের তপোভঙ্গের কারণ। অতিপরিচয়ের ম্লানতার মধ্যেই চির-বিশেষের উজ্জ্বলরূপ দেখাতে পারে যে-গুণী সেই তো গুণী। যেখানটা সর্বদা আমাদের চোখে পড়ে অথচ দেখতে পাই নে, সেইখানেই দেখবার জিনিসকে দেখানো হচ্ছে আর্টিস্টের কাজ। সেইজন্যেই তো বড়ো বড়ো আর্টিস্টের রচনার বিষয় চিরকালের জিনিস। আর্ট পুরাতনকে বারে বারে নূতন করে। বিশেষকে সে দেখতে পায় হাতের কাছে, ঘরের কাছে। সৃষ্টি তো খনির জিনিস নয় যে খুঁড়তে খুঁড়তে তার পুঁজি ফুরিয়ে যাবে। সে-যে ঝরনা; তার প্রাচীন ধারা-যে চিরদিনই নবীন হয়ে বইছে, এইটে প্রমাণ করবার জন্যে তাকে কোনো অদ্ভুত ভঙ্গী করতে হয় না। অশোকের মঞ্জরী কালিদাসের আমলেও যে-রঙে বসন্তের শ্যামল বক্ষ রাঙিয়ে দিয়েছে আজও নূতনত্বের ভান করে সেই রং বদল করবার তার দরকার হয় নি। নির্ভয়ে সে বর্ষে বর্ষে পুরাতনের বাসরঘরেই নবীনের ঘোমটা খুলে দিচ্ছে। বারে বারেই চোখের উপর থেকে জড়তার মোহ কেটে যাচ্ছে, আর চির-বিশেষকে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু, ইটের ঢেলার চেয়ে অশোকমঞ্জরীকেই বিশেষ করে দেখি কেন, এইটেই দাঁড়ায় প্রশ্ন। এর উত্তর এই যে, আপন অংশ-প্রত্যংশের সমাবেশ নিয়ে অশোক আপনার মধ্যে একটি সুসংগত বিশেষ ঐক্যকে প্রকাশ করে বলেই তার মধ্যে আমাদের মন একটি পুরো দেখাকে দেখে। ইটের ঢেলায় আমাদের কাছে সত্তার সেই চরমতা নেই। একটা ষ্টিম ইঞ্জিনের মধ্যে প্রয়োজনঘটিত সুষমার ঐক্য আছে। কিন্তু, সেই ঐক্য প্রয়োজনেরই অনুগত। সে নিজেকেই চরম বলে প্রকাশ করে না, আর-কিছুকে প্রকাশ করে। সেই ইঞ্জিনের মধ্যে ব্যবহারের আনন্দ, তার মধ্যে

কৌতূহলের বিষয় থাকতে পারে। কিন্তু তাতে বিশুদ্ধ দেখার অহৈতুক বিষয় নেই।

সত্তাকে সকলের চেয়ে অব্যবহিত করে অনুভব করি নিজের মধ্যে। আমার মধ্যে একটি এক নিয়ত বলছে "আছি"। গানের মধ্যে, ছবির মধ্যে, এক যদি তেমনি জোরে বলে উঠতে পারে "এই-যে আমি", তা হলেই তাতে-আমাতে মিলনের সুর পূর্ণ হয়ে বাজল। একেই বলে শুভদৃষ্টি ; ঐক্যের উপলব্ধিতে দেখবার বিষয় চোখে-পড়া

আর্টিস্ট প্রশ্ন করছে, আর্টের সাধনা কী। আমি বলি "দেখো", তবেই দেখাতে পারবে। সত্তার প্রবাহিনী ঝরে পড়ছে ; তারই স্রোতের জলে মনের অভিষেক হোক ; ছোটো-বড়ো সুন্দর-অসুন্দর সব নিয়ে তার নৃত্য। সেই প্রকাশধারার বেগ চিত্তকে স্পর্শ করলে চিত্তের মধ্যেও প্রকাশের বেগ প্রবল হয়ে ওঠে। সৃষ্টির লীলা চার দিকেই আছে, এই সহজ সত্যটি যদি আর্টিস্ট আজও আবিষ্কার করতে না পেরে থাকে, পুরাণ-কাহিনীর পুঁথির মধ্যে, প্রাচীন রাজপুতানার পটের মধ্যে, যদি সে দেখার জিনিস খুঁজে বেড়ায় তা হলে বুঝব, কলাসরস্বতীর পদ্মাসন তার মনের মধ্যে বিকশিত হয় নি। তাই সে সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড আসবাবের দোকানে নির্জীব কাঠের চৌকি খুঁজতে বেরিয়েছে।

পরিশিষ্ট

২৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৪

মানুষ যে মানুষের পক্ষে কত সুদূরের জীব তা য়ুরোপে আমেরিকায় গেলে বুঝতে পারা যায়। সেখানকার সমাজ হচ্ছে দ্বীপশ্রেণী— ছোটো এক এক দল জ্ঞাতির চারি দিকে বৃহৎ অজ্ঞাতির লবণসমুদ্র; পরস্পরসংলগ্ন মহাদেশের মতো নয়। জ্ঞাতি শব্দটা তার ধাতুগত বিশেষ অর্থে আমি ব্যবহার করছি; অর্থাৎ, যে-কয়জনের মধ্যে জানাশোনা আছে, আনাগোনা চলে; আমাদের দেশে পরস্পর আনাগোনার জন্ম জানাশোনার দরকার হয় না। আমরা তো খোলা জায়গায় রাস্তার চৌমাথায় বাস করি। একে আমাদের আয়ু কম, তার উপরে অবাধ সামাজিকতায় পরস্পরের সময় নষ্ট ও কাজ নষ্ট করতে আমাদের সংকোচমাত্র নেই।

আবার অন্তপক্ষে, ভোগের আদর্শ যেখানে অত্যন্ত বেশি ব্যয়সাধ্য, সুতরাং যেখানে সময়-জিনিসটাকে মানুষ টাকার দরে যাচাই করতে বাধ্য, সেখানে মানুষে মানুষে মিল কেবলই বাধাগ্রস্ত হবেই, আর সেই মিল যতই প্রতিহত ও অনভ্যস্ত হতে থাকবে ততই মানুষের সর্বনাশের দিন ঘনিয়ে আসবেই। একদিন দেখা যাবে, মানুষ বিস্তর জিনিস সংগ্রহ করেছে, বিস্তর বই লিখেছে, বিস্তর দেয়াল গেঁথে তুলেছে, কেবল নিজে গেছে হারিয়ে। মানুষ আর মানুষের কীর্তির মধ্যে সামঞ্জস্য ভেঙে গিয়েছে বলেই আজ মানুষ খুব সমারোহ করে আপন গোরস্থান তৈরি করতে বসেছে।

২৬ সেপ্টেম্বর

একজন আধুনিক জাপানি রূপদক্ষের রচিত একটি ছবি আমার কাছে আছে। সেটি যতবার দেখি আমার গভীর বিস্ময় লাগে। দিগন্তে রক্তবর্ণ সূর্য— শীতের বরফ-চাপা শাসন সবে-মাত্র ভেঙে গেছে, প্লাম গাছের পত্রহীন শাখাগুলি জয়ধ্বনির বাহু-ভঙ্গীর মতো সূর্যের দিকে প্রসারিত, সাদা সাদা ফুলের মঞ্জরীতে গাছ ভরা। সেই প্লাম গাছের তলায় একটি অন্ধ দাঁড়িয়ে তার আলোকপিপাসু দুই চক্ষু সূর্যের দিকে তুলে প্রার্থনা করছে।

আমাদের ঋষি প্রার্থনা করেছেন: তমসো মা জ্যোতির্গময়, অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যাও। চৈতন্তের পরিপূর্ণতাকে তাঁরা জ্যোতি বলেছেন। তাঁদের ধ্যানমন্ত্রে সূর্যকে তাঁরা বলেছেন: ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ, আমাদের চিত্তে তিনি ধীশক্তির ধারাগুলি প্রেরণ করছেন।

ঈশোপনিষদে বলেছেন, হে পূষন্‌, তোমার ঢাকা খুলে ফেলো, সত্যের মুখ দেখি; আমার মধ্যে যিনি সেই পুরুষ তোমার মধ্যে।

এই বাদলার অন্ধকারে আজ আমার মধ্যে যে ছায়াচ্ছন্ন বিষাদ সে ওই ব্যাকুলতারই একটি রূপ। সেও বলছে, হে পূষন্‌, তোমার ওই ঢাকা খুলে ফেলো, তোমার জ্যোতির মধ্যে আমার আত্মাকে উজ্জ্বল দেখি। অবসাদ দূর হোক। আমার চিত্তের বাঁশিতে তোমার আলোকের নিশ্বাস পূর্ণ করো— সমস্ত আকাশ আনন্দের গানে জাগ্রত হয়ে উঠুক। আমার প্রাণ-যে তোমার আলোকেরই একটি প্রকাশ, আমার দেহও তাই। আমার চিত্তকে তোমার জ্যোতিরঙ্গুলি যখনই স্পর্শ করে তখনই তো ভূর্ভুবস্বঃ দীপ্যমান হয়ে ওঠে। মেঘে মেঘে তোমার যেমন নানা রং আমার ভাবনায় ভাবনায় তোমার তেজ তেমনি সুখদুঃখের কত রং লাগিয়ে দিচ্ছে। একই জ্যোতি বাইরের পুষ্পপল্লবের বর্ণে গন্ধে এবং অন্তরের রাগে অনুরাগে বিচিত্র হয়ে ঠিকরে পড়ছে। প্রভাতে সন্ধ্যায় তোমার গান দিকে দিগন্তে বেজে ওঠে; তেমনি তোমারই গান আমার কবির চিত্ত গলিয়ে দিয়ে ভাষার স্রোতে ছন্দের নাচে বয়ে চলল। এক জ্যোতির এত রং, এত রূপ, এত ভাব, এত রস! অন্ধকারের সঙ্গে নিত্য ঘাতে প্রতিঘাতে তার এত নৃত্য, এত গান, তার এত ভাঙা, এত গড়া— তারি সারথ্যে যুগযুগান্তরের এমন রথযাত্রা! তোমার তেজের উৎসের কাছে পৃথিবীর অন্তরগূঢ় প্রার্থনাই তো গাছ হয়ে, ঘাস হয়ে আকাশে উঠছে, বলছে, অপাবৃণু— ঢাকা খুলে দাও। এই ঢাকা খোলাই তার প্রাণের লীলা, এই ঢাকা খোলা থেকেই তার ফুল ফল। এই প্রার্থনাই আদিম জীবাণুর মধ্যে দিয়ে আজ মানুষের মধ্যে এসে উপস্থিত। মানুষের প্রাণের ঘাট পেরিয়ে মানুষের চিত্তের ঘাটে পাড়ি দিয়ে চলল। মানুষের ইতিহাস বলছে, অপাবৃণু, ঢাকা খোলো। জীব বলছে, আমার মধ্যে যে-সত্য আছে তার জ্যোতির্ময় পূর্ণস্বরূপ দেখি। হে পূষন্‌, হে পরিপূর্ণ, তোমার হিরণ্ময় পাত্রের মুখের আবরণ ঘুচুক, তার অন্তরের রহস্য প্রকাশিত হোক— সেই রহস্য আমার মধ্যে তোমার মধ্যে একই।

প্রাণ যখন ক্লান্ত হয় তখন বলি, সুখদুঃখের দ্বন্দ্ব দূর হয়ে যাক, সৃষ্টির লীলাতরঙ্গে আর উঠতে নামতে পারি নে; পাত্রের ঢাকা কেবল খুলে যাক তা নয় পাত্রটাই যাক ভেঙে, একের বক্ষে বিরাজ না করে একের মধ্যে বিলুপ্ত হই। ভারতবর্ষে এই প্রার্থনা ক্ষণে ক্ষণে শুনতে পাই।

কিন্তু আমি বলি, অপাবৃণু; সত্যের মুখ খুলে দাও— এককে অন্তরে বাহিরে ভালো করে দেখি, তা হলেই অনেককে ভালো করে বুঝতে পারব। গানের মধ্যে আগাগোড়া যে একটি আনন্দময় এক আছে তাকে যতক্ষণ বুঝতে না পারি ততক্ষণ সুরের সঙ্গে

সুরের দ্বন্দ্ব আমাকে সুখ দেয় না, আমাকে পীড়া দেয়। তাই বলে আমি বলব না, গান যাক লুপ্ত হয়ে; আমি বলব, পূর্ণ গানটাকে অন্তরে যেন জানি, তা হলেই খণ্ড সুরের দ্বন্দ্বটা বাহিরে আমাকে আর বাজবে না, সেটাকেও অখণ্ড আনন্দের মধ্যে বিধৃত করে দেখব।

২৭ সেপ্টেম্বর

বয়স যখন অল্প ছিল তখন অনেক ঘটনা ঘটেছে যা মনকে খুব নাড়া দিয়েছে। এই ঘটনাগুলোর সত্যের গৌরব যদি যাচাই করতে চাই তবে দেখতে পাব, দুই বড়ো বড়ো সাক্ষী দুই-রকমের বাটখারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মধ্যে ওজনের মিল নেই। বৈজ্ঞানিক পুরাতাত্ত্বিক যে-প্রমাণকে সব-চেয়ে খাঁটি বলে মানে সে হচ্ছে, যাকে বলা যেতে পারে সাধারণ প্রমাণ, সে হচ্ছে নির্বিশেষ। কিন্তু, মানুষ যেহেতু একান্ত বৈজ্ঞানিক নয়, সেইজন্যে মানুষের জগতে যে-সকল ঘটনা ঘটে সেগুলি যদি নিতান্ত তুচ্ছ না হয় তা হলে তাদের ওজন সাধারণ বাটখারার ওজন মানে না। তাদের বেলায় বিজ্ঞানকে হটু করে দিয়ে কোথা থেকে একটা অসাধারণ তুলাদণ্ড এসে খাড়া হয়। বৈজ্ঞানিক সেই ওজনটাকে সাধারণ ওজনের সঙ্গে মিল করতে গিয়ে ভারি গোলমাল করতে থাকে। একটা খুব বড়ো দৃষ্টান্ত দেখা যাক, বুদ্ধদেব। যদি তাঁর সময়ে সিনেমাওয়ালা এবং খবরের কাগজের রিপোর্টারের চলন থাকত তা হলে তাঁর খুব একটা সাধারণ ছবি পাওয়া যেত। তাঁর চেহারা, চালচলন, তাঁর মেজাজ, তাঁর ছোটোখাটো ব্যক্তিগত অভ্যাস, তাঁর রোগ তাপ ক্লান্তি ভ্রান্তি সব নিয়ে আমাদের অনেকের সঙ্গে মিল দেখতুম। কিন্তু, বুদ্ধদেব সম্বন্ধে এই সাধারণ প্রমাণটাকেই যদি প্রামাণিক বলে গণ্য করা যায় তা হলে একটা মস্ত ভুল করি। সে ভুল হচ্ছে পরিপ্রেক্ষিতের— ইংরেজিতে যাকে বলে পার্‌স্‌পেক্‌টিভ্‌। যে-জনতাকে আমরা সর্বসাধারণ বলি, সে কেবল ক্ষণকালের জন্যে মানুষের মনে ছায়া ফেলে মুহূর্তে মুহূর্তে মিলিয়ে যায়। অথচ, এমন সব মানুষ আছেন যাঁরা শত শত শতাব্দী ধরে মানুষের চিত্তকে অধিকার করে থাকেন। যে-গুণে অধিকার করেন সেই গুণটাকে ক্ষণকালের জাল দিয়ে ধরাই যায় না। ক্ষণকালের জাল দিয়ে যেটা ধরা পড়ে সেই হল সাধারণ মানুষ; তাকে ডাঙায় তুলে মাছকোটার মতো কুটে বৈজ্ঞানিক যখন তার সাধারণত্ব প্রমাণ ক'রে আনন্দ করতে থাকেন তখন দামি জিনিসের বিশেষ দামটা থেকেই তাঁরা মানুষকে বঞ্চিত করতে চান। সুদীর্ঘকাল ধরে মানুষ অসামান্য মানুষকে এই বিশেষ দামটা দিয়ে এসেছে! সাধারণ সত্য মত্ত হস্তীর মতো এসে এই বিশেষ সত্যের পদ্মবনটাকে দলন করলে সেটা কি সহ্য করা যাবে। সিনেমা-ছবিতে গ্রামোফোনের ধ্বনিতে যে-বুদ্ধকে পাওয়া যেতে পারে সে তো ক্ষণকালের বুদ্ধ;

সুদীর্ঘকাল মানুষের সজীব চিত্তের সিংহাসনে ব'সে যিনি অসংখ্য নরনারীর ভক্তিপ্রেমের অর্ঘ্যে অলংকৃত হয়েছেন তিনি চিরকালের বুদ্ধ। তাঁর ছবি সুদীর্ঘ যুগযুগান্তরের পটে আঁকা হয়েই চলেছে। তাঁর সত্য কেবলমাত্র তাঁকে নিয়ে নয়, তাঁর সত্য বহু দেশকাল-পাত্রের বিপুলতাকে নিয়ে; সেই বৃহৎ পরিমণ্ডলের মধ্যে তাঁর দৈনিক ঘটনা, তাঁর সাময়িক মানসিক অবস্থার চঞ্চল ছায়ালোকপাত চোখে দেখতেই পাওয়া যাবে না। যদি কোনো অণুবীক্ষণ নিয়ে সেইগুলোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি তা হলে তাঁর বৃহৎ রূপটাকে দেখা অসম্ভব হবে। যে-মানুষ আপন সাধারণ-ব্যক্তিগত পরিধির মধ্যে বিশেষ দিনে জন্মলাভ করে বিশেষ দিনে মরে গেছেন তিনি বুদ্ধই নন। মানুষের ইতিহাস সেই আপন বিস্মরণশক্তির গুণেই সেই ছোটো বুদ্ধের প্রতিদিনের ছোটো ছোটো ব্যাপার ভুলে যেতে পেরেছে, তবেই একটি বড়ো বুদ্ধকে পেয়েছে। মানুষের স্মরণশক্তি যদি ফোটোগ্রাফের প্লেটের মতো সম্পূর্ণ নির্বিকার হত তা হলে সে আপন ইতিহাস থেকে উঞ্ছবৃত্তি করে মরত, বড়ো জিনিস থেকে বঞ্চিত হত।

বড়ো জিনিস যেহেতু দীর্ঘকাল থাকে এইজন্যে তাকে নিয়ে মানুষ অকর্মকভাবে থাকতেই পারে না। তাকে নিজের সৃষ্টিশক্তি নিজের কল্পনাশক্তি দিয়ে নিয়তই প্রাণ জুগিয়ে চলতে হয়। কেননা, বড়ো জিনিসের সঙ্গে তার-যে প্রাণের যোগ, কেবলমাত্র জ্ঞানের যোগ নয়। এই যোগের পথ দিয়ে মানুষ আপন প্রাণের মানুষদের কাছ থেকে যেমন প্রাণ পায় তেমনি তাদের প্রাণ দেয়।

এই প্রসঙ্গে একটি অপেক্ষাকৃত ছোটো দৃষ্টান্ত আমার মনে পড়ছে। ম্যাক্সিম গোর্কি টলস্টয়ের একটি জীবনচরিত লিখেছেন। বর্তমানকালের প্রখরবুদ্ধি পাঠকেরা বাহবা দিয়ে বলছেন, এ-লেখাটা আর্টিস্টের যোগ্য লেখা বটে। অর্থাৎ, টলস্টয় দোষে গুণে ঠিক যেমনটি সেই ছবিতে তীক্ষ্ণ রেখায় তেমনটি আঁকা হয়েছে; এর মধ্যে দয়ামায়া ভক্তি-শ্রদ্ধার কোনো কুয়াশা নেই। পড়লে মনে হয়, টলস্টয় যে সর্বসাধারণের চেয়ে বিশেষ কিছু বড়ো তা নয়, এমন-কি, অনেক বিষয়ে হেয়। এখানে আবার সেই কথাটাই আসছে। টলস্টয়ের কিছুই মন্দ ছিল না, এ কথা বলাই চলে না; খুঁটিনাটি বিচার করলে তিনি-যে নানা বিষয়ে সাধারণ মানুষের মতোই এবং অনেক বিষয়ে তাদের চেয়েও দুর্বল, এ কথা স্বীকার করা যেতে পারে। কিন্তু, যে-সত্যের গুণে টলস্টয় বহু-লোকের এবং বহুকালের, তাঁর ক্ষণিকমূর্তি যদি সেই সত্যকে আমাদের কাছ থেকে, আচ্ছন্ন করে থাকে তা হলে এই আর্টিস্টের আশ্চর্য ছবি নিয়ে আমার লাভ হবে কী। প্রথম যখন আমি দার্জিলিং দেখতে গিয়েছিলুম দিনের পর দিন কেবলই দেখেছিলুম মেঘ আর কুয়াশা। কিন্তু জানা ছিল, এগুলো সাময়িক এবং যদিও হিমালয়কে আচ্ছন্ন

করবার এদের শক্তি আছে তবুও এরা কালো বাষ্পমাত্র, কাঞ্চনজঙ্ঘার ধ্রুব শুভ্র মহত্ত্বকে এরা অতিক্রম করতে পারে না। আর যাই হোক, হিমালয়কে এই কুয়াশার দ্বারা তিরস্কৃত দেখে ফিরে যাওয়া আমার পক্ষে মূঢ়তা হত। ক্ষণকালের মায়ার দ্বারা চিরকালের স্বরূপকে প্রচ্ছন্ন করে দেখাই আর্টিস্টের দেখা, এ কথা মানতে পারি নে। তা ছাড়া, গোর্কির আর্টিস্ট-চিত্ত তো বৈজ্ঞানিক হিসাবে নির্বিকার নয়। তাঁর চিত্তে টলস্টয়ের যে-ছায়া পড়েছে সেটা একটা ছবি হতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক হিসাবেও সেটা-যে সত্য তা কেমন করে বলব। গোর্কির টলস্টয়ই কি টলস্টয়। বহুকালের ও বহু লোকের চিত্তকে যদি গোর্কি নিজের চিত্তের মধ্যে সংহত করতে পারতেন তা হলেই তাঁর দ্বারা বহুকালের ও বহুলোকের টলস্টয়ের ছবি আঁকা সম্ভবপর হত। তার মধ্যে অনেক ভোলবার সামগ্রী ভুলে যাওয়া হত; আর তবেই যা না-ভোলবার তা বড়ো হয়ে, সম্পূর্ণ হয়ে, দেখা দিত।

জাহাজ ক্রাকোভিয়া। ৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৫

মানুষের মধ্যে মন প্রাণ দেহ এই তিনে মিলে কাজ চালায়, এই তিনের আপসে আমাদের কর্মবেগের একটা ছন্দ তৈরি করে। শীতের দেশে দেহ সহজেই ছুটে চলতে চায়; তারই সঙ্গে তাল রাখবার জন্যে মনেরও তাড়াতাড়ি ভাবা দরকার। গরম দেশে আমরা ধীরে সুস্থে চলি, ধীরে সুস্থে ভাবি, কোনো বিষয়ে মন স্থির করতে বিলম্ব ঘটে। শীতের দেশে যে-তেজকে দেহের মধ্যেই জাগিয়ে তুলতে হয় গরম দেশে সেই তেজ দেহের বাইরে; সেই আকাশব্যাপী তেজ শরীরের প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি; সেইজন্যে আভ্যন্তরিক উত্তেজনা যাতে বেড়ে না ওঠে আমাদের শরীরের সেই অভিপ্রায়। চলাফেরার দম সর্বদাই তাকে কমিয়ে রাখতে হয়; তাই আমাদের মনের মধ্যে কর্মচিন্তার ছন্দ মন্দাক্রান্তা।

মনের ভাবনা ও হুকুমের অপেক্ষায় যখন দেহকে কাজ চালাবার জন্যে পথ চেয়ে থাকতে হয় না তখন তাকেই বলে অভ্যাস, সেই অভ্যাসেই নৈপুণ্য। কর্মের তাল যতই দ্রুত হয়, দেহের পক্ষে ততই দ্বিধাবিহীন হওয়া দরকার। ভাবতে মনের যে-সময় লাগে তার জন্যে সবুর করতে গেলেই দ্বিধা ঘটে। বাহিরে কর্মের ফল সেই সবুরের জন্যে যদি অপেক্ষা করতে না পারে তা হলেই বিভ্রাট। মোটরগাড়ির একটা বিশেষ বেগ আছে, কখন তার হাল বাঁয়ে ফেরাব, কখন ডাইনে, তা ঠিক করতে হলে সেই কলের বেগের দ্রুত ছন্দেই ঠিক করতে হয়, নইলে বিপদ ঘটে। সেই দ্রুততা বারবার অভ্যাসের জোরেই সহজ হয়। অভ্যাসের বাহিরে কোনো নূতন অবস্থা এসে

পড়লে অপঘাত ঘটায়, অর্থাৎ যেখানে মনের দরকার সেখানে মনকে প্রস্তুত না পেলেই মুশকিল।

দম দিয়ে কলের তাল দুন চৌদুন করা শক্ত নয়, সেই সঙ্গে অভ্যাসের বেগও অনেক পরিমাণে বাড়ানো চলে। কিন্তু এই দ্রুত অভ্যাসের নৈপুণ্যে সেই-সব কাজই সম্ভবপর হয় যা 'বস্তুগত'। অর্থাৎ, এক বস্তা বাঁধবার জায়গায় দুই বস্তা বাঁধা যায়। কিন্তু, যা কিছু প্রাণগত ভাবগত তা কলের ছন্দের অনুবর্তী হতে চায় না।

যারা পালোয়ান প্রকৃতির লোক সংগীতে তারা দুন চৌদুনের বেগ দেখে পুলকিত হয়ে ওঠে; কিন্তু পদ্মবনের তরঙ্গদোলায় যারা বীণাপাণির মাধুর্যে মুগ্ধ, ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে তাঁর মোটরযাত্রার প্রস্তাবে তাদের মন হায়-হায় করতে থাকে।

পশ্চিমমহাদেশে মানুষের জীবনযাত্রার তাল কেবলই দুন থেকে চৌদুনের অভিমুখে চলেছে। কেননা, জীবনের সার্থকতার চেয়ে বস্তুর প্রয়োজন অত্যন্ত বেড়ে উঠেছে। ঘর ভেঙে হাট তৈরি হল, রব উঠল: Time is Money। এই বেগের পরিমাপ সহজ। সেইজন্যে সেখানে একটা জিনিস সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে, যেটা সকলেরই কাছে সুস্পষ্ট, যেটা বুঝতে কারো মুহূর্তকাল দেরি হয় না, সে হচ্ছে পাখোয়াজির হাত দুটোর দুড় দাড় তাণ্ডবনৃত্য। গান বুঝতে যে সবুর করা অত্যাবশ্যক, সেটা সম্পূর্ণ বাদ দিয়েও রক্ত গরম হয়ে ওঠে, ভিড়ের লোকে বলে, "সাবাস! এ একটা কাণ্ড বটে!"

এবার জাহাজে সিনেমা অভিনয় দেখা আমার ভাগ্যে ঘটেছিল। দেখলুম, তার প্রধান জিনিসটাই হচ্ছে দ্রুত লয়। ঘটনার দ্রুততা বারে বারে চমক লাগিয়ে দিচ্ছে। এই সিনেমা আজকালকার দিনে সর্বসাধারণের একটা প্রকাণ্ড নেশা। ছেলে বুড়ো সকলকেই প্রতিদিন এতে মাতিয়ে রেখেছে। তার মানে হচ্ছে সকল বিভাগেই বর্তমান যুগে কলার চেয়ে কারদানি বড়ো হয়ে উঠেছে। প্রয়োজনসাধনের মুগ্ধদৃষ্টি কারদানিকেই পছন্দ করে। সিদ্ধি, ইংরেজিতে যাকে সাক্‌সেস্ বলে, তার প্রধান বাহন হচ্ছে দ্রুত নৈপুণ্য। পাপকর্মের মধ্য দিয়েও সেই নৈপুণ্যের লীলাদৃশ্য আজ সকলের কাছে উপাদেয়। সুষমাকে কল্যাণকে উপলব্ধি করবার মতো শান্তি ও অবকাশ প্রতিদিন প্রতিহত হতে চলল; সিদ্ধির ঘোড়দৌড়ে জুয়োখেলার উত্তেজনা পশ্চিমদিগন্তে কেবলই ঘূর্ণি হাওয়া বইয়ে দিচ্ছে।

পশ্চিমমহাদেশের অন্ধকার পটের উপর আবর্তমান পলিটিক্সের দৃশ্যটাকে একটা সিনেমার বিপুলাকার চলচ্ছবির মতো দেখতে হয়েছে। ব্যাপারটা হচ্ছে, দ্রুতলয়ের প্রতিযোগিতা। জলে স্থলে আকাশে কে একটুমাত্র এগিয়ে যেতে পারে তারই উপর হারজিত নির্ভর করছে। গতি কেবলই বাড়ছে, তার সঙ্গে শান্তির কোনো সমন্বয় নেই।

ধর্মের পথে ধৈর্য চাই, আত্মসংবরণ চাই; সিদ্ধির পথে চাতুরীর ধৈর্য নেই, সংযম নেই, তার হস্তপদচালনা যতই দ্রুত হবে ততই তার ভেলকি বিস্ময়কর হয়ে উঠবে— তাই জাদুকরের সভ্যতায় বেগের পরিমাণ সকল দিকেই এত বেশি ত্বরান্বিত যে, মানুষের মন অসত্যে লজ্জিত ও অপঘাতসম্ভাবনায় শঙ্কিত হবার সময় পাচ্ছে না।

ক্রাকোভিয়া। এডেন বন্দর
১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৫

ঘর বলে, পেয়েছি; পথ বলে, পাই নি। মানুষের কাছে "পেয়েছি" তারও একটা ডাক আছে, আর "পাই নি" তারও ডাক প্রবল। ঘর আর পথ নিয়েই মানুষ। শুধু ঘর আছে পথ নেই সেও যেমন মানুষের বন্ধন, শুধু পথ আছে ঘর নেই সেও তেমনি মানুষের শাস্তি। শুধু "পেয়েছি" বন্ধ গুহা, শুধু "পাই নি" অসীম মরুভূমি।

যাকে আমরা ভালোবাসি তারই মধ্যে সত্যকে আমরা নিবিড় করে উপলব্ধি করি। কিন্তু, সেই সত্য-উপলব্ধির লক্ষণ হচ্ছে পাওয়ার সঙ্গে না-পাওয়াকে অনুভব করা। সত্যের মধ্যে এই একান্ত বিরুদ্ধতার সমন্বয় আছে বলেই সত্য-উপলব্ধির জবানবন্দি এমন হয় যে, আদালতে তা গ্রাহ্যই হতে পারে না। সুন্দরকে দেখে আমাদের ভাষায় যখন বলি "আ মরি", তখন বাহিরের দাঁড়িপাল্লার ওজনে তাকে অত্যুক্তি বলা চলে, কিন্তু অন্তর্যামী তাকে বিশ্বাস করেন। সুন্দরের মধ্যে অনন্তের স্পর্শ যখন পাই তখন আমার মধ্যে যে-অন্ত আছে সে বলে, "আমি নেই। কেবল ওই আছে।" অর্থাৎ যাকে আমি অত্যন্ত পেয়েছি সে নেই, আর যাকে আমি পেয়েও পাই নে সেই অত্যন্ত আছে।

ঘড়ি-ধরা অবিশ্বাসী, সময়কে আপেক্ষিক অর্থাৎ মায়া বলে মানতে চায় না, সে জানে না— নিমেষই বল আর লক্ষ যুগই বল, দুয়ের মধ্যেই অসীম সমানভাবেই আছেন, শুধু কেবল উপলব্ধির অপেক্ষা। এইজন্যই কবি প্রেমের ভাষায় অর্থাৎ নিবিড় সত্য উপলব্ধির ভাষায় বলেছেন, "নিমিষে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি।" যারা আয়তনকে ঐকান্তিক সত্য বলে মনে করে তারাই অসীমের সীমা শুনলে কানে হাত দেয়। কিন্তু, দেশই বল, আর কালই বল, যাতে করে সৃষ্টির সীমা নির্দেশ করে দেয়, দুইই আপেক্ষিক, দুইই মায়া। সিনেমাতে কালের পরিমাণ বদল করে দিয়ে যে ব্যায়াম-ক্রীড়া দেখানো হয় তাতে দেখি যে ঘড়ি-ধরা কালে যা একভাবে প্রত্যক্ষ, কালকে বিলম্বিত করে দিলে তাকেই অন্যভাবে দেখা যায়, অর্থাৎ স্বল্পকালের সংহতিতে যা চঞ্চল, বৃহৎ কালের ব্যাপ্তিতে তাই স্থির। শুধু কাল কেন, আকাশ সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। আমাদের দৃষ্টির আকাশে গোলাপফুলকে যে-আয়তনে দেখছি অণুবীক্ষণের আকাশে তাকে

সে-আয়তনে দেখি নে। আকাশকে আরো অনেক বেশি আণুবীক্ষণিক করে দেখতে পারলে গোলাপের পরমাণুপুঞ্জকে বৈদ্যুতিক যুগলমিলনের নৃত্যলীলারূপে দেখতে পারি, সে-আকাশে গোলাপ একেবারে গোলাপই থাকে না। অথচ, সে-আকাশ দূরস্থ নয়, স্বতন্ত্র নয়, এই আকাশেই। তাই পরম সত্যকে উপনিষৎ বলেছেন: তদেজতি তন্নৈজতি, একই কালে তিনি চলেনও তিনি চলেনও না।

সংস্কৃত ভাষায় ছন্দ শব্দের একটা অর্থ হচ্ছে কাব্যের মাত্রা, আর-একটা অর্থ হচ্ছে ইচ্ছা। মাত্রা আকারে কবির সৃষ্টি-ইচ্ছা কাব্যকে বিচিত্র রূপ দিতে থাকে। বিশ্ব-সৃষ্টির বৈচিত্র্যও দেশকালের মাত্রা-অনুসারে। কালের বা দেশের মাত্রা বদল করবা-মাত্রই সৃষ্টির রূপ এবং ভাব বদল হয়ে যায়। এই বিশ্বছন্দের মাত্রাকে আমরা আরো গভীর করে দেখতে পারি; তা হলে চরম বিশ্বকবির ইচ্ছাশক্তির মধ্যে গিয়ে পৌঁছতে হবে। মাত্রা সেখানে মাত্রার অতীতের মধ্যে; সীমার বৈচিত্র্য সেখানে অসীমের লীলা অর্থে প্রকাশ পায়।

দেশকালের মধ্যেই দেশকালের অতীতকে উপলব্ধি করে তবেই আমরা বলতে পারি "মরি-মরি"। সেই আনন্দ না হলে মরা সহজ হবে কেমন করে। তাল আর সা-রে-গ-ম যখন কেবলমাত্র বাহিরের তথ্যরূপে কানের উপর মনের উপর পড়তে থাকে তখন তার থেকে মুক্তি পাবার জন্যে চিত্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠে, কিন্তু যখন সেই তাল আর সা-রে-গ-মের ভিতর থেকেই সংগীতকে দেখতে পাই তখন মাত্রায় অমাত্রকে, সীমায় অসীমকে, পাওয়ায় অপাওয়াকে জানি; তখন সেই আনন্দে মনে হয় এর জন্যে সব দিতে পারি। কার জন্যে। ঐ সা-রে-গ-মের জন্যে? ওই ঝাঁপতাল-চৌতালের জন্যে, দুন-চৌদুনের কসরতের জন্যে? না; এমন-কিছুর জন্যে যা অনির্বচনীয়, যা পাওয়া না-পাওয়ায় এক হয়ে মেশা; যা সুর নয়, তাল নয়, সুরতালে ব্যাপ্ত হয়ে থেকে সুর-তালের অতীত যা, সেই সংগীত।

প্রয়োজনের জানা নিতান্তই জানার সীমানার মধ্যে বদ্ধ, তার চার দিকে না-জানার আকাশমণ্ডলটা চাপা; সেইজন্যে তাকে সত্যরূপে দেখা হয় না, সেইজন্যে তার মধ্যে যথার্থ আনন্দ নেই, বিস্ময় নেই, শ্রদ্ধা নেই। সেইজন্যে তার উদ্দেশ্যে যথার্থ ত্যাগ স্বীকার সম্ভব হতে পারে না। এই কারণেই ভারতবর্ষের প্রতি ইংরেজের ব্যক্তিগত বদান্যতার অদ্ভুত অভাব। অথচ, এ সম্বন্ধে তার সংগতির বোধ এতই অল্প যে, ভারতবর্ষের জন্যে তার ত্যাগের তালিকা হিসাব করবার বেলায় সর্বদাই সে অহংকার করে বলে যে, তার সিভিল সার্ভিস, তার ফৌজের দল ভারতবর্ষের সেবায় গরমে দগ্ধ হয়ে, লিভার বিকৃত ক'রে, প্রবাসের দুঃখ মাথায় নিয়ে কী কষ্টই না পাচ্ছে। বিষয়কর্মের আনুষঙ্গিক দুঃখকে

ত্যাগের দুঃখ নাম দেওয়া, রাষ্ট্রনীতির আইন ও ব্যবস্থা-রক্ষার উপলক্ষে যে-কৃচ্ছ্রসাধন তাকে সত্যের তপস্যা, ধর্মের সাধনা, বলাটা হয় গুপ্ত পরিহাস নয় মিথ্যা অহংকার।

বাসনার চোখে বা বিদ্বেষের চোখে বা অহংকারের চোখে যাকে দেখি তাকে সীমায় বেঁধে দেখি ; তার প্রতি পূর্ণ সত্যের ব্যবহার কোনোমতেই হতে পারে না ব'লে তার থেকে এত দুঃখের উৎপত্তি হয়। মুনফার লোভে, ক্ষমতার অত্যাকাঙ্ক্ষায়, মানুষের সত্য আজ সর্বত্র যেমন আচ্ছন্ন হয়েছে এমন আর কখনোই হয় নি। মানুষের মধ্যে সত্যকে না দেখতে পাওয়ার নিরানন্দ এবং অন্যায়, বিশ্বের পূর্ণ অধিকার থেকে বিশ্বজিগীষু কুস্তিগিরদের আজ যেমন বঞ্চিত করেছে এমন কোনোদিন করে নি। সেইজন্যেই বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে মানুষ এ কথা বলতে লজ্জাও করছে না যে, মানুষকে শাসন করবার অধিকারই শ্রেষ্ঠ অধিকার ; অর্থাৎ, তাকে পৃথক করে রাখবার নীতিই বড়ো নীতি।...

বহু অল্পসংখ্যক য়ুরোপীয় বালকবালিকার শিক্ষার জন্য তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণ অর্থ গবর্নমেণ্ট ব্যয় করতে সম্মত হয়েছেন বলে দেশি লোকেরা যে নালিশ করে থাকে, শুনলুম, তার জবাবে আমাদের শাসনকর্তা বলেছেন, যেহেতু অনেক মিশনারি বিদ্যালয় ভারতের জন্য আত্মসমর্পণ করেছে সেই কারণে এই নালিশ অসংগত। আমি নিজে এই নালিশ করি নে, যে-কোনো সমাজের লোকের জন্য যত অধিক পরিমাণ অর্থব্যয় করা হোক আমার তাতে আপত্তি নেই। য়ুরোপীয় বালকবালিকারা যদি অশিক্ষিতভাবে মানুষ হয় তাতে আমাদেরও মন্দ ছাড়া ভালো হবার আশা নেই। কিন্তু, মিশনারি বিদ্যালয়ের ওজর দিয়ে আত্মগ্লানি দূর করবার চেষ্টা ঠিক নয়। এ কথা স্বীকৃত যে, এই পঁয়ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর শতকরা দশ অংশও শিক্ষিত নয় ; আজ প্রায় শতাব্দীকাল ইংরেজ-শাসনে শিক্ষার ব্যবস্থা হয় নি ব'লেই এটা ঘটেছে। সেটার প্রধান কারণ, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব। কিন্তু য়ুরোপীয় বালকবালিকার প্রতি সে-অভাব নেই। আমাদের পক্ষে শতকরা পাঁচভাগ শিক্ষাই যথেষ্ট, কিন্তু য়ুরোপীয় ছাত্রদের জন্য শতকরা নিরানব্বই ভাগ শিক্ষার ব্যবস্থা হলেও ওই একভাগের জন্য খুঁৎখুঁৎ থেকে যায়। জাপান তো জাপানি ছেলেদের জন্যে এমন কথা বলে নি, সেখানেও তো মিশনারি বিদ্যালয় আছে। যে-কারণে ভারতের অর্থে পুষ্ট ইংরেজধনীর মধ্যে প্রায়ই কেউ ভারতের দৈন্যদুঃখলাঘবের জন্য মুনফার সামান্য অংশও দিতে পারে নি, সেই কারণেই ভারত-গবর্নমেণ্ট ভারতের অজ্ঞতা-অপমানলাঘবের জন্যে উপযুক্ত পরিমাণ শিক্ষার ব্যয় বহন করতে পারে নি, সহজ বদান্যতার অভাবে। ভারতের সঙ্গে ইংলণ্ডের অস্বাভাবিক সম্বন্ধ— এই কারণেই ইংলণ্ডের কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় রাজামহারাজার দান দেখতে পাওয়া

যায়, কিন্তু ইংলণ্ডের কোনো ধনী ভারতের কোনো অনুষ্ঠানে দানের মতো কোনো দান করেছে শুনতে পাই নি। অথচ, ভারত নিঃস্ব, ইংরেজ ধনী।

মিশনারি বিদ্যালয়ে ইংরেজের অর্থ আছে এমন কথা উঠবে। কিন্তু, সে কি ইংরেজের অর্থ। সে-যে খৃস্টিয়ানের অর্থ। সে-যে ধর্মফলকামী সমস্ত ইউরোপের অর্থ। ধার্মিকের দান, আত্মীয়তার দান নয়, অধিকাংশ সময়েই তা পারলৌকিক বৈষয়িকতার দান। ভারতীয় খৃস্টিয়ানের সঙ্গে ইংরেজ খৃস্টিয়ানের যে কি সম্বন্ধ তা সকলেই জানে। ভারতের কোনো একটি পাহাড়ের শহরে চার্চ্ অফ ইংলণ্ডের সম্প্রদায়গত একজন ভারতীয় ভক্ত খৃস্টিয়ান ছিলেন। তাঁর অন্ত্যেষ্টিসংকারের অনুষ্ঠান নির্বাহের জন্য তাঁর বিধবা স্ত্রী সেখানকার একমাত্র স্বসাম্প্রদায়িক পাদ্রিকে অনুরোধ করেন। পাদ্রি আপন মর্যাদা-হানি করতে সম্মত হলেন না; বোধ করি এতে পোলিটিকাল প্রেস্টিজেরও খর্বতাসম্ভাবনা আছে। অগত্যা বিধবা প্রেস্‌বিটেরিয়ান পাদ্রির শরণাপন্ন হলেন; তিনি ভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দেওয়া অকর্তব্য বোধ করলেন। ভারতে কোনো যথার্থ ভক্ত ইংরেজ মিশনারি নেই, এ কথা আমি বলি নে। কিন্তু, মিশনারি অনুষ্ঠানের যে-অংশে সাধারণ ইংরেজ ধার্মিকের অর্থ আছে সেখানে শ্রদ্ধা আছে এ কথা মানব না। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্, অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্। আমরা তো এই জানি, ভারতীয় চরিত্র ও ভারতীয় ধর্ম ও সমাজনীতির প্রতি সত্য মিথ্যা নানা উপায়ে অশ্রদ্ধা জাগিয়ে দিয়ে এই অর্থ সংগ্রহ হয়ে থাকে। অর্থাৎ, ভারতের প্রতি ইংরেজের যে-অবজ্ঞা ইংরেজ ধর্মব্যবসায়ীরা সর্বদাই তার ভূমিকা পত্তন ও ভিত্তি দৃঢ় করে এসেছে, সেখানকার শিশুদের মনে তারা খৃস্টের নাম করে ভারতীয়ের প্রতি অপ্রীতির বীজ বপন করেছে। সেই বড়ো হয়ে যখন শাসনকর্তা হয় তখন জালিয়ানওয়ালাবাগের অমানুষিক হত্যাকাণ্ডকেও ন্যায়সংগত বলে বিচারকের আসন থেকে ঘোষণা করতে লজ্জা বোধ করে না। যেমন অশ্রদ্ধা তেমনি কার্পণ্য।...

আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে প্রধান ও সাধারণ আবরণ হচ্ছে অভ্যাসের মোহ। এই অভ্যাসে চেতনায় যে-জড়তা আসে তাতে সত্যের অনন্তরূপ আনন্দরূপ দেখতে দেয় না। শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে এই তত্ত্বটাকে আমরা একেবারেই অগ্রাহ্য করেছি। ছাত্রদের প্রতিদিন একই ক্লাসে একই সময়ে একই বিষয়ে শিক্ষার পুনরাবৃত্তি করানোর চেয়ে মনের জড়ত্বের কারণ আর কিছুই হতে পারে না। শিক্ষা সম্বন্ধে ছাত্রদের প্রধানত যে-বিতৃষ্ণা জন্মে শিক্ষার বিষয় কঠিন বলেই যে তা ঘটে তা সম্পূর্ণ সত্য নয়; শিক্ষাবিধি অত্যন্ত একঘেয়ে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। মানুষের প্রাণ যন্ত্রকে ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু যন্ত্রকে আত্মীয় করতে পারে না; শিক্ষাকে যন্ত্র করে তুললে তার থেকে কোনো বাহ্য ফলই হয় না তা নয়, কিন্তু সে শিক্ষা আত্মগত হতে গুরুতর বাধা পায়।

আকস্মিক হচ্ছে সীমার বাইরেকার দূত, অভাবনীয়ের বার্তা নিয়ে সে আসে। তাতেই আমাদের চেতনা জড়তা থেকে মুক্তির আনন্দ পায়। অভাবনীয়কে অনুভব করাতেই তার মুক্তি। বিশ্বের সর্বত্রই সেই অভাবনীয়। এই অভাবনীয়কে বোধের মধ্যে আনতে গেলে চিত্তকে প্রাণবান করে রাখা চাই, অর্থাৎ তাকে উৎসুক করে তুলতে হয়। এই ঔৎসুক্যই তাকে বদ্ধতার সীমার দিক থেকে বৃদ্ধির অসীমতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। অথচ, প্রাণের এই ঔৎসুক্য নষ্ট করে দিয়ে পুনরাবৃত্তির অন্ধ প্রদক্ষিণের জোয়ালে জোর করে চিত্তকে জুড়ে দেওয়াকেই অনেকে ডিসিপ্লিন বলে গৌরব করেন। অর্থাৎ, বিধাতা যে-মানুষকে প্রাণী করেছে সেই মানুষকেই তাঁরা যন্ত্র করতে চান। সেটা হয় সিদ্ধির লোভে। যন্ত্র হচ্ছে সিদ্ধিদেবীর বাহন, প্রাণকে পিষে সে প্রবল হয়। বিশেষ নির্দিষ্ট কোনো-একটা সংকীর্ণ ফল দেওয়াই তার কাজ। বিশ্বসত্যে নির্দিষ্টের চারি দিকে যে অসীম অনির্দিষ্ট আছে তাকে সে দেখতে পারে না, কেননা, প্রাণকে সে কেবলই গণ্ডীর বাহিরে আহ্বান করে। গণ্ডীর বাহিরে বিধাতার বাঁশি বাজে; ফলকামী সেই ধ্বনি রুদ্ধ করে প্রাচীর তোলে।

আমার মতে শিক্ষার প্রণালী হচ্ছে বৈরাগীর রাস্তায়। ছাত্রদের নিয়ে বিবাগী হয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়। চলতে চলতে নিয়ত নব নব বিস্ময়ে অজানার ভিতর দিয়ে জেনে চলাই হচ্ছে প্রাণবান শিক্ষা। প্রাণের ছন্দের সঙ্গে এই শিক্ষাপ্রবাহের তাল মেলে। বদ্ধ ক্লাস হচ্ছে প্রাণধর্মী চিত্তের সহজজ্ঞানের পথে কঠিন বাধা। খাঁচায় মধ্যে পাখিকে বাঁধা খোরাক খাওয়ানো যায়, কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ পাখি হতে শেখানো যায় না। বনের পাখি ওড়ার সঙ্গে খাওয়ার মিল করে আনন্দিত হয়। প্রকৃতির অভিপ্রায় ছিল চলার সঙ্গে পাওয়ার মিল করে মানুষকে শেখানো। কিন্তু, হতভাগ্য মানবসন্তানের পক্ষে চলা বন্ধ করে দিয়ে শেখানোই শিক্ষাপ্রণালী বলে গণ্য হয়েছে। তাতে কত ব্যর্থতা, কত দুঃখ তার হিসেব কে রাখে। আমি তো পথ-চলা শিক্ষাব্যবস্থার কথা অনেকবার প্রস্তাব করেছি, কিন্তু কারো মন পাই নে। কারণ, যারা ভদ্রশিক্ষা পেয়েছে তারা বাঁধনের শিক্ষাকেই বিশ্বাস করতে শিখেছে। আমার ভাগ্য আমাকে শিক্ষায় বিবাগী করেছে বলেই খোলা পথের শিক্ষার ধারাকেই আমি সব চেয়ে সম্মান দিই।

ক্রাকোভিয়া। ভারতসাগর
১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৫

শিশু যে-জগতে সঞ্চরণ করে তার প্রায় সমস্তই সে প্রবল করে দেখে। জীবনে নানা অবান্তর বিষয় জমে উঠে তার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে নি। যখন আমি শিশু ছিলুম

তখন আমাদের ছাদের উপর দিয়ে গয়লাপাড়ার দৃশ্য প্রতিদিনই দেখেছি; প্রতিদিনই তা সম্পূর্ণ চোখে পড়েছে, প্রতিদিনই তা ছবি ছিল। আমার দৃষ্টি আর আমার দৃষ্টির বিষয়ের মাঝখানে কোনো ভাবনা, অভ্যাসের কোনো জীর্ণতা আড়াল করে নি। আজ সেই গোয়ালপাড়া কতকটা তেমনি করে দেখতে হলে সুইজর্ল্যাণ্ডে যেতে হয়। সেখানে মন ভালো করে স্বীকার করে, হাঁ, আছে।

শিশুর কাছে বিশ্ব খুব করে আছে, আমরা বয়স্কেরা সে-কথা ভুলে যাই। এইজন্যে, শিশুকে কোনো ডিসিপ্লিনের ছাঁচে ঢালবার জন্যে যখন তাকে জগৎ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমাদের নিজের বানানো কলের মধ্যে বন্ধ করি তখন তাকে যে কতখানি বঞ্চিত করি তা নিজের অভ্যাসদোষেই বুঝতে পারি নে। বিশ্বের প্রতি তার এই একান্ত স্বাভাবিক ঔৎসুক্যের ভিতর দিয়েই যে তাকে শিক্ষা দিতে হবে, নিতান্ত গোঁয়ারের মতো সে-কথা আমরা মানি নে। তার ঔৎসুক্যের আলো নিবিয়ে তার মনটা অন্ধকার করে দিয়ে শিক্ষার জন্যে তাকে এডুকেশন-জেলখানার দারোগার হাতে সমর্পণ করে দেওয়াই আমরা পন্থা বলে জেনেছি। বিশ্বের সঙ্গে মানুষের মনের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ এই উপায়ে সেটাকে কঠোর শাসনে শিশুকাল থেকেই নষ্ট ও বিকৃত করে দিই।...

ছবি বলতে আমি কী বুঝি সেই কথাটাই আর্টিস্টকে খোলসা করে বলতে চাই।

মোহের কুয়াশায়, অভ্যাসের আবরণে, সমস্ত মন দিয়ে জগৎটাকে "আছে" বলে অভ্যর্থনা করে নেবার আমরা না পাই অবকাশ, না পাই শক্তি। সেইজন্য জীবনের অধিকাংশ সময়ই আমরা নিখিলকে পাশ কাটিয়েই চলেছি। সত্তার বিশুদ্ধ আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েই মারা গেলুম।

ছবি, পাশ কাটিয়ে যেতে আমাদের নিষেধ করে। যদি সে জোর গলায় বলতে পারে "চেয়ে দেখো", তা হলেই মন স্বপ্ন থেকে সত্যের মধ্যে জেগে ওঠে। কেননা, যা আছে তাই সৎ; যেখানেই সমস্ত মন দিয়ে তাকে অনুভব করি সেখানেই সত্যের স্পর্শ পাই।

কেউ না ভেবে বসেন, যা চোখে ধরা পড়ে তাই সত্য। সত্যের ব্যাপ্তি অতীতে ভবিষ্যতে দৃশ্যে অদৃশ্যে, বাহিরে অন্তরে। আর্টিস্ট সত্যের সেই পূর্ণতা যে-পরিমাণে সামনে ধরতে পারে "আছে" ব'লে মনের সায় সেই পরিমাণে প্রবল, সেই পরিমাণে স্থায়ী হয়; তাতে আমাদের ঔৎসুক্য সেই পরিমাণে অক্লান্ত, আনন্দ সেই পরিমাণে গভীর হয়ে ওঠে।

আসল কথা, সত্যকে উপলব্ধির পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে একটা অনুভূতি আছে, সেই অনুভূতিকেই আমরা সুন্দরের অনুভূতি বলি। গোলাপফুলকে সুন্দর বলি এই-

জন্তেই যে, গোলাপ ফুলের দিকে আমার মন যেমন করে চেয়ে দেখে ইটের ঢেলার দিকে তেমন করে চায় না। গোলাপফুল আমার কাছে তার ছন্দের রূপে সহজেই সত্তা-রহস্তের কী একটা নিবিড় পরিচয় দেয়। সে কোনো বাধা দেয় না। প্রতিদিন হাজার জিনিসকে যা না বলি, তাকে তাই বলি ; বলি, "তুমি আছ।"

একদিন আমার মালী ফুলদানি থেকে বাসি ফুল ফেলে দেবার জন্তে যখন হাত বাড়ালো, বৈষ্ণবী তখন ব্যথিত হয়ে বলে উঠল, "লিখতে পড়তেই তোমার সমস্ত মন লেগে আছে, তুমি তো দেখতে পাও না।" তখনই চমকে উঠে আমার মনে পড়ে গেল, হাঁ, তাই তো বটে। ওই 'বাসি' বলে একটা অভ্যস্ত কথার আড়ালে ফুলের সত্যকে আর আমি সম্পূর্ণ দেখতে পাই নে। যে আছে সেও আমার কাছে নেই ; নিতান্তই অকারণে, সত্য থেকে, সুতরাং আনন্দ থেকে বঞ্চিত হলুম। বৈষ্ণবী সেই বাসি ফুল-গুলিকে অঞ্চলের মধ্যে সংগ্রহ করে তাদের চুম্বন করে নিয়ে চলে গেল।

আর্টিস্ট তেমনি করে আমাদের চমক লাগিয়ে দিক। তার ছবি বিশ্বের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দিয়ে বলুক, "ওই দেখো, আছে।" সুন্দর বলেই আছে তা নয়, আছে বলেই সুন্দর।

সত্তাকে সকলের চেয়ে অব্যবহিত ও সুস্পষ্ট করে অনুভব করি আমার নিজের মধ্যে। "আছি" এই ধ্বনিটি নিয়তই আমার মধ্যে বাজছে। তেমনি স্পষ্ট করে যেখানেই আমরা বলতে পারি "আছে" সেখানেই তার সঙ্গে, কেবল আমার ব্যবহারের অগভীর মিল নয়, আত্মার গভীরতম মিল হয়। "আছি" অনুভূতিতে আমার যে-আনন্দ, তার মানে এ নয় যে, আমি মাসে হাজার টাকা রোজগার করি বা হাজার লোকে আমাকে বাহবা দেয়। তার মানে হচ্ছে এই যে, আমি যে সত্য এটা আমার কাছে নিঃসংশয়, তর্ক করা সিদ্ধান্তের দ্বারা নয়, নির্বিচার একান্ত উপলব্ধির দ্বারা। বিশ্বে যেখানে তেমনি একান্তভাবে "আছে" এই উপলব্ধি করি সেখানে আমার সত্তার আনন্দ বিস্তীর্ণ হয়। সত্যের ঐক্যকে সেখানে ব্যাপক করে জানি।

কোনো ফরাসি দার্শনিক অসীমের তিনটি ভাব নির্ণয় করেছেন— the True, the Good, the Beautiful। ব্রাহ্মসমাজে তারই একটি সংস্কৃত তর্জমা খুব চলতি হয়েছে— সত্যং শিবং সুন্দরম্। এমন-কি, অনেকে মনে করেন, এটি উপনিষদের বাণী। উপনিষৎ সত্যের স্বরূপ যে ব্যাখ্যা করেছেন সে হচ্ছে, শান্তং শিবং অদ্বৈতম্। শান্তং হচ্ছে সেই সামঞ্জস্য যার যোগে সমস্ত গ্রহতারা নিয়ে বিশ্ব শান্তিতে বিধৃত, যার যোগে কালের গতি চিরন্তন ধৃতির মধ্যে নিয়মিত : নিমেষা মুহূর্তাণ্যর্ধমাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি।— শিবং হচ্ছে মানবসমাজের মধ্যে সেই সামঞ্জস্য যা নিয়তই

কল্যাণের মধ্যে বিকাশ লাভ করছে, যার অভিমুখে মানুষের চিত্তের এই প্রার্থনা যুগে যুগে সমস্ত বিরোধের মধ্য দিয়েও গূঢ়ভাবে ও প্রকাশ্যে ধাবিত হচ্ছে : অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়। আর, অদ্বৈতং হচ্ছে আত্মার মধ্যে সেই ঐক্যের উপলব্ধি যা বিচ্ছেদের ও বিদ্বেষের মধ্য দিয়েও আনন্দে প্রেমে নিয়ত আত্মীয়তাকে ব্যাপ্ত করছে।

যাঁদের মন খৃষ্টিয়ানতত্ত্বের আবহাওয়াতে অত্যন্ত অভ্যস্ত তাঁরা উপনিষৎ সম্বন্ধে ভয়ে ভয়ে থাকেন, খৃষ্টিয়ান দার্শনিকদের নমুনার সঙ্গে মিলিয়ে উপনিষদের বাণীকে কিছু-না-কিছু বদল করে চালিয়ে দেওয়া তাঁদের ভিতরকার ইচ্ছা। কিন্তু, শান্তং শিবং অদ্বৈতম্ এই মন্ত্রটিকে চিন্তা করে দেখলেই তাঁরা এই আশ্বাস পাবেন যে, অসীমের মধ্যে দ্বন্দ্বের অভাবের কথা বলা হচ্ছে না, অসীমের মধ্যে দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্য এইটেই তাৎপর্য। কারণ, বিপ্লব না থাকলে শান্তির কোনো মানেই নেই, মন্দ না থাকলে ভালো একটা শব্দমাত্র, আর বিচ্ছেদ না থাকলে অদ্বৈত নিরর্থক। তাঁরা যখন সত্যের ত্রিগুণাত্মক ধ্যানের মন্ত্র-স্বরূপে 'সত্যং শিবং সুন্দরম্' বাক্যটি ব্যবহার করেন তখন তাঁদের বোঝা উচিত যে, সত্যকে সত্য বলাই বাহুল্য এবং সুন্দর সত্যের একটা তত্ত্ব নয়, আমাদের অনুভূতিগত বিশেষণমাত্র, সত্যের তত্ত্ব হচ্ছে অদ্বৈত। যে-সত্য বিশ্বপ্রকৃতি লোকসমাজ ও মানবাত্মা পূর্ণ করে আছেন তাঁর স্বরূপকে ধ্যান করবার সহায়তাকল্পে 'শান্তং শিবং অদ্বৈতম্' মন্ত্রটি যেমন সম্পূর্ণ উপযোগী এমন আমি তো আর কিছুই জানি নে। মানবসমাজে যখন শিবকে পাবার সাধনা করি তখন কল্যাণের উপলব্ধিকে শান্তং আর অদ্বৈতং এই দুই-এর মাঝখানে রেখে দেখি, অর্থাৎ ইংরেজিতে বলতে গেলে, ল এবং লভ্‌এর পূর্ণতাই হচ্ছে সমাজের ওয়েল্‌ফেয়ার্।

আমাদের চিত্তের মধ্যে তামসিকতা আছে, সেইজন্য বিশ্বকে দেখার বাধা হচ্ছে। কিন্তু, মানুষের মন তো বাধাকে মেনে বসে থাকবে না। এই বাধার ভিতর দিয়ে কেবলই দেখার পথ করতে হবে। মানুষ যতদিন আছে ততদিনই এই পথ-খোদা চলে আসছে। মানুষ অন্ন বস্ত্র সংগ্রহ করছে, মানুষ বাসা বাঁধছে, তার সঙ্গে-সঙ্গেই কেবলমাত্র সত্তার গভীর টানে আত্মা দিয়ে দেখার দ্বারা বিশ্বকে আপন করে চলছে। তাকে জানার দ্বারা নয়, ব্যবহারের দ্বারা নয়, সম্পূর্ণ করে দেখার দ্বারা ; ভোগের দ্বারা নয়, যোগের দ্বারা।

আর্টিস্ট আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আর্টের সাধনা কী। আর্টের একটা বাইরের দিক আছে সেটা হচ্ছে আঙ্গিক, টেক্‌নিক্, তার কথা বলতে পারি নে। কিন্তু ভিতরের কথা জানি। সেখানে জায়গা পেতে চাও যদি তা হলে সমস্ত চিত্ত দিয়ে দেখো, দেখো, দেখো।

অর্থাৎ, বিশ্বের যেখানে প্রকাশের ধারা, প্রকাশের লীলা, সেখানে যদি মনটাকে সম্পূর্ণ করে ধরা দিতে পার তা হলেই অন্তরের মধ্যে প্রকাশের বেগ সঞ্চারিত হয়— আলো থেকেই আলো জ্বলে। দেখতে-পাওয়া মানে হচ্ছে প্রকাশকে পাওয়া। সংবাদ গ্রহণ করা এক জিনিস আর প্রকাশকে গ্রহণ করা আর-এক জিনিস। বিশ্বের প্রকাশকে মন দিয়ে গ্রহণ করাই হচ্ছে আর্টিস্টের সাধনা ; তাতেই প্রকাশের শক্তি সচেষ্ট হয়ে ওঠে, প্রকাশের আঙ্গিকপদ্ধতি তার সঙ্গে-সঙ্গেই অনেকটা আপনি এসে পড়ে, কতকটা শিক্ষা ও চর্চার দ্বারা নৈপুণ্যকে পাকিয়ে তোলা যায়। এইটুকু সাধনা করতে হবে, হাতিয়ারের বোঝা যেন হাতটার উপর দৌরাত্ম্য না করে, সহজ-স্রোতকে আটক করে রেখে কষ্টকল্পিত পন্থাটাই যেন বাহবা নেবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে না ওঠে। বিশ্বপ্রবাহের প্রবাহিণীর মধ্যে গলা ডুবিয়ে তারই কলধ্বনি থেকে প্রকাশের মন্ত্র অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করো, তারই ধারার ছন্দ তোমার রক্তের স্রোতে আপন তাল বেঁধে দেবে— এই হল গোড়াকার কথা ; এই হল বর্ষণ, তার পরে তোমার যদি আধার থাকে তো ভরে উঠবে ; এই হল আগুন, প্রদীপ বের করতে পার যদি তো শিখা জ্বলবার জন্যে ভাবনা থাকবে না।

২২ সেপ্টেম্বর ১৯২৭

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

২২ সেপ্টেম্বর ১৯২৭

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

বোরোবুদুরে রবীন্দ্রনাথ

জাভাযাত্রীর পত্র

জাভাযাত্রীর পত্র

১

কল্যাণীয়াসু

যাত্রা যখন আরম্ভ করা গেল আকাশ থেকে বর্ষার পর্দা তখন সরিয়ে দিয়েছে ; সূর্য আমাকে অভিনন্দন করলেন। কলকাতা থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত যতদূর গেলুম রেল-গাড়ির জানলা দিয়ে চেয়ে চেয়ে মনে হল, পৃথিবীতে সবুজের বান ডেকেছে ; শ্যামলের বাঁশিতে তানের পর তান লাগছে, তার আর বিরাম নেই। খেতে খেতে নতুন ধানের অঙ্কুরে কাঁচা রং, বনে বনে রসপরিপুষ্ট প্রচুর পল্লবের ঘন সবুজ। ধরণীর বুকের থেকে অহল্যা জেগে উঠেছেন ; নবদূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের পায়ের স্পর্শ লাগল।

প্রকৃতির এই নব জীবনের উৎসবে রূপের উত্তরে রসের গান গাবার জন্যেই আমি এসেছিলুম ; এই কথাই কেবল মনে পড়ে। কাজের লোকেরা জিজ্ঞাসা করে, তার দরকার কী। বলে, ওটা শৌখিনতা। অর্থাৎ, এই প্রয়োজনের সংসারে আমরা বাহুল্যের দলে। তাতে লজ্জা পাব না। কেননা, এই বাহুল্যের দ্বারাই আত্মপরিচয়।

হিসাবি লোকেরা একটা কথা বারবার ভুলে যায় যে, প্রচুরের সাধনাতেই প্রয়োজনের সিদ্ধি ; এই আষাঢ়ের পৃথিবীতে সেই কথাটাই জানালো। আমি চাই ফসল, যেটুকুতে আমার পেট ভরবে। সেই স্বল্প প্রত্যাশাকে মূর্তিমান দেখি তখনই যখন বর্ষণে অভিষিক্ত মাটির ভাণ্ডারে শ্যামল ঐশ্বর্য আমার প্রয়োজনকে অনেক বেশি ছাপিয়ে পড়ে। মুষ্টিভিক্ষাও জোটে না যখন ধনের সংকীর্ণতা সেই মুষ্টিকে না ছাড়িয়ে যায়। প্রাণের কারবারে প্রাণের মুনফাটাই লক্ষ্য, এই মুনফাটাই বাহুল্য। আমাদের সন্ন্যাসী মানুষেরা এই বাহুল্যটাকে নিন্দা করে ; এই বাহুল্যকেই নিয়ে কবিদের উৎসব। খরচপত্র বাদেও যথেষ্ট উদ্‌বৃত্ত যদি থাকে তবেই সাহস করে খরচপত্র চলে, এই কথাটা মানি বলে আমরা মুনফা চাই। সেটা ভোগের বাহুল্যের জন্যে নয়, সেটা সাহসের আনন্দের জন্যে। মানুষের বুকের পাটা যাতে বাড়ে তাতেই মানুষকে কৃতার্থ করে।

বর্তমান যুগে য়ুরোপেই মানুষকে দেখি যার প্রাণের মুনফা নানা খাতায় কেবলই বেড়ে চলেছে। এই জন্যেই পৃথিবীতে এত ঘটা করে সে আলো জ্বালল। সেই আলোতে সে সকল দিকে প্রকাশমান। অল্প তেলে কেবল একটি মাত্র প্রদীপে ঘরের কাজ চলে যায়, কিন্তু পুরো মানুষটা তাতে অপ্রকাশিত থাকে। এই অপ্রকাশ অস্তিত্বের কার্পণ্য, কম করে থাকা। এটা মানবসত্যের অবসাদ। জীবলোকে

মানুষরা জ্যোতিষ্কজাতীয়; জন্তুরা কেবলমাত্র বেঁচে থাকে, তাদের অস্তিত্ব দীপ্ত হয়ে ওঠে নি। কিন্তু, মানুষ কেবল-যে আত্মরক্ষা করবে তা নয়, সে আত্মপ্রকাশ করবে। এই প্রকাশের জন্যে আত্মার দীপ্তি চাই। অস্তিত্বের প্রাচুর্য থেকে, অস্তিত্বের ঐশ্বর্য থেকেই এই দীপ্তি। বর্তমান যুগে য়ুরোপই সকল দিকে আপনার রশ্মি বিকীর্ণ করেছে; তাই মানুষ সেখানে কেবল-যে টিঁকে আছে তা নয়, টিঁকে থাকার চেয়ে আরো অনেক বেশি করে আছে। পর্যাপ্তে চলে আত্মরক্ষা, অপর্যাপ্তে আত্মপ্রকাশ। য়ুরোপে জীবন অপর্যাপ্ত।

এটাতে আমি মনে দুঃখ করি নে। কারণ, যে-দেশেই যে-কালেই মানুষ কৃতার্থ হোক-না কেন, সকল দেশের সকল কালের মানুষকেই সে কৃতার্থ করে। য়ুরোপ আজ প্রাণপ্রাচুর্যে সমস্ত পৃথিবীকেই স্পর্শ করেছে। সর্বত্রই মানুষের সুপ্ত শক্তির দ্বারে তার আঘাত এসে পড়ল। প্রভুত্বের দ্বারাই তার প্রভাব।

য়ুরোপ সর্বদেশ সর্বকালকে যে স্পর্শ করেছে সে তার কোন্ সত্য দ্বারা। তার বিজ্ঞান সেই সত্য। তার যে-বিজ্ঞান মানুষের সমস্ত জ্ঞানের ক্ষেত্রকে অধিকার করে কর্মের ক্ষেত্রে জয়ী হয়েছে সে একটা বিপুল শক্তি। এইখানে তার চাওয়ার অন্ত নেই, তার পাওয়াও সেই পরিমাণে। গত বছর য়ুরোপ থেকে আসবার সময় একটি জর্মন যুবকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তিনি তাঁর অল্পবয়সের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ভারতবর্ষে আসছিলেন। মধ্যভারতের আরণ্য প্রদেশে যে-সব জাতি প্রায় অজ্ঞাতভাবে আছে দুবৎসর তাদের মধ্যে বাস করে তাদের রীতিনীতি তন্ন তন্ন করে জানতে চান। এরই জন্যে তাঁরা দুজনে প্রাণপণ করতে কুণ্ঠিত হন নি। মানুষসম্বন্ধে মানুষকে আরো জানতে হবে, সেই আরো জানা বর্বর জাতির সীমার কাছে এসেও থামে না। সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়কে এই রকম সংঘবদ্ধ করে জানা, ব্যূহবদ্ধ করে সংগ্রহ করা, জানবার সাধনায় মনকে সম্পূর্ণ মোহমুক্ত করা, এতে করে মানুষ যে কত প্রকাণ্ড বড়ো হয়েছে য়ুরোপে গেলে তা বুঝতে পারা যায়। এই শক্তি দ্বারা পৃথিবীকে য়ুরোপ মানুষের পৃথিবী করে সৃষ্টি করে তুলছে। যেখানে মানুষের পক্ষে যা-কিছু বাধা আছে তা দূর করবার জন্যে সে যে-শক্তি প্রয়োগ করছে তাকে যদি আমরা সামনে মূর্তিমান করে দেখতে পেতুম তা হলে তার বিরাট রূপে অভিভূত হতে হত।

এইখানে য়ুরোপের প্রকাশ যেমন বড়ো, যাকে নিয়ে সকল মানুষ গর্ব করতে পারে, তেমনি তার এমন একটা দিক আছে যেখানে তার প্রকাশ আচ্ছন্ন। উপনিষদে আছে, যে-সাধকেরা সিদ্ধিলাভ করেছেন— তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি: তাঁরা সর্বগামী সত্যকে সকল দিক থেকে লাভ করে যুক্তাত্মভাবে সমস্তের

মধ্যে প্রবেশ করেন। সত্য সর্বগামী বলেই মানুষকে সকলের মধ্যে প্রবেশাধিকার দেয়। বিজ্ঞান বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে মানুষের প্রবেশপথ খুলে দিচ্ছে; কিন্তু আজ সেই য়ুরোপে এমন একটি সত্যের অভাব ঘটেছে যাতে মানুষের মধ্যে মানুষের প্রবেশ অবরুদ্ধ করে। অন্তরের দিকে য়ুরোপ মানুষের পক্ষে একটা বিশ্বব্যাপী বিপদ হয়ে উঠল। এইখানে বিপদ তার নিজেরও।

এই জাহাজেই একজন ফরাসি লেখকের সঙ্গে আমার আলাপ হল। তিনি আমাকে বলছিলেন, যুদ্ধের পর থেকে য়ুরোপের নবীন যুবকদের মধ্যে বড়ো করে একটা ভাবনা ঢুকেছে। এই কথা তারা বুঝেছে, তাদের আইডিয়ালে একটা ছিদ্র দেখা দিয়েছিল যে-ছিদ্র দিয়ে বিনাশ ঢুকতে পারলে। অর্থাৎ কোথাও তারা সত্যভ্রষ্ট হল এতদিনে সেটা ধরা পড়েছে।

মানুষের জগৎ অমরাবতী, তার যা সত্য-ঐশ্বর্য তা দেশে কালে পরিমিত নয়। নিজের জন্য নিয়ত মানুষ এই-যে অমরলোক সৃষ্টি করছে তার মূলে আছে মানুষের আকাঙ্ক্ষা করবার অসীম সাহস। কিন্তু, বড়োকে গড়বার উপকরণ মানুষের ছোটো যেই চুরি করতে শুরু করে অমনি বিপদ ঘটায়। মানুষের চাইবার অন্তহীন শক্তি যখন সংকীর্ণ পথে আপন ধারাকে প্রবাহিত করতে থাকে তখনই কূল ভাঙে, তখনই বিনাশের বন্যা দুর্দাম হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, মানুষের বিপুল চাওয়া ক্ষুদ্র-নিজের জন্যে হলে তাতেই যত অশান্তির সৃষ্টি। যেখানে তার সাধনা সকলের জন্যে সেইখানেই মানুষের আকাঙ্ক্ষা কৃতার্থ হয়। এই সাধনাকেই গীতা যজ্ঞ বলেছেন; এই যজ্ঞের দ্বারাই লোকরক্ষা। এই যজ্ঞের পন্থা হচ্ছে নিষ্কাম কর্ম। সে-কর্ম দুর্বল হবে না, সে-কর্ম ছোটো হবে না, কিন্তু সে-কর্মের ফলকামনা যেন নিজের জন্যে না হয়।

বিজ্ঞান যে বিশুদ্ধ তপস্যার প্রবর্তন করেছে সে সকল দেশের, সকল কালের, সকল মানুষের— এই জন্যেই মানুষকে তাতে দেবতার শক্তি দিয়েছে, সকলরকম দুঃখ দৈন্য পীড়াকে মানবলোক থেকে দূর করবার জন্যে সে অস্ত্র গড়ছে; মানুষের অমরাবতী নির্মাণের বিশ্বকর্মা এই বিজ্ঞান। কিন্তু, এই বিজ্ঞানই কর্মের রূপে যেখানে মানুষের ফল-কামনাকে অতিকায় করে তুললে সেইখানেই সে হল যমের বাহন। এই পৃথিবীতে মানুষ যদি একেবারে মরে তবে সে এই জন্যেই মরবে— সে সত্যকে জেনেছিল কিন্তু সত্যের ব্যবহার জানে নি। সে দেবতার শক্তি পেয়েছিল, দেবত্ব পায় নি। বর্তমান যুগে মানুষের মধ্যে সেই দেবতার শক্তি দেখা দিয়েছে য়ুরোপে। কিন্তু সেই শক্তি কি মানুষকে মারবার জন্যেই দেখা দিল। গত য়ুরোপের যুদ্ধে এই প্রশ্নটাই ভয়ংকর মূর্তিতে প্রকাশ পেয়েছে। য়ুরোপের বাইরে সর্বত্রই য়ুরোপ বিভীষিকা হয়ে উঠেছে, তার প্রমাণ

আজ এসিয়া আফ্রিকা জুড়ে। য়ুরোপ আপন বিজ্ঞান নিয়ে আমাদের মধ্যে আসে নি, এসেছে আপন কামনা নিয়ে। তাই এসিয়ার হৃদয়ের মধ্যে য়ুরোপের প্রকাশ অবরুদ্ধ। বিজ্ঞানের স্পর্ধায়, শক্তির গর্বে, অর্থের লোভে, পৃথিবী জুড়ে মানুষকে লাঞ্ছিত করবার এই-যে চর্চা বহুকাল থেকে য়ুরোপ করছে, নিজের ঘরের মধ্যে এর ফল যখন ফলল তখন আজ সে উদ্‌বিগ্ন। তৃণে আগুন লাগাচ্ছিল, আজ তার নিজের বনস্পতিতে সেই আগুন লাগল। সে ভাবছে, থামব কোথায়। সে থামা কি যন্ত্রকে থামিয়ে দিয়ে। আমি তা বলি নে। থামাতে হবে লোভ। সে কি ধর্ম-উপদেশ দিয়ে হবে। তাও সম্পূর্ণ হবে না। তার সঙ্গে বিজ্ঞানেরও যোগ চাই। যে-সাধনায় লোভকে ভিতরের দিক থেকে দমন করে সে-সাধনা ধর্মের, কিন্তু যে-সাধনায় লোভের কারণকে বাইরের দিক থেকে দূর করে সে-সাধনা বিজ্ঞানের। দুইয়ের সম্মিলনে সাধনা সিদ্ধ হয়, বিজ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে ধর্মবুদ্ধির আজ মিলনের অপেক্ষা আছে।

জাভায় যাত্রাকালে এই-সমস্ত তর্ক আমার মাথায় কেন এল জিজ্ঞাসা করতে পার। এর কারণ হচ্ছে এই যে, ভারতবর্ষের বিদ্যা একদিন ভারতবর্ষের বাইরে গিয়েছিল। কিন্তু সেই বাইরের লোক তাকে স্বীকার করেছে। তিব্বত মঙ্গোলিয়া মালয়দ্বীপসকলে ভারতবর্ষ জ্ঞানধর্ম বিস্তার করেছিল, মানুষের সঙ্গে মানুষের আন্তরিক সত্যসম্বন্ধের পথ দিয়ে। ভারতবর্ষের সেই সর্বত্র-প্রবেশের ইতিহাসের চিহ্ন দেখবার জন্যে আজ আমরা তীর্থযাত্রা করেছি। সেই সঙ্গে এই কথাও দেখবার আছে, সেদিনকার ভারতবর্ষের বাণী শুষ্কতা প্রচার করে নি। মানুষের ভিতরকার ঐশ্বর্যকে সকল দিকে উদ্‌বোধিত করেছিল, স্থাপত্যে ভাস্কর্যে চিত্রে সংগীতে সাহিত্যে; তারই চিহ্ন মরুভূমে অরণ্যে পর্বতে দ্বীপে দ্বীপান্তরে, দুর্গম স্থানে দুঃসাধ্য কল্পনায়। সন্ন্যাসীর যে-মন্ত্র মানুষকে রিক্ত ক'রে নগ্ন করে, মানুষের যৌবনকে পঙ্গু করে, মানবচিত্তবৃত্তিকে নানাদিকে খর্ব করে, এ সে-মন্ত্র নয়। এ জরাজীর্ণ কৃশপ্রাণ বৃদ্ধের বাণী নয়, এর মধ্যে পরিপূর্ণপ্রাণ বীর্যবান যৌবনের প্রভাব। ১ শ্রাবণ ১৩৩৪।[১]

২

কল্যাণীয়াসু

দেশ থেকে বেরবার মুখে আমার উপর ফরমাশ এল কিছু-কিছু লেখা পাঠাতে হবে। কাকে পাঠাব লেখা, কে পড়বে। সর্বসাধারণ? সর্বসাধারণকে বিশেষ করে চিনি নে,

১ শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখিত।

এই জন্যে তার ফরমাশে যখন লিখি তখন শক্ত করে বাঁধানো খুব একটা সাধারণ খাতা খুলে লিখতে হয়; সে-লেখার দাম খতিয়ে হিসেব কষা চলে।

কিন্তু, মানুষের একটা বিশেষ খাতা আছে; তার আলগা পাতা, সেটা যা-তা লেখবার জন্যে, সে লেখার দামের কথা কেউ ভাবেও না। লেখাটাই তার লক্ষ্য, কথাটা উপলক্ষ। সে-রকম লেখা চিঠিতে ভালো চলে; আটপৌরে লেখা— তার না আছে মাথায় পাগড়ি, না আছে পায়ে জুতো। পরের কাছে পরের বা নিজের কোনো দরকার নিয়ে সে যায় না— সে যায় যেখানে বিনা-দরকারে গেলেও জবাবদিহি নেই, যেখানে কেবলমাত্র বকে যাওয়ার জন্যেই যাওয়া-আসা।

স্রোতের জলের যে-ধ্বনি সেটা তার চলারই ধ্বনি, উড়ে-চলা মৌমাছির পাখার যেমন গুঞ্জন। আমরা যেটাকে বকুনি বলি সেটাও সেই মানসিক চলে যাওয়ারই শব্দ। চিঠি হচ্ছে লেখার অক্ষরে বকে যাওয়া।

এই বকে-যাওয়াটা মনের জীবনের লীলা। দেহটা কেবলমাত্র চলবার জন্যেই বিনা-প্রয়োজনে মাঝে মাঝে এক-একবার ধাঁ করে চলে ফিরে আসে। বাজার করবার জন্যেও নয়, সভা করবার জন্যেও নয়, নিজের চলাতেই সে নিজে আনন্দ পায় বলে। তেমনি নিজের বকুনিতেই মন জীবনধর্মের তৃপ্তি পায়। তাই বকবার অবকাশ চাই, লোক চাই। বক্তৃতার জন্যে লোক চাই অনেক, বকার জন্যে এক-আধজন।

দেশে অভ্যস্ত জায়গায় থাকি নিত্যনৈমিত্তিক কাজের মধ্যে, জানা অজানা লোকের ভিড়ে। নিজের সঙ্গে নিজের আলাপ করবার সময় থাকে না। সেখানে নানা লোকের সঙ্গে নানা কেজো কথা নিয়ে কারবার। সেটা কেমনতরো। যেন বাঁধা পুকুরের ঘাটে দশজনে জটলা করে জল ব্যবহার। কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা চাতকের ধর্ম আছে; হাওয়ায় উড়ে-আসা মেঘের বর্ষণের জন্যে সে চেয়ে থাকে একা একা। মনের আকাশে উড়ো ভাবনাগুলো সেই মেঘ— সেটা খামখেয়ালের ঝাপটা লেগে; তার আবির্ভাব তিরোভাব সবই আকস্মিক। প্রয়োজনের তাগিদমতো তাকে বাঁধা-নিয়মে পাওয়া যায় না বলেই তার বিশেষ দাম; পৃথিবী আপনারই বাঁধা জলকে আকাশে উড়ো জল করে দেয়; নিজের ফসলখেতকে সরস করবার জন্যে সেই জলের দরকার। বিনা প্রয়োজনে নিজের মনকে কথা বলাবার সেই প্রয়োজন, সেটাতে মন আপন ধারাতেই আপনাকে অভিষিক্ত করে।

জীবনযাত্রার পরিচিত ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এলে মন আজ যা-তা ভাববার সময় পেল। তাই ভেবেছি, কোনো সম্পাদকি বৈঠক স্মরণ করে প্রবন্ধ আওড়াব না, চিঠি লিখব তোমাকে। অর্থাৎ, পাত পেড়ে ভোজ দেওয়া তাকে বলা চলবে না; সে হবে

গাছতলায় দাঁড়িয়ে হাওয়ায় পড়ে-যাওয়া ফল আঁচলে ভরে দেওয়া। তার কিছু পাকা, কিছু কাঁচা; তার কোনোটাতে রং ধরেছে, কোনোটাতে ধরে নি। তার কিছু রাখলেও চলে, কিছু ফেলে দিলেও নালিশ চলবে না।

সেই ভাবেই চিঠি লিখতে শুরু করেছিলুম। কিন্তু, আকাশের আলো দিলে মুখ-ঢাকা। বৈঠকখানার আসর বন্ধ হয়ে গেলে ফরাশ বাতি নিবিয়ে দিয়ে যেমন ঝাড়লণ্ঠনে ময়লা রঙের ঘেরাটোপ পরিয়ে দেয়, দ্যুলোকের ফরাশ সেই কাণ্ডটা করলে; একটা ফিকে ধোঁয়াটে রঙের আবরণ দিয়ে আকাশসভার তৈজসপত্র দিলে মুড়ে। এই অবস্থায় আমার মন তার হালকা কলমের খেলা আপনিই বন্ধ করে দেয়। বকুনির কূলহারা ঝরনা বাক্যের নদী হয়ে কখন একসময় গভীর খাদে চলতে আরম্ভ করে; তখন তার চলাটা কেবলমাত্র সূর্যের আলোয় কলধ্বনির নূপুর বাজানোর জন্যে নয়, একটা কোনো লক্ষ্যে পৌঁছবার সাধনায়। আনমনা সাহিত্য তখন লোকালয়ের মাঝখানে এসে প'ড়ে সমনস্ক হয়ে ওঠে। তখন বাণীকে অনেক বেশি অতিক্রম করে ভাবনাগুলো মাথা তুলে দাঁড়ায়।

উপনিষদে আছে: স নো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা; তিনি ভালোবাসেন, তিনি সৃষ্টি করেন, আবার তিনিই বিধান করেন। সৃষ্টি-করাটা সহজ আনন্দের খেয়ালে, বিধান-করায় চিন্তা আছে। যাকে খাস সাহিত্য বলে সেটা হল সেই সৃষ্টিকর্তার এলেকায়, সেটা কেবল আপন মনে। যদি কোনো হিসাবি লোক স্রষ্টাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে "কেন সৃষ্টি করা হল" তিনি জবাব দেন, "আমার খুশি!" সেই খুশিটাই নানা রঙে নানা রসে আপনাতেই আপনি পর্যাপ্ত হয়ে ওঠে। পদ্মফুলকে যদি জিজ্ঞাসা করো "তুমি কেন হলে" সে বলে, "আমি হবার জন্যেই হলুম।" খাঁটি সাহিত্যেরও সেই একটিমাত্র জবাব।

অর্থাৎ, সৃষ্টির একটা দিক আছে যেটা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার বিশুদ্ধ বকুনি। সেদিক থেকে এমনও বলা যেতে পারে, তিনি আমাকে চিঠি লিখছেন। আমার কোনো চিঠির জবাবে নয়, তাঁর আপনার বলতে ইচ্ছে হয়েছে বলে; কাউকে তো বলা চাই। অনেকেই মন দিয়ে শোনে না, অনেকে বলে, "এ তো সারবান নয়; এ তো বন্ধুর আলাপ, এ তো সম্পত্তির দলিল নয়।" সারবান থাকে মাটির গর্ভে, সোনার খনিতে; সে নেই ফুলের বাগানে, নেই সে উদয়দিগন্তে মেঘের মেলায়। আমি একটা গর্ব করে থাকি, ওই চিঠিলিখিয়ের চিঠি পড়তে পারৎপক্ষে কখনো ভুলি নে। বিশ্ববকুনি যখন-তখন আমি শুনে থাকি। তাতে বিষয়কাজের ক্ষতি হয়েছে, আর যারা আমাকে দলে ভিড়িয়ে কাজে লাগাতে চায় তাদের কাছ থেকে নিন্দাও শুনেছি; কিন্তু আমার এই দশা।

অথচ, মুশকিল হয়েছে এই যে, বিধাতাও আমাকে ছাড়েন নি। সৃষ্টিকর্তার লীলাঘর থেকে বিধাতার কারখানাঘর পর্যন্ত যে-রাস্তাটা গেছে সে-রাস্তায় দুই প্রান্তেই আমার আনাগোনার কামাই নেই।

এই দোটানায় পড়ে আমি একটা কথা শিখেছি। যিনি সৃষ্টিকর্তা স এব বিধাতা; সেই জন্যেই তাঁর সৃষ্টি ও বিধান এক হয়ে মিশেছে, তাঁর লীলা ও কাজ এই দুয়ের মধ্যে একান্ত বিভাগ পাওয়া যায় না। তাঁর সকল কর্মই কারুকর্ম; ছুটিতে খাটুনিতে গড়া; কর্মের রূঢ় রূপের উপর সৌন্দর্যের আব্রু টেনে দিতে তাঁর আলস্য নেই। কর্মকে তিনি লজ্জা দেন নি। দেহের মধ্যে যন্ত্রের ব্যবস্থাকৌশল আছে কিন্তু তাকে আবৃত করে আছে তার সুষমাসৌষ্ঠব, বস্তুত সেইটেই প্রকাশমান।

মানুষকেও তিনি সৃষ্টি করবার অধিকার দিয়েছেন; এইটেই তার সব চেয়ে বড়ো অধিকার। মানুষ যেখানেই আপনার কর্মের গৌরব বোধ করেছে সেখানেই কর্মকে সুন্দর করবার চেষ্টা করেছে। তার ঘরকে বানাতে চায় সুন্দর করে; তার পানপাত্র অন্নপাত্র সুন্দর; তার কাপড়ে থাকে শোভার চেষ্টা। তার জীবনে প্রয়োজনের চেয়ে সজ্জার অংশ কম থাকে না। যেখানে মানুষের মধ্যে স্বভাবের সামঞ্জস্য আছে সেখানে এইরকমই ঘটে।

এই সামঞ্জস্য নষ্ট হয়, যেখানে কোনো একটা রিপু, বিশেষত লোভ অতি প্রবল হয়ে ওঠে। লোভ জিনিসটা মানুষের দৈন্য থেকে, তার লজ্জা নেই; সে আপন অসম্ভ্রমকে নিয়েই বড়াই করে। বড়ো বড়ো মুনফাওয়ালা পাটকল চটকল গঙ্গার ধারের লাবণ্যকে দলন করে ফেলেছে দম্ভভরেই। মানুষের রুচিকে সে একেবারেই স্বীকার করে নি; একমাত্র স্বীকার করেছে তার পাওনার ফুলে-ওঠা থলিটাকে।

বর্তমান যুগের বাহ্যরূপ তাই নির্লজ্জতায় ভরা। ঠিক যেন পাকযন্ত্রটা দেহের পর্দা থেকে সর্বসম্মুখে বেরিয়ে এসে আপন জটিল অন্ত্রতন্ত্র নিয়ে সর্বদা দোলায়মান। তার ক্ষুধার দাবি ও সুনিপুণ পাকপ্রণালীর বড়াইটাই সর্বাঙ্গীণ দেহের সম্পূর্ণ সৌষ্ঠবের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে। দেহ যখন আপন স্বরূপকে প্রকাশ করতে চায় তখন সুসংযত সুষমার দ্বারাই করে; যখন সে আপন ক্ষুধাকেই সব ছাড়িয়ে একান্ত করে তোলে তখন বীভৎস হতে তার কিছুমাত্র লজ্জা নেই। লালায়িত রিপুর নির্লজ্জতাই বর্বরতার প্রধান লক্ষণ, তা সে সভ্যতার গিলটি-করা তকমাই পরুক কিম্বা অসভ্যতার পশুচর্মেই সেজে বেড়াক— ডেভিল্ ডান্‌সই নাচুক কিম্বা জাজ্ ডান্‌স্।

বর্তমান সভ্যতায় রুচির সঙ্গে কৌশলের যে বিচ্ছেদ চার দিক থেকেই দেখতে পাই তার একমাত্র কারণ, লোভটাই তার অন্য-সকল সাধনাকে ছাড়িয়ে লম্বোদর হয়ে

উঠেছে। বস্তুর সংখ্যাধিক্যবিস্তারের প্রচণ্ড উন্মত্ততায় সুন্দরকে সে জায়গা ছেড়ে দিতে চায় না। সৃষ্টিপ্রেমের সঙ্গে পণ্যলোভের এই বিরোধে মানবধর্মের মধ্যে যে-আত্মবিপ্লব ঘটে তাতে দাসেরই যদি জয় হয়, পেটুকতারই যদি আধিপত্য বাড়ে, তা হলে যম আপন সশস্ত্র দূত পাঠাতে দেরি করবে না; দলবল নিয়ে নেমে আসবে দ্বেষ হিংসা মোহ মদ মাৎসর্য, লক্ষ্মীকে দেবে বিদায় করে।

পূর্বেই বলেছি, দীনতা থেকে লোভের জন্ম; সেই লোভের একটি স্থূলতনু সহোদরা আছে তার নাম জড়তা। লোভের মধ্যে অসংযত উদ্যম; সেই উদ্যমেই তাকে অশোভন করে। জড়তায় তার উলটো, সে নড়ে বসতে পারে না; সে না পারে সজ্জাকে গড়তে, না পারে আবর্জনাকে দূর করতে; তার অশোভনতা নিরুদ্যমের। সেই জড়তার অশোভনতায় আমাদের দেশের মানসম্ভ্রম নষ্ট করেছে। তাই আমাদের ব্যবহারে আমাদের জীবনের অনুষ্ঠানে সৌন্দর্য বিদায় নিতে বসল; আমাদের ঘরে-দ্বারে বেশে-ভূষায় ব্যবহারসামগ্রীতে রুচির স্বাধীন প্রকাশ রইল না; তার জায়গায় এসে পড়েছে চিত্তহীন আড়ম্বর— এতদূর পর্যন্ত শক্তির অসাড়তা এবং আপন রুচি সম্বন্ধেও নির্লজ্জ আত্ম-অবিশ্বাস যে, আমাদের সেই আড়ম্বরের সহায় হয়েছে চৌরঙ্গির বিলিতি দোকানগুলো।

বারবার মনে করি, লেখাগুলোকে করব বঙ্কিমবাবু যাকে বলেছেন 'সাধের তরণী।' কিন্তু, কোথা থেকে বোঝা এসে জমে, দেখতে দেখতে সাধের তরী হয়ে ওঠে বোঝাই-তরী। ভিতরে রয়েছে নানাপ্রকারের ক্ষোভ, লেখনীর আওয়াজ শুনেই তারা স্থানে অস্থানে বেরিয়ে পড়ে; কোনো বিশেষ প্রসঙ্গ যার মালেক নয় এমন একটা রচনা পেলেই সেটাকে অগ্নিবাস গাড়ি করে তোলে। কেউ-বা ভিতরেই ঢুকে বেঞ্চির উপর পা তুলে বসে যায়, কেউ-বা পায়দানে চড়ে চলতে থাকে; তার পরে যেখানে-খুশি অকস্মাৎ লাফ দিয়ে নেমে পড়ে।

আজ শ্রাবণমাসের পয়লা। কিন্তু ঝাঁকড়া-ঝুঁটিওয়ালা শ্রাবণ এক ভবঘুরে বেদের মতো তার কালো মেঘের তাঁবু গুটিয়ে নিয়ে কোথায় যে চলে গেছে তার ঠিকানা নেই। আজ যেন আকাশসরস্বতী নীলপদ্মের দোলায় দাঁড়িয়ে। আমার মন ওই সঙ্গে সঙ্গে দুলছে সমস্ত পৃথিবীটাকে ঘিরে। আমি যেন আলোতে তৈরি, বাণীতে গড়া, বিশ্ব-রাগিণীতে ঝংকৃত, জলে স্থলে আকাশে ছড়িয়ে যাওয়া। আমি শুনতে পাচ্ছি সমুদ্রটা কোন্ কাল থেকে কেবলই ভেরী বাজাচ্ছে, আর পৃথিবীতে তারই উত্থানপতনের ছন্দে জীবের ইতিহাসযাত্রা চলেছে আবির্ভাবের অস্পষ্টতা থেকে তিরোভাবের অদৃশ্যের মধ্যে। একদল বিপুলকায় বিকটাকার প্রাণী যেন সৃষ্টিকর্তার দুঃস্বপ্নের মতো দলে দলে এল, আবার মিলিয়ে গেল। তার পরে মানুষের ইতিহাস কবে শুরু হল প্রদোষের ক্ষীণ

আলোতে, গুহাগহ্বর-অরণ্যের ছায়ায় ছায়ায়। দুই পায়ের উপর খাড়া-দাঁড়ানো ছোটো ছোটো চটুল জীব, লাফ দিয়ে চড়ে চড়ে বসল মহাকায় বিপদবিভীষিকার পিঠের উপর, বিষ্ণু যেমন চড়েছেন গরুড়ের পিঠে। অসাধ্যের সাধনায় চলল তারা জীর্ণ যুগান্তরের ভগ্নাংশবিকীর্ণ দুর্গম পথে। তারই সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীকে ঘিরে ঘিরে বরুণের মৃদঙ্গ বাজতে লাগল দিনে রাত্রে, তরঙ্গে তরঙ্গে। আজ তাই শুনছি আর এমন-কোনো একটা কথা ছন্দে আবৃত্তি করতে ইচ্ছা করছে যা অনাদিকালের। আজকের দিনের মতোই এইরকম আলো-ঝল্‌মলানো কলকল্লোলিত নীলজলের দিকে তাকিয়ে ইংরেজ কবি শেলি একটি কবিতা লিখেছেন—

The sun is warm, the sky is clear,
The waves are dancing fast and bright.

কিন্তু, এ তাঁর ক্লান্ত জীবনের অবসাদের বিলাপ। এর সঙ্গে আজ ভিতরে বাইরে মিল পাচ্ছি নে। একটা জগৎজোড়া কলক্রন্দন শুনতে পাচ্ছি বটে, সেই ক্রন্দন ভরিয়ে তুলছে অন্তরীক্ষকে, যে-অন্তরীক্ষের উপর বিশ্বরচনার ভূমিকা, যে-অন্তরীক্ষকে বৈদিক ভারত নাম দিয়েছে ক্রন্দসী। এ কিন্তু শ্রান্তিভারাতুর পরাভবের ক্রন্দন নয়। এ নবজাত শিশুর ক্রন্দন, যে-শিশু উর্ধ্বস্বরে বিশ্বদ্বারে আপন অস্তিত্ব ঘোষণা ক'রে তার প্রথমক্রন্দিত নিশ্বাসেই জানায়, "অয়মহং ভোঃ।" অসীম ভাবীকালের দ্বারে সে অতিথি। অস্তিত্বের ঘোষণায় একটা বিপুল কান্না আছে। কেননা, বারে বারে তাকে ছিন্ন করতে হয় আবরণ, চূর্ণ করতে হয় বাধা। অস্তিত্বের অধিকার পড়ে-পাওয়া জিনিস নয়, প্রতি মুহূর্তেই সেটা লড়াই-করে-নেওয়া জিনিস। তাই তার কান্না এত তীব্র, আর জীবলোকে সকলের চেয়ে তীব্র মানবসত্তার নবজীবনের কান্না। সে যেন অন্ধকারের গর্ভ বিদারণ-করা নবজাত আলোকের ক্রন্দনধ্বনি। তারই সঙ্গে সঙ্গে নব নব জন্মে নব নব যুগে দেবলোকে বাজে মঙ্গলশঙ্খ, উচ্চারিত হয় বিশ্বপিতামহের অভিনন্দনমন্ত্র।

আজকের দিনে এই আমার শেষ উপলব্ধি নয়। সকালে দেখলুম, সমুদ্রের প্রান্তরেখায় আকাশ তার জ্যোতির্ময়ী চিরন্তনী বাণীটি লিখে দিলে; সেটি পরম শান্তির বাণী, তা মর্তলোকের বহু যুগের বহু দুঃখের আর্তকোলাহলের আবর্তকে ছাড়িয়ে ওঠে, যেন অশ্রুর ঢেউয়ের উপরে শ্বেতপদ্মের মতো। তার পরে দিনশেষের দিকে দেখলুম একটি অখ্যাত ব্যক্তিকে, যার মধ্যে মনুষ্যত্ব অপমানিত— যদি সময় পাই তার কথা পরে বলব। তখন মানব-ইতিহাসের দিগন্তে দিগন্তে দেখতে পেলুম বিরোধের কালো মেঘ, অশান্তির প্রচ্ছন্ন বজ্রগর্জন, আর লোকালয়ের উপর রুদ্রের ভ্রূকুটিচ্ছায়া। ইতি ২ শ্রাবণ ১৩৩৪।১

১ শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখিত।

৩

বুনো হাতি মূর্তিমান উৎপাত, বজ্রবৃংহিত ঝড়ের মেঘের মতো। এতটুকু মানুষ, হাতির একটা পায়ের সঙ্গেও যার তুলনা হয় না, সে ওকে দেখে খামখা বলে উঠল, "আমি এর পিঠে চড়ে বেড়াব।" এই প্রকাণ্ড দুর্দাম প্রাণপিণ্ডটাকে গাঁ গাঁ করে শুঁড় তুলে আসতে দেখেও এমন অসম্ভবপ্রায় কথা কোনো একজন ক্ষীণকায় মানুষ কোনো এককালে ভাবতেও পেরেছে, এইটেই আশ্চর্য। তার পরে "পিঠে চড়ব" বলা থেকে আরম্ভ করে পিঠে চড়ে-বসা পর্যন্ত যে-ইতিহাস সেটাও অতি অদ্ভুত। অনেকদিন পর্যন্তই সেই অসম্ভবের চেহারা সম্ভবের কাছ দিয়েও আসে নি— পরম্পরাক্রমে কত বিফলতা কত অপঘাত মানুষের সংকল্পকে বিদ্রূপ করেছে তার সংখ্যা নেই; সেটা গণনা করে করে মানুষ বলতে পারত, এটা হবার নয়। কিন্তু তা বলে নি। অবশেষে একদিন সে হাতির মতো জন্তুরও পিঠে চড়ে ফসলখেতের ধারে লোকালয়ের রাস্তায়-ঘাটে ঘুরে বেড়ালো। এটা সাংঘাতিক অধ্যবসায়, সেই জন্যেই গণেশের হাতির মুণ্ডে মানুষের সিদ্ধির মূর্তি। এই সিদ্ধির দুই দিকে দুই জন্তুর চেহারা, এক দিকে রহস্যসন্ধানকারী সূক্ষ্মঘ্রাণ তীক্ষ্ণদৃষ্টি খরদন্ত চঞ্চল কৌতূহল, সেটা ইঁদুর, সেইটেই বাহন; আর-একদিকে বন্ধনে বশীভূত বন্যশক্তি যা দুর্গমের উপর দিয়ে বাধা ডিঙিয়ে চলে, সেই হল যান— সিদ্ধির যান-বাহনযোগে মানুষ কেবলই এগিয়ে চলছে। তার ল্যাবরেটরিতে ছিল ইঁদুর, আর তার এরোপ্লেনের মোটরে আছে হাতি। ইঁদুরটা চুপিচুপি সন্ধান বাতলিয়ে দেয়, কিন্তু ওই হাতিটাকে কায়দা করে নিতে মানুষের অনেক দুঃখ। তা হোক, মানুষ দুঃখকে দেখে হার মানে না, তাই সে আজ দ্যুলোকের রাস্তায় যাত্রা আরম্ভ করলে। কালিদাস রাঘবদের কথায় বলেছেন, তাঁরা 'আনাকরথবর্ত্মনাম্'— স্বর্গ পর্যন্ত তাঁদের রথের রাস্তা। যখন এ কথা কবি বলেছেন তখন মাটির মানুষের মাথায় এই অদ্ভুত চিন্তা ছিল যে, আকাশে না চললে মানুষের সার্থকতা নেই। সেই চিন্তা ক্রমে আজ রূপ ধরে বাইরের আকাশে পাখা ছড়িয়ে দিলে। কিন্তু, রূপ যে ধরল সে মৃত্যুঞ্জয়কারী ভীষণ তপস্যায়। মানুষের বিজ্ঞানবুদ্ধি সন্ধান করতে জানে, এই যথেষ্ট নয়; মানুষের কীর্তি-বুদ্ধি সাহস করতে জানে, এইটে তার সঙ্গে যখন মিলেছে তখনই সাধকদের তপঃসিদ্ধির পথে পথে ইন্দ্রদেব যে-সব বাধা রেখে দেন সেগুলো ধূলিসাৎ হয়।

তীরে দাঁড়িয়ে মানুষ সামনে দেখলে সমুদ্র। এত বড়ো বাধা কল্পনা করাই যায় না। চোখে দেখতে পায় না এর পার, তলিয়ে পায় না এর তল। যমের মোষের মতো কালো, দিগন্তপ্রসারিত বিরাট একটা নিষেধ কেবলই তরঙ্গতর্জনী তুলছে। চিরবিদ্রোহী মানুষ বললে, "নিষেধ মানব না।" বজ্রগর্জনে জবাব এল, "না মান তো মরবে।" মানুষ

তার এতটুকুমাত্র বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তুলে বললে, "মরি তো মরব!" এই হল জাত-বিদ্রোহীদের উপযুক্ত কথা। জাত-বিদ্রোহীরাই চিরদিন জিতে এসেছে। একেবারে গোড়া থেকেই প্রকৃতির শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে মানুষ নানা ভাবেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে দিলে। আজ পর্যন্ত তাই চলছে। মানুষদের মধ্যে যারা যত খাঁটি বিদ্রোহী, যারা বাহ্য শাসনের সীমা-গণ্ডি যতই মানতে চায় না, তাদের অধিকার ততই বেড়ে চলতে থাকে।

যেদিন সাড়ে তিনহাত মানুষ স্পর্ধা করে বললে "এই সমুদ্রের পিঠে চড়ব" সেদিন দেবতারা হাসলেন না; তাঁরা এই বিদ্রোহীর কানে জয়মন্ত্র পড়িয়ে দিয়ে অপেক্ষা করে রইলেন। সমুদ্রের পিঠ আজ আয়ত্ত হয়েছে, সমুদ্রের তলটাকেও কায়দা করা শুরু হল। সাধনার পথে ভয় বারবার ব্যঙ্গ করে উঠছে; বিদ্রোহীর অন্তরের মধ্যে উত্তরসাধক অবিচলিত ব'সে প্রহরে প্রহরে হাঁক দিচ্ছে, "মা ভৈঃ।"

কালকের চিঠিতে ক্রন্দসীর কথা বলেছি, অন্তরীক্ষে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে সত্তার ক্রন্দন গ্রহে নক্ষত্রে। এই সত্তা বিদ্রোহী, অসীম অব্যক্তের সঙ্গে তার নিরন্তর লড়াই। বিরাট অপ্রকাশের তুলনায় সে অতি সামান্য, কিন্তু অন্ধকারের অন্তহীন পারাবারের উপর দিয়ে ছোটো ছোটো কোটি কোটি আলোর তরী সে ভাসিয়ে দিয়েছে— দেশ-কালের বুক চিরে অতলস্পর্শের উপর দিয়ে তার অভিযান। কিছু ডুবছে, কিছু ভাসছে, তবু যাত্রার শেষ নেই।

প্রাণ তার বিদ্রোহের ধ্বজা নিয়ে পৃথিবীতে অতি দুর্বলরূপে একদিন দেখা দিয়েছিল। অতি প্রকাণ্ড, অতি কঠিন, অতি গুরুভার অপ্রাণ চারি দিকে গদা উদ্যত করে দাঁড়িয়ে, আপন ধুলোর কয়েদখানায় তাকে দ্বার জানলা বন্ধ করে প্রচণ্ড শাসনে রাখতে চায়। কিন্তু, বিদ্রোহী প্রাণ কিছুতেই দমে না; দেয়ালে দেয়ালে কত জায়গায় কত ফুটোই করছে তার সংখ্যা নেই, কেবলই আলোর পথ নানা দিক দিয়েই খুলে দিচ্ছে।

সত্তার এই বিদ্রোহমন্ত্রের সাধনায় মানুষ যতদূর এগিয়েছে এমন আর-কোনো জীব না। মানুষের মধ্যে যার বিদ্রোহশক্তি যত প্রবল, যত দুর্দমনীয়, ইতিহাসকে ততই সে যুগ হতে যুগান্তরে অধিকার করছে, শুধু সত্তার ব্যাপ্তি দ্বারা নয়, সত্তার ঐশ্বর্য দ্বারা।

এই বিদ্রোহের সাধনা দুঃখের সাধনা; দুঃখই হচ্ছে হাতি, দুঃখই হচ্ছে সমুদ্র। বীর্যের দর্পে এর পিঠে যারা চড়ল তারাই বাঁচল; ভয়ে অভিভূত হয়ে এর তলায় যারা পড়েছে তারা মরেছে। আর, যারা একে এড়িয়ে সস্তায় ফল লাভ করতে চায় তারা নকল ফলের ছদ্মবেশে ফাঁকির বোঝার ভারে মাথা হেঁট করে বেড়ায়। আমাদের ঘরের কাছে সেই জাতের মানুষ অনেক দেখা যায়। বীরত্বের হাঁকডাক করতে তারা শিখেছে, কিন্তু সেটা যথাসম্ভব নিরাপদে করতে চায়। যখন মার আসে তখন নালিশ করে বলে,

বড়ো লাগছে। এরা পৌরুষের পরীক্ষাশালায় বসে বিলিতি বই থেকে তার বুলি চুরি করে, কিন্তু কাগজের পরীক্ষা থেকে যখন হাতের পরীক্ষার সময় আসে তখন প্রতিপক্ষের অনৌদার্য নিয়ে মামলা তুলে বলে, "ওদের স্বভাব ভালো নয়, ওরা বাধা দেয়।"

মানুষকে নারায়ণ সখা বলে তখনই সম্মান করেছেন যখন তাকে দেখিয়েছেন তাঁর উগ্ররূপ, তাকে দিয়ে যখন বলিয়েছেন : দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্— মানুষ যখন প্রাণমন দিয়ে স্তব করতে পেরেছে :

অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ।

তুমিই অনন্তবীর্য, তুমিই অমিতবিক্রম, তুমিই সমস্তকে গ্রহণ করো, তুমিই সমস্ত। ইতি ৩রা শ্রাবণ ১৩৩৪।[১]

৪

কাল সকালেই পৌঁছব সিঙাপুরে। তার পর থেকে আমার ডাঙার পালা। এই-যে চলছে আমার মনে মনে বকুনি, এটাতে খুবই বাধা হবে। অবকাশের অভাব হবে বলে নয়, মন এই কদিন যে-কক্ষে চলছিল সে-কক্ষ থেকে ভ্রষ্ট হবে বলে। কিসের জন্যে। সর্বসাধারণ বলে যে একটি মনুষ্যসমষ্টি আছে তারই আকর্ষণে।

লেখবার সময় তার কোনো আকর্ষণ যে একটুও মনের মধ্যে থাকবে না, তা হতেই পারে না। কিন্তু, তার নিকটের আকর্ষণটা লেখার পক্ষে বড়ো ব্যাঘাত। কাছে যখন সে থাকে তখন সে কেবলই ঠেলা দিয়ে দিয়ে দাবি করতে থাকে। দাবি করে তারই নিজের মনের কথাটাকে। প্রকাণ্ড একটা বাইরের ফরমাশ কলমটাকে ভিতরে ভিতরে টান মারে। বলতে চাই বটে "তোমাকে গ্রাহ্য করি নে", কিন্তু হেঁকে উঠে বলার মধ্যেই গ্রাহ্য করাটা প্রমাণ হয়।

আসল কথা সাহিত্যের শ্রোতৃসভায় আজ সর্বসাধারণই রাজাসনে। এ সত্যটাকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়ে লিখতে বসা অসম্ভব। প্রশ্ন উঠতে পারে উড়িয়ে দেবেই বা কেন। এমন সময় কবে ছিল যখন সাহিত্য সমস্ত মানবসাধারণের জন্যেই ছিল না।

কথাটা একটু ভেবে-দেখবার। কালিদাসের মেঘদূত মানবসাধারণের জন্যেই লেখা, আজ তার প্রমাণ হয়ে গেছে। যদি কোনো বিশিষ্ট দলের জন্যে লেখা হত তা হলে সে দলও থাকত না আর মেঘদূতও যেত তারই সঙ্গে অনুমরণে। কিন্তু, এমন

১ শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখিত।

যাকে পাবলিক বলছি কালিদাসের সময় সেই পাবলিক অত্যন্ত গা-ঘেঁষা হয়ে শ্রোতারূপে ছিল না। যদি থাকত তা হলে যে-মানবসাধারণ শত শত বৎসরের মহাক্ষেত্রে সমাগত তাদের পথ তারা অনেকটা পরিমাণে আটকে দিত।

এখনকার পাবলিক একটা বিশেষ কালের দানাবাঁধা সর্বসাধারণ। তার মধ্যে খুব নিরেট হয়ে তাল-পাকিয়ে আছে এখনকার কালের রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, এখনকার কালের বিশেষ রুচি প্রবৃত্তি এবং আরো কত কী। এই সর্বসাধারণ যে মানবসাধারণের প্রতিরূপ, তা বলা চলবে না। এর ফরমাশ যে একশো বছর পরের ফরমাশের সঙ্গে মিলবে না, সে-কথা জোর করেই বলতে পারি। কিন্তু, এই উপস্থিত-কালের সর্বসাধারণ কানের খুব কাছে এসে জোর গলায় দুয়ো দিচ্ছে, বাহবা দিচ্ছে।

উপস্থিতকালের সংকীর্ণ পরিধির তুলনাতেও এই দুয়ো-বাহবার স্থায়িত্ব অকিঞ্চিৎকর। পাবলিক-মহারাজ আজ দুই চোখ লাল করে যে-কথাটাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, আসছে-কাল সেইটেকেই এমনি চড়া গলায় ব্যবহার করে যেন সেটা তার নিজেরই চিরকালের চিন্তিত কথা। আজ যে-কথা শুনে তার দুই গাল বেয়ে চোখের জল বয়ে গেল, আসছে-কাল সেটাকে নিয়ে হাসাহাসি করবার সময় নিজের গদ্‌গদচিত্তের পূর্ব ইতিহাসটি সম্পূর্ণ বে-কবুল যায়।

ইংরেজ বেনের আপিসঘর-গুদামঘরের আশে-পাশে হঠাৎ যখন কলকাতা শহরটা মাথাঝাড়া দিয়ে উঠল তখন সেখানে এই নতুন-গড়া দোকানপাড়ার এক পাবলিক দেখা দিলে। অন্তত, তার এক ভাগের চেহারা হুতুম পেঁচার নকশায় উঠেছে। তারই ফরমাশের ছাপ পড়েছে দাশুরায়ের পাঁচালিতে। ঘন ঘন অনুপ্রাস তপ্ত-খোলার উপরকার খইয়ের মতো পট্‌পট্‌ শব্দে ফুটে ফুটে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল—

ভাবো শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে,
নিতান্ত কৃতান্ত-ভয়ান্ত হবে ভবে।

চারি দিকে হায়-হায় শব্দে সভা তোলপাড়। দুই কানে হাত-চাপা, তারস্বরে দ্রুত লয়ে গান উঠল—

ওরে রে লক্ষ্মণ, এ কী অলক্ষণ,
বিপদ ঘটেছে বিলক্ষণ।
অতি নগণ্য কাজে, অতি জঘন্য সাজে
ঘোর অরণ্য-মাঝে কত কাঁদিলাম। ইত্যাদি।

দোকানপাড়ার জনসাধারণ খুশি হয়ে নগদ বিদায় করলে। অবকাশের সম্পদকে অবকাশের শিক্ষাযোগে ভোগ করবার শক্তি যার ছিল না সেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির

হাটের পাবলিককে মাথা-গুনতির জোরে মানবসাধারণের প্রতিনিধি বলে মেনে নিতে হবে নাকি। বস্তুত, এই জনসাধারণই দাশুরায়ের প্রতিভাকে বিশ্বসাধারণের মহাসভায় উত্তীর্ণ হতে বাধা দিয়েছিল।

অথচ, মৈমনসিং থেকে যে-সব গাথা সংগ্রহ করা হয়েছে তাতে সহজেই বেজে উঠছে বিশ্বসাহিত্যের সুর। কোনো শহুরে পাবলিকের দ্রুত ফরমাশের ছাঁচে ঢালা সাহিত্য তো সে নয়। মানুষের চিরকালের সুখদুঃখের প্রেরণায় লেখা সেই গাথা। যদি-বা ভিড়ের মধ্যে গাওয়া হয়েও থাকে, তবু এ ভিড় বিশেষ কালের বিশেষ ভিড় নয়। তাই এ সাহিত্য সেই ফসলের মতো যা গ্রামের লোক আপন মাটির বাসনে ভোগ করে থাকে বটে তবুও তা বিশ্বেরই ফসল — তা ধানের মঞ্জরী।

যে-কবিকে আমরা কবি বলে সম্মান করে থাকি তার প্রতি সম্মানের মধ্যে এই সাধুবাদটুকু থাকে যে, তার একলার কথাই আমাদের সকলের কথা। এই জন্যেই কবিকে একলা বলতে দিলেই সে সকলের কথা সহজে বলতে পারে। হাটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সেইদিনকার হাটের লোকের মনের কথা যেমন-তেমন করে মিলিয়ে দিয়ে তাদের সেইদিনকার বহু-মুণ্ডের মাথা-নাড়া-গুনতির জোরে আমরা যেন আপন রচনাকে কৃতার্থ মনে না করি, যেন আমাদের এই কথা মনে করবার সাহস থাকে যে, সাহিত্যের গণনাতত্ত্বে এক অনেক সময়েই হাজারের চেয়ে সংখ্যায় বেশি হয়ে থাকে।

এইবার আমার জাহাজের চিঠি তার অন্তিম পংক্তির দিকে হেলে পড়ল। বিদায় নেবার পূর্বে তোমার কাছে মাপ চাওয়া দরকার মনে করছি। তার কারণ, চিঠি লিখব বলে বসলুম কিন্তু কোনোমতেই চিঠি লেখা হয়ে উঠল না। এর থেকে আশঙ্কা হচ্ছে, আমার চিঠি লেখবার বয়স পেরিয়ে গেছে। প্রতিদিনের স্রোতের থেকে প্রতি দিনের ভেসে-আসা কথা ছেঁকে তোলবার শক্তি এখন আমার নেই। চলতে চলতে চার দিকের পরিচয় দিয়ে যাওয়া এখন আমার দ্বারা আর সহজে হয় না। অথচ, এক সময়ে এ শক্তি আমার ছিল। তখন অনেককে অনেক চিঠিই লিখেছি। সেই চিঠিগুলি ছিল চলতি কালের সিনেমা ছবি। তখন ছিল মনের পটটা বাইরের সমস্ত আলোছায়ার দিকে মেলে দেওয়া। সেই সব ছাপের ধারায় চলত চিঠি। এখন বুঝিবা বাইরের ছবির ফোটোগ্রাফটা বন্ধ হয়ে গিয়ে মনের ধ্বনির ফোনোগ্রাফটাই সজাগ হয়ে উঠেছে। এখন হয়তো দেখি কম, শুনি বেশি।

মানুষ তো কোনো একটা জায়গায় খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে নেই। এই জন্যেই চলচ্চিত্র ছাড়া তার যথার্থ চিত্র হতেই পারে না। প্রবহমান ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে চলমান আপনার পরিচয় মানুষ দিতে থাকে। যারা আপনলোক, নিয়ত তারা সেই পরিচয়টা

পেতে ইচ্ছে করে। বিদেশে নূতন নূতন ধাবমান অবস্থা ও ঘটনার চঞ্চল ভূমিকার উপরে প্রকাশিত আত্মীয়-লোকের ধারাবাহিক পরিচয়ের ইচ্ছা স্বাভাবিক। চিঠি সেই ইচ্ছা পূরণ করবার জন্যেই।

কিন্তু, সকলপ্রকার রচনাই স্বাভাবিক শক্তির অপেক্ষা করে। চিঠি-রচনাও তাই। আমাদের দলের মধ্যে আছেন সুনীতি। আমি তাঁকে নিছক পণ্ডিত বলেই জানতুম। অর্থাৎ, আস্ত জিনিসকে টুকরো করা ও টুকরো জিনিসকে জোড়া দেওয়ার কাজেই তিনি হাত পাকিয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এবার দেখলুম, বিশ্ব বলতে যে-ছবির স্রোতকে বোঝায়, যা ভিড় করে ছোটে এবং এক মুহূর্ত স্থির থাকে না, তাকে তিনি তালভঙ্গ না করে মনের মধ্যে দ্রুত এবং সম্পূর্ণ ধরতে পারেন আর কাগজে-কলমে সেটা দ্রুত এবং সম্পূর্ণ তুলে নিতে পারেন। এই শক্তির মূলে আছে বিশ্বব্যাপারের প্রতি তাঁর মনের সজীব আগ্রহ। তাঁর নিজের কাছে তুচ্ছ বলে কিছুই নেই, তাই তাঁর কলমে তুচ্ছও এমন একটি স্থান পায় যাতে তাকে উপেক্ষা করা যায় না। সাধারণত, এ কথা বলা চলে যে শব্দতত্ত্বের মধ্যে যারা তলিয়ে গেছে শব্দচিত্র তাদের এলেকার সম্পূর্ণ বাইরে, কেননা চিত্রটা একেবারে উপরের তলায়। কিন্তু, সুনীতির মনে সুগভীর তত্ত্ব ভাসমান চিত্রকে ডুবিয়ে মারে নি এই বড়ো অপূর্ব। সুনীতির নীরন্ধ্র চিঠিগুলি তোমরা যথাসময়ে পড়তে পাবে— দেখবে এগুলো একেবারে বাদশাই চিঠি। এতে চিঠির ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম্; বর্ণনাসাম্রাজ্য সর্বগ্রাহী, ছোটো বড়ো কিছুই তার থেকে বাদ পড়ে নি। সুনীতিকে উপাধি দেওয়া উচিত, লিপিবাচস্পতি কিম্বা লিপিসার্বভৌম কিম্বা লিপি-চক্রবর্তী। ইতি ৩রা শ্রাবণ ১৩৩৪। নাগপঞ্চমী।[১]

৫

সামনে সমুদ্রের অর্ধচন্দ্রাকার তটসীমা। অনেক দূর পর্যন্ত জল অগভীর, জলের রঙে মাটির আভাস, সে যেন ধরণীর গেরুয়া আঁচল এলিয়ে পড়েছে। ঢেউ নেই, সমস্ত-দিন জলরাশি এগোয় আর পিছোয় অতি ধীর গমনে। অপ্সরী আসছে চুপি চুপি পিছন থেকে পৃথিবীর চোখ টিপে ধরবে বলে— সোনার রেখায় রেখায় কৌতুকের মুচকে-হাসি।

সামনে বাঁ-দিকে একদল নারকেলগাছ, সুদীর্ঘ গুঁড়ির উপর সিধে হয়ে দাঁড়াতে পারে নি, পরস্পরের দিকে তাদের হেলাহেলি। নিত্যদোলায়িত শাখায় শাখায়

১ শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখিত

সূর্যের আলো ওরা ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে, চঞ্চল ছেলেরা যেমন নদীর ঘাটে জল-ছোঁড়াছুঁড়ি করে। সকালের আকাশে ওদের এই অবগাহনস্নান।

এটা একজন চিনীয় ধনীর বাড়ি। আমরা তাঁর অতিথি। প্রশস্ত বারান্দায় বেতের কেদারায় বসে আছি। সমুদ্রের দিক থেকে বুক ভরে বইছে পশ্চিমে হাওয়া। চেয়ে দেখছি, আকাশের কোণে কোণে দলভাঙা মেঘগুলি শ্রাবণের কালো উর্দি ছেড়ে ফেলেছে, এখন কিছুদিনের জন্যে সূর্যের আলোর সঙ্গে ওদের সন্ধি। আমার অস্পষ্ট ভাবনাগুলোর উপর ঝরে পড়ছে কম্পমান নারকেলপাতার ঝরঝর শব্দের বৃষ্টি, বালির উপর দিয়ে ভাঁটার সমুদ্রের পিছু-হটার শব্দ ওরই সঙ্গে একই মৃদুস্বরে মেলানো। ওদিকে পাশের ঘরে ধীরেন এসরাজ নিয়ে আপন মনে বাজিয়ে চলেছে— ভৈরোঁ থেকে রাম-কেলি, রামকেলি থেকে ভৈরবী; আস্তে আস্তে অকেজো মেঘের মতো খেয়ালের হাওয়ায় বদল হচ্ছে রাগিণীর আকৃতি।

আজ সকালে মনটা যেন ভাঁটার সমুদ্র, তীরের দিক টানছে তাকে কোন্ দিকে তার ঠিকানা নেই। আপনাকে আপন সর্বাঙ্গে সর্বান্তঃকরণে ভরপুর মেলে দিয়ে বসে আছি, নিবিড় তরুপল্লবের শ্যামলতায় আবিষ্ট রোদ-পোয়ানো ওই ছোটো দ্বীপটির মতো।

আমার মধ্যে এই ঘনীভূত অনুভবটিকে বলা যেতে পারে হওয়ার আনন্দ। রূপে রঙে আলোয় ধ্বনিতে আকাশে অবকাশে ভরে-ওঠা একটি মূর্তিমান সমগ্রতা আমার চিত্তের উপরে ঘা দিয়ে বলছে "আছি"; তারই জগতে আমার চৈতন্য উছলে উঠছে; সমুদ্রকল্লোলেরই মতো একতান শব্দ জাগছে, ওম্, অর্থাৎ এই-যে আমি। বিরাট একটা "না", হাঁ-করা তার মুখগহ্বর, প্রকাণ্ড তার শূন্য— তারই সামনে ওই নারকেল-গাছ দাঁড়িয়ে, পাতা নেড়ে নেড়ে বলছে, এই-যে আমি। দুঃসাহসিক সত্তার এই স্পর্ধা গভীর বিস্ময়ে বাজছে আমার মনে, আর ধীরেন ওই-যে ভৈরবীতে মীড় লাগিয়েছে সেও যেন বিশ্বসত্তার আত্মঘোষণা, আপন কম্পমান সুরের ধ্বজাটিকে অসীম শূন্যের মাঝখানে তুলে ধরেছে।

এই তো হল "হওয়া"। এইখানেই শেষ নেই। এর সঙ্গে আছে করা। সমুদ্র আছে অন্তরে অন্তরে নিস্তব্ধ, কিন্তু তার উপরে উপরে উঠছে ঢেউ, চলছে জোয়ার ভাঁটা। জীবনে করার বিরাম নেই। এই করার দিকে কত প্রয়াস, কত উপকরণ, কত আবর্জনা। এরা সব জমে জমে কেবলই গণ্ডী হয়ে ওঠে, দেয়াল হয়ে দাঁড়ায়। এরা বাহিরে সমগ্রতার ক্ষেত্রকে, অন্তরে পরিপূর্ণতার উপলব্ধিকে, টুকরো টুকরো করতে থাকে। অহমিকার উত্তেজনায় কর্ম উদ্ধত হয়ে, একান্ত হয়ে, আপনাকে সকলের আগে ঠেলে তোলে; হওয়ার চেয়ে করা বড়ো হয়ে উঠতে চায়। এতে ক্লান্তি, এতে অশান্তি,

এতে মিথ্যা। বিশ্বকর্মার বাঁশিতে নিয়তই যে ছুটির সুর বাজে এই কারণেই সেটা শুনতে পাই নে; সেই ছুটির সুরেই বিশ্বকাজের ছন্দ বাঁধা।

সেই সুরটি আজ সকালের আলোতে ওই নারকেলগাছের তানপুরায় বাজছে। ওখানে দেখতে পাচ্ছি, শক্তির রূপ আর মুক্তির রূপ অনবচ্ছিন্ন এক। এতেই শান্তি, এতেই সৌন্দর্য। জীবনের মধ্যে এই মিলনটিই তো খুঁজি— করার চিরবহমান নদীধারায় আর হওয়ার চিরগম্ভীর মহাসমুদ্রে মিলন। এই আত্মপরিতৃপ্ত মিলনটিকে লক্ষ্য করেই গীতা বলেছেন, "কর্ম করো, ফল চেয়ো না।" এই চাওয়ার রাহুটাই কর্মের পাত্র থেকে তার অমৃত ঢেলে নেবার জন্যে লালায়িত। ভিতরকার সহজ হওয়াটি সার্থক হয় বাইরেকার সহজ কর্মে। অন্তরের সেই সার্থকতার চেয়ে বাইরের স্বার্থ প্রবল হয়ে উঠলেই কর্ম হয় বন্ধন; সেই বন্ধনেই জড়িত যত হিংসা দ্বেষ ঈর্ষা, নিজেকে ও অন্যকে প্রবঞ্চনা। এই কর্মের দুঃখ, কর্মের অগৌরব, যখন অসহ্য হয়ে ওঠে তখন মানুষ বলে বসে "দূর হোক গে, কর্ম ছেড়ে দিয়ে চলে যাই।" তখন আবার আহ্বান আসে, কর্ম ছেড়ে দিয়ে কর্ম থকে নিষ্কৃতি নেই; করাতেই হওয়ার আত্মপ্রকাশ। বাহ্য ফলের দ্বারা নয়, আপন অন্তর্নিহিত সত্যের দ্বারাই কর্ম সার্থক হোক, তাতেই হোক মুক্তি।

ফল-চাওয়া কর্মের নাম চাকরি, সেই চাকরির মনিব আমি নিজেই হই বা অন্যেই হোক। চাকরিতে মাইনের জন্যেই কাজ, কাজের জন্যে কাজ নয়। কাজ তার নিজের ভিতর থেকে নিজে যখন কিছুই রস জোগায় না, সম্পূর্ণ বাইরে থেকেই যখন আপন দাম নেয়, তখনই মানুষকে সে অপমান করে। মর্তলোকে প্রয়োজন বলে জিনিসটাকে একেবারেই অস্বীকার করতে পারি নে। বেঁচে থাকবার জন্যে আহার করতেই হবে। বলতে পারব না, "নেই বা করলেম।" সেই আবশ্যকের তাড়াতেই পরের দ্বারে মানুষ উমেদারি করে, আর সেই সঙ্গেই তত্ত্বজ্ঞানী ভাবতে থাকে কী করলে এই কর্মের জড় মারা যায়। বিদ্রোহী মানুষ বলে বসে, বৈরাগ্যমেবাভয়ম্। অর্থাৎ, এতই কম খাব, কম পরব, রৌদ্রবৃষ্টি এমন করে সহ্য করতে শিখব, দাসত্বে প্রবৃত্ত করবার জন্যে প্রকৃতি আমাদের জন্যে যতরকম কানমলার ব্যবস্থা করেছে সেগুলোকে এতটা এড়িয়ে চলব যে, কর্মের দায় অত্যন্ত হালকা হয়ে যাবে। কিন্তু, প্রকৃতির কাজে শুধু কানমলার তাড়া নেই, সেই সঙ্গে রসের জোগান আছে। এক দিকে ক্ষুধায় দেয় দুঃখ, আর-এক দিকে রসনায় দেয় সুখ— প্রকৃতি একই সঙ্গে ভয় দেখিয়ে আর লোভ দেখিয়ে আমাদের কাজ করায়। সেই লোভের দিক থেকে আমাদের মনে জন্মায় ভোগের ইচ্ছা। বিদ্রোহী মানুষ বলে, ওই ভোগের ইচ্ছাটা প্রকৃতির চাতুরী, ওইটেই মোহ, ওটাকে তাড়াও, বলো, বৈরাগ্যমেবাভয়ম্— মানব না দুঃখ, চাইব না সুখ।

দু-চারজন মানুষ এমনতরো স্পর্ধা করে ঘরবাড়ি ছেড়ে বনে জঙ্গলে ফলমূল খেয়ে কাটাতে পারে, কিন্তু সব মানুষই যদি এই পন্থা নেয় তা হলে বৈরাগ্য নিয়েই পরস্পর লড়াই বেধে যাবে— তখন বল্কলে কুলোবে না, গিরিগহ্বরে ঠেলাঠেলি ভিড় হবে, ফলমূল যাবে উজাড় হয়ে। তখন কপ্‌নিপরা ফৌজ মেশিন-গান বের করবে।

সাধারণ মানুষের সমস্যা এই যে, কর্ম করতেই হবে। জীবনধারণের গোড়াতেই প্রয়োজনের তাড়া আছেই। তবুও কী করলে কর্ম থেকে প্রয়োজনের চাপ যথাসম্ভব হালকা করা যেতে পারে। অর্থাৎ, কী করলে কর্মে পরের দাসত্বের চেয়ে নিজের কর্তৃত্বটা বড়ো হয়ে দেখা দেয়। কর্ম থেকে কর্তৃত্বকে যতই দূরে পাঠানো যাবে কর্ম ততই মজুরির বোঝা হয়ে মানুষকে চেপে মারবে; এই শূদ্রত্ব থেকে মানুষকে উদ্ধার করা চাই।

একটা কথা মনে পড়ে গেল। সেদিন যখন শিলঙে ছিলেম, নন্দলাল কার্সিয়ঙ থেকে পোস্টকার্ডে একটি ছবি পাঠিয়েছিলেন। স্যাকরা চার দিকে ছেলেমেয়েদের নিয়ে চোখে চশমা এঁটে গয়না গড়ছে। ছবির মধ্যে এই কথাটি পরিস্ফুট যে, এই স্যাকরার কাজের বাইরের দিকে আছে তার দর, ভিতরের দিকে আছে তার আদর। এই কাজের দ্বারা স্যাকরা নিছক নিজের অভাব প্রকাশ করছে না, নিজের ভাবকে প্রকাশ করছে; আপন দক্ষতার গুণে আপন মনের ধ্যানকে মূর্তি দিচ্ছে। মুখ্যত এ-কাজটি তার আপনারই, গৌণত যে-মানুষ পয়সা দিয়ে কিনে নেবে তার। এতে করে ফলকামনাটা হয়ে গেল লঘু, মূল্যের সঙ্গে অমূল্যতার সামঞ্জস্য হল, কর্মের শূদ্রত্ব গেল ঘুচে। এককালের বণিককে সমাজ অবজ্ঞা করত, কেননা, বণিক কেবল বিক্রি করে, দান করে না। কিন্তু, এই স্যাকরা এই যে গয়নাটি গড়লে তার মধ্যে তার দান এবং বিক্রি একই কালে মিলে গেছে। সে ভিতর থেকে দিয়েছে, বাইরে থেকে জোগায় নি।

ভৃত্যকে রেখেছি তাকে দিয়ে ঘরের কাজ করাতে। মনিবের সঙ্গে তার মনুষ্যত্বের বিচ্ছেদ একান্ত হলে সেটা হয় ষোলো-আনা দাসত্ব। যে-সমাজ লোভে বা দাম্ভিকতায় মানুষের প্রতি দরদ হারায় নি সে-সমাজ ভৃত্য আর আত্মীয়ের সীমারেখাটাকে যতদূর সম্ভব ফিকে করে দেয়। ভৃত্য সেখানে দাদা খুড়ো জেঠার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছয়। তখন তার কাজটা পরের কাজ না হয়ে আপনারই কাজ হয়ে ওঠে। তখন তার কাজের ফলকামনাটা যায় যথাসম্ভব ঘুচে। সে দাম পায় বটে, তবুও আপনার কাজ সে দান করে, বিক্রি করে না।

গুজরাটে কাঠিয়াবাড়ে দেখেছি, গোয়ালা গোরুকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসে।

সেখানে তার দুধের ব্যবসায়ে ফলকামনাকে তুচ্ছ করে দিয়েছে তার ভালোবাসায়; কর্ম করেও কর্ম থেকে তার নিত্য মুক্তি। এ গোয়ালা শূদ্র নয়। যে-গোয়ালা দুধের দিকে দৃষ্টি রেখেই গোরু পোষে, কসাইকে গোরু বেচতে যার বাধে না, সেই হল শূদ্র; কর্মে তার অগৌরব, কর্ম তার বন্ধন। যে-কর্মের অন্তরে মুক্তি নেই, যেহেতু তাতে কেবল লোভ, তাতে প্রেমের অভাব, সেই কর্মেই শূদ্রত্ব। জাত-শূদ্রেরা পৃথিবীতে অনেক উঁচু উঁচু আসন অধিকার করে বসে আছে। তারা কেউ-বা শিক্ষক, কেউ-বা বিচারক, কেউ-বা শাসনকর্তা, কেউ-বা ধর্মযাজক। কত ঝি, দাই, চাকর, মালী, কুমোর, চাষি আছে যারা ওদের মতো শূদ্র নয়— আজকের এই রৌদ্রে-উজ্জ্বল সমুদ্রতীরের নারকেল-গাছের মর্মরে তাদের জীবনসংগীতের মূল সুরটি বাজছে।

মলাক্কা

২৮শে জুলাই ১৯২৭

৬

কল্যাণীয়াসু

এখনই দুশো মাইল দূরে এক জায়গায় যেতে হবে। সকলেই সাজসজ্জা করে জিনিসপত্র বেঁধে প্রস্তুত; কেবল আমিই তৈরি হয়ে নিতে পারি নি। এখনই রেল-গাড়ির উদ্দেশে মোটরগাড়িতে চড়তে হবে। দ্বারের কাছে মোটরগাড়ি উদ্যত তারস্বরে মাঝে মাঝে শৃঙ্গধ্বনি করছে— আমাদের সঙ্গীদের কণ্ঠে তেমন জোর নেই, কিন্তু তাদের উৎকণ্ঠা কম প্রবল নয়। অতএব, এইখানেই উঠতে হল। দিনটি চমৎকার। নারকেলগাছের পাতা ঝিল্‌মিল্‌ করছে, ঝর্‌ঝর্‌ করছে, দুলে দুলে উঠছে, সামনেই সমুদ্র স্বগত-উক্তিতে অবিশ্রাম কলধ্বনিমুখরিত।

মলাক্কা

৩০শে জুলাই ১৯২৭[১]

৭

কল্যাণীয়াসু

রানী, এসেছি গিয়ানয়ার রাজবাড়িতে। মধ্যাহ্নভোজনের পূর্বে সুনীতি রাজবাড়ির ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের নিয়ে খুব আসর জমিয়ে তুলেছিলেন। খেতে বসে রাজা আমাকে বললেন একটু সংস্কৃত আওড়াতে। দু-চার রকমের শ্লোক আওড়ানো গেল। সুনীতি

১ শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখিত।

একটি শ্লোকের পরিচয় দিতে গিয়ে যেমনি বললেন "শার্দূলবিক্রীড়িত" অমনি রাজা সেটা উচ্চারণ করে জানালেন, তিনিও জানেন। এখানকার রাজার মুখে অত বড়ো একটা কড়া সংস্কৃত শব্দ শুনে আমি তো আশ্চর্য। তার পরে রাজা বলে গেলেন, শিখরিণী, স্রগ্ধরা, মালিনী, বসন্ততিলক, আরো কতকগুলো নাম যা আমাদের অলংকারশাস্ত্রে কখনো পাই নি। বললেন, তাঁদের ভাষায় এ-সব ছন্দ প্রচলিত। অথচ, মন্দাক্রান্তা বা অনুষ্টুভ এঁরা জানেন না। এখানে ভারতীয় বিদ্যার এই-সব ভাঙাচোরা মূর্তি দেখে মনে হয় যেন ভূমিকম্প হয়ে একটা প্রাচীন মহানগরী ধ্বসে গিয়েছে, মাটির নীচে বসে গিয়েছে— সেই-সব জায়গায় উঠেছে পরবর্তী কালের ঘরবাড়ি চাষ-আবাদ; আবার অনেক জায়গায় সেই পুরোনো কীর্তির অবশেষ উপরে জেগে, এই দুইয়ে মিলে জোড়া-তাড়া দিয়ে এখানকার লোকালয়।

সেকালের ভারতবর্ষের যা-কিছু বাকি আছে তার থেকে ভারতের তখনকার কালের বিবরণ অনেকটা আন্দাজ করা যায়। এখানে হিন্দুধর্ম প্রধানতই শৈব। দুর্গা আছেন কিন্তু কপালমালিনী লোলরসনা উলঙ্গিনী কালী নেই। কোনো দেবতার কাছে পশুবলি এরা জানে না। কিছুকাল আগে অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ উপলক্ষে পশুবধ হত, কিন্তু দেবীর কাছে জীবরক্ত নৈবেদ্য দেওয়া হত না। এর থেকে বোঝা যায়, তখনকার ভারতবর্ষে ব্যাধ-শবরদের উপাস্য দেবতা উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুমন্দিরে প্রবেশ করে রক্তাভিষিক্ত দেবপূজা প্রচার করেন নি।

তার পরে রামায়ণ-মহাভারতের যে-সকল পাঠ এ দেশে প্রচলিত আমাদের দেশের সঙ্গে তার অনেক প্রভেদ। যে যে স্থানে এদের পাঠান্তর তার সমস্তই যে অশুদ্ধ, এমন কথা জোর করে বলা যায় না। এখানকার রামায়ণে রাম সীতা ভাই-বোন; সেই ভাই-বোনে বিবাহ হয়েছিল। একজন ওলন্দাজ পণ্ডিতের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল; তিনি বললেন, তাঁর মতে এই কাহিনীটাই প্রাচীন, পরবর্তীকাল এই কথাটাকে চাপা দিয়েছে।

এই মতটাকে যদি সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় তা হলে রামায়ণ-মহাভারতের মধ্যে মস্ত কয়েকটি মিল দেখতে পাই। দুটি কাহিনীরই মূলে দুটি বিবাহ। দুটি বিবাহই আর্যরীতি অনুসারে অসংগত। ভাই-বোনে বিবাহ বৌদ্ধ ইতিহাসে কোনো কোনো জায়গায় শোনা যায়, কিন্তু সেটা আমাদের সম্পূর্ণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ। অন্য দিকে এক স্ত্রীকে পাঁচ ভাইয়ে মিলে বিবাহও তেমনি অদ্ভুত ও অশাস্ত্রীয়। দ্বিতীয় মিল হচ্ছে দুই বিবাহেরই গোড়ায় অস্ত্রপরীক্ষা, অথচ সেই পরীক্ষা বিবাহযোগ্যতা প্রসঙ্গে নিরর্থক। তৃতীয় মিল হচ্ছে, দুটি কন্যাই মানবীগর্ভজাত নয়; সীতা পৃথিবীর কন্যা, হলরেখার

মুখে কুড়িয়ে-পাওয়া ; কৃষ্ণা যজ্ঞসম্ভবা। চতুর্থ মিল হচ্ছে, উভয়ত্রই প্রধান নায়কদের রাজ্যচ্যুতি ও স্ত্রীকে নিয়ে বনগমন। পঞ্চম মিল হচ্ছে, দুই কাহিনীতেই শত্রুর হাতে স্ত্রীর অবমাননা ও সেই অবমাননার প্রতিশোধ।

সেই জন্যে আমি পূর্বেই অন্যত্র এই মত প্রকাশ করেছি যে, দুটি বিবাহই রূপক-মূলক। রামায়ণের রূপকটি খুবই স্পষ্ট। কৃষির হলবিদারণরেখাকে যদি কোনো রূপ দিতেই হয় তবে তাকে পৃথিবীর কন্যা বলা যেতে পারে। শস্যকে যদি নবদূর্বাদলশ্যাম রাম বলে কল্পনা করা যায় তবে সেই শস্যও তো পৃথিবীর পুত্র। এই রূপক অনুসারে উভয়ে ভাইবোন, আর পরস্পর পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ।

হরধনুভঙ্গের মধ্যেই রামায়ণের মূল অর্থ। বস্তুত সমস্তটাই হরধনুভঙ্গের ব্যাপার—সীতাকে গ্রহণ রক্ষণ ও উদ্ধারের জন্যে। আর্যাবর্তের পূর্ব অংশ থেকে ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত কৃষিকে বহন করে ক্ষত্রিয়দের যে-অভিযান হয়েছিল সে সহজ হয় নি ; তার পিছনে ঘরে-বাইরে মস্ত একটা দ্বন্দ্ব ছিল। সেই ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের ইতিহাস রামায়ণের মধ্যে নিহিত, অরণ্যের সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রের দ্বন্দ্ব।

মহাভারতে খাণ্ডববন-দাহনের মধ্যেও এই ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের আভাস পাই। সেও বনের গাছপালা পোড়ানো নয়, সেদিন বন যে প্রতিকূল মানবশক্তির আশ্রয় ছিল তাকে ধ্বংস করা। এর বিরুদ্ধে কেবল-যে অনার্য তা নয়, ইন্দ্র যাঁদের দেবতা তাঁরাও ছিলেন। ইন্দ্র বৃষ্টিবর্ষণে খাণ্ডবের আগুন নেবাবার চেষ্টা করেছিলেন।

মহাভারতেরও অর্থ পাওয়া যায় লক্ষ্যবেধের মধ্যে। এই শূন্যস্থিত লক্ষ্যবেধের মধ্যে এমন একটি সাধনার সংকেত আছে যে, একাগ্রসাধনার দ্বারা কৃষ্ণাকে পাওয়া যায় ; আর এই যজ্ঞসম্ভবা কৃষ্ণা এমন একটি তত্ত্ব যাকে নিয়ে একদিন ভারতবর্ষে বিষম দ্বন্দ্ব বেধে গিয়েছিল। একে একদল স্বীকার করেছিল, একদল স্বীকার করে নি। কৃষ্ণাকে পঞ্চ পাণ্ডব গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু কৌরবেরা তাঁকে অপমান করতে ত্রুটি করেন নি। এই যুদ্ধে কুরুসেনাপতি ছিলেন ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য, আর পাণ্ডববীর অর্জুনের সারথি ছিলেন কৃষ্ণ। রামের অস্ত্রদীক্ষা যেমন বিশ্বামিত্রের কাছ থেকে, অর্জুনের যুদ্ধদীক্ষা তেমনি কৃষ্ণের কাছ থেকে। বিশ্বামিত্র স্বয়ং লড়াই করেন নি, কিন্তু লড়াইয়ের প্রেরণা তাঁর কাছ থেকে ; কৃষ্ণও স্বয়ং লড়াই করেন নি কিন্তু কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রবর্তন করেছিলেন তিনি ; ভগবদ্গীতাতেই এই যুদ্ধের সত্য, এই যুদ্ধের ধর্ম, ঘোষিত হয়েছে— সেই ধর্মের সঙ্গে কৃষ্ণ একাত্মক, যে-কৃষ্ণ কৃষ্ণার সখা, অপমানকালে কৃষ্ণা যাঁকে স্মরণ করেছিলেন বলে তাঁর লজ্জা রক্ষা হয়েছিল, যে-কৃষ্ণের সম্মাননার জন্যেই পাণ্ডবদের রাজসূয়যজ্ঞ। রাম দীর্ঘকাল সীতাকে নিয়ে যে-বনে ভ্রমণ করেছিলেন সে ছিল অনার্যদের বন, আর

কৃষ্ণাকে নিয়ে পাণ্ডবেরা ফিরেছিলেন যে-বনে সে হচ্ছে ব্রাহ্মণ ঋষিদের বন। পাণ্ডবদের সাহচর্যে এই বনে কৃষ্ণার প্রবেশ ঘটেছিল। সেখানে কৃষ্ণা তাঁর অক্ষয় অন্নপাত্র থেকে অতিথিদের অন্নদান করেছিলেন। ভারতবর্ষে একটা দ্বন্দ্ব ছিল অরণ্যের সঙ্গে কৃষি-ক্ষেত্রের, আর-একটা দ্বন্দ্ব বেদের ধর্মের সঙ্গে কৃষ্ণের ধর্মের। লঙ্কা ছিল অনার্যশক্তির পুরী, সেইখানে আর্যের হল জয়; কুরুক্ষেত্র ছিল কৃষ্ণবিরোধী কৌরবের ক্ষেত্র, সেইখানে কৃষ্ণভক্ত পাণ্ডব জয়ী হলেন। সব ইতিহাসেই বাইরের দিকে অন্ন নিয়ে যুদ্ধ, আর ভিতরের দিকে তত্ত্ব নিয়ে যুদ্ধ। প্রজা বেড়ে যায়, তখন খাদ্য নিয়ে স্থান নিয়ে টানাটানি পড়ে, তখন নব নব ক্ষেত্রে কৃষিকে প্রসারিত করতে হয়। চিত্তের প্রসার বেড়ে যায়, তখন যারা সংকীর্ণ প্রথাকে আঁকড়ে থাকে তাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাধে যারা সত্যকে প্রশস্ত ও গভীর ভাবে গ্রহণ করতে চায়। এক সময়ে ভারতবর্ষে দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ প্রবল হয়েছিল; এক পক্ষ বেদমন্ত্রকেই ব্রহ্ম বলতেন, অন্য পক্ষ ব্রহ্মকে পরমাত্মা বলে জেনেছিলেন। বুদ্ধদেব যখন তাঁর ধর্মপ্রচার শুরু করেন তার পূর্বেই ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়ে মতের দ্বন্দ্ব তাঁর পথ অনেকটা পরিষ্কার করে দিয়েছে।

রামায়ণ-মহাভারতের মধ্যে ভারতবর্ষের যে মূল ইতিহাস নানা কাহিনীতে বিজড়িত, তাকে স্পষ্টতর করে দেখতে পাব যখন এখানকার পাঠগুলি মিলিয়ে দেখবার সুযোগ হবে। কথায় কথায় এখানকার একজনের কাছে শোনা গেল যে, দ্রোণাচার্য ভীমকে কৌশলে বধ করবার জন্যে কোনো-এক অসাধ্য কর্মে পাঠিয়েছিলেন। দ্রুপদ-বিদ্বেষী দ্রোণ যে পাণ্ডবদের অনুকূল ছিলেন না, তার হয়তো প্রমাণ এখানকার মহাভারতে আছে।

রামায়ণের কাহিনী সম্বন্ধে আর-একটি কথা আমার মনে আসছে, সেটা এখানে বলে রাখি। কৃষির ক্ষেত্র দুরকম করে নষ্ট হতে পারে— এক বাইরের দৌরাত্ম্যে, আর-এক নিজের অযত্নে। যখন রাবণ সীতাকে কেড়ে নিয়ে গেল তখন রামের সঙ্গে সীতার আবার মিলন হতে পেরেছিল। কিন্তু, যখন অযত্নে অনাদরে রামসীতার বিচ্ছেদ ঘটল তখন পৃথিবীর কন্যা সীতা পৃথিবীতেই মিলিয়ে গেলেন। অযত্নে নির্বাসিতা সীতার গর্ভে যে-যমজ সন্তান জন্মেছিল তাদের নাম লব কুশ। লবের মূল ধাতুগত অর্থ ছেদন, কুশের অর্থ জানাই আছে। কুশ ঘাস একবার জন্মালে ফসলের খেতকে-যে কিরকম নষ্ট করে সেও জানা কথা। আমি যে-মানেটা আন্দাজ করছি সেটা যদি একেবারেই অগ্রাহ্য না হয় তা হলে লবের সঙ্গে কুশের একত্র জন্মানোর ঠিক তাৎপর্য কী হতে পারে, এ কথা আমি পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করি।

অন্যদের চিঠি থেকে খবর পেয়ে থাকবে যে, এখানে আমরা প্রকাণ্ড একটা অন্ত্যেষ্টিসংকারের অনুষ্ঠান দেখতে এসেছি। মোটের উপরে এটা কতকটা চীনেদের

মতো— তারাও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় এইরকম ধুমধাম সাজসজ্জা বাজনাবাদ্য করে থাকে। কেবল মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতির ভঙ্গিটা হিন্দুদের মতো। দাহক্রিয়াটা এরা হিন্দুদের কাছ থেকে নিয়েছে। কিন্তু, কেমন মনে হয়, ওটা যেন অন্তরের সঙ্গে নেয় নি। হিন্দুরা আত্মাকে দেহের অতীত করে দেখতে চায়, তাই মৃত্যুর পরেই পুড়িয়ে ফেলে দেহের মমতা থেকে একেবারে মুক্তি পাবার চেষ্টা করে। এখানে মৃতদেহকে অনেক সময়েই বহু বৎসর ধরে রেখে দেয়। এই রেখে দেবার ইচ্ছেটা কবর দেবার ইচ্ছেরই সামিল। এদের রীতির মধ্যে এরা দেহটাকে রেখে দেওয়া আর দেহটাকে পোড়ানো, এই দুই উলটো প্রথার মধ্যে যেন রফানিষ্পত্তি করে নিয়েছে। মানুষের মনঃপ্রকৃতির বিভিন্নতা স্বীকার করে নিয়ে হিন্দুধর্ম রফানিষ্পত্তিসূত্রে কত বিপরীত রকম রাজিনামা লিখে দিয়েছে তার ঠিকানা নেই। ভেদ নষ্ট করে ফেলে হিন্দুধর্ম ঐক্যস্থাপনের চেষ্টা করে নি, ভেদ রক্ষা করেও সে একটা ঐক্য আনতে চেয়েছে।

কিন্তু, এমন ঐক্য সহজ নয় বলেই এর মধ্যে দৃঢ় ঐক্যের শক্তি থাকে না। বিভিন্ন বহুকে এক বলে স্বীকার করেও তার মাঝে মাঝে অলঙ্ঘনীয় দেয়াল তুলে দিতে হয়। একে অবিচ্ছিন্ন এক বলা যায় না, একে বলতে হয় বিভক্ত এক। ঐক্য এতে ভারগ্রস্ত হয়, ঐক্য এতে শক্তিমান হয় না। আমাদের দেশের স্বধর্মানুরাগী অনেকেই বালিদ্বীপের অধিবাসীদের আপন বলে স্বীকার করে নিতে উৎসুক হবেন, কিন্তু সেই মুহূর্তেই নিজের সমাজ থেকে ওদের দূরে ঠেকিয়ে রাখবেন। এইখানে প্রতিযোগিতায় মুসলমানের সঙ্গে আমাদের হারতেই হয়। মুসমলমানে মুসলমানে এক মুহূর্তেই সম্পূর্ণ জোড় লেগে যায়, হিন্দুতে হিন্দুতে তা লাগে না। এই জন্যেই হিন্দুর ঐক্য আপন বিপুল অংশ-প্রত্যংশ নিয়ে কেবলই নড়্‌নড়্‌ করছে। মুসলমান যেখানে আসে সেখানে সে-যে-কেবল মাত্র আপন বল দেখিয়ে বা যুক্তি দেখিয়ে বা চরিত্র দেখিয়ে সেখানকার লোককে আপন সম্প্রদায়ভুক্ত করে তা নয়, সে আপন সন্ততিবিস্তার দ্বারা সজীব ও ধারাবাহিক ভাবে আপন ধর্মের বিস্তার করে। স্বজাতির, এমন-কি, পরজাতির লোকের সঙ্গে বিবাহে তার কোনো বাধা নেই। এই অবাধ বিবাহের দ্বারা সে আপন সামাজিক অধিকার সর্বত্র প্রসারিত করতে পারে। কেবলমাত্র রক্তপাতের রাস্তা দিয়ে নয়, রক্তমিশ্রণের রাস্তা দিয়ে সে দূরে দূরান্তরে প্রবেশ করতে পেরেছে। হিন্দু যদি তা পারত তা হলে বালিদ্বীপে হিন্দুধর্ম স্থায়ী বিশুদ্ধ ও পরিব্যাপ্ত হতে দেরি হত না।

গিয়ানয়ার

১ আগস্ট ১৯২৭[১]

১ শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত।

৮

গোলমাল ঘোরাফেরা দেখাশোনা বলাকওয়া নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণের ফাঁকে ফাঁকে যখন-তখন দু-চার লাইন করে লিখি, ভাবের স্রোত আটকে আটকে যায়, তার সহজ গতিটা থাকে না। একে চিঠি বলা চলে না। কেননা, এর ভিতরে ভিতরে কর্তব্য-পরায়ণতার ঠেলা চলছে— সেটাতে কাজকে এগিয়ে দেয়, ভাবকে হয়রান করে। পাখি-ওড়ায় আর ঘুড়ি-ওড়ায় তফাত আছে। আমি ওড়াচ্ছি চিঠির ছলে লেখার ঘুড়ি, কর্তব্যের লাঠাইয়ে বাঁধা, কেবলই হেঁচকে হেঁচকে ওড়াতে হয়।

ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। দিনের মধ্যে দু-তিনরকমের প্রোগ্রাম। নতুন নতুন জায়গায় বক্তৃতা নিমন্ত্রণ ইত্যাদি। গীতার উপদেশ যদি মানতুম, ফললাভের প্রত্যাশা যদি না থাকত, তা হলে পাল-তোলা নৌকার মতো জীবনতরণী তীর থেকে তীরান্তরে নেচে নেচে যেতে পারত। চলেছি উজান বেয়ে, গুন টেনে, লগি ঠেলে, দাঁড় বেয়ে; পদে পদে জিব বেরিয়ে পড়ছে। আমৃত্যুকাল কোনোদিন কোথাও-যে সহজে ভ্রমণ করতে পারব সে আশা বিড়ম্বনা। পথ সুদীর্ঘ, পাথেয় স্বল্প; অর্জন করতে করতে গর্জন করতে করতে, হোটেলে হোটেলে ডলার বর্জন করতে করতে, আমার ভ্রমণ— গলা চালিয়ে আমার পা চালানো। পথে বিপথে যেখানে-সেখানে আচমকা আমাকে বক্তৃতা করতে বলে, আমিও উঠে দাঁড়িয়ে বকে যাই— আমেরিকায় মুড়ি তৈরি করবার কলের মুখ থেকে যেমন মুড়ি বেরোতে থাকে সেইরকম। হাসিও পায় দুঃখও ধরে। পৃথিবীর পনেরো-আনা লোক কবিকে নিয়ে সর্বসমক্ষে এইরকম অপদস্থ করতেই ভালোবাসে; বলে, "মেসেজ দাও।" মেসেজ বলতে কী বুঝায় সেটা ভেবে দেখো। সর্বসাধারণ-নামক নির্বিশেষ পদার্থের উদাসীন কানের কাছে অত্যন্ত নির্বিশেষ ভাবের উপদেশ দেওয়া, যা কোনো বাস্তব মানুষের কোনো বাস্তব কাজেই লাগে না। পরলোকগত বহুসংখ্যক পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে পাইকেরি প্রথায় পিণ্ডি দেওয়ার মতো— যেহেতু সে-পিণ্ড কেউ খায় না সেই জন্যে তাতে না আছে স্বাদ, না আছে শোভা। যেহেতু সেটা রসনাহীন ও ক্ষুধাহীন নামমাত্রের জন্য উৎসর্গ-করা সেই জন্যে সেটাকে যথার্থ খাদ্য করে তোলার জন্যে কারো গরজ নেই। মেসেজ-রচনা সেইরকম রচনা।

আজ বিকেলের গাড়িতে পিনাঙ যেতে হবে। তার আগে, যদি সুসাধ্য হয় তবে নাওয়া আছে, খাওয়া আছে; যদি দুঃসাধ্য হয় তবু একটা মিটিঙে গিয়ে বক্তৃতা আছে; ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই, শান্তি নেই, অবকাশ নেই— তার পরে সুদীর্ঘ রেলযাত্রা, তার পরে

স্টেশনে মাল্যগ্রহণ, অ্যাড্রেস-শ্রবণ, তদুত্তরে বিনতিপ্রকাশ, তার পরে নতুন বাসায় নতুন জনতার মধ্যে জীবনযাত্রার নতুন ব্যবস্থা, তার পরে ষোলোই তারিখে জাহাজে চড়ে জাভায় যাত্রা ; তার পরে নতুন অধ্যায়। ইতি

১৩ আগস্ট ১৯২৭

টাইপিঙ

৯

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, মালয় উপদ্বীপের বিবরণ আমাদের দলের লোকের চিঠিপত্র থেকে নিশ্চয় পেয়েছ। ভালো করে দেখবার মতো, ভাববার মতো, লেখার মতো সময় পাই নি। কেবল ঘুরেছি আর বকেছি। পিনাঙ থেকে জাহাজে চড়ে প্রথমে জাভার রাজধানী বাটাভিয়ায় এসে পৌছনো গেল। আজকাল পৃথিবীর সর্বত্রই বড়ো শহর মাত্রই দেশের শহর নয়, কালের শহর। সবাই আধুনিক। সবাই মুখের চেহারায় একই, কেবল বেশভূষায় কিছু তফাত। অর্থাৎ, কারো-বা পাগড়িটা ঝক্‌ঝকে কিন্তু জামায় বোতাম নেই, ধুতিখানা হাঁটু পর্যন্ত, ছেঁড়া চাদরখানায় ধোপ পড়ে না, যেমন কলকাতা ; কারো-বা আগা-গোড়াই ফিট্‌ফাট্‌ ধোয়া-মাজা, উজ্জ্বল বসনভূষণ, যেমন বাটাভিয়া। শহরগুলোর মুখের চেহারা একই বলেছি, কথাটা ঠিক নয়। মুখ দেখা যায় না, মুখোস দেখি। সেই মুখোসগুলো এক কারখানায় একই ছাঁচে ঢালাই করা। কেউ-বা সেই মুখোস পরিষ্কার পালিশ করে রাখে, কারো বা হেলায়-ফেলায় মলিন। কলকাতা আর বাটাভিয়া উভয়েই এক আধুনিক কালের কন্যা ; কেবল জামাতারা স্বতন্ত্র, তাই আদরযত্নে অনেক তফাত। শ্রীমতী বাটাভিয়ার সিঁথি থেকে চরণচক্র পর্যন্ত গয়নার অভাব নেই। তার উপরে সাবান দিয়ে গা মাজা-ঘষা ও অঙ্গলেপ দিয়ে ঔজ্জ্বল্যসাধন চলছেই। কলকাতার হাতে নোয়া আছে, কিন্তু বাজুবন্দ দেখি নে। তার পরে যে-জলে তার স্নান সে-জলও যেমন, আর যে-গামছায় গা-মোছা তারও সেই দশা। আমরা চিৎপুরবিভাগের পুরবাসী, বাটাভিয়ায় এসে মনে হয় কৃষ্ণপক্ষ থেকে শুক্লপক্ষে এলুম।

হোটেলের খাঁচায় ছিলেম দিন-তিনেক ; অভ্যর্থনার ত্রুটি হয় নি। সমস্ত বিবরণ বোধ হয় সুনীতি কোনো-একসময়ে লিখবেন। কেননা, সুনীতির যেমন দর্শনশক্তি তেমনি ধারণাশক্তি। যত বড়ো তাঁর আগ্রহ তত বড়োই তাঁর সংগ্রহ। যা-কিছু তাঁর চোখে পড়ে সমস্তই তাঁর মনে জমা হয়। কণামাত্র নষ্ট হয় না। নষ্ট-যে হয় না সে

দু দিক থেকেই, রক্ষণে এবং দানে। তন্নষ্টং যন্নদীয়তে। বুঝতে পারছি, তাঁর হাতে আমাদের ভ্রমণের ইতিবৃত্ত লেশমাত্র ব্যর্থ হবে না, লুপ্ত হবে না।

বাটাভিয়া থেকে জাহাজে করে বালিদ্বীপের দিকে রওনা হলুম। ঘণ্টা কয়েকের জন্যে সুরবায়া শহরে আমাদের নামিয়ে নিলে। এও একটা আধুনিক শহর; জাভার আঙ্গিক নয়, জাভার আনুষঙ্গিক। আলাদিনের প্রদীপের মন্ত্রে শহরটাকে নিউজীলণ্ডে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলেও খাপছাড়া হয় না।

পার হয়ে এলেম বালিদ্বীপে; দেখলেম ধরণীর চিরযৌবনা মূর্তি। এখানে প্রাচীন শতাব্দী নবীন হয়ে আছে। এখানে মাটির উপর অন্নপূর্ণার পাদপীঠ শ্যামল আস্তরণে দিগন্ত থেকে দিগন্তে বিস্তীর্ণ; বনচ্ছায়ার অঙ্কলালিত লোকালয়গুলিতে সচ্ছল অবকাশ। সেই অবকাশ উৎসবে অনুষ্ঠানে নিত্যই পরিপূর্ণ।

এই দ্বীপটুকুতে রেলগাড়ি নেই। রেলগাড়ি আধুনিক কালের বাহন। আধুনিক কালটি অত্যন্ত কৃপণ কাল, কোনো দিকে একটুমাত্র বাহুল্যের বরাদ্দ রাখতে চায় না। এই কালের মানুষ বলে : Time is money। তাই কালের বাজেখরচ বন্ধ করবার জন্যে রেলের এঞ্জিন হাঁফাতে হাঁফাতে, ধোঁয়া ওগরাতে ওগরাতে, মেদিনী কম্পমান করে দেশদেশান্তরে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু, এই বালিদ্বীপে বর্তমান কাল শত শত অতীত শতাব্দী জুড়ে এক হয়ে আছে। এখানে কালসংক্ষেপ করবার কোনো দরকার নেই। এখানে যা-কিছু আছে তা চিরদিনের; যেমন একালের তেমনি সেকালের। ঋতুগুলি যেমন চলেছে নানা রঙের ফুল ফোটাতে ফোটাতে, নানা রসের ফল ফলাতে ফলাতে, এখানকার মানুষ বংশপরম্পরায় তেমনি চলেছে নানা রূপে বর্ণে গীতে নৃত্যে অনুষ্ঠানের ধারা বহন করে।

রেলগাড়ি এখানে নেই কিন্তু আধুনিক কালের ভবঘুরে যারা এখানে আসে তাদের জন্যে আছে মোটরগাড়ি। অতি অল্পকালের মধ্যেই তাদের দেখাশুনো ভোগ-করা শেষ করা চাই। তারা আঁট-কালের মানুষ এসে পড়েছে অপর্যাপ্ত-কালের দেশে। এখানকার অরণ্য পর্বত লোকালয়ের মাঝখান দিয়ে ধুলো উড়িয়ে চলেছি আর কেবলই মনে হচ্ছে, এখানে পায়ে হেঁটে চলা উচিত। যেখানে পথের দুই ধারে ইমারত সেখানে মোটরের সঙ্গে সঙ্গে দুই চক্ষুকে দৌড় করালে খুব বেশি লোকসান হয় না; কিন্তু পথের দু ধারে যেখানে রূপের মেলা সেখানকার নিমন্ত্রণ সারতে গেলে গরজের মোটরটাকে গারাজেই রেখে আসতে হয়। মনে নেই কি, শিকার করতে দুষ্মন্ত যখন রথ ছুটিয়েছিলেন তখন তার বেগ কত; এই হচ্ছে যাকে বলে প্রোগ্রেস, লক্ষ্যভেদ করবার জন্যে তাড়াহুড়ো। কিন্তু, তপোবনের সামনে এসে তাঁকে রথ ফেলে নামতে হল,

লক্ষ্যসাধনের লোভে নয়, তৃপ্তিসাধনের আশায়। সিদ্ধির পথে চলা দৌড়ে, সুন্দরের পথে চলা ধীরে। আধুনিক কালে সিদ্ধির লোভ প্রকাণ্ড, প্রবল; তাই আধুনিক কালের বাহনের বেগ কেবলই বেড়ে যাচ্ছে। যা-কিছু গভীরভাবে নেবার যোগ্য, দৃষ্টি তাকে গ্রহণ না ক'রে স্পর্শ করেই চলে যায়। এখন হ্যাম্‌লেটের অভিনয় অসম্ভব হল, হ্যাম্‌লেটের সিনেমার হল জিত।

আমাদের মোটর যেখানে এসে থামল সেখানে এক বিপুল উৎসব। জায়গাটার নাম বাংলি। কোনো-এক রাজবংশের কার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। এর মধ্যে শোকের চিহ্ন নেই। না থাকবারই কথা— রাজার মৃত্যু হয়েছে অনেকদিন আগে, এতদিনে তাঁর আত্মা, দেবসভায় উত্তীর্ণ, উৎসব তাই নিয়ে। বহু দূর থেকে গ্রামের পথে পথে মেয়ে পুরুষেরা ভারে ভারে বিচিত্ররকমের নৈবেদ্য নিয়ে আসছে; যেন কোন্ পুরাণে-বর্ণিত যুগ হঠাৎ আমাদের চোখের সামনে বেঁচে উঠল; যেন অজন্তার শিল্পকলা চিত্রলোক থেকে প্রাণলোকে সূর্যের আলো ভোগ করতে এসেছে। মেয়েদের বেশভূষা অজন্তার ছবিরই মতো। এখানে আবরণবিরলতার স্বাভাবিক আবরু সুন্দর হয়ে দেখা দিল, সেটা চারি দিকের সঙ্গে সুসংগত; এমন-কি, যে-কয়েকজন আমেরিকান মিশনরি দর্শকরূপে এখানে এসেছে, আশা করি, তারাও এই দৃশ্যের সুশোভন সুরুচি সহজ-মনে অনুভব করতে পেরেছে।

যজ্ঞক্ষেত্র লোকে লোকারণ্য। এই উপলক্ষে সেখানে অনেকগুলি বাঁশের উঁচু মাচা-বাঁধা ঘরে এখানকার ব্রাহ্মণেরা সুসজ্জিত হয়ে, শিখা বেঁধে, ভূরি ভূরি খাদ্যবস্ত্র ফলপুষ্প পত্রের নৈবেদ্যের মধ্যে নানারকম মুদ্রা সহযোগে মন্ত্র পড়ছে; তারা কেউ-বা কতরকম অর্ঘ্য-উপকরণ তৈরি করছে। কোথাও-বা এখানকার বহুযন্ত্রমিলিত সংগীত; একজায়গায় তাঁবুর মধ্যে পৌরাণিক যাত্রার অভিনয়। উৎসবের এত অতিবৃহৎ আনুষ্ঠানিক বৈচিত্র্য আর কোথাও দেখি নি; অথচ কোথাও অসুন্দর বা বিশৃঙ্খল কিছু নেই; বিপুল সমারোহে দৃশ্যরূপটি বস্তুরাশির অসংলগ্নতায় বা জনতার ঠেলাঠেলিতে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যায় নি। এতগুলি মানুষের সমাবেশ, অথচ গোলমাল বা নোংরামি বা অব্যবস্থা নেই। উৎসবের অন্তর্নিহিত সুন্দর ঐক্যবন্ধনেই সমস্ত ভিড়ের লোককে আপনিই সংযত করে বেঁধেছে। সমস্ত ব্যাপারটি এত বৃহৎ, এত বিচিত্র, আর আমাদের পক্ষে এত অপূর্ব যে, এর বিস্তারিত বর্ণনা করা অসম্ভব। হিন্দু অনুষ্ঠানবিধির সঙ্গে এ দেশের লোকের চিত্তবৃত্তির মিল হয়ে এই যে সৃষ্টি, এর রূপের প্রাচুর্যটিই বিশেষ করে দেখবার ও ভাববার জিনিস। অপরিমিত উপকরণের দ্বারা নিজেকে অশেষভাবে প্রকাশ করবার চেষ্টা, সেই প্রকাশ কেবলমাত্র বস্তুকে পুঞ্জিত ক'রে নয়, তাকে নানা নিপুণ রীতিতে সজ্জিত ক'রে।

জাপানের সঙ্গে এখানকার প্রাকৃতিক অবস্থার মিল আছে। জাপানের মতোই এখানে দ্বীপটি আয়তনে ছোটো, অথচ এখানে প্রকৃতির রূপটি বিচিত্র, এবং তার সৃষ্টি-শক্তি প্রচুরভাবে উর্বরা। পদে পদেই পাহাড় ঝরনা নদী প্রান্তর অরণ্য অগ্নিগিরি সরোবর। অথচ, দেশটি চলাফেরার পক্ষে সুগম, নদীপর্বতের পরিমাণ ছোটো; প্রজাসংখ্যা বেশি, ভূমির পরিমাণ কম, এই জন্যে কৃষির উৎকর্ষ দ্বারা চাষের-যোগ্য সমস্ত জমি সম্পূর্ণরূপে এরা চষে ফেলেছে; খেতে খেতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল সেঁচ দেবার ব্যাপক ব্যবস্থা এ দেশে দীর্ঘকাল থেকে প্রচলিত। এখানে দারিদ্র্য নেই, রোগ নেই, জলবায়ু সুখকর। দেবদেবীবহুল, কাহিনীবহুল, অনুষ্ঠানবহুল পৌরাণিক হিন্দু-ধর্ম এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে সংগত; সেই প্রকৃতি এখানকার শিল্পকলায়, সামাজিক অনুষ্ঠানে, বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্যের প্রবর্তনা করেছে।

জাপানের সঙ্গে এর মস্ত একটা তফাত। জাপান শীতের দেশ; জাভা বালি গরমের দেশ। জাপান অন্য শীতের দেশের লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপনাকে রক্ষা করতে পারলে, জাভা বালি তা পারে নি। আত্মরক্ষার জন্যে যে দৃঢ়নিষ্ঠ অধ্যবসায় দরকার এদের তা ছিল না। গরম হাওয়া প্রাণের প্রকাশকে যেমন তাড়াতাড়ি পরিণত করে তেমনি তাড়াতাড়ি ক্ষয় করতে থাকে। মুহূর্তে মুহূর্তে শক্তিকে সে শিথিল করে, জীবনের অধ্যবসায়কে ক্লান্ত করে দেয়। বাটাভিয়া শহরটি-যে এমন নিখুঁত ভাবে পরিপাটি পরিচ্ছন্ন তার কারণ, শীতের দেশের মানুষ এর ভার নিয়েছে; তাদের শীতের দেশের দেহে শক্তি অনেক কাল থেকে বংশানুক্রমে অস্থিতে মজ্জাতে পেশীতে স্নায়ুতে পুঞ্জীভূত; তাই তাদের অক্লান্ত মন সর্বত্র ও প্রতি মুহূর্তে আপনাকে প্রয়োগ করতে পারে। আমরা কেবলই বলি, "যথেষ্ট হয়েছে, তুমিও যেমন, চলে যাবে।" যত্ন জিনিসটা কেবল হৃদয়ের জিনিস নয়, শক্তির জিনিস। অনুরাগের আগুনকে জ্বালিয়ে রাখতে শক্তির প্রাচুর্য চাই। শক্তিসঞ্চয় যেখানে অল্প সেখানে আপনিই বৈরাগ্য এসে পড়ে। বৈরাগ্য নিজের উপর থেকে সমস্ত দাবি কমিয়ে দেয়। বাইরের অসুবিধা, অস্বাস্থ্য, অব্যবস্থা, সমস্তই মেনে নেয়। নিজেকে ভোলাবার জন্যে বলতে চেষ্টা করে যে, ওগুলো সহ্য করার মধ্যে যেন মহত্ত্ব আছে। যার শক্তি অজস্র সে সমস্ত দাবি মেনে নিতে আনন্দ পায়; এই জন্যেই সে জোরের সঙ্গে বেঁচে থাকে, ধ্বংসের কাছে সহজে ধরা দিতে চায় না। য়ুরোপে গেলে সব চেয়ে আমার চোখে পড়ে মানুষের এই সদাজাগ্রত যত্ন। যাকে বলি বিজ্ঞান, সায়ান্স, তার প্রধান লক্ষণ হচ্ছে জ্ঞানের জন্যে অপরাজিত যত্ন। কোথাও আন্দাজ খাটবে না, খেয়ালকে মানবে না, বলবে না "ধরে নেওয়া যাক", বলবে না "সর্বজ্ঞ ঋষি এই কথা বলে গেছেন"। জ্ঞানের ক্ষেত্রে, নীতির ক্ষেত্রে, যখন আত্মশক্তির

ক্লান্তি আসে তখন বৈরাগ্য দেখা দেয়; সেই বৈরাগ্যের অযত্নের ক্ষেত্রেই ঋষিবাক্য, বেদবাক্য, গুরুবাক্য, মহাত্মাদের অনুশাসন, আগাছার জঙ্গলের মতো জেগে ওঠে—নিত্যপ্রয়াসসাধ্য জ্ঞানসাধনার পথ রুদ্ধ করে ফেলে। বৈরাগ্যের অযত্নে দিনে দিনে চারি দিকে যে প্রভূত আবর্জনার অবরোধ জমে ওঠে তাতেই মানুষের পরাভব ঘটায়। বৈরাগ্যের দেশে শিল্পকলাতেও মানুষ অন্ধ পুনরাবৃত্তির প্রদক্ষিণপথে চলে, এগোয় না, কেবলই ঘোরে। মাদ্রাজের শ্রেষ্ঠী পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা খরচ করে, হাজার বছর আগে যে-মন্দির তৈরি হয়েছে ঠিক তারই নকল করবার জন্যে। তার বেশি তার সাহস নেই, ক্লান্ত মনের শক্তি নেই; পাখির অসাড় ডানা খাঁচার বাইরে নিজেকে মেলে দিতে আনন্দ পায় না। খাঁচার কাছে হার মেনে যে-পাখি চিরকালের মতো ধরা দিয়েছে সমস্ত বিশ্বের কাছে তাকে হার মানতে হল।

এ দেশে এসে প্রথমে আনন্দ হয় এখানকার সব অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্যে ও সৌন্দর্যে। তার পরে ক্রমে মনে সন্দেহ হতে থাকে, এ হয়তো খাঁচার সৌন্দর্য, নীড়ের সৌন্দর্য নয়—এর মধ্যে হয়তো চিত্তের স্বাধীনতা নেই। অভ্যাসের যন্ত্রে নিখুঁত নকল শত শত বৎসর ধরে ধারাবাহিক ভাবে চলেছে। আমরা যারা এখানে বাহির থেকে এসেছি আমাদের একটা দুর্লভ সুবিধা ঘটেছে এই যে, আমরা অতীত কালকে বর্তমানভাবে দেখতে পাচ্ছি। সেই অতীত মহৎ, সেই অতীতের ছিল প্রতিভা, যাকে বলে নব-নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি; তার প্রাণশক্তির বিপুল উদ্যম আপন শিল্পসৃষ্টির মধ্যে প্রচুরভাবে আপন পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু তবুও সে অতীত, তার উচিত ছিল বর্তমানের পিছনে পড়া; সামনে এসে দাঁড়িয়ে বর্তমানকে সে ঠেকিয়ে রাখল কেন। বর্তমান সেই অতীতের বাহনমাত্র হয়ে বলছে, "আমি হার মানলুম।" সে দীনভাবে বলছে, "এই অতীতকে প্রকাশ করে রাখাই আমার কাজ, নিজেকে লুপ্ত করে দিয়ে।" নিজের 'পরে বিশ্বাস করবার সাহস নেই। এই হচ্ছে নিজের শক্তি সম্বন্ধে বৈরাগ্য, নিজের 'পরে দাবি যতদূর সম্ভব কমিয়ে দেওয়া। দাবি স্বীকার করায় দুঃখ আছে, বিপদ আছে, অতএব—বৈরাগ্যমেবাভয়ম্, অর্থাৎ, বৈনাশ্যমেবাভয়ম্।

সেদিন বাংলিতে আমরা যে অনুষ্ঠান দেখেছি সেটা প্রেতাত্মার স্বর্গারোহণপর্ব। মৃত্যু হয়েছে বহু পূর্বে; এতদিনে আত্মা দেবসভায় স্থান পেয়েছে বলে এই বিশেষ উৎসব। সুখবতী-নামক জেলায় উবুদ-নামক শহরে হবে দাহক্রিয়া, আগামী পাঁচই সেপ্টেম্বরে। ব্যাপারটার মধ্যে আরো অনেক বেশি সমারোহ থাকবে— কিন্তু তবু সেই মাদ্রাজি চেটির পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকার মন্দির। এ বহু বহু শতাব্দীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, সেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াই চলেছে, এর আর অন্ত নেই। এখানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় এত অসম্ভব-

রকম ব্যয় হয় যে সুদীর্ঘকাল লাগে তার আয়োজনে— যম আপন কাজ সংক্ষেপে ও সস্তায় সারেন কিন্তু নিয়ম চলে অতি লম্বা ও দুর্মূল্য চালে। এখানে অতীত কালের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া চলেছে বহুকাল ধরে, বর্তমানকালকে আপন সর্বস্ব দিতে হচ্ছে তার ব্যয় বহন করবার জন্যে।

এখানে এসে বারবার আমার এই কথা মনে হয়েছে যে, অতীতকাল যত বড়ো কালই হোক, নিজের সম্বন্ধে বর্তমানকালের একটা স্পর্ধা থাকা উচিত; মনে থাকা উচিত, তার মধ্যে জয় করবার শক্তি আছে। এই ভাবটাকে আমি একটি ছোটো কবিতায় লিখেছি, সেটা এইখানে তুলে দিয়ে এই দীর্ঘ পত্র শেষ করি।

নন্দগোপাল বুক ফুলিয়ে এসে
বললে আমায় হেসে,
"আমার সঙ্গে লড়াই করে কখ্‌খনো কি পার।
বারে বরেই হার।"
আমি বললেম, "তাই বই কি! মিথ্যে তোমার বড়াই,
হোক দেখি তো লড়াই।"
"আচ্ছা, তবে দেখাই তোমায়" এই বলে সে যেমনি টানলে হাত
দাদামশায় তখ্‌খনি চিৎপাত।
সবাইকে সে আনলে ডেকে, চেঁচিয়ে নন্দ করলে বাড়ি মাত॥

বারে বারে শুধায় আমায়, "বলো তোমার হার হয়েছে না কি।"
আমি কইলেম, "বলতে হবে তা কি।
ধুলোর যখন নিলেম শরণ প্রমাণ তখন রইল কি আর বাকি।
এই কথা কি জান—
আমার কাছে, নন্দগোপাল, যখনই হার মান,
আমারই সেই হার,
লজ্জা সে আমার।
ধুলোয় যেদিন পড়ব, যেন এই জানি নিশ্চিত,
তোমারই শেষ জিত।

ইতি ৩০শে আগস্ট ১৯২৭
কারেম আসন। বালি[১]

১ শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে লিখিত।

১০

কল্যাণীয়াসু

মীরা, যেখানে বসে লিখছি এ একটা ডাকবাঙলা, পাহাড়ের উপরে। সকালবেলা শীতের বাতাস দিচ্ছে। আকাশে মেঘগুলো দল বেঁধে আনাগোনা করছে, সূর্যকে একবার দিচ্ছে ঢাকা, একবার দিচ্ছে খুলে। পাহাড় বললে যে-ছবি মনে জাগে এ একেবারেই সেরকম নয়। শৈলশিখরশ্রেণী কোথাও দেখা যাচ্ছে না— বারান্দা থেকে অনতিদূরেই সামনে ঢালু উপত্যকা নেমে গিয়েছে, তলায় একটি ক্ষীণ জলের ধারা এঁকে বেঁকে চলেছে ; সামনে অন্য পারের পাড়ি অর্ধচন্দ্রের মতো, তার উপরে নারকেলবন আকাশের গায়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে।

উপর থেকে নীচে পর্যন্ত থাকে থাকে শস্যের খেত। পাহাড়ের বুক বেয়ে একটা ভাঙাচোরা পথ পরপারের গ্রামের থেকে জল পর্যন্ত নেমে গেছে। জলধারার কাছেই একটা উৎস। এই উৎসকে এ দেশের লোকে পবিত্র বলে জানে ; সমস্ত দিন দেখি, মেয়েরা স্নান করে, জল তুলে নিয়ে যায়। এরা বলে, এই জলে স্নান করলে সর্ব পাপ মোচন হয়। বিশেষ বিশেষ পার্বণ আছে যখন বিস্তর লোক এখানে পুণ্যস্নান করতে আসে। এই জায়গাটার নাম 'তীর্ত আম্পুল'। তীর্ত অর্থাৎ তীর্থ, আম্পুল মানে উৎস— উৎসতীর্থ।

এই উৎস সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। বহুকাল পূর্বে এক রাজার এক সুন্দরী মেয়ে ছিল। সেই মেয়েটি রাজার এক পারিষদকে ভালোবেসেছিল। পারিষদের মনেও যে ভালোবাসা ছিল না তা নয়, কিন্তু রাজকন্যাকে বিয়ে করবার যোগ্য তার জাতিমর্যাদা নয় জেনে রাজার সম্মানের প্রতি লক্ষ্য করে রাজকন্যার ভালোবাসা কর্তব্যবোধে প্রত্যাখ্যান করে। রাজকন্যা রাগ করে তার পানীয় দ্রব্যে বিষ মিশিয়ে দেয়। যুবক একটুখানি পান করেই ব্যাপারখানা বুঝতে পারে, কিন্তু পাছে রাজকন্যার নামে অপবাদ আসে তাই পালিয়ে এই জায়গাকার বনে এসে গোপনে মরবার জন্যে প্রস্তুত হয়। দেবতারা দয়া করে এই পুণ্য উৎসের জল খাইয়ে তাকে বাঁচিয়ে দেন।

হিন্দু ভাবের ও রীতির সঙ্গে এদের জীবন কিরকম জড়িয়ে গেছে ক্ষণে ক্ষণে তার পরিচয় পেয়ে বিস্ময় বোধ হয়। অথচ হিন্দুধর্ম এখানে কোথাও অমিশ্র ভাবে নেই ; এখানকার লোকের প্রকৃতির সঙ্গে মিলে গিয়ে সে একটা বিশেষ রূপ ধরেছে ; তার ভঙ্গীটা হিন্দু, অঙ্গটা এদের। প্রথম দিন এসেই এক জায়গায় কোন্-এক রাজার অন্ত্যেষ্টিসংকার দেখতে গিয়েছিলুম। সাজসজ্জা-আয়োজনের উপকরণ আমাদের সঙ্গে মেলে না ; উৎসবের ভাবটা ঠিক আমাদের শ্রাদ্ধের ভাব নয় ; সমারোহের বাহ্য দৃশ্যটা ভারতবর্ষের কোনো-কিছুর অনুরূপ নয় ; তবুও এর রকমটা

আমাদের মতোই ; মাচার উপরে এখানকার চূড়া-বাঁধা ব্রাহ্মণেরা ঘণ্টা নেড়ে ধূপ-ধুনো জ্বালিয়ে হাতের আঙুলে মুদ্রার ভঙ্গী করে বিড়্‌বিড়্‌ শব্দে মন্ত্র পড়ে যাচ্ছে। আবৃত্তিতে ও অনুষ্ঠানে কিছুমাত্র স্খলন হলেই সমস্ত অশুদ্ধ ও ব্যর্থ হয়ে যায়। ব্রাহ্মণের গলায় পৈতে নেই। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, এরা 'গায়ত্রী' শব্দটা জানে কিন্তু মন্ত্রটা ঠিক জানে না। কেউ বা কিছু কিছু টুকরো জানে। মনে হয়, এক সময়ে এরা সর্বাঙ্গীণ হিন্দুধর্ম পেয়েছিল, তার দেবদেবী রীতিনীতি উৎসব-অনুষ্ঠান পুরাণস্মৃতি সমস্তই ছিল। তার পরে মূলের সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, ভারতবর্ষ চলে গেল দূরে— হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা হল নিষিদ্ধ, হিন্দু আপন গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে কষে বাঁধলে, ঘরের বাইরে তার যে এক প্রশস্ত আঙিনা ছিল এ কথা সে ভুললে। কিন্তু, সমুদ্রপারের আত্মীয়-বাড়িতে তার অনেক বাণী, অনেক মূর্তি, অনেক চিহ্ন, অনেক উপকরণ, পড়ে আছে বলে সেই আত্মীয় তাকে সম্পূর্ণ ভুলতে পারলে না। পথে ঘাটে পদে পদে মিলনের নানা অভিজ্ঞান চোখে পড়ে। কিন্তু সেগুলির সংস্কার হতে পায় নি বলে কালের হাতে সেই-সব অভিজ্ঞান কিছু গেছে ক্ষয়ে, কিছু বেঁকেচুরে, কিছু গেছে লুপ্ত হয়ে।

সেই-সব অভিজ্ঞানের অবিচ্ছিন্ন সংগতি আর পাওয়া যায় না। তার অর্থ কিছু গেছে ঝাপসা হয়ে, কিছু গেছে টুকরো হয়ে। তার ফল হয়েছে এই, যেখানে-যেখানে ফাঁক পড়েছে সেই ফাঁকটা এখানকার মানুষের মন আপন সৃষ্টি দিয়ে ভরিয়েছে। হিন্দু-ধর্মের ভাঙাচোরা কাঠামো নিয়ে এখানকার মানুষ আপনার একটা ধর্ম, একটা সমাজ, গড়ে তুলেছে। এখানকার এক সময়ের শিল্পকলায় দেখা যায় পুরোপুরি হিন্দুর প্রভাব ; তার পরে দেখা যায় সে-প্রভাব ক্ষীণ ও বিচ্ছিন্ন। তবু যে-ক্ষেত্রকে হিন্দু উর্বর করে দিয়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে এখানকার স্বস্থানীয় প্রতিভা প্রচুরভাবে আপনার ফসল ফলিয়েছে। এখানে একটা বহুছিদ্র পুরোনো ইতিহাসের ভূমিকা দেখি ; সেই আধ-ভোলা ইতিহাসের ছেদগুলো দিয়ে এদেশের স্বকীয় চিত্ত নিজেকে প্রকাশ করছে।

বালিতে সব-প্রথমে কারেম-আসন বলে একজায়গার রাজবাড়িতে আমার থাকবার কথা। সেখানকার রাজা ছিলেন বাংলির শ্রাদ্ধ-উৎসবে। পারিষদসহ বালির ওলন্দাজ গবর্নর সেখানে মধ্যাহ্নভোজন করলেন, সেই ভোজে আমরাও ছিলেম। ভোজ শেষ করে যখন উঠলেম তখন বেলা তিনটে। সকালে সাড়ে ছটার সময় জাহাজ থেকে নেমেছি ; ঘাটের থেকে মোটরে আড়াই ঘণ্টা ঝাঁকানি ও ধুলো খেয়ে যজ্ঞস্থলে আগমন। এখানে ঘোরাঘুরি দেখাশুনা সেরে বিনা স্নানেই অত্যন্ত ক্লান্ত ও ধূলিম্লান অবস্থায় নিতান্ত বিতৃষ্ণার সঙ্গে খেতে বসেছি ; দীর্ঘকালপ্রসারিত সেই ভোজে আহার ও আলাপ-

আপ্যায়ন সেরে আমাদের নিমন্ত্রণকর্তা রাজার সঙ্গে তাঁর মোটরগাড়িতে চড়ে আবার সুদীর্ঘপথ ভেঙে চললুম তাঁর প্রাসাদে। প্রাসাদকে এরা পুরী বলে। রাজার ভাষা আমি জানি নে, আমার ভাষা রাজা বোঝেন না— বোঝবার লোকও কেউ সঙ্গে নেই। চুপ করে গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইলুম।

মস্ত সুবিধে এই, এখানকার প্রকৃতি বালিনি ভাষায় কথা কয় না ; সেই শ্যামার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি আর অরসিক মোটরগাড়িটাকে মনে মনে অভিশাপ দিই। মনে পড়ল, কখনো কখনো শুষ্কচিত্ত গাইয়ের মুখে গান শুনেছি ; রাগিণীর যেটা বিশেষ দরদের জায়গা, যেখানে মন প্রত্যাশা করছে, গাইয়ের কণ্ঠ অত্যুচ্চ আকাশের চিলের মতো পাখাটা ছড়িয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ স্থির থাকবে কিম্বা দুই-একটা মাত্র মীড়ের ঝাপটা দেবে, গানের সেই মর্মস্থানের উপর দিয়ে যখন সেই সংগীতের পালোয়ান তার তানগুলোকে লোটন-পায়রার মতো পালটিয়ে পালটিয়ে উড়িয়ে চলেছে, তখন কিরকম বিরক্ত হয়েছি। পথের দুই ধারে গিরি অরণ্য সমুদ্র, আর সুন্দর সব ছায়াবেষ্টিত লোকালয়, কিন্তু মোটরগাড়িটা দুন-চৌদুন মাত্রায় চাকা চালিয়ে ধুলো উড়িয়ে চলেছে, কোনো-কিছুর 'পরে তার কিছুমাত্র দরদ নেই ; মনটা ক্ষণে ক্ষণে বলে উঠছে, "আরে, রোসো রোসো, দেখে নিই।" কিন্তু, এই কল-দৈত্য মনটাকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায় ; তার একমাত্র ধুয়ো, "সময় নেই, সময় নেই।" এক জায়গায় যেখানে বনের ফাঁকের ভিতর দিয়ে নীল সমুদ্র দেখা গেল রাজা আমাদের ভাষাতেই বলে উঠলেন "সমুদ্র" ; আমাকে বিস্মিত ও আনন্দিত হতে দেখে আউড়ে গেলেন, "সমুদ্র, সাগর, অব্ধি, জলাঢ্য।" তার পরে বললেন, "সপ্তসমুদ্র, সপ্তপর্বত, সপ্তবন, সপ্তআকাশ।" তার পরে পর্বতের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন "অদ্রি" ; তার পরে বলে গেলেন, "সুমেরু, হিমালয়, বিন্ধ্য, মলয়, ঋষ্যমূক।" এক জায়গায় পাহাড়ের তলায় ছোটো নদী বয়ে যাচ্ছিল, রাজা আউড়িয়ে গেলেন, "গঙ্গা, যমুনা, নর্মদা, গোদাবরী, কাবেরী, সরস্বতী।" আমাদের ইতিহাসে একদিন ভারতবর্ষ আপন ভৌগোলিক সত্তাকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিল ; তখন সে আপনার নদীপর্বতের ধ্যানের দ্বারা আপন ভূমূর্তিকে মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিল। তার তীর্থগুলি এমন করে বাঁধা হয়েছে— দক্ষিণে কন্যাকুমারী, উত্তরে মানসসরোবর, পশ্চিমসমুদ্রতীরে দ্বারকা, পূর্ব-সমুদ্রে গঙ্গাসংগম— যাতে করে তীর্থভ্রমণের দ্বারা ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ রূপটিকে ভক্তির সঙ্গে মনের মধ্যে গভীরভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। ভারতবর্ষকে চেনবার এমন উপায় আর কিছু হতে পারে না। তখন পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করতে হত সুতরাং তীর্থভ্রমণের দ্বারা কেবল যে ভারতবর্ষের ভূগোল জানা যেত তা নয়, তার নানাজাতীয় অধিবাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আপনিই হত ; সেদিন ভারতবর্ষের আত্মোপলব্ধি

একটা সত্যসাধনা ছিল বলেই তার আত্মপরিচয়ের পদ্ধতিও আপনিই এমন সত্য হয়ে উঠেছিল। যথার্থ শ্রদ্ধা কখনো ফাঁকি দিয়ে কাজ সারতে চায় না। অর্থাৎ রাষ্ট্রসভার রঙ্গমঞ্চের উপর ক্ষণিক মিলনের অভিনয়কেই সে মিলন বলে নিজেকে ভোলাতে চায় না। সেদিন মিলনের সাধনা ছিল অকৃত্রিম নিষ্ঠার সাধনা।

সেদিনকার ভারতবর্ষের সেই আত্মমূর্তিধ্যান সমুদ্র পার হয়ে পূর্বমহাসাগরের এই সুদূর দ্বীপপ্রান্তে এমন করে স্থান পেয়েছিল যে, আজ হাজার বছর পরেও সেই ধ্যান-মন্ত্রের আবৃত্তি এই রাজার মুখে ভক্তির সুরে বেজে উঠল, এতে আমার মনে ভারি বিস্ময় লাগল। এই-সব ভৌগোলিক নামমালা এদের মনে আছে বলে নয়, কিন্তু যে-প্রাচীন যুগে এই নামমালা এখানে উচ্চারিত হয়েছিল সেই যুগে এই উচ্চারণের কী গভীর অর্থ ছিল সেই কথা মনে ক'রে। সেদিনকার ভারতবর্ষ আপনার ঐক্যটিকে কত বড়ো আগ্রহের সঙ্গে জানছিল আর সেই জানাটিকে স্থায়ী করবার জন্যে, ব্যাপ্ত করবার জন্যে, কিরকম সহজ উপায় উদ্ভাবন করেছিল তা স্পষ্ট বোঝা গেল আজ এই দূর দ্বীপে এসে— যে-দ্বীপকে ভারতবর্ষ ভুলে গিয়েছে।

রাজা কিরকম উৎসাহের সঙ্গে হিমালয় বিন্ধ্যাচল গঙ্গা যমুনার নাম করলেন, তাতে কিরকম তাঁর গর্ব বোধ হল! অথচ, এ ভূগোল বস্তুত তাঁদের নয়; রাজা য়ুরোপীয় ভাষা জানেন না, ইনি আধুনিক স্কুলে-পড়া মানুষ নন, সুতরাং পৃথিবীতে ভারতবর্ষ জায়গাটি-যে কোথায় এবং কিরকম, সে-সম্বন্ধে সম্ভবত তাঁর অস্পষ্ট ধারণা, অন্তত বাহ্যত এ ভারতবর্ষের সঙ্গে তাঁদের কোনো ব্যবহারই নেই; তবুও হাজার বছর আগে এই নামগুলির সঙ্গে যে-সুর মনে বাঁধা হয়েছিল সেই সুর আজও এ দেশের মনে বাজছে। সেই সুরটি কত বড়ো খাঁটি সুর ছিল তাই আমি ভাবছি। আমি কয়েক বছর আগে ভারতবিধাতার যে-জয়গান রচনা করেছি তাতে ভারতের প্রদেশগুলির নাম গেঁথেছি— বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গার নামও আছে। কিন্তু, আজ আমার মনে হচ্ছে, ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশের ও সমুদ্রপর্বতের নামগুলি ছন্দে গেঁথে কেবলমাত্র একটি দেশপরিচয় গান আমাদের লোকের মনে গেঁথে দেওয়া ভালো। দেশাত্মবোধ বলে একটা শব্দ আজকাল আমরা কথায় কথায় ব্যবহার করে থাকি, কিন্তু দেশাত্মজ্ঞান নেই যার তার দেশাত্মবোধ হবে কেমন করে।

তার পরে রাজা আউড়ে গেলেন সপ্তসমুদ্র, সপ্তপর্বত, সপ্তবন, সপ্তআকাশ— অর্থাৎ, তখনকার দিনে ভারতবর্ষ বিশ্বভূবৃত্তান্ত যে-রকম কল্পনা করেছিল তারই স্মৃতি। আজ নূতন জ্ঞানের প্রভাবে সেই স্মৃতি নির্বাসিত, কেবল তা পুরাণের জীর্ণ পাতায় আটকে রয়েছে, কিন্তু এখানকার কণ্ঠে এখনো তা শ্রদ্ধার সঙ্গে ধ্বনিত। তার পরে রাজা চার

বেদের নাম, যম বরুণ প্রভৃতি চার লোকপালের নাম, মহাদেবের নামাষ্টক বলে গেলেন; ভেবে ভেবে মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের নাম বলতে লাগলেন, সবগুলি মনে এল না।

রাজপুরীতে প্রবেশ করেই দেখি, প্রাঙ্গণে একটি বেদীর উপর বিচিত্র উপকরণ সাজানো; এখানকার চারজন ব্রাহ্মণ— একজন বুদ্ধের, একজন শিবের, একজন ব্রহ্মার, একজন বিষ্ণুর পূজারি; মাথায় মস্ত উঁচু কারুখচিত টুপি, টুপির উপরিভাগে কাঁচের তৈরি এক-একটা চূড়া। এঁরা চারজন পাশাপাশি বসে আপন-আপন দেবতার স্তবমন্ত্র পড়ে যাচ্ছেন। একজন প্রাচীনা এবং একজন বালিকা অর্ঘ্যের থালি হাতে করে দাঁড়িয়ে। সবসুদ্ধ সাজসজ্জা খুব বিচিত্র ও সমারোহবিশিষ্ট। পরে শোনা গেল, এই মাঙ্গল্যমন্ত্রপাঠ চলছিল রাজবাড়িতে আমারই আগমন উপলক্ষে। রাজা বললেন, আমার আগমনের পুণ্যে প্রজাদের মঙ্গল হবে, ভূমি সফলা হবে, এই কামনায় স্তবমন্ত্রের আবৃত্তি। রাজা বিষ্ণুবংশীয় বলে নিজের পরিচয় দিলেন।

বেলা সাড়ে চারটের সময় স্নান করে নিয়ে বারান্দায় এসে বসলুম। কারো মুখে কথা নেই। ঘণ্টা-দুয়েক এই ভাবে যখন গেল তখন রাজা স্থানীয় বাজার থেকে বোম্বাই প্রদেশের এক খোজা মুসলমান দোকানদারকে তলব দিয়ে আনালেন। কী আমার প্রয়োজন কিরকম আহারাদির ব্যবস্থা আমার জন্যে করতে হবে ইত্যাদি প্রশ্ন। আমি রাজাকে জানাতে বললুম, তিনি যদি আমাকে ত্যাগ করে বিশ্রাম করতে যান তাহলেই আমি সব চেয়ে খুশি হব।

তার পরদিনে রাজবাড়ির কয়েকজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত তালপাতার পুঁথিপত্র নিয়ে উপস্থিত। একটি পুঁথি মহাভারতের ভীষ্মপর্ব। এইখানকার অক্ষরেই লেখা; উপরের পংক্তি সংস্কৃত ভাষায়, নীচের পংক্তিতে দেশী ভাষায় তারই অর্থব্যাখ্যা। কাগজের একটি পুঁথিতে সংস্কৃত শ্লোক লেখা। সেই শ্লোক রাজা পড়ে যেতে লাগলেন; উচ্চারণের বিকৃতি থেকে বহু কষ্টে তাদের উদ্ধার করবার চেষ্টা করা গেল। সমস্তটা যোগতত্ত্বের উপদেশ। চিত্তবৃত্তি, ত্রি-অক্ষরাত্মক ওঁ, চন্দ্রবিন্দু এবং অন্য সমস্ত শব্দ ও ভাবনা বর্জন করে শুদ্ধ চৈতন্যযোগে সুখমাপ্নুয়াৎ— এই হচ্ছে সাধনা। আমি রাজাকে আশ্বাস দিলেম যে, আমরা এখানে যে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত পাঠিয়ে দেব, তিনি এখানকার গ্রন্থগুলি থেকে বিকৃত ও বিস্মৃত পাঠ উদ্ধার করে তার অর্থব্যাখ্যা করে দিতে পারবেন।

এদিকে আমার শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হতে চলল। প্রতি মুহূর্তে বুঝতে পারলুম, আমার শক্তিতে কুলোবে না। সৌভাগ্যক্রমে সুনীতি আমাদের সঙ্গে আছেন; তাঁর অশ্রান্ত উদ্যম, অদম্য উৎসাহ। তিনি ধুতি প'রে, কোমরে পট্টবস্ত্র জড়িয়ে, 'পেদণ্ড'

অর্থাৎ এখানকার ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বসে গেলেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের দেশের পূজোপকরণ ছিল; পূজাপদ্ধতি তাদের দেখিয়ে দিলেন। আলাপ-আলোচনায় সকলকেই তিনি আগ্রহান্বিত করে তুলেছেন।

যখন দেখা গেল, আমার শরীর আর সইতে পারছে না, তখন আমি রাজপুরী থেকে পালিয়ে এই আম্পুল-তীর্থাশ্রমেষু নির্বাসন গ্রহণ করলুম। এখানে লোকের ভিড় নেই, অভ্যর্থনা-পরিচর্যার উপদ্রব নেই। চার দিকে সুন্দর গিরিব্রজ, শস্যশ্যামলা উপত্যকা, জনপদবধূদের স্নানসেবায় চঞ্চল উৎসজলসঞ্চয়ের অবিরত কলপ্রবাহ, শৈলতটে নির্মল নীলাকাশে নারিকেলশাখার নিত্য আন্দোলন; আমি ব'সে আছি বারান্দায়, কখনো লিখছি, কখনো সামনে চেয়ে দেখছি। এমন সময়ে হঠাৎ এসে থামল এক মোটর-গাড়ি। গিয়ানয়ারের রাজা ও এই প্রদেশের একজন ওলন্দাজ রাজপুরুষ নেমে এলেন এঁর বাড়িতে আমার নিমন্ত্রণ। অন্তত এক রাত্রি যাপন করতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে আপনিই মহাভারতের কথা উঠল। মহাভারতের যে-কয়টা পর্ব এখনো এখানে পাওয়া যায় তাই তিনি অনেক ভেবে ভেবে আউড়িয়ে গেলেন। বাকি পর্ব কী তাই তিনি জানতে চান। এখানে কেবল আছে, আদিপর্ব, বিরাটপর্ব, উদ্যোগপর্ব ভীষ্মপর্ব, আশ্রমবাসপর্ব, মুষলপর্ব, প্রস্থানিকপর্ব, স্বর্গারোহণপর্ব।

মহাভারতের কাহিনীগুলির উপরে এ দেশের লোকের চিত্ত বাসা বেঁধে আছে। তাদের আমোদে আহ্লাদে কাব্যে গানে অভিনয়ে জীবনযাত্রায় মহাভারতের সমস্ত চরিত্রগুলি বিচিত্রভাবে বর্তমান। অর্জুন এদের আদর্শ পুরুষ। এখানে মহাভারতের গল্পগুলি কিরকম বদলে গেছে তার একটা দৃষ্টান্ত দিই। সংস্কৃত মহাভারতের শিখণ্ডী এখানে শ্রীকান্তি নাম ধরেছে। শ্রীকান্তি অর্জুনের স্ত্রী। তিনি যুদ্ধের রথে অর্জুনের সামনে থেকে ভীষ্মবধে সহায়তা করেছিলেন। এই শ্রীকান্তি এখানে সতী স্ত্রীর আদর্শ।

গিয়ানয়ারের রাজা আমাকে অনুরোধ করে গেলেন, আজ রাত্রে মহাভারতের হারানো পর্ব প্রভৃতি পৌরাণিক বিষয় নিয়ে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চান। আমি তাঁকে সুনীতির কথা বলেছি; সুনীতি তাঁকে শাস্ত্র বিষয়ে যথাজ্ঞান সংবাদ দিতে পারবেন।

ভারতের ভূগোলস্মৃতি সম্বন্ধে একটা কথা আমার মনে আন্দোলিত হচ্ছে। নদীর নামমালার মধ্যে সিন্ধু ও শতদ্রু প্রভৃতি পঞ্চনদের নাম নেই, ব্রহ্মপুত্রের নামও বাদ পড়েছে। অথচ, দক্ষিণের প্রধান নদীগুলির নাম দেখছি। এর থেকে বোঝা যায়, সেই যুগে পাঞ্জাবপ্রদেশ শক হূন যবন পারসিকদের দ্বারা বারবার বিধ্বস্ত ও অধিকৃত হয়ে ভারতবর্ষ থেকে যেন বিদ্যায় সভ্যতায় স্খলিত হয়ে পড়েছিল; অপর পক্ষে

ব্রহ্মপুত্র নদের দ্বারা অভিষিক্ত ভারতের পূর্বতম দেশ তখনো যথার্থরূপে হিন্দুভারতের অঙ্গীভূত হয় নি।

এই তো গেল এখানকার বিবরণ। আমার নিজের অবস্থাটা যে-রকম দেখছি তাতে এখানে আমার ভ্রমণ সংক্ষেপ করতে হবে।

৩১ আগস্ট ১৯২৭

কারেম আসন। বালি[১]

১১

কল্যাণীয়েষু,

রথী, বালিদ্বীপটি ছোটো, সেই জন্যেই এর মধ্যে এমন একটি সুসজ্জিত সম্পূর্ণতা। গাছে-পালায় পাহাড়ে-ঝরনায় মন্দিরে-মূর্তিতে কুটীরে-ধানখেতে হাটে-বাজারে সমস্তটা মিলিয়ে যেন এক। বেখাপ কিছু চোখে ঠেকে না। ওলন্দাজ গবর্মেণ্ট বাইরে থেকে কারখানা-ওয়ালাদের এই দ্বীপে আসতে বাধা দিয়েছে; মিশনরিদেরও এখানে আনাগোনা নেই। এখানে বিদেশীদের জমি কেনা সহজ নয়, এমন-কি, চাষবাসের জন্যেও কিনতে পারে না। আরবি মুসলমান, গুজরাটের খোজা মুসলমান, চীনদেশের ব্যাপারীরা এখানে কেনা-বেচা করে— চার দিকের সঙ্গে সেটা বেমিল হয় না। গঙ্গার ধার জুড়ে দ্বাদশ দেউলগুলিকে লজ্জিত করে বাংলাদেশের বুকের উপর জুটমিল যে নিদারুণ অমিল ঘটিয়েছে এ সেরকম নয়। গ্রামের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ গ্রামের লোকেরই হাতে। এখানে খেতে জলসেকের আর চাষবাসের যে-রীতিপদ্ধতি সে খুব উৎকৃষ্ট। এরা ফসল যা ফলায় পরিমাণে তা অন্য দেশের চেয়ে অনেক বেশি।

কাপড় বোনে নানা রঙচঙ ও কারুকৌশলে। অর্থাৎ, এরা কোনো মতে ময়লা ট্যানা কোমরে জড়িয়ে শরীরটাকে অনাদৃত করে রাখে না। তাই, যেখানে কোনো কারণে ভিড় জমে, বর্ণচ্ছটার সমাবেশে সেখানটা মনোরম হয়ে ওঠে। মেয়েদের উত্তর অঙ্গ অনাবৃত। এ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠলে তারা বলে, "আমরা কি নষ্ট মেয়ে যে, বুক ঢাকব।" শোনা গেল, বালিতে বেশ্যারাই বুকে কাপড় দেয়। মোটের উপর এখানকার মেয়ে-পুরুষের দেহসৌষ্ঠব ও মুখের চেহারা ভালোই। বেঢপ মোটা বা রোগা আমি তো এ-পর্যন্ত দেখি নি। এখানকার পরিপুষ্ট শ্যামল প্রকৃতির সঙ্গে এখানকার পাটল রঙের নধরদেহ গোরু, এখানকার সুস্থ সবল পরিতৃপ্ত প্রসন্ন ভাবের মানুষগুলি, মিলে গেছে। ছবির দিক থেকে দেখতে গেলে এমন জায়গা পৃথিবীতে খুব কমই আছে।

১ শ্রীমতী মীরা দেবীকে লিখিত।

নন্দলাল এখানে এলেন না ব'লে আমার মনে অত্যন্ত আক্ষেপ বোধ হয়; এমন সুযোগ তিনি আর-কোথাও কখনো পাবেন না; মনে আছে, কয়েকবৎসর আগে একজন নামজাদা আমেরিকান আর্টিস্ট আমাকে চিঠিতে লিখেছিলেন, এমন দেশ তিনি আর-কোথাও দেখেন নি। আর্টিস্টের চোখে পড়বার মতো জিনিস এখানে চার দিকেই। অন্নসচ্ছলতা আছে ব'লেই স্বভাবত গ্রামের লোকের পক্ষে ঘরদুয়ার আচার-অনুষ্ঠান আসবাবপত্রকে শিল্পকলায় সজ্জিত করবার চেষ্টা সফল হতে পেরেছে। কোথাও হেলা-ফেলার দৃশ্য দেখা গেল না। গ্রামে গ্রামে সর্বত্র চলছে নাচ, গান, অভিনয়; অভিনয়ের বিষয় প্রায়ই মহাভারত থেকে। এর থেকে বোঝা যাবে, গ্রামের লোকের পেটের খাদ্য ও মনের খাদ্যের বরাদ্দ অপর্যাপ্ত। পথে আশে-পাশে প্রায়ই নানাপ্রকার মূর্তি ও মন্দির। দারিদ্র্যের চিহ্ন নেই, ভিক্ষুক এ-পর্যন্ত চোখে পড়ল না। এখানকার গ্রামগুলি দেখে মনে হল, এই তো যথার্থ শ্রীনিকেতন। গ্রামের সমগ্র প্রাণটি সকল দিকে পরিপূর্ণ।

এ দেশে উৎসবের প্রধান অঙ্গ নাচ। এখানকার নারকেলবন যেমন সমুদ্র-হাওয়ায় দুলছে তেমনি এখানকার সমস্ত দেশের মেয়ে পুরুষ নাচের হাওয়ায় আন্দোলিত। এক-একটি জাতির আত্মপ্রকাশের এক-একটি বিশেষ পথ থাকে। বাংলাদেশের হৃদয় যেদিন আন্দোলিত হয়েছিল সেদিন সহজেই কীর্তনগানে সে আপন আবেগসঞ্চারের পথ পেয়েছে; এখনো সেটা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নি। এখানে এদের প্রাণ যখন কথা কইতে চায় তখন সে নাচিয়ে তোলে। মেয়ে নাচে, পুরুষ নাচে। এখানকার যাত্রা অভিনয় দেখেছি, তার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চলায়-ফেরায়, যুদ্ধে-বিগ্রহে, ভালোবাসার প্রকাশে, এমন-কি ভাঁড়ামিতে, সমস্তটাই নাচ। সেই নাচের ভাষা যারা ঠিকমতো জানে তারা বোধ হয় গল্পের ধারাটা ঠিকমতো অনুসরণ করতে পারে। সেদিন এখানকার এক রাজবাড়িতে আমরা নাচ দেখছিলুম। খানিক বাদে শোনা গেল, এই নাচ-অভিনয়ের বিষয়টা হচ্ছে শাল্ব-সত্যবতীর আখ্যান। এর থেকে বোঝা যায়, কেবল ভাবের আবেগ নয়, ঘটনা-বর্ণনাকেও এরা নাচের আকারে গড়ে তোলে। মানুষের সকল ঘটনারই বাহ্যরূপ চলা-ফেরায়। কোনো একটা অসামান্য ঘটনাকে পরিদৃশ্যমান করতে চাইলে তার চলা-ফেরাকে ছন্দের সুষমাযোগে রূপের সম্পূর্ণতা দেওয়া সংগত। বাণীর দিকটাকে বাদ দিয়ে কিম্বা খাটো করে কেবলমাত্র গতিরূপটিকে ছন্দের উৎকর্ষ দেওয়া এখানকার নাচ। পৌরাণিক যে-আখ্যায়িকা কাব্যে কেবলমাত্র কানে শোনার বিষয়, এরা সেইটেকেই কেবলমাত্র চোখে দেখার বিষয় করে নিয়েছে। কাব্যের বাহন বাক্য, সেই বাক্যের ছন্দ-অংশ সংগীতের বিশ্বজনীন নিয়মে চালিত; কিন্তু তার অর্থ-অংশ কৃত্রিম, সেটা

সমাজে পরস্পরের আপসে তৈরি-করা সংকেতমাত্র। দুইয়ের যোগে কাব্য। গাছ শব্দটা শুনলে গাছ তারাই দেখে যাদের মধ্যে এ সম্বন্ধে একটা আপসে বোঝাপড়া আছে। তেমনি এদের নাচের মধ্যে শুধু ছন্দ থাকলে তাতে আখ্যানবর্ণনা চলে না, সংকেতও আছে; এই দুইয়ের যোগে এদের নাচ। এই নাচে রসনা বন্ধ করে এরা সমস্ত দেহ দিয়ে কথা কইছে ইঙ্গিতে এবং ভঙ্গীসংগীতে। এদের নাচে যুদ্ধের যে-রূপ দেখি কোনো রণক্ষেত্রে সেরকম যুদ্ধ দূরতঃও সম্ভব নয়। কিন্তু যদি কোনো স্বর্গে এমন বিধি থাকে যে, ছন্দে যুদ্ধ করতে হবে, এমন যুদ্ধ যাতে ছন্দ-ভঙ্গ হলে সেটা পরাভবেরই সামিল হয়, তবে সেটা এইরকম যুদ্ধই হত। বাস্তবের সঙ্গে এই অনৈক্য নিয়ে যাদের মনে অশ্রদ্ধা বা কৌতুক জন্মায় শেক্‌স্‌পিয়রের নাটক পড়েও তাদের হাসা উচিত— কেননা, তাতে লড়তে লড়তেও ছন্দ, মরতে মরতেও তাই। সিনেমাতে আছে রূপের সঙ্গে গতি, সেই সুযোগটিকে যথার্থ আর্টে পরিণত করতে গেলে আখ্যানকে নাচে দাঁড়-করানো চলে। বলা বাহুল্য, বাইনাচ প্রভৃতি যে-সব পদার্থকে আমরা নাচ বলি তার আদর্শ এ নাচের নয়। জাপানে কিয়োটোতে ঐতিহাসিক নাট্যের অভিনয় দেখেছি; তাতে কথা আছে বটে; কিন্তু তার ভাবভঙ্গী চলাফেরা সমস্ত নাচের ধরনে; বড়ো আশ্চর্য তার শক্তি। নাটকে আমরা যখন ছন্দোময় বাক্য ব্যবহার করি তখন সেই সঙ্গে চলাফেরা হাবভাব যদি সহজ রকমেরই রেখে দেওয়া হয় তা হলে সেটা অসংগত হয়ে ওঠে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। নামেতেই প্রকাশ পায়, আমাদের দেশে একদিন নাট্য অভিনয়ে সর্বপ্রধান অঙ্গই ছিল নাচ। নাটক দেখতে যারা আসে, পশ্চিম মহাদেশে তাদের বলে অডিয়েন্‌স্‌, অর্থাৎ শ্রোতা। কিন্তু, ভারতবর্ষে নাটককে বলেছে দৃশ্যকাব্য; অর্থাৎ তাতে কাব্যকে আশ্রয় করে চোখে দেখার রস দেবার জন্যেই অভিনয়।

এই তো গেল নাচের দ্বারা অভিনয়। কিন্তু বিশুদ্ধ নাচও আছে। পরশু রাত্রে সেটা গিয়ানয়ারের রাজবাড়িতে দেখা গেল। সুন্দর-সাজ-করা দুটি ছোটো মেয়ে— মাথায় মুকুটের উপর ফুলের দণ্ডগুলি একটু নড়াতেই দুলে ওঠে। গামেলান বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে দুজনে মিলে নাচতে লাগল। এই বাদ্যসংগীত আমাদের সঙ্গে ঠিক মেলে না। আমাদের দেশের জলতরঙ্গ বাজনা আমার কাছে সংগীতের ছেলেখেলা বলে ঠেকে। কিন্তু, সেই জিনিসটিকে গম্ভীর, প্রশস্ত, সুনিপুণ বহুযন্ত্রমিশ্রিত বিচিত্র আকারে এদের বাদ্যসংগীতে যেন পাওয়া যায়। রাগরাগিণীতে আমাদের সঙ্গে কিছুই মেলে না; যে-অংশে মেলে সে হচ্ছে এদের মৃদঙ্গের ধ্বনি, সঙ্গে করতালও আছে। ছোটো বড়ো ঘণ্টা এদের এই সংগীতের প্রধান অংশ। আমাদের দেশের নাট্যশালায় কন্সর্ট বাজনায়

যে নূতন রীতি হয়েছে এ সেরকম নয়; অথচ, য়ুরোপীয় সংগীতে বহুযন্ত্রের যে-হার্মনি এ তাও নয়। ঘণ্টার মতো শব্দে একটা মূল স্বরসমাবেশ কানে আসছে; তার সঙ্গে নানাপ্রকার যন্ত্রের নানারকম আওয়াজ যেন একটা কারুশিল্পে গাঁথা হয়ে উঠছে। সমস্তটাই যদিও আমাদের থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র, তবু শুনতে ভারি মিষ্টি লাগে। এই সংগীত পছন্দ করতে য়ুরোপীয়দেরও বাধে না।

গামেলান বাজনার সঙ্গে ছোটো মেয়ে দুটি নাচলে; তার শ্রী অত্যন্ত মনোহর। অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে সমস্ত শরীরে ছন্দের যে-আলোড়ন তার কী চারুতা, কী বৈচিত্র্য, কী সৌকুমার্য, কী সহজ লীলা। অন্য নাচে দেখা যায়, নটী তার দেহকে চালনা করছে; এদের দেখে মনে হতে লাগল, দুটি দেহ যেন স্বত-উৎসারিত নাচের ফোয়ারা। বারো বছরের পরে এই মেয়েদের আর নাচতে দেওয়া হয় না; বারো বছরের পরে শরীরের এমন সহজ সুকুমার হিল্লোল থাকা সম্ভব নয়।

সেই সন্ধ্যাবেলাতেই রাজবাড়িতে আর একটি ব্যাপার দেখলুম, মুখোসপরা নটেদের অভিনয়। আমরা জাপান থেকে যে-সব মুখোস এনেছিলুম তার থেকে বেশ বোঝা যায় মুখোসতৈরি এক প্রকারের বিশেষ কলাবিদ্যা। এতে যথেষ্ট গুণপনা চাই। আমাদের সকলেরই মুখে যেমন ব্যক্তিগত তেমনি শ্রেণীগত বিশেষত্ব আছে। বিশেষ ছাঁচ ও ভাব-প্রকাশ অনুসারে আমাদের মুখের ছাঁদ এক-একরকম শ্রেণী নির্দেশ করে। মুখোসতৈরি যে-গুণী করে সে সেই শ্রেণীপ্রকৃতিকে মুখোসে বেঁধে দেয়। সেই বিশেষ-শ্রেণীর মুখের ভাববৈচিত্র্যকে একটি বিশেষ ছাঁদে সে সংহত করে। নট সেই মুখোস প'রে এলে আমরা তখনই দেখতে পাই, একটা বিশেষ মানুষকে কেবল নয়, বিশেষ ভাবের এক শ্রেণীর মানুষকে। সাধারণত, অভিনেতা ভাব অনুসারে অঙ্গভঙ্গী করে। কিন্তু, মুখোসে মুখের ভঙ্গী স্থির করে বেঁধে দিয়েছে। এইজন্যে অভিনেতার কাজ হচ্ছে মুখোসেরই সামঞ্জস্য রেখে অঙ্গভঙ্গী করা। মূল ধুয়োটা তার বাঁধা; এমন করে তান দিতে হবে যাতে প্রত্যেক সুরে সেই ধুয়োটার ব্যাখ্যা হয়, কিছু অসংগত না হয়। এই অভিনয়ে তাই দেখলুম।

অভিনয়ের সঙ্গে এদের কণ্ঠসংগীত যা শুনেছি তাকে সংগীত বলাই চলে না। আমাদের কানে অত্যন্ত বেসুরো এবং উৎকট ঠেকে। এখানে আমরা তো গ্রামের কাছেই আছি; এরা কেউ একলা কিম্বা দল বেঁধে গান গাচ্ছে, এ তো শুনি নি। আমাদের পাড়াগাঁয়ে চাঁদ উঠেছে অথচ কোথাও গান ওঠে নি, এ সম্ভব হয় না। এখানে সন্ধ্যার আকাশে নারকেলগাছগুলির মাথার উপর শুক্লপক্ষের চাঁদ দেখা দিচ্ছে, গ্রামে কুঁকড়ো ডাকছে, কুকুর ডাকছে, কিন্তু কোথাও মানুষের গান নেই।

এখানকার একটা জিনিস বার বার লক্ষ্য করে দেখেছি, ভিড়ের লোকের আত্মসংযম। সেদিন গিয়ানয়ারের রাজবাড়িতে যখন অভিনয় হচ্ছিল চার দিকে অবারিত লোকের সমাগম। সুনীতিকে ডেকে বললুম, মেয়েদের কোলে শিশুদের আর্তরব শুনি নে কেন। নারীকণ্ঠই বা এমন সম্পূর্ণ নীরব থাকে কোন্ আশ্চর্য শাসনে। মনে পড়ে, কলকাতার থিয়েটারে মেয়েদের কলালাপ ও শিশুদের কান্না বন্যার মতো কমেডি ও ট্র্যাজেডি ছাপিয়ে দিয়ে কিরকম অসংযত অসভ্যতার হিল্লোল তোলে। সেদিন এখানে দুই-একটি মেয়ের কোলে শিশুও দেখেছি কিন্তু তারা কাঁদল না কেন।

একটা জিনিস এখানে দেখা গেল যা আর কোথাও দেখি নি। এখানকার মেয়েদের গায়ে গহনা নেই। কখনো কখনো কারো এক হাতে একটা চুড়ি দেখেছি, সেও সোনার নয়। কানে ছিদ্র করে শুকনো তালপাতার একটি গুটি পরেছে। বোধ হচ্ছে, যেন অজন্তার ছবিতেও এরকম কর্ণভূষণ দেখেছি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এদের আর-সকল কাজেই অলংকারের বাহুল্য ছাড়া বিরলতা নেই। যেখানে সেখানে পাথরে কাঠে কাপড়ে নানা ধাতুদ্রব্যে এরা বিচিত্র অলংকার সমস্ত দেশে ছড়িয়ে রেখেছে, কেবল এদের মেয়েদের গায়েই অলংকার নেই।

আমাদের দেশে সাধারণত দেখা যায়, অলংকৃত জিনিসের প্রধান রচনাস্থান পুরোনো শহরগুলি যেখানে মুসলমান বা হিন্দু প্রভাব সংহত ছিল, যেমন দিল্লি, আগ্রা, ঢাকা, কাশী, মাদুরা প্রভৃতি জায়গা। এখানে সেরকম বোধ হল না। এখানে শিল্পকাজ কম-বেশি সর্বত্র ও সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়ানো। তার মানে, এখানকার লোক ধনীর ফরমাশে নয়, নিজের আনন্দেই নিজের চার দিককে সজ্জিত করে। কতকটা জাপানের মতো। তার কারণ, অল্প-পরিসর দ্বীপের মধ্যে আইডিয়া এবং বিদ্যা ছড়িয়ে যেতে বিলম্ব হয় না। তা ছাড়া এদের মধ্যে জাতিগত ঐক্য। সেই সমজাতীয় মনোবৃত্তিতে শক্তির সাম্য দেখা যায়। দ্বীপ মাত্রের একটি স্বাভাবিক বিশেষত্ব এই যে, সেখানকার মানুষ সমুদ্র-বেষ্টিত হয়ে বহুকাল নিজের বিশেষ নৈপুণ্যকে অব্যাঘাতে ঘনীভূত করতে ও তাকে রক্ষা করতে পারে। আমাদের অতিবিস্তৃত ভারতবর্ষে এক কালে যা প্রচুর হয়ে উৎপন্ন হয় অন্য কালে তা ছড়িয়ে নষ্ট হয়ে যায়। তাই আমাদের দেশে অজন্তা আছে অজন্তার কালকেই আঁকড়ে; কনারক আছে কনারকেরই যুগে; তারা আর একাল পর্যন্ত এসে পৌঁছতে পারলে না। শুধু তাই নয়, তত্ত্বজ্ঞান ভারতীয় মনের প্রধান সম্পদ, কিন্তু বহু দূরে দূরে উপনিষদের বা শঙ্করাচার্যের কালে তা ভাগে ভাগে লগ্ন হয়ে রইল। একালে আমরা শুধু তাই নিয়ে আবৃত্তি করি কিন্তু তার সৃষ্টিধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ভারতবর্ষ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়েও এত শতাব্দী পরেও ভারতবর্ষের এত জিনিস যে এখানে এখনো

এমন করে আছে, তার কারণ, এটা দ্বীপ ; এখানে সহজে কোনো জিনিস ভ্রষ্ট হয়ে যেতে পারে না। অর্থ নষ্ট হতে পারে, একটার দ্বারা আর-একটা চাপা পড়তে পারে, কিন্তু বস্তুটা তবু থেকে যায়। এই কারণেই প্রাচীন ভারতের অনেক জিনিসই এখানে আমরা বিশুদ্ধভাবে পাব বলে আশা করি। হয়তো এখানকার নাচ এবং নৃত্যমূলক অভিনয়টা সেই জাতের হতেও পারে। এখানকার রাজাদের বলে 'আর্য'। আমার বিশ্বাস, তার অর্থ, রাজবংশ নিজেদের আর্যবংশীয় বলেই জানে, তারা স্থানীয় অধিবাসীদের স্বজাতীয় ছিল না। তাই, এখানকার রাজাদের ঘরে যে-সকল কলা ও অনুষ্ঠান আজও চলে আসছে সেগুলি সন্ধান করলে এমন অনেক জিনিস পাওয়া যাবে যা আমাদের দেশে লুপ্ত ও বিস্মৃত।

এই ছোটো দ্বীপে এককালে অনেক রাজা ছিল, তাদের কেউ-কেউ ওলন্দাজ-আক্রমণে আসন্নপরাভবের আশঙ্কায় দলে দলে হাজার হাজার লোক নিঃশেষে আত্মহত্যা করে মরেছে। এখনো রাজোপাধিধারী যে কয়েকজন আছে তারা পুরোনো দামি শামাদানের মতো, যাতে বাতি আর জ্বলে না। তাদের প্রাসাদ ও সাজসজ্জা আছে, তা ছাড়া তারা যেখানে আছে তাকে নগর বলা চলে। কিন্তু, এই নগরে আর গ্রামে যে-পার্থক্য সে যেন ভাইবোনের পার্থক্যের মতো— তারা এক বাড়িতেই থাকে, তাদের মাঝে প্রাচীর নেই। আধুনিক ভারতে শিল্পচর্চা প্রভৃতি নানা বিষয়ে নগরে গ্রামে ছাড়াছাড়ি। শহরগুলি যে দীপ জ্বালে তার আলো গ্রামে গিয়ে পড়েই না। দেশের সম্পত্তি যেন ভাগ হয়ে গেছে, গ্রামের অংশে যেটুকু পড়েছে তাতে আচার অনুষ্ঠান বজায় রাখা সম্ভব নয়। এই কারণে সমস্ত দেশ এক হয়ে কোনো শিল্প, কোনো বিদ্যাকে, রক্ষণ ও পোষণ করতে পারে না। তাই শহরের লোক যখন দেশের কথা ভাবে তখন শহরকেই দেশ বলে জানে ; গ্রামের লোক দেশের কথা ভাবতেই জানে না। এই বালিতে আমরা মোটরে মোটরে দূরে দূরান্তরে যতই ভ্রমণ করি— নদী, গিরি, বন, শস্যক্ষেত্র ও পল্লীতে-শহরে মিলে খুব একটা ঘনিষ্ঠতা দেখতে পাই ; এখানকার সকল মানুষের মধ্যেই যেন এদের সকল সম্পদ ছড়ানো।

গামেলান-সংগীতের কথা পূর্বেই বলেছি। ইতিমধ্যে এ সম্বন্ধে আমাকে চিন্তা করতে হয়েছে। এরা-যে আপনমনে সহজ আনন্দে গান গায় না, তার কারণ এদের কণ্ঠসংগীতের অভাব। এরা টিং টিং টুং টাং করে যে-বাজনা বাজায় বস্তুত তাতে গান নেই, আছে তাল। নানা যন্ত্রে এরা তালেরই বোল দিয়ে চলে। এই বোল দেবার কোনো কোনো যন্ত্র ঢাক-ঢোলের মতোই, তাতে স্বর অল্প, শব্দই বেশি ; কোনো কোনো যন্ত্র ধাতুতে তৈরি, সেগুলি স্বরবান। এই ধাতুযন্ত্রে টানা সুর থাকা সম্ভব নয়, থাকবার

দরকার নেই, কেননা টানা সুর গানেরই জন্যে, বিচ্ছিন্ন সুরগুলিতে তালেরই বোল দেয়। আসলে এরা গান গায় গলা দিয়ে নয়, সর্বাঙ্গ দিয়ে ; এদের নাচই যেন পদে পদে টানা সুরের মিড় দেওয়া— বিলিতি নাচের মতো ঝম্পবহুল নয়। অর্থাৎ এদের নাচ বর্ষার ঝমাঝম জলবিন্দুবৃষ্টির মতো নয়, ঝরনার তরঙ্গিত ধারার মতো। তাল যে-ঐক্যকে দেখায় সে হচ্ছে কালের অংশগুলিকে যোজনা ক'রে, গান যে-ঐক্যকে দেখায় সে হচ্ছে রসের অখণ্ডতাকে সম্পূর্ণ ক'রে। তাই বলছি, এদের সংগীতই তাল, এদের নৃত্যই গান। আমাদের দেশে এবং য়ুরোপে গীতাভিনয় আছে, এদের দেশে নৃত্যাভিনয়।

ইতিমধ্যে এখানকার ওলন্দাজ রাজপুরুষ অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। এদের একটা বিশেষত্ব আমার চোখে লাগল। অধীনস্থ জাতের উপর এদের প্রভুত্ব যথেষ্ট নেই, তা নয়, কিন্তু এদের ব্যক্তিগত ব্যবহারে কর্তৃত্বের ঔদ্ধত্য লক্ষ্য করি নি। এখানকার লোকদের সঙ্গে এরা সহজে মেলামেশা করতে পারে। দুই জাতির পরস্পরের মধ্যে বিবাহ সর্বদাই হয় এবং সেই বিবাহের সন্তানেরা পিতৃকুল থেকে ভ্রষ্ট হয় না। এখানে অনেক উচ্চপদের ওলন্দাজ আছে যারা সংকরবর্ণ ; তারা অবজ্ঞাভাজন নয়। এখানকার মানুষকে মানুষ জ্ঞান ক'রে এমন সহজ ব্যবহার কেমন করে সম্ভব হল, এই প্রশ্ন করাতে একজন ওলন্দাজ আমাকে বলেছিলেন, "যাদের অনেক সৈন্য, অনেক যুদ্ধজাহাজ, অনেক সম্পদ, অনেক সাম্রাজ্য, ভিতরে ভিতরে সর্বদাই তাদের মনে থাকে যে তারা একটা মস্ত-কিছু ; এইজন্য ছোটো দরজা দিয়ে ঢুকতে তাদের অত্যন্ত বেশি সংকুচিত হতে হয়। নিজেদের সর্বদা তত প্রকাণ্ড বড়ো বলে জানবার অবসর আমাদের হয় নি। এই জন্যে সহজে সর্বত্র আমরা ঢুকতে পারি ; এই জন্যে সকলের সঙ্গে মেলামেশা করা আমাদের পক্ষে সহজ।" ইতি ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯২৭[১]

১২

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, আজ বালিদ্বীপে আমাদের শেষ দিন। মুণ্ডুক বলে একটি পাহাড়ের উপর ডাকবাঙলায় আশ্রয় নিয়েছি। এতদিন বালির যে-অংশে ঘুরেছি সমস্তই চাষ-করা বাস-করা জায়গা ; লোকালয়গুলি নারকেল, সুপারি, আম, তেঁতুল, সজনে

১ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত।

গাছের ঘনশ্যামল বেষ্টনে ছায়াবিষ্ট। এখানে এসে পাহাড়ের গা জুড়ে প্রাচীন অরণ্য দেখা গেল। কতকটা শিলঙ পাহাড়ের মতো। নীচে স্তরবিন্যস্ত ধানের খেত; পাহাড়ের একটা ফাঁকের ভিতর দিয়ে দূরে সমুদ্রের আভাস পাওয়া যায়। এখানে দূরের দৃশ্যগুলি প্রায়ই বাষ্পে অবগুণ্ঠিত। আকাশে অল্প একটু অস্পষ্টতার আবরণ, এখানকার পুরানো ইতিহাসের মতো। এখন শুক্লপক্ষের রাত্রি, কিন্তু এমন রাত্রে আমাদের দেশের চাঁদ দিগঙ্গনাদের কাছে যেমন সম্পূর্ণ ধরা দেয় এখানে তা নয়; যে-ভাষা খুব ভালো করে জানি নে যেন সেইরকম তার জ্যোৎস্নাটি।

এতদিন এ দেশটা একটি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল। আহূত রবাহূত বহু লোকের ভিড়। কত ফোটোগ্রাফওয়ালা, সিনেমাওয়ালা, কত ক্ষণিক-পরিব্রাজকের দল। পান্থশালা নিঃশেষে পরিপূর্ণ। মোটরের ধুলোয় এবং ধমকে আকাশ ম্লান। খেয়া-জাহাজ কাল জাভা অভিমুখে ফিরবে, তাই প্রতিবর্তী যাত্রীর দল আজ নানা পথ বিপথ দিয়ে চঞ্চল হয়ে ধাবমান। এত সমারোহ কেন, সে কথা জিজ্ঞাসা করতে পারো।

বালির লোকেরা যারা হিন্দু, যারা নিজের ধর্মকে আগম বলে, শ্রাদ্ধক্রিয়া তাদের কাছে একটা খুব বড়ো উৎসব। কেননা, যথানিয়মে মৃতের সংকার হলে তার আত্মা কুয়াশা হয়ে পৃথিবীতে এসে পুনর্জন্ম নেয়; তার পর বারে বারে সংস্কার পেতে পেতে শেষকালে শিবলোকে চরম মোক্ষে তার উদ্ধার।

এবারে আমরা যাঁদের শ্রাদ্ধে এসেছি তাঁরা দেবত্ব পেয়েছেন বলে আত্মীয়েরা স্থির করেছে, তাই এত বেশি ঘটা। এত ঘটা অনেক বৎসর হয় নি, আর কখনো হবে কি না সকলে সন্দেহ করছে। কেননা, আধুনিক কাল তার কাটারি হাতে পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছে অনুষ্ঠানের বাহুল্যকে খর্ব করবার জন্যে; তার একমাত্র উৎসাহ উপকরণ-বাহুল্যের দিকে।

এখানকার লোকে বলছে, সমারোহে খরচ হবে এখানকার টাকায় প্রায় চল্লিশ হাজার, আমাদের টাকায় পঞ্চাশ হাজার। ব্যয়ের এই পরিমাণটা সকলেরই কাছে অত্যন্ত বেশি বলেই ঠেকছে। আমাদের দেশের বড়ো লোকের শ্রাদ্ধে পঞ্চাশ হাজার টাকা বেশি কিছুই নয়। কিন্তু প্রভেদ হচ্ছে, আমাদের শ্রাদ্ধের খরচ ঘটা করবার জন্যে তেমন নয় যেমন পুণ্য করবার জন্যে। তার প্রধান অঙ্গই দান, পরলোকগত আত্মার কল্যাণকামনায়। এখানকার শ্রাদ্ধেও স্থানীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে অর্ঘ্য ও আহার্য দান যে নেই তা নয়, কিন্তু এর সব চেয়ে ব্যয়সাধ্য অংশ সাজসজ্জা। সে-সমস্তই চিতায় পুড়ে ছাই হয়। এই দেহকে নষ্ট করে ফেলতে এদের আন্তরিক অনুমোদন নেই, সেটা সেদিনকার

অনুষ্ঠানের একটা ব্যাপারে বোঝা যায়। কালো গোরুর মূর্তি, তার পেটের মধ্যে মৃতদেহ, রাস্তা দিয়ে এটাকে যখন বহন করে নিয়ে যায় তখন শোভাযাত্রার ভিন্ন ভিন্ন দলের মধ্যে ঠেলাঠেলি পড়ে যায়। যেন ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা, যেন অনিচ্ছা। বাহকেরা তাড়া খায়, ঘুরপাক দেয়। এইখানেই আগম অর্থাৎ যে-ধর্ম বাইরে থেকে এসেছে তার সঙ্গে এদের নিজের হৃদয়বৃত্তির বিরোধ। আগমেরই হল জিত, দেহ হল ছাই।

উবুদ বলে জায়গার রাজার ঘরে এই অনুষ্ঠান। তিনি যখন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ বলে সুনীতির পরিচয় পেলেন সুনীতিকে জানালেন, শ্রাদ্ধক্রিয়া এমন সর্বাঙ্গসম্পূর্ণভাবে এ দেশে পুনর্বার হবার সম্ভাবনা খুব বিরল ; অতএব, এই অনুষ্ঠানে সুনীতি যদি যথারীতি শ্রাদ্ধের বেদমন্ত্র পাঠ করেন তবে তিনি তৃপ্ত হবেন। সুনীতি ব্রাহ্মণসজ্জায় ধূপধুনো জ্বালিয়ে "মধুবাতা ঋতায়তে" এবং কঠোপনিষদের শ্লোক প্রভৃতি উচ্চারণ করে শুভকর্ম সম্পন্ন করেন। বহুশত বৎসর পূর্বে একদিন বেদমন্ত্রগানের সঙ্গে এই দ্বীপে শ্রাদ্ধক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল, বহুশত বৎসর পরে এখানকার শ্রাদ্ধে সেই মন্ত্র হয়তো বা শেষবার ধ্বনিত হল। মাঝখানে কত বিস্মৃতি, কত বিকৃতি। রাজা সুনীতিকে পৌরোহিত্যের সম্মানের জন্যে কী দিতে হবে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সুনীতি বলেছিলেন, এই কাজের জন্যে অর্থগ্রহণ তাঁর ব্রাহ্মণবংশের রীতিবিরুদ্ধ। রাজা তাঁকে কর্ম-অন্তে বালির তৈরি মহার্ঘ বস্ত্র ও আসন দান করেছিলেন।

এখানে একটা নিয়ম আছে যে, গৃহস্থের ঘরে এমন কারো যদি মৃত্যু হয় যার জ্যেষ্ঠরা বর্তমান তা হলে সেই গুরুজনদের মৃত্যু না হলে এর আর সংকার হবার জো নেই। এই জন্যে বড়োদের মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত মৃতদেহকে রেখে দিতে হয়। তাই অনেকগুলি দেহের দাহক্রিয়া এখানে একসঙ্গে ঘটে। মৃতকে বহুকাল অপেক্ষা করে থাকতে হয়।

সংকারের দীর্ঘকাল অপেক্ষার আরো একটা কারণ, সংকারের উপকরণ ও ব্যয়-বাহুল্য। তার জন্যে প্রস্তুত হতে দেরি হয়ে যায়। তাই শুনেছি, এখানে কয়েক বৎসর অন্তর বিশেষ বৎসর আসে, তখন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়।

শবাধার বহন করে নিয়ে যাবার জন্যে রথের মতো যে একটা মস্ত উঁচু যান তৈরি হয়, অনেকসংখ্যক বাহকে মিলে সেটাকে চিতার কাছে নিয়ে যায়। এই বাহনকে বলে ওয়াদা। আমাদের দেশে ময়ূরপংখি যেমন ময়ূরের মূর্তি দিয়ে সজ্জিত, তেমনি এদের এই ওয়াদার গায়ে প্রকাণ্ড বড়ো একটি গরুড়ের মুখ ; তার দুই-ধারে বিস্তীর্ণ মস্ত দুই পাখা, সুন্দর করে তৈরি। শিল্পনৈপুণ্যে বিস্মিত হতে হয়। শ্রাদ্ধের এই নানাবিধ উপকরণের আয়োজন মনের ভিতরে সবটা গ্রহণ করা বড়ো কঠিন ; যেটা সব চেয়ে

দৃষ্টি ও মনকে আকর্ষণ করে সে হচ্ছে জনতার অবিশ্রাম ধারা। বহু দূর ও নানা দিক থেকে মেয়েরা মাথায় কতরকমের অর্ঘ্য বহন করে সার বেঁধে রাস্তা দিয়ে চলেছে। দূরে দূরে, গ্রামে গ্রামে, যেখানে অর্ঘ্য-মাথায় বাহকেরা যাত্রা করতে প্রস্তুত, সেখানে গ্রামের তরুচ্ছায়ায় গামেলান বাজিয়ে এক-একটি স্বতন্ত্র উৎসব চলছে। সর্বসাধারণে মিলে দলে দলে এই অনুষ্ঠানের জন্যে আপন আপন উপহার নিয়ে এসে যজ্ঞক্ষেত্রে জমা করে দিচ্ছে। অর্ঘ্যগুলি যেমন-তেমন করে আনা নয়, সমস্ত বহু যত্নে সুসজ্জিত। সেদিন দেখলুম, ইয়াং-ইয়াং বলে এক শহরের রাজা বহু বাহনের মাথায় তাঁর উপহার পাঠালেন। সকলের পিছনে এলেন তাঁর প্রাসাদের পুরনারীরা। কী শোভা, কী সজ্জা, কী আভিজাত্যের বিনয়সৌন্দর্য! এমনি করে নানা পথ বেয়ে বেয়ে বহুবর্ণ-বিচিত্র তরঙ্গিত উৎসবের অবিরাম প্রবাহ। দেখে দেখে চোখের তৃপ্তির শেষ হয় না।

সব চেয়ে এই কথাটি মনে হয়, এইরকম বহুদূরব্যাপী উৎসবের টানে বহু মানুষের আনন্দমিলনটি কী কল্যাণময়। এই মিলন কেবলমাত্র একটা মেলা বসিয়ে বহু লোক জড়ো হওয়া নয়। এই মিলনটির বিচিত্র সুন্দর অবয়ব। নানা গ্রামে, নানা ঘরে, এই উৎসবমূর্তিকে অনেক দিন থেকে নানা মানুষে বসে বসে নিজের হাতে সুসম্পূর্ণ করে তুলেছে। এ হচ্ছে বহুজনের তেমনি সম্মিলিত সৃষ্টি যেমন ক'রে এরা নানা লোক ব'সে, নানা যন্ত্রে তাল মিলিয়ে, সুর মিলিয়ে, একটা সচল ধ্বনিমূর্তি তৈরি করে তুলতে থাকে। কোথাও অনাদর নেই, কুশ্রীতা নেই। এত নিবিড় লোকের ভিড়, কোথাও একটুও কলহের আভাস মাত্র দেখা গেল না। জনতার মধ্যে মেয়েদের সমাবেশ খুবই বেশি, তাতে একটুও আপদের সৃষ্টি হয় নি। বহুলোকের মিলন যেখানে গ্লানিহীন সৌন্দর্যে বিকশিত, যথার্থ সভ্যতার লক্ষ্মীকে সেইখানেই তো আসীন দেখি; যেখানে বিরোধ ঠেকাবার জন্যে পুলিসবিভাগের লাল পাগড়ি সেখানে নয়; যেখানে অন্তরের আনন্দে মানুষের মিলন কেবল-যে নিরাময় নিরাপদ তা নয়, আপনা-আপনি ভিতরের থেকে সৌন্দর্যে ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ, সেইখানেই সভ্যতার উৎকর্ষ। এই জিনিসটিকে এমনই সুসম্পূর্ণভাবে ইচ্ছা করি নিজের দেশে। কিন্তু, এই ছোটো দ্বীপের রাস্তার ধারে যে-ব্যাপারটিকে দেখা গেল সে কি সহজ কথা। কত কালের সাধনায়, ভিতরের কত গ্রন্থি মোচন ক'রে তবে এইটুকু জিনিস সহজ হয়। জড়ো হওয়া শক্ত নয়, এক হওয়াই শক্ত। সেই ঐক্যকে সকলের সৃষ্টিশক্তি দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, সুন্দর করে তোলা কতই শক্তিসাধ্য। আমাদের মিলিত কাজকে সকলে এক হয়ে উৎসবের রূপ দেওয়া আবশ্যক। আনন্দকে সুন্দরকে নানা মূর্তিতে নানা উপলক্ষে প্রকাশ করা চাই। সেই প্রকাশে সকলেই আপন-আপন ইচ্ছার, আপন-আপন শক্তির, যোগদান করতে থাকলে তবেই আমাদের ভিতরকার খোঁচাগুলো

ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হয়ে যায়, ঝরনার জল ক্রমাগত বইতে থাকলে তলার নুড়িগুলি যেমন সুডোল হয়ে আসে। আমাদের অনেক তপস্বী মনে করেন, সাধনায় জ্ঞান ও কর্মই যথেষ্ট। কিন্তু, বিধাতার রচনায় তিনি দেখিয়েছেন শুধু স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া নয়, রসেই সৃষ্টির চরম সম্পূর্ণতা। মরুর মধ্যে যা-কিছু শক্তি সমস্তই বিরোধের শক্তি, বিনাশের শক্তি। রস যখন সেখানে আসে তখনই প্রাণ আসে; তখন সব শক্তি সেই রসের টানে ফুল ফোটায়, ফল ধরায়; সৌন্দর্যে কল্যাণে সে উৎসবের রূপ ধারণ করে।

বেলা আটটা বাজল। বারান্দার সামনে গোটা-দুইতিন মোটরগাড়ি জমা হয়েছে। সুরেনে সুনীতিতে মিলে নানা আয়তনের বাক্সে ব্যাগে ঝুলিতে থলিতে গাড়ি বোঝাই করছেন। তাঁরা একদল আগে থাকতেই খেয়াঘাটের দিকে রওনা হবার অভিমুখী। নিকটের পাহাড়ের ঘনসবুজ অরণ্যের 'পরে রৌদ্র পড়েছে; দূরের পাহাড় নীলাভ বাষ্পে আবৃত। দক্ষিণ শৈলতটের সমুদ্রখণ্ডটি নিশ্বাসের-ভাপ-লাগা আয়নার মতো ম্লান। ওই কাছেই গিরিবক্ষসংলগ্ন পল্লীটির বনবেষ্টনের মধ্যে সুপুরি গাছের শাখাগুলি শীতের বাতাসে দুলছে। ঝরনা থেকে মেয়েরা জলপাত্রে জল বয়ে আনছে। নীচে উপত্যকায় শস্যক্ষেত্রের ওপারে, সামনের পাহাড়ের গায়ে ঘন গাছের অবকাশে লোকালয়ের আভাস দেখা যায়। নারকেলগাছগুলি মেঘমুক্ত আকাশের দিকে পাতার অঞ্জলি তুলে ধরে সূর্যালোক পান করছে।

এখান থেকে বিদায় নেবার মুহূর্তে মনে মনে ভাবছি, দ্বীপটি সুন্দর, এখানকার লোকগুলিও ভালো, তবুও মন এখানে বাসা বাঁধতে চায় না। সাগর পার হয়ে ভারতবর্ষের আহ্বান মনে এসে পৌঁচচ্ছে। শিশুকাল থেকে ভারতবর্ষের ভিতর দিয়েই বিশ্বের পরিচয় পেয়েছি বলেই যে এমন হয় তা নয়; ভারতবর্ষের আকাশে বাতাসে আলোতে, নদীতে প্রান্তরে, প্রকৃতির একটি উদারতা দেখেছি; চিরদিনের মতো আমার মন তাতে ভুলেছে। সেখানে বেদনা অনেক পাই, লোকালয়ে দুর্গতির মূর্তি চারি দিকে; তবুও সমস্তকে অতিক্রম করে সেখানকার আকাশে অনাদি কালের যে-কণ্ঠধ্বনি শুনতে পাই তাতে একটি বৃহৎ মুক্তির আস্বাদ আছে। ভারতবর্ষের নীচের দিকে ক্ষুদ্রতার বন্ধন, তুচ্ছতার কোলাহল, হীনতার বিড়ম্বনা, যত বেশি এমন আর কোথাও দেখি নি; তেমনি উপরের দিকে সেখানে বিরাটের আসনবেদীর, অপরিসীমের অবারিত আমন্ত্রণ। অতি দূরকালের তপোবনের ওঙ্কারধ্বনি এখনো সেখানকার আকাশে যেন নিত্য-নিশ্বসিত। তাই, আমার মনের কাছে আজকের এই প্রশান্ত প্রভাত সেই দিকেই তার আলোকের ইঙ্গিত প্রসারিত করে রয়েছে। ইতি

৮ই সেপ্টেম্বর ১৯২৭

পুনশ্চ : দ্রুত চলতে চলতে উপরে উপরে যে-ছবি চোখে জাগল, যে-ভাব মনের উপর দিয়ে ভেসে গেল, তাই লিখে দিয়েছি, কিন্তু তাই বলে এটাকে বালির প্রকৃত বিবরণ বলে গণ্য করা চলবে না। এই ছবিটিকে হয়তো উপরকার আবরণের জরি বলাও চলে। কিন্তু উপরের আবরণে ভিতরের ভাবের ছাপ নিত্যই পড়ে তো। অতএব, আবরণটিকে মানুষের পরিচয় নয় বলে উপেক্ষা করা যায় না। যে-আবরণ কৃত্রিম ছদ্মবেশের মতো সত্যকে উপর থেকে চাপা দেয় সেইটেতেই প্রতারণা করে, কিন্তু যে-আবরণ চঞ্চল জীবনের প্রতি মুহূর্তের ওঠায়-পড়ায়, বাঁকায়-চোরায়, দোলায়-কাঁপনে, আপনা-আপনি একটা চেহারা পায় মোটের উপর তাকে বিশ্বাস করা চলে। এখানকার ঘরে মন্দিরে, বেশে ভূষায়, উৎসবে অনুষ্ঠানে, সব-প্রথমেই যেটা খুব করে মনে আসে সেটা হচ্ছে সমস্ত জাতটার মনে শিল্পরচনায় স্বাভাবিক উদ্যম। একজন পাশ্চাত্য আর্টিস্ট এখানে তিন বৎসর আছেন ; তিনি বলেন, এদের শিল্পকলা থেমে নেই, সে আপন বেগে আপন পথ করে নিয়ে এগিয়ে চলেছে, কিন্তু শিল্পী স্বয়ং সে-সম্বন্ধে আত্মবিস্মৃত। তিনি বলেন, কিছুকাল পূর্বে পর্যন্ত এখানে চীনেদের প্রভাব ছিল, দেখতে দেখতে সেটা আপনি ক্ষয়ে আসছে, বালির চিত্ত আপন ভাষাতেই আত্মপ্রকাশ করতে বসেছে। তার কাজে এমন অনায়াস প্রতিভা আছে যে, আধুনিক যে দুই-একটি মূর্তি তিনি দেখেছেন সেগুলি য়ুরোপের শিল্পপ্রদর্শনীতে পাঠালে সেখানকার লোক চমকে উঠবে এই তাঁর বিশ্বাস। এই তো গেল রূপ-উদ্ভাবন করবার এদের স্বাভাবিক শক্তি। তার পরে, এই শক্তিটিই এদের সমাজকে মূর্তি দিচ্ছে। এরা উৎসবে অনুষ্ঠানে নানা প্রণালীতে সেই রূপ সৃষ্টি করবার ইচ্ছাকেই সুন্দর করে প্রকাশ করতে প্রবৃত্ত। যেখানে এই সৃষ্টির উদ্যম নিয়ত সচেষ্ট সেখানে সমস্ত দেশের মুখে একটি শ্রী ও আনন্দ ব্যক্ত হয়। অথচ, জীবনযাত্রার সকল অংশই যে শোভন তা বলা যায় না। এর মধ্যে অনেক জিনিস আছে যা আনন্দকে মারে, অন্ধ সংস্কারের কত কদাচার, কত নিষ্ঠুরতা। যে-মেয়ে বন্ধ্যা প্রেতলোকে গলায় দড়ি বেঁধে তাকে অফলা গাছের ডালে চিরদিনের মতো ঝুলিয়ে রাখা হয়, এখানকার লোকের এই বিশ্বাস। কোনো মেয়ে যদি যমজ সন্তান প্রসব করে,এক পুত্র, এক কন্যা, তা হলে প্রসবের পরেই বিছানা নিজে বহন করে সে শ্মশানে যায় ; পরিবারের লোক যমজ সন্তান তার পিছন-পিছন বহন করে নিয়ে চলে। সেখানে ডালপালা দিয়ে কোনোরকম করে একটা কুঁড়ে বেঁধে তিন চান্দ্রমাস তাকে কাটাতে হয়। দুই মাস ধরে গ্রামের মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হয়, পাপক্ষালনের উদ্দেশে নানাবিধ পূজার্চনা চলে। প্রসূতিকে মাঝে মাঝে কেবল খাবার পাঠানো হয়, সেই কয়দিন তার সঙ্গে সকলরকম ব্যবহার বন্ধ। এই

সুন্দর দ্বীপের চিরবসন্ত ও নিত্য উৎসবের ভিতরে ভিতরে অন্ধ বুদ্ধির মায়া সহস্র বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে, যেমন সে ভারতবর্ষেও ঘরে ঘরে করে থাকে। এর ভয় ও নিষ্ঠুরতা থেকে যে মোহমুক্ত জ্ঞানের দ্বারা মানুষকে বাঁচায় যেখানে তার চর্চা নেই, তার প্রতি বিশ্বাস নেই, সেখানে মানুষের আত্মাবমাননা আত্মপীড়ন থেকে তাকে কে বাঁচাবে। তবুও এইগুলোকেই প্রধান করে দেখবার নয়। জ্যোতির্বিদের কাছে সূর্যের কলঙ্ক ঢাকা পড়ে না, তবু সাধারণ লোকের কাছে তার আলোটাই যথেষ্ট। সূর্যকে কলঙ্কী বললে মিথ্যা বলা হয় না, তবুও সূর্যকে জ্যোতির্ময় বললেই সত্য বলা হয়। তথ্যের ফর্দ লম্বা করা যে-সব বৈজ্ঞানিকের কাজ তাঁরা পশুসংসারে হিংস্র দাঁতনখের ভীষণতার উপর কলমের ঝোঁক দেবামাত্র কল্পনায় মনে হয়, পশুদের জীবনযাত্রা কেবল ভয়েরই বাহন। কিন্তু, এই-সব অত্যাচারের চেয়ে বড়ো হচ্ছে সেই প্রাণ যা আপনার সদাসক্রিয় উদ্যমে আপনাতেই আনন্দিত, এমন-কি, শ্বাপদের হাত থেকে আত্মরক্ষার কৌশল ও চেষ্টা সেও এই আনন্দিত প্রাণক্রিয়ারই অংশ। ইন্টার্-ওসেন্ নামক যে-মাসিকপত্রে একজন লেখকের বর্ণনা থেকে বালির মেয়েদের দুঃখের বৃত্তান্ত পাওয়া গেল, সেই কাগজেই আর-একজন লেখক সেখানকার শিল্পকুশল উৎসববিলাসী সৌন্দর্যপ্রিয়তাকে আনন্দের সঙ্গে দেখেছেন। তাঁর সেই দেখার আলোতে বোঝা যায়, গ্লানির কলঙ্কটা অসত্য না হলেও সত্যও নয়। এই দ্বীপে আমরা অনেক ঘুরেছি; গ্রামে পথে বাজারে শস্যক্ষেত্রে মন্দিরদ্বারে উৎসবভূমিতে ঝরনাতলায় বালির মেয়েদের অনেক দেখেছি; সব জায়গাতেই তাদের দেখলুম সুস্থ, সুপরিপুষ্ট, সুবিনীত, সুপ্রসন্ন— তাদের মধ্যে পীড়া অপমান অত্যাচারের কোনো চেহারা তো দেখলুম না। খুঁটিয়ে খবর নিলে নিশ্চয় কলঙ্কের কথা অনেক পাওয়া যাবে; কিন্তু খুঁটিয়ে-পাওয়া ময়লা কথাগুলো সুতো দিয়ে এক সঙ্গে গাঁথলেই সত্যকে স্পষ্ট করা হবে, এ কথা বিশ্বাস করবার নয়। ইতি

৯ই সেপ্টেম্বর ১৯২৭

সুরবায়া। জাভা[১]

১৩

সুরকর্তা। জাভা

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, বালি থেকে পার হয়ে জাভা দ্বীপে সুরবায়া শহরে এসে নামা গেল। এই জায়গাটা হচ্ছে বিদেশী সওদাগরদের প্রধান আখড়া। জাভার সব চেয়ে বড়ো উৎপন্ন

১ শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লিখিত

জিনিস চিনি, এই ছোটো দ্বীপটি থেকে দেশবিদেশে চালান যাচ্ছে। এমন এক কাল ছিল, পৃথিবীতে চিনি বিতরণের ভার ছিল ভারতবর্ষের। আজ এই জাভার হাট থেকে চিনি কিনে বৌবাজারের ভীমচন্দ্র নাগের সন্দেশ তৈরি হয়। ধরণী স্বভাবত কী দান করেন আজকাল তারই উপরে ভরসা রাখতে গেলে ঠকতে হয়, মানুষ কী আদায় ক'রে নিতে পারে এইটেই হল আসল কথা। গোরু আপনা-আপনি যে-দুধটুকু দেয় তাতে যজ্ঞের আয়োজন চলে না, গৃহস্থের শিশুদের পেট ভরিয়ে বৌবাজারের দোকানে গিয়ে পৌঁছবার পূর্বেই কেঁড়ে শূন্য হয়ে যায়। যারা ওস্তাদ গোয়ালা তারা জানে কিরকম খোরাকি ও প্রজননবিধির দ্বারা গোরুর দুধ বাড়ানো চলে। এই শ্যামল দ্বীপটি ওলন্দাজদের পক্ষে ধরণী-কামধেনুর দুধভরা বাঁটের মতো। তারা জানে, কোন্ প্রণালীতে এই বাঁট কোনোদিন একফোঁটা শুকিয়ে না যায়, নিয়ত দুধে ভরে থাকে; সম্পূর্ণ দুইয়ে-নেবার কৌশলটাও তাদের আয়ত্ত। আমাদের কর্তৃপক্ষও তাঁদের গোয়ালবাড়ি ভারতবর্ষে বসিয়েছেন, চা আর পাট নিয়ে এতকাল তাঁদের হাট গুলজার হল; কিন্তু, এদিকে আমাদের চাষের খেত নির্জীব হয়ে এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে জিব বেরিয়ে পড়ল চাষিদের। এতকাল পরে আজ হঠাৎ তাঁদের নজর পড়েছে আমাদের ফসলহীন দুর্ভাগ্যের প্রতি। কমিশন বসেছে, তার রিপোর্টও বেরোবে। দরিদ্রের চাকাভাঙা মনোরথ রিপোর্টের টানে নড়ে উঠবে কি না জানি নে, কিন্তু রাস্তা বানাবার কাজে যে-সব রাজমজুর লাগবে মজুরি মিলতে তাদের অসুবিধে হবে না। মোট কথা, ওলন্দাজরা এখানে কৃষিক্ষেত্রে খুব ওস্তাদি দেখিয়েছে; তাতে এখানকার লোকের অন্নের সংস্থান হয়েছে, কর্তৃপক্ষেরও ব্যাবসা চলছে ভালো। এর মধ্যে তত্ত্বটা হচ্ছে এই যে, দেশের প্রতি প্রেম জানাবার জন্যে দেশের জিনিস ব্যবহার করব, এটা ভালো কথা; কিন্তু দেশের প্রতি প্রেম জানাবার জন্যে দেশের জিনিস-উৎপাদনের শক্তি বাড়াতে হবে, এটা হল পাকা কথা। এইখানে বিদ্যার দরকার; সেই বিদ্যা বিদেশ থেকে এলেও তাকে গ্রহণ করলে আমাদের জাত যাবে না, পরন্তু জান্ রক্ষা হবে।

সুরবায়াতে তিন দিন আমরা যাঁর বাড়িতে অতিথি ছিলেম তিনি সুরকর্তার রাজবংশের একজন প্রধান ব্যক্তি, কিন্তু তিনি আপন অধিকার ইচ্ছাপূর্বক পরিত্যাগ করে এই শহরে এসে বাণিজ্য করছেন। চিনি রপ্তানির কারবার, তাতে তাঁর প্রভূত মুনফা। চমৎকার মানুষটি, প্রাচীন অভিজাতকুলযোগ্য মর্যাদা ও সৌজন্যের অবতার। তাঁর ছেলে আধুনিক কালের শিক্ষা পেয়েছেন; বিনীত, নম্র, প্রিয়দর্শন— তাঁরই উপরে আমাদের অতিথিপরিচর্যার ভার। বড়ো ভয় ছিল, পাছে অবিশ্রাম অভ্যর্থনার পীড়নে আরাম-অবকাশ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু, সেই অত্যাচার থেকে রক্ষা পেয়েছিলেম।

তাঁদের প্রাসাদের এক অংশ সম্পূর্ণ আমাদের ব্যবহারের জন্যে ছেড়ে দিয়েছিলেন। নিরালায় ছিলেম, ত্রুটিবিহীন আতিথ্যের পনেরো-আনা অংশ ছিল নেপথ্যে। কেবল আহারের সময়েই আমাদের পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ। মনে হত, আমিই গৃহকর্তা, তাঁরা উপলক্ষ মাত্র। সমাদরের অন্যান্য আয়োজনের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস ছিল স্বাধীনতা ও অবকাশ।

এখানে একটি কলাসভা আছে। সেটা মুখ্যত য়ুরোপীয়। এখানকার সওদাগরদের ক্লাবের মতো। কলকাতায় যেমন সংগীতসভা এও তেমনি। কলকাতার সভায় সংগীতের অধিকার যতখানি এখানে কলাবিদ্যার অধিকার তার চেয়ে বেশি নয়। এই-খানে আর্ট সম্বন্ধে কিছু বলবার জন্যে আমার প্রতি অনুরোধ ছিল; যথাসাধ্য বুঝিয়ে বলেছি। একদিন আমাদের গৃহকর্তার বাড়িতে অনেকগুলি এদেশীয় প্রধান ব্যক্তির সমাগম হয়েছিল। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ছিল আমার কাজ। সুনীতিও একদিন তাঁদের সভায় বক্তৃতা করে এসেছেন; সকলের ভালো লেগেছে।

এখানকার ভারতীয়েরাও একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাকে অভ্যর্থনা উপলক্ষে এখানকার রাজপুরুষ ও অন্য অনেককে নিমন্ত্রণ ক'রে চা খাইয়েছিলেন। সেদিন আমি কিছু দক্ষিণাও পেয়েছি। এইভাবে এখানে কেটে গেল, একেবারে এঁদের বাড়ির ভিতরেই। আঙিনায় অনেকগুলি গাছ ও লতাবিতান। আমগাছ, সপেটা, আতা। যে-জাতের আম তাকে এরা বলে মধু, এদের মতে বিশেষভাবে স্বাদু। এবার যথেষ্ট বৃষ্টি হয় নি বলে আমগুলো কাঁচা অবস্থাতেই ঝরে ঝরে পড়ে যাচ্ছে। এখানে ভোজন-কালে যে-আম খেতে পেয়েছি দেশে থাকলে সে-আম কেনার পয়সাকে অপব্যয় আর কেটে খাওয়ার পরিশ্রমটাকে বৃথা ক্লান্তিকর বলে স্থির করতুম, কিন্তু এখানে তার আদরের ত্রুটি হয় নি।

এই আঙিনায় লতামণ্ডপের ছায়ায় আমাদের গৃহকর্ত্রী প্রায়ই বেলা কাটান। চার দিকে শিশুরা গোলমাল করছে, খেলা করছে— সঙ্গে তাদের বুড়ি ধাত্রীরা। মেয়েরা যেখানে-সেখানে বসে কাপড়ের উপর এদেশে-প্রচলিত সুন্দর বাতির ছাপ-দেওয়া কাজে নিযুক্ত। গৃহকর্মের নানা প্রবাহ এই ছায়াস্নিগ্ধ নিভৃত প্রাঙ্গণের চার দিকে আবর্তিত।

পরশু সুরবায়া থেকে দীর্ঘ রেলপথ ও রৌদ্রতাপক্লিষ্ট অপরাহ্নের ছ'টি ঘণ্টা কাটিয়ে তিনটের সময় সুরকর্তায় পৌঁচেছি। জাভার সব চেয়ে বড়ো রাজপরিবারের এইখানেই অবস্থান। ওলন্দাজেরা এঁদের রাজপ্রতাপ কেড়ে নিয়েছে কিন্তু প্রতিপত্তি কাড়তে পারে নি। এই বংশেরই একটি পরিবারের বাড়িতে আছি। তাঁদের উপাধি মঙ্কুনগরো; এঁদেরই এক শাখা সুরবায়ায় আশ্রয় নিয়েছে।

প্রাসাদের একটি নিভৃত অংশ আমরাই অধিকার করে আছি। এখানে স্থান প্রচুর, আরামের উপকরণ যথেষ্ট, আতিথ্যের উপদ্রব নেই। রাজবাড়ি বহুবিস্তীর্ণ, বহুবিভক্ত। আমরা যেখানে আছি তার প্রকাণ্ড একটি অলিন্দ, সাদা মার্বল পাথরে বাঁধানো, সারি সারি কাঠের থামের উপরে ঢালু কাঠের ছাদ। এই রাজপরিবারের বর্ণলাঞ্ছন হচ্ছে সবুজ ও হলদে, তাই এই অলিন্দের থাম ও ছাদ সবুজে সোনালিতে চিত্রিত। অলিন্দের এক ধারে গামেলান-সংগীতের যন্ত্র সাজানো। বৈচিত্র্যেও কম নয়, সংখ্যাতেও অনেক। সাত স্বরের ও পাঁচ স্বরের ধাতুফলকের যন্ত্র অনেক রকমের, অনেক আয়তনের, হাতুড়ি দিয়ে বাজাতে হয়। ঢোলের আকার ঠিক আমাদের দেশেরই মতো, বাজাবার বোল ও কায়দা অনেকটা সেই ধরনের। এ ছাড়া বাঁশি, আর ধনু দিয়ে বাজাবার তাঁতের যন্ত্র।

রাজা স্টেশনে গিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করে এনেছিলেন। সন্ধ্যাবেলায় একত্র আহারের সময় তাঁর সঙ্গে ভালো করে আলাপ হল। অল্প বয়স, বুদ্ধিতে উজ্জ্বল মুখশ্রী। ডাচ্ ভাষায় আধুনিক কালের শিক্ষা পেয়েছেন; ইংরেজি অল্প অল্প বলতে ও বুঝতে পারেন। খেতে বসবার আগে বারান্দার প্রান্তে বাজনা বেজে উঠল, সেইসঙ্গে এখানকার গানও শোনা গেল। সে-গানে আমাদের মতো আস্থায়ী-অন্তরার বিভাগ নেই। একই ধুয়ো বারবার আবৃত্তি করা হয়, বৈচিত্র্য যা-কিছু তা যন্ত্র বাজনায়। পূর্বের চিঠিতেই বলেছি, এদের যন্ত্রবাজনাটা তাল দেবার উদ্দেশে। আমাদের দেশে বাঁয়া তবলা প্রভৃতি তালের যন্ত্র যে-সপ্তকে গান ধরা হয় তারই সা স্বরে বাঁধা; এখানকার তালের যন্ত্রে গানের সব স্বরগুলিই আছে। মনে করো, "তুমি যেয়ো না এখনি, এখনো আছে রজনী" ভৈরবীর এই এক ছত্র মাত্র কেউ যদি ফিরে ফিরে গাইতে থাকে আর নানাবিধ যন্ত্রে ভৈরবীর স্বরেই যদি তালের বোল দেওয়া হয়, আর সেই বোল-যোগেই যদি ভৈরবী রাগিণীর ব্যাখ্যা চলে তা হলে যেমন হয় এও সেইরকম। পরীক্ষা করে দেখলে দেখা যাবে, শুনতে ভালোই লাগে, নানা আওয়াজের ধাতুবাদ্যে স্বরের নৃত্যে আসর খুব জমে ওঠে।

খেয়ে এসে আবার আমরা বারান্দায় বসলুম। নাচের তালে দুটি অল্প বয়সের মেয়ে এসে মেজের উপর পাশাপাশি বসল। বড়ো সুন্দর ছবি। সাজে সজ্জায় চমৎকার সুছন্দ। সোনায়-খচিত মুকুট মাথায়, গলায় সোনার হারে অর্ধচন্দ্রাকার হাঁসুলি, মণিবন্ধে সোনার সর্পকুণ্ডলী বালা, বাহুতে একরকম সোনার বাজুবন্দ— তাকে এরা বলে কীলকবাহু। কাঁধ ও দুই বাহু অনাবৃত, বুক থেকে কোমর পর্যন্ত সোনায়-সবুজে-মেলানো আঁট কাঁচলি; কোমরবন্দ থেকে দুই ধারায় বস্ত্রাঞ্চল কোঁচার মতো সামনে দুলছে। কোমর থেকে পা পর্যন্ত শাড়ির মতোই বস্ত্রবেষ্টনী, সুন্দর বত্তিকশিল্পে

বিচিত্র; দেখবামাত্রই মনে হয়, অজন্তার ছবিটি। এমনতরো বাহুল্যবর্জিত সুপরিচ্ছন্নতার সামঞ্জস্য আমি কখনো দেখি নি। আমাদের নর্তকী বাইজিদের আঁটপায়জামার উপর অত্যন্ত জবড়জঙ্গ কাপড়ের অসৌষ্ঠবতা চিরদিন আমাকে ভারি কুশ্রী লেগেছে! তাদের প্রচুর গয়না ঘাগরা ওড়না ও অত্যন্ত ভারী দেহ মিলিয়ে প্রথমেই মনে হয়, সাজানো একটা মস্ত বোঝা। তার পরে মাঝে মাঝে বাটা থেকে পান খাওয়া, অনুবর্তীদের সঙ্গে কথা কওয়া, ভুরু ও চোখের নানাপ্রকার ভঙ্গিমা ধিক্কারজনক বলে বোধ হয়— নীতির দিক থেকে নয়, রীতির দিক থেকে। জাপানে ও জাভাতে যে-নাচ দেখলুম তার সৌন্দর্য যেমন তার শালীনতাও তেমনি নিখুঁত। আমরা দেখলুম, এই দুটি বালিকার তনু দেহকে সম্পূর্ণ অধিকার করে অশরীরী নাচেরই আবির্ভাব। বাক্যকে অধিকার করেছে কাব্য, বচনকে পেয়ে বসেছে বচনাতীত।

শুনেছি, অনেক য়ুরোপীয় দর্শক এই নাচের অতিমৃদুতা ও সৌকুমার্য ভালোই বাসে না। তারা উগ্র মাদকতায় অভ্যস্ত বলে এই নাচকে একঘেয়ে মনে করে। আমি তো এ নাচে বৈচিত্র্যের একটু অভাব দেখলুম না; সেটা অতি প্রকট নয় বলেই যদি চোখে না পড়ে তবে চোখেরই অভ্যাসদোষ। কেবলই আমার এই মনে হচ্ছিল যে, এ হচ্ছে কলাসৌন্দর্যের একটি পরিপূর্ণ সৃষ্টি, উপাদানরূপে মানুষটি তার মধ্যে একেবারে হারিয়ে গেছে। নাচ হয়ে গেলে এরা যখন বাজিয়েদের মধ্যে এসে বসল তখন তারা নিতান্তই সাধারণ মানুষ। তখন দেখতে পাওয়া যায়, তারা গায়ে রঙ করেছে, কপালে চিত্র করেছে, শরীরের অতিস্ফূর্তিকে নিরস্ত করে দিয়ে একটি নিবিড় সৌষ্ঠব প্রকাশের জন্যে অত্যন্ত আঁট করে কাপড় পরেছে— সাধারণ মানুষের পক্ষে এ সমস্তই অসংগত, এতে চোখকে পীড়া দেয়। কিন্তু, সাধারণ মানুষের এই রূপান্তর নৃত্যকলায় অপরূপই হয়ে ওঠে।

পরদিন সকালে আমরা প্রাসাদের অন্যান্য বিভাগে ও অন্তঃপুরে আহূত হয়েছিলেম। সেখানে স্তম্ভশ্রেণীবিধৃত অতি বৃহৎ একটি সভামণ্ডপ দেখা গেল; তার প্রকাণ্ড ব্যাপ্তি অথচ সুপরিমিত বাস্তুকলার সৌন্দর্য দেখে ভারি আনন্দ পেলুম। এ-সমস্তর উপযুক্ত বিবরণ তোমরা নিশ্চয় সুরেন্দ্রের চিঠি ও চিত্র থেকে পাবে। অন্তঃপুরে অপেক্ষাকৃত ছোটো একটি মণ্ডপে গিয়ে দেখি সেখানে আমাদের গৃহকর্তা ও গৃহস্বামিনী বসে আছেন। রানীকে ঠিক যেন একজন সুন্দরী বাঙালী মেয়ের মতো দেখতে; বড়ো বড়ো চোখ, স্নিগ্ধ হাসি, সংযত সৌষম্যের মর্যাদা ভারি তৃপ্তিকর। মণ্ডপের বাইরে গাছপালা, আর নানারকম খাঁচায় নানা পাখি। মণ্ডপের ভিতরে গানবাজনার, ছায়াভিনয়ের, মুখোশের অভিনয়ের, পুতুলনাচের নানা সরঞ্জাম। একটা টেবিলে বর্তিক শিল্পের

অনেকগুলি কাপড় সাজানো। তার মধ্যে থেকে আমাকে তিনটি কাপড় পছন্দ করে নিতে অনুরোধ করলেন। সেইসঙ্গে আমার দলের প্রত্যেককে একটি একটি করে এই মূল্যবান কাপড় দান করলেন। কাপড়ের উপর এইরকম শিল্পকাজ করতে দু-তিন মাস করে লাগে। রাজবাড়ির পরিচারিকারাই এই কাজে সুনিপুণ।

এই রাজবংশীয়দের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পরিবারের যাঁরা, কাল রাত্রে তাঁদের ওখানে নিমন্ত্রণ ছিল। তাঁর ওখানে রাজকায়দার যতরকমের উপসর্গ। যেমন দুই সারস পাখি পরস্পরকে ঘিরে ঘিরে নানা গম্ভীর ভঙ্গীতে নাচে দেখেছি, এখানকার রেসিডেন্ট্‌ আর এই রাজা পরস্পরকে নিয়ে সেইরকম রাজকীয় চাল বিস্তার করতে লাগলেন। রাজা কিম্বা রাজপুরুষদের একটা পদোচিত মর্যাদা বাইরের দিক থেকে রক্ষা করে চলতে হয় মানি; তাতে সেইসব মানুষের সামান্যতা কিছু ঢাকাও পড়ে, কিন্তু বাড়াবাড়ি করলে তাতে তাদের সাধারণতাকেই হাস্যকরভাবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো হয়।

কাল রাত্রে যে-নাচ হল সে ন'জন মেয়েতে মিলে। তাতে যেমন নৈপুণ্য তেমনি সৌন্দর্য, কিন্তু দেখে মনে হল, কাল রাত্রের সেই নাচে স্বত-উচ্ছ্বসিত প্রাণের উৎসাহ ছিল না; যেন এরা ক্লান্ত, কেবল অভ্যাসের জোরে নেচে যাচ্ছে। কালকের নাচে গুণপনা যথেষ্ট ছিল কিন্তু তেমন করে মনকে স্পর্শ করতে পারে নি। রাজার একটি ছেলে পাশে বসে আমার সঙ্গে আলাপ করছিলেন, তাঁকে আমার বড়ো ভালো লাগল। অল্প বয়স, দুই বছর হল্যাণ্ডে শিক্ষা পেয়েছেন, ওলন্দাজ গবর্নমেণ্টের সৈনিকবিভাগে প্রধান পদে নিযুক্ত। তাঁর চেহারায় ও ব্যবহারে স্বাভাবিক আকর্ষণীশক্তি আছে।

কাল রাত্রে আমাদের এখানেও একটা নাচ হয়ে গেল। পূর্বরাত্রে যে-দুজন বালিকা নেচেছিল তাদের মধ্যে একজন আজ পুরুষ-সঙের মুখোশ পরে সঙের নাচ নাচলে। আশ্চর্য ব্যাপারটা হচ্ছে, এর মধ্যে নাচের শ্রী সম্পূর্ণ রক্ষা করেও ভাবে-ভঙ্গীতে গলার আওয়াজে পুরোমাত্রায় বিদূষকতা করে গেল। পুরুষের মুখোশের সঙ্গে তার অভিনয়ের কিছুমাত্র অসামঞ্জস্য হল না। বেশভূষার সৌন্দর্যেও একটুমাত্র ব্যত্যয় হয় নি। নাচের শোভনতাকে বিকৃত না করেও যে তার মধ্যে ব্যঙ্গবিদ্রূপের রস এমন করে আনা যেতে পারে, এ আমার কাছে আশ্চর্য ঠেকল। এরা প্রধানত নাচের ভিতর দিয়েই সমস্ত হৃদয়ভাব ব্যক্ত করতে চায়, সুতরাং বিদ্রূপের মধ্যেও এরা ছন্দ রাখতে বাধ্য। এরা বিদ্রূপকেও বিরূপ করতে পারে না; এদের রাক্ষসেরাও নাচে। ইতি

১৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৭[১]

১ শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে লিখিত।

১৪

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, শেষ চিঠিতে তোমাকে এখানকার নাচের কথা লিখেছিলুম, ভেবেছিলুম, নাচ সম্বন্ধে শেষ কথা বলা হয়ে গেল। এমন সময়ে সেই রাত্রে আর-এক নাচের বৈঠকে ডাক পড়ল। সেই অতিপ্রকাণ্ড মণ্ডপে আসর; বহুবিস্তীর্ণ শ্বেত পাথরের ভিত্তিতলে বিদ্যুদ্দীপের আলো ঝল্‌মল্ করছে। আহারে বসবার আগে নাচের একটা পালা আরম্ভ হল— পুরুষের নাচ, বিষয়টা হচ্ছে ইন্দ্রজিতের সঙ্গে হনুমানের লড়াই। এখানকার রাজার ভাই ইন্দ্রজিত সেজেছেন; ইনি নৃত্যবিদ্যায় ওস্তাদ। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় ইনি নাচ শিখতে আরম্ভ করেছেন। অল্প বয়সে সমস্ত শরীরটা যখন নম্র থাকে, হাড় যখন পাকে নি, সেই সময়ে এই নাচ শিক্ষাকরা দরকার; দেহের প্রত্যেক গ্রন্থি যাতে অতি সহজে সরে, প্রত্যেক মাংসপেশিতে যাতে অনায়াসে জোর পৌঁছয়, এমন অভ্যাস করা চাই। কিন্তু, নাচ সম্বন্ধে রাজার ভাইয়ের স্বাভাবিক প্রতিভা থাকাতে তাঁকে বেশি চেষ্টা করতে হয় নি।

হনুমান বনের জন্তু, ইন্দ্রজিত সুশিক্ষিত রাক্ষস, দুইজনের নাচের ভঙ্গীতে সেই ভাবের পার্থক্যটি বুঝিয়ে দেওয়া চাই, নইলে রসভঙ্গ হয়। প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে সে হচ্ছে এদের সাজ। সাধারণত আমাদের যাত্রায় নাটকে হনুমানের হনুমানত্ব খুব বেশি করে ফুটিয়ে তুলে দর্শকদের কৌতুক উদ্রেক করবার চেষ্টা হয়। এখানে হনুমানের আভাসটুকু দেওয়াতে তার মনুষ্যত্ব আরো বেশি উজ্জ্বল হয়েছে। হনুমানের নাচে লম্ফ-ঝম্ফ দ্বারা তার বানরস্বভাব প্রকাশ করা কিছুই কঠিন হত না, আর সেই উপায়ে সমস্ত সভা অনায়াসেই অট্টহাস্যে মুখরিত হয়ে উঠত, কিন্তু কঠিন কাজ হচ্ছে হনুমানকে মহত্ত্ব দেওয়া। বাংলাদেশের অভিনয় প্রভৃতি দেখলে বোঝা যায় যে, হনুমানের বীরত্ব, তার একনিষ্ঠ ভক্তি ও আত্মত্যাগের চেয়ে— তার লেজের দৈর্ঘ্য, তার পোড়ামুখের ভঙ্গিমা, তার বানরত্বই বাঙালির মনকে বেশি করে অধিকার করেছে। আমাদের পশ্চিমাঞ্চলে তার উলটো। এমন-কি, হনুমানপ্রসাদ নাম রাখতে বাপমায়ের দ্বিধা বোধ হয় না। বাংলায় হনুমানচন্দ্র বা হনুমানেন্দ্র আমরা কল্পনা করতে পারি নে। এ দেশের লোকেরাও রামায়ণের হনুমানের বড়ো দিকটাই দেখে। নাচে হনুমানের রূপ দেখলুম— পিঠ বেয়ে মাথা পর্যন্ত লেজ, কিন্তু এমন একটা শোভনভঙ্গী যে দেখে হাসি পাবার জো নেই। আর-সমস্তই মানুষের মতো। মুকুট থেকে পা পর্যন্ত ইন্দ্রজিতের সাজসজ্জা একটি সুন্দর ছবি। তার পরে দুইজনে নাচতে নাচতে লড়াই; সঙ্গে সঙ্গে ঢাকে-ঢোলে কাঁসরে-ঘণ্টায় নানাবিধ যন্ত্রে ও মাঝে মাঝে বহু মানুষের কণ্ঠের গর্জনে সংগীত

খুব গম্ভীর প্রবল ও প্রমত্ত হয়ে উঠছে। অথচ, সে সংগীত শ্রুতিকটু একটুও নয়; বহুযন্ত্র-সম্মিলনের সুশ্রাব্য নৈপুণ্য তার উদ্দামতার সঙ্গে চমৎকার সম্মিলিত।

নাচ, সে বড়ো আশ্চর্য। তাতে যেমন পৌরুষ সৌন্দর্যও তেমনি। লড়াইয়ের দ্বন্দ্ব-অভিনয়ে নাচের প্রকৃতি একটুমাত্র এলোমেলো হয়ে যায় নি। আমাদের দেশের স্টেজে রাজপুত বীরপুরুষের বীরত্ব যেরকম নিতান্ত খেলো এ তা একেবারেই নয়। প্রত্যেক ভঙ্গীতে ভারি একটা মর্যাদা আছে। গদাযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ, মুষলের আঘাত, সমস্তই ত্রুটিমাত্র-বিহীন নাচে ফুটে উঠেছে। সমস্তর মধ্যে অপূর্ব একটি শ্রী অথচ দৃপ্ত পৌরুষের আলোড়ন। এর আগে এখানে মেয়েদের নাচ দেখেছি, দেখে মুগ্ধও হয়েছি, কিন্তু এই পুরুষের নাচের তুলনায় তাকে ক্ষীণ বোধ হল। এর স্বাদ তার চেয়ে অনেক বেশি প্রবল। যখন ধ্রুপদের নেশায় পেয়ে বসে তখন টপ্পার নিছক মিষ্টতা হালকা বোধ হয়, এও সেইরকম।

আজ সকালে দশটার সময়ে আমাদের এখানেই গৃহকর্তা আর-একটি নাচের ব্যবস্থা করেছিলেন। মেয়ে দুজনে পুরুষের ভূমিকা নিয়েছিল। অর্জুন আর সুবলের যুদ্ধ। গল্পটা হয়তো মহাভারতে আছে কিন্তু আমার তো মনে পড়ল না। ব্যাপারটা হচ্ছে— কোন্‌-এক বাগানে অর্জুনের অস্ত্র ছিল, সেই অস্ত্র চুরি করেছে সুবল, সে খুঁজে বেড়াচ্ছে অর্জুনকে মারবার জন্যে। অর্জুন ছিল বাগানের মালী-বেশে। খানিকটা কথাবার্তার পরে দুজনের লড়াই। সুবলের কাছে বলরামের লাঙল অস্ত্রটা ছিল। যুদ্ধ করতে করতে অর্জুন সেটা কেড়ে নিয়ে তবে সুবলকে মারতে পারলে।

নটীরা যে মেয়ে সেটা বুঝতে কিছুই বাধে না, অতিরিক্ত যত্নে সেটা লুকোবার চেষ্টাও করে নি। তার কারণ, যারা নাচছে তারা মেয়ে কি পুরুষ সেটা গৌণ, নাচটা কী সেইটেই দেখবার বিষয়। দেহটা মেয়ের কিন্তু লড়াইটা পুরুষের, এর মধ্যে একটা বিরুদ্ধতা আছে বলেই এই অদ্ভুত সমাবেশে বিষয়টা আরো যেন তীব্র হয়ে ওঠে। কমনীয়তার আধারে বীররসের উচ্ছলতা। মনে করো না— বাঘ নয়, সিংহ নয়, জবাফুলে ধুতরাফুলে সাংঘাতিক হানাহানি, ডাঁটায় ডাঁটায় সংঘর্ষ, পাপড়িগুলি ছিন্নবিচ্ছিন্ন; এদিকে বনসভা কাঁপিয়ে বৈশাখী ঝড়ের গামেলান বাজছে, গুরুগুরু মেঘের মৃদঙ্গ, গাছের ডালে ডালে ঠকাঠকি, আর সোঁ সোঁ শব্দে বাতাসের বাঁশি।

সব-শেষে এলেন রাজার ভাই। এবার তিনি একলা নাচলেন। তিনি ঘটোৎকচ। হাস্যরসিক বাঙালি হয়তো ঘটোৎকচকে নিয়ে বরাবর হাসাহাসি করে এসেছে। এখানকার লোকচিত্তে ঘটোৎকচের খুব আদর। সেইজন্যেই মহাভারতের গল্প এদের হাতে আরো অনেকখানি বেড়ে গেল। এরা ঘটোৎকচের সঙ্গে ভার্গিবা (ভার্গবী) বলে এক

মেয়ের ঘটালে বিয়ে। সে মেয়েটি আবার অর্জুনের কন্যা। বিবাহ্ সম্বন্ধে এদের প্রথা য়ুরোপের কাছাকাছি যায়। খুড়তোত জাঠতোত ভাইবোনে বাধা নেই। ভাগিবার গর্ভে ঘটোৎকচের একটি ছেলেও আছে, তার নাম শশিকিরণ। যা হোক, আজকের নাচের বিষয়টা হচ্ছে, প্রিয়তমাকে স্মরণ করে বিরহী ঘটোৎকচের ঔৎসুক্য। এমন-কি, মাঝে মাঝে মূর্ছার ভাবে সে মাটিতে বসে পড়ছে, কল্পনায় আকাশে তার ছবি দেখে সে ব্যাকুল। অবশেষে আর থাকতে না পেয়ে প্রেয়সীকে খুঁজতে সে উড়ে চলে গেল। এর মধ্যে একটি ভাববার জিনিস আছে। য়ুরোপীয় শিল্পীর এঞ্জেলদের মতো এরা ঘটোৎকচের পিঠে নকল পাখা বসিয়ে দেয় নি। চাদরখানা নিয়ে নাচের ভঙ্গীতে ওড়ার ভাব দেখিয়েছে। এর থেকে মনে পড়ে গেল শকুন্তলা নাটকে কবির নির্দেশবাক্য— রথবেগং নাটয়তি। বোঝা যাচ্ছে, রথবেগটা নাচের দ্বারাই প্রকাশ হত, রথের দ্বারা নয়।

রামায়ণের মহাভারতের গল্প এ দেশের লোকের মনকে জীবনকে যে কিরকম গভীর-ভাবে অধিকার করেছে তা এই কদিনেই স্পষ্ট বোঝা গেল। ভূগোলের বইয়ে পড়া গেছে, বিদেশ থেকে অনুকূল ক্ষেত্রে কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদের নতুন আমদানি হবার অনতি-কাল পরেই দেখতে দেখতে তারা সমস্ত দেশকে ছেয়ে ফেলেছে; এমন-কি, যেখান থেকে তাদের আনা হয়েছে সেখানেও তাদের এমন অপরিমিত প্রভাব নেই। রামায়ণ-মহাভারতের গল্প এদের চিত্তক্ষেত্রে তেমনি করে এসে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। চিত্তের এমন প্রবল উদ্‌বোধন কলারচনায় নিজেকে প্রকাশ না করে থাকতে পারে না। সেই প্রকাশের অপর্যাপ্ত আনন্দ দেখা দিয়েছিল বরোবুদরের মূর্তিকল্পনায়। আজ এখানকার মেয়েপুরুষ নিজেদের দেহের মধ্যেই যেন মহাকাব্যের পাত্রদের চরিতকথাকে নৃত্যমূর্তিতে প্রকাশ করছে; ছন্দে ছন্দে এদের রক্তপ্রবাহে সেই সকল কাহিনী ভাবের বেগে আন্দোলিত।

এ ছাড়া কত রকম-বেরকমের অভিনয়, তার অধিকাংশই এই-সকল বিষয় নিয়ে। বাইরের দিকে ভারতবর্ষের থেকে এরা বহু শতাব্দী সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন; তবু এতকাল এই রামায়ণ মহাভারত নিবিড়ভাবে ভারতবর্ষের মধ্যেই এদের রক্ষা করে এসেছে। ওলন্দাজরা এই দ্বীপগুলিকে বলে 'ডাচ ইণ্ডীস,' বস্তুত এদের বলা যেতে পারে 'ব্যাস ইণ্ডীস'।

পূর্বেই বলেছি, এরা ঘটোৎকচের ছেলের নাম রেখেছে শশিকিরণ। সংস্কৃত ভাষা থেকে নাম রচনা এদের আজও চলেছে। মাঝে মাঝে নামকরণ অদ্ভুতরকম হয়। এখানকার রাজবৈদ্যের উপাধি ক্রীড়নির্মল। আমরা যাকে নিরাময় বা নীরোগ বলে

থাকি এরা নির্মল শব্দকে সেই অর্থ দিয়েছে। এদিকে ক্রীড় শব্দ আমাদের অভিধানে খেলা, কিন্তু ক্রীড় বলতে এখানে বোঝাচ্ছে উদ্যোগ। রোগ দূর করাতেই যার উদ্যোগ সেই হল ক্রীড়নির্মল। ফসলের খেতে যে সেঁচ দেওয়া হয় তাকে এরা বলে সিন্ধু-অমৃত। এখানে জল অর্থেই সিন্ধু কথার ব্যবহার, ক্ষেত্রকে যে-জলসেঁচ মৃত্যু থেকে বাঁচায় সেই হল সিন্ধু-অমৃত। আমাদের গৃহস্বামীর একটি ছেলের নাম সরোষ, আর-একটির নাম সন্তোষ। বলা বাহুল্য, সরোষ বলতে এখানে রাগী মেজাজের লোক বোঝায় না, বুঝতে হবে সতেজ। রাজার মেয়েটির নাম কুসুমবর্ধিনী। অনন্তকুসুম, জাতিকুসুম, কুসুমায়ুধ, কুসুমব্রত, এমন সব নামও শোনা যায়। এদের নামে যেমন বিশুদ্ধ ও সুগম্ভীর সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার এমনতরো আমাদের দেশে দেখা যায় না। যেমন আত্মসুবিজ্ঞ, শাস্ত্রাত্ম, বীরপুস্তক, বীর্যসুশাস্ত্র, সহস্রপ্রবীর, বীর্যসুব্রত, পদ্মসুশাস্ত্র, কৃতাধিরাজ, সহস্রসুগন্ধ, পূর্ণপ্রণত, যশোবিদগ্ধ, চক্রাধিরাজ, মৃতসঞ্জয়, আর্যসুতীর্থ, কৃতস্মর, চক্রাধিব্রত, সূর্যপ্রণত, কৃতবিভব।

সেদিন যে-রাজার বাড়িতে গিয়েছিলেম তাঁর নাম সুসুহুনন পাকু-ভুবন। তাঁরই এক ছেলের বাড়িতে কাল আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল, তাঁর নাম অভিমন্যু। এঁদের সকলেরই সৌজন্য স্বাভাবিক, নম্রতা সুন্দর। সেখানে মহাভারতের বিরাটপর্ব থেকে ছায়াভিনয়ের পালা চলছিল। ছায়াভিনয় এ দেশ ছাড়া আর কোথাও দেখি নি, অতএব বুঝিয়ে বলা দরকার। একটা সাদা কাপড়ের পট টাঙানো, তার সামনে একটা মস্ত প্রদীপ উজ্জ্বল শিখা নিয়ে জ্বলছে; তার দুই ধারে পাতলা চামড়ায় আঁকা মহাভারতের নানা চরিত্রের ছবি সাজানো, তাদের হাতপাগুলো দড়ির টানে নড়ানো যায় এমনভাবে গাঁথা। এই ছবিগুলি এক-একটা লম্বা কাঠিতে বাঁধা। একজন সুর করে গল্পটা আউড়ে যায়, আর সেই গল্প-অনুসারে ছবিগুলিকে পটের উপরে নানা ভঙ্গীতে নাড়াতে দোলাতে চালাতে থাকে। ভাবের সঙ্গে সংগতি রেখে গামেলান বাজে। এ যেন মহাভারত-শিক্ষার একটা ক্লাসে পাঠের সঙ্গে ছবির অভিনয়-যোগে বিষয়টা মনে মুদ্রিত করে দেওয়া। মনে করো, এমনি করে যদি স্কুলে ইতিহাস শেখানো যায়, মাস্টারমশায় গল্পটা বলে যান আর একজন পুতুল-খেলাওয়ালা প্রধান প্রধান ব্যাপারগুলো পুতুলের অভিনয় দিয়ে দেখিয়ে যেতে থাকে, আর সঙ্গে সঙ্গে ভাব-অনুসারে নানা সুরে তালে বাজনা বাজে, ইতিহাস শেখাবার এমন সুন্দর উপায় কি আর হতে পারে।

মানুষের জীবন বিপদসম্পদ-সুখদুঃখের আবেগে নানাপ্রকার রূপে ধ্বনিতে স্পর্শে লীলায়িত হয়ে চলছে; তার সমস্তটা যদি কেবল ধ্বনিতে প্রকাশ করতে হয় তা হলে সে একটা বিচিত্র সংগীত হয়ে ওঠে; তেমনি আর-সমস্ত ছেড়ে দিয়ে সেটাকে কেবল-

মাত্র যদি গতি দিয়ে প্রকাশ করতে হয় তা হলে সেটা হয় নাচ। ছন্দোময় সুরই হোক আর নৃত্যই হোক, তার একটা গতিবেগ আছে, সেই বেগ আমাদের চৈতন্যে রসচাঞ্চল্য সঞ্চার করে তাকে প্রবলভাবে জাগিয়ে রাখে। কোনো ব্যাপারকে নিবিড় করে উপলব্ধি করাতে হলে আমাদের চৈতন্যকে এইরকম বেগবান করে তুলতে হয়। এই দেশের লোক ক্রমাগতই সুর ও নাচের সাহায্যে রামায়ণ-মহাভারতের গল্পগুলিকে নিজের চৈতন্যের মধ্যে সর্বদাই দোলায়িত করে রেখেছে। এই কাহিনীগুলি রসের ঝরনাধারায় কেবলই এদের জীবনের উপর দিয়ে প্রবাহিত। রামায়ণ-মহাভারতকে এমনি নানাবিধ প্রাণবান উপায়ে সর্বতোভাবে আত্মসাৎ করবার চেষ্টা। শিক্ষার বিষয়কে একান্ত করে গ্রহণ ও ধারণ করবার প্রকৃষ্ট প্রণালী কী তা যেন সমস্ত দেশের লোকে মিলে উদ্ভাবন করেছে ; রামায়ণ-মহাভারতকে গভীর করে পাবার আগ্রহে ও আনন্দেই এই উদ্ভাবনা স্বাভাবিক হল।

কাল যে ছবির অভিনয় দেখা গেল তাও প্রধানতই নাচ, অর্থাৎ ছন্দোময় গতির ভাষা দিয়ে গল্প-বলা। এর থেকে একটা কথা বোঝা যাবে এ দেশে নাচের মনোহারিতা ভোগ করবার জন্যেই নাচ নয় ; নাচটা এদের ভাষা। এদের পুরাণ ইতিহাস নাচের ভাষাতেই কথা কইতে থাকে। এদের গামেলানের সংগীতটাও সুরের নাচ। কখনো দ্রুত, কখনো বিলম্বিত, কখনো প্রবল, কখনো মৃদু, এই সংগীতটাও সংগীতের জন্যে নয়, কোনো একটা কাহিনীকে নৃত্যচ্ছন্দের অনুষঙ্গ দেবার জন্যে।

দীপালোকিত সভায় এসে যখন প্রথম বসলুম তখন ব্যাপারখানা দেখে কিছুই বুঝতে পারা গেল না। বিরক্ত বোধ হতে লাগল। খানিক বাদে আমাকে পটের পশ্চাৎভাগে নিয়ে গেল। সেদিকে আলো নেই, সেই অন্ধকার ঘরে মেয়েরা বসে দেখছে। এদিকটাতে ছবিগুলি অদৃশ্য, ছবিগুলিকে যে-মানুষ নাচাচ্ছে তাকেও দেখা যায় না, কেবল আলোকিত পটের উপর অন্য পিঠের ছবির ছায়াগুলি নেচে বেড়াচ্ছে। যেন উত্তানশায়ী শিবের বুকের উপরে মহামায়ার নাচ। জ্যোতির্লোকে যে-সৃষ্টিকর্তা আছেন তিনি যখন নিজের সৃষ্টিপটের আড়ালে নিজেকে গোপন রাখেন তখন আমরা সৃষ্টিকে দেখতে পাই। সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সৃষ্টির অবিশ্রাম যোগ আছে বলে যে জানে সে-ই তাকে সত্য বলে জানে। সেই যোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে এই চঞ্চল ছায়াগুলোকে নিতান্তই মায়া বলে বোধ হয়। কোনো কোনো সাধক পটটাকে ছিঁড়ে ফেলে ওপারে গিয়ে দেখতে চায়, অর্থাৎ, সৃষ্টিকে বাদ দিয়ে সৃষ্টিকর্তাকে দেখবার চেষ্টা— কিন্তু তার মতো মায়া আর কিছুই হতে পারে না। ছায়ার খেলা দেখতে দেখতে এই কথাটাই কেবল আমার মনে হচ্ছিল।

আমি যখন চলে আসছি আমাদের নিমন্ত্রণকর্তা আমাকে খুব একটি মূল্যবান উপহার দিলেন। বড়ো একটি বাটিক শিল্পের কাপড়। বললেন, এইরকমের বিশেষ কাপড় রাজবংশের ছেলেরা ছাড়া কেউ পরতে পায় না। সুতরাং, এ জাতের কাপড় আমি কোথাও কিনতে পেতুম না।

আমাদের এখানকার পালা আজ শেষ হল। কাল যাব যোগ্যকর্তায়। সেখানকার রাজবাড়িতেও নাচগান প্রভৃতির রীতিপদ্ধতি বিশুদ্ধ প্রাচীনকালের, অথচ এখানকার সঙ্গে পার্থক্য আছে। যোগ্যকর্তা থেকে বোরোবুদুর কাছেই; মোটরে ঘণ্টাখানেকের পথ। আরো দিন পাঁচ-ছয় লাগবে এই সমস্ত দেখে শুনে নিতে, তার পরে ছুটি। ইতি ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৭[১]

১৫

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, এখানকার দেখাশুনো প্রায় শেষ হয়ে এল। ভারতবর্ষের সঙ্গে জোড়াতাড়া-দেওয়া এদের লোকযাত্রা দেখে পদে পদে বিস্ময় বোধ হয়েছে। রামায়ণ-মহাভারত এখানকার লোকের প্রাণের মধ্যে যে কিরকম প্রাণবান হয়ে রয়েছে সে-কথা পূর্বেই লিখেছি। প্রাণবান বলেই এ জিনিসটা কোনো লিখিত সাহিত্যের সম্পূর্ণ পুনরাবৃত্তি নয়। এখানকার মানুষের বহুকালের ভাবনা ও কল্পনার ভিতর দিয়ে তার অনেক বদল হয়ে গেছে। তার প্রধান কারণ, মহাভারতকে এরা নিজেদের জীবনযাত্রার প্রয়োজনে প্রতিদিন ব্যবহার করেছে। সংসারের কর্তব্যনীতিকে এরা কোনো শাস্ত্রগত উপদেশের মধ্যে সঞ্চিত পায় নি, এই দুই মহাকাব্যের নানা চরিত্রের মধ্যে তারা যেন মূর্তিমান। ভালোমন্দ নানা শ্রেণীর মানুষকে বিচার করবার মাপকাঠি এই-সব চরিত্রে। এইজন্যেই জীবনের গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের এই জীবনের সামগ্রীর অনেকরকম বদল হয়েছে। কালে কালে বাঙালি গায়কের মুখে মুখে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদগুলি যেমন রূপান্তরিত হয়েছে এও তেমনি। কাল আমরা যে-ছায়াভিনয় দেখতে গিয়েছিলেম তার গল্পাংশটাকে টাইপ করে আমাদের হাতে দিয়েছিল। সেটা পাঠিয়ে দিচ্ছি, পড়ে দেখো। মূল মহাভারতের সঙ্গে মিলিয়ে এটা বাংলায় তর্জমা করে নিয়ো। এ গল্পের বিশেষত্ব এই যে, এর মধ্যে দ্রৌপদী নেই। মূল মহাভারতের ক্লীব বৃহন্নলা এই গল্পে নারীরূপে 'কেন-বর্দি' নাম গ্রহণ করেছে। কীচক একে দেখেই মুগ্ধ হয় ও ভীমের

১ শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে লিখিত।

হাতে মারা পড়ে। এই কীচক জাভানি মহাভারতে মৎস্যপতির শত্রু, পাণ্ডবেরা একে বধ করে বিরাটের রাজার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিল।

আমি মঙ্কুনগরো-উপাধিধারী যে-রাজার বাড়ির অলিন্দে বসে লিখছি চারি দিকে তার ভিত্তিগাত্রে রামায়ণের চিত্র রেশমের কাপড়ের উপর অতি সুন্দর করে অঙ্কিত। অথচ ধর্মে এঁরা মুসলমান। কিন্তু, হিন্দুশাস্ত্রের দেবদেবীদের বিবরণ এঁরা তন্ন তন্ন করে জানেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন ভূ-বিবরণের গিরিনদীকে এঁরা নিজেদের দেশের মধ্যেই গ্রহণ করেছেন। বস্তুত, সেটাতে কোনো অপরাধ নেই, কেননা রামায়ণ-মহাভারতের নরনারীরা ভাবমূর্তিতে এঁদের দেশেই বিচরণ করছেন; আমাদের দেশে তাঁদের এমন সর্বজনব্যাপী পরিচয় নেই, সেখানে ক্রিয়াকর্মে উৎসবে আমোদে ঘরে ঘরে তাঁরা এমন করে বিরাজ করেন না।

আজ রাত্রে রাজসভায় জাভানি শ্রোতাদের কাছে আমার 'কথা ও কাহিনী' থেকে কয়েকটি কথা আবৃত্তি করে শোনাব। একজন জাভানি সেগুলি নিজের ভাষায় তর্জমা করে ব্যাখ্যা করবেন। কাল সুনীতি ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে দীপচিত্র সহযোগে বক্তৃতা করেছিলেন। আজ আবার তাঁকে সেইটে বলতে রাজা অনুরোধ করেছেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সব কথা জানতে এঁদের বিশেষ আগ্রহ। ইতি ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৭[১]

১৬

কল্যাণীয়েষু

রথী, সুরকর্তার মঙ্কুনগরোর ওখান থেকে বিদায় নিয়ে যোগ্যকর্তায় পাকোয়ালাম-উপাধিধারী রাজার প্রাসাদে আশ্রয় নিয়েছি। সুরকর্তা শহরে একটি নতুন সাঁকো ও রাস্তা তৈরি শেষ হয়েছে, সেই রাস্তা পথিকদের ব্যবহারের জন্যে মুক্ত করে দেবার ভার আমার উপরে ছিল। সাঁকোর সামনে রাস্তা আটকে একটা কাগজের ফিতে টাঙানো ছিল, কাঁচি দিয়ে সেটা কেটে দিয়ে পথ খোলসা করা গেল। কাজটা আমার লাগল ভালো; মনে হল, পথের বাধা দূর করাই আমার ব্রত। আমার নামে এই রাস্তার নামকরণ হয়েছে।

পথে আসতে পেরাম্বান বলে এক জায়গায় পুরোনো ভাঙা মন্দির দেখতে নামলুম। এ জায়গাটা ভুবনেশ্বরের মতো, মন্দিরের ভগ্নস্তূপে পরিকীর্ণ। ভাঙা পাথরগুলি জোড়া দিয়ে দিয়ে ওলন্দাজ গবর্মেণ্ট মন্দিরগুলিকে তার সাবেক মূর্তিতে গড়ে তুলছেন। কাজটা খুব কঠিন, অল্প অল্প করে এগোচ্ছে; দুই-একজন বিচক্ষণ য়ুরোপীয় পণ্ডিত এই কাজে

১ শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লিখিত।

নিযুক্ত। তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে বিশেষ আনন্দ পেলুম। এই কাজ সুসম্পূর্ণ করবার জন্যে আমাদের পুরাণগুলি নিয়ে এঁরা যথেষ্ট আলোচনা করছেন। অনেক জিনিস মেলে না, অথচ সেগুলি যে জাভানি লোকের স্মৃতিবিকার থেকে ঘটেছে তা নয়, তখনকার কালের ভারতবর্ষের লোকব্যবহারের মধ্যে এর ইতিহাস নিহিত। শিব-মন্দিরই এখানে প্রধান। শিবের নানাবিধ নাট্যমুদ্রা এখানকার মূর্তিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে তার বিস্তারিত সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। একটা জিনিস ভেবে দেখবার বিষয়। শিবকে এ দেশে গুরু, মহাগুরু বলে অভিহিত করেছে। আমার বিশ্বাস, বুদ্ধের গুরুপদ শিব অধিকার করেছিলেন; মানুষকে তিনি মুক্তির শিক্ষা দেন। এখানকার শিব নটরাজ, তিনি মহাকাল অর্থাৎ সংসারে যে চলার প্রবাহ, জন্মমৃত্যুর যে ওঠাপড়া, সে তাঁরই নাচের ছন্দে; তিনি ভৈরব, কেননা, তাঁর লীলার অঙ্গই হচ্ছে মৃত্যু। আমাদের দেশে এক সময়ে শিবকে দুই ভাগ করে দেখেছিল। এক দিকে তিনি অনন্ত, তিনি সম্পূর্ণ, সুতরাং তিনি নিষ্ক্রিয়, তিনি প্রশান্ত; আর-এক দিকে তাঁরই মধ্যে কালের ধারা তার পরিবর্তন-পরম্পরা নিয়ে চলেছে, কিছুই চিরদিন থাকছে না, এইখানে মহাদেবের তাণ্ডবলীলা কালীর মধ্যে রূপ নিয়েছে। কিন্তু, জাভায় কালীর কোনো পরিচয় নেই। কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলারও কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। পূতনাবধ প্রভৃতি অংশ আছে কিন্তু গোপীদের দেখতে পাই নে। এর থেকে সেই সময়কার ভারতের ইতিহাসের কিছু ছবি পাওয়া যায়। এখানে রামায়ণ-মহাভারতের নানাবিধ গল্প আছে যা অন্তত সংস্কৃত মহাকাব্যে ও বাংলাদেশে অপ্রচলিত। এখানকার পণ্ডিতদের মত এই যে, জাভানিরা ভারতবর্ষে গিয়ে অথবা জাভায় সমাগত ভারতীয়দের কাছ থেকে লোকমুখে-প্রচলিত নানা গল্প শুনেছিল, সেইগুলোই এখানে রয়ে গেছে। অর্থাৎ, সে সময়ে ভারতবর্ষেই নানা স্থানে নানা গল্পের বৈচিত্র্য ছিল। আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের কোনো পণ্ডিতই রামায়ণ-মহাভারতের তুলনামূলক আলোচনা করেন নি। করতে গেলে ভারতের প্রদেশে প্রদেশে স্থানীয় ভাষায় যে-সব কাব্য আছে মূলের সঙ্গে সেইগুলি মিলিয়ে দেখা দরকার হয়। কোনো-এক সময়ে কোনো এক জার্মান পণ্ডিত এই কাজ করবেন বলে অপেক্ষা করে আছি। তার পরে তাঁর লেখার কিছু প্রতিবাদ কিছু সমর্থন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা ডাক্তার উপাধি পাব।

এখানে পাকোয়ালাম লোকটিকে বড়ো ভালো লাগল। শান্ত, গম্ভীর, শিক্ষিত, চিন্তাশীল। জাভার প্রাচীন কলাবিদ্যা প্রভৃতিকে রক্ষা করবার জন্যে উৎসুক। যোগ্যকর্তার প্রধান ব্যক্তি হচ্ছেন এখানকার সুলতান। তাঁর বাড়িতে রাত্রে নাচ দেখবার নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে একজন ওলন্দাজ পণ্ডিতের কাছে শোনা গেল যে, এই

জায়গাটির নাম ছিল অযোধ্যা; ক্রমে তারই অপভ্রংশ হয়ে এখন যোগ্যা নামে এসে ঠেকেছে।

এখানে যে নাচ দেখলুম সে চারজন মেয়ের নাচ। রাজবংশের মেয়েরাই নাচেন। চারজনের মধ্যে দুজন ছিলেন সুলতানেরই মেয়ে। এখানে এসে যত নাচ দেখেছি সব চেয়ে এইটেই সুন্দর লেগেছে। বর্ণনা-দ্বারা এ বোঝানো অসম্ভব। এমন অনিন্দ্যসম্পূর্ণ রূপসৃষ্টি দেখা যায় না। এই-সব নাচের একটা দিক আছে যেটা এর বাইরের সৌন্দর্য, আর-একটা হচ্ছে বিশেষ বিশেষ ভঙ্গীর বিশেষ অর্থ আছে। যারা সেগুলি জানে তারাই এর শোভার সঙ্গে এর ভাষাকে মিলিয়ে সম্পূর্ণ আনন্দ পেতে পারে। এখানে নাচ-শিক্ষার বিদ্যালয় আছে, সেখানে নিমন্ত্রণ পাওয়া গেছে। সেখানে গেলে এদের নাচের তত্ত্ব আরো কিছু বুঝতে পারব আশা করছি।

আজ রাত্রে রামায়ণ থেকে যে অভিনয় হবে তার একটি সূচীপত্র পাঠাই। এটা পড়লে বোঝা যায়, এখানকার রামায়ণকথার ভাবখানা কী।

বৌমা পয়লা অগস্টে যে-চিঠি পাঠিয়েছিলেন আজ দেড় মাস পরে সেটি আমার হাতে এল। আমার চিঠির কোন্‌গুলো তোমাদের কাছে পৌঁছল কোন্‌গুলো পৌঁছল না, তা কেমন করে জানব। ইতি ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৭[1]

১৭

যোগ্যকর্তা
জাভা

কল্যাণীয়াসু

রানী, এখানকার পালা শেষ হয়ে এল, শরীরটাও ক্লান্ত। এখানে যে-রাজার বাড়িতে আছি কাল রাত্রে তিনি ছায়াভিনয়ের একটি পালা দেখাবেন; তার পরে আমরা যাব বরোবুদরে। সেখানে দুদিন কাটিয়ে ফেরবার পথে বাটাভিয়াতে গিয়ে জাহাজে চড়ে বসব।

কাল রাত্রে এক জায়গায় গিয়েছিলুম জটায়ুবধের অভিনয় দেখতে। দেখে এ দেশের লোকের মনের একটা পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা যাকে অভিনয় বলি তার প্রধান অংশ কথা, বাকি অংশ হচ্ছে নানাপ্রকার হৃদয়ভাবের সঙ্গে জড়িত ঘটনাবলীর প্রতিরূপ দেখানো। এখানে তা নয়। এখানে প্রধান জিনিস হচ্ছে ছবি এবং গতিচ্ছন্দ।

১ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত।

কিন্তু, সেই ছবি বলতে প্রতিরূপ নয়, মনোহর রূপ। আমরা সংসারে যে দৃশ্য সর্বদা দেখি তার সঙ্গে খুব বেশি অনৈক্য হলেও এদের বাধে না। পৃথিবীতে মানুষ উঠে দাঁড়িয়ে চলাফেরা করে থাকে। এই অভিনয়ে সবাইকে বসে বসে চলতে ফিরতে হয়। সেও সহজ চলাফেরা নয়, প্রত্যেক নড়াচড়া নাচের ভঙ্গীতে। মনে মনে এরা এমন একটা কল্পলোক সৃষ্টি করেছে যেখানে সবাই বসার অবস্থায় নেচে বেড়ায়। এই পঙ্গু মানুষের দেশ যদি প্রহসনের দেশ হত তা হলেও বুঝতুম। একেবারেই তা নয়, এ মহাকাব্যের দেশ। এরা স্বভাবকে খাতির করতে চায় না। স্বভাব তার প্রতিশোধস্বরূপে যে এদের বিদ্রূপ করবে, এদের হাস্যকর করে তুলবে, তাও ঘটল না। স্বভাবের বিকারকেও এরা সুদৃশ্য করবে, এই এদের পণ। ছবিটাই এদের লক্ষ্য, স্বভাবের অনুকরণ এদের লক্ষ্য নয়, এই কথাটা এরা যেন স্পর্ধার সঙ্গে বলতে চায়। মনে করো-না কেন, প্রথম দৃশ্যটা রাজসভায় দশরথ ও তাঁর অমাত্যবর্গ। রঙ্গভূমিতে এরা সবাই গুঁড়ি মেরে প্রবেশ করল। মনে হয়, এর চেয়ে অদ্ভুত কিছুই হতে পারে না। ব্যাপারটাকে হাস্যকরতা থেকে বাঁচানো কত কঠিন ভেবে দেখো। কিন্তু, এতে আমরা বিরূপ কিছুই দেখলুম না, এরা দশরথ কিম্বা রাজামাত্য সে কথাটা সম্পূর্ণ গৌণ হয়ে গেল। পরের দৃশ্যে কৈকেয়ী প্রভৃতি রানী আর সখীরা তেমনি করেই বসা-অবস্থায় হেলে দুলে নেচে নেচে প্রবেশ করলে। আট-নয় বছরের ছেলেরা সব কৌশল্যা প্রভৃতি রানী সেজেছে। এদিকে কৌশল্যার ছেলে রাম যে সেজেছে তার বয়স অন্তত পঁচিশ হবে; এটা যে কত বড়ো অসংগত সে প্রশ্ন কারো মনেই আসে না, কেননা, এরা দেখছে ছবির নাচ। যতক্ষণ সেটাতে কোনো দোষ ঘটছে না ততক্ষণ নালিশ করবার কোনো হেতু নেই। অন্য দেশের লোকেরা যখন জিজ্ঞাসা করে, এর মানে কী হলো, এরা বলে, "তা আমরা জানি নে, কিন্তু আমাদের 'রসম্' তৃপ্ত হচ্ছে।" অর্থাৎ, মানে না পাই রস পাচ্ছি। আমাকে একজন ওলন্দাজ পণ্ডিত বলছিলেন, বালির লোকেরা অভ্যাসমতো যে-সব পূজানুষ্ঠান করে তার মানে তারা কিছুই বোঝে না কিন্তু তারাও 'রসম্'-তৃপ্তির দোহাই দিয়ে থাকে। অর্থাৎ, সৌন্দর্যের, সম্পূর্ণতার একটা আইডিয়া তাদের মনের ভিতরে আছে, অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সেইটিতে যখন সাড়া পায় তখন তাদের যে আনন্দ তাকে তো আধ্যাত্মিক বলা যেতে পারে।

কাল রাত্রে এই রঙ্গক্ষেত্রের বহিরঙ্গনে কত যে লোক জমেছে তার সংখ্যা নেই। নিঃশব্দে তারা দেখছে; শুধু কেবল দেখারই সুখ। তাদের মনের মধ্যে রামায়ণের গল্প আছে, সেই গল্পের ধারার সঙ্গে ছবির ধারা মিলে কল্পনা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। এর মধ্যে আশ্চর্যের বিষয়টা হচ্ছে এই যে, যে-ছবিটা দেখছে সেটাতে গল্পকে ফুটিয়ে তোলবার

কোনো চেষ্টা নেই। রামের যৌবরাজ্যে কৈকেয়ী রাগ করেছে; কিন্তু যেরকম ভাবভঙ্গী ও কণ্ঠস্বরে আমাদের চোখে কানে রাগের ভাবটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই ছবির মধ্যে তার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। আট-দশ বছরের ছেলে স্ত্রীবেশে কৈকেয়ী সাজলে তার মধ্যে কৈকেয়ীত্ব লেশমাত্র থাকা অসম্ভব। তবু এরা তাতে কোনো অভাব বোধ করে না। জিনিসটা যদি আগাগোড়া ছেলেমানুষি ও গ্রাম্য বর্বর-গোছের কিছু হত তা হলে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই থাকত না— কিন্তু, যেখানে নৈপুণ্য ও সৌষম্যের সীমা নেই, অতি সামান্য ভঙ্গীটুকুমাত্র যেখানে নিরর্থক নয়, বহু যত্ন ও বহু শক্তির দ্বারা যেখানে এই ললিতকলাটি একেবারে সুপরিণত হয়ে উঠেছে, সেখানে একে অবজ্ঞা করা চলে না। এই কথাই বলতে হয় যে, রূপের ও গতির ছন্দবোধ এদের মনে অত্যন্ত বেশি প্রবল; সেই রূপের ও গতির ভাষা এদের মনে যতখানি কথা কয় আমাদের মনে ততখানি কয় না। এদের গামেলান-সংগীতেও সেটা দেখতে পাই। প্রথমত যন্ত্রগুলি বহুসংখ্যক, বহু যত্নে সুশোভিত, এবং তাদের সমাবেশ সুসজ্জিত, যারা বাজাচ্ছে তাদের মধ্যে সংযত শোভনতা। এই রম্যদর্শন এদের কাছে অত্যাবশ্যক। চোখের দেখার সুখটুকু রক্ষা করে এদের যে সংগীতের আলোচনা সে হচ্ছে সুরের নাচ। ছন্দের লীলা এদের কাছে গীতের ধারার চেয়ে বেশি। কিন্তু, ছন্দের লীলা আমাদের দেশের ভোজপুরিয়াদের খচ্‌মচ্‌ বাদ্যের দুঃসহ অত্যাচার নয়। এদের নাচ যেমন সুন্দর সজ্জিত অঙ্গের নাচ, এদের সংগীতে যে ছন্দের নাচ সেও খোল করতাল মৃদঙ্গের কোলাহল নয়— সুশ্রাব্য সুর দিয়ে সেই নাচ মণ্ডিত। এদের সংগীতকে বলা যেতে পারে স্বরনৃত্য, এদের অভিনয়কে বলা যায় রূপনাট্য। ভারতবর্ষ থেকে নটরাজ এসে একদিন এখানে মন্দিরে পূজা পেয়েছিলেন, তিনি এদের যে-বর দিয়েছেন সে হচ্ছে তাঁর নাচটি— আর, আমাদের জন্যে কি কেবল তাঁর শ্মশানভস্মই রইল। ইতি

২০ সেপ্টেম্বর ১৯২৭[1]

১৮

ডাগো

বাণ্ডুঙ। যবদ্বীপ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, আমরা একটি সুন্দর জায়গায় এসেছি। পাহাড়ের উপরে— শোনা গেল পাঁচ হাজার ফুট উঁচু। হাওয়াটা বেশ ঠাণ্ডা। কিন্তু, হিমালয়ের এতটা উঁচু কোনো

১ শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখিত

পাহাড়ে যতটা শীত এখানে তার কাছ দিয়েও যায় না। আমরা আছি ভীমন্‌ট বলে এক ভদ্রলোকের আতিথ্যে। এঁর স্ত্রী অষ্ট্রিয়, ভিয়েনার মেয়ে। বাগান দিয়ে বেষ্টিত সুন্দর বাড়িটি পাহাড়ের উপর। এখান থেকে ঠিক সামনেই দেখতে পাই নীল গিরিমণ্ডলীর কোলে বাণ্ডুঙ শহর। পাহাড়ের যে অঞ্জলির মধ্যে এই শহর, অনতিকাল আগে সেখানে সরোবর ছিল। কখন একসময় পাড়ি ধসে গিয়ে তার সমস্ত জল বেরিয়ে চলে গেছে। এতদিন ঘোরাঘুরির পরে এই সুন্দর নির্জন জায়গায় নিভৃত বাড়িতে এসে বড়ো আরাম বোধ হচ্ছে।

জাভাতে নামার পর থেকেই যিনি সমস্তক্ষণ অশ্রান্ত যত্নে আমাদের সাহচর্য করে আসছেন তাঁর নাম সামুয়েল কোপের্‌বর্‌গ্‌। নামের মূল অর্থ হচ্ছে তামার পাহাড়। সুনীতি সেই মানেটা নিয়ে তাঁর নামের সংস্কৃত অনুবাদ করে দিয়েছেন তাম্রচূড়। আমাদের মহলে তাঁর এই নামটিই চলে গিয়েছে, তিনি এতে আনন্দিত। লোকটির নাম বদলে তাঁকে স্বর্ণচূড় বলতে ইচ্ছে করে। কিসে আমাদের লেশমাত্র আরাম সুবিধা বা দাবি পূর্ণ হতে পারে সেজন্যে তিনি অসাধারণ চিন্তা ও পরিশ্রম করেছেন। অকৃত্রিম সৌহার্দ্য তাঁর। দৈহিক পরিমাণে মানুষটি সংকীর্ণ, কিন্তু হৃদয়ের পরিমাণে খুব প্রশস্ত। এতকাল আমরা তাঁকে নানা সময়ে নানা উপলক্ষে দিনরাত ধরে দেখেছি— কখনো তাঁর মধ্যে ঔদ্ধত্য বা ক্ষুদ্রতা বা অহমিকা দেখি নি। সব সময়েই দেখেছি, নিজেকে তিনি সকলের শেষে রেখেছেন। তাঁর শরীর রুগ্ন ও দুর্বল, অথচ সেই রুগ্ন শরীরের জন্যে কোনোদিন কোনো বিশেষ সুবিধা দাবি করেন নি। সকলের সব হয়ে গিয়ে যেটুকু উদ্‌বৃত্ত সেইটুকুতেই তাঁর অধিকার। অনেকের কাছে তিনি তর্জন সহ্য করেছেন কিন্তু তা নিয়ে কোনোদিন তাঁর কাছ থেকে নালিশ বা কারো নিন্দে শুনি নি। ইংরিজি ভালো বলতে পারেন না, বুঝতেও বাধে। কিন্তু, কথায় যা না কুলোয় কাজে তার চতুর্গুণ পুষিয়ে দেন। কোথাও যাতায়াতের সময় মোটরগাড়িতে প্রথম প্রথম তিনি আমাদের সঙ্গ নিতেন, কিন্তু যেই দেখলেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ করা আমাদের পক্ষে কঠিন, অমনি অকুণ্ঠিত মনে নিজেকে সরিয়ে দিয়ে ইংরেজি-জানা সঙ্গীদের জন্যে স্থান করে দিলেন। কিন্তু, এখন এমন হয়েছে, তিনি সঙ্গে না থাকলে কেবল যে অসুবিধা হয় তা নয়, আমার তো ভালোই লাগে না। আমাদের মানসম্মান-সুখ-স্বচ্ছন্দতার চিন্তায় তিনি নিজেকে এমন সম্পূর্ণ ঢেলে দিয়েছেন যে, তিনি একটু সরে গেলেই আমাদের বড়ো বেশি ফাঁক পড়ে। তাঁর স্নিগ্ধ হৃদয়ের একটি লক্ষণ দেখে আমার ভারি ভালো লাগে— সর্বত্রই দেখি, শিশুদের তিনি বন্ধু। তারা ওঁকে নিজেদের সমবয়সী বলেই জানে। তাঁর হৃদয়ের আর-একটি প্রমাণ, জাভার লোকদের তিনি

সম্পূর্ণ আপন করে নিয়েছেন। জাভানিদের নাচ গান শিল্প ইতিহাস প্রভৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে তাঁর একান্ত যত্ন। এই সমস্ত আলোচনার জন্যে 'জাভা সোসাইটি' বলে একটি সভা স্থাপিত হয়েছে, তারই পরিচালনার জন্যে এঁর সমস্ত সময় ও চেষ্টা নিযুক্ত। আমার বর্ণনা থেকে বুঝবে, এই সরল আত্মত্যাগী মানুষটিকে আমরা ভালোবেসেছি।

বোরোবুদুরের উদ্দেশে যে কবিতা[1] লিখেছি সেটি অন্য পাতায় তোমাদের জন্যে কপি করে পাঠানো গেল। ইতি ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৭[2]

১৯

বাণ্ডুঙ। জাভা

কল্যাণীয়াসু

মীরা, এখানকার যা-কিছু দেখবার তা শেষ করেছি। যোগ্য থেকে গিয়েছিলুম বোরোবুদুরে ; সেখানে একরাত্রি কাটিয়ে এলুম।

প্রথমে দেখলুম, মুণ্ডুঙ বলে এক জায়গায় একটি ছোটো মন্দির। ভেঙেচুরে পড়ছিল, সেটাকে এখানকার গবর্মেণ্ট সারিয়ে নিয়েছে। গড়নটি বেশ লাগল দেখতে। ভিতরে বুদ্ধের তিন ভাবের তিন বিরাট মূর্তি। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেম। মনের ভিতরে কেমন একটা বেদনা বোধ হয়। একদিন অনেক মানুষে মিলে এই মন্দির, এই মূর্তি, তৈরি করে তুলছিল। সে কত কোলাহল, কত আয়োজন, তার সঙ্গে সঙ্গে ছিল মানুষের প্রাণ। এই প্রকাণ্ড পাথরের প্রতিমা যেদিন পাহাড়ের উপর তোলা হচ্ছিল সেদিন এই গাছপালার মধ্যে এই সূর্যালোকে উজ্জ্বল আকাশের নীচে মানুষের বিপুল একটা প্রয়াস সজীবভাবে এইখানে তরঙ্গিত। পৃথিবীতে সেদিন খবর-চালাচালি ছিল না ; এই ছোটো দ্বীপটির মধ্যে যে প্রবল ইচ্ছা আপন কীর্তিরচনায় প্রবৃত্ত, সমুদ্র পার হয়ে তার সংবাদ আর কোথাও পৌঁছয় নি। কলকাতার ময়দানের ধারে যখন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল তৈরি হচ্ছিল তার কোলাহল পৃথিবীর সকল সমুদ্রের কূলে কূলে বিস্তীর্ণ হয়েছিল।

নিশ্চয় দীর্ঘকাল লেগেছিল এই মন্দির তৈরি হতে ; কোনো-একজন মানুষের আয়ুর মধ্যে এর সৃষ্টির সীমা ছিল না। এই মন্দিরকে তৈরি করে তোলবার জন্যে

১ বোরোবুদুর। পরিশেষ কাব্যে সংকলিত। ১৫শ খণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্রষ্টব্য।

২ শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে লিখিত।

যে প্রবল শ্রদ্ধা সেটা তখনকার সমস্ত কাল জুড়ে সত্য ছিল। এই মন্দির নির্মাণ নিয়ে কত বিস্ময়, কত বিতর্ক, সত্যমিথ্যা কত কাহিনী তখনকার এই দ্বীপের সুখদুঃখবিক্ষুব্ধ প্রতিদিনের জীবনযাত্রার সঙ্গে জড়িত হয়েছে। একদিন মন্দির তৈরি শেষ হল; তার পরে দিনের পর দিন এখানে পূজার দীপ জ্বলেছে, দলে দলে পূজার অর্ঘ্য এনেছে, বৎসরের বিশেষ বিশেষ দিনে পার্বণ হয়েছে, এর প্রাঙ্গণে তীর্থযাত্রী মেয়ে পুরুষ এসে ভিড় করেছে।

তার পরে সেদিনের ভাষার উপর, ভাবের উপর, ধুলো চাপা পড়ল; সেদিন যা অত্যন্ত সত্য ছিল তার অর্থ গেল হারিয়ে। ঝরনা শুকিয়ে গেলে যেমন কেবল পাথরগুলো বেরিয়ে পড়ে, এই-সব মন্দির আজ তেমনি। একে ঘিরে যে প্রাণের ধারা নিরন্তর বয়ে যেত সে যেমনি দূরে সরে গেল, অমনি এর পাথর আর কথা কয় না, এর উপরে সেদিনের প্রাণস্রোতের কেবল চিহ্নগুলি আছে, কিন্তু তার গতি নেই, তার বাণী নেই। মোটরগাড়ি চড়ে আমরা একদল এলুম দেখতে, কিন্তু দেখবার আলো কোথায়। মানুষের এই কীর্তি আপন প্রকাশের জন্যে মানুষের যে-দৃষ্টির অপেক্ষা করে, কতকাল হল, সে লুপ্ত হয়ে গেছে।

এর আগে বোরোবুদুরের ছবি অনেকবার দেখেছি। তার গড়ন আমার চোখে কখনোই ভালো লাগে নি। আশা করেছিলুম হয়তো প্রত্যক্ষ দেখলে এর রস পাওয়া যাবে। কিন্তু, মন প্রসন্ন হল না। থাকে-থাকে একে এমন ভাগ করেছে, এর মাথার উপরকার চূড়াটুকু এর আয়তনের পক্ষে এমন ছোটো যে, যত বড়োই এর আকার হোক এর মহিমা নেই। মনে হয়, যেন পাহাড়ের মাথার উপরে একটা পাথরের ঢাকনা চাপা দিয়েছে। এটা যেন কেবলমাত্র একটা আধারের মতো, বহুশত বুদ্ধমূর্তি ও বুদ্ধের জাতককথার ছবিগুলি বহন করবার জন্যে মস্ত একটি ডালি। সেই ডালি থেকে তুলে তুলে দেখলে অনেক ভালো জিনিস পাওয়া যায়। পাথরে-খোদা জাতকমূর্তিগুলি আমার ভারি ভালো লাগল— প্রতিদিনের প্রাণলীলার অজস্র প্রতিরূপ, অথচ তার মধ্যে ইতর অশোভন বা অশ্লীল কিছুমাত্র নেই। অন্য মন্দিরে দেখেছি সব দেবদেবীর মূর্তি, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীও খোদাই হয়েছে। এই মন্দিরে দেখতে পাই সর্বজনকে রাজা থেকে আরম্ভ করে ভিখারি পর্যন্ত। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে জনসাধারণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রবল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে; এর মধ্যে শুধু মানুষের নয়, অন্য জীবেরও, যথেষ্ট স্থান আছে। জাতককাহিনীর মধ্যে খুব একটা মস্ত কথা আছে, তাতে বলেছে, যুগ যুগ ধরে বুদ্ধ সর্বসাধারণের মধ্য দিয়েই ক্রমশ প্রকাশিত। প্রাণীজগতে নিত্যকাল ভালোমন্দর যে দ্বন্দ্ব চলেছে সেই দ্বন্দ্বের

প্রবাহ ধরেই ধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বুদ্ধের মধ্যে অভিব্যক্ত। অতি সামান্য জন্তুর ভিতরেও অতি সামান্য রূপেই এই ভালোর শক্তি মন্দর ভিতর দিয়ে নিজেকে ফুটিয়ে তুলছে ; তার চরম বিকাশ হচ্ছে অপরিমেয় মৈত্রীর শক্তিতে আত্মত্যাগ। জীবে জীবে লোকে লোকে সেই অসীম মৈত্রী অল্প অল্প করে নানা দিক থেকে আপন গ্রন্থি মোচন করছে, সেই দিকেই মোক্ষের গতি। জীব মুক্ত নয় কেননা, আপনার দিকেই তার টান ; সমস্ত প্রাণীকে নিয়ে ধর্মের যে অভিব্যক্তি তার প্রণালীপরম্পরায় সেই আপনার দিকে টানের 'পরে আঘাত লাগছে। সেই আঘাত যে-পরিমাণে যেখানেই দেখা যায় সেই পরিমাণে সেখানেই বুদ্ধের প্রকাশ। মনে আছে, ছেলেবেলায় দেখেছিলুম, দড়িতে বাঁধা ধোপার বাড়ির গাধার কাছে এসে একটি গাভী স্নিগ্ধচক্ষে তার গা চেটে দিচ্ছে ; দেখে আমার বড়ো বিস্ময় লেগেছিল। বুদ্ধই-যে তাঁর কোনো এক জন্মে সেই গাভী হতে পারেন, এ কথা বলতে জাতককথা-লেখকের একটুও বাধত না কেননা, গাভীর এই স্নেহেরই শেষ গিয়ে পৌঁচেছে মুক্তির মধ্যে। জাতককথায় অসংখ্য সামান্যের মধ্যে দিয়েই চরম অসামান্যকে স্বীকার করেছে। এতেই সামান্য এত বড়ো হয়ে উঠল। সেই জন্যেই এতবড়ো মন্দিরভিত্তির গায়ে গায়ে তুচ্ছ জীবনের বিবরণ এমন সরল ও নির্মল শ্রদ্ধার সঙ্গে চিত্রিত। ধর্মেরই প্রকাশচেষ্টার আলোতে সমস্ত প্রাণীর ইতিহাস বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে মহিমান্বিত।

দুজন ওলন্দাজ পণ্ডিত সমস্ত ভালো করে ব্যাখ্যা করবার জন্যে আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁদের চরিত্রে পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সরল হৃদ্যতার সম্মিলন আমার কাছে বড়ো ভালো লাগল। সব চেয়ে শ্রদ্ধা হয় এঁদের নিষ্ঠা দেখে। বোবা পাথরগুলোর মুখ থেকে কথা বের করবার জন্যে সমস্ত আয়ু দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে পাণ্ডিত্যের কৃপণতা লেশমাত্র নেই— অজস্র দাক্ষিণ্য। ভারতবর্ষের ইতিহাসকে সম্পূর্ণ করে জেনে নেবার জন্যে এঁদেরই গুরু বলে মেনে নিতে হবে। জ্ঞানের প্রতি বিশুদ্ধ নিষ্ঠা থেকেই এঁদের এই অধ্যবসায়। ভারতের বিদ্যা, ভারতের ইতিহাস, এঁদের নিকটের জিনিস নয়, অথচ এইটেই এঁদের সমস্ত জীবনের সাধনার জিনিস। আরো কয়েকজন পণ্ডিতকে দেখেছি ; তাঁদের মধ্যেও সহজ নম্রতা দেখে আমার মন আকৃষ্ট হয়েছে। ইতি

২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৭[১]

১ শ্রীমতী মীরা দেবীকে লিখিত।

২০

বিলিটন

কল্যাণীয়াসু

রানী, জাভার পালা সাঙ্গ করে যখন বাটাভিয়াতে এসে পৌঁছলুম, মনে হল খেয়াঘাটে এসে দাঁড়িয়েছি এবার পাড়ি দিলেই ওপারে গিয়ে পৌঁছব নিজের দেশে। মনটা যখন ঠিক সেই ভাবে ডানা মেলেছে এমন সময় ব্যাংকক্ থেকে আরিয়ামের টেলিগ্রাম এল যে, সেখানে আমার ডাক পড়েছে, আমার জন্যে অভ্যর্থনা প্রস্তুত। আবার হাল ফেরাতে হল। সারাদিন খাটুনির পর আস্তাবলের রাস্তায় এসে গাড়োয়ান যখন নতুন আরোহীর ফরমাশে ঘোড়াটাকে অন্য রাস্তায় বাঁক ফেরায় তখন তার অন্তঃকরণে যে-ভাবের উদয় হয় আমার ঠিক সেইরকম হল। ক্লান্ত হয়েছি, এ কথা মানতেই হবে। এমন লোক দেখেছি (নাম করতে চাই নে) ভাগ্য অনুকূল হলে যারা টুরিস্ট্-ব্রত গ্রহণ করে চিরজীবন অসাধ্য সাধন করতে পারত, কিন্তু তারা হয়তো পটলডাঙার কোন্-এক ঠিকানায় ধ্রুব হয়ে গৃহকর্মে নিযুক্ত। আর, আমি দেহটাকে কোণে বেঁধে মনটাকে গগনপথে ওড়াতে পারলে আরাম পাই অথচ সাত ঘাটের জল আমাকে খাওয়াচ্ছে। অতএব, চললুম শ্যামের পথে, ঘরের পথে নয়।

এখানকার যে-সরকারি জাহাজে সিঙাপুরে যাবার কথা সে-জাহাজে অত্যন্ত ভিড়, তাই একটি ছোটো জাহাজে আমি আর সুরেন স্থান করে নিয়েছি। কাল শুক্রবার সকালে রওনা হওয়া গেছে। সুনীতি ও ধীরেন একদিনের জন্য পিছিয়ে রয়ে গেল; কেননা, কাল রাত্রে ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে সুনীতির একটা বক্তৃতার ব্যবস্থা ছিল। জাভার পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সুনীতি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। তার কারণ, তাঁর পাণ্ডিত্যে কোনো ফাঁকি নেই, যা-কিছু বলেন তা তিনি ভালো করেই জানেন।

আমাদের জাহাজ দুটি দ্বীপ ঘুরে যাবে, তাই দুদিনের পথে তিন দিন লাগবে। এই জায়গাটাতে বিশ্বকর্মার মাটির ব্যাগ ছিঁড়ে অনেকগুলো ছোটো ছোটো দ্বীপ সমুদ্রের মধ্যে ছিটকে পড়েছে। সেগুলো ওলন্দাজদের দখলে। এখন যে-দ্বীপে জাহাজ নোঙর ফেলেছে তার নাম বিলিটন। মানুষ বেশি নেই; আছে টিনের খনি, আর আছে সেই-সব খনির ম্যানেজার ও মজুর। আশ্চর্য হয়ে বসে বসে ভাবছি, এরা সমস্ত পৃথিবীটাকে কিরকম দোহন করে নিচ্ছে। একদিন এরা সব ঝাঁকে ঝাঁকে পালের জাহাজে চড়ে অজানা সমুদ্রে বেরিয়ে পড়েছিল। পৃথিবীটাকে ঘুরে ঘুরে দেখে নিলে, চিনে নিলে, মেপে নিলে। সেই জেনে নেওয়ার সুদীর্ঘ ইতিহাস কত সাংঘাতিক সংকটে আকীর্ণ। মনে মনে ভাবি, ওদের স্বদেশ থেকে অতি দূর সমুদ্রকূলে এই-সব দ্বীপে যেদিন ওরা প্রথম

এসে পাল নামালে, সে কত আশঙ্কায় অথচ কত প্রত্যাশায় ভরা দিন। গাছপালা জীবজন্তু মানুষজন সেদিন সমস্তই নতুন। আর আজ! সমস্তই সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত, সম্পূর্ণ অধিকৃত।

এদের কাছে আমাদের হার মানতে হয়েছে। কেন, সেই কথা ভাবি। তার প্রধান কারণ, আমরা স্থিতিবান জাত, আর ওরা গতিবান। অন্যোন্যতন্ত্র সমাজবন্ধনে আমরা আবদ্ধ, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যে ওরা বেগবান। সেই জন্যেই এত সহজে ওরা ঘুরতে পারল। ঘুরেছে বলেই জেনেছে আর পেয়েছে। সেই কারণেই জানবার ও পাবার আকাঙ্ক্ষা ওদের এত প্রবল। স্থির হয়ে বসে থেকে আমাদের সেই আকাঙ্ক্ষাটাই ক্ষীণ হয়ে গেছে। ঘরের কাছেই কে আছে, কী হচ্ছে, ভালো করে তা জানি নে, জানবার ইচ্ছাও হয় না। কেননা, ঘর দিয়ে আমরা অত্যন্ত ঘেরা। জানবার জোর নেই যাদের, পৃথিবীতে বাঁচবার জোর তাদের কম। এই ওলন্দাজরা যে-শক্তিতে জাভাদ্বীপ সকলরকমে অধিকার করে নিয়েছে, সেই শক্তিতেই জাভাদ্বীপের পুরাতত্ত্ব অধিকার করবার জন্যে তাদের এত পণ্ডিতের এত একাগ্রমনে তপস্যা। অথচ, এ পুরাতত্ত্ব অজানা নতুন দ্বীপেরই মতো তাঁদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্বন্ধশূন্য। নিকটসম্পর্কীয় জ্ঞানের বিষয় সম্বন্ধেও আমরা উদাসীন, দূরসম্পর্কীয় জ্ঞান সম্বন্ধেও এঁদের আগ্রহের অন্ত নেই। কেবল বাহুবলে নয়, এই জিজ্ঞাসার প্রবলতায় এরা জগৎটাকে অন্তরে বাহিরে জিতে নিচ্ছে। আমরা একান্তভাবে গৃহস্থ। তার মানে, আমরা প্রত্যেকে আপন গার্হস্থ্যের অংশমাত্র, দায়িত্বের হাজার বন্ধনে বাঁধা। জীবিকাগত দায়িত্বের সঙ্গে অনুষ্ঠানগত দায়িত্ব বিজড়িত। ক্রিয়াকর্মের নিরর্থক বোঝা এত অসহ্য বেশি যে, অন্য সকল যথার্থ কর্ম তারই ভারে অচলপ্রায়। জাতকর্ম থেকে আরম্ভ করে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত যে-সমস্ত কৃত্য ইহলোক পরলোক জুড়ে আমাদের স্কন্ধে চেপেছে তাদের নিয়ে নড়াচড়া অসম্ভব, আর তারা আমাদের শক্তিকে কেবলই শোষণ করে নিচ্ছে। এই-সমস্ত ঘরের ছেলেরা পরের হাতে মার খেতে বাধ্য। এ কথাটা আমরা ভিতরে ভিতরে বুঝতে পারছি। এইজন্যে আমাদের নেতারা সন্ন্যাসের দিকে এতটা ঝোঁক দিয়েছেন। অথচ, তাঁরা সনাতনধর্মকেও ধ্রুব সত্য বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু, আমাদের সনাতনধর্ম গার্হস্থ্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত। সস্ত্রীকং ধর্মমাচরেৎ। আমাদের দেশে বিস্ত্রীক ধর্মের কোনো মানে নেই।

যাঁরা সনাতনধর্মের দোহাই দেন না, তাঁরা বলেন, ক্ষতি কী। কিন্তু, বহু যুগের সমাজব্যবস্থার পুরাতন ভিত্তি যদি-বা ভাঙা সহজ হয় তার জায়গায় নতুন ভিত্তি গড়বে কতদিনে। কর্তব্য-অকর্তব্য সম্বন্ধে প্রত্যেক সমাজ কতকগুলি নীতিকে সংস্কারগত

করে নিয়েছে। তর্ক ক'রে বিচার ক'রে, অল্প লোক সিধে থাকতে পারে— সংস্কারের জোরেই তারা সংসারের পথে চলে। এক সংস্কারের জায়গায় আর-এক সংস্কার গড়া তো সোজা কথা নয়। আমাদের সমাজের সমস্ত সংস্কারই আমাদের বহুদায়গ্রন্থিল গার্হস্থ্যকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ রাখবার জন্যে। য়ুরোপীয়দের কাছ থেকে বিজ্ঞান শেখা সহজ কিন্তু তাদের সমাজের সংস্কারকে আপন করা সহজ নয়।

আমাদের জাহাজে ছিলেন টিনখনির এক কর্তা; বললেন, ষোলো বৎসর এই-খানেই লেগে আছেন। টিন ছাড়া এখানে আর কিছু নেই। তবু এইখানেই তাঁর বাসা বাঁধা। বাটাভিয়াতে সিন্ধি বণিকেরা দোকান করেছেন। দু বছর অন্তর বাড়ি যাবার নিয়ম। জিজ্ঞাসা করলুম, স্ত্রীপুত্র নিয়ে এখানে বাসা বাঁধতে দোষ কী। বললেন, স্ত্রীকে নিয়ে এলে চলবে কেন, স্ত্রী-যে সমস্ত পরিবারের সঙ্গে বাঁধা, তাঁকে সরিয়ে আনতে গেলে সেখানে ভাঙন ধরে। বোধ করি রামায়ণের যুগে এ তর্ক ছিল না। টিনের কর্তা বালককাল কাটিয়েছেন সাশ্রম বিদ্যালয়ে, বয়ঃপ্রাপ্ত হতেই কাজের সন্ধানে ফিরেছেন, বিবাহ করবামাত্র নিজের শক্তির 'পরেই সম্পূর্ণ ভর দিয়ে বসেছেন। বাপের তবিলের উপরে তাগিদ নেই, মা-মাসি-পিসেমশায়ের জন্যেও মন খারাপ হয় না। সেই জন্যেই এই জনবিরল নির্বাসনেও টিনের খনি চলছে। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এরা ঘর বাঁধতে পারল তার কারণ, এরা ঘরছাড়া। তার পরে মঙ্গলগ্রহের দিকে দূরবীন তুলে-যে এরা রাতের পর রাত কাটিয়ে দিচ্ছে তারও কারণ, এদের জিজ্ঞাসাবৃত্তি ঘরছাড়া। সনাতন গৃহস্থেরা এদের সঙ্গে কেমন করে পারবে। তাদের প্রচণ্ড গতিবেগে এদের ঘরের খুঁটিগুলো পড়ছে ভেঙে; কিছুতে বাধা দিতে পারছে না। যতক্ষণ চুপ করে আছি ততক্ষণ যত রাজ্যের অহেতুক বোঝা জমে জমে পর্বতপ্রমাণ হয়ে উঠলেও তেমন দুঃখ বোধ হয় না, এমন-কি, ঠেস দিয়ে আরাম পাওয়া যায়। কিন্তু, ঘাড়ে তুলে নিয়ে চলতে গেলেই মেরুদণ্ড বাঁকে। যারা সচল জাত, বোঝাই সম্বন্ধে তাদের কেবলই সূক্ষ্ম বিচার করতে হয়। কোন্‌টা রাখবার, কোন্‌টা ফেলবার, এ তর্ক তাদের প্রতি মুহূর্তের; এতেই আবর্জনা দূর করবার বুদ্ধি পাকা হয়। কিন্তু, সনাতন গৃহস্থ চণ্ডী-মণ্ডপে আসন পেতে বসে আছেন; তাই তাঁর পঞ্জিকা থেকে তিনশোপঁয়ষট্টি-দিন-ভরা মূঢ়তায় আজ পর্যন্ত কিছুই বাদ পড়ল না। এই-সমস্ত রাবিশ যাদের অন্তরে বাহিরে কানায় কানায় ভরপুর, হঠাৎ কংগ্রেসের মাচার উপর থেকে তাদের 'পরে হুকুম এল, লঘুভার মানুষের সঙ্গে সমান পা ফেলে চলতে হবে, কেননা, দু-চার দিনের মধ্যেই স্বরাজ চাই। জবাব দেবার ভাষা তাদের মুখে নেই, কিন্তু তাদের পাঁজর-

ভাঙা বুকের ব্যথায় এই মূক মিনতি থেকে যায়, "তাই চলবার চেষ্টা করব, কিন্তু কর্তারা আমাদের বোঝা নামিয়ে দেন।" তখন কর্তারা শিউরে উঠে বলেন, "সর্বনাশ, ও-যে সনাতন বোঝা।" ইতি

মায়র জাহাজ

১ অক্টোবর ১৯২৭[১]

২১

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, অক্টোবর শুরু হল, বোধ হচ্ছে এখন তোমাদের পুজোর ছুটি; আন্দাজ করছি, ছুটি ভোগ করবার জন্যে আশ্রম ত্যাগ করা তুমি প্রয়োজন বোধ কর নি। নিশ্চয়ই তোমার ছুটির জোগান দেবার ভার দিয়েছ শান্তিনিকেতনের প্রফুল্লকাশগুচ্ছ-বীজিত শরৎপ্রকৃতির উপরে। পৃথিবীতে ঘুরে ঘুরে অন্তত এই বুদ্ধি আমার মাথায় এসেছে যে, ঘুরে বেড়িয়ে বেশি কিছু লাভ নেই, এ যেন চালুনিতে জল আনবার চেষ্টা, পথে-পথেই প্রায় সমস্তটা নিকেশ হয়ে যায়। আধুনিক কালের ভ্রমণ জিনিসটা উঞ্ছবৃত্তির মতো, যা ছড়িয়ে আছে তাকে খুঁটে খুঁটে কুড়িয়ে কুড়িয়ে চলা। নিজের সুদূর ভরা খেতে আঁটিবাঁধা ফসলের স্মৃতিটা মনে কেবলই জেগে ওঠে।

এবারকার যাত্রায় দেশের চিঠিপত্র ও খবরবার্তা প্রায় কিছু পাই নি বলে মনে হচ্ছে যেন জন্মান্তর গ্রহণ করেছি। এ জন্মের প্রত্যেক দিনের স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি সাবেক-জন্মের অন্তত সাতদিনের তুল্য। নতুন জায়গা, নতুন মানুষ, নতুন ঘটনার চলমান যূথপ্রবাহ একেবারে ঠাসাঠাসি হয়ে হুহু করে চলেছে। এই চলার মাপেই মন তোমাদেরও সময়ের বিচার করছে। রেলগাড়ির আরোহী যেমন মনে করে, তার গাড়ির বাইরে নদীগিরিবন হঠাৎ কালের তাড়া খেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিয়েছে, তেমনি এই দ্রুত বেগবান সময়ের কাঁধে চড়ে আমারও মনে হচ্ছে, তোমাদের ওখানেও সময়ের বেগ বুঝি এই পরিমাণেই— সেখানে আজ-গুলো বুঝি কাল-গুলোকে ডিঙিয়ে একেবারে পরশুর ঘাড়ে গিয়ে পড়ছে, মুকুলের সঙ্গে ফলের বয়সের ভেদ সেখানে বুঝি ঘুচল। দূরে বসে যখন বোরোবুদুর বালি প্রভৃতির কথা ভেবেছি তখন সেই ভাবনাকে একটা বিস্তৃত কালের উপর মেলে দিয়ে কল্পনা করেছি, নইলে অতখানি পদার্থ ধরাবার জায়গা পাওয়া যায় না। এই কয়দিনেই সে-সমস্ত তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করা গেল; যা স্বপ্নের মধ্যে আকীর্ণ হয়ে ছিল তা প্রত্যক্ষের মধ্যে সংকীর্ণ হয়ে এল। দূরে সময়ের যে-মাপ অস্ফুটতার মধ্যে মস্ত হয়ে ছিল, কাছে সেই সময়টাই ঘন হয়ে উঠল। হিসেব

১ শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখিত।

করে দেখলে, আমার এই কয়দিনের আয়ুতে অল্পকালের মধ্যে অনেকখানি কালকে ঠেসে দেওয়া হয়েছে। চণ্ডীমণ্ডপে মন্দগমনে যার দিন চলে তার বয়সটার অনেকখানি বাদ দিলে তবে খাঁটি আয়ুটুকুর মধ্যে পৌছনো যায়; অর্থাৎ কেবলমাত্র কালের পরিমাণে তার আয়ুর দাম দিতে গেলে ঠকতে হয়, অনেক দর-কষাকষি করেও দুখে পৌছনো শক্ত হয়ে ওঠে। তাই ব'লে এ কথা বলাও চলে না যে, দ্রুতবেগে দেশবিদেশে অনেকগুলো ব্যাপার-পরম্পরার মধ্যে লাফিয়ে লাফিয়ে চললেই আয়ু সেই অনুসারে কালকে ব্যাপ্ত করে। আমাদের শাস্ত্রীমশায়কে দেখো-না। তিনি কোণেই বসে আছেন। কিন্তু, সেইটুকুর মধ্যে স্থির হয়ে থেকে কালকে তিনি কিরকম ব্যাপকভাবে অধিকার করতে করতে চলেছেন; সাধারণ লোকের বয়সের বাটখারায় মাপলে তাঁর বয়স নব্বই ছাড়িয়ে যায়। এই তো সেদিন এলেন আশ্রমে মিত্রগোষ্ঠীর সম্পাদকপদ থেকে নেমে। এসেই তাঁর মন দৌড় দিল পালিশাস্ত্রের মহারণ্যের মধ্যে। দ্রুতবেগে পার হয়ে চলেছেন— কোথায় তিব্বতি, কোথায় চৈনিক। নাগাল পাবার জো নেই।

তাই বলছি, আমাদের এই ভ্রমণের কালটা ব্যাপ্তির দিকে যেরকম প্রাপ্তির দিকে সেরকম নয়। আমাদের ভ্রমণের তালটা চৌদুন লয়ে। এই লয় তো আমাদের জীবনের অভ্যস্ত লয় নয়, তাই বাইরের দ্রুতগতির সঙ্গে সঙ্গে অন্তরকে চালাতে গিয়ে হয়রান হয়ে পড়তে হয়। যেমন চিবিয়ে না খেলে খাদ্যটাকে খাদ্য বলেই মনে হয় না তেমনি হুড়মুড় করে কাজ করাকে কর্তব্য বলে উপলব্ধি করা যায় না। বিশ্বের উপর দিয়ে ভাসা-ভাসা ভাবে মন বুলিয়ে চলেছি; অভিজ্ঞতার পেয়ালা ধরে ফেনাটাতে মুখ ঠেকাবার জন্যে এক সেকেণ্ড মেয়াদ পাওয়া যায়, পানীয় পর্যন্ত পৌছবার সময় নেই। মৌমাছিকে ঝোড়ো হাওয়ার তাড়া খেয়ে কেবল যদি উড়তেই হয়, ফুলের উপর একটু-মাত্র পা ছুঁইয়েই তখনই যদি সে ছিটকে পড়ে, তা হলে তার ঘুরে-বেড়ানোটা যেমন ব্যর্থ হয়, আমার মনও তেমনি ব্যর্থতার দমকা হাওয়ায় ভন্‌ভন্‌ করেই মোলো— তার চলার সঙ্গে পৌছনোর যোগ হারিয়ে গেছে। এর থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারি, কোনো জন্মে আমেরিকান ছিলুম না। পাওয়া কাকে বলে যে-মানুষ জানে না ছোঁওয়াকেই সে পাওয়া মনে করে। আমার মন স্ন্যাপ্‌শটবিলাসী মন নয়, সে চিত্রবিলাসী।

এই মাত্র সুনীতি এসে তাড়া লাগাচ্ছে— বেরোতে হবে, সময় নেই। যেমন কোল্‌রিজ বলে গেছেন— সমুদ্রে জল সর্বত্রই, কিন্তু এক ফোঁটা জল নেই যে, পান করি। সময়ের সমুদ্রে আছি কিন্তু একমুহূর্ত সময় নেই। ইতি ২ অক্টোবর ১৯২৭[১]

১ শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লিখিত।

গ্রন্থপরিচয়

[রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশের তারিখ ও গ্রন্থ-সংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য গ্রন্থপরিচয়ে সংকলিত হইল। এই খণ্ডে মুদ্রিত কোনো কোনো রচনা সম্বন্ধে কবির নিজের মন্তব্য মুদ্রিত হইল। পূর্ণতর তথ্যসংগ্রহ সর্বশেষ খণ্ডে একটি পঞ্জীতে সংকলিত হইবে।]

বীথিকা

বীথিকা ১৩৪২ সালের ভাদ্র মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

'শ্রীমতী অপরাজিতা দেবীর পত্রের উত্তরে' লিখিত 'আধুনিকা' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের নির্দেশক্রমে পরবর্তী কালে (১৩৪৫) প্রহাসিনী গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেখানে কবিতাটির মুখবন্ধে লিখিত হইয়াছে, "দ্বারীর অনবধানে এই কবিতাটি 'বীথিকা'য় অনধিকার প্রবেশ করেছিল। সেই পরিহসিতাকে যথাযোগ্য স্থানে ফিরিয়ে আনা গেল।" রচনাবলী-সংস্করণে বীথিকা হইতে 'আধুনিকা' কবিতাটি সেই কারণে বাদ দেওয়া হইল।

রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপির সাহায্যে বর্তমান সংস্করণে অনেক কবিতার রচনা-স্থান ও তারিখ সংযোজিত হইল। 'প্রত্যর্পণ' কবিতাটির (পৃষ্ঠা ১৮) তারিখ '১৯৩২ ?' সালের পরিবর্তে '১২ মাঘ, ১৩৪০' হইবে।

'ছায়াছবি' কবিতাটির নিম্নমুদ্রিত আরম্ভাংশটুকু বর্জনচিহ্নিত আকারে পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়।—

ফিরিয়া দেখি জীবনতটে
অতীত পথপানে,
ছায়ারূপীরা দিকে বিদিকে
চলেছে নানাখানে।
কেহ বা চলে নব অরুণালোকে;
উঠিছে ফুটি নূতন-জাগা চোখে
অপরিচিত প্রত্যাশার
প্রথম উন্মেষ;

জানা ও নাহি-জানার সেতু
হতেছে পার— বোঝে না হেতু,
রাখে না উদ্দেশ ॥

ভাসিয়া চলে কোনো বা তরী
কোনো কিছু না লক্ষ্য করি
স্বপ্নাবেশে অবশ কার
তরুণ তনু বহি,
রাত্রি যবে নিশ্বসিছে
নীরবে রহি রহি ॥

ফাগুনমাসে শিথিল কেশে
শিহরি দিয়ে হাওয়া,
মেলিয়া দিয়া আঁচল হতে
সোনার আভা, বায়ুর স্রোতে,
অজানা কোন্ অধীরতায়
কারো বা আসা-যাওয়া ॥

জোনাকিদল তিমিরতলে
বিঁধিল আলো-সূচি,
ভোরের যেই লাগিল ছোঁওয়া
সে আলো গেল মুছি।
তেমনি সব চিহ্ন নিয়ে
মিলালো ওরা কত
চৈত্রশেষে মাধবীবন-
সৌরভের মতো ॥

'প্রাণের ডাক' কবিতার নিম্নে মুদ্রিত একটি নূতন স্তবক 'প্রবাসী'তে ও পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়। 'প্রবাসী'তে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১) উহা প্রথম স্তবকরূপে মুদ্রিত হয়।—

এখনো কি ক্লান্তি ঘোচে নাই,
ওঠো তবু ওঠো,

বৃথা হোক তবুও বৃথাই
পথপানে ছোটো।
স্বপ্ন যত ঘিরে ছিল রাতে,
অবসন্ন তারাদের সাথে
মিলালো আলোকে অবগাহি।
আয়ুঃক্ষীণ নিঃস্ব দীপগুলি
নিশীথের স্মৃতি গেছে ভুলি,
অন্ধ আঁখি শূন্যে আছে চাহি।

'গোধূলি' কবিতাটি ১৩৩৯ সালে কার্তিকের 'বিচিত্রা' মাসিকপত্রে শ্রীনন্দলাল বসুর একটি রঙিন চিত্র-সহ 'প্রাসাদভবনে' নামে প্রথম মুদ্রিত হয়। কবিতার শেষে সম্পাদকীয় মন্তব্যে জানা যায়, "এই কবিতা নন্দলালবাবুর ছবি দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন। পঞ্চাশটি নূতন ছবি ও তদ্‌দৃষ্টে লিখিত কবির পঞ্চাশটি নূতন কবিতা শীঘ্রই 'বিচিত্রিতা' নামে বই আকারে বাহির হইবে।"

১৩৪০ সালে সেই কবিতার একত্রিশটি 'বিচিত্রিতা' গ্রন্থে সংকলিত হয়। বাকি কবিতার অধিকাংশই বীথিকায় চিত্রবিহীন আকারে মুদ্রিত হইয়াছে।

'জয়ী' কবিতাটি রচনার স্থান-কাল জানা যায় নাই। উহার প্রথম স্তবকটির আদিম পাঠ (ও তাহার ইংরেজিরূপ) পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া গিয়াছে, রচনার স্থান-কালের উল্লেখ-সহ নিম্নে মুদ্রিত হইল। কবিতাটি আবা-মারু জাহাজের জাপানি কাপ্তেন ও কর্মচারীদের জন্য স্বাক্ষরলিপি, একটি মরুভূমির ছবির ধারে লেখা।—

রূপহীন, বর্ণহীন, শুষ্কমরু, নাই শব্দসুর—
তৃষ্ণাতুরবারি হাতে আসন মৃত্যুর—
সে মহানৈঃশব্দ-মাঝে বেজে ওঠে মানবের বাণী,
"বাধা নাহি মানি।"

Oct. 25, 1927
Awa-Maru, Bay of Bengal

ইহার একটি রূপান্তরিত পাঠ ১৩৪২ সালে বিবেকানন্দ ইন্‌স্টিটিউশন্‌ পত্রিকায় কবির হস্তলিপির প্রতিলিপিতে বাহির হইয়াছিল; তারিখ ছিল: ১৮ চৈত্র ১৩৪১।

উভয় স্থলেই— "বাধা নাহি মানি।"—থাকায় এবং আভ্যন্তরিক প্রমাণে অনুমিত হয় যে, বীথিকা গ্রন্থে মুদ্রিত— বাধা নাহি মানি'— ছাপার ভুল। তদনুযায়ী এই গ্রন্থের ১০৩-১০৪ পৃষ্ঠায় সংশোধন হইবে।

শেষরক্ষা

শেষরক্ষা ১৯২৮ সালের জুলাই মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

ইহা 'গোড়ায় গলদ' প্রহসনটির (রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য) পুনর্লিখিত অভিনয়যোগ্য সংস্করণ। ১৩৩৪ সালে আষাঢ় মাসের 'মাসিক বসুমতী'তে প্রথম প্রকাশিত হয়।

গল্পগুচ্ছ

বর্তমান খণ্ডে প্রকাশিত সাতটি গল্প ১৩০১ সালের 'সাধনা' মাসিকপত্রে নিম্ন সূচীক্রমে প্রকাশিত হয়।—

অনধিকার প্রবেশ	শ্রাবণ ১৩০১
মেঘ ও রৌদ্র	আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১
প্রায়শ্চিত্ত	অগ্রহায়ণ ১৩০১
বিচারক	পৌষ ১৩০১
নিশীথে	মাঘ ১৩০১
আপদ	ফাল্গুন ১৩০১
দিদি	চৈত্র ১৩০১

'অনধিকার প্রবেশ' গল্পটি সাধনার উক্ত সংখ্যায় 'বিদেশী অতিথি ও দেশীয় আতিথ্য' প্রবন্ধটির (রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড দ্রষ্টব্য) অব্যবহিত পরেই মুদ্রিত হইয়াছিল।

অনধিকার প্রবেশ 'বিচিত্র গল্প' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (১৩০১), মেঘ ও রৌদ্র 'কথা-চতুষ্টয়' (১৩০১) গ্রন্থে, এবং বাকি পাঁচটি গল্প 'গল্পদশক' (১৩০২) পুস্তকে প্রথম গ্রন্থান্তর্ভুক্ত হয়।

জাপানযাত্রী

জাপানযাত্রী ১৩২৬ সালের শ্রাবণ মাসে [ইং ১৯১৯] গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। বৈশাখ ১৩২৩ হইতে বৈশাখ ১৩২৪ পর্যন্ত সবুজপত্রের বিভিন্ন সংখ্যায় রচনাগুলি 'জাপানযাত্রীর পত্র', 'জাপানের পত্র' ও 'জাপানের কথা' নামে প্রথম প্রকাশিত হয়।

উইলিয়ম পিয়ার্সন, সি. এফ. এণ্ড্রুজ ও শ্রীমুকুলচন্দ্র দে -সহ রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা হইতে ১ মে ১৯১৬ তারিখে জাপান যাত্রা করেন। সেখান হইতে আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া জাপানের পথে তিনি ১৩ মার্চ ১৯১৬ তারিখে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।

১৩৪৩ সালের শ্রাবণ মাসে 'জাপানে-পারস্যে' গ্রন্থ-প্রকাশকালে 'জাপানযাত্রী' উক্ত গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

প্রসঙ্গত ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, জাপানযাত্রীর চতুর্দশ পরিচ্ছেদের শেষে শিল্পী শিমোমুরার আঁকা অন্ধের সূর্যবন্দনার যে-চিত্রটির বর্ণনা আছে তাহার একটি রঙিন প্রতিলিপি রবীন্দ্রনাথ জাপান হইতে রচনা করাইয়া আনেন। 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'-তে ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৪ তারিখে লেখা দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভে এই চিত্রটির পুনরুল্লেখ রহিয়াছে। চিত্রটি বর্তমানে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে রক্ষিত আছে।

—

জাপানযাত্রী গ্রন্থের শতবর্ষপূর্তি সংস্করণে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯) পরিশিষ্টে ও গ্রন্থপরিচয়ে রবীন্দ্রনাথের জাপানভ্রমণ সংক্রান্ত বহু তথ্য, চিঠিপত্র, ভাষণ ও অন্যান্য রচনা একত্র সংকলন করা হইয়াছে। এই সংস্করণ সচিত্র।

যাত্রী

যাত্রী ১৩৩৬ সালের জ্যৈষ্ঠে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি' অংশ প্রবাসীতে অগ্রহায়ণ ১৩৩১ হইতে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২ পর্যন্ত বিভিন্ন সংখ্যায় প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৩৩৩ সালের ফাল্গুনের প্রবাসীতে উক্ত ডায়ারির কিছু নূতন অংশ 'উদ্‌বৃত্ত' নামে বাহির হয় এবং যাত্রীর প্রথম সংস্করণে 'পরিশিষ্ট'রূপে (পৃ. ১৩৫-১৬২) মুদ্রিত হয়। উহার মুখবন্ধস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ প্রবাসীতে যাহা লিখিয়াছিলেন নিম্নে মুদ্রিত হইল :

'গাছতলায় শুকনো পাতার নীচে ঝড়ে-পড়া কাঁচাপাকা ফল কিছু-না কিছু পাওয়া যায়। আমার আবর্জিত ছিন্ন পাতার মধ্য থেকে যে লেখার টুকরোগুলি আমার তরুণ বন্ধু[1] কুড়িয়ে পেয়েছেন, মনে হচ্ছে, সেগুলি সাহিত্যের ভোজে ব্যবহার করার বাধা নেই। তাই তিনি যখন ভাণ্ডারে তোলবার প্রস্তাব করলেন আমি সম্মতি দিলাম।'

যাত্রীর দ্বিতীয় সংস্করণে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২) উক্ত উদ্‌বৃত্ত 'পরিশিষ্ট' অংশগুলিকে তাহাদের রচনার তারিখ অনুসারে ডায়ারির ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সন্নিবেশিত করা হইয়াছিল। 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'র বর্তমান মুদ্রণে প্রধানতঃ যাত্রীর প্রথম সংস্করণ অনুসৃত হইল।

রবীন্দ্রনাথ ১৯২৪ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রা করেন "তাদের শতবার্ষিক উৎসবে যোগ দেবার জন্যে", এবং ১৯২৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পূরবী কাব্যের 'পথিক' অংশের কবিতাগুলি এই সময়ের রচনা বলিয়া তাহাদের অনেক পরিচয় পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারির নানা স্থানে পাওয়া যায়।

২৮ ও ২৯ সেপ্টেম্বর (১৯২৪) এই দুই তারিখের দুইটি ডায়ারি-অংশে 'শুভ-ইচ্ছা'-

১ শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী।

পূর্ণ যে-চিঠির উল্লেখ আছে তাহা পূরবীর 'শিলংয়ের চিঠি'[১] কবিতায় উল্লিখিত শ্রীমতী নলিনী দেবী লিখিয়াছিলেন। সে চিঠির জবাবে রবীন্দ্রনাথ যে পত্র লেখেন এই প্রসঙ্গে ১৩৪৯ আশ্বিনের 'অলকা' মাসিকপত্র হইতে তাহা সম্পূর্ণ উদ্‌ধৃত করা গেল :

কল্যাণীয়াসু,

কলম্বোতে এসে যাত্রার আগের দিনই তোমার সুন্দর চিঠিখানি পেয়ে বড়ো খুশি হয়েছি। আজ সকালে এসে পৌঁছলুম। তখন থেকে আকাশ মেঘে অন্ধকার। ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টি পড়ছে, আর বাদলা হাওয়া খামকা হা-হুতাশ করে উঠছে। যাত্রার পূর্বে এরকম দুর্যোগে মনের উৎসাহ কমে যায়— সূর্যকিরণ না পেলে মনে হয় যেন আকাশের দৈববাণী থেকে বঞ্চিত হলুম। এমন সময় তোমার চিঠি আমার হাতে এল, মনে হল, বাংলাদেশ যেন একটি বাঙালি মেয়ের কণ্ঠে আমার কাছে জয়ধ্বনি পাঠিয়ে দিলেন। এই বৃষ্টিবাদলের পর্দার ভিতর থেকে বাংলার অন্তঃপুরের শাঁখ বেজে উঠল। যিনি সকল শুভ বিধান করেন তোমার শুভকামনা নিশ্চয় তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছবে, আমার যাত্রা সফল হবে।

এবারে কলকাতা থেকে বেরবার আগে আমার চারি দিকে যেমন ছিল ভিড় তেমনি আমার দেহে মনে ছিল ক্লান্তি। আস নি ভালোই করেছ, কেননা, তোমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলা অসম্ভব হত। তুমি হয়তো ভাবছ আমি ভারি অহংকারী— ছোটো মেয়েদের ছোটো বলে খাতির করি নে। ভারি ভুল, আমি বড়োদের ভয় করি, তাদের সব কথা বিশ্বাস করি নে— আমার অন্তরের শ্রদ্ধা ছোটোদের দিকে। আমার কেবল ভয় পাছে আমার পাকা দাড়ি দেখে অকস্মাৎ তারা আমাকে নারদঋষির মতো ভক্তিভাজন মনে করে বসে।

কিন্তু যাই বল, আমি ডায়ারি লিখতে পারব না। আমি ভারি কুঁড়ে। চিঠি লেখার, ডায়ারি লেখার, একটা বয়স আছে ; সে বয়স আমার কেটে গেছে। কিন্তু, অল্প বয়সেও আমি ডায়ারি লিখি নি। যে-সব কথা ভুলে যাবার সে-সব কথা জমিয়ে রাখবার চেষ্টাই করি নি ; যে-সব কথা না ভোলবার সে-সব তো মনে আপনিই আঁকা থাকে।

সময় পেলে তোমার সঙ্গে দু ঘণ্টা তিন ঘণ্টা ধরে গল্প করতে রাজি আছি। অবশ্য, তোমাকেই থেকে থেকে তার ধুয়ো ধরিয়ে দিতে হবে।

গল্প বলার চেয়ে গল্প শুনতেই ভালোবাসি, যদি গল্প বলার গলাটি মিষ্ট থাকে। অভি[২] বলে আমার একটি ভাইঝি ছিল, তার গলা ছিল খুব মিষ্টি। একদিন কী একটা

১ রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড দ্রষ্টব্য।

২ অভিজ্ঞা দেবী, হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয়া কন্যা।

কারণে আমার খুব রাগ হয়েছিল, অভি এসে আমার চৌকির পিছনে দাঁড়িয়ে চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ঠিক সেই সময়ে যা-তা বকে গেল ; এক মুহূর্তে আমার সমস্ত রাগ জুড়িয়ে গেল। সে আজ অনেক দিনের কথা, কিন্তু আজও মনে আছে। তারই মুখে রূপকথা শুনে আমি 'সোনার তরী'তে বিম্ববতীর গল্প লিখেছিলেম। সে অনেক দিন হল মারা গেছে। এখন আমার কাছে অনেকে তর্ক করতে আসে, গম্ভীর বাজে কথা আলাপ করতে চায়, কিন্তু অনেক দিন তেমন করে গল্প কেউ বলে নি। আমি ফিরে এলে দু ঘণ্টা ধরে গল্প করবে বলেছ, ভয় হয় পাছে ততদিন তুমি বেশি বড়ো হয়ে গম্ভীর হয়ে যাও। লোভ হচ্ছে শিগ্‌গির ফিরে আসতে। কিন্তু ওদিকে তোমার শুভকামনা সব জায়গায় সম্পূর্ণ সফল করতে তো দেরি হবে। এই দ্বিধায় রইলুম। ফিরে এলে দ্বিধা কাটবে, ইতিমধ্যে আমার অন্তরের আশীর্বাদ গ্রহণ করো। ইতি ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৪

'জাভাযাত্রীর পত্র' অংশের রচনাকাল ১৯২৭ সালের জুলাই হইতে অক্টোবরের মধ্যে। ১৩৩৪-৩৫ সালের মধ্যে সবগুলি রচনা 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত— ২১ সংখ্যক পত্র ছাড়া, সেটি ১৩৩৪ অগ্রহায়ণের 'প্রবাসী'তে 'কালের আপেক্ষিকতা' শিরোনামে মুদ্রিত।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর, শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা প্রমুখ অধ্যাপক ও শিল্পীগণকে সঙ্গে লইয়া ১৯২৭ সালে ১৪ জুলাই মাদ্রাজ হইতে রবীন্দ্রনাথ পূর্বদ্বীপপুঞ্জ অভিমুখে যাত্রা করেন। জাভা বালি প্রভৃতি দ্বীপ ভ্রমণ করিয়া সিয়াম হইয়া অক্টোবরের শেষে তিনি ফিরিয়া আসেন। নবম পত্রে শ্রীপ্রতিমা দেবীকে তিনি লিখিয়াছেন, "সমস্ত বিবরণ বোধ হয় সুনীতি কোনো-এক সময়ে লিখবেন।…বুঝতে পারছি তাঁর হাতে আমাদের ভ্রমণের ইতিবৃত্ত লেশমাত্র ব্যর্থ হবে না, লুপ্ত হবে না।" ১৩৩৪ সালের ভাদ্র হইতে ১৩৩৮ সালের আশ্বিন পর্যন্ত প্রবাসীর ধারাবাহিক সংখ্যায় শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহাদের এই ভ্রমণের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত 'যবদ্বীপের পথে' ও 'দ্বীপময় ভারত' নামে ক্রমশ প্রকাশ করেন। পরে উহা 'দ্বীপময় ভারত' নামে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়াছে।

পঞ্চদশ পত্রে উল্লেখ আছে যে, রবীন্দ্রনাথ জাভানি শ্রোতাদের সভায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করিয়া শুনাইবেন। সেই সভানুষ্ঠানের পরে লিখিত এক পত্র রবীন্দ্র-ভবনের সংগ্রহ হইতে প্রাসঙ্গিক বোধে নিম্নে মুদ্রিত হইল :

'আমার কবিতা পাঠ হয়ে গেলে পর এরা আমাকে কতকগুলি গান শুনিয়েছিল, তার মধ্যে একটি গান গদ্যছন্দে তর্জমা করে দিলুম—

হে রমণী, বিশ্বভুবনের ভূষণে তুমি মুক্তা।
অবসন্ন তোমার দাস, বিরহে বিষাদে বিমর্ষ,
তাকে আরোগ্যের অমৃত-ঔষধি দাও।
ওগো আমার কপোতিকা, আমার প্রাণপুত্তলি,
বলো দেখি, আমার দুঃখ কে জানে।
এমন পাষাণ চিত্ত কার, হে নারী,
তোমাকে দেখে যার মন ভালোবাসায় না ব্যথিত হয়।
বৃষ্টির পরে আকাশে-ছড়িয়ে-পড়া তারাগুলি জ্বল জ্বল করে,
মনে হয় ব্যর্থ প্রেমের বেদনায় ওরা অভিভূত—
আমার উষ্ণীষের ফুলও শিথিল হল সেই পীড়নে।
তোমার কবরীর দিকে তাকিয়ে তারাগুলির এই দশা।'

১৩৩৫ সালে কার্তিকের বিচিত্রায় উপরের কবিতাটি 'প্রেমাস্পদা' নামে প্রকাশিত হয়। প্রথম পংক্তির "তুমি মুক্তা" স্থলে সেখানে "তুমি ভূষিতা" পাঠ মুদ্রিত হয়। অনুবাদটি কবির কোনো কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয় নাই।

শ্রীবিজয়লক্ষ্মী, বোরোবুদুর, সিয়াম— যাত্রীর 'জাভাযাত্রীর পত্র' অংশের এই কয়টি কবিতা পরিশেষ কাব্যে (১৩৩৯) গৃহীত হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলীর পঞ্চদশ খণ্ডে কবিতাগুলি ইতিপূর্বেই মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া যাত্রীর বর্তমান সংস্করণে বর্জিত হইল। কিন্তু, 'রথীরে কহিল গৃহী উৎকণ্ঠায় উর্ধ্বস্বরে ডাকি' এবং 'নন্দগোপাল বুক ফুলিয়ে এসে' পঞ্চদশ খণ্ডের সংযোজনে সংকলিত হওয়া সত্ত্বেও, বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা-বশত যাত্রীর অন্তর্ভুক্ত রহিল।

—

পরবর্তীকালে, রবীন্দ্র শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে— 'বিশ্বযাত্রী রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থমালায় যাত্রী গ্রন্থের দুই অংশ দুইটি সচিত্র গ্রন্থের আকারে স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত— পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি (শ্রাবণ ১৩৬৮) ও জাভাযাত্রীর পত্র (ফাল্গুন ১৩৬৭)।

—

বর্ণানুক্রমিক সূচী

অতীতের ছায়া	...	...	৫
অনধিকার প্রবেশ	...	...	২০৫
অন্তরতম	...	...	৭৯
অন্ধকারে জানি না কে এল কোথা হতে		...	১৬
অপরাধ যদি ক'রে থাক	...	...	৪১
অপরাধিনী	...	...	৪১
অপরিচিতের দেখা বিকশিত ফুলের উৎসবে		...	৩৩
অপ্রকাশ	...	...	৯০
অবকাশ ঘোরতর অল্প	...	...	১০৫
অভ্যাগত	...	...	১০৭
অভ্যুদয়	...	...	৯৮
আকাশ আজিকে নির্মলতম নীল	...	...	১১৮
আকাশের দূরত্ব যে চোখে তারে দূর ব'লে জানি		...	৯৫
আজি বরষনমুখরিত শ্রাবণরাতি	...	...	৯৯
আদিতম	...	...	১৯
আপদ	...	...	২৬৭
আপন মনে যে-কামনার চলেছি পিছু পিছু		...	৭৯
আমি এ পথের ধারে একা রই	...	...	১১৩
আরবার কোলে এল শরতের	...	...	১০৭
আশ্বিনে	...	...	১১৮
আসন্ন রাত্রি	...	...	৪৫
আসে অবগুণ্ঠিতা প্রভাতের অরুণ দুকূলে		...	৫৭
ঈষৎ দয়া	...	...	৫২
উদাসীন	...	...	৫০
ঋতু-অবসান	...	...	১১৪
একটি দিন পড়িছে মনে মোর	...	...	২৩
একদা বসন্তে মোর বনশাখে যবে	...	...	১১৪

একলা বসে, হেরো, তোমার ছবি	… …	৪৭
এতদিনে বুঝিলাম, এ হৃদয় মরু না	… …	৬১
এবার মিলন-হাওয়ায় হাওয়ায় হেলতে হবে	…	১৮৯
এল আহ্বান, ওরে তুই ত্বরা কর্‌	… …	৪৫
এ লেখা মোর শূন্যদ্বীপের সৈকততীর	… …	২৯
এ সংসারে আছে বহু অপরাধ	… …	৬৪
এসো এসো ফিরে এসো— নাথ হে, ফিরে এসো	…	২৩৩
ও ভোলা মন, বল্‌ দেখি ভাই	… …	১৩৬
ওরা কি কিছু বোঝে	… …	৫৫
কবি	… …	৬১
কবির রচনা তব মন্দিরে জ্বালে ছন্দের ধূপ	…	১৮
কলুষিত	… …	৯৬
কাছে যবে ছিল, পাশে হল না যাওয়া	… …	১৩৯
কাঠবিড়ালি	… …	৭০
কাঠবিড়ালির ছানা দুটি	… …	৭০
কাল চলে আসিয়াছি, কোনো কথা বলি নি তোমারে	…	১২
কী আশা নিয়ে এসেছ হেথা উৎসবের দল	…	১১৯
কী বেদনা মোর জান সে কি তুমি, জান	…	১০৪
কুয়াশার জাল আবরি রেখেছে প্রাতঃকাল	…	৬৯
কে আমার ভাষাহীন অন্তরে	… …	১৯
কে গো তুমি গরবিনী, সাবধানে থাক দূরে দূরে	…	৯৩
কেন চুপ করে আছি, কেন কথা নাই	.. …	৩৭
কৈশোরিকা	… …	১৩
কোথা হতে পেলে তুমি অতি পুরাতন	… …	৮০
ক্ষণিক	… …	৫৪
গরবিনী	… …	৯৩
গীতচ্ছবি	… …	৪৬
গোধূলি	… …	৮৫
চক্ষে তোমার কিছু বা করুণা ভাসে	… …	৫২
চন্দনধূপের গন্ধ ঠাকুরদালান হতে আসে	…	৭৪

চৈত্রের রাতে যে মাধবীমঞ্জরী ৫৪
ছন্দোমাধুরী ৬২
ছবি ৪৭
ছায়াছবি ২৩
ছুটির লেখা ২৯
জন্ম মোর বহি যবে খেয়ার তরী এল ভবে ... ৬৬
জয় করেছিনু মন, তাহা বুঝি নাই ১০৯
জয় ক'রে তবু ভয় কেন তোর যায় না ১৯৪
জয়ী ১০৩
জাগরণ ১২২
জানি জানি, তুমি এসেছ এ-পথে মনের ভুলে ... ১০২
ডাকিল মোরে জাগার সাথি ১৩১
তুমি আছ বসি তোমার ঘরের দ্বারে ৮৯
তুমি যবে গান কর অলৌকিক গীতমূর্তি তব ... ৪৬
তোমাদের দুজনের মাঝে আছে কল্পনার বাধা ... ৪৩
তোমার সম্মুখে এসে, দুর্ভাগিনী, দাঁড়াই যখন ... ৯১
তোমারে ডাকিনু যবে কুঞ্জবনে ৫০
দানমহিমা ৫১
দিদি ২৭৮
দুই সখী ৮৭
দুঃখী ১১১
দুঃখী তুমি একা ১১১
দুজন ৯
দুজন সখীরে ৮৭
দুর্ভাগিনী ৯১
দূর অতীতের পানে পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলাম ... ৩১
দেবতা ১২০
দেবতা মানবলোকে ধরা দিতে চায় ১২০
দেবদারু ৬০
দেবদারু, তুমি মহাবাণী ৬০

দেহে মনে সুপ্তি যবে করে ভর	...	...	১২২
ধ্যান	...	...	১২
নন্দগোপাল বুক ফুলিয়ে এসে	...	...	৪৮২
নব পরিচয়	...	...	৬৬
নমস্কার	...	...	১১৬
নাট্যশেষ	...	...	৩১
নিঃস্ব	...	...	১১৯
নিমন্ত্রণ	...	...	২৫
নির্ঝরিণী অকারণ অবারণ সুখে	...	...	৫১
নিশীথে	...	...	২৫৫
নুটু	...	...	১০০
পত্র	...	...	১০৫
পথিক	...	...	৮৯
পথের শেষে নিবিয়া আসে আলো	...	...	৬৫
পর্বতের অন্য প্রান্তে ঝর্ঝরিয়া ঝরে রাত্রিদিন		...	৪৪
পাঠিকা	...	...	২১
পাষাণে-বাঁধা কঠোর পথ	...	...	৬২
পূর্ণ করি নারী তার জীবনের থালি	...	...	৮৬
পোড়োবাড়ি	...	...	৩৬
প্রণতি	...	...	৪৮
প্রণাম আমি পাঠানু গানে	...	...	৪৮
প্রতীক্ষা	...	...	৯৯
প্রত্যর্পণ	...	...	১৮
প্রভু, সৃষ্টিতে তব আনন্দ আছে	...	...	১১৬
প্রলয়	...	...	৯৫
প্রাণের ডাক	...	...	৫৮
প্রায়শ্চিত্ত	...	...	২৩৫
প্রাসাদভবনে নীচের তলায়	...	...	৮৫
ফাল্গুনের পূর্ণিমার আমন্ত্রণ পল্লবে পল্লবে	...	...	১০০
বনস্পতি	...	...	৮০

বনস্পতি, তুমি যে ভীষণ	...	...	৮১
বহিছে হাওয়া উতল বেগে	...	...	২১
বহি লয়ে অতীতের সকল বেদনা	...	...	১২১
বাঁখারির বেড়া-দেওয়া ভূমি ; হেথা করি ঘোরাফেরা		...	৭
বাদলরাত্রি	...	...	১০৪
বাদলসন্ধ্যা	...	...	১০২
বাধা	...	...	৮৬
বিচারক	...	...	২৪৮
বিচ্ছেদ	...	...	৪৩
বিদ্রোহী	...	...	৪৪
বিরোধ	...	...	৬৪
বিহ্বলতা	...	...	৩৩
বুঝিলাম, এ মিলন ঝড়ের মিলন	...	...	৪০
ব্যর্থ মিলন	...	...	৪০
ভীষণ	...	...	৮১
ভুল	...	...	২৩৯
মনে পড়ে, যেন এককালে লিখিতাম	...	...	২৫
মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ		...	১০৭
মরণমাতা	...	...	৬৮
মরণমাতা, এই যে কচি প্রাণ	...	...	৬৮
মহা-অতীতের সাথে আজ আমি করেছি মিতালি		...	৫
মাটি	...	...	৭
মাটিতে-আলোতে	...	...	১০৭
মাতা	...	...	৬৯
মিলনযাত্রা	...	...	৭৪
মুক্ত হও হে সুন্দরী	...	...	৯০
মুক্তি	...	...	১০৯
মুখ-পানে চেয়ে দেখি, ভয় হয় মনে	...	...	১৯৪
মূল্য	...	...	১১৩
মেঘ ও রৌদ্র	...	...	২১০

মেঘমালা … … ৫৭
মৌন … … ৩৭
যাবার বেলা শেষ কথাটি যাও ব'লে … … ১৩৩
যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেছে … … ১৯৯
যায় আসে সাঁওতাল মেয়ে … … ৭২
রথীরে কহিল গৃহী উৎকণ্ঠায় উর্ধ্বস্বরে ডাকি … ৪১২
রাতের দান … … ৬৫
রাত্রিরূপিণী … … ১১
রূপকার … … ৫৫
রূপহীন, বর্ণহীন, চিরস্তব্ধ, নাই শব্দ স্বর … ১০৩
লুকালে ব'লেই খুঁজে বাহির করা … … ১৯০
শত শত লোক চলে … … ৯৮
শেষ … … ১২১
শ্যামল প্রাণের উৎস হতে … … ৯৬
শ্যামলা … … ৩৫
সত্যরূপ … … ১৬
সন্ন্যাসী … … ৮৩
সহসা তুমি করেছ ভুল গানে .. … ৩৯
সাঁওতাল মেয়ে … … ৭২
সুদূর আকাশে ওড়ে চিল .. … ৫৮
সূর্যাস্তদিগন্ত হতে বর্ণচ্ছটা উঠেছে উচ্ছ্বাসি … ৯
সেদিন তোমার মোহ লেগে … … ৩৬
হরিণী … … ৮৪
হায় রে, ওরে যায় না কি জানা … … ১৩২
হে কৈশোরের প্রিয়া … … ১৩
হে রাত্রিরূপিণী … … ১১
হে শ্যামলা, চিত্তের গহনে আছ চুপ … … ৩৫
হে সন্ন্যাসী, হে গম্ভীর, মহেশ্বর … … ৮৩
হে হরিণী … … ৮৪

রবীন্দ্র রচনাবলী

বিংশ খণ্ড

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

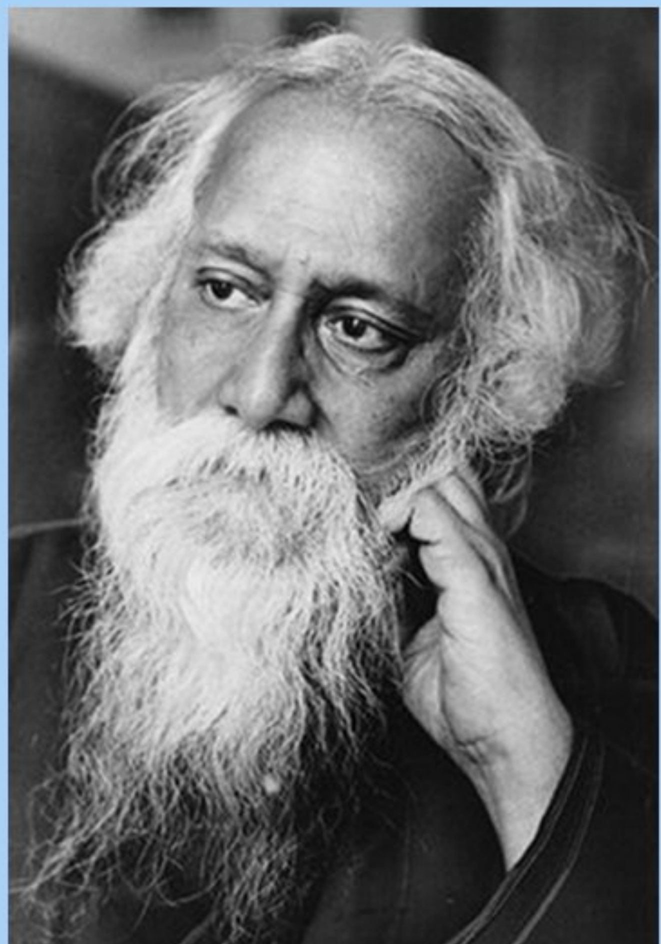

রবীন্দ্র-রচনাবলী

বিংশ খণ্ড

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ ৭ পৌষ ১৩৫২

পুনর্মুদ্রণ চৈত্র ১৩৬১

বৈশাখ ১৩৭৪ : ১৮৮৯ শক

মূল্য : কাগজের মলাট দশ টাকা

রেক্সিনে বাঁধাই তেরো টাকা

© বিশ্বভারতী ১৯৬৭

প্রকাশক বিশ্বভারতী

গ্রন্থনবিভাগ : ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

মুদ্রক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড : ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা ৯

২'১

সূচী

চিত্রসূচী ।৶৹

কবিতা ও গান

পত্রপুট ১

শ্যামলী ৫৫

নাটক ও প্রহসন

পরিত্রাণ ১২৭

উপন্যাস ও গল্প

গল্পগুচ্ছ ১৯৫

প্রবন্ধ

রাশিয়ার চিঠি ২৭১

মানুষের ধর্ম ৩৬৯

গ্রন্থপরিচয় ৪৩৩

বর্ণানুক্রমিক সূচী ৪৫৭

চিত্রসূচী

রাশিয়ায় রবীন্দ্রনাথ	৫
শ্যামলী	১২৪
রবীন্দ্র-চিত্র-প্রদর্শনীতে কবির আগমন	২৮০
পায়োনিয়রস্‌ কম্যুনে আলাপ-আলোচনা	২৮০
পায়োনিয়র ছাত্রছাত্রীগণকর্তৃক রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনা	২৮১

কবিতা ও গান

কল্যাণীয় শ্রীমান কৃষ্ণ কৃপালানি ও কল্যাণীয়া শ্রীমতী নন্দিতার

শুভপরিণয় উপলক্ষে আশীর্বাদ

নবজীবনের ক্ষেত্রে দুজনে মিলিয়া একমনা
যে নব সংসার তব প্রেমমন্ত্রে করিছ রচনা
দুঃখ সেথা দিক বীর্য, সুখ দিক সৌন্দর্যের সুধা,
মৈত্রীর আসনে সেথা নিক স্থান প্রসন্ন বসুধা,
হৃদয়ের তারে তারে অসংশয় বিশ্বাসের বীণা
নিয়ত সত্যের সুরে মধুময় করুক আঙিনা।
সমুদার আমন্ত্রণে মুক্তদ্বার গৃহের ভিতরে
চিত্ত তব নিখিলেরে নিত্য যেন আতিথ্য বিতরে।
প্রত্যহের আলিম্পনে দ্বারপথে থাকে যেন লেখা
সুকল্যাণী দেবতার অদৃশ্য চরণচিহ্নরেখা।
শুচি যাহা, পুণ্য যাহা, সুন্দর যা, যাহা-কিছু শ্রেয়,
নিরলস সমাদরে পায় যেন তাহাদের দেয়।
তোমার সংসার ঘেরি, নন্দিতা, নন্দিত তব মন
সরল মাধুর্যরসে নিজেরে করুক সমর্পণ।
তোমাদের আকাশেতে নির্মল আলোর শঙ্খনাদ,
তার সাথে মিলে থাক্‌ দাদামশায়ের আশীর্বাদ।

শান্তিনিকেতন
১২ বৈশাখ ১৩৪৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্রপুট

পত্রপুট

এক

জীবনে নানা সুখদুঃখের
এলোমেলো ভিড়ের মধ্যে
হঠাৎ কখনো কাছে এসেছে
সুসম্পূর্ণ সময়ের ছোটো একটু টুকরো।
গিরিপথের নানা পাথর-নুড়ির মধ্যে
যেন আচমকা কুড়িয়ে-পাওয়া একটি হীরে।
কতবার ভেবেছি গেঁথে রাখব
ভারতীর গলার হারে ;
সাহস করি নি,
ভয় হয়েছে কুলোবে না ভাষায়।
ভয় হয়েছে প্রকাশের ব্যগ্রতায়
পাছে সহজের সীমা যায় ছাড়িয়ে।

ছিলেম দার্জিলিঙে,
সদর রাস্তার নীচে এক প্রচ্ছন্ন বাসায়।
সঙ্গীদের উৎসাহ হল
রাত কাটাবে সিঞ্চল পাহাড়ে।
ভরসা ছিল না সন্ন্যাসী গিরিরাজের নির্জন সভার 'পরে—
কুলির পিঠের উপরে চাপিয়েছি নিজেদের সম্বল থেকেই
অবকাশ-সম্ভোগের উপকরণ।
সঙ্গে ছিল একখানা এস্রাজ, ছিল ভোজ্যের পেটিকা,
ছিল হো হা করবার অদম্য উৎসাহী যুবক,

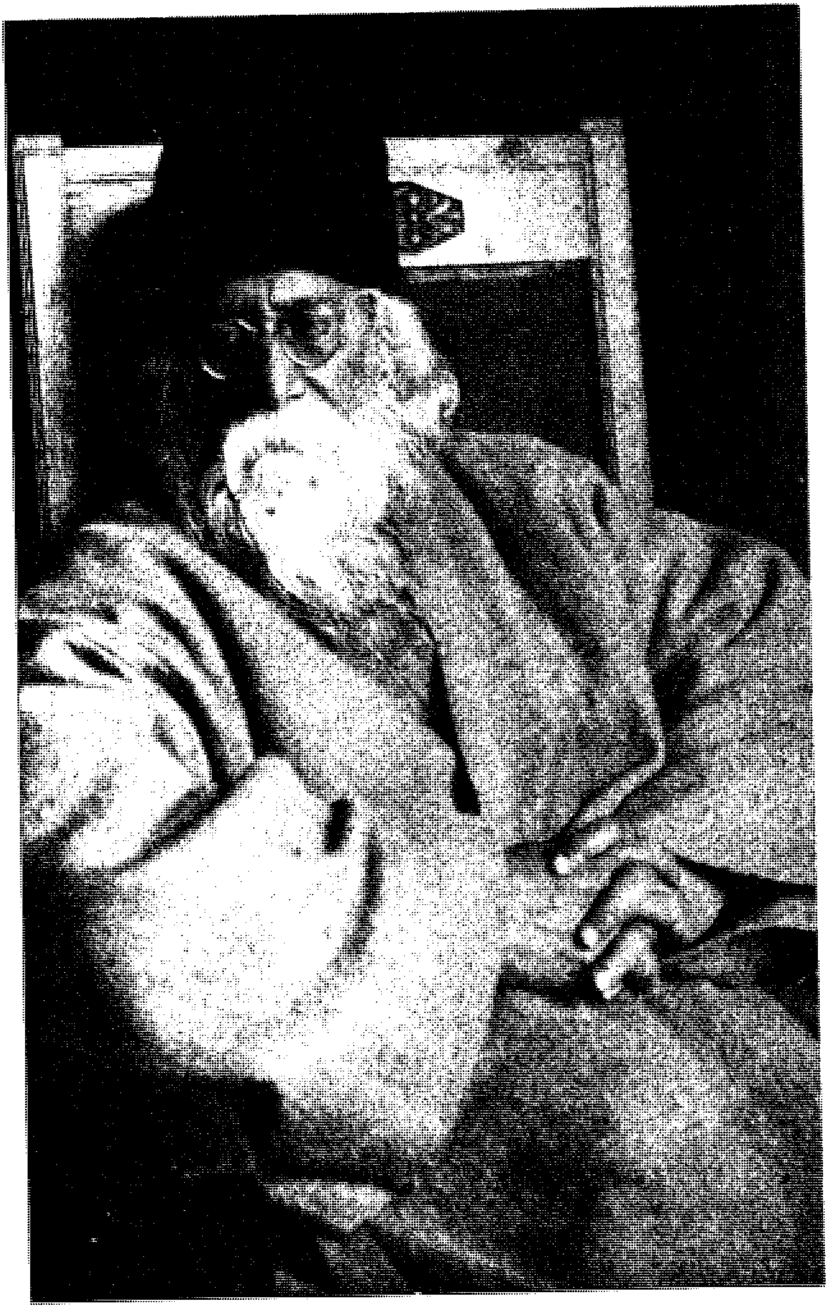

রাশিয়ার চিঠি]　　রবীন্দ্রনাথ　　[১৯৩০

টাট্টুর উপর চেপেছিল আনাড়ি নবগোপাল,
তাকে বিপদে ফেলবার জন্যে ছিল ছেলেদের কৌতুক।
সমস্ত আঁকাবাঁকা পথে
বেঁকে বেঁকে ধ্বনিত হল অট্টহাস্য।
শৈলশৃঙ্গবাসের শূন্যতা পূরণ করব কজনে মিলে,
সেই রস জোগান দেবার অধিকারী আমরাই
এমন ছিল আমাদের আত্মবিশ্বাস।
অবশেষে চড়াই-পথ যখন শেষ হল
তখন অপরাহ্ণের হয়েছে অবসান।
ভেবেছিলেম আমোদ হবে প্রচুর,
অসংযত কোলাহল উচ্ছ্বসিত মদিরার মতো
রাত্রিকে দেবে ফেনিল করে।

শিখরে গিয়ে পৌঁছলেম অবারিত আকাশে,
সূর্য নেমেছে অস্তদিগন্তে
নদীজালের রেখাঙ্কিত
বহুদূরবিস্তীর্ণ উপত্যকায়।
পশ্চিমের দিগ্‌বলয়ে,
সুরবালকের খেলার অঙ্গনে
স্বর্ণসুধার পাত্রখানা বিপর্যস্ত,
বিহ্বল তার প্লাবনে।

প্রমোদমুখর সঙ্গীরা হল নিস্তব্ধ।
দাঁড়িয়ে রইলেম স্থির হয়ে।
এস্রাজটা নিঃশব্দ পড়ে রইল মাটিতে,
পৃথিবী যেমন উন্মুখ হয়ে আছে
তার সকল কথা থামিয়ে দিয়ে।
মন্ত্ররচনার যুগে জন্ম হয় নি,
মন্ত্রিত হয়ে উঠল না মন্ত্র
উদাত্তে অনুদাত্তে।

এমন সময় পিছন ফিরে দেখি
সামনে পূর্ণচন্দ্র,
বন্ধুর অকস্মাৎ হাস্যধ্বনির মতো।
যেন স্বরলোকের সভাকবির
সদ্যোবিরচিত কাব্যপ্রহেলিকা
রহস্যে রসময়।

গুণী বীণায় আলাপ করে প্রতিদিন।
একদিন যখন কেউ কোথাও নেই
এমন সময় সোনার তারে রুপোর তারে
হঠাৎ সুরে সুরে এমন একটা মিল হল
যা আর কোনোদিন হয় নি।
সেদিন বেজে উঠল যে রাগিণী
সেদিনের সঙ্গেই সে মগ্ন হল
অসীম নীরবে।
গুণী বুঝি বীণা ফেললেন ভেঙে।

অপূর্ব সুর যেদিন বেজেছিল
ঠিক সেইদিন আমি ছিলেম জগতে,
বলতে পেরেছিলেম—
আশ্চর্য!

শান্তিনিকেতন
৪ মে ১৯৩৫

দুই

শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ
কল্যাণীয়েষু

আমার ছুটি চার দিকে ধু ধু করছে
ধান-কেটে-নেওয়া খেতের মতো।

আশ্বিনে সবাই গেছে বাড়ি,
তাদের সকলের ছুটির পলাতকা ধারা মিলেছে
আমার একলা ছুটির বিস্তৃত মোহানায় এসে
এই রাঙামাটির দীর্ঘ পথপ্রান্তে।
আমার ছুটি ব্যাপ্ত হয়ে গেল
দিগন্তপ্রসারী বিরহের জনহীনতায়;
তার তেপান্তর মাঠে কল্পলোকের রাজপুত্র
ছুটিয়েছে পবনবাহন ঘোড়া
মরণসাগরের নীলিমায় ঘেরা
স্মৃতিদ্বীপের পথে।
সেখানে রাজকন্যা চিরবিরহিণী
ছায়াভবনের নিভৃত মন্দিরে।
এমনি করে আমার ঠাঁইবদল হল
এই লোক থেকে লোকাতীতে।

আমার মনের মধ্যে ছুটি নেমেছে
যেন পদ্মার উপর শেষ শরতের প্রশান্তি
বাইরে তরঙ্গ গেছে থেমে,
গতিবেগ রয়েছে ভিতরে।
সাঙ্গ হল দুই তীর নিয়ে
ভাঙন-গড়নের উৎসাহ।
ছোটো ছোটো আবর্ত চলেছে ঘুরে ঘুরে
আনমনা চিত্তপ্রবাহে ভেসে-যাওয়া
অসংলগ্ন ভাবনা।
সমস্ত আকাশের তারার ছায়াগুলিকে
আঁচলে ভরে নেবার অবকাশ তার বক্ষতলে
রাত্রের অন্ধকারে।

মনে পড়ে অল্প বয়সের ছুটি;
তখন হাওয়া-বদল ঘর থেকে ছাদে;

লুকিয়ে আসত ছুটি, কাজের বেড়া ডিঙিয়ে,
নীল আকাশে বিছিয়ে দিত
বিরহের সুনিবিড় শূন্যতা,
শিরায় শিরায় মিড় দিত তীব্র টানে
না-পাওয়ার না-বোঝার বেদনায়
এড়িয়ে-যাওয়ার ব্যর্থতার সুরে।
সেই বিরহগীতগুঞ্জরিত পথের মাঝখান দিয়ে
কখনো বা চমকে চলে গেছে
শ্যামলবরন মাধুরী
চকিত কটাক্ষের অব্যক্ত বাণী বিক্ষেপ ক'রে,
বসন্তবনের হরিণী যেমন দীর্ঘনিশ্বাসে ছুটে যায়
দিগন্তপারের নিরুদ্দেশে।

এমনি ক'রে চিরদিন জেনে এসেছি
মোহনকে লুকিয়ে দেখার অবকাশ এই ছুটি
অকারণ বিরহের নিঃসীম নির্জনতায়।

হাওয়া-বদল চাই—
এই কথাটা আজ হঠাৎ হাঁপিয়ে উঠল
ঘরে ঘরে হাজার লোকের মনে।
টাইম-টেবিলের গহনে গহনে
ওদের খোঁজ হল সারা,
সাঙ্গ হল গাঁঠরি-বাঁধা,
বিরল হল গাঁঠের কড়ি।
এ দিকে, উনপঞ্চাশ পবনের লাগাম যাঁর হাতে
তিনি আকাশে আকাশে উঠেছেন হেসে
ওদের ব্যাপার দেখে।
আমার নজরে পড়েছে সেই হাসি,
তাই চুপচাপ বসে আছি এই চাতালে
কেদারাটা টেনে নিয়ে।

দেখলেম বর্ষা গেল চলে,
কালো ফরাশটা নিল গুটিয়ে।
ভাদ্রশেষের নিরেট গুমটের উপরে
থেকে থেকে ধাক্কা লাগল
সংশয়িত উত্তরে হাওয়ার।
সাঁওতাল ছেলেরা শেষ করেছে কেয়াফুল বেচা,
মাঠের দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়েছে গোরুর পাল,
শ্রাবণভাদ্রের ভূরিভোজের অবসানে
তাদের ভাবখানা অতি মন্থর;
কী জানি, মুখ-ডোবানো রসালো ঘাসেই তাদের তৃপ্তি
না পিঠে কাঁচা রৌদ্র লাগানো আলস্যে।

হাওয়া-বদলের দায় আমার নয়;
তার জন্যে আছেন স্বয়ং দিক্‌পালেরা
রেলোয়ে স্টেশনের বাইরে,
তাঁরাই বিশ্বের ছুটিবিভাগে রসসৃষ্টির কারিগর।
অস্ত-আকাশে লাগল তাঁদের নতুন তুলির টান
অপূর্ব আলোকের বর্ণচ্ছটায়।
প্রজাপতির দল নামালেন
রৌদ্রে ঝলমল ফুলভরা টগরের ডালে,
পাতায় পাতায় যেন বাহবাধ্বনি উঠেছে
ওদের হালকা ডানার এলোমেলো তালের রঙিন নৃত্যে।
আমার আঙিনার ধারে ধারে এতদিন চলেছিল
এক-সার জুঁই-বেলের ফোটা-ঝরার ছন্দ,
সংকেত এল, তারা সরে পড়ল নেপথ্যে;
শিউলি এল ব্যতিব্যস্ত হয়ে;
এখনো বিদায় মিলল না মালতীর।
কাশের বনে লুটিয়ে পড়েছে শুক্লাসপ্তমীর জ্যোৎস্না—
পূজার পার্বণে চাঁদের নূতন উত্তরী
বর্ষাজলে ধোপ-দেওয়া।

আজ নি-খরচার হাওয়া-বদল জলে স্থলে।
খরিদ্দারের দল তাকে এড়িয়ে চলে গেল
দোকানে বাজারে।
বিধাতার দামী দান থাকে লুকোনো
বিনা দামের প্রশ্রয়ে,
সুলভ ঘোমটার নীচে থাকে
দুর্লভের পরিচয়।
আজ এই নি-কড়িয়া ছুটির অজস্রতা
সরিয়েছেন তিনি ভিড়ের থেকে
জনকয়েক অপরাজেয় কুঁড়ে মানুষের প্রাঙ্গণে।
তাদের জন্যেই পেতেছেন খাস-দরবারের আসর
তাঁর আম-দরবারের মাঝখানেই—
কোনো সীমানা নেই আঁকা।
এই ক'জনের দিকে তাকিয়ে
উৎসবের বীনকারকে তিনি বায়না দিয়ে এসেছেন
অসংখ্য যুগ থেকে।

বাঁশি বাজল।
আমার দুই চক্ষু যোগ দিল
কয়খানা হালকা মেঘের দলে।
ওরা ভেসে পড়েছে নিঃশেষে মিলিয়ে যাবার খেয়ায়।
আমার মন বেরোল নির্জনে-আসন-পাতা
শান্ত অভিসারে,
যা-কিছু আছে সমস্ত পেরিয়ে যাবার যাত্রায়।

আমার এই স্তব্ধ ভ্রমণ হবে সারা,
ছুটি হবে শেষ,
হাওয়া-বদলের দল ফিরে আসবে ভিড় ক'রে,
আসন্ন হবে বাকি-পড়া কাজের তাগিদ।

ফুরোবে আমার ফিরতি-টিকিটের মেয়াদ,
ফিরতে হবে এইখান থেকে এইখানেই,
মাঝখানে পার হব অসীম সমুদ্র।

শান্তিনিকেতন
শুক্লাসপ্তমী আশ্বিন ১৩৪২
সংশোধন ১৫. ১০. ৩৫

তিন

আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো, পৃথিবী,
শেষ নমস্কারে অবনত দিনাবসানের বেদিতলে।

মহাবীর্যবতী, তুমি বীরভোগ্যা,
বিপরীত তুমি ললিতে কঠোরে,
মিশ্রিত তোমার প্রকৃতি পুরুষে নারীতে ;
মানুষের জীবন দোলায়িত কর তুমি দুঃসহ দ্বন্দ্বে।
ডান হাতে পূর্ণ কর সুধা
বাম হাতে চূর্ণ কর পাত্র,
তোমার লীলাক্ষেত্র মুখরিত কর অট্টবিদ্রূপে ;
দুঃসাধ্য কর বীরের জীবনকে মহৎজীবনে যার অধিকার।
শ্রেয়কে কর দুর্মূল্য,
কৃপা কর না কৃপাপাত্রকে।
তোমার গাছে গাছে প্রচ্ছন্ন রেখেছ প্রতি মুহূর্তের সংগ্রাম,
ফলে শস্যে তার জয়মাল্য হয় সার্থক।
জলে স্থলে তোমার ক্ষমাহীন রণরঙ্গভূমি,
সেখানে মৃত্যুর মুখে ঘোষিত হয় বিজয়ী প্রাণের জয়বার্তা।
তোমার নির্দয়তার ভিত্তিতে উঠেছে সভ্যতার জয়তোরণ,
ত্রুটি ঘটলে তার পূর্ণ মূল্য শোধ হয় বিনাশে।

তোমার ইতিহাসের আদিপর্বে দানবের প্রতাপ ছিল দুর্জয়,
সে পরুষ, সে বর্বর, সে মূঢ়।

তার অঙ্গুলি ছিল স্থূল, কলাকৌশলবর্জিত ;
গদা-হাতে মুষল-হাতে লণ্ডভণ্ড করেছে সে সমুদ্র পর্বত ;
অগ্নিতে বাষ্পেতে দুঃস্বপ্ন ঘুলিয়ে তুলেছে আকাশে।
জড়রাজত্বে সে ছিল একাধিপতি,
প্রাণের 'পরে ছিল তার অন্ধ ঈর্ষা।

দেবতা এলেন পরযুগে—
মন্ত্র পড়লেন দানবদমনের,
জড়ের ঔদ্ধত্য হল অভিভূত ;
জীবধাত্রী বসলেন শ্যামল আস্তরণ পেতে।
উষা দাঁড়ালেন পূর্বাচলের শিখরচূড়ায়,
পশ্চিমসাগরতীরে সন্ধ্যা নামলেন মাথায় নিয়ে শান্তিঘট।

নম্র হল শিকলে-বাঁধা দানব,
তবু সেই আদিম বর্বর আঁকড়ে রইল তোমার ইতিহাস।
ব্যবস্থার মধ্যে সে হঠাৎ আনে বিশৃঙ্খলতা,
তোমার স্বভাবের কালো গর্ত থেকে
হঠাৎ বেরিয়ে আসে এঁকেবেঁকে।
তোমার নাড়ীতে লেগে আছে তার পাগলামি।
দেবতার মন্ত্র উঠছে আকাশে বাতাসে অরণ্যে
দিনে রাত্রে
উদাত্ত অনুদাত্ত মন্দ্রস্বরে।
তবু তোমার বক্ষের পাতাল থেকে আধপোষা নাগদানব
ক্ষণে ক্ষণে উঠছে ফণা তুলে,
তার তাড়নায় তোমার আপন জীবকে করছ আঘাত,
ছারখার করছ আপন সৃষ্টিকে।

শুভে অশুভে স্থাপিত তোমার পাদপীঠে,
তোমার প্রচণ্ড সুন্দর মহিমার উদ্দেশে
আজ রেখে যাব আমার ক্ষতচিহ্নলাঞ্ছিত জীবনের প্রণতি।

বিরাট প্রাণের, বিরাট মৃত্যুর গুপ্তসঞ্চার
তোমার যে মাটির তলায়
তাকে আজ স্পর্শ করি, উপলব্ধি করি সর্ব দেহে মনে।
অগণিত যুগযুগান্তরের
অসংখ্য মানুষের লুপ্ত দেহ পুঞ্জিত তার ধুলায়।
আমিও রেখে যাব কয় মুষ্টি ধূলি
আমার সমস্ত সুখদুঃখের শেষ পরিণাম—
রেখে যাব এই নামগ্রাসী, আকারগ্রাসী, সকল-পরিচয়-গ্রাসী
নিঃশব্দ মহাধূলিরাশির মধ্যে।

অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী, মেঘলোকে উধাও পৃথিবী,
গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে ধ্যাননিমগ্না পৃথিবী,
নীলাম্বুরাশির অতন্দ্রতরঙ্গে কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবী,
অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা।
এক দিকে আপক্বধান্যভারনম্র তোমার শস্যক্ষেত্র,
সেখানে প্রসন্ন প্রভাতসূর্য প্রতিদিন মুছে নেয় শিশিরবিন্দু
কিরণ-উত্তরীয় বুলিয়ে দিয়ে।
অস্তগামী সূর্য শ্যামশস্যহিল্লোলে রেখে যায় অকথিত এই বাণী—
'আমি আনন্দিত'।
অন্য দিকে তোমার জলহীন ফলহীন আতঙ্কপাণ্ডুর মরুক্ষেত্রে
পরিকীর্ণ পশুকঙ্কালের মধ্যে মরীচিকার প্রেতনৃত্য।
বৈশাখে দেখেছি বিদ্যুৎচঞ্চুবিদ্ধ দিগন্তকে ছিনিয়ে নিতে এল
কালো শ্যেনপাখির মতো তোমার ঝড়,
সমস্ত আকাশটা ডেকে উঠল যেন কেশর-ফোলা সিংহ,
তার লেজের ঝাপটে ডালপালা আলুথালু ক'রে
হতাশ বনস্পতি ধুলায় পড়ল উবুড় হয়ে।
হাওয়ার মুখে ছুটল ভাঙা কুঁড়ের চাল
শিকল-ছেঁড়া কয়েদি-ডাকাতের মতো।
আবার ফাল্গুনে দেখেছি তোমার আতপ্ত দক্ষিনে হাওয়া
ছড়িয়ে দিয়েছে বিরহমিলনের স্বগতপ্রলাপ
আম্রমুকুলের গন্ধে।

চাঁদের পেয়ালা ছাপিয়ে দিয়ে উপচিয়ে পড়েছে
স্বর্গীয় মদের ফেনা।
বনের মর্মরধ্বনি বাতাসের স্পর্ধায় ধৈর্য হারিয়েছে
অকস্মাৎ কল্লোলোচ্ছ্বাসে।

স্নিগ্ধ তুমি, হিংস্র তুমি, পুরাতনী, তুমি নিত্যনবীনা,
অনাদি সৃষ্টির যজ্ঞহুতাগ্নি থেকে বেরিয়ে এসেছিলে
সংখ্যাগণনার অতীত প্রত্যুষে,
তোমার চক্রতীর্থের পথে পথে ছড়িয়ে এসেছ
শতশত ভাঙা ইতিহাসের অর্থলুপ্ত অবশেষ—
বিনা বেদনায় বিছিয়ে এসেছ তোমার বর্জিত সৃষ্টি
অগণ্য বিস্মৃতির স্তরে স্তরে।

জীবপালিনী, আমাদের পুষেছ
তোমার খণ্ডকালের ছোটো ছোটো পিঞ্জরে।
তারই মধ্যে সব খেলার সীমা,
সব কীর্তির অবসান।

আজ আমি কোনো মোহ নিয়ে আসি নি তোমার সম্মুখে,
এতদিন যে দিনরাত্রির মালা গেঁথেছি বসে বসে
তার জন্যে অমরতার দাবি করব না তোমার দ্বারে।
তোমার অযুত নিযুত বৎসর সূর্যপ্রদক্ষিণের পথে
যে বিপুল নিমেষগুলি উন্মীলিত নিমীলিত হতে থাকে
তারই এক ক্ষুদ্র অংশে কোনো একটি আসনের
সত্যমূল্য যদি দিয়ে থাকি,
জীবনের কোনো একটি ফলবান খণ্ডকে
যদি জয় করে থাকি পরম দুঃখে
তবে দিয়ো তোমার মাটির ফোঁটার একটি তিলক আমার কপালে;
সে চিহ্ন যাবে মিলিয়ে
যে রাত্রে সকল চিহ্ন পরম অচিনের মধ্যে যায় মিশে।

হে উদাসীন পৃথিবী,
আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে
তোমার নির্মম পদপ্রান্তে
আজ রেখে যাই আমার প্রণতি।

শান্তিনিকেতন
১৬ অক্টোবর ১৯৩৫

চার

একদিন আষাঢ়ে নামল
বাঁশবনের মর্মর-ঝরা ডালে
জলভারে অভিভূত নীলমেঘের নিবিড় ছায়া।
শুরু হল ফসল-খেতের জীবনীরচনা
মাঠে মাঠে কচি ধানের চিকন অঙ্কুরে।
এমন সে প্রচুর, এমন পরিপূর্ণ, এমন প্রোৎফুল্ল,
দ্যুলোকে ভূলোকে বাতাসে আলোকে
তার পরিচয় এমন উদার-প্রসারিত—
মনে হয় না সময়ের ছোটো বেড়ার মধ্যে তাকে কুলাতে পারে;
তার অপরিমেয় শ্যামলতায়
আছে যেন অসীমের চির-উৎসাহ,
যেমন আছে তরঙ্গ-উল্লোল সমুদ্রে।

মাস যায়।
শ্রাবণের স্নেহ নামে আঘাতের ছল ক'রে,
সবুজ মঞ্জরি এগিয়ে চলে দিনে দিনে
শিষগুলি কাঁধে তুলে নিয়ে
অন্তহীন স্পর্ধিত জয়যাত্রায়।
তার আত্মাভিমানী যৌবনের প্রগল্ভতার 'পরে
সূর্যের আলো বিস্তার করে হাস্যোজ্জ্বল কৌতুক,
নিশীথের তারা নিবিষ্ট করে নিস্তব্ধ বিস্ময়।

মাস যায়।
বাতাসে থেমে গেল মত্ততার আন্দোলন,
শরতের শান্তনির্মল আকাশ থেকে
অমন্দ্র শঙ্খধ্বনিতে বাণী এল—
প্রস্তুত হও।
সারা হল শিশিরজলে স্নানব্রত।

মাস যায়।
নির্মম শীতের হাওয়া এসে পৌঁছল হিমাচল থেকে,
সবুজের গায়ে গায়ে এঁকে দিল হলদের ইশারা,
পৃথিবীর দেওয়া রঙ বদল হল আলোর দেওয়া রঙে।
উড়ে এল হাঁসের পাঁতি নদীর চরে,
কাশের গুচ্ছ ঝরে পড়ল তটের পথে পথে।

মাস যায়।
বিকালবেলার রৌদ্রকে যেমন উজাড় করে দিনান্ত
শেষ-গোধূলির ধূসরতায়
তেমনি সোনার ফসল চলে গেল
অন্ধকারের অবরোধে।
তার পরে শূন্যমাঠে অতীতের চিহ্নগুলো
কিছুদিন রইল মৃত শিকড় আঁকড়ে ধরে—
শেষে কালো হয়ে ছাই হল আগুনের লেহনে।

মাস গেল।
তার পরে মাঠের পথ দিয়ে
গোরু নিয়ে চলে রাখাল—
কোনো ব্যথা নেই তাতে, কোনো ক্ষতি নেই কারো।
প্রান্তরে আপন ছায়ায় মগ্ন একলা অশথ গাছ,
সূর্য-মন্ত্র-জপ-করা ঋষির মতো।
তারই তলায় দুপুরবেলায় ছেলেটা বাজায় বাঁশি
আদিকালের গ্রামের সুরে।

সেই সুরে তাম্রবরন তপ্ত আকাশে
বাতাস হুহু করে ওঠে,
সে যে বিদায়ের নিত্যভাঁটায় ভেসে-চলা
মহাকালের দীর্ঘনিশ্বাস,
যে কাল, যে পথিক, পিছনের পান্থশালাগুলির দিকে
আর ফেরার পথ পায় না
এক দিনেরও জন্যে।

শান্তিনিকেতন
১৯ অক্টোবর ১৯৩৫

পাঁচ

সন্ধ্যা এল চুল এলিয়ে
অস্তসমুদ্রে সদ্য স্নান করে।
মনে হল, স্বপ্নের ধূপ উঠছে
নক্ষত্রলোকের দিকে।
মায়াবিষ্ট নিবিড় সেই স্তব্ধ ক্ষণে—
তার নাম করব না—
সবে সে চুল বেঁধেছে, পরেছে আসমানি রঙের শাড়ি,
খোলা ছাদে গান গাইছে একা।
আমি দাঁড়িয়ে ছিলেম পিছনে
ও হয়তো জানে না, কিম্বা হয়তো জানে।

ওর গানে বলছে সিন্ধু কাফির সুরে—
চলে যাবি এই যদি তোর মনে থাকে
ডাকব না ফিরে ডাকব না,
ডাকি নে তো সকালবেলার শুকতারাকে।

শুনতে শুনতে সরে গেল সংসারের ব্যবহারিক আচ্ছাদনটা,
যেন কুঁড়ি থেকে পূর্ণ হয়ে ফুটে বেরোল

অগোচরের অপরূপ প্রকাশ ;
তার লঘু গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল আকাশে ;
অপ্রাপণীয়ের সে দীর্ঘনিশ্বাস,
দুরূহ দুরাশার সে অনুচ্চারিত ভাষা।

একদা মৃত্যুশোকের বেদমন্ত্র
তুলে ধরেছে বিশ্বের আবরণ, বলেছে—
পৃথিবীর ধূলি মধুময়।
সেই সুরে আমার মন বললে—
সংগীতময় ধরার ধূলি।
আমার মন বললে—
মৃত্যু, ওগো মধুময় মৃত্যু,
তুমি আমায় নিয়ে চলেছ লোকান্তরে
গানের পাখায়।

আমি ওকে দেখলেম,
যেন নিকষবরন ঘাটে সন্ধ্যার কালো জলে
অরুণবরন পা-দুখানি ডুবিয়ে বসে আছে অপ্সরী,
অকূল সরোবরে সুরের ঢেউ উঠেছে মৃদুমৃদু,
আমার বুকের কাঁপনে কাঁপন-লাগা হাওয়া
ওকে স্পর্শ করছে ঘিরে ঘিরে।

আমি ওকে দেখলেম,
যেন আলো-নেবা বাসরঘরে নববধূ,
আসন্ন প্রত্যাশার নিবিড়তায়
দেহের সমস্ত শিরা স্পন্দিত।
আকাশে ধ্রুবতারার অনিমেষ দৃষ্টি,
বাতাসে সাহানা রাগিণীর করুণা।

আমি ওকে দেখলেম,
ও যেন ফিরে গিয়েছে পূর্বজন্মে
চেনা-অচেনার অস্পষ্টতায়।

সে যুগের পালানো বাণী ধরবে বলে
ঘুরিয়ে ফেলছে গানের জাল,
সুরের ছোঁওয়া দিয়ে খুঁজে খুঁজে ফিরছে
হারানো পরিচয়কে।

সমুখে ছাদ ছাড়িয়ে উঠেছে বাদামগাছের মাথা,
উপরে উঠল কৃষ্ণচতুর্থীর চাঁদ।
ডাকলেম নাম ধরে।
তীক্ষ্ণবেগে উঠে দাঁড়ালো সে,
ভ্রূকুটি করে বললে, আমার দিকে ফিরে—
"এ কী অন্যায়, কেন এলে লুকিয়ে।"
কোনো উত্তর করলেম না।
বললেম না, প্রয়োজন ছিল না এই তুচ্ছ ছলনার।
বললেম না, আজ সহজে বলতে পারতে 'এসো',
বলতে পারতে 'খুশি হয়েছি'।
মধুময়ের উপর পড়ল ধূলার আবরণ।

পরদিন ছিল হাটবার
জানলায় বসে দেখছি চেয়ে।
রৌদ্র ধূ ধূ করছে পাশের সেই খোলা ছাদে।
তার স্পষ্ট আলোয় বিগত বসন্তরাত্রের বিহ্বলতা
সে দিয়েছে ঘুচিয়ে।
নির্বিশেষে ছড়িয়ে পড়ল আলো মাঠে বাটে,
মহাজনের টিনের ছাদে,
শাক-সবজির ঝুড়ি-চুপড়িতে,
আঁটিবাঁধা খড়ে,
হাঁড়ি-মালসার স্তূপে,
নতুন গুড়ের কলসীর গায়ে।
সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিল
মহানিম গাছের ফুলের মঞ্জরিতে।

পথের ধারে তালের গুঁড়ি আঁকড়ে উঠেছে অশথ,
অন্ধ বৈরাগী তারই ছায়ায় গান গাইছে হাঁড়ি বাজিয়ে—
কাল আসব বলে চলে গেল,
আমি যে সেই কালের দিকে তাকিয়ে আছি।

কেনাবেচার বিচিত্র গোলমালের জমিনে
ঐ সুরের শিল্পে বুনে উঠছে
যেন সমস্ত বিশ্বের একটা উৎকণ্ঠার মন্ত্র— 'তাকিয়ে আছি'।

একজোড়া মোষ উদাস চোখ মেলে
বয়ে চলেছে বোঝাই গাড়ি,
গলায় বাজছে ঘণ্টা,
চাকার পাকে পাকে টেনে তুলছে কাতর ধ্বনি।
আকাশের আলোয় আজ যেন মেঠো বাঁশির সুর মেলে দেওয়া।
সব জড়িয়ে মন ভুলেছে।

বেদমন্ত্রের ছন্দে আবার মন বললে—
মধুময় এই পার্থিব ধূলি।

কেরোসিনের দোকানের সামনে
চোখে পড়ল একজন একেলে বাউল।
তালিদেওয়া আলখাল্লার উপরে
কোমরে-বাঁধা একটা বাঁয়া।
লোক জমেছে চারি দিকে।
হাসলেম, দেখলেম অদ্ভুতেরও সংগতি আছে এইখানে,
এও এসেছে হাটের ছবি ভর্তি করতে।
ওকে ডেকে নিলেম জানলার কাছে,
ও গাইতে লাগল—
হাট করতে এলেম আমি অধরার সন্ধানে,
সবাই ধরে টানে আমায়, এই যে গো এইখানে।

শান্তিনিকেতন
২৫ অক্টোবর ১৯৩৫

ছয়

অতিথিবৎসল,
ডেকে নাও পথের পথিককে
তোমার আপন ঘরে,
দাও ওর ভয় ভাঙিয়ে।
ও থাকে প্রদোষের বস্তিতে,
নিজের কালো ছায়া ওর সঙ্গে চলে
কখনো সমুখে কখনো পিছনে,
তাকেই সত্য ভেবে ওর যত দুঃখ যত ভয়।
দ্বারে দাঁড়িয়ে তোমার আলো তুলে ধরো,
ছায়া যাক মিলিয়ে,
থেমে যাক ওর বুকের কাঁপন।

বছরে বছরে ও গেছে চলে
তোমার আঙিনার সামনে দিয়ে,
সাহস পায় নি ভিতরে যেতে,
ভয় হয়েছে পাছে ওর বাইরের ধন
হারায় সেখানে।
দেখিয়ে দাও ওর আপন বিশ্ব
তোমার মন্দিরে,
সেখানে মুছে গেছে কাছের পরিচয়ের কালিমা,
ঘুচে গেছে নিত্যব্যবহারের জীর্ণতা,
তার চিরলাবণ্য হয়েছে পরিস্ফুট।

পান্থশালায় ছিল ওর বাসা,
বুকে আঁকড়ে ছিল তারই আসন, তারই শয্যা,
পলে পলে যার ভাড়া জুগিয়ে দিন কাটালো
কোন্ মুহূর্তে তাকে ছাড়বে ভয়ে
আড়াল তুলেছে উপকরণের।

একবার ঘরের অভয় স্বাদ পেতে দাও তাকে
বেড়ার বাইরে।

আপনাকে চেনার সময় পায় নি সে,
ঢাকা ছিল মোটা মাটির পর্দায় ;
পর্দা খুলে দেখিয়ে দাও যে, সে আলো, সে আনন্দ,
তোমারই সঙ্গে তার রূপের মিল।
তোমার যজ্ঞের হোমাগ্নিতে
তার জীবনের সুখদুঃখ আহুতি দাও,
জ্বলে উঠুক তেজের শিখায়,
ছাই হোক যা ছাই হবার।

হে অতিথিবৎসল,
পথের মানুষকে ডেকে নাও ঘরে,
আপনি যে ছিল আপনার পর হয়ে
সে পাক্ আপনাকে।

শান্তিনিকেতন
২৪ অক্টোবর ১৯৩৫

সাত

চোখ ঘুমে ভেরে আসে,
মাঝে-মাঝে উঠছি জেগে।
যেমন নববর্ষার প্রথম পসলা বৃষ্টির জল
মাটি চুঁইয়ে পৌঁছয় গাছের শিকড়ে এসে,
তেমনি তরুণ হেমন্তের আলো ঘুমের ভিতর দিয়ে
লেগেছে আমার অচেতন প্রাণের মূলে।
বেলা এগোল তিন প্রহরের কাছে।
পাংলা সাদা মেঘের টুকরো
স্থির হয়ে ভাসছে কার্তিকের রোদ্দুরে—
দেবশিশুদের কাগজের নৌকো।

পশ্চিম থেকে হাওয়া দিয়েছে বেগে,
দোলাদুলি লেগেছে তেঁতুলগাছের ডালে।
উত্তরে গোয়ালপাড়ার রাস্তা,
গোরুর গাড়ি বিছিয়ে দিল গেরুয়া ধুলো
ফিকে নীল আকাশে।

মধ্যদিনের নিঃশব্দ প্রহরে
অকাজে ভেসে যায় আমার মন
ভাবনাহীন দিনের ভেলায়।
সংসারের ঘাটের থেকে রশি-ছেঁড়া এই দিন
বাঁধা নেই কোনো প্রয়োজনে।
রঙের নদী পেরিয়ে সন্ধ্যাবেলায় অদৃশ্য হবে
নিস্তরঙ্গ ঘুমের কালো সমুদ্রে।

ফিকে কালিতে এই দিনটার চিহ্ন পড়ল কালের পাতায়,
দেখতে দেখতে যাবে সে মিলিয়ে।
ঘন অক্ষরে যে-সব দিন আঁকা পড়ে
মানুষের ভাগ্যলিপিতে,
তার মাঝখানে এ রইল ফাঁকা।
গাছের শুকনো পাতা মাটিতে ঝরে—
সেও শোধ করে যায় মাটির দেনা,
আমার এই অলস দিনের ঝরা পাতা
লোকারণ্যকে কিছুই দেয় নি ফিরিয়ে।

তবু মন বলে,
গ্রহণ করাও ফিরিয়ে-দেওয়ার রূপান্তর।
সৃষ্টির ঝর্না বেয়ে যে রস নামছে আকাশে আকাশে
তাকে মেনে নিয়েছি আমার দেহে মনে।
সেই রঙিন ধারায় আমার জীবনে রঙ লেগেছে—
যেমন লেগেছে ধানের খেতে,

যেমন লেগেছে বনের পাতায়,
যেমন লেগেছে শরতে বিবাগী মেঘের উত্তরীয়ে।
এরা সবাই মিলে পূর্ণ করেছে আজকে-দিনের বিশ্বছবি।
আমার মনের মধ্যে চিকিয়ে উঠল আলোর ঝলক,
হেমন্তের আতপ্ত নিশ্বাস শিহর লাগালো
ঘুম-জাগরণের গঙ্গাযমুনায়—
এও কি মেলে নি এই নিখিল ছবির পটে।
জল-স্থল-আকাশের রসসত্রে
অশথের চঞ্চল পাতার সঙ্গে
ঝলমল করছে আমার যে অকারণ খুশি
বিশ্বের ইতিবৃত্তের মধ্যে রইল না তার রেখা,
তবু বিশ্বের প্রকাশের মধ্যে রইল তার শিল্প।
এই রসনিমগ্ন মুহূর্তগুলি
আমার হৃদয়ের রক্তপদ্মের বীজ,
এই নিয়ে ঋতুর দরবারে গাঁথা চলেছে একটি মালা—
আমার চিরজীবনের খুশির মালা।
আজ অকর্মণ্যের এই অখ্যাত দিন
ফাঁক রাখে নি ঐ মালাটিতে—
আজও একটি বীজ পড়েছে গাঁথা।

কাল রাত্রি একা কেটেছে এই জানালার ধারে।
বনের ললাটে লগ্ন ছিল শুক্লপঞ্চমীর চাঁদের রেখা।
এও সেই একই জগৎ,
কিন্তু গুণী তার রাগিণী দিলেন বদল ক'রে
ঝাপসা আলোর মূর্ছনায়।
রাস্তায়-চলা ব্যস্ত যে পৃথিবী
এখন আঙিনায়-আঁচল-মেলা তার স্তব্ধ রূপ।
লক্ষ নেই কাছের সংসারে,
শুনছে তারার আলোয় গুঞ্জরিত পুরাণকথা।

মনে পড়ছে দূর বাষ্পযুগের শৈশবস্মৃতি।
গাছগুলো স্তম্ভিত,
রাত্রির নিঃশব্দতা পুঞ্জিত যেন দেহ নিয়ে।
ঘাসের অস্পষ্ট সবুজে সারি সারি পড়েছে ছায়া।
দিনের বেলায় জীবনযাত্রার পথের ধারে
সেই ছায়াগুলি ছিল সেবাসহচরী;
তখন রাখালকে দিয়েছে আশ্রয়,
মধ্যাহ্নের তীব্রতায় দিয়েছে শান্তি।
এখন তাদের কোনো দায় নেই জ্যোৎস্নারাতে;
রাত্রের আলোর গায়ে গায়ে বসেছে ওরা,
ভাইবোনে মিলে বুলিয়েছে তুলি
খামখেয়ালি রচনার কাজে।
আমার দিনের বেলাকার মন
আপন সেতারের পর্দা দিয়েছে বদল ক'রে।
যেন চলে গেলেম পৃথিবীর কোনো প্রতিবেশী গ্রহে,
তাকে দেখা যায় দুরবীনে।
যে গভীর অনুভূতিতে নিবিড় হল চিত্ত
সমস্ত সৃষ্টির অন্তরে তাকে দিয়েছি বিস্তীর্ণ ক'রে।
ঐ চাঁদ ঐ তারা ঐ তমঃপুঞ্জ গাছগুলি
এক হল, বিরাট হল, সম্পূর্ণ হল
আমার চেতনায়।
বিশ্ব আমাকে পেয়েছে,
আমার মধ্যে পেয়েছে আপনাকে
অলস কবির এই সার্থকতা।

শান্তিনিকেতন
কার্তিক শুক্লাষষ্ঠী ১৩৪২

আট

আমাকে এনে দিল এই বুনো চারাগাছটি।
পাতার রঙ হলদে-সবুজ,
ফুলগুলি যেন আলো পান করবার
শিল্প-করা পেয়ালা, বেগুনি রঙের।
প্রশ্ন করি 'নাম কী',
জবাব নেই কোনোখানে।
ও আছে বিশ্বের অসীম অপরিচিতের মহলে
যেখানে আছে আকাশের নামহারা তারা।
আমি ওকে ধরে এনেছি একটি ডাক-নামে
আমার একলা জানার নিভৃতে।
ওর নাম পেয়ালী।
বাগানের নিমন্ত্রণে এসেছে ডালিয়া, এসেছে ফুশিয়া,
এসেছে ম্যারিগোল্ড্,
ও আছে অনাদরের অচিহ্নিত স্বাধীনতায়,
জাতে বাঁধা পড়ে নি ;
ও বাউল, ও অসামাজিক।

দেখতে দেখতে ঐ খসে পড়ল ফুল।
যে শব্দটুকু হল বাতাসে
কানে এল না।
ওর কুষ্টির রাশিচক্র যে নিমেষগুলির সমবায়ে
অণুপরিমাণ তার অঙ্ক,
ওর বুকের গভীরে যে মধু আছে
কণাপরিমাণ তার বিন্দু।
একটুকু কালের মধ্যে সম্পূর্ণ ওর যাত্রা,
একটি কল্পে যেমন সম্পূর্ণ
আগুনের-পাপড়ি-মেলা সূর্যের বিকাশ।
ওর ইতিহাসটুকু অতি ছোটো পাতার কোণে
বিশ্বলিপিকারের অতি ছোটো কলমে লেখা।

তবু তারই সঙ্গে সঙ্গে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে বৃহৎ ইতিহাস,
দৃষ্টি চলে না এক পৃষ্ঠা থেকে অন্য পৃষ্ঠায়।
শতাব্দীর যে নিরন্তর স্রোত বয়ে চলেছে
বিলম্বিত তালের তরঙ্গের মতো,
যে ধারায় উঠল নামল কত শৈলশ্রেণী,
সাগরে মরুতে কত হল বেশপরিবর্তন,
সেই নিরবধি কালেরই দীর্ঘ প্রবাহে এগিয়ে এসেছে
এই ছোটো ফুলটির আদিম সংকল্প
সৃষ্টির ঘাতপ্রতিঘাতে।

লক্ষ লক্ষ বৎসর এই ফুলের ফোটা-ঝরার পথে
সেই পুরাতন সংকল্প রয়েছে নূতন, রয়েছে সজীব সচল,
ওর শেষ সমাপ্ত ছবি আজও দেয় নি দেখা।
এই দেহহীন সংকল্প, সেই রেখাহীন ছবি
নিত্য হয়ে আছে কোন্ অদৃশ্যের ধ্যানে!
যে অদৃশ্যের অন্তহীন কল্পনায় আমি আছি,
যে অদৃশ্যে বিধৃত সকল মানুষের ইতিহাস
অতীতে ভবিষ্যতে।

শান্তিনিকেতন
৫ নভেম্বর ১৯৩৫

নয়

হেঁকে উঠল ঝড়,
লাগালো প্রচণ্ড তাড়া,
সূর্যাস্তসীমার রঙিন পাঁচিল ডিঙিয়ে
ব্যস্ত বেগে বেরিয়ে পড়ল মেঘের ভিড়,
বুঝি ইন্দ্রলোকের আগুন-লাগা হাতিশালা থেকে
গাঁ গাঁ শব্দে ছুটছে ঐরাবতের কালো কালো শাবক
শুঁড় আছড়িয়ে।

মেঘের গায়ে গায়ে দগ্‌দগ্‌ করছে লাল আলো,
তার ছিন্ন ত্বকের রক্তরেখা।
বিদ্যুৎ লাফ মারছে মেঘের থেকে মেঘে,
চালাচ্ছে ঝক্‌ঝকে খাঁড়া;
বজ্রশব্দে গর্জে উঠছে দিগন্ত;
উত্তরপশ্চিমের আম-বাগানে শোনা গেল হাঁফ-ধরা একটা আওয়াজ,
এসে পড়ল পাটকিলে রঙের অন্ধকার,
শুকনো ধুলোর দম-আটকানো তুফান।
ছুঁড়ে মারে টুকরো ডাল শুকনো পাতা,
চোখে-মুখে ছিটোতে থাকে কাঁকরগুলো
আকাশটা ভূতে-পাওয়া।

পথিক উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ছে মাটিতে,
ঘন আঁধির ভিতর থেকে উঠছে ঘরহারা গোরুর উতরোল ডাক,
দূরে নদীর ঘাটে হৈ হৈ রব।
বোঝা গেল না কোন্‌ দিকে হুড়্‌মুড়্‌ দুড়্‌দাড়্‌ ক'রে
কিসের ওটা ভাঙচুর।
দুর্‌দুর্‌ করে বুক,
কী হল, কী হল ভাবনা।
কাকগুলো পড়ছে মুখ থুবড়িয়ে মাটিতে,
ঠোঁট দিয়ে ঘাস ধরছে কামড়িয়ে,
ধাক্কা খেয়ে যাচ্ছে সরে সরে,
ঝট্‌পট্‌ করছে পাখাদুটো।
নদীপথে ঝড়ের মুখে বাঁশঝাড়ের লুটোপুটি,
ডালগুলো ডাইনে বাঁয়ে আছাড় খায়,
দোহাই পাড়ে মরিয়া হয়ে।
তীক্ষ্ণ হাওয়া সাঁই সাঁই শান দিচ্ছে আর চালাচ্ছে ছুরি
অন্ধকারের পাঁজরের ভিতর দিয়ে।
জলে স্থলে শূন্যে উঠেছে
ঘুরপাক-খাওয়া আতঙ্ক।

হঠাৎ সোঁদা গন্ধের দীর্ঘনিশ্বাস উঠল মাটি থেকে,
মুহূর্তে এসে পড়ল বৃষ্টি প্রবল ঝাপটায়,
হাওয়ার চোটে গুঁড়োনো জলের ফোঁটা,
পাৎলা পর্দায় ঢেকে ফেললে সমস্ত বন,
আড়াল করলে মন্দিরের চুড়ো,
কাঁসর-ঘণ্টার ঢং ঢং শব্দের দিল মুখ চাপা।
রাত তিন পহরে থেমে গেল ঝড়বৃষ্টি,
কালী হয়ে এল অন্ধকার নিকষ-পাথরের মতো ;
কেবলই চলল ব্যাঙের ডাক,
ঝিঁঝি পোকার শব্দ,
জোনাকির মিটিমিটি আলো,
আর যেন স্বপ্নে-আঁৎকে-ওঠা দমকা হাওয়ায়
থেকে থেকে জল-ঝরা ঝাউয়ের ঝর্‌ঝরানি।

শান্তিনিকেতন
চৈত্র ১৩৪০

দশ

এই দেহখানা বহন করে আসছে দীর্ঘকাল
বহু ক্ষুদ্র মুহূর্তের রাগদ্বেষ ভয়ভাবনা
কামনার আবর্জনারাশি।
এর আবিল আবরণে বারে বারে ঢাকা পড়ে
আত্মার মুক্তরূপ।
এ সত্যের মুখোশ প'রে সত্যকে আড়ালে রাখে ;
মৃত্যুর কাদামাটিতেই গড়ে আপনার পুতুল,
তবু তার মধ্যে মৃত্যুর আভাস পেলেই
নালিশ করে আর্তকণ্ঠে।
খেলা করে নিজেকে ভোলাতে,
কেবলই ভুলতে চায় যে সেটা খেলা।

প্রাণপণ সঞ্চয়ে রচনা করে মরণের অর্ঘ্য ;
স্তুতিনিন্দার বাষ্পবুদ্‌বুদে ফেনিল হয়ে
পাক খায় ওর হাসিকান্নার আবর্ত।
বক্ষ ভেদ ক'রে ও হাউয়ের আগুন দেয় ছুটিয়ে,
শূন্যের কাছ থেকে ফিরে পায় ছাই—
দিনে দিনে তাই করে স্তূপাকার।

প্রতিদিন যে প্রভাতে পৃথিবী
প্রথম সৃষ্টির অক্লান্ত নির্মল দেববেশে দেয় দেখা,
আমি তার উন্মীলিত আলোকের অনুসরণ করে
অন্বেষণ করি আপন অন্তরলোক।
অসংখ্য দণ্ড পল নিমেষের জটিল মলিন জালে বিজড়িত
দেহটাকে সরিয়ে ফেলি মনের থেকে
যেখানে সরে যায় অন্ধকার রাতের
নানা ব্যর্থ ভাবনার অত্যুক্তি,
যায় বিস্মৃত দিনের অনবধানে পুঞ্জিত লেখন যত—
সেই-সব নিমন্ত্রণলিপি নীরব যার আহ্বান,
নিঃশেষিত যার প্রত্যুত্তর।
তখন মনে পড়ে, সবিতা,
তোমার কাছে ঋষিকবির প্রার্থনামন্ত্র,
যে মন্ত্রে বলেছিলেন, হে পূষণ,
তোমার হিরণ্ময় পাত্রে সত্যের মুখ আচ্ছন্ন,
উন্মুক্ত করো সেই আবরণ।

আমিও প্রতিদিন উদয়দিগ্‌বলয় থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মিচ্ছটায়
প্রসারিত করে দিই আমার জাগরণ ;
বলি, হে সবিতা,
সরিয়ে দাও আমার এই দেহ, এই আচ্ছাদন—
তোমার তেজোময় অঙ্গের সূক্ষ্ম অগ্নিকণায়
রচিত যে-আমার দেহের অণুপরমাণু,

তারও অলক্ষ্য অন্তরে আছে তোমার কল্যাণতম রূপ,
তাই প্রকাশিত হোক আমার নিরাবিল দৃষ্টিতে।
আমার অন্তরতম সত্য
আদি যুগে অব্যক্ত পৃথিবীর সঙ্গে
তোমার বিরাটে ছিল বিলীন,
সেই সত্য তোমারই।
তোমার জ্যোতির স্তিমিত কেন্দ্রে মানুষ
আপনার মহৎস্বরূপকে দেখেছে কালে কালে,
কখনো নীল-মহানদীর তীরে,
কখনো পারস্যসাগরের কূলে,
কখনো হিমাদ্রিগিরিতটে—
বলেছে 'জেনেছি আমরা অমৃতের পুত্র',
বলেছে 'দেখেছি অন্ধকারের পার হতে
আদিত্যবর্ণ মহান পুরুষের আবির্ভাব'।

শান্তিনিকেতন
৭ নবেম্বর ১৯৩৫

এগারো

ফাল্গুনের রঙিন আবেশ
যেমন দিনে দিনে মিলিয়ে দেয় বনভূমি
নীরস বৈশাখের রিক্ততায়,
তেমনি করেই সরিয়ে ফেলেছ হে প্রমদা, তোমার মদির মায়া
অনাদরে অবহেলায়।
একদিন আপন হাতে আমার চোখে বিছিয়েছিলে বিহ্বলতা,
রক্তে দিয়েছিলে দোল,
চিত্ত ভরেছিলে নেশায়, হে আমার সাকী,
পাত্র উজাড় ক'রে
দ্রাক্ষারসধারা আজ ঢেলে দিয়েছ ধুলায়।

আজ উপেক্ষা করেছ আমার স্তুতিকে,
আমার দুই চক্ষুর বিস্ময়কে ডাক দিতে ভুলে গেলে ;
আজ তোমার সাজের মধ্যে কোনো আকুতি নেই ;
নেই সেই নীরব ঝংকার
যা আমার নামকে দিয়েছিল রাগিণী।

শুনেছি একদিন চাঁদের দেহ ঘিরে
ছিল হাওয়ার আবর্ত।
তখন ছিল তার রঙের শিল্প,
ছিল সুরের মন্ত্র,
ছিল সে নিত্য নবীন।
দিনে দিনে উদাসী কেন ঘুচিয়ে দিল
আপন লীলার প্রবাহ।
কেন ক্লান্ত হল সে আপনার মাধুর্যকে নিয়ে।
আজ শুধু তার মধ্যে আছে
আলোছায়ার মৈত্রীবিহীন দ্বন্দ্ব—
ফোটে না ফুল,
বহে না কলমুখরা নির্ঝরিণী।

সেই বাণীহারা চাঁদ তুমি আজ আমার কাছে।
দুঃখ এই যে, এতে দুঃখ নেই তোমার মনে।
একদিন নিজেকে নূতন নূতন ক'রে সৃষ্টি করেছিলে মায়াবিনী,
আমারই ভালোলাগার রঙে রঙিয়ে।
আজ তারই উপর তুমি টেনে দিলে
যুগান্তের কালো যবনিকা
বর্ণহীন, ভাষাবিহীন।
ভুলে গেছ যতই দিতে এসেছিলে আপনাকে
ততই পেয়েছিলে আপনাকে বিচিত্র করে।
আজ আমাকে বঞ্চিত করে
বঞ্চিত হয়েছ আপন সার্থকতায়।

তোমার মাধুর্যযুগের ভগ্নশেষ
রইল আমার মনের স্তরে স্তরে—
সেদিনকার তোরণের স্তূপ,
প্রাসাদের ভিত্তি,
গুল্মে-ঢাকা বাগানের পথ।

আমি বাস করি
তোমার ভাঙা ঐশ্বর্যের ছড়ানো টুকরোর মধ্যে।
আমি খুঁজে বেড়াই মাটির তলার অন্ধকার,
কুড়িয়ে রাখি যা ঠেকে হাতে।
আর তুমি আছ
আপন কৃপণতার পাণ্ডুর মরুদেশে,
পিপাসিতের জন্যে জল নেই সেখানে,
পিপাসাকে ছলনা করতে পারে
নেই এমন মরীচিকারও সম্বল।

শান্তিনিকেতন
১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬

বারো

বসেছি অপরাহ্ণে পারের খেয়াঘাটে
শেষধাপের কাছটাতে।
কালো জল নিঃশব্দে বয়ে যাচ্ছে পা ডুবিয়ে দিয়ে।
জীবনের পরিত্যক্ত ভোজের ক্ষেত্র পড়ে আছে পিছন দিকে
অনেক দিনের ছড়ানো উচ্ছিষ্ট নিয়ে।
মনে পড়ছে ভোগের আয়োজনে
ফাঁক পড়েছে বারম্বার।
কতদিন যখন মূল্য ছিল হাতে
হাট জমে নি তখনো,
বোঝাই নৌকো লাগল যখন ডাঙায়

তখন ঘণ্টা গিয়েছে বেজে,
ফুরিয়েছে বেচাকেনার প্রহর।

অকালবসন্তে জেগেছিল ভোরের কোকিল ;
সেদিন তার চড়িয়েছি সেতারে,
গানে বসিয়েছি সুর।
যাকে শোনাব তার চুল যখন হল বাঁধা,
বুকে উঠল জাফরানি রঙের আঁচল
তখন ঝিকিমিকি বেলা,
করুণ ক্লান্তি লেগেছে মুলতানে।
ক্রমে ধূসর আলোর উপরে কালো মরচে পড়ে এল।
থেমে-যাওয়া গানখানি নিভে-যাওয়া প্রদীপের ভেলার মতো
ডুবল বুঝি কোন্‌ একজনের মনের তলায়,
উঠল বুঝি তার দীর্ঘনিশ্বাস,
কিন্তু জ্বালানো হল না আলো।

এ নিয়ে আজ নালিশ নেই আমার।
বিরহের কালোগুহা ক্ষুধিত গহ্বর থেকে
ঢেলে দিয়েছে ক্ষুভিত সুরের ঝর্না রাত্রিদিন।
সাত রঙের ছটা খেলেছে তার নাচের উড়নিতে
সারাদিনের সূর্যালোকে,
নিশীথরাত্রের জপমন্ত্র ছন্দ পেয়েছে
তার তিমিরপুঞ্জ কলোচ্ছল ধারায়।
আমার তপ্ত মধ্যাহ্নের শূন্যতা থেকে উচ্ছ্বসিত
গৌড়-সারঙের আলাপ।
আজ বঞ্চিত জীবনকে বলি সার্থক—
নিঃশেষ হয়ে এল তার দুঃখের সঞ্চয়
মৃত্যুর অর্ঘ্যপাত্রে,
তার দক্ষিণা রয়ে গেল কালের বেদিপ্রান্তে।

জীবনের পথে মানুষ যাত্রা করে
নিজেকে খুঁজে পাবার জন্যে।
গান যে মানুষ গায় দিয়েছে সে ধরা, আমার অন্তরে ;
যে মানুষ দেয় প্রাণ দেখা মেলে নি তার।

দেখেছি শুধু আপনার নিভৃত রূপ
ছায়ায় পরিকীর্ণ,
যেন পাহাড়তলিতে একখানা অনুত্তরঙ্গ সরোবর।
তীরের গাছ থেকে
সেখানে বসন্তশেষের ফুল পড়ে ঝ'রে,
ছেলেরা ভাসায় খেলার নৌকো,
কলস ভরে নেয় তরুণীরা
বুদ্‌বুদ্‌ফেনিল গর্গরধ্বনিতে।
নববর্ষার গম্ভীর বিরাট শ্যামমহিমা
তার বক্ষতলে পায় লীলাচঞ্চল দোসরটিকে।
কালবৈশাখী হঠাৎ মারে পাখার ঝাপট,
স্থির জলে আনে অশান্তির উন্মন্থন,
অধৈর্যের আঘাত হানে তটবেষ্টনের স্থাবরতায় ;
হঠাৎ বুঝি তার মনে হয়—
গিরিশিখরের পাগলা-ঝোরা পোষ মেনেছে
গিরিপদতলের বোবা জলরাশিতে—
বন্দী ভুলেছে আপনার উদ্‌বেলকে, উদ্দামকে—
পাথর ডিঙিয়ে আপন সীমানা চূর্ণ করতে করতে নিরুদ্দেশের পথে
অজানার সংঘাতে বাঁকে বাঁকে
গর্জিত করল না সে আপন অবরুদ্ধ বাণী,
আবর্তে আবর্তে উৎক্ষিপ্ত করল না
অন্তর্গূঢ়কে।

মৃত্যুর গ্রন্থি থেকে ছিনিয়ে ছিনিয়ে
যে উদ্ধার করে জীবনকে

সেই রুদ্র মানবের আত্মপরিচয়ে বঞ্চিত
ক্ষীণ পাণ্ডুর আমি
অপরিস্ফুটতার অসম্মান নিয়ে যাচ্ছি চলে।

দুর্গম ভীষণের ওপারে
অন্ধকারে অপেক্ষা করছে জ্ঞানের বরদাত্রী ;
মানবের অভ্রভেদী বন্ধনশালা
তুলেছে কালো পাথরে গাঁথা উদ্ধত চূড়া
সূর্যোদয়ের পথে ;
বহু শতাব্দীর ব্যথিত ক্ষত মুষ্টি
রক্তলাঞ্ছিত বিদ্রোহের ছাপ
লেপে দিয়ে যায় তার দ্বারফলকে ;
ইতিহাসবিধাতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ
দৈত্যের লৌহদুর্গে প্রচ্ছন্ন ;
আকাশে দেবসেনাপতির কণ্ঠ শোনা যায়—
'এসো মৃত্যুবিজয়ী'।
বাজল ভেরি,
তবু জাগল না রণদুর্মদ
এই নিরাপদ নিশ্চেষ্ট জীবনে,
ব্যূহ ভেদ ক'রে
স্থান নিই নি যুধ্যমান দেবলোকের সংগ্রামসহকারিতায়।
কেবল স্বপ্নে শুনেছি ডমরুর গুরুগুরু,
কেবল সমরযাত্রীর পদপাতকম্পন
মিলেছে হৃৎস্পন্দনে বাহিরের পথ থেকে।

যুগে যুগে যে মানুষের সৃষ্টি প্রলয়ের ক্ষেত্রে
সেই শ্মশানচারী ভৈরবের পরিচয়জ্যোতি
ম্লান হয়ে রইল আমার সত্তায় ;
শুধু রেখে গেলেম নতমস্তকের প্রণাম
মানবের হৃদয়াসীন সেই বীরের উদ্দেশে—

মর্তের অমরাবতী যাঁর সৃষ্টি
মৃত্যুর মূল্যে, দুঃখের দীপ্তিতে।

১ বৈশাখ ১৩৪৩

তেরো

হৃদয়ের অসংখ্য অদৃশ্য পত্রপুট
গুচ্ছে গুচ্ছে অঞ্জলি মেলে আছে
আমার চার দিকে চিরকাল ধ'রে,
আমি-বনস্পতির এরা কিরণপিপাসু পল্লবস্তবক,
এরা মাধুকরী-ব্রতীর দল।
প্রতিদিন আকাশ থেকে এরা ভরে নিয়েছে
আলোকের তেজোরস,
নিহিত করেছে সেই অলক্ষ্য অপ্রজ্বলিত অগ্নিসঞ্চয়
এই জীবনের গূঢ়তম মজ্জার মধ্যে।
সুন্দরের কাছে পেয়েছে অমৃতের কণা
ফুলের থেকে, পাখির গানের থেকে,
প্রিয়ার স্পর্শ থেকে, প্রণয়ের প্রতিশ্রুতি থেকে,
আত্মনিবেদনের অশ্রুগদ্‌গদ আকুতি থেকে—
মাধুর্যের কত স্মৃতরূপ কত বিস্মৃতরূপ
দিয়ে গেছে অমৃতের স্বাদ,
আমার নাড়ীতে নাড়ীতে।
নানা ঘাতে প্রতিঘাতে সংক্ষুব্ধ
সুখদুঃখের ঝোড়ো হাওয়া নাড়া দিয়েছে
আমার চিত্তের স্পর্শবেদনাবাহিনী পাতায় পাতায়।
লেগেছে নিবিড় হর্ষের অনুকম্পন,
এসেছে লজ্জার ধিক্কার, ভয়ের সংকোচ, কলঙ্কের গ্লানি,
জীবনবহনের প্রতিবাদ।
ভালোমন্দের বিচিত্র বিপরীত বেগ
দিয়ে গেছে আন্দোলন
প্রাণরসপ্রবাহে।

তার আবেগে বহে নিয়ে গেছে সর্বগৃধ্নু চেতনাকে
জগতের সর্বদানযজ্ঞের প্রাঙ্গণে।
এই চিরচঞ্চল চিন্ময় পল্লবের অশ্রুত মর্মরধ্বনি
উধাও করে দেয় আমার জাগ্রত স্বপ্নকে
চিল-উড়ে-যাওয়া দূর দিগন্তে
জনহীন মধ্যদিনে মৌমাছির-গুঞ্জন-মুখর অবকাশে।
হাত-ধরে-বসে-থাকা বাষ্পাকুল নির্বাক্ ভালোবাসায়
নেমে আসে এদেরই শ্যামল ছায়ার করুণা।
এদেরই মৃদুবীজন এসে লাগে
শয্যাপ্রান্তে নিদ্রিত দয়িতার
নিশ্বাসস্ফুরিত বক্ষের চেলাঞ্চলে।
প্রিয়প্রত্যাশিত দিনের চিরায়মান উৎকণ্ঠিত প্রহরে
শিহর লাগাতে থাকে এদেরই দোলায়িত কম্পনে।

বিশ্বভুবনের সমস্ত ঐশ্বর্যের সঙ্গে আমার যোগ হয়েছে
মনোবৃক্ষের এই ছড়িয়ে-পড়া
রসলোলুপ পাতাগুলির সম্বেদনে।
এরা ধরেছে সূক্ষ্মকে, বস্তুর অতীতকে ;
এরা তাল দিয়েছে সেই গানের ছন্দে
যার সুর যায় না শোনা।
এরা নারীর হৃদয় থেকে এনে দিয়েছে আমার হৃদয়ে
প্রাণলীলার প্রথম ইন্দ্রজাল আদিযুগের,
অনন্ত পুরাতনের আত্মবিলাস
নব নব যুগলের মায়ারূপের মধ্যে।
এরা স্পন্দিত হয়েছে পুরুষের জয়শঙ্খধ্বনিতে
মর্তলোকে যার আবির্ভাব
মৃত্যুর আলোকে আপন অমৃতকে উদ্‌বারিত করবার জন্যে
দুর্দাম উদ্যমে,
জল-স্থল-আকাশ-পথে দুর্গমজয়ের
স্পর্ধিত যার অধ্যবসায়।

আজ আমার এই পত্রপুঞ্জের
ঝরবার দিন এল জানি।
শুধাই আজ অন্তরীক্ষের দিকে চেয়ে—
কোথায় গো সৃষ্টির আনন্দনিকেতনের প্রভু,
জীবনের অলক্ষ্য গভীরে
আমার এই পত্রদূতগুলির সম্বাহিত দিনরাত্রির যে সঞ্চয়
অসংখ্য অপূর্ব অপরিমেয়
যা অখণ্ড ঐক্যে মিলে গিয়েছে আমার আত্মরূপে,
যে রূপের দ্বিতীয় নেই কোনোখানে কোনো কালে,
তাকে রেখে দিয়ে যাব কোন্ গুণীর কোন্ রসজ্ঞের
দৃষ্টির সম্মুখে,
কার দক্ষিণ করতলের ছায়ায়,
অগণ্যের মধ্যে কে তাকে নেবে স্বীকার করে।

শান্তিনিকেতন
১০ বৈশাখ ১৩৪৩

চোদ্দো

ওগো তরুণী,
ছিল অনেক দিনের পুরোনো বছরে
এমনি একখানি নতুন কাল,
দক্ষিণ হাওয়ায় দোলায়িত,
সেই কালেরই আমি।
মুছে-আসা ঝাপসা পথ বেয়ে
এসে পড়েছি বনগন্ধের সংকেতে
তোমাদের এই আজকে-দিনের নতুন কালে।
পারো যদি মেনে নিয়ো আমায় সখা বলে।
আর কিছু নয়, আমি গান জোগাতে পারি
তোমাদের মিলনরাতে
আমার সেই নিদ্রাহারা সুদূর রাতের গান;

তার স্বরে পাবে দূরের নতুনকে,
তোমার লাগবে ভালো,
পাবে আপনাকেই
আপনার সীমানার অতীত পারে।
সেদিনকার বসন্তের বাঁশিতে
লেগেছিল যে প্রিয়বন্দনার তান
আজ সঙ্গে এনেছি তাই,
সে নিয়ো তোমার অর্ধনিমীলিত চোখের পাতায়,
তোমার দীর্ঘনিশ্বাসে।
আমার বিস্মৃত বেদনার আভাসটুকু
ঝরা ফুলের মৃদু গন্ধের মতো
রেখে দিয়ে যাব তোমার নববসন্তের হাওয়ায়।
সেদিনকার ব্যথা
অকারণে বাজবে তোমার বুকে ;
মনে বুঝবে, সেদিন তুমি ছিলে না তবু ছিলে,
নিখিল যৌবনের রঙ্গভূমির নেপথ্যে
যবনিকার ও পারে।
ওগো চিরন্তনী,
আজ আমার বাঁশি তোমাকে বলতে এল—
যখন তুমি থাকবে না তখনো তুমি থাকবে আমার গানে।
ডাকতে এলেম আমার হারিয়ে-যাওয়া পুরোনোকে
তার খুঁজে-পাওয়া নতুন নামে।
হে তরুণী,
আমাকে মেনে নিয়ো তোমার সখা বলে,
তোমার অন্যযুগের সখা।

শান্তিনিকেতন
১৯ বৈশাখ ১৩৪৩

পনেরো

ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত।
দেবালয়ের মন্দিরদ্বারে
পূজা-ব্যবসায়ী ওদের ঠেকিয়ে রাখে।
ওরা দেবতাকে খুঁজে বেড়ায় তাঁর আপন স্থানে
সকল বেড়ার বাইরে
সহজ ভক্তির আলোকে,
নক্ষত্রখচিত আকাশে,
পুষ্পখচিত বনস্থলীতে,
দোসর-জনার মিলন-বিরহের
গহন বেদনায়।
যে দেখা বানিয়ে-দেখা বাঁধা ছাঁচে,
প্রাচীর ঘিরে, দুয়ার তুলে,
সে দেখার উপায় নেই ওদের হাতে।
কতদিন দেখেছি ওদের সাধককে
একলা প্রভাতের রৌদ্রে সেই পদ্মানদীর ধারে,
যে নদীর নেই কোনো দ্বিধা
পাকা দেউলের পুরাতন ভিত ভেঙে ফেলতে।
দেখেছি একতারা-হাতে চলেছে গানের ধারা বেয়ে
মনের মানুষকে সন্ধান করবার
গভীর নির্জন পথে।

কবি আমি ওদের দলে—
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
দেবতার বন্দীশালায়
আমার নৈবেদ্য পৌঁছল না।
পূজারি হাসিমুখে মন্দির থেকে বাহির হয়ে আসে,
আমাকে শুধায়, "দেখে এলে তোমার দেবতাকে?"
আমি বলি, "না।"

অবাক হয় শুনে ; বলে, "জানা নেই পথ ?"
আমি বলি, "না।"
প্রশ্ন করে, "কোনো জাত নেই বুঝি তোমার ?"
আমি বলি, "না।"

এমন করে দিন গেল ;
আজ আপন মনে ভাবি,
"কে আমার দেবতা,
কার করেছি পূজা।"
শুনেছি যাঁর নাম মুখে মুখে,
পড়েছি যাঁর কথা নানা ভাষায় নানা শাস্ত্রে,
কল্পনা করেছি তাঁকেই বুঝি মানি।
তিনিই আমার বরণীয় প্রমাণ করব বলে
পূজার প্রয়াস করেছি নিরন্তর।
আজ দেখেছি প্রমাণ হয় নি আমার জীবনে।
কেননা, আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন।
মন্দিরের রুদ্ধ দ্বারে এসে আমার পূজা
বেরিয়ে চলে গেল দিগন্তের দিকে—
সকল বেড়ার বাইরে,
নক্ষত্রখচিত আকাশতলে,
পুষ্পখচিত বনস্থলীতে,
দোসর-জনার মিলন-বিরহের
বেদনা-বন্ধুর পথে।

বালক ছিলেম যখন
পৃথিবীর প্রথম জন্মদিনের আদি মন্ত্রটি
পেয়েছি আপন পুলককম্পিত অন্তরে,
আলোর মন্ত্র।
পেয়েছি নারকেল-শাখার ঝালর ঝোলা
আমার বাগানটিতে,

ভেঙে-পড়া শ্যাওলা-ধরা পাঁচিলের উপর
একলা ব'সে।
প্রথম প্রাণের বহ্নি-উৎস থেকে
নেমেছে তেজোময়ী লহরী,
দিয়েছে আমার নাড়ীতে
অনির্বচনীয়ের স্পন্দন।
আমার চৈতন্যে গোপনে দিয়েছে নাড়া
অনাদিকালের কোন্ অস্পষ্ট বার্তা,
প্রাচীন সূর্যের বিরাট বাষ্পদেহে বিলীন
আমার অব্যক্ত সত্তার রশ্মিস্ফুরণ।
হেমন্তের রিক্তশস্য প্রান্তরের দিকে চেয়ে
আলোর নিঃশব্দ চরণধ্বনি
শুনেছি আমার রক্ত-চাঞ্চল্যে।
সেই ধ্বনি আমার অনুসরণ করেছে
জন্মপূর্বের কোন্ পুরাতন কালযাত্রা থেকে।
বিস্ময়ে আমার চিত্ত প্রসারিত হয়েছে অসীম কালে
যখন ভেবেছি
সৃষ্টির আলোকতীর্থে
সেই জ্যোতিতে আজ আমি জাগ্রত
যে জ্যোতিতে অযুত নিযুত বৎসর পূর্বে
সুপ্ত ছিল আমার ভবিষ্যৎ।
আমার পূজা আপনিই সম্পূর্ণ হয়েছে প্রতিদিন
এই জাগরণের আনন্দে।
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
রীতিবন্ধনের বাহিরে আমার আত্মবিস্মৃত পূজা
কোথায় হল উৎসৃষ্ট জানতে পারি নি।

যখন বালক ছিলেম ছিল না কেউ সাথি,
দিন কেটেছে একা একা
চেয়ে চেয়ে দূরের দিকে।

জন্মেছিলেম অনাচারের অনাদৃত সংসারে,
চিহ্ন-মোছা, প্রাচীরহারা।
প্রতিবেশীর পাড়া ছিল ঘন বেড়ায় ঘেরা,
আমি ছিলেম বাইরের ছেলে, নাম-না-জানা।
ওদের ছিল তৈরি বাসা, ভিড়ের বাসা—
ওদের বাঁধা পথের আসা-যাওয়া
দেখেছি দূরের থেকে
আমি ব্রাত্য, আমি পংক্তিহারা।
বিধান-বাঁধা মানুষ আমাকে মানুষ মানে নি,
তাই আমার বন্ধুহীন খেলা ছিল সকল পথের চৌমাথায়,
ওরা তার ও পাশ দিয়ে চলে গেছে
বসনপ্রান্ত তুলে ধরে।
ওরা তুলে নিয়ে গেল ওদের দেবতার পূজায়
শাস্ত্র মিলিয়ে বাছা-বাছা ফুল—
রেখে দিয়ে গেল আমার দেবতার জন্যে
সকল দেশের সকল ফুল—
এক সূর্যের আলোকে চিরস্বীকৃত।
দলের উপেক্ষিত আমি,
মানুষের মিলন-ক্ষুধায় ফিরেছি,
যে মানুষের অতিথিশালায়
প্রাচীর নেই, পাহারা নেই।
লোকালয়ের বাইরে পেয়েছি আমার নির্জনের সঙ্গী
যারা এসেছে ইতিহাসের মহাযুগে
আলো নিয়ে, অস্ত্র নিয়ে, মহাবাণী নিয়ে।
তারা বীর, তারা তপস্বী, তারা মৃত্যুঞ্জয়,
তারা আমার অন্তরঙ্গ, আমার স্ববর্ণ, আমার স্বগোত্র,
তাদের নিত্যশুচিতায় আমি শুচি।
তারা সত্যের পথিক, জ্যোতির সাধক,
অমৃতের অধিকারী।

মানুষকে গণ্ডির মধ্যে হারিয়েছি,
মিলেছে তার দেখা
দেশবিদেশের সকল সীমানা পেরিয়ে।
তাকে বলেছি হাত জোড় করে—
হে চিরকালের মানুষ, হে সকল মানুষের মানুষ,
পরিত্রাণ করো
ভেদচিহ্নের-তিলক-পরা
সংকীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে।
হে মহান্ পুরুষ, ধন্য আমি, দেখেছি তোমাকে
তামসের পরপার হতে
আমি ব্রাত্য, আমি জাতিহারা।

একদিন বসন্তে নারী এল সঙ্গীহারা আমার বনে
প্রিয়ার মধুর রূপে।
এল সুর দিতে আমার গানে,
নাচ দিতে আমার ছন্দে,
সুধা দিতে আমার স্বপ্নে।
উদ্দাম একটা ঢেউ হৃদয়ের তট ছাপিয়ে
হঠাৎ হল উচ্ছলিত,
ডুবিয়ে দিল সকল ভাষা,
নাম এল না মুখে।
সে দাঁড়ালো গাছের তলায়,
ফিরে তাকালো আমার কুণ্ঠিত বেদনাকরুণ
মুখের দিকে।
ত্বরিত পদে এসে বসল আমার পাশে।
দুই হাতের মধ্যে আমার হাত তুলে নিয়ে বললে,
"তুমি চেন না আমাকে, তোমাকে চিনি নে আমি,
আজ পর্যন্ত কেমন করে এটা হল সম্ভব
আমি তাই ভাবি।"
আমি বললেম, "দুই না-চেনার মাঝখানে

চিরকাল ধরে আমরা দুজনে বাঁধব সেতু,
এই কৌতূহল সমস্ত বিশ্বের অন্তরে।"

ভালোবেসেছি তাকে।
সেই ভালোবাসার একটা ধারা
ঘিরেছে তাকে স্নিগ্ধ বেষ্টনে
গ্রামের চিরপরিচিত অগভীর নদীটুকুর মতো।
অল্পবেগের সেই প্রবাহ
বহে চলেছে প্রিয়ার সামান্য প্রতিদিনের
অনুচ্চ তটচ্ছায়ায়।
অনাবৃষ্টির কার্পণ্যে কখনো সে হয়েছে ক্ষীণ,
আষাঢ়ের দাক্ষিণ্যে কখনো সে হয়েছে প্রগল্‌ভ
তুচ্ছতার আবরণে অনুজ্জ্বল
অতি সাধারণ স্ত্রী-স্বরূপকে
কখনো করেছে লালন, কখনো করেছে পরিহাস,
আঘাত করেছে কখনো বা।

আমার ভালোবাসার আর-একটা ধারা
মহাসমুদ্রের-বিরাট-ইঙ্গিত-বাহিনী।
মহীয়সী নারী স্নান করে উঠেছে
তারই অতল থেকে।
সে এসেছে অপরিসীম ধ্যানরূপে
আমার সর্ব দেহে মনে—
পূর্ণতর করেছে আমাকে, আমার বাণীকে।
জ্বেলে রেখেছে আমার চেতনার নিভৃত গভীরে
চিরবিরহের প্রদীপশিখা।
সেই আলোকে দেখেছি তাকে অসীম শ্রীলোকে,
দেখেছি তাকে বসন্তের পুষ্পপল্লবের প্লাবনে,
সিসুগাছের কাঁপন-লাগা পাতাগুলির থেকে

ঠিকরে পড়েছে যে রৌদ্রকণা
তার মধ্যে শুনেছি তার সেতারের দ্রুতঝংকৃত সুর।
দেখেছি ঋতুরঙ্গভূমিতে
নানা রঙের ওড়না-বদল-করা তার নাচ
ছায়ায় আলোয়।

ইতিহাসের সৃষ্টি-আসনে
ওকে দেখেছি বিধাতার বামপাশে ;
দেখেছি সুন্দর যখন অবমানিত
কদর্য-কঠোরের অশুচিস্পর্শে
তখন সেই রুদ্রাণীর তৃতীয় নেত্র থেকে
বিচ্ছুরিত হয়েছে প্রলয়-অগ্নি,
ধ্বংস করেছে মহামারীর গোপন আশ্রয়।

আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে
সৃষ্টির প্রথম রহস্য, আলোকের প্রকাশ—
আর সৃষ্টির শেষ রহস্য, ভালোবাসার অমৃত।
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
সকল মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল
দেবলোক থেকে
মানবলোকে,
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে
আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে

শান্তিনিকেতন
১৮ বৈশাখ ১৩৪৩

ষোলো

উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে
স্রষ্টা যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে
নতুন সৃষ্টিকে বারবার করছিলেন বিধ্বস্ত,
তাঁর সেই অধৈর্যে ঘন-ঘন মাথা-নাড়ার দিনে
রুদ্র সমুদ্রের বাহু
প্রাচী ধরিত্রীর বুকের থেকে
ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে, আফ্রিকা,
বাঁধলে তোমাকে বনস্পতির নিবিড় পাহারায়
কৃপণ আলোর অন্তঃপুরে।
সেখানে নিভৃত অবকাশে তুমি
সংগ্রহ করছিলে দুর্গমের রহস্য,
চিনছিলে জলস্থল-আকাশের দুর্বোধ সংকেত,
প্রকৃতির দৃষ্টি-অতীত জাদু
মন্ত্র জাগাচ্ছিল তোমার চেতনাতীত মনে।
বিদ্রূপ করছিলে ভীষণকে
বিরূপের ছদ্মবেশে,
শঙ্কাকে চাচ্ছিলে হার মানাতে
আপনাকে উগ্র করে বিভীষিকার প্রচণ্ড মহিমায়
তাণ্ডবের দুন্দুভিনিনাদে।

হায় ছায়াবৃতা,
কালো ঘোমটার নীচে
অপরিচিত ছিল তোমার মানবরূপ
উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে।
এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,
এল মানুষ-ধরার দল
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে।

সভ্যের বর্বর লোভ
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।
তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাষ্পাকুল অরণ্যপথে
পঙ্কিল হল ধূলি তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে ;
দস্যু-পায়ের কাঁটা-মারা জুতোর তলায়
বীভৎস কাদার পিণ্ড
চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে।

সমুদ্রপারে সেই মুহূর্তেই তাদের পাড়ায় পাড়ায়
মন্দিরে বাজছিল পূজার ঘণ্টা
সকালে সন্ধ্যায়, দয়াময় দেবতার নামে ;
শিশুরা খেলছিল মায়ের কোলে ;
কবির সংগীতে বেজে উঠছিল
সুন্দরের আরাধনা।

আজ যখন পশ্চিমদিগন্তে
প্রদোষকাল ঝঞ্ঝাবাতাসে রুদ্ধশ্বাস,
যখন গুপ্তগহ্বর থেকে পশুরা বেরিয়ে এল,
অশুভ ধ্বনিতে ঘোষণা করল দিনের অন্তিমকাল,
এসো যুগান্তরের কবি,
আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে
দাঁড়াও ঐ মানহারা মানবীর দ্বারে,
বলো 'ক্ষমা করো'—
হিংস্র প্রলাপের মধ্যে
সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী।

শান্তিনিকেতন
২৮ মাঘ ১৩৪৩

সতেরো

যুদ্ধের দামামা উঠল বেজে।
ওদের ঘাড় হল বাঁকা, চোখ হল রাঙা,
কিড়্‌মিড়্‌ করতে লাগল দাঁত।
মানুষের কাঁচা মাংসে যমের ভোজ ভর্তি করতে
বেরোল দলে দলে।
সবার আগে চলল দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে
তাঁর পবিত্র আশীর্বাদের আশায়।
বেজে উঠল তূরী ভেরি গরগর শব্দে,
কেঁপে উঠল পৃথিবী।

ধূপ জ্বলল, ঘণ্টা বাজল, প্রার্থনার রব উঠল আকাশে
'করুণাময়, সফল হয় যেন কামনা'—
কেননা, ওরা যে জাগাবে মর্মভেদী আর্তনাদ
অভ্রভেদ ক'রে,
ছিঁড়ে ফেলবে ঘরে ঘরে ভালোবাসার বাঁধনসূত্র,
ধ্বজা তুলবে লুপ্ত পল্লীর ভস্মস্তূপে,
দেবে ধুলোয় লুটিয়ে বিদ্যানিকেতন,
দেবে চুরমার করে সুন্দরের আসনপীঠ।
তাই তো চলেছে ওরা দয়াময় বুদ্ধের নিতে আশীর্বাদ।
বেজে উঠল তূরী ভেরি গরগর শব্দে,
কেঁপে উঠল পৃথিবী।

ওরা হিসাব রাখবে মরে পড়ল কত মানুষ,
পঙ্গু হয়ে গেল কয়জনা।
তারি হাজার সংখ্যার তালে তালে
ঘা মারবে জয়ডঙ্কায়।
পিশাচের অট্টহাসি জাগিয়ে তুলবে
শিশু আর নারীদেহের ছেঁড়া টুকরোর ছড়াছড়িতে।

ওদের এই মাত্র নিবেদন, যেন বিশ্বজনের কানে পারে
মিথ্যামন্ত্র দিতে,
যেন বিষ পারে মিশিয়ে দিতে নিশ্বাসে।
সেই আশায় চলেছে ওরা দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে
নিতে তাঁর প্রসন্ন মুখের আশীর্বাদ।
বেজে উঠছে তূরী ভেরি গরগর শব্দে,
কেঁপে উঠছে পৃথিবী।

শান্তিনিকেতন
পৌষ ১৩৪৪

আঠারো

কথার উপরে কথা চলেছ সাজিয়ে দিনরাতি,
এইবার থামো তুমি। বাক্যের মন্দিরচূড়া গাঁথি
যত ঊর্ধ্বে তোলো তারে তার চেয়ে আরো ঊর্ধ্বে ধায়
গাঁথুনির অন্তহীন উন্মত্ততা। থামিতে না চায়
রচনার স্পর্ধা তব; ভুলে গেছ, থামার পূর্ণতা
রচনার পরিত্রাণ; ভুলে গেছ নির্বাক্ দেবতা
বেদিতে বসিবে আসি যবে, কথার দেউলখানি
কথার অতীত মৌনে লভিবে চরমতম বাণী।
মহানিস্তব্ধের লাগি অবকাশ রেখে দিয়ো বাকি,
উপকরণের স্তূপে রচিয়ো না অভ্রভেদী ফাঁকি
অমৃতের স্থান রোধি। নির্মাণ-নেশায় যদি মাত
সৃষ্টি হবে গুরুভার, তার মাঝে লীলা রবে না তো।
থামিবার দিন এলে থামিতে না যদি থাকে জানা
নীড় গেঁথে গেঁথে পাখি আকাশেতে উড়িবার ডানা
ব্যর্থ করি দিবে। থামো তুমি থামো। সন্ধ্যা হয়ে আসে,
শান্তির ইঙ্গিত নামে দিবসের প্রগল্‌ভ প্রকাশে।
ছায়াহীন আলোকের সভায় দিনের যত কথা
আপনারে রিক্ত করি রাত্রির গভীর সার্থকতা

এসেছে ভরিয়া নিতে। তোমার বীণার শত তারে
মত্ততার নৃত্য ছিল এতক্ষণ ঝংকারে ঝংকারে
বিরাম বিশ্রামহীন— প্রত্যক্ষের জনতা তেয়াগি
নেপথ্যে যাক সে চলে স্মরণের নির্জনের লাগি
ল'য়ে তার গীত-অবশেষ, কথিত বাণীর ধারা
অসীমের অকথিত বাণীর সমুদ্রে হোক সারা।

শান্তিনিকেতন
৫ বৈশাখ ১৩৪৩

শ্যামলী

উৎসর্গ

কল্যাণীয়া শ্রীমতী রানী মহলানবীশ

ইটকাঠে গড়া নীরস খাঁচার থেকে
আকাশবিলাসী চিত্তেরে মোর এনেছিলে তুমি ডেকে
শ্যামল শুশ্রূষায়,
নারিকেলবন-পবন-বীজিত নিকুঞ্জ-আঙিনায়।
শরৎ-লক্ষ্মী কনকমাল্যে জড়ায় মেঘের বেণী,
নীলাম্বরের পটে আঁকে ছবি সুপারি গাছের শ্রেণী।
দক্ষিণ ধারে পুকুরের ঘাট বাঁকা সে কোমর-ভাঙা,
লিলি গাছ দিয়ে ঢাকা তার ঢালু ডাঙা।
জামরুল গাছে ধরে অজস্র ফুল,
হরণ করেছে সুরবালিকার হাজার কানের দুল।
লতানে যূথীর বিতানে মৌমাছিরা
করিতেছে ঘুরা-ফিরা।
পুকুরের তটে তটে
মধুচ্ছন্দা রজনীগন্ধা সুগন্ধ তার রটে।
ম্যাগ্‌নোলিয়ার শিথিল পাপড়ি খসে খসে পড়ে ঘাসে,
ঘরের পিছন হতে বাতাবির ফুলের খবর আসে।
একসার মোটা পায়াভারী পাম উদ্ধত মাথা-তোলা,
রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েছে যেন বিলিতি পাহারা-ওলা।

বসি যবে বাতায়নে
কলমি শাকের পাড় দেখা যায় পুকুরের এক কোণে
বিকেল বেলার আলো
জলে রেখা কাটে সবুজ সোনালি কালো।

ঝিলিমিলি করে আলোছায়া চুপে চুপে
চলতি হাওয়ার পায়ের চিহ্নরূপে।
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে
আমের শাখায় আঁখি ধেয়ে যায় সোনার রসের আশে।
লিচু ভরে যায় ফলে,
বাদুড়ের সাথে দিনে আর রাতে অতিথির ভাগ চলে।
বেড়ার ওপারে মৈসুমি ফুলে রঙের স্বপ্ন বোনা,
চেয়ে দেখে দেখে জানালার নাম রেখেছি— 'নেত্রকোণা'।

ওরাওঁ জাতের মালী ও মালিনী ভোর হতে লেগে আছে-
মাটি খোঁড়াখুঁড়ি, জল ঢালাঢালি গাছে।
মাটিগড়া যেন নিটোল অঙ্গ, মাটির নাড়ীর টানে
গাছপালাদের স্বজাত বলেই জানে।
রাত পোহালেই পাড়ার গোয়ালা গাভীদুটি নিয়ে আসে,
অধীর বাছুর ছুটোছুটি করে পাশে।
সাড়ে ছ'টা বাজে, সোজা হয়ে রোদ চলে আসে মোর ঘরে,
পথে দেখা দেয় খবরওআলা বাইক-রথের 'পরে।
পাঁচিল পেরিয়ে পুরোনো দোতলা বাড়ি,
আলসের ধারে এলোকেশিনীরা ঝোলায় সিক্ত শাড়ি।
পাড়ার মেয়েরা জল নিতে আসে ঘাটে,
সবুজ গহনে দু-চোখ ডুবিয়ে সোনার সকাল কাটে।

বাংলাদেশের বনপ্রকৃতির মন
শহর এড়িয়ে রচিল এখানে ছায়া দিয়ে ঘেরা কোণ
বাংলাদেশের গৃহিণী তাহার সাথে
আপন স্নিগ্ধ হাতে
সেবার অর্ঘ্য করেছে রচনা নীরব-প্রণতি-ভরা,
তারি আনন্দ কবিতায় দিল ধরা।

শুনেছি এবার হেথায় তোমার কদিনের ঘরবাড়ি
চলে যাবে তুমি ছাড়ি।
মেঘরৌদ্রের খেলার সৃষ্টি ঐ পুকুরের ধারে
লজ্জিত হবে অকবি ধনীর দৃষ্টির অধিকারে।
কালের লীলায় দিয়ে যাব সায়, খেদ রাখিব না চিতে—
এ ছবিখানি তো মন হতে ধনী পারিবে না কেড়ে নিতে।
তোমার বাগানে দেখেছি তোমারে কাননলক্ষ্মীসম—
তাহারি স্মরণ মম
শীতের রৌদ্রে, মুখর বর্ষারাতে
কুলায়বিহীন পাখির মতন
মিলিবে মেঘের সাথে।

শান্তিনিকেতন
১ ভাদ্র ১৩৪৩

শ্যামলী

দ্বৈত

সেদিন ছিলে তুমি আলো-আঁধারের মাঝখানটিতে,
বিধাতার মানসলোকের
মর্ত্যসীমায় পা বাড়িয়ে
বিশ্বের রূপ-আঙিনার নাছদুয়ারে
যেমন ভোরবেলার একটুখানি ইশারা,
শালবনের পাতার মধ্যে উস্‌খুস্‌,
শেষরাত্রের গায়ে-কাঁটা-দেওয়া
আলোর আড়-চাহনি ;
উষা যখন আপন-ভোলা—
যখন সে পায় নি আপন ডাক-নামটি পাখির ডাকে,
পাহাড়ের চূড়ায়, মেঘের লিখনপত্রে।
তার পরে সে নেমে আসে ধরাতলে,
তার মুখের উপর থেকে
অসীমের ছায়া-ঘোমটা খসে পড়ে
উদয়-সাগরের অরুণরাঙা কিনারায়।
পৃথিবী তাকে সাজিয়ে তোলে
আপন সবুজ-সোনার কাঁচলি দিয়ে ;
পরায় তাকে আপন হাওয়ার চুনরি।
তেমনি তুমি এনেছিলে তোমার ছবির তনুরেখাটুকু
আমার হৃদয়ের দিক্‌প্রান্তপটে।

আমি তোমার কারিগরের দোসর,
কথা ছিল তোমার রূপের 'পরে মনের তুলি

আমিও দেব বুলিয়ে,
পুরিয়ে তুলব তোমার গড়নটিকে।
দিনে দিনে তোমাকে রাঙিয়েছি
আমার ভাবের রঙে।
আমার প্রাণের হাওয়া
বইয়ে দিয়েছি তোমার চারি দিকে
কখনো ঝড়ের বেগে
কখনো মৃদুমৃদু দোলনে।

একদিন আপন সহজ নিরালায় ছিলে তুমি অধরা,
ছিলে তুমি একলা বিধাতার ;
একের মধ্যে একঘরে।
আমি বেঁধেছি তোমাকে দুয়ের গ্রন্থিতে,
তোমার সৃষ্টি আজ তোমাতে আর আমাতে,
তোমার বেদনায় আর আমার বেদনায়।
আজ তুমি আপনাকে চিনেছ
আমার চেনা দিয়ে।
আমার অবাক চোখ লাগিয়েছে সোনার কাঠির ছোঁওয়া,
জাগিয়েছে আনন্দরূপ
তোমার আপন চৈতন্যে।

বরানগর
২৩ মে ১৯৩৬

শেষ পহরে

ভালোবাসার বদলে দয়া
যৎসামান্য সেই দান,
সেটা হেলাফেলারই স্বাদ ভোলানো

পথের পথিকও পারে তা বিলিয়ে দিতে
পথের ভিখারিকে,
শেষে ভুলে যায় বাঁক পেরোতেই।
তার বেশি আশা করি নি সেদিন।

চলে গেলে তুমি রাতের শেষ প্রহরে।
মনে ছিল, বিদায় নিয়ে যাবে,
শুধু বলে যাবে, 'তবে আসি।'
যে কথা আর-একদিন বলেছিলে,
যা আর কোনোদিন শুনব না,
তার জায়গায় ঐ দুটি কথা,
ঐটুকু দরদের সরু বুনোনিতে যেটুকু বাঁধন পড়ে
তাও কি সইত না তোমার।

প্রথম ঘুম যেমনি ভেঙেছে
বুক উঠেছে কেঁপে,
ভয় হয়েছে সময় বুঝি গেল পেরিয়ে।
ছুটে এলেম বিছানা ছেড়ে।
দূরে গির্জের ঘড়িতে বাজল সাড়ে বারোটা।
রইলেম বসে আমার ঘরের চৌকাঠে
দরজায় মাথা রেখে,—
তোমার বেরিয়ে যাবার বারান্দার সামনে।
অতি সামান্য একটুখানি সুযোগ
অভাগীর ভাগ্য তাও নিল ছিনিয়ে,
পড়লেম ঘুমে ঢলে
তুমি যাবার কিছু আগেই।
আড়চোখে বুঝি দেখলে চেয়ে
এলিয়ে-পড়া দেহটা—
ডাঙায়-তোলা ভাঙা নৌকোটা যেন।

বুঝি সাবধানেই গেছ চলে,
ঘুম ভাঙে পাছে।
চমকে জেগে উঠেই বুঝেছি
মিছে হয়েছে জাগা।
বুঝেছি, যা যাবার তা গেছে এক নিমেষেই—
যা পড়ে থাকবার তাই রইল পড়ে
যুগযুগান্তর।

চুপচাপ চারি দিক—
যেমন চুপচাপ পাখিহারা পাখির বাসা।
গানহারা গাছের ডালে।
কৃষ্ণসপ্তমীর মিইয়ে-পড়া জ্যোৎস্নার সঙ্গে মিশেছে
ভোরবেলাকার ফ্যাকাশে আলো,
ছড়িয়ে পড়েছে আমার পাণ্ডাশ-বরণ শূন্য জীবনে।

গেলেম তোমার শোবার ঘরের দিকে
বিনা কারণে।
দরজার বাইরে জ্বলছে
ধোঁওয়ায়-কালি-পড়া হ্যারিকেন লণ্ঠন,
বারান্দায় নিবো-নিবো শিখার গন্ধ।
ছেড়ে-আসা বিছানায় খোলা মশারি
একটু একটু কাঁপছে বাতাসে।
জানলার বাইরের আকাশে
দেখা যায় শুকতারা,
আশা-বিদায়-করা
যত ঘুমহারাদের সাক্ষী।
হঠাৎ দেখি ফেলে গেছ ভুলে
সোনাবাঁধানো হাতির দাঁতের লাঠিগাছটা।
মনে হল, যদি সময় থাকে
তবে হয়তো স্টেশন থেকে ফিরে আসবে খোঁজ করতে—

কিন্তু ফিরবে না
আমার সঙ্গে দেখা হয় নি বলে।

বরানগর
২৩ মে ১৯৩৬

আমি

আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে,
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর',
সুন্দর হল সে।
তুমি বলবে, এ যে তত্ত্বকথা,
এ কবির বাণী নয়।
আমি বলব, এ সত্য,
তাই এ কাব্য
এ আমার অহংকার,
অহংকার সমস্ত মানুষের হয়ে।
মানুষের অহংকার-পটেই
বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প।
তত্ত্বজ্ঞানী জপ করছেন নিশ্বাসে প্রশ্বাসে,
না, না, না—
না-পান্না, না-চুনি, না-আলো, না-গোলাপ,
না-আমি, না-তুমি।
ও দিকে, অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা
মানুষের সীমানায়,
তাকেই বলে 'আমি'।

সেই আমির গহনে আলো-আঁধারের ঘটল সংগম,
দেখা দিল রূপ, জেগে উঠল রস।
'না' কখন ফুটে উঠে হল 'হাঁ' মায়ার মন্ত্রে,
রেখায় রঙে সুখে দুঃখে।

একে বোলো না তত্ত্ব ;
আমার মন হয়েছে পুলকিত
বিশ্ব-আমির রচনার আসরে
হাতে নিয়ে তুলি, পাত্রে নিয়ে রঙ।

পণ্ডিত বলছেন—
বুড়ো চন্দ্রটা, নিষ্ঠুর চতুর হাসি তার,
মৃত্যুদূতের মতো গুঁড়ি মেরে আসছে সে
পৃথিবীর পাঁজরের কাছে।
একদিন দেবে চরম টান তার সাগরে পর্বতে ;
মর্তলোকে মহাকালের নূতন খাতায়
পাতা জুড়ে নামবে একটা শূন্য,
গিলে ফেলবে দিনরাতের জমাখরচ ;
মানুষের কীর্তি হারাবে অমরতার ভান,
তার ইতিহাসে লেপে দেবে
অনন্ত রাত্রির কালি।
মানুষের যাবার দিনের চোখ
বিশ্ব থেকে নিকিয়ে নেবে রঙ,
মানুষের যাবার দিনের মন
ছানিয়ে নেবে রস।
শক্তির কম্পন চলবে আকাশে আকাশে,
জ্বলবে না কোথাও আলো।
বীণাহীন সভায় যন্ত্রীর আঙুল নাচবে,
বাজবে না সুর।
সেদিন কবিত্বহীন বিধাতা একা রবেন বসে

নীলিমাহীন আকাশে
ব্যক্তিত্বহারা অস্তিত্বের গণিততত্ত্ব নিয়ে।
তখন বিরাট বিশ্বভুবনে
দূরে দূরান্তে অনন্ত অসংখ্য লোকে লোকান্তরে
এ বাণী ধ্বনিত হবে না কোনোখানেই—
'তুমি সুন্দর',
'আমি ভালোবাসি'।
বিধাতা কি আবার বসবেন সাধনা করতে
যুগযুগান্তর ধ'রে।
প্রলয়সন্ধ্যায় জপ করবেন—
'কথা কও, কথা কও',
বলবেন 'বলো, তুমি সুন্দর',
বলবেন 'বলো, আমি ভালোবাসি'?

শান্তিনিকেতন
২৯ মে ১৯৩৬

সম্ভাষণ

রোজই ডাকি তোমার নাম ধরে,
বলি 'চারু'।
হঠাৎ ইচ্ছা হল আর-কিছু বলি,
যাকে বলে সম্ভাষণ,
যেমন বলত সত্যযুগের ভালোবাসায়।
সব চেয়ে সহজ ডাক— প্রিয়তমে।
সেটা আবৃত্তি করেছি মনে মনে,
তার উত্তরে মনে-মনেই শুনেছি তোমার উচ্চহাসি।
বুঝেছি, মন্দমধুর হাসি এ যুগের নয়;
এ যে নয় অবন্তী, নয় উজ্জয়িনী।

আটপহুরে নামটাতে দোষ কী হল
এই তোমার প্রশ্ন।
বলি তবে।
কাজ ছিল না বেশি,
সকাল সকাল ফিরেছি বাসায়।
হাতে বিকেলের খবরের কাগজ,
বসেছি বারান্দায়, রেলিঙে পা দুটো তোলা।
হঠাৎ চোখে পড়ল পাশের ঘরে
তোমার বৈকালিকী সাজের ধারা।

বাঁধছিলে চুল আয়নার সামনে
বেণী পাকিয়ে পাকিয়ে, কাঁটা বিঁধে বিঁধে।
এমন মন দিয়ে দেখি নি তোমাকে অনেক দিন ;
দেখি নি এমন বাঁকা করে মাথা-হেলানো
চুল-বাঁধার কারিগরিতে,
এমন দুই হাতের মিতালি
চুড়িবালার ঠুনঠুনির তালে।
শেষে ঐ ধানিরঙের আঁচলখানিতে
কোথাও কিছু ঢিল দিলে,
আঁট করলে কোথাও বা,
কোথাও একটু টেনে দিলে নীচের দিকে,
কবিরা যেমন ছন্দ বদল করে
একটু আধটু বাঁকিয়ে চুরিয়ে।

আজ প্রথম আমার মনে হল
অল্প মজুরির দিন-চালানো
একটা মানুষের জন্যে
নিজেকে তো সাজিয়ে তুলছে
আমাদের ঘরের পুরোনো বউ
দিনে দিনে নতুন-দাম-দেওয়া রূপে।

এ তো নয় আমার আটপহুরে চারু।
ঠিক এমনি করেই দেখা দিত অন্যযুগের অবন্তিকা
ভালোলাগার অপরূপবেশে
ভালোবাসার চকিত চোখে।
অমরুশতকের চৌপদীতে
—শিখরিণীতে হোক, স্রগ্ধরায় হোক—
ওকে তো ঠিক মানাতো।
সাজের ঘর থেকে বসবার ঘরে
ঐ যে আসছে অভিসারিকা,
ও যেন কাছের কালে আসছে
দূরের কালের বাণী।

বাগানে গেলেম নেমে।
ঠিক করেছি আমিও আমার সোহাগকে দেব মর্যাদা
শিল্পে-সাজিয়ে-তোলা মানপত্রে।
যখন ডাকব তোমাকে ঘরে
সে হবে যেন আবাহনী।
সামনেই লতা ভরেছে সাদা ফুলে—
বিলিতি নাম, মনে থাকে না—
নাম দিয়েছি তারাঝরা;
রাতের বেলায় গন্ধ তার
ফুলবাগানের প্রলাপের মতো।
এবার সে ফুটেছে অকালে,
সবুর সয় নি শীত ফুরোবার।
এনেছি তার একটি গুচ্ছ,
তারও একটি সই থাকবে আমার নিবেদনে।

আজ গোধূলিলগ্নে তুমি ক্লাসিক যুগের চারুপ্রভা,
আমি ক্লাসিকযুগের অজিতকুমার।
দুটি কথা আজ বলব আমি,

সাজানো কথা—
হাসতে হয় হেসো।
সে কথা মনে মনে গড়ে তুলেছি
যেমন করে তুমি জড়িয়ে তুলেছ তোমার খোঁপা।
বলব, "প্রিয়ে, এই পরদেশী ফুলের মঞ্জরী
আকাশে চেয়ে খুঁজছিল বসন্তের রাত্রি,
এনেছি আমি তাকে দয়া করে
তোমার ঐ কালো চুলে।"

শান্তিনিকেতন
৩০ মে ১৯৩৬

স্বপ্ন

ঘন অন্ধকার রাত,
বাদলের হাওয়া
এলোমেলো ঝাপট দিচ্ছে চার দিকে।
মেঘ ডাকছে গুরুগুরু,
থরথর করছে দরজা,
খড়খড় করে উঠছে জানালাগুলো।
বাইরে চেয়ে দেখি
সারবাঁধা সুপুরি-নারকেলের গাছ
অস্থির হয়ে দিচ্ছে মাথা-ঝাঁকানি
দুলে উঠছে কাঁঠাল গাছের ঘন ডালে
অন্ধকারের পিণ্ডগুলো
দল-পাকানো প্রেতের মতো।
রাস্তার থেকে পড়েছে আলোর রেখা
পুকুরের কোণে
সাপ-খেলানো আঁকাবাঁকা।

মনে পড়ছে ঐ পদটা—
'রজনী শাঙন ঘন, ঘন দেয়া-গরজন···
স্বপন দেখিনু হেনকালে।'
সেদিন রাধিকার ছবির পিছনে
কবির চোখের কাছে
কোন্ একটি মেয়ে ছিল,
ভালোবাসার-কুঁড়ি-ধরা তার মন।
মুখচোরা সেই মেয়ে,
চোখে কাজল পরা,
ঘাটের থেকে নীলশাড়ি
'নিঙাড়ি নিঙাড়ি' চলা।

আজ এই ঝোড়ো রাতে
তাকে মনে আনতে চাই—
তার সকালে, তার সাঁঝে,
তার ভাষায়, তার ভাবনায়,
তার চোখের চাহনিতে—
তিন-শো বছর আগেকার
কবির জানা সেই বাঙালির মেয়েকে।
দেখতে পাই নে স্পষ্ট করে।
আজ পড়েছে যাদের পিছনের ছায়ায়
তারা শাড়ির আঁচল যেমন করে বাঁধে কাঁধের 'পরে,
খোঁপা যেমন করে ঘুরিয়ে পাকায়
পিছনে নেমে-পড়া,
মুখের দিকে যেমন করে চায় স্পষ্টচোখে,
তেমন ছবিটি ছিল না
সেই তিন-শো বছর আগেকার কবির সামনে।

তবু— 'রজনী শাঙন ঘন···
স্বপন দেখিনু হেনকালে।'

শ্রাবণের রাত্রে এমনি করেই বয়েছে সেদিন
বাদলের হাওয়া,
মিল রয়ে গেছে
সেকালের স্বপ্নে আর একালের স্বপ্নে।

শান্তিনিকেতন
৩০ মে ১৯৩৬

প্রাণের রস

আমাকে শুনতে দাও,
আমি কান পেতে আছি।
পড়ে আসছে বেলা ;
পাখিরা গেয়ে নিচ্ছে দিনের শেষে
কণ্ঠের সঞ্চয় উজাড়-করে-দেবার গান।
ওরা আমার দেহ-মনকে নিল টেনে
নানা সুরের, নানা রঙের,
নানা খেলার
প্রাণের মহলে।
ওদের ইতিহাসের আর কোনো সাড়া নেই,
কেবল এইটুকু কথা—
আছি, আমরা আছি, বেঁচে আছি,
বেঁচে আছি এই আশ্চর্য মুহূর্তে।—
এই কথাটুকু পৌঁছল আমার মর্মে।
বিকালবেলায় মেয়েরা জল ভরে নিয়ে যায় ঘটে,
তেমনি করে ভরে নিচ্ছি প্রাণের এই কাকলি
আকাশ থেকে
মনটাকে ডুবিয়ে দিয়ে।

আমাকে একটু সময় দাও।
আমি মন পেতে আছি।

ভাঁটা-পড়া বেলায়,
ঘাসের উপরে ছড়িয়ে-পড়া বিকেলের আলোতে
গাছেদের নিস্তব্ধ খুশি,
মজ্জার মধ্যে লুকোনো খুশি,
পাতায় পাতায় ছড়ানো খুশি।
আমার প্রাণ নিজেকে বাতাসে মেলে দিয়ে
নিচ্ছে বিশ্বপ্রাণের স্পর্শরস
চেতনার মধ্যে দিয়ে ছেঁকে।
এখন আমাকে বসে থাকতে দাও,
আমি চোখ মেলে থাকি।

তোমরা এসেছ তর্ক নিয়ে।
আজ দিনান্তের এই পড়ন্ত রোদ্দুরে
সময় পেয়েছি একটুখানি ;
এর মধ্যে ভালো নেই, মন্দ নেই,
নিন্দা নেই, খ্যাতি নেই।
দ্বন্দ্ব নেই, দ্বিধা নেই,—
আছে বনের সবুজ,
জলের ঝিকিমিকি—
জীবনস্রোতের উপর তলে
অল্প একটু কাঁপন, একটু কল্লোল,
একটু ঢেউ।
আমার এই একটুখানি অবসর
উড়ে চলেছে
ক্ষণজীবী পতঙ্গের মতো
সূর্যাস্তবেলার আকাশে
রঙিন ডানার শেষ খেলা চুকিয়ে দিতে—
বৃথা প্রশ্ন কোরো না।
বৃথা এনেছ তোমাদের যত দাবি।
আমি বসে আছি বর্তমানের পিছন মুখে

অতীতের দিকে গড়িয়ে-পড়া ঢালুতটে।
নানান বেদনায় ধেয়ে-বেড়ানো প্রাণ
একদিন করে গেছে লীলা
ঐ বনবীথির ডাল দিয়ে বিনুনি-করা
আলোছায়ায়।
আশ্বিনে দুপুর বেলা
এই কাঁপনলাগা ঘাসের উপর,
মাঠের পারে, কাশের বনে,
হাওয়ায় হাওয়ায় স্বগত উক্তি
মিলেছে আমার জীবনবীণার ফাঁকে ফাঁকে।

যে সমস্যাজাল
সংসারের চারি দিকে পাকে-পাকে জড়ানো
তার সব গিঁঠ গেছে ঘুচে।
যাবার পথের যাত্রী পিছনে যায় নি ফেলে
কোনো উদ্‌যোগ, কোনো উদ্‌বেগ, কোনো আকাঙ্ক্ষা
কেবল গাছের পাতার কাঁপনে
এই বাণীটি রয়ে গেছে—
তারাও ছিল বেঁচে,
তারা যে নেই তার চেয়ে সত্য ঐ কথাটি।
শুধু আজ অনুভবে লাগে
তাদের কাপড়ের রঙের আভাস,
পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার হাওয়া,
চেয়ে দেখার বাণী,
ভালোবাসার ছন্দ—
প্রাণগঙ্গার পূর্বমুখী ধারায়
পশ্চিম প্রাণের যমুনার স্রোত।

শান্তিনিকেতন
১ জুন ১৯৩৬

হারানো মন

দাঁড়িয়ে আছ আড়ালে,
ঘরে আসবে কিনা ভাবছ সেই কথা।
একবার একটু শুনেছি চুড়ির শব্দ।
তোমার ফিকে পাটকিলে রঙের আঁচলের একটুখানি
দেখা যায় উড়ছে বাতাসে
দরজার বাইরে।
তোমাকে দেখতে পাচ্ছি নে,
দেখছি পশ্চিম আকাশের রোদ্দুর
চুরি করেছে তোমার ছায়া,
ফেলে রেখেছে আমার ঘরের মেঝের 'পরে।

দেখছি শাড়ির কালো পাড়ের নীচে থেকে
তোমার কনক-গৌরবর্ণ পায়ের দ্বিধা
ঘরের চৌকাঠের উপর।
আজ ডাকব না তোমাকে।
আজ ছড়িয়ে পড়েছে আমার হালকা চেতনা—
যেন কৃষ্ণপক্ষের গভীর আকাশে নীহারিকা,
যেন বর্ষণশেষে মিলিয়ে-আসা সাদা মেঘ
শরতের নীলিমায়।

আমার ভালোবাসা
যেন সেই আল-ভেঙে-যাওয়া খেতের মতো
অনেক দিন হল চাষি যাকে
ফেলে দিয়ে গেছে চলে ;
আনমনা আদিপ্রকৃতি
তার উপরে বিছিয়েছে আপন স্বত্ব
নিজের অজানিতে।
তাকে ছেয়ে উঠেছে ঘাস,

উঠেছে অনামা গাছের চারা,
সে মিলে গেছে চার দিকের বনের সঙ্গে
সে যেন শেষরাত্রির শুকতারা,
প্রভাত-আলোয় ডুবিয়ে দিল
তার আপন আলোর ঘটখানি।

আজ কোনো-সীমানা-দেওয়া নয় আমার মন,
হয়তো তাই ভুল বুঝবে আমাকে।
আগেকার চিহ্নগুলো সব গেছে মুছে,
আমাকে এক করে নিতে পারবে না কোনোখানে
কোনো বাঁধনে বেঁধে।

শান্তিনিকেতন
১ জুন ১৯৩৬

চিরযাত্রী

অস্পষ্ট অতীত থেকে বেরিয়ে পড়েছে ওরা দলে দলে,
ওরা সন্ধানী, ওরা সাধক,
বেরিয়েছে পুরাপৌরাণিক কালের
সিংহদ্বার দিয়ে।
তার তোরণের রেখা
আঁচড় কেটেছে অজানা আখরে,
ভেঙে-পড়া ভাষায়।

যাত্রী ওরা, রণযাত্রী,
ওদের চিরযাত্রা অনাগতকালের দিকে।
যুদ্ধ হয় নি শেষ,
বাজছে নিত্যকালের দুন্দুভি।
বহুশত যুগের পদপতনশব্দে
থর্‌থর্‌ করে ধরিত্রী,

অর্ধেক রাত্রে দুরুদুরু করে বক্ষ,
চিত্ত হয় উদাস,
তুচ্ছ হয় ধনমান,
মৃত্যু হয় প্রিয়।
তেজ ছিল যাদের মজ্জায়,
যারা চলতে বেরিয়েছিল পথে
মৃত্যু পেরিয়ে আজও তারাই চলেছে;
যারা বাস্তু ছিল আঁকড়িয়ে
তারা জিয়ন-মরা, তাদের নিঝুম বস্‌তি
বোবা সমুদ্রের বালুর ডাঙায়।
তাদের জগৎজোড়া প্রেতস্থানে
অশুচি হাওয়ায়
কে তুলবে ঘর,
কে রইবে চোখ উলটিয়ে কপালে,
কে জমাবে জঞ্জাল।

কোন্ আদিকালে মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে
বিশ্বপথের চৌমাথায়।
পাথেয় ছিল রক্তে, পাথেয় ছিল স্বপ্নে,
পাথেয় ছিল পথেই।
যেই এঁকেছে নক্‌শা,
ঘর বেঁধেছে পাকা গাঁথুনির,
ছাদ তুলেছে মেঘ ঘেঁষে—
পরের দিন থেকে মাটির তলায়
ভিত হয়েছে ঝাঁঝরা।
সে বাঁধ বেঁধেছে পাথরে পাথরে,
তলিয়ে গেছে বন্যার ধাক্কায়।
সারারাত হিসেব করেছে স্থাবর সম্পদের,
রাতের শেষে হিসেবে বেরোল সর্বনাশ।

সে জমা করেছে ভোগের ধন সাত হাট থেকে,
ভোগে লেগেছে আগুন,
আপন তাপে গুমরে গুমরে
গেছে ভোগের জোগান আঙার হয়ে।
তার রীতি, তার নীতি, তার শিকল, তার খাঁচা
চাপা পড়েছে মাটির নীচে
পরযুগের কবরস্থানে।

কখনো বা ঘুমিয়েছে সে
ঝিমিয়ে-পড়া নেশার আসরে বাতি-নেবা দালানে
আরামের গদি পেতে।
অন্ধকারে ঝোপের থেকে
ঝাঁপিয়ে পড়েছে স্কন্ধকাটা দুঃস্বপ্ন,
পাগ্‌লা জন্তুর মতো
গোঁ গোঁঃ শব্দে ধরেছে তার টুঁটি চেপে,
বুকের পাঁজরগুলোয় ঠক ঠক দিয়েছে নাড়া,
গুঙরে উঠে জেগেছে সে মৃত্যুযন্ত্রণায়।
ক্ষোভের মাতুনিতে ভেঙে ফেলেছে মদের পাত্র,
ছিঁড়ে ফেলেছে ফুলের মালা।
বারে বারে রক্তে-পিছল দুর্গমে
ছুটে এসেছে শতচ্ছিদ্র শতাব্দীর বাইরে
পথ-না-চেনা দিক্‌সীমানার অলক্ষ্যে।
তার হৃৎপিণ্ডের রক্তের ধাক্কায় ধাক্কায়
ডমরুতে বেজেছে গুরু গুরু,
"পেরিয়ে চলো, পেরিয়ে চলো।"

ওরে চিরপথিক,
করিস নে নামের মায়া,
রাখিস নে ফলের আশা,
ওরে ঘরছাড়া মানুষের সন্তান।

কালের-রথ-চলা রাস্তায়
বারে বারে কারা তুলেছিল জয়ের নিশানা,
বারে বারে পড়েছে চুরমার হয়ে
মানুষের কীর্তিনাশা সংসারে।
লড়াইয়ে-জয়-করা রাজত্বের প্রাচীর
সে পাকা করতে গেছে ভুল সীমানায়।
সীমানাভাঙার দল ছুটে আসছে
বহু যুগ থেকে
বেড়া ডিঙিয়ে, পাথর গুঁড়িয়ে,
পার হয়ে পর্বত ;
আকাশে বেজে উঠছে নিত্যকালের দুন্দুভি,
"পেরিয়ে চলো,
পেরিয়ে চলো।"

শান্তিনিকেতন
৪ জুন ১৯৩৬

বিদায়-বরণ

চার প্রহর রাতের বৃষ্টিভেজা ভারী হাওয়ায়
থমকে আছে সকাল বেলাটা,
রাত জাগার ভারে যেন মুদে এসেছে
মলিন আকাশের চোখের পাতা।
বাদলার পিছল পথে পা টিপে চলেছে প্রহরগুলো।
যত সব ভাবনার আবছায়া
উড়ছে ঝাঁক বেঁধে মনের চার দিকে
হালকা বেদনার রঙ মেলে দিয়ে।

তাদের ধরি-ধরি করে মনটা,
ভাবি বেঁধে রাখি লেখায় ;
পাশ কাটিয়ে চলে যায় কথাগুলো।

এ কান্না নয়, হাসি নয়, চিন্তা নয়, তত্ত্ব নয়,
যত-কিছু ঝাপসা-হয়ে-যাওয়া রূপ,
ফিকে-হয়ে-যাওয়া গন্ধ,
কথা-হারিয়ে-যাওয়া গান,
তাপহারা স্মৃতিবিস্মৃতির ধূপছায়া—
সব নিয়ে একটি মুখ-ফিরিয়ে-চলা স্বপ্নছবি
যেন ঘোমটাপরা অভিমানিনী।

মন বলছে, ডাকো ডাকো,
ঐ ভেসে-যাওয়া পারের খেয়ার আরোহিণী,
ওকে একবার ডাকো ফিরে ;
দিনান্তের সন্ধ্যাদীপটি তুলে ধরো
ওর মুখের দিকে ;
করো ওকে বিদায়-বরণ।
বলো, 'তুমি সত্য, তুমি মধুর,
তোমারই বেদনা আজ লুকিয়ে বেড়ায়
বসন্তের ফুল ফোটা আর ফুল ঝরার ফাঁকে।
তোমার ছবি-আঁকা অক্ষরের লিপিখানি
সবখানেই,
নীলে সবুজে সোনায়
রক্তের রাঙা রঙে।'

তাই আমার আজ মন ভেসেছে
পলাশবনের চিকন ঢেউয়ে,
ফাটা মেঘের কিনার দিয়ে উপচে পড়া
আচমকা রোদ্দুরের ছটায়।

শান্তিনিকেতন
৩ জুন ১৯৩৬

তেঁতুলের ফুল

জীবনের অনেক ধন পাই নি,
নাগালের বাইরে তারা ;
হারিয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশি
হাত পাতি নি ব'লেই।
সেই চেনা সংসারে
অসংস্কৃত পল্লীরূপসীর মতো
ছিল এই ফুল মুখঢাকা,
অকাতরে উপেক্ষা করেছে উপেক্ষাকে
এই তেঁতুলের ফুল।

বেঁটে গাছ পাঁচিলের ধারে,
বাড়তে পারে নি কৃপণ মাটিতে ;
উঠেছে ঝাঁকড়া ডাল মাটির কাছ ঘেঁষে।
ওর বয়স হয়েছে যায় নি বোঝা।

অদূরে ফুটেছে নেবু ফুল,
গাছ ভরেছে গোলকচাঁপায়,
কোণের গাছে ধরেছে কাঞ্চন,
কুড়চি-শাখা ফুলের তপস্যায় মহাশ্বেতা।
স্পষ্ট ওদের ভাষা,
ওরা আমাকে ডাক দিয়ে করেছে আলাপ।

আজ যেন হঠাৎ এল কানে
কোন্ ঘোমটার নীচে থেকে চুপিচুপি কথা।
দেখি পথের ধারে তেঁতুলশাখার কোণে
লাজুক একটি মঞ্জরী,
মৃদু বসন্তী রঙ,
মৃদু একটি গন্ধ,
চিকন লিখন তার পাপড়ির গায়ে।

শহরের বাড়িতে আছে
শিশুকাল থেকে চেনাশোনা অনেক কালের তেঁতুল গাছ,
দিক্‌পালের মতো দাঁড়িয়ে
উত্তরপশ্চিম কোণে,
পরিবারের যেন পুরোনো কালের সেবক,
প্রপিতামহের বয়সী।
এই বাড়ির অনেক জন্মমৃত্যুর পর্বের পর পর্বে
সে দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে,
যেন বোবা ইতিহাসের সভাপণ্ডিত।
ঐ গাছে ছিল যাদের নিশ্চিত দখল কালে কালে
তাদের কত লোকের নাম
আজ ওর ঝরা পাতার চেয়েও ঝরা,
তাদের কত লোকের স্মৃতি
ওর ছায়ার চেয়েও ছায়া।

একদিন ঘোড়ার আস্তাবল ছিল ওর তলায়
খুরের-খট্‌খটানিতে-অস্থির
খোলার-চালা-দেওয়া ঘরে।
কবে চলে গেছে সহিসের হাঁক ডাকা।
সেই ঘোড়া-বাহনের যুগ
ইতিবৃত্তের ও পারে।
আজ চুপ হয়েছে হ্রেষাধ্বনি,
রঙ বদল করেছে কালের ছবি।
সর্দার কোচম্যানের সযত্নসজ্জিত দাড়ি,
চাবুক হাতে তার সগর্ব উদ্ধত পদক্ষেপ,
সেদিনকার শৌখিন সমারোহের সঙ্গে
গেছে সাজ-পরিবর্তনের মহানেপথ্যে।

দশটা বেলার প্রভাত-রৌদ্রে
ঐ তেঁতুলতলা থেকে এসেছে দিনের পর দিন

অবিচলিত নিয়মে ইস্কুলে যাবার গাড়ি।
বালকের নিরুপায় অনিচ্ছার বোঝাটা
টেনে নিয়ে গেছে রাস্তার ভিড়ের মাঝখান দিয়ে।

আজ আর চেনা যাবে না সেই ছেলেকে—
না দেহে, না মনে, না অবস্থায়।
কিন্তু চিরদিন দাঁড়িয়ে আছে সেই আত্মসমাহিত তেঁতুল গাছ
মানবভাগ্যের ওঠানামার প্রতি
ভ্রূক্ষেপ না ক'রে।

মনে আছে এক দিনের কথা।
রাত্রি থেকে অঝোর ধারায় বৃষ্টি ;
ভোরের বেলায় আকাশের রঙ
যেন পাগলের চোখের তারা।
দিক্‌হারানো ঝড় বইছে এলোমেলো,
বিশ্বজোড়া অদৃশ্য খাঁচায় মহাকায় পাখি
চার দিকে ঝাপট মারছে পাখা।
রাস্তায় দাঁড়ালো জল,
আঙিনা গেছে ভেসে।
বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছি,
ক্রুদ্ধ মুনির মতো ঐ গাছ মাথা তুলেছে আকাশে,
তার শাখায় শাখায় ভর্ৎসনা।
গলির দুই ধারে কোঠাবাড়িগুলো হতবুদ্ধির মতো,
আকাশের অত্যাচারে
প্রতিবাদ করবার ভাষা নেই তাদের।
একমাত্র ঐ গাছটার পত্রপুঞ্জের আন্দোলনে
আছে বিদ্রোহের বাণী,
আছে স্পর্ধিত অভিসম্পাত।
অন্তহীন ইটকাঠের মূক জড়তার মধ্যে
ঐ ছিল একা মহারণ্যের প্রতিনিধি—
সেদিন দেখেছি তার বিক্ষুব্ধ মহিমা বৃষ্টিপাণ্ডুর দিগন্তে।

কিন্তু যখন বসন্তের পর বসন্ত এসেছে,
অশোক বকুল পেয়েছে সম্মান ;
ওকে জেনেছি যেন ঋতুরাজের বাহির-দেউড়ির দ্বারী,
উদাসীন, উদ্ধত।
সেদিন কে জেনেছিল—
ঐ রূঢ় বৃহতের অন্তরে সুন্দরের নম্রতা,
কে জেনেছিল বসন্তের সভায় ওর কৌলীন্য।

ফুলের পরিচয়ে আজ ওকে দেখছি।
যেন গন্ধর্ব চিত্ররথ,
যে ছিল অর্জুনবিজয়ী মহারথী
গানের সাধন করছে সে আপন মনে একা
নন্দনবনের ছায়ার আড়ালে গুন গুন সুরে।
সেদিনকার কিশোর কবির চোখে
ঐ প্রৌঢ় গাছের গোপন যৌবনমদিরতা
যদি ধরা পড়ত উপযুক্ত লগ্নে,
মনে আসছে, তবে
মৌমাছির পাখা-উতল-করা
কোন্-এক পরম দিনের তরুণ প্রভাতে
একটি ফুলের গুচ্ছ করতেম চুরি
পরিয়ে দিতেম কেঁপে-ওঠা আঙুল দিয়ে
কোন্ একজনের আনন্দে-রাঙা কর্ণমূলে।
যদি সে শুধাত, কী নাম,
হয়তো বলতেম—
ঐ যে রৌদ্রের এক টুকরো পড়েছে তোমার চিবুকে
ওর যদি কোনো নাম তোমার মুখে আসে
একেও দেব সেই নামটি।

শান্তিনিকেতন
৭ জুন ১৯৩৬

অকাল ঘুম

এসেছি অনাহূত।
কিছু কৌতুক করব ছিল মনে—
আচমকা বাধা দেব অসময়ে
কোমরে-আঁচল-জড়ানো গৃহিণীপনায়।
দুয়ারে পা বাড়াতেই চোখে পড়ল—
মেঝের 'পরে এলিয়ে পড়া
ওর অকাল ঘুমের রূপখানি।

দূর পাড়ায় বিয়ে-বাড়িতে বাজছে শানাই সারঙ সুরে।
প্রথম প্রহর পেরিয়ে গেছে
জ্যৈষ্ঠরৌদ্রে ঝাম্‌রে-পড়া সকাল বেলায়।
স্তরে স্তরে দুখানি হাত গালের নীচে,
ঘুমিয়েছে শিথিলদেহে
উৎসবরাতের অবসাদে
অসমাপ্ত ঘরকন্নার এক ধারে।
কর্মস্রোত নিস্তরঙ্গ ওর অঙ্গে অঙ্গে,
অনাবৃষ্টিতে অজয় নদের
প্রান্তশায়ী শ্রান্ত জলশেষের মতো।
ঈষৎ খোলা ঠোঁটদুটিতে মিলিয়ে আছে
মুদে-আসা ফুলের মধুর উদাসীনতা।
দুটি ঘুমন্ত চোখের কালো পক্ষ্মচ্ছায়া
পড়েছে পাণ্ডুর কপোলে।

ক্লান্ত জগৎ চলেছে পা টিপে
ওর খোলা জানলার সামনে দিয়ে
ওর শান্তনিশ্বাসের ছন্দে।
ঘড়ির ইশারা
বধির ঘরে টিক্‌টিক্‌ করছে কোণের টেবিলে,
বাতাসে দুলছে দিনপঞ্জী দেয়ালের গায়ে।

চলতি মুহূর্তগুলি গতি হারালো ওর স্তব্ধ চেতনায়,
মিলল একটি অনিমেষ মুহূর্তে ;
ছড়িয়ে দিল তার অশরীরী ডানা
ওর নিবিড় নিদ্রার 'পরে।

ওর ক্লান্ত দেহের করুণ মাধুরী মাটিতে মেলা,
যেন পূর্ণিমারাতের ঘুম-হারানো অলস চাঁদ
সকালবেলায় শূন্য মাঠের শেষ সীমানায়

পোষা বিড়াল দুধের দাবি স্মরণ করিয়ে
ডাক দিল ওর কানের কাছে।
চমকে জেগে উঠে দেখল আমাকে,
তাড়াতাড়ি বুকে কাপড় টেনে
অভিমানভরে বললে, "ছি, ছি,
কেন জাগালে না এতক্ষণ।"
কেন! আমি তার জবাব দিই নি ঠিকমত।

যাকে খুব জানি তাকেও সব জানি নে
এই কথা ধরা পড়ে কোনো একটা আকস্মিকে।
হাসি আলাপ যখন আছে থেমে,
মনে যখন থমকে আছে প্রাণের হাওয়া,
তখন সেই অব্যক্তের গভীরে
এ কী দেখা দিল আজ।
সে কি অস্তিত্বের সেই বিষাদ
যার তল মেলে না,
সে কি সেই বোবার প্রশ্ন
যার উত্তর লুকাচুরি করে রক্তে,
সে কি সেই বিরহ
যার ইতিহাস নেই,
সে কি অজানা বাঁশির ডাকে অচেনা পথে স্বপ্নে-চলা।

ঘুমের স্বচ্ছ আকাশতলে
কোন্ নির্বাক্ রহস্যের সামনে ওকে নীরবে শুধিয়েছি,
"কে তুমি।
তোমার শেষ পরিচয় খুলে যাবে কোন্ লোকে।'

সেদিন সকালে গলির ও পারে পাঠশালায়
ছেলেরা চেঁচিয়ে পড়ছিল নামতা ;
পাট-বোঝাই মোষের গাড়ি
চাকার ক্লিষ্টশব্দে মুচড়ে দিচ্ছিল বাতাসকে ;
ছাদ পিটোচ্ছিল পাড়ার কোন্ বাড়িতে ;
জানলার নীচে বাগানে
চালতা গাছের তলায়
উচ্ছিষ্ট আমের আঁঠি নিয়ে
টানাটানি করছিল একটা কাক।

আজ এ সমস্তর উপরেই ছড়িয়ে পড়েছে
সেই দূরকালের মায়ারশ্মি।
ইতিহাসে-বিলুপ্ত
তুচ্ছ এক মধ্যাহ্নের আলস্য-আবিষ্ট রৌদ্রে
এরা অপরূপের রসে রইল ঘিরে
অকাল ঘুমের একখানি ছবি।

শান্তিনিকেতন
১০ জুন ১৯৩৬

কনি

আমরা ছিলেম প্রতিবেশী।
যখন-তখন দুই বাসার সীমা ডিঙিয়ে
যা-খুশি করে বেড়াত কনি,
খালি পা, খাটো-ফ্রক-পরা মেয়ে ;

দুষ্টু চোখদুটো
যেন কালো আগুনের ফিনকি-ছড়ানো।
ছিপ্‌ছিপে শরীর।
ঝাঁকড়া চুল চায় না শাসন মানতে,
বেণী বাঁধতে মাকে পেতে হত দুঃখ।
সঙ্গে সঙ্গে সারাক্ষণ লাফিয়ে বেড়াত
কোঁকড়া-লোম-ওআলা বেঁটে জাতের কুকুরটা
ছন্দের মিলে বাঁধা
দুজনে যেন একটি দ্বিপদী।

আমি ছিলেম ভালো ছেলে
ক্লাসের দৃষ্টান্তস্থল।
আমার সেই শ্রেষ্ঠতার
কোনো দাম ছিল না ওর কাছে।
যে বছর প্রোমোশন পাই দু ক্লাস ডিঙিয়ে
লাফিয়ে গিয়ে ওকে জানাই,
ও বলে, "ভারি তো!
কী বলিস টেমি।"
ওর কুকুরটা ডেকে ওঠে,
"ঘেউ।"

ও ভালোবাসত হঠাৎ ভাঙতে আমার দেমাক,
রুখিয়ে তুলতে ঠাণ্ডা ছেলেটাকে;
যেমন ভালোবাসত
দম্ করে ফাটিয়ে দিতে মাছের পটকা।
ওকে জব্দ করার চেষ্টা
ঝরনার গায়ে নুড়ি ছুঁড়ে মারা।
কলকল হাসির ধারায়
বাধা দিত না কিছুতেই।

মুখস্থ করতে বসেছি সংস্কৃত শব্দরূপ
চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে, মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে ;
ও হঠাৎ কখন দুম করে
পিঠে মেরে গেল কিল
অত্যন্ত প্রাকৃত রীতিতে।
সংস্কৃতের অপভ্রংশ
মুখ থেকে ভ্রষ্ট হবার পূর্বেই
বেণীটুকুর দোলন দেখিয়ে দিল দৌড়।
মেয়ের হাতের সহাস্য অপমান
সহজে সম্ভোগ করবার বয়স
তখনো আমার ছিল অল্প দূরে।
তাই শাসনকর্তা ছুটত ওর অনুসরণে,
প্রায় পৌঁছতে পারে নি লক্ষ্যে।
ওর বিলীয়মান শব্দভেদী হাসি
শুনেছি দূর থেকে,
হাতের কাছে পাই নি
কোনো দায়িত্ববিশিষ্ট জীব—
কোনো বেদনাবিশিষ্ট সত্তা।

এমনিতরো ছিল আমাদের আদ্যযুগ,
ছোটোমেয়ের উৎপাতে ব্যতিব্যস্ত।
দুরন্তকে শাসনের ইচ্ছা করেছি
পুরুষোচিত অসহিষ্ণুতায় ;
শুনেছি ব্যর্থচেষ্টার জবাবে
তীব্রমধুর কণ্ঠে,
"দুয়ো দুয়ো দুয়ো।"
বাইরে থেকে হারের পরিমাণ
বেড়ে চলেছে যখন
তখন হয়তো জিত হয়েছে শুরু
ভিতর থেকে।

সেই বেতার-বার্তার কান খোলে নি তখনো,
যদিও প্রমাণ হচ্ছিল জড়ো।

ইতিমধ্যে আমাদের জীবননাট্যে
সাজ হয়েছে বদল।
ও পরেছে শাড়ি,
আঁচলে বিঁধিয়েছে ব্রোচ,
বেণী জড়িয়েছে হাল ফেশানের খোঁপায়।
আমি ধরেছি খাকি রঙের খাটো প্যান্ট্
আর খেলোয়াড়ের জামা
ফুটবল-বলরামের নকলে।
ভিতরের দিকে ভাবের হাওয়ারও
বদল হল শুরু,
কিছু তার পাওয়া যায় পরিচয়।

একদিন কনির বাবা পড়ছেন বসে
ইংরেজি সাপ্তাহিক।
বড়ো লোভ আমার ঐ ছবির কাগজটার 'পরে।
আমি লুকিয়ে পিছনে দাঁড়িয়ে দেখছি
উড়ো জাহাজের নক্শা।
জানতে পেরে তিনি উঠলেন হেসে।
তিনি ভাবতেন, ছেলেটার বিদ্যার দম্ভ বেশি।
সেটা তাঁরও ছিল ব'লেই
আর কারও পারতেন না সইতে।
কাগজখানা তুলে ধরে বললেন,
"বুঝিয়ে দাও তো বাপু, এই ক'টা লাইন,
দেখি তোমার ইংরেজি বিদ্যে।"
নিষ্ঠুর অক্ষরগুলোর দিকে তাকিয়ে
মুখ লাল করে উঠতে হল ঘেমে।
ঘরের এক কোণে বসে

একলা করছিল কড়িখেলা
আমার অপমানের সাক্ষী কনি।
দ্বিধা হল না পৃথিবী,
অবিচলিত রইল চার দিকের নির্মম জগৎ।

পরদিন সকালে উঠে দেখি,
সেই কাগজখানা আমার টেবিলে—
শিবরামবাবুর ছবির কাগজ।
এত বড়ো দুঃসাহসের গভীর রসের উৎস কোথায়,
তার মূল্য কত,
সেদিন বুঝতে পারে নি বোকা ছেলে।
ভেবেছিলেম, আমার কাছে কনির
এ শুধু স্পর্ধার বড়াই।

দিনে দিনে বয়স বাড়ছে
আমাদের দুজনের অগোচরে,
তার জন্যে দায়িক নই আমরা।
বয়স-বাড়ার মধ্যে অপরাধ আছে
এ কথা লক্ষ্য করি নি নিজে,
করেছেন শিবরামবাবু।
আমাকে স্নেহ করতেন কনির মা,
তার জবাবে ঝাঁঝিয়ে উঠত তাঁর স্বামীর প্রতিবাদ।
একদিন আমার চেহারা নিয়ে খোঁটা দিয়ে
শিবরামবাবু বলছিলেন তাঁর স্ত্রীকে,
আমার কানে গেল—
"টুক্‌টুকে আমের মতো ছেলে
পচতে করে না দেরি,
ভিতরে পোকার বাসা।"

আমার 'পরে ওঁর ভাব দেখে

বাবা প্রায় বলতেন রেগে,
"লক্ষ্মীছাড়া, কেন যাস ওদের বাড়ি।"
ধিক্কার হত মনে,
বলতেম দাঁত কামড়ে,
"যাব না আর কক্‌খনো।"
যেতে হত দুদিন বাদেই
কুলতলার গলি দিয়ে লুকিয়ে।
মুখ বাঁকিয়ে বসে রইত কনি
দুদিন না-আসার অপরাধে।
হঠাৎ বলে উঠত,
"আড়ি, আড়ি, আড়ি।"
আমি বলতুম, "ভারি তো।"
ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাতুম আকাশের দিকে।

একদিন আমাদের দুই বাড়িতেই এল
বাসা ভাঙবার পালা।
এঞ্জিনিয়র শিবরামবাবু যাবেন পশ্চিমে
কোন্‌ শহরে আলো-জ্বালার কারবারে।
আমরা চলেছি কলকাতায় ;
গ্রামের ইস্কুলটা নয় বাবার মনের মতো।

চলে যাবার দুদিন আগে
কনি এসে বললে, "এস আমাদের বাগানে।"
আমি বললাম "কেন।"
কনি বললে, "চুরি করব দুজনে মিলে ;
আর তো পাব না এমন দিন।"
বললেম, "কিন্তু তোমার বাবা—"
কনি বললে, "ভীতু।"
আমি বললেম মাথা বাঁকিয়ে,
"একটুও না।"

শিবরামবাবুর শখের বাগান ফলে আছে ভরে।
কনি শুধোল, "কোন্ ফল ভালোবাস সব চেয়ে।
আমি বললেম, "ঐ মজঃফরপুরের লিচু।"
কনি বললে, "গাছে চড়ে পাড়তে থাকো,
ধরে রইলেম ঝুড়ি।"
ঝুড়ি প্রায় ভরেছে,
হঠাৎ গর্জন উঠল "কে রে"—
স্বয়ং শিবরামবাবু।
বললেন, "আর কোনো বিদ্যা হবে না বাপু,
চুরি বিদ্যাই শেষ ভরসা।"
ঝুড়িটা নিয়ে গেলেন তিনি
পাছে ফলবান হয় পাপের চেষ্টা।
কনির দুই চোখ দিয়ে
মোটা মোটা ফোঁটায়
জল পড়তে লাগল নিঃশব্দে ;
গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে
অমন অচঞ্চল কান্না
দেখি নি ওর কোনোদিন।

তার পরে মাঝখানে অনেকখানি ফাঁক।
বিলেত থেকে ফিরে এসে দেখি
কনির হয়েছে বিয়ে।
মাথায় উঠেছে লালপেড়ে আঁচল,
কপালে কুঙ্কুম,
শান্তগভীর চোখের দৃষ্টি,
স্বর হয়েছে গম্ভীর।
আমি কলকাতায় রসায়নের কারখানায়
ওষুধ বানিয়ে থাকি।
আমার দিনের পর দিন চলেছে
কর্মচক্রের স্নেহহীন কর্কশধ্বনিতে।

একদিন কনির কাছ থেকে চিঠিতে এল
দেখা করতে অনুনয়।
গ্রামের বাড়িতে ভাগনির বিয়ে,
স্বামী পায় নি ছুটি,
ও একা এসেছে মায়ের কাছে।
বাবা গেছেন হুশিয়ারপুরে
বিবাহে মতবিরোধের আক্রোশে।

অনেক দিন পরে এসেছি গ্রামে,
এসেছি প্রতিবেশিনীর সেই বাড়িতে।
ঘাটের পাশে ঢালু পাড়িতে
ঝুঁকে রয়েছে সেই হিজল গাছ জলের দিকে,
পুকুর থেকে আসছে
সেই পুরোনো কালের মিষ্টি গন্ধ শ্যাওলার ;
আর সিসুগাছের ডালে দুলছে
সেই দোলনাটা আজও।
কনি প্রণাম করে বললে, "অমলদাদা,
থাকি দূর দেশে,
ভাইফোঁটার দিনে পাব তোমায় নেই সে আশা।
আজ অদিনে মেটাব আমার সাধ, তাই ডেকেছি।"
বাগানে আসন পড়েছে অশথতলার চাতালে !
অনুষ্ঠান হল সারা ;
পায়ের কাছে কনি রাখলে একটি ঝুড়ি,
সে ঝুড়ি লিচুতে ভরা
বললে, "সেই লিচু।"
আমি বললেম, "ঠিক সে লিচু নয় বুঝি।"
কনি বললে, "কী জানি।"
বলেই দ্রুত গেল চলে।

শান্তিনিকেতন
১২ জুন ১৯৩৬

বাঁশিওআলা

"ওগো বাঁশিওআলা,
বাজাও তোমার বাঁশি,
শুনি আমার নূতন নাম"
—এই বলে তোমাকে প্রথম চিঠি লিখেছি,
মনে আছে তো ?

আমি তোমার বাংলাদেশের মেয়ে।
সৃষ্টিকর্তা পুরো সময় দেন নি
আমাকে মানুষ করে গড়তে—
রেখেছেন আধাআধি করে।
অন্তরে বাহিরে মিল হয় নি
সেকালে আর আজকের কালে,
মিল হয় নি ব্যথায় আর বুদ্ধিতে,
মিল হয় নি শক্তিতে আর ইচ্ছায়।
আমাকে তুলে দেন নি এ যুগের পারানি নৌকোয়,
চলা আটক করে ফেলে রেখেছেন
কালস্রোতের ও পারে বালুডাঙায়।
সেখান থেকে দেখি
প্রখর আলোয় ঝাপসা দূরের জগৎ—
বিনা কারণে কাঙাল মন অধীর হয়ে ওঠে,
দুই হাত বাড়িয়ে দিই,
নাগাল পাই নে কিছুই কোনো দিকে।

বেলা তো কাটে না,
বসে থাকি জোয়ার-জলের দিকে চেয়ে—
ভেসে যায় মুক্তি-পারের খেয়া,
ভেসে যায় ধনপতির ডিঙা,
ভেসে যায় চল্‌তি বেলার আলোছায়া।

এমন সময় বাজে তোমার বাঁশি
ভরা জীবনের সুরে।
মরা দিনের নাড়ীর মধ্যে
দব্‌দবিয়ে ফিরে আসে প্রাণের বেগ

কী বাজাও তুমি,
জানি নে সে সুর জাগায় কার মনে কী ব্যথা।
বুঝি বাজাও পঞ্চমরাগে
দক্ষিণ হাওয়ার নবযৌবনের ভাটিয়ারি।
শুনতে শুনতে নিজেকে মনে হয়—
যে ছিল পাহাড়তলির ঝির্‌ঝিরে নদী,
তার বুকে হঠাৎ উঠেছে ঘনিয়ে
শ্রাবণের বাদলরাত্রি।
সকালে উঠে দেখা যায় পাড়ি গেছে ভেসে,
একগুঁয়ে পাথরগুলোকে ঠেলা দিচ্ছে
অসহ্য স্রোতের ঘূর্ণি-মাতন।

আমার রক্তে নিয়ে আসে তোমার সুর—
ঝড়ের ডাক, বন্যার ডাক, আগুনের ডাক,
পাঁজরের উপরে আছাড়-খাওয়া
মরণ-সাগরের ডাক,
ঘরের শিকল-নাড়া উদাসী হাওয়ার ডাক।
যেন হাঁক দিয়ে আসে
অপূর্ণের সংকীর্ণ খাদে
পূর্ণ স্রোতের ডাকাতি,
ছিনিয়ে নেবে, ভাসিয়ে দেবে বুঝি।
অঙ্গে অঙ্গে পাক দিয়ে ওঠে
কালবৈশাখীর ঘূর্ণি-মার-খাওয়া
অরণ্যের বকুনি।

ডানা দেয় নি বিধাতা,
তোমার গান দিয়েছে আমার স্বপ্নে
ঝোড়ো আকাশে উড়ো প্রাণের পাগলামি।
ঘরে কাজ করি শান্ত হয়ে ;
সবাই বলে 'ভালো'।
তারা দেখে আমার ইচ্ছার নেই জোর,
সাড়া নেই লোভের,
ঝাপট লাগে মাথার উপর,
ধুলোয় লুটোই মাথা।
দুরন্ত ঠেলায় নিষেধের পাহারা কাত করে ফেলি
নেই এমন বুকের পাটা ;
কঠিন করে জানি নে ভালোবাসতে,
কাঁদতে শুধু জানি,
জানি এলিয়ে পড়তে পায়ে।

বাঁশিওআলা,
বেজে ওঠে তোমার বাঁশি—
ডাক পড়ে অমর্ত্যলোকে ;
সেখানে আপন গরিমায়
উপরে উঠেছে আমার মাথা।
সেখানে কুয়াশার পর্দা-ছেঁড়া
তরুণ-সূর্য আমার জীবন।
সেখানে আগুনের ডানা মেলে দেয়
আমার বারণ-না-মানা আগ্রহ,
উড়ে চলে অজানা শূন্যপথে
প্রথম-ক্ষুধায়-অস্থির গরুড়ের মতো।
জেগে ওঠে বিদ্রোহিণী ;
তীক্ষ্ণ চোখের আড়ে জানায় ঘৃণা
চার দিকের ভীরুর ভিড়কে,
কৃশ কুটিলের কাপুরুষতাকে।

বাঁশিওআলা,
হয়তো আমাকে দেখতে চেয়েছ তুমি।
জানি নে ঠিক জায়গাটি কোথায়,
ঠিক সময় কখন,
চিনবে কেমন করে।
দোসর-হারা আষাঢ়ের ঝিল্লিঝনক রাত্রে
সেই নারী তো ছায়ারূপে
গেছে তোমার অভিসারে চোখ-এড়ানো পথে।
সেই অজানাকে কত বসন্তে
পরিয়েছ ছন্দের মালা,
শুকোবে না তার ফুল।

তোমার ডাক শুনে একদিন
ঘরপোষা নির্জীব মেয়ে
অন্ধকার কোণ থেকে
বেরিয়ে এল ঘোমটা-খসা নারী।
যেন সে হঠাৎ-গাওয়া নতুন ছন্দ বাল্মীকির,
চমক লাগালো তোমাকেই।
সে নামবে না গানের আসন থেকে ;
সে লিখবে তোমাকে চিঠি
রাগিণীর আবছায়ায় বসে।
তুমি জানবে না তার ঠিকানা।

ওগো বাঁশিওআলা,
সে থাক্ তোমার বাঁশির সুরের দূরত্বে।

শান্তিনিকেতন
১৬ জুন ১৯৩৬

মিলভাঙা

এসেছিলে কাঁচা জীবনের
পেলব রূপটি নিয়ে—
এনেছিলে আমার হৃদয়ের প্রথম বিস্ময়,
রক্তে প্রথম কোটালের বান।
আধোচেনার ভালোবাসার মাধুরী
ছিল যেন ভোরবেলাকার
কালো ঘোমটার সূক্ষ্ম সোনার কাজ—
গোপন শুভদৃষ্টির আবরণ।
মনের মধ্যে তখনো
অসংশয় হয় নি পাখির কাকলী;
বনের মর্মর একবার জাগে
একবার যায় মিলিয়ে।

বহুলোকের সংসারের মাঝখানে
চুপিচুপি তৈরি হতে লাগল
আমাদের দুজনের নিভৃত জগৎ।
পাখি যেমন প্রতিদিন
খড়কুটো কুড়িয়ে এনে বাসা বাঁধে
তেমনি সেই জগতের উপকরণ সামান্য,
চল্‌তি মুহূর্তের খসে-পড়া
উড়ে-আসা সঞ্চয় দিয়ে গাঁথা।
তার মূল্য ছিল তার রচনায়,
নয় তার বস্তুতে।

শেষে একদিন দুজনের নৌকো-বাওয়া থেকে
কখন একলা গেছ নেমে;
আমি ভেসে চলেছি স্রোতে,
তুমি বসে রইলে ও পারের ডাঙায়।

মিলল না আর আমার হাতে তোমার হাতে
কাজে কিম্বা খেলায়।
জোড় ভেঙে ভাঙল আমাদের জীবনের গাঁথনি।
যে দ্বীপের শ্যামল ছবিখানি সদ্য আঁকা পড়েছে
সমুদ্রের লীলাচঞ্চল তরঙ্গপটে
তাকে যেমন দেয় মুছে
এক জোয়ারের তুমুল তুফানে,
তেমনি মিলিয়ে গেল আমাদের কাঁচা জগৎ
সুখদুঃখের নতুন-অঙ্কুর-মেলা
শ্যামল রূপ নিয়ে।

তার পরে অনেক দিন গেছে কেটে।
আষাঢ়ের আসন্নবর্ষণ সন্ধ্যায়
যখন তোমাকে দেখি মনে মনে,
দেখতে পাই তুমি আছ
সেইদিনকার কচি যৌবনের মায়া দিয়ে ঘেরা।
তোমার বয়স গেছে থেমে।
তোমার সেই বসন্তের আমের বোলে
আজও তেমনি গন্ধেরই ঘোষণা;
তোমার সেদিনকার মধ্যাহ্ন
আজ মধ্যাহ্নেও ঘুঘুর ডাকে তেমনি বিরহাতুর।
আমার কাছে তোমার স্মরণ রয়ে গেছে
প্রকৃতির বয়সহারা এই-সব পরিচয়ের দলে।
সুন্দর তুমি বাঁধা রেখায়,
প্রতিষ্ঠিত তুমি অচল ভূমিতে।
আমার জীবনধারা
কোথাও রইল না থেমে।
দুর্গমের মধ্যে, গভীরের মধ্যে,
মন্দভালোর দ্বন্দ্ববিরোধে,
চিন্তায় সাধনায় আকাঙ্ক্ষায়,

কখনো সফলতায়, কখনো প্রমাদে,
চলে এসেছি তোমার জানা সীমার
বহুদূর বাইরে ;
সেখানে আমি তোমার কাছে বিদেশী।
সেই তুমি আজ এই মেঘ-ডাকা সন্ধ্যায়
যদি এসে বস আমার সামনে,
দেখতে পাবে আমার চোখে
দিক-হারানো চাহনি
অজানা আকাশের সমুদ্রপারে
নীল অরণ্যের পথে।

তুমি কি পাশে বসে শোনাবে
সেদিনকার কানে-কানে কথার উদ্‌বৃত্ত।
কিন্তু ঢেউ করছে গর্জন,
শকুন করছে চীৎকার,
মেঘ ডাকছে আকাশে,
মাথা নাড়ছে নিবিড় শালের বন।
তোমার বাণী হবে খেলার ভেলা
খেপাজলের ঘূর্ণিপাকে।

সেদিন আমার সব মন
মিলেছিল তোমার সব মনে,
তাই প্রকাশ পেয়েছে নূতন গান
প্রথম সৃষ্টির আনন্দে।
মনে হয়েছে,
বহু যুগের আশ মিটল তোমাতে আমাতে।
সেদিন প্রতিদিনই বয়ে এনেছে
নূতন আলোর আগমনী
আদিকালে সদ্য-চোখ-মেলা তারার মতো।

আজ আমার যন্ত্রে
তার চড়েছে বহুশত,
কোনোটা নয় তোমার জানা।
যে সুর সেধে রেখেছ সেদিন
সে সুর লজ্জা পাবে এর তারে।
সেদিন যা ছিল ভাবের লেখা
আজ হবে তা দাগা-বুলোনো।

তবু জল আসে চোখে।
এই সেতারে নেমেছিল তোমার আঙুলের
প্রথম দরদ;
এর মধ্যে আছে তার জাদু।
এই তরীটিকে প্রথম দিয়েছিলে ঠেলে
কিশোর-বয়সের শ্যামল পারের থেকে;
এর মধ্যে আছে তার বেগ।
আজ মাঝনদীতে সারিগান গাইব যখন
তোমার নাম পড়বে বাঁধা
তার হঠাৎ তানে।

শান্তিনিকেতন
২০ জুন ১৯৩৬

হঠাৎ-দেখা

রেলগাড়ির কামরায় হঠাৎ দেখা,
ভাবি নি সম্ভব হবে কোনোদিন

আগে ওকে বারবার দেখেছি
লালরঙের শাড়িতে
দালিম ফুলের মতো রাঙা;

আজ পরেছে কালো রেশমের কাপড়,
আঁচল তুলেছে মাথায়
দোলনচাঁপার মতো চিকনগৌর মুখখানি ঘিরে।
মনে হল, কালো রঙে একটা গভীর দূরত্ব
ঘনিয়ে নিয়েছে নিজের চার দিকে,
যে দূরত্ব সর্ষেখেতের শেষ সীমানায়
শালবনের নীলাঞ্জনে।
থমকে গেল আমার সমস্ত মনটা;
চেনা লোককে দেখলেম অচেনার গাম্ভীর্যে।

হঠাৎ খবরের কাগজ ফেলে দিয়ে
আমাকে করলে নমস্কার।
সমাজবিধির পথ গেল খুলে,
আলাপ করলেম শুরু—
কেমন আছ, কেমন চলছে সংসার
ইত্যাদি।
সে রইল জানলার বাইরের দিকে চেয়ে
যেন কাছের দিনের ছোঁয়াচ-পার-হওয়া চাহনিতে।
দিলে অত্যন্ত ছোটো দুটো-একটা জবাব,
কোনোটা বা দিলেই না।
বুঝিয়ে দিলে হাতের অস্থিরতায়—
কেন এ-সব কথা,
এর চেয়ে অনেক ভালো চুপ করে থাকা।

আমি ছিলেম অন্য বেঞ্চিতে
ওর সাথিদের সঙ্গে।
এক সময়ে আঙুল নেড়ে জানালে কাছে আসতে।
মনে হল কম সাহস নয়;
বসলুম ওর এক-বেঞ্চিতে।

গাড়ির আওয়াজের আড়ালে
বললে মৃদুস্বরে,
"কিছু মনে কোরো না,
সময় কোথা সময় নষ্ট করবার।
আমাকে নামতে হবে পরের স্টেশনেই ;
দূরে যাবে তুমি,
দেখা হবে না আর কোনোদিনই।
তাই যে প্রশ্নটার জবাব এতকাল থেমে আছে,
শুনব তোমার মুখে।
সত্য করে বলবে তো ?"

আমি বললেম, "বলব।"
বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়েই শুধোল,
"আমাদের গেছে যে দিন
একেবারেই কি গেছে,
কিছুই কি নেই বাকি।"

একটুকু রইলেম চুপ করে ;
তার পর বললেম,
"রাতের সব তারাই আছে
দিনের আলোর গভীরে।"

খটকা লাগল, কী জানি বানিয়ে বললেম না কি।
ও বললে, "থাক্, এখন যাও ও দিকে।"
সবাই নেমে গেল পরের স্টেশনে ;
আমি চললেম একা।

শান্তিনিকেতন
২৪ জুন ১৯৩৬

কালরাত্রে

কাল রাত্রে
বাদলের দানোয়-পাওয়া অন্ধকারে
বর্ষণের রিমঝিম প্রলাপে
চাপা দিয়েছিল
সন্ন্যাসী নিশীথের ধ্যানমন্ত্র।
জড়ত্বে ছিলেম পরাভূত,
ছিলেম উপবাসী ;
ছিল শিথিলশক্তি ধূলিশয়ান।
বুকে ভর দিয়ে বসেছিল
সমস্ত আকাশের সঙ্গহীনতা।
"চাই চাই" করে কেঁদে উঠেছিল প্রাণ
প্রহরে প্রহরে নিশাচর পাখির মতো।
নানা নাম ধরেছিল ভিক্ষা,
অন্তরের অন্ধস্তরে শিকড় চালিয়েছিল
আঁকাবাঁকা অশুচি কান্নার।
"চাই চাই" বলে
শূন্য হাৎড়ে বেড়িয়েছিল রাত-কানা
যাকে চায় তাকে না জেনে।
শেষে ক্রুদ্ধ গর্জনে হেঁকে উঠল,
"নেই সে নেই কোথাও নেই।"

সত্যহারা শূন্যতার গর্ত থেকে
কালো কামনার সাপের বংশ
বেরিয়ে এসে জড়িয়েছে কাঙালকে—
নাস্তিত্বের-সেই-শিকল-বাঁধা ভৃত্যকে—
নিরর্থের বোঝায়
বেঁকেছে যার পিঠ,
নেমেছে যার মাথা।

ভোর হল রাত্রি।
আষাঢ়ের সকালে অকস্মাৎ হাওয়ায়
ঘন মেঘের দুর্গপ্রাচীর
পড়ল ভেঙেচুরে।
ছুটে বেরিয়ে এসেছে
প্রভাতের বাঁধন-ছেঁড়া আলো।
মুক্তির আনন্দঘোষণা
বেজে উঠল আকাশে আকাশে
আগুনের ভাষায়।
পাখিদের ছোটো কোমল তনুতে
দুরন্ত হয়ে উঠল প্রাণের উৎসুক ছন্দ।
চলল তাদের সুরের তীর-খেলা
কণ্ঠ থেকে কণ্ঠে, শাখা থেকে শাখায়।
সেতারের দ্রুত তালের বাজন যেন
পাতায় পাতায় আলোর চমক।
মন দাঁড়িয়ে উঠল;
বললে, আমি পূর্ণ।
তার অভিষেক হল
আপনারই উদ্‌বেল তরঙ্গে।
তার আপন সঙ্গ
আপনাকে করলে বেষ্টন
শিলাতটকে ঝর্নার মতো;
উপচে উঠে মিলতে চলল
চার দিকের সব-কিছুর মধ্যে।

চেতনার সঙ্গে আলোর রইল না কোনো ব্যবধান।
প্রভাতসূর্যের অন্তরে
দেখতে পেলেম আপনাকে
হিরণ্ময় পুরুষ;
ডিঙিয়ে গেলেম দেহের বেড়া,

পেরিয়ে গেলেম কালের সীমা,
গান গাইলেম "চাই নে কিছু চাই নে"—
যেমন গাইছে রক্তপদ্মের রক্তিমা,
যেমন গাইছে সমুদ্রের ঢেউ,
সন্ধ্যাতারার শান্তি,
গিরিশিখরের নির্জনতা।

শান্তিনিকেতন
২৩ জুন ১৯৩৬

অমৃত

বিদায় নিয়ে চলে আসবার বেলা বললেম তাকে,
"ভারতের একজন নারী বলেছিলেন একদিন—
উপকরণ চান না তিনি,
তিনি চান অমৃত
এই তো নারীর পণ,
তুমি কী বল।"
অমিয়া হাসল একটু বিরস হাসি ;
বললে, "এ কি উপদেশ।"
আমি বললেম তার হাত চেপে ধরে,
"ভালোবাসাই সেই অমৃত,
উপকরণ তার কাছে তুচ্ছ,
বুঝবে একদিন।"

বিরক্ত হল অমিয়া ;
বললে, "তুমি কেন নিয়ে গেলে না আমাকে মিথ্যে থেকে।
জোর নেই কেন তোমার।"
আমি বললেম, "বাধে আত্মগৌরবে।

যতদিন না ধনে হব সমান
আসব না তোমার কাছে।
অমিয়া মাথা-ঝাঁকানি দিয়ে উঠে দাঁড়ালো,
চলল ঘরের বাইরে।
আমি বললেম, "শুনে রাখো,
তোমার ভালোবাসার বদলে
দেব না তোমাকে অকিঞ্চনের অসম্মান।
এই আমার পুরুষের পণ।"

দিন যায়, রাত যায়,
মাথায় চড়ে ওঠে সোনার মদের নেশা।
সঞ্চয়ের ধাক্কা যতই বাড়ে
ততই আমাকে চলে ঠেলে।
থামতে পারি নে, থামাতে পারি নে তার তাড়না।
বিত্ত বাড়ে, খ্যাতি বাড়ে,
বুক ফুলিয়ে এগিয়ে চলে আত্মশ্লাঘা।
শেষে ডাক্তার বললে, বিশ্রাম চাই নিতান্তই,
দেহের কল অচল হয়ে এল বলে।

গেলেম দূরদেশে নির্জনে।
সেখানে সমুদ্রের একটা খাড়ি এসে মিলেছে
পাহাড়তলির অরণ্যে।
ভিড় জমেছে গাছে গাছে
মাছ-ধরা পাখিদের পাড়ায়।
ক্ষীণ নদীটি ঝরে পড়ছে পাহাড় থেকে
পাথরের ধাপে ধাপে।
নুড়ি ডিঙিয়ে বেঁকে চলা
তার ফটিক জলের কল্‌কলানি
ধরিয়ে রেখেছে একটি মূল সুর নির্জনতার।
নিত্য-স্নান-করা সেখানকার হাওয়া
চলেছে মন্ত্র গুন্‌গুনিয়ে বনের থেকে বনে।

দল বেঁধেছে নারকেল গাছ—
কেউ খাড়া, কেউ হেলে-পড়া,
দিনরাত ওদের ঝালর-ঝোলা অস্থিরপনা।
ফিরে ফিরে আছাড় খেয়ে ফেনিয়ে উঠছে জেদালো ঢেউ
মোটা মোটা কালো পাথরে ;
ডাঙায় ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে
ঝিনুক শামুক শ্যাওলা।
ক্লান্ত শরীর ব্যস্ত মনকে ফিরিয়েছে
শান্ত রক্তধারার স্নিগ্ধতায়।
কর্মের নেশার ঝাঁজ এল মরে।
এতকালের খাটুনি মনে হল যেন ফাঁকি,
প্রাণ উঠল দু হাত বাড়িয়ে
জীবনের সাঁচ্চা সোনার জন্যে।

সেদিন ঢেউ ছিল না জলে।
আশ্বিনের রোদ্দুর কাঁপছে
সমুদ্রের শিহর-লাগা নীলিমায়।
বাসার ধারে পুরোনো ঝাউগাছে
ধেয়ে আসছে খাপছাড়া হাওয়া,
ঝর্‌ঝর্‌ করে উঠছে তার পাতা।
বেগনি রঙের পাখি, বুকের কাছে সাদা,
টেলিগ্রাফের তারে বসে লেজ দুলিয়ে
ডাকছে মিষ্টি মৃদু চাপা স্বরে।
শরৎ-আকাশের নির্মল নীলে ছড়িয়ে আছে
কোন্‌ অনাদি নির্বাসনের গভীর বিষাদ।
মনের মধ্যে হুহু করে উঠছে—
"ফিরে যেতে হবে।"
থেকে থেকে মনে পড়ছে,
সেদিনকার সেই জল-মুছে-ফেলা চোখে
জ্বলে উঠেছিল যে আলো।

সেইদিনই চড়লুম জাহাজে।
বন্দরে নেমেই এসেছি চলে।
রাস্তার বাঁকে এসে চাইলেম বাড়ির দিকে ;
মনে হল, সেখানে বাস নেই কারও।
এলেম সদর দরজার সামনে,
দেখি তালা বন্ধ।
ধক্ করে উঠল বুকের মধ্যে ;
বাড়ির ভিতর থেকে শূন্যতার দীর্ঘনিশ্বাস এসে
লাগল আমার অন্তরে।

অনেক সন্ধানের পর
দেখা হল শেষে।
কোন্ বারো-ভুঁইঞাদের আমলের
একখানা তিন-কাল-পেরোনো গ্রাম—
একটি পুরোনো দিঘির ধারে—
দিঘির নামেই লোচনদিঘি তার নাম।
সেখানে ভুলে-যাওয়া তারিখের
ঝাপসা-অক্ষর-পট-ওআলা
ভাঙা দেবালয়।
পূর্বখ্যাতির কোনো সাক্ষী রাখে নি,
আছে সে অশ্বত্থের পাঁজর-ভাঙা
আলিঙ্গনে জড়িয়ে-পড়া।
পাড়ির উপরে বুড়ো বটের তলায়
একটি নূতন আটচালা ঘর,
সেইখানে গ্রামের বালিকাবিদ্যালয়।

দেখলুম অমিয়াকে
ছাই রঙের মোটা শাড়ি পরা,
দুই হাতে দুইগাছি শাঁখা,
পায়ে নেই জুতো,

ঢিলে খোঁপা অযত্নে পড়েছে ঝুলে।
পাড়াগাঁয়ের শ্যামল রঙ লেগেছে মুখে।
ছোটো ঝারি হাতে পাঠশালার বাগানে
জল দিচ্ছে সবজি-খেতে।
ভেবে পেলেম না কী বলি।
তারও মুখে এল না
প্রথম-দেখার কোনো সম্ভাষণ,
কোনো প্রশ্ন।

চোখের আড়ে
আমার দামি জুতোজোড়াটার দিকে তাকিয়ে
বললে অনায়াসে,
"বেশি বর্ষায় আগাছায় চাপা পড়েছে
বিলিতি বেগুনের চারা ;
এসো-না, নিড়িয়ে দেবে।"

বোঝা গেল না, ঠাট্টা কি সত্যি।
জামার আস্তিনে ছিল মুক্তোর বোতাম,
লুকিয়ে আস্তিনটা দিলেম উলটিয়ে।
অমিয়ার জন্যে একটা ব্রোচ ছিল পকেটে,
বুঝলেম দিতে গেলে
হীরেটাতে লাগবে প্রহসনের হাসি।
একটু কেসে শুধালেম,
"এখানে থাক কোথায়।"
ঝারি রেখে দিয়ে বললে, "দেখবে ?"
নিয়ে গেল স্কুলের মধ্যে
দালানের পুব দিকটাতে
শতরঞ্চের পর্দা দিয়ে ভাগ করা ঘরে।
একটা তক্তপোশের উপর
বিছানা রয়েছে গোটানো।

টুলের উপর সেলাইয়ের কল,
ছিটের খাপে ঢাকা সেতার
দেয়ালে-ঠেসান-দেওয়া।
দক্ষিণের দরজার সামনে মাদুর পাতা,
তার উপরে ছড়িয়ে আছে
ছাঁটা কাপড়, নানা রঙের ফিতে,
রেশমের মোড়ক।
উত্তর কোণের দেয়ালে
ছোটো টিপায়ে হাত-আয়না,
চিরুনি, তেলের শিশি,
বেতের ঝুড়িতে টুকিটাকি।
দক্ষিণ কোণের দেয়ালের গায়ে
ছোটো টেবিলে লেখবার সামগ্রী
আর রঙ-করা মাটির ভাঁড়ে
একটি স্থলপদ্ম।
অমিয়া বললে, "এই আমার বাসা—
একটু বোসো, আসছি আমি।"

বাইরে জটা-ঝোলা বটের ডালে
ডাকছে কোকিল।
মান-কচুর ঝোপের পাশে
বিষম খেপে উঠেছে একদল ঝগড়াটে শালিখ।
দেখা যায়, ঝিল্‌মিল্‌ করছে
ঢালু পাড়ির তলায়
দিঘির উত্তর ধারের এক টুকরো জল
কলমি-শাকের-পাড়-দেওয়া।
চোখে পড়ল, লেখবার টেবিলে একটি ছবি—
অল্প বয়সের যুবা, চিনি নে তাকে—
কয়লায় আঁকা, কাঁচকড়ার ফ্রেমে বাঁধানো—
ফলাও তার কপাল, চুল আলুথালু,

চোখে যেন দূর ভবিষ্যের আলো,
ঠোঁটে যেন কঠিন পণ তালা-আঁটা।
এমন সময় অমিয়া নিয়ে এল
থালায় করে জলখাবার—
চিঁড়ে, কলা, নারকেল-নাড়ু,
কালো পাথর-বাটিতে দুধ,
এক-গেলাস ডাবের জল।
মেঝের উপর থালা রেখে
পশমে-বোনা একটা আসন দিল পেতে।
খিদে নেই বললে মিথ্যে হত না,
রুচি নেই বললে সত্য হত,
কিন্তু খেতেই হল।

তার পরে শোনা গেল খবর।

আমার ব্যবসায়ে আমদানি যখন জমে উঠেছে ব্যাঙ্কে,
যখন হুঁশ ছিল না আর-কোনো জমাখরচে,
তখন অমিয়ার বাবা কুঞ্জকিশোরবাবু
মাঝে মাঝে লক্ষপতির ঘরের
দুর্লভ দুই-একটি ছেলেকে
এনেছিলেন চায়ের টেবিলে।
সব সুযোগই ব্যর্থ করেছে বারে বারে
তাঁর একগুঁয়ে মেয়ে।
কপাল চাপড়ে হাল ছেড়েছেন যখন তিনি
এমন সময় পারিবারিক দিগন্তে
হঠাৎ দেখা দিল কক্ষছাড়া পাগলা জ্যোতিষ্ক—
মাধপাড়ার রায়বাহাদুরের একমাত্র ছেলে মহীভূষণ।
রায়বাহাদুর জমা টাকা আর জমাট বুদ্ধিতে
দেশবিখ্যাত।

তাঁর ছেলেকে কোনো পিতা পারে না হেলা করতে
যতই সে হোক লাগাম-ছেঁড়া।
আট বছর য়ুরোপে কাটিয়ে মহীভূষণ ফিরেছেন দেশে।
বাবা বললেন, "বিষয়কর্ম দেখো।"
ছেলে বললে, "কী হবে।"
লোকে বললে, ওর বুদ্ধির কাঁচা ফলে ঠোকর দিয়েছে
রাশিয়ার লক্ষ্মী-খেদানো বাদুড়টা।
অমিয়ার বাবা বললেন, "ভয় নেই,
নরম হয়ে এল বলে দেশের ভিজে হাওয়ায়।"
দু দিনে অমিয়া হল তার চেলা।
যখন-তখন আসত মহীভূষণ,
আশপাশের হাসাহাসি কানাকানি গায়ে লাগত না কিছুই।

দিনের পর দিন যায়।
অধীর হয়ে অমিয়ার বাবা তুললেন বিয়ের কথা।
মহী বললে, "কী হবে।"
বাবা রেগে বললেন, "তবে তুমি আস কেন রোজ।"
অনায়াসে বললে মহীভূষণ,
"অমিয়াকে নিয়ে যেতে চাই যেখানে ওর কাজ।"

অমিয়ার শেষ কথা এই,
"এসেছি তাঁরই কাজে।
উপকরণের দুর্গ থেকে তিনি করেছেন আমাকে উদ্ধার।"
আমি শুধালেম, "কোথায় আছেন তিনি।"
অমিয়া বললে, "জেলখানায়।"

শান্তিনিকেতন
৩ জুলাই ১৯৩৬

দুর্বোধ

অধ্যাপকমশায় বোঝাতে গেলেন নাটকটার অর্থ,
সেটা হয়ে উঠল বোধের অতীত।
আমার সেই নাটকের কথা বলি।—

বইটার নাম 'পত্রলেখা',
নায়ক তার কুশলসেন।
নবনীর কাছে বিদায় নিয়ে সে গেল বিলেতে।
চার বছর পরে ফিরে এসে হবে বিয়ে।
নবনী কাঁদল উপুড় হয়ে বিছানায়,
তার মনে হল, এ যেন চার বছরের মৃত্যুদণ্ড।

নবনীকে কুশলের প্রয়োজন ছিল না ভালোবাসার পথে,
প্রয়োজন ছিল সুগম করতে বিলাত-যাত্রার পথ।
সে কথা জানত নবনী,
সে পণ করেছিল হৃদয় জয় করবে প্রাণপণ সাধনায়।
কুশল মাঝে মাঝে
রুচিতে বুদ্ধিতে উঁচট খেয়ে ওকে হঠাৎ বলেছে রূঢ় কথা,
ও সয়েছে চুপ করে;
মেনে নিয়েছে নিজেকে অযোগ্য বলে;
ওর নালিশ নিজেরই উপরে।
ভেবেছিল দীনা বলেই একদিন হবে ওর জয়,
ঘাস যেমন দিনে দিনে নেয় ঘিরে কঠোর পাহাড়কে।
এ যেন ছিল ওর ভালোবাসার শিল্পরচনা,
নির্দয় পাথরটাকে ভেঙে ভেঙে রূপ আবাহন করা
ব্যথিত বক্ষের নিরন্তর আঘাতে।
আজ নবনীর সেই দিনরাতের আরাধনার ধন গেল দূরে।
ওর দুঃখের থালাটি ছিল অশ্রু-ভেজা অর্ঘ্যে ভরা,
আজ থেকে দুঃখ রইবে কিন্তু দুঃখের নৈবেদ্য রইবে না।

এখন ওদের সম্বন্ধের পথ রইল
শুধু এ পারে ও পারে চিঠি লেখার সাঁকো বেয়ে।
কিন্তু নবনী তো সাজিয়ে লিখতে জানে না মনের কথা,
ও কেবল যত্নের স্বাদ লাগাতে জানে সেবাতে,
অর্‌কিডের চমক দিয়ে যেতে ফুলদানির 'পরে
কুশলের চোখের আড়ালে,
গোপনে বিছিয়ে আসতে
নিজের-হাতে-কাজ-করা আসন
যেখানে কুশল পা রাখে।

কুশল ফিরল দেশে,
বিয়ের দিন করল স্থির।
আংটি এনেছে বিলেত থেকে,
গেল সেটা পরাতে;
গিয়ে দেখে ঠিকানা না রেখেই নবনী নিরুদ্দেশ।

তার ডায়ারিতে আছে লেখা,
"যাকে ভালোবেসেছি সে ছিল অন্য মানুষ,
চিঠিতে যার প্রকাশ, এ তো সে নয়।"
এ দিকে কুশলের বিশ্বাস
তার চিঠিগুলি গদ্যে মেঘদূত,
বিরহীদের চিরসম্পদ।
আজ সে হারিয়েছে প্রিয়াকে,
কিন্তু মন গেল না চিঠিগুলি হারাতে—
ওর মমতাজ পালালো, রইল তাজমহল।
নাম লুকিয়ে ছাপালো চিঠি 'উদ্‌ভ্রান্তপ্রেমিক' আখ্যা দিয়ে।

নবনীর চরিত্র নিয়ে
বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা হয়েছে বিস্তর।

কেউ বলেছে, বাঙালির মেয়েকে
লেখক এগিয়ে নিয়ে চলেছে
ইবসেনের মুক্তিবাণীর দিকে—
কেউ বলেছে, রসাতলে।

অনেকে এসেছে আমার কাছে জিজ্ঞাসা নিয়ে ;
আমি বলেছি, "আমি কী জানি।"
বলেছি, "শাস্ত্রে বলে, দেবা ন জানন্তি।"
পাঠকবন্ধু বলেছে,
"নারীর প্রসঙ্গে নাহয় চুপ করলেম
হতবুদ্ধি দেবতারই মতো,
কিন্তু পুরুষ ?
তারও কি অজ্ঞাতবাস চিররহস্যে।
ও মানুষটা হঠাৎ পোষ মানলে কোন্ মন্ত্রে।"

আমি বলেছি,
"মেয়েই হোক আর পুরুষই হোক, স্পষ্ট নয় কোনো পক্ষই ;
যেটুকু সুখ দেয় বা দুঃখ দেয় স্পষ্ট কেবল সেইটুকুই।
প্রশ্ন কোরো না,
পড়ে দেখো কী বলছে কুশল।"

কুশল বলে, "নবনী চার বছর ছিল দৃষ্টির বাইরে,
যেন নেমে গেল সৃষ্টির বাইরেতেই ;
ওর মাধুর্যটুকুই রইল মনে,
আর সব-কিছু হল গৌণ।
সহজ হয়েছে ওকে সুন্দর ছাঁদে চিঠি লিখতে।
অভাব হয়েছে, করেছি দাবি—
ওর ভালোবাসার উপর অবাধ ভরসা
মনকে করেছে রসসিক্ত, করেছে গর্বিত।

প্রত্যেক চিঠিতে আপন ভাষায় তুলিয়েছি আপনারই মন
লেখার উত্তাপে ঢালাই করা অলংকার
ওর স্মৃতির মূর্তিটিকে সাজিয়ে তুলেছে দেবীর মতো।
ও হয়েছে নূতন রচনা।
এই জন্যেই খ্রীস্টান শাস্ত্রে বলে,
সৃষ্টির আদিতে ছিল বাণী।"

পাঠকবন্ধু আবার জিগেস করেছে,
"ও কি সত্যি বললে,
না, এটা নাটকের নায়কগিরি?"
আমি বলেছি, "আমি কী জানি।"

শান্তিনিকেতন
৫ জুলাই ১৯৩৬

বঞ্চিত

ফুলিদের বাড়ি থেকে এসেই দেখি
পোস্ট্‌কার্ড্‌খানা আয়নার সামনেই,
কখন এসেছে জানি নে তো।
মনে হল, সময় নেই একটুও;
গাড়ি ধরতে পারব না বুঝি।
বাক্স থেকে টাকা বের করতে গিয়ে
ছড়িয়ে পড়ল সিকি দুয়ানি,
কিছু কুড়োলেম, কিছু রইল বা,
গ'নে ওঠা হল না।
কাপড় ছাড়ি কখন।
নীল রঙের রেশমি রুমালখানা
দিলেম মাথার উপর তুলে কাঁটায় বিঁধে।

চুলটাকে জড়িয়ে নিলুম কোনোমতে,
টবের গাছ থেকে তুলে নিলুম
চন্দ্রমল্লিকা বাসন্তীরঙের।

স্টেশনে এসে দেখি গাড়ি আসেই না,
জানি নে কতক্ষণ গেল—
পাঁচ মিনিট, হয়তো বা পঁচিশ মিনিট।
গাড়িতে উঠে দেখি চেলি-পরা বিয়ের কনে দলে-বলে ;
আমার চোখে কিছুই পড়ে না যেন,
খানিকটা লাল রঙের কুয়াশা, একখানা ফিকে ছবি।

গাড়ি চলেছে ঘটর ঘটর, বেজে উঠছে বাঁশি,
উড়ে আসছে কয়লার গুঁড়ো,
কেবলই মুখ মুছছি রুমালে।
কোন্-এক স্টেশনে
বাঁকে করে ছানা এনেছে গয়লার দল।
গাড়িটাকে দেরি করাচ্ছে মিছিমিছি।
হুইস্‌ল্ দিলে শেষকালে ;
সাড়া পড়ল চাকাগুলোয়, চলল গাড়ি।
গাছপালা, ঘরবাড়ি, পানাপুকুর
ছুটেছে জানলার ছু ধারে পিছনের দিকে—
পৃথিবী যেন কোথায় কী ফেলে এসেছে ভুলে,
ফিরে আর পায় কি না-পায়।
গাড়ি চলেছে ঘটর ঘটর।

মাঝখানে অকারণে গাড়িটা থামল অনেক ক্ষণ,
খেতে খেতে খাবার গলায় বেধে যাবার মতো।
আবার বাঁশি বাজল,
আবার চলল গাড়ি ঘটর ঘটর।
শেষে দেখা দিল হাবড়া স্টেশন।

চাইলেম না জানালার বাইরে,
মনে স্থির করে আছি—
খুঁজতে খুঁজতে আমাকে আবিষ্কার করবে একজন এসে,
তার পরে দুজনের হাসি।

বিয়ের কনে, টোপর-হাতে আত্মীয়স্বজন,
সবাই গেল চলে।
কুলি এসে চাইলে মুখের দিকে,
দেখলে গাড়ির ভিতরটাতে মুখ বাড়িয়ে,
কিছুই নেই।
যারা কনেকে নিতে এসেছিল গেল চলে।
যে জনস্রোত এ মুখে আসছিল
ফিরল গেটের দিকে।
গট গট করে চলতে চলতে
গার্ড্ আমার জানালার দিকে একটু তাকালে,
ভাবলে মেয়েটা নামে না কেন।
মেয়েটাকে নামতেই হল।

এই আগন্তুকের ভিড়ের মধ্যে
আমি একটিমাত্র খাপছাড়া।
মনে হল প্লাটফর্ম্‌টার
এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত প্রশ্ন করছে আমাকে ;
জবাব দিচ্ছি নীরবে,
"না এলেই হত।"
আর-একবার পড়লুম পোস্ট্‌কার্ড্‌খানা—
ভুল করি নি তো ?

এখন ফিরতি গাড়ি নেই একটাও।
যদি বা থাকত, তবু কি…

বুকের মধ্যে পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে
কত রকমের 'হয়তো'—
সবগুলিই সাংঘাতিক।

বেরিয়ে এসে তাকিয়ে রইলুম ব্রিজটার দিকে।
রাস্তার লোক কী ভাবলে জানি নে।
সামনে ছিল বাস্, উঠে পড়লুম।
ফেলে দিলুম চন্দ্রমল্লিকাটা।

অপর পক্ষ

সময় একটুও নেই।
লাল মখমলের জুতোটা গেল কোথায়;
বেরোল খাটের নীচে থেকে।
গলার বোতাম লাগাতে লাগাতে গেছি চৌকাঠ পর্যন্ত,
হঠাৎ এলেন বাবা।
আলাপ শুরু করলেন ধীরে সুস্থে;
খবর পেয়েছেন দুজন পাত্রের, মিনির জন্যে।
তাঁর মনটা একবার এর দিকে ঝুঁকছে একবার ওর দিকে
ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি আর উঠছি ঘেমে।

রাস্তায় বেরোলেম;
হাওড়ায় গাড়ি আসতে বারো মিনিট।
বুকের মধ্যে রক্তবেগ মন্দগতি সময়কে মারছে ঠেলা
ট্যাক্সি ছুটল বে-আইনি চালে।
হ্যারিসন রোড, চিৎপুর রোড,
হাওড়া ব্রিজ, ন মিনিট বাকি।

দুর্ভাগ্য আর গোরুর গাড়ি আসে যখন
আসে ভিড় করে।
রাস্তাটা পিণ্ডি পাকিয়ে গেছে পাট-বোঝাই গাড়িতে
হাঁক ডাক আর ধাক্কা লাগালে কনিস্টবল;
নিরেট আপদ ফাঁক দেয় না কোথাও।
নেমে পড়লুম ট্যাক্সি ছেড়ে,
হন্‌হনিয়ে চললুম পায়ে হেঁটে।
পৌঁছলুম হাওড়া স্টেশনে।
কী জানি কব্জিঘড়িটা ফাস্ট্‌ হয় যদি পনেরো মিনিট।
কী জানি, আজ থেকে টাইম্‌টেবিলের
সময় যদি পিছিয়ে থাকে।
ঢুকে পড়লুম ভিতরে।
দাঁড়িয়ে আছে একটা খালি ট্রেন—
যেন আদিকালের প্রকাণ্ড সরীসৃপটার কঙ্কাল,
যেন একঘেয়ে অর্থের গ্রন্থিতে বাঁধা
অমরকোষের একটা লম্বা শব্দাবলী।
নির্বোধের মতো এলেম উঁকি মেরে মেয়ে-গাড়িগুলোতে।
ডাকলেম নাম ধরে,
'কী জানি' ছাড়া আর-কোনো কারণ নেই
সেই পাগলামির।
ভগ্ন আশা শূন্য প্লাট্‌ফরম্‌ জুড়ে ভূলুণ্ঠিত।

বেরিয়ে এলুম বাইরে—
জানি নে যাই কোন্‌ দিকে।
বাসের নীচে চাপা পড়ি নি নিতান্ত দৈবক্রমে।
এই দয়াটুকুর জন্যে ইচ্ছে নেই
দেবতাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে।

শ্যামলী

ওগো শ্যামলী,
আজ শ্রাবণে তোমার কালো কাজল চাহনি
চুপ করে থাকা বাঙালি মেয়েটির
ভিজে চোখের পাতায় মনের কথাটির মতো।
তোমার মাটি আজ সবুজ ভাষায় ছড়া কাটে ঘাসে ঘাসে
আকাশের বাদল-ভাষার জবাবে।
ঘন হয়ে উঠল তোমার জামের বন পাতার মেঘে,
বলছে তারা উড়ে-চলা মেঘগুলোকে হাত তুলে,
"থামো, থামো—
থামো তোমার পুব বাতাসের সওয়ারি।"

পথের ধারে গাছতলাতে তোমার বাসা, শ্যামলী,
তুমি দেবতাপাড়ায় বেদের মেয়ে,
বাসা ভাঙ বারে বারে, খালি হাতে বেরিয়ে পড় পথে,
এক নিমেষে তুমি নিঃশেষে গরিব, তুমি নির্ভাবনা।
তোমাকে যে ভালোবেসেছে
গাঁঠছড়ার বাঁধন দাও না তাকে ;
বাসর-ঘরের দরজা যখন খোলে রাতের শেষে
তখন আর কোনোদিন চায় না সে পিছন ফিরে

মুখোমুখি বসব বলে বেঁধেছিলেম মাটির বাসা
তোমার কাঁচা-বেড়া-দেওয়া আঙিনাতে।
সেদিন গান গাইল পাখিরা,
তাদের নেই অচল খাঁচা ;
তারা নীড় যেমন বাঁধে তেমনি আবার ভাঙে।
বসন্তে এ পারে তাদের পালা, শীতের দিনে ও পারের অরণ্যে

সেদিন সকালে
হাওয়ার তালে হাততালি দিলে গাছের পাতা।
আজ তাদের নাচ বনে বনে,
কাল তাদের ধুলোয় লুটিয়ে-পড়া—
তা নিয়ে নেই বিলাপ, নেই নালিশ।
বসন্ত-রাজদরবারের নকিব ওরা ;
এ বেলায় ওদের কাজ, জবাব মেলে ও বেলায়।

এই ক'টা দিন তোমায় আমায় কথা হল কানে কানে ;
আজ কানে কানে বলছ আমায়,
"আর নয়, এবার তোলো বাসা।"
আমি পাকা করে গাঁথি নি ভিত,
আমার মিনতি ফাঁদি নি পাথর দিয়ে তোমার দরজায় ;
বাসা বেঁধেছি আলগা মাটিতে—
যে চলতি মাটি নদীর জলে এসেছিল ভেসে,
যে মাটি পড়বে গলে শ্রাবণধারায়।

যাব আমি।
তোমার ব্যথাবিহীন বিদায়দিনে
আমার ভাঙা ভিটের 'পরে গাইবে দোয়েল লেজ দুলিয়ে
এক শাহানাই বাজে তোমার বাঁশিতে, ওগো শ্যামলী,
যেদিন আসি আবার যেদিন যাই চলে।

। আগস্ট ১৯৩৬

শ্যামলী

শ্রীশম্ভু সাহা গৃহীত চিত্র

নাটক ও প্রহসন

পরিত্রাণ

পরিত্রাণ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ধনঞ্জয় ও প্রজাগণ

প্রজা। থাকতে পারলুম না যে ঠাকুর। তাই তোমাকে ধরে নিয়ে চলেছি।

ধনঞ্জয়। আমাকে নিয়ে তোদের কী হবে বল্ তো।

প্রজা। মাঝে মাঝে তোমাকে না দেখতে পেলে যে—

ধনঞ্জয়। তোরা ভাবছিস তোরাই আমাকে ধরে এনেছিস। তা নয় রে— আমিই তোদের খবর দিতে বেরিয়েছি—

প্রজা। কিসের খবর ঠাকুর ?

ধনঞ্জয়। দুঃখের দিন আসছে।

প্রজা। বল কী প্রভু ?

ধনঞ্জয়। হাঁ রে, আমি ধরণীর কান্না শুনতে পাই যে।

প্রজা। কোথায় পালাব ?

ধনঞ্জয়। পালাব না রে, তাকে বুঝে নেব— ভিতরে এসে দুঃখটাকে দেখব বাইরে।

গান

তুমি বাহির থেকে দিলে বিষম তাড়া—
তাই ভয়ে ঘোরায় দিক্-বিদিকে
শেষে অন্তরে পাই সাড়া।

আমি তোদের ডাকছি— সবাই আমার বুকের ভিতরে আয়, সেইখান থেকে নির্ভয়ে দেখবি তুফানের দাপট, মরণের চোখ-রাঙানি।

প্রজা। তুমি যেখানে ডাক দাও ঠাকুর সেখানে যাবার পথ পাই নে যে।

ধনঞ্জয়। যখন হারাই বন্ধ-ঘরের তালা,
যখন অন্ধ নয়ন, শ্রবণ কালা,
তখন অন্ধকারে লুকিয়ে দ্বারে
শিকলে দাও নাড়া।

ঘুম যখন ভাঙবে তখনই দরজা খোলবার সময় আসবে রে।

প্রজা। ঘুম যে ভাঙে না।

ধনঞ্জয়। সেইজন্যেই তাড়া লাগছে, নইলে দুঃখ আসবে কেন।

যত দুঃখ আমার দুঃস্বপনে,
সে-যে ঘুমের ঘোরেই আসে মনে,
ঠেলা দিয়ে মায়ার আবেশ
করো গো দেশছাড়া।

অজ্ঞান হয়ে থাকিস বলেই তো স্বপ্নের চোটে তোরা গুঙরে মরিস।

প্রজা। রাজার পেয়াদা এসে যখন মার লাগায়? সেটাকে তুমি স্বপ্ন বল নাকি?

ধনঞ্জয়। তা না তো কী? স্বপ্নের হাজার লক্ষ মুখোশ আছে; রাজার মুখোশ প'রেও আসে— তোদের অচৈতন্য নিয়েই তোদের সে মারে, তার হাতে আর কোনো অস্ত্র নেই।

আমি আপন মনের মারেই মরি
শেষে দশ জনারে দোষী করি—
আমি চোখ বুজে পথ পাই নে ব'লে
কেঁদে ভাসাই পাড়া।

দেখ্, আমি এই কথা তোদের বলতে এসেছি— সংসারে তোরাই দুঃখ এনেছিস।

প্রজা। সে কী কথা ঠাকুর, আমরা দুঃখ পাই, আমরা তো দুঃখ দিই নে। আমাদের সে শক্তিই নেই।

ধনঞ্জয়। ওরে বোকা, মার খাবার জন্যে যে তৈরি হয়ে আছে মারের ফসল ফলাবার মাটি সে যে চষে রেখেছে। তোদেরই অপরাধ সব চেয়ে বেশি— তোরা তোদের অন্তর্যামী ঠাকুরকে লজ্জা দিয়েছিস, তাই এত দুঃখ।

প্রজা। আমরা কী করব বলে দাও।

ধনঞ্জয়। আর কত বলব? বার বার বলছি ভয় নেই, ভয় নেই, ভয় নেই।

গান

নাই ভয়, নাই ভয় নাই রে।
থাক্ পড়ে থাক্ ভয় বাইরে!

জাগো মৃত্যুঞ্জয় চিত্তে
থৈ-থৈ-নর্তন-নৃত্যে,
ওরে মন বন্ধনছিন্ন
দাও তালি তাই তাই তাই রে।

প্রজা। ঠাকুর, ওই যেন কে আসছে?

ধনঞ্জয়। আসতে দে।

প্রজা। কী জানি, খুনে হবে কি ডাকাত হবে, এই অন্ধকার রাত্তিরে বেরিয়েছে।

ধনঞ্জয়। খুনেকে তোরাই খুনে করিস, ডাকাতকে করে তুলিস ডাকাত। খাড়া দাঁড়িয়ে থাক্।

প্রজা। প্রভু, বিপদ ঘটতে পারে। আমরা বরঞ্চ একটু সরে দাঁড়াই— একেবার সামনে এসে পড়বে— তখন—

ধনঞ্জয়। ওরে বোকারা, পিছন দিকে বিপদ যখন মারে তখন আর বাঁচোয়া নেই— বুক পেতে দিতে পারিস, বিপদ তা হলে নিজেই পিছন ফিরবে।

বসন্তরায় ও একজন পাঠানের প্রবেশ

পাঠান। কোন্ হ্যায় রে!

প্রজা। দোহাই বাবা, আমরা চাষি লোক—

পাঠান। রাত্তিরে কী করতে বেরিয়েছিস?

ধনঞ্জয়। রাত্তিরে যারা বেরোয় তাদের সঙ্গে মিলন হবে বলেই বেরিয়েছি। দিনে মিলি কাজের লোকের সঙ্গে, রাত্তিরে মিলি অকাজের লোকের সঙ্গে।

পাঠান। ভয় ডর নেই?

ধনঞ্জয়। দাদা, তোমারও তো ভয় ডর নেই দেখছি। দুই নির্ভয়ে সামনাসামনি দেখাসাক্ষাৎ হল— এ তো পরম আনন্দ। (প্রজাদের প্রতি) যাস কোথায় তোরা! চেনাশোনা করে নে-না।

বসন্ত। ভাবে বোধ হচ্ছে, তুমিই ধনঞ্জয় ঠাকুর, কেমন, ঠিক ঠাউরেছি কি না?

ধনঞ্জয়। ধরা পড়েছি। রাত-কানা নও তুমি।

বসন্ত। তেমন মানুষ অন্ধকারেও চোখে পড়ে।

ধনঞ্জয়। তুমিও তো অন্ধকারে ঢাকা পড়বার লোক নও, খুড়ো মহারাজ!

পাঠান। যাঃ চলে! সব ফেঁসে গেল!

ধনঞ্জয়। কী ফাঁসল দাদা!

পাঠান। মহারাজের সঙ্গে ঠিক যে সময়টিতে একলা আলাপ জমিয়েছিলুম, তুমি এসে বাগড়া দিলে।

ধনঞ্জয়। খাঁ-সাহেব, তুমি জান না, বাগড়া দিয়েই আলাপ জমান যিনি বড়ো আলাপী।

গান

আমার পথে পথেই পাথর ছড়ানো।
তাই তো তোমার বাণী বাজে
ঝর্না-ঝরানো।
আমার বাঁশি তোমার হাতে
ফুটোর পরে ফুটো তাতে,
তাই শুনি সুর অমন মধুর
পরান-ভরানো।
তোমার হাওয়া যখন জাগে
আমার পালে বাধা লাগে,
এমন করে গায়ে প'ড়ে
সাগর-তরানো।
ছাড়া পেলে একেবারে
রথ কি তোমার চলতে পারে?
তোমার হাতে আমার ঘোড়া
লাগাম-পরানো।

বসন্ত। খাঁ-সাহেব, এই তো জমে গেল। আজ পথে বাধা পেয়েছিলুম বলেই তো। যিনি বাগড়া দেন জয় হোক তাঁর।

ধনঞ্জয়। আজ বেরিয়েছ কোন্ ডাকে মহারাজ?

বসন্ত। যশোরে চলেছিলুম। ঠাকুর, গ্রামে ডাকাত পড়েছে খবর পেয়ে লোকজনদের সব পাঠিয়ে দিয়েছি। তাই খাঁ-সাহেবকে নিয়ে এই রাস্তার মধ্যেই মজলিশ জমে গেল।

ধনঞ্জয়। রাস্তার মাঝখানে হঠাৎ-মজলিশেই মজা মহারাজ। আমিও তোমার এই সভায় হঠাৎ-দরবারী।

গান

তুমি হঠাৎ-হাওয়ায় ভেসে-আসা ধন—
তাই হঠাৎ-পাওয়ায় চমকে ওঠে মন।

বসন্ত। বেশ, বেশ ঠাকুর। যা নিত্যি জোটে তা থাক্ পড়ে— এই হঠাতের টানেই তো বাঁধন কাটে।

ধনঞ্জয়।—
গোপন পথে আপন মনে
বাহির হও যে কোন্ লগনে,
হঠাৎ-গন্ধে মাতাও সমীরণ!

বসন্ত। হায় হায় ঠাকুর— বড়ো শুভক্ষণেই বেরিয়েছিলুম— দেহমন শিউরে উঠছে।

ধনঞ্জয়।—
নিত্য যেথায় আনাগোনা
হয় না সেথায় চেনাশোনা,
উড়িয়ে ধুলো আসছে কতই জন।

বসন্ত। আহা, ভিড়ের মধ্যে হল না দেখা! দিন বৃথা গেল।

ধনঞ্জয়।—
কখন পথের বাহির থেকে
হঠাৎ বাঁশি যায় যে ডেকে
পথহারাকে করে সচেতন।

বসন্ত। এসো ঠাকুর, একবার কোলাকুলি করে নিই।

প্রজা। কোথায় চলেছ মহারাজ?

বসন্ত। প্রতাপ আমাকে ডেকেছে, তাই যশোরে চলেছি।

প্রজা। রায়গড়ে ফিরে যাও আজ রাত্তিরেই।

বসন্ত। কেন বলো দেখি?

প্রজা। নানারকম গুজব কানে আসে। ভালো লাগে না।

ধনঞ্জয়। কোথাকার অযাত্রা এরা সব? নিজেরাও চলবি নে ভয়ে, অন্যকেও চলতে দিবি নে?

প্রজা। দেখছ না ঠাকুর, পাঠানটা হঠাৎ কখন সরে গেল?

ধনঞ্জয়। তোদের সঙ্গ ওর ভালো লাগল না, তাতে আর আশ্চর্য কী রে। সবাই কি তোদের সহ্য করতে পারে?

প্রজা। তোমার সাদা মন, তুমি বুঝবে না— ওর যে কী মতলব ছিল তা বোঝাই যাচ্ছে।

ধনঞ্জয়। সাদা মনে বোঝা যায় না, ময়লা মনে বোঝা সহজ হয়, এ কথা নতুন শোনা গেল। বিশ্বাস নেই, উপর থেকে দেখিস দিঘির পানা, বিশ্বাস করে নীচে ডুব মারিস, দেখবি ডুব-জল। তোরা ডাঙা থেকেই মুখ ফিরিয়ে যাস, আমি না তলিয়ে দেখে ছাড়ি নে।

প্রজা। প্রভু, রাগ যে হয়।

ধনঞ্জয়। সেইজন্যেই সংসারে কেবল রাগীকেই দেখিস— না রাগতিস, তা হলে যে রাগে না তাকেও দেখতে পেতিস।

পাঠানের পুনঃপ্রবেশ

বসন্ত। এই-যে খাঁ-সাহেব ফিরেছে। তুমি যে ফারসি বয়েদ্‌গুলি শুনিয়েছিলে, ওগুলি আমাকে লিখে দিতে হবে।

পাঠান। দেব হুজুর, কিন্তু একটা কথা নিবেদন করি। (প্রজাদিগকে দেখাইয়া) এই এদের সরে যেতে বলো।

প্রজা। না, সে হবে না। আমরা ওঁকে ফেলে যাব না।

ধনঞ্জয়। কেন যাবি নে রে? ভারি অহংকার তোদের দেখি। তোরা হলি রক্ষা-কর্তা, না?

প্রজা। তুমি যদি হুকুম কর তো যাই।

ধনঞ্জয়। রক্ষা করবার যদি দরকার হয়, খাঁ-সাহেব একলা রক্ষা করতে পারবেন।

[প্রজাদের প্রস্থান

পাঠান। মহারাজ, আমাকেই রক্ষা করো।

বসন্ত। সে কী কথা? কিছু বিপদ হয়েছে?

পাঠান। হয়েছে। আমি যদি আজ যশোরে ফিরে যাই, আমার প্রাণ থাকবে না।

বসন্ত। সর্বনাশ! কেন, কী অপরাধ করেছ?

পাঠান। প্রতাপাদিত্য রাজা কাল যখন আমাদের দুই ভাইকে রওনা করে দিলেন, তখন পথের মধ্যে আপনাকে খুন করবার হুকুম ছিল।

বসন্ত। কী বল খাঁ-সাহেব?

পাঠান। হাঁ, কিন্তু গোপনে। গোপনও রইল না, তা ছাড়া আপনাকে মারা আমার দ্বারা হবে না, মনিবের হুকুমেও না। এখন আপনার মেহেরবানি চাই।

বসন্ত। এখনই চলে যাও রায়গড়ে। তোমার কোনো ভয় নেই।

[সেলাম করিয়া পাঠানের প্রস্থান

বুকে বড়ো বাজল ঠাকুর!

ধনঞ্জয়। বাজবে বইকি ভাই। ভালোবাস যে— না বাজলে কি ভালো হত?

গান

কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসারি ঘায়ে—
নিবিড় বেদনাতে পুলক লাগে গায়ে।

বসন্ত। আহা, সার্থক হোক কান্না আমার।

ধনঞ্জয়।—
তোমার অভিসারে
যাব অগম পারে
চলিতে পথে পথে বাজুক ব্যথা পায়ে।

বসন্ত। এই ব্যথার পথেই আমাকে চালাও প্রভু! আমি আর কিছুই চাই নে।

ধনঞ্জয়।—
পরানে বাজে বাঁশি, নয়নে বহে ধারা—
দুখের মাধুরীতে করিল দিশাহারা।
সকলি নিবে কেড়ে
দিবে না তবু ছেড়ে—
মন সরে না যেতে ফেলিলে এ কী দায়ে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মন্ত্রগৃহে প্রতাপাদিত্য ও মন্ত্রী

মন্ত্রী। মহারাজ, কাজটা কি ভালো হবে?

প্রতাপ। কোন্ কাজটা?

মন্ত্রী। যেটা আদেশ করেছেন—

প্রতাপ। কী আদেশ করেছি?

মন্ত্রী। আপনার পিতৃব্য সম্বন্ধে—

প্রতাপ। আমার পিতৃব্য সম্বন্ধে কী?

মন্ত্রী। মহারাজ আদেশ করেছিলেন, যখন রাজা বসন্তরায় যশোরে আসবার পথে শিমুলতলির চটিতে আশ্রয় নেবেন, তখন—

প্রতাপ। তখন কী? কথাটা শেষ করেই ফেলো।

মন্ত্রী। তখন দুজন পাঠান গিয়ে—

প্রতাপ। হাঁ।

মন্ত্রী। তাঁকে নিহত করবে।

প্রতাপ। নিহত করবে! অমরকোষ খুঁজে বুঝি আর কোনো কথা খুঁজে পেলে না? নিহত করবে! মেরে ফেলবে কথাটা মুখে আনতে বুঝি বাধছে?

মন্ত্রী। মহারাজ আমার ভাবটি ভালো বুঝতে পারেন নি।

প্রতাপ। বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছি।

মন্ত্রী। আজ্ঞে মহারাজ, আমি—

প্রতাপ। তুমি শিশু! খুন করাটা যেখানে ধর্ম সেখানে না-করাটাই পাপ, এটা এখনো তোমার শিখতে বাকি আছে। পিতৃব্য বসন্তরায় নিজেকে ম্লেচ্ছের দাস বলে স্বীকার করেছেন। ক্ষত হলে নিজের বাহুকে কেটে ফেলা যায়, সে কথা মনে রেখো মন্ত্রী।

মন্ত্রী। যে-আজ্ঞে।

প্রতাপ। অমন তাড়াতাড়ি 'যে-আজ্ঞে' বললে চলবে না। তুমি মনে করছ নিজের পিতৃব্যকে বধ করা সকল অবস্থাতেই পাপ। 'না' বোলো না, ঠিক এই কথাটাই তোমার মনে জাগছে। কিন্তু মনে কোরো না এর উত্তর নেই। পিতার অনুরোধে ভৃগু তাঁর মাকে বধ করেছিলেন, আর ধর্মের অনুরোধে আমি আমার পিতৃব্যকে কেন বধ করব না?

মন্ত্রী। কিন্তু দিল্লীশ্বর যদি শোনেন, তবে—

প্রতাপ। আর যাই কর, দিল্লীশ্বরের ভয় আমাকে দেখিয়ো না!

মন্ত্রী। প্রজারা জানতে পারলে কী বলবে?

প্রতাপ। জানতে পারলে তো।

মন্ত্রী। এ কথা কখনোই চাপা থাকবে না।

প্রতাপ। দেখো মন্ত্রী, কেবল ভয় দেখিয়ে আমাকে দুর্বল করে তোলবার জন্যেই কি তোমাকে রেখেছি?

মন্ত্রী। মহারাজ, যুবরাজ উদয়াদিত্য—

প্রতাপ। দিল্লীশ্বর গেল, প্রজারা গেল, শেষকালে উদয়াদিত্য! সেই স্ত্রৈণ বালকটার কথা আমার কাছে তুলো না! দেখো দেখি মন্ত্রী, সে পাঠান দুটো এখনো এল না!

মন্ত্রী। সেটা তো আমার দোষ নয় মহারাজ।

প্রতাপ। দোষের কথা হচ্ছে না। দেরি কেন হচ্ছে তুমি কী অনুমান কর তাই জিজ্ঞাসা করছি।

মন্ত্রী। শিমুলতলি তো কাছে নয়। কাজ সেরে আসতে দেরি তো হবেই।

একজন পাঠানের প্রবেশ

প্রতাপ। কী হল?

পাঠান। মহারাজ, এতক্ষণে কাজ নিকেশ হয়ে গেছে।

প্রতাপ। সে কী রকম কথা? তবে তুমি জান না?

পাঠান। জানি বই-কি। কাজ শেষ হয়ে গেছে ভুল নেই, তবে আমি সে সময়ে উপস্থিত ছিলুম না। আমার ভাই হোসেন খাঁ'র উপর ভার আছে, সে খুব হুঁশিয়ার। মহারাজের পরামর্শমতে আমি খুড়া রাজাসাহেবের লোকজনদের তফাৎ করেই চলে আসছি।

প্রতাপ। হোসেন যদি ফাঁকি দেয়।

পাঠান। তোবা। সে তেমন বেইমান নয়। মহারাজ, আমি আমার শির জামিন রাখলুম।

প্রতাপ। আচ্ছা, এইখানে হাজির থাকো, তোমার ভাই ফিরে এলে বক্‌শিশ মিলবে। (পাঠানের বাহিরে গমন) এটা যাতে প্রজারা টের না পায় সে চেষ্টা করতে হবে।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ কথা গোপন থাকবে না।

প্রতাপ। কিসে তুমি জানলে?

মন্ত্রী। আপনার পিতৃব্যের প্রতি বিদ্বেষ আপনি তো কোনোদিন লুকোতে পারেন নি। এমন-কি, আপনার কন্যার বিবাহেও আপনি তাঁকে নিমন্ত্রণ করেন নি— তিনি বিনা নিমন্ত্রণেই এসেছিলেন। আর আজ আপনি অকারণে তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন, আর পথে এই কাণ্ডটি ঘটল, এমন অবস্থায় প্রজারা আপনাকেই মূল বলে জানবে।

প্রতাপ। তা হলেই তুমি খুব খুশি হও! না?

মন্ত্রী। মহারাজ, এমন কথা কেন বলছেন? আপনার ধর্ম-অধর্ম পাপ-পুণ্যের বিচার আমি করি নে, কিন্তু রাজ্যের ভালোমন্দর কথাও যদি আমাকে ভাবতে না দেবেন তবে আমি আছি কী করতে? কেবল প্রতিবাদ করে মহারাজের জেদ বাড়িয়ে তোলবার জন্যে?

প্রতাপ। আচ্ছা, ভালোমন্দর কথাটা কী ঠাওরালে শুনি।

মন্ত্রী। আমি এই কথাই বলছি, পদে পদে প্রজাদের মনে অসন্তোষ বাড়িয়ে তুলবেন না। দেখুন, মাধবপুরের প্রজারা খুব প্রবল এবং আপনার বিশেষ বাধ্য নয়। তারা রাজ্যের সীমানার কাছে থাকে, পাছে আপনার প্রতিবেশী শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগ দেয়, এই ভয়ে তাদের গায়ে হাত তোলা যায় না। সেইজন্য মাধবপুর-শাসনের ভার যুবরাজের উপর দেবার কথা আমিই মহারাজকে বলেছিলেম।

প্রতাপ। সে তো বলেছিলে। তার ফল কী হল দেখো-না। আজ দু বৎসরের খাজনা বাকি। সকল মহল থেকে টাকা এল, আর ওখান থেকে কী আদায় হল ?

মন্ত্রী। আজ্ঞে, আশীর্বাদ। তেমন সব বজ্জাত প্রজাও যুবরাজের পায়ের গোলাম হয়ে গেছে। টাকার চেয়ে কি তার কম দাম ? সেই যুবরাজের কাছ থেকে আপনি মাধবপুরের ভার কেড়ে নিলেন। সমস্তই উল্টে গেল। এর চেয়ে তাঁকে না পাঠানোই ভালো ছিল। সেখানকার প্রজারা তো হন্যে কুকুরের মতো ক্ষেপে রয়েছে— তার পরে যদি এই কথাটা প্রকাশ হয়, তা হলে কী হয় বলা যায় না। রাজকার্যে ছোটোদের অবজ্ঞা করতে নেই মহারাজ! অসহ্য হলেই ছোটোরা জোট বাঁধে, জোট বাঁধলেই ছোটোরা বড়ো হয়ে ওঠে।

প্রতাপ। সেই ধনঞ্জয় বৈরাগী তো মাধবপুরে থাকে ?

মন্ত্রী। আজ্ঞে হাঁ।

প্রতাপ। সেই বেটাই যত নষ্টের গোড়া। ধর্মের ভেক ধরে সেই তো যত প্রজাকে নাচিয়ে তোলে। সেই তো প্রজাদের পরামর্শ দিয়ে খাজনা বন্ধ করিয়েছে। উদয়কে বলেছিলুম যেমন করে হোক তাকে আচ্ছা করে শাসন করে দিতে। কিন্তু উদয়কে জান তো ? এ দিকে তার না আছে তেজ, না আছে পৌরুষ, কিন্তু একগুঁয়েমির অন্ত নেই। ধনঞ্জয়কে শাসন দূরে থাক্ তাকে আস্পর্ধা দিয়ে বাড়িয়ে তুলেছে। এবারে তার কণ্ঠিসুদ্ধ কণ্ঠ চেপে ধরতে হচ্ছে, তার পরে দেখা যাবে তোমার মাধবপুরের প্রজাদের কত বড়ো বুকের পাটা! আর দেখো, লোকজন আজই সব ঠিক করে রাখো— খবরটা পাবামাত্রই রায়গড়ে গিয়ে বসতে হবে। সেইখানেই শ্রাদ্ধশান্তি করব— আমি ছাড়া উত্তরাধিকারী আর তো কাউকে দেখি নে।

বসন্তরায়ের প্রবেশ। প্রতাপাদিত্য চমকিত হইয়া দণ্ডায়মান

বসন্ত। আমাকে কিসের ভয় প্রতাপ ? আমি তোমার পিতৃব্য, তাতেও যদি বিশ্বাস না হয় আমি বৃদ্ধ, তোমার কোনো অনিষ্ট করি এমন শক্তি নেই।

[প্রতাপ নীরব

প্রতাপ, একবার রায়গড়ে চলো— ছেলেবেলা কতদিন সেখানে কাটিয়েছ— তার পরে বহুকাল সেখানে যাও নি।

প্রতাপ। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া সগর্জনে) খবরদার! ওই পাঠানকে ছাড়িস নে! [দ্রুত প্রস্থান

বসন্তরায়ের প্রস্থান। প্রতাপ ও মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ

প্রতাপ। দেখো মন্ত্রী, রাজকার্যে তোমার অত্যন্ত অমনোযোগ দেখা যাচ্ছে।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ বিষয়ে আমার কোনো অপরাধ নেই।

প্রতাপ। এ বিষয়ের কথা তোমাকে কে বলছে? আমি বলছি, রাজকার্যে তোমার অত্যন্ত অমনোযোগ দেখছি। সেদিন তোমাকে চিঠি রাখতে দিলেম, হারিয়ে ফেললে! আর-একদিন মনে আছে উমেশ রায়ের কাছে তোমাকে যেতে বলেছিলুম, তুমি লোক দিয়ে কাজ সেরেছিলে।

মন্ত্রী। আজ্ঞে মহারাজ—

প্রতাপ। চুপ করো! দোষ কাটাবার জন্যে মিথ্যে চেষ্টা কোরো না। যা হোক, তোমাকে জানিয়ে রাখছি, রাজকার্যে তুমি কিছুমাত্র মনোযোগ দিচ্ছ না। আর-একটা কথা তোমাকে বলে দিচ্ছি মন্ত্রী, সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে উদয় আছে। এমনি করে সে নিজের চার দিকে জাল জড়াচ্ছে— এর পরে আমাকে দোষ দিতে পারবে না।

তৃতীয় দৃশ্য

উদয়াদিত্যের শয়নকক্ষ

উদয়াদিত্য ও সুরমা

উদয়। যাক্, চুকল।

সুরমা। কী চুকল।

উদয়। আমার উপর মাধবপুর শাসনের ভার মহারাজ রেখেছিলেন। টাকায় আট আনা বৃদ্ধি ধরে খাজনা আদায়ের হঠাৎ হুকুম এল। বৃষ্টি নেই, এবারে সেখানে অজন্মা— তাই আমি—

সুরমা। আমি তো তোমাকে আমার গহনাগুলো দিতে চেয়েছিলুম। তার থেকে—

উদয়। তোমার গহনা কেনে এত বড়ো বুকের পাটা এ রাজ্যে আছে? আমি

মহারাজকে বললুম, মাধবপুর থেকে বৃদ্ধি খাজনা আমি কোনোমতেই আদায় করতে পারব না। শুনে তিনি মাধবপুর আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন। তিনি এখন কেবলই সৈন্য বাড়াচ্ছেন, অস্ত্র কিনছেন, টাকা তাঁর নিতান্ত চাই— তা প্রজা বাঁচুক আর মরুক।

সুরমা। পরগনা তো কেড়ে নিলেন, কিন্তু তুমি চলে এলে প্রজারা যে মরবে!

উদয়। আমি ঠিক করেছি, যে করে হোক তাদের পেটের ভাতটা জোগাব। শুনতে পেলে মহারাজ খুশি হবেন না— নিশ্চয় ভাববেন, আমি তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছি। উনি মনে করেন, আমি দয়া দিয়ে নাম কিনি। কিন্তু তোমার ঘরে আজ ফুলের মালার ঘটা কেন?

সুরমা। রাজপুত্রকে রাজসভায় যখন চিনলে না, তখন যে তাকে চিনেছে সে তাকে মালা দিয়ে বরণ করবে।

উদয়। সত্যি নাকি! তোমার ঘরে রাজপুত্র আসা যাওয়া করেন? তিনি কে শুনি? এ খবরটা জানতুম না!

সুরমা। রামচন্দ্র যেমন ভুলেছিলেন তিনি অবতার, তোমারও সেই দশা। কিন্তু ভক্তকে ভোলাতে পারবে না!

উদয়। রাজপুত্র! রাজার ঘরে কোনো জন্মে পুত্র জন্মাবে না, বিধাতার এই অভিশাপ।

সুরমা। সে কী কথা?

উদয়। রাজার ঘরে উত্তরাধিকারীই জন্মায়, পুত্র জন্মায় না।

সুরমা। এ তুমি মনের ক্ষোভে বলছ।

উদয়। কথাটা কি নূতন যে ক্ষোভ হবে? যখন এতটুকু ছিলুম তখন থেকে মহারাজ এইটেই দেখছেন যে, আমি তাঁর রাজ্যভার বইবার যোগ্য কি না? কেবলই পরীক্ষা, স্নেহ নেই।

সুরমা। প্রিয়তম, দরকার কী স্নেহের। খুব কঠোর পরীক্ষাতেও তোমার জিত হবে। তোমার মতো রাজার ছেলে কোন্ রাজা পেয়েছে?

উদয়। বল কী? পরীক্ষক তোমার পরামর্শ নিয়ে বিচার করবেন না, সেটা বেশ বুঝতে পারছি।

সুরমা। কারো পরামর্শ নিয়ে বিচার করতে হবে না— আগুনের পরীক্ষাতেও সীতার চুল পোড়ে নি! তুমি রাজ্যভার বহনের উপযুক্ত নও, এ কথা বললেই হল? এত বড়ো অবিচার কি জগতে কখনো টিকতে পারে?

উদয়। রাজ্যভারটা নাই-বা ঘাড়ের উপর পড়ল, তাতেই বা দুঃখ কিসের ?

সুরমা। না, না, ও কথা তোমার মুখে আমার সহ্য হয় না। ভগবান তোমাকে রাজার ছেলে করে পাঠিয়েছেন, সে কথা বুঝি অমন করে উড়িয়ে দিতে আছে! নাহয় দুঃখই পেতে হবে— তা বলে—

উদয়। আমি দুঃখের পরোয়া রাখি নে। তুমি আমার ঘরে এসেছ, তোমাকে সুখী করতে পারি নে, আমার পৌরুষে সেই ধিক্‌কার!

সুরমা। যে সুখ দিয়েছ তাই যেন জন্মজন্মান্তরে পাই।

উদয়। সুখ যদি পেয়ে থাক তো নিজের গুণে, আমার শক্তিতে নয়। এ ঘরে আমার আদর নেই বলে তোমারও যে অপমান ঘটে ; এমন-কি, মাও যে তোমাকে অবজ্ঞা করেন।

সুরমা। আমার সব সম্মান যে তোমার প্রেমে, সে তো কেউ কাড়তে পারে নি।

উদয়। তোমার পিতা শ্রীপুররাজ কিনা যশোরের অধীনতা স্বীকার করেন না— সেই হয়েছে তোমার অপরাধ— মহারাজ তোমার উপর রাগ দেখিয়ে তার শোধ তুলতে চান।

নেপথ্যে। দাদা, দাদা!

উদয়। কেও! বিভা বুঝি ? (দ্বার খুলিয়া) কী বিভা ? কী হয়েছে ?

বিভা। একটা কাণ্ড হয়ে গেছে। আমি আর বাঁচি নে! [মুখ ঢাকিয়া কান্না

সুরমা। (বিভার গলা জড়াইয়া ধরিয়া) কী হয়েছে ভাই, বল্‌!

বিভা। আর-বার যখন উনি এখানে এসেছিলেন, ঠাট্টার সম্পর্ক ধরে ওঁকে কে ঠাট্টা করেছিল।

সুরমা। সে তো জানি, ওই লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়া মাখনটা ওঁর কাপড়ের সঙ্গে একটা লেজ জুড়ে দিয়েছিল— বলেছিল— উনি রামচন্দ্র নন, রামদাস।

বিভা। সে কথা তাঁরা ভুলতে পারেন নি। এবার এসে ঠাট্টায় জিততে পণ করে ওঁর রমাই ভাঁড়কে মেয়ে সাজিয়ে বাড়ির মধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন— মাকে কী-একটা যা-তা বলেছে।

উদয়। সর্বনাশ!

বিভা। আমি তাকে দেখেই চিনতে পেরেছিলুম— মোহন মালকে বলে তখনই তাকে বিদায় করে দিয়েছি। কিন্তু কী জানি যদি কেউ বুঝতে পেরে থাকে!

উদয়। তোমার কি মনে হয় মা টের পেয়েছিলেন ?

বিভা। হতেও পারে মা হয়তো টের পেয়েছেন, কিন্তু অপমানটা পাছে ছড়িয়ে পড়ে, তাই চুপ করে গেলেন।

উদয়। মা কখনো এত বড়ো সর্বনেশে কথাটা বাবাকে বলবেন না।

বিভা। তা বলবেন না, কিন্তু কেমন করে বুঝব আর কেউ জেনেছে কি না।

সুরমা। বিভা, ভয় পাস নে, নিশ্চয় কেউ টের পায় নি। পেলে এতক্ষণ আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠত।

উদয়। ব্যাপার তো কাল হয়ে গেছে?

বিভা। হাঁ।

উদয়। তা হলে আমি বলে দিচ্ছি ফাঁড়া কেটে গেছে। বিচার করতে মহারাজের এক মুহূর্ত বিলম্ব হয় না। খবর পেলে কালকের রাতটা কাটত না। তবু এক কাজ কর্, বিভা তুই এখনই যা। রামচন্দ্রকে বল্, এ বাড়ি থেকে চলে যেতে, যেন কিছুমাত্র বিলম্ব না করেন।

বিভা। তুমি বলো-না দাদা, আমার কথা যদি না শোনেন।

উদয়। না, আমি তাকে যেতে বললে সে অপমান বোধ করবে।

[বিভার প্রস্থান

সুরমা। রাজা হলেই কি মানুষ নিজের খেয়াল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না?

উদয়। সামান্য একটা মেয়েলি ঠাট্টার হার-জিতের কথা এই যশোরের রাজবাড়িতে স্বপ্নেও ভাবতে পারে, এত বড়ো নির্বোধ! এখানেও খেয়ালের রাজত্ব বটে, কিন্তু কত-বড়ো সব খেয়াল—বিধির লিখনকে মুছে ফেলে রক্তের অক্ষরে নতুন লিখন বসিয়ে দেওয়ার খেয়াল।

বসন্তরায়ের প্রবেশ

উদয়। একি, দাদামশায় যে! স্বপ্ন? না মতিভ্রম?

বসন্ত।— গান

আজ তোমারে দেখতে এলেম
অনেক দিনের পরে।
ভয় কিছু নেই, সুখে থাকো,
অধিক ক্ষণ থাকব নাকো—
এসেছি এক নিমেষের তরে।

দেখব শুধু মুখখানি,
শুনব দুটি মধুর বাণী,
আড়াল থেকে হাসি দেখে
চলে যাব দেশান্তরে।

সুরমা। দাদামশায়, কারো মুখে হাসি দেখবার জন্যে তোমাকে কোনোদিন আড়ালে থাকতে হয় নি।

উদয়। তুমি যাই বল, হাসি দেখে দেশান্তরে যেতে ইচ্ছে হয় এমন হাসি আমরা কেউ হাসি নে।

সুরমা। তুমি যে এলে আমরা কোনো খবর জানতুম না।

বসন্ত। দিদি, এ সংসারে প্রত্যক্ষ এসে না পৌছলে, কে আসবে কে না আসবে তার ঠিক খবরটি তো পাওয়া যায় না।

সুরমা। ওটা শঙ্করাচার্যের মতো কথা হল। তোমার ওই হাসিমুখে এমন কথা মানায় না।

বসন্ত। সে কথা মিথ্যে বলিস নি ভাই। সংসার অনিত্য, জীবন অনিশ্চিত, এ-সব কথা ঘোর মিথ্যে। তোদের মুখ যখনই দেখি তখনই সংসার নিত্য, তখনই জীবন চিরদিনের, তা যেদিন মরি আর যেদিন বাঁচি।

সুরমা। যে অমৃত-মুখের কথা বললে সেটিকে তোমার তৃষিত চক্ষু খুঁজে বেড়াচ্ছে, আমি কি বুঝতে পারছি নে?

বসন্ত। ওটা ভাই, মিথ্যে অভিমানের কথা বললি, মহাদেব বুকের মধ্যে রেখেছেন অন্নপূর্ণাকে, আর মাথার উপরে রেখেছেন গঙ্গাকে— কাউকেই তাঁর ছাড়লে একদণ্ড চলে না— তাঁর প্রাণের অন্নজল দুইই সমান চাই।

সুরমা। আর আমার ঠাকরুনদিদি! এখানে এসেই বুঝি ভুললে?

বসন্ত। তিনি তো আমার চাঁদ। বিধাতা আমার কপালে লিখে দিয়েছেন। তাঁকে ভুলেও ভোলবার জো নেই।

সুরমা। তিনি চাঁদের মতোই চুপ করে থাকেন বটে, আমি বোধ হয় গঙ্গার মতোই মুখরা।

বসন্ত। সে কথা অস্বীকার করতে পারি নে। চক্ষু বুজে ওই স্নিগ্ধ কলকণ্ঠ নিয়তই মনে মনে শুনতে পাই।

সুরমা। এত স্তুতিবাক্যও চতুর্মুখ তোমার এক মুখে জোগান কী করে?

বসন্ত। সে আমার এই বাগ্‌বাদিনীর গুণে— বিধিরও নয়, আমারও নয়।

সুরমা। আর নয় দাদামশায়, মিষ্টির পরিমাণটা একলার পক্ষে কিছু বেশি হয়ে উঠেছে।

বিভার দ্রুত প্রবেশ

বসন্ত। বিভা! কী হয়েছে দিদি, তোমার মুখ অমন কেন?

বিভা। মহারাজের কানে গিয়েছে।

উদয়। কী সর্বনাশ! কেমন করে গেল? মা কিছু বলেছেন না কি?

বিভা। না, মা বলেন নি। ওঁরা নিজেই থাকতে পারেন নি। এই নিয়ে আমাদের রাজবাড়ির লোকদের কাছে বড়াই করতে গিয়েছেন— তার থেকেই রাষ্ট্র হয়েছে।

বসন্ত। কী হয়েছে ব্যাপারটা?

উদয়। রামচন্দ্র ছেলেমানুষি করে অন্তঃপুরে তার ভাঁড়কে পাঠিয়েছিল মেয়ে সাজিয়ে। সে কথা মহারাজের কানে উঠেছে, এখন কী হয় কিছুই বলা যায় না।

বসন্ত। আমি একবার প্রতাপের কাছে যাই।

উদয়। এখন কিছু বোলো না— উলটো হবে। আগে দেখি মহারাজ কী হুকুম দেন।

সুরমা। হুকুম যাই দিন, এখনই যশোর ছেড়ে ওঁদের পালানো চাই।

রামমোহন মালের প্রবেশ

রামমোহন। (বিভার প্রতি) তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি মা, ঘরে দেখতে পেলুম না, তাই এখানে এলুম।

বিভা। (সভয়ে) কেন, কেন, কী হয়েছে!

রামমোহন। কিছুই হয় নি। আজ কতকাল পরে মায়ের দেখা পেয়েছি। চার-জোড়া শাঁখা এনেছি তুমি পরো, আমি দেখে যাই।

উদয়। রামমোহন, তোমাদের নৌকো সব তৈরি আছে?

রামমোহন। এখনই কিসের তৈরি যুবরাজ, কতদিন পরে আমাদের আসা, এখন তো শিগগির মাকে ছেড়ে যাচ্ছি নে।

বিভা। মোহন, এখনই নৌকো তৈরি কর্‌ গে— একটুও দেরি করিস নে।

রামমোহন। কেন মা?

বিভা। বিপদ ঘটিয়েছে— তুই তো সব জানিস। ওই-যে ভাঁড় এসেছিল অন্তঃপুরে। সে কথা মহারাজের কানে গিয়েছে।

রামমোহন। বেশ তো, এখনই তার মুণ্ডু নেন না— তার নোংরা মুখটা বন্ধ হলে আমরাও বাঁচি। আমি ধরে এনে দেব তাকে— ভাবনা নেই।

উদয়। রামমোহন, সে কীটটাকে কেউ ছোঁবেও না, তার চেয়ে বড়ো বিপদের ভয় আছে। তোমাদের সব চেয়ে বড়ো যে ছিপ নৌকো তার দাঁড়ি কত?

রামমোহন। চৌষট্টি জন।

উদয়। সেই নৌকোটা আমার এই জানলার সামনের ঘাটে এখনই তৈরি করে আনো। আজ রাত্তিরেই কোনোমতে রওনা করে দিতে হবে।

রামমোহন। দেরি হবে না যুবরাজ, দণ্ড দুয়েকের মধ্যে সব তৈরি করে রেখে দেব। কী করতে হবে বলে দাও।

উদয়। এই জানলা দিয়ে তাঁকে নাবিয়ে দিতে হবে, তার পরে রাতারাতি তোরা দাঁড় টেনে চলে যাবি।

[রামমোহনের প্রস্থান। বিভা বসিয়া পড়িয়া মুখে অঞ্চল দিয়া রোদন

বসন্ত। দিদি, ভয় করিস নে, ভগবানের কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি বেঁচে থাকতে তোর ভয় নেই রে।

বিভা। ভয় না, দাদামশায়, লজ্জা! ছি ছি, কী লজ্জা! রাজার ছেলে হয়ে এমন ব্যবহার তো আমি ভাবতে পারি নে। জন্মের মতো আমার যে মাথা হেঁট হয়ে গেল।

বসন্ত। এখন ও-সব কথা ভাবিস নে, আপাতত—

বিভা। অপরাধ করলে আমি নিজে মহারাজের কাছে মাপ চাইতে যেতুম। কিন্তু এ যে তারও বেশি। এ যে নীচতা। আমার মাপ চাইবার মুখ রইল না।

সুরমা। বিভা, এখন মনটা বিচলিত করিস নে।

বিভা। বউদিদি, যদি মহারাজ শাস্তি দেন, আমার তো কিছুই বলবার থাকবে না। তাঁর সম্মান তাঁর মেয়ে-জামাইয়ের সুখদুঃখের চেয়ে অনেক বড়ো, তাঁর মেয়ে হয়ে এ কথা কি আমি বুঝতে পারি নে?

বসন্ত। এখন রামচন্দ্র আছেন কোথায়?

বিভা। বাইরের বৈঠকখানায় নাচগান জমিয়েছেন— শহর থেকে তিনি সব নাচওআলী আনিয়েছেন, আজ দুদিন ধরে এই-সব চলছে।

বসন্ত। কলি যখন সর্বনাশ করে তখন আমোদ করতে করতেই করে। যেমন করে পার বিভা, তুমি এখনই তাকে ডাকিয়ে আনাও। [বিভার প্রস্থান

নেপথ্যে। উদয়, উদয়!

উদয়। ওই-যে মহারাজ আসছেন। [সুরমার পলায়ন

প্রতাপাদিত্যের প্রবেশ

প্রতাপ। শুনেছ সব কথা ?

উদয়। শুনেছি।

প্রতাপ। লছমন সর্দারকে হুকুম করেছি, কাল সকালে রামচন্দ্র যখন শয়নঘর থেকে বেরিয়ে আসবে, তখন তার মুণ্ডু কাটা যাবে। আজ রাত্রে অন্তঃপুরের পাহারার ভার তোমার উপরে।

উদয়। আমার উপরে মহারাজ ? এ যে আমাকে শাস্তি।

প্রতাপ। শাস্তি আমাকেও নয় ? তা বলে রাজার কর্তব্য করতে হবে না ?

বসন্ত। বাবা প্রতাপ ! (প্রতাপাদিত্য নিরুত্তর) বাবা প্রতাপ, এ ও কি সম্ভব ?

প্রতাপ। কেন সম্ভব নয় ?

বসন্ত। ছেলেমানুষ, সে তো অবজ্ঞার পাত্র, সে কি তোমার ক্রোধের যোগ্য ?

প্রতাপ। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়, এ কথা যে বোকা না'ও বোঝে তারও হাত পোড়ে। দুর্বুদ্ধি যার মাথায় জোগাতে পারে সে বুদ্ধির ফলটা কী হবে সে কি তার মাথায় জোগায় না ? দুঃখ এই, বুদ্ধিটা যখন মাথায় জোগাবে মাথাটা তখন দেহে থাকবে না।

বসন্ত। অপরাধ যে করে সে দুর্বল, ক্ষমা যে করে শক্তি তারই, এ কথা ভুলো না।

প্রতাপ। দেখো পিতৃব্য ঠাকুর, রায়বংশের কিসে মান-অপমান সে বোধ যদি তোমার থাকবে তা হলে পাকা মাথায় আজ মোগল-বাদশার শিরোপা জড়িয়ে বেড়াতে পারতে কি ? তোমারও লাঞ্ছিত মাথার স্থান এই ধুলায়, আমারই দুর্ভাগ্য তোমাকে বাঁচিয়ে দিলে। এই তোমাকে স্পষ্ট বললুম। খুড়োমশায়, এখন আমার নিদ্রার সময়।

বসন্ত। বুঝেছি প্রতাপ, একবার যে ছুরি তোমার খাপ থেকে বেরোয় রক্ত না নিয়ে সে ফিরবে না। তা নিক, যে তার প্রথম লক্ষ্য ছিল এখনো তো সামনেই আছে। প্রতাপ, একবার বিভার কথা ভেবে দেখো।

প্রতাপ। আচ্ছা, তবে ডাকো বিভাকে।

বিভার প্রবেশ

ওই-যে এসেছে। বিভা !

বিভা। মহারাজ !

প্রতাপ। সকল কথা শুনেছ বিভা ?

বিভা। হাঁ।

প্রতাপ। তোমার মাকে, আমাদের অন্তঃপুরকে কী রকম অপমান করেছে, তা তো জান?

বিভা। জানি।

প্রতাপ। আমি যদি তার প্রাণদণ্ড দিই তবে সেটা অন্যায় হবে কি?

বিভা। না।

বসন্ত। দিদি, কী বললি দিদি! মহারাজের পায়ে ধরে মাপ চেয়ে নে।

[বিভা নিরুত্তর

প্রতাপ। খুড়ামহারাজ, মনে রেখো বিভা আমারই মেয়ে।

উদয়। মহারাজ, আপনি দণ্ডদাতা, আপনিই শাস্তি দিন। কিন্তু এ শাস্তির দণ্ডভার আমাদের উপরে দেবেন না।

প্রতাপ। কী বলতে চাও তুমি?

উদয়। পাহারা দেবার লোক মহারাজের অনেক আছে, তাদের স্নেহ নেই, এই-জন্যে তাদের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়েই কর্তব্যপালন করবে। আমার উপরে পাহারা দেবার ভার দেবেন না।

প্রতাপ। লোক থাকবে আমার, কিন্তু দায় থাকবে তোমার।

উদয়। আমি আমার স্নেহকে অতিক্রম করতে পারব না।

প্রতাপ। না পার তো তারও জবাবদিহি আছে। [প্রস্থান

উদয়। কোথায় ফাঁক আছে, একবার দেখে আসি।

বসন্ত। কিন্তু, দাদা, তুমি এতে হাত যদি দাও তা হলে—

উদয়। তা হলে যা হবে সেটা তো এখনকার কথা নয়—এখনকার কথা হচ্ছে হাত দেওয়াই চাই।

চতুর্থ দৃশ্য

নৃত্যসভা

রামচন্দ্র। নটনটীর দল

রামমোহনের প্রবেশ

রামমোহন। একবার উঠে আসুন।

রামচন্দ্র। এখন না, যাঃ, বিরক্ত করিস নে। গান ছেড়ো না।

রামমোহন। শুনতেই হবে।

রামচন্দ্র। কাল সকালে শুনব। দেখ্, বিরক্ত করিস নে।

রামমোহন। যুবরাজ ডাকছেন, জরুরি কাজ আছে।

রামচন্দ্র। বুঝেছি, শালা বুঝি ঠাট্টার জবাব দিতে চায়! পারবে না আমার সঙ্গে।

রামমোহন। ঠাট্টা শেষ হয়ে গেছে, এখন বিপদের পালা। শীঘ্র এসো।

রামচন্দ্র। আর ভয় দেখাতে হবে না, এখন আমার সময় নেই।

রামমোহন। এ দিকেও সময় একটুও নেই। আচ্ছা, এই দিকে আসুন, বলছি। (রামচন্দ্রকে জনান্তিকে) প্রতাপাদিত্য মহারাজ সব কথা শুনেছেন।

রামচন্দ্র। না শুনলে মজাটা কী।

রামমোহন। কী বলেন মহারাজ, মজা! তিনি আপনার শ্বশুর, আপনার ঠাট্টার সম্পর্ক তো নন।

রামচন্দ্র। আমার ঠাট্টা চলছে শালাদের নিয়ে। তিনি সেটা যদি গায়ে মাখেন সেটা কি আমার দোষ?

রামমোহন। সে বিচার এখন নয়। আপাতত প্রাণদণ্ডের হুকুম হয়েছে, কাল সকালেই—

রামচন্দ্র। তুমি শুনলে কোথা থেকে?

রামমোহন। যুবরাজের নিজের মুখ থেকে।

রামচন্দ্র। তোর মতো বোকা দুনিয়ায় নেই রে। যুবরাজ ঠাট্টা করেছে বুঝতে পারিস নে! প্রাণদণ্ড!

রামমোহন। দোহাই তোমার, একটুও ঠাট্টা নয়।

রামচন্দ্র। আমাকে ঠাট্টায় ওরা হারাতে পারবে না। তুই এখন যা।

রামমোহন। আচ্ছা, আমি যুবরাজকে ডেকে আনছি। [প্রস্থান

রামচন্দ্র। (নটীদের প্রতি) ধরো গান।—

নটীদের নাচ ও গান

আমার নয়ন তোমার নয়নতলে
মনের কথা খোঁজে।
সেথায় কালো ছায়ার মায়ার ঘোরে
পথ হারালো ও যে।
নীরব দিঠে শুধায় যত
পায় না সাড়া মনের মতো,

অবুঝ হয়ে রয় সে চেয়ে
অশ্রুধারায় মজে।
তুমি আমার কথার আভাখানি
পেয়েছ কি মনে।
এই-যে আমি মালা আনি
তার বাণী কেউ শোনে?
পথ দিয়ে যাই, যেতে যেতে
হাওয়ায় ব্যথা দিই যে পেতে;
বাঁশি বিছায় বিষাদ-ছায়া
তার ভাষা কেউ বোঝে?

রামচন্দ্র। বেটা রামমোহন আমার মনটা মিছিমিছি খারাপ করে দিয়ে গেল। এ কেমন গোঁয়ার-গোছের ঠাট্টা এ বাড়ির? শ্যালাদের রসের জ্ঞান একটুও নেই। থেমো না, আর একটা গান ধরো। একটু দ্রুততালে।

নটীদের গান

না ব'লে যেয়ো না চলে মিনতি করি
গোপনে জীবন মন লইয়া হরি।
সারা নিশি জেগে থাকি
ঘুমে ঢ'লে পড়ে আঁখি,
ঘুমালে হারাই পাছে সে ভয়ে মরি।
চকিতে চমকি বঁধু তোমারে খুঁজি,
থেকে থেকে মনে হয় স্বপন বুঝি।
নিশিদিন চাহে হিয়া
পরান পসারি দিয়া
অধীর চরণ তব বাঁধিয়া ধরি।

(রামচন্দ্র মাঝে মাঝে বাহবা দিতেছেন, মাঝে মাঝে উৎকণ্ঠিতভাবে দ্বারের দিকে চাহিতেছেন।)

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

উদয়। উঠে এসো শীঘ্র।

রামচন্দ্র। একেবারে জোর তলব যে।

উদয়। দেরি কোরো না, এসো শিগগির।

রামচন্দ্র। বোনের পেয়াদা হয়ে এসেছ বুঝি, তলব দিতে?

উদয়। আমার কর্তব্য আমি করলুম। যদি না শোন তো থাকো। বিধাতা যাকে মারেন, তাকে কেউ বাঁচাতে পারে না। [প্রস্থান

রামচন্দ্র। আওয়াজটা ঠাট্টার মতো শোনাচ্ছে না। একবার দেখেই আসি গে। (নটীদের প্রতি) তোমরা গান থামিয়ো না— এখনো রাত আছে বাকি। আমি এখনই আসছি। [প্রস্থান

নটীদের গান

ফুল তুলিতে ভুল করেছি
প্রেমের সাধনে।
বঁধু তোমায় বাঁধব কিসে
মধুর বাঁধনে।
ভোলাব না মায়ার ছলে,
রইব তোমার চরণতলে,
মোহের ছায়া ফেলব না মোর
হাসি-কাঁদনে।
রইল শুধু বেদন-ভরা আশা,
রইল শুধু প্রাণের নীরব ভাষা।
নিরাভরণ যদি থাকি
চোখের কোণে চাইবে না কি,
যদি আঁখি নাই বা ভোলাই
রঙের ধাঁদনে।

প্রথমা নটী। কই, এখনো তো ফিরলেন না।

দ্বিতীয়া নটী। আর তো ভাই পারি নে। ঘুম পেয়ে আসছে।

তৃতীয়া নটী। ফের কি সভা জমবে নাকি!

প্রথমা নটী। কেউ যে জেগে আছে তা তো বোধ হচ্ছে না। এতবড়ো রাজবাড়ি সমস্ত যেন হাঁ হাঁ করছে।

দ্বিতীয়া নটী। চাকররাও সব হঠাৎ কে কোথায় যেন চলে গেল।

তৃতীয়া নটী। বাতিগুলো নিবে আসছে, কেউ জ্বালিয়ে দেবে না?

প্রথমা নটী। আমার কেমন ভয় করছে ভাই।

দ্বিতীয়া নটী। (বাদকদিগকে দেখাইয়া দিয়া) ওরাও যে সব ঘুমোতে লাগল— কী মুশকিলেই পড়া গেল। ওদের তুলে দে-না। কেমন গা ছম্ ছম্ করছে।

তৃতীয়া নটী। মিছে না ভাই। একটা গান ধরো। ওগো, তোমরা ওঠো, ওঠো।

বাদকগণ। (ধড়্‌ফড়্‌ করিয়া উঠিয়া) আঁ্যা আঁ্যা, এসেছেন নাকি ?

প্রথমা নটী। তোমরা একবার বেরিয়ে গিয়ে দেখো না গো। কেউ কোথাও নেই। আমাদের আজকে বিদায় দেবে না নাকি ?

একজন বাদক। (বাহিরে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া) ও দিকে যে সব বন্ধ।

প্রথমা নটী। আঁ্যা ! বন্ধ ! আমাদের কি কয়েদ করলে নাকি ?

দ্বিতীয়া নটী। দূর। কয়েদ করতে যাবে কেন ?

প্রথমা নটী। ভালো লাগছে না। কী হল বুঝতে পারছি নে। চলো ভাই, আর এখানে নয়। একটা কী কাণ্ড হচ্ছে। [প্রস্থান

রাজমহিষীর প্রবেশ

রাজমহিষী। কই এদের মহলেও তো মোহনকে দেখতে পাচ্ছি নে। কী হল বুঝতে পারছি নে। বামী !

বামীর প্রবেশ

এ দিককার খাওয়াদাওয়া তো সব শেষ হল, মোহনকে খুঁজে পাচ্ছি নে কেন।

বামী। মা, তুমি অত ভাবছ কেন। তুমি শুতে যাও, রাত যে পুইয়ে এল, তোমার শরীরে সইবে কেন।

রাজমহিষী। সে কি হয়। আমি যে তাকে নিজে বসিয়ে খাওয়াব বলে রেখেছি।

বামী। নিশ্চয় রাজকুমারী তাকে খাইয়েছেন। তুমি চলো, শুতে চলো।

রাজমহিষী। আমি ওই মহলে খোঁজ করতে যাচ্ছিলুম, দেখি সব দরজা বন্ধ— এর মানে কী, কিছুই বুঝতে পারছি নে।

বামী। বাড়িতে গোলমাল দেখে রাজকুমারী তাঁর মহলে দরজা বন্ধ করেছেন। অনেক দিন পরে জামাই এসেছেন, আজ লোকজনের ভিড় সইবে কেন। চলো, তুমি শুতে চলো।

রাজমহিষী। কী জানি বামী, আজ ভালো লাগছে না। প্রহরীদের ডাকতে বললুম, তাদের কারো কোনো সাড়াই পাওয়া গেল না।

বামী। যাত্রা হচ্ছে, তারা তাই আমোদ করতে গেছে।

রাজমহিষী। মহারাজ জানতে পারলে যে তাদের আমোদ বেরিয়ে যাবে। উদয়ের মহলও যে বন্ধ, তারা ঘুমিয়েছে বুঝি!

বামী। ঘুমোবেন না! বল কী। রাত কি কম হয়েছে।

রাজমহিষী। গান-বাজনা ছিল, জামাইকে নিয়ে একটু আমোদ-আহ্লাদ করবে না? ওরা মনে কি ভাববে বলো তো। এ-সমস্তই ওই বউমার কাণ্ড। একটু বিবেচনা নেই। রোজই তো ঘুমোচ্ছে— একটা দিন কি আর—

বামী। যাক্, সে-সব কথা কাল হবে— আজ চলো।

রাজমহিষী। মঙ্গলার সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে তো?

বামী। হয়েছে বই-কি।

রাজমহিষী। ওষুধের কথা বলেছিস?

বামী। সে-সব ঠিক হয়ে গেছে। [উভয়ের প্রস্থান

প্রতাপাদিত্য প্রহরী পীতাম্বর ও অনুচরের প্রবেশ

প্রতাপ। কত রাত আছে?

পীতাম্বর। এখনো চার দণ্ড রাত আছে।

প্রতাপ। কী যেন একটা গোলমাল শুনলুম।

পীতাম্বর। আজ্ঞে হাঁ, তাই শুনেই আমি আসছি।

প্রতাপ। কী হয়েছে?

পীতাম্বর। আসবার সময় দেখলুম বাইরের প্রহরীরা দ্বারে নেই।

প্রতাপ। অন্তঃপুরের প্রহরীরা?

পীতাম্বর। হাত-পা-বাঁধা পড়ে আছে।

প্রতাপ। তারা কী বললে?

পীতাম্বর। আমার কথার কোনো জবাব দিলে না— হয়তো অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

প্রতাপ। রামচন্দ্র রায় কোথায়? উদয়াদিত্য বসন্তরায় কোথায়?

পীতাম্বর। বোধ করি তাঁরা অন্তঃপুরেই আছেন।

প্রতাপ। বোধ করি! তোমার বোধ-করার কথা কে জিজ্ঞাসা করছে। মন্ত্রীকে ডাকো। [পীতাম্বরের প্রস্থান

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। মহারাজ, রাজজামাতা—

প্রতাপ। রামচন্দ্ররায়—

মন্ত্রী। হাঁ, তিনি রাজপুরী পরিত্যাগ করে গেছেন।

প্রতাপ। পরিত্যাগ করে গেছেন, প্রহরীরা গেল কোথা?

মন্ত্রী। বহির্দ্বারের প্রহরীরা পালিয়ে গেছে।

প্রতাপ। (মুষ্টি বদ্ধ করিয়া) পালিয়ে গেছে? পালাবে কোথায়? যেখানে থাকে তাদের খুঁজে আনতে হবে। অন্তঃপুরের পাহারায় কে কে ছিল?

মন্ত্রী। সীতারাম আর ভাগবত।

প্রতাপ। ভাগবত ছিল? সে তো হুঁশিয়ার; সেও কি উদয়ের সঙ্গে যোগ দিলে?

মন্ত্রী। সে হাত-পা-বাঁধা পড়ে আছে।

প্রতাপ। হাত-পা-বাঁধা আমি বিশ্বাস করি নে। হাত-পা ইচ্ছে করে বাঁধিয়েছে। আচ্ছা, সীতারামকে নিয়ে এসো, সেই গর্দভের কাছ থেকে কথা বের করা শক্ত হবে না।

মন্ত্রীর প্রস্থান ও সীতারামকে লইয়া পুনঃপ্রবেশ

প্রতাপ। অন্তঃপুরের দ্বার খোলা হল কী করে।

সীতারাম। (করজোড়ে) দোহাই মহারাজ, আমার কোনো দোষ নেই।

প্রতাপ। সে কথা তোকে কে জিজ্ঞাসা করছে।

সীতারাম। আজ্ঞা না, মহারাজ— যুবরাজ— যুবরাজ আমাকে বলপূর্বক বেঁধে—

ব্যস্তভাবে বসন্তরায়ের প্রবেশ

সীতারাম। যুবরাজকে নিষেধ করলুম, তিনি—

বসন্ত। হাঁ হাঁ সীতারাম, কী বললি? অধর্ম করিস নে সীতারাম, উদয়াদিত্যের এতে কোনো দোষ নেই।

সীতারাম। আজ্ঞা না, যুবরাজের কোনো দোষ নেই।

প্রতাপ। তবে তোর দোষ!

সীতারাম। আজ্ঞে না।

প্রতাপ। তবে কার দোষ?

সীতারাম। আজ্ঞা যুবরাজ—

প্রতাপ। তাঁর সঙ্গে আর কে ছিল?

সীতারাম। আজ্ঞে, বউরানীমা—

প্রতাপ। বউরানী? ওই সেই শ্রীপুরের— (বসন্তরায়ের দিকে চাহিয়া) উদয়াদিত্যের এ অপরাধের মার্জনা নেই।

বসন্ত। বাবা প্রতাপ, এতে উদয়ের কোনো দোষ ছিল না।

প্রতাপ। দোষ ছিল না! দেখো, তুমি তার পক্ষ নিয়ে যদি কথা কও তাতে তার ভালো হবে না— এই আমি বলে দিলুম।

[বসন্তরায় কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মাধবপুরের পথ

ধনঞ্জয় ও প্রজাদল

ধনঞ্জয়। একেবারে সব মুখ চুন করে আছিস কেন? মেরেছে, বেশ করেছে। এতদিন আমার কাছে আছিস বেটারা, এখনো ভালো করে মার খেতে শিখলি নে? হাড়গোড় সব ভেঙে গেছে নাকি রে?

প্রথম। রাজার কাছারিতে ধরে মারলে সে বড়ো অপমান!

ধনঞ্জয়। আমার চেলা হয়েও তোদের মানসম্ভ্রম আছে? এখনো সবাই তোদের গায়ে ধুলো দেয় না রে? তবে এখনো তোরা ধরা পড়িস নি? তবে এখনো আরো অনেক বাকি আছে!

দ্বিতীয়। বাকি আর রইল কী ঠাকুর। এ দিকে পেটের জ্বালায় মরছি, ও দিকে পিঠের জ্বালাও ধরিয়ে দিলে।

ধনঞ্জয়। বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে— একবার খুব করে নেচে নে।

গান

আরো প্রভু, আরো আরো!
এমনি করে আমায় মারো।

লুকিয়ে থাকি আমি পালিয়ে বেড়াই—
ধরা পড়ে গেছি, আর কি এড়াই ?
যা-কিছু আছে সব কাড়ো কাড়ো।
এবার যা করবার তা সারো সারো।
আমি হারি কিম্বা তুমিই হারো।
হাটে ঘাটে বাটে করি মেলা,
কেবল হেসে খেলে গেছে বেলা—
দেখি কেমনে কাঁদাতে পার।

দ্বিতীয়। আচ্ছা ঠাকুর, তুমি কোথায় চলেছ বলো দেখি ?

ধনঞ্জয়। যশোর যাচ্ছি রে।

তৃতীয়। কী সর্বনাশ। সেখানে কী করতে যাচ্ছ।

ধনঞ্জয়। একবার রাজাকে দেখে আসি। চিরকাল কি তোদের সঙ্গেই কাটাব ? এবার রাজ-দরবারে নাম রেখে আসব।

চতুর্থ। তোমার উপরে রাজার যে ভারি রাগ। তার কাছে গেলে কি তোমার রক্ষা আছে।

পঞ্চম। জান তো, যুবরাজ তোমাকে শাসন করতে চায় নি বলে তাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

ধনঞ্জয়। তোরা যে মার সইতে পারিস নে। সেইজন্যে, তোদের মারগুলো সব নিজের পিঠে নেবার জন্যে স্বয়ং রাজার কাছে চলেছি। পেয়াদা নয় রে পেয়াদা নয়— যেখানে স্বয়ং মারের বাবা বসে আছে সেইখানে ছুটেছি।

প্রথম। না না, সে হবে না ঠাকুর, সে হবে না।

ধনঞ্জয়। খুব হবে— পেট ভরে হবে, আনন্দে হবে।

প্রথম। তবে আমরাও তোমার সঙ্গে যাব।

ধনঞ্জয়। পেয়াদার হাতে আশ মেটে নি বুঝি ?

দ্বিতীয়। না ঠাকুর, সেখানে একলা যেতে পারছ না, আমরাও সঙ্গে যাব।

ধনঞ্জয়। আচ্ছা, যেতে চাস তো চল। একবার শহরটা দেখে আসবি।

তৃতীয়। কিছু হাতিয়ার সঙ্গে নিতে হবে।

ধনঞ্জয়। কেন রে ? হাতিয়ার নিয়ে কী করবি ?

তৃতীয়। যদি তোমার গায়ে হাত দেয় তা হলে—

ধনঞ্জয়। তা হলে তোরা দেখিয়ে দিবি হাত দিয়ে না মেরে কী করে হাতিয়ার দিয়ে মারতে হয়। কী আমার উপকারটা করতেই যাচ্ছ! তোদের যদি এইরকম বুদ্ধি হয়, তবে এইখানেই থাক্।

চতুর্থ। না না, তুমি যা বলবে তাই করব, কিন্তু আমরা তোমার সঙ্গে থাকব।

তৃতীয়। আমরাও রাজার কাছে দরবার করব।

ধনঞ্জয়। কী চাইবি রে?

তৃতীয়। আমরা যুবরাজকে চাইব।

ধনঞ্জয়। বেশ, বেশ, অর্ধেক রাজত্ব চাইবি নে?

তৃতীয়। ঠাট্টা করছ ঠাকুর!

ধনঞ্জয়। ঠাট্টা কেন করব। সব রাজত্বটাই কি রাজার। অর্ধেক রাজত্ব প্রজার নয় তো কী। চাইতে দোষ নেই রে। চেয়ে দেখিস।

চতুর্থ। যখন তাড়া দেবে?

ধনঞ্জয়। তখন আবার চাইব। তুই কি ভাবিস রাজা একলা শোনে। আরো একজন শোনবার লোক দরবারে বসে থাকেন— শুনতে শুনতে তিনি একদিন মঞ্জুর করেন, তখন রাজার তাড়াতে কিছুই ক্ষতি হয় না।

গান

আমরা বসব তোমার সনে।
তোমার শরিক হব রাজার রাজা
তোমার আধেক সিংহাসনে।
তোমার দ্বারী মোদের করেছে শির নত,
তারা জানে না যে মোদের গরব কত,
তাই বাহির হতে তোমায় ডাকি
তুমি ডেকে লও গো আপন জনে।

প্রথম। বাবাঠাকুর, রাজার কাছে যাচ্ছ, কিন্তু তিনি তোমাকে সহজে ছাড়বেন না।

ধনঞ্জয়। ছাড়বেন কেন বাপ-সকল। আদর করে ধরে রাখবেন।

প্রথম। সে আদরের ধরা নয়।

ধনঞ্জয়। ধরে রাখতে কষ্ট আছে বাপ— পাহারা দিতে হয়— যে-সে লোককে কি রাজা এত আদর করে? রাজবাড়িতে কত লোক যায়, দরজা থেকেই ফেরে— আমাকে ফেরাবে না।

গান

আমাকে যে বাঁধবে ধ'রে এই হবে যার সাধন,
সে কি অমনি হবে।
আপনাকে সে বাঁধা দিয়ে আমায় দেবে বাঁধন,
সে কি অমনি হবে।
আমাকে যে দুঃখ দিয়ে আনবে আপন বশে,
সে কি অমনি হবে।
তার আগে তার পাষাণ-হিয়া গলবে করুণরসে,
সে কি অমনি হবে।
আমাকে যে কাঁদাবে তার ভাগ্যে আছে কাঁদন,
সে কি অমনি হবে।

দ্বিতীয়। বাবাঠাকুর, তোমার গায়ে যদি রাজা হাত দেন, তা হলে কিন্তু আমরা সইতে পারব না।

ধনঞ্জয়। আমার এই গা যাঁর তিনি যদি সইতে পারেন বাবা, তবে তোমাদেরও সইবে। যেদিন থেকে জন্মেছি আমার এই গায়ে তিনি কত দুঃখই সইলেন— কত মার খেলেন, কত ধুলো মাখলেন— হায় হায়—

গান

কে বলেছে তোমায় বঁধু, এত দুঃখ সইতে।
আপনি কেন এলে বঁধু, আমার বোঝা বইতে।
প্রাণের বন্ধু, বুকের বন্ধু,
সুখের বন্ধু, দুখের বন্ধু,
তোমায় দেব না দুখ, পাব না দুখ,
হেরব তোমার প্রসন্ন মুখ,
আমি সুখে দুঃখে পারব বন্ধু চিরানন্দে রইতে—
তোমার সঙ্গে বিনা কথায় মনের কথা কইতে।

তৃতীয়। বাবা, আমরা রাজাকে গিয়ে কী বলব।

ধনঞ্জয়। বলব, আমরা খাজনা দেব না।

তৃতীয়। যদি শুধোয়, কেন দিবি নে?

ধনঞ্জয়। বলব, ঘরের ছেলেমেয়েকে কাঁদিয়ে যদি তোমাকে টাকা দিই তা হলে আমাদের ঠাকুর কষ্ট পাবে। যে অন্নে প্রাণ বাঁচে সেই অন্নে ঠাকুরের ভোগ হয়; তিনি যে প্রাণের ঠাকুর। তার বেশি যখন ঘরে থাকে তখন তোমাকে দিই— কিন্তু ঠাকুরকে ফাঁকি দিয়ে তোমাকে খাজনা দিতে পারব না।

চতুর্থ। বাবা, এ কথা রাজা শুনবে না।

ধনঞ্জয়। তবু শোনাতে হবে। রাজা হয়েছে ব'লেই কি সে এমন হতভাগা যে ভগবান তাকে সত্য কথা শুনতে দেবেন না? ওরে, জোর করে শুনিয়ে আসব।

পঞ্চম। ও ঠাকুর, তাঁর জোর যে আমাদের চেয়ে বেশি— তাঁরই জিত হবে।

ধনঞ্জয়। দূর বাঁদর, এই বুঝি তোদের বুদ্ধি! যে হারে তার বুঝি জোর নেই! তার জোর যে একেবারে বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছয় তা জানিস!

ষষ্ঠ। কিন্তু ঠাকুর, আমরা দূরে ছিলুম, লুকিয়ে বাঁচতুম— একেবারে রাজার দরজায় গিয়ে পড়ব, শেষে দায়ে ঠেকলে আর পালাবার পথ থাকবে না।

ধনঞ্জয়। দেখ্ পাঁচকড়ি, অমন চাপাচুপি দিয়ে রাখলে ভালো হয় না। যতদূর পর্যন্ত হবার তা হতে দে, নইলে কিছুই শেষ হতে চায় না। যখন চূড়ান্ত হয় তখনই শান্তি হয়।

সপ্তম। তোরা অত ভয় করছিস কেন? বাবা যখন আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন উনি আমাদের বাঁচিয়ে আনবেন।

ধনঞ্জয়। তোদের এই বাবা যার ভরসায় চলেছে তার নাম কর্। বেটারা, কেবল তোরা বাঁচতেই চাস— পণ করে বসেছিস যে মরবি নে। কেন, মরতে দোষ কী হয়েছে। যিনি মারেন তাঁর গুণগান করবি নে বুঝি। তোরা একটু দাঁড়া, চারি দিকের ভাব-গতিকটা একটু বুঝে নিয়ে আসি। [প্রস্থান

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

উদয়। ওরে, মরতে এসেছিস এখানে? মহারাজ খবর পেলে রক্ষা রাখবেন না। পালা পালা।

প্রথম। আমাদের মরণ সর্বত্রই। পালাব কোথায়?

দ্বিতীয়। তা, মরতে যদি হয় তোমার সামনে দাঁড়িয়ে মরব।

উদয়। তোদের কী চাই বল্ দেখি।

অনেকে। আমরা তোমাকে চাই।

উদয়। আমাকে নিয়ে তোদের কোনো লাভ হবে না রে— দুঃখই পাবি।

তৃতীয়। আমাদের দুঃখই ভালো, কিন্তু তোমাকে আমরা নিয়ে যাব।

চতুর্থ। আমাদের মাধবপুরে ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত কাঁদছে, সে কি কেবল ভাত না পেয়ে। তা নয়। তুমি চলে এসেছ ব'লে। তোমাকে আমরা ধরে নিয়ে যাব।

উদয়। আরে চুপ কর্, চুপ কর্। ও কথা বলিস নে।

পঞ্চম। রাজা তোমাকে ছাড়বে না। আমরা তোমাকে জোর করে নিয়ে যাব। আমরা রাজাকে মানি নে— আমরা তোমাকে রাজা করব।

প্রতাপাদিত্যের প্রবেশ

প্রতাপ। কাকে মানিস নে রে। তোরা কাকে রাজা করবি।

প্রজাগণ। মহারাজ, পেন্নাম হই।

প্রথম। আমরা তোমার কাছে দরবার করতে এসেছি।

প্রতাপ। কিসের দরবার ?

প্রথম। আমরা যুবরাজকে চাই।

প্রতাপ। বলিস কী রে।

সকলে। হাঁ মহারাজ, আমরা যুবরাজকে মাধবপুরে নিয়ে যাব।

প্রতাপ। আর ফাঁকি দিবি! খাজনা দেবার নামটি করবি নে!

সকলে। অন্ন বিনে মরছি যে।

প্রতাপ। মরতে তো সকলকেই হবে। বেটারা, রাজার দেনা বাকি রেখে মরবি ?

প্রথম। আচ্ছা, আমরা না খেয়েই খাজনা দেব, কিন্তু যুবরাজকে আমাদের দাও। মরি তো ওঁরই হাতে মরব।

প্রতাপ। সে বড়ো দেরি নেই। তোদের সর্দার কোথায় রে ?

দ্বিতীয়। (প্রথমকে দেখাইয়া) এই-যে আমাদের গণেশ সর্দার।

প্রতাপ। ও নয়— সেই বৈরাগীটা।

প্রথম। আমাদের ঠাকুর! তিনি তো পুজোয় বসেছেন। এখনই আসবেন। ওই-যে এসেছেন।

ধনঞ্জয় বৈরাগীর প্রবেশ

ধনঞ্জয়। দয়া যখন হয় তখন সাধনা না করেই পাওয়া যায়। ভয় ছিল, কাঙালদের দরজা থেকেই ফিরতে হয় বা। প্রভুর কৃপা হল, রাজাকে অমনি দেখতে

পেলুম। (উদয়াদিত্যের প্রতি) আর, এই আমাদের হৃদয়ের রাজা। ওকে রাজা বলতে যাই, বন্ধু বলে ফেলি।

উদয়। ধনঞ্জয়!

ধনঞ্জয়। কী রাজা। কী ভাই।

উদয়। এখানে কেন এলে।

ধনঞ্জয়। তোমাকে না দেখে থাকতে পারি নে যে।

উদয়। মহারাজ রাগ করছেন।

ধনঞ্জয়। রাগই সই। আগুন জ্বলছে তবু পতঙ্গ মরতে যায়।

প্রতাপ। তুমি এই-সমস্ত প্রজাদের খেপিয়েছ?

ধনঞ্জয়। খেপাই বই-কি। নিজে খেপি, ওদেরও খেপাই, এই তো আমাদের কাজ।

গান

আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায়
কোন্ খেপা সে।
ওরে আকাশ জুড়ে মোহন সুরে
কী যে বাজে কোন্ বাতাসে।

ওরে খেপার দল, গান ধর্ রে— হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? রাজাকে পেয়েছিস, আনন্দ করে নে। রাজা আমাদের মাধবপুরের নৃত্যটা দেখে নিক্।

সকলে মিলিয়া নৃত্যগীত

গেল রে গেল বেলা, পাগলের কেমন খেলা—
ডেকে সে আকুল করে, দেয় না ধরা।
তারে কানন গিরি খুঁজে ফিরি
কেঁদে মরি কোন্ হুতাশে।

(প্রতাপাদিত্যের মুখের দিকে চাহিয়া) আহা, আহা, রাজা আমার, অমন নিষ্ঠুর সেজে এ কী লীলা হচ্ছে। ধরা দেবে না বলে পণ করেছিলে, আমরা ধরব বলে কোমর বেঁধে বেরিয়েছি।

প্রতাপ। দেখো বৈরাগী, তুমি অমন পাগলামি করে আমাকে ভোলাতে পারবে না। এখন কাজের কথা হোক। মাধবপুরের প্রায় দু বছরের খাজনা বাকি— দেবে কি না বলো।

ধনঞ্জয়। না মহারাজ, দেব না।

প্রতাপ। দেবে না! এতবড়ো আস্পর্ধা।

ধনঞ্জয়। যা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পারব না।

প্রতাপ। আমার নয়!

ধনঞ্জয়। আমাদের ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়। যিনি আমাদের প্রাণ দিয়েছেন এ অন্ন যে তাঁর, এ আমি তোমাকে দিই কী বলে।

প্রতাপ। তুমিই প্রজাদের বারণ করেছ খাজনা দিতে?

ধনঞ্জয়। হাঁ মহারাজ, আমিই তো বারণ করেছি। ওরা মূর্খ, ওরা তো বোঝে না— পেয়াদার ভয়ে সমস্তই দিয়ে ফেলতে চায়। আমিই বলি, আরে আরে এমন কাজ করতে নেই— প্রাণ দিবি তাঁকে প্রাণ দিয়েছেন যিনি— তোদের রাজাকে প্রাণহত্যার অপরাধী করিস নে।

প্রতাপ। দেখো ধনঞ্জয়, তোমার কপালে দুঃখ আছে।

ধনঞ্জয়। যে দুঃখ কপালে ছিল তাকে আমার বুকের উপর বসিয়েছি মহারাজ, সেই দুঃখই তো আমাকে ভুলে থাকতে দেয় না। যেখানে ব্যথা সেইখানেই হাত পড়ে— ব্যথা আমার বেঁচে থাক্‌।

প্রতাপ। দেখো বৈরাগী, তোমার চাল নেই, চুলো নেই— কিন্তু এরা সব গৃহস্থ মানুষ, এদের কেন বিপদে ফেলতে চাচ্ছ। (প্রজাদের প্রতি) দেখ্‌, বেটারা, আমি বলছি, তোরা সব মাধবপুরে ফিরে যা।— বৈরাগী, তুমি এইখানেই রইলে।

প্রজাগণ। আমাদের প্রাণ থাকতে সে তো হবে না।

ধনঞ্জয়। কেন হবে না রে। তোদের বুদ্ধি এখনো হল না। রাজা বললে 'বৈরাগী তুমি রইলে,' তোরা বললি 'না তা হবে না'— আর বৈরাগী লক্ষ্মীছাড়াটা কি ভেসে এসেছে? তার থাকা না-থাকা কেবল রাজা আর তোরা ঠিক করে দিবি?

গান

রইল ব'লে রাখলে কারে,
হুকুম তোমার ফলবে কবে?
তোমার টানাটানি টিকবে না ভাই,
রবার যেটা সেটাই রবে।
যা খুশি তাই করতে পারো,
গায়ের জোরে রাখো মারো—
যাঁর গায়ে সব ব্যথা বাজে
তিনি যা সন সেটাই সবে।

অনেক তোমার টাকা কড়ি,
অনেক দড়া অনেক দড়ি,
অনেক অশ্ব অনেক করী,
অনেক তোমার আছে ভবে।
ভাবছ হবে তুমিই যা চাও,
জগৎটাকে তুমিই নাচাও—
দেখবে হঠাৎ নয়ন খুলে
হয় না যেটা সেটাও হবে।

মন্ত্রীর প্রবেশ

প্রতাপ। তুমি ঠিক সময়েই এসেছ। এই বৈরাগীকে এইখানেই ধরে রেখে দাও। ওকে মাধবপুরে যেতে দেওয়া হবে না।

মন্ত্রী। মহারাজ—

প্রতাপ। কী। হুকুমটা তোমার মনের মতো হচ্ছে না বুঝি।

উদয়। মহারাজ, বৈরাগীঠাকুর সাধুপুরুষ।

প্রজারা। মহারাজ, এ আমাদের সহ্য হবে না। মহারাজ, অকল্যাণ হবে।

ধনঞ্জয়। আমি বলছি, তোরা ফিরে যা। হুকুম হয়েছে আমি দুদিন রাজার কাছে থাকব, বেটাদের সেটা সহ্য হল না।

প্রজারা। আমরা এইজন্যেই কি দরবার করতে এসেছিলুম? আমরা যুবরাজকেও পাব না, তোমাকেও হারাব?

ধনঞ্জয়। দেখ্, তোদের কথা শুনলে আমার গা জ্বালা করে। হারাবি কি রে বেটা। আমাকে তোদের গাঁঠে বেঁধে রেখেছিলি? তোদের কাজ হয়ে গেছে, এখন পালা সব পালা।

প্রজারা। মহারাজ, আমরা কি আমাদের যুবরাজকে পাব না।

প্রতাপ। না।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুর

সুরমা ও বিভা

সুরমা। বিভা, ভাই বিভা, তোর চোখে যদি জল দেখতুম তা হলে আমার মনটা যে খোলসা হত। তোর হয়ে যে আমার কাঁদতে ইচ্ছা করে ভাই, সব কথাই কি এমনি করে চেপে রাখতে হয়।

বিভা। কোনো কথাই তো চাপা রইল না বউরানী। ভগবান তো লজ্জা রাখলেন না।

সুরমা। আমি কেবল এই কথাই ভাবি যে, জগতে সব দাহই জুড়িয়ে যায়। আজকের মতো এমন কপাল-পোড়া সকাল তো রোজ আসবে না। সংসার লজ্জা দিতেও যেমন, লজ্জা মিটিয়ে দিতেও তেমনি। সব ভাঙাচোরা জুড়ে আবার দেখতে দেখতে ঠিক হয়ে যায়।

বিভা। ঠিক নাও যদি হয়ে যায় তাতেই বা কী। যেটা হয় সেটা তো সইতেই হয়।

সুরমা। শুনেছিস তো বিভা, মাধবপুর থেকে ধনঞ্জয় বৈরাগী এসেছেন। তাঁর তো খুব নাম শুনেছি, বড়ো ইচ্ছা করে তাঁর গান শুনি। গান শুনবি বিভা? ওই দেখ্, কেবল অতটুকু মাথা নাড়লে হবে না। লোক দিয়ে বলে পাঠিয়েছি, আজ যেন একবার মন্দিরে গান গাইতে আসেন, তা হলে আমরা উপরের ঘর থেকে শুনতে পাব। ও কী, পালাচ্ছিস কোথায়?

বিভা। দাদা আসছেন।

সুরমা। তা, এলই বা দাদা।

বিভা। না, আমি যাই বউরানী। [প্রস্থান

সুরমা। আজ ওর দাদার কাছেও মুখ দেখাতে পারছে না।

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

আজ ধনঞ্জয় বৈরাগীকে আমাদের মন্দিরে গান গাবার জন্য ডেকে পাঠিয়েছি।

উদয়। সে তো হবে না।

সুরমা। কেন ?

উদয়। তাঁকে মহারাজ কয়েদ করেছেন।

সুরমা। কী সর্বনাশ, অমন সাধুকে কয়েদ করেছেন ?

উদয়। ওটা আমার উপর রাগ করে। তিনি জানেন আমি বৈরাগীকে ভক্তি করি, মহারাজের কঠিন আদেশেও আমি তাঁর গায়ে হাত দিই নি— সেইজন্যে আমাকে দেখিয়ে দিলেন রাজকার্য কেমন করে করতে হয়।

সুরমা। কিন্তু এগুলো যে অমঙ্গলের কথা— শুনলে ভয় হয়। কী করা যাবে !

উদয়। মন্ত্রী আমার অনুরোধে বৈরাগীকে গারদে না দিয়ে তাঁর বাড়িতে লুকিয়ে রাখতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু ধনঞ্জয় কিছুতেই রাজি হলেন না। তিনি বললেন, আমি গারদেই যাব, সেখানে যত কয়েদি আছে তাদের প্রভুর নামগান শুনিয়ে আসব। তিনি যেখানেই থাকুন তাঁর জন্যে কাউকেই ভাবতে হবে না, তাঁর ভাবনার লোক উপরে আছেন।

সুরমা। মাধবপুরের প্রজাদের জন্যে আমি সব সিধে সাজিয়ে রেখেছি কোথায় সব পাঠাব ?

উদয়। গোপনে পাঠাতে হবে। নির্বোধগুলো আমাকে রাজা রাজা করে চেঁচাচ্ছিল, মহারাজ সেটা শুনতে পেয়েছেন— নিশ্চয় তাঁর ভালো লাগে নি। এখন তোমার ঘর থেকে তাদের খাবার পাঠানো হলে মনে কী সন্দেহ করবেন বলা যায় না।

সুরমা। আচ্ছা, সে আমি বিভাকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু আমি ভাবছি, কাল রাত্রে যারা পাহারায় ছিল সেই সীতারাম-ভাগবতের কী দশা হবে !

উদয়। মহারাজ ওদের গায়ে হাত দেবেন না, সে ভয় নেই।

সুরমা। কেন ?

উদয়। মহারাজ কখনো ছোটো শিকারকে বধ করেন না। দেখলে না, রমাই ভাঁড়কে তিনি ছেড়ে দিলেন।

সুরমা। কিন্তু শাস্তি তো তিনি একজন কাউকে না দিয়ে থাকবেন না।

উদয়। সে তো আমি আছি।

সুরমা। ও কথা বোলো না।

উদয়। বলতে বারণ কর তো বলব না। কিন্তু বিপদের জন্যে কি প্রস্তুত হতে হবে না।

সুরমা। আমি থাকতে তোমার বিপদ ঘটবে কেন ? সব বিপদ আমি নেব।

উদয়। তুমি নেবে? তার চেয়ে বিপদ আমার আর আছে না কি? যাই হোক, সীতারাম-ভাগবতের অন্নবস্ত্রের একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

সুরমা। তুমি কিন্তু কিছু কোরো না। তাদের জন্যে যা করবার ভার সে আমি নিয়েছি।

উদয়। না, না, এতে তুমি হাত দিয়ো না।

সুরমা। আমি দেব না তো কে দেবে? ও তো আমারই কাজ। আমি সীতারাম ভাগবতের স্ত্রীদের ডেকে পাঠিয়েছি।

উদয়। সুরমা, তুমি বড়ো অসাবধান।

সুরমা। আমার জন্যে তুমি কিছু ভেবো না। আসল ভাবনার কথা কী জান?

উদয়। কী বলো দেখি।

সুরমা। ঠাকুরজামাই তাঁর ভাঁড়কে নিয়ে যে কাণ্ডটি করলেন, বিভা সেজন্যে লজ্জায় মরে গেছে।

উদয়। লজ্জার কথা বই-কি।

সুরমা। এতদিন স্বামীর অনাদরে বাপের 'পরেই তার অভিমান ছিল— আজ যে তার সেই অভিমান করবারও মুখ রইল না। বাপের নিষ্ঠুরতার চেয়ে তার স্বামীর এই নীচতা তাকে অনেক বেশি বেজেছে! একে তো ভারি চাপা মেয়ে, তার পরে এই কাণ্ড! আজ থেকে দেখো, ওর স্বামীর কথা আমার কাছেও বলতে পারবে না। স্বামীর গর্ব যে স্ত্রীলোকের ভেঙেছে জীবন তার পক্ষে বোঝা, বিশেষত বিভার মতো মেয়ে।

উদয়। ভগবান বিভাকে দুঃখ যথেষ্ট দিলেন, তেমনি সহ্য করবার শক্তিও দিয়েছেন।

সুরমা। সে শক্তির অভাব নেই— বিভা তোমারই তো বোন বটে।

উদয়। আমার শক্তি যে তুমি।

সুরমা। তাই যদি হয় তো সেও তোমারই শক্তিতে।

উদয়। আমার কেবলই ভয় হয় তোমাকে যদি হারাই তা হলে—

সুরমা। তা হলে তোমার কোনো অনিষ্ট হবে না। দেখো, একদিন ভগবান প্রমাণ করিয়ে দেবেন যে, তোমার মহত্ত্ব একলা তোমাতেই।

উদয়। আমার সে প্রমাণে কাজ নেই।

সুরমা। ভাগবতের স্ত্রী অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে।

উদয়। আচ্ছা, চললুম, কিন্তু দেখো— [প্রস্থান

ভাগবতের স্ত্রীর প্রবেশ

সুরমা। ভোর রাত্রে আমি যে টাকা আর কাপড় পাঠিয়েছি তা তোদের হাতে গিয়ে পৌঁচেছে তো ?

ভাগবতের স্ত্রী। পৌঁচেছে মা, কিন্তু তাতে আমাদের কতদিন চলবে ? তোমরা আমাদের সর্বনাশ করলে !

সুরমা। ভয় নেই কামিনী ! আমার যতদিন খাওয়াপরা জুটবে তোদেরও জুটবে। আজও কিছু নিয়ে যা। কিন্তু এখানে বেশিক্ষণ থাকিস নে ! [উভয়ের প্রস্থান

রাজমহিষী ও বামীর প্রবেশ

রাজমহিষী। এত বড়ো একটা কাণ্ড হয়ে গেল, আমি জানতেও পারলুম না।

বামী। মহারানীমা, জেনেই বা লাভ হত কী। তুমি তো ঠেকাতে পারতে না !

রাজমহিষী। সকালে উঠে আমি ভাবছি হল কী— জামাই বুঝি রাগ করেই গেল ! এ দিকে যে এমন সর্বনাশের উদ্‌যোগ হচ্ছিল, তা মনে আনতেও পারি নি। তুই সে রাত্রেই জানতিস, আমাকে ভাঁড়িয়েছিলি।

বামী। জানলে তুমি যে ভয়েই মরে যেতে ! তা মা, আর ও কথায় কাজ নেই— যা হয়ে গেছে সে হয়ে গেছে।

রাজমহিষী। হয়ে চুকলে তো বাঁচতুম— এখন যে আমার উদয়ের জন্যে ভয় হচ্ছে !

বামী। ভয় খুব ছিল, কিন্তু সে কেটে গেছে।

রাজমহিষী। কী করে কাটল।

বামী। মহারাজার রাগ বউরানীর উপর পড়েছে। তিনিও আচ্ছা মেয়ে যা হোক — আমাদের মহারাজের ভয়ে যম কাঁপে, কিন্তু ওঁর ভয় ডর নেই ! যাতে তাঁরই উপরে সব রাগ পড়ে তিনি ইচ্ছে করেই যেন তার জোগাড় করছেন।

রাজমহিষী। তার জন্যে তো বেশি জোগাড় করবার দরকার দেখি নে। মহারাজ যে ওকে বিদায় করতে পারলেই বাঁচেন। এবারে আর তো ঠেকিয়ে রাখতে পারা যাবে না। তা তোকে যা বলেছিলুম সেটা ঠিক আছে তো !

বামী। সে-সমস্তই তৈরি হয়ে রয়েছে, সেজন্যে ভেবো না।

রাজমহিষী। আর দেরি করিস নে, আজকেই যাতে—

বামী। সে আমাকে বলতে হবে না, কিন্তু—

রাজমহিষী। যা হয় হবে— অত ভাবতে পারি নে— ওকে বিদায় করতে

পারলেই আপাতত মহারাজের রাগ পড়ে যাবে, নইলে উদয়কে বাঁচাতে পারা যাবে না। তুই যা, শীঘ্র কাজ সেরে আয়।

বামী। আমি সে ঠিক করেই এসেছি— এতক্ষণে হয়তো— [প্রস্থান

রাজমহিষী। কী জানি বামী, ভয়ও হয়।

প্রতাপাদিত্যের প্রবেশ

প্রতাপ। মহিষী!

মহিষী। কী মহারাজ!

প্রতাপ। এসব কাজ কি আমাকে নিজের হাতে করতে হবে?

মহিষী। কী কাজ।

প্রতাপ। ওই-যে আমি তোমাকে বলেছিলুম শ্রীপুরের মেয়েকে তার পিত্রালয়ে দূর করে দিতে হবে— এ কাজটা কি আমার সৈন্য-সেনাপতি নিয়ে করতে হবে?

মহিষী। আমি তার জন্যে বন্দোবস্ত করছি।

প্রতাপ। বন্দোবস্ত! এর আবার বন্দোবস্ত কিসের! আমার রাজ্যে কজন পালকির বেহারা জুটবে না— না কি?

মহিষী। সেজন্যে নয় মহারাজ।

প্রতাপ। তবে কী জন্যে।

মহিষী। দেখো, তবে খুলে বলি! ওই বউ আমার উদয়কে যেন জাদু করে রেখেছে সে তো তুমি জান। ওকে যদি বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিই তা হলে—

প্রতাপ। এমন জাদু তো ভেঙে দিতে হবে— এ বাড়ি থেকে ওই মেয়েটাকে নির্বাসিত করে দিলেই জাদু ভাঙবে।

মহিষী। মহারাজ, এ-সব কথা তোমরা বুঝবে না— আমি ঠিক করেছি।

প্রতাপ। কী ঠিক করেছ জানতে চাই।

মহিষী। আমি বামীকে দিয়ে মঙ্গলার কাছ থেকে ওষুধ আনিয়েছি।

প্রতাপ। ওষুধ কিসের জন্যে?

মহিষী। ওকে ওষুধ খাওয়ালেই ওর জাদু কেটে যাবে। মঙ্গলার ওষুধ অব্যর্থ, সকলেই জানে।

প্রতাপ। আমি তোমার ওষুধ-টষুধ বুঝি নে— আমি এক ওষুধ জানি— শেষকালে সেই ওষুধ প্রয়োগ করব। আমি তোমাকে বলে রাখছি, কাল যদি ওই শ্রীপুরের মেয়ে

শ্রীপুরে ফিরে না যায় তা হলে আমি উদয়কে সুদ্ধ নির্বাসনে পাঠাব— এখন যা করতে হয় করোগে।

মহিষী। আর তো বাঁচি নে। কী যে করব মাথামুণ্ডু ভেবে পাই নে। [প্রস্থান

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

প্রতাপ। সীতারাম-ভাগবতের বেতন বন্ধ হয়েছে, সে কি রাজকোষে অর্থ নেই বলে ?

উদয়। না মহারাজ, আমি বলপূর্বক তাদের কর্তব্যে বাধা দিয়েছি, আমাকে তারই দণ্ড দেবার জন্যে।

প্রতাপ। বউমা তাদের গোপনে অর্থসাহায্য করছেন।

উদয়। আমিই তাঁকে সাহায্য করতে বলেছি।

প্রতাপ। আমার ইচ্ছার অপমান করবার জন্যে ?

উদয়। না মহারাজ, যে দণ্ড আমারই প্রাপ্য তা নিজে গ্রহণ করবার জন্যে।

প্রতাপ। আমি আদেশ করছি, ভবিষ্যতে তাদের আর যেন অর্থসাহায্য না করা হয়।

উদয়। আমার প্রতি আরো গুরুতর শাস্তির আদেশ হল।

প্রতাপ। আর বউমাকে বোলো, তিনি আমাকে একেবারেই ভয় করেন না— দীর্ঘকাল তাঁকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে বলেই এরকম ঘটতে পেরেছে, কিন্তু তিনি জানতে পারবেন স্পর্ধা প্রকাশ করা নিরাপদ নয়। তিনি মনে রাখেন যেন আমার রাজবাড়ি আমার রাজত্বের বাইরে নয়। [উভয়ের প্রস্থান

মহিষী ও বামীর প্রবেশ

মহিষী। ওষুধের কী করলি ?

বামী। সে তো এনেছি— পানের সঙ্গে সেজে দিয়েছি।

মহিষী। খাঁটি ওষুধ তো ?

বামী। খুব খাঁটি।

মহিষী। খুব কড়া ওষুধ হওয়া চাই, একদিনেই যাতে কাজ হয়। মহারাজ বলেছেন কালকের মধ্যে যদি সুরমা বিদায় না হয়, তা হলে উদয়কে সুদ্ধ নির্বাসনে পাঠাবেন। আমি যে কী কপাল করেছিলুম।

বামী। কড়া ওষুধ তো বটে। বড়ো ভয় হয় মা, কী হতে কী ঘটে।

মহিষী। ভয়-ভাবনা করবার সময় নেই বামী, একটা কিছু করতেই হবে। মহারাজকে তো জানিস— কেঁদেকেটে মাথা খুঁড়ে তাঁর কথা নড়ানো যায় না। উদয়ের জন্যে আমি দিনরাত্রি ভেবে মরছি। ওই বউটাকে বিদায় করতে পারলে তবু মহারাজের রাগ একটু কম পড়বে। ও যেন ওঁর চক্ষুশূল হয়েছে।

বামী। তা তো জানি। কিন্তু ওষুধের কথা তো বলা যায় না। দেখো, শেষকালে মা, আমি যেন বিপদে না পড়ি। আর, আমার বাজুবন্দর কথাটা মনে রেখো।

মহিষী। সে আমাকে বলতে হবে না। তোকে তো গোটছড়াটা আগাম দিয়েছি।

বামী। শুধু গোট নয় মা, বাজুবন্দ চাই। [প্রস্থান

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

মহিষী। বাবা উদয়, সুরমাকে বাপের বাড়ি পাঠানো যাক।

উদয়। কেন মা, সুরমা কী অপরাধ করেছে।

মহিষী। কী জানি বাছা, আমরা মেয়েমানুষ কিছু বুঝি না, বউমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে মহারাজের রাজকার্যের যে কী সুযোগ হবে মহারাজই জানেন।

উদয়। মা, রাজবাড়িতে যদি আমার স্থান হয়ে থাকে তবে সুরমার কি হবে না? কেবল স্থানটুকু মাত্রই তার ছিল, তার বেশি তো আর কিছু সে পায় নি।

মহিষী। (সরোদনে) কী জানি বাবা, মহারাজ কখন কী যে করেন কিছু বুঝতে পারি নে। কিন্তু তাও বলি বাছা, আমাদের বউমাও বড়ো ভালো মেয়ে নয়। ও রাজ-বাড়িতে প্রবেশ করে অবধিই এখানে আর শান্তি নেই। হাড় জ্বালাতন হয়ে গেল। তা, ও দিনকতক বাপের বাড়িতেই যাক-না কেন, দেখা যাক, কী বল বাছা? ও দিন-কতক এখান থেকে গেলেই দেখতে পাবে, বাড়ির শ্রী ফেরে কি না।

[উদয় নীরব থাকিয়া কিয়ৎকাল পরে প্রস্থান

সুরমার প্রবেশ

সুরমা। কই এখানে তো তিনি নেই।

মহিষী। পোড়ামুখী, আমার বাছাকে তুই কী কল্লি? আমার বাছাকে আমায় ফিরিয়ে দে। এসে অবধি তুই তার কী সর্বনাশ না কল্লি। অবশেষে— সে রাজার ছেলে —তার হাতে বেড়ি না দিয়ে কি তুই ক্ষান্ত হবি নি।

সুরমা। কোনো ভয় নেই মা। বেড়ি এবার ভাঙল। আমি বুঝতে পারছি আমার বিদায় হবার সময় হয়ে এসেছে— আর বড়ো দেরি নেই। আমি আর দাঁড়াতে পারছি নে। বুকের ভিতর যেন আগুন জ্বলে যাচ্ছে। তোমার পায়ের ধুলো নিতে এলুম। অপরাধ যা-কিছু করেছি মাপ কোরো। ভগবান করুন, যেন আমি গেলেই শান্তি হয়। [পদধূলি লইয়া প্রস্থান

মহিষী। ওষুধ খেয়েছে বুঝি! বিপদ কিছু ঘটবে না তো? যে যা বলুক, বউমা কিন্তু লক্ষ্মী মেয়ে। ওকে এমন জোর করে বিদায় করলে কি ধর্মে সইবে। বামী, বামী!

বামীর প্রবেশ

বামী। কী মা।

মহিষী। ওষুধটা কি বড্ড কড়া হয়েছে?

বামী। তুমি তো কড়া ওষুধের কথাই বলেছিলে।

মহিষী। কিন্তু বিপদ ঘটবে না তো?

বামী। আপদ-বিপদের কথা বলা যায় কি।

মহিষী। সত্যি বলছি বামী, আমার মনটা কেমন করছে। ওষুধটা কি খেয়েছে ঠিক জানিস।

বামী। বেশিক্ষণ নয়— এই খানিকক্ষণ হল খেয়েছে।

মহিষী। দেখলুম মুখ একেবারে সাদা ফেকাশে হয়ে গেছে। কী করলুম কে জানে। হরি, রক্ষা করো।

বামী। তোমরা তো ওকে বিদায় করতেই চেয়েছিলে।

মহিষী। না, না, ছি ছি— অমন কথা বলিস নে। দেখ্, আমি তোকে আমার এই গলার হারগাছটা দিচ্ছি, তুই শিগগির দৌড়ে গিয়ে মঙ্গলার কাছ থেকে এর উলটো ওষুধ নিয়ে আয়-গে। যা বামী, যা। শিগগির যা। [বামীর প্রস্থান

বিভার সরোদনে প্রবেশ

বিভা। মা, মা, কী হল মা।

মহিষী। কী হয়েছে বিভু।

বিভা। বউদিদির এমন হল কেন মা। তোমরা তাকে কী করলে মা। কী খাওয়ালে।

মহিষী। (উচ্চস্বরে) ওরে, বামী, বামী, শিগগির দৌড়ে যা— ওরে, ওষুধ নিয়ে আয়।

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

মহিষী। বাবা উদয়, কী হয়েছে বাপ।

উদয়। সুরমা বিদায় হয়েছে মা, এবার আমি বিদায় হতে এসেছি— আর এখানে নয়।

মহিষী। (কপালে করাঘাত করিয়া) কী সর্বনাশ হল রে, কী সর্বনাশ হল।

উদয়। (প্রণাম করিয়া) চললুম তবে।

মহিষী। (হাত ধরিয়া) কোথায় যাবি বাপ। আমাকে মেরে ফেলে দিয়ে যা।

বিভা। (পা জড়াইয়া) কোথায় যাবে দাদা। আমাকে কার হাতে দিয়ে যাবে।

উদয়। তোকে কার হাতে দিয়ে যাব। আমি হতভাগা ছাড়া তোর কে আছে। ওরে বিভা, তুইই আমাকে টেনে রাখলি— নইলে এ পাপ-বাড়িতে আমি আর এক মুহূর্ত থাকতুম না।

বিভা। বুক ফেটে গেল দাদা, বুক ফেটে গেল।

উদয়। দুঃখ করিস নে বিভা, যে গেছে সে সুখে গেছে। এ বাড়িতে এসে সেই সোনার লক্ষ্মী এই আজ প্রথম আরাম পেল। ওখানে কিসের গোলমাল।

(বাতায়ন হইতে নীচে চাহিয়া) প্রজারা এসেছে দেখছি। ওদের বিদায় করে দিয়ে আসি-গে। [প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

নীচের আঙিনায় মাধবপুরের প্রজাদল

প্রথম। (উচ্চস্বরে) আমরা এখানে হত্যা দিয়ে পড়ে থাকব।

দ্বিতীয়। আমরা এখানে না খেয়ে মরব।

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। এরা সব বৈরাগী ঠাকুরের চেলা, এদের গায়ে হাত দিতে ভয় করে। কিন্তু যেরকম গোলমাল লাগিয়েছে, এখনই মহারাজের কানে যাবে— মুশকিলে পড়ব। কী বাবা, তোমরা মিছে চেঁচামেচি করছ কেন বলো তো।

সকলে। আমরা রাজার কাছে দরবার করব।

প্রহরী। আমার পরামর্শ শোন্‌ বাবা, দরবার করতে গিয়ে মরবি। তোরা নেহাত ছোটো বলেই মহারাজ তোদের গায়ে হাত দেন নি, কিন্তু হাঙ্গামা যদি করিস তো একটি প্রাণীও রক্ষা পাবি নে।

প্রথম। আমরা আর তো কিছুই চাই নে, যে গারদে বাবা আছেন আমরাও সেখানে থাকতে চাই।

প্রহরী। ওরে, চাই বললেই হবে এমন দেশ এ নয়।

দ্বিতীয়। আচ্ছা, আমরা আমাদের যুবরাজকে দেখে যাব।

প্রহরী। তিনি তোদের ভয়েই লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন।

তৃতীয়। তাঁকে না দেখে আমরা যাব না।

সকলে। (উর্ধ্বস্বরে) দোহাই যুবরাজ বাহাদুর।

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

উদয়। আমি তোদের হুকুম করছি তোরা দেশে ফিরে যা।

প্রথম। তোমার হুকুম মানব— আমাদের ঠাকুরও হুকুম করেছে, তাঁর হুকুমও মানব— কিন্তু তোমাকে আমরা নিয়ে যাব।

উদয়। আমায় নিয়ে কী হবে।

প্রথম। তোমাকে আমাদের রাজা করব।

উদয়। তোদের তো বড়ো আস্পর্ধা হয়েছে। এমন কথা মুখে আনিস। তোদের কি মরবার জায়গা ছিল না।

দ্বিতীয়। মরতে হয় মরব, কিন্তু আমাদের আর দুঃখ সহ্য হয় না।

তৃতীয়। আমাদের যে বুক কেমন করে ফাটছে তা বিধাতাপুরুষ জানেন।

চতুর্থ। রাজা, তোমার দুঃখে আমাদের কলিজা জ্বলে গেল।

পঞ্চম। আমরা জোর করে নিয়ে যাব, কেড়ে নিয়ে যাব।

উদয়। আচ্ছা, শোন্‌, আমি বলি— তোরা যদি দেরি না করে এখনই দেশে চলে যাস, তা হলে আমি মহারাজের কাছে নিজে মাধবপুরে যাবার দরবার করব।

প্রথম। সঙ্গে আমাদের ঠাকুরকেও নিয়ে যাবে?

উদয়। চেষ্টা করব। কিন্তু, আর দেরি না। এই মুহূর্তে তোরা এখান থেকে বিদায় হ।

প্রজারা। আচ্ছা, আমরা বিদায় হলুম। জয় হোক। তোমার জয় হোক।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মন্ত্রী ও প্রতাপাদিত্য

মন্ত্রী। যুবরাজ কারাদণ্ড তো এতদিন ভোগ করলেন, এখন ছেড়ে দিন।

প্রতাপ। কারাদণ্ড দেবার কারণ ঘটেছিল, ছেড়ে দেবার তো কারণ ঘটে নি।

মন্ত্রী। কেবল সন্দেহমাত্রে ওঁকে শাস্তি দিয়েছেন। প্রমাণ তো পান নি।

প্রতাপ। মাধবপুরের প্রজারা দরখাস্ত নিয়ে দিল্লিতে চলেছিল, হাতে হাতে ধরা পড়েছিল, সেও কি তুমি অবিশ্বাস কর।

মন্ত্রী। আজ্ঞে না মহারাজ, অবিশ্বাস করছি নে।

প্রতাপ। ওরা তাতে লিখেছে আমি দিল্লীশ্বরের শত্রু, ওদের ইচ্ছা আমাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে উদয়কে সিংহাসন দেওয়া হয়— এ কথাগুলো তো ঠিক?

মন্ত্রী। আজ্ঞে হাঁ, সে দরখাস্ত তো আমি দেখেছি।

প্রতাপ। এর চেয়ে তুমি আর কী প্রমাণ চাও।

মন্ত্রী। কিন্তু এর মধ্যে আমাদের যুবরাজ আছেন, এ কথা আমি কিছুতে বিশ্বাস করতে পারি নে।

প্রতাপ। তোমার বিশ্বাস কিম্বা তোমার আন্দাজের উপর নির্ভর করে তো আমি রাজকার্য চালাতে পারি নে। যদি বিপদ ঘটে তবে 'ওই যা, মন্ত্রী আমার ভুল বিশ্বাস করেছিল' বলে তো নিষ্কৃতি পাব না।

মন্ত্রী। কিন্তু ন্যায়বিচার করা রাজতন্ত্রের অঙ্গ মহারাজ। যুবরাজকে যে সন্দেহে কারাদণ্ড দিয়েছেন তার যদি কোনো মূল না থাকে তা হলেও রাজকার্যের মঙ্গল হবে না।

প্রতাপ। রাজ্যরক্ষা সহজ ব্যাপার নয় মন্ত্রী। অপরাধ নিশ্চয় প্রমাণ হলে তার পরে দণ্ড দেওয়াই যে রাজার কর্তব্য তা আমি মনে করি নে। যেখানে সন্দেহ করা যায় কিম্বা যেখানে ভবিষ্যতেও অপরাধের সম্ভাবনা আছে, সেখানেও রাজা দণ্ড দিতে বাধ্য।

মন্ত্রী। আপনি রাগ করবেন, কিন্তু আমি এ ক্ষেত্রে সন্দেহ কিম্বা ভবিষ্যৎ অপরাধের সম্ভাবনা পর্যন্ত কল্পনা করতে পারি নে।

প্রতাপ। মাধবপুরের প্রজারা এখানে এসেছিল কি না?

মন্ত্রী। হাঁ।

প্রতাপ। তারা ওকেই রাজা করতে চেয়েছিল কি না?

মন্ত্রী। হাঁ চেয়েছিল।

প্রতাপ। তুমি বলতে চাও এ-সকলের মধ্যে উদয়ের কোনো হাত ছিল না?

মন্ত্রী। যদি হাত থাকত তা হলে এত প্রকাশ্যে এ কথার আলোচনা হত না।

প্রতাপ। আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার নিঃসংশয় নিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হয়েই বসে থাকো— বিপদটা একেবারে ঘাড়ে এসে পড়ার জন্যে পথ চেয়ে বসে থাকব না। রাজার দায়িত্ব মন্ত্রীর দায়িত্বের চেয়ে ঢের বেশি। অন্যায়ের দ্বারা অবিচারের দ্বারাও রাজাকে রাজধর্ম পালন করতে হয়।

মন্ত্রী। অন্তত বৈরাগী ঠাকুরকে ছেড়ে দিন মহারাজ। প্রজাদের মনে একসঙ্গে এতগুলো বেদনা চাপাবেন না।

প্রতাপ। আচ্ছা, সে আমি বিবেচনা করে দেখব।

মন্ত্রী। চলুন-না মহারাজ, একবার স্বয়ং ভিতরে গিয়ে যুবরাজকে দেখে আসুন-না। ওঁর মুখ দেখলে, ওঁর দুটো কথা শুনলেই বুঝতে পারবেন, গোপনে অপরাধ ওঁর দ্বারা কখনো ঘটতেই পারে না।

প্রতাপ। যারা মুখের ভাব দেখে আর হায়-হায় আহা-উহু করতে করতে রাজ্যশাসন করে তারা রাজা হবার যোগ্য নয়।

বসন্তরায়ের প্রবেশ

বসন্ত। বাবা প্রতাপ, উদয়কে আর কেন কষ্ট দাও। পদে পদেই যদি সে তোমাদের কাছে অপরাধ করে তবে তাকে এই বুড়োর কাছে দাও-না।

[প্রতাপ নিরুত্তর

তুমি যা মনে করে উদয়কে শাস্তি দিচ্ছ, সেই অপরাধ যে যথার্থ আমার। আমিই যে রামচন্দ্ররায়কে রক্ষা করবার জন্যে চক্রান্ত করেছিলুম।

প্রতাপ। খুড়োমশায়, বৃথা কথা বলে আমার কাছে কোনোদিন কেউ কোনো ফল পায় নি।

বসন্ত। ভালো, আমার আর-একটা ক্ষুদ্র প্রার্থনা আছে। আমি একবার কেবল

উদয়কে দেখে যেতে চাই— আমাকে সেই কারাগৃহে প্রবেশ করতে কেউ যেন বাধা না দেয় এই অনুমতি দাও।

প্রতাপ। সে হতে পারবে না।

বসন্ত। তা হলে আমাকে তার সঙ্গে বন্দী করে রাখো। আমাদের দুজনেরই অপরাধ এক— দণ্ডও এক হোক— যতদিন সে কারাগারে থাকবে আমিও থাকব।

[নীরবে প্রতাপের প্রস্থান

রামমোহনের প্রবেশ

বসন্ত। কী মোহন। কী খবর।

রামমোহন। মাকে আমাদের চন্দ্রদ্বীপে আসবার কথা বলতে এসেছিলুম।

বসন্ত। প্রতাপকে জানিয়েছিস নাকি।

রামমোহন। তাঁকে জানাবার আগে একবার স্বয়ং মাকে নিবেদন করতে গিয়েছিলুম।

বসন্ত। তা, বিভা কী বললে।

রামমোহন। তিনি বললেন, তিনি যেতে পারবেন না।

বসন্ত। কেন, কেন। অভিমান করেছে বুঝি ? সেটা মিছে অভিমান, রামমোহন, সে বেশিক্ষণ থাকবে না, একটু তুমি সবুর করো।

রামমোহন। তিনি বললেন, 'দাদাকে ছেড়ে আজ আমি যেতে পারব না।'

বসন্ত। আহা, সে কথা বলতে পারে বটে।

রামমোহন। বড়ো বুক ফুলিয়ে এসেছিলেম। মহারাজ নিষেধ করেছিলেন।— বলেছিলেম, মালক্ষ্মী আমাকে বড়ো দয়া করেন, আমার কথা ঠেলতে পারবেন না। আমাদের রাজা বললেন, প্রতাপাদিত্যের ঘরের মেয়েকে নিতে পারব না। আমি বললেম, তিনি কি কেবল প্রতাপাদিত্যের ঘরের মেয়ে ? আপনার ঘরের রানী নন ? শ্বশুরের উপর রাগ করে নিজের সিংহাসনকে অপমান করবেন ? এই বলে চলে এসেছি, আজ আমি ফিরব কোন্ মুখে ?

বসন্ত। বিভাকে দোষ দিয়ো না রামমোহন।

রামমোহন। না খুড়োমহারাজ, আমাদের মহারাজার ভাগ্যকেই দোষ দিই— এমন লক্ষ্মীকে পেয়েও হেলায় হারাতে বসেছেন।

বসন্ত। হারাবে কেন রামমোহন। শুভদিন আসবে, আবার মিলন হবে।

রামমোহন। কুপরামর্শ দেবার লোক যে ঢের আছে। ওরা বলছে যাদবপুরের ঘরের মেয়ে এনে তাকে ওঁর পাটরানী করবে।

বসন্ত। এও কি কখনো সম্ভব ? আমাদের বিভাকে ত্যাগ করবে ?

রামমোহন। সেই চক্রান্তই হয়েছে, তাই আমি ছুটে এলুম। অপরাধ করলেন নিজে, আর যিনি সতীলক্ষ্মী তাঁকে দণ্ড দিলেন। এও কি কখনো সইবে ? হোক-না কলি, ধর্ম কি একেবারে নেই। চললুম মহারাজ, আশীর্বাদ করবেন, আমাদের রাজার যেন সুমতি হয়।

বসন্ত। এখানকার বিপদ কেটে গেলে আমি নিজে যাব তোমাদের ওখানে। এমন অন্যায় হতে দেব কেন। [রামমোহনের প্রণাম করিয়া প্রস্থান

সীতারামের প্রবেশ

কী সীতারাম, খবর কি ?

সীতারাম। কারাগারে আমরা আগুন লাগিয়ে দিয়েছি, এখনই যুবরাজ বেরিয়ে আসবেন।

বসন্ত। আবার আর-একটা উৎপাত ঘটবে না তো ? একটা ফাঁড়া কাটাতে গিয়ে আর-একটা ফাঁড়া ঘাড়ে চাপে যে। আমার ভালো ঠেকছে না।

সীতারাম। কাছেই নৌকো তৈরি আছে খুড়োমহারাজ, তাঁকে নিয়ে এখনই আপনাকে পালাতে হবে। এ ছাড়া আর কোনো গতি নেই।

বসন্ত। তার আগে বিভার সঙ্গে একবার দেখা করে আসি-গে।

সীতারাম। না, তার সময় নেই।

বসন্ত। দেরি করব না সীতারাম, তার সঙ্গে জীবনে আর তো দেখা হবে না।

সীতারাম। তা হলে সমস্ত আমাদের বৃথা হয়ে যাবে। ওই দেখুন, আগুনের শিখা জ্বলে উঠেছে।

বসন্ত। আগুন থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে তো রে ?

সীতারাম। কারাগারের মধ্যেই আমাদের চর আছে, এই এলেন বলে, দেখুন-না।

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

উদয়। দাদামশায় যে !

বসন্ত। আয় ভাই, আয়।

উদয়। সমস্তই স্বপ্ন নাকি ? আমি তো বুঝতে পারছি নে।

সীতারাম। যুবরাজ, এই দিকে নৌকো আছে, শীঘ্র আসুন।

উদয়। কেন, নৌকো কেন।

সীতারাম। নইলে আবার প্রহরীরা ধরে ফেলবে।

উদয়। কেন, আমি কি পালিয়ে যাচ্ছি।

বসন্ত। হাঁ ভাই, আমি তোকে চুরি করে নিয়ে চলেছি।

সীতারাম। কয়েদখানায় আমিই আগুন লাগিয়েছি।

উদয়। কী সর্বনাশ! মরবি যে রে!

সীতারাম। যতদিন তুমি কয়েদে ছিলে, প্রতিদিন আমি মরেছি।

উদয়। না, আমি পালাব না।

বসন্ত। কেন দাদা।

উদয়। নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে অন্যদের বিপদের জালে জড়াতে পারব না।

বসন্ত। অন্যদের যে তাতেই আনন্দ। তোমার তাতে কোনো অপরাধ নেই।

উদয়। সে আমি পারব না। কারাগারের বন্ধন আমার পক্ষে তার চেয়ে অনেক ভালো। যদি পালাই তবে মুক্তি আমার ফাঁস হবে। আমি কারাগারে ফিরব।

বসন্ত। কারাগার তো গেছে ছাই হয়ে, তুমি ফিরবে কোথায়।

উদয়। ওই দিকে একখানা ঘর বাকি আছে।

বসন্ত। তা হলে আমিও যাই।

উদয়। না, তুমি যেতে পারবে না। কিছুতেই না।

বসন্ত। আচ্ছা, তা হলে আমি বিভার কাছে যাই। তার প্রাণটা যে কিরকম করছে, সে আমিই জানি।

উদয়। সীতারাম, আমার জন্যে যে নৌকো তৈরি আছে সে নৌকোয় চড়ে এখন তুই রায়গড়ে চলে যা।

সীতারাম। (উদয়কে প্রণাম করিয়া) তা ছাড়া আমার আর গতি নেই। প্রভু, যদি কোনো পুণ্য করে থাকি আর-জন্মে যেন তোমার দাস হয়ে জন্মাই।

[উভয়ের প্রস্থান

ধনঞ্জয়ের প্রবেশ

নৃত্য ও গীত

ওরে আগুন আমার ভাই,
আমি তোমারি জয় গাই।
তোমার শিকলভাঙা এমন রাঙা মূর্তি দেখি নাই।

তুমি দু হাত তুলে আকাশ-পানে
মেতেছ আজ কিসের গানে,
একি আনন্দময় নৃত্য অভয় বলিহারি যাই।
যেদিন ভবের মেয়াদ ফুরাবে ভাই,
আগল যাবে সরে—
সেদিন হাতের দড়ি পায়ের বেড়ি
দিবি রে ছাই করে।
সেদিন আমার অঙ্গ তোমার অঙ্গে
ঐ নাচনে নাচবে রঙ্গে,
সকল দাহ মিটবে দাহে
ঘুচবে সব বালাই।

[প্রস্থান

প্রতাপাদিত্য ও মন্ত্রীর প্রবেশ

প্রতাপ। দৈবাৎ আগুন লাগার কথা আমি একবর্ণ বিশ্বাস করি নে। এর মধ্যে চক্রান্ত আছে। খুড়ো কোথায়?

মন্ত্রী। তাঁকে দেখা যাচ্ছে না।

প্রতাপ। হুঁ। তিনিই এই অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে ছোঁড়াটাকে নিয়ে পালিয়েছেন।

মন্ত্রী। তিনি সরল লোক— এ সকল বুদ্ধি তো তাঁর আসে না।

প্রতাপ। বাইরে থেকে যাকে সরল বলে বোধ হবে না তার কুটিল বুদ্ধি বৃথা।

মন্ত্রী। কারাগার ভস্মসাৎ হয়ে গেছে। আমার আশঙ্কা হচ্ছে যদি—

প্রতাপ। কোনো আশঙ্কা নেই, আমি বলছি উদয়কে নিয়ে খুড়োমহারাজ পালিয়েছেন। বৈরাগীটার খবর পেয়েছ?

মন্ত্রী। না মহারাজ।

প্রতাপ। সে বোধ হয় পালিয়েছে। সে যদি থাকে তো আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ো।

মন্ত্রী। কেন মহারাজ, তাকে আবার কিসের প্রয়োজন।

প্রতাপ। আর কিছু নয়— সেই ভাঁড়টাকে নিয়ে একটু আমোদ করতে পারতুম, তার কথা শুনতে মজা আছে।

ধনঞ্জয়ের প্রবেশ

ধনঞ্জয়। জয় হোক মহারাজ। আপনি তো আমাকে ছাড়তেই চান না, কিন্তু কোথা থেকে আগুন ছুটির পরোয়ানা নিয়ে হাজির ; কিন্তু না বলে যাই কী করে। তাই হুকুম নিতে এলুম।

প্রতাপ। ক দিন কাটল কেমন?

ধনঞ্জয়। সুখে কেটেছে, কোনো ভাবনা ছিল না। এ-সব তারই লুকোচুরি খেলা— ভেবেছিল গারদে লুকোবে, ধরতে পারবে না। কিন্তু ধরেছি, চেপে ধরেছি, তার পর খুব হাসি, খুব গান। বড়ো আনন্দে গেছে, আমার গারদ-ভাইকে মনে থাকবে।

গান

ওরে শিকল, তোমায় অঙ্গে ধরে
দিয়েছি ঝংকার।
তুমি আনন্দে ভাই, রেখেছিলে
ভেঙে অহংকার।
তোমায় নিয়ে করে খেলা
সুখে দুঃখে কাটল বেলা—
অঙ্গ বেড়ি দিলে বেড়ি,
বিনা দামের অলংকার।
তোমার 'পরে করি নে রোষ,
দোষ থাকে তো আমারই দোষ,
ভয় যদি রয় আপন মনে
তোমায় দেখি ভয়ংকর।
অন্ধকারে সারা রাতি
ছিলে আমার সাথের সাথি,
সেই দয়াটি স্মরি তোমায়
করি নমস্কার।

প্রতাপ। বল কী বৈরাগী, গারদে তোমার এত আনন্দ কিসের।

ধনঞ্জয়। মহারাজ, রাজ্যে তোমার যেমন আনন্দ, তেমনি আনন্দ। অভাব কিসের। তোমাকে সুখ দিতে পারেন আর আমাকে পারেন না?

প্রতাপ। এখন তুমি যাবে কোথায়।

ধনঞ্জয়। রাস্তায়।

প্রতাপ। বৈরাগী, আমার এক-একবার মনে হয় তোমার ওই রাস্তাই ভালো— আমার এই রাজ্যটা কিছু না।

ধনঞ্জয়। মহারাজ, রাজ্যটাও তো রাস্তা। চলতে পারলেই হল। ওটাকে যে পথ বলে জানে সেই তো পথিক; আমরা কোথায় লাগি। তা হলে অনুমতি যদি হয় তো এবারকার মতো বেরিয়ে পড়ি।

প্রতাপ। আচ্ছা, কিন্তু মাধবপুরে যেয়ো না।

ধনঞ্জয়। সে কেমন করে বলি, যখন নিয়ে যাবে তখন কার বাবার সাধ্য বলে যে যাব না। [প্রস্থান

মন্ত্রী। মহারাজ! ওই তো দেখি যুবরাজ আসছেন।

প্রতাপ। তাই তো, পালায় নি তবে।

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

প্রতাপ। কী, তুমি যে মুক্ত দেখি?

উদয়। কেমন করে বলব মহারাজ। কারাগার পুড়লেই কি কারাগার যায়।

প্রতাপ। তুমি যে পালিয়ে গেলে না?

উদয়। মেয়াদ না ফুরোলে পালাব কী করে। মহারাজের সঙ্গে আমার যে চিরবন্ধনের সম্বন্ধ, সেটা যখন নিজে ছিন্ন করে দেবেন সেইদিনই তো ছাড়া পাব।

প্রতাপ। তোমাকে ত্যাগ ক'রে?

উদয়। তা ছাড়া আর কী বলব। আমাকে গ্রহণ করে আমাদের তো কারো কোনো সুখ নেই।

প্রতাপ। তুমি অথচ সিংহাসনের যোগ্য নও, সেই সিংহাসনে তোমার অধিকার আছে, এর থেকেই যত দুঃখ। যেখানে যার স্থান নয় সেইখানেই তার বন্ধন।

উদয়। না মহারাজ, আমি যোগ্য নই। আপনার এই সিংহাসন হতে আমাকে অব্যাহতি দিন এই ভিক্ষা।

প্রতাপ। তুমি যা বলছ তা যে সত্যই তোমার হৃদয়ের ভাব তা কী করে জানব।

উদয়। আজ আমি মা-কালীর চরণ স্পর্শ করে শপথ করব, আপনার রাজ্যের সূচ্যগ্র ভূমিও আমি কখনো শাসন করব না; সমরাদিত্যই আপনার রাজ্যের উত্তরাধিকারী।

প্রতাপ। তুমি তবে কী চাও।

উদয়। মহারাজ, আমি আর কিছুই চাই নে— কেবল আমাকে পিঞ্জরের পশুর মতো গারদে পুরে রাখবেন না। আমাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করুন, আমি একাকী কাশী চলে যাই।

প্রতাপ। আচ্ছা বেশ। আমি এর ব্যবস্থা করছি।

উদয়। আমার আর-একটি প্রার্থনা আছে মহারাজ। আমি বিভাকে নিজে তার শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবার অনুমতি চাই।

প্রতাপ। তার আবার শ্বশুরবাড়ি কোথায়।

উদয়। তাই যদি মনে করেন তবে সেই অনাথা কন্যাকে আমার কাছে থাকবার অনুমতি দিন। এখানে তো তার সুখও নেই, কর্মও নেই।

প্রতাপ। তার মাতার কাছে অনুমতি নিতে পার। [মন্ত্রীর প্রস্থান

মহিষী ও বিভার প্রবেশ

মহিষী। উদয় কি বেঁচে আছে।

প্রতাপ। ভয় নেই। বেঁচে আছে। তুমি এখানে যে ?

মহিষী। পারব কেন থাকতে। শুনলুম কারাগারে আগুন লেগেছে। উদয়, বাবা আমার, এখন ঘরে চল্।

উদয়। আমার ঘর নেই। আমি যাচ্ছি কাশী।

মহিষী। সে কী কথা। তা হলে আমাকে মেরে ফেলে যা।

উদয়। মা, এতদিনে তুমি কি ঠাউরেছ তোমার আশ্রয়েই ছেলে নিরাপদে থাকবে। আমার তো শিক্ষার আর কিছু বাকি নেই। আজ তোমাদেরই কল্যাণে বিশ্বনাথের আশ্রয় পেয়েছি। কারাগারের সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্য সব আশ্রয়ই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কেঁদে কী হবে মা, আজই চোখের জল মোছবার সময়।

বিভা। দাদা, আমাকে ফেলে যেতে পারবে না।

উদয়। কিছুতে না। (মাতার প্রতি) বিভারও তো আর জায়গা নেই— এখন তুমি অনুমতি করো, আমার সঙ্গে ওকেও অভয়-আশ্রয়ে নিয়ে যাই।

মহিষী। তুই যদি যাবি উদয়, তো ও যাক তোর সঙ্গে— তোর মায়ের হয়ে ওই তোকে দেখতে শুনতে পারবে। ইতিমধ্যে ওর শ্বশুরবাড়িতে খবর পাঠিয়ে দিই, যদি তারা—

প্রতাপ। চুপ করো, ওর আবার শ্বশুরবাড়ি কোথায়।

মহিষী। গর্ভে ধরে সংসারে কী দুঃখই এনেছি। রাজার বাড়িতে এরা জন্মেছিল এইজন্যেই ? এখন একবার বাড়িতে চল্— তার পরে—

উদয়। না মা, ও বাড়িতে আর নয়— রাস্তা বেয়ে সোজা চলে যাব, আমাদের পিছনে তাকাবার কিছুই নেই।

মহিষী। তোরা রাস্তায় বেরিয়ে যাবি, আর এই রাজবাড়ির অন্ন যে আমার বিষের মতো ঠেকবে।

উদয়। এখন আমাদের আশীর্বাদ করে বিদায় করো।

মহিষী। বুঝতে পারছি, তোদের দুঃখের দিন ঘুচল। এবার ঈশ্বর তোদের সুখেই রাখবেন। তবু দুর্বল মন মানে না যে। আজ থেকে মায়ের যোগা সেবা তোদের আর তো কিছু করতে পারব না, তোদের জন্যে যশোরেশ্বরীর কাছে রোজ পুজো দেব।

বিভা। দাদামহাশয় কোথায় দাদা।

উদয়। তিনি কাছেই কোথাও আছেন— এখনই দেখা হবে।

প্রতাপ। না, দেখা হবে না। কোনোদিন না।

উদয়। কেন, তাঁর কী হল ?

প্রতাপ। তাঁর বিচার বাকি আছে। সে-সব কথা তোমাদের ভাববার কথা নয়।

উদয়। না হতে পারে, কিন্তু এই বলে গেলুম মহারাজ, রাজ্য তো মাটির নয়, রাজ্য হল পুণ্যের— সে পুণ্য রাজাকে নিয়ে, প্রজাকে নিয়ে, সকলকে নিয়ে। বিভা, আর কাঁদিস নে। দাদামশায় তো মহাপুরুষ, ভয়ে তাঁর ভয় নেই, মৃত্যুতে তাঁর মৃত্যু নেই। আমাদের মতো সামান্য মানুষই ঘা খেয়ে মরে।

প্রতাপ। এখন এসো উদয়, কালীর মন্দিরে এসো, মায়ের পা ছুঁয়ে শপথ করতে হবে।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বরবেশে রামচন্দ্র

রমাই। আপনি তো চলে এলেন, এ দিকে যুবরাজ বাবাজি বিষম গোলে পড়লেন

মন্ত্রী। কিরকম হে রমাই।

রমাই। রাজার অভিপ্রায় ছিল, কন্যাটি বিধবা হলে হাতের নোয়া আর বালা দুগাছি বিক্রি করে রাজকোষে কিঞ্চিৎ অর্থাগম হয়। যুবরাজ তাতে ব্যাঘাত করাতে তম্বি কত।

মন্ত্রী। মহারাজ, শুনতে পাই প্রতাপাদিত্য আপসোসে সারা হচ্ছেন। এ দিকে একটু ইশারা করলেই নিজের খরচে এখনো মেয়েটিকে পৌঁছিয়ে দিতে রাজি।

রমাই। সেটা বিনি-খরচায় হতে পারে, কিন্তু ফিরে পাঠাবার খরচাটা মহারাজের নিজের গাঁট থেকে দিতে হবে।

মন্ত্রী। সে তো বটেই। বিবাহ করেছেন তাঁদের বাড়িতে, কিন্তু নিজের বাড়িতে আনবার বেলা তো বিচার করতে হয়। কী বল রমাই।

রমাই। সে তো বটেই। পাঁকে যদি মহারাজা পা দিয়ে থাকেন সে তো পাঁকের বাবার ভাগ্যি, তা বলে ঘরে ঢোকবার সময় পা ধুয়ে আসবেন না?

মন্ত্রী। বেশ বলেছ রমাই।

রমাই। মন্ত্রিবর, শুভকর্মে মহারাজের যশুরে শ্বশুরমশায়কে একখানা নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছে তো? কী জানি, মনে দুঃখ করতেও পারেন। [সকলের হাস্য

বরণ করবার জন্যে এয়োস্ত্রীদের মধ্যে শাশুড়ি-ঠাকরুনকেও ভুললে চলবে না। মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ, সেটাও চাই— অতএব সেখানে যখন মিষ্টান্ন পাঠানো হবে তখন সেই সঙ্গে দুচারছড়া কাঁচা রম্ভাও পাঠানো ভালো। কী বল মন্ত্রী।

মন্ত্রী। তার উপরে কথা। [উচ্চহাস্য

রমাই। আর দেখেন মহারাজ, যুবরাজকে একখানা পত্র লিখে জানাবেন যে, তোমাদের রাজত্ব রাজকন্যা তোমাদেরই থাক্, প্রজাপতির কৃপায় জগতে শালা-শ্বশুরের অভাব নেই। কী বলেন আপনারা। [সকলের উচ্চহাস্য

রামচন্দ্র। রমাই, তুমি যাও, লোকজনদের দেখো-গে। [রমাইয়ের প্রস্থান

সেনাপতি, তুমি এইখানে বোসো, রমাইয়ের হাসি আমার ভালো লাগছে না।

সেনাপতি ফর্নাণ্ডিজ। মহারাজ, রমাইয়ের হাসি গন্ধকের ধোঁয়ার মতো, তার ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসে।

রামচন্দ্র। ঠিক বলেছ সেনাপতি, আমার ইচ্ছে হচ্ছিল উঠে চলে যাই। আজ গান বাজনা ভালো জমছে না ফর্নাণ্ডিজ।

ফর্নাণ্ডিজ। না মহারাজ, জমছে না, আমার বুকে বাজছে— আর-এক দিনের কথা মনে পড়ছে।

রামচন্দ্র। গুজবটা কি সত্য।

ফর্নাণ্ডিজ। কিসের গুজব।

রামচন্দ্র। ওই তাঁরা কি যশোর থেকে আসছেন।

ফর্নাণ্ডিজ। হাঁ মহারাজ, শুনেছি বটে। আদেশ করেন তো তাঁদের এগিয়ে আনি-গে।

রামচন্দ্র। এগিয়ে আনবে? তা হলে কিন্তু মন্ত্রী রমাই সবাই হাসবে।

ফর্নাণ্ডিজ। আদেশ করেন তো ওদের হাসিসুদ্ধ মুখ একেবারে চেঁছে পরিষ্কার করে দিই।

রামচন্দ্র। না, না, গোলমাল করে কাজ নেই। কিন্তু সেনাপতি, আমি তোমাকে গোপনে বলছি, কাউকে বোলো না, আমি তাকে কিছুতে ভুলতে পারছি নে। কালই রাত্রে তাকে স্বপ্নে দেখেছি।

ফর্নাণ্ডিজ। মহারাজ, আমি আর কী বলব— তাঁর জন্যে প্রাণ দিলে যদি কোনো কাজেও না লাগে তবু দিতে ইচ্ছা হচ্ছে।

রামচন্দ্র। দেখো সেনাপতি, এক কাজ করলে হয় না?

ফর্নাণ্ডিজ। কী বলুন।

রামচন্দ্র। মোহন যদি একবার খবর পায় যে, তাঁরা আসছেন তা হলে সে আপনি ছুটে যাবে। একবার কোনোমতে তাকে সংবাদটা জানাও-না। কিন্তু দেখো, আমার নাম কোরো না।

ফর্নাণ্ডিজ। যে আজ্ঞা মহারাজ।

রমাইয়ের প্রবেশ

রমাই। মহারাজ, যশোর থেকে তো কেউ নিমন্ত্রণ রাখতে এল না। রাগ করলে-বা।

রামচন্দ্র। হা, হা, হা, হা।

রমাই। আপনার প্রথম পক্ষের শ্বশুর তো সেবার তাঁর কন্যার সিঁথির সিঁদুরের উপর হাত বুলাবার চেষ্টায় ছিলেন— এবারে তাঁকে—

রামমোহন দ্রুত আসিয়া

রামমোহন। চুপ। আর একটি কথা যদি কও তা হলে—

রমাই। বুঝেছি বাবা, আর বলতে হবে না।

রামমোহন। মহারাজ, হাসবেন না মহারাজ। আজকের দিনে অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু মহারাজার ওই হাসি সহ্য করতে পারছি নে।

রামচন্দ্র। ফের বেয়াদবি করছিস।

রামমোহন। আমার বেয়াদবি! বেয়াদবি কে করলে বুঝলে না!

ফর্নাণ্ডিজ। মোহন, একটা কথা আছে ভাই, একটু এ দিকে এসো।

[উভয়ের প্রস্থান

রামচন্দ্র। ওরা সব গান বন্ধ করে হাঁ করে বসে রইল কেন। ওদের একটু গাইতে বলো-না। আজ সব যেন কেমন ঝিমিয়ে পড়ছে। গান ধরো।

গান

চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে,
উছলে পড়ে আলো—
ও রজনীগন্ধা, তোমার
গন্ধসুধা ঢালো।
পাগল হাওয়া বুঝতে নারে
ডাক পড়েছে কোথায় তারে,
ফুলের বনে যার পাশে যায়
তারেই লাগে ভালো।
নীল গগনের ললাটখানি
চন্দনে আজ মাখা,
বাণীবনের হংসমিথুন
মেলেছে আজ পাখা।
পারিজাতের কেশর নিয়ে
ধরায়, শশি, ছড়াও কি এ।
ইন্দ্রপুরীর কোন্ রমণী
বাসরপ্রদীপ জ্বালো।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পথে

উদয়াদিত্য ও ধনঞ্জয়

ধনঞ্জয়। আজ রাস্তায় মিলন, আজ বড়ো আনন্দ। আজ আর ভণ্ডামির কোনো দরকার নেই, আজ আর যুবরাজ নয়। আজ তো তুমি ভাই। আয় ভাই, কোলাকুলি করে নিই। [কোলাকুলি

দাদা, যেখানে দীন দরিদ্র সবাই এসে মেলে সেই দরাজ জায়গাটাতে এসে দাঁড়িয়েছ, আজ আর কিছু ভাবনা নেই।

গান

সকল ভয়ের ভয় যে তারে
কোন্ বিপদে কাড়বে।
প্রাণের সঙ্গে যে প্রাণ গাঁথা
কোন্ কালে সে ছাড়বে।
নাহয় গেল সবই ভেসে—
রইবে তো সেই সর্বনেশে,
যে লাভ সকল ক্ষতির শেষে
সে লাভ কেবল বাড়বে।
সুখ নিয়ে ভাই, ভয়ে থাকি—
আছে আছে দেয় সে ফাঁকি,
দুঃখে যে সুখ থাকে বাকি
কেই বা সে সুখ নাড়বে।
যে পড়েছে পড়ার শেষে
ঠাঁই পেয়েছে তলায় এসে—
ভয় মিটেছে, বেঁচেছে সে,
তারে কে আর পাড়বে।

উদয়। বৈরাগী ঠাকুর, আমি তোমার সঙ্গ ধরলুম, আর ছাড়ছি নে কিন্তু।

ধনঞ্জয়। তুমি ছাড়লে আমি ছাড়ি কই ভাই। মনে বেশ আনন্দ আছে তো? খুঁতমুত কিছু নেই তো?

উদয়। কিছু না, বেশ আছি।

ধনঞ্জয়। তবে দাও একটু পায়ের ধুলো।

উদয়। ও কী কর, ও কী কর। অপরাধ হবে যে।

ধনঞ্জয়। দাদা, এতবড়ো বোঝা নিজের হাতে ভগবান যার কাঁধ থেকে নামিয়ে দেন, সে যে মহাপুরুষ। তোমাকে দেখে আমার সর্ব গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। একবার দিদিকে আনো, তাকে একবার দেখি।

উদয়। সে তোমাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে, তাকে ডেকে আনছি।

বিভার প্রবেশ ও বৈরাগীকে প্রণাম

ধনঞ্জয়। ভয় নেই দিদি, ভয় নেই, কোনো ভয় নেই। এই দেখ্-না, আমাকে দেখ্-না— আমি তাঁর রাস্তার ছেলে— রাস্তার কোলে-কোলেই দিন কেটে গেল— দিনরাত্রি একেবারে ধুলোয় ধুলোময় হয়ে বেড়াই, মায়ের আদরে লাল হয়ে উঠি। আমার মায়ের ওই ধুলোঘরে আজ তোমার নতুন নিমন্ত্রণ, কিন্তু মনে কোনো ভয় রেখো না।

বিভা। বৈরাগী ঠাকুর, তুমি কোথায় যাচ্ছ। তুমি কি আমাদের সঙ্গে যাবে।

ধনঞ্জয়। কোথায় যাব সে কথা আমার মনেই থাকে না। ওই রাস্তাই তো আমাকে মজিয়েছে। এই মাটি দেখলে আমাকে মাটি করে দেয়।

গান

সারিগানের সুর

গ্রামছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ
আমার মন ভুলায় রে।
ওরে কার পানে মন হাত বাড়িয়ে
লুটিয়ে যায় ধুলায় রে।
ও যে আমায় ঘরের বাহির করে,
পায়ে পায়ে পায়ে ধরে—
ও যে কেড়ে আমায় নিয়ে যায় রে
যায় রে কোন্ চুলায় রে।
ও যে কোন্ বাঁকে কী ধন দেখাবে,
কোন্‌খানে কী দায় ঠেকাবে,
কোথায় গিয়ে শেষ মেলে যে—
ভেবেই না কুলায় রে।

উদয়। ঠাকুর, তুমি কি ভাবছ বিভা আমার পথের সঙ্গিনী। ওকে আমি ওর শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দিতে যাচ্ছি।

ধনঞ্জয়। বেশ, বেশ, হরি যেখানে নিয়ে যান সেইখানেই ভালো। দেখি তিনি কোন্‌খানে পৌঁছিয়ে দেন, আমিও সঙ্গে আছি। কোনো ভয় নেই দিদি, কোনো ভয় নেই। [প্রস্থান

বিভা। দাদা, ওই-যে মোহন আসছে। ওর সঙ্গে আমি একটু আলাদা কথা কইতে চাই।

উদয়। আচ্ছা, আমি একটু সরে যাচ্ছি। [প্রস্থান

রামমোহনের প্রবেশ

বিভা। মোহন!

রামমোহন। মা, আজ তুমি এলে?

বিভা। হাঁ মোহন, তুই কি আমায় নিতে এলি।

রামমোহন। না মা, অত ব্যস্ত হোয়ো না, আজ থাক্‌।

বিভা। কেন মোহন, আজ কেন নয়।

রামমোহন। আজ দিন ভালো নয় যে মা, আজ দিন ভালো নয়।

বিভা। ভালো দিন নয়? তবে আজ এত উৎসবের আয়োজন কেন। বরাবর দেখলুম রাস্তায় আলোর মালা, বাঁশি বাজছে। আজ বুঝি শুভলগ্ন পড়েছে।

রামমোহন। শুভলগ্ন, মিথ্যা কথা! সমস্ত ভুল!

বিভা। মোহন, তোর কথা আমি বুঝতে পারছি নে, কী হয়েছে আমাকে সত্যি করে বল্‌। মহারাজ কি রাগ করেছেন?

রামমোহন। রাগ করেছেন বই-কি।

বিভা। তিনি তো আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

রামমোহন। দেরি হয়ে গেছে মা, দেরি হয়ে গেছে। অনেক দেরি হয়ে গেছে। সময় গেলে আর ফেরে না।

বিভা। কে বললে ফেরে না। আমি তপস্যা করে ফেরাব, আমি জীবন মন দিয়ে ফেরাব। মোহন, এখনই তুই আমাকে নিয়ে যা। দেরি যদি হয়ে থাকে, আর এক মুহূর্ত দেরি করব না।

রামমোহন। যুবরাজ কোথায় গেছেন?

বিভা। তিনি এখনই আসবেন।

রামমোহন। তিনি ফিরে আসুন-না।

বিভা। না মোহন, আর বিলম্ব নয়। তিনি কি খবর পেয়েছেন আমি এসেছি। দাদা বললেন, তিনি নৌকার ছাত থেকে দেখেছেন ময়ূরপংখি সাজানো হচ্ছে।

রামমোহন। হাঁ, সাজানো হচ্ছে বটে—

বিভা। এখনো কি সাজানো শেষ হয় নি।

রামমোহন। ওই ময়ূরপংখির সাজসজ্জায় আগুন লাগুক।

বিভা। মোহন, তোর মুখে এ কী কথা! তুই যখন আনতে গেলি আসতে পারি নি বলে এত রাগ করেছিস? তুইও আমার দুঃখ বুঝতে পারিস নি মোহন?

[রামমোহন নিরুত্তর

এই দেখ্, তোর দেওয়া সেই শাঁখাজোড়া পরে এসেছি— আজকের দিনে তুই আমার উপর রাগ করিস নে।

রামমোহন। আমাকে আর দগ্ধ কোরো না। মিথ্যে দিয়ে তোমার কাছে আর চাপা দিতে পারলুম না। মা জননি, এ রাজ্যের লক্ষ্মী তুমি, কিন্তু এ রাজ্যে তোমার আজ আর স্থান নেই। চলো মা, তুমি ফিরে চলো— তোমার এই পাদপদ্মের দাস, এই অধম সন্তান তোমার সঙ্গে যাবে।

বিভা। মোহন, যা তোর বলবার আছে সব তুই বল্। আমি যে কত দুঃখ সইতে পারি তা কি তুই জানিস নে?

রামমোহন। সন্তান যখন ডাকতে গেল তখন কেন এলি নে— তখন কেন এলি নে — আমার পোড়া কপাল, তোকে কেন আনতে পারলুম না।

বিভা। ওরে মোহন, জগতে এমন কোনো সুখ নেই যার লোভে আমি সেদিন দাদাকে ফেলে আসতে পারতুম— এতে আমার কপালে যা থাকে তাই হবে।

রামমোহন। তবে শোন্ মা, সেই ময়ূরপংখি তোর জন্যে নয়।

বিভা। নাই হল মোহন, দুঃখ কিসের। আমি হেঁটে চলে যাব।

রামমোহন। যাবি কোথায়। সেখানে যে আজ আর-এক রানী আসছে।

বিভা। আর-এক রানী!

রামমোহন। হাঁ, আর-এক রানী। আজ মহারাজের বিবাহ।

বিভা। ওঃ— আজ বিবাহের লগ্ন!

রামমোহন। এক বিবাহের লগ্নে মহারাজ তোমাদের ঘরে গিয়েছিলেন— আজ কোন্ বিবাহের লগ্নে তুমি তাঁর ঘরের সামনে এসে পৌঁছলে। আর, আমার এমন কপাল আজ আমি বেঁচে আছি। চল্ মা, ফিরে চল্, আর এক দণ্ড নয়— ওই বাঁশি আমার

কানে বিষ ঢালছে। ওরে, আর-একদিন কী বাঁশি শুনেছিলুম, সেই কথা মনে পড়ছে। চল্ চল্, ফিরে চল্। অমন চুপ করে বসে রইলে কেন মা? কেমন করে যে কাঁদতে হয় তাও কি একেবারে ভুলে গেছ।

বিভা। মোহন, আমার একটি কথা রাখতে হবে।

রামমোহন। কী কথা।

বিভা। আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে। যদি না যাস আমি একলা যাব।

রামমোহন। সে আজ ময়ূরপংখিতে চড়বে, আর তুমি আজ হেঁটে যাবে?

বিভা। হেঁটে যাওয়াই আমাকে সাজে— আমি হেঁটেই যাব। তুই সঙ্গে যাবি নে?

রামমোহন। আমি সঙ্গে যাব না, তো কে যাবে। কিন্তু মা, সে সভায় আজ তুমি কিসের জন্যে যাবে।

বিভা। তা বটে, কেন যাব। মোহন, আমাকে দুঃখ সইতে হবে সে কথাটা হঠাৎ আমি ভুলে গিয়েছিলুম— ভেবেছিলুম, যা ভোগ হবার তা বুঝি হয়ে চুকে গেছে।

রামমোহন। কেন মা, তুমি সতীলক্ষ্মী, তুমি দুঃখ কেন পাও।

বিভা। মোহন, সেদিন অপরাধ যে সত্যি হয়েছিল। সে অপরাধের শাস্তি না হয়ে তো মিটবে না, সে শাস্তি আমিই নিলুম— প্রায়শ্চিত্ত আমাকে দিয়েই হবে।

রামমোহন। মা, তোমার পিতার হাতের আঘাত সেও তুমিই মাথায় করে নিয়েছ, আবার তোমার স্বামীর হাতের আঘাত সেও তুমিই নিলে। কিন্তু আমি বলছি মা, সকলের চেয়ে বড়ো দণ্ড পেলে তোমার স্বামী। সে আজ দ্বারের কাছ থেকেও তোমাকে হারালো।

উদয়াদিত্যের প্রবেশ

উদয়। ওরে বিভা!

বিভা। দাদা, সব জানি। কিছু ভেবো না।

উদয়। এখন কী করবি বোন।

বিভা। ভেবেছিলুম রাজবাড়িতে একবার যাব, কিন্তু যাব না।

রামমোহন। মা, যেয়ো না, যেয়ো না। গেলে তোমার অপমান হত— সেই অপমানে তোমার স্বামীর পাপ আরো বাড়ত।

বিভা। আমার মান-অপমান সব চুকে গেছে। কিন্তু দাদার অপমান হত যে। দাদা, এবার নৌকা ফেরাও।

উদয়। তুই কোথায় যাবি বিভা।

বিভা। তোমার সঙ্গে কাশী যাব। আমি আজ মুক্তি পেয়েছি। এখন তোমার চরণসেবা করে আমার জীবন আনন্দে কাটবে। মোহন, তুই তোর প্রভুর কাছে ফিরে যা।

রামমোহন। ওই দেখো মা, ফেরবার পথে আগুন লেগেছে, ওই-যে ময়ুরপংখি চলেছে। ও পথ আমার পথ নয়।

ধনঞ্জয়ের প্রবেশ

বিভা। বৈরাগী ঠাকুর!

ধনঞ্জয়। কেন দিদি।

বিভা। আমাকে তোমাদের সঙ্গ দিয়ো ঠাকুর।

উদয়। ঠাকুর, শেষকালে বিভাকেও আমাদের পথ নিতে হল!

ধনঞ্জয়। সে তো বেশ কথা। দয়াময় হরি! কী আনন্দ, তোমার এ কী আনন্দ! ছাড় না, কিছুতেই ছাড় না। শ্বশুরবাড়ির রাস্তার ধারেও ডাকাতের মতো বসে আছে। দিদি, এই মাঝরাস্তায় আমাদের পাগল প্রভুর তলব পড়েছে। একেবারে জোর তলব। চল্ চল্। চল্ চল্। পা ফেলে চল্। খুশি হয়ে চল্। হাসতে হাসতে চল্। রাস্তা এমন করে পরিষ্কার করে দিয়েছে— আর ভয় কিসের।

গীত

আমি ফিরব না রে, ফিরব না আর ফিরব না রে—
এখন হাওয়ার মুখে ভাসল তরী,
কূলে ভিড়ব না আর ভিড়ব না রে।
ছড়িয়ে গেছে সুতো ছিঁড়ে,
তাই খুঁটে আজ মরব কি রে।
এখন ভাঙা ঘরের কুড়িয়ে খুঁটি
বেড়া ঘিরব না আর ঘিরব না রে।
ঘাটের রসি গেছে কেটে,
কাঁদব কি তাই বক্ষ ফেটে?
এখন পালের রসি ধরব কসি,
এ রসি ছিঁড়ব না আর ছিঁড়ব না রে।

উপন্যাস ও গল্প

গল্পগুচ্ছ

গল্পগুচ্ছ

মানভঞ্জন

প্রথম পরিচ্ছেদ

রমানাথ শীলের ত্রিতল অট্টালিকায় সর্বোচ্চ তলের ঘরে গোপীনাথ শীলের স্ত্রী গিরিবালা বাস করে। শয়নকক্ষের দক্ষিণ দ্বারের সম্মুখে ফুলের টবে গুটিকতক বেলফুল এবং গোলাপফুলের গাছ; ছাতটি উচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘেরা— বহির্দৃশ্য দেখিবার জন্য প্রাচীরের মাঝে মাঝে একটি করিয়া ইট ফাঁক দেওয়া আছে। শোবার ঘরে নানা বেশ এবং বিবেশ-বিশিষ্ট বিলাতি নারীমূর্তির বাঁধানো এন্‌গ্রেভিং টাঙানো রহিয়াছে; কিন্তু প্রবেশদ্বারের সম্মুখবর্তী বৃহৎ আয়নার উপরে ষোড়শী গৃহস্বামিনীর যে প্রতিবিম্বটি পড়ে তাহা দেয়ালের কোনো ছবি অপেক্ষা সৌন্দর্যে ন্যূন নহে।

গিরিবালার সৌন্দর্য অকস্মাৎ আলোকরশ্মির ন্যায়, বিস্ময়ের ন্যায়, নিদ্রাভঙ্গে চেতনার ন্যায়, একেবারে চকিতে আসিয়া আঘাত করে এবং এক আঘাতে অভিভূত করিয়া দিতে পারে। তাহাকে দেখিলে মনে হয়, ইহাকে দেখিবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না; চারি দিকে এবং চিরকাল যেরূপ দেখিয়া আসিতেছি এ একেবারে হঠাৎ তাহা হইতে অনেক স্বতন্ত্র।

গিরিবালাও আপন লাবণ্যোচ্ছ্বাসে আপনি আদ্যোপান্ত তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছে। মদের ফেনা যেমন পাত্র ছাপিয়া পড়িয়া যায়, নবযৌবন এবং নবীন সৌন্দর্য তাহার সর্বাঙ্গে তেমনি ছাপিয়া পড়িয়া যাইতেছে। তাহার বসনে ভূষণে গমনে, তাহার বাহুর বিক্ষেপে, তাহার গ্রীবার ভঙ্গীতে, তাহার চঞ্চল চরণের উদ্দাম ছন্দে, নূপুরনিক্কণে, কঙ্কণের কিঙ্কিণীতে, তরল হাস্যে, ক্ষিপ্র ভাষায়, উজ্জ্বল কটাক্ষে, একেবারে উচ্ছৃঙ্খল ভাবে উদ্‌বেলিত হইয়া উঠিতেছে।

আপন সর্বাঙ্গের এই উচ্ছলিত মদির রসে গিরিবালার একটা নেশা লাগিয়াছে। প্রায় দেখা যাইত, একখানি কোমল রঙিন বস্ত্রে আপনার পরিপূর্ণ দেহখানি জড়াইয়া

সে ছাদের উপরে অকারণে চঞ্চল হইয়া বেড়াইতেছে। যেন মনের ভিতরকার কোনো এক অশ্রুত অব্যক্ত সংগীতের তালে তালে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নৃত্য করিতে চাহিতেছে। আপনার অঙ্গকে নানা ভঙ্গীতে উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত প্রক্ষিপ্ত করিয়া তাহার যেন বিশেষ কী এক আনন্দ আছে; সে যেন আপন সৌন্দর্যের নানা দিকে নানা ঢেউ তুলিয়া দিয়া সর্বাঙ্গের উত্তপ্ত রক্তস্রোতে অপূর্ব পুলক-সহকারে বিচিত্র আঘাতপ্রতিঘাত অনুভব করিতে থাকে। সে হঠাৎ গাছ হইতে পাতা ছিঁড়িয়া দক্ষিণ বাহু আকাশে তুলিয়া সেটা বাতাসে উড়াইয়া দেয়— অমনি তাহার বালা বাজিয়া উঠে, তাহার অঞ্চল বিস্রস্ত হইয়া পড়ে, তাহার সুললিত বাহুর ভঙ্গীটি পিঞ্জরমুক্ত অদৃশ্য পাখির মতো অনন্ত আকাশের মেঘরাজ্যের অভিমুখে উড়িয়া চলিয়া যায়। হঠাৎ সে টব হইতে একটা মাটির ঢেলা তুলিয়া অকারণে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়; চরণাঙ্গুলির উপর ভর দিয়া উচ্চ হইয়া দাঁড়াইয়া প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া বৃহৎ বহির্জগৎটা একবার চট করিয়া দেখিয়া লয় —আবার ঘুরিয়া আঁচল ঘুরাইয়া চলিয়া আসে, আঁচলের চাবির গোচ্ছা ঝিন্ ঝিন্ করিয়া বাজিয়া উঠে। হয়তো আয়নার সম্মুখে গিয়া খোঁপা খুলিয়া ফেলিয়া অসময়ে চুল বাঁধিতে বসে; চুল বাঁধিবার দড়ি দিয়া কেশমূল বেষ্টন করিয়া সেই দড়ি কুন্দদন্তপংক্তিতে দংশন করিয়া ধরে, দুই বাহু উর্ধ্বে তুলিয়া মস্তকের পশ্চাতে বেণীগুলিকে দৃঢ় আকর্ষণে কুণ্ডলায়িত করে— চুল বাঁধা শেষ করিয়া হাতের সমস্ত কাজ ফুরাইয়া যায়— তখন সে আলস্যভরে কোমল বিছানার উপরে আপনাকে পত্রান্তরালচ্যুত একটি জ্যোৎস্নালেখার মতো বিস্তীর্ণ করিয়া দেয়।

তাহার সন্তানাদি নাই, ধনিগৃহে তাহার কোনো কাজকর্মও নাই— সে কেবল নির্জনে প্রতিদিন আপনার মধ্যে আপনি সঞ্চিত হইয়া শেষকালে আপনাকে আর ধারণ করিয়া রাখিতে পারিতেছে না। স্বামী আছে, কিন্তু স্বামী তাহার আয়ত্তের মধ্যে নাই। গিরিবালা বাল্যকাল হইতে যৌবনে এমন পূর্ণবিকশিত হইয়া উঠিয়াও কেমন করিয়া তাহার স্বামীর চক্ষু এড়াইয়া গেছে।

বরঞ্চ বাল্যকালে সে তাহার স্বামীর আদর পাইয়াছিল। স্বামী তখন ইস্কুল পালাইয়া তাহার সুপ্ত অভিভাবকদিগকে বঞ্চনা করিয়া নির্জন মধ্যাহ্নে তাহার বালিকা স্ত্রীর সহিত প্রণয়ালাপ করিতে আসিত। এক বাড়িতে থাকিয়াও শৌখিন চিঠির কাগজে স্ত্রীর সহিত চিঠিপত্র লেখালেখি করিত। ইস্কুলের বিশেষ বন্ধুদিগকে সেই-সমস্ত চিঠি দেখাইয়া গর্ব অনুভব করিত। তুচ্ছ এবং কল্পিত কারণে স্ত্রীর সহিত মান-অভিমানেরও অসদ্ভাব ছিল না।

এমন সময়ে বাপের মৃত্যুতে গোপীনাথ স্বয়ং বাড়ির কর্তা হইয়া উঠিল। কাঁচা

কাঠের তক্তায় শীঘ্র পোকা ধরে— কাঁচা বয়সে গোপীনাথ যখন স্বাধীন হইয়া উঠিল তখন অনেকগুলি জীবজন্তু তাহার স্কন্ধে বাসা করিল। তখন ক্রমে অন্তঃপুরে তাহার গতিবিধি হ্রাস হইয়া অন্যত্র প্রসারিত হইতে লাগিল।

দলপতিত্বের একটা উত্তেজনা আছে, মানুষের কাছে মানুষের নেশাটা অত্যন্ত বেশি। অসংখ্য মনুষ্যজীবন এবং সুবিস্তীর্ণ ইতিহাসের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করিবার প্রতি নেপোলিয়নের যে একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল—একটি ছোটো বৈঠকখানার ছোটো কর্তাটিরও নিজের ক্ষুদ্র দলের নেশা অল্পতর পরিমাণে সেই এক-জাতীয়। সামান্য ইয়ার্কিবন্ধনে আপনার চারি দিকে একটা লক্ষ্মীছাড়া ইয়ার-মণ্ডলী সৃজন করিয়া তুলিলে তাহাদের উপর আধিপত্য এবং তাহাদের নিকট হইতে বাহবা লাভ করা একটা প্রচণ্ড উত্তেজনার কারণ হইয়া দাঁড়ায়; সেজন্য অনেক লোক বিষয়-নাশ, ঋণ, কলঙ্ক সমস্তই স্বীকার করিতে প্রস্তুত হয়।

গোপীনাথ তাহার ইয়ার-সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ হইয়া ভারি মাতিয়া উঠিল। সে প্রতিদিন ইয়ার্কির নব নব কীর্তি, নব নব গৌরবলাভ করিতে লাগিল। তাহার দলের লোক বলিতে লাগিল— শ্যালকবর্গের মধ্যে ইয়ার্কিতে অদ্বিতীয় খ্যাতিলাভ করিল গোপীনাথ। সেই গর্বে সেই উত্তেজনায় অন্যান্য সমস্ত সুখদুঃখকর্তব্যের প্রতি অন্ধ হইয়া হতভাগ্য ব্যক্তিটি রাত্রিদিন আবর্তের মতো পাক খাইয়া খাইয়া বেড়াইতে লাগিল।

এ দিকে জগজ্জয়ী রূপ লইয়া আপন অন্তঃপুরের প্রজাহীন রাজ্যে, শয়নগৃহের শূন্য সিংহাসনে গিরিবালা অধিষ্ঠান করিতে লাগিল। সে নিজে জানিত, বিধাতা তাহার হস্তে রাজদণ্ড দিয়াছেন— সে জানিত, প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া যে বৃহৎ জগৎখানি দেখা যাইতেছে সেই জগৎটিকে সে কটাক্ষে জয় করিয়া আসিতে পারে— অথচ বিশ্বসংসারের মধ্যে একটি মানুষকেও সে বন্দী করিতে পারে নাই।

গিরিবালার একটি সুরসিকা দাসী আছে, তাহার নাম সুধো, অর্থাৎ সুধামুখী; সে গান গাহিত, নাচিত, ছড়া কাটিত, প্রভুপত্নীর রূপের ব্যাখ্যা করিত, এবং অরসিকের হস্তে এমন রূপ নিষ্ফল হইল বলিয়া আক্ষেপ করিত। গিরিবালার যখন-তখন এই সুধোকে নহিলে চলিত না। উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া সে নিজের মুখের শ্রী, দেহের গঠন, বর্ণের উজ্জ্বলতা সম্বন্ধে বিস্তৃত সমালোচনা শুনিত; মাঝে মাঝে তাহার প্রতিবাদ করিত এবং পরম পুলকিত চিত্তে সুধোকে মিথ্যাবাদিনী চাটুভাষিণী বলিয়া গঞ্জনা করিতে ছাড়িত না। সুধো তখন শত শত শপথ সহকারে নিজের মতের অকৃত্রিমতা প্রমাণ করিতে বসিত, গিরিবালার পক্ষে তাহা বিশ্বাস করা নিতান্ত কঠিন হইত না।

VISVA-BHARATI

সুধো গিরিবালাকে গান শুনাইত—"দাসখত দিলাম লিখে শ্রীচরণে" ; এই গানের মধ্যে গিরিবালা নিজের অলক্তাঙ্কিত অনিন্দ্যসুন্দর চরণপল্লবের স্তব শুনিতে পাইত এবং একটি পদলুণ্ঠিত দাসের ছবি তাহার কল্পনায় উদিত হইত—কিন্তু হায়, দুটি শ্রীচরণ মলের শব্দে শূন্য ছাতের উপরে আপন জয়গান ঝংকৃত করিয়া বেড়ায়, তবু কোনো স্বেচ্ছাবিক্রীত ভক্ত আসিয়া দাসখত লিখিয়া দিয়া যায় না।

গোপীনাথ যাহাকে দাসখত লিখিয়া দিয়াছে তাহার নাম লবঙ্গ—সে থিয়েটারে অভিনয় করে—সে স্টেজের উপর চমৎকার মূর্ছা যাইতে পারে—সে যখন সানুনাসিক কৃত্রিম কাঁদুনির স্বরে হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া টানিয়া টানিয়া আধ-আধ উচ্চারণে "প্রাণনাথ" "প্রাণেশ্বর" করিয়া ডাক ছাড়িতে থাকে তখন পাতলা ধুতির উপর ওয়েস্ট্‌কোট পরা, ফুলমোজামণ্ডিত দর্শকমণ্ডলী "এক্সেলেন্ট্" "এক্সেলেন্ট্" করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

এই অভিনেত্রী লবঙ্গের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার বর্ণনা গিরিবালা ইতিপূর্বে অনেকবার তাহার স্বামীর মুখেই শুনিয়াছে। তখনো তাহার স্বামী সম্পূর্ণরূপে পলাতক হয় নাই। তখন সে তাহার স্বামীর মোহাবস্থা না জানিয়াও মনে মনে অসূয়া অনুভব করিত। আর-কোনো নারীর এমন কোনো মনোরঞ্জিনী বিদ্যা আছে যাহা তাহার নাই ইহা সে সহ্য করিতে পারিত না। সাসূয় কৌতূহলে সে অনেকবার থিয়েটার দেখিতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিত, কিন্তু কিছুতেই স্বামীর মত করিতে পারিত না।

অবশেষে সে একদিন টাকা দিয়া সুধোকে থিয়েটার দেখিতে পাঠাইয়া দিল ; সুধো আসিয়া নাসা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রামনাম-উচ্চারণ-পূর্বক অভিনেত্রীদিগের ললাট-দেশে সম্মার্জনীর ব্যবস্থা করিল—এবং তাহাদের কদর্য মূর্তি ও কৃত্রিম ভঙ্গিতে যে-সমস্ত পুরুষের অভিরুচি জন্মে তাহাদের সম্বন্ধেও সেই একই রূপ বিধান স্থির করিল। শুনিয়া গিরিবালা বিশেষ আশ্বস্ত হইল।

কিন্তু যখন তাহার স্বামী বন্ধন ছিন্ন করিয়া গেল তখন তাহার মনে সংশয় উপস্থিত হইল। সুধোর কথায় অবিশ্বাস প্রকাশ করিলে সুধো গিরির গা ছুঁইয়া বারম্বার কহিল, বস্ত্রখণ্ডাবৃত দগ্ধকাষ্ঠের মতো তাহার নীরস এবং কুৎসিত চেহারা। গিরি তাহার আকর্ষণী শক্তির কোনো কারণ নির্ণয় করিতে পারিল না এবং নিজের অভিমানে সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া জ্বলিতে লাগিল।

অবশেষে একদিন সন্ধ্যাবেলায় সুধোকে লইয়া গোপনে থিয়েটার দেখিতে গেল। নিষিদ্ধ কাজের উত্তেজনা বেশি। তাহার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে যে-এক মৃদু কম্পন উপস্থিত হইয়াছিল সেই কম্পনাবেগে এই আলোকময়, লোকময়, বাদ্যসংগীতমুখরিত, দৃশ্যপট-শোভিত রঙ্গভূমি তাহার চক্ষে দ্বিগুণ অপরূপতা ধারণ করিল। তাহার সেই প্রাচীর-

বেষ্টিত নির্জন নিরানন্দ অন্তঃপুর হইতে এ কোন্ এক সুসজ্জিত সুন্দর উৎসবলোকের প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। সমস্ত স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

সেদিন 'মানভঞ্জন' অপেরা অভিনয় হইতেছে। কখন ঘণ্টা বাজিল, বাদ্য থামিয়া গেল, চঞ্চল দর্শকগণ মুহূর্তে স্থির নিস্তব্ধ হইয়া বসিল, রঙ্গমঞ্চের সম্মুখবর্তী আলোকমালা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল, পট উঠিয়া গেল, একদল সুসজ্জিত নটী ব্রজাঙ্গনা সাজিয়া সংগীতসহযোগে নৃত্য করিতে লাগিল, দর্শকগণের করতালি ও প্রশংসাবাদে নাট্যশালা থাকিয়া থাকিয়া ধ্বনিত কম্পিত হইয়া উঠিল, তখন গিরিবালার তরুণ দেহের রক্তলহরী উন্মাদনায় আলোড়িত হইতে লাগিল। সেই সংগীতের তানে, আলোক ও আভরণের ছটায়, এবং সম্মিলিত প্রশংসাধ্বনিতে সে ক্ষণকালের জন্য সমাজ সংসার সমস্তই বিস্মৃত হইয়া গেল; মনে করিল, এমন এক জায়গায় আসিয়াছে যেখানে বন্ধনমুক্ত সৌন্দর্যপূর্ণ স্বাধীনতার কোনো বাধামাত্র নাই।

সুধো মাঝে মাঝে আসিয়া ভীতস্বরে কানে কানে বলে, "বউঠাকরুন, এই বেলা বাড়ি ফিরিয়া চলো; দাদাবাবু জানিতে পারিলে রক্ষা থাকিবে না।" গিরিবালা সে কথায় কর্ণপাত করে না। তাহার মনে এখন আর কিছুমাত্র ভয় নাই।

অভিনয় অনেক দূর অগ্রসর হইল। রাধার দুর্জয় মান হইয়াছে; সে মানসাগরে কৃষ্ণ আর কিছুতেই থই পাইতেছে না; কত অনুনয়বিনয় সাধাসাধি কাঁদাকাঁদি, কিছুতেই কিছু হয় না। তখন গর্বভরে গিরিবালার বক্ষ ফুলিতে লাগিল। কৃষ্ণের এই লাঞ্ছনায় সে যেন মনে মনে রাধা হইয়া নিজের অসীম প্রতাপ নিজে অনুভব করিতে লাগিল। কেহ তাহাকে কখনো এমন করিয়া সাধে নাই; সে অবহেলিত অবমানিত পরিত্যক্ত স্ত্রী, কিন্তু তবু সে এক অপূর্ব মোহে স্থির করিল যে, এমন করিয়া নিষ্ঠুরভাবে কাঁদাইবার ক্ষমতা তাহারও আছে। সৌন্দর্যের যে কেমন দোর্দণ্ড প্রতাপ তাহা সে কানে শুনিয়াছে, অনুমান করিয়াছে মাত্র— আজ দীপের আলোকে, গানের সুরে, সুদৃশ্য রঙ্গমঞ্চের উপরে তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিল। নেশায় তাহার সমস্ত মস্তিষ্ক ভরিয়া উঠিল।

অবশেষে যবনিকাপতন হইল, গ্যাসের আলো ম্লান হইয়া আসিল, দর্শকগণ প্রস্থানের উপক্রম করিল; গিরিবালা মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসিয়া রহিল। এখান হইতে উঠিয়া যে বাড়ি যাইতে হইবে এ কথা তাহার মনে ছিল না। সে ভাবিতেছিল অভিনয় বুঝি ফুরাইবে না, যবনিকা আবার উঠিবে। রাধিকার নিকট শ্রীকৃষ্ণের পরাভব, জগতে ইহা ছাড়া আর কোনো বিষয় উপস্থিত নাই। সুধো কহিল, "বউঠাকরুন, করো কী, ওঠো, এখনই সমস্ত আলো নিবাইয়া দিবে।"

গিরিবালা গভীর রাত্রে আপন শয়নকক্ষে ফিরিয়া আসিল। কোণে একটি দীপ মিট্‌মিট্‌ করিতেছে— ঘরে একটি লোক নাই, শব্দ নাই— গৃহপ্রান্তে নির্জন শয্যার উপরে একটি পুরাতন মশারি বাতাসে অল্প অল্প দুলিতেছে; তাহার প্রতিদিনের জগৎ অত্যন্ত বিশ্রী বিরস এবং তুচ্ছ বলিয়া ঠেকিতে লাগিল। কোথায় সেই সৌন্দর্যময় আলোকময় সংগীতময় রাজ্য— যেখানে সে আপনার সমস্ত মহিমা বিকীর্ণ করিয়া দিয়া জগতের কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করিতে পারে— যেখানে সে অজ্ঞাত অবজ্ঞাত তুচ্ছ সাধারণ নারীমাত্র নহে।

এখন হইতে সে প্রতি সপ্তাহেই থিয়েটারে যাইতে আরম্ভ করিল। কালক্রমে, তাহার সেই প্রথম মোহ অনেকটা পরিমাণে হ্রাস হইয়া আসিল— এখন সে নটনটীদের মুখের রঙচঙ, সৌন্দর্যের অভাব, অভিনয়ের কৃত্রিমতা সমস্ত দেখিতে পাইল। কিন্তু তবু তাহার নেশা ছুটিল না। রণসংগীত শুনিলে যোদ্ধার হৃদয় যেমন নাচিয়া উঠে, রঙ্গমঞ্চের পট উঠিয়া গেলেই তাহার বক্ষের মধ্যে সেইরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইত। ঐ যে সমস্ত সংসার হইতে স্বতন্ত্র সুদৃশ্য সমুচ্চ সুন্দর বেদিকা স্বর্ণলেখায় অঙ্কিত, চিত্রপটে সজ্জিত, কাব্য এবং সংগীতের ইন্দ্রজালে মায়ামণ্ডিত, অসংখ্য মুগ্ধদৃষ্টির দ্বারা আক্রান্ত, নেপথ্যভূমির গোপনতার দ্বারা অপূর্বরহস্যপ্রাপ্ত, উজ্জ্বল আলোকমালায় সর্বসমক্ষে সুপ্রকাশিত— বিশ্ববিজয়িনী সৌন্দর্যরাজ্ঞীর পক্ষে এমন মায়াসিংহাসন আর কোথায় আছে।

প্রথমে যেদিন সে তাহার স্বামীকে রঙ্গভূমিতে উপস্থিত দেখিল, এবং যখন গোপীনাথ কোনো নটীর অভিনয়ে উন্মত্ত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন স্বামীর প্রতি তাহার মনে প্রবল অবজ্ঞার উদয় হইল। সে জর্জরিত চিত্তে মনে করিল, যদি কখনো এমন দিন আসে যে, তাহার স্বামী তাহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া দগ্ধপক্ষ পতঙ্গের মতো তাহার পদতলে আসিয়া পড়ে, এবং সে আপন চরণনখরের প্রান্ত হইতে উপেক্ষা বিকীর্ণ করিয়া দিয়া অভিমানভরে চলিয়া যাইতে পারে, তবেই তাহার এই ব্যর্থ রূপ ব্যর্থ যৌবন সার্থকতা লাভ করিবে।

কিন্তু সে শুভদিন আসিল কই। আজকাল গোপীনাথের দর্শন পাওয়াই দুর্লভ হইয়াছে। সে আপন প্রমত্ততার ঝড়ের মুখে ধূলি-ধ্বজের মতো একটা দল পাকাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহার আর ঠিকানা নাই।

একদিন চৈত্রমাসের বাসন্তী পূর্ণিমায় গিরিবালা বসন্তীরঙের কাপড় পরিয়া দক্ষিণ বাতাসে অঞ্চল উড়াইয়া ছাদের উপর বসিয়া ছিল। যদিও ঘরে স্বামী আসে না তবু গিরি উলটিয়া পালটিয়া প্রতিদিন বদল করিয়া নূতন নূতন গহনায় আপনাকে সুসজ্জিত করিয়া তুলিত। হীরামুক্তার আভরণ তাহার অঙ্গে প্রত্যঙ্গে একটি উন্মাদনা সঞ্চার

করিত— ঝল্‌মল্‌ করিয়া, রুনুঝুনু বাজিয়া তাহার চারি দিকে একটি হিল্লোল তুলিতে থাকিত। আজ সে হাতে বাজুবন্ধ এবং গলায় একটি চুনি ও মুক্তার কণ্ঠী পরিয়াছে এবং বামহস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে একটি নীলার আংটি দিয়াছে। সুধো পায়ের কাছে বসিয়া মাঝে মাঝে তাহার নিটোল কোমল রক্তোৎপলপদপল্লবে হাত বুলাইতেছিল, এবং অকৃত্রিম উচ্ছ্বাসের সহিত বলিতেছিল, "আহা বউঠাকরুন, আমি যদি পুরুষমানুষ হইতাম, তাহা হইলে এই পা দুখানি বুকে লইয়া মরিতাম।" গিরিবালা সগর্বে হাসিয়া উত্তর দিতেছিল, "বোধ করি বুকে না লইয়াই মরিতে হইত— তখন কি আর এমন করিয়া পা ছড়াইয়া দিতাম। আর বকিস নে। তুই সেই গানটা গা।"

সুধো সেই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নির্জন ছাদের উপর গাহিতে লাগিল—

দাসখত দিলেম লিখে শ্রীচরণে,
সকলে সাক্ষী থাকুক বৃন্দাবনে।

তখন রাত্রি দশটা। বাড়ির আর সকলে আহারাদি সমাধা করিয়া ঘুমাইতে গিয়াছে। এমন সময় আতর মাখিয়া, উড়ানি উড়াইয়া, হঠাৎ গোপীনাথ আসিয়া উপস্থিত হইল— সুধো অনেকখানি জিভ কাটিয়া সাত হাত ঘোমটা টানিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল।

গিরিবালা ভাবিল, তাহার দিন আসিয়াছে। সে মুখ তুলিয়া চাহিল না। সে রাধিকার মতো গুরুমানভরে অটল হইয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু দৃশ্যপট উঠিল না; শিখিপুচ্ছচূড়া পায়ের কাছে লুটাইল না; কেহ রাগিণীতে গাহিয়া উঠিল না, "কেন পূর্ণিমা আঁধার কর লুকায়ে বদনশশী।" সংগীতহীন নীরসকণ্ঠে গোপীনাথ বলিল, "একবার চাবিটা দাও দেখি।"

এমন জ্যোৎস্নায়, এমন বসন্তে, এতদিনের বিচ্ছেদের পরে এই কি প্রথম সম্ভাষণ! কাব্যে নাটকে উপন্যাসে যাহা লেখে তাহার আগাগোড়াই মিথ্যা কথা! অভিনয়মঞ্চেই প্রণয়ী গান গাহিয়া পায়ে আসিয়া লুটাইয়া পড়ে— এবং তাহাই দেখিয়া যে দর্শকের চিত্ত বিগলিত হইয়া যায় সেই লোকটি বসন্তনিশীথে গৃহছাদে আসিয়া আপন অনুপমা যুবতী স্ত্রীকে বলে, "ওগো, একবার চাবিটা দাও দেখি।" তাহাতে না আছে রাগিণী, না আছে প্রীতি; তাহাতে কোনো মোহ নাই, মাধুর্য নাই— তাহা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর।

এমন সময়ে দক্ষিনে বাতাস জগতের সমস্ত অপমানিত কবিত্বের মর্মান্তিক দীর্ঘনিশ্বাসের মতো হুহু করিয়া বহিয়া গেল— টব-ভরা ফুটন্ত বেলফুলের গন্ধ ছাদময় ছড়াইয়া দিয়া গেল— গিরিবালার চূর্ণ অলক চোখে মুখে আসিয়া পড়িল এবং তাহার

বাসন্তীরঙের সুগন্ধি আঁচল অধীরভাবে যেখানে সেখানে উড়িতে লাগিল। গিরিবালা সমস্ত মান বিসর্জন দিয়া উঠিয়া পড়িল।

স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল, "চাবি দিব এখন, তুমি ঘরে চলো।" আজ সে কাঁদিবে কাঁদাইবে, তাহার সমস্ত নির্জন কল্পনাকে সার্থক করিবে, তাহার সমস্ত ব্রহ্মাস্ত্র বাহির করিয়া বিজয়ী হইবে, ইহা সে দৃঢ় সংকল্প করিয়াছে।

গোপীনাথ কহিল, "আমি বেশি দেরি করিতে পারিব না, তুমি চাবি দাও।"

গিরিবালা কহিল, "আমি চাবি দিব এবং চাবির মধ্যে যাহা-কিছু আছে সমস্ত দিব — কিন্তু আজ রাত্রে তুমি কোথাও যাইতে পারিবে না।"

গোপীনাথ বলিল, "সে হইবে না। আমার বিশেষ দরকার আছে।"

গিরিবালা বলিল, "তবে আমি চাবি দিব না।"

গোপী বলিল, "দিবে না বই-কি। কেমন না দাও দেখিব।" বলিয়া সে গিরিবালার আঁচলে দেখিল, চাবি নাই। ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাহার আয়নার বাক্সর দেরাজ খুলিয়া দেখিল, তাহার মধ্যেও চাবি নাই। তাহার চুল বাঁধিবার বাক্স জোর করিয়া ভাঙিয়া খুলিল— তাহাতে কাজললতা, সিঁদুরের কৌটা, চুলের দড়ি প্রভৃতি বিচিত্র উপকরণ আছে ; চাবি নাই। তখন সে বিছানা ঘাঁটিয়া, গদি উঠাইয়া, আলমারি ভাঙিয়া নাস্তানাবুদ করিয়া তুলিল।

গিরিবালা প্রস্তরমূর্তির মতো শক্ত হইয়া, দরজা ধরিয়া, ছাদের দিকে চাহিয়া, দাঁড়াইয়া রহিল। ব্যর্থমনোরথ গোপীনাথ রাগে গর্‌গর্‌ করিতে করিতে আসিয়া বলিল, "চাবি দাও বলিতেছি, নহিলে ভালো হইবে না।"

গিরিবালা উত্তরমাত্র দিল না। তখন গোপী তাহাকে চাপিয়া ধরিল এবং তাহার হাত হইতে বাজুবন্ধ, গলা হইতে কণ্ঠী, অঙ্গুলি হইতে আংটি ছিনিয়া লইয়া তাহাকে লাথি মারিয়া চলিয়া গেল।

বাড়ির কাহারো নিদ্রাভঙ্গ হইল না, পল্লীর কেহ কিছুই জানিতে পারিল না, জ্যোৎস্নারাত্রি তেমনি নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, সর্বত্র যেন অখণ্ড শান্তি বিরাজ করিতেছে। কিন্তু অন্তরের চীৎকারধ্বনি যদি বাহিরে শুনা যাইত, তবে সেই চৈত্রমাসের সুখসুপ্ত জ্যোৎস্নানিশীথিনী অকস্মাৎ তীব্রতম আর্তস্বরে দীর্ণ বিদীর্ণ হইয়া যাইত। এমন সম্পূর্ণ নিঃশব্দে এমন হৃদয়বিদারণ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে।

অথচ সে রাত্রিও কাটিয়া গেল। এমন পরাভব, এত অপমান গিরিবালা সুধোর কাছেও বলিতে পারিল না। মনে করিল, আত্মহত্যা করিয়া, এই অতুল রূপযৌবন নিজের হাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙিয়া ফেলিয়া, সে আপন অনাদরের প্রতিশোধ

লইবে। কিন্তু তখনই মনে পড়িল, তাহাতে কাহারো কিছু আসিবে যাইবে না; পৃথিবীর যে কতখানি ক্ষতি হইবে তাহা কেহ অনুভবও করিবে না। জীবনেও কোনো সুখ নাই, মৃত্যুতেও কোনো সান্ত্বনা নাই।

গিরিবালা বলিল, "আমি বাপের বাড়ি চলিলাম।" তাহার বাপের বাড়ি কলিকাতা হইতে দূরে। সকলেই নিষেধ করিল; কিন্তু বাড়ির কর্ত্রী নিষেধও শুনিল না, কাহাকে সঙ্গেও লইল না। এ দিকে গোপীনাথও সদলবলে নৌকাবিহারে কতদিনের জন্য কোথায় চলিয়া গিয়াছে কেহ জানে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গান্ধর্ব থিয়েটারে গোপীনাথ প্রায় প্রত্যেক অভিনয়েই উপস্থিত থাকিত। সেখানে 'মনোরমা' নাটকে লবঙ্গ মনোরমা সাজিত এবং গোপীনাথ সদলে সম্মুখের সারে বসিয়া তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে বাহবা দিত এবং স্টেজের উপর তোড়া ছুঁড়িয়া ফেলিত। মাঝে মাঝে এক-একদিন গোলমাল করিয়া দর্শকদের অত্যন্ত বিরক্তিভাজন হইত। তথাপি রঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণ তাহাকে কখনো নিষেধ করিতে সাহস করে নাই।

অবশেষে একদিন গোপীনাথ কিঞ্চিৎ মত্তাবস্থায় গ্রীনরুমের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভারি গোল বাধাইয়া দিল। কী এক সামান্য কাল্পনিক কারণে সে আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া কোনো নটীকে গুরুতর প্রহার করিল। তাহার চীৎকারে এবং গোপীনাথের গালিবর্ষণে সমস্ত নাট্যশালা চকিত হইয়া উঠিল।

সেদিন অধ্যক্ষগণ আর সহ্য করিতে না পারিয়া গোপীনাথকে পুলিসের সাহায্যে বাহির করিয়া দেয়।

গোপীনাথ এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে কৃতনিশ্চয় হইল। থিয়েটারওয়ালারা পূজার একমাস পূর্ব হইতে নূতন নাটক 'মনোরমা'র অভিনয় খুব আড়ম্বরসহকারে ঘোষণা করিয়াছে। বিজ্ঞাপনের দ্বারা কলিকাতা শহরটাকে কাগজে মুড়িয়া ফেলিয়াছে; রাজধানীকে যেন সেই বিখ্যাত গ্রন্থকারের নামাঙ্কিত নামাবলী পরাইয়া দিয়াছে।

এমন সময় গোপীনাথ তাহাদের প্রধান অভিনেত্রী লবঙ্গকে লইয়া বোটে চড়িয়া কোথায় অন্তর্ধান হইল তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না।

থিয়েটারওয়ালারা হঠাৎ অকূলপাথারে পড়িয়া গেল। কিছুদিন লবঙ্গের জন্য অপেক্ষা করিয়া অবশেষে এক নূতন অভিনেত্রীকে মনোরমার অংশ অভ্যাস করাইয়া লইল; তাহাতে তাহাদের অভিনয়ের সময় পিছাইয়া গেল।

কিন্তু বিশেষ ক্ষতি হইল না। অভিনয়স্থলে দর্শক আর ধরে না। শত শত লোক দ্বার হইতে ফিরিয়া যায়। কাগজেও প্রশংসার সীমা নাই।

সে প্রশংসা দূরদেশে গোপীনাথের কানে গেল। সে আর থাকিতে পারিল না। বিদ্বেষে এবং কৌতূহলে পূর্ণ হইয়া সে অভিনয় দেখিতে আসিল।

প্রথম পট-উৎক্ষেপে অভিনয়ের আরম্ভভাগে মনোরমা দীনহীনবেশে দাসীর মতো তাহার শ্বশুরবাড়িতে থাকে— প্রচ্ছন্ন বিনম্র সংকুচিতভাবে সে আপনার কাজকর্ম করে— তাহার মুখে কথা নাই, এবং তাহার মুখ ভালো করিয়া দেখাই যায় না।

অভিনয়ের শেষাংশে মনোরমাকে পিতৃগৃহে পাঠাইয়া তাহার স্বামী অর্থলোভে কোনো এক লক্ষপতির একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছে। বিবাহের পর বাসরঘরে যখন স্বামী নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, তখন দেখিতে পাইল— এও সেই মনোরমা, কেবল সেই দাসীবেশ নাই। আজ সে রাজকন্যা সাজিয়াছে— তাহার নিরুপম সৌন্দর্য আভরণে ঐশ্বর্যে মণ্ডিত হইয়া দশ দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। শিশুকালে মনোরমা তাহার ধনী পিতৃগৃহ হইতে অপহৃত হইয়া দরিদ্রের গৃহে পালিত হইয়াছে। বহুকাল পরে সম্প্রতি তাহার পিতা সেই সন্ধান পাইয়া কন্যাকে ঘরে আনাইয়া তাহার স্বামীর সহিত পুনরায় নূতন সমারোহে বিবাহ দিয়াছে।

তাহার পরে বাসরঘরে মানভঞ্জনের পালা আরম্ভ হইল। কিন্তু ইতিমধ্যে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে ভারি এক গোলমাল বাধিয়া উঠিল। মনোরমা যতক্ষণ মলিন দাসীবেশে ঘোমটা টানিয়া ছিল ততক্ষণ গোপীনাথ নিস্তব্ধ হইয়া দেখিতেছিল। কিন্তু যখন সে আভরণে ঝল্‌মল্‌ করিয়া, রক্তাম্বর পরিয়া, মাথার ঘোমটা ঘুচাইয়া, রূপের তরঙ্গ তুলিয়া বাসরঘরে দাঁড়াইল এবং এক অনির্বচনীয় গর্বে গৌরবে গ্রীবা বঙ্কিম করিয়া সমস্ত দর্শকমণ্ডলীর প্রতি এবং বিশেষ করিয়া সম্মুখবর্তী গোপীনাথের প্রতি চকিত বিদ্যুতের ন্যায় অবজ্ঞাবজ্রপূর্ণ তীক্ষ্ণকটাক্ষ নিক্ষেপ করিল— যখন সমস্ত দর্শকমণ্ডলীর চিত্ত উদ্‌বেলিত হইয়া প্রশংসার করতালিতে নাট্যস্থলী সুদীর্ঘকাল কম্পান্বিত করিয়া তুলিতে লাগিল — তখন গোপীনাথ সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া 'গিরিবালা' 'গিরিবালা' করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ছুটিয়া স্টেজের উপর লাফ দিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল— বাদকগণ তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

এই অকস্মাৎ রসভঙ্গে মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া দর্শকগণ ইংরাজিতে বাংলায় "দূর করে দাও" "বের করে দাও" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

গোপীনাথ পাগলের মতো ভগ্নকণ্ঠে চীৎকার করিতে লাগিল, "আমি ওকে খুন করব, ওকে খুন করব।"

পুলিস আসিয়া গোপীনাথকে ধরিয়া টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেল। সমস্ত কলিকাতা শহরের দর্শক দুই চক্ষু ভরিয়া গিরিবালার অভিনয় দেখিতে লাগিল, কেবল গোপীনাথ সেখানে স্থান পাইল না।

বৈশাখ ১৩০২

ঠাকুরদা

প্রথম পরিচ্ছেদ

নয়নজোড়ের জমিদারেরা এককালে বাবু বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। তখনকার কালের বাবুয়ানার আদর্শ বড়ো সহজ ছিল না। এখন যেমন রাজা-রায়বাহাদুর খেতাব অর্জন করিতে অনেক খানা নাচ ঘোড়দৌড় এবং সেলাম-সুপারিশের শ্রাদ্ধ করিতে হয়, তখনো সাধারণের নিকট হইতে বাবু উপাধি লাভ করিতে বিস্তর দুঃসাধ্য তপশ্চরণ করিতে হইত।

আমাদের নয়নজোড়ের বাবুরা পাড় ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ঢাকাই কাপড় পরিতেন, কারণ পাড়ের কর্কশতায় তাঁহাদের সুকোমল বাবুয়ানা ব্যথিত হইত। তাঁহারা লক্ষ টাকা দিয়া বিড়ালশাবকের বিবাহ দিতেন এবং কথিত আছে, একবার কোনো উৎসব উপলক্ষে রাত্রিকে দিন করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া অসংখ্য দীপ জ্বালাইয়া সূর্যকিরণের অনুকরণে তাঁহারা সাচ্চা রুপার জরি উপর হইতে বর্ষণ করিয়াছিলেন।

ইহা হইতেই সকলে বুঝিবেন সেকালে বাবুদের বাবুয়ানা বংশানুক্রমে স্থায়ী হইতে পারিত না। বহুবর্তিকাবিশিষ্ট প্রদীপের মতো নিজের তৈল নিজে অল্পকালের ধুমধামেই নিঃশেষ করিয়া দিত।

আমাদের কৈলাসচন্দ্র রায় চৌধুরী সেই প্রখ্যাতযশ নয়নজোড়ের একটি নির্বাপিত বাবু। ইনি যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তৈল তখন প্রদীপের তলদেশে আসিয়া ঠেকিয়াছিল; ইঁহার পিতার মৃত্যু হইলে পর নয়নজোড়ের বাবুয়ানা গোটাকতক অসাধারণ শ্রাদ্ধশান্তিতে অন্তিম দীপ্তি প্রকাশ করিয়া হঠাৎ নিবিয়া গেল। সমস্ত বিষয়-আশয় ঋণের দায়ে বিক্রয় হইল— যে অল্প অবশিষ্ট রহিল তাহাতে পূর্বপুরুষের খ্যাতি রক্ষা করা অসম্ভব।

সেইজন্য নয়নজোড় ত্যাগ করিয়া পুত্রকে সঙ্গে লইয়া কৈলাসবাবু কলিকাতায়

আসিয়া বাস করিলেন; পুত্রটিও একটি কন্যামাত্র রাখিয়া এই হৃতগৌরব সংসার পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিলেন।

আমরা তাঁহার কলিকাতার প্রতিবেশী। আমাদের ইতিহাসটা তাঁহাদের হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। আমার পিতা নিজের চেষ্টায় ধন উপার্জন করিয়াছিলেন; তিনি কখনো হাঁটুর নিম্নে কাপড় পরিতেন না, কড়াক্রান্তির হিসাব রাখিতেন, এবং বাবু উপাধি লাভের জন্য তাঁহার লালসা ছিল না। সেজন্য আমি তাঁহার একমাত্র পুত্র তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি। আমি যে লেখাপড়া শিখিয়াছি এবং নিজের প্রাণ ও মান রক্ষার উপযোগী যথেষ্ট অর্থ বিনা চেষ্টায় প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহাই আমি পরম গৌরবের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করি— শূন্য ভাণ্ডারে পৈতৃক বাবুয়ানার উজ্জ্বল ইতিহাসের অপেক্ষা লোহার সিন্দুকের মধ্যে পৈতৃক কোম্পানির কাগজ আমার নিকট অনেক বেশি মূল্যবান বলিয়া মনে হয়।

বোধ করি, সেই কারণেই, কৈলাসবাবু তাঁহাদের পূর্বগৌরবের ফেল্‌-করা ব্যাঙ্কের উপর যখন দেদার লম্বাচৌড়া চেক চালাইতেন তখন তাহা আমার এত অসহ্য ঠেকিত। আমার মনে হইত, আমার পিতা স্বহস্তে অর্থ উপার্জন করিয়াছেন বলিয়া কৈলাসবাবু বুঝি মনে মনে আমাদের প্রতি অবজ্ঞা অনুভব করিতেছেন। আমি রাগ করিতাম এবং ভাবিতাম অবজ্ঞার যোগ্য কে। যে লোক সমস্ত জীবন কঠোর ত্যাগ স্বীকার করিয়া, নানা প্রলোভন অতিক্রম করিয়া, লোকমুখের তুচ্ছ খ্যাতি অবহেলা করিয়া, অশ্রান্ত এবং সতর্ক বুদ্ধিকৌশলে সমস্ত প্রতিকূল বাধা প্রতিহত করিয়া, সমস্ত অনুকূল অবসরগুলিকে আপনার আয়ত্তগত করিয়া, একটি একটি রৌপ্যের স্তরে সম্পদের একটি সমুচ্চ পিরামিড একাকী স্বহস্তে নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন, তিনি হাঁটুর নীচে কাপড় পরিতেন না বলিয়া যে কম লোক ছিলেন তাহা নয়।

তখন বয়স অল্প ছিল সেইজন্য এইরূপ তর্ক করিতাম, রাগ করিতাম— এখন বয়স বেশি হইয়াছে; এখন মনে করি, ক্ষতি কী। আমার তো বিপুল বিষয় আছে, আমার কিসের অভাব। যাহার কিছু নাই সে যদি অহংকার করিয়া সুখী হয় তাহাতে আমার তো সিকি পয়সার লোকসান নাই, বরং সে বেচারার সান্ত্বনা আছে।

ইহাও দেখা গিয়াছে আমি ব্যতীত আর কেহ কৈলাসবাবুর উপর রাগ করিত না। কারণ এতবড়ো নিরীহ লোক সচরাচর দেখা যায় না। ক্রিয়াকর্মে সুখে দুঃখে প্রতিবেশীদের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ যোগ ছিল। ছেলে হইতে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলকেই দেখা হইবা মাত্র তিনি হাসি মুখে প্রিয়সম্ভাষণ করিতেন; যেখানে যাহার যে-কেহ আছে সকলেরই কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া তবে তাঁহার শিষ্টতা বিরাম

লাভ করিত। এইজন্য কাহারো সহিত তাঁহার দেখা হইলে একটা সুদীর্ঘ প্রশ্নোত্তর-মালার সৃষ্টি হইত— ভালো তো? শশী ভালো আছে? আমাদের বড়োবাবু ভালো আছেন? মধুর ছেলেটির জ্বর হয়েছিল শুনেছিলুম, সে এখন ভালো আছে তো? হরিচরণবাবুকে অনেক কাল দেখি নি, তাঁর অসুখবিসুখ কিছু হয় নি? তোমাদের রাখালের খবর কী। বাড়ির এঁয়ারা সকলে ভালো আছেন? ইত্যাদি।

লোকটি ভারি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কাপড়চোপড় অধিক ছিল না, কিন্তু মেরজাইটি চাদরটি জামাটি, এমন-কি, বিছানায় পাতিবার একটি পুরাতন র‍্যাপার, বালিশের ওয়াড়, একটি ক্ষুদ্র সতরঞ্চ, সমস্ত স্বহস্তে রৌদ্রে দিয়া, ঝাড়িয়া, দড়িতে খাটাইয়া, ভাঁজ করিয়া, আলনায় তুলিয়া, পরিপাটি করিয়া রাখিতেন। যখনই তাঁহাকে দেখা যাইত তখনই মনে হইত যেন তিনি সুসজ্জিত প্রস্তুত হইয়া আছেন। অল্পস্বল্প সামান্য আসবাবেও তাঁহার ঘরদ্বার সমুজ্জ্বল হইয়া থাকিত। মনে হইত যেন তাঁহার আরো অনেক আছে।

ভৃত্যাভাবে অনেক সময় ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তিনি নিজের হস্তে অতি পরিপাটি করিয়া ধুতি কোঁচাইতেন এবং চাদর ও জামার আস্তিন বহু যত্নে ও পরিশ্রমে গিলে করিয়া রাখিতেন। তাঁহার বড়ো বড়ো জমিদারি ও বহুমূল্যের বিষয়সম্পত্তি লোপ পাইয়াছে, কিন্তু একটি বহুমূল্য গোলাপপাশ, আতরদান, একটি সোনার রেকাবি, একটি রুপার আলবোলা, একটি বহুমূল্য শাল ও সেকেলে জামাজোড়া ও পাগড়ি দারিদ্র্যের গ্রাস হইতে বহুচেষ্টায় তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন। কোনো একটা উপলক্ষ উপস্থিত হইলে এইগুলি বাহির হইত এবং নয়নজোড়ের জগদ্‌বিখ্যাত বাবুদের গৌরব রক্ষা হইত।

এ দিকে কৈলাসবাবু মাটির মানুষ হইলেও কথায় যে অহংকার করিতেন সেটা যেন পূর্বপুরুষদের প্রতি কর্তব্যবোধে করিতেন; সকল লোকেই তাহাতে প্রশ্রয় দিত এবং বিশেষ আমোদ বোধ করিত।

পাড়ার লোকে তাঁহাকে ঠাকুরদামশাই বলিত এবং তাঁহার ওখানে সর্বদা বিস্তর লোকসমাগম হইত; কিন্তু দৈন্যাবস্থায় পাছে তাঁহার তামাকের খরচটা গুরুতর হইয়া উঠে এইজন্য প্রায়ই পাড়ার কেহ না কেহ দুই-এক সের তামাক কিনিয়া লইয়া গিয়া তাঁহাকে বলিত, "ঠাকুরদামশায়, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখো দেখি, ভালো গয়ার তামাক পাওয়া গেছে।"

ঠাকুরদামশায় দুই-এক টান টানিয়া বলিতেন, "বেশ ভাই, বেশ তামাক।" অমনি

সেই উপলক্ষে ষাট-পঁয়ষট্টি টাকা ভরির তামাকের গল্প পাড়িতেন; এবং জিজ্ঞাসা করিতেন, সে তামাক কাহারো আস্বাদ করিয়া দেখিবার ইচ্ছা আছে কি না।

সকলেই জানিত যে যদি কেহ ইচ্ছা প্রকাশ করে তবে নিশ্চয় চাবির সন্ধান পাওয়া যাইবে না অথবা অনেক অন্বেষণের পর প্রকাশ পাইবে যে, পুরাতন ভৃত্য গণেশ বেটা কোথায় যে কী রাখে তাহার আর ঠিকানা নাই— গণেশও বিনা প্রতিবাদে সমস্ত অপবাদ স্বীকার করিয়া লইবে। এইজন্যই সকলেই একবাক্যে বলিত, "ঠাকুরদামশায়, কাজ নেই, সে তামাক আমাদের সহ্য হবে না, আমাদের এই ভালো।"

শুনিয়া ঠাকুরদা দ্বিরুক্তি না করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতেন। সকলে বিদায় লইবার কালে বৃদ্ধ হঠাৎ বলিয়া উঠিতেন, "সে যেন হল, তোমরা কবে আমার এখানে খাবে বলো দেখি ভাই।"

অমনি সকলে বলিত, "সে একটা দিন ঠিক করে দেখা যাবে।"

ঠাকুরদামহাশয় বলিতেন, "সেই ভালো, একটু বৃষ্টি পড়ুক, ঠাণ্ডা হোক, নইলে এ গরমে গুরুভোজনটা কিছু নয়।"

যখন বৃষ্টি পড়িত তখন ঠাকুরদাকে কেহ তাঁহার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিত না; বরঞ্চ কথা উঠিলে সকলে বলিত, "এই বৃষ্টিবাদলটা না ছাড়লে সুবিধে হচ্ছে না।" ক্ষুদ্র বাসাবাড়িতে বাস করাটা তাঁহার পক্ষে ভালো দেখাইতেছে না এবং কষ্টও হইতেছে এ কথা তাঁহার বন্ধুবান্ধব সকলেই তাঁহার সমক্ষে স্বীকার করিত, অথচ কলিকাতায় কিনিবার উপযুক্ত বাড়ি খুঁজিয়া পাওয়া যে কত কঠিন সে বিষয়েও কাহারো সন্দেহ ছিল না— এমন-কি, আজ ছয় সাত বৎসর সন্ধান করিয়া ভাড়া লইবার মতো একটা বড়ো বাড়ি পাড়ার কেহ দেখিতে পাইল না— অবশেষে ঠাকুরদামশায় বলিতেন, "তা হোক ভাই, তোমাদের কাছাকাছি আছি এই আমার সুখ। নয়নজোড়ে বড়ো বাড়ি তো পড়েই আছে, কিন্তু সেখানে কি মন টেঁকে।"

আমার বিশ্বাস, ঠাকুরদাও জানিতেন যে সকলে তাঁহার অবস্থা জানে এবং যখন তিনি ভূতপূর্ব নয়নজোড়কে বর্তমান বলিয়া ভাণ করিতেন এবং অন্য সকলেও তাহাতে যোগ দিত তখন তিনি মনে মনে বুঝিতেন যে, পরস্পরের এই ছলনা কেবল পরস্পরের প্রতি সৌহার্দবশত।

কিন্তু আমার বিষম বিরক্তি বোধ হইত। অল্পবয়সে পরের নিরীহ গর্বও দমন করিতে ইচ্ছা করে এবং সহস্র গুরুতর অপরাধের তুলনায় নির্বুদ্ধিতাই সর্বাপেক্ষা অসহ্য বোধ হয়। কৈলাসবাবু ঠিক নির্বোধ ছিলেন না, কাজে কর্মে তাঁহার সহায়তা এবং পরামর্শ সকলেই প্রার্থনীয় জ্ঞান করিত। কিন্তু নয়নজোড়ের গৌরব প্রকাশ

সম্বন্ধে তাঁহার কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। সকলে তাঁহাকে ভালোবাসিয়া এবং আমোদ করিয়া তাঁহার কোনো অসম্ভব কথাতেই প্রতিবাদ করিত না বলিয়া তিনি আপনার কথার পরিমাণ রক্ষা করিতে পারিতেন না। অন্য লোকেও যখন আমোদ করিয়া অথবা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নয়নজোড়ের কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে বিপরীত মাত্রায় অত্যুক্তি প্রয়োগ করিত তিনি অকাতরে সমস্ত গ্রহণ করিতেন এবং স্বপ্নেও সন্দেহ করিতেন না যে, অন্য কেহ এ-সকল কথা লেশমাত্র অবিশ্বাস করিতে পারে।

আমার এক-এক সময় ইচ্ছা করিত, বৃদ্ধ যে মিথ্যা দুর্গ অবলম্বন করিয়া বাস করিতেছে এবং মনে করিতেছে ইহা চিরস্থায়ী, সেই দুর্গটি দুই তোপে সর্বসমক্ষে উড়াইয়া দিই। একটা পাখিকে সুবিধামতো ডালের উপর বসিয়া থাকিতে দেখিলেই শিকারির ইচ্ছা করে তাহাকে গুলি বসাইয়া দিতে, পাহাড়ের গায়ে একটা প্রস্তর পতনোন্মুখ থাকিতে দেখিলেই বালকের ইচ্ছা করে এক লাথি মারিয়া তাহাকে গড়াইয়া ফেলিতে— যে জিনিসটা প্রতি মুহূর্তে পড়ি-পড়ি করিতেছে অথচ কোনো একটা কিছুতে সংলগ্ন হইয়া আছে, তাহাকে ফেলিয়া দিলেই তবে যেন তাহার সম্পূর্ণতা-সাধন এবং দর্শকের মনে তৃপ্তিলাভ হয়। কৈলাসবাবুর মিথ্যাগুলি এতই সরল, তাহার ভিত্তি এতই দুর্বল, তাহা ঠিক সত্য-বন্দুকের লক্ষের সামনে এমনি বুক ফুলাইয়া নৃত্য করিত যে, তাহাকে মুহূর্তের মধ্যে বিনাশ করিবার জন্য একটি আবেগ উপস্থিত হইত— কেবল নিতান্ত আলস্যবশত এবং সর্বজনসম্মত প্রথার অনুসরণ করিয়া সে কার্যে হস্তক্ষেপ করিতাম না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নিজের অতীত মনোভাব বিশ্লেষণ করিয়া যতটা মনে পড়ে তাহাতে বোধ করি, কৈলাসবাবুর প্রতি আমার আন্তরিক বিদ্বেষের আর-একটি গূঢ় কারণ ছিল। তাহা একটু বিবৃত করিয়া বলা আবশ্যক।

আমি বড়োমানুষের ছেলে হইয়াও যথাকালে এম. এ. পাস করিয়াছি, যৌবন সত্ত্বেও কোনোপ্রকার কুসংসর্গ কুৎসিত-আমোদে যোগ দিই নাই, এবং অভিভাবকদের মৃত্যুর পরে স্বয়ং কর্তা হইয়াও আমার স্বভাবের কোনোপ্রকার বিকৃতি উপস্থিত হয় নাই। তাহা ছাড়া চেহারাটা এমন যে, তাহাকে আমি নিজমুখে সুশ্রী বলিলে অহংকার হইতে পারে, কিন্তু মিথ্যাবাদ হয় না।

অতএব বাংলাদেশে ঘটকালির হাটে আমার দাম যে অত্যন্ত বেশি তাহাতে আর

সন্দেহ নাই— এই হাটে আমার সেই দাম আমি পুরা আদায় করিয়া লইব, এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। ধনী পিতার পরমরূপবতী একমাত্র বিদুষী কন্যা আমার কল্পনায় আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছিল।

দশ হাজার বিশ হাজার টাকা পণের প্রস্তাব করিয়া দেশ বিদেশ হইতে আমার সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। আমি অবিচলিতচিত্তে নিক্তি ধরিয়া তাহাদের যোগ্যতা ওজন করিয়া লইতেছিলাম, কোনোটাই আমার সমযোগ্য বোধ হয় নাই। অবশেষে ভবভূতির ন্যায় আমার ধারণা হইয়াছিল যে—

কী জানি জন্মিতে পারে মম সমতুল,
অসীম সময় আছে, বসুধা বিপুল।

কিন্তু বর্তমান কালে এবং ক্ষুদ্র বঙ্গদেশে সেই অসম্ভব দুর্লভ পদার্থ জন্মিয়াছে কি না সন্দেহ।

কন্যাদায়গ্রস্তগণ প্রতিনিয়ত নানা ছন্দে আমার স্তবস্তুতি এবং বিবিধোপচারে আমার পূজা করিতে লাগিল। কন্যা পছন্দ হউক বা না হউক, এই পূজা আমার মন্দ লাগিত না। ভালো ছেলে বলিয়া কন্যার পিতৃগণের এই পূজা আমার উচিত প্রাপ্য স্থির করিয়াছিলাম। শাস্ত্রে পড়া যায়, দেবতা বর দিন আর না দিন, যথাবিধি পূজা না পাইলে বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। নিয়মিত পূজা পাইয়া আমারও মনে সেইরূপ অত্যুচ্চ দেবভাব জন্মিয়াছিল।

পূর্বেই বলিয়াছিলাম, ঠাকুরদামশায়ের একটি পৌত্রী ছিল। তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছি, কিন্তু কখনো রূপবতী বলিয়া ভ্রম হয় নাই। সুতরাং তাহাকে বিবাহ করিবার কল্পনাও আমার মনে উদিত হয় নাই। কিন্তু ইহা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম যে, কৈলাসবাবু লোক মারফত অথবা স্বয়ং পৌত্রীটিকে অর্ঘ্য দিবার মানসে আমার পূজার বোধন করিতে আসিবেন, কারণ আমি ভালো ছেলে। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না।

শুনিতে পাইলাম, আমার কোনো বন্ধুকে তিনি বলিয়াছিলেন, নয়নজোড়ের বাবুরা কখনো কোনো বিষয়ে অগ্রসর হইয়া কাহারো নিকটে প্রার্থনা করে নাই— কন্যা যদি চিরকুমারী হইয়া থাকে তথাপি সে কুলপ্রথা তিনি ভঙ্গ করিতে পারিবেন না।

শুনিয়া আমার বড়ো রাগ হইল। সে রাগ অনেক দিন পর্যন্ত আমার মনের মধ্যে ছিল; কেবল ভালো ছেলে বলিয়াই চুপচাপ করিয়া ছিলাম।

যেমন বজ্রের সঙ্গে বিদ্যুৎ থাকে, তেমনি আমার চরিত্রে রাগের সঙ্গে সঙ্গে একটা

কৌতুকপ্রিয়তা জড়িত ছিল। বৃদ্ধকে শুদ্ধমাত্র নিপীড়ন করা আমার দ্বারা সম্ভব হইত না; কিন্তু একদিন হঠাৎ এমন একটা কৌতুকাবহ প্ল্যান মাথায় উদয় হইল যে, সেটা কাজে খাটাইবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

পূর্বেই বলিয়াছি, বৃদ্ধকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নানা লোকে নানা মিথ্যা কথার সৃজন করিত। পাড়ার একজন পেনসনভোগী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট প্রায় বলিতেন, "ঠাকুরদা, ছোটোলাটের সঙ্গে যখনই দেখা হয় তিনি নয়নজোড়ের বাবুদের খবর না নিয়ে ছাড়েন না— সাহেব বলেন, বাংলাদেশে, বর্ধমানের রাজা এবং নয়নজোড়ের বাবু, এই দুটি মাত্র যথার্থ বনেদি বংশ আছে।"

ঠাকুরদা ভারি খুশি হইতেন এবং ভূতপূর্ব ডেপুটিবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে অন্যান্য কুশলসংবাদের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেন, "ছোটোলাট সাহেব ভালো আছেন? তাঁর মেমসাহেব ভালো আছেন? তাঁর পুত্রকন্যারা সকলেই ভালো আছেন? সাহেবের সহিত শীঘ্র একদিন সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন এমন ইচ্ছাও প্রকাশ করিতেন। কিন্তু ভূতপূর্ব ডেপুটি নিশ্চয়ই জানিতেন, নয়নজোড়ের বিখ্যাত চৌঘুড়ি প্রস্তুত হইয়া দ্বারে আসিতে আসিতে বিস্তর ছোটোলাট এবং বড়োলাট বদল হইয়া যাইবে।

আমি একদিন প্রাতঃকালে গিয়া কৈলাসবাবুকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া চুপিচুপি বলিলাম, "ঠাকুরদা, কাল লেপ্টেনেণ্ট গবর্নরের লেভিতে গিয়েছিলুম। তিনি নয়নজোড়ের বাবুদের কথা পাড়াতে আমি বললুম, নয়নজোড়ের কৈলাসবাবু কলকাতাতেই আছেন; শুনে, ছোটোলাট এতদিন দেখা করতে আসেন নি বলে ভারি দুঃখিত হলেন— বলে দিলেন, আজই দুপুরবেলা তিনি গোপনে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসবেন।"

আর কেহ হইলে কথাটার অসম্ভবতা বুঝিতে পারিত এবং আর-কাহারো সম্বন্ধে হইলে কৈলাসবাবুও এ কথায় হাস্য করিতেন কিন্তু নিজের সম্বন্ধীয় বলিয়া এ সংবাদ তাঁহার লেশমাত্র অবিশ্বাস্য বোধ হইল না। শুনিয়া যেমন খুশি হইলেন তেমনি অস্থির হইয়া উঠিলেন— কোথায় বসাইতে হইবে, কী করিতে হইবে, কেমন করিয়া অভ্যর্থনা করিবেন, কী উপায়ে নয়নজোড়ের গৌরব রক্ষিত হইবে, কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। তাহা ছাড়া তিনি ইংরাজি জানেন না, কথা চালাইবেন কী করিয়া সেও এক সমস্যা।

আমি বলিলাম, "সেজন্য ভাবনা নাই, তাঁহার সঙ্গে একজন করিয়া দোভাষী থাকে; কিন্তু ছোটোলাট-সাহেবের বিশেষ ইচ্ছা, আর কেহ উপস্থিত না থাকে।"

মধ্যাহ্নে পাড়ার অধিকাংশ লোক যখন আপিসে গিয়াছে এবং অবশিষ্ট অংশ দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিদ্রামগ্ন, তখন কৈলাসবাবুর বাসার সম্মুখে এক জুড়ি আসিয়া দাঁড়াইল।

তকমা-পরা চাপরাশি তাঁহাকে খবর দিল, "ছোটোলাট-সাহেব আয়া।" ঠাকুরদা প্রাচীনকাল-প্রচলিত শুভ্র জামাজোড়া এবং পাগড়ি পরিয়া প্রস্তুত হইয়া ছিলেন, তাঁহার পুরাতন ভৃত্য গণেশটিকেও তাঁহার নিজের ধুতি চাদর জামা পরাইয়া ঠিকঠাক করিয়া রাখিয়াছিলেন। ছোটোলাটের আগমনসংবাদ শুনিয়াই হাঁপাইতে হাঁপাইতে কাঁপিতে কাঁপিতে ছুটিয়া দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন— এবং সন্নতদেহে বারম্বার সেলাম করিতে করিতে ইংরেজবেশধারী আমার এক প্রিয় বয়স্যকে ঘরে লইয়া গেলেন।

সেখানে চৌকির উপরে তাঁহার একমাত্র বহুমূল্য শালটি পাতিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহারই উপর কৃত্রিম ছোটোলাটকে বসাইয়া উর্দুভাষায় এক অতিবিনীত সুদীর্ঘ বক্তৃতা পাঠ করিলেন, এবং নজরের স্বরূপে স্বর্ণরেকাবিতে তাঁহাদের বহুকষ্টরক্ষিত কুলক্রমাগত এক আসরফির মালা ধরিলেন। প্রাচীন ভৃত্য গণেশ গোলাপপাশ এবং আতরদান লইয়া উপস্থিত ছিল।

কৈলাসবাবু বারম্বার আক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের নয়নজোড়ের বাড়িতে হুজুরবাহাদুরের পদধূলি পড়িলে তাঁহাদের যথাসাধ্য যথোচিত আতিথ্যের আয়োজন করিতে পারিতেন— কলিকাতায় তিনি প্রবাসী— এখানে তিনি জলহীন মীনের ন্যায় সর্ববিষয়েই অক্ষম— ইত্যাদি।

আমার বন্ধু দীর্ঘ হ্যাট সমেত অত্যন্ত গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িতে লাগিলেন। ইংরেজি কায়দা-অনুসারে এরূপ স্থলে মাথায় টুপি না থাকিবার কথা কিন্তু আমার বন্ধু ধরা পড়িবার ভয়ে যথাসম্ভব আচ্ছন্ন থাকিবার চেষ্টায় টুপি খোলেন নাই। কৈলাসবাবু এবং তাঁহার গর্বান্ধ প্রাচীন ভৃত্যটি ছাড়া আর-সকলেই মুহূর্তের মধ্যে বাঙালির এই ছদ্মবেশ ধরিতে পারিত।

দশ মিনিট কাল ঘাড় নাড়িয়া আমার বন্ধু গাত্রোত্থান করিলেন এবং পূর্ব-শিক্ষা-মত চাপরাশিগণ সোনার রেকাবিসুদ্ধ আসরফির মালা, চৌকি হইতে সেই শাল, এবং ভৃত্যের হাত হইতে গোলাপপাশ এবং আতরদান সংগ্রহ করিয়া ছদ্মবেশীর গাড়িতে তুলিয়া দিল— কৈলাসবাবু বুঝিলেন, ইহাই ছোটোলাটের প্রথা। আমি গোপনে এক পাশের ঘরে লুকাইয়া দেখিতেছিলাম এবং রুদ্ধ হাস্যবেগে আমার পঞ্জর বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইতেছিল।

অবশেষে কিছুতে আর থাকিতে না পারিয়া ছুটিয়া কিঞ্চিৎ দূরবর্তী এক ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলাম— এবং সেখানে হাসির উচ্ছ্বাস উন্মুক্ত করিয়া দিয়া হঠাৎ

দেখি, একটি বালিকা তক্তপোষের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

আমাকে হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করিয়া হাসিতে দেখিয়া সে তৎক্ষণাৎ তক্তা ছাড়িয়া দাঁড়াইল, এবং অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে রোষের গর্জন আনিয়া, আমার মুখের উপর সজল বিপুল কৃষ্ণচক্ষের সুতীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ বর্ষণ করিয়া কহিল, "আমার দাদামশায় তোমাদের কী করেছেন— কেন তোমরা তাঁকে ঠকাতে এসেছ— কেন এসেছ তোমরা"— অবশেষে আর কোনো কথা জুটিল না— বাক্‌রুদ্ধ হইয়া মুখে কাপড় দিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কোথায় গেল আমার হাস্যাবেগ। আমি যে কাজটি করিয়াছি তাহার মধ্যে কৌতুক ছাড়া আর যে কিছু ছিল এতক্ষণ তাহা আমার মাথায় আসে নাই। হঠাৎ দেখিলাম, অত্যন্ত কোমল স্থানে অত্যন্ত কঠিন আঘাত করিয়াছি; হঠাৎ আমার কৃতকার্যের বীভৎস নিষ্ঠুরতা আমার সম্মুখে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল— লজ্জায় এবং অনুতাপে পদাহত কুক্কুরের ন্যায় ঘর হইতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলাম। বৃদ্ধ আমার কাছে কী দোষ করিয়াছিল। তাহার নিরীহ অহংকার তো কখনো কোনো প্রাণীকে আঘাত করে নাই। আমার অহংকার কেন এমন হিংস্রমূর্তি ধারণ করিল।

তাহা ছাড়া আর-একটি বিষয়ে আজ হঠাৎ দৃষ্টি খুলিয়া গেল। এতদিন আমি কুসুমকে কোনো অবিবাহিত পাত্রের প্রসন্নদৃষ্টিপাতের প্রতীক্ষায় সংরক্ষিত পণ্যপদার্থের মতো দেখিতাম; ভাবিতাম, আমি পছন্দ করি নাই বলিয়া ও পড়িয়া আছে, দৈবাৎ যাহার পছন্দ হইবে ও তাহারই হইবে। আজ দেখিলাম, এই গৃহকোণে ঐ বালিকা-মূর্তির অন্তরালে একটি মানবহৃদয় আছে। তাহার নিজের সুখদুঃখ অনুরাগবিরাগ লইয়া একটি অন্তঃকরণ এক দিকে অজ্ঞেয় অতীত আর-এক দিকে অভাবনীয় ভবিষ্যৎ -নামক দুই অনন্ত রহস্যরাজ্যের দিকে পূর্বে পশ্চিমে প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে। যে মানুষের মধ্যে হৃদয় আছে সে কি কেবল পণের টাকা এবং নাক-চোখের পরিমাণ মাপিয়া পছন্দ করিয়া লইবার যোগ্য।

সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। পরদিন প্রত্যুষে বৃদ্ধের সমস্ত অপহৃত বহুমূল্য দ্রব্যগুলি লইয়া চোরের ন্যায় চুপিচুপি ঠাকুরদার বাসায় গিয়া প্রবেশ করিলাম— ইচ্ছা ছিল, কাহাকেও কিছু না বলিয়া গোপনে চাকরের হস্তে সমস্ত দিয়া আসিব।

চাকরকে দেখিতে না পাইয়া ইতস্তত করিতেছি এমন সময় অদূরবর্তী ঘরে বৃদ্ধের সহিত বালিকার কথোপকথন শুনিতে পাইলাম। বালিকা সুমিষ্ট সস্নেহস্বরে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, "দাদামশায়, কাল লাটসাহেব তোমাকে কী বললেন।" ঠাকুরদা

অত্যন্ত হর্ষিতচিত্তে লাটসাহেবের মুখে প্রাচীন নয়নজোড়-বংশের বিস্তর কাল্পনিক গুণানুবাদ বসাইতেছিলেন। বালিকা তাহাই শুনিয়া মহোৎসাহ প্রকাশ করিতেছিল।

বৃদ্ধ অভিভাবকের প্রতি মাতৃহৃদয়া এই ক্ষুদ্র বালিকার সকরুণ ছলনায় আমার দুই চক্ষে জল ছল্ ছল্ করিয়া আসিল। অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম; অবশেষে ঠাকুরদা তাঁহার কাহিনী সমাপন করিয়া চলিয়া আসিলে আমার প্রতারণার বমালগুলি লইয়া বালিকার নিকট উপস্থিত হইলাম এবং নিঃশব্দে তাহার সম্মুখে রাখিয়া চলিয়া আসিলাম।

বর্তমান কালের প্রথানুসারে অন্যদিন বৃদ্ধকে দেখিয়া কোনোপ্রকার অভিবাদন করিতাম না; আজ তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। বৃদ্ধ নিশ্চয় মনে ভাবিলেন, গতকল্য ছোটোলাট তাঁহার বাড়িতে আসাতেই সহসা তাঁহার প্রতি আমার ভক্তির উদ্রেক হইয়াছে। তিনি পুলকিত হইয়া শতমুখে ছোটোলাটের গল্প বানাইয়া বলিতে লাগিলেন, আমিও কোনো প্রতিবাদ না করিয়া তাহাতে যোগ দিলাম। বাহিরের অন্য লোক যাহারা শুনিল তাহারা এ কথাটাকে আদ্যোপান্ত গল্প বলিয়া স্থির করিল, এবং সকৌতুকে বৃদ্ধের সহিত সকল কথায় সায় দিয়া গেল।

সকলে উঠিয়া গেলে আমি অত্যন্ত সলজ্জমুখে দীনভাবে বৃদ্ধের নিকট একটি প্রস্তাব করিলাম। বলিলাম, যদিও নয়নজোড়ের বাবুদের সহিত আমাদের বংশমর্যাদার তুলনাই হইতে পারে না, তথাপি—

প্রস্তাবটা শেষ হইবামাত্র বৃদ্ধ আমাকে বক্ষে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন এবং আনন্দবেগে বলিয়া উঠিলেন, "আমি গরিব— আমার যে এমন সৌভাগ্য হবে তা আমি জানতুম না ভাই, আমার কুসুম অনেক পুণ্য করেছে তাই তুমি আজ ধরা দিলে।" বলিতে বলিতে বৃদ্ধের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বৃদ্ধ, আজ এই প্রথম তাঁহার মহিমান্বিত পূর্বপুরুষদের প্রতি কর্তব্য বিস্মৃত হইয়া স্বীকার করিলেন যে তিনি গরিব, স্বীকার করিলেন যে আমাকে লাভ করিয়া নয়নজোড়-বংশের গৌরবহানি হয় নাই। আমি যখন বৃদ্ধকে অপদস্থ করিবার জন্য চক্রান্ত করিতেছিলাম তখন বৃদ্ধ আমাকে পরম সৎপাত্র জানিয়া একান্ত মনে কামনা করিতেছিলেন।

জ্যৈষ্ঠ ১৩০২

প্রতিহিংসা

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুকুন্দবাবুদের ভূতপূর্ব দেওয়ানের পৌত্রী, বর্তমান ম্যানেজারের স্ত্রী ইন্দ্রাণী অশুভক্ষণে বাবুদের বাড়িতে তাঁহাদের দৌহিত্রের বিবাহে বউভাতের নিমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন।

তৎপূর্বকার ইতিহাস সংক্ষেপে বলিয়া রাখিলে কথাটা পরিষ্কার হইবে।

এক্ষণে মুকুন্দবাবুও ভূতপূর্ব, তাঁহার দেওয়ান গৌরীকান্তও ভূতপূর্ব; কালের আহ্বান অনুসারে উভয়ের কেহই স্বস্থানে সশরীরে বর্তমান নাই। কিন্তু যখন ছিলেন তখন উভয়ের মধ্যে বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। পিতৃমাতৃহীন গৌরীকান্তের যখন কোনো জীবনোপায় ছিল না তখন মুকুন্দলাল কেবলমাত্র মুখ দেখিয়া তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার উপরে নিজের ক্ষুদ্র বিষয়সম্পত্তির পর্যবেক্ষণের ভার দেন। কালে প্রমাণ হইল যে, মুকুন্দলাল ভুল করেন নাই। কীট যেমন করিয়া বল্মীক রচনা করে, স্বর্গকামী যেমন করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করে, গৌরীকান্ত তেমনি করিয়া অশ্রান্ত যত্নে তিলে তিলে দিনে দিনে মুকুন্দলালের বিষয় বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। অবশেষে যখন তিনি কৌশলে আশ্চর্য সুলভ মূল্যে তরফ বাঁকাগাড়ি ক্রয় করিয়া মুকুন্দলালের সম্পত্তিভুক্ত করিলেন তখন হইতে মুকুন্দবাবুরা গণ্যমান্য জমিদারশ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। প্রভুর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভৃত্যেরও উন্নতি হইল; অল্পে অল্পে তাঁহার কোঠাবাড়ি, জোতজমা এবং পূজার্চনা বিস্তার লাভ করিল। এবং যিনি এক কালে সামান্য তহশিলদার শ্রেণীর ছিলেন তিনিও সাধারণের নিকট দেওয়ানজি নামে পরিচিত হইলেন।

ইহাই ভূতপূর্ব কালের ইতিহাস। বর্তমান কালে মুকুন্দবাবুর একটি পোষ্যপুত্র আছেন, তাঁহার নাম বিনোদবিহারী। এবং গৌরীকান্তের সুশিক্ষিত নাতজামাই অম্বিকাচরণ তাঁহাদের ম্যানেজারের কাজ করিয়া থাকেন। দেওয়ানজি তাঁহার পুত্র রমাকান্তকে বিশ্বাস করিতেন না— সেইজন্য বার্ধক্যবশত নিজে যখন কাজ ছাড়িয়া দিলেন তখন পুত্রকে লঙ্ঘন করিয়া নাতজামাই অম্বিকাকে আপন কার্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

কাজকর্ম বেশ চলিতেছে; পূর্বের আমলে যেমন ছিল এখনো সকলই প্রায় তেমনি আছে, কেবল একটা বিষয়ে একটু প্রভেদ ঘটিয়াছে; এখন প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক কেবল

কাজকর্মের সম্পর্ক— হৃদয়ের সম্পর্ক নহে। পূর্বকালে টাকা সস্তা ছিল এবং হৃদয়টাও কিছু সুলভ ছিল, এখন সর্বসম্মতিক্রমে হৃদয়ের বাজে খরচটা একপ্রকার রহিত হইয়াছে; নিতান্ত আত্মীয়ের ভাগেই টানাটানি পড়িয়াছে, তা বাহিরের লোকে পাইবে কোথা হইতে।

ইতিমধ্যে বাবুদের বাড়িতে দৌহিত্রের বিবাহে বউভাতের নিমন্ত্রণে দেওয়ানজির পৌত্রী ইন্দ্রাণী গিয়া উপস্থিত হইল।

সংসারটা কৌতূহলী অদৃষ্টপুরুষের রাসায়নিক পরীক্ষাশালা। এখানে কতকগুলা বিচিত্রচরিত্র মানুষ একত্র করিয়া তাহাদের সংযোগ-বিয়োগে নিয়ত কত চিত্রবিচিত্র অভূতপূর্ব ইতিহাস সৃজিত হইতেছে, তাহার আর সংখ্যা নাই।

এই বউভাতের নিমন্ত্রণস্থলে, এই আনন্দকার্যের মধ্যে, দুটি দুই রকমের মানুষের দেখা হইল এবং দেখিতে দেখিতে সংসারের অশ্রান্ত জালবুনানির মধ্যে একটা নূতন বর্ণের সূত্র উঠিয়া পড়িল এবং একটা নূতন রকমের গ্রন্থি পড়িয়া গেল।

সকলের আহারাদি শেষ হইয়া গেলে ইন্দ্রাণী বৈকালের দিকে কিছু বিলম্বে মনিব-বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। বিনোদের স্ত্রী নয়নতারা যখন বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিল, ইন্দ্রাণী গৃহকর্মের ব্যস্ততা, শারীরিক অস্বাস্থ্য প্রভৃতি দুই-চারিটা কারণ প্রদর্শন করিল, কিন্তু তাহা কাহারো সন্তোষজনক বোধ হইল না।

প্রকৃত কারণ যদিও ইন্দ্রাণী গোপন করিল তথাপি তাহা বুঝিতে কাহারো বাকি রহিল না। সে কারণটি এই— মুকুন্দবাবুরা প্রভু, ধনী বটেন, কিন্তু কুলমর্যাদায় গৌরীকান্ত তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রাণী সে শ্রেষ্ঠতা ভুলিতে পারে না। সেইজন্য মনিবের বাড়ি পাছে খাইতে হয় এই ভয়ে সে যথেষ্ট বিলম্ব করিয়া গিয়াছিল। তাহার অভিসন্ধি বুঝিয়া তাহাকে খাওয়াইবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করা হইয়াছিল, কিন্তু ইন্দ্রাণী পরাস্ত হইবার মেয়ে নহে, তাহাকে কিছুতেই খাওয়ানো গেল না।

একবার মুকুন্দ এবং গৌরীকান্ত বর্তমানেও কুলাভিমান লইয়া ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর বিপ্লব বাধিয়াছিল। সে ঘটনা এই স্থানে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ইন্দ্রাণী দেখিতে বড়ো সুন্দর। আমাদের ভাষায় সুন্দরীর সহিত স্থিরসৌদামিনীর তুলনা প্রসিদ্ধ আছে। সে তুলনা অধিকাংশ স্থলেই খাটে না, কিন্তু ইন্দ্রাণীকে খাটে। ইন্দ্রাণী যেন আপনার মধ্যে একটা প্রবল বেগ এবং প্রখর জ্বালা একটি সহজ শক্তির দ্বারা অটল গাম্ভীর্যপাশে অতি অনায়াসে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। বিদ্যুৎ তাহার মুখে চক্ষে এবং সর্বাঙ্গে নিত্যকাল ধরিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। এখানে তাহার চপলতা নিষিদ্ধ।

এই সুন্দরী মেয়েটিকে দেখিয়া মুকুন্দবাবু তাঁহার পোষ্যপুত্রের সহিত ইহার বিবাহ দিবার প্রস্তাব গৌরীকান্তের নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলেন। প্রভুভক্তিতে গৌরীকান্ত কাহারো নিকটে ন্যূন ছিলেন না; তিনি প্রভুর জন্য প্রাণ দিতে পারিতেন; এবং তাঁহার অবস্থার যতই উন্নতি হউক এবং কর্তা তাঁহার প্রতি বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিয়া তাঁহাকে যতই প্রশ্রয় দিন, তিনি কখনো ভ্রমেও স্বপ্নেও প্রভুর সম্মান বিস্মৃত হন নাই; প্রভুর সম্মুখে, এমন-কি, প্রভুর প্রসঙ্গে তিনি যেন সন্নত হইয়া পড়িতেন— কিন্তু এই বিবাহের প্রস্তাবে তিনি কিছুতেই সম্মত হন নাই। প্রভুভক্তির দেনা তিনি কড়ায় গণ্ডায় শোধ করিতেন, কুলমর্যাদার পাওনা তিনি ছাড়িবেন কেন। মুকুন্দলালের পুত্রের সহিত তিনি তাঁহার পৌত্রীর বিবাহ দিতে পারেন না।

ভৃত্যের এই কুলগর্ব মুকুন্দলালের ভালো লাগে নাই। তিনি আশা করিয়াছিলেন এই প্রস্তাবের দ্বারা তাঁহার ভক্ত সেবকের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করা হইবে; গৌরীকান্ত যখন কথাটা সেভাবে লইলেন না তখন মুকুন্দলাল কিছুদিন তাঁহার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত মনঃকষ্ট দিয়াছিলেন। প্রভুর এই বিমুখভাব গৌরীকান্তের বক্ষে মৃত্যুশেলের ন্যায় বাজিয়াছিল, কিন্তু তথাপি তিনি তাঁহার পৌত্রীর সহিত এক পিতৃমাতৃহীন দরিদ্র কুলীনসন্তানের বিবাহ দিয়া তাহাকে ঘরে পালন করিয়া নিজের অর্থে শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন।

সেই কুলমদগর্বিত পিতামহের পৌত্রী ইন্দ্রাণী তাহার প্রভুগৃহে গিয়া আহার করিল না; ইহাতে তাহার প্রভুপত্নী নয়নতারার অন্তঃকরণে সুমধুর প্রীতিরস উদ্‌বেলিত হইয়া উঠে নাই সে কথা বলা বাহুল্য। তখন ইন্দ্রাণীর অনেকগুলি স্পর্ধা নয়নতারার বিদ্বেষ-কষায়িত কল্পনাচক্ষে প্রকাশ পাইতে লাগিল।

প্রথম, ইন্দ্রাণী অনেক গহনা পরিয়া অত্যন্ত সুসজ্জিত হইয়া আসিয়াছিল। মনিব-বাড়িতে এত ঐশ্বর্যের আড়ম্বর করিয়া প্রভুদের সহিত সমকক্ষতা দেখাইবার কী আবশ্যক ছিল।

দ্বিতীয়, ইন্দ্রাণীর রূপের গর্ব। ইন্দ্রাণীর রূপটা ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং নিম্নপদস্থ ব্যক্তির এত অধিক রূপ থাকা অনাবশ্যক এবং অন্যায় হইতে পারে, কিন্তু তাহার গর্বটা সম্পূর্ণ নয়নতারার কল্পনা। রূপের জন্য কাহাকেও দোষী করা যায় না, এইজন্য নিন্দা করিতে হইলে অগত্যা গর্বের অবতারণা করিতে হয়।

তৃতীয়, ইন্দ্রাণীর দাম্ভিকতা, চলিত ভাষায় যাহাকে বলে দেমাক। ইন্দ্রাণীর একটি স্বাভাবিক গাম্ভীর্য ছিল। অত্যন্ত প্রিয় পরিচিত ব্যক্তি ব্যতীত সে কাহারো সহিত মাখামাখি করিতে পারিত না। তাহা ছাড়া গায়ে পড়িয়া একটা সোরগোল করা,

অগ্রসর হইয়া সকল কাজে হস্তক্ষেপ করিতে যাওয়া, সেও তাহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল না।

এইরূপ নানাপ্রকার অমূলক ও সমূলক কারণে নয়নতারা ক্রমশ উত্তপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। এবং অনাবশ্যক সূত্র ধরিয়া ইন্দ্রাণীকে 'আমাদের ম্যানেজারের স্ত্রী' 'আমাদের দেওয়ানের নাংনী' বলিয়া বারম্বার পরিচিত ও অভিহিত করিতে লাগিল। তাহার একজন প্রিয় মুখরা দাসীকে শিখাইয়া দিল— সে ইন্দ্রাণীর গায়ের উপর পড়িয়া সখীভাবে তাহার গহনাগুলি হাত দিয়া নাড়িয়া নাড়িয়া সমালোচনা করিতে লাগিল। কণ্ঠী এবং বাজুবন্দের প্রশংসা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ ভাই, এ কি গিল্টি-করা।"

ইন্দ্রাণী পরম গম্ভীরমুখে কহিল, "না, এ পিতলের।"

নয়নতারা ইন্দ্রাণীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "ওগো, তুমি ওখানে একলা দাঁড়িয়ে কী করছ, এই খাবারগুলো হাটখোলার পালকিতে তুলে দিয়ে এসো-না।"

অদূরে বাড়ির দাসী উপস্থিত ছিল।

ইন্দ্রাণী কেবল মুহূর্তকালের জন্য তাহার বিপুলপক্ষ্মচ্ছায়াগভীর উদার দৃষ্টি মেলিয়া নয়নতারার মুখের দিকে চাহিল এবং পরক্ষণেই নীরবে মিষ্টান্নপূর্ণ সরা খুরি তুলিয়া লইয়া হাটখোলার পালকির উদ্দেশে নীচে চলিল।

যিনি এই মিষ্টান্ন উপহার প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি শশব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "তুমি কেন ভাই, কষ্ট করছ, দাও-না ঐ দাসীর হাতে দাও।"

ইন্দ্রাণী তাহাতে সম্মত না হইয়া কহিল, "এতে আর কষ্ট কিসের।"

অপরা কহিলেন, "তবে ভাই, আমার হাতে দাও।"

ইন্দ্রাণী কহিল, "না, আমিই নিয়ে যাচ্ছি।"

বলিয়া, অন্নপূর্ণা যেমন স্নিগ্ধগম্ভীর মুখে সমুচ্চ স্নেহে ভক্তকে স্বহস্তে অন্ন তুলিয়া দিতে পারিতেন তেমনি অটল স্নিগ্ধভাবে ইন্দ্রাণী পালকিতে মিষ্টান্ন রাখিয়া আসিল— এবং সেই দুই মিনিট-কালের সংস্রবে হাটখোলাবাসিনী ধনিগৃহবধূ এই স্বল্পভাষিণী মিতহাসিনী ইন্দ্রাণীর সহিত জন্মের মতো প্রাণের সখীত্ব স্থাপনের জন্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

এইরূপে নয়নতারা স্ত্রীজনসুলভ নিষ্ঠুর নৈপুণ্যের সহিত যতগুলি অপমানশর বর্ষণ করিল ইন্দ্রাণী তাহার কোনোটাকেই গায়ে বিঁধিতে দিল না; সকলগুলিই তাহার অকলঙ্ক সমুজ্জ্বল সহজ তেজস্বিতার কঠিন বর্মে ঠেকিয়া আপনি ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িয়া গেল। তাহার গম্ভীর অবিচলতা দেখিয়া নয়নতারার আক্রোশ আরো বাড়িয়া উঠিতে লাগিল এবং ইন্দ্রাণী তাহা বুঝিতে পারিয়া একসময় অলক্ষ্যে কাহারো নিকট বিদায় না লইয়া বাড়ি চলিয়া আসিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যাহারা শান্তভাবে সহ্য করে তাহারা গভীরতররূপে আহত হয়; অপমানের আঘাত ইন্দ্রাণী যদিও অসীম অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তথাপি তাহা তাহার অন্তরে বাজিয়াছিল।

ইন্দ্রাণীর সহিত যেমন বিনোদবিহারীর বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল তেমনি এক সময় ইন্দ্রাণীর এক দূরসম্পর্কের নিঃস্ব পিসতুতো ভাই বামাচরণের সহিত নয়নতারার বিবাহের কথা হয়, সেই বামাচরণ এখন বিনোদের সেরেস্তায় একজন সামান্য কর্মচারী। ইন্দ্রাণীর এখনো মনে পড়ে, বাল্যকালে একদিন নয়নতারার বাপ নয়নকে সঙ্গে করিয়া তাঁহাদের বাড়িতে আসিয়া বামাচরণের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহের জন্য গৌরী-কান্তকে বিস্তর অনুনয়-বিনয় করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে ক্ষুদ্র বালিকা নয়নতারার অসামান্য প্রগল্‌ভতায় গৌরীকান্তের অন্তঃপুরে সকলেই আশ্চর্য এবং কৌতুকান্বিত হইয়াছিলেন এবং তাহার সেই অকালপক্বতার নিকট মুখচোরা লাজুক ইন্দ্রাণী নিজেকে নিতান্ত অক্ষমা অনভিজ্ঞা জ্ঞান করিয়াছিল। গৌরীকান্ত এই মেয়েটির অনর্গল কথায়-বার্তায় এবং চেহারায় বড়োই খুশি হইয়াছিলেন, কিন্তু কুলের যৎকিঞ্চিৎ ত্রুটি থাকায় বামাচরণের সহিত ইহার বিবাহপ্রস্তাবে মত দিলেন না। অবশেষে তাঁহারই পছন্দে এবং তাঁহারই চেষ্টায় অকুলীন বিনোদের সহিত নয়নতারার বিবাহ হয়।

এই-সকল কথা মনে করিয়া ইন্দ্রাণী কোনো সান্ত্বনা পাইল না, বরং অপমান আরো বেশি করিয়া বাজিতে লাগিল। মহাভারতে বর্ণিত শুক্রাচার্যদুহিতা দেবযানী এবং শর্মিষ্ঠার কথা মনে পড়িল। দেবযানী যেমন তাহার প্রভুকন্যা শর্মিষ্ঠার দর্প চূর্ণ করিয়া তাহাকে দাসী করিয়াছিল, ইন্দ্রাণী যদি তেমনি করিতে পারিত তবেই যথোপযুক্ত বিধান হইত। এক সময় ছিল, যখন দৈত্যদের নিকট দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের ন্যায় মুকুন্দবাবুর পরিবারবর্গের নিকট তাহার পিতামহ গৌরীকান্ত একান্ত আবশ্যক ছিলেন। তখন তিনি যদি ইচ্ছা করিতেন তবে মুকুন্দবাবুকে হীনতা স্বীকার করাইতে পারিতেন। কিন্তু তিনিই মুকুন্দলালের বিষয়সম্পত্তিকে উন্নতির চরম সীমায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়া সর্বপ্রকার শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, অতএব আজ আর তাঁহাকে স্মরণ করিয়া প্রভুদের কৃতজ্ঞ হইবার আবশ্যকতা নাই। ইন্দ্রাণী মনে করিল, বাঁকাগাড়ি পরগনা তাহার পিতামহ অনায়াসে নিজের জন্যই কিনিতে পারিতেন, তখন তাঁহার সে ক্ষমতা জন্মিয়াছিল, তাহা না করিয়া তিনি সেটা মনিবকে কিনিয়া দিলেন— ইহা যে একপ্রকার দান করা সে কথা কি আজ সেই মনিবের বংশে কেহ মনে করিয়া রাখিয়াছে।

'আমাদেরই দত্ত ধনমানের গর্বে তোমরা আমাদিগকে আজ অপমান করিবার অধিকার পাইয়াছ' ইহাই মনে করিয়া ইন্দ্রাণীর চিত্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া সে দেখিল তাহার স্বামী প্রভুগৃহের নিমন্ত্রণ ও তাহার পরে জমিদারি কাছারির সমস্ত কাজকর্ম সারিয়া তাহার শয়নকক্ষের একটি কেদারা আশ্রয় করিয়া নিভৃতে খবরের কাগজ পাঠ করিতেছেন।

অনেকের ধারণা আছে যে, স্বামী-স্ত্রীর স্বভাব প্রায়ই একরূপ হইয়া থাকে। তাহার কারণ, দৈবাৎ কোনো কোনো স্থলে স্বামী-স্ত্রীর স্বভাবের মিল দেখিতে পাইলে সেটা আমাদের নিকট এমন সমুচিত এবং সংগত বলিয়া বোধ হয় যে, আমরা আশা করি এই নিয়ম বুঝি অধিকাংশ স্থলেই খাটে। যাহা হউক, বর্তমান ক্ষেত্রে অম্বিকাচরণের সহিত ইন্দ্রাণীর দুই-একটা বিশেষ বিষয়ে বাস্তবিক স্বভাবের মিল দেখা যায়। অম্বিকাচরণ তেমন মিশুক লোক নহেন। তিনি বাহিরে যান কেবলমাত্র কাজ করিতে। নিজের কাজ সম্পূর্ণ শেষ করিয়া এবং অন্যকে পুরামাত্রায় কাজ করাইয়া লইয়া বাড়ি আসিয়া যেন তিনি অনাত্মীয়তার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য এক দুর্গম দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করেন। বাহিরে তিনি এবং তাঁহার কর্তব্য কর্ম, ঘরের মধ্যে তিনি এবং তাঁহার ইন্দ্রাণী, ইহাতেই তাঁহার সমস্ত জীবন পর্যাপ্ত।

ভূষণের ছটা বিস্তার করিয়া যখন সুসজ্জিতা ইন্দ্রাণী ঘরে প্রবেশ করিলেন তখন অম্বিকাচরণ তাঁহাকে পরিহাস করিয়া কী একটা কথা বলিবার উপক্রম করিলেন, কিন্তু সহসা ক্ষান্ত হইয়া চিন্তিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কী হয়েছে।"

ইন্দ্রাণী তাঁহার সমস্ত চিন্তা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, "কী আর হবে। সম্প্রতি আমার স্বামিরত্নের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে।"

অম্বিকা খবরের কাগজ ভূমিতলে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, "সে তো আমার অগোচর নেই। তৎপূর্বে ?"

ইন্দ্রাণী একে একে গহনা খুলিতে খুলিতে বলিলেন, "তৎপূর্বে স্বামিনীর কাছ থেকে সমাদর লাভ হয়েছে।"

অম্বিকা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সমাদরটা কী রকমের।"

ইন্দ্রাণী স্বামীর কাছে আসিয়া তাঁহার কেদারার হাতার উপর বসিয়া তাঁহার গ্রীবা বেষ্টন করিয়া উত্তর করিল, "তোমার কাছ থেকে যে রকমের পাই ঠিক সেই রকমের নয়।"

তাহার পর, ইন্দ্রাণী একে একে সকল কথা বলিয়া গেল। সে মনে করিয়াছিল স্বামীর কাছে এ-সকল অপ্রিয় কথার উত্থাপন করিবে না ; কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল

না এবং ইহার অনুরূপ প্রতিজ্ঞাও ইন্দ্রাণী ইতিপূর্বে কখনো রক্ষা করিতে পারে নাই। বাহিরের লোকের নিকট ইন্দ্রাণী যতই সংযত সমাহিত হইয়া থাকিত স্বামীর নিকটে সে সেই পরিমাণে আপন প্রকৃতির সমুদয় স্বাভাবিক বন্ধন মোচন করিয়া ফেলিত— সেখানে লেশমাত্র আত্মগোপন করিতে পারিত না।

অম্বিকাচরণ সমস্ত ঘটনা শুনিয়া মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "এখনই আমি কাজে ইস্তফা দিব।" তৎক্ষণাৎ তিনি বিনোদবাবুকে এক কড়া চিঠি লিখিতে উদ্যত হইলেন।

ইন্দ্রাণী তখন চৌকির হাতা হইতে নীচে নামিয়া মাদুর-পাতা মেঝের উপর স্বামীর পায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার কোলের উপর বাহু রাখিয়া বলিল, "এত তাড়াতাড়ি কাজ নেই। চিঠি আজ থাক্। কাল সকালে যা হয় স্থির কোরো।"

অম্বিকা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, "না, আর এক দণ্ড বিলম্ব করা উচিত নয়।"

ইন্দ্রাণী তাহার পিতামহের হৃদয়মৃণালে একটিমাত্র পদ্মের মতো ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার অন্তর হইতে সে যেমন স্নেহরস আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল তেমনি পিতামহের চিত্তসঞ্চিত অনেকগুলি ভাব সে অলক্ষ্যে গ্রহণ করিয়াছিল। মুকুন্দলালের পরিবারের প্রতি গৌরীকান্তের যে-একটি অচল নিষ্ঠা ও ভক্তি ছিল ইন্দ্রাণী যদিও তাহা সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হয় নাই, কিন্তু প্রভুপরিবারের হিতসাধনে জীবন অর্পণ করা যে তাহাদের কর্তব্য এই ভাবটি তাহার মনে দৃঢ় বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। তাহার সুশিক্ষিত স্বামী ইচ্ছা করিলে ওকালতি করিতে পারিতেন, সম্মানজনক কাজ লইতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর হৃদয়ের দৃঢ় সংস্কার অনুসরণ করিয়া তিনি অনন্যমনে সন্তুষ্টচিত্তে বিনোদের বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। ইন্দ্রাণী যদিও অপমানে আহত হইয়াছিল, তথাপি তাহার স্বামী যে বিনোদবিহারীর কাজ ছাড়িয়া দিবে এ তাহার কিছুতেই মনে লইল না।

ইন্দ্রাণী তখন যুক্তির অবতারণা করিয়া মৃদুস্বরে মিষ্টস্বরে কহিল, "বিনোদবাবুর তো কোনো দোষ নেই, তিনি এর কিছুই জানেন না। তাঁর স্ত্রীর উপর রাগ করে তুমি হঠাৎ তাড়াতাড়ি তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করতে যাবে কেন।"

শুনিয়া অম্বিকাবাবু উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন; নিজের সংকল্প তাঁহার নিকট অত্যন্ত হাস্যকর বলিয়া বোধ হইল। তিনি কহিলেন, "সে একটা কথা বটে। কিন্তু মনিব হোন আর যিনিই হোন, ওদের ওখানে আর কখনো তোমাকে পাঠাচ্ছি নে।"

এই অল্প একটু ঝড়েই সেদিনকার মতো মেঘ কাটিয়া গেল, গৃহ প্রসন্ন হইয়া

উঠিল এবং স্বামীর বিশেষ আদরে ইন্দ্রাণী বাহিরের সমস্ত অনাদর বিস্মৃত হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিনোদবিহারী অম্বিকাচরণের উপর সম্পূর্ণ ভার দিয়া জমিদারির কাজ কিছুই দেখিতেন না। নিতান্তনির্ভর ও অতিনিশ্চয়তাবশত কোনো কোনো স্বামী ঘরের স্ত্রীকে যেরূপ অবহেলার চক্ষে দেখিয়া থাকে, নিজের জমিদারির প্রতিও বিনোদের কতকটা সেইভাবের উপেক্ষা ছিল। জমিদারির আয় এতই নিশ্চিত, এতই বাঁধা যে তাহাকে আয় বলিয়া বোধ হয় না, তাহা অভ্যস্ত, এবং তাহার কোনো আকর্ষণ ছিল না।

বিনোদের ইচ্ছা ছিল, একটা সংক্ষেপ সুড়ঙ্গপথ অবলম্বন করিয়া হঠাৎ এক রাত্রির মধ্যে কুবেরের ভাণ্ডারের মধ্যে প্রবেশ করিবেন। সেইজন্য নানা লোকের পরামর্শে তিনি গোপনে নানাপ্রকার আজগবি ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিতেন। কখনো স্থির হইত, দেশের সমস্ত বাবলা গাছ জমা লইয়া গোরুর গাড়ির চাকা তৈরি করিবেন; কখনো পরামর্শ হইত, সুন্দরবনের সমস্ত মধুচক্র তিনি আহরণ করিবেন; কখনো লোক পাঠাইয়া পশ্চিমপ্রদেশের বনগুলি বন্দোবস্ত করিয়া হরীতকীর ব্যবসায় একচেটে করিবার আয়োজন হইত। বিনোদ মনে মনে ইহা বুঝিতেন যে অন্য লোকে শুনিলে হাসিবে, সেইজন্য কাহারো কাছে প্রকাশ করিতে চাহিতেন না। বিশেষত অম্বিকাচরণকে তিনি একটু বিশেষ লজ্জা করিতেন; অম্বিকা পাছে মনে করেন তিনি টাকাগুলো নষ্ট করিতে বসিয়াছেন, সেজন্য মনে মনে সংকুচিত ছিলেন। অম্বিকার নিকট তিনি এমনভাবে থাকিতেন যেন অম্বিকাই জমিদার এবং তিনি কেবল বসিয়া থাকিবার জন্য বার্ষিক কিছু বেতন পাইতেন।

নিমন্ত্রণের পরদিন হইতে নয়নতারা তাঁহার স্বামীর কানে মন্ত্র দিতে লাগিলেন। "তুমি তো নিজে কিছুই দেখ না, তোমাকে অম্বিকা হাত তুলিয়া যাহা দেয় তাহাই তুমি শিরোধার্য করিয়া লও; এ দিকে ভিতরে ভিতরে কী সর্বনাশ হইতেছে তাহা কেহই জানে না। তোমার ম্যানেজারের স্ত্রী যা গয়না পরিয়া আসিয়াছিল এমন গয়না তোমার ঘরে আসিয়া আমি কখনো চক্ষেও দেখি নাই। এ-সব গয়না সে পায় কোথা হইতে এবং এত দেমাকই বা তাহার বাড়িল কিসের জোরে" ইত্যাদি ইত্যাদি। গহনার বর্ণনা নয়নতারা অনেকটা অতিরঞ্জিত করিয়া বলিল, এবং ইন্দ্রাণী নিজমুখে তাহার দাসীকে কী-সকল কথা বলিয়া গেছে তাহাও সে বহুল পরিমাণে রচনা করিয়া গেল।

বিনোদ দুর্বল প্রকৃতির লোক ; এক দিকে সে পরের প্রতি নির্ভর না করিয়াও থাকিতে পারে না, অপর দিকে যে তাহার কানে যেরূপ সন্দেহ তুলিয়া দেয় সে তাহাই বিশ্বাস করিয়া বসে। ম্যানেজার যে চুরি করিতেছে মুহূর্তকালের মধ্যেই এ বিশ্বাস তাহার দৃঢ় হইল। বিশেষত কাজ সে নিজে দেখে না বলিয়া কল্পনায় সে নানাপ্রকার বিভীষিকা দেখিতে লাগিল। অথচ কেমন করিয়া ম্যানেজারের চুরি ধরিতে হইবে তাহারও রাস্তা সে জানে না। স্পষ্ট করিয়া তাহাকে কিছু বলিতে পারে এমন সাহস নাই। মহা মুশকিল হইল।

অম্বিকাচরণের একাধিপত্যে কর্মচারিগণ সকলেই ঈর্ষান্বিত ছিল। বিশেষত গৌরীকান্ত তাঁহার যে দূরসম্পর্কীয় ভাগিনেয় বামাচরণকে কাজ দিয়াছিলেন অম্বিকার প্রতি বিদ্বেষ তাহারই সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল। কারণ, সম্পর্ক প্রভৃতি অনুসারে সে নিজেকে অম্বিকার সমান জ্ঞান করিত এবং অম্বিকা তাহার আত্মীয় হইয়াও কেবলমাত্র ঈর্ষাবশতই তাহাকে উচ্চপদ দিতেছে না, এ ধারণা তাহার দৃঢ় ছিল। পদ পাইলেই পদের উপযুক্ত যোগ্যতা আপনি জোগায় এই তাহার মত। বিশেষত ম্যানেজারের কাজকে সে অত্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করিত ; বলিত, সেকালে রথের উপর যেমন ধ্বজা থাকিত, আজকাল আপিসের কাজে ম্যানেজার সেইরূপ— ঘোড়া-বেটা খাটিয়া মরে আর ধ্বজা-মহাশয় রথের সঙ্গে সঙ্গে কেবল দর্পভরে দুলিতে থাকেন।

বিনোদ ইতিপূর্বে কাজকর্মের কোনো খোঁজখবর লইত না ; কেবল যখন ব্যাবসা উপলক্ষে হঠাৎ অনেক টাকার প্রয়োজন হইত তখন গোপনে খাজাঞ্চিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিত, এখন তহবিলে কত টাকা আছে? খাজাঞ্চি টাকার পরিমাণ বলিলে কিঞ্চিৎ ইতস্তত করিয়া সে টাকাটা চাহিয়া ফেলিত, যেন তাহা পরের টাকা। খাজাঞ্চি তাহার নিকট সই লইয়া টাকা দিত, তাহার পরে কিছুকাল ধরিয়া অম্বিকাবাবুর নিকট বিনোদ কুণ্ঠিত হইয়া থাকিত। কোনোমতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না হইলেই আরাম বোধ করিত।

অম্বিকাচরণ মাঝে মাঝে ইহা লইয়া বিপদে পড়িতেন। কারণ, জমিদারের অংশ জমিদারকে দিয়া তহবিলে প্রায় আমানতি সদরখাজনা, অথবা আমলাবর্গের বেতন প্রভৃতির খরচের টাকা জমা থাকিত। সে টাকা অন্যায় ব্যয় হইয়া গেলে বড়োই অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। কিন্তু বিনোদ টাকাটি লইয়া এমনি চোরের মতো লুকাইয়া বেড়াইত যে, তাহাকে এ সম্বন্ধে কোনো কথা বলিবার অবসর পাওয়া যাইত না ; পত্র লিখিলেও কোনো ফল হইত না ; কারণ, লোকটার কেবল চক্ষুলজ্জা ছিল, আর-কোনো লজ্জা ছিল না, এইজন্য সে কেবল সাক্ষাৎকারকে ডরাইত।

ক্রমে যখন বিনোদ বাড়াবাড়ি করিতে লাগিল, তখন অম্বিকাচরণ বিরক্ত হইয়া লোহার সিন্ধুকের চাবি নিজের কাছে রাখিলেন। বিনোদের গোপনে টাকা লওয়া একেবারে বন্ধ হইল। অথচ লোকটা এতই দুর্বল প্রকৃতি যে, প্রভু হইয়াও স্পষ্ট করিয়া এ সম্বন্ধে কোনোপ্রকার বল খাটাইতে পারিল না। অম্বিকাচরণের বৃথা চেষ্টা। অলক্ষ্মী যাহার সহায় লোহার সিন্ধুকের চাবি তাহার টাকা আটক করিয়া রাখিতে পারে না। বরং হিতে বিপরীত হইল। কিন্তু সে-সকল কথা পরে হইবে।

অম্বিকাচরণের কড়া নিয়মে বিনোদ ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত উত্ত্যক্ত হইয়াছিল। এমন সময় নয়নতারা যখন তাহার মনে সন্দেহ জন্মাইয়া দিল তখন সে কিছু খুশি হইল। গোপনে একে একে নিম্নতন কর্মচারীদিগকে ডাকিয়া সন্ধান লইতে লাগিল। তখন বামাচরণ তাহার প্রধান চর হইয়া উঠিল।

গৌরীকান্তের আমলে দেওয়ানজি বলপূর্বক পার্শ্ববর্তী জমিদারের জমিতে হস্তক্ষেপ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এমন করিয়া তিনি অনেকের অনেক জমি অপহরণ করিয়াছেন। কিন্তু অম্বিকাচরণ কখনো সে কাজে প্রবৃত্ত হইতেন না। এবং মকদ্দমা বাধিবার উপক্রম হইলে তিনি যথাসাধ্য আপসের চেষ্টা করিতেন। বামাচরণ ইহারই প্রতি প্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। স্পষ্ট বুঝাইয়া দিল, অম্বিকাচরণ নিশ্চয় অপর পক্ষ হইতে ঘুষ লইয়া মনিবের ক্ষতি করিয়া আপস করিয়াছে। বামাচরণের নিজেরও বিশ্বাস তাহাই; যাহার হাতে ক্ষমতা আছে সে যে ঘুষ না লইয়া থাকিতে পারে, ইহা সে মরিয়া গেলেও বিশ্বাস করিতে পারে না।

এইরূপে গোপনে নানা মুখ হইতে ফুৎকার পাইয়া বিনোদের সন্দেহশিখা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল; কিন্তু সে প্রত্যক্ষভাবে কোনো উপায় অবলম্বন করিতেই সাহস করিল না। এক চক্ষুলজ্জা; দ্বিতীয়ত. আশঙ্কা, পাছে সমস্ত অবস্থাভিজ্ঞ অম্বিকাচরণ তাহার কোনো অনিষ্ট করে।

অবশেষে নয়নতারা স্বামীর এই কাপুরুষতায় জ্বলিয়া পুড়িয়া বিনোদের অজ্ঞাতসারে একদিন অম্বিকাচরণকে ডাকিয়া পর্দার আড়াল হইতে বলিলেন, "তোমাকে আর রাখা হবে না, তুমি বামাচরণকে সমস্ত হিসেব বুঝিয়ে দিয়ে চলে যাও।"

তাঁহার সম্বন্ধে বিনোদের নিকট আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে সে কথা অম্বিকা পূর্বেই আভাসে জানিতে পারিয়াছিলেন, সেজন্য নয়নতারার কথায় তিনি তেমন আশ্চর্য হন নাই; তৎক্ষণাৎ বিনোদবিহারীর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে কি আপনি কাজ থেকে নিষ্কৃতি দিতে চান।"

বিনোদ শশব্যস্ত হইয়া কহিল, "না, কখনোই না।"

অম্বিকাচরণ পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার উপর কি আপনার কোনো সন্দেহের কারণ ঘটেছে।"

বিনোদ অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "কিছুমাত্র না।" অম্বিকাচরণ নয়নতারার ঘটনা উল্লেখমাত্র না করিয়া আপিসে চলিয়া আসিলেন; বাড়িতে ইন্দ্রাণীকেও কিছু বলিলেন না। এইভাবে কিছুদিন গেল।

এমন সময় অম্বিকাচরণ ইনফ্লুয়েঞ্জায় পড়িলেন। শক্ত ব্যামো নহে, কিন্তু দুর্বলতা-বশত অনেক দিন আপিস কামাই করিতে হইল।

সেই সময় সদর খাজনা দেয় এবং অন্যান্য কাজের বড়ো ভিড়। সেইজন্য একদিন সকালে রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া অম্বিকাচরণ হঠাৎ আপিসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেদিন কেহই তাঁহাকে প্রত্যাশা করে নাই এবং সকলেই বলিতে লাগিল, "আপনি বাড়ি যান, এত কাহিল শরীরে কাজ করিবেন না।"

অম্বিকাচরণ নিজের দুর্বলতার প্রসঙ্গ উড়াইয়া দিয়া, ডেস্কে গিয়া বসিলেন। আমলারা সকলেই কিছু যেন অস্থির হইয়া উঠিল এবং হঠাৎ অত্যন্ত অতিরিক্ত মনোযোগের সহিত নিজ নিজ কাজে প্রবৃত্ত হইল।

অম্বিকাচরণ ডেস্ক খুলিয়া দেখেন তাহার মধ্যে তাঁহার একখানি কাগজও নাই। সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কী!" সকলেই যেন আকাশ হইতে পড়িল, চোরে লইয়াছে কি ভূতে লইয়াছে কেহ ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না।

বামাচরণ কহিল, "আরে মশায়, আপনারা ন্যাকামি রেখে দিন। সকলেই জানেন, ওর কাগজপত্র বাবু নিজে তলব করে নিয়ে গেছেন।"

অম্বিকা রুদ্ধ রোষে শ্বেতবর্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন।"

বামাচরণ কাগজ লিখিতে লিখিতে বলিল, "সে আমরা কেমন করে বলব।"

বিনোদ অম্বিকাচরণের অনুপস্থিতি-সুযোগে বামাচরণের মন্ত্রণাক্রমে নূতন চাবি তৈয়ার করাইয়া ম্যানেজারের প্রাইভেট ডেস্ক খুলিয়া তাঁহার সমস্ত কাগজপত্র পরীক্ষা করিতে লইয়া গিয়াছেন। চতুর বামাচরণ সে কথা গোপন করিল না, অম্বিকা অপমানিত হইয়া কাজে ইস্তফা দেন ইহা তাহার অনভিপ্রেত ছিল না।

অম্বিকাচরণ ডেস্কে চাবি লাগাইয়া কম্পিতদেহে বিনোদের সন্ধানে গেলেন— বিনোদ বলিয়া পাঠাইল তাহার মাথা ধরিয়াছে— সেখান হইতে বাড়ি গিয়া হঠাৎ দুর্বলদেহে বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। ইন্দ্রাণী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে তাহার সমস্ত হৃদয় দিয়া যেন আবৃত করিয়া ধরিল। ক্রমে ইন্দ্রাণী সকল কথা শুনিল।

স্থিরসৌদামিনী আজ স্থির রহিল না— তাহার বক্ষ ফুলিতে লাগিল, বিস্ফারিত

মেঘকৃষ্ণ চক্ষুপ্রান্ত হইতে উন্মুক্ত বজ্রশিখা সুতীব্র উগ্রজ্বালা বিক্ষেপ করিতে লাগিল। এমন স্বামীর এমন অপমান! এত বিশ্বাসের এই পুরস্কার!

ইন্দ্রাণীর এই অত্যুগ্র নিঃশব্দ রোষদাহ দেখিয়া অম্বিকার রাগ থামিয়া গেল। তিনি যেন দেবতার শাসন হইতে পাপীকে রক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্রাণীর হাত ধরিয়া বলিলেন, "বিনোদ ছেলেমানুষ, দুর্বলস্বভাব, পাঁচজনের কথা শুনে তার মন বিগড়ে গেছে।"

তখন ইন্দ্রাণী দুই হস্তে তাহার স্বামীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া তাঁহাকে বক্ষের কাছে টানিয়া লইয়া আবেগের সহিত চাপিয়া ধরিল এবং হঠাৎ তাহার দুই চক্ষুর রোষদীপ্তি ম্লান করিয়া দিয়া ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া অশ্রুজল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। পৃথিবীর সমস্ত অন্যায় হইতে, সমস্ত অপমান হইতে, দুই বাহুপাশে টানিয়া লইয়া সে যেন তাহার হৃদয়-দেবতাকে আপন হৃদয়মন্দিরে তুলিয়া রাখিতে চায়।

স্থির হইল অম্বিকাচরণ এখনই কাজ ছাড়িয়া দিবেন— আজ আর কেহ তাহাতে কিছুমাত্র প্রতিবাদ করিল না। কিন্তু এই তুচ্ছ প্রতিশোধে ইন্দ্রাণীর মন কিছুই সান্ত্বনা মানিল না। যখন সন্দিগ্ধ প্রভু নিজেই অম্বিকাকে ছাড়াইতে উদ্যত তখন কাজ ছাড়িয়া দিয়া তাহার আর কী শাসন হইল। কাজে জবাব দিবার সংকল্প করিয়াই অম্বিকার রাগ থামিয়া গেল, কিন্তু সকল কাজকর্ম সকল আরামবিশ্রামের মধ্যে ইন্দ্রাণীর রাগ তাহার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে জ্বলিতে লাগিল।

পরিশিষ্ট

এমন সময়ে চাকর আসিয়া খবর দিল, বাবুদের বাড়ির খাজাঞ্চি আসিয়াছে। অম্বিকা মনে করিলেন, বিনোদ স্বাভাবিক চক্ষুলজ্জাবশত খাজাঞ্চির মুখ দিয়া তাঁহাকে কাজ হইতে জবাব দিয়া পাঠাইয়াছেন। সেইজন্য নিজেই একখানি ইস্তফাপত্র লিখিয়া খাজাঞ্চির হস্তে গিয়া দিলেন।

খাজাঞ্চি তৎসম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন না করিয়া কহিল, "সর্বনাশ হইয়াছে।"

অম্বিকা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী হইয়াছে।"

তদুত্তরে শুনিলেন, যখন হইতে অম্বিকাচরণের সতর্কতাবশত খাজাঞ্চিখানা হইতে বিনোদের টাকা লওয়া বন্ধ হইয়াছে তখন হইতে বিনোদ নানা স্থান হইতে গোপনে বিস্তর টাকা ধার লইতে আরম্ভ করিয়াছিল। একটার পর একটা ব্যাবসা ফাঁদিয়া সে যতই প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল ততই তাহার রোখ চড়িয়া যাইতেছিল; ততই নূতন নূতন অসম্ভব উপায়ে আপন ক্ষতি নিবারণের চেষ্টা করিয়া অবশেষে আকণ্ঠ ঋণে নিমগ্ন হইয়াছে। অম্বিকাচরণ যখন পীড়িত ছিলেন তখন বিনোদ সেই সুযোগে

তহবিল হইতে সমস্ত টাকা উঠাইয়া লইয়াছে। বাঁকাগাড়ি পরগনা অনেক কাল হইতেই পার্শ্ববর্তী জমিদারের নিকট রেহেনে আবদ্ধ; সে এ-পর্যন্ত টাকার জন্য কোনোপ্রকার তাগাদা না দিয়া অনেক টাকা সুদ জমিতে দিয়াছে, এখন সময় বুঝিয়া হঠাৎ ডিক্রি করিয়া লইতে উদ্যত হইয়াছে। এই তো বিপদ।

শুনিয়া অম্বিকাচরণ কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। অবশেষে কহিলেন, "আজ কিছুই ভেবে উঠতে পারছি নে, কাল এর পরামর্শ করা যাবে।"

খাজাঞ্চি যখন বিদায় লইতে উঠিলেন তখন অম্বিকা তাঁহার ইস্তফাপত্র চাহিয়া লইলেন।

অন্তঃপুরে আসিয়া অম্বিকা ইন্দ্রাণীকে সকল কথা বিস্তারিত জানাইয়া কহিলেন, "বিনোদের এ অবস্থায় তো আমি কাজ ছেড়ে দিতে পারি নে।"

ইন্দ্রাণী অনেকক্ষণ প্রস্তরমূর্তির মতো স্থির হইয়া রহিল। অবশেষে অন্তরের সমস্ত বিরোধদ্বন্দ্ব সবলে দলন করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "না, এখন ছাড়তে পার না।"

তাহার পরে 'কোথায় টাকা' 'কোথায় টাকা' করিয়া সন্ধান পড়িয়া গেল— যথেষ্ট পরিমাণে টাকা আর জুটে না। অন্তঃপুর হইতে গহনাগুলি সংগ্রহ করিবার জন্য অম্বিকা বিনোদকে পরামর্শ দিলেন। ইতিপূর্বে ব্যাবসা উপলক্ষে বিনোদ সে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কখনো কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। এবারে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া, অনেক কাঁদিয়া-কাটিয়া, অনেক দীনতা স্বীকার করিয়া গহনাগুলি ভিক্ষা চাহিলেন। নয়নতারা কিছুতেই দিলেন না; তিনি মনে করিলেন, তাঁহার চারি দিক হইতে সকলই খসিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে; এখন এই গহনাগুলি তাঁহার একমাত্র শেষ অবলম্বনস্থল— এবং ইহা তিনি অন্তিম আগ্রহ সহকারে প্রাণপণে চাপিয়া ধরিলেন।

যখন কোথা হইতেও কোনো টাকা পাওয়া গেল না তখন ইন্দ্রাণীর প্রতিহিংসা-ভ্রূকুটির উপরে একটা তীব্র আনন্দের জ্যোতি পতিত হইল। সে তাহার স্বামীর হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "তোমার যাহা কর্তব্য তাহা তো করিয়াছ; এখন তুমি ক্ষান্ত হও, যাহা হইবার তা হউক।"

স্বামীর অবমাননায় উদ্দীপ্ত সতীর রোষানল এখনো নির্বাপিত হয় নাই দেখিয়া অম্বিকা মনে মনে হাসিলেন। বিপদের দিনে অসহায় বালকের ন্যায় বিনোদ তাঁহার উপরে এমন একান্ত নির্ভর করিয়াছে যে, তাহার প্রতি তাঁহার দয়ার উদ্রেক হইয়াছে— এখন তাহাকে তিনি কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারেন না। তিনি মনে করিতেছিলেন, তাঁহার নিজের বিষয় আবদ্ধ রাখিয়া টাকা উঠাইবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু

ইন্দ্রাণী তাঁহাকে মাথার দিব্য দিয়া বলিল, "ইহাতে আর তুমি হাত দিতে পারিবে না।"

অম্বিকাচরণ বড়ো ইতস্ততের মধ্যে পড়িয়া ভাবিতে বসিয়া গেলেন। তিনি ইন্দ্রাণীকে আস্তে আস্তে বুঝাইবার যতই চেষ্টা করিতে লাগিলেন ইন্দ্রাণী কিছুতেই তাঁহাকে কথা কহিতে দিল না। অবশেষে অম্বিকা কিছু বিমর্ষ হইয়া, গম্ভীর হইয়া, নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন।

তখন ইন্দ্রাণী লোহার সিন্দুক খুলিয়া তাহার সমস্ত গহনা একটি বৃহৎ থালায় স্তূপাকার করিল এবং সেই গুরুভার থালাটি বহুকষ্টে দুই হস্তে তুলিয়া ঈষৎ হাসিয়া তাহার স্বামীর পায়ের কাছে রাখিল।

পিতামহের একমাত্র স্নেহের ধন ইন্দ্রাণী পিতামহের নিকট হইতে জন্মাবধি বৎসরে বৎসরে অনেক বহুমূল্য অলংকার উপহার পাইয়া আসিয়াছে; মিতাচারী স্বামীরও জীবনের অধিকাংশ সঞ্চয় এই সন্তানহীন রমণীর ভাণ্ডারে অলংকাররূপে রূপান্তরিত হইয়াছে। সেই সমস্ত স্বর্ণমাণিক্য স্বামীর নিকট উপস্থিত করিয়া ইন্দ্রাণী কহিল, "আমার এই গহনাগুলি দিয়া আমার পিতামহের দত্ত দান উদ্ধার করিয়া আমি পুনর্বার তাঁহার প্রভুবংশকে দান করিব!"

এই বলিয়া সে সজল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মস্তক নত করিয়া কল্পনা করিল, তাহার সেই বিরলশুভ্রকেশধারী, সরলসুন্দরমুখচ্ছবি, শান্তস্নেহহাস্যময়, ধীপ্রদীপ্ত উজ্জ্বলগৌর-কান্তি বৃদ্ধ পিতামহ এই মুহূর্তে এখানে উপস্থিত আছেন এবং তাহার নত মস্তকে শীতল স্নেহহস্ত রাখিয়া তাহাকে নীরবে আশীর্বাদ করিতেছেন।

বাঁকাগাড়ি পরগনা পুনশ্চ ক্রয় হইয়া গেলে, তখন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া গতভূষণা ইন্দ্রাণী আবার নয়নতারার অন্তঃপুরে নিমন্ত্রণে গমন করিল। আর তাহার মনে কোনো অপমান-বেদনা রহিল না।

আষাঢ় ১৩০২

ক্ষুধিত পাষাণ

আমি এবং আমার আত্মীয় পূজার ছুটিতে দেশভ্রমণ সারিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতেছিলাম, এমন সময় রেলগাড়িতে বাবুটির সঙ্গে দেখা হয়। তাঁহার বেশভূষা দেখিয়া প্রথমটা তাঁহাকে পশ্চিমদেশীয় মুসলমান বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। তাঁহার কথাবার্তা শুনিয়া আরো ধাঁধা লাগিয়া যায়। পৃথিবীর সকল বিষয়েই এমন করিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন, যেন তাঁহার সহিত প্রথম পরামর্শ করিয়া বিশ্ববিধাতা সকল কাজ করিয়া থাকেন। বিশ্বসংসারের ভিতরে ভিতরে যে এমন-সকল অশ্রুতপূর্ব নিগূঢ় ঘটনা ঘটিতেছিল, রুশিয়ানরা যে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে, ইংরাজদের যে এমন-সকল গোপন মতলব আছে, দেশীয় রাজাদের মধ্যে যে একটা খিচুড়ি পাকিয়া উঠিয়াছে, এ-সমস্ত কিছুই না জানিয়া আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া ছিলাম। আমাদের নবপরিচিত আলাপীটি ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন : There happen more things in heaven and earth, Horatio, than are reported in your newspapers. আমরা এই প্রথম ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছি, সুতরাং লোকটির রকমসকম দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। লোকটা সামান্য উপলক্ষে কখনো বিজ্ঞান বলে, কখনো বেদের ব্যাখ্যা করে, আবার হঠাৎ কখনো পার্সি বয়েত আওড়াইতে থাকে। বিজ্ঞান বেদ এবং পার্সিভাষায় আমাদের কোনোরূপ অধিকার না থাকাতে তাঁহার প্রতি আমাদের ভক্তি উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। এমন-কি, আমার থিয়সফিস্ট্‌ আত্মীয়টির মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, আমাদের এই সহযাত্রীর সহিত কোনো এক রকমের অলৌকিক ব্যাপারের কিছু-একটা যোগ আছে; কোনো একটা অপূর্ব ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্‌ অথবা দৈবশক্তি, অথবা সূক্ষ্ম শরীর, অথবা ঐ ভাবের একটা-কিছু। তিনি এই অসামান্য লোকের সমস্ত সামান্য কথাও ভক্তিবিহ্বল মুগ্ধভাবে শুনিতেছিলেন এবং গোপনে নোট করিয়া লইতেছিলেন; আমার ভাবে বোধ হইল, অসামান্য ব্যক্তিটিও গোপনে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং কিছু খুশি হইয়াছিলেন।

গাড়িটি আসিয়া জংশনে থামিলে আমরা দ্বিতীয় গাড়ির অপেক্ষায় ওয়েটিংরুমে সমবেত হইলাম। তখন রাত্রি সাড়ে দশটা। পথের মধ্যে একটা কী ব্যাঘাত হওয়াতে গাড়ি অনেক বিলম্বে আসিবে শুনিলাম। আমি ইতিমধ্যে টেবিলের উপর বিছানা পাতিয়া ঘুমাইব স্থির করিয়াছি, এমন সময়ে সেই অসামান্য ব্যক্তিটি নিম্নলিখিত গল্প

কাঁদিয়া বসিলেন। সে রাত্রে আমার আর ঘুম হইল না।

রাজ্যচালনা সম্বন্ধে দুই-একটা বিষয়ে মতান্তর হওয়াতে আমি জুনাগড়ের কর্ম ছাড়িয়া দিয়া হাইদ্রাবাদে যখন নিজাম-সরকারে প্রবেশ করিলাম তখন আমাকে অল্পবয়স্ক ও মজবুত লোক দেখিয়া প্রথমে বরীচে তুলার মাশুল-আদায়ে নিযুক্ত করিয়া দিল।

বরীচ জায়গাটি বড়ো রমণীয়। নির্জন পাহাড়ের নীচে বড়ো বড়ো বনের ভিতর দিয়া শুস্তা নদীটি (সংস্কৃত স্বচ্ছতোয়ার অপভ্রংশ) উপলমুখরিত পথে নিপুণা নর্তকীর মতো পদে পদে বাঁকিয়া বাঁকিয়া দ্রুত নৃত্যে চলিয়া গিয়াছে। ঠিক সেই নদীর ধারেই পাথর-বাঁধানো দেড়-শত-সোপান-ময় অত্যুচ্চ ঘাটের উপরে একটি শ্বেতপ্রস্তরের প্রাসাদ শৈলপদমূলে একাকী দাঁড়াইয়া আছে— নিকটে কোথাও লোকালয় নাই। বরীচের তুলার হাট এবং গ্রাম এখান হইতে দূরে।

প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্বে দ্বিতীয় শা-মামুদ ভোগবিলাসের জন্য প্রাসাদটি এই নির্জন স্থানে নির্মাণ করিয়াছিলেন। তখন হইতে স্নানশালার ফোয়ারার মুখ হইতে গোলাপগন্ধী জলধারা উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকিত এবং সেই শীকরশীতল নিভৃত গৃহের মধ্যে মর্মরখচিত স্নিগ্ধ শিলাসনে বসিয়া কোমল নগ্ন পদপল্লব জলাশয়ের নির্মল জলরাশির মধ্যে প্রসারিত করিয়া তরুণী পারসিক রমণীগণ স্নানের পূর্বে কেশ মুক্ত করিয়া দিয়া সেতার-কোলে দ্রাক্ষাবনের গজল গান করিত।

এখন আর সে ফোয়ারা খেলে না, সে গান নাই, সাদা পাথরের উপর শুভ্র চরণের সুন্দর আঘাত পড়ে না— এখন ইহা আমাদের মতো নির্জনবাসপীড়িত সঙ্গিনীহীন মাশুল-কালেক্টরের অতি বৃহৎ এবং অতি শূন্য বাসস্থান। কিন্তু আপিসের বৃদ্ধ কেরানি করিম খাঁ আমাকে এই প্রাসাদে বাস করিতে বারম্বার নিষেধ করিয়াছিল। বলিয়াছিল, ইচ্ছা হয় দিনের বেলা থাকিবেন, কিন্তু কখনো এখানে রাত্রিযাপন করিবেন না। আমি হাসিয়া উড়াইয়া দিলাম। ভৃত্যেরা বলিল, তাহারা সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করিবে, কিন্তু রাত্রে এখানে থাকিবে না। আমি বলিলাম, তথাস্তু। এ বাড়ির এমন বদনাম ছিল যে, রাত্রে চোরও এখানে আসিতে সাহস করিত না।

প্রথম প্রথম আসিয়া এই পরিত্যক্ত পাষাণপ্রাসাদের বিজনতা আমার বুকের উপর যেন একটা ভয়ংকর ভারের মতো চাপিয়া থাকিত, আমি যতটা পারিতাম বাহিরে থাকিয়া অবিশ্রাম কাজকর্ম করিয়া রাত্রে ঘরে ফিরিয়া শ্রান্তদেহে নিদ্রা দিতাম।

কিন্তু সপ্তাহখানেক না যাইতেই বাড়িটার এক অপূর্ব নেশা আমাকে ক্রমশ আক্রমণ

করিয়া ধরিতে লাগিল। আমার সে অবস্থা বর্ণনা করাও কঠিন এবং সে কথা লোককে বিশ্বাস করানোও শক্ত। সমস্ত বাড়িটা একটা সজীব পদার্থের মতো আমাকে তাহার জঠরস্থ মোহরসে অল্পে অল্পে যেন জীর্ণ করিতে লাগিল।

বোধ হয় এ বাড়িতে পদার্পণমাত্রেই এ প্রক্রিয়ার আরম্ভ হইয়াছিল— কিন্তু আমি যেদিন সচেতনভাবে প্রথম ইহার সূত্রপাত অনুভব করি সেদিনকার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে।

তখন গ্রীষ্মকালের আরম্ভে বাজার নরম; আমার হাতে কোনো কাজ ছিল না। সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে আমি সেই নদীতীরে ঘাটের নিম্নতলে একটা আরাম-কেদারা লইয়া বসিয়াছি। তখন শুস্তানদী শীর্ণ হইয়া আসিয়াছে; ও পারে অনেকখানি বালুতট অপরাহ্নের আভায় রঙিন হইয়া উঠিয়াছে, এ পারে ঘাটের সোপানমূলে স্বচ্ছ অগভীর জলের তলে নুড়িগুলি ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে। সেদিন কোথাও বাতাস ছিল না। নিকটের পাহাড়ে বনতুলসী পুদিনা ও মৌরির জঙ্গল হইতে একটা ঘন সুগন্ধ উঠিয়া স্থির আকাশকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল।

সূর্য যখন গিরিশিখরের অন্তরালে অবতীর্ণ হইল তৎক্ষণাৎ দিবসের নাট্যশালায় একটা দীর্ঘ ছায়াযবনিকা পড়িয়া গেল— এখানে পর্বতের ব্যবধান থাকাতে সূর্যাস্তের সময় আলো আঁধারের সম্মিলন অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। ঘোড়ায় চড়িয়া একবার ছুটিয়া বেড়াইয়া আসিব মনে করিয়া উঠিব-উঠিব করিতেছি, এমন সময়ে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনিতে পাইলাম। পিছনে ফিরিয়া দেখিলাম, কেহ নাই।

ইন্দ্রিয়ের ভ্রম মনে করিয়া পুনরায় ফিরিয়া বসিতেই একেবারে অনেকগুলি পায়ের শব্দ শোনা গেল, যেন অনেকে মিলিয়া ছুটাছুটি করিয়া নামিয়া আসিতেছে। ঈষৎ ভয়ের সহিত এক অপরূপ পুলক মিশ্রিত হইয়া আমার সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। যদিও আমার সম্মুখে কোনো মূর্তি ছিল না তথাপি স্পষ্ট প্রত্যক্ষবৎ মনে হইল যে, এই গ্রীষ্মের সায়াহ্নে একদল প্রমোদচঞ্চল নারী শুস্তার জলের মধ্যে স্নান করিতে নামিয়াছে। যদিও সেই সন্ধ্যাকালে নিস্তব্ধ গিরিতটে, নদীতীরে, নির্জন প্রাসাদে কোথাও কিছুমাত্র শব্দ ছিল না, তথাপি আমি যেন স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম নির্ঝরের শতধারার মতো সকৌতুক কলহাস্যের সহিত পরস্পরের দ্রুত অনুধাবন করিয়া আমার পার্শ্ব দিয়া স্নানার্থিনীরা চলিয়া গেল। আমাকে যেন লক্ষ্য করিল না। তাহারা যেমন আমার নিকট অদৃশ্য, আমিও যেন সেইরূপ তাহাদের নিকট অদৃশ্য। নদী পূর্ববৎ স্থির ছিল, কিন্তু আমার নিকট স্পষ্ট বোধ হইল, স্বচ্ছতোয়ার অগভীর স্রোত অনেকগুলি বলয়শিঞ্জিত বাহুবিক্ষেপে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে; হাসিয়া হাসিয়া সখীগণ পরস্পরের

গায়ে জল ছুঁড়িয়া মারিতেছে, এবং সন্তরণকারিণীদের পদাঘাতে জলবিন্দুরাশি মুক্তামুষ্টির মতো আকাশে ছিটিয়া পড়িতেছে।

আমার বক্ষের মধ্যে একপ্রকার কম্পন হইতে লাগিল; সে উত্তেজনা ভয়ের কি আনন্দের কি কৌতূহলের, ঠিক বলিতে পারি না। বড়ো ইচ্ছা হইতে লাগিল ভালো করিয়া দেখি, কিন্তু সম্মুখে দেখিবার কিছুই ছিল না; মনে হইল ভালো করিয়া কান পাতিলেই উহাদের কথা সমস্তই স্পষ্ট শোনা যাইবে, কিন্তু একান্তমনে কান পাতিয়া কেবল অরণ্যের ঝিল্লিরব শোনা যায়। মনে হইল, আড়াই শত বৎসরের কৃষ্ণবর্ণ যবনিকা ঠিক আমার সম্মুখে দুলিতেছে— ভয়ে ভয়ে একটি ধার তুলিয়া ভিতরে দৃষ্টিপাত করি— সেখানে বৃহৎ সভা বসিয়াছে, কিন্তু গাঢ় অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না।

হঠাৎ গুমট ভাঙিয়া হু হু করিয়া একটা বাতাস দিল— শুস্তার স্থির জলতল দেখিতে দেখিতে অপ্সরীর কেশদামের মতো কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, এবং সন্ধ্যাছায়াচ্ছন্ন সমস্ত বনভূমি এক মুহূর্তে একসঙ্গে মর্মরধ্বনি করিয়া যেন দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল। স্বপ্নই বল আর সত্যই বল, আড়াই শত বৎসরের অতীত ক্ষেত্র হইতে প্রতিফলিত হইয়া আমার সম্মুখে যে এক অদৃশ্য মরীচিকা অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহা চকিতের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। যে মায়াময়ীরা আমার গায়ের উপর দিয়া দেহহীন দ্রুতপদে শব্দহীন উচ্চকলহাস্যে ছুটিয়া শুস্তার জলের উপর গিয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিল তাহারা সিক্ত অঞ্চল হইতে জল নিষ্কর্ষণ করিতে করিতে আমার পাশ দিয়া উঠিয়া গেল না। বাতাসে যেমন করিয়া গন্ধ উড়াইয়া লইয়া যায়, বসন্তের এক নিশ্বাসে তাহারা তেমনি করিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল।

তখন আমার বড়ো আশঙ্কা হইল যে, হঠাৎ বুঝি নির্জন পাইয়া কবিতাদেবী আমার স্কন্ধে আসিয়া ভর করিলেন; আমি বেচারা তুলার মাশুল আদায় করিয়া খাটিয়া খাই, সর্বনাশিনী এইবার বুঝি আমার মুণ্ডপাত করিতে আসিলেন। ভাবিলাম, ভালো করিয়া আহার করিতে হইবে; শূন্য উদরেই সকল প্রকার দুরারোগ্য রোগ আসিয়া চাপিয়া ধরে। আমার পাচকটিকে ডাকিয়া প্রচুরঘৃতপক্ক মসলা-সুগন্ধি রীতিমত মোগলাই খানা হুকুম করিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে সমস্ত ব্যাপারটি পরম হাস্যজনক বলিয়া বোধ হইল। আনন্দমনে সাহেবের মতো সোলাটুপি পরিয়া, নিজের হাতে গাড়ি হাঁকাইয়া, গড় গড় শব্দে আপন তদন্তকার্যে চলিয়া গেলাম। সেদিন ত্রৈমাসিক রিপোর্ট্ লিখিবার দিন থাকাতে বিলম্বে বাড়ি ফিরিবার কথা। কিন্তু সন্ধ্যা হইতে না হইতেই আমাকে বাড়ির দিকে টানিতে লাগিল। কে টানিতে লাগিল বলিতে পারি না; কিন্তু মনে হইল, আর বিলম্ব করা

উচিত হয় না। মনে হইল, সকলে বসিয়া আছে। রিপোর্ট্ অসমাপ্ত রাখিয়া সোলার টুপি মাথায় দিয়া সেই সন্ধ্যাধূসর তরুচ্ছায়াঘন নির্জন পথ রথচক্রশব্দে সচকিত করিয়া সেই অন্ধকার শৈলান্তবর্তী নিস্তব্ধ প্রকাণ্ড প্রাসাদে গিয়া উত্তীর্ণ হইলাম।

সিঁড়ির উপরে সম্মুখের ঘরটি অতি বৃহৎ। তিন সারি বড়ো বড়ো থামের উপর কারুকার্যখচিত খিলানে বিস্তীর্ণ ছাদ ধরিয়া রাখিয়াছে। এই প্রকাণ্ড ঘরটি আপনার বিপুল শূন্যতাভরে অহর্নিশি গম্ গম্ করিতে থাকে। সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে তখনো প্রদীপ জ্বালানো হয় নাই। দরজা ঠেলিয়া আমি সেই বৃহৎ ঘরে যেমন প্রবেশ করিলাম অমনি মনে হইল ঘরের মধ্যে যেন ভারি একটা বিপ্লব বাধিয়া গেল— যেন হঠাৎ সভা ভঙ্গ করিয়া চারি দিকের দরজা জানলা ঘর পথ বারান্দা দিয়া কে কোন্ দিকে পলাইল তাহার ঠিকানা নাই। আমি কোথাও কিছু না দেখিতে পাইয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। শরীর একপ্রকার আবেশে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। যেন বহুদিবসের লুপ্তাবশিষ্ট মাথাঘষা ও আতরের মৃদু গন্ধ আমার নাসার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। আমি সেই দীপহীন জনহীন প্রকাণ্ড ঘরের প্রাচীন প্রস্তরস্তম্ভশ্রেণীর মাঝখানে দাঁড়াইয়া শুনিতে পাইলাম— ঝর্ঝর শব্দে ফোয়ারার জল সাদা পাথরের উপরে আসিয়া পড়িতেছে, সেতারে কী সুর বাজিতেছে বুঝিতে পারিতেছি না, কোথাও বা স্বর্ণভূষণের শিঞ্জিত, কোথাও বা নূপুরের নিক্বণ, কখনো বা বৃহৎ তাম্রঘণ্টায় প্রহর বাজিবার শব্দ, অতি দূরে নহবতের আলাপ, বাতাসে দোদুল্যমান ঝাড়ের স্ফটিকদোলকগুলির ঠুন্ ঠুন্ ধ্বনি, বারান্দা হইতে খাঁচার বুলবুলের গান, বাগান হইতে পোষা সারসের ডাক আমার চতুর্দিকে একটা প্রেতলোকের রাগিণী সৃষ্টি করিতে লাগিল।

আমার এমন একটা মোহ উপস্থিত হইল, মনে হইল, এই অস্পৃশ্য অগম্য অবাস্তব ব্যাপারই জগতে একমাত্র সত্য; আর সমস্তই মিথ্যা মরীচিকা। আমি যে আমি— অর্থাৎ আমি যে শ্রীযুক্ত অমুক, ৺অমুকের জ্যেষ্ঠ পুত্র, তুলার মাশুল সংগ্রহ করিয়া সাড়ে চার-শো টাকা বেতন পাই, আমি যে সোলার টুপি এবং খাটো কোর্তা পরিয়া টম্‌টম্ হাঁকাইয়া আপিস করিতে যাই, এ-সমস্তই আমার কাছে এমন অদ্ভুত হাস্যকর অমূলক মিথ্যা কথা বলিয়া বোধ হইল যে, আমি সেই বিশাল নিস্তব্ধ অন্ধকার ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলাম।

তখনই আমার মুসলমান ভৃত্য প্রজ্জ্বলিত কেরোসিন ল্যাম্প হাতে করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সে আমাকে পাগল মনে করিল কি না জানি না, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমার স্মরণ হইল যে, আমি ৺অমুকচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত অমুকনাথ বটে; ইহাও মনে করিলাম যে, জগতের ভিতরে অথবা বাহিরে কোথাও অমূর্ত ফোয়ারা নিত্যকাল

উৎসারিত ও অদৃশ্য অঙ্গুলির আঘাতে কোনো মায়া-সেতারে অনন্ত রাগিণী ধ্বনিত হইতেছে কি না তাহা আমাদের মহাকবি এবং কবিবরেরাই বলিতে পারেন, কিন্তু এ কথা নিশ্চয় সত্য যে, আমি বরীচের হাটে তুলার মাশুল আদায় করিয়া মাসে সাড়ে চার-শো টাকা বেতন লইয়া থাকি। তখন আবার আমার পূর্বক্ষণের অদ্ভুত মোহ স্মরণ করিয়া কেরোসিন-প্রদীপ্ত ক্যাম্প্‌টেবিলের কাছে খবরের কাগজ লইয়া সকৌতুকে হাসিতে লাগিলাম।

খবরের কাগজ পড়িয়া এবং মোগলাই খানা খাইয়া একটি ক্ষুদ্র কোণের ঘরে প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া বিছানায় গিয়া শয়ন করিলাম। আমার সম্মুখবর্তী খোলা জানালার ভিতর দিয়া অন্ধকার বনবেষ্টিত আরালী পর্বতের ঊর্ধ্বদেশের একটি অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র সহস্র কোটি যোজন দূর আকাশ হইতে সেই অতিতুচ্ছ ক্যাম্প্‌খাটের উপর শ্রীযুক্ত মাশুল-কালেক্টরকে একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিল ইহাতে আমি বিস্ময় ও কৌতুক অনুভব করিতে করিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম বলিতে পারি না। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম তাহাও জানি না। সহসা এক সময় শিহরিয়া জাগিয়া উঠিলাম; ঘরে যে কোনো শব্দ হইয়াছিল তাহা নহে, কোনো যে লোক প্রবেশ করিয়াছিল তাহাও দেখিতে পাইলাম না। অন্ধকার পর্বতের উপর হইতে অনিমেষ নক্ষত্রটি অস্তমিত হইয়াছে এবং কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণচন্দ্রালোক অনধিকারসংকুচিত ম্লানভাবে আমার বাতায়নপথে প্রবেশ করিয়াছে।

কোনো লোককেই দেখিলাম না। তবু যেন আমার স্পষ্ট মনে হইল, কে একজন আমাকে আস্তে আস্তে ঠেলিতেছে। আমি জাগিয়া উঠিতেই সে কোনো কথা না বলিয়া কেবল যেন তাহার অঙ্গুরীখচিত পাঁচ অঙ্গুলির ইঙ্গিতে অতি সাবধানে তাহার অনুসরণ করিতে আদেশ করিল।

আমি অত্যন্ত চুপিচুপি উঠিলাম। যদিও সেই শতকক্ষপ্রকোষ্ঠময় প্রকাণ্ডশূন্যতাময়, নিদ্রিত ধ্বনি এবং সজাগ প্রতিধ্বনি -ময় বৃহৎ প্রাসাদে আমি ছাড়া আর জনপ্রাণীও ছিল না তথাপি পদে পদে ভয় হইতে লাগিল, পাছে কেহ জাগিয়া উঠে। প্রাসাদের অধিকাংশ ঘর রুদ্ধ থাকিত এবং সে-সকল ঘরে আমি কখনো যাই নাই।

সে রাত্রে নিঃশব্দপদবিক্ষেপে সংযতনিশ্বাসে সেই অদৃশ্য-আহ্বান-রূপিণীর অনুসরণ করিয়া আমি যে কোথা দিয়া কোথায় যাইতেছিলাম, আজ তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি না। কত সংকীর্ণ অন্ধকার পথ, কত দীর্ঘ বারান্দা, কত গম্ভীর নিস্তব্ধ সুবৃহৎ সভাগৃহ, কত রুদ্ধবায়ু ক্ষুদ্র গোপন কক্ষ পার হইয়া যাইতে লাগিলাম তাহার ঠিকানা নাই।

আমার অদৃশ্য দূতীটিকে যদিও চক্ষে দেখিতে পাই নাই, তথাপি তাহার মূর্তি আমার মনের অগোচর ছিল না। আরব রমণী, ঝোলা আস্তিনের ভিতর দিয়া শ্বেত-প্রস্তররচিতবৎ কঠিন নিটোল হস্ত দেখা যাইতেছে, টুপির প্রান্ত হইতে মুখের উপরে একটি সূক্ষ্ম বসনের আবরণ পড়িয়াছে, কটিবন্ধে একটি বাঁকা ছুরি বাঁধা।

আমার মনে হইল, আরব্য উপন্যাসের একাধিক সহস্র রজনীর একটি রজনী আজ উপন্যাসলোক হইতে উড়িয়া আসিয়াছে। আমি যেন অন্ধকার নিশীথে সুপ্তিমগ্ন বোগদাদের নির্বাপিতদীপ সংকীর্ণ পথে কোনো এক সংকটসংকুল অভিসারে যাত্রা করিয়াছি।

অবশেষে আমার দূতী একটি ঘননীল পর্দার সম্মুখে সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া যেন নিম্নে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইল। নিম্নে কিছুই ছিল না, কিন্তু ভয়ে আমার বক্ষের রক্ত স্তম্ভিত হইয়া গেল। আমি অনুভব করিলাম, সেই পর্দার সম্মুখে ভূমিতলে কিংখাবের-সাজ-পরা একটি ভীষণ কাফ্রি খোজা কোলের উপর খোলা তলোয়ার লইয়া দুই পা ছড়াইয়া দিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে। দূতী লঘুগতিতে তাহার দুই পা ডিঙাইয়া পর্দার এক প্রান্তদেশ তুলিয়া ধরিল।

ভিতর হইতে একটি পারস্য-গালিচা-পাতা ঘরের কিয়দংশ দেখা গেল। তক্তের উপরে কে বসিয়া আছে দেখা গেল না— কেবল জাফরান রঙের স্ফীত পায়জামার নিম্নভাগে জরির-চটি-পরা দুইখানি ক্ষুদ্র সুন্দর চরণ গোলাপি মখমল-আসনের উপর অলসভাবে স্থাপিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। মেজের এক পার্শ্বে একটি নীলাভ স্ফটিকপাত্রে কতকগুলি আপেল নাশপাতি নারাঙ্গি এবং প্রচুর আঙুরের গুচ্ছ সজ্জিত রহিয়াছে এবং তাহার পার্শ্বে দুইটি ছোটো পেয়ালা ও একটি স্বর্ণাভ মদিরার কাচপাত্র অতিথির জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। ঘরের ভিতর হইতে একটা অপূর্ব ধূপের এক-প্রকার মাদক সুগন্ধি ধূম আসিয়া আমাকে বিহ্বল করিয়া দিল।

আমি কম্পিতবক্ষে সেই খোজার প্রসারিত পদদ্বয় যেমন লঙ্ঘন করিতে গেলাম অমনি সে চমকিয়া জাগিয়া উঠিল— তাহার কোলের উপর হইতে তলোয়ার পাথরের মেজেয় শব্দ করিয়া পড়িয়া গেল।

সহসা একটা বিকট চীৎকার শুনিয়া চমকিয়া দেখিলাম, আমার সেই ক্যাম্পখাটের উপরে ঘর্মাক্তকলেবরে বসিয়া আছি, ভোরের আলোয় কৃষ্ণপক্ষের খণ্ড-চাঁদ জাগরণ-ক্লিষ্ট রোগীর মতো পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেছে— এবং আমাদের পাগলা মেহের আলি তাহার প্রাত্যহিক প্রথা-অনুসারে প্রত্যুষের জনশূন্য পথে "তফাত যাও" "তফাত যাও" করিয়া চীৎকার করিতে করিতে চলিয়াছে।

এইরূপে আমার আরব্য উপন্যাসের এক রাত্রি অকস্মাৎ শেষ হইল— কিন্তু এখনো এক সহস্র রজনী বাকি আছে।

আমার দিনের সহিত রাত্রের ভারি একটা বিরোধ বাধিয়া গেল। দিনের বেলায় শ্রান্তক্লান্তদেহে কর্ম করিতে যাইতাম এবং শূন্যস্বপ্নময়ী মায়াবিনী রাত্রিকে অভিসম্পাত করিতে থাকিতাম, আবার সন্ধ্যার পরে আমার দিনের বেলাকার কর্মবদ্ধ অস্তিত্বকে অত্যন্ত তুচ্ছ মিথ্যা এবং হাস্যকর বলিয়া বোধ হইত।

সন্ধ্যার পরে আমি একটা নেশার জালের মধ্যে বিহ্বলভাবে জড়াইয়া পড়িতাম। শত শত বৎসর পূর্বেকার কোনো-এক অলিখিত ইতিহাসের অন্তর্গত আর-একটা অপূর্ব ব্যক্তি হইয়া উঠিতাম, তখন আর বিলাতি খাটো কোর্তা এবং আঁট প্যাণ্টলুনে আমাকে মানাইত না। তখন আমি মাথায় এক লাল মখমলের ফেজ তুলিয়া, ঢিলা পায়জামা, ফুলকাটা কাবা এবং রেশমের দীর্ঘ চোগা পরিয়া, রঙিন রুমালে আতর মাখিয়া, বহুযত্নে সাজ করিতাম এবং সিগারেট ফেলিয়া দিয়া গোলাপজলপূর্ণ বহুকুণ্ডলায়িত বৃহৎ আল-বোলা লইয়া এক উচ্চগদিবিশিষ্ট বড়ো কেদারায় বসিতাম। যেন রাত্রে কোন্-এক অপূর্ব প্রিয়সম্মিলনের জন্য পরমাগ্রহে প্রস্তুত হইয়া থাকিতাম।

তাহার পর অন্ধকার যতই ঘনীভূত হইত ততই কী-যে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতে থাকিত তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। ঠিক যেন একটা চমৎকার গল্পের কতক-গুলি ছিন্ন অংশ বসন্তের আকস্মিক বাতাসে এই বৃহৎ প্রাসাদের বিচিত্র ঘরগুলির মধ্যে উড়িয়া বেড়াইত। খানিকটা দূর পর্যন্ত পাওয়া যাইত তাহার পরে আর শেষ দেখা যাইত না। আমিও সেই ঘূর্ণ্যমান বিচ্ছিন্ন অংশগুলির অনুসরণ করিয়া সমস্ত রাত্রি ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতাম।

এই খণ্ডস্বপ্নের আবর্তের মধ্যে— এই কচিৎ হেনার গন্ধ, কচিৎ সেতারের শব্দ, কচিৎ সুরভিজলশীকরমিশ্র বায়ুর হিল্লোলের মধ্যে একটি নায়িকাকে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎশিখার মতো চকিতে দেখিতে পাইতাম। তাহারই জাফরান রঙের পায়জামা এবং দুটি শুভ্র রক্তিম কোমল পায়ে বক্রশীর্ষ জরির চটি পরা, বক্ষে অতিপিনদ্ধ জরির ফুলকাটা কাঁচুলি আবদ্ধ, মাথায় একটি লাল টুপি এবং তাহা হইতে সোনার ঝালর ঝুলিয়া তাহার শুভ্র ললাট এবং কপোল বেষ্টন করিয়াছে।

সে আমাকে পাগল করিয়া দিয়াছিল। আমি তাহারই অভিসারে প্রতি রাত্রে নিদ্রার রসাতলরাজ্যে স্বপ্নের জটিলপথসংকুল মায়াপুরীর মধ্যে গলিতে গলিতে কক্ষে কক্ষে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছি।

এক-একদিন সন্ধ্যার সময় বড়ো আয়নার দুই দিকে দুই বাতি জ্বালাইয়া যত্নপূর্বক

শাহজাদার মতো সাজ করিতেছি এমন সময় হঠাৎ দেখিতে পাইতাম, আয়নায় আমার প্রতিবিম্বের পার্শ্বে ক্ষণিকের জন্য সেই তরুণী ইরাণীর ছায়া আসিয়া পড়িল— পলকের মধ্যে গ্রীবা বাঁকাইয়া, তাহার ঘনকৃষ্ণ বিপুল চক্ষুতারকায় সুগভীর আবেগতীব্র বেদনাপূর্ণ আগ্রহকটাক্ষপাত করিয়া, সরস সুন্দর বিম্বাধরে একটি অস্ফুট ভাষার আভাসমাত্র দিয়া, লঘু ললিত নৃত্যে আপন যৌবনপুষ্পিত দেহলতাটিকে দ্রুতবেগে ঊর্ধ্বাভিমুখে আবর্তিত করিয়া, মুহূর্তকালের মধ্যে বেদনা বাসনা ও বিভ্রমের, হাস্য কটাক্ষ ও ভূষণজ্যোতির স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি করিয়া দিয়া, দর্পণেই মিলাইয়া গেল। গিরিকাননের সমস্ত সুগন্ধ লুণ্ঠন করিয়া একটা উদ্দাম বায়ুর উচ্ছ্বাস আসিয়া আমার দুইটা বাতি নিবাইয়া দিত; আমি সাজসজ্জা ছাড়িয়া দিয়া, বেশগৃহের প্রান্তবর্তী শয্যাতলে পুলকিতদেহে মুদ্রিতনেত্রে শয়ন করিয়া থাকিতাম— আমার চারি দিকে সেই বাতাসের মধ্যে, সেই আরালী গিরিকুঞ্জের সমস্ত মিশ্রিত সৌরভের মধ্যে, যেন অনেক আদর অনেক চুম্বন অনেক কোমল করস্পর্শ নিভৃত অন্ধকার পূর্ণ করিয়া ভাসিয়া বেড়াইত— কানের কাছে অনেক কলগুঞ্জন শুনিতে পাইতাম, আমার কপালের উপর সুগন্ধ নিশ্বাস আসিয়া পড়িত, এবং আমার কপোলে একটি মৃদুসৌরভরমণীয় সুকোমল ওড়না বারম্বার উড়িয়া উড়িয়া আসিয়া স্পর্শ করিত। অল্পে অল্পে যেন একটি মোহিনী সর্পিণী তাহার মাদক-বেষ্টনে আমার সর্বাঙ্গ বাঁধিয়া ফেলিত, আমি গাঢ় নিশ্বাস ফেলিয়া অসাড় দেহে সুগভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িতাম।

একদিন অপরাহ্ণে আমি ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইব সংকল্প করিলাম— কে আমাকে নিষেধ করিতে লাগিল জানি না— কিন্তু সেদিন নিষেধ মানিলাম না। একটা কাষ্ঠদণ্ডে আমার সাহেবি হ্যাট এবং খাটো কোর্তা দুলিতেছিল, পাড়িয়া লইয়া পরিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় শুস্তানদীর বালি এবং আরালী পর্বতের শুষ্ক পল্লবরাশির ধ্বজা তুলিয়া হঠাৎ একটা প্রবল ঘূর্ণাবাতাস আমার সেই কোর্তা এবং টুপি ঘুরাইতে ঘুরাইতে লইয়া চলিল এবং একটা অত্যন্ত সুমিষ্ট কলহাস্য সেই হাওয়ার সঙ্গে ঘুরিতে ঘুরিতে কৌতুকের সমস্ত পর্দায় পর্দায় আঘাত করিতে করিতে উচ্চ হইতে উচ্চতর সপ্তকে উঠিয়া সূর্যাস্তলোকের কাছে গিয়া মিলাইয়া গেল।

সেদিন আর ঘোড়ায় চড়া হইল না এবং তাহার পরদিন হইতে সেই কৌতুকাবহ খাটো কোর্তা এবং সাহেবি হ্যাট পরা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছি।

আবার সেইদিন অর্ধরাত্রে বিছানার মধ্যে উঠিয়া বসিয়া শুনিতে পাইলাম কে যেন গুমরিয়া গুমরিয়া, বুক ফাটিয়া ফাটিয়া কাঁদিতেছে— যেন আমার খাটের নীচে, মেঝের নীচে, এই বৃহৎ প্রাসাদের পাষাণভিত্তির তলবর্তী একটা আর্দ্র অন্ধকার গোরের ভিতর

হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, ‘তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও— কঠিন মায়া, গভীর নিদ্রা, নিষ্ফল স্বপ্নের সমস্ত দ্বার ভাঙিয়া ফেলিয়া, তুমি আমাকে ঘোড়ায় তুলিয়া, তোমার বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া, বনের ভিতর দিয়া, পাহাড়ের উপর দিয়া, নদী পার হইয়া তোমাদের সূর্যালোকিত ঘরের মধ্যে আমাকে লইয়া যাও। আমাকে উদ্ধার করো।’

আমি কে! আমি কেমন করিয়া উদ্ধার করিব। আমি এই ঘূর্ণ্যমান পরিবর্তমান স্বপ্নপ্রবাহের মধ্য হইতে কোন্ মজ্জমানা কামনাসুন্দরীকে তীরে টানিয়া তুলিব। তুমি কবে ছিলে, কোথায় ছিলে হে দিব্যরূপিণী। তুমি কোন্ শীতল উৎসের তীরে খর্জুর-কুঞ্জের ছায়ায় কোন্ গৃহহীনা মরুবাসিনীর কোলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। তোমাকে কোন্ বেদুয়ীন দস্যু বনলতা হইতে পুষ্পকোরকের মতো মাতৃক্রোড় হইতে ছিন্ন করিয়া, বিদ্যুৎগামী অশ্বের উপরে চড়াইয়া, জ্বলন্ত বালুকারাশি পার হইয়া, কোন্ রাজপুরীর দাসীহাটে বিক্রয়ের জন্য লইয়া গিয়াছিল। সেখানে কোন্ বাদশাহের ভৃত্য তোমার নববিকশিত সলজ্জকাতর যৌবনশোভা নিরীক্ষণ করিয়া স্বর্ণমুদ্রা গনিয়া দিয়া, সমুদ্র পার হইয়া, তোমাকে সোনার শিবিকায় বসাইয়া, প্রভুগৃহের অন্তঃপুরে উপহার দিয়াছিল। সেখানে সে কী ইতিহাস। সেই সারঙ্গীর সংগীত, নূপুরের নিক্বণ এবং সিরাজের সুবর্ণমদিরার মধ্যে মধ্যে ছুরির ঝলক, বিষের জ্বালা, কটাক্ষের আঘাত। কী অসীম ঐশ্বর্য, কী অনন্ত কারাগার। দুই দিকে দুই দাসী বলয়ের হীরকে বিজুলি খেলাইয়া চামর দুলাইতেছে। শাহেনশা বাদশা শুভ্র চরণের তলে মণিমুক্তাখচিত পাদুকার কাছে লুটাইতেছে; বাহিরের দ্বারের কাছে যমদূতের মতো হাবশি দেবদূতের মতো সাজ করিয়া, খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়াইয়া। তাহার পরে সেই রক্তকলুষিত ঈর্ষাফেনিল ষড়যন্ত্রসংকুল ভীষণোজ্জ্বল ঐশ্বর্যপ্রবাহে ভাসমান হইয়া, তুমি মরুভূমির পুষ্পমঞ্জরী কোন্ নিষ্ঠুর মৃত্যুর মধ্যে অবতীর্ণ অথবা কোন্ নিষ্ঠুরতর মহিমাতটে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিলে?

এমন সময় হঠাৎ সেই পাগলা মেহের আলি চীৎকার করিয়া উঠিল, “তফাত যাও, তফাৎ যাও। সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়।” চাহিয়া দেখিলাম, সকাল হইয়াছে; চাপরাশি ডাকের চিঠিপত্র লইয়া আমার হাতে দিল এবং পাচক আসিয়া সেলাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আজ কিরূপ খানা প্রস্তুত করিতে হইবে।

আমি কহিলাম, না, আর এ বাড়িতে থাকা হয় না। সেইদিনই আমার জিনিসপত্র তুলিয়া আপিস-ঘরে গিয়া উঠিলাম। আপিসের বৃদ্ধ কেরানি করিম খাঁ আমাকে দেখিয়া

ঈষৎ হাসিল। আমি তাহার হাসিতে বিরক্ত হইয়া কোনো উত্তর না করিয়া কাজ করিতে লাগিলাম।

যত বিকাল হইয়া আসিতে লাগিল ততই অন্যমনস্ক হইতে লাগিলাম— মনে হইতে লাগিল, এখনই কোথায় যাইবার আছে— তুলার হিসাব পরীক্ষার কাজটা নিতান্ত অনাবশ্যক মনে হইল, নিজামের নিজামতও আমার কাছে বেশি কিছু বোধ হইল না— যাহা-কিছু বর্তমান, যাহা-কিছু আমার চারি দিকে চলিতেছে ফিরিতেছে খাটিতেছে খাইতেছে সমস্তই আমার কাছে অত্যন্ত দীন অর্থহীন অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইল।

আমি কলম ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, বৃহৎ খাতা বন্ধ করিয়া তৎক্ষণাৎ টম্‌টম্‌ চড়িয়া ছুটিলাম। দেখিলাম টম্‌টম্‌ ঠিক গোধূলিমুহূর্তে আপনিই সেই পাষাণ-প্রাসাদের দ্বারের কাছে গিয়া থামিল। দ্রুতপদে সিঁড়িগুলি উত্তীর্ণ হইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

আজ সমস্ত নিস্তব্ধ। অন্ধকার ঘরগুলি যেন রাগ করিয়া মুখ ভার করিয়া আছে। অনুতাপে আমার হৃদয় উদ্‌বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু কাহাকে জানাইব, কাহার নিকট মার্জনা চাহিব খুঁজিয়া পাইলাম না। আমি শূন্য মনে অন্ধকার ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। ইচ্ছা করিতে লাগিল একখানা যন্ত্র হাতে লইয়া কাহাকেও উদ্দেশ করিয়া গান গাহি ; বলি, 'হে বহ্নি, যে পতঙ্গ তোমাকে ফেলিয়া পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, সে আবার মরিবার জন্য আসিয়াছে। এবার তাহাকে মার্জনা করো, তাহার দুই পক্ষ দগ্ধ করিয়া দাও, তাহাকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলো।'

হঠাৎ উপর হইতে আমার কপালে দুই ফোঁটা অশ্রুজল পড়িল। সেদিন আরালী পর্বতের চূড়ায় ঘনঘোর মেঘ করিয়া আসিয়াছিল। অন্ধকার অরণ্য এবং শুস্তার মসীবর্ণ জল একটি ভীষণ প্রতীক্ষায় স্থির হইয়া ছিল। জলস্থল আকাশ সহসা শিহরিয়া উঠিল ; এবং অকস্মাৎ একটা বিদ্যুদ্দন্তবিকশিত ঝড় শৃঙ্খলছিন্ন উন্মাদের মতো পথহীন সুদূর বনের ভিতর দিয়া আর্ত চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল। প্রাসাদের বড়ো বড়ো শূন্য ঘরগুলা সমস্ত দ্বার আছড়াইয়া তীব্র বেদনায় হুহু করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আজ ভৃত্যগণ সকলেই আপিস-ঘরে ছিল, এখানে আলো জ্বালাইবার কেহ ছিল না। সেই মেঘাচ্ছন্ন অমাবস্যার রাত্রে গৃহের ভিতরকার নিকষকৃষ্ণ অন্ধকারের মধ্যে আমি স্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিলাম— একজন রমণী পালঙ্কের তলদেশে গালিচার উপরে উপুড় হইয়া পড়িয়া দুই দৃঢ় বদ্ধ মুষ্টিতে আপনার আলুলায়িত কেশজাল টানিয়া ছিঁড়িতেছে,

তাহার গৌরবর্ণ ললাট দিয়া রক্ত ফাটিয়া পড়িতেছে, কখনো সে শুষ্ক তীব্র অট্টহাস্তে হাহা করিয়া হাসিয়া উঠিতেছে, কখনো ফুলিয়া ফুলিয়া ফাটিয়া ফাটিয়া কাঁদিতেছে, দুই হস্তে বক্ষের কাঁচুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া অনাবৃত বক্ষে আঘাত করিতেছে, মুক্ত বাতায়ন দিয়া বাতাস গর্জন করিয়া আসিতেছে এবং মুষলধারে বৃষ্টি আসিয়া তাহার সর্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিয়া দিতেছে।

সমস্ত রাত্রি ঝড়ও থামে না, ক্রন্দনও থামে না। আমি নিষ্ফল পরিতাপে ঘরে ঘরে অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কেহ কোথাও নাই; কাহাকে সান্ত্বনা করিব। এই প্রচণ্ড অভিমান কাহার। এই অশান্ত আক্ষেপ কোথা হইতে উত্থিত হইতেছে।

পাগল চীৎকার করিয়া উঠিল, "তফাত যাও, তফাত যাও! সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়।"

দেখিলাম ভোর হইয়াছে এবং মেহের আলি এই ঘোর দুর্যোগের দিনেও যথানিয়মে প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করিয়া তাহার অভ্যস্ত চীৎকার করিতেছে। হঠাৎ আমার মনে হইল, হয়তো ওই মেহের আলিও আমার মতো এক সময় এই প্রাসাদে বাস করিয়াছিল, এখন পাগল হইয়া বাহির হইয়াও এই পাষাণ-রাক্ষসের মোহে আকৃষ্ট হইয়া প্রত্যহ প্রত্যুষে প্রদক্ষিণ করিতে আসে।

আমি তৎক্ষণাৎ সেই বৃষ্টিতে পাগলার নিকট ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মেহের আলি, ক্যা ঝুট হ্যায় রে?"

সে আমার কথায় কোনো উত্তর না করিয়া আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া অজগরের কবলের চতুর্দিকে ঘূর্ণমান মোহাবিষ্ট পক্ষীর ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে বাড়ির চারি দিকে ঘুরিতে লাগিল। কেবল প্রাণপণে নিজেকে সতর্ক করিবার জন্য বারম্বার বলিতে লাগিল, "তফাত যাও, তফাত যাও, সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়।"

আমি সেই জলঝড়ের মধ্যে পাগলের মতো আপিসে গিয়া করিম খাঁকে ডাকিয়া বলিলাম, "ইহার অর্থ কী আমায় খুলিয়া বলো।"

বৃদ্ধ যাহা কহিল তাহার মর্মার্থ এই: একসময় ওই প্রাসাদে অনেক অতৃপ্ত বাসনা, অনেক উন্মত্ত সম্ভোগের শিখা আলোড়িত হইত— সেই-সকল চিত্তদাহে, সেই-সকল নিষ্ফল কামনার অভিশাপে এই প্রাসাদের প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড ক্ষুধার্ত তৃষার্ত হইয়া আছে; সজীব মানুষ পাইলে তাহাকে লালায়িত পিশাচীর মতো খাইয়া ফেলিতে চায়। যাহারা ত্রিরাত্রি ওই প্রাসাদে বাস করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেবল মেহের আলি পাগল হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে, এ পর্যন্ত আর কেহ তাহার গ্রাস এড়াইতে পারে নাই।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার উদ্ধারের কি কোনো পথ নাই।"

বৃদ্ধ কহিল, "একটিমাত্র উপায় আছে তাহা অত্যন্ত দুরূহ। তাহা তোমাকে বলিতেছি— কিন্তু তৎপূর্বে ওই গুলবাগের একটি ইরানী ক্রীতদাসীর পুরাতন ইতিহাস বলা আবশ্যক। তেমন আশ্চর্য এবং তেমন হৃদয়বিদারক ঘটনা সংসারে আর কখনো ঘটে নাই।"

এমন সময় কুলিরা আসিয়া খবর দিল, গাড়ি আসিতেছে। এত শীঘ্র? তাড়াতাড়ি বিছানাপত্র বাঁধিতে বাঁধিতে গাড়ি আসিয়া পড়িল। সে গাড়ির ফার্স্ট্ ক্লাসে একজন সুপ্তোত্থিত ইংরাজ জানলা হইতে মুখ বাড়াইয়া স্টেশনের নাম পড়িবার চেষ্টা করিতেছিল, আমাদের সহযাত্রী বন্ধুটিকে দেখিয়াই 'হ্যালো' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল এবং নিজের গাড়িতে তুলিয়া লইল। আমরা সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিলাম। বাবুটি কে খবর পাইলাম না, গল্পেরও শেষ শোনা হইল না।

আমি বলিলাম লোকটা আমাদিগকে বোকার মতো দেখিয়া কৌতুক করিয়া ঠকাইয়া গেল; গল্পটা আগাগোড়া বানানো।

এই তর্কের উপলক্ষে আমার থিয়সফিস্ট আত্মীয়টির সহিত আমার জন্মের মতো বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেছে।

শ্রাবণ ১৩০২

অতিথি

প্রথম পরিচ্ছেদ

কাঁঠালিয়ার জমিদার মতিলালবাবু নৌকা করিয়া সপরিবারে স্বদেশে যাইতেছিলেন। পথের মধ্যে মধ্যাহ্নে নদীতীরের এক গঞ্জের নিকট নৌকা বাঁধিয়া পাকের আয়োজন করিতেছেন এমন সময় এক ব্রাহ্মণবালক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, তোমরা যাচ্ছ কোথায়?"

প্রশ্নকর্তার বয়স পনেরো-ষোলোর অধিক হইবে না।

মতিবাবু উত্তর করিলেন, "কাঁঠালে।"

ব্রাহ্মণবালক কহিল, "আমাকে পথের মধ্যে নন্দীগাঁয়ে নাবিয়ে দিতে পার?"

বাবু সম্মতি প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কী।"

ব্রাহ্মণবালক কহিল, "আমার নাম তারাপদ।"

গৌরবর্ণ ছেলেটিকে বড়ো সুন্দর দেখিতে। বড়ো বড়ো চক্ষু এবং হাস্যময় ওষ্ঠাধরে একটি সুললিত সৌকুমার্য প্রকাশ পাইতেছে। পরিধানে একখানি মলিন ধুতি। অনাবৃত দেহখানি সর্বপ্রকার বাহুল্যবর্জিত; কোনো শিল্পী যেন বহু যত্নে নিখুঁত নিটোল করিয়া গড়িয়া দিয়াছেন। যেন সে পূর্বজন্মে তাপসবালক ছিল এবং নির্মল তপস্যার প্রভাবে তাহার শরীর হইতে শরীরাংশ বহুলপরিমাণে ক্ষয় হইয়া একটি সম্মার্জিত ব্রাহ্মণ্যশ্রী পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

মতিলালবাবু তাহাকে পরম স্নেহভরে কহিলেন, "বাবা, তুমি স্নান করে এসো, এইখানেই আহারাদি হবে।"

তারাপদ বলিল, "রোসুন।" বলিয়া তৎক্ষণাৎ অসংকোচে রন্ধনের আয়োজনে যোগদান করিল। মতিলালবাবুর চাকরটা ছিল হিন্দুস্থানী, মাছ কোটা প্রভৃতি কার্যে তাহার তেমন পটুতা ছিল না; তারাপদ তাহার কাজ নিজে লইয়া অল্পকালের মধ্যেই সুসম্পন্ন করিল এবং দুই-একটা তরকারিও অভ্যস্ত নৈপুণ্যের সহিত রন্ধন করিয়া দিল। পাককার্য শেষ হইলে তারাপদ নদীতে স্নান করিয়া বোঁচকা খুলিয়া একটি শুভ্র বস্ত্র পরিল; একটি ছোটো কাঠের কাঁকই লইয়া মাথার বড়ো বড়ো চুল কপাল হইতে তুলিয়া গ্রীবার উপর ফেলিল এবং মার্জিত পইতার গোচ্ছা বক্ষে বিলম্বিত করিয়া নৌকায় মতিবাবুর নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

মতিবাবু তাহাকে নৌকার ভিতরে লইয়া গেলেন। সেখানে মতিবাবুর স্ত্রী এবং তাঁহার নবমবর্ষীয়া এক কন্যা বসিয়া ছিলেন। মতিবাবুর স্ত্রী অন্নপূর্ণা এই সুন্দর বালকটিকে দেখিয়া স্নেহে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন— মনে মনে কহিলেন, আহা, কাহার বাছা, কোথা হইতে আসিয়াছে— ইহার মা ইহাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া প্রাণ ধরিয়া আছে।

যথাসময়ে মতিবাবু এবং এই ছেলেটির জন্য পাশাপাশি দুইখানি আসন পড়িল। ছেলেটি তেমন ভোজনপটু নহে; অন্নপূর্ণা তাহার স্বল্প আহার দেখিয়া মনে করিলেন, সে লজ্জা করিতেছে; তাহাকে এটা ওটা খাইতে বিস্তর অনুরোধ করিলেন; কিন্তু যখন সে আহার হইতে নিরস্ত হইল তখন সে কোনো অনুরোধ মানিল না। দেখা গেল, ছেলেটি সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছা-অনুসারে কাজ করে, অথচ এমন সহজে করে যে তাহাতে কোনোপ্রকার জেদ বা গোঁ প্রকাশ পায় না। তাহার ব্যবহারে লজ্জার লক্ষণও লেশমাত্র দেখা গেল না।

সকলের আহারাদির পরে অন্নপূর্ণা তাহাকে কাছে বসাইয়া প্রশ্ন করিয়া তাহার ইতিহাস জানিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিস্তারিত বিবরণ কিছুই সংগ্রহ হইল না। মোট কথা এইটুকু জানা গেল, ছেলেটি সাত-আট বৎসর বয়সেই স্বেচ্ছাক্রমে ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছে।

অন্নপূর্ণা প্রশ্ন করিলেন, "তোমার মা নাই ?"

তারাপদ কহিল, "আছেন।"

অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি তোমাকে ভালোবাসেন না ?"

তারাপদ এই প্রশ্ন অত্যন্ত অদ্ভুত জ্ঞান করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "কেন ভালোবাসবেন না ?"

অন্নপূর্ণা প্রশ্ন করিলেন, "তবে তুমি তাঁকে ছেড়ে এলে যে।"

তারাপদ কহিল, "তাঁর আরো চারটি ছেলে এবং তিনটি মেয়ে আছে।"

অন্নপূর্ণা বালকের এই অদ্ভুত উত্তরে ব্যথিত হইয়া কহিলেন, "ওমা, সে কী কথা ! পাঁচটি আঙুল আছে বলে কি একটি আঙুল ত্যাগ করা যায়।"

তারাপদর বয়স অল্প, তাহার ইতিহাসও সেই পরিমাণে সংক্ষিপ্ত, কিন্তু ছেলেটি সম্পূর্ণ নূতনতর। সে তাহার পিতামাতার চতুর্থ পুত্র, শৈশবেই পিতৃহীন হয়। বহু সন্তানের ঘরেও তারাপদ সকলের অত্যন্ত আদরের ছিল ; মা ভাই বোন এবং পাড়ার সকলেরই নিকট হইতে সে অজস্র স্নেহ লাভ করিত। এমন-কি, গুরুমহাশয়ও তাহাকে মারিত না ; মারিলেও বালকের আত্মীয়পর সকলেই তাহাতে বেদনা বোধ করিত। এমন অবস্থায় তাহার গৃহত্যাগ করিবার কোনোই কারণ ছিল না। যে উপেক্ষিত রোগা ছেলেটা সর্বদাই চুরি-করা গাছের ফল এবং গৃহস্থ লোকদের নিকট তাহার চতুর্গুণ প্রতিফল খাইয়া বেড়ায় সেও তাহার পরিচিত গ্রামসীমার মধ্যে তাহার নির্যাতনকারিণী মার নিকট পড়িয়া রহিল, আর সমস্ত গ্রামের এই আদরের ছেলে একটা বিদেশী যাত্রার দলের সহিত মিলিয়া অকাতরচিত্তে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

সকলে খোঁজ করিয়া তাহাকে গ্রামে ফিরাইয়া আনিল। তাহার মা তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া অশ্রুজলে আর্দ্র করিয়া দিল, তাহার বোনরা কাঁদিতে লাগিল ; তাহার বড়ো ভাই পুরুষ-অভিভাবকের কঠিন কর্তব্য পালন উপলক্ষে তাহাকে মৃদু রকম শাসন করিবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে অনুতপ্তচিত্তে বিস্তর প্রশ্রয় এবং পুরস্কার দিল। পাড়ার মেয়েরা তাহাকে ঘরে ঘরে ডাকিয়া প্রচুরতর আদর এবং বহুতর প্রলোভনে বাধ্য করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু বন্ধন, এমন-কি, স্নেহবন্ধনও তাহার

সহিল না ; তাহার জন্মনক্ষত্র তাহাকে গৃহহীন করিয়া দিয়াছে ; সে যখনই দেখিত নদী দিয়া বিদেশী নৌকা গুণ টানিয়া চলিয়াছে, গ্রামের বৃহৎ অশ্বত্থগাছের তলে কোন্‌ দূরদেশ হইতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে, অথবা বেদেরা নদীতীরের পতিত মাঠে ছোটো ছোটো চাটাই বাঁধিয়া বাঁখারি ছুলিয়া চাঙারি নির্মাণ করিতে বসিয়াছে, তখন অজ্ঞাত বহিঃপৃথিবীর স্নেহহীন স্বাধীনতার জন্য তাহার চিত্ত অশান্ত হইয়া উঠিত। উপরি-উপরি দুই-তিনবার পলায়নের পর তাহার আত্মীয়বর্গ এবং গ্রামের লোক তাহার আশা পরিত্যাগ করিল।

প্রথম সে একটা যাত্রার দলের সঙ্গ লইয়াছিল। অধিকারী যখন তাহাকে পুত্রনির্বিশেষে স্নেহ করিতে লাগিল এবং দলস্থ ছোটো-বড়ো সকলেরই যখন সে প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল, এমন-কি, যে বাড়িতে যাত্রা হইত সে বাড়ির অধ্যক্ষগণ, বিশেষত পুরমহিলাবর্গ, যখন বিশেষরূপে তাহাকে আহ্বান করিয়া সমাদর করিতে লাগিল, তখন একদিন সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না।

তারাপদ হরিণশিশুর মতো বন্ধনভীরু, আবার হরিণেরই মতো সংগীতমুগ্ধ। যাত্রার গানেই তাহাকে প্রথম ঘর হইতে বিবাগি করিয়া দেয়। গানের সুরে তাহার সমস্ত শিরার মধ্যে অনুকম্পন এবং গানের তালে তাহার সর্বাঙ্গে আন্দোলন উপস্থিত হইত। যখন সে নিতান্ত শিশু ছিল তখনো সংগীতসভায় সে যেরূপ সংযত গম্ভীর বয়স্কভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া বসিয়া বসিয়া দুলিত, দেখিয়া প্রবীণ লোকের হাস্য সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইত। কেবল সংগীত কেন, গাছের ঘন পল্লবের উপর যখন শ্রাবণের বৃষ্টিধারা পড়িত, আকাশে মেঘ ডাকিত, অরণ্যের ভিতর মাতৃহীন দৈত্যশিশুর ন্যায় বাতাস ক্রন্দন করিতে থাকিত, তখন তাহার চিত্ত যেন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিত। নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে বহুদূর আকাশ হইতে চিলের ডাক, বর্ষার সন্ধ্যায় ভেকের কলরব, গভীর রাত্রে শৃগালের চীৎকারধ্বনি সকলই তাহাকে উতলা করিত। এই সংগীতের মোহে আকৃষ্ট হইয়া সে অনতিবিলম্বে এক পাঁচালির দলের মধ্যে গিয়া প্রবিষ্ট হইল। দলাধ্যক্ষ তাহাকে পরম যত্নে গান শিখাইতে এবং পাঁচালি মুখস্থ করাইতে প্রবৃত্ত হইল, এবং তাহাকে আপন বক্ষ-পিঞ্জরের পাখির মতো প্রিয় জ্ঞান করিয়া স্নেহ করিতে লাগিল। পাখি কিছু কিছু গান শিখিল এবং একদিন প্রত্যুষে উড়িয়া চলিয়া গেল।

শেষবারে সে এক জিম্‌ন্যাস্টিকের দলে জুটিয়াছিল। জ্যৈষ্ঠমাসের শেষভাগ হইতে আষাঢ়মাসের অবসান পর্যন্ত এ অঞ্চলে স্থানে স্থানে পর্যায়ক্রমে বারোয়ারির মেলা হইয়া থাকে। তদুপলক্ষে দুই-তিন দল যাত্রা পাঁচালি কবি নর্তকী এবং নানাবিধ দোকান

নৌকাযোগে ছোটো ছোটো নদী-উপনদী দিয়া এক মেলা অন্তে অন্য মেলায় ঘুরিয়া বেড়ায়। গত বৎসর হইতে কলিকাতার এক ক্ষুদ্র জিম্‌ন্যাস্টিকের দল এই পর্যটনশীল মেলার আমোদচক্রের মধ্যে যোগ দিয়াছিল। তারাপদ প্রথমত নৌকারোহী দোকানির সহিত মিশিয়া মেলায় পানের খিলি বিক্রয়ের ভার লইয়াছিল। পরে তাহার স্বাভাবিক কৌতূহলবশত এই জিম্‌ন্যাস্টিকের ছেলেদের আশ্চর্য ব্যায়ামনৈপুণ্যে আকৃষ্ট হইয়া এই দলে প্রবেশ করিয়াছিল। তারাপদ নিজে নিজে অভ্যাস করিয়া ভালো বাঁশি বাজাইতে শিখিয়াছিল— জিম্‌ন্যাস্টিকের সময় তাহাকে দ্রুত তালে লক্ষ্ণৌ ঠুংরির সুরে বাঁশি বাজাইতে হইত— এই তাহার একমাত্র কাজ ছিল।

এই দল হইতেই তাহার শেষ পলায়ন। সে শুনিয়াছিল, নন্দীগ্রামের জমিদারবাবুরা মহাসমারোহে এক শখের যাত্রা খুলিতেছেন— শুনিয়া সে তাহার ক্ষুদ্র বোঁচকাটি লইয়া নন্দীগ্রামে যাত্রার আয়োজন করিতেছিল, এমন সময় মতিবাবুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়।

তারাপদ পর্যায়ক্রমে নানা দলের মধ্যে ভিড়িয়াও আপন স্বাভাবিক কল্পনাপ্রবণ প্রকৃতিপ্রভাবে কোনো দলের বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। অন্তরের মধ্যে সে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত এবং মুক্ত ছিল। সংসারে অনেক কুৎসিত কথা সে সর্বদা শুনিয়াছে এবং অনেক কদর্য দৃশ্য তাহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, কিন্তু তাহা তাহার মনের মধ্যে সঞ্চিত হইবার তিলমাত্র অবসর প্রাপ্ত হয় নাই। এ ছেলেটির কিছুতেই খেয়াল ছিল না। অন্যান্য বন্ধনের ন্যায় কোনোপ্রকার অভ্যাসবন্ধনও তাহার মনকে বাধ্য করিতে পারে নাই, সে এই সংসারের পঙ্কিল জলের উপর দিয়া শুভ্রপক্ষ রাজহংসের মতো সাঁতার দিয়া বেড়াইত। কৌতূহল-বশত যতবারই ডুব দিত তাহার পাখা সিক্ত বা মলিন হইতে পারিত না। এইজন্য এই গৃহত্যাগী ছেলেটির মুখে একটি শুভ্র স্বাভাবিক তারুণ্য অম্লানভাবে প্রকাশ পাইত, তাহার সেই মুখশ্রী দেখিয়া প্রবীণ বিষয়ী মতিলালবাবু তাহাকে বিনা প্রশ্নে বিনা সন্দেহে পরম আদরে আহ্বান করিয়া লইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আহারান্তে নৌকা ছাড়িয়া দিল। অন্নপূর্ণা পরম স্নেহে এই ব্রাহ্মণবালককে তাহার ঘরের কথা, তাহার আত্মীয়পরিজনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; তারাপদ অত্যন্ত সংক্ষেপে তাহার উত্তর দিয়া বাহিরে আসিয়া পরিত্রাণ লাভ করিল। বাহিরে বর্ষার নদী পরিপূর্ণতার শেষ রেখা পর্যন্ত ভরিয়া উঠিয়া আপন আত্ম-হারা উদ্দাম চাঞ্চল্যে প্রকৃতিমাতাকে যেন উদ্‌বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল। মেঘনির্মুক্ত

রৌদ্রে নদীতীরে অর্ধনিমগ্ন কাশতৃণশ্রেণী, এবং তাহার উর্ধ্বে সরস সঘন ইক্ষুক্ষেত্র এবং তাহার পরপ্রান্তে দূরদিগন্তচুম্বিত নীলাঞ্জনবর্ণ বনরেখা সমস্তই যেন কোন্-এক রূপকথার সোনার কাঠির স্পর্শে সদ্যজাগ্রত নবীন সৌন্দর্যের মতো নির্বাক্ নীলাকাশের মুগ্ধদৃষ্টির সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল— সমস্তই যেন সজীব, স্পন্দিত, প্রগল্‌ভ, আলোকে উদ্ভাসিত, নবীনতায় সুচিক্কণ, প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ।

তারাপদ নৌকার ছাদের উপরে পালের ছায়ায় গিয়া আশ্রয় লইল। পর্যায়ক্রমে ঢালু সবুজ মাঠ, প্লাবিত পাটের খেত, গাঢ় শ্যামল আমনধান্যের আন্দোলন, ঘাট হইতে গ্রামাভিমুখী সংকীর্ণ পথ, ঘনবনবেষ্টিত ছায়াময় গ্রাম তাহার চোখের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল। এই জল স্থল আকাশ, এই চারি দিকের সচলতা সজীবতা মুখরতা, এই ঊর্ধ্ব-অধোদেশের ব্যাপ্তি এবং বৈচিত্র্য এবং নির্লিপ্ত সুদূরতা, এই সুবৃহৎ চিরস্থায়ী নির্নিমেষ বাক্যবিহীন বিশ্বজগৎ তরুণ বালকের পরমাত্মীয় ছিল; অথচ সে এই চঞ্চল মানবকটিকে এক মুহূর্তের জন্যও স্নেহবাহু দ্বারা ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিত না। নদীতীরে বাছুর লেজ তুলিয়া ছুটিতেছে, গ্রাম্য টাটুঘোড়া সম্মুখের দুই দড়ি-বাঁধা পা লইয়া লাফ দিয়া দিয়া ঘাস খাইয়া বেড়াইতেছে, মাছরাঙা জেলেদের জাল বাঁধিবার বংশদণ্ডের উপর হইতে ঝপ্ করিয়া সবেগে জলের মধ্যে ঝাঁপাইয়া মাছ ধরিতেছে, ছেলেরা জলের মধ্যে পড়িয়া মাতামাতি করিতেছে, মেয়েরা উচ্চকণ্ঠে সহাস্য গল্প করিতে করিতে আবক্ষজলে বসনাঞ্চল প্রসারিত করিয়া দুই হস্তে তাহা মার্জন করিয়া লইতেছে, কোমর-বাঁধা মেছুনিরা চুপড়ি লইয়া জেলেদের নিকট হইতে মাছ কিনিতেছে, এ-সমস্তই সে চিরনূতন অশ্রান্ত কৌতূহলের সহিত বসিয়া বসিয়া দেখে, কিছুতেই তাহার দৃষ্টির পিপাসা নিবৃত্ত হয় না।

নৌকার ছাতের উপরে গিয়া তারাপদ ক্রমশ দাঁড়িমাঝিদের সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিল। মাঝে মাঝে আবশ্যকমতে মাল্লাদের হাত হইতে লগি লইয়া নিজেই ঠেলিতে প্রবৃত্ত হইল; মাঝির যখন তামাক খাইবার আবশ্যক তখন সে নিজে গিয়া হাল ধরিল— যখন যে দিকে পাল ফিরানো আবশ্যক সমস্ত সে দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়া দিল।

সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে অন্নপূর্ণা তারাপদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাত্রে তুমি কী খাও?"

তারাপদ কহিল, "যা পাই তাই খাই; সকল দিন খাইও না।"

এই সুন্দর ব্রাহ্মণবালকটির আতিথ্যগ্রহণে ঔদাসীন্য অন্নপূর্ণাকে ঈষৎ পীড়া দিতে লাগিল। তাঁহার বড়ো ইচ্ছা, খাওয়াইয়া পরাইয়া এই গৃহচ্যুত পান্থ বালকটিকে পরিতৃপ্ত করিয়া দেন। কিন্তু কিসে যে তাহার পরিতোষ হইবে তাহার কোনো সন্ধান

পাইলেন না। অন্নপূর্ণা চাকরদের ডাকিয়া গ্রাম হইতে দুধ মিষ্টান্ন প্রভৃতি ক্রয় করিয়া আনিবার জন্য ধুমধাম বাধাইয়া দিলেন। তারাপদ যথাপরিমাণে আহার করিল; কিন্তু দুধ খাইল না। মৌনস্বভাব মতিলালবাবুও তাহাকে দুধ খাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন; সে সংক্ষেপে বলিল, "আমার ভালো লাগে না।"

নদীর উপর দুই-তিন দিন গেল। তারাপদ রাঁধাবাড়া, বাজার করা হইতে নৌকা-চালনা পর্যন্ত সকল কাজেই স্বেচ্ছা এবং তৎপরতার সহিত যোগ দিল। যে-কোনো দৃশ্য তাহার চোখের সম্মুখে আসে তাহার প্রতি তারাপদর সকৌতূহল দৃষ্টি ধাবিত হয়, যে-কোনো কাজ তাহার হাতের কাছে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাতেই সে আপনি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। তাহার দৃষ্টি, তাহার হস্ত, তাহার মন সর্বদাই সচল হইয়া আছে; এইজন্য সে এই নিত্যসচলা প্রকৃতির মতো সর্বদাই নিশ্চিন্ত উদাসীন, অথচ সর্বদাই ক্রিয়াসক্ত। মানুষমাত্রেরই নিজের একটি স্বতন্ত্র অধিষ্ঠানভূমি আছে; কিন্তু তারাপদ এই অনন্ত নীলাম্বরবাহী বিশ্বপ্রবাহের একটি আনন্দোজ্জ্বল তরঙ্গ— ভূত-ভবিষ্যতের সহিত তাহার কোনো বন্ধন নাই— সম্মুখাভিমুখে চলিয়া যাওয়াই তাহার একমাত্র কার্য।

এ দিকে অনেক দিন নানা সম্প্রদায়ের সহিত যোগ দিয়া অনেকপ্রকার মনোরঞ্জনী বিদ্যা তাহার আয়ত্ত হইয়াছিল। কোনোপ্রকার চিন্তার দ্বারা আচ্ছন্ন না থাকাতে তাহার নির্মল স্মৃতিপটে সকল জিনিস আশ্চর্য সহজে মুদ্রিত হইয়া যাইত। পাঁচালি কথকতা কীর্তনগান যাত্রাভিনয়ের সুদীর্ঘ খণ্ডসকল তাহার কণ্ঠাগ্রে ছিল। মতিলালবাবু চিরপ্রথামত একদিন সন্ধ্যাবেলায় তাঁহার স্ত্রীকন্যাকে রামায়ণ পড়িয়া শুনাইতে-ছিলেন; কুশলবের কথার সূচনা হইতেছে এমন সময় তারাপদ উৎসাহ সম্বরণ করিতে না পারিয়া নৌকার ছাদের উপর হইতে নামিয়া আসিয়া কহিল, "বই রাখুন। আমি কুশলবের গান করি, আপনারা শুনে যান।"

এই বলিয়া সে কুশলবের পাঁচালি আরম্ভ করিয়া দিল। বাঁশির মতো সুমিষ্ট পরিপূর্ণস্বরে দাশুরায়ের অনুপ্রাস ক্ষিপ্রবেগে বর্ষণ করিয়া চলিল। দাঁড়ি মাঝি সকলেই দ্বারের কাছে আসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল; হাস্য করুণা এবং সংগীতে সেই নদীতীরের সন্ধ্যাকাশে এক অপূর্ব রসস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল— দুই নিস্তব্ধ তটভূমি কুতূহলী হইয়া উঠিল, পাশ দিয়া যে-সকল নৌকা চলিতেছিল তাহাদের আরোহিগণ ক্ষণকালের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া সেই দিকে কান দিয়া রহিল; যখন শেষ হইয়া গেল সকলেই ব্যথিতচিত্তে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, ইহারই মধ্যে শেষ হইল কেন।

সজলনয়না অন্নপূর্ণার ইচ্ছা করিতে লাগিল, ছেলেটিকে কোলে বসাইয়া বক্ষে চাপিয়া

তাহার মস্তক আঘ্রাণ করেন। মতিলালবাবু ভাবিতে লাগিলেন, এই ছেলেটিকে যদি কোনোমতে কাছে রাখিতে পারি তবে পুত্রের অভাব পূর্ণ হয়। কেবল ক্ষুদ্র বালিকা চারুশশীর অন্তঃকরণ ঈর্ষা ও বিদ্বেষে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চারুশশী তাহার পিতামাতার একমাত্র সন্তান, তাঁহাদের পিতৃমাতৃস্নেহের একমাত্র অধিকারিণী। তাহার খেয়াল এবং জেদের অন্ত ছিল না। খাওয়া, কাপড় পরা, চুল বাঁধা সম্বন্ধে তাহার নিজের স্বাধীন মত ছিল; কিন্তু সে মতের কিছুমাত্র স্থিরতা ছিল না। যেদিন কোথাও নিমন্ত্রণ থাকিত সেদিন তাহার মায়ের ভয় হইত, পাছে মেয়েটি সাজসজ্জা সম্বন্ধে একটা অসম্ভব জেদ ধরিয়া বসে। যদি দৈবাৎ একবার চুল বাঁধাটা তাহার মনের মতো না হইল তবে সেদিন যতবার চুল খুলিয়া যতরকম করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া যাক্ কিছুতেই তাহার মন পাওয়া যাইবে না, অবশেষে মহা কান্নাকাটির পালা পড়িয়া যাইবে। সকল বিষয়েই এইরূপ। আবার এক-এক সময় চিত্ত যখন প্রসন্ন থাকে তখন কিছুতেই তাহার কোনো আপত্তি থাকে না। তখন সে অতিমাত্রায় ভালোবাসা প্রকাশ করিয়া তাহার মাকে জড়াইয়া ধরিয়া, চুম্বন করিয়া, হাসিয়া বকিয়া একেবারে অস্থির করিয়া তোলে। এই ক্ষুদ্র মেয়েটি একটি দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা।

এই বালিকা তাহার দুর্বাধ্য হৃদয়ের সমস্ত বেগ প্রয়োগ করিয়া মনে মনে তারাপদকে সুতীব্র বিদ্বেষে তাড়না করিতে লাগিল। পিতামাতাকেও সর্বতোভাবে উদ্‌বেজিত করিয়া তুলিল। আহারের সময় রোদনোন্মুখী হইয়া ভোজনের পাত্র ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়, রন্ধন তাহার রুচিকর বোধ হয় না, দাসীকে মারে, সকল বিষয়েই অকারণ অভিযোগ করিতে থাকে। তারাপদর বিদ্যাগুলি যতই তাহার এবং অন্য সকলের মনোরঞ্জন করিতে লাগিল ততই যেন তাহার রাগ বাড়িয়া উঠিল। তারাপদর যে কোনো গুণ আছে ইহা স্বীকার করিতে তাহার মন বিমুখ হইল, অথচ তাহার প্রমাণ যখন প্রবল হইতে লাগিল তাহার অসন্তোষের মাত্রাও উচ্চে উঠিল। তারাপদ যেদিন কুশলবের গান করিল সেদিন অন্নপূর্ণা মনে করিলেন, 'সংগীতে বনের পশু বশ হয়, আজ বোধ হয় আমার মেয়ের মন গলিয়াছে।' তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চারু, কেমন লাগল।" সে কোনো উত্তর না দিয়া অত্যন্ত প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া দিল। এই ভঙ্গিটিকে ভাষায় তর্জমা করিলে এইরূপ দাঁড়ায়— কিছুমাত্র ভালো লাগে নাই এবং কোনোকালে ভালো লাগিবে না।

চারুর মনে ঈর্ষার উদয় হইয়াছে বুঝিয়া তাহার মাতা চারুর সম্মুখে তারাপদর প্রতি

স্নেহ প্রকাশ করিতে বিরত হইলেন। সন্ধ্যার পরে যখন সকাল সকাল খাইয়া চারু শয়ন করিত তখন অন্নপূর্ণা নৌকাকক্ষের দ্বারের নিকট আসিয়া বসিতেন এবং মতিবাবু ও তারাপদ বাহিরে বসিত এবং অন্নপূর্ণার অনুরোধে তারাপদ গান আরম্ভ করিত; তাহার গানে যখন নদীতীরের বিশ্রামনিরতা গ্রামশ্রী সন্ধ্যার বিপুল অন্ধকারে মুগ্ধ নিস্তব্ধ হইয়া রহিত এবং অন্নপূর্ণার কোমল হৃদয়খানি স্নেহে ও সৌন্দর্যরসে উচ্ছলিত হইতে থাকিত তখন হঠাৎ চারু দ্রুতপদে বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া সরোষ-সরোদনে বলিত, "মা, তোমরা কী গোল করছ, আমার ঘুম হচ্ছে না।" পিতামাতা তাহাকে একলা ঘুমাইতে পাঠাইয়া তারাপদকে ঘিরিয়া সংগীত উপভোগ করিতেছেন ইহা তাহার একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিত। এই দীপ্তকৃষ্ণনয়না বালিকার স্বাভাবিক সুতীব্রতা তারাপদর নিকটে অত্যন্ত কৌতুকজনক বোধ হইত। সে ইহাকে গল্প শুনাইয়া, গান গাহিয়া, বাঁশি বাজাইয়া বশ করিতে অনেক চেষ্টা করিল; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইল না। কেবল তারাপদ মধ্যাহ্নে যখন নদীতে স্নান করিতে নামিত, পরিপূর্ণ জলরাশির মধ্যে গৌরবর্ণ সরল তনু দেহখানি নানা সন্তরণভঙ্গিতে অবলীলাক্রমে সঞ্চালন করিয়া তরুণ জলদেবতার মতো শোভা পাইত, তখন বালিকার কৌতূহল আকৃষ্ট না হইয়া থাকিত না। সে সেই সময়টির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত; কিন্তু আন্তরিক আগ্রহ কাহাকেও জানিতে দিত না, এবং এই অশিক্ষাপটু অভিনেত্রী পশমের গলাবন্ধ বোনা একমনে অভ্যাস করিতে করিতে মাঝে মাঝে যেন অত্যন্ত উপেক্ষাভরে কটাক্ষে তারাপদর সন্তরণলীলা দেখিয়া লইত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নন্দীগ্রাম কখন ছাড়াইয়া গেল তারাপদ তাহার খোঁজ লইল না। অত্যন্ত মৃদুমন্দ গতিতে বৃহৎ নৌকা কখনো পাল তুলিয়া, কখনো গুণ টানিয়া, নানা নদীর শাখা-প্রশাখার ভিতর দিয়া চলিতে লাগিল; নৌকারোহীদের দিনগুলিও এই-সকল নদী-উপনদীর মতো শান্তিময় সৌন্দর্যময় বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া সহজ সৌম্য গমনে মৃদুমিষ্ট কলস্বরে প্রবাহিত হইতে লাগিল। কাহারো কোনোরূপ তাড়া ছিল না; মধ্যাহ্নে স্নানাহারে অনেকক্ষণ বিলম্ব হইত; এ দিকে সন্ধ্যা হইতে না হইতেই একটা বড়ো দেখিয়া গ্রামের ধারে, ঘাটের কাছে, ঝিল্লিমন্দ্রিত খদ্যোতখচিত বনের পার্শ্বে নৌকা বাঁধিত।

এমনি করিয়া দিন-দশেকে নৌকা কাঁঠালিয়ায় পৌঁছিল। জমিদারের আগমনে বাড়ি হইতে পালকি এবং টাট্টুঘোড়ার সমাগম হইল, এবং বাঁশের লাঠি হস্তে পাইক-

বরকন্যাজের দল ঘন ঘন বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজে গ্রামের উৎকণ্ঠিত কাকসমাজকে যৎপরোনাস্তি মুখর করিয়া তুলিল।

এই-সমস্ত সমারোহে কালবিলম্ব হইতেছে, ইতিমধ্যে তারাপদ নৌকা হইতে দ্রুত নামিয়া একবার সমস্ত গ্রাম পর্যটন করিয়া লইল। কাহাকেও দাদা, কাহাকেও খুড়া, কাহাকেও দিদি, কাহাকেও মাসি বলিয়া দুই-তিন ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত গ্রামের সহিত সৌহার্দ্যবন্ধন স্থাপিত করিয়া লইল। কোথাও তাহার প্রকৃত কোনো বন্ধন ছিল না বলিয়াই এই বালক আশ্চর্য সত্বর ও সহজে সকলেরই সহিত পরিচয় করিয়া লইতে পারিত। তারাপদ দেখিতে দেখিতে অল্পদিনের মধ্যেই গ্রামের সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া লইল।

এত সহজে হৃদয় হরণ করিবার কারণ এই, তারাপদ সকলেরই সঙ্গে তাহাদের নিজের মতো হইয়া স্বভাবতই যোগ দিতে পারিত। সে কোনোপ্রকার বিশেষ সংস্কারের দ্বারা বদ্ধ ছিল না, অথচ সকল অবস্থা সকল কাজের প্রতিই তাহার একপ্রকার সহজ প্রবণতা ছিল। বালকের কাছে সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বালক, অথচ তাহাদের হইতে শ্রেষ্ঠ ও স্বতন্ত্র; বৃদ্ধের কাছে সে বালক নহে, অথচ জ্যাঠাও নহে; রাখালের সঙ্গে সে রাখাল, অথচ ব্রাহ্মণ। সকলের সকল কাজেই সে চিরকালের সহযোগীর ন্যায় অভ্যস্ত-ভাবে হস্তক্ষেপ করে। ময়রার দোকানে গল্প করিতে করিতে ময়রা বলে "দাদাঠাকুর, একটু বোসো তো ভাই, আমি আসছি"— তারাপদ অম্লানবদনে দোকানে বসিয়া একখানা শালপাতা লইয়া সন্দেশের মাছি তাড়াইতে প্রবৃত্ত হয়। ভিয়ান করিতেও সে মজবুত, তাঁতের রহস্যও তাহার কিছু কিছু জানা আছে, কুমারের চক্রচালনও তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত নহে।

তারাপদ সমস্ত গ্রামটি আয়ত্ত করিয়া লইল, কেবল গ্রামবাসিনী একটি বালিকার ঈর্ষা সে এখনো জয় করিতে পারিল না। এই বালিকাটি তারাপদর সুদূরে নির্বাসন তীব্রভাবে কামনা করিতেছে জানিয়াই বোধ করি তারাপদ এই গ্রামে এতদিন আবদ্ধ হইয়া রহিল।

কিন্তু বালিকাবস্থাতেও নারীদের অন্তররহস্য ভেদ করা সুকঠিন, চারুশশী তাহার প্রমাণ দিল।

বামুনঠাকরুনের মেয়ে সোনামণি পাঁচ বছর বয়সে বিধবা হয়; সেই চারুর সম-বয়সী সখী। তাহার শরীর অসুস্থ থাকাতে গৃহপ্রত্যাগত সখীর সহিত সে কিছুদিন সাক্ষাৎ করিতে পারে নাই। সুস্থ হইয়া যেদিন দেখা করিতে আসিল সেদিন প্রায় বিনা কারণেই দুই সখীর মধ্যে একটু মনোবিচ্ছেদ ঘটিবার উপক্রম হইল।

চারু অত্যন্ত ফাঁদিয়া গল্প আরম্ভ করিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল, তারাপদ নামক তাহাদের নবার্জিত পরমরত্নটির আহরণকাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া সে তাহার সখীর কৌতূহল এবং বিস্ময় সপ্তমে চড়াইয়া দিবে। কিন্তু যখন সে শুনিল, তারাপদ সোনামণির নিকট কিছুমাত্র অপরিচিত নহে, বামুনঠাকরুনকে সে মাসি বলে এবং সোনামণি তাহাকে দাদা বলিয়া থাকে— যখন শুনিল, তারাপদ কেবল যে বাঁশিতে কীর্তনের সুর বাজাইয়া মাতা ও কন্যার মনোরঞ্জন করিয়াছে তাহা নহে, সোনামণির অনুরোধে তাহাকে স্বহস্তে একটি বাঁশের বাঁশি বানাইয়া দিয়াছে, তাহাকে কতদিন উচ্চশাখা হইতে ফল ও কণ্টকশাখা হইতে ফুল পাড়িয়া দিয়াছে, তখন চারুর অন্তঃকরণে যেন তপ্তশেল বিঁধিতে লাগিল। চারু জানিত, তারাপদ বিশেষরূপে তাহাদেরই তারাপদ— অত্যন্ত গোপনে সংরক্ষণীয়, ইতরসাধারণে তাহার একটু-আধটু আভাসমাত্র পাইবে, অথচ কোনোমতে নাগাল পাইবে না, দূর হইতে তাহার রূপে গুণে মুগ্ধ হইবে এবং চারুশশীদের ধন্যবাদ দিতে থাকিবে। এই আশ্চর্য দুর্লভ দৈবলব্ধ ব্রাহ্মণবালকটি সোনামণির কাছে কেন সহজগম্য হইল। আমরা যদি এত যত্ন করিয়া না আনিতাম, এত যত্ন করিয়া না রাখিতাম, তাহা হইলে সোনামণিরা তাহার দর্শন পাইত কোথা হইতে। সোনামণির দাদা! শুনিয়া সর্বশরীর জ্বলিয়া যায়।

যে তারাপদকে চারু মনে মনে বিদ্বেষশরে জর্জর করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহারই একাধিকার লইয়া এমন প্রবল উদ্‌বেগ কেন।— বুঝিবে কাহার সাধ্য।

সেই দিনই অপর একটা তুচ্ছসূত্রে সোনামণির সহিত চারুর মর্মান্তিক আড়ি হইয়া গেল। এবং সে তারাপদর ঘরে গিয়া তাহার শখের বাঁশিটি বাহির করিয়া তাহার উপর লাফাইয়া মাড়াইয়া নির্দয়ভাবে ভাঙিতে লাগিল।

চারু যখন প্রচণ্ড আবেগে এই বংশিধ্বংসকার্যে নিযুক্ত আছে এমন সময় তারাপদ আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। সে বালিকার এই প্রলয়মূর্তি দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। কহিল, "চারু, আমার বাঁশিটা ভাঙছ কেন!" চারু রক্তনেত্রে রক্তিমমুখে "বেশ করছি" "খুব করছি" বলিয়া আরো বার দুই-চার বিদীর্ণ বাঁশির উপর অনাবশ্যক পদাঘাত করিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তারাপদ বাঁশিটা তুলিয়া উলটিয়া পালটিয়া দেখিল, তাহাতে আর পদার্থ নাই। অকারণে তাহার পুরাতন নিরপরাধ বাঁশিটার এই আকস্মিক দুর্গতি দেখিয়া সে আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। চারুশশী প্রতিদিনই তাহার পক্ষে পরম কৌতূহলের বিষয় হইয়া উঠিল।

তাহার আর-একটি কৌতূহলের ক্ষেত্র ছিল, মতিলালবাবুর লাইব্রেরিতে ইংরাজি

ছবির বইগুলি। বাহিরের সংসারের সহিত তাহার যথেষ্ট পরিচয় হইয়াছে, কিন্তু এই ছবির জগতে সে কিছুতেই ভালো করিয়া প্রবেশ করিতে পারে না। কল্পনার দ্বারা আপনার মনে অনেকটা পূরণ করিয়া লইত, কিন্তু তাহাতে মন কিছুতেই তৃপ্তি মানিত না।

ছবির বহির প্রতি তারাপদর এই আগ্রহ দেখিয়া একদিন মতিলালবাবু বলিলেন, "ইংরিজি শিখবে? তা হলে এ-সমস্ত ছবির মানে বুঝতে পারবে।"

তারাপদ তৎক্ষণাৎ বলিল, "শিখব।"

মতিবাবু খুব খুশি হইয়া গ্রামের এন্‌ট্রেন্স্‌স্কুলের হেড-মাস্টার রামরতনবাবুকে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় এই বালকের ইংরাজি-অধ্যাপনকার্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তারাপদ তাহার প্রখর স্মরণশক্তি এবং অখণ্ড মনোযোগ লইয়া ইংরাজি-শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইল। সে যেন এক নূতন দুর্গম রাজ্যের মধ্যে ভ্রমণে বাহির হইল, পুরাতন সংসারের সহিত কোনো সম্পর্ক রাখিল না; পাড়ার লোকেরা আর তাহাকে দেখিতে পাইল না; যখন সে সন্ধ্যার পূর্বে নির্জন নদীতীরে দ্রুতবেগে পদচারণ করিতে করিতে পড়া মুখস্থ করিত তখন তাহার উপাসক বালকসম্প্রদায় দূর হইতে ক্ষুণ্ণচিত্তে সসম্ভ্রমে তাহাকে নিরীক্ষণ করিত, তাহার পাঠে ব্যাঘাত করিতে সাহস করিত না।

চারুও আজকাল তাহাকে বড়ো একটা দেখিতে পাইত না। পূর্বে তারাপদ অন্তঃপুরে গিয়া অন্নপূর্ণার স্নেহদৃষ্টির সম্মুখে বসিয়া আহার করিত— কিন্তু তদুপলক্ষে প্রায় মাঝে মাঝে কিছু বিলম্ব হইয়া যাইত বলিয়া সে মতিবাবুকে অনুরোধ করিয়া বাহিরে আহারের বন্দোবস্ত করিয়া লইল। ইহাতে অন্নপূর্ণা ব্যথিত হইয়া আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু মতিবাবু বালকের অধ্যয়নের উৎসাহে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এই নূতন ব্যবস্থার অনুমোদন করিলেন।

এমন সময় চারুও হঠাৎ জেদ করিয়া বসিল, "আমিও ইংরাজি শিখিব।" তাহার পিতামাতা তাঁহাদের খামখেয়ালি কন্যার এই প্রস্তাবটিকে প্রথমে পরিহাসের বিষয় জ্ঞান করিয়া স্নেহমিশ্রিত হাস্য করিলেন; কিন্তু কন্যাটি এই প্রস্তাবের পরিহাস্য অংশটুকুকে প্রচুর অশ্রুজলধারায় অতি শীঘ্রই নিঃশেষে ধৌত করিয়া ফেলিয়াছিল। অবশেষে এই স্নেহদুর্বল নিরুপায় অভিভাবকদ্বয় বালিকার প্রস্তাব গম্ভীরভাবে গ্রাহ্য করিলেন। চারু মাস্টারের নিকট তারাপদর সহিত একত্র অধ্যয়নে নিযুক্ত হইল।

কিন্তু পড়াশুনা করা এই অস্থিরচিত্ত বালিকার স্বভাবসংগত ছিল না। সে নিজে

কিছু শিখিল না, কেবল তারাপদর অধ্যয়নে ব্যাঘাত করিতে লাগিল। সে পিছাইয়া পড়ে, পড়া মুখস্থ করে না, কিন্তু তবু কিছুতেই তারাপদর পশ্চাদ্‌বর্তী হইয়া থাকিতে চাহে না। তারাপদ তাহাকে অতিক্রম করিয়া নূতন পড়া লইতে গেলে সে মহা রাগারাগি করিত, এমন-কি, কান্নাকাটি করিতে ছাড়িত না। তারাপদ পুরাতন বই শেষ করিয়া নূতন বই কিনিলে তাহাকেও সেই নূতন বই কিনিয়া দিতে হইত। তারাপদ অবসরের সময় নিজে ঘরে বসিয়া লিখিত এবং পড়া মুখস্থ করিত, ইহা সেই ঈর্ষাপরায়ণা কন্যাটির সহ্য হইত না; সে গোপনে তাহার লেখা খাতায় কালী ঢালিয়া আসিত, কলম চুরি করিয়া রাখিত, এমন-কি বইয়ের যেখানে অভ্যাস করিবার, সেই অংশটি ছিঁড়িয়া আসিত। তারাপদ এই বালিকার অনেক দৌরাত্ম্য সকৌতুকে সহ্য করিত, অসহ্য হইলে মারিত, কিন্তু কিছুতেই শাসন করিতে পারিত না।

দৈবাৎ একটা উপায় বাহির হইল। একদিন বড়ো বিরক্ত হইয়া নিরুপায় তারাপদ তাহার মসীবিলুপ্ত লেখা খাতা ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া গম্ভীর বিষণ্নমুখে বসিয়া ছিল; চারু দ্বারের কাছে আসিয়া মনে করিল, আজ মার খাইবে। কিন্তু তাহার প্রত্যাশা পূর্ণ হইল না। তারাপদ একটি কথামাত্র না কহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বালিকা ঘরের ভিতরে বাহিরে ঘুর্‌ঘুর্‌ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বারম্বার এত কাছে ধরা দিল যে, তারাপদ ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই তাহার পৃষ্ঠে এক চপেটাঘাত বসাইয়া দিতে পারিত। কিন্তু সে তাহা না দিয়া গম্ভীর হইয়া রহিল। বালিকা মহা মুশকিলে পড়িল। কেমন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয় সে বিদ্যা তাহার কোনোকালেই অভ্যাস ছিল না, অথচ অনুতপ্ত ক্ষুদ্র হৃদয়টি তাহার সহপাঠীর ক্ষমালাভের জন্য একান্ত কাতর হইয়া উঠিল। অবশেষে কোনো উপায় না দেখিয়া ছিন্ন খাতার এক টুকরা লইয়া তারাপদর নিকটে বসিয়া খুব বড়ো বড়ো করিয়া লিখিল, "আমি আর কখনো খাতায় কালী মাখাব না।" লেখা শেষ করিয়া সেই লেখার প্রতি তারাপদর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য অনেকপ্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে লাগিল। দেখিয়া তারাপদ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না—হাসিয়া উঠিল। তখন বালিকা লজ্জায় ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া ঘর হইতে দ্রুতবেগে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। যে কাগজের টুকরায় সে স্বহস্তে দীনতা প্রকাশ করিয়াছে সেটা অনন্ত কাল এবং অনন্ত জগৎ হইতে সম্পূর্ণ লোপ করিতে পারিলে তবে তাহার হৃদয়ের নিদারুণ ক্ষোভ মিটিতে পারিত।

এ দিকে সংকুচিতচিত্ত সোনামণি দুই-একদিন অধ্যয়নশালার বাহিরে উঁকিঝুঁকি মারিয়া ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছে। সখী চারুশশীর সহিত তাহার সকল বিষয়েই বিশেষ হৃদ্যতা ছিল, কিন্তু তারাপদর সম্বন্ধে চারুকে সে অত্যন্ত ভয় এবং সন্দেহের সহিত

দেখিত। চারু যে সময়ে অন্তঃপুরে থাকিত সেই সময়টি বাছিয়া সোনামণি সসংকোচে তারাপদর দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইত। তারাপদ বই হইতে মুখ তুলিয়া সস্নেহে বলিত, "কী সোনা। খবর কী। মাসি কেমন আছে।"

সোনামণি কহিত, "অনেক দিন যাও নি, মা তোমাকে একবার যেতে বলেছে। মার কোমরে ব্যথা বলে দেখতে আসতে পারে না।"

এমন সময় হয়তো হঠাৎ চারু আসিয়া উপস্থিত। সোনামণি শশব্যস্ত। সে যেন গোপনে তাহার সখীর সম্পত্তি চুরি করিতে আসিয়াছিল। চারু কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়াইয়া চোখ মুখ ঘুরাইয়া বলিত, "অ্যাঁ সোনা! তুই পড়ার সময় গোল করতে এসেছিস, আমি এখনই বাবাকে গিয়ে বলে দেব।" যেন তিনি নিজে তারাপদর একটি প্রবীণা অভিভাবিকা; তাহার পড়াশুনায় লেশমাত্র ব্যাঘাত না ঘটে রাত্রিদিন ইহার প্রতিই তাহার একমাত্র দৃষ্টি। কিন্তু সে নিজে কী অভিপ্রায়ে এই অসময়ে তারাপদর পাঠগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল তাহা অন্তর্যামীর অগোচর ছিল না এবং তারাপদও তাহা ভালোরূপ জানিত। কিন্তু সোনামণি বেচারা ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ একরাশ মিথ্যা কৈফিয়ত সৃজন করিত; অবশেষে চারু যখন ঘৃণাভরে তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া সম্ভাষণ করিত তখন সে লজ্জিত শঙ্কিত পরাজিত হইয়া ব্যথিতচিত্তে ফিরিয়া যাইত। দয়ার্দ্র তারাপদ তাহাকে ডাকিয়া বলিত, "সোনা, আজ সন্ধ্যাবেলায় আমি তোদের বাড়ি যাব এখন।" চারু সর্পিণীর মতো ফোঁস করিয়া উঠিয়া বলিত, "যাবে বৈকি। তোমার পড়া করতে হবে না? আমি মাস্টারমশায়কে বলে দেব না?"

চারুর এই শাসনে ভীত না হইয়া তারাপদ দুই-একদিন সন্ধ্যার পর বামুনঠাকরুনের বাড়ি গিয়াছিল। তৃতীয় বা চতুর্থ বারে চারু ফাঁকা শাসন না করিয়া আস্তে আস্তে এক সময় বাহির হইতে তারাপদর ঘরের দ্বারে শিকল আঁটিয়া দিয়া মার মসলার বাক্সর চাবিতালা আনিয়া তালা লাগাইয়া দিল। সমস্ত সন্ধ্যাবেলা তারাপদকে এইরূপ বন্দী অবস্থায় রাখিয়া আহারের সময় দ্বার খুলিয়া দিল। তারাপদ রাগ করিয়া কথা কহিল না এবং না খাইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। তখন অনুতপ্ত ব্যাকুল বালিকা করজোড়ে সানুনয়ে বারম্বার বলিতে লাগিল, "তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আর আমি এমন করব না। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তুমি খেয়ে যাও।" তাহাতেও যখন তারাপদ বশ মানিল না, তখন সে অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিল; তারাপদ সংকটে পড়িয়া ফিরিয়া আসিয়া খাইতে বসিল।

চারু কতবার একান্তমনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, সে তারাপদর সহিত সদ্ব্যবহার করিবে, আর কখনো তাহাকে মুহূর্তের জন্য বিরক্ত করিবে না, কিন্তু সোনামণি প্রভৃতি

আর পাঁচজন মাঝে আসিয়া পড়াতে কখন তাহার কিরূপ মেজাজ হইয়া যায় কিছুতেই আত্মসম্বরণ করিতে পারে না। কিছুদিন যখন উপরি-উপরি সে ভালোমানুষি করিতে থাকে তখনই একটা উৎকট আসন্ন বিপ্লবের জন্য তারাপদ সতর্কভাবে প্রস্তুত হইয়া থাকে। আক্রমণটা হঠাৎ কী উপলক্ষে কোন্ দিক হইতে আসে কিছুই বলা যায় না। তাহার পরে প্রচণ্ড ঝড়, ঝড়ের পরে প্রচুর অশ্রুবারিবর্ষণ, তাহার পরে প্রসন্ন স্নিগ্ধ শান্তি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এমনি করিয়া প্রায় দুই বৎসর কাটিল। এত সুদীর্ঘকালের জন্য তারাপদ কখনো কাহারো নিকট ধরা দেয় নাই। বোধ করি, পড়াশুনার মধ্যে তাহার মন এক অপূর্ব আকর্ষণে বদ্ধ হইয়াছিল; বোধ করি, বয়োবৃদ্ধিসহকারে তাহার প্রকৃতির পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছিল এবং স্থায়ী হইয়া বসিয়া সংসারের সুখস্বচ্ছন্দতা ভোগ করিবার দিকে তাহার মন পড়িয়াছিল; বোধ করি, তাহার সহপাঠিকা বালিকার নিয়তদৌরাত্ম্যচঞ্চল সৌন্দর্য অলক্ষিতভাবে তাহার হৃদয়ের উপর বন্ধন বিস্তার করিতেছিল।

এ দিকে চারুর বয়স এগারো উত্তীর্ণ হইয়া যায়। মতিবাবু সন্ধান করিয়া তাঁহার মেয়ের বিবাহের জন্য দুই-তিনটি ভালো ভালো সম্বন্ধ আনাইলেন। কন্যার বিবাহ-বয়স উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া মতিবাবু তাহার ইংরাজি পড়া এবং বাহিরে যাওয়া নিষেধ করিয়া দিলেন। এই আকস্মিক অবরোধে চারু ঘরের মধ্যে ভারি-একটা আন্দোলন উপস্থিত করিল।

তখন একদিন অন্নপূর্ণা মতিবাবুকে ডাকিয়া কহিলেন, "পাত্রের জন্যে তুমি অত খোঁজ করে বেড়াচ্ছ কেন। তারাপদ ছেলেটি তো বেশ। আর তোমার মেয়েরও ওকে পছন্দ হয়েছে।"

শুনিয়া মতিবাবু অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। কহিলেন, "সেও কি কখনো হয়। তারাপদর কুলশীল কিছুই জানা নেই। আমার একটিমাত্র মেয়ে, আমি ভালো ঘরে দিতে চাই।"

একদিন রায়ডাঙার বাবুদের বাড়ি হইতে মেয়ে দেখিতে আসিল। চারুকে বেশভূষা পরাইয়া বাহির করিবার চেষ্টা করা হইল। সে শোবার ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল, কিছুতেই বাহির হইল না। মতিবাবু ঘরের বাহির হইতে অনেক অনুনয় করিলেন, ভর্ৎসনা করিলেন, কিছুতেই কিছু ফল হইল না। অবশেষে বাহিরে আসিয়া

রায়ডাঙার দূতবর্গের নিকট মিথ্যা করিয়া বলিতে হইল, কন্যার হঠাৎ অত্যন্ত অসুখ করিয়াছে, আজ আর দেখানো হইবে না। তাহারা ভাবিল, মেয়ের বুঝি কোনো-একটা দোষ আছে, তাই এইরূপ চাতুরী অবলম্বন করা হইল।

তখন মতিবাবু ভাবিতে লাগিলেন, তারাপদ ছেলেটি দেখিতে শুনিতে সকল হিসাবেই ভালো; উহাকে আমি ঘরেই রাখিতে পারিব, তাহা হইলে আমার একমাত্র মেয়েটিকে পরের বাড়ি পাঠাইতে হইবে না। ইহাও চিন্তা করিয়া দেখিলেন, তাঁহার অশান্ত অবাধ্য মেয়েটির দুরন্তপনা তাঁহাদের স্নেহের চক্ষে যতই মার্জনীয় বোধ হউক, শ্বশুরবাড়িতে কেহ সহ্য করিবে না।

তখন স্ত্রী-পুরুষে অনেক আলোচনা করিয়া তারাপদর দেশে তাহার সমস্ত কৌলিক সংবাদ সন্ধান করিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। খবর আসিল যে, বংশ ভালো, কিন্তু দরিদ্র। তখন মতিবাবু ছেলের মা এবং ভাইয়ের নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইলেন। তাঁহারা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া সম্মতি দিতে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব করিলেন না।

কাঁঠালিয়ায় মতিবাবু এবং অন্নপূর্ণা বিবাহের দিনক্ষণ আলোচনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু স্বাভাবিক গোপনতাপ্রিয় সাবধানী মতিবাবু কথাটা গোপনে রাখিলেন।

চারুকে ধরিয়া রাখা গেল না। সে মাঝে মাঝে বর্গির হাঙ্গামার মতো তারাপদর পাঠগৃহে গিয়া পড়িত। কখনো রাগ, কখনো অনুরাগ, কখনো বিরাগের দ্বারা তাহার পাঠচর্যার নিভৃত শান্তি অকস্মাৎ তরঙ্গিত করিয়া তুলিত। তাহাতে আজকাল এই নির্লিপ্ত মুক্তস্বভাব ব্রাহ্মণবালকের চিত্তে মাঝে মাঝে ক্ষণকালের জন্য বিদ্যুৎস্পন্দনের ন্যায় এক অপূর্ব চাঞ্চল্য সঞ্চার হইত। যে ব্যক্তির লঘুভার চিত্ত চিরকাল অক্ষুণ্ণ অব্যাহতভাবে কালস্রোতের তরঙ্গচূড়ায় ভাসমান হইয়া সম্মুখে প্রবাহিত হইয়া যাইত সে আজকাল এক-একবার অন্যমনস্ক হইয়া বিচিত্র দিবাস্বপ্নজালের মধ্যে জড়ীভূত হইয়া পড়ে। এক-একদিন পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া সে মতিবাবুর লাইব্রেরির মধ্যে প্রবেশ করিয়া ছবির বইয়ের পাতা উল্‌টাইতে থাকিত; সেই ছবিগুলির মিশ্রণে যে কল্পনালোক সৃজিত হইত তাহা পূর্বেকার হইতে অনেক স্বতন্ত্র এবং অধিকতর রঙিন। চারুর অদ্ভুত আচরণ লক্ষ্য করিয়া সে আর পূর্বের মতো স্বভাবত পরিহাস করিতে পারিত না, দুষ্টামি করিলে তাহাকে মারিবার কথা মনেও উদয় হইত না। নিজের এই গূঢ় পরিবর্তন, এই আবদ্ধ আসক্ত ভাব তাহার নিজের কাছে এক নূতন স্বপ্নের মতো মনে হইতে লাগিল।

শ্রাবণ মাসে বিবাহের শুভদিন স্থির করিয়া মতিবাবু তারাপদর মা ও ভাইদের আনিতে পাঠাইলেন, তারাপদকে তাহা জানিতে দিলেন না। কলিকাতায়

মোক্তারকে গড়ের বাদ্য বায়না দিতে আদেশ করিলেন এবং জিনিসপত্রের ফর্দ পাঠাইয়া দিলেন।

আকাশে নববর্ষার মেঘ উঠিল। গ্রামের নদী এতদিন শুষ্কপ্রায় হইয়া ছিল, মাঝে মাঝে কেবল এক-একটা ডোবায় জল বাধিয়া থাকিত; ছোটো ছোটো নৌকা সেই পঙ্কিল জলে ডোবানো ছিল এবং শুষ্ক নদীপথে গোরুর গাড়ি -চলাচলের সুগভীর চক্রচিহ্ন খোদিত হইতেছিল— এমন সময় একদিন, পিতৃগৃহপ্রত্যাগত পার্বতীর মতো, কোথা হইতে দ্রুতগামিনী জলধারা কলহাস্যসহকারে গ্রামের শূন্যবক্ষে আসিয়া সমাগত হইল— উলঙ্গ বালকবালিকারা তীরে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে নৃত্য করিতে লাগিল, অতৃপ্ত আনন্দে বারম্বার জলে ঝাঁপ দিয়া দিয়া নদীকে যেন আলিঙ্গন করিয়া ধরিতে লাগিল, কুটিরবাসিনীরা তাহাদের পরিচিত প্রিয়সঙ্গিনীকে দেখিবার জন্য বাহির হইয়া আসিল— শুষ্ক নির্জীব গ্রামের মধ্যে কোথা হইতে এক প্রবল বিপুল প্রাণহিল্লোল আসিয়া প্রবেশ করিল। দেশবিদেশ হইতে বোঝাই হইয়া ছোটো বড়ো নানা আয়তনের নৌকা আসিতে লাগিল, বাজারের ঘাট সন্ধ্যাবেলায় বিদেশী মাঝির সংগীতে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। দুই তীরের গ্রামগুলি সম্বৎসর আপনার নিভৃত কোণে আপনার ক্ষুদ্র ঘরকন্না লইয়া একাকিনী দিনযাপন করিতে থাকে, বর্ষার সময় বাহিরের বৃহৎ পৃথিবী বিচিত্র পণ্যোপহার লইয়া গৈরিকবর্ণজলরথে চড়িয়া এই গ্রামকন্যকাগুলির তত্ত্ব লইতে আসে; তখন জগতের সঙ্গে আত্মীয়তাগর্বে কিছুদিনের জন্য তাহাদের ক্ষুদ্রতা ঘুচিয়া যায়, সমস্তই সচল সজাগ সজীব হইয়া উঠে এবং মৌন নিস্তব্ধ দেশের মধ্যে সুদূর রাজ্যের কলালাপধ্বনি আসিয়া চারি দিকের আকাশকে আন্দোলিত করিয়া তুলে।

এই সময়ে কুড়ুলকাটায় নাগবাবুদের এলাকায় বিখ্যাত রথযাত্রার মেলা হইবে। জ্যোৎস্নাসন্ধ্যায় তারাপদ ঘাটে গিয়া দেখিল, কোনো নৌকা নাগরদোলা, কোনো নৌকা যাত্রার দল, কোনো নৌকা পণ্যদ্রব্য লইয়া প্রবল নবীন স্রোতের মুখে দ্রুতবেগে মেলা অভিমুখে চলিয়াছে; কলিকাতার কন্সর্টের দল বিপুলশব্দে দ্রুততালের বাজনা জুড়িয়া দিয়াছে; যাত্রার দল বেহালার সঙ্গে গান গাহিতেছে এবং সমের কাছে হাহাহাঃ শব্দে চীৎকার উঠিতেছে; পশ্চিমদেশী নৌকার দাঁড়িমাল্লাগুলো কেবলমাত্র মাদল এবং করতাল লইয়া উন্মত্ত উৎসাহে বিনা সংগীতে খচমচ শব্দে আকাশ বিদীর্ণ করিতেছে— উদ্দীপনার সীমা নাই। দেখিতে দেখিতে পূর্বদিগন্ত হইতে ঘনমেঘরাশি প্রকাণ্ড কালো পাল তুলিয়া দিয়া আকাশের মাঝখানে উঠিয়া পড়িল, চাঁদ আচ্ছন্ন হইল— পুবে-বাতাস বেগে বহিতে লাগিল, মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিয়া চলিল, নদীর জল খল খল হাস্যে স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল— নদীতীরবর্তী আন্দোলিত বনশ্রেণীর মধ্যে অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল, ভেক

ডাকিতে আরম্ভ করিল, ঝিল্লিধ্বনি যেন করাত দিয়া অন্ধকারকে চিরিতে লাগিল। সম্মুখে আজ যেন সমস্ত জগতের রথযাত্রা— চাকা ঘুরিতেছে, ধ্বজা উড়িতেছে, পৃথিবী কাঁপিতেছে; মেঘ উড়িয়াছে, বাতাস ছুটিয়াছে, নদী বহিয়াছে, নৌকা চলিয়াছে, গান উঠিয়াছে; দেখিতে দেখিতে গুরু গুরু শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, বিদ্যুৎ আকাশকে কাটিয়া কাটিয়া ঝলসিয়া উঠিল, সুদূর অন্ধকার হইতে একটা মুষলধারাবর্ষী বৃষ্টির গন্ধ আসিতে লাগিল। কেবল নদীর এক তীরে এক পার্শ্বে কাঁঠালিয়া গ্রাম আপন কুটিরদ্বার বন্ধ করিয়া দীপ নিবাইয়া দিয়া নিঃশব্দে ঘুমাইতে লাগিল।

পরদিন তারাপদর মাতা ও ভ্রাতাগণ কাঁঠালিয়ায় আসিয়া অবতরণ করিলেন, পরদিন কলিকাতা হইতে বিবিধসামগ্রীপূর্ণ তিনখানা বড়ো নৌকা আসিয়া কাঁঠালিয়ার জমিদারি কাছারির ঘাটে লাগিল, এবং পরদিন অতি প্রাতে সোনামণি কাগজে কিঞ্চিৎ আমসত্ত এবং পাতার ঠোঙায় কিঞ্চিৎ আচার লইয়া ভয়ে ভয়ে তারাপদর পাঠগৃহদ্বারে আসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইল, কিন্তু পরদিন তারাপদকে দেখা গেল না। স্নেহ-প্রেম-বন্ধুত্বের ষড়যন্ত্রবন্ধন তাহাকে চারি দিক হইতে সম্পূর্ণরূপে ঘিরিবার পূর্বেই সমস্ত গ্রামের হৃদয়খানি চুরি করিয়া একদা বর্ষার মেঘান্ধকার রাত্রে এই ব্রাহ্মণবালক আসক্তিবিহীন উদাসীন জননী বিশ্বপৃথিবীর নিকট চলিয়া গিয়াছে।

ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২

ইচ্ছাপূরণ

সুবলচন্দ্রের ছেলেটির নাম সুশীলচন্দ্র। কিন্তু সকল সময়ে নামের মতো মানুষটি হয় না। সেইজন্যই সুবলচন্দ্র কিছু দুর্বল ছিলেন এবং সুশীলচন্দ্র বড়ো শান্ত ছিলেন না।

ছেলেটি পাড়াসুদ্ধ লোককে অস্থির করিয়া বেড়াইত, সেইজন্য বাপ মাঝে মাঝে শাসন করিতে ছুটিতেন; কিন্তু বাপের পায়ে ছিল বাত, আর ছেলেটি হরিণের মতো দৌড়িতে পারিত; কাজেই কিল চড়-চাপড় সকল সময় ঠিক জায়গায় গিয়া পড়িত না। কিন্তু সুশীলচন্দ্র দৈবাৎ যেদিন ধরা পড়িতেন সেদিন তাঁহার আর রক্ষা থাকিত না।

আজ শনিবারের দিনে দুটোর সময় স্কুলের ছুটি ছিল, কিন্তু আজ স্কুলে যাইতে সুশীলের কিছুতেই মন উঠিতেছিল না। তাহার অনেকগুলা কারণ ছিল। একে তো আজ স্কুলে ভূগোলের পরীক্ষা, তাহাতে আবার ও পাড়ার বোসেদের বাড়ি আজ সন্ধ্যার সময় বাজি পোড়ানো হইবে। সকাল হইতে সেখানে ধুমধাম চলিতেছে। সুশীলের ইচ্ছা, সেইখানেই আজ দিনটা কাটাইয়া দেয়।

অনেক ভাবিয়া, শেষকালে স্কুলে যাইবার সময় বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার বাপ সুবল গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী রে, বিছানায় পড়ে আছিস যে। আজ ইস্কুলে যাবি নে?"

সুশীল বলিল, "আমার পেট কামড়াচ্ছে, আজ আমি ইস্কুলে যেতে পারব না।"

সুবল তাহার মিথ্যা কথা সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। মনে মনে বলিলেন, 'রোসো, একে আজ জব্দ করতে হবে।' এই বলিয়া কহিলেন, "পেট কামড়াচ্ছে? তবে আর তোর কোথাও গিয়ে কাজ নেই। বোসেদের বাড়ি বাজি দেখতে হরিকে একলাই পাঠিয়ে দেব এখন। তোর জন্যে আজ লজঞ্চুস কিনে রেখেছিলুম, সেও আজ খেয়ে কাজ নেই। তুই এখানে চুপ করে পড়ে থাক্, আমি খানিকটা পাঁচন তৈরি করে নিয়ে আসি।"

এই বলিয়া তাহার ঘরে শিকল দিয়া সুবলচন্দ্র খুব তিতো পাঁচন তৈয়ার করিয়া আনিতে গেলেন। সুশীল মহা মুশকিলে পড়িয়া গেল। লজঞ্চুস সে যেমন ভালোবাসিত পাঁচন খাইতে হইলে তাহার তেমনি সর্বনাশ বোধ হইত। ও দিকে আবার বোসেদের বাড়ি যাইবার জন্য কাল রাত হইতে তাহার মন ছট্‌ফট্ করিতেছে, তাহাও বুঝি বন্ধ হইল।

সুবলবাবু যখন খুব বড়ো এক বাটি পাঁচন লইয়া ঘরে ঢুকিলেন সুশীল বিছানা হইতে ধড়্‌ফড়্ করিয়া উঠিয়া বলিল, "আমার পেট কামড়ানো একেবারে সেরে গেছে, আমি আজ ইস্কুলে যাব।"

বাবা বলিলেন, "না না, সে কাজ নেই, তুই পাঁচন খেয়ে এইখানে চুপচাপ করে শুয়ে থাক্।" এই বলিয়া তাহাকে জোর করিয়া পাঁচন খাওয়াইয়া ঘরে তালা লাগাইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

সুশীল বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত দিন ধরিয়া কেবল মনে করিতে লাগিল যে, 'আহা, যদি কালই আমার বাবার মতো বয়স হয়, আমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারি, আমাকে কেউ বন্ধ করে রাখতে পারে না।'

তাহার বাপ সুবলবাবু বাহিরে একলা বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, 'আমার বাপ মা আমাকে বড়ো বেশি আদর দিতেন বলেই তো আমার ভালোরকম পড়াশুনো

কিছু হল না। আহা, আবার যদি সেই ছেলেবেলা ফিরে পাই, তা হলে আর কিছুতেই সময় নষ্ট না করে কেবল পড়াশুনো করে নিই।'

ইচ্ছাঠাকরুন সেই সময় ঘরের বাহির দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি বাপের ও ছেলের মনের ইচ্ছা জানিতে পারিয়া ভাবিলেন, 'আচ্ছা, ভালো, কিছুদিন ইহাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াই দেখা যাক।'

এই ভাবিয়া বাপকে গিয়া বলিলেন, "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। কাল হইতে তুমি তোমার ছেলের বয়স পাইবে।" ছেলেকে গিয়া বলিলেন, "কাল হইতে তুমি তোমার বাপের বয়সী হইবে।" শুনিয়া দুইজনে ভারি খুশি হইয়া উঠিলেন।

বৃদ্ধ সুবলচন্দ্র রাত্রে ভালো ঘুমাইতে পারিতেন না, ভোরের দিকটায় ঘুমাইতেন। কিন্তু আজ তাঁহার কী হইল, হঠাৎ খুব ভোরে উঠিয়া একেবারে লাফ দিয়া বিছানা হইতে নামিয়া পড়িলেন। দেখিলেন, খুব ছোটো হইয়া গেছেন; পড়া দাঁত সবগুলি উঠিয়াছে; মুখের গোঁফদাড়ি সমস্ত কোথায় গেছে, তাহার আর চিহ্ন নাই। রাত্রে যে ধুতি এবং জামা পরিয়া শুইয়াছিলেন, সকালবেলায় তাহা এত ঢিলা হইয়া গেছে যে, হাতের দুই আস্তিন প্রায় মাটি পর্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে, জামার গলা বুক পর্যন্ত নাবিয়াছে, ধুতির কোঁচাটা এতই লুটাইতেছে যে, পা ফেলিয়া চলাই দায়।

আমাদের সুশীলচন্দ্র অন্যদিন ভোরে উঠিয়া চারি দিকে দৌরাত্ম্য করিয়া বেড়ান, কিন্তু আজ তাহার ঘুম আর ভাঙে না; যখন তাহার বাপ সুবলচন্দ্রের চেঁচামেচিতে সে জাগিয়া উঠিল তখন দেখিল, কাপড়-চোপড়গুলো গায়ে এমনি আঁটিয়া গেছে যে, ছিঁড়িয়া ফাটিয়া কুটিকুটি হইবার জো হইয়াছে; শরীরটা সমস্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে; কাঁচা-পাকা গোঁফে-দাড়িতে অর্ধেকটা মুখ দেখাই যায় না; মাথায় একমাথা চুল ছিল, হাত দিয়া দেখে সামনে চুল নাই— পরিষ্কার টাক তক্‌তক্‌ করিতেছে।

আজ সকালে সুশীলচন্দ্র বিছানা ছাড়িয়া উঠিতেই চায় না। অনেকবার তুড়ি দিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাই তুলিল; অনেকবার এপাশ ওপাশ করিল; শেষকালে বাপ সুবলচন্দ্রের গোলমালে ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল।

দুইজনের মনের ইচ্ছা পূর্ণ হইল বটে, কিন্তু ভারি মুশকিল বাধিয়া গেল। আগেই বলিয়াছি, সুশীলচন্দ্র মনে করিত যে, সে যদি তাহার বাবা সুবলচন্দ্রের মতো বড়ো এবং স্বাধীন হয়, তবে যেমন ইচ্ছা গাছে চড়িয়া, জলে ঝাঁপ দিয়া, কাঁচা আম খাইয়া, পাখির বাচ্ছা পাড়িয়া, দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইবে; যখন ইচ্ছা ঘরে আসিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই খাইবে, কেহ বারণ করিবার থাকিবে না। কিন্তু আশ্চর্য এই, সেদিন সকালে উঠিয়া

তাহার গাছে চড়িতে ইচ্ছাই হইল না। পানাপুকুরটা দেখিয়া তাহার মনে হইল, ইহাতে ঝাঁপ দিলেই আমার কাঁপুনি দিয়া জ্বর আসিবে। চুপচাপ করিয়া দাওয়ায় একটা মাদুর পাতিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

একবার মনে হইল, খেলাধুলোগুলো একেবারেই ছাড়িয়া দেওয়াটা ভালো হয় না, একবার চেষ্টা করিয়াই দেখা যাক। এই ভাবিয়া কাছে একটা আমড়া গাছ ছিল, সেইটাতে উঠিবার জন্য অনেকরকম চেষ্টা করিল। কাল যে গাছটাতে কাঠবিড়ালির মতো তর তর করিয়া চড়িতে পারিত আজ বুড়া শরীর লইয়া সে গাছে কিছুতেই উঠিতে পারিল না; নিচেকার একটা কচি ডাল ধরিবামাত্র সেটা তাহার শরীরের ভারে ভাঙিয়া গেল এবং বুড়া সুশীল ধপ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। কাছে রাস্তা দিয়া লোক চলিতেছিল, তাহারা বুড়াকে ছেলেমানুষের মতো গাছে চড়িতে ও পড়িতে দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হইয়া গেল। সুশীলচন্দ্র লজ্জায় মুখ নিচু করিয়া আবার সেই দাওয়ায় মাদুরে আসিয়া বসিল; চাকরকে বলিল, "ওরে, বাজার থেকে এক টাকার লজঞ্জুস কিনে আন্।"

লজঞ্জুসের প্রতি সুশীলচন্দ্রের বড়ো লোভ ছিল। স্কুলের ধারে দোকানে সে রোজ নানা রঙের লজঞ্জুস সাজানো দেখিত; দু-চার পয়সা যাহা পাইত তাহাতেই লজঞ্জুস কিনিয়া খাইত; মনে করিত যখন বাবার মতো টাকা হইবে তখন কেবল পকেট ভরিয়া ভরিয়া লজঞ্জুস কিনিবে এবং খাইবে। আজ চাকর এক টাকায় একরাশ লজঞ্জুস কিনিয়া আনিয়া দিল; তাহারই একটা লইয়া সে দন্তহীন মুখের মধ্যে পুরিয়া চুষিতে লাগিল; কিন্তু বুড়ার মুখে ছেলেমানুষের লজঞ্জুস কিছুতেই ভালো লাগিল না। একবার ভাবিল 'এগুলো আমার ছেলেমানুষ বাবাকে খাইতে দেওয়া যাক্'; আবার তখনই মনে হইল, 'না কাজ নাই, এত লজঞ্জুস খাইলে উহার আবার অসুখ করিবে।'

কাল পর্যন্ত যে-সকল ছেলে সুশীলচন্দ্রের সঙ্গে কপাটি খেলিয়াছে আজ তাহারা সুশীলের সন্ধানে আসিয়া বুড়ো সুশীলকে দেখিয়া দূরে ছুটিয়া গেল।

সুশীল ভাবিয়াছিল, বাপের মতো স্বাধীন হইলে তাহার সমস্ত ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে সমস্তদিন ধরিয়া কেবলই ডুডু ডুডু শব্দে কপাটি খেলিয়া বেড়াইবে; কিন্তু আজ রাখাল গোপাল অক্ষয় নিবারণ হরিশ এবং নন্দকে দেখিয়া মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিল; ভাবিল, 'চুপচাপ করিয়া বসিয়া আছি, এখনই বুঝি ছোঁড়াগুলো গোলমাল বাধাইয়া দিবে।'

আগেই বলিয়াছি, বাবা সুবলচন্দ্র প্রতিদিন দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতেন, যখন ছোটো ছিলাম তখন দুষ্টামি করিয়া সময় নষ্ট করিয়াছি, ছেলেবয়স ফিরিয়া পাইলে সমস্তদিন শান্ত শিষ্ট হইয়া, ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া, কেবল বই

লইয়া পড়া মুখস্থ করি। এমন-কি, সন্ধ্যার পরে ঠাকুরমার কাছে গল্প শোনাও বন্ধ করিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া রাত্রি দশটা এগারোটা পর্যন্ত পড়া তৈয়ারি করি।

কিন্তু ছেলেবয়স ফিরিয়া পাইয়া সুবলচন্দ্র কিছুতেই স্কুলমুখো হইতে চাহেন না। সুশীল বিরক্ত হইয়া আসিয়া বলিত, "বাবা, ইস্কুলে যাবে না?" সুবল মাথা চুলকাইয়া মুখ নিচু করিয়া আস্তে আস্তে বলিতেন, "আজ আমার পেট কামড়াচ্ছে, আমি ইস্কুলে যেতে পারব না।" সুশীল রাগ করিয়া বলিত, "পারবে না বইকি! ইস্কুলে যাবার সময় আমারও অমন ঢের পেট কামড়েছে, আমি ও-সব জানি।"

বাস্তবিক সুশীল এতরকম উপায়ে স্কুল পলাইত এবং সে এত অল্পদিনের কথা যে, তাহাকে ফাঁকি দেওয়া তাহার বাপের কর্ম নহে। সুশীল জোর করিয়া ক্ষুদ্র বাপটিকে স্কুলে পাঠাইতে আরম্ভ করিল। স্কুলের ছুটির পরে সুবল বাড়ি আসিয়া খুব একচোট ছুটাছুটি করিয়া খেলিয়া বেড়াইবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িতেন; কিন্তু ঠিক সেই সময়টিতে বৃদ্ধ সুশীলচন্দ্র চোখে চশমা দিয়া একখানা কৃত্তিবাসের রামায়ণ লইয়া সুর করিয়া করিয়া পড়িত, সুবলের ছুটাছুটি গোলমালে তাহার পড়ার ব্যাঘাত হইত। তাই সে জোর করিয়া সুবলকে ধরিয়া সম্মুখে বসাইয়া হাতে একখানা শ্লেট দিয়া আঁক কষিতে দিত। আঁকগুলো এমনি বড়ো বড়ো বাছিয়া দিত যে, তাহার একটা কষিতেই তাহার বাপের একঘণ্টা চলিয়া যাইত। সন্ধ্যাবেলায় বুড়া সুশীলের ঘরে অনেক বুড়ায় মিলিয়া দাবা খেলিত। সে সময়টায় সুবলকে ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য সুশীল একজন মাস্টার রাখিয়া দিল; মাস্টার রাত্রি দশটা পর্যন্ত তাহাকে পড়াইত।

খাওয়ার বিষয়ে সুশীলের বড়ো কড়াক্কড় ছিল। কারণ, তাহার বাপ সুবল যখন বৃদ্ধ ছিলেন তখন তাঁহার খাওয়া ভালো হজম হইত না, একটু বেশি খাইলেই অম্বল হইত— সুশীলের সে কথাটা বেশ মনে আছে, সেইজন্য সে তাহার বাপকে কিছুতেই অধিক খাইতে দিত না। কিন্তু হঠাৎ অল্পবয়স হইয়া আজকাল তাঁহার এমনি ক্ষুধা হইয়াছে যে, নুড়ি হজম করিয়া ফেলিতে পারিতেন। সুশীল তাঁহাকে যতই অল্প খাইতে দিত পেটের জ্বালায় তিনি ততই অস্থির হইয়া বেড়াইতেন। শেষকালে রোগা হইয়া শুকাইয়া তাঁহার সর্বাঙ্গের হাড় বাহির হইয়া পড়িল। সুশীল ভাবিল, শক্ত ব্যামো হইয়াছে; তাই কেবলই ঔষধ গিলাইতে লাগিল।

বুড়া সুশীলেরও বড়ো গোল বাধিল। সে তাহার পূর্বকালের অভ্যাসমত যাহা করে তাহাই তাহার সহ্য হয় না; পূর্বে সে পাড়ায় কোথাও যাত্রাগানের খবর পাইলেই বাড়ি হইতে পালাইয়া, হিমে হোক, বৃষ্টিতে হোক, সেখানে গিয়া হাজির হইত। আজিকার বুড়া সুশীল সেই কাজ করিতে গিয়া, সর্দি হইয়া, কাসি হইয়া, গায়ে মাথায়

ব্যথা হইয়া, তিন হপ্তা শয্যাগত হইয়া পড়িয়া রহিল। চিরকাল সে পুকুরে স্নান করিয়া আসিয়াছে, আজও তাহাই করিতে গিয়া হাতের গাঁট পায়ের গাঁট ফুলিয়া বিষম বাত উপস্থিত হইল; তাহার চিকিৎসা করিতে ছয় মাস গেল। তাহার পর হইতে দুই দিন অন্তর সে গরম জলে স্নান করিত এবং সুবলকেও কিছুতেই পুকুরে স্নান করিতে দিত না। পূর্বেকার অভ্যাসমত, ভুলিয়া তক্তপোষ হইতে সে লাফ দিয়া নামিতে যায়, আর হাড়গুলো টন্‌টন্ ঝন্‌ঝন্ করিয়া উঠে। মুখের মধ্যে আস্ত পান পুরিয়াই হঠাৎ দেখে, দাঁত নাই, পান চিবানো অসাধ্য। ভুলিয়া চিরুনি ব্রুশ লইয়া মাথা আঁচড়াইতে গিয়া দেখে, প্রায় সকল মাথাতেই টাক। এক-একদিন হঠাৎ ভুলিয়া যাইত যে, সে তাহার বাপের বয়সী বুড়া হইয়াছে এবং ভুলিয়া পূর্বের অভ্যাসমত দুষ্টামি করিয়া পাড়ার বুড়ি আন্দি পিসির জলের কলসে হঠাৎ ঠন্ করিয়া ঢিল ছুঁড়িয়া মারিত— বুড়ামানুষের এই ছেলেমানুষি দুষ্টামি দেখিয়া লোকেরা তাহাকে মার্ মার্ করিয়া তাড়াইয়া যাইত, সেও লজ্জায় মুখ রাখিবার জায়গা পাইত না।

সুবলচন্দ্রও এক-একদিন দৈবাৎ ভুলিয়া যাইত যে, সে আজকাল ছেলেমানুষ হইয়াছে। আপনাকে পূর্বের মতো বুড়া মনে করিয়া যেখানে বুড়ামানুষেরা তাস পাশা খেলিতেছে সেইখানে গিয়া সে বসিত এবং বুড়ার মতো কথা বলিত, শুনিয়া সকলেই তাহাকে "যা যা, খেলা কর্‌গে যা, জ্যাঠামি করতে হবে না" বলিয়া কান ধরিয়া বিদায় করিয়া দিত। হঠাৎ ভুলিয়া মাস্টারকে গিয়া বলিত, "দাও তো, তামাকটা দাও তো, খেয়ে নিই।" শুনিয়া মাস্টার তাহাকে বেঞ্চের উপর এক পায়ে দাঁড় করাইয়া দিত। নাপিতকে গিয়া বলিত, "ওরে বেজা, ক দিন আমাকে কামাতে আসিস নি কেন।" নাপিত ভাবিত, ছেলেটি খুব ঠাট্টা করিতে শিখিয়াছে। সে উত্তর দিত, "আর বছর-দশেক বাদে আসব এখন।" আবার এক-একদিন তাহার পূর্বের অভ্যাসমত তাহার ছেলে সুশীলকে গিয়া মারিত। সুশীল ভারি রাগ করিয়া বলিত, "পড়াশুনো করে তোমার এই বুদ্ধি হচ্ছে? একরত্তি ছেলে হয়ে বুড়োমানুষের গায়ে হাত তোল!" অমনি চারি দিক হইতে লোকজন ছুটিয়া আসিয়া কেহ কিল, কেহ চড়, কেহ গালি দিতে আরম্ভ করে।

তখন সুবল একান্তমনে প্রার্থনা করিতে লাগিল যে, "আহা, যদি আমি আমার ছেলে সুশীলের মতো বুড়ো হই এবং স্বাধীন হই, তাহা হইলে বাঁচিয়া যাই।"

সুশীলও প্রতিদিন জোড়হাত করিয়া বলে, "হে দেবতা, আমার বাপের মতো আমাকে ছোটো করিয়া দাও, মনের সুখে খেলা করিয়া বেড়াই। বাবা যেরকম দুষ্টামি আরম্ভ করিয়াছেন উঁহাকে আর আমি সামলাইতে পারি না, সর্বদা ভাবিয়া অস্থির হইলাম।"

২০।১৮

তখন ইচ্ছাঠাকরুন আসিয়া বলিলেন, "কেমন, তোমাদের শখ মিটিয়াছে ?"

তাঁহারা দুইজনেই গড় হইয়া প্রণাম করিয়া কহিলেন, "দোহাই ঠাকরুন, মিটিয়াছে। এখন আমরা যে যাহা ছিলাম আমাদিগকে তাহাই করিয়া দাও।"

ইচ্ছাঠাকরুন বলিলেন, "আচ্ছা, কাল সকালে উঠিয়া তাহাই হইবে।"

পরদিন সকালে সুবল পূর্বের মতো বুড়া হইয়া এবং সুশীল ছেলে হইয়া জাগিয়া উঠিলেন। দুইজনেরই মনে হইল যে, স্বপ্ন হইতে জাগিয়াছি। সুবল গলা ভার করিয়া বলিলেন, "সুশীল, ব্যাকরণ মুখস্থ করবে না ?"

সুশীল মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "বাবা, আমার বই হারিয়ে গেছে।"

আশ্বিন ১৩০২

প্রবন্ধ

রাশিয়ার চিঠি

কল্যাণীয় শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ করকে
আশীর্বাদ

শান্তিনিকেতন
২৫ বৈশাখ ১৩৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাশিয়ার চিঠি

১

মস্কৌ

রাশিয়ায় অবশেষে আসা গেল। যা দেখছি আশ্চর্য ঠেকছে। অন্য কোনো দেশের মতোই নয়। একেবারে মূলে প্রভেদ। আগাগোড়া সকল মানুষকেই এরা সমান করে জাগিয়ে তুলছে।

চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন; তাদের মানুষ হবার সময় নেই; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সব চেয়ে কম খেয়ে, কম প'রে, কম শিখে, বাকি সকলের পরিচর্যা করে; সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা রোগে মরে, উপোসে মরে, উপরওয়ালাদের লাথি ঝাঁটা খেয়ে মরে— জীবনযাত্রার জন্য যত-কিছু সুযোগ সুবিধে সব-কিছুর থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে— উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।

আমি অনেক দিন এদের কথা ভেবেছি, মনে হয়েছে এর কোনো উপায় নেই। এক দল তলায় না থাকলে আর-এক দল উপরে থাকতেই পারে না, অথচ উপরে থাকার দরকার আছে। উপরে না থাকলে নিতান্ত কাছের সীমার বাইরে কিছু দেখা যায় না; কেবলমাত্র জীবিকানির্বাহ করার জন্যে তো মানুষের মনুষ্যত্ব নয়। একান্ত জীবিকাকে অতিক্রম করে তবেই তার সভ্যতা। সভ্যতার সমস্ত শ্রেষ্ঠ ফসল অবকাশের ক্ষেত্রে ফলেছে। মানুষের সভ্যতায় এক অংশে অবকাশ রক্ষা করার দরকার আছে। তাই ভাবতুম, যে-সব মানুষ শুধু অবস্থার গতিকে নয়, শরীরমনের গতিকে নীচের তলায় কাজ করতে বাধ্য এবং সেই কাজেরই যোগ্য, যথাসম্ভব তাদের শিক্ষাস্বাস্থ্য-সুখসুবিধার জন্যে চেষ্টা করা উচিত।

মুশকিল এই, দয়া করে কোনো স্থায়ী জিনিস করা চলে না; বাইরে থেকে উপকার

করতে গেলে পদে পদে তার বিকার ঘটে। সমান হতে পারলে তবেই সত্যকার সহায়তা সম্ভব হয়। যাই হোক, আমি ভালো করে কিছুই ভেবে পাই নি, অথচ অধিকাংশ মানুষকে তলিয়ে রেখে, অমানুষ করে রেখে, তবেই সভ্যতা সমুচ্চে থাকবে এ কথা অনিবার্য বলে মেনে নিতে গেলে মনে ধিক্‌কার আসে।

ভেবে দেখো-না, নিরন্ন ভারতবর্ষের অন্নে ইংলণ্ড্ পরিপুষ্ট হয়েছে। ইংলণ্ডের অনেক লোকেরই মনের ভাব এই যে, ইংলণ্ড্‌কে চিরদিন পোষণ করাই ভারতবর্ষের সার্থকতা। ইংলণ্ড্ বড়ো হয়ে উঠে মানবসমাজে বড়ো কাজ করছে, অতএব এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে চিরকালের মতো একটা জাতিকে দাসত্বে বদ্ধ করে রেখে দিলে দোষ নেই। এই জাতি যদি কম খায়, কম পরে, তাতে কী যায় আসে— তবুও দয়া করে তাদের অবস্থার কিছু উন্নতি করা উচিত, এমন কথা তাদের মনে জাগে। কিন্তু এক-শো বছর হয়ে গেল; না পেলুম শিক্ষা, না পেলুম স্বাস্থ্য, না পেলুম সম্পদ।

প্রত্যেক সমাজের নিজের ভিতরেও এই একই কথা। যে মানুষকে মানুষ সম্মান করতে পারে না সে মানুষকে মানুষ উপকার করতে অক্ষম। অন্তত যখনই নিজের স্বার্থে এসে ঠেকে তখনই মারামারি কাটাকাটি বেধে যায়। রাশিয়ায় একেবারে গোড়া ঘেঁষে এই সমস্যা সমাধান করবার চেষ্টা চলছে। তার শেষ ফলের কথা এখনো বিচার করবার সময় হয় নি, কিন্তু আপাতত যা চোখে পড়ছে তা দেখে আশ্চর্য হচ্ছি। আমাদের সকল সমস্যার সব চেয়ে বড়ো রাস্তা হচ্ছে শিক্ষা। এতকাল সমাজের অধিকাংশ লোক শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত— ভারতবর্ষ তো প্রায় সম্পূর্ণই বঞ্চিত। এখানে সেই শিক্ষা যে কী আশ্চর্য উদ্যমে সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হচ্ছে তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। শিক্ষার পরিমাণ শুধু সংখ্যায় নয়, তার সম্পূর্ণতায়, তার প্রবলতায়। কোনো মানুষই যাতে নিঃসহায় ও নিষ্কর্মা হয়ে না থাকে এজন্যে কী প্রচুর আয়োজন ও কী বিপুল উদ্যম। শুধু শ্বেত-রাশিয়ার জন্যে নয়— মধ্য-এশিয়ার অর্ধসভ্য জাতের মধ্যেও এরা বন্যার মতো বেগে শিক্ষা বিস্তার করে চলেছে; সায়ান্সের শেষ-ফসল পর্যন্ত যাতে তারা পায় এইজন্যে প্রয়াসের অন্ত নেই। এখানে থিয়েটারে ভালো ভালো অপেরা ও বড়ো নাটকের অভিনয়ে বিষম ভিড়, কিন্তু যারা দেখছে তারা কৃষি ও কর্মীদের দলের। কোথাও এদের অপমান নেই। ইতিমধ্যে এদের যে দুই-একটা প্রতিষ্ঠান দেখলুম সর্বত্রই লক্ষ্য করেছি এদের চিত্তের জাগরণ এবং আত্মমর্যাদার আনন্দ। আমাদের দেশের জনসাধারণের তো কথাই নেই, ইংলণ্ডের মজুর-শ্রেণীর সঙ্গে তুলনা করলে আকাশপাতাল তফাত দেখা যায়। আমরা শ্রীনিকেতনে যা করতে চেয়েছি এরা সমস্ত দেশ জুড়ে প্রকৃষ্টভাবে তাই করছে। আমাদের কর্মীরা

যদি কিছুদিন এখানে এসে শিক্ষা করে যেতে পারত তা হলে ভারি উপকার হত। প্রতিদিনই আমি ভারতবর্ষের সঙ্গে এখানকার তুলনা করে দেখি আর ভাবি, কী হয়েছে আর কী হতে পারত। আমার আমেরিকান সঙ্গী ডাক্তার হ্যারি টিম্বর্‌স্‌ এখানকার স্বাস্থ্যবিধানের ব্যবস্থা আলোচনা করছে— তার প্রকৃষ্টতা দেখলে চমক লাগে— আর কোথায় পড়ে আছে রোগতপ্ত অভুক্ত হতভাগ্য নিরুপায় ভারতবর্ষ! কয়েক বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের অবস্থার সঙ্গে এদের জনসাধারণের অবস্থার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য ছিল— এই অল্পকালের মধ্যে দ্রুত বেগে বদলে গেছে— আমরা পড়ে আছি জড়তার পাঁকের মধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন।

এর মধ্যে যে গলদ কিছুই নেই তা বলি নে; গুরুতর গলদ আছে। সেজন্যে একদিন এদের বিপদ ঘটবে। সংক্ষেপে সে গলদ হচ্ছে, শিক্ষাবিধি দিয়ে এরা ছাঁচ বানিয়েছে— কিন্তু ছাঁচে-ঢালা মনুষ্যত্ব কখনো টেঁকে না— সজীব মনের তত্ত্বের সঙ্গে বিদ্যার তত্ত্ব যদি না মেলে তা হলে হয় একদিন ছাঁচ হবে ফেটে চুরমার, নয় মানুষের মন যাবে মরে আড়ষ্ট হয়ে, কিম্বা কলের পুতুল হয়ে দাঁড়াবে।

এখানকার ছেলেদের মধ্যে বিভাগ করে কর্মের ভার দেওয়া হয়েছে দেখলুম, ওদের আবাসের ব্যবস্থা সম্বন্ধে একদল স্বাস্থ্য, একদল ভাণ্ডার ইত্যাদি নানারকম তদারকের দায়িত্ব নেয়; কর্তৃত্ব সবই ওদের হাতে, কেবল একজন পরিদর্শক থাকে। শান্তিনিকেতনে আমি চিরকাল এই-সমস্ত নিয়ম প্রবর্তন করতে চেষ্টা করেছি— কেবলই নিয়মাবলী রচনা হয়েছে, কোনো কাজ হয় নি। তার অন্যতম কারণ হচ্ছে, স্বভাবতই পাঠবিভাগের চরম লক্ষ্য হয়েছে পরীক্ষায় পাস করা, আর সব-কিছুই উপলক্ষ; অর্থাৎ হলে ভালোই, না হলেও ক্ষতি নেই। আমাদের অলস মন জবরদস্ত দায়িত্বের বাইরে কাজ বাড়াতে অনিচ্ছুক। তা ছাড়া শিশুকাল থেকেই আমরা পুঁথিমুখস্থ বিদ্যাতেই অভ্যস্ত। নিয়মাবলী রচনা করে কোনো লাভ নেই; নিয়ামকদের পক্ষে যেটা আন্তরিক নয় সেটা উপেক্ষিত না হয়ে থাকতে পারে না। গ্রামের কাজ ও শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে আমি যে-সব কথা এতকাল ভেবেছি এখানে তার বেশি কিছু নেই— কেবল আছে শক্তি, আছে উদ্যম, আর কার্যকর্তাদের ব্যবস্থাবুদ্ধি। আমার মনে হয়, অনেকটাই নির্ভর করে গায়ের জোরের উপর— ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ অপরিপুষ্ট দেহ নিয়ে সম্পূর্ণ বেগে কাজ করা দুঃসাধ্য; এখানকার শীতের দেশের লোকের হাড় শক্ত বলেই কাজ এমন করে সহজে এগোয়। মাথা গুনতি করে আমাদের দেশের কর্মীদের সংখ্যা নির্ণয় করা ঠিক নয়, তারা পুরো একখানা মানুষ নয়। ইতি ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩০

২

মস্কৌ

স্থান রাশিয়া। দৃশ্য, মস্কৌয়ের উপনগরীতে একটি প্রাসাদভবন। জানলার ভিতর দিয়ে চেয়ে দেখি, দিক্‌প্রান্ত পর্যন্ত অরণ্যভূমি, সবুজ রঙের ঢেউ উঠেছে— ঘন সবুজ, ফিকে সবুজ, বেগনির সঙ্গে মেশামেশি সবুজ, হলদের-আমেজ-দেওয়া সবুজ। বনের শেষ-সীমায় বহু দূরে গ্রামের কুটিরশ্রেণী। বেলা প্রায় দশটা, আকাশে স্তরে স্তরে মেঘ করেছে, অবৃষ্টিসংরম্ভ সমারোহ, বাতাসে ঋজুকায়া পপ্‌লার গাছের শিখরগুলি দোদুল্যমান।

মস্কৌয়েতে কয়দিন যে হোটেলে ছিলুম তার নাম গ্র্যান্‌ড্‌ হোটেল। বাড়িটা মস্ত, কিন্তু অবস্থা অতি দরিদ্র। যেন ধনীর ছেলে দেউলে হয়ে গেছে। সাবেক কালের সাজসজ্জা কতক গেছে বিকিয়ে, কতক গেছে ছিঁড়ে; তালি দেওয়ারও সঙ্গতি নেই; ময়লা হয়ে আছে, ধোবার বাড়ির সম্পর্ক বন্ধ। সমস্ত শহরেরই অবস্থা এইরকম— একান্ত অপরিচ্ছন্নতার ভিতর দিয়েও নবাবী আমলের চেহারা দেখা যাচ্ছে, যেন ছেঁড়া জামাতেও সোনার বোতাম লাগানো, যেন ঢাকাই ধুতি রিফু-করা। আহারে ব্যবহারে এমন সর্বব্যাপী নির্ধনতা য়ুরোপের আর কোথাও দেখা যায় না। তার প্রধান কারণ, আর-আর সব জায়গায় ধনীদরিদ্রের প্রভেদ থাকাতে ধনের পুঞ্জীভূত রূপ সব চেয়ে বড়ো করে চোখে পড়ে— সেখানে দারিদ্র্য থাকে যবনিকার আড়ালে নেপথ্যে; সেই নেপথ্যে সব এলোমেলো, নোংরা, অস্বাস্থ্যকর, দুঃখে দুর্দশায় দুষ্কর্মে নিবিড় অন্ধকার। কিন্তু বাইরে থেকে গিয়ে আমরা যেখানে বাসা পাই সেখানকার জানলা দিয়ে যা-কিছু দেখতে পাই সমস্তই সুভদ্র, শোভন, সুপরিপুষ্ট। এই সমৃদ্ধি যদি সমানভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যেত তা হলে তখনই ধরা পড়ত, দেশের ধন এত কিছু বেশি নয় যাতে সকলেরই ভাত কাপড় যথেষ্ট পরিমাণে জোটে। এখানে ভেদ নেই বলেই ধনের চেহারা গেছে ঘুচে; দৈন্যেরও কুশ্রীতা নেই, আছে অকিঞ্চনতা। দেশ-জোড়া এই অধন আর কোথাও দেখি নি বলেই প্রথমেই এটা আমাদের খুব চোখে পড়ে। অন্য দেশে যাদের আমরা জনসাধারণ বলি এখানে তারাই একমাত্র।

মস্কৌয়ের রাস্তা দিয়ে নানা লোক চলেছে। কেউ ফিটফাট নয়, দেখলেই বোঝা যায় অবকাশভোগীর দল একেবারে অন্তর্ধান করেছে। সকলকেই স্বহস্তে কাজকর্ম করে দিনপাত করতে হয়, বাবুগিরির পালিশ কোনো জায়গাতেই নেই। ডাক্তার পেট্রোভ্‌ বলে এক ভদ্রলোকের বাড়ি যেতে হয়েছিল, তিনি এখানকার একজন সম্মানী লোক, উচ্চপদস্থ কর্মচারী। যে বাড়িতে তাঁর আপিস সেটা সেকালের একজন বড়োলোকের

বাড়ি। কিন্তু ঘরে আসবাব অতি সামান্য, পারিপাট্যের কোনো লক্ষণ নেই; নিষ্কার্পেট মেঝের এক কোণে যেমন-তেমন একখানা টেবিল; সবসুদ্ধ, পিতৃবিয়োগে ধোবা-নাপিত-বর্জিত অশৌচদশার মতো শয্যাসনলুপ্ত ভাব, যেন বাইরের লোকের কাছে সামাজিকতা রক্ষার কোনো দায় নেই। আমার বাসায় আহারাদির যে ব্যবস্থা তা গ্র্যান্ড্ হোটেল নামধারী পান্থাবাসের পক্ষে নিতান্তই অসংগত। কিন্তু এজন্যে কোনো কুণ্ঠা নেই, কেননা সকলেরই এক দশা।

আমাদের বাল্যকালের কথা মনে পড়ে। তখনকার জীবনযাত্রা ও তার আয়োজন এখনকার তুলনায় কতই অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু সেজন্যে আমাদের কারো মনে কিছুমাত্র সংকোচ ছিল না। তার কারণ, তখনকার সংসারযাত্রার আদর্শে অত্যন্ত বেশি উঁচুনিচু ছিল না। সকলেরই ঘরে একটা মোটামুটি রকমের চালচলন ছিল; তফাত যা ছিল তা বৈদগ্ধ্যের, অর্থাৎ গানবাজনা পড়াশুনো ইত্যাদি নিয়ে। তা ছাড়া ছিল কৌলিক রীতির পার্থক্য, অর্থাৎ ভাষাভাবভঙ্গী আচারবিচার -গত বিশেষত্ব। কিন্তু তখন আমাদের আহারবিহার ও সকল -প্রকার উপকরণ যা ছিল তা দেখলে এখনকার মধ্যবিত্ত লোকদের মনেও অবজ্ঞা জাগতে পারত।

ধনগত বৈষম্যের বড়াই আমাদের দেশে এসেছে পশ্চিম মহাদেশ থেকে। এক সময়ে আমাদের দেশে যখন হাল আমলের আপিসবিহারী ও ব্যাবসাদারদের ঘরে নতুন টাকার আমদানি হল তখন তারা বিলিতি বাবুগিরির চলন শুরু করে দিলে। তখন থেকে আসবাবের মাপেই ভদ্রতার পরিমাপ আরম্ভ হয়েছে। তাই আমাদের দেশেও আজকাল কুলশীল রীতিনীতি বুদ্ধিবিদ্যা সমস্ত ছাপিয়ে চোখে পড়ে ধনের বিশিষ্টতা। এই বিশিষ্টতার গৌরবই মানুষের পক্ষে সব চেয়ে অগৌরব। এরই ইতরতা যাতে মজ্জার মধ্যে প্রবেশ না করে সেজন্যে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

এখানে এসে সব চেয়ে যেটা আমার চোখে ভালো লেগেছে সে হচ্ছে, এই ধন-গরিমার ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব। কেবলমাত্র এই কারণেই এ দেশে জনসাধারণের আত্মমর্যাদা এক মুহূর্তে অবারিত হয়েছে। চাষাভুষো সকলেই আজ অসম্মানের বোঝা ঝেড়ে ফেলে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে, এইটে দেখে আমি যেমন বিস্মিত তেমনি আনন্দিত হয়েছি। মানুষে মানুষে ব্যবহার কী আশ্চর্য সহজ হয়ে গেছে। অনেক কথা বলবার আছে, বলবার চেষ্টা করব; কিন্তু এই মুহূর্তে আপাতত বিশ্রাম করবার দরকার হয়েছে। অতএব জানলার সামনে লম্বা কেদারার উপর হেলান দিয়ে বসব, পায়ের উপর একটা কম্বল টেনে দেব— তার পরে চোখ যদি বুজে আসতে চায় জোর করে টেনে রাখতে চেষ্টা করব না। ইতি ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩০

৩

মস্কৌ

বহুকাল গত হল তোমাদের উভয়কে পত্র লিখেছিলুম। তোমাদের সম্মিলিত নৈঃশব্দ্য থেকে অনুমান করি সেই যুগলপত্র কৈবল্য লাভ করেছে। এমনতরো মহতী বিনষ্টি ভারতীয় ডাকঘরে আজকাল মাঝে মাঝে ঘটছে বলে শঙ্কা করি। এই কারণেই আজকাল চিঠি লিখতে উৎসাহ বোধ করি নে। অন্তত তোমাদের দিক থেকে সাড়া না পেলে চুপ করে যাই। নিঃশব্দ রাত্রির প্রহরগুলোকে দীর্ঘ বলে মনে হয়; তেমনিতরোই নিশ্চিঠি কাল কল্পনায় অত্যন্ত লম্বা হয়ে ওঠে। তাই থেকে থেকে মনে হয় যেন লোকান্তরপ্রাপ্তি হয়েছে। তাই পাঁজি গেছে বদল হয়ে, ঘড়ি বাজছে লম্বা তালে। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের মতো আমার দেশে যাবার সময়কে যতই টান মারছে ততই অফুরান হয়ে বেড়ে চলেছে। যেদিন ফিরব সেদিন নিশ্চিতই ফিরব— আজকের দিন যেমন অব্যবহিত নিকটে সেদিনও তেমনিই নিকটে আসবে, এই মনে করে সান্ত্বনার চেষ্টা করি।

তা হোক, আপাতত রাশিয়ায় এসেছি— না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত। এখানে এরা যা কাণ্ড করছে তার ভালোমন্দ বিচার করবার পূর্বে সর্বপ্রথমেই মনে হয়, কী অসম্ভব সাহস। সনাতন বলে পদার্থটা মানুষের অস্থিমজ্জায় মনে-প্রাণে হাজারখানা হয়ে আঁকড়ে আছে; তার কত দিকে কত মহল, কত দরজায় কত পাহারা, কত যুগ থেকে কত ট্যাক্‌সো আদায় করে তার তহবিল হয়ে উঠেছে পর্বতপ্রমাণ। এরা তাকে একেবারে জটে ধরে টান মেরেছে; ভয় ভাবনা সংশয় কিছু মনে নেই। সনাতনের গদি দিয়েছে ঝাঁটিয়ে, নূতনের জন্যে একেবারে নূতন আসন বানিয়ে দিলে। পশ্চিম মহাদেশ বিজ্ঞানের জাদুবলে দুঃসাধ্য সাধন করে, দেখে মনে মনে তারিফ করি। কিন্তু এখানে যে প্রকাণ্ড ব্যাপার চলছে সেটা দেখে আমি সব চেয়ে বেশি বিস্মিত হয়েছি। শুধু যদি একটা ভীষণ ভাঙচুরের কাণ্ড হত তাতে তেমন আশ্চর্য হতুম না— কেননা নাস্তানাবুদ করবার শক্তি এদের যথেষ্ট আছে— কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, বহুদূরব্যাপী একটা ক্ষেত্র নিয়ে এরা একটা নূতন জগৎ গড়ে তুলতে কোমর বেঁধে লেগে গেছে। দেরি সইছে না; কেননা জগৎ জুড়ে এদের প্রতিকূলতা, সবাই এদের বিরোধী— যত শীঘ্র পারে এদের খাড়া হয়ে দাঁড়াতে হবে— হাতে হাতে প্রমাণ করে দিতে হবে, এরা যেটা চাচ্ছে সেটা ভুল নয়, ফাঁকি নয়। হাজার বছরের বিরুদ্ধে দশ-পনেরো বছর জিতবে বলে পণ করেছে। অন্য দেশের তুলনায় এদের অর্থের জোর অতি সামান্য, প্রতিজ্ঞার জোর দুর্ধর্ষ।

এই-যে বিপ্লবটা ঘটল এটা রাশিয়াতে ঘটবে বলেই অনেক কাল থেকে অপেক্ষা

করছিল। আয়োজন কত দিন থেকেই চলছে। খ্যাত-অখ্যাত কত লোক কত কাল থেকেই প্রাণ দিয়েছে, অসহ্য দুঃখ স্বীকার করেছে। পৃথিবীতে বিপ্লবের কারণ বহুদূর পর্যন্ত ব্যাপক হয়ে থাকে, কিন্তু এক-একটা জায়গায় ঘনীভূত হয়ে ওঠে। সমস্ত শরীরের রক্ত দূষিত হয়ে উঠলেও এক-একটা দুর্বল জায়গায় ফোড়া হয়ে লাল হয়ে ওঠে। যাদের হাতে ধন, যাদের হাতে ক্ষমতা, তাদের হাত থেকে নির্ধন ও অক্ষমেরা এই রাশিয়াতেই অসহ্য যন্ত্রণা বহন করেছে। দুই পক্ষের মধ্যে একান্ত অসাম্য অবশেষে প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে এই রাশিয়াতেই প্রতিকারসাধনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত।

একদিন ফরাসী-বিদ্রোহ ঘটেছিল এই অসাম্যের তাড়নায়। সেদিন সেখানকার পীড়িতেরা বুঝেছিল এই অসাম্যের অপমান ও দুঃখ বিশ্বব্যাপী। তাই সেদিনকার বিপ্লবে সাম্য সৌভ্রাত্র ও স্বাতন্ত্র্যের বাণী স্বদেশের গণ্ডি পেরিয়ে উঠে ধ্বনিত হয়েছিল। কিন্তু টি঳কল না। এদের এখানকার বিপ্লবের বাণীও বিশ্ববাণী। আজ পৃথিবীতে অন্তত এই একটা দেশের লোক স্বাজাতিক স্বার্থের উপরেও সমস্ত মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করছে। এ বাণী চিরদিন টি঳কবে কি না কেউ বলতে পারে না। কিন্তু স্বজাতির সমস্যা সমস্ত মানুষের সমস্যার অন্তর্গত, এই কথাটা বর্তমান যুগের অন্তর্নিহিত কথা। একে স্বীকার করতেই হবে।

এই যুগে বিশ্ব-ইতিহাসের রঙ্গভূমির পর্দা উঠে গেছে। এতকাল যেন আড়ালে আড়ালে রিহার্স্যাল চলছিল, টুকরো টুকরো ভাবে, ভিন্ন ভিন্ন কামরায়। প্রত্যেক দেশের চারি দিকে বেড়া ছিল। বাহির থেকে আনাগোনা করবার পথ একেবারে ছিল না তা নয়, কিন্তু বিভাগের মধ্যে মানবসংসারের যে চেহারা দেখেছি আজ তা দেখি নে। সেদিন দেখা যাচ্ছিল একটি-একটি গাছ, আজ দেখছি অরণ্য। মানবসমাজের মধ্যে যদি ভারসামঞ্জস্যের অভাব ঘটে থাকে সেটা আজ দেখা দিচ্ছে পৃথিবীর এক দিক থেকে আর-এক দিক পর্যন্ত। এমন বিরাট করে দেখতে পাওয়া কম কথা নয়।

টোকিয়োতে যখন কোরীয় যুবককে জিজ্ঞাসা করেছিলুম "তোমাদের দুঃখটা কী" সে বললে, "আমাদের কাঁধে চেপেছে মহাজনের রাজত্ব, আমরা তাদের মুনফার বাহন।" আমি প্রশ্ন করলুম, যে কারণেই হোক, "তোমরা যখন দুর্বল তখন এই বোঝা নিজের জোরে ঝেড়ে ফেলবে কী উপায়ে।" সে বললে, নিরুপায়ের দল আজ পৃথিবী জুড়ে, দুঃখে তাদের মেলাবে— যারা ধনী, যারা শক্তিমান, তারা নিজের নিজের লোহার সিন্ধুক ও সিংহাসনের চার দিকে পৃথক হয়ে থাকবে, তারা কখনো মিলতে পারবে না। কোরিয়ার জোর হচ্ছে তার দুঃখের জোর।[১]

১ দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট : কোরীয় যুবকের রাষ্ট্রিক মত

দুঃখী আজ সমস্ত মানুষের রঙ্গভূমিতে নিজেকে বিরাট করে দেখতে পাচ্ছে, এইটে মস্ত কথা। আগেকার দিনে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে দেখেছে বলেই কোনোমতে নিজের শক্তিরূপ দেখতে পায় নি— অদৃষ্টের উপর ভর করে সব সহ্য করেছে। আজ অত্যন্ত নিরুপায়ও অন্তত সেই স্বর্গরাজ্য কল্পনা করতে পারছে যে রাজ্যে পীড়িতের পীড়া যায়, অপমানিতের অপমান ঘোচে। এই কারণেই সমস্ত পৃথিবীতেই আজ দুঃখজীবীরা নড়ে উঠেছে।

যারা শক্তিমান তারা উদ্ধত। দুঃখীদের মধ্যে আজ যে শক্তির প্রেরণা সঞ্চারিত হয়ে তাদের অস্থির করে তুলেছে তাকে বলশালীরা বাইরে থেকে ঠেকাবার চেষ্টা করছে— তার দূতদের ঘরে ঢুকতে দিচ্ছে না, তাদের কণ্ঠ দিচ্ছে রুদ্ধ করে। কিন্তু আসল যাকে সব চেয়ে ওদের ভয় করা উচিত ছিল সে হচ্ছে দুঃখীর দুঃখ— কিন্তু তাকেই এরা চিরকাল সব চেয়ে অবজ্ঞা করতে অভ্যস্ত। নিজের মুনফার খাতিরে সেই দুঃখকে এরা বাড়িয়ে চলতে ভয় পায় না, হতভাগ্য চাষীকে দুর্ভিক্ষের কবলের মধ্যে ঠেসে ধরে শতকরা দু-শো তিন-শো হারে মুনফা ভোগ করতে এদের হৃৎকম্প হয় না। কেননা সেই মুনফাকেই এরা শক্তি বলে জানে। কিন্তু মানুষের সমাজে সমস্ত আতিশয্যের মধ্যেই বিপদ, সে বিপদকে কখনোই বাইরে থেকে ঠেকানো যায় না। অতিশয় শক্তি অতিশয় অশক্তির বিরুদ্ধে চিরদিন নিজেকে বাড়িয়ে চলতেই পারে না। ক্ষমতাশালী যদি আপন শক্তিমদে উন্মত্ত হয়ে না থাকত তা হলে সব চেয়ে ভয় করত এই অসাম্যের বাড়াবাড়িকে— কারণ অসামঞ্জস্য মাত্রই বিশ্ববিধির বিরুদ্ধে।

মস্কৌ থেকে যখন নিমন্ত্রণ এল তখনো বলশেভিকদের সম্বন্ধে আমার মনে স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না। তাদের সম্বন্ধে ক্রমাগতই উলটো উলটো কথা শুনেছি। আমার মনে তাদের বিরুদ্ধে একটা খটকা ছিল। কেননা গোড়ায় ওদের সাধনা ছিল জবরদস্তির সাধনা। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখলুম, ওদের প্রতি বিরুদ্ধতা য়ুরোপে যেন অনেকটা ক্ষীণ হয়ে এসেছে। আমি রাশিয়াতে আসছি শুনে অনেক লোকেই আমাকে উৎসাহ দিয়েছে। এমন-কি, অনেক ইংরেজের মুখেও ওদের প্রশংসা শুনেছি। অনেকে বলেছে, ওরা অতি আশ্চর্য একটা পরীক্ষায় প্রবৃত্ত।

আবার অনেকে আমাকে ভয় দেখিয়েছে; কিন্তু প্রধান ভয়ের বিষয়, আরামের অভাব; বলেছে, আহারাদি সমস্তই এমন মোটারকম যে আমি তা সহ্য করতে পারব না। তা ছাড়া এমন কথাও অনেকে বলেছে, আমাকে যা এরা দেখাবে তার অধিকাংশই বানানো। এ কথা মানতেই হবে, আমার বয়সে আমার মতো শরীর নিয়ে রাশিয়ায় ভ্রমণ দুঃসাহসিকতা। কিন্তু পৃথিবীতে যেখানে সব চেয়ে বড়ো

রবীন্দ্রচিত্রপ্রদর্শনীতে কবির আগমন

পায়োনিয়রস্ কম্যুনে আলাপ-আলোচনা

পায়োনিয়র ছাত্রছাত্রীগণকর্তৃক রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনা

ঐতিহাসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান সেখানে নিমন্ত্রণ পেয়েও না আসা আমার পক্ষে অমার্জনীয় হত।

তা ছাড়া আমার কানে সেই কোরীয় যুবকের কথাটা বাজছিল। মনে মনে ভাবছিলুম, ধনশক্তিতে দুর্জয় পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাঙ্গণদ্বারে ওই রাশিয়া আজ নির্ধনের শক্তিসাধনার আসন পেতেছে সমস্ত পশ্চিম মহাদেশের ভ্রূকুটিকুটিল কটাক্ষকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, এটা দেখবার জন্যে আমি যাব না তো কে যাবে। ওরা শক্তিশালীর শক্তিকে, ধনশালীর ধনকে বিপর্যস্ত করে দিতে চায়, তাতে আমরা ভয় করব কিসের, রাগই করব বা কেন। আমাদের শক্তিই বা কী, ধনই বা কত। আমরা তো জগতের নিরন্ন নিঃসহায়দের দলের।

যদি কেউ বলে, দুর্বলের শক্তিকে উদ্‌বোধিত করবার জন্যেই তারা পণ করেছে, তা হলে আমরা কোন্ মুখে বলব যে, তোমাদের ছায়া মাড়াতে নেই। তারা হয়তো ভুল করতে পারে— তাদের প্রতিপক্ষেরাও যে ভুল করছে না তা নয়। কিন্তু আমাদের বলবার আজ সময় এসেছে যে, অশক্তের শক্তি এখনই যদি না জাগে তা হলে মানুষের পরিত্রাণ নেই, কারণ শক্তিমানের শক্তিশেল অতিমাত্র প্রবল হয়ে উঠেছে— এতদিন ভূলোক উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল, আজ আকাশকে পর্যন্ত পাপে কলুষিত করে তুললে; নিরুপায় আজ অতিমাত্র নিরুপায়— সমস্ত সুযোগ-সুবিধা আজ কেবল মানবসমাজের এক পাশে পুঞ্জীভূত, অন্য পাশে নিঃসহায়তা অন্তহীন।

এরই কিছুদিন পূর্বে থেকে ঢাকার অত্যাচারের কাহিনী আমার মনের মধ্যে তোলপাড় করছিল। কী সব অমানুষিক নিষ্ঠুরতা, অথচ ইংলণ্ডের খবরের কাগজে তার খবর নেই— এখানকার মোটরগাড়ির দুর্যোগে দুটো-একটা মানুষ ম'লে তার খবর এ দেশের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু আমাদের ধন প্রাণ মান কী অসম্ভব সস্তা হয়ে গেছে। যারা এত সস্তা তাদের সম্বন্ধে কখনো সুবিচার হতেই পারে না।

আমাদের নালিশ পৃথিবীর কানে ওঠবার জো নেই, সমস্ত রাস্তা বন্ধ। অথচ আমাদের বিরুদ্ধ বচন জগতে ব্যাপ্ত করবার সকলপ্রকার উপায় এদের হাতে। আজকের দিনে দুর্বল জাতির পক্ষে এও একটি প্রবলতম গ্লানির বিষয়। কেননা আজকের দিনের জনশ্রুতি সমস্ত জগতের কাছে ঘোষিত হয়, বাক্যচালনার যন্ত্রগুলো যে-সব শক্তিমান জাতির হাতে তারা অখ্যাতির এবং অপযশের আড়ালে অশক্তজাতীয়দের বিলুপ্ত করে রাখতে পারে। পৃথিবীর লোকের কাছে এ কথা প্রচারিত যে, আমরা হিন্দু মুসলমানে কাটাকাটি মারামারি করি, অতএব ইত্যাদি। কিন্তু য়ুরোপেও একদা সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে

কাটাকাটি মারামারি চলত— গেল কী উপায়ে। কেবলমাত্র শিক্ষাবিস্তারের দ্বারা। আমাদের দেশেও সেই উপায়েই যেত। কিন্তু শতাধিক বৎসরের ইংরেজ-শাসনের পরে দেশে শতকরা পাঁচজনের কপালে শিক্ষা জুটেছে, সে শিক্ষাও শিক্ষার বিড়ম্বনা।

অবজ্ঞার কারণকে দূর করবার চেষ্টা না করে লোকের কাছে প্রমাণ করা যে, আমরা অবজ্ঞার যোগ্য, এইটে হচ্ছে আমাদের অশক্তির সব চেয়ে বড়ো ট্যাক্‌সো। মানুষের সকল সমস্যা সমাধানের মূলে হচ্ছে তার সুশিক্ষা। আমাদের দেশে তার রাস্তা বন্ধ, কারণ 'ল অ্যাণ্ড্ অর্ডার' আর কোনো উপকারের জন্যে জায়গা রাখলে না, তহবিল একেবারে ফাঁকা। আমি দেশের কাজের মধ্যে একটি কাজকেই শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিয়েছিলুম ; জনসাধারণকে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠা দেবার শিক্ষা দেব বলে এতকাল ধরে আমার সমস্ত সামর্থ্য দিয়েছি। এজন্যে কর্তৃপক্ষের আনুকূল্যও আমি প্রত্যাখ্যান করতে চাই নি, প্রত্যাশাও করেছি, কিন্তু তুমি জান কতটা ফল পেয়েছি। বুঝতে পেরেছি, হবার নয়। মস্ত আমাদের পাপ, আমরা অশক্ত।

তাই যখন শুনলুম, রাশিয়াতে জনসাধারণের শিক্ষা প্রায় শূন্য অঙ্ক থেকে প্রভূত-পরিমাণে বেড়ে গেছে, তখন মনে মনে ঠিক করলুম, ভাঙা শরীর আরো যদি ভাঙে তো ভাঙুক, ওখানে যেতেই হবে। এরা জেনেছে, অশক্তকে শক্তি দেবার একটিমাত্র উপায় শিক্ষা— অন্ন স্বাস্থ্য শান্তি সমস্তই এরই 'পরে নির্ভর করে। ফাঁকা 'ল অ্যাণ্ড্ অর্ডার' নিয়ে না ভরে পেট, না ভরে মন। অথচ তার দাম দিতে গিয়ে সর্বস্ব বিকিয়ে গেল।

আধুনিক ভারতবর্ষের আবহাওয়ায় আমি মানুষ, তাই এতকাল আমার মনে দৃঢ় ধারণা ছিল, প্রায় তেত্রিশ কোটি মূর্খকে বিদ্যাদান করা অসম্ভব বললেই হয় ; এজন্য আমাদের মন্দ ভাগ্য ছাড়া আর কাউকে বুঝি দোষ দেওয়া চলে না। যখন শুনেছিলুম, এখানে চাষী ও কর্মীদের মধ্যে শিক্ষা হুহু করে এগিয়ে চলেছে আমি ভেবেছিলুম, সে শিক্ষা বুঝি সামান্য একটুখানি পড়া ও লেখা ও অঙ্ক কষা— কেবলমাত্র মাথা-গুনতিতেই তার গৌরব। সেও কম কথা নয়। আমাদের দেশে তাই হলেই রাজাকে আশীর্বাদ করে বাড়ি চলে যেতুম। কিন্তু এখানে দেখলুম, বেশ পাকা রকমের শিক্ষা, মানুষ করে তোলবার উপযুক্ত, নোট মুখস্থ করে এম. এ. পাস করবার মতন নয়।

কিন্তু এ-সব কথা আর-একটু বিস্তারিত করে পরে লিখব, আজ আর সময় নেই। আজই সন্ধ্যাবেলায় বর্লিন অভিমুখে যাত্রা করব। তার পরে ৩রা অক্টোবর আট্‌লান্টিক পাড়ি দেব— কত দিনের মেয়াদ আজও নিশ্চিত করে বলতে পারছি নে।

কিন্তু, শরীর মন কিছুতেই সায় দিচ্ছে না। তবু এবারকার সুযোগ ছাড়তে সাহস হয় না— যদি কিছু কুড়িয়ে আনতে পারি তা হলেই বাকি যে-ক'টা দিন বাঁচি বিশ্রাম করতে

পারব। নইলে দিনে দিনে মূলধন খুইয়ে দিয়ে অবশেষে বাতি নিবিয়ে দিয়ে বিদায় নেওয়া সেও মন্দ প্ল্যান নয়; সামান্য কিছু উচ্ছিষ্ট ছড়িয়ে রেখে গেলে জিনিসটা নোংরা হয়ে উঠবে। সম্বল যতই কমে আসতে থাকে মানুষের আন্তরিক দুর্বলতা ততই ধরা পড়ে— ততই শৈথিল্য, ঝগড়াঝাঁটি, পরস্পরের বিরুদ্ধে কানাকানি। ঔদার্য ভরা উদরের উপরে অনেকটা নির্ভর করে। কিন্তু যেখানেই যথার্থ সিদ্ধির একটি চেহারা দেখতে পাই সেখানেই দেখা যায় সেটা কেবলমাত্র টাকা দিয়ে হাটে কেনবার নয়— দারিদ্র্যের জমিতেই সে সোনার ফসল ফলায়। এখানকার শিক্ষাব্যবস্থায় যে অক্লান্ত উদ্যম, সাহস, বুদ্ধিশক্তি, যে আত্মোৎসর্গ দেখলুম, তার অতি অল্প পরিমাণ থাকলেও কৃতার্থ হতুম। আন্তরিক শক্তি ও অকৃত্রিম উৎসাহ যত কম থাকে টাকা খুঁজতে হয় ততই বেশি করে। ইতি ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩০

৪

মস্কৌ থাকতে সোভিয়েট ব্যবস্থা সম্বন্ধে দুটো বড়ো বড়ো চিঠি লিখেছিলুম। সে চিঠি কবে পাবে এবং পাবে কি না কী জানি।

বর্লিনে এসে একসঙ্গে তোমার দুখানা চিঠি পাওয়া গেল। ঘন বর্ষার চিঠি, শান্তিনিকেতনের আকাশে শালবনের উপরে মেঘের ছায়া এবং জলের ধারায় শ্রাবণ ঘনিয়ে উঠেছে, সেই ছবি মনে জাগলে আমার চিত্ত কি রকম উৎসুক হয়ে ওঠে সে তোমাকে বলা বাহুল্য।

কিন্তু এবারে রাশিয়া ঘুরে এসে সেই সৌন্দর্যের ছবি আমার মন থেকে মুছে গেছে। কেবলই ভাবছি আমাদের দেশ-জোড়া চাষীদের দুঃখের কথা। আমার যৌবনের আরম্ভকাল থেকেই বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের সঙ্গে আমার নিকট-পরিচয় হয়েছে। তখন চাষীদের সঙ্গে আমার প্রত্যহ ছিল দেখাশোনা— ওদের সব নালিশ উঠেছে আমার কানে। আমি জানি, ওদের মতো নিঃসহায় জীব অল্পই আছে, ওরা সমাজের যে তলায় তলিয়ে সেখানে জ্ঞানের আলো অল্পই পৌঁছয়, প্রাণের হাওয়া বয় না বললেই হয়।

তখনকার দিনে দেশের পলিটিক্স্ নিয়ে যাঁরা আসর জমিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একজনও ছিলেন না যাঁরা পল্লীবাসীকে এ দেশের লোক বলে অনুভব করতেন। আমার মনে আছে পাবনা কন্ফারেন্সের সময় আমি তখনকার খুব বড়ো একজন রাষ্ট্রনেতাকে বলেছিলুম, আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় উন্নতিকে যদি আমরা সত্য করতে চাই তা হলে সব-

আগে আমাদের এই তলার লোকদের মানুষ করতে হবে। তিনি সে কথাটাকে এতই তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিলেন যে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলুম যে, আমাদের দেশাত্মবোধীরা দেশ বলে একটা তত্ত্বকে বিদেশের পাঠশালা থেকে সংগ্রহ করে এনেছেন, দেশের মানুষকে তাঁরা অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করেন না। এইরকম মনোবৃত্তির সুবিধে হচ্ছে এই যে, আমাদের দেশ আছে বিদেশীর হাতে এই কথা নিয়ে আক্ষেপ করা, উত্তেজিত হওয়া, কবিতা লেখা, খবরের কাগজ চালানো সহজ; কিন্তু দেশের লোক আমাদের আপন লোক, এ কথা বলবামাত্র তার দায়িত্ব তখন থেকেই স্বীকার করে নিতে হয়, কাজ শুরু হয় সেই মুহূর্তে।

সেদিনকার পরেও অনেক দিন চলে গেল। সেই পাবনা কন্‌ফারেন্সে পল্লী সম্বন্ধে যা বলেছিলুম তার প্রতিধ্বনি অনেকবার শুনেছি— শুধু শব্দ নয়, পল্লীর হিতকল্পে অর্থও সংগ্রহ হয়েছে, কিন্তু দেশের যে উপরিতলায় শব্দের আবৃত্তি হয় সেইখানটাতেই সেই অর্থও আবর্তিত হয়ে বিলুপ্ত হয়েছে, সমাজের যে গভীরতলায় পল্লী তলিয়ে আছে সেখানে তার কিছুই পৌঁছল না।

একদা আমি পদ্মার চরে বোট বেঁধে সাহিত্যচর্চা করেছিলুম। মনে ধারণা ছিল, লেখনী দিয়ে ভাবের খনি খনন করব এই আমার একমাত্র কাজ, আর কোনো কাজের আমি যোগ্যই নই। কিন্তু যখন এ কথা কাউকে বলে কয়ে বোঝাতে পারলুম না যে, আমাদের স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্র হচ্ছে কৃষিপল্লীতে, তার চর্চা আজ থেকেই শুরু করা চাই, তখন কিছুক্ষণের জন্যে কলম কানে গুঁজে এ কথা আমাকে বলতে হল— আচ্ছা, আমিই এ কাজে লাগব। এই সংকল্পে আমার সহায়তা করবার জন্যে সেদিন একটিমাত্র লোক পেয়েছিলুম, সে হচ্ছে কালীমোহন। শরীর তার রোগে জীর্ণ, দু-বেলা তার জ্বর আসে, তার উপরে পুলিসের খাতায় তার নাম উঠেছে।

তার পর থেকে দুর্গম বন্ধুর পথে সামান্য পাথেয় নিয়ে চলেছে সেই ইতিহাস। চাষীকে আত্মশক্তিতে দৃঢ় করে তুলতে হবে, এই ছিল আমার অভিপ্রায়। এ সম্বন্ধে দুটো কথা সর্বদাই আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে— জমির স্বত্ব ন্যায়ত জমিদারের নয়, সে চাষীর; দ্বিতীয়ত, সমবায়নীতি-অনুসারে চাষের ক্ষেত্র একত্র করে চাষ না করতে পারলে কৃষির উন্নতি হতেই পারে না। মান্ধাতার আমলের হাল লাঙল নিয়ে আলবাঁধা টুকরো জমিতে ফসল ফলানো আর ফুটো কলসীতে জল আনা একই কথা।

কিন্তু এই দুটো পন্থাই দুরূহ। প্রথমত চাষীকে জমির স্বত্ব দিলেই সে স্বত্ব পরমুহূর্তেই মহাজনের হাতে গিয়ে পড়বে, তার দুঃখভার বাড়বে বই কমবে না। কৃষিক্ষেত্র একত্রীকরণের কথা আমি নিজে একদিন চাষীদের ডেকে আলোচনা করে-

ছিলুম। শিলাইদহে আমি যে বাড়িতে থাকতুম তার বারান্দা থেকে দেখা যায়, খেতের পর খেত নিরন্তর চলে গেছে দিগন্ত পেরিয়ে। ভোরবেলা থেকে হাল লাঙল এবং গোরু নিয়ে একটি-একটি করে চাষী আসে, আপন টুকরো খেতটুকু ঘুরে ঘুরে চাষ করে চলে যায়। এইরকম ভাগ-করা শক্তির যে কতটা অপচয় ঘটে প্রতিদিন সে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। চাষীদের ডেকে যখন সমস্ত জমি একত্র করে কলের লাঙলে চাষ করার সুবিধের কথা বুঝিয়ে বললুম, তারা তখনই সমস্ত মেনে নিলে। কিন্তু, বললে, আমরা নির্বোধ, এতবড়ো ব্যাপার করে তুলতে পারব কী করে। আমি যদি বলতে পারতুম, এ ভার আমিই নেব, তা হলে তখনই মিটে যেতে পারত। কিন্তু আমার সাধ্য কী! এমন কাজের চালনাভার নেবার দায়িত্ব আমার পক্ষে অসম্ভব; সে শিক্ষা, সে শক্তি আমার নেই।

কিন্তু এই কথাটা বরাবর আমার মনে জেগে ছিল। যখন বোলপুরের কো-অপারেটিভের ব্যবস্থা বিশ্বভারতীর হাতে এল তখন আবার একদিন আশা হয়েছিল, এইবার বুঝি সুযোগ হতে পারবে। যাদের হাতে আপিসের ভার তাদের বয়স অল্প, আমার চেয়ে তাদের হিসাবী বুদ্ধি এবং শিক্ষা অনেক বেশি। কিন্তু আমাদের যুবকেরা ইস্কুলে-পড়া ছেলে, তাদের বই মুখস্থ করার মন। যে শিক্ষা আমাদের দেশে প্রচলিত তাতে করে আমাদের চিন্তা করার সাহস, কর্ম করবার দক্ষতা থাকে না, পুঁথির বুলি পুনরাবৃত্তি করার 'পরেই ছাত্রদের পরিত্রাণ নির্ভর করে।

বুদ্ধির এই পল্লবগ্রাহিতা ছাড়া আমাদের আর-একটা বিপদ ঘটে। ইস্কুলে যারা পড়া মুখস্থ করেছে আর ইস্কুলের বাইরে পড়ে থেকে যারা পড়া মুখস্থ করে নি, তাদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ ঘটে গেছে—শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত। ইস্কুলে-পড়া মনের আত্মীয়তাবোধ পুঁথি-পোড়োদের পাড়ার বাইরে পৌঁছতে পারে না। যাদের আমরা বলি চাষাভূষো, পুঁথির পাতার পর্দা ভেদ করে তাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি পৌঁছয় না, তারা আমাদের কাছে অস্পষ্ট। এইজন্যেই ওরা আমাদের সকল প্রচেষ্টা থেকে স্বভাবতই বাদ পড়ে যায়। তাই কো-অপারেটিভের যোগে অন্য দেশে যখন সমাজের নীচের তলায় একটা সৃষ্টির কাজ চলছে, আমাদের দেশে টিপে টিপে টাকা ধার দেওয়ার বেশি কিছু এগোয় না। কেননা ধার দেওয়া, তার সুদ কষা এবং দেনার টাকা আদায় করা অত্যন্ত ভীরু মনের পক্ষেও সহজ কাজ, এমন-কি ভীরু মনের পক্ষেই সহজ, তাতে যদি নামতার ভুল না ঘটে তা হলে কোনো বিপদ নেই।

বুদ্ধির সাহস এবং জনসাধারণের প্রতি দরদ-বোধ এই উভয়ের অভাব ঘটাতেই দুঃখীর দুঃখ আমাদের দেশে ঘোচানো এত কঠিন হয়েছে; কিন্তু এই অভাবের জন্যে

কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। কেননা কেরানি-তৈরির কারখানা বসাবার জন্যেই একদা আমাদের দেশে বণিক-রাজত্বে ইস্কুলের পত্তন হয়েছিল। ডেস্ক্-লোকে মনিবের সঙ্গে সাযুজ্যলাভই আমাদের সদ্‌গতি। সেইজন্যে উমেদারিতে অকৃতার্থ হলেই আমাদের বিদ্যাশিক্ষা ব্যর্থ হয়ে যায়। এইজন্যেই আমাদের দেশে প্রধানত দেশের কাজ কংগ্রেসের পান্‌ডালে এবং খবরের কাগজের প্রবন্ধশালায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেদনা উদ্‌ঘোষণের মধ্যেই পাক খাচ্ছিল। আমাদের কলমে-বাঁধা হাত দেশকে গড়ে তোলবার কাজে এগোতেই পারলে না।

ঐ দেশের হাওয়াতেই আমিও তো মানুষ, সেইজন্যেই জোরের সঙ্গে মনে করতে সাহস হয় নি যে, বহু কোটি জনসাধারণের বুকের উপর থেকে অশিক্ষা ও অসামর্থ্যের জগদ্দল পাথর ঠেলে নামানো সম্ভব। অল্পস্বল্প কিছু করতে পারা যায় কি না এতদিন এই কথাই ভেবেছি। মনে করেছিলুম, সমাজের একটা চিরবাধাগ্রস্ত তলা আছে, সেখানে কোনোকালেই সূর্যের আলো সম্পূর্ণ প্রবেশ করানো চলবে না, সেইজন্যেই সেখানে অন্তত তেলের বাতি জ্বালাবার জন্যে উঠে পড়ে লাগা উচিত। কিন্তু সাধারণত সেটুকু কর্তব্যবোধও লোকের মনে যথেষ্ট জোরের সঙ্গে ধাক্কা মারতে চায় না; কারণ যাদের আমরা অন্ধকারে দেখতেই পাই নে তাদের জন্যে যে কিছুই করা যেতে পারে এ কথা স্পষ্ট করে মনে আসে না।

এইরকম স্বল্পসাহস মন নিয়েই রাশিয়াতে এসেছিলুম; শুনেছিলুম, এখানে চাষী ও কর্মিকদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের পরিমাণ অনেক বেড়ে চলেছে। ভেবেছিলুম, তার মানে ওখানে পল্লীর পাঠশালায় শিশুশিক্ষা প্রথমভাগ, বড়োজোর দ্বিতীয়ভাগ পড়ানোর কাজ সংখ্যায় আমাদের চেয়ে বেশি হয়েছে। ভেবেছিলুম, ওদের সাংখ্যিক তালিকা নেড়েচেড়ে দেখতে পাব ওদের কজন চাষী নাম সই করতে পারে আর কজন চাষীর নামতা দশের কোঠা পর্যন্ত এগিয়েছে।

মনে রেখো, এখানে যে বিপ্লবে জারের শাসন লয় পেলে সেটা ঘটেছে ১৯১৭ খৃস্টাব্দে। অর্থাৎ তেরো বছর পার হল মাত্র। ইতিমধ্যে ঘরে বাইরে এদের প্রচণ্ড বিরুদ্ধতার সঙ্গে লড়ে চলতে হয়েছে। এরা একা, অত্যন্ত ভাঙাচোরা একটা রাষ্ট্রব্যবস্থার বোঝা নিয়ে। পথ পূর্বতন দুঃশাসনের প্রভূত আবর্জনায় দুর্গম। যে আত্মবিপ্লবের প্রবল ঝড়ের মুখে এরা নবযুগের ঘাটে পাড়ি দিলে সেই বিপ্লবের প্রচ্ছন্ন এবং প্রকাশ্য সহায় ছিল ইংলণ্ড্ এবং আমেরিকা। অর্থসম্বল এদের সামান্য; বিদেশের মহাজনী গদিতে এদের ক্রেডিট্ নেই। দেশের মধ্যে কলকারখানা এদের যথেষ্ট পরিমাণে না থাকাতে অর্থ-উৎপাদনে এরা শক্তিহীন। এইজন্যে কোনোমতে পেটের ভাত বিক্রি

করে চলছে এদের উদ্যোগপর্ব। অথচ রাষ্ট্রব্যবস্থায় সকলের চেয়ে যে অনুৎপাদক বিভাগ—সৈনিক-বিভাগ—তাকে সম্পূর্ণরূপে সুদক্ষ রাখার অপব্যয় এদের পক্ষে অনিবার্য। কেননা আধুনিক মহাজনী যুগের সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি এদের শত্রুপক্ষ এবং তারা সকলেই আপন আপন অস্ত্রশালা কানায় কানায় ভরে তুলেছে।

মনে আছে, এরাই 'লীগ অব নেশন্‌স্'এ অস্ত্রবর্জনের প্রস্তাব পাঠিয়ে দিয়ে কপট শান্তিকামীদের মনে চমক লাগিয়ে দিয়েছিল। কেননা নিজেদের প্রতাপ-বর্ধন বা রক্ষণ সোভিয়েটদের লক্ষ্য নয়—এদের সাধনা হচ্ছে জনসাধারণের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অন্নসম্বলের উপায়-উপকরণকে প্রকৃষ্ট প্রণালীতে ব্যাপক করে গড়ে তোলা, এদেরই পক্ষে নিরুপদ্রব শান্তির দরকার সব চেয়ে বেশি। কিন্তু তুমি তো জান, 'লীগ অব নেশন্‌স্'এর সমস্ত পালোয়ানই গুণ্ডাগিরির বহুবিস্তৃত উদ্যোগ কিছুতেই বন্ধ করতে চায় না, কিন্তু 'শান্তি চাই' বলে সকলে মিলে হাঁক পাড়ে। এইজন্যেই সকল সাম্রাজ্যিক দেশেই অস্ত্রশস্ত্রের কাঁটাবনের চাষ অন্নের চাষকে ছাপিয়ে বেড়ে চলেছে। এর মধ্যে আবার কিছুকাল ধরে রাশিয়ায় অতি ভীষণ দুর্ভিক্ষ ঘটেছিল; কত লোক মরেছে তার ঠিক নেই। তার ধাক্কা কাটিয়ে সবেমাত্র আট বছর এরা নূতন যুগকে গড়ে তোলবার কাজে লাগতে পেরেছে, বাইরের উপকরণের অভাব সত্ত্বেও।

কাজ সামান্য নয়—য়ুরোপ-এশিয়া জুড়ে প্রকাণ্ড এদের রাষ্ট্রক্ষেত্র। প্রজামণ্ডলীর মধ্যে যত বিভিন্ন জাতের মানুষ আছে ভারতবর্ষেও এত নেই। তাদের ভূপ্রকৃতি মানবপ্রকৃতির মধ্যে পরস্পর পার্থক্য অনেক বেশি। বস্তুত এদের সমস্যা বহুবিচিত্র-জাতি-সমাকীর্ণ, বহুবিচিত্র-অবস্থা-সংকুল বিশ্বপৃথিবীর সমস্যারই সংক্ষিপ্ত রূপ।

তোমাকে পূর্বেই বলেছি, বাহির থেকে মস্কৌ শহরে যখন চোখ পড়ল দেখলুম, য়ুরোপের অন্য সমস্ত ধনী শহরের তুলনায় অত্যন্ত মলিন। রাস্তায় যারা চলেছে তারা একজনও শৌখিন নয়, সমস্ত শহর আটপৌরে-কাপড়-পরা। আটপৌরে কাপড়ে শ্রেণীভেদ থাকে না, শ্রেণীভেদ পোষাকী কাপড়ে। এখানে সাজে পরিচ্ছদে সবাই এক। সবটা মিলেই শ্রমিকদের পাড়া; যেখানে দৃষ্টি পড়ে সেখানেই ওরা। এখানে শ্রমিকদের কৃষাণদের কি রকম বদল হয়েছে তা দেখবার জন্যে লাইব্রেরিতে গিয়ে বই খুলতে অথবা গাঁয়ে কিম্বা বস্তিতে গিয়ে নোট নিতে হয় না। যাদের আমরা 'ভদ্দর লোক' বলে থাকি তারা কোথায় সেইটেই জিজ্ঞাস্য।

এখানকার জনসাধারণ ভদ্রলোকের আওতায় একটুও ছায়া ঢাকা পড়ে নেই, যারা

যুগে যুগে নেপথ্যে ছিল তারা আজ সম্পূর্ণ প্রকাশ্যে। এরা যে প্রথমভাগ শিশুশিক্ষা পড়ে কেবলমাত্র ছাপার অক্ষর হাৎড়ে বেড়াতে শিখেছে, এ ভুল ভাঙতে একটুও দেরি হল না। এরা মানুষ হয়ে উঠেছে এই ক'টা বছরেই।

নিজের দেশের চাষীদের মজুরদের কথা মনে পড়ল। মনে হল, আরব্য উপন্যাসের জাদুকরের কীর্তি। বছর দশেক আগেই এরা ঠিক আমাদেরই দেশের জন-মজুরদের মতোই নিরক্ষর নিঃসহায় নিরন্ন ছিল, তাদেরই মতো অন্ধসংস্কার এবং মূঢ় ধার্মিকতা। দুঃখে বিপদে এরা দেবতার দ্বারে মাথা খুঁড়েছে; পরলোকের ভয়ে পাণ্ডাপুরুতদের হাতে এদের বুদ্ধি ছিল বাঁধা, আর ইহলোকের ভয়ে রাজপুরুষ মহাজন ও জমিদারের হাতে; যারা এদের জুতো-পেটা করত তাদের সেই জুতো সাফ করা এদের কাজ ছিল। হাজার বছর থেকে এদের প্রথাপদ্ধতির বদল হয় নি; যান-বাহন চরকা-ঘানি সমস্ত প্রপিতামহের আমলের, হালের হাতিয়ারে হাত লাগাতে বললে বেঁকে বসত। আমাদের দেশের ত্রিশ কোটির পিঠের উপরে যেমন চেপে বসেছে ভূতকালের ভূত, চেপে ধরেছে তাদের দুই চোখ— এদেরও ঠিক তেমনিই ছিল। ক'টা বছরের মধ্যে এই মূঢ়তার অক্ষমতার অভ্রভেদী পাহাড় নড়িয়ে দিলে যে কী করে, সে কথা এই হতভাগ্য ভারতবাসীকে যেমন একান্ত বিস্মিত করেছে এমন আর কাকে করবে বলো। অথচ যে সময়ের মধ্যে এই পরিবর্তন চলছিল সে সময়ে এ দেশে আমাদের দেশের বহুপ্রশংসিত 'ল অ্যাণ্ড্‌ অর্ডার' ছিল না।

তোমাকে পূর্বেই বলেছি, এদের জনসাধারণের শিক্ষার চেহারা দেখবার জন্যে আমাকে দূরে যেতে হয় নি, কিম্বা স্কুলের ইন্‌স্‌পেক্টরের মতো এদের বানান তদন্ত করবার সময় দেখতে হয় নি 'কান'এ 'সোনা'য় এরা মূর্ধন্য ণ লাগায় কি না। একদিন সন্ধ্যাবেলা মস্কৌ শহরে একটা বাড়িতে গিয়েছিলুম, সেটা চাষীদের বাসা, গ্রাম থেকে কোনো উপলক্ষে যখন তারা শহরে আসে তখন সস্তায় ঐ বাড়িতে কিছু দিনের মতো থাকতে পায়। তাদের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়েছিল। সে-রকম কথাবার্তা যখন আমাদের দেশের চাষীদের সঙ্গে হবে সেইদিন সাইমন কমিশনের জবাব দিতে পারব।

আর কিছু নয়, এটা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি, সবই হতে পারত কিন্তু হয় নি— না হোক, আমরা পেয়েছি 'ল অ্যাণ্ড্‌ অর্ডার'। আমাদের ওখানে সাম্প্রদায়িক লড়াই ঘটে বলে একটা অখ্যাতি বিশেষ ঝোঁক দিয়ে রটনা হয়ে থাকে— এখানেও য়িহুদি সম্প্রদায়ের সঙ্গে খৃস্টান সম্প্রদায়ের লড়াই আমাদের দেশেরই আধুনিক উপসর্গের মতো অতিকুৎসিত অতিবর্বর ভাবেই ঘটত— শিক্ষায় এবং শাসনে একেবারে তার মূল উৎপাটিত হয়েছে।

কতবার আমি ভেবেছি, আমাদের দেশে সাইমন কমিশন যাবার আগে একবার রাশিয়ায় তার ঘুরে যাওয়া উচিত ছিল।

তোমার মতো ভদ্রমহিলাকে সাধারণ ভদ্রগোছের চিঠি না লিখে এরকম চিঠি যে কেন লিখলুম তার কারণ চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে, দেশের দশা আমার মনের মধ্যে কি রকম তোলপাড় করছে। জালিয়ানওয়ালাবাগের উপদ্রবের পর একবার আমার মনে এই রকম অশান্তি জেগেছিল। এবার ঢাকার উপদ্রবের পর আবার সেইরকম দুঃখ পাচ্ছি। সে ঘটনার উপর সরকারী চুনকামের কাজ হয়েছে, কিন্তু এরকম সরকারী চুনকামের যে কী মূল্য তা রাষ্ট্রনীতিবিৎ সবাই জানে। এই রকম ঘটনা যদি সোভিয়েট রাশিয়ায় ঘটত তা হলে কোনো চুনকামেই তার কলঙ্ক ঢাকা পড়ত না। সুধীন্দ্র, আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যার কোনো শ্রদ্ধা কোনোদিন ছিল না, সেও এবারে আমাকে এমন চিঠি লিখেছে যাতে বোঝা যাচ্ছে সরকারী ধর্মনীতির প্রতি ধিক্কার আজ আমাদের দেশে কতদূর পর্যন্ত পৌঁচেছে। যা হোক, তোমার চিঠি অসমাপ্ত রইল —কাগজ এবং সময় ফুরিয়ে এসেছে, পরের চিঠিতে এ চিঠির অসম্পূর্ণ অংশ সম্পূর্ণ করব। ইতি ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০

৫

বর্লিন

মস্কৌ থেকে তোমাকে একটা বড়ো চিঠিতে রাশিয়া সম্বন্ধে আমার ধারণা লিখেছিলুম। সে চিঠি যদি পাও তো রাশিয়া সম্বন্ধে কিছু খবর পাবে।

এখানে চাষীদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য কতটা কাজ করা হচ্ছে তারই বিবরণ কিছু দিয়েছি। আমাদের দেশে যে শ্রেণীর লোক মূক মূঢ়, জীবনের সকল সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাদের মন অন্তর-বাহিরের দৈন্যের তলায় চাপা পড়ে গেছে, এখানে সেই শ্রেণীর লোকের সঙ্গে যখন আমার পরিচয় হল তখন বুঝতে পারলুম, সমাজের অনাদরে মানুষের চিত্তসম্পদ কত প্রভূতপরিমাণে অবলুপ্ত হয়ে থাকে— কী অসীম তার অপব্যয়, কী নিষ্ঠুর তার অবিচার।

মস্কৌতে একটি কৃষিভবন দেখতে গিয়েছিলুম ; এটা ওদের ক্লাবের মতো। রাশিয়ার সমস্ত ছোটোবড়ো শহরে এবং গ্রামে এরকম আবাস ছড়ানো আছে। এ-সব জায়গায় কৃষিবিদ্যা সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে উপদেশ দেবার ব্যবস্থা আছে ; যারা নিরক্ষর তাদের পড়াশুনো শেখানোর উপায় করেছে ; এখানে বিশেষ বিশেষ ক্লাসে বৈজ্ঞানিক রীতিতে

চাষ করার ব্যবস্থা কৃষাণদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এইরকম প্রত্যেক বাড়িতে প্রাকৃতিক সামাজিক সকলপ্রকার শিক্ষণীয় বিষয়ে ম্যুজিয়ম, তা ছাড়া চাষীদের সকলপ্রকার প্রয়োজনের উপযোগী পরামর্শ দেবার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।

চাষীরা কোনো উপলক্ষে গ্রাম থেকে যখন শহরে আসে তখন খুব কম খরচে অন্তত তিন সপ্তাহ এইরকম বাড়িতে থাকতে পারে। এই বহুব্যাপক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সোভিয়েট গবর্মেণ্ট এককালে নিরক্ষর চাষীদের চিত্তকে উদ্‌বোধিত করে সমাজব্যাপী নবজীবন প্রতিষ্ঠার প্রশস্ততম ভিত্তি স্থাপন করেছে।

বাড়িতে ঢুকে দেখি, খাবার ঘরে কেউ কেউ বসে খাচ্ছে, পড়বার ঘরে এক দল খবরের কাগজ পড়তে প্রবৃত্ত। উপরে একটা বড়ো ঘরে আমি এসে বসলুম; সেখানে সবাই এসে জমা হল। তারা নানা স্থানের লোক, কেউ বা অনেক দূর প্রদেশ থেকে এসেছে। বেশ সহজ ওদের ভাবগতিক, কোনোরকম সংকোচ নেই।

প্রথম অভ্যর্থনা ও পরিচয় উপলক্ষে বাড়ির পরিদর্শক কিছু বললে, আমিও কিছু বললুম। তার পরে ওরা আমাকে প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলে।

প্রথমেই ওদের মধ্যে একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঝগড়া হয় কেন।

উত্তর দিলুম, "যখন আমার বয়স অল্প ছিল কখনো এরকম বর্বরতা দেখি নি। তখন গ্রামে ও শহরে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্যের অভাব ছিল না। পরস্পরের ক্রিয়াকাণ্ডে পরস্পরের যোগ ছিল, জীবনযাত্রায় সুখে দুঃখে তারা ছিল এক। এ-সব কুৎসিত কাণ্ড দেখতে পাচ্ছি যখন থেকে আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন শুরু হয়েছে। কিন্তু প্রতিবেশীদের মধ্যে এইরকম অমানুষিক দুর্ব্যবহারের আশু কারণ যাই হোক, এর মূল কারণ হচ্ছে আমাদের জনসাধারণের মধ্যে অশিক্ষা। যে পরিমাণ শিক্ষার দ্বারা এইরকম দুর্বুদ্ধি দূর হয় আমাদের দেশে বিস্তৃত ভাবে তার প্রচলন করা আজ পর্যন্ত হয় নি। যা তোমাদের দেশে দেখলুম তাতে আমি বিস্মিত হয়েছি।"

প্রশ্ন। তুমি তো লেখক, তোমাদের চাষীদের কথা কি কিছু লিখেছ। ভবিষ্যতে তাদের কী গতি হবে।

উত্তর। শুধু লেখা কেন, তাদের জন্য আমি কাজ ফেঁদেছি। আমার একলার সাধ্যে যতটুকু সম্ভব তাই দিয়ে তাদের শিক্ষার কাজ চালাই, পল্লীর উন্নতিসাধনে তাদের সাহায্য করি। কিন্তু তোমাদের এখানে যে প্রকাণ্ড শিক্ষাব্যাপার যে আশ্চর্য অল্প সময়ের মধ্যে তৈরি হয়েছে তার তুলনায় আমার এ উদ্যোগ অতি যৎসামান্য।

প্রশ্ন। আমাদের দেশে কৃষিক্ষেত্রের একত্রীকরণের যে চেষ্টা চলছে সে সম্বন্ধে তোমার মত কী।

উত্তর। মত দেবার মতো আমার অভিজ্ঞতা হয় নি, তোমাদেরই কাছ থেকে শুনতে চাই। আমার জানবার কথা এই যে, এতে তোমাদের ইচ্ছার উপর জবরদস্তি করা হচ্ছে কি না।

প্রশ্ন। ভারতবর্ষে সবাই কি এই ঐকত্রিকতা এবং সাধারণভাবে এখানকার অন্য সমস্ত উদ্যোগের কথা কিছু জানে না।

উত্তর। জানবার মতো শিক্ষা অতি অল্প লোকেরই আছে। তা ছাড়া তোমাদের খবর নানা কারণে চাপা পড়ে যায়। এবং যা-কিছু শোনা যায় তাও সব বিশ্বাসযোগ্য নয়।

প্রশ্ন। আমাদের দেশে এই-যে চাষীদের জন্যে আবাস-ব্যবস্থা হয়েছে, এর অস্তিত্বও কি তুমি আগে জানতে না।

উত্তর। তোমাদের কল্যাণের জন্যে কী করা হচ্ছে মস্কৌয়ে এসে তা প্রথম দেখলুম এবং জানলুম। যাই হোক, এবার আমার প্রশ্নের উত্তর তোমরা দাও। চাষী প্রজার পক্ষে এই ঐকত্রিকতার ফলাফল সম্বন্ধে তোমাদের মত কী, তোমাদের ইচ্ছা কী।

একজন যুবক চাষী য়ুক্রেন প্রদেশ থেকে এসেছে, সে বললে, "দু বছর হল একটি ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হয়েছে, আমি তাতে কাজ করি। এই ক্ষেত্রের মধ্যে ফল-ফসলের বাগান আছে, তার থেকে আমরা সবজির জোগান দিই সব কারখানাঘরে। সেখানে সেগুলো টিনের কৌটোয় মোড়াই হয়। এ ছাড়া বড়ো বড়ো খেত আছে, সেখানে সব গমের চাষ। আট ঘণ্টা করে আমাদের খাটুনি, প্রত্যেক পঞ্চম দিনে আমাদের ছুটি। আমাদের প্রতিবেশী যে-সব চাষী নিজের খেত নিজে চষে তাদের চেয়ে আমাদের এখানে অন্তত দুনো ফল উৎপন্ন হয়।

"প্রায় গোড়াতেই আমাদের এই ঐকত্রিক চাষে দেড়-শো চাষীর খেত মিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৯২৯ সালে অর্ধেক চাষী তাদের খেত ফিরিয়ে নিলে। তার প্রধান কারণ, সোভিয়েট কম্যুন্ দলের প্রধান মন্ত্রী স্ট্যালিনের উপদেশ আমাদের কর্মচারীরা ঠিকমত ব্যবহার করে নি। তাঁর মতে, ঐকত্রিকতার মূলনীতি হচ্ছে সমাজবদ্ধ স্বেচ্ছাকৃত যোগ। কিন্তু অনেক জায়গায় আমলারা এই কথাটা মনে না রাখাতেই গোড়ার দিকে অনেক চাষী ঐকত্রিক কৃষিসমবায় ছেড়ে দিয়েছিল। তার পরে ক্রমে তাদের মধ্যেকার সিকি ভাগ লোক আবার ফিরে এসেছে। এখন আগেকার

চেয়ে আরো আমরা বল পেয়েছি। আমাদের দলের লোকের জন্যে নতুন সব বাসা, একটা নতুন ভোজনশালা, আর-একটা ইস্কুল তৈরি আরম্ভ হয়েছে।"

তার পরে সাইবীরিয়ার একজন চাষী স্ত্রীলোক বললে, "সমবেত খেতের কাজে আমি প্রায় দশ বছর আছি। একটা কথা মনে রেখো, ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে নারী-উন্নতি-প্রচেষ্টার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। আজ দশ বছরের মধ্যে এখানে চাষী-মেয়েদের বদল হয়েছে যথেষ্ট। নিজের উপর তাদের অনেক বেশি ভরসা হয়েছে। যে-সব মেয়ে পিছিয়ে আছে, ঐকত্রিক চাষের যারা প্রধান বাধা, এরাই তাদের মন গড়ে তুলছে। আমরা মেয়ে-ঐকত্রিকের দল তৈরি করেছি; তারা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ঘুরে বেড়ায়, মেয়েদের মধ্যে কাজ করে, চিত্তের এবং অর্থের উন্নতিসাধনে ঐকত্রিকতার সুযোগ কত তা ওদের বুঝিয়ে দেয়। ঐকত্রিক দলের চাষী-মেয়েদের জীবনযাত্রা সহজ করে দেবার জন্যে প্রত্যেক ঐকত্রিক ক্ষেত্রে একটি করে শিশুপালনাবাস, শিশুবিদ্যালয়, আর সাধারণ-পাকশালা স্থাপিত হয়েছে।"

সুখোজ প্রদেশে জাইগানট্ নামক একটি সুবিখ্যাত সরকারী কৃষিক্ষেত্র আছে। সেখানকার একজন চাষী রাশিয়ায় ঐকত্রিকতার কিরকম বিস্তার হচ্ছে সেই সম্বন্ধে আমাকে বললে, "আমাদের এই খেতে জমির পরিমাণ এক লক্ষ হেক্‌টার (hectares)। গত বছরে সেখানে তিন হাজার চাষী কাজ করত। এ বছরে সংখ্যা কিছু কমে গেছে, কিন্তু ফসলের ফলন আগেকার চেয়ে বাড়বার কথা। কেননা জমিতে বিজ্ঞানসম্মত সার দেবার এবং কলের লাঙল ব্যবহার করবার ব্যবস্থা হয়েছে। এইরকম লাঙল এখন আমাদের তিন-শো'র বেশি আছে। প্রতিদিন আমাদের আট ঘণ্টা কাজ করবার মেয়াদ। যারা তার বেশি কাজ করে তারা উপরি পারিশ্রমিক পায়। শীতের সময় খেতের কাজের পরিমাণ কমে; তখন চাষীরা বাড়ি-তৈরি রাস্তা-মেরামত প্রভৃতি নানা কাজে শহরে চলে যায়। এই অনুপস্থিতির সময়েও তারা বেতনের এক-তৃতীয়াংশ পেয়ে থাকে আর তাদের পরিবারের লোক তাদের নির্দিষ্ট ঘরে বাস করতে পায়।"

আমি বললেম, "ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্রে আপন স্বতন্ত্র সম্পত্তি মিলিয়ে দেওয়া সম্বন্ধে তোমাদের আপত্তি কিম্বা সম্মতি যদি থাকে আমাকে স্পষ্ট করে বলো।"

পরিদর্শক প্রস্তাব করলে, হাত তুলে মত জানানো হোক। দেখা গেল, যাদের সম্মতি নেই এমন লোকও অনেক আছে। অসম্মতির কারণ তাদের বলতে বললুম; ভালো করে বলতে পারলে না। একজন বললে, "আমি ভালো বুঝতে পারি নে।" বেশ বোঝা গেল, অসম্মতির কারণ মানবচরিত্রের মধ্যে। নিজের সম্পত্তির প্রতি

নিজের মমতা, ওটা তর্কের বিষয় নয়, ওটা আমাদের সংস্কারগত। নিজেকে আমরা প্রকাশ করতে চাই, সম্পত্তি সেই প্রকাশের একটা উপায়।

তার চেয়ে বড়ো উপায় যাদের হাতে আছে তারা মহৎ, তারা সম্পত্তিকে গ্রাহ্য করে না। সমস্ত খুইয়ে দিতে তাদের বাধা নেই। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে আপন সম্পত্তি তার আপন ব্যক্তিস্বরূপের ভাষা—সেটা হারালে সে যেন বোবা হয়ে যায়। সম্পত্তি যদি কেবল আপন জীবিকার জন্যে হত, আত্মপ্রকাশের জন্যে না হত, তা হলে যুক্তির দ্বারা বোঝানো সহজ হত যে, ওটা ত্যাগের দ্বারাই জীবিকার উন্নতি হতে পারে। আত্মপ্রকাশের উচ্চতন উপায়, যেমন বুদ্ধি, যেমন গুণপনা, কেউ কারো কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নিতে পারে না; সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া চলে, ফাঁকি দেওয়া চলে। সেই কারণে সম্পত্তি-বিভাগ ও ভোগ নিয়ে সমাজে এত নিষ্ঠুরতা, এত ছলনা, এত অন্তহীন বিরোধ।

এর একটা মাঝামাঝি সমাধান ছাড়া উপায় আছে বলে মনে করি নে; অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে অথচ তার ভোগের একান্ত স্বাতন্ত্র্যকে সীমাবদ্ধ করে দিতে হবে। সেই সীমার বাইরেকার উদ্‌বৃত্ত অংশ সর্বসাধারণের জন্যে ছাপিয়ে যাওয়া চাই। তা হলেই সম্পত্তির মমত্ব লুব্ধতায় প্রতারণায় বা নিষ্ঠুরতায় গিয়ে পৌঁছয় না।

সোভিয়েটরা এই সমস্যাকে সমাধান করতে গিয়ে তাকে অস্বীকার করতে চেয়েছে। সেজন্যে জবরদস্তির সীমা নেই। এ কথা বলা চলে না যে, মানুষের স্বাতন্ত্র্য থাকবে না; কিন্তু বলা চলে যে, স্বার্থপরতা থাকবে না। অর্থাৎ নিজের জন্যে কিছু নিজস্ব না হলে নয়, কিন্তু বাকি সমস্তই পরের জন্যে হওয়া চাই। আত্ম এবং পর উভয়কেই স্বীকার করে তবেই তার সমাধান সম্ভব। কোনো একটাকে বাদ দিতে গেলেই মানবচরিত্রের সত্যের সঙ্গে লড়াই বেধে যায়। পশ্চিম মহাদেশের মানুষ জোর জিনিসটাকে অত্যন্ত বেশি বিশ্বাস করে। যে ক্ষেত্রে জোরের যথার্থ কাজ আছে সে ক্ষেত্রে সে খুবই ভালো, কিন্তু অন্যত্র সে বিপদ ঘটায়। সত্যের জোরকে গায়ের জোরের দ্বারা যত প্রবলভাবেই আমরা মেলাতে চেষ্টা করি একদা তত প্রবলভাবেই তাদের বিচ্ছেদ ঘটে।

মধ্য-এশিয়ার বাস্‌কির রিপাব্লিকের (Bashkir Republic) একজন চাষী বললে, "আজও আমার নিজের স্বতন্ত্র খেত আছে, কিন্তু নিকটবর্তী ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্রে আমি শীঘ্রই যোগ দেব। কেননা, দেখছি, স্বাতন্ত্রিক প্রণালীর চেয়ে ঐকত্রিক প্রণালীতে ঢের ভালো জাতের এবং অধিক পরিমাণে ফসল উৎপন্ন করানো যায়। যেহেতু প্রকৃষ্টভাবে

চাষ করতে গেলেই যন্ত্র চাই ; ছোটো খেতের মালিকের পক্ষে যন্ত্র কেনা চলে না। তা ছাড়া, আমাদের টুকরো জমিতে যন্ত্রের ব্যবহার অসম্ভব।"

আমি বললুম, "কাল একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর সঙ্গে আলাপ হল। তিনি বললেন, মেয়েদের এবং শিশুদের সর্বপ্রকার সুযোগের জন্য সোভিয়েট গবর্মেন্টের দ্বারা যেরকম সব ব্যবস্থা হয়েছে এরকম আর কোথাও হয় নি। আমি তাঁকে বললুম, তোমরা পারিবারিক দায়িত্বকে সরকারী দায়িত্ব করে তুলে হয়তো পরিবারের সীমা লোপ করে দিতে চাও। তিনি বললেন, সেটাই যে আমাদের আশু সংকল্প তা নয়— কিন্তু শিশুদের প্রতি দায়িত্বকে ব্যাপক করে দিয়ে যদি স্বভাবতই একদা পরিবারের গণ্ডী লোপ পায় তা হলে এই প্রমাণ হবে, সমাজে পারিবারিক যুগ আপন সংকীর্ণতা এবং অসম্পূর্ণতা -বশতই নবযুগের প্রসারের মধ্যে আপনিই অন্তর্ধান করেছে। যা হোক, এ সম্বন্ধে তোমাদের কী মত জানতে ইচ্ছে করি। তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের একত্রীকরণের নীতি বজায় রেখে পরিবার বজায় থাকতে পারে।"

সেই য়ুক্রেনিয়ার যুবকটি বললে, "আমাদের নূতন সমাজব্যবস্থা পারিবারিকতার উপর কিরকম প্রভাব বিস্তার করেছে আমার নিজের দিক থেকে তার একটা দৃষ্টান্ত দিই। আমার পিতা যখন বেঁচে ছিলেন, শীতের ছয় মাস তিনি শহরে কাজ করতেন আর গরমের ছয় মাস ভাইবোনদের নিয়ে আমি ধনীর চাকরি নিয়ে পশুচারণ করতে যেতুম। বাবার সঙ্গে আমাদের দেখা প্রায়ই হত না। এখন এরকম বিচ্ছেদ ঘটে না। শিশুবিদ্যালয় থেকে আমার ছেলে রোজ ফিরে আসে, রোজই তার সঙ্গে দেখা হয়।"

একজন চাষী-মেয়ে বললে, "শিশুদের দেখাশোনা ও শেখানোর স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হওয়াতে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি ঢের কমে গেছে। তা ছাড়া, ছেলেদের সম্বন্ধে দায়িত্ব যে কতখানি তা বাপ-মা ভালো করে শিখতে পারছে।"

একটি ককেশীয় যুবতী দোভাষীকে বললে, "কবিকে বলো, আমরা ককেশীয় রিপাব্লিকের লোকেরা বিশেষ করেই অনুভব করি যে, অক্টোবরের বিপ্লবের পর থেকে আমরা যথার্থ স্বাধীনতা এবং সুখ পেয়েছি। আমরা নতুন যুগ সৃষ্টি করতে প্রবৃত্ত, তার কঠিন দায়িত্ব খুবই বুঝি, তার জন্যে চূড়ান্ত রকমের ত্যাগ স্বীকার করতে আমরা রাজী। কবিকে জানাও, সোভিয়েট-সম্মিলনের বিচিত্র জাতির লোক তাঁর মারফত ভারতবাসীদের 'পরে তাদের আন্তরিক দরদ জানাতে চায়। আমি বলতে পারি, যদি সম্ভব হত, আমার ঘরদুয়োর, আমার ছেলেপুলে, সবাইকে ছেড়ে তাঁর স্বদেশীয়ের সাহায্য করতে যেতুম।"

দলের মধ্যে একজন ছিল তার মঙ্গোলীয় ছাঁদের মুখ। তার কথা জিজ্ঞাসা করতেই জবাব পেলুম, সে খিরগিজ-জাতীয় চাষীর ছেলে, মস্কো এসেছে কলে কাপড় বোনার বিদ্যা শিখতে। তিন বছর বাদে এঞ্জিনিয়র হয়ে তাদের রিপাব্লিকে ফিরে যাবে— বিপ্লবের পরে সেখানে একটা বড়ো কারখানা স্থাপিত হয়েছে, সেইখানে সে কাজ করবে।

একটা কথা মনে রেখো, এরা নানা জাতির লোক কল-কারখানার রহস্য আয়ত্ত করবার জন্যে এত অবাধ উৎসাহ এবং সুযোগ পেয়েছে, তার একমাত্র কারণ যন্ত্রকে ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় না। যত লোকেই শিক্ষা করুক তাতে সকল লোকেরই উপকার, কেবল ধনীলোকের নয়। আমরা আমাদের লোভের জন্যে যন্ত্রকে দোষ দিই, মাৎলামির জন্যে শাস্তি দিই তালগাছকে। মাস্টারমশায় যেমন নিজের অক্ষমতার জন্যে বেঞ্চির উপরে দাঁড় করিয়ে রাখেন ছাত্রকে।

সেদিন মস্কো কৃষি-আবাসে গিয়ে স্পষ্ট করে স্বচক্ষে দেখতে পেলুম, দশ বছরের মধ্যে রাশিয়ার চাষীরা ভারতবর্ষের চাষীদের কত বহুদূরে ছাড়িয়ে গেছে। কেবল বই পড়তে শেখে নি, ওদের মন গেছে বদলে, ওরা মানুষ হয়ে উঠেছে। শুধু শিক্ষার কথা বললে সব কথা বলা হল না, চাষের উন্নতির জন্যে সমস্ত দেশ জুড়ে যে প্রভূত উদ্যম সেও অসাধারণ। ভারতবর্ষেরই মতো এ দেশ কৃষিপ্রধান দেশ, এইজন্যে কৃষিবিদ্যাকে যতদূর সম্ভব এগিয়ে দিতে না পারলে দেশের মানুষকে বাঁচানো যায় না। এরা সে কথা ভোলে নি। এরা অতি দুঃসাধ্য সাধন করতে প্রবৃত্ত।

সিভিল সার্ভিসের আমলাদের দিয়ে এরা মোটা মাইনেয় আপিস চালাবার কাজ করছে না— যারা যোগ্য লোক, যারা বৈজ্ঞানিক, তারা সবাই লেগে গেছে। এই দশ বছরের মধ্যে এদের কৃষিচর্চাবিভাগের যে উন্নতি ঘটেছে তার খ্যাতি ছড়িয়ে গেছে জগতের বৈজ্ঞানিক-মহলে। যুদ্ধের পূর্বে এ দেশে বীজ-বাছাইয়ের কোনো চেষ্টাই ছিল না। আজ প্রায় তিন কোটি মণ বাছাই-করা বীজ এদের হাতে জমেছে। তা ছাড়া নূতন শস্যের প্রচলন শুধু এদের কৃষি-কলেজের প্রাঙ্গণে নয়, দ্রুতবেগে সমস্ত দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। কৃষি সম্বন্ধে বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাশালা আজরবাইজান উজ্‌বেকিস্তান জর্জিয়া য়ুক্রেন প্রভৃতি রাশিয়ার প্রত্যন্তপ্রদেশেও স্থাপিত হয়েছে।

রাশিয়ার সমস্ত দেশ-প্রদেশকে জাতি-উপজাতিকে সক্ষম ও শিক্ষিত করে তোলবার জন্যে এতবড়ো সর্বব্যাপী অসামান্য অক্লান্ত উদ্যোগ আমাদের মতো ব্রিটিশ সাব্‌জেক্টের সুদূর কল্পনার অতীত। এতটা দূর পর্যন্ত করে তোলা যে সম্ভব, এখানে আসবার আগে কখনো আমি তা মনেও করতে পারি নি। কেননা শিশুকাল থেকে আমরা যে

'ল অ্যাণ্ড্ অর্ডার'এর আবহাওয়ায় মানুষ, সেখানে এর কাছে পৌঁছতে পারে এমন দৃষ্টান্ত দেখি নি।

এবার ইংলণ্ডে থাকতে একজন ইংরেজের কাছে প্রথম শুনেছিলুম সাধারণের কল্যাণের জন্যে এরা কিরকম অসাধারণ আয়োজন করেছে। চোখে দেখলুম— এও দেখতে পেলুম, এদের রাষ্ট্রে জাতিবর্ণবিচার একটুও নেই। সোভিয়েট শাসনের অন্তর্গত বর্বরপ্রায় প্রজার মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্যে এরা যে প্রকৃষ্ট প্রণালীর ব্যবস্থা করেছে ভারতবর্ষের জনসাধারণের পক্ষে তা দুর্লভ। অথচ এই অশিক্ষার অনিবার্য ফলে আমাদের বুদ্ধিতে চরিত্রে যে দুর্বলতা, ব্যবহারে যে মূঢ়তা, দেশ-বিদেশের কাছে তার রটনা চলছে। ইংরেজিতেই কথা চলিত আছে, যে কুকুরকে ফাঁসি দিতে হবে তাকে বদনাম দিলে কাজ সহজ হয়। যাতে বদনামটা কোনোদিন না ঘোচে তার উপায় করলে যাবজ্জীবন মেয়াদ ও ফাঁসি দুই'ই মিলিয়ে নেওয়া চলে। ইতি ১ অক্টোবর ১৯৩০

৬

বর্লিন

রাশিয়া ঘুরে এসে আজ আমেরিকার মুখে চলেছি, এমন সন্ধিক্ষণে তোমার চিঠি পেলুম। রাশিয়ায় গিয়েছিলুম ওদের শিক্ষাবিধি দেখবার জন্যে। দেখে খুবই বিস্মিত হয়েছি। আট বছরের মধ্যে শিক্ষার জোরে সমস্ত দেশের লোকের মনের চেহারা বদলে দিয়েছে। যারা মূক ছিল তারা ভাষা পেয়েছে, যারা মূঢ় ছিল তাদের চিত্তের আবরণ উদ্‌ঘাটিত, যারা অক্ষম ছিল তাদের আত্মশক্তি জাগরূক, যারা অবমাননার তলায় তলিয়ে ছিল আজ তারা সমাজের অন্ধকুটুরি থেকে বেরিয়ে এসে সবার সঙ্গে সমান আসন পাবার অধিকারী। এত প্রভূত লোকের যে এত দ্রুত এমন ভাবান্তর ঘটতে পারে, তা কল্পনা করা কঠিন। এদের এক কালের মরা গাঙে শিক্ষার প্লাবন বয়েছে দেখে মন পুলকিত হয়। দেশের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত সচেষ্ট সচেতন। এদের সামনে একটা নূতন আশার বীথিকা দিগন্ত পেরিয়ে অবারিত; সর্বত্র জীবনের বেগ পূর্ণমাত্রায়।

এরা তিনটে জিনিস নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত আছে। শিক্ষা, কৃষি এবং যন্ত্র। এই তিন পথ দিয়ে এরা সমস্ত জাতি মিলে চিত্ত, অন্ন এবং কর্মশক্তিকে সম্পূর্ণতা দেবার সাধনা করছে। আমাদের দেশের মতোই এখানকার মানুষ কৃষিজীবী। কিন্তু আমাদের দেশের কৃষক এক দিকে মূঢ়, আর-এক দিকে অক্ষম; শিক্ষা এবং শক্তি দুই থেকেই বঞ্চিত। তার একমাত্র ক্ষীণ আশ্রয় হচ্ছে প্রথা— পিতামহের আমলের চাকরের মতো সে কাজ করে কম, অথচ কর্তৃত্ব করে বেশি। তাকে মেনে চলতে হলে

তাকে এগিয়ে চলবার উপায় থাকে না। অথচ শত শত বৎসর থেকে সে খুঁড়িয়ে চলছে।

আমাদের দেশে কোনো-এক সময়ে গোবর্ধনধারী কৃষ্ণ বোধ হয় ছিলেন কৃষির দেবতা, গোয়ালার ঘরে তাঁর বিহার; তাঁর দাদা বলরাম, হলধর। ঐ লাঙল-অস্ত্রটা হল মানুষের যন্ত্রবলের প্রতীক। কৃষিকে বল দান করেছে যন্ত্র। আজকের দিনে আমাদের কৃষিক্ষেত্রের কোনো কিনারায় বলরামের দেখা নেই— তিনি লজ্জিত— যে দেশে তাঁর অস্ত্রে তেজ আছে সেই সাগরপারে তিনি চলে গেছেন। রাশিয়ায় কৃষি বলরামকে ডাক দিয়েছে; দেখতে দেখতে সেখানকার কেদারখণ্ডগুলো অখণ্ড হয়ে উঠল, তাঁর নূতন হলের স্পর্শে অহল্যাভূমিতে প্রাণসঞ্চার হয়েছে।

একটা কথা আমাদের মনে রাখা উচিত, রামেরই হলযন্ত্রধারী রূপ হচ্ছে বলরাম।

১৯১৭ খৃস্টাব্দে এখানে যে বিপ্লব হয়ে গেল তার আগে এ দেশে শতকরা নিরানব্বই জন চাষী আধুনিক হলযন্ত্র চক্ষেও দেখে নি। তারা সেদিন আমাদেরই চাষীদের মতো সম্পূর্ণ দুর্বলরাম ছিল, নিরন্ন, নিঃসহায়, নির্বাক্। আজ দেখতে দেখতে এদের খেতে হাজার হাজার হলযন্ত্র নেমেছে। আগে এরা ছিল যাকে আমাদের ভাষায় বলে কৃষ্ণের জীব, আজ এরা হয়েছে বলরামের দল।

কিন্তু শুধু যন্ত্রে কোনো কাজ হয় না যন্ত্রী যদি মানুষ না হয়ে ওঠে। এদের খেতের কৃষি মনের কৃষির সঙ্গে সঙ্গে এগোচ্ছে। এখানকার শিক্ষার কাজ সজীব প্রণালীতে। আমি বরাবর বলে এসেছি শিক্ষাকে জীবযাত্রার সঙ্গে মিলিয়ে চালানো উচিত। তার থেকে অবচ্ছিন্ন করে নিলে ওটা ভাণ্ডারের সামগ্রী হয়, পাকযন্ত্রের খাদ্য হয় না।

এখানে এসে দেখলুম, এরা শিক্ষাটাকে প্রাণবান করে তুলেছে। তার কারণ এরা সংসারের সীমা থেকে ইস্কুলের সীমাকে সরিয়ে রাখে নি। এরা পাস করবার কিম্বা পণ্ডিত করবার জন্যে শেখায় না— সর্বতোভাবে মানুষ করবার জন্যে শেখায়। আমাদের দেশে বিদ্যালয় আছে, কিন্তু বিদ্যার চেয়ে বুদ্ধি বড়ো, সংবাদের চেয়ে শক্তি বড়ো, পুঁথির পংক্তির বোঝার ভারে চিত্তকে চালনা করবার ক্ষমতা আমাদের থাকে না। কতবার চেষ্টা করেছি আমাদের ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করতে, কিন্তু দেখতে পাই তাদের মনে কোনো প্রশ্নও নেই। জানতে চাওয়ার সঙ্গে জানতে পাওয়ার যে যোগ আছে সে যোগ ওদের বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ওরা কোনোদিন জানতে চাইতে শেখে নি— প্রথম থেকেই কেবলই বাঁধা নিয়মে ওদের জানিয়ে দেওয়া হয়, তার পরে সেই শিক্ষিত বিদ্যার পুনরাবৃত্তি করে ওরা পরীক্ষার মার্কা সংগ্রহ করে।

আমার মনে আছে শান্তিনিকেতনে যখন দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে মহাত্মাজীর ছাত্রেরা ছিল তখন একদিন তাদের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, আমাদের ছেলেদের সঙ্গে পারুল-বনে বেড়াতে যেতে ইচ্ছা কর কি। সে বললে, জানি নে। এ সম্বন্ধে সে তাদের দলপতিকে জিজ্ঞাসা করতে চাইলে। আমি বললুম, জিজ্ঞাসা পরে কোরো, কিন্তু বেড়াতে যেতে তোমার ইচ্ছা আছে কি না আমাকে বলো। সে বললে, আমি জানি নে। অর্থাৎ এ ছাত্র স্বয়ং কোনো বিষয়ে কিছু ইচ্ছা করবার চর্চাই করে না; তাকে চালনা করা হয়, সে চলে, আপনা থেকে তাকে কিছু ভাবতে হয় না।

এরকম সামান্য বিষয়ে মনের এতটা অসাড়তা যদিও সাধারণত আমাদের ছাত্রদের মধ্যে দেখা যায় না, কিন্তু এর চেয়ে আরো একটুখানি শক্ত রকমের চিন্তনীয় বিষয় যদি পাড়া যায় তবে দেখা যাবে সেজন্যে এদের মন একটুখানিও প্রস্তুত নেই। এরা কেবলই অপেক্ষা করে থাকে আমরা উপরে থেকে কী বলতে পারি তাই শোনবার জন্যে। সংসারে এরকম মনের মতো নিরুপায় মন আর হতে পারে না।

এখানে শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে নানারকম পরীক্ষা চলছে, তার বিস্তারিত বিবরণ পরে দেবার চেষ্টা করব। শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে রিপোর্ট্ এবং বই পড়ে অনেকটা জানা যেতে পারে, কিন্তু শিক্ষার চেহারা মানুষের মধ্যে যেটা প্রত্যক্ষ দেখা যায় সেটাই সব চেয়ে বড়ো কাজের। সেইটে সেদিন দেখে এসেছি। পায়োনিয়র্‌স্ কম্যুন বলে এ দেশে যে-সব আশ্রম স্থাপিত হয়েছে তারই একটা দেখতে সেদিন গিয়েছিলুম। আমাদের শান্তিনিকেতনে যেরকম ব্রতীবালক ব্রতীবালিকা আছে এদের পায়োনিয়র্‌স্ দল কতকটা সেই ধরনের।

বাড়িতে প্রবেশ করেই দেখি আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে সিঁড়ির দু ধারে বালকবালিকার দল সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে আসতেই ওরা আমার চার দিকে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসল, যেন আমি ওদেরই আপন দলের। একটা কথা মনে রেখো, এরা সকলেই পিতৃমাতৃহীন। এরা যে শ্রেণী থেকে এসেছে একদা সে শ্রেণীর মানুষ কারো কাছে কোনো যত্নের দাবি করতে পারত না, লক্ষ্মীছাড়া হয়ে নিতান্ত নীচ বৃত্তির দ্বারা দিনপাত করত। এদের মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম, অনাদরের অসম্মানের কুয়াশা-ঢাকা চেহারা একেবারেই নয়। সংকোচ নেই, জড়তা নেই। তা ছাড়া সকলেরই মনের মধ্যে একটা পণ, সামনে একটা কর্মক্ষেত্র আছে বলে মনে হয় যেন সর্বদা তৎপর হয়ে আছে, কোনো-কিছুতে অনবধানের শৈথিল্য থাকবার জো নেই।

অভ্যর্থনার জবাবে আমি ওদের অল্প যা বলেছিলুম তারই প্রসঙ্গক্রমে একজন ছেলে

বললে, "পরশ্রমজীবীরা (bourgeoisie) নিজের ব্যক্তিগত মুনফা খোঁজে, আমরা চাই দেশের ঐশ্বর্যে সকল মানুষের সমান স্বত্ব থাকে। এই বিদ্যালয়ে আমরা সেই নীতি অনুসারে চলে থাকি।"

একটি মেয়ে বললে, "আমরা নিজেরা নিজেদের চালনা করি। আমরা সকলে মিলে পরামর্শ করে কাজ করে থাকি, যেটা সকলের পক্ষেই শ্রেয় সেইটেই আমাদের স্বীকার্য।"

আর-একটি ছেলে বললে, "আমরা ভুল করতে পারি, কিন্তু যদি ইচ্ছা করি যারা আমাদের চেয়ে বড়ো তাদের পরামর্শ নিয়ে থাকি। প্রয়োজন হলে ছোটো ছেলে-মেয়েরা বড়ো ছেলেমেয়েদের মত নেয় এবং তারা যেতে পারে তাদের শিক্ষকদের কাছে। আমাদের দেশের শাসনতন্ত্রের এই বিধি। আমরা এখানে সেই বিধিরই চর্চা করে থাকি।"

এর থেকে বুঝতে পারবে, এদের শিক্ষা কেবল পুঁথিপড়ার শিক্ষা নয়। নিজের ব্যবহারকে চরিত্রকে একটা বৃহৎ লোকযাত্রার অনুগত করে এরা তৈরি করে তুলছে। সেই সম্বন্ধে এদের একটা পণ আছে এবং সেই পণ রক্ষায় এদের গৌরববোধ।

আমার ছেলেমেয়ে এবং শিক্ষকদের আমি অনেকবার বলেছি, লোকহিত এবং স্বায়ত্তশাসনের যে দায়িত্ববোধ আমরা সমস্ত দেশের কাছ থেকে দাবি করে থাকি শান্তিনিকেতনের ছোটো সীমার মধ্যে তারই একটি সম্পূর্ণ রূপ দিতে চাই। এখানকার ব্যবস্থা ছাত্র ও শিক্ষকদের সমবেত স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা হওয়া দরকার— সেই ব্যবস্থায় যখন এখানকার সমস্ত কর্ম সুসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে তখন এইটুকুর মধ্যে আমাদের সমস্ত দেশের সমস্যার পূরণ হতে পারবে। ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সাধারণ হিতের অনুগত করে তোলবার চর্চা রাষ্ট্রীয় বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে হতে পারে না, তার জন্যে ক্ষেত্র তৈরি করতে হয়— সেই ক্ষেত্র আমাদের আশ্রম।

একটা ছোটো দৃষ্টান্ত তোমাকে দিই। আহারের রুচি এবং অভ্যাস সম্বন্ধে বাংলাদেশে যেমন কদাচার এমন আর কোথাও নেই। পাকশালা এবং পাকযন্ত্রকে অত্যন্ত অনাবশ্যক আমরা ভারগ্রস্ত করে তুলেছি। এ সম্বন্ধে সংস্কার করা বড়ো কঠিন। স্বজাতির চিরন্তন হিতের প্রতি লক্ষ করে আমাদের ছাত্ররা ও শিক্ষকেরা পথ্য সম্বন্ধে নিজের রুচিকে যথোচিতভাবে নিয়ন্ত্রিত করবার পণ গ্রহণ করতে যদি পারত তা হলে আমি যাকে শিক্ষা বলি সেই শিক্ষা সার্থক হত। তিন-নয়ে সাতাশ হয় এইটে মুখস্থ করাকে আমরা শিক্ষা বলে গণ্য করে থাকি, সে সম্বন্ধে ছেলেরা কোনো-মতেই ভুল না করে তার প্রতি লক্ষ না করাকে গুরুতর অপরাধ বলে জানি, কিন্তু যে

জিনিসটাকে উদরস্থ করি সে সম্বন্ধে শিক্ষাকে তার চেয়ে কম দাম দেওয়াই মূর্খতা। আমাদের প্রতিদিনের খাওয়া সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত দেশের কাছে দায়িত্ব আছে এবং সে দায়িত্ব অতি গুরুতর— সম্পূর্ণ উপলব্ধির সঙ্গে এটাকে মনে রাখা পাসের মার্কার চেয়ে অনেক বড়ো।

আমি এদের জিজ্ঞাসা করলুম, "কেউ কোনো অপরাধ করলে এখানে তার বিধান কী।"

একটি মেয়ে বললে, "আমাদের কোনো শাসন নেই, কেননা আমরা নিজেদের শাস্তি দিই।"

আমি বললুম, "আর-একটু বিস্তারিত করে বলো। কেউ অপরাধ করলে তার বিচার করবার জন্যে তোমরা কি বিশেষ সভা ডাকো। নিজেদের মধ্যে থেকে কাউকে কি তোমরা বিচারক নির্বাচন করো। শাস্তি দেবার বিধিই বা কী রকমের।"

একটি মেয়ে বললে, "বিচারসভা যাকে বলে তা নয়, আমরা বলা-কওয়া করি। কাউকে অপরাধী করাই শাস্তি, তার চেয়ে শাস্তি আর নেই।"

একটি ছেলে বললে, "সেও দুঃখিত হয় আমরাও দুঃখিত হই, বাস্‌ চুকে যায়।"

আমি বললুম, "মনে করো কোনো ছেলে যদি ভাবে তার প্রতি অযথা দোষারোপ হচ্ছে তা হলে তোমাদের উপরেও আর-কারো কাছে কি সে ছেলের আপিল চলে।"

ছেলেটি বললে, "তখন আমরা ভোট নিই— অধিকাংশের মতে যদি স্থির হয় যে সে অপরাধ করেছে তা হলে তার উপরে আর কথা চলে না।"

আমি বললুম, "কথা না চলতে পারে, কিন্তু তবু ছেলেটি যদি মনে করে অধিকাংশই তার উপরে অন্যায় করছে তা হলে তার কোনো প্রতিবিধান আছে কি।"

একটি মেয়ে উঠে বললে, "তা হলে হয়তো আমরা শিক্ষকদের পরামর্শ নিতে যাই— কিন্তু এরকম ঘটনা কখনো ঘটে নি।"

আমি বললুম, "যে-একটি সাধনার মধ্যে সকলে আছ সেইটেতেই আপনা হতেই অপরাধ থেকে তোমাদের রক্ষা করে।"

ওদের কর্তব্য কী প্রশ্ন করাতে বললে, "অন্য দেশের লোকেরা নিজের কাজের জন্য অর্থ চায়, সম্মান চায়, আমরা তার কিছুই চাই নে, আমরা সাধারণের হিত চাই। আমরা গাঁয়ের লোকদের শিক্ষা দেবার জন্যে পাড়াগাঁয়ে যাই— কী করে পরিষ্কার হয়ে থাকতে হয়, সকল কাজ কী করে বুদ্ধিপূর্বক করতে হয়, এইসব তাদের বুঝিয়ে দিই। অনেক সময়ে আমরা তাদের মধ্যে গিয়েই বাস করি, নাটক-অভিনয় করি, দেশের অবস্থার কথা বলি।"

তার পরে আমাকে দেখাতে চাইলে কাকে ওরা বলে সজীব সংবাদপত্র। একটি মেয়ে বললে, "দেশের সম্বন্ধে আমাদের অনেক খবর জানতে হয়, আমরা যা জানি তাই আবার অন্য সবাইকে জানানো আমাদের কর্তব্য। কেননা, ঠিকমত করে তথ্যগুলিকে জানতে এবং তাদের সম্বন্ধে চিন্তা করতে পারলে তবেই আমাদের কাজ খাঁটি হতে পারে।"

একটি ছেলে বললে, "প্রথমে আমরা বই থেকে, আমাদের শিক্ষকের কাছ থেকে শিখি, তার পরে তাই নিয়ে আমরা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করি, তার পরে সেইগুলি সাধারণকে জানাবার জন্যে যাবার হুকুম হয়।"

সজীব সংবাদপত্র অভিনয় করে আমাকে দেখালে। বিষয়টা হচ্ছে এদের পাঞ্চবার্ষিক সংকল্প। ব্যাপারটা হচ্ছে, এরা কঠিন পণ করেছে পাঁচ বছরের মধ্যে সমস্ত দেশকে যন্ত্রশক্তিতে সুদক্ষ করে তুলবে, বিদ্যুৎশক্তি বাষ্পশক্তিকে দেশের এক ধার থেকে আর-এক ধার পর্যন্ত কাজে লাগিয়ে দেবে। এদের দেশ বলতে কেবল য়ুরোপীয় রাশিয়া বোঝায় না। এশিয়ার অনেক দূর পর্যন্ত তার বিস্তার। সেখানেও নিয়ে যাবে এদের শক্তির বাহনকে। ধনীকে ধনীতর করবার জন্যে নয়, জনসমষ্টিকে শক্তিসম্পন্ন করবার জন্যে— সেই জনসমষ্টির মধ্যে মধ্য-এশিয়ার অসিতচর্ম মানুষও আছে। তারাও শক্তির অধিকারী হবে ব'লে ভয় নেই, ভাবনা নেই।

এই কাজের জন্য এদের প্রভূত টাকার দরকার— য়ুরোপীয় বড়োবাজারে এদের হুণ্ডি চলে না, নগদ দামে কেনা ছাড়া উপায় নেই। তাই পেটের অন্ন দিয়ে এরা জিনিস কিনছে, উৎপন্ন শস্য পশুমাংস ডিম মাখন সমস্ত চালান হচ্ছে বিদেশের হাটে। সমস্ত দেশের লোক উপবাসের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। এখনো দেড় বছর বাকি। অন্য দেশের মহাজনরা খুশি নয়। বিদেশী এঞ্জিনিয়াররা এদের কল-কারখানা অনেক নষ্টও করেছে। ব্যাপারটা বৃহৎ ও জটিল, সময় অত্যন্ত অল্প। সময় বাড়াতে সাহস হয় না, কেননা সমস্ত ধনী-জগতের প্রতিকূলতার মুখে এরা দাঁড়িয়ে, যত শীঘ্র সম্ভব আপন শক্তিতে ধন উৎপাদন এদের পক্ষে নিতান্ত দরকার। তিন বছর কষ্টে কেটে গেছে, এখনো দু বছর বাকি।

'সজীব খবরের কাগজ'টা অভিনয়ের মতো ; নেচে গেয়ে পতাকা তুলে এরা জানিয়ে দিতে চায় দেশের অর্থশক্তিকে যন্ত্রবাহিনী করে ক্রমে ক্রমে কী পরিমাণে এরা সফলতা লাভ করছে। দেখবার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। যারা জীবনযাত্রার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী থেকে বঞ্চিত হয়ে বহু কষ্টে কাল কাটাচ্ছে তাদের বোঝানো চাই অনতিকালের মধ্যে এই কষ্টের অবসান হবে এবং বদলে যা পাবে তার কথা স্মরণ করে যেন তারা আনন্দের সঙ্গে, গৌরবের সঙ্গে, কষ্টকে বরণ করে নেয়।

এর মধ্যে সান্ত্বনার কথাটা এই যে, কোনো এক-দল লোক নয়, দেশের সকল লোকই একসঙ্গে তপস্যার প্রবৃত্ত। এই 'সজীব সংবাদপত্র' অন্য দেশের বিবরণও এইরকম করে প্রচার করে। মনে পড়ল পতিসরে দেহতত্ত্ব মুক্তিতত্ত্ব নিয়ে এক যাত্রার পালা শুনেছিলুম— প্রণালীটা একই, লক্ষ্যটা আলাদা। মনে করছি দেশে ফিরে গিয়ে শান্তিনিকেতনে স্কুলে 'সজীব সংবাদপত্র' চালাবার চেষ্টা করব।

ওদের দৈনিক কার্যপদ্ধতি হচ্ছে এইরকম— সকাল সাতটার সময় ওরা বিছানা থেকে ওঠে। তার পর পনেরো মিনিট ব্যায়াম, প্রাতঃকৃত্য, প্রাতরাশ। আটটার সময় ক্লাস বসে। একটার সময় কিছুক্ষণের জন্য আহার ও বিশ্রাম। বেলা তিনটে পর্যন্ত ক্লাস চলে। শেখবার বিষয় হচ্ছে ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, প্রাথমিক প্রাকৃতবিজ্ঞান, প্রাথমিক রসায়ন, প্রাথমিক জীববিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্য, হাতের কাজ, ছুতোরের কাজ, বই-বাঁধাই, হাল আমলের চাষের যন্ত্র প্রভৃতির ব্যবহার ইত্যাদি। রবিবার নেই। প্রত্যেক পঞ্চম দিনে ছুটি। তিনটের পরে বিশেষ দিনের কার্যতালিকা অনুসারে পায়োনিয়ররা (পুরোযায়ীর দল) কারখানা, হাসপাতাল, গ্রাম প্রভৃতি দেখতে যায়।

পল্লীগ্রামে ভ্রমণ করতে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। মাঝে মাঝে নিজেরা অভিনয় করে; মাঝে মাঝে থিয়েটার দেখতে, সিনেমা দেখতে যায়। সন্ধ্যাবেলায় গল্প পড়া, গল্প বলা, তর্কসভা, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক সভা। ছুটির দিনে পায়োনিয়ররা কিছু পরিমাণে নিজেদের কাপড় কাচে, ঘর পরিষ্কার করে, বাড়ি এবং বাড়ির চার দিক পরিষ্কার করে, ক্লাস-পাঠ্যের অতিরিক্ত পড়া পড়ে, বেড়াতে যায়। ভর্তি হবার বয়েস সাত-আট, বিদ্যালয় ত্যাগ করবার বয়েস ষোলো। এদের অধ্যয়নকাল আমাদের দেশের মতো লম্বা লম্বা ছুটি দিয়ে ফাঁক করে দেওয়া নয়, সুতরাং অল্পদিনে অনেক বেশি পড়তে পারে।

এখানকার বিদ্যালয়ের মস্ত একটা গুণ, এরা যা পড়ে, তার সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকে। তাতে পড়ার বিষয় মনে চিত্রিত হয়ে ওঠে, ছবির হাত পেকে যায়— আর পড়ার সঙ্গে রূপসৃষ্টি করার আনন্দ মিলিত হয়। হঠাৎ মনে হতে পারে, এরা বুঝি কেবলই কাজের দিকে ঝোঁক দিয়েছে গোঁয়ারের মতো ললিতকলাকে অবজ্ঞা ক'রে। একেবারেই তা নয়। সম্রাটের আমলের তৈরি বড়ো বড়ো রঙ্গশালায় উচ্চ অঙ্গের নাটক ও অপেরার অভিনয়ে বিলম্বে টিকিট পাওয়াই শক্ত হয়। নাট্যাভিনয়কলায় এদের মতো ওস্তাদ জগতে অল্পই আছে, পূর্বতন কালে আমীর-ওমরাওরাই সে-সমস্ত ভোগ করে এসেছেন— তখনকার দিনে যাদের পায়ে না ছিল জুতো, গায়ে ছিল ময়লা ছেঁড়া কাপড়, আহার

ছিল আধ-পেটা, দেবতা মানুষ সবাইকেই যারা অহোরাত্র ভয় করে করে বেড়িয়েছে, পরিত্রাণের জন্যে পুরুত-পাণ্ডাকে দিয়েছে ঘুষ, আর মনিবের কাছে ধুলোয় মাথা লুটিয়ে আত্মাবমাননা করেছে, তাদেরই ভিড়ে থিয়েটারে জায়গা পাওয়া যায় না।

আমি যেদিন অভিনয় দেখতে গিয়েছিলুম সেদিন হচ্ছিল টলস্টয়ের 'রিসারেক্‌শান'। জিনিসটা জনসাধারণের পক্ষে সহজে উপভোগ্য বলে মনে করা যায় না। কিন্তু শ্রোতারা গভীর মনোযোগের সঙ্গে সম্পূর্ণ নিঃশব্দে শুনছিল। অ্যাংলোস্যাক্‌শন চাষী-মজুর শ্রেণীর লোকে এ জিনিস রাত্রি একটা পর্যন্ত এমন স্তব্ধ শান্ত ভাবে উপভোগ করছে এ কথা মনে করা যায় না, আমাদের দেশের কথা ছেড়েই দাও।

আর-একটা উদাহরণ দিই। মস্কৌ শহরে আমার ছবির প্রদর্শনী হয়েছিল। এ ছবিগুলো সৃষ্টিছাড়া সে কথা বলা বাহুল্য। শুধু যে বিদেশী তা নয়, বলা চলে যে তারা কোনোদেশীই নয়। কিন্তু লোকের ঠেলাঠেলি ভিড়। অল্প কয় দিনে পাঁচ হাজার লোক ছবি দেখেছে। আর যে যা বলুক, অন্তত আমি তো এদের রুচির প্রশংসা না করে থাকতে পারব না।

রুচির কথা ছেড়ে দাও, মনে করা যাক এ একটা ফাঁকা কৌতূহল। কিন্তু কৌতূহল থাকাটাই যে জাগ্রত চিত্তের পরিচয়। মনে আছে একদা আমাদের ইঁদারার জন্যে আমেরিকা থেকে একটা বায়ুচল চক্রযন্ত্র এনেছিলুম, তাতে কুয়োর গভীর তলা থেকে জল উঠেছিল। কিন্তু যখন দেখলুম ছেলেদের চিত্তের গভীর তলদেশ থেকে একটুও কৌতূহল টেনে তুলতে পারলে না তখন মনে বড়োই ধিক্‌কার লাগল। এই তো আমাদের ওখানে আছে বৈদ্যুত আলোর কারখানা, কজন ছেলের তাতে একটুও ঔৎসুক্য আছে? অথচ এরা তো ভদ্রশ্রেণীর ছেলে। বুদ্ধির জড়তা যেখানে সেইখানে কৌতূহল দুর্বল।

এখানে ইস্কুলের ছেলেদের আঁকা অনেকগুলি ছবি আমরা পেয়েছি— দেখে বিস্মিত হতে হয়; সেগুলো রীতিমত ছবি, কারো নকল নয়, নিজের উদ্ভাবন। এখানে নির্মাণ এবং সৃষ্টি দুইয়েরই প্রতি লক্ষ দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছি। এখানে এসে অবধি স্বদেশের শিক্ষার কথা অনেক ভাবতে হয়েছে। আমার নিঃসহায় সামান্য শক্তি দিয়ে কিছু এর আহরণ এবং প্রয়োগ করতে চেষ্টা করব। কিন্তু আর সময় কই— আমার পক্ষে পাঞ্চবার্ষিক সংকল্পও হয়তো পূরণ না হতে পারে। প্রায় ত্রিশ বছর কাল যেমন একা একা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লগি ঠেলে কাটিয়েছি আরো দু-চার বছর তেমনি করেই ঠেলতে হবে— বিশেষ এগোবে না তাও জানি, তবু নালিশ করব না। আজ আর সময় নেই। আজ রাত্রের গাড়িতে জাহাজের ঘাটের অভিমুখে যেতে হবে, সমুদ্রে কাল পাড়ি দেব। ইতি ২ অক্টোবর ১৯৩০

৭

ব্রেমেন স্টীমার

অতলান্তিক

রাশিয়া থেকে ফিরে এসে আজ চলেছি আমেরিকার ঘাটে। কিন্তু রাশিয়ার স্মৃতি আজও আমার সমস্ত মন অধিকার করে আছে। তার প্রধান কারণ— অন্যান্য যে-সব দেশে ঘুরেছি তারা সমগ্রভাবে মনকে নাড়া দেয় না, তাদের নানা কর্মের উদ্যম আছে আপন আপন মহলে। কোথাও আছে পলিটিক্স্‌, কোথাও আছে হাসপাতাল, কোথাও আছে বিশ্ববিদ্যালয়, কোথাও আছে ম্যুজিয়ম— বিশেষজ্ঞরা তাই নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু এখানে সমস্ত দেশটা এক অভিপ্রায় মনে নিয়ে সমস্ত কর্মবিভাগকে এক স্নায়ুজালে জড়িত করে এক বিরাট দেহ এক বৃহৎ ব্যক্তিস্বরূপ ধারণ করেছে। সব-কিছু মিলে গেছে একটি অখণ্ড সাধনার মধ্যে।

যে-সব দেশে অর্থ এবং শক্তির অধ্যবসায় ব্যক্তিগত স্বার্থদ্বারা বিভক্ত সেখানে এরকম চিত্তের নিবিড় ঐক্য অসম্ভব। যখন এখানে পাঞ্চবার্ষিক য়ুরোপীয় যুদ্ধ চলছিল তখন দায়ে পড়ে দেশের অধিকাংশ ভাবনা ও কাজ এক অভিপ্রায়ে মিলিত হয়ে এক চিত্তের অধিকারে এসেছিল, এটা হয়েছিল অস্থায়ীভাবে। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ায় যে কাণ্ড চলছে তার প্রকৃতিই এই— সাধারণের কাজ, সাধারণের চিত্ত, সাধারণের স্বত্ব ব'লে একটা অসাধারণ সত্তা এরা সৃষ্টি করতে লেগে গেছে।

উপনিষদের একটা কথা আমি এখানে এসে খুব স্পষ্ট করে বুঝেছি— 'মা গৃধঃ', লোভ কোরো না। কেন লোভ করবে না। যেহেতু সমস্ত কিছু এক সত্যের দ্বারা পরিব্যাপ্ত; ব্যক্তিগত লোভেতেই সেই একের উপলব্ধির মধ্যে বাধা আনে। 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'— সেই একের থেকে যা আসছে তাকেই ভোগ করো। এরা আর্থিক দিক থেকে সেই কথাটা বলছে। সমস্ত মানবসাধারণের মধ্যে এরা একটি অদ্বিতীয় মানবসত্যকেই বড়ো বলে মানে— সেই একের যোগে উৎপন্ন যা-কিছু, এরা বলে, তাকেই সকলে মিলে ভোগ করো— 'মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং'— কারো ধনে লোভ কোরো না। কিন্তু ধনের ব্যক্তিগত বিভাগ থাকলেই ধনের লোভ আপনিই হয়। সেইটিকে ঘুচিয়ে দিয়ে এরা বলতে চায়, 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।'

য়ুরোপে অন্য সকল দেশেরই সাধনা ব্যক্তির লাভকে, ব্যক্তির ভোগকে নিয়ে। তারই মন্থন-আলোড়ন খুবই প্রচণ্ড, আর পৌরাণিক সমুদ্রমন্থনের মতোই তার থেকে বিষ ও সুধা দুই'ই উঠছে। কিন্তু সুধার ভাগ কেবল এক দলই পাচ্ছে অধিকাংশই পাচ্ছে না—

এই নিয়ে অসুখ-অশান্তির সীমা নেই। সবাই মেনে নিয়েছিল এইটেই অনিবার্য; বলেছিল মানবপ্রকৃতির মধ্যেই লোভ আছে এবং লোভের কাজই হচ্ছে ভোগের মধ্যে অসমান ভাগ করে দেওয়া। অতএব প্রতিযোগিতা চলবে এবং লড়াইয়ের জন্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকা চাই। কিন্তু সোভিয়েটরা যা বলতে চায় তার থেকে বুঝতে হবে মানুষের মধ্যে ঐক্যটাই সত্য, ভাগটাই মায়া, সম্যক্ চিন্তা সম্যক্ চেষ্টা -দ্বারা সেটাকে যে মুহূর্তে মানব না সেই মুহূর্তেই স্বপ্নের মতো সে লোপ পাবে।

রাশিয়ায় সেই না-মানার চেষ্টা সমস্ত দেশ জুড়ে প্রকাণ্ড করে চলছে। সব-কিছু এই এক চেষ্টার অন্তর্গত হয়ে গেছে। এইজন্যে রাশিয়ায় এসে একটা বিরাট চিত্তের স্পর্শ পাওয়া গেল। শিক্ষার বিরাটপর্ব আর কোনো দেশে এমন করে দেখি নি, তার কারণ অন্য দেশে শিক্ষা যে করে শিক্ষার ফল তারই— 'দুধুভাতু খায় সেই।' এখানে প্রত্যেকের শিক্ষায় সকলের শিক্ষা। একজনের মধ্যে শিক্ষার যে অভাব হবে সে অভাব সকলকেই লাগবে। কেননা সম্মিলিত শিক্ষারই যোগে এরা সম্মিলিত মনকে বিশ্বসাধারণের কাজে সফল করতে চায়। এরা 'বিশ্বকর্মা'; অতএব এদের বিশ্বমনা হওয়া চাই। অতএব এদের জন্যেই যথার্থ বিশ্ববিদ্যালয়।

শিক্ষা-ব্যাপারকে এরা নানা প্রণালী দিয়ে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে ম্যুজিয়ম। নানাপ্রকার ম্যুজিয়মের জালে এরা সমস্ত গ্রাম-শহরকে জড়িয়ে ফেলেছে। সে ম্যুজিয়ম আমাদের শান্তিনিকেতনের লাইব্রেরির মতো অকারী (passive) নয়, সকারী (active)।

রাশিয়ার region study অর্থাৎ স্থানিক তথ্যসন্ধানের উদ্যোগ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। এরকম শিক্ষাকেন্দ্র প্রায় দু হাজার আছে, তার সদস্যসংখ্যা সত্তর হাজার পেরিয়ে গেছে। এই-সব কেন্দ্রে তত্তৎ স্থানের অতীত ইতিহাস এবং অতীত ও বর্তমানের আর্থিক অবস্থার অনুসন্ধান হয়। তা ছাড়া সে-সব জায়গার উৎপাদিকা শক্তি কিরকম শ্রেণীর কিম্বা কোনো খনিজ পদার্থ সেখানে প্রচ্ছন্ন আছে কি না, তার খোঁজ হয়ে থাকে। এই-সব কেন্দ্রের সঙ্গে যে-সব ম্যুজিয়ম আছে তারই যোগে সাধারণের শিক্ষাবিস্তার একটা গুরুতর কর্তব্য। সোভিয়েট রাষ্ট্রে সর্বসাধারণের জ্ঞানোন্নতির যে নবযুগ এসেছে, এই স্থানিক তথ্যসন্ধানের ব্যাপক চর্চা এবং তৎসংশ্লিষ্ট ম্যুজিয়ম তার একটা প্রধান প্রণালী।

এইরকম নিকটবর্তী স্থানের তথ্যানুসন্ধান শান্তিনিকেতনে কালীমোহন কিছু পরিমাণে করেছেন; কিন্তু এই কাজের সঙ্গে আমাদের ছাত্র ও শিক্ষকেরা যুক্ত না থাকাতে তাদের এতে কোনো উপকার হয় নি। সন্ধান করবার ফল পাওয়ার চেয়ে

সন্ধান করার মন তৈরি করা কম কথা নয়। কলেজ-বিভাগের ইকনমিক্স্ ক্লাসের ছাত্রদের নিয়ে প্রভাত এইরকম চর্চার পত্তন করছেন শুনেছিলুম; কিন্তু এ কাজটা আরো বেশি সাধারণভাবে করা দরকার, পাঠভবনের ছেলেদেরও এই কাজে দীক্ষিত করা চাই, আর এইসঙ্গে সমস্ত প্রাদেশিক সামগ্রীর ম্যুজিয়ম স্থাপন করা আবশ্যক।

এখানে ছবির ম্যুজিয়মের কাজ কিরকম চলে তার বিবরণ শুনলে নিশ্চয় তোমার ভালো লাগবে। মস্কৌ শহরে ট্রেটিয়াকভ গ্যালারি (Tretyakov Gallery) নামে এক বিখ্যাত চিত্রভাণ্ডার আছে। সেখানে ১৯২৮ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত এক বছরের মধ্যে প্রায় তিন লক্ষ লোক ছবি দেখতে এসেছে। যত দর্শক আসতে চায় তাদের ধরানো শক্ত হয়ে উঠেছে। সেইজন্যে ছুটির দিনে আগে থাকতে দর্শকদের নাম রেজেস্ট্রি করানো দরকার হয়েছে।

১৯১৭ খৃস্টাব্দে সোভিয়েট-শাসন প্রবর্তিত হবার পূর্বে যে-সব দর্শক এইরকম গ্যালারিতে আসত তারা ধনী মানী জ্ঞানী দলের লোক এবং তারা, যাদের এরা বলে bourgeoisie, অর্থাৎ পরশ্রমজীবী। এখন আসে অসংখ্য স্বশ্রমজীবীর দল, যথা রাজমিস্ত্রি, লোহার, মুদি, দরজি ইত্যাদি। আর আসে সোভিয়েট সৈনিক, সেনানায়ক, ছাত্র এবং চাষী-সম্প্রদায়।

আর্টের বোধ ক্রমে ক্রমে এদের মনে জাগিয়ে তোলা আবশ্যক। এদের মতো আনাড়িদের পক্ষে চিত্রকলার রহস্য প্রথম দৃষ্টিতে ঠিকমত বোঝা অসাধ্য। দেয়ালে দেয়ালে ছবি দেখে দেখে এরা ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, বুদ্ধি যায় পথ হারিয়ে। এই কারণে প্রায় সব ম্যুজিয়মেই উপযুক্ত পরিচায়ক রেখে দেওয়া হয়েছে। ম্যুজিয়মের শিক্ষাবিভাগে কিম্বা অন্যত্র তদনুরূপ রাষ্ট্রকর্মশালায় যে-সমস্ত বৈজ্ঞানিক কর্মী আছে তাদেরই মধ্যে থেকে পরিচায়ক বাছাই করে নেওয়া হয়। যারা দেখতে আসে তাদের সঙ্গে এদের দেনাপাওনার কোনো কারবার থাকে না। ছবিতে যে বিষয়টা প্রকাশ করছে সেইটে দেখলেই যে ছবি দেখা হয়, দর্শকেরা যাতে সেই ভুল না করে পরিদর্শয়িতার সেটা জানা চাই।

চিত্রবস্তুর সংস্থান (composition), তার বর্ণকল্পনা (colour scheme), তার অঙ্কন, তার অবকাশ (space), তার উজ্জ্বলতা (illumination), যাতে করে তার বিশেষ সম্প্রদায় ধরা পড়ে সেই তার বিশেষ আঙ্গিক (technique)— এ-সকল বিষয়ে আজও অল্প লোকেরই জানা আছে। এইজন্যে পরিচায়কের বেশ দস্তুরমত শিক্ষা থাকা চাই, তবেই দর্শকদের ঔৎসুক্য ও মনোযোগ সে জাগিয়ে রাখতে পারে। আর-একটি কথা তাকে বুঝতে হবে, ম্যুজিয়মে কেবল একটিমাত্র ছবি নেই, অতএব একটা

ছবিকে চিনে নেওয়া দর্শকের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়; ম্যুজিয়মে যে-সব বিশেষ শ্রেণীর ছবি রক্ষিত আছে তাদের শ্রেণীগত রীতি বোঝা চাই। পরিচায়কদের কর্তব্য কয়েকটি করে বিশেষ ছাঁদের ছবি বেছে নিয়ে তাদের প্রকৃতি বুঝিয়ে দেওয়া। আলোচ্য ছবিগুলির সংখ্যা খুব বেশি হলে চলবে না এবং সময়ও বিশ মিনিটের বেশি হওয়া ঠিক নয়। ছবির যে-একটি স্বকীয় ভাষা, একটি ছন্দ আছে সেইটেই বুঝিয়ে দেবার বিষয়; ছবির রূপের সঙ্গে ছবির বিষয়ের ও ভাবের সম্বন্ধ কী সেইটে ব্যাখ্যা করা দরকার। ছবির পরস্পর-বৈপরীত্যদ্বারা তাদের বিশেষত্ব বোঝানো অনেক সময় কাজে লাগে। কিন্তু দর্শকদের মন একটুমাত্র শ্রান্ত হলেই তাদের তখনই ছুটি দেওয়া চাই।

অশিক্ষিত দর্শকদের এরা কী করে ছবি দেখতে শেখায় তারই একটা রিপোর্ট্ থেকে উল্লিখিত কথাগুলি তোমাকে সংগ্রহ করে পাঠালুম। এর থেকে আমাদের দেশের লোকের যেটি ভাববার কথা আছে সেটি হচ্ছে এই—

পূর্বে যে চিঠি লিখেছি তাতে আমি বলেছি, সমস্ত দেশকে কৃষিবলে যন্ত্রবলে অতিক্রতমাত্রায় শক্তিমান করে তোলবার জন্যে এরা একান্ত উদ্যমের সঙ্গে লেগে গেছে। এটা ঘোরতর কেজো কথা। অন্য-সব ধনী দেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজের জোরে টিঁকে থাকবার জন্যে এদের এই বিপুল সাধনা। আমাদের দেশে যখন এই-জাতীয় দেশব্যাপী রাষ্ট্রিক সাধনার কথা ওঠে তখনই আমরা বলতে শুরু করি, এই একটিমাত্র লাল মশাল জ্বালিয়ে তুলে দেশের অন্য সকল বিভাগের সকল আলো নিবিয়ে দেওয়া চাই, নইলে মানুষ অন্যমনস্ক হবে। বিশেষত ললিতকলা সকল প্রকার কঠোর সংকল্পের বিরোধী। স্বজাতিকে পালোয়ানি করবার জন্যে কেবলই তাল ঠুকিয়ে পয়তারা করাতে হবে, সরস্বতীর বীণাটাকে নিয়ে যদি লাঠি বানানো সম্ভব হয় তবেই সেটা চলবে, নতুবা নৈব নৈব চ। এই কথাগুলো যে কতখানি মেকি পৌরুষের কথা তা এখানে এলে স্পষ্ট বোঝা যায়। এখানে এরা দেশ জুড়ে কারখানা চালাতে যে-সব শ্রমিকদের পাকা করে তুলতে চায়, তারাই যাতে শিক্ষিত মন নিয়ে ছবির রস বুঝতে পারে তারই জন্যে এত প্রভূত আয়োজন। এরা জানে, রসজ্ঞ যারা নয় তারা বর্বর; যারা বর্বর তারা বাইরে রুক্ষ, অন্তরে দুর্বল। রাশিয়ায় নবনাট্যকলার অসামান্য উন্নতি হয়েছে। এদের ১৯১৭ খৃস্টাব্দের বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গেই ঘোরতর দুর্দিন দুর্ভিক্ষের মধ্যেই এরা নেচেছে, গান গেয়েছে, নাট্যাভিনয় করেছে—এদের ঐতিহাসিক বিরাট নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে তার কোনো বিরোধ ঘটে নি।

মরুভূমিতে শক্তি নেই। শক্তির যথার্থ রূপ দেখা যায় সেইখানেই যেখানে পাথরের বুক থেকে জলের ধারা কল্লোলিত হয়ে বেরিয়ে আসে, যেখানে বসন্তের রূপহিল্লোলে

হিমাচলের গাম্ভীর্য মনোহর হয়ে ওঠে। বিক্রমাদিত্য ভারতবর্ষ থেকে শক শত্রুদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু কালিদাসকে নিষেধ করেন নি মেঘদূত লিখতে। জাপানীরা তলোয়ার চালাতে পারে না এ কথা বলবার জো নেই, কিন্তু সমান নৈপুণ্যেই তারা তুলিও চালায়। রাশিয়ায় এসে যদি দেখতুম এরা কেবলই মজুর সেজে কারখানাঘরের সরঞ্জাম জোগাচ্ছে আর লাঙল চালাচ্ছে, তা হলেই বুঝতুম, এরা শুকিয়ে মরবে। যে বনস্পতি পল্লবমর্মর বন্ধ করে দিয়ে খট্‌ খট্‌ আওয়াজে অহংকার করে বলতে থাকে 'আমার রসের দরকার নেই' সে নিশ্চয়ই ছুতোরের দোকানের নকল বনস্পতি— সে খুবই শক্ত হতে পারে, কিন্তু খুবই নিষ্ফল। অতএব আমি বীরপুরুষদের বলে রাখছি এবং তপস্বীদেরও সাবধান করে দিচ্ছি যে, দেশে যখন ফিরে যাব পুলিসের যষ্টিধারার শ্রাবণবর্ষণেও আমার নাচগান বন্ধ হবে না।

রাশিয়ার নাট্যমঞ্চে যে কলাসাধনার বিকাশ হয়েছে সে অসামান্য। তার মধ্যে নূতন সৃষ্টির সাহস ক্রমাগতই দেখা দিচ্ছে, এখনো থামে নি। ওখানকার সমাজবিপ্লবে এই নূতন সৃষ্টিরই অসমসাহস কাজ করছে। এরা সমাজে রাষ্ট্রে কলাতত্ত্বে কোথাও নূতনকে ভয় করে নি।

যে পুরাতন ধর্মতন্ত্র এবং পুরাতন রাষ্ট্রতন্ত্র বহু শতাব্দী ধরে এদের বুদ্ধিকে অভিভূত এবং প্রাণশক্তিকে নিঃশেষপ্রায় করে দিয়েছে এই সোভিয়েট-বিপ্লবীরা তাদের দুটোকেই দিয়েছে নির্মূল করে; এত বড়ো বন্ধনজর্জর জাতিকে এত অল্পকালে এত বড়ো মুক্তি দিয়েছে দেখে মন আনন্দিত হয়। কেননা, যে ধর্ম মূঢ়তাকে বাহন করে মানুষের চিত্তের স্বাধীনতা নষ্ট করে, কোনো রাজাও তার চেয়ে আমাদের বড়ো শত্রু হতে পারে না— সে রাজা বাইরে থেকে প্রজাদের স্বাধীনতাকে যতই নিগড়বদ্ধ করুক-না। এ-পর্যন্ত দেখা গেছে, যে রাজা প্রজাকে দাস করে রাখতে চেয়েছে সে রাজার সর্বপ্রধান সহায় সেই ধর্ম যা মানুষকে অন্ধ করে রাখে। সে ধর্ম বিষকন্যার মতো; আলিঙ্গন করে সে মুগ্ধ করে, মুগ্ধ করে সে মারে। শক্তিশেলের চেয়ে ভক্তিশেল গভীরতর মর্মে গিয়ে প্রবেশ করে, কেননা তার মার আরামের মার।

সোভিয়েটরা রুশসম্রাট্‌কৃত অপমান এবং আত্মকৃত অপমানের হাত থেকে এই দেশকে বাঁচিয়েছে— অন্য দেশের ধার্মিকেরা ওদের যত নিন্দাই করুক আমি নিন্দা করতে পারব না। ধর্মমোহের চেয়ে নাস্তিকতা অনেক ভালো। রাশিয়ার বুকের 'পরে ধর্ম ও অত্যাচারী রাজার পাথর চাপা ছিল; দেশের উপর থেকে সেই পাথর নড়ে যাওয়ায় কী প্রকাণ্ড নিষ্কৃতি হয়েছে, এখানে এলে সেটা স্বচক্ষে দেখতে পেতে। ইতি ৩ অক্টোবর ১৯৩০

৮

অতলান্তিক মহাসাগর

রাশিয়া থেকে ফিরে এসেছি, চলেছি আমেরিকার পথে। রাশিয়াযাত্রায় আমার একটিমাত্র উদ্দেশ্য ছিল— ওখানে জনসাধারণের শিক্ষাবিস্তারের কাজ কিরকম চলছে আর ওরা তার ফল কিরকম পাচ্ছে সেইটে অল্প সময়ের মধ্যে দেখে নেওয়া।

আমার মত এই যে, ভারতবর্ষের বুকের উপর যত-কিছু দুঃখ আজ অভ্রভেদী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার একটিমাত্র ভিত্তি হচ্ছে অশিক্ষা। জাতিভেদ, ধর্মবিরোধ, কর্মজড়তা, আর্থিক দৌর্বল্য— সমস্তই আঁকড়ে আছে এই শিক্ষার অভাবকে। সাইমন কমিশনে ভারতবর্ষের সমস্ত অপরাধের তালিকা শেষ করে ব্রিটিশ শাসনের কেবল একটিমাত্র অপরাধ কবুল করেছে। সে হচ্ছে যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষাবিধানের ত্রুটি। কিন্তু আর-কিছু বলবার দরকার ছিল না। মনে করুন যদি বলা হয়— গৃহস্থ সাবধান হতে শেখে নি; এক ঘর থেকে আর-এক ঘরে যেতে চৌকাঠে হুঁচট লেগে সে আছাড় খেয়ে পড়ে; জিনিসপত্র কেবলই হারায়, তার পরে খুঁজে পায় না; ছায়া দেখলে তাকে জুজু বলে ভয় করে; নিজের ভাইকে দেখে চোর এসেছে বলে লাঠি উঁচিয়ে মারতে যায়; কেবলই বিছানা আঁকড়ে পড়ে থাকে; উঠে হেঁটে বেড়াবার সাহসই নেই; খিদে পায়, কিন্তু খাবার কোথায় আছে খুঁজে পায় না; অদৃষ্টের উপর অন্ধ নির্ভর করে থাকা ছাড়া অন্য সমস্ত পথ তার কাছে লুপ্ত; অতএব নিজের গৃহস্থালির তদারকের ভার তার উপর দেওয়া চলে না— তার পরে সবশেষে গলা অত্যন্ত খাটো করে যদি বলা হয় 'আমি ওর বাতি নিবিয়ে রেখেছি'— তা হলে সেটা কেমন হয়।

ওরা একদিন ডাইনী বলে নিরপরাধাকে পুড়িয়েছে, পাপিষ্ঠ বলে বৈজ্ঞানিককে মেরেছে, ধর্মমতের স্বাতন্ত্র্যকে অতি নিষ্ঠুরভাবে পীড়ন করেছে, নিজেরই ধর্মের ভিন্ন সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রাধিকারকে খর্ব করে রেখেছে, এ ছাড়া কত অন্ধতা কত মূঢ়তা কত কদাচার মধ্যযুগের ইতিহাস থেকে তার তালিকা স্তূপাকার করে তোলা যায়। এ-সমস্ত দূর হল কী করে। বাইরেকার কোনো কোর্ট্ অফ ওয়ার্ড্সের হাতে ওদের অক্ষমতার সংস্কারসাধনের ভার দেওয়া হয় নি; একটিমাত্র শক্তি ওদের এগিয়ে দিয়েছে, সে হচ্ছে ওদের শিক্ষা।

জাপান এই শিক্ষার যোগেই অল্পকালের মধ্যেই দেশের রাষ্ট্রশক্তিকে সর্বসাধারণের ইচ্ছা ও চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছে, দেশের অর্থ-উৎপাদনের শক্তিকে বহুগুণে বাড়িয়ে তুলেছে। বর্তমান তুরস্ক প্রবলবেগে এই শিক্ষা অগ্রসর করে দিয়ে ধর্মান্ধতার প্রবল

বোঝা থেকে দেশকে মুক্ত করবার পথে চলেছে। 'ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়'। কেননা ঘরে আলো আসতে দেওয়া হয় নি; যে আলোতে আজকের পৃথিবী জেগে সেই শিক্ষার আলো ভারতের রুদ্ধ দ্বারের বাইরে।

রাশিয়ায় যখন যাত্রা করলুম খুব বেশি আশা করি নি। কেননা, কতটা সাধ্য এবং অসাধ্য তার আদর্শ ব্রিটিশ ভারতবর্ষ থেকেই আমি পেয়েছি। ভারতের উন্নতিসাধনের দুরূহতা যে কত বেশি সে কথা স্বয়ং খৃস্টান পাদ্রি টমসন অতি করুণস্বরে সমস্ত পৃথিবীর কাছে জানিয়েছেন। আমাকেও মানতে হয়েছে দুরূহতা আছে বই-কি, নইলে আমাদের এমন দশা হবেই বা কেন। একটা কথা আমার জানা ছিল, রাশিয়ায় প্রজাসাধারণের উন্নতিবিধান ভারতবর্ষের চেয়ে বেশি দুরূহ বই কম নয়। প্রথমত এখানকার সমাজে যারা ভদ্রেতর শ্রেণীতে ছিল আমাদের দেশের সেই শ্রেণীর লোকের মতোই তাদের অন্তর-বাহিরের অবস্থা। সেইরকমই নিরক্ষর নিরুপায়, পূজার্চনা পুরুতপাণ্ডা দিনক্ষণ তাগাতাবিজে বুদ্ধিসুদ্ধি সমস্ত চাপা-পড়া, উপরওআলাদের পায়ের ধুলোতেই মলিন তাদের আত্মসম্মান, আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের সুযোগ-সুবিধা তারা কিছুই পায় নি, প্রপিতামহদের ভূতে-পাওয়া তাদের ভাগ্য, সেই ভূত তাদের বেঁধে রেখেছে হাজার বছরের আগেকার অচল খোঁটায়— মাঝে মাঝে য়িহুদী প্রতিবেশীদের 'পরে খুন চেপে যায়, তখন পাশবিক নিষ্ঠুরতার আর অন্ত থাকে না। উপরওআলাদের কাছ থেকে চাবুক খেতে যেমন মজবুত, নিজেদের সমশ্রেণীর প্রতি অন্যায় অত্যাচার করতে তারা তেমনি প্রস্তুত।

এই তো হল ওদের দশা— বর্তমানে যাদের হাতে ওদের ভাগ্য ইংরেজের মতো তারা ঐশ্বর্যশালী নয়, কেবলমাত্র ১৯১৭ খৃস্টাব্দের পর থেকে নিজের দেশে তাদের অধিকার আরম্ভ হয়েছে; রাষ্ট্রব্যবস্থা আটে-ঘাটে পাকা হবার মতো সময় এবং সম্বল তারা পায় নি; ঘরে-বাইরে প্রতিকূলতা; তাদের মধ্যে আত্মবিদ্রোহ সমর্থন করবার জন্যে ইংরেজ এমন-কি আমেরিকানরাও গোপনে ও প্রকাশ্যে চেষ্টা করছে। জনসাধারণকে সক্ষম ও শিক্ষিত করে তোলবার জন্যে তারা যে পণ করেছে তার 'ডিফিকাল্‌টি' ভারতকর্তৃপক্ষের ডিফিকাল্‌টির চেয়ে বহুগুণে বড়ো।

অতএব রাশিয়ায় গিয়ে বেশি কিছু দেখতে পাব এরকম আশা করা অন্যায় হত। কীই বা জানি, কীই বা দেখেছি যাতে আমাদের আশার জোর বেশি হতে পারে। আমাদের দুঃখী দেশে লালিত অতিদুর্বল আশা নিয়ে রাশিয়ায় গিয়েছিলুম। গিয়ে যা দেখলুম তাতে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি। 'ল অ্যাণ্ড্ অর্ডার' কী পরিমাণে রক্ষিত হচ্ছে বা না হচ্ছে তার তদন্ত করবার যথেষ্ট সময় পাই নি— শোনা যায়, যথেষ্ট জবরদস্তি

আছে; বিনা বিচারে দ্রুত পদ্ধতিতে শাস্তি, সেও চলে; আর-সব বিষয়ে স্বাধীনতা আছে, কিন্তু কর্তৃপক্ষের বিধানের বিরুদ্ধে নেই। এটা তো হল চাঁদের কলঙ্কের দিক, কিন্তু আমার দেখবার প্রধান লক্ষ্য ছিল আলোকের দিক। সে দিকটাতে যে দীপ্তি দেখা গেল সে অতি আশ্চর্য— যারা একেবারেই অচল ছিল তারা সচল হয়ে উঠেছে।

শোনা যায় য়ুরোপের কোনো কোনো তীর্থস্থানে দৈবকৃপায় এক মুহূর্তে চিরপঙ্গু তার লাঠি ফেলে এসেছে। এখানে তাই হল; দেখতে দেখতে খুঁড়িয়ে চলবার লাঠি দিয়ে এরা ছুটে চলবার রথ বানিয়ে নিচ্ছে, পদাতিকের অধম যারা ছিল তারা বছর দশেকের মধ্যে হয়ে উঠেছে রথী। মানবসমাজে তারা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তাদের বুদ্ধি স্ববশ, তাদের হাত-হাতিয়ার স্ববশ।

আমাদের সম্রাট্‌বংশীয় খৃস্টান পাদ্রিরা বহুকাল ভারতবর্ষে কাটিয়েছেন, ডিফিকাল্‌টিজ যে কিরকম অনড় তা তাঁরা দেখে এসেছেন। একবার তাঁদের মস্কৌ আসা উচিত। কিন্তু এলে বিশেষ ফল হবে না। কারণ বিশেষ করে কলঙ্ক দেখাই তাঁদের ব্যাবসা-গত অভ্যাস; আলো চোখে পড়ে না, বিশেষত যাদের উপর বিরাগ আছে। ভুলে যান তাঁদের শাসনচন্দ্রেও কলঙ্ক খুঁজে বের করতে বড়ো চশমার দরকার করে না।

প্রায় সত্তর বছর আমার বয়স হল; এতকাল আমার ধৈর্যচ্যুতি হয় নি। নিজেদের দেশের অতি দুর্বহ মূঢ়তার বোঝার দিকে তাকিয়ে নিজের ভাগ্যকেই বেশি করে দোষ দিয়েছি। অতি সামান্য শক্তি নিয়ে অতি সামান্য প্রতিকারের চেষ্টাও করেছি, কিন্তু জীর্ণ আশার রথ যত মাইল চলেছে তার চেয়ে বেশি সংখ্যায় দড়ি ছিঁড়েছে, চাকা ভেঙেছে। দেশের হতভাগাদের দুঃখের দিকে তাকিয়ে সমস্ত অভিমান বিসর্জন দিয়েছি। কর্তৃপক্ষের কাছে সাহায্য চেয়েছি; তাঁরা বাহবাও দিয়েছেন; যেটুকু ভিক্ষে দিয়েছেন তাতে জাত যায় পেট ভরে না। সব চেয়ে দুঃখ এবং লজ্জার কথা এই যে, তাঁদের প্রসাদলালিত আমাদের স্বদেশী জীবরাই সব চেয়ে বাধা দিয়েছে। যে দেশ পরের কর্তৃত্বে চালিত সেই দেশে সব চেয়ে গুরুতর ব্যাধি হল এই— সে-সব জায়গায় দেশের লোকের মনে যে ঈর্ষা যে ক্ষুদ্রতা যে স্বদেশবিরুদ্ধতার কলুষ জন্মায় তার মতো বিষ নেই।

বাইরের সকল কাজের উপরেও একটা জিনিস আছে যেটা আত্মার সাধনা। রাষ্ট্রিক আর্থিক নানা গোলেমালে যখন মনটা আবিল হয়ে ওঠে তখন তাকে স্পষ্ট দেখতে পাই নে বলেই তার জোর কমে যায়। আমার মধ্যে যে বিপদ আছে, সেই-জন্যেই আসল জিনিসকে আঁকড়ে ধরতে চাই। কেউ বা আমাকে উপহাস করে, কেউ বা আমার উপর রাগ করে, তাদের নিজের পথেই আমাকে টেনে নিতে চায়। কিন্তু

কোথা থেকে জানি নে আমি এসেছি এই পৃথিবীর তীর্থে, আমার পথ আমার তীর্থ-দেবতার বেদীর কাছে। মানুষের দেবতাকে স্বীকার করে এবং প্রণাম করে যাব আমার জীবনদেবতা আমাকে সেই মন্ত্র দিয়েছেন। যখন আমি সেই দেবতার নির্মাল্য ললাটে প'রে যাই তখন সব জাতের লোকই আমাকে ডেকে আসন দেয়, আমার কথা মন দিয়ে শোনে। যখন ভারতবর্ষীয়ের মুখোস পরে দাঁড়াই তখন বাধা বিস্তর। যখন আমাকে এরা মানুষরূপে দেখে তখনই এরা আমাকে ভারতবর্ষীয়রূপেই শ্রদ্ধা করে; যখন নিছক ভারতবর্ষীয়রূপে দেখা দিতে চাই তখন এরা আমাকে মানুষরূপে সমাদর করতে পারে না। আমার স্বধর্ম পালন করতে গিয়ে আমার চলবার পথ ভুল-বোঝার দ্বারা বন্ধুর হয়ে ওঠে। আমার পৃথিবীর মেয়াদ সংকীর্ণ হয়ে এসেছে; অতএব আমাকে সত্য হবার চেষ্টা করতে হবে, প্রিয় হবার নয়।

আমার এখানকার খবর সত্য মিথ্যা নানাভাবে দেশে গিয়ে পৌঁছয়। সে সম্বন্ধে সব সময় উদাসীন থাকতে পারি নে বলে নিজের উপর ধিক্কার জন্মে। বার বার মনে হয়, বানপ্রস্থের বয়সে সমাজস্থের মতো ব্যবহার করতে গেলে বিপদে পড়তে হয়।

যাই হোক এ দেশের 'এনর্মাস্ ডিফিকাল্‌টিজ'এর কথা বইয়ে পড়েছিলুম, কানে শুনেছিলুম, কিন্তু সেই ডিফিকাল্‌টিজ অতিক্রমণের চেহারা চোখে দেখলুম। ইতি

৪ অক্টোবর ১৯৩০

৯

ব্রেমেন জাহাজ

আমাদের দেশে পলিটিক্‌স্‌কে যারা নিছক পালোয়ানি বলে জানে সব-রকম ললিতকলাকে তারা পৌরুষের বিরোধী বলে ধরে রেখেছেন। এ সম্বন্ধে আমি আগেই লিখেছি। রাশিয়ার জার ছিল একদিন দশাননের মতো সম্রাট; তার সাম্রাজ্য পৃথিবীর অনেকখানিকেই অজগর সাপের মতো গিলে ফেলেছিল, লেজের পাকে যাকে সে জড়িয়েছে তার হাড়গোড় দিয়েছে পিষে।

প্রায় বছর-তেরো হল এরই প্রতাপের সঙ্গে বিপ্লবীদের ঝুটোপুটি বেধে গিয়েছিল। সম্রাট যখন গুষ্টিসুদ্ধ গেল সরে তখনো তার সাঙ্গোপাঙ্গরা দাপিয়ে বেড়াতে লাগল, তাদের অস্ত্র এবং উৎসাহ জোগালে অপর সাম্রাজ্যভোগীরা। বুঝতেই পারছ ব্যাপার-খানা সহজ ছিল না। একদা যারা ছিল সম্রাটের উপগ্রহ, ধনীর দল, চাষীদের 'পরে যাদের ছিল অসীম প্রভুত্ব, তাদের সর্বনাশ বেধে গেল। লুটপাট কাড়াকাড়ি চলল;

তাদের বহুমূল্য ভোগের সামগ্রী ছারখার করবার জন্যে প্রজারা হন্যে হয়ে উঠেছে। এতবড়ো উচ্ছৃঙ্খল উৎপাতের সময় বিপ্লবী নেতাদের কাছ থেকে কড়া হুকুম এসেছে— আর্ট্-সামগ্রীকে কোনোমতে যেন নষ্ট হতে দেওয়া না হয়। ধনীদের পরিত্যক্ত প্রাসাদ থেকে ছাত্ররা অধ্যাপকেরা অর্ধ-অভুক্ত শীতক্লিষ্ট অবস্থায় দল বেঁধে যা-কিছু রক্ষাযোগ্য জিনিস সমস্ত উদ্ধার করে য়ুনিভার্সিটির ম্যুজিয়মে সংগ্রহ করতে লাগল।

মনে আছে আমরা যখন চীনে গিয়েছিলুম কী দেখেছিলুম। য়ুরোপের সাম্রাজ্য-ভোগীরা পিকিনের বসন্তপ্রাসাদকে কিরকম ধূলিসাৎ করে দিয়েছে, বহু যুগের অমূল্য শিল্পসামগ্রী কিরকম লুটে পুটে ছিঁড়ে ভেঙে দিয়েছে উড়িয়ে-পুড়িয়ে। তেমন সব জিনিস জগতে আর কোনোদিন তৈরি হতেই পারবে না।

সোভিয়েটরা ব্যক্তিগতভাবে ধনীকে বঞ্চিত করেছে, কিন্তু যে ঐশ্বর্যে সমস্ত মানুষের চিরদিনের অধিকার, বর্বরের মতো তাকে নষ্ট হতে দেয় নি। এতদিন যারা পরের ভোগের জন্যে জমি চাষ করে এসেছে এরা তাদের যে কেবল জমির স্বত্ব দিয়েছে তা নয়; জ্ঞানের জন্যে, আনন্দের জন্যে, মানবজীবনের যা-কিছু মূল্যবান সমস্ত তাদের দিতে চেয়েছে; শুধু পেটের ভাত পশুর পক্ষে যথেষ্ট, মানুষের পক্ষে নয়— এ কথা তারা বুঝেছিল এবং প্রকৃত মনুষ্যত্বের পক্ষে পালোয়ানির চেয়ে আর্টের অনুশীলন অনেক বড়ো এ কথা তারা স্বীকার করেছে।

এদের বিপ্লবের সময় উপরতলার অনেক জিনিস নীচে তলিয়ে গেছে এ কথা সত্য, কিন্তু টিঁকে রয়েছে এবং ভরে উঠেছে ম্যুজিয়ম থিয়েটর লাইব্রেরি সংগীতশালা।

আমাদের দেশের মতোই একদা এদের গুণীর গুণপনা প্রধানত ধর্মমন্দিরেই প্রকাশ পেত। মোহন্তেরা নিজের স্থূল রুচি নিয়ে তার উপরে যেমন-খুশি হাত চালিয়েছে। আধুনিক শিক্ষিত ভক্ত বাবুরা পুরীর মন্দিরকে যেমন চুনকাম করতে সংকুচিত হয় নি, তেমনি এখানকার মন্দিরের কর্তারা আপন সংস্কার-অনুসারে সংস্কৃত করে প্রাচীন কীর্তিকে অবাধে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে— তার ঐতিহাসিক মূল্য যে সর্ব-জনের সর্বকালের পক্ষে এ কথা তারা মনে করে নি, এমন-কি পুরোনো পুজোর পাত্র-গুলিকে নূতন করে ঢালাই করেছে। আমাদের দেশেও মঠে মন্দিরে অনেক জিনিস আছে, ইতিহাসের পক্ষে যা মূল্যবান। কিন্তু কারো তা ব্যবহার করবার জো নেই— মোহন্তেরাও অতলস্পর্শ মোহে মগ্ন— সেগুলিকে ব্যবহার করবার মতো বুদ্ধি ও বিদ্যার ধার ধারে না; ক্ষিতিবাবুর কাছে শোনা যায়, প্রাচীন অনেক পুঁথি মঠে মঠে আটক পড়ে আছে, দৈত্যপুরীতে রাজকন্যার মতো, উদ্ধার করবার উপায় নেই।

বিপ্লবীরা ধর্মমন্দিরের সম্পত্তির বেড়া ভেঙে দিয়ে সমস্তকেই সাধারণের সম্পত্তি করে

দিয়েছে। যেগুলি পূজার সামগ্রী সেগুলি রেখে বাকি সমস্ত জমা করা হচ্ছে ম্যুজিয়মে। এক দিকে যখন আত্মবিপ্লব চলছে, যখন চার দিকে টাইফয়িডের প্রবল প্রকোপ, রেলের পথ সব উৎখাত, সেই সময়ে বৈজ্ঞানিক সন্ধানীর দল গিয়েছে প্রত্যন্তপ্রদেশ সমস্ত হাৎড়িয়ে পুরাকালীন শিল্পসামগ্রী উদ্ধার করবার জন্যে। কত পুঁথি কত ছবি কত খোদকারির কাজ সংগ্রহ হল তার সীমা নেই।

এ তো গেল ধনীগৃহে বা ধর্মমন্দিরে যা-কিছু পাওয়া গেছে তারই কথা। দেশের সাধারণ চাষীদের, কর্মিকদের কৃত শিল্পসামগ্রী, পূর্বতন কালে যা অবজ্ঞাভাজন ছিল তার মূল্য নিরূপণ করবার দিকেও দৃষ্টি পড়েছে। শুধু ছবি নয়, লোকসাহিত্য লোকসংগীত প্রভৃতি নিয়েও প্রবলবেগে কাজ চলছে।

এই তো গেল সংগ্রহ, তার পরে এই-সমস্ত সংগ্রহ নিয়ে লোকশিক্ষার ব্যবস্থা। ইতিপূর্বেই তার বিবরণ লিখেছি। এত কথা যে তোমাকে লিখছি তার কারণ এই, দেশের লোককে আমি জানাতে চাই, আজ কেবলমাত্র দশ বছরের আগেকার রাশিয়ার জনসাধারণ আমাদের বর্তমান জনসাধারণের সমতুল্যই ছিল ; সোভিয়েট শাসনে এই-জাতীয় লোককেই শিক্ষার দ্বারা মানুষ করে তোলবার আদর্শ কতখানি উচ্চ। এর মধ্যে বিজ্ঞান সাহিত্য সংগীত চিত্রকলা সমস্তই আছে— অর্থাৎ আমাদের দেশের ভদ্রনামধারীদের জন্যে শিক্ষার যে আয়োজন তার চেয়ে অনেক গুণেই সম্পূর্ণতর।

কাগজে পড়লুম, সম্প্রতি দেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন উপলক্ষে হুকুম পাস হয়েছে প্রজাদের কান ম'লে শিক্ষাকর আদায় করা, এবং আদায়ের ভার পড়েছে জমিদারের 'পরে। অর্থাৎ যারা অমনিতেই আধমরা হয়ে রয়েছে শিক্ষার ছুতো করে তাদেরই মার বাড়িয়ে দেওয়া।

শিক্ষাকর চাই বইকি, নইলে খরচ জোগাবে কিসে। কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্যে যে কর, কেন দেশের সবাই মিলে সে কর দেবে না। সিভিল সার্ভিস আছে, মিলিটারি সার্ভিস আছে, গভর্নর ভাইসরয় ও তাঁদের সদস্যবর্গ আছেন, কেন তাঁদের পরিপূর্ণ পকেটে হাত দেবার জো নেই। তাঁরা কি এই চাষীদের অন্নের ভাগ থেকেই বেতন নিয়ে ও পেনসন নিয়ে অবশেষে দেশে গিয়ে ভোগ করেন না। পাটকলের যে-সব বড়ো বড়ো বিলাতি মহাজন পাটের চাষীর রক্ত দিয়ে মোটা মুনফার সৃষ্টি করে দেশে রওনা করে, সেই মৃতপ্রায় চাষীদের শিক্ষা দেবার জন্যে তাদের কোনোই দায়িত্ব নেই ? যে-সব মিনিস্টার শিক্ষা-আইন পাস নিয়ে ভরা পেটে উৎসাহ প্রকাশ করেন তাঁদের উৎসাহের কানাকড়ি মূল্যও কি তাঁদের নিজের তহবিল থেকে দিতে হবে না।

একেই বলে শিক্ষার জন্যে দরদ ? আমি তো একজন জমিদার, আমার প্রজাদের

প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে কিছু দিয়েও থাকি— আরো দ্বিগুণ তিনগুণ যদি দিতে হয় তো তাও দিতে রাজি আছি, কিন্তু এই কথাটা প্রতিদিন তাদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার হবে যে, আমি তাদের আপন লোক, তাদের শিক্ষায় আমারই মঙ্গল এবং আমিই তাদের দিচ্ছি, দিচ্ছে না এই রাজ্যশাসকদের সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন শ্রেণীর একজনও এক পয়সাও।

সোভিয়েট রাশিয়ায় জনসাধারণের উন্নতিবিধানের চাপ খুবই বেশি, সেজন্যে আহারে বিহারে লোকে কষ্ট পাচ্ছে কম নয়, কিন্তু এই কষ্টের ভাগ উপর থেকে নীচে পর্যন্ত সকলেই নিয়েছে। তেমন কষ্টকে তো কষ্ট বলব না, সে যে তপস্যা। প্রাথমিক শিক্ষার নামে কণামাত্র শিক্ষা চালিয়ে ভারত-গবর্মেণ্ট এতদিন পরে দু-শো বছরের কলঙ্ক মোচন করতে চান— অথচ তার দাম দেবে তারাই যারা দাম দিতে সকলের চেয়ে অক্ষম; গবর্মেণ্টের প্রশ্রয়লালিত বহ্বাশী বাহন যারা তারা নয়, তারা আছে গৌরব ভোগ করবার জন্যে।

আমি নিজের চোখে না দেখলে কোনোমতেই বিশ্বাস করতে পারতুম না যে, অশিক্ষা ও অবমাননার নিম্নতম তল থেকে আজ কেবলমাত্র দশ বৎসরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এরা শুধু ক খ গ ঘ শেখায় নি, মনুষ্যত্বে সম্মানিত করেছে। শুধু নিজের জাতকে নয়, অন্য জাতের জন্যেও এদের সমান চেষ্টা। অথচ সাম্প্রদায়িক ধর্মের মানুষেরা এদের অধার্মিক বলে নিন্দা করে। ধর্ম কি কেবল পুঁথির মন্ত্রে, দেবতা কি কেবল মন্দিরের প্রাঙ্গণে। মানুষকে যারা কেবলই ফাঁকি দেয় দেবতা কি তাদের কোনোখানে আছে।

অনেক কথা বলবার আছে। এরকম তথ্য সংগ্রহ করে লেখা আমার অভ্যস্ত নয়, কিন্তু না-লেখা আমার অন্যায় হবে বলে লিখতে বসেছি। রাশিয়ার শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে লিখব বলে আমার সংকল্প আছে। কতবার মনে হয়েছে আর-কোথাও নয়, রাশিয়ায় এসে একবার তোমাদের সব দেখে যাওয়া উচিত। ভারতবর্ষ থেকে অনেক চর সেখানে যায়, বিপ্লবপন্থীরাও আনাগোনা করে; কিন্তু আমার মনে হয় কিছুর জন্যে নয়, কেবল শিক্ষাসম্বন্ধে শিক্ষা করতে যাওয়া আমাদের পক্ষে একান্ত দরকার।

যাক, আমার নিজের খবর দিতে উৎসাহ পাই নে। আমি যে আর্টিস্ট্ এই অভিমান মনে প্রবল হবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু এ পর্যন্ত বাইরে খ্যাতি পেয়েছি, অন্তরে পৌঁছয় না। কেবলই মনে হয়, দৈবগুণে পেয়েছি, নিজগুণে নয়।

ভাসছি এখন মাঝ-সমুদ্রে। পারে গিয়ে কপালে কী আছে জানি নে। শরীর

ক্লান্ত, মন অনিচ্ছুক। শূন্য ভিক্ষাপাত্রের মতো ভারী জিনিস জগতে আর কিছুই নেই, সেটা জগন্নাথকে শেষ নিবেদন করে দিয়ে কবে আমি ছুটি পাব। ইতি ৫ অক্টোবর ১৯৩০

১০

D. 'Bremen'

বিজ্ঞানশিক্ষায় পুঁথির পড়ার সঙ্গে চোখের দেখার যোগ থাকা চাই, নইলে সে শিক্ষার বারো-আনা ফাঁকি হয়। শুধু বিজ্ঞান কেন, অধিকাংশ শিক্ষাতেই এ কথা খাটে। রাশিয়াতে বিবিধ বিষয়ের ম্যুজিয়মের যোগে সেই শিক্ষার সহায়তা করা হয়েছে। এই ম্যুজিয়ম শুধু বড়ো বড়ো শহরে নয়, প্রদেশে প্রদেশে, সামান্য পল্লীগ্রামের লোকেরও আয়ত্তগোচরে।

চোখে দেখে শেখার আর-একটা প্রণালী হচ্ছে ভ্রমণ। তোমরা তো জান'ই আমি অনেক দিন থেকেই ভ্রমণ-বিদ্যালয়ের সংকল্প মনে বহন করে এসেছি। ভারতবর্ষ এতবড়ো দেশ, সকল বিষয়েই তার এত বৈচিত্র্য বেশি যে, তাকে সম্পূর্ণ করে উপলব্ধি করা হণ্টারের গেজেটিয়র পড়ে হতে পারে না। এক সময়ে পদব্রজে তীর্থভ্রমণ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল— আমাদের তীর্থগুলিও ভারতবর্ষের সকল অংশে ছড়ানো। ভারতবর্ষকে যথাসম্ভব সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষ অনুভব করবার এই ছিল উপায়। শুধুমাত্র শিক্ষাকে লক্ষ্য করে পাঁচ বছর ধরে ছাত্রদের যদি সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরিয়ে নেওয়া যায় তা হলে তাদের শিক্ষা পাকা হয়।

মন যখন সচল থাকে সে তখন শিক্ষার বিষয়কে সহজে গ্রহণ ও পরিপাক করতে পারে। বাঁধা খোরাকের সঙ্গে সঙ্গেই ধেনুদের চ'রে খেতে দেওয়ারও দরকার হয়— তেমনি বাঁধা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই চ'রেঃ শিক্ষা মনের পক্ষে অত্যাবশ্যক। অচল বিদ্যালয়ে বন্দী হয়ে অচল ক্লাসের পুঁথির খোরাকিতে মনের স্বাস্থ্য থাকে না। পুঁথির প্রয়োজন একেবারে অস্বীকার করা যায় না— জ্ঞানের বিষয় মানুষের এত বেশি যে, ক্ষেত্রে গিয়ে তাদের আহরণ করবার উপায় নেই, ভাণ্ডার থেকেই তাদের বেশির ভাগ সংগ্রহ করতে হয়। কিন্তু পুঁথির বিদ্যালয়কে সঙ্গে করে নিয়ে যদি প্রকৃতির বিদ্যালয়ের মধ্যে দিয়ে ছাত্রদের বেড়িয়ে নিয়ে আসা যায় তা হলে কোনো অভাব থাকে না। এ সম্বন্ধে অনেক কথা আমার মনে ছিল, আশা ছিল যদি সম্বল জোটে তবে কোনো-এক সময়ে শিক্ষাপরিব্রজন চালাতে পারব। কিন্তু আমার সময়ও নেই, সম্বলও জুটবে না।

সোভিয়েট রাশিয়ায় দেখছি সর্বসাধারণের জন্য দেশভ্রমণের ব্যবস্থা ফলাও করে তুলছে। বৃহৎ এদের দেশ, বিচিত্রজাতীয় মানুষ তার অধিবাসী। জার-শাসনের সময়ে এদের পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ জানাশোনা মেলামেশার সুযোগ ছিল না বললেই হয়। বলা বাহুল্য, তখন দেশভ্রমণ ছিল শখের জিনিস, ধনী লোকের পক্ষেই ছিল সম্ভব। সোভিয়েট আমলে সর্বসাধারণের জন্য তার উদ্যোগ। শ্রমক্লান্ত এবং রুগ্ণ কর্মিকদের শ্রান্তি এবং রোগ দূর করবার জন্যে প্রথম থেকেই সোভিয়েটরা দূরে নিকটে নানা স্থানে স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপনের চেষ্টা করেছে। আগেকার কালের বড়ো বড়ো প্রাসাদ তারা এই কাজে লাগিয়েছে। সে-সব জায়গায় গিয়ে বিশ্রাম এবং আরোগ্যলাভ যেমন একটা লক্ষ্য তেমনি শিক্ষালাভ আর-একটা।

লোকহিতের প্রতি যাদের অনুরাগ আছে এই ভ্রমণ-উপলক্ষে তারা নানা স্থানে নানা লোকের আনুকূল্য করবার অবকাশ পায়। জনসাধারণকে দেশভ্রমণে উৎসাহ দেওয়া এবং তার সুবিধা করে দেওয়ার জন্যে পথের মাঝে মাঝে বিশেষ বিশেষ শিক্ষা-বিতরণের উপযোগী প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছে, সেখানে পথিকদের আহারনিদ্রার ব্যবস্থা আছে, তা ছাড়া সকল-রকম দরকারি বিষয়ে তারা পরামর্শ পেতে পারে। ককেশীয় প্রদেশ ভূতত্ত্ব-আলোচনার উপযুক্ত স্থান। সেখানে এইরকম পান্থ-শিক্ষালয় থেকে ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ পাবার আয়োজন আছে। যে-সব প্রদেশ বিশেষভাবে নৃতত্ত্ব-আলোচনার উপযোগী সে-সব জায়গায় পথিকদের জন্যে নৃতত্ত্ববিৎ উপদেশক তৈরি করে নেওয়া হয়েছে।

গ্রীষ্মের সময় হাজার হাজার ভ্রমণেচ্ছু আপিসে নাম রেজেস্ট্রি করে। যে মাস থেকে আরম্ভ করে দলে দলে নানা পথ বেয়ে প্রতিদিন যাত্রা চলে— এক-একটি দলে পঁচিশ-ত্রিশটি করে যাত্রী। ১৯২৮ খৃস্টাব্দে এই যাত্রীসংঘের সভ্যসংখ্যা ছিল তিন হাজারের কাছাকাছি— ২৯-এ হয়েছে বারো হাজারের উপর।

এ সম্বন্ধে য়ুরোপের অন্যত্র বা আমেরিকার সঙ্গে তুলনা করা সংগত হবে না; সর্বদাই মনে রাখা দরকার হবে যে, রাশিয়ায় দশ বছর আগে শ্রমিকদের অবস্থা আমাদের মতোই ছিল— তারা শিক্ষা করবে, বিশ্রাম করবে বা আরোগ্য লাভ করবে, সেজন্যে কারো কোনো খেয়াল ছিল না— আজ এরা যে-সমস্ত সুবিধা সহজেই পাচ্ছে তা আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের আশাতীত এবং ধনীদের পক্ষেও সহজ নয়। তা ছাড়া শিক্ষালাভের ধারা সমস্ত দেশ বেয়ে একসঙ্গে কত প্রণালীতে প্রবাহিত তা আমাদের সিবিল-সার্বিসে-পাওয়া দেশের লোকের পক্ষে ধারণা করাই কঠিন।

যেমন শিক্ষার ব্যবস্থা তেমনি স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা। স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে সোভিয়েট

রাশিয়ায় যেরকম বৈজ্ঞানিক অনুশীলন চলছে তা দেখে য়ুরোপ আমেরিকার পণ্ডিতেরা প্রচুর প্রশংসা করেছেন। শুধু মোটা বেতনের বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পুঁথি সৃষ্টি করা নয়, সর্বজনের মধ্যে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রয়োগ যাতে পরিব্যাপ্ত হয়, এমন-কি এ দেশের চৌরঙ্গী থেকে যারা বহু দূরে থাকে তারাও যাতে অস্বাস্থ্যকর অবস্থার মধ্যে অযত্নে বা বিনা চিকিৎসায় মারা না যায় সে দিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি আছে।

বাংলাদেশে ঘরে ঘরে যক্ষ্মারোগ ছড়িয়ে পড়ছে— রাশিয়া দেখে অবধি এ প্রশ্ন মন থেকে তাড়াতে পারছি নে যে, বাংলাদেশের এই-সব অল্পবিত্ত মুমূর্ষুদের জন্যে কটা আরোগ্যাশ্রম আছে। এ প্রশ্ন আমার মনে সম্প্রতি আরো জেগেছে এইজন্যে যে, খৃস্টান ধর্মযাজক ভারতশাসনে অসাধারণ ডিফিকল্‌টিজ নিয়ে আমেরিকার লোকের কাছে বিলাপ করছেন।

ডিফিকল্‌টিজ আছে বইকি। এক দিকে সেই ডিফিকল্‌টিজের মূলে আছে ভারতীয়দের অশিক্ষা, অপর দিকে ভারতশাসনের ভূরিব্যয়িতা। সেজন্যে দোষ দেব কাকে। রাশিয়ায় অন্নবস্ত্রের সচ্ছলতা আজও হয় নি, রাশিয়াও বহুবিস্তৃত দেশ, সেখানেও বহু বিচিত্র জাতির বাস, সেখানেও অজ্ঞান এবং স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে অনাচার ছিল পর্বতপ্রমাণ; কিন্তু শিক্ষাও বাধা পাচ্ছে না, স্বাস্থ্যও না। সেইজন্যেই প্রশ্ন না করে থাকা যায় না, ডিফিকল্‌টিজটা ঠিক কোন্‌খানে।

যারা খেটে খায় তারা সোভিয়েট স্বাস্থ্যনিবাসে বিনাব্যয়ে থাকতে পারে, তা ছাড়া এই স্বাস্থ্যনিবাসের সঙ্গে সঙ্গে থাকে আরোগ্যালয় (sanatorium)। সেখানে শুধু চিকিৎসা নয়, পথ্য ও শুশ্রূষার উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে। এই-সমস্ত ব্যবস্থাই সর্বসাধারণের জন্যে। সেই সর্বসাধারণের মধ্যে এমন-সব জাত আছে যারা য়ুরোপীয় নয় এবং য়ুরোপীয় আদর্শ -অনুসারে যাদের অসভ্য বলা হয়ে থাকে।

এইরকম পিছিয়ে-পড়া জাত, যারা য়ুরোপীয় রাশিয়ার প্রাঙ্গণের ধারে বা বাইরে বাস করে তাদের শিক্ষার জন্য ১৯২৮ খৃস্টাব্দের বজেটে কত টাকা ধরে দেওয়া হয়েছে তা দেখলে শিক্ষার জন্যে কী উদার প্রয়াস তা বুঝতে পারবে। য়ুক্রেনিয়ান রিপব্লিকের জন্য ৪০ কোটি ৩০ লক্ষ, অতি-ককেশীয় রিপব্লিকের জন্য ১৩ কোটি ৪০ লক্ষ, উজবেকিস্তানের জন্য ৯ কোটি ৭০ লক্ষ, তুর্কমেনিস্তানের জন্য ২ কোটি ৯ লক্ষ রুব্‌ল্‌।

অনেক দেশে আরবী অক্ষরের চলন থাকাতে শিক্ষাবিস্তারের বাধা হচ্ছিল, সেখানে রোমক বর্ণমালা চালিয়ে দেওয়াতে শিক্ষার কাজ সহজ হয়েছে।

যে বুলেটিন থেকে তথ্য সংগ্রহ করছি তারই দুটি অংশ তুলে দিই :

Another of the most important tasks in the sphere of culture is

undoubtedly the stabilization of local administrative institutions and the transfer of all local government and administrative work in the federative and autonomous republics to a language which is familiar to the toiling masses. This is by no means simple, and great efforts are still needed in this regard, owing to the low cultural level of the mass of the workers and peasants, and lack of sufficient skilled labour.

একটুখানি ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। সোভিয়েট সম্মিলনীর অন্তর্গত কতকগুলি রিপব্লিক ও স্বতন্ত্রশাসিত (autonomous) দেশ আছে। তারা প্রায়ই য়ুরোপীয় নয়, এবং তাদের আচারব্যবহার আধুনিক কালের সঙ্গে মেলে না। উদ্‌ধৃত অংশ থেকে বোঝা যাবে যে, সোভিয়েটদের মতে দেশের শাসনতন্ত্র দেশের লোকের শিক্ষারই একটা প্রধান উপায় ও অঙ্গ। আমাদের দেশের রাষ্ট্রচালনায় ভাষা যদি দেশের লোকের আপন ভাষা হত, তা হলে শাসনতন্ত্রের শিক্ষা তাদের পক্ষে সুগম হত। ভাষা ইংরেজি হওয়াতে শাসননীতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা সাধারণের আয়ত্তাতীত হয়েই রইল। মধ্যস্থের যোগে কাজ চলছে, কিন্তু প্রত্যক্ষ যোগ রইল না। আত্মরক্ষার জন্যে অস্ত্রচালনার শিক্ষা ও অভ্যাস থেকে যেমন জনসাধারণ বঞ্চিত, দেশশাসননীতির জ্ঞান থেকেও তারা তেমনি বঞ্চিত। রাষ্ট্রশাসনের ভাষাও পরভাষা হওয়াতে পরাধীনতার নাগপাশের পাক আরো বেড়ে গেছে। রাজমন্ত্রসভায় ইংরেজি ভাষায় যে আলোচনা হয়ে থাকে তার সফলতা কতদূর আমি আনাড়ি তা বুঝি নে, কিন্তু তার থেকে প্রজাদের যে শিক্ষা হতে পারত তা একটুও হল না।

আর-একটা অংশ :

Whenever questions of cultural-economic construction in the national republics and districts come before the organs of the Soviet government, they are settled not on the lines of guardianship, but on the lines of the maximum development of independence among the board masses of workers and peasants and of initiative of the local Soviet organs.

যাদের কথা বলা হল তারা হচ্ছে পিছিয়ে-পড়া জাত। তাদের আগাগোড়া সমস্তই ডিফিকল্‌টিজ, কিন্তু এই ডিফিকল্‌টিজ সরিয়ে দেবার জন্যে সোভিয়েটরা দু-শো বছর চুপচাপ বসে থাকবার বন্দোবস্ত করে নি। ইতিমধ্যে দশ বছর কাজ করেছে। দেখে-শুনে ভাবছি, আমরা কি উজবেকদের চেয়ে, তুর্কমানীদের চেয়েও, পিছিয়ে-পড়া জাত। আমাদের ডিফিকল্‌টিজের মাপ কি এদের চেয়েও বিশগুণ বেশি।

একটা কথা মনে পড়ল। এদের এখানে খেলনার ম্যুজিয়ম আছে। এই খেলনা-

সংগ্রহের সংকল্প বহুকাল থেকে আমার মনের মধ্যে ঘুরেছে। তোমাদের নন্দনালয়ে কলাভাণ্ডারে এই কাজ অবশেষে আরম্ভও হল। রাশিয়া থেকে কিছু খেলনা পেয়েছি। অনেকটা আমাদেরই মতো।

পিছিয়ে-পড়া জাতের সম্বন্ধে আরো কিছু জানাবার আছে। কাল লিখব। পরশু সকালে পৌঁছব নিয়ুইয়র্কে— তার পরে লেখবার যথেষ্ট অবসর পাব কি না কে জানে। ইতি ৭ অক্টোবর ১৯৩০

১১

পিছিয়ে-পড়া জাতের শিক্ষার জন্যে সোভিয়েট রাশিয়ায় কিরকম উদ্যোগ চলছে সে কথা তোমাকে লিখেছি। আজ দুই-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

উরাল পর্বতের দক্ষিণে বাষ্‌কিরদের বাস। জারের আমলে সেখানকার সাধারণ প্রজার অবস্থা আমাদের দেশের মতোই ছিল। তারা চির-উপবাসের ধার দিয়ে দিয়েই চলত। বেতনের হার ছিল অতি সামান্য, কোনো কারখানায় বড়োরকমের কাজ করবার মতো শিক্ষা ছিল না, অবস্থাগতিকে তাদের ছিল নিতান্তই মজুরের কাজ। বিপ্লবের পরে এই দেশের প্রজাদের স্বতন্ত্র শাসনের অধিকার দেবার চেষ্টা আরম্ভ হল।

প্রথমে যাদের উপর ভার পড়েছিল তারা ছিল আগেকার আমলের ধনী জোতদার, ধর্মযাজক এবং বর্তমানে আমাদের ভাষায় যাদের বলে থাকি শিক্ষিত। সাধারণের পক্ষে সেটাতে সুবিধা হল না। আবার এই সময়ে উৎপাত আরম্ভ করলে কল্‌চাকের সৈন্য। সে ছিল জার-আমলের পক্ষপাতী, তার পিছনে ছিল ক্ষমতাশালী বহিঃশত্রুদের উৎসাহ এবং আনুকূল্য। সোভিয়েটরা যদি বা তাদের তাড়ালে, এল ভীষণ দুর্ভিক্ষ। দেশে চাষ-বাসের ব্যবস্থা ছারখার হয়ে গেল।

১৯২২ খৃস্টাব্দ থেকে সোভিয়েট আমলের কাজ ঠিকমত শুরু হতে পেরেছে। তখন থেকে দেশে শিক্ষাদান এবং অর্থোৎপত্তির ব্যবস্থা প্রবলবেগে গড়ে উঠতে লাগল। এর আগে বাষ্‌কিরিয়াতে নিরক্ষরতা ছিল প্রায় সর্বব্যাপী। এই কয় বছরের মধ্যে এখানে আটটি নর্মাল স্কুল, পাঁচটি কৃষিবিদ্যালয়, একটি ডাক্তারি শিক্ষালয়, অর্থকরী বিদ্যা শেখাবার জন্যে দুটি, কারখানার কাজে হাত পাকাবার জন্যে সতেরোটি, প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে ২৪৯৫টি এবং মধ্য-প্রাথমিকের জন্যে ৮৭টি স্কুল শুরু হয়েছে। বর্তমানে বাষ্‌কিরিয়াতে দুটি আছে সরকারি থিয়েটার, দুটি ম্যুজিয়ম, চৌদ্দটি পৌরগ্রন্থাগার, ১১২টি গ্রামের পাঠগৃহ (reading room), ৩০টি সিনেমা শহরে এবং ৪৬টি গ্রামে,

চাষীরা কোনো উপলক্ষে শহরে এলে তাদের জন্যে বহুতর বাসা, ৮৯১টি খেলা ও আরামের জায়গা (recreation corners), তা ছাড়া হাজার হাজার কর্মী ও চাষীদের ঘরে রেডিয়ো প্রভৃতিযন্ত্র। বীরভূম জেলার লোক বাষ্‌কিরদের চেয়ে নিঃসন্দেহ স্বভাবত উন্নততর শ্রেণীর জীব। বাষ্‌কিরিয়ার সঙ্গে বীরভূমের শিক্ষা ও আরামের ব্যবস্থা মিলিয়ে দেখো। উভয় পক্ষের ডিফিকল্‌টিজেরও তুলনা করা কর্তব্য হবে।

সোভিয়েট রাষ্ট্রসংঘের মধ্যে যতগুলি রিপাবলিক হয়েছে তার মধ্যে তুর্কমেনিস্তান এবং উজবেকিস্তান সব চেয়ে অল্পদিনের। তাদের পত্তন হয়েছে ১৯২৪ খৃস্টাব্দের অক্টোবরে, অর্থাৎ বছর-ছয়েকের চেয়েও তাদের বয়স কম। তুর্কমেনিস্তানের জনসংখ্যা সবশুদ্ধ সাড়ে দশ লক্ষ। এদের মধ্যে নয় লক্ষ লোক চাষের কাজ করে। কিন্তু নানা কারণে খেতের অবস্থা ভালো নয়, পশুপালনের সুযোগও তদ্রূপ।

এরকম দেশকে বাঁচাবার উপায় কারখানার কাজ খোলা, যাকে বলে industrialization। বিদেশী বা স্বদেশী ধনী মহাজনদের পকেট ভরাবার জন্যে কারখানার কথা হচ্ছে না, এখানকার কারখানার উপস্বত্ব সর্বসাধারণের। ইতিমধ্যেই একটা বড়ো সুতোর কল এবং রেশমের কল খোলা হয়েছে। আশকাবাদ শহরে একটা বৈদ্যুতজনন স্টেশন বসেছে, অন্যান্য শহরেও উদ্যোগ চলেছে। যন্ত্রচালনক্ষম শ্রমিক চাই, তাই বহুসংখ্যক তুর্কমেনি যুবকদের মধ্য-রুশিয়ার বড়ো বড়ো কারখানায় শিক্ষার জন্যে পাঠানো হয়ে থাকে। আমাদের যুবকদের পক্ষে বিদেশী-চালিত কারখানায় শিক্ষার সুযোগলাভ যে কত দুঃসাধ্য তা সকলেরই জানা আছে।

বুলেটিনে লিখছে, তুর্কমেনিস্তানে শিক্ষার ব্যবস্থা করা এত কঠিন যে, তার তুলনা বোধ হয় অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। বিরলবসতি জনসংস্থান দূরে দূরে, দেশে রাস্তার অভাব, জলের অভাব, লোকালয়ের মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো মরুভূমি, লোকের আর্থিক দুরবস্থা অত্যন্ত বেশি।

আপাতত মাথা-পিছু পাঁচ রুবল করে শিক্ষার খরচ পড়ছে। এ দেশের প্রজাসংখ্যার সিকি পরিমাণ লোক যাযাবর (nomads)। তাদের জন্যে প্রাথমিক পাঠশালার সঙ্গে সঙ্গে বোর্ডিং স্কুল খোলা হয়েছে, ইঁদারার কাছাকাছি, যেখানে বহু পরিবার মিলে আড্ডা করে সেইরকম জায়গায়। পড়ুয়াদের জন্যে খবরের কাগজও প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

মস্কো শহরে নদীতীরে সাবেক কালের একটি উদ্যানবেষ্টিত সুন্দর প্রাসাদে তুর্কমেনদের জন্য শিক্ষক শিক্ষিত করবার একটি বিদ্যাভবন (Turcomen People's Home of Education) স্থাপিত হয়েছে। সেখানে সম্প্রতি এক-শো তুর্কমেন ছাত্র শিক্ষা পাচ্ছে, বারো-তেরো বছর তাদের বয়স। এই বিদ্যাভবনের ব্যবস্থা স্বায়ত্তশাসন-

নীতি-অনুসারে। এই ব্যবস্থার মধ্যে কতকগুলি কর্মবিভাগ আছে। যেমন স্বাস্থ্যবিভাগ, গার্হস্থ্যবিভাগ (household commission), ক্লাস-কমিটি। স্বাস্থ্যবিভাগ থেকে দেখা হয়, সমস্ত মহলগুলি (compartments), ক্লাসগুলি, বাসের ঘর, আঙিনা পরিষ্কার আছে কি না। কোনো ছেলের যদি অসুখ করে, তা সে যতই সামান্য হোক, তার জন্যে ডাক্তার দেখাবার বন্দোবস্ত এই বিভাগের 'পরে। গার্হস্থ্যবিভাগের অন্তর্গত অনেকগুলি উপবিভাগ আছে। এই বিভাগের কর্তব্য হচ্ছে দেখা— ছেলেরা পরিষ্কার পরিপাটি আছে কি না। ক্লাসে পড়বার কালে ছেলেদের ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি রাখা ক্লাস-কমিটির কাজ। প্রত্যেক বিভাগ থেকে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে অধ্যক্ষসভা গড়ে ওঠে। এই অধ্যক্ষসভার প্রতিনিধিরা স্কুল-কৌন্সিলে ভোট দেবার অধিকার পায়। ছেলেদের নিজেদের মধ্যে বা আর-কারো সঙ্গে বিবাদ হলে অধ্যক্ষসভা তার তদন্ত করে ; এই সভার বিচার স্বীকার করে নিতে সব ছাত্রই বাধ্য।

এই বিদ্যাভবনের সঙ্গে একটি ক্লাব আছে। সেখানে অনেক সময়ে ছেলেরা নিজের ভাষায় নিজেরা নাট্যাভিনয় করে, গান-বাজনার সংগত হয়। ক্লাবের একটি সিনেমা আছে, তার থেকে মধ্য-এশিয়ার জীবনযাত্রার চিত্রাবলী ছেলেরা দেখতে পায়। এ ছাড়া দেওয়ালে-টাঙানো খবরের কাগজ বের করা হয়।

তুর্কমেনিস্তানের চাষের উন্নতির জন্যে সেখানে বহুসংখ্যক কৃষিবিদ্যার ওস্তাদ পাঠানো হচ্ছে। দু-শো'র বেশি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র খোলা হয়েছে। তা ছাড়া জল এবং জমি ব্যবহার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করা হল তাতে কুড়ি হাজার দরিদ্রতম কৃষক-পরিবার কৃষির খেত, জল এবং কৃষির বাহন পেয়েছে।

এই বিরলপ্রজ দেশে ১৩০টা হাসপাতাল খোলা হয়েছে, ডাক্তারের সংখ্যা ছয়-শো। বুলেটিনের লেখক সলজ্জ ভাষায় বলছেন :

However there is no occasion to rejoice in the fact since there are 2,640 inhabitants to each hospital bed and, as regards doctors, Turcmenistan must be relegated to the last place in the Union. We can boast of some attainments in the field of modernization and the struggle against crass ignorance, though again we must warn the reader that Turcmenistan being on a very low level of civilization has preserved a good many customs of the distant past. However, the recent laws, passed in order to combat the selling of women into marriage and child marriages had produced the desired effect.

তুর্কমেনিস্তানের মতো মরুপ্রদেশে ছয় বৎসরের মধ্যে আপাতত ১৩০টা হাসপাতাল স্থাপন করে এরা লজ্জা পায়— এমনতরো লজ্জা দেখা আমাদের অভ্যাস নেই ব'লে

বড়ো আশ্চর্য বোধ হল। আমাদের ভাগ্যদোষে বিস্তর 'ডিফিকল্‌টিজ' দেখতে পেলুম, সেগুলো নড়ে বসবার কোনো লক্ষণ দেখায় না তাও দেখলুম, কিন্তু বিশেষ লজ্জা দেখতে পাই নে কেন।

সত্যি কথা বলি, ইতিপূর্বে আমারও মনে দেশের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে আশা করবার মতো সাহস চলে গিয়েছিল। খৃস্টান পাদ্রির মতো আমিও ডিফিকল্‌টিজের হিসাব দেখে স্তম্ভিত হয়েছি— মনে মনে বলেছি, এত বিচিত্র জাতের মানুষ, এত বিচিত্র জাতের মূর্খতা, এত পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম, কী জানি কত কাল লাগবে আমাদের ক্লেশের বোঝা, আমাদের কলুষের আবর্জনা নড়াতে।

সাইমন কমিশনের ফসল যে আবহাওয়ায় ফলেছে স্বদেশ সম্বন্ধে আমার প্রত্যাশার ভীরুতা সেই আবহাওয়ারই। সোভিয়েট রাশিয়াতে এসে দেখলুম, এখানকার উন্নতির ঘড়ি আমাদেরই মতো বন্ধ ছিল, অন্তত জনসাধারণের ঘরে— কিন্তু বহু শত বছরের অচল ঘড়িতেও আট-দশ বছর দম লাগাতেই দিব্যি চলতে লেগেছে। এতদিন পরে বুঝতে পেরেছি আমাদের ঘড়িও চলতে পারত, কিন্তু দম দেওয়া হল না। ডিফিকল্‌টিজের মন্ত্র আওড়ানোতে এখন থেকে আর বিশ্বাস করতে পারব না।

এইবার বুলেটিন থেকে দুই-একটি অংশ উদ্‌ধৃত করে চিঠি শেষ করব :

The imperialist policy of the Czarist generals, after the conquest of Azerbaijan, consisted in converting the districts, inhabited by Mahommedans, into colonies destined to supply raw material to the central Russian markets.

মনে আছে অনেক কাল হল, পরলোকগত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় একদা রেশমগুটির চাষ প্রচলন সম্বন্ধে উৎসাহী ছিলেন। তাঁরই পরামর্শ নিয়ে আমিও রেশমগুটির চাষ প্রবর্তনের চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলুম। তিনি আমাকে বলেছিলেন, রেশমগুটির চাষে তিনি ম্যাজিস্‌ট্রেটের কাছ থেকে যথেষ্ট আনুকূল্য পেয়েছিলেন। কিন্তু যতবার এই গুটি থেকে সুতো ও সুতো থেকে কাপড় বোনা চাষীদের মধ্যে চলতি করবার ইচ্ছা করেছেন ততবারই ম্যাজিস্‌ট্রেট দিয়েছেন বাধা।

The agents of the Czar's Government were ruthlessly carrying out the principle of 'Divide and Rule' and did all in their power to sow hatred and discord between the various races. National animosities were fostered by the Government and Mahommedans and Armenians were systematically incited against each other. The ever-recurring conflicts between these two nations at times assumed the form of massacres.

হাসপাতালের সংখ্যাল্পতা নিয়ে বুলেটিন-লেখক লজ্জা স্বীকার করেছেন বটে, কিন্তু একটা বিষয়ে গৌরব প্রকাশ না করে থাকতে পারেন নি :

It is an undoubted fact, which even the worst enemies of the Soviets cannot deny: for the last eight years the peace between the races of Azerbaijan has never been disturbed.

ভারতবর্ষের রাজত্বে লজ্জা-প্রকাশের চলন নেই, গৌরব-প্রকাশেরও রাস্তা দেখা যায় না।

এই লজ্জা স্বীকারের উপলক্ষে একটা কথা পরিষ্কার করে দেওয়া দরকার। বুলেটিনে আছে, সমস্ত তুর্কমেনিস্তানে শিক্ষার জন্য জন-পিছু পাঁচ রুবল খরচ হয়ে থাকে। রুবলের মূল্য আমাদের টাকার হিসাবে আড়াই টাকা। পাঁচ রুবল বলতে বোঝায় সাড়ে বারো টাকা। এই বাবদ কর আদায়ের কোনো একটা ব্যবস্থা হয়তো আছে, কিন্তু সেই কর আদায় উপলক্ষে প্রজাদের নিজেদের মধ্যে আত্মবিরোধ ঘটিয়ে দেবার কোনো আশঙ্কা নিশ্চয় সৃষ্টি করা হয় নি। ইতি ৮ অক্টোবর ১৯৩০। ব্রেমেন জাহাজ

১২

ব্রেমেন জাহাজ

তুর্কোমেনদের কথা পূর্বেই বলেছি, মরুভূমিবাসী তারা, দশ লক্ষ মানুষ। এই চিঠি তারই পরিশিষ্ট। সোভিয়েট গবর্মেণ্ট সেখানে কী কী বিদ্যায়তন-স্থাপনের সংকল্প করেছে তারই একটা ফর্দ তুলে দিচ্ছি।

Beginning with October 1st, 1930, the new budget year, a number of new scientific institutions and Institutes will be opened in Turcomenia, namely:

1. Turcomen Geological Committee
2. Turcomen Institute of Applied Botany
3. Institute for study and research of stock breeding
4. Institute of Hydrology and Geophysics
5. Institute for Economic Research
6. Chemico-Bacteriological Institute and Institute of Social Hygiene

The activity of all the scientific institutions of Turcomenia will be regulated by a special scientific management attached to the Council of People's Commissars of Turcomenia.

In connection with the removal of the Turcomen Government from Ashkhabad to Chardjni the construction of buildings for the following museums has been started: Historical, Agricultural, Industrial and Trade Museum, Art Museum, Museum of the Revolution. In addition, the construction of an Observatory, State Library, House of Published Books and House of Science and Culture is planned.

The Department of Language and Literature of the Institute of the Turcomen Culture has completed the revision and translation into Russian of Turcomenian poetry, including folk-lore material and old poetry texts.

Five itinerant cultural bases have been organized in Turcomenia. During the year 1930 two courses for training practical nurses and midwives were completed. Altogether 46 persons were graduated. All graduates are sent to the village.

ইতি ৮ অক্টোবর ১৯৩০

১৩

সোভিয়েট রাশিয়ায় জনসাধারণকে শিক্ষা দেবার জন্যে কত বিবিধ রকমের উপায় অবলম্বন করা হয়েছে তার কিছু কিছু আভাস পূর্বের চিঠিপত্র থেকে পেয়ে থাকবে। আজ তোমাকে তারই মধ্যে একটা উদ্যোগের সংক্ষেপ বিবরণ লিখে পাঠাচ্ছি।

কিছুদিন হল মস্কৌ শহরে সাধারণের জন্য একটি আরামবাগ খোলা হয়েছে। বুলেটিনে তার নাম দিয়েছে Moscow Park of Education and Recreation। তার মধ্যে প্রধান মণ্ডপটি প্রদর্শনীর জন্যে। সেখানে ইচ্ছা করলে খবর পাওয়া যায় সমস্ত প্রদেশে কারখানার শতসহস্র শ্রমিকদের জন্যে কত ডিস্‌পেন্সারি খোলা হয়েছে, মস্কৌ প্রদেশে স্কুলের সংখ্যা কত বাড়ল; ম্যুনিসিপ্যাল বিভাগে দেখিয়েছে কত নতুন বাসাবাড়ি তৈরি হল, কত নতুন বাগান— শহরের কত বিষয়ে কতরকমের উন্নতি হয়েছে। নানারকমের মডেল আছে, পুরানো পাড়াগাঁ এবং আধুনিক পাড়াগাঁ, ফল ও সব্‌জি উৎপাদনের আদর্শ খেত, সোভিয়েট আমলে সোভিয়েট কারখানায় যে-সব যন্ত্র তৈরি হচ্ছে তার নমুনা, হাল আমলের কো-অপারেটিভ ব্যবস্থায় কী রুটি তৈরি হচ্ছে আর ওদের বিপ্লবের সময়েতেই বা কিরকম হত। তা ছাড়া নানা তামাশা, নানা খেলার জায়গা, একটা নিত্য-মেলার মতো আর-কি!

পার্কের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র জায়গা কেবল ছোটো ছেলেদের জন্যে, সেখানে বয়স্ক

লোকেদের প্রবেশ নিষেধ, সেখানকার প্রবেশদ্বারে লেখা আছে 'ছেলেদের উৎপাত কোরো না'। এইখানে ছেলেদের যতরকম খেলনা, খেলা, ছেলেদের থিয়েটার— সে থিয়েটারের ছেলেরাই চালক, ছেলেরাই অভিনেতা।

এই ছেলেদের বিভাগ থেকে কিছু দূরে আছে creche, বাংলায় তার নাম দেওয়া যেতে পারে শিশুরক্ষণী। মা-বাপ যখন পার্কে ঘুরে বেড়াতে প্রবৃত্ত তখন এই জায়গায় ধাত্রীদের জিম্মায় ছোটো শিশুদের রেখে যেতে পারে। একটা দোতলা মণ্ডপ (pavillion) আছে ক্লাবের জন্য। উপরের তলায় লাইব্রেরি। কোথাও বা সতরঞ্চ-খেলার ঘর, কোথাও আছে মানচিত্র আর দেয়ালে-ঝোলানো খবরের কাগজ। তা ছাড়া সাধারণের জন্যে আহারের বেশ ভালো কো-অপারেটিভ দোকান আছে, সেখানে মদ বিক্রি বন্ধ। মস্কো পশুশালাবিভাগ থেকে এখানে একটা দোকান খুলেছে; এই দোকানে নানারকম পাখি মাছ চারাগাছ কিনতে পাওয়া যায়। প্রাদেশিক শহরগুলিতেও এইরকমের পার্ক্ খোলবার প্রস্তাব আছে।

যেটা ভেবে দেখবার বিষয় সেটা হচ্ছে এই যে, জনসাধারণকে এরা ভদ্রসাধারণের উচ্ছিষ্টে মানুষ করতে চায় না। শিক্ষা, আরাম, জীবনযাত্রার সুযোগ সমস্তই এদের ষোলো-আনা পরিমাণে। তার প্রধান কারণ, জনসাধারণ ছাড়া এখানে আর-কিছুই নেই। এরা সমাজগ্রন্থের পরিশিষ্ট অধ্যায় নয়; সকল অধ্যায়েই এরা।

আর-একটা দৃষ্টান্ত তোমাকে দিই। মস্কো শহর থেকে কিছু দূরে সাবেক কালের একটি প্রাসাদ আছে। রাশিয়ার প্রাচীন অভিজাত বংশীয় কাউন্ট আপ্রাক্সিনদের সেই ছিল বাসভবন। পাহাড়ের উপর থেকে চারি দিকের দৃশ্য অতি সুন্দর দেখতে— শস্যক্ষেত্র, নদী এবং পার্বত্য অরণ্য। দুটি আছে সরোবর, আর অনেকগুলি উৎস। থামওয়ালা বড়ো বড়ো প্রকোষ্ঠ, উঁচু বারান্দা, প্রাচীনকালের আসবাব ছবি ও পাথরের মূর্তি দিয়ে সাজানো দরবারগৃহ; এ ছাড়া আছে সংগীতশালা, খেলার ঘর, লাইব্রেরি, নাট্যশালা; এ ছাড়া অনেকগুলি সুন্দর বহির্ভবন বাড়িটিকে অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে আছে।

এই বৃহৎ প্রাসাদে অল্‌গভো নাম দিয়ে একটি কো-অপারেটিভ স্বাস্থ্যাগার স্থাপন করা হয়েছে, এমন সমস্ত লোকদের জন্য যারা একদা এই প্রাসাদে দাসশ্রেণীতে গণ্য হত। সোভিয়েট রাষ্ট্রসংঘে একটি কো-অপারেটিভ সোসাইটি আছে, শ্রমিকদের জন্যে বাসা-নির্মাণ যার প্রধান কর্তব্য; সেই সোসাইটির নাম বিশ্রান্তিনিকেতন: The Home of Rest। এই অল্‌গভো তারই তত্ত্বাবধানে।

এমনতরো আরো চারটে সানাটোরিয়ম এর হাতে আছে। খাটুনির ঋতুকাল

শেষ হয়ে গেলে অন্তত ত্রিশ হাজার শ্রমক্লান্ত এই পাঁচটি আরোগ্যশালায় এসে বিশ্রাম করতে পারবে। প্রত্যেক লোক এক পক্ষকাল এখানে থাকতে পারে। আহারের ব্যবস্থা পর্যাপ্ত, আরামের ব্যবস্থা যথেষ্ট, ডাক্তারের ব্যবস্থাও আছে। কো-অপারেটিভ প্রণালীতে এইরকম বিশ্রান্তিনিকেতন স্থাপনের উদ্যোগ ক্রমশই সাধারণের সম্মতি লাভ করছে।

আর-কিছু নয়, শ্রমিকদের বিশ্রামের প্রয়োজন এমনভাবে আর-কোথাও কেউ চিন্তাও করে নি, আমাদের দেশের অবস্থাপন্ন লোকের পক্ষেও এরকম সুযোগ দুর্লভ।

শ্রমিকদের জন্যে এদের ব্যবস্থা কিরকম সে তো শুনলে, এখন শিশুদের সম্বন্ধে এদের বিধান কিরকম সে কথা বলি। শিশু জারজ কিংবা বিবাহিত দম্পতির সন্তান সে সম্বন্ধে কোনো পার্থক্য এরা গণ্যই করে না। আইন এই যে, শিশু যে-পর্যন্ত না আঠারো বছর বয়সে সাবালক হয় সে-পর্যন্ত তাদের পালনের ভার বাপ-মায়ের। বাড়িতে তাদের কী ভাবে পালন করা বা শিক্ষা দেওয়া হয় স্টেট সে সম্বন্ধে উদাসীন নয়। ষোলো বছর বয়সের পূর্বে সন্তানকে কোথাও খাটুনির কাজে নিযুক্ত করতে পারবে না। আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত তাদের কাজের সময়-পরিমাণ ছয় ঘণ্টা। ছেলেদের প্রতি পিতামাতা আপন কর্তব্য করছে কি না তার তদারকের ভার অভিভাবক-বিভাগের 'পরে। এই বিভাগের কর্মচারী মাঝে মাঝে পরিদর্শন করতে আসে, দেখে ছেলেদের স্বাস্থ্য কিরকম আছে, পড়াশুনো কিরকম চলছে। যদি দেখা যায় ছেলেদের প্রতি অযত্ন হচ্ছে তা হলে বাপ-মায়ের হাত থেকে ছেলেদের ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু তবু ছেলেদের ভরণপোষণের দায়িত্ব থাকে বাপ-মায়েরই। এইরকম ছেলেমেয়েদের মানুষ করবার ভার পড়ে সরকারী অভিভাবক-বিভাগের।

ভাবখানা এই, সন্তানেরা কেবল তো বাপ-মায়ের নয়, মুখ্যত সমস্ত সমাজের। তাদের ভালোমন্দ নিয়ে সমস্ত সমাজের ভালোমন্দ। এরা যাতে মানুষ হয়ে ওঠে তার দায়িত্ব সমাজের, কেননা তার ফল সমাজেরই। ভেবে দেখতে গেলে পরিবারের দায়িত্বের চেয়ে সমাজের দায়িত্ব বেশি বই কম নয়। জনসাধারণ সম্বন্ধেও এদের মনের ভাব ঐরকমেরই। এদের মতে জনসাধারণের অস্তিত্ব প্রধানত বিশিষ্টসাধারণের সুযোগ-সুবিধার জন্যে নয়। তারা সমগ্র সমাজের অঙ্গ, সমাজের কোনো বিশেষ অঙ্গের প্রত্যঙ্গ নয়। অতএব তাদের জন্য দায়িত্ব সমস্ত স্টেটের। ব্যক্তিগতভাবে নিজের ভোগের বা প্রতাপের জন্য কেউ সমগ্র সমাজকে ডিঙিয়ে যেতে গেলে চলবে না।

যাই হোক, মানুষের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত সীমা এরা যে ঠিকমত ধরতে পেরেছে

তা আমার বোধ হয় না। সে হিসাবে এরা ফ্যাসিস্ট্‌দেরই মতো। এই কারণে সমষ্টির খাতিরে ব্যষ্টির প্রতি পীড়নে এরা কোনো বাধাই মানতে চায় না। ভুলে যায়, ব্যষ্টিকে দুর্বল করে সমষ্টিকে সবল করা যায় না, ব্যষ্টি যদি শৃঙ্খলিত হয় তবে সমষ্টি স্বাধীন হতে পারে না। এখানে জবরদস্ত লোকের একনায়কত্ব চলছে। এইরকম একের হাতে দশের চালনা দৈবাৎ কিছুদিনের মতো ভালো ফল দিতেও পারে, কিন্তু কখনোই চিরদিন পারে না। উপযুক্তমত নায়ক পরম্পরাক্রমে পাওয়া কখনোই সম্ভব নয়।

তা ছাড়া, অবাধ ক্ষমতার লোভ মানুষের বুদ্ধিবিকার ঘটায়। একটা সুবিধার কথা এই যে, যদিও সোভিয়েট মূলনীতি সম্বন্ধে এরা মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে অতি নির্দয়ভাবে পীড়ন করতে কুণ্ঠিত হয় নি, তথাপি সাধারণভাবে শিক্ষার দ্বারা, চর্চার দ্বারা, ব্যক্তির আত্মনিহিত শক্তিকে বাড়িয়েই চলেছে— ফ্যাসিস্ট্‌দের মতো নিয়তই তাকে পেষণ করে নি। শিক্ষাকে আপন বিশেষ মতের একান্ত অনুবর্তী করে কতকটা গায়ের জোরে কতকটা মোহমন্ত্রের জোরে একঝোঁকা করে তুলেছে, তবুও সাধারণের বুদ্ধির চর্চা বন্ধ করে নি। যদিও সোভিয়েট নীতি -প্রচার সম্বন্ধে এরা যুক্তির জোরের উপরেও বাহুবলকে খাড়া করে রেখেছে, তবুও যুক্তিকে একেবারে ছাড়ে নি এবং ধর্মমূঢ়তা এবং সমাজপ্রথার অন্ধতা থেকে সাধারণের মনকে মুক্ত রাখবার জন্যে প্রবল চেষ্টা করেছে।

মনকে এক দিকে স্বাধীন করে অন্য দিকে জুলুমের বশ করা সহজ নয়। ভয়ের প্রভাব কিছুদিন কাজ করবে, কিন্তু সেই ভীরুতাকে ধিক্‌কার দিয়ে শিক্ষিত মন একদিন আপন চিন্তার স্বাতন্ত্র্যের অধিকার জোরের সঙ্গে দাবি করবেই। মানুষকে এরা দেহের দিকে নিপীড়িত করেছে, মনের দিকে নয়। যারা যথার্থই দৌরাত্ম্য করতে চায় তারা মানুষের মনকে মারে আগে; এরা মনের জীবনীশক্তি বাড়িয়ে তুলছে। এইখানেই পরিত্রাণের রাস্তা রয়ে গেল।

আজ আর ঘণ্টা-কয়েকের মধ্যে পৌঁছব নিয়ুইয়র্কে। তার পরে আবার নতুন পালা। এরকম করে সাত ঘাটের জল খেয়ে বেড়াতে আর ভালো লাগে না। এবারে এ অঞ্চলে না আসার ইচ্ছায় মনে অনেক তর্ক উঠেছিল, কিন্তু লোভই শেষকালে জয়ী হল। ইতি ৯ অক্টোবর ১৯৩০

১৪

ল্যান্স্‌ডাউন

ইতিমধ্যে দুই-একবার দক্ষিণ-দরজার কাছ ঘেঁষে গিয়েছি। মলয়-সমীরণের দক্ষিণদ্বার নয়, যে দ্বার দিয়ে প্রাণবায়ু বেরোবার পথ খোঁজে। ডাক্তার বললে, নাড়ীর সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের মুহূর্তকালের যে বিরোধ ঘটেছিল সেটা যে অল্পের উপর দিয়েই কেটে গেছে এটাকে অবৈজ্ঞানিক ভাষায় মিরাক্‌ল্‌ বলা যেতে পারে। যাই হোক, যমদূতের ইশারা পাওয়া গেছে, ডাক্তার বলছে এখন থেকে সাবধান হতে হবে। অর্থাৎ, উঠে হেঁটে বেড়াতে গেলেই বুকের কাছটাতে বাণ এসে লাগবে— শুয়ে পড়লেই লক্ষ্য এড়িয়ে যাবে। তাই ভালোমানুষের মতো আধ-শোওয়া অবস্থায় দিন কাটাচ্ছি। ডাক্তার বলে, এমন করে বছর-দশেক নিরাপদে কাটতে পারে, তার পরে দশম দশাকে কেউ ঠেকাতে পারে না। বিছানায় হেলান দিয়ে আছি, আমার লেখার লাইনও আমার দেহ-রেখার নকল করতে প্রবৃত্ত। রোসো, একটু উঠে বসি।

দেখলুম কিছু দুঃসংবাদ পাঠিয়েছ, শরীরের এ অবস্থায় পড়তে ভয় করে, পাছে ঢেউয়ের ঘায়ে ভাঙন লাগে। বিষয়টা কী তার আভাস পূর্বেই পেয়েছিলুম— বিস্তারিত বিবরণের ধাক্কা সহ্য করা আমার পক্ষে শক্ত। তাই আমি নিজে পড়ি নি, অমিয়কে পড়তে দিয়েছি।

যে বাঁধনে দেশকে জড়িয়েছে টান মেরে মেরে সেটা ছিঁড়তে হয়। প্রত্যেক টানে চোখের তারা উলটে যায়, কিন্তু এ ছাড়া বন্ধনমুক্তির অন্য উপায় নেই। ব্রিটিশরাজ নিজের বাঁধন নিজের হাতেই ছিঁড়ছে, তাতে আমাদের তরফে বেদনা যথেষ্ট, কিন্তু তার তরফে লোকসান কম নয়। সকলের চেয়ে বড়ো লোকসান এই যে, ব্রিটিশরাজ আপন মান খুইয়েছে। ভীষণের দুর্বৃত্ততাকে আমরা ভয় করি, সেই ভয়ের মধ্যেও সম্মান আছে, কিন্তু কাপুরুষের দুর্বৃত্ততাকে আমরা ঘৃণা করি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আজ আমাদের ঘৃণার দ্বারা ধিক্‌কৃত। এই ঘৃণায় আমাদের জোর দেবে, এই ঘৃণার জোরেই আমরা জিতব।

সম্প্রতি রাশিয়া থেকে এসেছি— দেশের গৌরবের পথ যে কত দুর্গম তা অনেকটা স্পষ্ট করে দেখলুম। যে অসহ্য দুঃখ পেয়েছে সেখানকার সাধকেরা পুলিসের মার তার তুলনায় পুষ্পবৃষ্টি। দেশের ছেলেদের বোলো, এখনো অনেক বাকি আছে— তার কিছুই বাদ যাবে না। অতএব তারা যেন এখনই বলতে শুরু না করে যে বড়ো লাগছে— সে কথা বললেই গুণ্ডার লাঠিকে অর্ঘ্য দেওয়া হয়।

২০৷২২

দেশে বিদেশে ভারতবর্ষ আজ গৌরব লাভ করেছে কেবলমাত্র মারকে স্বীকার না করে— দুঃখকে উপেক্ষা করবার সাধনা আমরা যেন কিছুতে না ছাড়ি। পশুবল কেবলই চেষ্টা করছে আমাদের পশুকে জাগিয়ে তুলতে, যদি সফল হতে পারে তবেই আমরা হারব। দুঃখ পাচ্ছি সেজন্যে আমরা দুঃখ করব না। এই আমাদের প্রমাণ করবার অবকাশ এসেছে যে, আমরা মানুষ— পশুর নকল করতে গেলেই এই শুভযোগ নষ্ট হবে। শেষ পর্যন্ত আমাদের বলতে হবে, ভয় করি নে। বাংলাদেশের মাঝে মাঝে ধৈর্য নষ্ট হয়, সেটাই আমাদের দুর্বলতা। আমরা যখন নখদন্ত মেলতে যাই তখনই তার দ্বারা নখীদন্তীদের সেলাম করা হয়। উপেক্ষা কোরো, নকল কোরো না। অশ্রুবর্ষণ নৈব নৈব চ।

আমার সব চেয়ে দুঃখ এই, যৌবনের সম্বল নেই। আমি পড়ে আছি গতিহীন হয়ে পান্থশালায়— যারা পথ চলছে তাদের সঙ্গে চলবার সময় চলে গেছে। ইতি ২৮ অক্টোবর ১৯৩০

উপসংহার

সোভিয়েট শাসনের প্রথম পরিচয় আমার মনকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে, সে কথা পূর্বেই বলেছি। তার কয়েকটি বিশেষ কারণ আছে, সেটা আলোচনার যোগ্য।

সেখানকার যে ছবিটি আমার মনের মধ্যে মূর্তি নিয়েছে তার পিছনে দুলছে ভারতবর্ষের দুর্গতির কালো রঙের পটভূমিকা। এই দুর্গতির মূলে যে ইতিহাস আছে তার থেকে একটি তত্ত্ব পাওয়া যায়, সেই তত্ত্বটিকে চিন্তা করে দেখলে আলোচ্য প্রসঙ্গে আমার মনের ভাব বোঝা সহজ হবে।

ভারতবর্ষে মুসলমান-শাসন-বিস্তারের ভিতরকার মানসটি ছিল রাজমহিমালাভ। সেকালে সর্বদাই রাজ্য নিয়ে যে হাত-চালাচালি হত তার গোড়ায় ছিল এই ইচ্ছা। গ্রীসের সেকেন্দর শাহ ধূমকেতুর অনলোজ্জ্বল পুচ্ছের মতো তাঁর রণবাহিনী নিয়ে বিদেশের আকাশ ঝেঁটিয়ে বেড়িয়েছিলেন সে কেবল তাঁর প্রতাপ প্রসারিত করবার জন্যে। রোমকদেরও ছিল সেই প্রবৃত্তি। ফিনীশীয়েরা নানা সমুদ্রের তীরে তীরে বাণিজ্য করে ফিরেছে কিন্তু তারা রাজ্য নিয়ে কাড়াকাড়ি করে নি।

একদা য়ুরোপ হতে বণিকের পণ্যতরী যখন পূর্ব-মহাদেশের ঘাটে ঘাটে পাড়ি জমালে তখন থেকে পৃথিবীতে মানুষের ইতিহাসে এক নূতন পর্ব ক্রমশ অভিব্যক্ত হয়ে উঠল ; ক্ষাত্রযুগ গেল চলে, বৈশ্যযুগ দেখা দিল। এই যুগে বণিকের দল বিদেশে এসে তাদের পণ্যহাটের খিড়কিমহলে রাজ্য জুড়ে দিতে লাগল। প্রধানত তারা মুনফার অঙ্ক বাড়াতে চেয়েছিল ; বীরের সম্মান তাদের লক্ষ্য ছিল না। এই কাজে তারা নানা কুটিল পন্থা অবলম্বন করতে কুণ্ঠিত হয় নি ; কারণ তারা চেয়েছিল সিদ্ধি, কীর্তি নয়।

এই সময় ভারতবর্ষ তার বিপুল ঐশ্বর্যের জন্য জগতে বিখ্যাত ছিল— তখনকার বিদেশী ঐতিহাসিকেরা সে কথা বারম্বার ঘোষণা করে গেছেন। এমন-কি স্বয়ং ক্লাইভ বলে গেছেন যে, "ভারতবর্ষের ধনশালিতার কথা যখন চিন্তা করে দেখি তখন অপহরণ-নৈপুণ্যে নিজের সংযমে আমি নিজেই বিস্মিত হই।" এই প্রভূত ধন, এ কখনো সহজে হয় না— ভারতবর্ষ এ ধন উৎপন্ন করেছিল। তখন বিদেশ থেকে যারা এসে এখানকার রাজাসনে বসেছে তারা এ ধন ভোগ করেছে, কিন্তু নষ্ট করে নি। অর্থাৎ তারা ভোগী ছিল, কিন্তু বণিক ছিল না।

তার পর বাণিজ্যের পথ সুগম করার উপলক্ষে বিদেশী বণিকেরা তাদের কারবারের গদিটার উপরে রাজতক্ত চড়িয়ে বসল। সময় ছিল অনুকূল। তখন মোগলরাজত্বে ভাঙন ধরেছে, মারাঠিরা শিখেরা এই সাম্রাজ্যের গ্রন্থিগুলো শিথিল করতে প্রবৃত্ত, ইংরেজের হাতে সেটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল ধ্বংসের পথে।

পূর্বতন রাজগৌরবলোলুপেরা যখন এ দেশে রাজত্ব করত তখন এ দেশে অত্যাচার-অবিচার-অব্যবস্থা ছিল না এ কথা বলা চলে না। কিন্তু তারা ছিল এ দেশের অঙ্গীভূত। তাদের আঁচড়ে দেশের গায়ে যা ক্ষত হয়েছিল তা ত্বকের উপরে; রক্তপাত অনেক হয়েছে, কিন্তু অস্থিবন্ধনীগুলোকে নড়িয়ে দেয় নি। ধন-উৎপাদনের বিচিত্র কাজ তখন অব্যাহত চলছিল, এমন-কি নবাব-বাদশাহের কাছ থেকে সে-সমস্ত কাজ প্রশ্রয় পেয়েছে। তা যদি না হত তা হলে এখানে বিদেশী বণিকের ভিড় ঘটবার কোনো কারণ থাকত না— মরুভূমিতে পঙ্গপালের ভিড় জমবে কেন।

তার পরে ভারতবর্ষে বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যের অশুভ সংগমকালে বণিক রাজা দেশের ধনকল্পতরুর শিকড়গুলোকে কী করে ছেদন করতে লাগলেন, সে ইতিহাস শতবার-কথিত এবং অত্যন্ত শ্রুতিকটু। কিন্তু পুরাতন বলে সেটাকে বিস্মৃতির মুখ্ঠুলি চাপা দিয়ে রাখবার চেষ্টা চলবে না। এ দেশের বর্তমান দুর্বহ দারিদ্র্যের উপক্রমণিকা সেইখানে। ভারতবর্ষের ধনমহিমা ছিল, কিন্তু সেটা কোন্ বাহন-যোগে দ্বীপান্তরিত হয়েছে সে কথা যদি ভুলি তবে পৃথিবীর আধুনিক ইতিহাসের একটা তত্ত্বকথা আমাদের এড়িয়ে যাবে। আধুনিক রাষ্ট্রনীতির প্রেরণাশক্তি বীর্যাভিমান নয়, সে হচ্ছে ধনের লোভ, এই তত্ত্বটি মনে রাখা চাই। রাজগৌরবের সঙ্গে প্রজাদের একটা মানবিক সম্বন্ধ থাকে, কিন্তু ধনলোভের সঙ্গে তা থাকতেই পারে না। ধন নির্মম, নৈর্ব্যক্তিক। যে মুরগি সোনার ডিম পাড়ে লোভ যে কেবল তার ডিমগুলোকেই ঝুড়িতে তোলে তা নয়, মুরগিটাকে সুদ্ধ সে জবাই করে।

বণিকরাজের লোভ ভারতের ধন-উৎপাদনের বিচিত্র শক্তিকেই পঙ্গু করে দিয়েছে। বাকি রয়েছে কেবল কৃষি, নইলে কাঁচা মালের জোগান বন্ধ হয় এবং বিদেশী পণ্যের হাটে মূল্য দেবার শক্তি একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। ভারতবর্ষের সদ্যপাতী জীবিকা এই অতিক্ষীণ বৃন্তের উপর নির্ভর করে আছে।

এ কথা মেনে নেওয়া যাক, তখনকার কালে যে নৈপুণ্য ও যে-সকল উপায়ের যোগে হাতের কাজ চলত ও শিল্পীরা খেয়ে-প'রে বাঁচত, যন্ত্রের প্রতিযোগিতায় তারা স্বতই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। অতএব প্রজাদের বাঁচাবার জন্যে নিতান্তই প্রয়োজন ছিল সর্বপ্রযত্নে তাদের যন্ত্রকুশল করে তোলা। প্রাণের দায়ে বর্তমান কালে সকল দেশেই এই উদ্যোগ

প্রবল। জাপান অল্পকালের মধ্যে ধনের যন্ত্রবাহনকে আয়ত্ত করে নিয়েছে, যদি না সম্ভব হত তা হলে যন্ত্রী য়ুরোপের ষড়যন্ত্রে সে ধনে-প্রাণে মারা যেত। আমাদের ভাগ্যে সে সুযোগ ঘটল না, কেননা লোভ ঈর্ষাপরায়ণ। এই প্রকাণ্ড লোভের আওতায় আমাদের ধনপ্রাণ মুষড়ে এল, তৎপরিবর্তে রাজা আমাদের সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন, "এখনো ধনপ্রাণের যেটুকু বাকি সেটুকু রক্ষা করবার জন্যে আইন এবং চৌকিদারের ব্যবস্থাভার রইল আমার হাতে।" এ দিকে আমাদের অন্নবস্ত্র বিদ্যাবুদ্ধি বন্ধক রেখে কণ্ঠাগত প্রাণে আমরা চৌকিদারের উর্দির খরচ জোগাচ্ছি। এই-যে সাংঘাতিক ঔদাসীন্য এর মূলে আছে লোভ। সকলপ্রকার জ্ঞানে ও কর্মে যেখানে শক্তির উৎস বা পীঠস্থান সেখান থেকে বহু নীচে দাঁড়িয়ে এতকাল আমরা হাঁ করে উপরের দিকে তাকিয়ে আছি আর সেই ঊর্ধ্বলোক থেকে এই আশ্বাসবাণী শুনে আসছি, "তোমাদের শক্তি ক্ষয় যদি হয় ভয় কী, আমাদের শক্তি আছে, আমরা তোমাদের রক্ষা করব।"

যার সঙ্গে মানুষের লোভের সম্বন্ধ তার কাছ থেকে মানুষ প্রয়োজন উদ্ধার করে, কিন্তু কখনো তাকে সম্মান করে না। যাকে সম্মান করে না তার দাবিকে মানুষ যথাসম্ভব ছোটো করে রাখে; অবশেষে সে এত সস্তা হয়ে পড়ে যে, তার অসামান্য অভাবেও সামান্য খরচ করতে গায়ে বাজে। আমাদের প্রাণরক্ষা ও মনুষ্যত্বের লজ্জা-রক্ষার জন্যে কতই কম বরাদ্দ সে কারো অগোচর নেই। অন্ন নেই, বিদ্যা নেই, বৈদ্য নেই, পানের জল পাওয়া যায় পাঁক ছেঁকে; কিন্তু চৌকিদারের অভাব নেই, আর আছে মোটা মাইনের কর্মচারী— তাদের মাইনে গাল্‌ফ্‌ স্ট্রীমের মতো সম্পূর্ণ চলে যায় ব্রিটিশ দ্বীপের শৈত্যনিবারণের জন্যে, তাদের পেন্‌সন জোগাই আমাদের অন্ত্যেষ্টিসৎকারের খরচের অংশ থেকে। এর একমাত্র কারণ, লোভ অন্ধ, লোভ নিষ্ঠুর— ভারতবর্ষ ভারতেশ্বরদের লোভের সামগ্রী।

অথচ কঠিন বেদনার অবস্থাতেও এ কথা আমি কখনো অস্বীকার করি নে যে, ইংরেজের স্বভাবে ঔদার্য আছে, বিদেশীয় শাসনকার্যে অন্য য়ুরোপীয়দের ব্যবহার ইংরেজের চেয়েও কৃপণ এবং নিষ্ঠুর। ইংরেজ জাতি ও তার শাসননীতি সম্বন্ধে বাক্যে ও আচরণে আমরা যে বিরুদ্ধতা প্রকাশ করে থাকি তা আর-কোনো জাতের শাসন-কর্তাদের সম্বন্ধে সম্ভবপর হত না; যদি-বা হত তবে তার দণ্ডনীতি আরো অনেক দুঃসহ হত, স্বয়ং য়ুরোপে এমন-কি আমেরিকাতেও তার প্রমাণের অভাব নেই। প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহঘোষণাকালেও রাজপুরুষদের কাছে পীড়িত হলে আমরা যখন সবিস্ময়ে নালিশ করি তখন প্রমাণ হয় যে, ইংরেজ জাতির প্রতি আমাদের নিগূঢ় শ্রদ্ধা

মার খেতে খেতেও মরতে চায় না। আমাদের স্বদেশী রাজা বা জমিদারের কাছে আমাদের প্রত্যাশা আরো অনেক কম।

ইংলণ্ডে থাকার সময় এটা লক্ষ্য করে দেখেছি, ভারতবর্ষে দণ্ডবিধানব্যাপারে গ্লানিজনক ঘটনা ইংরেজ খবরের কাগজে প্রায় কিছুই এসে পৌঁছত না। তার একমাত্র কারণ এ নয়, পাছে য়ুরোপে বা আমেরিকায় নিন্দা রটে। বস্তুত, কড়া ইংরেজ শাসনকর্তা স্বজাতির শুভবুদ্ধিকেই ভয় করে। বেশ করেছি, খুব করেছি, দরকার ছিল জবরদস্তি করবার—এটা বুক ফুলিয়ে বলা ইংরেজদের পক্ষে সহজ নয়, তার কারণ ইংরেজের মধ্যে বড়ো মন আছে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আসল কথাগুলো ইংরেজ খুব কম জানে। নিজেদের উপর ধিক্‌কার দেবার কারণ চাপা থাকে। এ কথাও সত্য, ভারতের নিমক দীর্ঘকাল যে খেয়েছে তার ইংরেজি যকৃৎ এবং হৃদয় কলুষিত হয়ে গেছে, অথচ আমাদের ভাগ্যক্রমে তারাই হল অথরিটি।

ভারতবর্ষে বর্তমান বিপ্লব উপলক্ষে দণ্ডচালনা সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ বলেছেন যে, তার পীড়ন ছিল ন্যূনতম মাত্রায়। এ কথা মেনে নিতে আমরা অনিচ্ছুক, কিন্তু অতীত ও বর্তমানের প্রচলিত শাসননীতির সঙ্গে তুলনা করে দেখলে কথাটাকে অত্যুক্তি বলতে পারব না। মার খেয়েছি, অন্যায় মারও যথেষ্ট খেয়েছি; এবং সব চেয়ে কলঙ্কের কথা গুপ্ত মার, তারও অভাব ছিল না। এ কথাও বলব, অনেক স্থলেই যারা মার খেয়েছে মাহাত্ম্য তাদেরই, যারা মেরেছে তারা আপন মান খুইয়েছে। কিন্তু সাধারণ রাষ্ট্রশাসন নীতির আদর্শে আমাদের মারের মাত্রা ন্যূনতম বইকি। বিশেষত আমাদের 'পরে ওদের নাড়ীর টান নেই, তা ছাড়া সমস্ত ভারতবর্ষকে জালিয়ানওআলাবাগ করে তোলা এদের পক্ষে বাহুবলের দিক থেকে অসম্ভব ছিল না। আমেরিকার সমগ্র নিগ্রোজাতি যুক্তরাজ্যের সঙ্গে নিজেদের যোগ বিচ্ছিন্ন করবার জন্যে যদি স্পর্ধাপূর্বক অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হত তা হলে কিরকম বীভৎসভাবে রক্তপ্লাবন ঘটত, বর্তমান শান্তির অবস্থাতেও তা অনুমান করে নিতে অধিক কল্পনাশক্তির প্রয়োজন হয় না। তা ছাড়া ইটালি প্রভৃতি দেশে যা ঘটেছে তা নিয়ে আলোচনা করা বাহুল্য।

কিন্তু এতে সান্ত্বনা পাই নে। যে মার লাঠির ডগায় সে মার দুদিন পরে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, এমন-কি, ক্রমে তার লজ্জা আসাও অসম্ভব নয়। কিন্তু যে মার অন্তরে অন্তরে সে তো কেবল কতকগুলো মানুষের মাথা ভেঙে তার পরে খেলাঘরের ব্রিজ-পার্টির অন্তরালে অন্তর্ধান করে না। সমস্ত জাতকে সে যে ভিতরে ভিতরে ফতুর করে দিলে। শতাব্দীর পর শতাব্দী তার তো বিরাম নেই। ক্রোধের মার থামে, লোভের মারের অন্ত পাওয়া যায় না।

টাইম্‌স্‌'এর সাহিত্যিক ক্রোড়পত্রে দেখা গেল ম্যাকী-নামক এক লেখক বলেছেন যে, ভারতে দারিদ্র্যের root cause, মূল কারণ হচ্ছে, এ দেশে নির্বিচার বিবাহের ফলে অতিপ্রজন। কথাটার ভিতরকার ভাবটা এই যে, বাহির থেকে যে শোষণ চলছে তা দুঃসহ হত না যদি স্বল্প অন্ন নিয়ে স্বল্প লোকে হাঁড়ি চেঁচে-পুঁছে খেত। শুনতে পাই, ইংলণ্ডে ১৮৭১ খৃস্টাব্দ থেকে ১৯২১ খৃস্টাব্দের মধ্যে শতকরা ৬৬ সংখ্যা হারে প্রজাবৃদ্ধি হয়েছে। ভারতবর্ষে পঞ্চাশ বৎসরের প্রজাবৃদ্ধির হার শতকরা ৩৩। তবে এক যাত্রায় পৃথক ফল হল কেন। অতএব দেখা যাচ্ছে root cause প্রজাবৃদ্ধি নয়, root cause অন্নসংস্থানের অভাব। তারও root কোথায়!

দেশ যারা শাসন করছে আর যে প্রজারা শাসিত হচ্ছে তাদের ভাগ্য যদি এক-কক্ষবর্তী হয় তা হলে অন্তত অন্নের দিক থেকে নালিশের কথা থাকে না, অর্থাৎ সুভিক্ষে দুর্ভিক্ষে উভয়ের ভাগ প্রায় সমান হয়ে থাকে। কিন্তু যেখানে কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষের মাঝখানে মহালোভ ও মহাসমুদ্রের ব্যবধান সেখানে অমাবস্যার তরফে বিদ্যাস্বাস্থ্য-সম্মানসম্পদের কৃপণতা ঘুচতে চায় না, অথচ নিশীথরাত্রির চৌকিদারদের হাতে বৃষচক্ষু লণ্ঠনের আয়োজন বেড়ে চলে। এ কথা হিসাব করে দেখতে স্ট্যাটিস্‌টিক্‌সের খুব বেশি খিটিমিটির দরকার হয় না, আজ একশো ষাট বৎসর ধরে ভারতের পক্ষে সর্ববিষয়ে দারিদ্র্য ও ব্রিটেনের পক্ষে সর্ববিষয়ে ঐশ্বর্য পিঠোপিঠি সংলগ্ন হয়ে আছে। এর যদি একটি সম্পূর্ণ ছবি আঁকতে চাই তবে বাংলাদেশের যে চাষী পাট উৎপন্ন করে আর সুদূর ডাণ্ডিতে যারা তার মুনফা ভোগ করে উভয়ের জীবনযাত্রার দৃশ্য পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দেখতে হয়। উভয়ের মধ্যে যোগ আছে লোভের, বিচ্ছেদ আছে ভোগের— এই বিভাগ দেড়শো বছরে বাড়ল বই কমল না।

যান্ত্রিক উপায়ে অর্থলাভকে যখন থেকে বহুগুণীকৃত করা সম্ভবপর হল তখন থেকে মধ্যযুগের শিভল্‌রি অর্থাৎ বীরধর্ম বণিকধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। এই নিদারুণ বৈশ্যযুগের প্রথম সূচনা হল সমুদ্রযানযোগে বিশ্বপৃথিবী-আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে। বৈশ্যযুগের আদিম ভূমিকা দস্যুবৃত্তিতে। দাসহরণ ও ধনহরণের বীভৎসতায় ধরিত্রী সেদিন কেঁদে উঠেছিল। এই নিষ্ঠুর ব্যবসায় বিশেষভাবে চলেছিল পরদেশে। সেদিন মেক্সিকোতে স্পেন শুধু কেবল সেখানকার সোনার সঞ্চয় নয়, সেখানকার সমগ্র সভ্যতাটাকেও রক্ত দিয়ে মুছে দিয়েছে। সেই রক্তমেঘের ঝড় পশ্চিম থেকে ভিন্ন ভিন্ন দমকায় ভারতবর্ষে এসে পড়ল। তার ইতিহাস আলোচনা করা অনাবশ্যক। ধনসম্পদের স্রোত পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে ফিরল।

তার পর থেকে কুবেরের সিংহাসন পাকা হল পৃথিবীতে। বিজ্ঞান ঘোষণা করে

দিলে, যন্ত্রের নিয়মই বিশ্বের নিয়ম, বাহ্য সিদ্ধিলাভের বাহিরে কোনো নিত্য সত্য নেই। প্রতিযোগিতার উগ্রতা সর্বব্যাপী হয়ে উঠল, দস্যুবৃত্তি ভদ্রবেশে পেল সম্মান। লোভের প্রকাশ্য ও চোরা রাস্তা দিয়ে কারখানাঘরে, খনিতে বড়ো বড়ো আবাদে, ছদ্মনামধারী দাসবৃত্তি মিথ্যাচার ও নির্দয়তা কিরকম হিংস্র হয়ে উঠেছে সে সম্বন্ধে য়ুরোপীয় সাহিত্যে রোমহর্ষক বর্ণনা বিস্তর পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে যারা টাকা করে আর যারা টাকা যোগায় অনেক দিন ধরে তাদের মধ্যে হাতাহাতি বেধে গেছে। মানুষের সব চেয়ে বড়ো ধর্ম সমাজধর্ম, লোভরিপু সব চেয়ে তার বড়ো হন্তারক। এই যুগে সেই রিপু মানুষের সমাজকে আলোড়িত করে তার সম্বন্ধবন্ধনকে শিথিল ও বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে।

এক দেশে এক জাতির মধ্যেই এই নির্মম ধনার্জন ব্যাপারে যে বিভাগ সৃষ্টি করতে উদ্যত তাতে যত দুঃখই থাক্ তবু সেখানে সুযোগের ক্ষেত্র খোলা থাকে, শক্তির বৈষম্য থাকতে পারে কিন্তু অধিকারের বাধা থাকে না। ধনের জাঁতাকলে সেখানে আজ যে আছে পেষ্যবিভাগে কাল সেই উঠতে পারে পেষণবিভাগে। শুধু তাই নয়, ধনীরা যে ধন সঞ্চয় করে, নানা আকারে সমস্ত দেশের মধ্যে তার কিছু-না-কিছু ভাগ-বাঁটোয়ারা আপনিই হয়ে যায়। ব্যক্তিগত সম্পদ জাতীয় সম্পদের দায়িত্বভার অনেক পরিমাণে না নিয়ে থাকতে পারে না। লোকশিক্ষা, লোকস্বাস্থ্য, লোকরঞ্জন, সাধারণের জন্যে নানাপ্রকার হিতানুষ্ঠান— এ-সমস্তই প্রভূত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। দেশের এই-সমস্ত বিচিত্র দাবি ইচ্ছায় অনিচ্ছায় লক্ষ্যত অলক্ষ্যত ধনীরা মিটিয়ে থাকে।

কিন্তু ভারতের যে ধনে বিদেশী বণিক বা রাজপুরুষেরা ধনী তার ন্যূনতম উচ্ছিষ্ট-মাত্রই ভারতের ভাগে পড়ে। পাটের চাষী শিক্ষার জন্যে, স্বাস্থ্যের জন্যে সুগভীর অভাবগুলো অনাবৃষ্টির নালাডোবার মতো হাঁ করে রইল, বিদেশগামী মুনফা থেকে তার দিকে কিছুই ফিরল না। যা গেল তা নিঃশেষে গেল। পাটের মুনফা সম্ভবপর করবার জন্যে গ্রামের জলাশয়গুলি দূষিত হল— এই অসহ্য জলকষ্ট নিবারণের উদ্দেশে বিদেশী মহাজনদের ভরা থলি থেকে এক পয়সা খসল না। যদি জলের ব্যবস্থা করতে হয় তবে তার সমস্ত ট্যাক্সের টান এই নিঃস্ব নিরন্নদের রক্তের উপরই পড়ে। সাধারণকে শিক্ষা দেবার জন্যে রাজকোষে টাকা নেই— কেন নেই। তার প্রধান কারণ, প্রভূত পরিমাণ টাকা ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণই ত্যাগ করে চলে যায়— এ হল লোভের টাকা, যাতে করে আপন টাকা ষোলো-আনাই পর হয়ে যায়। অর্থাৎ জল উবে যায় এ পারের জলাশয়ে আর মেঘ হয়ে তার বর্ষণ হতে থাকে ও পারের দেশে। সে দেশের হাঁসপাতালে বিদ্যালয়ে এই হতভাগ্য অশিক্ষিত অসুস্থ মুমূর্ষু ভারতবর্ষ সুদীর্ঘকাল অপ্রত্যক্ষভাবে রসদ জুগিয়ে আসছে।

দেশের লোকের দৈহিক ও মানসিক অবস্থার চরম দুঃখদৃশ্য অনেককাল স্বচক্ষে দেখে আসছি। দারিদ্র্যে মানুষ কেবল যে মরে তা নয়, নিজেকে অবজ্ঞার যোগ্য করে তোলে। তাই সার্ জন সাইমন বললেন যে :

In our view the most formidable of the evils from which India is suffering have their roots in social and economic customs of longstanding which can only be remedied by the action of the Indian people themselves.

এটা হল অবজ্ঞার কথা। ভারতের প্রয়োজনকে তিনি যে আদর্শ থেকে বিচার করছেন সেটা তাঁদের নিজেদের আদর্শ নয়। প্রচুর ধন-উৎপাদনের জন্যে যে অবারিত শিক্ষা, যে সুযোগ, যে স্বাধীনতা তাঁদের নিজেদের আছে, যে-সমস্ত সুবিধা থাকাতে তাঁদের জীবনযাত্রার আদর্শ জ্ঞানে কর্মে ভোগে নানা দিক থেকে প্রভূত পরিমাণে পরিপুষ্ট হতে পেরেছে, জীর্ণবস্ত্র শীর্ণতনু রোগক্লান্ত শিক্ষাবঞ্চিত ভারতের পক্ষে সে আদর্শ তারা কল্পনার মধ্যেই আনেন না— আমরা কোনোমতে দিনযাপন করব লোকবৃদ্ধি নিবারণ করে এবং খরচপত্র কমিয়ে, আর আজ তাঁরা নিজের জীবিকার যে পরিস্ফীত আদর্শ বহন করছেন তাকে চিরদিন বহুলপরিমাণে সম্ভব করে রাখব আমাদের জীবিকা খর্ব করে, এর বেশি কিছু ভাববার নেই। অতএব রেমেডি'র দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমাদেরই হাতে, যারা রেমেডি'কে দুঃসাধ্য করে তুলেছে তাদের বিশেষ কিছু করবার নেই।

মানুষ এবং বিধাতার বিরুদ্ধে এই-সমস্ত নালিশ ক্ষান্ত করে রেখেই অন্তরের দিক থেকে আমাদের নির্জীব পল্লীর মধ্যে প্রাণসঞ্চার করবার জন্যে আমার অতিক্ষুদ্র শক্তিকে কিছুকাল প্রয়োগ করছি। এ কাজে গবর্মেণ্টের আনুকূল্য আমি উপেক্ষা করি নি, এমন-কি ইচ্ছা করেছি। কিন্তু ফল পাই নি, তার কারণ দরদ নেই। দরদ থাকা সম্ভব নয়— আমাদের অক্ষমতা, আমাদের সকলপ্রকার দুর্দশা, আমাদের দাবিকে ক্ষীণ করে দিয়েছে। দেশের কোনো যথার্থ কৃত্যকর্মে গবর্মেণ্টের সঙ্গে আমাদের কর্মীদের উপযুক্ত যোগসাধন অসম্ভব বলেই অবশেষে স্থির করেছি। অতএব চৌকিদারদের উর্দির খরচ জুগিয়ে যে-কটা কড়ি বাঁচে তাই দিয়ে যা সম্ভব তাই করা যাবে, এই রইল কথা।

রাজকীয় লোভ ও তৎপ্রসূত দুর্বিষহ ঔদাসীন্যের চেহারাটা যখন মনের মধ্যে নৈরাশ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে বসেছে এমন সময়েই রাশিয়ায় গিয়েছিলুম। য়ুরোপের অন্যান্য দেশে ঐশ্বর্যের আড়ম্বর যথেষ্ট দেখেছি; সে এতই উত্তুঙ্গ যে দরিদ্র দেশের ঈর্ষাও তার উচ্চ চূড়া পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। রাশিয়ায় সেই ভোগের

সমারোহ একেবারেই নেই, বোধ করি সেইজন্যেই তার ভিতরকার একটা রূপ দেখা সহজ ছিল।

ভারতবর্ষ যার থেকে একেবারেই বঞ্চিত তারই আয়োজনকে সর্বব্যাপী করবার প্রবল প্রয়াস এখানে দেখতে পেলেম। বলা বাহুল্য, আমি আমার বহুদিনের ক্ষুধিত দেখার ভিতর দিয়ে সমস্তটা দেখেছি। পশ্চিম মহাদেশের অন্য কোনো স্বাধিকার-সৌভাগ্যশালী দেশবাসীর চক্ষে দৃশ্যটা কিরকম ঠেকে সে কথা ঠিকমত বিচার করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। অতীতকালে ভারতবর্ষের কী পরিমাণ ধন ব্রিটিশ দ্বীপে চালান গিয়েছে এবং বর্তমানে কী পরিমাণ অর্থ বর্ষে বর্ষে নানা প্রণালী দিয়ে সেই দিকে চলে যাচ্ছে তার অঙ্কসংখ্যা নিয়ে তর্ক করতে চাই নে। কিন্তু অতি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি এবং অনেক ইংরেজ লেখকও তা স্বীকার করেন যে, আমাদের দেশের রক্তহীন দেহে মন চাপা পড়ে গেছে, জীবনে আনন্দ নেই, আমরা অন্তরে বাহিরে মরছি— এবং তার root cause যে ভারতবাসীরই মর্মগত অপরাধের সঙ্গে জড়িত, অর্থাৎ কোনো গবর্মেণ্টই এর প্রতিকার করতে নিরতিশয় অক্ষম, এ অপবাদ আমরা একেবারেই স্বীকার করব না।

এ কথা চিরদিনই আমার মনে ছিল যে ভারতের সঙ্গে যে পরদেশবাসী শাসনকর্তার স্বার্থের সম্বন্ধ প্রবল এবং দরদের সম্বন্ধ নেই সে গবর্মেণ্ট নিজের গরজেই প্রবল শক্তিতে বিধি ও ব্যবস্থা রক্ষা করতে উৎসাহপরায়ণ; কিন্তু যে-সকল ব্যাপারে গরজ একান্ত আমাদেরই, যেখানে আমাদের দেশকে সর্বপ্রকারে বাঁচিয়ে তুলতে হবে ধনে মনে ও প্রাণে, সেখানে যথোচিত পরিমাণে শক্তি প্রয়োগ করতে এ গবর্মেণ্ট উদাসীন। অর্থাৎ এ সম্বন্ধে নিজের দেশের প্রতি শাসনকর্তাদের যত সচেষ্টতা, যত বেদনাবোধ, আমাদের দেশের প্রতি তার কিয়দংশও সম্ভব হয় না। অথচ আমাদের ধনপ্রাণ তাদেরই হাতে, যে উপায়ে যে উপাদানে আমরা বিনাশ থেকে রক্ষা পেতে পারি সে আমাদের হাতে নেই।

এমন-কি, এ কথা যদি সত্য হয় যে, সমাজবিধি সম্বন্ধে মূঢ়তাবশতই আমরা মরতে বসেছি তবে এই মূঢ়তা যে শিক্ষা, যে উৎসাহ দ্বারা দূর হতে পারে সেও ঐ বিদেশী গবর্মেণ্টেরই রাজকোষে ও রাজমর্জিতে। দেশব্যাপী অশিক্ষাজনিত বিপদ দূর করবার উপায় কমিশনের পরামর্শমাত্র দ্বারা লাভ করা যায় না— সে সম্বন্ধে গবর্মেণ্টের তেমনি তৎপর হওয়া উচিত যেমন তৎপর ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট নিশ্চয়ই হত যদি এই সমস্যা ব্রিটেন দ্বীপের হত। সাইমন কমিশনকে আমাদের প্রশ্ন এই যে, ভারতের অজ্ঞতা-অশিক্ষার মধ্যেই এতবড়ো মৃত্যুশেল নিহিত হয়ে এতদিন রক্তপাত করছে, এই কথাই যদি সত্য

হয় তবে আজ একশো ষাট বৎসরের ব্রিটিশ শাসনে তার কিছুমাত্র লাঘব হল না কেন। কমিশন কি সাংখ্যতথ্যযোগে দেখিয়েছেন পুলিসের ডাণ্ডা যোগাতে ব্রিটিশরাজ যে খরচ করে থাকেন তার তুলনায় দেশকে শিক্ষিত করতে এই সুদীর্ঘকাল কত খরচ করা হয়েছে। দূরদেশবাসী ধনী শাসকের পক্ষে পুলিসের ডাণ্ডা অপরিহার্য কিন্তু সেই লাঠির বংশগত যাদের মাথার খুলি তাদের শিক্ষার ব্যয়বিধান বহু শতাব্দী মুলতবি রাখলেও কাজ চলে যায়।

রাশিয়ায় পা বাড়িয়েই প্রথমেই চোখে পড়ল, সেখানকার যে চাষী ও শ্রমিক-সম্প্রদায়, আজ আট বৎসর পূর্বে, ভারতীয় জনসাধারণেরই মতো নিঃসহায় নিরন্ন নির্যাতিত নিরক্ষর ছিল, অনেক বিষয়ে যাদের দুঃখভার আমাদের চেয়ে বেশি বই কম ছিল না, অন্তত তাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার এ অল্প কয় বৎসরের মধ্যেই যে উন্নতি লাভ করেছে দেড় শো বছরেও আমাদের দেশে উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও তা হয় নি। আমাদের দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ স্বদেশের শিক্ষা সম্বন্ধে যে দুরাশার ছবি মরীচিকার পটে আঁকতেও সাহস পায় নি এখানে তার প্রত্যক্ষ রূপ দেখলুম দিগন্ত থেকে দিগন্তে বিস্তৃত।

নিজেকে এ প্রশ্ন বারবার জিজ্ঞাসা করেছি— এতবড়ো আশ্চর্য ব্যাপার সম্ভবপর হল কী করে। মনের মধ্যে এই উত্তর পেয়েছি যে, লোভের বাধা কোনোখানে নেই। শিক্ষার দ্বারা সব মানুষই যথোচিত সক্ষম হয়ে উঠবে, এ কথা মনে করতে কোথাও খটকা লাগছে না। দূর এশিয়ার তুর্কমেনিস্তানবাসী প্রজাদেরও পুরোপুরি শিক্ষা দিতে এদের মনে একটুও ভয় নেই, প্রত্যুত প্রবল আগ্রহ আছে। তুর্কমেনিস্তানের প্রথাগত মূঢ়তার মধ্যেই সেখানকার লোকের সমস্ত দুঃখের কারণ, এই কথাটা রিপোর্টে নির্দেশ করে উদাসীন হয়ে বসে নেই।

কোচিন-চায়নায় শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে শুনেছি, কোনো ফরাসী পাণ্ডিত্যব্যবসায়ী বলেছেন যে, ভারতবর্ষে ইংরেজ-রাজ দেশী লোককে শিক্ষা দিতে গিয়ে যে ভুল করেছেন ফ্রান্স্ যেন সে ভুল না করেন। এ কথা মানতে হবে যে, ইংরেজের চরিত্রে এমন একটা মহত্ত্ব আছে যেজন্যে বিদেশী শাসননীতিতে তাঁরা কিছু কিছু ভুল করে বসেন, শাসনের ঠাস বুনানিতে কিছু কিছু খেই হারায়, নইলে আমাদের মুখ ফুটতে হয়তো আরো এক-আধ শতাব্দী দেরি হত।

এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই যে শিক্ষার অভাবে অশক্তি অটল হয়ে থাকে, অতএব অশিক্ষা পুলিসের ডাণ্ডার চেয়ে কম বলবান নয়। বোধ হয় যেন লর্ড কার্জন সে কথাটা কিছু কিছু অনুভব করেছিলেন। শিক্ষাদান সম্বন্ধে ফরাসী পাণ্ডিত্যব্যবসায়ী স্বদেশের প্রয়োজনকে যে আদর্শে বিচার করে থাকেন, শাসিত দেশের প্রয়োজনকে সে

আদর্শে করেন না। তার একমাত্র কারণ লোভ। লোভের বাহন যারা তাদের মনুষ্যত্বের বাস্তবতা লুব্ধের পক্ষে অস্পষ্ট, তাদের দাবিকে আমরা স্বভাবতই খর্ব করে থাকি। যাদের সঙ্গে ভারতের শাসনের সম্বন্ধ তাদের কাছে ভারতবর্ষ আজ দেড় শো বৎসর খর্ব হয়ে আছে। এইজন্যেই তার মর্মগত প্রয়োজনের 'পরে উপরওআলার ঔদাসীন্য ঘুচল না। আমরা যে কী অন্ন খাই, কী জলে আমাদের পিপাসা মেটাতে হয়, কী সুগভীর অশিক্ষায় আমাদের চিত্ত তমসাবৃত, তা আজ পর্যন্ত ভালো করে তাদের চোখে পড়ল না। কেননা, আমরাই তাদের প্রয়োজনের এইটেই বড়ো কথা, আমাদেরও যে প্রাণগত প্রয়োজন আছে এ কথাটা জরুরি নয়। তা ছাড়া আমরা এত অকিঞ্চিৎকর হয়ে আছি যে, আমাদের প্রয়োজনকে সম্মান করাই সম্ভব হয় না।

ভারতের যে কঠিন সমস্যা, যাতে করে আমরা এতকাল ধরে ধনে প্রাণে মনে মরছি, এ সমস্যাটা পাশ্চাত্যে কোথাও নেই। সে সমস্যাটি এই যে, ভারতের সমস্ত স্বত্ব দ্বিধাকৃত ও সেই সর্বনেশে বিভাগের মূলে আছে লোভ। এই কারণে রাশিয়ায় এসে যখন সেই লোভকে তিরস্কৃত দেখলুম তখন সেটা আমাকে যতবড়ো আনন্দ দিলে এতটা হয়তো স্বভাবত অন্যকে না দিতে পারে। তবুও মূল কথাটা মন থেকে তাড়াতে পারি নে, সে হচ্ছে এই যে, আজ কেবল ভারতে নয়, সমস্ত পৃথিবীতেই যে-কোনো বড়ো বিপদের জালবিস্তার দেখা যাচ্ছে তার প্রেরণা হচ্ছে লোভ— সেই লোভের সঙ্গেই যত ভয়, যত সংশয়; সেই লোভের পিছনেই যত অস্ত্রসজ্জা, যত মিথ্যুক ও নিষ্ঠুর রাষ্ট্রনীতি।

আর-একটা তর্কের বিষয় হচ্ছে ডিক্‌টেটর্‌শিপ অর্থাৎ রাষ্ট্রব্যাপারে নায়কতন্ত্র নিয়ে। কোনো বিষয়েই নায়কিয়ানা আমি নিজে পছন্দ করি নে। ক্ষতি বা শাস্তির ভয়কে অগ্রবর্তী করে অথবা ভাষায় ভঙ্গীতে বা ব্যবহারে জিদ প্রকাশের দ্বারা, নিজের মত-প্রচারের রাস্তাটাকে সম্পূর্ণ সমতল করবার লেশমাত্র চেষ্টা আমি কোনোদিন নিজের কর্মক্ষেত্রে করতে পারি নে। সন্দেহ নেই যে, একনায়কতার বিপদ আছে বিস্তর; তার ক্রিয়ার একতানতা ও নিত্যতা অনিশ্চিত, যে চালক ও যারা চালিত তাদের মধ্যে ইচ্ছার অসম্পূর্ণ যোগসাধন হওয়াতে বিপ্লবের কারণ সর্বদাই ঘটে, তা ছাড়া সবলে চালিত হওয়ার অভ্যাস চিত্তের ও চরিত্রের বলহানি করে— এর সফলতা যখন বাইরের দিকে দুই-চার ফসলে হঠাৎ আঁজলা ভরে তোলে, ভিতরের শিকড়কে দেয় মেরে।

জনগণের ভাগ্য যদি তাদের সম্মিলিত ইচ্ছার দ্বারাই সৃষ্ট ও পালিত না হয় তবে সেটা হয় খাঁচা, দানাপানি সেখানে ভালো মিলতেও পারে, কিন্তু তাকে নীড় বলা চলে না, সেখানে থাকতে থাকতে পাখা যায় আড়ষ্ট হয়ে। এই নায়কতা শাস্ত্রের মধ্যেই

থাক্, গুরুর মধ্যেই থাক্, আর রাষ্ট্রনেতার মধ্যেই থাক্, মনুষ্যত্বহানির পক্ষে এমন উপদ্রব কিছুই নেই।

আমাদের সমাজে এই ক্লীবত্বসৃষ্টি বহুযুগ থেকে ঘটে আসছে এবং এর ফল প্রতিদিন দেখে আসছি। মহাত্মাজি যখন বিদেশী কাপড়কে অশুচি বলেছিলেন আমি তার প্রতিবাদ করেছিলাম; আমি বলেছিলাম, ওটা আর্থিক ক্ষতিকর হতে পারে, অশুচি হতেই পারে না। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রচালিত অন্ধ চিত্ত ভোলাতে হবে, নইলে কাজ পাব না— মনুষ্যত্বের এমনতরো চিরস্থায়ী অবমাননা আর কী হতে পারে। নায়ক-চালিত দেশ এমনিভাবেই মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকে— এক জাদুকর যখন বিদায় গ্রহণ করে তখন আর-এক জাদুকর আর-এক মন্ত্র সৃষ্টি করে।

ডিক্‌টেটর্‌শিপ একটা মস্ত আপদ, সে কথা আমি মানি এবং সেই আপদের বহু অত্যাচার রাশিয়ায় আজ ঘটছে সে কথাও আমি বিশ্বাস করি। এর নঙর্থক দিকটা জবরদস্তির দিক, সেটা পাপ। কিন্তু সদর্থক দিকটা দেখেছি, সেটা হল শিক্ষা, জবরদস্তির একেবারে উলটো।

দেশের সৌভাগ্যসৃষ্টি-ব্যাপারে জনগণের চিত্ত সম্মিলিত হলে তবে সেটার ক্রিয়া সজীব ও স্থায়ী হয়; নিজের একনায়কত্বের প্রতি যারা লুব্ধ, নিজের চিত্ত ছাড়া অন্য সকল চিত্তকে অশিক্ষা-দ্বারা আড়ষ্ট করে রাখাই তাদের অভিপ্রায়সিদ্ধির একমাত্র উপায়। জারের রাজত্বে শিক্ষার অভাবে জনগণ ছিল মোহাভিভূত, তার উপরে সর্বব্যাপী একটা ধর্মমূঢ়তা অজগর সাপের মতো সাধারণের চিত্তকে শত পাকে বেড়ে ধরেছিল। সেই মূঢ়তাকে সম্রাট অতিসহজে নিজের কাজে লাগাতে পারতেন। তখন য়িহুদির সঙ্গে খৃস্টানের, মুসলমানের সঙ্গে আর্মানির সকলপ্রকার বীভৎস উৎপাত ধর্মের নামে অনায়াসে ঘটানো যেতে পারত। তখন জ্ঞান ও ধর্মের মোহ দ্বারা আত্মশক্তিহারা শ্লথগ্রন্থি বিভক্ত দেশ বাহিরের শক্তির কাছে সহজেই অভিভূত ছিল। একনায়কত্বের চিরাধিপত্যের পক্ষে এমন অনুকূল অবস্থা আর কিছুই হতে পারে না।

পূর্বতন রাশিয়ার মতোই আমাদের দেশে এই অবস্থা বহুকাল থেকে বর্তমান। আজ আমাদের দেশ মহাত্মাজির চালনার কাছে বশ মেনেছে, কাল তিনি থাকবেন না, তখন চালকত্বের প্রত্যাশীরা তেমনি করেই অকস্মাৎ দেখা দিতে থাকবে যেমন করে আমাদের দেশের ধর্মাভিভূতদের কাছে নূতন নূতন অবতার ও গুরু যেখানে-সেখানে উঠে পড়ছে। চীনদেশে আজ নায়কত্ব নিয়ে জনকয়েক ক্ষমতালোভী জবরদস্তদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন প্রলয়সংঘর্ষ চলেইছে, কারণ, জনসাধারণের মধ্যে সে শিক্ষা নেই যাতে তারা নিজের সম্মিলিত ইচ্ছা-দ্বারা দেশের ভাগ্য নিয়মিত করতে পারে; তাই সেখানে

আজ সমস্ত দেশ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। আমাদের দেশে সেই নায়কপদ নিয়ে দারুণ হানাহানি ঘটবে না, এমন কথা মনে করতে পারি নে; তখন দলিতবিদলিত হয়ে মরবে উলুখড় জনসাধারণ, কারণ তারা উলুখড়, তারা বনস্পতি নয়।

রাশিয়াতেও সম্প্রতি নায়কের প্রবল শাসন দেখা গেল। কিন্তু এই শাসন নিজেকে চিরস্থায়ী করবার পন্থা নেয় নি— একদা সে পন্থা নিয়েছিল জারের রাজত্ব, অশিক্ষা ও ধর্মমোহের দ্বারা জনসাধারণের মনকে অভিভূত ক'রে এবং কসাকের কশাঘাতে তাদের পৌরুষকে জীর্ণ করে দিয়ে। বর্তমান আমলে রাশিয়ায় শাসনদণ্ড নিশ্চল আছে বলে মনে করি নে, কিন্তু শিক্ষাপ্রচারের প্রবলতা অসাধারণ। তার কারণ এর মধ্যে ব্যক্তিগত বা দলগত ক্ষমতালিপ্সা বা অর্থলোভ নেই। একটা বিশেষ অর্থনৈতিক মতে সর্বসাধারণকে দীক্ষিত করে জাতি বর্ণ ও শ্রেণী-নির্বিশেষে সকলকেই মানুষ করে তোলবার একটা দুর্নিবার ইচ্ছা আছে। তা যদি না হত তা হলে ফরাসী পণ্ডিতের কথা মানতে হত যে, শিক্ষা দেওয়াটা একটা মস্ত ভুল।

অর্থনৈতিক মতটা সম্পূর্ণ গ্রাহ্য কি না সে কথা বলবার সময় আজও আসে নি, কেননা এ মত এতদিন প্রধানত পুঁথির মধ্যেই টলে টলে বেড়াচ্ছিল, এমন বৃহৎ ক্ষেত্রে এতবড়ো সাহসের সঙ্গে ছাড়া পায় নি। যে প্রবল লোভের কাছে এই মত প্রথম থেকেই সাংঘাতিক বাধা পেত সেই লোভকেই এরা সাংঘাতিকভাবে সরিয়ে দিয়েছে। পরীক্ষার ভিতর দিয়ে পরিবর্তন ঘটতে ঘটতে এ মতের কতটুকু কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা আজ নিশ্চিত কেউ বলতে পারে না। কিন্তু এ কথাটা নিশ্চিত বলা যেতে পারে যে, রাশিয়ার জনসাধারণ এতকাল পরে যে শিক্ষা নির্বারিত ও প্রচুরভাবে পাচ্ছে তাতে করে তাদের মনুষ্যত্ব স্থায়ীভাবে উৎকর্ষ এবং সম্মানলাভ করল।

বর্তমান রাশিয়ার নিষ্ঠুর শাসনের জনশ্রুতি সর্বদাই শোনা যায়— অসম্ভব না হতে পারে। নিষ্ঠুর শাসনের ধারা সেখানে চিরদিন চলে এসেছে, হঠাৎ তিরোভূত না হওয়াই সম্ভব। অথচ সেখানে চিত্রযোগে সিনেমাযোগে ইতিহাসের ব্যাখ্যায় সাবেক আমলের নিদারুণ শাসনবিধি ও অত্যাচারকে সোভিয়েট গবর্মেণ্ট অবিরত প্রত্যক্ষ করিয়ে দিচ্ছে। এই গবর্মেণ্ট নিজেও যদি এইরকম নিষ্ঠুর পথ অবলম্বন করে থাকে তবে নিষ্ঠুরাচারের প্রতি এত প্রবল করে ঘৃণা উৎপাদন করে দেওয়াটাকে, আর-কিছু না হোক, অদ্ভুত ভুল বলতে হবে। সিরাজউদ্দৌলা-কর্তৃক কালা-গর্তের নৃশংসতাকে যদি সিনেমা প্রভৃতি দ্বারা সর্বত্র লাঞ্ছিত করা হত তবে তার সঙ্গে সঙ্গেই জালিয়ানওআলা বাগের কাণ্ড করাটাকে অন্তত মূর্খতা বললে দোষ হত না। কারণ, এ ক্ষেত্রে বিমুখ অস্ত্র অস্ত্রীকেই লাগবার কথা।

সোভিয়েট রাশিয়ায় মার্ক্‌সীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে সর্বসাধারণের বিচারবুদ্ধিকে এক ছাঁচে ঢালবার একটা প্রবল প্রয়াস সুপ্রত্যক্ষ; সেই জেদের মুখে এ সম্বন্ধে স্বাধীন আলোচনার পথ জোর করে অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে, এই অপবাদকে আমি সত্য বলে বিশ্বাস করি। সেদিনকার য়ুরোপীয় যুদ্ধের সময় এইরকম মুখ চাপা দেওয়া এবং গবর্মেণ্ট-নীতির বিরুদ্ধবাদীর মতস্বাতন্ত্র্যকে জেলখানায় বা ফাঁসিকাঠে বিলুপ্ত করে দেওয়ার চেষ্টা দেখা গিয়েছিল।

যেখানে আশু ফললাভের লোভ অতি প্রবল সেখানে রাষ্ট্রনায়কেরা মানুষের মতস্বাতন্ত্র্যের অধিকারকে মানতে চায় না। তারা বলে, ওসব কথা পরে হবে, আপাতত কাজ উদ্ধার করে নিই। রাশিয়ার অবস্থা যুদ্ধকালের অবস্থা। অন্তরে বাহিরে শত্রু। ওখানকার সমস্ত পরীক্ষাকে পণ্ড করে দেবার জন্যে চারি দিকে নানা ছলবলের কাণ্ড চলছে। তাই ওদের নির্মাণকার্যের ভিতটা যত শীঘ্র পাকা করা চাই, এজন্যে বলপ্রয়োগ করতে ওদের কোনো দ্বিধা নেই। কিন্তু গরজ যত জরুরিই হোক, বল জিনিসটা একতরফা জিনিস। ওটাতে ভাঙে, সৃষ্টি করে না। সৃষ্টিকার্যে দুই পক্ষ আছে; উপাদানকে স্বপক্ষে আনা চাই, মারধোর করে নয়, তার নিয়মকে স্বীকার করে।

রাশিয়া যে কাজে লেগেছে এ হচ্ছে যুগান্তরের পথ বানানো; পুরাতন বিধি-বিশ্বাসের শিকড়গুলো তার সাবেক জমি থেকে উপড়ে দেওয়া; চিরাভ্যাসের আরামকে তিরস্কৃত করা। এরকম ভাঙনের উৎসাহে যে আবর্ত সৃষ্টি করে তার মাঝখানে পড়লে মানুষ তার মাতুনির আর অন্ত পায় না— স্পর্ধা বেড়ে ওঠে; মানবপ্রকৃতিকে সাধনা করে বশ করবার অপেক্ষা আছে, এ কথা ভুলে যায়; মনে করে, তাকে তার আশ্রয় থেকে ছিঁড়ে নিয়ে একটা সীতাহরণ-ব্যাপার করে তাকে পাওয়া যেতে পারে। তার পরে লঙ্কায় আগুন লাগে তো লাগুক। উপযুক্ত সময় নিয়ে স্বভাবের সঙ্গে রফা করবার তর সয় না যাদের তারা উৎপাতকে বিশ্বাস করে; অবশেষে লাঠিয়ে পিটিয়ে রাতারাতি যা গড়ে তোলে তার উপরে ভরসা রাখা চলে না, তার উপরে দীর্ঘকালের ভর সয় না।

যেখানে মানুষ তৈরি নেই, মত তৈরি হয়েছে, সেখানকার উচ্চণ্ড দণ্ডনায়কদের আমি বিশ্বাস করি নে। প্রথম কারণ, নিজের মত সম্বন্ধে আগেভাগে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা সুবুদ্ধি নয়, সেটাকে কাজে খাটাতে খাটাতে তবে তার পরিচয় হয়। ও দিকে ধর্মতন্ত্রের বেলায় যে জননায়কেরা শাস্ত্রবাক্য মানে না তারাই দেখি অর্থতন্ত্রের দিকে শাস্ত্র মেনে অচল হয়ে বসে আছে। সেই শাস্ত্রের সঙ্গে যেমন করে হোক মানুষকে টুঁটি চেপে ঝুঁটি ধরে মেলাতে চায়— এ কথাও বোঝে না, জোর করে ঠেসে-ঠুসে যদি কোনো-এক

রকমে মেলানো হয় তাতে সত্যের প্রমাণ হয় না; বস্তুত যে পরিমাণেই জোর সেই পরিমাণেই সত্যের অপ্রমাণ।

য়ুরোপে যখন খৃস্টান শাস্ত্রবাক্যে জবরদস্ত বিশ্বাস ছিল তখন মানুষের হাড়গোড় ভেঙে, তাকে পুড়িয়ে বিঁধিয়ে, তাকে ঢিলিয়ে, ধর্মের সত্য-প্রমাণের চেষ্টা দেখা গিয়েছিল। আজ বলশেভিক মতবাদ সম্বন্ধে তার বন্ধু ও শত্রু উভয় পক্ষেরই সেইরকম উদ্দাম গায়ের-জোরী যুক্তিপ্রয়োগ। দুই পক্ষেরই পরস্পরের নামে নালিশ এই যে, মানুষের মতস্বাতন্ত্র্যের অধিকারকে পীড়িত করা হচ্ছে। মাঝের থেকে পশ্চিম মহাদেশে আজ মানবপ্রকৃতি দুই তরফ থেকেই ঢেলা খেয়ে মরছে। আমার মনে পড়ছে আমাদের বাউলের গান—

নিঠুর গরজী,
তুই কি মানসমুকুল ভাজবি আগুনে?
তুই ফুল ফুটাবি বাস ছুটাবি সবুর বিহনে।
দেখ্-না আমার পরম গুরু সাঁই
সে যুগযুগান্তে ফুটায় মুকুল, তাড়াহুড়া নাই।
তোর লোভ প্রচণ্ড, তাই ভরসা দণ্ড—
এর আছে কোন্ উপায়।
কয় সে মদন দিস নে বেদন, শোন্ নিবেদন,
সেই শ্রীগুরুর মনে।
সহজধারা আপনহারা তাঁর বাণী শোনে
রে গরজী॥

সোভিয়েট রাশিয়ার লোকশিক্ষা সম্বন্ধে আমার যা বক্তব্য সে আমি বলেছি, তা ছাড়া সেখানকার পলিটিক্স্ মুনফা-লোলুপদের লোভের দ্বারা কলুষিত নয় বলে রাশিয়া রাষ্ট্রের অন্তর্গত নানাবিধ প্রজা জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সমান অধিকারের দ্বারা ও প্রকৃষ্ট শিক্ষার সুযোগে সম্মানিত হয়েছে, এ কথাটারও আলোচনা করেছি। আমি ব্রিটিশ-ভারতের প্রজা বলেই এই দুটি ব্যাপার আমাকে এত গভীরভাবে আনন্দ দিয়েছে।

এখন বোধ করি একটি শেষ প্রশ্নের উত্তর আমাকে দিতে হবে। বলশেভিক অর্থনীতি সম্বন্ধে আমার মত কী, এ কথা অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করে থাকেন। আমার ভয় এই যে, আমরা চিরদিন শাস্ত্রশাসিত পাণ্ডাচালিত দেশ, বিদেশের আমদানি বচনকে একেবারেই বেদবাক্য বলে মেনে নেবার দিকেই আমাদের মুগ্ধ মনের ঝোঁক। গুরুমন্ত্রের মোহ থেকে সামলিয়ে নিয়ে আমাদের বলা দরকার যে, প্রয়োগের দ্বারাই

মতের বিচার হতে পারে, এখনো পরীক্ষা শেষ হয় নি। যে-কোনো মতবাদ মানুষ-সম্বন্ধীয় তার প্রধান অঙ্গ হচ্ছে মানবপ্রকৃতি। এই মানবপ্রকৃতির সঙ্গে তার সামঞ্জস্য কী পরিমাণে ঘটবে তার সিদ্ধান্ত হতে সময় লাগে। তত্ত্বটাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করবার পূর্বে অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু তবু সে সম্বন্ধে আলোচনা করা চলে, কেবলমাত্র লজিক নিয়ে বা অঙ্ক কষে নয়— মানবপ্রকৃতিকে সামনে রেখে।

মানুষের মধ্যে দুটো দিক আছে— এক দিকে সে স্বতন্ত্র, আর-এক দিকে সে সকলের সঙ্গে যুক্ত। এর একটাকে বাদ দিলে যেটা বাকি থাকে সেটা অবাস্তব। যখন কোনো একটা ঝোঁকে পড়ে মানুষ এক দিকেই একান্ত উধাও হয়ে যায় এবং ওজন হারিয়ে নানাপ্রকার বিপদ ঘটাতে থাকে তখন পরামর্শদাতা এসে সংকটটাকে সংক্ষেপ করতে চান ; বলেন, অন্য দিকটাকে একেবারেই ছেঁটে দাও। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যখন উৎকট স্বার্থপরতায় পৌঁছিয়ে সমাজে নানাপ্রকার উৎপাত মথিত করে তখন উপদেষ্টা বলেন, স্বার্থ থেকে স্ব-টাকে এক কোপে দাও উড়িয়ে, তা হলেই সমস্ত ঠিক চলবে। তাতে হয়তো উৎপাত কমতে পারে, কিন্তু চলা বন্ধ হওয়া অসম্ভব নয়। লাগাম-ছেঁড়া ঘোড়া গাড়িটাকে খানায় ফেলবার জো করে— ঘোড়াটাকে গুলি করে মারলেই যে তার পর থেকে গাড়িটা সুস্থভাবে চলবে, এমন চিন্তা না করে লাগামটা সম্বন্ধে চিন্তা করবার দরকার হয়ে ওঠে।

দেহে দেহে পৃথক বলেই মানুষ কাড়াকাড়ি হানাহানি করে থাকে, কিন্তু সব মানুষকে এক দড়িতে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে সমস্ত পৃথিবীতে একটিমাত্র বিপুল কলেবর ঘটিয়ে তোলবার প্রস্তাব বলগর্বিত অর্থতাত্ত্বিক কোনো জারের মুখেই শোভা পায়। বিধাতার বিধিকে একেবারে সমূলে অতিদিষ্ট করবার চেষ্টায় যে পরিমাণে সাহস তার চেয়ে অধিক পরিমাণে মূঢ়তা দরকার করে।

একদিন ভারতের সমাজটাই ছিল প্রধানত পল্লীসমাজ। এইরকম ঘনিষ্ঠ পল্লীসমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে সমাজগত সম্পত্তির সামঞ্জস্য ছিল। লোকমতের প্রভাব ছিল এমন যে, ধনী আপনার ধন সম্পূর্ণ আপন ভোগে লাগাতে অগৌরব বোধ করত। সমাজ তার কাছ থেকে আনুকূল্য স্বীকার করেছে বলেই তাকে কৃতার্থ করেছে, অর্থাৎ ইংরেজি ভাষায় যাকে চ্যারিটি বলে এর মধ্যে তা ছিল না। ধনীর স্থান ছিল সেখানেই যেখানে ছিল নির্ধন ; সেই সমাজে আপন স্থানমর্যাদা রক্ষা করতে গেলে ধনীকে নানা পরোক্ষ আকারে বড়ো অঙ্কের খাজনা দিতে হত। গ্রামে বিশুদ্ধ জল, বৈদ্য, পণ্ডিত, দেবালয়, যাত্রা, গান, কথা, পথঘাট, সমস্তই রক্ষিত হত গ্রামের ব্যক্তিগত অর্থের সমাজমুখীন প্রবাহ থেকে, রাজকর থেকে নয়। এর মধ্যে স্বেচ্ছা এবং সমাজের

ইচ্ছা দু'ই মিলতে পেরেছে। যেহেতু এই আদানপ্রদান রাষ্ট্রীয় যন্ত্রযোগে নয়, পরন্তু মানুষের ইচ্ছাবাহিত, সেইজন্যে এর মধ্যে ধর্মসাধনার ক্রিয়া চলত, অর্থাৎ এতে কেবলমাত্র আইনের চালনায় বাহ্য ফল ফলত না, অন্তরের দিকে ব্যক্তিগত উৎকর্ষসাধন হত। এই ব্যক্তিগত উৎকর্ষই মানবসমাজের স্থায়ী কল্যাণময় প্রাণবান আশ্রয়।

বণিকসম্প্রদায়, বিত্ত খাটিয়ে লাভ করাটাই যাদের মুখ্য ব্যবসায়, তারা সমাজে ছিল পতিত। যেহেতু তখন ধনের বিশেষ সম্মান ছিল না এইজন্য ধন ও অধনের একটা মস্ত বিভেদ তখন ছিল অবর্তমান। ধন আপন বৃহৎ সঞ্চয়ের দ্বারা নয়, আপন মহৎ দায়িত্ব পূরণ করে তবে সমাজে মর্যাদা লাভ করত; নইলে তার ছিল লজ্জা। অর্থাৎ সম্মান ছিল ধর্মের, ধনের নয়। এই সম্মান সমর্পণ করতে গিয়ে কারো আত্মসম্মানের হানি হত না। এখন সেদিন গেছে বলেই সামাজিক-দায়িত্বহীন ধনের প্রতি একটা অসহিষ্ণুতার লক্ষণ নানা আকারে দেখা যাচ্ছে। কারণ, ধন এখন মানুষকে অর্ঘ্য দেয় না, তাকে অপমানিত করে।

য়ুরোপীয় সভ্যতা প্রথম থেকেই নগরে সংহত হবার পথ খুঁজেছে। নগরে মানুষের সুযোগ হয় বড়ো, সম্বন্ধ হয় খাটো। নগর অতিবৃহৎ, মানুষ সেখানে বিক্ষিপ্ত, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য একান্ত, প্রতিযোগিতার মথন প্রবল। ঐশ্বর্য সেখানে ধনী-নির্ধনের বিভাগকে বাড়িয়ে তোলে এবং চ্যারিটির দ্বারা যেটুকু যোগসাধন হয় তাতে সান্ত্বনা নেই, সম্মান নেই। সেখানে যারা ধনের অধিকারী এবং যারা ধনের বাহন তাদের মধ্যে আর্থিক যোগ আছে, সামাজিক সম্বন্ধ বিকৃত অথবা বিচ্ছিন্ন।

এমন অবস্থায় যন্ত্রযুগ এল, লাভের অঙ্ক বেড়ে চলল অসম্ভব পরিমাণে। এই লাভের মহামারী সমস্ত পৃথিবীতে যখন ছড়াতে লাগল তখন যারা দূরবাসী অনাত্মীয়, যারা নির্ধন, তাদের আর উপায় রইল না— চীনকে খেতে হল আফিম; ভারতকে উজাড় করতে হল তার নিজস্ব; আফ্রিকা চিরদিন পীড়িত, তার পীড়া বেড়ে চলল। এ তো গেল বাইরের কথা, পশ্চিম মহাদেশের ভিতরেও ধনী-নির্ধনের বিভাগ আজ অত্যন্ত কঠোর; জীবনযাত্রার আদর্শ বহুমূল্য ও উপকরণবহুল হওয়াতে দুই পক্ষের ভেদ অত্যন্ত প্রবল হয়ে চোখে পড়ে। সাবেক কালে, অন্তত আমাদের দেশে, ঐশ্বর্যের আড়ম্বর ছিল প্রধানত সামাজিক দানে ও কর্মে, এখন হয়েছে ব্যক্তিগত ভোগে। তাতে বিস্মিত করে, আনন্দিত করে না; ঈর্ষা জাগায়, প্রশংসা জাগায় না। সব চেয়ে বড়ো কথাটা হচ্ছে এই যে, তখন সমাজে ধনের ব্যবহার একমাত্র দাতার স্বেচ্ছার উপর নির্ভর করত না, তার উপরে ছিল সামাজিক ইচ্ছার প্রবল প্রভাব। সুতরাং দাতাকে নম্র হয়ে দান করতে হত; 'শ্রদ্ধয়া দেয়ং' এই কথাটা খাটত।

মোট কথা হচ্ছে, আধুনিক কালে ব্যক্তিগত ধনসঞ্চয় ধনীকে যে প্রবল শক্তির অধিকার দিচ্ছে তাতে সর্বজনের সম্মান ও আনন্দ থাকতে পারে না। তাতে এক পক্ষে অসীম লোভ, অপর পক্ষে গভীর ঈর্ষা, মাঝখানে দুস্তর পার্থক্য। সমাজে সহযোগিতার চেয়ে প্রতিযোগিতা অসম্ভব বড়ো হয়ে উঠল। এই প্রতিযোগিতা নিজের দেশের এক শ্রেণীর সঙ্গে অন্য শ্রেণীর, এবং বাহিরে এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের। তাই চার দিকে সংশয়হিংস্র অস্ত্র শানিত হয়ে উঠছে, কোনো উপায়েই তার পরিমাণ কেউ খর্ব করতে পারছে না। আর, পরদেশী যারা এই দুরস্থিত ভোগরাক্ষসের ক্ষুধা মেটাবার কাজে নিযুক্ত তাদের রক্তবিরল কৃশতা যুগের পর যুগে বেড়েই চলেছে। এই বহুবিস্তৃত কৃশতার মধ্যে পৃথিবীর অশান্তি বাসা বাঁধতে পারে না, এ কথা যারা বলদর্পে কল্পনা করে তারা নিজের গোঁয়ার্তমির অন্ধতার দ্বারা বিড়ম্বিত। যারা নিরন্তর দুঃখ পেয়ে চলেছে সেই হতভাগারাই দুঃখবিধাতার প্রেরিত দূতদের প্রধান সহায়; তাদের উপবাসের মধ্যে প্রলয়ের আগুন সঞ্চিত হচ্ছে।

বর্তমান সভ্যতার এই অমানবিক অবস্থায় বলশেভিক নীতির অভ্যুদয়; বায়ু-মণ্ডলের এক অংশে তনুত্ব ঘটলে ঝড় যেমন বিদ্যুদ্দন্ত পেষণ করে মারমূর্তি ধরে ছুটে আসে এও সেইরকম কাণ্ড। মানবসমাজে সামঞ্জস্য ভেঙে গেছে বলেই এই একটা অপ্রাকৃতিক বিপ্লবের প্রাদুর্ভাব। সমষ্টির প্রতি ব্যষ্টির উপেক্ষা ক্রমশই বেড়ে উঠছিল বলেই সমষ্টির দোহাই দিয়ে আজ ব্যষ্টিকে বলি দেবার আত্মঘাতী প্রস্তাব উঠেছে। তীরে অগ্নিগিরি উৎপাত বাধিয়েছে বলে সমুদ্রকেই একমাত্র বন্ধু বলে এই ঘোষণা। তীরহীন সমুদ্রের রীতিমত পরিচয় যখন পাওয়া যাবে তখন কূলে ওঠবার জন্যে আবার আঁকুবাঁকু করতে হবে। সেই ব্যষ্টিবর্জিত সমষ্টির অবাস্তবতা কখনোই মানুষ চিরদিন সইবে না। সমাজ থেকে লোভের দুর্গগুলোকে জয় করে আয়ত্ত করতে হবে, কিন্তু ব্যক্তিকে বৈতরণী পার করে দিয়ে সমাজরক্ষা করবে কে। অসম্ভব নয় যে, বর্তমান রুগ্ন যুগে বলশেভিক নীতিই চিকিৎসা; কিন্তু চিকিৎসা তো নিত্যকালের হতে পারে না, বস্তুত ডাক্তারের শাসন যেদিন ঘুচবে সেইদিনই রোগীর শুভদিন।

আমাদের দেশে আমাদের পল্লীতে পল্লীতে ধন- উৎপাদন ও পরিচালনার কাজে সমবায়নীতির জয় হোক, এই আমি কামনা করি। কারণ, এই নীতিতে যে সহযোগিতা আছে তাতে সহযোগীদের ইচ্ছাকে চিন্তাকে তিরস্কৃত করা হয় না বলে, মানবপ্রকৃতিকে স্বীকার করা হয়। সেই প্রকৃতিকে বিরুদ্ধ করে দিয়ে জোর খাটাতে গেলে সে জোর খাটবে না।

এই সঙ্গে একটা কথা বিশেষ করে বলা দরকার। আমি যখন ইচ্ছা করি যে আমাদের দেশের গ্রামগুলি বেঁচে উঠুক, তখন কখনো ইচ্ছে করি নে যে গ্রাম্যতা ফিরে আসুক। গ্রাম্যতা হচ্ছে সেইরকম সংস্কার, বিদ্যা, বুদ্ধি, বিশ্বাস ও কর্ম যা গ্রামসীমার বাইরের সঙ্গে বিযুক্ত— বর্তমান যুগের যে প্রকৃতি তার সঙ্গে যা কেবলমাত্র পৃথক নয়, যা বিরুদ্ধ। বর্তমান যুগের বিদ্যা ও বুদ্ধির ভূমিকা বিশ্বব্যাপী, যদিও তার হৃদয়ের অনুবেদনা সম্পূর্ণ সে পরিমাণে ব্যাপক হয় নি। গ্রামের মধ্যে সেই প্রাণ আনতে হবে যে প্রাণের উপাদান তুচ্ছ ও সংকীর্ণ নয়, যার দ্বারা মানবপ্রকৃতিকে কোনো দিকে খর্ব ও তিমিরাবৃত না রাখা হয়।

ইংলণ্ডে একদা কোনো-এক গ্রামে একজন কৃষকের বাড়িতে ছিলুম। দেখলুম, লণ্ডনে যাবার জন্যে ঘরের মেয়েগুলির মন চঞ্চল। শহরের সর্ববিধ ঐশ্বর্যের তুলনায় গ্রামের সম্বলের এত দীনতা যে, গ্রামের চিত্তকে স্বভাবতই সর্বদা শহরের দিকে টানছে। দেশের মাঝখানে থেকেও গ্রামগুলির যেন নির্বাসন। রাশিয়ায় দেখেছি, গ্রামের সঙ্গে শহরের বৈপরীত্য ঘুচিয়ে দেবার চেষ্টা। এই চেষ্টা যদি ভালো করে সিদ্ধ হয় তা হলে শহরের অস্বাভাবিক অতিবৃদ্ধি নিবারণ হবে। দেশের প্রাণশক্তি চিন্তাশক্তি দেশের সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আপন কাজ করতে পারবে।

আমাদের দেশের গ্রামগুলিও শহরের উচ্ছিষ্ট ও উদ্‌বৃত্ত -ভোজী না হয়ে মনুষ্যত্বের পূর্ণ সম্মান ও সম্পদ ভোগ করুক, এই আমি কামনা করি। একমাত্র সমবায়প্রণালীর দ্বারাই গ্রাম আপন সর্বাঙ্গীণ শক্তিকে নিমজ্জনদশা থেকে উদ্ধার করতে পারবে, এই আমার বিশ্বাস। আক্ষেপের বিষয় এই যে, আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে সমবায়প্রণালী কেবল টাকা ধার দেওয়ার মধ্যেই ম্লান হয়ে আছে, মহাজনী গ্রাম্যতাকেই কিঞ্চিৎ শোধিত আকারে বহন করছে, সম্মিলিত চেষ্টায় জীবিকা উৎপাদন ও ভোগের কাজে সে লাগল না।

তার প্রধান কারণ, যে শাসনতন্ত্রকে আশ্রয় করে আমলা-বাহিনী সমবায়নীতি আমাদের দেশে আবির্ভূত হল সে যন্ত্র, অন্ধ, বধির, উদাসীন। তা ছাড়া হয়তো এ কথা লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে, চরিত্রে যে গুণ থাকলে সমবেত হওয়া সহজ হয় আমাদের সে গুণ নেই ; যারা দুর্বল পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস তাদের দুর্বল। নিজের 'পরে অশ্রদ্ধাই অপরের প্রতি অশ্রদ্ধার ভিত্তি। যারা দীর্ঘকাল পরাধীন, আত্মসম্মান হারিয়ে তাদের এই দুর্গতি। প্রভুশ্রেণীর শাসন তারা নতশিরে স্বীকার করতে পারে, কিন্তু স্বশ্রেণীর চালনা তারা সহ্য করে না। স্বশ্রেণীকে বঞ্চনা করা এবং তার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করা তাদের পক্ষে সহজ।

রুশীয় গল্পের বই পড়ে জানা যায়, সেখানকার বহুকাল-নির্যাতন-পীড়িত কৃষকদেরও এই দশা। যতই দুঃসাধ্য হোক, আর কোনো রাস্তা নেই, পরস্পরের শক্তিকে মনকে সম্মিলিত করবার উপলক্ষ সৃষ্টি করে প্রকৃতিকে শোধন করে নিতে হবে। সমবায়-প্রণালীতে ঋণ দিয়ে নয়, একত্র কর্ম করিয়ে পল্লীবাসীর চিত্তকে ঐক্যপ্রবণ করে তুলে তবে আমরা পল্লীকে বাঁচাতে পারব।

পরিশিষ্ট

গ্রামবাসীদিগের প্রতি

শ্রীনিকেতন বাৎসরিক উৎসবে সমবেত গ্রামবাসীগণের নিকট কথিত

বন্ধুগণ, আমি এক বৎসর প্রবাসে পশ্চিম মহাদেশের নানা জায়গায় ঘুরে আবার আমার আপন দেশে ফিরে এসেছি। একটি কথা তোমাদের কাছে বলা দরকার— অনেকেই হয়তো তোমরা অনুভব করতে পারবে না কথাটি কতখানি সত্য। পশ্চিমের দেশ বিদেশ হতে এত দুঃখ আজ প্রকাশ হয়ে পড়েছে ভিতর থেকে— এরকম চিত্র যে আমি দেখব মনে করি নি। তারা সুখে নেই। সেখানে বিপুল পরিমাণে আসবাবপত্র নানারকম আয়োজন উপকরণের সৃষ্টি হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু গভীর অশান্তি তার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে; সুগভীর একটা দুঃখ তাদের সর্বত্র অধিকার করে রয়েছে।

আমার নিজের দেশের উপর কোনো অভিমান আছে বলে এ কথাটি বলছি মনে কোরো না। বস্তুত য়ুরোপের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে। পশ্চিম মহাদেশে মানুষ যে সাধনা করছে সে সাধনার যে মূল্য তা আমি অন্তরের সঙ্গে স্বীকার করি। স্বীকার না করাকে অপরাধ বলে গণ্য করি। সে মানুষকে অনেক ঐশ্বর্য দিয়েছে, ঐশ্বর্যের পন্থা বিস্তৃত করে দিয়েছে। সব হয়েছে। কিন্তু, দুঃখ পাপে। কলি এমন কোনো ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করে, তা প্রথমত চোখেই পড়ে না। ক্রমে ক্রমে তার ফল আমরা দেখতে পাই।

আমি সেখানকার অনেক চিন্তাশীল মনীষীর সঙ্গে আলাপ করেছি। তাঁরা উদ্‌বিগ্ন হয়ে ভাবতে বসেছেন— এত বিদ্যা, এত জ্ঞান, এত শক্তি, এত সম্পদ, কিন্তু কেন সুখ নেই, শান্তি নেই। প্রতি মুহূর্তে সকলে শঙ্কিত হয়ে আছে, কখন একটা ভীষণ উপদ্রব প্রলয়কাণ্ড বাধিয়ে দেবে। তাঁরা কী স্থির করলেন বলতে পারি না। এখনো বোধ হয় ভালো করে কোনো কারণ নির্ণয় করতে পারেন নি কিম্বা তাঁদের মধ্যে নানান লোক আপন আপন স্বভাব-অনুসারে নানারকম কারণ কল্পনা করেছেন। আমিও এ সম্বন্ধে কিছু চিন্তা করেছি। আমি যেটা মনে করি সেটা সম্পূর্ণ সত্য কি না জানি না; কিন্তু আমার নিজের বিশ্বাস, এর কারণটি কোথায় তা আমি অনুভব করতে পেরেছি ঠিকমত।

পশ্চিম দেশ যে সম্পদ সৃষ্টি করেছে সে অতিবিপুল প্রচণ্ডশক্তিসম্পন্ন যন্ত্রের যোগে।

ধনের বাহন হয়েছে যন্ত্র, আবার সেই যন্ত্রের বাহন হয়েছে মানুষ। হাজার হাজার বহু শতসহস্র। তার পর যান্ত্রিক সম্পৎ-প্রতিষ্ঠার বেদীরূপে তারা বড়ো বড়ো শহর তৈরি করেছে। সে শহরের পেট ক্রমেই বেড়ে চলেছে, তার পরিধি অত্যন্ত বড়ো হয়ে উঠল। নিউইয়র্ক লণ্ডন প্রভৃতি শহর বহু গ্রাম-উপগ্রামের প্রাণশক্তি গ্রাস করে তবে একটা বৃহৎ দানবীয় রূপ ধারণ করেছে। কিন্তু একটি কথা মনে রাখতে হবে— শহরে মানুষ কখনো ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত হতে পারে না। দূরে যাবার দরকার নেই— কলিকাতা শহর, যেখানে আমরা থাকি, জানি, প্রতিবেশীর সঙ্গে সেখানে প্রতিবেশীর সুখে দুঃখে বিপদে আপদে কোনো সম্বন্ধ নেই। আমরা তাদের নাম পর্যন্ত জানি নে।

মানুষের একটি স্বাভাবিক ধর্ম আছে, সে তার সমাজধর্ম। সমাজের মধ্যে সে যথার্থ আপনার আশ্রয় পায় পরস্পরের যোগে। পরস্পর সাহায্য করে বলে মানুষ যে শক্তি পায় আমি তার কথা বলি না। মানুষের সম্বন্ধ যখন চারি দিকের প্রতিবেশীর মধ্যে, যখন আপন ঘরে এবং আপন ঘরের বাইরে ব্যাপ্ত হয়, তখন সে সম্বন্ধের বৃহত্ত্ব মানুষকে আপনি আনন্দ দেয়। আমাদের গভীর পরিতৃপ্তি সেখানে যেখানে কেবলমাত্র ব্যবহারিক সম্বন্ধ নয়, সুযোগ-সুবিধার সম্বন্ধ নয়, ব্যাবসার সম্বন্ধ নয়, কিন্তু সকলরকম স্বার্থের অতীত আত্মীয়সম্বন্ধ। সেখানে মানুষ আর-সমস্ত থেকে বঞ্চিত হতে পারে, কিন্তু মানব-আত্মার তৃপ্তি তার প্রচুর পরিমাণে হয়।

বিদেশে আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করেছেন— যাকে ওঁরা 'হ্যাপিনেস্' বলেন, আমরা বলি সুখ, এর আধার কোথায়। মানুষ সুখী হয় সেখানেই যেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ সত্য হয়ে ওঠে— এ কথাটি বলাই বাহুল্য। কিন্তু আজকের দিনে এটা বলার প্রয়োজন হয়েছে। কেননা, এই সম্বন্ধকে বাদ দিয়ে যেখানে ব্যাবসাঘটিত যোগ সেখানে মানুষ এত প্রচুর ফললাভ করে— বাইরের ফল— এত তাতে মুনফা হয়, এতরকম সুযোগ-সুবিধা মানুষ পায় যে মানুষের বলবার সাহস থাকে না, এটাই সভ্যতার চরম বিকাশ নয়। এত পায়! এত তার শক্তি! যন্ত্রযোগে যে শক্তি প্রবল হয়ে ওঠে তার দ্বারা এমনি করে সমস্ত পৃথিবীকে সে অভিভূত করেছে, বিদেশের এত লোককে তার নিজের দাসত্বে ব্রতী করতে পেরেছে— তার এত অহংকার! আর, সেই সঙ্গে এমন অনেক সুযোগ-সুবিধা আছে যা বস্তুত মানুষের জীবনযাত্রার পথে অত্যন্ত অনুকূল। সেগুলি ঐশ্বর্যযোগে উদ্ভূত হয়েছে। এগুলিকে চরম লাভ বলে মানুষ সহজেই মনে করে। না মনে করে থাকতে পারে না। এর কাছে সে বিকিয়ে দিয়েছে মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস, সে হল মানবসম্বন্ধ।

মানুষ বন্ধুকে চায়, যারা সুখে দুঃখে আমার আপন, যাদের কাছে বসে আলাপ করলে খুশি হই, যাদের বাপ-মার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ছিল, যাদের আমার পিতৃস্থানীয় বলে জেনেছি, যাদের ছেলেরা আমার পুত্রসন্তানের স্থানীয়। এ-সব পরিমণ্ডলীর ভিতর মানুষ আপনার মানবত্বকে উপলব্ধি করে।

এ কথা সত্য, একটা প্রকাণ্ড দানবীয় ঐশ্বর্যের মধ্যে মানুষ আপনার শক্তিকে অনুভব করে। সেও বহুমূল্য, আমি তাকে অবজ্ঞা করব না। কিন্তু সেই শক্তি-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যদি মানুষী সম্বন্ধ-বিকাশের অনুকূল ক্ষেত্র কেবলই সংকীর্ণ হতে থাকে তবে সেই শক্তি শক্তিশেল হয়ে উঠে মানুষকে মারে, মারবার অস্ত্র তৈরি করে, মানুষের সর্বনাশ করবার জন্য ষড়যন্ত্র করে, অনেক মিথ্যার সৃষ্টি করে, অনেক নিষ্ঠুরতাকে পালন করে, অনেক বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ করে সমাজে। এ হতেই হবে। দরদ যখন চলে যায়, মানুষ অধিকাংশ মানুষকে যখন প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মতো দেখতে অভ্যস্ত হয়, লক্ষ লক্ষ মানুষকে যখন দেখে 'তারা আমার কলের চাকা চালিয়ে আমার কাপড় সস্তা করবে, আমার খাবার জুগিয়ে দেবে, আমার ভোগের উপকরণ সুগম করবে'— এইভাবে যখন মানুষকে দেখতে অভ্যস্ত হয় তখন তারা মানুষকে দেখে না, মানুষের মধ্যে কলকে দেখে।

এখানে চালের কল আছে। সেই কল-দানবের চাকা সাঁওতাল ছেলেমেয়েরা। ধনী তাদের কি মানুষ মনে করে। তাদের সুখদুঃখের কি হিসেব আছে। প্রতিদিনের পাওনা গুনে দিয়ে তার কাছে কষে রক্ত শুষে কাজ আদায় করে নিচ্ছে। এতে টাকা হয়, সুখও হয়, অনেক হয়, কিন্তু বিকিয়ে যায় মানুষের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মানবত্ব। দয়ামায়া, পরস্পরের সহজ আনুকূল্য, দরদ— কিছু থাকে না। কে দেখে তাদের ঘরে কী হয়েছে না হয়েছে। একসময় আমাদের গ্রামে উচ্চনীচের ভেদ ছিল না তা নয়— প্রভু ছিল, দাস ছিল ; পণ্ডিত ছিল, অজ্ঞান ছিল ; ধনী ছিল, নির্ধন ছিল ; কিন্তু সকলের সুখদুঃখের উপর সকলের দৃষ্টি ছিল। পরস্পর সম্মিলিত হয়ে একত্রীভূত একটা জীবনযাত্রা তারা তৈরি করে তুলেছিল। পূজাপার্বণে আনন্দ-উৎসবে সকল সম্বন্ধে প্রতিদিন তারা নানারকমে মিলিত হয়েছে। চণ্ডীমণ্ডপে এসে গল্প করেছে দাদাঠাকুরের সঙ্গে। যে অন্ত্যজ সেও একপাশে বসে আনন্দের অংশ গ্রহণ করেছে। উপর-নীচ জ্ঞানী-অজ্ঞানীর মাঝখানে যে রাস্তা যে সেতু সেটা খোলা ছিল।

আমি পল্লীর কথা বলছি, কিন্তু মনে রেখো— পল্লীই তখন সব ; শহর তখন নগণ্য বলতে চাই না, কিন্তু গৌণ, মুখ্য নয়, প্রধান নয়। পল্লীতে পল্লীতে কত পণ্ডিত, কত ধনী, কত মানী, আপনার পল্লীকে জন্মস্থানকে আপনার করে বাস করেছে। সমস্ত

জীবন হয়তো নবাবের ঘরে, দরবারে কাজ করেছে। যা-কিছু সম্পদ তারা পল্লীতে এনেছে। সেই অর্থে টোল চলেছে, পাঠশালা বসেছে, রাস্তাঘাট হয়েছে, অতিথিশালা, যাত্রা-পূজা-অর্চনায় গ্রামের মনপ্রাণ এক হয়ে মিলেছে। গ্রামে আমাদের দেশের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ছিল, তার কারণ গ্রামে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সামাজিক সম্বন্ধ সেটা সত্য হতে পারে। শহরে তা সম্ভব নয়। অতএব সামাজিক মানুষ আশ্রয় পায় গ্রামে। আর, সামাজিক মানুষের জন্যই তো সব। ধর্মকর্ম সামাজিক মানুষেরই জন্য। লক্ষপতি ক্রোড়পতি টাকার থলি নিয়ে গদিয়ান হয়ে বসে থাকতে পারে। বড়ো বড়ো হিসাবের খাতা ছাড়া তার আর কিছু নেই, তার সঙ্গে কারো সম্বন্ধ নেই। আপনার টাকার গড়খাই করে তার মধ্যে সে বসে আছে, সর্বসাধারণের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কোথায়।

এখনকার সঙ্গে তুলনা করলে অনেক অভাব আমাদের দেশে ছিল। এখন আমরা কলের জল খাই, তাতে রোগের বীজ কম ; ভালো ডাক্তার পাই, ডাক্তারখানা আছে ; জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহায্যে অনেক সুযোগ ঘটেছে। আমি তাকে অসম্মান করি নে ; কিন্তু আমাদের খুব একটা বড়ো সম্পদ ছিল, সে হচ্ছে আত্মীয়তা। এর চেয়ে বড়ো সম্পদ নেই। এই আত্মীয়তার যেখানে অভাব সেখানে সুখশান্তি থাকতে পারে না।

সমস্ত পশ্চিম মহাদেশে মানুষে মানুষে আত্মীয়তা অত্যন্ত ভাসা-ভাসা। তার গভীর শিকড় নেই। সকলে বলছে, "আমি ভোগ করব, আমি বড়ো হব, আমার নাম হবে, আমার মুনফা হবে।" যে তা করছে তার কতবড়ো সম্মান। তার ধনশক্তির পরিমাপ করতে গিয়ে সেখানকার লোকের মন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। ব্যক্তিগত শক্তির এইরকম উপাসনা এমনভাবে আমাদের দেশে দেখি নি। কিছু না, একটা লোক শুধু ঘুষি চালাতে পারে। সে ঘুষির বড়ো ওস্তাদ রাস্তা দিয়ে বেরোল, রাস্তায় ভিড় জমে গেল। খবর এল সিনেমার নটী লণ্ডনের রাস্তা দিয়ে গাড়ি করে আসছে, গাড়ির ভিতর থেকে চকিতে তাকে দেখবে বলে জনতায় রাস্তা নিরেট হয়ে উঠল। আমাদের দেশে মহদাশয় যাঁকে বলি তিনি এলে আমরা সকলে তাঁর চরণধুলো নেব। মহাত্মা গান্ধী যদি আসেন দেশসুদ্ধ লোক খেপে যাবে। তাঁর না আছে অর্থ, না আছে বাহুবল, কিন্তু আছে হৃদয়, আছে আধ্যাত্মিক শক্তি। আমি যতদূর জানি তিনি ঘুষি মারতে জানেন না, কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে তিনি বড়ো করে স্বীকার করেছেন ; আপনাকে তিনি স্বতন্ত্র করে রাখেন নি, তিনি আমাদের সকলের, আমরা সকলে তাঁর। ব্যস্, হয়ে গেল, এর চেয়ে বেশি আমরা কিছু বুঝি নে। তাঁর চেয়ে অনেক বিদ্বান, অনেক জ্ঞানী, অনেক ধনী আছে ; কিন্তু আমাদের দেশ দেখবে আত্মদানের ঐশ্বর্য। এ কি কম কথা। এর থেকে বুঝি, আমাদের দেশের লোক কী চায়।

পাণ্ডিত্য নয়, ঐশ্বর্য নয়, আর কিছু নয়, চায় মানুষের আত্মার সম্পদ। কিন্তু দিনে দিনে পরিবর্তন হয়ে এসেছে। আমি গ্রামে অনেকদিন কাটিয়েছি, কোনোরকম চাটুবাক্য বলতে চাই নে। গ্রামের যে মূর্তি দেখেছি সে অতি কুৎসিত। পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা বিদ্বেষ ছলনা বঞ্চনা বিচিত্র আকারে প্রকাশ পায়। মিথ্যা মকদ্দমায় সাংঘাতিক জালে পরস্পরকে জড়িয়ে মারে। সেখানে দুর্নীতি কতদূর শিকড় গেড়েছে তা চক্ষে দেখেছি। শহরে কতকগুলি সুবিধা আছে, গ্রামে তা নেই ; গ্রামের যেটা আপন জিনিস ছিল তাও আজ সে হারিয়েছে।

মনের মধ্যে উৎকণ্ঠা নিয়ে আজ এসেছি গ্রামবাসী তোমাদের কাছে। পূর্বে তোমরা সমাজবন্ধনে এক ছিলে, আজ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পরস্পরকে কেবল আঘাত করছ। আর-একবার সম্মিলিত হয়ে তোমাদের শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। বাহিরের আনুকূল্যের অপেক্ষা কোরো না। শক্তি তোমাদের মধ্যে আছে জেনেই সেই শক্তির আত্মবিস্মৃতি আমরা ঘোচাতে ইচ্ছা করেছি। কেননা তোমাদের সেই শক্তির উপর সমস্ত দেশের দাবি আছে। ভিত যতই যাচ্ছে ধ্বসে উপরের তলায় ফাটল ধরছে— বাইরে থেকে পলস্তারা দিয়ে বেশি দিন তাকে বাঁচিয়ে রাখা চলবে না।

এসো তোমরা, প্রার্থীভাবে নয়, কৃতীভাবে। আমাদের সহযোগী হও, তা হলেই সার্থক হবে আমাদের এই উদ্যোগ। গ্রামের সামাজিক প্রাণ সুস্থ হয়ে সবল হয়ে উঠুক। গানে গীতে কাব্যে কথায় অনুষ্ঠানে আনন্দে শিক্ষায় দীক্ষায় চিত্ত জাগুক। তোমাদের দৈন্য দুর্বলতা আত্মাবমাননা ভারতবর্ষের বুকের উপর প্রকাণ্ড বোঝা হয়ে চেপে রয়েছে। আর-সকল দেশ এগিয়ে চলেছে, আমরা অজ্ঞানে অশিক্ষায় স্থাবর হয়ে পড়ে আছি। এ সমস্তই দূর হয়ে যাবে যদি নিজের শক্তিসম্বলকে সমবেত করতে পারি। আমাদের এই শ্রীনিকেতনে জনসাধারণের সেই শক্তিসমবায়ের সাধনা।

১৩৩৭

পল্লীসেবা

শ্রীনিকেতনের উৎসবে কথিত

বেদে অনন্তস্বরূপকে বলেছেন আবিঃ, প্রকাশস্বরূপ। তাঁর প্রকাশ আপনার মধ্যেই সম্পূর্ণ। তাঁর কাছে মানুষের প্রার্থনা এই যে : আবিরাবীর্ম এধি। হে আবি, আমার মধ্যে তোমার আবির্ভাব হোক। অর্থাৎ, আমার আত্মায় অনন্তস্বরূপের প্রকাশ চাই। জ্ঞানে প্রেমে কর্মে আমার অভিব্যক্তি অনন্তের পরিচয় দেবে, এতেই আমার সার্থকতা। আমাদের চিত্তবৃত্তি থেকে, ইচ্ছাশক্তি থেকে, কর্মোদ্যম থেকে, অপূর্ণতার আবরণ ক্রমে ক্রমে মোচন করে অনন্তের সঙ্গে নিজের সাধর্ম্য প্রমাণ করতে থাকব এই হচ্ছে মানুষের ধর্মসাধনা।

অন্য জীবজন্তু যেমন অবস্থায় সংসারে এসেছে সেই অবস্থাতেই তাদের পরিণাম। অর্থাৎ, প্রকৃতিই তাদের প্রকাশ করেছে এবং সেই প্রকৃতির প্রবর্তনা মেনেই তারা প্রাণযাত্রা নির্বাহ করে, তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু, নিজের ভিতর থেকে নিজের অন্তরতর সত্যকে নিরন্তর উদ্‌ঘাটিত করতে হবে নিজের উদ্যমে— মানুষের এই চরম অধ্যবসায়। সেই আত্মোপলব্ধ সত্যেই তার প্রকাশ, প্রকৃতিনিয়ন্ত্রিত প্রাণযাত্রায় নয়। তাই তার দুরূহ প্রার্থনা এই যে, সকল দিকেই অনন্তকে যেন প্রকাশ করি। তাই সে বলে, ভূমৈব সুখং, মহত্ত্বেই সুখ, নাল্পে সুখমস্তি, অল্প-কিছুতেই সুখ নেই।

মানুষের পক্ষে তাই সকলের চেয়ে দুর্গতি যখন আপনার জীবনে সে আপন অন্তর্নিহিত ভূমাকে প্রকাশ করতে পারলে না— বাধাগুলো শক্ত হয়ে রইল। এই তার পক্ষে মৃত্যুর চেয়ে বড়ো মৃত্যু। আহারে বিহারে ভোগে বিলাসে সে পরিপুষ্ট হতে পারে; কিন্তু জ্ঞানের দীপ্তিতে, ত্যাগের শক্তিতে, প্রেমের বিস্তারে, কর্মচেষ্টার সাহসে সে যদি আপনার প্রবুদ্ধ মুক্তস্বরূপ কিছু পরিমাণেও প্রকাশ করতে না পারে তবে তাকেই বলে 'মহতী বিনষ্টিঃ'। সে বিনষ্টি জীবের মৃত্যুতে নয়, আত্মার অপ্রকাশে।

সভ্যতা যাকে বলি তার এক প্রতিশব্দ হচ্ছে 'ভূমাকে প্রকাশ'। মানুষের ভিতরকার যে 'নিহিতার্থ' যা তার গভীর সত্য, সভ্যতায় তারই আবিষ্কার চলছে। সভ্য মানুষের শিক্ষাবিধি এত ব্যাপক, এত দুরূহ এইজন্যেই। তার সীমা কেবলই অগ্রসর হয়ে চলেছে; সভ্য মানুষের চেষ্টা প্রকৃতিনির্দিষ্ট কোনো গণ্ডীকে চরম বলতে চাচ্ছে না।

মানুষের মধ্যে নিত্যপ্রসার্যমাণ সম্পূর্ণতার যে আকাঙ্ক্ষা তার দুটো দিক, কিন্তু তারা পরস্পরযুক্ত। একটা ব্যক্তিগত পূর্ণতা, আর-একটা সামাজিক, এদের মাঝখানে ভেদ নেই। ব্যক্তিগত উৎকর্ষের ঐকান্তিকতা অসম্ভব। মানবলোকে যাঁরা

শ্রেষ্ঠ পদবী পেয়েছেন তাঁদের শক্তি সকলের শক্তির ভিতর দিয়েই ব্যক্ত, তা পরিচ্ছিন্ন নয়। মানুষ যেখানে ব্যক্তিগতভাবে বিচ্ছিন্ন, পরস্পরের সহযোগিতা যেখানে নিবিড় নয়, সেইখানেই বর্বরতা। বর্বর একা একা শিকার করে, খণ্ড খণ্ড ভাবে জীবিকার উপযুক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, সেই জীবিকার ভোগ অত্যন্ত ছোটো সীমার মধ্যে। বহুজনের চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষসহযোগে নিজের চিত্তের উৎকর্ষ, বহুজনের শক্তিকে সংযুক্ত করে নিজের শক্তি, বহুজনের সম্পদকে সম্মিলিত করার দ্বারা নিজের সম্পদ সুপ্রতিষ্ঠিত করাই হল সভ্য মানবের লক্ষ্য।

উপনিষৎ বলেন, আমরা যখন আপনার মধ্যে অন্যকে ও অন্যের মধ্যে আপনাকে পাই তখনই সত্যকে পাই— ন ততো বিজুগুপ্সতে— তখন আর গোপনে থাকতে পারি নে, তখনই আমাদের প্রকাশ। সভ্যতায় মানুষ প্রকাশমান, বর্বরতায় মানুষ অপ্রকাশিত। পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের আত্মোপলব্ধি যতই সত্য হতে থাকে ততই সভ্যতার যথার্থ স্বরূপ পরিস্ফুট হয়। ধর্মের নামে, কর্মের নামে, বৈষয়িকতার নামে, স্বাদেশিকতার নামে, যেখানেই মানুষ মানবলোকে ভেদ সৃষ্টি করেছে সেইখানেই দুর্গতির কারণ গোচরে অগোচরে বল পেতে থাকে। সেখানে মানব আপন মানবধর্মকে আঘাত করে, সেই হচ্ছে আত্মঘাতের প্রকৃষ্ট পন্থা। ইতিহাসে যুগে যুগে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

সভ্যতা-বিনাশের কারণ সন্ধান করলে একটিমাত্র কারণ পাওয়া যায়, সে হচ্ছে মানবসম্বন্ধের বিকৃতি বা ব্যাঘাত। যারা ক্ষমতাশালী ও যারা অক্ষম তাদের মধ্যেকার ব্যবধান প্রশস্ত হয়ে সেখানে সামাজিক সামঞ্জস্য নষ্ট হয়েছে। সেখানে প্রভুর দলে, দাসের দলে, ভোগীর দলে, অভুক্তের দলে, সমাজকে দ্বিখণ্ডিত করে সমাজদেহে প্রাণ-প্রবাহের সঞ্চরণকে অবরুদ্ধ করেছে; তাতে এক অঙ্গের অতিপুষ্টি এবং অন্য অঙ্গের অতিশীর্ণতায় রোগের সৃষ্টি হয়েছে; পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই এই ছিদ্র দিয়ে আজ যমের চর আনাগোনা করছে। আমাদের দেশে তার প্রবেশপথ অন্য দেশের চেয়ে আরো যেন অবারিত। এই দুর্ঘটনা সম্প্রতি ঘটেছে।

একদিন আমাদের দেশে পল্লীসমাজ সজীব ছিল। এই সমাজের ভিতর দিয়েই ছিল সমস্ত দেশের যোগবন্ধন, আমাদের সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা ধর্মকর্মের প্রবাহ পল্লীতে পল্লীতে ছিল সঞ্চারিত। দেশের বিরাট চিত্ত পল্লীতে পল্লীতে প্রসারিত হয়ে আশ্রয় পেয়েছে, প্রাণ পেয়েছে। এ কথা সত্য যে, আধুনিক অনেক জ্ঞানবিজ্ঞান সুযোগ-সুবিধা থেকে আমরা বঞ্চিত ছিলুম। তখন আমাদের চেষ্টার পরিধি ছিল সংকীর্ণ, বৈচিত্র্য ছিল স্বল্প, জীবনযাত্রার আয়োজনে উপকরণে অভাব ছিল বিস্তর। কিন্তু, সামাজিক প্রাণক্রিয়ার যোগ ছিল অবিচ্ছিন্ন। এখন তা নেই। নদীতে স্রোত যখন

বহমান থাকে তখন সেই স্রোতের দ্বারা এ পারে ও পারে, এ দেশে ও দেশে, আনাগোনা-দেনাপাওনার যোগ রক্ষা হয়। জল যখন শুকিয়ে যায় তখন এই নদীরই খাত বিষম বিঘ্ন হয়ে ওঠে। তখন এক কালের পথটাই হয় অন্য কালের অপথ। বর্তমানে তাই ঘটেছে।

যাদের আমরা ভদ্রসাধারণ নাম দিয়ে থাকি তারা যে বিদ্যালাভ করে, তাদের যা আকাঙ্ক্ষা ও সাধনা, তারা যে-সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকে, সে-সব হল মরা নদীর শুষ্ক গহ্বরের এক পাড়িতে— তার অপর পাড়ির সঙ্গে জ্ঞান-বিশ্বাস আচার-অভ্যাস দৈনিক জীবনযাত্রায় দুস্তর দূরত্ব। গ্রামের লোকের না আছে বিদ্যা, না আছে আরোগ্য, না আছে সম্পদ, না আছে অন্নবস্ত্র। ও দিকে যারা কলেজে পড়ে, ওকালতি করে, ডাক্তারি করে, ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেয়, তারা রয়েছে দ্বীপের মধ্যে ; চারি দিকে অতল-স্পর্শ বিচ্ছেদ।

যে স্নায়ুজালের যোগে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বেদনা দেহের মর্মস্থানে পৌঁছয়, সমস্ত দেহের আত্মবোধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বোধের সম্মিলনে সম্পূর্ণ হয়, তার মধ্যে যদি বিচ্ছিন্নতা ঘটে তবে তো মরণদশা। সেই দশা আমাদের সমাজে। দেশকে মুক্তিদান করবার জন্যে আজ যারা উৎকট অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত এমন-সব লোকের মধ্যেও দেখা যায়, সমাজের মধ্যে গুরুতর ভেদ যেখানে, যেখানে পক্ষাঘাতের লক্ষণ, সেখানে তাঁদের দৃষ্টিই পড়ে না। থেকে থেকে বলে ওঠেন, কিছু করা চাই। কিন্তু কণ্ঠের সঙ্গে সঙ্গে হাত এগোয় না। দেশ সম্বন্ধে আমাদের যে উদ্যোগ তার থেকে দেশের লোক বাদ পড়ে। এটা আমাদের এতই অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে, এর বিপুল বিড়ম্বনা সম্বন্ধে আমাদের বোধ নেই। একটা তার দৃষ্টান্ত দিই।

আমাদের দেশে আধুনিক শিক্ষাবিধি বলে একটা পদার্থের আবির্ভাব হয়েছে। তারই নামে স্কুল কলেজ ব্যাঙের ছাতার মতো ইতস্তত মাথা তুলে উঠেছে। এমন ভাবে এটা তৈরি যে, এর আলো কলেজি মণ্ডলের বাইরে অতি অল্পই পৌঁছয়— সূর্যের আলো চাঁদের আলোয় পরিণত হয়ে যতটুকু বিকীর্ণ হয় তার চেয়েও কম। বিদেশী ভাষার স্থূল বেড়া তার চার দিকে। মাতৃভাষার যোগে শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে যখন চিন্তা করি সে চিন্তার সাহস অতি অল্প। সে যেন অন্তঃপুরিকা বধূর মতোই ভীরু। আঙিনা পর্যন্তই তার অধিকার, তার বাইরে চিবুক পেরিয়ে তার ঘোমটা নেমে পড়ে। মাতৃভাষার আমল প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যেই, অর্থাৎ সে কেবল শিশুশিক্ষারই যোগ্য— অর্থাৎ মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা শেখবার সুযোগ নেই, সেই বিরাট জনসংঘকে বিদ্যার অধিকার সম্বন্ধে চিরশিশুর মতোই গণ্য করা হয়েছে। তারা কোনোমতেই পুরো

মানুষ হয়ে উঠবে না, অথচ স্বরাজ সম্বন্ধে তারা পুরো মানুষের অধিকার লাভ করবে, চোখ বুজে এইটে আমরা কল্পনা করি।

জ্ঞানলাভের ভাগ নিয়ে দেশের অধিকাংশ জনমণ্ডলী সম্বন্ধে এতবড়ো অনশনের ব্যবস্থা আর-কোনো নবজাগ্রত দেশে নেই— জাপানে নেই, পারস্যে নেই, তুরস্কে নেই, ইজিপ্টে নেই। যেন মাতৃভাষা একটা অপরাধ, যাকে খৃস্টান ধর্মশাস্ত্রে বলে আদিম পাপ। দেশের লোকের পক্ষে মাতৃভাষাগত শিক্ষার ভিতর দিয়ে জ্ঞানের সর্বাঙ্গসম্পূর্ণতা আমরা কল্পনার বাইরে ফেলে রেখেছি। 'ইংরেজি হোটেলওয়ালার দোকান ছাড়া আর কোথাও দেশের লোকের পুষ্টিকর অন্ন মিলবেই না' এমন কথা বলাও যা আর 'ইংরেজি ভাষা ছাড়া মাতৃভাষার যোগে জ্ঞানের সম্যক সাধনা হতেই পারবে না' এও বলা তাই।

এই উপলক্ষে এ কথা মনে রাখা দরকার যে, আধুনিক সমস্ত বিদ্যাকে জাপানী ভাষার সম্পূর্ণ আয়ত্তগম্য করে তবে জাপানী বিশ্ববিদ্যালয় দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে সত্য ও সম্পূর্ণ করে তুলেছে। তার কারণ, শিক্ষা বলতে জাপান সমস্ত দেশের শিক্ষা বুঝেছে— ভদ্রলোক বলে এক সংকীর্ণ শ্রেণীর শিক্ষা বোঝে নি। মুখে আমরা যাই বলি, দেশ বলতে আমরা যা বুঝি সে হচ্ছে ভদ্রলোকের দেশ। জনসাধারণকে আমরা বলি, ছোটোলোক; এই সংজ্ঞাটা বহুকাল থেকে আমাদের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেছে। ছোটোলোকদের পক্ষে সকলপ্রকার মাপকাঠিই ছোটো। তারা নিজেও সেটা স্বীকার করে নিয়েছে। বড়ো মাপের কিছুই দাবি করবার ভরসা তাদের নেই। তারা ভদ্রলোকের ছায়াচর, তাদের প্রকাশ অনুজ্জ্বল, অথচ দেশের অধিকাংশই তারা, সুতরাং দেশের অন্তত বারো-আনা অনালোকিত। ভদ্রসমাজ তাদের স্পষ্ট করে দেখতেই পায় না, বিশ্বসমাজের তো কথাই নেই।

রাষ্ট্রীয় আলোচনার মত্ত অবস্থায় আমরা মুখে যাই কিছু বলি-না কেন, দেশাভিমান যত তারস্বরে প্রকাশ করি-না কেন, আমাদের দেশ প্রকাশহীন হয়ে আছে বলেই কর্মের পথ দিয়ে দেশের সেবায় আমাদের এত ঔদাসীন্য। যাদের আমরা ছোটো করে রেখেছি মানবস্বভাবের কৃপণতাবশত তাদের আমরা অবিচার করেই থাকি। তাদের দোহাই দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে অর্থসংগ্রহ করি; কিন্তু তাদের ভাগে পড়ে বাক্য, অর্থটা অবশেষে আমাদের দলের লোকের ভাগ্যেই এসে জোটে। মোট কথাটা হচ্ছে, দেশের যে অতিক্ষুদ্র অংশে বুদ্ধি বিদ্যা ধন মান, সেই শতকরা পাঁচ পরিমাণ লোকের সঙ্গে পঁচানব্বই পরিমাণ লোকের ব্যবধান মহাসমুদ্রের ব্যবধানের চেয়ে বেশি। আমরা এক দেশে আছি, অথচ আমাদের এক দেশ নয়।

শিশুকালে আমাদের ঘরে যে সেজের দীপ জ্বলত তার এক অংশে অল্প তেল অপর

অংশে অনেকখানি জল ছিল। জলের অংশ ছিল নীচে, তেলের অংশ ছিল উপরে। আলো মিট্‌মিট্‌ করে জলত, অনেকখানি ছড়াত ধোঁয়া। এটা কতকটা আমাদের সাবেক কালের অবস্থা। ভদ্রসাধারণ এবং ইতরসাধারণের সম্বন্ধটা এইরকমই ছিল। তাদের মর্যাদা সমান নয় কিন্তু তবুও তারা উভয়ে একত্র মিলে একই আলো জালিয়ে রেখেছিল। তাদের ছিল একটা অখণ্ড আধার। আজকের দিনে তেল গিয়েছে এক দিকে, জল গিয়েছে আর-এক দিকে; তেলের দিকে আলোর উপাদান অতি সামান্য, জলের দিকে একেবারেই নেই।

বয়স যখন হল, ঘরে এল কেরোসিনের ল্যাম্প্‌ বিদেশ থেকে; তাতে সবটাতেই এক তেল, সেই তেলের সমস্তটার মধ্যেই উদ্দীপনের শক্তি। আলোর উজ্জ্বলতাও বেশি। এর সঙ্গে য়ুরোপীয় সভ্যসমাজের তুলনা করা যেতে পারে। সেখানে এক জাতেরই বিদ্যা ও শক্তি দেশের সকল লোকের মধ্যেই ব্যাপ্ত। সেখানে উপরিতল নিম্নতল আছে, সেই উপরিতলের কাছেই বাতি দীপ্ত হয়ে জলে, নীচের তল অদীপ্ত। কিন্তু, সেই ভেদ অনেকটা আকস্মিক; সমস্ত তেলের মধ্যেই দীপ্তির শক্তি আছে। সে হিসাবে জ্যোতির জাতিভেদ নেই; নীচের তেল যদি উপরে ওঠে তা হলে উজ্জ্বলতার তারতম্য ঘটে না। সেখানে নীচের দলের পক্ষে উপরের দলে উত্তীর্ণ হওয়া অসাধ্য নয়; সেই চেষ্টা নিয়তই চলছে।

আর-এক শ্রেণীর বাতি আছে তাকে বলি বিজলি বাতি। তার মধ্যে তারের কুণ্ডলী আলো দেয়, তার আগাগোড়াই সমান প্রদীপ্ত। তার মধ্যে দীপ্ত-অদীপ্তের ভেদ নেই; এই আলো দিবালোকের প্রায় সমান। য়ুরোপীয় সমাজে এই বাতি জালাবার উদ্যোগ সব দেশে এখন চলছে না; কিন্তু কোথাও কোথাও শুরু হয়েছে— এর যন্ত্রটাকে পাকা করে তুলতে হয়তো এখনো অনেক ভাঙচুর করতে হবে, যন্ত্রের মহাজন কেউ কেউ হয়তো দেউলে হয়ে যেতেও পারে, কিন্তু পশ্চিম মহাদেশে এই দিকে একটা ঝোঁক পড়েছে সে কথা আর গোপন করে রাখবার জো নেই। এইটে হচ্ছে প্রকাশের চেষ্টা, মানুষের অন্তর্নিহিত ধর্ম; এই ধর্মসাধনায় সকল মানুষই অব্যাহত অধিকার লাভ করবে এইরকমের একটা প্রয়াস ক্রমশই যেন ছড়িয়ে পড়ছে।

কেবল আমাদের হতভাগ্য দেশে দেখি, মাটির প্রদীপে যে আলো একদিন এখানে জলেছিল তাতেও আজ বাধা পড়ল। আজ আমাদের দেশের ডিগ্রিধারীরা পল্লীর কথা যখন ভাবেন তখন তাদের জন্যে অতি সামান্য ওজনে কিছু করাকেই যথেষ্ট বলে মনে করেন। যতক্ষণ আমাদের এইরকমের মনোভাব ততক্ষণ পল্লীর লোকেরা আমাদের পক্ষে বিদেশী। এমন-কি, তার চেয়েও তারা বেশি পর, তার কারণ এই— আমরা স্কুলে

কলেজে যেটুকু বিদ্যা পাই সে বিদ্যা য়ুরোপীয়। সেই বিদ্যার সাহায্যে য়ুরোপীয়কে বোঝা ও য়ুরোপীয়ের কাছে নিজেকে বোঝানো আমাদের পক্ষে সহজ। ইংলণ্ড ফ্রান্স্ জার্মানির চিত্তবৃত্তি আমাদের কাছে সহজে প্রকাশমান ; তাদের কাব্য গল্প নাটক যা আমরা পড়ি সে আমাদের কাছে হেঁয়ালি নয় ; এমন-কি যে কামনা, যে তপস্যা তাদের, আমাদের কামনা-সাধনাও অনেক পরিমাণে তারই পথ নিয়েছে। কিন্তু, যারা মা-ষষ্ঠী মনসা ওলাবিবি শীতলা ঘেঁটু রাহু শনি ভূত প্রেত ব্রহ্মদৈত্য গুপ্তপ্রেস-পঞ্জিকা পাণ্ডা পুরুতের আওতায় মানুষ হয়েছে তাদের থেকে আমরা খুব বেশি উপরে উঠেছি তা নয়, কিন্তু দূরে সরে গিয়েছি— পরস্পরের মধ্যে ঠিকমত সাড়া চলে না। তাদের ঠিকমত পরিচয় নেবার উপযুক্ত কৌতূহল পর্যন্ত আমাদের নেই।

আমাদের কলেজে যারা ইকনমিক্স্ এথ্‌নোলজি পড়ে তারা অপেক্ষা করে থাকে য়ুরোপীয় পণ্ডিতের— পাশের গ্রামের লোকের আচারবিচার বিধিব্যবস্থা জানবার জন্যে। ওরা ছোটোলোক, আমাদের মনে মানুষের প্রতি যেটুকু দরদ আছে তাতে করে ওরা আমাদের কাছে দৃশ্যমান নয়। পশ্চিম মহাদেশের নানাপ্রকার 'মুভ্‌মেণ্ট্'এর পূর্বাপর ইতিহাস এঁরা পড়েছেন। আমাদের জনসাধারণদের মধ্যেও নানা মুভ্‌মেণ্ট্ চলে আসছে, কিন্তু সে আমাদের শিক্ষিত-সাধারণের অগোচরে। জানবার জন্যে কোনো ঔৎসুক্য নেই ; কেননা তাতে পরীক্ষা-পাসের মার্কা মেলে না। দেশের সাধারণের মধ্যে আউল বাউল কত সম্প্রদায় আছে, সেটা একেবারে অবজ্ঞার বিষয় নয় ; ভদ্র-সমাজের মধ্যে নূতন নূতন ধর্মপ্রচেষ্টার চেয়ে তার মধ্যে অনেক বিষয়ে গভীরতা আছে ; সে-সব সম্প্রদায়ের যে সাহিত্য তাও শ্রদ্ধা করে রক্ষা করবার যোগ্য— কিন্তু 'ওরা ছোটোলোক'।

সকল দেশেই নৃত্য কলাবিদ্যার অন্তর্গত, ভাবপ্রকাশের উপায়রূপে শ্রদ্ধা পেয়ে থাকে। আমাদের দেশে ভদ্রসমাজে তা লোপ পেয়ে গেছে বলে আমরা ধরে রেখেছি সেটা আমাদের নেই। অথচ জনসাধারণের নৃত্যকলা নানা আকারে এখনো আছে— কিন্তু 'ওরা ছোটোলোক'। অতএব ওদের যা আছে সেটা আমাদের নয়। এমন-কি, সুন্দর সুনিপুণ হলেও সেটা আমাদের পক্ষে লজ্জার বিষয়। ক্রমে হয়তো এ-সমস্তই লোপ হয়ে যাচ্ছে ; কিন্তু সেটাকে আমরা দেশের ক্ষতি বলেই গণ্য করি নে, কেননা বস্তুতই ওরা আমাদের দেশে নেই।

কবি বলেছেন, 'নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে!' তিনি এইভাবেই বলেছিলেন যে, আমরা বিদেশীর শাসনে আছি। তার চেয়ে সত্যতর গভীরতর ভাবে বলা চলে যে, আমাদের দেশে আমরা পরবাসী, অর্থাৎ আমাদের জাতের অধিকাংশের দেশ আমাদের

দেশ নয়। সে দেশ আমাদের অদৃশ্য, অস্পৃশ্য। যখন দেশকে মা বলে আমরা গলা ছেড়ে ডাকি তখন মুখে যাই বলি মনে মনে জানি, সে মা গুটিকয়েক আদুরে ছেলের মা। এই করেই কি আমরা বাঁচব। শুধু ভোট দেবার অধিকার পেয়েই আমাদের চরম পরিত্রাণ?

এই দুঃখেই দেশের লোকের গভীর ঔদাসীন্যের মাঝখানে, সকল লোকের আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়ে, এখানে এই গ্রাম-কয়টির মধ্যে আমরা প্রাণ-উদ্‌বোধনের যজ্ঞ করেছি। যাঁরা কোনো কাজই করেন না তাঁরা অবজ্ঞার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, এতে কতটুকু কাজই বা হবে। স্বীকার করতেই হবে, তেত্রিশ কোটির ভার নেবার যোগ্যতা আমাদের নেই। কিন্তু, তাই বলে লজ্জা করব না। কর্মক্ষেত্রের পরিধি নিয়ে গৌরব করতে পারব এ কল্পনাও আমাদের মনে নেই, কিন্তু তার সত্য নিয়ে যেন গৌরব করতে পারি। কখনো আমাদের সাধনায় যেন এ দৈন্য না থাকে যে, পল্লীর লোকের পক্ষে অতি অল্পটুকুই যথেষ্ট। ওদের জন্যে উচ্ছিষ্টের ব্যবস্থা করে যেন ওদের অশ্রদ্ধা না করি। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্‌। পল্লীর কাছে আমাদের আত্মোৎসর্গের যে নৈবেদ্য তার মধ্যে শ্রদ্ধার যেন কোনো অভাব না থাকে।

১৩৩৭

কোরীয় যুবকের রাষ্ট্রিক মত

কোরীয় যুবকটি সাধারণ জাপানীর চেয়ে মাথায় বড়ো। ইংরেজি সহজে বলেন, উচ্চারণে জড়তা নেই।

আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, "কোরিয়ায় জাপানী রাষ্ট্রশাসন তোমার পছন্দ নয়?"

"না।"

"কেন। জাপানী আমলে তোমাদের দেশে পূর্বেকার চেয়ে কি ব্যবস্থা ভালো হয় নি।"

"তা হয়েছে। কিন্তু আমাদের যে দুঃখ সেটা সংক্ষেপে বলতে গেলে দাঁড়ায়, জাপানী রাজত্ব ধনিকের রাজত্ব। কোরিয়া তার মুনফার উপায়, তার ভোজ্যের ভাণ্ডার। প্রয়োজনের আসবাবকে মানুষ উজ্জ্বল করে রাখে, কারণ সেটা তার আপন সম্পত্তি,

তাকে নিয়ে তার অহমিকা। কিন্তু মানুষ তো থালা ঘটী বাটি কিম্বা গাড়োয়ানের ঘোড়া বা গোয়ালের গোরু নয় যে, বাহ্য যত্ন করলেই তার পক্ষে যথেষ্ট।"

"তুমি কি বলতে চাও জাপান যদি কোরিয়ার সঙ্গে প্রধানত আর্থিক সম্বন্ধ না পাতিয়ে তোমাদের 'পরে রাজপ্রতাপের সম্বন্ধ খাটাত, অর্থাৎ বৈশ্যরাজ না হয়ে ক্ষত্রিয়রাজ হত, তা হলে তোমাদের পরিতাপের কারণ থাকত না।"

"আর্থিক সম্বন্ধের যোগে বিরাট জাপানের সহস্রমুখী ক্ষুধা আমাদের শোষণ করে, কিন্তু রাজপ্রতাপের সম্বন্ধ ব্যক্তিগত, সীমাবদ্ধ— তার বোঝা হালকা। রাজার ইচ্ছা কেবল যদি শাসনের ইচ্ছা হয়, শোষণের ইচ্ছা না হয়, তবে তাকে স্বীকার করেও মোটের উপর সমস্ত দেশ আপন স্বাতন্ত্র্য ও আত্মসম্মান রাখতে পারে। কিন্তু ধনিকের শাসনে আমাদের গোটা দেশ আর-একটি গোটা দেশের পণ্যদ্রব্যে পরিণত। আমরা লোভের জিনিস; আত্মীয়তার না, গৌরবের না।"

"এই-যে কথাগুলি ভাবছ এবং বলছ, এই-যে সমষ্টিগতভাবে জাতীয় আত্মসম্মানের জন্যে তোমার আগ্রহ, তার কি কারণ এই নয় যে, জাপানের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে তোমরা আধুনিক যুগের রাষ্ট্রিক শিক্ষায় দীক্ষিত।"

কোরীয় যুবক দ্বিধার ভাবে চুপ করে রইলেন।

আমি বললুম, "চেয়ে দেখো সামনে ঐ চীনদেশ। সেখানে স্বজাতীয় আত্মসম্মানবোধ শিক্ষার অভাবে দেশের জনসাধারণের মধ্যে অপ্রবুদ্ধ। তাই দেখি, ব্যক্তিগত ক্ষমতাপ্রাপ্তির দুরাশায় সেখানে কয়েকজন লুব্ধ লোকের হানাহানি-কাটাকাটির ঘূর্ণিপাক। এই নিয়ে লুটপাট-অত্যাচারে, ডাকাতের হাতে, সৈনিকের হাতে, হতভাগ্য দেশ ক্ষতবিক্ষত, রক্তে প্লাবিত, অসহায়ভাবে দিনরাত সন্ত্রস্ত। শিক্ষার জোরে যেখানে সাধারণ লোকের মধ্যে স্বাধিকারবোধ স্পষ্ট না হয়েছে সেখানে স্বদেশী বা বিদেশী দুরাকাঙ্ক্ষীদের হাতে তাদের নির্যাতন ঠেকাবে কিসে। সে অবস্থায় তারা ক্ষমতা-লোলুপের স্বার্থসাধনের উপকরণমাত্র হয়ে থাকে। তুমি তোমার দেশকে ধনীর উপকরণদশাগ্রস্ত বলে আক্ষেপ করেছিলে, সেই পরের উপকরণদশা তাদের কিছুতেই ঘোচে না যারা মূঢ়, যারা কাপুরুষ, ভাগ্যের মুখপ্রত্যাশী, যারা আত্মকর্তৃত্বে আস্থাবান নয়। কোরিয়ার অবস্থা জানি নে, কিন্তু সেখানে নবযুগের শিক্ষার প্রভাবে যদি সাধারণের মধ্যে স্বাধিকারবোধের অঙ্কুরমাত্র উদ্গত হয়ে থাকে তবে সে শিক্ষা কি জাপানের কাছ থেকেই পাও নি।"

"কার কাছ থেকে পেয়েছি তাতে কী আসে যায়। শত্রু হোক, মিত্র হোক, যে-কেউ আমাদের যে উপায়ে জাগিয়ে তুলুক-না কেন, জাগরণের যা ধর্ম তার তো কাজ চলবে।"

"সে কথা আমি মানি, সে তর্ক আমার নয়। বিচারের বিষয় এই যে, তোমার দেশে শিক্ষাবিস্তার এতটা হয়েছে কি না যাতে দেশের অধিকাংশ লোক স্বাধিকার উপলব্ধি এবং সেটা যথার্থভাবে দাবি করতে পারে। যদি তা না হয়ে থাকে তবে সেখানে বিদেশী নিরস্ত হলেও সর্বসাধারণের যোগে আত্মশাসন ঘটবে না, ঘটবে কয়েকজনের দৌরাত্ম্যে আত্মবিপ্লব। এই স্বল্প লোকের ব্যক্তিগত স্বার্থবোধকে সংযত করবার একমাত্র উপায় বহু লোকের সমষ্টিগত স্বার্থবোধের উদ্‌বোধন।"

"যে পরিমাণ ও যে প্রকৃতির শিক্ষায় বৃহৎ ভাবে সমস্ত দেশের চৈতন্য হতে পারে সেটা আমরা সম্পূর্ণভাবে পরের হাত থেকে প্রত্যাশা করব কেমন করে।"

"তোমরা শিক্ষিত লোকেরা দেশে সেই শিক্ষার অভাব যদি অনুভব কর তবে এই শিক্ষাবিস্তারের সাধনাকেই সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্য-রূপে নিজেরাই গ্রহণ করবে না কেন। দেশকে বাঁচাতে গেলে কেবল তো ভাবুকতা নয়, জ্ঞানের প্রয়োজন করে। আমার মনে আরো একটি চিন্তার বিষয় আছে। ভৌগোলিক ঐতিহাসিক বা জাতীয়প্রকৃতি-গত কারণে কোরিয়া অনেক কাল থেকেই দুর্বল। আজকের দিনে যুদ্ধবিগ্রহ যখন বৈজ্ঞানিক-সাধনা-সাধ্য ও প্রভূতব্যয়সাধ্য তখন জাপান হতে নিজের শক্তিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে তোমরা নিজের শক্তিতেই কি আত্মরক্ষা করতে পার— ঠিক করে বলো।"

"পারি নে সে কথা স্বীকার করতেই হবে।"

"যদি না পার তবে এ কথাও মানতে হবে যে, দুর্বল কেবল নিজের বিপদ নয়, অন্যেরও বিপদ ঘটায়। দুর্বলতার গহ্বর-কেন্দ্রে প্রবলের দুরাকাঙ্ক্ষা আপনিই দূর থেকে আকৃষ্ট হয়ে আবর্তিত হতে থাকে। সওয়ার সিংহের পিঠে চড়ে না; ঘোড়াকেই লাগামে বাঁধে। মনে করো, রাশিয়া যদি কোরিয়ায় ধ্বজা গেড়ে বসে তবে সেটা, কেবল কোরিয়ার পক্ষে নয়, জাপানের পক্ষেও বিপদ। এমন অবস্থায় অন্য প্রবলকে ঠেকাবার জন্যই কোরিয়ায় জাপানের নিজের শক্তিকেই প্রবল করতে হয়। এমন অবস্থায় কোনো একদিন জাপান বিনা পরাভবেই কোরিয়ার ক্ষীণ হস্তেই কোরিয়ার ভাগ্যকে সমর্পণ করবে, এ সম্ভবপর নয়। এর মধ্যে জাপানের শুধু মুনফার লোভ না, প্রাণের দায়।"

"আপনার প্রশ্ন এই যে, তা হলে কোরিয়ার উপায় কী। জানি, আধুনিক যুদ্ধের উপযোগী সৈন্যদল বানিয়ে তুলতে পারব না। তার পরে যুদ্ধের জন্য ভাসান-জাহাজ, ডুব-জাহাজ, উড়ো-জাহাজ, এ-সমস্ত তৈরি করা, চালনা করা, বর্তমান অবস্থায় আমাদের কল্পনার অতীত। সেই উদ্দেশে চেষ্টা করাও বিদেশী শাসনাধীনে অসম্ভব। তবু তাই বলে হাল ছেড়ে দেব, এ কথা বলতে পারি নে।"

"এ কথা বলা ভালোও না। হাল ছাড়ব না, কিন্তু কোন্ দিক বাগে হাল চালাতে হবে সেটা যদি না ভাবি ও বুদ্ধিসংগত তার একটা জবাব না দিই তবে মুখে যতই আস্ফালন করি, ভাষান্তরে তাকেই বলে হাল ছেড়ে দেওয়া।"

"আমি কী ভাবি তা বলা যাক। এমন একটা সময় আসবে যখন পৃথিবীতে জাপানী চীনীয় রুশীয় কোরীয় প্রভৃতি নানা জাতির মধ্যে আর্থিক-স্বার্থগত রাষ্ট্রীয় প্রতিযোগিতাই সব চেয়ে প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনারূপে থাকবে না। কেন থাকবে না তা বলি। যে দেশের মানুষকে চলিত ভাষায় স্বাধীন বলে থাকে তাদেরও ঐশ্বর্য এবং প্রতাপের ক্ষেত্রে দুই ভাগ। এক ভাগের অল্প লোকে ঐশ্বর্য ভোগ করে, আর-এক ভাগের অসংখ্য দুর্ভাগা সেই ঐশ্বর্যের ভার বয়; এক ভাগের দু-চারজন লোক প্রতাপযজ্ঞশিখা নিজের ইচ্ছায় উদ্দীপিত করে, আর-এক ভাগের বিস্তর লোক ইচ্ছা না থাকলেও নিজের অস্থিমাংস দিয়ে সেই প্রতাপের ইন্ধন জোগায়। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যুগে যুগে মানুষের মধ্যে এই মূলগত বিভাগ, এই দুই স্তর। এতদিন নিম্নস্তরের মানুষ নিজের নিম্নতা নতশিরেই মেনে নিয়েছে, ভাবতেই পারে নি যে এটা অবশ্য-স্বীকার্য নয়।"

আমি বললুম, "ভাবতে আরম্ভ করেছে, কেননা আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য মহাদেশে নিম্নস্তরের মধ্যে শিক্ষা পরিব্যাপ্ত।"

"তাই ধরে নিচ্ছি। কারণ যাই হোক, আজ পৃথিবীতে যে যুগান্তকারী দ্বন্দ্বের সূচনা হয়েছে সে ভিন্ন ভিন্ন মহাজাতির মধ্যে নয়, মানুষের এই দুই বিভাগের মধ্যে, শাসয়িতা এবং শাসিত, শোষয়িতা এবং শুষ্ক। এখানে কোরীয় এবং জাপানী, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য এক পঙ্‌ক্তিতেই মেলে। আমাদের দুঃখই আমাদের দৈন্যই আমাদের মহাশক্তি। সেইটেতেই জগৎ জুড়ে আমাদের সম্মিলন এবং সেইটেতেই ভবিষ্যৎকে আমরা অধিকার করব। অথচ যারা ধনিক তারা কিছুতেই একত্র মিলতে পারে না, স্বার্থের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরে তারা বিচ্ছিন্ন। আমাদের মস্ত আশ্বাসের কথা এই যে, যারা সত্য করে মিলতে পারে তাদেরই জয়। য়ুরোপে যে মহাযুদ্ধ হয়ে গেছে সেটা ধনিকের যুদ্ধ। সেই যুদ্ধের বীজ আজ অসংখ্য পরিমাণে পৃথিবীতে ছড়িয়ে রইল। সেই বীজ মানব-প্রকৃতির মধ্যেই; স্বার্থই বিদ্বেষবুদ্ধির জন্মভূমি, পালন-দোলা। এতকাল দুঃখীরাই দৈন্য-দ্বারা, অজ্ঞানের দ্বারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিল; ধনের মধ্যে যে শক্তিশেল আছে তাই দিয়েই তাদের মর্ম বিদ্ধ হয়েছে। আজ দুঃখদৈন্যেই আমরা মিলিত হব, আর ধনের দ্বারাই ধনী হবে বিচ্ছিন্ন। পৃথিবীতে আজ রাষ্ট্রতন্ত্রে যে অশান্ত আলোড়ন, বলশালী জাতির মধ্যে যে দুরন্ত আশঙ্কা, তাতে এইটেই কি দেখতে পাচ্ছি নে।"

এর পরে আমাদের আর কথা কবার অবকাশ হয় নি। আমি মনে মনে ভাবলুম, অসংযত শক্তিলুব্ধতা নিজের মধ্যে বিষ উৎপাদন করেই নিজেকে মারে এ কথা সত্য, কিন্তু শক্ত ও অশক্তের ভেদ আজ যে একটা বিশেষ আকার ধরে প্রকাশ পাচ্ছে সেইটেকেই রক্তপাত করে বিনাশ করলেই কি মানবপ্রকৃতি থেকে ভেদের মূল একেবারে চলে যায়। পৃথিবীর সমস্ত উচ্চভূমি ঝড়বৃষ্টির ঝাঁটার তাড়নায় ক্ষয় পেয়ে পেয়ে একদিন সমুদ্রের গর্ভে তলিয়ে যাবে এমন কথা শোনা যায়, কিন্তু সেই দিনেই কি পৃথিবীর মরবার সময় আসবে না। সমত্ব এবং পঞ্চত্ব কি একই কথা নয়। ভেদ নষ্ট করে মানবসমাজের সত্য নষ্ট করা হয়। ভেদের মধ্যে কল্যাণসম্বন্ধ স্থাপনই তার নিত্য সাধনা, আর ভেদের মধ্যকার অন্যায়ের সঙ্গেই তার নিত্য সংগ্রাম। এই সাধনায়, এই সংগ্রামেই মানুষ বড়ো হয়ে ওঠে। য়ুরোপ আজ সাধনাকে বাদ দিয়ে সংগ্রামকেই যখন একান্ত করতে চায় তখন তার চেষ্টা হয়— শক্তকে বিনাশ করে অশক্তকে সাম্য দেওয়া। যদি অভিলাষ সফল হয় তবে যে হিংসার সাহায্যে সফল হবে সেই রক্তবীজকেই জয়ডঙ্কা বাজিয়ে সেই সফলতার কাঁধের উপর চড়িয়ে দেবে। কেবলই চলতে থাকবে রক্তপাতের চক্রাবর্তন। শান্তির দোহাই পেড়ে এরা লড়াই করে এবং সেই লড়াইয়ের ধাক্কাতেই সেই শান্তিকে মারে; আজকের দিনের শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কালকের দিনের যে শক্তিকে জাগিয়ে তোলে আবার তারই বিরুদ্ধে পরদিন থেকে যুদ্ধের আয়োজন করতে থাকে। অবশেষে চরমশান্তি কি বিশ্বব্যাপী শ্মশানক্ষেত্রে?

কোরীয় যুবকের সঙ্গে আমার যে কথাবার্তা হয়েছিল তার ভাবখানা এই লেখায় আছে। এটা যথাযথ অনুলিপি নয়।

১৩৩৬

মানুষের ধর্ম

ভূমিকা

মানুষের একটা দিক আছে যেখানে বিষয়বুদ্ধি নিয়ে সে আপন সিদ্ধি খোঁজে। সেইখানে আপন ব্যক্তিগত জীবনযাত্রানির্বাহে তার জ্ঞান, তার কর্ম, তার রচনাশক্তি একান্ত ব্যাপৃত। সেখানে সে জীবরূপে বাঁচতে চায়।

কিন্তু মানুষের আর-একটা দিক আছে যা এই ব্যক্তিগত বৈষয়িকতার বাইরে। সেখানে জীবনযাত্রার আদর্শে যাকে বলি ক্ষতি তাই লাভ, যাকে বলি মৃত্যু সেই অমরতা। সেখানে বর্তমান কালের জন্যে বস্তু-সংগ্রহ করার চেয়ে অনিশ্চিত কালের উদ্দেশে আত্মত্যাগ করার মূল্য বেশি। সেখানে জ্ঞান উপস্থিত-প্রয়োজনের সীমা পেরিয়ে যায়, কর্ম স্বার্থের প্রবর্তনাকে অস্বীকার করে। সেখানে আপন স্বতন্ত্র জীবনের চেয়ে যে বড়ো জীবন সেই জীবনে মানুষ বাঁচতে চায়।

স্বার্থ আমাদের যে-সব প্রয়াসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় তার মূল প্রেরণা দেখি জীবপ্রকৃতিতে; যা আমাদের ত্যাগের দিকে, তপস্যার দিকে নিয়ে যায় তাকেই বলি মনুষ্যত্ব, মানুষের ধর্ম।

কোন্ মানুষের ধর্ম। এতে কার পাই পরিচয়। এ তো সাধারণ মানুষের ধর্ম নয়, তা হলে এর জন্যে সাধনা করতে হত না।

আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'। তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব। তাঁরই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায় ভাবে কর্মে সর্বজনীনতার আবির্ভাব। মহাত্মারা সহজে তাঁকে অনুভব করেন সকল মানুষের মধ্যে, তাঁর প্রেমে সহজে জীবন উৎসর্গ করেন। সেই মানুষের উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীবসীমা অতিক্রম করে মানবসীমায় উত্তীর্ণ হয়। সেই মানুষের উপলব্ধি সর্বত্র সমান নয় ও অনেক স্থলে বিকৃত বলেই সব মানুষ আজও মানুষ হয় নি। কিন্তু তাঁর আকর্ষণ নিয়ত মানুষের অন্তর থেকে কাজ করছে বলেই আত্মপ্রকাশের প্রত্যাশায় ও প্রয়াসে মানুষ কোথাও সীমাকে স্বীকার করছে না। সেই মানবকেই মানুষ নানা নামে

পূজা করেছে, তাঁকেই বলেছে 'এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা'। সকল মানবের ঐক্যের মধ্যে নিজের বিচ্ছিন্নতাকে পেরিয়ে তাঁকে পাবে আশা করে তাঁর উদ্দেশে প্রার্থনা জানিয়েছে—

স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

সেই মানব, সেই দেবতা, য একঃ, যিনি এক, তাঁর কথাই আমার এই বক্তৃতাগুলিতে আলোচনা করেছি।

শান্তিনিকেতন
১৮ মাঘ ১৩৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মানুষের ধর্ম

পথ চলেছিল একটানা বাইরের দিকে, তার নিজের মধ্যে নিজের অর্থ ছিল না। পৌঁছল এসে ঘরে, সেখানে অর্থ পাওয়া গেল, আরম্ভ হল ভিতরের লীলা। মানুষে এসে পৌঁছল সৃষ্টিব্যাপার, কর্মবিধির পরিবর্তন ঘটল, অন্তরের দিকে বইল তার ধারা। অভিব্যক্তি চলছিল প্রধানত প্রাণীদের দেহকে নিয়ে, মানুষে এসে সেই প্রক্রিয়ার সমস্ত ঝোঁক পড়ল মনের দিকে। পূর্বের থেকে মস্ত একটা পার্থক্য দেখা গেল। দেহে দেহে জীব স্বতন্ত্র; পৃথকভাবে আপন দেহরক্ষায় প্রবৃত্ত, তা নিয়ে প্রবল প্রতিযোগিতা। মনে মনে সে আপনার মিল পায় এবং মিল চায়, মিল না পেলে সে অকৃতার্থ। তার সফলতা সহযোগিতায়। বুঝতে পারে, বহুর মধ্যে সে এক; জানে, তার নিজের মনের জানাকে বিশ্বমানবমন যাচাই করে, প্রমাণিত করে, তবে তার মূল্য। দেখতে পায়, জ্ঞানে কর্মে ভাবে যতই সকলের সঙ্গে সে যুক্ত হয় ততই সে সত্য হয়। যোগের এই পূর্ণতা নিয়েই মানুষের সভ্যতা। তাই মানুষের সেই প্রকাশই শ্রেষ্ঠ যা একান্ত ব্যক্তিগত মনের নয়, যাকে সকল কালের সকল মানুষের মন স্বীকার করতে পারে। বুদ্ধির বর্বরতা তাকেই বলে যা এমন মতকে, এমন কর্মকে, সৃষ্টি করে যাতে বৃহৎকালে সর্বজনীন মন আপনার সায় পায় না। এই সর্বজনীন মনকে উত্তরোত্তর বিশুদ্ধ করে উপলব্ধি করাতেই মানুষের অভিব্যক্তির উৎকর্ষ। মানুষ আপন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিসীমাকে পেরিয়ে বৃহৎমানুষ হয়ে উঠছে, তার সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাধনা এই বৃহৎমানুষের সাধনা। এই বৃহৎমানুষ অন্তরের মানুষ। বাইরে আছে নানা দেশের নানা সমাজের নানা জাত, অন্তরে আছে এক মানব।

ইতিহাসে দেখা যায়, মানুষের আত্মোপলব্ধি বাহির থেকে অন্তরের দিকে আপনিই গিয়েছে, যে অন্তরের দিকে তার বিশ্বজনীনতা, যেখানে বস্তুর বেড়া পেরিয়ে সে পৌঁচেছে বিশ্বমানসলোকে। যে লোকে তার বাণী, তার শ্রী, তার মুক্তি। সফলতালাভের জন্যে সে মন্ত্রতন্ত্র ক্রিয়াকর্ম নিয়ে বাহ্য পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়েছিল; অবশেষে সার্থকতালাভের জন্যে একদিন সে বললে, তপস্যা বাহ্যানুষ্ঠানে নয়, সত্যই তপস্যা; গীতার ভাষায় ঘোষণা করলে, দ্রব্যময় যজ্ঞের চেয়ে জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেয়; খৃস্টের বাণীতে শুনলে, বাহ্য বিধিনিষেধে পবিত্রতা নয়, পবিত্রতা চিত্তের নির্মলতায়। তখন মানবের রুদ্ধ মনে বিশ্বমানবচিত্তের উদ্‌বোধন হল। এই তার আন্তর সত্তার বোধ দৈহিক সত্তার ভেদসীমা ছাড়িয়ে দেশে

কালে সকল মানুষের মধ্যে ঐক্যের দিকে প্রসারিত। এই বোধেরই শেষ কথা এই যে, যে মানুষ আপনার আত্মার মধ্যে অন্যের আত্মাকে ও অন্যের আত্মার মধ্যে আপনার আত্মাকে জানে সেই জানে সত্যকে।

মানুষ আছে তার দুই ভাবকে নিয়ে, একটা তার জীবভাব, আর-একটা বিশ্বভাব। জীব আছে আপন উপস্থিতকে আঁকড়ে, জীব চলছে আশু প্রয়োজনের কেন্দ্র প্রদক্ষিণ করে। মানুষের মধ্যে সেই জীবকে পেরিয়ে গেছে যে সত্তা সে আছে আদর্শকে নিয়ে। এই আদর্শ অন্নের মতো নয়, বস্ত্রের মতো নয়। এ আদর্শ একটা আন্তরিক আহ্বান, এ আদর্শ একটা নিগূঢ় নির্দেশ। কোন্ দিকে নির্দেশ। যে দিকে সে বিচ্ছিন্ন নয়, যে দিকে তার পূর্ণতা, যে দিকে ব্যক্তিগত সীমাকে সে ছাড়িয়ে চলেছে, যে দিকে বিশ্বমানব। ঋগ্‌বেদে সেই বিশ্বমানবের কথা বলেছেন,

পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি—

তাঁর এক চতুর্থাংশ আছে জীবজগতে, তাঁর বাকি বৃহৎ অংশ ঊর্ধ্বে অমৃতরূপে। মানুষ যে দিকে সেই ক্ষুদ্র অংশগত আপনার উপস্থিতকে, প্রত্যক্ষকে, অতিক্রম করে সত্য সেই দিকে সে মৃত্যুহীন; সেই দিকে তার তপস্যা শ্রেষ্ঠকে আবিষ্কার করে। সেই দিক আছে তার অন্তরে, যেখান থেকে চিরকালের সকলের চিন্তাকে সে চিন্তিত করে, সকলের ইচ্ছাকে সে সফল করে, রূপদান করে সকলের আনন্দকে। যে পরিমাণে তার গতি এর বিপরীত দিকে, বাহ্যিকতার দিকে, দেশকালগত সংকীর্ণ পার্থক্যের দিকে, মানবসত্য থেকে সেই পরিমাণে সে ভ্রষ্ট; সভ্যতার অভিমান সত্ত্বেও সেই পরিমাণে সে বর্বর।

মানবদেহে বহুকোটি জীবকোষ; তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র জন্ম, স্বতন্ত্র মরণ। অণুবীক্ষণযোগে জানা যায়, তাদের প্রত্যেকের চারি দিকে ফাঁক। এক দিকে এই জীবকোষগুলি আপন আপন পৃথক জীবনে জীবিত, আর-এক দিকে তাদের মধ্যে একটি গভীর নির্দেশ আছে, প্রেরণা আছে, একটি ঐক্যতত্ত্ব আছে, সেটি অগোচর পদার্থ; সেই প্রেরণা সমগ্র দেহের দিকে, সেই ঐক্য সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত। মনে করা যেতে পারে, সেই সমগ্র দেহের উপলব্ধি অসংখ্য জীবকোষের অগম্য, অথচ সেই দেহের পরম রহস্যময় আহ্বান তাদের প্রত্যেকের কাছে দাবি করছে তাদের আত্মনিবেদন। যেখানে তারা প্রত্যেকে নিজেরই স্বতন্ত্র জীবনসীমায় বর্তমান সেখানে তার মধ্যে রহস্য কিছুই নেই। কিন্তু, যেখানে তারা নিজের জীবনসীমাকে অতিক্রম করে সমস্ত দেহের জীবনে সত্য সেখানে তারা আশ্চর্য, সেখানে তারা আপন স্বতন্ত্র জন্মমৃত্যুর মধ্যে বদ্ধ নয়। সেইখানেই তাদের সার্থকতা।

শোনা যায়, প্রতি সাত বছর অন্তর মানুষের দেহে এই জীবকোষগুলির পরিবর্তন ঘটে। তারা বিদায় নেয়, অর্থাৎ তাদের পৃথক সত্তা থাকে না। কিন্তু তাদের মধ্যে যে সত্তা সমস্ত দেহের আয়ুর অন্তর্গত, অর্থাৎ যেটা তাদের স্বদৈহিক নয়, বিশ্বদৈহিক, সেই সত্তা সমস্ত দেহের জীবনপ্রবাহে থেকে যায়।

দেহে কখনো কখনো কর্কটরোগ অর্থাৎ ক্যান্সার জন্মায়; সেই ক্যান্সার একান্তই স্বতন্ত্র, বলা যেতে পারে তার মধ্যে দেহাত্মবোধ নেই। সমগ্র দেহের সে প্রতিকূল। দেহের পক্ষে একেই বলা যায় অশুভ।

মানুষের দেহের জীবকোষগুলির যদি আত্মবোধ থাকত তা হলে এক দিকে তারা ক্ষুদ্রভাবে আপনাদেরকে স্বতন্ত্র জানত, আবার বৃহৎভাবে নিজেদেরকে জানত সমগ্র দেহে। কিন্তু জানত অনুভবে, কল্পনায়; সমগ্র দেহকে প্রত্যক্ষত ও সম্পূর্ণত জানা সম্ভব হত না। কেননা এই দেহ শুধু যে বর্তমানে অধিষ্ঠিত তা নয়, এই দেহে রয়েছে তার অতীত, অপেক্ষা করছে তার ভবিষ্যৎ। আরো একটা প্রত্যক্ষাতীত পদার্থ রয়েছে যা সর্বদেহব্যাপী কল্যাণ, যাকে বলি স্বাস্থ্য, যাকে বিশ্লেষণ করা যায় না। তা ছাড়াও সমগ্র জীবনরক্ষার গভীরতর চেষ্টা প্রত্যেক জীবকোষের আছে, যে চেষ্টা রোগের অবস্থায় সর্বদেহের শত্রুহননে নিজেদের আত্মহানিও ঘটায়, দেশপ্রেমিক যেমন করে দেশের জন্যে প্রাণ দেয়। এই চেষ্টার রহস্য অনুসরণ করলেই বোঝা যেতে পারে, এই ক্ষুদ্র দেহগুলির চরম লক্ষ্য অর্থাৎ পরম ধর্ম এমন-কিছুকে আশ্রয় করে যাকে বলব তাদের বিশ্বদেহ।

মানুষও আপন অন্তরের গভীরতর চেষ্টার প্রতি লক্ষ করে অনুভব করেছে যে, সে শুধু ব্যক্তিগত মানুষ নয়, সে বিশ্বগত মানুষের একাত্ম। সেই বিরাট মানব 'অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্'। সেই বিশ্বমানবের প্রেরণায় ব্যক্তিগত মানুষ এমন-সকল কাজে প্রবৃত্ত হয় যা তার ভৌতিক সীমা অতিক্রমণের মুখে। যাকে সে বলে ভালো, বলে সুন্দর, বলে শ্রেষ্ঠ— কেবল সমাজরক্ষার দিক থেকে নয়— আপন আত্মার পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তির দিক থেকে।

ডিমের ভিতরে যে পাখির ছানা আছে তার অঙ্গে দেখতে পাই ডানার সূচনা। ডিমে-বাঁধা জীবনে সেই ডানার কোনো অর্থই নেই। সেখানে আছে ডানার অবিচলিত প্রতিবাদ। এই অপরিণত ডানার সংকেত জানিয়ে দেয়, ডিমের বাইরে সত্যের যে পূর্ণতা আজও তার কাছে অপ্রত্যক্ষ সেই মুক্ত সত্যে সঞ্চরণেই পাখির সার্থকতা। তেমনিই মানুষের চিত্তবৃত্তির যে ঔৎসুক্য মানুষের পূর্ণ সত্যের সাক্ষ্য দেয় সেইখানেই অনুভব করি তার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য থেকে মুক্তি। সেইখানে সে বিশ্বাভিমুখী।

জীবকে কল্পনা করা যাক, সে যেন জীবযাত্রার একটা রেলগাড়ির মধ্যেই জন্মায়, বেঁচে থাকে এবং মরে। এই গাড়ি সংকীর্ণ লক্ষ্যপথে বাঁধা রাস্তায় চলে। জন্তুর মাথাটা গাড়ির নিম্নতলের সমরেখায়। গাড়ির সীমার মধ্যে তার আহারবিহারের সন্ধান চলছে নীচের দিকে ঝুঁকে। ঐটুকুর মধ্যে বাধাবিপত্তি যথেষ্ট। তাই নিয়ে দিন কাটে। মানুষের মতো সে মাথা তুলে উঠে দাঁড়াতে পারে না। উপরের জানলা পর্যন্ত পৌঁছয় না তার দৃষ্টি, তার মনের গতি নেই প্রাণধারণের বাইরে।

মানুষ খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। সামনে পেয়েছে জানলা। জানতে পেরেছে, গাড়ির মধ্যেই সব-কিছু বদ্ধ নয়। তার বাইরে দিগন্তের পর দিগন্ত। জীবনের আশু লক্ষ্যপথ উত্তীর্ণ হয়েও যা বাকি আছে তার আভাস পাওয়া যায়, সীমা দেখা যায় না। যেটুকু আলো গাড়ির প্রয়োজনের পক্ষে যথোপযুক্ত, বাইরে তারই বিস্তার অবাধ অজস্র। সেই আলো তাকে ডাকে কেন। ঐ প্রয়োজনাতীত বাইরেটার প্রতি উদাসীন থাকলে ক্ষতি কী ছিল। দিন তো চলে যেত, যেমন চলছে হাজার লক্ষ প্রাণীর। কিন্তু মানুষকে অস্থির করে তুললে যে। বললে, তাকে ছাড়া পেতে হবে সেইখানেই যেখানে তার প্রয়োজন নেই, যার পরিচয় তার কাছে আজও অসম্পূর্ণ। প্রাণশক্তির অতিনির্দিষ্ট সাম্রাজ্যপ্রাচীর লঙ্ঘন করে সে জয় করতে বেরোল আপন স্বরাজ। এই জয়যাত্রার পথে তার সহজ প্রবৃত্তি তার পক্ষ নেয় না, এই পথে তার আরাম নেই, তার বিশ্রাম নেই ; শত শত যাত্রী প্রাণ দিয়ে এই পথকে কেবলই প্রশস্ত করছে, উন্মুক্ত করছে।

দেহের দিকে মানুষকে বিচার করে দেখা যাক। সে উঠে দাঁড়িয়েছে। এমন কথা বলা চলে না যে, দাঁড়াবে না তো কী। দাঁড়ানো সহজ নয়। পাখির দেহের ছন্দটা দ্বিপদী। মানুষের দেহটা চতুষ্পদ জীবের প্রশস্ত ছন্দে বানানো। চার পায়ের উপর লম্বা দেহের ওজন সামনে পিছনে ভাগ করে দিলেই এমনতরো দেহটাকে একসঙ্গে বহন ও সঞ্চালন তার পক্ষে সহজ হতে পারত। কিন্তু মানুষ আপন দেহের স্বভাবকে মানতে চাইলে না, এজন্যে সে অসুবিধে সইতেও রাজি। চলমান দীর্ঘ দেহটার ভাররক্ষার সাধনা করলে ঐ দুই পায়ের উপরেই। সেটা সহজসাধ্য নয়, ছেলেদের প্রথম চলার অভ্যাস দেখলেই তা বোঝা যায়। শেষ বয়সে বৃদ্ধকে লাঠির উপর ভর দিতে হয়, সেও একটা প্রমাণ। এও দেখা যায়, চার-পেয়ে জন্তু যত সহজে ভার বহন করতে পারে মানুষ তা পারে না— এইজন্যেই অন্যের 'পরে নিজের বোঝা চাপাবার নানা কৌশল মানুষের অভ্যস্ত। সেই সুযোগ পেয়েছে বলেই যত পেরেছে ভার-সৃষ্টি করেছে। তাকে পরিমিত করবার চেষ্টা নেই। মানুষের এই চালটা যে সহজ নয় তার দৃষ্টান্ত প্রায়ই পাওয়া যায়। ধাক্কা খেয়ে মানুষের অঙ্গহানি বা গাম্ভীর্যহানির যে

আশঙ্কা, জন্তুদের সেটা নেই। শুধু তাই নয়, ডাক্তারের কাছে শোনা যায় মানুষ উত্তভঙ্গী নিয়েছে বলে তার আদিম অবতত দেহের অনেক যন্ত্রকে রোগদুঃখ ভোগ করতে হয়। তবু মানুষ স্পর্ধা করে উঠে দাঁড়ালো।

নীচের দিকে ঝুঁকে পড়ে জন্তু দেখতে পায় খণ্ড খণ্ড বস্তুকে। তার দেখার সঙ্গে তার ঘ্রাণ দেয় যোগ। চোখের দেখাটা অপেক্ষাকৃত অনাসক্ত, জ্ঞানের রাজ্যে তার প্রভাব বেশি। ঘ্রাণের অনুভূতি দেহবৃত্তির সংকীর্ণ সীমায়। দেখা ও ঘ্রাণ নিয়ে জন্তুরা বস্তুর যে পরিচয় পায় সে পরিচয় বিশেষভাবে আশু প্রয়োজনের। উপরে মাথা তুলে মানুষ দেখলে কেবল বস্তুকে নয়, দেখলে দৃশ্যকে অর্থাৎ বিচিত্র বস্তুর ঐক্যকে। একটি অখণ্ড বিস্তারের কেন্দ্রস্থলে দেখলে নিজেকে। একে বলা যায় মুক্তদৃষ্টি। খাড়া-হওয়া মানুষের কাছে নিকটের চেয়ে দূরের দাম বেশি। অজ্ঞাত অভাবনীয়ের দিকে তার মন হয়েছে প্রবৃত্ত। এই দৃষ্টির সঙ্গে যোগ দিয়েছে অন্তরের কল্পনাদৃষ্টি। শুধু দৃষ্টি নয়, সঙ্গে সঙ্গে দুটো হাতও পেয়েছে মুক্তি। পায়ের কাজ থেকে হাত যদি ছুটি না পেত তা হলে সে থাকত দেহেরই একান্ত অনুগত, চতুর্থ বর্ণের মতো অস্পৃশ্যতার মলিনতা নিয়ে। পুরাণে বলে, ব্রহ্মার পায়ের থেকে শূদ্র জন্মেছে, ক্ষত্রিয় হাতের থেকে।

মানুষের দেহে শূদ্রের পদোন্নতি হল ক্ষাত্রধর্মে, পেল সে হাতের গৌরব, তখন মনের সঙ্গে হল তার মৈত্রী। মানুষের কল্পনাবৃত্তি হাতকে পেয়ে বসল। দেহের জরুরি কাজগুলো সেরে দিয়েই সে লেগে গেল নানা বাজে কাজে। জীবনযাত্রার কর্মব্যবস্থায় সে whole-time কর্মচারী রইল না। সে লাগল অভাবিতের পরীক্ষায়, অচিন্ত্যপূর্বের রচনায়— অনেকটাই অনাবশ্যক। মানুষের ঋজু মুক্ত দেহ মাটির নিকটস্থ টান ছাড়িয়ে যেতেই তার মন এমন একটা বিরাট রাজ্যের পরিচয় পেলে যা অন্নব্রহ্মের নয়, যাকে বলা যায় বিজ্ঞানব্রহ্মের, আনন্দব্রহ্মের রাজ্য। এ রাজ্যে মানুষ যে কাজগুলো করে হিসাবি লোক জিজ্ঞাসা করতে পারে, "এ-সব কেন।" একমাত্র তার উত্তর, "আমার খুশি।" তার বিজ্ঞানে, তার সাহিত্যে, তার শিল্পকলায় এই এক উত্তর "আমার খুশি"। মাথা-তোলা মানুষের এতবড়ো গর্ব। জন্তুদেরও যথেচ্ছ খেলার অবকাশ আছে, কিন্তু জীবনে তাদের খেলাটা গৌণ। তা ছাড়া তাদের খেলাও প্রকৃতির অনুগত। বিড়াল-ছানার খেলা মিথ্যা ইঁদুর মিছামিছি ধরা, কুকুর-ছানার খেলা নিজের লেজের সঙ্গে লড়াই করার সগর্জন ভাণ। কিন্তু, মানুষের যে কাজটাকে লীলা বলা যায় অর্থাৎ যা তার কোনো দরকারের আমলে আসে না, কথায় কথায় সেইটেই হয়ে ওঠে মুখ্য, ছাড়িয়ে যায় তার প্রাণযাত্রাকে। সেইটের দ্বারাই তার শ্রেষ্ঠতার পরিচয়। অবকাশের ভূমিকায় মানুষ সর্বত্রই আপন অমরাবতী-রচনায় ব্যস্ত, সেখানে তার আকাশকুসুমের কুঞ্জবন। এই-

সব কাজে সে এত গৌরব বোধ করে যে চাষের খেতে তার অবজ্ঞা। আধুনিক বাংলা-ভাষায় সে যাকে একটা কুশ্রাব্য নাম দিয়েছে কৃষ্টি, হাল-লাঙলের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই এবং গোরুকে তার বাহন বললে ব্যঙ্গ করা হয়। বলা বাহুল্য, দূরতম তারায় মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন, সেই তারার যে আলোকরশ্মি চার-পাঁচ হাজার এবং ততোধিক বৎসর ধরে ব্যোমবিহারী, গৃহত্যাগী, তারই দৌড় মাপতে মানুষের দিন যায়, তার রাত কাটে। তা ছাড়া মানুষ অকারণে কথার সঙ্গে কথার বিনুনি করে কবিতাও লেখে; এমন-কি, যারা আধপেটা খেয়ে কৃশতনু তারাও বাহবা দেয়। এর থেকেই আন্দাজ করি, মানুষের অন্নের খেত প্রকৃতির এলেকায় থাকতে পারে, দেহের দ্বারে পেয়াদার তাগিদে তার খাজনাও দিতে হয়, কিন্তু যেখানে মানুষের বাস্তুভিটে সেই লাখেরাজ দেবত্রভূমি প্রকৃতির এলেকার বাইরে। সেখানে জোর তলবের দায় নেই, সেখানে সকলের চেয়ে বড়ো দায়িত্ব স্বাধীন দায়িত্ব; তাকে বলব আদর্শের দায়িত্ব, মনুষ্যত্বের দায়িত্ব।

দেহের দিক থেকে মানুষ যেমন ঊর্ধ্বশিরে নিজেকে টেনে তুলেছে খণ্ডভূমির থেকে বিশ্বভূমির দিকে, নিজের জানাশোনাকেও তেমনি স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে জৈবিক প্রয়োজন থেকে, ব্যক্তিগত অভিরুচির থেকে। জ্ঞানের এই সম্মানে মানুষের বৈষয়িক লাভ হোক বা না হোক, আনন্দলাভ হল। এইটেই বিস্ময়ের কথা। পেট না ভরিয়েও কেন হয় আনন্দ। বিষয়কে বড়ো করে পায় বলে আনন্দ নয়, আপনাকেই বড়ো করে, সত্য করে পায় বলে আনন্দ। মানবজীবনের যে বিভাগ অহৈতুক অনুরাগের অর্থাৎ আপনার বাহিরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগের, তার পুরস্কার আপনারই মধ্যে। কারণ, সেই যোগের প্রসারেই আত্মার সত্য।

ন বা অরে পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়োভবতি, আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রিয়োভবতি।

জীবলোকে চৈতন্যের নীহারিকা অস্পষ্ট আলোকে ব্যাপ্ত। সেই নীহারিকা মানুষের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে উজ্জ্বল দীপ্তিতে বললে, "অয়মহং ভোঃ! এই-যে আমি।" সেই দিন থেকে মানুষের ইতিহাসে নানা ভাবে নানা রূপে নানা ভাষায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া চলল "আমি কী"। ঠিক উত্তরটিতে তার আনন্দ, তার গৌরব। জন্তুর উত্তর পাওয়া যায় তার দৈহিক ব্যবস্থার যথাযোগ্যতায়। সনাতন গণ্ডারের মতো স্থূল ব্যবহারে গণ্ডার যদি কোনো বাহ্য বাধা না পায় তা হলে আপন সার্থক্য সম্বন্ধে তার কোনো সংশয় থাকে না। কিন্তু, মানুষ কী করে হবে মানুষের মতো তাই নিয়ে বর্বর-দশা থেকে সভ্য অবস্থা পর্যন্ত তার চিন্তা ও প্রয়াসের অন্ত নেই। সে বুঝেছে, সে সহজ নয়, তার মধ্যে একটা রহস্য আছে; এই রহস্যের আবরণ উদ্ঘাটিত হতে হতে তবে সে

আপনাকে চিনবে। শত শত শতাব্দী ধরে চলেছে তার প্রয়াস। কত ধর্মতন্ত্র, কত অনুষ্ঠানের পত্তন হল ; সহজ প্রবৃত্তির প্রতিবাদ করে নিজেকে সে স্বীকার করাতে চায় যে, বাইরে সে যা ভিতরে ভিতরে তার চেয়ে সে বড়ো। এমন কোনো সত্তার স্বরূপকে সে মনের মধ্যে গ্রহণ করবার চেষ্টা করছে, আদর্শরূপে যিনি তার চেয়ে বড়ো অথচ তার সঙ্গে চিরসম্বন্ধযুক্ত। এমনি করে বড়ো ভূমিকায় নিজের সত্যকে স্পষ্ট করে উপলব্ধি করতে তার অহৈতুক আগ্রহ। যাকে সে পূজা করে তার দ্বারাই সে প্রমাণ করে তার মতে নিজে সে সত্য কিসে, তার বুদ্ধি কাকে বলে পূজনীয়, কাকে জানে পূর্ণতা বলে। সেইখানেই আপন দেবতার নামে মানুষ উত্তর দিতে চেষ্টা করে "আমি কী— আমার চরম মূল্য কোথায়"। বলা বাহুল্য, উত্তর দেবার উপলক্ষে পূজার বিষয়কল্পনায় অনেক সময়ে তার এমন চিত্ত প্রকাশ পায় বুদ্ধিতে যা অন্ধ, শ্রেয়োনীতিতে যা গর্হিত, সৌন্দর্যের আদর্শে যা বীভৎস। তাকে বলব ভ্রান্ত উত্তর এবং মানুষের কল্যাণের জন্যে সকল রকম ভ্রমকেই যেমন শোধন করা দরকার এখানেও তাই। এই ভ্রমের বিচার মানুষেরই শ্রেয়োবুদ্ধি থেকেই, মানুষের দেবতার শ্রেষ্ঠতার বিচার মানুষেরই পূর্ণতার আদর্শ থেকে।

জীবসৃষ্টির প্রকাশপর্যায়ে দেহের দিকটাই যখন প্রধান ছিল তখন দেহসংস্থানঘটিত ভ্রম বা অপূর্ণতা নিয়ে অনেক জীবের ধ্বংস বা অবনতি ঘটেছে। জীবসৃষ্টির প্রকাশে মানুষের মধ্যে যখন 'আমি' এসে দাঁড়ালো তখন এই 'আমি' সম্বন্ধে ভুল করলে দৈহিক বিনাশের চেয়ে বড়ো বিনাশ। এই আমিকে নিয়ে ভুল কোথায় ঘটে সে প্রশ্নের একই উত্তর দিয়েছেন আমাদের সকল মহাপুরুষ। তাঁরা এই অদ্ভুত কথা বলেন, যেখানে আমিকে না-আমির দিকে জানতে বাধা পাই, তাকে অহং-বেড়ায় বিচ্ছিন্ন সীমাবদ্ধ করে দেখি। এক আত্মলোকে সকল আত্মার অভিমুখে আত্মার সত্য ; এই সত্যের আদর্শেই বিচার করতে হবে মানুষের সভ্যতা, মানুষের সমস্ত অনুষ্ঠান, তার রাষ্ট্রতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মতন্ত্র— এর থেকে যে পরিমাণে সে ভ্রষ্ট সেই পরিমাণে সে বর্বর।

মানুষের দায় মহামানবের দায়, কোথাও তার সীমা নেই। অন্তহীন সাধনার ক্ষেত্রে তার বাস। জন্তুদের বাস ভূমণ্ডলে, মানুষের বাস সেইখানে যাকে সে বলে তার দেশ। দেশ কেবল ভৌমিক নয়, দেশ মানসিক। মানুষে মানুষে মিলিয়ে এই দেশ জ্ঞানে জ্ঞানে, কর্মে কর্মে। যুগযুগান্তরের প্রবাহিত চিন্তাধারায় প্রীতিধারায় দেশের মন ফলে শস্যে সমৃদ্ধ। বহু লোকের আত্মত্যাগে দেশের গৌরব সমুজ্জ্বল। যে-সব দেশবাসী অতীতকালের তাঁরা বস্তুত বাস করতেন ভবিষ্যতে। তাঁদের ইচ্ছার গতি কর্মের গতি ছিল আগামীকালের অভিমুখে। তাঁদের তপস্যার ভবিষ্যৎ আজ বর্তমান হয়েছে আমাদের

মধ্যে, কিন্তু আবদ্ধ হয় নি। আবার আমরাও দেশের ভবিষ্যতের জন্য বর্তমানকে উৎসর্গ করছি। সেই ভবিষ্যৎকে ব্যক্তিগতরূপে আমরা ভোগ করব না। যে তপস্বীরা অন্তহীন ভবিষ্যতে বাস করতেন, ভবিষ্যতে যাঁদের আনন্দ, যাঁদের আশা, যাঁদের গৌরব, মানুষের সভ্যতা তাঁদেরই রচনা। তাঁদেরই স্মরণ করে মানুষ আপনাকে জেনেছে অমৃতের সন্তান; বুঝেছে যে, তার দৃষ্টি, তার সৃষ্টি, তার চরিত্র মৃত্যুকে পেরিয়ে। মৃত্যুর মধ্যে গিয়ে যাঁরা অমৃতকে প্রমাণ করেছেন তাঁদের দানেই দেশ রচিত। ভাবীকালবাসীরা, শুধু আপন দেশকে নয়, সমস্ত পৃথিবীর লোককে অধিকার করেছেন। তাঁদের চিন্তা, তাঁদের কর্ম, জাতিবর্ণনির্বিচারে সমস্ত মানুষের। সবাই তাঁদের সম্পদের উত্তরাধিকারী। তাঁরাই প্রমাণ করেন, সব মানুষকে নিয়ে, সব মানুষকে অতিক্রম করে, সীমাবদ্ধ কালকে পার হয়ে এক-মানুষ বিরাজিত। সেই মানুষকেই প্রকাশ করতে হবে, শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে হবে বলেই মানুষের বাস দেশে। অর্থাৎ, এমন জায়গায় যেখানে প্রত্যেক মানুষের বিস্তার খণ্ড খণ্ড দেশকালপাত্র ছাড়িয়ে— যেখানে মানুষের বিদ্যা, মানুষের সাধনা সত্য হয় সকল কালের সকল মানুষকে নিয়ে।

ভবিষ্যৎকাল অসীম, অতীতকালও তাই। এই দুই দিকে মানুষের মন প্রবলভাবে আকৃষ্ট। পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্‌ভূতং যচ্চ ভব্যম্‌। যা ভূত, যা ভাবী, এই সমস্তই সেই পুরুষ। মানুষ ভাবতে ভালোবাসে, কোনো-এক কালে তার শ্রেষ্ঠতার আদর্শ পূর্বেই বিষয়ীকৃত। তাই প্রায় সকলজাতীয় মানুষের পুরাণে দেখা যায় সত্যযুগের কল্পনা অতীতকালে। সে মনে করে, যে আদর্শের উপলব্ধি অসম্পূর্ণ কোনো-এক দূরকালে তা পরিপূর্ণ অখণ্ড বিশুদ্ধ আকারে। সেই পুরাণের বৃত্তান্তে মানুষের এই আকাঙ্ক্ষাটি প্রকাশ পায় যে, অনাদিতে যা প্রতিষ্ঠিত অসীমে তাই প্রমাণিত হতে থাকবে। যে গানটি পূর্বেই সম্পূর্ণ রচিত গাওয়ার দ্বারাই সেটা ক্রমশ প্রকাশমান, এও তেমনি। মনুষ্যত্বের আদর্শ এক কোটিতে সমাপ্ত, আর-এক কোটিতে উপলভ্যমান। এখনকার দিনে মানুষ অতীতকালে সত্যযুগকে মানে না, তবু তার সকলপ্রকার শ্রেয়োনুষ্ঠানের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে অনাগতকালে সত্যযুগের প্রত্যাশা। কোনো ব্যক্তি নাস্তিক হতে পারে কিন্তু সেই নাস্তিক যাকে সত্য বলে জানে দূরদেশে ভাবীকালে সেও তাকে সার্থক করবার জন্যে প্রাণ দিতে পারে, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। অগোচর ভবিষ্যতেই নিজেকে সত্যতররূপে অনুভব করে বলেই তার প্রত্যক্ষ বর্তমানকে বিসর্জন দেওয়া সে ক্ষতি মনে করে না। ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি। পূর্ণ পুরুষের অধিকাংশ এখনো আছে অব্যক্ত। তাঁকেই ব্যক্ত করবার প্রত্যাশা নিয়ত চলেছে ভবিষ্যতের দিকে। পূর্ণপুরুষ আগন্তুক। তাঁর রথ ধাবমান, কিন্তু তিনি এখনো এসে পৌঁছন নি। বরযাত্রীরা

আসছে, যুগের পর যুগ অপেক্ষা করছে, বরের বাজনা আসছে দূর থেকে। তাঁকে এগিয়ে নিয়ে আসবার জন্যে দূতেরা চলেছে দুর্গম পথে। এই-যে অনিশ্চিত আগামীর দিকে মানুষের এত প্রাণপণ আগ্রহ— এই-যে অনিশ্চিতের মধ্যে, অনাগতের মধ্যে তার চিরনিশ্চিতের সন্ধান অক্লান্ত— তারই সংকটসংকুল পথে মানুষ বারবার বাধা পেয়ে ব্যর্থ হয়েও যাত্রা বন্ধ করতে পারলে না। এই অধ্যবসায়কে বলা যেতে পারত পাগলামি, কিন্তু মানুষ তাকেই বলেছে মহত্ত্ব। এই মহত্ত্বের আশ্রয় কোথায়। অলক্ষ্য একটা পরিপূর্ণতার দিকে মানুষের মনের আকর্ষণ দেখতে পাই ; অন্ধকার ঘরের গাছে, তার শাখায় প্রশাখায়, যেমন একটা স্বাভাবিক ব্যাকুলতা প্রাচীরের ও-পারের আলোকের দিকে। আলোক যেমন সত্য, পূর্ণের আকর্ষণ নিয়ত যেখান থেকে প্রেরিত সেও যদি তেমনি সত্য না হত তা হলে জীবিকার প্রয়োজনের বাইরে আত্মার উৎকর্ষের জন্যে মানুষ যা-কিছু চিন্তা করে, কর্ম করে, তার কোনো অর্থই থাকে না। এই সত্যকে ক্ষণে ক্ষণে স্পর্শ করি আমাদের সংকল্পে, আমাদের ধ্যানে, আমাদের আদর্শে। সেই অভাবনীয় পূর্ণকে দেখতে পাই দুঃখের দীপ্তিতে, মৃত্যুর গৌরবে। সে আমাদের জ্ঞানকে ঘরছাড়া করে বড়ো ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়েছে, নইলে পরমাণুতত্ত্বের চেয়ে পাকপ্রণালী মানুষের কাছে অধিক আদর পেত। সীমাবদ্ধ সৃষ্টিকে মানুষ প্রত্যক্ষ দেখছে, তাকে ব্যবহার করছে ; কিন্তু তার মন বলছে, এই সমস্তেরই সত্য রয়েছে সীমার অতীতে— এই সীমাকে যদি প্রশ্ন করি তার শেষ উত্তর পাই নে এই সীমার মধ্যেই।

ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত আছে, ক্ষত্রিয় রাজা প্রবাহণের সামনে দুই ব্রাহ্মণ তর্ক তুলেছিলেন, সামগানের মধ্যে যে রহস্য আছে তার প্রতিষ্ঠা কোথায়।

দাল্‌ভ্য বললেন, "এই পৃথিবীতেই।" স্থূল প্রত্যক্ষই সমস্ত রহস্যের চরম আশ্রয়, বোধ করি দাল্‌ভ্যের এই ছিল মত।

প্রবাহণ বললেন, "তা হলে তোমার সত্য তো অন্তবান হল, সীমায় এসে ঠেকে গেল যে।"

ক্ষতি কী তাতে। ক্ষতি এই যে, সীমার মধ্যে মানুষের জিজ্ঞাসা অসমাপ্ত থেকে যায়। কোনো সীমাকেই মানুষ চরম বলে যদি মানত তা হলে মানুষের ভৌতিক বিজ্ঞানও বহুকাল পূর্বেই ঘাটে নোঙর ফেলে যাত্রা বন্ধ করত। একদিন পণ্ডিতেরা বলেছিলেন, ভৌতিক বিশ্বের মূল উপাদানস্বরূপ আদিভূতগুলিকে তাঁরা একেবারে কোণঠেসা করে ধরেছেন, একটার পর একটা আবরণ খুলে এমন-কিছুতে ঠেকেছেন যাকে আর বিশ্লেষণ করা যায় না। বললে কী হবে। অন্তরে আছেন প্রবাহণ রাজা, তিনি বহন করে নিয়ে চলেছেন মানুষের সব প্রশ্নকে সীমা থেকে দূরতর ক্ষেত্রে। তিনি বললেন,

অপ্রতিষ্ঠিতং বৈ কিল তে সাম, অন্তবদ্‌ বৈ কিল তে সাম।

আদিভূতের যে বস্তুসীমায় প্রশ্ন এসে থেমেছিল সে সীমাও পেরোল। আজ মানুষের চরম ভৌতিক উপলব্ধি পৌঁছল গাণিতিক চিহ্নসংকেতে, কোনো বোধগম্যতায় নয়। একদিন আলোকের তত্ত্বকে মানুষ বোধগম্যতার পরপারেই স্থাপন করেছিল। অদ্ভুত কথা বলেছিল, 'ঈথরের ঢেউ' -জিনিসকেই আলোকরূপে অনুভব করি। অথচ ঈথর যে কী আমাদের বোধের ভাষায় তার কোনো কিনারা পাওয়া যায় না। আলো, যা আমাদের দৃষ্টির ক্ষেত্রে সকল ভৌতিক জিনিসকে প্রকাশ করে দাঁড়ালো তা এমন-কিছুর প্রকাশ যা সম্পূর্ণই ভৌতিক ধর্মের অতীত, কেবল ব্যবহারে মাত্র জানা যায় যে তাতে নানা ছন্দের ঢেউ খেলে। কিন্তু, প্রবাহণের গণনা থামে না। খবর আসে, কেবল তরঙ্গধর্মী বললে আলোর চরিত্রের হিসাব পুরো মেলে না, সে কণিকাবর্ষীও বটে। এই-সব স্ববিরোধী কথা মানুষের সহজ বুদ্ধির সহজ ভাষার সীমার বাইরেকার কথা। তবু বোধাতীতের ডুবজলেও মানুষ ভয় পেলে না। পাথরের দেয়ালটাকেও বললে বিদ্যুৎ-কণার নিরন্তর নৃত্য। সন্দেহ করলে না যে, হয়তো বা পাগল হয়ে গেছি। মনে করলে না, হয়তো প্রজ্ঞা, যাকে বলে রীজ্‌ন্‌, সে মানস-সার্কাসের ডিগ্‌বাজি-খেলোয়াড়; সব জিনিসকে একেবারে উলটিয়ে ধরাই তার ব্যাবসা। পশুরা যদি বিচারক হত মানুষকে বলত জন্ম-পাগল। বস্তুত মানুষের বিজ্ঞান সব মানুষকে এক-পাগলামিতে-পাওয়া জীব বলে প্রমাণ করছে। বলছে, সে যাকে যেরকম জানছে বলে মনে করে সেটা একেবারেই তা নয়, সম্পূর্ণই উলটো। জন্তুরা নিজেদের সম্বন্ধে এরকম লাইবেল প্রচার করে না। তাদের বোধের কাছে যেটা যা সেটা তাই, অর্থাৎ তাদের কাছে কেবল আছে তথ্য, তাদের অবিচলিত নিষ্ঠা প্রতীয়মানের প্রতি। তাদের জগতের আয়তন কেবল তলপৃষ্ঠ নিয়ে। তাদের সমস্ত দায় ঐ একতলাটাতেই। মানবজগতের আয়তনে বেধ আছে, যা চোখে পড়ে তার গভীরে। প্রত্যক্ষ তথ্যকে উপেক্ষা করলে মানুষের চলে না, আবার সত্যকেও নইলে নয়।

অন্যান্য বস্তুর মতোই তথ্য মানুষের সম্বল, কিন্তু সত্য তার ঐশ্বর্য। ঐশ্বর্যের চরম লক্ষ্য অভাব দূর করা নয়, মহিমা উপলব্ধি করানো। তাই ঐশ্বর্য-অভিমানী মানুষ বলেছে, ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি। বলেছে, অল্পে সুখ নেই, বৃহতেই সুখ।

এটা নিতান্তই বেহিসাবি কথা হল। হিসাবিবুদ্ধিতে বলে, যা চাই আর যা পাই এই দুটো মাপে মিলে গেলেই সুখের বিষয়। ইংরেজিতে একটা চলতি কথা আছে, যা যথেষ্ট সেটাই ভূরিভোজের সমান-দরের। শাস্ত্রেও বলছে, সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ। তবেই তো দেখছি, সন্তোষে সুখ নেই আবার সন্তোষেই সুখ, এই

দুটো উলটো কথা সামনে এসে দাঁড়ালো। তার কারণ, মানুষের সত্তায় দ্বৈধ আছে। তার যে সত্তা জীবসীমার মধ্যে, সেখানে যেটুকু আবশ্যক সেইটুকুতেই তার সুখ। কিন্তু, অন্তরে অন্তরে জীবমানব বিশ্বমানবে প্রসারিত, সেই দিকে সে সুখ চায় না, সে সুখের বেশি চায়, সে ভূমাকে চায়। তাই সকল জীবের মধ্যে মানুষই কেবল অমিতাচারী। তাকে পেতে হবে অমিত, তাকে দিতে হবে অমিত, কেননা তার মধ্যে আছে অমিত-মানব। সেই অমিতমানব সুখের কাঙাল নয়, দুঃখভীরু নয়। সেই অমিতমানব আরামের দ্বার ভেঙে কেবলই মানুষকে বের করে নিয়ে চলেছে কঠোর অধ্যবসায়ে। আমাদের ভিতরকার ছোটো মানুষটি তা নিয়ে বিদ্রূপ করে থাকে ; বলে, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। উপায় নেই। বিশ্বের মানুষটি ঘরের মানুষকে পাঠিয়ে দেন বুনো মোষটাকে দাবিয়ে রাখতে, এমন-কি ঘরের খাওয়া যথেষ্ট না জুটলেও।

উপনিষদে ভগবান সম্বন্ধে একটি প্রশ্নোত্তর আছে। স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ। সেই ভগবান কোথায় প্রতিষ্ঠিত। এই প্রশ্নের উত্তর, স্বে মহিম্নি। নিজের মহিমায়। সেই মহিমাই তাঁর স্বভাব। সেই স্বভাবেই তিনি আনন্দিত।

মানুষেরও আনন্দ মহিমায়। তাই বলা হয়েছে, ভূমৈব সুখম্। কিন্তু, যে স্বভাবে তার মহিমা সেই স্বভাবকে সে পায় বিরোধের ভিতর দিয়ে, পরম সুখকে পায় পরম দুঃখে। মানুষের সহজ অবস্থা ও স্বভাবের মধ্যে নিত্যই দ্বন্দ্ব। তাই ধর্মের পথকে অর্থাৎ মানুষের পরম স্বভাবের পথকে— দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

জন্তুর অবস্থাও যেমন, স্বভাবও তার অনুগত। তার বরাদ্দও যা, কামনাও তার পিছনে চলে বিনা বিদ্রোহে। তার যা পাওনা তার বেশি তার দাবি নেই। মানুষ বলে বসল, "আমি চাই উপরি-পাওনা।" বাঁধা বরাদ্দের সীমা আছে, উপরি-পাওনার সীমা নেই। মানুষের জীবিকা চলে বাঁধা বরাদ্দে, উপরি-পাওনা দিয়ে প্রকাশ পায় তার মহিমা।

জীবধর্মরক্ষার চেষ্টাতেও মানুষের নিরন্তর একটা দ্বন্দ্ব আছে। সে হচ্ছে প্রাণের সঙ্গে অপ্রাণের দ্বন্দ্ব। অপ্রাণ আদিম, অপ্রাণ বিরাট। তার কাছ থেকে রসদ সংগ্রহ করতে হয় প্রাণকে, মালমসলা নিয়ে গড়ে তুলতে হয় দেহযন্ত্র। সেই অপ্রাণ নিষ্ঠুর মহাজনের মতো, ধার দেয় কিন্তু কেবলই টানাটানি করে ফিরে নেবার জন্যে, প্রাণকে দেউলে করে দিয়ে মিলিয়ে দিতে চায় পঞ্চভূতে।

এই প্রাণচেষ্টাতে মানুষের শুধু কেবল অপ্রাণের সঙ্গে প্রাণের দ্বন্দ্ব নয়, পরিমিতের সঙ্গে অপরিমিতের। বাঁচবার দিকেও তার উপরি-পাওনার দাবি। বড়ো করে বাঁচতে হবে, তার অন্ন যেমন-তেমন নয় ; তার বসন, তার বাসস্থান কেবল কাজ চলাবার জন্যে

নয়— বড়োকে প্রকাশ করবার জন্যে। এমন-কিছুকে প্রকাশ, যাকে সে বলে থাকে 'মানুষের প্রকাশ', জীবযাত্রাতেও যে প্রকাশে ন্যূনতা ঘটলে মানুষ লজ্জিত হয়। সেই তার বাড়তি ভাগের প্রকাশ নিয়ে মানুষের যেমন দুঃসাধ্য প্রয়াস এমন তার সাধারণ প্রয়োজন মেটাবার জন্যও নয়। মানুষের মধ্যে যিনি বড়ো আছেন, আহারে বিহারেও পাছে তাঁর অসম্মান হয় মানুষের এই এক বিষম ভাবনা।

ঋজু হয়ে চলতে গিয়ে প্রতি মুহূর্তেই মানুষকে ভারাকর্ষণের বিরুদ্ধে মান বাঁচিয়ে চলতে হয়। পশুর মতো চলতে গেলে তা করতে হত না। মনুষ্যত্ব বাঁচিয়ে চলাতেও তার নিয়ত চেষ্টা, পদে পদেই নীচে পড়বার শঙ্কা। এই মনুষ্যত্ব বাঁচানোর দ্বন্দ্ব মানব-ধর্মের সঙ্গে পশুধর্মের দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের। মানুষের ইতিহাসে এই পশুও আদিম। সে টানছে তামসিকতায়, মূঢ়তার দিকে। পশু বলছে, "সহজধর্মের পথে ভোগ করো।" মানুষ বলছে, "মানবধর্মের দিকে তপস্যা করো।" যাদের মন মন্থর— যারা বলে, যা আছে তাই ভালো, যা হয়ে গেছে তাই শ্রেষ্ঠ, তারা রইল জন্তুধর্মের স্থাবর বেড়াটার মধ্যে; তারা মুক্ত নয়, তারা স্বভাব থেকে ভ্রষ্ট। তারা পূর্বসঞ্চিত ঐশ্বর্যকে বিকৃত করে, নষ্ট করে।

মানুষ এক দিকে মৃত্যুর অধিকারে, আর-এক দিকে অমৃতে; এক দিকে সে ব্যক্তিগত সীমায়, আর-এক দিকে বিশ্বগত বিরাটে। এই দুয়ের কোনোটাকেই উপেক্ষা করা চলে না। মানুষ নিজেকে জানে, তদ্দূরে তদ্বন্তিকে চ— সে দূরেও বটে, সে নিকটেও। সেই দূরের মানুষের দাবি নিকটের মানুষের সব-কিছুকেই ছাড়িয়ে যায়। এই অপ্রত্যক্ষের দিকে মানুষের কল্পনাবৃত্তি দৌত্য করে। ভুল করে বিস্তর, যেখানে থই পায় না সেখানে অদ্ভুত সৃষ্টি দিয়ে ফাঁক ভরায়; তবুও এই অপ্রতিহত প্রয়াস সত্যকেই প্রমাণ করে, মানুষের এই একটি আশ্চর্য সংস্কারের সাক্ষ্য দেয় যে, যেখানে আজও তার জানা পৌঁছয় নি সেখানেও শেষ হয় নি তার জানা।

গাছে গাছে ঘর্ষণে আগুন জ্বলে। জ্বলে বলেই জ্বলে, এই জেনে চুপ করে থাকলে মানুষের বুদ্ধিকে দোষ দেওয়া যেত না। জানবার নেই বলেই জানা যাচ্ছে না, এ কথাটা সংগত নয় তো কী। কিন্তু, মানুষ ছেলেমানুষের মতো বারবার জিজ্ঞাসা করতে লাগল, ঘর্ষণে আগুন জ্বলে কেন। বুদ্ধির বেগার-খাটুনি শুরু হল। খুব সম্ভব গোড়ায় ছেলেমানুষের মতোই জবাব দিয়েছিল; হয়তো বলেছিল, গাছের মধ্যে একটা রাগী ভূত অদৃশ্যভাবে বাস করে, মার খেলে সে রেগে আগুন হয়ে ওঠে। এইরকম সব উত্তরে মানুষের পুরাণ বোঝাই-করা। যাদের শিশুবুদ্ধি কিছুতেই বাড়তে চায় না তারা এইরকম উত্তরকে আঁকড়ে ধরে থাকে। কিন্তু, অল্পে-সন্তুষ্ট মূঢ়তার মাঝখানেও মানুষের

প্রশ্ন বাধা ঠেলে ঠেলে চলে। কাজেই উনুন ধরাবার জন্যে আগুন জ্বালাতে মানুষকে যত চেষ্টা করতে হয়েছে তার চেয়ে সে কম চেষ্টা করে নি 'আগুন জ্বলে কেন' তার অনাবশ্যক উত্তর বের করতে। এ দিকে হয়তো উনুনের আগুন গেছে নিবে, হাঁড়ি চড়ে নি, পেটে ক্ষুধার আগুন জ্বলছে, প্রশ্ন চলছেই— আগুন জ্বলে কেন। সাক্ষাৎ আগুনের মধ্যে তার উত্তর নেই, উত্তর আছে প্রত্যক্ষ আগুনকে বহুদূরে ছাড়িয়ে। জন্তু-বিচারক মানুষকে কি নির্বোধ বলবে না, আমরা পতঙ্গকে যেমন বলি মূঢ়, বারবার যে পতঙ্গ আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে ?

এই অদ্ভুত বুদ্ধির সকলের চেয়ে স্পর্ধা প্রকাশ পায় যখন মানুষকে সে ঠেলা দিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করে, "তুমি আপনি কে।" এমন কথা বলতেও তার বাধে না যে, "মনে হচ্ছে বটে তুমি আছ কিন্তু সত্যই তুমি আছ কি, তুমি আছ কোথায়।" উপস্থিতমত কোনো জবাব না খুঁজে পেয়ে তাড়াতাড়ি যদি বলে বসি "আছি দেহধর্মে" অমনি অন্তর থেকে প্রবাহণ রাজা মাথা নেড়ে বলবেন, ওখানে প্রশ্নের শেষ হতে পারে না। তখন মানুষ বললে, ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্— মানবধর্মের গভীর সত্য নিহিত আছে গোপনে। আমার 'এই আমি' আছে প্রত্যক্ষে, 'সেই আমি' আছে অপ্রত্যক্ষে।

কথাটা স্পষ্ট করে বুঝে দেখবার চেষ্টা করা যাক।

এই-যে জল, এই-যে স্থল, এই-যে এটা, এই-যে ওটা, যত-কিছু পদার্থকে নির্দেশ করে বলি 'এই-যে', এই-সমস্তই ভালো করে জেনে-বুঝে নিতে হবে, নইলে ভালো করে বাঁচা যায় না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ বলে, তদ্‌বিদ্ধি নেদং যদিদম্ উপাসতে। তাকেই জানো। কাকে, না, ইদং অর্থাৎ এই-যে বলে যাকে স্বীকার করি তাকে নয়। 'এই-যে আমি শুনছি' এ হল সহজ কথা। তবুও মানুষ বললে, এর শেষ কথা সেইখানে যেখানে ইদং সর্বনাম পৌঁছয় না। খেপার মতো সে জিজ্ঞাসা করে, কোথায় আছে শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং— শ্রবণেরও শ্রবণ। ভৌতিক প্রণালীতে খোঁজ করতে করতে এসে ঠেকে বাতাসের কম্পনে। কিন্তু, ওখানেও রয়েছে ইদং, 'এই-যে কম্পন'। কম্পন তো শোনা নয়। যে বলছে 'আমি শুনছি' তার কাছে পৌঁছনো গেল। তারও সত্য কোথায়।

উপর থেকে নীচে পড়ল একটা পাথর। জ্ঞানের দেউড়িতে যে দ্বারী থাকে সে খবর দিলে, এই-যে পড়েছে। নীচের দিকে উপরের বস্তুর যে টান সেইটে ঘটল। দ্বারীর কর্তব্য শেষ হল। ভিতর-মহল থেকে শোনা গেল, একে টান, ওকে টান, তাকে টান, বারে বারে 'এই-যে'। কিন্তু সব 'এই-যে'কে পেরিয়ে বিশ্বজোড়া একমাত্র টান।

উপনিষদ সকলের মধ্যে এই এককে জানাই বলেন প্রতিবোধবিদিতম্— প্রত্যেক

পৃথক পড়ার বোধে একটি অদ্বিতীয় টানকে সত্য বলে জানা। তেমনি, আমি শুনি, তুমি শোন, এখন শুনি, তখন শুনি, এই প্রত্যেক শোনার বোধে যে একমাত্র পরম শোনার সত্য বিদিত সেই প্রতিবোধবিদিত এক সত্যই শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং। তার সম্বন্ধে উপনিষদ বলেন, অন্যদেব তদ্‌বিদিতাদথো অবিদিতাদধি। আমরা যা-কিছু জানি এবং জানি নে সব হতেই স্বতন্ত্র। ভৌতিক বিজ্ঞানেও যা গুহাহিত তাকে আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে কেবল যে মেলাতে পারি নে তা নয়, বলতে হয়— এ তার বিপরীত। ভাষায় বলি ভারাকর্ষণশক্তি, কিন্তু আকর্ষণ বলতে সাধারণত যা বুঝি এ তা নয়, শক্তি বলতে যা বুঝি এ তাও নয়।

প্রকৃতির গুহাহিত শক্তিকে আবিষ্কার ও ব্যবহার করেই মানুষের বাহিরের সমৃদ্ধি; যে সত্যে তার আত্মার সমৃদ্ধি সেও গুহাহিত, তাকে সাধনা করেই পেতে হবে। সেই সাধনাকে মানুষ বলে ধর্মসাধনা।

ধর্ম শব্দের অর্থ স্বভাব। চেষ্টা করে সাধনা করে স্বভাবকে পাওয়া, কথাটা শোনায় স্ববিরোধী অর্থাৎ স্বভাবকে অতিক্রম করে স্বভাবকে পাওয়া। খৃস্টানশাস্ত্রে মানুষের স্বভাবকে নিন্দা করেছে; বলেছে, তার আদিতেই পাপ, অবাধ্যতা। ভারতীয় শাস্ত্রেও আপনার সত্য পাবার জন্যে স্বভাবকে অস্বীকার করতে বলে। মানুষ নিজে সহজে যা তাকে শ্রদ্ধা করে না। মানুষ বলে বসল, তার সহজ স্বভাবের চেয়ে তার সাধনার স্বভাব সত্য। একটা স্বভাব তার নিজেকে নিয়ে; আর-একটা স্বভাব তার ভূমাকে নিয়ে।

কথিত আছে—

> শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্‌তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
> তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়োবৃণীতে॥

মানুষের স্বভাবে শ্রেয়ও আছে, প্রেয়ও আছে। ধীর ব্যক্তি দুইকে পৃথক করেন। যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন তিনি সাধু, যিনি প্রেয়কে করেন তিনি পুরুষার্থ থেকে হীন হন।

এ-সব কথাকে আমরা চিরাভ্যস্ত হিতকথা বলে গণ্য করি অর্থাৎ মনে করি, লোকব্যবহারের উপদেশরূপেই এর মূল্য। কিন্তু, সমাজব্যবহারের প্রতি লক্ষ করেই এ শ্লোকটি বলা হয় নি। এই শ্লোকে আত্মাকে সত্য করে জানবার উপায় আলোচনা করা হয়েছে।

প্রবৃত্তির প্রেরণায় আমরা যা ইচ্ছা করি সেই প্রেয়ের ইচ্ছা মানুষের স্বভাবে বর্তমান, আবার যা ইচ্ছা করা উচিত সেই শ্রেয়ের ইচ্ছাও মানুষের স্বভাবে। শ্রেয়কে গ্রহণ

করার দ্বারা মানুষ কিছু-একটা পায় যে তা নয়, কিছু-একটা হয়। সেই হওয়াকে বলে সাধু হওয়া। তার দ্বারা ধনী হয় না, বলী হয় না, সমাজে সম্মানিত হতেও পারে, না-হতেও পারে, এমন-কি, অবমানিত হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। সাধু হওয়া পদার্থটা কী, প্রকৃতির রাজ্যে তার কোনো কিনারা নেই। শ্রেয় শব্দটাও তেমনি। অপর পক্ষে প্রেয়কে একান্তরূপে বরণ করার দ্বারা মানুষ আর-একটা কিছু হয়, তাকে উপনিষদ বলছেন— আপন অর্থ থেকে হীন হওয়া। নাগর শব্দ বলতে যদি citizen না বুঝিয়ে libertine বোঝায় তা হলে বলতে হয়, নাগর শব্দ আপন সত্য অর্থ হতে হীন হয়ে গেছে। তেমনি একান্তভাবে প্রেয়কে অবলম্বন করলে, মানুষ বলতে যা বোঝায় সেই সত্য হীন হয়ে যায়। নিজের মধ্যে সর্বকালীন বিশ্বভূমীন মনুষ্যধর্মের উপলব্ধিই সাধুতা, হীনতা সেই মহামানবের উপলব্ধি থেকে বিচ্যুত হওয়া। প্রাকৃতিক স্বভাবের উপরেও মানুষের আত্মিক স্বভাব যদি না থাকত তা হলে এ-সব কথার অর্থ থাকত না।

✓ ডিমের মধ্যেই পাখির প্রথম জন্ম। তখনকার মতো সেই ডিমটাই তার একমাত্র ইদম্‌। আর-কিছুই সে জানে না। তবু তার মধ্যে একটা প্রবর্তনা আছে বাইরের অজানার মধ্যে সার্থকতার দিকে। সেই সার্থকতা— নেদং যদিদমুপাসতে। যদি খোলাটার মধ্যেই এক-শো বছর সে বেঁচে থাকত তা হলে সেটাকেই বলা যেত তার মহতী বিনষ্টি।

মানুষের সাধনাও এক স্বভাব থেকে স্বভাবান্তরের সাধনা। ব্যক্তিগত সংস্কার ছাড়িয়ে যাবে তার জিজ্ঞাসা, তবেই বিশ্বগত জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হবে তার বিজ্ঞান। ব্যক্তিগত স্বার্থ ও জড়প্রথাগত অভ্যাস কাটিয়ে যাবে তার প্রয়াস, তবেই বিশ্বগত কর্মের দ্বারা সে হবে বিশ্বকর্মা। অহংকারকে ভোগাসক্তিকে উত্তীর্ণ হবে তার প্রেম, তবেই বিশ্বগত আত্মীয়তায় মানুষ হবে মহাত্মা। মানুষের একটা স্বভাবে আবরণ, অন্য স্বভাবে মুক্তি।

জ্যোতির্বিদ দেখলেন, কোনো গ্রহ আপন কক্ষপথ থেকে বিচলিত। নিঃসন্দেহ মনে বললেন, অন্য কোনো অগোচর গ্রহের অদৃশ্য শক্তি তাকে টান দিয়েছে। দেখা গেল, মানুষেরও মন আপন প্রকৃতিনির্দিষ্ট প্রাণধারণের কক্ষপথ যথাযথ আবৃত্তি করে চলছে না। অনির্দিষ্টের দিকে, স্বভাবের অতীতের দিকে ঝুঁকছে। তার থেকে মানুষ কল্পনা করলে দেবলোক। বললে, আদেশ সেইখানকার, আকর্ষণ সেখান হতে। কে সেই দেবলোকের দেবতা তা নিয়ে মানুষে মানুষে হানাহানি চলেছে। যিনিই হোন, তাঁকে দেবতাই বলি আর যাই বলি, মানুষকে জীবসীমার মধ্যে কিছুতেই স্থির থাকতে দিলেন না।

সমুদ্র চঞ্চল হল। জোয়ার-ভাঁটার ওঠাপড়া চলছেই। চাঁদ না দেখা গেলেও সমুদ্রের চাঞ্চল্যেই চাঁদের আহ্বান প্রমাণ হত। বাঁচবার চেষ্টাতেও মানুষ অনেক সময় মরে। যে ক্ষুধা তার অন্তরে নিঃসংশয়, তার লক্ষ্য যে তার বাইরেও সত্য সে কথাটা সদ্যোজাত শিশুও স্বতই জানে। মানুষের প্রাণান্তিক উদ্যম দেখা গেছে এমন কিছুর জন্যে যার সঙ্গে বাঁচবার প্রয়োজনের কোনো যোগই নেই। মৃত্যুকে ছাড়িয়ে আছে যে প্রাণ সেই তাকে দুঃসাহসের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। ভৌতিক প্রাণের পথে প্রাণীর নিজেকে রক্ষা; আর এ পথে আত্মবানের আত্মাকে রক্ষা নয়, আত্মাকে প্রকাশ।

বৈদিক ভাষায় ঈশ্বরকে বলেছে আবিঃ, প্রকাশস্বরূপ। তাঁর সম্বন্ধে বলেছে, যস্য নাম মহদ্‌যশঃ। তাঁর মহদ্‌যশই তাঁর নাম, তাঁর মহৎ কীর্তিতেই তিনি সত্য। মানুষের স্বভাবও তাই— আত্মাকে প্রকাশ। বাইরে থেকে খাদ্যবস্তু গ্রহণ করার দ্বারাই প্রাণী আপনাকে রক্ষা করে, বাইরে আপনাকে উৎসর্গ করার দ্বারাই আত্মা আপনাকে প্রকাশ করে। এইখানে প্রকৃতিকে ছাড়িয়ে গিয়ে সে আপনাকে ঘোষণা করে। এমন-কি, বর্বর দেশের মানুষও নিজেকে প্রকাশ করার চেষ্টায় প্রকৃতিকে লঙ্ঘন করতে চায়। সে নাক ফুঁড়ে মস্ত এক শলা দিয়েছে চালিয়ে। উখো দিয়ে দাঁত ঘষে ঘষে ছুঁচোলো করেছে। শিশুকালে তক্তা দিয়ে চেপে বিকৃত করেছে মাথার খুলি, বানিয়েছে বিকটাকার বেশভূষা। এই-সব উৎকট সাজে-সজ্জায় অসহ্য কষ্ট মেনেছে; বলতে চেয়েছে, সে নিজে সহজে যা তার চেয়ে সে বড়ো। সেই তার বড়ো-আমি প্রকৃতির বিপরীত। যে দেবতাকে সে আপন আদর্শ বলে মানে সেও এমনি অদ্ভুত; তার মহিমার প্রধান পরিচয় এই যে, সে অপ্রাকৃতিক। প্রকৃতির হাতে পালিত তবু প্রকৃতিকে দুয়ো দেবার জন্যে মানুষের এই যেন একটা ঝগড়াটে ভাব। ভারতবর্ষেও দেখি, কত লোক, কেউ বা ঊর্ধ্ববাহু, কেউ বা কণ্টকশয্যায় শয়ান, কেউ বা অগ্নিকুণ্ডের দিকে নতশীর্ষ। তারা জানাচ্ছে, তারা শ্রেষ্ঠ, তারা সাধু, কেননা তারা অস্বাভাবিক। আধুনিক পাশ্চাত্য দেশেও কত লোক নিরর্থক কৃচ্ছ্রসাধনের গৌরব করে। তাকে বলে 'রেকর্ড্‌ ব্রেক' করা, দুঃসাধ্যতার পূর্ব-অধ্যবসায় পার হওয়া। সাঁতার কাটছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, বাইসিক্‌লে অবিশ্রাম ঘুরপাক খাচ্ছে, দীর্ঘ উপবাস করছে স্পর্ধা করে, কেবলমাত্র অস্বাভাবিকতার গৌরব প্রচারের জন্যে। ময়ূরকে দেখা যায় গর্ব করতে আপন ময়ূরত্ব নিয়েই, হিংস্র জন্তু উৎসাহ বোধ করে আপনার হিংস্রতার সাফল্যে। কিন্তু, বর্বর মানুষ মুখশ্রীর বিকৃতি ও বেশভূষার অতিকৃতি নিয়ে গর্ব করে জানায়, "আমি ঠিক মানুষের মতো নই, সাধারণ মানুষরূপে আমাকে চেনবার জো নেই।" এমনতরো আত্মপ্রকাশের চেষ্টাকে বলি নঙর্থক, এ সদর্থক নয়; প্রকৃতির বিরুদ্ধে স্পর্ধামাত্র, যা তার সহজ তার প্রতিবাদমাত্র—

তার বেশি আর কোনো অর্থ এতে নেই। অহংকারের প্রকাশকে আত্মগৌরবের প্রকাশ বলে মনে করা বর্বরতা, তেমনি নিরর্থক বাহ্যানুষ্ঠানকে মনে করা পুণ্যানুষ্ঠান।

এ যেমন দৈহিক দিকে তেমনি আর্থিক দিকেও মানুষের স্পর্ধার অন্ত নেই। এখানেও রেকর্ড্‌ ব্রেক্‌ করা, পূর্ব-ইতিহাসের বেড়া-ডিঙোনো লক্ষ। এখানকার চেষ্টা ঠিক অস্বাভাবিকের জন্যে নয়, অসাধারণের জন্যে। এতে আছে সীমার প্রতি অসহিষ্ণুতা, তার বাইরে আর কিছুই নয়। কিন্তু, যা-কিছু বস্তুগত বা বাহ্যিক, সীমাই তার ধর্ম। সেই সীমাকে বাড়িয়ে চলা যায়, পেরিয়ে যাওয়া যায় না। যিশুখৃস্ট বলেছেন, সূচীর রন্ধ্র দিয়ে উট যেমন গলে না ধনীর পক্ষে স্বর্গদ্বার তেমনি দুর্গম। কেননা ধনী নিজের সত্যকে এমন-কিছুর দ্বারা অনুভব ও প্রকাশ করতে অভ্যস্ত যা অপরিমেয়ের বিপরীত, তাই সে হীয়তেঽর্থাৎ, মনুষ্যত্বের অর্থ হতে হীন হয়। হাতির মতো বড়ো হওয়াকে মানুষ বড়োলোক হওয়া বলে না, হয়তো বর্বর মানুষ তাও বলে। বাহিরের উপকরণ পুঞ্জিত করার গর্ব করা সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। অন্যের চেয়ে আমার বস্তুসঞ্চয় বেশি, এ কথা মানুষের পক্ষে বলবার কথা নয়। তাই মৈত্রেয়ী বলেছিলেন, যেনাহং নামৃতা স্যাম্‌ কিমহং তেন কুর্যাম্‌। তিনি উপেক্ষা করেছিলেন উপকরণবতাং জীবিতম্‌। যে ওস্তাদ তানের অজস্রতা গণনা করে গানের শ্রেষ্ঠতা বিচার করে তার বিদ্যাকে সেই উটের সঙ্গে তুলনা করব। শ্রেষ্ঠ গান এমন পর্যাপ্তিতে এসে স্তব্ধ হয় যার উপরে আর একটিমাত্র স্বরও যোগ করা যায় না। বস্তুত গানের সেই থামাকে সীমা বলা যায় না। সে এমন একটি শেষ যার শেষ নেই। অতএব যথার্থ গায়কের আত্মা আপন সার্থকতাকে প্রকাশ করে তানের প্রভূত সংখ্যার দ্বারা নয়, সমগ্র গানের সেই চরম রূপের দ্বারা, যা অপরিমেয়, অনির্বচনীয়, বাইরের দৃষ্টিতে যা স্বল্প, অন্তরে যা অসীম। তাই মানুষের যে সংসার তার অহং-এর ক্ষেত্র সে দিকে তার অহংকার ভূরিতায়, যে দিকে তার আত্মা সে দিকে তার সার্থকতা ভূমায়। এক দিকে তার গর্ব স্বার্থসিদ্ধিতে, আর-এক দিকে তার গৌরব পরিপূর্ণতায়। সৌন্দর্য কল্যাণ বীর্য ত্যাগ প্রকাশ করে মানুষের আত্মাকে, অতিক্রম করে প্রাকৃত মানুষকে, উপলব্ধি করে জীবমানবের অন্তরতম বিশ্বমানবকে। যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।

চারি দিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে অন্য-সকল প্রাণী, বাইরে থেকে জীবিকার অর্থ খুঁজে খুঁজে। মানুষ আপন অন্তরের মধ্যে আশ্চর্য হয়ে কাকে অনুভব করলে। যিনি নিহিতার্থো দধাতি, যিনি তাকে তার অন্তর্নিহিত অর্থ দিচ্ছেন। সেই অর্থ মানুষের আপন আত্মারই গভীর অর্থ। সেই অর্থ এই যে মানুষ মহৎ। মানুষকে প্রমাণ করতে হবে যে, সে মহৎ; তবেই প্রমাণ হবে যে, সে মানুষ। প্রাণের মূল্য দিয়েও তার আপন ভূমাকে প্রকাশ

করতে হবে ; কেননা তিনি চিরন্তন মানব, সর্বজনীন মানব, তিনি মৃত্যুর অতীত— তাঁকে যে অর্ঘ্য দিতে হবে সে অর্ঘ্য সকল মানুষের হয়ে, সকল কালের হয়ে, আপনারই অন্তরতম বেদীতে। আপনারই পরমকে না দেখে মানুষ বাইরের দিকে সার্থকতা খুঁজে বেড়ায়। শেষকালে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ক্লান্ত হয়ে সে বলে, কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। মানুষের দেবতা মানুষের মনের মানুষ ; জ্ঞানে কর্মে ভাবে যে পরিমাণে সত্য হই সেই পরিমাণেই সেই মনের মানুষকে পাই— অন্তরে বিকার ঘটলে সেই আমার আপন মনের মানুষকে মনের মধ্যে দেখতে পাই নে। মানুষের যত-কিছু দুর্গতি আছে সেই আপন মনের মানুষকে হারিয়ে, তাকে বাইরের উপকরণে খুঁজতে গিয়ে, অর্থাৎ আপনাকেই পর করে দিয়ে। আপনাকে তখন টাকায় দেখি, খ্যাতিতে দেখি, ভোগের আয়োজনে দেখি। এই নিয়েই তো মানুষের যত বিবাদ, যত কান্না। সেই বাইরে-বিক্ষিপ্ত আপনহারা মানুষের বিলাপগান একদিন শুনেছিলেম পথিক ভিখারির মুখে—

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে।

সেই নিরক্ষর গাঁয়ের লোকের মুখেই শুনেছিলেম—

তোরই ভিতর অতল সাগর।

সেই পাগলই গেয়েছিল—

মনের মধ্যে মনের মানুষ করো অন্বেষণ।

সেই অন্বেষণেরই প্রার্থনা বেদে আছে, আবিরাবীর্ম এধি— পরম মানবের বিরাটরূপে যাঁর স্বতঃপ্রকাশ আমারই মধ্যে তাঁর প্রকাশ সার্থক হোক।

দুই

অথর্ববেদ বলেছেন—

ঋতং সত্যং তপো রাষ্ট্রং শ্রমো ধর্মশ্চ কর্ম চ
ভূতং ভবিষ্যদুচ্ছিষ্টে বীর্যং লক্ষ্মীর্বলং বলে।

ঋত সত্য তপস্যা রাষ্ট্র শ্রম ধর্ম কর্ম ভূত ভবিষ্যৎ বীর্য সম্পদ বল সমস্তই উচ্ছিষ্টে অর্থাৎ উদ্‌বৃত্তে আছে।

অর্থাৎ, মানবধর্ম বলতে আমরা যা বুঝি প্রকৃতির প্রয়োজন সে পেরিয়ে, সে আসছে অতিরিক্ততা থেকে। জীবজগতে মানুষ বাড়তির ভাগ। প্রকৃতির বেড়ার মধ্যে তাকে

কুলোল না। ইতিপূর্বে জীবাণুকোষের সঙ্গে সমগ্র দেহের সম্বন্ধ আলোচনা করেছিলুম। অথর্ববেদের ভাষায় বলা যেতে পারে, প্রত্যেক জীবকোষ তার অতিরিক্তের মধ্যে বাস করে। সেই অতিরিক্ততাতেই উৎপন্ন হচ্ছে স্বাস্থ্য আনন্দ শক্তি, সেই অতিরিক্ততাকেই অধিকার করে আছে সৌন্দর্য, সেই অতিরিক্ততাতেই প্রসারিত ভূত ভবিষ্যৎ। জীবকোষ এই সমগ্র দেহগত বিভূতি উপলব্ধি করে না। কিন্তু, মানুষ প্রকৃতিনির্দিষ্ট আপন ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে পেরিয়ে যায়; পেরিয়ে গিয়ে যে আত্মিক সম্পদকে উপলব্ধি করে অথর্ববেদ তাকেই বলেছেন, ঋতং সত্যম্। এ সমস্তই বিশ্বমানবমনের ভূমিকায়, যারা একে স্বীকার করে তারাই মনুষ্যত্বের পদবীতে এগোতে থাকে। অথর্ববেদ যে-সমস্ত গুণের কথা বলেছেন তার সমস্তই মানবগুণ। তার যোগে আমরা যদি আমাদের জীবধর্মসীমার অতিরিক্ত সত্তাকে অনুভব করি তবে বলতে হবে, সে সত্তা কখনোই অমানব নয়, তা মানবব্রহ্ম। আমাদের ঋতে সত্যে তপস্যায় ধর্মে কর্মে সেই বৃহৎ মানবকে আমরা আত্মবিষয়ীকৃত করি। এই কথাটিকেই উপনিষদ আর-এক রকম করে বলেছেন—

এষাস্য পরমা গতি রেষাস্য পরমা সম্পদ্
এষোঽস্য পরমো লোক এষোঽস্য পরম আনন্দঃ।

এখানে উনি এবং এ, এই দুয়ের কথা। বলছেন, উনি এর পরম গতি, উনি এর পরম সম্পদ, উনি এর পরম আশ্রয়, উনি এর পরম আনন্দ। অর্থাৎ, এর পরিপূর্ণতা তাঁর মধ্যে। উৎকর্ষের পথে এ চলেছে সেই বৃহতের দিকে, এর ঐশ্বর্য সেইখানেই, এর প্রতিষ্ঠা তাঁর মধ্যেই, এর শাশ্বত আনন্দের ধন যা-কিছু সে তাঁতেই।

এই তিনি বস্তু-অবচ্ছিন্ন একটা তত্ত্বমাত্র নন। যাকে বলি 'আমার আমি' সে যেমন অন্তরতমভাবে আমার একান্ত বোধবিষয় তিনিও তেমনি। যখন তাঁর প্রতি ভক্তি জেগে ওঠে, যখন তাঁতে আনন্দ পাই, তখন আমার এই আমি-বোধই বৃহৎ হয়, গভীর হয়, প্রসারিত হয় আপন সীমাতীত সত্যে। তখন অনুভব করি, এক বৃহৎ আনন্দের অন্তর্গত আমার আনন্দ। অন্য কোনো গ্রন্থে এ সম্বন্ধে যে উপমা ব্যবহার করেছি এখানে তার পুনরাবৃত্তি করতে চাই।

একখণ্ড লোহার রহস্যভেদ করে বৈজ্ঞানিক বলেছেন, সেই টুকরোটি আর-কিছুই নয়, কতকগুলি বিশেষ ছন্দের বিদ্যুৎমণ্ডলীর চিরচঞ্চলতা। সেই মণ্ডলীর তড়িৎকণাগুলি নিজেদের আয়তনের অনুপাতে পরস্পরের থেকে বহু দূরে দূরে অবস্থিত। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যা ধরা পড়েছে সহজ দৃষ্টিতে যদি সেইরকম দেখা যেত, তা হলে মানবমণ্ডলীতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে যেমন পৃথক দেখি তেমনি তাদেরও দেখতুম। এই অণুগুলি যত

পৃথকই হোক, এদের মধ্যে একটা শক্তি কাজ করছে। তাকে শক্তিই বলা যাক। সে সম্বন্ধশক্তি, ঐক্যশক্তি, সে ঐ লৌহখণ্ডের সংঘশক্তি। আমরা যখন লোহা দেখছি. তখন বিদ্যুৎকণা দেখছি নে, দেখছি সংঘরূপকে। বস্তুত, এই-যে লোহার প্রতীয়মান রূপ এ একটা প্রতীক। বস্তুটা পরমার্থত যা, এ তা নয়। অন্যবিধ দৃষ্টি যদি থাকে তবে এর প্রকাশ হবে অন্যবিধ। দশ-টাকার নোট পাওয়া গেল, বিশেষ রাজত্বে তার বিশেষ মূল্য। একে দেখবামাত্র যে জানে যে এই কাগজখানা স্বতন্ত্র দশ-সংখ্যক টাকার সংঘরূপ, তা হলেই সে একে ঠিক জানে। কাগজখানা ঐ সংঘের প্রতীক।

আমরা যাকে চোখে দেখছি লোহা সেও প্রকাশ করছে সেই সংঘকে যাকে চোখে দেখা যায় না, দেখা যায় স্থূল প্রতীককে। তেমনি ব্যক্তিগত মানুষগুলির মধ্যে দেশকালের ব্যবধান যথেষ্ট, কিন্তু সমস্ত মানুষকে নিয়ে আছে একটি বৃহৎ এবং গভীর ঐক্য। সেই ইন্দ্রিয়বোধাতীত ঐক্য সাংখ্যিক সমষ্টিকে নিয়ে নয়, সমষ্টিকে অতিক্রম করে। সেই হচ্ছে সমস্তের এক গূঢ় আত্মা, একধৈবানুদ্রষ্টব্যঃ, কিন্তু বহুধাশক্তিযোগে তার প্রকাশ। সমস্ত মানুষের মধ্যে সেই এক আত্মাকে নিজের মধ্যে অনুভব করবার উদার শক্তি যাঁরা পেয়েছেন তাঁদেরই তো বলি মহাত্মা, তাঁরাই তো সর্বমানবের জন্যে প্রাণ দিতে পারেন। তাঁরাই তো এই এক গূঢ় আত্মার প্রতি লক্ষ করে বলতে পারেন, তদেতং প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাদ্‌ অন্তরতরং যদয়মাত্মা— তিনি পুত্রের চেয়ে প্রিয়, বিত্তের চেয়ে প্রিয়, অন্য-সকল হতে প্রিয়, এই আত্মা যিনি অন্তরতর।

বৈজ্ঞানিক এই কথা শুনে ধিক্‌কার দেন, বলেন, দেবতাকে প্রিয় বললে দেবতার প্রতি মানবিকতা আরোপ করা হয়। আমি বলি, মানবত্ব আরোপ করা নয়, মানবত্ব উপলব্ধি করা। মানুষ আপন মানবিকতারই মাহাত্ম্যবোধ অবলম্বন করে আপন দেবতায় এসে পৌঁচেছে। মানুষের মন আপন দেবতায় আপন মানবত্বের প্রতিবাদ করতে পারে না। করা তার পক্ষে সত্যই নয়। ঈথরের কম্পনে মানুষ আলোকত্ব আরোপ করে না, তাকে স্বতই আলোকরূপে অনুভব করে, আলোকরূপেই ব্যবহার করে, করে ফল পায়, এও তেমনি।

পরমমানবিক সত্তাকে পেরিয়ে গিয়েও পরমজাগতিক সত্তা আছে। সূর্যলোককে ছাড়িয়ে যেমন আছে নক্ষত্রলোক। কিন্তু, যার অংশ এই পৃথিবী, যার উত্তাপে পৃথিবীর প্রাণ, যার যোগে পৃথিবীর চলাফেরা, পৃথিবীর দিনরাত্রি, সে একান্তভাবে এই সূর্যলোক। জ্ঞানে আমরা নক্ষত্রলোককে জানি, কিন্তু জ্ঞানে কর্মে আনন্দে দেহমনে সর্বতোভাবে জানি এই সূর্যলোককে। তেমনি জাগতিক ভূমা আমাদের জ্ঞানের বিষয়, মানবিক ভূমা

আমাদের সমগ্র দেহমন ও চরিত্রের পরিতৃপ্তি ও পরিপূর্ণতার বিষয়। আমাদের ধর্মশ্চ কর্ম চ, আমাদের ঋতং সত্যং, আমাদের ভূতং ভবিষ্যৎ সেই সত্তারই অপর্যাপ্তিতে।

মানবিক সত্তাকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে যে নৈর্ব্যক্তিক জাগতিক সত্তা, তাঁকে প্রিয় বলা বা কোনো-কিছুই বলার কোনো অর্থ নেই। তিনি ভালো-মন্দ সুন্দর-অসুন্দরের ভেদ-বর্জিত। তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ নিয়ে পাপপুণ্যের কথা উঠতে পারে না। অস্তীতিব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে। তিনি আছেন, এ ছাড়া তাঁকে কিছুই বলা চলে না। মানবমনের সমস্ত লক্ষণ সম্পূর্ণ লোপ করে দিয়ে সেই নির্বিশেষে মগ্ন হওয়া যায়, এমন কথা শোনা গেছে। এ নিয়ে তর্ক চলে না। মন-সমেত সমস্ত সত্তার সীমানা কেউ একেবারেই ছাড়িয়ে গেছে কি না, আমাদের মন নিয়ে সে কথা নিশ্চিত বলব কী করে। আমরা সত্তামাত্রকে যে ভাবে যেখানেই স্বীকার করি সেটা মানুষের মনেরই স্বীকৃতি। এই কারণেই দোষারোপ করে মানুষের মন স্বয়ং যদি তাকে অস্বীকার করে, তবে শূন্যতাকেই সত্য বলা ছাড়া উপায় থাকে না। এমন নাস্তিবাদের কথাও মানুষ বলেছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক তা বললে তার ব্যাবসা বন্ধ করতে হয়। বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতায় আমরা যে জগৎকে জানি বা কোনোকালে জানবার সম্ভাবনা রাখি সেও মানবজগৎ। অর্থাৎ, মানুষের বুদ্ধির, যুক্তির কাঠামোর মধ্যে কেবল মানুষই তাকে আপন চিন্তার আকারে আপন বোধের দ্বারা বিশিষ্টতা দিয়ে অনুভব করে। এমন কোনো চিত্ত কোথাও থাকতেও পারে যার উপলব্ধ জগৎ আমাদের গাণিতিক পরিমাপের অতীত, আমরা যাকে আকাশ বলি সেই আকাশে যে বিরাজ করে না। কিন্তু, যে জগতের গূঢ় তত্ত্বকে মানব আপন অন্তর্নিহিত চিন্তাপ্রণালীর দ্বারা মিলিয়ে পাচ্ছে তাকে অতিমানবিক বলব কী করে। এইজন্যে কোনো আধুনিক পণ্ডিত বলেছেন, বিশ্বজগৎ গাণিতিক মনের সৃষ্টি। সেই গাণিতিক মন তো মানুষের মনকে ছাড়িয়ে গেল না। যদি যেত তবে এ জগতের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আমরা জানতেই পারতুম না, যেমন কুকুর বিড়াল কিছুতেই জানতে পারে না। যিনি আমাদের দর্শনে শাস্ত্রে সগুণ ব্রহ্ম তাঁর স্বরূপসম্বন্ধে বলা হয়েছে সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসম্। অর্থাৎ মানুষের বহিরিন্দ্রিয়-অন্তরিন্দ্রিয়ের যত-কিছু গুণ তার আভাস তাঁরই মধ্যে। তার অর্থই এই যে, মানবব্রহ্ম, তাই তাঁর জগৎ মানবজগৎ। এ ছাড়া অন্য জগৎ যদি থাকে তা হলে সে আমাদের সম্বন্ধে শুধু যে আজই নেই তা নয়, কোনো কালেই নেই।

এই জগৎকে জানি আপন বোধ দিয়ে। যে জানে সেই আমার আত্মা। সে আপনাকেও আপনি জানে। এই স্বপ্রকাশ আত্মা একা নয়। আমার আত্মা, তোমার আত্মা, তার আত্মা, এমন কত আত্মা। তারা যে এক আত্মার মধ্যে সত্য

তাঁকে আমাদের শাস্ত্রে বলেন পরমাত্মা। এই পরমাত্মা মানবপরমাত্মা, ইনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। ইনি আছেন সর্বদা জনে-জনের হৃদয়ে।

বলা হয়েছে বটে, আমাদের সকল ইন্দ্রিয়গুণের আভাস এঁর মধ্যে, কিন্তু এতেই সব কথা শেষ হল না। এক আত্মার সঙ্গে আর-এক আত্মার যে সম্বন্ধ সকলের চেয়ে নিবিড়, সকলের চেয়ে সত্য, তাকেই বলে প্রেম। ভৌতিক বিশ্বের সঙ্গে আমাদের বাস্তব পরিচয় ইন্দ্রিয়বোধে, আত্মিক বিশ্বের সঙ্গে আমাদের সত্য পরিচয় প্রেমে। আত্মিক বিশ্বের পরিচয় মানুষ জন্মমুহূর্তেই আরম্ভ করেছে পিতামাতার প্রেমে। এইখানে অপরিমেয় রহস্য, অনির্বচনীয়ের সংস্পর্শ। প্রশ্ন উঠল মনে, এই পিতামাতার সত্য কোথায় প্রতিষ্ঠিত। দাল্‌ভ্য যদি উত্তর করেন, এই পৃথিবীর মাটিতে প্রবাহণ মাথা নেড়ে বলবেন, যিনি পিতৃতমঃ পিতৄণাম্‌, সকল পিতাই যাঁর মধ্যে পিতৃতম হয়ে আছেন, তাঁরই মধ্যে। মাটির অর্থ বুঝতে পারি বাহির থেকে তাকে নেড়েচেড়ে দেখে, পিতামাতার রহস্য বুঝতে পারি আপনারই আত্মার গভীরে এবং সেই গভীরেই উপলব্ধি করি পিতৃতমকে। সেই পিতৃতম বিশেষ কোনো স্বর্গে নেই, বিশেষ কোনো দেশকালে-বদ্ধ ইতিহাসে নেই, ইনি বিশেষ কোনো একটি মানুষে একদা অবতীর্ণ নন, ইনি প্রেমের সম্বন্ধে মানবের ভূতভবিষ্যৎকে পূর্ণ করে আছেন নিখিল মানবলোকে। আহ্বান করছেন দুর্গম পথের ভিতর দিয়ে পরিপূর্ণতার দিকে, অসত্যের থেকে সত্যের দিকে, অন্ধকার থেকে জ্যোতির দিকে, মৃত্যু থেকে অমৃতের দিকে, দুঃখের মধ্য দিয়ে, তপস্যার মধ্য দিয়ে।

এই আহ্বান মানুষকে কোনোকালে কোথাও থামতে দিলে না, তাকে চিরপথিক করে রেখে দিলে। ক্লান্ত হয়ে যারা পথ ছেড়ে পাকা করে ঘর বেঁধেছে তারা আপন সমাধিঘর রচনা করেছে। মানুষ যথার্থই অনাগারিক। জন্তুরা পেয়েছে বাসা, মানুষ পেয়েছে পথ। মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাঁরা তাঁরা পথনির্মাতা, পথপ্রদর্শক। বুদ্ধকে যখন কোনো একজন লোক চরমতত্ত্বের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল তিনি বলেছিলেন, "আমি চরমের কথা বলতে আসি নি, আমি বলব পথের কথা।" মানুষ এক যুগে যাকে আশ্রয় করছে আর-এক যুগে উন্মাদের মতো তার দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে পড়েছে পথে। এই-যে বারে বারে ঘর ভেঙে দিয়ে চলবার উদ্দামতা, যার জন্যে সে প্রাণপণ করে, এ প্রমাণ করছে কোন্‌ সত্যকে। সেই সত্য সম্বন্ধেই উপনিষদ বলেন, মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্‌ পূর্বমর্ষৎ। তিনি মনকে ইন্দ্রিয়কে ছাড়িয়ে চলে গেছেন। ছাড়িয়ে যদি না যেতেন তবে পদে পদে মানুষও আপনাকে ছাড়িয়ে যেত না। অথর্ববেদ বলেছেন, এই আরও'র দিকে, এই ছাড়িয়ে যাবার দিকে মানুষের শ্রী, তার ঐশ্বর্য, তার মহত্ত্ব।

তাই মানবদেবতার সম্বন্ধে এই কথা শুনি—

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদ্ ঊর্জিতমেব বা
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্।

যা কিছুতে ঐশ্বর্য আছে, শ্রী আছে, শ্রেষ্ঠতা আছে, সে আমারই তেজের অংশ থেকে সম্ভূত।'

বিশ্বে ছোটোবড়ো নানা পদার্থই আছে। থাকা-মাত্রের যে দাম তা সকলের পক্ষেই সমান। নিছক অস্তিত্বের আদর্শে মাটির ঢেলার সঙ্গে পদ্মফুলের উৎকর্ষ-অপকর্ষের ভেদ নেই। কিন্তু, মানুষের মনে এমন একটি মূল্যভেদের আদর্শ আছে যাতে প্রয়োজনের বিচার নেই, যাতে আয়তনের বা পরিমাণের তৌল চলে না। মানুষের মধ্যে বস্তুর অতীত একটি অহৈতুক পূর্ণতার অনুভূতি আছে, একটা অন্তরতম সার্থকতার বোধ। তাকেই সে বলে শ্রেষ্ঠতা। অথচ, এই শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে মতের ঐক্য তো দেখি নে। তা হলে সেটা যে নৈর্ব্যক্তিক শাশ্বত সত্যে প্রতিষ্ঠিত, এ কথা বলা যায় কী করে।

জ্যোতির্বিদ দূরবীন নিয়ে জ্যোতিষ্কের পর্যালোচনা করতে চান, কিন্তু তার বাধা বিস্তর। আকাশে আছে পৃথিবীর ধুলো, বাতাসের আবরণ, বাষ্পের অবগুণ্ঠন চার দিকে নানাপ্রকার চঞ্চলতা। যন্ত্রের ত্রুটিও অসম্ভব নয়, যে মন দেখছে তার মধ্যে আছে পূর্বসংস্কারের আবিলতা। ভিতর-বাহিরের সমস্ত ব্যাঘাত নিরস্ত করলে বিশুদ্ধ সত্য পাওয়া যায়। সেই বিশুদ্ধ সত্য এক, কিন্তু বাধাগ্রস্ত প্রতীতির বিশেষত্ব-অনুসারে ভ্রান্ত মত বহু।

পুরোনো সভ্যতার মাটিচাপা ভাঙাচোরা চিহ্নশেষ উদ্ধার করলে তার মধ্যে দেখা যায় আপন শ্রেষ্ঠতাকে প্রকাশ করবার জন্যে মানুষের প্রভূত প্রয়াস। নিজের মধ্যে যে কল্পনাকে সকল কালের সকল মানুষের বলে সে অনুভব করেছে তারই দ্বারা সর্বকালের কাছে নিজের পরিচয় দিতে তার কত বল কত কৌশল। ছবিতে, মূর্তিতে, ঘরে, ব্যবহারের সামগ্রীতে, সে ব্যক্তিগত মানুষের খেয়ালকে প্রচার করতে চায় নি— বিশ্বগত মানুষের আনন্দকে স্থায়ী রূপ দেবার জন্যে তার দুঃসাধ্য সাধনা। মানুষ তাকেই জানে শ্রেষ্ঠতা যাকে সকল কাল ও সকল মানুষ স্বীকার করতে পারে। সেই শ্রেষ্ঠতার দ্বারা মানুষ আত্মপরিচয় দিয়ে থাকে। অর্থাৎ, আপন আত্মায় সকল মানুষের আত্মার পরিচয় দেয়। এই পরিচয়ের সম্পূর্ণতাতেই মানুষের অভ্যুদয়, তার বিকৃতিতেই মানুষের পতন। বাহ্যসম্পদের প্রাচুর্যের মাঝখানেই সেই বিনষ্টির লক্ষণ সহসা এসে দেখা দেয় যখন মদান্ধ স্বার্থান্ধ মানুষ চিরমানবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। পাশ্চাত্য

মহাদেশে কি সেই লক্ষণ আজ দেখা দেয় নি। সেখানে বিজ্ঞান আছে, বাহুবল আছে, অর্থবল আছে, বুদ্ধিবল আছে, কিন্তু তার দ্বারাও মানুষ রক্ষা পায় না। স্বাজাত্যের শিখরের উপরে চড়ে বিশ্বগ্রাসী লোভ যখন মনুষ্যত্বকে খর্ব করতে স্পর্ধা করে, রাষ্ট্র-নীতিতে নিষ্ঠুরতা ও ছলনার সীমা থাকে না, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা এবং সংশয় যখন নিদারুণ হিংস্রতায় শান দিতে বসে, তখন মানবের ধর্ম আঘাত পায় এবং মানবের ধর্মই মানুষকে ফিরে আঘাত করে। এ কোনো পৌরাণিক ঈশ্বরের আদিষ্ট বিধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা নয়। এই-সব আত্মম্ভরীরা আত্মহনো জনাঃ। এরা সেই আত্মাকে মারে যে আত্মা স্বদেশের বা স্বগোষ্ঠীর মধ্যে বদ্ধ নয়, যে আত্মা নিত্যকালের বিশ্বজনের। একলা নিজেকে বা নিজেদেরকে বড়ো করবার চেষ্টায় অন্য-সকল প্রাণীরই উন্নতি ঘটতে পারে, তাতে তাদের সত্যদ্রোহ ঘটে না; কিন্তু মানুষের পক্ষে সেইটেই অসত্য, অধর্ম, এইজন্যে সকলপ্রকার সমৃদ্ধির মাঝখানেই তার দ্বারাই মানুষ সমূলেন বিনশ্যতি।

বিশুদ্ধ সত্যের উপলব্ধিতে বিশ্বমানবমনের প্রকাশ, এ কথা স্বীকার করা সহজ; কিন্তু রসের অনুভূতিতে সেই বিশ্বমনকে হৃদয়ংগম করি কি না, এ নিয়ে সংশয় জন্মাতে পারে। সৌন্দর্যে আনন্দবোধের আদর্শ দেশকালপাত্রভেদে বিচিত্র যদি হয় তবে এর শাশ্বত আদর্শ কোথায়। অথচ, বৃহৎ কালে মেলে দিয়ে মানুষের ইতিহাসকে যখন দেখি তখন দেখতে পাই, শিল্পসৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে সকল কালের সকল সাধকদের মন মেলবার দিকেই যায়। এ কথা সত্য যে, নিশ্চিতভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিই সুন্দর সৃষ্টিতে সম্পূর্ণ রস পায় না। অনেকের মন রূপকানা, তাদের ব্যক্তিগত অভিরুচির সঙ্গে বিশ্বরুচির মিল নেই। মানুষের মধ্যে অনেকে আছে স্বভাবতই বিজ্ঞানমূঢ়, বিশ্ব সম্বন্ধে তাদের ধারণা মোহাচ্ছন্ন বলেই তা বহু, এক সংস্কারের সঙ্গে আর-এক সংস্কারের মিল হয় না, অথচ নিজ নিজ অন্ধ সংস্কারের সত্যতা সম্বন্ধে তাদের প্রত্যেকের এমন প্রচণ্ড দম্ভ যে তা নিয়ে তারা খুনোখুনি করতেও প্রস্তুত। তেমনি সংসারে স্বভাবতই অরসিক বা বেরসিকের অভাব নেই; তাদেরও মতভেদ সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। নিম্নসপ্তক থেকে উচ্চসপ্তক পর্যন্ত উদারা মুদারা তারা নানা পর্যায়ের জন্মমূঢ়তা আছে বলেই যেমন জ্ঞানের বিশ্বভূমীন সম্পূর্ণতায় অশ্রদ্ধা করা যায় না, সৌন্দর্যের আদর্শ সম্বন্ধেও তেমনি।

বার্ট্রাণ্ড্ রাসেল কোনো-এক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন যে, বেটোভনের 'সিম্ফনি'কে বিশ্বমনের রচনা বলা যায় না, সেটা ব্যক্তিগত; অর্থাৎ, সেটা তো গাণিতিক তত্ত্বের মতো নয় যার উদ্ভাবনা সম্বন্ধে ব্যক্তিগত মন উপলক্ষমাত্র, যা নিখিল মনের সামগ্রী। কিন্তু, যদি এ কথা স্বীকার করতে হয় যে, বেটোভনের রচনা সকলেরই

ভালো লাগা উচিত অর্থাৎ ঠিকমত শিক্ষা পেলে, স্বাভাবিক চিত্তজড়তা না থাকলে, অজ্ঞান অনভ্যাসের আবরণ দূর হলে, সকল মানুষের তা ভালো লাগবে, তা হলে বলতেই হবে শ্রেষ্ঠগীত-রচয়িতার শ্রেষ্ঠত্ব সকল মানুষের মনেই সম্পূর্ণ আছে, শ্রোতৃরূপে ব্যক্তিবিশেষের মনে তা বাধাগ্রস্ত।

বুদ্ধি জিনিসটা অস্তিত্বরক্ষার পক্ষে অপরিহার্য, কিন্তু সৌন্দর্যবোধের অপূর্ণতা সত্ত্বেও সংসারে সিদ্ধিলাভের দৃষ্টান্ত অনেক আছে। সৌন্দর্যবোধের কোনো সাংঘাতিক তাগিদ নেই। এ সম্বন্ধে যথেচ্ছাচারের কোনো দণ্ডনীয় বাধা নেই। যুক্তিস্বীকারকারী বুদ্ধি মানুষের মনে যত সুনিশ্চিত হয়েছে প্রাণের বিভাগে, শাসনের অভাবে সৌন্দর্যস্বীকার-কারী রুচি তেমন পাকা হয় নি। তবু সমস্ত মানবসমাজে সৌন্দর্যসৃষ্টির কাজে মানুষের যত প্রভূত শক্তির প্রয়োগ হচ্ছে এমন অল্প বিষয়েই। অথচ, জীবনধারণে এর প্রয়োজন নেই, এর প্রয়োজন আত্মিক। অর্থাৎ, এর দ্বারা বাইরের জিনিসকে পাই নে, অন্তরের থেকে দীপ্তিমান হই, পরিতৃপ্ত হই। এই পরিতৃপ্ত হওয়ার দ্বারা যাঁকে জানি তাঁকে বলি, রসো বৈ সঃ।

এই হওয়ার দ্বারা পাওয়ার কথা উপনিষদে বারবার শোনা যায়; তার থেকে এই বুঝি, মানুষের যা চরম পাবার বিষয় তার সঙ্গে মানুষ একাত্মক, মানুষ তারই মধ্যে সত্য— কেবল তার বোধের বাধা আছে।

নাবিরতো দুশ্চরিতান্ নাশান্তো নাসমাহিতঃ
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।

বলছেন, কেবল জানার দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না। হওয়ার দ্বারা পেতে হবে, দুশ্চরিত থেকে বিরত হওয়া, সমাহিত হওয়া, রিপুদমন করে অচঞ্চলমন হওয়া দ্বারাই তাঁকে পেতে হবে। অর্থাৎ, এ এমন পাওয়া যা আপনারই চিরন্তন সত্যকে পাওয়া।

পূর্বে বলেছি, ভৌতিক সত্যকে বিশুদ্ধ করে দেখতে গেলে কাছের সমস্ত মলিনতা ও চাঞ্চল্য, ব্যক্তিগত সমস্ত বিকার দূর করা চাই। আত্মিক সত্য সম্বন্ধে সে কথা আরো বেশি খাটে। যখন পশুসত্তার বিকার আমরা আত্মিক সত্যে আরোপ করি তখন সেই প্রমাদ সব চেয়ে সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। কেননা, তখন আমাদের হওয়ার ভিত্তিতেই লাগে আঘাত। জানার ভুলের চেয়ে হওয়ার ভুল কত সর্বনেশে তা বুঝতে পারি যখন দেখতে পাই বিজ্ঞানের সাহায্যে যে শক্তিকে আমরা আয়ত্ত করেছি সেই শক্তিই মানুষের হিংসা ও লোভের বাহন হয়ে তার আত্মঘাতকে বিস্তার করছে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। এইজন্যেই সম্প্রদায়ের নামে ব্যক্তিগত বা বিশেষজনগত স্বভাবের বিকৃতি মানুষের পাপবুদ্ধিকে যত প্রশ্রয় দেয় এমন বৈজ্ঞানিক ভ্রান্তিতে কিংবা

বৈষয়িক বিরোধেও না। সাম্প্রদায়িক দেবতা তখন বিদ্বেষবুদ্ধির, অহংকারের, অবজ্ঞাপরতার, মূঢ়তার দৃঢ় আশ্রয় হয়ে দাঁড়ায় ; শ্রেয়ের নামাঙ্কিত পতাকা নিয়ে অশ্রেয় জগদ্‌ব্যাপী অশান্তির প্রবর্তন করে— স্বয়ং দেবত্ব অবমানিত হয়ে মানুষকে অবমানিত ও পরস্পরব্যবহারে আতঙ্কিত করে রাখে। আমাদের দেশে এই দুর্যোগ আমাদের শক্তি ও সৌভাগ্যের মূলে আঘাত করছে।

অন্য দেশেও তার দৃষ্টান্ত আছে। সাম্প্রদায়িক খৃস্টান ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক দেবচরিত্রে পূজাবিধিতে চরিত্রবিকৃতি বা হিংস্রতা দেখে অবজ্ঞা প্রকাশ করেন। সংস্কারবশত দেখতে পান না, মানুষের আপন অহিতবুদ্ধি তাঁদেরও দেবতার ধারণাকে কিরকম নিদারুণভাবে অধিকার করতে পারে। অপ্‌দীক্ষা বা ব্যাপ্‌টিজ্‌ম্ হবার পূর্বে কোনো শিশুর মৃত্যু হলে যে সাম্প্রদায়িক শাস্ত্রমতে তার অনন্ত নরকবাস বিহিত হতে পারে সেই শাস্ত্রমতে দেবচরিত্রে যে অপরিসীম নির্দয়তার আরোপ করা হয় তার তুলনা কোথায় আছে। বস্তুত, যে-কোনো পাপের প্রসঙ্গেই হোক, অনন্ত-নরকের কল্পনা হিংস্রবুদ্ধির চরম প্রকাশ। য়ুরোপে মধ্যযুগে শাস্ত্রগত ধর্মবিশ্বাসকে অবিচলিত রাখবার জন্যে যে বিজ্ঞানবিদ্বেষী ও ধর্মবিরুদ্ধ উৎপীড়ন আচরিত তার ভিত্তি এইখানে। সেই নরকের আদর্শ সভ্যমানুষের জেলখানায় আজও বিভীষিকা বিস্তার করে আছে। সেখানে শোধন করবার নীতি নেই, আছে শাসন করবার হিংস্রতা।

মনুষ্যত্বের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই দেবতার উপলব্ধি মোহমুক্ত হতে থাকে, অন্তত হওয়া উচিত। হয় না যে তার কারণ, ধর্মসম্বন্ধীয় সব-কিছুকেই আমরা নিত্য বলে ধরে নিয়েছি। ভুলে যাই যে, ধর্মের নিত্য আদর্শকে শ্রদ্ধা করি বলেই ধর্মমতকেও নিত্য বলে স্বীকার করতে হবে এমন কথা বলা চলে না। ভৌতিক বিজ্ঞানের মূলে নিত্য সত্য আছে বলেই বৈজ্ঞানিক মতমাত্রই নিত্য, এমন গোঁড়ামির কথা যদি বলি তা হলে আজও বলতে হবে, সূর্যই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। ধর্ম সম্বন্ধে সাধারণত এই ভুলই ঘটে ; সম্প্রদায় আপন মতকেই বলে ধর্ম, আর ধর্মকেই করে আঘাত। তার পরে যে বিবাদ, যে নির্দয়তা, যে বুদ্ধিবিচারহীন অন্ধসংস্কারের প্রবর্তন হয় মানুষের জীবনে আর-কোনো বিভাগে তার তুলনাই পাওয়া যায় না।

এ কথা মানতে হবে, ভুল মত মানুষেরই আছে, জন্তুর নেই। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত ভুল মতবাদের উদ্ভব হচ্ছে, যেহেতু মানুষের একটা দুর্নিবার সমগ্রতার বোধ আছে। কোনো-একটা তথ্য যখন স্বতন্ত্রভাবে বিচ্ছিন্নভাবে তার সামনে আসে তখন তাকেই সম্যক্ বলে সে স্বীকার করে নিতে পারে না। তাকে পূর্ণ করবার আগ্রহে কল্পনার আশ্রয় নেয়। সেই কল্পনা প্রকৃতিভেদে মূঢ় বা প্রাজ্ঞ, সুন্দর বা

কুৎসিৎ, নিষ্ঠুর বা সকরুণ, নানাপ্রকার হতে পারে। কিন্তু, মূল কথাটা হচ্ছে, তার এই বিশ্বাস যে, প্রত্যক্ষ বিচ্ছিন্নতাকে পরিপূর্ণ করে আছে অপ্রত্যক্ষ নিখিলতার সত্য। সমগ্রকে উপলব্ধি করবার যে প্রেরণা আছে তার মনে সেই তার ভূমার বোধ।

মানুষ অন্তরে বাহিরে অনুভব করে, সে আছে একটি নিখিলের মধ্যে। সেই নিখিলের সঙ্গে সচেতন সচেষ্ট যোগসাধনের দ্বারাই সে আপনাকে সত্য করে জানতে থাকে। বাহিরের যোগে তার সমৃদ্ধি ভিতরের যোগে তার সার্থকতা।

আমাদের ভৌতিক দেহ স্বতন্ত্র পদার্থ নয়। পৃথিবীর মাটি জল বাতাস উত্তাপ, পৃথিবীর ওজন আয়তন গতি, সমস্তের সঙ্গে সামঞ্জস্যে এই শরীর ; কোথাও তার সঙ্গে এর একান্ত ছেদ নেই। বলা যেতে পারে, পৃথিবী মানুষের পরম দেহ ; সাধনার দ্বারা, যোগবিস্তারের দ্বারা এই বিরাটকে মানুষ আপন করে তুলছে, বড়ো দেহের মধ্যে ছোটো দেহকে প্রসারিত করছে, বিশ্বভৌতিক শক্তিকে আয়ত্ত করে পরিমিত দেহের কর্মশক্তিকে পরিপূর্ণ করেছে, চোখ স্পষ্টতর করে দেখছে সুদূরস্থ মহীয়ান ও নিকটস্থ কনীয়ানকে, দুই হাত পাচ্ছে বহুসহস্র হাতের শক্তি, দেশের দূরত্ব সংকীর্ণ হয়ে আমাদের দেহের নিকটবর্তী হচ্ছে। একদিন সমস্ত ভৌতিক শক্তি দেহশক্তির পরিশিষ্ট হয়ে উঠবে, মানুষের এই সংকল্প।

সর্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোঁকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।

এই বাণীকে নিজের মধ্যে সার্থক করবে সেই স্পর্ধা নিয়ে মানুষ অগ্রসর। একেবারে নতুন-কিছু উদ্ভাবন করবে তা নয়, নিজের দেহশক্তির সঙ্গে বিরাট ভৌতিক শক্তির সংযোগকে উত্তরতর করে তুলবে।

মনে করা যাক, সবই হল, ভৌতিক শক্তির পূর্ণতাই ঘটল। তবু কি মানুষ বলতে ছাড়বে 'ততঃ কিম্'। রামায়ণে বর্ণিত দশাননের শরীরে মানবের স্বভাবসিদ্ধ দেহশক্তি বহুগুণিত হয়েছিল, দশ দিক থেকে আহরিত ঐশ্বর্যে পূর্ণ হয়েছিল স্বর্ণলঙ্কাপুরী। কিন্তু মহাকাব্যে শেষ জায়গাটা সে পেল না। তার পরাভব হল রামচন্দ্রের কাছে। অর্থাৎ, বাহিরে যে দরিদ্র, আত্মায় যে ঐশ্বর্যবান, তার কাছে। সংসারে এই পরাভব আমরা যে সর্বদা প্রত্যক্ষ করে থাকি তা নয়, অনেক সময়ে তার বিপরীত দেখি ; তবু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মানুষ একে পরাভব বলে। মানুষের আর-একটা গূঢ় জগৎ আছে, সেই-খানেই এই পরাভবের অর্থ পাওয়া যায়। সেই হল তার আত্মার জগৎ।

আপন সত্তার পরিচয়ে মানুষের ভাষায় দুটি নাম আছে। একটি অহং, আর-একটি আত্মা। প্রদীপের সঙ্গে একটিকে তুলনা করা যায়, আর-একটিকে শিখার

সঙ্গে। প্রদীপ আপনার তেল সংগ্রহ করে। আপনার উপাদান নিয়ে প্রদীপের বাজার-দর, কোনোটার দর সোনার, কোনোটার মাটির। শিখা আপনাকেই প্রকাশ করে, এবং তারই প্রকাশে আর-সমস্তও প্রকাশিত। প্রদীপের সীমাকে উত্তীর্ণ হয়ে সে প্রবেশ করে নিখিলের মধ্যে।

মানুষের আলো জ্বালায় তার আত্মা, তখন ছোটো হয়ে যায় তার সঞ্চয়ের অহংকার। জ্ঞানে প্রেমে ভাবে বিশ্বের মধ্যে ব্যাপ্তি-দ্বারাই সার্থক হয় সেই আত্মা। সেই যোগের বাধাতেই তার অপকর্ষ। জ্ঞানের যোগে বিকার ঘটায় মোহ, ভাবের যোগে অহংকার, কর্মের যোগে লোভ স্বার্থপরতা। ভৌতিক বিশ্বে সত্য আপন সর্বব্যাপক ঐক্য প্রমাণ করে, সেই ঐক্য-উপলব্ধিতে আনন্দিত হয় বৈজ্ঞানিক। তেমনি আত্মার আনন্দ আত্মিক ঐক্যকে উপলব্ধি-দ্বারা; যে আত্মার সম্বন্ধে উপনিষদ বলছেন তমেবৈকং জানথ আত্মানম্— সেই আত্মাকে জানো, সেই এককে, যাকে সকল আত্মার মধ্যে এক করে জানলে সত্যকে জানা হয়। প্রার্থনামন্ত্রে আছে য একঃ, যিনি এক, স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু, শুভবুদ্ধির দ্বারা তিনি আমাদের সকলকে এক করে দিন। যে বুদ্ধিতে আমরা সকলে মিলি সেই বুদ্ধিই শুভবুদ্ধি, সেই বুদ্ধিই আত্মার। যথৈবাত্মা পরস্তদ্বদ্ দ্রষ্টব্যঃ শুভমিচ্ছতা। আপনার মতো করে পরকে দেখার ইচ্ছাকেই বলে শুভ-ইচ্ছা, সিদ্ধিলোভেও শুভ নয়, পুণ্যলোভেও শুভ নয়। পরের মধ্যে আপন চৈতন্যের প্রসারণেই শুভ, কেননা পরম মানবাত্মার মধ্যেই আত্মা সত্য।

সর্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ— যেহেতু ভগবান সর্বগত, সকলকে নিয়ে আছেন, সেইজন্যেই তিনি শিব। সমগ্রের মধ্যেই শিব, শিব ঐক্যবন্ধনে। আচারীরা সামাজিক কৃত্রিম বিধির দ্বারা যখন খণ্ডতার সৃষ্টি করে তখন কল্যাণকে হারায়, তার পরিবর্তে যে কাল্পনিক পদার্থ দিয়ে আপনাকে ভোলায় তার নাম দিয়েছে পুণ্য। সেই পুণ্য আর যাই হোক সে শিব নয়। সেই সমাজবিধি আত্মার ধর্মকে পীড়িত করে। স্বলক্ষণন্তু যো বেদ স মুনিঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে। আত্মার লক্ষণকে যে জানে সেই মুনি শ্রেষ্ঠ। আত্মার লক্ষণ হচ্ছে শুভবুদ্ধি, যে শুভবুদ্ধিতে সকলকে এক করে।

পৃথিবী আপনাতে আপনি আবর্তিত, আবার বৃহৎ কক্ষপথে সে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। মানুষের সমাজেও যা-কিছু চলছে সেও এই দুইরকমের বেগে। এক দিকে ব্যক্তিগত আমি'র টানে ধনসম্পদপ্রভুত্বের আয়োজন পুঞ্জিত হয়ে উঠছে, আর-এক দিকে অমিতমানবের প্রেরণায় পরস্পরের সঙ্গে তার কর্মের যোগ, তার আনন্দের যোগ, পরস্পরের উদ্দেশে ত্যাগ। এইখানে আত্মার লক্ষণকে স্বীকার করার দ্বারাই তার

শ্রেষ্ঠতার উপলব্ধি। উভয়ের মধ্যে পাশাপাশি কিরকম বিপরীত অসংগতি দেখা যায় একটা তার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

কয়েক বৎসর পূর্বে লণ্ডনের টাইম্‌স্ পত্রে একটি সংবাদ বেরিয়েছিল, আমেরিকার নেশন পত্র থেকে তার বিবরণ পেয়েছি। বায়ুপোতে চড়ে ব্রিটিশ বায়ুনাবিকসৈন্য আফগানিস্থানে মাহ্‌সুদ্ গ্রাম ধ্বংস করতে লেগেছিল; শতঘ্নীবর্ষিণী একটা বায়ুতরী বিকল হয়ে গ্রামের মাঝখানে গেল পড়ে। একজন আফগান মেয়ে নাবিকদের নিয়ে গেল নিকটবর্তী গুহার মধ্যে, একজন মালিক তাদের রক্ষার জন্যে গুহার দ্বার আগলিয়ে রইল। চল্লিশজন ছুরি আস্ফালন করে তাদের আক্রমণ করতে উদ্যত, মালিক তাদের ঠেকিয়ে রাখলে। তখনো উপর থেকে বোমা পড়ছে, ভিড়ের লোক ঠেলাঠেলি করছে গুহায় আশ্রয় নেবার জন্যে। নিকটবর্তী স্থানের অন্য কয়েকজন মালিক এবং একজন মোল্লা এদের আনুকূল্যে প্রবৃত্ত হল। মেয়েরা কেউ কেউ নিলে এদের আহারের ভার। অবশেষে কিছুদিন পরে মাহ্‌সুদের ছদ্মবেশ পরিয়ে এরা তাদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দিল।

এই ঘটনার মধ্যে মানবস্বভাবের দুই বিপরীত দিক চূড়ান্তভাবেই দেখা দিয়েছে। এরোপ্লেন থেকে বোমাবর্ষণে দেখা যায় মানুষের শক্তির আশ্চর্য সমৃদ্ধি, ভূতল থেকে নভস্তল পর্যন্ত তার সশস্ত্র বাহুর বিপুল বিস্তার। আবার হননে-প্রবৃত্ত শত্রুকে ক্ষমা করে তাকে রক্ষা করতে পারল, মানুষের এই আর-এক পরিচয়। শত্রুহননের সহজ প্রবৃত্তি মানুষের জীবধর্মে, তাকে উত্তীর্ণ হয়ে মানুষ অদ্ভুত কথা বললে, "শত্রুকে ক্ষমা করো।" এ কথাটা জীবধর্মের হানিকর, কিন্তু মানবধর্মের উৎকর্ষলক্ষণ।

আমাদের ধর্মশাস্ত্রে বলে, যুদ্ধকালে যে মানুষ রথে নেই, যে আছে ভূতলে, রথী তাকে মারবে না! যে ক্লীব, যে কৃতাঞ্জলি, যে মুক্তকেশ, যে আসীন, যে সাম্নয়ে বলে 'আমি তোমারই', তাকেও মারবে না। যে ঘুমচ্ছে, যে বর্মহীন, যে নগ্ন, যে নিরস্ত্র, যে অযুধ্যমান, যে যুদ্ধ দেখছে মাত্র, যে অন্যের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত, তাকেও মারবে না। যার অস্ত্র গেছে ভেঙে, যে শোকার্ত, যে পরিক্ষত, ভীত, যে পরাবৃত্ত, সতের ধর্ম অনুসরণ করে তাকেও মারবে না।

সতের ধর্ম বলতে বোঝায় মানুষের মধ্যে যে সত্য তারই ধর্ম, মানুষের মধ্যে যে মহৎ তাঁরই ধর্ম। যুদ্ধ করতে গিয়ে মানুষ যদি তাঁকে অস্বীকার করে তবে ছোটো দিকে তার জিত হলেও বড়ো দিকে তার হার। উপকরণের দিকে তার সিদ্ধি, অমৃতের দিকে সে বঞ্চিত; এই অমৃতের আদর্শ মাপজোখের বাইরে।

স্বর্ণলঙ্কার মাপজোখ চলে। দশাননের মুণ্ড ও হাত গণনা করে বিস্মিত হবার কথা। তার অক্ষৌহিণী সেনারও সংখ্যা আছে, জয়বিস্তারের পরিধি-দ্বারা সেই সেনার

শক্তিও পরিমেয়। আত্মার মহিমার পরিমাণ নেই। শত্রুকে নিধনের পরিমাপ আছে, শত্রুকে ক্ষমার পরিমাপ নেই। আত্মা যে মহার্ঘতায় আপন পরিচয় দেয় ও পরিচয় পায় সেই পরিচয়ের সত্য কি বিরাজ করে না অপরিমেয়ের মধ্যে, যাকে অথর্ববেদ বলেছেন সকল সীমার উদ্‌বৃত্ত, সকল শেষের উৎশেষ। সে কি এমন একটি স্বয়ম্ভূব বুদ্‌বুদ্‌ কোনো সমুদ্রের সঙ্গে যার কোনো যোগ নেই। মানুষের কাছে শুনেছি, ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ— তোমার প্রতি পাপ যে করে তার প্রতি ফিরে পাপ কোরো না। কথাটাকে ব্যবহারে ব্যক্তিবিশেষ মানে বা নাই মানে, তবু মন তাকে পাগলের প্রলাপ বলে হেসে ওঠে না। মানুষের জীবনে এর স্বীকৃতি দৈবাৎ দেখি, প্রায় দেখি বিরুদ্ধতা, অর্থাৎ মাথা গনতি করে এর সত্য চোখে পড়ে না বললেই হয়। তবে এর সত্যতা কোন্‌খানে। মানুষের যে স্বভাবে এটা আছে তার আশ্রয় কোথায়। মানুষ এ প্রশ্নের কী উত্তর দিয়েছে শুনি।

যস্যাত্মা বিরতঃ পাপাৎ কল্যাণে চ নিবেশিতঃ
তেন সর্বমিদং বুদ্ধং প্রকৃতির্বিকৃতিশ্চ যা।

আত্মা যার পাপ থেকে বিরত ও কল্যাণে নিবিষ্ট তিনি সমস্তকে বুঝেছেন। তাই তিনি জানেন কোন্‌টা স্বভাবসিদ্ধ, কোন্‌টা স্বভাববিরুদ্ধ।

মানুষ আপনার স্বভাবকে তখনই জানে যখন পাপ থেকে নিবৃত্ত হয়ে কল্যাণের অর্থাৎ সর্বজনের হিতসাধনা করে। অর্থাৎ মানুষের স্বভাবকে জানে মানুষের মধ্যে যারা মহাপুরুষ। জানে কী করে। তেন সর্বমিদং বুদ্ধম্‌। স্বচ্ছ মন নিয়ে সমস্তটাকে সে বোঝে। সত্য আছে, শিব আছে সমগ্রের মধ্যে। যে পাপ অহংসীমাবদ্ধ স্বভাবের তার থেকে বিরত হলে তবে মানুষ আপনার আত্মিক সমগ্রকে জানে, তখনই জানে আপনার প্রকৃতি। তার এই প্রকৃতি কেবল আপনাকে নিয়ে নয়, তাঁকেই নিয়ে যাঁকে গীতা বলছেন : তিনিই পৌরুষং নৃষু, মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব। মানুষ এই পৌরুষের প্রতিই লক্ষ করে বলতে পারে, ধর্মযুদ্ধে মৃতো বাপি তেন লোকত্রয়ং জিতম্‌। মৃত্যুতে সেই পৌরুষকে সে প্রমাণ করে যা তার দেবত্বের লক্ষণ, যা মৃত্যুর অতীত।

শ্রেয় প্রেয় নিয়ে এতক্ষণ যা বলা হল সেটা সমাজস্থিতির দিক দিয়ে নয়। নিন্দা-প্রশংসার ভিত্তিতে পাকা করে গেঁথে, শাসনের দ্বারা, উপদেশের দ্বারা, আত্মরক্ষার উদ্দেশে সমাজ যে ব্যবস্থা করে থাকে তাতে চিরন্তন শ্রেয়োধর্ম গৌণ, প্রথাঘটিত সমাজ-রক্ষাই মুখ্য। তাই এমন কথা শোনা যায়, শ্রেয়োধর্মকে বিশুদ্ধভাবে সমাজে প্রবর্তন করা ক্ষতিকর। প্রায়ই বলা হয়, সাধারণ মানুষের মধ্যে ভূরিপরিমাণ মূঢ়তা আছে, এই-জন্যে অনিষ্ট থেকে ঠেকিয়ে রাখতে হলে মোহের দ্বারাও তাদের মন ভোলানো চাই,

মিথ্যা উপায়েও তাদের ভয় দেখানো বা সান্ত্বনা দেওয়া দরকার, তাদের সঙ্গে এমন ভাবে ব্যবহার করা দরকার যেন তারা চিরশিশু বা চিরপশু। ধর্মসম্প্রদায়েও যেমন সমাজেও তেমনি, কোনো এক পূর্বতনকালে যে-সমস্ত মত ও প্রথা প্রচলিত ছিল সেগুলি পরবর্তীকালেও আপন অধিকার ছাড়তে চায় না। পতঙ্গমহলে দেখা যায়, কোনো কোনো নিরীহ পতঙ্গ ভীষণ পতঙ্গের ছদ্মবেশে নিজেকে বাঁচায়। সমাজরীতিও তেমনি। তা নিত্যধর্মের ছদ্মবেশে আপনাকে প্রবল ও স্থায়ী করতে চেষ্টা করে। এক দিকে তার পবিত্রতার বাহ্যাড়ম্বর, অন্য দিকে পারত্রিক দুর্গতির বিভীষিকা, সেই সঙ্গে সম্মিলিত শাসনের নানাবিধ কঠোর, এমন-কি অন্যায় প্রণালী— ঘর-গড়া নরকের তর্জনী-সংকেতে নিরর্থক অন্ধ আচারের প্রবর্তন। রাষ্ট্রতন্ত্রে এই বুদ্ধিরই প্রতীক আণ্ডামান, ফ্রান্সের ডেভিল আইলান্ড্, ইটালির লিপারি দ্বীপ। এদের ভিতরের কথা এই যে, বিশুদ্ধ শ্রেয়োনীতি ও লোকস্থিতি এক তালে চলতে পারে না। এই বুদ্ধির সঙ্গে চিরদিনই তাঁদের লড়াই চলে এসেছে যাঁরা সত্যকে শ্রেয়কে মনুষ্যত্বকে চরম লক্ষ্য বলে শ্রদ্ধা করেন।

রাজ্যের বা সমাজের উপযোগিতারূপে শ্রেয়ের মূল্যবিচার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। শ্রেয়কে মানুষ যে স্বীকার করেছে, সেই স্বীকৃতির আশ্রয় কোথায়, সত্য কোথায়, সেইটেই আমার আলোচ্য। রাজ্যে সমাজে নানাপ্রকার স্বার্থসাধনের ক্ষেত্রে প্রতিদিনের ব্যবহারে তার প্রতিবাদ পদে পদে, তবুও আত্মপরিচয়ে মানুষ তাকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছে, তাকেই বলেছে ধর্ম অর্থাৎ নিজের চরম স্বভাব; শ্রেয়ের আদর্শ সম্বন্ধে দেশকালপাত্রভেদে যথেষ্ট মতভেদ সত্ত্বেও সেই শ্রেয়ের সত্যকে সকল মানুষই শ্রদ্ধা করেছে, এইটেতে মানুষের ধর্মের কোন্ স্বরূপ প্রমাণিত হয় সেইটে আমি বিচার করেছি। 'হয়' এবং 'হওয়া উচিত' এই দ্বন্দ্ব মানব-ইতিহাসের আরম্ভকাল থেকেই প্রবলবেগে চলছে, তার কারণ বিচার করতে গিয়ে বলেছি— মানুষের অন্তরে এক দিকে পরমমানব, আর-এক দিকে স্বার্থসীমাবদ্ধ জীবমানব, এই উভয়ের সামঞ্জস্য-চেষ্টাই মানবের মনের নানা অবস্থা-অনুসারে নানা আকারে প্রকারে ধর্মতন্ত্ররূপে অভিব্যক্ত। নইলে কেবল সুবিধা-অসুবিধা প্রিয়-অপ্রিয় প্রবল থাকত জৈবিক ক্ষেত্রে জীবধর্মে; পাপ-পুণ্য কল্যাণ-অকল্যাণের কোনো অর্থই থাকত না।

মানুষের এই-যে কল্যাণের মতি এর সত্য কোথায়। ক্ষুধাতৃষ্ণার মতো প্রথম থেকেই আমাদের মনে তার বোধ যদি পূর্ণ থাকত তা হলে তার সাধনা করতে হত না। বলব, বিশ্বমানবমনে আছে। কিন্তু, সকল মানুষের মন সমষ্টিভূত হয়ে বিশ্ব-মানবমনের মহাদেশ সৃষ্ট, এ কথা বলব না। ব্যক্তিমন বিশ্বমনে আশ্রিত কিন্তু ব্যক্তি-

মনের যোগফল বিশ্বমন নয়। তাই যদি হত তা হলে যা আছে তাই হত একান্ত, যা হতে পারে তার জায়গা পাওয়া যেত না। অথচ, যা হয় নি, যা হতে পারে, মানুষের ইতিহাসে তারই জোর তারই দাবি বেশি। তারই আকাঙ্ক্ষা দুর্নিবার হয়ে মানুষের সভ্যতাকে যুগে যুগে বর্তমানের সীমা পার করিয়ে দিচ্ছে। সেই আকাঙ্ক্ষা শিথিল হলেই সত্যের অভাবে সমাজ শ্রীহীন হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, আমার ব্যক্তিগত মনে সুখদুঃখের যে অনুভূতি সেটা বিশ্বমনের মধ্যেও সত্য কি না। ভেবে দেখলে দেখা যায়, অহংসীমার মধ্যে যে সুখদুঃখ আত্মার সীমায় তার রূপান্তর ঘটে। যে মানুষ সত্যের জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছে, দেশের জন্যে, লোকহিতের জন্যে— বৃহৎ ভূমিকায় যে নিজেকে দেখেছে, ব্যক্তিগত সুখদুঃখের অর্থ তার কাছে উলটো হয়ে গেছে। সে মানুষ সহজেই সুখকে ত্যাগ করতে পারে এবং দুঃখকে স্বীকার করে দুঃখকে অতিক্রম করে। স্বার্থের জীবনযাত্রায় সুখদুঃখের ভার গুরুতর, মানুষ স্বার্থকে যখন ছাড়িয়ে যায় তখন তার ভার এত হালকা হয়ে যায় যে, তখন পরম দুঃখের মধ্যে তার সহিষ্ণুতাকে, পরম অপমানের আঘাতে তার ক্ষমাকে, অলৌকিক বলে মনে হয়। আপনাকে বৃহতে উপলব্ধি করাই সত্য, অহংসীমায় অবরুদ্ধ জানাই অসত্য। ব্যক্তিগত দুঃখ এই অসত্যে।

আমরা দুঃখকে যে ভাবে দেখি বৃহতের মধ্যে সে ভাব থাকতে পারে না, যদি থাকত তা হলে সেখানে দুঃখের লাঘব বা অবসান হত না। সংগীতের অসম্পূর্ণতায় বিস্তর বেসুর আছে, সেই বেসুরের একটিও থাকতে পারে না সম্পূর্ণ সংগীতে— সেই সম্পূর্ণ সংগীতের দিকে যতই যাওয়া যায় ততই বেসুরের হ্রাস হতে থাকে। বেসুর আমাদের পীড়া দেয়, যদি না দিত তা হলে সুরের দিকে আমাদের যাত্রা এগোত না। তাই বিরাটকে বলি রুদ্র, তিনি মুক্তির দিকে আকর্ষণ করেন দুঃখের পথে। অপূর্ণতাকে ক্ষয় করার দ্বারা পূর্ণের সঙ্গে মিলন বিশুদ্ধ আনন্দময় হবে, এই অভিপ্রায় আছে বিশ্বমানবের মধ্যে। তাঁর প্রতি প্রেমকে জাগরিত করে তাঁরই প্রেমকে সার্থক করব, যুগে যুগে এই প্রতীক্ষার আহ্বান আসছে আমাদের কাছে।

সেই আহ্বানের আকর্ষণে মানুষ বেরিয়ে পড়েছে অজানার দিকে, এই যাত্রার ইতিহাসই তার ইতিহাস। তার চলার পথপার্শ্বে কত সাম্রাজ্য উঠল এবং পড়ল, ধনসম্পদ হল স্তূপীকৃত, আবার গেল মিলিয়ে ধুলোর মধ্যে। তার আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেবার জন্যে কত প্রতিমা সে গড়ে তুললে, আবার ভেঙে দিয়ে গেল, বয়স পেরিয়ে ছেলেবেলাকার খেলনার মতো। কত মায়ামন্ত্রের চাবি বানাবার চেষ্টা করলে— তাই দিয়ে খুলতে চেয়েছিল প্রকৃতির রহস্যভাণ্ডার, আবার সমস্ত ফেলে দিয়ে নূতন করে

খুঁজতে বেরিয়েছে গহনে প্রবেশের গোপন পথ। এমনি করে তার ইতিবৃত্তে এক যুগের পর আর-এক যুগ আসছে— মানুষ অশ্রান্ত যাত্রা করেছে অন্নবস্ত্রের জন্যে নয়, আপনার সমস্ত শক্তি দিয়ে মানবলোকে মহামানবের প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে, আপনার জটিল বাধার থেকে আপনার অন্তরতম সত্যকে উদ্ধার করবার জন্যে; সেই সত্য যা তার পুঞ্জিত দ্রব্যভারের চেয়ে বড়ো, তার সমস্ত কৃতকর্মের চেয়ে বড়ো, তার সমস্ত প্রথা মত বিশ্বাসের চেয়ে বড়ো, যার মৃত্যু নেই, যার ক্ষয় নেই। প্রভূত হয়েছে মানুষের ভুলভ্রান্তি নিষ্ফলতা, পথে পথে তারা প্রকাণ্ড ভগ্নস্তূপরূপে ছড়িয়ে আছে; মানুষের দুঃখব্যথার আঘাত হয়েছে অপরিসীম, তার অবরুদ্ধ সার্থকতার শৃঙ্খল ছেদনে কঠিন অধ্যবসায়; এ-সমস্ত এক মুহূর্তও কে সহ্য করতে পারত, মানুষের অন্তরবাসী ভূমার মধ্যে যদি এর চিরন্তন কোনো অর্থ না থাকত। মানুষের সকল দুঃখের উপরকার কথা এই যে— মানুষ আপন চৈতন্যকে প্রসারিত করছে আপন অসীমের দিকে, জ্ঞানে প্রেমে কর্মে বৃহত্তর ঐক্যকে আয়ত্ত করতে চলেছে আপনার সকল মহৎ কীর্তিতে, তাঁর নিকটতর সামীপ্য পাবার জন্যে ব্যগ্র বাহু বাড়িয়েছে যাঁকে তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি। মানুষ হয়ে জন্মলাভ করে আরাম চাইবে কে, বিশ্রাম পাব কোথায়। মুক্তি পেতে হবে, মুক্তি দিতে হবে, এই-যে তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য—

মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।
মৃত্যুরে না করি শঙ্কা। দুর্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি— তারি মাঝে যাব অভিসারে
তারি কাছে, জীবনসর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি।

কে সে। জানি না কে। চিনি নাই তারে।
শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর-পানে,
ঝড়ঝঞ্ঝা-বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর-প্রদীপখানি। শুধু জানি, যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বানগীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরানে
সংকট-আবর্ত-মাঝে, দিয়েছে সে সর্ব বিসর্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি; মৃত্যুর গর্জন

শুনেছে সে সংগীতের মতো। দহিয়াছে অগ্নি তারে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে,
সর্বপ্রিয়বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোমহুতাশন।

শুনিয়াছি, তারি লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক। মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
প্রত্যহের কুশাঙ্কুর।

তারি পদে মানী সঁপিয়াছে মান,
ধনী সঁপিয়াছে ধন, বীর সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ।

শুধু জানি
সে বিশ্বপ্রিয়ার প্রেমে ক্ষুদ্রতারে দিয়া বলিদান
বর্জিতে হইবে দূরে জীবনের সর্ব অসম্মান,
সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নত মস্তক উচ্চে তুলি
যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি
আঁকে নাই কলঙ্ক তিলক।

তিন

বৃহদারণ্যকে একটি আশ্চর্য বাণী আছে—

অথ যোঽন্যাং দেবতাম্‌ উপাস্তে অন্যোঽসৌ অন্যোঽহম্‌ অস্মীতি
ন স বেদ, যথা পশুরেবং স দেবানাম্‌।

যে মানুষ অন্য দেবতাকে উপাসনা করে সেই 'দেবতা অন্য আর আমি অন্য' এমন কথা ভাবে সে তো দেবতাদের পশুর মতোই।

অর্থাৎ, সেই দেবতার কল্পনা মানুষকে আপনার বাইরে বন্দী করে রাখে; তখন মানুষ আপন দেবতার দ্বারাই আপন আত্মা হতে নির্বাসিত, অপমানিত।

এই যেমন শোনা গেল উপনিষদে আবার সেই কথাই আপন ভাষায় বলছে নিরক্ষর অশাস্ত্রজ্ঞ বাউল। সে আপন দেবতাকে জানে আপনার মধ্যেই, তাকে বলে মনের মানুষ। বলে, "মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ।"

মানুষের ইতিহাসে এমন অনেক ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে যারা কাঠ-পাথর-পূজাকে

বলেছে হীনতা এবং তাই নিয়ে তারা মারকাট করতে ছোটে। স্বীকার করি, কাঠ-পাথর বাইরের জিনিস, সেখানে সর্বকালের সর্বমানুষের পূজা মিলতে পারে না। মানুষের ভক্তিকে জাতিতে জাতিতে প্রথায় প্রথায় সেই পূজা বিচ্ছিন্ন করে, তার ঐতিহাসিক গণ্ডীগুলি সংকীর্ণ।

কিন্তু, তাদের বিরুদ্ধ-সম্প্রদায়েরও দেবতা প্রতিমার মতোই বাইরে অবস্থিত, নানা-প্রকার অমানুষিক বিশেষণে লক্ষণে সজ্জিত, শুধু তাই নয়, বিশেষ জাতির ঐতিহাসিক কার্যকলাপে জড়িত ও কাল্পনিক কাহিনী দ্বারা দৈশিক ও কালিক বিশেষত্ব-গ্রস্ত। এই পৌত্তলিকতা সূক্ষ্মতর উপাদানে রচিত বলেই নিজেকে অপৌত্তলিক বলে গর্ব করে। বৃহদারণ্যক এই বাহ্যিকতাকেও হীন বলে নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন, যে দেবতাকে আমার থেকে পৃথক করে বাইরে স্থাপন করি তাঁকে স্বীকার করার দ্বারাই নিজেকে নিজের সত্য থেকে দূরে সরিয়ে দিই।

এমনতরো কথায় একটা ক্রুদ্ধ কলরব উঠতে পারে। তবে কি মানুষ নিজেকে নিজেই পূজা করবে। নিজেকে ভক্তি করা কি সম্ভব। তা হলে পূজা-ব্যাপারকে তো বলতে হবে অহংকারের বিপুলীকরণ।

একেবারে উলটো। অহংকে নিয়েই অহংকার। সে তো পশুও করে। অহং থেকে বিযুক্ত আত্মায় ভূমার উপলব্ধি একমাত্র মানুষের পক্ষেই সাধ্য। কেননা মানুষের পক্ষে তাই সত্য। ভূমা— আহারে বিহারে আচারে বিচারে ভোগে নৈবেদ্যে মন্ত্রে তন্ত্রে নয়। ভূমা— বিশুদ্ধ জ্ঞানে, বিশুদ্ধ প্রেমে, বিশুদ্ধ কর্মে। বাইরে দেবতাকে রেখে স্তবে অনুষ্ঠানে পূজোপচারে শাস্ত্রপাঠে বাহ্যিক বিধিনিষেধ-পালনে উপাসনা করা সহজ, কিন্তু আপনার চিন্তায়, আপনার কর্মে, পরম মানবকে উপলব্ধি ও স্বীকার করা সব চেয়ে কঠিন সাধনা। সেইজন্যেই কথিত আছে, নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। তারা সত্যকে অন্তরে পায় না যারা অন্তরে দুর্বল। অহংকারকে দূর করতে হয়, তবেই অহংকে পেরিয়ে আত্মাতে পৌছতে পারি।

য আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকোঽবিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।

আমার মধ্যে যে মহান আত্মা আছেন, যিনি জরামৃত্যুশোক-ক্ষুধাতৃষ্ণার অতীত, যিনি সত্যকাম, সত্যসংকল্প, তাঁকে অন্বেষণ করতে হবে, তাঁকে জানতে হবে।

"মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ।" এই-যে তাঁকে সন্ধান করা, তাঁকে জানা, এ তো বাইরে জানা, বাইরে পাওয়া নয়; এ যে আপন অন্তরে আপনি হওয়ার দ্বারা জানা, হওয়ার দ্বারা পাওয়া।

প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ— যুক্তিতর্কের যোগে বাহ্যজ্ঞানের বিষয়কে যেমন করে জানি এ তো তেমন করে জানা নয়, অন্তরে হওয়ার দ্বারা জানা। নদী সমুদ্রকে পায় যেমন করে, প্রতিক্ষণেই সমুদ্র হতে হতে। এক দিকে সে ছোটো নদী, আর-এক দিকে সে বৃহৎ সমুদ্র। সেই হওয়া তার পক্ষে সম্ভব, কেননা সমুদ্রের সঙ্গে তার স্বাভাবিক ঐক্য; বিচ্ছেদের ভিতর দিয়ে সেই ঐক্য। জীবধর্ম যেন উঁচু পাড়ির মতো জন্তুদের চেতনাকে ঘিরে আটক করেছে। মানুষের আত্মা জীবধর্মের পাড়ির ভিতর দিয়ে তাকে কেবলই পেরিয়ে চলেছে, মিলেছে আত্মার মহাসাগরে, সেই সাগরের যোগে সে জেনেছে আপনাকে। যেমন নদী পায় আপনাকে যখন সে বৃহৎ জলরাশিকে আপন করে; নইলে সে থাকে বদ্ধ হয়ে, বিল হয়ে, জলা হয়ে। তাই বাউল মানুষকে বলেছে, "তোরই ভিতর অতল সাগর।" পূর্বেই বলেছি; মানুষ আপন ব্যক্তিগত সংস্কারকে পার হয়ে যে জ্ঞানকে পায়, যাকে বলে বিজ্ঞান, সেই জ্ঞান নিখিল মানবের, তাকে সকল মানুষই স্বীকার করবে, সেইজন্যে তা শ্রদ্ধেয়। তেমনি মানুষের মধ্যে স্বার্থগত আমির চেয়ে যে বড়ো আমি সেই-আমির সঙ্গে সকলের ঐক্য, তার কর্ম সকলের কর্ম। একলা আমির কর্মই বন্ধন, সকল আমির কর্ম মুক্তি। আমাদের বাংলাদেশের বাউল বলেছে—

মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ।
একবার দিব্যচক্ষু খুলে গেলে দেখতে পাবি সর্বঠাঁই।

সেই মনের মানুষ সকল মনের মানুষ, আপন মনের মধ্যে তাঁকে দেখতে পেলে সকলের মধ্যেই তাঁকে পাওয়া হয়। এই কথাই উপনিষদ বলেছেন, যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি। বলেছেন, তং বেদ্যং পুরুষং বেদ— যিনি বেদনীয় সেই পূর্ণ মানুষকে জানো; অন্তরে আপনার বেদনায় যাঁকে জানা যায় তাঁকে সেই বেদনায় জানো, জ্ঞানে নয়, বাইরে নয়।

আমাদের শাস্ত্রে সোঽহম্ বলে যে তত্ত্বকে স্বীকার করা হয়েছে তা যত বড়ো অহংকারের মতো শুনতে হয় আসলে তা নয়। এতে ছোটোকে বড়ো বলা হয় নি, এতে সত্যকে ব্যাপক বলা হয়েছে। আমার যে ব্যক্তিগত আমি তাকে ব্যাপ্ত করে আছে বিশ্বগত আমি। মাথায় জটা ধারণ করলে, গায়ে ছাই মাখলে, বা মুখে এই শব্দ উচ্চারণ করলেই সোঽহম্-সত্যকে প্রকাশ করা হল, এমন কথা যে মনে করে সেই অহংকৃত। যে আমি সকলের সেই আমিই আমারও এটা সত্য, কিন্তু এই সত্যকে আপন করাই মানুষের সাধনা। মানুষের ইতিহাসে চিরকাল এই সাধনাই নানা রূপে নানা নামে নানা সংকল্পের মধ্য দিয়ে চলেছে। যিনি পরম আমি, যিনি সকলের আমি, সেই আমিকেই আমার বলে সকলের মধ্যে জানা যে পরিমাণে আমাদের জীবনে,

আমাদের সমাজে উপলব্ধ হচ্ছে সেই পরিমাণেই আমরা সত্য মানুষ হয়ে উঠছি। মানুষের রিপু মাঝখানে এসে এই সোঽহম্‌-উপলব্ধিকে দুই ভাগ করে দেয়, একান্ত হয়ে ওঠে অহম্‌।

তাই উপনিষদ বলেন, মা গৃধঃ— লোভ কোরো না। লোভ বিশ্বের মানুষকে ভুলিয়ে বৈষয়িক মানুষ করে দেয়। যে ভোগ মানুষের যোগ্য তা সকলকে নিয়ে, তা বিশ্বভৌমিক, তা মানুষের সাহিত্যে আছে, শিল্পকলায় আছে, তাই প্রকাশ পায় মানুষের সংসারযাত্রায় তার হৃদয়ের আতিথ্যে। তাই আমাদের শাস্ত্রে বলে, অতিথি-দেবো ভব। কেননা 'আমার ভোগ সকলের ভোগ' এই কথাটা অতিথিকে দিয়ে গৃহস্থ স্বীকার করে; তার ঐশ্বর্যের সংকোচ দূর হয়। ব্যক্তিগত মানবের ঘরে সর্বমানবের প্রতিনিধি হয়ে আসে অতিথি, তার গৃহসীমাকে বিশ্বের দিকে নিয়ে যায়। না নিয়ে গেলে সেটা রাজপ্রাসাদের পক্ষেও দীনতা। এই আতিথ্যের মধ্যে আছে সোঽহংতত্ত্ব— অর্থাৎ, আমি তাঁর সঙ্গে এক যিনি আমার চেয়ে বড়ো। আমি তাঁর সঙ্গে মিলে আছি যিনি আমার এবং আমার অতিরিক্ত।

আমাদের দেশে এমন-সকল সন্ন্যাসী আছেন যাঁরা সোঽহংতত্ত্বকে নিজের জীবনে অনুবাদ করে নেন নিরতিশয় নৈষ্কর্ম্যে ও নির্মমতায়। তাঁরা দেহকে পীড়ন করেন জীবপ্রকৃতিকে লঙ্ঘন করবার জন্যে, মানুষের স্বাধীন দায়িত্বও ত্যাগ করেন মানব-প্রকৃতিকে অস্বীকার করবার স্পর্ধায়। তাঁরা অহংকে বর্জন করেন যে অহং বিষয়ে আসক্ত, আত্মাকেও অমান্য করেন যে আত্মা সকল আত্মার সঙ্গে যোগে যুক্ত। তাঁরা যাঁকে ভূমা বলেন তিনি উপনিষদে-উক্ত সেই ঈশ নন যিনি সকলকেই নিয়ে আছেন; তাঁদের ভূমা সব-কিছু হতে বর্জিত, সুতরাং তাঁর মধ্যে কর্মতত্ত্ব নেই। তাঁরা মানেন না তাঁকে যিনি পৌরুষং নৃষু, মানুষের মধ্যে যিনি মনুষ্যত্ব, যিনি বিশ্বকর্মা মহাত্মা, যাঁর কর্ম খণ্ডকর্ম নয়, যাঁর কর্ম বিশ্বকর্ম; যাঁর স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ— যাঁর মধ্যে জ্ঞানশক্তি ও কর্ম স্বাভাবিক, যে স্বাভাবিক জ্ঞানশক্তিকর্ম অন্তহীন দেশে কালে প্রকাশমান।

পূর্বেই বলেছি, মানুষের অভিব্যক্তির গতি অন্তরের দিকে। এই দিকে তার সীমার আবরণ খুলে যাবার পথ। একদা মানুষ ছিল বর্বর, সে ছিল পশুর মতো, তখন ভৌতিক জীবনের সীমায় তার মন তার কর্ম ছিল বদ্ধ। জ্বলে উঠল যখন ধীশক্তি তখন চৈতন্যের রশ্মি চলল সংকীর্ণ জীবনের সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বভৌমিকতার দিকে। ভারতীয় মধ্যযুগের কবিস্মৃতি ভাণ্ডার সুহৃদ্‌ ক্ষিতিমোহনের কাছ থেকে কবি রজ্জবের একটি বাণী পেয়েছি। তিনি বলেছেন—

সব সাঁচ মিলৈ সো সাঁচ হৈ না মিলৈ সো ঝূঁঠ।
জন রজ্জব সাঁচী কহী ভাবই রিঝি ভাবই রূঠ॥

সব সত্যের সঙ্গে যা মেলে তাই সত্য, যা মিলল না তা মিথ্যে; রজ্জব বলছে, এই কথাই খাঁটি, এতে তুমি খুশিই হও আর রাগই কর।

ভাষা থেকে বোঝা যাচ্ছে, রজ্জব বুঝেছেন, এ কথায় রাগ করবার লোকই সমাজে বিস্তর। তাদের মত ও প্রথার সঙ্গে বিশ্বসত্যের মিল হচ্ছে না, তবু তারা তাকে সত্য নাম দিয়ে জটিলতায় জড়িয়ে থাকে— মিল নেই বলেই এই নিয়ে তাদের উত্তেজনা উগ্রতা এত বেশি। রাগারাগির দ্বারা সত্যের প্রতিবাদ, অগ্নিশিখাকে ছুরী দিয়ে বেঁধবার চেষ্টার মতো। সেই ছুরী সত্যকে মারতে পারে না, মারে মানুষকে। তবু সেই বিভীষিকার সামনে দাঁড়িয়েই বলতে হবে—

সব সাঁচ মিলৈ সো সাঁচ হৈ না মিলৈ সো ঝূঁঠ।

একদা যেদিন কোনো-একজন মাত্র বৈজ্ঞানিক বললেন, পৃথিবী সূর্যের চার দিকে ঘুরছে, সেদিন সেই একজন মাত্র মানুষই বিশ্বমানুষের বুদ্ধিকে প্রকাশ করেছেন। সেদিন লক্ষ লক্ষ লোক সে কথায় ক্রুদ্ধ; তারা ভয় দেখিয়ে জোর করে বলাতে চেয়েছে, সূর্যই পৃথিবীর চার দিকে ঘুরছে। তাদের সংখ্যা যতই বেশি হোক, তাদের গায়ের জোর যতই থাক্, তবু তারা প্রজ্ঞাকে অস্বীকার করবামাত্র চিরকালের মানবকে অস্বীকার করলে। সেদিন অসংখ্য বিরুদ্ধবাদীর মাঝখানে একলা দাঁড়িয়ে কে বলতে পেরেছে সোঽহং, অর্থাৎ, আমার জ্ঞান আর মানবভূমার জ্ঞান এক। তিনিই বলেছেন যাঁকে সেদিন বিপুল জনসংঘ সত্য প্রত্যাখ্যান করাবার জন্যে প্রাণান্তিক পীড়ন করেছিল।

যদি লক্ষ লক্ষ লোক বলে, কোটি যোজন দূরে কোনো বিশেষ গ্রহনক্ষত্রের সমবায়ে পৃথিবীর কোনো-একটি প্রদেশের জলধারায় এমন অভৌতিক জাদুশক্তির সঞ্চার হয় যাতে স্নানকারীর নিজের ও পূর্বপুরুষের আন্তরিক পাপ যায় ধুয়ে, তা হলে বলতেই হবে—

সব সাঁচ মিলৈ সো সাঁচ হৈ না মিলৈ সো ঝূঁঠ।

বিশ্বের বুদ্ধি এ বুদ্ধির সঙ্গে মিলল না। কিন্তু যেখানে বলা হয়েছে, অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি— জল দিয়ে কেবল দেহেরই শোধন হয়, মনের শোধন হয় সত্যে, সেখানে বিশ্বমানবমনের সম্মতি পাওয়া যায়। কিংবা যেখানে বলা হয়েছে—

কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
নৈবং কুর্যাম্ পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ॥

পাপ করে সন্তপ্ত হলে সেই সন্তাপ থেকেই পাপের মোচন হয়, 'এমন কাজ আর করব

না' বলে নিবৃত্ত হলেই মানুষ পবিত্র হতে পারে— সেখানে এই বলাতেই মানুষ আপন বুদ্ধিতে স্বীকার করে বিশ্বমনের প্রজ্ঞাকে। তং হ দেবম্ আত্মবুদ্ধিপ্রকাশম্— সেই দেবতাকে আমাদের আত্মায় জানি যিনি আত্মবুদ্ধিপ্রকাশক। আমার মন আর বিশ্বমন একই, এই কথাই সত্যসাধনার মূলে, আর ভাষান্তরে এই কথাই সোঽহম্।

একদিন ব্রাহ্মণ রামানন্দ তাঁর শিষ্যদের কাছ থেকে চলে গিয়ে আলিঙ্গন করলেন নাভা চণ্ডালকে, মুসলমান জোলা কবীরকে, রবিদাস চামারকে। সেদিনকার সমাজ তাঁকে জাতিচ্যুত করলে। কিন্তু, তিনি একলাই সেদিন সকলের চেয়ে বড়ো জাতিতে উঠেছিলেন যে জাতি নিখিল মানুষের। সেদিন ব্রাহ্মণমণ্ডলীর ধিক্‌কারের মাঝখানে একা দাঁড়িয়ে রামানন্দই বলেছিলেন সোঽহম্ ; সেই সত্যের শক্তিতেই তিনি পার হয়ে গিয়েছিলেন সেই ক্ষুদ্র সংস্কারগত ঘৃণাকে যা নিষ্ঠুর হয়ে মানুষে মানুষে ভেদ ঘটিয়ে সমাজস্থিতির নামে সমাজধর্মের মূলে আঘাত করে।

একদিন যিশুখৃস্ট বলেছিলেন, "সোঽহম্। আমি আর আমার পরমপিতা একই।" কেননা, তাঁর যে প্রীতি, যে কল্যাণবুদ্ধি সকল মানুষের প্রতি সমান প্রসারিত সেই প্রীতির আলোকেই আপন অহংসীমাকে ছাড়িয়ে পরমমানবের সঙ্গে তিনি আপন অভেদ দেখেছিলেন।

বুদ্ধদেব উপদেশ দিলেন, সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য হিংসাশূন্য শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমাণ মৈত্রী পোষণ করবে। দাঁড়াতে বসতে চলতে শুতে, যাবৎ নিদ্রিত না হবে, এই মৈত্রীস্মৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকবে— একেই বলে ব্রহ্মবিহার।

এতবড়ো উপদেশ মানুষকেই দেওয়া চলে। কেননা, মানুষের মধ্যে গভীর হয়ে আছে সোঽহংতত্ত্ব। সে কথা বুদ্ধদেব নিজের মধ্য থেকেই জেনেছেন, তাই বলেছেন, অপরিমাণ প্রেমেই আপনার অন্তরের অপরিমেয় সত্যকে মানুষ প্রকাশ করে।

অথর্ববেদ বলেন, তস্মাদ্ বৈ বিদ্বান্ পুরুষমিদং ব্রহ্মেতি মন্যতে— যিনি বিদ্বান তিনি মানুষকে তার প্রত্যক্ষের অতীত বৃহৎ বলেই জানেন। সেইজন্যে তিনি তার কাছে প্রত্যাশা করতে পারেন দুঃসাধ্য কর্মকে, অপরিমিত ত্যাগকে। যে পুরুষে ব্রহ্ম বিদুস্তে বিদুঃ পরমেষ্ঠিনম্— যাঁরা ভূমাকে জানেন মানুষে তাঁরা জানেন পরম দেবতাকেই। সেই মানবদেবতাকে মানুষের মধ্যে জেনেছিলেন বলেই বুদ্ধদেব উপদেশ দিতে পেরেছিলেন—

মাতা যথা নিয়ং পুত্তং আয়ুসা এক পুত্তমনুরক্‌খে,
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং।

মা যেমন আপন আয়ু ক্ষয় করেই নিজের একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করে তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি মনে অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাবে।

মাথা গ'ণে বলব না ক'জন এই উপদেশ পালন করতে পারে। সেই গণনায় নয় সত্যের বিচার।

মানুষের অসীমতা যিনি নিজের মধ্যে অনুভব করেছিলেন তাঁকে অপেক্ষা করতে হয় নি মাথা গোনবার। তিনি অসংকোচে মানুষের মহামানবকে আহ্বান করেছিলেন; বলেছিলেন, "অপরিমাণ ভালোবাসায় প্রকাশ করো আপনার অন্তরে ব্রহ্মকে।" এই বাণী অসংকোচে সকলকে শুনিয়ে তিনি মানুষকে শ্রদ্ধা করেছিলেন।

আমাদের দেশে এমন আত্মাবমাননার কথা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় যে, সোঽহংতত্ত্ব সকলের নয়, কেবল তাঁদেরই যাঁরা ক্ষণজন্মা। এই বলে মানুষের অধিকারকে শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট -ভেদে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নিশ্চেষ্ট নিকৃষ্টতাকে আরাম দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশে যাদের অন্ত্যজ বলা হয় তারা যেমন নিজের হেয়তাকে নিশ্চল করে রাখতে কুণ্ঠিত হয় না তেমনি এ দেশে অগণ্য মানুষ আপন কনিষ্ঠ অধিকার নিঃসংকোচে মেনে নিয়ে মূঢ়তাকে, চিত্তের ও ব্যবহারের দীনতাকে, বিচিত্র আকারে প্রকাশ করতে বাধা পায় না। কিন্তু, মানুষ হয়ে জন্মেছি, ললাটের লিখনে নিয়ে এসেছি সোঽহম্— এই বাণীকে সার্থক করবার জন্যেই আমরা মানুষ। আমাদের একজনেরও অগৌরব সকল মানুষের গৌরব ক্ষুণ্ণ করবে। যে সেই আপন অধিকারকে খর্ব করে সে নিজের মধ্যে তাঁর অসম্মান করে যিনি কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী— যিনি সকলের কর্মের অধ্যক্ষ, সকলের যিনি অন্তরতম সাক্ষী, সকলের মধ্যে যাঁর বাস।

পূর্বেই দেখিয়েছি অথর্ববেদ বলেছেন, মানুষ প্রত্যক্ষত যা পরমার্থত তার চেয়ে বেশি, সে আছে অসীম উদ্‌বৃত্তের মধ্যে। সেই উদ্‌বৃত্তেই মানুষের যা কিছু শ্রেষ্ঠ, তার ঋতং সত্যং তপো রাষ্ট্রং শ্রমো ধর্মশ্চ কর্ম চ।

স্থূলদ্রব্যময়ী এই পৃথিবী। তাকে বহুদূর অতিক্রম করে গেছে তার বায়ুমণ্ডল। সেই অদৃশ্য বায়ুলোকের ভিতর দিয়ে আসছে তার আলো, তার বর্ণচ্ছটা, বইছে তার প্রাণ, এরই উপর জমছে তার মেঘ, ঝরছে তার বারিধারা, এইখানকার প্রেরণাতেই তার অঙ্গে অঙ্গে রূপধারণ করছে পরমরহস্যময় সৌন্দর্য— এইখান থেকেই আসছে পৃথিবীর যা শ্রেষ্ঠ, পৃথিবীর শ্রী, পৃথিবীর প্রাণ। এই বায়ুমণ্ডলেই পৃথিবীর সেই জানালা খোলা রয়েছে যেখানে নক্ষত্রলোক থেকে অন্ধকার পেরিয়ে প্রতি রাত্রে দূত আসছে আত্মীয়তার জ্যোতির্ময় বার্তা নিয়ে। এই তার প্রসারিত বায়ুমণ্ডলকেই বলা যেতে পারে পৃথিবীর উদ্‌বৃত্ত ভাগের আত্মা, যেমন পূর্ণ মানুষকে বলা হয়েছে, ত্রিপাদস্যামৃতম্ —তাঁর এক অংশ প্রত্যক্ষ, বাকি তিন অংশ অমৃতরূপে তাঁকে ছাড়িয়ে আছে ঊর্ধ্বে।

এই সূক্ষ্মবায়ুলোক ভূলোকের একান্ত আপনারই বলে সম্ভব হয়েছে পৃথিবীর ধূলিস্তরে এত বিচিত্র ঐশ্বর্যবিস্তার যার মূল্য ধূলির মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি।

উপনিষদ বলেন, অসম্ভূতি ও সম্ভূতিকে এক করে জানলেই তবে সত্য জানা হয়। অসম্ভূতি যা অসীমে অব্যক্ত, সম্ভূতি যা দেশে কালে অভিব্যক্ত। এই সীমায় অসীমে মিলে মানুষের সত্য সম্পূর্ণ। মানুষের মধ্যে যিনি অসীম তাঁকে সীমার মধ্যে জীবনে সমাজে ব্যক্ত করে তুলতে হবে। অসীম সত্যকে বাস্তব সত্য করতে হবে। তা করতে গেলে কর্ম চাই। ঈশোপনিষদ তাই বলেন, "শত বৎসর তোমাকে বাঁচতে হবে, কর্ম তোমার না করলে নয়।" শত বৎসর বাঁচাকে সার্থক করো কর্মে— এমনতরো কর্মে যাতে প্রত্যয়ের সঙ্গে, প্রমাণের সঙ্গে, বলতে পারা যায় সোঽহম্। এ নয় যে, চোখ উলটিয়ে, নিশ্বাস বন্ধ করে বসে থাকতে হবে মানুষের থেকে দূরে। অসীম উদ্‌বৃত্ত থেকে মানুষের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠতা সঞ্চারিত হচ্ছে সে কেবল সত্যং ঋতং নয়, তার সঙ্গে আছে রাষ্ট্রং শ্রমো ধর্মশ্চ কর্ম চ ভূতং ভবিষ্যৎ। এই-যে কর্ম, এই-যে শ্রম, যা জীবিকার জন্যে নয়, এর নিরন্তর উদ্যম কোন্ সত্যে। কিসের জোরে মানুষ প্রাণকে করছে তুচ্ছ, দুঃখকে করছে বরণ, অন্যায়ের দুর্দান্ত প্রতাপকে উপেক্ষা করছে বিনা উপকরণে, বুক পেতে নিচ্ছে অবিচারের দুঃসহ মৃত্যুশেল। তার কারণ, মানুষের মধ্যে শুধু কেবল তার প্রাণ নেই, আছে তার মহিমা। সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষেরই মাথা তুলে বলবার অধিকার আছে, সোঽহম্। সেই অধিকার জাতিবর্ণনির্বিচারে সকল মানুষেরই। ক্ষিতিমোহনের অমূল্য সংগ্রহ থেকে বাউলের এই বাণী পাই—

জীবে জীবে চাইয়া দেখি সবই যে তার অবতার,
ও তুই নূতন লীলা কী দেখাবি যার নিত্যলীলা চমৎকার।

প্রতিদিনই মানব-সমাজে এই লীলা। অসংখ্য মানুষ জ্ঞানে প্রেমে ত্যাগে নানা আকারেই অপরিমেয়কে প্রকাশ করছে। ইতিহাসে তাদের নাম ওঠে না, আপন প্রাণ থেকে মানুষের প্রাণপ্রবাহে তারা ঢেলে দিয়ে যায় তাঁরই অমিততেজ যশ্চায়মস্মিন্ তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বানুভূঃ— যিনি এই আত্মার মধ্যেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, যিনি সমস্তই অনুভব করেন, যেমন আকাশব্যাপী তেজকে উদ্ভিদ আপন প্রাণের সামগ্রী করে নিয়ে পৃথিবীর প্রাণলোকে উৎসর্গ করে।

উদ্ভিদের ভিতর দিয়ে বিশ্বতেজ যদি প্রাণবস্তুতে নিয়ত পরিণত না হতে পারত তা হলে জীবলোক যেমন মরুশয্যাশায়ী হত, তেমনি আমাদের গোচরে-অগোচরে দেশে দেশে কালে-কালে নরনারী নিজের অন্তরস্থিত পরমপুরুষের অমিততেজ যদি কল্যাণে ও প্রেমে, জ্ঞানে ও কর্মে, নিরন্তর সমাজের প্রাণবস্তুতে পরিণত না করত, তা হলে সমাজ

সোঽহংতত্ত্ববর্জিত হয়ে পশুলোকের সাথে এক হয়ে যেত। তাও নয়, আপন সত্য হতে স্খলিত হয়ে বাঁচতেই পারত না। ডাক্তার বলেন, মানুষের দেহে পশুরক্ত সঞ্চার করলে তাতে তার প্রাণবৃদ্ধি না হয়ে প্রাণনাশ হয়। পশুসমাজ পশুভাবেই চিরদিন বাঁচতে পারে, মানুষের সমাজ পশু হয়ে বাঁচতেই পারে না। তার্কিক বলবে, নরলোকে তো অনেক পশু আরামেই বেড়ে ওঠে। শরীরে ফোড়াও তো বাড়ে। আশপাশের চেয়ে তার উন্নতি বেশি বই কম নয়। সমস্ত দেহে স্বাস্থ্যের গৌরব সেই ফোড়াকে যদি ছাড়িয়ে না যায় তা হলে সে মারে এবং মেরে মরে। প্রকৃতিস্থ সমাজ অনেক পাপ সইতে পারে, কিন্তু যখন তার বিকৃতিটাই হয়ে ওঠে প্রধান তখন চিন্তায় ব্যবহারে সাহিত্যে শিল্পকলায় পশুরক্তস্রোত আত্মস্থ করে সমাজ বেশিদিন বাঁচতেই পারে না। বিলাসোন্মত্ত রোম কি আপন ঐশ্বর্যের মধ্যেই পাকা ফলে কীটের মতো মরে নি। কালিদাস রঘুবংশের যে পতনের ছবি দিয়েছেন সে কি মানুষের জীবনে পশুপ্রবেশের ফলেই না।

অথর্ববেদে শুধু কেবল সত্য ও ঋতের কথা নেই, আছে রাষ্ট্রের কথাও। জনসংঘের শ্রেষ্ঠ রূপ প্রকাশ করবার জন্যে তার রাষ্ট্র। ছোটো টবের বাইরে বনস্পতি যদি তার হাজার শিকড় মেলতে না পারে তা হলে সে বেঁটে হয়ে, কাঠি হয়ে থাকে। রাষ্ট্রের প্রশস্ত ভূমি না পেলে জনসমূহ পৌরুষবর্জিত হয়ে থাকে। আপনার মধ্যে যে ভূমাকে প্রমাণ করবার দায়িত্ব মানুষের, সমস্ত জাতি বৃহৎ জীবনযাত্রায় তার থেকে বঞ্চিত হলে ইতিহাসে ধিক্‌কৃত হয়। সকলের মাঝখানে সকল কালের সম্মুখে উঠে দাঁড়িয়ে সে বলতে পারে না "সোঽহম্‌", বলতে পারে না "আমি আছি আমার মহিমায়, যে আমি কেবল আজকের দিনের জন্য নয়, যার আত্মঘোষণা ভাবীকালের তোরণে তোরণে ধ্বনিত হতে থাকবে"। ইতিহাসের সেই ধিক্‌কার বহুকালের সুপ্তিমগ্ন এসিয়া-মহাদেশের বক্ষে দিয়েছে আজ আঘাত; সকল দিকেই শুনছি জনগণের অন্তর্যামী মহান পুরুষ তামসিকতার বন্দীশালায় শৃঙ্খলে দিয়েছেন ঝংকার, তাঁর প্রকাশের তপোদীপ্তি জ্বলে উঠেছে তমসঃ পরস্তাৎ। রব উঠেছে, শৃণ্বন্তু বিশ্বে— শোনো বিশ্বজন, তাঁর আহ্বান শোনো, যে আহ্বানে ভয় যায় ছুটে, স্বার্থ হয় লজ্জিত, মৃত্যুঞ্জয় শঙ্খধ্বনি করে ওঠেন মৃত্যুদুঃখবন্ধুর অমৃতের পথে।

ভূমা থেকে উৎশিষ্ট যে শ্রেষ্ঠতার কথা অথর্ববেদ বলেছেন সে কোনো একটিমাত্র বিশেষ সিদ্ধিতে নয়। মানুষের সকল তপস্যাই তার মধ্যে, মানুষের বীর্যং লক্ষ্মীর্বলং সমস্ত তার অন্তর্গত। মনুষ্যত্বের বহুধা বৈচিত্র্যকে একটিমাত্র বিন্দুতে সংহত করে নিশ্চল করলে হয়তো তার আত্মভোলা একটা আনন্দ আছে। কিন্তু, ততঃ কিম। কী

হবে সে আনন্দে। সে আনন্দকে বলব না শ্রেয়, বলব না চরম সত্য। সমস্ত মানব-সংসারে যতক্ষণ দুঃখ আছে, অভাব আছে, অপমান আছে, ততক্ষণ কোনো একটিমাত্র মানুষ নিষ্কৃতি পেতে পারে না। একটিমাত্র প্রদীপ অন্ধকারে একটুমাত্র ছিদ্র করলে তাতে রাত্রির ক্ষয় হয় না, সমস্ত অন্ধকারের অপসারণে রাত্রির অবসান। সেইজন্যে মানুষের মুক্তি যে মহাপুরুষেরা কামনা করেছেন তাঁদেরই বাণী "সম্ভবামি যুগে যুগে"। যুগে যুগেই তো জন্মাচ্ছেন তাঁরা দেশে দেশে। আজও এই মুহূর্তেই জন্মেছেন, কালও জন্মাবেন। সেই জন্মের ধারা চলেছে ইতিহাসের মধ্য দিয়ে, এই বাণী বহন করে—সোঽহম্। I and my Father are one.

সোঽহম্ মন্ত্র মুখে আউড়িয়ে তুমি দুরাশা কর কর্ম থেকে ছুটি নিতে! সমস্ত পৃথিবী রইল পড়ে, তুমি একা যাবে দায় এড়িয়ে! যে ভীরু চোখ বুজে মনে করে "পালিয়েছি" সে কি সত্যই পালিয়েছে। সোঽহম্ সমস্ত মানুষের সম্মিলিত অভিব্যক্তির মন্ত্র, কেবল একজনের না। ব্যক্তিগত শক্তিতে নিজে কেউ যতটুকু মুক্ত হচ্ছে সেই মুক্তি তার নিরর্থক যতক্ষণ সে তা সকলকে না দিতে পারে। বুদ্ধদেব আপনার মুক্তিতেই সত্যই যদি মুক্ত হতেন, তা হলে একজন মানুষের জন্যেও তিনি কিছুই করতেন না। দীর্ঘজীবন ধরে তাঁর তো কর্মের অন্ত ছিল না। দৈহিক প্রাণ নিয়ে তিনি যদি আজ পর্যন্ত বেঁচে থাকতেন তা হলে আজ পর্যন্তই তাঁকে কাজ করতে হত আমাদের সকলের চেয়ে বেশি। কেননা, যাঁরা মহাত্মা তাঁরা বিশ্বকর্মা।

নীহারিকার মহাক্ষেত্রে যেখানে জ্যোতিষ্ক সৃষ্টি হচ্ছে সেখানে মাঝে মাঝে এক-একটি তারা দেখা যায়; তারা স্পষ্ট জানিয়ে দেয় সমস্ত নীহারিকার বিরাট অন্তরে সৃষ্টি-হোমহুতাশনের উদ্দীপনা। তেমনি মানুষের ইতিহাসের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে মহাপুরুষদের দেখি। তাঁদের থেকে এই কথাই বুঝি যে, সমস্ত মানুষের অন্তরেই কাজ করছে অভিব্যক্তির প্রেরণা। সে ভূমার অভিব্যক্তি। জীবমানব কেবলই তার অহং-আবরণ মোচন করে আপনাকে উপলব্ধি করতে চাচ্ছে বিশ্বমানবে। বস্তুত, সমস্ত পৃথিবীরই অভিব্যক্তি আপন সত্যকে খুঁজছে সেইখানে, এই বিশ্বপৃথিবীর চরম সত্য সেই মহামানবে। পৃথিবীর আরম্ভকালের লক্ষ লক্ষ যুগের পরে মানুষের সূচনা। সেই সাংখ্যিক তথ্য মনে নিয়ে কালের ও আয়তনের পরিমাণে মানুষের ক্ষুদ্রতা বিচার করে কোনো কোনো পণ্ডিত অভিভূত হয়ে পড়েন। পরিমাণকে অপরিমেয় সত্যের চেয়ে বড়ো করা একটা মোহ মাত্র। যাকে আমরা জড় বলি সেই অব্যক্ত প্রাণ বহু কোটি কোটি বৎসর সুপ্ত ছিল। কিন্তু, একটিমাত্র প্রাণকণা যেদিন এই পৃথিবীতে দেখা দিল সেইদিনই জগতের অভিব্যক্তি তার একটি মহৎ অর্থে এসে পৌঁছল। জড়ের বাহ্যিক

সত্তার মধ্যে দেখা দিল একটি আন্তরিক সত্য। প্রাণ আন্তরিক। যেহেতু সেই প্রাণকণা জড়পুঞ্জের তুলনায় দৃশ্যত অতি ক্ষুদ্র এবং যেহেতু সুদীর্ঘকালের এক প্রান্তে তার সদ্য জন্ম, তাই তাকে হেয় করবে কে। মূকতার মধ্যে এই-যে অর্থ অবারিত হল তার থেকে মানুষ বিরাট প্রাণের রূপ দেখলে; বললে, যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্। যা-কিছু সমস্তই প্রাণ থেকে নিঃসৃত হয়ে প্রাণে কম্পিত হচ্ছে। আমরা জড়কে তথ্যরূপে জানি, কেননা সে যে বাইরের। কিন্তু, প্রাণকে আমাদের অন্তর থেকে জানি সত্যরূপে। প্রাণের ক্রিয়া অন্তরে অন্তরে— তার সমস্তটাই গতি। তাই চলার একটিমাত্র ভাষা আমাদের কাছে অব্যবহিত, সে আমাদের প্রাণের ভাষা। চলা ব্যাপারকে অন্তর থেকে সত্য করে চিনেছি নিজেরই মধ্যে। বিশ্বে অবিশ্রাম চলার যে উদ্যম তাকে উত্তাপই বলি, বিদ্যুৎই বলি, সে কেবল একটা কথা মাত্র। যদি বলি, এই চলার মধ্যে আছে প্রাণ, তা হলে এমন-কিছু বলা হয় আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে যার অর্থ আছে। সেই সঙ্গে এও বুঝি, আমার প্রাণ যে চলছে সেও ঐ বিশ্বপ্রাণের চলার মধ্যেই। প্রাণগতির এই উদ্যম নিখিলে কোথাও নেই, কেবল আকস্মিকভাবে আছে প্রাণীতে— এমন খাপছাড়া কথা আমাদের মন মানতে চায় না, যে মন সমগ্রতার ভূমিকায় সত্যকে শ্রদ্ধা জানায়।

উপনিষদ বলেছেন, কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। একটা কীটও প্রাণের ইচ্ছা করত কিসের জোরে, যদি প্রাণের আনন্দ সমস্ত আকাশে না থাকত। দেশালাইয়ের মুখে একটি শিখা এক মুহূর্তের জন্যেও জ্বলে কী করে, যদি সমস্ত আকাশে তার সত্য ব্যাপ্ত না থাকে। প্রাণের মধ্যে সমস্ত সৃষ্টির একটি অন্তরতর অর্থ পাওয়া গেল, সেই অর্থকে বলি ইচ্ছা। জড় মূক হয়ে ছিল, এই ইচ্ছার ভাষা জানাতে পারে নি; প্রাণ এসে ইচ্ছার বার্তা প্রকাশ করলে। যে বার্তা গভীরে নিহিত ছিল তাই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

ছাত্র বহুদিন বহু প্রয়াসে অক্ষর শিখল, বানান শিখল, ব্যাকরণ শিখল, অনেক কাগজে অনেক আঁকাবাঁকা অসম্পূর্ণ নিরর্থক লেখা শিখল, উপকরণ ব্যবহার করল ও বর্জন করল বিস্তর; অবশেষে কবিরূপে যে মুহূর্তে সে তার প্রথম কবিতাটি লিখতে পেরেছে সেই মুহূর্তে ঐ একটি লেখায় এতদিনকার পুঞ্জ পুঞ্জ বাক্যহীন উপকরণের প্রথম অর্থটুকু দেখা দিল। জগতের বিপুল অভিব্যক্তিতে প্রথম অর্থ দেখলুম প্রাণকণায়, তার পরে জন্তুতে, তার পরে মানুষে। বাহির থেকে অন্তরের দিকে একে একে মুক্তির দ্বার খুলে যেতে লাগল। মানুষে এসে যখন ঠেকল তখন যবনিকা উঠতেই জীবকে দেখলুম তার ভূমায়। দেখলুম রহস্যময় যোগের তত্ত্বকে, পরম ঐক্যকে। মানুষ বলতে

পারলে, যাঁরা সত্যকে জানেন তাঁরা সর্বমেবাবিশন্তি— সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেন।

আলোকেরই মতো মানুষের চৈতন্য মহাবিকিরণের দিকে চলেছে জ্ঞানে কর্মে ভাবে। সেই প্রসারণের দিকে দেখি তার মহৎকে, দেখি মহামানবকে, দেখি যশ্চায়মস্মিন্ আত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বানুভূঃ এবং শুভকামনায় হৃদয়কে সর্বত্র এই বলে ব্যাপ্ত করতে পারি—

সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু, অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্‌ঝা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু। সব্বে সত্তা দুক্‌খা পমুঞ্চন্তু। সব্বে সত্তা মা যথালদ্ধসম্পত্তিতো বিগচ্ছন্তু।

সকল জীব সুখিত হোক, নিঃশত্রু হোক, অবধ্য হোক, সুখী হয়ে কালহরণ করুক। সকল জীব দুঃখ হতে প্রমুক্ত হোক, সকল জীব যথালব্ধ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত না হোক।

সেই সঙ্গে এও বলতে পারি, দুঃখ আসে তো আসুক, মৃত্যু হয় তো হোক, ক্ষতি ঘটে তো ঘটুক— মানুষ আপন মহিমা থেকে বঞ্চিত না হোক, সমস্ত দেশকালকে ধ্বনিত করে বলতে পারুক "সোঽহম্"।

পরিশিষ্ট

মানবসত্য

আমাদের জন্মভূমি তিনটি, তিনটিই একত্র জড়িত। প্রথম পৃথিবী। মানুষের বাসস্থান পৃথিবীর সর্বত্র। শীতপ্রধান তুষারাদ্রি, উত্তপ্ত বালুকাময় মরু, উৎতুঙ্গ দুর্গম গিরিশ্রেণী, আর এই বাংলার মতো সমতলভূমি, সর্বত্রই মানুষের স্থিতি। মানুষের বস্তুত বাসস্থান এক। ভিন্ন ভিন্ন জাতির নয়, সমগ্র মানুষজাতির। মানুষের কাছে পৃথিবীর কোনো অংশ দুর্গম নয়। পৃথিবী তার কাছে হৃদয় অবারিত করে দিয়েছে।

মানুষের দ্বিতীয় বাসস্থান স্মৃতিলোক। অতীতকাল থেকে পূর্বপুরুষদের কাহিনী নিয়ে কালের নীড় সে তৈরি করেছে। এই কালের নীড় স্মৃতির দ্বারা রচিত, গ্রথিত। এ শুধু এক-একটা বিশেষ জাতির কথা নয়, সমস্ত মানুষজাতির কথা। স্মৃতিলোকে সকল মানুষের মিলন। বিশ্বমানবের বাসস্থান— এক দিকে পৃথিবী, আর-এক দিকে সমস্ত মানুষের স্মৃতিলোক। মানুষ জন্মগ্রহণ করে সমস্ত পৃথিবীতে, জন্মগ্রহণ করে নিখিল ইতিহাসে।

তার তৃতীয় বাসস্থান আত্মিক লোক। সেটাকে বলা যেতে পারে সর্বমানবচিত্তের মহাদেশ। অন্তরে অন্তরে সকল মানুষের যোগের ক্ষেত্র এই চিত্তলোক। কারো চিত্ত হয়তো বা সংকীর্ণ বেড়া দিয়ে ঘেরা, কারো বা বিকৃতির দ্বারা বিপরীত। কিন্তু, একটি ব্যাপক চিত্ত আছে যা ব্যক্তিগত নয়, বিশ্বগত। সেটির পরিচয় অকস্মাৎ পাই। একদিন আহ্বান আসে। অকস্মাৎ মানুষ সত্যের জন্যে প্রাণ দিতে উৎসুক হয়। সাধারণ লোকের মধ্যেও দেখা যায়, যখন সে স্বার্থ ভোলে, যেখানে সে ভালোবাসে, নিজের ক্ষতি করে ফেলে, তখন বুঝি, মনের মধ্যে একটা দিক আছে যেটা সর্বমানবের চিত্তের দিকে।

বিশেষ প্রয়োজনে ঘরের সীমায় খণ্ডাকাশ বদ্ধ, কিন্তু মহাকাশের সঙ্গে তার সত্যকার যোগ। ব্যক্তিগত মন আপন বিশেষ প্রয়োজনের সীমায় সংকীর্ণ হলেও তার সত্যকার বিস্তার সর্বমানবচিত্তে। সেইখানকার প্রকাশ আশ্চর্যজনক। একজন কেউ জলে পড়ে গেছে, আর-একজন জলে ঝাঁপ দিলে তাকে বাঁচাবার জন্যে। অন্যের প্রাণরক্ষার জন্যে নিজের প্রাণ সংকটাপন্ন করা। নিজের সত্তাই যার একান্ত সে বলবে, আপনি বাঁচলে বাপের নাম। কিন্তু, আপনি বাঁচাকে সব চেয়ে বড়ো বাঁচা বললে না, এমনও দেখা গেল। তার কারণ, সর্বমানবসত্তা পরস্পর যোগযুক্ত।

আমার জন্ম যে পরিবারে সে পরিবারের ধর্মসাধন একটি বিশেষ ভাবের। উপনিষদ এবং পিতৃদেবের অভিজ্ঞতা, রামমোহন এবং আর-আর সাধকদের সাধনাই আমাদের পারিবারিক সাধনা। আমি পিতার কনিষ্ঠ পুত্র। জাতকর্ম থেকে আরম্ভ করে আমার সব সংস্কারই বৈদিক মন্ত্র-দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, অবশ্য ব্রাহ্মমতের সঙ্গে মিলিয়ে। আমি ইস্কুল-পালানো ছেলে। যেখানেই গণ্ডী দেওয়া হয়েছে সেখানেই আমি বনিবনাও করতে পারি নি কখনো। যে অভ্যাস বাইরে থেকে চাপানো তা আমি গ্রহণ করতে অক্ষম। কিন্তু, পিতৃদেব সেজন্যে কখনো ভর্ৎসনা করতেন না। তিনি নিজেই স্বাধীনতা অবলম্বন করে পৈতামহিক সংস্কার ত্যাগ করেছিলেন। গভীরতর জীবনতত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করার স্বাধীনতা আমারও ছিল। এ কথা স্বীকার করতেই হবে, আমার এই স্বাতন্ত্র্যের জন্যে কখনো কখনো তিনি বেদনা পেয়েছেন। কিছু বলেন নি।

বাল্যে উপনিষদের অনেক অংশ বারবার আবৃত্তি-দ্বারা আমার কণ্ঠস্থ ছিল। সব-কিছু গ্রহণ করতে পারি নি সকল মন দিয়ে। শ্রদ্ধা ছিল, শক্তি ছিল না হয়তো। এমন সময় উপনয়ন হল। উপনয়নের সময় গায়ত্রীমন্ত্র দেওয়া হয়েছিল। কেবলমাত্র মুখস্থভাবে না; বারংবার সুস্পষ্ট উচ্চারণ করে আবৃত্তি করেছি এবং পিতার কাছে গায়ত্রীমন্ত্রের ধ্যানের অর্থ পেয়েছি। তখন আমার বয়স বারো বৎসর হবে। এই মন্ত্র চিন্তা করতে করতে মনে হত, বিশ্বভুবনের অস্তিত্ব আর আমার অস্তিত্ব একাত্মক। ভূর্ভুবঃ স্বঃ— এই ভূলোক, অন্তরীক্ষ, আমি তারই সঙ্গে অখণ্ড। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি-অন্তে যিনি আছেন তিনিই আমাদের মনে চৈতন্য প্রেরণ করছেন। চৈতন্য ও বিশ্ব, বাহিরে ও অন্তরে সৃষ্টির এই দুই ধারা এক ধারায় মিলছে।

এমনি করে ধ্যানের দ্বারা যাঁকে উপলব্ধি করছি তিনি বিশ্বাত্মাতে আমার আত্মাতে চৈতন্যের যোগে যুক্ত। এইরকম চিন্তার আনন্দে আমার মনের মধ্যে একটা জ্যোতি এনে দিলে। এ আমার সুস্পষ্ট মনে আছে।

যখন বয়স হয়েছে, হয়তো আঠারো কি উনিশ হবে, বা বিশও হতে পারে, তখন চৌরঙ্গিতে ছিলুম দাদার সঙ্গে। এমন দাদা কেউ কখনো পায় নি। তিনি ছিলেন একাধারে বন্ধু, ভাই, সহযোগী।

তখন প্রত্যুষে ওঠা প্রথা ছিল। আমার পিতাও খুব প্রত্যুষে উঠতেন। মনে আছে, একবার ডালহৌসি পাহাড়ে পিতার সঙ্গে ছিলুম। সেখানে প্রচণ্ড শীত। সেই শীতে ভোরে আলো-হাতে এসে আমাকে শয্যা থেকে উঠিয়ে দিতেন। সেই ভোরে উঠে একদিন চৌরঙ্গির বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলুম। তখন ওখানে ফ্রি ইস্কুল বলে একটা

ইস্কুল ছিল। রাস্তাটা পেরিয়েই ইস্কুলের হাতাটা দেখা যেত। সে দিকে চেয়ে দেখলুম, গাছের আড়ালে সূর্য উঠছে। যেমনি সূর্যের আবির্ভাব হল গাছের অন্তরালের থেকে, অমনি মনের পর্দা খুলে গেল। মনে হল, মানুষ আজন্ম একটা আবরণ নিয়ে থাকে। সেটাতেই তার স্বাতন্ত্র্য। স্বাতন্ত্র্যের বেড়া লুপ্ত হলে সাংসারিক প্রয়োজনের অনেক অসুবিধা। কিন্তু, সেদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার আবরণ খসে পড়ল। মনে হল, সত্যকে মুক্ত দৃষ্টিতে দেখলুম। মানুষের অন্তরাত্মাকে দেখলুম। দুজন মুটে কাঁধে হাত দিয়ে হাসতে হাসতে চলেছে। তাদের দেখে মনে হল, কী অনির্বচনীয় সুন্দর। মনে হল না, তারা মুটে। সেদিন তাদের অন্তরাত্মাকে দেখলুম, যেখানে আছে চিরকালের মানুষ।

সুন্দর কাকে বলি। বাইরে যা অকিঞ্চিৎকর, যখন দেখি তার আন্তরিক অর্থ তখন দেখি সুন্দরকে। একটি গোলাপফুল বাছুরের কাছে সুন্দর নয়। মানুষের কাছে সে সুন্দর— যে মানুষ তার কেবল পাপড়ি না, বোঁটা না, একটা সমগ্র আন্তরিক সার্থকতা পেয়েছে। পাবনার গ্রামবাসী কবি যখন প্রতিকূল প্রণয়িনীর মানভঞ্জনের জন্যে 'ট্যাহা দামের মোটরি' আনার প্রস্তাব করেন তখন মোটরির দাম এক টাকার চেয়ে অনেক বেড়ে যায়। এই মোটরি বা গোলাপের আন্তরিক অর্থটি যখন দেখতে পাই তখনই সে সুন্দর। সেদিন তাই আশ্চর্য হয়ে গেলুম। দেখলুম, সমস্ত সৃষ্টি অপরূপ। আমার এক বন্ধু ছিল, সে সুবুদ্ধির জন্যে বিশেষ বিখ্যাত ছিল না। তার সুবুদ্ধির একটু পরিচয় দিই। একদিন সে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "আচ্ছা, ঈশ্বরকে দেখেছ?" আমি বললুম, "না, দেখি নি তো।" সে বললে, "আমি দেখেছি।" জিজ্ঞাসা করলুম, "কিরকম।" সে উত্তর করলে, "কেন? এই-যে চোখের কাছে বিজ্‌ বিজ্‌ করছে।" সে এলে ভাবতুম, বিরক্ত করতে এসেছে। সেদিন তাকেও ভালো লাগল। তাকে নিজেই ডাকলুম। সেদিন মনে হল, তার নির্বুদ্ধিতাটা আকস্মিক, সেটা তার চরম ও চিরন্তন সত্য নয়। তাকে ডেকে সেদিন আনন্দ পেলুম। সেদিন সে 'অমুক' নয়। আমি যার অন্তর্গত সেও সেই মানবলোকের অন্তর্গত। তখন মনে হল, এই মুক্তি। এই অবস্থায় চার দিন ছিলুম। চার দিন জগৎকে সত্যভাবে দেখেছি। তার পর জ্যোতিদা বললেন, "দার্জিলিঙ চলো।" সেখানে গিয়ে আবার পর্দা পড়ে গেল। আবার সেই অকিঞ্চিৎকরতা, সেই প্রাত্যহিকতা। কিন্তু, তার পূর্বে কয়দিন সকলের মাঝে যাঁকে দেখা গেল তাঁর সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত আর সংশয় রইল না। তিনি সেই অখণ্ড মানুষ যিনি মানুষের ভূত-ভবিষ্যতের মধ্যে পরিব্যাপ্ত— যিনি অরূপ, কিন্তু সকল মানুষের রূপের মধ্যে যাঁর অন্তরতম আবির্ভাব।

২

সেই সময়ে এই আমার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা যাকে আধ্যাত্মিক নাম দেওয়া যেতে পারে। ঠিক সেই সময়ে বা তার অব্যবহিত পরে যে ভাবে আমাকে আবিষ্ট করেছিল তার স্পষ্ট ছবি দেখা যায় আমার সেই সময়কার কবিতাতে— প্রভাত-সংগীতের মধ্যে। তখন স্বতই যে ভাব আপনাকে প্রকাশ করেছে তাই ধরা পড়েছে প্রভাতসংগীতে। পরবর্তীকালে চিন্তা করে লিখলে তার উপর ততটা নির্ভর করা যেত না। গোড়াতেই বলে রাখা ভালো, প্রভাতসংগীত থেকে যে কবিতা শোনাব তা কেবল তখনকার ছবিকে স্পষ্ট দেখাবার জন্যে, কাব্যহিসাবে তার মূল্য অত্যন্ত সামান্য। আমার কাছে এর একমাত্র মূল্য এই যে, তখনকার কালে আমার মনে যে একটা আনন্দের উচ্ছ্বাস এসেছিল তা এতে ব্যক্ত হয়েছে। তার ভাব অসংলগ্ন, ভাষা কাঁচা, যেন হাৎড়ে হাৎড়ে বলবার চেষ্টা। কিন্তু, 'চেষ্টা' বললেও ঠিক হবে না, বস্তুত চেষ্টা নেই তাতে, অস্ফুটবাক্ মন বিনা চেষ্টায় যেমন করে পারে ভাবকে ব্যক্ত করেছে, সাহিত্যের আদর্শ থেকে বিচার করলে স্থান পাওয়ার যোগ্য সে মোটেই নয়।

যে কবিতাগুলো পড়ব তা একটু কুণ্ঠিতভাবেই শোনাব, উৎসাহের সঙ্গে নয়। প্রথম দিনেই যা লিখেছি সেই কবিতাটাই আগে পড়ি। অবশ্য, ঠিক প্রথম দিনেরই লেখা কি না, আমার পক্ষে জোর করে বলা শক্ত। রচনার কাল সম্বন্ধে আমার উপর নির্ভর করা চলে না ; আমার কাব্যের ঐতিহাসিক যাঁরা তাঁরা সে কথা ভালো জানেন। হৃদয় যখন উদ্‌বেল হয়ে উঠেছিল আশ্চর্য ভাবোচ্ছ্বাসে, এ হচ্ছে তখনকার লেখা। একে এখনকার অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। আমি বলেছি, আমাদের এক দিক অহং আর-একটা দিক আত্মা। অহং যেন খণ্ডাকাশ, ঘরের মধ্যেকার আকাশ, যা নিয়ে বিষয়কর্ম মামলা-মকদ্দমা এই-সব। সেই আকাশের সঙ্গে যুক্ত মহাকাশ, তা নিয়ে বৈষয়িকতা নেই ; সেই আকাশ অসীম, বিশ্বব্যাপী। বিশ্বব্যাপী আকাশে ও খণ্ডাকাশে যে ভেদ, অহং আর আত্মার মধ্যেও সেই ভেদ। মানবত্ব বলতে যে বিরাট পুরুষ তিনি আমার খণ্ডাকাশের মধ্যেও আছেন। আমারই মধ্যে দুটো দিক আছে— এক আমাতেই বদ্ধ, আর-এক সর্বত্র ব্যাপ্ত। এই দুই'ই যুক্ত এবং এই উভয়কে মিলিয়েই আমার পরিপূর্ণ সত্তা। তাই বলেছি, যখন আমরা অহংকে একান্তভাবে আঁকড়ে ধরি তখন আমরা মানবধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ি। সেই মহামানব, সেই বিরাটপুরুষ যিনি আমার মধ্যে রয়েছেন, তাঁর সঙ্গে তখন ঘটে বিচ্ছেদ।

জাগিয়া দেখিনু আমি আঁধারে রয়েছি আঁধা,
আপনারি মাঝে আমি আপনি রয়েছি বাঁধা।
রয়েছি মগন হয়ে আপনারি কলস্বরে,
ফিরে আসে প্রতিধ্বনি নিজেরি শ্রবণ-'পরে।

এইটেই হচ্ছে অহং, আপনাতে আবদ্ধ, অসীম থেকে বিচ্যুত হয়ে, অন্ধ হয়ে থাকে অন্ধকারের মধ্যে। তারই মধ্যে ছিলুম, এটা অনুভব করলুম। সে যেন একটা স্বপ্নদশা।

গভীর— গভীর গুহা, গভীর আঁধার ঘোর,
গভীর ঘুমন্ত প্রাণ একেলা গাহিছে গান,
মিশিছে স্বপনগীতি বিজন হৃদয়ে মোর।

নিদ্রার মধ্যে স্বপ্নের যে-লীলা সত্যের যোগ নেই তার সঙ্গে। অমূলক, মিথ্যা, নানা নাম দিই তাকে। অহং-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ যে জীবন সেটা মিথ্যা। নানা অতিকৃতি দুঃখ ক্ষতি সব জড়িয়ে আছে তাতে। অহং যখন জেগে উঠে আত্মাকে উপলব্ধি করে তখন সে নূতন জীবন লাভ করে। এক সময়ে সেই অহং-এর খেলাঘরের মধ্যে বন্দী ছিলুম। এমনি করে নিজের কাছে নিজের প্রাণ নিয়েই ছিলুম, বৃহৎ সত্যের রূপ দেখি নি।

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাতপাখির গান!
না জানি কেন রে এত দিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ!
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি।

এটা হচ্ছে সেদিনকার কথা যেদিন অন্ধকার থেকে আলো এল বাইরের, অসীমের। সেদিন চেতনা নিজেকে ছাড়িয়ে ভূমার মধ্যে প্রবেশ করল। সেদিন কারার দ্বার খুলে বেরিয়ে পড়বার জন্যে, জীবনের সকল বিচিত্র লীলার সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে প্রবাহিত হবার জন্যে অন্তরের মধ্যে তীব্র ব্যাকুলতা। সেই প্রবাহের গতি মহান বিরাট সমুদ্রের

দিকে। তাকেই এখন বলেছি বিরাটপুরুষ। সেই-যে মহামানব তারই মধ্যে গিয়ে নদী মিলবে, কিন্তু সকলের মধ্যে দিয়ে। এই-যে ডাক পড়ল, সূর্যের আলোতে জেগে মন ব্যাকুল হয়ে উঠল, এ আহ্বান কোথা থেকে। এর আকর্ষণ মহাসমুদ্রের দিকে, সমস্ত মানবের ভিতর দিয়ে, সংসারের ভিতর দিয়ে, ভোগ ত্যাগ কিছুই অস্বীকার করে নয়, সমস্ত স্পর্শ নিয়ে শেষে পড়ে এক জায়গায় যেখানে—

কী জানি কী হল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ,
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।
সেই সাগরের পানে হৃদয় ছুটিতে চায়,
তারি পদপ্রান্তে গিয়ে জীবন টুটিতে চায়।

সেখানে যাওয়ার একটা ব্যাকুলতা অন্তরে জেগেছিল। মানবধর্ম সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেছি, সংক্ষেপে এই তার ভূমিকা। এই মহাসমুদ্রকে এখন নাম দিয়েছি মহামানব। সমস্ত মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান নিয়ে তিনি সর্বজনের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর সঙ্গে গিয়ে মেলবারই এই ডাক।

এর দু-চার দিন পরেই লিখেছি 'প্রভাত-উৎসব'। একই কথা, আর-একটু স্পষ্ট করে লেখা—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি!
জগত আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
ধরায় আছে যত মানুষ শত শত
আসিছে প্রাণে মোর, হাসিছে গলাগলি।

এই তো সমস্তই মানুষের হৃদয়ের তরঙ্গলীলা। মানুষের মধ্যে স্নেহ-প্রেম-ভক্তির যে সম্বন্ধ সেটা তো আছেই। তাকে বিশেষ করে দেখা, বড়ো ভূমিকার মধ্যে দেখা, যার মধ্যে সে তার একটা ঐক্য, একটা তাৎপর্য লাভ করে। সেদিন যে-দুজন মুটের কথা বলেছি তাদের মধ্যে যে আনন্দ দেখলুম সে সখ্যের আনন্দ, অর্থাৎ এমন-কিছু যার উৎস সর্বজনীন সর্বকালীন চিত্তের গভীরে। সেইটে দেখেই খুশি হয়েছিলুম। আরো খুশি হয়েছিলুম এইজন্যে যে, যাদের মধ্যে ঐ আনন্দটা দেখলুম তাদের বরাবর চোখে পড়ে না, তাদের অকিঞ্চিৎকর বলেই দেখে এসেছি; যে মুহূর্তে তাদের মধ্যে বিশ্বব্যাপী প্রকাশ দেখলুম অমনি পরম সৌন্দর্যকে অনুভব করলুম। মানবসম্বন্ধের যে বিচিত্র রসলীলা, আনন্দ, অনির্বচনীয়তা, তা দেখলুম সেইদিন। সে দেখা বালকের কাঁচা লেখায় আকুবাকু করে নিজেকে প্রকাশ করেছে কোনোরকমে, পরিস্ফুট হয় নি। সে সময়ে আভাসে যা অনুভব করেছি তাই লিখেছি। আমি যে যা-খুশি গেয়েছি তা

নয়। এ গান দু দণ্ডের নয়, এর অবসান নেই। এর একটা ধারাবাহিকতা আছে, এর অনুবৃত্তি আছে মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে। আমার গানের সঙ্গে সকল মানুষের যোগ আছে। গান থামলেও সে যোগ ছিন্ন হয় না।

কাল গান ফুরাইবে, তা বলে গাবে না কেন
আজ যবে হয়েছে প্রভাত।
কিসের হরষ-কোলাহল,
শুধাই তোদের, তোরা বল্!
আনন্দ-মাঝারে সব উঠিতেছে ভেসে ভেসে,
আনন্দে হতেছে কভু লীন,
চাহিয়া ধরণী-পানে নব আনন্দের গানে
মনে পড়ে আর-এক দিন।

এই-যে বিরাট আনন্দের মধ্যে সব তরঙ্গিত হচ্ছে তা দেখি নি বহুদিন, সেদিন দেখলুম। মানুষের বিচিত্র সম্বন্ধের মধ্যে একটি আনন্দের রস আছে। সকলের মধ্যে এই-যে আনন্দের রস, তাকে নিয়ে মহারসের প্রকাশ। রসো বৈ সঃ। রসের খণ্ড খণ্ড প্রকাশের মধ্যে তাকে পাওয়া গিয়েছিল। সেই অনুভূতিকে প্রকাশের জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিলুম, কিন্তু ভালোরকম প্রকাশ করতে পারি নি। যা বলেছি অসম্পূর্ণভাবে বলেছি।

প্রভাতসংগীতের শেষের কবিতা—

আজ আমি কথা কহিব না।
আর আমি গান গাহিব না।
হেরো আজি ভোরবেলা এসেছে রে মেলা লোক,
ঘিরে আছে চারি দিকে,
চেয়ে আছে অনিমিখে,
হেরে মোর হাসিমুখ ভুলে গেছে দুখশোক।
আজ আমি গান গাহিব না।

এর থেকে বুঝতে পারা যাবে, মন তখন কী ভাবে আবিষ্ট হয়েছিল, কোন্ সত্যকে মন স্পর্শ করেছিল। যা-কিছু হচ্ছে সেই মহামানবে মিলছে, আবার ফিরেও আসছে সেখান থেকে প্রতিধ্বনিরূপে নানা রসে সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে। এটা উপলব্ধি হয়েছিল অনুভূতিরূপে, তত্ত্বরূপে নয়। সে সময় বালকের মন এই অনুভূতি-দ্বারা যেভাবে আন্দোলিত হয়েছিল তারই অসম্পূর্ণ প্রকাশ প্রভাতসংগীতের মধ্যে। সেদিন

অক্‌স্‌ফোর্ডে যা বলেছি তা চিন্তা করে বলা। অনুভূতি থেকে উদ্ধার করে অন্য তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে যুক্তির উপর খাড়া করে সেটা বলা। কিন্তু, তার আরম্ভ ছিল এখানে। তখন স্পষ্ট দেখেছি, জগতের তুচ্ছতার আবরণ খসে গিয়ে সত্য অপরূপ সৌন্দর্যে দেখা দিয়েছে। তার মধ্যে তর্কের কিছু নেই, সেই দেখাকে তখন সত্যরূপে জেনেছি। এখনো বাসনা আছে, হয়তো সমস্ত বিশ্বের আনন্দরূপকে কোনো-এক শুভমুহূর্তে আবার তেমনি পরিপূর্ণভাবে কখনো দেখতে পাব। এইটে যে একদিন বাল্যাবস্থায় সুস্পষ্ট দেখেছিলুম, সেইজন্যেই 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি' উপনিষদের এই বাণী আমার মুখে বারবার ধ্বনিত হয়েছে। সেদিন দেখেছিলুম, বিশ্ব স্থূল নয়, বিশ্বে এমন কোনো বস্তু নেই যার মধ্যে রসস্পর্শ নেই। যা প্রত্যক্ষ দেখেছি তা নিয়ে তর্ক কেন। স্থূল আবরণের মৃত্যু আছে, অন্তরতম আনন্দময় যে সত্তা তার মৃত্যু নেই।

৩

বর্ষার সময় খালটা থাকত জলে পূর্ণ। শুকনোর দিনে লোক চলত তার উপর দিয়ে। এ পারে ছিল একটা হাট, সেখানে বিচিত্র জনতা। দোতলার ঘর থেকে লোকালয়ের লীলা দেখতে ভালো লাগত। পদ্মায় আমার জীবনযাত্রা ছিল জনতা থেকে দূরে। নদীর চর, ধূ-ধূ বালি, স্থানে স্থানে জলকুণ্ড ঘিরে জলচর পাখি। সেখানে যে-সব ছোটো গল্প লিখেছি তার মধ্যে আছে পদ্মাতীরের আভাস। সাজাদপুরে যখন আসতুম চোখে পড়ত গ্রাম্যজীবনের চিত্র, পল্লীর বিচিত্র কর্মোদ্যম। তারই প্রকাশ 'পোস্ট্‌মাস্টার' 'সমাপ্তি' 'ছুটি' প্রভৃতি গল্পে। তাতে লোকালয়ের খণ্ড খণ্ড চলতি দৃশ্যগুলি কল্পনার দ্বারা ভরাট করা হয়েছে।

সেই সময়কার একদিনের কথা মনে আছে। ছোটো শুকনো পুরানো খালে জল এসেছে। পাঁকের মধ্যে ডিঙিগুলো ছিল অর্ধেক ডোবানো, জল আসতে তাদের ভাসিয়ে তোলা হল। ছেলেগুলো নতুন জলধারার ডাক শুনে মেতে উঠেছে। তারা দিনের মধ্যে দশবার করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে জলে।

দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে সেদিন দেখছিলুম সামনের আকাশে নববর্ষার জলভারনত মেঘ, নীচে ছেলেদের মধ্যে দিয়ে প্রাণের তরঙ্গিত কল্লোল। আমার মন সহসা আপন খোলা দুয়ার দিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে, সুদূরে। অত্যন্ত নিবিড়ভাবে আমার অন্তরে একটা অনুভূতি এল; সামনে দেখতে পেলুম নিত্যকালব্যাপী একটি সর্বানুভূতির অনবচ্ছিন্ন ধারা, নানা প্রাণের বিচিত্র লীলাকে মিলিয়ে নিয়ে একটি অখণ্ড

লীলা। নিজের জীবনে যা বোধ করছি, যা ভোগ করছি, চার দিকে ঘরে ঘরে জনে জনে মুহূর্তে মুহূর্তে যা-কিছু উপলব্ধি চলেছে, সমস্ত এক হয়েছে একটি বিরাট অভিজ্ঞতার মধ্যে। অভিনয় চলেছে নানা নটকে নিয়ে, সুখদুঃখের নানা খণ্ডপ্রকাশ চলছে তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র জীবনযাত্রায়, কিন্তু সমস্তটার ভিতর দিয়ে একটা নাট্যরস প্রকাশ পাচ্ছে এক পরমদ্রষ্টার মধ্যে যিনি সর্বানুভূঃ। এতকাল নিজের জীবনে সুখদুঃখের যে-সব অনুভূতি একান্তভাবে আমাকে বিচলিত করেছে, তাকে দেখতে পেলুম দ্রষ্টারূপে এক নিত্য সাক্ষীর পাশে দাঁড়িয়ে।

এমনি করে আপনা থেকে বিবিক্ত হয়ে সমগ্রের মধ্যে খণ্ডকে স্থাপন করবামাত্র নিজের অস্তিত্বের ভার লাঘব হয়ে গেল। তখন জীবনলীলাকে রসরূপে দেখা গেল কোনো রসিকের সঙ্গে এক হয়ে। আমার সেদিনকার এই বোধটি নিজের কাছে গভীর-ভাবে আশ্চর্য হয়ে ঠেকল।

একটা মুক্তির আনন্দ পেলুম। স্নানের ঘরে যাবার পথে একবার জানলার কাছে দাঁড়িয়েছিলুম ক্ষণকাল অবসরযাপনের কৌতুকে। সেই ক্ষণকাল এক মুহূর্তে আমার সামনে বৃহৎ হয়ে উঠল। চোখ দিয়ে জল পড়ছে তখন; ইচ্ছে করছে, সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করি কাউকে। কে সেই আমার পরম অন্তরঙ্গ সঙ্গী যিনি আমার সমস্ত ক্ষণিককে গ্রহণ করছেন তাঁর নিত্যে। তখনই মনে হল, আমার এক দিক থেকে বেরিয়ে এসে আর-এক দিকের পরিচয় পাওয়া গেল; এষোঽস্য পরম আনন্দঃ। আমার মধ্যে এ এবং সে— এই এ যখন সেই সে-র দিকে এসে দাঁড়ায় তখন তার আনন্দ।

সেদিন হঠাৎ অত্যন্ত নিকটে জেনেছিলুম, আপন সত্তার মধ্যে দুটি উপলব্ধির দিক আছে। এক, যাকে বলি আমি; আর তারই সঙ্গে জড়িয়ে মিশিয়ে যা-কিছু, যেমন আমার সংসার, আমার দেশ, আমার ধনজনমান, এই যা-কিছু নিয়ে মারামারি কাটাকাটি ভাবনা-চিন্তা। কিন্তু, পরমপুরুষ আছেন সেই-সমস্তকে অধিকার করে এবং অতিক্রম করে, নাটকের স্রষ্টা ও দ্রষ্টা যেমন আছে নাটকের সমস্তটাকে নিয়ে এবং তাকে পেরিয়ে। সত্তার এই দুই দিককে সব সময়ে মিলিয়ে অনুভব করতে পারি নে। একলা আপনাকে বিরাট থেকে বিচ্ছিন্ন করে সুখে দুঃখে আন্দোলিত হই। তার মাত্রা থাকে না, তার বৃহৎ সামঞ্জস্য দেখি নে। কোনো-এক সময়ে সহসা দৃষ্টি ফেরে তার দিকে, মুক্তির স্বাদ পাই তখন। যখন অহং আপন ঐকান্তিকতা ভোলে তখন দেখে সত্যকে। আমার এই অনুভূতি কবিতাতে প্রকাশ পেয়েছে 'জীবনদেবতা' শ্রেণীর কাব্যে।

ওগো অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম।

আমি যে পরিমাণে পূর্ণ অর্থাৎ বিশ্বভূমীন সেই পরিমাণে আপন করেছি তাঁকে, ঐক্য হয়েছে তাঁর সঙ্গে। সেই কথা মনে করে বলেছিলুম, "তুমি কি খুশি হয়েছ আমার মধ্যে তোমার লীলার প্রকাশ দেখে।"

বিশ্বদেবতা আছেন, তাঁর আসন লোকে লোকে, গ্রহচন্দ্রতারায়। জীবনদেবতা বিশেষভাবে জীবনের আসনে, হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁর পীঠস্থান সকল অনুভূতি, সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। বাউল তাঁকেই বলেছে মনের মানুষ। এই মনের মানুষ, এই সর্বমানুষের জীবনদেবতার কথা বলবার চেষ্টা করেছি 'Religion of Man' বক্তৃতাগুলিতে। সেগুলিকে দর্শনের কোঠায় ফেললে ভুল হবে। তাকে মতবাদের একটা আকার দিতে হয়েছে, কিন্তু বস্তুত সে কবিচিত্তের একটা অভিজ্ঞতা। এই আন্তরিক অভিজ্ঞতা অনেককাল থেকে ভিতরে ভিতরে আমার মধ্যে প্রবাহিত; তাকে আমার ব্যক্তিগত চিত্তপ্রকৃতির একটা বিশেষত্ব বললে তাই আমাকে মেনে নিতে হবে।

যিনি সর্বজগদ্‌গত ভূমা তাঁকে উপলব্ধি করবার সাধনায় এমন উপদেশ পাওয়া যায় যে, "লোকালয় ত্যাগ করো, গুহাগহ্বরে যাও, নিজের সত্তাসীমাকে বিলুপ্ত করে অসীমে অন্তর্হিত হও।" এই সাধনা সম্বন্ধে কোনো কথা বলবার অধিকার আমার নেই। অন্তত, আমার মন যে সাধনাকে স্বীকার করে তার কথাটা হচ্ছে এই যে, আপনাকে ত্যাগ না করে আপনার মধ্যেই সেই মহান পুরুষকে উপলব্ধি করবার ক্ষেত্র আছে—তিনি নিখিল মানবের আত্মা। তাঁকে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হয়ে কোনো অমানব বা অতিমানব সত্যে উপনীত হওয়ার কথা যদি কেউ বলেন তবে সে কথা বোঝবার শক্তি আমার নেই। কেননা, আমার বুদ্ধি মানববুদ্ধি, আমার হৃদয় মানবহৃদয়, আমার কল্পনা মানবকল্পনা। তাকে যতই মার্জনা করি, শোধন করি, তা মানবচিত্ত কখনোই ছাড়াতে পারে না। আমরা যাকে বিজ্ঞান বলি তা মানববুদ্ধিতে প্রমাণিত বিজ্ঞান, আমরা যাকে ব্রহ্মানন্দ বলি তাও মানবের চৈতন্যে প্রকাশিত আনন্দ। এই বুদ্ধিতে, এই আনন্দে যাঁকে উপলব্ধি করি তিনি ভূমা, কিন্তু মানবিক ভূমা। তাঁর বাইরে অন্য কিছু থাকা না-থাকা মানুষের পক্ষে সমান। মানুষকে বিলুপ্ত করে যদি মানুষের মুক্তি, তবে মানুষ হলুম কেন।

একসময় বসে বসে প্রাচীন মন্ত্রগুলিকে নিয়ে ঐ আত্মবিলয়ের ভাবেই ধ্যান করেছিলুম। পালাবার ইচ্ছে করেছি, শান্তি পাই নি তা নয়। বিক্ষোভের থেকে সহজেই নিষ্কৃতি পাওয়া যেত। এ ভাবে দুঃখের সময় সান্ত্বনা পেয়েছি। প্রলোভনের হাত থেকে এমনি ভাবে উদ্ধার পেয়েছি। আবার এমন একদিন এল যেদিন সমস্তকে স্বীকার করলুম, সবকে গ্রহণ করলুম। দেখলুম, মানবনাট্যমঞ্চের মাঝখানে যে লীলা তার অংশের অংশ আমি। সব জড়িয়ে দেখলুম সকলকে। এই-যে দেখা একে ছোটো বলব না। এও সত্য। জীবনদেবতার সঙ্গে জীবনকে পৃথক করে দেখলেই দুঃখ, মিলিয়ে দেখলেই মুক্তি।

গ্রন্থপরিচয়

[রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশের তারিখ ও রচনা-সংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য গ্রন্থপরিচয়ে সংকলিত হইল। পূর্ণতর তথ্যসংগ্রহ সর্বশেষ খণ্ডে একটি পঞ্জীতে সংকলিত হইবে।]

পত্রপুট

পত্রপুট ১৩৪৩ সালের ২৫ বৈশাখ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তৎপূর্বে ইহার অধিকাংশ কবিতা বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল—

পত্রপুট-সংখ্যা	সাময়িক পত্রে প্রকাশিত নাম	পত্রিকা
১	বিস্ময়	প্রবাসী। কার্তিক ১৩৪২
২	ছুটি	কবিতা। পৌষ ১৩৪২
৩	পৃথিবী	প্রবাসী। অগ্রহায়ণ ১৩৪২
৫	হাটে	প্রবাসী। পৌষ ১৩৪২
৬	পথের মানুষ	বিচিত্রা। মাঘ ১৩৪২
৭	সার্থক আলস্য	প্রবাসী। মাঘ ১৩৪২
৮	পেয়ালী	প্রবাসী। ফাল্গুন ১৩৪২
১০	দেহাতীত	প্রবাসী। চৈত্র ১৩৪২
১১	উদাসীন	প্রবাসী। বৈশাখ ১৩৪৩
১২	'বসেছি অপরাহ্ণে পারের খেয়াঘাটে'	প্রবাসী। জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩
১৬	আফ্রিকা	প্রবাসী। চৈত্র ১৩৪৩
১৭	বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি	প্রবাসী। মাঘ ১৩৪৪
১৮	শেষের মৌন	বিচিত্রা। বৈশাখ ১৩৪৩

পত্রপুটের বর্তমান ষোলো ও সতেরো-সংখ্যক কবিতা, ১৩৪৫ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থভুক্ত হয়। ষোলো-সংখ্যক কবিতার 'মিলহীন পঙ্ক্তিছন্দে' লিখিত অন্য দুইটি পাঠ এখানে মুদ্রিত হইল।

আফ্রিকা

বিশ্বভারতী পত্রিকা : শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫১

উদ্‌ভ্রান্ত আদিম যুগে
রুদ্র সমুদ্রের বাহু ছিন্ন করি নিয়ে গেল তোরে
প্রাচী ধরিত্রীর বক্ষ হতে
রে আফ্রিকা,
রেখে দিল নির্বাসনে মহা-অরণ্যের অন্ধকারে।

লতাগুল্ম-অবরুদ্ধ বনঘনিমায়
চিনে নিতেছিলে পথ
তিমির বিদীর্ণ করি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে।
বিদ্রূপ করিতেছিলে ভীষণেরে
নিজেরে বিরূপ করি—
ভয়মোচনের মন্ত্রে
আপনারে দিতেছিলে বিভীষার প্রচণ্ড মহিমা
তাণ্ডবের দুন্দুভি বাজায়ে।
অরণ্যের প্রেরণায়
রচনা করিতেছিলে
জীবনের অনুষ্ঠান
অরণ্যের মতো,
অর্থগ্রন্থিহীন,
খচিত বিবিধ বর্ণে,
সহজে উদ্ভূত জটিলতা।

সেদিন উঠিতেছিল দূর মহাদেশে
নব নব বাণীর নির্ঘোষ
নব নব দিন-অভ্যুদয়ে
মানবচিত্তের তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ-'পরে।

উন্মথিত ইতিহাস
প্রকাশ লভিতেছিল অকস্মাৎ সৃষ্টিতে প্রলয়ে;
বারম্বার-অবলুপ্ত সভ্যতার ভূগর্ভবিলীন
কবরের 'পরে
উঠেছে হঠাৎস্ফূর্ত প্রতাপের স্পর্ধিত পতাকা।

সৃষ্টির আরম্ভযুগে থাকে যে স্তম্ভিত অন্ধকার
গর্ভে বহি শিশু সূর্যতারা
নিভৃতে আছিলে তুমি
তেমনি তমিস্রঘন
ধরণীর ধ্যানের মন্দিরে।
অন্ধকারভাণ্ডারের রহস্যসম্পদ যত,
অধরা, অছোঁওয়া, নিতেছিলে সন্ধান তাহার।
মায়াবিনী প্রকৃতির যত মায়া
ধরিতে শিখিতেছিলে ইন্দ্রিয়ের ফাঁদে।

ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা,
কালো অবগুণ্ঠনের তলে
আছিলে অপরিচিতা তব প্রতিবেশিনীর কাছে।
রূপমদোদ্ধত ইয়ুরোপ
দস্যুবেশে গিয়েছিল দীপহীন তোমার প্রাঙ্গণে
তোমার বক্ষের 'পরে চালায়েছে রথ,
যেখানে বেদনাভরা মানবহৃদয়
তরুচ্ছায়ে ছিল প্রসারিত।
সভ্যের বর্বর লোভ নগ্ন করেছিল অন্ধকারে
নির্লজ্জ অমানুষিতা।
অশ্রু তব রক্ত-সাথে মিশে
ভাষাহীন ক্রন্দনের পথ
দিয়েছে পঙ্কিল করি—

দস্যুপদপাদুকার তলে
অশুচি কর্দম সেই
চিরচিহ্ন দিয়ে গেছে তোমার দুর্ভাগা ইতিহাসে।

তখনি তাদের দেশে দয়াময় দেবতার নামে
মন্দিরে বাজিতেছিল পূজাঘণ্টা প্রভাতে সন্ধ্যায়,
শিশুরা খেলিতেছিল মার কোলে,
অবাধে ধ্বনিতেছিল কবির সংগীতে
সুন্দরের আরাধনা।

আজ হেরো পশ্চিমদিগন্তে হোথা
ঝঞ্ঝামেঘে উঠে ওই বজ্রের ঝঞ্ঝনা
ধূলিবাষ্প-আবর্তের আবিল আকাশে—
দিন বুঝি হল অবসান।
পশুরা উঠিল গর্জি ছিল যারা গোপন গহ্বরে—
নখে নখে ছিন্ন করিতেছে তারা
অঙ্গনের বহুমূল্য আস্তরণ,
ধূলিরে করিছে অবারিত।

এসো তুমি যুগান্তের কবি—
আত্ম-অবমাননায় আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে
ওই চিরনিপীড়িতা মানবীর কাছে,
ওই অবমানিতার দ্বারে,
ক্ষমা ভিক্ষা করো।
হোক তাহা তব সভ্যতার
হিংস্র প্রলাপের মাঝে শেষ পুণ্যবাণী।

আফ্রিকা

কবিতা : আশ্বিন ১৩৪৪

উদ্‌ভ্রান্ত আদিম যুগে যবে একদিন
আপনাতে স্রষ্টার আপন অসন্তোষ
বিক্ষত করিতেছিল বারবার নূতন সৃষ্টিরে
সেইদিন
রুদ্র সমুদ্রের বাহু তোমারে নিয়েছে ছিন্ন করি
প্রাচী ধরিত্রীর বক্ষ হতে
হে আফ্রিকা।

সেথায় অরণ্য-অন্তরালে
নিভৃতে গোপন অবকাশে
দুর্গমের বিদ্যা তুমি করেছ সঞ্চয়
দিনে দিনে।
জলস্থল-বাতাসের
দুর্বোধ সংকেত যত নিয়েছ চিনিয়া।
প্রকৃতির মায়া
ধরিতে শিখিতেছিলে আপন চেতনাতীত মনে।
বিদ্রূপ করিতেছিলে ভীষণেরে
আপনারে করিয়া বিরূপ,
শঙ্কারে মানাতে হার
নিজেরে অর্পিতেছিলে বিভীষার প্রচণ্ড মহিমা
তাণ্ডবের দুন্দুভিনিনাদে।

ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা,
কালো অবগুণ্ঠনের তলে
আছিল অপরিচিত তোমার মানবরূপ
উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে।

এল তারা দলে দলে
তোমার শ্বাপদ হতে ক্রূরতর যারা,
এল তারা গর্বে যারা অন্ধপ্রায়
সূর্যহারা তোমার অরণ্য-চেয়ে।
সেথা অন্ধকারে
সভ্যের বর্বর লোভ উলঙ্গ করিল আপনার
নির্লজ্জ দুর্মানুষতা।
অশ্রু তব রক্ত-সাথে মিশে
ভাষাহীন ক্রন্দনের বাষ্পাকুল পথ
ডুবালো পঙ্কের স্তরে।
দস্যুপদপাদুকার তলে
বীভৎস কর্দম
চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার দুর্ভাগা ইতিহাসে।

সে মুহূর্তে তাদের পল্লীতে
মন্দিরে বাজিতেছিল দয়াময় দেবতার নামে
পূজাঘণ্টা প্রভাতে সন্ধ্যায়,
শিশুরা খেলিতেছিল মার কোলে,
অবাধে ধ্বনিতেছিল কবির সংগীতে
সুন্দরের আরাধনা।

আজ যবে পশ্চিমদিগন্ততলে
ঝঞ্ঝাঘাতে রুদ্ধশ্বাস মুমূর্ষু প্রদোষ,
গোপনগহ্বরচারী পশুর অশুভ ধ্বনি
দিনান্তের করিছে ঘোষণা,
এসো যুগান্তের কবি—
অবসন্ন এ সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে

নির্দয়দলিত ওই মানহারা মানবীর কাছে
ক্ষমা ভিক্ষা করো,
হোক তাহা তব সভ্যতার
হিংস্র প্রলাপের মাঝে শেষ পুণ্যবাণী।

সতেরো-সংখ্যক কবিতার অন্য একটি রূপ নবজাতক গ্রন্থে মুদ্রিত আছে। এখানে তাহা উদ্‌ধৃত হইল।

বুদ্ধভক্তি

জাপানের কোনো কাগজে পড়েছি, জাপানি সৈনিক যুদ্ধের সাফল্য কামনা করে বুদ্ধমন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছিল। ওরা শক্তির বাণ মারছে চীনকে, ভক্তির বাণ বুদ্ধকে।

হুংকৃত যুদ্ধের বাদ্য
সংগ্রহ করিবারে শমনের খাদ্য।
সাজিয়াছে ওরা সবে উৎকটদর্শন,
দন্তে দন্তে ওরা করিতেছে ঘর্ষণ,
হিংসার উষ্মায় দারুণ অধীর
সিদ্ধির বর চায় করুণানিধির—
ওরা তাই স্পর্ধায় চলে
বুদ্ধের মন্দিরতলে।
তূরী ভেরি বেজে ওঠে রোষে গরোগরো,
ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরোথরো।

গর্জিয়া প্রার্থনা করে;
আর্তরোদন যেন জাগে ঘরে ঘরে।
আত্মীয়বন্ধন করি দিবে ছিন্ন,
গ্রামপল্লীর রবে ভস্মের চিহ্ন,
হানিবে শূন্য হতে বহ্নি-আঘাত,
বিদ্যার নিকেতন হবে ধূলিসাৎ—
বক্ষ ফুলায়ে বর যাচে
দয়াময় বুদ্ধের কাছে।

তূরী ভেরি বেজে ওঠে রোষে গরোগরো,
ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরোথরো।

হত-আহতের গণি সংখ্যা
তালে তালে মন্ত্রিত হবে জয়ডঙ্কা।
নারীর শিশুর যত কাটা-ছেঁড়া অঙ্গ
জাগাবে অট্টহাসে পৈশাচীরঙ্গ,
মিথ্যায় কলুষিবে জনতার বিশ্বাস,
বিষবাষ্পের বাণে রোধি দিবে নিশ্বাস—
মুষ্টি উঁচায়ে তাই চলে
বুদ্ধেরে নিতে নিজ দলে।
তূরী ভেরি বেজে ওঠে রোষে গরোগরো,
ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরোথরো।

শান্তিনিকেতন
৭ জানুয়ারি ১৯৩৮

পত্রপুটের আঠারো-সংখ্যক কবিতার একটি পাঠান্তর পাণ্ডুলিপি হইতে উদ্‌ধৃত হইল—

এসো অন্তরে গম্ভীর নির্বাক্‌,
সংগীত যদি সঞ্চিত থাকে থাক্‌,
এখনো ক্লান্ত নাহয় না হল গলা;
শক্তির মাঝে যত-কিছু আছে দান
সব যদি করি নিঃশেষে অবসান,
সব কথা যদি শেষ হয়ে যায় বলা,
বলার অতীত যাহা তার তরে তবে
অবকাশটুকু কিছু আর নাহি রবে,
শব্দে লুকাবে স্তব্ধের মহাবাণী—

লীলা হারাইয়া গুরুভার হয় খেলা,
নীড়ের পাখির উড়িবার যায় বেলা,
থামিবার দিনে থামিতে যদি না জানি।

দিবস ঢালে যা মুখর মুখের কথা
রজনীতে তার নীরব সার্থকতা,
তারার আলোয় দিনের আলোর ছুটি।
মানুষেরে ঢাকে সংসারে নানা কাজে,
উজ্জ্বল রূপ লভে স্মরণের মাঝে,
চরমের ভাষা আভাসেতে উঠে ফুটি।

মোর হৃদয়ের কথিত বাণীর ধারা
অকথিত বাণী-সমুদ্রে হোক সারা,
পূর্ণ সে হোক মিলিয়া মৌন-সাথে।
জানা জীবনের নানা বেদনার কবি
রেখে দিয়ে যেন যায়[১] অজানার ছবি
যে শেষ অশেষ হেন মরণের রাতে।

[শান্তিনিকেতন]
১ বৈশাখ ১৩৪৩

১ 'যেন যায়' পাঠান্তরে 'যাক চির-'।

শ্যামলী

শ্যামলী ১৩৪৩ সালের ভাদ্র মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তৎপূর্বে ইহার অনেক কবিতা বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল—

নাম	পত্রিকা
শেষ পহরে	বিচিত্রা। আষাঢ় ১৩৪৩
আমি	পরিচয়। ভাদ্র ১৩৪৩
স্বপ্ন	কবিতা। আশ্বিন ১৩৪৩
চিরযাত্রী	প্রবাসী। ভাদ্র ১৩৪৩
বিদায়-বরণ	বিচিত্রা। ভাদ্র ১৩৪৩
অকাল ঘুম	প্রবাসী। শ্রাবণ ১৩৪৩
বাঁশিওয়ালা	প্রবাসী। আশ্বিন ১৩৪৩
অমৃত	প্রবাসী। আশ্বিন ১৩৪৩
বঞ্চিত, অপর পক্ষ[১]	পরিচয়। বৈশাখ ১৩৪৩

‘দ্বৈত’ কবিতার একটি পাঠান্তর আষাঢ় ১৩৪৩ প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল ; এখানে তাহা মুদ্রিত হইল।

দ্বৈত

প্রথম দেখেছি তোমাকে,
বিশ্বরূপকারের ইঙ্গিতে,
তখন ছিলে তুমি আভাসে।
যেন দাঁড়িয়ে ছিলে বিধাতার মানসলোকের
সেই সীমানায়
সৃষ্টির আঙিনা যেখানে আরম্ভ।

যেমন অন্ধকারে ভোরের ব্যঞ্জনা
অরণ্যের অশ্রুতপ্রায় মর্মরে

১ এই যুগ্ম-কবিতা ‘পাত্র ও পাত্রী ১) চন্দ্রমল্লিকা ২) অপরপক্ষ’ নামে পরিচয়ে প্রকাশিত হয়।

আকাশের অস্পষ্টপ্রায় রোমাঞ্চে—
উষা যখন পায় নি আপন নাম,
যখন জানে নি আপনাকে।
তার পরে সে নেমে আসে ধরাতলে ;
তার মুখ থেকে
অসীমের ছায়া-ঘোমটা পড়ে খ'সে
উদয়সমুদ্রতটে।
পৃথিবী তাকে আপন রঙে রাঙিয়ে তোলে,
পরায় তাকে আপন হাওয়ার উত্তরীয়।
তেমনি তুমি এসেছিলে ছবির প্রান্তরেখাটুকু
আমার হৃদয়ের দিগন্তপটে।
আমি তোমার চিত্রকরের শরিক ;
কথা ছিল, তোমার 'পরে মনের তুলি আমিও দেব বুলিয়ে,
তোমার রচনা সম্পূর্ণ করব আমি।—
দিনে দিনে তোমাকে রাঙিয়েছি
আমার ভাবের রঙে।
আমার প্রাণের হাওয়া
বইয়ে দিয়েছি তোমার চারি দিকে,
কখনো ঝড়ের বেগে,
কখনো মৃদুমন্দ বীজনে।

একদিন দ্যুলোকের দূরত্বে ছিলে তুমি অধরা,
ছিলে তুমি একলা বিধাতার,
একের নির্জনে।
আমি বেঁধেছি তোমাকে দুইয়ের গ্রন্থিতে ;
তোমার সৃষ্টি আজ তোমাতে আর আমাতে,
তোমার বেদনায় আমার বেদনায়।
আজ তুমি আপনাকে চিনেছ
আমার চেনা দিয়ে,
আমার সীমাবন্ধনে তুমি স্পষ্ট।

আমার বিস্মিত দৃষ্টির সোনার কাঠির স্পর্শে
জাগ্রত তোমার আনন্দরূপ
তোমার আপন চৈতন্তে।

বরানগর
৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩

'অকাল ঘুম' কবিতাটির একটি পূর্বতন পাঠ পাণ্ডুলিপি হইতে উদ্‌ধৃত করা গেল। ইহার চতুর্থ স্তবকটি কবির স্বহস্তের লেখায় একাধিক খাতাতেই আছে, এবং ঘটনা-বিবৃতি অনুসরণ করিবার পক্ষে অনুকূল বলিয়া প্রণিধানযোগ্য—

এসেছি অনাহূত,
মনে ছিল—
কোমরে-আঁচল-জড়ানো ব্যস্ততায় ওর
অসময়ে দেব বাধা।
চমক লাগল ঘরের দুয়ারে পা বাড়িয়ে,
চোখে পড়ল মেঝের 'পরে এলিয়ে পড়া
অকাল ঘুমের ছবিখানি।
দুখানি হাত গালের নীচে জড়ো করে
আজ পড়েচে ঘুমিয়ে শিথিল দেহে
উৎসবরাত্রির অবসাদে
অসমাপ্ত ঘরকন্নার এক ধারে।

দূর পাড়ায় বিয়েবাড়িতে
বাজচে সানাই সারং সুরে,
প্রথম প্রহর পেরিয়ে গেছে
জ্যৈষ্ঠের রৌদ্রে ঝামরে পড়া
সকালবেলায়। এই তো
কোমরে-আঁচল-বাঁধা ব্যস্ততার সময়,
এতক্ষণে কর্মস্রোত বইত অঙ্গে অঙ্গে—

হঠাৎ গেছে থেমে।
যেন ভরা বাদলের মাঝখানে
অকস্মাৎ বৃষ্টির অবসর।
ঘড়ির উপেক্ষিত ইঙ্গিত চলচে পাশের টেবিলে,
দেয়ালে দুলচে দিনপঞ্জী।
চলতি মুহূর্তগুলি
নিশ্চল এক-মুহূর্ত হয়ে মিলেছে
ওর নিস্তব্ধ নিদ্রায়।
দুটি সুপ্ত চোখের কালো পক্ষ্মচ্ছায়া
পড়েছে পাণ্ডুর কপোলে।
ক্লান্ত দেহের করুণ মাধুরী
যেন সারারাত-জাগা পূর্ণিমার
সকালের চাঁদ।
চেয়ে চেয়ে দেখলেম
অকাল ঘুমের
ছবিখানি।

ঘুম ভেঙে অভিমানভরে সে বললে, "ছি ছি,
কেন জাগালে না এতক্ষণ!"
আমি তার জবাব দিই নি ঠিকমত।

এ ছবি অনেক দিনের ছবি।
অনেক দূরের মূল্যে এ আজ অসামান্য।
প্রতিদিনের ছোঁওয়া লাগবে না এর গায়ে;
যে ভাষায় পূর্ণ হত এর অর্থ
সে আমার জানা নেই,
সে বুঝি কোন্ পৌরাণিক যুগের ধ্বনিগম্ভীর ভাষা,

আজকের দিনের অপরিচিত।[১]

সেদিন গলির ও পারের পাঠশালায়
ছেলেরা চেঁচিয়ে পড়ছিল নামতা,
পাট-বোঝাই মোষের গাড়ি
চাকার ক্লিষ্ট শব্দে চলেছিল রাস্তায়,
ছাদ পিটোচ্ছিল পাড়ার কোন্ বাড়িতে,
জানলার নীচে বাগানে
চালতা গাছের তলায়
উচ্ছিষ্ট আমের আঁঠি নিয়ে
টানাটানি করছিল একটা কাক—
আজ এ-সমস্তর উপরেই লেগেছে
সেই দূর কালের মায়া।
ইতিহাসবিস্মৃত
তুচ্ছ মধ্যাহ্নের রৌদ্রে
এরা অপরূপের রসে রইল ঘিরে
সেই অকালঘুমের ছবিখানি।

বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি আলোচনা করিয়া দেখা যায় 'কনি' (পৃ ৮৭-৯৪) কবিতাটির নানা পাঠান্তরের ভিতর দিয়া একপ্রকার রূপান্তর ঘটিয়াছে। পূর্ববর্তী একটি পাঠে 'টেমি' কুকুরের কোনো প্রসঙ্গ নাই, পক্ষান্তরে কনির পুতুলের বিয়ে ও তদুপলক্ষে অমলের সহিত তাহার মান-অভিমানের বর্ণনা আছে। উপসংহারটুকু সম্পূর্ণ অন্যরূপ, যেমন, ৯৩ পৃষ্ঠার সপ্তম ছত্র হইতে—

হঠাৎ গর্জন উঠল "কে রে" ;
লাফ দিতে যাচ্ছি গাছ থেকে,

১ অপ্রকাশিতপূর্ব স্তবক। অন্য এক পাণ্ডুলিপিতে ইহারই ঈষৎ ভিন্ন পাঠ আছে।

কনি বললে, "কখ্‌খনো না—
ফল পাড়ো তুমি।"
স্বয়ং শিবরামবাবু।
বললেন, "আর কোনো বিদ্যা হবে না বাপু,
চুরিবিদ্যাই শেষ ভরসা।"
কনি বললে, "ওঁকে ডেকে এনেছি আমিই তো।
মিছে বোকো না অমলদাকে।"
শিবরামবাবু কান দিলেন না সে কথায়।
বললেন, "লোভী তুমি।
এই চুরির ফল ভোগ করতে পাবে না,
এই তোমার শাস্তি।"
ঝুড়িটা নিয়ে গেলেন তিনি,
পাছে ফলবান হয় পাপের চেষ্টা।
কনির দুই চোখ দিয়ে
জল পড়তে লাগল মোটা মোটা ফোঁটায়—
ওর চোখে জল দেখেছি
এই প্রথম।

মাঝখানে অনেকখানি ফাঁক।
বিলেত থেকে ফিরে এসে দেখি,
কনির হয়ে গেছে বিয়ে।
মাথায় উঠেছে কাপড়,
সিঁথেয় সিঁদুর,
শান্ত হয়েছে চোখের দৃষ্টি ;
স্বর হয়েছে গম্ভীর।

আমি রসায়নের কারখানায়
ওষুধ বানিয়ে থাকি।

উন্নতির আশা আছে
এইরকম জনশ্রুতি।

শিবরামবাবুর জামাই
বাজি রেখে বিন্তি চালে তাস খেলেন
সন্ধ্যাবেলায় বন্ধুমণ্ডলীতে,
তাঁর সিনেমা দেখবারও
অপরিমিত শখ।
শিবরামবাবু চেষ্টা করেছেন
পাপসংশোধনের,
উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটেছে তর্কের ফলে,
তিনি চলে গেছেন হুশিয়ারপুরে।

এমনি চলছে আমার দিন
কর্মচক্রে বাঁধা।

গ্রামের বাড়ি সংস্কার করব বলে
গিয়েছি সেখানে কাজের ছুটি নিয়ে।
তখন কনি এসেছে শ্বশুরবাড়ি থেকে
তার মায়ের কাছে।
দূরের থেকে দেখি তাকে বাগানে,
বসে আছে অশথগাছের বাঁধা চাতালে।
কতবার যাই-যাই করে মন,
ভেবে পাই নে যাবার অধিকার
এখনো আছে কি নেই।

রবীন্দ্রনাথের 'মাটির বাসা' 'শেষবেলাকার ঘরখানি'র উদ্দেশে লিখিত 'শ্যামলী' কবিতা-প্রসঙ্গে 'শেষ সপ্তক'-এর চুয়াল্লিশ-সংখ্যক কবিতাও দ্রষ্টব্য। ২৫ বৈশাখ ১৩৪২ তারিখে শ্যামলীগৃহ-প্রবেশ উপলক্ষে শিল্পী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ করকে লিখিত কবিতাটিও ১৩৪২ জ্যৈষ্ঠের প্রবাসী হইতে এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কল্যাণীয়েষু

ধরণী বিদায়বেলা আজ মোরে ডাক দিল পিছু—
কহিল, "একটু থাম্, তোরে আমি দিতে চাই কিছু,
আমার বক্ষের স্নেহ; রাখিব একান্ত কাছে ধরে
যে ক'দিন রয়েছিস হেথা, ঘিরিয়া রাখিব তোরে
স্পর্শ মোর করি মূর্তিমান।"

হে সুরেন্দ্র, গুণী তুমি,
তোমারে আদেশ দিল ধ্যানে তব মোর মাতৃভূমি—
অপরূপ রূপ দিতে শ্যামস্নিগ্ধ তাঁর মমতারে
অপূর্ব নৈপুণ্যবলে। আজ্ঞা তাঁর মোর জন্মবারে
সম্পূর্ণ করেছ তুমি আজি। তাঁর বাহুর আহ্বান
নিঃশব্দ সৌন্দর্যে রচি আমারে করিলে তুমি দান
ধরণীর দূত হয়ে। মাটির আসনখানি ভরি
রূপের যে প্রতিমারে সম্মুখে তুলিলে তুমি ধরি
আমি তার উপলক্ষ; ধরার সন্তান যারা আছে
ধরার মহিমাগান করিবে সে সকলের কাছে।
পঁচিশে বৈশাখে আমি একদিন না রহিব যবে
মোর আমন্ত্রণখানি তোমার কীর্তিতে বাঁধা রবে,
তোমার বাণীতে পাবে বাণী। সে বাণীতে রবে গাঁথা,
ধরারে বেসেছি ভালো, ভূমিরে জেনেছি মোর মাতা।

শান্তিনিকেতন
২৫ বৈশাখ ১৩৪২

পরিত্রাণ

পরিত্রাণ ১৩৩৬ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তৎপূর্বে ১৩৩৪ সালের বার্ষিক শারদীয়া বসুমতীতে ইহা মুদ্রিত হইয়াছিল।

পরিত্রাণ 'বউঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের পুনঃসংস্কৃত রূপ ; ইহার কোনো কোনো অংশ প্রায়শ্চিত্ত হইতে গৃহীত, অবশিষ্ট অংশ নূতন।

গল্পগুচ্ছ

বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গল্পগুলি ১৩০২ সালে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে প্রকাশসূচী প্রদত্ত হইল—

নাম	পত্রিকা
মানভঞ্জন	সাধনা। বৈশাখ ১৩০২
ঠাকুরদা	সাধনা। জ্যৈষ্ঠ ১৩০২
প্রতিহিংসা	সাধনা। আষাঢ় ১৩০২
ক্ষুধিত পাষাণ	সাধনা। শ্রাবণ ১৩০২
অতিথি	সাধনা। ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২
ইচ্ছাপূরণ	সখা ও সাথী। আশ্বিন ১৩০২

রাশিয়ার চিঠি

রাশিয়ার চিঠি ১৩৩৮ সালের ২৫ বৈশাখ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তৎপূর্বে এই গ্রন্থের অন্তর্‌ভুক্ত পত্র ও প্রবন্ধাবলী প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়, নিম্নে প্রকাশসূচী মুদ্রিত হইল—

সংখ্যা বা নাম	প্রবাসীতে প্রকাশিত গ্রন্থবহির্ভূত নাম	প্রকাশকাল
১	রাশিয়ার লোকশিক্ষা (১)	অগ্রহায়ণ ১৩৩৭
২	রাশিয়ার সর্বব্যাপী নির্ধনতা	পৌষ ১৩৩৭
৩	রাশিয়ার সকল মানুষের উন্নতির চেষ্টা [১]	পৌষ ১৩৩৭
৪	রাশিয়া সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী [১]	ফাল্গুন ১৩৩৭
৫	রাশিয়ার সকল মানুষের উন্নতির চেষ্টা [২]	পৌষ ১৩৩৭
৬	রাশিয়ার শিক্ষাবিধি [১]	চৈত্র ১৩৩৭

সংখ্যা বা নাম	প্রবাসীতে প্রকাশিত গ্রন্থবহির্ভূত নাম	প্রকাশকাল
৭	সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা [১]	মাঘ ১৩৩৭
৮	সাইমন কমিশনের কবুল	অগ্রহায়ণ ১৩৩৭
	রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি পত্রাংশ [৩]	অগ্রহায়ণ ১৩৩৭
৯	রাশিয়ায় লোকশিক্ষা (২)	অগ্রহায়ণ ১৩৩৭
১০	সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা [২]	মাঘ ১৩৩৭
১১	রাশিয়া সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী [২]	ফাল্গুন ১৩৩৭
১২	রাশিয়া সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী [৩]	ফাল্গুন ১৩৩৭
১৩	রাশিয়ার শিক্ষাবিধি [২]	চৈত্র ১৩৩৭
১৪	রাশিয়ার শিক্ষাবিধি [৩]	চৈত্র ১৩৩৭
উপসংহার	সোভিয়েট নীতি	বৈশাখ ১৩৩৮
পরিশিষ্ট		
গ্রামবাসীদিগের প্রতি		চৈত্র ১৩৩৭
পল্লীসেবা		ফাল্গুন ১৩৩৭
কোরীয় যুবকের রাষ্ট্রিক মত		পৌষ ১৩৩৬

১-সংখ্যক চিঠি শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে; ২ ও ৪ -সংখ্যক চিঠি শ্রীনির্মলকুমারী মহলানবীশকে; ৩ ও ৫ -সংখ্যক চিঠি শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশকে; ৬-সংখ্যক চিঠি শ্রীআশা অধিকারীকে; ৭, ১০, ১১ ও ১২ -সংখ্যক চিঠি শ্রীসুরেন্দ্রনাথ করকে; ৮-সংখ্যক চিঠি এবং 'উপসংহার' রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে; ৯-সংখ্যক চিঠি শ্রীনন্দলাল বসুকে; ১৩-সংখ্যক চিঠি কালীমোহন ঘোষকে এবং ১৪-সংখ্যক চিঠি শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত হয়। 'রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি পত্রাংশ' শিরোনামে অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ প্রবাসীতে প্রকাশিত ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত একটি চিঠি (২৬ অগস্ট ১৯৩০) রাশিয়ার চিঠিতে ৮-সংখ্যক চিঠির পরিশেষে ("বাইরের সকল কাজের উপরেও··· বিপদে পড়তে হয়" অংশ) যুক্ত হইয়াছে।

১৯৩০ সালের পূর্বেও রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার রাশিয়ায় আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন; ১৯২৬ ও ১৯২৯ সালে রাশিয়া-যাত্রার প্রস্তাব তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গহেতু কার্যে পরিণত হইতে পারে নাই; অবশেষে ১৯৩০ সালে য়ুরোপভ্রমণ উপলক্ষে তিনি হ্যারি টিম্বার্স্, কুমারী মার্গট আইনস্টাইন, শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীআরিয়াম উইলিয়াম্‌স্ (আর্যনায়কম্) ও শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে সঙ্গে লইয়া রাশিয়া-দর্শনে যান এবং ১১ সেপ্টেম্বর হইতে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মস্কোতে অবস্থান করিয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানাদি

পরিদর্শন করেন। এই পর্যটনের বিবরণ বিশ্বভারতী-কর্তৃক প্রকাশিত *Letters from Russia* পুস্তকের পরিশিষ্টে লিপিবদ্ধ আছে।

রাশিয়া রবীন্দ্রনাথকে কোন্ ভাবে উদ্‌বোধিত করিয়াছিল, রাশিয়া-দর্শনের অব্যবহিত পরে লিখিত অন্যান্য চিঠিতেও স্থানে স্থানে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়—

[১৯৩০]

ধনীপরিবারের ব্যক্তিগত অমিতব্যয়িতার উপরে এবার আমার আন্তরিক বৈরাগ্য হয়েছে। দেনাশোধের ভাবনা ঘুচে গেলেই দেনা বাড়াবার পথ একেবারে বন্ধ করতে হবে। তা ছাড়া নিজেদের ভরণপোষণের দায়িত্ব আমাদের গরিব চাষি প্রজাদের 'পরে যেন আর চাপাতে না হয়। এ কথা আমার অনেক দিনের পুরোনো কথা। বহুকাল থেকেই আশা করেছিলুম, আমাদের জমিদারি যেন আমাদের প্রজাদেরই জমিদারি হয়— আমরা যেন ট্রস্‌টির মতো থাকি। অল্প কিছু খোরাক-পোশাক দাবি করতে পারব, কিন্তু সে ওদেরই অংশিদারের মতো। কিন্তু দিনে দিনে দেখলুম, জমিদারি-রথ সে রাস্তায় গেল না— তার পরে যখন দেনার অঙ্ক বেড়ে চলল তখন মনের থেকেও সংকল্প সরাতে হল। এতে করে দুঃখ বোধ করেছি— কোনো কথা বলি নি। এবার যদি দেনা শোধ হয় তা হলে আর-একবার আমার বহুদিনের ইচ্ছা পূর্ণ করবার আশা করব।

আমি যা বহুকাল ধ্যান করেছি রাশিয়ায় দেখলুম, এরা তা কাজে খাটিয়েছে; আমি পারি নি বলে দুঃখ হল। কিন্তু হাল ছেড়ে দিলে লজ্জার বিষয় হবে। অল্প বয়সে জীবনের যা লক্ষ্য ছিল শ্রীনিকেতনে শান্তিনিকেতনে তা সম্পূর্ণ সিদ্ধ না হোক, সাধনার পথ অনেকখানি প্রশস্ত করেছি। নিজের প্রজাদের সম্বন্ধেও আমার অনেক কালের বেদনা রয়ে গেছে। মৃত্যুর আগে সে দিককার পথও কি খুলে যেতে পারব না।...

এই পরিশিষ্টের শেষ অংশে ধনীর পোশাক আমাদের ছাড়তে হবে, নইলে লজ্জা ঘুচবে না। আমার ভাগ্যবিধাতার আশ্চর্য বিধান এই যে, এখন থেকে শেষ পর্যন্ত নিজের জীবিকা নিজের চেষ্টায় উপার্জন করতে পারব।

—চিঠিপত্র ৩। শ্রীপ্রতিমা দেবীকে লিখিত

১৪ অক্টোবর ১৯৩০

এবার রাশিয়ার অভিজ্ঞতায় আমাকে গভীরভাবে অনেক কথা ভাবিয়েছে। প্রচুর উপকরণের মধ্যে আত্মসম্মানের যে বিঘ্ন আছে সেটা বেশ স্পষ্ট চোখে দেখতে পেয়েছি। সেখান থেকে ফিরে এসে মেগেওলদের ঐশ্বর্যের মধ্যে যখন পৌঁছলুম, একটুও ভালো লাগল না— ব্রেমেন জাহাজের আড়ম্বর এবং অপব্যয় প্রতিদিন মনকে বিমুখ

করেছে। ধনের বোঝা কী প্রকাণ্ড এবং কী অনর্থক। জীবনযাত্রার কত জটিলতা কত সহজেই এড়ানো যেতে পারে।

৩১ অক্টোবর ১৯৩০

জমিদারির অবস্থা লিখেছিস। যেরকম দিন আসছে তাতে জমিদারির উপরে কোনোদিন আর ভরসা রাখা চলবে না। ও জিনিসটার উপর অনেককাল থেকেই আমার মনে মনে ধিক্কার ছিল, এবার সেটা আরও পাকা হয়েছে। যে-সব কথা বহুকাল ভেবেছি এবার রাশিয়ায় তার চেহারা দেখে এলুম। তাই জমিদারি ব্যবসায়ে আমার লজ্জা বোধ হয়। আমার মন আজ উপরের তলার গদি ছেড়ে নীচে এসে বসেছে। দুঃখ এই যে, ছেলেবেলা থেকে পরোপজীবী হয়ে মানুষ হয়েছি।···

এ দিকে দেশের ইতিহাসে একটা নূতন অধ্যায় দেখা দিয়েছে। অনেক কিছু উলট-পালট হবে। এই সময়ে বোঝা যত হালকা করতে পারব সমস্যা ততই সহজ হবে। জীবনযাত্রাকে গোড়া ঘেঁষে বদল করবার দিন এল, সেটা যেন অনায়াসে প্রসন্ন মনে করতে পারি। যারা যত বেশি নানা জালে জড়িয়ে আছে তারা তত বেশি কষ্ট পাবে। দুঃখের দিন যখন আসে তখন তাকে দায়ে পড়ে মেনে নেওয়ার চেয়ে এগিয়ে গিয়ে মেনে নেওয়া ভালো— তাতে দুঃখের ভার কমে যায়— বৃথা ঝুটোপুটি করতে হয় না। ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে দুঃখ সকলকেই পেতে হবে— এখনি পাচ্ছে, সংকট এড়িয়ে আরামে থাকবার প্রত্যাশা করাই ভুল। নূতন অভ্যাসের সঙ্গে নিজেকে বনিয়ে নেওয়া কিছুই শক্ত নয়, যদি অন্তরের দিকে প্রস্তুত হয়ে থাকি, যদি পুরাতনের বাঁধন আপনা হতে আলগা করে দিই— টানাটানি করতে গেলেই বাঁধন হয়ে ওঠে ফাঁসি।

···এটা খুব করে বুঝেছি, আমাদের সব চেয়ে বড়ো কাজ শ্রীনিকেতনে। সমস্ত দেশকে কী করে বাঁচাতে হবে ঐখানে ছোটো আকারে তারই নিষ্পত্তি করা আমাদের ব্রত। যদি তুই রাশিয়ায় আসতিস এ সম্বন্ধে অনেক তোর অভিজ্ঞতা হত। যাই হোক, কিছু মালমসলা সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছি, দেশে গিয়ে আলোচনা করা যাবে। নিজেদের কথা সম্পূর্ণ ভুলতে হবে ; তার চেয়ে বড়ো কথা সামনে এসেছে।

২১ নভেম্বর ১৯৩০

তোরা রাশিয়ায় যদি আসতিস তা হলে বুঝতে পারতিস কাজ করবার ঢের আছে। কম টাকা হলেও চলে যদি বুদ্ধি থাকে ও উদ্যম থাকে, যদি নিজের উপরে ভরসা থাকে।

—চিঠিপত্র ২। শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

১৯৩৪ সালের জুন-সংখ্যা মডার্ন্ রিভিউ পত্রে 'রাশিয়ার চিঠি'র 'সোভিয়েট নীতি' বা 'উপসংহার' শীর্ষক পত্রের শ্রীশশধর সিংহ -কৃত অনুবাদ প্রকাশিত হয় এবং অন্যান্য পত্রগুলির অনুবাদও ধারাবাহিক প্রকাশের আয়োজন হয়। ইতিপূর্বে প্রবাসী পত্রে 'রাশিয়ার চিঠি' যখন ক্রমশ মুদ্রিত হয় তখন সরকার-পক্ষ হইতে এ বিষয়ে কোনো আপত্তি হয় নাই ; উক্ত 'সোভিয়েট নীতি' বা 'উপসংহার'এর অপর একটি ইংরেজি অনুবাদ মডার্ন্ রিভিউ পত্রেই ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল, তখনও সরকার ইহাতে চাঞ্চল্য প্রকাশ করেন নাই ; কিন্তু ১৯৩৪ সালে মডার্ন্ রিভিউ পত্রে উক্ত অনুবাদ প্রকাশের পরে, অন্যান্য পত্রগুলির অনুবাদ-প্রকাশ নিষিদ্ধ হয়। (অবশ্য, শ্রীবসন্তকুমার রায় -কৃত অনুবাদ অতঃপর আমেরিকার য়ুনিটি পত্রে ধারাবাহিক প্রকাশিত হইয়াছিল।) মডার্ন রিভিউ পত্রে 'রাশিয়ার চিঠি'র অনুবাদ-প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা লইয়া পার্লামেণ্টে আলোচনা হয়। এ সম্পর্কে 'রাশিয়ার চিঠি'র ১৩৫৮ ফাল্গুন সংস্করণে ১৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রসঙ্গক্রমে প্রবাসী হইতে সম্পাদকীয় মন্তব্যবিশেষ সংকলন করা যাইতে পারে—

রুশীয় টেলিগ্রাম ও রবীন্দ্রনাথের উত্তর

কয়েকদিন হইল, রুশিয়া হইতে অধ্যাপক পেট্রভ রবীন্দ্রনাথকে একটি টেলিগ্রাম পাঠান। কর্তৃপক্ষ যে-ব্যক্তিই হউন, উহার কোনো কোনো অংশ রবীন্দ্রনাথ পাঠ করিলে তাঁহার অকল্যাণ হইবে এবং উহা প্রকাশিত হইলে ভারতবর্ষের ও গ্রেটব্রিটেন সমেত পৃথিবীর অন্যান্য অংশের অমঙ্গল হইবে, ঐ ব্যক্তির এই আশঙ্কায় তিনি (অর্থাৎ ঐ সর্বজনঅভিভাবক) টেলিগ্রামটির কোনো কোনো অংশ বাদ দিয়া বাকি রবীন্দ্রনাথকে ডাকঘরের মারফৎ প্রেরণ করেন। ছাঁট বাদে উহা এইরূপ :

To Rabindranath Tagore, Santiniketan, India.

What is your explanation of gigantic growth of U. S. S. R. industry; its high tempo of development; setting up of extensive collectivized, mechanized agriculture; liquidation of illiteracy; tremendous increase in number of scientific institutions, universities, schools; and cultural upheaval of U. S. S. R. in general?

What problems will confront you in your work during next five years and what obstacles?

Please telegraph for Soviet press, Moscow Kultviaz.

Petrov, V. O. K. S., Moscow.

রবীন্দ্রনাথ টেলিগ্রাফে ইহার উত্তর দিয়াছেন—

To Professor Petrov, V. O. K. S., Moscow.

Your success is due to turning the tide of wealth from the individual to collective humanity.

Our obstacles are social and political inanity, bigotry and illiteracy.

Rabindranath Tagore

—বিবিধ প্রসঙ্গ। প্রবাসী। অগ্রহায়ণ ১৩৩৮। পৃ ৩০২

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ১৯৩০ সালে রাশিয়া-যাত্রার পূর্বেও রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া-ভ্রমণের প্রস্তাব হইয়াছিল। ১৯২৬ সালে বার্লিনে সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষ হইতে শিক্ষাসচিব লুনাচারস্কি তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানাইতে আসিয়াছিলেন। তৎপূর্বেও রাশিয়ার সহিত রবীন্দ্রনাথের আত্মিক যোগ স্থাপিত হইয়াছিল— ১৯২২ সালে রাশিয়ার দুর্ভিক্ষে বিপন্ন রুশীয় মনস্বীদের সাহায্যের জন্য সর্বত্র যে আবেদন প্রচারিত হয়, তদনুরূপ আবেদন অক্‌সফোর্ড্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পি ভিনোগ্রাডফ এ দেশে রবীন্দ্রনাথের নিকট প্রেরণ করেন এবং ঐ পত্রের প্রারম্ভে লেখেন—

Oxford, May 19, 1922

When I met you in Calcutta eight years ago, I little thought that I should have to appeal to you on behalf of my unfortunate countrymen in Russia.

The impression I carried away after our interview was that I had met one who was fitted to represent the great Indian nation that has struggled for centuries with all kinds of hardships—physical and moral. It is to such humanitarians and idealists that I appeal in order to bring to their notice a particularly grievous and pressing need—the need of the intellectual leaders, the brain-workers of Russia who are threatened with destruction...

—শঙ্খ। ১২ আষাঢ় ১৩২৯, পৃ ১৯৫

রবীন্দ্রনাথ বিনীতভাবে এই কার্যে নিজের অযোগ্যতা জানাইয়া তাহা সত্ত্বেও দৈনিক কাগজগুলিতে অধ্যাপক ভিনোগ্রাডফের চিঠির সারাংশ সমেত নিজের আবেদন ছাপাইয়াছেন। তাঁহার নিকট শান্তিনিকেতন ডাকঘরের ঠিকানায় যিনি যত অর্থ পাঠাইবেন তিনি তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া যথাস্থানে পাঠাইয়া দিবেন।

—প্রবাসী। আষাঢ় ১৩২৯, পৃ ৪৬১

পায়োনিয়র্‌স্‌ কম্যুন রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসবে যে অভিনন্দন প্রেরণ করেন তাহার কিয়দংশ সংকলিত হইল—

Dear Poet,

The First Pioneers' Commune still remember the evening they spent with you and send you their warm greetings on your seventieth birthday.

We remember well your national song which you sang to us.

Since your departure life has carried us ahead and the country has taken giant strides towards socialism...

We wish you all happiness and hope to meet you again in our free socialistic country.

Greetings from the First Pioneers' Commune.

—*Golden Book of Tagore*, p. 265

রবীন্দ্রনাথের পরলোকগমনের পর লণ্ডনে-স্থিত সোভিয়েট প্রতিনিধি মেইস্কি শ্রদ্ধা-নিবেদন উপলক্ষে লেখেন—

May I express my profound grief at the passing of a great Indian writer and poet whose name was so familiar in my country and whose works were so popular with the masses of the Soviet People?

মানুষের ধর্ম

মানুষের ধর্ম ১৩৪০ সালে (মে ১৯৩৩) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধত্রয় প্রথমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কমলা-বক্তৃতারূপে পঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-মত এই বক্তৃতামালা, বা উহার সারাংশ, কলিকাতার বাহিরে কোনো স্থানে পঠনীয়। তদনুসারে গ্রন্থের পরিশিষ্টে মুদ্রিত 'মানবসত্য' শান্তিনিকেতনে কথিত হয়। 'মানবসত্য' এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইবার পূর্বে ১৩৪০ সালে প্রবাসীর বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ -সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

বর্ণানুক্রমিক সূচী

অকাল ঘুম … ৮৫,৪৪৪
অতিথিবৎসল, ডেকে নাও পথের পথিককে … ২২
অতিথি … ২৪৩
অধ্যাপকমশায় বোঝাতে গেলেন নাটকটার অর্থ ১১৫
অপর পক্ষ … ১২১
অমৃত … ১০৭
অস্পষ্ট অতীত থেকে বেরিয়ে পড়েছে ওরা দলে দলে ৭৬
আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো, পৃথিবী … ১২
আজ তোমারে দেখতে এলেম … ১৪২
আফ্রিকা … ৪৩৪, ৪৩৭
আমরা ছিলেম প্রতিবেশী … ৮৭
আমরা বসব তোমার সনে … ১৫৬
আমাকে এনে দিল এই বুনো চারাগাছটি … ২৭
আমাকে যে বাঁধবে ধরে এই হবে যার সাধন ১৫৭
আমাকে শুনতে দাও … ৭২
আমার ছুটি চার দিকে ধু ধু করছে … ৭
আমার নয়ন তোমার নয়নতলে … ১৪৮
আমার পথে পথেই পাথর ছড়ানো … ১৩২
আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ … ৬৫
আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায় … ১৬০
আমি … ৬৫
আমি ফিরব না রে, ফিরব না আর ফিরব না রে ১৯১
আরো আরো প্রভু, আরো আরো … ১৫৪
ইচ্ছাপূরণ … ২৬০
ইটকাঠে গড়া নীরস খাঁচার থেকে … ৫৭
উদ্‌ভ্রান্ত আদিম যুগে … ৪৩৪
উদ্‌ভ্রান্ত আদিম যুগে যবে একদিন … ৪৩৭
উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে … ৪৯

এই দেহখানা বহন করে আসছে দীর্ঘকাল ... ৩০
একদিন আষাঢ়ে নামল ... ১৬
এসেছি অনাহূত ... ৮৫,৪৪৪
এসেছিলে কাঁচা জীবনের পেলব রূপটি নিয়ে ... ৯৯
এসো অন্তরে গম্ভীর নির্বাক্ ... ৪৪০
ওগো তরুণী ... ৪০
ওগো বাঁশিওআলা ... ৯৫
ওগো শ্যামলী ... ১২৩
ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত ... ৪২
ওরে আগুন, আমার ভাই ... ১৭৭
ওরে শিকল, তোমায় অঙ্গে ধরে ... ১৭৯
কথার উপরে কথা চলেছ সাজিয়ে দিনরাতি ... ৫২
কনি ... ৮৭
কালরাত্রে ... ১০৫
কাল রাত্রে বাদলের দানোয়-পাওয়া অন্ধকারে ... ১০৫
কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসারি ঘায়ে ... ১৩৫
কে বলেছে তোমায় বঁধু, এত দুঃখ সইতে ... ১৫৭
কোরীয় যুবকের রাষ্ট্রিক মত ... ৩৬৪
ক্ষুধিত পাষাণ ... ২৩১
গ্রামছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ ... ১৮৭
গ্রামবাসীদিগের প্রতি ... ৩৫৩
ঘন অন্ধকার রাত ... ৭০
চার প্রহর রাতের বৃষ্টিভেজা ভারী হাওয়ায় ... ৭৯
চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে ... ১৮৫
চিরযাত্রী ... ৭৬
চোখ ঘুমে ভরে আসে ... ২৩
জীবনে অনেক ধন পাই নি ... ৮১
জীবনে নানা সুখদুঃখের ... ৫
ঠাকুরদা ... ২০৭
তুমি বাহির থেকে দিলে বিষম তাড়া ... ১২৯

তুমি হঠাৎ-হাওয়ায় ভেসে-আসা ধন ... ১৩২
তেঁতুলের ফুল ... ৮১
দাঁড়িয়ে আছ আড়ালে ... ৭৫
দুর্বোধ ... ১১৫
দ্বৈত ... ৬১,৪৪২
ধরণী বিদায়বেলা আজ মোরে ... ৪৪৯
নবজীবনের ক্ষেত্রে দুজনে মিলিয়া একমনা ... ৩
নাই ভয়, নাই ভয় নাই রে ... ১৩০
না বলে যেয়ো না চলে মিনতি করি ... ১৪৯
নির্বাক্ ... ৪৪০
পল্লীসেবা ... ৩৫৮
প্রতিহিংসা ... ২১৭
প্রথম দেখেছি তোমাকে ... ৪৪২
প্রাণের রস ... ৭২
ফাল্গুনের রঙিন আবেশ ... ৩২
ফুল তুলিতে ভুল করেছি ... ১৫০
ফুলিদের বাড়ি থেকে এসেই দেখি ... ১১৮
বঞ্চিত ... ১১৮
বসেছি অপরাহ্ণে পারের খেয়াঘাটে ... ৩৪
বাঁশিওআলা ... ৯৫
বিদায় নিয়ে চলে আসবার বেলা বললেম তাকে ১০৭
বিদায়-বরণ ... ৭৯
বুদ্ধভক্তি ... ৪৩৯
ভালোবাসার বদলে দয়া ... ৬২
মানভঞ্জন ... ১৯৭
মিলভাঙা ... ৯৯
যুদ্ধের দামামা উঠল বেজে ... ৫১
রইল বলে রাখলে কারে ... ১৬১
রেলগাড়ির কামরায় হঠাৎ দেখা ... ১০২
রোজই ডাকি তোমার নাম ধরে .. ৬৭

শেষ পহরে	...	৬২
শ্যামলী	...	১২৩
সকল ভয়ের ভয় যে তারে	...	১৮৬
সন্ধ্যা এল চুল এলিয়ে	...	১৮
সময় একটুও নেই	...	১২১
সম্ভাষণ	...	৬৭
স্বপ্ন	...	৭০
সেদিন ছিলে তুমি আলো-আঁধারের মাঝখানটিতে		৬১
হঠাৎ-দেখা	...	১০২
হারানো মন	...	৭৫
হৃদয়ের অসংখ্য অদৃশ্য পত্রপুট	...	৩৮
হেঁকে উঠল ঝড়	...	২৮
হুংকৃত যুদ্ধের বাদ্য	...	৪৩৯

রবীন্দ্র রচনাবলী

একবিংশ খণ্ড

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

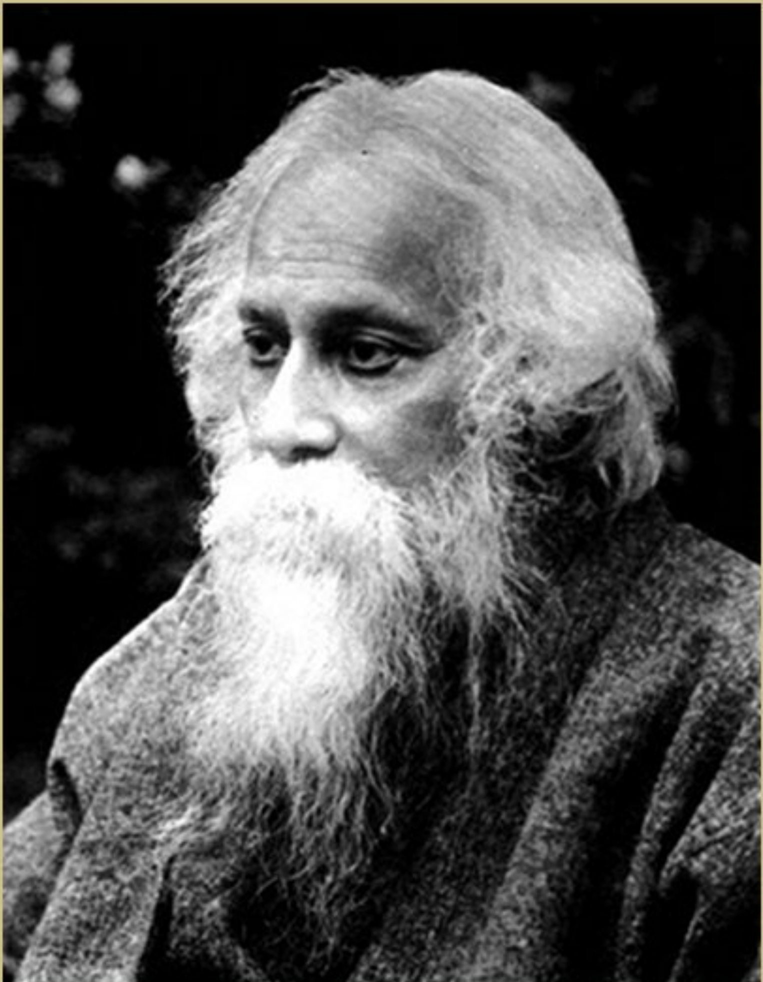

রবীন্দ্র-রচনাবলী

একবিংশ খণ্ড

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা

প্রকাশ : ২২ শ্রাবণ ১৩৫৩
পুনর্মুদ্রণ : অগ্রহায়ণ ১৩৬৪
আশ্বিন ১৩৭৮ : ১৮৯৩ শক

মূল্য : কাগজের মলাট আঠারো টাকা
রেক্সিনে বাঁধাই বাইশ টাকা

© বিশ্বভারতী ১৯৭১

প্রকাশক রণজিৎ রায়
বিশ্বভারতী। ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

মুদ্রক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড। ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা ৯

সূচী

চিত্রসূচী ।৵০

কবিতা ও গান

খাপছাড়া ৩

সংযোজন ৫৭

ছড়ার ছবি ৬৩

নাটক ও প্রহসন

তপতী ১১৯

উপন্যাস ও গল্প

গল্পগুচ্ছ ১৯১

প্রবন্ধ

ছন্দ ২৯৫

গ্রন্থপরিচয় ৪৩৩

বর্ণানুক্রমিক সূচী ৪৪৫

চিত্রসূচী

আত্মপ্রতিকৃতি — ৪
কবি-কর্তৃক অঙ্কিত

থাপছাড়া : কবি-কর্তৃক অঙ্কিত

বর এসেছে বীরের ছাঁদে — ৮
ক্ষান্তবুড়ি — ৯
ধুনিচাঁদ শিরখ — ৩৬
স্ত্রীর বোন — ৩৭
ম্যালাবারের কন্যা — ৪২
দাঁয়েদের গিন্নিটি — ৪৩

কবিতা ও গান

খাপছাড়া

সহজ কথায় লিখতে আমায় কহ যে,
সহজ কথা যায় না লেখা সহজে।

লেখার কথা মাথায় যদি জোটে
তখন আমি লিখতে পারি হয়তো।
কঠিন লেখা নয়কো কঠিন মোটে,
যা-তা লেখা তেমন সহজ নয় তো।

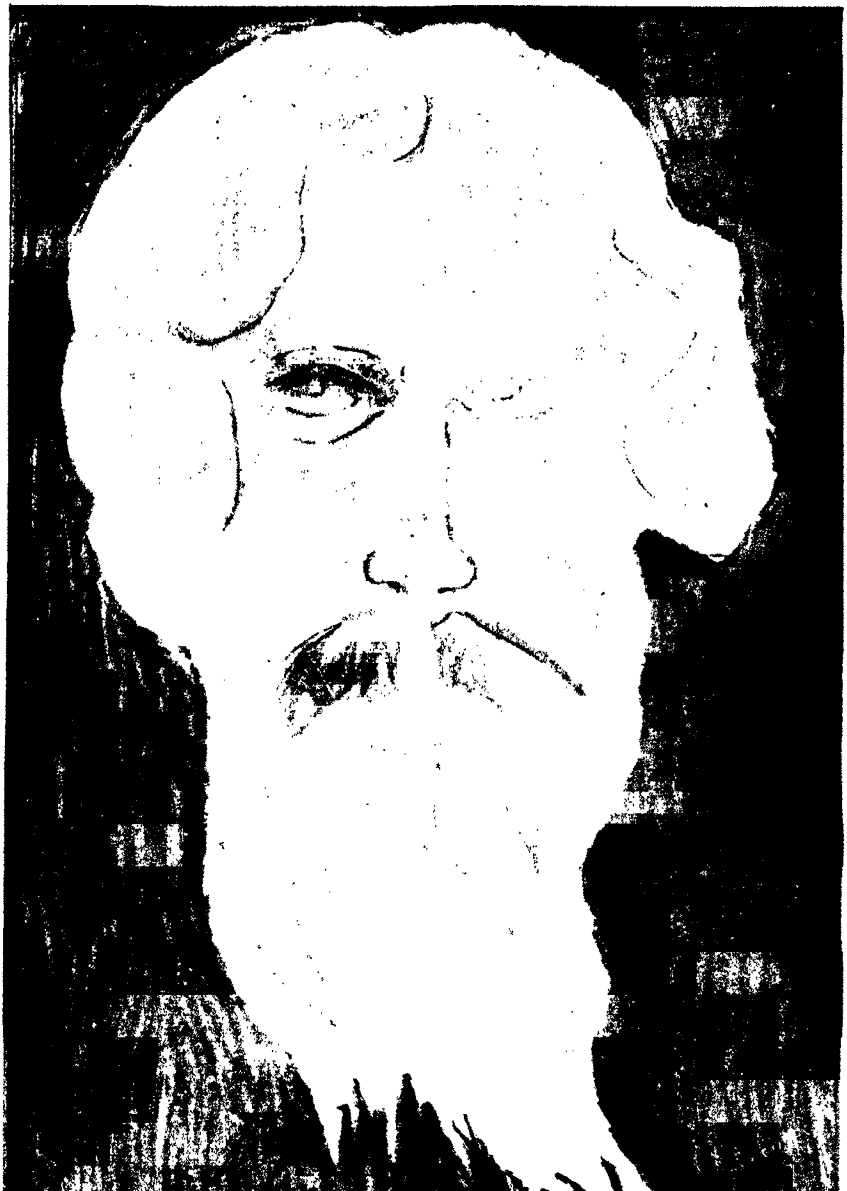

আত্মপ্রতিকৃতি

নন্দিতা কৃপালনীর সৌজন্যে

শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু

বন্ধুবরেষু

যদি দেখ খোলসটা
খসিয়াছে বৃদ্ধের,
যদি দেখ চপলতা
প্রলাপেতে সফলতা
ফলেছে জীবনে সেই ছেলেমিতে-সিদ্ধের,
যদি ধরা পড়ে সে যে নয় ঐকান্তিক
ঘোর বৈদান্তিক,
দেখ গম্ভীরতায় নয় অতলান্তিক,
যদি দেখ কথা তার
কোনো মানে-বোদ্ধার
হয়তো ধারে না ধার, মাথা উদ্‌ভ্রান্তিক,
মনখানা পৌঁছয় খ্যাপামির প্রান্তিক,
তবে তার শিক্ষার
দাও যদি ধিক্কার—
শুধাব, বিধির মুখ চারিটা কী কারণে।
একটাতে দর্শন
করে বাণী বর্ষণ,
একটা ধ্বনিত হয় বেদ-উচ্চারণে।
একটাতে কবিতা
রসে হয় দ্রবিতা,
কাজে লাগে মনটারে উচাটনে মারণে।
নিশ্চিত জেনো তবে,
একটাতে হো হো রবে
পাগলামি বেড়া ভেঙে উঠে উচ্ছ্বাসিয়া।

তাই তারি ধাক্কায়
বাজে কথা পাক খায়,
আওড় পাকাতে থাকে মগজেতে আসিয়া।
চতুর্মুখের চেলা কবিটিরে বলিলে
তোমরা যতই হাস, রবে সেটা দলিলে।
দেখাবে সৃষ্টি নিয়ে খেলে বটে কল্পনা,
অনাসৃষ্টিতে তবু ঝোঁকটাও অল্প না।

[শান্তিনিকেতন]
৩ ভাদ্র ১৩৪৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূমিকা

ডুগডুগিটা বাজিয়ে দিয়ে
ধুলোয় আসর সাজিয়ে দিয়ে
পথের ধারে বসল জাদুকর।
এল উপেন, এল রূপেন,
দেখতে এল নৃপেন, ভূপেন,
গোঁদলপাড়ার এল মাধু কর।
দাড়িওয়ালা বুড়ো লোকটা,
কিসের-নেশায়-পাওয়া চোখটা,
চার দিকে তার জুটল অনেক ছেলে।
যা-তা মন্ত্র আউড়ে, শেষে
একটুখানি মুচকে হেসে
ঘাসের 'পরে চাদর দিল মেলে।
উঠিয়ে নিল কাপড়টা যেই
দেখা দিল ধুলোর মাঝেই
ছুটো বেগুন, একটা চড়ুইছানা,
আমের আঁঠি, ছেঁড়া ঘুড়ি,
একটিমাত্র গালার চুড়ি,
ধুঁইয়ে-ওঠা ধুনুচি একখানা,
টুকরো বাসন চিনেমাটির,
মুড়ো ঝাঁটা খড়কেকাঠির,
নলছে-ভাঙা হুঁকো, পোড়া কাঠটা—
ঠিকানা নেই আগুপিছুর,
কিছুর সঙ্গে যোগ না কিছুর,
ক্ষণকালের ভোজবাজির এই ঠাট্টা।

শান্তিনিকেতন
১৬ পৌষ ১৩৪৩

বর এসেছে বীরের ছাঁদে

কবিতাসংখ্যা ২৪

ক্ষান্তবুড়ি

কবিতাসংখ্যা ১

খাপছাড়া

১

কাঁকুড়ির দিদিশাশুড়ির
পাঁচ বোন থাকে কাল্‌নায়,
শাড়িগুলো তারা উনুনে বিছায়,
হাঁড়িগুলো রাখে আলনায়।
কোনো দোষ পাছে ধরে নিন্দুকে
নিজে থাকে তারা লোহাসিন্দুকে,
টাকাকড়িগুলো হাওয়া খাবে ব'লে
রেখে দেয় খোলা জালনায়—
নুন দিয়ে তারা ছাঁচিপান সাজে,
চুন দেয় তারা ডালনায়।

২

অল্পেতে খুশি হবে
দামোদর শেঠ কি।
মুড়কির মোয়া চাই,
চাই ভাজা ভেটকি।

আনবে কটকি জুতো,
মটকিতে ঘি এনো,
জলপাইগুড়ি থেকে
এনো কই জিয়োনো—
চাঁদনিতে পাওয়া যাবে
বোয়ালের পেট কি।

চিনেবাজারের থেকে
এনো তো করমচা,
কাঁকড়ার ডিম চাই,
চাই যে গরম চা,
নাহয় খরচা হবে
মাথা হবে হেঁট কি।
মনে রেখো বড়ো মাপে
করা চাই আয়োজন,
কলেবর খাটো নয়—
তিন মোন প্রায় ওজন।
খোঁজ নিয়ো ঝড়িয়াতে
জিলিপির রেট কী।

৩

পাঠশালে হাই তোলে
মতিলাল নন্দী।
বলে, 'পাঠ এগোয় না
যত কেন মন দি।'
শেষকালে একদিন
গেল চড়ি টঙ্গায়,
পাতাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে
ভাসালো মা-গঙ্গায়,
সমাস এগিয়ে গেল,
ভেসে গেল সন্ধি—
পাঠ এগোবার তরে
এই তার ফন্দি।

৪

কাঁচড়াপাড়াতে এক
ছিল রাজপুত্তুর,

রাজকন্যারে লিখে
পায় না সে উত্তর।
টিকিটের দাম দিয়ে
রাজ্য বিকাবে কি এ,
রেগেমেগে শেষকালে
বলে ওঠে— ছুত্তোর!
ডাকবাবুটিকে দিল
মুখে ভালকুত্তোর।

৫

দাড়ীশ্বরকে মানত ক'রে
গোঁপ-গাঁ গেল হাবল—
স্বপ্নে শেয়ালকাঁটা-পাখি
গালে মারল খাবল।

দেখতে দেখতে ছাড়ায় দাড়ি
ভদ্র সীমার মাত্রা—
নাপিত খুঁজতে করল হাবল
রাওলপিণ্ডি যাত্রা।
উর্দু ভাষায় হাজাম এসে
বকল আবল-তাবল।

তিরিশটা খুর একে একে
ভাঙল যখন পটাৎ,
কামারটুলি থেকে নাপিত
আনল তখন হঠাৎ
যা হাতে পায় খাঁড়া বঁটি
কোদাল করাত শাবল।

৬

নিধু বলে আড়চোখে ‘কুছ নেই পরোয়া’—
স্ত্রী দিলে গলায় দড়ি বলে, ‘এটা ঘরোয়া।’
দারোগাকে হেসে কয়,
‘খবরটা দিতে হয়’—
পুলিস যখন করে ঘরে এসে চড়োয়া।
বলে, ‘চরণের রেণু
নাহি চাহিতেই পেনু’—
এই ব’লে নিধিরাম করে পায়ে-ধরোয়া।

নিধু বাঁকা ক’রে ঘাড় ওড়নাটা উড়িয়ে
বলে, ‘মোর পাকা হাড়, যাব নাকো বুড়িয়ে।
যে যা খুশি করুক-না,
মারুক-না, ধরুক-না,
তাকিয়াতে দিয়ে ঠেস দেব সব তুড়িয়ে।’
গালি তারে দিলে লোকে
হাসে নিধু আড়চোখে;
বলে, ‘দাদা, আরো বলো, কান গেল জুড়িয়ে।’

পিসে হয় কুলদার, ভুলুদার কাকা সে—
আড়চোখে হাসে আর করে ঘাড় বাঁকা সে।
যবে গিয়ে শালিখায়
সাহেবের গালি খায়,
‘কেয়ার করি নে’ ব’লে তুড়ি মারে আকাশে।
যেদিন ফয়জাবাদে
পত্নী ফুঁপিয়ে কাঁদে,
‘তবে আসি’ বলে হাসি চলে যায় ঢাকা সে।

৭

দু-কানে ফুটিয়ে দিয়ে
　　কাঁকড়ার দাঁড়া
বর বলে, 'কান ছুটো
　　ধীরে ধীরে নাড়া।'
বউ দেখে আয়নায়,
জাপানে কি চায়নায়
হাজার হাজার আছে
　　মেছনীর পাড়া—
কোথাও ঘটে নি কানে
　　এত বড়ো ফাঁড়া।

৮

পাখিওয়ালা বলে, 'এটা
　　কালোরঙ চন্দনা।'
পানুলাল হালদার
　　বলে, 'আমি অন্ধ না—
কাক ওটা নিশ্চিত,
　　হরিনাম ঠোঁটে নাই।'
পাখিওয়ালা বলে, 'বুলি
　　ভালো করে ফোটে নাই-
পারে না বলিতে বাবা,
　　কাকা নামে বন্দনা।'

৯

রসগোল্লার লোভে
　　পাঁচকড়ি মিত্তির
দিল ঠোঙা শেষ করে
　　বড়ো ভাই পুত্তির।

সইল না কিছুতেই,
যকৃতের নিচুতেই
যন্ত্র বিগড়ে গিয়ে
ব্যামো হল পিত্তির।
ঠোঙাটাকে বলে, 'পাজি
ময়রার কারসাজি।'
দাদার উপরে রাগে—
দাদা বলে, 'চিত্তির!
পেটে যে স্মরণসভা
আপনারি কীর্তির।'

১০

হাতে কোনো কাজ নেই,
নওগাঁর তিনকড়ি
সময় কাটিয়ে দেয়
ঘরে ঘরে ঋণ করি।
ভাঙা খাট কিনেছিল,
ছ পয়সা খরচা—
শোয় না সে হয় পাছে
কুঁড়েমির চর্চা।
বলে, 'ঘরে এত ঠাসা
কিঙ্কর কিঙ্করী,
তাই কম খেয়ে খেয়ে
দেহটারে ক্ষীণ করি।'

১১

মেছুয়াবাজার থেকে
পালোয়ান চারজন
পরের ঘরেতে করে
জঞ্জাল-মার্জন।

ভালায় লাগিয়ে চাপ
বাক্সো করেছে সাফ,
হঠাৎ লাগালো গুঁতো
পুলিসের সার্জন।
কেঁদে বলে, 'আমাদের
নেই কোনো গার্জন,
ভেবেছিনু হেথা হয়
নৈশবিদ্যালয়—
নিখরচা জীবিকায়
বিদ্যা-উপার্জন।'

১২

টেরিটি বাজারে তার
সন্ধান পেনু—
গোরা বোষ্টমবাবা,
নাম নিল বেণু।
শুদ্ধ নিয়ম-মতে
মুরগিরে পালিয়া,
গঙ্গাজলের যোগে
রাঁধে তার কালিয়া—
মুখে জল আসে তার
চরে যবে ধেনু।
বড়ি ক'রে কৌটায়
বেচে পদরেণু।

১৩

ইতিহাসবিশারদ গণেশ ধুরন্ধর
ইজারা নিয়েছে একা বম্বাই বন্দর।
নিয়ে সাতজন জেলে
দেখে মাপকাঠি ফেলে—

সাগরমথনে কোথা উঠেছিল চন্দর,
কোথা ডুব দিয়ে আছে ডানাকাটা মন্দর

১৪

মুচকে হাসে অতুল খুড়ো,
কানে কলম গোঁজা।
চোখ টিপে সে বললে হঠাৎ,
'পরতে হবে মোজা।'
হাসল ভজা, হাসল নবাই—
'ভারি মজা' ভাবল সবাই—
ঘরসুদ্ধ উঠল হেসে,
কারণ যায় না বোঝা।

১৫

স্বপ্নে দেখি নৌকো আমার
নদীর ঘাটে বাঁধা ;
নদী কিম্বা আকাশ সেটা
লাগল মনে ধাঁধা।
এমনসময় হঠাৎ দেখি,
দিক্‌সীমানায় গেছে ঠেকি
একটুখানি ভেসে-ওঠা
ত্রয়োদশীর চাঁদা।
'নৌকোতে তোর পার করে দে'
এই ব'লে তার কাঁদা।
আমি বলি, 'ভাবনা কী তায়,
আকাশপারে নেব মিতায়—
কিন্তু আমি ঘুমিয়ে আছি
এই যে বিষম বাধা,
দেখছ আমার চতুর্দিকটা
স্বপ্নজালে ফাঁদা।'

১৬

বউ নিয়ে লেগে গেল   বকাবকি
    রোগা ফনী আর মোটা   পক্ষিতে,
মণিকর্ণিকা-ঘাটে   ঠকাঠকি
    যেন বাঁশে আর শঙ্ক   কঞ্চিতে।
দুজনে না জানে এই   বউ কার,
মিছেমিছি ভাড়া বাড়ে   নৌকার,
পক্ষি চেঁচায় শুধু   হাউহাউ,—
    'পারবি নে তুই মোরে   বঞ্চিতে।'
বউ বলে, 'বুঝে নিই   দাউদাউ
    মোর তরে জলে ঐ   কোন্ চিতে।'

১৭

ইদিলপুরেতে বাস নরহরি শর্মা,
হঠাৎ খেয়াল গেল যাবেই সে বর্মা।
দেখবে-শুনবে কে যে তাই নিয়ে ভাবনা,
রাঁধবে বাড়বে, রেবে গোরুটাকে জাবনা—
    সহধর্মিণী নেই, খোঁজে সহধর্মা।
গেল তাই খণ্ডালা, গেল তাই অণ্ডালে,
মহা রেগে গাল দেয় রেলগাড়ি-চণ্ডালে,
    সাথি খুঁজে সে বেচারা কী গলদ্ঘর্মা—
    বিস্তর ভেবে শেষে গেল সে কোডর্মা।

১৮

ঘাসে আছে ভিটামিন, গোরু ভেড়া অশ্ব
    ঘাস খেয়ে বেঁচে আছে, আঁখি মেলে পশ্য।
অনুকূল বাবু বলে, 'ঘাস খাওয়া ধরা চাই,
কিছুদিন জঠরেতে অভ্যেস করা চাই—
    বৃথাই খরচ ক'রে চাষ করা শস্য।

গৃহিণী দোহাই পাড়ে মাঠে যবে চরে সে,
ঠেলা মেরে চলে যায় পায়ে যবে ধরে সে—
মানবহিতের ঝোঁকে কথা শোনে কস্ত!

দুদিন না যেতে যেতে মারা গেল লোকটা,
বিজ্ঞানে বিঁধে আছে এই মহা শোকটা,
বাঁচলে প্রমাণ-শেষ হ'ত যে অবশ্য।

১৯

ভয় নেই, আমি আজ
রান্নাটা দেখছি।
চালে জলে মেপে, নিধু,
চড়িয়ে দে ডেকচি।
আমি গনি কলাপাতা,
তুমি এসো নিয়ে হাতা,
যদি দেখ, মেজবউ,
কোনোখানে ঠেকছি।

রুটি মেখে বেলে দিয়ো,
উনুনটা জেলে দিয়ো,
মহেশকে সাথে নিয়ে
আমি নয় সেঁকছি।

২০

মন উড়ু উড়ু, চোখ ঢুলুঢুলু,
ম্লান মুখখানি কাঁদুনিক—
আলুথালু ভাষা, ভাব এলোমেলো,
ছন্দটা নির্বাধুনিক।
পাঠকেরা বলে, 'এ তো নয় সোজা,
বুঝি কি বুঝি নে যায় না সে বোঝা।'
কবি বলে, 'তার কারণ, আমার
কবিতার ছাঁদ আধুনিক।'

২১

কালুর খাবার শখ সব চেয়ে পিষ্টকে।
গৃহিণী গড়েছে যেন চিনি মেখে ইষ্টকে।
পুড়ে সে হয়েছে কালো,
মুখে কালু বলে 'ভালো',
মনে মনে খোঁটা দেয় দগ্ধ অদৃষ্টকে।
কলিক্-ব্যথায় ডাকে ক্রুসে-বেঁধা খৃস্টকে।

২২

রাজা বসেছেন ধ্যানে,
বিশজন সর্দার
চীৎকাররবে তারা
হাঁকিছে— 'খবরদার'।

সেনাপতি ডাক ছাড়ে,
মন্ত্রী সে দাড়ি নাড়ে,
যোগ দিল তার সাথে
ঢাকঢোল-বর্দার।

ধরাতল কম্পিত,
পশুপ্রাণী লম্ফিত,
রানীরা মূর্ছা যায়
আড়ালেতে পর্দার।

২৩

নাম তার সন্তোষ,
জঠরে অগ্নিদোষ,
হাওয়া খেতে গেল সে পচম্বা।

নাকছাবি দিয়ে নাকে
বাঘনাপাড়ায় থাকে
বউ তার বেঁটে জগদম্বা।

ডাক্তার গ্রেগ্‌সন
দিল ইনজেক্‌শন—
দেহ হল সাত ফুট লম্বা।

এত বাড়াবাড়ি দেখে
সন্তোষ কহে হেঁকে,
'অপমান সহিব কথম্‌ বা।
শুন ডাক্তার ভায়া,
উঁচু করো মোর পায়া,
স্ত্রীর কাছে কেন রব কম বা।
খড়ম জোড়ায় ঘষে
ওষুধ লাগাও কষে—
শুনে ডাক্তার হতভম্বা।

২৪

বর এসেছে বীরের ছাঁদে,
বিয়ের লগ্ন আটটা।
পিতল-আঁটা লাঠি কাঁধে,
গালেতে গালপাট্টা।

শ্যালীর সঙ্গে ক্রমে ক্রমে
আলাপ যখন উঠল জমে,
রায়বেঁশে নাচ নাচের ঝোঁকে
মাথায় মারলে গাঁট্টা।
শ্বশুর কাঁদে মেয়ের শোকে,
বর হেসে কয়— 'ঠাট্টা'।

২৫

নিষ্কাম পরহিতে কে ইহারে সামলায়—
স্বার্থেরে নিঃশেষে-মুছে-ফেলা বামলায়।

চলেছে উদারভাবে সবল-খোয়ানি—
গিনি যায়, টাকা যায়, সিকি যায় দোয়ানি,
হল সারা বাঁটোয়ারা উকিলে ও আমলায়।

গিয়েছে পরের লাগি অন্নের শেষ গুঁড়ো—
কিছু খুঁটে পাওয়া যায় ভুষি তুঁষ খুদকুঁড়ো
গোরুহীন গোয়ালের তলাহীন গামলায়।

২৬

জামাই মহিম এল, সাথে এল কিনি—
হায় রে কেবলই ভুলি ষষ্ঠীর দিনই।

মেয়েটা কাহিল বড়ো রাঁধবার নামে,
কে জানে কেন রে বাপু, ভেসে যায় ঘামে।
বিধাতা জানেন আমি বড়ো অভাগিনী।
বেয়ানকে লিখে দেব, খাওয়াবেন তিনি।

২৭

ঘাসি কামারের বাড়ি   সাঁড়া,
গড়েছে মন্ত্রপড়া   খাঁড়া।
খাপ থেকে বেরিয়ে সে
উঠেছে অট্টহেসে ;
কামার পালায় যত
বলে, 'দাঁড়া দাঁড়া।'
দিনরাত দেয় তার
নাড়ীটাতে নাড়া।

২৮

যখনি যেমনি হোক জিতেনের মর্জি
কথায় কথায় তার লাগে আশ্চর্যি।

অডিটর ছিল জিতু হিসাবেতে টঙ্ক,
আপিসে মেলাতেছিল বজেটের অঙ্ক ;
শুনলে সে, গেছে দেশে রামদীন্ দর্জি,
শুনতে না-শুনতেই বলে 'আশ্চর্যি'।

যে দোকানি গাড়ি তাকে করেছিল বিক্রি
কিছুতে দাম না পেয়ে করেছে সে ডিক্রি,
বিস্তর ভেবে জিতু উঠল সে গর্জি—
'ভারি আশ্চর্যি'।

শুনলে, জামাইবাড়ি ছিল বুড়ি ঝিনাদায়,
ছ বছর মেলেরিয়া ভুগে ভুগে চিনা দায়,
সেদিন মরেছে শেষে পুরোনো সে ওর ঝি,
জিতেন চশমা খুলে বলে 'আশ্চর্যি'।

২৯

'শুনব হাতির হাঁচি'
এই ব'লে কেষ্টা
নেপালের বনে বনে
ফেরে সারা দেশটা।

শুঁড়ে সুড়্সুড়ি দিতে
নিয়ে গেল কঞ্চি,
সাত জালা নস্যি ও
রেখেছিল সঞ্চি,
জল কাদা ভেঙে ভেঙে
করেছিল চেষ্টা—
হেঁচে দু-হাজার হাঁচি
মরে গেল শেষটা।

৩০

আধা রাতে গলা ছেড়ে
　　মেতেছিনু কাব্যে;
ভাবি নি পাড়ার লোকে
　　মনেতে কী ভাববে।
ঠেলা দেয় জানলায়,
　　শেষে দ্বার-ভাঙাভাঙি,
ঘরে ঢুকে দলে দলে
　　মহা চোখ-রাঙারাঙি—
শ্রাব্য আমার ভেবে
　　ওদেরই অশ্রাব্যে।
আমি শুধু করেছিনু
　　সামান্য ভনিতাই,
সামলাতে পারল না
　　অরসিক জনে তাই—
কে জানিত অধৈর্য
　　মোর পিঠে নাববে!

৩১

গুপ্তিপাড়ায় জন্ম তাহার;
　　নিন্দাবাদের দংশনে
অভিমানে মরতে গেল
　　মোগলসরাই জংসনে।
কাছা কোঁচা ঘুচিয়ে গুপি
ধরল ইজের, পড়ল টুপি,
দু হাত দিয়ে লেগে গেল
　　কোফ্তা-কাবাব-ধ্বংসনে।
গুরুপুত্র সঙ্গে ছিল—
　　বললে তারে, 'অংশ নে।'

৩২

বেণীর মোটরখানা
চালায় মুখুর্জে।
বেণী ঝেঁকে উঠে বলে,
'মরল কুকুর যে!'
অকারণে সেরে দিলে
দফা ল্যাম্‌-পোস্‌টার,
নিমেষেই পরলোকে
গতি হল মোষটার।
যে দিকে ছুটেছে সোজা
ওদিকে পুকুর যে—
আরে চাপা পড়ল কে?
জামাই খুকুর যে।

৩৩

নাম তার ডাক্তার ময়জন।
বাতাসে মেশায় কড়া পয়জন।
গনিয়া দেখিল, বড়ো বহরের
একখানা রীতিমত শহরের
টিঁকে আছে নাবালক নয়জন।
খুশি হয়ে ভাবে, এই গবেষণা
না জানি সবার কবে হবে শোনা,
শুনিতে বা বাকি রবে কয়জন।

৩৪

খ্যাতি আছে সুন্দরী বলে তার,
ত্রুটি ঘটে নুন দিতে ঝোলে তার;
চিনি কম পড়ে বটে পায়সে
স্বামী তবু চোখ বুজে খায় সে—
যা পায় তাহাই মুখে তোলে তার,
দোষ দিতে মুখ নাহি খোলে তার

৩৫

ঘোষালের বক্তৃতা
করা কর্তব্যই,
বেঞ্চি চৌকি আদি
আছে সব দ্রব্যই।

মাতৃভূমির লাগি
পাড়া ঘুরে মরেছে,
একশো টিকিট বিলি
নিজহাতে করেছে।
চোখ বুজে ভাবে, বুঝি
এল সব সভ্যই।
চোখ চেয়ে দেখে, বাকি
শুধু নিরেনব্বই।

৩৬

কুঁজো তিনকড়ি ঘোরে
পাড়া চারিদিককার,
সন্ধ্যায় ঘরে ফেরে
নিয়ে ঝুলি ভিক্ষার।

বলে সিধু গড়গড়ি
রাগে দাঁত কড়মড়ি,
'ভিখ্ মেগে ফেরো, মনে
হয় না কি ধিক্কার?'
ঝুলি নিজে কেড়ে বলে,
'মাহিনা এ শিক্ষার।'

৩৭

মুরগি-পাখির 'পরে
অন্তরে টান তার,

জীবে তার দয়া আছে
　এই তো প্রমাণ তার।
বিড়াল চাতুরী ক'রে
পাছে পাখি নেয় ধরে
এই ভয়ে সেই দিকে
　সদা আছে কান তার—
শেয়ালের খলতায়
　ব্যথা পায় প্রাণ তার।

৩৮

সন্ধেবেলায় বন্ধুঘরে
　জুটল চুপিচুপি
　　গোপেন্দ্র মুস্তফি।

রাত্রে যখন ফিরল ঘরে
সবাই দেখে তারিফ করে—
পাগড়িতে তার জুতোজোড়া,
　　পায়ে রঙিন টুপি।

এই উপদেশ দিতে এল—
সব করা চাই এলোমেলো,
'মাথায় পায়ে রাখব না ভেদ'
　　চেঁচিয়ে বলে গুপি।

৩৯

সভাতলে ভুঁয়ে
　কাৎ হয়ে শুয়ে
নাক ডাকাইছে সুল্‌তান,
　পাকা দাড়ি নেড়ে
　গলা দিয়ে ছেড়ে
মন্ত্রী গাহিছে মুলতান।

এত উৎসাহ দেখি গায়কের
জেদ হল মনে সেনানায়কের—
কোমরেতে এক ওড়না জড়িয়ে
নেচে করে সভা গুলতান।
ফেলে সব কাজ
বরকন্দাজ
বাঁশিতে লাগায় ভুল তান।

৪০

নাম তার ভেলুরাম ধুনিচাঁদ শিরথ,
ফাটা এক তম্বুরা কিনেছে সে নিরর্থ।
সুরবোধ-সাধনায়
ধুরপদে বাধা নাই ;
পাড়ার লোকেরা তাই হারিয়েছে ধীরত্ব—
অতি-ভালোমানুষেরও বুকে জাগে বীরত্ব।

৪১

ইটের গাদার নীচে
ফটকের ঘড়িটা।
ভাঙা দেয়ালের গায়ে
হেলে-পড়া কড়িটা।
পাচিলটা নেই, আছে
কিছু ইট সুরকি।
নেই দই সন্দেশ,
আছে খই মুড়কি।
ফাটা হুঁকো আছে হাতে,
গেছে গড়গড়িটা।
গলায় দেবার মতো
বাকি আছে দড়িটা।

৪২

নিজের হাতে উপার্জনে
  সাধনা নেই সহিষ্ণুতার।
পরের কাছে হাত পেতে খাই,
  বাহাদুরি তারি গুঁতার।
কৃপণ দাতার অন্নপাকে
ডাল যদি বা কমতি থাকে
গাল-মিশানো গিলি তো ভাত—
  নাহয় তাতে নেইকো সুতার।
নিজের জুতার পাত্তা না পাই,
  স্বাদ পাওয়া যায় পরের জুতার।

৪৩

আদর ক'রে মেয়ের নাম
  রেখেছে ক্যালিফর্নিয়া,
গরম হল বিয়ের হাট
  ঐ মেয়েরই দর নিয়া।

মহেশদাদা খুঁজিয়া গ্রামে গ্রামে
  পেয়েছে ছেলে ম্যাসাচুসেট্‌স্‌ নামে,
শাশুড়ি বুড়ি ভীষণ খুশি
  নামজাদা সে বর নিয়া—
ভাটের দল চেঁচিয়ে মরে
  নামের গুণ বর্ণিয়া।

৪৪

কন্‌কনে শীত তাই
  চাই তার দস্তানা;
বাজার ঘুরিয়ে দেখে
  জিনিসটা সস্তা না।

কম দামে কিনে মোজা
বাড়ি ফিরে গেল সোজা—
কিছুতে ঢোকে না হাতে,
তাই শেষে পস্তানা।

৪৫

খবর পেলেম কল্য,
তাঞ্জামেতে চ'ড়ে রাজা
গাঞ্জামেতে চলল।
সময়টা তার জলদি কাটে ;
পৌঁছল যেই হলদিঘাটে
একটা ঘোড়া রইল বাকি,
তিনটে ঘোড়া মরল।
গরানহাটায় পৌঁছে সেটা
মুটের ঘাড়ে চড়ল।

৪৬

'সময় চলেই যায়'
নিত্য এ নালিশে
উদ্বেগে ছিল ভুপু
মাথা রেখে বালিশে।

কব্জির ঘড়িটার
উপরেই সন্দ,
একদম করে দিল
দম তার বন্ধ—
সময় নড়ে না আর,
হাতে বাঁধা খালি সে,
ভুপুরাম অবিরাম
বিশ্রাম-শালী সে।

ঝাঁ-ঝাঁ করে রোদ্দুর,
তবু ভোর পাঁচটায়
ঘড়ি করে ইঙ্গিত
ডালাটার কাঁচটায়—
রাত বুঝি ঝক্‌ঝকে
কুঁড়েমির পালিশে।
বিছানায় প'ড়ে তাই
দেয় হাততালি সে।

৪৭

উজ্জ্বলে ভয় তার,
ভয় মিট্‌মিটেতে,
ঝালে তার যত ভয়
তত ভয় মিঠেতে।

ভয় তার পশ্চিমে,
ভয় তার পূর্বে,
যে দিকে তাকায় ভয়
সাথে সাথে ঘুরবে।
ভয় তার আপনার
বাড়িটার ইটেতে,
ভয় তার অকারণে
অপরের ভিটেতে।

ভয় তার বাহিরেতে,
ভয় তার অন্তরে,
ভয় তার ভূত-প্রেতে,
ভয় তার মন্তরে।
দিনের আলোতে ভয়
সামনের দিঠেতে,
রাতের আঁধারে ভয়
আপনারি পিঠেতে।

৪৮

কনের পণের আশে
চাকরি সে ত্যেজেছে।
বারবার আয়নাতে
মুখখানি মেজেছে।
হেনকালে বিনা কোনো কসুরে
যম এসে ঘা দিয়েছে শশুরে,
কনেও বাঁকালো মুখ—
বুকে তাই বেজেছে।
বরবেশ ছেড়ে ছাঁক
দরবেশ সেজেছে।

৪৯

বরের বাপের বাড়ি
যেতেছে বৈবাহিক,
সাথে সাথে ভাঁড় হাতে
চলেছে দই-বাহিক।
পণ দেবে কত টাকা
লেখাপড়া হবে পাকা,
দলিলের খাতা নিয়ে
এসেছে সই-বাহিক।

৫০

আয়না দেখেই চমকে বলে,
'মুখ যে দেখি ফ্যাকাশে,
বেশিদিন আর বাঁচব না তো—'
ভাবছে বসে একা সে।
ডাক্তারেরা লুটল কড়ি,
খাওয়ায় জোলাপ, খাওয়ায় বড়ি,
অবশেষে বাঁচল না সেই
বয়স যখন একাশি।

৫১

বাদশার মুখখানা
গুরুতর গম্ভীর,
মহিষীর হাসি নাহি ঘুচে।
কহিলা বাদশা-বীর—
'যতগুলো দন্তীর
দন্ত মুছিব চেঁচে-পুঁছে।'

উঁচু মাথা হল হেঁট,
খালি হল ভরা পেট,
শপাশপ্ পিঠে পড়ে বেত।
কভু ফাঁসি কভু জেল,
কভু শূল কভু শেল,
কভু ক্রোক দেয় ভরা খেত।
মহিষী বলেন তবে—
'দন্ত যদি না র'বে
কী দেখে হাসিব তবে, প্রভু।
বাদশা শুনিয়া কহে—
'কিছুই যদি না রহে
হসনীয় আমি র'ব তবু।

৫২

আপিস থেকে ঘরে এসে
মিলত গরম আহার্য,
আজকে থেকে রইবে না আর
তাহার জো।
বিধবা সেই পিসি ম'রে
গিয়েছে ঘর খালি করে,
বন্ধি স্বয়ং করেছে তার
সাহায্য।

৫৩

গব্‌রাজার পাতে
ছাগলের কোর্‌মাতে
যবে দেখা গেল তেলা
পোকাটা
রাজা গেল মহা চ'টে,
চীৎকার করে ওঠে—
'খানসামা কোথাকার
বোকাটা।'

মন্ত্রী জুড়িয়া পাণি
কহে, 'সবই এক প্রাণী।'
রাজার ঘুচিয়া গেল
ধোঁকাটা।
জীবের শিবের প্রেমে
একদম গেল থেমে
মেঝে তার তলোয়ার
ঠোকাটা।

৫৪

নামজাদা দাতুবাবু
রীতিমত খর্‌চে,
অথচ ভিটের তার
ঘুঘু সদা চর্‌ছে।
দানধর্ম্মের 'পরে
মন তার নিবিষ্ট,
রোজগার করিবার
বেলা জপে 'শ্রীবিষ্ণু',
চাদার খাতাটা তাই
দ্বারে দ্বারে ধর্‌ছে।

এই ভাবে পুণ্যের
খাতা তার ভরছে।

৫৫

বহু কোটি যুগ পরে
সহসা বাণীর বরে
জলচর প্রাণীদের
কণ্ঠটা পাওয়া যেই
সাগর জাগর হল
কতমতো আওয়াজেই।
তিমি ওঠে গাঁ গাঁ করে;
চিঁ চিঁ করে চিংড়ি;
ইলিস বেহাগ ভাঁজে
যেন মধু নিংড়ি;
শাঁখগুলো বাজে, বহে
দক্ষিণে হাওয়া যেই;
গান গেয়ে শুশুকেরা
লাগে কুচ-কাওয়াজেই।

৫৬

আমার পাচকবর গদাধর মিশ্র,
তারি ঘরে দেখি মোর কুন্তলবৃষ্য।
কহিনু তাহারে ডেকে—
'এ শিশিটা এনেছে কে,
শোভন করিতে চাও হেঁশেলের দৃশ্য?'

সে কহিল 'বরিষার
এই ঋতু; সরিষার
তেলে ক'রে যায় খাত, বেড়ে যায় কৃশ্য।'

কহে, 'কাঠমুণ্ডার
নেপালের গুণ্ডার
এই তেলে কেটে যায় জঠরের গ্রীষ্ম।
লোকমুখে শুনেছি তো, রাজা-গোলকুণ্ডার
এই সাত্ত্বিক তেলে পূজার হবিষ্য।
আমি আর তাঁরা সবে চরকের শিষ্য।'

৫৭

রান্নার সব ঠিক,
পেয়েছি তো নুনটা—
অল্প অভাব আছে,
পাই নি বেগুনটা।
পরিবেষণের তরে
আছি মোরা সব ভাই,
যাদের আসার কথা
অনাগত সব্বাই।
পান পেলে পুরো হয়,
জুটিয়েছি চুনটা—
একটু-আধটু বাকি,
নাই তাহে কুণ্ঠা।

৫৮

সর্দিকে সোজাসুজি
সর্দি ব'লেই বুঝি
মেডিকেল বিজ্ঞান না শিখে।
ডাক্তার দেয় শিষ,
টাকা নিয়ে পঁয়ত্রিশ
ইনফ্লুয়েঞ্জা বলে কাশিকে।

ভাবনায় গেল ঘুম,
ওষুধের লাগে ধুম,
শঙ্কা লাগালো পারিভাষিকে।

আমি পুরাতন পাপী,
Hanging শুনেই কাঁপি,
ভরিনেকো সাদাসিধে ফাঁসিকে

শূন্য তবিল যবে,
বলে 'পাচনেই হবে'—
চেতাইল এ ভারতবাসীকে।
নবুস্‌কে ঠেকিয়ে দূরে
যাই বিক্রমপুরে,
সহায় মিলিল খাঞ্জমাসিকে।

৫৯

হাস্যদমনকারী গুরু—
নাম যে বশীশ্বর,
কোথা থেকে জুটল তাহার
ছাত্র হসীশ্বর।
হাসিটা তার অপর্যাপ্ত,
তরঙ্গে তার বাতাস ব্যাপ্ত,
পরীক্ষাতে মার্কা যে তাই
কাটেন মসীশ্বর।
ডাকি সরস্বতী মাকে—
'ত্রাণ করো এই ছেলেটাকে,
মাস্টারিতে ভর্তি করো
হাস্যরসীশ্বর।'

ধুনিচাঁদ শিরত্ন

কবিতাসংখ্যা ৪০

স্ত্রীর বোন

কবিতাসংখ্যা ৬২

৬০

ত্রিজটার প্ল্যান দিল
বড়ো এন্‌জিনিয়ার
ডিস্ট্রিক্ট্ বোর্ডের
সবচেয়ে সীনিয়ার।
নতুন রকম প্ল্যান
দেখে সবে অজ্ঞান,
বলে, 'এই চাই, এটা
চিনি নাই-চিনি আর।'

ব্রিজখানা গেল শেষে
কোন্ অঘটন দেশে,
তার সাথে গেছে ভেসে
ন হাজার গিনি আর।

৬১

স্ত্রীর বোন চায়ে তার
ভুলে ঢেলেছিল কালি,
'শ্যালী' ব'লে ভর্ৎসনা
করেছিল বনমালী।

এত বড়ো গালি শুনে
জ্ব'লে মরে মনাগুনে,
আফিম সে খাবে কিনা
সাত মাস ভাবে খালি,
অথবা কি গঙ্গায়
পোড়া দেহ দিবে ডালি

৬২

ননীলাল বাবু যাবে লঙ্কা ;
শ্যালা শুনে এল, তার
ডাক-নাম টঙ্কা ।

বলে, 'হেন উপদেশ তোমারে দিয়েছে সে কে,
আজও আছে রাক্ষস, হঠাৎ চেহারা দেখে
রামের সেবক ব'লে করে যদি শঙ্কা ।

আকৃতি প্রকৃতি তব হতে পারে জম্‌কালো,
দিদি যা বলুন, মুখ নয় কভু কম কালো—
খামকা তাদের ভয় লাগিবে আচমকা ।
হয়তো বাজাবে রণডঙ্কা ।'

৬৩

ভোলানাথ লিখেছিল,
তিন-চারে নব্বই—
গণিতের মার্কায়
কাটা গেল সর্বই ।

তিন-চারে বারো হয়,
মাস্টার তারে কয় ;
'লিখেছিনু ঢের বেশি'
এই তার গর্বই ।

৬৪

একটা খোঁড়া ঘোড়ার 'পরে
চড়েছিল চাটুর্জে,

পড়ে গিয়ে কী দশা তার
হয়েছিল হাঁটুর যে !
বলে কেঁদে, 'ব্রাহ্মণেরে
বইতে ঘোড়া পারল না যে
সইত তাও, মরি আমি
তার থেকে এই অধিক লাজে—
লোকের মুখের ঠাট্টা যত
বইতে হবে টাটুর যে !'

৬৫

থাকে সে কাহালগাঁয় ;
কলুটোলা আফিসে
রোজ আসে দশটায়
একায় চাপি সে ।
ঠিক যেই মোড়ে এসে
লাগাম গিয়েছে ফেঁসে,
দেখি হয়ে গেল ব'লে
ভয়ে মরে কাঁপি সে—
ঘোড়াটার লেজ ধ'রে
করে দাপাদাপি সে ।

৬৬

বটে আমি উদ্ধত,
নই তবু ক্রুদ্ধ তো,
শুধু ঘরে মেয়েদের সাথে মোর যুদ্ধ তো ।
যেই দেখি গুণ্ডায়
কমি হেঁটমুণ্ডায়,
দুর্জন মানুষেরে কয়েছেন বুদ্ধ তো ।
পাড়ায় দারোগা এলে দ্বার করি রুদ্ধ তো—
সাত্ত্বিক সাধকের এ আচার শুদ্ধ তো ।

৬৭

ভূত হয়ে দেখা দিল
বড়ো কোলাব্যাঙ,
এক পা টেবিলে রাখে,
কাঁধে এক ঠ্যাঙ।

বনমালী খুড়ো বলে—
'করো মোরে রক্ষে,
শীতল দেহটি তব
বুলিয়ো না বক্ষে।'
উত্তর দেয় না সে,
বলে শুধু 'ক্যাঙ'।

৬৮

পেঁচোটাকে মাসি তার
যত দেয় আস্কারা,
মুশকিল ঘটে তত
এক সাথে বাস করা।
হঠাৎ চিমটি কাটে
কপালের চামড়ায়—
বলে সে, 'এমনি ক'রে
ভিমরুল কামড়ায়।'
আমার বিছানা নিয়ে
খেলা ওর চাষ-করা—
মাথার বালিশ থেকে
তুলোগুলো হ্রাস-করা।

৬৯

কেন মার' সিঁধ-কাটা ধূর্তে।
কাজ ওর দেয়ালটা খুঁড়তে।

তোমার পকেটটাকে করেছ কি ডোবা হে—
চিরদিন বহমান অর্থের প্রবাহে
  বাধা দেবে অপরের পকেটটি পূরতে ?
আর, যত নীতিকথা সে তো ওর চেনা না—
ওর কাছে অর্থনীতিটা নয় জেনানা ;
  বদ্ধ ধনেরে তাই দেয় সদা ঘুরতে,
  হেথা হতে হোথা তারে চালায় মুহূর্তে।

৭০

যে মাসেতে আপিসেতে
  হল তার নাম ছাঁটা
স্ত্রীর শাড়ি নিজে পরে,
  স্ত্রী পরিল গামছাটা।
বলে, 'আমি বৈরাগী,
  ছেড়ে দেব শিগ্‌গির,
ঘরে মোর যত আছে
  বিলাস-সামিগ্‌গির।'
ছিল তার টিনে-গড়া
  চা-খাওয়ার চাম্‌চাটা,
কেউ তা কেনে না সেটা
  যত করে দাম-ছাঁটা।

৭১

জমল সতেরো টাকা—
  সুদে টাকা খেলাবার
শখ গেল, নবু তাই
  গেল চলি ম্যালাবার।
ভাবনা বাড়ায় তার
  মুনফার মাত্রা,

পাঁচ মেয়ে বিয়ে ক'রে
বাঁচল এ যাত্রা।
কাজ দিল কন্তারা
ঠেলাগাড়ি ঠেলাবার,
রোদ্দুরে ভার্যার
ভিজে চুল এলাবার।

৭২

বেদনায় সারা মন
করতেছে টনটন্‌
শ্যালী কথা বলল না
সেই বৈরাগ্যে।
মরে গেলে ট্রাস্‌টিরা
করে দিক বণ্টন
বিষয়-আশয় যত—
সব-কিছু যাক গে।
উমেদারি-পথে আহা
ছিল যাহা সঙ্গী—
কোথা সে শ্যামবাজার
কোথা চৌরঙ্গি—
সেই ছেঁড়া ছাতা চোরে
নেয় নাই ভাগ্যে—
আর আছে ভাঙা ঐ
হ্যারিকেন লণ্ঠন,
বিশ্বের কাজে তারা
লাগে যদি লাগ্‌ গে।

৭৩

ইস্কুল-এড়ায়নে
সেই ছিল বরিষ্ঠ,

ম্যালাবারের কন্যা

কবিতাসংখ্যা ৭১

দাঁয়েদের গিন্নিটি

কবিতাসংখ্যা ৭৪

ফেল-করা ছেলেদের
সবচেয়ে গরিষ্ঠ।
কাজ যদি জুটে যায়
দুদিনে তা ছুটে যায়,
চাকরির বিভাগে সে
অতিশয় নড়িষ্ঠ—
গলদ করিতে কাজে
ভয়ানক দড়িষ্ঠ।

৭৪

দাঁয়েদের গিন্নিটি
কিপ্‌টে সে অতিশয়,
পান থেকে চুন গেলে
কিছুতে না ক্ষতি সয়।
কাঁচকলা-খোষা দিয়ে
পচা মহুয়ার ঘিয়ে
ছেঁচকি বানিয়ে আনে—
সে কেবল পতি সয়;
একটু করলে 'উহু'
যদি এক-রতি সয়!

৭৫

আধখানা বেল
খেয়ে কানু বলে—
'কোথা গেল বেল
একখানা।'
আধা গেলে শুধু
আধা বাকি থাকে,
যত করি আমি
ব্যাখ্যানা,

সে বলে, 'তা হলে মহা ঠকিলাম,
আমি তো দিয়েছি ষোল-আনা দাম।'
হাতে হাতে সেটা করিল প্রমাণ
ঝাড়া দিয়ে তার
ব্যাগখানা।

৭৬

পাড়াতে এসেছে এক
নাড়ীটেপা ডাক্তার,
দূর থেকে দেখা যায়
অতি উঁচু নাক তার।
নাম লেখে ওষুধের,
এ দেশের পণ্ডদের
সাধ্য কী পড়ে তাহা
এই বড়ো জাঁক তার।
যেথা যায় বাড়ি বাড়ি
দেখে যে ছেড়েছে নাড়ী,
পাওনাটা আদায়ের
মেলে না যে ফাঁক তার।
গেছে নির্বাক্‌পুরে
ভক্তের ঝাঁক তার।

৭৭

ইয়ারিং ছিল তার দু কানেই।
গেল যবে স্যাকরার দোকানেই
মনে প'ল, গয়না তো চাওয়া যায়,
আরেকটা কান কোথা পাওয়া যায়—
সে কথাটা নোটবুকে টোকা নেই।
মাসি বলে, 'তোর মতো বোকা নেই

৭৮

লটারিতে পেল পীতু
হাজার পঁচাত্তর,
জীবনী লেখার লোক
জুটিল সে-মাত্তর।

যখনি পড়িল চোখে
চেহারাটা চেক্‌টার
'আমি পিসে' কহে এসে
ড্রেন্‌ইন্‌স্‌পেক্‌টার।
গুরু-ট্রেনিঙের এক
পিলেওয়ালা ছাত্তর
অযাচিত এল তার
কন্যার পাত্তর।

৭৯

চিন্তাহরণ দালালের বাড়ি
গিয়ে
একশো টাকার একখানি নোট
দিয়ে
তিনখানা নোট আনে সে
দশ টাকার।

কাগজ-গন্‌তি মুনফা যতই
বাড়ে
টাকার গন্‌তি লক্ষ্মী ততই
ছাড়ে,
কিছুতে বুঝিতে পারে না
দোষটা কার।

৮০

জিরাফের বাবা বলে—
 'খোকা তোর দেহ
দেখে দেখে মনে মোর
 ক'মে যায় স্নেহ।
সামনে বিষম উঁচু,
 পিছনেতে খাটো,
এমন দেহটা নিয়ে
 কী করে যে হাঁটো।'

খোকা বলে, 'আপনার
 পানে তুমি চেহো,
মা যে কেন ভালোবাসে
 বোঝে না তা কেহ।'

৮১

যখন জলের কল
 হয়েছিল পুলতায়
সাহেবে জানালো খুড়,
 ভয়ে দেবে জল তায়।
ঘড়াগুলো পেত যদি
শহরে বহাত নদী,
পারে নি যে সে কেবল
 কুমোরের খলতায়।

৮২

মহারাজা ভয়ে থাকে
 পুলিসের থানাতে,
আইন বানায় যত
 পারে না তা মানাতে।

চর ফিরে ডাকে ডাকে—
সাধু যদি ছাড়া থাকে
খোঁজ পেলে নৃপতিরে
হয় তাহা জানাতে,
রক্ষা করিতে তারে
রাখে জেলখানাতে।

৮৩

বাংলাদেশের মানুষ হয়ে
ছুটিতে ধাও চিতোরে,
কাঁচড়াপাড়ায় জলহাওয়াটা
লাগল এতই তিতো রে ?

মরিস ভয়ে ঘরের প্রিয়ার,
পালাস ভয়ে ম্যালেরিয়ার,
হায় রে ভীরু, রাজপুতানার
ভূত পেয়েছে কী তোরে।
লড়াই ভালোবাসিস, সে তো
আছেই ঘরের ভিতরে।

৮৪

ডাকাতের সাড়া পেয়ে
তাড়াতাড়ি ইজেরে
চোখ ঢেকে মুখ ঢেকে
ঢাকা দিল নিজেরে।

পেটে ছুরি লাগালো কি,
প্রাণ তার ভাগালো কি,
দেখতে পেল না কালু
হল তার কী যে রে !

৮৫

গণিতে রেলেটিভিটি প্রমাণের ভাব্‌নায়
দিনরাত একা ব'সে কাটালো সে পাব্‌নায়—
নাম তার চুনিলাল, ডাক নাম ঝোড়্‌কে।
১ গুলো সবই ১ সাদা আর কালো কি,
গণিতের গণনায় এ মতটা ভালো কি।
অবশেষে সাম্যের সামলাবে তোড় কে।

একের বহর কভু বেশি কভু কম হবে,
এক রীতি হিসাবের তবুও কি সম্ভবে।
৭ যদি বাঁশ হয়, ৩ হয় খড়কে,
তবু শুধু ১০ দিয়ে জুড়বে সে জোড় কে

যোগ যদি করা যায় হিড়িম্বা কুন্তীতে,
সে কি ২ হতে পারে গণিতের গুন্‌তিতে।
যতই না কষে নাও মোচা আর থোড়কে
তার গুণফল নিয়ে আঁক যাবে ভড়কে।

৮৬

তম্বুরা কাঁধে নিয়ে
শর্মা বাণেশ্বর
ভেবেছিল, তীর্থেই
যাবে সে থানেশ্বর।
হঠাৎ খেয়াল চাপে গাইয়ের কাজ নিতে—
বরাবর গেল চলে একদম গাজ্‌নিতে,
পাঠানের ভাব দেখে
ভাঙিল গানের স্বর।

৮৭

নিদ্রা-ব্যাপার কেন
হবেই অবাধ্য,
চোখ-চাওয়া ঘুম হোক
মানুষের সাধ্য—
এম. এস্‌সি বিভাগের ব্রিলিয়ান্ট্ ছাত্র
এই নিয়ে সন্ধান করে দিনরাত্র,
বাজায় পাড়ার কানে
নানাবিধ বাদ্য,
চোখ-চাওয়া ঘটে তাহে,
নিদ্রার শ্রাদ্ধ।

৮৮

দিন চলে না যে, নিলেমে চড়েছে
খাট-টিপাই।
ব্যাবসা ধরেছি গল্পেরে করা
নাট্য-fy।
ক্রিটিক মহল করেছি ঠাণ্ডা,
মুর্গি এবং মুর্গি-আণ্ডা
খেয়ে করে শেষ, আমি হাড় দুটি-
চারটি পাই—
ভোজন-ওজনে লেখা ক'রে দেয়
certify।

৮৯

জান তুমি, রাত্তিরে
নাই মোর সাথি আর—
ছোটোবউ, জেগে থেকো,
হাতে রেখো হাতিয়ার।
যদি করে ডাকাতি,
পারি নে যে তাকাতেই,

আছে এক ভাঙা বেত
আছে ছেঁড়া ছাতি আর।
ভাঙতে চায় না ঘুম,
তা না হলে ধুমাধুম্
লাগাতেম কিল ঘুষি
চালাতেম লাথি আর

৯০

পণ্ডিত কুমিরকে
ডেকে বলে, 'নক্র,
প্রখর তোমার দাঁত,
মেজাজটা বক্র।
আমি বলি নখ তব
করো তুমি কর্তন,
হিংস্র স্বভাব তবে
হবে পরিবর্তন
আমিষ ছাড়িয়া যদি
শুধু খাও তক্র।'

৯১

শ্বশুরবাড়ির গ্রাম,
নাম তার কুলকাঁটা,
যেতে হবে উপেনের—
চাই তাই চুল-ছাঁটা।
নাপিত বললে, 'কাঁচি
খুঁজে যদি পাই বাঁচি—
ক্ষুর আছে, একেবারে
করে দেব মূল-ছাঁটা।
জেনো বাবু, তা হলেই
বেঁচে যায় ভুল-ছাঁটা।'

৯২

খড়দয়ে যেতে যদি সোজা এস খুল্না
যত কেন রাগ করো, কে বলে তা ভুল না।

মালা গাঁথা পণ ক'রে আন যদি আমড়া,
রাগ করে বেত মেরে ফাটাও-না চামড়া,
তবুও বলতে হবে— ও জিনিস ফুল না।

বেঞ্চিতে বসে তুমি বল যদি 'দোল দাও',
চটে-মটে শেষে যদি কড়া কড়া বোল দাও,
পষ্ট বুঝিয়ে দেব— ওটা নয় ঝুল্না।

যদি বা মাথার গোলে ঘরে এসে বসবার
হাটুতে বুরুষ করো একমনে দশবার,
কী করি, বলতে হবে— ওখানে তো চুল না

৯৩

নীলুবাবু বলে, 'শোনো
নেয়ামৎ দর্জি,
পুরোনো ফ্যাশানটাতে
নয় মোর মর্জি।'
শুনে নিয়ামৎ মিঞা যতনে পঁচিশটে
সম্মুখে ছিদ্র, বোতাম দিল পৃষ্ঠে।
লাফ দিয়ে বলে নীলু, 'এ কী আশ্চর্যি!'
ঘরের গৃহিণী কয়, 'রয় না তো ধর্যি।'

৯৪

বিড়ালে মাছেতে হল সখ্য।
বিড়াল কহিল, 'ভাই ভক্ষ্য,
বিধাতা স্বয়ং জেনো সর্বদা কন তোরে—
ঢোকো গিয়ে বন্ধুর রসময় অন্তরে,
সেখানে নিজেরে তুমি সযতনে রক্ষ।

ঐ দেখো পুকুরের ধারে আছে ঢালু ডাঙা,
ঐখানে শয়তান বসে থাকে মাছরাঙা,
কেন মিছে হবে ওর চক্ষুর লক্ষ্য !'

৯৫

হরপণ্ডিত বলে, 'ব্যঞ্জন সন্ধি এ,
পড়ো দেখি, মন্টুবাবা, একটুকু মন দিয়ে।'

মনোযোগহন্ত্রীর
বেড়ি আর খন্তির
ঝংকার মনে পড়ে ; হেঁসেলের পন্থার
ব্যঞ্জন-চিন্তায় অস্থির মন তার।
থেকে থেকে জল পড়ে চক্ষুর কোণ দিয়ে।

৯৬

ঝিনেদার জানদার
ছেলেটার জন্যে
ত্রিচিনাপল্লী গিয়ে
খুঁজে পেল কন্যে।

শহরেতে সব-সেরা
ছিল যেই বিবেচক
দেখে দেখে বললে সে—
'কিবে নাক, কিবে চোখ ;
চুলের ডগার খুঁত
বুঝবে না অন্যে।'

কন্যেকর্তা শুনে
ঘটকের কানে কয়—

'ওটুকু ত্রুটির তরে
করিস নে কোনো ভয় ;
ক'খানা মেয়েকে বেছে
আরো তিনজন নে,
তাতেও না ভরে যদি
ভরি কয় পণ নে।'

৯৭

খুদিরাম ক'সে টান
দিল খেলো হুঁকোতে—
গেল সারবান কিছু
অন্তরে ঢুকোতে।
অবশেষে হাঁড়ি শেষ
করি রসগোল্লার
রোদে বসে খুদুবাবু
গান ধরে মোল্লার ;
বলে, 'এতখানি রস
দেহ থেকে চুকোতে
হবে তাকে ধোঁয়া দিয়ে
সাত দিন শুকোতে।'

৯৮

প্রাইমারি ইস্কুলে
প্রায়-মারা পণ্ডিত
সব কাজ ফেলে রেখে
ছেলে করে দণ্ডিত।
নাকে খত দিয়ে দিয়ে
ক্ষয়ে গেল যত নাক,
কথা-শোনবার পথ
টেনে টেনে করে ফাঁক।

ক্লাসে যত কান ছিল
সব হল খণ্ডিত,
বেঞ্চিটেঞ্চিগুলো
লণ্ডিত ভণ্ডিত।

৯৯

জন্মকালেই ওর লিখে দিল কুষ্ঠি,
ভালো মানুষের 'পরে চালাবে ও মুষ্টি।

যতই প্রমাণ পায় বাবা বলে, 'মোদ্দা,
কভু জন্মে নি ঘরে এত বড়ো যোদ্ধা।'
'বেঁচে থাকলেই বাঁচি' বলে ঘোষগুষ্টি—
এত গাল খায় তবু এত পরিপুষ্টি।

১০০

টাকা সিকি আধুলিতে
ছিল তার হাত জোড়া;
সে-সাহসে কিনেছিল
পান্তোয়া সাত ঝোড়া।

ফুঁকে দিয়ে কড়াকড়ি
শেষে হেসে গড়াগড়ি;
ফেলে দিতে হল সব—
আলুভাতে পাত-জোড়া।

১০১

বেলা আটটার কমে
খোলে না তো চোখ সে।
সামলাতে পারে না যে
নিদ্রার ঝোঁক সে।
জরিমানা হলে বলে—
'এসেছি যে মা ফেলে,

আমার চলে না দিন
মাইনেটা না পেলে।
তোমার চলবে কাজ
যে ক'রেই হোক সে,
আমারে অচল করে
মাইনের শোক সে।'

১০২

বশীরহাটেতে বাড়ি
বশ-মানা ধাত তার,
ছেলে বুড়ো যে যা বলে
কথা শোনে যার-তার।

দিনরাত সর্বথা
সাধে নিজ খর্বতা,
মাথা আছে হেঁট-করা,
সদা জোড় হাত তার,
সেই ফাঁকে কুকুরটা
চেটে যায় পাত তার।

১০৩

নাম তার চিন্তুলাল
হরিরাম মোতিভয়,
কিছুতে ঠকায় কেউ
এই তার অতি ভয়।
সাতানব্বই থেকে
তেরোদিন ব'কে ব'কে
বারোতে নামিয়ে এনে
তবু ভাবে, গেল ঠকে।
মনে মনে আঁক কষে,
পদে পদে ক্ষতি-ভয়।

কষ্টে কেরানি তার
টিঁকে আছে কতিপয়

১০৪

হাজারিবাগের ঝোপে হাজারটা হাই
তুলেছিল হাজারটা বাঘে,
ময়মন্‌সিংহের মাসতুত ভাই
গর্জি উঠিল তাই রাগে।
খেঁকশেয়ালের দল শেয়ালদহর
হাঁচি শুনে হেসে মরে অষ্টপ্রহর,
হাতিবাগানের হাতি ছাড়িয়া শহর
ভাগলপুরের দিকে ভাগে—
গিরিডির গিরগিটি মস্ত-বহর
পথ দেখাইয়া চলে আগে।
মহিশূরে মহিষটা খায় অড়হর—
খামকাই তেড়ে গিয়ে লাগে।

১০৫

স্বপ্ন হঠাৎ উঠল রাতে
প্রাণ পেয়ে,
মৌন হতে ত্রাণ পেয়ে।
ইন্দ্রলোকের পাগ্‌লাগারদ
খুলল তারই দ্বার,
পাগল ভুবন দুদ্দাড়িয়া
ছুটল চারিধার—
দারুণ ভয়ে মানুষগুলোর
চক্ষে বারিধার,
বাঁচল আপন স্বপন হতে
খাটের তলায় স্থান পেয়ে।

সংযোজন

১

পাবনায় বাড়ি হবে, গাড়ি গাড়ি ইঁট কিনি,
রাঁধুনিমহল-তরে করোগেট-শীট্ কিনি।
ধার ক'রে মিস্ত্রির সিকি বিল চুকিয়েছি,
পাওনাদারের ভয়ে দিনরাত লুকিয়েছি,
শেষে দেখি জানলায় লাগে নাকো ছিট্‌কিনি।
দিনরাত দুড়্‌দাড়্‌ কী বিষম শব্দ যে,
তিনটে পাড়ার লোক হয়ে গেল জব্দ যে,
ঘরের মানুষ করে খিট্ খিট্ খিট্‌কিনি।

কী করি না ভেবে পেয়ে মথুরায় দিনু পাড়ি,
বাজে খরচের ভয়ে আরেকটা পাকাবাড়ি
বানাবার মতলবে পোড়ো এক ভিট কিনি।
তিনতলা ইমারত শোভা পায় নবাবেরই,
সিঁড়িটা রইল বাকি চিহ্ন সে অভাবেরই,
তাই নিয়ে গৃহিণীর কী যে নাক-সিট্‌কিনি।

শান্তিনিকেতন
৫ বৈশাখ ১৩৪৪

২

বালিশ নেই, সে ঘুমোতে যায় মাথার নীচে ইঁট দিয়ে।
কাঁথা নেই, সে প'ড়ে থাকে রোদের দিকে পিঠ দিয়ে।
শশুর বাড়ি নেমন্তন্ন, তাড়াতাড়ি তারই জন্য
ছেঁড়া গামছা পরেছে সে তিনটে-চারটে গিঁঠ দিয়ে।
ভাঙা ছাতার বাঁটখানাতে ছড়ি ক'রে চায় বানাতে,
রোদে মাথা স্নিগ্ধ করে ঠাণ্ডা জলের ছিট দিয়ে।
হাসির কথা নয় এ মোটে, খেঁকশেয়ালিই হেসে ওঠে
যখন রাতে পথ করে সে হতভাগার ভিট দিয়ে।

৩

পাঁচদিন ভাত নেই, দুধ একরত্তি—
জ্বর গেল, যায় না যে তবু তার পথ্যি।

সেই চলে জলসাবু, সেই ডাক্তারবাবু,
কাঁচা কুলে আমড়ায় তেমনি আপত্তি।

ইস্কুলে যাওয়া নেই সেইটে যা মঙ্গল—
পথ খুঁজে ঘুরিনেকো গণিতের জঙ্গল।
কিন্তু যে বুক ফাটে দূর থেকে দেখি মাঠে
ফুটবল-ম্যাচে জমে ছেলেদের দঙ্গল।

কিনুরাম পণ্ডিত, মনে পড়ে, টাক তার—
সমান ভীষণ জানি চুনিলাল ডাক্তার।
খুলে ওষুধের ছিপি হেসে আসে টিপিটিপি—
দাঁতের পাটিতে দেখি, দুটো দাঁত ফাঁক তার।

জ্বরে বাঁধে ডাক্তারে, পালাবার পথ নেই;
প্রাণ করে হাঁসফাঁস যত থাকি যত্নেই।
জ্বর গেলে মাস্টারে গিঁঠ দেয় ফাঁসটারে—
আমারে ফেলেছে সেরে এই দুটি রত্নেই।

উদয়ন
শান্তিনিকেতন
১৫।৯।৩৮

৪

মানিক কহিল, 'পিঠ পেতে দিই দাঁড়াও।
আম দুটো ঝোলে, ওর দিকে হাত বাড়াও।
উপরের ডালে সবুজে ও লালে
ভরে আছে, কষে নাড়াও।
নীচে নেমে এসে ছুরি দিয়ে শেষে
ব'সে ব'সে খোসা ছাড়াও।
যদি আসে মালি চোখে দিয়ে বালি
পারো যদি তারে তাড়াও।
বাকি কাজটার মোর 'পরে ভার,
পাবে না শাঁসের সাড়াও।
আঁঠি যদি থাকে দিয়ো মালিটাকে,
মাড়াব না তার পাড়াও।

পিসিমা রাগিলে   তাঁর চড়ে ফিলে
বাঁদরামি-ভূত   ঝাড়াও।'

৫

ভোতনমোহন স্বপ্ন দেখেন, চড়েছেন চৌঘুরি।
মোচার খোলার গাড়িতে তাঁর ব্যাঙ দিয়েছেন জুড়ি।
পথ দেখালো মাছরাঙাটায়,   দেখল এসে চিংড়িঘাটায়—
ঝুম্‌কো ফুলের বোঝাই নিয়ে মোচার খোলা ভাসে।
খোকনবাবু বিষম খুশি খিল্‌খিলিয়ে হাসে।

উত্তরায়ণ
৫।২।৩৮

৬

গিন্নির কানে শোনা   ঘটে অতি সহজেই
'গিনি সোনা এনে দেব'   কানে কানে কহ যেই।
না হলে তোমারি কানে   দুর্গ্রহ টেনে আনে,
অনেক কঠিন শোনা— চুপ করে রহ যেই।

৭

খাঁক কহে শূন্যেতে মজো রে,
নিরাধার সত্যেরে ভজো রে।
এত বলি যত চায় শূন্যেতে ওড়াটা
কিছুতে কিছু-না-পানে পৌঁছে না ঘোড়াটা,
চাবুক লাগায় তারে সজোরে।
ছুটে মরে সারারাত, ছুটে মরে সারাদিন—
হয়রান হয়ে তবু আমিহীন ঘোড়াহীন
আপনারে নাহি পড়ে নজরে।

৮

ট্রাম্‌-কন্‌ডাক্টার,
হুইসেলে ফুঁক দিয়ে   শহরের বুক দিয়ে
গাড়িটা চালায়, তার সীমা নেই ডাকটার।

বারো-আনা ফাঁকা তার মাথাটার তেলো যে,
চিরুনির চালাচালি শেষ হয়ে এল যে।
বিধাতার নিজ হাতে ঝাঁট-দেওয়া ফাঁকটার
কিছু চুল দুপাশেতে ফুটপাথ আছে পেতে,
মাঝে বড়ো রাস্তাটা বুক জুড়ে টাকটার।

৯

মাস্টার বলে, 'তুমি দেবে ম্যাট্রিক,
এক লাফে দিতে চাও হবে না সে ঠিক।
ঘরে দাদামশায়ের দেখো example,
সত্তর বৎসরও হয়নিকো ample।
একদা পরীক্ষায় হবে উত্তীর্ণ
যখন পাকবে চুল, হাড় হবে জীর্ণ।'

১০

তিনকড়ি। তোল্‌পাড়িয়ে উঠল পাড়া,
তবু কর্তা দেন না সাড়া! জাগুন শিগ্‌গির জাগুন্।
কর্তা। এলারামের ঘড়িটা যে
চুপ রয়েছে, কই সে বাজে—
তিনকড়ি। ঘড়ি পরে বাজবে, এখন ঘরে লাগল আগুন।
কর্তা। অসময়ে জাগলে পরে
ভীষণ আমার মাথা ধরে—
তিনকড়ি। জানলাটা ঐ উঠল জ্বলে, ঊর্ধ্বশ্বাসে ভাগুন।
কর্তা। বড্ড জ্বালায় তিনকড়িটা—
তিনকড়ি। জ্বলে যে ছাই হল ভিটা,
ফুটপাথে ঐ বাকি ঘুমটা শেষ করতে লাগুন।

১১

গাড়িতে মদের পিপে ছিল তেরো-চোদ্দো,
এঞ্জিনে জল দিতে দিল ভুলে মদ্য।
চাকাগুলো ধেয়ে করে ধানখেত-ধ্বংশন,
বাঁশি ডাকে কেঁদে কেঁদে 'কোথা কান্থ জংশন'—

ট্রেন করে যাতলামি নেহাত অবোধ্য,
সাবধান করে দিতে কবি লেখে পদ্য।

১২

রায়ঠাকুরানী অম্বিকা।
দিনে দিনে তাঁর বাড়ে বাণীটার লম্বিকা।
অবকাশ নেই তবুও তো কোনো গতিকে
নিজে ব'কে যান, কহিতে না দেন পতিকে।
নারীসমাজের তিনি তোরণের স্তম্ভিকা।
সয় নাকো তাঁর দ্বিতীয় কাহারো দম্ভিকা।

১৩

জর্মন প্রোফেসার দিয়েছেন গোঁফে সার কত যে!
উঠেছে ঝাঁকড়া হয়ে খোঁচা-খোঁচা ছাঁটা ছাঁটা—
দেখে তাঁর ছাত্রের ভয়ে গায়ে দেয় কাঁটা,
মাটির পানেতে চোখ নত যে।
বৈদিক ব্যাখ্যায় বাণী তাঁর মুখে এসে
যে নিমেষে পা বাড়ান ওষ্ঠের দ্বারদেশে
চরণকমল হয় ক্ষত যে।

১৪

হাত দিয়ে পেতে হবে কী তাহে আনন্দ—
হাত পেতে পাওয়া যাবে সেটাই পছন্দ।
আপিসেতে খেটে মরা তার চেয়ে ঝুলি ধরা
ঢের ভালো— এ কথায় নাই কোনো সন্দ।

১৫

দোতলায় ধুপ্‌ধাপ্‌ হেমবাবু দেয় লাফ,
মা বলেন, একি খেলা ভূতের নাচন নেচে?
নাকি সুরে বলে হেমা, 'চলতে যে পারি নে, মা,
সকালে সর্দি লেগে যেমনি উঠেছি হেঁচে
অমনি যে খচ্‌ করে পা আমার মচ্‌কেছে।'

১৬

কনে দেখা হয়ে গেছে, নাম তার চন্দনা ;
তোমারে মানাবে ভায়া, অতিশয় মন্দ না।
লোকে বলে, খিট্‌খিটে, মেজাজটা নয় মিঠে—
দেবী ভেবে নেই তারে করিলে বা বন্দনা।
কুঁজো হোক, কালো হোক, কালাও না, অন্ধ না।

১৭

পাতালে বলিরাজার যত বলীরামরা,
ভূতলেতে ঘাসিরাম আর ঘনশ্যামরা,
লড়াই লাগালো বেগে ; ভূমিকম্পন লেগে
চারি দিকে হাহাকার করে ওঠে গ্রামরা।
মানুষ কহিল, 'ক্রমে খবর উঠছে জমে,
সেটা খুব মজা, তবু মরি কেন আমরা।'

১৮

মাঝে মাঝে বিধাতার ঘটে একি ভুল—
ধান পাকাবার মাসে ফোটে বেলফুল।
হঠাৎ আনাড়ি কবি তুলি হাতে আঁকে ছবি,
অকারণে কাঁচা কাজে পেকে যায় চুল।

১৯

পেন্‌সিল টেনেছিনু হপ্তায় সাতদিন,
রবার ঘষেছি শেষে তিনমাস রাতদিন।
কাগজ হয়েছে সাদা ; সংশোধনের বাধা
ঘুচে গেছে, এইবার শিক্ষক হাত দিন—
কিন্তু ছবির কোণে স্বাক্ষর বাদ দিন।

২০

বলিয়াছিনু মামারে—
তোমারি ঐ চেহারাখানি কেন গো দিলে আমারে।
তখনো আমি জন্মি নি তো, নেহাত ছিনু অপরিচিত,
আগেভাগেই শাস্তি এমন, এ কথা মনে ঘা মারে।
হাড় ক'খানা চামড়া দিয়ে ঢেকেছ কেন চামারে।

২১

কাঁধে মই, বলে 'কই ভুঁইচাঁপা গাছ',
দইভাঁড়ে ছিপ ছাড়ে, খোঁজে কইমাছ,
ঘুঁটেছাই মেখে লাউ রাঁধে ঝাউপাতা—
কী খেতাব দেব তায় ঘুরে যায় মাথা।

২২

শিমুল রাঙা রঙে চোখেরে দিল ভ'রে।
নাকটা হেসে বলে, 'হায় রে যাই ম'রে।'
নাকের মতে, গুণ কেবলি আছে ঘ্রাণে,
রূপ যে রঙ খোঁজে নাকটা তা কি জানে।

২৩

আইডিয়াল নিয়ে থাকে, নাহি চড়ে হাঁড়ি।
প্র্যাক্‌টিক্যাল লোকে বলে, এ যে বাড়াবাড়ি।
শিবনেত্র হল বুঝি, এইবার মোলো—
অক্সিজেন নাকে দিয়ে চাঙ্গা ক'রে তোলো।

২৪

খুব তার বোলচাল, সাজ ফিটফাট,
তক্‌রার হলে আর নাই মিট্‌মাট্।
চশমায় চম্‌কায়, আড়ে চায় চোখ—
কোনো ঠাঁই ঠেকে নাই কোনো বড়ো লোক।

ছড়ার ছবি

ভূমিকা

এই ছড়াগুলি ছেলেদের জন্যে লেখা। সবগুলো মাথায় এক নয়; রোলার চালিয়ে প্রত্যেকটি সমান সুগম করা হয় নি। এর মধ্যে অপেক্ষাকৃত জটিল যদি কোনোটা থাকে তবে তার অর্থ হবে কিছু দুরূহ, তবু তার ধ্বনিতে থাকবে সুর। ছেলেমেয়েরা অর্থ নিয়ে নালিশ করবে না, খেলা করবে ধ্বনি নিয়ে। ওরা অর্থলোভী জাত নয়।

ছড়ার ছন্দ প্রাকৃত ভাষার ঘরাও ছন্দ। এ ছন্দ মেয়েদের মেয়েলি আলাপ, ছেলেদের ছেলেমি প্রলাপের বাহনগিরি করে এসেছে। ভদ্র-সমাজে সভাযোগ্য হবার কোনো খেয়াল এর মধ্যে নেই। এর ভঙ্গীতে এর সজ্জায় কাব্যসৌন্দর্য সহজে প্রবেশ করে, কিন্তু সে অজ্ঞাতসারে। এই ছড়ায় গভীর কথা হালকা চালে পায়ে নূপুর বাজিয়ে চলে, গাম্ভীর্যের গুমোর রাখে না। অথচ এই ছড়ার সঙ্গে ব্যবহার করতে গিয়ে দেখা গেল, যেটাকে মনে হয় সহজ সেটাই সব চেয়ে কম সহজ।

ছড়ার ছন্দকে চেহারা দিয়েছে প্রাকৃত বাংলা শব্দের চেহারা। আলোর স্বরূপ সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানে দুটো উলটো কথা বলে। এক হচ্ছে আলোর রূপ ঢেউয়ের রূপ, আর হচ্ছে সেটা কণাবৃষ্টির রূপ। বাংলা সাধুভাষার রূপ ঢেউয়ের, বাংলা প্রাকৃত-ভাষার রূপ কণাবৃষ্টির। সাধু-ভাষার শব্দগুলি গায়ে গায়ে মিলিয়ে গড়িয়ে চলে, শব্দগুলির ধ্বনি স্বরবর্ণের মধ্যবর্তিতায় আঁট বাঁধতে পারে না। দৃষ্টান্ত যথা— শমন-দমন রাবণ রাজা, রাবণদমন রাম। বাংলা প্রাকৃত ভাষায় হসন্ত-প্রধান ধ্বনিতে ফাঁক বুজিয়ে শব্দগুলিকে নিবিড় করে দেয়। পাতলা, আঁজলা, বাদলা, পাপড়ি, চাঁদনি প্রভৃতি নিরেট শব্দগুলি সাধুভাষার ছন্দে গুরুপাক।

সাধুভাষার ছন্দে ভদ্র বাঙালি চলতে পারে না, তাকে চলিতে হয়, বসতে তার নিষেধ, বসিতে সে বাধ্য।

ছড়ার ছন্দটি যেমন ঘেঁষাঘেঁষি শব্দের জায়গা, তেমনি সেই সব ভাবের উপযুক্ত— যারা অসতর্ক চালে ঘেঁষাঘেঁষি করে রাস্তায় চলে, যারা পদাতিক, যারা রথচক্রের মোটা চিহ্ন রেখে যায় না পথে পথে, যাদের হাটে মাঠে যাবার পায়ে-চলার-চিহ্ন ধুলোর উপর পড়ে আর লোপ পেয়ে যায়।

শান্তিনিকেতন
২ আশ্বিন ১৩৪৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বৌমাকে

ছড়ার ছবি

জলযাত্রা

নৌকো বেঁধে কোথায় গেল, যা ভাই মাঝি ডাকতে,
মহেশগঞ্জে যেতে হবে শীতের বেলা থাকতে।
পাশের গাঁয়ে ব্যাবসা করে ভায়ে আমার বলাই,
তার আড়তে আসব বেচে খেতের নতুন কলাই।
সেখান থেকে বাদুড়ঘাটা আন্দাজ তিনপোয়া,
যতুঘোষের দোকান থেকে নেব খইয়ের মোয়া।
পেরিয়ে যাব চন্দনীদ' মুন্সিপাড়া দিয়ে,
মালসি যাব, পুঁটকি সেথায় থাকে মায়ে ঝিয়ে।
ওদের ঘরে সেরে নেব দুপুরবেলার খাওয়া;
তার পরেতে মেলে যদি পালের যোগ্য হাওয়া
একপহরে চলে যাব মুখ্‌লুচরের ঘাটে,
যেতে যেতে সন্ধে হবে খড়কেডাঙার হাটে।
সেথায় থাকে নওয়াপাড়ায় পিসি আমার আপন,
তার বাড়িতে উঠব গিয়ে, করব রাত্রিযাপন।
তিন পহরে শেয়ালগুলো উঠবে যখন ডেকে
ছাড়ব শয়ন ঝাউয়ের মাথায় শুকতারাটি দেখে।
লাগবে আলোর পরশমণি পুব আকাশের দিকে,
একটু ক'রে আঁধার হবে ফিকে।
বাঁশের বনে একটি-দুটি কাক
দেবে প্রথম ডাক।
সদর পথের ঐ পারেতে গোঁসাইবাড়ির ছাদ
আড়াল করে নামিয়ে নেবে একাদশীর চাঁদ।
উস্‌খুস্‌ করবে হাওয়া শিরীষ গাছের পাতায়,
রাঙা রঙের ছোঁয়া দেবে দেউল-চুড়োর মাথায়।

বোষ্টমি সে ঠুনুঠুনু বাজাবে মন্দিরা,
সকালবেলায় কাজ আছে তার নাম শুনিয়ে ফিরা।
ছেলেদুলে পোষা হাঁসের দল
যেতে যেতে জলের পথে করবে কোলাহল।
আমারও পথ হাঁসের যে-পথ, জলের পথে যাত্রী,
ভাসতে যাব ঘাটে ঘাটে ফুরোবে যেই রাত্রি।
সাঁতার কাটব জোয়ার-জলে পৌঁছে উজিরপুরে,
শুকিয়ে নেব ভিজে ধুতি বালিতে রোদ্দুরে।
গিয়ে ভজনঘাটা
কিনব বেগুন পটোল মুলো, কিনব সজনেডাঁটা।
পৌঁছব আটবাঁকে,
সূর্য উঠবে মাঝগগনে, মহিষ নামবে পাঁকে।
কোকিল-ডাকা বকুল-তলায় রাঁধব আপন হাতে,
কলার পাতায় মেখে নেব গাওয়া ঘি আর ভাতে।
মাখনাগাঁয়ে পাল নামাবে, বাতাস যাবে থেমে;
বনঝাউ-ঝোপ রঙিয়ে দিয়ে সূর্য পড়বে নেমে।
বাঁকাদিঘির ঘাটে যাব যখন সন্ধে হবে
গোষ্ঠে-ফেরা ধেনুর হাম্বারবে।
ভেঙে-পড়া ডিঙির মতো হেলে-পড়া দিন
তারা-ভাসা আঁধার-তলায় কোথায় হবে লীন।

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

ভজহরি

হংকঙেতে সারাবছর আপিস করেন মামা,
সেখান থেকে এনেছিলেন চীনের দেশের জামা,
দিয়েছিলেন মাকে,
ঢাকার নীচে যখন-তখন শিস দিয়ে সে ডাকে।

নিচিনপুরের বনের থেকে ঝুলির মধ্যে ক'রে
ভজহরি আনত ফড়িঙ ধরে।
পাড়ায় পাড়ায় যত পাখি খাঁচায় খাঁচায় ঢাকা
আওয়াজ শুনেই উঠত নেচে, ঝাপট দিত পাখা।
কাউকে ছাতু, কাউকে পোকা, কাউকে দিত ধান,
অসুখ করলে হলুদজলে করিয়ে দিত স্নান।
ভজু বলত, "পোকার দেশে আমিই হচ্ছি দত্যি,
আমার ভয়ে গঙ্গাফড়িঙ ঘুমোয় না একরত্তি।
ঝোপে ঝোপে শাসন আমার কেবলই ধরপাকড়,
পাতায় পাতায় লুকিয়ে বেড়ায় যত পোকামাকড়।"

একদিন সে ফাগুন মাসে মাকে এসে বলল,
"গোধূলিতে মেয়ের আমার বিয়ে হবে কল্য।"
শুনে আমার লাগল ভারি মজা,
এই আমাদের ভজা,
এরও আবার মেয়ে আছে, তারও হবে বিয়ে,
রঙিন চেলির ঘোমটা মাথায় দিয়ে।
সুধাই তাকে, "বিয়ের দিনে খুব বুঝি ধুম হবে?"
ভজু বললে, "খাঁচার রাজ্যে নইলে কি মান রবে।
কেউবা ওরা দাঁড়ের পাখি, পিঁজরেতে কেউ থাকে,
নেমন্তন্ন চিঠিগুলো পাঠিয়ে দেব তাকে।
মোটা মোটা ফড়িঙ দেব, ছাতুর সঙ্গে দই,
ছোলা আনব ভিজিয়ে জলে, ছড়িয়ে দেব খই।
এমনি হবে ধুম,
সাত পাড়াতে চক্ষে কারও রইবে না আর ঘুম।
ময়নাগুলোর খুলবে গলা, খাইয়ে দেব লঙ্কা;
কাকাতুয়া চীৎকারে তার বাজিয়ে দেবে ডঙ্কা।
পায়রা যত ফুলিয়ে গলা লাগাবে বক্‌বকম;
শালিকগুলোর চড়া মেজাজ, আওয়াজ নানারকম।

আসবে কোকিল, চন্দনাদের শুভাগমন হবে,
মন্ত্র শুনতে পাবে না কেউ পাখির কলরবে।
ডাকবে যখন টিয়ে
বরকর্তা রবেন বসে কানে আঙুল দিয়ে।"

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

পিস্‌নি

কিশোরগাঁয়ের পুবের পাড়ায় বাড়ি,
পিস্‌নি বুড়ি চলেছে গ্রাম ছাড়ি।
একদিন তার আদর ছিল, বয়স ছিল ষোলো,
স্বামী মরতেই বাড়িতে বাস অসহ্য তার হল।
আর-কোনো ঠাঁই হয়তো পাবে আর-কোনো এক বাসা,
মনের মধ্যে আঁকড়ে থাকে অসম্ভবের আশা।
অনেক গেছে ক্ষয় হয়ে তার, সবাই দিল ফাঁকি,
অল্প কিছু রয়েছে তার বাকি।
তাই দিয়ে সে তুলল বেঁধে ছোট্ট বোঝাটাকে,
জড়িয়ে কাঁথা আঁকড়ে নিল কাঁখে।
বাঁ হাতে এক ঝুলি আছে, ঝুলিয়ে নিয়ে চলে,
মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে উঠে বসে ধূলির তলে।
সুধাই যবে, কোন্‌ দেশেতে যাবে
মুখে ক্ষণেক চায় সকরুণ ভাবে;
কয় সে দ্বিধায়, "কী জানি ভাই, হয়তো আলম্‌ডাঙা,
হয়তো সান্‌কিভাঙা,
কিংবা যাব পাটনা হয়ে কাশী।"
গ্রাম-সুবাদে কোন্‌কালে সে ছিল যে কার মাসি,
মণিলালের হয় দিদিমা, চুনিলালের মামি—
বলতে বলতে হঠাৎ সে যায় থামি,
স্মরণে কার নাম যে নাহি মেলে।

গভীর নিশ্বাস ফেলে
চুপটি ক'রে ভাবে,
এমন করে আর কতদিন যাবে।
দূরদেশে তার আপন জনা, নিজেরই ঝঞ্ঝাটে
তাদের বেলা কাটে।
তারা এখন আর কি মনে রাখে
এতবড়ো আদরকারি তাকে।
চোখে এখন কম দেখে সে, ঝাপসা যে তার মন,
ভগ্নশেষের সংসারে তার শুকনো ফুলের বন।
স্টেশন-মুখে গেল চলে পিছনে গ্রাম ফেলে,
রাত থাকতে, পাছে দেখে পাড়ার মেয়ে ছেলে।
দূরে গিয়ে, বাঁশবাগানের বিজন গলি বেয়ে
পথের ধারে বসে পড়ে, শূন্যে থাকে চেয়ে।

আলমোড়া
৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

কাঠের সিঙ্গি

ছোটো কাঠের সিঙ্গি আমার ছিল ছেলেবেলায়,
সেটা নিয়ে গর্ব ছিল বীরপুরুষি খেলায়।
গলায় বাঁধা রাঙা ফিতের দড়ি,
চিনেমাটির ব্যাঙ বেড়াত পিঠের উপর চড়ি।
ব্যাঙটা যখন পড়ে যেত ধমকে দিতেম কষে,
কাঠের সিঙ্গি ভয়ে পড়ত বসে।
গাঁ গাঁ করে উঠছে বুঝি, যেমনি হত মনে,
"চুপ করো" যেই ধমকানো আর চমকাত সেইখনে।
আমার রাজ্যে আর যা থাকুক সিংহভয়ের কোনো
সম্ভাবনা ছিল না কখখোনো।
মাংস ব'লে মাটির ঢেলা দিতেম ভাঁড়ের 'পরে,
আপত্তি ও করত না তার তরে।

বুঝিয়ে দিতেম, গোপাল যেমন সুবোধ সবার চেয়ে
তেমনি সুবোধ হওয়া তো চাই যা দেব তাই খেয়ে।
ইতিহাসে এমন শাসন করে নি কেউ পাঠ,
দিবানিশি কাঠের সিঙ্গি ভয়েই ছিল কাঠ।
খুদি কইত মিছিমিছি, "ভয় করছে, দাদা।"
আমি বলতেম, "আমি আছি, থামাও তোমার কাঁদা-
যদি তোমায় খেয়েই ফেলে এমনি দেব মার
দু চক্ষে ও দেখবে অন্ধকার।"
মেজ্‌দিদি আর ছোড়্‌দিদিদের খেলা পুতুল নিয়ে,
কথায় কথায় দিচ্ছে তাদের বিয়ে।
নেমন্তন্ন করত যখন যেতুম বটে খেতে,
কিন্তু তাদের খেলার পানে চাই নি কটাক্ষেতে।
পুরুষ আমি, সিঙ্গিমামা নত পায়ের কাছে,
এমন খেলার সাহস বলো ক'জন মেয়ের আছে।

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

ঝড়

দেখ্‌ রে চেয়ে নামল বুঝি ঝড়,
ঘাটের পথে বাঁশের শাখা ওই করে ধড়ফড়।
আকাশতলে বজ্রপাণির ডঙ্কা উঠল বাজি,
শীঘ্র তরী বেয়ে চল্‌ রে মাঝি।
ঢেউয়ের গায়ে ঢেউগুলো সব গড়ায় ফুলে ফুলে,
পুবের চরে কাশের মাথা উঠছে দুলে দুলে।
ঈশান কোণে উড়তি বালি আকাশখানা ছেয়ে
হু হু করে আসছে ছুটে ধেয়ে।
কাকগুলো তার আগে আগে উড়ছে প্রাণের ভয়ে,
হার মেনে শেষ আছাড় খেয়ে পড়ে মাটির 'পরে।
হাওয়ার বিষম ধাক্কা তাদের লাগছে ক্ষণে ক্ষণে,
উঠছে পড়ছে, পাখার ঝাপট দিতেছে প্রাণপণে।

বিজুলি ধায় দাঁত মেলে তার ডাকিনীটার মতো,
দিক্‌দিগন্ত চমকে ওঠে হঠাৎ মর্মাহত।

ওই রে, মাঝি, খেপল গাঙের জল,
লগি দিয়ে ঠেকা নৌকো, চরের কোলে চল্‌।
সেই যেখানে জলের শাখা, চখাচখীর বাস,
হেথা-হোথায় পলিমাটি দিয়েছে আশ্বাস
কাঁচা সবুজ নতুন ঘাসে ঘেরা।
তলের চরে বালুতে রোদ পোহায় কচ্ছপেরা।
হোথায় জেলে বাঁশ টাঙিয়ে শুকোতে দেয় জাল,
ডিঙির ছাতে বসে বসে সেলাই করে পাল।
রাত কাটাব ঐখানেতেই করব রাঁধাবাড়া,
এখনি আজ নেই তো যাবার তাড়া।
ভোর থাকতে কাক ডাকতেই নৌকো দেব ছাড়ি,
ইটেখোলার মেলায় দেব সকাল সকাল পাড়ি।

আলমোড়া
১২।৬।৩৭

খাটুলি

একলা হোথায় বসে আছে, কেই বা জানে ওকে—
আপন-ভোলা সহজ তৃপ্তি রয়েছে ওর চোখে।
খাটুলিটা বাইরে এনে আঙিনাটার কোণে
টানছে তামাক বসে আপন-মনে।
মাথার উপর বটের ছায়া, পিছন দিকে নদী
বইছে নিরবধি।
আয়োজনের বালাই নেইকো ঘরে,
আমের কাঠের নড়্‌নড়ে এক তক্তপোষের 'পরে
মাঝখানেতে আছে কেবল পাতা
বিধবা তার মেয়ের হাতের সেলাই-করা কাঁথা।
নাতনি গেছে, রাখে তারি পোষা ময়নাটাকে,
তেমনি রুচি গলায় ওকে 'দাদু' ব'লেই ডাকে।

ছেলের গাঁথা ঘরের দেয়াল, চিহ্ন আছে তারি
রঙিন মাটি দিয়ে আঁকা সিপাই সারি সারি।
সেই ছেলেটাই তালুকদারের সর্দারি পদ পেয়ে
জেলখানাতে মরছে পচে দাঙ্গা করতে যেয়ে।
দুঃখ অনেক পেয়েছে ও হয়তো ডুবছে দেনায়,
হয়তো ক্ষতি হয়ে গেছে তিসির বেচাকেনায়।
বাইরে দারিদ্র্যের
কাটা-ছেঁড়ার আঁচড় লাগে ঢের,
তবুও তার ভিতর-মনে দাগ পড়ে না বেশি,
প্রাণটা যেমন কঠিন তেমনি কঠিন মাংসপেশী।
হয়তো গোরু বেচতে হবে মেয়ের বিয়ের দায়ে,
মাসে দুবার ম্যালেরিয়া কাঁপন লাগায় গায়ে,
ডাগর ছেলে চাকরি করতে গঙ্গাপারের দেশে
হয়তো হঠাৎ মারা গেছে ওই বছরের শেষে—
শুকনো করুণ চক্ষু দুটো তুলে উপর-পানে
কার খেলা এই দুঃখসুখের, কী ভাবলে সেই জানে;
বিচ্ছেদ নেই খাটুনিতে, শোকের পায় না ফাঁক,
ভাবতে পারে স্পষ্ট ক'রে নেইকো এমন বাক্।
জমিদারের কাছারিতে নালিশ করতে এসে
কী বলবে যে কেমন ক'রে পায় না ভেবে শেষে।

খাটুনিতে এসে বসে যখনি পায় ছুটি,
ভাব্‌নাগুলো ধোঁয়ায় মেলায়, ধোঁয়ায় ওঠে ফুটি।
ওর যে আছে খোলা আকাশ, ওর যে মাথার কাছে
শিষ দিয়ে যায় বুলবুলিরা আলোছায়ার নাচে,
নদীর ধারে মেঠো পথে টাট্টু চলে ছুটে,
চক্ষু ভোলায় খেতের ফসল রঙের হরির-লুটে—
জন্মমরণ ব্যেপে আছে এরা প্রাণের ধন
অতি সহজ ব'লেই তাহা জানে না ওর মন।

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

ঘরের খেয়া

সন্ধ্যা হয়ে আসে ;
সোনা-মিশোল ধূসর আলো ঘিরল চারিপাশে।

নৌকোখানা বাঁধা আমার মধ্যিখানের গাঙে
অস্তরবির কাছে নয়ন কী যেন ধন মাঙে।
আপন গাঁয়ে কুটীর আমার দূরের পটে লেখা,
ঝাপসা আভায় যাচ্ছে দেখা বেগনি রঙের রেখা।
যাব কোথায় কিনারা তার নাই,
পশ্চিমেতে মেঘের গায়ে একটু আভাস পাই।
হাঁসের দলে উড়ে চলে হিমালয়ের পানে,
পাখা তাদের চিহ্নবিহীন পথের খবর জানে।
শ্রাবণ গেল, ভাদ্র গেল, শেষ হল জল-ঢালা,
আকাশতলে শুরু হল শুভ্র আলোর পালা।
খেতের পরে খেত একাকার প্লাবনে রয় ডুবে,
লাগল জলের দোলযাত্রা পশ্চিমে আর পুবে।
আসন্ন এই আঁধার মুখে নৌকোখানি বেয়ে
যায় কারা ওই শুধাই, "ওগো নেয়ে,
চলেছ কোন্‌খানে।"
যেতে যেতে জবাব দিল, "যাব গাঁয়ের পানে।"
অচিন-শূন্তে-ওড়া পাখি চেনে আপন নীড়,
জানে বিজন-মধ্যে কোথায় আপন জনের ভিড়।
অসীম আকাশ মিলেছে ওর বাসার সীমানাতে,
ওই অজানা জড়িয়ে আছে জানাশোনার সাথে।
তেমনি ওরা ঘরের পথিক ঘরের দিকে চলে
যেথায় ওদের তুলসিতলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ জলে।

দাঁড়ের শব্দ ক্ষীণ হয়ে যায় ধীরে,
মিলায় সুদূর নীরে।

সেদিন দিনের অবসানে সজল মেঘের ছায়ে
আমার চলার ঠিকানা নাই, ওরা চলল গাঁয়ে।

আলমোড়া
২৮।৫।৩৭

যোগীনদা

যোগীনদাদার জন্ম ছিল ডেরাস্মাইলখাঁয়ে।
পশ্চিমেতে অনেক শহর অনেক গাঁয়ে গাঁয়ে
বেড়িয়েছিলেন মিলিটারি জরিপ করার কাজে,
শেষ বয়সে স্থিতি হল শিশুদলের মাঝে।
"জুলুম তোদের সইব না আর" হাঁক চালাতেন রোজই,
পরের দিনেই আবার চলত ওই ছেলেদের খোঁজই।
দরবারে তাঁর কোনো ছেলের ফাঁক পড়বার জো কী—
ডেকে বলতেন, "কোথায় টুনু, কোথায় গেল খোকি।"
"ওরে ভজু, ওরে বাঁদর, ওরে লক্ষ্মীছাড়া।"
হাঁক দিয়ে তাঁর ভারী গলায় মাতিয়ে দিতেন পাড়া।
চার দিকে তাঁর ছোটো বড়ো জুটত যত লোভী
কেউ বা পেত মার্বেল, কেউ গণেশমার্কা ছবি।
কেউ বা লজঞ্জুস,
সেটা ছিল মজলিসে তার হাজরি দেবার ঘুষ।
কাজলি যদি অকারণে করত অভিমান
হেসে বলতেন "হাঁ করো তো", দিতেন ছাঁচি পান।
আপনসৃষ্ট নাতনিও তাঁর ছিল অনেকগুলি,
পাগলি ছিল, পটলি ছিল, আর ছিল জঙ্গুলি।
কেয়া-খয়ের এনে দিত, দিত কাসুন্দিও,
মায়ের হাতের জারকলেবু যোগীনদাদার প্রিয়।

তখনো তাঁর শক্ত ছিল মুগুর-ভাঁজা দেহ,
বয়স যে যাট পেরিয়ে গেছে, বুঝত না তা কেহ।

ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি, চোখদুটি জল্‌জলে,
মুখ যেন তাঁর পাকা আমটি, হয় নি সে থল্‌থলে।
চওড়া কপাল, সামনে মাথায় বিরল চুলের টাক,
গোঁফ জোড়াটার খ্যাতি ছিল, তাই নিয়ে তাঁর জাঁক।

দিন ফুরোত, কুলুঙ্গিতে প্রদীপ দিত জ্বালি,
বেলের মালা হেঁকে যেত মোড়ের মাথায় মালী।
চেয়ে রইতেম মুখের দিকে শান্তশিষ্ট হয়ে,
কাঁসর-ঘণ্টা উঠত বেজে গলির শিবালয়ে।
সেই সেকালের সন্ধ্যা মোদের সন্ধ্যা ছিল সত্যি,
দিন-ভ্যাঙানো ইলেকট্রিকের হয়নিকো উৎপত্তি।
ঘরের কোণে কোণে ছায়া, আঁধার বাড়ত ক্রমে,
মিট্‌মিটে এক তেলের আলোয় গল্প উঠত জমে।
শুরু হলে থামতে তাঁরে দিতেম না তো ক্ষণেক,
সত্যি মিথ্যে যা-খুশি তাই বানিয়ে যেতেন অনেক।
ভূগোল হত উলটো-পালটা, কাহিনী আজগুবি,
মজা লাগত খুবই।
গল্পটুকু দিচ্ছি, কিন্তু দেবার শক্তি নাই তো
বলার ভাবে যে রঙটুকু মন আমাদের ছাইত।

হুশিয়াঁরপুর পেরিয়ে গেল ছন্দোসির গাড়ি,
দেড়টা রাতে সর্‌হরোয়ায় দিল স্টেশন ছাড়ি।
ভোর থাকতেই হয়ে গেল পার
বুলন্দশর আয়োরিসর্গায়।
পেরিয়ে যখন ফিরোজাবাদ এল
যোগীনদাদার বিষম খিদে পেল।
ঠোঙায় ভরা পকৌড়ি আর চলছে মটরভাজা
এমন সময় হাজির এসে জৌনপুরের রাজা।
পাঁচশো-সাতশো লোকলস্কর, বিশপঁচিশটা হাতি,
মাথার উপর ঝালর-দেওয়া প্রকাণ্ড এক ছাতি।

মন্ত্রী এসেই দাদার মাথায় চড়িয়ে দিল তাজ,
বললে, 'যুবরাজ,
আর কতদিন রইবে প্রভু, মোতিমহল ত্যেজে।'
বলতে বলতে রামশিঙা আর ঝাঁঝর উঠল বেজে।

ব্যাপারখানা এই—
রাজপুত্র তেরো বছর রাজভবনে নেই।
সদ্য ক'রে বিয়ে,
নাথদোয়ারার সেগুনবনে শিকার করতে গিয়ে
তার পরে যে কোথায় গেল খুঁজে না পায় লোক।
কেঁদে কেঁদে অন্ধ হল রানীমায়ের চোখ।
খোঁজ পড়ে যায় যেমনি কিছু শোনে কানাঘুষায়,
খোঁজে পিণ্ডিদাদনখাঁয়ে, খোঁজে লালামুসায়।
খুঁজে খুঁজে লুধিয়ানায় ঘুরেছে পঞ্জাবে,
গুলজারপুর হয় নি দেখা, শুনছি পরে যাবে।
চঙ্গামঙ্গা দেখে এল সবাই আলমগিরে,
রাওলপিণ্ডি থেকে এল হতাশ হয়ে ফিরে।

ইতিমধ্যে যোগীনদাদা হাৎরাশ জংশনে
গেছেন লেগে চায়ের সঙ্গে পাঁউরুটি-দংশনে।
দিব্যি চলছে খাওয়া,
তারি সঙ্গে খোলা গায়ে লাগছে মিঠে হাওয়া—
এমন সময় সেলাম করলে জৌনপুরের চর;
জোড় হাতে কয়, 'রাজাসাহেব, কঁহা আপ্‌কা ঘর।'
দাদা ভাবলেন, সম্মানটা নিতান্ত জমকালো,
আসল পরিচয়টা তবে না দেওয়াই তো ভালো।
ভাবখানা তাঁর দেখে চরের ঘনালো সন্দেহ,
এ মানুষটি রাজপুত্রই, নয় কভু আর-কেহ।
রাজলক্ষণ এতগুলো একখানা এই গায়
ওরে বাস রে, দেখে নি সে আর কোনো জায়গায়।

তার পরে মাস পাঁচেক গেছে দুঃখে সুখে কেটে,
হারাধনের খবর গেল জৌনপুরের স্টেটে।
ইস্টেশনে নির্ভাবনায় বসে আছেন দাদা,
কেমন করে কী যে হল লাগল বিষম ধাঁধা।
গুর্খা ফৌজ সেলাম করে দাঁড়ালো চার দিকে,
ইস্টেশনটা ভরে গেল আফগানে আর শিখে।
ঘিরে তাঁকে নিয়ে গেল কোথায় ইটার্সিতে,
দেয় কারা সব জয়ধ্বনি উর্দুতে ফার্সিতে।
সেখান থেকে মৈনপুরী, শেষে লছ্‌মন্‌-ঝোলায়
বাজিয়ে সানাই চড়িয়ে দিল ময়ূরপংখি দোলায়।
দশটা কাহার কাঁধে নিল, আর পঁচিশটা কাহার
সঙ্গে চলল তাঁহার।
ভাটিণ্ডাতে দাঁড় করিয়ে জোরালো দূরবীনে
দখিনমুখে ভালো করে দেখে নিলেন চিনে
বিন্ধ্যাচলের পর্বত।
সেইখানেতে খাইয়ে দিল কাঁচা আমের শর্বৎ।
সেখান থেকে এক পহরে গেলেন জৌনপুরে
পড়ন্ত রোদ্দুরে।

এইখানেতেই শেষে
যোগীনদাদা থেমে গেলেন যৌবরাজ্যে এসে।
হেসে বললেন, "কী আর বলব দাদা,
মাঝের থেকে মটর-ভাজা খাওয়ায় পড়ল বাধা।"
"ও হবে না, ও হবে না" বিষম কলরবে
ছেলেরা সব চেঁচিয়ে উঠল, "শেষ করতেই হবে।"
যোগীনদা কয়, "যাক গে,
বেঁচে আছি শেষ হয় নি ভাগ্যে।
তিনটে দিন না যেতে যেতেই হলেম গলদ্‌ঘর্ম।
রাজপুত্র হওয়া কি, ভাই, যে-সে লোকের কর্ম।

মোটা মোটা পরোটা আর তিন পোয়াটাক ঘি
বাংলাদেশের-হাওয়ায়-মানুষ সইতে পারে কি।
নাগরা জুতায় পা ছিঁড়ে যায়, পাগড়ি মুটের বোঝা,
এগুলি কি সহ্য করা সোজা।
তা ছাড়া এই রাজপুত্রের হিন্দি শুনে কেহ
হিন্দি বলেই করলে না সন্দেহ।
যেদিন দূরে শহরেতে চলছিল রামলীলা
পাহারাটা ছিল সেদিন ঢিলা।
সেই সুযোগে গৌড়বাসী তখনি এক দৌড়ে
ফিরে এল গৌড়ে।
চলে গেল সেই রাত্রেই ঢাকা—
মাঝের থেকে চর পেয়ে যায় দশটি হাজার টাকা।
কিন্তু, গুজব শুনতে পেলেম শেষে,
কানে মোচড় খেয়ে টাকা ফেরত দিয়েছে সে।"

"কেন তুমি ফিরে এলে" চেঁচাই চারিপাশে,
যোগীনদাদা একটু কেবল হাসে।
তার পরে তো শুতে গেলেম, আধেক রাত্রি ধ'রে
শহরগুলোর নাম যত সব মাথার মধ্যে ঘোরে।
ভারতভূমির সব ঠিকানাই ভুলি যদি দৈবে,
যোগীনদাদার ভূগোল-গোলা গল্প মনে রইবে।

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

বুধু

মাঠের শেষে গ্রাম,
সাতপুরিয়া নাম।
চাষের তেমন সুবিধা নেই কৃপণ মাটির গুণে,
পঁয়ত্রিশ ঘর তাঁতির বসত, ব্যাবসা জাজিম বুনে।
নদীর ধারে খুঁড়ে খুঁড়ে পলির মাটি খুঁজে
গৃহস্থেরা ফসল করে কাঁকুড়ে তরমুজে।

ওইখানেতে বালির ডাঙা, মাঠ করছে ধু ধু,
ঢিবির 'পরে বসে আছে গাঁয়ের মোড়ল বুধু।
সামনে মাঠে ছাগল চরছে ক'টা—
শুকনো জমি, নেইকো ঘাসের ঘটা।
কী যে ওরা পাচ্ছে খেতে ওরাই সেটা জানে,
ছাগল ব'লেই বেঁচে আছে প্রাণে।
আকাশে আজ হিমের আভাস, ফ্যাকাশে তার নীল,
অনেক দূরে যাচ্ছে উড়ে চিল।
হেমন্তের এই রোদ্দুরটা লাগছে অতি মিঠে,
ছোটো নাতি মোগ্‌লুটা তার জড়িয়ে আছে পিঠে।
স্পর্শপুলক লাগছে দেহে, মনে লাগছে ভয়—
বেঁচে থাকলে হয়।
গুটি তিনটি মরে শেষে ওইটি সাধের নাতি,
রাত্রিদিনের সাথি!
গোরুর গাড়ির ব্যাবসা বুধুর চলছে হেসে-খেলেই,
নাড়ি ছেঁড়ে এক পয়সা খরচ করতে গেলেই।
কৃপণ ব'লে গ্রামে গ্রামে বুধুর নিন্দে রটে,
সকালে কেউ নাম করে না উপোস পাছে ঘটে।
ওর যে কৃপণতা সে তো ঢেলে দেবার তরে,
যত কিছু জমাচ্ছে সব মোগ্‌লু নাতির 'পরে।
পয়সাটা তার বুকের রক্ত, কারণটা তার ওই—
এক পয়সা আর কারো নয় ওই ছেলেটার বই।
না খেয়ে, না প'রে, নিজের শোষণ ক'রে প্রাণ
যেটুকু রয় সেইটুকু ওর প্রতি দিনের দান।
দেবতা পাছে ঈর্ষাভরে নেয় কেড়ে মোগ্‌লুকে,
আঁকড়ে রাখে বুকে।
এখনো তাই নাম দেয় নি, ডাক নামেতেই ডাকে,
নাম ভাঁড়িয়ে ফাঁকি দেবে নিষ্ঠুর দেবতাকে।

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

চড়িভাতি

ফল ধরেছে বটের ডালে ডালে ;
অফুরন্ত আতিথ্যে তার সকালে বৈকালে
বনভোজনে পাখিরা সব আসছে ঝাঁকে ঝাঁক।
মাঠের ধারে আমার ছিল চড়িভাতির ডাক।
যে যার আপন ভাঁড়ার থেকে যা পেল যেইখানে
মালমসলা নানারকম জুটিয়ে সবাই আনে।
জাত-বেজাতের চালে ডালে মিশোল ক'রে শেষে
ডুমুরগাছের তলাটাতে মিলল সবাই এসে।
বারে বারে ঘটি ভ'রে জল তুলে কেউ আনে,
কেউ চলেছে কাঠের খোঁজে আমবাগানের পানে।
হাঁসের ডিমের সন্ধানে কেউ গেল গাঁয়ের মাঝে,
তিন কন্যা লেগে গেল রান্নাকরার কাজে।
গাঁঠ-পাকানো শিকড়েতে মাথাটা তার থুয়ে
কেউ পড়ে যায় গল্পের বই জামের তলায় শুয়ে।
সকল-কর্ম-ভোলা
দিনটা যেন ছুটির নৌকা বাঁধন-রশি-খোলা
চলে যাচ্ছে আপনি ভেসে সে কোন্ আঘাটায়
যথেচ্ছ ভাঁটায়।
মানুষ যখন পাকা ক'রে প্রাচীর তোলে নাই
মাঠে বনে শৈলগুহায় যখন তাহার ঠাঁই,
সেইদিনকার আল্গা-বিধির বাইরে-ঘোরা প্রাণ
মাঝে মাঝে রক্তে আজও লাগায় মন্ত্রগান।
সেইদিনকার যথেচ্ছ-রস আস্বাদনের খোঁজে
মিলেছিলেম অবেলাতে অনিয়মের ভোজে।
কারো কোনো স্বত্বদাবীর নেই যেখানে চিহ্ন,
যেখানে এই ধরাতলের সহজ দাক্ষিণ্য,
হালকা সাদা মেঘের নীচে পুরানো সেই ঘাসে,
একটা দিনের পরিচিত আমবাগানের পাশে,

মাঠের ধারে, অনভ্যাসের সেবার কাজে খেটে
কেমন ক'রে কয়টা প্রহর কোথায় গেল কেটে।
সমস্ত দিন ডাকল ঘুঘু দুটি,
আশে পাশে এঁটোর লোভে কাক এল সব জুটি,
গাঁয়ের থেকে কুকুর এল, লড়াই গেল বেধে—
একটা তাদের পালালো তার পরাভবের খেদে।

রৌদ্র পড়ে এল ক্রমে, ছায়া পড়ল বেঁকে,
ক্লান্ত গোরু গাড়ি টেনে চলেছে হাট থেকে।
আবার ধীরে ধীরে
নিয়ম-বাঁধা যে-যার ঘরে চলে গেলেম ফিরে।
একটা দিনের মুছল স্মৃতি, ঘুচল চড়িভাতি,
পোড়াকাঠের ছাই পড়ে রয়, নামে আঁধার রাতি

আলমোড়া
আষাঢ় ১৩৪৪

কাশী

কাশীর গল্প শুনেছিলুম যোগীনদাদার কাছে,
পষ্ট মনে আছে।
আমরা তখন ছিলাম না কেউ, বয়েস তাঁহার সবে
বছর-আষ্টেক হবে।
সঙ্গে ছিলেন খুড়ি,
মোরব্বা বানাবার কাজে ছিল না তাঁর জুড়ি।
দাদা বলেন, আমলকি বেল পেঁপে সে তো আছেই,
এমন কোনো ফল ছিল না এমন কোনো গাছেই
তাঁর হাতে রস জমলে লোকের গোল না ঠেকত— এটাই
ফল হবে কি মেঠাই।
রসিয়ে নিয়ে চালতা যদি মুখে দিতেন গুঁজি
মনে হত বড়োরকম রসগোল্লাই বুঝি।

কাঁঠাল বিচির মোরব্বা যা বানিয়ে দিতেন তিনি
পিঠে ব'লে পৌষমাসে সবাই নিত কিনি।
দাদা বলেন, "মোরব্বাটা হয়তো মিছেমিছিই,
কিন্তু মুখে দিতে যদি, বলতে কাঁঠাল বিচিই।"
মোরব্বাতে ব্যাবসা গেল জ'মে,
বেশ কিঞ্চিৎ টাকা জমল ক্রমে।
একদিন এক চোর এসেছে তখন অনেক রাত,
জানলা দিয়ে সাবধানে সে বাড়িয়ে দিল হাত।
খুড়ি তখন চাটনি করতে তেল নিচ্ছেন মেপে,
ধড়াস করে চোরের হাতে জানলা দিলেন চেপে।
চোর বললে 'উহু উহু'; খুড়ি বললেন, 'আহা,
বাঁ হাত মাত্র, এইখানেতেই থেকে যাক না তাহা।'
কেঁদে-কেটে কোনোমতে চোর তো পেল খালাস;
খুড়ি বললেন, 'মরবি, যদি এ ব্যাবসা তোর চালাস।'

দাদা বললেন, "চোর পালালো, এখন গল্প থামাই,
ছ'দিন হয় নি ক্ষৌর করা, এবার গিয়ে কামাই।"
আমরা টেনে বসাই; বলি, "গল্প কেন ছাড়বে।"
দাদা বলেন, "রবার নাকি, টানলেই কি বাড়বে।—
কে ফেরাতে পারে তোদের আবদারের এই জোর,
তার চেয়ে যে অনেক সহজ ফেরানো সেই চোর,
আচ্ছা তবে শোন্, সে মাসে গ্রহণ লাগল চাঁদে,
শহর যেন ঘিরল নিবিড় মানুষ-বোনা ফাঁদে।
খুড়ি গেছেন স্নান করতে বাড়ির ঘাটের পাশে,
আমায় তখন পূর্ণগ্রহণ ভিড়ের রাহুগ্রাসে।
প্রাণটা যখন কণ্ঠাগত, মরছি যখন ভয়ে,
গুণ্ডা এসে তুলে নিল হঠাৎ কাঁধের 'পরে।
তখন মনে হল, এ তো বিষ্ণুদূতের দয়া,
আর-একটুকু দেরি হলেই প্রাপ্ত হতেম গয়া।

বিষ্ণুদূতটা ধরল যখন যমদূতের মূর্তি
এক নিমেষেই একেবারেই ঘুচল আমার স্ফূর্তি।
সাত গলি সে পেরিয়ে শেষে একটা এঁধোঘরে
বসিয়ে আমায় রেখে দিল খড়ের আঁঠির 'পরে।
চোদ্দ আনা পয়সা আছে পকেট দেখি ঝেড়ে,
কেঁদে কইলাম, 'ও পাড়েজি, এই নিয়ে দাও ছেড়ে।'
গুণ্ডা বলে, 'ওটা নেব, ওটা ভালো দ্রব্যই,
আরো নেব চারটি হাজার নয়শো নিরেনব্বই—
তার উপরে আর দু আনা, খুড়িটা তো মরবে,
টাকার বোঝা বয়ে সে কি বৈতরণী তরবে।
দেয় যদি তো দিক চুকিয়ে, নইলে—'পাকিয়ে চোখ
যে ভঙ্গিটা দেখিয়ে দিলে সেটা মারাত্মক।

"এমনসময়, ভাগ্যি ভালো, গুণ্ডাজির এক ভাগ্নি
মূর্তিটা তার রণচণ্ডী, যেন সে রায়বাঘ্‌নি,
আমার মরণদশার মধ্যে হলেন সমাগত
দাবানলের ঊর্ধ্বে যেন কালো মেঘের মতো।
রাত্তিরে কাল ঘরে আমার উঁকি মারল বুঝি,
যেমনি দেখা অমনি আমি রইনু চক্ষু বুজি।
পরের দিনে পাশের ঘরে, কী গলা তার বাপ,
মামার সঙ্গে ঠাণ্ডা ভাষায় নয় সে বাক্যালাপ।
বলছে, 'তোমার মরণ হয় না, কাহার বাছনি ও,
পাপের বোঝা বাড়িয়ো না আর, ঘরে ফেরৎ দিয়ো—
আহা, এমন সোনার টুকরো—' শুনে আগুন মামা;
বিশ্রী রকম গাল দিয়ে কয়, 'মিহি সুরটা থামা।'
এ'কেই বলে মিহি সুর কি, আমি ভাবছি শুনে।
দিন তো গেল কোনোমতে কড়ি বর্গা গুনে।
রাত্রি হবে দুপুর, ভাগ্নি ঢুকল ঘরে ধীরে;
চুপি চুপি বললে কানে, 'যেতে কি চাস ফিরে।'

লাফিয়ে উঠে কেঁদে বললেম, 'যাব যাব যাব।'
ভাগ্নি বললে, 'আমার সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে নাবো—
কোথায় তোমার খুড়ির বাসা অগস্ত্যকুণ্ডে কি,
যে ক'রে হোক আজকে রাতেই খুঁজে একবার দেখি;
কালকে মামার হাতে আমার হবেই মুণ্ডপাত।'—
আমি তো, ভাই বেঁচে গেলেম, ফুরিয়ে গেল রাত।"

হেসে বললেম যোগীনদাদার গম্ভীর মুখ দেখে,
ঠিক এমনি গল্প বাবা শুনিয়েছে বই থেকে।
দাদা বললেন, "বিধি যদি চুরি করেন নিজে
পরের গল্প, জানি নে ভাই, আমি করব কী যে।"

আলমোড়া
১০।৬।৩৭

প্রবাসে

বিদেশমুখো মন যে আমার কোন্ বাউলের চেলা,
গ্রাম-ছাড়ানো পথের বাতাস সর্বদা দেয় ঠেলা।
তাই তো সেদিন ছুটির দিনে টাইমটেবিল প'ড়ে
প্রাণটা উঠল নড়ে।
বাক্সো নিলেম ভর্তি করে, নিলেম ঝুলি থলে,
বাংলাদেশের বাইরে গেলেম গঙ্গাপারে চ'লে।
লোকের মুখে গল্প শুনে গোলাপ-খেতের টানে
মনটা গেল এক দৌড়ে গাজিপুরের পানে।
সামনে চেয়ে চেয়ে দেখি, গম-জোয়ারির খেতে
নবীন অঙ্কুরেতে
বাতাস কখন হঠাৎ এসে সোহাগ করে যায়
হাত বুলিয়ে কাঁচা শ্যামল কোমল কচি গায়।
আটচালা ঘর, ডাহিন দিকে সবজি-বাগানখানা
শুশ্রূষা পায় সারা দুপুর, জোড়া-বলদটানা।

আঁকাবাঁকা কল্‌কলানি করুণ জলের ধারায়—
চাকার শব্দে অলস প্রহর ঘুমের ভারে ভারায়।
ইদারাটার কাছে
বেগনি ফলে তুঁতের শাখা রঙিন হয়ে আছে।
অনেক দূরে জলের রেখা চরের কূলে কূলে,
ছবির মতো নৌকো চলে পাল-তোলা মাস্তুলে।
সাদা ধুলো হাওয়ায় ওড়ে, পথের কিনারায়
গ্রামটি দেখা যায়।
খোলার চালের কুটীরগুলি লাগাও গায়ে গায়ে
মাটির প্রাচীর দিয়ে ঘেরা আমকাঁঠালের ছায়ে।
গোরুর গাড়ি পড়ে আছে মহানিমের তলে,
ডোবার মধ্যে পাতা-পচা পাঁক-জমানো জলে
গম্ভীর ঔদাস্যে অলস আছে মহিষগুলি
এ ওর পিঠে আরামে ঘাড় তুলি।
বিকেল-বেলায় একটুখানি কাজের অবকাশে
খোলা দ্বারের পাশে
দাঁড়িয়ে আছে পাড়ার তরুণ মেয়ে
আপন-মনে অকারণে বাহির-পানে চেয়ে।
অশথতলায় বসে তাকাই ধেনুচারণ মাঠে,
আকাশে মন পেতে দিয়ে সমস্ত দিন কাটে।
মনে হ'ত, চতুর্দিকে হিন্দি ভাষায় গাঁথা
একটা যেন সজীব পুঁথি, উলটিয়ে যাই পাতা—
কিছু বা তার ছবি-আঁকা কিছু বা তার লেখা,
কিছু বা তার আগেই যেন ছিল কখন্ শেখা।
ছন্দে তাহার রস পেয়েছি, আউড়িয়ে যায় মন।
সকল কথায় অর্থ বোঝার নাইকো প্রয়োজন।

আলমোড়া
আষাঢ় ১৩৪৪

পদ্মায়

আমার নৌকো বাঁধা ছিল পদ্মানদীর পারে,
হাঁসের পাঁতি উড়ে যেত মেঘের ধারে ধারে—
জানি নে মন-কেমন-করা লাগত কী সুর হাওয়ার
আকাশ বেয়ে দূর দেশেতে উদাস হয়ে যাওয়ার।
কী জানি সেই দিনগুলি সব কোন্ আঁকিয়ের লেখা,
ঝিকিমিকি সোনার রঙে হালকা তুলির রেখা।
বালির 'পরে বয়ে যেত স্বচ্ছ নদীর জল,
তেমনি বইত তীরে তীরে গাঁয়ের কোলাহল—
ঘাটের কাছে, মাঠের ধারে, আলো-ছায়ার স্রোতে;
অলস দিনের উড়ুনিখানার পরশ আকাশ হতে
বুলিয়ে যেত মায়ার মন্ত্র আমার দেহে মনে।
তারই মধ্যে আসত ক্ষণে ক্ষণে
দূর কোকিলের স্বর,
মধুর হত আশ্বিনে রোদ্দুর।
পাশ দিয়ে সব নৌকো বড়ো বড়ো
পরদেশিয়া নানা খেতের ফসল ক'রে জড়ো
পশ্চিমে হাট বাজার হতে, জানি নে তার নাম,
পেরিয়ে আসত ধীর গমনে গ্রামের পরে গ্রাম
ঝপ্‌ঝপিয়ে দাঁড়ে।
খোরাক কিনতে নামত দাঁড়ি ছায়ানিবিড় পাড়ে।
যখন হত দিনের অবসান
গ্রামের ঘাটে বাজিয়ে মাদল গাইত হোলির গান।
ক্রমে রাত্রি নিবিড় হয়ে নৌকো ফেলত ঢেকে,
একটি কেবল দীপের আলো জ্বলত ভিতর থেকে।
শিকলে আর স্রোতে মিলে চলত টানের শব্দ;
স্বপ্নে যেন ব'কে উঠত রজনী নিস্তব্ধ।
পুবে হাওয়ায় এল ঋতু, আকাশ-জোড়া মেঘ;
ঘরমুখো ওই নৌকোগুলোয় লাগল অধীর বেগ।

ইলিশমাছ আর পাকা কাঁঠাল জমল পারের হাটে,
কেনাবেচার ভিড় লাগল নৌকো-বাঁধা ঘাটে।
ডিঙি বেয়ে পাটের আঁটি আনছে ভারে ভারে,
মহাজনের দাঁড়িপাল্লা উঠল নদীর ধারে।
হাতে পয়সা এল, চাষি ভাব্‌না নাহি মানে,
কিনে নতুন ছাতা জুতো চলেছে ঘর-পানে।
পরদেশিয়া নৌকোগুলোর এল ফেরার দিন,
নিল ভরে খালি-করা কেরোসিনের টিন;
একটা পালের 'পরে ছোটো আরেকটা পাল তুলে
চলার বিপুল গর্বে তরীর বুক উঠেছে ফুলে।
মেঘ ডাকছে গুরু গুরু, থেমেছে দাঁড় বাওয়া,
ছুটছে ঘোলা জলের ধারা, বইছে বাদল হাওয়া।

আলমোড়া
৬।৬।৩৭

বালক

বয়স তখন ছিল কাঁচা; হালকা দেহখানা
ছিল পাখির মতো, শুধু ছিল না তার ডানা।
উড়ত পাশের ছাদের থেকে পায়রাগুলোর ঝাঁক,
বারান্দাটার রেলিং-'পরে ডাকত এসে কাক।
ফেরিওয়ালা হেঁকে যেত গলির ওপার থেকে,
তপসিমাছের ঝুড়ি নিত গামছা দিয়ে ঢেকে।
বেহালাটা হেলিয়ে কাঁধে ছাদের 'পরে দাদা,
সন্ধ্যাতারার সুরে যেন সুর হত তাঁর সাধা।
জুটেছি বৌদিদির কাছে ইংরেজি পাঠ ছেড়ে,
মুখখানিতে-ঘের-দেওয়া তাঁর শাড়িটি লালপেড়ে।
চুরি ক'রে চাবির গোছা লুকিয়ে ফুলের টবে
স্নেহের রাগে রাগিয়ে দিতেম নানান উপদ্রবে।
কঙ্কালী চাটুজ্জে হঠাৎ জুটত সন্ধ্যা হলে;
বাঁ হাতে তার থেলো হুঁকো, চাদর কাঁধে ঝোলে।

দ্রুত লয়ে আউড়ে যেত লবকুশের ছড়া;
থাকত আমার খাতা লেখা, পড়ে থাকত পড়া—
মনে মনে ইচ্ছে হত, যদিই কোনো ছলে
ভর্তি হওয়া সহজ হত এই পাঁচালির দলে
ভাব্‌না মাথায় চাপত নাকো ক্লাসে ওঠার দায়ে,
গান শুনিয়ে চলে যেতুম নতুন নতুন গাঁয়ে।
স্কুলের ছুটি হয়ে গেলে বাড়ির কাছে এসে
হঠাৎ দেখি, মেঘ নেমেছে ছাদের কাছে ঘেঁষে।
আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে, রাস্তা ভাসে জলে,
ঐরাবতের শুঁড় দেখা দেয় জল-ঢালা সব নলে।
অন্ধকারে শোনা যেত রিম্‌ঝিমিনি ধারা,
রাজপুত্র তেপান্তরে কোথা সে পথহারা।
ম্যাপে যে-সব পাহাড় জানি, জানি যে-সব গাঙ
কুয়েন্‌লুন আর মিসিসিপি ইয়াংসিকিয়াং,
জানার সঙ্গে আধেক-জানা, দূরের থেকে শোনা,
নানা রঙের নানা সুতোয় সব দিয়ে জাল-বোনা,
নানারকম ধ্বনির সঙ্গে নানান চলাফেরা,
সব দিয়ে এক হালকা জগৎ মন দিয়ে মোর ঘেরা,
ভাব্‌নাগুলো তারই মধ্যে ফিরত থাকি থাকি,
বানের জলে শ্যাওলা যেমন, মেঘের তলে পাখি।

শান্তিনিকেতন
আষাঢ় ১৩৪৪

দেশান্তরী

প্রাণ-ধারণের বোঝাখানা বাঁধা পিঠের 'পরে,
আকাল পড়ল, দিন চলে না, চলল দেশান্তরে।
দূর শহরে একটা কিছু যাবেই যাবে জুটে,
এই আশাতেই লগ্ন দেখে ভোরবেলাতে উঠে
দুর্গা ব'লে বুক বেঁধে সে চলল ভাগ্যজয়ে,
মা ডাকে না পিছুর ডাকে অমঙ্গলের ভয়ে।

স্ত্রী দাঁড়িয়ে দুয়ার ধরে দুচোখ শুধু মোছে,
আজ সকালে জীবনটা তার কিছুতেই না রোচে।
ছেলে গেছে আম কুড়োতে দিঘির পাড়ে উঠি,
মা তারে আজ ভুলে আছে তাই পেয়েছে ছুটি।
স্ত্রী বলেছে বারে বারে, যে ক'রে হোক খেটে
সংসারটা চালাবে সে, দিন যাবে তার কেটে।
ঘর ছাইতে খড়ের আঁটির জোগান দেবে সে যে,
গোবর দিয়ে নিকিয়ে দেবে দেয়াল পাঁচিল মেঝে।
মাঠের থেকে খড়কে কাঠি আনবে বেছে বেছে,
ঝাঁটা বেঁধে কুমোরটুলির হাটে আসবে বেচে।
ঢেঁকিতে ধান ভেনে দেবে বামুনদিদির ঘরে,
খুদকুঁড়ো যা জুটবে তাতেই চলবে দুর্বছরে।
দূর দেশেতে বসে বসে মিথ্যা অকারণে
কোনোমতেই ভাব্না যেন না রয় স্বামীর মনে।
সময় হল, ওই তো এল খেয়াঘাটের মাঝি,
দিন না যেতে রহিমগঞ্জে যেতেই হবে আজি।
সেইখানেতে চৌকিদারি করে ওদের জ্ঞাতি,
মহেশখুড়োর মেজো জামাই, নিতাই দাসের নাতি।
নতুন নতুন গাঁ পেরিয়ে অজানা এই পথে
পৌঁছবে পাঁচদিনের পরে শহর কোনোমতে।
সেইখানে কোন্ হাঁসপিবাগান, ওদের গ্রামের কালো,
শর্ষেতেলের দোকান সেথায় চালাচ্ছে খুব ভালো।
গেলে সেথায় কালুর খবর সবাই বলে দেবে—
তার পরে সব সহজ হবে, কী হবে আর ভেবে।
স্ত্রী বললে, "কালুদাকে খবরটা এই দিয়ো,
ওদের গাঁয়ের বাদল পালের জাঠতুত ভাই প্রিয়
বিয়ে করতে আসবে আমার ভাইঝি মল্লিকাকে
উনত্রিশে বৈশাখে।"

শান্তিনিকেতন
আষাঢ় ১৩৪৪

অচলা বুড়ি

অচলবুড়ি, মুখখানি তার হাসির রসে ভরা,
স্নেহের রসে পরিপক্ব অতিমধুর জরা।
ফুলো ফুলো দুই চোখে তার, দুই গালে আর ঠোঁটে
উছলে-পড়া হৃদয় যেন ঢেউ খেলিয়ে ওঠে।
পরিপুষ্ট অঙ্গটি তার, হাতের গড়ন মোটা,
কপালে দুই ভুরুর মাঝে উল্‌কি-আঁকা ফোঁটা।
গাড়ি-চাপা কুকুর একটা মরতেছিল পথে,
সেবা ক'রে বাঁচিয়ে তারে তুলল কোনোমতে।
খোঁড়া কুকুর সেই ছিল তার নিত্যসহচর;
আধপাগলি ঝি ছিল এক, বাড়ি বালেশ্বর।
দাদাঠাকুর বলত, "বুড়ি, জমল কত টাকা,
সঙ্গে ওটা যাবে না তো, বাক্সে রইল ঢাকা,
ব্রাহ্মণে দান করতে না চাও নাহয় দাও-না ধার,
জানোই তো এই অসময়ে টাকার কী দরকার।"
বুড়ি হেসে বলে, "ঠাকুর, দরকার তো আছেই,
সেইজন্যে ধার না দিয়ে রাখি টাকা কাছেই।"

সাঁৎরাপাড়ার কায়েতবাড়ির বিধবা এক মেয়ে,
এককালে সে সুখে ছিল বাপের আদর পেয়ে।
বাপ মরেছে, স্বামী গেছে, ভাইরা না দেয় ঠাঁই—
দিন চালাবে এমনতরো উপায় কিছু নাই।
শেষকালে সে ক্ষুধার দায়ে, দৈন্যদশার লাজে
চলে গেল হাঁসপাতালে রোগীসেবার কাজে।
এর পিছনে বুড়ি ছিল, আর ছিল লোক তার
কংসারি শীল বেনের ছেলে মুকুন্দ মোক্তার।
গ্রামের লোকে ছি-ছি করে, জাতে ঠেলল তাকে,
একলা কেবল অচল বুড়ি আদর করে ডাকে।

সে বলে, "তুই বেশ করেছিস যা বলুক-না যেবা,
ভিক্ষা মাগার চেয়ে ভালো দুঃখী দেহের সেবা।"

জমিদারের মায়ের শ্রাদ্ধ, বেগার খাটার ডাক—
রাই ডোম্‌নির ছেলে বললে, কাজের যে নেই ফাঁক,
পারবে না আজ যেতে। শুনে কোতলপুরের রাজা
বললে, ওকে যে ক'রে হোক দিতেই হবে সাজা।
মিশনরির স্কুলে প'ড়ে, কম্পোজিটরের
কাজ শিখে সে শহরেতে আয় করেছে ঢের—
তাই হবে কি ছোটোলোকের ঘাড়-বাঁকানো চাল।
সাক্ষ্য দিল হরিশ মৈত্র, দিল মাখনলাল—
ডাকলুঠের এক মোকদ্দমায় মিথ্যে জড়িয়ে ফেলে
গোষ্ঠকে তো চালান দিল সাত বছরের জেলে।
ছেলের নামের অপমানে আপন পাড়া ছাড়ি
ডোম্‌নি গেল ভিন গাঁয়েতে পাততে নতুন বাড়ি।
প্রতি মাসে অচলবুড়ি দামোদরের পারে
মাসকাবারের জিনিস নিয়ে দেখে আসত তারে।
যখন তাকে খোঁটা দিল গ্রামের শম্ভু পিসে
"রাই ডোম্‌নির 'পরে তোমার এত দরদ কিসে"
বুড়ি বললে, "যারা ওকে দিল দুঃখরাশি
তাদের পাপের বোঝা আমি হালকা করে আসি।"

পাতানো এক নাতনি বুড়ির একজ্বরি জ্বরে
ভুগতেছিল স্বরূপগঞ্জে আপন শ্বশুরঘরে।
মেয়েটাকে বাঁচিয়ে তুলল দিন রাত্রি জেগে,
ফিরে এসে আপনি পড়ল রোগের ধাক্কা লেগে।
দিন ফুরলো, দেব্‌তা শেষে ডেকে নিল তাকে—
এক আঘাতে মারল যেন সকল পল্লীটাকে।
অবাক হল দাদাঠাকুর, অবাক স্বরূপকাকা—
ডোম্‌নিকে সব দিয়ে গেছে বুড়ির জমা টাকা।

জিনিসপত্র আর যা ছিল দিল পাগল ঝিকে,
সঁপে দিল তারই হাতে খোঁড়া কুকুরটিকে।
ঠাকুর বললে মাথা নেড়ে, "অপাত্রে এই দান!
পরলোকের হারালো পথ, ইহলোকের মান।"

শান্তিনিকেতন
[? আষাঢ়] ১৩৪৪

সুধিয়া

গয়লা ছিল শিউনন্দন, বিখ্যাত তার নাম
গোয়ালবাড়ি ছিল যেন একটা গোটা গ্রাম।
গোরু-চরার প্রকাণ্ড খেত, নদীর ওপার চরে,
কলাই শুধু ছিটিয়ে দিত পলি জমির 'পরে।
জেগে উঠত চারা তারই, গজিয়ে উঠত ঘাস,
ধেনুদলের ভোজ চলত মাসের পরে মাস।
মাঠটা জুড়ে বাঁধা হত বিশ-পঞ্চাশ চালা,
জমত রাখাল ছেলেগুলোর মহোৎসবের পালা।
গোপাষ্টমীর পর্বদিনে প্রচুর হত দান,
গুরুঠাকুর গা ডুবিয়ে দুধে করত স্নান।
তার থেকে সর ক্ষীর নবনী তৈরি হত কত,
প্রসাদ পেত গাঁয়ে গাঁয়ে গয়লা ছিল যত।

বছর তিনেক অনাবৃষ্টি, এল মন্বন্তর;
শ্রাবণ মাসে শোণনদীতে বান এল তার পর।
ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে গর্জি ছুটল ধারা,
ধরণী চায় শূন্য-পানে সীমার চিহ্নহারা।
ভেসে চলল গোরু বাছুর, টান লাগল গাছে;
মানুষে আর সাপে মিলে শাখা আঁকড়ে আছে।
বন্যা যখন নেমে গেল, বৃষ্টি গেল থামি—
আকাশ জুড়ে দৈত্য-দেবের ঘুচল সে পাগলামি।

শিউনন্দন দাঁড়ালো তার শূন্য ভিটেয় এসে—
তিনটে শিশুর ঠিকানা নেই, স্ত্রী গেছে তার ভেসে।
চুপ করে সে রইল বসে, বুদ্ধি পায় না খুঁজি।
মনে হল, সব কথা তার হারিয়ে গেল বুঝি।
ছেলেটা তার ভীষণ জোয়ান, সামরু বলে তাকে ;
এক-গলা এই জলে-ডোবা সকল পাড়াটাকে
মথন করে ফিরে ফিরে তিনটে গোরু নিয়ে
ঘরে এসে দেখলে, দু হাত চোখে ঢাকা দিয়ে
ইষ্টদেবকে স্মরণ ক'রে নড়ছে বাপের মুখ ;
তাই দেখে ওর একেবারে জ্বলে উঠল বুক—
বলে উঠল, "দেবতাকে তোর কেন মরিস ডাকি।
তার দয়াটা বাঁচিয়ে যেটুক আজও রইল বাকি
ভার নেব তার নিজের 'পরেই, ঘটুক-নাকো যাই আর,
এর বাড়া তো সর্বনাশের সম্ভাবনা নাই আর।"
এই বলে সে বাড়ি ছেড়ে পাঁকের পথে ঘুরে
চিহ্ন-দেওয়া নিজের গোরু অনেক দূরে দূরে
গোটা পাঁচেক খোঁজ পেয়ে তার আনলে তাদের কেড়ে,
মাথা ভাঙবে ভয় দেখাতেই সবাই দিল ছেড়ে।
ব্যাবসাটা ফের শুরু করল নেহাত গরিব চালে,
আশা রইল উঠবে জেগে আবার কোনোকালে।

এদিকেতে প্রকাণ্ড এক দেনার অজগরে
একে একে গ্রাস করছে যা আছে তার ঘরে।
একটু যদি এগোয় আবার পিছন দিকে ঠেলে,
দেনা পাওনা দিনরাত্রি জোয়ার-ভাঁটা খেলে।
মাল তদন্ত করতে এল দুনিয়াচাঁদ বেনে,
দশবছরের ছেলেটাকে সঙ্গে করে এনে।
ছেলেটা ওর জেদ ধরেছে— ওই সুধিয়া গাই
পুষবে ঘরে আপন ক'রে ওইটে নেহাত চাই।

সামরু বলে, "তোমার ঘরে কী ধন আছে কত
আমাদের এই সুখিয়াকে কিনে নেবার মতো।
ও যে আমার মানিক, আমার সাত রাজার ওই ধন,
আর যা আমার যায় সবই যাক, দুঃখিত নয় মন।
মৃত্যুপারের থেকেই ও যে ফিরেছে মোর কাছে,
এমন বন্ধু তিন ভুবনে আর কি আমার আছে।"
বাপের কানে কি বললে সেই দুনিচাঁদের ছেলে,
জেদ বেড়ে তার গেল বুঝি যেমনি বাধা পেলে।
শেঠজি বলে মাথা নেড়ে, "দুই চারিমাস যেতেই
ওই সুখিয়ার গতি হবে আমার গোয়ালেতেই।"

কালোয় সাদায় মিশোল বরন, চিকন নধর দেহ,
সর্ব অঙ্গে ব্যাপ্ত যেন রাশীকৃত স্নেহ।
আকাল এখন, সামরু নিজে দুইবেলা আধ-পেটা;
সুখিয়াকে খাওয়ানো চাই যখনি পায় যেটা।
দিনের কাজের অবসানে গোয়ালঘরে ঢুকে
ব'কে যায় সে গাভীর কানে যা আসে তার মুখে।
কারো 'পরে রাগ সে জানায়, কখনো সাবধানে
গোপন খবর থাকলে কিছু জানায় কানে কানে।
সুখিয়া সব দাঁড়িয়ে শোনে কানটা খাড়া ক'রে,
বুঝি কেবল ধ্বনির সুখে মন ওঠে তার ভরে।

সামরু যখন ছোটো ছিল পালোয়ানের পেশা
ইচ্ছা করেছিল নিতে, ওই ছিল তার নেশা।
খবর পেল, নবাববাড়ি কুস্তিগিরের দল
পাল্লা দেবে— সামরু শুনে অসহ্য চঞ্চল।
বাপকে ব'লে গেল ছেলে, "কথা দিচ্ছি শোনো,
এক হপ্তার বেশি দেরি হবে না কখ্‌খোনো।"
ফিরে এসে দেখতে পেলে, সুখিয়া তার গাই
শেঠ নিয়েছে ছলে-বলে, গোয়ালঘরে নাই।

যেমনি শোনা অমনি ছুটল, ভোজালি তার হাতে,
ছুনিচাঁদের গদি যেথায় নাজির-মহল্লাতে।
"কী রে সামরু, ব্যাপারটা কী" শেঠজি শুধায় তাকে।
সামরু বলে, "ফিরিয়ে নিতে এলুম সুধিয়াকে।"
শেঠ বললে, "পাগল নাকি, ফিরিয়ে দেব তোরে,
পরশু ওকে নিয়ে এলুম ডিক্রিজারি করে।"
"সুধিয়া রে" "সুধিয়া রে" সামরু দিল হাঁক,
পাড়ার আকাশ পেরিয়ে গেল বজ্রমন্দ্র ডাক।
চেনা সুরের হাম্বা ধ্বনি কোথায় জেগে উঠে,
দড়ি ছিঁড়ে সুধিয়া ওই হঠাৎ এল ছুটে।
দু চোখ দিয়ে ঝরছে বারি, অঙ্গটি তার রোগা,
অন্নপানে দেয় নি সে মুখ, অনশনে-ভোগা।
সামরু ধরল জড়িয়ে গলা, বললে, "নাই রে ভয়,
আমি থাকতে দেখব এখন কে তোরে আর লয়।—
তোমার টাকায় ছুনিয়া কেনা, শেঠ ছুনিচাঁদ, তবু
এই সুধিয়া একলা নিজের, আর কারো নয় কভু।
আপন ইচ্ছামতে যদি তোমার ঘরে থাকে
তবে আমি এই মুহূর্তে রেখে যাব তাকে।"
চোখ পাকিয়ে কয় ছুনিচাঁদ, "পশুর আবার ইচ্ছে!
গয়লা তুমি, তোমার কাছে কে উপদেশ নিচ্ছে।
গোল কর তো ডাকব পুলিস।" সামরু বললে, "ডেকো।
ফাঁসি আমি ভয় করি নে, এইটে মনে রেখো।
দশবছরের জেল খাটব, ফিরব তো তার পর,
সেই কথাটাই ভেবো বসে, আমি চললেম ঘর।"

শান্তিনিকেতন
আষাঢ় ১৩৪৪

মাধো

রায়বাহাদুর কিষনলালের স্যাকরা জগন্নাথ,
সোনারুপোর সকল কাজে নিপুণ তাহার হাত।
আপন বিদ্যা শিখিয়ে মানুষ করবে ছেলেটাকে
এই আশাতে সময় পেলেই ধরে আনত তাকে;
বসিয়ে রাখত চোখের সামনে, জোগান দেবার কাজে
লাগিয়ে দিত যখন তখন; আবার মাঝে মাঝে
ছোটো মেয়ের পুতুল-খেলার গয়না গড়াবার
ফরমাশেতে খাটিয়ে নিত; আগুন ধরাবার
সোনা গলাবার কর্মে একটুখানি ভুলে
চড়চাপড়টা পড়ত পিঠে, টান লাগাত চুলে।
সুযোগ পেলেই পালিয়ে বেড়ায় মাধো যে কোন্‌খানে
ঘরের লোকে খুঁজে ফেরে বৃথাই সন্ধানে।
শহরতলির বাইরে আছে দিঘি সাবেককেলে
সেইখানে সে জোটায় যত লক্ষ্মীছাড়া ছেলে।
গুলিডাণ্ডা খেলা ছিল, দোলনা ছিল গাছে,
জানা ছিল যেথায় যত ফলের বাগান আছে।
মাছ ধরবার ছিপ বানাত, সিসুডালের ছড়ি;
টাট্টু ঘোড়ার পিঠে চড়ে ছোটাত দড়বড়ি!
কুকুরটা তার সঙ্গে থাকত, নাম ছিল তার বটু—
গিরগিটি আর কাঠবেড়ালি তাড়িয়ে ফেরায় পটু।
শালিখপাখির মহলেতে মাধোর ছিল যশ,
ছাতুর গুলি ছড়িয়ে দিয়ে করত তাদের বশ।
বেগার দেওয়ার কাজে পাড়ায় ছিল না তার মতো,
বাপের শিক্ষানবিশিতেই কুঁড়েমি তার যত।

কিষনলালের ছেলে, তাকে দুলাল ব'লে ডাকে,
পাড়াসুদ্ধ ভয় করে এই বাঁদর ছেলেটাকে।
বড়োলোকের ছেলে ব'লে গুমর ছিল মনে,

অত্যাচারে তারই প্রমাণ দিত সকলখনে।
বটুর হবে সাঁতারখেলা, বটু চলছে ঘাটে,
এসেছে যেই দুলালচাঁদের গোলা খেলার মাঠে
অকারণে চাবুক নিয়ে দুলাল এলো তেড়ে;
মাধো বললে, "মারলে কুকুর ফেলব তোমায় পেড়ে।"
উঁচিয়ে চাবুক দুলাল এল, মানল নাকো মানা,
চাবুক কেড়ে নিয়ে মাধো, করলে দুভিলখানা।
দাঁড়িয়ে রইল মাধো, রাগে কাঁপছে থরোথরো,
বললে, "দেখব সাধ্য তোমার, কী করবে তা করো।"
দুলাল ছিল বিষম ভীতু, বেগ শুধু তার পায়ে;
নামের জোরেই জোর ছিল তার, জোর ছিল না গায়ে।

দশবিশজন লোক লাগিয়ে বাপ আনলে ধরে,
মাধোকে এক খাটের খুরোয় বাঁধল কষে জোরে।
বললে, "জানিসনেকো বেটা, কাহার অন্ন খাস্‌সি,
এত বড়ো বুকের পাটা, মনিবকে তুই মারিস।
আজ বিকালে হাটের মধ্যে হিঁচড়ে নিয়ে তোকে,
দুলাল স্বয়ং মারবে চাবুক, দেখবে সকল লোকে।"
মনিববাড়ির পেয়াদা এল দিন হল যেই শেষ।
দেখলে দড়ি আছে পড়ি, মাধো নিরুদ্দেশ।
মাকে শুধায়, "এ কী কাণ্ড।" মা শুনে কয়, "নিজে
আপন হাতে বাঁধন তাহার আমিই খুলেছি যে।
মাধো চাইল চলে যেতে; আমি বললেম, যেয়ো,
এমন অপমানের চেয়ে মরণ ভালো সেও।"
স্বামীর 'পরে হানল দৃষ্টি দারুণ অবজ্ঞার;
বললে, "তোমার গোলামিতে ধিক্‌ সহস্রবার।"

পেরোলো বিশ-পঁচিশ বছর; বাংলাদেশে গিয়ে
আপন জাতের মেয়ে বেছে মাধো করল বিয়ে।
ছেলে মেয়ে চলল বেড়ে, হল সে সংসারী;

কোন্‌খানে এক পাটকলে সে করতেছে সর্দারি।
এমন সময় নরম যখন হল পাটের বাজার
মাইনে ওদের কমিয়ে দিতেই, মজুর হাজার হাজার
ধর্মঘটে বাঁধল কোমর; সাহেব দিল ডাক;
বললে, "মাধো, ভয় নেই তোর, আলগোছে তুই থাক্‌।
দলের সঙ্গে যোগ দিলে শেষ মরবি-যে মার খেয়ে।"
মাধো বললে, "মরাই ভালো এ বেইমানির চেয়ে।"
শেষপালাতে পুলিস নামল, চলল গুঁতোগাঁতা;
কারো পড়ল হাতে বেড়ি, কারো ভাঙল মাথা।
মাধো বললে, "সাহেব, আমি বিদায় নিলেম কাজে,
অপমানের অন্ন আমার সহ্য হবে না যে।"
চলল সেথায় যে-দেশ থেকে দেশ গেছে তার মুছে,
মা মরেছে, বাপ মরেছে, বাঁধন গেছে ঘুচে।
পথে বাহির হল ওরা ভরসা বুকে আঁটি,
ছেঁড়া শিকড় পাবে কি আর পুরোনো তার মাটি।

শ্রাবণ ১৩৪৪

আতার বিচি

আতার বিচি নিজে পুঁতে পাব তাহার ফল,
দেখব ব'লে ছিল মনে বিষম কৌতূহল।
তখন আমার বয়স ছিল নয়,
অবাক লাগত কিছুর থেকে কেন কিছুই হয়।
দোতলাতে পড়ার ঘরের বারান্দাটা বড়ো,
ধুলোবালি একটা কোণে করেছিলুম জড়ো।
সেথায় বিচি পুঁতেছিলুম অনেক যত্ন করে,
গাছ বুঝি আজ দেখা দেবে, ভেবেছি রোজ ভোরে।
বারান্দাটার পূর্বধারে টেবিল ছিল পাতা,
সেইখানেতে পড়া চলত; পুঁথিপত্র খাতা
রোজ সকালে উঠত জমে দুর্ভাবনার মতো;

পড়া দিতেন, পড়া নিতেন মাস্টার মন্মথ।
পড়তে পড়তে বারে বারে চোখ যেত ওই দিকে,
গোল হত সব বানানেতে, ভুল হত সব ঠিকে।
অধৈর্য অসহ্য হত, খবর কে তার জানে
কেন আমার যাওয়া-আসা ওই কোণটার পানে।
ছ মাস গেল মনে আছে, সেদিন শুক্রবার—
অঙ্কুরটি দেখা দিল নবীন সুকুমার।
অন্ধ-কষার বারান্দাতে চুনসুরকির কোণে
অপূর্ব সে দেখা দিল, নাচ লাগালো মনে।
আমি তাকে নাম দিয়েছি আতা গাছের খুকু,
ক্ষণে ক্ষণে দেখতে যেতেম, বাড়ল কতটুকু।
দুদিন বাদেই শুকিয়ে যেত সময় হলে তার,
এ জায়গাতে স্থান নাহি ওর করত আবিষ্কার ;
কিন্তু যেদিন মাস্টার ওর দিলেন মৃত্যুদণ্ড,
কচিকচি পাতায় কুঁড়ি হল খণ্ড খণ্ড,
আমার পড়ায় ত্রুটির জন্যে দায়ী করলেন ওকে,
বুক যেন মোর ফেটে গেল, অশ্রু ঝরল চোখে।
দাদা বললেন, কী পাগলামি, শান-বাঁধানো মেঝে,
হেথায় আতার বীজ লাগানো মোর বোকামি এ যে।
আমি ভাবলুম, সারা দিনটা বুকের ব্যথা নিয়ে,
বড়োদের এই জোর খাটানো অন্যায় নয় কি এ।
মূর্খ আমি ছেলেমানুষ, সত্য কথাই সে তো,
একটু সবুর করলেই তা আপনি ধরা যেত।

শ্রাবণ ১৩৪৪

মাকাল

গৌরবর্ণ নধর দেহ, নাম শ্রীযুক্ত রাখাল,
জন্ম তাহার হয়েছিল সেই যে-বছর আকাল।
গুরুমশায় বলেন তারে,
"বুদ্ধি যে নেই একেবারে ;

দ্বিতীয়ভাগ করতে সারা ছ'মাস ধরে নাকাল।"
রেগেমেগে বলেন, "বাঁদর, নাম দিনু তোর মাকাল।"

নামটা শুনে ভাবলে প্রথম বাঁকিয়ে যুগল ভুরু ;
তার পর সে বাড়ি এসে নৃত্য করলে শুরু।
হঠাৎ ছেলের মাতন দেখি
সবাই তাকে শুধায়, এ কী!
সকলকে সে জানিয়ে দিল, নাম দিয়েছেন গুরু—
নতুন নামের উৎসাহে তার বক্ষ দুরুদুরু।

কোলের 'পরে বসিয়ে দাদা বললে কানে-কানে,
"গুরুমশায় গাল দিয়েছেন, বুঝিস নে তার মানে!"
রাখাল বলে, "কখ্‌খোনো না,
মা যে আমায় বলেন সোনা,
সেটা তো গাল নয় সে কথা পাড়ার সবাই জানে।
আচ্ছা, তোমায় দেখিয়ে দেব, চলো তো ঐখানে।"

টেনে নিয়ে গেল তাকে পুকুরপাড়ের কাছে,
বেড়ার 'পরে লতায় যেথা মাকাল ফ'লে আছে।
বললে, "দাদা সত্যি বোলো,
সোনার চেয়ে মন্দ হল?
তুমি শেষে বলতে কি চাও, গাল ফলেছে গাছে।"
"মাকাল আমি" ব'লে রাখাল দু হাত তুলে নাচে।

দোয়াত কলম নিয়ে ছোটে, খেলতে নাহি চায় ;
লেখাপড়ায় মন দেখে মা অবাক হয়ে যায়।
খাবার বেলায় অবশেষে
দেখে ছেলের কাণ্ড এসে—
মেঝের 'পরে ঝুঁকে প'ড়ে খাতার পাতাটায়
লাইন টেনে লিখছে শুধু— মাকালচন্দ্র রায়।

৮ ডিসেম্বর ১৯৩১

পাথরপিণ্ড

সাগরতীরে পাথরপিণ্ড ঢুঁ মারতে চায় কাকে,
বুঝি আকাশটাকে।
শান্ত আকাশ দেয় না কোনো জবাব,
পাথরটা রয় উঁচিয়ে মাথা, এমনি সে তার স্বভাব।
হাতের কাছেই আছে সমুদ্রটা,
অহংকারে তারই সঙ্গে লাগত যদি ওটা,
এমনি চাপড় খেত, তাহার ফলে
হুড়্‌মুড়িয়ে ভেঙেচুরে পড়ত অগাধ জলে।
ঢুঁ-মারা এই ভঙ্গীখানা কোটি বছর থেকে
ব্যঙ্গ ক'রে কপালে তার কে দিল ওই এঁকে।
পণ্ডিতেরা তার ইতিহাস বের করেছেন খুঁজি;
শুনি তাহা, কতক বুঝি, নাইবা কতক বুঝি।

অনেক যুগের আগে
একটা সে কোন্ পাগলা বাষ্প আগুন-ভরা রাগে
মা ধরণীর বক্ষ হতে ছিনিয়ে বাঁধন-পাশ
জ্যোতিষ্কদের ঊর্ধ্বপাড়ায় করতে গেল বাস।
বিদ্রোহী সেই দুরাশা তার প্রবল শাসন-টানে
আছাড় খেয়ে পড়ল ধরার পানে।
লাগল কাহার শাপ,
হারালো তার ছুটোছুটি, হারালো তার তাপ।
দিনে দিনে কঠিন হয়ে ক্রমে
আড়ষ্ট এক পাথর হয়ে কখন গেল জমে।
আজকে যে ওর অন্ধ নয়ন, কাতর হয়ে চায়
সম্মুখে কোন্ নিঠুর শূন্যতায়।
স্তম্ভিত চীৎকার সে যেন, যন্ত্রণা নির্বাক,
যে যুগ গেছে তার উদ্দেশে কণ্ঠহারার ডাক।

আগুন ছিল পাখায় যাহার আজ মাটি-পিঞ্জরে
কান পেতে সে আছে ঢেউয়ের তরল কলস্বরে।
শোনার লাগি ব্যগ্র তাহার ব্যর্থ বধিরতা
হেরে-যাওয়া সে যৌবনের ভুলে-যাওয়া কথা।

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

তালগাছ

বেড়ার মধ্যে একটি আমের গাছে
গম্ভীরতায় আসর জমিয়ে আছে।
পরিতৃপ্ত মূর্তিটি তার তৃপ্ত চিকন পাতায়,
দুপুরবেলায় একটুখানি হাওয়া লাগছে মাথায়।

মাটির সঙ্গে মুখোমুখি ঘাসের আঙিনাতে
সঙ্গিনী তার শ্যামল ছায়া, আঁচলখানি পাতে।
গোরু চরে রৌদ্রছায়ায় সারা প্রহর ধরে ;
খাবার মতো ঘাস বেশি নেই, আরাম শুধুই চ'রে।
পেরিয়ে বেড়া ওই যে তালের গাছ,
নীল গগনে ক্ষণে ক্ষণে দিচ্ছে পাতার নাচ।
আশেপাশে তাকায় না সে, দূরে-চাওয়ার ভঙ্গী,
এমনিতরো ভাবটা যেন নয় সে মাটির সঙ্গী।
ছায়াতে না মেলায় ছায়া বসন্ত-উৎসবে,
বায়না না দেয় পাখির গানের বনের গীতরবে।
তারার পানে তাকিয়ে কেবল কাটায় রাত্রিবেলা,
জোনাকিদের 'পরে যে তার গভীর অবহেলা।
উলঙ্গ সুদীর্ঘ দেহে সামান্য সম্বলে
তার যেন ঠাঁই ঊর্ধ্ববাহু সন্ন্যাসীদের দলে।

আলমোড়া
১৩।৬।৩৭

শনির দশা

আধবুড়ো ওই মানুষটি মোর নয় চেনা—
একলা বসে ভাবছে, কিংবা ভাবছে না,
মুখ দেখে ওর সেই কথাটাই ভাবছি,
মনে মনে আমি যে ওর মনের মধ্যে নাবছি।

বুঝিবা ওর মেঝোমেয়ে পাতা ছয়েক ব'কে
মাথার দিব্যি দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল ওকে।
উমারানীর বিষম স্নেহের শাসন,
জানিয়েছিল, চতুর্থীতে খোকার অন্নপ্রাশন—
জিদ ধরেছে, হোক-না যেমন ক'রেই
আসতে হবে শুক্রবার কি শনিবারের ভোরেই।
আবেদনের পত্র একটি লিখে
পাঠিয়েছিল বুড়ো তাদের কর্তাবাবুটিকে।
বাবু বললে, 'হয় কখনো তা কি,
মাসকাবারের ঝুড়িঝুড়ি হিসাব লেখা বাকি,
সাহেব শুনলে আগুন হবে চটে,
ছুটি নেবার সময় এ নয় মোটে।'
মেয়ের দুঃখ ভেবে
বুড়ো বারেক ভেবেছিল কাজে জবাব দেবে।
সুবুদ্ধি তার কইল কানে রাগ গেল যেই থামি,
আসন্ন পেন্‌সনের আশা ছাড়াটা পাগলামি।
নিজেকে সে বললে, 'ওরে, এবার না হয় কিনিস।
ছোটোছেলের মনের মতো একটা-কোনো জিনিস।'
যেটার কথাই ভেবে দেখে দামের কথায় শেষে
বাধায় ঠেকে এসে।
শেষকালে ওর পড়ল মনে জাপানি ঝুমঝুমি,
দেখলে খুশি হয়তো হবে উমি।

কেইবা জানবে দামটা যে তার কত,
বাইরে থেকে ঠিক দেখাবে খাঁটি রুপোর মতো।
এমনি করে সংশয়ে তার কেবলই মন ঠেলে,
হাঁ-না নিয়ে ভাবনাস্রোতে জোয়ার-ভাঁটা খেলে।
রোজ সে দেখে টাইম্‌টেবিলখানা,
ক'দিন থেকে ইস্‌টিশনে প্রত্যহ দেয় হানা।
সামনে দিয়ে যায় আসে রোজ মেল,
গাড়িটা তার প্রত্যহ হয় ফেল।
চিন্তিত ওর মুখের ভাবটা দেখে
এমনি একটা ছবি মনে নিয়েছিলেম এঁকে।

কৌতূহলে শেষে
একটুখানি উস্‌খুসিয়ে একটুখানি কেশে,
শুধাই তারে ব'সে তাহার কাছে,
"কী ভাবতেছেন, বাড়িতে কি মন্দ খবর আছে।"
বললে বুড়ো, "কিচ্ছুই নয়, মশায়,
আসল কথা, আছি শনির দশায়।
তাই ভাবছি কী করা যায় এবার
ঘোড়দৌড়ে দশটি টাকা বাজি ফেলে দেবার।
আপনি বলুন, কিনব টিকিট আজ কি।"
আমি বললেম, "কাজ কী।"
রাগে বুড়োর গরম হল মাথা;
বললে, "থামো, ঢের দেখেছি পরামর্শদাতা!
কেনার সময় রইবে না আর আজিকার এই দিন বৈ!
কিনব আমি, কিনব আমি, যে ক'রে হোক কিনবই।"

আলমোড়া
৪।৬।৩৭

রিক্ত

বইছে নদী বালির মধ্যে, শূন্য বিজন মাঠ,
নাই কোনো ঠাঁই ঘাট।
অল্প জলের ধারাটি বয়, ছায়া দেয় না গাছে,
গ্রাম নেইকো কাছে।
রুক্ষ হাওয়ায় ধরার বুকে সূক্ষ্ম কাঁপন কাঁপে
চোখ-ধাঁধাঁনো তাপে।
কোথাও কোনো শব্দ-যে নেই তারই শব্দ বাজে
ঝাঁ-ঝাঁ ক'রে সারাদুপুর দিনের বক্ষোমাঝে।
আকাশ বাহার একলা অতিথ শুষ্ক বালুর স্তূপে
দিগ্‌বধূ রয় অবাক হয়ে বৈরাগিণীর রূপে।
দূরে দূরে কাশের ঝোপে শরতে ফুল ফোটে,
বৈশাখে ঝড় ওঠে।
আকাশ ব্যেপে ভূতের মাতন বালুর ঘূর্ণি ঘোরে;
নৌকো ছুটে আসে না তো সামাল সামাল ক'রে।
বর্ষা হলে বন্যা নামে দূরের পাহাড় হতে,
কূল-হারানো স্রোতে
জলে স্থলে হয় একাকার; দমকা হাওয়ার বেগে
সওয়ার যেন চাবুক লাগায় দৌড়-দেওয়া মেঘে।
সারা বেলাই বৃষ্টিধারা ঝাপট লাগায় যবে
মেঘের ডাকে সুর মেশে না ধেনুর হাম্বারবে।
খেতের মধ্যে কল্‌কলিয়ে ঘোলা স্রোতের জল
ভাসিয়ে নিয়ে আসে না তো শ্যাওলা-পানার দল।
রাত্রি যখন ধ্যানে বসে তারাগুলির মাঝে
তীরে তীরে প্রদীপ জ্বলে না যে—
সমস্ত নিঃঝুম
জাগাও নেই কোনোখানে, কোথাও নেই ঘুম।

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

বাসাবাড়ি

এই শহরে এই তো প্রথম আসা।
আড়াইটা রাত, খুঁজে বেড়াই কোন্ ঠিকানায় বাসা।
লণ্ঠনটা ঝুলিয়ে হাতে আন্দাজে যাই চলি,
অজগরের ভূতের মতন গলির পরে গলি।
ধাঁধাঁ ক্রমেই বেড়ে ওঠে, এক জায়গায় থেমে
দেখি পথের বাঁদিক থেকে ঘাট গিয়েছে নেমে।
আঁধার মুখোশ-পরা বাড়ি সামনে আছে খাড়া;
হাঁ-করা-মুখ দুয়ারগুলো, নাইকো শব্দসাড়া।
চৌতলাতে একটা ধারে জানলাখানার ফাঁকে
প্রদীপশিখা ছুঁচের মতো বিঁধছে আঁধারটাকে।
বাকি মহল যত
কালো মোটা ঘোমটা-দেওয়া দৈত্যনারীর মতো।
বিদেশীর এই বাসাবাড়ি, কেউবা কয়েক মাস
এইখানে সংসার পেতেছে, করছে বসবাস;
কাজকর্ম সাঙ্গ করি কেউবা কয়েক দিনে
চুকিয়ে ভাড়া কোন্‌খানে যায়, কেই বা তাদের চিনে।
সুধাই আমি, "আছ কি কেউ, জায়গা কোথায় পাই।"
মনে হল জবাব এল, "আমরা নাই নাই।"
সকল দুয়োর জানলা হতে, যেন আকাশ জুড়ে
ঝাঁকে ঝাঁকে রাতের পাখি শূন্যে চলল উড়ে।
একসঙ্গে চলার বেগে হাজার পাখা তাই
অন্ধকারে জাগায় ধ্বনি, "আমরা নাই নাই।"
আমি সুধাই, "কিসের কাজে এসেছ এইখানে।"
জবাব এল, "সেই কথাটা কেহই নাহি জানে।
যুগে যুগে বাড়িয়ে চলি নেই-হওয়াদের দল,
বিপুল হয়ে ওঠে যখন দিনের কোলাহল
সকল কথার উপরেতে চাপা দিয়ে যাই—
নাই, নাই, নাই।"

পরের দিনে সেই বাড়িতে গেলেম সকালবেলা—
ছেলেরা সব পথে করছে লড়াই-লড়াই খেলা,
কাঠি হাতে দুই পক্ষের চলছে ঠকাঠকি।
কোণের ঘরে দুই বুড়োতে বিষম বকাবকি—
বাজিখেলায় দিনে দিনে কেবল জেতা হারা,
দেনা-পাওনা জমতে থাকে, হিসাব হয় না সারা।
গন্ধ আসছে রান্নাঘরের, শব্দ বাসন-মাজার ;
শূন্য ঝুড়ি দুলিয়ে হাতে ঝি চলেছে বাজার।
একে একে এদের সবার মুখের দিকে চাই,
কানে আসে রাত্রিবেলার "আমরা নাই নাই"।

আলমোড়া
৯।৬।৩৭

আকাশ

শিশুকালের থেকে
আকাশ আমার মুখে চেয়ে একলা গেছে ডেকে।

দিন কাটত কোণের ঘরে দেয়াল দিয়ে ঘেরা
কাছের দিকে সর্বদা মুখ-ফেরা ;
তাই সুদূরের পিপাসাতে
অতৃপ্ত মন তপ্ত ছিল। লুকিয়ে যেতেম ছাতে,
চুরি করতেম আকাশভরা সোনার বরন ছুটি,
নীল অমৃতে ডুবিয়ে নিতেম ব্যাকুল চক্ষু দুটি।
দুপুর রৌদ্রে সুদূর শূন্যে আর কোনো নেই পাখি,
কেবল একটি সঙ্গীবিহীন চিল উড়ে যায় ডাকি
নীল অদৃশ্যপানে ;
আকাশপ্রিয় পাখি ওকে আমার হৃদয় জানে।
স্তব্ধ ডানা প্রখর আলোর বুকে
যেন সে কোন্ যোগীর ধেয়ান মুক্তি-অভিমুখে।
তীক্ষ্ণ তীব্র স্বর
সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্ম হয়ে দূরের হতে দূর

ভেদ করে যায় চলে।
বৈরাগী ওই পাখির ভাষা মন কাঁপিয়ে তোলে।

আলোর সঙ্গে আকাশ যেথায় এক হয়ে যায় মিলে
শুভ্রে এবং নীলে
তীর্থ আমার জেনেছি সেইখানে।
অতল নীরবতার মাঝে অবগাহনস্নানে।
আবার যখন ঝঞ্ঝা, যেন প্রকাণ্ড এক চিল
এক নিমেষে ছোঁ মেরে নেয় সব আকাশের নীল,
দিকে দিকে ঝাপটে বেড়ায় স্পর্ধাবেগের ডানা,
মানতে কোথাও চায় না কারো মানা,
বারে বারে তড়িৎশিখার চঞ্চু আঘাত হানে
অদৃশ্য কোন্ পিঞ্জরটার কালো নিষেধপানে,
আকাশে আর ঝড়ে
আমার মনে সব-হারানো ছুটির মূর্তি গড়ে।
তাই তো খবর পাই—
শান্তি সেও মুক্তি, আবার অশান্তিও তাই।

আলমোড়া
৯।৬।৩৭

খেলা

এই জগতের শক্ত মনিব সয় না একটু ত্রুটি,
যেমন নিত্য কাজের পালা তেমনি নিত্য ছুটি।
বাতাসে তার ছেলেখেলা, আকাশে তার হাসি,
সাগর জুড়ে গদ্‌গদ ভাষ বুদ্‌বুদে যায় ভাসি।
ঝরনা ছোটে দূরের ডাকে পাথরগুলো ঠেলে—
কাজের সঙ্গে নাচের খেয়াল কোথায় থেকে পেলে।
ওই হোথা শাল, পাঁচশো বছর মজ্জাতে ওর ঢাকা—
গম্ভীরতায় অটল যেমন, চঞ্চলতায় পাকা।
মজ্জাতে ওর কঠোর শক্তি, বকুনি ওর পাতায়—
ঝড়ের দিনে কি পাগলামি চাপে যে ওর মাথায়।

ফুলের দিনে গন্ধের ভোজ অবাধ সারাক্ষণ,
ডালে ডালে দখিন হাওয়ার বাঁধা নিমন্ত্রণ।

কাজ ক'রে মন অসাড় যখন মাথা যাচ্ছে ঘুরে
হিমালয়ের খেলা দেখতে এলেম অনেক দূরে।
এসেই দেখি নিষেধ জাগে কুহেলিকার স্তূপে,
গিরিরাজের মুখ ঢাকা কোন্ সুগম্ভীরের রূপে।
রাত্তিরে যেই বৃষ্টি হল, দেখি সকালবেলায়,
চাদরটা ওর কাজে লাগে চাদর-খোলার খেলায়।
ঢাকার মধ্যে চাপা ছিল কৌতুক একরাশি,
প্রকাণ্ড এক হাসি।

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

ছবি-আঁকিয়ে

ছবি আঁকার মানুষ ওগো পথিক চিরকেলে,
চলছ তুমি আশেপাশে দৃষ্টির জাল ফেলে।
পথ-চলা সেই দেখাগুলো লাইন দিয়ে এঁকে
পাঠিয়ে দিলে দেশ-বিদেশের থেকে।
যাহা-তাহা যেমন-তেমন আছে কতই কী যে,
তোমার চোখে ভেদ ঘটে নাই চণ্ডালে আর দ্বিজে।
ওই যে গরিবপাড়া,
আর কিছু নেই ঘেঁষাঘেঁষি কয়টা কুটীর ছাড়া।
তার ওপারে শুধু
চৈত্রমাসের মাঠ করছে ধু ধু।
এদের পানে চক্ষু মেলে কেউ কভু কি দাঁড়ায়,
ইচ্ছে ক'রে এ ঘরগুলোর ছায়া কি কেউ মাড়ায়।
তুমি বললে, দেখার ওরা অযোগ্য নয় মোটে;
সেই কথাটিই তুলির রেখায় তক্ষনি যায় রটে।
হঠাৎ তখন বেঁকে উঠে আমরা বলি, তাই তো,
দেখার মতোই জিনিস বটে, সন্দেহ তার নাই তো।

ওই যে কারা পথে চলে, কেউ করে বিশ্রাম,
নেই বললেই হয় ওরা সব, পোঁছে না কেউ নাম—
তোমার কলম বললে, ওরা খুব আছে এই জেনো ;
অমনি বলি, তাই বটে তো, সবাই চেনো-চেনো।
ওরাই আছে, নেইকো কেবল বাদশা কিংবা নবাব ;
এই ধরণীর মাটির কোলে থাকাই ওদের স্বভাব।
অনেক খরচ ক'রে রাজা আপন ছবি আঁকায়,
তার পানে কি রসিক লোকে কেউ কখনো তাকায়।
সে-সব ছবি সাজে-সজ্জায় বোকার লাগায় ধাঁধাঁ,
আর এরা সব সত্যি মানুষ সহজ রূপেই বাঁধা।

ওগো চিত্রী, এবার তোমার কেমন খেয়াল এ যে,
এঁকে বসলে ছাগল একটা উচ্চশ্রবা ত্যেজে।
জন্তুটা তো পায় না খাতির হঠাৎ চোখে ঠেকলে,
সবাই ওঠে হাঁ হাঁ ক'রে সবজি-খেতে দেখলে।
আজ তুমি তার ছাগলামিটা ফোটালে যেই দেহে
এক মুহূর্তে চমক লেগে বলে উঠলেম, কে হে।
ওরে ছাগলওয়ালা, এটা তোরা ভাবিস কার—
আমি জানি, একজনের এই প্রথম আবিষ্কার।

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

অজয় নদী

এককালে এই অজয়নদী ছিল যখন জেগে
স্রোতের প্রবল বেগে
পাহাড় থেকে আনত সদাই ঢালি
আপন জোরের গর্ব ক'রে চিকন-চিকন বালি।
অচল বোঝা বাড়িয়ে দিয়ে যখন ক্রমে ক্রমে
জোর গেল তার কমে,

নদীর আপন আসন বালি নিল হরণ করে,
নদী গেল পিছনপানে সরে ;
অনুচরের মতো
রইল তখন আপন বালির নিত্য-অনুগত।
কেবল যখন বর্ষা নামে ঘোলা জলের পাকে
বালির প্রতাপ ঢাকে।
পূর্বযুগের আক্ষেপে তার ক্ষোভের মাতন আসে,
বাঁধনহারা ঈর্ষা ছোটে সবার সর্বনাশে।
আকাশেতে গুরুগুরু মেঘের ওঠে ডাক,
বুকের মধ্যে ঘুরে ওঠে হাজার ঘূর্ণিপাক।
তার পরে আশ্বিনের দিনে শুভ্রতার উৎসবে
সুর আপনার পায় না খুঁজে শুভ্র আলোর স্তবে।
দূরে তীরে কাশের দোলা, শিউলি ফুটে দূরে,
শুষ্ক বুকে শরৎ নামে বালিতে রোদ্দুরে।
চাঁদের কিরণ পড়ে যেথায় একটু আছে জল
যেন বন্ধ্যা কোন্‌ বিধবার লুটানো অঞ্চল।
নিঃস্ব দিনের লজ্জা সদাই বহন করতে হয়,
আপনাকে হায় হারিয়ে-ফেলা অকীর্তি অক্ষয়।

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

পিছু-ডাকা

যখন দিনের শেষে
চেয়ে দেখি সমুখপানে সূর্য ডোবার দেশে
মনের মধ্যে ভাবি,
অস্তসাগর-তলায় গেছে নাবি
অনেক সূর্য-ডোবার সঙ্গে অনেক আনাগোনা,
অনেক দেখাশোনা,
অনেক কীর্তি, অনেক মূর্তি, অনেক দেবালয়,
শক্তিমানের অনেক পরিচয়।

তাদের হারিয়ে-যাওয়ার ব্যথায় টান লাগে না মনে,
কিন্তু যখন চেয়ে দেখি সামনে সবুজ বনে
ছায়ায় চরছে গোরু,
মাঝ দিয়ে তার পথ গিয়েছে সরু,
ছেয়ে আছে শুকনো বাঁশের পাতায়,
হাট করতে চলে মেয়ে ঘাসের আঁটি মাথায়,
তখন মনে হঠাৎ এসে এই বেদনাই বাজে—
ঠাঁই রবে না কোনোকালেই ওই যা-কিছুর মাঝে।
ওই যা-কিছুর ছবির ছায়া দুলেছে কোন্‌কালে
শিশুর-চিত্ত-নাচিয়ে-তোলা ছড়াগুলির তালে—
তিরপূর্নির চরে
বালি ঝুর্‌ঝুর্‌ করে,
কোন্‌ মেয়ে সে চিকন-চিকন চুল দিচ্ছে ঝাড়ি,
পরনে তার ঘুরে-পড়া ডুরে একটি শাড়ি।
ওই যা-কিছু ছবির আভাস দেখি সাঁঝের মুখে
মর্তধরার পিছু-ডাকা দোলা লাগায় বুকে।

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

ভ্রমণী

মাটির ছেলে হয়ে জন্ম, শহর নিল মোরে
পোষ্যপুত্র ক'রে।
ইঁটপাথরের আলিঙ্গনের বাধল আড়ালটিকে
আমার চতুর্দিকে।
মন রইত ব্যাকুল হয়ে দিবস রজনীতে
মাটির স্পর্শ নিতে।
বই প'ড়ে তাই পেতে হত ভ্রমণকারীর দেখা
ছাদের উপর একা।
কষ্ট তাদের, বিপদ তাদের, তাদের শঙ্কা যত
লাগত নেশার মতো।

পথিক যে জন পথে পথেই পায় সে পৃথিবীকে,
মুক্ত সে চৌদিকে।
চলার ক্ষুধায় চলতে সে চায় দিনের পরে দিনে
অচেনাকেই চিনে।
লড়াই ক'রে দেশ করে জয়, বহায় রক্তধারা,
ভূপতি নয় তারা।
পলে পলে পায় যারা হয় মাটির পরে মাটি
প্রত্যেক পদ হাঁটি—
নাইকো সেপাই, নাইকো কামান, জয়পতাকা নাহি—
আপন বোঝা বাহি
অপথেও পথ পেয়েছে, অজানাতে জানা,
মানে নাইকো মানা—
মরু তাদের, মেরু তাদের, গিরি অভ্রভেদী
তাদের বিজয়বেদী।
সবার চেয়ে মানুষ ভীষণ সেই মানুষের ভয়
ব্যাঘাত তাদের নয়।
তারাই ভূমির বরপুত্র, তাদের ডেকে কই,
তোমরা পৃথ্বীজয়ী।

[আলমোড়া]
৬ আষাঢ় ১৩৪৪

আকাশপ্রদীপ

অন্ধকারের সিন্ধুতীরে একলাটি ওই মেয়ে
আলোর নৌকা ভাসিয়ে দিল আকাশপানে চেয়ে।
মা যে তাহার স্বর্গে গেছে এই কথা সে জানে,
ওই প্রদীপের খেয়া বেয়ে আসবে ঘরের পানে।
পৃথিবীতে অসংখ্য লোক, অগণ্য তার পথ,
অজানা দেশ কত আছে অচেনা পর্বত,

তারই মধ্যে স্বর্গ থেকে ছোট্ট ঘরের কোণ
যায় কি দেখা যেথায় থাকে দুটিতে ভাইবোন।
মা কি তাদের খুঁজে খুঁজে বেড়ায় অন্ধকারে,
তারায় তারায় পথ হারিয়ে যায় শূন্যের পারে।
মেয়ের হাতের একটি আলো জ্বালিয়ে দিল রেখে,
সেই আলো মা নেবে চিনে অসীম দূরের থেকে।
ঘুমের মধ্যে আসবে ওদের চুমো খাবার তরে
রাতে রাতে মা-হারা সেই বিছানাটির 'পরে।

পতিসর
৮ শ্রাবণ ১৩৪৪

নাটক ও প্রহসন

তপতী

ভূমিকা

রাজা ও রানী আমার অল্পবয়সের রচনা, সেই আমার প্রথম নাটক লেখার চেষ্টা।

সুমিত্রা এবং বিক্রমের সম্বন্ধের মধ্যে একটি বিরোধ আছে— সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই বিরোধের সমাধা হয়। বিক্রমের যে প্রচণ্ড আসক্তি পূর্ণভাবে সুমিত্রাকে গ্রহণ করবার অন্তরায় ছিল, সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই আসক্তির অবসান হওয়াতে সেই শান্তির মধ্যেই সুমিত্রার সত্য উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হল, এইটেই রাজা ও রানীর মূল কথা।

রচনার দোষে এই ভাবটি পরিস্ফুট হয় নি। কুমার ও ইলার প্রেমের বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিকতার দ্বারা নাটককে বাধা দিয়েছে এবং নাটকের শেষ অংশে কুমার যে অসংগত প্রাধান্য লাভ করেছে তাতে নাট্যের বিষয়টি হয়েছে ভারগ্রস্ত ও দ্বিধাবিভক্ত। এই নাটকের অন্তিমে কুমারের মৃত্যু দ্বারা চমৎকার উৎপাদনের চেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে— এই মৃত্যু আখ্যান-ধারার অনিবার্য পরিণাম নয়।

অনেকদিন ধরে রাজা ও রানীর ত্রুটি আমাকে পীড়া দিয়েছে। কিছুদিন পূর্বে শ্রীমান গগনেন্দ্রনাথ যখন এই নাটকটি অভিনয়ের উদ্‌যোগ করেন তখন এটাকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত করে একে অভিনয়যোগ্য করবার চেষ্টা করেছিলুম। দেখলুম এমনতরো অসম্পূর্ণ সংস্কারের দ্বারা সংশোধন সম্ভব নয়। তখনই স্থির করেছিলুম এ নাটক আগাগোড়া নতুন করে না লিখলে এর সদ্‌গতি হতে পারে না। লিখে এই বইটার সম্বন্ধে আমার সাধ্যমত দায়িত্ব শোধ করেছি।

পুরানো নাটককে নতুন করে যখন লেখা গেল তখন পুরাতনের মোহ কাটিয়ে তার নতুন পরিচয়কে পাকা করতে গেলে অভিনয় করে দেখানো দরকার। সেই চেষ্টা করতে প্রবৃত্ত হয়েছি। এই উপলক্ষে নাট্যমঞ্চের আয়োজনের কথা সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলা আবশ্যক।

আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদ্রবরূপে প্রবেশ করেছে। ওটা ছেলেমানুষি। লোকের চোখ ভোলাবার চেষ্টা। সাহিত্য ও নাট্যকলার মাঝখানে ওটা গায়ের জোরে প্রক্ষিপ্ত। কালিদাস মেঘদূত লিখে গেছেন, ওই কাব্যটি ছন্দোময় বাক্যের চিত্রশালা। রেখা-চিত্রকর তুলি-হাতে এর পাশে পাশে তাঁর রেখাঙ্ক-ব্যাখ্যা যদি চালনা করেন তা হলে কবির প্রতিও যেমন অবিচার, পাঠকের প্রতিও তেমনি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়। নিজের কবিত্বই কবির পক্ষে যথেষ্ট, বাইরের সাহায্য তাঁর পক্ষে সাহায্যই নয়, সে ব্যাঘাত; এবং অনেক স্থলে স্পর্ধা।

শকুন্তলায় তপোবনের একটি ভাব কাব্যকলার আভাসেই আছে। সে-ই পর্যাপ্ত। আঁকা-ছবির দ্বারা অত্যন্ত বেশি নির্দিষ্ট না হওয়াতেই দর্শকের মনে অবাধে সে আপন কাজ করতে পারে। নাট্যকাব্য দর্শকের কল্পনার উপরে দাবি রাখে, চিত্র সেই দাবিকে খাটো করে, তাতে ক্ষতি হয় দর্শকেরই। অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল; দৃশ্যপটটা তার বিপরীত; অনধিকার প্রবেশ ক'রে সচলতার মধ্যে থাকে সে মূক, মূঢ়, স্থাণু; দর্শকের চিত্তদৃষ্টিকে নিশ্চল বেড়া দিয়ে সে একান্ত সংকীর্ণ করে রাখে। মন যে-জায়গায় আপন আসন নেবে সেখানে একটা পটকে বসিয়ে মনকে বিদায় দেওয়ার নিয়ম যান্ত্রিক যুগে প্রচলিত হয়েছে, পূর্বে ছিল না। আমাদের দেশে চিরপ্রচলিত যাত্রার পালাগানে লোকের ভিড়ে স্থান সংকীর্ণ হয় বটে কিন্তু পটের ঔদ্ধত্যে মন সংকীর্ণ হয় না। এই কারণেই যে-নাট্যাভিনয়ে আমার কোনো হাত থাকে সেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো-নামানোর ছেলেমানুষিকে আমি প্রশ্রয় দিই নে। কারণ বাস্তব-সত্যকেও এ বিদ্রূপ করে, ভাবসত্যকেও বাধা দেয়।

শান্তিনিকেতন
১৭ ভাদ্র ১৩৩৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নাটকের পাত্র ও পাত্রীগণ

সুমিত্রা	জালন্ধরের রানী
বিক্রমদেব	জালন্ধরের রাজা
নরেশ	বিক্রমের বৈমাত্র ভাই
বিপাশা	সুমিত্রার সখী
দেবদত্ত	রাজার সখা
নারায়ণী	দেবদত্তের স্ত্রী
গৌরী, কালিন্দী, মঞ্জরী	রাজবাড়ির পরিচারিকা
কুমারসেন	কাশ্মীরের যুবরাজ
চন্দ্রসেন	কুমারের পিতৃব্য
শংকর	কুমারের পুরাতন বৃদ্ধ ভৃত্য
ত্রিবেদী	জালন্ধরের রাজপুরোহিত
ভার্গব	কাশ্মীরের মার্তণ্ডমন্দিরের পুরোহিত

রত্নেশ্বর, শিখরিনী, কুঞ্জলাল, জনতা প্রভৃতি

তপতী

১

ভৈরবমন্দিরের প্রাঙ্গণ

দেবদত্ত ও একদল উপাসক

গান

সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ,
হে ভৈরব, শক্তি দাও, ভক্তপানে চাহ।
দূর করো মহারুদ্র,
যাহা মুগ্ধ, যাহা ক্ষুদ্র,
মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ।
দুঃখের মন্থনবেগে উঠিবে অমৃত
শঙ্কা হতে রক্ষা পাবে যারা মৃত্যুভীত
তব দীপ্ত রৌদ্র তেজে
নির্ঝরিয়া গলিবে যে,
প্রস্তর-শৃঙ্খলোন্মুক্ত ত্যাগের প্রবাহ।

[দেবদত্ত ব্যতীত অন্য সকলের প্রস্থান

বিক্রমের প্রবেশ

বিক্রম। এর কী অর্থ? আজ মীনকেতুর পূজার আয়োজন করেছি। ভৈরবের স্তব দিয়ে তোমরা তার ভূমিকা করলে কেন।

দেবদত্ত। রাজার এই পূজা এখনো জনসাধারণে স্বীকার করতেই পারছে না। এমন-কি, তারা ভীত হয়েছে।

বিক্রম। কেন, তাদের ভয় কিসের।

দেবদত্ত। তোমার সাহস দেখে তারা স্তম্ভিত। পঞ্চশর দগ্ধ হয়েছেন যাঁর তপোবনে, তাঁরই পূজার বনে কন্দর্পের পূজা? এর পরিণামে বিপদ ঘটবে না কি?

বিক্রম। কন্দর্প সেবায় এসেছিলেন অপরাধীর মতো লুকিয়ে— এবার তাঁকে ডাকব প্রকাশ্যে, আসবেন দেবতার যোগ্য নিঃসংকোচে— মাথা তুলে ধ্বজা উড়িয়ে। বিপদের ভয় বিপদ ডেকে আনে।

দেবদত্ত। মহারাজ, আদিকাল থেকেই ওই দুই দেবতায় মধ্যে বিরোধ।

বিক্রম। ক্ষতি তাতে মানুষেরই। এক দেবতা আর-এক দেবতার প্রসাদ থেকে মানুষকে বঞ্চিত করেন। ব্রাহ্মণ, শাস্ত্র মিলিয়ে চিরদিন তোমরা দেবপূজার ব্যাবসা করে এসেছ তাই দেবতার তোমরা কিছুই জান না।

দেবদত্ত। সে কথা ঠিক, দেবতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় পুঁথির থেকে। শ্লোকের ভিড় ঠেলে মরি; দক্ষিণা পাই, কিন্তু ওঁদের কাছে ঘেঁষবার সময়ই পাই নে।

বিক্রম। আমার মীনকেতু অশাস্ত্রীয়; অনুষ্টুভ-ত্রিষ্টুভের বন্ধন মানেন না। তিনি প্রলয়েরই দেবতা। রুদ্রভৈরবের সঙ্গেই তাঁর অন্তরের মিল— পিনাক ছদ্মবেশ ধরেছে তাঁর পুষ্পধনুতে।

দেবদত্ত। মহারাজ, ওই দেবতাটিকে যথাসাধ্য পাশ কাটিয়ে চলবারই চেষ্টা করেছি। আভাসে যেটুকু জানাশোনা ঘটেছে তাতে ভৈরবের সঙ্গে অন্তত বেশেভূষায় ওঁর যথেষ্ট মিল দেখতে পাই নি।

বিক্রম। তার কারণ, এ পর্যন্ত রতি নিজেরই বেশের অংশ দিয়ে কন্দর্পকে সাজিয়েছে। তাঁকে রাঙিয়েছে নিজেরই কজ্জলের কালিমায়, কুঙ্কুমের রক্তিমায়, নীল কঞ্চুলিকার নীলিমায়— উনি রমণীর লালনে লালিত্যে আচ্ছন্ন আবিষ্ট, তাই তো বজ্রপাণি ইন্দ্রের সভায় উনি লজ্জিতভাবে চরের বৃত্তি করেন। রুদ্রের পৌরুষের আগুনে তাই তো ওঁকে দগ্ধ করেছিল।

দেবদত্ত। সে ইতিহাস তো চুকে গেছে। আবার সেই পোড়া দেবতাকে নিয়ে কেন এই উপসর্গ। পুনর্বার ওঁকে পোড়াতে হবে নাকি।

বিক্রম। না, তাঁকে মৃত্যুর ভিতর দিয়েই বাঁচাতে হবে— সেজন্যে বীরের শক্তি চাই। তোমাদের ভৈরবের স্তব সম্পূর্ণ হবে না আমাদের মীনকেতুর স্তব যদি তার সঙ্গে না যোগ করি।

ভস্ম-অপমানশয্যা ছাড়ো, পুষ্পধনু,
রুদ্রবহ্নি হতে লহ জ্বলদর্চি তনু।
যাহা মরণীয় যাক মরে,
জাগো অবিস্মরণীয় ধ্যানমূর্তি ধরে।

যাহা রূঢ়, যাহা মূঢ় তব,
যাহা স্থূল দগ্ধ হোক, হও নিত্য নব।
মৃত্যু হতে জাগো পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহ তনু।

তোমরা জান না, মহেশ্বর মদনকে অগ্নিবর দিয়েছিলেন, মৃত্যু দিয়েই তিনি তাকে অমর করেছেন। অনঙ্গই অমৃত দেবার অধিকারী হয়েছেন।

মৃত্যুঞ্জয় যে-মৃত্যুরে দিয়েছেন হানি
অমৃত সে-মৃত্যু হতে দাও তুমি আনি।
সেই দিব্য দীপ্যমান দাহ
উন্মুক্ত করুক অগ্নি-উৎসের প্রবাহ।
মিলনেরে করুক প্রখর,
বিচ্ছেদেরে করে দিক দুঃসহ সুন্দর।
মৃত্যু হতে ওঠো পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহ তনু।

মীনকেতুর পথ সহজ পথ নয়, সে নয় পুষ্পবিকীর্ণ ভোগের পথ, সে দেয় না আরামের তৃপ্তি।

দেবদত্ত। শুনে ভয় হয়। কিন্তু যা নিয়ে বিপদ ঘটে তার কারণ হচ্ছে অনঙ্গদেব যে-ঘরকে তাঁর পায়ের ধূলিলেপনে চিহ্নিত করে নেন, সে-ঘরে অন্য কোনো দেবতাকে প্রবেশ করতে দেন না। তাতেই পূজনীয়দের মনে ঈর্ষা জন্মায়।

বিক্রম। মনে হচ্ছে কথাটা আমাকেই লক্ষ্য ক'রে। সাহস বাড়ছে।

দেবদত্ত। রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব দুঃসাহসের চরম। ভাগ্যদোষেই রাজার বন্ধু দুর্মুখ। ইচ্ছাক্রমে নয়।

বিক্রম। তবে মুখ খোলো। স্পষ্ট করেই বলো, প্রজারা আমার নামে কী বলছে।

দেবদত্ত। তারা বলছে, অন্তঃপুরের অবগুণ্ঠনতলে সমস্ত রাজ্যে আজ প্রদোষান্ধকার। রাজলক্ষ্মী রাজ্ঞীর ছায়ায় ম্লান।

বিক্রম। দুর্মুখ, প্রজারঞ্জনে আর-একবার সীতার নির্বাসন চাই নাকি?

দেবদত্ত। নির্বাসন তো তুমিই দিতে চাও তাঁকে অন্তঃপুরে, প্রজারা তাঁকে চায় সর্বজনের রাজসিংহাসনে। তাঁর হৃদয়ের সম্পূর্ণ অংশ তো তোমার নয়, এক অংশ প্রজাদের। শুধু কি তিনি রাজবধূ। তিনি যে লোকমাতা।

বিক্রম। দেবদত্ত, অংশ নিয়েই যত বিরোধ। ওই নিয়েই কুরুক্ষেত্র। ওই তিনি আসছেন, রাজবধূর অংশ নিয়ে, না লোকমাতার?

দেবদত্ত। আমি তবে বিদায় হই, মহারাজ। [প্রস্থান

মহিষী সুমিত্রার প্রবেশ

বিক্রম। দেবী, কোথায় চলেছ। শুনে যাও।

সুমিত্রা। কী মহারাজ।

বিক্রম। একটা সুসংবাদ আছে।

সুমিত্রা। কী, শুনি।

বিক্রম। লোকনিন্দার পরম গৌরবে আমি ধন্য হয়েছি।

সুমিত্রা। নিন্দা কিসের।

বিক্রম। লোকে বলছে, তোমার প্রেমে কর্তব্যকেও তুচ্ছ করতে পেরেছি। এতবড়ো কথা।

সুমিত্রা। যারা বলে তাদের কথা মিথ্যা হোক।

বিক্রম। অক্ষয় হোক এই সত্য, ইতিহাসে বিখ্যাত হোক, কবিকণ্ঠে আখ্যাত হোক, রসতত্ত্বে ব্যাখ্যাত হোক, ইতরলোকের নিন্দাপ্রশংসার অতীত হোক।

সুমিত্রা। মহারাজ, যে-প্রেম রাজকর্তব্যেরও উপরে, সে গ্রহণ করুন দেবতা, সে কি আমি নিতে পারি।

বিক্রম। দেবতার যা প্রাপ্য তিনি তা নেবেন তোমার মধ্যে দিয়েই। তোমার মুখে পরমাশ্চর্যকে দেখেছি। লজ্জা কোরো না, শোনো আমার কথা। যশের লোভে যারা দেশ জয় করে বেড়ায় লক্ষ্মীর তারা বিদূষক। তাদের আয়ু যায় বৃথায়, কীর্তিও চিরকাল থাকে না, লক্ষ্মী বসে বসে হাসেন। আমি তাদের দলে নই। কাশ্মীরে গিয়ে যুদ্ধ করেছিলাম তোমারই সাধনায়।

সুমিত্রা। তোমার যুদ্ধযাত্রা সফল হয়েছে। এখন আর কী চাও।

বিক্রম। পেয়েছি বীণাটিকে। সংগীত দিয়ে অধিকার হবে কোন্ শুভক্ষণে? সুর মেলাতে পারছি নে, পেয়েও হার হচ্ছে পদে পদে। ভাগ্যের কাছে যে-দান পেয়েছি, সেই দানই আমাকে লজ্জা দিচ্ছে।

সুমিত্রা। মুঠোর মধ্যে চেপে রেখেছ আর কল্পনা করছ, পাই নি। কিন্তু তোমার কাছে আমারও কিছু চাবার নেই কি।

বিক্রম। সবই চাইতে পার, কিছু চাও না বলেই আমার রাজসম্পদ ব্যর্থ।

সুমিত্রা। আমি চাই আমার রাজাকে।

বিক্রম। পাও নি?

সুমিত্রা। না, পাই নি। সিংহাসন থেকে তুমি নেমে এসেছ এই নারীর কাছে। আমাকে কেন তুলে নিয়ে যাও না তোমার সিংহাসনের পাশে?

বিক্রম। হৃদয়ের সর্বোচ্চ শিখরে তোমার আসন দিয়েছি— তাতেও গৌরব নেই?

সুমিত্রা। মহারাজ, আমাকে নিয়ে অমন করে কথা সাজিয়ো না— এ তোমাকে শোভা পায় না। এতে আমাকেও ছোটো করে। কী হবে আমার স্তুতিবাক্য। আমার অনুরোধ রাখো। আমি এসেছি প্রজাদের হয়ে প্রার্থনা জানাতে।

বিক্রম। এই উদ্যানে? এখানে আজ ঋতুরাজের অধিকার! অন্তত আজ এক-দিনের জন্যেও সম্পূর্ণ ক'রে তাকে স্বীকার করো।

সুমিত্রা। আমি তো তোমার আদেশ পালনে ত্রুটি করি নি— উৎসব যাতে সুন্দর হয় আমি তো সেই আয়োজন করেছি। কিন্তু তোমারও কিছু করবার নেই কি? উৎসব যাতে মহৎ হয়ে ওঠে তুমি তাই করো, তোমার রাজমহিমা দিয়ে।

বিক্রম। বলো, আমার কী করবার আছে।

সুমিত্রা। কাশ্মীর থেকে যে-সব লুব্ধের দল তোমার সঙ্গে জালন্ধরে এসেছে, আজই সেই পরোপজীবীদের আদেশ করো কাশ্মীরে ফিরে যাক।

বিক্রম। আমার এই বিদেশী অমাত্যদের 'পরে তোমার মনে ক্রোধ আছে।

সুমিত্রা। তা আছে।

বিক্রম। কাশ্মীরবিজয়ে ওরা আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল এই তার কারণ।

সুমিত্রা। হাঁ মহারাজ, আমি জানি, বিশ্বাসঘাতকের শত্রুতা ভালো, তাদের মৈত্রী অস্পৃশ্য।

বিক্রম। ওদের ধর্ম ওরা বুঝবে কিন্তু আমি কৃতঘ্ন হব কী করে।

সুমিত্রা। তোমার সপক্ষে ওরা পাপ করেছে, ক্ষমা করতে হয় কোরো, কিন্তু তোমার বিপক্ষে অন্যায় করছে তাও কি ক্ষমা করতে হবে। তোমার ক্ষমার আশ্রয়ে প্রজাদের প্রতি পীড়ন হচ্ছে, তাতেও বাধা দেবে না?

বিক্রম। মিথ্যা অপবাদ সৃষ্টি করছে প্রজারা, তাদের ঈর্ষা ওরা বিদেশী ব'লে।

সুমিত্রা। তারও বিচার চাই।

বিক্রম। এ-সব ব্যাপারে তুমি যখন হস্তক্ষেপ কর, মহারানী, তখন সুবিচার কঠিন হয়। তুমি স্বয়ং আন অভিযোগ, কোনো প্রমাণকে আমি কি তার উপরে

আসন দিতে পারি। তুমি অনুরোধ করাতে যুধাজিৎকে বিনা বিচারেই পদচ্যুত করতে হল। আরো অমাত্য-বলি চাই তোমার?

সুমিত্রা। তবে সেই ভালো। বিচার কোরো না। আমারই প্রার্থনা রাখো। কাশ্মীরের পঙ্গপালগুলো যদি কোনো অপরাধ না করেও থাকে তবু ওরা আমার রাত্রিদিনের লজ্জা। আমাকে তার থেকে বাঁচাও।

বিক্রম। ওরা কলঙ্ক স্বীকার ক'রে বিপদ সামনে রেখে আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল। তোমার কথাতেও ওদের ত্যাগ করতে পারব না। দেখো প্রিয়ে, রাজার হৃদয়েই তোমার অধিকার, রাজার কর্তব্যে নয় এই কথা মনে রেখো।

সুমিত্রা। মহারাজ, তোমার বিলাসে আমি সঙ্গিনী, তোমার রাজধর্মে আমি কেউ নই এ কথা মনে রেখে আমার সুখ নেই। [প্রস্থান

বিক্রম। শুনে যাও মহিষী।

সুমিত্রা। (ফিরে এসে) কী, বলো।

বিক্রম। তুমি জাগছ না কেন। কিসের এই সূক্ষ্ম আবরণ। সমস্ত আমার রাজার শক্তি নিয়ে একে সরাতে পারলেম না। আপনাকে প্রকাশ করো— দেখা দাও, ধরা দাও। আমাকে এই অত্যন্ত অদৃশ্য বঞ্চনায় বিড়ম্বিত কোরো না।

সুমিত্রা। আমিও তোমাকে ওই কথাই বলছি। তুমি রাজা, আমি তোমার সম্পূর্ণ প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি নে— তোমার শক্তিকে অন্ধকারে ঢেকে রাখলে। তুমি জাগ নি। তুমি আমাকে কেড়ে নিয়ে এসেছ কাশ্মীর থেকে— সেই অপমান আমার ঘুচিয়ে দাও— আমাকে রানীর পদ দিতে হবে।

বিক্রম। আচ্ছা আচ্ছা, আমার রাজকোষ তোমার পায়ের তলায় সম্পূর্ণ ফেলে দিচ্ছি— তুমি প্রজাদের দান করতে চাও, করো দান যত খুশি। তোমার দাক্ষিণ্যের প্লাবন বয়ে যাক এ রাজ্যে।

সুমিত্রা। ক্ষমা করো মহারাজ, তোমার কোষ তোমারই থাক্। আমার দেহের অলংকার থাক্ আমার প্রজার জন্যে। অন্যায়ের হাত থেকে প্রজারক্ষায় যদি মহিষীর অধিকার আমার না থাকে তবে এ-সব তো বন্দিনীর বেশভূষা— এ বইতে পারব না। মহিষীকে যদি গ্রহণ কর সেবিকাকেও পাবে, নইলে শুধু দাসী! সে আমি নই। [প্রস্থান

মন্ত্রীর প্রবেশ

বিক্রম। যুধাজিতের নামে রানীর কাছে কে অভিযোগ করেছিল? তুমি?

মন্ত্রী। মন্ত্রগৃহের বাইরে আমি মন্ত্রণা করি নে, মহারাজ!

বিক্রম। তবে এ-সব কথা কে তাঁর কানে তুললে?

মন্ত্রী। যারা দুঃখ পেয়েছে তারা স্বয়ং।

বিক্রম। রানীর সাক্ষাৎ তারা পায় কী করে।

মন্ত্রী। করুণার যোগ্য যারা করুণাময়ী স্বয়ং তাদের সন্ধান রাখেন।

বিক্রম। আমাকে অতিক্রম করে যারা রানীর কাছে আবেদন নিয়ে আসে তারা দণ্ডের যোগ্য এ কথা যেন মনে থাকে।

মন্ত্রী। দণ্ড তারা পেয়েছে। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তারা তাদের পাকা ফসলের খেত জ্বালিয়ে দিয়েছে, এ কথা সবাই জানে।

বিক্রম। মন্ত্রী, নানা কৌশলে তুমি এই অমাত্যদের নামে নিন্দা করবার সুযোগ খোঁজ, এটা আমি লক্ষ্য করেছি।

মন্ত্রী। নিন্দনীয়দের নিন্দা করে থাকি কিন্তু কৌশল করে নয়।

বিক্রম। এই বিদেশীরা আমার আশ্রিত, তোমাদের ঈর্ষা থেকে তাদের বিশেষভাবে রক্ষা করা আমার রাজকর্তব্য।

মন্ত্রী। ওদের সম্বন্ধে নীরব থাকব। কিন্তু গুরুতর মন্ত্রণার বিষয় আছে। মহারাজ, ক্ষণকালের জন্যে—

বিক্রম। এখন সময় নয়। যাও, বিপাশাকে সংবাদ দাও আজ বকুলবীথিকায় মধ্যরাত্রে তার নৃত্য। ত্রিবেদীকে বোলো মীনকেতুর পূজায় মন্ত্রোচ্চারণে তার কোনো স্খলন সহ্য করব না।

মন্ত্রী। কাশ্মীরদেশী অমাত্য সবাই উৎসবে আসবেন সংবাদ পাঠিয়েছেন।

বিক্রম। মহারানীর সঙ্গে কোনোমতে তাদের সাক্ষাৎ না হয়, সতর্ক থেকো।

[উভয়ের প্রস্থান

রাজভ্রাতা নরেশ ও সুমিত্রার সহচরী বিপাশার প্রবেশ

বিপাশা। মানব না ও কথা। কাশ্মীর জয় করেছ তোমরা! মানব না।

নরেশ। সুন্দরী, অরসিক ইতিহাস মধুর কণ্ঠের সম্মতির অপেক্ষা রাখে না।

বিপাশা। রাজকুমার, দাম্ভিক কণ্ঠের আস্ফালনের ভাষাও তার ভাষা নয়।

নরেশ। কিন্তু তলোয়ারের সাক্ষ্য তো মানতে হবে। যমরাজকে সামনে রেখে সে কথা কয়। আমাদের মহারাজ কাশ্মীর জয় করেছেন।

বিপাশা। করেন নি। আমাদের যুবরাজ ছিলেন অনুপস্থিত। মানস-সরোবর থেকে অভিষেকের জল আনতে গিয়েছিলেন। তাই যুদ্ধ হয় নি, দস্যুবৃত্তি হয়েছিল।

নরেশ। তাঁর পিতৃব্য চন্দ্রসেন ছিলেন প্রতিনিধি। যুদ্ধ করেছিলেন।

বিপাশা। যুদ্ধের ভান করেছিলেন। লুঠ-করা সিংহাসন হার-মানার ছদ্মমূল্যে নিজে কিনে নেবার জন্যে। তোমাদের সভাকবি এই নিয়ে সাত সর্গ কবিতা লিখেছেন। তোমাদের যুদ্ধ ফাঁকি, তোমাদের ইতিহাস ফাঁকি। চুপ করে হাসছ যে! লজ্জা নেই!

নরেশ। মহারানী সুমিত্রা তো ফাঁকি নন। তিনি তো পর্বত থেকে নেমে এসেছেন আমাদের জয়লক্ষ্মীর অনুবর্তিনী হয়ে।

বিপাশা। চুপ করো, চুপ করো। দুঃখের কথা মনে করিয়ে দিয়ো না। রাজকন্যা তখন বালিকা, বয়েস ষোলো। খুড়োমহারাজ এসে বললেন, বিজয়ীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে, নইলে সন্ধি অসম্ভব। রাজকুমারী আগুন জ্বালিয়ে ঝাঁপ দিয়ে মরতে গিয়েছিলেন। পুরবৃদ্ধরা এসে বললে, মা, রক্ষা করো, যে পাণি মৃত্যুবর্ষণ করছে তোমার পাণি দিয়ে তাকে অধিকার করো— শান্তি হোক।

নরেশ। কিন্তু সেদিনকার কোনো গ্লানি তো মহারানীর মনে নেই। প্রসন্ন মহিমায় সিংহাসনে তাঁর আপন স্থান নিয়েছেন।

বিপাশা। মহাদুঃখ ভোলবার মতোই মহাশক্তি তাঁর, তিনি যে সতীলক্ষ্মী। মৃত্যুর জন্যে যে আগুন জ্বলেছিল তাকে সাক্ষী করে তাঁর বিবাহ। তিনদিন কৈলাসনাথের মন্দিরে ধ্যানে বসে উপবাস করে নিজেকে শুদ্ধ করে নিয়েছেন। অসহ্য অপমানকে নিঃশেষে নিজের মধ্যে দগ্ধ করে নিয়ে তবে এলেন তোমাদের ঘরে। বীরাঙ্গনার ক্ষমা যদি না থাকত তবে আগুন ধরত তোমাদের সিংহাসনে।

নরেশ। জান বিপাশা, ওই বীরাঙ্গনা আপন মহিমাচ্ছটায় কাশ্মীরের দিকে আমাদের হৃদয়ের একটি দীপ্যমান ছায়াপথ এঁকে দিয়েছেন। জালন্ধরের যুবকদের মন তিনি উদাস করেছেন ওই কাশ্মীরের মুখে। তিনি তাদের ধ্যানের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছেন একটি অপরূপ জ্যোতির্মূর্তি। তুমি জান না, জালন্ধর থেকে কত পাগল গেছে ওই কাশ্মীরে, খুঁজতে তাদের সাধনার ধনকে।

বিপাশা। হায় রে, এ তো যুদ্ধ করা নয়। ওখানে তোমাদের অস্ত্র চলবার রাস্তা থাকতেও পারে কিন্তু হৃদয়জয়ের পথ ও দিকে বন্ধ করে দিয়েছ তোমাদের বর্বরতা দিয়ে।

নরেশ। সাধনা করতে হবে— তাতেও তো আনন্দ আছে।

বিপাশা। তা করো, কিন্তু সিদ্ধির আশা ছেড়ে দাও।

নরেশ। সিদ্ধি হবেই, আমি একলাই তা প্রমাণ করব— কাশ্মীর পর্যন্ত না গিয়ে!

বিপাশা। তোমার যত বড়ো অহংকার তত বড়োই দুরাশা।

নরেশ। দুরাশাই আমার, সেই আমার অহংকার। আমার আকাঙ্ক্ষা পর্বতের দুর্গম শিখর। সেখানে প্রভাতের দুর্লভ তারাকে দেখি, ভোরের স্বপ্নে।

বিপাশা। তোমাদের কবির কাছে পাঠ মুখস্থ করে এলে বুঝি?

নরেশ। প্রয়োজন হয় না। বাইরে যার কাছ থেকে পাই কঠোর কথা, অন্তরে সেই দেয় বাণীর বর, গোপনে। যদি সাহস দাও তার নামটি তোমাকে বলি।

বিপাশা। কাজ নেই অত সাহসে।

নরেশ। তবে থাক্। কিন্তু এই পদ্মের কুঁড়ি, একে নিতে দোষ কী। এও তো মুখ ফুটে কিছু বলে না।

বিপাশা। না, নেব না।

নরেশ। কাশ্মীরের সরোবর থেকে এর মূল এনেছিলুম। অনেকদিন অনেক দ্বিধার পরে দেখা দিয়েছে তার এই কুঁড়িটি। মনে হচ্ছে আমার সৌভাগ্য তার প্রথম নিদর্শনপত্রটি পাঠিয়েছে— এর মধ্যে একজনের অদৃশ্য স্বাক্ষর আছে। নেবে না? এই রেখে গেলাম তোমার পায়ের কাছে। [প্রস্থানোদ্যম

বিপাশা। শোনো, শোনো, আবার বলছি তোমরা কাশ্মীর জয় কর নি।

নরেশ। নিশ্চয় করেছি। সেজন্যে রাগ করতে পার, অবজ্ঞা করতে পারবে না। জয় করেছি।

বিপাশা। ছল করে।

নরেশ। না, যুদ্ধ করে।

বিপাশা। তাকে যুদ্ধ বলে না।

নরেশ। হাঁ, যুদ্ধই বলে।

বিপাশা। সে জয় নয়।

নরেশ। সে জয়ই।

বিপাশা। তবে ফিরিয়ে নিয়ে যাও তোমার পদ্মের কুঁড়ি।

নরেশ। ফিরিয়ে নেবার সাধ্য আমার নেই।

বিপাশা। এ আমি কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলব।

নরেশ। পার তো ছিঁড়ে ফেলো— কিন্তু আমি দিয়েছি আর তুমি নিয়েছ, এ কথা রইল বিধাতার মনে— চিরদিনের মতো। [প্রস্থান

সুমিত্রার প্রবেশ

সুমিত্রা। পদ্মের কুঁড়ি-হাতে একলা দাঁড়িয়ে কী ভাবছিস, বিপাশা।

বিপাশা। মনে-মনে ফুলের সঙ্গে করছি ঝগড়া।

সুমিত্রা। সংসারে তোর ঝগড়া আর কিছুতেই মিটতে চায় না। কিসের ঝগড়া। ফুলের সঙ্গে আবার ঝগড়া কিসের।

বিপাশা। ওকে বলছি, তুমি কাশ্মীরের ফুল, এখানেও তোমার মুখ প্রসন্ন কেন। অপমান এত সহজেই ভুলেছ ?

সুমিত্রা। দেবতার ফুল মানুষের অপরাধ যদি মনে রাখত তা হলে মরু হত এই পৃথিবী।

বিপাশা। তুমিই সেই দেবতার ফুল, মহারানী, কিন্তু কাঁটাও দেবতারই সৃষ্টি। সত্যি করো বলো, কাশ্মীরের 'পরে যে-অন্যায় হয়েছে সে কখনো তোমার মনে পড়ে না ? চুপ করে রইলে যে ? উত্তর দেবে না ? তোমার মাতৃভূমির দোহাই, এর একটা উত্তর দাও।

সুমিত্রা। সেই আমার মাতৃভূমিরই দোহাই, আমাকে কেবল এই একটিমাত্র কথাই মনে রাখতে দে যে, আমি জালন্ধরের রানী।

বিপাশা। আর যা ভুলতে পার ভুলো, কখনো ভুলতে দেব না যে, তুমি কাশ্মীরের কন্যা।

সুমিত্রা। ভুলি নে। তাই কাশ্মীরের গৌরব রক্ষার জন্যেই কর্তব্যের গৌরব রাখতে হবে। নইলে এখানে কি দেহে মনে দাসীর কলঙ্ক মাখব।

বিপাশা। সে-কথা প্রতিদিন বুঝতে পারছ, মহারানী। কাশ্মীরকে জয়ী করেছ এদের হৃদয়ে। আমি তো কেউ না, তবু তোমার মহিমার আলোতেই এরা আমাকে মুগ্ধ যে চোখে দেখছে কাশ্মীরের কারো চোখে তো সে মোহ লাগে নি।

সুমিত্রা। বিনয় করছিস বুঝি ?

বিপাশা। বিনয় না মহারানী। আমি আপনাতে আপনি বিস্মিত। হেসো না তুমি, এরা আমাকে উদ্দেশ ক'রে যে-সব কথা আজকাল বলে থাকে কাশ্মীরের ভাষাতে সে-সব কথা আছে বলে অন্তত আমার জানা নেই।

সুমিত্রা। যে ভোরবেলায় এখানে চলে এলি তখনো তোর কানে কাশ্মীরের ভাষা সম্পূর্ণ জাগবার সময় হয় নি। তবু কাকলি একটু আধটু আরম্ভ হয়েছিল, সে কথা আজ বুঝি স্মরণ নেই ? যাই হোক এখনো যে উৎসবের সাজ করিস নি।

বিপাশা। সাজ শুরু করেছিলেম, এমন সময় কে একজন এসে বললে ওরা

কাশ্মীর জয় করেছে। কবরী থেকে ফেলে দিয়েছি মালা, আমার রক্তাংশুক লুটছে শিরীষবনের পথে। হাসছ কেন রানী।

সুমিত্রা। সে জায়গাটাকে তুই বনের পথ বলিস? এখানে আসবার সময় তোর রক্তাংশুক যে একজনের মাথায় দেখলুম।

বিপাশা। ওই দেখো, মহারানী, লজ্জা নেই, এখানকার যুবকদের অভ্যাস খারাপ, ওটা চুরি!

সুমিত্রা। আমার সন্দেহ হচ্ছে চুরিবিদ্যা শেখাবার জন্যেই চোরের রাস্তায় তোর রক্তাংশুক পড়ে থাকে। শুনেছি তার বিদ্যা সম্পূর্ণ হয়েছে, এবার তার চুরির শেষ পরীক্ষা হবে, তোর উপর দিয়ে।

বিপাশা। রাজার আজ্ঞা নাকি।

সুমিত্রা। যাঁর আজ্ঞা তাঁর বেদী সাজাবি চল্। ওই পদ্মের কুঁড়িটিই তোর প্রথম অর্ঘ্য হোক।

বিপাশা। যেয়ো না তুমি, তবে একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, সত্য করে বলো। মকরকেতনের পূজায় আজ রাত্রে যে-উৎসব হবে তাতে তোমার উৎসাহ আছে?

সুমিত্রা। মহারাজের আদেশ।

বিপাশা। সে তো জানি কিন্তু তোমার নিজের মন কী বলে।—চুপ করে থাকবে?

সুমিত্রা। হাঁ, চুপ করেই থাকব।

বিপাশা। আচ্ছা বেশ। কিন্তু একটা প্রশ্ন এতদিন তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে সাহস করি নি— আজ জিজ্ঞাসা করবই— চুপ করে থাকলে চলবে না।

সুমিত্রা। কী প্রশ্ন তোর।

বিপাশা। সত্যই কি তুমি মহারাজকে ভালোবাস। বলতেই হবে আমাকে।

সুমিত্রা। হাঁ ভালোবাসি। উত্তর শুনে চুপ করে রইলি যে!

বিপাশা। তবে সত্য কথা বলি তোমাকে। আর কিছুদিন আগে এ প্রশ্নও আমার মনে আসত না, উত্তর শুনলেও মেনে নিতুম।

সুমিত্রা। আজ নিজের মনের সঙ্গে মনে মনে মিলিয়ে দেখছিস বুঝি।

বিপাশা। তা তোমাকে লুকোব না, সবই তুমি জানো— মিলিয়ে দেখছি বৈকি, কিন্তু ঠিক মেলাতে পারছি নে।

সুমিত্রা। কী করে মিলবে। প্রজারক্ষার কল্পনায় কাশ্মীরের অসম্মান স্বীকার

ক'রে যেদিন আমি মহারাজের কাছে আত্মসমর্পণ করতে সম্মত হয়েছিলুম তখন তিন দিন ধরে কৈলাসনাথের মন্দিরে কিসের জন্যে তপস্যা করেছি?

বিপাশা। আমি হলে জালন্ধরের বিনিপাতের জন্যে তপস্যা করতুম।

সুমিত্রা। এই শক্তি চেয়েছিলুম, রুদ্রের প্রসাদে আমার বিবাহ যেন ভোগের না হয়। জালন্ধরের রাজগৃহে আমি কোনোদিন কিছুর জন্যেই যেন লোভ না করি; তবেই আমাকে অপমান স্পর্শ করতে পারবে না।

বিপাশা। কোনোদিন তোমার মন বিচলিত হয় নি, মহারানী?

সুমিত্রা। প্রতিদিন হয়েছে— হাজারবার হয়েছে।

বিপাশা। মাপ করো মহারানী, আমার সন্দেহ হয় তুমি তাঁকে অবজ্ঞা কর।

সুমিত্রা। অবজ্ঞা! এমন কথা বলিস নে, বিপাশা। ওঁর মধ্যে তুচ্ছ কিছুই নেই। প্রচণ্ড ওঁর শক্তি— সে-শক্তিতে বিলাসের আবিলতা নেই, আছে উল্লাসের উদ্দামতা। আমি যদি সেই কূল-ভাঙা বন্যার ধারে এসে দাঁড়াতুম, তা হলে আমার সমস্ত কোথায় ভেসে যেত, ধর্মকর্ম, শিক্ষাদীক্ষা। ওই শক্তির দুর্জয়তাকে অহরহ ঠেকাতে গিয়েই আমার মন এমন পাষাণ হয়ে উঠল। এত অজস্র দান কোনো নারী পায় না— এই দুর্লভ সৌভাগ্যকে প্রত্যাখ্যান করবার জন্যে নিজের সঙ্গে আমার এমন দুর্বিষহ দ্বন্দ্ব। মহারাজকে যদি অবজ্ঞা করতে পারতুম তা হলে তো সমস্তই সহজ হত। অন্তরে বাহিরে আমার দুঃখ যে কত দুঃসহ তা তিনিই জানেন যাঁর কাছে ব্রত নিয়েছিলুম।

বিপাশা। ব্রত যেন রাখলে, মহারানী, কিন্তু ভালোবাসা!

সুমিত্রা। কী বলিস, বিপাশা। এই ব্রতই তো আমার ভালোবাসাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, নইলে ধিক্‌কারের মধ্যে তলিয়ে যেত সে। প্রেম যদি লজ্জার বিষয় হয় তবে তার চেয়ে তার বিনাশ কী হতে পারে। আমার প্রেমকে বাঁচিয়েছেন তপস্বী মৃত্যুঞ্জয়। বিবাহের হোমাগ্নি থেকে আমার এ প্রেম গ্রহণ করেছি— আহুতির আর অন্ত নেই।

বিপাশা। নিষ্ঠুর তোমার দেবতা, আমি কিন্তু তাঁকে মানতে পারতুম না।

সুমিত্রা। কী করে জানলি। তিনি ডাক দিলেই তোকেও মানতে হত। কিন্তু বিপাশা, ব্রতের কথা প্রকাশ করা অপরাধ, আজ অন্যায় করলুম, ক্ষমা করুন আমার ব্রতপতি।—

বিপাশা। আমাকে ক্ষমা করো, মহারানী। কিন্তু কোথায় চলেছ।

সুমিত্রা। দেবদত্ত ঠাকুরের কাছে শুনলুম উৎসব উপলক্ষে দূরের থেকে প্রজারা

এসেছে। আজ মন্দিরের বাগানে তারা দর্শন পাবে। রাজা সেই সংবাদ পেয়ে শুনছি দ্বার রুদ্ধ করবার আদেশ করেছেন।

বিপাশা। তুমি কি সে দ্বার খোলাতে পারবে?

সুমিত্রা। হয়তো পারব না। তবুও দেখতে যাব যদি কোনোখানে তার কোনো ফাঁক থাকে।

বিপাশা। দ্বার রোধ করবার বিদ্যায় এরা এত নিপুণ যে, তার মধ্যে কোনো ত্রুটিই তুমি পাবে না— এ আমি বলে দিচ্ছি। [উভয়ের প্রস্থান

দেবদত্তের প্রবেশ। রত্নেশ্বরের দ্রুত প্রবেশ

রত্নেশ্বর। ঠাকুর, দেবদত্ত ঠাকুর।

দেবদত্ত। আমাকে ডাক পেড়ে আমাকে সুদ্ধ বিপদে ফেলবে দেখছি। কেন, কী হয়েছে।

রত্নেশ্বর। রাজার কাছে অপরাধী। তাঁর প্রহরীকে প্রহার করে এখানে এসেছি।

দেবদত্ত। প্রহার করেছ? শুনে শরীর পুলকিত হল। এমন উগ্র পরিহাসের ইচ্ছা হঠাৎ কেন তোমার মনে উদয় হল।

রত্নেশ্বর। উৎসবে রাজার দর্শন মিলবে আশা করেই বহু কষ্টে রাজধানীতে এসেছি। দ্বারী বললে উৎসবের দ্বার বন্ধ। তাই তাকে মারতে হল। অভিযোগ করতে এলে যদি সাক্ষাৎ না মেলে অপরাধ করলে অন্তত সেই উপলক্ষে তো রাজার সামনে পৌছব।

দেবদত্ত। কোথাকার মূর্খ তুমি। তুমি কি মনে কর, বুধকোটের গোঁয়ারের হাতে রাজার প্রহরী মার খেয়েছে এ কথা সে মরে গেলেও স্বীকার করবে। তার স্ত্রী শুনলে যে ঘরে ঢুকতে দেবে না।

রত্নেশ্বর। ঠাকুর, অনেক দূর থেকে এসেছি।

দেবদত্ত। এখনো অনেক দূরেই আছ। রাজার দর্শন কি সহজে মেলে। যোজন গণনা করেই কি দূরত্ব।

রত্নেশ্বর। গ্রামের মানুষ, রাজদর্শনের রীতিনীতি বুঝি নে, সেই জেনেই মহারাজ দয়া করবেন।

দেবদত্ত। নিজের বুদ্ধি থেকে বাহুবলে রাজদর্শনের যে রীতি তুমি উদ্‌ভাবন করেছ সেটা রাজধানীতে বা রাজসভায় প্রচলিত নেই। পারিষদবর্গের জন্যে দর্শনী কিছু এনেছ কি।

রত্নেশ্বর। আর কিছুই আনি নি আমার অভিযোগ ছাড়া, কিছু নেইও।

দেবদত্ত। গ্রামের মানুষ তা বুঝতে পারছি।

রত্নেশ্বর। কিসে বুঝলে, ঠাকুর।

দেবদত্ত। এখনো এ শিক্ষা হয় নি যে, রাজা তোমাদের মুখ থেকে শুনতে চান রাজ্যে সমস্তই ভালো চলছে, সত্যযুগ, রামরাজত্ব।

রত্নেশ্বর। সমস্তই যদি ভালো না চলে?

দেবদত্ত। তা হলে সেটা গোপন না করলে আরো মন্দ চলবে। রাজাকে অপ্রিয় কথা শোনানো রাজদ্রোহিতা।

রত্নেশ্বর। আমাদের প্রতি যদি উৎপাত হয়?

দেবদত্ত। হয় যদি তো সে তোমাদের প্রতিই হল। রাজাকে জানাতে গেলে উৎপাত হবে রাজার প্রতি।

রত্নেশ্বর। ঠাকুর, সন্দেহ হচ্ছে পরিহাস করছ।

দেবদত্ত। পরিহাস করেন ভাগ্য। বর্তমান অবস্থাটা বুঝিয়ে বলি। আজ ফাল্গুনের শুক্লাচতুর্দশী। এখানে চন্দ্রোদয়ের মুহূর্তে কেশরকুঞ্জে ভগবান মকরকেতনের পূজা, রাজার আদেশ। নাচগান বাজনা অনেক হবে, তার সঙ্গে তোমার কণ্ঠস্বর একটুও মিলবে না।

রত্নেশ্বর। না মিলুক, কিন্তু রাজার চরণ মিলবে।

দেবদত্ত। রাজাকে রাজসভায় পাওয়াই হচ্ছে পাওয়া, অস্থানে তাঁর অরাজকত্ব। অপেক্ষা করো, কাল নিজে তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

রত্নেশ্বর। ঠাকুর, তোমাদের সবুর সয়। আমার যে সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে, প্রত্যেক মুহূর্ত অসহ্য। আমাদের সব চেয়ে দুর্ভাগ্য এই যে, যমযন্ত্রণাও যখন পাই, অপমানের শূলের উপর যখন চড়ে থাকি তখনো অপেক্ষা করে থাকতে হয় রাজশাসনের জন্যে, নিজের হাত পঙ্গু। ধিক্ বিধাতাকে।

দেবদত্ত। এখন একটু থামো, ঐ মহারানী আসছেন। ওঁর কাছে আর্তনাদ করে ধৃষ্টতা কোরো না।

রত্নেশ্বর। আমার সৌভাগ্য, আপনি এসেছেন মহারানী, সমস্ত রাস্তা ওঁরই তো দর্শন কামনা করে এসেছি।

দেবদত্ত। যিনি দুঃখ পান তাঁকেই দুঃখ দিতে চাও তোমরা? জান না, বিচারের ভার ওঁর 'পরে নেই, রাজ্যশাসন করেন রাজা।

রত্নেশ্বর। মহারানী মা!

সুমিত্রার প্রবেশ

সুমিত্রা। কী বৎস, তুমি কে।

দেবদত্ত। ও কেউ না, নাম রত্নেশ্বর, এসেছে বুধকোট থেকে; এর বেশি ওর পরিচয় নেই। পায়ের ধুলো নিয়েই চলে যাবে। হল তো দর্শন— চল্‌ এখন ঘরে, আমার ব্রাহ্মণীর প্রসাদ পাবি।

সুমিত্রা। বুধকোট, সে তো শিলাদিত্যের শাসনে। বলো দেখি তার ব্যবহার কী রকম।

দেবদত্ত। মহারানী, এ সব প্রশ্ন এখানকার কোকিলের ডাকের মধ্যে ভালো শোনাচ্ছে না। আমি ওকে কালই নিজে রাজসভায় নিয়ে যাব।

রত্নেশ্বর। রাজসভা! মহারানী, সেখানে কোনো আশা নেই বলেই এই উৎসবের প্রাঙ্গণে অভিযোগ এনেছি।

সুমিত্রা। কেন আশা নেই।

রত্নেশ্বর। শিলাদিত্য স্বয়ং রাজধানীতে উপস্থিত, আমাদের কান্না চাপা দেবার জন্যে। তিনি বসেন রাজার কানের কাছে, আমরা থাকি দূরে।

সুমিত্রা। কোনো ভয় নেই তোমার, কী বলতে চাও আমার কাছে বলো।

রত্নেশ্বর। সতীতীর্থ ভৃগুকূট পাহাড়ের তলে। আমাদেরই রাজকুলের মহিষী মহেশ্বরী সেখানে স্বামীর অনুমৃতা হয়েছিলেন, সে আজ পাঁচশো বছরের কথা।

সুমিত্রা। সেই সতীকাহিনী তো ভাটের মুখে শুনেছি আমার বিবাহদিনে।

রত্নেশ্বর। তাঁরই সিঁদুরের কৌটো সেখানে সমাধিমন্দিরে।

সুমিত্রা। সেই কৌটোর সিঁদুর বিবাহকালে আমিও পরেছি।

রত্নেশ্বর। আমাদের মেয়েরা তীর্থে যায়, সেই কৌটোর সিঁদুর মাথায় পরে পুণ্য কামনায়। এতকাল কোনো বাধা হয় নি।

সুমিত্রা। এখন কি বাধা ঘটেছে।

রত্নেশ্বর। হাঁ, মহারানী।

সুমিত্রা। কিসে বাধা।

রত্নেশ্বর। শিলাদিত্য তীর্থদ্বারে কর বসিয়েছে। দরিদ্র মেয়েদের পক্ষে দুঃসাধ্য হল। হাত থেকে তাদের কঙ্কণ কেড়ে নিয়ে কর আদায় হচ্ছে।

সুমিত্রা। কী বললে! মহারাজের সম্মতি আছে এতে?

রত্নেশ্বর। রাজকার্যের রহস্য জানি নে, মা, কথা কইতে সাহস হয় না।

সুমিত্রা। ঠাকুর, বলো, এতে মহারাজের সম্মতি আছে?

দেবদত্ত। সম্মতির প্রয়োজন হয় না, এতে আয়বৃদ্ধি আছে।

সুমিত্রা। সত্য করে বলো, এই অর্থ রাজকোষ গ্রহণ করে?

দেবদত্ত। সেদিন সভাপণ্ডিত ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন অগ্নি যা গ্রহণ করেন তাতে মলিনতা থাকে না, রাজার কর সেই অগ্নি।

সুমিত্রা। আমি পণ্ডিতের ব্যাখ্যা শুনতে চাই নে— বলো, এই অর্থ রাজকোষে আসে?

দেবদত্ত। নিয়মরক্ষার জন্যে কিছু আসে বৈকি, কিন্তু অনিয়মের কবলটা তার চেয়ে অনেক বড়ো, বেশির ভাগ তলিয়ে যায় সেই গহ্বরে। মহারানী, অনেক পাপীর উচ্ছিষ্ট রাজকোষে জমা হয়।

রত্নেশ্বর। মা, এটুকু কথা নিয়ে দুঃখ কোরো না— আমাদের অন্নসম্বল অল্প, তার কান্না কেঁদে কেঁদে আমাদের স্বর ক্লান্ত। সেই সম্বলকে যখন কেউ স্বল্পতর করে তখন তা নিয়ে অভিযোগ করা আমরা ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু আমাদেরও মর্মস্থান আছে, সেখানে রাজায় প্রজায় ভেদ নেই; সেখানে যদি রাজা হাত দেন সে আমাদের সইবে না।

সুমিত্রা। বলো সব কথা। ভয় কোরো না।

রত্নেশ্বর। আমরা অত্যন্ত ভীরু, মহারানী, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখে আমাদেরও ভয় ভেঙে যায়। সেইজন্যেই এমন করে চলে আসতে পেরেছি। জানি বিপদ সাংঘাতিক, কিন্তু বিপদের চেয়ে যেখানে গ্লানি দুঃসহ সেখানে আমাদের মতো দুর্বলও বিপদকে গ্রাহ্য করে না। না খেয়ে মরার দুঃখ কম নয় কিন্তু এমন অবস্থা আছে যখন বেঁচে থাকার মতো দুঃখ আর নেই।

সুমিত্রা। সে কথা আমিও বুঝি। যা তোমার বলবার আছে সব তুমি আমার কাছে বলো।

রত্নেশ্বর। তীর্থদ্বারে কর সংগ্রহের জন্যে রাজার অনুচর নিযুক্ত, সুন্দরী মেয়েদের বিপদ ঘটছে প্রতিদিন।

সুমিত্রা। সর্বনাশ! সত্য বলছ?

রত্নেশ্বর। যে কথা নিয়ে মানুষ মরতে প্রস্তুত হয়, আমি সেই কথা শুধু মুখে বলতে এসেছি মহারানী, এই আমার লজ্জা। আমার ছোটোবোন গিয়েছিল তীর্থে, হতভাগিনী আজও ফেরে নি।

সুমিত্রা। এও তুমি সহ্য করেছ?

রত্নেশ্বর। সহ্য করব না, সেই পণ করেই বেরিয়েছি। নিজের হাতেই দণ্ড

তুলতে হবে, কিন্তু তার আগে রাজদণ্ডের শেষ দোহাই পেড়ে যাব। তার পরে ধর্মই জানেন, আর আমিই জানি।

সুমিত্রা। এই সমস্ত কি শিলাদিত্যের জ্ঞাতসারে?

রত্নেশ্বর। তাঁরই ইচ্ছাক্রমে।

সুমিত্রা। ঠাকুর, সত্য করে বলো, রাজার কানে এ কথা কি আজও ওঠে নি।

দেবদত্ত। তোমার কাছে কোনোদিন মিথ্যা বলি নি, আজও বলব না। রত্নেশ্বর, তোমার আবেদন হল, এখন যাও ওই আমার কুটির দেখা যাচ্ছে। [রত্নেশ্বরের প্রস্থান

সুমিত্রা। ঠাকুর, রাজার কাছে এই অভিযোগ আসে নি?

দেবদত্ত। হাঁ এসেছে। মন্ত্রী দ্বিধা করেছিলেন, আমি স্বয়ং জানিয়েছি।

সুমিত্রা। ফল কী হল।

দেবদত্ত। শুনে লাভ নেই। রাজারা যখন অন্যায় করেন তখন তার সমর্থনের জন্যে অতি ভীষণ হয়ে ওঠেন।

সুমিত্রা। ঠাকুর, ভীষণতা অন্যায়ের ছদ্মবেশ; ভয় ক'রে তাকে যেন সম্মান না করি। অন্যায়কারীকে ক্ষুদ্র বলেই জানতে হবে, অতি ক্ষুদ্র, তার হাতে যত বড়ো একটা দণ্ড থাক্‌। তাকে যদি ভয় করি তবে তার চেয়েও ক্ষুদ্র হতে হবে। শিলাদিত্য উৎসবের নিমন্ত্রণে রাজধানীতে এসেছে?

দেবদত্ত। হাঁ, এসেছে।

সুমিত্রা। মন্ত্রীকে আদেশ করো তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই।

দেবদত্ত। মহারানী!

সুমিত্রা। তুমি যা বলবে আমি তা সব জানি, সমস্ত জেনেই বলছি আজ তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হওয়া চাই।

দেবদত্ত। আগে উৎসব সমাধা হোক।

সুমিত্রা। এ পাপের বিচার না হলে আজ উৎসব হতেই পারবে না।

দেবদত্ত। মহারানী, সাবধান হবার অত্যন্ত প্রয়োজন আছে।

সুমিত্রা। আমাকে নিবৃত্ত কোরো না। একদিন আগুনে ঝাঁপ দিতে গিয়েছিলুম, সুবিজ্ঞের পরামর্শে নিবৃত্ত হয়েছি। তখনই সংকল্প রক্ষা করলে এত অমঙ্গল ঘটত না এ জগতে। শিলাদিত্যের বিচার যদি না হয় তা হলে এ রাজত্বে রানী হবার লজ্জা আমি সইব না। ওই-যে গর্জন শুনতে পাচ্ছি দ্বারের বাইরে।

দেবদত্ত। দয়াময়ী, কতটুকুই বা শুনলে। সবটা কানে উঠলে কান বধির হয়ে যেত। যে নিঃসহায়দের সামনে সকল দ্বার রুদ্ধ তাদের কণ্ঠও রুদ্ধ থাকে, তাই তো

আছি আমরা আরামে। বাধা আজ অল্প-একটু বুঝি সরেছে— তাই গুমরে-ওঠা দুঃখসমুদ্রের ধ্বনি সামান্য একটু শোনা গেল।

সুমিত্রা। ঠাকুর, বাধা আছে তো আছে— কিন্তু তার সামনে দাঁড়িয়ে আর্তনাদ করছে কেন, ভীরু সব। বিধাতা যাদের অবজ্ঞা করেন তাদের দয়া করেন না তাও কি এরা জানে না? দ্বার ভেঙে ফেলুক-না। বিচার ভয়ে ভয়ে চায় বলেই তো ওরা বিচার পায় না। রাজা যত বড়ো জোরের সঙ্গে ওদের কাছে কর দাবি করে, তত বড়ো জোরের সঙ্গেই ওদের বিচার চাবার অধিকার। ধর্মের বিধান মানুষের অনুগ্রহের দান নয়। আমাকে নিয়ে চলো ঠাকুর, ওদের মাঝখানে।

দেবদত্ত। মহারানী, তোমার নিজের জায়গায় থাকলেই ওদের বাঁচাতে পারবে; তোমার আসন যেখানে তোমার শক্তি সেখানেই।

সুমিত্রা। আমার আসন! আমার আসন আমি পাই নি। অহর্নিশি সেই শূন্যতা সইতে পারছি নে, মন কেবলই বলছে, রুদ্রভৈরবের পায়ের কাছেই আমার স্থান— দেখিয়ে দিন তিনি পথ, ভেঙে দিন তিনি বিঘ্ন, ব্যর্থতার অপমান থেকে সেবিকাকে উদ্ধার করুন। [উভয়ের প্রস্থান

নরেশ ও বিপাশার প্রবেশ

নরেশ। শোনো শোনো, বিপাশা, শুনে যাও।

বিপাশা। শোনবার যোগ্য কথা থাকলে তবেই শুনব।

নরেশ। আমি বলতে এসেছি জালন্ধর কাশ্মীর জয় করে নি।

বিপাশা। কবে তোমার ভুল ভাঙল।

নরেশ। প্রতিদিনই ভাঙছে। প্রতিদিনই প্রমাণ পাচ্ছি, কাশ্মীরই জালন্ধর জয় করেছে। হার মানলুম। এখন প্রসন্ন হও।

বিপাশা। তার সময় আসে নি।

নরেশ। কবে আসবে।

বিপাশা। যখন আর-একবার তোমার সৈন্য নিয়ে কাশ্মীরে যুদ্ধ করতে যাবে।

নরেশ। যাব যুদ্ধ করতে, চেষ্টা করে হেরেও আসব।

বিপাশা। চেষ্টা করতে হবে না, বীরপুরুষ। সেই যুদ্ধটা না দেখে আমি যেন না মরি। ছলনাকে গৌরব বলে অহংকার করছ সেইটে চূর্ণ হবে তবেই ধর্ম আছেন এ কথা মানব।

নরেশ। সত্য বলছি, সেই গৌরবটাকে ফেলে দিতে পারলে বাঁচি।

বিপাশা। কেন বলো তো।

নরেশ। কেননা, সেই গৌরবটার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যের জিনিস দেখেছি।

বিপাশা। রানী সুমিত্রাকে দেখেছ।

নরেশ। তাঁর কথা বলা বাহুল্য। আমি বলছিলুম—

বিপাশা। আর কিছু বলতে হবে না। তাঁর চেয়ে বড়ো কথা তোমাদের রাজ্যে আর নেই। তোমাদের রাজা কি তাঁর নাগাল পায়। চুপ করে রইলে যে? লজ্জা আছে দেখছি। স্বীকার করোই-না।

নরেশ। স্বীকার অনেকদিন করেছি। কুক্ষণে মহারাজ কাশ্মীর জয় করতে গিয়েছিলেন। জয় করে তাঁর নিজের রাজ্য হারিয়েছেন। কাশ্মীর থেকে পাপগ্রহকে অভ্যর্থনা করে এনেছেন রাজ্যের মধ্যে, পাপের নৈবেদ্যে তাকেই পুষ্ট করে তুলেছেন। বিপাশা, তোমার কাছে গোপন করব না— বিপদের জাল চারি দিকে ঘিরে আসছে, গ্রন্থির পর গ্রন্থি, তারই মাঝখানে নিশ্চিন্ত বসে আছেন আমাদের স্বেচ্ছান্ধ মহারাজ, প্রস্তুত হতে হবে আমাদেরই, আর সময় নেই।

বিপাশা। অতএব?

নরেশ। অতএব এই বেলা তোমার মুখে একটা গান শুনে নিতে চাই।

বিপাশা। আমার গান, বিপদের ভূমিকায়!

নরেশ। বাঁশির স্বরে সাপের জড়তা ঘোচে, তোমার গানে আমার তরবারি জেগে উঠবে।

বিপাশা। যুদ্ধের গান চাই?

নরেশ। না, সে-গান আমার অস্থিমজ্জায় আছে, আমি ক্ষত্রিয়।

বিপাশা। তবে?

নরেশ। তুমি জান কোন্ গানটা আমি ভালোবাসি।

বিপাশা। উৎসবের সময় তো গাইতেই হবে, তখন শুনো।

নরেশ। যা সকলেই পাবে তাতে আমার কেবল একটা মাত্র ভাগ। একটি সম্পূর্ণ দান আমাকে দাও, যা কেবল আমার একলারই।

বিপাশা। গান

মন যে বলে, চিনি চিনি
যে-গন্ধ বয় এই সমীরে।
কে ওরে কয় বিদেশিনী
চৈত্ররাতের চামেলিরে?

রক্তে রেখে গেছে ভাষা
স্বপ্নে ছিল যাওয়া-আসা
কোন্ যুগে কোন্ হাওয়ার পথে
কোন্ বনে কোন্ সিন্ধুতীরে।
এই সুদূরে পরবাসে
ওর বাঁশি আজ প্রাণে আসে।
মোর পুরাতন দিনের পাখি
ডাক শুনে তার উঠল ডাকি,
চিত্ততলে জাগিয়ে তোলে
অশ্রুজলের ভৈরবীরে॥

নরেশ। বিপাশা, একটা কথা শুনতে চাই।

বিপাশা। ওই তো তোমার লুব্ধ স্বভাব। বললে, একটি গান শুনতে চাই, যেমনি গান শেষ হল রব উঠেছে একটি কথা শুনতে চাই। একটি কথা থেকে দুটি কথা হবে, তার পর আমার কাজের বেলা যাবে চলে। আমি যাই।

নরেশ। শোনো, শোনো, একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাও। ওই-যে গাইলে ওটা কি সত্য। প্রবাসে বাঁশি কি বেজেছে।

বিপাশা। অরসিক, কথা দিয়ে যার কাছে গান ব্যাখ্যা করতে হয় তাকে গান না শোনানোই ভালো। তুমি-যে অলংকার-শাস্ত্রের ছাত্রদেরও ছাড়িয়ে উঠলে।

নরেশ। তবে থাক ব্যাখ্যা, গানই আমার যথেষ্ট। [উভয়ের প্রস্থান

রাজপুরাঙ্গনা কালিন্দীর প্রবেশ। কালিন্দীর আপনমনে কাব্য আবৃত্তি

মঞ্জরী, গৌরীর প্রবেশ

গৌরী। একা-একা কার সঙ্গে আলাপ চলছে? বনদেবতার সঙ্গে?

কালিন্দী। না গো, মনোদেবতার সঙ্গে। মন্মথর স্তব কণ্ঠস্থ করছি। রাজার আদেশ।

গৌরী। ওটা হৃদয়স্থ থাকলেই হয়, কণ্ঠে আনবার দরকার কী।

কালিন্দী। হৃদয়ের পদচারণার পথ কণ্ঠে।

গৌরী। ওগো অলঙ্কারিণী, এতদিন আছি, তোমাদের ধরনধারন আজও বুঝতে পারলুম না।

কালিন্দী। আশ্চর্য নেই গো কাশ্মিরিনী, বুঝতে বুদ্ধির দরকার করে। কোন্‌খানটা দুর্বোধ ঠেকছে, শুনি-না।

গৌরী। বেদে অগ্নি সূর্য ইন্দ্র বরুণ অনেক দেবতারই স্তব আছে, কিন্তু তোমাদের এই দেবতাটির তো নামও শোনা যায় না।

কালিন্দী। সত্যযুগের ঋষিমুনিরা এঁকে যত সাবধানে এড়িয়ে চলতেন ততই অসাবধানে পড়তেন বিপদে। মুখে তাঁর নাম করতেন না তাই মার খেয়ে মরতেন অন্তরে। পুরাণগুলো পড় নি বুঝি?

গৌরী। মূর্খ আছি সেই ভালো, বিদুষী। সত্যযুগের কলঙ্ককাহিনী কলিযুগে টেনে আনবার মতো এত বিদ্যের দরকার কী ভাই। কলিযুগের পাপের ভরা যথেষ্ট ভারী আছে।

কালিন্দী। বড়ো লজ্জা দিলে— মূর্খ ব'লে অহংকার করতে পারলুম না— ওখানে কাশ্মীরেরই জিত রইল।

মঞ্জরী। ভাই, তোর কালিন্দীকলকল্লোল একটুখানি থামা। ত্রিবেদীঠাকুর বলেন, কালিন্দীর রসনা তার প্রতিবেশী দশনপংক্তির কাছ থেকে দংশন করবার বিদ্যেটা শিখে নিয়েছে। কেবল সেই বিদ্যেটা ফলাবার জন্যেই যে-দেবতাকে মানিস নে তাকে নিয়ে তর্ক তুলেছিস। নতুন দেবতাকে ভক্তি করবার আগে তোর ইষ্টদেবতার সাধনা সারা হোক।

কালিন্দী। তার পরে আছেন অনিষ্টদেবতাটি। একটু চুপ কর্‌, ভাই, স্তবটা আর-একবার আউড়ে নিই। দেবতা ত্রুটি মার্জনা করেন, কিন্তু আমাদের সভাকবি তাঁর রচনার আবৃত্তিতে একটু ভুল পেলে কাঁদিয়ে ছাড়েন।

মঞ্জরী। ওই আসছেন ত্রিবেদীঠাকুর, ওঁর কাছে আজ সন্দেহ মিটিয়ে নিই।

আবৃত্তি করতে করতে ত্রিবেদীর প্রবেশ

ত্রিবেদী। কর্পূর ইব দগ্ধোঽপি শক্তিমান্‌ যো জনে জনে—
নমোঽস্ত্ববার্যবীর্যায় তস্মৈ মকরকেতবে।

মঞ্জরী। আপন মনে কী বকছ, ঠাকুর।

ত্রিবেদী। গোলমাল কোরো না, মুখস্থ করছি।

মঞ্জরী। কী মুখস্থ করছ।

ত্রিবেদী। মকরকেতুর স্তব। রাজার আদেশ।

কালিন্দী। তোমারও এই দশা?

ত্রিবেদী। দেখছ না, মধুকরের গুঞ্জন আর শোনা যাচ্ছে না। সংস্কৃত শৌরসেনী মাগধী অর্ধমাগধী মহারাষ্ট্রী পারসিক যাবনিক নানা ভাষায় আজ অভ্যাস চলছে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে মকরকেতুর সকল দেশের সকল ভাষাতেই পাণ্ডিত্য।

কালিন্দী। কিন্তু অনুচ্চারিত ভাষাই তিনি সব চেয়ে ভালো বোঝেন। দাদা-ঠাকুর, একটা কথার উত্তর দাও। মকরকেতুর পূজার বিধান পেয়েছ কোন্ বেদে।

ত্রিবেদী। চুপ চুপ। কি কণ্ঠস্বরই পেয়েছ তোমরা পুরাঙ্গনারা।

কালিন্দী। অরসিক, বয়স হয়েছে বলে কি কণ্ঠস্বরের বিচারবুদ্ধিটাও খোয়াতে হবে। তোমাদের কবি যে কোকিলের সঙ্গে এই কণ্ঠের তুলনা করেন।

ত্রিবেদী। অন্যায় করেন না। কোনো কথা গোপনে বলবার অভ্যাস ওই পাখিটার নেই।

কালিন্দী। দাদাঠাকুর, তোমার সঙ্গে গোপন কথা বলবার মতো মনের ভাব আমার নয়। শাস্ত্রের বিচার চাই। এরা বলছিল, পুরাণে অতনুর নেই তনু, আবার বেদে নেই তার নামগন্ধ— বাকি রইল কী। তা হলে পূজাটা হবে কাকে নিয়ে।

ত্রিবেদী। আরে চুপ চুপ— স্বরটাকে আর-এক সপ্তক নামিয়ে আনো।

মঞ্জরী। কেন, ঠাকুর, ভয় কাকে?

ত্রিবেদী। যারা নতুন দেবতার পূজা চালাতে চায় তারা ভক্তির জোরের চেয়ে গায়ের জোরটা বেশি ব্যবহার করে। আমি ভালোমানুষ, দেবতার চেয়ে এই দেবতাভক্তদের ভয় করি অনেক বেশি।

গৌরী। ঠাকুর, আমি বলছিলুম এই-সব হঠাৎ-দেবতার আবার পূজা কিসের।

ত্রিবেদী। মূঢ়ে, যারা বনেদি দেবতা তাদের এত উগ্রতা নেই। সংসারে হঠাৎ-দেবতারাই সাংঘাতিক। তাদের পূজা করায় ব্যর্থতা, না-পূজা করায় সর্বনাশ। অতএব ছাড়ো তর্ক, পরো মঞ্জীর, আনো বীণা, গাঁথো মালা— পঞ্চশরের শরগুলোকে শান দেও গে।

কালিন্দী। কিন্তু তোমার মন্ত্রটি পেলে কোথা থেকে ঠাকুর।

ত্রিবেদী। যিনি পূজা প্রচার করছেন পূজার মন্ত্ররচনা তাঁরই। আমি সেটাকে শ্রুতির দ্বারা গ্রহণ ক'রে স্মৃতির দ্বারা ব্যক্ত করব। দেখে নিয়ো, রাজসভায় শ্রুতিভূষণ বলবেন, সাধু, স্মৃতিরত্নাকর বলবেন, অহো কিমাশ্চর্যম্!

মঞ্জরী। ও কী ও, ভাই, বাইরে যে অস্ত্রের ঝঞ্ঝনি শোনা গেল।

কালিন্দী। হয়তো ওটা সত্যকার নয়। হয়তো উৎসবের একটা কোনো পালার অভ্যাস চলছে।

গৌরী। ত্রিবেদীঠাকুর, এও বুঝি তোমাদের জালন্ধরের সৃষ্টিছাড়া কীর্তি? মীনকেতুর উৎসবে রক্তপাতের পালা?

ত্রিবেদী। সুন্দরী, জগতে এ পালা বার বার অভিনয় হয়ে গেছে। ত্রেতাযুগে এই পালায় একবার রাক্ষসে বানরে মিলে অগ্নিকাণ্ড করেছিল। কলিযুগে তাদের বংশ বেড়েছে বৈ কমে নি। যাই হোক শব্দটা ভালো লাগছে না— যাও তোমরা মন্দিরে আশ্রয় লও গে। [সকলের প্রস্থান

২

সুমিত্রা ও প্রতিহারীর প্রবেশ

সুমিত্রা। সেই প্রজাকে চাই, রত্নেশ্বর তার নাম।

প্রতিহারী। তাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না, মহারানী।

সুমিত্রা। এই কিছুক্ষণ আগেই ছিল।

প্রতিহারী। কিন্তু কারো কাছে তার সন্ধান পাচ্ছি নে।

সুমিত্রা। দেবদত্ত ঠাকুরের ঘরে কি নেই।

প্রতিহারী। ঠাকরুন বললেন সেখানে কেউ আসে নি। ঐ যে ঠাকুর স্বয়ং আসছেন। [প্রস্থান

দেবদত্তের প্রবেশ

সুমিত্রা। রত্নেশ্বর কোথায়।

দেবদত্ত। তাকেই খুঁজতে এসেছি।

সুমিত্রা। তাকে যে নিতান্তই পাওয়া চাই।

দেবদত্ত। সেই কারণেই তাকে পাওয়া নিতান্তই কঠিন হবে। হতভাগ্যকে বলেছিলুম আমার ঘরে আশ্রয় নিতে।

সুমিত্রা। তুমি কি তবে সন্দেহ করছ—

দেবদত্ত। সন্দেহ করছি কিন্তু নাম করছি নে।

সুমিত্রা। এও কি সহ্য করতে হবে।

দেবদত্ত। হবে বৈকি। প্রমাণ নেই যে।

সুমিত্রা। তাই বলে পাপিষ্ঠকে নিষ্কৃতি দেবে?

দেবদত্ত। নিষ্কৃতির সদুপায় পাপিষ্ঠ নিজেই জানে, আমাদের কিছুই করতে হবে না।

সুমিত্রা। ঠাকুর, তবে কিছুই করবে না ?

দেবদত্ত। যদি সম্ভব হত নিজের অস্থি দিয়ে বজ্র তৈরি করে ওর মাথায় ভেঙে পড়তুম।

সুমিত্রা। তুমি বলতে চাও কিছুই করবার নেই ? চুপ করে রইলে কেন ঠাকুর, লজ্জায় ? পাছে কিছু করতে হয় সেই ভয়ে ? আমি তো ধৈর্য রাখতে পারছি নে। বিপাশা, কী করছিস এখানে।

বিপাশার প্রবেশ

বিপাশা। অনঙ্গদেবের পূজায় মহারানীর জন্যে অর্ঘ্য সাজিয়ে এনেছি।

সুমিত্রা। ফেলে দে, ফেলে দে, দূর করে ফেলে দে সব। আমি যাব রুদ্রভৈরবের মন্দিরে, ঠাকুর, পূজা প্রস্তুত করো।

দেবদত্ত। পুরোহিত ত্রিবেদীকে মহারাজ তাঁর কাজে আজ নিযুক্ত করেছেন।

সুমিত্রা। তুমি হবে আমার পুরোহিত।

দেবদত্ত। আমি পুরোহিত ?

সুমিত্রা। হাঁ তুমি। নীরব যে, মনে কি ভয় আছে।

দেবদত্ত। ভয় দেবতাকে। মুখে মন্ত্র পড়তে পারি, কিন্তু অন্তরের কথা যে অন্তর্যামী জানেন। কিন্তু মহারানী, ভৈরবের পূজায় তোমার কিসের প্রয়োজন।

সুমিত্রা। দুর্বল মন, শক্তি চাই।

বিপাশা। শক্তির দরকার যার সে তোমার নয়, সে মহারাজের। যে অসামান্য রূপ নিয়ে এসেছ সংসারে তার কাছে রাজলক্ষ্মী হার মেনেছেন— সে জন্যে দোষ দেব কাকে। যদি ক্ষমা কর তো বলি, দোষ তোমারই।

সুমিত্রা। বুঝিয়ে বলো।

বিপাশা। ওই যে কাশ্মীরের নরাধমদের রাজ্যের হৃৎপিণ্ডের উপর বসিয়েছেন রাজা, তার কারণ শুনবে ? রাগ করবে না ?

সুমিত্রা। কারণ শুনতেই চাই আমি।

বিপাশা। প্রেমের গৌরব খুব প্রকাণ্ড করে জানাতে চেয়েছিলেন রাজা, খুব দুর্মূল্য দান দুঃসাহসের সঙ্গে দিতে পারলে তিনি বাঁচতেন। এই সামান্য কথাটা তুমি বুঝতে পার নি ?

সুমিত্রা। আমি তো কোনো বাধা দিই নি।

বিপাশা। দাও নি বাধা? ওই ভুবনমোহন রূপ নিয়ে কোথায় সুদূরে দাঁড়িয়ে রইলে তুমি। কিছু চাইলে না, কিছু নিলে না, এ কী নিষ্ঠুর নিরাসক্তি। তুমি রাজহংসীর মতো, রাজার তরঙ্গিত কামনাসাগরের জলে তোমার পাখা সিক্ত হতে চায় না, রাজবৈভবের জালে পারলে না তোমাকে একটুও বাঁধতে, তুমি যত রইলে মুক্ত, রাজা ততই হলেন বন্দী। শেষে একদিন আপন রাজ্যটাকে খণ্ড খণ্ড করে ছড়িয়ে ফেলে দিলেন ওই কাশ্মীরী কুটুম্বদের হাতে— মনে করলেন তোমাকেই দেওয়া হল।

সুমিত্রা। আমি তার কিছুই জানতেম না।

বিপাশা। তা জানি, রাজা ভেবেছিলেন নিজের দাক্ষিণ্যের উন্মত্ততায় তোমাকে বিস্মিত করে দেবেন। তখনো তোমাকে চেনেন নি। কিন্তু কতবড়ো দুর্ভাগা— রাজসিংহাসনের উপরে বসে ছটফট করে মরছে; দিতে চায় দিতে পারে না, নিতে চায় নেবার যোগ্যতা নেই। ব্যর্থ নির্বুদ্ধিতার ধিক্কারে আজ সকলেরই উপর রেগে রেগে উঠছেন। তার মধ্যে তুমিও আছ।

সুমিত্রা। ঠাকুর, আজ পর্যন্ত ভালো করে বুঝতে পারি নি আমার অপরাধটা কোথায়।

দেবদত্ত। মহারানী, কলিকে কখন কোথায় নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তুলি সব সময়ে ভেবে পাই নে।

বিপাশা। ঠাকুর, ভেবে পেয়েছ তুমি, বলতে চাও না। কিন্তু আমি বলব। আমি ভয় করি নে কাউকে। মহারানীর সঙ্গে মহারাজের সম্বন্ধ অন্যায় দিয়ে আরম্ভ হয়েছে সেই পাপের ছিদ্র দিয়েই কলির প্রবেশ।

সুমিত্রা। বিপাশা, চুপ কর্‌ তুই।

বিপাশা। কেন চুপ করব। কাশ্মীর জয় করে এরা তোমাকে অধিকার করেছে এই মিথ্যে কথাটাই বলে বেড়াতে হবে? আশ্চর্য হয়ে যাই তোমার ধৈর্য দেখে, মহারানী। পাপকে জয় করেছ পুণ্য দিয়ে। কিন্তু সেই পুণ্যের দান কি মহারাজ গ্রহণ করতে পারলেন।

সুমিত্রা। চুপ কর্‌, চুপ কর্‌, বিপাশা।

বিপাশা। চুপ করিয়ো না। যে কথা অন্তরের মধ্যে জান সে কথা বাইরে থেকেও শোনা ভালো। ওই রাজা আসছেন। আমি যাই। থাকতে পারব না, শেষে কী বলতে কী বলে ফেলব। [প্রস্থান

বিক্রমের প্রবেশ

বিক্রম। মহারানী, দেবদত্তকে নিয়ে কী গূঢ় পরামর্শ চলছে।

সুমিত্রা। আজ ভৈরবমন্দিরে পূজা করব, ওঁকে পুরোহিত করেছি।

বিক্রম। আজ ভৈরবের পূজা? এ কি হতে পারে।

সুমিত্রা। পাপের মূর্তি দেখে ভয় পেয়েছি, যিনি সকল ভয়ের ভয় তাঁর স্মরণ নেব।

বিক্রম। পাপের মূর্তি কী দেখলে।

সুমিত্রা। সতীতীর্থে সতীধর্মের অবমাননা, অথচ এ রাজ্যে তার কোনো প্রতিকার নেই, এ সংবাদ শুনে উৎসব করতে আমি সাহস করি নি।

বিক্রম। এ সংবাদ কে দিলে। দেবদত্ত?

সুমিত্রা। যারা অত্যাচারে মর্মান্তিক পীড়িত তাদেরই একজন।

বিক্রম। মহারানী, অন্তঃপুরে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী বিচারশালা স্থাপন করেছ? আমার অধিকার হরণ করতে চাও?

সুমিত্রা। মহারাজ, ধর্ম সাক্ষী করে আমি কি তোমার সহধর্মিণী হই নি। রাজ্যের পাপ যে মুহূর্তে তোমাকে স্পর্শ করে সেই মুহূর্তেই কি আমাকেও স্পর্শ করে না।

বিক্রম। দেবদত্ত, অভিযোগ কে এনেছে। কার নামে অভিযোগ।

দেবদত্ত। বুধকোট থেকে প্রজা এসেছে, নাম রত্নেশ্বর, শিলাদিত্যের নামে অভিযোগ।

বিক্রম। আমাকে লঙ্ঘন করে রানীর কাছে কেন এই অভিযোগ।

দেবদত্ত। প্রশ্ন যখন করলে তখন সত্য কথা বলব, তোমার কাছে পূর্বেই অভিযোগ হয়েছে।

বিক্রম। আমি কি কান দিই নি।

দেবদত্ত। কান দিয়েছিলে, বলেছিলে বিশ্বাস কর না।

বিক্রম। সেই তো বিচার। অমাত্যের নামে মিথ্যা অপবাদ দিলে তারও বিচার রাজাকে করতে হবে না? জান শিলাদিত্যের 'পরে যে-ভার আছে সে অতি কঠিন। প্রত্যন্তদেশের সীমা রক্ষা করতে হয় তাকেই।

দেবদত্ত। রাজার প্রতিনিধিরূপে ধর্মরক্ষা করাও তারই কাজ।

বিক্রম। কে বললে সে তা করে নি।

দেবদত্ত। তোমার নিজের অন্তরই বলছে, তাই আমার 'পরে এত রাগ করছ।

অভিযোগকারীকে আমিই তোমার কাছে নিয়ে গেছি। মন্ত্রী সাহস করে নি। সেদিন দেখি নি কি বিচারকালে ক্ষণে ক্ষণে তোমার ভ্রূকুটি। দণ্ড তোমার কতবার উদ্যত হয়েও দুর্বল দ্বিধায় নিরস্ত হয়েছে সে কথা স্বীকার করবে না?

বিক্রম। সাবধান! আমি দুর্বল! কিসের ভয়ে দুর্বল!

দেবদত্ত। শিলাদিত্যকে যে-শক্তি নিজে দিয়েছ আজ তার প্রতিরোধ করা তোমার নিজের পক্ষেও দুঃসাধ্য— এই কারণেই দ্বিধা। তুমি ওদের ভয় করতে আরম্ভ করেছ— আমাদের ভয় সেইখানেই।

বিক্রম। অসহ্য তোমার স্পর্ধা! অনুতাপের দিন তোমার আসন্ন।

সুমিত্রা। আর্যপুত্র, আমাদের দণ্ড দেওয়া সহজ কথা— সেজন্যে রাজশক্তির প্রয়োজন হবে না। কিন্তু শিলাদিত্যের বিচার আজই করা চাই।

বিক্রম। অভিযোগ যার সে কই?

সুমিত্রা। সে আমি।

বিক্রম। তুমি?

সুমিত্রা। যে হতভাগা এসেছিল তাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

বিক্রম। নিজের মিথ্যার ভয়ে সে পালিয়েছে।

সুমিত্রা। মহারাজ, তুমি নিশ্চয় জান কে তাকে হরণ করেছে।

বিক্রম। মহারানী, অন্ধ দয়া আর অস্পষ্ট অনুমানের দ্বারা বিচার হয় না।

রত্নেশ্বরকে নিয়ে নরেশের প্রবেশ

নরেশ। শিলাদিত্যের লোক একে বলপূর্বক ধরে নিয়ে যাচ্ছিল রাজদ্বারের সম্মুখ দিয়ে। আমার নিষেধ শুনলে না। তলোয়ার খুলতে হল রাজা আছেন এই কথা এদের স্মরণ করিয়ে দিতে।

বিক্রম। কেন ওকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল।

নরেশ। বললে শিলাদিত্যের আদেশ। সে আদেশের উপরে তোমার আদেশ কী, সেইটে শোনবার জন্যে অপেক্ষা করছি।

রত্নেশ্বর। মহারানী, আমার রক্ষা নেই সে আমি জানি, কিন্তু বিচার চাই— সে বিচার আজই যেন হয়, তোমার সামনেই যেন হয়, দোহাই তোমার।

সুমিত্রা। মূঢ়, ওই যে মহারাজ আছেন, ওঁকে জানাও তোমার অভিযোগ।

রত্নেশ্বর। মহারাজ, মর্মঘাতী দুঃখ আমাদের— সে দুঃখ বাধা মানবে না, বিলম্ব সইবে না, মৃত্যুযন্ত্রণার চেয়ে সে প্রবল।

বিক্রম। চুপ কর্‌! দেবদত্ত, কে এদের এমন করে প্রশ্রয় দিচ্ছে। এরা বলপূর্বক আমার কাছ থেকে বিচার কেড়ে নিতে চায়? দ্বারী কোথায়।

দ্বারীর প্রবেশ

দ্বারী। কী মহারাজ।

বিক্রম। একে প্রহরীশালায় নিয়ে রাখো। কাল বিচার হবে।

দ্বারী। যে আদেশ।

রত্নেশ্বর। মহারানী, আমার আজকের দিন গেল, কালকের দিনকে বিশ্বাস নেই। বাঁচি আর মরি আমার যা-হয় হোক, কিন্তু প্রজার অভিযোগ তোমার পায়ে রেখে গেলুম, তোমাকে সে তুলে নিতে হবে। আমি বিদায় নিলুম।

সুমিত্রা। মনে রইল রত্নেশ্বর। [দ্বারী ও রত্নেশ্বরের প্রস্থান

নরেশ। মহারাজ, মন্ত্রী আমাকে দিয়ে কিছু সংবাদ পাঠিয়েছেন— আশু মন্ত্রণার আবশ্যক।

বিক্রম। তোমরা একটার পর আর-একটা উৎপাত নিজে সাজিয়ে আনছ।

নরেশ। উৎপাত সৃষ্টি করতে পারি এত শক্তি আমাদের আছে?

বিক্রম। সৃষ্টি করবার দরকার নেই। সত্যযুগেও রাজ্যে উৎপাতের অভাব ছিল না। কিন্তু উৎপাত ছড়িয়ে থাকে দেশে ও কালে। তোমরা তাদের আজই একদিনের মধ্যে পুঞ্জিত করে সাজিয়েছ। যে-সমস্ত প্রমাণ তোমাদের মিত্রদের বেলায় থাকে বিক্ষিপ্ত, তোমাদের শত্রুদের বেলা আজ তোমরা সেইগুলোকে সংহত করে কালো করে আমার সামনে ধরতে চাও— আজ উৎসবদিনের আলোর উপরে এই কালীমূর্তিকে দাঁড় করিয়ে কেবল এই কথাটা বলতে চাও, যে, তোমাদেরই জিত হল। তোমাদের এই সাজিয়ে-তোলা বিভীষিকার কাছে আমি হার মানব না এ কথা নিশ্চয় জেনো। উৎপাতের সংবাদ আছে, থাক্‌-না, নিশ্চয়ই সে আগামী কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে।

নরেশ। অপেক্ষা করতে নিশ্চয় পারে, মহারাজ, কিন্তু আজ যা সংবাদ আছে কাল তা সংকট হয়ে দাঁড়ায়। তবে যাই, মন্ত্রীকে জানাই গে।

বিক্রম। ওরা আমার প্রিয়পাত্র, ওদের প্রতি আমার পক্ষপাত, ওদের বিচার আমি করতে পারি নে, ওদের শাস্তি দিতে আমি অক্ষম— তোমাদের এসব কথা মিথ্যা, মিথ্যা। দণ্ডের যারা যোগ্য তাদের যখন দণ্ড দেব তখন ভয়ে স্তব্ধ হয়ে যাবে। ক্ষীণ দুর্বল তোমরাই, কর্তব্যের তোমরা কী জান! ক্ষমায় দয়ায় অশ্রুজলে তোমাদের

কর্তব্যবুদ্ধি পঙ্কিল— তোমরা বিচার করবার স্পর্ধা কর! সময় আসবে, বিচার করব, কিন্তু তোমাদের ওই কান্না শুনে নয়। মহারানী, তুমি কোথায় চলেছ। যেয়ো না, থামো।

সুমিত্রা। এমন আদেশ কোরো না। চলো রাজকুমার, ওই লতাবিতানে, মন্ত্রী কী সংবাদ পাঠিয়েছেন শুনতে চাই।

বিক্রম। মহারানী, তোমার এই প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা আমার কর্তব্যকে আরো অসাধ্য করে তুলছে। শুনে যাও— আমি আদেশ করছি। ফিরে এসো।

সুমিত্রা। কী, বলো।

বিক্রম। তুমি আমাকে চিনতে পারলে না— তোমার হৃদয় নেই, নারী! শংকরের তাণ্ডবকে উপেক্ষা করতে পারি কি। সে তো অপ্সরার নৃত্য নয়। আমার প্রেম, এ প্রকাণ্ড, এ প্রচণ্ড, এতে আছে আমার শৌর্য— আমার রাজপ্রতাপের চেয়ে এ ছোটো নয়। তুমি যদি এর মহিমাকে স্বীকার করতে পারতে তা হলে সব সহজ হত। ধর্মশাস্ত্র পড়েছ তুমি, ধর্মভীরু— কর্মদাসের কাঁধের উপর কর্তব্যের বোঝা চাপানোকেই মহৎ ব'লে গণ্য করা তোমার গুরুর শিক্ষা। ভুলে যাও, তোমার ওই কানে মন্ত্রগুলো। যে আদিশক্তির বন্যার উপরে ফেনিয়ে চলেছে সৃষ্টির বুদ্‌বুদ, সেই শক্তির বিপুল তরঙ্গ আমার প্রেমে— তাকে দেখো, তাকে প্রণাম করো, ওর কাছে তোমার কর্ম অকর্ম দ্বিধাদ্বন্দ্ব সমস্ত ভাসিয়ে দাও, একেই বলে মুক্তি, একেই বলে প্রলয়, এতেই আনে জীবনে যুগান্তর।

সুমিত্রা। সাহস নেই মহারাজ, সাহস নেই! তোমার প্রেম তোমার প্রেমের পাত্রকে অনেক দূরে ছাড়িয়ে গেছে— আমি তার কাছে অত্যন্ত ছোটো। তোমার চিত্তসমুদ্রে যে তুফান উঠেছে তাতে পাড়ি দেবার মতো আমার এ তরী নয়— উন্মত্ত হয়ে যদি ভাসিয়ে দিই তবে মুহূর্তে এ যাবে তলিয়ে। আমার স্থিতি তোমার প্রজাদের কল্যাণলক্ষ্মীর দ্বারে— সেখানকার ধূলির 'পরেও যদি আসন দিতে, আমার লজ্জা দূর হত। তোমার নিজের তরঙ্গগর্জনে তোমার কর্ণ বধির, কেমন করে জানবে কী নিদারুণ দুঃখ তোমার চার দিকে। কত মর্মভেদী কান্নার প্রতিধ্বনি দিনরাত্রি আমার চিত্তকুহরে ক্ষুব্ধ হয়ে বেড়াচ্ছে তোমাকে তা বোঝাবার আশা ছেড়ে দিয়েছি। যখন চার দিকেই সবাই বঞ্চিত তখন আমাকে তুমি যত বড়ো সম্পদই দাও, তাতে আমার রুচি হয় না। চলো রাজকুমার, মন্ত্রী কী আবেদন করছেন আমাকে বলবে চলো।

বিক্রম। শোনো নরেশ, কী সংবাদ এনেছ বলো আমাকে।

নরেশ। মহারাজ যুধাজিৎকে পত্রত্যাগের আদেশ করেছিলেন, সে তো একেবারেই শোনে নি। এদের পরস্পরের মধ্যে একটা যোগ হয়েছে বলে বোধ হচ্ছে।

বিক্রম। কিসে বোধ হল।

নরেশ। শিলাদিত্যকে যে মুহূর্তে মহারানী আহ্বান করে পাঠালেন তার পরমুহূর্তেই সে রাজধানী থেকে চলে গেল। মহারানীর আদেশ গ্রাহ্যই করলে না।

বিক্রম। আবার সংকট বাধিয়েছ? রাজকার্যে কেন হাত দিতে গেলে, মহারানী।

সুমিত্রা। রাজকার্য নয়, আত্মীয়ের কর্তব্য। জালন্ধরের কিছুতে আমার অধিকার না যদি থাকে কাশ্মীরের দায়িত্ব আছে আমার।

বিক্রম। সম্মানী লোকের অভিমানে আঘাত করে অসম্মান যদি ফিরে পেয়ে থাক কাকে দোষ দেবে।

সুমিত্রা। আত্মীয় যদি আত্মীয়ের অমর্যাদা করে থাকে তা নিয়ে আমার অভিযোগ নেই। তবে যে অপরাধ রাজার বিরুদ্ধে, তোমার প্রজার হয়ে তারই বিচার আমি চাই।

বিক্রম। বিচার যদি চাও তবে প্রথমে যুদ্ধ করতে হবে।

সুমিত্রা। হাঁ, যুদ্ধই করতে হবে।

বিক্রম। যুদ্ধ! সে তো নারীর মুখের কথা নয়।

সুমিত্রা। নারীর বাহুর সাহায্য যদি চাও তো প্রস্তুত আছি।

বিক্রম। দেখো প্রিয়ে, জয়ের অভিপ্রায়েই যুদ্ধ, আস্ফালনের জন্যে নয়। এতে সময় এবং সুযোগের অপেক্ষা আছে।

সুমিত্রা। রাজকুমার নরেশ, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, দুর্বৃত্তদের হাত থেকে প্রজাদের বাঁচাবার কোনো পথই নেই?

বিক্রম। মহারানী, মনে রেখো দয়ার অবিচারেও অন্যায় আছে। প্রজাদের 'পরে অত্যাচার হচ্ছে এও যেমন আক্তি , অন্যায়কারীদের শাসন আমার পক্ষে অসাধ্য এও তেমনি অশ্রদ্ধেয়। এসব কথা তোমার সঙ্গেও নয় এবং আজও নয়। দেবদত্ত, পৌরোহিত্য তুমি রাজার কাছ থেকে পাও নি— ত্রিবেদী পুরোহিত। আজ তার অবকাশ নেই, পূজা কাল হবে। রাজার কার্যে বা পূজার কার্যে যদি অনধিকার হস্তক্ষেপ কর তবে তোমার 'পরে রাজার হস্তক্ষেপ প্রীতিকর হবে না। মহারানী, উৎসবের বেশ তুমি এখনো পর নি। যাও, রাজার আদেশ, এখনই বেশ পরিবর্তন করো গে। এ তো রাজরানীর বেশ—

সুমিত্রা। তাই করব মহারাজ, তাই করব, বেশ পরিবর্তন করব। ধিক এই রাজ্য! ধিক আমি এ রাজ্যের রানী! [দেবদত্ত ও বিক্রম ছাড়া আর সকলের প্রস্থান

দেবদত্ত। মহারাজ, আমিও যাচ্ছি। কিন্তু একটা অপ্রিয় কথা বলে যাব। নির্বিচারে যেদিন ওই কাশ্মীরীদের হাতে ক্ষমতা দিলে সেদিন রাজ্যে বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল। কত লোকের প্রাণদণ্ড হল, কত লোকের নির্বাসন। কত অভিজাত বংশের সম্মানী লোক অন্য রাজ্যে আশ্রয় নিলে। এত বাধা পেয়েছিলে বলেই, আত্মাভিমানের তাড়নায় তোমার নির্বন্ধ এমন দুর্ধর্ষ হয়েছিল।

বিক্রম। দেবদত্ত, এই ইতিবৃত্ত আবৃত্তি করবার কী প্রয়োজন হয়েছে।

দেবদত্ত। মহারাজ, আমার আর কিছু সাধ্য নেই, আমি কেবল পারি বিপদ সামনে রেখে অপ্রিয় কথা তোমাকে শোনাতে। একদিন কেবলমাত্র অস্ত্রের যুক্তিতে প্রমাণ করতে চেয়েছিলে যে, এ রাজ্যে সকলেই ভুল করছে কেবল তুমি ছাড়া। বহু কণ্ঠ ছেদন করে রাজ্যের কণ্ঠরোধ করেছিলে। এতবড়ো প্রকাণ্ড অহংকারের প্রমাদ সংশোধন পরিশেষে তোমার পক্ষে দুঃসাধ্য হবে এ আমি জানি। সুতরাং স্বয়ং বিধাতাকে নিতে হল সেই ভার।

বিক্রম। এ কথার সহজ অর্থ, তোমরা বিদ্রোহ করবে?

দেবদত্ত। তুমি জান সে আমার অসাধ্য— দেবতা হয়েছেন বিদ্রোহী, রাজ্যে দুর্যোগ এল, কঠিন দুঃখে এর অবসান।

বিক্রম। দেবতার নাম নিচ্ছ আমাকে ভয় দেখাতে?

দেবদত্ত। মহারাজ, তোমাকে ভয় দেখানো কি একটা খেলা। তোমার ভয় আমাদের পক্ষে সব চেয়ে ভয়ংকর। তোলো তোমার দণ্ড, প্রথম আঘাত পড়ুক আমাদের 'পরে যারা তোমার একান্ত আপনার। তোমার অন্যায়কে যারা নিজের লজ্জা করে নিয়েছে, তোমার ক্রোধকে দুঃখরূপে নিক তারা মাথায় করে। দাও দণ্ড আমাকে।

বিক্রম। যদি নাই দিই?

দেবদত্ত। অগ্রসর হয়ে নেব। আজ আমাদের জন্যে আরাম নেই, সম্মান নেই। যাও মহারাজ, তুমি উৎসব করো। আমাকে রুদ্রভৈরবের পূজা করতেই হবে। মন্দিরে প্রবেশ করতে নাই দিলে— তাঁর পূজার আহ্বান আজ শুনতে পাচ্ছি সর্বত্র এই রাজ্যের বাতাসে।

বিক্রম। স্পষ্ট কথার ছলে আমাকে অপমান করতে চাও, আমার কথাও একদিন অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠবে— বিলম্ব নেই। [উভয়ের প্রস্থান

বিপাশার প্রবেশ

বিপাশা। শোনো শোনো, রাজকুমার শোনো।

নরেশের প্রবেশ

নরেশ। কী বলো।

বিপাশা। এই মালা তোমার, বীরের কণ্ঠের যোগ্য।

নরেশ। পরিচয় পেয়েছ?

বিপাশা। পেয়েছি।

নরেশ। এত সহজে?

বিপাশা। আমি অনাগতকে দেখতে পাচ্ছি।

নরেশ। কী দেখতে পেলে।

বিপাশা। জালন্ধরের রানীর সম্মান তুমি উদ্ধার করবে। চুপ করে রইলে কেন কুমার।

নরেশ। কথা বলবার সময় এখনো আসে নি।

বিপাশা। আমি বলি কথা বলবার সময় এখন চলে গেছে।

গান

আলোক-চোরা লুকিয়ে এল ওই,
তিমিরজয়ী বীর, তোরা আজ কই।
এই কুয়াশা-জয়ের দীক্ষা
কাহার কাছে লই।
মলিন হল শুভ্র বরন,
অরুণ সোনা করল হরণ,
লজ্জা পেয়ে নীরব হল
উষা জ্যোতির্ময়ী।
সুপ্তিসাগর-তীর বেয়ে সে
এসেছে মুখ ঢেকে,
অঙ্গে কালি মেখে।
রবির রশ্মি, কই গো তোরা,
কোথায় আঁধার-ছেদন ছোরা,
উদয়শৈলশৃঙ্গ হতে
বল্‌ মাভৈঃ মাভৈঃ॥

নরেশ। এ গান কোথায় পেলে বিপাশা ?

বিপাশা। কাশ্মীরে মার্তণ্ডদেবের মন্দিরে আমরা এ গান গাই হেমন্তে গিরিশিখিরে যখন আলোকরাজ্যে অরাজকতা আসে।

নরেশ। এ গান আমাকে শোনালে যে ?

বিপাশা। এখানকার ক্লিষ্ট আকাশে তুমিই আলোকের দূত। যাক মীনকেতুর বেদি ভেঙে, সেখানে তোমার আসন ধরবে না, রুদ্রভৈরবের নির্মাল্য আনব তোমার জন্যে। এখানে তিনি ভৈরব কাশ্মীরে তিনিই মার্তণ্ড, সেই দেবতাকে প্রসন্ন করো বীর। আজ সকালে আর্তত্রাণের জন্যে যে কৃপাণ খুলেছিলে একবার দাও আমার হাতে। (তলোয়ার কপালে ঠেকিয়ে) রুদ্রের তৃতীয় চক্ষুতে তুমিই অগ্নি, প্রভাতমার্তণ্ডের দীপ্ত দৃষ্টিতে তুমিই রৌদ্রচ্ছটা, বীরের হাতে তুমি কৃপাণ, তোমাকে নমস্কার।

জাগো হে রুদ্র জাগো।
সুপ্তিজড়িত তিমিরজাল
সহে না সহে না গো।
এসো নিরুদ্ধ দ্বারে
বিমুক্ত করো তারে,
তনুমনপ্রাণ ধনজনমান
হে মহাভিক্ষু, মাগো॥

রাজকুমার, ওই দেখো !

নরেশ। সেই আমার পদ্মের কুঁড়ি ! এখনো রেখেছ ?

বিপাশা। এ আজ কথা কয়েছে— কাশ্মীরের হৃদয় জেগেছে এর মধ্যে।

নরেশ। ওই আসছেন মন্ত্রীর সঙ্গে রাজা। আমাকে হয়তো প্রয়োজন আছে— তুমি মন্দির-প্রাঙ্গণে অপেক্ষা করো।

[বিপাশার প্রস্থান

বিক্রম ও মন্ত্রীর প্রবেশ

বিক্রম। প্রজারা বিদ্রোহী ? কোথায়।

মন্ত্রী। বুধকোটে সিংহগড়ে।

বিক্রম। ক্ষমার কথা বোলো না। অক্ষমের স্পর্ধা সব চেয়ে ক্ষমার অযোগ্য।

নরেশ। বস্তুত ওদের বিদ্রোহ বিদেশী সামন্তদের বিরুদ্ধে।

বিক্রম। তারা কি আমার প্রতিনিধি নয়।

নরেশ। তখন নয় যখন তারা নিজের স্বার্থ দেখে, প্রজার নয়, রাজার নয়। আমাকে আদেশ করো আমি প্রজাদের শান্ত করে আসি।

বিক্রম। তুমি! আমার শাসন আলগা করেছ তোমরাই। প্রজাদের প্রশ্রয়ে মহারানীর সঙ্গে যোগ দিয়েছ তুমিই, বিদেশীর প্রতি ঈর্ষা তোমার মতো এমন স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে কেউ সাহস করে নি। প্রতিহারী, মহারানী কোথায়। আমার আহ্বান এখনই তাঁকে জানাও গে। তিনি শুনুন তাঁর দয়াদৃপ্ত প্রজারা আজ বিদ্রোহ করেছে— ভীরুরা বিদ্রোহ করতে সাহস করেছে তাঁর ভরসায়। কিন্তু তিনি ওদের বাঁচাতে পারবেন? বিচার সর্বাগ্রে তাঁকেই গ্রহণ করতে হবে। এখনই, এখানেই। মন্ত্রী, তোমরা অপবাদ দিয়ে এসেছ আমার চিত্ত দুর্বল, রানীর প্রতি অন্ধ আমার প্রেম। আজ দেখাব তোমরা ভুল করেছ। তোমাদের মহারানীরও বিচার হবে। নির্বাসন দিতে পারি নে ভাবছ? আমাদের বংশ রামচন্দ্রের, সূর্যবংশ।

মন্ত্রী। মহারাজ।

বিক্রম। কী, বলো। স্তব্ধ হয়ে রইলে কেন?

মন্ত্রী। সামন্তরাজদের সৈন্যদল নিকটবর্তী। শিলাদিত্য তাদের সেনাপতি।

বিক্রম। সিংহাসনের প্রতি লক্ষ?

মন্ত্রী। হাঁ মহারাজ।

বিক্রম। প্রতিরোধের কী ব্যবস্থা করেছ।

মন্ত্রী। সৈন্য প্রস্তুত নেই, তাদের সকলকে বিশ্বাস করাও কঠিন।

নরেশ। আমাকে ভার দিন মহারাজ। দ্বিধা করবার সময় নেই। আমি সৈন্য প্রস্তুত করি গে।

বিক্রম। প্রতিহারী, মহারানী কোথায়।

প্রতিহারী। তিনি অন্তঃপুরে নেই।

বিক্রম। কোথায় তিনি। ভৈরবমন্দিরে?

প্রতিহারী। সেখানে দর্শন পাই নি।

বিক্রম। কোথায় তবে।

প্রতিহারী। দ্বারপাল বলে, ঘোড়ায় চড়ে তিনি উত্তরের পথে চলে গেছেন।

বিক্রম। অর্থ কী। রাজকুমার, তুমি নিশ্চয় জান কোথায় গেছেন তিনি।

নরেশ। কিছুই জানি নে মহারাজ।

বিক্রম। চলে গেছেন? বিদ্রোহী প্রজাদের উত্তেজিত করতে? ফিরিয়ে নিয়ে এসো, ধরে নিয়ে এসো, বেঁধে নিয়ে এসো শৃঙ্খল দিয়ে— বৈরিনী!

নরেশ। এমন কথা মুখে আনবেন না। আমরা সইতে পারব না।

বিক্রম। মূঢ় আমি! ধিক আমাকে! অন্ধ, দেখতেই পাই নি, সিংহাসনের আড়ালে বসে কাশ্মীরের কন্যা চক্রান্ত করছিলেন। স্ত্রীলোককে বিশ্বাস নেই, বিশ্বাস নেই। অন্তঃপুরে ওকে কে রাখবে! কারাগার চাই!

নরেশ। এমন পাপ চিন্তা করবেন না, মহারাজ!

বিক্রম। তোমরা সবাই আছ এর মধ্যে। তুমিও আছ, নিশ্চয় আছ। চলে গেছেন! আগে তোমাদের দণ্ড দিয়ে তবে আমার অন্য কাজ। দেবদত্ত কোথায়। কোথায় সেই বিশ্বাসঘাতক।

মন্ত্রী। বৃথা চঞ্চল হবেন না, মহারাজ। মহারানী মনকে শান্ত করতে গেছেন, নিশ্চয় আপনিই ফিরে আসবেন। অধীর হয়ে তাঁকে অপমান করলে চিরদিনের মতো তাঁকে আমরা হারাব।

বিক্রম। ফিরে আসবেন সে কি আমি জানি নে? আমাকে কেবল স্পর্ধা দেখিয়ে গেলেন। মনে করেছেন তাঁকে কাকুতি মিনতি করে ফেরাব। ভুল মনে করেছেন। আমাকে এমনি কাপুরুষ বলেই জানেন বটে! আমার পরিচয় পান নি। নিষ্ঠুর হবার প্রচণ্ড শক্তি আমার আছে। আমাকে ভয় করতে হবে— এইবার তা বুঝবেন।

দূতের প্রবেশ

দূত। উত্তরপথ থেকে মহারানীর এই পত্র।

বিক্রম। (পত্র পড়তে পড়তে) রাজকুমার নরেশ, সুমিত্রা এসব কী লিখেছেন। এর কী মানে।—"বিবাহের পূর্বে একদিন রুদ্রভৈরবকে আত্মনিবেদন করতে গিয়েছিলেম। তাঁরই বলি ফিরিয়ে নিয়ে এসে দিলেম তোমাকে, তোমার রাজ্যকে। ব্যর্থ হল, তুমিও পেলে না, তোমার রাজ্যও পেতে বাধা পেল।"

নরেশ। মহারাজ, তুমি তো জান, মহারানী আগুনে ঝাঁপ দিতে গিয়েছিলেন, পুরবাসীরা ফিরিয়ে এনে তোমার হাতে দিলেন।

বিক্রম। সেই আগুন যে সঙ্গে আনলেন, দগ্ধ করলেন আমাকে। এই লও নরেশ, পড়ো, আমার চোখে অক্ষরগুলি নৃত্য করছে, আমি পড়তে পারছি নে!

নরেশ। মহারানী লিখছেন, "আমি যাঁর কাছে নিবেদিত তাঁকে তাঁর অর্ঘ্য ফিরিয়ে দিতে চললেম। কাশ্মীরে ধ্রুবতীর্থে মার্তণ্ডদেব আমাকে গ্রহণ করবেন। রূপ দিয়ে তোমাকে তৃপ্ত করতে পারি নি, শুভকামনা দিয়ে তোমার রাজ্যের অকল্যাণ দূর করতে পারলুম না। যদি আমার তপস্যা সার্থক হয়, যদি দেবতাকে প্রসন্ন করি

তবে দূর হতে তোমাদের মঙ্গল করতে পারব। আমাকে কামনা কোরো না, এই তোমার কাছে আমার শেষ নিবেদন। আমাকে ত্যাগ করো, তোমাদের শান্তি হোক।"

বিক্রম। দেন নি, তিনি কিছুই দেন নি, সমস্ত ফাঁকি! নারী যে সুধা এনেছে আমার দীনতম প্রজারও ঘরে, আমি রাজ্যেশ্বর তার কণাও পাই নি— আমার দিন রাত্রি তৃষ্ণায় শুকিয়ে গেছে, সুধাসমুদ্রের তীরে বসে। নরেশ, আজ আমাকে কী করতে হবে বলো, আমি মন স্থির করতে পারছি নে।

নরেশ। মহারাজ, আমার কথা শোনো, তাঁকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা কোরো না।

বিক্রম। কী বললে! করব না চেষ্টা! বিশ্বের সামনে আমার পৌরুষ ধিক্কৃত হবে! আনো আগে তাঁকে ফিরিয়ে, তার পর সর্বসমক্ষে তাঁকে ত্যাগ করব। রাষ্ট্রপালকে বলো তাঁকে আনুক বন্দী করে।

নরেশ। হবে না মহারাজ, সে হবে না, আমার প্রাণ থাকতে সে হতে দেব না।

বিক্রম। বিদ্রোহ?

নরেশ। হাঁ বিদ্রোহ! তুমি আত্মবিস্মৃত, তোমার অনুমোদন করে তোমার অবমাননা করতে পারব না। তোমার রাজ্যসীমা অতিক্রম করতে এখনো তাঁর তিন-চার দিন লাগবে। আমি নিজে যাব তাঁকে ফিরিয়ে আনতে।

বিক্রম। যাও, তবে এখনই যাও, শীঘ্র যাও। [নরেশের প্রস্থান

মন্ত্রী, তুমি ভাবছ, তাঁকে ক্ষমা করে ফিরিয়ে আনছি। একেবারেই নয়। রাজবিদ্রোহিণী তিনি, আমি নিজেই দিতেম তাঁকে নির্বাসন। আমার দণ্ড এড়িয়ে তিনি পালাচ্ছেন, এই আমার ক্ষোভ।

মন্ত্রী। মহারাজ, তাঁকে দণ্ড দেবার কথা বলে আমাদের সকলকে দুঃখ দিচ্ছেন। তিনি কাছে আসলেই দেখতে পাবেন তাঁকে দণ্ড দেবার সাধ্য আপনার নেই।

বিক্রম। তা হতে পারে, আমি মুগ্ধ। এ মোহপাশ যাক, যাক ছিন্ন হয়ে, আমি আনব না তাঁকে আমার কাছে। প্রতিহারী, রাজকুমার নরেশকে শীঘ্র ফিরিয়ে আনো। যেতে দাও, যেতে দাও, কাশ্মীরের কন্যাকে কাশ্মীরে ফিরে যেতে দাও।

মন্ত্রী। দাসের অনুনয় শুনুন মহারাজ। রাজকুমার নরেশ তাঁকে ফিরিয়ে আনুন, তার পরে আজকের দিনের এই ক্ষতবেদনা ভুলতে দেরি হবে না।

বিক্রম। মিনতি করে ফিরিয়ে আনা নয়, নয়, কিছুতেই নয়। একদিন যুদ্ধ করে তাঁকে জালন্ধরে এনেছি, পুনর্বার যুদ্ধ করেই তাঁকে জালন্ধরে ফিরিয়ে আনব।

মন্ত্রী। যুদ্ধ করে?

বিক্রম। হাঁ, যুদ্ধ করেই। কাশ্মীরের অভিমানে কাশ্মীরে চলেছেন— জালন্ধরের অপমান ঘোষণা করবেন! পদানত ধূলিশায়ী কাশ্মীরের চোখের উপর দিয়ে নিয়ে আসব তাঁকে বন্দিনী করে, যেমন করে দাসীকে নিয়ে আসে। এই কাশ্মীরের স্পর্ধা মনের মধ্যে গোপনে পোষণ করে এতদিন আমাকে উপেক্ষা করেছেন। এবার তলোয়ার দিয়ে তার মূল উৎপাটিত করে তবে আমি শান্তি পাব। মন্ত্রী, বৃথা তর্কের চেষ্টা কোরো না— এই মুহূর্তে সৈন্য প্রস্তুত করতে বলো গে।

মন্ত্রী। মহারাজ, ইতিমধ্যে তবে কি বিনা বাধায় বিদ্রোহী সামন্তরাজদের দেবে রাজ্য অধিকার করতে।

বিক্রম। না।

মন্ত্রী। তা হলে আপাতত এদের সঙ্গে যুদ্ধ সেরে তবে অন্য কথা।

বিক্রম। যুদ্ধ নয়।

মন্ত্রী। তবে?

বিক্রম। সন্ধি।

মন্ত্রী। মহারাজ কী বললেন, সন্ধি?

বিক্রম। হাঁ, সন্ধি করব। ওরাই হবে কাশ্মীর-অভিযানে আমার সঙ্গী।

মন্ত্রী। সন্ধি করবে! মহারাজ, ক্ষোভের মুখেই এমন কথা বলছ।

বিক্রম। তোমার মন্ত্রণা দেবার সময় চলে গেছে। এখন বিনা বিচারে আমার আদেশ পালন করো।

মন্ত্রী। তবু বলতে হবে। যা সংকল্প করেছ তাতে রাজ্যের সমস্ত প্রজা উন্মত্ত হয়ে উঠবে।

বিক্রম। উন্মত্ততা গোপন থাকলে স্থায়ী হয়ে থাকে— উন্মত্ততা প্রকাশ হলে তাকে দমন করা সহজ। সেজন্যে আমার কোনো চিন্তা নেই। দূতকে ডেকে পাঠাও। [উভয়ের প্রস্থান

কন্দর্পের পুষ্পমূর্তি ও পূজোপকরণ নিয়ে বিপাশা ও তরুণীগণের প্রবেশ

বিপাশা। গান

বকুলগন্ধে বন্যা এল দখিন হাওয়ার স্রোতে।
পুষ্পধনু, ভাসাও তরী নন্দনতীর হতে।

মহারাজা বলেছিলেন এইখান থেকে যাত্রারম্ভ হবে। মাধবীবিতানে তিনি আমাদের সঙ্গে যাবেন। কই, তাঁকে তো দেখছি নে।

প্রথমা। আমাদের গান শুনতে পেলেই দেখা দেবেন।

গান। অনুবৃত্তি

পলাশকলি দিকে দিকে
তোমার আখর দিল লিখে,
চঞ্চলতা জাগিয়ে দিল অরণ্যে পর্বতে।

দ্বিতীয়া। কিন্তু মহারাজ তো এলেন না— গোধূলিলগ্ন বয়ে যাচ্ছে। ওই তো দিগন্তে চাঁদের রেখা দেখা দিল।

বিপাশা। লগ্ন এলেই কী আর গেলেই কী, আমাদের তাতে কী আসে যায়। গান থামাস নে। মহারাজ বলেছেন উৎসবকে জাগিয়ে রাখতে, একটুও যেন ম্রিয়মাণ না হয়।

গান। অনুবৃত্তি

আকাশপারে পেতে আছে একলা আসনখানি,—
নিত্যকালের সেই বিরহীর জাগল আশার বাণী।
পাতায় পাতায় ঘাসে ঘাসে
নবীন প্রাণের পত্র আসে,
পলাশ-জবায় কনকচাঁপায় অশোকে অশ্বত্থে।

বিক্রমের প্রবেশ

বিপাশা। মহারাজ, সময় হয়েছে।

বিক্রম। হাঁ সময় হয়েছে— এবার ফেলে দাও এসব, দ'লে ফেলে দাও ধুলোয়।

প্রথমা। মহারাজ কী করলেন, এ-যে দেবতার মূর্তি।

বিক্রম। এমন অক্ষম, এমন ব্যর্থ, এমন মিথ্যা, ওকে বল দেবতা! বিড়ম্বনা! এই আমি ওকে পায়ের তলায় দলছি। দ্বারী।

দ্বারী। কী মহারাজ।

বিক্রম। নিবিয়ে দিতে বলে দাও এইসব আলোর মালা। দ্বারের কাছে বাজিয়ে দাও রণভেরী। [রাজা ও তরুণীগণের প্রস্থান

নরেশের প্রবেশ

নরেশ। বিপাশা, শুনে যাও।

বিপাশা। কী, বলো।

নরেশ। চলে গেলেন।

বিপাশা। কে চলে গেলেন।

নরেশ। আমাদের মহারানী।

বিপাশা। কোথায় চলে গেলেন।

নরেশ। জান না তুমি ?

বিপাশা। না।

নরেশ। তিনি গেছেন একলা ঘোড়ায় চড়ে কাশ্মীরের পথে।

বিপাশা। বলো বলো, সব কথাটা বলো।

নরেশ। পত্র পাঠিয়েছেন তিনি আর ফিরবেন না। ধ্রুবতীর্থে মার্তণ্ডমন্দিরে আশ্রয় নেবেন।

বিপাশা। আহা, কী আনন্দ। মুক্তি এতদিন পরে!

নরেশ। বিপাশা, তাঁকে তো বাঁধতে কেউ পারে নি।

বিপাশা। শিকল পরাতে পারে নি, খাঁচায় রেখেছিল। পাখা বাঁধিয়ে দিয়েছিল সোনা দিয়ে। ধরতে গিয়ে তাঁকে হারাল। এই হারানোর কী অপূর্ব মহিমা। সূর্যাস্তরশ্মির পশ্চিমযাত্রা। কিন্তু এই অন্ধরা কি এর পুণ্যরূপের ছটা দেখতে পেলে।

নরেশ। আমরা যাব তাঁকে ফেরাতে। এতক্ষণে তিনি গেছেন নন্দীগড়ের মাঠের কাছে।

বিপাশা। যেয়ো না যেয়ো না, তিনি তোমাদের নন ; তাঁকে পাও নি, পাবেও না। আজ ভাঙা-উৎসবের ভিতর দিয়ে তিনি ছাড়া পেলেন পাষাণের বুকফাটা নির্ঝরের মতো।

গান

প্রলয়-নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে
হে নটরাজ, জটার বাঁধন পড়ল খুলে।
জাহ্নবী তাই মুক্তধারায়
উন্মাদিনী দিশা হারায়,
সংগীতে তার তরঙ্গদল উঠল দুলে।
রবির আলো সাড়া দিল আকাশপারে।
শুনিয়ে দিল অভয়বাণী ঘরছাড়ারে।
আপন স্রোতে আপনি মাতে,
সাথি হল আপন সাথে,
সবহারা সে সব পেল তার কূলে কূলে॥

এই গান আমরা পাহাড়ে গাই বসন্তে যখন বরফ গলতে থাকে, ঝরনাগুলো বেরিয়ে পড়ে পথে-পথে। এই তো তার সময়— ফাল্গুনের স্পর্শ লেগেছে পাহাড়ের শিখরে শিখরে, হিমালয়ের মৌন গেছে ভেঙে।

নরেশ। খুব খুশি হয়েছ, বিপাশা?

বিপাশা। খুব খুশি আমি।

নরেশ। কোনো দুঃখই বাজছে না তোমার মনে?

বিপাশা। এমন সুখ কোথায় পাব, কুমার, যাতে কোনো দুঃখ নেই।

নরেশ। বন্ধন তো কাটল, এখন তুমি কী করবে।

বিপাশা। যাঁর সঙ্গে ঘরে ছিলাম তাঁর সঙ্গেই পথে বেরব।

নরেশ। তোমাকেও আর ফেরাতে পারব না?

বিপাশা। কী হবে ফিরিয়ে বন্ধু। হয়তো বাঁধতে গিয়ে ভুল করবে।

নরেশ। আচ্ছা যাও তুমি। আমার মন বলছে, মিলব একদিন। এখানে আমারও স্থান নেই।

বিপাশা। কেন নেই, কুমার।

নরেশ। মহারাজ স্থির করেছেন, কাশ্মীরে যুদ্ধযাত্রা করবেন— যুদ্ধে জয় করেই মহারানীকে ফিরিয়ে আনবেন।

বিপাশা। সেও ভালো। এমনি রাগ করেও যদি রাজার পৌরুষ জাগে তো সেও ভালো।

নরেশ। ভুল করছ বিপাশা। এ পৌরুষ নয়, এ অসংযম— ক্ষত্রিয়তেজ একে বলে না। যে উন্মত্ততায় এতদিন আপনাকে বিস্মৃত হতে লজ্জা পান নি এও সেই উন্মাদনারই রূপান্তর। কোনো আকারে মোহমাদকতা চাই, নিজেকে ভুলতেই হবে এই তাঁর প্রকৃতি। মীনকেতুরই কেতনে রক্তের রঙ মাখাতে চলেছেন— কল্যাণ নেই। আমাকেও যেতে হল কাশ্মীরে।

বিপাশা। লড়াই করতে?

নরেশ। মহারানীকে এই কথা জানাতে যে, যারা কাশ্মীরে যুদ্ধ করতে এসেছে তারা জালন্ধরের আবর্জনা, তাদের পাপে আমাদের সকলকে যেন তিনি অপরাধী না করেন।

বিপাশা। যাবে তুমি? সত্যি যাবে?

নরেশ। হাঁ, সত্যি যাব।

বিপাশা। তবে আমিও তোমার পথের পথিক।

নরেশ। তা হলে এ পথের অবসান যেন কখনো না হয়।

বিপাশা। তুমি আর ফিরবে না ?

নরেশ। ফেরবার দ্বার বন্ধ। রাজা আমাকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছেন। অন্ধ সংশয়ের হাতে যেখানে রাজদণ্ড, রাজার বন্ধুদের স্থান সেখান হতে বহুদূরে।

[উভয়ের প্রস্থান

৩

কাশ্মীর

১। সর্বনাশ! বল কী!

২। চলো, আর দেরি নয়।

১। ঠিক জান তো ?

২। তরাইয়ে গিয়েছিলুম ভালুকের চামড়া বেচতে— স্বচক্ষে দেখে এলুম জালন্ধরের সৈন্য। আর দেখলুম ধনদত্তকে, চন্দ্রসেনের দূত। দুই পক্ষে বোঝাপড়া চলছে।

১। ওদের পথ আগলানো হবে না ?

২। কে আগলাবে। খুড়োমহারাজ নিজের পথ খোলসা করছেন। এবার আমরা প্রজারা মিলে যেদিন যুবরাজকে রাজা করতে দাঁড়িয়েছি, এমনি অদৃষ্ট, ঠিক সেইদিনেই এসে পড়ল বিদেশী দস্যু। খুড়োরাজা এবার কাশ্মীরের রাজছত্রের উপর জালন্ধরের ছত্র চড়িয়ে সিংহাসনে নিজের অধিকার পাকা করে নিতে চেষ্টা করছেন।

১। কিন্তু দেখো বলভদ্র, এ সংবাদ এখন প্রচার করে অভিষেক ভেঙে দিয়ো না। এখানকার অনুষ্ঠান চলতে থাক্, আজকের মধ্যেই সমাধা হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে আমরা যা করতে পারি করি গে। রণজিৎকে পাঠাও পত্তনে। আর জঠিয়াতে খবর দাও কাঠুরিয়াপাড়ায়— আমি চললেম রঙ্গীপুরে। ঘোড়া যার যতগুলো পাওয়া যায় ধরে আনা চাই। পাঁচমুড়ির মহাজনদের গমের গোলা আটক করতে হবে— অন্তত দু মাসের যুদ্ধের খোরাক দরকার।

২। এবার আমরা মরি আর বাঁচি ওই পিশাচের অভিপ্রায় কিছুতেই সিদ্ধ হতে দেব না। কুমারের অভিষেক আজ সম্পন্ন হওয়াই চাই। তার পর থেকেই

চন্দ্রসেনকে রাজবিদ্রোহী বলে গণ্য করব। ওরে, তোরা তোরণে দেবদারুশাখার মালাগুলো শীঘ্র খাটিয়ে দে। ভেরীওয়ালাকে বল্‌-না বাজিয়ে দিতে ভেরী।

১। সবাই এসে জড়ো হোক। এই-যে মহীপাল— তোমাকে অত্যন্ত দরকার।

মহীপাল। কেন, কী হয়েছে।

২। সে কথা এখানে বলা চলবে না। চলো ওই দিকে। দেরি কোরো না।

১। এইমাত্র একটা খবর পেয়েছি, চন্দ্রসেন এই দিকে আসছেন। বোধ করি অভিষেক ভেঙে দিতে।

২। না, আমার বিশ্বাস, কৌশলে যুবরাজকে সতর্ক করে দিতে। চন্দ্রসেন আর সব করতে পারে কিন্তু কুমারকে ওরা বন্দী করে নিয়ে যাবে এ তিনি কখনোই সইবেন না। কিন্তু চল্‌, আর দেরি না। [সকলের প্রস্থান

আর-এক দল

১। ব্যাপারখানা কী ভাই।

২। আকাশ থেকে পড়লে নাকি।

১। সেইরকমই তো বটে। দুঃখের কথাটা বলি। জান তো পেটের দায়ে একদিন ঢুকেছিলুম খুড়োরাজার প্রহরীর দলে। খুব মোটা মাইনে নইলে ওঁর কাজে লোক আসতে চায় না। স্ত্রীর গায়ে গহনা চড়ল— কিন্তু লজ্জায় সে ইঁদারায় জল আনতে যাওয়া বন্ধ করলে। আমাদের পাড়ায় থাকে কুন্দন; সকলের নামে সে ছড়া কাটে। সে আমার নাম দিলে খুড়ো-গণেশের খুড়তুতো ইঁদুর। শুনে দেশসুদ্ধ লোক খুব হাসলে, আমি ছাড়া।

৩। বাহবা, ঠিক নামটা বের করেছে তোদের কুন্দন। দেশে খুড়তুতো ইঁদুরের বাড়াবাড়ি হতে চলল। ঘরের ভিত পর্যন্ত ফুটো করে দিলে রে, দাঁত বসাচ্ছে সব-তাতেই, এইবার ওদের গর্তে লাগাব আগুন। তার পরে বুদ্ধু, পিঠে গণেশঠাকুরের শুঁড়-বুলোনি সইল না বুঝি।

১। অনেকদিন অনেক সহ্য করলুম। শেষকালে যেদিন খুড়োরাজা খুশি হয়ে আমাকে প্রহরীশালার সর্দার করে দিলে— সেইদিন পথের মধ্যে দেখা আমার ছোটোশালীর সঙ্গে। জান তাকে—

২। জানি বৈকি। ওই তোদের রূপমতী, বাসা মেয়ে রে! তোদের ছড়া-কাটিয়ে তাকেই তো বলে মৃত্যুশেল।

১। সে আমাকে দেখে বাঁ পা দিয়ে মাটিতে এক লাথি মারলে, ধুলো উড়িয়ে দিলে, পায়ের মল ঝম ঝম করে উঠল— মুখ বাঁকিয়ে চলে গেল। আর সইল না।

৩। হা হা হা হা! রাজা পায়ের এক ঘায়ে খুড়তুতো ইঁদুরের লেজ গেল কাটা!

১। দিলেম ফেলে আমার পাগড়ি প্রহরীশালার দ্বারে, চলে গেলেম উত্তরে মালখণ্ডে। গ্রীষ্মভোর ছাগল চরাই, শীতকালে রাজধানীতে নিয়ে আসি; কম্বল বিক্রি করি। পণ করেছি যখন হাতে কিছু টাকা হবে, পাগড়িতে লাগাব সোনার পাড়— যাব আমার শ্যালীর বাড়িতে, সেই বাঁ পায়ের লাথিটা সে ফিরিয়ে নেবে, তবে অন্য কথা। এই কথাই ভাবতে ভাবতে আসছিলেম ছাগলের পাল নিয়ে, যাচ্ছিলেম রাজধানীর দিকে। পথের মধ্যে একদল লোক ছাগলসুদ্ধ আমাকে হৈঃ হৈঃ শব্দে খেদিয়ে নিয়ে এল এইখানে, বললে এই আমাদের রাজধানী এইখানে— এই উদয়পুরে।

২। মূর্খ, মনে রাখিস, আজ থেকে এর নাম উদয়পুর নয়, কুমারপুর।

১। মনে রাখা শক্ত হবে ভাই, এখানে আমার দাদাশ্বশুরের বাড়ি, চিরদিন জানি—

৩। ভাবনা কী, নতুন রাজত্বে তোর দাদাশ্বশুরের নাম নতুন করে দেব।

১। তা যেন দিলে, কিন্তু আমার ছাগলের মহাজন থাকে সেইখানটাতে যাকে রাজধানী বলে জানতুম। সে লোকটার কাছে দেনাও আছে পাওনাও আছে। নইলে তারও নাম বদল করে দিলে খুশি হতুম।

২। আচ্ছা বেশ, খুড়োরাজের রাজত্বকালের দেনাটা কুমাররাজের রাজত্বকালে মাপ করে দেওয়া গেল।

১। আর পাওনাটা?

২। সেটা পরে দেখা যাবে— সময়মতো।

১। পেটের তাগিদ সময় মানবে না, দাদা। তা যাই হোক, তোদের মুখের কথায় রাজধানী তৈরি হয় না তো ভাই, সেরকম চেহারা দেখছি নে।

৩। সবই কি চোখে দেখতে হয়। মনে-মনে দেখ্।

১। কিন্তু ছাগলের দামটা মনে-মনে পেলে আমার চলবে না। কথাটা একটু বুঝিয়ে বলো, দাদা।

৩। তবে শোন্, কুমার এলেন তীর্থ থেকে, তবু খুড়োমহারাজ সিংহাসন আঁকড়েই রইলেন। দেখলুম, টানাটানি করতে গেলে রক্তারক্তি হবে। ঠিক করেছি এখানেই যুবরাজের রাজধানী বসিয়ে তাঁকে রাজা করব। আজই অভিষেক।

১। এই আখরোটের বনে?

২। কোথাকার গোঁয়ার এটা ? রাজা যেখানেই বসবেন সিংহাসন সেইখানেই। আর তোকে যদি ইন্দ্রের আসনেও বসাই তার তলা থেকে ছাগল ডাকতে থাকবে রে।

১। না ডাকলেও সুখ হবে না ভাই, মন কেমন করবে। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি নে। ছিলেন এক রাজা, হলেন দুই রাজা, ভার সইবে ? এক ঘোড়ার দুই সওয়ার, লেজের দিকে লাগাম টানবে একজন, মুখের দিকে আর-একজন, জন্তুটা চলবে কোন্ রাস্তায়।

২। ওরে, জন্তুটার চেয়ে মুশকিল হবে সওয়ারের— যিনি থাকবেন লেজের দিকে তাঁকে আপনিই খসে পড়তে হবে। বুঝতে পেরেছিস ?

১। অনেকখানি বোঝা বাকি আছে। লেজের মানুষটা খসে পড়বার আগে খাজনা দেব কাকে।

৩। খাজনা দিতে হবে মহারাজ কুমারসেনকে।

১। তার পরে ?

৩। তার পরে আর কিছুই নেই।

১। খুড়োমহারাজ তো সিংহাসনে বসে উপোস করবার ব্রত নেন নি। যখন খিদে চড়ে যাবে তখন ?

২। সে কথা খুড়োমহারাজ চিন্তা করবেন। আমরা সবাই পণ করেছি খাজনা দেব মহারাজ কুমারসেনকে, আর কাউকে নয়।

১। ঠিক বলছ দাদা, সবাই পণ করেছ ?

২। হাঁ, সবাই।

১। বরাবর দেখে আসছি তোমরা মোড়লরা পিছন থেকে চেঁচিয়ে বল, বাহবা, আর সামনে থেকে মাথায় বাড়ি পড়ে আমাদেরই। ঠিক বলছ, সবাই খাজনা দেবে কুমার-মহারাজকে, কেউ পিছবে না ?

৩। কেউ না, কেউ না। আজ মহারাজের পা ছুঁয়ে শপথ গ্রহণ করব।

১। এ কথা ভালো। মার তো কপালে লেখাই আছে। একলা খাই সেইটেই দুঃখ। দেশ জুড়ে মারের ভোজ বসে যায় যদি, পাত পাড়তে ভয় করি নে।

২। এই রইল কথা ?

১। হাঁ, রইল।

৩। পিছোবি নে ?

১। পিছোবার রাস্তাটা তোমরাই খোলসা রাখ, সে রাস্তা আমরা খুঁজেই পাই নে।

৩। ওরে বোকা, মরতে পারি নে, তা নয়, কিন্তু আমরা মলে তোদের দশা কী হবে।

১। আমাদের অন্ত্যেষ্টিসংকারটা বন্ধ থাকবে।

একদল স্ত্রীলোকের প্রবেশ

প্রথমা। রাজার অভিষেকের সময় হল ?

২। না, এখনো দেরি আছে। তোমরা প্রস্তুত আছ তো ?

প্রথমা। আমাদের জন্যে ভেবো না গো, ভেবো না। তোমাদের পুরুষের মধ্যেই দেখি কেউ বা এগোন কেউ বা পিছোন। কেউ বলছেন সময় বুঝে কাজ, কেউ বলছেন কাজ বুঝে সময়। মাঝের থেকে সময় যাচ্ছে চলে।

দ্বিতীয়া। দেখে এলেম তোমাদের ন্যায়বাগীশ এখনো বসে তর্ক করছেন, যিনি রাজা তিনি সিংহাসনে বসেন, না, যিনি সিংহাসনে বসেন তিনিই রাজা। এই নিয়ে দুই পক্ষে মাথা-ভাঙাভাঙি চলছে আমাদের পাড়ায়। মেয়েরা কাল সমস্ত রাত ধরে সাজিয়েছে মাঙ্গল্যের ডালা।

তৃতীয়া। ভোর থেকে যে-যার গ্রাম থেকে সব বেরিয়ে পড়ল।

১। আর লজ্জা দিয়ো না আমাদের। এ কথা মেনে নিচ্ছি মেয়েদের মতো পুরুষ মেলে না। তোমাদের গানের দল আছে তো ?

দ্বিতীয়া। হাঁ, তারা এল বলে।

২। তোমাদের উমিচাঁদের মেয়ে ?

তৃতীয়া। সেই তো সব দল ডেকে আনছে।

২। নন্দপল্লীর উপযুক্ত মেয়ে বটে। সেদিন বিতস্তার ঘাটে আমাদের করমচাঁদ গিয়েছিলেন তাকে গোটা দুয়েক মিঠে কথা বলতে। কঙ্কণের এক ঘা খেয়েই মুখ বন্ধ।

প্রথমা। জান না বুঝি, সে বলেছে বেত্রবতী নাম নেবে— কুমার মহারাজের সিংহাসনের পশ্চাতে থাকবে তার পরিচারিকা হয়ে।

১। দাদা, তা হলে আমি ছাগল-চরানোর ব্যাবসা ছেড়ে দিয়ে রাজার ছত্রধর হব।

২। ওরে বুদ্ধু, এই খানেক আগেই তোকে দোমনা দেখেছি, একমুহূর্তে রাজভক্তি ভরপুর হয়ে উঠল কিসে।

১। এক আগুন থেকে আর-এক আগুন জ্বলে।

৩। তুই তো ছাগল চরাতে গিয়েছিলি, উত্তরখণ্ডের খবর কিছু এনেছিস ?

১। কাউকে যদি না বলো তো বলি।

৩। ভয় কিসের। বলে ফেল্ না।

১। বললে না প্রত্যয় যাবে স্বয়ং রানী সুমিত্রাকে দেখেছি ভৈরবীবেশে চলেছেন ধ্রুবতীর্থে।

২। পাগল রে !

প্রথমা। না গো, উনি মিথ্যা বলছেন না। আমিও শুনেছি বটে। কাউকে বলতে সাহস করি নি।

৩। কার কাছে শুনলে।

প্রথমা। ওই যে আমার ভাসুরঝি মন্দাকিনী। তীর্থ করে ফিরে আসছিল। পথে দেখা। রাজকুমারী চলেছেন মার্তণ্ডদেবের উপাসিকার দীক্ষা নিতে।

২। বিশ্বাস করি কী করে। বুদ্ধু, তোর সঙ্গে কথা হল কিছু ?

১। প্রণাম করে বললুম, তুমি আমাদের রাজকুমারী সুমিত্রা। তিনি বললেন, আমার নাম তপতী। জানিস তো সেই অপরূপ রূপ। সেই লাবণ্য যেন আগুনের স্নান করে এল। বললেম, দেবী, চরণের সেবক হয়ে যাই সঙ্গে। তিনি নীরবে তর্জনী তুলে ফিরে যেতে ইঙ্গিত করলেন।

৩। দুর্গম তীর্থে রাজকুমারী একলা চলেছেন, তুই এখানে এসে রাজবাড়িতে জানালি নে ?

১। দুই-একজনকে জানাতে গিয়েছিলেম— আমাকে মারে আর কি। বলে, আমি নেশা করেছি !

আর-একজনের প্রবেশ

৪। কিছুতে রাজি হল না।

২। কার কথা বলছ।

৪। আমাদের সভাকবি দর্দুর। খুড়োমহারাজের আশ্রয় ছাড়তে সাহস করল না। আজ অভিষেকে কোনোরকমের একটা সভাকবি চাই তো।

৩। চাই বৈকি। আজকের মতো রীতরক্ষা করে তার পরে সংক্ষেপে বিদায় করলেই হবে।

৪। জোগাড় করেছি একটি। মধু তাকে নিয়ে আসছে। বিদেশী, যাচ্ছে ধ্রুবতীর্থে, সঙ্গে নারী আছে।

৩। এর থেকেই ঠাওরালে সে কবি ?

৪। দেখলেম, গাছতলায় বসে মেয়েটি গান গাচ্ছে আর সে বাজাচ্ছে একতারা। মুখ দেখেই সন্দেহ হল লোকটা আর কিছুই না পারুক, গান বানাতে পারে। সিধে গিয়ে বললুম, তুমি কবি, চলো রাজার অভিষেকে। প্রথমটা কিছুতেই মানতে রাজি নয়। ভাবলে তাকে পাগল বললুম, না বোকা বললুম। সঙ্গের মেয়েটি বলল, হাঁ, ইনি কবি বৈকি, নিশ্চয় কবি, অভিষেকে যেতে হবেই তো। অমনি মানুষটা জল হয়ে গেল— আর 'না' বলবার জো রইল না।

৩। 'না' বলবার মতো মেয়েটি নয় বোধ করি।

৪। একেবারেই না। দেখলেম দিব্যি বশ মেনেছে। মেয়েটি যদি বলত, চলো, লড়াই করবে, তবে তখনই ছুটত লড়াই করতে, কবিতা লেখা তো সামান্য কথা।

২। শুনে বুঝছি, লোকটি কবি। মনে তো আছে, আমাদের ধরণীদাস। গৌরীতরাইয়ের নথনি বুনত শাল, ধরণী আস্তে আস্তে এসে দাঁড়াত তার আঙিনার কোণে। আর সে দিত তার কুণ্ডল ঝুলিয়ে ঝংকার, তারই চোটে ধরণী সাত খাতা জুড়ে ছড়া লিখছে। খেতুলাল, তুই ধরেছিস ঠিক, লোকটা কবি।

৪। হোক, বা না হোক, চেহারায় মানাবে। ওই-যে আসছে।

মন্নুর সঙ্গে নরেশ ও বিপাশার প্রবেশ

বিপাশা। (নরেশের প্রতি) কবি নরোত্তম, এঁদের বঞ্চিত কোরো না। তোমাকে গান গাইতে বলতে সাহস পাই নে। কিন্তু আমি তো তোমারই শিষ্যা, যথাসময়ে আমাকে অনুমতি কোরো, আমি গাইব।

নরেশ। তোমার ভক্তিতে আমি প্রীত। ভালো, অনুমতি করছি, গাও তুমি।

বিপাশা। সে কি প্রভু, এখনই? এখনো তো সময় হয় নি।

নরেশ। এতদিনেও আমার কাছে এ শিক্ষা হল না যে, গানের অসময় নেই?

১। কবি অন্যায় বলেন নি। ওই দেখো-না, লোক জড়ো হয়েছে। সময় হল।

বিপাশা। গান

দিনের পরে দিন-যে গেল আঁধার ঘরে,
তোমার আসনখানি দেখে মন-যে কেমন করে।
ওগো বঁধু, ফুলের সাজি
মঞ্জরীতে ভরল আজি,
ব্যথার হারে গাঁথব তারে রাখব চরণ 'পরে।

পায়ের ধ্বনি গনি গনি রাতের তারা জাগে।
উত্তরীয়ের হাওয়া এসে ফুলের বনে লাগে।
ফাগুনবেলার বুকের মাঝে
পথ-চাওয়া সুর কেঁদে বাজে,
প্রাণের কথা ভাষা হারায় চোখের জলে ঝরে॥

১। হায় হায়, খাঁটি কবি বটে রে। ছেড়ে দেওয়া হবে না। দাদাশ্বশুরের আটচালায় এক কোণে জায়গা করে দেব।

২। কবি, রচনা তোমারই বটে তো? ভণিতা নেই কেন। আমাদের বংশীলাল খুব লম্বা করেই ভণিতা লাগায়।

নরেশ। ভণিতার সম্পর্ক রাখি নে। আমি জানি গান যে গায় গান তারই। গানটা আমার কি তোমার, এই অত্যন্ত বাজে প্রশ্ন যদি না ভুলিয়ে দিলে তা হলে সে গান গানই নয়।

৩। কিন্তু দেখো কবি, আমার কেমন মনে হচ্ছে এ গান আমি পূর্বে শুনেছি এই কাশ্মীরেই।

নরেশ। বড়ো খুশি হলুম এ কথা শুনে। তুমি রসিক লোক। ভালো গান শুনলেই মনে হয় এ গান আগেই শুনেছি।

৩। মনে হচ্ছে আমাদের কবি শশাঙ্ক যেন ওইরকমের একটা—

নরেশ। কিছুই অসম্ভব নয়, কোনো কোনো কবি থাকেন যাঁর রচনা ঠিক অন্য লোকের রচনার মতোই হয়।

৩। কবি, ইচ্ছে করছে তোমাকে একটা মালা দিই।

নরেশ। মালা আমি নিই নে। আমার গান যাঁর কণ্ঠে, আমার মালাও তাঁরই কণ্ঠে পড়ে।

৪। সে তো ভালো কথা। উনি মালা পরার যোগ্য বটেন। হাঁ গা, তোমাদের ডালিতে তো মালা অনেক আছে, একখানা দাও-না ওঁকে পরিয়ে দিই।

প্রথমা। হাঁ, দিলাম বলে!

৪। ভালোমানুষের ঝি, দিলে দোষ কী।

দ্বিতীয়া। তোমরা দোষ দেখতে পাবে কেন। পথে ঘাটে মালা পরিয়ে বেড়ানো তোমাদের স্বভাব যে।

৩। মাসি, রাগ কর কেন?

দ্বিতীয়া। আর 'মাসি' 'মাসি' করতে হবে না।

৩। আচ্ছা, ছাড়লেম মাসি বলা, যা বললে খুশি হও তাই বলব। আপাতত একখানা মালা দাও-না, ওঁকে পরিয়ে দিই।

তৃতীয়া। তোমরা কি লজ্জার মাথা খেয়ে বসেছ! কোথাকার কে তার ঠিক নেই, রাজার অভিষেকের মালা দিতে হবে! এত সস্তা নয় গো।

১। ও-কথা বোলো না দিদিশাশুড়ি, রাজা থাকলে স্বয়ং ওকে মালা দিতেন।

দ্বিতীয়া। ভরতজলির লোক, তোমাদের ব্যাভারটা কী রকম গো। ওকে দিদিশাশুড়ি বল কোন্ সম্পর্কে। ও আমার বোনঝি।

১। মাসি বলতে সাহস হল না। ভাবলুম দাদাশশুরের গ্রামে থাকে, ওই সম্পর্কের নামটা বেমানান হবে না।

প্রথমা। ওই-যে রাজা আসছেন শিবির থেকে। এখনো তো সময় হয় নি। এরা সব গান গেয়ে উৎপাত করে ওঁকে বের করে আনলে।

সকলে। জয়, মহারাজ কুমারসেনের জয়!

কুমারসেনের প্রবেশ

কুমার। শীঘ্র আমার অশ্ব প্রস্তুত করো।

৩। কবি, ধরো ধরো, একটা গান ধরো শিগগির।

বিপাশা। গান

তোমার আসন শূন্য আজি, হে বীর পূর্ণ করো,
ওই যে দেখি বসুন্ধরা কাঁপল থরোথরো।
বাজল তূর্য আকাশপথে,
সূর্য আসেন অগ্নিরথে,
এই প্রভাতে দখিন হাতে বিজয়খড়্গ ধরো।
ধর্ম তোমার সহায়, তোমার সহায় বিশ্ববাণী।
অমর বীর্য সহায় তোমার, সহায় বজ্রপাণি।
দুর্গম পথ সগৌরবে
তোমার চরণচিহ্ন লবে,
চিত্তে অভয়বর্ম তোমার বক্ষে তাহাই পরো॥

কুমারসেন। (বিপাশাকে ইঙ্গিতে কাছে ডেকে) হঠাৎ এখানে এলে যে।

বিপাশা। ছুটি পেয়েছি যুবরাজ।

কুমারসেন। সুমিত্রা?

বিপাশা। সে বন্দিনীও ছুটি পেয়েছে।

কুমারসেন। মৃত্যু?

বিপাশা। না, নূতন প্রাণ।

কুমারসেন। অর্থ কী, বুঝিয়ে দাও।

বিপাশা। জালন্ধর ছেড়েছেন তিনি। গেছেন ধ্রুবতীর্থে, উপাসিকার দীক্ষা নেবেন।

কুমারসেন। তোমার কথাটাকে এখনো মনের মধ্যে ঠিক নিতে পারছি নে।

বিপাশা। যুবরাজ, সুমিত্রাকে তো চেনো। স্বর্গের তপস্যা সেই জ্যোতির্ময়ী ছাড়া কে গ্রহণ করতে পারে আজকের দিনে। আলোকের দূতী যারা, ভোগের ভাণ্ডারে তাদের বন্ধন রুদ্রদেব সহ্য করতে পারেন না।

কুমারসেন। আর জালন্ধররাজ বুঝি শৃঙ্খল হাতে নিয়ে ছুটেছেন।

বিপাশা। মাটির বাঁধ দিয়ে নদীকে বেঁধে তার স্রোতকে রাজভাণ্ডারে জমা করবার জন্যে; তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করো আমার ওই পথের সঙ্গীকে।

কুমারসেন। তোমার পথের সঙ্গী?

বিপাশা। হাঁ যুবরাজ, আমার পথের সঙ্গী। চুপ করে রইলে! এর থেকে বুঝছি তুমি বুঝেছ। এর উপরে কথা চলে না।

কুমারসেন। এতদিনে বন্ধন গ্রহণ করলে, বিপাশা?

বিপাশা। বিপাশা সিন্ধুনদীতে মিলেছে, সে মুক্তধারার মিলন।

কুমারসেন। ওঁর নামটি বলো।

বিপাশা। ওঁর নাম নরেশ। রাজা বিক্রমের বৈমাত্র ভাই। ডেকে আনছি।

কুমারসেন। নমস্কার, রাজকুমার।

নরেশ। নমস্কার।

কুমারসেন। তোমার মতো অতিথিকে পেয়ে আমার আজকের দিন সার্থক।

নরেশ। আমি আমার মহারানীর অনুবর্তী— তীর্থযাত্রী আমি, পথের অতিথি। তোমার দ্বারে আজ যে-অতিথি অনাহূত এসেছেন, তাঁর সংবাদ পেয়েছ? প্রস্তুত হয়েছ তো?

কুমারসেন। এই মাত্র সংবাদ পেয়েছি। আয়োজন নেই, কিন্তু আহ্বান করতে হবে। বিশেষ করে আমারই সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের কারণ কী ঘটেছে তা এখনো পর্যন্ত বুঝতেই পারি নি।

নরেশ। কারণের প্রয়োজন হয় না। অন্ধ বিদ্বেষ অন্ধ ঈর্ষা বাইরে থেকে পথ

খোঁজে না, স্বভাবের ভিতরেই তার আশ্রয়। তোমার মর্যাদা উনি সহ্য করতে পারেন না, তার অহৈতুক উত্তেজনা ওঁর দীনতার মধ্যে। এ যে বিধাতার অভিশাপ। তার উপরে উনি মনে-মনে সন্দেহ করেন মহারানী সুমিত্রা তোমার প্রশ্রয় পেয়েছেন বা তোমার প্রশ্রয় প্রার্থনা করতে এসেছেন।

কুমারসেন। এতদিনেও কি জানেন না সুমিত্রার পক্ষে তা অসম্ভব।

নরেশ। জানবার শক্তি যদি থাকত তা হলে হারাবার দুর্ভাগ্য তাঁর ঘটত না।

ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ

পুরোহিত। মহারাজ, অভিষেকের কাজ এখনই আরম্ভ করা কর্তব্য। মনে হচ্ছে বিলম্বে বিঘ্ন হতে পারে। নানাপ্রকার জনশ্রুতি শোনা যাচ্ছে।

কুমারসেন। অভিষেকের কাজ সংক্ষিপ্ত করো। বিলম্ব সইবে না।

পুরোহিত। চলো তবে মহারাজ, ওই অশ্বত্থবেদিকায়। সকলে জয়ধ্বনি করো।

তূরী ভেরী শঙ্খধ্বনি

সকলে। জয় মহারাজাধিরাজ কাশ্মীরাধিপতির জয়!

কুমারসেন। বাহিরে ওই কিসের কোলাহল।

অনুচরদের প্রবেশ

অনুচর। খুড়োমহারাজ হঠাৎ উপস্থিত। প্রহরীরা বলছে প্রাণ থাকতে তাঁকে এখানে প্রবেশ করতে দেবে না। তারা লড়াই করে মরতে প্রস্তুত। আদেশ করো মহারাজ।

কুমারসেন। শান্ত করো প্রহরীদের। খুড়োমহারাজকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এসো।

[অনুচরদের প্রস্থান

বিপাশা। আমরা তবে প্রচ্ছন্ন হই। [নরেশ ও বিপাশার প্রস্থান

চন্দ্রসেনের প্রবেশ

একদল। কোথায় চলেছ চন্দ্রসেন। পাষণ্ড, কপট। কোথায় যাও বিশ্বাসঘাতক। ওকে বন্দী করো।

কুমারসেন। থামো তোমরা। এ কেমন বুদ্ধি তোমাদের। উনি এসেছেন বিশ্বাস করে আমার কাছে।

চন্দ্রসেন। কিছু ভয় নেই, বৎস, শুধু বিশ্বাসের উপর ভর করে আসি নি। ওদের যদি অপঘাতমৃত্যুর ইচ্ছা থাকে নিরাশ করব না।

কুমারসেন। প্রণাম পিতৃব্যদেব। আমার অভিষেকমুহূর্ত তোমার সমাগমে সার্থক হল। আমাকে আশীর্বাদ করো।

চন্দ্রসেন। সে পরে হবে। সময় একটুও নেই। কেন এসেছি শোনো। সহসা জালন্ধররাজ সসৈন্যে কাশ্মীরে উপস্থিত।

কুমারসেন। শুনেছি সে সংবাদ। অভিষেকের কাজ সত্বর সমাধা করব।

চন্দ্রসেন। থাক্‌ এখন অভিষেক। অবিলম্বে চলো তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করবে।

কুমারসেন। আত্মসমর্পণ! যুদ্ধ নয়?

চন্দ্রসেন। সৈন্য কোথায় তোমার।

কুমারসেন। কেন। রাজধানীতে সৈন্যের অভাব নেই।

চন্দ্রসেন। সে তো এখনো তোমার নয়।

কুমারসেন। কিন্তু কাশ্মীরের তো বটে!

চন্দ্রসেন। বিক্রম তো কাশ্মীর চান না, তোমাকেই চান।

কুমারসেন। আমার মান-অপমান কী কাশ্মীরের নয়।

চন্দ্রসেন। কী বল তুমি! এ তো সামান্য আত্মীয়কলহ। দাও তাঁর কাছে ধরা, চাও তাঁর স্নেহ ও ক্ষমা, হাসিমুখে সমস্ত নিষ্পত্তি হয়ে যাবে।

কুমারসেন। খুড়োমহারাজ, তর্ক করবার সময় নেই, শেষবার জিজ্ঞাসা করি— রাজধানী থেকে সৈন্য পাব না?

চন্দ্রসেন। রাজধানী! বিদ্রূপ করছ? শুনেছি ওই আখরোটবনেই কাশ্মীরের রাজধানী। তোমার আদেশ এইখান থেকেই ঘোষণা কোরো। আমাকে তো কোনো প্রয়োজন নেই। আমি বিদায় হই। [প্রস্থান

সকলে। ধিক্‌ ধিক্‌। নিপাত যাও। কোটি জন্ম তোমার নরকবাস হোক। সিংহাসনের কীট, সিংহাসনকে জীর্ণ করে তার ধূলির মধ্যে তোমার বিলুপ্তি ঘটুক।

কুমারসেন। স্তব্ধ হও। শোনো। জালন্ধর কাশ্মীর আক্রমণে এসেছেন, আমাকে একলা লড়তে হবে।

সকলে। মহারাজ, ন্যায় তোমার পক্ষে, ধর্ম তোমার পক্ষে, সমস্ত কাশ্মীরের হৃদয় তোমার পক্ষে। জয় মহারাজা কুমারসেনের জয়! ধিক্‌ ধিক্‌ চন্দ্রসেনকে শত শত শত ধিক্‌।

কুমারসেন। চুপ করো, বৃথা উত্তেজনায় বলক্ষয় কোরো না। এখনই যাও সৈন্য সংগ্রহ করো গে।

সকলে। আর অভিষেক?

কুমারসেন। নাইবা হল অভিষেক।

সকলে। সে হবে না, মহারাজ, সে হবে না। চন্দ্রসেনের চক্রান্ত শেষে সফল হবে! এ কিছুতেই পারব না সইতে। আমরা আছি, সৈন্যসংগ্রহের আয়োজনে এখনই চললুম। কিন্তু উৎসব চলুক, অনুষ্ঠান শেষ হোক।

কুমারসেন। ভয় নেই, মন্দিরে দেবসাক্ষী করে তীর্থোদকে একমুহূর্তে আমার অভিষেক হয়ে যাবে। যদি ফিরে আসি উৎসব সম্পূর্ণ করব। কিন্তু তোমরা যাও। আর বিলম্ব নয়।

সকলে। জয় মহারাজ কুমারসেনের। ধিক্ চন্দ্রসেন। ধিক্ ধিক্ ধিক্।

[সকলের প্রস্থান

আর-এক দলের প্রবেশ

১। মহারাজ, আর সময় নেই। পালাতে হবে।

কুমারসেন। কেন।

১। জালন্ধরের সৈন্য অন্ধমুনির মাঠ পর্যন্ত এসেছে, পালানো ছাড়া এখন আর উপায় নেই। চলো, শম্ভুপ্রস্থের বনে আমি পথ জানি। [উভয়ের প্রস্থান

২। এইমাত্র-যে খুড়োমহারাজ এসেছিলেন।

১। চাতুরী, চাতুরী। শত্রুপক্ষকে তিনি নিজে সন্ধান বাতলিয়েছেন।

২। গ্রামে গ্রামে লোক গেছে সৈন্য জোগাড় করতে, কিন্তু সময় তো পাওয়া গেল না। এরা যুদ্ধ করতেও দিলে না রে।

৩। এ-যে বেড়া আগুন, কিছুই করতে পারব না, মরব শুধু। অসহ্য!

১। জালন্ধরের পাপিষ্ঠরা একেই বলে যুদ্ধ করা। এ তো মানুষ খুন করা!

আর-এক দল

১। নাগপত্তন জালিয়ে দিয়েছে রে, জালিয়ে দিয়েছে।

২। বলিস কী।

৩। হাঁ, সেখানকার মানুষগুলো শেষ পর্যন্ত চেঁচিয়ে গলা ভেঙেছে— জয় মহারাজ কুমারসেনের জয়।

২। এর পিছনে আছে খুড়োরাজা। নাগপত্তন ওকে কিছুতেই মানে নি কিনা, এবার তারই শোধ নিলে বিদেশীকে দিয়ে।

৩। তা হলে অনেক পত্তনেরই লীলা সাঙ্গ হবে।

দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত। শোনো শোনো, তোমাদের মধ্যে কুন্তীপুরের মানুষ কেউ আছ?

১। কেন বলো তো।

দেবদত্ত। চন্দ্রসেনের সঙ্গে বিক্রম মহারাজের পরামর্শ হয়েছে, সেখানে সৈন্য পাঠাবেন উৎপাত করবার জন্যে।

২। আপনি কে হন মহাশয়। বিদেশী বলে বোধ হচ্ছে।

দেবদত্ত। হাঁ বিদেশী।

৩। জালন্ধরের মানুষ?

দেবদত্ত। ঠিক ঠাউরেছ।

১। তোমার এতটা ধর্মবুদ্ধি হল কেমন করে।

দেবদত্ত। বিধাতার আশ্চর্য মহিমায় কদাচিৎ এমনতরো ঘটে। তোমাদের কাশ্মীরে চন্দ্রসেন যে বংশে জন্মেছেন সে বংশেও ভদ্রমানুষ জন্মায় দেখেছি।

২। বেশ বলেছেন, ঠাকুর, বেশ বলেছেন। ব্রাহ্মণ তো?

দেবদত্ত। হাঁ, ব্রাহ্মণ।

সকলে। প্রণাম হই।

২। নিজের রাজার বিরুদ্ধে আপনি—

দেবদত্ত। রাজার বিরুদ্ধে বল একে কোন্ বুদ্ধিতে। আমার রাজার পাপ যতটা নিবারণ করব আমার রাজভক্তি ততটাই সার্থক হবে।

৩। কিন্তু বিপদ আছে তো ঠাকুর, রাজা যদি—

দেবদত্ত। রাজার হয়ে আজ যারা অন্যায় করছে, বিপদের আশঙ্কা আমার চেয়ে তাদের তো কম নয়। অধর্ম যদি সাহস দিতে পারে, ধর্ম কি ভীরু হবে।

২। খুব বড়ো কথা বললে ঠাকুর। দাও, আর-একবার পায়ের ধুলো দাও।

দেবদত্ত। যুবরাজ কুমারসেন এখান থেকে পালাতে পেরেছেন?

১। ঠাকুর, মাপ করো, ওইটে পারব না, যুবরাজের কথা তোমার সঙ্গেও চলবে না।

দেবদত্ত। কিছু বলতে হবে না, আমি জানতে চাই, তিনি নিরাপদ তো?

১। আপদ-বিপদের কথা কে বলতে পারে। তবে কিনা আমাদের চেষ্টায় ত্রুটি হবে না।

৩। দেখো দেখো, ওই পশ্চিম পাহাড়ে। বোধ হচ্ছে অচলেশ্বরের কাছে ওরা আগুন লাগিয়েছে। বনটা সুদ্ধ জলে উঠেছে। অকারণ সর্বনাশ করতে এল কেন এরা! খিদে পেলে বাঘে খায়, ভয় পেলে সাপে তাড়া করে আসে, এদের এ যে নিষ্কাম পাপ, অহৈতুকী হিংসা। এরা কোন্ জাতের মানুষ, ঠাকুর।

দেবদত্ত। দৈত্য, দৈত্য। দেবতার 'পরে এদের বিশুদ্ধ বিদ্বেষ। ওরে উন্মত্ত দুর্বৃত্ত অন্ধ, তোমার মহাপাতক তোমাকে মহাপতনে নিয়ে চলল, আজ কে তোমাকে বাঁচাতে পারে। ধিক্ তোমার বন্ধুদের। [প্রস্থান

বিক্রম ও চরের প্রবেশ

বিক্রম। কী বললে। সন্ধান পাওয়া গেল না?

চর। না মহারাজ।

বিক্রম। তবে যে চন্দ্রসেন বললেন, এইখানেই তাঁর অভিষেক হচ্ছিল। সে তো বেশিক্ষণের কথা নয়।

চর। এইমাত্র দেখলুম তাঁর ঘোড়া ফিরিয়ে আনছে। তিনি প্রবেশ করেছেন শম্ভুপ্রস্থের বনে। সেখানে গুহার পথে অদৃশ্য হতে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব হয় না।

বিক্রম। যারা পথ জানে তাদের ধরে আনো।

চর। মহারাজ, মরে গেলেও তারা বলবে না। ওখানে সন্ধান করতে যাবে এমন সাহসও কারো নেই। ও যে ভূতে পাওয়া অরণ্য।

বিক্রম। ডেকে আনো চন্দ্রসেনকে।

চন্দ্রসেনের প্রবেশ

কোথায় কুমারসেন?

চন্দ্রসেন। প্রজারা মিলে কোথায় তাঁকে গোপন করেছে, খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

বিক্রম। আগুন লাগাও চারি দিকে, আপনি বেরিয়ে আসবেন।

চন্দ্রসেন। কোথায় আছেন না জেনে আগুন লাগানো হিংসার ছেলেমানুষি।

বিক্রম। সন্ধান তুমি জান, গোপন করছ।

চন্দ্রসেন। পাপে তো প্রবৃত্ত হয়েছি, তার উপরে মূঢ়তা যোগ করব, এতবড়ো অর্বাচীন আমি নই। গোপন করে তোমার কাছে নিজের বিপদ কেন ঘটাব।

বিক্রম। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি নে।

চন্দ্রসেন। সমস্ত কাশ্মীরের লোক আমাকে অভিসম্পাত করছে, অবশেষে তোমারও মুখে এমন কথা শুনব এ আমি আশা করি নি।

বিক্রম। তুমি অল্প আগেই এখানে কুমারের কাছে এসেছিলে এ কথা সত্য কি না।

চন্দ্রসেন। তাঁকে তোমার কাছে আত্মসমর্পণের পরামর্শ দিতে এসেছিলুম।

বিক্রম। সেই ছলেই তাকে জানিয়েছ আমি এসেছি। আমার পক্ষ অবলম্বনের ভান করে তাকে সতর্ক করে দিয়েছ।

চন্দ্রসেন। ভুল করে আমাকে অবিশ্বাস কোরো না, মহারাজ।

বিক্রম। সেও ভালো, কিন্তু বিশ্বাস করে ভুল করবার সময় নেই। সেনাপতিকে আদেশ করে দিচ্ছি, তুমি দৃষ্টিবন্দী হয়ে থাকবে, শেষ পর্যন্ত কুমারকে সুমিত্রাকে যদি না পাই তবে পশুর মতো পিঞ্জরে পুরে তোমাকে জালন্ধরে নিয়ে যাব, প্রাণদণ্ড দেওয়াও তোমার পক্ষে সম্মান।

দ্বিতীয় চরের প্রবেশ

চর। মহিষীর সংবাদ পাওয়া গেছে।

বিক্রম। বলো বলো, কোথায় তিনি।

চর। তিনি গেছেন মার্তণ্ডদেবের মন্দিরে, ধ্রুবতীর্থে।

বিক্রম। চলো, এখনই চলো সেখানে। এই মুহূর্তে।

চন্দ্রসেন। মহারাজ, কাশ্মীরের দেবতার বিরুদ্ধে স্পর্ধা প্রকাশ কোরো না। দেবালয়ে গিয়ে মার্তণ্ডদেবের উপাসিকাকে হরণ করা সইবে না।

বিক্রম। তোমাদের মার্তণ্ডদেবই তো আমার মহিষীকে হরণ করেছেন। দেবতার চৌর্য আমি স্বীকার করব না।

চন্দ্রসেন। এ কী বলছ। ভয় নেই তোমার?

বিক্রম। না, ভয় নেই।

চন্দ্রসেন। তা হলে আমার প্রাণদণ্ড করো। এ পাপের দায়িত্ব আমি বহন করতে পারব না।

বিক্রম। প্রাণদণ্ড সব শেষে। যতক্ষণ তোমার কাছ থেকে কাজ উদ্ধারের আশা আছে, ততক্ষণ নয়। সেনাপতি—

সেনাপতির প্রবেশ

সেনাপতি। কী মহারাজ।

বিক্রম। চলো মার্তণ্ডদেবের মন্দিরের পথে।

সেনাপতি। ওই মন্দিরের দুর্গম পথে সৈন্য নিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

বিক্রম। অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে। মন্দিরের দুর্গমতা লৌকিক হোক অলৌকিক হোক, ভৌতিক হোক দৈবিক হোক, কিছুতে মানব না। সুমিত্রার পক্ষে কাশ্মীরের আশ্রয় চূর্ণ চূর্ণ করব এই শপথ আমি নিয়েছি।

চন্দ্রসেন। দেবমন্দির ইহলোকের সীমায় নয় মহারাজ, সে তো পার্থিব কাশ্মীরের বাহিরে।

বিক্রম। সে কথা দেবতা সম্বন্ধে খাটে, কিন্তু সুমিত্রা সম্বন্ধে নয়; তিনি ইহলোকের সীমায় যতক্ষণ আছেন ততক্ষণ তিনি আমার, ততক্ষণ তিনি দেবতার নন। ততক্ষণ আমার কাছে তাঁর নিষ্কৃতি নেই, তাঁর কাছে আমারও নেই নিষ্কৃতি।

চন্দ্রসেন। মহারাজ, আমি তোমার বয়োজ্যেষ্ঠ, আমি তোমার পায়ের কাছে মাথা রাখছি, লও আমার মুণ্ডচ্ছেদন করে, কাশ্মীরের দেবতার অপমান কোরো না।

বিক্রম। তোমার মুণ্ডের কী মূল্য আছে যে, তার পরিবর্তে আমার অপমান লাঘব হবে। আমাকে ছলনা করে তুমি পরিত্রাণ পাবে না। সেনাপতি, উদয়পুর অবরোধ করো। এইখানেই কুমার নিশ্চয় লুকিয়ে আছেন চন্দ্রসেন সে কথা গোপন করছেন। তার পরে চলব তীর্থের পথে। কন্দর্পদেবের পরিচয় পূর্বেই পেয়েছি, এবার নেব মার্তণ্ডদেবের পরিচয়। যে উৎসব জালন্ধরের দেবমন্দিরে আরম্ভ করেছিলুম, কাশ্মীরের দেবমন্দিরে সেই উৎসবের সমাপ্তি হবে।

৪

ধ্রুবতীর্থ। মার্তণ্ডমন্দির

বিপাশা, পুরোহিত, মন্দিরের সেবকগণ

সূর্যোদয়কালে বেদমন্ত্রে স্তব

উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ
দৃশে বিশ্বায় সূর্যম্॥
অপ ত্যে তায়বো যথা নক্ষত্রা যন্ত্যক্তুভিঃ
সূরায় বিশ্বচক্ষসে॥

পদ্মের অর্ঘ্য হাতে সুমিত্রার প্রবেশ

বিপাশা। গান

জাগো জাগো
আলসশয়নবিলগ্ন।
জাগো জাগো
তামসগহননিমগ্ন।
ধৌত করুক করুণারুণ বৃষ্টি
সুপ্তিজড়িত যত আবিল দৃষ্টি ;
জাগো জাগো
দুঃখভারনত উদ্যমভগ্ন।
জ্যোতিঃসম্পদ ভরি দিক চিত্ত
ধনপ্রলোভননাশন বিত্ত,
জাগো জাগো
পুণ্যবসন পরো লজ্জিত নগ্ন॥

পুরোহিত ভার্গবের প্রবেশ

ভার্গব। মা।

সুমিত্রা। কী বৎস ভার্গব।

ভার্গব। কিছুদিন থেকে এই দুর্গম তীর্থের পথে নানাবিধ লোকের যাতায়াত লক্ষ্য করছি। তারা পুণ্যকামী নয়।

সুমিত্রা। তাতে দোষ নেই, ভয়ও নেই।

ভার্গব। বোধ হয় যেন তারা বিদেশী।

সুমিত্রা। ভগবান সূর্যের উদয়দিগন্ত দেশে দেশে। তাঁর দেশে বিদেশী কে আছে।

ভার্গব। অপরাধ নিয়ো না দেবি, আমরা কিন্তু কিছুদিন থেকে এখানে বিদেশীদের পথরোধ করেছি।

সুমিত্রা। তা হলে আমারও এখানে পথ রুদ্ধ হল।

ভার্গব। ক্ষমা করো, দেবি। তোমাকে বিপদ হতে রক্ষা করব আমরা, এমন চিন্তা করা আমাদের স্পর্ধা, এ আমাদের মোহ। দুর্বল বুদ্ধির অপরাধ নিয়ো না, যাত্রীদের কোনো বাধা ঘটবে না।

শিখরিণীর প্রবেশ

শিখরিণী। মা তপতী।

সুমিত্রা। কী শিখরিণী, তুমি যে এখানে ?

শিখরিণী। আমার স্বামীকে ওরা মেরে ফেলেছে।

সুমিত্রা। সে কী কথা। তিনি যে সাধুপুরুষ ছিলেন, তাঁকে মারলে কেন।

শিখরিণী। যুবরাজ কোথায়, সেই সংবাদ তাঁর কাছ থেকে ওরা বের করতে চেষ্টা করেছিল। দেশে সবাই তাঁকে সত্যবাদী বলে জানত বলেই তাঁর এই বিপদ ঘটল। দেবি, আমি কিছুতেই সান্ত্বনা পাচ্ছি নে, আমাকে বুঝিয়ে বলো, সংসারে যাঁরা ধর্মকে প্রাণপণে মানেন, ধর্ম কেন তাঁদেরই এত দুঃখ দিয়ে মারেন।

সুমিত্রা। যাঁরা মরতে পেরেছেন তাঁরাই এ কথার তত্ত্ব জানেন। মৃত্যু দিয়ে যাঁরা সত্যকে পান তাঁদের জন্য শোক কোরো না।

শিখরিণী। শোক করব না মা, তিনি আমার মৃত্যুর ভয় ঘুচিয়ে দিয়ে গেছেন, আমাকে এই তাঁর শেষ দান। গ্রামের লোকেরা আমাকে বলেছে অভাগিনী ; কী বুঝবে তারা ! তিনি আমার স্বামী ছিলেন এই আমার পরম সৌভাগ্য।

সুমিত্রা। যারা তাঁকে মেরেছে, মৃত্যুর দ্বারা তাদের তিনি জয় করেছেন, সে কথা তারা কোনোদিন বুঝবে না এইটেই সকলের চেয়ে শোকের কথা। কিন্তু বৎসে, তুমি এখানে এসেছ কেন।

শিখরিণী। এখানে তোমার চরণতলে যদি আশ্রয় নিতে পারতুম তা হলে বেঁচে যেতুম। কিন্তু মা, সংসারের আলো নিবলে তবুও সংসার থাকে। আমার মেয়েটি আছে— অমন পিতার কোল হারিয়েছে, তার কল্যাণের জন্যেই সেই অন্ধকারায় আমাকে থাকতে হবে। তারই জন্যে তোমার কাছে এসেছি।

সুমিত্রা। বলো, আমাকে কী করতে হবে।

শিখরিণী। এই অলংকারগুলি এনেছি দেবমন্দিরে রক্ষা করবার জন্যে। আমার মায়ের কাছ থেকে আমি পেয়েছি, আমার কন্যার জন্যে রাখব। যে পরিবারের 'পরে চন্দ্রসেনের বিদ্বেষ, জালন্ধরের সৈন্য দিয়ে তাদের সর্বস্ব লুঠ করাচ্ছেন। এই লও মা, তোমার স্পর্শ লাভ করুক— আমার মেয়ের দেহ পবিত্র হবে।

কুঞ্জলালের প্রবেশ

কুঞ্জলাল। আজ বাহিরের কোথাও আমাদের দুঃখের পরিত্রাণ নেই দেবি, কিন্তু মনে হয় যেন অন্তরে অন্তরে তুমি সেই দুঃখকে নাশ করতে পার, তাই এসেছি।

সুমিত্রা। বলো বৎস, তোমার কী বলবার আছে।

কুণ্ডলাল। যে নগরীতে তোমার মাতামহীর জন্মভূমি সেই উদয়পুর এতদিন চন্দ্রসেনকে অস্বীকার করে স্বতন্ত্র ছিল। তিনি যখনই সৈন্য নিয়ে উৎপাত করতে এসেছেন প্রজারা সমস্ত পুরী উজাড় করে চলে গেছে। এবার সেইখানেই যুবরাজের রাজধানী স্থাপন করে তাঁর অভিষেকের আয়োজন হয়েছিল, বাধা পড়ল। রাজা বিক্রমের সৈন্য উদয়পুর বেষ্টন করেছে। প্রজাদের বেরিয়ে যাবার পথ রুদ্ধ।

ভার্গব। কুণ্ডলাল, এ কী বুদ্ধি তোর। কত বড়ো দুঃখ ওঁকে দিলি দেখ্‌ তো। কেন এ-সব সংবাদ এই শান্তিতীর্থে।

কুণ্ডলাল। মা, কেন এমন স্তব্ধ হয়ে আকাশে তাকিয়ে রইলে। চিন্তার কথা কিছুই নেই, মৃত্যুর পথ খোলা আছে, কোনো অপমান সেখানে পৌঁছয় না। দাও স্বহস্তে আজকে পূজার নির্মাল্য, নিয়ে যাই তাদের কাছে, আর দাও তোমার হাতের লিখন একখানি, একটি আশীর্বাদ— তাদের সব দুঃখ শুভ্র হয়ে যাবে।

[সকলের প্রস্থান

নরেশের প্রবেশ

নরেশ। বিপাশা, আমার কী মনে হচ্ছে বলব?

বিপাশা। বলো তো।

নরেশ। এইখানে এসে আমাদের প্রেম পরিপূর্ণ হয়েছে। আশ্চর্যের কথা শুনবে?

বিপাশা। কী, বলো।

নরেশ। আজ মন তোমার গান শোনবারও অপেক্ষা করে না— সকল ধ্বনি এখানে আলোক হয়ে উঠেছে, প্রত্যক্ষ আমার অন্তরে প্রবেশ করে। তুমি কি তাই অনুভব কর না।

বিপাশা। প্রিয়তম, তোমার আনন্দে আজ আমি আনন্দিত, তার চেয়ে বেশি কিছু বলতে পারি নে।

নরেশ। আজ আলোকের মধ্যে তোমাকে দেখলুম আলোকরূপে, আর সেই সঙ্গে আমাকেও। আর কোনো ক্ষোভ নেই আমার।

সুমিত্রার প্রবেশ

সুমিত্রা। কুমার এসেছেন, শীঘ্র তাঁকে ডেকে আনো, বিপাশা।

[নরেশ ও বিপাশার প্রস্থান

কুমারসেনের প্রবেশ

কুমারসেন। রাজত্বের পথ অতিক্রম করে এই তীর্থেই শেষে আসতে হল, বোন।

সুমিত্রা। অন্যত্র তোমাকে অনেক প্রয়োজন আছে। শেষ যদি না হয়ে থাকে, এখানে এলে কেন।

কুমারসেন। তোমাকে রক্ষা করবার জন্যে।

সুমিত্রা। কার হাত থেকে।

কুমারসেন। বিক্রম মহারাজ জালামুখী দেবীর শপথ নিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে করে হোক এখান থেকে তোমাকে সরাবেন। তীর্থের পথে সৈন্যবাহিনী আসা অসম্ভব তাই একে একে ক্রমে ক্রমে তাঁর লোক নিয়ে চারি দিক পূর্ণ করে তুলছেন।

সুমিত্রা। আমাকে তিনি চান?

. কুমারসেন। হাঁ।

সুমিত্রা। আর কী চান।

কুমারসেন। আর তিনি চান আমাকে।

সুমিত্রা। কেন, তোমার সঙ্গে তাঁর কিসের বিরোধ।

কুমারসেন। আমার সঙ্গে বিরোধের স্পষ্ট কারণ যদি থাকত তা হলে সে কারণ দূর করলেই বিপদ কাটত। কারণ তাঁর অন্ধপ্রকৃতির মধ্যে, সেইজন্যে এত দুর্নিবার, এত ভয়ংকর।

সুমিত্রা। আমি যদি যাই তিনি কি তোমাকে মুক্তি দেবেন।

কুমারসেন। কিন্তু তুমি কী করে যাবে তাঁর কাছে? তুমি যে দেবতার। রাজ্যের কথা আর আমি ভাবি নে কিন্তু কাশ্মীরের দেবতার অপমান ঘটতে দিতে পারব না।

সুমিত্রা। কী করবে তুমি।

কুমারসেন। কিছু না পারি তো মরব। পাপকে ঠেকাবার জন্যে কিছু না করাই তো পাপ।

নেপথ্যে। মহারানী!

সুমিত্রা। একী, এ যে দেবদত্ত ঠাকুর!

দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত। কয়েকদিন থেকে দর্শনের চেষ্টা করেছিলুম, আমার চেহারা দেখে তোমার অনুচরদের মনে সংশয় ঘোচে না। অশোকবনে হনুমানকে দেখে রাক্ষসরা যে-রকম সন্দিগ্ধ হয়েছিল এদের সেই দশা। আজ এইমাত্র হঠাৎ কেন এরা প্রসন্ন হল

জানি নে। ছাড়া পেয়েই দেখা করতে এসেছি। একটা নিবেদন আছে— শুনতেই হবে আমার কথা।

সুমিত্রা। বলো।

দেবদত্ত। আর সহ্য হয় না মহারানী। গ্রাম থেকে গ্রামে, নগর থেকে নগরে অগ্নিকাণ্ড দুর্ভিক্ষ রক্তপাত নারীনির্যাতন। পাপের নেশা জালন্ধরের সমস্ত সৈন্যকেই পেয়েছে— থামতে পারছে না, মাত্রা কেবলই বেড়ে চলেছে। আমি মহারাজকে গিয়ে অভিশাপ দিয়েছিলেম, বলেছিলেম, অহরহ যমরাজের কাছে প্রার্থনা করছি তিনি তোমাকে সরিয়ে নিয়ে যান। রাজা আমাকে কারারুদ্ধ করেছিলেন, প্রহরী দয়া করে ছেড়ে দিলে। আজ মহারাজকে কেউ নিষেধ করতে পারবে না একমাত্র তুমি ছাড়া।

কুমারসেন। ঠাকুর, এমন কথা কী করে বলছ, সুমিত্রা যাবেন তাঁর কাছে? এ মন্দির থেকে ওঁর তো ফেরবার পথ নেই। এতে স্বর্গে মর্ত্যে ধিক্‌কার উঠবে যে।

দেবদত্ত। আমি জানি বড়োই কঠিন ব্যাপার, এও জানি রাজা এখন প্রকৃতিস্থ নন। তবু বলছি দেবী সুমিত্রা, আজ তুমি সকল মান-অপমান সুখ-দুঃখের অতীত— তুমি পবিত্র, পাপ তোমার কাছে কুণ্ঠিত হবে, তুমি এই বীভৎসের মধ্যে নির্বিকার চিত্তে নামতে পার।

কুমারসেন। সুমিত্রার কী ঘটতে পারে না-পারে সে কথা ভাববার সময় আজ নেই— কিন্তু সুমিত্রা কাশ্মীরের দেবতাকে অপমান করে এখান থেকে চলে যাবে সে আমি ঘটতে দেব না। দেবতার ধন হরণ করে তাকে মানুষের ভোগের ভাণ্ডারে নিয়ে যাবে আমাদের বংশের কন্যা!

সুমিত্রা। ভাই কুমার, তাঁকে এইখানে আহ্বান করে আনব।

কুমারসেন। এইখানে? এই দেবালয়ে?

সুমিত্রা। আসুন এখানেই, নইলে তাঁর মুক্তি কিছুতেই হবে না। আমার এই শেষ কাজ, তাঁকে বাঁচাতে হবে— তাঁর মোহগ্রন্থি ছিন্ন করে দিয়ে চলে যাব।

দেবদত্ত। এ কিন্তু বড়ো সংকটের কথা, মহারানী। অনেক পাপ সে করেছে, অবশেষে দুর্বৃত্ত যদি দেবালয়ে এসে দেবতার অসম্মান করে, পুণ্যতীর্থে যদি কলুষ আনে?

সুমিত্রা। ভয় নেই, ঠাকুর, কোনো ভয় নেই। আমার প্রভু, আমার হিরণ্যদ্যুতি সকল পাপ দগ্ধ করবেন, নিঃশেষে ভস্ম করবেন। সেই রুদ্র আমাকে গ্রহণ করেছেন, তাঁর কাছ থেকে আমাকে ছিন্ন করে নিতে পারে এমন শক্তি কারো নেই। কুমার, তোমার সঙ্গে শংকর আছে?

কুমারসেন। ওই যে সে প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে।

সুমিত্রা। শংকর!

শংকর। কী দিদি। কী দেবি। এই যে আমি এসেছি। যেদিন ওরা তোমাকে কেড়ে নিয়ে গেল সেদিন মরার বেশি দুঃখ পেয়েছি; শেষকালে কাশ্মীরের কন্যাকে কাশ্মীরের দেবতা স্বয়ং উদ্ধার করে আনলেন এই দেখে আমার জন্ম সার্থক হল।

সুমিত্রা। তুমি আমার দূত হয়ে যাও মহারাজ বিক্রমের কাছে।

শংকর। এখনই যাব। বলো কী জানাতে হবে।

নরেশ। দেবী, শংকরকে নয়, আমাকে পাঠিয়ে দাও, রাজা যদি অপমান করে বৃদ্ধ সইতে পারবে না।

সুমিত্রা। না রাজকুমার, এই আমার শেষ আমন্ত্রণ— আমার চিরবন্ধু ছাড়া কার হাত দিয়ে পাঠাব। শংকর, শিশুকালে তোমার কোলে একদিন আমাকে গ্রহণ করেছ। মৃত্যুর সময় পিতা তাঁর শেষ অভিবাদন দিয়েছিলেন তোমাকেই। আজ সেই তোমার সুমিত্রার বাণী নিয়ে তোমাকেই যেতে হবে, হয়তো অপমানের মুখে। শান্ত হয়ে সহিষ্ণু হয়ে বোলো মহারাজকে, তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধের চরম পরিণামের জন্যে মন্দিরে দেবতার চরণপ্রান্তে সুমিত্রা অপেক্ষা করবে। আর তোমার পরম স্নেহের ধন কুমার, ওই কুমারের জন্য ভেবো না; তিনি মৃত্যুকে ভয় করেন না। সেই বন্ধু, সেই বিশ্ববিচারক ধর্মরাজ রইলেন তাঁর সহায়।

শংকর। দিদি, বৃদ্ধের একটি কথা শোনো, জানি কুমারের সৈন্যসামন্ত নেই, জানি চন্দ্রসেন ওঁর বিরুদ্ধে, তবু যে-কয়জন আমরা আছি ওঁর সহচর, তাদের নিয়ে ওঁকে যুদ্ধক্ষেত্রেই যেতে হবে। সেখানে তাঁর জন্মভূমি তাঁকে পুণ্যক্রোড়ে গ্রহণ করবেন।

দেবদত্ত। দেশের দুঃখ তাতে আরো আলোড়িত হয়ে উঠবে, শংকর। উন্মত্তের মত্ততাগ্নিতে আর ইন্ধন দিয়ো না।

কুমারসেন। শংকর, যাও তুমি, মহারাজকে ডেকে নিয়ে এসোগে। অতিথি তিনি, অতিথির মতো তাঁকে সংকৃত করব।

শংকর। হে রুদ্র, হে হিরণ্যপাণি, আজ তোমার জ্যোতিতে আবরণ কেন। তোমার সেবকদের লজ্জা নিবারণ করো। দীপ্যমান তেজে এসো বাহির হয়ে— তোমার অগ্নিকেতু উদ্‌ঘাটিত করে দাও। নমস্কার তোমাকে, নমস্কার তোমাকে, বারবার তোমাকে নমস্কার।

ভার্গবের প্রবেশ

ভার্গব। মহারাজ বিক্রম অনতিদূরে, এই শুনি জনশ্রুতি। আদেশ করো, সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করে দিই।

সুমিত্রা। খুলে দাও, খুলে দাও, সমস্ত দ্বার খুলে দাও, আসবার দ্বার এবং যাবার দ্বার। যাও যাও ভার্গব, তাঁকে আমন্ত্রণ করে আনো।

ভার্গব। তাঁর প্রতিজ্ঞা, দেবতার কাছ থেকে তিনি তোমাকে কেড়ে নিয়ে যাবেন। আমি এ মন্দিরের পুরোহিত, আমার কর্তব্য করতে হবে তো।

সুমিত্রা। তোমার কর্তব্যই করো। দেবতার পথ রোধ কোরো না— যে পথ দিয়ে রাজার সৈন্য আসবে সেই পথ দিয়েই আমার দেবতা আমাকে উদ্ধার করতে আসবেন। যাও তুমি এখনই, মন্দিরের সিংহদ্বার খুলে দাও। [ভার্গবের প্রস্থান

দেবদত্ত। তা হলে শংকর তুমি থাকো, মহারানীর দূত হয়ে আমিই তাঁকে আহ্বান করে আনি। [প্রস্থান

শংকর। দিদি, রাজগৃহ থেকে সেবার তোমাকে ওরা কেড়ে নিয়ে গেল, এবার কি দেবালয় থেকে তোমাকে কেড়ে নিতে দেবে। এও কি আমরা চুপ করে সহ্য করব।

সুমিত্রা। ভয় নেই শংকর। আজ আমাকে নেবার সাধ্য কার আছে।

শংকর। তবে বলো, তোমার কী সংকল্প।

সুমিত্রা। রুদ্রের কাছে বহুদিন পূর্বে আত্মনিবেদন করেছিলুম। ব্যাঘাত ঘটেছিল, সংসার আমাকে অশুচি করেছে। তপস্যা করেছি, আমার দেহমন শুদ্ধ হয়েছে। আজ আমার সেই অনেকদিনের সংকল্প সম্পূর্ণ হবে। তাঁর পরমতেজে আমার তেজ মিলিয়ে দেব।

শংকর। আমার মোহ দূর হোক সুমিত্রা, মোহ দূর হোক। তোমাকে যেন নিবৃত্ত না করি। [শংকরের প্রস্থান

সুমিত্রা। বিপাশা!

বিপাশার প্রবেশ

বিপাশা। বলো দেবি।

সুমিত্রা। আমার অগ্নিশয্যা অনেকদিন থেকেই প্রস্তুত হচ্ছে, তুমি দেখেছ বহু-দুঃখের সেই আয়োজন। আজ সময় হয়েছে, আনন্দ করো, জ্বলুক শিখা, বিলম্ব কোরো না।

বিপাশা। যে আদেশ দেবি। [পায়ের কাছে মাথা রেখে পড়ে রইল

সুমিত্রা। ওঠ্‌ বিপাশা, এবার আমার শেষ পূজা করি। অর্ঘ্য প্রস্তুত আছে?

বিপাশা। আছে, দেবী।

পদ্মের অর্ঘ্য হাতে সুমিত্রা

বিপাশা। গান

শুভ্র নবশঙ্খ তব গগন ভরি বাজে,
ধ্বনিল শুভ জাগরণ-গীত।
অরুণরুচি আসনে চরণ তব রাজে,
মম হৃদয়কমল বিকশিত।
গ্রহণ করো তারে
তিমির পরপারে,
বিমলতর পুণ্যকরপরশ-হরষিত॥

সুমিত্রা। অস্থা দেবা উদিতা সূর্যস্ত
নিরংহসঃ পিপৃতা নিরবদ্যাৎ।
পৃথিবী শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তির্দ্যৌঃ শান্তিঃ।
শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

শেষ দৃশ্য

নেপথ্য থেকে চিতাগ্নির আভাস আসছে
সকলের বেদমন্ত্রসহ বেদী প্রদক্ষিণ

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্॥
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর।
ক্রতো স্মর কৃতং স্মর॥
অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম॥

নেপথ্যে বাদ্যোদ্যম। বিক্রম, দেবদত্ত, শংকরের প্রবেশ

পরিশিষ্ট

মন্ত্রের অনুবাদ

১। কর্পূর ইব দগ্ধোঽপি শক্তিমান্ যো জনে জনে।
নমোঽস্ত্ববার্যবীর্যায় তস্মৈ মকরকেতবে॥

—সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার

কর্পূরের মতো, দগ্ধ হইলেও যাঁহার শক্তি প্রত্যেক ব্যক্তিতে অনুভূত, যাঁহার প্রভাবকে কেহ নিবারণ করিতে পারে না, সেই মকরকেতুকে নমস্কার॥

২। উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ
দৃশে বিশ্বায় সূর্যম্॥

—ঋগ্‌বেদ ১. ৫০. ১

অপ ত্যে তায়বো যথা নক্ষত্রা যন্ত্যক্তুভিঃ
সূরায় বিশ্বচক্ষসে॥

—ঋগ্‌বেদ ১. ৫০. ২

বিশ্ব দেখিতে পাইবে এই উদ্দেশ্যে রশ্মিসমূহ সমস্ত ভূতের জ্ঞাতা উজ্জ্বল সূর্যকে ঊর্ধ্বে বহন করিতেছে॥

বিশ্বদ্রষ্টা সূর্যকে আসিতে দেখিয়া সেই নক্ষত্রগুলি রাত্রির সহিত চোরের মতো পলায়ন করিতেছে॥

৩। বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্॥
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর।
ক্রতো স্মর কৃতং স্মর॥
অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম॥

—ঈশোপনিষৎ ১৮

মহাবায়ুতে আমার প্রাণবায়ু এবং এই শরীর ভস্মে মিলিত হোক ॥

ওঁ, আপন কর্তব্য স্মরণ করো, আপন কৃতকার্য স্মরণ করো ॥

হে অগ্নি, আমাদিগকে সুপথে লইয়া যাও। হে দেব, তুমি আমাদের সকল কার্য জান, তুমি আমাদের সমস্ত কুটিল পাপকে বিনাশ করো। তোমাকে আমরা বারংবার নমস্কার করি ॥

৪। অদ্যা দেবা উদিতা সূর্যস্য
নিরংহসঃ পিপৃতা নিরবদ্যাৎ ॥

—ঋগ্‌বেদ ১. ১১৫. ৬

অদ্য সূর্যের উদিত উজ্জ্বল কিরণসমূহ পাপ হইতে, নিন্দনীয় কর্ম হইতে, আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া পালন করুন ॥

৫। পৃথিবী শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তির্দ্যৌঃ শান্তিঃ।
শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

—অথর্ববেদ ১৯. ৯. ১৪

পৃথিবীলোক শান্তি আনয়ন করুক। অন্তরীক্ষলোক শান্তি আনয়ন করুক। দ্যুলোক শান্তি আনয়ন করুক ॥

উপন্যাস ও গল্প

গল্পগুচ্ছ

২১।১৪

গল্পগুচ্ছ

দুরাশা

দার্জিলিঙে গিয়া দেখিলাম, মেঘে বৃষ্টিতে দশ দিক আচ্ছন্ন। ঘরের বাহির হইতে ইচ্ছা হয় না, ঘরের মধ্যে থাকিতে আরো অনিচ্ছা জন্মে।

হোটেলে প্রাতঃকালের আহার সমাধা করিয়া পায়ে মোটা বুট এবং আপাদমস্তক ম্যাকিণ্টশ পরিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছি। ক্ষণে ক্ষণে টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে এবং সর্বত্র ঘন মেঘের কুজ্ঝটিকায় মনে হইতেছে, যেন বিধাতা হিমালয়-পর্বতসুদ্ধ সমস্ত বিশ্বচিত্র রবার দিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া মুছিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছেন।

জনশূন্য ক্যাল্‌কাটা রোডে একাকী পদচারণ করিতে করিতে ভাবিতেছিলাম— অবলম্বনহীন মেঘরাজ্যে আর তো ভালো লাগে না, শব্দস্পর্শরূপময়ী বিচিত্রা ধরণী-মাতাকে পুনরায় পাঁচ ইন্দ্রিয় দ্বারা পাঁচ রকমে আঁকড়িয়া ধরিবার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে।

এমন সময়ে অনতিদূরে রমণীকণ্ঠের সকরুণ রোদনগুঞ্জনধ্বনি শুনিতে পাইলাম। রোগশোকসংকুল সংসারে রোদনধ্বনিটা কিছুই বিচিত্র নহে, অন্যত্র অন্যসময় হইলে ফিরিয়া চাহিতাম কি না সন্দেহ, কিন্তু এই অসীম মেঘরাজ্যের মধ্যে সে-রোদন সমস্ত লুপ্ত জগতের একমাত্র রোদনের মতো আমার কানে আসিয়া প্রবেশ করিল, তাহাকে তুচ্ছ বলিয়া মনে হইল না।

শব্দ লক্ষ্য করিয়া নিকটে গিয়া দেখিলাম, গৈরিকবসনাবৃতা নারী, তাহার মস্তকে স্বর্ণকপিশ জটাভার চূড়া-আকারে আবদ্ধ, পথপ্রান্তে শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া মৃদুস্বরে ক্রন্দন করিতেছে। তাহা সদ্যশোকের বিলাপ নহে, বহুদিনসঞ্চিত নিঃশব্দ শ্রান্তি ও অবসাদ আজ মেঘান্ধকার নির্জনতার ভারে ভাঙিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছে।

মনে মনে ভাবিলাম, এ বেশ হইল, ঠিক যেন ঘর-গড়া গল্পের মতো আরম্ভ হইল ; পর্বতশৃঙ্গে সন্ন্যাসিনী বসিয়া কাঁদিতেছে ইহা যে কখনো চর্মচক্ষে দেখিব এমন আশা কস্মিনকালে ছিল না।

মেয়েটি কোন্ জাত ঠাহর হইল না। সদয় হিন্দি ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে তুমি, তোমার কী হইয়াছে।"

প্রথমে উত্তর দিল না, মেঘের মধ্য হইতে সজলদীপ্তনেত্রে আমাকে একবার দেখিয়া লইল।

আমি আবার কহিলাম, "আমাকে ভয় করিয়ো না। আমি ভদ্রলোক।"

শুনিয়া সে হাসিয়া খাস হিন্দুস্থানিতে বলিয়া উঠিল, "বহুদিন হইতে ভয়ডরের মাথা খাইয়া বসিয়া আছি, লজ্জাশরমও নাই। বাবুজি, একসময় আমি যে-জেনানায় ছিলাম সেখানে আমার সহোদর ভাইকে প্রবেশ করিতে হইলেও অনুমতি লইতে হইত, আজ বিশ্বসংসারে আমার পর্দা নাই।"

প্রথমটা একটু রাগ হইল; আমার চালচলন সমস্তই সাহেবী, কিন্তু এই হত-ভাগিনী বিনা দ্বিধায় আমাকে বাবুজি সম্বোধন করে কেন। ভাবিলাম, এইখানেই আমার উপন্যাস শেষ করিয়া সিগারেটের ধোঁয়া উড়াইয়া উদ্যতনাসা সাহেবিয়ানার রেলগাড়ির মতো সশব্দে সবেগে সদর্পে প্রস্থান করি। অবশেষে কৌতূহল জয়লাভ করিল। আমি কিছু উচ্চভাব ধারণ করিয়া বক্রগ্রীবায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমাকে কিছু সাহায্য করিতে পারি? তোমার কোনো প্রার্থনা আছে?"

সে স্থিরভাবে আমার মুখের দিকে চাহিল এবং ক্ষণকাল পরে সংক্ষেপে উত্তর করিল, "আমি বদ্রাওনের নবাব গোলামকাদের খাঁর পুত্রী।"

বদ্রাওন কোন্ মুল্লুকে এবং নবাব গোলামকাদের খাঁ কোন্ নবাব এবং তাঁহার কন্যা যে কী দুঃখে সন্ন্যাসিনীবেশে দার্জিলিঙে ক্যালকাটা রোডের ধারে বসিয়া কাঁদিতে পারে আমি তাহার বিন্দুবিসর্গ জানি না এবং বিশ্বাসও করি না, কিন্তু ভাবিলাম, রসভঙ্গ করিব না, গল্পটি দিব্য জমিয়া আসিতেছে।

তৎক্ষণাৎ সুগম্ভীর মুখে সুদীর্ঘ সেলাম করিয়া কহিলাম, "বিবিসাহেব, মাপ করো, তোমাকে চিনিতে পারি নাই।"

চিনিতে না পারিবার অনেকগুলি যুক্তিসংগত কারণ ছিল, তাহার মধ্যে সর্বপ্রধান কারণ, তাঁহাকে পূর্বে কস্মিনকালে দেখি নাই, তাহার উপর এমনি কুয়াশা যে নিজের হাত পা কয়খানিই চিনিয়া লওয়া দুঃসাধ্য।

বিবিসাহেবও আমার অপরাধ লইলেন না এবং সন্তুষ্টকণ্ঠে দক্ষিণহস্তের ইঙ্গিতে স্বতন্ত্র শিলাখণ্ড নির্দেশ করিয়া আমাকে অনুমতি করিলেন, "বৈঠিয়ে।"

দেখিলাম, রমণীটির আদেশ করিবার ক্ষমতা আছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে সেই সিক্ত শৈবালাচ্ছন্ন কঠিনবন্ধুর শিলাখণ্ডতলে আসনগ্রহণের সম্মতি প্রাপ্ত হইয়া

এক অভাবনীয় সম্মান লাভ করিলাম। বদ্রাওনের গোলামকাদের খাঁর পুত্রী নুরউন্নীসা বা মেহেরউন্নীসা বা নুর-উল্‌মুল্‌ক্‌ আমাকে দার্জিলিঙে ক্যালকাটা রোডের ধারে তাঁহার অনতিদূরবর্তী অনতি-উচ্চ পঙ্কিল আসনে বসিবার অধিকার দিয়াছেন। হোটেল হইতে ম্যাকিণ্টশ পরিয়া বাহির হইবার সময় এমন সুমহৎ সম্ভাবনা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

হিমালয়বক্ষে শিলাতলে একান্তে দুইটি পান্থ নরনারীর রহস্যালাপকাহিনী সহসা সদ্যসম্পূর্ণ কবোষ্ণ কাব্যকথার মতো শুনিতে হয়, পাঠকের হৃদয়ের মধ্যে দূরাগত নির্জন গিরিকন্দরের নির্ঝরপ্রপাতধ্বনি এবং কালিদাসরচিত মেঘদূত-কুমারসম্ভবের বিচিত্র সংগীতমর্মর জাগ্রত হইয়া উঠিতে থাকে, তথাপি এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, বুট এবং ম্যাকিণ্টশ পরিয়া ক্যালকাটা রোডের ধারে কর্দমাসনে এক দীনবেশিনী হিন্দুস্থানী রমণীর সহিত একত্র উপবেশনপূর্বক সম্পূর্ণ আত্মগৌরব অক্ষুণ্ণভাবে অনুভব করিতে পারে, এমন নব্যবঙ্গ অতি অল্পই আছে। কিন্তু সেদিন ঘনঘোর বাষ্পে দশ দিক আবৃত ছিল, সংসারের নিকট চক্ষুলজ্জা রাখিবার কোনো বিষয় কোথাও ছিল না, কেবল অনন্ত মেঘরাজ্যের মধ্যে বদ্রাওনের নবাব গোলামকাদের খাঁর পুত্রী এবং আমি, এক নববিকশিত বাঙালী সাহেব— দুইজনে দুইখানি প্রস্তরের উপর বিশ্বজগতের দুইখণ্ড প্রলয়াবশেষের ন্যায় অবশিষ্ট ছিলাম, এই বিসদৃশ সম্মিলনের পরম পরিহাস কেবল আমাদের অদৃষ্টের গোচর ছিল, কাহারো দৃষ্টিগোচর ছিল না।

আমি কহিলাম, "বিবিসাহেব, তোমার এ হাল কে করিল।"

বদ্রাওনকুমারী কপালে করাঘাত করিলেন। কহিলেন, "কে সমস্ত করায় তা আমি কি জানি! এতবড়ো প্রস্তরময় কঠিন হিমালয়কে কে সামান্য বাষ্পের মেঘে অন্তরাল করিয়াছে।"

আমি কোনোরূপ দার্শনিক তর্ক না তুলিয়া সমস্ত স্বীকার করিয়া লইলাম; কহিলাম, "তা বটে, অদৃষ্টের রহস্য কে জানে! আমরা তো কীটমাত্র।"

তর্ক তুলিতাম, বিবিসাহেবকে আমি এত সহজে নিষ্কৃতি দিতাম না কিন্তু আমার ভাষায় কুলাইত না। দরোয়ান এবং বেহারাদের সংসর্গে যেটুকু হিন্দি অভ্যস্ত হইয়াছে তাহাতে ক্যালকাটা রোডের ধারে বসিয়া বদ্রাওনের অথবা অন্য কোনো স্থানের কোনো নবাবপুত্রীর সহিত অদৃষ্টবাদ ও স্বাধীন ইচ্ছাবাদ সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইত।

বিবিসাহেব কহিলেন, "আমার জীবনের আশ্চর্য কাহিনী অদ্যই পরিসমাপ্ত হইয়াছে, যদি ফরমায়েশ করেন তো বলি।"

আমি শশব্যস্ত হইয়া কহিলাম, "বিলক্ষণ! ফরমায়েশ কিসের। যদি অনুগ্রহ করেন তো শুনিয়া শ্রবণ সার্থক হইবে।"

কেহ না মনে করেন, আমি ঠিক এই কথাগুলি এমনিভাবে হিন্দুস্থানি ভাষায় বলিয়াছিলাম, বলিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সামর্থ্য ছিল না। বিবিসাহেব যখন কথা কহিতেছিলেন আমার মনে হইতেছিল, যেন শিশিরস্নাত স্বর্ণশীর্ষ স্নিগ্ধশ্যামল শস্যক্ষেত্রের উপর দিয়া প্রভাতের মন্দমধুর বায়ু হিল্লোলিত হইয়া যাইতেছে, তাহার পদে পদে এমন সহজ নম্রতা, এমন সৌন্দর্য, এমন বাক্যের অবারিত প্রবাহ। আর আমি অতি সংক্ষেপে খণ্ড খণ্ড ভাবে বর্বরের মতো সোজা সোজা উত্তর দিতেছিলাম। ভাষায় সেরূপ সুসম্পূর্ণ অবিচ্ছিন্ন সহজ শিষ্টতা আমার কোনোকালে জানা ছিল না; বিবিসাহেবের সহিত কথা কহিবার সময় এই প্রথম নিজের আচরণের দীনতা পদে পদে অনুভব করিতে লাগিলাম।

তিনি কহিলেন, "আমার পিতৃকুলে দিল্লির সম্রাটবংশের রক্ত প্রবাহিত ছিল, সেই কুলগর্ব রক্ষা করিতে গিয়া আমার উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান পাওয়া দুঃসাধ্য হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌয়ের নবাবের সহিত আমার সম্বন্ধের প্রস্তাব আসিয়াছিল, পিতা ইতস্তত করিতেছিলেন, এমন সময় দাঁতে টোটা কাটা লইয়া সিপাহিলোকের সহিত সরকার-বাহাদুরের লড়াই বাধিল, কামানের ধোঁয়ায় হিন্দুস্থান অন্ধকার হইয়া গেল।"

স্ত্রীকণ্ঠে, বিশেষত সম্ভ্রান্ত মহিলার মুখে হিন্দুস্থানি কখনো শুনি নাই, শুনিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, এ ভাষা আমিরের ভাষা— এ যে-দিনের ভাষা সে-দিন আর নাই, আজ রেলোয়ে টেলিগ্রাফে, কাজের ভিড়ে, আভিজাত্যের বিলোপে সমস্তই যেন হ্রস্ব খর্ব নিরলংকার হইয়া গেছে। নবাবজাদীর ভাষামাত্র শুনিয়া সেই ইংরাজরচিত আধুনিক শৈলনগরী দার্জিলিঙের ঘনকুজ্ঝটিকাজালের মধ্যে আমার মনশ্চক্ষের সম্মুখে মোঘলসম্রাটের মানসপুরী মায়াবলে জাগিয়া উঠিতে লাগিল— শ্বেতপ্রস্তররচিত বড়ো বড়ো অভ্রভেদী সৌধশ্রেণী, পথে লম্বপুচ্ছ অশ্বপৃষ্ঠে মছলন্দের সাজ, হস্তীপৃষ্ঠে স্বর্ণঝালরখচিত হাওদা, পুরবাসিগণের মস্তকে বিচিত্রবর্ণের উষ্ণীষ, শালের রেশমের মস্‌লিনের প্রচুরপ্রসর জামা পায়জামা, কোমরবন্ধে বক্র তরবারি, জরির জুতার অগ্রভাগে বক্র শীর্ষ— সুদীর্ঘ অবসর, সুলম্ব পরিচ্ছদ, সুপ্রচুর শিষ্টাচার।

নবাবপুত্রী কহিলেন, "আমাদের কেল্লা যমুনার তীরে। আমাদের ফৌজের অধিনায়ক ছিল একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ। তাহার নাম ছিল কেশরলাল।"

রমণী এই কেশরলাল শব্দটির উপর তাহার নারীকণ্ঠের সমস্ত সংগীত যেন একেবারে এক মুহূর্তে উপুড় করিয়া ঢালিয়া দিল। আমি ছড়িটা ভূমিতে রাখিয়া নড়িয়া-চড়িয়া খাড়া হইয়া বসিলাম।

"কেশরলাল পরম হিন্দু ছিল। আমি প্রত্যহ প্রত্যূষে উঠিয়া অন্তঃপুরের গবাক্ষ হইতে দেখিতাম, কেশরলাল আবক্ষ যমুনার জলে নিমগ্ন হইয়া প্রদক্ষিণ করিতে করিতে জোড়করে ঊর্ধ্বমুখে নবোদিতসূর্যের উদ্দেশে অঞ্জলি প্রদান করিত। পরে সিক্তবস্ত্রে ঘাটে বসিয়া একাগ্রমনে জপ সমাপন করিয়া পরিষ্কার সুকণ্ঠে ভৈরোঁরাগে ভজনগান করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া আসিত।

আমি মুসলমানবালিকা ছিলাম কিন্তু কখনো স্বধর্মের কথা শুনি নাই এবং স্বধর্মসংগত উপাসনাবিধিও জানিতাম না; তখনকার দিনে বিলাসে মদ্যপানে স্বেচ্ছাচারে আমাদের পুরুষের মধ্যে ধর্মবন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছিল এবং অন্তঃপুরের প্রমোদ-ভবনেও ধর্ম সজীব ছিল না।

বিধাতা আমার মনে বোধ করি স্বাভাবিক ধর্মপিপাসা দিয়াছিলেন, অথবা আর-কোনো নিগূঢ় কারণ ছিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু প্রত্যহ প্রশান্ত প্রভাতে নবোন্মেষিত অরুণালোকে নিস্তরঙ্গ নীল যমুনার নির্জন শ্বেত সোপানতটে কেশরলালের পূজার্চনাদৃশ্যে আমার সদ্যসুপ্তোত্থিত অন্তঃকরণ একটি অব্যক্ত ভক্তিমাধুর্যে পরিপ্লুত হইয়া যাইত।

নিয়ত সংযত শুদ্ধাচারে ব্রাহ্মণ কেশরলালের গৌরবর্ণ প্রাণসার সুন্দর তনু দেহখানি ধূমলেশহীন জ্যোতিঃশিখার মতো বোধ হইত; ব্রাহ্মণের পুণ্যমাহাত্ম্য অপূর্ব শ্রদ্ধাভরে এই মুসলমানদুহিতার মূঢ় হৃদয়কে বিনম্র করিয়া দিত।

আমার একটি হিন্দু বাঁদি ছিল, সে প্রতিদিন নত হইয়া প্রণাম করিয়া কেশরলালের পদধূলি লইয়া আসিত, দেখিয়া আমার আনন্দও হইত ঈর্ষাও জন্মিত। ক্রিয়াকর্ম-পার্বণ উপলক্ষে এই বন্দিনী মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া দক্ষিণা দিত। আমি নিজে হইতে তাহাকে অর্থসাহায্য করিয়া বলিতাম, 'তুই কেশরলালকে নিমন্ত্রণ করিবি না?' সে জিভ কাটিয়া বলিত, 'কেশরলালঠাকুর কাহারো অন্নগ্রহণ বা দানপ্রতিগ্রহ করেন না।'

এইরূপে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কেশরলালকে কোনোরূপ ভক্তিচিহ্ন দেখাইতে না পারিয়া আমার চিত্ত যেন ক্ষুব্ধ ক্ষুধাতুর হইয়া থাকিত।

আমাদের পূর্বপুরুষের কেহ-একজন একটি ব্রাহ্মণকন্যাকে বলপূর্বক বিবাহ করিয়া আনিয়াছিলেন, আমি অন্তঃপুরের প্রান্তে বসিয়া তাঁহারই পুণ্যরক্তপ্রবাহ আপন শিরার মধ্যে অনুভব করিতাম, এবং সেই রক্তসূত্রে কেশরলালের সহিত একটি ঐক্যসম্বন্ধ কল্পনা করিয়া কিয়ৎপরিমাণে তৃপ্তি বোধ হইত।

আমার হিন্দু দাসীর নিকট হিন্দুধর্মের সমস্ত আচার ব্যবহার, দেবদেবীর সমস্ত

আশ্চর্য কাহিনী, রামায়ণ-মহাভারতের সমস্ত অপূর্ব ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া শুনিতাম, শুনিয়া সেই অবরুদ্ধ অন্তঃপুরের প্রান্তে বসিয়া হিন্দুজগতের এক অপরূপ দৃশ্য আমার মনের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইত। মূর্তিপ্রতিমূর্তি, শঙ্খঘণ্টাধ্বনি, স্বর্ণচূড়াখচিত দেবালয়, ধূপধুনার ধূম, অগুরুচন্দনমিশ্রিত পুষ্পরাশির সুগন্ধ, যোগীসন্ন্যাসীর অলৌকিক ক্ষমতা, ব্রাহ্মণের অমানুষিক মাহাত্ম্য, মানুষ-ছদ্মবেশধারী দেবতাদের বিচিত্র লীলা, সমস্ত জড়িত হইয়া আমার নিকটে এক অতিপুরাতন অতিবিস্তীর্ণ অতিসুন্দর অপ্রাকৃত মায়ালোক সৃজন করিত ; আমার চিত্ত যেন নীড়হারা ক্ষুদ্র পক্ষীর ন্যায় প্রদোষকালের একটি প্রকাণ্ড প্রাচীন প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইত। হিন্দুসংসার আমার বালিকাহৃদয়ের নিকট একটি পরমরমণীয় রূপকথার রাজ্য ছিল।

এমন সময় কোম্পানি বাহাদুরের সহিত সিপাহিলোকের লড়াই বাধিল। আমাদের বদ্রাওনের ক্ষুদ্র কেল্লাটির মধ্যেও বিপ্লবের তরঙ্গ জাগিয়া উঠিল।

কেশরলাল বলিল, 'এইবার গো-খাদক গোরালোককে আর্যাবর্ত হইতে দূর করিয়া দিয়া আর-একবার হিন্দুস্থানে হিন্দুমুসলমানে রাজপদ লইয়া দ্যূতক্রীড়া বসাইতে হইবে।'

আমার পিতা গোলামকাদের খাঁ সাবধানী লোক ছিলেন ; তিনি ইংরাজ জাতিকে কোনো একটি বিশেষ কুটুম্বসম্ভাষণে অভিহিত করিয়া বলিলেন, 'উহারা অসাধ্য সাধন করিতে পারে, হিন্দুস্থানের লোক উহাদের সহিত পারিয়া উঠিবে না। আমি অনিশ্চিত প্রত্যাশে আমার এই ক্ষুদ্র কেল্লাটুকু খোয়াইতে পারিব না, আমি কোম্পানিবাহাদুরের সহিত লড়িব না।'

যখন হিন্দুস্থানের সমস্ত হিন্দুমুসলমানের রক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, তখন আমার পিতার এই বণিকের মতো সাবধানতায় আমাদের সকলের মনেই ধিক্কার উপস্থিত হইল। আমার বেগম মাতৃগণ পর্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

এমন সময় ফৌজ লইয়া সশস্ত্র কেশরলাল আসিয়া আমার পিতাকে বলিলেন, 'নবাবসাহেব, আপনি যদি আমাদের পক্ষে যোগ না দেন তবে যতদিন লড়াই চলে আপনাকে বন্দী রাখিয়া আপনার কেল্লার আধিপত্যভার আমি গ্রহণ করিব।'

পিতা বলিলেন, 'সে-সমস্ত হাঙ্গামা কিছুই করিতে হইবে না, তোমাদের পক্ষে আমি রহিব।'

কেশরলাল কহিলেন, 'ধনকোষ হইতে কিছু অর্থ বাহির করিতে হইবে।'

পিতা বিশেষ কিছু দিলেন না, কহিলেন, 'যখন যেমন আবশ্যক হইবে আমি দিব।'

আমার সীমন্ত হইতে পদাঙ্গুলি পর্যন্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যতকিছু ভূষণ ছিল সমস্ত কাপড়ে বাঁধিয়া আমার হিন্দু দাসী দিয়া গোপনে কেশরলালের নিকট পাঠাইয়া দিলাম। তিনি গ্রহণ করিলেন। আনন্দে আমার ভূষণবিহীন প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

কেশরলাল মরিচাপড়া বন্দুকের চোঙ এবং পুরাতন তলোয়ারগুলি মাজিয়া ঘষিয়া সাফ করিতে প্রস্তুত হইলেন, এমন সময় হঠাৎ একদিন অপরাহ্ণে জিলার কমিশনার সাহেব লালকুর্তি গোরা লইয়া আকাশে ধুলা উড়াইয়া আমাদের কেল্লার মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল।

আমার পিতা গোলামকাদের খাঁ গোপনে তাঁহাকে বিদ্রোহসংবাদ দিয়াছিলেন।

বদ্রাওনের ফৌজের উপর কেশরলালের এমন একটি অলৌকিক আধিপত্য ছিল যে, তাঁর কথায় তাহারা ভাঙা বন্দুক ও ভোঁতা তরবারি হস্তে লড়াই করিয়া মরিতে প্রস্তুত হইল।

বিশ্বাসঘাতক পিতার গৃহ আমার নিকট নরকের মতো বোধ হইল। ক্ষোভে দুঃখে লজ্জায় ঘৃণায় বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, তবু চোখ দিয়া এক ফোঁটা জল বাহির হইল না। আমার ভীরু ভ্রাতার পরিচ্ছদ পরিয়া ছদ্মবেশে অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া গেলাম, কাহারো দেখিবার অবকাশ ছিল না।

তখন ধুলা এবং বারুদের ধোঁয়া, সৈনিকের চিৎকার এবং বন্দুকের শব্দ থামিয়া গিয়া মৃত্যুর ভীষণ শান্তি জলস্থল-আকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছে। যমুনার জল রক্তরাগে রঞ্জিত করিয়া সূর্য অস্ত গিয়াছে, সন্ধ্যাকাশে শুক্লপক্ষের পরিপূর্ণপ্রায় চন্দ্রমা।

রণক্ষেত্র মৃত্যুর বিকট দৃশ্যে আকীর্ণ। অন্য সময় হইলে করুণায় আমার বক্ষ ব্যথিত হইয়া উঠিত, কিন্তু সেদিন স্বপ্নাবিষ্টের মতো আমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে-ছিলাম, খুঁজিতেছিলাম কোথায় আছে কেশরলাল, সেই একমাত্র লক্ষ্য ছাড়া আর সমস্ত আমার নিকট অলীক বোধ হইতেছিল।

খুঁজিতে খুঁজিতে রাত্রি দ্বিপ্রহরে উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইলাম, রণক্ষেত্রের অদূরে যমুনাতীরের আম্রকাননচ্ছায়ায় কেশরলাল এবং তাঁহার ভক্তভৃত্য দেওকি-নন্দনের মৃতদেহ পড়িয়া আছে। বুঝিতে পারিলাম, সাংঘাতিক আহত অবস্থায়, হয় প্রভু ভৃত্যকে অথবা ভৃত্য প্রভুকে রণক্ষেত্র হইতে এই নিরাপদ স্থানে বহন করিয়া আনিয়া শান্তিতে মৃত্যুহস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

প্রথমেই আমি আমার বহুদিনের বুভুক্ষিত ভক্তিবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিলাম। কেশরলালের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া আমার আজানুলম্বিত কেশজাল উন্মুক্ত

করিয়া দিয়া বারম্বার তাঁহার পদধূলি মুছিয়া লইলাম, আমার উত্তপ্ত ললাটে তাঁহার হিমশীতল পাদপদ্ম তুলিয়া লইলাম, তাঁহার চরণ চুম্বন করিবামাত্র বহুদিবসের নিরুদ্ধ অশ্রুরাশি উচ্ছ্বসিত উদ্‌বেলিত হইয়া উঠিল।

এমন সময়ে কেশরলালের দেহ বিচলিত হইল, এবং সহসা তাঁহার মুখ হইতে বেদনার অস্ফুট আর্তস্বর শুনিয়া আমি তাঁহার চরণতল ছাড়িয়া চমকিয়া উঠিলাম; শুনিলাম নিমীলিত নেত্রে শুষ্ক কণ্ঠে একবার বলিলেন 'জল'।

আমি তৎক্ষণাৎ আমার গাত্রবস্ত্র যমুনার জলে ভিজাইয়া ছুটিয়া চলিয়া আসিলাম। বসন নিংড়াইয়া কেশরলালের আমীলিত ওষ্ঠাধরের মধ্যে জল দিতে লাগিলাম, এবং বামচক্ষু নষ্ট করিয়া তাঁহার কপালে যে নিদারুণ আঘাত লাগিয়াছিল সেই আহত স্থানে আমার সিক্ত বসনপ্রান্ত ছিঁড়িয়া বাঁধিয়া দিলাম।

এমনি বারকতক যমুনা হইতে জল আনিয়া তাঁহার মুখে চক্ষে সিঞ্চন করার পর অল্পে অল্পে চেতনার সঞ্চার হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আর জল দিব?' কেশরলাল কহিলেন, 'কে তুমি।' আমি আর থাকিতে পারিলাম না, বলিলাম, 'অধীনা আপনার ভক্ত সেবিকা। আমি নবাব গোলামকাদের খাঁর কন্যা।' মনে করিয়াছিলাম, কেশরলাল আসন্ন মৃত্যুকালে তাঁহার ভক্তের শেষ পরিচয় সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন, এ সুখ হইতে আমাকে কেহ বঞ্চিত করিতে পারিবে না।

আমার পরিচয় পাইবামাত্র কেশরলাল সিংহের ন্যায় গর্জন করিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'বেইমানের কন্যা, বিধর্মী! মৃত্যুকালে যবনের জল দিয়া তুই আমার ধর্ম নষ্ট করিলি!' এই বলিয়া প্রবল বলে আমার কপোলদেশে দক্ষিণ করতলের আঘাত করিলেন, আমি মূর্ছিতপ্রায় হইয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম।

তখন আমি ষোড়শী, প্রথম দিন অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিয়াছি, তখনো বহিরাকাশের লুব্ধ তপ্ত সূর্যকর আমার সুকুমার কপোলের রক্তিম লাবণ্যবিভা অপহরণ করিয়া লয় নাই, সেই বহিঃসংসারে পদক্ষেপ করিবামাত্র সংসারের নিকট হইতে, আমার সংসারের দেবতার নিকট হইতে এই প্রথম সম্ভাষণ প্রাপ্ত হইলাম।"

আমি নির্বাপিত-সিগারেটে এতক্ষণ মোহমুগ্ধ চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া ছিলাম। গল্প শুনিতেছিলাম, কি ভাষা শুনিতেছিলাম, কি সংগীত শুনিতেছিলাম জানি না, আমার মুখে একটি কথা ছিল না। এতক্ষণ পরে আমি আর থাকিতে পারিলাম না, হঠাৎ বলিয়া উঠিলাম, "জানোয়ার।"

নবাবজাদী কহিলেন, "কে জানোয়ার! জানোয়ার কি মৃত্যুযন্ত্রণার সময় মুখের নিকট সমাহৃত জলবিন্দু পরিত্যাগ করে।"

আমি অপ্রতিভ হইয়া কহিলাম, "তা বটে। সে দেবতা।"

নবাবজাদী কহিলেন, "কিসের দেবতা! দেবতা কি ভক্তের একাগ্রচিত্তের সেবা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে!"

আমি বলিলাম, "তাও বটে।" বলিয়া চুপ করিয়া গেলাম।

নবাবপুত্রী কহিতে লাগিলেন, "প্রথমটা আমার বড়ো বিষম বাজিল। মনে হইল, সমস্ত বিশ্বজগৎ হঠাৎ আমার মাথার উপর চুরমার হইয়া ভাঙিয়া পড়িয়া গেল। মুহূর্তের মধ্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়া সেই কঠোর কঠিন নিষ্ঠুর নির্বিকার পবিত্র বীর ব্রাহ্মণের পদতলে দূর হইতে প্রণাম করিলাম— মনে মনে কহিলাম, হে ব্রাহ্মণ, তুমি হীনের সেবা, পরের অন্ন, ধনীর দান, যুবতীর যৌবন, রমণীর প্রেম কিছুই গ্রহণ কর না; তুমি স্বতন্ত্র, তুমি একাকী, তুমি নির্লিপ্ত, তুমি সুদূর, তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করিবার অধিকারও আমার নাই!

নবাবদুহিতাকে ভূলুণ্ঠিতমস্তকে প্রণাম করিতে দেখিয়া কেশরলাল কী মনে করিল বলিতে পারি না, কিন্তু তাহার মুখে বিস্ময় অথবা কোনো ভাবান্তর প্রকাশ পাইল না। শান্তভাবে একবার আমার মুখের দিকে চাহিল; তাহার পরে ধীরে ধীরে উঠিল। আমি সচকিত হইয়া আশ্রয় দিবার জন্য আমার হস্ত প্রসারণ করিলাম, সে তাহা নীরবে প্রত্যাখ্যান করিল, এবং বহু কষ্টে যমুনার ঘাটে গিয়া অবতীর্ণ হইল। সেখানে একটি খেয়ানৌকা বাঁধা ছিল। পার হইবার লোকও ছিল না, পার করিবার লোকও ছিল না। সেই নৌকার উপর উঠিয়া কেশরলাল বাঁধন খুলিয়া দিল, নৌকা দেখিতে দেখিতে মধ্যস্রোতে গিয়া ক্রমশ অদৃশ্য হইয়া গেল— আমার ইচ্ছা হইতে লাগিল, সমস্ত হৃদয়ভার, সমস্ত যৌবনভার, সমস্ত অনাদৃত ভক্তিভার লইয়া সেই অদৃশ্য নৌকার অভিমুখে জোড়কর করিয়া সেই নিস্তব্ধ নিশীথে সেই চন্দ্রালোকপুলকিত নিস্তরঙ্গ যমুনার মধ্যে অকাল-বৃন্তচ্যুত পুষ্পমঞ্জরীর ন্যায় এই ব্যর্থ জীবন বিসর্জন করি।

কিন্তু পারিলাম না। আকাশের চন্দ্র, যমুনাপারের ঘনকৃষ্ণ বনরেখা, কালিন্দীর নিবিড় নীল নিষ্কম্প জলরাশি, দূরে আম্রবনের ঊর্ধ্বে আমাদের জ্যোৎস্নাচিক্কণ কেল্লার চূড়াগ্রভাগ, সকলেই নিঃশব্দগম্ভীর ঐকতানে মৃত্যুর গান গাহিল; সেই নিশীথে গ্রহচন্দ্রতারাখচিত নিস্তব্ধ তিন ভুবন আমাকে একবাক্যে মরিতে কহিল। কেবল

বীচিভঙ্গবিহীন প্রশান্ত যমুনাবক্ষোবাহিত একখানি অদৃশ্য জীর্ণ নৌকা সেই জ্যোৎস্না রজনীর সৌম্যসুন্দর শান্তশীতল অনন্ত ভুবনমোহন মৃত্যুর প্রসারিত আলিঙ্গনপাশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আমাকে জীবনের পথে টানিয়া লইয়া চলিল। আমি মোহ-স্বপ্নাভিহতার ন্যায় যমুনার তীরে তীরে কোথাও-বা কাশবন, কোথাও-বা মরুবালুকা কোথাও-বা বন্ধুর বিদীর্ণ তট, কোথাও-বা ঘনগুল্মদুর্গম বনখণ্ডের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলাম।"

এইখানে বক্তা চুপ করিল। আমিও কোনো কথা কহিলাম না।

অনেকক্ষণ পরে নবাবদুহিতা কহিল, "ইহার পরে ঘটনাবলী বড়ো জটিল। সে কেমন করিয়া বিশ্লেষ করিয়া পরিষ্কার করিয়া বলিব জানি না। একটা গহন অরণ্যের মাঝখান দিয়া যাত্রা করিয়াছিলাম, ঠিক কোন্ পথ দিয়া কখন চলিয়াছিলাম সে কি আর খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি। কোথায় আরম্ভ করিব, কোথায় শেষ করিব, কোন্‌টা ত্যাগ করিব, কোন্‌টা রাখিব, সমস্ত কাহিনীকে কী উপায়ে এমন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিব যাহাতে কিছুই অসাধ্য অসম্ভব অপ্রকৃত বোধ না হয়।

কিন্তু জীবনের এই কয়টা দিনে ইহা বুঝিয়াছি যে, অসাধ্য অসম্ভব কিছুই নাই। নবাব-অন্তঃপুরের বালিকার পক্ষে বাহিরের সংসার একান্ত দুর্গম বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু তাহা কাল্পনিক; একবার বাহির হইয়া পড়িলে একটা চলিবার পথ থাকেই। সে-পথ নবাবি পথ নহে, কিন্তু পথ; সে-পথে মানুষ চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে— তাহা বন্ধুর বিচিত্র সীমাহীন, তাহা শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত, তাহা সুখেদুঃখে বাধাবিঘ্নে জটিল, কিন্তু তাহা পথ।

এই সাধারণ মানবের পথে একাকিনী নবাবদুহিতার সুদীর্ঘ ভ্রমণবৃত্তান্ত সুখশ্রাব্য হইবে না, হইলেও সে-সব কথা বলিবার উৎসাহ আমার নাই। এক কথায়, দুঃখকষ্ট বিপদ অবমাননা অনেক ভোগ করিতে হইয়াছে, তবু জীবন অসহ্য হয় নাই। আতশবাজির মতো যত দাহন ততই উদ্দাম গতি লাভ করিয়াছি। যতক্ষণ বেগে চলিয়াছিলাম ততক্ষণ পুড়িতেছি বলিয়া বোধ ছিল না, আজ হঠাৎ সেই পরম দুঃখের সেই চরম সুখের আলোকশিখাটি নিবিয়া গিয়া এই পথপ্রান্তের ধূলির উপর জড়-পদার্থের ন্যায় পড়িয়া গিয়াছি— আজ আমার যাত্রা শেষ হইয়া গেছে, এইখানেই আমার কাহিনী সমাপ্ত।"

এই বলিয়া নবাবপুত্রী থামিল। আমি মনে মনে ঘাড় নাড়িলাম; এখানে তো

কোনোমতেই শেষ হয় না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ভাঙা হিন্দিতে বলিলাম, "বেয়াদপি মাপ করিবেন, শেষদিককার কথাটা আর অল্প একটু খোলসা করিয়া বলিলে অধীনের মনের ব্যাকুলতা অনেকটা হ্রাস হয়।"

নবাবপুত্রী হাসিলেন। বুঝিলাম, আমার ভাঙা হিন্দিতে ফল হইয়াছে। যদি আমি খাস হিন্দিতে বাৎ চালাইতে পারিতাম তাহা হইলে আমার কাছে তাঁহার লজ্জা ভাঙিত না, কিন্তু আমি যে তাঁহার মাতৃভাষা অতি অল্পই জানি সেইটেই আমাদের উভয়ের মধ্যে বৃহৎ ব্যবধান, সেইটেই একটা আব্রু।

তিনি পুনরায় আরম্ভ করিলেন, "কেশরলালের সংবাদ আমি প্রায়ই পাইতাম কিন্তু কোনোমতেই তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারি নাই। তিনি তাঁতিয়াটোপির দলে মিশিয়া সেই বিপ্লবাচ্ছন্ন আকাশতলে অকস্মাৎ কখনো পূর্বে, কখনো পশ্চিমে, কখনো ঈশানে, কখনো নৈর্ঋতে, বজ্রপাতের মতো মুহূর্তের মধ্যে ভাঙিয়া পড়িয়া, মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হইতেছিলেন।

আমি তখন যোগিনী সাজিয়া কাশীর শিবানন্দস্বামীকে পিতৃসম্বোধন করিয়া তাঁহার নিকট সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলাম। ভারতবর্ষের সমস্ত সংবাদ তাঁহার পদতলে আসিয়া সমাগত হইত, আমি ভক্তিভরে শাস্ত্র শিক্ষা করিতাম এবং মর্মান্তিক উদ্‌বেগের সহিত যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহ করিতাম।

ক্রমে ব্রিটিশরাজ হিন্দুস্থানের বিদ্রোহবহ্নি পদতলে দলন করিয়া নিবাইয়া দিল। তখন সহসা কেশরলালের সংবাদ আর পাওয়া গেল না। ভীষণ প্রলয়ালোকের রক্ত-রশ্মিতে ভারতবর্ষের দূরদূরান্তর হইতে যে-সকল বীর-মূর্তি ক্ষণে ক্ষণে দেখা যাইতেছিল, হঠাৎ তাহারা অন্ধকারে পড়িয়া গেল।

তখন আমি আর থাকিতে পারিলাম না। গুরুর আশ্রয় ছাড়িয়া ভৈরবীবেশে আবার বাহির হইয়া পড়িলাম। পথে পথে, তীর্থে তীর্থে, মঠে মন্দিরে ভ্রমণ করিয়াছি, কোথাও কেশরলালের কোনো সন্ধান পাই নাই। দুই-একজন যাহারা তাহার নাম জানিত, কহিল, 'সে হয় যুদ্ধে নয় রাজদণ্ডে মৃত্যু লাভ করিয়াছে।' আমার অন্তরাত্মা কহিল, 'কখনো নহে, কেশরলালের মৃত্যু নাই।— সেই ব্রাহ্মণ সেই দুঃসহ জলদগ্নি কখনো নির্বাণ পায় নাই, আমার আত্মাহুতি গ্রহণ করিবার জন্য সে এখনো কোন্ দুর্গম নির্জন যজ্ঞবেদীতে ঊর্ধ্বশিখা হইয়া জ্বলিতেছে।'

হিন্দুশাস্ত্রে আছে জ্ঞানের দ্বারা তপস্যার দ্বারা শূদ্র ব্রাহ্মণ হইয়াছে, মুসলমান

ব্রাহ্মণ হইতে পারে কি না সে কথায় কোনো উল্লেখ নাই ; তাহার একমাত্র কারণ তখন মুসলমান ছিল না। আমি জানিতাম কেশরলালের সহিত আমার মিলনের বহু বিলম্ব আছে, কারণ তৎপূর্বে আমাকে ব্রাহ্মণ হইতে হইবে। একে একে ত্রিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইল। আমি অন্তরে বাহিরে আচারে ব্যবহারে কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্মণ হইলাম, আমার সেই ব্রাহ্মণ পিতামহীর রক্ত নিষ্কলুষতেজে আমার সর্বাঙ্গে প্রবাহিত হইল, আমি মনে মনে আমার সেই যৌবনারম্ভের প্রথম ব্রাহ্মণ, আমার যৌবনশেষের শেষ ব্রাহ্মণ, আমার ত্রিভুবনের এক ব্রাহ্মণের পদতলে সম্পূর্ণ নিঃসংকোচে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া একটি অপরূপ দীপ্তিলাভ করিলাম।

যুদ্ধবিপ্লবের মধ্যে কেশরলালের বীরত্বের কথা আমি অনেক শুনিয়াছি, কিন্তু সে কথা আমার হৃদয়ে মুদ্রিত হয় নাই। আমি সেই যে দেখিয়াছিলাম, নিঃশব্দে জ্যোৎস্নানিশীথে নিস্তব্ধ যমুনার মধ্যস্রোতে একখানি ক্ষুদ্র নৌকার মধ্যে একাকী কেশরলাল ভাসিয়া চলিয়াছে, সেই চিত্রই আমার মনে অঙ্কিত হইয়া আছে। আমি কেবল অহরহ দেখিতেছিলাম, ব্রাহ্মণ নির্জন স্রোত বাহিয়া নিশিদিন কোন্ অনির্দেশ মহারহস্যাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, তাহার কোনো সঙ্গী নাই, সেবক নাই, কাহাকেও তাহার কোনো আবশ্যক নাই, সেই নির্মল আত্মনিমগ্ন পুরুষ আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ; আকাশের গ্রহচন্দ্রতারা তাহাকে নিঃশব্দে নিরীক্ষণ করিতেছে।

এমন সময় সংবাদ পাইলাম, কেশরলাল রাজদণ্ড হইতে পলায়ন করিয়া নেপালে আশ্রয় লইয়াছে। আমি নেপালে গেলাম। সেখানে দীর্ঘকাল বাস করিয়া সংবাদ পাইলাম, কেশরলাল বহুকাল হইল নেপাল ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে কেহ জানে না।

তাহার পর হইতে পাহাড়ে পাহাড়ে ভ্রমণ করিতেছি। এ হিন্দুর দেশ নহে— ভুটিয়া লেপচাগণ ম্লেচ্ছ, ইহাদের আহারব্যবহারে আচারবিচার নাই, ইহাদের দেবতা ইহাদের পূজার্চনাবিধি সকলই স্বতন্ত্র। বহুদিনের সাধনায় আমি যে বিশুদ্ধ শুচিতা লাভ করিয়াছি, ভয় হইতে লাগিল, পাছে তাহাতে রেখামাত্র চিহ্ন পড়ে। আমি বহু চেষ্টায় আপনাকে সর্বপ্রকার মলিন সংস্পর্শ হইতে রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলাম। আমি জানিতাম, আমার তরী তীরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, আমার জীবনের চরমতীর্থ অনতিদূরে।

তাহার পরে আর কী বলিব। শেষ কথা অতি স্বল্প। প্রদীপ যখন নেবে

তখন একটি ফুৎকারেই নিবিয়া যায়, সে কথা আর সুদীর্ঘ করিয়া কী ব্যাখ্যা করিব।

আটত্রিশ বৎসর পরে এই দার্জিলিঙে আসিয়া আজ প্রাতঃকালে কেশরলালের দেখা পাইয়াছি।"

বক্তাকে এইখানে ক্ষান্ত হইতে দেখিয়া আমি ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, "কী দেখিলেন।"

নবাবপুত্রী কহিলেন, "দেখিলাম, বৃদ্ধ কেশরলাল ভুটিয়াপল্লীতে ভুটিয়া স্ত্রী এবং তাহার গর্ভজাত পৌত্রপৌত্রী লইয়া ম্লানবস্ত্রে মলিন অঙ্গনে ভুট্টা হইতে শস্য সংগ্রহ করিতেছে।"

গল্প শেষ হইল। আমি ভাবিলাম, একটা সান্ত্বনার কথা বলা আবশ্যক। কহিলাম, "আটত্রিশ বৎসর একাদিক্রমে যাহাকে প্রাণভয়ে বিজাতীয়ের সংস্রবে অহরহ থাকিতে হইয়াছে সে কেমন করিয়া আপন আচার রক্ষা করিবে।"

নবাবকন্যা কহিলেন, "আমি কি তাহা বুঝি না। কিন্তু এতদিন আমি কী মোহ লইয়া ফিরিতেছিলাম! যে ব্রহ্মণ্য আমার কিশোর হৃদয় হরণ করিয়া লইয়াছিল আমি কি জানিতাম, তাহা অভ্যাস তাহা সংস্কার মাত্র। আমি জানিতাম, তাহা ধর্ম, তাহা অনাদি অনন্ত। তাহাই যদি না হইবে তবে ষোলোবৎসর বয়সে প্রথম পিতৃগৃহ হইতে বাহির হইয়া সেই জ্যোৎস্নানিশীথে আমার বিকশিত পুষ্পিত ভক্তিবেগ-কম্পিত দেহমনপ্রাণের প্রতিদানে ব্রাহ্মণের দক্ষিণ হস্ত হইতে যে দুঃসহ অপমান প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, কেন তাহা গুরুহস্তের দীক্ষার ন্যায় নিঃশব্দে অবনত মস্তকে দ্বিগুণিত ভক্তিভরে শিরোধার্য করিয়া লইয়াছিলাম। হায় ব্রাহ্মণ, তুমি তো তোমার এক অভ্যাসের পরিবর্তে আর এক অভ্যাস লাভ করিয়াছ, আমি আমার এক যৌবন এক জীবনের পরিবর্তে আর-এক জীবন যৌবন কোথায় ফিরিয়া পাইব।"

এই বলিয়া রমণী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "নমস্কার বাবুজি!"

মুহূর্তপরেই যেন সংশোধন করিয়া কহিল, "সেলাম বাবুসাহেব!" এই মুসলমান-অভিবাদনের দ্বারা সে যেন জীর্ণভিত্তি ধূলিশায়ী ভগ্ন ব্রহ্মণ্যের নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিল। আমি কোনো কথা না বলিতেই সে সেই হিমাদ্রিশিখরের ধূসর কুজ্ঝটিকারাশির মধ্যে মেঘের মতো মিলাইয়া গেল।

আমি ক্ষণকাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সমস্ত ঘটনাবলী মানসপটে চিত্রিত দেখিতে

লাগিলাম। মছলন্দের আসনে যমুনাতীরের গবাক্ষে সুখাসীনা ষোড়শী নবাব-বালিকাকে দেখিলাম, তীর্থমন্দিরে সন্ধ্যারতিকালে তপস্বিনীর ভক্তিগদ্‌গদ একাগ্র মূর্তি দেখিলাম, তাহার পরে এই দার্জিলিঙে ক্যালকাটা রোডের প্রান্তে প্রবীণার কুহেলিকাচ্ছন্ন ভগ্নহৃদয়ভারকাতর নৈরাশ্যমূর্তিও দেখিলাম, একটি সুকুমার রমণীদেহে ব্রাহ্মণমুসলমানের রক্ততরঙ্গের বিপরীত সংঘর্ষজনিত বিচিত্র ব্যাকুল সংগীতধ্বনি সুন্দর সুসম্পূর্ণ উর্দু ভাষায় বিগলিত হইয়া আমার মস্তিষ্কের মধ্যে স্পন্দিত হইতে লাগিল।

চক্ষু খুলিয়া দেখিলাম, হঠাৎ মেঘ কাটিয়া গিয়া স্নিগ্ধ রৌদ্রে নির্মল আকাশ ঝলমল করিতেছে, ঠেলাগাড়িতে ইংরাজ রমণী ও অশ্বপৃষ্ঠে ইংরাজ পুরুষগণ বায়ুসেবনে বাহির হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে দুই-একটি বাঙালির গলাবন্ধবিজড়িত মুখমণ্ডল হইতে আমার প্রতি সকৌতুক কটাক্ষ বর্ষিত হইতেছে।

দ্রুত উঠিয়া পড়িলাম, এই সূর্যালোকিত অনাবৃত জগৎদৃশ্যের মধ্যে সেই মেঘাচ্ছন্ন কাহিনীকে আর সত্য বলিয়া মনে হইল না। আমার বিশ্বাস, আমি পর্বতের কুয়াশার সহিত আমার সিগারেটের ধূম ভূরিপরিমাণে মিশ্রিত করিয়া একটি কল্পনাখণ্ড রচনা করিয়াছিলাম— সেই মুসলমানব্রাহ্মণী, সেই বিপ্রবীর, সেই যমুনা-তীরের কেল্লা, কিছুই হয়তো সত্য নহে।

বৈশাখ ১৩০৫

পুত্রযজ্ঞ

বৈদ্যনাথ গ্রামের মধ্যে বিজ্ঞ ছিলেন সেইজন্য তিনি ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বর্তমানের সমস্ত কাজ করিতেন। যখন বিবাহ করিলেন তখন তিনি বর্তমান নববধূর অপেক্ষা ভাবী নবকুমারের মুখ স্পষ্টতররূপে দেখিতে পাইয়াছিলেন। শুভদৃষ্টির সময় এতটা দূরদৃষ্টি প্রায় দেখা যায় না। তিনি পাকা লোক ছিলেন সেইজন্য প্রেমের চেয়ে পিণ্ডটাকেই অধিক বুঝিতেন এবং পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা এই মর্মেই তিনি বিনোদিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

কিন্তু এ সংসারে বিজ্ঞ লোকও ঠকে। যৌবনপ্রাপ্ত হইয়াও যখন বিনোদিনী তাহার সর্বপ্রধান কর্তব্যটি পালন করিল না তখন পুন্নাম নরকের দ্বার খোলা দেখিয়া বৈদ্যনাথ বড়ো চিন্তিত হইলেন। মৃত্যুর পরে তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্যই বা কে ভোগ

করিবে এই ভাবনায় মৃত্যুর পূর্বে তিনি সেই ঐশ্বর্য ভোগ করিতে একপ্রকার বিমুখ হইলেন। পূর্বেই বলিয়াছি, বর্তমানের অপেক্ষা ভবিষ্যৎটাকেই তিনি সত্য বলিয়া জানিতেন।

কিন্তু যুবতী বিনোদিনীর নিকট হঠাৎ এতটা প্রাজ্ঞতা প্রত্যাশা করা যায় না। সে বেচারার দুর্মূল্য বর্তমান তাহার নববিকশিত যৌবন বিনা প্রেমে বিফলে অতিবাহিত হইয়া যায়, এইটেই তাহার পক্ষে সবচেয়ে শোচনীয় ছিল। পারলৌকিক পিণ্ডের ক্ষুধাটা সে ইহলৌকিক চিত্তক্ষুধাদাহে একেবারেই ভুলিয়া বসিয়াছিল, মনুর পবিত্র বিধান এবং বৈদ্যনাথের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় তাহার বুভুক্ষিত হৃদয়ে তিলমাত্র তৃপ্তি হইল না।

যে যাহাই বলুক, এই বয়সটাতে ভালোবাসা দেওয়া এবং ভালোবাসা পাওয়াই রমণীর সকল সুখ এবং সকল কর্তব্যের চেয়ে স্বভাবতই বেশি মনে হয়।

কিন্তু বিনোদার ভাগ্যে নবপ্রেমের বর্ষাবারিসিঞ্চনের বদলে স্বামীর, পিস্‌শাশুড়ির এবং অন্যান্য গুরু ও গুরুতর লোকের সমুচ্চ আকাশ হইতে তর্জন-গর্জনের শিলাবৃষ্টি ব্যবস্থা হইল। সকলেই তাহাকে বন্ধ্যা বলিয়া অপরাধী করিত। একটা ফুলের চারাকে আলোক এবং বাতাস হইতে রুদ্ধঘরে রাখিলে তাহার যেরূপ অবস্থা হয়, বিনোদার বঞ্চিত যৌবনেরও সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল।

সদাসর্বদা এইসকল চাপাচুপি ও বকাবকির মধ্যে থাকিতে না পারিয়া যখন সে কুসুমের বাড়ি তাস খেলিতে যাইত সেই সময়টা তাহার বড়ো ভালো লাগিত। সেখানে পুংনরকের ভীষণ ছায়া সর্বদা বর্তমান না থাকাতে হাসি-ঠাট্টা-গল্পের কোনো বাধা ছিল না।

কুসুম যেদিন তাস খেলিবার কাল না পাইত সেদিন তাহার তরুণ দেবর নগেন্দ্রকে ধরিয়া আনিত। নগেন্দ্র ও বিনোদার আপত্তি হাসিয়া উড়াইয়া দিত। এ সংসারে এক হইতে আর হয় এবং খেলা ক্রমে সংকটে পরিণত হইতে পারে, এ-সব গুরুতর কথা অল্পবয়সে হঠাৎ বিশ্বাস হয় না।

এ সম্বন্ধে নগেন্দ্রেরও আপত্তির দৃঢ়তা কিছুমাত্র দেখা গেল না, এখন আর সে তাস খেলিবার জন্য অধিক পীড়াপীড়ির অপেক্ষা করিতে পারে না।

এইরূপে বিনোদার সহিত নগেন্দ্রের প্রায়ই দেখাসাক্ষাৎ হইতে লাগিল।

নগেন্দ্র যখন তাস খেলিতে বসিত তখন তাসের অপেক্ষা সজীবতর পদার্থের প্রতি তাহার নয়নমন পড়িয়া থাকাতে খেলায় প্রায়ই হারিতে লাগিল। পরাজয়ের প্রকৃত কারণ বুঝিতে কুসুম এবং বিনোদার কাহারো বাকি রহিল না। পূর্বেই বলিয়াছি,

কর্মফলের গুরুত্ব বোঝা অল্প বয়সের কর্ম নহে। কুসুম মনে করিত, এ একটা বেশ মজা হইতেছে, এবং মজাটা ক্রমে ষোলো-আনায় সম্পূর্ণ হইয়া উঠে ইহাতে তাহার একটা আগ্রহ ছিল। ভালোবাসার নবাঙ্কুরে গোপনে জলসিঞ্চন তরুণীদের পক্ষে বড়ো কৌতুকের।

বিনোদারও মন্দ লাগিল না। হৃদয়জয়ের সুতীক্ষ্ণ ক্ষমতাটা একজন পুরুষ মানুষের উপর শাণিত করিবার ইচ্ছা অন্যায় হইতে পারে, কিন্তু নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে।

এইরূপে তাসের হারজিৎ ও ছক্কাপাঞ্জার পুনঃপুন আবর্তনের মধ্যে কোন্-এক সময়ে দুইটি খেলোয়াড়ের মনে মনে মিল হইয়া গেল, অন্তর্যামী ব্যতীত আর-একজন খেলোয়াড় তাহা দেখিল এবং আমোদ বোধ করিল।

একদিন দুপুরবেলায় বিনোদা কুসুম ও নগেন্দ্র তাস খেলিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে কুসুম তাহার রুগ্‌ণ শিশুর কান্না শুনিয়া উঠিয়া গেল। নগেন্দ্র বিনোদার সহিত গল্প করিতে লাগিল। কিন্তু কী গল্প করিতেছিল তাহা নিজেই বুঝিতে পারিতেছিল না; রক্তস্রোত তাহার হৃৎপিণ্ড উদ্‌বেলিত করিয়া তাহার সর্বশরীরের শিরায় মধ্যে তরঙ্গিত হইতেছিল।

হঠাৎ একসময় তাহার উদ্দাম যৌবন বিনয়ের সমস্ত বাঁধ ভাঙিয়া ফেলিল, হঠাৎ বিনোদার হাত দুটি চাপিয়া ধরিয়া সবলে তাহাকে টানিয়া লইয়া চুম্বন করিল। বিনোদা নগেন্দ্র-কর্তৃক এই অবমাননায় ক্রোধে ক্ষোভে লজ্জায় অধীর হইয়া নিজের হাত ছাড়াইবার জন্য টানাটানি করিতেছে এমন সময় তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল, ঘরে তৃতীয় ব্যক্তির আগমন হইয়াছে। নগেন্দ্র নতমুখে ঘর হইতে বাহির হইবার পথ অন্বেষণ করিতে লাগিল।

পরিচারিকা গম্ভীরস্বরে কহিল, "বউঠাকরুন, তোমাকে পিসিমা ডাকছেন।" বিনোদা ছলছল চক্ষে নগেন্দ্রের প্রতি বিদ্যুৎকটাক্ষ বর্ষণ করিয়া দাসীর সঙ্গে চলিয়া গেল।

পরিচারিকা যেটুকু দেখিয়াছিল তাহাকে হ্রস্ব এবং যাহা না দেখিয়াছিল তাহাকেই সুদীর্ঘতর করিয়া বৈদ্যনাথের অন্তঃপুরে একটা ঝড় তুলিয়া দিল। বিনোদার কী দশা হইল সে কথা বর্ণনার অপেক্ষা কল্পনা সহজ। সে যে কতদূর নিরপরাধ কাহাকেও বুঝাইতে চেষ্টা করিল না, নতমুখে সমস্ত সহিয়া গেল।

বৈদ্যনাথ আপন ভাবী পিণ্ডদাতার আবির্ভাবসম্ভাবনা অত্যন্ত সংশয়াচ্ছন্ন জ্ঞান করিয়া বিনোদাকে কহিল, "কলঙ্কিনী, তুই আমার ঘর হইতে দূর হইয়া যা।"

বিনোদা শয়নকক্ষের দ্বার রোধ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল, তাহার অশ্রুহীন

চক্ষু মধ্যাহ্নের মরুভূমির মতো জ্বলিতেছিল। যখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া বাহিরের বাগানে কাকের ডাক থামিয়া গেল, তখন নক্ষত্রখচিত শান্ত আকাশের দিকে চাহিয়া তাহার বাপমায়ের কথা মনে পড়িল এবং তখন দুই গণ্ড দিয়া অশ্রু বিগলিত হইয়া পড়িতে লাগিল।

সেই রাত্রে বিনোদা স্বামীগৃহ ত্যাগ করিয়া গেল। কেহ তাহার খোঁজও করিল না।

তখন বিনোদা জানিত না যে, 'প্রজনার্থং মহাভাগা' স্ত্রী-জন্মের মহাভাগ্য সে লাভ করিয়াছে, তাহার স্বামীর পারলৌকিক সদ্‌গতি তাহার গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

এই ঘটনার পর দশ বৎসর অতীত হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে বৈদ্যনাথের বৈষয়িক অবস্থার প্রচুর উন্নতি হইয়াছে। এখন তিনি পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় বৃহৎ বাড়ি কিনিয়া বাস করিতেছেন।

কিন্তু তাঁহার বিষয় যতই বৃদ্ধি হইল বিষয়ের উত্তরাধিকারীর জন্য প্রাণ ততই ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল।

পরে পরে দুইবার বিবাহ করিলেন তাহাতে পুত্র না জন্মিয়া কেবলই কলহ জন্মিতে লাগিল। দৈবজ্ঞপণ্ডিতে সন্ন্যাসী-অবধূতে ঘর ভরিয়া গেল; শিকড় মাদুলি জলপড়া এবং পেটেন্ট ঔষধের বর্ষণ হইতে লাগিল। কালীঘাটে যত ছাগশিশু মরিল তাহার অস্থিস্তূপে তৈমুরলঙ্গের কঙ্কালজয়স্তম্ভ ধিক্‌কৃত হইতে পারিত; কিন্তু তবু, কেবল গুটিকতক অস্থি ও অতি স্বল্প মাংসের একটি ক্ষুদ্রতম শিশুও বৈদ্যনাথের বিশাল প্রাসাদের প্রান্তস্থান অধিকার করিয়া দেখা দিল না। তাঁহার অবর্তমানে পরের ছেলে কে তাঁহার অন্ন খাইবে ইহাই ভাবিয়া অন্নে তাঁহার অরুচি জন্মিল।

বৈদ্যনাথ আরো একটি স্ত্রী বিবাহ করিলেন; কারণ সংসারে আশারও অন্ত নাই, কন্যাদায়গ্রস্তের কন্যারও শেষ নাই।

দৈবজ্ঞেরা কোষ্ঠী দেখিয়া বলিল, ওই কন্যার পুত্রস্থানে যেরূপ শুভযোগ দেখা যাইতেছে তাহাতে বৈদ্যনাথের ঘরে প্রজাবৃদ্ধির আর বিলম্ব নাই; তাহার পরে ছয় বৎসর অতীত হইয়া গেল তথাপি পুত্রস্থানের শুভযোগ আলস্য পরিত্যাগ করিলেন না।

বৈদ্যনাথ নৈরাশ্যে অবনত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের পরামর্শে একটা প্রচুর ব্যয়সাধ্য যজ্ঞের আয়োজন করিলেন, তাহাতে বহুকাল ধরিয়া বহু ব্রাহ্মণের সেবা চলিতে লাগিল।

এ দিকে তখন দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা অস্থিচর্মসার হইয়া উঠিয়াছিল। বৈদ্যনাথ যখন অন্নের মধ্যে বসিয়া ভাবিতেছিলেন 'আমার অন্ন কে খাইবে', তখন সমস্ত উপবাসী দেশ আপন রিক্তস্থালীর দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল 'কী খাইব'।

ঠিক সেই সময়ে চারিমাস কাল ধরিয়া বৈদ্যনাথের চতুর্থ সহধর্মিণী একশত ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করিতেছিল এবং একশত ব্রাহ্মণ প্রাতে প্রচুর অন্ন এবং সায়াহ্নে অপর্যাপ্ত পরিমাণে জলপান খাইয়া খুরি সরা ভাঁড় এবং দধিঘৃতলিপ্ত কলার পাতে ম্যুনিসিপালিটির আবর্জনাশকট পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছিল। অন্নের গন্ধে দুর্ভিক্ষকাতর বুভুক্ষুগণ দলে দলে দ্বারে সমাগত হইতে লাগিল, তাহাদিগকে সর্বদা খেদাইয়া রাখিবার জন্য অতিরিক্ত দ্বারী নিযুক্ত হইল।

একদিন প্রাতে বৈদ্যনাথের মার্বলমণ্ডিত দালানে একটি স্থূলোদর সন্ন্যাসী দুইসের মোহনভোগ এবং দেড়সের দুগ্ধ- সেবায় নিযুক্ত আছে, বৈদ্যনাথ গায়ে একখানি চাদর দিয়া জোড়করে একান্ত বিনীতভাবে ভূতলে বসিয়া ভক্তিভরে পবিত্র ভোজনব্যাপার নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, এমন সময় কোনোমতে দ্বারীদের দৃষ্টি এড়াইয়া জীর্ণদেহ বালক-সহিত একটি অতি শীর্ণকায়া রমণী গৃহে প্রবেশ করিয়া ক্ষীণ স্বরে কহিল, "বাবু, দুটি খেতে দাও।"

বৈদ্যনাথ শশব্যস্ত হইয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "গুরুদয়াল! গুরুদয়াল!" গতিক মন্দ বুঝিয়া স্ত্রীলোকটি অতি করুণ স্বরে কহিল, "ওগো, এই ছেলেটিকে দুটি খেতে দাও। আমি কিছু চাই নে।"

গুরুদয়াল আসিয়া বালক ও তাহার মাতাকে তাড়াইয়া দিল। সেই ক্ষুধাতুর নিরন্ন বালকটি বৈদ্যনাথের একমাত্র পুত্র। একশত পরিপুষ্ট ব্রাহ্মণ এবং তিনজন বলিষ্ঠ সন্ন্যাসী বৈদ্যনাথকে পুত্রপ্রাপ্তির দুরাশায় প্রলুব্ধ করিয়া তাহার অন্ন খাইতে লাগিল।

জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫

ডিটেকটিভ

আমি পুলিসের ডিটেকটিভ কর্মচারী। আমার জীবনে দুটিমাত্র লক্ষ্য ছিল— আমার স্ত্রী এবং আমার ব্যবসায়। পূর্বে একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে ছিলাম, সেখানে আমার স্ত্রীর প্রতি সমাদরের অভাব হওয়াতেই আমি দাদার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া বাহির হইয়া আসি। দাদাই উপার্জন করিয়া আমাকে পালন করিতেছিলেন, অতএব সহসা সস্ত্রীক তাঁহার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া আসা আমার পক্ষে দুঃসাহসের কাজ হইয়াছিল।

কিন্তু কখনো নিজের উপরে আমার বিশ্বাসের ত্রুটি ছিল না। আমি নিশ্চয় জানিতাম, সুন্দরী স্ত্রীকে যেমন বশ করিয়াছি বিমুখ অদৃষ্টলক্ষ্মীকেও তেমনি বশ করিতে পারিব। মহিমচন্দ্র এ সংসারে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে না।

পুলিসবিভাগে সামান্যভাবে প্রবেশ করিলাম, অবশেষে ডিটেকটিভ-পদে উত্তীর্ণ হইতে অধিক বিলম্ব হইল না।

উজ্জ্বল শিখা হইতেও যেমন কজ্জলপাত হয় তেমনি আমার স্ত্রীর প্রেম হইতেও ঈর্ষা এবং সন্দেহের কালিমা বাহির হইত। সেটাতে আমার কিছু কাজের ব্যাঘাত করিত; কারণ পুলিসের কর্মে স্থানাস্থান কালাকাল বিচার করিলে চলে না, বরঞ্চ স্থানের অপেক্ষা অস্থান এবং কালের অপেক্ষা অকালটারই চর্চা অধিক করিয়া করিতে হয়— তাহাতে করিয়া আমার স্ত্রীর স্বভাবসিদ্ধ সন্দেহ আরো যেন দুর্নিবার হইয়া উঠিত। সে আমাকে ভয় দেখাইবার জন্য বলিত, "তুমি এমন যখন-তখন যেখানে-সেখানে যাপন কর, কালেভদ্রে আমার সঙ্গে দেখা হয়, আমার জন্য তোমার আশঙ্কা হয় না?" আমি তাহাকে বলিতাম, "সন্দেহ করা আমাদের ব্যবসায়, সেই কারণে ঘরের মধ্যে সেটাকে আর আনি না।"

স্ত্রী বলিত, "সন্দেহ করা আমার ব্যবসায় নহে, উহা আমার স্বভাব, আমাকে তুমি লেশমাত্র সন্দেহের কারণ দিলে আমি সব করিতে পারি।"

ডিটেকটিভ লাইনে আমি সকলের সেরা হইব, একটা নাম রাখিব, এ প্রতিজ্ঞা আমার দৃঢ় ছিল। এ সম্বন্ধে যতকিছু বিবরণ এবং গল্প আছে তাহার কোনোটাই পড়িতে বাকি রাখি নাই। কিন্তু পড়িয়া কেবল মনের অসন্তোষ এবং অধীরতা বাড়িতে লাগিল।

কারণ, আমাদের দেশের অপরাধীগুলা ভীরু নির্বোধ, অপরাধগুলা নির্জীব এবং

সরল, তাহার মধ্যে দুরূহতা দুর্গমতা কিছুই নাই। আমাদের দেশের খুনী নররক্তপাতের উৎকট উত্তেজনা কোনোমতেই নিজের মধ্যে সংবরণ করিতে পারে না। জালিয়াত যে-জাল বিস্তার করে তাহাতে অনতিবিলম্বে নিজেই আপাদমস্তক জড়াইয়া পড়ে, অপরাধব্যূহ হইতে নির্গমনের কূটকৌশল সে কিছুই জানে না। এমন নির্জীব দেশে ডিটেকটিভের কাজে সুখও নাই, গৌরবও নাই।

বড়োবাজারের মাড়োয়ারি জুয়াচোরকে অনায়াসে গ্রেপ্তার করিয়া কতবার মনে মনে বলিয়াছি, 'ওরে অপরাধীকুলকলঙ্ক, পরের সর্বনাশ করা গুণী ওস্তাদলোকের কর্ম; তোর মতো আনাড়ি নির্বোধের সাধুতপন্থী হওয়া উচিত ছিল।' খুনীকে ধরিয়া তাহার প্রতি স্বগত উক্তি করিয়াছি, 'গবর্মেণ্টের সমুন্নত ফাঁসিকাষ্ঠ কি তোদের মতো গৌরববিহীন প্রাণীদের জন্য হইয়াছিল— তোদের না আছে উদার কল্পনাশক্তি, না আছে কঠোর আত্মসংযম, তোরা বেটারা খুনী হইবার স্পর্ধা করিস!'

আমি কল্পনাচক্ষে যখন লণ্ডন এবং প্যারিসের জনাকীর্ণ পথের দুই পার্শ্বে শীত-বাষ্পাকুল অভ্রভেদী হর্ম্যশ্রেণী দেখিতে পাইতাম তখন আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত। মনে মনে ভাবিতাম, 'এই হর্ম্যরাজি এবং পথ-উপপথের মধ্য দিয়া যেমন জনস্রোত কর্মস্রোত উৎসবস্রোত সৌন্দর্যস্রোত অহরহ বহিয়া যাইতেছে, তেমনি সর্বত্রই একটা হিংস্রকুটিল কৃষ্ণকুঞ্চিত ভয়ংকর অপরাধপ্রবাহ তলে তলে আপনার পথ করিয়া চলিয়াছে; তাহারই সামীপ্যে য়ুরোপীয় সামাজিকতার হাস্যকৌতুক শিষ্টাচার এমন বিরাটভীষণ রমণীয়তা লাভ করিয়াছে। আর, আমাদের কলিকাতার পথপার্শ্বের মুক্তবাতায়ন গৃহশ্রেণীর মধ্যে রান্নাবাটনা, গৃহকার্য, পরীক্ষার পাঠ, তাসদাবার বৈঠক, দাম্পত্য কলহ, বড়োজোর ভ্রাতৃবিচ্ছেদ এবং মকদ্দমার পরামর্শ ছাড়া বিশেষ কিছু নাই— কোনো-একটা বাড়ির দিকে চাহিয়া কখনো এ কথা মনে হয় না যে, হয়তো এই মুহূর্তেই এই গৃহের কোনো-একটা কোণে শয়তান মুখ গুঁজিয়া বসিয়া আপনার কালো কালো ডিমগুলিতে তা দিতেছে।

আমি অনেক সময়ই রাস্তায় বাহির হইয়া পথিকদের মুখ এবং চলনের ভাব পর্যবেক্ষণ করিতাম; ভাবে ভঙ্গিতে যাহাদিগকে কিছুমাত্র সন্দেহজনক বোধ হইয়াছে আমি অনেক সময়ই গোপনে তাহাদের অনুসরণ করিয়াছি, তাহাদের নামধাম ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়াছি, অবশেষে পরম নৈরাশ্যের সহিত আবিষ্কার করিয়াছি— তাহারা নিষ্কলঙ্ক ভালোমানুষ, এমন-কি তাহাদের আত্মীয়-বান্ধবেরাও তাদের সম্বন্ধে আড়ালে কোনোপ্রকার গুরুতর মিথ্যা অপবাদও প্রচার করে না। পথিকদের মধ্যে সবচেয়ে যাহাকে পাষণ্ড বলিয়া মনে হইয়াছে, এমন-কি যাহাকে দেখিয়া নিশ্চয় মনে করিয়াছি

যে, এইমাত্র সে কোনো একটা উৎকট দুষ্কার্য সাধন করিয়া আসিয়াছে, সন্ধান করিয়া জানিয়াছি— সে একটি ছাত্রবৃত্তি স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিত, তখনই অধ্যাপনকার্য সমাধা করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিতেছে। এইসকল লোকেরাই অন্য-কোনো দেশে জন্মগ্রহণ করিলে বিখ্যাত চোরডাকাত হইয়া উঠিতে পারিত, কেবলমাত্র যথোচিত জীবনীশক্তি এবং যথেষ্ট পরিমাণ পৌরুষের অভাবেই আমাদের দেশে ইহারা কেবল পণ্ডিতি করিয়া বৃদ্ধবয়সে পেন্সন লইয়া মরে ; বহু চেষ্টা ও সন্ধানের পর এই দ্বিতীয় পণ্ডিতটার নিরীহতার প্রতি আমার যেরূপ সুগভীর অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল কোনো অতিক্ষুদ্র ঘটিবাটি-চোরের প্রতি তেমন হয় নাই।

অবশেষে একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদেরই বাসার অনতিদূরে একটি গ্যাসপোস্টের নীচে একটা মানুষ দেখিলাম, বিনা আবশ্যকে সে উৎসুকভাবে একই স্থানে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে। তাহাকে দেখিয়া আমার সন্দেহমাত্র রহিল না যে, সে একটি-কোনো গোপন দুরভিসন্ধির পশ্চাতে নিযুক্ত রহিয়াছে। নিজে অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাহার চেহারাখানা বেশ ভালো করিয়া দেখিয়া লইলাম— তরুণ বয়স, দেখিতে সুশ্রী ; আমি মনে মনে কহিলাম, দুষ্কর্ম করিবার এই তো ঠিক উপযুক্ত চেহারা ; নিজের মুখশ্রীই যাহাদের সর্বপ্রধান বিরুদ্ধ সাক্ষী তাহারা যেন সর্বপ্রকার অপরাধের কাজ সর্বপ্রযত্নে পরিহার করে ; সৎকার্য করিয়া তাহারা নিষ্ফল হইতে পারে, কিন্তু দুষ্কর্ম দ্বারা সফলতালাভও তাহাদের পক্ষে দুরাশা। দেখিলাম, এই ছোকরাটির চেহারাটাই ইহার সর্বপ্রধান বাহাদুরি ; সে জন্য আমি মনে মনে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার তারিফ করিলাম ; বলিলাম, 'ভগবান তোমাকে যে দুর্লভ সুবিধাটি দিয়াছেন সেটাকে রীতিমত কাজে খাটাইতে পার, তবে তো বলি সাবাস্‌।'

আমি অন্ধকার হইতে তাহার সম্মুখে আসিয়াই পৃষ্ঠে চপেটাঘাতপূর্বক বলিলাম, "এই যে, ভালো আছেন তো ?" সে তৎক্ষণাৎ প্রবলমাত্রায় চমকিয়া উঠিয়া একেবারে ফ্যাকাশে হইয়া উঠিল। আমি কহিলাম, মাপ করিবেন, ভুল হইয়াছে, হঠাৎ আপনাকে অন্য লোক ঠাওরাইয়াছিলাম।" মনে মনে কহিলাম 'কিছুমাত্র ভুল করি নাই, যাহা ঠাওরাইয়াছিলাম তাই বটে।' কিন্তু এতটা অধিক চমকিয়া ওঠা তাহার পক্ষে অনুপযুক্ত হইয়াছিল, ইহাতে আমি কিছু ক্ষুণ্ণ হইলাম। নিজের শরীরের প্রতি তাহার আরো অধিক দখল থাকা উচিত ছিল ; কিন্তু শ্রেষ্ঠতার সম্পূর্ণ আদর্শ অপরাধী শ্রেণীর মধ্যেও বিরল। চোরকেও সেরা চোর করিয়া তুলিতে প্রকৃতি কৃপণতা করিয়া থাকে।

অন্তরালে আসিয়া দেখিলাম, সে ত্রস্তভাবে গ্যাসপোস্ট ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

পিছনে পিছনে গেলাম; দেখিলাম, ছোকরাটি গোলদিঘির মধ্যে প্রবেশ করিয়া পুষ্করিণীতীরে তৃণশয্যার উপর চিত হইয়া শুইয়া পড়িল; আমি ভাবিলাম, উপায়চিন্তার এ একটা স্থান বটে, গ্যাসপোস্টের তলদেশ অপেক্ষা অনেকাংশে ভালো— লোকে যদি কিছু সন্দেহ করে তো বড়োজোর এই ভাবিতে পারে যে, ছোকরাটি অন্ধকার আকাশে প্রেয়সীর মুখচন্দ্র অঙ্কিত করিয়া কৃষ্ণপক্ষ রাত্রির অভাব পূরণ করিতেছে। ছেলেটির প্রতি উত্তরোত্তর আমার চিত্ত আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

অনুসন্ধান করিয়া তাহার বাসা জানিলাম। মন্মথ তাহার নাম, সে কলেজের ছাত্র, পরীক্ষা ফেল্‌ করিয়া গ্রীষ্মাবকাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহার বাসার সহবাসী ছাত্রগণ সকলেই আপন আপন বাড়ি চলিয়া গেছে। দীর্ঘ অবকাশকালে সকল ছাত্রই বাসা ছাড়িয়া পালায়, এই লোকটিকে কোন্‌ দুষ্টগ্রহ ছুটি দিতেছে না সেটা বাহির করিতে কৃতসংকল্প হইলাম।

আমিও ছাত্র সাজিয়া তাহার বাসার এক অংশ গ্রহণ করিলাম। প্রথম দিন যখন সে আমাকে দেখিল কেমন একরকম করিয়া সে আমার মুখের দিকে চাহিল, তাহার ভাবটা ভালো বুঝিলাম না। যেন সে বিস্মিত, যেন সে আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছে, এমনি একটা ভাব। বুঝিলাম, শিকারীর উপযুক্ত শিকার বটে, ইহাকে সোজাভাবে ফস্‌ করিয়া কায়দা করা যাইবে না।

অথচ যখন তাহার সহিত প্রণয়বন্ধনের চেষ্টা করিলাম তখন সে ধরা দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিল না। কিন্তু মনে হইল, সেও আমাকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে, সেও আমাকে চিনিতে চায়। মনুষ্যচরিত্রের প্রতি এইরূপ সদাসতর্ক সজাগ কৌতূহল, ইহা ওস্তাদের লক্ষণ। এত অল্প বয়সে এতটা চাতুরী দেখিয়া বড়ো খুশি হইলাম।

মনে ভাবিলাম, মাঝখানে একজন রমণী না আনিলে এই অসাধারণ অকালধূর্ত ছেলেটির হৃদয়দ্বার উদ্‌ঘাটন করা সহজ হইবে না।

একদিন গদ্‌গদকণ্ঠে মন্মথকে বলিলাম, "ভাই, একটি স্ত্রীলোককে আমি ভালোবাসি, কিন্তু সে আমাকে ভালোবাসে না।"

প্রথমটা সে যেন কিছু চকিতভাবে আমার মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "এরূপ দুর্যোগ বিরল নহে। এইপ্রকার মজা করিবার জন্যই কৌতুকপর বিধাতা নরনারীর প্রভেদ করিয়াছেন।"

আমি কহিলাম, "তোমার পরামর্শ ও সাহায্য চাহি।" সে সম্মত হইল।

আমি বানাইয়া বানাইয়া অনেক ইতিহাস কহিলাম; সে সাগ্রহে কৌতূহলে সমস্ত কথা শুনিল, কিন্তু অধিক কথা কহিল না। আমার ধারণা ছিল, ভালোবাসার,

বিশেষত গর্হিত ভালোবাসার, ব্যাপার প্রকাশ করিয়া বলিলে মানুষের মধ্যে অন্তরঙ্গতা দ্রুত বাড়িয়া উঠে; কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে তাহার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না, ছোকরাটি পূর্বাপেক্ষা যেন চুপ মারিয়া গেল, অথচ সকল কথা মনে গাঁথিয়া লইল। ছেলেটির প্রতি আমার ভক্তির সীমা রহিল না।

এ দিকে মন্মথ প্রত্যহ গোপনে দ্বার রোধ করিয়া কী করে, এবং তার গোপন অভিসন্ধি কিরূপে কতদূর অগ্রসর হইতেছে আমি তাহার ঠিকানা করিতে পারিলাম না, অথচ অগ্রসর হইতেছিল তাহার সন্দেহ নাই। কী একটা নিগূঢ় ব্যাপারে সে ব্যাপৃত আছে এবং সম্প্রতি সেটা অত্যন্ত পরিপক্ব হইয়াছে, তাহা এই নবযুবকটির মুখ দেখিবামাত্র বুঝা যাইত। আমি গোপন চাবিতে তাহার ডেস্‌ক খুলিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে একটা অত্যন্ত দুর্বোধ কবিতার খাতা, কলেজের বক্তৃতার নোট এবং বাড়ির লোকের গোটাকতক অকিঞ্চিৎকর চিঠি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় নাই। কেবল বাড়ির চিঠি হইতে এই প্রমাণ হইয়াছে যে, বাড়ি ফিরিবার জন্য আত্মীয়স্বজন বারম্বার প্রবল অনুরোধ করিয়াছে; তথাপি, তৎসত্ত্বেও বাড়ি না যাইবার একটা সংগত কারণ অবশ্য আছে; সেটা যদি ন্যায়সঙ্গত হইত তবে নিশ্চয় কথায় কথায় এতদিনে ফাঁস হইত, কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইবার সম্ভাবনা থাকাতেই এই ছোকরাটির গতিবিধি এবং ইতিহাস আমার কাছে এমন নিরতিশয় ঔৎসুক্যজনক হইয়াছে— যে অসামাজিক মনুষ্যসম্প্রদায় পাতালতলে সম্পূর্ণ আত্মগোপন করিয়া এই বৃহৎ মনুষ্যসমাজকে সর্বদাই নীচের দিক হইতে দোলায়মান করিয়া রাখিয়াছে, এই বালকটি সেই বিশ্বব্যাপী বহুপুরাতন বৃহৎজাতির একটি অঙ্গ, এ সামান্য একজন স্কুলের ছাত্র নহে; এ জগৎবক্ষবিহারিণী সর্বনাশিনীর একটি প্রলয়সহচর; আধুনিককালের চশমাপরা নিরীহ বাঙালী ছাত্রের বেশে কলেজের পাঠ অধ্যয়ন করিতেছে, নৃমুণ্ডধারী কাপালিক বেশে ইহার ভৈরবতা আমার নিকট আরো ভৈরবতর হইত না; আমি ইহাকে ভক্তি করি।

অবশেষে সশরীরে রমণীর অবতারণা করিতে হইল। পুলিসের বেতনভোগী হরিমতি আমার সহায় হইল। মন্মথকে জানাইলাম, আমি এই হরিমতির হতভাগ্য প্রণয়াকাঙ্ক্ষী, ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই আমি কিছুদিন গোলদিঘির ধারে মন্মথের পার্শ্বচর হইয়া 'আবার গগনে কেন সুধাংশু-উদয় রে' কবিতাটি বারম্বার আবৃত্তি করিলাম; এবং হরিমতিও কতকটা অন্তরের সহিত, কতকটা লীলাসহকারে জানাইল যে, তাহার চিত্ত সে মন্মথকে সমর্পণ করিয়াছে। কিন্তু আশানুরূপ ফল হইল না, মন্মথ সুদূর নির্লিপ্ত অবিচলিত কৌতূহলের সহিত সমস্ত পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

এমন সময় একদিন মধ্যাহ্নে তাহার ঘরের মেজেতে একখানি চিঠির গুটিকতক ছিন্নাংশ কুড়াইয়া পাইলাম। জোড়া দিয়া দিয়া এই অসম্পূর্ণ বাক্যটুকু আদায় করিলাম, "আজ সন্ধ্যা সাতটার সময় গোপনে তোমার বাসায়"— অনেক খুঁজিয়া আর কিছু বাহির করিতে পারিলাম না।

আমার অন্তঃকরণ পুলকিত হইয়া উঠিল; মাটির মধ্য হইতে কোনো বিলুপ্তবংশ প্রাচীন প্রাণীর একখণ্ড হাড় পাইলে প্রত্নজীবতত্ত্ববিদের কল্পনা যেমন মহানন্দে সজাগ হইয়া উঠে আমারও সেই অবস্থা হইল।

আমি জানিতাম, আজ রাত্রি দশটার সময় আমাদের বাসায় হরিমতির আবির্ভাব হইবার কথা আছে, ইতিমধ্যে সন্ধ্যা সাতটার সময় ব্যাপারখানা কী। ছেলেটির যেমন সাহস তেমনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। যদি কোনো গোপন অপরাধের কাজ করিতে হয় তবে ঘরে যেদিন কোনো একটা বিশেষ হাঙ্গামা সেই দিন অবকাশ বুঝিয়া করা ভালো। প্রথমত প্রধান ব্যাপারের দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট থাকে, দ্বিতীয়ত যেদিন যেখানে কোনো বিশেষ সমাগম আছে সেদিন সেখানে কেহ ইচ্ছাপূর্বক কোনো গোপন ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিবে ইহা কেহ সম্ভব মনে করে না।

হঠাৎ আমার সন্দেহ হইল যে, আমার সহিত এই নূতন বন্ধুত্ব এবং হরিমতির সহিত এই প্রেমাভিনয়, ইহাকেও মন্মথ আপন কার্যসিদ্ধির উপায় করিয়া লইয়াছে; এইজন্যই সে আপনাকে ধরাও দেয় না, আপনাকে ছাড়াইয়াও লয় না। আমরা তাহাকে তাহার গোপন কার্য হইতে আড়াল করিয়া রাখিয়াছি; সকলেই মনে করিতেছে যে, সে আমাদিগকে লইয়াই ব্যাপৃত রহিয়াছে— সেও সে ভ্রম দূর করিতে চায় না।

তর্কগুলা একবার ভাবিয়া দেখো। যে বিদেশী ছাত্র ছুটির সময় আত্মীয়স্বজনের অনুনয়বিনয় উপেক্ষা করিয়া শূন্য বাসায় একলা পড়িয়া থাকে, নির্জন স্থানে তাহার বিশেষ প্রয়োজন আছে এ-বিষয়ে কাহারো সংশয় থাকিতে পারে না, অথচ আমি তাহার বাসায় আসিয়া তাহার নির্জনতা ভঙ্গ করিয়াছি; এবং একটা রমণীর অবতারণা করিয়া নূতন উপদ্রব সৃজন করিয়াছি; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সে বিরক্ত হয় না, বাসা ছাড়ে না, আমাদের সঙ্গ হইতে দূরে থাকে না— অথচ হরিমতি অথবা আমার প্রতি তাহার তিলমাত্র আসক্তি জন্মে নাই ইহা নিশ্চয় সত্য, এমন-কি তাহার অসতর্ক অবস্থায় বারম্বার লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, আমাদের উভয়ের প্রতি তাহার একটা আন্তরিক ঘৃণা ক্রমেই যেন প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

ইহার একমাত্র তাৎপর্য এই যে, সজনতার সাফাইটুকু রক্ষা করিয়া নির্জনতার

সুবিধাটুকু ভোগ করিতে হইলে আমার মতো নবপরিচিত লোককে নিকটে রাখা সর্বাপেক্ষা সদুপায়; এবং কোনো বিষয়ে একান্তমনে লিপ্ত হওয়ার পক্ষে রমণীর মতো এমন সহজ ছুতা আর কিছু নাই। ইতিপূর্বে মন্মথর আচরণ যেরূপ নিরর্থক এবং সন্দেহজনক ছিল, আমাদের আগমনের পর তাহা সম্পূর্ণ লোপ হইল। কিন্তু এতটা দূরের কথা মুহূর্তের মধ্যে বিচার করিয়া দেখিতে পারে, এতবড়ো মতলবী লোক যে আমাদের বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করিতে পারে ইহা চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ হইয়া উঠিল— মন্মথ কিছু যদি মনে না করিত, তবে আমি বোধ হয় তাহাকে দুই হাতে বক্ষে চাপিয়া ধরিতে পারিতাম।

সেদিন মন্মথের সঙ্গে দেখা হইবামাত্র তাহাকে বলিলাম, "আজ তোমাকে সন্ধ্যা সাতটার সময় হোটেলে খাওয়াইব সংকল্প করিয়াছি।" শুনিয়া সে একটু চমকিয়া উঠিল, পরে আত্মসম্বরণ করিয়া কহিল, "ভাই, মাপ করো, আমার পাকযন্ত্রের অবস্থা আজ বড়ো শোচনীয়।" হোটেলের খানায় মন্মথর কখনো কোনো কারণে অনভিরুচি দেখি নাই, আজ তাহার অন্তরিন্দ্রিয় নিশ্চয়ই নিতান্তই দুরূহ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে।

সেদিন সন্ধ্যার পূর্বভাগে আমার বাসায় থাকিবার কথা ছিল না। কিন্তু আমি সেদিন গায়ে পড়িয়া নানা কথা পাড়িয়া বৈকালের দিকে কিছুতেই আর উঠিবার গা করিলাম না। মন্মথ মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল, আমার সকল মতের সঙ্গেই সে সম্পূর্ণ সম্মতি প্রকাশ করিল, কোনো তর্কের কিছুমাত্র প্রতিবাদ করিল না। অবশেষে ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ব্যাকুলচিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "হরিমতিকে আজ আনিতে যাইবে না?" আমি সচকিত ভাবে কহিলাম, "হাঁ হাঁ, সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তুমি, ভাই, আহারাদি প্রস্তুত করিয়া রাখো, আমি ঠিক সাড়ে দশটা রাত্রে তাহাকে এখানে আনিয়া উপস্থিত করিব।" এই বলিয়া চলিয়া গেলাম।

আনন্দের নেশা আমার সর্বশরীরের রক্তের মধ্যে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। সন্ধ্যা সাত ঘটিকার প্রতি মন্মথের যেপ্রকার ঔৎসুক্য দেখিলাম আমার ঔৎসুক্য তদপেক্ষা অল্প ছিল না; আমি আমাদের বাসার অনতিদূরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া প্রেয়সীসমাগমোৎকণ্ঠিত প্রণয়ীর ন্যায় মুহুর্মুহু ঘড়ি দেখিতে লাগিলাম। গোধূলির অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া যখন রাজপথে গ্যাস জ্বালিবার সময় হইল এমন সময় একটি রুদ্ধদ্বার পাল্‌কি আমাদের বাসার মধ্যে প্রবেশ করিল। ওই আচ্ছন্ন পাল্‌কিটির মধ্যে একটি অশ্রুসিক্ত অবগুণ্ঠিত পাপ, একটি মূর্তিমতী ট্র্যাজেডি কলেজের ছাত্রনিবাসের মধ্যে গুটিকতক

উড়ে বেহারার স্কন্ধে চাপিয়া সমুচ্চ হাই-হাই শব্দে অত্যন্ত অনায়াসে সহজভাবে প্রবেশ করিতেছে কল্পনা করিয়া আমার সর্বশরীরে অপূর্ব পুলকসঞ্চার হইল।

আমি আর অধিক বিলম্ব করিতে পারিলাম না। অনতিকাল পরে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বাহিয়া দোতলায় উঠিলাম। ইচ্ছা ছিল গোপনে লুকাইয়া দেখিয়া শুনিয়া লইব, কিন্তু তাহা ঘটিল না; কারণ, সিঁড়ির সম্মুখবর্তী ঘরেই সিঁড়ির দিকে মুখ করিয়া মন্মথ বসিয়াছিল, এবং গৃহের অপর প্রান্তে বিপরীতমুখে একটি অবগুণ্ঠিতা নারী বসিয়া মৃদুস্বরে কথা কহিতেছিল। যখন দেখিলাম মন্মথ আমাকে দেখিতে পাইয়াছে, তখন দ্রুত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই বলিলাম, "ভাই, আমার ঘড়িটা ঘরে ফেলিয়া আসিয়াছি, তাই লইতে আসিলাম।" মন্মথ এমনি অভিভূত হইয়া পড়িল যে, বোধ হইল যেন তখনই সে মাটিতে পড়িয়া যাইবে। আমি কৌতুক এবং আনন্দে নিরতিশয় ব্যগ্র হইয়া উঠিলাম; বলিলাম, "ভাই, তোমার অসুখ করিয়াছে না কি।" সে কোনো উত্তর দিতে পারিল না। তখন সেই কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ আড়ষ্ট অবগুণ্ঠিত নারীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি মন্মথর কে হন।" কোনো উত্তর পাইলাম না, কিন্তু দেখিলাম তিনি মন্মথর কেহই হন না, আমারই স্ত্রী হন! তাহার পর কী হইল সকলে জানেন।

এই আমার ডিটেকটিভ-পদের প্রথম চোর ধরা।

আমি কিয়ৎক্ষণ পরে ডিটেকটিভ মহিমচন্দ্রকে কহিলাম, "মন্মথর সহিত তোমার স্ত্রীর সম্বন্ধ সমাজবিরুদ্ধ না হইতেও পারে।"

মহিম কহিল, "না হইবারই সম্ভব। আমার স্ত্রীর বাক্স হইতে মন্মথর এই চিঠিখানি পাওয়া গেছে।" বলিয়া একখানি চিঠি আমার হাতে দিল; সেখানি নিম্নে প্রকাশিত হইল—

সুচরিতাসু,

হতভাগ্য মন্মথের কথা তুমি বোধ করি এতদিনে ভুলিয়া গিয়াছ। বাল্যকালে যখন কাজিবাড়ির মাতুলালয়ে যাইতাম, তখন সর্বদাই সেখান হইতে তোমাদের বাড়ি গিয়া তোমার সহিত অনেক খেলা করিয়াছি। আমাদের সে খেলাঘর এবং সে খেলার সম্পর্ক ভাঙিয়া গেছে। তুমি জান কি না বলিতে পারি না, একসময় ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিয়া এবং লজ্জার মাথা খাইয়া তোমার সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ-চেষ্টাও করিয়াছিলাম, কিন্তু আমাদের বয়স প্রায় এক বলিয়া উভয় পক্ষেরই কর্তারা কোনোক্রমে রাজি হইলেন না।

তাহার পর তোমার বিবাহ হইয়া গেলে চার-পাঁচ বৎসর তোমার আর কোনো

সন্ধান পাই নাই। আজ পাঁচ মাস হইল তোমার স্বামী কলিকাতার পুলিসের কর্ম লইয়া শহরে বদলি হইয়াছেন, খবর পাইয়া আমি তোমাদের বাসা সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছি।

তোমার সহিত সাক্ষাতের দুরাশা আমার নাই এবং অন্তর্যামী জানেন, তোমার গার্হস্থ্যসুখের মধ্যে উপদ্রবের মতো প্রবেশলাভ করিবার দুরভিসন্ধিও আমি রাখি না। সন্ধ্যার সময় তোমাদের বাসার সম্মুখবর্তী একটি গ্যাসপোস্টের তলে আমি সূর্যোপাসকের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকি, তুমি ঠিক সাড়ে-সাতটার সময় একটি প্রজ্জ্বলিত কেরোসিন ল্যাম্প লইয়া প্রত্যহ নিয়মিত তোমাদের দোতলার দক্ষিণ দিকের ঘরের কাঁচের জানলাটির সম্মুখে স্থাপন কর; সেইসময় মুহূর্তকালের জন্য তোমার দীপালোকিত প্রতিমাখানি আমার দৃষ্টিপথে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তোমার সম্বন্ধে আমার এই একটিমাত্র অপরাধ।

ইতিমধ্যে ঘটনাক্রমে তোমার স্বামীর সহিত আমার আলাপ এবং ক্রমে ঘনিষ্ঠতাও হইয়াছে। তাঁহার চরিত্র যেরূপ দেখিলাম তাহাতে বুঝিতে বাকি নাই যে, তোমার জীবন সুখের নহে। তোমার প্রতি আমার কোনোপ্রকার সামাজিক অধিকার নাই, কিন্তু যে বিধাতা তোমার দুঃখকে আমার দুঃখে পরিণত করিয়াছেন তিনিই সে দুঃখ-মোচনের চেষ্টাভার আমার উপরেই স্থাপন করিয়াছেন।

অতএব আমার স্পর্ধা মাপ করিয়া শুক্রবার সন্ধ্যাবেলায় ঠিক সাতটার সময় গোপনে পালকি করিয়া একবার বিশ মিনিটের জন্য আমার বাসায় আসিলে আমি তোমাকে তোমার স্বামী সম্বন্ধে কতকগুলি গোপন কথা বলিতে চাহি, যদি বিশ্বাস না কর এবং যদি সহ্য করিতে পার তবে তৎসম্বন্ধে প্রমাণও দেখাইতে পারি, এবং সেই সঙ্গে কতকগুলি পরামর্শ দিতেও ইচ্ছা করি; আমি ভগবানকে অন্তরে রাখিয়া আশা করিতেছি, সেই পরামর্শমতে চলিলে তুমি একদিন সুখী হইতে পারিবে।

আমার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ নহে। ক্ষণকালের জন্য তোমাকে সম্মুখে দেখিব, তোমার কথা শুনিব এবং তোমার চরণতলস্পর্শে আমার গৃহখানিকে চিরকালের জন্য সুখস্বপ্নমণ্ডিত করিয়া তুলিব, এ আকাঙ্ক্ষাও আমার অন্তরে আছে। যদি আমাকে বিশ্বাস না কর এবং যদি এ সুখ হইতেও আমাকে বঞ্চিত করিতে চাও, তবে সে কথা আমাকে লিখিয়ো, আমি তদুত্তরে পত্রযোগেই সকল কথা জানাইব। যদি চিঠি লিখিবার বিশ্বাসও না থাকে তবে আমার এই পত্রখানি তোমার স্বামীকে দেখাইয়ো, তাহার পরে আমার যাহা বক্তব্য তাহা তাঁহাকেই বলিব।

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার

আষাঢ় ১৩০৫

অধ্যাপক

প্রথম পরিচ্ছেদ

কলেজে আমার সহপাঠীসম্প্রদায়ের মধ্যে আমার একটু বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। সকলেই আমাকে সকল বিষয়েই সমজদার বলিয়া মনে করিত।

ইহার প্রধান কারণ, ভুল হউক আর ঠিক হউক, সকল বিষয়েই আমার একটা মতামত ছিল। অধিকাংশ লোকেই হাঁ এবং না জোর করিয়া বলিতে পারে না, আমি সেটা খুব বলিতাম।

কেবল যে আমি মতামত লইয়া ছিলাম তাহা নহে, নিজেও রচনা করিতাম; বক্তৃতা দিতাম, কবিতা লিখিতাম, সমালোচনা করিতাম, এবং সর্বপ্রকারেই আমার সহপাঠীদের ঈর্ষা ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলাম।

কালেজে এইরূপে শেষপর্যন্ত আপন মহিমা মহীয়ান রাখিয়া বাহির হইয়া আসিতে পারিতাম। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার খ্যাতিস্থানের শনি এক নূতন অধ্যাপকের মূর্তি ধারণ করিয়া কালেজে উদিত হইল।

আমাদের তখনকার সেই নবীন অধ্যাপকটি আজকালকার একজন সুবিখ্যাত লোক, অতএব আমার এই জীবনবৃত্তান্তে তাঁহার নাম গোপন করিলেও তাঁহার উজ্জ্বল নামের বিশেষ ক্ষতি হইবে না। আমার প্রতি তাঁহার আচরণ লক্ষ করিয়া বর্তমান ইতিহাসে তাঁহাকে বামাচরণবাবু বলিয়া ডাকা যাইবে।

ইঁহার বয়স যে আমাদের অপেক্ষা অধিক ছিল তাহা নহে; অল্পদিন হইল এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম হইয়া টনি সাহেবের বিশেষ প্রশংসালাভ করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু লোকটি ব্রাহ্ম বলিয়া কেমন তাঁহাকে অত্যন্ত সুদূর এবং স্বতন্ত্র মনে হইত, আমাদের সমকালীন সমবয়স্ক বলিয়া বোধ হইত না। আমরা নব্যহিন্দুর দল পরস্পরের মধ্যে তাঁহাকে ব্রহ্মদৈত্য বলিয়া ডাকিতাম।

আমাদের একটি তর্কসভা ছিল। আমি সে সভার বিক্রমাদিত্য এবং আমিই সে-সভার নবরত্ন ছিলাম। আমরা ছত্রিশজন সভ্য ছিলাম, তন্মধ্যে পঁয়ত্রিশ জনকে গণনা হইতে বাদ দিলে কোনো ক্ষতি হইত না এবং অবশিষ্ট একজনের যোগ্যতা সম্বন্ধে আমার যেরূপ ধারণা উক্ত পঁয়ত্রিশ জনেরও সেইরূপ ধারণা ছিল।

এই সভার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে আমি কার্লাইলের সমালোচনা করিয়া এক ওজস্বী প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলাম। মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তাহার অসাধারণত্বে

শ্রোতামাত্রেই চমৎকৃত হইবে— চমৎকৃত হইবার কথা ছিল, কারণ, আমার প্রবন্ধে কার্লাইলকে আদ্যোপান্ত নিন্দা করিয়াছিলাম।

সে অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন বামাচরণবাবু। প্রবন্ধপাঠ শেষ হইলে আমার সহাধ্যায়ী ভক্তগণ আমার মতের অসমসাহসিকতা ও ইংরাজিভাষায় বিশুদ্ধ তেজস্বিতায় বিমুগ্ধ ও নিরুত্তর হইয়া বসিয়া রহিল। কাহারো কিছু বক্তব্য নাই শুনিয়া বামাচরণবাবু উঠিয়া শান্তগম্ভীর স্বরে সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিলেন যে, আমেরিকার সুলেখক সুবিখ্যাত লাউয়েল সাহেবের প্রবন্ধ হইতে আমার প্রবন্ধটির যে-অংশ চুরি সে-অংশ অতি চমৎকার, এবং যে-অংশ আমার সম্পূর্ণ নিজের সেটুকু পরিত্যাগ করিলেই ভালো হইত।

যদি তিনি বলিতেন, লাউয়েলের সহিত নবীন প্রবন্ধলেখকের মতের এমন-কি ভাষারও আশ্চর্য অবিকল ঐক্য দেখা যাইতেছে, তাহা হইলে তাঁহার কথাটা সত্যও হইত অথচ অপ্রিয়ও হইত না।

এই ঘটনার পর, সহপাঠীমহলে আমার প্রতি যে অখণ্ড বিশ্বাস ছিল তাহাতে একটি বিদারণরেখা পড়িল। কেবল আমার চিরানুরক্ত ভক্তাগ্রগণ্য অমূল্যচরণের হৃদয়ের লেশমাত্র বিকার জন্মিল না। সে আমাকে বারম্বার বলিতে লাগিল, "তোমার বিদ্যাপতি নাটকখানা ব্রহ্মদৈত্যকে শুনাইয়া দাও, দেখি সে সম্বন্ধে নিন্দুক কী বলিতে পারে।"

রাজা শিবসিংহের মহিষী লছিমাদেবীকে কবি বিদ্যাপতি ভালোবাসিতেন এবং তাঁহাকে না দেখিলে তিনি কবিতা রচনা করিতে পারিতেন না। এই মর্ম অবলম্বন করিয়া আমি একখানি পরম শোকাবহ উচ্চশ্রেণীর পদ্যনাটক রচনা করিয়াছিলাম; আমার শ্রোতৃবর্গের মধ্যে যাঁহারা পুরাতত্ত্বের মর্যাদা লঙ্ঘন করিতে চাহেন না তাঁহারা বলিতেন, ইতিহাসে এরূপ ঘটনা ঘটে নাই। আমি বলিতাম, সে ইতিহাসের দুর্ভাগ্য! ঘটিলে ইতিহাস ঢের বেশি সরস ও সত্য হইত।

নাটকখানি যে উচ্চশ্রেণীর সে কথা আমি পূর্বেই বলিয়াছি। অমূল্য বলিত সর্বোচ্চ-শ্রেণীর। আমি আপনাকে যতটা মনে করিতাম, সে আবার আমাকে তাহারও চেয়ে বেশি মনে করিত। অতএব, আমার যে কী-এক বিরাট রূপ তাহার চিত্তে প্রতিফলিত ছিল, আমিও তাহার ইয়ত্তা করিতে পারিতাম না।

নাটকখানি বামাচরণবাবুকে শুনাইয়া দিবার পরামর্শ আমার কাছে মন্দ লাগিল না; কারণ, সে নাটকে নিন্দাযোগ্য ছিদ্র লেশমাত্র ছিল না এইরূপ আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস। অতএব, আর-একদিন তর্কসভার বিশেষ অধিবেশন আহূত হইল, ছাত্রবৃন্দের

সমক্ষে আমি আমার নাটকখানি পাঠ করিলাম এবং বামাচরণবাবু তাহার সমালোচনা করিলেন।

সে সমালোচনাটি বিস্তারিত আকারে লিপিবদ্ধ করিবার প্রবৃত্তি আমার নাই। সংক্ষেপত, সমালোচনাটি আমার অনুকূল হয় নাই; বামাচরণবাবুর মতে নাটকগত পাত্রগণের চরিত্র ও মনোভাব-সকল নির্দিষ্ট বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। বড়ো বড়ো সাধারণ ভাবের কথা আছে, কিন্তু তাহা বাষ্পবৎ অনিশ্চিত, লেখকের অন্তরের মধ্যে আকার ও জীবন প্রাপ্ত হইয়া তাহা সৃজিত হইয়া উঠে নাই।

বৃশ্চিকের পুচ্ছদেশেই হুল থাকে, বামাচরণবাবুর সমালোচনার উপসংহারেই তীব্রতম বিষ সঞ্চিত ছিল। আসন গ্রহণ করিবার পূর্বে তিনি বলিলেন, আমার এই নাটকের অনেকগুলি দৃশ্য এবং মূলভাবটি গেটে-রচিত টাসো নাটকের অনুকরণ, এমন কি অনেকস্থলে অনুবাদ।

এ কথার সদুত্তর ছিল। আমি বলিতে পারিতাম, হউক অনুকরণ, কিন্তু সেটা নিন্দার বিষয় নহে! সাহিত্যরাজ্যে চুরিবিদ্যা বড়ো বিদ্যা, এমন-কি, ধরা পড়িলেও। সাহিত্যের বড়ো বড়ো মহাজনগণ এই কাজ করিয়া আসিয়াছেন, এমন-কি, সেক্স-পিয়রও বাদ যান না। সাহিত্যে যাহার অরিজিন্যালিটি অত্যন্ত অধিক সেই চুরি করিতে সাহস করে, কারণ, সে পরের জিনিসকে সম্পূর্ণ আপনার করিতে পারে।

ভালো ভালো এইরূপ আরো অনেক কথা ছিল, কিন্তু সেদিন বলা হয় নাই। বিনয় তাহার কারণ নহে। আসল কথা, সেদিন একটি কথাও মনে পড়ে নাই। প্রায় পাঁচ-সাতদিন পরে একে একে উত্তরগুলি দৈবাগত ব্রহ্মাস্ত্রের ন্যায় আমার মনে উদয় হইতে লাগিল; কিন্তু শত্রুপক্ষ সম্মুখে উপস্থিত না থাকাতে সে অস্ত্রগুলি আমাকেই বিঁধিয়া মারিল। ভাবিতাম, এ কথাগুলো অন্তত আমার ক্লাসের ছাত্রদিগকে শুনাইয়া দিব। কিন্তু উত্তরগুলি আমার সহাধ্যায়ী গর্দভদিগের বুদ্ধির পক্ষে কিছু অতিমাত্র সূক্ষ্ম ছিল! তাহারা জানিত, চুরিমাত্রেই চুরি; আমার চুরি এবং অন্যের চুরিতে যে কতটা প্রভেদ আছে তাহা বুঝিবার সামর্থ্য যদি তাহাদের থাকিত তবে আমার সহিতও তাহাদের বিশেষ প্রভেদ থাকিত না।

বি. এ পরীক্ষা দিলাম, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিব তাহাতেও আমার সন্দেহ ছিল না; কিন্তু মনে আনন্দ রহিল না। বামাচরণের সেই গুটিকতক কথার আঘাতে আমার সমস্ত খ্যাতি ও আশার অভ্রভেদী মন্দির ভগ্নস্তূপ হইয়া পড়িল। কেবল আমার প্রতি অবোধ অমূল্যের শ্রদ্ধা কিছুতেই হ্রাস হইল না; প্রভাতে যখন যশঃসূর্য আমার সম্মুখে উদিত ছিল তখনো সেই শ্রদ্ধা অতি দীর্ঘ ছায়ার ন্যায় আমার পদতললগ্ন হইয়া

ছিল, আবার সায়াহ্নে যখন আমার যশঃসূর্য পশ্চাতে অস্তোন্মুখ হইল তখনো সেই শ্রদ্ধা দীর্ঘায়তন বিস্তার করিয়া আমার পদপ্রান্ত পরিত্যাগ করিল না। কিন্তু এ শ্রদ্ধায় কোনো পরিতৃপ্তি নাই, ইহা শূন্য ছায়ামাত্র, ইহা মূঢ় ভক্তহৃদয়ের মোহান্ধকার, ইহা বুদ্ধির উজ্জ্বল রশ্মিপাত নহে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাবা বিবাহ দিবার জন্য আমাকে দেশ হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি কিছুদিন সময় লইলাম।

বামাচরণবাবুর সমালোচনায় আমার নিজের মধ্যে একটা আত্মবিরোধ, নিজের প্রতি নিজের একটা বিদ্রোহভাব জন্মিয়াছিল। আমার সমালোচক অংশ আমার লেখক অংশকে গোপনে আঘাত দিতেছিল। আমার লেখক অংশ বলিতেছিল, আমি ইহার প্রতিশোধ লইব; আবার একবার লিখিব এবং তখন দেখিব, আমি বড়ো না আমার সমালোচক বড়ো।

মনে মনে স্থির করিলাম, বিশ্বপ্রেম, পরের জন্য আত্মবিসর্জন এবং শত্রুকে মার্জনা —এই ভাবটি অবলম্বন করিয়া গদ্যে হউক পদ্যে হউক, খুব 'সাব্লাইম'-গোছের একটা-কিছু লিখিব; বাঙালী সমালোচকদিগকে সুবৃহৎ সমালোচনার খোরাক জোগাইব।

স্থির করিলাম, একটি সুন্দর নির্জন স্থানে বসিয়া আমার জীবনের এই সর্বপ্রধান কীর্তিটির সৃষ্টিকার্য সমাধা করিব। প্রতিজ্ঞা করিলাম, অন্তত একমাসকাল বন্ধুবান্ধব পরিচিত অপরিচিত কাহারো সহিত সাক্ষাৎ করিব না।

অমূল্যকে ডাকিয়া আমার প্ল্যান বলিলাম। সে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল, সে যেন তখনই আমার ললাটে স্বদেশের অনতিদূরবর্তী ভাবী মহিমার প্রথম অরুণ-জ্যোতি দেখিতে পাইল। গম্ভীর মুখে আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বিস্ফারিত নেত্র আমার মুখের প্রতি স্থাপন করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "যাও, ভাই, অমর কীর্তি অক্ষয় গৌরব অর্জন করিয়া আইস।"

আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল; মনে হইল, যেন আসন্নগৌরবগর্বিত ভক্তিবিহ্বল বঙ্গদেশের প্রতিনিধি হইয়া অমূল্য এই কথাগুলি আমাকে বলিল।

অমূল্যও বড়ো কম ত্যাগস্বীকার করিল না; সে স্বদেশের হিতের জন্য সুদীর্ঘ একমাসকাল আমার সঙ্গপ্রত্যাশা সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন করিল। সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস

ফেলিয়া আমার বন্ধু ট্রামে চড়িয়া তাহার কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের বাসায় চলিয়া গেল, আমি গঙ্গার ধারে ফরাসডাঙার বাগানে অমর কীর্তি অক্ষয় গৌরব উপার্জন করিতে গেলাম।

গঙ্গার ধারে নির্জন ঘরে চিত হইয়া শুইয়া বিশ্বজনীন প্রেমের কথা ভাবিতে ভাবিতে মধ্যাহ্নে প্রগাঢ় নিদ্রাবেশ হইত, একেবারে অপরাহ্ণে পাঁচটার সময় জাগিয়া উঠিতাম। তাহার পর শরীর-মনটা কিছু অবসাদগ্রস্ত হইয়া থাকিত; কোনোমতে চিত্তবিনোদন ও সময়যাপনের জন্য বাগানের পশ্চাদ্দিকে রাজপথের ধারে একটা ছোটো কাষ্ঠাসনে বসিয়া চুপচাপ করিয়া গোরুর গাড়ি ও লোক-চলাচল দেখিতাম। নিতান্ত অসহ্য হইলে স্টেশনে গিয়া বসিতাম, টেলিগ্রাফের কাঁটা কট্‌কট্‌ শব্দ করিত, টিকিটের ঘণ্টা বাজিত, লোকসমাগম হইত, রক্তচক্ষু সহস্রপদ লৌহসরীসৃপ ফুঁষিতে ফুঁষিতে আসিত, উৎকট চীৎকার করিয়া চলিয়া যাইত, লোকজনের হুড়ামুড়ি পড়িত, কিয়ৎক্ষণের জন্য কৌতুকবোধ করিতাম। বাড়ি ফিরিয়া, আহার করিয়া, সঙ্গী অভাবে সকাল-সকাল শুইয়া পড়িতাম, এবং প্রাতঃকালে সকাল-সকাল উঠিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন না থাকাতে বেলা আট-নয়টা পর্যন্ত বিছানায় যাপন করিতাম।

শরীর মাটি হইল, বিশ্বপ্রেমেরও কোনো অন্ধিসন্ধি খুঁজিয়া পাইলাম না। কোনোকালে একা থাকা অভ্যাস না থাকাতে সঙ্গীহীন গঙ্গাতীর শূন্য শ্মশানের মতো বোধ হইতে লাগিল; অমূল্যটাও এমনি গর্দভ যে, একদিনের জন্যও সে আপন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিল না।

ইতিপূর্বে কলিকাতায় বসিয়া ভাবিতাম, বিপুলচ্ছায়া বটবৃক্ষের তলে পা ছড়াইয়া বসিব, পদপ্রান্তে কলনাদিনী স্রোতস্বিনী আপন-মনে বহিয়া চলিবে— মাঝখানে স্বপ্নাবিষ্ট কবি, এবং চারি দিকে তাহার ভাবরাজ্য ও বহিঃপ্রকৃতি— কাননে পুষ্প, শাখায় বিহঙ্গ, আকাশে তারা, মনের মধ্যে বিশ্বজনীন প্রেম এবং লেখনীমুখে অশ্রান্ত অজস্র ভাবস্রোত বিচিত্র ছন্দে প্রবাহিত। কিন্তু কোথায় প্রকৃতি এবং কোথায় প্রকৃতির কবি, কোথায় বিশ্ব আর কোথায় বিশ্বপ্রেমিক! একদিনের জন্যও বাগানে বাহির হই নাই। কাননের ফুল কাননে ফুটিত, আকাশের তারা আকাশে উঠিত, বটবৃক্ষের ছায়া বটবৃক্ষের তলে পড়িত, আমিও ঘরের ছেলে ঘরেই পড়িয়া থাকিতাম।

আত্মমাহাত্ম্য কিছুতেই প্রমাণ করিতে না পারিয়া বামাচরণের প্রতি আক্রোশ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

সে সময়টাতে বাল্যবিবাহ লইয়া বাঙলার শিক্ষিতসমাজে একটা বাগ্‌যুদ্ধ

বাধিয়াছিল। বামাচরণ বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধ পক্ষে ছিলেন এবং পরম্পর শোনা গিয়াছিল যে তিনি একটি যুবতী কুমারীর প্রণয়পাশে আবদ্ধ এবং অচিরে পরিণয়-পাশে বদ্ধ হইবার প্রত্যাশায় আছেন।

বিষয়টা আমার কাছে অত্যন্ত কৌতুকাবহ ঠেকিয়াছিল, এবং বিশ্বপ্রেমের মহাকাব্যও ধরা দিল না, তাই বসিয়া বসিয়া বামাচরণকে নায়কের আদর্শ করিয়া কদম্বকলি মজুমদার নামক একটি কাল্পনিক যুবতীকে নায়িকা খাড়া করিয়া সুতীব্র এক প্রহসন লিখিলাম। লেখনী এই অমর কীর্তিটি প্রসব করিবার পর আমি কলিকাতা যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। এমন সময় যাত্রায় ব্যাঘাত পড়িল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

একদিন অপরাহ্ণে স্টেশনে না গিয়া অলসভাবে বাগানবাড়ির ঘরগুলি পরিদর্শন করিতেছিলাম। আবশ্যক না হওয়াতে ইতিপূর্বে অধিকাংশ ঘরে পদার্পণ করি নাই, বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে আমার কৌতূহল বা অভিনিবেশ লেশমাত্র ছিল না। সেদিন নিতান্তই সময়যাপনের উদ্দেশে বায়ুভরে উড্ডীন চ্যুতপত্রের মতো ইতস্তত ফিরিতেছিলাম।

উত্তর দিকের ঘরের দরজা খুলিবামাত্র একটি ক্ষুদ্র বারান্দায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। বারান্দার সম্মুখেই বাগানের উত্তরসীমার প্রাচীরের গাত্রসংলগ্ন দুইটি বৃহৎ জামের গাছ মুখামুখী করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সেই দুইটি গাছের মধ্যবর্তী অবকাশ দিয়া আর-একটি বাগানের সুদীর্ঘ বকুলবীথির কিয়দংশ দেখা যায়।

কিন্তু সে-সমস্তই আমি পরে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, তখন আমার আর-কিছুই দেখিবার অবসর হয় নাই, কেবল দেখিয়াছিলাম, একটি ষোড়শী যুবতী হাতে একখানি বই লইয়া মস্তক আনমিত করিয়া পদচারণা করিতে করিতে অধ্যয়ন করিতেছে।

ঠিক সে-সময়ে কোনোরূপ তত্ত্বালোচনা করিবার ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু কিছুদিন পরে ভাবিয়াছিলাম যে, দুষ্মন্ত বড়ো বড়ো বাণ শরাসন বাগাইয়া রথে চড়িয়া বনে মৃগয়া করিতে আসিয়াছিলেন, মৃগ তো মরিল না, মাঝে হইতে দৈবাৎ দশমিনিট কাল গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া যাহা দেখিলেন, যাহা শুনিলেন, তাহাই তাঁহার জীবনের সকল দেখাশুনার সেরা হইয়া দাঁড়াইল। আমিও পেন্সিল কলম এবং খাতাপত্র উদ্যত করিয়া কাব্যমৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলাম, বিশ্বপ্রেম বেচারা তো পলাইয়া রক্ষা পাইল, আর আমি দুইটি জামগাছের আড়াল হইতে যাহা দেখিবার তাহা দেখিয়া লইলাম; মানুষের একটা জীবনে এমন দুইবার দেখা যায় না।

পৃথিবীতে অনেক জিনিসই দেখি নাই। জাহাজে উঠি নাই, বেলুনে চড়ি নাই, কয়লার খনির মধ্যে নামি নাই— কিন্তু আমার নিজের মানসী আদর্শের সম্বন্ধে আমি যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং অজ্ঞ ছিলাম তাহা এই উত্তর দিকের বারান্দায় আসিবার পূর্বে সন্দেহমাত্র করি নাই। বয়স একুশ প্রায় উত্তীর্ণ হয়, ইতিমধ্যে আমার অন্তঃকরণ কল্পনাযোগবলে নারীসৌন্দর্যের একটা ধ্যানমূর্তি যে সৃজন করিয়া লয় নাই, এ কথা বলিতে পারি না। সেই মূর্তিকে নানা বেশভূষায় সজ্জিত এবং নানা অবস্থার মধ্যে স্থাপন করিয়াছি, কিন্তু কখনো সুদূর স্বপ্নেও তাহার পায়ে জুতা, গায়ে জামা, হাতে বই দেখিব এমন আশাও করি নাই, ইচ্ছাও করি নাই। কিন্তু আমার লক্ষ্মী ফাল্গুন-শেষের অপরাহ্নে প্রবীণ তরুশ্রেণীর আকম্পিত ঘনপল্লববিতানে দীর্ঘনিপতিত ছায়া- এবং আলোক-রেখাঙ্কিত পুষ্পবনপথে, জুতা পায়ে দিয়া, জামা গায়ে দিয়া, বই হাতে করিয়া, দুইটি জামগাছের আড়ালে অকস্মাৎ দেখা দিলেন— আমিও কোনো কথাটি কহিলাম না।

দুই মিনিটের বেশি আর দেখা গেল না। নানা ছিদ্র দিয়া দেখিবার নানা চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু কোনো ফল পাই নাই। সেইদিন প্রথম সন্ধ্যার প্রাক্কালে বটবৃক্ষতলে প্রসারিত চরণে বসিলাম— আমার চোখের সম্মুখে পরপারের ঘনীভূত তরুশ্রেণীর উপর সন্ধ্যাতারা প্রশান্ত স্মিতহাস্যে উদিত হইল, এবং দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যাশ্রী আপন নাথহীন বিপুল নির্জন বাসরগৃহের দ্বার খুলিয়া দিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

যে বইখানি তাহার হাতে দেখিয়াছিলাম সেটা আমার পক্ষে একটা নূতন রহস্য-নিকেতন হইয়া দাঁড়াইল। ভাবিতে লাগিলাম, সেটা কী বই। উপন্যাস অথবা কাব্য? তাহার মধ্যে কী ভাবের কথা আছে। যে পাতাটি খোলা ছিল এবং যাহার উপরে সেই অপরাহ্নবেলার ছায়া ও রবিরশ্মি, সেই বকুলবনের পল্লবমর্মর এবং সেই যুগলচক্ষুর ঔৎসুক্যপূর্ণ স্থিরদৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল, ঠিক সেই পাতাটিতে গল্পের কোন্ অংশ, কাব্যের কোন্ রসটুকু প্রকাশ পাইতেছিল। সেইসঙ্গে ভাবিতে লাগিলাম, ঘনমুক্ত কেশজালের অন্ধকারচ্ছায়াতলে সুকুমার ললাটমণ্ডপটির অভ্যন্তরে বিচিত্র ভাবের আবেশ কেমন করিয়া লীলায়িত হইয়া উঠিতেছিল, কুমারীহৃদয়ের নিভৃত নির্জনতার উপরে নব নব কাব্যমায়া কী অপূর্ব সৌন্দর্যলোক সৃজন করিতেছিল —অর্ধেক রাত্রি ধরিয়া এমন কত কী ভাবিয়াছিলাম তাহা পরিস্ফুটরূপে ব্যক্ত করা অসম্ভব।

কিন্তু, সে যে কুমারী এ কথা আমাকে কে বলিল। আমার বহুপূর্ববর্তী প্রেমিক

দুষ্মন্তকে পরিচয়লাভের পূর্বেই যিনি শকুন্তলা সম্বন্ধে আশ্বাস দিয়াছিলেন, তিনিই। তিনি মনের বাসনা; তিনি মানুষকে সত্য মিথ্যা ঢের কথা অজস্র বলিয়া থাকেন; কোনোটা খাটে, কোনোটা খাটে না, দুষ্মন্তের এবং আমারটা খাটিয়া গিয়াছিল।

আমার এই অপরিচিতা প্রতিবেশিনী বিবাহিতা কি কুমারী কি ব্রাহ্মণ কি শূদ্র, সে সংবাদ লওয়া আমার পক্ষে কঠিন ছিল না, কিন্তু তাহা করিলাম না, কেবল নীরব চকোরের মতো বহুসহস্র যোজন দূর হইতে আমার চন্দ্রমণ্ডলটিকে বেষ্টন করিয়া করিয়া ঊর্ধ্বকণ্ঠে নিরীক্ষণ করিবার চেষ্টা করিলাম।

পরদিন মধ্যাহ্নে একখানি ছোটো নৌকা ভাড়া করিয়া তীরের দিকে চাহিয়া জোয়ার বাহিয়া চলিলাম, মাল্লাদিগকে দাঁড় টানিতে নিষেধ করিয়া দিলাম।

আমার শকুন্তলার তপোবনকুটিরটি গঙ্গার ধারেই ছিল। কুটিরটি ঠিক কণ্বের কুটিরের মতো ছিল না; গঙ্গা হইতে ঘাটের সিঁড়ি বৃহৎ বাড়ির বারান্দার উপর উঠিয়াছে, বারান্দাটি ঢালু কাঠের ছাদ দিয়া ছায়াময়।

আমার নৌকাটি যখন নিঃশব্দে ঘাটের সম্মুখে ভাসিয়া আসিল, দেখিলাম আমার নবযুগের শকুন্তলা বারান্দার ভূমিতলে বসিয়া আছেন; পিঠের দিকে একটা চৌকি, চৌকির উপরে গোটাকতক বই রহিয়াছে, সেই বইগুলির উপরে তাঁহার খোলা চুল স্তূপাকারে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তিনি সেই চৌকিতে ঠেস্ দিয়া ঊর্ধ্বমুখ করিয়া উত্তোলিত বাম বাহুর উপর মাথা রাখিয়াছেন, নৌকা হইতে তাঁহার মুখ অদৃশ্য, কেবল সুকোমল কণ্ঠের একটি সুকুমার বক্ররেখা দেখা যাইতেছে, খোলা দুইখানি পদপল্লবের একটি ঘাটের উপরের সিঁড়িতে এবং একটি তাহার নীচের সিঁড়িতে প্রসারিত, শাড়ির কালো পাড়টি বাঁকা হইয়া পড়িয়া সেই দুটি পা বেষ্টন করিয়া আছে। একখানা বই মনোযোগহীন শিথিল দক্ষিণ হস্ত হইতে স্রস্ত হইয়া ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে। মনে হইল, যেন মূর্তিমতী মধ্যাহ্নলক্ষ্মী! সহসা দিবসের কর্মের মাঝখানে একটি নিস্পন্দসুন্দরী অবসরপ্রতিমা। পদতলে গঙ্গা, সম্মুখে সুদূর পরপার এবং ঊর্ধ্বে তীব্রতাপিত নীলাম্বর তাহাদের সেই অন্তরাত্মারূপিণীর দিকে, সেই দুটি খোলা পা, সেই অলসবিন্যস্ত বাম বাহু, সেই উৎক্ষিপ্ত বঙ্কিম কণ্ঠরেখার দিকে নিরতিশয় নিস্তব্ধ একাগ্রতার সহিত নীরবে চাহিয়া আছে।

যতক্ষণ দেখা যায় দেখিলাম, দুই সজলপল্লব নেত্রপাতের দ্বারা দুইখানি চরণপদ্ম বারম্বার নিছিয়া মুছিয়া লইলাম।

অবশেষে নৌকা যখন দূরে গেল, মাঝখানে একটা তীরতরুর আড়াল আসিয়া পড়িল, তখন হঠাৎ যেন কী একটা ত্রুটি স্মরণ হইল, চমকিয়া মাঝিকে কহিলাম,

"মাঝি, আজ আর আমার হুগলি যাওয়া হইল না, এইখান হইতেই বাড়ি ফেরো।" কিন্তু ফিরিবার সময় উজানে দাঁড় টানিতে হইল, সেই শব্দে আমি সংকুচিত হইয়া উঠিলাম। সেই দাঁড়ের শব্দে যেন এমন কাহাকে আঘাত করিতে লাগিল যাহা সচেতন সুন্দর সুকুমার, যাহা অনন্ত-আকাশ-ব্যাপী অথচ একটি হরিণশাবকের মতো ভীরু। নৌকা যখন ঘাটের নিকটবর্তী হইল তখন দাঁড়ের শব্দে আমার প্রতিবেশিনী প্রথমে ধীরে মুখ তুলিয়া মৃদু কৌতূহলের সহিত আমার নৌকার দিকে চাহিল, মুহূর্ত পরেই আমার ব্যগ্রব্যাকুল দৃষ্টি দেখিয়া সে চকিত হইয়া গৃহমধ্যে চলিয়া গেল ; আমার মনে হইল, আমি যেন তাহাকে আঘাত করিলাম, যেন কোথায় তাহার বাজিল !

তাড়াতাড়ি উঠিবার সময় তাহার ক্রোড় হইতে একটি অর্ধদষ্ট স্বল্পপক্ব পেয়ারা গড়াইতে গড়াইতে নিম্ন সোপানে আসিয়া পড়িল, সেই দশনচিহ্নিত অধরচুম্বিত ফলটির জন্য আমার সমস্ত অন্তঃকরণ উৎসুক হইয়া উঠিল, কিন্তু মাঝিমাল্লাদের লজ্জায় তাহা দূর হইতে নিরীক্ষণ করিতে করিতে চলিয়া গেলাম। দেখিলাম, উত্তরোত্তর লোলুপায়মান জোয়ারের জল ছলছল লুব্ধ শব্দে তাহার লোল রসনার দ্বারা সেই ফলটিকে আয়ত্ত করিবার জন্য বারম্বার উন্মুখ হইয়া উঠিতেছে, আধ ঘণ্টার মধ্যে তাহার নির্লজ্জ অধ্যবসায় চরিতার্থ হইবে ইহাই কল্পনা করিয়া ক্লিষ্টচিত্তে আমি আমার বাড়ির ঘাটে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলাম।

বটবৃক্ষচ্ছায়ায় পা ছড়াইয়া দিয়া সমস্ত দিন স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম, দুইখানি সুকোমল পদপল্লবের তলে বিশ্বপ্রকৃতি মাথা নত করিয়া পড়িয়া আছে— আকাশ আলোকিত, ধরণী পুলকিত, বাতাস উতলা, তাহারই মধ্যে দুইখানি অনাবৃত চরণ স্থির নিস্পন্দ সুন্দর ; তাহারা জানেও না যে, তাহাদেরই রেণুকণার মাদকতায় তপ্তযৌবন নববসন্ত দিগ্‌দিকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে।

ইতিপূর্বে প্রকৃতি আমার কাছে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ছিল, নদী বন আকাশ সমস্তই স্বতন্ত্র ছিল। আজ সেই বিশাল বিপুল বিকীর্ণতার মাঝখানে একটি সুন্দরী প্রতিমূর্তি দেখা দিবামাত্র তাহা অবয়ব ধারণ করিয়া এক হইয়া উঠিয়াছে। আজ প্রকৃতি আমার কাছে এক ও সুন্দর, সে আমাকে অহরহ মূকভাবে অনুনয় করিতেছে, "আমি মৌন, তুমি আমাকে ভাষা দেও, আমার অন্তঃকরণে যে-একটি অব্যক্ত স্তব উত্থিত হইতেছে তুমি তাহাকে ছন্দে লয়ে তানে তোমার সুন্দর মানবভাষায় ধ্বনিত করিয়া তোলো !"

প্রকৃতির সেই নীরব অনুনয়ে আমার হৃদয়ের সমস্ত তন্ত্রী বাজিতে থাকে। বারম্বার কেবল এই গান শুনি, "হে সুন্দরী, হে মনোহারিণী, হে বিশ্বজয়িনী, হে মনপ্রাণপতঙ্গের

একটিমাত্র দীপশিখা, হে অপরিসীম জীবন, হে অনন্তমধুর মৃত্যু!" এ গান শেষ করিতে পারি না, সংলগ্ন করিতে পারি না; ইহাকে আকারে পরিস্ফুট করিতে পারি না, ইহাকে ছন্দে গাঁথিয়া ব্যক্ত করিয়া বলিতে পারি না; মনে হয়, আমার অন্তরের মধ্যে জোয়ারের জলের মতো একটা অনির্বচনীয় অপরিমেয় শক্তির সঞ্চার হইতেছে, এখনো তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারিতেছি না, যখন পারিব তখন আমার কণ্ঠ অকস্মাৎ দিব্য সংগীতে ধ্বনিত, আমার ললাট অলৌকিক আভায় আলোকিত হইয়া উঠিবে।

এমন সময় একটি নৌকা পরপারের নৈহাটি স্টেশন হইতে পার হইয়া আমার বাগানের ঘাটে আসিয়া লাগিল। দুই স্কন্ধের উপর কোঁচানো চাদর ঝুলাইয়া ছাতাটি কক্ষে লইয়া হাস্যমুখে অমূল্য নামিয়া পড়িল। অকস্মাৎ বন্ধুকে দেখিয়া আমার মনে যেরূপ ভাবোদয় হইল, আশা করি, শত্রুর প্রতিও কাহারো যেন সেইরূপ না ঘটে। বেলা প্রায় দুইটার সময় আমাকে সেই বটের ছায়ায় নিতান্ত ক্ষিপ্তের মতো বসিয়া থাকিতে দেখিয়া অমূল্যর মনে ভারি একটা আশার সঞ্চার হইল। পাছে বঙ্গদেশের ভবিষ্যৎ সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যের কোনো-একটা অংশ তাহার পদশব্দে সচকিত হইয়া বন্য রাজহংসের মতো একেবারে জলের মধ্যে গিয়া পড়ে সেই ভয়ে সে সসংকোচে মৃদুমন্দগমনে আসিতে লাগিল; দেখিয়া আমার আরো রাগ হইল, কিঞ্চিৎ অধীর হইয়া কহিলাম, "কী হে অমূল্য, ব্যাপারখানা কী! তোমার পায়ে কাঁটা ফুটিল নাকি।" অমূল্য ভাবিল, আমি খুব একটা মজার কথা বলিলাম; হাসিতে হাসিতে কাছে আসিয়া তরুতল কোঁচা দিয়া বিশেষরূপে ঝাড়িয়া লইল, পকেট হইতে একটি রুমাল লইয়া ভাঁজ খুলিয়া বিছাইয়া তাহার উপরে সাবধানে বসিল, কহিল, "যে প্রহসনটা লিখিয়া পাঠাইয়াছ সেটা পড়িয়া হাসিয়া বাঁচি না।" বলিয়া তাহার স্থানে স্থানে আবৃত্তি করিতে করিতে হাস্যোচ্ছ্বাসে তাহার নিশ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল। আমার এমনি মনে হইল যে, যে কলমে সেই প্রহসনটা লিখিয়াছিলাম, সেটা যে গাছের কাষ্ঠদণ্ডে নির্মিত সেটাকে শিকড়সুদ্ধ উৎপাটন করিয়া মস্ত একটা আগুন করিয়া প্রহসনটাকে ছাই করিয়া ফেলিলেও আমার খেদ মিটিবে না।

অমূল্য সসংকোচে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার সে কাব্যের কতদূর।" শুনিয়া আরো আমার গা জ্বলিতে লাগিল, মনে মনে কহিলাম, 'যেমন আমার কাব্য তেমনি তোমার বুদ্ধি!' মুখে কহিলাম, "সে-সব পরে হইবে ভাই, আমাকে অনর্থক ব্যস্ত করিয়া তুলিয়ো না।"

অমূল্য লোকটা কৌতূহলী, চারি দিক পর্যবেক্ষণ না করিয়া সে থাকিতে পারে না,

তাহার ভয়ে আমি উত্তরের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিলাম। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ও দিকে কী আছে হে।" আমি বলিলাম, "কিছু না!" এতবড়ো মিথ্যা কথাটা আমার জীবনে আর কখনো বলি নাই।

দুটা দিন আমাকে নানা প্রকারে বিদ্ধ করিয়া, দগ্ধ করিয়া, তৃতীয় দিনের সন্ধ্যার ট্রেনে অমূল্য চলিয়া গেল। এই দুটা দিন আমি বাগানের উত্তরের দিকে যাই নাই, সে দিকে নেত্রপাতমাত্র করি নাই, কৃপণ যেমন তাহার রত্নভাণ্ডারটি লুকাইয়া বেড়ায় আমি তেমনি করিয়া আমার উত্তরের সীমানার বাগানটি সামলাইয়া বেড়াইতেছিলাম। অমূল্য চলিয়া যাইবামাত্র একেবারে ছুটিয়া দ্বার খুলিয়া দোতলার ঘরের উত্তরের বারান্দায় বাহির হইয়া পড়িলাম। উপরে উন্মুক্ত আকাশে প্রথম কৃষ্ণপক্ষের অপর্যাপ্ত জ্যোৎস্না; নিম্নে শাখাজালনিবদ্ধ তরুশ্রেণীতলে খণ্ডকিরণখচিত একটি গভীর নিভৃত প্রদোষান্ধকার; মর্মরিত ঘনপল্লবের দীর্ঘনিশ্বাসে, তরুতলবিচ্যুত বকুলফুলের নিবিড় সৌরভে এবং সন্ধ্যারণ্যের স্তম্ভিত সংযত নিঃশব্দতায় তাহা রোমে রোমে পরিপূর্ণ হইয়া ছিল। তাহারই মাঝখানটিতে আমার কুমারী প্রতিবেশিনী তাহার শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধ পিতার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া ধীরে ধীরে পদচারণা করিতে করিতে কী কথা কহিতেছিল— বৃদ্ধ সস্নেহে অথচ শ্রদ্ধাভরে ঈষৎ অবনমিত হইয়া নীরবে মনোযোগসহকারে শুনিতেছিলেন। এই পবিত্র স্নিগ্ধ বিশ্রম্ভালাপে ব্যাঘাত করিবার কিছুই ছিল না, সন্ধ্যাকালের শান্ত নদীতে কচিৎ দাঁড়ের শব্দ সুদূরে বিলীন হইতেছিল এবং অবিরল তরুশাখার অসংখ্য নীড়ে দুটি-একটি পাখি দৈবাৎ ক্ষণিক মৃদুকাকলিতে জাগিয়া উঠিতেছিল। আমার অন্তঃকরণ আনন্দে অথবা বেদনায় যেন বিদীর্ণ হইবে মনে হইল। আমার অস্তিত্ব যেন প্রসারিত হইয়া সে ছায়ালোকবিচিত্র ধরণীতলের সহিত এক হইয়া গেল, আমি যেন আমার বক্ষঃস্থলের উপর ধীরবিক্ষিপ্ত পদচারণা অনুভব করিতে লাগিলাম, যেন তরুপল্লবের সহিত সংলগ্ন হইয়া গিয়া আমার কানের কাছে মধুর মৃদুগুঞ্জনধ্বনি শুনিতে পাইলাম। এই বিশাল মূঢ় প্রকৃতির অন্তর্বেদনা যেন আমার সর্বশরীরের অস্থিগুলির মধ্যে কুহরিত হইয়া উঠিল; আমি যেন বুঝিতে পারিলাম, ধরণী পায়ের নীচে পড়িয়া থাকে, অথচ পা জড়াইয়া ধরিতে পারে না বলিয়া ভিতরে ভিতরে কেমন করিতে থাকে, নতশাখা বনস্পতিগুলি কথা শুনিতে পায় অথচ কিছুই বুঝিতে পারে না বলিয়া সমস্ত শাখায় পল্লবে মিলিয়া কেমন ঊর্ধ্বশ্বাসে উন্মাদ কলশব্দে হাহাকার করিয়া উঠিতে চাহে। আমিও আমার সর্বাঙ্গে সর্বান্তঃকরণে ওই পদবিক্ষেপ, ওই বিশ্রম্ভালাপ, অব্যবহিতভাবে অনুভব করিতে লাগিলাম কিন্তু কোনোমতেই ধরিতে পারিলাম না বলিয়া ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরিতে লাগিলাম।

পরদিনে আমি আর থাকিতে পারিলাম না। প্রাতঃকালে আমার প্রতিবেশীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। ভবনাথবাবু তখন বড়ো এক পেয়ালা চা পাশে রাখিয়া চোখে চশমা দিয়া নীলপেন্সিলে-দাগ-করা একখানা হ্যামিল্‌টনের পুরাতন পুঁথি মনোযোগ দিয়া পড়িতেছিলেন। আমি ঘরে প্রবেশ করিলে চশমার উপরিভাগ হইতে আমাকে কিয়ৎক্ষণ অন্যমনস্কভাবে দেখিলেন, বই হইতে মনটাকে এক মুহূর্তে প্রত্যাহরণ করিতে পারিলেন না। অবশেষে অকস্মাৎ সচকিত হইয়া ত্রস্তভাবে আতিথ্যের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিলেন। আমি সংক্ষেপে আত্মপরিচয় দিলাম। তিনি এমনি শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন যে চশমার খাপ খুঁজিয়া পাইলেন না। খামকা বলিলেন, "আপনি চা খাইবেন?" আমি যদিচ চা খাই না, তথাপি বলিলাম, "আপত্তি নাই।" ভবনাথবাবু ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া 'কিরণ' 'কিরণ' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। দ্বারের নিকট অত্যন্ত মধুর শব্দ শুনিলাম, "কী, বাবা।" ফিরিয়া দেখিলাম, তাপসকন্যাদুহিতা সহসা আমাকে দেখিয়া ত্রস্ত হরিণীর মতো পলায়নোদ্যতা হইয়াছেন। ভবনাথবাবু তাঁহাকে ফিরিয়া ডাকিলেন; আমার পরিচয় দিয়া কহিলেন, "ইনি আমাদের প্রতিবেশী মহীন্দ্রকুমার বাবু।" এবং আমাকে কহিলেন, "ইনি আমার কন্যা কিরণবালা।" আমি কী করিব ভাবিয়া পাইতেছিলাম না, ইতিমধ্যে কিরণ আমাকে আনম্রসুন্দর নমস্কার করিলেন। আমি তাড়াতাড়ি ক্রটি সারিয়া লইয়া তাহা শোধ করিয়া দিলাম। ভবনাথবাবু কহিলেন, "মা, মহীন্দ্রবাবুর জন্য এক পেয়ালা চা আনিয়া দিতে হইবে।" আমি মনে মনে অত্যন্ত সংকুচিত হইয়া উঠিলাম কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবার পূর্বেই কিরণ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আমার মনে হইল, যেন কৈলাসে সনাতন ভোলানাথ তাঁহার কন্যা স্বয়ং লক্ষ্মীকে অতিথির জন্য এক পেয়ালা চা আনিতে বলিলেন; অতিথির পক্ষে সে নিশ্চয়ই অমিশ্র অমৃত হইবে, কিন্তু তবু, কাছাকাছি নন্দীভৃঙ্গী কোনো বেটাই কি হাজির ছিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভবনাথবাবুর বাড়ি আমি এখন নিত্য অতিথি। পূর্বে চা জিনিসটাকে অত্যন্ত ডরাইতাম, এক্ষণে সকালে বিকালে চা খাইয়া খাইয়া আমার চায়ের নেশা ধরিয়া গেল।

আমাদের বি. এ. পরীক্ষার জন্য জর্মানপণ্ডিত-বিরচিত দর্শনশাস্ত্রের নব্য-ইতিহাস আমি সদ্য পাঠ করিয়া আসিয়াছিলাম, তদুপলক্ষে ভবনাথবাবুর সহিত কেবল দর্শন-আলোচনার জন্যই আসিতাম কিছুদিন এইপ্রকার ভান করিলাম। তিনি হ্যামিলটন

প্রভৃতি কতকগুলি সেকাল-প্রচলিত ভ্রান্ত পুঁথি লইয়া এখনো নিযুক্ত রহিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাকে আমি কৃপাপাত্র মনে করিতাম, এবং আমার নূতন বিদ্যা অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত জাহির করিতে ছাড়িতাম না। ভবনাথবাবু এমনি ভালোমানুষ, এমনি সকল বিষয়ে সসংকোচ যে, আমার মতো অল্পবয়স্ক যুবকের মুখ হইতেও সকল কথা মানিয়া যাইতেন, তিলমাত্র প্রতিবাদ করিতে হইলে অস্থির হইয়া উঠিতেন, ভয় করিতেন পাছে আমি কিছুতে ক্ষুণ্ণ হই। কিরণ আমাদের এই-সকল তত্ত্বালোচনার মাঝখান হইতেই কোনো ছুতায় উঠিয়া চলিয়া যাইত। তাহাতে আমার যেমন ক্ষোভ জন্মিত তেমনি আমি গর্বও অনুভব করিতাম। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের দুরূহ পাণ্ডিত্য কিরণের পক্ষে দুঃসহ; সে যখন মনে মনে আমার বিদ্যাপর্বতের পরিমাপ করিত তখন তাহাকে কত উচ্চেই চাহিতে হইত।

কিরণকে যখন দূর হইতে দেখিতাম তখন তাহাকে শকুন্তলা দময়ন্তী প্রভৃতি বিচিত্র নামে এবং বিচিত্র ভাবে জানিতাম, এখন ঘরের মধ্যে তাহাকে 'কিরণ' বলিয়া জানিলাম, এখন আর সে জগতের বিচিত্র নায়িকার ছায়ারূপিণী নহে, এখন সে একমাত্র কিরণ। এখন সে শতশতাব্দীর কাব্যলোক হইতে অবতীর্ণ হইয়া, অনন্তকালের যুবকচিত্তের স্বপ্নস্বর্গ পরিহার করিয়া, একটি নির্দিষ্ট বাঙালিঘরের মধ্যে কুমারী-কন্যারূপে বিরাজ করিতেছে। সে আমারই মাতৃভাষায় আমার সঙ্গে অত্যন্ত সাধারণ ঘরের কথা বলিয়া থাকে, সামান্য কথায় সরলভাবে হাসিয়া উঠে, সে আমাদেরই ঘরের মেয়ের মতো দুই হাতে দুটি সোনার বালা পরিয়া থাকে, গলার হারটি বেশি কিছু নয় কিন্তু বড়ো সুমিষ্ট, শাড়ির প্রান্তটি কখনো কবরীর উপরিভাগ বাঁকিয়া বেষ্টন করিয়া আসে কখনো বা পিতৃগৃহের অনভ্যাসবশত চ্যুত হইয়া পড়িয়া যায়, ইহা আমার কাছে বড়ো আনন্দের। সে যে অকাল্পনিক, সে যে সত্য, সে যে কিরণ, সে যে তাহা ব্যতীত নহে এবং তাহার অধিক নহে, এবং যদিচ সে আমার নহে তবুও সে যে আমাদের, সেজন্য আমার অন্তঃকরণ সর্বদাই তাহার প্রতি উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতারসে অভিষিক্ত হইতে থাকে।

একদিন জ্ঞানমাত্রেরই আপেক্ষিকতা লইয়া ভবনাথবাবুর নিকট অত্যন্ত উৎসাহ-সহকারে বাচালতা প্রকাশ করিতেছিলাম; আলোচনা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবামাত্র কিরণ উঠিয়া গেল এবং অনতিকাল পরেই সম্মুখের বারান্দায় একটা তোলা উনান এবং রাঁধিবার সরঞ্জাম আনিয়া রাখিয়া, ভবনাথবাবুকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, "বাবা, কেন তুমি মহীন্দ্রবাবুকে ঐসকল শক্ত কথা লইয়া বৃথা বকাইতেছ! আসুন মহীন্দ্রবাবু, তার চেয়ে আমার রান্নায় যোগ দিলে কাজে লাগিবে।"

ভবনাথবাবুর কোনো দোষ ছিল না, এবং কিরণ তাহা অবগত ছিল। কিন্তু ভবনাথবাবু অপরাধীর মতো অনুতপ্ত হইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তা বটে! আচ্ছা ও কথাটা আর-একদিন হইবে।" এই বলিয়া নিরুদ্‌বিগ্নচিত্তে তিনি তাঁহার নিত্য-নিয়মিত অধ্যয়নে নিযুক্ত হইলেন।

আবার আর-একদিন অপরাহ্ণে আর-একটা গুরুতর কথা পাড়িয়া ভবনাথবাবুকে স্তম্ভিত করিয়া দিতেছি এমন সময় ঠিক মাঝখানে আসিয়া কিরণ কহিল, "মহীন্দ্রবাবু, অবলাকে সাহায্য করিতে হইবে। দেয়ালে লতা চড়াইব, নাগাল পাইতেছি না, আপনাকে এই পেরেকগুলি মারিয়া দিতে হইবে।" আমি উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া গেলাম, ভবনাথবাবুও প্রফুল্লমনে পড়িতে বসিলেন।

এমনি প্রায় যখনই ভবনাথবাবুর কাছে আমি ভারী কথা পাড়িবার উপক্রম করি, কিরণ একটা-না-একটা কাজের ছুতা ধরিয়া ভঙ্গ করিয়া দেয়। ইহাতে আমি মনে-মনে পুলকিত হইয়া উঠিতাম, আমি বুঝিতাম যে, কিরণের কাছে আমি ধরা পড়িয়াছি; সে কেমন করিয়া বুঝিতে পারিয়াছে যে, ভবনাথবাবুর সহিত তত্ত্বালোচনা আমার জীবনের চরম সুখ নহে।

বাহ্যবস্তুর সহিত আমাদের ইন্দ্রিয়বোধের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে গিয়া যখন দুরূহ রহস্যরসাতলের মধ্যপথে অবতীর্ণ হইয়াছি এমন সময় কিরণ আসিয়া বলিত, "মহীন্দ্রবাবু, রান্নাঘরের পাশে আমার বেগুনের খেত আপনাকে দেখাইয়া আনিগে, চলুন।"

আকাশকে অসীম মনে করা কেবল আমাদের অনুমানমাত্র, আমাদের অভিজ্ঞতা ও কল্পনাশক্তির বাহিরে কোথাও কোনো-একরূপে তাহার সীমা থাকা কিছুই অসম্ভব নহে, ইত্যাকার মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি, এমন সময় কিরণ আসিয়া বলিত, "মহীন্দ্র-বাবু, দুটো আম পাকিয়াছে, আপনাকে ডাল নামাইয়া ধরিতে হইবে।"

কী উদ্ধার, কী মুক্তি! অকূল সমুদ্রের মাঝখান হইতে এক মুহূর্তে কী সুন্দর কূলে আসিয়া উঠিতাম। অনন্ত আকাশ ও বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে সংশয়জাল যতই দুশ্ছেদ্য জটিল হউক-না কেন, কিরণের বেগুনের খেত বা আমতলা সম্বন্ধে কোনোপ্রকার দুরূহতা ও সন্দেহের লেশমাত্র ছিল না। কাব্যে বা উপন্যাসে তাহা উল্লেখযোগ্য নহে কিন্তু জীবনে তাহা সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপের ন্যায় মনোহর। মাটিতে পা ঠেকা যে কী আরাম তাহা সে-ই জানে যে বহুক্ষণ জলের মধ্যে সাঁতার দিয়াছে। আমি এতদিন কল্পনায় যে প্রেমসমুদ্র সৃজন করিয়াছিলাম তাহা যদি সত্য হইত তবে সেখানে চিরকাল যে কী করিয়া ভাসিয়া বেড়াইতাম তাহা বলিতে পারি না। সেখানে আকাশও অসীম,

সমুদ্রও অসীম, সেখান হইতে আমাদের প্রতিদিবসের বিচিত্র জীবনযাত্রার সীমাবদ্ধ ব্যাপার একেবারে নির্বাসিত, সেখানে তুচ্ছতার লেশমাত্র নাই, সেখানে কেবল ছন্দে লয়ে সংগীতে ভাব ব্যক্ত করিতে হয়, এবং তলাইতে গেলে কোথাও তল পাওয়া যায় না। কিরণ সেখান হইতে মজ্জমান এই হতভাগ্যের কেশপাশ ধরিয়া যখন তাহার আমতলায় তাহার বেগুনের খেতে টানিয়া তুলিল তখন পায়ের তলায় মাটি পাইয়া আমি বাঁচিয়া গেলাম। আমি দেখিলাম, বারান্দায় বসিয়া খিচুড়ি রাঁধিয়া, মই চড়িয়া দেয়ালে পেরেক মারিয়া, লেবুগাছে ঘনসবুজ পত্ররাশির মধ্য হইতে সবুজ লেবুফল সন্ধান করিতে সাহায্য করিয়া অভাবনীয় আনন্দ লাভ করা যায়, অথচ সে আনন্দলাভের জন্য কিছুমাত্র প্রয়াস পাইতে হয় না— আপনি যে কথা মুখে আসে, আপনি যে হাসি উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে, আকাশ হইতে যতটুকু আলো আসে এবং গাছ হইতে যতটুকু ছায়া পড়ে তাহাই যথেষ্ট। ইহা ছাড়া আমার কাছে একটি সোনার কাঠি ছিল আমার নবযৌবন, একটি পরশপাথর ছিল আমার প্রেম, একটি অক্ষয় কল্পতরু ছিল আমার নিজের প্রতি নিজের অক্ষুণ্ণ বিশ্বাস; আমি বিজয়ী, আমি ইন্দ্র, আমার উচ্চৈঃশ্রবার পথে কোনো বাধা দেখিতে পাই নাই। কিরণ, আমার কিরণ, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। সে কথা এতক্ষণ স্পষ্ট করিয়া বলি নাই, কিন্তু হৃদয়ের এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত মুহূর্তের মধ্যে মহাসুখে বিদীর্ণ করিয়া সে কথা বিদ্যুতের মতো আমার সমস্ত অন্তঃকরণ ধাঁধিয়া ক্ষণে ক্ষণে নাচিয়া উঠিতেছিল। কিরণ, আমার কিরণ।

ইতিপূর্বে আমি কোনো অনাত্মীয়া মহিলার সংস্রবে আসি নাই, যে নব্য-রমণীগণ শিক্ষালাভ করিয়া অবরোধের বাহিরে সঞ্চরণ করেন তাঁহাদের রীতিনীতি আমি কিছুই অবগত নহি; অতএব তাঁহাদের আচরণে কোন্‌খানে শিষ্টতার সীমা, কোন্‌খানে প্রেমের অধিকার, তাহা আমি কিছুই জানি না; কিন্তু ইহাও জানি না, আমাকে কেনই বা ভালো না বাসিবে, আমি কোন্ অংশে ন্যূন।

কিরণ যখন আমার হাতে চায়ের পেয়ালাটি দিয়া যাইত তখন চায়ের সঙ্গে পাত্রভরা কিরণের ভালোবাসাও গ্রহণ করিতাম, চা-টি যখন পান করিতাম তখন মনে করিতাম, আমার গ্রহণ সার্থক হইল এবং কিরণেরও দান সার্থক হইল। কিরণ যদি সহজ স্বরে বলিত 'মহীন্দ্রবাবু, কাল সকাল-সকাল আসবেন তো?' তাহার মধ্যে ছন্দে লয়ে বাজিয়া উঠিত—

কী মোহিনী জান, বন্ধু, কী মোহিনী জান!
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা-হেন!

আমি সহজ কথায় উত্তর করিতাম, 'কাল আটটার মধ্যে আসব।' তাহার মধ্যে কিরণ কি শুনিতে পাইত না—

পরানপুতলি তুমি হিয়ে-মণিহার,
সরবস ধন মোর সকল সংসার।

আমার সমস্ত দিন এবং সমস্ত রাত্রি অমৃতে পূর্ণ হইয়া গেল। আমার সমস্ত চিন্তা এবং কল্পনা মুহূর্তে মুহূর্তে নূতন নূতন শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া লতার ন্যায় কিরণকে আমার সহিত বেষ্টন করিয়া বাঁধিতে লাগিল। যখন শুভ-অবসর আসিবে তখন কিরণকে কী পড়াইব, কী শিখাইব, কী শুনাইব, কী দেখাইব তাহারই অসংখ্য সংকল্পে আমার মন আচ্ছন্ন হইয়া গেল। এমন-কি স্থির করিলাম, জর্মানপণ্ডিত-রচিত দর্শনশাস্ত্রের নব্য ইতিহাসেও যাহাতে তাহার চিত্তের ঔৎসুক্য জন্মে এমন শিক্ষা তাহাকে দিতে হইবে, নতুবা আমাকে সে সর্বতোভাবে বুঝিতে পারিবে না। ইংরাজি কাব্যসাহিত্যের সৌন্দর্যলোকে আমি তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইব। আমি মনে মনে হাসিলাম, কহিলাম, 'কিরণ, তোমার আমতলা এবং বেগুনের খেত আমার কাছে নূতন রাজ্য। আমি কস্মিনকালে স্বপ্নেও জানিতাম না যে, সেখানে বেগুন এবং ঝড়ে-পড়া কাঁচা আম ছাড়াও দুর্লভ অমৃতফল এত সহজে পাওয়া যায়। কিন্তু যখন সময় আসিবে তখন আমিও তোমাকে এমন এক রাজ্যে লইয়া যাইব যেখানে বেগুন ফলে না কিন্তু তথাপি বেগুনের অভাব মুহূর্তের জন্য অনুভব করিতে হয় না। সে জ্ঞানের রাজ্য, ভাবের স্বর্গ।"

সূর্যাস্তকালের দিগন্তবিলীন পাণ্ডুবর্ণ সন্ধ্যাতারা ঘনায়মান সায়াহ্নে ক্রমেই যেমন পরিস্ফুট দীপ্তি লাভ করে, কিরণও তেমনি কিছুদিন ধরিয়া ভিতর হইতে আনন্দে লাবণ্যে নারীত্বের পূর্ণতায় যেন প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। সে যেন তাহার গৃহের, তাহার সংসারের ঠিক মধ্য-আকাশে অধিরোহণ করিয়া চারি দিকে আনন্দের মঙ্গল-জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে লাগিল; সেই জ্যোতিতে তাহার বৃদ্ধ পিতার শুভ্রকেশের উপর পবিত্রতর উজ্জ্বল আভা পড়িল, এবং সেই জ্যোতি আমার উদ্‌বেল হৃদয়সমুদ্রের প্রত্যেক তরঙ্গের উপর কিরণের মধুর নামের একটি করিয়া জ্যোতির্ময় স্বাক্ষর মুদ্রিত করিয়া দিল।

এ দিকে আমার ছুটি সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিল, বিবাহ-উদ্দেশে বাড়ি আসিবার জন্য পিতার সস্নেহ অনুরোধ ক্রমে কঠিন আদেশে পরিণত হইবার উপক্রম হইল, এ দিকে অমূল্যকেও আর ঠেকাইয়া রাখা যায় না, সে কোন্‌দিন উন্মত্ত বন্যহস্তীর ন্যায় আমার এই পদ্মবনের মাঝখানে ফস করিয়া তাহার বিপুল চরণচতুষ্টয় নিক্ষেপ করিবে

এ উদ্‌বেগও উত্তরোত্তর প্রবল হইতে লাগিল। কেমন করিয়া অবিলম্বে অন্তরের আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করিয়া আমার প্রণয়কে পরিণয়ে বিকশিত করিয়া তুলিব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

একদিন মধ্যাহ্নকালে ভবনাথবাবুর গৃহে গিয়া দেখি, তিনি গ্রীষ্মের উত্তাপে চৌকিতে ঠেসান দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন এবং সম্মুখে গঙ্গাতীরের বারান্দায় নির্জন ঘাটের সোপানে বসিয়া কিরণ কী বই পড়িতেছে। আমি নিঃশব্দপদে পশ্চাতে গিয়া দেখি, একখানি নূতন কাব্যসংগ্রহ, যে পাতাটি খোলা আছে তাহাতে শেলির একটি কবিতা উদ্‌ধৃত এবং তাহার পার্শ্বে লাল কালিতে একটি পরিষ্কার লাইন টানা। সেই কবিতাটি পাঠ করিয়া কিরণ ঈষৎ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্বপ্নভারাকুল নয়নে আকাশের দূরতম প্রান্তের দিকে চাহিল; বোধ হইল, যেন সেই একটি কবিতা কিরণ আজ এক ঘণ্টা ধরিয়া দশবার করিয়া পড়িয়াছে এবং অনন্ত নীলাকাশে, আপন হৃদয়-তরণীর পালে একটিমাত্র উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস দিয়া, তাহাকে অতিদূর নক্ষত্রলোকে প্রেরণ করিয়াছে। শেলি কাহার জন্য এই কবিতাটি লিখিয়াছিল জানি না; মহীন্দ্রনাথ নামক কোনো বাঙালি যুবকের জন্য লেখে নাই তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু আজ এই স্তবগানে আমি ছাড়া আর-কাহারো অধিকার নাই ইহা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। কিরণ এই কবিতাটির পাশে আপন অন্তরতম হৃদয়-পেন্সিল দিয়া একটি উজ্জ্বল রক্তচিহ্ন আঁকিয়া দিয়াছে, সেই মায়াগণ্ডির মোহমন্ত্রে কবিতাটি আজ তাহারই, এবং সেই সঙ্গে আমারও। আমি পুলকোচ্ছ্বসিত চিত্তকে সম্বরণ করিয়া সহজ সুরে কহিলাম, "কী পড়িতেছেন।" পালভরা নৌকা যেন হঠাৎ চড়ায় ঠেকিয়া গেল। কিরণ চমকিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি বইখানা বন্ধ করিয়া একেবারে আঁচলের মধ্যে ঢাকিয়া ফেলিল। আমি হাসিয়া কহিলাম, "বইখানি একবার দেখিতে পারি?" কিরণকে কী যেন বাজিল, সে আগ্রহসহকারে বলিয়া উঠিল, "না না, ও বই থাক্।"

আমি কিয়দ্দূরে একটা ধাপ নীচে বসিয়া ইংরাজি কাব্যসাহিত্যের কথা উত্থাপন করিলাম, এমন করিয়া কথা তুলিলাম যাহাতে কিরণেরও সাহিত্যশিক্ষা হয় এবং আমারও মনের কথা ইংরাজ কবির জবানিতে ব্যক্ত হইয়া উঠে। খররৌদ্রতাপে সুগভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে জলের স্থলের ছোটো ছোটো কলশব্দগুলি নিদ্রাকাতর জননীর ঘুমপাড়ানি গানের মতো অতিশয় মৃদু এবং সকরুণ হইয়া আসিল।

কিরণ যেন অধীর হইয়া উঠিল; কহিল, "বাবা একা বসিয়া আছেন, অনন্ত

আকাশ সম্বন্ধে আপনাদের সে তর্কটা শেষ করিবেন না?" আমি মনে মনে ভাবিলাম, অনন্ত আকাশ তো চিরকাল থাকিবে এবং তাহার সম্বন্ধে তর্কও তো কোনোকালে শেষ হইবে না, কিন্তু জীবন স্বল্প এবং শুভ অবসর দুর্লভ ও ক্ষণস্থায়ী। কিরণের কথার উত্তর না দিয়া কহিলাম, "আমার কতকগুলি কবিতা আছে, আপনাকে শুনাইব।" কিরণ কহিল, "কাল শুনিব।" বলিয়া একেবারে উঠিয়া ঘরের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "বাবা, মহীন্দ্রবাবু আসিয়াছেন।" ভবনাথবাবু নিদ্রাভঙ্গে বালকের ন্যায় তাঁহার সরল নেত্রদ্বয় উন্মীলন করিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। আমার বক্ষে যেন ধক্ করিয়া একটা মস্ত ঘা লাগিল। ভবনাথবাবুর ঘরে গিয়া অনন্ত আকাশ সম্বন্ধে তর্ক করিতে লাগিলাম। কিরণ বই হাতে লইয়া দোতলায় বোধ হয় তাহার নির্জন শয়নকক্ষে নির্বিঘ্নে পড়িতে গেল।

পরদিন সকালের ডাকে লালপেন্সিলের দাগ দেওয়া একখানা স্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজ পাওয়া গেল, তাহাতে বি. এ পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। প্রথমেই প্রথম-ডিবিশান-কোঠায় কিরণবালা বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়া একটা নাম চোখে পড়িল; আমার নিজের নাম প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় কোনো বিভাগেই নাই।

পরীক্ষায় অকৃতার্থ হইবার বেদনার সঙ্গে সঙ্গে বজ্রাগ্নির ন্যায় একটা সন্দেহ বাজিতে লাগিল যে, কিরণবালা বন্দ্যোপাধ্যায় হয়তো আমাদেরই কিরণবালা। সে-যে কালেজে পড়িয়াছে বা পরীক্ষা দিয়াছে, এ কথা যদিও আমাকে বলে নাই তথাপি সন্দেহ ক্রমেই প্রবল হইতে লাগিল। কারণ, ভাবিয়া দেখিলাম, বৃদ্ধ পিতা এবং তাঁহার কন্যাটি নিজেদের সম্বন্ধে কোনো কথাই কখনো আলাপ করেন নাই, এবং আমিও নিজের আখ্যান বলিতে এবং নিজের বিদ্যা প্রচার করিতে সর্বদাই এমন নিযুক্ত ছিলাম যে, তাঁহাদের কথা ভালো করিয়া জিজ্ঞাসাও করি নাই।

জর্মানপণ্ডিত-রচিত আমার নূতন-পড়া দর্শনের ইতিহাস সম্বন্ধীয় তর্কগুলি আমার মনে পড়িতে লাগিল, এবং মনে পড়িল, আমি একদিন কিরণকে বলিয়াছিলাম, "আপনাকে যদি আমি কিছুদিন গুটিকতক বই পড়াইবার সুযোগ পাই তাহা হইলে ইংরাজি কাব্যসাহিত্য সম্বন্ধে আপনার একটা পরিষ্কার ধারণা জন্মাইতে পারি।"

কিরণবালা দর্শনশাস্ত্রে অনার লইয়াছেন এবং সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ। যদি এই কিরণ হয়!

অবশেষে প্রবল খোঁচা দিয়া আপন ভস্মাচ্ছন্ন অহংকারকে উদ্দীপ্ত করিয়া কহিলাম,

"হয় হউক— আমার রচনাবলী আমার জয়স্তম্ভ।" বলিয়া খাতা-হাতে সবলে পা ফেলিয়া মাথা পূর্বাপেক্ষা উচ্চে তুলিয়া ভবনাথবাবুর বাগানে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

তখন তাঁহার ঘরে কেহ ছিল না। আমি একবার ভালো করিয়া বৃদ্ধের পুস্তকগুলি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, এক কোণে আমার সেই নব্যজার্মান-পণ্ডিত-রচিত দর্শনের ইতিহাসখানি অনাদরে পড়িয়া রহিয়াছে; খুলিয়া দেখিলাম, ভবনাথবাবুর স্বহস্তলিখিত নোটে তাহার মার্জিন পরিপূর্ণ। বৃদ্ধ নিজে তাঁহার কন্যাকে শিক্ষা দিয়াছেন। আমার আর সন্দেহ রহিল না।

ভবনাথবাবু অন্যদিনের অপেক্ষা প্রসন্নজ্যোতির্বিচ্ছুরিত মুখে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন, যেন কোনো সুসংবাদের নির্ঝরধারায় তিনি সদ্য প্রাতঃস্নান করিয়া আসিয়াছেন। আমি অকস্মাৎ কিছু দম্ভের ভাবে রুক্ষহাস্য হাসিয়া কহিলাম, "ভবনাথবাবু, আমি পরীক্ষায় ফেল করিয়াছি।" যে-সকল বড়ো বড়ো লোক বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ফেল করিয়া জীবনের পরীক্ষায় প্রথমশ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়, আমি যেন আজ তাহাদেরই মধ্যে গণ্য হইলাম। পরীক্ষা বাণিজ্য ব্যবসায় চাকুরি প্রভৃতিতে কৃতকার্য হওয়া মাঝামাঝি লোকের লক্ষণ, নিম্নতম এবং উচ্চতম শ্রেণীর লোকদেরই অকৃতকার্য হইবার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। ভবনাথবাবুর মুখ সস্নেহকরুণ হইয়া আসিল, তিনি তাঁহার কন্যার পরীক্ষোত্তরণসংবাদ আমাকে আর দিতে পারিলেন না; কিন্তু আমার অসংগত উগ্র প্রফুল্লতা দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইয়া গেলেন। তাঁহার সরল বুদ্ধিতে আমার গর্বের কারণ বুঝিতে পারিলেন না।

এমন সময় আমাদের কালেজের নবীন অধ্যাপক বামাচরণবাবুর সহিত কিরণ সলজ্জ সরসোজ্জ্বল মুখে বর্ষাধৌত লতাটির মতো ছল্‌ছল্‌ করিতে করিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমার আর কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না। রাত্রে বাড়িতে আসিয়া আমার রচনাবলীর খাতাখানা পুড়াইয়া ফেলিয়া দেশে গিয়া বিবাহ করিলাম।

গঙ্গার ধারে যে বৃহৎ কাব্য লিখিবার কথা ছিল তাহা লেখা হইল না, কিন্তু জীবনের মধ্যে তাহা লাভ করিলাম।

ভাদ্র ১৩০৫

রাজটিকা

নবেন্দুশেখরের সহিত অরুণলেখার যখন বিবাহ হইল তখন হোমধূমের অন্তরাল হইতে ভগবান প্রজাপতি ঈষৎ একটু হাস্য করিলেন। হায়, প্রজাপতির পক্ষে যাহা খেলা আমাদের পক্ষে তাহা সকল সময়ে কৌতুকের নহে।

নবেন্দুশেখরের পিতা পূর্ণেন্দুশেখর ইংরাজরাজ-সরকারে বিখ্যাত। তিনি এই ভবসমুদ্রে কেবলমাত্র দ্রুতবেগে সেলাম-চালনা দ্বারা রায়বাহাদুর পদবীর উত্তুঙ্গ মরুকূলে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; আরো দুর্গমতর সম্মানপথের পাথেয় তাঁহার ছিল, কিন্তু পঞ্চান্ন বৎসর বয়ঃক্রমকালে অনতিদূরবর্তী রাজখেতাবের কুহেলিকাচ্ছন্ন গিরিচূড়ার প্রতি করুণ লোলুপ দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ করিয়া এই রাজানুগৃহীত ব্যক্তি অকস্মাৎ খেতাব-বর্জিত-লোকে গমন করিলেন এবং তাঁহার বহু-সেলাম-শিথিল গ্রীবাগ্রন্থি শ্মশানশয্যায় বিশ্রাম লাভ করিল।

কিন্তু, বিজ্ঞানে বলে, শক্তির স্থানান্তর ও রূপান্তর আছে, নাশ নাই—চঞ্চলা লক্ষ্মীর অচঞ্চলা সখী সেলামশক্তি পৈতৃক স্কন্ধ হইতে পুত্রের স্কন্ধে অবতীর্ণ হইলেন, এবং নবেন্দুর নবীন মস্তক তরঙ্গতাড়িত কুষ্মাণ্ডের মতো ইংরাজের দ্বারে দ্বারে অবিশ্রাম উঠিতে পড়িতে লাগিল।

নিঃসন্তান অবস্থায় ইঁহার প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হইলে যে পরিবারে ইনি দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিলেন সেখানকার ইতিহাস ভিন্নপ্রকার।

সে পরিবারে বড়োভাই প্রমথনাথ পরিচিতবর্গের প্রীতি এবং আত্মীয়বর্গের আদরের স্থল ছিলেন। বাড়ির লোকে এবং পাড়ার পাঁচজনে তাঁহাকে সর্ববিষয়ে অনুকরণস্থল বলিয়া জানিত।

প্রমথনাথ বিদ্যায় বি. এ. এবং বুদ্ধিতে বিচক্ষণ ছিলেন, কিন্তু মোটা মাহিনা বা জোর কলমের কোনো ধার ধারিতেন না; মুরুব্বির বলও তাঁহার বিশেষ ছিল না, কারণ, ইংরাজ তাঁহাকে যে পরিমাণ দূরে রাখিত তিনিও তাহাকে সেই পরিমাণ দূরে রাখিয়া চলিতেন। অতএব, গৃহকোণে এবং পরিচিতমণ্ডলীর মধ্যেই প্রমথনাথ জাজ্বল্যমান ছিলেন, দূরস্থ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার কোনো ক্ষমতা তাঁহার ছিল না।

এই প্রমথনাথ একবার বছর তিনেকের জন্য বিলাতে ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন। সেখানে ইংরাজের সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া ভারতবর্ষের অপমানদুঃখ সমস্ত ভুলিয়া ইংরাজি সাজ পরিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন।

ভাইবোনেরা প্রথমটা একটু কুণ্ঠিত হইল, অবশেষে দুইদিন পরে বলিতে লাগিল,

ইংরাজি কাপড়ে দাদাকে যেমন মানায় এমন আর-কাহাকেও না। ইংরাজি বস্ত্রের গৌরবগর্ব পরিবারের অন্তরের মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইল।

প্রমথনাথ বিলাত হইতে মনে ভাবিয়া আসিয়াছিলেন 'কী করিয়া ইংরাজের সহিত সমপর্যায় রক্ষা করিয়া চলিতে হয় আমি তাহারই অপূর্ব দৃষ্টান্ত দেখাইব'— নত না হইলে ইংরাজের সহিত মিলন হয় না এ কথা যে বলে সে নিজের হীনতা প্রকাশ করে এবং ইংরাজকেও অন্যায় অপরাধী করিয়া থাকে।

প্রমথনাথ বিলাতের বড়ো বড়ো লোকের কাছ হইতে অনেক সাদরপত্র আনিয়া ভারতবর্ষীয় ইংরাজমহলে কিঞ্চিৎ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। এমন-কি মধ্যে মধ্যে সস্ত্রীক ইংরাজের চা ডিনার খেলা এবং হাস্যকৌতুকের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভাগ পাইতে লাগিলেন। সৌভাগ্যমদমত্ততায় ক্রমশই তাঁহার শিরা-উপশিরাগুলি অল্প অল্প রীরী করিতে শুরু করিল।

এমন সময়ে একটি নূতন রেলওয়ে লাইন খোলা উপলক্ষে রেলওয়ে কোম্পানির নিমন্ত্রণে ছোটোলাটের সঙ্গে দেশের অনেকগুলি রাজপ্রসাদগর্বিত সম্ভ্রান্তলোকে গাড়ি বোঝাই করিয়া নবলৌহপথে যাত্রা করিলেন। প্রথমনাথও তাহার মধ্যে ছিলেন।

ফিরিবার সময় একটা ইংরাজ দারোগা দেশীয় বড়োলোকদিগকে কোনো-এক বিশেষ গাড়ি হইতে অত্যন্ত অপমানিত করিয়া নামাইয়া দিল। ইংরাজবেশধারী প্রমথনাথও মানে মানে নামিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছেন দেখিয়া দারোগা কহিল, "আপনি উঠিতেছেন কেন, আপনি বসুন-না।"

এই বিশেষ সম্মানে প্রমথনাথ প্রথমটা একটু স্ফীত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু, যখন গাড়ি ছাড়িয়া দিল, যখন তৃণহীন কর্ষণধূসর পশ্চিম প্রান্তরের প্রান্তসীমা হইতে ম্লান সূর্যাস্ত-আভা সকরুণরক্তিম লজ্জার মতো সমস্ত দেশের উপর যেন পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল এবং যখন তিনি একাকী বসিয়া বাতায়নপথ হইতে অনিমেষনয়নে বনান্তরাল-বাসিনী কুণ্ঠিতা বঙ্গভূমির প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, তখন ধিক্কারে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল এবং দুই চক্ষু দিয়া অগ্নিজ্বালাময়ী অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল।

তাঁহার মনে একটা গল্পের উদয় হইল। একটি গর্দভ রাজপথ দিয়া দেবপ্রতিমার রথ টানিয়া চলিতেছিল, পথিকবর্গ তাহার সম্মুখে ধুলায় লুণ্ঠিত হইয়া প্রতিমাকে প্রণাম করিতেছিল এবং মূঢ় গর্দভ আপন মনে ভাবিতেছিলেন, 'সকলে আমাকেই সম্মান করিতেছে।'

প্রমথনাথ মনে মনে কহিলেন, 'গর্দভের সহিত আমার এই একটু প্রভেদ

দেখিতেছি, আমি আজ বুঝিয়াছি, সম্মান আমাকে নহে, আমার স্কন্ধের বোঝাগুলাকে।'

প্রমথনাথ বাড়ি আসিয়া বাড়ির ছেলেপুলে সকলকে ডাকিয়া একটা হোমাগ্নি জ্বালাইলেন এবং বিলাতি বেশভূষাগুলো একে একে আহুতিস্বরূপ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। শিখা যতই উচ্চ হইয়া উঠিল ছেলেরা ততই উচ্ছ্বসিত আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল।

তাহার পর হইতে প্রমথনাথ ইংরাজঘরের চায়ের চুমুক এবং রুটির টুকরা পরিত্যাগ করিয়া পুনশ্চ গৃহকোণদুর্গের মধ্যে দুর্গম হইয়া বসিলেন, এবং পূর্বোক্ত লাঞ্ছিত উপাধিধারীগণ পূর্ববৎ ইংরাজের দ্বারে দ্বারে উষ্ণীষ আন্দোলিত করিয়া ফিরিতে লাগিল।

দৈবদুর্যোগে দুর্ভাগ্য নবেন্দুশেখর এই পরিবারের একটি মধ্যমা ভগিনীকে বিবাহ করিয়া বসিলেন। বাড়ির মেয়েগুলি লেখাপড়াও যেমন জানে দেখিতে শুনিতেও তেমনি; নবেন্দু ভাবিলেন, 'বড়ো জিতিলাম।'

কিন্তু 'আমাকে পাইয়া তোমরাও জিতিয়াছ' এ কথা প্রমাণ করিতে কালবিলম্ব করিলেন না। কোন্ সাহেব তাঁহার বাবাকে কবে কী চিঠি লিখিয়াছিল তাহা যেন নিতান্ত ভ্রমবশত দৈবক্রমে পকেট হইতে বাহির করিয়া শ্যালীদের হস্তে চালান করিয়া দিতে লাগিলেন। শ্যালীদের সুন্দর সুকোমল বিম্বোষ্ঠের ভিতর হইতে তীক্ষ্ণ প্রখর হাসি যখন টুক্‌টুকে মখমলের খাপের ভিতরকার ঝক্‌ঝকে ছোরার মতো দেখা দিতে লাগিল, তখন স্থানকালপাত্র সম্বন্ধে হতভাগ্যের চৈতন্য জন্মিল। বুঝিল, 'বড়ো ভুল করিয়াছি।'

শ্যালীবর্গের মধ্যে জ্যেষ্ঠা এবং রূপে গুণে শ্রেষ্ঠা লাবণ্যলেখা একদা শুভদিন দেখিয়া নবেন্দুর শয়নকক্ষের কুলুঙ্গির মধ্যে দুইজোড়া বিলাতি বুট সিন্দুরে মণ্ডিত করিয়া স্থাপন করিল; এবং তাহার সম্মুখে ফুলচন্দন ও দুই জ্বলন্ত বাতি রাখিয়া ধূপধুনা জ্বালাইয়া দিল। নবেন্দু ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র দুই শ্যালী তাহার দুই কান ধরিয়া কহিল, "তোমার ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করো, তাঁহার কল্যাণে তোমার পদবৃদ্ধি হউক।"

তৃতীয়া শ্যালী কিরণলেখা বহুদিন পরিশ্রম করিয়া একখানি চাদরে জোন্স্ স্মিথ ব্রাউন টম্‌সন প্রভৃতি একশত প্রচলিত ইংরাজি নাম লাল সুতা দিয়া সেলাই করিয়া একদিন মহাসমারোহে নবেন্দুকে নামাবলি উপহার দিল।

চতুর্থ শ্যালী শশাঙ্কলেখা যদিও বয়ঃক্রম হিসাবে গণ্যব্যক্তির মধ্যে নহে, বলিল, "ভাই, আমি একটা জপমালা তৈরি করিয়া দিব, সাহেবের নাম জপ করিবে।"

তাহার বড়ো বোনরা তাহাকে শাসন করিয়া বলিল, "যাঃ, তোর আর জ্যাঠামি করিতে হইবে না।"

নবেন্দুর মনে মনে রাগও হয়, লজ্জাও হয়, কিন্তু শ্যালীদের ছাড়িতেও পারে না; বিশেষত বড়োশ্যালীটি বড়ো সুন্দরী। তাহার মধুও যেমন কাঁটাও তেমনি; তাহার নেশা এবং তাহার জ্বালা দুটোই মনের মধ্যে একেবারে লাগিয়া থাকে! ক্ষতপক্ষ পতঙ্গ রাগিয়া ভোঁ-ভোঁ করিতে থাকে অথচ অন্ধ অবোধের মতো চারি দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরে।

অবশেষে শ্যালীসংসর্গের প্রবল মোহে পড়িয়া সাহেবের সোহাগ-লালসা নবেন্দু সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে লাগিল। বড়োসাহেবকে যেদিন সেলাম নিবেদন করিতে যাইত শ্যালীদিগকে বলিত, "সুরেন্দ্রবাঁড়ুয্যের বক্তৃতা শুনিতে যাইতেছি।" দার্জিলিং হইতে প্রত্যাসন্ন মেজোসাহেবকে শেয়ালদহ স্টেশনে সম্মান জ্ঞাপন করিতে যাইবার সময় শ্যালীদিগকে বলিয়া যাইত, "মেজমামার সহিত দেখা করিতে চলিলাম।"

সাহেব এবং শ্যালী, এই দুই নৌকায় পা দিয়া হতভাগা বিষম সংকটে পড়িল। শ্যালীরা মনে মনে কহিল, 'তোমার অন্য নৌকাটাকে ফুটা না করিয়া ছাড়িব না।'

মহারানীর আগামী জন্মদিনে নবেন্দু খেতাব-স্বর্গলোকের প্রথম সোপানে রায়বাহাদুর পদবীতে পদার্পণ করিবেন এইরূপ গুজব শুনা গেল, কিন্তু সেই সম্ভাবিত সম্মানলাভের আনন্দ-উচ্ছ্বসিত সংবাদ ভীরু বেচারা শ্যালীদিগের নিকটে ব্যক্ত করিতে পারিল না; কেবল একদিন শরৎশুক্লপক্ষের সায়াহ্নে সর্বনেশে চাঁদের আলোকে পরিপূর্ণচিত্তাবেগে স্ত্রীর কাছে প্রকাশ করিয়া ফেলিল। পরদিন দিবালোকে স্ত্রী পাল্কি করিয়া তাহার বড়দিদির বাড়ি গিয়া অশ্রুগদ্‌গদ কণ্ঠে আক্ষেপ করিতে লাগিল। লাবণ্য কহিল, "তা বেশ তো, রায়বাহাদুর হইয়া তোর স্বামীর তো লেজ বাহির হইবে না, তোর এত লজ্জাটা কিসের!"

অরুণলেখা বারম্বার বলিতে লাগিল, "না দিদি, আর যা-ই হই, আমি রায়বাহাদুরনী হইতে পারিব না।"

আসল কথা, অরুণের পরিচিত ভূতনাথবাবু রায়বাহাদুর ছিলেন, পদবীটার প্রতি আন্তরিক আপত্তির কারণ তাহাই।

লাবণ্য অনেক আশ্বাস দিয়া কহিল, "আচ্ছা, তোকে সেজন্য ভাবিতে হইবে না।"

বক্সারে লাবণ্যর স্বামী নীলরতন কাজ করিতেন। শরতের অবসানে নবেন্দু সেখান হইতে লাবণ্যর নিমন্ত্রণ পাইলেন। আনন্দচিত্তে অনতিবিলম্বে গাড়ি চড়িয়া যাত্রা করিলেন। রেলে চড়িবার সময় তাঁহার বামাঙ্গ কাঁপিল না, কিন্তু তাহা হইতে কেবল এই প্রমাণ হয় যে, আসন্ন বিপদের সময় বামাঙ্গ কাঁপাটা একটা অমূলক কুসংস্কারমাত্র।

লাবণ্যলেখা পশ্চিম প্রদেশের নবশীতাগমসম্ভূত স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের অরুণে পাণ্ডুরে পূর্ণপরিস্ফুট হইয়া নির্মল শরৎকালের নির্জন-নদীকূল-লালিতা অম্লানপ্রফুল্লা কাশবনশ্রীর মতো হাস্যে ও হিল্লোলে ঝলমল করিতেছিল।

নবেন্দুর মুগ্ধ দৃষ্টির উপরে যেন একটি পূর্ণপুষ্পিতা মালতীলতা নবপ্রভাতের শীতোজ্জ্বল শিশিরকণা ঝলকে ঝলকে বর্ষণ করিতে লাগিল।

মনের আনন্দে এবং পশ্চিমের হাওয়ায় নবেন্দুর অজীর্ণ রোগ দূর হইয়া গেল। স্বাস্থ্যের নেশায়, সৌন্দর্যের মোহে এবং শ্যালীহস্তের শুশ্রূষাপুলকে সে যেন মাটি ছাড়িয়া আকাশের উপর দিয়া চলিতে লাগিল। তাহাদের বাগানের সম্মুখ দিয়া পরিপূর্ণ গঙ্গা যেন তাহারই মনের দুরন্ত পাগলামিকে আকার দান করিয়া বিষম গোলমাল করিতে করিতে প্রবল আবেগে নিরুদ্দেশ হইয়া চলিয়া যাইত।

ভোরের বেলা নদীতীরে বেড়াইয়া ফিরিবার সময় শীতপ্রভাতের স্নিগ্ধরৌদ্র যেন প্রিয়মিলনের উত্তাপের মতো তাহার সমস্ত শরীরকে চরিতার্থ করিয়া দিত। তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া শ্যালীর শখের রন্ধনে জোগান দিবার ভার লইয়া নবেন্দুর অজ্ঞতা ও অনৈপুণ্য পদে পদে প্রকাশ পাইতে থাকিত। কিন্তু, অভ্যাস ও মনোযোগের দ্বারা উত্তরোত্তর তাহা সংশোধন করিয়া লইবার জন্য মূঢ় অনভিজ্ঞের কিছুমাত্র আগ্রহ দেখা গেল না; কারণ, প্রত্যহ নিজেকে অপরাধী করিয়া সে যে-সকল তাড়না ভর্ৎসনা লাভ করিত তাহাতে কিছুতেই তাহার তৃপ্তির শেষ হইত না। যথাযথ পরিমাণে মালমসলা বিভাগ, উনান হইতে হাঁড়ি তোলা-নামা, উত্তাপাধিক্যে ব্যঞ্জন পুড়িয়া না যায় তাহার যথোচিত ব্যবস্থা— ইত্যাদি বিষয়ে সে যে সদ্যোজাত শিশুর মতো অপটু অক্ষম এবং নিরুপায় ইহাই প্রত্যহ বলপূর্বক প্রমাণ করিয়া নবেন্দু শ্যালীর কৃপামিশ্রিত হাস্য এবং হাস্যমিশ্রিত লাঞ্ছনা মনের সুখে ভোগ করিত।

মধ্যাহ্নে এক দিকে ক্ষুধার তাড়না অন্য দিকে শ্যালীর পীড়াপীড়ি, নিজের আগ্রহ

এবং প্রিয়জনের ঔৎসুক্য, রন্ধনের পারিপাট্য এবং রন্ধনীর সেবামাধুর্য, উভয়ের সংযোগে ভোজন ব্যাপারের ওজন রক্ষা করা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিত।

আহারের পর সামান্য তাস খেলাতেও নবেন্দু প্রতিভার পরিচয় দিতে পারিত না। চুরি করিত, হাতের কাগজ দেখিত, কাড়াকাড়ি বকাবকি বাধাইয়া দিত কিন্তু তবু জিতিতে পারিত না। না জিতিলেও জোর করিয়া তাহার হার অস্বীকার করিত এবং সেজন্য প্রত্যহ তাহার গঞ্জনার সীমা থাকিত না; তথাপিও পাষণ্ড আত্মসংশোধনচেষ্টায় সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল।

কেবল এক বিষয়ে তাহার সংশোধন সম্পূর্ণ হইয়াছিল। সাহেবের সোহাগ যে জীবনের চরম লক্ষ্য, এ কথা সে উপস্থিতমত ভুলিয়া গিয়াছিল। আত্মীয়-স্বজনের শ্রদ্ধা ও স্নেহ যে কত সুখের ও গৌরবের ইহাই সে সর্বান্তঃকরণে অনুভব করিতেছিল।

তাহা ছাড়া, সে যেন এক নূতন আবহাওয়ার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিল। লাবণ্যর স্বামী নীলরতনবাবু আদালতে বড়ো উকিল হইয়াও সাহেবসুবাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন না বলিয়া অনেক কথা উঠিত। তিনি বলিতেন, "কাজ কী, ভাই! যদি পাণ্টা ভদ্রতা না করে তবে আমি যাহা দিলাম তাহা তো কোনোমতেই ফিরাইয়া পাইব না। মরুভূমির বালি ফুটফুটে সাদা বলিয়াই কি তাহাতে বীজ বুনিয়া কোনো সুখ আছে! ফসল ফিরিয়া পাইলে কালো জমিতেও বীজ বোনা যায়।"

নবেন্দুও টানে পড়িয়া দলে ভিড়িয়া গেল তাহার আর পরিণামচিন্তা রহিল না। পৈতৃক এবং স্বকীয় যত্নে পূর্বে জমি যাহা পাট করা ছিল তাহাতেই রায়বাহাদুর খেতাবের সম্ভাবনা আপনিই বাড়িতে লাগিল। ইতিমধ্যে আর নবজলসিঞ্চনের প্রয়োজন রহিল না। নবেন্দু ইংরাজের বিশেষ একটি শখের শহরে এক বহুব্যয়সাধ্য ঘোড়দৌড়স্থান নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

হেনকালে কন্‌গ্রেসের সময় নিকটবর্তী হইল। নীলরতনের নিকট চাঁদা-সংগ্রহের অনুরোধপত্র আসিল।

নবেন্দু লাবণ্যর সহিত মনের আনন্দে নিশ্চিন্তমনে তাস খেলিতেছিল। নীলরতন খাতা-হস্তে মধ্যে আসিয়া পড়িয়া কহিল, "একটা সই দিতে হইবে।"

পূর্বসংস্কারক্রমে নবেন্দুর মুখ শুকাইয়া গেল। লাবণ্য শশব্যস্ত হইয়া কহিল, "খবরদার, এমন কাজ করিয়ো না, তোমার ঘোড়দৌড়ের মাঠখানা মাটি হইয়া যাইবে।"

নবেন্দু আস্ফালন করিয়া কহিল, "সেই ভাবনায় আমার রাত্রে ঘুম হয় না!"

নীলরতন আশ্বাস দিয়া কহিল, "তোমার নাম কোনো কাগজে প্রকাশ হইবে না।"

লাবণ্য অত্যন্ত চিন্তিত বিজ্ঞভাবে কহিল, "তবু কাজ কী! কী জানি যদি কথায় কথায়—"

নবেন্দু তীব্রস্বরে কহিল, "কাগজে প্রকাশ হইলে আমার নাম ক্ষইয়া যাইবে না।"

এই বলিয়া নীলরতনের হাত হইতে খাতা টানিয়া একেবারে হাজার টাকা ফস্ করিয়া সই করিয়া দিল। মনের মধ্যে আশা রহিল, কাগজে সংবাদ বাহির হইবে না।

লাবণ্য মাথায় হাত দিয়া কহিল, "করিলে কী!"

নবেন্দু দর্পভরে কহিল, "কেন, অন্যায় কী করিয়াছি।"

লাবণ্য কহিল, "শেয়ালদা স্টেশনের গার্ড, হোয়াইট্-অ্যাবের দোকানের অ্যাসিস্টান্ট, হার্ট্‌ব্রাদারদের সহিস-সাহেব, এঁরা যদি তোমার উপর রাগ করিয়া অভিমান করিয়া বসেন, যদি তোমার পূজার নিমন্ত্রণে শ্যাম্পেন খাইতে না আসেন, যদি দেখা হইলে তোমার পিঠ না চাপড়ান!"

নবেন্দু উদ্ধতভাবে কহিল, "তাহা হইলে আমি বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিব।"

দিনকয়েক পরেই নবেন্দু প্রাতঃকালে চা খাইতে-খাইতে খবরের কাগজ পড়িতেছেন, হঠাৎ চোখে পড়িল এক x স্বাক্ষরিত পত্রপ্রেরক তাঁহাকে প্রচুর ধন্যবাদ দিয়া কন্‌গ্রেসে চাঁদার কথা প্রকাশ করিয়াছে এবং তাঁহার মতো লোককে দলে পাইয়া কন্‌গ্রেসের যে কতটা বলবৃদ্ধি হইয়াছে লোকটা তাহারও পরিমাণ নির্ণয় করিতে পারে নাই।

কন্‌গ্রেসের বলবৃদ্ধি! হা স্বর্গগত তাত পূর্ণেন্দুশেখর! কন্‌গ্রেসের বলবৃদ্ধি করিবার জন্যই কি তুমি হতভাগাকে ভারতভূমিতে জন্মদান করিয়াছিলে!

কিন্তু, দুঃখের সঙ্গে সুখও আছে। নবেন্দুর মতো লোক যে যে-সে লোক নহেন, তাঁহাকে নিজ তীরে তুলিবার জন্য যে এক দিকে ভারতবর্ষীয় ইংরাজ-সম্প্রদায় অপর দিকে কন্‌গ্রেস লালায়িতভাবে ছিপ ফেলিয়া অনিমিষলোচনে বসিয়া আছে, এ কথাটা নিতান্ত ঢাকিয়া রাখিবার কথা নহে। অতএব নবেন্দু হাসিতে হাসিতে কাগজখানা লইয়া লাবণ্যকে দেখাইলেন। কে লিখিয়াছে যেন কিছুই জানে না, এমনি ভাবে লাবণ্য আকাশ হইতে পড়িয়া কহিল, "ওমা, এ যে সমস্তই ফাঁস করিয়া দিয়াছে! আহা! আহা! তোমার এমন শত্রু কে ছিল! তাহার কলমে যেন ঘুণ ধরে, তাহার কালিতে যেন বালি পড়ে, তাহার কাগজ যেন পোকায় কাটে—"

নবেন্দু হাসিয়া কহিল, "আর অভিশাপ দিয়ো না। আমি আমার শত্রুকে মার্জনা করিয়া আশীর্বাদ করিতেছি, তাহার সোনার দোয়াত-কলম হয় যেন!"

দুইদিন পরে কন্‌গ্রেসের বিপক্ষপক্ষীয় একখানা ইংরাজ-সম্পাদিত ইংরাজি কাগজ ডাকযোগে নবেন্দুর হাতে আসিয়া পৌঁছিলে পড়িয়া দেখিলেন, তাহাতে 'One who knows' স্বাক্ষরে পূর্বোক্ত সংবাদের প্রতিবাদ বাহির হইয়াছে। লেখক লিখিতেছেন যে, নবেন্দুকে যাঁহারা জানেন তাঁহারা তাঁহার সম্বন্ধে এই দুর্নাম-রটনা কখনোই বিশ্বাস করিতে পারেন না; চিতাবাঘের পক্ষে নিজ চর্মের কৃষ্ণ অঙ্কগুলির পরিবর্তন যেমন অসম্ভব নবেন্দুর পক্ষেও কন্‌গ্রেসের দলবৃদ্ধি করা তেমনি। বাবু নবেন্দুশেখরের যথেষ্ট নিজস্ব পদার্থ আছে, তিনি কর্মশূন্য উমেদার ও মক্কেলশূন্য আইনজীবী নহেন। তিনি দুইদিন বিলাতে ঘুরিয়া, বেশভূষা-আচারব্যবহারে অদ্ভুত কপিবৃত্তি করিয়া, স্পর্ধাভরে, ইংরেজ-সমাজে প্রবেশোদ্যত হইয়া, অবশেষে ক্ষুণ্ণমনে হতাশভাবে ফিরিয়া আসেন নাই, অতএব কেন যে তিনি এই-সকল ইত্যাদি ইত্যাদি।

হা পরলোকগত পিতঃ পূর্ণেন্দুশেখর! ইংরাজের নিকট এত নাম এত বিশ্বাস সঞ্চয় করিয়া তবে তুমি মরিয়াছিলে!

এ চিঠিখানিও শ্যালীর নিকট পেখমের মতো বিস্তার করিয়া ধরিবার যোগ্য। ইহার মধ্যে একটা কথা আছে যে, নবেন্দু অখ্যাত অকিঞ্চন লক্ষ্মীছাড়া নহেন, তিনি সারবান পদার্থবান লোক।

লাবণ্য পুনশ্চ আকাশ হইতে পড়িয়া কহিল, "এ আবার তোমার কোন্ পরমবন্ধু লিখিল! কোন্ টিকিট কালেক্টর, কোন্ চামড়ার দালাল, কোন্ গড়ের বাদ্যের বাজনদার!"

নীলরতন কহিল, "এ চিঠির একটা প্রতিবাদ করা তো তোমার উচিত।"

নবেন্দু কিছু উঁচু চালে বলিল, "দরকার কী! যে যা বলে তাহারই কি প্রতিবাদ করিতে হইবে।"

লাবণ্য উচ্চৈঃস্বরে চারি দিকে একেবারে হাসির ফোয়ারা ছড়াইয়া দিল।

নবেন্দু অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "এত হাসি যে!"

তাহার উত্তরে লাবণ্য পুনর্বার অনিবার্য বেগে হাসিয়া পুষ্পিতযৌবনা দেহলতা লুণ্ঠিত করিতে লাগিল।

নবেন্দু নাকে মুখে চোখে এই প্রচুর পরিহাসের পিচকারি খাইয়া অত্যন্ত নাকাল হইল। একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, "তুমি মনে করিতেছ, প্রতিবাদ করিতে আমি ভয় করি!"

লাবণ্য কহিল, "তা কেন। আমি ভাবিতেছিলাম, তোমার অনেক আশাভরসার সেই ঘোড়দৌড়ের মাঠখানি বাঁচাইবার চেষ্টা এখনো ছাড় নাই— যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।"

নবেন্দু কহিল, "আমি বুঝি সেইজন্য লিখিতে চাহি না!" অত্যন্ত রাগিয়া দোয়াতকলম লইয়া বসিল। কিন্তু, লেখার মধ্যে রাগের রক্তিমা বড়ো প্রকাশ পাইল না, কাজেই লাবণ্য ও নীলরতনকে সংশোধনের ভার লইতে হইল। যেন লুচিভাজার পালা পড়িল; নবেন্দু যেটা জলে ও ঘিয়ে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা নরম নরম করিয়া এবং চাপিয়া যথাসাধ্য চেপটা করিয়া বেলিয়া দেয় তাঁহার দুই সহকারী তৎক্ষণাৎ সেটাকে ভাজিয়া কড়া ও গরম করিয়া ফুলাইয়া ফুলাইয়া তোলে। লেখা হইল যে, আত্মীয় যখন শত্রু হয় তখন বহিঃশত্রু অপেক্ষা ভয়ংকর হইয়া উঠে। পাঠান অথবা রাশিয়ান ভারত-গবর্মেন্টের তেমন শত্রু নহে যেমন শত্রু গর্বোদ্ধত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান-সম্প্রদায়। গবর্মেন্টের সহিত প্রজাসাধারণের নিরাপদ সৌহার্দ্যবন্ধনের তাহারাই দুর্ভেদ্য অন্তরায়। কন্‌গ্রেস রাজা ও প্রজার মাঝখানে স্থায়ী সদ্ভাবসাধনের যে প্রশস্ত রাজপথ খুলিয়াছে, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলো ঠিক তাহার মধ্যস্থল জুড়িয়া একেবারে কণ্টকিত হইয়া রহিয়াছে। ইত্যাদি।

নবেন্দুর ভিতরে ভিতরে ভয়-ভয় করিতে লাগিল অথচ 'লেখাটা বড়ো সরেস হইয়াছে' মনে করিয়া, রহিয়া রহিয়া একটু আনন্দও হইতে লাগিল। এমন সুন্দর রচনা তাহার সাধ্যাতীত ছিল।

ইহার পর কিছুদিন ধরিয়া নানা কাগজে বিবাদবিসম্বাদ-বাদপ্রতিবাদে নবেন্দুর চাঁদা এবং কন্‌গ্রেসে যোগ দেওয়ার কথা লইয়া দশ দিকে ঢাক বাজিতে লাগিল।

নবেন্দু এক্ষণে মরিয়া হইয়া কথায় বার্তায় শ্যালীসমাজে অত্যন্ত নির্ভীক দেশহিতৈষী হইয়া উঠিল। লাবণ্য মনে মনে হাসিয়া কহিল, 'এখনো তোমার অগ্নিপরীক্ষা বাকি আছে।'

একদিন প্রাতঃকালে নবেন্দু স্নানের পূর্বে বক্ষস্থল তৈলাক্ত করিয়া পৃষ্ঠদেশের দুর্গম অংশগুলিতে তৈলসঞ্চার করিবার কৌশল অবলম্বন করিতেছেন, এমন সময় বেহারা এক কার্ড হাতে করিয়া তাঁহাকে দিল, তাহাতে স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেটের নাম আঁকা। লাবণ্য সহাস্যকুতূহলী চক্ষে আড়াল হইতে কৌতুক দেখিতেছিল।

তৈললাঞ্ছিত কলেবরে তো ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করা যায় না— নবেন্দু ভাজিবার পূর্বে মসলা-মাখা কই-মৎস্যের মতো বৃথা ব্যতিব্যস্ত হইতে লাগিলেন। তাড়াতাড়ি চকিতের মধ্যে স্নান করিয়া কোনোমতে কাপড় পরিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে

বাহিরের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বেহারা বলিল, "সাহেব অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া চলিয়া গিয়াছেন।" এই আগাগোড়া মিথ্যাচরণ পাপের কতটা অংশ বেহারার, কতটা অংশ লাবণ্যর, তাহা নৈতিক গণিতশাস্ত্রের একটা সূক্ষ্ম সমস্যা।

টিকটিকির কাটা লেজ যেমন সম্পূর্ণ অন্ধভাবে ধড় ফড় করে, নবেন্দুর ক্ষুব্ধ হৃদয় ভিতরে ভিতরে তেমনি আছাড় খাইতে লাগিল। সমস্ত দিন খাইতে শুইতে আর সোয়াস্তি রহিল না।

লাবণ্য আভ্যন্তরিক হাস্যের সমস্ত আভাস মুখ হইতে সম্পূর্ণ দূর করিয়া দিয়া উদ্‌বিগ্নভাবে থাকিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "আজ তোমার কী হইয়াছে বলো দেখি! অসুখ করে নাই তো?"

নবেন্দু কায়ক্লেশে হাসিয়া কোনোমতে একটা দেশকালপাত্রোচিত উত্তর বাহির করিল; কহিল, "তোমার এলেকার মধ্যে আবার অসুখ কিসের। তুমি আমার ধন্বন্তরিনী।"

কিন্তু, মুহূর্তমধ্যেই হাসি মিলাইয়া গেল এবং সে ভাবিতে লাগিল, 'একে আমি কন্‌গ্রেসে চাঁদা দিলাম, কাগজে কড়া চিঠি লিখিলাম, তাহার উপরে ম্যাজিস্ট্রেট নিজে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, আমি তাঁহাকে বসাইয়া রাখিলাম, না জানি কী মনে করিতেছেন!'

'হা তাত, হা পূর্ণেন্দুশেখর! আমি যাহা নই ভাগ্যের বিপাকে গোলেমালে তাহাই প্রতিপন্ন হইলাম।'

পরদিন সাজগোজ করিয়া ঘড়ির চেন ঝুলাইয়া মস্ত একটা পাগড়ি পরিয়া নবেন্দু বাহির হইল। লাবণ্য জিজ্ঞাসা করিল, "যাও কোথায়।"

নবেন্দু কহিল, "একটা বিশেষ কাজ আছে—"

লাবণ্য কিছু বলিল না।

সাহেবের দরজার কাছে কার্ড বাহির করিবামাত্র আরদালি কহিল, "এখন দেখা হইবে না।"

নবেন্দু পকেট হইতে দুইটা টাকা বাহির করিল। আরদালি সংক্ষিপ্ত সেলাম করিয়া কহিল, "আমরা পাঁচজন আছি।" নবেন্দু তৎক্ষণাৎ দশ টাকার এক নোট বাহির করিয়া দিলেন।

সাহেবের নিকট তলব পড়িল। সাহেব, তখন চটিজুতা ও মর্নিংগৌন পরিয়া লেখাপড়ার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। নবেন্দু একটা সেলাম করিলেন, ম্যাজিস্ট্রেট

তাঁহাকে অঙ্গুলিসংকেতে বসিবার অনুমতি করিয়া কাগজ হইতে মুখ না তুলিয়া কহিলেন, "কী বলিবার আছে, বাবু।"

নবেন্দু ঘড়ির চেন নাড়িতে নাড়িতে বিনীত কম্পিত স্বরে বলিল, "কাল আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু—"

সাহেব ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একটা চোখ কাগজ হইতে তুলিয়া বলিলেন, "সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম! Babu, what nonsense are you talking!"

নবেন্দু "Beg your pardon! ভুল হইয়াছে, গোল হইয়াছে" করিতে করিতে ঘর্মাপ্লুত কলেবরে কোনোমতে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। এবং সে রাত্রে বিছানায় শুইয়া কোনো দূরস্বপ্নশ্রুত মন্ত্রের ন্যায় একটা বাক্য থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার কানে আসিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল, "Babu, you are a howling idiot!"

পথে আসিতে আসিতে তাঁহার মনে ধারণা হইল যে, ম্যাজিস্ট্রেট যে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল সে কথাটা কেবল রাগ করিয়া সে অস্বীকার করিল। মনে মনে কহিলেন, 'ধরণী দ্বিধা হও!' কিন্তু ধরণী তাঁহার অনুরোধ রক্ষা না করাতে নির্বিঘ্নে বাড়ি আসিয়া পৌঁছিলেন।

লাবণ্যকে আসিয়া কহিলেন, "দেশে পাঠাইবার জন্য গোলাপজল কিনিতে গিয়াছিলাম।"

বলিতে-না-বলিতে কালেক্টরের চাপরাস-পরা জনছয়েক পেয়াদা আসিয়া উপস্থিত। সেলাম করিয়া হাস্যমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

লাবণ্য হাসিয়া কহিল, "তুমি কন্‌গ্রেসে চাঁদা দিয়াছ বলিয়া তোমাকে গ্রেফ্‌তার করিতে আসে নাই তো?"

পেয়াদারা ছয়জনে বারো পাটি দন্তাগ্রভাগ উন্মুক্ত করিয়া কহিল, "বকশিশ, বাবুসাহেব।"

নীলরতন পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া বিরক্তস্বরে কহিলেন, "কিসের বকশিশ!"

পেয়াদারা বিকশিতদন্তে কহিল, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন, তাহার বকশিশ।

লাবণ্য হাসিয়া কহিল, "ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আজকাল গোলাপজল বিক্রি ধরিয়াছেন নাকি। এমন অত্যন্ত ঠাণ্ডা ব্যবসায় তো তাঁহার পূর্বে ছিল না।"

হতভাগ্য নবেন্দু গোলাপজলের সহিত ম্যাজিস্ট্রেট-দর্শনের সামঞ্জস্য সাধন করিতে গিয়া কী যে আবোলতাবোল বলিল তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না।

নীলরতন কহিল, "বকশিশের কোনো কাজ হয় নাই। বকশিশ নাহি মিলেগা।"

নবেন্দু সংকুচিতভাবে পকেট হইতে একটা নোট বাহির করিয়া কহিল, "উহারা গরিব মানুষ, কিছু দিতে দোষ কী।"

নীলরতন নবেন্দুর হাত হইতে নোট টানিয়া লইয়া কহিল, "উহাদের অপেক্ষা গরিব মানুষ জগতে আছে, আমি তাহাদিগকে দিব।"

রুষ্ট মহেশ্বরের ভূতপ্রেতগণকেও কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা করিবার সুযোগ না পাইয়া নবেন্দু অত্যন্ত ফাঁপরে পড়িয়া গেল। পেয়াদাগণ যখন বজ্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গমনোদ্যত হইল, তখন নবেন্দু একান্ত করুণভাবে তাহাদের দিকে চাহিলেন; নীরবে নিবেদন করিলেন, "বাবাসকল, আমার কোনো দোষ নাই, তোমরা তো জান!"

কলিকাতায় কন্‌গ্রেসের অধিবেশন। তদুপলক্ষে নীলরতন সস্ত্রীক রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। নবেন্দুও তাঁহাদের সঙ্গে ফিরিল।

কলিকাতায় পদার্পণ করিবামাত্র কন্‌গ্রেসের দলবল নবেন্দুকে চতুর্দিকে ঘিরিয়া একটা প্রকাণ্ড তাণ্ডব শুরু করিয়া দিল। সম্মান সমাদর স্তুতিবাদের সীমা রহিল না। সকলেই বলিল, "আপনাদের মতো নায়কগণ দেশের কাজে যোগ না দিলে দেশের উপায় নাই।" কথাটার যাথার্থ্য নবেন্দু অস্বীকার করিতে পারিলেন না, এবং গোলেমালে হঠাৎ কখন্ দেশের একজন অধিনায়ক হইয়া উঠিলেন। কন্‌গ্রেস-সভায় যখন পদার্পণ করিলেন তখন সকলে মিলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিজাতীয় বিলাতী তারস্বরে 'হিপ্ হিপ্ হুরে' শব্দে তাঁহাকে উৎকট অভিবাদন করিল। আমাদের মাতৃভূমির কর্ণমূল লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিল।

যথাকালে মহারানীর জন্মদিন আসিল, নবেন্দুর রায়বাহাদুর খেতাব নিকটসমাগত মরীচিকার মতো অন্তর্ধান করিল।

সেইদিন সায়াহ্নে লাবণ্যলেখা সমারোহে নবেন্দুকে নিমন্ত্রণপূর্বক তাঁহাকে নববস্ত্রে ভূষিত করিয়া স্বহস্তে তাঁহার ললাটে রক্তচন্দনের তিলক এবং প্রত্যেক শ্যালী তাঁহার কণ্ঠে একগাছি করিয়া স্বরচিত পুষ্পমালা পরাইয়া দিল। অরুণাম্বরবসনা অরুণলেখা সেদিন হাস্যে লজ্জায় এবং অলংকারে আড়াল হইতে ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল। তাহার স্বেদাঙ্কিত লজ্জাশীতল হস্তে একটা গোড়েমালা দিয়া ভগিনীরা তাহাকে টানাটানি করিল কিন্তু সে কোনোমতে বশ মানিল না এবং সেই প্রধান মাল্যখানি নবেন্দুর কণ্ঠ কামনা করিয়া জনহীন নিশীথের জন্য গোপনে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

শ্যালীরা নবেন্দুকে কহিল, "আজ আমরা তোমাকে রাজা করিয়া দিলাম! ভারতবর্ষে এমন সম্মান তুমি ছাড়া আর কাহারো সম্ভব হইবে না।"

নবেন্দু ইহাতে সম্পূর্ণ সান্ত্বনা পাইল কি না তাহা তাহার অন্তঃকরণ আর অন্তর্যামীই জানেন, কিন্তু আমাদের এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, মরিবার পূর্বে সে রায়বাহাদুর হইবেই এবং তাহার মৃত্যু উপলক্ষে Englishman ও Pioneer সমস্বরে শোক করিতে ছাড়িবে না। অতএব, ইতিমধ্যে Three Cheers for বাবু পূর্ণেন্দুশেখর! হিপ্ হিপ্ হুরে, হিপ্ হিপ হুরে, হিপ্ হিপ্ হুরে!

আশ্বিন ১৩০৫

মণিহারা

সেই জীর্ণপ্রায় বাঁধাঘাটের ধারে আমার বোট লাগানো ছিল। তখন সূর্য অস্ত গিয়াছে।

বোটের ছাদের উপরে মাঝি নমাজ পড়িতেছে। পশ্চিমের জ্বলন্ত আকাশপটে তাহার নীরব উপাসনা ক্ষণে ক্ষণে ছবির মতো আঁকা পড়িতেছিল। স্থির রেখাহীন নদীর জলের উপর ভাষাতীত অসংখ্য বর্ণচ্ছটা দেখিতে দেখিতে ফিকা হইতে গাঢ় লেখায়, সোনার রঙ হইতে ইস্পাতের রঙে, এক আভা হইতে আর-এক আভায় মিলাইয়া আসিতেছিল।

জানালা-ভাঙা বারান্দা-ঝুলিয়া-পড়া জরাগ্রস্ত বৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে অশ্বত্থমূল-বিদারিত ঘাটের উপর ঝিল্লিমুখর সন্ধ্যাবেলায় একলা বসিয়া আমার শুষ্ক চক্ষুর কোণ ভিজিবে-ভিজিবে করিতেছে, এমন সময়ে মাথা হইতে পা পর্যন্ত হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া শুনিলাম, "মহাশয়ের কোথা হইতে আগমন।"

দেখিলাম ভদ্রলোকটি স্বল্পাহারশীর্ণ, ভাগ্যলক্ষ্মী কর্তৃক নিতান্ত অনাদৃত। বাংলাদেশের অধিকাংশ বিদেশী চাকুরের যেমন একরকম বহুকাল-জীর্ণসংস্কার-বিহীন চেহারা, ইহারও সেইরূপ। ধুতির উপরে একখানি মলিন তৈলাক্ত আসামী মটকার বোতাম-খোলা চাপকান; কর্মক্ষেত্র হইতে যেন অল্পক্ষণ হইল ফিরিতেছেন। এবং যে সময় কিঞ্চিৎ জলপান খাওয়া উচিত ছিল সে সময় হতভাগ্য নদীতীরে কেবল সন্ধ্যার হাওয়া খাইতে আসিয়াছেন।

আগন্তুক সোপানপার্শ্বে আসনগ্রহণ করিলেন। আমি কহিলাম, "আমি রাঁচি হইতে আসিতেছি।"

"কী করা হয়।"

"ব্যাবসা করিয়া থাকি।"

"কী ব্যাবসা।"

"হরীতকী, রেশমের গুটি এবং কাঠের ব্যাবসা।"

"কী নাম।"

ঈষৎ থামিয়া একটা নাম বলিলাম। কিন্তু সে আমার নিজের নাম নহে।

ভদ্রলোকের কৌতুহলনিবৃত্তি হইল না। পুনরায় প্রশ্ন হইল, "এখানে কী করিতে আগমন।"

আমি কহিলাম, "বায়ুপরিবর্তন।"

লোকটি কিছু আশ্চর্য হইল। কহিল, "মহাশয়, আজ প্রায় ছয়বৎসর ধরিয়া এখানকার বায়ু এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ গড়ে পনেরো গ্রেন্ করিয়া কুইনাইন খাইতেছি কিন্তু কিছু তো ফল পাই নাই।"

আমি কহিলাম, "এ কথা মানিতেই হইবে, রাঁচি হইতে এখানে বায়ুর যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা যাইবে।"

তিনি কহিলেন, "আজ্ঞা হাঁ, যথেষ্ট। এখানে কোথায় বাসা করিবেন।"

আমি ঘাটের উপরকার জীর্ণবাড়ি দেখাইয়া কহিলাম, "এই বাড়িতে।"

বোধ করি লোকটির মনে সন্দেহ হইল, আমি এই পোড়ো বাড়িতে কোনো গুপ্তধনের সন্ধান পাইয়াছি। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর কোনো তর্ক তুলিলেন না, কেবল আজ পনেরো বৎসর পূর্বে এই অভিশাপগ্রস্ত বাড়িতে যে ঘটনাটি ঘটিয়াছিল তাহারই বিস্তারিত বর্ণনা করিলেন।

লোকটি এখানকার ইস্কুলমাস্টার। তাঁহার ক্ষুধা ও রোগ-শীর্ণ মুখে মস্ত একটা টাকের নীচে একজোড়া বড়ো বড়ো চক্ষু আপন কোটরের ভিতর হইতে অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতায় জ্বলিতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়া ইংরাজ-কবি কোল্‌রিজের সৃষ্ট প্রাচীন নাবিকের কথা আমার মনে পড়িল।

মাঝি নমাজ পড়া সমাধা করিয়া রন্ধনকার্যে মন দিয়াছে। সন্ধ্যার শেষ আভাটুকু মিলাইয়া আসিয়া ঘাটের উপরকার জনশূন্য অন্ধকার বাড়ি আপন পূর্বাবস্থার প্রকাণ্ড প্রেতমূর্তির মতো নিস্তব্ধ দাঁড়াইয়া রহিল।

ইস্কুলমাস্টার কহিলেন—

আমি এই গ্রামে আসার প্রায় দশ বৎসর পূর্বে এই বাড়িতে ফণিভূষণ সাহা বাস

করিতেন। তিনি তাঁহার অপুত্রক পিতৃব্য দুর্গামোহন সাহার বৃহৎ বিষয় এবং ব্যবসায়ের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

কিন্তু, তাঁহাকে একালে ধরিয়াছিল। তিনি লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তিনি জুতাসমেত সাহেবের আপিসে ঢুকিয়া সম্পূর্ণ খাঁটি ইংরাজি বলিতেন। তাহাতে আবার দাড়ি রাখিয়াছিলেন, সুতরাং সাহেব-সওদাগরের নিকট তাঁহার উন্নতির সম্ভাবনামাত্র ছিল না। তাঁহাকে দেখিবামাত্রই নব্যবঙ্গ বলিয়া ঠাহর হইত।

আবার ঘরের মধ্যেও এক উপসর্গ জুটিয়াছিল। তাঁহার স্ত্রীটি ছিলেন সুন্দরী। একে কালেজে-পড়া তাহাতে সুন্দরী স্ত্রী, সুতরাং সেকালের চালচলন আর রহিল না। এমন-কি, ব্যামো হইলে অ্যাসিস্টাণ্ট-সার্জনকে ডাকা হইত। অশন বসন ভূষণও এই পরিমাণে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

মহাশয় নিশ্চয়ই বিবাহিত, অতএব এ কথা আপনাকে বলাই বাহুল্য যে, সাধারণত স্ত্রীজাতি কাঁচা আম, ঝাল লঙ্কা এবং কড়া স্বামীই ভালোবাসে। যে দুর্ভাগ্য পুরুষ নিজের স্ত্রীর ভালোবাসা হইতে বঞ্চিত সে-যে কুশ্রী অথবা নির্ধন তাহা নহে, সে নিতান্ত নিরীহ।

যদি জিজ্ঞাসা করেন, কেন এমন হইল, আমি এ সম্বন্ধে অনেক কথা ভাবিয়া রাখিয়াছি। যাহার যা প্রবৃত্তি এবং ক্ষমতা সেটার চর্চা না করিলে সে সুখী হয় না। শিঙে শান দিবার জন্য হরিণ শক্ত গাছের গুঁড়ি খোঁজে, কলাগাছে তাহার শিং ঘষিবার সুখ হয় না। নরনারীর ভেদ হইয়া অবধি স্ত্রীলোক দুরন্ত পুরুষকে নানা কৌশলে ভুলাইয়া বশ করিবার বিদ্যা চর্চা করিয়া আসিতেছে। যে স্বামী আপনি বশ হইয়া বসিয়া থাকে তাহার স্ত্রী-বেচারা একেবারেই বেকার, সে তাহার মাতামহীদের নিকট হইতে শতলক্ষ বৎসরের শাণ-দেওয়া যে উজ্জ্বল বরুণাস্ত্র, অগ্নিবাণ ও নাগপাশবন্ধনগুলি পাইয়াছিল তাহা সমস্ত নিষ্ফল হইয়া যায়।

স্ত্রীলোক পুরুষকে ভুলাইয়া নিজের শক্তিতে ভালোবাসা আদায় করিয়া লইতে চায়, স্বামী যদি ভালোমানুষ হইয়া সে অবসরটুকু না দেয়, তবে স্বামীর অদৃষ্ট মন্দ এবং স্ত্রীরও ততোধিক।

নবসভ্যতার শিক্ষামন্ত্রে পুরুষ আপন স্বভাবসিদ্ধ বিধাতাদত্ত সুমহৎ বর্বরতা হারাইয়া আধুনিক দাম্পত্যসম্বন্ধটাকে এমন শিথিল করিয়া ফেলিয়াছে। অভাগা ফণিভূষণ আধুনিক সভ্যতার কল হইতে অত্যন্ত ভালোমানুষটি হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিল —ব্যবসায়েও সে সুবিধা করিতে পারিল না, দাম্পত্যেও তাহার তেমন সুযোগ ঘটে নাই।

ফণিভূষণের স্ত্রী মণিমালিকা, বিনা চেষ্টায় আদর, বিনা অশ্রুবর্ষণে ঢাকাই শাড়ি এবং বিনা দুর্জয় মানে বাজুবন্ধ লাভ করিত। এইরূপে তাহার নারীপ্রকৃতি এবং সেই সঙ্গে তাহার ভালোবাসা নিশ্চেষ্ট হইয়া গিয়াছিল; সে কেবল গ্রহণ করিত, কিছু দিত না। তাহার নিরীহ এবং নির্বোধ স্বামীটি মনে করিত, দানই বুঝি প্রতিদান পাইবার উপায়। একেবারে উল্‌টা বুঝিয়াছিল আর কি।

ইহার ফল হইল এই যে, স্বামীকে সে আপন ঢাকাই শাড়ি এবং বাজুবন্ধ জোগাইবার যন্ত্রস্বরূপ জ্ঞান করিত; যন্ত্রটিও এমন সুচারু যে, কোনোদিন তাহার চাকায় এক ফোঁটা তেল জোগাইবারও দরকার হয় নাই।

ফণিভূষণের জন্মস্থান ফুলবেড়ে, বাণিজ্যস্থান এখানে। কর্মানুরোধে এখানেই তাহাকে অধিকাংশ সময় থাকিতে হইত। ফুলবেড়ের বাড়িতে তাহার মা ছিল না, তবু পিসি মাসি ও অন্য পাঁচজন ছিল। কিন্তু, ফণিভূষণ পিসি মাসি ও অন্য পাঁচজনের উপকারার্থেই বিশেষ করিয়া সুন্দরী স্ত্রী ঘরে আনে নাই। সুতরাং স্ত্রীকে সে পাঁচজনের কাছ থেকে আনিয়া এই কুঠিতে একলা নিজের কাছেই রাখিল। কিন্তু অন্যান্য অধিকার হইতে স্ত্রী-অধিকারের প্রভেদ এই যে, স্ত্রীকে পাঁচজনের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একলা নিজের কাছে রাখিলেই যে সব সময় বেশি করিয়া পাওয়া যায় তাহা নহে।

স্ত্রীটি বেশি কথাবার্তা কহিত না, পাড়াপ্রতিবেশিনীদের সঙ্গেও তাহার মেলামেশা বেশি ছিল না; ব্রত উপলক্ষ্য করিয়া দুটো ব্রাহ্মণকে খাওয়ানো বা বৈষ্ণবীকে দুটো পয়সা ভিক্ষা দেওয়া কখনো তাহার দ্বারা ঘটে নাই। তাহার হাতে কোনো জিনিস নষ্ট হয় নাই; কেবল স্বামীর আদরগুলা ছাড়া আর যাহা পাইয়াছে সমস্তই জমা করিয়া রাখিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সে নিজের অপরূপ যৌবনশ্রী হইতেও যেন লেশমাত্র অপব্যয় ঘটিতে দেয় নাই। লোকে বলে, তাহার চব্বিশবৎসর বয়সের সময়ও তাহাকে চোদ্দবৎসরের মতো কাঁচা দেখিতে ছিল। যাহাদের হৃৎপিণ্ড বরফের পিণ্ড, যাহাদের বুকের মধ্যে ভালোবাসার জ্বালাযন্ত্রণা স্থান পায় না, তাহারা বোধ করি সুদীর্ঘকাল তাজা থাকে, তাহারা কৃপণের মতো অন্তরে বাহিরে আপনাকে জমাইয়া রাখিতে পারে।

ঘনপল্লবিত অতিসতেজ লতার মতো বিধাতা মণিমালিকাকে নিষ্ফলা করিয়া রাখিলেন, তাহাকে সন্তান হইতে বঞ্চিত করিলেন। অর্থাৎ, তাহাকে এমন একটা কিছু দিলেন না যাহাকে সে আপন লোহার সিন্দুকের মণিমাণিক্য অপেক্ষা বেশি করিয়া বুঝিতে পারে, যাহা বসন্তপ্রভাতের নবসূর্যের মতো আপন কোমল উত্তাপে তাহার হৃদয়ের বরফপিণ্ডটা গলাইয়া সংসারের উপর একটা স্নেহনির্ঝর বহাইয়া দেয়।

কিন্তু মণিমালিকা কাজকর্মে মজবুত ছিল। কখনোই সে লোকজন বেশি রাখে নাই। যে কাজ তাহার দ্বারা সাধ্য সে কাজে কেহ বেতন লইয়া যাইবে ইহা সে সহিতে পারিত না। সে কাহারো জন্য চিন্তা করিত না, কাহাকেও ভালোবাসিত না, কেবল কাজ করিত এবং জমা করিত, এইজন্য তাহার রোগ শোক তাপ কিছুই ছিল না; অপরিমিত স্বাস্থ্য, অবিচলিত শান্তি এবং সঞ্চীয়মান সম্পদের মধ্যে সে সবলে বিরাজ করিত।

অধিকাংশ স্বামীর পক্ষে ইহাই যথেষ্ট; যথেষ্ট কেন, ইহা দুর্লভ। অঙ্গের মধ্যে কটিদেশ বলিয়া একটা ব্যাপার আছে তাহা কোমরে ব্যথা না হইলে মনে পড়ে না; গৃহের আশ্রয়স্বরূপে স্ত্রী-যে একজন আছে ভালোবাসার তাড়নায় তাহা পদে পদে এবং তাহা চব্বিশঘণ্টা অনুভব করার নাম ঘরকন্নার কোমরে ব্যথা। নিরতিশয় পাতিব্রত্যটা স্ত্রীর পক্ষে গৌরবের বিষয় কিন্তু পতির পক্ষে আরামের নহে, আমার তো এইরূপ মত।

মহাশয়, স্ত্রীর ভালোবাসা ঠিক কতটা পাইলাম, ঠিক কতটুকু কম পড়িল, অতি সূক্ষ্ম নিক্তি ধরিয়া তাহা অহরহ তৌল করিতে বসা কি পুরুষমানুষের কর্ম! স্ত্রী আপনার কাজ করুক, আমি আপনার কাজ করি, ঘরের মোটা হিসাবটা তো এই। অব্যক্তের মধ্যে কতটা ব্যক্ত, ভাবের মধ্যে কতটুকু অভাব, সুস্পষ্টের মধ্যেও কী পরিমাণ ইঙ্গিত, অণুপরমাণুর মধ্যে কতটা বিপুলতা— ভালোবাসাবাসির তত সুসূক্ষ্ম বোধশক্তি বিধাতা পুরুষমানুষকে দেন নাই, দিবার প্রয়োজন হয় নাই। পুরুষ-মানুষের তিলপরিমাণ অনুরাগ-বিরাগের লক্ষণ লইয়া মেয়েরা বটে ওজন করিতে বসে। কথার মধ্য হইতে আসল ভঙ্গীটুকু এবং ভঙ্গীর মধ্য হইতে আসল কথাটুকু চিরিয়া চিরিয়া চুনিয়া চুনিয়া বাহির করিতে থাকে। কারণ, পুরুষের ভালোবাসাই তাহাদের বল, তাহাদের জীবনব্যবসায়ের মূলধন। ইহারই হাওয়ার গতিক লক্ষ্য করিয়া ঠিক সময়ে ঠিকমত পাল ঘুরাইতে পারিলে তবেই তাহাদের তরণী তরিয়া যায়। এইজন্যই বিধাতা ভালোবাসামান-যন্ত্রটি মেয়েদের হৃদয়ের মধ্যে ঝুলাইয়া দিয়াছেন, পুরুষদের দেন নাই।

কিন্তু বিধাতা যাহা দেন নাই সম্প্রতি পুরুষরা সেটি সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন। কবিরা বিধাতার উপর টেক্কা দিয়া এই দুর্লভ যন্ত্রটি, এই দিগ্‌দর্শন যন্ত্রশলাকাটি নির্বিচারে সর্বসাধারণের হস্তে দিয়াছেন। বিধাতার দোষ দিই না, তিনি মেয়ে-পুরুষকে যথেষ্ট ভিন্ন করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু সভ্যতায় সে ভেদ আর থাকে না, এখন মেয়েও পুরুষ হইতেছে, পুরুষও মেয়ে হইতেছে; সুতরাং ঘরের

মধ্য হইতে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিদায় লইল। এখন শুভবিবাহের পূর্বে, পুরুষকে বিবাহ করিতেছি না মেয়েকে বিবাহ করিতেছি, তাহা কোনোমতে নিশ্চয় করিতে না পারিয়া, বরকন্যা উভয়েরই চিত্ত আশঙ্কায় দুরু দুরু করিতে থাকে।

আপনি বিরক্ত হইতেছেন! একলা পড়িয়া থাকি, স্ত্রীর নিকট হইতে নির্বাসিত; দূর হইতে সংসারের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব মনের মধ্যে উদয় হয়—এগুলো ছাত্রদের কাছে বলিবার বিষয় নয়, কথাপ্রসঙ্গে আপনাকে বলিয়া লইলাম, চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

মোটকথাটা এই যে, যদিচ রন্ধনে নুন কম হইত না এবং পানে চুন বেশি হইত না, তথাপি ফণিভূষণের হৃদয় কী-যেন-কী নামক একটা দুঃসাধ্য উৎপাত অনুভব করিত। স্ত্রীর কোনো দোষ ছিল না, কোনো ভ্রম ছিল না, তবু স্বামীর কোনো সুখ ছিল না। সে তাহার সহধর্মিণীর শূন্যগহ্বর হৃদয় লক্ষ্য করিয়া কেবলই হীরামুক্তার গহনা ঢালিত কিন্তু সেগুলা পড়িত গিয়া লোহার সিন্দুকে, হৃদয় শূন্যই থাকিত। খুড়া দুর্গামোহন ভালোবাসা এত সূক্ষ্ম করিয়া বুঝিত না, এত কাতর হইয়া চাহিত না, এত প্রচুর পরিমাণে দিত না, অথচ খুড়ির নিকট হইতে তাহা অজস্র পরিমাণে লাভ করিত। ব্যবসায়ী হইতে গেলে নব্যবাবু হইলে চলে না এবং স্বামী হইতে গেলে পুরুষ হওয়া দরকার, এ কথায় সন্দেহমাত্র করিবেন না।

ঠিক এই সময়ে শৃগালগুলা নিকটবর্তী ঝোপের মধ্য হইতে অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল। মাস্টারমহাশয়ের গল্পস্রোতে• মিনিটকয়েকের জন্য বাধা পড়িল। ঠিক মনে হইল, সেই অন্ধকার সভাভূমিতে কৌতুকপ্রিয় শৃগালসম্প্রদায় ইস্কুলমাস্টারের ব্যাখ্যাত দাম্পত্যনীতি শুনিয়াই হউক বা নবসভ্যতাদুর্বল ফণিভূষণের আচরণেই হউক রহিয়া রহিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিতে লাগিল। তাহাদের ভাবোচ্ছ্বাস নিবৃত্ত হইয়া জলস্থল দ্বিগুণতর নিস্তব্ধ হইলে পর, মাস্টার সন্ধ্যার অন্ধকারে তাঁহার বৃহৎ উজ্জ্বল চক্ষু পাকাইয়া গল্প বলিতে লাগিলেন—

ফণিভূষণের জটিল এবং বহুবিস্তৃত ব্যবসায়ে হঠাৎ একটা ফাঁড়া উপস্থিত হইল। ব্যাপারটা কী তাহা আমার মতো অব্যবসায়ীর পক্ষে বোঝা এবং বোঝানো শক্ত। মোদ্দা কথা, সহসা কী কারণে বাজারে তাহার ক্রেডিট রাখা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। যদি কেবলমাত্র পাঁচটা দিনের জন্যও সে কোথাও হইতে লাখদেড়েক টাকা বাহির করিতে পারে, বাজারে একবার বিদ্যুতের মতো এই টাকাটার চেহারা দেখাইয়া

যায়, তাহা হইলেই মুহূর্তের মধ্যে সংকট উত্তীর্ণ হইয়া তাহার ব্যাবসা পালভরে ছুটিয়া চলিতে পারে।

টাকাটার সুযোগ হইতেছিল না। স্থানীয় পরিচিত মহাজনদের নিকট হইতে ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এরূপ জনরব উঠিলে তাহার ব্যবসায়ের দ্বিগুণ অনিষ্ট হইবে, আশঙ্কায় তাহাকে অপরিচিত স্থানে ঋণের চেষ্টা দেখিতে হইতেছিল। সেখানে উপযুক্ত বন্ধক না রাখিলে চলে না।

গহনা বন্ধক রাখিলে লেখাপড়া এবং বিলম্বের কারণ থাকে না, চট্‌পট্‌ এবং সহজেই কাজ হইয়া যায়।

ফণিভূষণ একবার স্ত্রীর কাছে গেল। নিজের স্ত্রীর কাছে স্বামী যেমন সহজভাবে যাইতে পারে ফণিভূষণের তেমন করিয়া যাইবার ক্ষমতা ছিল না। সে দুর্ভাগ্যক্রমে নিজের স্ত্রীকে ভালোবাসিত, যেমন ভালোবাসা কাব্যের নায়ক কাব্যের নায়িকাকে বাসে; যে ভালোবাসায় সন্তর্পণে পদক্ষেপ করিতে হয় এবং সকল কথা মুখে ফুটিয়া বাহির হইতে পারে না, যে ভালোবাসার প্রবল আকর্ষণ সূর্য এবং পৃথিবীর আকর্ষণের ন্যায় মাঝখানে একটা অতিদূর ব্যবধান রাখিয়া দেয়।

তথাপি তেমন তেমন দায়ে পড়িলে কাব্যের নায়ককেও প্রেয়সীর নিকট হুণ্ডি এবং বন্ধক এবং হ্যাণ্ড্‌নোটের প্রসঙ্গ তুলিতে হয়; কিন্তু সুর বাধিয়া যায়, বাক্যস্খলন হয়, এমন সকল পরিষ্কার কাজের কথার মধ্যেও ভাবের জড়িমা ও বেদনার বেপথু আসিয়া উপস্থিত হয়। হতভাগ্য ফণিভূষণ স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিল না, 'ওগো, আমার দরকার হইয়াছে, তোমার গহনাগুলো দাও।'

কথাটা বলিল, অথচ অত্যন্ত দুর্বলভাবে বলিল। মণিমালিকা যখন কঠিন মুখ করিয়া হাঁ-না কিছুই উত্তর করিল না, তখন সে একটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর আঘাত পাইল কিন্তু আঘাত করিল না। কারণ, পুরুষোচিত বর্বরতা লেশমাত্র তাহার ছিল না। যেখানে জোর করিয়া কাড়িয়া লওয়া উচিত ছিল, সেখানে সে আপনার আন্তরিক ক্ষোভ পর্যন্ত চাপিয়া গেল। যেখানে ভালোবাসার একমাত্র অধিকার, সর্বনাশ হইয়া গেলেও সেখানে বলকে প্রবেশ করিতে দিবে না, এই তাহার মনের ভাব। এ সম্বন্ধে তাহাকে যদি ভর্ৎসনা করা যাইত তবে সম্ভবত সে এইরূপ সূক্ষ্ম তর্ক করিত যে, বাজারে যদি অন্যায় কারণেও আমার ক্রেডিট না থাকে তবে তাই বলিয়া বাজার লুটিয়া লইবার অধিকার আমার নাই, স্ত্রী যদি স্বেচ্ছাপূর্বক বিশ্বাস করিয়া আমাকে গহনা না দেয় তবে তাহা আমি কাড়িয়া লইতে পারি না। বাজারে যেমন ক্রেডিট ঘরে তেমনি ভালোবাসা, বাহুবল কেবলমাত্র রণক্ষেত্রে। পদে পদে

এইরূপ অত্যন্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তর্কসূত্র কাটিবার জন্যই কি বিধাতা পুরুষমানুষকে এরূপ উদার, এরূপ প্রবল, এরূপ বৃহদাকার করিয়া নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাহার কি বসিয়া বসিয়া অত্যন্ত সুকুমার চিত্তবৃত্তিকে নিরতিশয় তনিমার সহিত অনুভব করিবার অবকাশ আছে, না ইহা তাহাকে শোভা পায়।

যাহা হউক, আপন উন্নত হৃদয়বৃত্তির গর্বে স্ত্রীর গহনা স্পর্শ না করিয়া ফণিভূষণ অন্য উপায়ে অর্থ-সংগ্রহের জন্য কলিকাতায় চলিয়া গেল।

সংসারে সাধারণত স্ত্রীকে স্বামী যতটা চেনে স্বামীকে স্ত্রী তাহার চেয়ে অনেক বেশি চেনে; কিন্তু স্বামীর প্রকৃতি যদি অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয় তবে স্ত্রীর অণুবীক্ষণে তাহার সমস্তটা ধরা পড়ে না। আমাদের ফণিভূষণকে ফণিভূষণের স্ত্রী ঠিক বুঝিত না। স্ত্রীলোকের অশিক্ষিতপটুত্ব যে-সকল বহুকালাগত প্রাচীন সংস্কারের দ্বারা গঠিত, অত্যন্ত নব্য পুরুষেরা তাহার বাহিরে গিয়া পড়ে। ইহারা এক রকমের! ইহারা মেয়েমানুষের মতোই রহস্যময় হইয়া উঠিতেছে। সাধারণ পুরুষমানুষের যে-কটা বড়ো বড়ো কোটা আছে, অর্থাৎ কেহ-বা বর্বর, কেহ-বা নির্বোধ, কেহ-বা অন্ধ, তাহার মধ্যে কোনোটাতেই ইহাদিগকে ঠিকমত স্থাপন করা যায় না।

সুতরাং মণিমালিকা পরামর্শের জন্য তাহার মন্ত্রীকে ডাকিল। গ্রামসম্পর্কে অথবা দূরসম্পর্কে মণিমালিকার এক ভাই ফণিভূষণের কুঠিতে গোমস্তার অধীনে কাজ করিত। তাহার এমন স্বভাব ছিল না যে কাজের দ্বারা উন্নতি লাভ করে, কোনো-একটা উপলক্ষ্য করিয়া আত্মীয়তার জোরে বেতন এবং বেতনেরও বেশি কিছু কিছু সংগ্রহ করিত।

মণিমালিকা তাহাকে ডাকিয়া সকল কথা বলিল; জিজ্ঞাসা করিল, 'এখন পরামর্শ কী।'

সে অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মতো মাথা নাড়িল; অর্থাৎ গতিক ভালো নহে। বুদ্ধিমানেরা কখনোই গতিক ভালো দেখে না। সে কহিল, 'বাবু কখনোই টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবেন না, শেষকালে তোমার এ গহনাতে টান পড়িবেই।'

মণিমালিকা মানুষকে যেরূপ জানিত তাহাতে বুঝিল, এইরূপ হওয়াই সম্ভব এবং ইহাই সংগত। তাহার দুশ্চিন্তা সুতীব্র হইয়া উঠিল। সংসারে তাহার সন্তান নাই; স্বামী আছে বটে কিন্তু স্বামীর অস্তিত্ব সে অন্তরের মধ্যে অনুভব করে না, অতএব যাহা তাহার একমাত্র যত্নের ধন, যাহা তাহার ছেলের মতো ক্রমে ক্রমে বৎসরে বৎসরে বাড়িয়া উঠিতেছে, যাহা রূপকমাত্র নহে, যাহা প্রকৃতই সোনা, যাহা

মানিক, যাহা বক্ষের, যাহা কণ্ঠের, যাহা মাথার— সেই অনেকদিনের অনেক সাধের সামগ্রী এক মুহূর্তেই ব্যবসায়ের অতলস্পর্শ গহ্বরের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে ইহা কল্পনা করিয়া তাহার সর্বশরীর হিম হইয়া আসিল। সে কহিল, 'কী করা যায়।'

মধুসূদন কহিল, 'গহনাগুলো লইয়া এইবেলা বাপের বাড়ি চলো।' গহনার কিছু অংশ, এমন-কি অধিকাংশই যে তাহার ভাগে আসিবে বুদ্ধিমান মধু মনে মনে তাহার উপায় ঠাহরাইল।

মণিমালিকা এ প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল।

আষাঢ়শেষের সন্ধ্যাবেলায় এই ঘাটের ধারে একখানি নৌকা আসিয়া লাগিল। ঘনমেঘাচ্ছন্ন প্রত্যুষে নিবিড় অন্ধকারে নিদ্রাহীন ভেকের কলরবের মধ্যে একখানি মোটা চাদরে পা হইতে মাথা পর্যন্ত আবৃত করিয়া মণিমালিকা নৌকায় উঠিল। মধুসূদন নৌকার মধ্য হইতে জাগিয়া উঠিয়া কহিল, 'গহনার বাক্সটা আমার কাছে দাও।' মণি কহিল, 'সে পরে হইবে, এখন নৌকা খুলিয়া দাও।'

নৌকা খুলিয়া দিল, খরস্রোতে হুহু করিয়া ভাসিয়া গেল।

মণিমালিকা সমস্ত রাত ধরিয়া একটি একটি করিয়া তাহার সমস্ত গহনা সর্বাঙ্গ ভরিয়া পরিয়াছে, মাথা হইতে পা পর্যন্ত আর স্থান ছিল না। বাক্সে করিয়া গহনা লইলে সে বাক্স হাতছাড়া হইয়া যাইতে পারে, এ আশঙ্কা তাহার ছিল। কিন্তু, গায়ে পরিয়া গেলে তাহাকে না বধ করিয়া সে গহনা কেহ লইতে পারিবে না।

সঙ্গে কোনোপ্রকার বাক্স না দেখিয়া মধুসূদন কিছু বুঝিতে পারিল না, মোটা চাদরের নীচে যে মণিমালিকার দেহপ্রাণের সঙ্গে সঙ্গে দেহপ্রাণের অধিক গহনাগুলি আচ্ছন্ন ছিল তাহা সে অনুমান করিতে পারে নাই! মণিমালিকা ফণিভূষণকে বুঝিত না বটে, কিন্তু মধুসূদনকে চিনিতে তাহার বাকি ছিল না।

মধুসূদন গোমস্তার কাছে একখানা চিঠি রাখিয়া গেল যে, সে কর্ত্রীকে পিত্রালয়ে পৌঁছাইয়া দিতে রওনা হইল। গোমস্তা ফণিভূষণের বাপের আমলের; সে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া হ্রস্ব-ইকারকে দীর্ঘ-ঈকার এবং দন্ত্য-সকে তালব্য-শ করিয়া মনিবকে এক পত্র লিখিল, ভালো বাংলা লিখিল না কিন্তু স্ত্রীকে অযথা প্রশ্রয় দেওয়া যে পুরুষোচিত নহে এ কথাটা ঠিকমতই প্রকাশ করিল।

ফণিভূষণ মণিমালিকার মনের কথাটা ঠিক বুঝিল। তাহার মনে এই আঘাতটা প্রবল হইল যে, 'আমি গুরুতর ক্ষতিসম্ভাবনা সত্ত্বেও স্ত্রীর অলংকার পরিত্যাগ করিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তবু আমাকে সন্দেহ। আমাকে আজিও চিনিল না।'

নিজের প্রতি যে নিদারুণ অন্যায়ে ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত ছিল, ফণিভূষণ তাহাতে ক্ষুব্ধ হইল মাত্র। পুরুষমানুষ বিধাতার ন্যায়দণ্ড, তাহার মধ্যে তিনি বজ্রাগ্নি নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন, নিজের প্রতি অথবা অপরের প্রতি অন্যায়ের সংঘর্ষে সে যদি দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতে না পারে তবে ধিক্‌ তাহাকে। পুরুষমানুষ দাবাগ্নির মতো রাগিয়া উঠিবে সামান্য কারণে, আর স্ত্রীলোক শ্রাবণমেঘের মতো অশ্রুপাত করিতে থাকিবে বিনা উপলক্ষে বিধাতা এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু সে আর টেঁকে না।

ফণিভূষণ অপরাধিনী স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া মনে মনে কহিল, 'এই যদি তোমার বিচার হয় তবে এইরূপই হউক, আমার কর্তব্য আমি করিয়া যাইব।' আরো শতাব্দী-পাঁচছয় পরে যখন কেবল অধ্যাত্মশক্তিতে জগৎ চলিবে তখন যাহার জন্মগ্রহণ করা উচিত ছিল সেই ভাবী যুগের ফণিভূষণ উনবিংশ শতাব্দীতে অবতীর্ণ হইয়া সেই আদিযুগের স্ত্রীলোককে বিবাহ করিয়া বসিয়াছে শাস্ত্রে যাহার বুদ্ধিকে প্রলয়ংকরী বলিয়া থাকে। ফণিভূষণ স্ত্রীকে এক-অক্ষর পত্র লিখিল না এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, এ সম্বন্ধে স্ত্রীর কাছে কখনো সে কোনো কথার উল্লেখ করিবে না। কী ভীষণ দণ্ডবিধি।

দিনদশেক পরে কোনোমতে যথোপযুক্ত টাকা সংগ্রহ করিয়া বিপদুত্তীর্ণ ফণিভূষণ বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। সে জানিত, বাপের বাড়িতে গহনাপত্র রাখিয়া এতদিনে মণিমালিকা ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। সেদিনকার দীন প্রার্থীভাব ত্যাগ করিয়া কৃতকার্য কৃতীপুরুষ স্ত্রীর কাছে দেখা দিলে মণি যে কিরূপ লজ্জিত এবং অনাবশ্যক প্রয়াসের জন্য কিঞ্চিৎ অনুতপ্ত হইবে, ইহাই কল্পনা করিতে করিতে ফণিভূষণ অন্তঃপুরে শয়নাগারের দ্বারের কাছে আসিয়া উপনীত হইল।

দেখিল, দ্বার রুদ্ধ। তালা ভাঙিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, ঘর শূন্য। কোণে লোহার সিন্দুক খোলা পড়িয়া আছে, তাহাতে গহনাপত্রের চিহ্নমাত্র নাই।

স্বামীর বুকের মধ্যে ধক্‌ করিয়া একটা ঘা লাগিল। মনে হইল, সংসার উদ্দেশ্যহীন এবং ভালোবাসা ও বাণিজ্যব্যবসা সমস্তই ব্যর্থ। আমরা এই সংসারপিঞ্জরের প্রত্যেক শলাকার উপরে প্রাণপাত করিতে বসিয়াছি, কিন্তু তাহার ভিতরে পাখি নাই, রাখিলেও সে থাকে না। তবে অহরহ হৃদয়খনির রক্তমানিক ও অশ্রুজলের মুক্তামালা দিয়া কী সাজাইতে বসিয়াছি। এই চিরজীবনের সর্বস্বজড়ানো শূন্য সংসার-খাঁচাটা ফণিভূষণ মনে মনে পদাঘাত করিয়া অতিদূরে ফেলিয়া দিল।

ফণিভূষণ স্ত্রীর সম্বন্ধে কোনোরূপ চেষ্টা করিতে চাহিল না। মনে করিল, যদি

ইচ্ছা হয় তো ফিরিয়া আসিবে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গোমস্তা আসিয়া কহিল, 'চুপ করিয়া থাকিলে কী হইবে, কর্ত্রীবধূর খবর লওয়া চাই তো।' এই বলিয়া মণিমালিকার পিত্রালয়ে লোক পাঠাইয়া দিল। সেখান হইতে খবর আসিল, মণি অথবা মধু এ পর্যন্ত সেখানে পৌঁছে নাই।

তখন চারি দিকে খোঁজ পড়িয়া গেল। নদীতীরে-তীরে প্রশ্ন করিতে করিতে লোক ছুটিল। মধুর তল্লাস করিতে পুলিসে খবর দেওয়া হইল— কোন্ নৌকা, নৌকার মাঝি কে, কোন্ পথে তাহারা কোথায় চলিয়া গেল, তাহার কোনো সন্ধান মিলিল না।

সর্বপ্রকার আশা ছাড়িয়া দিয়া একদিন ফণিভূষণ সন্ধ্যাকালে তাহার পরিত্যক্ত শয়নগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেদিন জন্মাষ্টমী, সকাল হইতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে। উৎসব উপলক্ষে গ্রামের প্রান্তরে একটা মেলা বসে, সেখানে আটচালার মধ্যে বারোয়ারির যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। মুষলধারায় বৃষ্টিপাতশব্দে যাত্রার গানের সুর মৃদুতর হইয়া কানে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। ঐ-যে বাতায়নের উপরে শিথিলকব্জা দরজাটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে ঐখানে ফণিভূষণ অন্ধকারে একলা বসিয়াছিল— বাদলার হাওয়া বৃষ্টির ছাঁট এবং যাত্রার গান ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল, কোনো খেয়ালই ছিল না। ঘরের দেওয়ালে আর্ট্‌ স্টুডিয়ো-রচিত লক্ষ্মীসরস্বতীর একজোড়া ছবি টাঙানো; আলনার উপরে একটি গামছা ও তোয়ালে, একটি চুড়িপেড়ে ও একটি ডুরে শাড়ি সদ্যব্যবহারযোগ্যভাবে পাকানো ঝুলানো রহিয়াছে। ঘরের কোণে টিপাইয়ের উপরে পিতলের ডিবায় মণিমালিকার স্বহস্তরচিত গুটিকতক পান শুষ্ক হইয়া পড়িয়া আছে। কাচের আলমারির মধ্যে তাহার আবাল্যসঞ্চিত চীনের পুতুল, এসেন্সের শিশি, রঙিন কাচের ডিক্যাণ্টার, শৌখিন তাস, সমুদ্রের বড়ো বড়ো কড়ি, এমন-কি শূন্য সাবানের বাক্সগুলি পর্যন্ত অতি পরিপাটি করিয়া সাজানো; যে অতিক্ষুদ্র গোলকবিশিষ্ট ছোটো শখের কেরোসিন-ল্যাম্প সে নিজে প্রতিদিন প্রস্তুত করিয়া স্বহস্তে জ্বালাইয়া কুলুঙ্গিটির উপর রাখিয়া দিত তাহা যথাস্থানে নির্বাপিত এবং ম্লান হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, কেবল সেই ক্ষুদ্র ল্যাম্পটি এই শয়নকক্ষে মণিমালিকার শেষমুহূর্তের নিরুত্তর সাক্ষী; সমস্ত শূন্য করিয়া যে চলিয়া যায়, সেও এত চিহ্ন, এত ইতিহাস, সমস্ত জড়সামগ্রীর উপর আপন সজীব হৃদয়ের এত স্নেহস্বাক্ষর রাখিয়া যায়! এসো মণিমালিকা, এসো, তোমার দীপটি তুমি জ্বালাও, তোমার ঘরটি তুমি আলো করো, আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তোমার যত্নকুঞ্চিত শাড়িটি তুমি পরো, তোমার জিনিসগুলি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তোমার কাছ হইতে কেহ

কিছু প্রত্যাশা করে না, কেবল তুমি উপস্থিত হইয়া মাত্র তোমার অক্ষয় যৌবন তোমার অম্লান সৌন্দর্য লইয়া চারি দিকের এই-সকল বিপুল বিক্ষিপ্ত অনাথ জড়-সামগ্রীরাশিকে একটি প্রাণের ঐক্যে সঞ্জীবিত করিয়া রাখো ; এই-সকল মূক প্রাণহীন পদার্থের অব্যক্ত ক্রন্দন গৃহকে শ্মশান করিয়া তুলিয়াছে।

গভীর রাত্রে কখন একসময়ে বৃষ্টির ধারা এবং যাত্রার গান থামিয়া গেছে। ফণিভূষণ জানলার কাছে যেমন বসিয়া ছিল তেমনি বসিয়া আছে। বাতায়নের বাহিরে এমন একটা জগদ্ব্যাপী নীরন্ধ্র অন্ধকার যে তাহার মনে হইতেছিল, যেন সম্মুখে যমালয়ের একটা অভ্রভেদী সিংহদ্বার, যেন এইখানে দাঁড়াইয়া কাঁদিয়া ডাকিলে চিরকালের লুপ্ত জিনিস অচিরকালের মতো একবার দেখা দিতেও পারে। এই মসীকৃষ্ণ মৃত্যুর পটে, এই অতি কঠিন নিকষ-পাষাণের উপর সেই হারানো সোনার একটি রেখা পড়িতেও পারে।

এমন সময় একটা ঠক্‌ঠক্‌ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গহনার ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ শোনা গেল। ঠিক মনে হইল, শব্দটা নদীর ঘাটের উপর হইতে উঠিয়া আসিতেছে। তখন নদীর জল এবং রাত্রির অন্ধকার এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছিল। পুলকিত ফণিভূষণ দুই উৎসুক চক্ষু দিয়া অন্ধকার ঠেলিয়া ঠেলিয়া ফুঁড়িয়া ফুঁড়িয়া দেখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল— স্ফীত হৃদয় এবং ব্যগ্র দৃষ্টি ব্যথিত হইয়া উঠিল, কিছুই দেখা গেল না। দেখিবার চেষ্টা যতই একান্ত বাড়িয়া উঠিল অন্ধকার ততই যেন ঘনীভূত, জগৎ ততই যেন ছায়াবৎ হইয়া আসিল। প্রকৃতি নিশীথরাত্রে আপন মৃত্যুনিকেতনের গবাক্ষদ্বারে অকস্মাৎ অতিথিসমাগম দেখিয়া দ্রুত হস্তে আরো একটা বেশি করিয়া পর্দা ফেলিয়া দিল।

শব্দটা ক্রমে ঘাটের সর্বোচ্চ সোপানতল ছাড়িয়া বাড়ির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বাড়ির সম্মুখে আসিয়া থামিল। দেউড়ি বন্ধ করিয়া দরোয়ান যাত্রা শুনিতে গিয়াছিল। তখন সেই রুদ্ধ দ্বারের উপর ঠক্‌ঠক্‌ ঝম্‌ঝম্‌ করিয়া ঘা পড়িতে লাগিল, যেন অলংকারের সঙ্গে সঙ্গে একটা শক্ত জিনিস দ্বারের উপর আসিয়া পড়িতেছে। ফণিভূষণ আর থাকিতে পারিল না। নির্বাণদীপ কক্ষগুলি পার হইয়া, অন্ধকার সিঁড়ি দিয়া নামিয়া, রুদ্ধ দ্বারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্বার বাহির হইতে তালাবদ্ধ ছিল। ফণিভূষণ প্রাণপণে দুই হাতে সেই দ্বার নাড়া দিতেই সেই সংঘাতে এবং তাহার শব্দে চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। দেখিতে পাইল, সে নিদ্রিত অবস্থায় উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিয়াছিল। তাহার সর্বশরীর ঘর্মাক্ত, হাত পা বরফের মতো ঠাণ্ডা, এবং হৃৎপিণ্ড নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের মতো

স্ফুরিত হইতেছে। স্বপ্ন ভাঙিয়া দেখিল, বাহিরে আর-কোনো শব্দ নাই, কেবল শ্রাবণের ধারা তখনো ঝর্‌ঝর্‌ শব্দে পড়িতেছিল এবং তাহারই সহিত মিশ্রিত হইয়া শুনা যাইতেছিল, যাত্রার ছেলেরা ভোরের সুরে তান ধরিয়াছে।

যদিচ ব্যাপারটা সমস্তই স্বপ্ন কিন্তু এত অধিক নিকটবর্তী এবং সত্যবৎ যে ফণিভূষণের মনে হইল, যেন অতি অল্পের জন্যই সে তাহার অসম্ভব আকাঙ্ক্ষার আশ্চর্য সফলতা হইতে বঞ্চিত হইল। সেই জলপতনশব্দের সহিত দূরাগত ভৈরবীর তান তাহাকে বলিতে লাগিল, এই জাগরণই স্বপ্ন, এই জগৎই মিথ্যা।

তাহার পরদিনেও যাত্রা ছিল এবং দরোয়ানেরও ছুটি ছিল। ফণিভূষণ হুকুম দিল, আজ সমস্ত রাত্রি যেন দেউড়ির দরজা খোলা থাকে। দরোয়ান কহিল, মেলা উপলক্ষে নানা দেশ হইতে নানাপ্রকার লোক আসিয়াছে, দরজা খোলা রাখিতে সাহস হয় না। ফণিভূষণ সে কথা মানিল না। দরোয়ান কহিল, 'তবে আমি সমস্ত রাত্রি হাজির থাকিয়া পাহারা দিব।' ফণিভূষণ কহিল, 'সে হইবে না, তোমাকে যাত্রা শুনিতে যাইতেই হইবে।' দরোয়ান আশ্চর্য হইয়া গেল।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় দীপ নিভাইয়া দিয়া ফণিভূষণ তাহার শয়নকক্ষের সেই বাতায়নে আসিয়া বসিল। আকাশে অবৃষ্টিসংরম্ভ মেঘ এবং চতুর্দিকে কোনো-একটি অনির্দিষ্ট আসন্নপ্রতীক্ষার নিস্তব্ধতা। ভেকের অশ্রান্ত কলরব এবং যাত্রার গানের চিৎকারধ্বনি সেই স্তব্ধতা ভাঙিতে পারে নাই, কেবল তাহার মধ্যে একটা অসংগত অদ্ভুতরস বিস্তার করিতেছিল।

অনেকরাত্রে একসময়ে ভেক এবং ঝিল্লি এবং যাত্রার দলের ছেলেরা চুপ করিয়া গেল এবং রাত্রের অন্ধকারের উপরে আরো একটা কিসের অন্ধকার আসিয়া পড়িল। বুঝা গেল, এইবার সময় আসিয়াছে।

পূর্বদিনের মতো নদীর ঘাটে একটা ঠক্‌ঠক্‌ এবং ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ উঠিল। কিন্তু, ফণিভূষণ সে দিকে চোখ ফিরাইল না। তাহার ভয় হইল, পাছে অধীর ইচ্ছা এবং অশান্ত চেষ্টায় তাহার সকল ইচ্ছা সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। পাছে আগ্রহের বেগ তাহার ইন্দ্রিয়শক্তিকে অভিভূত করিয়া ফেলে। সে আপনার সকল চেষ্টা নিজের মনকে দমন করিবার জন্য প্রয়োগ করিল, কাঠের মূর্তির মতো শক্ত হইয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

শিঞ্জিত শব্দ আজ ঘাট হইতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া মুক্ত দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করিল। শুনা গেল, অন্দর মহলের গোলসিঁড়ি দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে শব্দ উপরে উঠিতেছে। ফণিভূষণ আপনাকে আর দমন করিতে পারে না, তাহার বক্ষ তুফানের

ডিঙির মতো আছাড় খাইতে লাগিল এবং নিশ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল। গোলসিঁড়ি শেষ করিয়া সেই শব্দ বারান্দা দিয়া ক্রমে ঘরের নিকটবর্তী হইতে লাগিল। অবশেষে ঠিক সেই শয়নকক্ষের দ্বারের কাছে আসিয়া খট্‌খট্ এবং ঝম্‌ঝম্ থামিয়া গেল। কেবল চৌকাঠটি পার হইলেই হয়।

ফণিভূষণ আর থাকিতে পারিল না। তাহার রুদ্ধ আবেগ এক মুহূর্তে প্রবলবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; সে বিদ্যুদ্‌বেগে চৌকি হইতে উঠিয়া কাঁদিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, 'মণি!' অমনি সচকিত হইয়া জাগিয়া দেখিল, তাহারই সেই ব্যাকুল কণ্ঠের চিৎকারে ঘরের শার্সিগুলা পর্যন্ত ধ্বনিত স্পন্দিত হইতেছে। বাহিরে সেই ভেকের কলরব এবং যাত্রার ছেলেদের ক্লিষ্ট কণ্ঠের গান।

ফণিভূষণ নিজের ললাটে সবলে আঘাত করিল।

পরদিন মেলা ভাঙিয়া গেছে। দোকানি এবং যাত্রার দল চলিয়া গেল। ফণিভূষণ হুকুম দিল, সেইদিন সন্ধ্যার পর তাহার বাড়িতে সে নিজে ছাড়া আর কেহই থাকিবে না। চাকরেরা স্থির করিল, বাবু তান্ত্রিকমতে একটা কী সাধনে নিযুক্ত আছেন। ফণিভূষণ সমস্তদিন উপবাস করিয়া রহিল।

জনশূন্য বাড়িতে সন্ধ্যাবেলায় ফণিভূষণ বাতায়নতলে আসিয়া বসিল। সেদিন আকাশের স্থানে স্থানে মেঘ ছিল না, এবং ধৌত নির্মল বাতাসের মধ্য দিয়া নক্ষত্রগুলিকে অত্যুজ্জ্বল দেখাইতেছিল। কৃষ্ণপক্ষ দশমীর চাঁদ উঠিতে অনেক বিলম্ব আছে। মেলা উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়াতে পরিপূর্ণ নদীতে নৌকা মাত্রই ছিল না এবং উৎসবজাগরণক্লান্ত গ্রাম দুইরাত্রি জাগরণের পর আজ গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন।

ফণিভূষণ একখানা চৌকিতে বসিয়া চৌকির পিঠের উপর মাথা ঊর্ধ্বমুখ করিয়া তারা দেখিতেছিল; ভাবিতেছিল, একদিন যখন তাহার বয়স ছিল উনিশ, যখন কলিকাতার কালেজে পড়িত, যখন সন্ধ্যাকালে গোলদিঘির তৃণশয়নে চিত হইয়া, হাতের উপরে মাথা রাখিয়া, ঐ অনন্তকালের তারাগুলির দিকে চাহিয়া থাকিত এবং মনে পড়িত তাহার সেই নদীকূলবর্তী শ্বশুরবাড়ির একটি বিরলকক্ষে চোদ্দবৎসরের বয়ঃসন্ধিগতা মণির সেই উজ্জ্বল কাঁচা মুখখানি, তখনকার সেই বিরহ কী সুমধুর, তখনকার সেই তারাগুলির আলোকস্পন্দন হৃদয়ের যৌবনস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে কী বিচিত্র 'বসন্তরাগেণ যতিতালাভ্যাং' বাজিয়া বাজিয়া উঠিত! আজ সেই একই তারা আগুন দিয়া আকাশে মোহমুদ্গরের শ্লোক কয়টা লিখিয়া রাখিয়াছে; বলিতেছে, সংসারোহয়মতীব বিচিত্রঃ!

দেখিতে দেখিতে তারাগুলি সমস্ত লুপ্ত হইয়া গেল। আকাশ হইতে একখানা

অন্ধকার নামিয়া এবং পৃথিবী হইতে একখানা অন্ধকার উঠিয়া চোখের উপরকার এবং নীচেকার পল্লবের মতো একত্র আসিয়া মিলিত হইল। আজ ফণিভূষণের চিত্ত শান্ত ছিল। সে নিশ্চয় জানিত, আজ তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, সাধকের নিকট মৃত্যু আপন রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া দিবে।

পূর্বরাত্রির মতো সেই শব্দ নদীর জলের মধ্য হইতে ঘাটের সোপানের উপর উঠিল। ফণিভূষণ দুই চক্ষু নিমীলিত করিয়া স্থির দৃঢ়চিত্তে ধ্যানাসনে বসিল। শব্দ দ্বারীশূন্য দেউড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল, শব্দ জনশূন্য অন্তঃপুরের গোলসিঁড়ির মধ্য দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠিতে লাগিল, শব্দ দীর্ঘ বারান্দা পার হইল এবং শয়নকক্ষের দ্বারের কাছে আসিয়া ক্ষণকালের জন্য থামিল।

ফণিভূষণের হৃদয় ব্যাকুল এবং সর্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, কিন্তু আজ সে চক্ষু খুলিল না। শব্দ চৌকাঠ পার হইয়া অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আলনায় যেখানে শাড়ি কোঁচানো আছে, কুলুঙ্গিতে যেখানে কেরোসিনের দীপ দাঁড়াইয়া, টিপাইয়ের ধারে যেখানে পানের বাটায় পান শুষ্ক, এবং সেই বিচিত্রসামগ্রীপূর্ণ আলমারির কাছে প্রত্যেক জায়গায় এক-একবার করিয়া দাঁড়াইয়া অবশেষে শব্দটা ফণিভূষণের অত্যন্ত কাছে আসিয়া থামিল।

তখন ফণিভূষণ চোখ মেলিল এবং দেখিল, ঘরে নবোদিত দশমীর চন্দ্রালোক আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, এবং তাহার চৌকির ঠিক সম্মুখে একটি কঙ্কাল দাঁড়াইয়া। সেই কঙ্কালের আট আঙুলে আংটি, করতলে রতনচক্র, প্রকোষ্ঠে বালা, বাহুতে বাজুবন্ধ, গলায় কণ্ঠি, মাথায় সিঁথি, তাহার আপাদমস্তকে অস্থিতে অস্থিতে এক-একটি আভরণ সোনায় হীরায় ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। অলংকারগুলি ঢিলা, ঢল্‌ঢল্ করিতেছে, কিন্তু অঙ্গ হইতে খসিয়া পড়িতেছে না। সর্বাপেক্ষা ভয়ংকর, তাহার অস্থিময় মুখে তাহার দুই চক্ষু ছিল সজীব; সেই কালো তারা, সেই ঘনদীর্ঘ পক্ষ্ম, সেই সজল উজ্জ্বলতা, সেই অবিচলিত দৃঢ়শান্ত দৃষ্টি। আজ আঠারো বৎসর পূর্বে একদিন আলোকিত সভাগৃহে নহবতের সাহানা আলাপের মধ্যে ফণিভূষণ যে দুটি আয়ত-সুন্দর কালো-কালো ঢলঢল চোখ শুভদৃষ্টিতে প্রথম দেখিয়াছিল সেই দুটি চক্ষুই আজ শ্রাবণের অর্ধরাত্রে কৃষ্ণপক্ষ দশমীর চন্দ্রকিরণে দেখিল; দেখিয়া তাহার সর্বশরীরে রক্ত হিম হইয়া আসিল। প্রাণপণে দুই চক্ষু বুজিতে চেষ্টা করিল, কিছুতেই পারিল না; তাহার চক্ষু মৃত মানুষের চক্ষুর মতো নির্নিমেষ চাহিয়া রহিল।

তখন সেই কঙ্কাল স্তম্ভিত ফণিভূষণের মুখের দিকে তাহার দৃষ্টি স্থির রাখিয়া

দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া নীরবে অঙ্গুলিসংকেতে ডাকিল। তাহার চার আঙুলের অস্থিতে হীরার আংটি ঝক্‌মক্‌ করিয়া উঠিল।

ফণিভূষণ মূঢ়ের মতো উঠিয়া দাঁড়াইল। কঙ্কাল দ্বারের অভিমুখে চলিল; হাড়েতে হাড়েতে গহনায় গহনায় কঠিন শব্দ হইতে লাগিল। ফণিভূষণ পাশবদ্ধ পুত্তলীর মতো তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। বারান্দা পার হইল, নিবিড় অন্ধকার গোলসিঁড়ি ঘুরিয়া ঘুরিয়া খট্‌খট্‌ ঠক্‌ঠক্‌ ঝম্‌ঝম্‌ করিতে করিতে নীচে উত্তীর্ণ হইল। নীচেকার বারান্দা পার হইয়া জনশূন্য দীপহীন দেউড়িতে প্রবেশ করিল। অবশেষে দেউড়ি পার হইয়া ইটের-খোয়া-দেওয়া বাগানের রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। খোয়াগুলি অস্থিপাতে কড়্‌কড়্‌ করিতে লাগিল। সেখানে ক্ষীণ জ্যোৎস্না ঘন ডালপালার মধ্যে আটক খাইয়া কোথাও নিষ্কৃতির পথ পাইতেছিল না; সেই বর্ষার নিবিড়গন্ধ অন্ধকার ছায়াপথে জোনাকির ঝাঁকের মধ্য দিয়া উভয়ে নদীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ঘাটের যে ধাপ বাহিয়া শব্দ উপরে উঠিয়াছিল সেই ধাপ দিয়া অলংকৃত কঙ্কাল তাহার আন্দোলনহীন ঋজুগতিতে কঠিন শব্দ করিয়া এক-পা এক-পা নামিতে লাগিল। পরিপূর্ণ বর্ষানদীর প্রবলস্রোত জলের উপর জ্যোৎস্নার একটি দীর্ঘরেখা ঝিক্‌ঝিক্‌ করিতেছে।

কঙ্কাল নদীতে নামিল, অনুবর্তী ফণিভূষণও জলে পা দিল। জলস্পর্শ করিবামাত্র ফণিভূষণের তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। সম্মুখে আর তাহার পথপ্রদর্শক নাই, কেবল নদীর পরপারে গাছগুলা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া এবং তাহাদের মাথার উপরে খণ্ড চাঁদ শান্ত অবাকভাবে চাহিয়া আছে। আপাদমস্তক বারম্বার শিহরিয়া শিহরিয়া স্খলিতপদে ফণিভূষণ স্রোতের মধ্যে পড়িয়া গেল। যদিও সাঁতার জানিত কিন্তু স্নায়ু তাহার বশ মানিল না, স্বপ্নের মধ্য হইতে কেবল মুহূর্তমাত্র জাগরণের প্রান্তে আসিয়া পরক্ষণে অতলস্পর্শ সুপ্তির মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেল।

গল্প শেষ করিয়া ইস্কুলমাস্টার খানিকক্ষণ থামিলেন। হঠাৎ থামিবামাত্র বোঝা গেল, তিনি ছাড়া ইতিমধ্যে জগতের আর-সকলই নীরব নিস্তব্ধ হইয়া গেছে। অনেকক্ষণ আমি একটি কথাও বলিলাম না এবং অন্ধকারে তিনি আমার মুখের ভাবও দেখিতে পাইলেন না।

আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি এ গল্প বিশ্বাস করিলেন না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি ইহা বিশ্বাস করেন।"

তিনি কহিলেন, "না। কেন করি না তাহার কয়েকটি যুক্তি দিতেছি। প্রথমত প্রকৃতিঠাকুরানী উপন্যাসলেখিকা নহেন, তাঁহার হাতে বিস্তর কাজ আছে—"

আমি কহিলাম, "দ্বিতীয়ত, আমারই নাম শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ সাহা।"

ইস্কুলমাস্টার কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া কহিলেন, "আমি তাহা হইলে ঠিকই অনুমান করিয়াছিলাম, আপনার স্ত্রীর নাম কী ছিল।"

আমি কহিলাম, "নৃত্যকালী।"

অগ্রহায়ণ ১৩০৫

দৃষ্টিদান

শুনিয়াছি, আজকাল অনেক বাঙালির মেয়েকে নিজের চেষ্টায় স্বামী সংগ্রহ করিতে হয়। আমিও তাই করিয়াছি, কিন্তু দেবতার সহায়তায়। আমি ছেলেবেলা হইতে অনেক ব্রত এবং অনেক শিবপূজা করিয়াছিলাম।

আমার আটবৎসর বয়স উত্তীর্ণ না হইতেই বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু পূর্ব-জন্মের পাপবশত আমি আমার এমন স্বামী পাইয়াও সম্পূর্ণ পাইলাম না। মা ত্রিনয়নী আমার দুইচক্ষু লইলেন। জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত স্বামীকে দেখিয়া লইবার সুখ দিলেন না।

বাল্যকাল হইতেই আমার অগ্নিপরীক্ষার আরম্ভ হয়। চোদ্দবৎসর পার না হইতেই আমি একটি মৃতশিশু জন্ম দিলাম; নিজেও মরিবার কাছাকাছি গিয়াছিলাম কিন্তু যাহাকে দুঃখভোগ করিতে হইবে সে মরিলে চলিবে কেন। যে দীপ জ্বলিবার জন্য হইয়াছে তাহার তেল অল্প হয় না; রাত্রিভোর জ্বলিয়া তবে তাহার নির্বাণ।

বাঁচিলাম বটে কিন্তু শরীরের দুর্বলতায়, মনের খেদে, অথবা যে কারণেই হউক, আমার চোখের পীড়া হইল।

আমার স্বামী তখন ডাক্তারি পড়িতেছিলেন। নূতন বিদ্যাশিক্ষার উৎসাহবশত চিকিৎসা করিবার সুযোগ পাইলে তিনি খুশি হইয়া উঠিতেন। তিনি নিজেই আমার চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন।

দাদা সে বছর বি. এল. দিবেন বলিয়া কালেজে পড়িতেছিলেন। তিনি একদিন আসিয়া আমার স্বামীকে কহিলেন, "করিতেছ কী। কুমুর চোখ দুটো যে নষ্ট করিতে বসিয়াছ। একজন ভালো ডাক্তার দেখাও।"

আমার স্বামী কহিলেন, "ভালো ডাক্তার আসিয়া আর নূতন চিকিৎসা কী করিবে। ওষুধপত্র তো সব জানাই আছে।"

দাদা কিছু রাগিয়া কহিলেন, "তবে তো তোমার সঙ্গে তোমাদের কলেজের বড়োসাহেবের কোনো প্রভেদ নাই।"

স্বামী বলিলেন, "আইন পড়িতেছ, ডাক্তারির তুমি কী বোঝ। তুমি যখন বিবাহ করিবে তখন তোমার স্ত্রীর সম্পত্তি লইয়া যদি কখনো মকদ্দমা বাধে তুমি কি আমার পরামর্শমত চলিবে।"

আমি মনে মনে ভাবিতেছিলাম, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইলে উলুখড়েরই বিপদ সবচেয়ে বেশি। স্বামীর সঙ্গে বিবাদ বাধিল দাদার, কিন্তু দুইপক্ষ হইতে বাজিতেছে আমাকেই। আবার ভাবিলাম, দাদারা যখন আমাকে দানই করিয়াছেন তখন আমার সম্বন্ধে কর্তব্য লইয়া এ-সমস্ত ভাগাভাগি কেন। আমার সুখদুঃখ, আমার রোগ ও আরোগ্য, সে তো সমস্তই আমার স্বামীর।

সে দিন আমার এই এক সামান্য চোখের চিকিৎসা লইয়া দাদার সঙ্গে আমার স্বামীর যেন একটু মনান্তর হইয়া গেল। সহজেই আমার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল, আমার জলের ধারা আরো বাড়িয়া উঠিল; তাহার প্রকৃত কারণ আমার স্বামী কিম্বা দাদা কেহই তখন বুঝিলেন না।

আমার স্বামী কালেজে গেলে বিকালবেলায় হঠাৎ দাদা এক ডাক্তার লইয়া আসিয়া উপস্থিত। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া কহিল, সাবধানে না থাকিলে পীড়া গুরুতর হইবার সম্ভাবনা আছে। এই বলিয়া কী-সমস্ত ওষুধ লিখিয়া দিল, দাদা তখনই তাহা আনাইতে পাঠাইলেন।

ডাক্তার চলিয়া গেলে আমি দাদাকে বলিলাম, "দাদা, আপনার পায়ে পড়ি, আমার যে চিকিৎসা চলিতেছে তাহাতে কোনোরূপ ব্যাঘাত ঘটাইবেন না।"

আমি শিশুকাল হইতে দাদাকে খুব ভয় করিতাম; তাঁহাকে যে মুখ ফুটিয়া এমন করিয়া কিছু বলিতে পারিব, ইহা আমার পক্ষে এক আশ্চর্য ঘটনা। কিন্তু, আমি বেশ বুঝিয়াছিলাম, আমার স্বামীকে লুকাইয়া দাদা আমার যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেছেন তাহাতে আমার অশুভ বৈ শুভ নাই।

দাদাও আমার প্রগল্‌ভতায় বোধ করি কিছু আশ্চর্য হইলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিয়া অবশেষে বলিলেন, "আচ্ছা, আমি আর ডাক্তার আনিব না, কিন্তু যে ওষুধটা আসিবে তাহা বিধিমতে সেবন করিয়া দেখিস্।" ওষুধ আসিলে পর আমাকে তাহা ব্যবহারের নিয়ম বুঝাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। স্বামী কলেজ হইতে আসিবার

পূর্বেই আমি সে কৌটা এবং শিশি এবং তুলি এবং বিধিবিধান সমস্তই সযত্নে আমাদের প্রাঙ্গণের পাতকুয়ার মধ্যে ফেলিয়া দিলাম।

দাদার সঙ্গে কিছু আড়ি করিয়াই আমার স্বামী যেন আরো দ্বিগুণ চেষ্টায় আমার চোখের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেন। এবেলা ওবেলা ওষুধ বদল হইতে লাগিল। চোখে ঠুলি পরিলাম, চশমা পরিলাম, চোখে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ওষুধ ঢালিলাম, গুঁড়া লাগাইলাম, দুর্গন্ধ মাছের তেল খাইয়া ভিতরকার পাকযন্ত্রসুদ্ধ যখন বাহির হইবার উদ্যম করিত তাহাও দমন করিয়া রহিলাম।

স্বামী জিজ্ঞাসা করিতেন, কেমন বোধ হইতেছে। আমি বলিতাম, অনেকটা ভালো। আমি মনে করিতেও চেষ্টা করিতাম যে, ভালোই হইতেছে। যখন বেশি জল পড়িতে থাকিত তখন ভাবিতাম জল কাটিয়া যাওয়াই ভালো লক্ষণ; যখন জল পড়া বন্ধ হইত তখন ভাবিতাম, এই তো আরোগ্য হইবার পথে দাঁড়াইয়াছি।

কিন্তু কিছুকাল পরে যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিল। চোখে ঝাপসা দেখিতে লাগিলাম এবং মাথার বেদনায় আমাকে স্থির থাকিতে দিল না। দেখিলাম, আমার স্বামীও যেন কিছু অপ্রতিভ হইয়াছেন। এতদিন পরে কী ছুতা করিয়া যে ডাক্তার ডাকিবেন, ভাবিয়া পাইতেছেন না।

আমি তাঁহাকে বলিলাম, "দাদার মন রক্ষার জন্য একবার একজন ডাক্তার ডাকিতে দোষ কী। এই লইয়া তিনি অনর্থক রাগ করিতেছেন, ইহাতে আমার মনে কষ্ট হয়। চিকিৎসা তো তুমিই করিবে, ডাক্তার একজন উপসর্গ থাকা ভালো।"

স্বামী কহিলেন, "ঠিক বলিয়াছ।" এই বলিয়া সেইদিনই এক ইংরাজ ডাক্তার লইয়া হাজির করিলেন। কী কথা হইল জানি না কিন্তু মনে হইল, যেন সাহেব আমার স্বামীকে কিছু ভর্ৎসনা করিলেন; তিনি নতশিরে নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ডাক্তার চলিয়া গেলে আমি আমার স্বামীর হাত ধরিয়া বলিলাম, "কোথা হইতে একটা গোঁয়ার গোরা-গর্দভ ধরিয়া আনিয়াছ, একজন দেশী ডাক্তার আনিলেই হইত। আমার চোখের রোগ ও কি তোমার চেয়ে ভালো বুঝিবে।"

স্বামী কিছু কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "চোখে অস্ত্র করা আবশ্যক হইয়াছে।"

আমি একটু রাগের ভান করিয়া কহিলাম, "অস্ত্র করিতে হইবে, সে তো তুমি জানিতে কিন্তু প্রথম হইতেই সে কথা আমার কাছে গোপন করিয়া গেছ। তুমি কি মনে কর, আমি ভয় করি।"

স্বামীর লজ্জা দূর হইল; তিনি বলিলেন, "চোখে অস্ত্র করিতে হইবে শুনিলে ভয় না করে, পুরুষের মধ্যে এমন বীর কয়জন আছে।"

আমি ঠাট্টা করিয়া বলিলাম, "পুরুষের বীরত্ব কেবল স্ত্রীর কাছে।"

স্বামী তৎক্ষণাৎ ম্লান গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "সে কথা ঠিক। পুরুষের কেবল অহংকার সার।"

আমি তাঁহার গাম্ভীর্য উড়াইয়া দিয়া কহিলাম, "অহংকারেও বুঝি তোমরা মেয়েদের সঙ্গে পার? তাহাতেও আমাদের জিত।"

ইতিমধ্যে দাদা আসিলে আমি দাদাকে বিরলে ডাকিয়া বলিলাম, "দাদা, আপনার সেই ডাক্তারের ব্যবস্থামত চলিয়া এতদিন আমার চোখ বেশ ভালোই হইতেছিল, একদিন ভ্রমক্রমে খাইবার ওষুধটা চক্ষে লেপন করিয়া তাহার পর হইতে চোখ যায়-যায় হইয়া উঠিয়াছে। আমার স্বামী বলিতেছেন, চোখে অস্ত্র করিতে হইবে।"

দাদা বলিলেন, "আমি ভাবিতেছিলাম, তোর স্বামীর চিকিৎসাই চলিতেছে, তাই আরো আমি রাগ করিয়া এতদিন আসি নাই।"

আমি বলিলাম, "না, আমি গোপনে সেই ডাক্তারের ব্যবস্থামতই চলিতে-ছিলাম, স্বামীকে জানাই নাই, পাছে তিনি রাগ করেন।"

স্ত্রীজন্ম গ্রহণ করিলে এত মিথ্যাও বলিতে হয়! দাদার মনেও কষ্ট দিতে পারি না, স্বামীর যশও ক্ষুণ্ণ করা চলে না। মা হইয়া কোলের শিশুকে ভুলাইতে হয়, স্ত্রী হইয়া শিশুর বাপকে ভুলাইতে হয়— মেয়েদের এত ছলনার প্রয়োজন।

ছলনার ফল হইল এই যে, অন্ধ হইবার পূর্বে আমার দাদা এবং স্বামীর মিলন দেখিতে পাইলাম। দাদা ভাবিলেন, গোপনচিকিৎসা করিতে গিয়া এই দুর্ঘটনা ঘটিল; স্বামী ভাবিলেন, গোড়ায় আমার দাদার পরামর্শ শুনিলেই ভালো হইত। এই ভাবিয়া দুই অনুতপ্ত হৃদয় ভিতরে ভিতরে ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া পরস্পরের অত্যন্ত নিকটবর্তী হইল। স্বামী দাদার পরামর্শ লইতে লাগিলেন, দাদাও বিনীতভাবে সকল বিষয়ে আমার স্বামীর মতের প্রতিই নির্ভর প্রকাশ করিলেন।

অবশেষে উভয়ের পরামর্শক্রমে একদিন একজন ইংরাজ ডাক্তার আসিয়া আমার বাম চোখে অস্ত্রাঘাত করিল। দুর্বল চক্ষু সে আঘাত কাটাইয়া উঠিতে পারিল না, তাহার ক্ষীণ দীপ্তিটুকু হঠাৎ নিবিয়া গেল। তাহার পরে বাকি চোখটাও দিনে দিনে অল্পে অল্পে অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল। বাল্যকালে শুভদৃষ্টির দিনে যে চন্দনচর্চিত তরুণমূর্তি আমার সম্মুখে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার উপরে চিরকালের মতো পর্দা পড়িয়া গেল।

একদিন স্বামী আমার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া কহিলেন, "তোমার কাছে আর মিথ্যা বড়াই করিব না, তোমার চোখ-দুটি আমিই নষ্ট করিয়াছি।"

দেখিলাম, তাঁহার কণ্ঠস্বরে অশ্রুজল ভরিয়া আসিয়াছে। আমি দুই হাতে তাঁহার দক্ষিণহস্ত চাপিয়া কহিলাম, "বেশ করিয়াছ, তোমার জিনিস তুমি লইয়াছ। ভাবিয়া দেখো দেখি, যদি কোনো ডাক্তারের চিকিৎসায় আমার চোখ নষ্ট হইত তাহাতে আমার কী সান্ত্বনা থাকিত। ভবিতব্যতা যখন খণ্ডে না তখন চোখ তো আমার কেহই বাঁচাইতে পারিত না, সে চোখ তোমার হাতে গিয়াছে এই আমার অন্ধতার একমাত্র সুখ। যখন পূজার ফুল কম পড়িয়াছিল তখন রামচন্দ্র তাঁহার দুই চক্ষু উৎপাটন করিয়া দেবতাকে দিতে গিয়াছিলেন। আমার দেবতাকে আমার দৃষ্টি দিলাম— আমার পূর্ণিমার জ্যোৎস্না, আমার প্রভাতের আলো, আমার আকাশের নীল, আমার পৃথিবীর সবুজ সব তোমাকে দিলাম; তোমার চোখে যখন যাহা ভালো লাগিবে আমাকে মুখে বলিয়ো, সে আমি তোমার চোখের দেখার প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করিব।"

আমি এত কথা বলিতে পারি নাই, মুখে এমন করিয়া বলাও যায় না; এ-সব কথা আমি অনেক দিন ধরিয়া ভাবিয়াছি। মাঝে মাঝে যখন অবসাদ আসিত, নিষ্ঠার তেজ ম্লান হইয়া পড়িত, নিজেকে বঞ্চিত দুঃখিত দুর্ভাগ্যদগ্ধ বলিয়া মনে হইত, তখন আমি নিজের মনকে দিয়া এই-সব কথা বলাইয়া লইতাম; এই শান্তি, এই ভক্তিকে অবলম্বন করিয়া নিজের দুঃখের চেয়েও নিজেকে উচ্চ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতাম। সে দিন কতকটা কথায় কতকটা নীরবে বোধ করি আমার মনের ভাবটা তাঁহাকে একরকম করিয়া বুঝাইতে পারিতেছিলাম। তিনি কহিলেন, "কুমু, মূঢ়তা করিয়া তোমার যা নষ্ট করিয়াছি সে আর ফিরাইয়া দিতে পারিব না, কিন্তু আমার যতদূর সাধ্য তোমার চোখের অভাব মোচন করিয়া তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব।"

আমি কহিলাম, "সে কোনো কাজের কথা নয়। তুমি যে তোমার ঘরকন্নাকে একটি অন্ধের হাসপাতাল করিয়া রাখিবে, সে আমি কিছুতেই দিব না। তোমাকে আর-একটি বিবাহ করিতেই হইবে।"

কিজন্য যে বিবাহ করা নিতান্ত আবশ্যক তাহা সবিস্তারে বলিবার পূর্বে আমার একটুখানি কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইল। একটু কাশিয়া, একটু সামলাইয়া লইয়া বলিতে যাইতেছি, এমন সময় আমার স্বামী উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিয়া উঠিলেন, "আমি মূঢ়, আমি অহংকারী, কিন্তু তাই বলিয়া আমি পাষণ্ড নই। নিজের হাতে তোমাকে অন্ধ করিয়াছি, অবশেষে সেই দোষে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যদি অন্য

স্ত্রী গ্রহণ করি তবে আমাদের ইষ্টদেব গোপীনাথের শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি যেন ব্রহ্মহত্যা-পিতৃহত্যার পাতকী হই।"

এতবড়ো শপথটা করিতে দিতাম না, বাধা দিতাম, কিন্তু অশ্রু তখন বুক বাহিয়া, কণ্ঠ চাপিয়া, দুইচক্ষু ছাপিয়া, ঝরিয়া পড়িবার জো করিতেছিল; তাহাকে সম্বরণ করিয়া কথা বলিতে পারিতেছিলাম না। তিনি যাহা বলিলেন তাহা শুনিয়া বিপুল আনন্দের উদ্‌বেগে বালিশের মধ্যে মুখ চাপিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। আমি অন্ধ, তবু তিনি আমাকে ছাড়িবেন না। দুঃখীর দুঃখের মতো আমাকে হৃদয়ে করিয়া রাখিবেন। এত সৌভাগ্য আমি চাই না, কিন্তু মন তো স্বার্থপর।

অবশেষে অশ্রুর প্রথম পশলাটা সবেগে বর্ষণ হইয়া গেলে তাঁহার মুখ আমার বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলাম, "এমন ভয়ংকর শপথ কেন করিলে। আমি কি তোমাকে নিজের সুখের জন্য বিবাহ করিতে বলিয়াছিলাম। সতিনকে দিয়া আমি আমার স্বার্থ সাধন করিতাম। চোখের অভাবে তোমার যে কাজ নিজে করিতে পারিতাম না সে আমি তাহাকে দিয়া করাইতাম!"

স্বামী কহিলেন, "কাজ তো দাসীতেও করে। আমি কি কাজের সুবিধার জন্য একটা দাসী বিবাহ করিয়া আমার এই দেবীর সঙ্গে একাসনে বসাইতে পারি।" বলিয়া আমার মুখ তুলিয়া ধরিয়া আমার ললাটে একটি নির্মল চুম্বন করিলেন; সেই চুম্বনের দ্বারা আমার যেন তৃতীয় নেত্র উন্মীলিত হইল, সেইক্ষণে আমার দেবীত্বে অভিষেক হইয়া গেল। আমি মনে মনে কহিলাম, সেই ভালো। যখন অন্ধ হইয়াছি তখন আমি এই বহিঃসংসারের আর গৃহিণী হইতে পারি না, এখন আমি সংসারের উপরে উঠিয়া দেবী হইয়া স্বামীর মঙ্গল করিব। আর মিথ্যা নয়, ছলনা নয়, গৃহিণী রমণীর যতকিছু ক্ষুদ্রতা এবং কপটতা আছে সমস্ত দূর করিয়া দিলাম।

সে দিন সমস্ত দিন নিজের সঙ্গে একটা বিরোধ চলিতে লাগিল। গুরুতর শপথে বাধ্য হইয়া স্বামী যে কোনোমতেই দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারিবেন না, এই আনন্দ মনের মধ্যে যেন একেবারে দংশন করিয়া রহিল; কিছুতেই তাহাকে ছাড়াইতে পারিলাম না। অদ্য আমার মধ্যে যে নূতন দেবীর আবির্ভাব হইয়াছে তিনি কহিলেন, 'হয়তো এমন দিন আসিতে পারে যখন এই শপথ-পালন অপেক্ষা বিবাহ করিলে তোমার স্বামীর মঙ্গল হইবে।' কিন্তু আমার মধ্যে যে পুরাতন নারী ছিল সে কহিল, 'তা হউক, কিন্তু তিনি যখন শপথ করিয়াছেন তখন তো আর বিবাহ করিতে পারিবেন না।' দেবী কহিলেন, 'তা হউক, কিন্তু ইহাতে তোমার খুশি হইবার কোনো কারণ নাই।' মানবী কহিল, 'সকলই বুঝি, কিন্তু যখন তিনি শপথ করিয়াছেন

তখন' ইত্যাদি। বার বার সেই এক কথা। দেবী তখন কেবল নিরুত্তরে ভ্রূকুটি করিলেন এবং একটা ভয়ংকর আশঙ্কার অন্ধকারে আমার সমস্ত অন্তঃকরণ আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

আমার অনুতপ্ত স্বামী চাকরদাসীকে নিষেধ করিয়া নিজে আমার সকল কাজ করিয়া দিতে উদ্যত হইলেন। স্বামীর উপর তুচ্ছ বিষয়েও এইরূপ নিরুপায় নির্ভর প্রথমটা ভালোই লাগিত। কারণ, এমনি করিয়া সর্বদাই তাঁহাকে কাছে পাইতাম। চোখে তাঁহাকে দেখিতাম না বলিয়া তাঁহাকে সর্বদা কাছে পাইবার আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। স্বামীসুখের যে অংশ আমার চোখের ভাগে পড়িয়াছিল সেইটে এখন অন্য ইন্দ্রিয়েরা বাঁটিয়া লইয়া নিজেদের ভাগ বাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল। এখন আমার স্বামী অধিকক্ষণ বাহিরের কাজে থাকিলে মনে হইত, আমি যেন শূন্যে রহিয়াছি, আমি যেন কোথাও কিছু ধরিতে পারিতেছি না, আমার যেন সব হারাইল। পূর্বে স্বামী যখন কালেজে যাইতেন তখন বিলম্ব হইলে পথের দিকের জানালা একটুখানি ফাঁক করিয়া পথ চাহিয়া থাকিতাম। যে জগতে তিনি বেড়াইতেন সে জগৎটাকে আমি চোখের দ্বারা নিজের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম। আজ আমার দৃষ্টিহীন সমস্ত শরীর তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে চেষ্টা করে। তাঁহার পৃথিবীর সহিত আমার পৃথিবীর যে প্রধান সাঁকো ছিল সেটা আজ ভাঙিয়া গেছে। এখন তাঁহার এবং আমার মাঝখানে একটা দুস্তর অন্ধতা ; এখন আমাকে কেবল নিরুপায় ব্যগ্রভাবে বসিয়া থাকিতে হয়, কখন তিনি তাঁহার পার হইতে আমার পারে আপনি আসিয়া উপস্থিত হইবেন। সেইজন্য এখন, যখন ক্ষণকালের জন্যও তিনি আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যান তখন আমার সমস্ত অন্ধ দেহ উদ্যত হইয়া তাঁহাকে ধরিতে যায়, হাহাকার করিয়া তাঁহাকে ডাকে।

কিন্তু এত আকাঙ্ক্ষা, এত নির্ভর তো ভালো নয়। একে তো স্বামীর উপরে স্ত্রীর ভারই যথেষ্ট, তাহার উপরে আবার অন্ধতার প্রকাণ্ড ভার চাপাইতে পারি না। আমার এই বিশ্বজোড়া অন্ধকার, এ আমিই বহন করিব। আমি একাগ্রমনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, আমার এই অনন্ত অন্ধতা দ্বারা স্বামীকে আমি আমার সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিব না।

অল্পকালের মধ্যেই কেবল শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের দ্বারা আমি আমার সমস্ত অভ্যস্ত কর্ম সম্পন্ন করিতে শিখিলাম। এমন-কি আমার অনেক গৃহকর্ম পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি নৈপুণ্যের সহিত নির্বাহ করিতে পারিলাম। এখন মনে হইতে লাগিল, দৃষ্টি আমাদের কাজের যতটা সাহায্য করে তাহার চেয়ে ঢের বেশি বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়।

যতটুকু দেখিলে কাজ ভালো হয় চোখ তাহার চেয়ে ঢের বেশি দেখে। এবং চোখ যখন পাহারার কাজ করে কান তখন অলস হইয়া যায়, যতটা তাহার শোনা উচিত তাহার চেয়ে সে কম শোনে। এখন চঞ্চল চোখের অবর্তমানে আমার অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয় তাহাদের কর্তব্য শান্ত এবং সম্পূর্ণভাবে করিতে লাগিল।

এখন আমার স্বামীকে আর আমার কোনো কাজ করিতে দিলাম না, এবং তাঁহার সমস্ত কাজ আবার পূর্বের মতো আমিই করিতে লাগিলাম।

স্বামী আমাকে কহিলেন, "আমার প্রায়শ্চিত্ত হইতে আমাকে বঞ্চিত করিতেছ।"

আমি কহিলাম, "তোমার প্রায়শ্চিত্ত কিসের আমি জানি না, কিন্তু আমার পাপের ভার আমি বাড়াইব কেন।"

যাহাই বলুন, আমি যখন তাঁহাকে মুক্তি দিলাম তখন তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন; অন্ধ স্ত্রীর সেবাকে চিরজীবনের ব্রত করা পুরুষের কর্ম নহে।

আমার স্বামী ডাক্তারি পাস করিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া মফস্বলে গেলেন।

পাড়াগাঁয়ে আসিয়া যেন মাতৃক্রোড়ে আসিলাম মনে হইল। আমার আট বৎসর বয়সের সময় আমি গ্রাম ছাড়িয়া শহরে আসিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে দশ বৎসরে জন্মভূমি আমার মনের মধ্যে ছায়ার মতো অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছিল। যতদিন চক্ষু ছিল কলিকাতা শহর আমার চারি দিকে আর-সমস্ত স্মৃতিকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। চোখ যাইতেই বুঝিলাম, কলিকাতা কেবল চোখ ভুলাইয়া রাখিবার শহর, ইহাতে মন ভরিয়া রাখে না। দৃষ্টি হারাইবামাত্র আমার সেই বাল্যকালের পল্লীগ্রাম দিবাবসানে নক্ষত্রলোকের মতো আমার মনের মধ্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

অগ্রহায়ণের শেষাশেষি আমরা হাসিমপুরে গেলাম। নূতন দেশ, চারি দিক দেখিতে কিরকম তাহা বুঝিলাম না, কিন্তু বাল্যকালের সেই গন্ধে এবং অনুভাবে আমাকে সর্বাঙ্গে বেষ্টন করিয়া ধরিল। সেই শিশিরে-ভেজা নূতন চষা খেত হইতে প্রভাতের হাওয়া, সেই সোনা-ঢালা অড়র এবং সরিষা-খেতের আকাশ-ভরা কোমল সুমিষ্ট গন্ধ, সেই রাখালের গান, এমন-কি ভাঙা রাস্তা দিয়া গোরুর গাড়ি চলার শব্দ পর্যন্ত আমাকে পুলকিত করিয়া তুলিল। আমার সেই জীবনারম্ভের অতীত স্মৃতি তাহার অনির্বচনীয় ধ্বনি ও গন্ধ লইয়া প্রত্যক্ষ বর্তমানের মতো আমাকে ঘিরিয়া বসিল; অন্ধ চক্ষু তাহার কোনো প্রতিবাদ করিতে পারিল না। সেই বাল্যকালের মধ্যে ফিরিয়া গেলাম, কেবল মাকে পাইলাম না। মনে মনে দেখিতে পাইলাম, দিদিমা তাঁহার বিরল কেশগুচ্ছ মুক্ত করিয়া রৌদ্রে পিঠ দিয়া প্রাঙ্গণে বড়ি দিতেছেন, কিন্তু তাঁহার সেই মৃদুকম্পিত প্রাচীন দুর্বল কণ্ঠে আমাদের গ্রাম্য সাধু ভজনদাসের

দেহতত্ত্ব-গান গুঞ্জনস্বরে শুনিতে পাইলাম না; সেই নবান্নের উৎসব শীতের শিশির-স্নাত আকাশের মধ্যে সজীব হইয়া জাগিয়া উঠিল, কিন্তু ঢেঁকিশালে নূতন ধান কুটিবার জনতার মধ্যে আমার ছোটো ছোটো পল্লিসঙ্গিনীদের সমাগম কোথায় গেল! সন্ধ্যাবেলা অদূরে কোথা হইতে হাম্বাধ্বনি শুনিতে পাই, তখন মনে পড়ে, মা সন্ধ্যা-দীপ হাতে করিয়া গোয়ালে আলো দেখাইতে যাইতেছেন; সেইসঙ্গে ভিজা জাবনার ও খড়-জ্বালানো ধোঁয়ার গন্ধ যেন হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে এবং শুনিতে পাই, পুকুরের পাড়ে বিদ্যালংকারদের ঠাকুরবাড়ি হইতে কাঁসরঘণ্টার শব্দ আসিতেছে। কে যেন আমার সেই শিশুকালের আটটি বৎসরের মধ্য হইতে তাহার সমস্ত বস্তু-অংশ ছাঁকিয়া লইয়া কেবল তাহার রসটুকু গন্ধটুকু আমার চারি দিকে রাশীকৃত করিয়াছে।

এইসঙ্গে আমার সেই ছেলেবেলাকার ব্রত এবং ভোরবেলায় ফুল তুলিয়া শিব-পূজার কথা মনে পড়িল। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, কলিকাতার আলাপ-আলোচনা আনাগোনার গোলমালে বুদ্ধির একটু বিকার ঘটেই। ধর্মকর্ম-ভক্তিশ্রদ্ধার মধ্যে নির্মল সরলতাটুকু থাকে না। সে দিনের কথা আমার মনের পড়ে যে দিন অন্ধ হওয়ার পরে কলিকাতায় আমার পল্লিবাসিনী এক সখী আসিয়া আমাকে বলিয়াছিল, "তোর রাগ হয় না, কুমু? আমি হইলে এমন স্বামীর মুখ দেখিতাম না।" আমি বলিলাম, "ভাই, মুখ দেখা তো বন্ধই বটে, সেজন্যে এ পোড়া চোখের উপর রাগ হয়, কিন্তু স্বামীর উপর রাগ করিতে যাইব কেন।" যথাসময়ে ডাক্তার ডাকেন নাই বলিয়া লাবণ্য আমার স্বামীর উপর অত্যন্ত রাগিয়াছিল এবং আমাকেও রাগাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। আমি তাহাকে বুঝাইলাম, সংসারে থাকিলে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় জ্ঞানে অজ্ঞানে ভুলে ভ্রান্তিতে দুঃখ সুখ নানারকম ঘটিয়া থাকে; কিন্তু মনের মধ্যে যদি ভক্তি স্থির রাখিতে পারি তবে দুঃখের মধ্যেও একটা শান্তি থাকে, নহিলে কেবল রাগারাগি রেষারেষি বকাবকি করিয়াই জীবন কাটিয়া যায়। অন্ধ হইয়াছি এই তো যথেষ্ট দুঃখ, তাহার পরে স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ করিয়া দুঃখের বোঝা বাড়াইব কেন। আমার মতো বালিকার মুখে সেকেলে কথা শুনিয়া লাবণ্য রাগ করিয়া অবজ্ঞাভরে মাথা নাড়িয়া চলিয়া গেল। কিন্তু যা-ই বলি, কথার মধ্যে বিষ আছে, কথা একেবারে ব্যর্থ হয় না। লাবণ্যের মুখ হইতে রাগের কথা আমার মনের মধ্যে দুটো-একটা স্ফুলিঙ্গ ফেলিয়া গিয়াছিল, আমি সেটা পা দিয়া মাড়াইয়া নিবাইয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু তবু দুটো-একটা দাগ থাকিয়াছিল; তাই বলিতেছিলাম, কলিকাতায় অনেক তর্ক, অনেক কথা; সেখানে দেখিতে দেখিতে বুদ্ধি অকালে পাকিয়া কঠিন হইয়া উঠে।

পাড়াগাঁয়ে আসিয়া আমার সেই শিবপূজার শীতল শিউলিফুলের গন্ধে হৃদয়ের সমস্ত আশা ও বিশ্বাস আমার সেই শিশুকালের মতোই নবীন ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দেবতায় আমার হৃদয় এবং আমার সংসার পরিপূর্ণ হইয়া গেল। আমি নতশিরে লুটাইয়া পড়িলাম। বলিলাম, "হে দেব, আমার চক্ষু গেছে বেশ হইয়াছে, তুমি তো আমার আছ।"

হায় ভুল বলিয়াছিলাম। তুমি আমার আছ, এ কথাও স্পর্ধার কথা। আমি তোমার আছি, কেবল এইটুকু বলিবারই অধিকার আছে। ওগো, একদিন কণ্ঠ চাপিয়া আমার দেবতা এই কথাটা আমাকে বলাইয়া লইবে। কিছুই না থাকিতে পারে, কিন্তু আমাকে থাকিতেই হইবে। কাহারো উপরে কোনো জোর নাই; কেবল নিজের উপরেই আছে।

কিছুকাল বেশ সুখে কাটিল। ডাক্তারিতে আমার স্বামীরও প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল। হাতে কিছু টাকাও জমিল।

কিন্তু টাকা জিনিসটা ভালো নয়। উহাতে মন চাপা পড়িয়া যায়। মন যখন রাজত্ব করে তখন সে আপনার সুখ আপনি সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু ধন যখন সুখ-সঞ্চয়ের ভার নেয় তখন মনের আর কাজ থাকে না। তখন, আগে যেখানে মনের সুখ ছিল জিনিসপত্র আসবাব আয়োজন সেই জায়গাটুকু জুড়িয়া বসে। তখন সুখের পরিবর্তে কেবল সামগ্রী পাওয়া যায়।

কোনো বিশেষ কথা বা বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিতে পারি না কিন্তু অন্ধের অনুভবশক্তি বেশি বলিয়া, কিম্বা কী কারণ জানি না, অবস্থার সচ্ছলতার সঙ্গে সঙ্গে আমার স্বামীর পরিবর্তন আমি বেশ বুঝিতে পারিতাম। যৌবনারম্ভে ন্যায়-অন্যায় ধর্ম-অধর্ম সম্বন্ধে আমার স্বামীর যে একটি বেদনাবোধ ছিল সেটা যেন প্রতিদিন অসাড় হইয়া আসিতেছিল। মনে আছে, তিনি একদিন বলিতেন, "ডাক্তারি যে কেবল জীবিকার জন্য শিখিতেছি তাহা নহে, ইহাতে অনেক গরিবের উপকার করিতে পারিব।" যে-সব ডাক্তার দরিদ্র মুমূর্ষুর দ্বারে আসিয়া আগাম ভিজিট না লইয়া নাড়ি দেখিতে চায় না তাহাদের কথা বলিতে গিয়া ঘৃণায় তাঁহার বাক্‌রোধ হইত। আমি বুঝিতে পারি, এখন আর সে দিন নাই। একমাত্র ছেলের প্রাণরক্ষার জন্য দরিদ্র নারী তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়াছে, তিনি তাহা উপেক্ষা করিয়াছেন; শেষে আমি মাথার দিব্য দিয়া তাঁহাকে চিকিৎসায় পাঠাইয়াছি, কিন্তু মনের সঙ্গে কাজ করেন নাই। যখন আমাদের টাকা অল্প ছিল তখন অন্যায় উপার্জনকে আমার স্বামী কী চক্ষে দেখিতেন, তাহা আমি জানি। কিন্তু ব্যাঙ্কে এখন অনেক টাকা

জমিয়াছে, এখন একজন ধনী লোকের আমলা আসিয়া তাঁহার সঙ্গে গোপনে দুই দিন ধরিয়া অনেক কথা বলিয়া গেল, কী বলিল আমি কিছুই জানি না, কিন্তু তাহার পরে যখন তিনি আমার কাছে আসিলেন, অত্যন্ত প্রফুল্লতার সঙ্গে অন্য নানা বিষয়ে নানা কথা বলিলেন, তখন আমার অন্তঃকরণের স্পর্শশক্তিদ্বারা বুঝিলাম, তিনি আজ কলঙ্ক মাখিয়া আসিয়াছেন।

অন্ধ হইবার পূর্বে আমি যাঁহাকে শেষবার দেখিয়াছিলাম আমার সে স্বামী কোথায়। যিনি আমার দৃষ্টিহীন দুই চক্ষুর মাঝখানে একটি চুম্বন করিয়া আমাকে এক-দিন দেবীপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার কী করিতে পারিলাম। একদিন একটা রিপুর ঝড় আসিয়া যাহাদের অকস্মাৎ পতন হয় তাহারা আর-একটা হৃদয়াবেগে আবার উপরে উঠিতে পারে, কিন্তু এই-যে দিনে দিনে পলে পলে মজ্জার ভিতর হইতে কঠিন হইয়া যাওয়া, বাহিরে বাড়িয়া উঠিতে উঠিতে অন্তরকে তিলে তিলে চাপিয়া ফেলা, ইহার প্রতিকার ভাবিতে গেলে কোনো রাস্তা খুঁজিয়া পাই না।

স্বামীর সঙ্গে আমার চোখে-দেখার যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে সে কিছুই নয়; কিন্তু প্রাণের ভিতরটা যেন হাঁপাইয়া ওঠে যখন মনে করি, আমি যেখানে তিনি সেখানে নাই; আমি অন্ধ, সংসারে আলোকবর্জিত অন্তরপ্রদেশে আমার সেই প্রথম বয়সের নবীন প্রেম, অক্ষুণ্ণ ভক্তি, অখণ্ড বিশ্বাস লইয়া বসিয়া আছি— আমার দেবমন্দিরে জীবনের আরম্ভে আমি বালিকার করপুটে যে শেফালিকার অর্ঘ্যদান করিয়াছিলাম তাহার শিশির এখনো শুকায় নাই; আর, আমার স্বামী এই ছায়াশীতল চিরনবীনতার দেশ ছাড়িয়া টাকা-উপার্জনের পশ্চাতে সংসারমরুভূমির মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া চলিয়া যাইতেছেন! আমি যাহা বিশ্বাস করি, যাহাকে ধর্ম বলি, যাহাকে সকল সুখ-সম্পত্তির অধিক বলিয়া জানি, তিনি অতিদূর হইতে তাহার প্রতি হাসিয়া কটাক্ষপাত করেন! কিন্তু একদিন এ বিচ্ছেদ ছিল না, প্রথম বয়সে আমরা এক পথেই যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলাম; তাহার পরে কখন যে পথের ভেদ হইতে আরম্ভ হইতেছিল তাহা তিনিও জানিতে পারেন নাই, আমিও জানিতে পারি নাই; অবশেষে আজ আমি আর তাঁহাকে ডাকিয়া সাড়া পাই না।

এক-এক সময়ে ভাবি, হয়তো অন্ধ বলিয়া সামান্য কথাকে আমি বেশি করিয়া দেখি। চক্ষু থাকিলে আমি হয়তো সংসারকে ঠিক সংসারের মতো করিয়া চিনিতে পারিতাম।

আমার স্বামীও আমাকে এক দিন তাহাই বুঝাইয়া বলিলেন। সে দিন সকালে একটি বৃদ্ধ মুসলমান তাহার পৌত্রীর ওলাউঠার চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে ডাকিতে

আসিয়াছিল। আমি শুনিতে পাইলাম সে কহিল, "বাবা আমি গরিব, কিন্তু আল্লা তোমার ভালো করিবেন।" আমার স্বামী কহিলেন, "আল্লা যাহা করিবেন কেবল তাহাতেই আমার চলিবে না, তুমি কী করিবে সেটা আগে শুনি।" শুনিবামাত্র ভাবিলাম, ঈশ্বর আমাকে অন্ধ করিয়াছেন, কিন্তু বধির করেন নাই কেন। বৃদ্ধ গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত 'হে আল্লা' বলিয়া বিদায় হইয়া গেল। আমি তখনই ঝিকে দিয়া তাহাকে অন্তঃপুরের খিড়কিদ্বারে ডাকাইয়া আনিলাম; কহিলাম, "বাবা, তোমার নাতনির জন্য এই ডাক্তারের খরচা কিছু দিলাম, তুমি আমার স্বামীর মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া পাড়া হইতে হরিশ ডাক্তারকে ডাকিয়া লইয়া যাও।"

কিন্তু সমস্ত দিন আমার মুখে অন্ন রুচিল না। স্বামী অপরাহ্ণে নিদ্রা হইতে জাগিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে বিমর্ষ দেখিতেছি কেন।" পূর্বকালের অভ্যস্ত উত্তর একটা মুখে আসিতেছিল— 'না, কিছুই হয় নাই'; কিন্তু ছলনার কাল গিয়াছে, আমি স্পষ্ট করিয়া বলিলাম, "কতদিন তোমাকে বলিব মনে করি, কিন্তু বলিতে গিয়া ভাবিয়া পাই না, ঠিক কী বলিবার আছে। আমার অন্তরের কথাটা আমি বুঝাইয়া বলিতে পারিব কি না জানি না, কিন্তু নিশ্চয় তুমি নিজের মনের মধ্যে বুঝিতে পার, আমরা দুজনে যেমনভাবে এক হইয়া জীবন আরম্ভ করিয়াছিলাম আজ তাহা পৃথক হইয়া গেছে।" স্বামী হাসিয়া কহিলেন, "পরিবর্তনই তো সংসারের ধর্ম।" আমি কহিলাম, "টাকাকড়ি রূপযৌবন সকলেরই পরিবর্তন হয়, কিন্তু নিত্য জিনিস কি কিছুই নাই।" তখন তিনি একটু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "দেখো, অন্য স্ত্রীলোকেরা সত্যকার অভাব লইয়া দুঃখ করে— কাহারো স্বামী উপার্জন করে না, কাহারো স্বামী ভালোবাসে না, তুমি আকাশ হইতে দুঃখ টানিয়া আন।" আমি তখনই বুঝিলাম, অন্ধতা আমার চোখে এক অঞ্জন মাখাইয়া আমাকে এই পরিবর্তমান সংসারের বাহিরে লইয়া গেছে, আমি অন্য স্ত্রীলোকের মতো নহি, আমাকে আমার স্বামী বুঝিবেন না।

ইতিমধ্যে আমার এক পিসশাশুড়ি দেশ হইতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের সংবাদ লইতে আসিলেন। আমরা উভয়ে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিতেই তিনি প্রথম কথাতেই বলিলেন, "বলি, বউমা, তুমি তো কপালক্রমে দুইটি চক্ষু খোয়াইয়া বসিয়াছ, এখন আমাদের অবিনাশ অন্ধ স্ত্রীকে লইয়া ঘরকন্না চালাইবে কী করিয়া। উহার আর-একটা বিয়ে-থাওয়া দিয়া দাও।" স্বামী যদি ঠাট্টা করিয়া বলিতেন 'তা বেশ তো পিসিমা, তোমরা দেখিয়া শুনিয়া একটা ঘটকালি করিয়া দাও-না'— তাহা হইলে সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যাইত। কিন্তু তিনি কুণ্ঠিত হইয়া কহিলেন, "আঃ, পিসিমা, কী

বলিতেছ।" পিসিমা উত্তর করিলেন, "কেন, অন্যায় কী বলিতেছি। আচ্ছা, বউমা, তুমিই বলো তো, বাছা।" আমি হাসিয়া কহিলাম, "পিসিমা, ভালো লোকের কাছে পরামর্শ চাহিতেছ। যাহার গাঁঠ কাটিতে হইবে তাহার কি কেহ সম্মতি নেয়।" পিসিমা উত্তর করিলেন, "হাঁ, সে কথা ঠিক বটে। তা, তোতে আমাতে গোপনে পরামর্শ করিব, কী বলিস, অবিনাশ। তাও বলি, বউমা, কুলীনের মেয়ের সতিন যত বেশি হয়, তাহার স্বামিগৌরব ততই বাড়ে। আমাদের ছেলে ডাক্তারি না করিয়া যদি বিবাহ করিত, তবে উহার রোজগারের ভাবনা কী ছিল। রোগী তো ডাক্তারের হাতে পড়িলেই মরে, মরিলে তো আর ভিজিট দেয় না, কিন্তু বিধাতার শাপে কুলীনের স্ত্রীর মরণ নাই এবং সে যতদিন বাঁচে ততদিনই স্বামীর লাভ।"

দুই দিন বাদে আমার স্বামী আমার সম্মুখে পিসিমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিসিমা, আত্মীয়ের মতো করিয়া বউয়ের সাহায্য করিতে পারে, এমন একটি ভদ্রঘরের স্ত্রীলোক দেখিয়া দিতে পার? উনি চোখে দেখিতে পান না, সর্বদা ওঁর একটি সঙ্গিনী কেহ থাকিলে আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি।" যখন নূতন অন্ধ হইয়াছিলাম তখন এ কথা বলিলে খাটিত, কিন্তু এখন চোখের অভাবে আমার কিম্বা ঘরকন্নার বিশেষ কী অসুবিধা হয় জানি না; কিন্তু প্রতিবাদমাত্র না করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। পিসিমা কহিলেন, "অভাব কী। আমারই তো ভাসুরের এক মেয়ে আছে, যেমন সুন্দরী তেমনি লক্ষ্মী। মেয়েটির বয়স হইল, কেবল উপযুক্ত বরের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিয়া আছে; তোমার মতো কুলীন পাইলে এখনই বিবাহ দিয়া দেয়।" স্বামী চকিত হইয়া কহিলেন, "বিবাহের কথা কে বলিতেছে।" পিসিমা কহিলেন, "ওমা, বিবাহ না করিলে ভদ্রঘরের মেয়ে কি তোমার ঘরে অমনি আসিয়া পড়িয়া থাকিবে।" কথাটা সংগত বটে এবং স্বামী তাহার কোনো সদুত্তর দিতে পারিলেন না।

আমার রুদ্ধ চক্ষুর অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে আমি একলা দাঁড়াইয়া ঊর্ধ্বমুখে ডাকিতে লাগিলাম, 'ভগবান আমার স্বামীকে রক্ষা করো।'

তাহার দিনকয়েক পরে একদিন সকালবেলায় আমার পূজা-আহ্নিক সারিয়া বাহিরে আসিতেই পিসিমা কহিলেন, "বউমা, যে ভাসুরঝির কথা বলিয়াছিলাম সেই আমাদের হেমাঙ্গিনী আজ দেশ হইতে আসিয়াছে। হিমু, ইনি তোমার দিদি, ইহাকে প্রণাম করো।"

এমন সময় আমার স্বামী হঠাৎ আসিয়া যেন অপরিচিত স্ত্রীলোককে দেখিয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। পিসিমা কহিলেন, "কোথা যাস, অবিনাশ।" স্বামী

জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে।" পিসিমা কহিলেন, "এই মেয়েটিই আমার সেই ভাসুরঝি হেমাঙ্গিনী।" ইহাকে কখন আনা হইল, কে আনিল, কী বৃত্তান্ত, লইয়া আমার স্বামী বারম্বার অনেক অনাবশ্যক বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

আমি মনে মনে কহিলাম, 'যাহা ঘটিতেছে তাহা তো সবই বুঝিতেছি, কিন্তু ইহার উপরে আবার ছলনা আরম্ভ হইল? লুকাচুরি, ঢাকাঢাকি, মিথ্যাকথা! অধর্ম করিতে যদি হয় তো করো, সে নিজের অশান্ত প্রবৃত্তির জন্য, কিন্তু আমার জন্য কেন হীনতা করা। আমাকে ভুলাইবার জন্য কেন মিথ্যাচরণ।'

হেমাঙ্গিনীর হাত ধরিয়া আমি তাহাকে আমার শয়নগৃহে লইয়া গেলাম। তাহার মুখে গায়ে হাত বুলাইয়া তাহাকে দেখিলাম, মুখটি সুন্দর হইবে, বয়সও চোদ্দ-পনেরোর কম হইবে না।

বালিকা হঠাৎ মধুর উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল; কহিল, "ও কী করিতেছ। আমার ভূত ঝাড়াইয়া দিবে নাকি।"

সেই উন্মুক্ত সরল হাস্যধ্বনিতে আমাদের মাঝখানের একটা অন্ধকার মেঘ যেন একমুহূর্তে কাটিয়া গেল। আমি দক্ষিণবাহুতে তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া কহিলাম, "আমি তোমাকে দেখিতেছি, ভাই।" বলিয়া তাহার কোমল মুখখানিতে আর-একবার হাত বুলাইলাম।

"দেখিতেছ?" বলিয়া সে আবার হাসিতে লাগিল। কহিল, "আমি কি তোমার বাগানের সিম না বেগুন যে হাত বুলাইয়া দেখিতেছ কতবড়োটা হইয়াছি?"

তখন আমার হঠাৎ মনে হইল, আমি যে অন্ধ তাহা হেমাঙ্গিনী জানে না। কহিলাম, "বোন, আমি যে অন্ধ।" শুনিয়া সে কিছুক্ষণ আশ্চর্য হইয়া গম্ভীর হইয়া রহিল। বেশ বুঝিতে পারিলাম, তাহার কুতূহলী তরুণ আয়ত নেত্র দিয়া সে আমার দৃষ্টিহীন চক্ষু এবং মুখের ভাব মনোযোগের সহিত দেখিল; তাহার পরে কহিল, "ওঃ, তাই বুঝি কাকিকে এখানে আনাইয়াছ?"

আমি কহিলাম, "না, আমি ডাকি নাই। তোমার কাকি আপনি আসিয়াছেন।"

বালিকা আবার হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "দয়া করিয়া? তাহা হইলে দয়াময়ী শীঘ্র নড়িতেছেন না! কিন্তু, বাবা আমাকে এখানে কেন পাঠাইলেন।"

এমন সময় পিসিমা ঘরে প্রবেশ করিলেন। এতক্ষণ আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁহার কথাবার্তা চলিতেছিল। ঘরে আসিতেই হেমাঙ্গিনী কহিল, "কাকি, আমরা বাড়ি ফিরিব কবে বলো।"

পিসিমা কহিলেন, "ওমা! এইমাত্র আসিয়াই অমনি যাই-যাই। অমন চঞ্চল মেয়েও তো দেখি নাই।"

হেমাঙ্গিনী কহিল, "কাকি, তোমার তো এখান হইতে শীঘ্র নড়িবার গতিক দেখি না। তা, তোমার এ হল আত্মীয়ঘর, তুমি যতদিন খুশি থাকো, আমি কিন্তু চলিয়া যাইব, তা তোমাকে বলিয়া রাখিতেছি।" এই বলিয়া আমার হাত ধরিয়া কহিল, "কী বলো ভাই, তোমরা তো আমার ঠিক আপন নও।" আমি তাহার এই সরল প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়া তাহাকে আমার বুকের কাছে টানিয়া লইলাম। দেখিলাম, পিসিমা যতই প্রবলা হউন এই কন্যাটিকে তাঁহার সামলাইবার সাধ্য নাই। পিসিমা প্রকাশ্যে রাগ না দেখাইয়া হেমাঙ্গিনীকে একটু আদর করিবার চেষ্টা করিলেন; সে তাহা যেন গা হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল। পিসিমা সমস্ত ব্যাপারটাকে আদুরে মেয়ের একটা পরিহাসের মতো উড়াইয়া দিয়া হাসিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। আবার কী ভাবিয়া ফিরিয়া আসিয়া হেমাঙ্গিনীকে কহিলেন, "হিমু, চল্ তোর স্নানের বেলা হইল।" সে আমার কাছে আসিয়া কহিল, "আমরা দুইজনে ঘাটে যাইব, কী বলো ভাই।" পিসিমা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ক্ষান্ত দিলেন; তিনি জানিতেন, টানাটানি করিতে গেলে হেমাঙ্গিনীরই জয় হইবে এবং তাঁহাদের মধ্যেকার বিরোধ অশোভনরূপে আমার সম্মুখে প্রকাশ হইবে।

খিড়কির ঘাটে যাইতে যাইতে হেমাঙ্গিনী আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার ছেলেপুলে নাই কেন।" আমি ঈষৎ হাসিয়া কহিলাম, "কেন তাহা কী করিয়া জানিব, ঈশ্বর দেন নাই।" হেমাঙ্গিনী কহিল, "অবশ্য, তোমার ভিতরে কিছু পাপ ছিল।" আমি কহিলাম, "তাহাও অন্তর্যামী জানেন।" বালিকা প্রমাণস্বরূপে কহিল, "দেখো-না, কাকির ভিতরে এত কুটিলতা যে উঁহার গর্ভে সন্তান জন্মিতে পায় না।" পাপপুণ্য সুখদুঃখ দণ্ডপুরস্কারের তত্ত্ব নিজেও বুঝি না, বালিকাকেও বুঝাইলাম না; কেবল একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে তাঁহাকে কহিলাম, তুমিই জান! হেমাঙ্গিনী তৎক্ষণাৎ আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "ওমা, আমার কথা শুনিয়াও তোমার নিশ্বাস পড়ে! আমার কথা বুঝি কেহ গ্রাহ্য করে।"

দেখিলাম, স্বামীর ডাক্তারি ব্যবসায়ে ব্যাঘাত হইতে লাগিল। দূরে ডাক পড়িলে তো যানই না, কাছে কোথাও গেলেও চট্‌পট্ সারিয়া চলিয়া আসেন। পূর্বে যখন কর্মের অবসরে ঘরে থাকিতেন, মধ্যাহ্নে আহার এবং নিদ্রার সময়ে কেবল বাড়ির ভিতরে আসিতেন। এখন পিসিমাও যখন-তখন ডাকিয়া পাঠান, তিনিও অনাবশ্যক পিসিমার খবর লইতে আসেন। পিসিমা যখন ডাক ছাড়িয়া বলেন

'হিমু, আমার পানের বাটাটা নিয়ে আয় তো', আমি বুঝিতে পারি, পিসিমার ঘরে আমার স্বামী আসিয়াছেন। প্রথম প্রথম দিন-দুই-তিন হেমাঙ্গিনী পানের বাটা, তেলের বাটি, সিঁদুরের কৌটো প্রভৃতি যথাদিষ্ট লইয়া যাইত। কিন্তু, তাহার পরে ডাক পড়িলে সে আর কিছুতেই নড়িত না, ঝির হাত দিয়া আদিষ্ট দ্রব্য পাঠাইয়া দিত। পিসি ডাকিতেন, 'হেমাঙ্গিনী, হিমু, হিমি'— বালিকা যেন আমার প্রতি একটা করুণার আবেগে আমাকে জড়াইয়া থাকিত; একটা আশঙ্কা এবং বিষাদে তাহাকে আচ্ছন্ন করিত। ইহার পর হইতে আমার স্বামীর কথা সে আমার কাছে ভ্রমেও উল্লেখ করিত না।

ইতিমধ্যে আমার দাদা আমাকে দেখিতে আসিলেন। আমি জানিতাম, দাদার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। ব্যাপারটা কিরূপ চলিতেছে তাহা তাঁহার নিকট গোপন করা প্রায় অসাধ্য হইবে। আমার দাদা বড়ো কঠিন বিচারক। তিনি লেশমাত্র অন্যায়কে ক্ষমা করিতে জানেন না। আমার স্বামী যে তাঁহারই চক্ষের সম্মুখে অপরাধীরূপে দাঁড়াইবেন, ইহাই আমি সবচেয়ে ভয় করিতাম। আমি অতিরিক্ত প্রফুল্লতা দ্বারা সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া রাখিলাম। আমি বেশি কথা বলিয়া, বেশি ব্যস্তসমস্ত হইয়া, অত্যন্ত ধুমধাম করিয়া চারি দিকে যেন একটা ধুলা উড়াইয়া রাখিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু, সেটা আমার পক্ষে এমন অস্বাভাবিক যে তাহাতেই আরো বেশি ধরা পড়িবার কারণ হইল। কিন্তু, দাদা বেশি দিন থাকিতে পারিলেন না, আমার স্বামী এমনি অস্থিরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, তাহা প্রকাশ্য রূঢ়তার আকার ধারণ করিল। দাদা চলিয়া গেলেন। বিদায় লইবার পূর্বে পরিপূর্ণ স্নেহের সহিত আমার মাথার উপর অনেকক্ষণ কম্পিত হস্ত রাখিলেন; মনে মনে একাগ্রচিত্তে কী আশীর্বাদ করিলেন তাহা বুঝিতে পারিলাম; তাঁহার অশ্রু আমার অশ্রুসিক্ত কপোলের উপর আসিয়া পড়িল।

মনে আছে, সে দিন চৈত্রমাসের সন্ধ্যাবেলায় হাটের বারে লোকজন বাড়ি ফিরিয়া যাইতেছে। দূর হইতে বৃষ্টি লইয়া একটা ঝড় আসিতেছে, তাহারই মাটি-ভেজা গন্ধ এবং বাতাসের আর্দ্রভাব আকাশে ব্যাপ্ত হইয়াছে, সঙ্গচ্যুত সাথিগণ অন্ধকার মাঠের মধ্যে পরস্পরকে ব্যাকুল ঊর্ধ্বকণ্ঠে ডাকিতেছে। অন্ধের শয়নগৃহে যতক্ষণ আমি একলা থাকি ততক্ষণ প্রদীপ জ্বালানো হয় না; পাছে শিখা লাগিয়া কাপড় ধরিয়া উঠে বা কোনো দুর্ঘটনা হয়। আমি সেই নির্জন অন্ধকার কক্ষের মধ্যে মাটিতে বসিয়া দুই হাত জুড়িয়া আমার অনন্ত অন্ধজগতের জগদীশ্বরকে ডাকিতেছিলাম, বলিতেছিলাম, "প্রভু, তোমার দয়া যখন অনুভব হয় না, তোমার অভিপ্রায় যখন

বুঝি না, তখন এই অনাথ ভগ্ন হৃদয়ের হালটাকে প্রাণপণে দুই হাতে বক্ষে চাপিয়া ধরি; বুক দিয়া রক্ত বাহির হইয়া যায় তবু তুফান সামলাইতে পারি না; আমার আর কত পরীক্ষা করিবে, আমার কতটুকুই বা বল।" এই বলিতে বলিতে অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, খাটের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। সমস্ত দিন ঘরের কাজ করিতে হয়। হেমাঙ্গিনী ছায়ার মতো কাছে কাছে থাকে, বুকের ভিতরে যে অশ্রু ভরিয়া উঠে সে আর ফেলিবার অবসর পাই না। অনেক দিন পরে আজ চোখের জল বাহির হইল। এমন সময় দেখিলাম, খাট একটু নড়িল, মানুষ চলার উস্‌খুস্‌ শব্দ হইল এবং মুহূর্তপরে হেমাঙ্গিনী আসিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া নিঃশব্দে অঞ্চল দিয়া আমার চোখ মুছাইয়া দিতে লাগিল। সে-যে সন্ধ্যার আরম্ভে কী ভাবিয়া কখন আসিয়া খাটেই শুইয়াছিল, আমি জানিতে পারি নাই। সে একটি প্রশ্নও করিল না, আমিও তাহাকে কোনো কথাই বলিলাম না। সে ধীরে ধীরে তাহার শীতল হস্ত আমার ললাটে বুলাইয়া দিতে লাগিল। ইতিমধ্যে কখন মেঘগর্জন এবং মুষলধারে বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে একটা ঝড় হইয়া গেল বুঝিতেই পারিলাম না; বহুকাল পরে একটি সুস্নিগ্ধ শান্তি আসিয়া আমার জ্বরদাহদগ্ধ হৃদয়কে জুড়াইয়া দিল।

পরদিন হেমাঙ্গিনী কহিল, "কাকি, তুমি যদি বাড়ি না যাও আমি আমার কৈবর্ত-দাদার সঙ্গে চলিলাম, তাহা বলিয়া রাখিতেছি।" পিসিমা কহিলেন, "তাহাতে কাজ কী, আমিও কাল যাইতেছি; একসঙ্গেই যাওয়া হইবে। এই দেখ্‌ হিমু, আমার অবিনাশ তোর জন্যে কেমন একটি মুক্তা-দেওয়া আংটি কিনিয়া দিয়াছে।" বলিয়া সগর্বে পিসিমা আংটি হেমাঙ্গিনীর হাতে দিলেন। হেমাঙ্গিনী কহিল, "এই দেখো কাকি, আমি কেমন সুন্দর লক্ষ করিতে পারি।" বলিয়া জানলা হইতে তাক করিয়া আংটি খিড়কি পুকুরের মাঝখানে ফেলিয়া দিল। পিসিমা রাগে দুঃখে বিস্ময়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিলেন। আমাকে বারম্বার করিয়া হাতে ধরিয়া বলিয়া দিলেন, "বউমা, এই ছেলেমানষির কথা অবিনাশকে খবরদার বলিয়ো না; ছেলে আমার তাহা হইলে মনে দুঃখ পাইবে। মাথা খাও, বউমা।" আমি কহিলাম, "আর বলিতে হইবে না পিসিমা, আমি কোনো কথাই বলিব না।"

পরদিনে যাত্রার পূর্বে হেমাঙ্গিনী আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "দিদি, আমাকে মনে রাখিস।" আমি দুই হাত বারম্বার তাহার মুখে বুলাইয়া কহিলাম, "অন্ধ কিছু ভোলে না, বোন; আমার তো জগৎ নাই, আমি কেবল মন লইয়াই আছি।" বলিয়া তাহার মাথাটা লইয়া একবার আঘ্রাণ করিয়া চুম্বন করিলাম। ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া তাহার কেশরাশির মধ্যে আমার অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

হেমাঙ্গিনী বিদায় লইলে আমার পৃথিবীটা শুষ্ক হইয়া গেল— সে আমার প্রাণের মধ্যে যে সৌগন্ধ্য সৌন্দর্য সংগীত যে উজ্জ্বল আলো এবং যে কোমল তরুণতা আনিয়াছিল তাহা চলিয়া গেলে একবার আমার সমস্ত সংসার, আমার চারি দিকে, দুই হাত বাড়াইয়া দেখিলাম, কোথায় আমার কী আছে! আমার স্বামী আসিয়া বিশেষ প্রফুল্লতা দেখাইয়া কহিলেন, "ইহারা গেলেন, এখন বাঁচা গেল, একটু কাজকর্ম করিবার অবসর পাওয়া যাইবে।" ধিক্ ধিক্, আমাকে। আমার জন্য কেন এত চাতুরী। আমি কি সত্যকে ডরাই। আমি কি আঘাতকে কখনো ভয় করিয়াছি। আমার স্বামী কি জানেন না? যখন আমি দুই চক্ষু দিয়াছিলাম তখন আমি কি শান্তমনে আমার চিরান্ধকার গ্রহণ করি নাই?

এতদিন আমার এবং আমার স্বামীর মধ্যে কেবল অন্ধতার অন্তরাল ছিল, আজ হইতে আর-একটা ব্যবধান সৃজন হইল। আমার স্বামী ভুলিয়াও কখনো হেমাঙ্গিনীর নাম আমার কাছে উচ্চারণ করিতেন না, যেন তাঁহার সম্পর্কীয় সংসার হইতে হেমাঙ্গিনী একেবারে লুপ্ত হইয়া গেছে, যেন সেখানে সে কোনোকালে লেশমাত্র রেখাপাত করে নাই। অথচ পত্র দ্বারা তিনি যে সর্বদাই তাহার খবর পাইতেছেন, তাহা আমি অনায়াসে অনুভব করিতে পারিতাম; যেমন পুকুরের মধ্যে বন্যার জল যে দিন একটু প্রবেশ করে সেই দিনই পদ্মের ডাঁটায় টান পড়ে, তেমনি তাঁহার ভিতরে একটুও যে দিন স্ফীতির সঞ্চার হয় সে দিন আমার হৃদয়ের মূলের মধ্য হইতে আমি আপনি অনুভব করিতে পারি। কবে তিনি খবর পাইতেন এবং কবে পাইতেন না তাহা আমার কাছে কিছু অগোচর ছিল না। কিন্তু, আমিও তাঁহাকে তাহার কথা শুধাইতে পারিতাম না। আমার অন্ধকার হৃদয়ে সেই যে উন্মত্ত উদ্দাম উজ্জ্বল সুন্দর তারাটি ক্ষণকালের জন্য উদয় হইয়াছিল তাহার একটু খবর পাইবার এবং তাহার কথা আলোচনা করিবার জন্য আমার প্রাণ তৃষিত হইয়া থাকিত, কিন্তু আমার স্বামীর কাছে মুহূর্তের জন্য তাহার নাম করিবার অধিকার ছিল না। আমাদের দুজনার মাঝখানে বাক্যে এবং বেদনায় পরিপূর্ণ এই একটা নীরবতা অটল ভাবে বিরাজ করিত।

বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি একদিন ঝি আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মাঠাকরুন, ঘাটে যে অনেক আয়োজনে নৌকা প্রস্তুত হইতেছে, বাবামশায় কোথায় যাইতেছেন?" আমি জানিতাম, একটা কী উদ্যোগ হইতেছে; আমার অদৃষ্টাকাশে প্রথম কিছুদিন ঝড়ের পূর্বকার নিস্তব্ধতা এবং তাহার পরে প্রলয়ের ছিন্নবিচ্ছিন্ন মেঘ আসিয়া জমিতেছিল, সংহারকারী শংকর নীরব অঙ্গুলির ইঙ্গিতে তাঁহার সমস্ত

প্রলয়শক্তিকে আমার মাথার উপরে জড়ো করিতেছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছিলাম। ঝিকে বলিলাম, "কই, আমি তো এখনো কোনো খবর পাই নাই।" ঝি আর-কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে সাহস না করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল।

অনেক রাত্রে আমার স্বামী আসিয়া কহিলেন, "দূরে এক জায়গায় আমার ডাক পড়িয়াছে, কাল ভোরেই আমাকে রওনা হইতে হইবে। বোধ করি ফিরিতে দিন-দুই-তিন বিলম্ব হইতে পারে।"

আমি শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম, "কেন আমাকে মিথ্যা বলিতেছ।"

আমার স্বামী কম্পিত অস্ফুট কণ্ঠে কহিলেন, "মিথ্যা কী বলিলাম।"

আমি কহিলাম, "তুমি বিবাহ করিতে যাইতেছ!"

তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। আমিও স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ ধরে কোনো শব্দ রহিল না। শেষে আমি বলিলাম, "একটা উত্তর দাও। বলো, হাঁ, আমি বিবাহ করিতে যাইতেছি।"

তিনি প্রতিধ্বনির ন্যায় উত্তর দিলেন, "হাঁ, আমি বিবাহ করিতে যাইতেছি।"

আমি কহিলাম, "না, তুমি যাইতে পারিবে না। তোমাকে আমি এই মহাবিপদ মহাপাপ হইতে রক্ষা করিব। এ যদি না পারি তবে আমি তোমার কিসের স্ত্রী; কী জন্য আমি শিবপূজা করিয়াছিলাম।"

আবার অনেকক্ষণ গৃহ নিঃশব্দ হইয়া রহিল। আমি মাটিতে পড়িয়া স্বামীর পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিলাম, "আমি তোমার কী অপরাধ করিয়াছি, কিসে আমার ত্রুটি হইয়াছে, অন্য স্ত্রীতে তোমার কিসের প্রয়োজন। মাথা খাও, সত্য করিয়া বলো।"

তখন আমার স্বামী ধীরে ধীরে কহিলেন, "সত্যই বলিতেছি, আমি তোমাকে ভয় করি। তোমার অন্ধতা তোমাকে এক অনন্ত আবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, সেখানে আমার প্রবেশ করিবার জো নাই। তুমি আমার দেবতা, তুমি আমার দেবতার ন্যায় ভয়ানক, তোমাকে লইয়া প্রতিদিন গৃহকার্য করিতে পারি না। যাহাকে বকিব ঝকিব, রাগ করিব, সোহাগ করিব, গহনা গড়াইয়া দিব, এমন একটি সামান্য রমণী আমি চাই।"

"আমার বুকের ভিতরে চিরিয়া দেখো! আমি সামান্য রমণী, আমি মনের মধ্যে সেই নববিবাহের বালিকা বৈ কিছু নই; আমি বিশ্বাস করিতে চাই, নির্ভর করিতে চাই, পূজা করিতে চাই; তুমি নিজেকে অপমান করিয়া আমাকে দুঃসহ দুঃখ দিয়া

তোমার চেয়ে আমাকে বড়ো করিয়া তুলিয়ো না— আমাকে সর্ববিষয়ে তোমার পায়ের নীচে রাখিয়া দাও।"

আমি কী কী কথা বলিয়াছিলাম সে কি আমার মনে আছে। ক্ষুব্ধ সমুদ্র কি নিজের গর্জন নিজে শুনিতে পায়। কেবল মনে পড়ে বলিয়াছিলাম, "যদি আমি সতী হই তবে ভগবান সাক্ষী রহিলেন, তুমি কোনোমতেই তোমার ধর্মশপথ লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। সে মহাপাপের পূর্বে হয় আমি বিধবা হইব, নয় হেমাঙ্গিনী বাঁচিয়া থাকিবে না।" এই বলিয়া আমি মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলাম।

যখন আমার মূর্ছা ভঙ্গ হইয়া গেল তখনো রাত্রিশেষের পাখি ডাকিতে আরম্ভ করে নাই এবং আমার স্বামী চলিয়া গেছেন।

আমি ঠাকুরঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পূজায় বসিলাম। সমস্ত দিন আমি ঘরের বাহির হইলাম না। সন্ধ্যার সময়ে কালবৈশাখী ঝড়ে দালান কাঁপিতে লাগিল। আমি বলিলাম না যে, 'হে ঠাকুর, আমার স্বামী এখন নদীতে আছেন, তাঁহাকে রক্ষা করো।' আমি কেবল একান্তমনে বলিতে লাগিলাম, 'ঠাকুর, আমার অদৃষ্টে যাহা হইবার তা হউক, কিন্তু আমার স্বামীকে মহাপাতক হইতে নিবৃত্ত করো।' সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। তাহার পরদিনও আসন পরিত্যাগ করি নাই। এই অনিদ্রা-অনাহারে কে আমাকে বল দিয়াছিল জানি না, আমি পাষাণমূর্তির সম্মুখে পাষাণমূর্তির মতোই বসিয়া ছিলাম।

সন্ধ্যার সময় বাহির হইতে দ্বার-ঠেলাঠেলি আরম্ভ হইল। দ্বার ভাঙিয়া যখন ঘরে লোক প্রবেশ করিল তখন আমি মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া আছি।

মূর্ছাভঙ্গে শুনিলাম, "দিদি।" দেখিলাম, হেমাঙ্গিনীর কোলে শুইয়া আছি। মাথা নাড়িতেই তাহার নূতন চেলি খস্‌খস্‌ করিয়া উঠিল। হা ঠাকুর, আমার প্রার্থনা শুনিলে না। আমার স্বামীর পতন হইল।

হেমাঙ্গিনী মাথা নিচু করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "দিদি, তোমার আশীর্বাদ লইতে আসিয়াছি।"

প্রথম একমুহূর্ত কাঠের মতো হইয়া পরক্ষণেই উঠিয়া বসিলাম; কহিলাম, "কেন আশীর্বাদ করিব না, বোন। তোমার কী অপরাধ।"

হেমাঙ্গিনী তাহার সুমিষ্ট উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল; কহিল, "অপরাধ! তুমি বিবাহ করিলে অপরাধ হয় না, আর আমি করিলেই অপরাধ?"

হেমাঙ্গিনীকে জড়াইয়া ধরিয়া আমিও হাসিলাম। মনে মনে কহিলাম, জগতে আমার প্রার্থনাই কি চূড়ান্ত। তাঁহার ইচ্ছাই কি শেষ নহে। যে আঘাত পড়িয়াছে

সে আমার মাথার উপরেই পড়ুক, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে যেখানে আমার ধর্ম, আমার বিশ্বাস আছে, সেখানে পড়িতে দিব না। আমি যেমন ছিলাম তেমনি থাকিব।

হেমাঙ্গিনী আমার পায়ের কাছে পড়িয়া আমার পায়ের ধুলা লইল। আমি কহিলাম, "তুমি চিরসৌভাগ্যবতী, চিরসুখিনী হও।"

হেমাঙ্গিনী কহিল, "কেবল আশীর্বাদ নয়, তোমার সতীর হস্তে আমাকে এবং তোমার ভগ্নীপতিকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। তুমি তাঁহাকে লজ্জা করিলে চলিবে না। যদি অনুমতি কর তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া আসি।"

আমি কহিলাম, "আনো।"

কিছুক্ষণ পরে আমার ঘরে নূতন পদশব্দ প্রবেশ করিল। সস্নেহ প্রশ্ন শুনিলাম, "ভালো আছিস, কুমু?"

আমি ত্রস্ত বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া কহিলাম, "দাদা!"

হেমাঙ্গিনী কহিল, "দাদা কিসের। কান মলিয়া দাও, ও তোমার ছোটো ভগ্নীপতি।"

তখন সমস্ত বুঝিলাম। আমি জানিতাম, দাদার প্রতিজ্ঞা ছিল বিবাহ করিবেন না; মা নাই, তাঁহাকে অনুনয় করিয়া বিবাহ করাইবার কেহ ছিল না। এবার আমিই তাঁহার বিবাহ দিলাম। দুই চক্ষু বাহিয়া হুহু করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, কিছুতেই থামাইতে পারি না। দাদা ধীরে ধীরে আমার চুলের মধ্যে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন; হেমাঙ্গিনী আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কেবল হাসিতে লাগিল।

রাত্রে ঘুম হইতেছিল না; আমি উৎকণ্ঠিতচিত্তে স্বামীর প্রত্যাগমন প্রত্যাশা করিতেছিলাম। লজ্জা এবং নৈরাশ্য তিনি কিরূপভাবে সম্বরণ করিবেন, তাহা আমি স্থির করিতে পারিতেছিলাম না।

অনেক রাত্রে অতি ধীরে দ্বার খুলিল। আমি চমকিয়া উঠিয়া বসিলাম। আমার স্বামীর পদশব্দ। বক্ষের মধ্যে হৃৎপিণ্ড আছাড় খাইতে লাগিল।

তিনি বিছানার মধ্যে আসিয়া আমার হাত ধরিয়া কহিলেন, "তোমার দাদা আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। আমি ক্ষণকালের মোহে পড়িয়া মরিতে যাইতেছিলাম। সে দিন আমি যখন নৌকায় উঠিয়াছিলাম, আমার বুকের মধ্যে যে কী পাথর চাপিয়াছিল তাহা অন্তর্যামী জানেন; যখন নদীর মধ্যে ঝড়ে পড়িয়াছিলাম তখন প্রাণের ভয়ও হইতেছিল, সেই সঙ্গে ভাবিতেছিলাম, যদি ডুবিয়া যাই তাহা হইলেই আমার উদ্ধার হয়। মথুরগঞ্জে পৌঁছিয়া শুনিলাম, তাহার পূর্বদিনেই তোমার দাদার সঙ্গে হেমাঙ্গিনীর

বিবাহ হইয়া গেছে। কী লজ্জায় এবং কী আনন্দে নৌকায় ফিরিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। এই কয়দিনে আমি নিশ্চয় করিয়া বুঝিয়াছি, তোমাকে ছাড়িয়া আমার কোনো সুখ নাই। তুমি আমার দেবী।"

আমি হাসিয়া কহিলাম, "না, আমার দেবী হইয়া কাজ নাই, আমি তোমার ঘরের গৃহিণী, আমি সামান্য নারী মাত্র।"

স্বামী কহিলেন, "আমারও একটা অনুরোধ তোমাকে রাখিতে হইবে। আমাকে আর দেবতা বলিয়া কখনো অপ্রতিভ করিয়ো না।"

পরদিন হুলুরব ও শঙ্খধ্বনিতে পাড়া মাতিয়া উঠিল। হেমাঙ্গিনী আমার স্বামীকে আহারে উপবেশনে প্রভাতে রাত্রে, নানা প্রকারে পরিহাস করিতে লাগিল; নির্যাতনের আর সীমা রহিল না, কিন্তু তিনি কোথায় গিয়াছিলেন, কী ঘটিয়াছিল, কেহ তাহার লেশমাত্র উল্লেখ করিল না।

পৌষ ১৩০৫

প্রবন্ধ

ছন্দ

বিজ্ঞপ্তি

বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে যতকিছু আলোচনা করেছি এই গ্রন্থে প্রকাশ করা হল। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে আমার কিছু বাদপ্রতিবাদ হয়েছে, তাঁদের তর্কের উত্তর এই গ্রন্থের অন্তর্গত করেছি। এই উপলক্ষে বলা আবশ্যক, তাঁদের সঙ্গে আমার কিছু কিছু মতভেদ সত্ত্বেও ছন্দের বিচারে তাঁদের প্রবীণতা আমি শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্বীকার করে থাকি। ইতি ২০ আষাঢ় ১৩৪৩

শান্তিনিকেতন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উৎসর্গ

কল্যাণীয়

শ্রীমান দিলীপকুমার রায়কে

ছন্দ

ছন্দের অর্থ

শুধু কথা যখন খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে তখন কেবলমাত্র অর্থকে প্রকাশ করে। কিন্তু সেই কথাকে যখন তির্যক্ ভঙ্গি ও বিশেষ গতি দেওয়া যায় তখন সে আপন অর্থের চেয়ে আরো কিছু বেশি প্রকাশ করে। সেই বেশিটুকু যে কী তা বলাই শক্ত। কেননা তা কথার অতীত, সুতরাং অনির্বচনীয়। যা আমরা দেখছি শুনছি জানছি তার সঙ্গে যখন অনির্বচনীয়ের যোগ হয় তখন তাকেই আমরা বলি রস। অর্থাৎ সে জিনিসটাকে অনুভব করা যায়, ব্যাখ্যা করা যায় না। সকলে জানেন, এই রসই হচ্ছে কাব্যের বিষয়।

এইখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার, অনির্বচনীয় শব্দটার মানে অভাবনীয় নয়। তা যদি হত তা হলে ওটা কাব্যে অকাব্যে কুকাব্যে কোথাও কোনো কাজে লাগত না। বস্তু-পদার্থের সংজ্ঞা নির্ণয় করা যায় কিন্তু রস-পদার্থের করা যায় না। অথচ রস আমাদের একান্ত অনুভূতির বিষয়। গোলাপকে আমরা বস্তুরূপে জানি, আর গোলাপকে আমরা রসরূপে পাই। এর মধ্যে বস্তু-জানাকে আমরা সাদা কথায় তার আকার আয়তন ভার কোমলতা প্রভৃতি বহুবিধ পরিচয়ের দ্বারা ব্যাখ্যা করতে পারি, কিন্তু রস-পাওয়া এমন একটি অখণ্ড ব্যাপার যে তাকে তেমন করে সাদা কথায় বর্ণনা করা যায় না; কিন্তু তাই বলেই সেটা অলৌকিক অদ্ভুত অসামান্য কিছুই নয়। বরঞ্চ রসের অনুভূতি বস্তুজ্ঞানের চেয়ে আরো নিকটতর প্রবলতর গভীরতর। এইজন্য গোলাপের আনন্দকে আমরা যখন অন্যের মনে সঞ্চার করতে চাই তখন একটা সাধারণ অভিজ্ঞতার রাস্তা দিয়েই করে থাকি। তফাত এই বস্তু-অভিজ্ঞতার ভাষা সাদা কথায় বিশেষণ, কিন্তু রস-অভিজ্ঞতার ভাষা আকার ইঙ্গিত সুর এবং রূপক। পুরুষমানুষের যে পরিচয়ে তিনি আপিসের বড়োবাবু সেটা আপিসের খাতাপত্র দেখলেই জানা যায়, কিন্তু মেয়ের যে পরিচয়ে তিনি গৃহলক্ষ্মী সেটা প্রকাশের জন্যে তাঁর সিঁথের সিঁদুর, তাঁর হাতে কঙ্কণ। অর্থাৎ, এটার মধ্যে রূপক চাই, অলংকার চাই, কেননা কেবলমাত্র তথ্যের চেয়ে এ যে

বেশি ; এর পরিচয় শুধু জ্ঞানে নয়, হৃদয়ে। ওই যে গৃহলক্ষ্মীকে লক্ষ্মী বলা গেল এইটেই তো হল একটা কথার ইশারামাত্র ; অথচ আপিসের বড়োবাবুকে তো আমাদের কেরানি-নারায়ণ বলবার ইচ্ছাও হয় না, যদিও ধর্মতত্ত্বে বলে থাকে সকল নরের মধ্যেই নারায়ণের আবির্ভাব আছে। তা হলেই বোঝা যাচ্ছে, আপিসের বড়োবাবুর মধ্যে অনির্বচনীয়তা নেই। কিন্তু যেখানে তাঁর গৃহিণী সাধ্বী সেখানে তাঁর মধ্যে আছে। তাই বলে এমন কথা বলা যায় না যে, ওই বাবুটিকেই আমরা সম্পূর্ণ বুঝি আর মা-লক্ষ্মীকে বুঝি নে, বরঞ্চ উলটো। কেবল কথা এই যে, বোঝবার বেলায় মা-লক্ষ্মী যত সহজ বোঝাবার বেলায় তত নয়।

'কেবা শুনাইল শ্যামনাম'। ব্যাপারটা ঘটনা হিসাবে সহজ। কোনো এক ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে তৃতীয় ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করেছে। এমন কাণ্ড দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার ঘটে। এইটুকু বলবার জন্যে কথাকে বেশি নাড়া দেবার দরকার হয় না। কিন্তু নাম কানের ভিতর দিয়ে যখন মরমে গিয়ে পশে, অর্থাৎ এমন জায়গায় কাজ করতে থাকে যে জায়গা দেখা-শোনার অতীত, এবং এমন কাজ করতে থাকে যাকে মাপা যায় না, ওজন করা যায় না, চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে যার সাক্ষ্য নেওয়া যায় না, তখন কথাগুলোকে নাড়া দিয়ে তাদের পুরো অর্থের চেয়ে তাদের কাছ থেকে আরো অনেক বেশি আদায় করে নিতে হয়। অর্থাৎ, আবেগকে প্রকাশ করতে গেলে কথার মধ্যে সেই আবেগের ধর্ম সঞ্চার করতে হয়। আবেগের ধর্ম হচ্ছে বেগ। কথা যখন সেই বেগ গ্রহণ করে তখনই আমাদের হৃদয়ভাবের সঙ্গে তার মিল ঘটে।

এই বেগের কত বৈচিত্র্যই যে আছে তার ঠিকানা নেই। এই বেগের বৈচিত্র্যেই তো আলোকের রঙ বদল হচ্ছে, শব্দের সুর বদল হচ্ছে, এবং লীলাময়ী সৃষ্টি রূপ থেকে রূপান্তর গ্রহণ করছে। এমন-কি সৃষ্টির বাইরের পর্দা সরিয়ে ভিতরের রহস্যনিকেতনে যতই প্রবেশ করা যায় ততই বস্তুত্ব ঘুচে গিয়ে কেবল বেগই প্রকাশ পেতে থাকে। শেষকালে এই কথাই মনে হয়, প্রকাশবৈচিত্র্যের মূলে বুঝি এই বেগবৈচিত্র্য। যদিদং সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।

মানুষের সত্তার মধ্যে এই অনুভূতিলোকই হচ্ছে সেই রহস্যলোক যেখানে বাহিরের রূপজগতের সমস্ত বেগ অন্তরে আবেগ হয়ে উঠছে, এবং সেই অন্তরের আবেগ আবার বাহিরে রূপ গ্রহণ করবার জন্যে উৎসুক হচ্ছে। এইজন্যে বাক্য যখন আমাদের অনুভূতিলোকের বাহনের কাজে ভর্তি হয় তখন তার গতি না হলে চলে না। সে তার অর্থের দ্বারা বাহিরের ঘটনাকে ব্যক্ত করে, গতির দ্বারা অন্তরের গতিকে প্রকাশ করে।

শ্যামের নাম রাধা শুনেছে। ঘটনাটা শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু যে-একটা অদৃশ্য বেগ জন্মালো তার আর শেষ নেই। আসল ব্যাপারটাই হল তাই। সেইজন্যে কবি ছন্দের ঝংকারের মধ্যে এই কথাটাকে দুলিয়ে দিলেন। যতক্ষণ ছন্দ থাকবে ততক্ষণ এই দোলা আর থামবে না। 'সই, কেবা শুনাইল শ্যামনাম'। কেবলই ঢেউ উঠতে লাগল। ওই কটি কথা ছাপার অক্ষরে যদিও ভালোমানুষের মতো দাঁড়িয়ে থাকার ভান করে, কিন্তু ওদের অন্তরের স্পন্দন আর কোনোদিনই শান্ত হবে না। ওরা অস্থির হয়েছে, এবং অস্থির করাই ওদের কাজ।

আমাদের পুরাণে ছন্দের উৎপত্তির কথা যা বলেছে তা সবাই জানেন। দুটি পাখির মধ্যে একটিকে যখন ব্যাধ মারলে তখন বাল্মীকি মনে যে ব্যথা পেলেন সেই ব্যথাকে শ্লোক দিয়ে না জানিয়ে তাঁর উপায় ছিল না। যে পাখিটা মারা গেল এবং আর যে একটি পাখি তার জন্যে কাঁদল তারা কোন্‌কালে লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এই নিদারুণতার ব্যথাটিকে তো কেবল কালের মাপকাঠি দিয়ে মাপা যায় না। সে-যে অনন্তের বুকে বেজে রইল। সেইজন্যে কবির শাপ ছন্দের বাহনকে নিয়ে কাল থেকে কালান্তরে ছুটতে চাইলে। হায় রে, আজও সেই ব্যাধ নানা অস্ত্র হাতে নানা বীভৎসতার মধ্যে নানা দেশে নানা আকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু সেই আদিকবির শাপ শাশ্বতকালের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে রইল। এই শাশ্বতকালের কথাকে প্রকাশ করবার জন্যেই তো ছন্দ।

আমরা ভাষায় বলে থাকি, কথাকে ছন্দে বাঁধা। কিন্তু এ কেবল বাইরে বাঁধন, অন্তরে মুক্তি। কথাকে তার জড়ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই ছন্দ। সেতারের তার বাঁধা থাকে বটে কিন্তু তার থেকে সুর পায় ছাড়া। ছন্দ হচ্ছে সেই তার-বাঁধা সেতার, কথার অন্তরের সুরকে সে ছাড়া দিতে থাকে। ধনুকের সে ছিলা, কথাকে সে তীরের মতো লক্ষ্যের মর্মের মধ্যে প্রক্ষেপ করে।

গোড়াতেই ছন্দ সম্বন্ধে এতখানি ওকালতি করা হয়তো বাহুল্য বলে অনেকের মনে হতে পারে। কিন্তু আমি জানি, এমন লোক আছেন যাঁরা ছন্দকে সাহিত্যের একটা কৃত্রিম প্রথা বলে মনে করেন। তাই আমাকে এই গোড়ার কথাটা বুঝিয়ে বলতে হল যে পৃথিবী ঠিক চব্বিশ ঘণ্টার ঘূর্ণিলয়ে তিনশো পঁয়ষট্টি মাত্রার ছন্দে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, সেও যেমন কৃত্রিম নয়, ভাবাবেগ তেমনি ছন্দকে আশ্রয় করে আপন গতিকে প্রকাশ করবার যে চেষ্টা করে সেও তেমনি কৃত্রিম নয়।

এইখানে কাব্যের সঙ্গে গানের তুলনা করে আলোচ্য বিষয়টাকে পরিষ্কার করবার চেষ্টা করা যাক।

সুর পদার্থটাই একটা বেগ। সে আপনার মধ্যে আপনি স্পন্দিত হচ্ছে। কথা যেমন অর্থের মোক্তারি করবার জন্যে, সুর তেমন নয়, সে আপনাকে আপনিই প্রকাশ করে। বিশেষ সুরের সঙ্গে বিশেষ সুরের সংযোগে ধ্বনিবেগের একটা সমবায় উৎপন্ন হয়। তাল সেই সমবেত বেগটাকে গতিদান করে। ধ্বনির এই গতিবেগে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে গতি সঞ্চার করে সে একটা বিশুদ্ধ আবেগ মাত্র, তার যেন কোনো অবলম্বন নেই। সাধারণত সংসারে আমরা কতকগুলি বিশেষ ঘটনা আশ্রয় করে সুখে দুঃখে বিচলিত হই। সেই ঘটনা সত্যও হতে পারে, কাল্পনিকও হতে পারে অর্থাৎ আমাদের কাছে সত্যের মতো প্রতিভাত হতে পারে। তারই আঘাতে আমাদের চেতনা নানা রকমে নাড়া পায়, সেই নাড়ার প্রকারভেদে আমাদের আবেগের প্রকৃতি-ভেদ ঘটে। কিন্তু গানের সুরে আমাদের চেতনাকে যে নাড়া দেয় সে কোনো ঘটনার উপলক্ষ দিয়ে নয়, সে একেবারে অব্যবহিত ভাবে। সুতরাং তাতে যে আবেগ উৎপন্ন হয় সে অহৈতুক আবেগ। তাতে আমাদের চিত্ত নিজের স্পন্দনবেগেই নিজেকে জানে, বাইরের সঙ্গে কোনো ব্যবহারের যোগে নয়।

সংসারে আমাদের জীবনে যে-সব ঘটনা ঘটে তার সঙ্গে নানা দায় জড়ানো আছে। জৈবিক দায়, বৈষয়িক দায়, সামাজিক দায়, নৈতিক দায়। তার জন্যে নানা চিন্তায় নানা কাজে আমাদের চিত্তকে বাইরে বিক্ষিপ্ত করতে হয়। শিল্পকলায়, কাব্যে এবং রসসাহিত্যমাত্রেই আমাদের চিত্তকে সেই-সমস্ত দায় থেকে মুক্তি দেয়। তখন আমাদের চিত্ত সুখদুঃখের মধ্যে আপনারই বিশুদ্ধ প্রকাশ দেখতে পায়। সেই প্রকাশই আনন্দ। এই প্রকাশকে আমরা চিরন্তন বলি এইজন্যে যে, বাইরের ঘটনাগুলি সংসারের জাল বুনতে বুনতে, নানা প্রয়োজন সাধন করতে করতে, সরে যায়, চলে যায়— তাদের নিজের মধ্যে নিজের কোনো চরম মূল্য নেই। কিন্তু আমাদের চিত্তের যে আত্মপ্রকাশ তার আপনাতেই আপনার চরম, তার মূল্য তার আপনার মধ্যেই পর্যাপ্ত। তমসাতীরে ক্রৌঞ্চবিরহিণীর দুঃখ কোনোখানেই নেই, কিন্তু আমাদের চিত্তের আত্মানুভূতির মধ্যে সেই বেদনার তার বাঁধা হয়েই আছে। সে ঘটনা এখন ঘটছে না, বা সে ঘটনা কোনোকালেই ঘটে নি, এ কথা তার কাছে প্রমাণ করে কোনো লাভ নেই।

যা হোক, দেখা যাচ্ছে গানের স্পন্দন আমাদের চিত্তের মধ্যে যে আবেগ জন্মিয়ে দেয় সে কোনো সাংসারিক ঘটনামূলক আবেগ নয়। তাই মনে হয়, সৃষ্টির গভীরতার মধ্যে যে একটি বিশ্বব্যাপী প্রাণকম্পন চলছে, গান শুনে সেইটেরই বেদনাবেগ যেন আমরা চিত্তের মধ্যে অনুভব করি। ভৈরবী যেন সমস্ত সৃষ্টির অন্তরতম বিরহব্যাকুলতা,

দেশমল্লার যেন অভ্রংলিহ শৈলশৃঙ্গের ভিতর দিয়ে বহু বৎসর ধরে প্রবাহিত গঙ্গোত্রীর কোন্ আদিনির্ঝরের কলকল্লোল। এতে করে আমাদের চেতনা দেশকালের সীমা পার হয়ে নিজের চঞ্চল প্রাণধারাকে বিরাটের মধ্যে উপলব্ধি করে।

কাব্যেও আমরা আমাদের চিত্তের এই আত্মানুভূতিকে বিশুদ্ধ এবং মুক্তভাবে অথচ বিচিত্র আকারে পেতে চাই। কিন্তু কাব্যের প্রধান উপকরণ হল কথা। সে তো সুরের মতো স্বপ্রকাশ নয়। কথা অর্থকে জানাচ্ছে। অতএব কাব্যে এই অর্থকে নিয়ে কারবার করতেই হবে। তাই গোড়ায় দরকার, এই অর্থটা যেন রসমূলক হয়। অর্থাৎ, সেটা এমন কিছু হয় যা স্বতই আমাদের মনে স্পন্দন সঞ্চার করে, যাকে আমরা বলি আবেগ।

কিন্তু যেহেতু কথা জিনিসটা স্বপ্রকাশ নয়, এইজন্যে সুরের মতো কথার সঙ্গে আমাদের চিত্তের সাধর্ম্য নেই। আমাদের চিত্ত বেগবান্, কিন্তু কথা স্থির। এ প্রবন্ধের আরম্ভেই আমরা এই বিষয়টার আলোচনা করেছি। বলেছি, কথাকে বেগ দিয়ে আমাদের চিত্তের সামগ্রী করে তোলবার জন্যে ছন্দের দরকার। এই ছন্দের বাহন-যোগে কথা কেবল যে দ্রুত আমাদের চিত্তে প্রবেশ করে তা নয়, তার স্পন্দনে নিজের স্পন্দন যোগ করে দেয়।

এই স্পন্দনের যোগে শব্দের অর্থ যে কী অপরূপতা লাভ করে তা আগে থাকতে হিসাব করে বলা যায় না। সেইজন্যে কাব্যরচনা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। তার বিষয়টা কবির মনে বাঁধা, কিন্তু কাব্যের লক্ষ্য হচ্ছে বিষয়কে অতিক্রম করা; সেই বিষয়ের চেয়ে বেশিটুকুই হচ্ছে অনির্বচনীয়। ছন্দের গতি কথার মধ্য থেকে সেই অনির্বচনীয়কে জাগিয়ে তোলে।

রজনী শাঙনঘন, ঘন দেয়া-গরজন,
রিমিঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে, বিগলিত চীর অঙ্গে,
নিন্দ যাই মনের হরিষে।

বাদলার রাত্রে একটি মেয়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে, বিষয়টা এইমাত্র কিন্তু ছন্দ এই বিষয়টিকে আমাদের মনে কাঁপিয়ে তুলতেই এই মেয়ের ঘুমোনো ব্যাপারটি যেন নিত্যকালকে আশ্রয় করে একটি পরম ব্যাপার হয়ে উঠল— এমন-কি, জর্মন কাইজার আজ যে চার বছর ধরে এমন দুর্দান্ত প্রতাপে লড়াই করছে সেও এর তুলনায় তুচ্ছ এবং অনিত্য। ওই লড়াইয়ের তথ্যটাকে একদিন বহুকষ্টে ইতিহাসের বই থেকে মুখস্থ করে ছেলেদের এক্‌জামিন পাস করতে হবে; কিন্তু 'পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে, বিগলিত চীর

অন্দে, নিন্দ যাই মনের হরিষে', এ পড়া-মুখস্থ করার জিনিস নয়। এ আমরা আপনার প্রাণের মধ্যে দেখতে পাব, এবং যা দেখব সেটা একটি মেয়ের বিছানায় শুয়ে ঘুমোনোর চেয়ে অনেক বেশি। এই কথাটাকেই আর-এক ছন্দে লিখলে বিষয়টা ঠিকই থাকবে, কিন্তু বিষয়ের চেয়ে বেশি যেটা তার অনেকখানি বদল হবে।

শ্রাবণমেঘে তিমিরঘন শর্বরী,
বরিষে জল কাননতল মর্মরি।
জলদরব-ঝংকারিত ঝঞ্ঝাতে
বিজন ঘরে ছিলাম সুখ-তন্দ্রাতে,
অলস মম শিথিল তনু-বল্লরী।
মুখর শিখী শিখরে ফিরে সঞ্চরি॥

এই ছন্দে হয়তো বাইরের ঝড়ের দোলা কিছু আছে কিন্তু মেয়েটির ভিতরের গভীর কথা ফুটল না। এ আর-এক জিনিস হল।

ছন্দ কবিতার বিষয়টির চার দিকে আবর্তন করছে। পাতা যেমন গাছের ডাঁটার চার দিকে ঘুরে ঘুরে তাল রেখে ওঠে এও সেইরকম। গাছের বস্তু-পদার্থ তার ডালের মধ্যে, গুঁড়ির মধ্যে, মজ্জাগত হয়ে রয়েছে; কিন্তু তার লাবণ্য, তার চাঞ্চল্য, বাতাসের সঙ্গে তার আলাপ, আকাশের সঙ্গে তার চাউনির বদল, এ সমস্ত প্রধানত তার পাতার ছন্দে।

পৃথিবীর আহ্নিক এবং বার্ষিক গতির মতো কাব্যে ছন্দের আবর্তনের দুটি অঙ্গ আছে, একটি বড়ো গতি, আর-একটি ছোটো গতি। অর্থাৎ চাল এবং চলন। প্রদক্ষিণ এবং পদক্ষেপ। দৃষ্টান্ত দেখাই।

শারদ চন্দ্র পবন মন্দ, বিপিন ভরল কুসুমগন্ধ।

এরই প্রত্যেকটি হল চলন। এমন আটটি চলনে এই ছন্দের চাল সারা হচ্ছে। অর্থাৎ, ছয়ের মাত্রায় এ পা ফেলছে এবং আটের মাত্রায় ঘুরে আসছে। 'শারদ চন্দ্র' এই কথাটি ছয় মাত্রার, 'শারদ' তিন এবং 'চন্দ্র'ও তিন। বলা বাহুল্য, যুক্ত অক্ষরে দুই অক্ষরের মাত্রা আছে, এই কারণে 'শারদ চন্দ্র' এবং 'বিপিন ভরল' ওজনে একই।

১	২	৩	৪
শারদ চন্দ্র	পবন মন্দ,	বিপিন ভরল	কুসুমগন্ধ,
৫	৬	৭	৮
ফুল্ল মল্লি	মালতি যূথি	মত্তমধুপ-	ভোরনী।

প্রদক্ষিণের মাত্রার চেয়ে পদক্ষেপের মাত্রার 'পরেই ছন্দের বিশেষত্ব বেশি নির্ভর

করছে। কেননা এই আট পদক্ষেপের আবর্তন সকল ছন্দেই চলে। বস্তুত এইটেই হচ্ছে অধিকাংশ ছন্দের চলিত কায়দা। যথা—

১ ২ ৩ ৪
মহাভার- তের কথা অমৃত স- মান,
৫ ৬ ৭ ৮
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্য- বান্।

এও আট পদক্ষেপ।

এই জাত নির্ণয় করতে হলে চালের দিকে ততটা নয় কিন্তু চলনের দিকেই দৃষ্টি দিতে হবে। দিলে দেখা যাবে, ছন্দকে মোটের উপর তিন জাতে ভাগ করা যায়। সমচলনের ছন্দ, অসমচলনের ছন্দ এবং বিষমচলনের ছন্দ। দুই মাত্রার চলনকে বলি সমমাত্রার চলন, তিন মাত্রার চলনকে বলি অসমমাত্রার চলন এবং দুই-তিনের মিলিত মাত্রার চলনকে বলি বিষমমাত্রার ছন্দ।

ফিরে ফিরে আঁখি- নীরে পিছু পানে চায়।
পায়ে পায়ে বাধা প'ড়ে চলা হল দায়।

এ হল দুই মাত্রার চলন। দুইয়ের গুণফল চার বা আটকেও আমরা এক জাতিরই গণ্য করি।

নয়ন- ধারায় পথ সে হারায়, চায় সে পিছন পানে,
চলিতে চলিতে চরণ চলে না, ব্যথার বিষম টানে।

এ হল তিন মাত্রার চলন। আর—

যতই চলে চোখের জলে নয়ন ভ'রে ওঠে,
চরণ বাধে, পরান কাঁদে, পিছনে মন ছোটে।

এ হল দুই-তিনের যোগে বিষমমাত্রার ছন্দ।

তা হলেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, চলনের ভেদেই ছন্দের প্রকৃতি-ভেদ।

বৈষ্ণবপদাবলীতে বাংলাসাহিত্যে ছন্দের প্রথম ঢেউ ওঠে। কিন্তু দেখা যায়, তার লীলাবৈচিত্র্য সংস্কৃত ছন্দের দীর্ঘহ্রস্ব মাত্রা অবলম্বন করেই প্রধানত প্রকাশ পেয়েছে। প্রাকৃত বাংলায় যত কবিতা আছে তার ছন্দসংখ্যা বেশি নয়। সমমাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত—

কেন তোরে আনমন দেখি।
কাহে নখে ক্ষিতিতল লেখি।

এ ছাড়া পয়ার এবং ত্রিপদী আছে, সেও সমমাত্রার ছন্দ। অসমমাত্রার অর্থাৎ তিনের ছন্দ চার রকমের পাওয়া যায়—

মলিন বদন ভেল,
ধীরে ধীরে চলি গেল।
আওল রাইর পাশ।
কি কহিব জ্ঞান- দাস॥ ১॥

জাগিয়া জাগিয়া হইল খীন
অসিত চাঁদের উদয়দিন॥ ২॥

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ন- তারা।
বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে
যেমত যোগিনী- পারা॥ ৩॥

বেলি অবসান- কালে
কবে গিয়াছিলা জলে।
তাহারে দেখিয়া ইষত হাসিয়া
ধরিলি সখীর গলে॥ ৪॥

বিষমমাত্রার দৃষ্টান্ত কেবল একটা চোখে পড়েছে, সেও কেবল গানের আরম্ভে— শেষ পর্যন্ত টেকে নি।

চিকনকালা, গলায় মালা,
বাজন নূপুর পায়।
চূড়ার ফুলে ভ্রমর বুলে,
তেরছ নয়ানে চায়॥

বাংলায় সমমাত্রার ছন্দের মধ্যে পয়ার এবং ত্রিপদীই সবচেয়ে প্রচলিত। এই দুটি ছন্দের বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, এদের চলন খুব লম্বা। এদের প্রত্যেক পদক্ষেপে আট মাত্রা। এই আট মাত্রার মোট ওজন রেখে পাঠক এর মাত্রাগুলিকে অনেকটা ইচ্ছামত চালাচালি করতে পারেন।

পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে।

এর মধ্যে যে কতটা ফাঁক আছে তা যুক্তাক্ষর বসালেই টের পাওয়া যায়।

পাষাণ মূর্ছিয়া যায় গায়ের বাতাসে।

ভারী হল না।

পাষাণ মূর্ছিয়া যায় অঙ্গের বাতাসে।

এতেও বিশেষ ভিড় বাড়ল না।

পাষাণ মূর্ছিয়া যায় অঙ্গের উচ্ছ্বাসে।

এও বেশ সহ্য হয়।

সংগীত তরঙ্গি উঠে অঙ্গের উচ্ছ্বাসে।

এতেও অত্যন্ত ঠেসাঠেসি হল না।

সংগীততরঙ্গরঙ্গ অঙ্গের উচ্ছ্বাস।

অনুপ্রাসের ভিড় হল বটে কিন্তু এখনো অন্ধকূপহত্যা হবার মতো হয় নি। কিন্তু এর বেশি আর সাহস হয় না। তবু যদি আরো প্যাসেঞ্জার নেওয়া যায় তা হলে যে একেবারে পয়ারের নৌকাডুবি হবে তা নয়, তবে কিনা হাঁপ ধরবে। যথা—

দুর্দান্তপাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত।

কিন্তু দুই মাত্রার ছন্দ মাত্রেরই যে এইরকম অসাধারণ শোষণশক্তি তা বলতে পারি নে। যেখানে পদক্ষেপ ঘন ঘন সেখানে ঠিক উলটো। যথা—

২ ২	২ ২	২ ২	২
ধরণীর	আঁখিনীর	মোচনের	ছলে
২ ২	২ ২	২ ২	২
দেবতার	অবতার	বসুধার	তলে।

এও পয়ার কিন্তু যেহেতু এর পদক্ষেপ আটে নয়, দুইয়ে, সেইজন্যে এর উপরে বোঝা সয় না। যে দ্রুত চলে তাকে হালকা হতে হয়। যদি লেখা যায়—

ধরিত্রীর চক্ষুনীর মুঞ্চনের ছলে

কংসারির শঙ্খরব সংসারের তলে।

তা হলে ও একটা স্বতন্ত্র ছন্দ হয়ে যায়। সংস্কৃতেও দেখো, সমমাত্রার ছন্দ যেখানে দুয়ের লয়ে চলে সেখানে দৌড় বেশি। যেমন—

২ ২	২ ২	২ ২	২ ২
হরি রিহ	বিহরতি	সর সব	সন্তে।

অসম অর্থাৎ তিন মাত্রার চলনও দ্রুত।

পাষাণ মিলায় গায়ের বাতাসে।

এর লয়টা দুরন্ত। পড়লেই বোঝা যায়, এর প্রত্যেক তিন মাত্রা পরবর্তী তিন মাত্রাকে চাচ্ছে, কিছুতে তর সচ্ছে না। তিনের মাত্রাটা টল্‌টলে, গড়িয়ে যাবার দিকে তার ঝোঁক। এইজন্যে তিনকে গুণ করে ছয় বা বারো করলেও তার চাপল্য ঘোচে না।

দুই মাত্রার চলন ক্ষিপ্র, তিন মাত্রার চঞ্চল, চার মাত্রার মন্থর, আট মাত্রার গম্ভীর। তিন মাত্রার ছন্দে যে পয়ারের মতো ফাঁক নেই তা যুক্তাক্ষর জুড়তে গেলেই ধরা পড়বে। যথা—

গিরির গুহায় ঝরিছে নিঝর

এই পদটিকে যদি লেখা যায়

পর্বত- কন্দরে ঝরিছে নির্ঝর

তা হলে ছন্দের পক্ষে সাংঘাতিক হয়। অথচ পয়ারে

গিরিগুহাতল বেয়ে ঝরিছে নিঝর

এবং

পর্বতকন্দরতলে ঝরিছে নির্ঝর

ছন্দের পক্ষে দুই-ই সমান।

বিষমমাত্রার ছন্দের স্বভাব হচ্ছে, তার প্রত্যেক পদে এক অংশে গতি, আর-এক অংশে বাধা। এই গতি এবং বাধার সম্মিলনে তার নৃত্য।

অহহ কল- য়ামি বল- য়াদিমণি- ভূষণং
হরিবিরহ- দহনবহ- নেন বহু- দূষণং।

তিন মাত্রার 'অহহ' যে ছাঁদে চলবার জন্যে বেগ সঞ্চয় করলে, দুই মাত্রার 'কল' তাকে হঠাৎ টেনে থামিয়ে দিলে, আবার পরক্ষণেই তিন যেই নিজমূর্তি ধরলে অমনি আবার দুই এসে তার লাগামে টান দিলে। এই বাধা যদি সত্যকার বাধা হত তা হলে ছন্দই হত না; এ কেবল বাধার ছল, এতে গতিকে আরো উস্‌কিয়ে দেয় এবং বিচিত্র করে তোলে। এইজন্যে অন্য ছন্দের চেয়ে বিষমমাত্রার ছন্দে গতিকে আরো যেন বেশি অনুভব করা যায়।

যাই হোক আমার বক্তব্য এই, ছন্দের পরিচয়ের মূলে দুটি প্রশ্ন আছে। এক হচ্ছে, তার প্রত্যেক পদক্ষেপে কটি করে মাত্রা আছে। দুই হচ্ছে, সে মাত্রা সম, অসম, না বিষম অথবা সম-বিষমের যোগ। আমরা যখন মোটা করে বলে থাকি যে, এটা চোদ্দ মাত্রার ছন্দ, বা, ওটা দশ মাত্রার, তখন আসল কথাটাই বলা হয় না। তার কারণ পূর্বেই বলেছি, চাল অর্থাৎ প্রদক্ষিণের মাত্রায় ছন্দকে চেনা যায় না, চলন অর্থাৎ পদক্ষেপের মাত্রায় তার পরিচয়। চোদ্দ মাত্রায় শুধু যে পয়ার হয় না, আরো অনেক ছন্দ হয়, তার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

বসন্ত পাঠায় দূত রহিয়া রহিয়া,
যে কাল গিয়েছে তারি নিশ্বাস বহিয়া।

এই তো পয়ার, এর প্রত্যেক প্রদক্ষিণে দুটি পদক্ষেপ। প্রথম পদক্ষেপে আটটি উচ্চারিত মাত্রা, দ্বিতীয় পদক্ষেপে ছয়টি উচ্চারিত মাত্রা এবং দুটি অনুচ্চারিত অর্থাৎ যতির মাত্রা। অর্থাৎ, প্রত্যেক প্রদক্ষিণে মোটের উপর উচ্চারিত মাত্রা চোদ্দ। আমরা পয়ারের পরিচয় দেওয়ার কালে প্রত্যেক প্রদক্ষিণের উচ্চারিত মাত্রার সমষ্টির হিসাব দিয়ে থাকি। তার প্রধান কারণ, কিছুকাল পূর্বে পয়ার ছাড়া চোদ্দ মাত্রা-সমষ্টির ছন্দ আমাদের ব্যবহারে লাগত না। নিম্নলিখিত চোদ্দ মাত্রার ছন্দেও ঠিক পয়ারের মতোই প্রত্যেক প্রদক্ষিণে দুটি করে পদক্ষেপ।

ফাগুন এল দ্বারে কেহ যে ঘরে নাই,
পরান ডাকে কারে ভাবিয়া নাহি পাই।

অথচ এটা মোটেই পয়ার নয়। তফাত হল কিসে যাচাই করে দেখলে দেখা যাবে যে, এর প্রতি পদক্ষেপে আটের বদলে সাত উচ্চারিত মাত্রা। আর অনুচ্চারিত মাত্রা প্রতি পদক্ষেপের শেষে একটি করে দেওয়া যেতে পারে। যেমন—

ফাগুন এল দ্বারে-এ কেহ যে ঘরে না-আ-ই।

কিম্বা কেবল শেষ ছেদে একটি দেওয়া যেতে পারে। যেমন—

ফাগুন এল দ্বারে কেহ যে ঘরে না-আ-ই।

কিম্বা যতি একেবারেই না দেওয়া যেতে পারে।

পুনশ্চ এই ছন্দেরই মাত্রাসমষ্টি সমান রেখে এরই পদক্ষেপমাত্রার পরিবর্তন করে যদি পড়া যায় তা হলে শ্লোকটি চোখে দেখতে একই রকম থাকবে কিন্তু কানে শুনতে অন্যরকম হবে। এইখানে বলে রাখি, ছন্দের প্রত্যেক ভাগে একটা করে তালি দিলে পড়বার সুবিধা হবে এবং এই তালি অনুসারে ভিন্ন ছন্দের ভিন্ন লয় ধরা পড়বে। প্রথমে সাত মাত্রাকে তিন এবং চারে স্বতন্ত্র ভাগ করে পড়া যাক। যেমন—

তালি	তালি	তালি	তালি
ফাগুন	এল দ্বারে	কেহ যে	ঘরে নাই,
পরান	ডাকে কারে	ভাবিয়া	নাহি পাই।

তার পরে পাঁচ-দুই ভাগ করা যাক। যেমন—

তালি	তালি	তালি	তালি
ফাগুন এল	দ্বারে	কেহ যে ঘরে	নাই,
পরান ডাকে	কারে	ভাবিয়া নাহি	পাই।

এই চোদ্দ মাত্রা-সমষ্টির ছন্দ আরো কতরকম হতে পারে তার কতকগুলি নমুনা দেওয়া

যাক। দুই-পাঁচ দুই-পাঁচ ভাগের ছন্দ, যথা[১]—

।   ।   ।   ।
সে যে   আপন মনে   শুধু   দিবস গণে,
তার   চোখের বারি   কাঁপে   আঁখির কোণে।

চার-তিন চার-তিন ভাগ—

।   ।   ।   ।
নয়নের   সলিলে   যে কথাটি   বলিলে
রবে তাহা   স্মরণে   জীবনে ও   মরণে।

কিম্বা এক-ছয় এক-ছয় ভাগ—

।   ।   ।   ।
যে   কথা নাহি শোনে   সে   থাক্ নিজমনে,
কে   বৃথা নিবেদনে   রে   ফিরে তার সনে।

সাত-চার-তিনের ভাগ—

।   ।   ।
চাহিছ বারে বারে   আপনারে   ঢাকিতে,
মন না মানে মানা   মেলে ডানা   আঁখিতে।

এই কবিতাটাকেই অন্য লয়ে পড়া যায়—

।   ।   ।   ।
চাহিছ   বারে বারে   আপনারে   ঢাকিতে,
মন না   মানে মানা   মেলে ডানা   আঁখিতে।

তিন-তিন-তিন-তিন-দুইয়ের ভাগ—

।   ।   ।   ।   ।
ব্যাকুল   বকুল   ঝরিল   পড়িল   ঘাসে,
বাতাস   উদাস   আমের   বোলের   বাসে।

একেই ছয়-আটের ভাগে পড়া যায়—

।   ।
ব্যাকুল বকুল   ঝরিল পড়িল ঘাসে,
বাতাস উদাস   আমের বোলের বাসে।

১ এই প্রত্যেক দণ্ডচিহ্নের অনুসরণ করে তাল দেওয়া আবশ্যক।

পাঁচ-চার-পাঁচের ভাগ—

নীরবে গেলে	ম্লানমুখে	আঁচল টানি
কাঁদিছে দুখে	মোর বুকে	না-বলা বাণী।

এই শ্লোককেই তিন-ছয়-পাঁচ ভাগ করা যায়—

নীরবে	গেলে ম্লানমুখে	আঁচল টানি
কাঁদিছে	দুখে মোর বুকে	না-বলা বাণী।

এর থেকে এই বোঝা যাচ্ছে, প্রদক্ষিণের সমষ্টিমাত্রা চোদ্দ হলেও সেই সমষ্টির অংশের হিসাব কে কী ভাবে নিকাশ করছে তারই উপর ছন্দের প্রভেদ ধরা পড়ে। কেবল ছন্দরসায়নে নয়, বস্তুরসায়নেও এইরকম উপাদানের মাত্রা-ভাগ নিয়েই বস্তুর প্রকৃতিভেদ ঘটে, রাসায়নিকেরা বোধ করি এই কথা বলেন।

পয়ার-ছন্দের বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, তাকে প্রায় গাঁঠে গাঁঠে ভাগ করা চলে, এবং প্রত্যেক ভাগেই মূল ছন্দের একটা আংশিক রূপ দেখা যায়। যথা—

ওহে পান্থ, চলো পথে, পথে বন্ধু আছে
একা বসে ম্লানমুখে, সে যে সঙ্গ যাচে।

'ওহে পান্থ', এইখানে একটা থামবার স্টেশন মেলে। তার পরে যথাক্রমে, 'ওহে পান্থ চলো', 'ওহে পান্থ চলো পথে', 'ওহে পান্থ চলো পথে পথে'। তার পরে 'বন্ধু আছে', এই ভগ্নাংশটার সঙ্গে পরের লাইন জোড়া যায়, যেমন—'বন্ধু আছে একা', 'বন্ধু আছে একা বসে', 'বন্ধু আছে একা বসে সে যে'। কিন্তু তিনের ছন্দকে তার ভাগে ভাগে পাওয়া যায় না, এইজন্যে তিনের ছন্দে ইচ্ছামত থামা চলে না। যেমন, 'নিশি দিল ডুব অরুণসাগরে'। 'নিশি দিল', এখানে থামা যায়, কিন্তু তা হলে তিনের ছন্দ ভেঙে যায়; 'নিশি দিল ডুব' পর্যন্ত এসে ছয় মাত্রা পুরিয়ে দিয়ে তবেই তিনের ছন্দ হাঁফ ছাড়তে পারে। কিন্তু আবার, 'নিশি দিল ডুব অরুণ' এখানেও থামা যায় না; কেননা তিন এমন একটি মাত্রা যা আর একটা তিনকে পেলে তবে দাঁড়াতে পারে, নইলে টলে পড়তে চায়; এইজন্য 'অরুণসাগর' এর মাঝখানে থামতে গেলে রসনা কূল পায় না। তিনের ছন্দে গতির প্রাবল্যই বেশি, স্থিতি কম। সুতরাং তিনের ছন্দ চাঞ্চল্যপ্রকাশের পক্ষে ভালো কিন্তু তাতে গাম্ভীর্য এবং প্রসার অল্প। তিনের মাত্রার ছন্দে অমিত্রাক্ষর রচনা করতে গেলে বিপদে পড়তে হয়, সে যেন চাকা নিয়ে লাঠিখেলার চেষ্টা। পয়ার আট পায়ে চলে বলে তাকে যে কতরকমে চালানো যায় মেঘনাদবধ কাব্যে তার প্রমাণ

আছে। তার অবতারণাটি পরখ করে দেখা যাক। এর প্রত্যেক ভাগে কবি ইচ্ছামত ছোটো বড়ো নানা ওজনের নানা সুর বাজিয়েছেন; কোনো জায়গাতেই পয়ারকে তার প্রচলিত আড্ডায় এসে থামতে দেন নি। প্রথম আরম্ভেই বীরবাহুর বীরমর্যাদা সুগম্ভীর হয়ে বাজল— 'সম্মুখসমরে পড়ি বীরচূড়ামণি বীরবাহু'। তার পরে তার অকালমৃত্যুর সংবাদটি যেন ভাঙা রণপতাকার মতো ভাঙা ছন্দে ভেঙে পড়ল— 'চলি যবে গেলা যমপুরে অকালে'। তার পরে ছন্দ নত হয়ে নমস্কার করলে— 'কহ হে দেবি অমৃতভাষিণি'। তার পরে আসল কথাটা, যেটা সবচেয়ে বড়ো কথা, সমস্ত কাব্যের ঘোর পরিণামের যেটা সূচনা, সেটা যেন আসন্ন ঝটিকার সুদীর্ঘ মেঘগর্জনের মতো এক দিগন্ত থেকে আর-এক দিগন্তে উদ্‌ঘোষিত হল— 'কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতিপদে পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি রাঘবারি'।

বাংলা ভাষায় অধিকাংশ শব্দই দুই মাত্রার এবং তিন মাত্রার, এবং ত্রৈমাত্রিক শব্দের উপর বিভক্তিযোগে চার মাত্রার। পয়ারের পদবিভাগটি এমন যে, দুই, তিন এবং চার মাত্রার শব্দ তাতে সহজেই জায়গা পায়।

চৈত্রের সেতারে বাজে বসন্তবাহার,
বাতাসে বাতাসে ওঠে তরঙ্গ তাহার।

এ পয়ারে তিন অক্ষরের ভিড়। আবার—

চক্‌মকি-ঠোকাঠুকি-আগুনের প্রায়
চোখোচোখি ঘটিতেই হাসি ঠিকরায়।

এই পয়ারে চারের প্রাধান্য।

তারাগুলি সারারাতি কানে কানে কয়,
সেই কথা ফুলে ফুলে ফুটে বনময়।

এইখানে দুই মাত্রার আয়োজন।

প্রেমের অমরাবতী প্রেয়সীর প্রাণে,
কে সেথা দেবাধিপতি সে কথা কে জানে।

এই পয়ারে এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত সকল রকম মাত্রারই সমাবেশ। এর থেকে জানা যায় পয়ারের আতিথেয়তা খুব বেশি, আর সেইজন্যেই বাংলা কাব্যসাহিত্যে প্রথম থেকেই পয়ারের এত অধিক চলন।

পয়ারের চেয়ে লম্বা দৌড়ের সমমাত্রার ছন্দ আজকাল বাংলাকাব্যে চলছে। স্বপ্নপ্রয়াণে এর প্রথম প্রবর্তন দেখা গেছে। স্বপ্নপ্রয়াণ থেকেই তার নমুনা তুলে দেখাই।

গম্ভীর পাতাল, যেথা কালরাত্রি করালবদনা
বিস্তারে একাধিপত্য। শ্বসয়ে অযুত ফণিফণা
দিবানিশি ফাটি রোষে; ঘোরনীল বিবর্ণ অনল
শিখাসংঘ আলোড়িয়া দাপাদাপি করে দেশময়
তমোহন্ত এড়াইতে— প্রাণ যথা কালের কবল।

উচ্চারিত এবং অনুচ্চারিত মাত্রা নিয়ে পয়ার যেমন আট পদমাত্রায় সমান দুই ভাগে বিভক্ত এ তা নয়। এর এক ভাগে উচ্চারিত মাত্রা আট, অন্য ভাগে উচ্চারিত মাত্রা দশ। এইরকম অসমান ভাগে ছন্দের গাম্ভীর্য বাড়ে। ছন্দে পদে পদে ঠিক সমান ওজন দাবি করা কানের যেন একটা বাঁধা মৌতাতের মতো দাঁড়ায়, সেইটি ভেঙে দিলে ছন্দের গৌরব আরো বাড়ে। সংস্কৃত মন্দাক্রান্তার অসমান ভাগের গাম্ভীর্য সবাই জানেন—

কশ্চিৎকান্তা- বিরহগুরুণা স্বাধিকার- প্রমত্তঃ।

এর প্রথম ভাগে আট, দ্বিতীয় ভাগে সাত, তৃতীয় ভাগে সাত, এবং চতুর্থ ভাগে চার[১] মাত্রা। এমনতরো ভাগে কানের কোনো সংকীর্ণ অভ্যাস হবার জো নেই।

সংস্কৃতের সঙ্গে সাধু বাংলা সাহিত্যের ছন্দের যে-একটি বিশেষ প্রভেদ আছে সেইটির কথা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। সংস্কৃত-উচ্চারণের বিশেষত্ব হচ্ছে তার ধ্বনির দীর্ঘহ্রস্বতা। সেইজন্য সংস্কৃতছন্দ কেবলমাত্র পদক্ষেপের মাত্রা গণনা করেই নিশ্চিন্ত থাকে না, নির্দিষ্ট নিয়মে দীর্ঘহ্রস্ব মাত্রাকে সাজানো তার ছন্দের অঙ্গ। আমি একটি বাংলা বই থেকে এর দৃষ্টান্ত তুলছি। বইটির নাম 'ছন্দঃকুসুম'। আর চুয়ান্ন বছর পূর্বের এটি রচনা। লেখক ভুবনমোহন রায়চৌধুরী রাধাকৃষ্ণের লীলাচ্ছলে বাংলা ভাষায় সংস্কৃতছন্দের দৃষ্টান্ত দিয়ে ছন্দ শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেছেন। কৃষ্ণবিরহিণী রাধা কালো রঙটারই দূষণীয়তা প্রমাণ করবার জন্যে যখন কালো কোকিল, কালো ভ্রমর, কালো পাথর, কালো লোহার নিন্দা করলেন তখন অপর পক্ষের উকিল লোহার দোষ ক্ষালন করতে প্রবৃত্ত হলেন।

॥ I I	॥ I I	॥ I I	॥ I I	॥ I I	॥ I I	॥ I I	॥ I I
দেখহ	সুন্দর	লৌহর-	থে চড়ি	লৌহপ-	থে কত	লোক চ-	লে . . ,
ষষ্ঠ মু-	হূর্তক	মধ্য ক-	রে গতি	যোজন	পঞ্চ দ-	শের প-	থে . . ।
লৌহবি-	নির্মিত	তার ত-	রে বহু	দূর অ-	বস্থিত	লোক স-	বে . . ,
দূর অ-	বস্থিত	বন্ধু স-	নে সুখ-	চিত্ত প-	রস্পর	বাক্য ক-	হে . . ॥

১ পাঁচ?

এই কবিতাটির যুক্তি ও আধ্যাত্মিক রসমাধুর্যের বিচারভার আধুনিককালের বস্তুতান্ত্রিক উকিল রসিকদের উপর অর্পণ করা গেল। তা ছাড়া লোকশিক্ষায় এর প্রয়োজনীয়তার তর্ক তোলবার অধিকারীও আমি নই। আমি ছন্দের দিক দিয়ে বলছি, এর প্রত্যেক পদভাগে একটি দীর্ঘ ও দুইটি হ্রস্ব মাত্রা, সেই দীর্ঘহ্রস্বের ওঠাপড়ার পর্যায়ই হচ্ছে এই ছন্দের প্রকৃতি। বাংলায় স্বরের দীর্ঘহ্রস্বতা নাই কিম্বা নাই বললেই হয়, এবং যুক্তব্যঞ্জনকে সাধু বাংলা কোনো গৌরব দেয় না, অযুক্তের সঙ্গে একই বাটখারায় তার ওজন চলে। অতএব মাত্রাসংখ্যা মিলিয়ে ওই লোহার স্তব যদি বাংলা ছন্দে লেখা যায় তা হলে তার দশা হয় এই—

দেখ দেখ মনোহর লোহার গা- ড়িতে চড়ি
লোহাপথে কত শত মানুষ চ- লিছে
দেখিতে দে- খিতে তারা যোজন যো- জন পথ
অনায়াসে তরে যায় টিকিট কি- নিয়া।
যেসব মা- নুষ আছে অনেক দূ- রের দেশে,
লোহা দিয়ে গড়া তার রয়েছে ব- লিয়া,
সুদূর বঁ- ধুর সাথে কত যে ম- নের সুখে
কথা চালা- চালি করে নিমেষে নি- মেষে॥

বাংলায় আর সবই রইল—মাত্রাও রইল, আর সম্ভবত আধ্যাত্মিকতারও হানি হয় নি, কেননা ভক্তির টিকিট থাকলে লোহার গাড়ি যে কঠিন লোহার পথও তরিয়ে দেয় এবং বঁধুর সঙ্গে যতই দূরত্ব থাক্ স্বয়ং লোহার তারে তাদের কথা চালাচালি হতে পারে এ ভাবটা বাংলাতেও প্রকাশ পাচ্ছে—কিন্তু মূল ছন্দের প্রকৃতিটা বাংলায় রক্ষা পায় নি। এ কেমন, যেমন ঢেউ-খেলানো দেশের জমির পরিমাণ সমতল দেশে জরিপের দ্বারা মিলিয়ে নেওয়া। তাতে জমি পাওয়া গেল কিন্তু ঢেউ পাওয়া গেল না। অথচ ঢেউটা ছন্দের একটা প্রধান জিনিস। সমতল বাংলা আপন কাব্যের ভাষাকে সমতল করে দিয়েছে। এ হচ্ছে কাজকে সহজ করবার একটা কৃত্রিম বাঁধা নিয়ম। আমরা যখন বলি থার্ড্‌ক্লাসের ছেলে, তখন মনে ধরে নিই যেন সব ছেলেই সমান মাত্রার। কিন্তু আসলে থার্ড্‌ক্লাসের আদর্শকে যদি একটা সরল রেখা বলে ধরে নিই তবে কোনো ছেলে সেই রেখার উপরে চড়ে কেউ-বা তার নীচে নামে। ভালো শিক্ষাপ্রণালী তাকেই বলে যাতে প্রত্যেক ছেলেকে তার নিজের স্বতন্ত্র বুদ্ধি ও শক্তির মাত্রা অনুসারে ব্যবহার করা যায়, থার্ড্‌ক্লাসের একটা কাল্পনিক মাত্রা ক্লাসের সকল ছেলের উপরে সমানভাবে আরোপ না করা যায়। কিন্তু কাজ

সহজ করবার জন্য বহু অসমানকে এক সমান কাঠগড়ায় বন্দী করবার নিয়ম আছে। সাধু বাংলার ছন্দে তারই প্রমাণ পাই। হলন্ত[১]ই হোক, হসন্তই হোক, আর যুক্তবর্ণই হোক, এই ছন্দে সকলেরই সমান মাত্রা।

অথচ প্রাকৃত-বাংলার প্রকৃতি সমতল নয়। সংস্কৃতের নিয়মে না হোক, নিজের নিয়মে তার একটা ঢেউখেলা আছে। তার কথার সকল অংশ সমান ওজনের নয়। বস্তুত পদে পদেই তার শব্দ বন্ধুর হয়ে ওঠে। তার কারণ, প্রাকৃত-বাংলায় হসন্তের প্রাদুর্ভাব খুব বেশি। এই হসন্তের দ্বারা ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে সংঘাত জন্মাতে থাকে, সেই সংঘাতে ধ্বনি গুরু হয়ে ওঠে। প্রাকৃত-বাংলার এই গুরুধ্বনির প্রতি যদি সদ্‌ব্যবহার করা যায় তা হলে ছন্দের সম্পদ বেড়ে যায়। প্রাকৃত-বাংলার দৃষ্টান্ত—

বৃষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্ নদেয় এল বান্।
শিব্ ঠাকুরের্ বিয়ে হবে তিন্ কন্যে দান্॥
এক্ কন্যে রাঁধেন্ বাড়েন্ এক্ কন্যে খান্।
এক্ কন্যে না পেয়ে বাপের্ বাড়ি যান্॥

এই ছড়াটিতে দুটি জিনিস দেখবার আছে। এক হচ্ছে, বিসর্গের[২] ঘটকালিতে ব্যঞ্জনের সঙ্গে ব্যঞ্জনের সম্মিলন, আর-এক হচ্ছে 'বৃষ্টি' এবং 'কন্যে' কথার যুক্তবর্ণকে যথোচিত মর্যাদা দেওয়া। এই ছড়া সাধু বাংলার ছন্দে বাঁধলে পালিশ-করা আবলুস কাঠের মতো পিছল হয়ে ওঠে।

বারি ঝরে ঝর ঝর নদিয়ায় বান।
শিবুঠাকুরের বিয়ে তিন মেয়ে দান॥
এক মেয়ে রাঁধিছেন এক মেয়ে খান।
এক মেয়ে ক্ষুধাভরে পিতৃঘরে যান॥

এতে যুক্তবর্ণের সংযোগ হলেও ছন্দের উল্লাস তাতে বিশেষ বাড়ে না। যথা—

মন্দ মন্দ বৃষ্টি পড়ে নবদ্বীপে বান।
শিবুঠাকুরের বিয়া তিন কন্যা দান॥
এক কন্যা রান্ধিছেন এক কন্যা খান।
এক কন্যা ঊর্ধ্বশ্বাসে পিতৃগৃহে যান॥

এই-সব যুক্তবর্ণের যোগে এ ছন্দ বন্ধুর হয়ে উঠেছে বটে কিন্তু তরঙ্গিত হয় নি, কেননা যুক্তবর্ণ যথেচ্ছ ছড়ানো হয়েছে মাত্র, তাদের মর্যাদা অনুসারে জায়গা দেওয়া হয় নি।

১ 'স্বরান্ত' অর্থে ব্যবহৃত।

২ স্বর-বিসর্জনের।

অর্থাৎ, হাটের মধ্যে ছোটোয় বড়োয় যেমন গায়ে গায়ে ভিড় করে তেমনি, সভার মধ্যে যেমন তারা যথাযোগ্য আসন পায় তেমন নয়।

ছন্দঃকুসুম বইটির লেখক প্রাকৃত-বাংলার ছন্দ সম্বন্ধে অনুষ্টুভ ছন্দে বিলাপ করে বলছেন—

পাঁচালী নাম বিখ্যাতা সাধারণ-মনোরমা।
পয়ার ত্রিপদী আদি প্রাকৃতে হয় চালনা॥
দ্বিপাদে শ্লোক সংপূর্ণ তুল্যসংখ্যার অক্ষরে।
পাঠে দুই পদে মাত্র শেষাক্ষর সদা মিলে॥
পঠনে সে সব ছন্দঃ রাখিতে তালগৌরব।
পঠিছে সর্বদা লোকে উচ্চারণ-বিপর্যয়ে॥
লঘুকে গুরু সম্ভাষে দীর্ঘবর্ণে কহে লঘু।
হ্রস্বে দীর্ঘে সমজ্ঞানে উচ্চারণ করে সবে॥

কবির এই বিলাপের সঙ্গে আমিও যোগ দিচ্ছি। কেবল আমি এই বলতে চাই, প্রাকৃত বাংলার ছন্দে এমনতরো দুর্ঘটনা ঘটে না, এ-সব ঘটে সংস্কৃত-বাংলার ছন্দে। প্রাকৃত-বাংলার যে স্বকীয় দীর্ঘহ্রস্বতা আছে তার ছন্দে তার বিপর্যয় দেখি নে, কিন্তু সাধু ভাষায় দেখি।

এই প্রাকৃত-বাংলা মেয়েদের ছড়ায়, বাউলের গানে, রামপ্রসাদের পদে আপন স্বভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সাধুসভায় তার সমাদর হয় নি বলে সে মুখ ফুটে নিজের সব কথা বলতে পারে নি এবং তার শক্তি যে কত তারও সম্পূর্ণ পরিচয় হল না। আজকের দিনের ডিমক্রেসির যুগেও সে ভয়ে ভয়ে দ্বিধা করে চলেছে; কোথায় যে তার পংক্তি এবং কোথায় নয় তা স্থির হয় নি। এই সংকোচে তার আত্মপরিচয়ের খর্বতা হচ্ছে। আমরা একটা কথা ভুলে যাই প্রাকৃত-বাংলার লক্ষ্মীর পেট্‌রায় সংস্কৃত, পারসি, ইংরেজি প্রভৃতি নানা ভাষা থেকেই শব্দসঞ্চয় হচ্ছে, সেইজন্যে শব্দের দৈন্য প্রাকৃত-বাংলার স্বভাবগত বলে মনে করা উচিত নয়। প্রয়োজন হলেই আমরা প্রাকৃত-ভাণ্ডারে সংস্কৃত শব্দের আমদানি করতে পারব। কাজেই যেখানে অর্থের বা ধ্বনির প্রয়োজনবশত সংস্কৃত শব্দই সংগত সেখানে প্রাকৃত-বাংলায় তার বাধা নেই। আবার ফার্সি কথাও তার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা একসারে বসিয়ে দিতে পারি। সাধুবাংলায় তার বিঘ্ন আছে, কেননা সেখানে জাতি রক্ষা করাকেই সাধুতা রক্ষা করা বলে। প্রাকৃত ভাষার এই ঔদার্য গদ্যে পদ্যে আমাদের সাহিত্যের একটি পরম সম্পদ, এই কথা মনে রাখতে হবে।

চৈত্র ১৩২৪

ছন্দের হসন্ত হলন্ত[1]

আমার নিজের বিশ্বাস যে, আমরা ছন্দ রচনা করি স্বতই কানের ওজন রেখে, বাজারে প্রচলিত কোনো বাইরের মানদণ্ডের দ্বারা মেপে মেপে এ কাজ করি নে, অন্তত সজ্ঞানে নয়। কিন্তু ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন এই বলে আমাদের দোষ দিয়েছেন যে—আমরা একটা কৃত্রিম মানদণ্ড দিয়ে, পাঠকের কানকে ফাঁকি দিয়ে, তার চোখ ভুলিয়ে এসেছি; আমরা ধ্বনি চুরি করে থাকি অক্ষরের আড়ালে।

ছন্দোবিৎ কী বলছেন ভালো করে বোঝবার চেষ্টা করা যাক। তাঁর প্রবন্ধে আমার লেখা থেকে কিছু লাইন তুলে চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তস্বরূপে ব্যবহার করেছেন। যথা—

+ । + । ।
উদয়দিগন্তে ঐ শুভ্র শঙ্খ বাজে।
+ ।
মোর চিত্ত মাঝে,
+
চিরনূতনেরে দিল ডাক
। +
পঁচিশে বৈশাখ।

তিনি বলেন, "এখানে দণ্ডচিহ্নিত যুগ্মধ্বনিগুলিকে এক বলে ধরা হয়েছে, কারণ এগুলি শব্দের মধ্যে অবস্থিত; আর যোগচিহ্নিত যুগ্মধ্বনিগুলিকে দুই বলে ধরা হয়েছে, যেহেতু এগুলি শব্দের অন্তে অবস্থিত।" অর্থাৎ 'উদয়'-এর অয়্ হয়েছে দুই মাত্রা অথচ 'দিগন্ত'-এর অন্ হয়েছে এক মাত্রা, এইজন্যে 'উদয়' শব্দকেও তিন মাত্রা এবং 'দিগন্ত' শব্দকেও তিন মাত্রা গণনা করা হয়েছে। 'যুগ্মধ্বনি' শব্দটার পরিবর্তে ইংরেজি সিলেব্‌ল্ শব্দ ব্যবহার করলে অনেকের পক্ষে সহজ হবে। আমি তাই করব।

বহুকালপূর্বে একদিন বাংলার শব্দতত্ত্ব আলোচনা করেছিলুম। সেই প্রসঙ্গে ধ্বনিতত্ত্বের কথাও মনে উঠেছিল। তখন দেখেছিলুম, বাংলায় স্বরবর্ণ যদিও সংস্কৃত বানানের হ্রস্বদীর্ঘতা মানে না তবু এ সম্বন্ধে তার নিজের একটি স্বকীয় নিয়ম আছে। সে হচ্ছে বাংলায় হসন্ত শব্দের পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হয়। যেমন জল, চাঁদ। এ দুটি শব্দের

১ 'হলন্ত' শব্দটি কবিকর্তৃক স্বরান্ত অর্থে ব্যবহৃত।

উচ্চারণে জ-এর অ এবং চাঁ-এর আ আমরা দীর্ঘ করে টেনে পরবর্তী হসন্তের ক্ষতিপূরণ করে থাকি। জল এবং জলা, চাঁদ এবং চাঁদা শব্দের তুলনা করলে এ কথা ধরা পড়বে। এ সম্বন্ধে বাংলার বিখ্যাত ধ্বনিতত্ত্ববিৎ সুনীতিকুমারের বিধান মিলে নিশ্চয়ই তিনি আমার সমর্থন করবেন। বাংলায় ধ্বনির এই নিয়ম স্বাভাবিক বলেই আধুনিক বাঙালি কবি ও ততোধিক আধুনিক বাঙালি ছন্দোবিৎ জন্মাবার বহু পূর্বেই বাংলা ছন্দে প্রাক্‌হসন্ত স্বরকে দুই মাত্রার পদবি দেওয়া হয়েছে। আজ পর্যন্ত কোনো বাঙালির কানে ঠেকে নি ; এই প্রথম দেখা গেল, নিয়মের ধাঁধায় পড়ে বাঙালি পাঠক কানকে অবিশ্বাস করলেন। কবিতা লেখা শুরু করবার বহুপূর্বে সবে যখন দাঁত উঠেছে তখন পড়েছি, "জল পড়ে, পাতা নড়ে।" এখানে 'জল' যে 'পাতা'র চেয়ে মাত্রা-কৌলীন্যে কোনো অংশে কম, এমন সংশয় কোনো বাঙালি শিশু বা তার পিতামাতার কানে বা মনেও উদয় হয় নি। এইজন্যে ওই দুটো কথা অনায়াসে এক পঙ্‌ক্তিতে বসে গেছে, আইনের ঠেলা খায় নি। ইংরেজি মতে 'জল' সর্বত্রই এক সিলেব্‌ল্, 'পাতা' তার ডবল ভারী। কিন্তু জল শব্দটা ইংরেজি নয়। 'কাশীরাম' নামের 'কাশী' এবং 'রাম' যে একই ওজনের এ কথাটা কাশীরামের স্বজাতীয় সকলকেই মানতেই হয়েছে। 'উদয়দিগন্তে ঐ শুভ্র শঙ্খ বাজে' এই লাইনটা নিয়ে আজ পর্যন্ত প্রবোধচন্দ্র ছাড়া আর কোনো পাঠকের কিছুমাত্র খটকা লেগেছে বলে আমি জানি নে, কেননা তারা সবাই কান পেতে পড়েছে, নিয়ম পেতে নয়। যদি কর্তব্যবোধে নিতান্তই খটকা লাগা উচিত হয়, তা হলে সমস্ত বাংলাকাব্যের পনেরো-আনা লাইনের এখনই প্রুফ সংশোধন করতে বসতে হবে।

লেখক আমার একটা মস্ত ফাঁকি ধরেছেন। তিনি বলেন, আমি ইচ্ছামত কোথাও 'ঐ' লিখি, কোথাও লিখি 'ওই', এই উপায়ে পাঠকের চোখ ভুলিয়ে অক্ষরের বাটখারার চাতুরীতে একই উচ্চারণকে জায়গা বুঝে দুইরকমের মূল্য দিয়েছি।

তা হলে গোড়াকার ইতিহাসটা বলি। তখনকার দিনে বাংলা কবিতায় এক-একটি অক্ষর এক সিলেব্‌ল্ বলেই চলত। অথচ সে দিন কোনো কোনো ছন্দে যুগ্মধ্বনিকে দ্বৈমাত্রিক বলে গণ্য করার দরকার আছে বলে অনুভব করেছিলুম।

আকাশের ওই আলোর কাঁপন
নয়নেতে এই লাগে,
সেই মিলনের তড়িৎ-তাপন
নিখিলের রূপে জাগে।

আজকের দিনে এমন কথা অতি অর্বাচীনকেও বলা অনাবশ্যক যে, ওই ত্রৈমাত্রিক ভূমিকার ছন্দকে নীচের মতো রূপান্তরিত করা অপরাধ—

ঐ যে তপনের রশ্মির কম্পন
এই মস্তিষ্কেতে লাগে,
সেই সম্মিলনে বিদ্যুৎ-ঝম্পন
বিশ্বমূর্তি হয়ে জাগে।

অথচ সে দিন বৃত্রসংহারে এইজাতীয় ছন্দে হেমচন্দ্র ঐন্দ্রিলার রূপবর্ণনায় অসংকোচে লিখতে পেরেছিলেন—

বদনমণ্ডলে ভাসিছে ব্রীড়া।

বেশ মনে আছে, সে দিন স্থানবিশেষে 'ঐ' শব্দের বানান নিয়ে আমাকে ভাবতে হয়েছিল। প্রবোধচন্দ্র নিশ্চয় বলবেন, "ভেবে যা হয় একটা স্থির করে ফেলাই ভালো ছিল। কোথাও বা 'ঐ', কোথাও বা 'ওই' বানান কেন।" তার উত্তর এই, বাংলায় স্বরের হ্রস্বদীর্ঘতা সংস্কৃতের মতো বাঁধা নিয়ম মানে না, ওর মধ্যে অতি সহজেই বিকল্প চলে। "ও—ই দেখো, খোকা ফাউন্টেন পেন মুখে পুরেছে", এখানে দীর্ঘ ওকারে কেউ দোষ ধরবে না। আবার যদি বলি "ঐ দেখো, ফাউন্টেন পেনটা খেয়ে ফেললে বুঝি", তখন হ্রস্ব ঐকার নিয়ে বচসা করবার লোক মিলবে না। বাংলা উচ্চারণে স্বরের ধ্বনিতে টান দিয়ে অতি সহজেই বাড়ানো-কমানো যায় বলেই ছন্দে তার গৌরব বা লাঘব নিয়ে আজ পর্যন্ত দলাদলি হয় নি।

এ-সব কথা দৃষ্টান্ত না দিলে স্পষ্ট হয় না, তাই দৃষ্টান্ত তৈরি করতে হল।

মনে পড়ে দুইজনে জুঁই তুলে বাল্যে
নিরালায় বনছায় গেঁথেছিনু মাল্যে।
দোঁহার তরুণ প্রাণ বেঁধে দিল গন্ধে
আলোয়-আঁধারে-মেশা নিভৃত আনন্দে॥

এখানে 'দুই' 'জুঁই' আপন আপন উকারকে দীর্ঘ করে দুই সিলেব্‌ল্‌-এর টিকিট পেয়েছে, কান তাদের সাধুতায় সন্দেহ করলে না, দ্বার ছেড়ে দিলে। উলটো দৃষ্টান্ত দেখাই।

এই যে এল সেই আমারি স্বপ্নে দেখা রূপ,
কই দেউলে দেউটি দিলি, কই জ্বালালি ধূপ।
যায় যদি রে যাক-না ফিরে, চাই নে তারে রাখি,
সব গেলেও হায় রে তবু স্বপ্ন রবে বাকি॥

এখানে 'এই' 'সেই' 'কই' 'যায়' 'হায়' প্রভৃতি শব্দ এক সিলেব্‌ল্‌-এর বেশি মান দাবি করলে না। বাঙালি পাঠক সেটাকে অন্যায় না মনে করে সহজ ভাবেই নিলে।

কাঁধে মই, বলে, "কই ভুঁইচাঁপা গাছ।"
দইভাঁড়ে ছিপ ছাড়ে, খোঁজে কইমাছ।
ঘুঁটে ছাই মেখে লাউ রাঁধে ঝাউপাতা,
কী খেতাব দেব তায় ঘুরে যায় মাথা॥

এখানে 'মই' 'কই' 'ভুঁই' 'দই' 'ছাই' 'লাউ' প্রভৃতি সকলেরই সমান দৈর্ঘ্য, যেন গ্র্যানেডিয়ারের সৈন্যদল। যে পাঠক এটা পড়ে দুঃখ পান নি সেই পাঠককেই অনুরোধ করি, তিনি পড়ে দেখুন—

দুইজনে জুঁই তুলতে যখন
গেলেম বনের ধারে,
সন্ধ্যা-আলোর মেঘের ঝালর
ঢাকল অন্ধকারে।
কুঞ্জে গোপন গন্ধ বাজায়
নিরুদ্দেশের বাঁশি,
দোঁহার নয়ন খুঁজে বেড়ায়
দোঁহার মুখের হাসি॥

এখানে যুগ্মধ্বনিগুলো এক সিলেব্‌ল্‌-এর চাকার গাড়িতে অনায়াসে ধেয়ে চলেছে। চণ্ডীদাসের গানে রাধিকা বলেছেন, "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো।" বাঁশি-ধ্বনির এই তো ঠিক পথ, নিয়মের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করলে মরমে পৌঁছত না। কবিরাও সেই কান লক্ষ্য করে চলেন, নিয়ম যদি চৌমাথার পাহারাওয়ালার মতো সিগ্‌ন্যাল তোলে তবু তাঁদের রুখতে পারে না।

আমার দুঃখ এই, তথাচ আইনবিৎ বলছেন যে, লিপিপদ্ধতির দোষে 'অক্ষর গুনে ছন্দরচনার অন্ধ অভ্যাস' আমাদের পেয়ে বসেছে। আমার বক্তব্য এই যে, ছন্দরচনার অভ্যাসটাই অন্ধ অভ্যাস। অন্ধের কান খুব সজাগ, ধ্বনির সংকেতে সে চলতে পারে, কবিরও সেই দশা। তা যদি না হত তা হলেই পায়ে পায়ে কবিকে চোখে চশমা এঁটে অক্ষর গ'নে গ'নে চলতে হত।

'বৎসর' 'উৎসব' প্রভৃতি খণ্ড ৎ-ওয়ালা কথাগুলোকে আমরা ছন্দের মাপে বাড়াই কমাই, এরকম চাতুরী সম্ভব হয় যেহেতু খণ্ড ৎ-কে কখনো আমরা চোখে দেখার সাক্ষ্যে এক অক্ষর ধরি, আবার কখনো কানে শোনার দোহাই দিয়ে তাকে আধ অক্ষর বলে

চালাই— প্রবন্ধলেখক এই অপবাদ দিয়েছেন। অভিযোগকারীর বোঝা উচিত, এটা একেবারেই অসম্ভব, কেননা ছন্দের কাজ চোখ-ভোলানো নয়, কানকে খুশি করা— সেই কানের জিনিসে ইঞ্চি-গজের মাপ চলেই না। 'বৎসর' প্রভৃতি শব্দ গেঞ্জিজামার মতো ; মধুপুরের স্বাস্থ্যকর হাওয়ায় দেহ এক-আধ ইঞ্চি বাড়লেও চলে, আবার শহরে এসে এক-আধ ইঞ্চি কমলেও সহজে খাপ খেয়ে যায়। কান যদি সম্মতি না দিত তা হলে কোনো কবির সাধ্য ছিল না ছন্দ নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারে।

বৎসরে বৎসরে হাঁকে কালের গোমায়ু—
যায় আয়ু, যায় আয়ু, যায় যায় আয়ু।

এখানে 'বৎসর' তিন মাত্রা। কিন্তু সেতারে মীড় লাগাবার মতো অল্প একটু টানলে বেসুর লাগে না। যথা—

সখা-সনে উৎসবে বৎসর যায়
শেষে মরি বিরহের ক্ষুৎপিপাসায়।
ফাগুনের দিনশেষে মউমাছি ও যে
মধুহীন বনে বৃথা মাধবীরে খোঁজে।

টান কমিয়ে দেওয়া যাক—

উৎসবের রাত্রিশেষে মৃৎপ্রদীপ হায়,
তারকার মৈত্রী ছেড়ে মৃত্তিকারে চায়।

দেখা যাচ্ছে, এটুকু কমিবেশিতে মামলা চলে না, বাংলাভাষার স্বভাবের মধ্যেই যথেষ্ট প্রশ্রয় আছে। যদি লেখা যেত

সখাসনে মহোৎসবে বৎসর যায়

তা হলে নিয়ম বাঁচত, কারণ পূর্ববর্তী ওকারের সঙ্গে খণ্ড ৎ মিলে এক মাত্রা ; কিন্তু কর্ণধার বলছে ওইখানটায় তরণী যেন একটু কাত হয়ে পড়ল। আমি এক জায়গায় লিখেছি 'উদয়-দিক্‌প্রান্ত-তলে'। ওটাকে বদলে 'উদয়ের দিক্‌প্রান্ত-তলে' লিখলে কানে খারাপ শোনাত না এ কথা প্রবন্ধলেখক বলেছেন, সালিসির জন্যে কবিদের উপর বরাত দিলুম।

অপর পক্ষে দেখা যাক, চোখ ভুলিয়ে ছন্দের দাবিতে ফাঁকি চালানো যায় কি না।

এখনই আসিলাম দ্বারে,
অমনই ফিরে চলিলাম।
চোখও দেখে নি কভু তারে,
কানই শুনিল তার নাম।

'তোমারি', 'যখনি' শব্দগুলির ই-কারকে বাংলা বানানে অনেক সময় বিচ্ছিন্ন করে লেখা হয়, সেই সুযোগ অবলম্বন করে কোনো অলস কবি ওগুলোকে চার মাত্রার কোঠায় বসিয়ে ছন্দ ভরাট করেছেন কি না জানি নে, যদি করে থাকেন বাঙালি পাঠক তাঁকে শিরোপা দেবে না। ওদের উকিল তখন 'বৎসর' 'উৎসব' 'দিক্‌প্রান্ত' প্রভৃতি শব্দগুলির নজির দেখিয়ে তর্ক করবে। তার একমাত্র উত্তর এই যে, কান যেটাকে মেনে নিয়েছে কিম্বা মেনে নেয় নি, চোখের সাক্ষ্য নিয়ে কিম্বা বাঁধানিয়মের দোহাই দিয়ে সেখানে তর্ক তোলা অগ্রাহ্য। যে-কোনো কবি উপরের ছড়াটাকে অনায়াসে বদল করে লিখতে পারে—

এখনি আসিনু তার দ্বারে,
অমনি ফিরিয়া চলিলাম।
চোখেও দেখি নি কভু তারে,
কানেই শুনেছি তার নাম।

'বৎসর' 'উৎসব' প্রভৃতি শব্দ যদি তিন মাত্রার কোঠা পেরোতে গেলেই স্বভাবতই খুঁড়িয়ে পড়ত তা হলে তার স্বাভাবিক ওজন বাঁচিয়ে ছন্দ চালানো এতই দুঃসাধ্য হত যে, ধ্বনিকে এড়িয়ে অক্ষরগণনার আশ্রয়ে শেষে মান-বাঁচানো আবশ্যক হত। ওটা চলে বলেই চালানো হয়েছে, দায়ে পড়ে না। কেবল অক্ষর সাজিয়ে অচল রীতিকে ছন্দে চালানো যদি সম্ভব হত তা হলে খোকাবাবুকে কেবল লম্বা টুপি পরিয়ে দাদামশায় বলে চালানো অসাধ্য হত না।

পৌষ ১৩৩৮

২

দিলীপকুমার আশ্বিনের 'উত্তরা'য় ছন্দ সম্বন্ধে আমার দুই-একটি চিঠির খণ্ড ছাপিয়েছেন। সর্বশেষে যে নোটটুকু দিয়েছেন তার থেকে বোঝা গেল, আমি যে কথা বলতে চেয়েছি এখনো সেটা তাঁর কাছে স্পষ্ট হয় নি।

তিনি আমারই লেখার নজির তুলে দেখিয়েছেন যে, নিম্নলিখিত কবিতায় আমি 'একেকটি' শব্দটাকে চার মাত্রার ওজন দিয়েছি।

ইচ্ছা করে অবিরত আপনার মনোমত
গল্প লিখি একেকটি করে।

এ দিকে নীরেনবাবুর রচনায় "একটি কথা এতবার হয় কলুষিত" পদটিতে 'একটি'

শব্দটাকে দুই মাত্রায় গণ্য করতে আপত্তি করি নি বলে তিনি দ্বিধা বোধ করছেন। তর্ক না করে দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

একটি কথার লাগি তিনটি রজনী জাগি,
একটুও নাহি মেলে সাড়া।
সখীরা যখন জোটে মুখে তব বন্যা ছোটে,
গোলমালে তোলপাড় পাড়া॥

'একটি' 'তিনটি' 'একটু' শব্দগুলি হসন্তমধ্য, 'গোলমাল' 'তোলপাড়'ও সেই জাতের। অথচ হসন্তে ধ্বনিলাঘবতার অভিযোগে ওদের মাত্রা জরিমানা দিতে হয় নি। তিন মাত্রা ও চার মাত্রার গৌরবেই রয়ে গেল। কেউ কেউ বলেন, কেবলমাত্র অক্ষরগণনার দোহাই দিয়েই এরা মান বাঁচিয়েছে, অর্থাৎ যদি যুক্ত অক্ষরের ছাঁদে লেখা যেত তা হলেই ছন্দে ধ্বনির কমতি ধরা পড়ত। আমার বক্তব্য এই যে, চোখ দিয়ে ছন্দ পড়া আর বাইসিক্‌ল্‌-এর চাকা দিয়ে হামাগুড়ি দেওয়া একই কথা, ওটা হবার জো নেই। বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা বোঝা যাবে।

টোট্‌কা এই মুষ্টিযোগ লট্‌কানের ছাল,
সিট্‌কে মুখ খাবি, জ্বর আট্‌কে যাবে কাল।

বলে রাখা ভালো এটা ভিষক-ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন নয়, সাহিত্য-ডাক্তারের বানানো ছড়া, ছন্দ সম্বন্ধে মতসংশয় নিবারণের উদ্দেশ্যে; এর থেকে অন্য কোনো রোগের প্রতিকার কেউ যেন আশা না করেন। আরো একটা—

একটি কথা শুনিবারে তিন্‌টে রাত্রি মাটি,
এর পরে ঝগ্‌ড়া হবে, শেষে দাঁত্‌কপাটি॥

অথবা—

একটি কথা শোনো, মনে খট্‌কা নাহি রেখে,
টাট্‌কা মাছ জুট্‌ল না তো, শুঁট্‌কি দেখো চেখে।

শেষের তিনটি ছড়ায় অক্ষর গুনতি করতে গেলে দৃশ্যত পয়ারের সীমা ছাড়িয়ে যায়, কিন্তু তাই বলেই যে পয়ার ছন্দের নির্দিষ্ট ধ্বনি বেড়ে গেল তা নয়। আপাতত মনে হয়, এটা যথেচ্ছাচার। কিন্তু হিসাব করে দেখলেই দেখা যাবে ছন্দের নীতি নষ্ট করা হয় নি। কেননা, তার জো নেই। এ তো রাজত্ব করা নয় কবিত্ব করা, এখানে লক্ষ্য হল মনোরঞ্জন; খামকা একটা জবরদস্তির আইন জারি করে তার পরে পাহারাওয়ালা লাগিয়ে দেওয়া, ব্যাপারটা এত সহজ নয়। ধ্বনির রাজ্যে গোঁয়ার্তমি করে কেউ জিতে যাবে এমন সাধ্য আছে কার। চব্বিশ ঘণ্টা কান রয়েছে সতর্ক।

আমি এই কথাটি বোঝাতে চেষ্টা করছি যে, আক্ষরিক ছন্দ বলে কোনো অদ্ভুত পদার্থ বাংলায় কিম্বা অন্য কোনো ভাষাতেই নেই। অক্ষর ধ্বনির চিহ্নমাত্র। যেমন 'জল' শব্দটাকে দিয়ে 'জল' পদার্থটার প্রতিবাদ চলে না, অক্ষরকে ধ্বনির প্রতিপক্ষ দাঁড় করানো তেমনি বিড়ম্বনা।

প্রশ্ন উঠবে, তাই যদি হয়, তা হলে খোঁড়া হসন্তবর্ণকে কখনো আধ মাত্রা কখনো পুরোমাত্রার পদবিতে বসানো হয় কেন। উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, স্বয়ং ভাষা যদি নিজেই আসন পেতে দেয় তবে তার উপরে অন্য কোনো আইন চলে না। ভাষাও বর্ণভেদে পঙ্‌ক্তির ব্যবস্থা নিজের ধ্বনির নিয়ম বাঁচিয়ে তবে করতে পারে। বাংলা ভাষায় স্বরবর্ণের ধ্বনিমাত্রা বিকল্পে দীর্ঘ ও হ্রস্ব হয়ে থাকে, ধনুকের ছিলের মতো, টানলে বাড়ে, টান ছেড়ে দিলে কমে। সেটাকে গুণ বলেই গণ্য করি। তাতে ধ্বনিরসের বৈচিত্র্য হয়। আমরা দ্রুত লয়ে বলতে পারি 'এইরে', আবার তাকে টানলে ডবল করে বলতে পারি 'এ-ইরে'। তার কারণ আমাদের স্বরবর্ণগুলো জীবধর্মী, ব্যবহারের প্রয়োজনে একটা সীমার মধ্যে তাদের সংকোচন-প্রসারণ চলে। চারটে পাথরের মূর্তি ধরাবার মতো জায়গায় পাঁচটা ধরাতে গেলে মুশকিল বাধে; কিন্তু চারজন প্যাসেঞ্জার বসবার বেঞ্চিতে পাঁচজন মানুষ বসালে দুর্ঘটনার আশঙ্কা নেই, যদি তারা পরস্পর রাজি থাকে। বাংলা ভাষার স্বরবর্ণগুলিও পাথুরে নয়, নিজের স্থিতিস্থাপকতার গুণে তারা প্রতিবেশীর জন্যে একটু-আধটু জায়গার ব্যবস্থা করতে সহজেই রাজি থাকে। এইজন্যেই অক্ষরের সংখ্যা গণনা করে ছন্দের ধ্বনিমাত্রা গণনা বাংলায় চলে না। এটা বাঙালির আত্মীয়সভার মতন। সেখানে যতগুলো চৌকি তার চেয়ে মানুষ বেশি থাকা কিছুই অসম্ভব নয়, অথবা পাশে ফাঁক পেলে দুইজনের জায়গা একজনে হাত পা মেলে আরামে দখল করাও এই জনতার অভ্যস্ত। বাংলার প্রাকৃতছন্দ ধরে তার প্রমাণ দেওয়া যাক।

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান।
শিবঠাকুরের বিয়ে হবে, তিন কন্যে দান।

এটা তিন মাত্রার ছন্দ। অর্থাৎ চার পোয়ায় সেরওয়ালা এর ওজন নয়, তিন পোয়ায় এর সের। এর প্রত্যেক পা ফেলার লয় হচ্ছে তিনের।

বৃষ্‌টি | পড়ে- | টাপুর | টুপুর | নদেয় | এল | বা-ন |
শিবঠা | কুরের | বিয়ে- | হবে- | তিন্‌ক | ন্নে- | দা-ন |

দেখা যাচ্ছে, তিন গণনায় যেখানে যেখানে ফাঁক, পার্শ্ববর্তী স্বরবর্ণগুলি সহজেই ধ্বনি প্রসারিত করে সেই পোড়ো জায়গা দখল করে নিয়েছে। এত সহজে যে, হাজার

হাজার ছেলেমেয়ে এই ছড়া আউড়েছে, তবু ছন্দের কোনো গর্তে তাদের কারো কণ্ঠ স্খলিত হয় নি। ফাঁকগুলো যদি ঠেসে ভরাতে কেউ ইচ্ছা করেন— দোহাই দিচ্ছি, না করেন যেন— তবে এইরকম দাঁড়াবে—

বৃষ্টি পড়ছে টাপুর টুপুর নদেয় আসছে বন্যা,
শিব ঠাকুরের বিয়ের বাসরে দান হবে তিন কন্যা।

রামপ্রসাদের একটি গান আছে—

মা আমায় ঘুরাবি কত
চোখবাঁধা বলদের মতো

এটাও তিন মাত্রা লয়ের ছন্দ।

মা-আ | মায় ঘু | রাবি- | কত- |

ফাঁক ভরাট করতে হলে হবে এই চেহারা—

হে মাতা আমারে ঘুরাবি কতই
চক্ষুবদ্ধ বৃষের মতোই।

যাঁরা অক্ষর গণনা করে নিয়ম বাঁধেন তাঁদের জানিয়ে রাখা ভালো যে, স্বরবর্ণে টান দিয়ে মিড় দেবার জন্যেই প্রাকৃত-বাংলা ছন্দে কবিরা বিনা দ্বিধায় ফাঁক রেখে দেন; সেই ফাঁকগুলো ছন্দেরই অঙ্গ, সে-সব জায়গায় ধ্বনির রেশ কিছু কাজ করবার অবকাশ পায়।

হারিয়ে ফেলা বাঁশি আমার পালিয়েছিল বুঝি
লুকোচুরির ছলে।

এর মধ্যে প্রায় প্রত্যেক যতিতে ফাঁক আছে।

১ ২ ৩ ৪
হারিয়ে ফেলা- | বাঁশি আমা-র | পালিয়েছিল | বুঝি— |
৫ ৬
লুকোচুরি-র | ছলে— |

কিছু বৈচিত্র্যও দেখছি। প্রথম দুটি বিভাগে সমান্তরাল ফাঁক। কিন্তু তিনের ভাগে ফাঁক বাদ দিয়ে একেবারে চতুর্থ ভাগের শেষে দীর্ঘ ফাঁক পড়েছে। পাঠক 'হারিয়ে ফেলা'র পরেও ফাঁক না দিয়ে একেবারে দ্বিতীয় ভাগের শেষে যদি সেটা পূরণ করে দেন তবে ভালোই শুনতে হবে। কিন্তু যদি বেফাঁক ঠাসবুনানির বিশেষ ফরমাশ থাকে তা হলে সেটাও চেষ্টা করলে মন্দ হবে না।

স্বপ্ন আমার বন্ধনহীন সন্ধ্যাতারার সঙ্গী
মরণযাত্রীদলে,
স্বর্ণবরণ কুজ্ঝটিকায় অস্তশিখর লঙ্ঘি
লুকায় মৌনতলে।

এই কথাটা লক্ষ্য করবার বিষয় যে, হসন্তবর্ণের হ্রস্ব বা দীর্ঘ যে মাত্রাই থাক পাঠ করতে বাঙালি পাঠকের একটুও বাধে না, ছন্দের ঝোঁক আপনিই অবিলম্বে তাকে ঠিকমত চালনা করে।

পাৎলা করিয়া কাটো কাৎলা মাছেরে,
উৎসুক নাৎনি যে চাহিয়া আছে রে।

এই ছড়াটা পড়তে গেলে বাঙালি নিঃসংশয়ে স্বতই খণ্ড ৎ-এর পূর্ববর্তী স্বরবর্ণকে দীর্ঘ করে পড়বে। আবার যেমনি নিম্নের ছড়াটি সামনে ধরা—

পাৎলা করি কাটো, প্রিয়ে, কাৎলা মাছটিরে,
টাট্‌কা তেলে ফেলে দাও সরষে আর জিরে,
ভেট্‌কি যদি জোটে তাহে মাখো লঙ্কাবাটা,
যত্ন করে বেছে ফেলো টুক্‌রো যত কাঁটা—

অমনি প্রাক্‌-হসন্ত স্বরগুলিকে ঠেসে দিতে এক মুহূর্তও দেরি হবে না। এই যে বাংলা স্বরবর্ণের সজীবতা, একে কোনো কড়া নিয়মের চাপে আড়ষ্ট করে তাকে সর্বত্র সমানভাবে ব্যবহারযোগ্য করা উচিত— এ মত চালালে বাংলা ভাষাকে ফাঁকি দেওয়া হবে। শুকনো আমসত্ত্বের মধ্যেই সাম্য, কিন্তু সরস আমের মধ্যে বৈচিত্র্য, ভোজে কোন্‌টার দাম বেশি তা নিয়ে তর্ক অনাবশ্যক।

বাংলা প্রাকৃত ভাষার কাব্যে স্বরধ্বনির যে প্রাণবান্‌ স্বচ্ছন্দতা আছে সংস্কৃত বাংলা ভাষা, যাকে আমরা সাধুভাষা বলি, তার মধ্যে পড়ে সে কেন জেনানা মেয়ের মতো দেয়ালে আটকা পড়ে গেল। তার কারণ, সংস্কৃত-বাংলা কৃত্রিম ভাষা, ওখানে বাইরের নিয়মের প্রাধান্য, তার আপন নিয়ম অনেক জায়গায় কুণ্ঠিত। সভাস্থলে একটি আসনে একটি মানুষের স্থান নির্দিষ্ট; কারো বা দেহ ক্ষীণ, আসনে ফাঁক থেকে যায়, কারো বা স্থূল দেহ, আসনে ঠেসে বসতে হয়; কিন্তু গোনাগন্‌তি চৌকি, সীমা নির্দিষ্ট। যদি ফরাশে বসতে হত তা হলে কলেবরের তারতম্য ধরে মর্যাদার আসনের সীমানায় কমিবেশি স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটত। কিন্তু সভ্যতার মর্যাদার দিকে দৃষ্টি রেখে স্বভাবের নিয়মকে বাঁধানিয়মে পাকা করে দিতে হয়। তাতে কিছু পীড়ন ঘটলেও গাম্ভীর্যের পক্ষে তার একটা সার্থকতা আছে। সেইজন্যেই সভার

রীতি ও ঘরের রীতিতে কিছু ভেদ থাকেই। শকুন্তলার বাকল দেখে দুষ্মন্ত বলেছিলেন: কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্। কিন্তু যখন তাঁকে রাজান্তঃপুরে নিয়েছিলেন তখন তাঁকে নিশ্চয়ই বাকল পরান নি। তখন শকুন্তলার স্বাভাবিক শোভাকে অলংকৃত করেছিলেন, সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্যে নয়, মর্যাদারক্ষার জন্যে। রাজরানীর সৌন্দর্য ব্যক্তি-বিশেষে বিচিত্র, কিন্তু তাঁর মর্যাদার আদর্শ সকল রাজরানীর মধ্যে এক। ওটা প্রকৃতির হাতে তৈরি নয়, রাজসমাজের দ্বারা নির্দিষ্ট। অর্থাৎ, ওটা প্রাকৃত নয়, সংস্কৃত। তাই দুষ্মন্ত স্বীকার করেছিলেন বটে বনলতার দ্বারা উদ্যানলতা পরাভূত, তবু উদ্যানকে বনের আদর্শে রমণীয় করে তুলতে নিশ্চয় তাঁর সাহস হয় নি। তাই, আমি নিজে আকন্দফুল ভালোবাসি, কিন্তু আমার সাধুসমাজের মালি ওই গাছের অঙ্কুর দেখবামাত্র উপড়ে ফেলে। সে যদি কবি হত, সাধুভাষায় ছাড়া কবিতা লিখত না। সাধুভাষার ছন্দের বাঁধারীতি যে-জাতীয় ছন্দে চলে এবং শোভা পায় সে হচ্ছে পয়ারজাতীয় ছন্দ। এখানে ফাঁক-ফাঁক নির্দিষ্ট আসনের উপর নানা ওজনেরই ধ্বনিকে চড়ানো নিরাপদ। এখানে ঠিক চোদ্দটা অক্ষরকে বাহন করে যুগ্ম-অযুগ্ম নানারকমের ধ্বনিই একত্র সভা জমাতে পারে।

কাব্যলীলা একদিন যখন শুরু করেছিলেম তখন বাংলাসাহিত্যে সাধুভাষারই ছিল একাধিপত্য। অর্থাৎ, তখন ছিল কাটা-কাটা পিঁড়িতে ভাগ-করা ছন্দ। এই আইনের অধীনে যতক্ষণ পয়ারের এলাকায় থাকি ততক্ষণ আসনপীড়া ঘটে না। কিন্তু, তিনমাত্রামূলক ছন্দের দিকে আমার কলমের একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। ওই ছন্দে প্রত্যেক অক্ষরে স্বতন্ত্র-আরূঢ় সকল ওজনের ধ্বনিকেই সমান দরের একক বলে ধরে নিতে বারম্বার কানে বাজত। সেইজন্যে যুক্ত-অক্ষর অর্থাৎ যুগ্মধ্বনি বর্জন করবার একটা দুর্বল অভ্যাস আমাকে ক্রমেই পেয়ে বসছিল। ঠোকর খাবার ভয়ে পদগুলোকে একেবারে সমতল করে যাচ্ছিলুম। সব জায়গায় পেরে উঠি নি, কিন্তু মোটের উপর চেষ্টা ছিল। 'ছবি ও গান'-এ 'রাহুর প্রেম' কবিতা পড়লে দেখা যাবে যুক্ত-অক্ষর ঝেঁটিয়ে দেবার প্রয়াস আছে তবু তারা পাথরের টুকরোর মতো রাস্তার মাঝে মাঝে উঁচু হয়ে রইল। তাই যখন লিখেছিলুম—

কঠিন বাঁধনে চরণ বেড়িয়া
চিরকাল তোরে রব আঁকড়িয়া
লৌহশৃঙ্খলের ডোর—

মনে খটকা লেগেছিল, কান প্রসন্ন হয় নি। কিন্তু, তখন কলম ছিল অপটু এবং অলস মন ছিল অসতর্ক। কেননা, পাঠকদের তরফ থেকে বিপদের আশঙ্কা ছিল না। তখন

ছন্দের সদর রাস্তাও গ্রাম্য রাস্তার মতো এবড়ো-খেবড়ো থাকত, অভ্যাসের গতিকে কেউ সেটাকে নিন্দনীয় বলে মনেও করে নি।

অক্ষরের দাসত্বে বন্দী বলে প্রবোধচন্দ্র বাঙালি কবিদেরকে যে দোষ দিয়েছেন সেটা এই সময়কার পক্ষে কিছু অংশে খাটে। অর্থাৎ, অক্ষরের মাপ সমান রেখে ধ্বনির মাপে ইতরবিশেষ করা তখনকার শৈথিল্যের দিনে চলত, এখন চলে না। তখন পয়ারের রীতি সকল ছন্দেরই সাধারণ রীতি বলে সাহিত্যসমাজে চলে গিয়েছিল। তার প্রধান কারণ পয়ারজাতীয় ছন্দই তখন প্রধান, অন্যজাতীয় অর্থাৎ ত্রৈমাত্রিক ছন্দের ব্যবহার তখন অতি অল্পই। তাই এই মাইনরিটির স্বতন্ত্র দাবি সে দিন বিধিবদ্ধ হয় নি।

তার পরে 'মানসী' লেখার সময় এল। তখন ছন্দের কান আর ধৈর্য রাখতে পারছে না। এ কথা তখন নিশ্চিত বুঝেছি যে, ছন্দের প্রধান সম্পদ যুগ্মধ্বনি; অথচ এটাও জানছি যে, পয়ারসম্প্রদায়ের বাইরে নির্বিচারে যুগ্মধ্বনির পরিবেশন চলে না।

রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা

এ লাইন-বেচারাকে পয়ারের বাঁধাপ্রথাটা শৃঙ্খল হয়েই বেঁধেছে, তিন মাত্রার স্কন্ধকে চার মাত্রার বোঝা বইতে হচ্ছে। সেই 'মানসী' লেখবার বয়সে আমি যুগ্মধ্বনিকে দুই মাত্রার মূল্য দিয়ে ছন্দরচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি।

প্রথম প্রথম পয়ারেও সেই নিয়ম প্রয়োগ করেছিলুম। অনতিকাল পরেই দেখা গেল, তার প্রয়োজন নেই। পয়ারে যুগ্মধ্বনির উপযুক্ত ফাঁক যথেষ্ট আছে। (এই প্রবন্ধে আমি ত্রিপদী প্রভৃতি পয়ারজাতীয় সমস্ত দ্বৈমাত্রিক ছন্দকেই 'পয়ার' নাম দিচ্ছি।)

পয়ারে ধ্বনিবিন্যাসের এই যে স্বচ্ছন্দতা, দুই মাত্রার লয় তার একমাত্র কারণ নয়। পয়ারের পদগুলিতে তার ধ্বনিভাগের বৈচিত্র্য একটা মস্ত কথা। সাধারণ ভাগ হচ্ছে ৩+৩+২+৩+৩, যথা—

নিখিল আকাশভরা আলোর মহিমা
তৃণের শিশির মাঝে লভিল প্রতিমা।

অন্যরকম, যথা—

তপনের পানে চেয়ে সাগরের ঢেউ
বলে ওই পুতলিরে এনে দে-না কেউ।

অথবা—

রাখি যাহা তার বোঝা কাঁধে চেপে রহে,
দিই যাহা তার ভার চরাচর বহে।

অথবা—

সারা দিবসের হায় যত কিছু আশা
রজনীর কারাগারে হারাবে কি ভাষা।

অমিত্রাক্ষর ছন্দে পয়ারের প্রবর্তন হয়েছে এই কারণেই। সে কোনো কোনো আদিম জীবের মতো বহুগ্রন্থিল, তাকে নষ্ট না করেও যেখানে-সেখানে ছিন্ন করা যায়। এই ছেদের বৈচিত্র্য থাকাতেই প্রয়োজন হলে সে পদ্য হলেও গদ্যের অবন্ধ গতি অনেকটা অনুকরণ করতে পারে। সে গ্রামের মেয়ের মতো; যদিও থাকে অন্তঃপুরে, তবুও হাটে-ঘাটে তার চলাফেরায় বাধা নেই।

উপরের দৃষ্টান্তগুলিতে ধ্বনির বোঝা হালকা। যুগ্মবর্ণের ভার চাপানো যাক।

সুরাঙ্গনা নন্দনের নিকুঞ্জপ্রাঙ্গণে
মন্দারমঞ্জরি তোলে চঞ্চলকঙ্কণে।
বেণীবন্ধ তরঙ্গিত কোন্ ছন্দ নিয়া,
স্বর্গবীণা গুঞ্জরিছে তাই সন্ধানিয়া।

আধুনিক বাংলা ছন্দে সবচেয়ে দীর্ঘ পয়ার আঠারো অক্ষরে গাঁথা। তার প্রথম যতি পদের মাঝখানে আট অক্ষরের পরে, শেষ যতি দশ অক্ষরের পরে পদের শেষে। এতেও নানাপ্রকারের ভাগ চলে। তাই অমিত্রাক্ষরের লাইন-ডিঙোনো চালে এর ধ্বনিশ্রেণীকে নানারকমে কুচকাওয়াজ করানো যায়।

হিমাদ্রির ধ্যানে যাহা | স্তব্ধ হয়ে ছিল রাত্রিদিন
সপ্তর্ষির দৃষ্টিতলে | বাক্যহীন স্তব্ধতায় লীন,
সেই নির্ঝরিণীধারা | রবিকরস্পর্শে উচ্ছ্বসিতা
দিগ্দিগন্তে প্রচারিছে | অন্তহীন আনন্দের গীতা।

বাংলায় এই আর-একটি গুরুভারবহ ছন্দ। এরা সবাই মহাকাব্য বা আখ্যান বা চিন্তাগর্ভ বড়ো বড়ো কথার বাহন। ছোটো পয়ার আর এই বড়ো পয়ার, বাংলাকাব্যে এরা যেন ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবা আর ঐরাবত। অন্তত, এই বড়ো পয়ারকে গীতিকাব্যের কাজে খাটাতে গেলে বেমানান হয়। এর নিজের গড়নের মধ্যেই একটা সমারোহ আছে, সেইজন্যে এর প্রয়োজন সমারোহসূচক ব্যাপারে।

ছোটো পয়ারকে চেঁচে-ছুলে হালকা কাজে লাগানো যায়, যেমন বাঁশের কঞ্চিকে ছিপ করা চলে। পয়ারের দেহসংস্থানেই গুরুর সঙ্গে লঘুর যোগ আছে। তার প্রথম অংশে আট, দ্বিতীয় অংশে ছয়; অর্থাৎ, হালের দিকে সে চওড়া কিন্তু দাঁড়ের দিকে সরু; তাকে নিয়ে মাল-বওয়ানোও যায়, বাচ-খেলানোও চলে। বড়ো পয়ারের

দেহসংস্থান এর উলটো; তার প্রথমভাগে আট, শেষভাগে দশ; তার গৌরবটা ক্রমেই প্রশস্ত হয়ে উঠেছে। ছোটো পয়ারের ছিব্‌লেমির একটা পরিচয় দেওয়া যাক।

খুব তার বোল্‌চাল, সাজ ফিট্‌ফাট,
তক্‌রার হলে আর নাই মিট্‌মাট।
চশ্‌মায় চম্‌কায় আড়ে চায় চোখ,
কোনো ঠাঁই ঠেকে নাই কোনো বড়ো লোক।

এর ভাগগুলোকে কাটা-কাটা ছোটো-ছোটো করে হ্রস্বস্বরে হসন্তবর্ণে ঘনঘন ঝোঁক দিয়ে এর চটুলতা বাড়িয়ে দেওয়া গেছে। এখানে এটা পাতলা কিরিচের মতো। একেই আবার যুগ্মধ্বনির যোগে মজবুত করে খাড়া করে তোলা যায়।

বাক্য তার অনর্গল মল্লসজ্জাশালী,
তর্কযুদ্ধে উগ্র তেজ, শেষ যুক্তি গালি।
ভ্রূকুটিপ্রচ্ছন্ন চক্ষু কটাক্ষিয়া চায়,
কুত্রাপিও মহত্ত্বের চিহ্ন নাহি পায়।

যেখানে-সেখানে নানাপ্রকার অসমান ভার নিয়েও পয়ারের পদস্খলন হয় না, এই তত্ত্বটির মধ্যে অসামান্যতা আছে। অন্য কোনো ভাষার কোনো ছন্দে এরকম স্বচ্ছন্দতা এতটা পরিমাণে আছে বলে আমি তো জানি নে।

এর কৌশলটা কোন্‌খানে যখন ভেবে দেখা যায় তখন দেখি, পয়ারে প্রত্যেক পদের মাঝখানে ও শেষে যে দুটো হাঁফ ছাড়বার যতি আছে সেইখানেই তার ভারসামঞ্জস্য হয়ে থাকে।

নিঃস্বতাসংকোচে দিন | অবসন্ন হলে
নিভৃতে নিঃশব্দ সন্ধ্যা | নেয় তারে কোলে।

গণনা করে দেখলে ধরা পড়ে, এই পয়ারের দুই লাইনে ধ্বনিভারের সাম্য নেই। তবু যে টলমল করতে করতে ছন্দটা কাত হয়ে পড়ে না, তার কারণ ডাইনে-বাঁয়ে যতির লগির ঠেকা দিয়ে দিয়ে তাকে চালিয়ে নেওয়া হয়। চতুষ্পদ জন্তু যেমন তার ভারী দেহটাকে দুইজোড়া পায়ের দ্বারা দুই দিকে ঠেকাতে ঠেকাতে চলে সেইরকম। পয়ারের প্রকৃত রূপ চোদ্দটা অক্ষরে নয়, সেটা প্রথম অংশের আট অক্ষর ও দ্বিতীয় অংশের ছয় অক্ষরের পরবর্তী দুই যতিতে। অজগর সমস্ত দেহটা নিয়ে চলে। তার দেহে মুণ্ড এবং ধড়ের মধ্যে ভাগ নেই। ঘোড়ার দেহে সেই ভাগ আছে। তার মুণ্ডটার পরে যেখানে গলা সেখানে একটা যতি, ধড়ের শেষ ভাগে যেখানে ক্ষীণ কটি সেখানেও আর-একটা। এই বিভক্তভাবের দেহকে সামলিয়ে নিয়ে সে চার পা ফেলে চলে। পয়ারেরও

সেইরকম বিশেষভাবে বিভক্ত দেহ এবং চার পা ফেলতে ফেলতে চলা। চতুষ্পদ জন্তুর দুই পায়ের সমান বিন্যাস। যদি এমন হত যে, কোনো জানোয়ারের পা দুটো বাঁয়ের চেয়ে ডাইনে এক ফুট বেশি লম্বা তা হলে তার চলনে-স্থিতির চেয়ে অস্থিতিই বেশি হত; সুতরাং তার পিঠে সওয়ার চাপালে কোনো পক্ষেই আরাম থাকত না। ছন্দে তার একটা দৃষ্টান্ত দিই—

তরণী বেয়ে শেষে | এসেছি ভাঙা ঘাটে,
স্থলে না মেলে ঠাঁই | জলে না দিন কাটে।

এ ছড়ায় প্রত্যেক লাইনে চোদ্দ অক্ষর, এবং মাঝে আর শেষে দুই যতিও আছে। তবু ওকে পয়ার বলবার জো নেই। ওর পা-ফেলার ভাগ অসমান।

তরণী | বেয়ে শেষে ॥ এসেছি | ভাঙা ঘাটে।

এক পায়ে তিন মাত্রা, আর-এক পায়ে চার। সাত মাত্রার পরে একটা করে যতি আছে, কিন্তু বেজোড় অঙ্কের অসাম্য ওই যতিতে পুরো বিরাম পায় না। সেইজন্যে সমস্ত পদটার মধ্যে নিয়তই একটা অস্থিরতা থাকে, যে পর্যন্ত না পদের শেষে এসে একটা সম্পূর্ণ স্থিতি ঘটে। এই অস্থিরতাই এরকম ছন্দের স্বভাব, অর্থাৎ পয়ারের ঠিক বিপরীত। এই অস্থিরতার সৌন্দর্যকে ব্যবহার করবার জন্যেই এইরকম ছন্দের রচনা। এর পিঠের উপর যেমন-তেমন করে যুগ্মধ্বনির সওয়ার চাপালে অস্বস্তি ঘটে। যদি লেখা যায়

সায়াহ্ন-অন্ধকারে এসেছি ভগ্ন ঘাটে

তা হলে ছন্দটার কোমর ভেঙে যাবে। তবুও যদি যুগ্মবর্ণ দেওয়াই মত হয় তা হলে তার জন্যে বিশেষভাবে জায়গা করে দিতে হবে। পয়ারের মতো উদারভাবে যেমন খুশি ভার চাপিয়ে দিলেই হল না।

অন্ধরাতে যবে | বন্ধ হল দ্বার,
ঝঞ্ঝাবাতে ওঠে | উচ্চ হাহাকার।

মনে রাখা দরকার, এই শ্লোক অবিকৃত রেখেও এর ভাগের যদি পরিবর্তন করে পড়া যায়, দুই ভাগের বদলে প্রত্যেক লাইনে যদি তিন ভাগ বসানো যায়, তা হলে এটা আর-এক ছন্দ হয়ে যাবে। একে নিম্নলিখিত-রকম ভাগ করে পড়া যাক—

অন্ধরাতে | যবে বন্ধ | হল দ্বার,
ঝঞ্ঝাবাতে | ওঠে উচ্চ | হাহাকার।

পশুপক্ষীদের চলন সমান মাত্রার দুই বা চার পায়ের উপর। এই পা'কে কেবল যে চলতে হয় তা নয়, দেহভার বইতে হয়। পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই বিরাম আছে বলে

বোঝা সামলিয়ে চলা সম্ভব। আজ পর্যন্ত জীবলোকে জুড়িওয়ালা পায়ের পরিবর্তে চাকার উদ্ভব কোথাও হল না ; কেননা, চাকা না থেমে গড়িয়ে চলে, চলার সঙ্গে থামার সামঞ্জস্য তার মধ্যে নেই। দুইমূলক সমমাত্রায় দুই পায়ের চাল, তিনমূলক অসমমাত্রায় চাকার চাল। দুই-পা-ওয়ালা জীব উঁচুনিচু পথের বাধা ডিঙিয়ে চলে যায়, পয়ারের সেই শক্তি। চাকা বাধায় ঠেকলে ধাক্কা খায়, ত্রৈমাত্রিক ছন্দের সেই দশা। তার পথে যুগ্মস্বর যাতে বাধা হয়ে না দাঁড়ায় সেই চেষ্টা করতে হবে।

অধীর বাতাস এল সকালে,
বনেরে বৃথাই শুধু বকালে।
দিনশেষে দেখি চেয়ে,
ঝরা ফুলে মাটি ছেয়ে—
লতারে কাঙাল ক'রে ঠকালে।

এ ছন্দ পয়ারজাতীয়, টেনিস-খেলোয়াড়ের আধা পায়জামার মতো বহরটা নীচের দিকে ছাঁটা। এ ছন্দে তাই যুগ্মস্বর যেমন খুশি চলে।

নবারুণচন্দনের তিলকে
দিক্‌ললাট এঁকে আজি দিল কে।
বরণের পাত্র হাতে
উষা এল সুপ্রভাতে,
জয়শঙ্খ বেজে ওঠে ত্রিলোকে।

শরতে শিশিরবাতাস লেগে
জল ভ'রে আসে উদাসী মেঘে।
বরষন তবু হয় না কেন,
ব্যথা নিয়ে চেয়ে রয়েছে যেন।

এখানে তিন মাত্রার ছন্দ গড়িয়ে চলেছে। চাকার চাল, পা-ফেলার চাল নয় ; তাই যুগ্মবর্ণের স্বেচ্ছাচারিতা এর সইবে না।

চাষের সময়ে যদিও করি নি হেলা,
ভুলিয়া ছিলাম ফসল-কাটার বেলা।

পয়ারের মতোই চোদ্দটা অক্ষরে পদ, কিন্তু জাত আলাদা। তিন মাত্রার চাকায় চলেছে। পদাতিকের সঙ্গে চক্রীর মেলে না।

শ্যামলঘন | বকুলবন | ছায়ে ছায়ে
যেন কী সুর | বাজে মধুর | পায়ে পায়ে।

এখানেও চোদ্দ অক্ষর। কিন্তু এর চালে পয়ারের মতো সমমাত্রার পদচারণের শান্তি নেই বলে বিষমমাত্রার ভাগগুলি যতির মধ্যেও গতির ঝোঁক রেখে দেয়। খোঁড়া মানুষের চলার মতো, যতক্ষণ না লক্ষ্যস্থানে গিয়ে বসে পড়ে থেমেও ভালো করে থামতে পারে না।

বাংলা চলতি ভাষার মূল সংস্কৃত শব্দের অনেকগুলি স্বরবর্ণ ই কোনোটা আধখানা কোনোটা পুরোপুরি ক্ষয়ে যাওয়াতে ব্যঞ্জনগুলো তাল পাকিয়ে অত্যন্ত পরস্পরের গায়ে-পড়া হয়ে গেছে। স্বরের ধ্বনিই ব্যঞ্জনের ধ্বনিকে অবকাশ দেয়, তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে; সেগুলো সরে গেলেই ব্যঞ্জনধ্বনি পিণ্ডীভূত হয়ে পড়ে। চলিত এবং চল্‌তি, ঘৃণা এবং ঘেন্না, বসতি এবং বস্‌তি, শব্দগুলো তুলনা করে দেখলেই বোঝা যাবে। সংস্কৃত ভাষায় স্বরধ্বনির দাক্ষিণ্য, আর প্রাকৃত-বাংলায় তার কার্পণ্য, এইটেই হল দুটো ভাষার ধ্বনিগত মূল পার্থক্য। স্বরবর্ণবহুল ধ্বনিসংগীত এবং স্বরবর্ণবিরল ধ্বনিসংগীতে প্রভূত প্রভেদ। এই দুইয়েরই বিশেষ মূল্য আছে। বাঙালি কবি তাঁদের কাব্যে যথাস্থানে দুটোরই সুযোগ নিতে চান। তাঁরা ধ্বনিরসিক বলেই কোনোটাকেই বাদ দিতে ইচ্ছা করেন না।

প্রাকৃত-বাংলার ধ্বনির বিশেষত্ববশত দেখতে পাই, তার ছন্দ তিন মাত্রার দিকেই বেশি ঝুঁকেছে। অর্থাৎ, তার তালটা স্বভাবতই একতালাজাতীয়, কাওয়ালিজাতীয় নয়; সংস্কৃত ভাষায় এই 'তাল' শব্দটা দুই সিলেব্‌ল্‌এর; বাংলায় 'ল' আপন অন্তিম অকার খসিয়ে ফেলেছে, তার জায়গায় টি বা টা যোগ করে শব্দটাকে পুষ্ট করবার দিকে তার ঝোঁক। টি টা-এর ব্যবধান যদি না থাকে তবে ঐ নিঃস্বর ধ্বনিটি প্রতিবেশী যে-কোনো ব্যঞ্জন বা স্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পূর্ণতা পেতে চায়।

রূপসাগরের তলে ডুব দিনু আমি

এটা সংস্কৃত-বাংলার ছাঁদে লেখা। এখানে শব্দগুলো পরস্পর গা-ঘেঁষা নয়। বাংলা প্রাকৃতের অনিবার্য নিয়মে এই পদের যে শব্দগুলি হসন্ত, তারা আপনারই স্বরধ্বনিকে প্রসারিত করে ফাঁক ভরতি করে নিয়েছে। 'রূপ' এবং 'ডুব' আপন উকারধ্বনিকে টেনে বাড়িয়ে দিলে। 'সাগরের' শব্দ আপন একারকে পরবর্তী হসন্ত র-এর পঙ্গুতা চাপা দিতে লাগিয়েছে। এই উপায়ে ওই পদটার প্রত্যেক শব্দ নিজের মধ্যেই নিজের মর্যাদা বাঁচিয়ে চলেছে। অর্থাৎ এ ছন্দে ডিমক্রেসির প্রভাব নেই। এই-রকমের ছন্দে দুই মাত্রার ধ্বনি আপন পদক্ষেপের প্রত্যেক পর্যায়ে যে অবকাশ পায় তা

নিয়ে তার গৌরব। বস্তুত, এই অবকাশের সুযোগ গ্রহণ করে তার ধ্বনিসমারোহ বাড়িয়ে তুললে এ ছন্দের সার্থকতা। যথা—

চৈতন্য নিমগ্ন হল রূপসিন্ধুতলে।

প্রাকৃত-বাংলা দেখা যাক।

রূপসাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপ রতন আশা ক'রে

এখানে 'রূপ' আপন হসন্ত 'প'এর ঝোঁকে 'সাগরে'র 'সা'টাকে টেনে আপন করে নিয়েছে, মাঝে ব্যবধান থাকতে দেয় নি। 'রূপ-সা' তাই আপনিই তিন মাত্রা হয়ে গেল। 'সাগরে'র বাকি টুকরো রইল 'গরে'। সে আপন ওজন বাঁচাবার জন্যে 'রে'টাকে দিলে লম্বা করে, তিন মাত্রা পুরল। 'ডুব' আপনার হসন্তর টানে 'দিয়েছি'র 'দি'টাকে করলে আত্মসাৎ। এমনি করে আগাগোড়া তিন মাত্রা জমে উঠল। হসন্ত-প্রধান ভাষা সহজেই তিন মাত্রার দানা পাকায়, এটা দেখেছি। এমন-কি, যেখানে হসন্তের ভিড় নেই সেখানেও তার ওই একই চাল। এটা যেন তার অভ্যস্ত হয়ে মজ্জাগত হয়ে গেছে। যেমন—

অচে- | তনে- | ছিলেম | ভালো- ।
আমায় | চেতন | করলি | কেনে- ।

প্রাকৃত-বাংলার এই তিন মাত্রার ভঙ্গি চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিরা সাধুভাষাতেও গ্রহণ করেছেন। যেমন—

হাসিয়া হাসিয়া মুখ নিরখিয়া
মধুর কথাটি কয়।
ছায়ার সহিতে ছায়া মিশাইতে
পথের নিকটে রয়।

কিন্তু প্রাকৃত-বাংলার ক্রিয়াপদ নিয়ে একটু ভাববার বিষয় আছে।

মত্তরোষে বীরভদ্র ছুটল ঊর্ধ্বশ্বাসে,
ঘূর্ণিবেগে উড়্‌ল ধুলো রক্ত সন্ধ্যাকাশে।

কিম্বা—

ছুটল কেন মহেন্দ্রের আনন্দের ঘোর,
টুটল কেন উর্বশীর মঞ্জীরের ডোর।
বৈকালে বৈশাখী এল আকাশলুণ্ঠনে,
শুক্লরাতি ঢাক্‌ল মুখ মেঘাবগুণ্ঠনে।

এদের সম্বন্ধে কী বলা যাবে।

প্রধানত ক্রিয়াপদেরই বিশেষ রূপটাতে প্রাকৃত-বাংলার চেহারা ধরা পড়ে। উপরের ছড়াগুলিতে 'উড়্‌ল' 'ছুট্‌ল' 'টুট্‌ল' 'ঢাক্‌ল' প্রভৃতি প্রয়োগ নিয়ে তর্কটা ছন্দের তর্ক নয়, ভাষারীতির। এইরকম ক্রিয়াপদ যদি ব্যবহার করি তবে ধরে নিতে হবে ওই ছড়াগুলি প্রাকৃত-বাংলাতেই লেখা হচ্ছে। আমি যে প্রবন্ধ লিখছি এও প্রাকৃত-বাংলার ঠাটে। যদি আমাকে কারো সঙ্গে মুখে মুখে আলোচনা করতে হত তা হলে এই লেখার সঙ্গে আমার মুখের কথার কোনো তফাত থাকত না। মাঝে মাঝে অভ্যাসদোষে হয়তো ইংরেজি শব্দ মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেত, কিন্তু কখনোই 'করিয়াছিল' 'গিয়াছে' ধরনের ক্রিয়াপদ ভুলেও ব্যবহার করতে পারতুম না। আবার প্রাকৃত-বাংলার ক্রিয়াপদ সংস্কৃত-বাংলায় ব্যবহার করাও চলে না। প্রবোধচন্দ্র 'বিচিত্রা'য় লিখেছেন যে, বাঙালি কবিরা সাহস করে কবিতায় 'করিব' 'চলিব' প্রভৃতি প্রয়োগ না করে কেন 'করব' 'চলব' প্রয়োগ না করেন। যদি প্রশ্নটার অর্থ এই হয় যে, অযথাস্থানে কেন করি নে তবে তার উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক। যদি বলেন, যথাস্থানেও কেন করি নে, তবে তার উত্তরে বলব, যথাস্থানে করে থাকি।

যে তর্ক নিয়ে লেখা শুরু করেছিলেম সেটাতে ফিরে আসা যাক। বাংলায় হসন্তমধ্য শব্দগুলোর কয় মাত্রা গণনা করা হবে, তাই নিয়ে সংশয় উঠেছে।

যেগুলি ক্রিয়াপদ নয় সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এ প্রবন্ধে গোড়াতেই আলোচনা করেছি। বলেছি, নিয়মের বিকল্প চলে; কেননা, বাঙালির কান সাধারণ ব্যবহারে সেই বিকল্প মঞ্জুর করেছে। এ ক্ষেত্রে হিসাবে একটা মাত্রার কমিবেশি নিয়ে তর্ক ওঠে না।

চিম্‌নি ভেঙে গেছে দেখে গিন্নি রেগে খুন;
ঝি বলে, আমার দোষ নেই, ঠাকরুন।

অন্তত 'চিমনি'কে দুই মাত্রা করায় কবির দোষ হয় নি। আবার

চিমনি ফেটেছে দেখে গৃহিণী সরোষ;
ঝি বলে, ঠাক্‌রুন মোর নাই কোনো দোষ।

এরকম বিপর্যয়ও চলে। একই ছড়ায় 'চিম্‌নি'কে এক মাত্রা গ্রেস মার্কা দেওয়া হয়েছে, অথচ 'ঠাক্‌রুন'কে খর্ব করে তিন মাত্রায় নামানো গেল। অপরাধ ঘটেছে বলে মনে করি নি।

কুস্তির আখড়ায় ভিস্তিকে ধরে
জল ছিটাইয়া দাও, ধুলা যাক মরে।

অপর পক্ষে—

রাস্তা দিয়ে কুস্তিগির চলে ঘেঁষাঘেঁষি,
একটা নয় দুটো নয় একশোর বেশি।

প্রয়োজনমত এটাও চলে, ওটাও চলে। নিখতির মাপে বিচার করতে গেলে বিশুদ্ধ ওজনের পয়ার হচ্ছে—

পালোয়ানে পালোয়ানে চলে ঘেঁষাঘেঁষি।

তাতে প্রত্যেক অক্ষর নিখুঁত এক মাত্রা, সবসুদ্ধ চোদ্দটা। 'রাস্তা' 'কুস্তি' প্রভৃতি শব্দে ওজন বেড়ে যায়, তবুও বহুসহিষ্ণু পয়ারকে কাবু করতে পারে না।

প্রাকৃত-বাংলার ক্রিয়াপদ নিয়ে কথা হচ্ছিল। ক্রিয়াপদেই তার আপন চেহারা। ওইটুকু ছাড়া তার আর কোনো উপসর্গ নেই বললেই চলে। বাংলা-সংস্কৃত ভাষার মতো সে শুচিবায়ুগ্রস্ত নয়। ভোজে বসে গেছে ব্রাহ্মণ, তাকে পরিবেশনকর্তা জিজ্ঞাসা করলে, নিরামিষ না আমিষ। সে বললে, দ্বৌ কর্তব্যৌ। তেমনি শব্দ-বাছাই নিয়ে যদি প্রাকৃত-বাংলাকে প্রশ্ন করা যায় 'কী চাই, প্রাকৃত শব্দ না সংস্কৃত শব্দ' সে বলবে, দ্বৌ কর্তব্যৌ। তার জাতবিচার নেই বললেই হয়। পছন্দ হবামাত্র ইংরেজি পারসি সব শব্দই সে আত্মসাৎ করে। আবার অমরকোষবিহারী বড়ো বড়ো বহরওয়ালা সংস্কৃত শব্দকে ওদেরই ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে নেয়। সংস্কৃত ভাষার প্রতি সম্ভ্রমবশত তার মুখে বাধবে না—

রূপযৌবন উপঢৌকন দেবেন কন্যা তাহারে,
তাই পরেছেন চীনাংশুকের পট্টবসন বাহারে।

নন-কো-অপরেশনের দিনেও ইংরেজি শব্দ চালিয়ে দিতে পিকেটিঙের ভয় নেই। যথা—

আইডিয়াল নিয়ে থাকে, নাহি চড়ে হাঁড়ি,
প্রাক্‌টিক্যাল লোকে বলে, এ যে বাড়াবাড়ি।
শিবনেত্র হল বুঝি, এইবার মোলো,
অক্‌সিজেন নাকে দিয়ে চাঙ্গা করে তোলো।

কিন্তু সংস্কৃত-বাংলায় বাছবিচার খুব কড়া। আধুনিকদের হাতে পড়ে ম্লেচ্ছপনা কিছু-কিছু সয়ে গেছে; কিন্তু সেটুকু বড়োজোর বাইরের রোয়াকে, ভিতরমহলে রীতরক্ষা সম্বন্ধে কষাকষি।

কর্ণে দিলা ঝুম্‌কাফুল, নাসিকায় নথ,
অঙ্গসজ্জাসমাধানে ভূরি মেহন্নৎ।

এটাকে প্রহসন বলে পাঠক হয়তো মাপ করতে পারেন, কিন্তু প্রাকৃত-বাংলায় এইরকম

ভিন্নপর্যায়ের শব্দগুলো যখন কাছাকাছি বসানো যায় তাদের আওয়াজের মধ্যে অত্যন্ত বেশি বেমিল হয় না। আমার এই গদ্যপ্রবন্ধ পড়ে দেখলে পাঠকেরা সেটা লক্ষ্য করতে পারবেন। কিন্তু এটাও দেখে থাকবেন, এটার মধ্যে 'করিব' 'করিয়াছে' 'করিয়াছিল' প্রভৃতি ক্রিয়ারূপ কলমের কোনো ভুলে ঢুকে পড়বার কোনো সম্ভাবনা নেই। সেইজন্যে আমরা বাংলায় সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে দুই ভিন্ন নিয়মেই চলি, তার অন্যথা করা অসম্ভব। তাই বাংলা কাব্যে এই দুই ভাষার ধারায় ছন্দের রীতি যদি দুই ভিন্ন পথ নিয়ে থাকে তবে সেই আপত্তিতে শুদ্ধির গোময়লেপনে সমস্ত একাকার করবার পক্ষপাতী আমি নই। আমি বলি, দ্বৌ কর্তব্যৌ। কারণ, ছন্দের এই দ্বিবিধ রসেই আমার রসনার লোভ।[১]

মাঘ ১৩৩৮

ছন্দের মাত্রা

বহুকাল পূর্বে একটি গান রচনা করেছিলেম। 'সবুজ পত্রে' সেটি উদ্ধৃত হয়েছিল।

আঁধার রজনী পোহালো,
জগৎ পূরিল পুলকে,
বিমল প্রভাতকিরণে
মিলিল দ্যুলোক ভূলোকে।

তা ছাড়া এই ছন্দে পরবর্তী কালে দুই-একটি শ্লোক লিখেছিলুম। যথা—

গোড়াতেই ঢাক বাজনা,
কাজ করা তার কাজ না।

আর-একটি—

শকতিহীনের দাপনি
আপনারে মারে আপনি।

বলা বাহুল্য এগুলি ৯ মাত্রার চালে লেখা।

'সবুজ পত্রে'র প্রবন্ধে তার পরে দেখিয়েছিলুম ধ্বনিসংখ্যার কতরকম হেরফের করে এই ছন্দের বৈচিত্র্য ঘটতে পারে, অর্থাৎ তার চলন কত ভঙ্গির হয়। তাতে যে দৃষ্টান্ত রচনা করেছিলেম তার পুনরুক্তি না করে নতুন বাণী প্রয়োগ করা যাক।

১ পরিশিষ্টে 'ছন্দে হসন্ত' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

এইখানে বলে রাখা ভালো এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত উদাহরণগুলিতে প্রত্যেক ভাগে তাল দিলে ছন্দের পার্থক্য ধরা সহজ হয়।

উপরের ছন্দে ৩+৩+৩-এর লয়। নীচের ছন্দে ৩+২+৪-এর লয়।

আসন | দিলে | অনাহূতে,
ভাষণ | দিলে | বীণাতানে,
বুঝি গো | তুমি | মেঘদূতে |
পাঠায়ে | ছিলে | মোর পানে।
বাদল রাতি এল যবে
বসিয়াছিনু একা একা,
গভীর গুরু গুরু রবে
কী ছবি মনে দিল দেখা।
পথের কথা পুবে হাওয়া
কহিল মোরে থেকে থেকে;
উদাস হয়ে চলে যাওয়া,
খ্যাপামি সেই রোধিবে কে।
আমার তুমি অচেনা যে
সে কথা নাহি মানে হিয়া,
তোমারে কবে মনোমাঝে
জেনেছি আমি না জানিয়া
ফুলের ডালি কোলে দিনু,
বসিয়াছিলে একাকিনী,
তখনি ডেকে বলেছিনু,
তোমারে চিনি, ওগো চিনি।

তার পরে ৪+৩+২—

বলেছিনু | বসিতে | কাছে,
দেবে কিছু | ছিল না | আশা,
দেব ব'লে | যেজন | যাচে
বুঝিলে না | তাহারো | ভাষা।
শুকতারা চাঁদের সাথি
বলে, "প্রভু, বেসেছি ভালো,

নিয়ে যেয়ো আমার বাতি
যেথা যাবে তোমার আলো।"
ফুল বলে, "দখিনহাওয়া,
বাঁধিব না বাহুর ডোরে,
ক্ষণতরে তোমারে পাওয়া
চিরতরে দেওয়া যে মোরে।"

তার পরে ৩+৬—

বিজুলি | কোথা হতে এলে,
তোমারে | কে রাখিবে বেঁধে।
মেঘের | বুক চিরি গেলে
অভাগা | মরে কেঁদে কেঁদে।
আগুনে গাঁথা মণিহারে
ক্ষণেক সাজায়েছ যারে,
প্রভাতে মরে হাহাকারে
বিফল রজনীর খেদে।

দেখা যাক ৪+৫—

মোর বনে | ওগো গরবী,
এলে যদি | পথ ভুলিয়া,
তবে মোর | রাঙা করবী
নিজ হাতে | নিয়ো তুলিয়া।

আর-একটা—

জলে ভরা | নয়নপাতে
বাজিতেছে | মেঘরাগিণী,
কী লাগিয়া | বিজনরাতে
উড়ে হিয়া, | হে বিবাগিনী।
ম্লান মুখে | মিলালো হাসি,
গলে দোলে | নবমালিকা।
ধরাতলে | কী ভুলে আসি
সুর ভোলে | সুরবালিকা।

তার পরে ৪+৪+১। বলে রাখা ভালো এই ছন্দটি পড়বার সময় সবশেষ ধ্বনিটিকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

বারে বারে | যায় চলি | য়া,
ভাসায় ন | য়ননীরে | সে,
বিরহের | ছলে ছলি | য়া
মিলনের | লাগি ফিরে | সে।
যায় নয়নের আড়া লে,
আসে হৃদয়ের মাঝে গো।
বাঁশিটিরে পায়ে মাড়া লে
বুকে তার সুর বাজে গো।
ফুলমালা গেল শুকা য়ে,
দীপ নিবে গেল বাতা সে,
মোর ব্যথাখানি লুকা য়ে
মনে তার রহে গাঁথা সে।
যাবার বেলায় ছুয়া রে
তালা ভেঙে নেয় ছিনি য়ে,
ফিরিবার পথ উহা রে
ভাঙা দ্বার দেয় চিনি য়ে॥

৩+২+৪-এর লয় পূর্বে দেখানো হয়েছে। ৫+৪-এর লয় এখানে দেওয়া গেল।

আলো এল যে | দ্বারে তব,
ওগো মাধবী | বনছায়া।
দোঁহে মিলিয়া | নবনব
তৃণে বিছায়ে | গাঁথো মায়া।
চাঁপা, তোমার আঙিনাতে
ফেরে বাতাস কাছে কাছে,
আজি ফাগুনে একসাথে
দোলা লাগিয়ো নাচে নাচে॥
বধূ, তোমার দেহলিতে
বর আসিছে দেখিছ কি।

আজি তাহার   বাঁশরিতে
হিয়া মিলায়ে   দিয়ো, সখি।

৬+৩-এর ঠাটেও ৯ মাত্রাকে সাজানো চলে। যেমন—

সেতারের তারে | ধানশী
মিড়ে মিড়ে উঠে | বাজিয়া।
গোধূলির রাগে | মানসী
সুরে যেন এল | সাজিয়া।

আর-একটা—

তৃতীয়ার চাঁদ | বাঁকা সে,
আপনারে দেখে | ফাঁকা সে।
তারাদের পানে | তাকিয়ে
কার নাম যায় | ডাকিয়ে,
সাথি নাহি পায় | আকাশে।

এতক্ষণ এই যে ৯ মাত্রার ছন্দটাকে নিয়ে নয়-ছয় করছিলুম সেটা বাহাদুরি করবার জন্যে নয়, প্রমাণ করবার জন্যে যে এতে বিশেষ বাহাদুরি নেই। ইংরেজি ছন্দে এক্‌সেন্‌টের প্রভাব; সংস্কৃত ছন্দে দীর্ঘহ্রস্বের সুনির্দিষ্ট ভাগ। বাংলায় তা নেই, এইজন্যে লয়ের দাবিরক্ষা ছাড়া বাংলা ছন্দে মাত্রা বাড়িয়ে-কমিয়ে চলার আর-কোনো বাধা নেই। 'জল পড়ে পাতা নড়ে' থেকে আরম্ভ করে পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ মাত্রা পর্যন্ত বাংলা ছন্দে আমরা দেখি। এই সুযোগে কেউ বলতে পারেন, এগারো মাত্রার ছন্দ বানিয়ে নতুন কীর্তি স্থাপন করব। আমি বলি, তা করো কিন্তু পুলকিত হোয়ো না, কেননা কাজটা নিতান্তই সহজ। দশ মাত্রার পরে আর-একটা মাত্রা যোগ করা একেবারেই দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়। যেমন—

চামেলির ঘনছায়া-বিতানে
বনবীণা বেজে ওঠে কী তানে।
স্বপনে মগন সেথা মালিনী
কুসুমমালায় গাঁথা শিথানে।

অন্যরকমের মাত্রাভাগ করতে চাও সেও কঠিন নয়। যেমন—

মিলনসুলগনে | কেন বল্‌,
নয়ন করে তোর | ছল্‌ছল্‌।

বিদায়দিনে যবে | ফাটে বুক,
সেদিনো দেখেছি তো | হাসিমুখ।

তার পরে তেরো মাত্রার প্রস্তাবটা শুনতে লাগে খাপছাড়া এবং নতুন, কিন্তু পয়ার থেকে এক মাত্রা হরণ করতে দুঃসাহসের দরকার হয় না। সে কাজ অনেকবার করেছি, তা নিয়ে নালিশ ওঠে নি। যথা—

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।

এক মাত্রা যোগ করে পয়ারের জাতিবৃদ্ধি করাও খুবই সহজ। যথা—

হে বীর, জীবন দিয়ে মরণেরে জিনিলে,
নিজেরে নিঃস্ব করি বিশ্বেরে কিনিলে।

ষোলো মাত্রার ছন্দ দুর্লভ নয়। অতএব দেখা যাক সতেরো মাত্রা—

নদীতীরে দুই | কূলে কূলে |
কাশবন দুলি | ছে।
পূর্ণিমা তারি | ফুলে ফুলে |
আপনারে ভুলি | ছে।

আঠারো মাত্রার ছন্দ সুপরিচিত। তার পরে উনিশ—

ঘন মেঘভার গগনতলে,
বনে বনে ছায়া তারি,
একাকিনী বসি নয়নজলে
কোন্ বিরহিণী নারী।

তার পরে কুড়ি মাত্রার ছন্দ সুপ্রচলিত। একুশ মাত্রা, যথা—

বিচলিত কেন মাধবীশাখা,
মঞ্জরি কাঁপে থরথর।
কোন্ কথা তার পাতায় ঢাকা
চুপিচুপি করে মরমর।

তার পরে— আর কাজ নেই। বোধ হয় যথেষ্ট প্রমাণ করতে পেরেছি যে, বাংলায় নতুন ছন্দ তৈরি করতে অসাধারণ নৈপুণ্যের দরকার করে না।

সংস্কৃত ভাষায় নূতন ছন্দ বানানো সহজ নয়, পুরানো ছন্দ রক্ষা করাও কঠিন। যথানিয়মে দীর্ঘহ্রস্ব স্বরের পর্যায় বেঁধে তার সংগীত। বাংলায় সেই দীর্ঘধ্বনিগুলিকে দুইমাত্রায় বিশ্লিষ্ট করে একটা ছন্দ দাঁড় করানো যেতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে মূলের মর্যাদা থাকবে না। মন্দাক্রান্তার বাংলা রূপান্তর দেখলেই তা বোঝা যাবে।

যক্ষ সে কোনো জনা আছিল আনমনা, সেবার অপরাধে প্রভুশাপে
হয়েছে বিলয়গত মহিমা ছিল যত, বরষকাল যাপে দুখতাপে।
নির্জন রামগিরি শিখরে মরে ফিরি একাকী দূরবাসী প্রিয়াহারা
যেথায় শীতল ছায় ঝরনা বহি যায় সীতার স্নানপূত জলধারা।
মাস পরে কাটে মাস, প্রবাসে করে বাস প্রেয়সীবিচ্ছেদে বিমলিন;
কনকবলয়-খসা বাহুর ক্ষীণ দশা, বিরহদুখে হল বলহীন।
একদা আষাঢ় মাসে প্রথম দিন আসে, যক্ষ নিরখিল গিরি'পর
ঘনঘোর মেঘ এসে লেগেছে সানুদেশে, দন্ত হানে যেন করিবর।

কার্তিক ১৩৩৯

২

উপরের প্রবন্ধে লিখেছি 'আঁধার রজনী পোহালো' গানটি নয় মাত্রার ছন্দে রচিত। ছন্দতত্ত্বে প্রবীণ অমূল্যবাবু ওর নয়-মাত্রিকতার দাবি একেবারে নামঞ্জুর করে দিলেন। আর কারো হাত থেকে এ রায় এলে তাকে আপিল করবার যোগ্য বলেও গণ্য করতুম না, এ ক্ষেত্রে ধাঁধা লাগিয়ে দিলে। রাস্তার লোক এসে যদি আমাকে বলে তোমার হাতে পাঁচটা আঙুল নেই, তা হলে মনে উদ্‌বেগের কোনো কারণ ঘটে না। কিন্তু, শারীরতত্ত্ববিদ্‌ এসে যদি এই সংবাদটা জানিয়ে যান তা হলে দশবার করে নিজের আঙুল গুনে দেখি, মনে ভয় হয়, অঙ্ক বুঝি ভুলে গেছি। অবশেষে নিতান্ত হতাশ হয়ে স্থির করি, যে-কটাকে এতদিন আঙুল বলে নিশ্চিন্ত ছিলুম বৈজ্ঞানিক মতে তার সব-কটা আঙুলই নয়; হয়তো শাস্ত্রবিচারে জানা যাবে যে, আমার আঙুল আছে মাত্র তিনটি, বাকি দুটো বুড়ো আঙুল আর কড়ে আঙুল, তারা হরিজন-শ্রেণীয়।

বর্তমান তর্কে আমার মনে সেইরকম উদ্‌বেগ জন্মেছে। 'আঁধার রজনী পোহালো' চরণের মাত্রাসংখ্যা যে দিক থেকে যেমন করে গ'নে দেখি, নয় মাত্রায় গিয়ে ঠেকে। অমূল্যবাবু বললেন, এটা তো নয় মাত্রার ছন্দ নয়ই, বাংলা ভাষায় আজও নয় মাত্রার উদ্ভব হয় নি, হয়তো নিরবধিকালে কোনো এক সময়ে হতেও পারে। তিনি বলেন, বাংলা ছন্দ দশ মাত্রাকে মেনেছে, নয় মাত্রাকে মানে নি। এ কথায় আরো আমার ধাঁধা লাগল।

অমূল্যবাবু পরীক্ষা করে বলছেন, এ ছন্দে জোড়ের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। 'আঁধার রজনী' পর্যন্ত এক পর্ব, এইখানে একটা ফাঁক; তার পরে 'পোহালো' শব্দে তিন মাত্রার একটা পঙ্গু পর্বাঙ্গ; তার পরে পুরো যতি। অর্থাৎ, এ ছন্দে ছয়

মাত্রারই প্রাধান্য। এর ধড়টা ছয় মাত্রার, ল্যাজটা তিন মাত্রার। চোখ দিয়ে এক পঙ্‌ক্তিতে নয় মাত্রা দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু অমূল্যবাবুর মতে, কান দিয়ে দেখলে ওর দুটো অসমান ভাগ বেরিয়ে পড়ে।

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, আমার অঙ্কবিদ্যায় আমি যে সংখ্যাকে ৯ বলি অমূল্যবাবুর অঙ্কশাস্ত্রেও তাকেই ৯ বলে বটে, কিন্তু ছন্দের মাত্রানির্ণয় সম্বন্ধে তাঁর পদ্ধতির সঙ্গে আমার পদ্ধতির মূলেই প্রভেদ আছে। কথাটা পরিষ্কার করে নেওয়া ভালো।

পৃথিবী চলছে, তার একটা ছন্দ আছে। অর্থাৎ, তার গতিকে মাত্রাসংখ্যায় ভাগ করা যায়। এই ছন্দের পূর্ণায়তনকে নির্ণয় করব কোন্ লক্ষণ মতে। পৃথিবী নিয়মিত কালে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। আমাদের পঞ্জিকা-অনুসারে পয়লা বৈশাখ থেকে আরম্ভ করে চৈত্রসংক্রান্তিতে তার আবর্তনের এক পর্যায় শেষ হয়, তার পরে আবার সেই পরিমিতকালে পয়লা বৈশাখ থেকে পুনর্বার তার আবর্তন শুরু হয়। এই পুনরাবর্তনের দিকে লক্ষ করে আমরা বলতে পারি, পৃথিবীর সূর্যপ্রদক্ষিণের মাত্রাসংখ্যা ৩৬৫ দিন।

মহাভারতের কথা অমৃতসমান,
কাশীরামদাস কহে শুনে পুণ্যবান্।

এই ছন্দের যাত্রাপথে পুনরাবর্তন আরম্ভ হয়েছে কোথায় সে তো জানা কথা। সেই অনুসারে সর্বজনে বলে থাকে, এর মাত্রাসংখ্যা চোদ্দ। বলা বাহুল্য, এই চোদ্দ মাত্রা একটা অখণ্ড নিরেট পদার্থ নয়। এর মধ্যে জোড় দেখা যায়, সেই জোড় আট মাত্রার অবসানে, অর্থাৎ 'মহাভারতের কথা' একটুখানি দাঁড়িয়েছে যেখানে এসে। পয়ারে এই দাঁড়াবার আড্ডা দু জায়গায়, প্রথম আট ধ্বনিমাত্রার পরে ও শেষার্ধের ছয় ধ্বনি-মাত্রার ও দুই যতিমাত্রার শেষে। পৃথিবীর প্রদক্ষিণ-ছন্দের মধ্যেও দুইভাগ আছে, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন। যতি-সমেত ষোলো মাত্রা পয়ারেও তেমনি আছে উত্তরভাগ ও দক্ষিণভাগ, কিন্তু সেই দুটি ভাগ সমগ্রেরই অন্তর্গত।

মহাভারতের বাণী
　　অমৃতসমান মানি,
কাশীরামদাস ভনে
　　শোনে তাহা সর্বজনে।

যদিও পয়ারের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তবু একে অন্য ছন্দ বলব, কারণ এর পুনরাবর্তন আট মাত্রায়, ষোলো মাত্রায় নয়।

আঁধার রজনী পোহালো,
　　জগৎ পুরিল পুলকে।

এই ছন্দের আবর্তন ছয় মাত্রার পর্যায়ে ঘটে না, তার কক্ষপথ সম্পূর্ণ হয়েছে ৯ মাত্রায়। নয় মাত্রায় তার প্রদক্ষিণ নিজেকে বারে বারে বহুগুণিত করছে। এই নয় মাত্রায় মাঝে-মাঝে সমভাগে জোড়ের বিচ্ছেদ আছে। সেই জোড় ছয় মাত্রায় না, তিন মাত্রায়।

এই ছন্দের লক্ষণ কী। প্রশ্নের উত্তর এই যে, এর পূর্ণভাগ নয় মাত্রা নিয়ে, আংশিক ভাগ তিন, এবং সেই প্রত্যেক ভাগের মাত্রাসংখ্যা তিন। কোনো পাঠক যদি ছয় মাত্রার পরে এসে হাঁপ ছাড়েন, তাঁকে বাধা দেবার কোনো দণ্ডবিধি নেই; সুতরাং সেটা তিনি নিজের স্বচ্ছন্দেই করবেন, আমার ছন্দে করবেন না। আমার ছন্দের লক্ষণ এই— প্রত্যেক পদে তিন কলা, প্রত্যেক কলায় তিন মাত্রা, অতএব সমগ্র পদের মাত্রাসমষ্টি ৯। অমূল্যবাবু এটিকে নিয়ে যে ছন্দ বানিয়েছেন তার প্রত্যেক পদে দুই কলা। প্রথম কলার মাত্রাসংখ্যা ছয়, দ্বিতীয় কলার তিন, অতএব সমগ্র পদের মাত্রাসমষ্টি ৯। দুটি ছন্দেরই মোট আয়তন একই হবে, কানে শোনাবে ভিন্নরকম।

ছান্দসিক যাই বলুন, এখানে ছন্দরচয়িতা হিসাবে আমার আবেদন আছে। ছন্দের তত্ত্ব সম্বন্ধে আমি যা বলি সেটা আমার অশিক্ষিত বলা, সুতরাং তাতে দোষ স্পর্শ করতে পারে; কিন্তু ছন্দের রস সম্বন্ধে আমি যদি কিছু আলোচনা করি, সংকোচ করব না, কেননা ছন্দসৃষ্টিতে অশিক্ষিতপটুত্বের মূল্য উপেক্ষা করবার নয়। 'আঁধার রজনী পোহালো' রচনাকালে আমার কান যে আনন্দ পেয়েছিল সেটা অন্যছন্দোজনিত আনন্দ থেকে বিশেষভাবে স্বতন্ত্র। কারণটা বলি।

অন্যত্র বলেছি, দুই মাত্রায় স্থৈর্য আছে, কিন্তু বেজোড় বলেই তিন মাত্রা অস্থির। ত্রৈমাত্রিক ছন্দে সেই অস্থিরতার বেগটাকে বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়।

বিংশতি কোটি মানবের বাস
এ ভারতভূমি যবনের দাস
রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা।

এ ছন্দে শব্দগুলি পরস্পরকে অস্থিরভাবে ঠেলা দিচ্ছে। একে জোড়মাত্রার ছন্দে রূপান্তরিত করা যাক।

যেথায় বিংশতি কোটি মানবের বাস
সেই তো ভারতবর্ষ যবনের দাস
শৃঙ্খলেতে বাঁধা পড়ে আছে।

এর চালটা শান্ত।

আলোচ্য নয় মাত্রার ছন্দে তিন সংখ্যার অস্থিরতা শেষপর্যন্তই রয়ে গেছে। সেটা উচিত নয়, ছয় মাত্রার পরে থামবার একটুখানি অবকাশ দেওয়া ভালো— এমন তর্ক

তোলা যেতে পারে। কিন্তু ছন্দের সিদ্ধান্ত তর্কে হয় না, ওটার মীমাংসা কানে। সৌভাগ্যক্রমে এ সভায় সুযোগ পেয়েছি কানের দরবারে আরজি পেশ করবার। নয় মাত্রার চঞ্চল ভঙ্গিতে কান সায় দিচ্ছে না, এ কথা যদি সুধীজন বলেন তা হলে অগত্যা চুপ করে যাব, কিন্তু তবুও নিজের কানের স্বীকৃতিকে অশ্রদ্ধা করতে পারব না।

'আঁধার রজনী পোহালো' কবিতাটি গানরূপে রচিত। সংগীতাচার্য ভীমরাও শাস্ত্রী মৃদঙ্গের বোলে একে যে তালের রূপ দিয়েছিলেন তাতে দুটি আঘাত এবং একটি ফাঁক। যথা—

১ ২ •

আঁধার | রজনী | পোহালো।

এ কথা সকলেরই জানা আছে যে, ফাঁকটা তালের শেষ ঝোঁক, তার পরে পুনরাবর্তন। এই গানের স্বাভাবিক ঝোঁক প্রত্যেক তিন মাত্রায় এবং এর তালের অর্থাৎ ছন্দের সম্পূর্ণতা তিনমাত্রাঘটিত তিন ভাগে। অমূল্যবাবু বা শৈলেন্দ্রবাবু যদি অন্য কোনো রকমের ভাগ ইচ্ছা করেন তবে রচয়িতার ইচ্ছার সঙ্গে তার ঐক্য হবে না, এর বেশি আমার আর কিছু বলবার নাই।

উত্তরদিগন্ত ব্যাপি দেবতাত্মা হিমাদ্রি বিরাজে,
দুই প্রান্তে দুই সিন্ধু, মানদণ্ড যেন তারি মাঝে;

এই ছন্দকে আঠারো মাত্রা যখন বলি তখন সমগ্র পদের মাত্রাসংখ্যা গণনা করেই বলে থাকি। আট মাত্রার পরে এর একটা সুস্পষ্ট বিরাম আছে বলে এর আঠারো মাত্রার সীমানার বিরুদ্ধে নালিশ চলে না।

আমাদের হাতে তিন পর্ব আছে। মণিবন্ধ পর্যন্ত এক; এটি ছোটো পর্ব, কনুই পর্যন্ত দুই; কনুই থেকে কাঁধ পর্যন্ত তিন; যাকে আমরা সমগ্র বাহু বলি সে এই তিন পর্ব মিলিয়ে। আমাদের দেহে এক বাহু অন্য বাহুর অবিকল পুনরাবৃত্তি। প্রত্যেক ছন্দেরই এমনিতরো একটি সম্পূর্ণ রূপকল্প অর্থাৎ প্যাটার্ন্‌ আছে। ছন্দোবদ্ধ কাব্যে সেই প্যাটার্ন্‌কেই পুনঃপুনিত করে। সেই প্যাটার্নের সম্পূর্ণ সীমার মধ্যেই তার নানা পর্ব পর্বাঙ্গ প্রভৃতি যা-কিছু। সেই সমগ্র প্যাটার্নের মাত্রাই সেই ছন্দের মাত্রা। 'আঁধার রজনী পোহালো' গানটিকে এইজন্যেই নয় মাত্রার বলেছি। যেহেতু প্রত্যেক নয় মাত্রাকে নিয়েই তার পুনঃপুন আবর্তন।

কোন্‌ ছন্দ কী রকম ভাগ করে পড়তে হবে, এ নিয়ে মতান্তর হওয়া অসম্ভব নয়। পুরাতন ছন্দগুলির নাম-অনুসারে সংজ্ঞা আছে। নতুন ছন্দের নামকরণ হয় নি। এইজন্যে তার আবৃত্তির কোনো নিশ্চিত নির্দেশ নেই। কবির কল্পনা এবং

পাঠকের রুচিতে যদি অনৈক্য হয় তবে কোনো আইন নেই যা নিয়ে নালিশ চলতে পারে। বর্তমান প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য এই যে, আমি যখন স্পষ্টতই আমার কোনো কাব্যের ছন্দকে নয় মাত্রার বলছি তখন সেটা অনুসরণ করাই বিহিত। হতে পারে তাতে কানের তৃপ্তি হবে না। না যদি হয় তবে সে দায় কবির। কবিকে নিন্দা করবার অধিকার সকলেরই আছে, তার রচনাকে সংশোধন করবার অধিকার কারো নেই।

এই উপলক্ষে একটা গল্প মনে পড়ছে। গল্পটা বানানো নয়। পার্লামেন্টে দর্শকদের বসবার আসনে দুটি শ্রেণীভাগ আছে। সম্মুখভাগের আসনে বসেন যাঁরা খ্যাতনামা, পশ্চাতের ভাগে বসেন অপর-সাধারণ। দুই বিভাগের মাঝখানে কেবল একটিমাত্র দড়ি বাঁধা। একজন ভারতীয় দর্শক সেই সামনের দিক নির্দেশ করে প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: Can I go over there? প্রহরী উত্তর করেছিল: 'Yes, sir, you *can* but you *mayn't*.

ছন্দেও যতিবিভাগ সম্বন্ধে কোনো কোনো ক্ষেত্রে can-এর নিষেধ বলবান নয়, কিন্তু তবু mayর নিষেধ স্বীকার্য। একটা দৃষ্টান্ত দেখা যাক। পাঠকমহলে স্বনামখ্যাত পয়ার ছন্দের একটা পাকা পরিচয় আছে, এইজন্যে তার পদে কোথায় আধা যতি কোথায় পুরো যতি তা নিয়ে বচসার আশঙ্কা নেই। নিম্নলিখিত কবিতার চেহারা অবিকল পয়ারের। সেই চোখের দলিলের জোরে তার সঙ্গে পয়ারের চালে ব্যবহার অবৈধ হয় না।

মাথা তুলে তুমি যবে চল তব রথে
তাকাও না কোথা আমি ফিরি পথে পথে,
অবসাদজাল মোরে ঘেরে পায় পায়।
মনে পড়ে, এই হাতে নিয়েছিলে সেবা,
তবু হায় আজ মোরে চিনিবে সে কেবা,
তোমারি চাকার ধুলা মোরে ঢেকে যায়।

কিন্তু যদি পয়ার নাম বদলিয়ে এর নাম দেওয়া যায় 'ষড়ঙ্গী' এবং এর যথোচিত সংজ্ঞা নির্দেশ করি তা হলে বিনা প্রতিবাদে নিম্নলিখিত ভাগেই একে পড়া উচিত হবে।

মাথা তুলে তুমি
যবে চল তব
রথে

তাকাও না কোথা
আমি ফিরি পথে
পথে,
অবসাদজাল
ঘেরে মোরে পায়ে
পায়।
মনে পড়ে, এই
হাতে নিয়েছিলে
সেবা—
তবু হায় আজ
মোরে চিনিবে সে
কেবা—
তোমারি চাকার
ধুলা মোরে ঢেকে
যায়।

এর প্রত্যেক পদে ১৪ মাত্রা, ৩ কলা, সেই কলার মাত্রাসংখ্যা যথাক্রমে ৬, ৬, ২।

অমূল্যবাবুর মতে, বাংলায় নয় মাত্রার ছন্দ নেই, আছে দশ মাত্রার, কিন্তু দশ মাত্রার উর্ধ্বে আর ছন্দ চলে না। আমি অনেক চিন্তা করেও তাঁর এই মতের তাৎপর্য বুঝতে পারি নি। একাদিক্রমে মাত্রাগণনা গণিতশাস্ত্রের সবচেয়ে সহজ কাজ, তাতেও যদি তিনি বাধা দেন তা হলে বুঝতে হবে, তাঁর মতে গণনার বাইরে আরো কিছু গণ্য করবার আছে। হয়তো মোট মাত্রার ভাগগুলো নিয়ে তর্ক। ভাগ সকল ছন্দেই আছে। দশ মাত্রার ছন্দ, যথা—

প্রাণে মোর আছে তার বাণী,
তার বেশি তারে নাহি জানি।

এর সহজ ভাগ এই—

প্রাণে মোর
আছে তার
বাণী।

একে অন্যরকমেও ভাগ করা চলে। যথা—

প্রাণে মোর আছে
তার বাণী।

অথবা 'প্রাণে' শব্দটাকে একটু আড় করে রেখে—

প্রাণে
মোর আছে তার
বাণী।

এই তিনটেই ১০ মাত্রার ছন্দের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। তা হলেই দেখা যাচ্ছে, ছন্দকে চিনতে হলে প্রথম দেখা চাই, তার পদের মোট মাত্রা, তার পরে তার কলাসংখ্যা, তার পরে প্রত্যেক কলার মাত্রা।

১ ২
সকল বেলা | কাটিয়া গেল, |
৩ ৪
বিকাল নাহি | যায়।

এই ছন্দের প্রত্যেক পদে ১৭ মাত্রা। এর ৪ কলা। অন্ত্য কলাটিতে দুই ও অন্য তিনটি কলায় পাঁচ-পাঁচ মাত্রা। এই ১৭ মাত্রা বজায় রেখে অন্যজাতীয় ছন্দ রচনা চলে কলাবৈচিত্র্যের দ্বারা। যথা—

১ ২ ৩
মন চায় | চলে আসে | কাছে, |
৪ ৫
তবুও পা | চলে না।
বলিবার | কত কথা | আছে, |
তবু কথা | বলে না।

এ ছন্দে পদের মাত্রা ১৭, কলার সংখ্যা ৫, তার মাত্রাসংখ্যা যথাক্রমে— ৪+৪+২+৪+৩। আঠারো মাত্রার দীর্ঘপয়ারে প্রথম আট মাত্রার পরে যেমন স্পষ্ট যতি আছে, এই ছন্দের প্রথম দশ মাত্রার পরে তেমনি।

নয়নে | নিঠুর | চাহনি |
হৃদয়ে | করুণা | ঢাকা।
গভীর | প্রেমের | কাহিনী |
গোপন | করিয়া | রাখা।

এরও পদের মাত্রা ১৭, কলার সংখ্যা ৬, শেষ কলাটি ছাড়া প্রত্যেক কলার মাত্রা ৩।

অন্তর তার | কী বলিতে চায় | চঞ্চল চর | ণে,
কণ্ঠের হার | নয়ন ডুবায় | চম্পক বর | নে।

এরও সমগ্র পদের মাত্রা ১৭*। এর চারটি কলা। প্রথম তিনটি কলায় মাত্রাসংখ্যা ৬, চতুর্থ কলায় ১। সতেরো মাত্রার ছন্দকে কলাবৈচিত্র্যের দ্বারা আরো নব নব রূপ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু সাক্ষী আর বাড়াবার দরকার নেই।

শেষের যে দৃষ্টান্ত দেওয়া গেছে তাতে মাত্রাসংখ্যাগণনা উপলক্ষে 'চরণে' শব্দকে ভাগ করে দিয়ে এক মাত্রার 'ণে' ধ্বনিকে স্বতন্ত্র কলায় বসিয়েছি। ওটা যে স্বতন্ত্রকলা-ভুক্ত তার প্রমাণ এই ছন্দের তাল দেবার সময় ঐ 'ণে' ধ্বনিটির উপর তাল পড়ে।

ইতিপূর্বে অন্যত্র একটি নয় মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত দেবার সময় নিম্নলিখিত শ্লোকটি ব্যবহার করেছি। তাল দেবার রীতি বদল করে একে দুরকম করে পড়া যায়, দুটোই পৃথক্ ছন্দ।

বারে বারে যায় | চলিয়া
ভাসায় গো আঁখি | নীরে সে।
বিরহের ছলে | ছলিয়া
মিলনের লাগি | ফিরে সে।

এটা ৯ মাত্রার শ্রেণীর ছন্দ; এর দুই কলা এবং কলাগুলি ত্রৈমাত্রিক। এর পদকে তিন কলায় ভাগ করে কলাগুলিকে দুই মাত্রার ছাঁদ দিলে এই একই ছড়া সম্পূর্ণ নূতন ছন্দে গিয়ে পৌঁছাবে। যথা—

১ ২ ৩

বারে বারে | যায় চলি | য়া
ভাসায় গো | আঁখিনীরে | সে।
বিরহের | ছলে ছলি | য়া
মিলনের | লাগি ফিরে | সে।
সারাদিন | দহে তিয়া | ষা,
বারেক না | দেখি উহা | রে।
অসময়ে | লয়ে কী আ | শা
অকারণে | আসে দুয়া | রে।

অমূল্যবাবু বলেন, এর প্রথম দুই কলায় চার চার আট এবং শেষের কলায় এক মাত্রার

ছন্দ কৃত্রিম শুনতে হয়। বোধ হয় অখণ্ড শব্দকে খণ্ডিত করা হচ্ছে বলে তাঁর কাছে এটা কৃত্রিম ঠেকছে। কিন্তু, ছন্দের ঝোঁকে অখণ্ড শব্দকে দু ভাগ করার দৃষ্টান্ত অনেক আছে। এরকম তর্কে বিশুদ্ধ হাঁ এবং না -এর দ্বন্দ্ব; কোনো পক্ষে কোনো যুক্তিপ্রয়োগের ফাঁক নেই। আমি বলছি, কৃত্রিম শোনায় না; তিনি বলছেন, শোনায়। আমি এখনো বলি, এইরকম কলাভাগে এই ছন্দে একটি নূতন নৃত্যভঙ্গি জেগে ওঠে, তার একটা রস আছে।

দশের বেশি মাত্রাভার বাংলা ছন্দ বহন করতে অক্ষম, এ কথা মানতে পারব না। নিম্নে বারো মাত্রার একটি শ্লোক দেওয়া গেল।

মেঘ ডাকে গম্ভীর গরজনে,
ছায়া নামে তমালের বনে বনে,
ঝিল্লি ঝনকে নীপবীথিকায়।
সরোবর উচ্ছল কূলে কূলে,
তটে তারি বেণুশাখা দুলে দুলে
মেতে ওঠে বর্ষণগীতিকায়।

শ্রোতারা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, আবৃত্তিকালে পদান্তের পূর্বে কোনো যতিই দিই নি, অর্থাৎ বারো মাত্রা একটি ঘনিষ্ঠ গুচ্ছের মতোই হয়েছে। এই পদগুলিকে বারো মাত্রার পদ বলবার কোনো বাধা আছে বলে আমি কল্পনা করতে পারি নে। উল্লিখিত শ্লোকের ছন্দে বারো মাত্রা, প্রত্যেক পদে তিন কলা, প্রত্যেক কলায় চার মাত্রা। বারো মাত্রার পদকে চার কলায় বিভক্ত করে ত্রৈমাত্রিক করলে আর-এক ছন্দ দেখা দেবে। যথা—

শ্রাবণগগন, ঘোর ঘনঘটা,
তাপসী যামিনী এলায়েছে জটা,
দামিনী ঝলকে রহিয়া রহিয়া।

এ ছন্দ বাংলা ভাষায় সুপরিচিত।

তমালবনে ঝরিছে বারিধারা,
তড়িৎ ছুটে আঁধারে দিশাহারা।
ছিঁড়িয়া ফেলে কিরণকিঙ্কিণী
আত্মঘাতী যেন সে পাগলিনী।

পঞ্চমাত্রাঘটিত এই বারো মাত্রাকেও কেন যে বারো মাত্রা বলে স্বীকার করব না, আমি বুঝতেই পারি নে।

কেবল নয় মাত্রার পদ বলার দ্বারা ছন্দের একটা সাধারণ পরিচয় দেওয়া হয়, সে

পরিচয় বিশেষভাবে সম্পূর্ণ হয় না। আমার সাধারণ পরিচয়, আমি ভারতীয়; বিশেষ পরিচয়, আমি বাঙালি; আরো বিশেষ পরিচয়, আমি বিশেষ পরিবারের বিশেষ নামধারী মানুষ। নয় মাত্রার পদবিশিষ্ট ছন্দ সাধারণভাবে অনেক হতে পারে। আরো বিশেষ পরিচয় দাবি করলে, এর কলাসংখ্যা এবং সেই কলার মাত্রাসংখ্যার হিসাব দিতে হয়।

কোনো কোনো ছন্দে কলাবিভাগ করতে ভুল হবার আশঙ্কা আছে। যেমন— গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা। পয়ারের ১৪ মাত্রা থেকে এক মাত্রা হরণ করে এই ১৩ মাত্রার ছন্দ গঠিত। অর্থাৎ 'গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরিষণ' এবং এই ছন্দটি বস্তুত এক, এমন মনে হতে পারে। আমি তা স্বীকার করি নে; তার সাক্ষী শুধু কান নয়, তালও বটে। এই দুটি ছন্দে তালের ঘা পড়েছে কী রকম তা দেখা উচিত।

১ ২
গগনে গরজে মেঘ | ঘন বরিষণ।

সাধারণ পয়ারের নিয়মে এতে দুটি আঘাত।

১ ২ ৩
গগনে গরজে মেঘ | ঘন বর | ষা।

এতে তিনটি আঘাত। পদটি তিন অসমান ভাগে বিভক্ত। পদের শেষবর্ণে স্বতন্ত্র ঝোঁক দিলে তবেই এর ভঙ্গিটাকে রক্ষা করা হয়। 'বরষা' শব্দের শেষ আকার যদি হরণ করা যায় তা হলে ঝোঁক দেবার জায়গা পাওয়া যায় না, তা হলে অক্ষরসংখ্যা সমান হলেও ছন্দ কাত হয়ে পড়ে।

'আঁধার রজনী পোহালো' পদের অন্তবর্ণে দীর্ঘস্বর আছে, কিন্তু নয় মাত্রার ছন্দের পক্ষে সেটা অনিবার্য নয়। তারই একটি প্রমাণ নীচে দেওয়া গেল।

জ্বেলেছে পথের আলোক
সূর্যরথের চালক,
অরুণরক্ত গগন।
বক্ষে নাচিছে রুধির,
কে রবে শান্ত সুধীর
কে রবে তন্দ্রামগন।
বাতাসে উঠিছে হিল্লোল,
সাগর-উর্মি বিলোল,
এল মহেন্দ্রলগন,
কে রবে তন্দ্রামগন।

এই তর্কক্ষেত্রে আর-একটি আমার কৈফিয়ত দেবার আছে। অমূল্যবাবুর নালিশ এই যে, ছন্দের দৃষ্টান্তে কোনো কোনো স্থলে দুই পঙ্‌ক্তিকে মিলিয়ে আমি কবিতার এক পদ বলে চালিয়েছি। আমার বক্তব্য এই, লেখার পঙ্‌ক্তি এবং ছন্দের পদ এক নয়। আমাদের হাঁটুর কাছে একটা জোড় আছে বলে আমরা প্রয়োজনমত পা মুড়ে বসতে পারি, তৎসত্ত্বেও গণনায় ওটাকে এক পা বলেই স্বীকার করি এবং অনুভব করে থাকি। নইলে চতুষ্পদের কোঠায় পড়তে হয়। ছন্দেও ঠিক তাই—

সকল বেলা কাটিয়া গেল,
বিকাল নাহি যায়।

অমূল্যবাবু একে দুই চরণ বলেন, আমি বলি নে। এই দুটি ভাগকে নিয়েই ছন্দের সম্পূর্ণতা। যদি এমন হত—

সকল বেলা কাটিয়া গেল,
বকুলতলে আসন মেলো—

তা হলে নিঃসংশয়ে একে দুই চরণ বলতুম।

পুনর্বার বলি যে, যে বিরামস্থলে পৌঁছিয়ে পদ্যছন্দ অনুরূপ ভাগে পুনরাবর্তন করে সেই পর্যন্ত এসে তবেই কোন্‌টা কোন্ ছন্দ এবং তার মাত্রার পরিমাণ কত তার নির্ণয় সম্ভব, মাঝখানে কোনো একটা জোড়ের মুখে গণনা শেষ করা অসংগত। সংস্কৃত বা প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রে এই নিয়মেরই অনুসরণ করা হয়। দৃষ্টান্ত—

পৈঙ্গল-ছন্দঃসূত্রাণি

ভংজিঅ মলঅচোলবই ণিবলিঅ
গংজিঅ গুজ্জরা।
মালবরাঅ মলঅগিরি লুক্কিঅ
পরিহরি কুংজরা।
খুরাসাণ খুহিঅ রণমহ মুহিঅ
লংঘিঅ সাঅরা।
হম্মীর চলিঅ হারব পলিঅ
রিউগণহ কাঅরা॥

গ্রন্থকার বলছেন 'বিংশত্যক্ষরাণি' এবং 'পঞ্চবিংশতিমাত্রাঃ প্রতিপাদং দেয়াঃ'। এর পদে পদে কুড়িটি অক্ষর ও পঁচিশটা মাত্রা, ছন্দের এই পরিচয়।

পচ্চম দহ দিজ্জিআ
পুণবি তহ কিজ্জিআ

পুণবি দহ সত্ত তহ বিরই জাআ।
এম পরি বিবিহুদল
মত্ত সততীস পল
এহু কহ ঝুল্লণা ণাঅরআ॥

ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা এই : প্রথমং দশমাত্রা দীয়স্তে। অর্থাৎ তত্র বিরতিঃ ক্রিয়তে। পুনরপি তথা কর্তব্যা। পুনরপি সপ্তদশমাত্রাসু বিরতির্জাতা চ। অনয়ৈব রীত্যা দলদ্বয়েপি মাত্রা সপ্তত্রিংশৎ পতন্তি। এমনি করে দলগুলিকে মিলিয়ে যে ছন্দের সাঁইত্রিশ মাত্রা 'তামিমাং নাগরাজঃ পিঙ্গলো ঝুল্লণামিতি কথয়তি'। আমি যাকে ছন্দোবিশেষের রূপকল্প বা প্যাটর্‌ন্ বলছি 'ঝুল্লণা' ছন্দে সেইটে সাঁইত্রিশ মাত্রায় সম্পূর্ণ, তার পরে তার অনুরূপ পুনরাবৃত্তি। অমূল্যবাবু হয়তো এর কথাগুলির প্রতি লক্ষ রেখে একে পাঁচ বা দশ মাত্রার ছন্দ বলবেন, কিন্তু পাঁচ বা দশ মাত্রায় এর পদের সম্পূর্ণতা নয়।

যার ভাগগুলি অসমান এমন ছন্দ দেখা যাক—

কুংতঅরু ধণুদ্ধরু
হঅবর গঅবরু
ছক্কলু বিবি পা-
ইক্ক দলে।

এই ছন্দ সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'দ্বাত্রিংশন্মাত্রাঃ পাদে সুপ্রসিদ্ধাঃ'। এই ছন্দকে বাংলায় ভাঙতে গেলে এইরকম দাঁড়ায়।

কুঞ্জপথে জ্যোৎস্নারাতে
চলিয়াছে সখীসাথে
মল্লিকাকলিকার
মাল্য হাতে।

চার পঙ্‌ক্তিতে এই ছন্দের পূর্ণরূপ এবং সেই পূর্ণরূপের মাত্রাসংখ্যা বত্রিশ। ছন্দে মাত্রাগণনার এই ধারা আমি অনুসরণ করা কর্তব্য মনে করি। মনে নেই, আমার কোনো পূর্বতন প্রবন্ধে অন্য মত প্রকাশ করেছি কি না ; যদি করে থাকি তবে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

সবশেষে পুনরায় বলি, ছন্দের স্বরূপনির্ণয় করতে হলে সমগ্রের মাত্রাসংখ্যা, তার কলাসংখ্যা ও কলাগুলির মাত্রাসংখ্যা জানা আবশ্যক। শুধু তাই নয়, যেখানে ছন্দের রূপকল্প একাধিক পদের দ্বারা সম্পূর্ণ হয় সেখানে পদসংখ্যাও বিচার্য। যথা—

বর্ষণশান্ত
পাণ্ডুর মেঘ যবে ক্লান্ত
বন ছাড়ি মনে এল নীপরেণুগন্ধ,
ভরি দিল কবিতার ছন্দ।

এখানে চারিটি পদ এবং প্রত্যেক পদ নানা অসমান মাত্রায় রচিত, সমস্তটাকে নিয়ে ছন্দের রূপকল্প। বিশেষজাতীয় ছন্দে এইরূপ পদ ও মাত্রা গণনাতেও আমি পিঙ্গলাচার্যের অনুবর্তী।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১

বাংলা ছন্দের প্রকৃতি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত

আমাদের দেহ বহন করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভার, আর তাকে চালন করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতিবেগ; এই দুই বিপরীত পদার্থ যখন পরস্পরমিলনে লীলায়িত হয় তখন জাগে নাচ। দেহের ভারটাকে দেহের গতি নানা ভঙ্গিতে বিচিত্র করে, জীবিকার প্রয়োজনে নয়, সৃষ্টির অভিপ্রায়ে; দেহটাকে দেয় চলমান শিল্পরূপ। তাকে বলি নৃত্য।

রূপসৃষ্টির প্রবাহই তো বিশ্ব। সেই রূপটা জাগে ছন্দে, আধুনিক পরমাণুতত্ত্বে সে কথা সুস্পষ্ট। সাধারণ বিদ্যুৎপ্রবাহ আলো দেয়, তাপ দেয়, তার থেকে রূপ দেখা দেয় না। কিন্তু, বিদ্যুৎকণা যখন বিশেষ সংখ্যায় ও গতিতে আমাদের চৈতন্যের দ্বারে ঘা মারে তখনই আমাদের কাছে প্রকাশ পায় রূপ, কোনোটা দেখা দেয় সোনা হয়ে, কোনোটা হয় সীসে। বিশেষসংখ্যক মাত্রা ও বিশেষবেগের গতি এই দুই নিয়েই ছন্দ, সেই ছন্দের মায়ামন্ত্র না পেলে রূপ থাকে অব্যক্ত। বিশ্বসৃষ্টির এই ছন্দোরহস্য মানুষের শিল্পসৃষ্টিতে। তাই ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলছেন: শিল্পানি শংসন্তি দেবশিল্পানি। মানুষের সব শিল্পই দেবশিল্পের স্তবগান করছে। এতেষাং বৈ শিল্পানামনুকৃতীহ শিল্পম্ অধিগম্যতে। মানবলোকের সব শিল্পই এই দেবশিল্পের অনুকৃতি, অর্থাৎ বিশ্বশিল্পের রহস্যকেই অনুসরণ করে মানবশিল্প। সেই মূলরহস্য ছন্দে, সেই রহস্য আলোকতরঙ্গে, শব্দতরঙ্গে, রক্ততরঙ্গে, স্নায়ুতন্তুর বৈদ্যুততরঙ্গে।

মানুষ তার প্রথম ছন্দের সৃষ্টিকে জাগিয়েছে আপন দেহে। কেননা তার দেহ ছন্দরচনার উপযোগী। ভূতলের টান থেকে মুক্ত করে দেহকে সে তুলেছে ঊর্ধ্ব দিকে।

চলমান মানুষের পদে পদে ভারসাম্যের অপ্রতিষ্ঠতা, unstable equilibrium। এতেই তার বিপদ, এতেই তার সম্পদ। চলার চেয়ে পড়াই তার পক্ষে সহজ। ছাগলের ছানা চলা নিয়েই জন্মেছে, মানুষের শিশু চলাকে আপনি সৃষ্টি করেছে ছন্দে। সামনে-পিছনে ডাইনে-বাঁয়ে পায়ে-পায়ে দেহভারকে মাত্রাবিভক্ত করে ওজন বাঁচিয়ে তবেই তার চলা সম্ভব হয়। সেটা সহজ নয়, মানবশিশুর চলার ছন্দসাধনা দেখলেই তা বোঝা যায়। যে পর্যন্ত আপন ছন্দকে সে আপনি উদ্ভাবন না করে সে পর্যন্ত তার হামাগুড়ি, অর্থাৎ, ভারাকর্ষণের কাছে তার অবনতি, সে পর্যন্ত সে নৃত্যহীন।

চতুষ্পদ জন্তুর নিত্যই হামাগুড়ি। তার চলা মাটির কাছে হার মেনে চলা। লাফ দিয়ে যদি-বা সে উপরে ওঠে, পরক্ষণেই মাটির দরবারে ফিরে এসেই তার মাথা হেঁট। বিদ্রোহী মানুষ মাটির একান্ত শাসন থেকে দেহভারকে মুক্ত করে নিয়ে তাতেই চালায় প্রয়োজনের কাজ এবং অপ্রয়োজনের লীলা। ভূমির টানের বিরুদ্ধে ছন্দের সাহায্যে তার এই জয়লব্ধ শক্তি।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলছেন: আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি। শিল্পই হচ্ছে আত্মসংস্কৃতি। সম্যক্ রূপদানই সংস্কৃতি, তাকেই বলে শিল্প। আত্মাকে সুসংযত করে মানুষ যখন আত্মার সংস্কার করে, অর্থাৎ তাকে দেয় সম্যক্ রূপ, সেও তো শিল্প। মানুষের শিল্পের উপাদান কেবল তো কাঠপাথর নয়, মানুষ নিজে। বর্বর অবস্থা থেকে মানুষ নিজেকে সংস্কৃত করেছে। এই সংস্কৃতি তার স্বরচিত বিশেষ ছন্দোময় শিল্প। এই শিল্প নানা দেশে, নানা কালে, নানা সভ্যতায়, নানা আকারে প্রকাশিত, কেননা বিচিত্র তার ছন্দ। ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমান আত্মানং সংস্কুরুতে। শিল্পযজ্ঞের যজমান আত্মাকে সংস্কৃত করেন, তাকে করেন ছন্দোময়।

যেমন মানুষের আত্মার তেমনি মানুষের সমাজেরও প্রয়োজন ছন্দোময় সংস্কৃতি। সমাজও শিল্প। সমাজে আছে নানা মত, নানা ধর্ম, নানা শ্রেণী। সমাজের অন্তরে সৃষ্টিতত্ত্ব যদি সক্রিয় থাকে, তা হলে সে এমন ছন্দ উদ্ভাবন করে যাতে তার অংশ-প্রত্যংশের মধ্যে কোথাও ওজনের অত্যন্ত বেশি অসাম্য না হয়। অনেক সমাজ পঙ্গু হয়ে আছে ছন্দের এই ত্রুটিতে, অনেক সমাজ মরেছে ছন্দের এই অপরাধে। সমাজে যখন হঠাৎ কোনো একটা সংরাগ অতিপ্রবল হয়ে ওঠে তখন মাতাল সমাজ পা ঠিক রাখতে পারে না, ছন্দ থেকে হয় ভ্রষ্ট। কিম্বা যখন এমন সকল মতের, বিশ্বাসের, ব্যবহারের বোঝা অচল হয়ে কাঁধে চেপে থাকে, যাকে ছন্দ বাঁচিয়ে সম্মুখে বহন করে চলা সমাজের পক্ষে অসম্ভব হয়, তখন সেই সমাজের পরাভব ঘটে। যেহেতু

জগতের ধর্মই চলা, সংসারের ধর্ম স্বভাবতই সরতে থাকা, সেইজন্যেই তার বাহন ছন্দ। যে গতি ছন্দ রাখে না, তাকেই বলে দুর্গতি।

মানুষের ছন্দোময় দেহ কেবল প্রাণের আন্দোলনকে নয় তার ভাবের আন্দোলনকেও যেমন সাড়া দেয়, এমন আর কোনো জীবে দেখি নে। অন্য জন্তুর দেহেও ভাবের ভাষা আছে কিন্তু মানুষের দেহভঙ্গির মতো সে ভাষা চিন্ময়তা লাভ করে নি, তাই তার তেমন শক্তি নেই, ব্যঞ্জনা নেই।

কিন্তু, এই যথেষ্ট নয়। মানুষ সৃষ্টিকর্তা। সৃষ্টি করতে গেলে ব্যক্তিগত তথ্যকে দাঁড় করাতে হয় বিশ্বগত সত্যে। সুখদুঃখ-রাগবিরাগের অভিজ্ঞতাকে আপন ব্যক্তিগত ঐকান্তিকতা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সেটাকে রূপসৃষ্টির উপাদান করতে চায় মানুষ। 'আমি ভালোবাসি' এই কথাটিকে ব্যক্তিগত ভাষায় প্রকাশ করা যেতে পারে ব্যক্তিগত সংবাদ বহন করবার কাজে। আবার, 'আমি ভালোবাসি' এই কথাটিকে 'আমি' থেকে স্বতন্ত্র করে সৃষ্টির কাজে লাগানো যেতে পারে, যে সৃষ্টি সর্বজনের, সর্বকালের। যেমন সাজাহানের বিরহশোক দিয়ে সৃষ্ট হয়েছে তাজমহল, সাজাহানের সৃষ্টি অপরূপ ছন্দে অতিক্রম করেছে ব্যক্তিগত সাজাহানকে।

নৃত্যকলার প্রথম ভূমিকা দেহচাঞ্চল্যের অর্থহীন সুষমায়। তাতে কেবলমাত্র ছন্দের আনন্দ। গানেরও আদিম অবস্থায় একঘেয়ে তালে একঘেয়ে সুরের পুনরাবৃত্তি; সে কেবল তালের নেশা-জমানো, চেতনাকে ছন্দের দোল-দেওয়া। তার সঙ্গে ক্রমে ভাবের দোলা মেশে। কিন্তু, এই ভাবব্যক্তি যখন আপনাকে ভোলে, অর্থাৎ ভাবের প্রকাশটাই যখন লক্ষ্য না হয়, তাকে উপলক্ষ করে রূপসৃষ্টিই হয় চরম, তখন নাচটা হয় সর্বজনের ভোগ্য; সেই নাচটা ক্ষণকালের পরে বিস্মৃত হলেও যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তার রূপে চিরকালের স্বাক্ষর লাগে।

নাচতে দেখেছি সারসকে। সেই নাচকে কেবল আঙ্গিক বলা যায় না, অর্থাৎ টেক্‌নিকেই তার পরিশেষ নয়। আঙ্গিকে মন নেই, আছে নৈপুণ্য। সারসের নাচের মধ্যে দেখেছি ভাব এবং তার চেয়েও আরো কিছু বেশি। সারস যখনই মুগ্ধ করতে চেয়েছে আপন দোসরকে তখনই তার মন সৃষ্টি করতে চেয়েছে নৃত্যভঙ্গির সংস্কৃতি, বিচিত্র ছন্দের পদ্ধতি। সারসের মন আপন দেহে এই নৃত্যশিল্প রচনা করতে পেরেছে, তার কারণ তার দেহভারটা অনেক মুক্ত।

কুকুরের মনে আবেগের প্রবলতা যথেষ্ট, কিন্তু তার দেহটা বন্ধক দেওয়া মাটির কাছে। মুক্ত আছে কেবল তার ল্যাজ। ভাবাবেগের চাঞ্চল্যে কুকুরীর ছন্দে ওই ল্যাজটাতেই চঞ্চল হয় তার নৃত্য, দেহ আঁকুবাঁকু করে বন্দীর মতো।

মানুষের সমগ্র মুক্ত দেহ নাচে ; নাচে মানুষের মুক্ত কণ্ঠের ভাষা। তাদের মধ্যে ছন্দের সৃষ্টিরহস্য যথেষ্ট জায়গা পায়। সাপ অপদস্থ জীব, মানুষের মতো পদস্থ নয়। সমস্ত দেহ সে মাটিকে সমর্পণ করে বসেছে। সে কখনো নিজে নাচে না। সাপুড়ে তাকে নাচায়। বাহিরের উত্তেজনায় ক্ষণকালের জন্য দেহের এক অংশকে সে মুক্ত করে নেয়, তাকে দোলায় ছন্দে। এই ছন্দ সে পায় অন্যের কাছ থেকে, এ তার আপন ইচ্ছার ছন্দ নয়। ছন্দ মানেই ইচ্ছা। মানুষের ভাবনা রূপগ্রহণের ইচ্ছা করেছে নানা শিল্পে, নানা ছন্দে। কত বিলুপ্ত সভ্যতার ভগ্নাবশেষে বিস্মৃত যুগের ইচ্ছার বাণী আজও ধ্বনিত হচ্ছে তার কত চিত্রে, জলপাত্রে, কত মূর্তিতে। মানুষের আনন্দময় ইচ্ছা সেই ছন্দোলীলার নটরাজ, ভাষায় ভাষায় তার সাহিত্যে সেই ইচ্ছা নব নব নৃত্যে আন্দোলিত।

মানুষের সহজ চলায় অব্যক্ত থাকে নৃত্য, ছন্দ যেমন প্রচ্ছন্ন থাকে গদ্যভাষায়। কোনো মানুষের চলাকে বলি সুন্দর, কোনোটাকে বলি তার উলটো। তফাতটা কিসে। সে কেবল একটা সমস্যাসমাধান নিয়ে। দেহের ভার সামলিয়ে দেহের চলা একটা সমস্যা। ভারটাই যদি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হয়, তা হলেই অসাধিত সমস্যা প্রমাণ করে অপটুতা। যে চলায় সমস্যার সমুৎকৃষ্ট মীমাংসা সেই চলাই সুন্দর।

পালে-চলা নৌকো সুন্দর, তাতে নৌকোর ভারটার সঙ্গে নৌকোর গতির সম্পূর্ণ মিলন ; সেই পরিণয়ে শ্রী উঠেছে ফুটে, অতিপ্রয়াসের অবমান হয়েছে অন্তর্হিত। এই মিলনেই ছন্দ। দাঁড়ি দাঁড় টানে, সে লগি ঠেলে, কঠিন কাজের ভারটাকে সে কমিয়ে আনে কেবল ছন্দ রেখে। তখন কাজের ভঙ্গি হয় সুন্দর। বিশ্ব চলেছে প্রকাণ্ড ভার নিয়ে বিপুল দেশে নিরবধি কালে সুপরিমিতির ছন্দে। এই সুপরিমিতির প্রেরণায় শিশিরের ফোঁটা থেকে সূর্যমণ্ডল পর্যন্ত সুগোল ছন্দে গড়া। এইজন্যেই ফুলের পাপড়ি সুবঙ্কিম, গাছের পাতা সুঠাম, জলের ঢেউ সুডোল।

জাপানে ফুলদানিতে ফুল সাজাবার একটি কলাবিদ্যা আছে। যেমন-তেমন আকারে পুঞ্জীকৃত পুষ্পিত শাখায় বস্তুভারটাই প্রত্যক্ষ ; তাকে ছন্দ দিয়ে যেই শিল্প করা যায়, তখন সেই ভারটা হয় অগোচর, হালকা হয়ে গিয়ে অন্তরে প্রবেশ করে সহজে।

প্রাচীন জাপানের একজন বিখ্যাত বীর এই ফুল সাজানো দেখতে ভালোবাসতেন। তিনি বলতেন, এই সজ্জাপ্রকরণ থেকে তাঁর মনে আসত আপন যুদ্ধব্যবসায়ের প্রেরণা। যুদ্ধও ছন্দে-বাঁধা শিল্প, ছন্দের সমুৎকর্ষ থেকেই তার শক্তি। এই কারণেই লাঠি-খেলাও নৃত্য।

জাপানে দেখেছি চা-উৎসব। তাতে চা-তৈরি, চা-পরিবেশনের প্রত্যেক অংশই সযত্ন, সুন্দর। তার তাৎপর্য এই যে কর্মের সৌষ্ঠব এবং কর্মের নৈপুণ্য একসঙ্গে গাঁথা। গৃহিণীপনা যদি সত্য হয় তাকে সুন্দর হতেই হবে; অকৌশল ধরা পড়ে কুশ্রীতায়, কর্মের ও লোক-ব্যবহারের ছন্দোভঙ্গে। ভাঙা ছন্দের ছিদ্র দিয়েই লক্ষ্মী বিদায় নেন।

এতক্ষণ ছন্দকে দেখা গেল নৃত্যে। কেননা ছন্দের প্রথম উল্লাস মানুষের বাক্যহীন দেহই। তার পরে দেহের ইশারা মেলে ভাষার ইশারায়। এবার ভাষার ক্ষেত্রে দেখা যাক ছন্দকে।

সেই একই কথা, ভার আর গতি, সেই দুইয়ের যোগে ওজন বাঁচিয়ে চলা। জন্তুর আওয়াজের পরিধি কতটুকুই বা; তাতে জোর থাকতে পারে কিন্তু ভার সামান্য। কুকুর যতই ডাকুক, শেয়াল যতই চেঁচাক, ধ্বনির ওজন বাঁচিয়ে চলবার সমস্যা তাদের নেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু আভাস পাওয়া যায়। গাধার 'পরে অবিচার করতে চাই নে। সে শুধু পরের ময়লা কাপড় বহন করে তা নয়, এ-পর্যন্ত কণ্ঠস্বর সম্বন্ধে আপন প্রভূত অখ্যাতি বহন করে এসেছে। কিন্তু, যখনই সে নিজের ডাককে দীর্ঘায়িত করে, তখনই পর্যায়ে পর্যায়ে তাকে ধ্বনির ওজন ভাগ করতে হয়। নিজের ব্যবসায়ের প্রতি লক্ষ রেখে এই ব্যাপারকে ছন্দ বলতে কুণ্ঠিত হচ্ছি। কিন্তু, আর কী বলব জানি নে।

মানুষকে বহন করতে হয় ভাষার সুদীর্ঘতা। প্রলম্বিত ভাষার ওজন তাকে রাখতেই হয়। মানুষের সেই বাক্যের সঙ্গে তার গানের সুর যখন মিশল, তখন গীতিকলা হল দীর্ঘায়ত। নানাবিধ তাল নিযুক্ত হয়েছে তার ভার বইতে। কিন্তু, তাল অর্থাৎ ছন্দকে কেবল ভারবাহক বললে চলবে না। সে তো ধ্বনিভারের ঝাঁকামুটে নয়। ভারগুলিকে নানা আয়তনে বিভক্ত করে যেই সে তাকে গতি দেয়, অমনি রূপ নিয়ে সংগীত আমাদের চৈতন্যকে আঘাত করে। ভাষা অবলম্বন করে যখন আমরা খবর দিতে চাই তখন বিবরণের সত্যতা রক্ষা করাই আমাদের একমাত্র দায়িত্ব; কিন্তু যখন রূপ দিতে চাই তখন সত্যতার চেয়ে বেশি আবশ্যক হয় ছন্দের।

'একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল', এটা নিছক খবর। গল্প হিসাবে বা ঘটনা হিসাবে সত্য হলে এর আর কোনোই জবাবদিহি নেই। কিন্তু, গলায়-হাড়-বেঁধা জন্তুটার ল্যাজ যদি প্রত্যক্ষভাবে চৈতন্যের মধ্যে আছড়িয়ে নিতে চাই তবে ভাষায় লাগাতে হবে ছন্দের মন্ত্র।

বিদ্যুৎ-লাঙ্গুল করি ঘন তর্জন
বজ্রবিদ্ধ মেঘ করে বারি বর্জন।
তদ্রূপ যাতনায় অস্থির শার্দূল
অস্থিবিদ্ধগলে করে ঘোর গর্জন।

কাব্যসাহিত্য কেবল রসসাহিত্য নয়, তা রূপসাহিত্য। সাধারণত, ভাষায় শব্দগুলি অর্থবহন করে, কিন্তু ছন্দে তারা রূপগ্রহণ করে।

ছন্দ সম্বন্ধে এই গেল আমার সাধারণ বক্তব্য। বিশ্বের ভাষায় মানুষের ভাষায় রূপ দেওয়া তার কাজ। এখন বাংলা কাব্যছন্দ সম্বন্ধে বিশেষভাবে কিছু বলবার চেষ্টা করা যাক।

২

প্রত্যেক ভাষার একটি স্বকীয় ধ্বনি-উদ্ভাবনা আছে। তার থেকে তার স্বরূপ চেনা যায়। ইংরেজিতে বেশির ভাগ শব্দে স্বরবর্ণের মধ্যস্থতা নেই বলে সে যেন হয়েছে সরদ যন্ত্রের মতো, আঙুলের আঘাতে তার ঐকমাত্রিক ধ্বনিগুলি উচ্চকিত, ইটালিয়ানে ছড়ির লম্বা টানে বেহালার টানা সুর।

বাংলাভাষাও নিজের একটা বিশেষ ধ্বনিস্বরূপ আছে। তার ধ্বনির এই চেহারা হসন্তবর্ণের যোগে। যে বাংলা আমাদের মায়ের কণ্ঠগত, জ্যেষ্ঠতাতের লেখনীগত নয়, ইংরেজির মতো তারও সুর ব্যঞ্জনবর্ণের সংঘাতে। আজ সাধুভাষার ছন্দে জোর দেবার অভিপ্রায়ে অভিধান ঘেঁটে যুক্তবর্ণের আয়োজনে লেগেছি, অথচ প্রাকৃতবাংলায় হসন্তের প্রাধান্য আছে বলেই যুক্তবর্ণের জোর তার মধ্যে আপনি এসে পড়ে। এই ভাষায় একটি শ্লোক রচনা করা যাক একটিও যুক্তবর্ণ না দিয়ে।

দূর সাগরের পারের পবন
আসবে যখন কাছের কূলে
রঙিন আগুন জ্বালবে ফাগুন,
মাতবে অশোক সোনার ফুলে।

হসন্তের ধাক্কায় যুক্তবর্ণের ঢেউ আপনি উঠছে।

চীনদেশের সাংঘাই নগরে একটি আরামবাগ আছে। অনেককাল সেখানে চীনের লোকেরই প্রবেশ নিষেধ ছিল। তেমনি বাংলাদেশের সাহিত্য-আরামবাগ থেকে বাংলাভাষার স্বকীয় ধ্বনিরূপটি পণ্ডিত-পাহারাওয়ালার ধাক্কা খেয়ে অনেক কাল বাইরে বাইরে ফিরেছিল।

ভাষার শব্দে অর্থ আছে, স্বর আছে। অর্থ জিনিসটা সকল ভাষাতেই এক, স্বরটা প্রত্যেক ভাষাতেই স্বতন্ত্র। 'জল' শব্দে যা বোঝায় 'water' শব্দেও তাই বুঝি, কিন্তু ওদের সুর আলাদা। ভাষা এই সুর নিয়ে শিল্প রচনা করে, ধ্বনির শিল্প। সেই রূপসৃষ্টির যে ধ্বনিতত্ত্ব বাংলাভাষার আপন সম্বল পণ্ডিতরা তাকে অবজ্ঞা করতে পারেন, কেননা, তাঁরা অর্থের মহাজন; কিন্তু, যাঁরা রূপরসিক তাঁদের মূলধন ধ্বনি। প্রাকৃত-বাংলার দুয়োরানীকে যারা সুয়োরানীর অপ্রতিহতপ্রভাবে সাহিত্যের গোয়াল-ঘরে বাসা না দিয়ে হৃদয়ে স্থান দিয়েছে, সেই 'অশিক্ষিত'-লাঞ্ছনাধারীর দল যথার্থ বাংলাভাষার সম্পদ নিয়ে আনন্দ করতে বাধা পায় না। তাদের প্রাণের গভীর কথা তাদের প্রাণের সহজ ভাষায় উদ্ধৃত করে দিই।

আছে যার মনের মানুষ আপন মনে
সে কি আর জপে মালা।
নির্জনে সে বসে বসে দেখছে খেলা।
কাছে রয়, ডাকে তারে
উচ্চস্বরে
কোন্ পাগেলা,
ওরে যে যা বোঝে তাই সে বুঝে
থাকে ভোলা।
যেথা যার ব্যথা নেহাত
সেইখানে হাত
ডলামলা,
তেমনি জেনো মনের মানুষ মনে তোলা।
যে জনা দেখে সে রূপ
করিয়া চুপ,
রয় নিরালা।
ওরে লালন-ভেড়ের লোক-দেখানো
মুখে 'হরি হরি' বোলা।

আর-একটি—

এমন মানব-জনম আর কি হবে।
যা কর মন ত্বরায় করো
এই ভবে।

অনন্তরূপ ছিষ্টি করেন সাঁই,
শুনি মানবের তুলনা কিছুই নাই।
দেব-দেবতাগণ
করে আরাধন
জন্ম নিতে মানবে।…
এই মানুষে হবে মাধুর্যভজন
তাইতে মানুষ-রূপ গঠিল নিরঞ্জন।
এবার ঠকলে আর
না দেখি কিনার,
লালন কয় কাতরভাবে।

এই ছন্দের ভঙ্গি একঘেয়ে নয়। ছোটো বড়ো নানা ভাগে বাঁকে বাঁকে চলেছে। সাধুপ্রসাধনে মেজে-ঘষে এর শোভা বাড়ানো চলে, আশা করি এমন কথা বলবার সাহস হবে না কারো।

এই খাঁটি বাংলায় সকল রকম ছন্দেই সকল কাব্যই লেখা সম্ভব, এই আমার বিশ্বাস। ব্যঙ্গকবিতায় এ ভাষার জোর কত ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা থেকে তার নমুনা দিই। কুইন ভিক্টোরিয়াকে সম্বোধন করে কবি বলছেন—

তুমি মা কল্পতরু,
আমরা সব পোষা গোরু
শিখি নি শিঙ-বাঁকানো,
কেবল খাব খোল-বিচিলি ঘাস।
যেন রাঙা আমলা তুলে মামলা
গামলা ভাঙে না,
আমরা ভুষি পেলেই খুশি হব
ঘুষি খেলে বাঁচব না।

কেবল এর হাসিটা নয়, এর ছন্দের বিচিত্র ভঙ্গিটা লক্ষ করে দেখবার বিষয়।

অথচ, এই প্রাকৃত-বাংলাতেই 'মেঘনাদবধ' কাব্য লিখলে যে বাঙালিকে লজ্জা দেওয়া হত সে কথা স্বীকার করব না। কাব্যটা এমন ভাবে আরম্ভ করা যেত—

যুদ্ধ তখন সাঙ্গ হল বীরবাহু বীর যবে
বিপুল বীর্য দেখিয়ে হঠাৎ গেলেন মৃত্যুপুরে

যৌবনকাল পার না হতেই। কও মা সরস্বতী,
অমৃতময় বাক্য তোমার, সেনাধ্যক্ষপদে
কোন্ বীরকে বরণ করে পাঠিয়ে দিলেন রণে
রঘুকুলের পরম শত্রু, রক্ষকুলের নিধি।

এতে গাম্ভীর্যের ত্রুটি ঘটেছে এ কথা মানব না। এই যে বাংলা বাঙালির দিনরাত্রির ভাষা এর একটি মস্ত গুণ, এ ভাষা প্রাণবান্। এইজন্যে সংস্কৃত বলো, ফার্সি বলো, ইংরেজি বলো, সব শব্দকেই প্রাণের প্রয়োজনে আত্মসাৎ করতে পারে। খাঁটি হিন্দি ভাষারও সেই গুণ। যারা হেড্পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে পড়ে নি তাদের একটা লেখা তুলে দিই—

চক্ষু আঁধার দিলের ধোঁকায়
কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়,
কী রঙ্গ সাঁই দেখছে সদাই
বসে নিগম ঠাঁই।
এখানে না দেখলেম তারে
চিনব তবে কেমন ক'রে,
ভাগ্যেতে আখেরে তারে
চিনতে যদি পাই।

প্রাকৃত-বাংলাকে গুরুচণ্ডালি দোষ স্পর্শই করে না। সাধু ছাঁদের ভাষাতেই শব্দের মিশোল সয় না।

চলতি বাংলাভাষার প্রসঙ্গটা দীর্ঘ হয়ে পড়ল। তার কারণ, এ ভাষাকে যাঁরা প্রতিদিন ঘরে দেন স্থান, তাঁদের অনেকে সাহিত্যে একে অবজ্ঞা করেন। সেটাতে সাহিত্যকে তার প্রাণরসের মূল আধার থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে জেনে আমার আপত্তিকে বড়ো করেই জানালুম। ছন্দের তত্ত্ববিচারে ভাষার অন্তর্নিহিত ধ্বনিপ্রকৃতির বিচার অত্যাবশ্যক, সেই কথাটা এই উপলক্ষে বোঝাবার চেষ্টা করেছি।

বাংলা ছন্দের তিনটি শাখা। একটি আছে পুঁথিগত কৃত্রিম ভাষাকে অবলম্বন করে, সেই ভাষায় বাংলার স্বাভাবিক ধ্বনিরূপকে স্বীকার করে নি। আর-একটি সচল বাংলার ভাষাকে নিয়ে, এই ভাষা বাংলার হসন্ত-শব্দের ধ্বনিকে আপন বলে গ্রহণ করেছে। আর-একটি শাখার উদ্গম হয়েছে সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় ভেঙে নিয়ে।

শিখরিণী মালিনী মন্দাক্রান্তা শার্দূলবিক্রীড়িত প্রভৃতি বড়ো বড়ো গম্ভীরচালের ছন্দ গুরুলঘুস্বরের যথানির্দিষ্ট বিন্যাসে অসমান মাত্রাভাগের ছন্দ। বাংলায় আমরা

বিষমমাত্রামূলক ছন্দ কিছু কিছু চালিয়েছি, কিন্তু বিষমমাত্রার ঘনঘন পুনরাবৃত্তির দ্বারা তারও একটা সম্মিতি রক্ষা হয়।

শিমুল রাঙা রঙে
চোখেরে দিল ভরে।
নাকটা হেসে বলে,
হায় রে যাই মরে।
নাকের মতে, গুণ
কেবলি আছে ঘ্রাণে,
রূপ যে রঙ খোঁজে
নাকটা তা কি জানে।

এখানে বিষমমাত্রার পদগুলি জোড়ে-জোড়ে এসে চলনের অসমানতা ঘুচিয়ে দিয়েছে। কিন্তু, সংস্কৃত ভাষায় বিষমমাত্রার বিস্তার আরো অনেক বড়ো। এই সংস্কৃত ছন্দের দীর্ঘহ্রস্ব স্বরকে সমান করে নিয়ে কেবলমাত্র মাত্রা মিলিয়ে ছন্দ রচনা বাংলায় দেখেছি, সে বহুকাল পূর্বে 'স্বপ্নপ্রয়াণ'এ।

লজ্জা বলিল, "হবে
কি লো তবে,
কতদিন পরান রবে
অমন করি।
হইয়ে জলহীন
যথা মীন
রহিবি ওলো কতদিন
মরমে মরি।"

এর প্রত্যেক ভাগে মাত্রাসংখ্যা স্বতন্ত্র।

সংস্কৃত ছন্দে বিবিধ মাত্রার এই গতিবৈচিত্র্য যা সম্মিতি উপেক্ষা করেও ভঙ্গিলীলা বাঁচিয়ে চলে, বাংলায় তার অনুকৃতি এখনো যথেষ্ট প্রচলিত হয় নি। নূতন ছন্দ বাংলায় সৃষ্টি করবার শখ যাঁদের প্রবল, এই পথে তাঁরা অনেক নূতনত্বের সন্ধান পাবেন। তবু বলে রাখি, তাতে তাঁরা সংস্কৃত ছন্দের মোট আয়তনটা পাবেন, তার ধ্বনিতরঙ্গ পাবেন না। মন্দাক্রান্তার মাত্রা-গোনা একটা বাংলা ছন্দের নমুনা দেওয়া যাক—

সারা প্রভাতের
বিকালে গেঁথে আনি
ভাবিনু হারখানি
দিব গলে।
ভয়ে ভয়ে অবশেষে
তোমার কাছে এসে
কথা যে যায় ভেসে
আঁখিজলে।
দিন যবে হয় গত
না-বলা কথা যত
খেলার ভেলা-মতো
হেলাভরে
লীলা তার করে সারা
যে পথে ঠাঁইহারা
রাতের যত তারা
যায় সরে।

শিখরিণীকেও এই ভাবে বাংলায় রূপান্তরিত করা যেতে পারে—

কেবলি অহরহ মনে-মনে
নীরবে তোমা-সনে
যা-খুশি কহি কত ;
বিরহব্যথা মম নিজে নিজে
তোমারি মুরতি যে
গড়িছে অবিরত।
এ পূজা ধায় যবে তোমা-পানে
বাজে কি কোনোখানে,
কাঁপে কি মন তব।
জান কি দিবানিশি বহুদূরে
গোপনে বাজে সুরে
বেদনা অভিনব।

ছন্দ সম্বন্ধে আরো কিছু বলা বাকি রইল, আর কোনো সময়ে পরে বলবার ইচ্ছা আছে। উপসংহারে আজ কেবল এই কথাটি বলতে চাই যে, ছন্দের একটা দিক আছে যেটাকে বলা যেতে পারে কৌশল। কিন্তু, তার চেয়ে আছে বড়ো জিনিস যেটাকে বলি সৌষ্ঠব। বাহাদুরি তার মধ্যে নেই, সমগ্র কাব্যসৃষ্টির কাছে ছন্দের আত্মবিস্মৃত আত্মনিবেদনে তার উদ্ভব। কাব্য পড়তে গিয়ে যদি অনুভব করি যে, ছন্দ পড়ছি, তা হলে সেই প্রগল্‌ভ ছন্দকে ধিক্কার দেব। মস্তিষ্ক হৃৎপিণ্ড পাকস্থলী অতি আশ্চর্য যন্ত্র, সৃষ্টিকর্তা তাদের স্বাতন্ত্র্য ঢাকা দিয়েছেন। দেহ তাদেরকে ব্যবহার করে, প্রকাশ করে না। করে প্রকাশ যখন রোগে ধরে; তখন যকৃৎটা হয় প্রবল, তার কাছে মাথা হেঁট করে লাবণ্য। শরীরে স্বাস্থ্যের মতোই কবি ছন্দকে ভুলে থাকে, ছন্দ যখন তার যথার্থ আপন হয়।

বৈশাখ ১৩৪১

গদ্যছন্দ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত

কথা যখন খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে তখন সে কেবলমাত্র আপন অর্থটুকু নিবেদন করে। যখন তাকে ছন্দের আঘাতে নাড়া দেওয়া যায় তখন তার কাছ থেকে অর্থের বেশি আরো কিছু বেরিয়ে পড়ে। সেটা জানার জিনিস নয়, বেদনার জিনিস। সেটাতে পদার্থের পরিচয় নয়, রসের সম্ভোগ।

আবেগকে প্রকাশ করতে গেলে কথার মধ্যে আবেগের ধর্ম সঞ্চার করতে হয়। আবেগের ধর্ম হচ্ছে বেগ; সে চলে, চালায়। কথা যখন সেই বেগ গ্রহণ করে তখন স্পন্দিত হৃদয়ভাবের সঙ্গে তার সাধর্ম্য ঘটে।

চলতি ভাষায় আমরা বলি কথাকে ছন্দে বাঁধা। বাঁধা বটে, কিন্তু সে বাঁধন বাইরে, রূপের দিকে; ভাবের দিকে মুক্তি। যেমন সেতারে তার বাঁধা, তার থেকে সুর পায় ছাড়া। ছন্দ সেই সেতারের বাঁধা তার, সুরের বেগে কথাকে অন্তরে দেয় মুক্তি।

উপনিষদে আছে, আত্মার লক্ষ্য ব্রহ্ম, ওঙ্কারের ধ্বনিবেগ তাকে ধনুর মতো লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দেয়। এতে বলা হচ্ছে, বাক্যের দ্বারা যুক্তির দ্বারা ব্রহ্ম জানবার বিষয় নন, তিনি আত্মার সঙ্গে একাত্ম হবার বিষয়। এই উপলব্ধিতে ধ্বনিই সহায়তা করে, শব্দার্থ করে না।

জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় উভয়ের মধ্যে মোকাবিলা হয় মাত্র; অর্থাৎ সান্নিধ্য হয়, সাযুজ্য

হয় না। কিন্তু, এমন-সকল বিষয় আছে যাকে জানার দ্বারা পাওয়া যায় না, যাকে আত্মস্থ করতে হয়। আম বস্তুটাকে সামনে রেখে জানা চলে, কিন্তু তার রসটাকে আত্মগত করতে না পারলে বুদ্ধিমূলক কোনো প্রণালীতে তাকে জানবার উপায় নেই। রসসাহিত্য মুখ্যত জ্ঞানের জিনিস নয়, তা মর্মের অধিগম্য। তাই, সেখানে কেবল অর্থ যথেষ্ট নয়, সেখানে ধ্বনির প্রয়োজন; কেননা ধ্বনি বেগবান্। ছন্দের বন্ধনে এই ধ্বনিবেগ পায় বিশিষ্টতা, পায় প্রবলতা।

নিত্যব্যবহারের ভাষাকে ব্যাকরণের নিয়মজাল দিয়ে বাঁধতে হয়। রসপ্রকাশের ভাষাকে বাঁধতে হয় ধ্বনিসংগতের নিয়মে। সমাজেই বলো, ভাষাতেই বলো, সাধারণ ব্যবহারবিধির প্রয়োজন বাইরের দিকে, কিন্তু তাতেই সম্পূর্ণতা নেই। আর-একটা বিধি আছে যেটা আত্মিকতার বিধি। সমাজের দিক থেকে একটা দৃষ্টান্ত দেখানো যাক।

জাপানে গিয়ে দেখা গেল জাপানি সমাজস্থিতি। সেই স্থিতি ব্যবস্থাবন্ধনে। সেখানে চোরকে ঠেকায় পুলিস, জুয়াচোরকে দেয় সাজা, পরস্পরের দেনাপাওনা পরস্পরকে আইনের তাড়ায় মিটিয়ে দিতে হয়। এই যেমন স্থিতির দিক তেমনি গতির দিক আছে; সে চরিত্রে, যা চলে যা চালায়। এই গতি হচ্ছে অন্তর থেকে উদ্গত সৃষ্টির গতি, এই গতিপ্রবাহে জাপানি মনুষ্যত্বের আদর্শ নিয়ত রূপ গ্রহণ করে। জাপানি সেখানে ব্যক্তি, সর্বদাই তার ব্যঞ্জনা চলছে। সেখানে জাপানির নিত্য-উদ্ভাবিত সচল সত্তার পরিচয় পাওয়া গেল। দেখতে পেলেম, স্বভাবতই জাপানি রূপকার। কেবল যে শিল্পে সে আপন সৌষম্যবোধ প্রকাশ করছে তা নয়, প্রকাশ করছে আপন ব্যবহারে। প্রতিদিনের আচরণকেও সে শিল্পসামগ্রী করে তুলেছে, সৌজন্যে তার শৈথিল্য নেই। আতিথেয়তায় তার দাক্ষিণ্য আছে, হৃদ্যতা আছে, বিশেষভাবে আছে সুষমা। জাপানের বৌদ্ধমন্দিরে গেলেম। মন্দিরসজ্জায়, উপাসকদের আচরণে অনিন্দ্যনির্মল শোভনতা; বহুনৈপুণ্যে নির্মিত মন্দিরের ঘণ্টার গম্ভীর মধুর ধ্বনি মনকে আনন্দে আন্দোলিত করে। কোথাও সেখানে এমন কিছুই নেই যা মানুষের কোনো ইন্দ্রিয়কে কদর্যতা বা অপারিপাট্যে অবমানিত করতে পারে। এই সঙ্গে দেখা যায় পৌরুষের অভিমানে জাপানির প্রাণপণ নির্ভীকতা। চারুতা ও বীর্যের সম্মিলনে এই যে তার আত্মপ্রকাশ, এ তো ফৌজদারি দণ্ডবিধির সৃষ্টি নয়। অথচ, জাপানির ব্যক্তিস্বরূপ বন্ধনের সৃষ্টি, তার পরিপূর্ণতা সীমার দ্বারাতেই। নিয়ত প্রকাশমান চলমান এই তার প্রকৃতিকে শক্তিদান রূপদান করে যে আন্তরিক বন্ধন, যে সজীব সীমা, তাকেই বলি ছন্দ। আইনের শাসনে সমাজস্থিতি, অন্তরের ছন্দে আত্মপ্রকাশ।

বিংশতিকোটি মানবের বাস
এ ভারতভূমি যবনের দাস
রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা।
আর্যাবর্তজয়ী মানব যাহারা
সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা,
জন কত শুধু প্রহরী-পাহারা
দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধা।

দেখা যাচ্ছে, ছন্দের বন্ধনে শব্দগুলোকে শৈথিল্য থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে, এলিয়ে পড়ছে না, তারা একটা বিশেষ রূপ নিয়ে চলেছে। বাঁধন ভেঙে দেওয়া যাক।

'ভারতভূমিতে বিংশতিকোটি মানব বাস করিয়া থাকে, তথাপি এই দেশ দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া আছে। যাহারা একদা আর্যাবর্ত জয় করিয়াছিল ইহারা কি সেই বংশ হইতে উদ্ভূত। কয়েকজনমাত্র প্রহরীর পরিক্রমণ দেখিয়াই ইহাদের চক্ষুতে কি দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়াছে।'

কথাগুলোর কোনো লোকসান হয় নি, বরঞ্চ হিসাব করে দেখলে কয়েক পার্সেন্ট মুনফাই দেখা যায়। কিন্তু কেবল ব্যাকরণের বাঁধনে কথাগুলোকে অন্তরের দিকে সংঘবদ্ধ করে নি, তারই অভাবে সে শক্তি হারিয়েছে। উদাস মনের রুদ্ধ দ্বার ভাঙবার উদ্দেশে সবাই মিলে এক হয়ে ঘা দিতে পারছে না।[১]

ছন্দর সঙ্গে অছন্দর তফাত এই যে, কথা একটাতে চলে, আর-একটাতে শুধু বলে কিন্তু চলে না। যে চলে সে কখনো খেলে, কখনো নাচে, কখনো লড়াই করে, হাসে কাঁদে; যে স্থির বসে থাকে সে আপিস চালায়, তর্ক করে, বিচার করে, হিসাব দেখে, দল পাকায়। ব্যবসায়ীর শুষ্ক প্রবীণতা ছন্দোহীন বাক্যে, অব্যবসায়ীর সরসচঞ্চল প্রাণের বেগ ছন্দোময় ছবিতে কাব্যে গানে।

এই ছবি-গান-কাব্যকে আমরা গড়ে-তোলা জিনিস বলে অনুভব করি নে; মনে লাগে, যেন তারা হয়ে-ওঠা পদার্থ। তাদের মধ্যে উপাদানের বাহ্য সংঘটনটা অত্যন্ত বেশি ধরা দেয় না; দেখা যায় উদ্ভাবনার একটা অখণ্ড প্রকাশ, যে প্রকাশ একান্তভাবে আমাদের বোধের সঙ্গে মেলে। বিশ্বসৃষ্টিতে স্পন্দিত আকাশ, কম্পিত বাতাস, চঞ্চল হৃদয়াবেগ স্নায়ুতন্তুতে ছন্দোবিভঙ্গিত হয়ে আলোতে গানেতে বেদনায় আমাদের চৈতন্যে কেবলই এঁকে দিচ্ছে আলিম্পন। ছবি-গান-কাব্যও আপন ছন্দঃস্পন্দনের

১ আরম্ভ হইতে প্রবন্ধের এই অনুচ্ছেদ পর্যন্ত অংশ সাময়িক পত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে।

চলদ্‌বেগে আমাদের চৈতন্তকে গতিমান্‌ আকৃতিমান্‌ করে তুলছে নানাপ্রকার চাঞ্চল্যে। অন্তরে যেটা এসে প্রবেশ করছে সেটা মিলে যাচ্ছে আমাদের চৈতন্তে, সে আর স্বতন্ত্র থাকছে না।

ঘোড়ার ছবি দেখি প্রাণিতত্ত্বের বইয়ে। সেখানে ঘোড়ার আকৃতির সঙ্গে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমস্ত হিসাব ঠিকঠাক মেলে। তাতে খবর পাই, সে খবর বাইরের খবর; তাতে জ্ঞানলাভ করি, ভিতরটা খুশি হয়ে ওঠে না। এই খবরটা স্থাবর পদার্থ। রূপকার ঘোড়ার যে ছবি আঁকে তার চরম উদ্দেশ্য খবর নয় খুশি, এই খুশিটা বিচলিত চৈতন্তের বিশেষ উদ্‌বোধন। ভালো ছবির মধ্যে বরাবরের মতো একটা সচলতার বেগ রয়েই গেল, তাকে বলা চলে পর্‌পেচুয়ল মুভ্‌মেন্ট; প্রাণিতত্ত্বের বইয়ে ঘোড়ার ছবিটা চারি দিকেই সঠিক করে বাঁধা, খাঁটি খবরের যাথার্থ্যে পিলপে-গাড়ি করা তার সীমানা। রূপকারের রেখায় রেখায় তার তুলি মৃদঙ্গের বোল বাজিয়েছে, দিয়েছে সুষমার নাচের দোলা। সেই ঘোড়ার ছবিতে চতুষ্পদজাতীয় জীবের খাঁটি খবর না মিলতেও পারে, মিলবে ছন্দ যার নাড়া খেয়ে সচকিত চৈতন্য সাড়া দিয়ে বলে ওঠে 'হাঁ এই তো বটে'। আপনারই মধ্যে সেই সৃষ্টিকে সে স্বীকার করে, সেই থেকে চিরকালের মতো সেই ধ্বনিময় রূপ আমাদের বিশ্বপরিচয়ের অন্তর্গত হয়ে থাকে। আকাশ কালো মেঘে স্নিগ্ধ, বনভূমি তমালগাছে শ্যামবর্ণ, ব্যাপারটা এর বেশি কিছুই নয়; খবরটা একবারের বেশি দুবার বললে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিই; কবি বরাবরকার মতো বলতে থাকলেন—

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ।

কবির মনের মেঘলা দিনের সংবেগ চড়ে বসল ছন্দ-পক্ষিরাজের পিঠে, চলল চিরকালের মনোহরণ করতে।

গদ্যে প্রধানত অর্থবান শব্দকে ব্যূহবদ্ধ করে কাজে লাগাই, পদ্যে প্রধানত ধ্বনিমান্‌ শব্দকে ব্যূহবদ্ধ করে সাজিয়ে তোলা হয়। ব্যূহ শব্দটা এখানে অসার্থক নয়। ভিড় জমে রাস্তায়, তার মধ্যে সাজাই-বাছাই নেই, কেবল এলোমেলো চলাফেরা। সৈন্যের ব্যূহ সংহত সংযত, সাজাই-বাছাইয়ের দ্বারা সবগুলি মানুষের যে সম্মিলন ঘটে তার থেকে একটা প্রবল শক্তি উদ্‌ভাবিত হয়। এই শক্তি স্বতন্ত্রভাবে যথেচ্ছভাবে প্রত্যেক সৈনিকের মধ্যে নেই। মানুষকে উপাদান করে নিয়ে ছন্দোবিন্যাসের দ্বারা সেনাপতি এই শক্তিরূপের সৃষ্টি করে। এ যেন বহু-ইন্ধনের হোমহুতাশন থেকে যাজ্ঞসেনীর আবির্ভাব। ছন্দঃসজ্জিত শব্দব্যূহে ভাষায় তেমনি একটি শক্তিরূপের সৃষ্টি।

চিত্রসৃষ্টিতেও এ কথা খাটে। তার মধ্যে রেখার ও রঙের একটা সামঞ্জস্যবদ্ধ

সাজাই-বাছাই আছে। সে প্রতিরূপ নয়, সে স্বরূপ। তার উদ্দেশ্য রিপোর্ট করা নয়, তার উদ্দেশ্য চৈতন্যকে কবুল করিয়ে নেওয়া 'এই তো স্বয়ং দেখলুম'। গুণীর হাতে রেখা ও রঙের ছন্দোবন্ধন হলেই ছবির নাড়ির মধ্যে প্রাণের স্পন্দন চলতে থাকে, আমাদের চিৎস্পন্দন তার লয়টাকে স্বীকার করে, ঘটতে থাকে গতির সঙ্গে গতির সহযোগিতা বাতাসের হিল্লোলের সঙ্গে সমুদ্রের তরঙ্গের মতো।

ভারতবর্ষে বেদমন্ত্রে ছন্দ প্রথম দেখা দিল, মন্ত্রে প্রবেশ করল প্রাণের বেগ, সে প্রবাহিত হতে পারল নিশ্বাসে প্রশ্বাসে, আবর্তিত হতে থাকল মননধারায়। মন্ত্রের ক্রিয়া কেবল জ্ঞানে নয়, তা প্রাণে মনে ; স্মৃতির মধ্যে তা চিরকাল স্পন্দিত হয়ে বিরাজ করে। ছন্দের এই গুণ।

ছন্দকে কেবল আমরা ভাষায় বা রেখায় স্বীকার করলে সব কথা বলা হয় না। শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ছন্দ আছে ভাবের বিন্যাসে, সে কানে শোনবার নয়, মনে অনুভব করবার। ভাবকে এমন করে সাজানো যায় যাতে সে কেবলমাত্র অর্থবোধ ঘটায় না, প্রাণ পেয়ে ওঠে আমাদের অন্তরে। বাছাই করে সুবিন্যস্ত সুবিভক্ত করে ভাবের শিল্প রচনা করা যায়। বর্জন গ্রহণ সজ্জীকরণের বিশেষ প্রণালীতে ভাবের প্রকাশে সঞ্চারিত হয় চলৎশক্তি। যেহেতু সাহিত্যে ভাবের বাহন ভাষা, সেই কারণে সাহিত্যে যে ছন্দ আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ সে ছন্দ ভাষার সঙ্গে জড়িত। তাই, অনেক সময়ে এ কথাটা ভুলে যাই যে, ভাবের ছন্দই তাকে অতিক্রম করে আমাদের মনকে বিচলিত করে। সেই ছন্দ ভাবের সংযমে, তার বিন্যাসনৈপুণ্যে।

জ্ঞানের বিষয়কে প্রাঞ্জল ও যথার্থ করে ব্যক্ত করতে হলেও প্রকাশের উপাদানকে আঁট করে তাকে ঠিকমত শ্রেণীবদ্ধ করা চাই। সে তাকে প্রাণের বেগ দেবার জন্যে নয়, তাকে প্রকৃষ্ট অর্থ দেবার জন্যেই। শংকরের বেদান্তভাষ্য তার একটি নিদর্শন। তার প্রত্যেক শব্দই সার্থক, তার কোনো অংশেই বাহুল্য নেই, তাই তত্ত্বব্যাখ্যা সম্বন্ধে তা এমন সুস্পষ্ট। কিন্তু, এই শব্দযোজনার সংযমটি যৌক্তিকতার সংযম, আর্থিক যাথাতথ্যের সংযম, শব্দগুলি লজিক-সংগত পঙ্‌ক্তিবন্ধনে সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু শংকরাচার্যের নামে যে আনন্দলহরী কাব্য প্রচলিত তার ভাবের প্রকাশ লজিকের পক্ষ থেকে অসংযত, অথচ প্রাণবান্‌ গতিমান্‌ রূপসৃষ্টির পক্ষ থেকে তার কলাকৌশল দেখতে পাই।

বহন্তী সিন্দূরং প্রবলকবরীভারতিমির-
দ্বিষাং বৃন্দৈর্বন্দীকৃতমিব নবীনার্ককিরণম্‌।

তনোতু ক্ষেমং নস্তব বদনসৌন্দর্যলহরী-
পরীবাহস্রোতঃসরণিরিব সীমন্তসরণিঃ ॥

ওই সিঁথির রেখা আমাদের কল্যাণ দিক যে-রেখাটি তোমার মুখসৌন্দর্যধারার স্রোতঃপথের মতো। আর যে-সিঁদুর আঁকা রয়েছে তোমার ওই সিঁথিতে সে যেন নবীন সূর্যের আলো, তাকে ঘনকবরীভারের অন্ধকার শত্রু হয়ে বন্দী করে রেখেছে।

আনন্দলহরীতে যে নারীরূপের কথা পাই সে সাধারণ নারী নয়, সে বিশ্বসৌন্দর্যের প্রতিমা। নিয়ত বয়ে চলেছে তার সৌন্দর্যের প্রবাহ, পিছনে তার ঘনকবরীপুঞ্জে রাত্রি, সম্মুখে তার সীমন্তরেখার সিন্দুররাগে তরুণসূর্যকিরণ, এই অল্প কথায় ভাবের যে স্তবক-গুলি সংবদ্ধ তাতে কবিহৃদয়ের আনন্দ দিয়ে আঁকা একটি ছবি দেখতে পাচ্ছি, সেই ছবিটি বিশ্বপ্রকৃতির নারীরূপ।

যে ছন্দ দিয়ে এই ছবি আঁকা এ শুধু ভাষার ছন্দ নয়, এ ভাবের ছন্দ। এতে ভাবের গুটিকয়েক উপকরণ উপমার গুচ্ছে সাজানো, তাই দিয়েই ওর জাদু। ওর নিত্যসচল কটাক্ষে অনেক না-বলা কথার ইশারা রয়ে গেল।

একদিন ছিল যখন ছাপার অক্ষরের সাম্রাজ্যপত্তন হয় নি। যেমন কল-কারখানার আবির্ভাবে পণ্যবস্তুর ভূরি-উৎপাদন সম্ভবপর হল তেমনি লিখিত ও মুদ্রিত অক্ষরের প্রসাদে সাহিত্যে শব্দসংকোচের প্রয়োজন চলে গেছে। আজ সরস্বতীর আসনই বল, আর তাঁর ভাণ্ডারই বল প্রকাণ্ড আয়তনের। সাবেক সাহিত্যের দুই বাহন, তার উচ্চৈঃশ্রবা আর তার ঐরাবত, তার শ্রুতি ও স্মৃতি; তারা নিয়েছে ছুটি। তাদের জায়গায় যে যান এখন চলল, তার নাম দেওয়া যেতে পারে লিখিতি। সে রেলগাড়ির মতো, তাতে কোনোটা যাত্রীর কামরা, কোনোটা মালের। কোনোটাতে বস্তুর পিণ্ড, সংবাদপুঞ্জ, কোনোটাতে সজীব যাত্রী অর্থাৎ রসসাহিত্য। তার অনেক চাকা, অনেক কক্ষ; একসঙ্গে মস্ত মস্ত চালান। স্থানের এই অসংকোচে গদ্যের ভূরিভোজ।

সাহিত্যে অক্ষরের অতিথিশালায় বাক্যের এত বড়ো সদাব্রতের আয়োজন যখন ছিল না তখন ছন্দের সাহায্য ছিল অপরিহার্য। তাতে বাধা পেত শব্দের অতিব্যয়িতা, আর ছন্দ আপন সাংগীতিক গতিবেগের দ্বারা স্মৃতিকে রাখত সচল করে। সেদিন পদ্যছন্দের সতিন ছিল না ভাষায়, সেদিন বাণীর ছন্দের সঙ্গে ভাবের ছন্দের অন্বয়-বিবাহ অর্থাৎ মনোগেমি ছিল প্রচলিত। এখন বই-পড়াটা অনেকস্থলেই নিঃশব্দ পড়া, কানের একান্ত শাসন তাই উপেক্ষিত হতে পারে। এই সুযোগেই আজকাল কাব্যশ্রেণীর রচনা অনেক স্থলে পদ্যছন্দের বিশেষ অধিকার এড়িয়ে ভাবছন্দের মুক্তি দাবি করছে।

গদ্যসাহিত্যের আরম্ভ থেকেই তার মধ্যে মধ্যে প্রবেশ করেছে ছন্দের অন্তঃশীলা ধারা। রস যেখানেই চঞ্চল হয়েছে, রস যেখানেই চেয়েছে রূপ নিতে, সেখানেই শব্দগুচ্ছ স্বতই সজ্জিত হয়ে উঠেছে। ভাবরসপ্রধান গদ্য-আবৃত্তির মধ্যে সুর লাগে অথচ তাকে রাগিণী বলা চলে না, তাতে তালমানসুরের আভাসমাত্র আছে। তেমনি গদ্যরচনায় যেখানে রসের আবির্ভাব সেখানে ছন্দ অতিনির্দিষ্ট রূপ নেয় না, কেবল তার মধ্যে থেকে যায় ছন্দের গতিলীলা।

করবী গাছের প্রতি লক্ষ করলে দেখা যায়, তার ডালে-ডালে জুড়ি-জুড়ি সমানভাগে পত্রবিন্যাস। কিন্তু, বটগাছে সেই প্রশাখাগত সুনিয়মিত পত্রপর্যায় চোখে পড়ে না। তাতে দেখি বহু শাখা-প্রশাখায় পত্রপুঞ্জের বড়ো-বড়ো স্তবক। এই অনতিসমান রাশীকৃত ভাগগুলি বনস্পতির মধ্যে একটি সামঞ্জস্য পেয়েছে, তাকে দিয়েছে একটি বৃহৎ চরিত্ররূপ। অথচ, পাথরের যে পিণ্ডীকৃত স্থাবর বিভাগগুলি দেখা যায় পাহাড়ে, এ সেরকম নয়। এর মধ্যে দেখতে পাই প্রাণশক্তি অবলীলাক্রমে আপন নানায়তন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ওজন প্রতিনিয়ত বিশেষ মহিমার সঙ্গে বাঁচিয়ে চলেছে; তার মধ্যে দেখি যেন মহাদেবের তাণ্ডব, বলদেবের নৃত্য, সে অপ্সরীর নাচ নয়। একেই তুলনা করা যায় সেই আধুনিক কাব্যরীতির সঙ্গে, গদ্যের সঙ্গে যার বাহ্য রূপ মেলে আর পদ্যের সঙ্গে আন্তর রূপ।

সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর 'পালামৌ' গ্রন্থে কোল নারীদের নাচের বর্ণনা করেছেন। নৃতত্ত্বে যেমন করে বিবরণ লেখা হয় এ তা নয়, লেখক ইচ্ছা করেছেন নাচের রূপটা রসটা পাঠকদের সামনে ধরতে। তাই এ লেখায় ছন্দের ভঙ্গি এসে পৌঁচেছে অথচ কোনো বিশেষ ছন্দের কাঠামো নেই। এর গদ্য সমমাত্রায় বিভক্ত নয়, কিন্তু শিল্পপ্রচেষ্টা আছে এর গতির মধ্যে।

গদ্যসাহিত্যে এই-যে বিচিত্র মাত্রার ছন্দ মাঝে মাঝে উচ্ছ্বসিত হয়, সংস্কৃত বিশেষত প্রাকৃত আর্যা প্রভৃতি ছন্দে তার তুলনা মেলে। সে-সকল ছন্দে সমান পদক্ষেপের নৃত্য নেই, বিচিত্রপরিমাণ ধ্বনিপুঞ্জ কানকে আঘাত করতে থাকে। যজুর্বেদের গদ্যমন্ত্রের ছন্দকে ছন্দ বলেই গণ্য করা হয়েছে। তার থেকে দেখা যায়, প্রাচীনকালেও ছন্দের মূলতত্ত্বটি গদ্যে পদ্যে উভয়ত্রই স্বীকৃত। অর্থাৎ, যে পদবিভাগ বাণীকে কেবল অর্থ দেবার জন্যে নয়, তাকে গতি দেবার জন্যে, তা সমমাত্রায় না হলেও তাতে ছন্দের স্বভাব থেকে যায়।

পদ্যছন্দের প্রধান লক্ষণ পঙ্‌ক্তিসীমানায় বিভক্ত তার কাঠামো। নির্দিষ্টসংখ্যক ধ্বনিগুচ্ছে এক-একটি পঙ্‌ক্তি সম্পূর্ণ। সেই পঙ্‌ক্তিশেষে একটি করে বড়ো যতি। বলা বাহুল্য, গদ্যে এই নিয়মের শাসন নেই। গদ্যে বাক্য যেখানে আপন অর্থ সম্পূর্ণ

করে সেইখানেই তার দাঁড়াবার জায়গা। পদ্যছন্দ যেখানে আপন ধ্বনিসংগতিকে অপেক্ষাকৃত বড়ো রকমের সমাপ্তি দেয়, অর্থনির্বিচারে সেইখানে পঙ্‌ক্তি শেষ করে। পদ্য সব-প্রথমে এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে অমিত্রাক্ষর ছন্দে, পঙ্‌ক্তির বাইরে পদচারণা শুরু করলে। আধুনিক পদ্যে এই স্বৈরাচার দেখা দিল পয়ারকে আশ্রয় করে।

বলা বাহুল্য, এক মাত্রা চলে না। বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ। যেই দুইয়ের সমাগম অমনি হল চলা শুরু। থাম আছে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থেমে। জন্তুর পা, পাখির পাখা, মাছের পাখনা দুই সংখ্যার যোগে চলে। সেই নিয়মিত গতির উপরে যদি আর-একটা একের অতিরিক্ত ভার চাপানো যায় তবে সেই গতিতে ভারসাম্যের অপ্রতিষ্ঠতা প্রকাশ পায়। এই অনিয়মের ঠেলায় নিয়মিত গতির বেগ বিচিত্র হয়ে ওঠে। মানুষের দেহটা তার দৃষ্টান্ত। আদিমকালের চারপেয়ে মানুষ আধুনিক কালে দুই পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তার কোমর থেকে পদতল পর্যন্ত দুই পায়ের সাহায্যে মজবুত, কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত টলমলে। এই দুই ভাগের অসামঞ্জস্যকে সামলাবার জন্যে মানুষের গতিতে মাথা হাত কোমর পা বিচিত্র হিল্লোলে হিল্লোলিত। পাখিও দুই পায়ে চলে, কিন্তু তার দেহ স্বভাবতই দুই পায়ের ছন্দে নিয়মিত। টলবার ভয় নেই তার। দুই মাত্রায় অর্থাৎ জোড় মাত্রায় যে পদ বাঁধা হয় তার মধ্যে দাঁড়ানোও আছে, চলাও আছে; বেজোড় মাত্রায় চলার ঝোঁকটাই প্রধান। এইজন্যে অমিত্রাক্ষরে যেখানে-সেখানে থেমে যাবার যে নিয়ম আছে সেটা পালন করা বিষম মাত্রার ছন্দের পক্ষে দুঃসাধ্য। এইজন্যে বেজোড় মাত্রায় পদ্যধর্মই একান্ত প্রবল। চেষ্টা করে দেখা যাক বেজোড় মাত্রার দরজাটা খুলে দিয়ে। প্রথম পরীক্ষা হোক তিন মাত্রার মহলে।

বিরহী গগন ধরণীর কাছে
পাঠালো লিপিকা। দিকের প্রান্তে
নামে তাই মেঘ, বহিয়া সজল
বেদনা ; বহিয়া তড়িৎ-চকিত
ব্যাকুল আকুতি। উৎসুক ধরা
ধৈর্য হারায়, পারে না লুকাতে
বুকের কাঁপন পল্লবদলে।
বকুলকুঞ্জে রচে সে প্রাণের
মুগ্ধ প্রলাপ ; উল্লাস ভাসে
চামেলিগন্ধে পূর্বপবনে।

পয়ার ছন্দের মতো এর গতি সিধে নয়। এই তিন মাত্রার এবং জোড়-বিজোড় মাত্রার ছন্দে পদক্ষেপ মাঘনৈষধের নায়িকাদের মতো মরালগমনে, ডাইনে-বাঁয়ে ঝোঁকে-ঝোঁকে হেলতে-দুলতে।

এবার যে-ছন্দের নমুনা দেব সেটা তিন-দুই মাত্রার, গানের ভাষায় ঝাঁপতাল-জাতীয়।

চিত্ত আজি দুঃখদোলে
আন্দোলিত। দূরের সুর
বক্ষে লাগে। অঙ্গনের
সম্মুখেতে পান্থ মম
ক্লান্তপদে গিয়েছে চলি
দিগন্তরে। বিরহবেণু
ধ্বনিছে তাই মন্দবায়ে।
ছন্দে তারি কুন্দফুল
ঝরিছে কত, চঞ্চলিয়া
কাঁপিছে কাশগুচ্ছশিখা।

এ ছন্দ পাঁচ মাত্রার মাঝখানে ভাগ করে থামতে পারে না; এর যতিস্থাপনায় বৈচিত্র্যের যথেষ্ট স্বাধীনতা নেই।

এবার দেখানো যাক তিন-চার মাত্রার ছন্দ।

মালতী সারাবেলা ঝরিছে রহি রহি
কেন যে বুঝি না তো। হায় রে উদাসিনী,
পথের ধূলিরে কি করিলি অকারণে
মরণসহচরী। অরুণ গগনের
ছিলি তো সোহাগিনী। শ্রাবণবরিষনে
মুখর বনভূমি তোমারি গন্ধের
গর্ব প্রচারিছে সিক্ত সমীরণে
দিশে দিশান্তরে। কী অনাদরে তবে
গোপনে বিকশিয়া বাদল-রজনীতে
প্রভাত-আলোকেরে কহিলি 'নহে নহে'।

উপরের দৃষ্টান্তগুলি থেকে দেখা যায়, অসম ও বিষম মাত্রার ছন্দে পঙ্‌ক্তিলঙ্ঘন চলে বটে, কিন্তু তার এক-একটি ধ্বনিগুচ্ছ সমান মাপের, তাতে ছোটো-বড়ো ভাগের বৈচিত্র্য নেই। এইজন্যেই একমাত্র পয়ারছন্দই অমিত্রাক্ষর রীতিতে কতকটা গদ্য-জাতীয় স্বাধীনতা পেয়েছে।

এইবার আমার শ্রোতাদের মনে করিয়ে দেবার সময় এল যে, এই-সব পঙ্‌ক্তিলঙ্ঘক ছন্দের কথাটা উঠেছে প্রসঙ্গক্রমে। মূলকথাটা এই যে, কবিতায় ক্রমে-ক্রমে ভাষাগত ছন্দের আঁটা-আঁটির সমান্তরে ভাবগত ছন্দ উদ্‌ভাবিত হচ্ছে। পূর্বেই বলেছি, তার প্রধান কারণ, কবিতা এখন কেবলমাত্র শ্রাব্য নয়, তা প্রধানত পাঠ্য। যে সুনিবিড় সুনিয়মিত ছন্দ আমাদের স্মৃতির সহায়তা করে তার অত্যাবশ্যকতা এখন আর নেই। একদিন খনার বচনে চাষবাসের পরামর্শ লেখা হয়েছিল ছন্দে। আজকালকার বাংলায় যে 'কৃষ্টি' শব্দের উদ্‌ভব হয়েছে খনার এই-সমস্ত কৃষির ছড়ায় তাকে নিশ্চিত এগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এই ধরনের কৃষ্টি প্রচারের ভার আজকাল গদ্য নিয়েছে। ছাপার অক্ষর তার বাহন, এইজন্যে ছন্দের পুঁটুলিতে ওই বচনগুলো মাথায় করে বয়ে বেড়াবার দরকার হয় না। একদিন পুরুষও আপিসে যেত পালকিতে, মেয়েও সেই উপায়েই যেত শ্বশুর-বাড়িতে। এখন রেলগাড়ির প্রভাবে উভয়ে একত্রে একই রথে জায়গা পায়। আজকাল গদ্যের অপরিহার্য প্রভাবের দিনে ক্ষণে-ক্ষণে দেখা যাবে কাব্যও আপন গতিবিধির জন্যে বাঁধাছন্দের ময়ূরপংখিটাকে অত্যাবশ্যক বলে গণ্য করবে না। পূর্বেই বলেছি, অমিত্রাক্ষর ছন্দে সব-প্রথমে পালকির দরজা গেছে খুলে, তার ঘটাটোপ হয়েছে বর্জিত। তবুও পয়ার যখন পঙ্‌ক্তির বেড়া ডিঙিয়ে চলতে শুরু করেছিল তখনো সাবেকি চালের পরিশেষরূপে গণ্ডির চিহ্ন পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে রয়ে গেছে। ঠিক যেন পুরানো বাড়ির অন্দরমহল; তার দেয়ালগুলো সরানো হয় নি, কিন্তু আধুনিককালের মেয়েরা তাকে অস্বীকার করে অনায়াসে সদরে যাতায়াত করছে। অবশেষে হাল-আমলের তৈরি ইমারতে সেই দেওয়ালগুলো ভাঙা শুরু হয়েছে। চোদ্দ অক্ষরের গণ্ডিভাঙা পয়ার একদিন 'মানসী'র এক কবিতায় লিখেছিলুম, তার নাম নিষ্ফল-প্রয়াস[১]। অবশেষে আরো অনেক বছর পরে বেড়াভাঙা পয়ার দেখা দিতে লাগল 'বলাকা'য়, 'পলাতকা'য়। এতে করে কাব্যছন্দ গদ্যের কতকটা কাছে এল বটে, তবু মেয়ে-কম্পার্টমেন্ট্ রয়ে গেল, পুরাতন ছন্দোরীতির বাঁধন খুলল না। এমন-কি, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় আর্যা প্রভৃতি ছন্দে ধ্বনিবিভাগ যতটা স্বাধীনতা পেয়েছে আধুনিক বাংলায় ততটা সাহসও

১ বস্তুতঃ 'নিষ্ফল-কামনা'।

প্রকাশ পায় নি। একটি প্রাকৃত ছন্দের শ্লোক উদ্ধৃত করি।

বরিস জল ভমই ঘণ গঅণ
সিঅল পবণ মণহরণ
কণঅ-পিঅরি ণচই বিজ্জুরি ফুল্লিআ ণীবা।
পত্থর-বিত্থর-হিঅলা
পিঅলা [নিঅলং] ণ আবেই॥

মাত্রা মিলিয়ে এই ছন্দ বাংলায় লেখা যাক।

বৃষ্টিধারা শ্রাবণে ঝরে গগনে,
শীতল পবন বহে সঘনে,
কনক-বিজুরি নাচে রে, অশনি গর্জন করে।
নিষ্ঠুর-অন্তর মম প্রিয়তম নাই ঘরে।

বাঙালি পাঠকের কান একে রীতিমত ছন্দ বলে মানতে বাধা পাবে তাতে সন্দেহ নেই, কারণ এর পদবিভাগ প্রায় গদ্যের মতোই অসমান। যাই হোক, এর মধ্যে একটা ছন্দের কাঠামো আছে; সেটুকুও যদি ভেঙে দেওয়া যায় তা হলে কাব্যকেই কি ভেঙে দেওয়া হল। দেখা যাক।

অবিরল ঝরছে শ্রাবণের ধারা,
বনে বনে সজল হাওয়া বয়ে চলেছে,
সোনার বরন ঝলক দিয়ে নেচে উঠছে বিদ্যুৎ,
বজ্র উঠছে গর্জন করে।
নিষ্ঠুর আমার প্রিয়তম ঘরে এল না।

একেও বলতে হবে কাব্য, বুদ্ধির সঙ্গে এর বোঝাপড়া নয়, একে অনুভব করতে হয় রসবোধে। সেইজন্যেই যতই সামান্য হোক, এর মধ্যে বাক্যসংস্থানের একটা শিল্পকলা শব্দব্যবহারের একটা 'তেরছ চাহনি' রাখতে হয়েছে। সুবিহিত গৃহিণীপনার মধ্যে লোকে দেখতে পায় লক্ষ্মীশ্রী, বহু উপকরণে বহু অলংকারে তার প্রকাশ নয়। ভাষার কক্ষেও অনতিভূষিত গৃহস্থালি গদ্য হলেও তাকে সম্পূর্ণ গদ্য বলা চলবে না, যেমন চলবে না আপিসঘরের অসজ্জাকে অন্তঃপুরের সরল শোভনতার সঙ্গে তুলনা করা। আপিসঘরে ছন্দটা প্রত্যক্ষই বর্জিত, অন্যত্র ছন্দটা নিগূঢ় মর্মগত, বাহ্য ভাষায় নয়, অন্তরের ভাবে।

আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যে গদ্যে কাব্য রচনা করেছেন ওয়াল্ট্ হুইট্ম্যান। সাধারণ গদ্যের সঙ্গে তার প্রভেদ নেই, তবু ভাবের দিক থেকে তাকে কাব্য না বলে

থাকবার জো নেই। এইখানে একটা তর্জমা করে দিই।

লুইসিয়ানাতে দেখলুম একটি তাজা ওক গাছ বেড়ে উঠছে ;
একলা সে দাঁড়িয়ে, তার ডালগুলো থেকে শ্যাওলা পড়ছে ঝুলে।
কোনো দোসর নেই তার, ঘন সবুজ পাতায় কথা কইছে তার খুশিটি।
তার কড়া খাড়া তেজালো চেহারা মনে করিয়ে দিলে আমারই নিজেকে।
আশ্চর্য লাগল, কেমন করে এ গাছ ব্যক্ত করছে খুশিতে ভরা
আপন পাতাগুলিকে,

যখন না আছে ওর বন্ধু না আছে দোসর।
আমি বেশ জানি, আমি তো পারতুম না।
গুটিকতক পাতাওয়ালা একটি ডাল তার ভেঙে নিলেম,
তাতে জড়িয়ে দিলেম শ্যাওলা।
নিয়ে এসে চোখের সামনে রেখে দিলেম আমার ঘরে ;
প্রিয় বন্ধুদের কথা স্মরণ করাবার জন্যে যে তা নয়।
(সম্প্রতি ওই বন্ধুদের ছাড়া আর কোনো কথা আমার মনে ছিল না।)
ও রইল একটি অদ্ভুত চিহ্নের মতো,
পুরুষের ভালোবাসা যে কী তাই মনে করাবে।
তা যাই হোক, যদিও সেই তাজা ওক গাছ
লুইসিয়ানার বিস্তীর্ণ মাঠে একলা ঝল্‌মল্‌ করছে,
বিনা বন্ধু বিনা দোসরে খুশিতে ভরা পাতাগুলি প্রকাশ করছে
চিরজীবন ধরে,

তবু আমার মনে হয়, আমি তো পারতুম না।

এক দিকে দাঁড়িয়ে আছে কঠিন বলিষ্ঠ সতেজ ওক গাছ, একলা আপন আত্মসম্পূর্ণ নিঃসঙ্গতায় আনন্দময় ; আর-এক দিকে একজন মানুষ, সেও কঠিন বলিষ্ঠ সতেজ, কিন্তু তার আনন্দ অপেক্ষা করছে প্রিয়সঙ্গের জন্যে— এটি কেবলমাত্র সংবাদরূপে গদ্যে বলবার বিষয় নয়। এর মধ্যে কবির আপন মনোভাবের একটি ইশারা আছে। একলা গাছের সঙ্গে তুলনায় একলা বিরহী-হৃদয়ের উৎকণ্ঠা আভাসে জানানো হল। এই প্রচ্ছন্ন আবেগের ব্যঞ্জনা, এই তো কাব্য ; এর মধ্যে ভাববিন্যাসের শিল্প আছে, তাকেই বলব ভাবের ছন্দ।

চীন-কবিতার তরজমা থেকে একটি দৃষ্টান্ত দেখাই।

স্বপ্ন দেখলেম, যেন চড়েছি কোনো উঁচু ডাঙায় ;
সেখানে চোখে পড়ল গভীর এক ইঁদারা।
চলতে চলতে কণ্ঠ আমার শুকিয়েছে ;
ইচ্ছে হল, জল খাই।
ব্যগ্র দৃষ্টি নামতে চায় ঠাণ্ডা সেই কুয়োর তলার দিকে।
ঘুরলেম চার দিকে, দেখলেম ভিতরে তাকিয়ে,
জলে পড়ল আমার ছায়া।
দেখি এক মাটির ঘড়া কালো সেই গহ্বরে ;
দড়ি নাই যে তাকে টেনে তুলি।
ঘড়াটা পাছে তলিয়ে যায়
এই ভেবে প্রাণ কেন এমন ব্যাকুল হল।
পাগলের মতো ছুটলেম সহায় খুঁজতে।
গ্রামে গ্রামে ঘুরি, লোক নেই একজনও,
কুকুরগুলো ছুটে আসে টুঁটি কামড়ে ধরতে।
কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলেম কুয়োর ধারে।
জল পড়ে দুই চোখ বেয়ে, দৃষ্টি হল অন্ধপ্রায়।

শেষকালে জাগলেম নিজেরই কান্নার শব্দে।
ঘর নিস্তব্ধ, স্তব্ধ সব বাড়ির লোক ;
বাতির শিখা নিবো-নিবো, তার থেকে সবুজ ধোঁয়া উঠছে,
তার আলো পড়ছে আমার চোখের জলে।
ঘণ্টা বাজল, রাতদুপুরের ঘণ্টা,
বিছানায় উঠে বসলুম, ভাবতে লাগলুম অনেক কথা।

মনে পড়ল, যে ডাঙাটা দেখেছি সে চাং-আনের কবরস্থান ;
তিনশো বিঘে পোড়ো জমি,
ভারী মাটি তার, উঁচু-উঁচু সব ঢিবি :
নীচে গভীর গর্তে মৃতদেহ শোওয়ানো।
শুনেছি, মৃত মানুষ কখনো-কখনো দেখা দেয় সমাধির বাইরে।
আজ আমার প্রিয় এসেছিল ইঁদারায় ডুবে-যাওয়া সেই ঘড়া,
তাই দুচোখ বেয়ে জল পড়ে আমার কাপড় গেল ভিজে।

এতে পদ্যছন্দ নেই, এতে জমানো ভাবের ছন্দ। শব্দবিন্যাসে সুপ্রত্যক্ষ অলংকরণ নেই, তবুও আছে শিল্প।

উপসংহারে শেষকথা এই যে, কাব্যের অধিকার প্রশস্ত হতে চলেছে। গদ্যের সীমানার মধ্যে সে আপন বাসা বাঁধছে ভাবের ছন্দ দিয়ে। একদা কাব্যের পালা শুরু করেছি পদ্যে, তখন সে মহলে গদ্যের ডাক পড়ে নি। আজ পালা সাঙ্গ করবার বেলায় দেখি, কখন অসাক্ষাতে গদ্যে-পদ্যে রফানিষ্পত্তি চলছে। যাবার আগে তাদের রাজিনামায় আমিও একটা সই দিয়েছি। এক কালের খাতিরে অন্য কালকে অস্বীকার করা যায় না।

বৈশাখ ১৩৪১

পরিশিষ্ট

বাংলাভাষার স্বাভাবিক ছন্দ

প্রকাশক সিন্ধুদূত[১]-এর ছন্দ সম্বন্ধে বলিতেছেন, "সিন্ধুদূতের ছন্দঃ প্রচলিত ছন্দঃসকল হইতে একরূপ স্বতন্ত্র ও নূতন। এই নূতনত্বহেতু অনেকেরই প্রথম প্রথম পড়িতে কিছু কষ্ট হইতে পারে।··· বাঙ্গালা ছন্দের প্রাণগত ভাব কি ও তাহার স্বাভাবিক গতি কোন্‌দিকে এবং কি প্রণালীতেই বা ইচ্ছামতে উহার সুন্দর বৈচিত্র্য-সাধন করা যায়, ইহার নিগূঢ়তত্ত্ব সিন্ধুদূতের ছন্দঃ আলোচনা করিলে উপলব্ধ হইতে পারে।"

আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থের ছন্দ পড়িতে প্রথম-প্রথম কষ্ট বোধ হয় সত্য ; কিন্তু, ছন্দের নূতনত্ব তাহার কারণ নহে, ছত্রবিভাগের ব্যতিক্রমই তাহার একমাত্র কারণ। নিম্নে গ্রন্থ হইতে একটি শ্লোক উদ্‌ধৃত করিয়া দিতেছি।

এ কি এ, আগত সন্ধ্যা, এখনো রয়েছি বসে সাগরের তীরে ?
দিবস হয়েছে গত, না জানি ভেবেছি কত,
প্রভাত হইতে বসে রয়েছি এখানে বাহ্য জগৎ পাশরে,
ক্ষুধাতৃষ্ণা নিদ্রাহার কিছু নাহি মোর ; সব ত্যেজেছে আমারে।

রীতিমত ছত্রবিভাগ করিলে উপরি-উদ্‌ধৃত শ্লোকটি নিম্নলিখিত আকারে প্রকাশ পায়।

এ কি এ, আগত সন্ধ্যা, এখনো রয়েছি বসে
সাগরের তীরে ?
দিবস হয়েছে গত,
না জানি ভেবেছি কত,
প্রভাত হইতে বসে রয়েছি এখানে বাহ্য
জগৎ পাশরে,
ক্ষুধাতৃষ্ণা নিদ্রাহার কিছু নাই মোর ; সব
ত্যেজেছে আমারে।

মাইকেল-রচিত নিম্নলিখিত কবিতাটি যাঁহাদের মনে আছে তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, সিন্ধুদূতের ছন্দ বাস্তবিক নূতন নহে।

১ 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা'র (১৮৭৫-৭৭) কবি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের রচিত। 'সিন্ধুদূত' (১৮৮০) এঁর তৃতীয় কাব্য।

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়,
তাই ভাবি মনে।
জীবনপ্রবাহ বহি কালসিন্ধু-পানে ধায়,
ফিরাব কেমনে ?

একটি ছত্রের মধ্যে দুইটি ছত্র পুরিয়া দিলে পর প্রথমত চোখে দেখিতে খারাপ হয়, দ্বিতীয়ত কোন্‌খানে হাঁপ ছাড়িতে হইবে পাঠকরা হঠাৎ ঠাহর পান না। এখানে-ওখানে হাতড়াইতে হাতড়াইতে অবশেষে ঠিক জায়গাটা বাহির করিতে হয়। প্রকাশক যে বলিয়াছেন, বাংলা ছন্দের প্রাণগত ভাব কী ও তাহার স্বাভাবিক গতি কোন্ দিকে তাহা সিন্ধুদূতের ছন্দ আলোচনা করিলে উপলব্ধ হইতে পারে, সে বিষয়ে আমাদের মতভেদ আছে। ভাষার উচ্চারণ-অনুসারে ছন্দ নিয়মিত হইলে তাহাকেই স্বাভাবিক ছন্দ বলা যায়, কিন্তু বর্তমান কোনো কাব্যগ্রন্থে (এবং সিন্ধুদূতেও) তদনুসারে ছন্দ নিয়মিত হয় নাই। আমাদের ভাষায় পদে পদে হসন্ত শব্দ দেখা যায়, কিন্তু আমরা ছন্দ পাঠ করিবার সময় তাহাদের হসন্ত উচ্চারণ লোপ করিয়া দিই। এইজন্য যেখানে চোদ্দটা অক্ষর বিন্যস্ত হইয়াছে, বাস্তবিক বাংলার উচ্চারণ অনুসারে পড়িতে গেলে তাহা হয়তো আট বা নয় অক্ষরে পরিণত হয়। রামপ্রসাদের নিম্নলিখিত ছন্দটি পাঠ করিয়া দেখো।

মন্ বেচারির্ কী দোষ্ আছে,
তারে যেমন্ নাচাও্ তেম্‌নি নাচে।

দ্বিতীয় ছত্রের 'তারে' নামক অতিরিক্ত শব্দটি ছাড়িয়া দিলে দুই ছত্রে এগারোটি করিয়া অক্ষর থাকে। কিন্তু, উহাই আধুনিক ছন্দে পরিণত করিতে হইলে নিম্নলিখিতরূপ হয়—

মনের কী দোষ আছে,
যেমন নাচাও নাচে।

ইহাতে দুই ছত্রে আটটি অক্ষর হয়; তাল ঠিক সমান রহিয়াছে অথচ অক্ষর কম পড়িতেছে। তাহার কারণ, শেষোক্ত ছন্দে আমরা হসন্ত শব্দকে আমল দিই না। বাস্তবিক ধরিতে গেলে রামপ্রসাদের ছন্দেও আটটির অধিক অক্ষর নাই।

মন্বেচারি কী দোষাছে,
যেমন্নাচা তেম্নি নাচে।

দ্বিতীয় ছত্র হইতে 'নাচাও' শব্দের 'ও' অক্ষর ছাড়িয়া দিয়াছি; তাহার কারণ এই ও-টি 'হসন্ত' ও, পরবর্তী 'তে'-র সহিত ইহা যুক্ত।

উপরে দেখাইলাম বাংলাভাষার স্বাভাবিক ছন্দ কী। আর, যদি কখনো স্বাভাবিক দিকে বাংলা ছন্দের গতি হয় তবে ভবিষ্যতের ছন্দ রামপ্রসাদের ছন্দের অনুযায়ী হইবে।

শ্রাবণ ১২৯০

বাংলা শব্দ ও ছন্দ

বাংলা শব্দ-উচ্চারণের মধ্যে কোথাও ঝোঁক নাই, অথবা যদি থাকে সে এত সামান্য যে তাহাকে নাই বলিলেও ক্ষতি হয় না। এইজন্যই আমাদের ছন্দে অক্ষর গণিয়া মাত্রা নিরূপিত হইয়াছে। কথার প্রত্যেক অক্ষরের মাত্রা সমান। কারণ, কোনো স্থানে বিশেষ ঝোঁক না থাকাতে অক্ষরের বড়ো ছোটো প্রায় নাই। সংস্কৃত উচ্চারণে যে দীর্ঘহ্রস্বের নিয়ম আছে তাহাও বাংলায় লোপ পাইয়াছে। এই কারণে উচ্চারণ-হিসাবে বাংলাভাষা বঙ্গদেশের সমতল-প্রসারিত প্রান্তরভূমির মতো সর্বত্র সমান। জিহ্বা কোথাও বাধা না পাইয়া ভাষার উপর দিয়া যেন একপ্রকার নিদ্রিত অবস্থায় চলিয়া যায়; কথাগুলি চিত্তকে পদে পদে প্রতিহত করিয়া অবিশ্রাম মনোযোগ জাগ্রত করিয়া রাখিতে পারে না। শব্দের সহিত শব্দের সংঘর্ষণে যে বিচিত্র সংগীত উৎপন্ন হয় তাহা সাধারণত বাংলাভাষায় অসম্ভব; কেবল একতান কলধ্বনি ক্রমে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের চেতনা লোপ করিয়া দেয়। একটি শব্দের সম্পূর্ণ অর্থ হৃদয়ংগম হইবার পূর্বেই অবিলম্বে আর-একটি কথার উপরে স্খলিত হইয়া পড়িতে হয়। বৈষ্ণব কবির একটি গান আছে—

মন্দপবন, কুঞ্জভবন,
কুসুমগন্ধ-মাধুরী।

এই দুটি ছত্রে অক্ষরের গুরুলঘু নিরূপিত হওয়াতে এই সামান্য গুটিকয়েক কথার মধুর ভাবে সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া লয়। কিন্তু, এই ভাব সমমাত্রক[১] ছন্দে নিবিষ্ট হইলে অনেকটা নিষ্ফল হইয়া পড়ে। যেমন—

মৃদুল পবন, কুসুমকানন,
ফুলপরিমল-মাধুরী।

১ এখানে 'সমমাত্রক' শব্দে "দুই মাত্রায় চলন" উদ্দিষ্ট নয়, শব্দের হ্রস্বদীর্ঘতা বা উচ্চনীচতা নাই এইমাত্র বুঝাইতেছে।

ইংরাজিতে অনেক সময় আট-দশ লাইনের একটি ছোটো কবিতা লঘুবাণের মতো ক্ষিপ্রগতিতে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া মর্মের মধ্যে বিদ্ধ হইয়া থাকে। বাংলায় ছোটো কবিতা আমাদের হৃদয়ের স্বাভাবিক জড়তায় আঘাত দিতে পারে না। বোধ করি কতকটা সেই কারণে আমাদের ভাষার এই খর্বতা আমরা অত্যুক্তি দ্বারা পূরণ করিয়া লইতে চেষ্টা করি। একটা কথা বাহুল্য করিয়া না বলিলে আমাদের ভাষায় বড়োই ফাঁকা শুনায় এবং সে কথা কাহারো কানে পৌঁছায় না। সেইজন্য সংক্ষিপ্ত সংহত রচনা আমাদের দেশে প্রচলিত নাই বলিলেই হয়। কোনো লেখা অত্যুক্তি পুনরুক্তি বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং আড়ম্বর -পূর্ণ না হইলে সাধারণত গ্রাহ্য হয় না।

বাংলা পড়িবার সময় অনেক পাঠক অধিকাংশ স্বরবর্ণকে দীর্ঘ করিয়া টানিয়া টানিয়া পড়েন। নচেৎ সমমাত্র হ্রস্বস্বরে হৃদয়ের সমস্ত আবেগ কুলাইয়া উঠে না। বাংলার বক্তারা অনেকেই দীর্ঘ উচ্চারণ প্রয়োগ করিয়া বক্তৃতা বৃহৎ ও গম্ভীর করিয়া তোলেন। ভালো ইংরাজ অভিনেতার অভিনয়ে দেখিতে পাওয়া যায়, এক-একটি শব্দকে সবলে বেষ্টন করিয়া প্রচণ্ড হৃদয়াবেগ কিরূপ উদ্দামগতিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। কিন্তু, বাংলা অভিনয়ে শিথিল কোমল কথাগুলি হৃদয়স্রোতের নিকট সহজেই মাথা নত করিয়া দেয়, তাহাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতে পারে না। এইজন্য তাহাতে সর্বত্রই একপ্রকার দুর্বল সমায়ত সানুনাসিক ক্রন্দনস্বর ধ্বনিত হইতে থাকে। এইজন্য আমাদের অভিনেতারা যেখানে শ্রোতাদের হৃদয় বিচলিত করিতে চান সেখানে গলা চড়াইয়া অযথা-পরিমাণে চিৎকার করিতে থাকেন এবং তাহাতে প্রায়ই ফললাভ করেন।

মাইকেল তাঁহার মহাকাব্যে যে বড়ো বড়ো সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন—শব্দের স্থায়িত্ব, গাম্ভীর্য এবং পাঠকের সমগ্র মনোযোগ বদ্ধ করিবার চেষ্টাই তাহার কারণ বোধ হয়। 'যাদঃপতিরোধঃ যথা চলোর্মি-আঘাতে' দুর্বোধ হইতে পারে, কিন্তু 'সাগরের তট যথা তরঙ্গের ঘায়' দুর্বল; 'উড়িল কলম্বকুল অম্বরপ্রদেশে' ইহার পরিবর্তে 'উড়িল যতেক তীর আকাশ ছাইয়া' ব্যবহার করিলে ছন্দের পরিপূর্ণ ধ্বনি নষ্ট হয়।

বাংলা শব্দের মধ্যে এই ধ্বনির অভাববশত বাংলায় পদ্যের অপেক্ষা গীতের প্রচলনই অধিক। কারণ, গীত সুরের সাহায্যে প্রত্যেক কথাটিকে মনের মধ্যে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট করিয়া দেয়। কথায় যে অভাব আছে সুরে তাহা পূর্ণ হয়। এবং গানে এক কথা বারবার ফিরিয়া গাহিলে ক্ষতি হয় না। যতক্ষণ চিত্ত না জাগিয়া উঠে ততক্ষণ সংগীত ছাড়ে না। এইজন্য প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে গান ছাড়া কবিতা নাই বলিলে হয়।

সংস্কৃতে ইহার বিপরীত দেখা যায়। বেদ ছাড়িয়া দিলে সংস্কৃত ভাষায় এত মহাকাব্য খণ্ডকাব্য সত্ত্বেও গান নাই। শকুন্তলা প্রভৃতি নাটকে যে দুই-একটি প্রাকৃত

গীত দেখিতে পাওয়া যায় তাহা কাব্যের মধ্যে স্থান পাইতে পারে না। বাঙালি জয়দেবের গীতগোবিন্দ আধুনিক এবং তাহাকে এক হিসাবে গান না বলিলেও চলে। কারণ, তাহার ভাষালালিত্য ও ছন্দোবিন্যাস এমন সম্পূর্ণ যে তাহা সুরের অপেক্ষা রাখে না; বরং আমার বিশ্বাস সুরসংযোগে তাহার স্বাভাবিক শব্দনিহিত সংগীতের লাঘব করে। কিন্তু,

মনে রইল, সই, মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে
তারে বলি বলি আর বলা হল না।

ইহা কাব্যকলায় অসম্পূর্ণ, অতএব সুরের প্রতি ইহার অনেকটা নির্ভর। সংস্কৃত শব্দ এবং ছন্দ ধ্বনিগৌরবে পরিপূর্ণ। সুতরাং সংস্কৃতে কাব্যরচনার সাধ গানে মিটাইতে হয় নাই, বরং গানের সাধ কাব্যে মিটিয়াছে। মেঘদূত সুরে বসানো বাহুল্য।

হিন্দীসাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না। কিন্তু, এ কথা বলিতে পারি, হিন্দীতে যে-সকল ধ্রুপদ খেয়াল প্রভৃতি পদ শুনা যায় তাহার অধিকাংশই কেবলমাত্র গান, একেবারেই কাব্য নহে। কথাকে সামান্য উপলক্ষমাত্র করিয়া সুর শুনানোই হিন্দী গানের প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু বাংলায় সুরের সাহায্য লইয়া কথার ভাবে শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করাই কবির উদ্দেশ্য। কবির গান, কীর্তন, রামপ্রসাদী গান, বাউলের গান প্রভৃতি দেখিলেই ইহার প্রমাণ হইবে। অতএব কাব্যরচনাই বাংলাগানের মুখ্য উদ্দেশ্য, সুরসংযোগ গৌণ। এই-সকল কারণে বাংলা সাহিত্য-ভাণ্ডারে রত্ন যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা গান।

শ্রাবণ ১২৯৯

সংগীত ও ছন্দ[১]

অনেক দিন হইতেই কবিতা লিখিতেছি, এইজন্য যতই বিনয় করি না কেন এটুকু না বলিয়া পারি না যে, ছন্দের তত্ত্ব কিছু কিছু বুঝি। সেই ছন্দের বোধ লইয়া যখন গান লিখিতে বসিলাম, তখন চাঁদ সদাগরের উপর মনসার যে-রকম আক্রোশ, আমার রচনার উপর তালের দেবতা তেমনি ফোঁস করিয়া উঠিলেন। আমার জানা ছিল, ছন্দের মধ্যে যে-নিয়ম আছে তাহা বিধাতার গড়া নিয়ম, তা কামারের গড়া-

১ সবুজ পত্রে মুদ্রিত 'সঙ্গীতের মুক্তি' প্রবন্ধের অংশ। মূলানুগত পাঠ। গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য।

নিগড় নয়। সুতরাং, তার সংযমে সংকীর্ণ করে না, তাহাতে বৈচিত্র্যকে উদ্‌ঘাটিত করিতে থাকে। সেই কথা মনে রাখিয়া বাংলা কাব্যে ছন্দকে বিচিত্র করিতে সংকোচ বোধ করি নাই।

কাব্যে ছন্দের যে কাজ, গানে তালের সেই কাজ। অতএব, ছন্দ যে নিয়মে কবিতায় চলে তাল সেই নিয়মে গানে চলিবে এই ভরসা করিয়া গান বাঁধিতে চাহিলাম। তাহাতে কী উৎপাত ঘটিল একটা দৃষ্টান্ত দিই। মনে করা যাক, আমার গানের কথাটি এই—

কাঁপিছে দেহলতা থরথর,
চোখের জলে আঁখি ভরভর।
দোদুল তমালেরি বনছায়া
তোমার নীলবাসে নিল কায়া,
বাদল-নিশীথেরি ঝরঝর
তোমার আঁখি-'পরে ভরভর।
যে কথা ছিল তব মনে মনে
চমকে অধরের কোণে কোণে।
নীরব হিয়া তব দিল ভরি
কী মায়া-স্বপনে যে, মরি মরি,
নিবিড় কাননের মরমর
বাদল-নিশীথের ঝরঝর।

এ ছন্দে আমার পাঠকেরা কিছু আপত্তি করিলেন না। তাই সাহস করিয়া ওইটেই ওই ছন্দেই সুরে গাহিলাম। তখন দেখি, যাঁরা কাব্যের বৈঠকে দিব্য খুশি ছিলেন তাঁরাই গানের বৈঠকে রক্তচক্ষু। তাঁরা বলেন, এ ছন্দের এক অংশে সাত আর-এক অংশে চার, ইহাতে কিছুতেই তাল মেলে না। আমার জবাব এই, তাল যদি না মেলে সেটা তালেরই দোষ, ছন্দটাতে দোষ হয় নাই। কেন তাহা বলি। এই ছন্দ তিন এবং চার মাত্রার যোগে তৈরি। এইজন্যই 'তোমার নীলবাসে' এই সাত মাত্রার পর 'নিল কায়া' এই চার মাত্রা খাপ খাইল। তিন মাত্রা হইলেও ক্ষতি হইত না। যেমন, 'তোমার নীলবাসে মিলিল'। কিন্তু, ইহার মধ্যে ছয় মাত্রা কিছুতেই সইবে না। যেমন, 'তোমারি নীলবাসে ধরিল শরীর'। অথচ, প্রথম অংশে যদি ছয়ের ভাগ থাকিত তবে দিব্য চলিত। যেমন, 'তোমার সুনীল বাসে ধরিল শরীর'। এ আমি বলিতেছি কানের স্বাভাবিক রুচির কথা। এই কানের ভিতর দিয়া মরমে

পশিবার পথ। অতএব, এই কানের কাছে যদি ছাড় মেলে তবে ওস্তাদকে কেন ডরাইব।

আমার দৃষ্টান্তগত ছন্দটিতে প্রত্যেক লাইনেই সবসুদ্ধ ১১ মাত্রা আছে। কিন্তু এমন ছন্দ হইতে পারে যার প্রত্যেক লাইনে সমান মাত্রাবিভাগ নাই। যেমন—

বাজিবে, সখী, বাঁশি বাজিবে,
হৃদয়রাজ হৃদে রাজিবে।
বচন রাশি রাশি কোথা যে যাবে ভাসি,
অধরে লাজহাসি সাজিবে।
নয়নে আঁখিজল করিবে ছলছল
সুখবেদনা মনে বাজিবে।
মরমে মুরছিয়া মিলাতে চাবে হিয়া
সেই চরণযুগ-রাজীবে।

ইহার প্রথম দুই লাইনে মাত্রা ভাগ ৩+৪+৩=১০। তৃতীয় লাইনে ৩+৪+৩+৪=১৪। আমার মতে এই বৈচিত্র্যে ছন্দের মিষ্টতা বাড়ে। অতএব, উৎসাহ করিয়া গান ধরিলাম। কিন্তু, এক ফের ফিরিতেই তালওয়ালা পথ আটক করিয়া বসিল। সে বলিল, "আমার সমের মাসুল চুকাইয়া দাও।" আমি তো বলি, এটা বে-আইনি আবোয়াব। কান মহারাজার উচ্চ আদালতে দরবার করিয়া খালাস পাই। কিন্তু, সেই দরবারের বাহিরে খাড়া আছে মাঝারি শাসনতন্ত্রের দারোগা। সে খপ্ করিয়া হাত চাপিয়া ধরে, নিজের বিশেষ বিধি খাটায়, রাজার দোহাই মানে না।

কবিতায় যেটা ছন্দ, সংগীতে সেইটেই লয়। এই লয় জিনিসটি সৃষ্টি ব্যাপিয়া আছে, আকাশের তারা হইতে পতঙ্গের পাখা পর্যন্ত সমস্তই ইহাকে মানে বলিয়াই বিশ্বসংসার এমন করিয়া চলিতেছে অথচ ভাঙিয়া পড়িতেছে না। অতএব, কাব্যেই কী গানেই কী, এই লয়কে যদি মানি তবে তালের সঙ্গে বিবাদ ঘটিলেও ভয় করিবার প্রয়োজন নাই।

একটি দৃষ্টান্ত দিই—

ব্যাকুল বকুলের ফুলে
ভ্রমর মরে পথ ভুলে।
আকাশে কী গোপন বাণী
বাতাসে করে কানাকানি,
বনের অঞ্চলখানি
পুলকে উঠে দুলে দুলে।

বেদনা সুমধুর হয়ে
ভুবনে গেল আজি বয়ে।
বাঁশিতে মায়া তান পুরি
কে আজি মন করে চুরি,
নিখিল তাই মরে ঘুরি
বিরহসাগরের কূলে।

এটা যে কী তাল তা আমি আনাড়ি জানি না। এবং কোনো ওস্তাদও জানেন না। গণিয়া দেখিলে দেখি প্রত্যেক লাইনে নয় মাত্রা। যদি এমন বলা যায় যে, নাহয় নয় মাত্রায় একটা নূতন তালের সৃষ্টি করা যাক, তবে আর-একটা নয় মাত্রার গান পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক।

যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে
সে কাঁদনে সেও কাঁদিল।
যে বাঁধনে মোরে বাঁধিছে
সে বাঁধনে তারে বাঁধিল।
পথে পথে তারে খুঁজিনু
মনে মনে তারে পূজিনু,
সে পূজার মাঝে লুকায়ে
আমারেও সে যে সাধিল।
এসেছিল মন হরিতে
মহাপারাবার পারায়ে।
ফিরিল না আর তরীতে,
আপনারে গেল হারায়ে।
তারি আপনার মাধুরী
আপনারে করে চাতুরী,
ধরিবে কি ধরা দিবে সে
কী ভাবিয়া ফাঁদ ফাঁদিল।

এও নয় মাত্রা, কিন্তু এর ছন্দ আলাদা। প্রথমটার লয় ছিল তিনে-ছয়ে, দ্বিতীয়টার লয় ছয়ে-তিনে। আরো একটা নয়ের তাল দেখা যাক।

আঁধার রজনী পোহালো,
জগৎ পুরিল পুলকে,

বিমল প্রভাতকিরণে
মিলিল দ্যুলোকে ভূলোকে।

নয় মাত্রা বটে, কিন্তু এ ছন্দ স্বতন্ত্র। ইহার লয় তিন তিন তিনে। ইহাকে কোন্ নাম দিবে? আরো একটা দেখা যাক।

দুয়ার মম পথপাশে,
সদাই তারে খুলে রাখি।
কখন তার রথ আসে
ব্যাকুল হয়ে জাগে আঁখি।
শ্রাবণ শুনি দূর মেঘে
লাগায় গুরু গরগর,
ফাগুন শুনি বায়ুবেগে
জাগায় মৃদু মরমর,
আমার বুকে উঠে জেগে
চমক তারি থাকি থাকি।
কখন তার রথ আসে
ব্যাকুল হয়ে জাগে আঁখি।
সবাই দেখি যায় চলে
পিছন-পানে নাহি চেয়ে
উতল রোলে কল্লোলে
পথের গান গেয়ে গেয়ে।
শরৎ-মেঘ ভেসে ভেসে
উধাও হয়ে যায় দূরে,
যেথায় সব পথ মেশে
গোপন কোন্ সুরপুরে—
স্বপনে ওড়ে কোন্ দেশে
উদাস মোর প্রাণ-পাখি।
কখন তার রথ আসে
ব্যাকুল হবে জাগে আঁখি।

এও তো আর-এক ছন্দ। ইহার লয় পাঁচে চারে মিলিয়া, আবার এইটেকে উলটাইয়া দিয়া চারে পাঁচে করিলে নয়ের ছন্দকে লইয়া নয়-ছয় করা যাইতে পারে।

চৌতাল তো বারো মাত্রার ছন্দ। কিন্তু, এই বারো মাত্রা রক্ষা করিলেও চৌতালকে রক্ষা করা যায় না এমন হয়। এই তো বারো মাত্রা—

বনের পথে পথে বাজিছে বায়ে
নূপুর রুনুরুনু কাহার পায়ে।
কাটিয়া যায় বেলা মনের ভুলে,
বাতাস উদাসিছে আকুল চুলে,
ভ্রমরমুখরিত বকুলছায়ে
নূপুর রুনুরুনু কাহার পায়ে।

ইহা চৌতালও নহে, একতালাও নহে, ধামারও নয়, ঝাঁপতালও নয়। লয়ের হিসাব দিলেও তালের হিসাব মেলে না। তালওয়ালা সেই গরমিল লইয়া কবিকে দায়িক করে।

কিন্তু, হাল আমলে এ-সমস্ত উৎপাত চলিবে না। আমরা শাসন মানিব, তাই বলিয়া অত্যাচার মানিব না। কেননা, যে-নিয়ম সত্য সে-নিয়ম বাহিরের জিনিস নয়, তাহা বিশ্বের বলিয়াই তাহা আমার আপনার। যে-নিয়ম ওস্তাদের তাহা আমার ভিতরে নাই, বাহিরে আছে; সুতরাং তাকে অভ্যাস করিয়া বা ভয় করিয়া বা দায়ে পড়িয়া মানিতে হয়। এইরূপ মানার দ্বারাই শক্তির বিকাশ বন্ধ হইয়া যায়। আমাদের সংগীতকে এই মানা হইতে মুক্তি দিলে তবেই তার স্বভাব তার স্বরূপকে নব নব উদ্‌ভাবনার ভিতর দিয়া ব্যক্ত করিতে থাকিবে।

ভাদ্র ১৩২৪

সংস্কৃত-বাংলা ও প্রাকৃত-বাংলার ছন্দ

সংস্কৃত-বাংলা এবং প্রাকৃত-বাংলার গতিভঙ্গিতে একটা লয়ের তফাত আছে। তার প্রকৃত কারণ প্রাকৃত-বাংলার দেহতত্ত্বটা হসন্তের ছাঁচে, সংস্কৃত-বাংলার হলন্তের।[1] অর্থাৎ, উভয়ের ধ্বনিস্বভাবটা পরস্পরের উলটো। প্রাকৃত-বাংলা স্বরবর্ণের মধ্যস্থতা থেকে মুক্ত হয়ে পদে পদে তার ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে আঁট করে তোলে। সুতরাং তার ছন্দের বুনানি সমতল নয়, তা তরঙ্গিত। সোজা লাইনের সুতো ধরে বিশেষ কোনো প্রাকৃত-বাংলার ছন্দকে মাপলে হয়তো বিশেষ কোনো সংস্কৃত-বাংলার ছন্দের সঙ্গে সে বহরে সমান হতে পারে, কিন্তু সুতোর মাপকে কি আদর্শ বলে ধরা যায়।

১ হলন্ত শব্দ স্বরান্ত অর্থে প্রযুক্ত।

মনে করা যাক, রাজমিস্ত্রি দেয়াল বানাচ্ছে; ওলনদণ্ড ঝুলিয়ে দেখা গেল, সেটা হল বারো ফিট। কিন্তু, মোটের উপর দেয়াল খাড়া দাঁড়িয়ে থাকলেও সেটার উপরিতল যদি ঢেউখেলানো হয়, তবে কারুবিচারে সেই তরঙ্গিত ভঙ্গিটাই বিশেষ আখ্যা পেয়ে থাকে। দৃষ্টান্তের সাহায্য নেওয়া যাক।

'বউ কথা কও, বউ কথা কও'
যতই গায় সে পাখি,
নিজের কথাই কুঞ্জবনের
সব কথা দেয় ঢাকি।

খাড়া সুতোর মাপে দাঁড়ায় এই—

১ ২ ১ ২ | ১ ২ ১ ২
বউ ক | থা কও | বউ ক | থা কও
১ ২ ১ ২ ১ ২
য তই | গায় সে | পা খি,
১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
নি জের | ক থাই | কুন্ জ | ব নের
১ ২ ১ ২ ১ ২
সব ক | থা দেয় | ঢা কি।

সেই সুতোর মাপে এর সংস্কৃত সংস্করণকে মাপা যাক—

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
ক থা | ক হ | ক থা | ক হ
১ ২ ১ ২ ১ ২
পা খি | য ত | ডা কে,
১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
নি জ | ক থা | কা ন | নে র
১ ২ ১ ২ ১ ২
স ব | ক থা | ঢা কে।

সুতোর মাপে সমান। কিন্তু, কান কি সেই মাপে আঙুল গুনে ছন্দের পরিচয় নেয়। ছন্দ যে ভঙ্গি নিয়ে, বস্তুর পরিমাপ নিয়ে নয়।

তোমার সঙ্গে আমার মিলন
বাধল কাছেই এসে।

তাকিয়ে ছিলেম আসন মেলে,
অনেক দূর যে পেরিয়ে এলে,
আঙিনাতে বাড়িয়ে চরণ
ফিরলে কঠিন হেসে।
তীরের হাওয়ায় তরী উধাও
পারের নিরুদ্দেশে।

এরই সংস্কৃত রূপান্তর দেওয়া যাক—

তোমা সনে মোর প্রেম
বাধে কাছে এসে।
চেয়েছিনু আঁখি মেলে,
বহুদূর হতে এলে,
আঙিনাতে পা বাড়িয়ে
ফিরে গেলে হেসে।
তীর-বায়ে তরী গেল
ওপারের দেশে।

মাপে মিলল, কিন্তু লয়ে মিলেছে কি। সমুদ্র যখন স্থির থাকে আর সমুদ্র যখন ঢেউ খেলিয়ে ওঠে তখন তার দৈর্ঘ্যপ্রস্থ সমান থাকে, কিন্তু তার ভঙ্গির বৈচিত্র্য ঘটে। এই ভঙ্গি নিয়েই ছন্দ। বিধাতা সেই ভঙ্গির দিকে তাকিয়েই মৃদঙ্গ বাজান, বোল বদলিয়ে দেন, তাই মনের মধ্যে ভিন্ন রকমের আঘাত লাগে।

আমি অন্যত্র বলেছি, প্রাকৃত-বাংলার ছন্দে যতিবিভাগ সকল সময় ঠিক কাটা কাটা সমান ভাগে নয়। পাঠক এক জায়গায় মাত্রা হরণ করে আর-এক জায়গায় ওজন রেখে তা পূরণ করে দিলে নালিশ চলে না। এইজন্যে একই কবিতা পাঠক আপন রুচি-অনুসারে কিছু পরিমাণে ভিন্নরকম করে পড়তে পারেন।

রূপসাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপরতন আশা করি।
ঘাটে ঘাটে ফিরব না আর
ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী।

এই কবিতাটি আমি পড়ি 'রূপ' এবং 'ডুব' এবং 'অরূপ' শব্দের ধ্বনিকে দীর্ঘ করে। অর্থাৎ ওই উকারগুলোর ওজন হয় দুই মাত্রার কিছু বেশি। তখন তারই পূরণস্বরূপে 'ডুব দিয়েছি'র পরে যতিকে থামতে দেওয়া যায় না। অপরপক্ষে 'ঘাটে ঘাটে' শব্দে

মাত্রাহ্রাসের ত্রুটি পূরণ করবার বরাত দেওয়া যায় 'ফিরব না' শব্দের উপর; নইলে লিখতে হত 'সাতঘাটে আর ফিরব না ভাই'।

সংস্কৃত-বাংলা ও প্রাকৃত-বাংলার ছন্দে লয়ের যে ভেদ কানে লাগে তার কারণ সংস্কৃত-বাংলায় অনেক স্থলেই যে-শব্দের মাপ দুইয়ের তার ওজনও দুইয়ের। যেমন—

১ ২ ১ ২
তো মা স নে।

কিন্তু প্রাকৃত-বাংলায় প্রায়ই সে স্থলে মাপ দুইয়ের হলেও ওজন তিনের। যেমন—

১ ২ ১ ২
তো মার সঙ্‌ গে।

এতে করে তিন-ঘেঁষা ছন্দের প্রকৃতি বদলে যায়।

'রূপসাগরে' গানটির পরিবর্তে লেখা যেতে পারত—

রূপরসে ডুব দিনু অরূপের আশা করি।
ঘাটে ঘাটে ফিরিব না বেয়ে মোর ভাঙা তরী।

যদি কেউ বলেন, দুটোর একই ছন্দ, তা হলে এইটুকু বলে চুপ করব যে, আমার সঙ্গে মতে মিলল না। কেননা, আমি ছন্দ গুনি নে, আমি ছন্দ শুনি।

শ্রাবণ ১৩৩৯

ছন্দে হসন্ত[১]

তব চিত্তগগনের দূর দিক্‌সীমা
বেদনার রাঙা মেঘে পেয়েছে মহিমা।

এখানে 'দিক্‌' শব্দের ক্ হসন্ত হওয়া সত্ত্বেও তাকে এক মাত্রার পদবি দেওয়া গেল। নিশ্চিত জানি, পাঠক সেই পদবির সম্মান স্বতই রক্ষা করে চলবেন।

মনের আকাশে তার দিক্‌সীমানা বেয়ে
বিবাগী স্বপনপাখি চলিয়াছে ধেয়ে।

১ রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' প্রবন্ধ এবং গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য।

অথবা—

দিগ্‌বলয়ে নবশশিলেখা
টুকরো যেন মানিকের রেখা।

এতেও কানের সম্মতি আছে।

দিক্‌প্রান্তে ওই চাঁদ বুঝি
দিক্‌-ভ্রান্ত মরে পথ খুঁজি।

আপত্তির বিশেষ কারণ নেই।

দিক্‌প্রান্তের ধূমকেতু উন্মত্তের প্রলাপের মতো
নক্ষত্রের আঙিনায় টলিয়া পড়িল অসংগত।

এও চলে। একের নজিরে অন্যের প্রামাণ্য ঘোচে না।

কিন্তু যাঁরা এ নিয়ে আলোচনা করছেন তাঁরা একটা কথা বোধ হয় সম্পূর্ণ মনে রাখছেন না যে, সব দৃষ্টান্তগুলিই পয়ারজাতীয় ছন্দের। আর এ কথা বলাই বাহুল্য যে, এই ছন্দ যুক্তধ্বনি ও অযুক্তধ্বনি উভয়কেই বিনা পক্ষপাতে এক মাত্রারূপে ব্যবহার করবার সনাতন অধিকার পেয়েছে। আবার যুক্তধ্বনিকে দুই ভাগে বিশ্লিষ্ট করে তাকে দুই মাত্রায় ব্যবহার করার স্বাধীনতা সে যে দাবি করতে পারে না তাও নয়।

যাকে আমি অসম বা বিষম মাত্রার ছন্দ বলি যুক্তধ্বনির বাছ-বিচার তাদেরই এলেকায়।

হৃৎ-ঘটে সুধারস ভরি

কিম্বা—

হৃৎ-ঘটে অমৃতরস ভরি
তৃষা মোর হরিলে সুন্দরী।

এ ছন্দে দুইই চলবে। কিন্তু—

অমৃতনির্ঝরে হৃৎপাত্রটি ভরি
কারে সমর্পণ করিলে সুন্দরী।

অগ্রাহ্য, অন্তত আধুনিক কালের কানে। অসম মাত্রার ছন্দে এরকম যুক্তধ্বনির বন্ধুরতা আবার একদিন ফিরে আসতেও পারে, কিন্তু আজ এটার চল নেই।

এই উপলক্ষে একটা কথা বলে রাখি, সেটা আইনের কথা নয়, কানের অভিরুচির কথা।

হৃৎপটে আঁকা ছবিখানি

ব্যবহার করা আমার পক্ষে সহজ, কিন্তু—

হৃৎপত্রে আঁকা ছবিখানি

অল্প একটু বাধে। তার কারণ খণ্ড ত'কে পূর্ণ ত'এর জাতে তুলতে হলে তার পূর্ববর্তী স্বরবর্ণকে দীর্ঘ করতে হয়; এই চুরিটুকুতে পীড়াবোধ হয় না যদি পরবর্তী স্বরটা হ্রস্ব থাকে। কিন্তু, পরবর্তী স্বরটাও যদি দীর্ঘ হয় তা হলে শব্দটার পায়া ভারী হয়ে পড়ে।

হৃৎপত্রে এঁকেছি ছবিখানি

আমি সহজে মঞ্জুর করি, কারণ এখানে 'হৃৎ' শব্দের স্বরটি ছোটো ও 'পত্র' শব্দের স্বরটি বড়ো। রসনা 'হৃৎ' শব্দ দ্রুত পেরিয়ে 'পত্র' শব্দে পুরো ঝোঁক দিতে পারে। এই কারণেই 'দিক্‌সীমা' শব্দকে চার মাত্রার আসন দিতে কুণ্ঠিত হই নে, কিন্তু 'দিক্‌প্রান্ত' শব্দের বেলা ঈষৎ একটু দ্বিধা হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয়। 'দিক্‌সীমা' কথাটি দরিদ্র, 'দিক্‌প্রান্ত' কথাটি পরিপুষ্ট।

এ অসীম গগনের তীরে

মৃৎকণা জানি ধরণীরে।

'মৃৎকণা' না বলে যদি 'মৃৎপিণ্ড' বলা যায় তবে তাকে চালিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু একটু যেন ঠেলতে হয়, তবেই চলে।

মৃৎ-ভবনে এ কী সুধা

রাখিয়াছ হে বসুধা।

কানে বাধে না। কিন্তু—

মৃত-ভাণ্ডেতে এ কী সুধা

ভরিয়াছ হে বসুধা।

কিছু পীড়া দেয় না যে তা বলতে পারি নে। কিন্তু, অক্ষর গন্‌তি করে যদি বল ওটা ইন্‌ভীডিয়স্ ডিস্‌টিঙ্ক্‌শন, তা হলে চুপ করে যাব। কারণ, কান-বেচারা প্রিমিটিভ্ ইন্দ্রিয়, তর্কবিদ্যায় অপটু।

কার্তিক ১৩৩৯

চিঠিপত্র

জে. ডি. এণ্ডার্সন্‌কে লিখিত [১]

আপনি বলিয়াছেন, আমাদের উচ্চারণের ঝোঁকটা বাক্যের আরম্ভে পড়ে। ইহা আমি অনেক দিন পূর্বে লক্ষ্য করিয়াছি। ইংরাজিতে প্রত্যেক শব্দেরই একটি নিজস্ব ঝোঁক আছে। সেই বিচিত্র ঝোঁকগুলিকে নিপুণভাবে ব্যবহার করার দ্বারাই আপনাদের ছন্দ সংগীতে মুখরিত হইয়া উঠে। সংস্কৃত ভাষার ঝোঁক নাই কিন্তু দীর্ঘহ্রস্বস্বর ও যুক্তব্যঞ্জনবর্ণের মাত্রাবৈচিত্র্য আছে, তাহাতে সংস্কৃত ছন্দ ঢেউ খেলাইয়া উঠে। যথা—

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা।

উক্ত বাক্যের যেখানে যেখানে যুক্তব্যঞ্জনবর্ণ বা দীর্ঘস্বর আছে সেখানেই ধ্বনি গিয়া বাধা পায়। সেই বাধার আঘাতে আঘাতে ছন্দ হিল্লোলিত হইয়া উঠে।

যে ভাষায় এইরূপ প্রত্যেক শব্দের একটি বিশেষ বেগ আছে সে ভাষার মস্ত সুবিধা এই যে, প্রত্যেক শব্দটিই নিজেকে জানান দিয়া যায়, কেহই পাশ কাটাইয়া আমাদের মনোযোগ এড়াইয়া যাইতে পারে না। এইজন্য যখন একটা বাক্য (sentence) আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় তখন তাহার উচ্চনীচতার বৈচিত্র্যবশত একটা সুস্পষ্ট চেহারা দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলা বাক্যের অসুবিধা এই যে, একটা ঝোঁকের টানে একসঙ্গে অনেকগুলা শব্দ অনায়াসে আমাদের কানের উপর দিয়া পিছলাইয়া চলিয়া যায়; তাহাদের প্রত্যেকটার সঙ্গে সুস্পষ্ট পরিচয়ের সময় পাওয়া যায় না। ঠিক যেন আমাদের একান্নবর্তী পরিবারের মতো। বাড়ির কর্তাটিকেই স্পষ্ট করিয়া অনুভব করা যায় কিন্তু তাঁহার পশ্চাতে তাঁহার কত পোষ্য আছে, তাহারা আছে কি নাই, তাহার হিসাব রাখিবার দরকার হয় না।

এইজন্য দেখা যায়, আমাদের দেশে কথকতা যদিচ জনসাধারণকে শিক্ষা এবং আমোদ দিবার জন্য, তথাপি কথকমহাশয় ক্ষণে ক্ষণে তাহার মধ্যে ঘনঘটাচ্ছন্ন সংস্কৃত সমাসের আমদানি করিয়া থাকেন। সে-সকল শব্দ গ্রাম্যলোকেরা বোঝে না, কিন্তু এই-সমস্ত গম্ভীর শব্দের আওয়াজে তাহাদের মনটা ভালো করিয়া

১ সবুজ পত্রে প্রকাশিত 'সাধু' ভাষার লিখিত মূল পাঠ।

জাগিয়া ওঠে। বাংলাভাষায় শব্দের মধ্যে আওয়াজ মৃদু বলিয়া অনেক সময় আমাদের কবিদিগকে দায়ে পড়িয়া অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে হয়।

এইজন্যই আমাদের যাত্রার ও পাঁচালির গানে ঘন ঘন অনুপ্রাস ব্যবহারের প্রথা আছে। সে অনুপ্রাস অনেক সময় অর্থহীন এবং ব্যাকরণবিরুদ্ধ; কিন্তু সাধারণ শ্রোতাদের পক্ষে তাহার প্রয়োজন এত অধিক যে বাছ-বিচার করিবার সময় পাওয়া যায় না। নিরামিষ তরকারি রাঁধিতে হইলে ঝাল-মসলা বেশি করিয়া দিতে হয়, নহিলে স্বাদ পাওয়া যায় না। এই মসলা পুষ্টির জন্য নহে; ইহা কেবলমাত্র রসনাকে তাড়া দিয়া উত্তেজিত করিবার জন্য। সেইজন্য দাশরথি রায়ের রামচন্দ্র যখন নিম্নলিখিত রীতিতে অনুপ্রাসচ্ছটা বিস্তার করিয়া বিলাপ করিতে থাকেন—

অতি অগণ্য কাজে ছি ছি জঘন্য সাজে
ঘোর অরণ্যমাঝে কত কাঁদিলাম—

তাহাতে শ্রোতার হৃদয় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। আমাদের বন্ধু দীনেশবাবু-কর্তৃক পরমপ্রশংসিত কৃষ্ণকমল গোস্বামী মহাশয়ের গানের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রকারের আবর্জনা ঝুড়িঝুড়ি চাপিয়া আছে। তাহাতে কাহাকেও বাধা দেয় না।

পুনঃ যদি কোনক্ষণে দেখা দেয় কমলেক্ষণে
যতনেকরে রক্ষণে জানাবি তৎক্ষণে।

এখানে কমলেক্ষণ এবং রক্ষণ শব্দটাতে এ-কার যোগ করা একেবারেই নিরর্থক; কিন্তু অনুপ্রাসের বন্যার মুখে অমন কত এ-কার উ-কার স্থানে অস্থানে ভাসিয়া বেড়ায় তাহাতে কাহারো কিছু আসে যায় না।

একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, বাংলা রামায়ণ, মহাভারত, অন্নদামঙ্গল, কবিকঙ্কণচণ্ডী প্রভৃতি সমস্ত পুরাতন কাব্য গানের সুরে কীর্তিত হইত। এইজন্য শব্দের মধ্যে যাহা কিছু ক্ষীণতা ও ছন্দের মধ্যে যাহা কিছু ফাঁক ছিল সমস্তই গানের সুরে ভরিয়া উঠিত; সঙ্গে সঙ্গে চামর দুলিত, করতাল চলিত এবং মৃদঙ্গ বাজিতে থাকিত। সেই-সমস্ত বাদ দিয়া যখন আমাদের সাধুসাহিত্য-প্রচলিত ছন্দগুলি পড়িয়া দেখি, তখন দেখিতে পাই একে তো প্রত্যেক কথাটিতে স্বতন্ত্র ঝোঁক নাই, তাহাতে প্রত্যেক অক্ষরটি একমাত্রা বলিয়া গণ্য হইয়াছে।…

গানের পক্ষে ইহাই সুবিধা। বাংলার সমতল ক্ষেত্রে নদীর ধারা যেমন স্বচ্ছন্দে চারি দিকে শাখায় প্রশাখায় প্রসারিত হইয়াছে, তেমনি সমমাত্রিক ছন্দে সুর আপন প্রয়োজনমত যেমন-তেমন করিয়া চলিতে পারে। কথাগুলা মাথা হেঁট করিয়া সম্পূর্ণ তাহার অনুগত হইয়া থাকে।

কিন্তু, সুর হইতে বিযুক্ত করিয়া পড়িতে গেলে এই ছন্দগুলি একেবারে বিধবার মতো হইয়া পড়ে। এইজন্য আজ পর্যন্ত বাংলা কবিতা পড়িতে হইলে আমরা সুর করিয়া পড়ি। এমন-কি, আমাদের গদ্য আবৃত্তিতেও যথেষ্ট পরিমাণে সুর লাগে। আমাদের ভাষার প্রকৃতি-অনুসারেই এরূপ ঘটিয়াছে। আমাদের এই অভ্যাসবশত ইংরেজি পড়িবার সময়েও আমরা সুর লাগাই; ইংরেজের কানে নিশ্চয়ই তাহা অদ্ভুত লাগে।

কিন্তু, আমাদের প্রত্যেক অক্ষরটিই যে বস্তুত এক মাত্রার এ কথা সত্য নহে। যুক্ত বর্ণ এবং অযুক্ত বর্ণ কখনোই এক মাত্রার হইতে পারে না।

কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্।

'পুণ্যবান্' শব্দটি 'কাশীরাম' শব্দের সমান ওজনের নহে। কিন্তু, আমরা প্রত্যেক বর্ণটিকে সুর করিয়া টানিয়া টানিয়া পড়ি বলিয়া আমাদের শব্দগুলির মধ্যে এতটা ফাঁক থাকে যে, হালকা ও ভারী দুইরকম শব্দই সমমাত্রা অধিকার করিতে পারে।...

Equality, Fraternity প্রভৃতি পদার্থগুলি খুব মূল্যবান বটে, কিন্তু সেইজন্যই ঝুটা হইলে তাহা ত্যাজ্য হয়। আমাদের সাধুছন্দে বর্ণগুলির মধ্যে সাম্য ও সৌভ্রাত্র দেখা যায় তাহা গানের সুরে সাঁচ্চা হইতে পারে, কিন্তু আবৃত্তি করিয়া পড়িবার প্রয়োজনে তাহা ঝুটা। এই কথাটা অনেকদিন আমার মনে বাজিয়াছে। কোনো কোনো কবি ছন্দের এই দীনতা দূর করিবার জন্য বিশেষ জোর দিবার বেলায় বাংলা শব্দগুলিকে সংস্কৃতের রীতি-অনুযায়ী স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ রাখিয়া ছন্দে বসাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রে তাহার দুই-একটা নমুনা আছে। যথা—

মহারুদ্র বেশে মহাদেব সাজে।

বৈষ্ণব কবিদের রচনায় এরূপ অনেক দেখা যায়।... কিন্তু, এগুলি বাংলা নয় বলিলেই হয়। ভারতচন্দ্র যেখানে সংস্কৃত ছন্দে লিখিয়াছেন, সেখানে তিনি বাংলা শব্দ যতদূর সম্ভব পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং বৈষ্ণব কবিরা যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন তাহা মৈথিলী ভাষার বিকার।

আমার বড়দাদা মাঝে মাঝে এ কাজ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা কৌতুক করিয়া। যথা—

ইচ্ছা সম্যক্ ভ্রমণগমনে কিন্তু পাথেয় নাস্তি।
পায়ে শিক্লী মন উড়ু উড়ু এ কি দৈবেরি শাস্তি!

বাংলায় এ জিনিস চলিবে না; কারণ বাংলায় হ্রস্বদীর্ঘস্বরের পরিমাণভেদ সুব্যক্ত নহে। কিন্তু, যুক্ত ও অযুক্ত বর্ণের মাত্রাভেদ বাংলাতেও না ঘটিয়া থাকিতে পারে না।...

সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার একটা প্রভেদ এই যে, বাংলার প্রায় সর্বত্রই শব্দের অন্তস্থিত অ-স্বরবর্ণের উচ্চারণ হয় না। যেমন—ফল, জল, মাঠ, ঘাট, চাঁদ, ফাঁদ, বাঁদর, আদর ইত্যাদি। ফল শব্দ বস্তুত এক মাত্রার কথা। অথচ সাধু বাংলাভাষার ছন্দে ইহাকে দুই মাত্রা বলিয়া ধরা হয়। অর্থাৎ ফলা এবং ফল বাংলা ছন্দে একই ওজনের। এইরূপে বাংলা সাধুছন্দে হসন্ত জিনিসটাকে একেবারে ব্যবহারে লাগানো হয় না। অথচ জিনিসটা ধ্বনি উৎপাদনের কাজে ভারি মজবুত। হসন্ত শব্দটা স্বরবর্ণের বাধা পায় না বলিয়া পরবর্তী শব্দের ঘাড়ের উপর পড়িয়া তাহাকে ধাক্কা দেয় ও বাজাইয়া তোলে। 'করিতেছি' শব্দটা ভোঁতা। উহাতে কোনো সুর বাজে না কিন্তু 'কর্চি' শব্দে একটা সুর আছে। 'যাহা হইবার তাহাই হইবে' এই বাক্যের ধ্বনিটা অত্যন্ত ঢিলা; সেইজন্য ইহার অর্থের মধ্যেও একটা আলস্য প্রকাশ পায়। কিন্তু, যখন বলা যায় 'যা হবার তাই হবে' তখন 'হবার' শব্দের হসন্ত-'র' 'তাই' শব্দের উপর আছাড় খাইয়া একটা জোর জাগাইয়া তোলে; তখন উহার নাকী সুর ঘুচিয়া গিয়া ইহা হইতে একটা মরিয়া ভাবের আওয়াজ বাহির হয়। বাংলার হসন্তবর্জিত সাধু ভাষাটা বাবুদের আদুরে ছেলেটার মতো মোটাসোটা গোলগাল; চর্বির স্তরে তাহার চেহারাটা একেবারে ঢাকা পড়িয়া গেছে, এবং তাহার চিক্কণতা যতই থাক্, তাহার জোর অতি অল্পই।

কিন্তু, বাংলার অসাধু ভাষাটা খুব জোরালো ভাষা, এবং তাহার চেহারা বলিয়া একটা পদার্থ আছে। আমাদের সাধু ভাষার কাব্যে এই অসাধু ভাষাকে একেবারেই আমল দেওয়া হয় নাই; কিন্তু, তাই বলিয়া অসাধু ভাষা যে বাসায় গিয়া মরিয়া আছে তাহা নহে। সে আউলের মুখে, বাউলের মুখে, ভক্ত কবিদের গানে, মেয়েদের ছড়ায় বাংলাদেশের চিত্তটাকে একেবারে শ্যামল করিয়া ছাইয়া রহিয়াছে। কেবল ছাপার কালির তিলক পরিয়া সে ভদ্রসাহিত্যসভায় মোড়লি করিয়া বেড়াইতে পারে না। কিন্তু, তাহার কণ্ঠে গান থামে নাই, তাহার বাঁশের বাঁশি বাজিতেছেই। সেই-সব মেঠো-গানের ঝরনার তলায় বাংলাভাষার হসন্ত-শব্দগুলা নুড়ির মতো পরস্পরের উপর পড়িয়া ঠুন্‌ঠুন্ শব্দ করিতেছে। আমাদের ভদ্রসাহিত্যপল্লীর গম্ভীর দিঘিটার স্থির জলে সেই শব্দ নাই; সেখানে হসন্তর ঝংকার বন্ধ।

আমার শেষ বয়সের কাব্য-রচনায় আমি বাংলার এই চলতি ভাষার সুরটাকে ব্যবহারে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছি। কেননা দেখিয়াছি, চলতি ভাষাটাই স্রোতের জলের মতো চলে, তাহার নিজের একটি কলধ্বনি আছে। গীতাঞ্জলি[১] হইতে আপনি

১ গীতিমাল্য?

আমার যে লাইনগুলি তুলিয়া দিয়াছেন তাহা আমাদের চলতি ভাষার হসন্ত স্বরের লাইন।

আমার্ সকল্ কাঁটা ধন্য করে
ফুট্‌বে গো ফুল্ ফুট্‌বে।
আমার্ সকল্ ব্যথা রঙিন্ হয়ে
গোলাপ্ হয়ে উঠ্‌বে।

আপনি লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন এই ছন্দের প্রত্যেক গাঁঠে গাঁঠে একটি করিয়া হসন্তের ভঙ্গি আছে। 'ধন্য' শব্দটার মধ্যেও একটা হসন্ত আছে। উহা "ধন্‌ন" এই বানানে লেখা যাইতে পারে। এইটে সাধু ভাষার ছন্দে লিখিলাম—

যত কাঁটা মম সফল করিয়া ফুটিবে কুসুম ফুটিবে।
সকল বেদনা অরুণ বরনে গোলাপ হইয়া উঠিবে।

অথবা যুক্তবর্ণকে যদি এক মাত্রা বলিয়া ধরা যায় তবে এমন হইতে পারে—

সকল কণ্টক সার্থক করিয়া কুসুমস্তবক ফুটিবে।
বেদনা যন্ত্রণা রক্তমূর্তি ধরি গোলাপ হইয়া উঠিবে।

এমনি করিয়া সাধু ভাষার কাব্যসভায় যুক্তবর্ণের মৃদঙ্গটা আমরা ফুটা করিয়া দিয়াছি এবং হসন্তর বাঁশির ফাঁকগুলি সীসা দিয়া ভর্তি করিয়াছি। ভাষার নিজের অন্তরের স্বাভাবিক সুরটাকে রুদ্ধ করিয়া দিয়া বাহির হইতে সুর যোজনা করিতে হইয়াছে। সংস্কৃতভাষার জরি-জহরতের ঝালরওয়ালা দেড়-হাত দুই-হাত ঘোমটার আড়ালে আমাদের ভাষাবধূটির চোখের জল মুখের হাসি সমস্ত ঢাকা পড়িয়া গেছে, তাহার কালো চোখের কটাক্ষে যে কত তীক্ষ্ণতা তাহা আমরা ভুলিয়া গেছি। আমি তাহার সেই সংস্কৃত ঘোমটা খুলিয়া দিবার কিছু সাধনা করিয়াছি তাহাতে সাধু লোকেরা ছি ছি করিয়াছে। সাধু লোকেরা জরির আঁচলাটা দেখিয়া তাহার দর যাচাই করুক; আমার কাছে চোখের চাহনিটুকুর দর তাহার চেয়ে অনেক বেশি; সে যে বিনামূল্যের ধন, সে ভট্টাচার্যপাড়ার হাটে বাজারে মেলে না।

জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

২

সম্মুখসমরে পড়ি বীরচূড়ামণি
বীরবাহু—

এই বাক্যটি আবৃত্তি করিবার সময়ে আমরা 'সম্মুখ' শব্দটার উপরে ঝোঁক দিয়া সেই এক ঝোঁকে একেবারে 'বীরবাহু' পর্যন্ত গড় গড় করিয়া চলিয়া যাইতে পারি। আমরা

নিশ্বাসটার বাজে-খরচ করিতে নারাজ, এক নিশ্বাসে যতগুলা শব্দ সারিয়া লইতে পারি ছাড়ি না।

আপনাদের ইংরাজি বাক্যে সেটা সম্ভব হয় না, কেননা, আপনাদের শব্দগুলা বেজায় রোখা মেজাজের। তাহারা প্রত্যেকেই ঢুঁ মারিয়া নিশ্বাসের শাসন ঠেলিয়া বাহির হইতে চায়। She was absolutely authentic, new, and inexpressible —এই বাক্যে যতগুলি বিশেষণপদ আছে সব কটাই উঁচু হইয়া উঠিয়া নিশ্বাসের বাতাসটাকে ফুটবলের গোলার মতো এক মাথা হইতে আর-এক মাথায় ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া চালান করিয়া দিতেছে।

প্রত্যেক ভাষারই একটা স্বাভাবিক চলিবার ভঙ্গি আছে। সেই ভঙ্গিটারই অনুসরণ করিয়া সেই ভাষার নৃত্য অর্থাৎ তাহার ছন্দ রচনা করিতে হয়। এখন দেখা যাক, আমাদের ভাষার চাল-চলনটা কী রকম।

আপনি বলিয়াছেন, বাংলা বাক্য -উচ্চারণে বাক্যের আরম্ভে আমরা ঝোঁক দিয়া থাকি। এই ঝোঁকের দৌড়টা যে কতদূর পর্যন্ত হইবে তাহার কোনো বাঁধা নিয়ম নাই, সেটা আমাদের ইচ্ছা। যদি জোর দিতে না চাই তবে সমস্ত বাক্যটা একটানা বলিতে পারি, যদি জোর দিতে চাই তবে বাক্যের পর্বে পর্বেই ঝোঁক দিয়া থাকি। 'আদিম মানবের তুমুল পাশবতা মনে করিয়া দেখো'— এই বাক্যটা আমরা এমনি করিয়া পড়িতে পারি যাহাতে উহার সকল শব্দই একেবারে মাথায় মাথায় সমান হইয়া থাকে। আবার উত্তেজনার বেগে নিম্নলিখিত-মত করিয়াও পড়া যাইতে পারে—

।　　।　　।　　।　　।

আদিম মানবের তুমুল পাশবতা মনে করিয়া দেখো।

এই বাংলা শব্দগুলির নিজের কোনো বিশেষ দাবি নাই, আমাদের মর্জির উপরেই নির্ভর। কিন্তু, Realize the riotous animality of primitive man— এই বাক্যে প্রায় প্রত্যেক শব্দই নিজ নিজ এক্‌সেন্টের ধ্বজা গাড়িয়া বসিয়া আছে বলিয়া নিশ্বাস তাহাদিগকে খাতির করিয়া চলিতে বাধ্য।

বাংলা ছন্দে যে পদবিভাগ হয় সেই প্রত্যেক পদের গোড়াতেই একটি করিয়া ঝোঁকালো শব্দ কাপ্তেনি করে এবং তাহার পিছন পিছন কয়েকটি অনুগত শব্দ সমান তালে পা ফেলিয়া কুচ করিয়া চলিয়া যায়। এইরূপ এক-একটি ঝোঁক-কাপ্তেনের অধীনে কয়টা করিয়া মাত্রা-সিপাই থাকিবে ছন্দের নিয়ম-অনুসারে তাহার বরাদ্দ হইয়া থাকে।

পয়ারের রীতিটা দেখা যাক। পয়ারটা চতুষ্পদ ছন্দ। আমার বিশ্বাস, পয়ার

শব্দটা পদ-চার শব্দের বিকার। ইহার এক-একটি পদ এক-একটি ঝোঁকের শাসনে চলে।

মহাভারতের কথা | অমৃতসমান।
কাশীরামদাস কহে | শুনে পুণ্যবান্‌।

'অমৃতসমান' ও 'শুনে পুণ্যবান্‌' এই দুই অংশে ছয়টি অক্ষর দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু মাত্রাগণনায় ইহারা আট। ওইখানে লাইন শেষ হয় বলিয়া দুটি মাত্রা-পরিমাণ জায়গা ফাঁক থাকে। যাহারা সুর করিয়া পড়ে তাহারা 'মান' এবং 'বান' শব্দের আকারটিকে দীর্ঘাকার করিয়া ওই ফাঁক ভরাইয়া দেয়।

এক-একটি ঝোঁকে কয়টি করিয়া মাত্রা আগলাইতেছে তাহা দেখিয়াই ছন্দের বিচার করিতে হয়। নতুবা যদি মোটা করিয়া বলি যে, এক-এক লাইনে চোদ্দটা করিয়া অক্ষর থাকিলে তাহাকে পয়ার বলে তবে নানা ভিন্নপ্রকারের ছন্দকে পয়ার বলিতে হয়। নিম্নলিখিত ছন্দে প্রত্যেক লাইনে চোদ্দটা অক্ষর আছে—

ফাগুন যামিনী, প্রদীপ জ্বলিছে ঘরে।
দখিন-বাতাস মরিছে বুকের 'পরে।

ইহাকে যে পয়ার বলি না তাহার কারণ ইহার এক-একটি ঝোঁকের দখলে ছয়টি করিয়া মাত্রা। ইহার ভাগ নীচে লিখিলাম—

ফাগুন যামিনী,| প্রদীপ জ্বলিছে | ঘরে—।

চোদ্দ-অক্ষরী লাইনের আরো দৃষ্টান্ত আছে—

পুরব-মেঘমুখে | পড়েছে রবিরেখা।
অরুণ-রথচূড়া | আধেক গেল দেখা।

এখানে স্পষ্টই এক-এক ঝোঁকে সাতটি করিয়া মাত্রা। সুতরাং পয়ারের তুলনায় প্রত্যেক পদে ইহার এক মাত্রা কম।

তবেই দেখা যাইতেছে, আট মাত্রার ছন্দকেই পয়ার বলে। আট মাত্রাকে দুখানা করিয়া চার মাত্রায় ভাগ করা চলে, কিন্তু সেটাতে পয়ারের চাল খাটো করা হয়। বস্তুত লম্বা নিশ্বাসের মন্দগতি চালেই পয়ারের পদমর্যাদা। চার-চার মাত্রায় পা ফেলিয়া পয়ার যখন দুলকি চালে চলে তখন তাহার পায়ে পায়ে মিল থাকে। যেমন—

বাজে তীর, পড়ে বীর ধরণীর 'পরে।

এরূপ ছন্দ হালকা কাজে চলে; ইহা যুক্ত-অক্ষরের ভার সয় না এবং সাতকাণ্ড বা অষ্টাদশ পর্ব জুড়িয়া লম্বা দৌড় ইহার পক্ষে অসাধ্য। চৌপদীটা পয়ারের সহোদর

বোন। আট মাত্রায় তাহার পা পড়ে, কেবল তাহার পায়ে মিলের মলজোড়ার ঝংকারটা কিছু বেশি।

বাহিরের চেহারা দেখিয়া ছন্দের জাতিনির্ণয় করায় যে প্রমাদ ঘটিতে পারে তাহার একটা দৃষ্টান্ত এইখানে দিই। একদিন আমার মাথায় একটা ছয় মাত্রার ছন্দ আসিয়া হাজির হইয়াছিল। তাহার চেহারাটা এইরকম—

প্রথম শীতের মাসে, শিশির লাগিল ঘাসে,
হুহু করে হাওয়া আসে হিহি করে কাঁপে গাত্র।

গোটা কয়েক শ্লোক যখন লেখা হইয়া গেছে তখন হঠাৎ হুঁশ হইল যে, আকারে-আয়তনে চৌপদীর সঙ্গে ইহার কোনো তফাত নাই, অতএব পাঠকেরা আট মাত্রার ঝোঁক দিয়াই ইহা পড়িবে— তখন আমি হাল ছাড়িয়া দিয়া চৌপদীর দস্তরেই লিখিতে লাগিলাম। এই ছন্দটিকে ছয় মাত্রার কায়দায় পড়িতে হইলে নিম্নলিখিত-মত ভাগ হয়—

| |
প্রথম শীতের | মাসে—
| |
শিশির লাগিল | ঘাসে—

আমাদের দেশের সংগীতের তাল যদি আপনার জানা থাকে তবে এক কথায় বলিলেই বুঝিবেন, চৌপদীতে কাওয়ালির লয়ে ঝোঁক দিতে হয় এবং আমি যে ছন্দটা লক্ষ্য করিয়া লিখিতেছিলাম তাহার তাল একতালা। কাওয়ালি দুইবর্গ মাত্রার তাল, এবং একতালা তিনবর্গ মাত্রার।

ত্রিপদীরও মোটের উপর আট মাত্রার চাল। যথা—

| |
ভবানীর কটুভাবে | লজ্জা হৈল কীর্তিবাসে,
| |
ক্ষুধানলে কলেবর | দহে।

তৃতীয় পদে দুটা মাত্রা বেশি আছে; তাহার কারণ, যে চতুর্থ পদটি থাকিলে এই ছন্দের ভারসামঞ্জস্য থাকিত সেটি নাই। 'ক্ষুধানলে কলেবর' পর্যন্ত আসিয়া থামিতে গেলে ছন্দটা কাত হইয়া পড়ে এইজন্য 'দহে' একটা যোগ করিয়া ছোটো একটি ঠেকা দিয়া উহাকে খাড়া রাখা হইয়াছে। চতুষ্পদ জন্তুর পায়ের তেলোটা চওড়া হয় না, কিন্তু মানুষের খাড়া শরীরের টলটলে ভারটা দুই পায়ের পক্ষে বেশি হওয়াতেই তাহার

পদতলটা গোড়ালি ছাড়াইয়া সামনের দিকে খানিকটা বিস্তীর্ণ; সেইটুকুই ত্রিপদীর ওই শেষ দুটো অতিরিক্ত মাত্রা।

এইরূপ অনেকগুলি ছন্দ দেখা যায় যাহাতে খানিকটা করিয়া বড়ো মাত্রাকে একটি করিয়া ছোটো মাত্রা দিয়া বাধা দিবার কায়দা দেখা যায়। দশ মাত্রার ছন্দ তাহার দৃষ্টান্ত। ইহার ভাগ আট+দুই, অথবা চার+চার+দুই—

। । ।
মোর পানে। চাহ মুখ। তুলি,
। । ।
পরশিব। চরণের। ধূলি।

ছয় মাত্রার ছন্দেও এরূপ বড়ো-ছোটোর ভাগ চলে। সেই ভাগ ছয়+দুই অথবা তিন+তিন+দুই। যেমন—

আঁখিতে। মিলিল। আঁখি।
হাসিল। বদন। ঢাকি।
মরম- বারতা শরমে মরিল
কিছু না রহিল বাকি।

উক্ত ছন্দে তিনের দল বুক ফুলাইয়া জুড়ি মিলাইয়া চলিতেছিল, হঠাৎ মাঝে মাঝে একটা খাপছাড়া দুই আসিয়া তাহাদিগকে বাধা দিয়াছে। এইরূপে গতি ও বাধার মিলনে ছন্দের সংগীত একটু বিশেষ ভাবে বাজিয়া উঠিয়াছে। এই বাধাটি গতির অনুপাতে ছোটো হওয়া চাই। কারণ, বড়ো হইলে সে বাধা সত্য হয়, এবং গতিকে আবদ্ধ করে, সেটা ছন্দের পক্ষে দুর্ঘটনা। তাই উপরের দুইটি দৃষ্টান্তে দেখিয়াছি চারের দল ও তিনের দলকে দুই আসিয়া রোধ করিয়াছে, সেইজন্য ইহা বন্ধনের অবরোধ নহে, ইহা লীলার উপরোধ। দুইয়ের পরিবর্তে এক হইলেও ক্ষতি হয় না। যেমন—

। । ।
প্রতিদিন হায়। এসে ফিরে যায়। কে।

অথবা—

। । ।
মুখে তার। নাহি আর। রা।
। । ।
লাজে লীন। কাঁপে ক্ষীণ। গা।

বাংলা ছন্দকে তিন প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। দুই বর্গের মাত্রা, তিন বর্গের

মাত্রা এবং অসমান মাত্রার ছন্দ।

দুই বর্গ মাত্রার ছন্দ, যেমন পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী। এই-সমস্ত ছন্দ বড়ো বড়ো বোঝা বহিতে পারে, কেননা দুই, চার, আট মাত্রাগুলি বেশ চৌকা। এইজন্য পৃথিবীতে পা-ওয়ালা জীবমাত্রেরই, হয় দুই, নয় চার, নয় আট পা। বাংলাসাহিত্যে ইহারাই মহাকাব্যের বাহন।

চাকার গুণ এই যে একবার ধাক্কা পাইলে সেই ঝোঁকে সে গড়াইয়া চলে, থামিতে চায় না। তিন মাত্রার ছন্দ সেই চাকার মতো। দুই সংখ্যাটা স্থিতিপ্রবণ, তিন সংখ্যাটা গতিপ্রবণ।

নবীন | কিশোরী | মেঘের | বিজুরি | চমকি | চলিয়া | গেল।

এখানে তিন মাত্রার শব্দগুলি একটা আর-একটার গায়ের উপর গড়াইয়া পড়িয়া ঠেলা দিয়া চলিয়াছে, থামানো দায়। অবশেষে একটি দুই মাত্রা আসিয়া তাহাকে ক্ষণকালের জন্য ঠেকাইয়াছে।

দুই মাত্রার সঙ্গে তিন মাত্রার মিলনে অসম মাত্রার ছন্দের উৎপত্তি। ৩+২, ৩+৪, ৫+৪ মাত্রার ছন্দ তাহার দৃষ্টান্ত।

৩+২, যথা—

কাঁপিলে পাতা, নড়িলে পাখি
চমকি উঠে চকিত আঁখি।

৩+৪—

তরল জলধর বরিষে ঝরঝর

৫+৪—

বচন বলে আধো-আধো,
চরণ চলে বাধো-বাধো,
নয়ন- তলে কাঁদো-কাঁদো চাহনি।

তিন মাত্রার ছন্দের ন্যায় অসম মাত্রার ছন্দও স্বভাবত চঞ্চল। মাত্রার অসমানতাই তাহাকে কেবল টলাইতে থাকে। প্রত্যেক পদ পরবর্তী পদের উপর ঠেস দিয়া আপনাকে সামলাইতে চেষ্টা করে। বস্তুত তিন মাত্রাও অসম মাত্রা, তাহার উপাদান দুই+এক।

কারণ, ছন্দের মূল মাত্রা দুই, তাহা এক নহে। নিয়মিত গতিমাত্রই দুই সংখ্যাকে অবলম্বন করিয়া। তাই স্তম্ভ, যাহা থামিয়া থাকে, তাহা এক হইতে পারে; কিন্তু

জন্তুর পা বল, পাখির পাখা বল, মাছের পাখনা বল, দুইয়ের যোগে তবে চলে। সেই দুইয়ের নিয়মিত গতির উপরে যদি একটা একের অতিরিক্ত ভার চাপানো যায় তবে সেই গতিতে একটা অনিয়মের বেগ পড়ে, সেই অনিয়মের ঠেলায় নিয়মিত গতির বেগ বাড়িয়া যায় এবং তাহার বৈচিত্র্য ঘটে। মানুষের শরীর তাহার দৃষ্টান্ত। চারপেয়ে মানুষ যখন সোজা হইয়া দাঁড়াইল তখন তাহার কোমর হইতে মাথা পর্যন্ত টল্‌মলে এবং কোমর হইতে পদতল পর্যন্ত মজবুত হওয়াতে এই দুইভাগের মধ্যে অসামঞ্জস্য ঘটিয়াছে। এই অসামঞ্জস্যকে ছন্দে সামলাইবার জন্য মানুষের গতিতে মাথা হাত কোমর পা বিচিত্র হিল্লোলে হিল্লোলিত হইতেছে। চার পায়ের ছন্দ ইহার চেয়ে অনেক সরল।

অতএব বাংলা ছন্দকে সম মাত্রা, অসম মাত্রা এবং বিষম মাত্রায় শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে। শুধু বাংলা কেন, কোনো ভাষার ছন্দের আর-কোনোপ্রকার ভাগ হইতে পারে বলিয়া মনে করিতে পারি না। তবে প্রভেদ হয় কিসে। মাত্রাগুলির চেহারায়।

সংস্কৃতভাষায় অসমান স্বর ও ব্যঞ্জনগুলিকে কৌশলে মিলাইয়া সমান মাত্রায় ভাগ করিতে হয়, তাহাতে ধ্বনির বৈচিত্র্য ও গাম্ভীর্য ঘটে। যথা—

বদসি যদি | কিঞ্চিদপি | দন্তরুচি | কৌমুদী

হরতি দর | তিমিরমতি | ঘোরম্।

ইহা পাঁচ মাত্রা অর্থাৎ বিষম মাত্রার ছন্দ। বাঙালি জয়দেব তাঁহার গানে সংস্কৃতভাষার যুক্তবর্ণের বেণী যথাসম্ভব এলাইয়া দিতে ভালোবাসিতেন, এইজন্য উপরের উদ্ধৃত শ্লোকাংশটি যথেষ্ট ভালো দৃষ্টান্ত নহে; তবু ইহাতে আমার কথাটি বুঝা যাইবে। ইহার প্রত্যেক ঝোঁকে যে পাঁচ মাত্রা পড়িয়াছে তাহার ভাগ এইরূপ—

১+১+১+১+১ | ২+১+১+১ | ২+১+১+১ | ২+১+২

১+১+১+১+১ | ১+১+১+১+১ | ২+২+—

বাংলাভাষার সাধু ছন্দে একের মাঝে মাঝে দুই বসিবার জায়গা পায় না, এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। উপরের কবিতাটুকু বাংলায় তর্জমা করিতে হইলে নিম্নলিখিত-মত হইবে—

বচন যদি | কহ গো দুটি

দশনরুচি | উঠিবে ফুটি,

ঘুচাবে মোর | মনের ঘোর | তামসী।

একটি ইংরাজি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক—

Ah distinctly | I remember |
It was in the | bleak December. |

এটি চৌপদী ছন্দ। ইহার মাত্রাগুলিকে ছাড়াইয়া দেখা যাক—

১ ২ ৩ ৪
Ah dis tinct ly
১ ২ ৩ ৪
I re mem ber

ইহার এক-একটা ঝোঁকে চারিটি করিয়া মাত্রা, কিন্তু অসমান শব্দগুলিকে ভাগ করিয়া এই মাত্রাগুলি তৈরি হইয়াছে এবং distinct শব্দের tinct এবং remember শব্দের mem অংশটি নিজের একসেণ্টের সড়্‌কি আস্ফালন করিতেছে।

ইহাই সাধু বাংলায় হইবে—

আহা মোর মনে আসে
দারুণ শীতের মাসে।

ইংরেজ কবি ইচ্ছা করিলেও এমনতরো নখদন্তহীন মাত্রায় ছন্দ রচিতেই পারেন না, কারণ, তাঁহাদের শব্দগুলি কোণওয়ালা।

ইচ্ছা করিলে যুক্ত-অক্ষরের আমদানি করিয়া আমরা ওই শ্লোকটাকে শক্ত করিয়া তুলিতে পারি। যেমন—

স্পষ্ট স্মৃতি চিত্তে ভাসে
দুরন্ত অঘ্রান মাসে
অগ্নিকুণ্ড নিবে আসে
নাচে তারি উপচ্ছায়া।

এখানে বাংলার সঙ্গে ইংরাজির প্রধান প্রভেদ এই যে, বাংলা শব্দগুলিতে স্বরবর্ণের টান ইংরাজির চেয়ে বেশি। কিন্তু, আমার প্রথম পত্রেই লিখিয়াছি, সেটা কেবল সাধু ভাষায়; বাংলার চলতি ভাষায় ঠিক ইহার উলটা। চলতি ভাষার কথাগুলি শুচিভাবে পরস্পরের স্পর্শ বাঁচাইয়া চলে না, ইংরাজি শব্দেরই মতো চলিবার সময় কে কাহার গায়ে পড়ে তাহার ঠিক নাই।

পূর্বপত্রেই লিখিয়াছি, বাংলা চলতি ভাষার ধ্বনিটা হসন্তের সংঘাত-ধ্বনি, এইজন্য ধ্বনিহিসাবে সংস্কৃতের চেয়ে ইংরাজির সঙ্গে তাহার মিল বেশি। তাই এই চলতি ভাষার ছন্দে মাত্রাবিভাগ বিচিত্র। বাংলা-প্রাকৃতের একটা চৌপদী নীচে লিখিলাম।—

কই পালঙ্ক, কই রে কম্বল,
কপ্‌নি-টুক্‌রো রইল সম্বল,
একলা পাগ্‌লা ফির্‌বে জঙ্গল,
মিট্‌বে সংকট ঘুচ্‌বে ধন্দ।

ইহার সঙ্গে Ah distinctly I remember শ্লোকটি মিলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে, ধ্বনির বিশেষ কোনো তফাত নাই।

ইহার সাধু পাঠ এইরূপ—

শয্যা কই বস্ত্র কই,
কী আছে কৌপীন বৈ,
একা বনে ফিরে ওই
নাহি মনে ভয় চিন্তা।

সাধু ও অসাধুর মাত্রাভাগ নীচে নীচে লিখিলাম, মিলাইয়া দেখিবেন।

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪
কই | পা | লঙ্‌ | ক || কই | রে | কম্‌ | বল্‌ ||
শ | য্যা | ক | ই || বস্‌ | ত্র | ক | ই ||
১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪
কপ্‌ | নি | টুক্‌ | রো || রই | ল | সম | বল্‌ ||
কী | আ | ছে | কৌ || পী | ন | ব | ই ||
১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪
এক্‌ | লা | পাগ্‌ | লা || ফির্‌ | বে | জঙ্‌ | গল্‌ ||
এ | কা | ব | নে || ফি | রে | ও | ই ||

সাধু ভাষার ছন্দটি যেন মোটা মোটা ফাঁকওয়ালা জালের মতো, আর অসাধুটির একেবারে ঠাসবুনানি।

ইংরাজিতে সম মাত্রার ছন্দ অনেক আছে, তাহার একটি দৃষ্টান্ত পূর্বেই দিয়াছি। অসম মাত্রা অর্থাৎ তিন মাত্রার দৃষ্টান্ত। যথা—

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
One | more | un || for | tu | nate ||
১ ২ ৩ ১ ২ ৩
Wea | ry | of || breath — — ||

ইংরেজিতে বিষম মাত্রার একটি উদাহরণ দিতে পারিলেই আপাতত আমার পালা

শেষ হয়। একটি মনে পড়িতেছে।—

১ ২ ৩ ৪ ৫
When | we | two | par | ted |
১ ২ ৩ ৪ ৫
(In) si | lence | and | tears | — |
১ ২ ৩ ৪ ৫
Half | bro | ken | heart | ed |
১ ২ ৩ ৪ ৫
(To) se | ver | for | years | — |

এই শ্লোকটির দুই লাইনকে মিলাইয়া এক লাইন করিয়া পড়িলে ইহার ছন্দকে তিন মাত্রায় ভাগ করিয়া পড়া সহজ হয়। কিন্তু বিষম মাত্রার লয়ে ইহাকে পড়িলে চলে বলিয়াই এই দৃষ্টান্তটি প্রয়োগ করিয়াছি, বোধ করি এরূপ দৃষ্টান্ত ইংরেজি ছন্দে দুর্লভ।

দেখা গিয়াছে ইংরেজি ছন্দে ঝোঁক পদের আরম্ভেও পড়িতে পারে, পদের শেষেও পড়িতে পারে। আরম্ভে, যেমন—

| |
O the dreary | dreary moorland
| |
O the barren | barren shore

পদের শেষে, যেমন—

| |
And are ye sure | the news is true
| |
And are ye sure | he's well |

বাংলায় আরম্ভে ছাড়া পদের আর-কোথাও ঝোঁক পড়িতে পারে না।

| | | |
একলা পাগলা ফিরবে জঙ্গল

কিম্বা—

| |
একলা পাগলা ফিরবে জঙ্গল

এমনটি হইবার জো নাই।

আমার কথাটি ফুরালো। ইংরেজি ছন্দকে আমি বাংলা ছন্দের রীতি-অনুসারে ভাগ করিয়া দেখিয়াছি, সেটা ভালো হইল কি না জানি না। ইংরেজি ছন্দতত্ত্ব আমার একদম জানা নাই বলিয়াই বোধ করি এরূপ দুঃসাহস আমার পক্ষে সহজ হইয়াছে। কারণ, চাণক্য যাহাদিগকে কথা কহিতে বারণ করেন তাহারাই আগেভাগে কথা কহিয়া বসে; আপনারাও জানেন angelরা প্রবেশ করিতে ভয় পান এমন জায়গা আছে, কিন্তু foolদের কোথাও বাধা নাই। এরূপ সতর্কতায় সকল সময়েই যে এঞ্জেলরা জেতেন তাহা নহে, অনেক সময়েই ঠকিয়া থাকেন; অবুঝ হঠকারিতায় অপর পক্ষের কখনো কখনো জিত হইবার সম্ভাবনা আছে, এই আমার ভরসা। আপনার পক্ষে বোঝা সহজ হইতে পারে বলিয়াই আমি ইংরেজি দৃষ্টান্তগুলি ব্যবহার করিয়াছি, ইহাতে আমার বিদ্যা প্রকাশ না হইয়া বিদ্যা ফাঁস হইয়া যাইতে পারে।

১৮ আষাঢ় ১৩২১

শ্রীপ্রমথ চৌধুরীকে লিখিত

চলতি কথায় একটা লম্বা ছন্দের কবিতা লিখেছি। এটা কি পড়া যায় কিম্বা বোঝা যায় কিম্বা ছাপানো যেতে পারে। নাম-রূপের মধ্যে রূপটা আমি দিলুম, নাম দিতে হয় তুমি দিয়ো।…

যারা আমার সাঁঝ-সকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো
আপন হিয়ার পরশ দিয়ে, এই জীবনের সকল সাদা-কালো
যাদের আলো-ছায়ার লীলা, বাইরে বেড়ায় মনের মানুষ যারা
তাদের প্রাণের ঝরনাস্রোতে আমার পরান হয়ে হাজার ধারা
চলছে বয়ে চতুর্দিকে। কালের যোগে নয় তো মোদের আয়ু—
নয় সে কেবল দিবস-রাতির সাতনলি হার, নয় সে নিশাসবায়ু।
নানান প্রাণের প্রেমের মিলে নিবিড় হয়ে আত্মীয়ে বান্ধবে
মোদের পরমায়ুর পাত্র গভীর ক'রে পূরণ করে সবে।
সবার বাঁচায় আমার বাঁচা আপন সীমা ছাড়ায় বহুদূরে,
নিমেষগুলির ফল পেকে যায় বিচিত্র আনন্দরসে পূরে;
অতীত হয়ে তবুও তারা বর্তমানের বৃন্তদোলায় দোলে—
গর্ভ হতে মুক্ত শিশু তবুও যেমন মায়ের বক্ষে কোলে
বন্দী থাকে নিবিড় প্রেমের বাঁধন দিয়ে। তাই তো যখন শেষে
একে একে আপন জনে সূর্য-আলোর অন্তরালের দেশে

আঁখির নাগাল এড়িয়ে পালায়, তখন রিক্ত শীর্ণ জীবন মম
শুষ্ক রেখায় মিলিয়ে আসে বর্ষাশেষের নির্ঝরিণীসম
শূন্য বালুর একটি প্রান্তে ক্লান্তবারি স্রস্ত অবহেলায়।
তাই যারা আজ রইল পাশে এই জীবনের অপরাহ্ণ-বেলায়
তাদের হাতে হাত দিয়ে তুই গান গেয়ে নে থাকতে দিনের আলো—
বলে নে ভাই, "এই যা দেখা, এই যা ছোঁওয়া, এই ভালো, এই ভালো।
এই ভালো আজ এ-সংগমে কান্নাহাসির গঙ্গাযমুনায়
ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।
এই ভালো রে প্রাণের রঙ্গে এই আসঙ্গ সকল অঙ্গে মনে
পুণ্য ধরার ধুলো মাটি ফল হাওয়া জল তৃণ তরুর সনে।
এই ভালো রে ফুলের সঙ্গে আলোয় জাগা, গান-গাওয়া এই ভাষায়,
তারার সাথে নিশীথ-রাতে ঘুমিয়ে-পড়া নূতন প্রাতের আশায়।"

এই জাতের সাধু ছন্দে আঠারো অক্ষরের আসন থাকে। কিন্তু, এটাতে কোনো কোনো লাইনে পঁচিশ পর্যন্ত উঠেছে। ফার্স্ট ক্লাসের এক বেঞ্চিতে ছ-জনের বেশি বসবার হুকুম নেই কিন্তু থার্ড ক্লাসে ঠেসাঠেসি ভিড়, এ সেইরকম। কিন্তু, যদি এটা ছাপাও তা হলে লাইন ভেঙো না, তা হলে ছন্দ পড়া কঠিন হবে।···

৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্তকে লিখিত

সংস্কৃত কাব্য-অনুবাদ সম্বন্ধে আমার মত এই যে, কাব্যধ্বনিময় গদ্যে ছাড়া বাংলা পদ্যচ্ছন্দে তার গাম্ভীর্য ও রস রক্ষা করা সহজ নয়। দুটি-চারটি শ্লোক কোনোমতে বানানো যেতে পারে, কিন্তু দীর্ঘ কাব্যের অনুবাদকে সুখপাঠ্য ও সহজবোধ্য করা দুঃসাধ্য। নিতান্ত সরল পয়ারে তার অর্থটিকে প্রাঞ্জল করা যেতে পারে। কিন্তু তাতে ধ্বনিসংগীত মারা যায়, অথচ সংস্কৃত কাব্যে এই ধ্বনিসংগীত অর্থসম্পদের চেয়ে বেশি বৈ কম নয়।

মন্দাক্রান্তা ছন্দের আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রবোধ বাঙালির কানের উল্লেখ করেছেন। বাঙালির কান বলে কোনো বিশেষ পদার্থ আছে বলে আমি মানি নে। মানুষের

স্বাভাবিক কানের দাবি অনুসরণ করলে দেখা যায়, মন্দাক্রান্তা ছন্দের চার পর্ব। যথা—

মেঘালোকে | ভবতি সুখিনো | প্যন্যথাবৃৎ | তি চেতঃ।

অর্থাৎ, মাত্রা-হিসাবে আট+সাত+সাত+চার। শেষের চারকে ঠিক চার বলা চলে না। কারণ, লাইনের শেষে এক মাত্রা আন্দাজের যতি বিরামের পক্ষে অনিবার্য। এই ছন্দকে বাংলায় আনতে গেলে এইরকম দাঁড়ায়—

দূরে ফেলে গেছ জানি,
স্মৃতির বীণাখানি,
বাজায় তব বাণী
মধুরতম।
অনুপমা, জেনো অয়ি,
বিরহ চিরজয়ী
করেছে মধুময়ী
বেদনা মম।

সংস্কৃতের অমিত্রাক্ষররীতি অনুবর্তন করা যেতে পারে। যথা—

অভাগা যক্ষ কবে করিল কাজে হেলা, কুবের তাই তারে দিলেন শাপ,
নির্বাসনে সে রহি প্রেয়সী-বিচ্ছেদে বর্ষ ভরি স'বে দারুণ জ্বালা।
গেল চলি রামগিরি-শিখর-আশ্রমে হারায়ে সহজাত মহিমা তার,
সেখানে পাদপরাজি স্নিগ্ধছায়াবৃত সীতার স্নানে পূত সলিলধারা॥

১৩ মার্চ ১৯৩১

শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লিখিত

গীতাঞ্জলির কয়েকটি গানের ছন্দ সম্বন্ধে কৈফিয়ত চেয়েছ। গোড়াতেই বলে রাখা দরকার গীতাঞ্জলিতে এমন অনেক কবিতা আছে যার ছন্দোরক্ষার বরাত দেওয়া হয়েছে গানের সুরের 'পরে। অতএব, যে পাঠকের ছন্দের কান আছে তিনি গানের খাতিরে এর মাত্রা কম-বেশি নিজেই দুরস্ত করে নিয়ে পড়তে পারেন, যার নেই তাঁকে ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে।

১। 'নব নব রূপে এসো প্রাণে'— এই গানের অন্তিম পদগুলির কেবল অন্তিম দুটি অক্ষরের দীর্ঘহ্রস্ব স্বরের সম্মান স্বীকৃত হয়েছে। যথা 'প্রাণে' 'গানে' ইত্যাদি। একটিমাত্র পদে তার ব্যতিক্রম আছে। এসো দুঃখে সুখে, এসো মর্মে— এখানে 'সুখে'র এ-কারকে অবাঙালি রীতিতে দীর্ঘ করা হয়েছে। 'সৌখ্যে' কথাটা দিলে বলবার কিছু থাকত না। তবু সেটাতে রাজি হই নি, মানুষ চাপা দেওয়ার চেয়ে মোটর ভাঙা ভালো।

২। 'অমল ধবল পা-লে লেগেছে মন্দমধুর হাওয়া'— এ গানে গানই মুখ্য, কাব্য গৌণ। অতএব, তালকে সেলাম ঠুকে ছন্দকে পিছিয়ে থাকতে হল। যদি বল, পাঠকেরা তো শ্রোতা নয়, তারা মাপ করবে কেন। হয়তো করবে না— কবি জোড়হাত করে বলবে, 'তালদ্বারা ছন্দ রাখিলাম, ত্রুটি মার্জনা করিবেন।'

৩। চৌত্রিশ-নম্বরটাও গান। তবুও এর সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য হচ্ছে এই যে, যে ছন্দগুলি বাংলার প্রাকৃত ছন্দ, অক্ষর গণনা করে তাদের মাত্রা নয়। বাঙালি সেটা বরাবর নিজের কানের সাহায্যে উচ্চারণ করে এসেছে। যথা—

বৃষ্টি পড়ে- টাপুর টুপুর, নদেয় এল-বা- ন,
শিবু ঠাকুরের বিয়ে- হবে- তিন কন্যে দা- ন।

আক্ষরিক মাত্রা গুনতি করে একে যদি সংশোধন করতে চাও তা হলে নিখুঁত পাঠান্তরটা দাঁড়াবে এইরকম—

বৃষ্টি পড়ছে টাপুর টুপুর, নদেয় আসছে বন্যা,
শিবু ঠাকুরের বিবাহ হচ্ছে, দান হবে তিন কন্যা।

রামপ্রসাদের একটি গান আছে—

মা আমায় ঘুরাবি কত
যেন | চোখবাঁধা বলদের মতো।

এটাকে যদি সংশোধিত মাত্রায় কেতাদুরস্ত করে লিখতে চাও তা হলে তার নমুনা একটা দেওয়া যাক—

হে মাতা আমারে ঘুরাবি কতই
চক্ষুবদ্ধ বৃষের মতোই।

একটা কথা তোমাকে মনে রাখতে হবে, বাঙালি আবৃত্তিকার সাধুভাষা-প্রচলিত ছন্দেও নিজের উচ্চারণসম্মত মাত্রা রাখে নি বলে ছন্দের অনুরোধে হ্রস্বদীর্ঘের সহজ নিয়মের সঙ্গে রফানিষ্পত্তি করে চলেছে। যথা—

মহাভারতের কথা অমৃতসমান,
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্।

উচ্চারণ-অনুসারে 'মহাভারতের কথা' লিখতে হয় 'মহাভারতের্কথা', তেমনি 'কাশীরাম দাস কহে' লেখা উচিত 'কাশীরাম দাস্কহে'। কারণ, হসন্ত শব্দ পরবর্তী স্বর বা ব্যঞ্জন শব্দের সঙ্গে মিলে যায়, মাঝখানে কোনো স্বরবর্ণ তাদের ঠোকাঠুকি নিবারণ করে না। কিন্তু, বাঙালি বরাবর সহজেই 'মহাভারতে-র্কথা' পড়ে এসেছে, অর্থাৎ 'তে'র এ-কারকে দীর্ঘ করে আপসে মীমাংসা করে দিয়েছে। তার পরে 'পুণ্যবান্' কথাটার 'পুণ্যে'র মাত্রা কমিয়ে দিতে সংকোচ করে নি, অথচ 'বান্' কথাটার আক্ষরিক দুই মাত্রাকে টান এবং যতির সাহায্যে চার মাত্রা করেছে।

৪। 'নিভৃত প্রাণের দেবতা'— এই গানের ছন্দ তুমি কী নিয়মে পড় আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে। 'দেবতা' শব্দের পরে একটা দীর্ঘ যতি আছে, সেটা কি রাখ না। যদি সেই যতিকে মান্য করে থাক তা হলে দেখবে, 'দেবতা' এবং 'খোলো দ্বার' মাত্রায় অসমান হয় নি। এ-সব ধ্বনিগত তর্ক মোকাবিলায় মীমাংসা করাই সহজ। লিখিত বাক্যের দ্বারা এর শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব হবে কি না জানি নে। ছাপাখানা-শাসিত সাহিত্যে ছন্দোবিলাসী কবির এই এক মুশকিল— নিজের কণ্ঠ স্তব্ধ, পরের কণ্ঠের করুণার উপর নির্ভর। সেইজন্যেই আমাকে সম্প্রতি এমন কথা শুনতে হচ্ছে যে, আমি ছন্দ ভেঙে থাকি, তোমাদের স্তুতিবাক্যের কল্লোলে সেটা আমার কানে ওঠে না। তখন আকাশের দিকে চেয়ে বলি, 'চতুরানন, কোন্ কানওয়ালাদের 'পরে এর বিচারের ভার।'

৫। 'আজি গন্ধবিধুর সমীরণে'— কবিতাটি সহজ নিয়মেই পড়া উচিত। অবশ্য, এর পঠিত ছন্দে ও গীতছন্দে প্রভেদ আছে।

৬। 'জনগণমন-অধিনায়ক' গানটায় যে মাত্রাধিক্যের কথা বলেছ সেটা অন্যায় বল নি। ওই বাহুল্যের জন্যে 'পঞ্জাব' শব্দের প্রথম সিলেব্‌লটাকে দ্বিতীয় পদের গেটের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখি—

পন্ | জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা ইত্যাদি।

'পঞ্জাব'কে 'পঞ্জব' করে নামটার আকার খর্ব করতে সাহস হয় নি, ওটা দীর্ঘকায়াদের দেশ। ছন্দের অতিরিক্ত অংশের জন্যে একটু তফাতে আসন পেতে দেওয়া রীতি বা গীতি-বিরুদ্ধ নয়।

এই গেল আমার কৈফিয়তের পালা।

তোমার ছন্দের তর্কে আমাকে সালিস মেনেছ। 'লীলানন্দে'র যে লাইনটা নিয়ে তুমি অভিযুক্ত আমার মতে তার ছন্দঃপতন হয় নি। ছন্দ রেখে পড়তে গেলে কয়েকটি কথাকে অস্থানে খণ্ডিত করতে হয় বলেই বোধ হয় সমালোচক ছন্দঃপাত কল্পনা করেছেন। ভাগ করে দেখাই—

নৃত্য | শুধু বি | লানো লা | বণ্য ছন্দ।

আসলে 'বিলানো' কথাটাকে দুভাগ করলে কানে খটকা লাগে।

নৃত্য শুধু লাবণ্যবিলানো ছন্দ

লিখলে কোনোরকম আপত্তি মনে আসে না, অর্থহিসাবেও স্পষ্টতর হয়। ওই কবিতায় যে লাইনে তোমার ছন্দের অপরাধ ঘটেছে সেটা এই—

সংগীতসুধা নন্দনে(র) সে আলিম্পনে।

ভাগ করে দেখো—

সংগী | ত সুধা | নন্দ | নের সে আ | লিম্পনে।

যদি লিখতে—

সংগীতসুধা নন্দনেরি আলিম্পনে

তা হলে ছন্দের ত্রুটি হত না।

যাক। তার পরে 'ঐকান্তিকা'। ওটা প্রাকৃত ছন্দে লেখা। সে ছন্দের স্থিতিস্থাপকতা যথেষ্ট। মাত্রার ওজনের একটু-আধটু নড়চড় হলে ক্ষতি হয় না। তবুও নেহাত ঢিলেমি করা চলে না। বাঁধামাত্রার নিয়মের চেয়ে কানের নিয়ম সূক্ষ্ম; বুঝিয়ে বলা বড়ো শক্ত, কেন ভালো লাগল বা লাগল না। 'ঐকান্তিকা'র ছন্দটা বন্ধুর হয়েছে সে কথা বলতেই হবে। অনেক জায়গায় দুরান্বয়ের জন্যে এবং ছন্দের বিভাগে বাক্য বিভক্ত হয়ে গেছে বলে অর্থ বুঝতে কষ্ট পেয়েছি। তন্ন তন্ন আলোচনা করতে হলে বিস্তর বাক্য ও কাল -ব্যয় করতে হয়। তাই আমার কান ও বুদ্ধি অনুসরণ করে তোমার কবিতাকে কিছু কিছু বদল করেছি। তুমি গ্রহণ করবে এ আশা করে নয়, আমার অভিমতটা অনুমান করতে পারবে এই আশা করেই।

১ কার্তিক ১৩৩৬

২

তুমি এমন করে সব প্রশ্ন ফাঁদ যে দু-চার কথায় সেরে দেওয়া অসম্ভব হয়, তোমার সম্বন্ধে আমার এই নালিশ।

১। 'আবার এরা ঘিরেছে মোর মন'— এই পঙ্‌ক্তির ছন্দোমাত্রার সঙ্গে 'দাহ

আবার বেড়ে ওঠে ক্রমে'র মাত্রার অসাম্য ঘটেছে এই তোমার মত। 'ক্রমে' শব্দটার 'ক্র'র উপর যদি যথোচিত ঝোঁক দাও তা হলে হিসাবের গোল থাকে না। 'বেড়ে ওঠেক্‌রমে'— বস্তুত সংস্কৃত ছন্দের নিয়মে 'ক্র' পরে থাকাতে 'ওঠে'র 'এ' স্বরবর্ণে মাত্রা বেড়ে ওঠা উচিত। তুমি বলতে পার, আমরা সাধারণত শব্দের প্রথম বর্ণস্থিত র-ফলাকে দুই মাত্রা দিতে কৃপণতা করি। 'আক্রমণ' শব্দের 'ক্র'কে তার প্রাপ্য মাত্রা দিই, কিন্তু 'ওঠে ক্রমে'র 'ক্র' হ্রস্বমাত্রায় খর্ব করে থাকি। আমি সুযোগ বুঝে বিকল্পে দুইরকম নিয়মই চালাই।

২। ভক্‌ত | সেথায় | খোলো দ্বা | ০০র্ | এইরকম ভাগে কোনো দোষ নেই। কিন্তু, তুমি যে ভাগ করেছিলে | র০০ | এটা চলে না; যেহেতু 'র' হসন্ত বর্ণ, ওর পরে স্বরবর্ণ নেই, অতএব টানব কাকে।

৩। 'জনগণ' গান যখন লিখেছিলেম তখন 'মারাঠা' বানান করি নি। মরাঠিরাও প্রথমবর্ণে আকার দেয় না। আমার ছিল 'মরাঠা'। তার পরে যাঁরা শোধন করেছেন তাঁরাই নিরাকারকে সাকার করে তুলেছেন, আমার চোখে পড়ে নি।

৪। 'জাগিয়ে' ও 'রটিয়ে' শব্দের 'গিয়ে' ও 'টিয়ে' প্রাকৃত-বাংলার মতে এক মাত্রাই। আমি যদি পরিবর্তন করে থাকি সেটাকে স্বীকার করবার প্রয়োজন নেই।

১০ নভেম্বর ১৯২৯

৩

তুমি যে 'ম্লান' শব্দটিকে হসন্তভাবে উচ্চারণ কর এ আমার কাছে নতুন লাগল। আমি কখনোই 'ম্লান্' বলি নে। প্রাকৃত-বাংলায় যে-সব শব্দ অতিপ্রচলিত তাদেরই উচ্চারণে এইরকম স্বরলুপ্তি সহ্য করা চলে। 'ম্লান' শব্দটা সে-জাতের নয় এবং ওটা অতি সুন্দর শব্দ, ওকে বিনা দোষে জরিমানা করে ওর স্বরহরণ কোরো না, তোমার কাছে এই আমার দরবার।

যতি বলতে বোঝায় বিরাম। ছন্দ জিনিসটাই হচ্ছে আবৃত্তিকে বিরামের বিশেষ বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা।

ললিত ল | বঙ্গ ল | তা পরি | শীলন।

প্রত্যেক চার মাত্রার পরে বিরাম।

বদসি যদি | কিঞ্চিদপি।

পাঁচ-পাঁচ মাত্রার শেষে বিরাম। তুমি যদি লেখ 'বদসি যদ্যপি' তা হলে এই ছন্দে যতির যে পঞ্চায়তি বিধান আছে তা রক্ষা হবে না। এখানে যতিভঙ্গ ছন্দোভঙ্গ একই কথা।

প্রত্যেক পদক্ষেপের সমষ্টি নিয়ে নৃত্য, কিন্তু একটিমাত্র পদপাতে যদি চ্যুতি ঘটে তা হলে সে ত্রুটি পদবিক্ষেপের ত্রুটি, সুতরাং সমস্ত নৃত্যেরই ত্রুটি।

৯ শ্রাবণ ১৩৩৮

৪

'তোমারই' কথাটাকে সাধু ভাষার ছন্দেও আমরা 'তোমারি' বলে গণ্য করি। এমন একদিন ছিল যখন করা হত না। আমিই প্রথমে এটা চালাই। 'একটি' শব্দকে সাধু ভাষায় তিন মাত্রার মর্যাদা যদি দেও তবে ওর হসন্ত হরণ করে অত্যাচারের দ্বারা সেটা সম্ভব হয়। যদি হসন্ত রাখ তবে দ্বৈমাত্রিক বলে ওকে ধরতেই হবে। যদি মাছের উপর কবিতা লেখার প্রয়োজন হয় তবে 'কাৎলা' মাছকে কা-ত-লা উচ্চারণের জোরে সাধুত্বে উত্তীর্ণ করা আর্যসমাজি শুদ্ধিতেও বাধবে। তুমি কি লিখতে চাও—

পাতলা করিয়া কাটো কাতলা মাছেরে,
উৎসুক নাতনী যে চাহিয়া আছে রে।

আর আমি যদি লিখি—

পাৎলা করি কাটো প্রিয়ে কাৎলা মাছটিরে
টাট্‌কা করি দাও ঢেলে সর্ষে আর জিরে,
ভেট্‌কি যদি জোটে তাহে মাখো লঙ্কাবাঁটা,
যত্ন করে বেছে ফেলো টুক্‌রো যত কাঁটা।

আপত্তি করবে কি। 'উষ্ট্র' যদি দুই মাত্রায় পদক্ষেপ করতে পারে তবে 'একটি' কী দোষ করেছে।

'জনগণমন-অধিনায়ক' সংস্কৃত ছন্দে বাংলায় আমদানি।

৭ ভাদ্র ১৩৩৮

ছন্দ সম্বন্ধে তুমি অতিমাত্র সচেতন হয়ে উঠেছ। শুধু তাই নয়, কোনোমতে নতুন ছন্দ তৈরি করাকে তুমি বিশেষ সার্থকতা বলে কল্পনা কর। আশা করি, এই অবস্থা একদিন তুমি কাটিয়ে উঠবে এবং ছন্দ সম্বন্ধে একেবারেই সহজ হবে তোমার মন। আজ তুমি ভাগবিভাগ করে ছন্দ যাচাই করছ, প্রাণের পরীক্ষা চলছে দেহ-ব্যবচ্ছেদ করে। যারা ছান্দসিক তাদের উপর এই কাটাছেঁড়ার ভার দাও, তুমি যদি

ছন্দরসিক হও তবে ছুরিকাঁচি ফেলে দিয়ে কানের পথ খোলসা রাখো যেখান দিয়ে বাঁশি মরমে প্রবেশ করে। গীতার একটা শ্লোকের আরম্ভ এই—

অপরং ভবতো জন্ম,

ঠিক তার পরবর্তী শ্লোক—

বহূনি মে ব্যতীতানি।

দ্বিতীয়টির সমান ওজনে প্রথমটি যদি লিখতে হয় তা হলে লেখা উচিত 'অপারং ভাবতো জন্ম'। কিন্তু, যাঁরা এই ছন্দ বানিয়েছিলেন তাঁরা ছান্দসিকের হাটে গিয়ে নিক্তি নিয়ে বসেন নি। আমি যখন 'পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা' লিখেছিলুম তখন জানতুম, কোনো কবির কানে খটকা লাগবে না, ছান্দসিকের কথা মনে ছিল না।

১৩ মাঘ ১৩৩৯

৬

ছন্দ নিয়ে যে কথাটা তুলেছ সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্যটা বলি। বাংলার উচ্চারণে হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণভেদ নেই, সেইজন্যে বাংলাছন্দে সেটা চালাতে গেলে কৃত্রিমতা আসেই।

। । । । । ।

হেসে হেসে হল যে অস্থির,

। । । । ।

মেয়েটা বুঝি ব্রাহ্মণবস্তির।

এটা জবরদস্তি। কিন্তু—

হেসে কুটিকুটি এ কী দশা এর,

এ মেয়েটি বুঝি রায়মশায়ের।

এর মধ্যে কোনো অত্যাচার নেই। রায়মশায়ের চঞ্চল মেয়েটির কাহিনী যদি বলে যাই লোকের মিষ্টি লাগবে, কিন্তু দীর্ঘে হ্রস্বে পা ফেলে চলেন যিনি তাঁর সঙ্গে বেশিক্ষণ আলাপ চলে না। যেটা একেবারে প্রকৃতিবিরুদ্ধ তার নৈপুণ্যে কিছুক্ষণ বাহবা দেওয়া চলে, তার সঙ্গে ঘরকরা চলে না।

'জনগণমনঅধিনায়ক'— ওটা যে গান। দ্বিতীয়ত, সকল প্রদেশের কাছে যথাসম্ভব সুগম করবার জন্যে যথাসাধ্য সংস্কৃত শব্দ লাগিয়ে ওটাকে আমাদের পাড়া থেকে অমরদেবীর পল্লীতে চালান করে দেওয়া হয়েছে। বাংলা শব্দে একসেন্ট দিয়ে বা

ইংরেজি শব্দে না দিয়ে কিম্বা সংস্কৃত কাব্যে দীর্ঘহ্রস্বকে বাংলার মতো সমভূম করে যদি রচনা করা যায় তবে কেবলমাত্র ছন্দকৌশলের খাতিরে সাহিত্যসমাজে তার নতুন মেলবন্ধন করা চলবে না। বিশেষত, চিহ্ন উঁচিয়ে চোখে খোঁচা দিয়ে পড়াতে চেষ্টা করলে পাঠকদের প্রতি অসৌজন্য করা হয়।

Autumn flaunteth in his bushy bowers

এতে একটা ছন্দের সূচনা থাকতে পারে, কিন্তু সেইটেই কি যথেষ্ট। অথবা—

সম্মুখ সমরে পড়ি বীর চূড়ামণি বীরবাহু।

এক্সেণ্ট-এর তাড়ায় ধাক্কা মেরে চালালে এইরকম লাইনের আলস্য ভেঙে দেওয়া যায় যদি মানি, তবু আর কিছু মানবার নেই কি।

৬ জুলাই ১৯৩৬

দীর্ঘহ্রস্ব ছন্দ সম্বন্ধে আর-একবার বলি। ও এক বিশেষ ধরনের লেখায় বিশেষ ভাষারীতিতেই চলতে পারে। আকবর বাদশার যোধপুরী মহিষীর জন্যে তিনি মহল বানিয়েছিলেন স্বতন্ত্র, সমগ্র প্রাসাদের মধ্যে সে আপন জাত বাঁচিয়ে নির্লিপ্ত ছিল। বাংলার উচ্চারণরীতিকে মেনে চলে যে ছন্দ তার চলাফেরা সাহিত্যের সর্বত্র, কোনো গণ্ডির মধ্যে নয়। তা পণ্ডিত-অপণ্ডিত সকল পাঠকের পক্ষেই সুগম। তুমি বলতে পার, সকল কবিতাই সকলের পক্ষে সুগম হবেই এমনতরো কবুলতিনামায় লেখককে সই দিতে বাধ্য করতে পারি নে। সে তর্ক খাটে ভাবের দিক থেকে, চিন্তার দিক থেকে, কিন্তু ভাষার সর্বজনীন উচ্চারণরীতির দিক থেকে নয়। তুমি বেলের শরবতই করো, দইয়ের শরবতই করো, মূল উপাদান জলটা সাধারণ জল— ভাষার উচ্চারণটাও সেইরকম। My heart aches— কোনো ধ্বনিসৌষ্ঠবের খাতিরেই বা বাঙালির অভ্যাসের অনুরোধে heartএর আ এবং achesএর এ-কে হ্রস্ব করা চলবে না। এই কারণে বাংলায় বিশুদ্ধ সংস্কৃত ছন্দ চালাতে গেলে দীর্ঘ স্বরধ্বনির জায়গায় যুক্তবর্ণের ধ্বনি দিতে হয়। সেটার জন্যে বাংলাভাষা ও পাঠককে সর্বদা ঠেলা মারতে হয় না। অথবা দীর্ঘস্বরকে দুই মাত্রার মূল্য দিলেও চলে। যদি লিখতে—

হে অমল চন্দনগন্ধিত, তনু রঞ্জিত
হিমানীতে সিঞ্চিত স্বর্ণ

তা হলে চতুষ্পাঠীর বহির্বর্তী পাঠকের দুশ্চিন্তা ঘটাত না।

৮ জুলাই ১৯৩৬

বাংলায় প্রাক্‌হসন্ত স্বর দীর্ঘায়ত হয় এ কথা বলেছি। জল এবং জলা, এই দুটো শব্দের মাত্রাসংখ্যা সমান নয়। এইজন্যেই 'টুমুস্‌ টুমুস্‌ বাদ্যি বাজে' পদটাকে ত্রৈমাত্রিক বলেছি। টু-মু দুই সিলেব্‌ল্‌, পরবর্তী হসন্ত স্‌-ও এক সিলেব্‌ল্‌এর মাত্রা নিয়েছে পূর্ববর্তী উ স্বরকে সহজেই দীর্ঘ ক'রে। 'টুমু টুমু বাজ্জা বাজে' এবং 'টুমুস্‌ টুমুস্‌ বাদ্যি বাজে' এক ছন্দ নয়। 'রণিয়া রণিয়া বাজিছে বাজনা' এবং 'টুমুস্‌ টুমুস্‌ বাদ্যি বাজে', এক ওজনের ছন্দ। দুটোই ত্রৈমাত্রিক। আমি প্রচলিত ছড়ার দৃষ্টান্তও দেখিয়েছি।

২৫ জুলাই ১৯৩৬

শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত

যখন কবিতাগুলি পড়বে তখন পূর্বাভ্যাসমত মনে কোরো না ওগুলো পদ্য। অনেকে সেই চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে রুষ্ট হয়ে ওঠে। গদ্যের প্রতি গদ্যের সম্মানরক্ষা করে চলা উচিত। পুরুষকে সুন্দরী রমণীর মতো ব্যবহার করলে তার মর্যাদাহানি হয়। পুরুষেরও সৌন্দর্য আছে, সে মেয়ের সৌন্দর্য নয়— এই সহজ কথাটা বলবার প্রয়াস পেয়েছি পরবর্তী পাতাগুলিতে।

২৬ আশ্বিন ১৩৩৯

২

'পুনশ্চ'র কবিতাগুলোকে কোন্‌ সংজ্ঞা দেবে। পদ্য নয়, কারণ পদ নেই। গদ্য বললে, অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। পক্ষিরাজ ঘোড়াকে পাখি বলবে না ঘোড়া বলবে? গদ্যের পাখা উঠেছে এ কথা যদি বলি, তবে শত্রুপক্ষ বলে বসবে, 'পিপিড়ার পাখা ওঠে মরিবার তরে।' জলে স্থলে যে সাহিত্য বিভক্ত, সেই সাহিত্যে এ জিনিসটা জল নয়, তাই বলে মাটিও নয়। তা হলে খনিজ বলতে দোষ আছে কি। সোনা বলতে

পারি এমন অহংকার যদি বা মনে থাকে মুখে বলবার সাহস নেই। না হয় তাঁবাই হল। অর্থাৎ, এমন কোনো ধাতু যাতে মূর্তি-গড়ার কাজ চলে। গদাধরের মূর্তিও হতে পারে, তিলোত্তমারও হয়। অর্থাৎ, রূপরসাত্মক গদ্য, অর্থভারবহ গদ্য নয়। তৈজস গদ্য।

সংজ্ঞা পরে হবে, আপাতত প্রশ্ন এই— ওতে চেহারা গড়ে উঠেছে কি না। যদি উঠে থাকে তা হলেই হল।

৭ কার্তিক ১৩৩৯

৩

গানের আলাপের সঙ্গে 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের গদ্যিকারীতির যে তুলনা করেছ সেটা মন্দ হয় নি। কেননা আলাপের মধ্যে তালটা বাঁধনছাড়া হয়েও আত্মবিস্মৃত হয় না। অর্থাৎ, বাইরে থাকে না মৃদঙ্গের বোল, কিন্তু নিজের অঙ্গের মধ্যেই থাকে চলবার একটা ওজন।

কিন্তু সংগীতের সঙ্গে কাব্যের একটা জায়গায় মিল নেই। সংগীতের সমস্তটাই অনির্বচনীয়। কাব্যে বচনীয়তা আছে সে কথা বলা বাহুল্য। অনির্বচনীয়তা সেইটেকেই বেষ্টন করে হিল্লোলিত হতে থাকে, পৃথিবীর চার দিকে বায়ুমণ্ডলের মতো। এপর্যন্ত বচনের সঙ্গে অনির্বচনের, বিষয়ের সঙ্গে রসের গাঁঠ বেঁধে দিয়েছে ছন্দ। পরস্পরকে বলিয়ে নিয়েছে, যদেতদ্ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব। বাক্ এবং অবাক্ বাঁধা পড়েছে ছন্দের মাল্যবন্ধনে। এই বাক্ এবং অবাক্ -এর একান্ত মিলনেই কাব্য। বিবাহিত জীবনে যেমন কাব্যেও তেমনি, মাঝে মাঝে বিরোধ বাধে, উভয়ের মাঝখানে ফাঁক পড়ে যায়, ছন্দও তখন জোড় মেলাতে পারে না। সেটাকেই বলি আক্ষেপের বিষয়। বাসরঘরে এক শয্যায় দুই পক্ষ দুই দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকার মতোই সেটা শোচনীয়। তার চেয়ে আরো শোচনীয়, যখন 'এক কন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ি যান'। যথাপরিমিত খাদ্যবস্তুর প্রয়োজন আছে, এ কথা অজীর্ণ রোগীকেও স্বীকার করতে হয়। কোনো কোনো কাব্যে বাগ্‌দেবী স্থূলখাদ্যাভাবে ছায়ার মতো হয়ে পড়েন। সেটাকে আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ বলে উল্লাস না করে আধিভৌতিকতার অভাব বলে বিমর্ষ হওয়াই উচিত।

'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে আধিভৌতিককে সমাদর করে ভোজে বসানো হয়েছে। যেন জামাইষষ্ঠী। এ মানুষটা পুরুষ। একে সোনার ঘড়ির চেন পরালেও অলংকৃত করা হয় না। তা হোক, পাশেই আছেন কাঁকনপরা অর্ধাবগুণ্ঠিতা মাধুরী, তিনি তাঁর

শিল্পসমৃদ্ধ ব্যঞ্জনিকার আন্দোলনে এই ভোজের মধ্যে অমরাবতীর মৃদুমন্দ হাওয়ার আভাস এনে দিচ্ছেন। নিজের রচনা নিয়ে অহংকার করছি মনে করে আমাকে হঠাৎ সদুপদেশ দিতে বোসো না। আমি যে কীর্তিটা করেছি তার মূল্য নিয়ে কথা হচ্ছে না, তার যেটি আদর্শ, এই চিঠিতে তারই আলোচনা চলছে। বক্ষ্যমাণ কাব্যে গদ্যটি মাংসপেশল পুরুষ বলেই কিছু প্রাধান্য যদি নিয়ে থাকে তবু তার কলাবতী বধূ দরজার আধখোলা অবকাশ দিয়ে উঁকি মারছে, তার সেই ছায়াবৃত কটাক্ষ-সহযোগে সমস্ত দৃশ্যটি রসিকদের উপভোগ্য হবে বলেই ভরসা করেছিলুম। এর মধ্যে ছন্দ নেই বললে অত্যুক্তি হবে, ছন্দ আছে বললেও সেটাকে বলব স্পর্ধা। তবে কী বললে ঠিক হবে ব্যাখ্যা করি। ব্যাখ্যা করব কাব্যরস দিয়েই।

বিবাহসভায় চন্দনচর্চিত বর-কনে টোপর মাথায় আল্‌পনা-আঁকা পিঁড়ির উপর বসেছে। পুরুত পড়ে চলেছে মন্ত্র, ও দিকে আকাশ থেকে আসছে সাহানা-রাগিণীতে সানাইয়ের সংগীত। এমন অবস্থায় উভয়ের যে বিবাহ চলেছে সেটা নিঃসন্দিগ্ধ, সুস্পষ্ট। নিশ্চিত-ছন্দ-ওয়ালা কাব্যে সেই সানাই বাজনা সেই মন্ত্রপড়া লেগেই আছে। তার সঙ্গে আছে লাল চেলি, বেনারসির জোড়, ফুলের মালা, ঝাড়লণ্ঠনের রোশনাই। সাধারণত যাকে কাব্য বলি সেটা হচ্ছে বচন-অনির্বচনের সম্মিলনের পরিভূষিত উৎসব। অনুষ্ঠানে যা যা দরকার সযত্নে তা সংগ্রহ করা হয়েছে। কিন্তু, তার পরে? অনুষ্ঠান তো বারোমাস চলবে না। তাই বলেই তো নীরবিত সাহানা-সংগীতের সঙ্গে সঙ্গেই বরবধূর মহাশূন্যে অন্তর্ধান কেউ প্রত্যাশা করে না। বিবাহ-অনুষ্ঠানটা সমাপ্ত হল, কিন্তু বিবাহটা তো রইল, যদি না কোনো মানসিক বা সামাজিক উপনিপাত ঘটে। এখন থেকে সাহানা-রাগিণীটা অশ্রুত বাজবে, এমন-কি, মাঝে মাঝে তার সঙ্গে বেসুরো নিখাদে অত্যন্তশ্রুত কড়া সুরও না-মেশা অস্বাভাবিক, সুতরাং একেবারে না-মেশা প্রার্থনীয় নয়। চেলি-বেনারসিটা তোলা রইল, আবার কোনো অনুষ্ঠানের দিনে কাজে লাগবে। সপ্তপদীর বা চতুর্দশপদীর পদক্ষেপটা প্রতিদিন মানায় না। তাই বলেই প্রাত্যহিক পদক্ষেপটা অস্থানে পড়ে বিপজ্জনক হবেই এমন আশঙ্কা করি নে। এমন কি বাম দিক থেকে ঝুনুঝুনু মলের আওয়াজ গোলমালের মধ্যেও কানে আসে। তবু মোটের উপর বেশভূষাটা হল আটপৌরে। অনুষ্ঠানের বাঁধারীতি থেকে ছাড়া পেয়ে একটা সুবিধে হল এই যে, উভয়ের মিলনের মধ্যে দিয়ে সংসারযাত্রার বৈচিত্র্য সহজ রূপ নিয়ে স্থূল সূক্ষ্ম নানা ভাবে দেখা দিতে লাগল। যুগলমিলন নেই অথচ সংসারযাত্রা আছে এমনও ঘটে। কিন্তু, সেটা লক্ষ্মীছাড়া। যেন খবুরে-কাগজি সাহিত্য। কিন্তু, যে সংসারটা প্রতিদিনের, অথচ সেই প্রতিদিনকেই লক্ষ্মীশ্রী চিরদিনের করে তুলছে, যাকে

চিরন্তনের পরিচয় দেবার জন্যে বিশেষ বৈঠকখানায় অলংকৃত আয়োজন করতে হয় না তাকে কাব্যশ্রেণীতেই গণ্য করি। অথচ চেহারায় সে গদ্যের মতো হতেও পারে। তার মধ্যে বেসুর আছে, প্রতিবাদ আছে, নানাপ্রকার বিমিশ্রতা আছে, সেইজন্যেই চারিত্রশক্তি আছে। যেমন কর্ণের চারিত্রশক্তি যুধিষ্ঠিরের চেয়ে অনেক বড়ো। অথচ, একরকম শিশুমতি আছে যারা ধর্মরাজের কাহিনী শুনে অশ্রুবিগলিত হয়। রামচন্দ্র নামটার উল্লেখ করলুম না সে কেবল লোকভয়ে, কিন্তু আমার দৃঢ়বিশ্বাস, আদিকবি বাল্মীকি রামচন্দ্রকে ভূমিকাপত্তনস্বরূপে খাড়া করেছিলেন তার অসবর্ণতায় লক্ষ্মণের চরিত্রকে উজ্জ্বল করে আঁকবার জন্যেই, এমন-কি, হনুমানের চরিত্রকেও বাদ দেওয়া চলবে না। কিন্তু, সেই একঘেয়ে ভূমিকাটা অত্যন্ত বেশি রঙফলানো চওড়া বলেই লোকে ওইটের দিকে তাকিয়ে হায়-হায় করে। ভবভূতি তা করেন নি। তিনি রামচন্দ্রের চরিত্রকে অশ্রদ্ধেয় করবার জন্যেই কবিজনোচিত কৌশলে 'উত্তররামচরিত' রচনা করেছিলেন। তিনি সীতাকে দাঁড় করিয়েছেন রামভদ্রের প্রতি প্রবল গঞ্জনারূপে।

ওই দেখো, কী কথা বলতে কী কথা এসে পড়ল। আমার বক্তব্য ছিল এই— কাব্যকে বেড়াভাঙা গদ্যের ক্ষেত্রে স্ত্রীস্বাধীনতা দেওয়া যায় যদি, তা হলে সাহিত্যসংসারের আলংকারিক অংশটা হালকা হয়ে তার বৈচিত্র্যের দিক তার চরিত্রের দিক অনেকটা খোলা জায়গা পায়। কাব্য জোরে পা ফেলে চলতে পারে। সেটা সযত্নে নেচে চলার চেয়ে সব সময়ে যে নিন্দনীয় তা নয়। নাচের আসরের বাইরে আছে এই উঁচুনিচু বিচিত্র বৃহৎ জগৎ, রূঢ় অথচ মনোহর, সেখানে জোরে চলাটাই মানায় ভালো, কখনো ঘাসের উপর, কখনো কাঁকরের উপর দিয়ে।

রোসো। নাচের কথাটা যখন উঠল, ওটাকে সেরে নেওয়া যাক। নাচের জন্য বিশেষ সময়, বিশেষ কায়দা চাই। চারি দিক বেষ্টন করে আলোটা মালাটা দিয়ে তার চালচিত্র খাড়া না করলে মানানসই হয় না। কিন্তু, এমন মেয়ে দেখা যায় যার সহজ চলনের মধ্যেই বিনা ছন্দের ছন্দ আছে। কবিরা সেই অনায়াসের চলন দেখেই নানা উপমা খুঁজে বেড়ায়। সে মেয়ের চলনটাই কাব্য, তাতে নাচের তাল নাই-বা লাগল; তার সঙ্গে মৃদঙ্গের বোল দিতে গেলে বিপত্তি ঘটবে। তখন মৃদঙ্গকে দোষ দেব না তার চলনকে? সেই চলন নদীর ঘাট থেকে আরম্ভ করে রান্নাঘর বাসরঘর পর্যন্ত। তার জন্যে মালমসলা বাছাই করে বিশেষ ঠাট বানাতে হয় না। গদ্যকাব্যেরও এই দশা। সে নাচে না, সে চলে। সে সহজে চলে বলেই তার গতি সর্বত্র। সেই গতিভঙ্গি আবাঁধা। ভিড়ের ছোঁওয়া বাঁচিয়ে পোশাকি-শাড়ির-প্রান্ত-তুলে-ধরা

আধাঘোমটা-টানা সাবধান চাল তার নয়।

এই গেল আমার 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের কৈফিয়ত। আরো-একটা পুনশ্চ-নাচের আসরে নাট্যাচার্য হয়ে বসব না, এমন পণ করি নি। কেবলমাত্র কাব্যের অধিকারকে বাড়াব মনে করেই একটা দিকের বেড়ায় গেট বসিয়েছি। এবারকার মতো আমার কাজ ওই পর্যন্ত। সময় তো বেশি নেই। এর পরে আবার কোন্ খেয়াল আসবে বলতে পারি নে। যাঁরা দৈবদুর্যোগে মনে করবেন, গদ্যে কাব্যরচনা সহজ, তাঁরা এই খোলা দরজাটার কাছে ভিড় করবেন সন্দেহ নেই। তা নিয়ে ফৌজদারি বাধলে আমাকে স্বদলের লোক বলে স্বপক্ষে সাক্ষী মেনে বসবেন। সেই দুর্দিনের পূর্বেই নিরুদ্দেশ হওয়া ভালো। এর পরে মদ্রচিত আরো একখানা কাব্যগ্রন্থ বেরবে, তার নাম 'বিচিত্রিতা'। সেটা দেখে ভদ্রলোকে এই মনে করে আশ্বস্ত হবে যে, আমি পুনশ্চ প্রকৃতিস্থ হয়েছি।...

দেওয়ালি ১৩৩৯

৪

সম্প্রতি কতকগুলো গদ্যকবিতা জড়ো করে 'শেষসপ্তক' নাম দিয়ে একখানি বই বের করেছি। সমালোচকরা ভেবে পাচ্ছেন না ঠিক কী বলবেন। একটা কিছু সংজ্ঞা দিতে হবে, তাই বলছেন আত্মজৈবনিক। অসম্ভব নয়, কিন্তু তাতে বলা হল না, এগুলো কবিতা কিম্বা কবিতা নয় কিম্বা কোন্ দরের কবিতা। এদের সম্বন্ধে মুখ্য কথা যদি এই হয় যে, এতে কবির আত্মজীবনের পরিচয় আছে, তা হলে পাঠক অসহিষ্ণু হয়ে বলতে পারে, আমার তাতে কী। মদের গেলাসে যদি রঙকরা জল রাখা যায় তা হলে মদের হিসাবেই ওর বিচার আপনি উঠে পড়ে। কিন্তু, পাথরের বাটিতে রঙিন পানীয় দেখলে মনের মধ্যে গোড়াতেই তর্ক ওঠে, ওটা শরবত না ওষুধ। এরকম দ্বিধার মধ্যে পড়ে সমালোচক এই কথাটার 'পরেই জোর দেন যে, বাটিটা জয়পুরের কি মুঙ্গেরের। হায় রে, রসের যাচাই করতে যেখানে পিপাসু এসেছিল সেখানে মিলল পাথরের বিচার। আমি কাব্যের পসারি, আমি শুধোই— লেখাগুলোর ভিতরে ভিতরে কি স্বাদ নেই, ভঙ্গি নেই, থেকে থেকে কটাক্ষ নেই, সদর দরজার চেয়ে এর খিড়কির দুয়ারের দিকেই কি ইশারা নেই, গদ্যের বকুনির মুখে রাস টেনে ধরে তার মধ্যে কি কোথাও দুলকির চাল আনা হয় নি, চিন্তাগর্ভ কথার মুখে কোনোখানে অচিন্ত্যের ইঙ্গিত কি লাগল না, এর মধ্যে ছন্দোরাজকতার নিয়ন্ত্রিত শাসন না থাকলেও আত্মরাজকতার অনিয়ন্ত্রিত সংযম নেই কি। সেই সংযমের গুণে থেমে-যাওয়া কিম্বা

হঠাৎ-বেঁকে-যাওয়া কথার মধ্যে কোথাও কি নীরবের সরবতা পাওয়া যাচ্ছে না। এই-সকল প্রশ্নের উত্তরই হচ্ছে এর সমালোচনা। কালিদাস 'রঘুবংশে'র গোড়াতেই বলেছেন, বাক্য এবং অর্থ একত্র সম্পৃক্ত থাকে; এমন স্থলে বাক্য এবং অর্থাতীতকে একত্র সম্পৃক্ত করার দুঃসাধ্য কাজ হচ্ছে কবির, সেটা গদ্যেই হোক আর পদ্যেই হোক তাতে কী এল গেল।

৩ জুন ১৯৩৫

৫

অন্তরে যে ভাবটা অনির্বচনীয় তাকে প্রেয়সী নারী প্রকাশ করবে গানে নাচে, এটাকে লিরিক বলে স্বীকার করা হয়। এর ভঙ্গিগুলিকে ছন্দের বন্ধনে বেঁধে দেওয়া হয়েছে; তারা সেই ছন্দের শাসনে পরস্পরকে যথাযথভাবে মেনে চলে বলেই তাদের সুনিয়ন্ত্রিত সম্মিলিত গতিতে একটি শক্তির উদ্ভব হয়, সে আমাদের মনকে প্রবল বেগে আঘাত দিয়ে থাকে। এর জন্যে বিশেষ প্রসাধন, আয়োজন, বিশেষ রঙ্গমঞ্চের আবশ্যক ঘটে। সে আপনার একটি স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করে, একটি দূরত্ব।

কিন্তু, একবার সরিয়ে দাও ওই রঙ্গমঞ্চ, জরির-আঁচলা-দেওয়া বেনারসি শাড়ি তোলা থাক পেটিকায়, নাচের বন্ধনে তনুদেহের গতিকে মধুর নিয়মে নাই-বা সংযত করলে— তা হলেই কি রস নষ্ট হল। তা হলেও দেহের সহজ ভঙ্গিতে কান্তি আপনি জাগে, বাহুর ভাষায় যে বেদনার ইঙ্গিত ঠিকরে ওঠে সে মুক্ত বলেই যে নিরর্থক এমন কথা যে বলতে পারে তার রসবোধ অসাড় হয়েছে। সে নাচে না বলেই যে তার চলনে মাধুর্যের অভাব ঘটে কিম্বা সে গান করে না বলেই যে তার কানে-কানে কথার মধ্যে কোনো ব্যঞ্জনা থাকে না, এ কথা অশ্রদ্ধেয়। বরঞ্চ এই অনিয়ন্ত্রিত কলায় একটি বিশেষ গুণের বিকাশ হয়, তাকে বলব ভাবের স্বচ্ছন্দতা, আপন আন্তরিক সত্যেই তার আপনার পর্যাপ্তি। তার বাহুল্যবর্জিত আত্মনিবেদনে তার সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত কাছের সম্বন্ধ ঘটে। অশোকের গাছে সে আলতা-আঁকা নূপুরশিঞ্জিত পদাঘাত নাই করল; নাহয় কোমরে আঁট আঁচল বাঁধা, বাঁ হাতের কুক্ষিতে ঝুড়ি, ডান হাত দিয়ে মাচা থেকে লাউশাক তুলছে, অযত্নশিথিল খোঁপা ঝুলে পড়েছে আলগা হয়ে; সকালের রৌদ্রজড়িত ছায়াপথে হঠাৎ এই দৃশ্যে কোনো তরুণের বুকের মধ্যে যদি ধক্ করে ধাক্কা লাগে তবে সেটাকে কি লিরিকের ধাক্কা বলা চলে না, নাহয় গদ্য-লিরিকই হল।

এ রস শালপাতায় তৈরি গদ্যের পেয়ালাতেই মানায়, ওটাকে তো ত্যাগ করা চলবে না। প্রতিদিনের তুচ্ছতার মধ্যে একটি স্বচ্ছতা আছে, তার মধ্যে দিয়ে অতুচ্ছ পড়ে ধরা— গদ্যের আছে সেই সহজ স্বচ্ছতা। তাই বলে এ কথা মনে করা ভুল হবে যে, গদ্যকাব্য কেবলমাত্র সেই অকিঞ্চিৎকর কাব্যবস্তুর বাহন। বৃহতের ভার অনায়াসে বহন করবার শক্তি গদ্যছন্দের মধ্যে আছে। ও যেন বনস্পতির মতো, তার পল্লবপুঞ্জের ছন্দোবিন্যাস কাটাছাঁটা সাজানো নয়, অসম তার স্তবকগুলি, তাতেই তার গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য।

প্রশ্ন উঠবে, গদ্য তা হলে কাব্যের পর্যায়ে উঠবে কোন্ নিয়মে। এর উত্তর সহজ। গদ্যকে যদি ঘরের গৃহিণী বলে কল্পনা কর তা হলে জানবে, তিনি তর্ক করেন, ধোবার বাড়ির কাপড়ের হিসাব রাখেন, তাঁর কাশি সর্দি জ্বর প্রভৃতি হয়, 'মাসিক বসুমতী' পাঠ করে থাকেন— এ-সমস্তই প্রাত্যহিক হিসেব, সংবাদের কোঠার অন্তর্গত, এই ফাঁকে ফাঁকে মাধুরীর স্রোত উছলিয়ে ওঠে, পাথর ডিঙিয়ে ঝরনার মতো। সেটা সংবাদের বিষয় নয়, সে সংগীতের শ্রেণীয়। গদ্যকাব্যে তাকে বাছাই করে নেওয়া যায় অথবা সংবাদের সঙ্গে সংগীত মিশিয়ে দেওয়া চলে। সেই মিশ্রণের উদ্দেশ্য সংগীতের রসকে পরুষের স্পর্শে ফেনায়িত উগ্রতা দেওয়া। শিশুদের সেটা পছন্দ না হতে পারে, কিন্তু দৃঢ়দন্ত বয়স্কের রুচিতে এটা উপাদেয়।

আমার শেষ বক্তব্য এই যে, এই জাতের কবিতায় গদ্যকে কাব্য হতে হবে। গদ্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে কাব্য পর্যন্ত পৌঁছল না, এটা শোচনীয়। দেবসেনাপতি কার্তিকেয় যদি কেবল স্বর্গীয় পালোয়ানের আদর্শ হতেন তা হলে শুম্ভনিশুম্ভের চেয়ে উপরে উঠতে পারতেন না। কিন্তু, তাঁর পৌরুষ যখন কমনীয়তার সঙ্গে মিশ্রিত হয় তখনই তিনি দেবসাহিত্যে গদ্যকাব্যের সিংহাসনের উপযুক্ত হন। (দোহাই তোমার, বাংলাদেশের ময়ূরে-চড়া কার্তিকটিকে সম্পূর্ণ ভোলবার চেষ্টা কোরো।)

১৭ মে ১৯৩৫

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষকে লিখিত

গদ্যের চালটা পথে চলার চাল, পদ্যের চাল নাচের। এই নাচের গতির প্রত্যেক অংশের মধ্যে সুসংগতি থাকা চাই। যদি কোনো গতির মধ্যে নাচের ধরনটা থাকে অথচ সুসংগতি না থাকে তবে সেটা চলাও হবে না, নাচও হবে না, হবে খোঁড়ার

চাল অথবা লম্ফঝম্প। কোনো ছন্দে বাঁধন বেশি, কোনো ছন্দে বাঁধন কম; তবু ছন্দমাত্রের অন্তরে একটা ওজন আছে। সেটার অভাব ঘটলে যে টলমলে ব্যাপার দাঁড়ায় তাকে বলা যেতে পারে মাতালের চাল, তাতে সুবিধাও নেই, সৌন্দর্যও নেই।

২২ জুলাই ১৯৩২

২

গদ্যকে গদ্য বলে স্বীকার করেও তাকে কাব্যের পঙ্‌ক্তিতে বসিয়ে দিলে আচারবিরুদ্ধ হলেও সুবিচারবিরুদ্ধ না হতেও পারে, যদি তাতে কবিত্ব থাকে। ইদানীং দেখছি, গদ্য আর রাশ মানছে না, অনেক সময় দেখি তার পিঠের উপর সেই সওয়ারটিই নেই যার জন্যে তার খাতির। ছন্দের বাঁধা সীমা যেখানে লুপ্ত সেখানে সংগত সীমা যে কোথায় সে তো আইনের দোহাই দিয়ে বোঝাবার জো নেই। মনে মনে ঠিক করে রেখেছি, স্বাধীনতার ভিতর দিয়েই বাঁধন ছাড়ার বিধান আপনি গড়ে উঠবে— এর মধ্যে আমার অভিরুচিকে আমি প্রাধান্য দিতে চাই নে। নানারকম পরীক্ষার ভিতর দিয়ে অভিজ্ঞতা গড়ে উঠছে। সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা আদর্শ ক্রমে দাঁড়িয়ে যাবে। আধুনিক ইংরেজি কাব্যসাহিত্যে এই পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে।

তুমি যে রচনাটি পাঠিয়েছ তাকে কবিতা বলে মেনে নিতে দ্বিধা করি নে, যদিও তুমি অসংকোচে তাকে গদ্যের পুরুষবেশ পরিয়েছ। একটুও বেমানান হয় নি। গদ্য-সওয়ারি কবিতার শাড়িশেমিজ নেই-বা রইল।

২৮ আশ্বিন ১৩৪৩

মোটকথা

পদ্যছন্দ

দুই মাত্রা বা দুই মাত্রার গুণক নিয়ে যে-সব ছন্দ তারা পদাতিক ; বোঝা সামলিয়ে ধীরপদক্ষেপে তাদের চাল। এই জাতের ছন্দকে পয়ারশ্রেণীয় বলব। সাধারণ পয়ারে প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিতে দুটি করে ভাগ, ধ্বনির মাত্রা ও যতির মাত্রা মিলিয়ে প্রত্যেক ভাগে আটটি করে মাত্রা, সুতরাং সমগ্র পয়ারের ধ্বনিমাত্রাসংখ্যা চোদ্দ এবং তার সঙ্গে মিলেছে যতিমাত্রাসংখ্যা দুই, অতএব সর্বসমেত ষোলো মাত্রা।

বচন নাহি তো মুখে | তবু মুখখানি • •
হৃদয়ের কানে বলে | নয়নের বাণী • •।

আট মাত্রার উপর ঝোঁক না রেখে প্রত্যেক দুই মাত্রার উপর ঝোঁক যদি রাখি তবে সেই দুল্‌কি চালে পয়ারের পদমর্যাদার লাঘব হয়।

কেন | তার | মুখ | ভার | বুক | ধুক | ধুক | • •,
চোখ | লাল | লাজে | গাল | রাঙা | টুক | টুক • •।

অথবা প্রত্যেক চার মাত্রায় ঝোঁক দিয়ে পয়ার পড়া যেতে পারে। যেমন—

সুনিবিড় | শ্যামলতা | উঠিয়াছে | জেগে • •
ধরণীর | বনতলে | গগনের | মেঘে • •।

ছন্দের দুটি জিনিস দেখবার আছে— এক হচ্ছে তার সমগ্র অবয়ব, আর তার সংঘটন। পয়ারের অবয়বের মাত্রাসমষ্টি ষোলো সংখ্যায়। এই ষোলো মাত্রা সংঘটিত হয়েছে দুই মাত্রার অংশযোজনায়। ধ্বনিরূপসৃষ্টিতে দুই সংখ্যার একটি বিশেষ প্রভাব আছে, তিন সংখ্যা থেকে তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দৃষ্টান্ত দেখাই—

শ্রাবণধারে সঘনে
        কাঁদিয়া মরে যামিনী,
ছোটে তিমিরগগনে
        পথহারানো দামিনী।

এই ছন্দটির সমগ্র অবয়ব ষোলো মাত্রায়। সেই ষোলো মাত্রাটি সংঘটিত হচ্ছে তিন-দুই-তিন মাত্রার যোগে, এইজন্যেই পয়ারের মতো এর চাল-চলন নয়। যে আট মাত্রা

দুইয়ের অংশ নিয়ে সে চলে সোজা সোজা পা ফেলে, কিন্তু যে আট মাত্রা তিন দুই-তিনের ভাগে সে চলছে হেলতে দুলতে মরালগমনে।

চেয়ে থাকে মুখপানে,
সে চাওয়া নীরব গানে   মনে এসে বাজে,
যেন ধীর ধ্রুবতারা
কহে কথা ভাষাহারা   জনহীন সাঁঝে।

যতিমাত্রাসমেত চব্বিশ মাত্রায় এই ত্রিপদীর অবয়ব। এই চব্বিশ মাত্রা দুই মাত্রা-খণ্ডের সমষ্টি, এইজন্যেই একে পয়ারশ্রেণীতে গণ্য করব।

রিমি ঝিমি বরিষে শ্রাবণধারা,
ঝিল্লি ঝনকিছে ঝিনি   ঝিনি;
দুরু দুরু হৃদয়ে বিরামহারা
তাকায়ে পথপানে বিরহিণী।

এ ছন্দেরও অবয়ব চব্বিশ মাত্রায়। কিন্তু, এর গড়ন স্বতন্ত্র, এর অংশগুলি দুই-তিনের মিশ্রিত মাত্রা।

পয়ার ছন্দের বিশেষ গুণ এই যে, তার বুনোনি ঠাসবুনোনি নয়, তাকে বাড়ানো-কমানো যায়। সুর করে টেনে টেনে পড়বার সময় কেউ যদি যতির যোগে পয়ারের প্রথম ভাগে দশ ও শেষ ভাগে আট মাত্রা পড়ে তবু পয়ারের প্রকৃতি বজায় থাকে। যেমন—

মহাভারতের কথা • • | অমৃতসমান • •।
কাশীরাম দাস ভনে • • | শুনে পুণ্যবান্ • •।

অথবা—

মহা •• ভারতের কথা •• | অমৃত • • সমা • • ন।
কাশীরা • • ম দাস ভনে • • | শুনে • • পুণ্যবা • • ন্।

পয়ার ছন্দ স্থিতিস্থাপক বলেই এটা সম্ভব, আর সেই গুণেই বাংলা কাব্যসাহিত্যকে সে এমন করে অধিকার করেছে।

যেমন দুই মাত্রামূলক পয়ার তেমনি তিন মাত্রামূলক ছন্দও বাংলাদেশে অনেককাল

থেকে প্রচলিত। পয়ারের ব্যবহার প্রধানত আখ্যানে রামায়ণ-মহাভারত-মঙ্গলকাব্য প্রভৃতিতে। তিন মাত্রামূলক ছন্দ গীতিকাব্যে, যেমন বৈষ্ণব-পদাবলীতে।

পূর্বেই বলেছি পয়ারের চাল পদাতিকের চাল, পা ফেলে ফেলে চলে।

অভিসারযাত্রাপথে হৃদয়ের ভার
পদে পদে দেয় বক্ষে ব্যথার ঝংকার।

এই পা ফেলে চলার মাঝে মাঝে যতি পাওয়া যায় যথেষ্ট, ইচ্ছা করলে তাকে বাড়ানো-কমানো চলে। কিন্তু, তিন মাত্রার তালটা যেন গোল গড়নের, গড়িয়ে চলে, পরস্পরকে ঠেলে নিয়ে দৌড় দেয়।

চলিতে চলিতে চরণে উছলে
চলিবার ব্যাকুলতা,
নূপুরে নূপুরে বাজে বনতলে
মনের অধীর কথা।

এইজন্যে মাত্রা যদি কোথাও তিনের মাপের একটু বেশি হয় এ ছন্দ তাকে প্রসন্নমনে জায়গা দিতে পারে না। দায়ে পড়ে এই অত্যাচার কখনো করি নি এমন কথা বলতে পারব না।

প্রভু বুদ্ধ লাগি আমি ভিক্ষা মাগি,
ওগো পুরবাসী, কে রয়েছ জাগি,
অনাথপিণ্ডদ কহিলা অম্বুদ-
নিনাদে।

এ কথা বোঝা শক্ত নয় যে, 'অনাথপিণ্ডদ' নামটার খাতিরে নিয়ম রদ করেছিলেম। গার্ড্ এসে গাড়ির কামরায় বরাদ্দর বেশি মানুষকে ঠেসে ঢুকিয়ে দিয়েছে, ঘুষ খেয়ে থাকবে কিম্বা আগন্তুক ভারী দরের।

সে কালে অক্ষরগনতি-করা তিন মাত্রামূলক ছন্দে যুক্তধ্বনি বর্জন করে চলতুম। কিন্তু, তাতে রচনায় অতিলালিত্যের দুর্বলতা এসে পৌঁছত। সেটা যখন আমার কাছে বিরক্তিকর হল তখন যুক্তধ্বনির শরণ নিলুম। ছন্দটা একদিন ছিল যেন নবনী দিয়ে গড়া—

ঝরঝর রাতে জলের আঘাতে
পড়িতেছে যূথী ঝরিয়া,
পরিমলে তারি সজল পবন
করুণায় উঠে ভরিয়া।

এই দুর্বলতার মধ্যে যুক্তবর্ণ এসে দেখা দিল—

নববর্ষার বারিসংঘাতে
পড়ে মল্লিকা ঝরিয়া,
সিক্তপবন সুগন্ধে তারি
কারুণ্যে উঠে ভরিয়া।

তিন-তিন মাত্রায় যার গ্রন্থিযোজনা এমন আর-একটি ছন্দের দৃষ্টান্ত দেখাই—

আঁখির পাতায় নিবিড় কাজল
গলিছে নয়ন সলিলে।

অক্ষরসংখ্যা সমান রেখে এই দুটো পদে যুক্তবর্ণ যদি চড়াই তা হলে সেটা কেমন হয়— যেমন এক-এক সময়ে দেখা যায়, জোয়ান পুরুষ ক্ষীণ স্ত্রীর ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে পথে চলে নির্মমভাবে। প্রমাণ দিই—

চক্ষুর পল্লবে নিবিড় কজ্জল
গলিছে অশ্রুর নির্ঝরে।

কিন্তু, এই বোঝা পয়ারজাতীয় পালোয়ানের স্কন্ধে চাপালে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকবে না। প্রথমে বিনা-বোঝার চালটা দেখানো যাক—

শ্রাবণের কালো ছায়া নেমে আসে তমালের বনে
যেন দিক্-ললনার গলিত কাজল-বরিষনে।

এটিকে গুরুভার করে দিই—

বর্ষার তমিস্রচ্ছায়া ব্যাপ্ত হল অরণ্যের তলে
যেন অশ্রুসিক্ত চক্ষু দিগ্‌বধূর গলিত কজ্জলে।

এতটা ভারবৃদ্ধি যে সম্ভব হয় তার কারণ পয়ার স্থিতিস্থাপক।

ধ্বনির দুই মাত্রা এবং তিন মাত্রা বাংলা ছন্দের আদিম এবং রূঢ়িক উপাদান। তার পরে এই দুই এবং তিনের যোগে যৌগিকমাত্রার ছন্দের উৎপত্তি। তিন+দুই, তিন+চার, তিন+দুই+চার প্রভৃতি নানাপ্রকার যোগ চলেছে আধুনিক বাংলা ছন্দে। তিন+দুই মাত্রামূলক ছন্দের দৃষ্টান্ত—

আঁধার রাতি জ্বেলেছে বাতি
অযুতকোটি তারা,
আপন কারা-ভবনে পাছে
আপনি হয় হারা।

দেখা যাচ্ছে, এখানে পদশেষের অংশটিকে খর্ব করা হয়েছে। যদি লেখা যেত—

আঁধার রাতি জ্বেলেছে বাতি
আকাশ ভরি অযুত তারা

তা হলে ছন্দের কাছে দেনা বাকি থাকত না। কিন্তু, পূর্বোক্ত প্রথম শ্লোকটির পদশেষে পাঁচ মাত্রার থেকে তিন মাত্রাকে জবাব দেওয়া হয়েছে। তা হলে বুঝতে হবে, সেই তিন মাত্রা দেহত্যাগ করে ওইখানেই বসে আছে যতিকে ভর করে।

কিন্তু, এই কৈফিয়তটা সম্পূর্ণ হল বলে মনে হয় না, আরো কথা আছে। প্রকৃতির কাজের অলংকরণতত্ত্বটা আলোচ্য। দুই পা দুই হাত নিয়ে দেহটা দাঁড়ালো, দুই কাঁধে দুটো মুণ্ড বসালেই সম্মিতি অর্থাৎ symmetry ঘটত। তা না করে দুই কাঁধের মাঝখানে একটি মুণ্ড বসিয়ে সমাপ্তিটা সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। কৃষ্ণচূড়ার গাছে ডাঁটার দু ধারে দুটি করে পত্রগুচ্ছ চলতে চলতে প্রান্তে এসে থামল একটিমাত্র গুচ্ছে। অলংকরণের ধারা যেখানে পূর্ণ হয়েছে সেখানে একটিমাত্র তর্জনী, ছোটো একটি ইশারা।

সকল ভাষারই যতি আছে, কিন্তু যতিকে বাটখারাস্বরূপ করে ছন্দের ওজন পূরণ বাংলা ছন্দ ছাড়া আর কোনো ছন্দে আছে কি না জানি নে। সংস্কৃত ছন্দে এই রীতি বিরল, তবু একেবারে পাওয়া যায় না তা নয়।

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতি ঘোরম্ ∘ ∘।

যতিকে কেবল বিরতির স্থান না দিয়ে তাকে পূর্তির কাজে লাগাবার অভ্যাস আরম্ভ হয়েছে আমাদের ছড়ার ছন্দ থেকে। ছড়া আবৃত্তি করবার সময় আপনি যতির জোগান দেয় আমাদের কান।

কাক কালো বটে, পিক সেও কালো,
কালো সে ফিঙের বেশ,
তাহার অধিক কালো যে, কন্যা,
তোমার চিকন কেশ।

এমন করে ছন্দটাকে পুরোপুরি ভরিয়ে দিলে কানের কাছে ঋণী হতে হত না। কিন্তু, এতে ছড়ার জাত যেত। ছড়ার রীতি এই যে, সে কিছু ধ্বনি জোগায় নিজে, কিছু আদায় করে কণ্ঠের কাছ থেকে; এ দুইয়ের মিলনে সে হয় পূর্ণ। প্রকৃতি আমের মধুরতায় জল মিশিয়েছেন, তাকে আমসত্ত্ব করে তোলেন নি; সেজন্যে রসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই

কৃতজ্ঞ। তেমনি যথেষ্ট যতি মিশোল করা হয়েছে ছড়ার ছন্দে, শিশুকাল থেকে বাঙালি তাতে আনন্দ পায়। সে সহজেই আউড়েছে—

কাক কালো, কোকিল কালো,
কালো ফিঙের বেশ,
তাহার অধিক কালো, কন্যে,
তোমার চিকন কেশ।

কিম্বা—

টুমুস টুমুস বাদ্যি বাজে,
লোকে বলে কী,
শামুকরাজা বিয়ে করে
ঝিনুকরাজার ঝি।

১৩৪১

গদ্যছন্দ

গদ্য বলতে বুঝি যে ভাষা আলাপ করবার ভাষা; ছন্দোবদ্ধ পদে বিভক্ত যে ভাষা তাই পদ্য। আর, রসাত্মক বাক্যকেই আলংকারিক পণ্ডিত কাব্য সংজ্ঞা দিয়েছেন। এই রসাত্মক বাক্য পদ্যে বললে সেটা হবে পদ্যকাব্য আর গদ্যে বললে হবে গদ্যকাব্য। গদ্যেও অকাব্য ও কুকাব্য হতে পারে, পদ্যেও তথৈবচ। গদ্যে তার সম্ভাবনা বেশি, কেননা ছন্দেরই একটা স্বকীয় রস আছে—সেই ছন্দকে ত্যাগ করে যে কাব্য, সুন্দরী বিধবার মতো তার অলংকার তার আপন বাণীদেহেই, বাইরে নয়। এ কথা বলা বাহুল্য যে, গদ্যকাব্যেও একটা আবাঁধা ছন্দ আছে। আন্তরিক প্রবর্তনা থেকে কাব্য সেই ছন্দ চলতে চলতে আপনি উদ্ভাবিত করে, তার ভাগগুলি অসম হয় কিন্তু সবসুদ্ধ জড়িয়ে ভারসামঞ্জস্য থেকে সে স্খলিত হয় না। বড়ো-ওজনের সংস্কৃত ছন্দে এই আপাতপ্রতীয়মান মুক্তগতি দেখতে পাওয়া যায়। যেমন—

মেঘৈর্ মেদুর | মম্বরং বনভুবঃ | শ্যামাস্তমা | লদ্রুমৈঃ।

এই ছন্দ সমান ভাগ মানে না, কিন্তু সমগ্রের ওজন মেনে চলে। মুখের কথায় আমরা যখন খবর দিই তখন সেটাতে নিশ্বাসের বেগে ঢেউ খেলায় না। যেমন—

তার চেহারাটা মন্দ নয়।

কিন্তু ভাবের আবেগ লাগবামাত্র আপনি ঝোঁক এসে পড়ে। যেমন—

কী সুন্দর তার চেহারাটি।

একে ভাগ করলে এই দাঁড়ায় : কী সুন্ | দর তার | চেহারাটি।

মরে যাই তোমার বালাই নিয়ে।

এত গুমর সইবে না গো, সইবে না— এই বলে দিলুম।

কথা কয় নি তো কয় নি
চলে গেছে সামনে দিয়ে,
বুক ফেটে মরব না তাই বলে।

এ-সমস্তই প্রতিদিনের চলতি কথার সহজ ছন্দ, গদ্য, কাব্যের গতিবেগে আত্মরচিত। মনকে খবর দেবার সময় এর দরকার হয় না, ধাক্কা দেবার সময় আপনি দেখা দেয়, ছান্দসিকের দাগ-কাটা মাপকাঠির অপেক্ষা রাখে না। ইতি ২২ মে ১৯৩৫

গ্রন্থপরিচয়

রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশের তারিখ ও রচনাসংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য গ্রন্থপরিচয়ে সংকলিত হইল।

খাপছাড়া

'খাপছাড়া' ১৩৪৩ সালের মাঘ মাসে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি বহু রঙিন ছবিতে ও রেখাচিত্রে কবি নিজেই চিত্রিত করিয়াছিলেন।

স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে 'খাপছাড়া'র নূতন সংস্করণ ১৩৭২ বৈশাখে প্রকাশিত। ইহার 'সংযোজন' অংশে ২, ৩, ৫, ১০ ও ১১ -সংখ্যক কবিতা বাদে রবীন্দ্র-রচনাবলীর 'সংযোজন'-ধৃত সব কবিতাই দেওয়া হইয়াছে। কারণ শিশুপাঠ্য চিত্রবিচিত্র গ্রন্থে প্রথমাবধি (শ্রাবণ ১৩৬১) উহার চারিটি ও পরে (ভাদ্র ১৩৬২) ২-সংখ্যক কবিতাটি সংকলিত।

বর্তমান গ্রন্থপরিচয়ে 'খাপছাড়া'র ৮২ ও ৯৪ -সংখ্যক কবিতার যে-কয়টি পূর্বপাঠ দেওয়া হইয়াছে তাহার অতিরিক্ত এক-একটি পাঠ স্বতন্ত্র খাপছাড়া গ্রন্থের (১৩৭২) গ্রন্থপরিচয়ে সংকলিত। ৭-সংখ্যক সংযোজনের একটি মাত্র পূর্বপাঠ এ স্থলে মুদ্রিত, স্বতন্ত্র গ্রন্থের গ্রন্থপরিচয় অংশে দুইটি মুদ্রিত আছে।

রবীন্দ্রনাথের বহু পাণ্ডুলিপি (বিশেষত শেষ বয়সের রচনা) শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত। এ-সকলের পর্যালোচনায় রবীন্দ্র-রচনা সংক্রান্ত বহু নূতন তথ্য ক্রমশ আবিষ্কৃত এবং পাঠভেদ সংগ্রহ করা হইতেছে।

পাঠভেদের নিদর্শনরূপে দুইটি কবিতার পূর্বপাঠ পাণ্ডুলিপি হইতে নিম্নে মুদ্রিত হইল—

৮২-সংখ্যক কবিতা

প্রথম পাঠ

বাদশার ফরমাসে সন্দেশ বানাতে
খুব কষে মাখে চিনি কুঁকড়োর ছানাতে।
সর্দার খোঁজে পাড়া— আজো কি রয়েছে ছাড়া
সাধু কেউ— বাদশাকে হয় তাই জানাতে।
ডাকাতেরা মারে পাছে, রাখে জেলখানাতে।

দ্বিতীয় পাঠ

বাদশার ফরমাসে সন্দেশ বানাতে
ছানা ছেড়ে মাখে চিনি কুঁকড়োর ছানাতে।
সর্দার খুঁজে খুঁজে ফিরিতেছে পাড়া পাড়া,
এখনো কি কোনোখানে কোনো সাধু আছে ছাড়া—
বাদশাকে সে-খবর হয় তারে জানাতে।
ডাকাতেরা মারে পাছে, রাখে জেলখানাতে।

তৃতীয় পাঠ

মহারাজা লুকিয়েছে পুলিসের থানাতে।
চোরকে সে পারে নাই আদালত মানাতে।
সর্দার খুঁজে খুঁজে ফিরিতেছে পাড়া পাড়া,
আজো যদি কোনোখানে কোনো সাধু থাকে ছাড়া—
রাজাকে সে খবরটা হয় তারে জানাতে।
অসাধুর ভয়ে তারে রাখে জেলখানাতে।

২৪-সংখ্যক কবিতা

প্রথম পাঠ

বিড়ালে মাছেতে হল সখ্য—
বিড়াল কহিল, "ভাই, ভক্ষ্য
বিধাতাই কন তোরে—
বন্ধুর অন্তরে
পশিয়া নিজেরে তুমি রক্ষ।
ওই দেখো উঁচু ডাঙা,
আছে বক মাছরাঙা—
কেন হবে উহাদের লক্ষ্য।"

দ্বিতীয় পাঠ

বিড়ালে মাছেতে হল সখ্য—
বিড়াল কহিল, "ভাই, ভক্ষ্য
বিধাতা স্বয়ং জেনো কন তোরে—
ঢোকো গিয়ে বন্ধুর অন্তরে,
সেখানে নিজেরে তুমি রক্ষ।

ওই দেখো পুকুরের ধারে ডাঙা,
ওইখানে শয়তান মাছ-রাঙা—
কেন মিছে হবে ওর লক্ষ্য।"

সংযোজন-অংশের কবিতাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্র, কবির 'ছন্দ' গ্রন্থ এবং রবীন্দ্রসদনের পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত হইল। 'পাবনায় বাড়ি হবে', 'বালিশ নেই সে ঘুমোতে যায়', 'পাঁচদিন ভাত নেই', এই কবিতা তিনটি 'প্রহাসিনী' (১৩৪৫) গ্রন্থের 'খাপছাড়া' অংশ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে; উক্ত গ্রন্থের রচনাবলী সংস্করণে (খণ্ড ২৩) কবিতা তিনটি বর্জিত হইয়াছে। এই অংশের ৪-২০-সংখ্যক কবিতা কয়টি ইতিপূর্বে কোনো গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই। সংযোজনের ৭-সংখ্যক কবিতার পাণ্ডুলিপিতে-প্রাপ্ত পূর্বপাঠ এখানে মুদ্রিত হইল—

ধীরু কহে শূন্যেতে মজো রে,
নিরাধার সত্যেরে ভজো রে।
এত বলি ঘোড়াটারে
দুই পায়ে গুঁতো মারে,
চাবুক লাগায় তারে সজোরে।
যত ছোটে সারাদিন
কিছুতেই ঘোড়াহীন
আপনারে নাহি পড়ে নজরে॥

ছড়ার ছবি

'ছড়ার ছবি' ১৩৪৪ সালের আশ্বিন মাসে 'নন্দলাল বসু -কর্তৃক চিত্রাঙ্কিত' আকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৩৭ সালের গ্রীষ্মে (মে-জুন মাসে) আলমোড়া বাসকালে রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বপরিচয়' ও এই গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা রচনা করেন।

রবীন্দ্রসদনে-রক্ষিত পাণ্ডুলিপির সাহায্যে বর্তমান সংস্করণে কয়েকটি কবিতার রচনার তারিখ এবং স্থান -সম্বন্ধীয় নির্দেশ সংশোধিত বা সংযোজিত হইল।

'বুধু' কবিতাটির শেষে সাময়িকপত্রে (সোনার কাঠি : আশ্বিন ১৩৪৪) এবং পাণ্ডু-লিপিতে নিম্নমুদ্রিত অতিরিক্ত অংশটুকু পাওয়া যায়—

পাছে কোথাও হারিয়ে সে যায় দৃষ্টি দেয় বা কেহ
সর্বদা সন্দেহ।

একদিন কোন্ ছেলে ওকে মেরেছিল ঢেলা,
সেদিন থেকে কারো সঙ্গে পায় না করতে খেলা।
আনন্দ নেই, উৎসাহ নেই, শখ মেটে না কিছু—
ফেরে কেবল বুড়োর পিছু পিছু।
উড়ন গেল, নাচন গেল, সাহস না রয় বাকি।
স্নেহের খাঁচার পাখি।
সবাই বলে, ভাগ্যি ভালো, জমছে টাকা দানের—
হায়, ছেলেটির অভাব কেবল দুর্লভ এই প্রাণের।

'কাশী' কবিতার ১৫-১৬শ ছত্রের পূর্বপাঠ পাণ্ডুলিপি হইতে উদ্ধৃত হইল—

হাসছ শুনে, কী জানি বা সত্যি পিঠেই হবে,
কিন্তু মুখে দাও যদি তো কাঁঠাল-বিচিই কবে।

'বালক' কবিতাটি 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে প্রথম সংস্করণ (১৩৪৭) হইতেই পুনর্মুদ্রিত আছে। ইহার ১৩শ ছত্রে 'কঙ্কালী চাটুজ্জে' স্থলে পাণ্ডুলিপিতে তথা ছেলেবেলা গ্রন্থে পূর্বপাঠ পাওয়া যায় 'কিশোরী চাটুজ্জে'।

এই প্রসঙ্গে 'যোগীন্দা' কবিতার আরম্ভাংশের পাণ্ডুলিপিতে-প্রাপ্ত পূর্বপাঠ উল্লেখযোগ্য—

যোগেন্দ্র হালদার
দেশে দেশে ঘুরে ঘুরে কাল কেটেছে তার।
ইত্যাদি।

'রিক্ত' কবিতাটির সংক্ষিপ্ত প্রথম পাঠ পাণ্ডুলিপিতে এরূপ পাওয়া যায়—

মরুর মতো ডাঙা,
চোখ-ভোলানো রঙের নেশা-ভাঙা।
শস্যনিঃস্ব মাঠে
মধ্যদিনের বিজন লীলা রুদ্ররসের নাটে।
রুক্ষ হাওয়ায় ধরার বুকে সূক্ষ্ম কাঁপন কাঁপে,
শুকনো পাতা ঘুর খাচ্ছে কিসের অভিশাপে।
মনে হচ্ছে, ধরাতলের এই মহাশূন্যতায়
আকাশ যেন কান পেতে রয় আপনি আপন কথায়।
তারি সঙ্গে মিশ খেয়ে যায় আমার চেয়ে থাকা
ব্যাপ্ত করে পাণ্ডুবরন ফাঁকা।

কোথাও কোনো শব্দ যে নাই, তারি শব্দ বাজে
বক্ষোগুহার মাঝে।
আকাশ যাহার একলা অতিথ শুষ্ক বালুর স্তূপে
স্তব্ধ থাকি সেই ধরণীর বৈরাগিনীর রূপে।

আলমোড়া
১০।৬।৩৭

তপতী

'তপতী' ১৩৩৬ সালের ভাদ্র মাসে প্রথম গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। নাটকটির রচনা-পরিচয় 'ভূমিকা'তে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বিশদভাবে লিখিয়াছেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, 'রাজা ও রানী' রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে, উক্ত নাটকের গ্রন্থপরিচয় অংশ এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

'পথে ও পথের প্রান্তে' গ্রন্থের ৩৯-সংখ্যক পত্রে তপতী নাটকটি সদ্য রচিত হইবার সংবাদ আছে। পত্রটির প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত হইল—

পুত্রসন্তান লাভ হলে সে সংবাদ খুব উৎসাহ করে প্রচার করা হয়। গতকল্য আমার লেখনী একটি সর্বাঙ্গসুন্দর নাটককে জন্ম দিয়েছে— দশমাস তার গর্ভবাস হয় নি— বোধ করি দিন-দশেকের বেশি সময় নেয় নি। 'সর্বাঙ্গসুন্দর' বিশেষণটা পড়ে হয়তো তোমার ওষ্ঠাধর হাস্যকুটিল হয়ে উঠবে। ওর মধ্যে একটুখানি সাইকলজির খেলা আছে। বাক্যটা যখন মনের মধ্যে রচিত হয়েছিল তখন কথাটা ছিল 'সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ' কিন্তু যখন লেখা হল তখন দেখি, কথাটা বদলে গেছে। কেটে সংশোধন করা অসম্ভব ছিল না কিন্তু ভেবে দেখলুম, যেটাকে সত্য বলে বিশ্বাস করি সেইটেই লেখা হয়ে গেছে। বিনয়টাকে তখনই সদ্‌গুণ বলতে রাজি আছি যখন সেটা অসত্য নয়।··· নিজের লেখা খারাপ লাগতে যার বাধে না, এবং সেটাকে অকুণ্ঠিত ভাষায় স্বীকার করতে যার বেদনা নেই, নিজের লেখার প্রশংসা করা তার পক্ষে অহংকার নয়। অতএব খুব জোরের সঙ্গেই বলব, নাটকটা সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে।··· যাক গে। বিষয়টা ছিল, আমার নতুন নাটক রচনা। রাজা ও রানীর রূপান্তরীকরণ। সেই নাম রইল; সেই রূপ রইল না। বিশ্বভারতীর কর্মসচিবকে খাজনা দিতে হবে না। যদি সাবেক নামটার জন্যে ভাড়ার দাবি করেন সেটাকে বদলাতে কতক্ষণ। 'সুমিত্রা' নামই

ঠিক করেছি।[১] প্রশান্ত[২] মাঝে মাঝে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, যেন আমি নেড়াছন্দে ব্ল্যাঙ্কভার্সে নাটক লিখি। আমি স্পষ্টই দেখলুম, গদ্যে তার চেয়ে ঢের বেশি জোর পাওয়া যায়। পদ্য জিনিসটা সমুদ্রের মতো, তার যা বৈচিত্র্য তা প্রধানত তরঙ্গের; কিন্তু, গদ্যটা স্থলদৃশ্য, তাতে নানা মেজাজের রূপ আনা যায়— অরণ্য, পাহাড়, মরুভূমি, সমতল, অসমতল, প্রান্তর, কান্তার ইত্যাদি ইত্যাদি।··· ২৩ শ্রাবণ ১৩৩৬

১৩৩৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে "দ্বিতীয় সংস্করণে 'তপতী' কিছু পরিবর্তিত আকারে প্রকাশিত" হয়। রচনাবলী সংস্করণে সেই পরিবর্তিত শেষ পাঠ মুদ্রিত হইল।

ভূমিকায় নাটকটি অভিনয়ের চেষ্টার যে উল্লেখ আছে সে অভিনয় কবির জোড়াসাঁকো বাড়িতে ১৯৩৬ সালে হইয়াছিল। বিক্রমের ভূমিকা রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন।

গল্পগুচ্ছ

গল্পগুচ্ছের যে সাতটি গল্প রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত হইল সেগুলি ১৩০৫ সালে ভারতীতে প্রথম প্রকাশিত হয়; এই বৎসর রবীন্দ্রনাথ ভারতীর সম্পাদক ছিলেন। নিম্নে প্রকাশকাল দেওয়া হইল—

দুরাশা	বৈশাখ	১৩০৫
পুত্রযজ্ঞ	জ্যৈষ্ঠ	১৩০৫
ডিটেক্‌টিভ	আষাঢ়	১৩০৫
অধ্যাপক	ভাদ্র	১৩০৫
রাজটিকা	আশ্বিন	১৩০৫
মণিহারা	অগ্রহায়ণ	১৩০৫
দৃষ্টিদান	পৌষ	১৩০৫

'পুত্রযজ্ঞ' গল্পটির লেখকের নাম ভারতীর সূচীপত্রে 'শ্রীসমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর' মুদ্রিত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে শ্রীপুলিনবিহারী সেনকে লিখিত শ্রীসমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রের নিম্নমুদ্রিত অংশটুকু প্রণিধানযোগ্য—

'পুত্রযজ্ঞ' গল্পটি রবীন্দ্রনাথের লিখিত, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। আমি কেবলমাত্র উহার আখ্যান বস্তুটি আমার কাঁচা ভাষায় লিখিয়া 'খামখেয়ালি' সভায়

১ রবীন্দ্রসদনে-রক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপিতেও নাটকটির নাম 'সুমিত্রা' রহিয়াছে।

২ শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ।

পাঠের জন্য তাঁহাকে দেখাইয়াছিলাম, তিনি উহা দেখিয়া তাহার আমূল সংশোধন করিয়া ও নিজের অতুলনীয় ভাষায় লিখিয়া সেই সভায় আমার লিখিত বলিয়া পাঠ করেন ; বোধ হয় সেই কারণে গল্পটি আমার লিখিত বলিয়া সেই সময় উক্ত মুদ্রণপ্রমাদ ঘটিয়াছিল। যাহা হউক, পরে পুনর্মুদ্রণের সময় গল্পগুচ্ছে সে ভ্রম সংশোধিত হইয়াছে শুনিয়া আশ্বস্ত ও সুখী হইলাম। ২১ ফাল্গুন ১৩৫১

রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় প্রকাশিত বিশ্বভারতীসংস্করণ (১৯২৬) গল্পগুচ্ছে 'পুত্রযজ্ঞ' গল্পটি প্রথম রবীন্দ্রগ্রন্থভুক্ত করা হয়। বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত অন্য ছয়টি গল্প মজুমদার এজেন্সি হইতে প্রকাশিত (১৯০১) গল্পগুচ্ছের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রথম গ্রন্থাকারে বাহির হয়।

'দুরাশা' ও 'মণিহারা' গল্পের রচনাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশ প্রণিধানযোগ্য—

কেশরলালের গল্পটা পেয়েছি মগজ থেকে। চতুর্মুখের মগজ আছে কিনা জানি নে। কিন্তু, তিনি কিছু-না থেকে কিছুকে যেভাবে গড়ে তোলেন এও তাই। অনেককাল পূর্বে একবার যখন দার্জিলিঙ গিয়েছিলুম, সেখানে ছিলেন কুচবিহারের মহারানী[৩]। তিনি আমাকে গল্প বলতে কেবলই জেদ করতেন। তাঁর সঙ্গে দার্জিলিঙের রাস্তায় বেড়াতে মুখে মুখে এই গল্পটা বলেছিলুম। মাস্টারমশায় গল্পের ভুতুড়ে ভূমিকা-অংশটা এবং মণিহারা গল্পটিও এমনি করে তাঁরই তাগিদে মুখে মুখে রচিত।

—পত্রধারা। প্রবাসী। শ্রাবণ ১৩৩৯, পৃ. ৪৫১

ছন্দ

ছন্দ ১৩৪৩ সালের আষাঢ় মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

রচনাবলী সংস্করণে প্রবন্ধগুলি সাময়িকপত্রে প্রকাশের কালানুক্রমে মুদ্রিত হইয়াছে। নিম্নমুদ্রিত সূচীক্রমে প্রবন্ধগুলি সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল—

ছন্দের অর্থ : 'ছন্দ', সবুজ পত্র, চৈত্র ১৩২৪

ছন্দের হসন্ত হলন্ত :

১. 'বাংলা ছন্দ', বিচিত্রা, পৌষ ১৩৩৮

২. 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত', পরিচয়, মাঘ ১৩৩৮

৩ সুনীতি দেবী।

ছন্দের মাত্রা :

১. 'নবছন্দ' (শেষার্ধ), পরিচয়, কার্তিক ১৩৩৯

২. 'ছন্দের মাত্রা', উদয়ন, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১

বাংলা ছন্দের প্রকৃতি[৪] : 'ছন্দ', উদয়ন, বৈশাখ ১৩৪১

গদ্য ছন্দ[৪] : 'ছন্দ', বঙ্গশ্রী, বৈশাখ ১৩৪১

১৩২৪ সালের ভাদ্র মাসে সবুজপত্রে প্রকাশিত 'সংগীতের মুক্তি' প্রবন্ধটির সম্পূর্ণ পাঠ প্রথম সংস্করণে মূল গ্রন্থের অন্তর্গত ছিল। প্রবন্ধটির প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে নিম্নরূপ মুখবন্ধ করা হইয়াছিল, "মুখ্যত এই লেখাটি সংগীতসম্বন্ধীয়। তালের আলোচনা কালে আপনা থেকে এর শেষ দিকে ছন্দের কথা এসে পড়েছে। সেই কারণেই একে 'ছন্দ' গ্রন্থে গ্রহণ করা গেল।"

বর্তমান সংস্করণে প্রবন্ধটির উক্ত শেষাংশটুকু, 'সংগীত ও ছন্দ' নামে পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল। সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি রচনাবলীর পরবর্তী কোনো-এক খণ্ডে প্রকাশিত হইবে।

পরিশিষ্ট

প্রথমসংস্করণ ছন্দ গ্রন্থে জে. ডি. এণ্ডার্সনকে লিখিত একখানি পত্র ও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত তিনখানি পত্র, মোট চারখানি পত্রের প্রাসঙ্গিক অংশ, এবং 'পদ্যছন্দ' ও 'গদ্যছন্দ' সম্বন্ধে আলোচনা-সংবলিত একটি 'মোটকথা' পরিশিষ্ট অংশে মুদ্রিত হয়। ১৩৪৩ সালে বা তাহার পূর্বে লিখিত এবং প্রথমসংস্করণ ছন্দ গ্রন্থে অসংকলিত রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ছন্দবিষয়ক রচনা একত্র মুদ্রিত করিয়া বর্তমান সংস্করণে উক্ত পরিশিষ্ট অংশটিকে পূর্ণতর আকার দেওয়া হইল। বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন সম্প্রতি ছন্দ গ্রন্থের যে পূর্ণাঙ্গ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রস্তুত করিয়াছেন রচনাবলী-সংস্করণে উক্ত গ্রন্থ হইতে প্রচুর সাহায্য পাওয়া গিয়াছে।

আলোচ্য অংশে সংকলিত প্রবন্ধ কয়টির প্রকাশসূচী নিম্নে প্রদত্ত হইল। বোধসৌকর্যার্থে কয়েক ক্ষেত্রে প্রবন্ধের নূতন নামকরণ প্রয়োজন হইয়াছে।

বাংলাভাষার স্বাভাবিক ছন্দ : 'সংক্ষিপ্ত সমালোচনা : সিন্ধু-দূত', ভারতী, শ্রাবণ ১২৯০

বাংলা শব্দ ও ছন্দ : 'সংক্ষিপ্ত সমালোচনা', সাধনা, শ্রাবণ ১২৯৯

৪ প্রবন্ধ দুইটি ১৩৪০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত হয়।

সংগীত ও ছন্দ[৫] : 'সংগীতের মুক্তি', সবুজ পত্র, ভাদ্র ১৩২৪

সংস্কৃত-বাংলা ও প্রাকৃত-বাংলার ছন্দ : 'ছন্দবিতর্ক', পরিচয়, শ্রাবণ ১৩৩৯

ছন্দে হসন্ত : 'নবছন্দ' (প্রথমার্ধ), পরিচয়, কার্তিক ১৩৩৯

'ছন্দে হসন্ত' প্রবন্ধাংশটির আরম্ভের দুইটিমাত্র অনুচ্ছেদ প্রথম সংস্করণে 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত ১' প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। রচনাবলী-সংস্করণে উক্ত আলোচনার পূর্ণতর পাঠ পরিশিষ্টে স্বতন্ত্র আকারে মুদ্রিত হইল।

'চিঠিপত্র' অংশে মুদ্রিত কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা অধ্যাপক জে. ডি. এণ্ডার্সন মহাশয়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের অধুনাদুষ্প্রাপ্য পত্র দুইটি ১৩২১ সালের সবুজ পত্রের জ্যৈষ্ঠ ও শ্রাবণ সংখ্যা হইতে মূলপাঠ-অনুযায়ী সংকলিত হইয়াছে। চিঠি দুইখানি পত্রিকায় 'বাংলা ছন্দ' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের এই পত্র ভারতী পত্রিকায় প্রকাশের প্রস্তাবে এণ্ডার্সন সাহেব কেম্‌ব্রিজ হইতে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া যে চিঠি লেখেন তাহা প্রণিধানযোগ্য—

It would be a thousand pities if the charming and most interesting letter which our Kavivar has been so good as to address to me were not published. Will you kindly present my respects to Mr. Tagore's distinguished sister[৬] and assure her that, so far as I am concerned, the letter is very much at her disposal. I wonder if you would be so kind as to send me the copy of the *Bharati* in which it appears?

The letter seems to me to be a marvel of poetic wit and wisdom, the metaphorical illustrations being especially delightful and illuminating. I have only read it through, and have not had time to think out the various problems it discusses. But it has been a sheer delight to read matter so suggestive and original. The critical work of poets in England (Dryden was a remarkable exception) is often not so interesting as their verses. But Mr. Tagore's letter is as full of matter for thought as one of Victor Hugo's prefaces, and I am not a little proud that he should have addressed his remarks to a [n] old গুরুমহাশয় like me.

এণ্ডার্সনকে লিখিত দ্বিতীয় পত্রটির শেষাংশের দু-একটি উদাহরণের সমালোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে যে পত্র লেখেন তাহা মূল পত্রের পরিপূরক রূপে মুদ্রিত হইল—

সত্যেন্দ্র, তুমি যদি 'কই' শব্দের শেষ 'ই'টির মাত্রা বাজেয়াপ্ত করতে চাও তবে

৫ সবুজ পত্রে প্রকাশিত সাধুভাষায় লিখিত পাঠ সংকলিত হইয়াছে।

৬ স্বর্ণকুমারী দেবী।

অন্যায় হবে না? আমার দৃষ্টান্তে দৈবক্রমে 'কই' কথাটা পদের শেষে পড়ে গেছে। তাই ফাঁক পেয়ে সেই ফাঁকির উপর দিয়ে মাত্রাটা চালিয়েছ কিন্তু যদি "কই শয্যা, কই বস্ত্র" হত তা হলে কী রকম করে এমন অবৈধাচরণ করতে পারতে? বস্তুত ইকারের পরে ফাঁক্ নেই— ক-এর অ-টাকে দীর্ঘ করে ই-এর হ্রস্বতা পূরণ করা হয়। সে তো সকল হসন্ত বর্ণের সম্বন্ধেই খাটে— "কোথা জল, কোথা স্থল"— এখানে মাত্রার ওজন যদি দেখ তবে দেখবে 'জ' যত বড়ো 'ল্' তত বড়ো নয়— সেইজন্যে জ-টাকে দেড় মাত্রা করতে হয়েছে। তোমার বিধি অনুসারে 'জল্'-কে এক মাত্রা করে ফাঁকের উপরে আর-এক মাত্রা ফেলতে হয়। কিন্তু সেটা সাধু ছন্দের নিয়মবিরুদ্ধ। "সেইত বহিছে বায়ু", এখানে তুমি 'সেই'-এর 'ই'-টিকে কি বিমাত্র বলে গণ্য করবে।

"When we two parted" কবিতাটির সম্বন্ধে অনেক দ্বিধা আমার মনে উদয় হয়েছিল কিন্তু শেষকালে অন্য কোনো দৃষ্টান্ত মনে না পড়াতে ওটাকে ত্যাগ করি নি— আমার অভিপ্রায় এই ছিল, যদি কেবলমাত্র প্রথম লাইনটা পড়া যায় তা হলে সম-অসম মাত্রার ছন্দের লয়টা ইংরেজের কানে পরিচিত হতে পারে— মনে কর যদি এমন হত—

When we two parted
Silence and tears

তা হলে তো ছন্দভঙ্গ হত না— এমন অবস্থায় 'In' টাকে ফাল্‌তো বলে ধরবার অধিকার আছে। বস্তুত ছন্দের মধ্যে ফাল্‌তো অংশের লক্ষণই এই যে, সেটাকে বাদ দিলে মূল ছন্দের তাল কাটে না— ও জিনিসটা ফাঁকের মধ্যে ঢুকে পড়ে, আসলে ওর স্থান নেই। তথাপি আমার প্রবন্ধটার মধ্যে একটু বদল করে দেওয়া গেল— কিন্তু আমার বোধ হয় যে সেটা অনাবশ্যক।

অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত তৃতীয় ও পঞ্চম পত্রদ্বয় 'কাব্যে গদ্যরীতি' নামে ১৩৫০ সালে 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে। চিঠিপত্র-অংশের পূর্ণতাসাধনের উদ্দেশ্যে পত্র দুইটি পরিশিষ্টে সংকলিত হইল।

'মোটকথা'র 'পদ্যছন্দ' অংশটি বস্তুত ১৩৪০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত ও ১৩৪১ বৈশাখের 'উদয়ন' মাসিকপত্রে 'ছন্দ' নামে প্রকাশিত প্রবন্ধের একাংশ। উক্ত প্রবন্ধটির এতদতিরিক্ত প্রধান অংশ 'বাংলা-ছন্দের প্রকৃতি' নামে মূলগ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে।

'মোটকথা'র 'গদ্যছন্দ' অংশটি কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে ১৯৩৫ সালের ২২ মে তারিখে পত্রাকারে লিখিত হইয়াছিল।

ভাষা ও সাহিত্য -বিষয়ক নানা রচনায় রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গত ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। সেই-সব রচনার অধিকাংশই ইতিপূর্বে রচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। 'সাহিত্যের পথে' (১৩৪৩), 'বাংলাভাষা পরিচয়' (ইং ১৯৩৮) ও 'সাহিত্যের স্বরূপ' (১৩৫০) গ্রন্থ তিনখানি ও রবীন্দ্র-রচনাবলীর পরবর্তী বিভিন্ন খণ্ডে যথাক্রমে সংকলিত হইতেছে। ছন্দ প্রসঙ্গে 'মানসী', 'পুনশ্চ' ও 'ছড়ার ছবি'র ভূমিকা তিনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মানসীর প্রথম সংস্করণের ভূমিকা রচনাবলীর সপ্তম খণ্ডে 'কথা ও কাহিনী'র গ্রন্থপরিচয়ে মুদ্রিত হইয়াছে। 'পুনশ্চ'র ভূমিকা ষোড়শ খণ্ডে এবং 'ছড়ার ছবি'র ভূমিকা বর্তমান খণ্ডে যথাস্থানে মুদ্রিত আছে।

বর্ণানুক্রমিক সূচী

অচলবুড়ি, মুখখানি তার হাসির রসে ভরা	...	৮৮
অচলা বুড়ি	...	৮৮
অজয় নদী	...	১০৮
অধ্যাপক	...	২১৮
অন্ধকারের সিন্ধুতীরে একলাটি ওই মেয়ে	...	১১১
অল্পেতে খুশি হবে দামোদর শেঠ কি	...	৯
আইডিয়াল নিয়ে থাকে, নাহি চড়ে হাঁড়ি	...	৬২ক
আকাশ	...	১০৫
আকাশপ্রদীপ	...	১১১
আতার বিচি	...	৯৬
আতার বিচি নিজে পুঁতে পাব তাহার ফল	...	৯৬
আদর ক'রে মেয়ের নাম	...	২৮
আধখানা বেল খেয়ে কানু বলে	...	৪৩
আধবুড়ো ওই মানুষটি মোর নয় চেনা	...	১০১
আধা রাতে গলা ছেড়ে মেতেছিনু কাব্যে	...	২৩
আপিস থেকে ঘরে এসে	...	৩২
আমার নৌকো বাঁধা ছিল পদ্মানদীর পারে	...	৮৪
আমার পাচকবর গদাধর মিশ্র	...	৩৪
আয়না দেখেই চমকে বলে	...	৩১
আলোক-চোরা লুকিয়ে এল ওই	...	১৫০
ইটের গাদার নীচে ফট্‌কের ঘড়িটা	...	২৭
ইতিহাসবিশারদ গণেশ ধুরন্ধর	...	১৫
ইদিলপুরেতে বাস নরহরি শর্মা	...	১৭
ইয়ারিং ছিল তার দু কানেই	...	৪৪
ইস্কুল-এড়ানে সেই ছিল বরিষ্ঠ	...	৪২
উজ্জ্বলে ভয় তার	...	৩০
এই জগতের শক্ত মনিব সয় না একটু ত্রুটি	...	১০৬

এই শহরে এই তো প্রথম আসা … ১০৪
এককালে এই অজয় নদী ছিল যখন জেগে … ১০৮
একটা খোঁড়া ঘোড়ার 'পরে … ৩৮
একলা হোথায় বসে আছে … ৬৯
কন্‌কনে শীত তাই … ২৮
কনে দেখা হয়ে গেছে … ৬২
কনের পণের আশে … ৩১
কাঁচড়াপাড়াতে এক ছিল রাজপুত্তুর … ১০
কাঠের সিঙ্গি … ৬৭
কাঁধে মই, বলে কই ভুঁইচাঁপা গাছ … ৬২ক
কালুর খাবার শখ সব চেয়ে পিষ্টকে … ১৯
কাশী … ৭৭
কাশীর গল্প শুনেছিলুম যোগীনদাদার কাছে … ৭৯
কিশোরগাঁয়ের পুবের পাড়ায় বাড়ি … ৬৬
কুঁজো তিনকড়ি ঘোরে … ২৫
কেন মার' সিঁধকাটা ধূর্তে … ৪০
ক্ষান্তবুড়ির দিদিশাশুড়ির … ৯
খড়দয়ে যেতে যদি সোজা এস খুল্‌না … ৫১
খবর পেলেম কল্য … ২৯
খাটুলি … ৬৯
খুদিরাম ক'সে টান দিল থেলো হুঁকোতে … ৫৩
খুব তার বোলচাল, সাজ ফিটফাট … ৬২ক
খেলা … ১০৬
খ্যাতি আছে সুন্দরী বলে তার … ২৪
গণিতে রেলেটিভিটি প্রমাণের ভাবনায় … ৪৮
গদ্যছন্দ … ৩৬২
গন্ধুরাজার পাতে … ৩৩
গয়লা ছিল শিউনন্দন, বিখ্যাত তার নাম … ৯০
গাড়িতে মদের পিপে ছিল তেরো-চোদ্দো … ৬০
গিন্নির কানে শোনা ঘটে অতি সহজেই … ৫৭

গুপ্তিপাড়ায় জন্ম তাহার ... ২৩
গৌরবর্ণ নধর দেহ, নাম শ্রীযুক্ত রাখাল ... ৯৭
ঘরের খেয়া ... ৭১
ঘাসি কামারের বাড়ি সাঁড়া ... ২১
ঘাসে আছে ভিটামিন ... ১৭
ঘোষালের বক্তৃতা করা কর্তব্যই ... ২৫
চড়িভাতি ... ৭৮
চিঠিপত্র ... ৩৯৪
চিন্তাহরণ দালালের বাড়ি গিয়ে ... ৪৫
ছন্দে হসন্ত ... ৩৯১
ছন্দের অর্থ ... ২৯৫
ছন্দের মাত্রা ... ৩৩৩
ছন্দের হসন্ত হলন্ত ... ৩১৩
ছবি আঁকার মানুষ ওগো পথিক চিরকেলে ... ১০৭
ছবি-আঁকিয়ে ... ১০৭
ছোটো কাঠের সিঙ্গি আমার ছিল ছেলেবেলায় ... ৬৭
জন্মকালেই ওর লিখে দিল কুষ্ঠি ... ৫৪
জমল সতেরো টাকা ... ৪১
জর্মন প্রোফেসার ... ৬১
জলযাত্রা ... ৬৩
জাগো জাগো আলসশয়নবিলগ্ন ... ১৭৬
জাগো হে রুদ্র জাগো ... ১৫১
জান তুমি, রাত্তিরে ... ৪৯
জামাই মহিম এল, সাথে এল কিনি ... ২১
জিরাফের বাবা বলে ... ৪৬
ঝড় ... ৬৮
ঝিনেদার জানদার ছেলেটার জন্তে ... ৫২
টাকা সিকি আধুলিতে ... ৫৪
টেরিটি বাজারে তার সন্ধান পেনু ... ১৫
ট্রাম্-কন্ডাক্টার, হুইসেলে ফুঁক দিয়ে ... ৫৯

ডাকাতের সাড়া পেয়ে	...	৪৭
ডিটেক্‌টিভ	...	২০৯
ডুগডুগিটা বাজিয়ে দিয়ে	...	৭
তম্বুরা কাঁধে নিয়ে শর্মা বাগেশ্বর	...	৪৮
তালগাছ	...	১০০
তোমার আসন শূন্য আজি	...	১৬৭
তোল্‌পাড়িয়ে উঠল পাড়া	...	৬০
থাকে সে কাহালগাঁয়	...	৩৯
দাড়ীশ্বরকে মানত ক'রে	...	১১
দাঁয়েদের গিন্নিটি	...	৪৩
দিন চলে না যে, নিলেমে চড়েছে খাট-টিপাই	...	৪৯
দিনের পরে দিন-যে গেল আঁধার ঘরে	...	১৬৫,
দু-কানে ফুটিয়ে দিয়ে কাঁকড়ার দাড়া	...	১৩
দুরাশা	...	১৯১
দৃষ্টিদান	...	২৬৫
দেখ্‌ রে চেয়ে নামল বুঝি ঝড়	...	৬৮
দেশান্তরী	...	৮৬
দোতলায় ধুপ্‌ধাপ্‌	...	৬১
ধীরু কহে শূন্যেতে মজো রে	...	৫৯, ৪৩৫
ননীলাল বাবু যাবে লঙ্কা	...	৩৮
নামজাদা দানুবাবু রীতিমত খর্‌চে	...	৩৩
নাম তার চিনুলাল হরিরাম মোতিভয়	...	৫৫
নাম তার ডাক্তার ময়জন	...	২৪
নাম তার ভেলুরাম ধুনিচাঁদ শিরখ	...	২৭
নাম তার সন্তোষ	...	১৯
নিজের হাতে উপার্জনে	...	২৮
নিদ্রা-ব্যাপার কেন হবেই অবাধ্য	...	৪৯
নিধু বলে আড়চোখে 'কুছ নেই পরোয়া'	...	১২
নিষ্কাম পরহিতে কে ইহারে সামলায়	...	২০
নীলুবাবু বলে, শোনো নেয়ামৎ দর্জি	...	৫১

নৌকো বেঁধে কোথায় গেল	...	৬৩
পণ্ডিত কুমিরকে ডেকে বলে, নক্র	...	৫০
পদ্মায়	...	৮৪
পাখিওয়ালা বলে, 'এটা কালো-রঙ চন্দনা'	...	১৩
পাঁচদিন ভাত নেই, দুধ একরত্তি	...	৫৭
পাঠশালে হাই তোলে মতিলাল নন্দী	...	১০
পাড়াতে এসেছে এক নাড়ীটেপা ডাক্তার	...	৪৪
পাতালে বলিরাজার যত বলীরামরা	...	৬২
পাথরপিণ্ড	...	৯৯
পাবনায় বাড়ি হবে, গাড়ি গাড়ি ইঁট কিনি	...	৫৭
পিছু-ডাকা	...	১০৯
পিস্নি	...	৬৬
পুত্রযজ্ঞ	...	২০৪
পেঁচোটাকে মাসি তার যত দেয় আস্কারা	...	৪০
পেন্‌সিল টেনেছিনু হপ্তায় সাতদিন	...	৬২
প্রবাসে	...	৮২
প্রলয়-নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে	...	১৫৭
প্রাইমারি ইস্কুলে প্রায়-মারা পণ্ডিত	...	৫৩
প্রাণ-ধারণের বোঝাখানা বাঁধা পিঠের 'পরে	...	৮৬
ফল ধরেছে বটের ডালে ডালে	...	৭৮
বইছে নদী বালির মধ্যে, শূন্য বিজন মাঠ	...	১০৩
বউ নিয়ে লেগে গেল বকাবকি	...	১৭
বকুলগন্ধে বন্যা এল দখিন হাওয়ার স্রোতে	...	১৫৫
বটে আমি উদ্ধত	...	৩৯
বয়স তখন ছিল কাঁচা; হালকা দেহখানা	...	৮৫
বর এসেছে বীরের ছাঁদে	...	২০
বরের বাপের বাড়ি যেতেছে বৈবাহিক	...	৩১
বলিয়াছিনু মামারে	...	৬২
বশীরহাটেতে বাড়ি	...	৫৫
বহু কোটি যুগ পরে সহসা বাণীর বরে	..	৩৪

বাংলা ছন্দের প্রকৃতি ... ৩৫১
বাংলাদেশের মানুষ হয়ে ... ৪৭
বাংলাভাষার স্বাভাবিক ছন্দ ... ৩৭৯
বাংলা শব্দ ও ছন্দ ... ৩৮১
বাদশার ফরমাসে সন্দেশ বানাতে ... ৪৩৩
বাদশার মুখখানা গুরুতর গম্ভীর ... ৩২
বালক ... ৮৫
বালিশ নেই, সে ঘুমোতে যায় ... ৫৭
বাসাবাড়ি ... ১০৪
বিড়ালে মাছেতে হল সখ্য ... ৫১, ৪৩৪
বিদেশমুখো মন যে আমার কোন্ বাউলের চেলা ৮২
বুধু ... ৭৬
বেড়ার মধ্যে একটি আমের গাছে ... ১০০
বেণীর মোটরখানা চালায় মুখুর্জে ... ২৪
বেদনায় সারা মন করতেছে টন্‌টন্ ... ৪২
বেলা আটটার কমে ... ৫৪
ব্রিজটার প্ল্যান দিল বড়ো এন্‌জিনিয়ার ... ৩৭
ভজহরি ... ৬৪
ভয় নেই, আমি আজ রান্নাটা দেখছি ... ১৮
ভস্ম-অপমানশয্যা ছাড়ো, পুষ্পধনু . ১২০
ভূত হয়ে দেখা দিল বড়ো কোলাব্যাঙ ... ৪০
ভোতনমোহন স্বপ্ন দেখেন ... ৫৯
ভোলানাথ লিখেছিল তিন-চারে নব্বই ... ৬৮
ভ্রমণী ... ১১০
মণিহারা ... ২৪৯
মন উড়ু উড়ু, চোখ ঢুলুঢুলু ... ১৮
মন যে বলে, চিনি চিনি ... ১৩৭
মরুর মতো ডাঙা ... ৪৩৬
মহারাজা ভয়ে থাকে পুলিসের থানাতে ... ৪৬
মহারাজা লুকিয়েছে পুলিসের থানাতে ... ৪৩৩

মাকাল	...	৯৭
মাঝে মাঝে বিধাতার ঘটে একি ভুল	...	৬২
মাটির ছেলে হয়ে জন্ম, শহর নিল মোরে	...	১১০
মাঠের শেষে গ্রাম	...	৭৬
মাধো	...	৯৪
মানিক কহিল, পিঠ পেতে দিই দাঁড়াও	...	৫৮
মাস্টার বলে, তুমি দেবে ম্যাট্রিক	...	৬০
মুচকে হাসে অতুল খুড়ো	...	১৬
মুরগি পাখির 'পরে অন্তরে টান তার	...	২৫
মেছুয়াবাজার থেকে পালোয়ান চারজন	...	১৪
মোটকথা	...	৪২৬
যখন জলের কল হয়েছিল পলতায়	...	৪৬
যখন দিনের শেষে	...	১০৯
যখনি যেমনি হোক জিতেনের মর্জি	...	২১
যদি দেখ খোলসটা খসিয়াছে বৃদ্ধের	...	৫
যে মাসেতে আপিসেতে	...	৪১
যোগীনদা	...	৭২
যোগীনদাদার জন্ম ছিল ডেরাস্মাইলখাঁয়ে	...	৭২
রসগোল্লার লোভে পাঁচকড়ি মিত্তির	...	১৩
রাজটিকা	...	২৩৭
রাজা বসেছেন ধ্যানে	...	১৯
রান্নার সব ঠিক	...	৩৫
রায়ঠাকুরানী অম্বিকা	...	৬১
রায়বাহাদুর কিষনলালের স্যাকরা জগন্নাথ	...	৯৪
রিক্ত	...	১০৩
লটারিতে পেল পীতু হাজার পঁচাত্তর	...	৪৫
শনির দশা	...	১০১
শিমুল রাঙা রঙে চোখেরে দিল ভ'রে	...	৬২ক
শিশুকালের থেকে	...	১০৫
'শুনব হাতির হাঁচি' এই ব'লে কেষ্টা	...	২২

শুভ্র নবশঙ্খ তব গগন ভরি বাজে	...	১৮৩
শ্বশুরবাড়ির গ্রাম	...	৫০
সন্ধেবেলায় বন্ধুঘরে জুটল চুপিচুপি	...	২৬
সন্ধ্যা হয়ে আসে	...	৭১
সভাতলে ভুঁয়ে কাৎ হয়ে শুয়ে	...	২৬
'সময় চলেই যায়' নিত্য এ নালিশে	...	২৯
সর্দিকে সোজাসুজি	...	৩৫
সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ	...	১১৯
সহজ কথায় লিখতে আমায় কহ যে	...	৩
সাগরতীরে পাথরপিণ্ড ঢুঁ মারতে চায় কাকে	...	৯৯
সুখিয়া	...	৯০
সংগীত ও ছন্দ	...	৩৮৩
সংস্কৃত-বাংলা ও প্রাকৃত-বাংলার ছন্দ	...	৩৮৮
স্ত্রীর বোন চায়ে তার	...	৩৭
স্বপ্ন হঠাৎ উঠল রাতে প্রাণ পেয়ে	...	৫৬
স্বপ্নে দেখি নৌকো আমার	...	১৬
হংকঙেতে সারা বছর আপিস করেন মামা	...	৬৪
হরপণ্ডিত বলে, ব্যঞ্জন সন্ধি এ	...	৫২
হাজারিবাগের ঝোপে হাজারটা হাই	...	৫৬
হাত দিয়ে পেতে হবে কী তাহে আনন্দ	...	৬১
হাতে কোনো কাজ নেই	...	১৪
হাস্যদমনকারী গুরু	...	৩৬

রবীন্দ্র রচনাবলী

দ্বাবিংশ খণ্ড

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

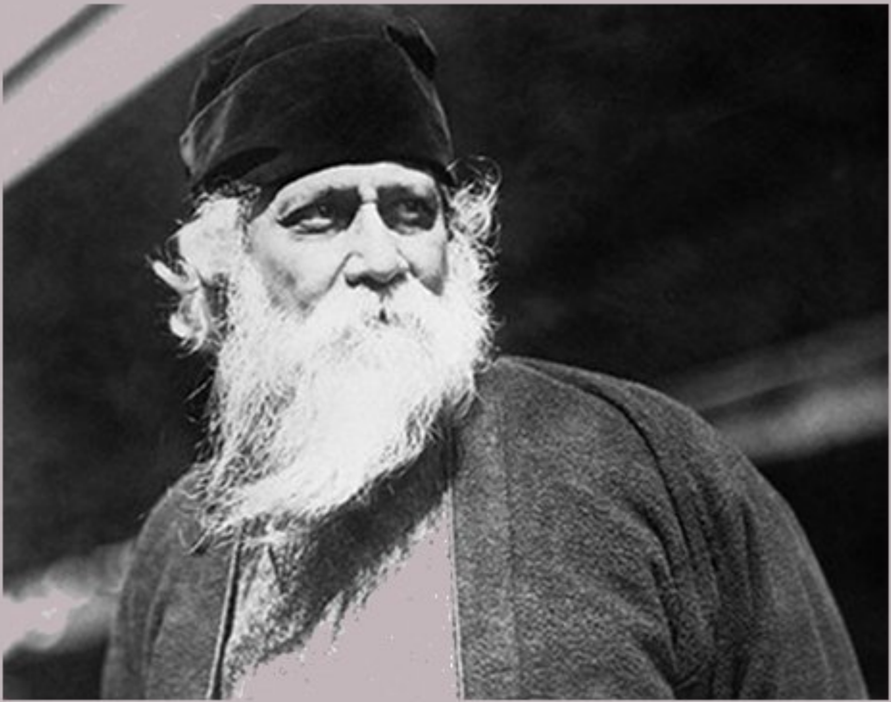

রবীন্দ্র-রচনাবলী

দ্বাবিংশ খণ্ড

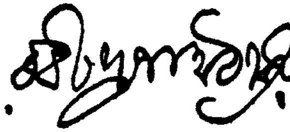

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা

প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৫৩
পুনর্মুদ্রণ : শ্রাবণ ১৩৬৪
কার্তিক ১৩৭৮ : ১৮৯৩ শক

মূল্য : কাগজের মলাট আঠারো টাকা
রেক্সিনে বাঁধাই বাইশ টাকা

© বিশ্বভারতী ১৯৭১

প্রকাশক রণজিৎ রায়
বিশ্বভারতী। ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

মুদ্রক শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস। ৩০ বিধান সরণী। কলিকাতা ৬

২'১

সূচী

চিত্রসূচী ।৶০

কবিতা ও গান

প্রান্তিক ৩
সেঁজুতি ২৩

নাটক ও প্রহসন

নবীন ৬৭
পরিশিষ্ট ৮১
শাপমোচন ৮৫
সংযোজন ১০৫
কালের যাত্রা ১১৭
পরিশিষ্ট ১৫৭

উপন্যাস ও গল্প

গল্পগুচ্ছ ১৭৫

প্রবন্ধ

পারস্যে ৪৩৩

গ্রন্থপরিচয় ৫০৩
বর্ণানুক্রমিক সূচী ৫৩১

চিত্রসূচী

রবীন্দ্রনাথ। রোগমুক্তির পর। ১৯৩৭ ৩

পাণ্ডুলিপি চিত্র। অস্তসিন্ধুকূলে এসে রবি ৩

পাণ্ডুলিপি-চিত্র। যাবার সময় হল বিহঙ্গের ১৬

সাদির সমাধি-উদ্যানে রবীন্দ্রনাথ। শিরাজ ৪৫৮

হাফেজের সমাধিপার্শ্বে রবীন্দ্রনাথ। শিরাজ ৪৫৮

ইরান-ইরাক-সীমান্তে ইরাক-সরকার কর্তৃক কবিসংবর্ধনা ৪৫৯

বেদুয়িনদের তাঁবুতে রবীন্দ্রনাথ ৪৫৯

কবিতা ও গান

প্রান্তিক

প্রান্তিক

১

বিশ্বের আলোকলুপ্ত তিমিরের অন্তরালে এল
মৃত্যুদূত চুপে চুপে ; জীবনের দিগন্ত-আকাশে
যত ছিল সূক্ষ্ম ধূলি স্তরে স্তরে, দিল ধৌত করি
ব্যথার দ্রাবক রসে, দারুণ স্বপ্নের তলে তলে
চলেছিল পলে পলে দৃঢ়হস্তে নিঃশব্দে মার্জনা।
কোন্ ক্ষণে নটলীলা-বিধাতার নবনাট্যভূমে
উঠে গেল যবনিকা। শূন্য হতে জ্যোতির তর্জনী
স্পর্শ দিল এক প্রান্তে স্তম্ভিত বিপুল অন্ধকারে,
আলোকের থরহর শিহরণ চমকি চমকি
ছুটিল বিদ্যুৎবেগে অসীম তন্দ্রার স্তূপে স্তূপে—
দীর্ণ দীর্ণ করি দিল তারে। গ্রীষ্মরিক্ত অবলুপ্ত
নদীপথে অকস্মাৎ প্লাবনের দুরন্ত ধারায়
বন্যার প্রথম নৃত্য শুষ্কতার বক্ষে বিসর্পিয়া
ধায় যথা শাখায় শাখায় সেইমত জাগরণ
শূন্য আঁধারের গূঢ় নাড়ীতে নাড়ীতে— অন্তঃশীলা
জ্যোতির্ধারা দিল প্রবাহিয়া। আলোকে আঁধারে মিলি
চিত্তাকাশে অর্ধস্ফুট অস্পষ্টের রচিল বিভ্রম।
অবশেষে দ্বন্দ্ব গেল ঘুচি। পুরাতন সম্মোহের
স্থূল কারাপ্রাচীরবেষ্টন, মুহূর্তেই মিলাইল
কুহেলিকা। নূতন প্রাণের সৃষ্টি হল অবারিত
স্বচ্ছ শুভ্র চৈতন্যের প্রথম প্রত্যূষ-অভ্যুদয়ে।
অতীতের সঞ্চয়পুঞ্জিত দেহখানা, ছিল যাহা
আসন্নের বক্ষ হতে ভবিষ্যের দিকে মাথা তুলি
বিন্ধ্যগিরিব্যবধানসম, আজ দেখিলাম

প্রভাতের অবসন্ন মেঘ তাহা, স্রস্ত হয়ে পড়ে
দিগন্তবিচ্যুত। বন্ধমুক্ত আপনারে লভিলাম
সুদূর অন্তরাকাশে, ছায়াপথ পার হয়ে গিয়ে
অলোক আলোকতীর্থে সূক্ষ্মতম বিলয়ের তটে

শান্তিনিকেতন
২৫।৯।৩৭

২

ওরে চিরভিক্ষু, তোর আজন্মকালের ভিক্ষাঝুলি
চরিতার্থ হোক আজি, মরণের প্রসাদবহ্নিতে
কামনার আবর্জনা যত, ক্ষুধিত অহমিকার
উঞ্ছবৃত্তি-সঞ্চিত জঞ্জালরাশি দগ্ধ হয়ে গিয়ে
ধন্য হোক আলোকের দানে, এ মর্তের প্রান্তপথ
দীপ্ত ক'রে দিক, অবশেষে নিঃশেষে মিলিয়া যাক
পূর্বসমুদ্রের পারে অপূর্ব উদয়াচলচূড়ে
অরুণকিরণতলে একদিন অমর্ত প্রভাতে।

শান্তিনিকেতন
২৯।৯।৩৭

৩

এ জন্মের সাথে লগ্ন স্বপ্নের জটিল সূত্র যবে
ছিঁড়িল অদৃশ্য ঘাতে, সে মুহূর্তে দেখিনু সম্মুখে
অজ্ঞাত সুদীর্ঘ পথ অতিদূর নিঃসঙ্গের দেশে
নিরাসক্ত নির্মমের পানে। অকস্মাৎ মহা-একা
ডাক দিল একাকীরে প্রলয়তোরণচূড়া হতে।
অসংখ্য অপরিচিত জ্যোতিষ্কের নিঃশব্দতামাঝে
মেলিনু নয়ন; জানিলাম একাকীর নাই ভয়,
ভয় জনতার মাঝে; একাকীর কোনো লজ্জা নাই,

লজ্জা শুধু যেথা-সেথা যার-তার চক্ষুর ইঙ্গিতে।
বিশ্বসৃষ্টিকর্তা একা, সৃষ্টিকাজে আমার আহ্বান
বিরাট নেপথ্যলোকে তাঁর আসনের ছায়াতলে।
পুরাতন আপনার ধ্বংসোন্মুখ মলিন জীর্ণতা
ফেলিয়া পশ্চাতে, রিক্তহস্তে মোরে বিরচিতে হবে
নূতন জীবনচ্ছবি শূন্য দিগন্তের ভূমিকায়।

শান্তিনিকেতন
২৯।৯।৩৭

৪

সত্য মোর অবলিপ্ত সংসারের বিচিত্র প্রলেপে,
বিবিধের বহু হস্তক্ষেপে, অযত্নে অনবধানে
হারালো প্রথম রূপ, দেবতার আপন স্বাক্ষর
লুপ্তপ্রায়— ক্ষয়ক্ষীণ জ্যোতির্ময় আদিমূল্য তার।
চতুষ্পথে দাঁড়াল সে ললাটে পণ্যের ছাপ নিয়ে
আপনারে বিকাইতে— অঙ্কিত হতেছে তার স্থান
পথে-চলা সহস্রের পরীক্ষাচিহ্নিত তালিকায়।
হেনকালে একদিন আলো-আঁধারের সন্ধিস্থলে
আরতিশঙ্খের ধ্বনি যে লগ্নে বাজিল সিন্ধুপারে,
মনে হল, মুহূর্তেই থেমে গেল সব বেচাকেনা,
শান্ত হল আশাপ্রত্যাশার কোলাহল। মনে হল,
পরের মুখের মূল্য হতে মুক্ত, সব চিহ্ন-মোছা
অসজ্জিত আদিকৌলীন্যের শান্ত পরিচয় বহি
যেতে হবে নীরবের ভাষাহীন সংগীতমন্দিরে
একাকীর একতারা হাতে। আদিমসৃষ্টির যুগে
প্রকাশের যে আনন্দ রূপ নিল আমার সত্তায়
আজ ধূলিময় তাহা, নিদ্রাহারা রুগ্‌ণ বুভুক্ষার
দীপধূমে কলঙ্কিত। তারে ফিরে নিয়ে চলিয়াছি
মৃত্যুস্নানতীর্থতটে সেই আদি নির্ঝরতলায়।

বুঝি এই যাত্রা মোর স্বপ্নের অরণ্যবীথিপারে
পূর্ব ইতিহাস-ধৌত অকলঙ্ক প্রথমের পানে—
যে প্রথম বারে বারে ফিরে আসে বিশ্বের সৃষ্টিতে
কখনো বা অগ্নিবর্ষী প্রচণ্ডের প্রলয়হুংকারে,
কখনো বা অকস্মাৎ স্বপ্নভাঙা পরম বিস্ময়ে
শুকতারানিমন্ত্রিত আলোকের উৎসবপ্রাঙ্গণে।

শান্তিনিকেতন
১।১০।৩৭

৫

পশ্চাতের নিত্যসহচর, অকৃতার্থ হে অতীত,
অতৃপ্ত তৃষ্ণার যত ছায়ামূর্তি প্রেতভূমি হতে
নিয়েছ আমার সঙ্গ, পিছু-ডাকা অক্লান্ত আগ্রহে
আবেশ-আবিল সুরে বাজাইছ অস্ফুট সেতার,
বাসাছাড়া মৌমাছির গুন গুন গুঞ্জরণ যেন
পুষ্পরিক্ত মৌনী বনে। পিছু হতে সম্মুখের পথে
দিতেছ বিস্তীর্ণ করি অস্তশিখরের দীর্ঘ ছায়া
নিরন্ত ধূসরপাণ্ডু বিদায়ের গোধূলি রচিয়া।
পশ্চাতের সহচর, ছিন্ন করো স্বপ্নের বন্ধন;
রেখেছ হরণ করি মরণের অধিকার হতে
বেদনার ধন যত, কামনার রঙিন ব্যর্থতা—
মৃত্যুরে ফিরায়ে দাও। আজি মেঘমুক্ত শরতের
দূরে-চাওয়া আকাশেতে ভারমুক্ত চিরপথিকের
বাঁশিতে বেজেছে ধ্বনি, আমি তারি হব অনুগামী।

শান্তিনিকেতন
৪।১০।৩৭

৬

মুক্তি এই— সহজে ফিরিয়া আসা সহজের মাঝে,
নহে কৃচ্ছ্রসাধনায় ক্লিষ্ট কৃশ বঞ্চিত প্রাণের
আত্ম-অস্বীকারে। রিক্ততায় নিঃস্বতায়, পূর্ণতার
প্রেতচ্ছবি ধ্যান করা অসম্মান জগংলক্ষ্মীর।
আজ আমি দেখিতেছি, সম্মুখে মুক্তির পূর্ণরূপ
ওই বনস্পতিমাঝে, উর্ধ্বে তুলি ব্যগ্র শাখা তার
শরৎপ্রভাতে আজি স্পর্শিছে সে মহা-অলক্ষ্যেরে
কম্পমান পল্লবে পল্লবে; লভিল মজ্জার মাঝে
সে মহা-আনন্দ যাহা পরিব্যাপ্ত লোকে লোকান্তরে,
বিচ্ছুরিত সমীরিত আকাশে আকাশে, স্ফুটোন্মুখ
পুষ্পে পুষ্পে, পাখিদের কণ্ঠে কণ্ঠে স্বত-উৎসারিত।
সন্ন্যাসীর গৈরিক বসন লুকায়েছে তৃণতলে
সর্ব-আবর্জনা-গ্রাসী বিরাট ধুলায়, জপমন্ত্র
মিলে গেছে পতঙ্গগুঞ্জনে। অনিঃশেষ যে তপস্যা
প্রাণরসে উচ্ছ্বসিত, সব দিতে সব নিতে
যে বাড়ালো কমণ্ডলু দ্যুলোকে ভূলোকে, তারি বর
পেয়েছি অন্তরে মোর, তাই সর্ব দেহ মন প্রাণ
সূক্ষ্ম হয়ে প্রসারিল আজি ওই নিঃশব্দ প্রান্তরে
ছায়ারৌদ্রে হেথাহোথা যেথায় রোমন্থরত ধেনু
আলস্যে শিথিল-অঙ্গ, তৃপ্তিরসসম্ভোগ তাদের
সঞ্চারিছে ধীরে মোর পুলকিত সত্তার গভীরে।
দলে দলে প্রজাপতি রৌদ্র হতে নিতেছে কাঁপায়ে
নীরব আকাশবাণী শেফালির কানে কানে বলা,
তাহারি বীজন আজি শিরায় শিরায় রক্তে মোর
মৃদু স্পর্শে শিহরিত তুলিছে হিল্লোল।

হে সংসার,

আমাকে বারেক ফিরে চাও; পশ্চিমে যাবার মুখে

বর্জন কোরো না মোরে উপেক্ষিত ভিক্ষুকের মতো।
জীবনের শেষপাত্র উচ্ছলিয়া দাও পূর্ণ করি,
দিনান্তের সর্বদানযজ্ঞে যথা মেঘের অঞ্জলি
পূর্ণ করি দেয় সন্ধ্যা, দান করি' চরম আলোর
অজস্র ঐশ্বর্যরাশি সমুজ্জ্বল সহস্ররশ্মির—
সর্বহর আঁধারের দস্যুবৃত্তি-ঘোষণার আগে।

শান্তিনিকেতন
৪।১০।৩৭

৭

এ কী অকৃতজ্ঞতার বৈরাগ্যপ্রলাপ ক্ষণে ক্ষণে,
বিকারের রোগীসম অকস্মাৎ ছুটে যেতে চাওয়া
আপনার আবেষ্টন হতে।

ধন্য এ জীবন মোর—
এই বাণী গাব আমি, প্রভাতে প্রথম-জাগা পাখি
যে সুরে ঘোষণা করে আপনাতে আনন্দ আপন।
দুঃখ দেখা দিয়েছিল, খেলায়েছি দুঃখনাগিনীরে
ব্যথার বাঁশির সুরে। নানা রন্ধ্রে প্রাণের ফোয়ারা
করিয়াছি উৎসারিত অন্তরের নানা বেদনায়।
এঁকেছি বুকের রক্তে মানসীর ছবি বারবার
ক্ষণিকের পটে, মুছে গেছে রাত্রির শিশিরজলে,
মুছে গেছে আপনার আগ্রহস্পর্শনে— তবু আজো
আছে তারা সূক্ষ্মরেখা স্বপনের চিত্রশালা জুড়ে,
আছে তারা অতীতের শুষ্কমাল্যগন্ধে বিজড়িত।
কালের অঞ্জলি হতে ভ্রষ্ট কত অব্যক্ত মাধুরী
রসে পূর্ণ করিয়াছে থরে থরে মনের বাতাস,
প্রভাত-আকাশ যথা চেনা-অচেনার বহু সুরে
কূজনে গুঞ্জনে ভরা। অনভিজ্ঞ নবকৈশোরের
কম্পমান হাত হতে স্খলিত প্রথম বরমালা
কণ্ঠে ওঠে নাই, তাই আজিও অক্লিষ্ট অম্লান

আছে তার অস্ফুট কলিকা। সমস্ত জীবন মোর
তাই দিয়ে পুষ্পমুকুটিত। পেয়েছি যা অযাচিত
প্রেমের অমৃতরস, পাই নি যা বহু সাধনায়—
তুই মিশেছিল মোর পীড়িত যৌবনে। কল্পনায়
বাস্তবে মিশ্রিত, সত্যে ছলনায়, জয়ে পরাজয়ে,
বিচিত্রিত নাট্যধারা বেয়ে, আলোকিত রঙ্গমঞ্চে
প্রচ্ছন্ন নেপথ্যভূমে, সুগভীর সৃষ্টিরহস্যের
যে প্রকাশ পর্বে পর্বে পর্যায়ে পর্যায়ে উদ্‌বারিত
আমার জীবনরচনায়, তাহারে বাহন করি
স্পর্শ করেছিল মোরে কতদিন জাগরণক্ষণে
অপরূপ অনির্বচনীয়। আজি বিদায়ের বেলা
স্বীকার করিব তারে, সে আমার বিপুল বিস্ময়।
গাব আমি, হে জীবন, অস্তিত্বের সারথি আমার,
বহু রণক্ষেত্র তুমি করিয়াছ পার, আজি লয়ে যাও
মৃত্যুর সংগ্রামশেষে নবতর বিজয়যাত্রায়।

শান্তিনিকেতন
৭।১০।৩৭

৮

✓ রঙ্গমঞ্চে একে একে নিবে গেল যবে দীপশিখা,
রিক্ত হল সভাতল, আঁধারের মসী-অবলেপে
স্বপ্নচ্ছবি-মুছে-যাওয়া সুষুপ্তির মতো শান্ত হল
চিত্ত মোর নিঃশব্দের তর্জনীসংকেতে। এতকাল
যে সাজে রচিয়াছিনু আপনার নাট্যপরিচয়
প্রথম উঠিতে যবনিকা, সেই সাজ মুহূর্তেই
হল নিরর্থক। চিহ্নিত করিয়াছিনু আপনারে
নানা চিহ্নে, নানা বর্ণপ্রসাধনে সহস্রের কাছে,
মুছিল তা, আপনাতে আপনার নিগূঢ় পূর্ণতা
আমারে করিল স্তব্ধ, সূর্যাস্তের অন্তিম সংকারে

দিনান্তের শূন্যতায় ধরার বিচিত্র চিত্রলেখা
যখন প্রচ্ছন্ন হয়, বাধামুক্ত আকাশ যেমন
নির্বাক্ বিস্ময়ে স্তব্ধ তারাদীপ্ত আত্মপরিচয়ে।

শান্তিনিকেতন
৯।১০।৩৭

৯

দেখিলাম— অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায়
দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি
নিয়ে অনুভূতিপুঞ্জ, নিয়ে তার বিচিত্র বেদনা,
চিত্র-করা আচ্ছাদনে আজন্মের স্মৃতির সঞ্চয়,
নিয়ে তার বাঁশিখানি। দূর হতে দূরে যেতে যেতে
ম্লান হয়ে আসে তার রূপ, পরিচিত তীরে তীরে
তরুচ্ছায়া-আলিঙ্গিত লোকালয়ে ক্ষীণ হয়ে আসে
সন্ধ্যা-আরতির ধ্বনি, ঘরে ঘরে রুদ্ধ হয় দ্বার,
ঢাকা পড়ে দীপশিখা, নৌকা বাঁধা পড়ে ঘাটে।
দুই তটে ক্ষান্ত হল পারাপার, ঘনালো রজনী,
বিহঙ্গের মৌনগান অরণ্যের শাখায় শাখায়
মহানিঃশব্দের পায়ে রচি দিল আত্মবলি তার।
এক কৃষ্ণ অরূপতা নামে বিশ্ববৈচিত্র্যের 'পরে
স্থলে জলে। ছায়া হয়ে, বিন্দু হয়ে মিলে যায় দেহ
অন্তহীন তমিস্রায়। নক্ষত্রবেদীর তলে আসি
একা স্তব্ধ দাঁড়াইয়া, ঊর্ধ্বে চেয়ে কহি জোড় হাতে—
হে পূষন্, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল,
এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ,
দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক।

শান্তিনিকেতন
৮।১২।৩৭

১০

মৃত্যুদূত এসেছিল হে প্রলয়ংকর, অকস্মাৎ
তব সভা হতে। নিয়ে গেল বিরাট প্রাঙ্গণে তব ;
চক্ষে দেখিলাম অন্ধকার ; দেখি নি অদৃশ্য আলো
আঁধারের স্তরে স্তরে অন্তরে অন্তরে, যে আলোক
নিখিল জ্যোতির জ্যোতি ; দৃষ্টি মোর ছিল আচ্ছাদিয়া
আমার আপন ছায়া। সেই আলোকের সামগান
মন্দ্রিয়া উঠিবে মোর সত্তার গভীর গুহা হতে
সৃষ্টির-সীমান্ত-জ্যোতির্লোকে, তারি লাগি ছিল মোর
আমন্ত্রণ। লব আমি চরমের কবিত্বমর্যাদা
জীবনের রঙ্গভূমে, এরি লাগি সেধেছিনু তান।
বাজিল না রুদ্রবীণা নিঃশব্দ ভৈরব নবরাগে,
জাগিল না মর্মতলে ভীষণের প্রসন্ন মুরতি,
তাই ফিরাইয়া দিলে। আসিবে আরেক দিন যবে
তখন কবির বাণী পরিপক্ক ফলের মতন
নিঃশব্দে পড়িবে খসি আনন্দের পূর্ণতার ভারে
অনন্তের অর্ঘ্যডালি-'পরে। চরিতার্থ হবে শেষে
জীবনের শেষ মূল্য, শেষ যাত্রা, শেষ নিমন্ত্রণ।

শান্তিনিকেতন
৮।১২।৩৭

১১

কলরবমুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণে যে আসন
পাতা হয়েছিল কবে, সেথা হতে উঠে এসো কবি,
পূজা সাঙ্গ করি দাও চাটুলুব্ধ জনতাদেবীরে
বচনের অর্ঘ্য বিরচিয়া। দিনের সহস্র কণ্ঠ
ক্ষীণ হয়ে এল ; যে প্রহরগুলি ধ্বনিপণ্যবাহী
নোঙর ফেলেছে তারা সন্ধ্যার নির্জন ঘাটে এসে।

আকাশের আঙিনায় শান্ত যেথা পাখির কাকলি
সুরসভা হতে সেথা নৃত্যপরা অপ্সরকন্যার
বাষ্পে-বোনা চেলাঞ্চল উড়ে পড়ে, দেয় ছড়াইয়া
স্বর্ণোজ্জ্বল বর্ণরশ্মিচ্ছটা। চরম ঐশ্বর্য নিয়ে
অস্তলগনের, শূন্য পূর্ণ করি এল চিত্রভানু,
দিল মোরে করস্পর্শ, প্রসারিল দীপ্ত শিল্পকলা
অন্তরের দেহলিতে, গভীর অদৃশ্যলোক হতে
ইশারা ফুটিয়া পড়ে তুলির রেখায়। আজন্মের
বিচ্ছিন্ন ভাবনা যত, স্রোতের সেঁউলি-সম যারা
নিরর্থক ফিরেছিল অনিশ্চিত হাওয়ায় হাওয়ায়,
রূপ নিয়ে দেখা দেবে ভাঁটার নদীর প্রান্ততীরে
অনাদৃত মঞ্জরীর অজানিত আগাছার মতো—
কেহ শুধাবে না নাম, অধিকারগর্ব নিয়ে তার
ঈর্ষা রহিবে না কারো, অনামিক স্মৃতিচিহ্ন তারা
খ্যাতিশূন্য অগোচরে রবে যেন অস্পষ্ট বিস্মৃতি।

শান্তিনিকেতন
১৮।১২।৩৭

১২

শেষের অবগাহন সাঙ্গ করো কবি, প্রদোষের
নির্মলতিমিরতলে। ভৃতি তব সেবার শ্রমের
সংসার যা দিয়েছিল আঁকড়িয়া রাখিয়ো না বুকে;
এক প্রহরের মূল্য আরেক প্রহরে ফিরে নিতে
কুণ্ঠা কভু নাহি তার; বাহির-দ্বারের যে দক্ষিণা
অন্তরে নিয়ো না টেনে; এ মুদ্রার স্বর্ণলেপটুকু
দিনে দিনে হাতে হাতে ক্ষয় হয়ে লুপ্ত হয়ে যাবে,
উঠিবে কলঙ্করেখা ফুটি। ফল যদি ফলায়েছ বনে,
মাটিতে ফেলিয়া তার হোক অবসান। সাঙ্গ হল
ফুল ফোটাবার ঋতু, সেই সঙ্গে সাঙ্গ হয়ে যাক

লোকমুখবচনের নিশ্বাসপবনে দোল খাওয়া।
পুরস্কারপ্রত্যাশায় পিছু ফিরে বাড়ায়ো না হাত
যেতে যেতে ; জীবনে যা-কিছু তব সত্য ছিল দান
মূল্য চেয়ে অপমান করিয়ো না তারে ; এ জনমে
শেষ ত্যাগ হোক তব ভিক্ষাঝুলি, নববসন্তের
আগমনে অরণ্যের শেষ শুষ্ক পত্রগুচ্ছ যথা।
যার লাগি আশাপথ চেয়ে আছ সে নহে সম্মান,
সে যে নবজীবনের অরুণের আহ্বান-ইঙ্গিত,
নবজাগ্রতের ভালে প্রভাতের জ্যোতির তিলক।

শান্তিনিকেতন
১৮।১২।৩৭

১৩

একদা পরমমূল্য জন্মক্ষণ দিয়েছে তোমায়
আগন্তুক। রূপের দুর্লভ সত্তা লভিয়া বসেছ
সূর্যনক্ষত্রের সাথে। দূর আকাশের ছায়াপথে
যে আলোক আসে নামি ধরণীর শ্যামল ললাটে
সে তোমার চক্ষু চুম্বি তোমারে বেঁধেছে অনুক্ষণ
সখ্যডোরে দ্যুলোকের সাথে ; দূর যুগান্তর হতে
মহাকালযাত্রী মহাবাণী পুণ্যমুহূর্তেরে তব
শুভক্ষণে দিয়েছে সম্মান ; তোমার সম্মুখদিকে
আত্মার যাত্রার পন্থ গেছে চলি অনন্তের পানে,
সেথা তুমি একা যাত্রী, অফুরন্ত এ মহাবিস্ময়।

শান্তিনিকেতন
১৯।১২।৩৭

১৪

যাবার সময় হল বিহঙ্গের। এখনি কুলায়
রিক্ত হবে। স্তব্ধগীতি ভ্রষ্টনীড় পড়িবে ধুলায়
অরণ্যের আন্দোলনে। শুষ্কপত্র-জীর্ণপুষ্প-সাথে
পথচিহ্নহীন শূন্যে যাব উড়ে রজনীপ্রভাতে
অস্তসিন্ধুপরপারে। কত কাল এই বসুন্ধরা
আতিথ্য দিয়েছে; কভু আম্রমুকুলের গন্ধে ভরা
পেয়েছি আহ্বানবাণী ফাল্গুনের দাক্ষিণ্যে মধুর;
অশোকের মঞ্জরী সে ইঙ্গিতে চেয়েছে মোর স্বর,
দিয়েছি তা প্রীতিরসে ভরি; কখনো বা ঝঞ্ঝাঘাতে
বৈশাখের, কণ্ঠ মোর রুধিয়াছে উত্তপ্ত ধুলাতে,
পক্ষ মোর করেছে অক্ষম— সব নিয়ে ধন্য আমি
প্রাণের সম্মানে। এ পারের ক্লান্ত যাত্রা গেলে থামি,
ক্ষণতরে পশ্চাতে ফিরিয়া মোর নম্র নমস্কারে
বন্দনা করিয়া যাব এ জন্মের অধিদেবতারে।

শান্তিনিকেতন
১৫ বৈশাখ ১৩৪১

১৫

অবরুদ্ধ ছিল বায়ু; দৈত্যসম পুঞ্জ মেঘভার
ছায়ার প্রহরীব্যূহে ঘিরে ছিল সূর্যের দুয়ার;
অভিভূত আলোকের মূর্ছাতুর ম্লান অসম্মানে
দিগন্ত আছিল বাষ্পাকুল। যেন চেয়ে ভূমিপানে
অবসাদে-অবনত ক্ষীণশ্বাস চিরপ্রাচীনতা
স্তব্ধ হয়ে আছে বসে দীর্ঘকাল, ভুলে গেছে কথা,
ক্লান্তিভারে আঁখিপাতা বন্ধপ্রায়।

শূন্যে হেনকালে
জয়শঙ্খ উঠিল বাজিয়া। চন্দনতিলক ভালে

যাবার সময় হোলো বিহঙ্গের। এখনি কুলায়
রিক্ত হবে। স্তব্ধগীতি ভ্রষ্টনীড় পড়িবে ধূলায়
অরণ্যের আন্দোলনে। শুষ্কপত্র জীর্ণ পুষ্প সাথে
পথচিহ্নহীন শূন্যে উড়ে যাব রজনী প্রভাতে
অস্তসিন্ধু পরপারে। কতকাল এই বসুন্ধরা
আতিথ্য দিয়েছে, কভু আম্রমুকুলের গন্ধে ভরা
পেয়েছি আহ্বানবাণী ফাল্গুনের দাক্ষিণ্যে মধুর,
অশোকের মঞ্জরী সে ইঙ্গিতে চেয়েছে মোর সুর
দিয়েছি তা প্রীতিরসে ভরি'; কখনো বা ঝঞ্ঝাঘাতে
বৈশাখের, কণ্ঠ মোর রুধিয়াছে উত্তপ্ত ধূলাতে,
পক্ষ মোর করেছে অক্ষম; সব নিয়ে ধন্য আমি
প্রাণের সম্মানে। এ পারের ক্লান্ত যাত্রা গেলে থামি
ক্ষণতরে পশ্চাতে ফিরিয়া মোর নম্র নমস্কারে
বন্দনা করিয়া যাব এ জন্মের অধিদেবতারে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন
১৪ বৈশাখ
১৩৪২

শরৎ উঠিল হেসে চমকিত গগনপ্রাঙ্গণে ;
পল্লবে পল্লবে কাঁপি বনলক্ষ্মী কিঙ্কিণীকঙ্কণে
বিচ্ছুরিল দিকে দিকে জ্যোতিষ্কণা। আজি হেরি চোখে
কোন্ অনির্বচনীয় নবীনেরে তরুণ আলোকে।
যেন আমি তীর্থযাত্রী অতিদূর ভাবীকাল হতে
মন্ত্রবলে এসেছি ভাসিয়া। উজান স্বপ্নের স্রোতে
অকস্মাৎ উত্তরিনু বর্তমান শতাব্দীর ঘাটে
যেন এই মুহূর্তেই। চেয়ে চেয়ে বেলা মোর কাটে।
আপনারে দেখি আমি আপন বাহিরে, যেন আমি
অপর যুগের কোনো অজানিত, সদ্য গেছে নামি
সত্তা হতে প্রত্যহের আচ্ছাদন ; অক্লান্ত বিস্ময়
যার পানে চক্ষু মেলি তারে যেন আঁকড়িয়া রয়
পুষ্পলগ্ন ভ্রমরের মতো। এই তো ছুটির কাল—
সর্বদেহমন হতে ছিন্ন হল অভ্যাসের জাল,
নগ্ন চিত্ত মগ্ন হল সমস্তের মাঝে। মনে ভাবি
পুরানোর দুর্গদ্বারে মৃত্যু যেন খুলে দিল চাবি,
নূতন বাহিরি এল ; তুচ্ছতার জীর্ণ উত্তরীয়
ঘুচালো সে ; অস্তিত্বের পূর্ণ মূল্যে কী অভাবনীয়
প্রকাশিল তার স্পর্শে, রজনীর মৌন সুবিপুল
প্রভাতের গানে সে মিশায়ে দিল ; কালো তার চুল
পশ্চিমদিগন্তপারে নামহীন বননীলিমায়
বিস্তারিল রহস্য নিবিড়।

আজি মুক্তিমন্ত্র গায়
আমার বক্ষের মাঝে দূরের পথিকচিত্ত মম,
সংসারযাত্রার প্রান্তে সহমরণের বধূ-সম।

১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

১৬

পথিক দেখেছি আমি পুরাণে-কীর্তিত কত দেশ
কীর্তিনিঃস্ব আজি ; দেখেছি অবমানিত ভগ্নশেষ
দর্পোদ্ধত প্রতাপের ; অন্তর্হিত বিজয়নিশান
বজ্রাঘাতে স্তব্ধ যেন অট্টহাসি ; বিরাট সম্মান
সাষ্টাঙ্গে সে ধুলায় প্রণত, যে ধুলার 'পরে মেলে
সন্ধ্যাবেলা ভিক্ষু জীর্ণ কাঁথা, যে ধুলায় চিহ্ন ফেলে
শ্রান্ত পদ পথিকের, পুনঃ সেই চিহ্ন লোপ করে
অসংখ্যের নিত্য পদপাতে। দেখিলাম বালুস্তরে
প্রচ্ছন্ন সুদূর যুগান্তর, ধূসর সমুদ্রতলে
যেন মগ্ন মহাতরী অকস্মাৎ ঝঞ্ঝাবর্তবলে,
লয়ে তার সব ভাষা, সর্ব দিনরজনীর আশা,
মুখরিত ক্ষুধাতৃষ্ণা, বাসনাপ্রদীপ্ত ভালোবাসা।
তবু করি অনুভব বসি এই অনিত্যের বুকে,
অসীমের হৃৎস্পন্দন তরঙ্গিছে মোর দুঃখে সুখে।

[শান্তিনিকেতন]
৭ বৈশাখ ১৩৪১

১৭

যেদিন চৈতন্য মোর মুক্তি পেল লুপ্তিগুহা হতে
নিয়ে এল দুঃসহ বিস্ময়ঝড়ে দারুণ দুর্যোগে
কোন্ নরকাগ্নিগিরিগহ্বরের তটে ; তপ্তধূমে
গর্জি উঠি ফুঁসিছে সে মানুষের তীব্র অপমান,
অমঙ্গলধ্বনি তার কম্পান্বিত করে ধরাতল,
কালিমা মাথায় বায়ুস্তরে। দেখিলাম একালের
আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা, দেখিনু সর্বাঙ্গে তার
বিকৃতির কদর্য বিদ্রূপ। এক দিকে স্পর্ধিত ক্রূরতা,
মত্ততার নির্লজ্জ হুংকার, অন্য দিকে ভীরুতার

দ্বিধাগ্রস্ত চরণবিক্ষেপ, বক্ষে আলিঙ্গিয়া ধরি
কৃপণের সতর্ক সম্বল— সন্ত্রস্ত প্রাণীর মতো
ক্ষণিক-গর্জন-অন্তে ক্ষীণস্বরে তখনি জানায়
নিরাপদ নীরব নম্রতা। রাষ্ট্রপতি যত আছে
প্রৌঢ় প্রতাপের, মন্ত্রসভাতলে আদেশ-নির্দেশ
রেখেছে নিষ্পিষ্ট করি রুদ্ধ ওষ্ঠ-অধরের চাপে
সংশয়ে সংকোচে। এ দিকে দানবপক্ষী ক্ষুব্ধ শূন্যে
উড়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে বৈতরণীনদীপার হতে
যন্ত্রপক্ষ হুংকারিয়া নরমাংসক্ষুধিত শকুনি,
আকাশেরে করিল অশুচি। মহাকালসিংহাসনে-
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নারীঘাতী
কুৎসিত বীভৎসা-'পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন
নিত্যকাল রবে যা স্পন্দিত লজ্জাতুর ঐতিহ্যের
হৃৎস্পন্দনে, রুদ্ধকণ্ঠ ভয়ার্ত এ শৃঙ্খলিত যুগ যবে
নিঃশব্দে প্রচ্ছন্ন হবে আপন চিতার ভস্মতলে।

শান্তিনিকেতন
২৫।১২।৩৭

১৮

নাগিনীরা চারি দিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

শান্তিনিকেতন
খ্রীস্ট-জন্মদিন
২৫।১২।৩৭

সেঁজুতি

উৎসর্গ

ডাক্তার সার্ নীলরতন সরকার

বন্ধুবরেষু

অন্ধতামসগহ্বর হতে
ফিরিনু সূর্যালোকে।
বিস্মিত হয়ে আপনার পানে
হেরিনু নূতন চোখে।
মর্তের প্রাণরঙ্গভূমিতে
যে চেতনা সারারাতি
সুখদুঃখের নাট্যলীলায়
জ্বেলে রেখেছিল বাতি
সে আজি কোথায় নিয়ে যেতে চায়
অচিহ্নিতের পারে,
নবপ্রভাতের উদয়সীমায়
অরূপলোকের দ্বারে।
আলো-আঁধারের ফাঁকে দেখা যায়
অজানা তীরের বাসা,
ঝিমিঝিমি করে শিরায় শিরায়
দূর নীলিমার ভাষা।
সে ভাষার আমি চরম অর্থ
জানি কিবা নাহি জানি—
ছন্দের ডালি সাজানু তা দিয়ে,
তোমারে দিলাম আনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন
১ শ্রাবণ ১৩৪৫

সেঁজুতি

জন্মদিন

আজ মম জন্মদিন। সদ্যই প্রাণের প্রান্তপথে
ডুব দিয়ে উঠেছে সে বিলুপ্তির অন্ধকার হতে
মরণের ছাড়পত্র নিয়ে। মনে হতেছে কী জানি
পুরাতন বৎসরের গ্রন্থিবাঁধা জীর্ণ মালাখানি
সেথা গেছে ছিন্ন হয়ে; নবসূত্রে পড়ে আজি গাঁথা
নব জন্মদিন। জন্মোৎসবে এই-যে আসন পাতা
হেথা আমি যাত্রী শুধু, অপেক্ষা করিব, লব টিকা
মৃত্যুর দক্ষিণ হস্ত হতে, নূতন অরুণলিখা
যবে দিবে যাত্রার ইঙ্গিত।

আজ আসিয়াছে কাছে
জন্মদিন মৃত্যুদিন, একাসনে দোঁহে বসিয়াছে,
দুই আলো মুখোমুখি মিলিছে জীবনপ্রান্তে মম
রজনীর চন্দ্র আর প্রত্যুষের শুকতারাসম—
এক মন্ত্রে দোঁহে অভ্যর্থনা।

প্রাচীন অতীত, তুমি
নামাও তোমার অর্ঘ্য; অরূপ প্রাণের জন্মভূমি,
উদয়শিখরে তার দেখো আদিজ্যোতি। করো মোরে
আশীর্বাদ, মিলাইয়া যাক তৃষাতপ্ত দিগন্তরে
মায়াবিনী মরীচিকা। ভরেছিনু আসক্তির ডালি
কাঙালের মতো; অশুচি সঞ্চয়পাত্র করো খালি,
ভিক্ষামুষ্টি ধুলায় ফিরায়ে লও, যাত্রাতরী বেয়ে
পিছু ফিরে আর্ত চক্ষে যেন নাহি দেখি চেয়ে চেয়ে
জীবনভোজের শেষ উচ্ছিষ্টের পানে।

হে বসুধা,
নিত্য নিত্য বুঝায়ে দিতেছ মোরে— যে তৃষ্ণা, যে ক্ষুধা
তোমার সংসাররথে সহস্রের সাথে বাঁধি মোরে
টানায়েছে রাত্রিদিন স্থূল সূক্ষ্ম নানাবিধ ডোরে
নানা দিকে নানা পথে, আজ তার অর্থ গেল কমে
ছুটির গোধূলিবেলা তন্দ্রালু আলোকে। তাই ক্রমে
ফিরায়ে নিতেছ শক্তি, হে কৃপণা, চক্ষুকর্ণ থেকে
আড়াল করিছ স্বচ্ছ আলো ; দিনে দিনে টানিছে কে
নিষ্প্রভ নেপথ্যপানে। আমাতে তোমার প্রয়োজন
শিথিল হয়েছে, তাই মূল্য মোর করিছ হরণ,
দিতেছ ললাটপটে বর্জনের ছাপ। কিন্তু জানি,
তোমার অবজ্ঞা মোরে পারে না ফেলিতে দূরে টানি।
তব প্রয়োজন হতে অতিরিক্ত যে মানুষ তারে
দিতে হবে চরম সম্মান তব শেষ নমস্কারে।
যদি মোরে পঙ্গু কর, যদি মোরে কর অন্ধপ্রায়,
যদি বা প্রচ্ছন্ন কর নিঃশক্তির প্রদোষচ্ছায়ায়,
বাঁধ বার্ধক্যের জালে, তবু ভাঙা মন্দিরবেদীতে
প্রতিমা অক্ষুণ্ন রবে সগৌরবে ; তারে কেড়ে নিতে
শক্তি নাই তব।

ভাঙো ভাঙো, উচ্চ করো ভগ্নস্তূপ,
জীর্ণতার অন্তরালে জানি মোর আনন্দস্বরূপ
রয়েছে উজ্জ্বল হয়ে। সুধা তারে দিয়েছিল আনি
প্রতিদিন চতুর্দিকে রসপূর্ণ আকাশের বাণী ;
প্রত্যুত্তরে নানা ছন্দে গেয়েছে সে 'ভালোবাসিয়াছি'।
সেই ভালোবাসা মোরে তুলেছে স্বর্গের কাছাকাছি
ছাড়ায়ে তোমার অধিকার। আমার সে ভালোবাসা
সব ক্ষয়ক্ষতিশেষে অবশিষ্ট রবে ; তার ভাষা
হয়তো হারাবে দীপ্তি অভ্যাসের ম্লানস্পর্শ লেগে,
তবু সে অমৃতরূপ সঙ্গে রবে যদি উঠি জেগে

মৃত্যুপরপারে। তারি অঙ্গে এঁকেছিল পত্রলিখা
আম্রমঞ্জরীর রেণু, এঁকেছে পেলব শেফালিকা
সুগন্ধি শিশিরকণিকায় ; তারি সূক্ষ্ম উত্তরীতে
গেঁথেছিল শিল্পকারু প্রভাতের দোয়েলের গীতে
চকিত কাকলিসূত্রে ; প্রিয়ার বিহ্বল স্পর্শখানি
সৃষ্টি করিয়াছে তার সর্বদেহে রোমাঞ্চিত বাণী,
নিত্য তাহা রয়েছে সঞ্চিত। যেথা তব কর্মশালা
সেথা বাতায়ন হতে কে জানি পরায়ে দিত মালা
আমার ললাট ঘেরি সহসা ক্ষণিক অবকাশে,
সে নহে ভৃত্যের পুরস্কার ; কী ইঙ্গিতে কী আভাসে
মুহূর্তে জানায়ে চলে যেত অসীমের আত্মীয়তা
অধরা অদেখা দূত, বলে যেত ভাষাতীত কথা
অপ্রয়োজনের মানুষেরে।

সে মানুষ, হে ধরণী,
তোমার আশ্রয় ছেড়ে যাবে যবে, নিয়ো তুমি গণি
যা-কিছু দিয়েছ তারে, তোমার কর্মীর যত সাজ,
তোমার পথের যে পাথেয়, তাহে সে পাবে না লাজ ;
রিক্ততায় দৈন্য নহে। তবু জেনো অবজ্ঞা করি নি
তোমার মাটির দান, আমি সে মাটির কাছে ঋণী —
জানায়েছি বারংবার, তাহারি বেড়ার প্রান্ত হতে
অমূর্তের পেয়েছি সন্ধান। যবে আলোতে আলোতে
লীন হত জড়যবনিকা, পুষ্পে পুষ্পে তৃণে তৃণে
রূপে রসে সেই ক্ষণে যে গূঢ় রহস্য দিনে দিনে
হত নিঃশ্বসিত, আজি মর্তের অপর তীরে বুঝি
চলিতে ফিরানু মুখ তাহারি চরম অর্থ খুঁজি।

যবে শান্ত নিরাসক্ত গিয়েছি তোমার নিমন্ত্রণে
তোমার অমরাবতী সুপ্রসন্ন সেই শুভক্ষণে

মুক্তদ্বার ; বুভুক্ষুর লালসারে করে সে বঞ্চিত ;
তাহার মাটির পাত্রে যে অমৃত রয়েছে সঞ্চিত
নহে তাহা দীন ভিক্ষু লালায়িত লোলুপের লাগি।
ইন্দ্রের ঐশ্বর্য নিয়ে হে ধরিত্রী, আছ তুমি জাগি
ত্যাগীরে প্রত্যাশা করি, নির্লোভেরে সঁপিতে সম্মান,
দুর্গমের পথিকেরে আতিথ্য করিতে তব দান
বৈরাগ্যের শুভ্র সিংহাসনে। ক্ষুব্ধ যারা, লুব্ধ যারা,
মাংসগন্ধে মুগ্ধ যারা, একান্ত আত্মার দৃষ্টিহারা
শ্মশানের প্রান্তচর, আবর্জনাকুণ্ড তব ঘেরি
বীভৎস চীৎকারে তারা রাত্রিদিন করে ফেরাফেরি,
নির্লজ্জ হিংসায় করে হানাহানি।

শুনি তাই আজি
মানুষ-জন্তুর হুহুংকার দিকে দিকে উঠে বাজি।
তবু যেন হেসে যাই যেমন হেসেছি বারে বারে
পণ্ডিতের মূঢ়তায়, ধনীর দৈন্যের অত্যাচারে,
সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে। মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে
তারে হাস্য হেনে যাব, বলে যাব, 'এ প্রহসনের
মধ্য-অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের ;
নাট্যের কবররূপে বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি
দগ্ধশেষ মশালের, আর অদৃষ্টের অট্টহাসি।'
বলে যাব, 'দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।'

বৃথা বাক্য থাক্। তব দেহলিতে শুনি ঘণ্টা বাজে,
শেষপ্রহরের ঘণ্টা ; সেই সঙ্গে ক্লান্ত বক্ষোমাঝে
শুনি বিদায়ের দ্বার খুলিবার শব্দ সে অদূরে
ধ্বনিতেছে সূর্যাস্তের রঙে রাঙা পুরবীর সুরে।

জীবনের স্মৃতিদীপে আজিও দিতেছে যারা জ্যোতি
সেই ক'টি বাতি দিয়ে রচিব তোমার সন্ধ্যারতি
সপ্তর্ষির দৃষ্টির সম্মুখে ; দিনান্তের শেষ পলে
রবে মোর মৌন বীণা মূর্ছিয়া তোমার পদতলে।

আর রবে পশ্চাতে আমার, নাগকেশরের চারা
ফুল যার ধরে নাই, আর রবে খেয়াতরীহারা
এ পারের ভালোবাসা — বিরহস্মৃতির অভিমানে
ক্লান্ত হয়ে রাত্রিশেষে ফিরিবে সে পশ্চাতের পানে।

গৌরীপুর-ভবন। কালিম্পং
২৫ বৈশাখ ১৩৪৫

পত্রোত্তর

ডাক্তার শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তকে লিখিত

বন্ধু,

চিরপ্রশ্নের বেদীসম্মুখে চিরনির্বাক্ রহে
বিরাট নিরুত্তর,
তাহারি পরশ পায় যবে মন নম্রললাটে বহে
আপন শ্রেষ্ঠ বর।
খনে খনে তারি বহিরঙ্গণদ্বারে
পুলকে দাঁড়াই, কত কী যে হয় বলা ;
শুধু মনে জানি বাজিল না বীণাতারে
পরমের সুরে চরমের গীতিকলা।

চকিত আলোকে কখনো সহসা দেখা দেয় সুন্দর,
দেয় না তবুও ধরা—
মাটির দুয়ার ক্ষণেক খুলিয়া আপন গোপন ঘর
দেখায় বসুন্ধরা।

আলোকধামের আভাস সেথায় আছে
মর্তের বুকে অমৃত পাত্রে ঢাকা ;
ফাগুন সেথায় মন্ত্র লাগায় গাছে,
অরূপের রূপ পল্লবে পড়ে আঁকা।

তারি আহ্বানে সাড়া দেয় প্রাণ, জাগে বিস্মিত সুর,
নিজ অর্থ না জানে ;
ধূলিময় বাধা-বন্ধ এড়ায়ে চলে যাই বহুদূর
আপনারি গানে গানে।
'দেখেছি দেখেছি' এই কথা বলিবারে
সুর বেধে যায়, কথা না জোগায় মুখে ;
ধন্য যে আমি, সে কথা জানাই কারে—
পরশাতীতের হরষ জাগে যে বুকে।

দুঃখ পেয়েছি, দৈন্য ঘিরেছে, অশ্লীল দিনে রাতে
দেখেছি কুশ্রীতারে,
মানুষের প্রাণে বিষ মিশায়েছে মানুষ আপন হাতে,
ঘটেছে তা বারে বারে।
তবু তো বধির করে নি শ্রবণ কভু,
বেসুর ছাপায়ে কে দিয়েছে সুর আনি ;
পরুষকলুষ ঝঞ্ঝায় শুনি তবু
চিরদিবসের শান্ত শিবের বাণী।

যাহা জানিবার কোনোকালে তার জেনেছি যে কোনোকিছু
কে তাহা বলিতে পারে—
সকল পাওয়ার মাঝে না-পাওয়ার চলিয়াছি পিছু পিছু
অচেনার অভিসারে।
তবুও চিত্ত অহেতু আনন্দেতে
বিশ্বনৃত্যলীলায় উঠেছে মেতে ;
সেই ছন্দেই মুক্তি আমার পাব,
মৃত্যুর পথে মৃত্যু এড়ায়ে যাব।

ওই শুনি আমি চলেছে আকাশে বাঁধন-ছেঁড়ার রবে
নিখিল আত্মহারা ;
ওই দেখি আমি অন্তবিহীন সত্তার উৎসবে
ছুটেছে প্রাণের ধারা।
সে ধারার বেগ লেগেছে আমার মনে
এ ধরণী হতে বিদায় নেবার ক্ষণে ;
নিবায়ে ফেলিব ঘরের কোণের বাতি,
যাব অলক্ষ্যে সূর্যতারার সাথি।

কী আছে জানি না দিন-অবসানে মৃত্যুর অবশেষে ;
এ প্রাণের কোনো ছায়া
শেষ আলো দিয়ে ফেলিবে কি রঙ অস্তরবির দেশে,
রচিবে কি কোনো মায়া।
জীবনেরে যাহা জেনেছি অনেক তাই ;
সীমা থাকে থাক্, তবু তার সীমা নাই।
নিবিড় তাহার সত্য আমার প্রাণে
নিখিল ভুবন ব্যাপিয়া নিজেরে জানে।

মংপু। দার্জিলিং
১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

যাবার মুখে

যাক এ জীবন,
যাক নিয়ে যাহা টুটে যায়, যাহা
ছুটে যায়, যাহা
ধূলি হয়ে লোটে ধূলি-'পরে, চোরা
মৃত্যুই যার অন্তরে, যাহা
রেখে যায় শুধু ফাঁক।
যাক এ জীবন পুঞ্জিত তার জঞ্জাল নিয়ে যাক।
টুকরো যা থাকে ভাঙা পেয়ালার,
ফুটো সেতারের সুরহারা তার,
শিখা-নিবে-যাওয়া বাতি,

স্বপ্নশেষের ক্লান্তি-বোঝাই রাতি—
নিয়ে যাক যত দিনে-দিনে-জমা-করা
প্রবঞ্চনায়-ভরা
নিষ্ফলতার সযত্ন সঞ্চয়।
কুড়ায়ে ঝাঁটায়ে মুছে নিয়ে যাক, নিয়ে যাক শেষ করি
ভাঁটার স্রোতের শেষ-খেয়া-দেওয়া তরী।

নিঃশেষ যবে হয় যত কিছু ফাঁকি
তবুও যা রয় বাকি—
জগতের সেই
সকল-কিছুর অবশেষেতেই
কাটায়েছি কাল যত অকাজের বেলায়।
মন-ভোলাবার অকারণ গানে কাজ ভোলাবার খেলায়।
সেখানে যাহারা এসেছিল মোর পাশে
তারা কেহ নয়, তারা কিছু নয় মানুষের ইতিহাসে।
শুধু অসীমের ইশারা তাহারা এনেছে আঁখির কোণে,
অমরাবতীর নৃত্যনূপুর বাজিয়ে গিয়েছে মনে।
দখিনহাওয়ার পথ দিয়ে তারা উঁকি মেরে গেছে দ্বারে,
কোনো কথা দিয়ে তাদের কথা যে বুঝাতে পারি নি কারে।
রাজা মহারাজ মিলায় শূন্যে ধুলার নিশান তুলে,
তারা দেখা দিয়ে চলে যায় যবে ফুটে ওঠে ফুলে ফুলে।
থাকে নাই থাকে কিছুতেই নেই ভয়,
যাওয়ায় আসায় দিয়ে যায় ওরা নিত্যের পরিচয়।
অজানা পথের নামহারা ওরা লজ্জা দিয়েছে মোরে
হাটে বাটে যবে ফিরেছি কেবল নামের বেসাতি করে।

আমার দুয়ারে আঙিনার ধারে ওই চামেলির লতা
কোনো দুর্দিনে করে নাই কৃপণতা।
ওই-যে শিমুল, ওই-যে সজিনা, আমারে বেঁধেছে ঋণে—
কত-যে আমার পাগলামি-পাওয়া দিনে

কেটে গেছে বেলা শুধু চেয়ে-থাকা মধুর মৈতালিতে,
নীল আকাশের তলায় ওদের সবুজ বৈতালিতে।
সকালবেলার প্রথম আলোয় বিকালবেলার ছায়ায়
দেহপ্রাণমন ভরেছে সে কোন্ অনাদি কালের মায়ায়।
পেয়েছি ওদের হাতে
দূরজনমের আদিপরিচয় এই ধরণীর সাথে।
অসীম আকাশে যে প্রাণ-কাঁপন অসীম কালের বুকে
নাচে অবিরাম, তাহারি বারতা শুনেছি ওদের মুখে।
যে মন্ত্রখানি পেয়েছি ওদের স্বরে
তাহার অর্থ মৃত্যুর সীমা ছাড়ায়ে গিয়েছে দূরে।
সেই সত্যেরই ছবি
তিমিরপ্রান্তে চিত্তে আমার এনেছে প্রভাতরবি।
সে রবিরে চেয়ে কবির সে বাণী আসে অন্তরে নামি—
'যে আমি রয়েছে তোমার আমায় সে আমি আমারি আমি'।
সে আমি সকল কালে,
সে আমি সকল খানে,
প্রেমের পরশে সে অসীম আমি বেজে ওঠে মোর গানে।

যায় যদি তবে যাক
এল যদি শেষ ডাক—
অসীম জীবনে এ ক্ষীণ জীবন শেষ রেখা এঁকে যাক,
মৃত্যুতে ঠেকে যাক।
যাক নিয়ে যাহা টুটে যায়, যাহা
ছুটে যায়, যাহা
ধূলি হয়ে লুটে ধূলি-'পরে, চোরা
মৃত্যুই যার অন্তরে, যাহা
রেখে যায় শুধু ফাঁক—
যাক নিয়ে তাহা, যাক এ জীবন, যাক।

শান্তিনিকেতন
২২ মাঘ ১৩৪৩

অমর্ত

আমার মনে একটুও নেই বৈকুণ্ঠের আশা। –
ওইখানে মোর বাসা
যে মাটিতে শিউরে ওঠে ঘাস,
যার 'পরে ঐ মন্ত্র পড়ে দক্ষিনে বাতাস।
চিরদিনের আলোক-জ্বালা নীল আকাশের নীচে
যাত্রা আমার নৃত্যপাগল নটরাজের পিছে।
ফুল ফোটাবার যে রাগিণী বকুলশাখায় সাধা,
নিষ্কারণে ওড়ার আবেগ চিলের পাখায় বাঁধা,
সেই দিয়েছে রক্তে আমার ঢেউয়ের দোলাদুলি ;
স্বপ্নলোকে সেই উড়েছে সুরের পাখনা তুলি।
দায়-ভোলা মোর মন
মন্দে-ভালোয় সাদায়-কালোয় অঙ্কিত প্রাঙ্গণ
ছাড়িয়ে গেছে দূর দিগন্ত-পানে
আপন বাঁশির পথ-ভোলানো তানে।

দেখা দিল দেহের অতীত কোন্ দেহ এই মোর
ছিন্ন করি বস্তুবাঁধন-ডোর।
শুধু কেবল বিপুল অনুভূতি,
গভীর হতে বিচ্ছুরিত আনন্দময় দ্যুতি,
শুধু কেবল গানেই ভাষা যার,
পুষ্পিত ফাল্গুনের ছন্দে গন্ধে একাকার ;
নিমেষহারা চেয়ে-থাকার দূর অপারের মাঝে
ইঙ্গিত যার বাজে।
যে দেহেতে মিলিয়ে আছে অনেক ভোরের আলো,
নাম-না-জানা অপূর্বেরে যার লেগেছে ভালো,
যে দেহেতে রূপ নিয়েছে অনির্বচনীয়
সকল প্রিয়ের মাঝখানে যে প্রিয়,

পেরিয়ে মরণ সে মোর সঙ্গে যাবে—
কেবল রসে, কেবল সুরে, কেবল অনুভাবে।

শান্তিনিকেতন
১১।৩।৩৭

পলায়নী

যে পলায়নের অসীম তরণী
বাহিছে সূর্যতারা
সেই পলায়নে দিবসরজনী
ছুটেছে গঙ্গাধারা।
চিরধাবমান নিখিলবিশ্ব
এ পলায়নের বিপুল দৃশ্য,
এই পলায়নে ভূত ভবিষ্য
দীক্ষিছে ধরণীরে।
জলের ছায়া সে দ্রুততালে বয়,
কঠিন ছায়া সে ওই লোকালয়,
একই প্রলয়ের বিভিন্ন লয়
স্থিরে আর অস্থিরে।

সৃষ্টি যখন আছিল নবীন
নবীনতা নিয়ে এলে,
ছেলেমানুষির স্রোতে নিশিদিন
চল অকারণ খেলে।
লীলাছলে তুমি চিরপথহারা,
বন্ধনহীন নৃত্যের ধারা,
তোমার কূলেতে সীমা দিয়ে কারা
বাঁধন গড়িছে মিছে।

আবাঁধা ছন্দে হেসে যাও সরি
পাথরের মুঠি শিথিলিত করি,
বাঁধাছন্দের নগরনগরী
ধুলায় মিলায় পিছে।

অচঞ্চলের অমৃত বরিষে
চঞ্চলতার নাচে,
বিশ্বলীলা তো দেখি কেবলি সে
নেই নেই ক'রে আছে।
ভিত ফেঁদে যারা তুলিছে দেয়াল
তারা বিধাতার মানে না খেয়াল,
তারা বুঝিল না— অনন্তকাল
অচির কালেরই মেলা।
বিজয়তোরণ গাঁথে তারা যত
আপনার ভারে ভেঙে পড়ে তত,
খেলা করে কাল বালকের মতো
লয়ে তার ভাঙা ঢেলা।

ওরে মন, তুই চিন্তার টানে
বাঁধিস নে আপনারে,
এই বিশ্বের সুদূর ভাসানে
অনায়াসে ভেসে যা রে।
কী গেছে তোমার কী রয়েছে আর
নাই ঠাঁই তার হিসাব রাখার,
কী ঘটিতে পারে জবাব তাহার
নাই বা মিলিল কোনো।
ফেলিতে ফেলিতে যাহা ঠেকে হাতে
তাই পরশিয়া চলো দিনে রাতে,
যে সুর বাজিল মিলাতে মিলাতে
তাই কান দিয়ে শোনো।

এর বেশি যদি আরো কিছু চাও
দুঃখই তাহে মেলে।
যেটুকু পেয়েছ তাই যদি পাও
তাই নাও, দাও ফেলে।
যুগ যুগ ধরি জেনো মহাকাল
চলার নেশায় হয়েছে মাতাল,
ডুবিছে ভাসিছে আকাশ পাতাল
আলোক আঁধার বহি।
দাঁড়াবে না কিছু তব আহ্বানে,
ফিরিয়া কিছু না চাবে তোমা-পানে,
ভেসে যদি যাও যাবে একখানে
সকলের সাথে রহি।

শান্তিনিকেতন
১৯ চৈত্র ১৩৪৩

স্মরণ

যখন রব না আমি মর্তকায়ায়
তখন স্মরিতে যদি হয় মন
তবে তুমি এসো হেথা নিভৃত ছায়ায়
যেথা এই চৈত্রের শালবন।

হেথায় যে মঞ্জরী দোলে শাখে শাখে,
পুচ্ছ নাচায়ে যত পাখি গায়,
ওরা মোর নাম ধরে কভু নাহি ডাকে,
মনে নাহি করে বসি নিরালায়।
কত যাওয়া কত আসা এই ছায়াতলে
আনমনে নেয় ওরা সহজেই,
মিলায় নিমেষে কত প্রতি পলে পলে
হিসাব কোথাও তার কিছু নেই।

ওদের এনেছে ডেকে আদিসমীরণে
ইতিহাসলিপিহারা যেই কাল
আমারে সে ডেকেছিল কভু খনে খনে,
রক্তে বাজায়েছিল তারি তাল।
সেদিন ভুলিয়াছিনু কীর্তি ও খ্যাতি,
বিনা পথে চলেছিল ভোলা মন ;
চারি দিকে নামহারা ক্ষণিকের জ্ঞাতি
আপনারে করেছিল নিবেদন।
সেদিন ভাবনা ছিল মেঘের মতন,
কিছু নাহি ছিল ধরে রাখিবার ;
সেদিন আকাশে ছিল রূপের স্বপন,
রঙ ছিল উড়ো ছবি আঁকিবার।
সেদিনের কোনো দানে ছোটো বড়ো কাজে
স্বাক্ষর দিয়ে দাবি করি নাই ;
যা লিখেছি যা মুছেছি শূন্যের মাঝে
মিলায়েছে, দাম তার ধরি নাই।

সেদিনের হারা আমি— চিহ্নবিহীন
পথ বেয়ে কোরো তার সন্ধান,
হারাতে হারাতে যেথা চলে যায় দিন,
ভরিতে ভরিতে ডালি অবসান।
মাঝে মাঝে পেয়েছিল আহ্বান-পাঁতি
যেখানে কালের সীমারেখা নেই—
খেলা করে চলে যায় খেলিবার সাথি
গিয়েছিল দায়হীন সেখানেই।
দিই নাই, চাই নাই, রাখি নি কিছুই
ভালো মন্দের কোনো জঞ্জাল ;
চলে-যাওয়া ফাগুনের ঝরা ফুলে ভুঁই
আসন পেতেছে মোর ক্ষণকাল।

সেইখানে মাঝে মাঝে এল যারা পাশে
কথা তারা ফেলে গেছে কোন্ ঠাঁই ;
সংসার তাহাদের ভোলে অনায়াসে,
সভাঘরে তাহাদের স্থান নাই।
বাসা যার ছিল ঢাকা জনতার পারে,
ভাষাহারাদের সাথে মিল যার,
যে আমি চায় নি কারে ঋণী করিবারে,
রাখিয়া যে যায় নাই ঋণভার,
সে আমারে কে চিনেছ মর্তকায়ায়,
কখনো স্মরিতে যদি হয় মন,
ডেকো না ডেকো না সভা — এসো এ ছায়ায়
যেথা এই চৈত্রের শালবন।

শান্তিনিকেতন
২৫ চৈত্র ১৩৪৩

সন্ধ্যা

চলেছিল সারাপ্রহর
আমায় নিয়ে দূরে
যাত্রী-বোঝাই দিনের নৌকো
অনেক ঘাটে ঘুরে।
দূর কেবলই বেড়ে ওঠে
সামনে যতই চাই,
অন্ত যে তার নাই।
দূর ছড়িয়ে রইল দিকে দিকে,
আকাশ থেকে দূর চেয়ে রয় নির্নিমিখে।
দিনের রৌদ্রে বাজতে থাকে
যাত্রাপথের সুর,
অনেক দূর-যে অনেক অনেক দূর।
ওগো সন্ধ্যা শেষপ্রহরের মেয়ে,
ভাসাও খেয়া তাঁটার গঙ্গা বেয়ে।

পৌঁছিয়ে দাও কূলে
যেথায় আছ অতি-কাছের
দুয়ারখানি খুলে।
ঐ-যে তোমার সন্ধ্যাতারা
মনকে ছুঁয়ে আছে,
ছায়ায় ঢাকা আম্‌লকী-বন
এগিয়ে এল কাছে।

দিনের আলো সবার আলো
লাগিয়েছিল ধাঁদা—
অনেক সেথায় নিবিড় হয়ে
দিল অনেক বাধা।
নানান-কিছু ছুঁয়ে ছুঁয়ে
হারানো আর পাওয়ায়
নানান দিকে ধাওয়ায়।
সন্ধ্যা ওগো কাছের তুমি,
ঘনিয়ে এসো প্রাণে—
আমার মধ্যে তারে জাগাও
কেউ যারে না জানে।
ধীরে ধীরে দাও আঙিনায় আনি
একলারই দীপখানি,
মুখোমুখি চাওয়ার সে দীপ,
কাছাকাছি বসার,
অতি-দেখার আবরণটি খসার।
সব-কিছুরে সরিয়ে করো
একটু-কিছুর ঠাঁই—
যার চেয়ে আর নাই।

শান্তিনিকেতন
২৩।৪।৩৭

ভাগীরথী

পূর্বযুগে, ভাগীরথী, তোমার চরণে দিল আনি
মর্তের ক্রন্দনবাণী ;
সঞ্জীবনীতপস্থায় ভগীরথ
উত্তরিল দুর্গম পর্বত,
নিয়ে গেল তোমা-কাছে মৃত্যুবন্দী প্রেতের আহ্বান—
ডাক দিল, আনো আনো প্রাণ—
নিবেদিল, হে চৈতন্যস্বরূপিণী তুমি,
গৈরিক অঞ্চল তব চুমি
তৃণে শস্পে রোমাঞ্চিত হোক মরুতল,
ফলহীনে দাও ফল,
পুষ্পবন্ধ্যালতিকার ঘুচাও ব্যর্থতা,
নির্বাক্ ভূমির মুখে দাও কথা।
তুমি যে প্রাণের ছবি,
হে জাহ্নবী—
ধরণীর আদিসুপ্তি ভেঙে দিয়ে যেথা যাও চলে
জাগ্রত কল্লোলে
গানে মুখরিয়া উঠে মাটির প্রাঙ্গণ,
দুই তীরে জেগে ওঠে বন ;
তট বেয়ে মাথা তোলে নগরনগরী
জীবনের আয়োজনে ভাণ্ডার ঐশ্বর্যে ভরি ভরি।

মানুষের মুখ্যভয় মৃত্যুভয়,
কেমনে করিবে তারে জয়
নাহি জানে ;
তাই সে হেরিছে ধ্যানে,
মৃত্যুবিজয়ীর জটা হতে
অক্ষয় অমৃতস্রোতে
প্রতিক্ষণে নামিছ ধরায়।

পুণ্যতীর্থতটে সে যে তোমার প্রসাদ পেতে চায়।
সে ডাকিছে— মিথ্যাশঙ্কা-নাগপাশ ঘুচাও ঘুচাও,
মরণেরে যে কালিমা লেপিয়াছি সে তুমি মুছাও ;
গম্ভীর অভয়মূর্তি মরণের
তব কলধ্বনিমাঝে গান ঢেলে দিক তরণের
এ জন্মের শেষ ঘাটে ;
নিরুদ্দেশ যাত্রীর ললাটে
স্পর্শ দিক আশীর্বাদ তব,
নিক সে নূতন পথে যাত্রার পাথেয় অভিনব ;
শেষ দণ্ডে ভরে দিক তার কান
অজানা সমুদ্রপথে তব নিত্য-অভিসার-গান।

শান্তিনিকেতন
২৬।৭।৩৭

তীর্থযাত্রিণী

তীর্থের যাত্রিণী ও যে, জীবনের পথে
শেষ আধক্রোশটুকু টেনে টেনে চলে কোনোমতে।
হাতে নামজপ-ঝুলি,
পাশে তার রয়েছে পুঁটুলি।
ভোর হতে ধৈর্য ধরি বসি ইস্টেশনে
অস্পষ্ট ভাবনা আসে মনে—
আর কোনো ইস্টেশনে আছে যেন আর কোনো ঠাঁই,
যেথা সব ব্যর্থতাই
আপনায়
হারানো অর্থেরে ফিরে পায়,
যেথা গিয়ে ছায়া
কোনো-এক রূপ ধরি পায় যেন কোনো-এক কায়া।
বুকের ভিতরে ওর পিছু হতে দেয় দোল
আশৈশব-পরিচিত দূর সংসারের কলরোল

প্রত্যাখ্যাত জীবনের প্রতিহত আশা
অজানার নিরুদ্দেশে প্রদোষে খুঁজিতে চলে বাসা।

যে পথে সে করেছিল যাত্রা একদিন
সেখানে নবীন
আলোকে আকাশ ওর মুখ চেয়ে উঠেছিল হেসে।
সে পথে পড়েছে আজ এসে
অজানা লোকের দল,
তাদের কণ্ঠের ধ্বনি ওর কাছে ব্যর্থ কোলাহল।
যে যৌবনখানি
একদিন পথে যেতে বল্লভেরে দিয়েছিল আনি
মধুমদিরার রসে বেদনার নেশা
দুঃখে-সুখে-মেশা
সে রসের রিক্ত পাত্রে আজ শুষ্ক অবহেলা,
মধুপগুঞ্জনহীন যেন ক্লান্ত হেমন্তের বেলা।

আজিকে চলেছে যারা খেলার সঙ্গীর আশে
ওরে ঠেলে যায় পথপাশে;
যে খুঁজিছে দুর্গমের সাথি
ও পারে না তার পথে জ্বালাইতে বাতি
জীর্ণ কম্পমান হাতে
দুর্যোগের রাতে।
একদিন যারা সবে এ পথনির্মাণে
লেগেছিল আপনার জীবনের দানে
ও ছিল তাদেরি মাঝে
নানা কাজে—
সে পথ উহার আজ নহে।
সেথা আজি কোন্ দূত কী বারতা বহে
কোন্ লক্ষ্য-পানে
নাহি জানে।

পরিত্যক্ত একা বসি ভাবিতেছে, পাবে বুঝি দূরে
সংসারের গ্লানি ফেলে স্বর্গ-ঘেঁষা দুর্মূল্য কিছুরে।
হায়, সেই কিছু
যাবে ওর আগে আগে প্রেতসম, ও চলিবে পিছু
ক্ষীণালোকে, প্রতিদিন ধরি-ধরি করি তারে
অবশেষে মিলাবে আঁধারে।

আলমোড়া
২২ মে ১৯৩৭

নতুন কাল

কোন্‌-সে কালের কণ্ঠ হতে এসেছে এই স্বর—
'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা, মধ্যিখানে চর।'

অনেক বাণীর বদল হল, অনেক বাণী চুপ,
নতুন কালের নটরাজা নিল নতুন রূপ।
তখন যে-সব ছেলেমেয়ে শুনেছে এই ছড়া
তারা ছিল আর-এক ছাঁদে গড়া।
প্রদীপ তারা ভাসিয়ে দিত পূজা আনত তীরে,
কী জানি কোন্‌ চোখে দেখত মকরবাহিনীরে।
তখন ছিল নিত্য অনিশ্চয়,
ইহকালের পরকালের হাজার-রকম ভয়।
জাগত রাজার দারুণ খেয়াল, বর্গি নামত দেশে,
ভাগ্যে লাগত ভূমিকম্প হঠাৎ এক নিমেষে।
ঘরের থেকে খিড়কিঘাটে চলতে হত ডর,
লুকিয়ে কোথায় রাজদস্যুর চর।
আঙিনাতে শুনত পালাগান,
বিনা দোষে দেবীর কোপে সাধুর অসম্মান।
সামান্য ছুতায়
ঘরের বিবাদ গ্রামের শত্রুতায়

গুপ্ত চালের লড়াই যেত লেগে,
শক্তিমানের উঠত গুমর জেগে।
হারত যে তার ঘুচত পাড়ায় বাস,
ভিটেয় চলত চাষ।
ধর্ম ছাড়া কারো নামে পাড়বে যে দোহাই
ছিল না সেই ঠাঁই।
ফিস্‌ফিসিয়ে কথা কওয়া, সংকোচে মন ঘেরা,
গৃহস্থবউ, জিব কেটে তার হঠাৎ পিছন-ফেরা—
আলতা পায়ে, কাজল চোখে, কপালে তার টিপ,
ঘরের কোণে জ্বালে মাটির দীপ।
মিনতি তার জলে স্থলে, দোহাই-পাড়া মন,
অকল্যাণের শঙ্কা সারাক্ষণ।
আয়ুলাভের তরে
বলির পশুর রক্ত লাগায় শিশুর ললাট-'পরে।
রাত্রিদিবস সাবধানে তার চলা,
অশুচিতার ছোঁয়াচ কোথায় যায় না কিছুই বলা।
ও দিকেতে মাঠে বাটে দস্যুরা দেয় হানা,
এ দিকে সংসারের পথে অপদেব্‌তা নানা।
জানা কিম্বা না-জানা সব অপরাধের বোঝা,
ভয়ে তারই হয় না মাথা সোজা।
এরই মধ্যে গুন্‌গুনিয়ে উঠল কাহার স্বর—
'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা, মধ্যিখানে চর।'

সেদিনও সেই বইতেছিল উদার নদীর ধারা,
ছায়া-ভাসান দিতেছিল সাঁজ-সকালের তারা।
হাটের ঘাটে জমেছিল নৌকো মহাজনি,
রাত না যেতে উঠেছিল দাঁড়-চালানো ধ্বনি।
শান্ত প্রভাতকালে
সোনার রৌদ্র পড়েছিল জেলেডিঙির পালে।

সন্ধেবেলায় বন্ধ আসা-যাওয়া,
হাঁস-বলাকার পাখার ঘায়ে চমকেছিল হাওয়া।
ডাঙায় উনুন পেতে
রান্না চড়েছিল মাঝির বনের কিনারেতে।
শেয়াল ক্ষণে ক্ষণে
উঠতেছিল ডেকে ডেকে ঝাউয়ের বনে বনে।

কোথায় গেল সেই নবাবের কাল,
কাজির বিচার, শহর-কোতোয়াল।
পুরাকালের শিক্ষা এখন চলে উজান-পথে,
ভয়ে-কাঁপা যাত্রা সে নেই বলদ-টানা রথে।
ইতিহাসের গ্রন্থে আরো খুলবে নতুন পাতা,
নতুন রীতির সূত্রে হবে নতুন জীবন গাঁথা।
যে হোক রাজা যে হোক মন্ত্রী কেউ রবে না তারা,
বইবে নদীর ধারা—
জেলেডিঙি চিরকালের নৌকো মহাজনি,
উঠবে দাঁড়ের ধ্বনি।
প্রাচীন অশথ আধা ডাঙায় জলের 'পরে আধা,
সারারাত্রি গুঁড়িতে তার পান্‌সি রইবে বাঁধা।

তখনো সেই বাজবে কানে যখন যুগান্তর—
'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা, মধ্যিখানে চর।'

আলমোড়া
২৫ মে ১৯৩৭

চলতি ছবি

রোদ্দুরেতে ঝাপসা দেখায় ওই-যে দূরের গ্রাম
যেমন ঝাপসা না-জানা ওর নাম।
পাশ দিয়ে যাই উড়িয়ে ধূলি, শুধু নিমেষ-তরে
চলতি ছবি পড়ে চোখের 'পরে।

দেখে গেলেম গ্রামের মেয়ে কলসি-মাথায়-ধরা,
রঙিন-শাড়ি-পরা ;
দেখে গেলেম পথের ধারে ব্যাবসা চালায় মুদি ;
দেখে গেলেম নতুন বধূ আধেক দুয়ার রুধি
ঘোমটা থেকে ফাঁক করে তার কালোচোখের কোণা
দেখছে চেয়ে পথের আনাগোনা।
বাঁধানো বট-গাছের তলায় পড়তি রোদের বেলায়
গ্রামের ক'জন মাতব্বরে মগ্ন তাসের খেলায়।
এইটুকুতে চোখ বুলিয়ে আবার চলি ছুটে,
এক মুহূর্তে গ্রামের ছবি ঝাপসা হয়ে উঠে।

ওই না-জানা গ্রামের প্রান্তে সকালবেলায় পুবে
সূর্য ওঠে, সন্ধেবেলায় পশ্চিমে যায় ডুবে।
দিনের সকল কাজে,
স্বপ্ন-দেখা রাতের নিদ্রামাঝে,
ওই ঘরে, ওই মাঠে,
ওইখানে জল-আনার পথে ভিজে পায়ের ঘাটে,
পাখি-ডাকা ওই গ্রামেরই প্রান্তে,
ওই গ্রামেরই দিনের অন্তে স্তিমিতদীপ রাতে
তরঙ্গিত দুঃখসুখের নিত্য ওঠা-নাবা—
কোনোটা বা গোপন মনে, বাইরে কোনোটা বা।

তারা যদি তুলত ধ্বনি, তাদের দীপ্ত শিখা
ওই আকাশে লিখত যদি লিখা,
রাত্রিদিনকে-কাঁদিয়ে-তোলা ব্যাকুল প্রাণের ব্যথা
পেত যদি ভাষার উদ্‌বেলতা,
তবে হোথায় দেখা দিত পাথর-ভাঙা স্রোতে
মানবচিত্ত-তুঙ্গশিখর হতে
সাগর-খোঁজা নির্ঝর সেই, গর্জিয়া নর্তিয়া
ছুটছে যাহা নিত্যকালের বক্ষে আবর্তিয়া
কান্নাহাসির পাকে—
তাহা হলে তেমনি করেই দেখে নিতেম তাকে
চমক লেগে হঠাৎ পথিক দেখে যেমন ক'রে
নায়েগারার জলপ্রপাত অবাক দৃষ্টি ভ'রে।

যুদ্ধ লাগল স্পেনে;
চলছে দারুণ ভ্রাতৃহত্যা শতঘ্নীবাণ হেনে।
সংবাদ তার মুখর হল দেশ-মহাদেশ জুড়ে,
সংবাদ তার বেড়ায় উড়ে উড়ে
দিকে দিকে যন্ত্রগরুড়রথে
উদয়রবির পথ পেরিয়ে অস্তরবির পথে।
কিন্তু যাদের নাই কোনো সংবাদ,
কণ্ঠে যাদের নাইকো সিংহনাদ,
সেই-যে লক্ষ-কোটি মানুষ কেউ কালো কেউ ধলো,
তাদের বাণী কে শুনছে আজ বলো।
তাদের চিত্তমহাসাগর উদ্দাম উত্তাল
মগ্ন করে অন্তবিহীন কাল;
ওই তো তাহা সম্মুখেতেই, চার দিকে বিস্তৃত
পৃথ্বীজোড়া মহাতুফান, তবু দোলায় নি তো
তাহারই মাঝখানে-বসা আমার চিত্তখানি।
এই প্রকাণ্ড জীবননাট্যে কে দিয়েছে টানি
প্রকাণ্ড এক অটল যবনিকা।

ওদের আপন ক্ষুদ্র প্রাণের শিখা
যে আলো দেয় একা,
পূর্ণ ইতিহাসের মূর্তি যায় না তাহে দেখা।

এই পৃথিবীর প্রান্ত হতে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি
জেনেছে আজ তারার বক্ষে উজ্জ্বালিত সৃষ্টি
উন্মথিত বহ্নিসিন্ধু-প্লাবননির্ঝরে
কোটিযোজন দূরত্বেরে নিত্য লেহন করে।
কিন্তু এই-যে এই মুহূর্তে বেদন-হোমানল
আলোড়িছে বিপুল চিত্ততল
বিশ্বধারায় দেশে-দেশান্তরে
লক্ষ লক্ষ ঘরে—
আলোক তাহার, দাহন তাহার, তাহার প্রদক্ষিণ
যে অদৃশ্য কেন্দ্র ঘিরে চলছে রাত্রিদিন
তাহা মর্তজনের কাছে
শান্ত হয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে।
যেমন শান্ত যেমন স্তব্ধ দেখায় মুগ্ধ চোখে
বিরামহীন জ্যোতির ঝঞ্ঝা নক্ষত্র-আলোকে।

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৪৪

ঘরছাড়া

তখন একটা রাত— উঠেছে সে তড়বড়ি,
কাঁচা ঘুম ভেঙে। শিয়রেতে ঘড়ি
কর্কশ সংকেত দিল নির্মম ধ্বনিতে।
অঘ্রানের শীতে
এ বাসার মেয়াদের শেষে
যেতে হবে আত্মীয়পরশহীন দেশে

ক্ষমাহীন কর্তব্যের ডাকে।
পিছে পড়ে থাকে
এবারের মতো
ত্যাগযোগ্য গৃহসজ্জা যত।
জরাগ্রস্ত তক্তপোশ কালিমাখা-শতরঞ্চ-পাতা;
আরামকেদারা ভাঙা-হাতা;
পাশের শোবার ঘরে
হেলে-পড়া টিপয়ের 'পরে
পুরোনো আয়না দাগ-ধরা;
পোকা-কাটা হিসাবের খাতা-ভরা
কাঠের সিন্দুক এক ধারে;
দেয়ালে-ঠেসান-দেওয়া সারে সারে
বহু বৎসরের পাঁজি;
কুলুঙ্গিতে অনাদৃত পূজার ফুলের জীর্ণ সাজি।
প্রদীপের স্তিমিত শিখায়
দেখা যায়,
ছায়াতে জড়িত তারা
স্তম্ভিত রয়েছে অর্থহারা।

ট্যাক্সি এল দ্বারে, দিল সাড়া
হুংকারপরুষরবে। নিদ্রায় গম্ভীর পাড়া
রহে উদাসীন।
প্রহরীশালায় দূরে বাজে সাড়ে-তিন।

শূন্যপানে চক্ষু মেলি
দীর্ঘশ্বাস ফেলি
দূরযাত্রী নাম নিল দেবতার,
তালা দিয়ে রুধিল দুয়ার।
টেনে নিয়ে অনিচ্ছুক দেহটিরে
দাঁড়ালো বাহিরে।

উর্ধ্বে কালো আকাশের ফাঁকা
ঝাঁট দিয়ে চলে গেল বাদুড়ের পাখা।
যেন সে নির্মম
অনিশ্চিত-পানে-ধাওয়া অদৃষ্টের প্রেতচ্ছায়াসম।
বৃদ্ধবট মন্দিরের ধারে,
অজগর-অন্ধকার গিলিয়াছে তারে।
সদ্য-মাটি-কাটা পুকুরের
পাড়ি-ধারে বাসা বাঁধা মজুরের
খেজুরের পাতা-ছাওয়া— ক্ষীণ আলো করে মিট্‌মিট্‌,
পাশে ভেঙে-পড়া পাঁজা। তলায় ছড়ানো তার ইঁট।
রজনীর মসীলিপ্তিমাঝে
লুপ্তরেখা সংসারের ছবি— ধান-কাটা কাজে
সারাবেলা চাষীর ব্যস্ততা;
গলা-ধরাধরি কথা
মেয়েদের; ছুটি-পাওয়া
ছেলেদের ধেয়ে যাওয়া
হৈহৈ রবে; হাটবারে ভোরবেলা
বস্তা-বহা গোরুটাকে তাড়া দিয়ে ঠেলা;
আঁকড়িয়া মহিষের গলা
ও পারে মাঠের পানে রাখাল ছেলের ভেসে চলা।
নিত্যজানা সংসারের প্রাণলীলা না উঠিতে ফুটে
যাত্রী লয়ে অন্ধকারে গাড়ি যায় ছুটে।

যেতে যেতে পথপাশে
পানাপুকুরের গন্ধ আসে,
সেই গন্ধে পায় মন
বহুদিনরজনীর সকরুণ স্নিগ্ধ আলিঙ্গন।
আঁকাবাঁকা গলি
রেলের স্টেশনপথে গেছে চলি;

দুই পাশে বাসা সারি সারি ;
নরনারী
যে যাহার ঘরে
রহিল আরামশয্যা 'পরে।
নিবিড়-আঁধার-ঢালা আমবাগানের ফাঁকে
অসীমের টিকা দিয়া বরণ করিয়া শুক্লতাকে
শুকতারা দিল দেখা।
পথিক চলিল একা
অচেতন অসংখ্যের মাঝে।
সাথে সাথে জনশূন্য পথ দিয়ে বাজে
রথের চাকার শব্দ হৃদয়বিহীন ব্যস্ত স্বরে
দূর হতে দূরে।

শ্রীনিকেতন
২২ নভেম্বর ১৯৩৬

জন্মদিন

দৃষ্টিজালে জড়ায় ওকে হাজারখানা চোখ,
ধ্বনির ঝড়ে বিপন্ন ঐ লোক।
জন্মদিনের মুখর তিথি যারা ভুলেই থাকে,
দোহাই ওগো, তাদের দলে লও এ মানুষটাকে—
সজনে পাতার মতো যাদের হালকা পরিচয়,
দুলুক খসুক শব্দ নাহি হয়।

সবার মাঝে পৃথক ও যে ভিড়ের কারাগারে
খ্যাতি-বেড়ির নিরন্ত ঝংকারে।
সবাই মিলে নানা রঙে রঙিন করছে ওরে,
নিলাজ মঞ্চে রাখছে তুলে ধরে,
আঙুল তুলে দেখাচ্ছে দিনরাত ;
লুকোয় কোথা ভেবে না পায়, আড়াল ভূমিসাৎ।

দাও-না ছেড়ে ওকে
স্নিগ্ধ-আলো শ্যামল-ছায়া বিরল-কথার লোকে,
বেড়াবিহীন বিরাট ধূলি-'পর,
সেই যেখানে মহাশিশুর আদিম খেলাঘর।

ভোরবেলাকার পাখির ডাকে প্রথম খেয়া এসে
ঠেকল যখন সব-প্রথমের চেনাশোনার দেশে,
নামল ঘাটে যখন তারে সাজ রাখে নি ঢেকে,
ছুটির আলো নগ্ন গায়ে লাগল আকাশ থেকে—
যেমন করে লাগে তরীর পালে,
যেমন লাগে অশোক গাছের কচি পাতার ডালে।
নাম ভোলা ফুল ফুটল ঘাসে ঘাসে
সেই প্রভাতের সহজ অবকাশে।
ছুটির যজ্ঞে পুষ্পহোমে জাগল বকুলশাখা,
ছুটির শূন্যে ফাগুনবেলা মেলল সোনার পাখা।

ছুটির কোণে গোপনে তার নাম
আচম্‌কা সেই পেয়েছিল মিষ্টিসুরের দাম;
কানে কানে সে নাম ডাকার ব্যথা উদাস করে
চৈত্রদিনের স্তব্ধ দুইপ্রহরে।
আজ সবুজ এই বনের পাতায় আলোর ঝিকিমিকি
সেই নিমেষের তারিখ দিল লিখি।

তাহারে ডাক দিয়েছিল পদ্মানদীর ধারা,
কাঁপন-লাগা বেণুর শিরে দেখেছে শুকতারা;
কাজল-কালো মেঘের পুঞ্জ সজল সমীরণে
নীল ছায়াটি বিছিয়েছিল তটের বনে বনে;
ও দেখেছে গ্রামের বাঁকা বাটে
কাঁখে কলস মুখর মেয়ে চলে স্নানের ঘাটে;

সর্ষেতিসির খেতে
দুইরঙা সুর মিলেছিল অবাক আকাশেতে;
তাই দেখেছে চেয়ে চেয়ে অস্তরবির রাগে—
বলেছিল, এই তো ভালো লাগে।
সেই-যে ভালো-লাগাটি তার যাক সে রেখে পিছে,
কীর্তি যা সে গেঁথেছিল হয় যদি হোক মিছে,
না যদি রয় নাই রহিল নাম—
এই মাটিতে রইল তাহার বিস্মিত প্রণাম।

আলমোড়া
২২ বৈশাখ ১৩৪৪

প্রাণের দান

অব্যক্তের অন্তঃপুরে উঠেছিলে জেগে,
তার পর হতে তরু, কী ছেলেখেলায়
নিজেরে ঝরায়ে চল চলাহীন বেগে,
পাওয়া দেওয়া দুই তব হেলায়-ফেলায়।
প্রাণের উৎসাহ নাহি পায় সীমা খুঁজি
মর্মরিত মাধুর্যের সৌরভসম্পদে।
মৃত্যুর উৎসাহ সেও অফুরন্ত বুঝি
জীবনের বিত্তনাশ করে পদে পদে।
আপনার সার্থকতা আপনার প্রতি
আনন্দিত ঔদাসীন্যে; পাও কোন্ সুধা
রিক্ততায়; পরিতাপহীন আত্মক্ষতি
মিটায় জীবনযজ্ঞে মরণের ক্ষুধা।
এমনি মৃত্যুর সাথে হোক মোর চেনা,
প্রাণেরে সহজে তার করিব খেলেনা।

শান্তিনিকেতন
১ মার্চ ১৯৩৮

নিঃশেষ

শরৎবেলার বিত্তবিহীন মেঘ
হারায়েছে তার ধারাবর্ষণ-বেগ ;
ক্লান্তি-আলসে যাত্রার পথে দিগন্ত আছে চুমি,
অঞ্জলি তব বৃথা তুলিয়াছ হে তরুণী বনভূমি।
শান্ত হয়েছে দিক্‌হারা তার ঝড়ের মত্ত লীলা,
বিদ্যুৎপ্রিয়া স্মৃতির গভীরে হল অন্তঃশীলা।
সময় এসেছে, নির্জনগিরিশিরে
কালিমা ঘুচায়ে শুভ্র তুষারে মিশে যাবে ধীরে ধীরে।
অস্তসাগরপশ্চিমপারে সন্ধ্যা নামিবে যবে
সপ্তঋষির নীরব বীণার রাগিণীতে লীন হবে।
তবু যদি চাও শেষদান তার পেতে,
ওই দেখো ভরা খেতে
পাকা ফসলের দোদুল্য অঞ্চলে
নিঃশেষে তার সোনার অর্ঘ্য রেখে গেছে ধরাতলে।
সে কথা স্মরিয়ো, চলে যেতে দিয়ো তারে—
লজ্জা দিয়ো না নিঃস্ব দিনের নিঠুর রিক্ততারে।

শান্তিনিকেতন
৮।৪।৩৮

প্রতীক্ষা

অসীম আকাশে মহাতপস্বী
মহাকাল আছে জাগি।
আজিও যাহারে কেহ নাহি জানে,
দেয় নি যে দেখা আজো কোনোখানে,
সেই অভাবিত কল্পনাতীত
আবির্ভাবের লাগি
মহাকাল আছে জাগি।

বাতাসে আকাশে যে নবরাগিণী
জগতে কোথাও কখনো জাগে নি
রহস্যলোকে তারি গান সাধা
চলে অনাহত রবে।
ভেঙে যাবে বাঁধ স্বর্গপুরের,
প্লাবন বহিবে নূতন সুরের,
বধির যুগের প্রাচীন প্রাচীর
ভেসে চলে যাবে তবে।

যার পরিচয় কারো মনে নাই,
যার নাম কভু কেহ শোনে নাই,
না জেনে নিখিল পড়ে আছে পথে
যার দরশন মাগি—
তারি সত্যের অপরূপ রসে
চমকিবে মন অদ্ভুত পরশে,
মৃত পুরাতন জড় আবরণ
মুহূর্তে যাবে ভাগি,
যুগ যুগ ধরি তাহার আশায়
মহাকাল আছে জাগি।

শান্তিনিকেতন
৪।১০।৩৬

পরিচয়

একদিন তরীখানা থেমেছিল এই ঘাটে লেগে,
বসন্তের নূতন হাওয়ার বেগে।
তোমরা শুধায়েছিলে মোরে ডাকি
পরিচয় কোনো আছে নাকি,
যাবে কোন্‌খানে।
আমি শুধু বলেছি, কে জানে।

নদীতে লাগিল দোলা, বাঁধনে পড়িল টান,
একা বসে গাহিলাম যৌবনের বেদনার গান।
সেই গান শুনি
কুসুমিত তরুতলে তরুণতরুণী
তুলিল অশোক,
মোর হাতে দিয়ে তারা কহিল, 'এ আমাদেরই লোক।'
আর কিছু নয়,
সে মোর প্রথম পরিচয়।

তার পরে জোয়ারের বেলা
সাঙ্গ হল, সাঙ্গ হল তরঙ্গের খেলা;
কোকিলের ক্লান্ত গানে
বিস্মৃত দিনের কথা অকস্মাৎ যেন মনে আনে;
কনকচাঁপার দল পড়ে ঝুরে,
ভেসে যায় দূরে—
ফাল্গুনের উৎসবরাতির
নিমন্ত্রণলিখন-পাঁতির
ছিন্ন অংশ তারা
অর্থহারা।

ভাঁটার গভীর টানে
তরীখানা ভেসে যায় সমুদ্রের পানে।
নূতন কালের নব যাত্রী ছেলেমেয়ে
শুধাইছে দূর হতে চেয়ে,
'সন্ধ্যার তারার দিকে
বহিয়া চলেছে তরণী কে।'

সেতারেতে বাঁধিলাম তার,
গাহিলাম আরবার—

মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক,
আমি তোমাদেরই লোক
আর কিছু নয়,
এই হোক শেষ পরিচয়।

শান্তিনিকেতন
১৩ মাঘ ১৩৪৩

পালের নৌকা

তীরের পানে চেয়ে থাকি পালের নৌকা ছাড়ি—
গাছের পরে গাছ ছুটে যায়, বাড়ির পরে বাড়ি।
দক্ষিণে ও বামে
গ্রামের পরে গ্রামে
ঘাটের পরে ঘাটগুলো সব পিছিয়ে চলে যায়
ভোজবাজিরই প্রায়।

নাইছে যারা তারা যেন সবাই মরীচিকা
যেমনি চোখে ছবি আঁকে মোছে ছবির লিখা।
আমি যেন চেপে আছি মহাকালের তরী,
দেখছি চেয়ে যে খেলা হয় যুগযুগান্ত ধরি।
পরিচয়ের যেমন শুরু তেমনি তাহার শেষ—
সামনে দেখা দেয়, পিছনে অমনি নিরুদ্দেশ।
ভেবেছিলুম ভুলব না যা তাও যাচ্ছি ভুলে,
পিছু-দেখার ঘুচিয়ে বেদন চলছি নতুন কূলে।

পেতে পেতেই ছাড়া
দিনরাত্তির মনটাকে দেয় নাড়া।
এই নাড়াতেই লাগছে খুশি, লাগছে ব্যথা কভু,
বেঁচে-থাকার চলতি খেলা লাগছে ভালোই তবু।

বারেক ফেলা, বারেক তোলা, ফেলতে ফেলতে যাওয়া—
এ'কেই বলে জীবনতরীর চলন্ত দাঁড় বাওয়া।
তাহার পরে রাত্রি আসে, দাঁড় টানা যায় থামি,
কেউ কারেও দেখতে না পায় আঁধারতীর্থগামী।
ভাঁটার স্রোতে ভাসে তরী, অকূলে হয় হারা—
যে সমুদ্রে অস্তে নামে কালপুরুষের তারা।

আলমোড়া
৮।৬।৩৭

চলাচল

ওরা তো সব পথের মানুষ, তুমি পথের ধারের ;
ওরা কাজে চলছে ছুটে, তুমি কাজের পারের।
বয়স তোমায় অনেক দিল, অনেক নিল কেড়ে ;
রইল যত তাহার চেয়ে অধিক গেল ছেড়ে।
চিহ্ন পড়ে, তারে ঢাকে নতুন চিহ্ন এসে ;
কোনো চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে রয় না অবশেষে।
যেথায় ছিল চেনা লোকের নীড়
অনায়াসে জমল সেথায় অচেনাদের ভিড়।
তুমি শান্ত হাসি হাস যখন ওরা ভাবে
ওদের বেলায় অক্ষত দিন এমনি করেই যাবে।

আলমোড়া
২৯ মে ১৯৩৭

মায়া

করেছিনু যত সুরের সাধন
নতুন গানে,
খসে পড়ে তার স্মৃতির বাঁধন
আলগা টানে।

পুরানো অতীতে শেষে মিলে যায়—
বেড়ায় ঘুরে,
প্রেতের মতন জাগায় রাত্রি
মায়ার সুরে।

২

ধরা নাহি দেয় কণ্ঠ এড়ায়
যে সুরখানি
স্বপ্নগহনে লুকিয়ে বেড়ায়
তাহার বাণী।
বুকের কাঁপনে নীরবে দোলে সে
ভিতরপানে,
মায়ার রাগিণী ধ্বনিয়া তোলে সে
সকলখানে।

৩

দিবস ফুরায়, কোথা চলে যায়
মর্তকায়া—
বাঁধা পড়ে থাকে ছবির রেখায়
ছায়ার ছায়া।
নিত্য ভাবিয়া করি যার সেবা
দেখিতে দেখিতে কোথা যায় কেবা,
স্বপ্ন আসিয়া রচি দেয় তার
রূপের মায়া।

[শান্তিনিকেতন
অক্টোবর ১৯৩৭]

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

গগনেন্দ্রনাথ,

রেখার রঙের তীর হতে তীরে
ফিরেছিল তব মন,
রূপের গভীরে হয়েছিল নিমগন।
গেল চলি তব জীবনের তরী
রেখার সীমার পার
অরূপ ছবির রহস্যমাঝে
অমল শুভ্রতার।

শান্তিনিকেতন
১২।৮।৩৮

ছুটি

আমার ছুটি আসছে কাছে সকল ছুটির শেষ,
ছবি একটি জাগছে মনে— ছুটির মহাদেশ।
আকাশ আছে স্তব্ধ সেথায়, একটি সুরের ধারা
অসীম নীরবতার কানে বাজাচ্ছে একতারা।

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

—

নাটক ও প্রহসন

নবীন

নবীন

প্রথম পর্ব

বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী,
দিকপ্রান্তে, বনপ্রান্তে,
শ্যাম প্রান্তরে, আম্রছায়ে,
সরোবরতীরে, নদীনীরে,
নীল আকাশে, মলয়বাতাসে
ব্যাপিল অনন্ত তব মাধুরী।
নগরে গ্রামে কাননে,
দিনে নিশীথে,
পিকসংগীতে নৃত্যগীতকলনে
বিশ্ব আনন্দিত—
ভবনে ভবনে
বীণাতান রণ-রণ ঝংকৃত।
মধুমদমোদিত হৃদয়ে হৃদয়ে রে
নবপ্রাণ উচ্ছ্বসিল আজি,
বিচলিত চিত উচ্ছলি উন্মাদনা
ঝন-ঝন ঝনিল মঞ্জীরে মঞ্জীরে ॥

শুনেছ অলিমালা, ওরা ধিক্কার দিচ্ছে ওই ও পাড়ার মল্লের দল ; তোমাদের চাপল্য তাদের ভালো লাগছে না। শৈবালগুচ্ছবিলম্বী ভারী ভারী সব কালো কালো পাথরগুলোর মতো তমিস্রগহন গাম্ভীর্যে ওরা গুহাদ্বারে ভ্রূকুটি পুঞ্জিত করে বসে আছে। কলহাস্যচঞ্চলা নির্ঝরিণী ওদের নিষেধ লঙ্ঘন করেই বেরিয়ে পড়ুক এই আনন্দময় বিশ্বের আনন্দপ্রবাহ দিকে দিগন্তে বইয়ে দিতে, নাচে গানে কল্লোলে হিল্লোলে ; চূর্ণ চূর্ণ সূর্যের আলো উদ্‌বেল তরঙ্গভঙ্গের অঞ্জলিবিক্ষেপে ছড়িয়ে ছড়িয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে। এই আনন্দ-আবেগের অন্তরে অন্তরে যে অক্ষয় শৌর্যের

অনুপ্রেরণা আছে সেটা ও পাড়ার শাস্ত্রবচনের বেড়া এড়িয়ে চলে গেল। ভয় কোরো না তোমরা, যে রসরাজের নিমন্ত্রণে এসেছ তাঁর প্রসন্নতা যেমন আজ নেমেছে আমাদের নিকুঞ্জে ওই অন্তঃস্মিত গন্ধরাজমুকুলের প্রচ্ছন্ন গন্ধরেণুতে, তেমনি নামুক তোমাদের কণ্ঠে, তোমাদের দেহলতায় নিরুদ্ধনটনোৎসাহে। সেই যিনি সুরের গুরু, তাঁরই চরণে তোমাদের নৃত্যের নৈবেদ্য আজ নির্ঝরিত করে দাও।

সুরের গুরু, দাও গো সুরের দীক্ষা—
মোরা সুরের কাঙাল, এই আমাদের ভিক্ষা।
মন্দাকিনীর ধারা
উষার শুকতারা
কনকচাঁপা কানে কানে যে সুর পেল শিক্ষা।

তোমার সুরে ভরিয়ে নিয়ে চিত্ত
যাব যেথায় বেসুর বাজে নিত্য।
কোলাহলের বেগে
ঘূর্ণি উঠে জেগে,
নিয়ো তুমি আমার বীণার সেইখানেই পরীক্ষা॥

—

তুমি সুন্দর যৌবনঘন,
রসময় তব মূর্তি,
দৈন্যভরণ বৈভব তব
অপচয়পরিপূর্তি।
নৃত্য গীত কাব্য ছন্দ
কলগুঞ্জন বর্ণ গন্ধ
মরণহীন চিরনবীন
তব মহিমাস্ফূর্তি॥

ও দিকে আধুনিক আমলের বারোয়ারির দল বলছে, উৎসবে নতুন কিছু চাই। কোণা-কাটা ত্যাড়াবাঁকা ধুম্‌ধাম্‌-করা কড়া-ফ্যাশানের আহেলা বেলাতি নতুনকে না হলে তাদের শুকনো মেজাজে জোর পৌঁচচ্ছে না। কিন্তু, যাঁদের রসবেদনা আছে

তাঁরা কানে কানে বলে গেলেন, আমরা নতুন চাই নে, আমরা চাই নবীনকে। এঁরা বলেন, মাধবী বছরে বছরে বাঁকা করে খোঁচা মেরে সাজ বদলায় না, অশোক পলাশ একই পুরাতন রঙে নিঃসংকোচে বারে বারে রঙিন। চিরপুরাতনী ধরণী চিরপুরাতন নবীনের দিকে তাকিয়ে বলছে, 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল!' সেই নিত্যনন্দিত সহজশোভন নবীনের উদ্দেশে তোমাদের আত্মনিবেদনের গান শুরু করে দাও।

আন্ গো তোরা কার কী আছে,
দেবার হাওয়া বইল দিকে দিগন্তরে—
এই সুসময় ফুরায় পাছে।
কুঞ্জবনের অঞ্জলি-যে ছাপিয়ে পড়ে,
পলাশকানন ধৈর্য হারায় রঙের ঝড়ে,
বেণুর শাখা তালে মাতাল পাতার নাচে।

প্রজাপতি রঙ ভাসালো নীলাম্বরে,
মৌমাছিরা ধ্বনি উড়ায় বাতাস-'পরে।
দখিন হাওয়া হেঁকে বেড়ায় 'জাগো জাগো',
দোয়েল কোয়েল গানের বিরাম জানে না গো,
রক্তরঙের জাগল প্রলাপ অশোক গাছে॥

আজ বরবর্ণিনী অশোকমঞ্জরী তার চেলাঞ্চল-আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আকাশে রক্তরঙের কিঙ্কিণীঝংকার বিকীর্ণ করে দিলে; কুঞ্জবনের শিরীষবীথিকায় আজ সৌরভের অপরিমেয় দাক্ষিণ্য। ললিতিকা, আমরাও তো শূন্য হাতে আসি নি। মাধুর্যের অতল সমুদ্রে আজ দানের জোয়ার লেগেছে, আমরাও ঘাটে ঘাটে দানের বোঝাই তরীর রশি খসিয়ে দিয়েছি। যে নাচের তরঙ্গে তারা ভেসে পড়ল সেই নাচের ছন্দটা, কিশোর, দেখিয়ে দাও।

ফাগুন, তোমার হাওয়ায় হাওয়ায়
করেছি-যে দান
আমার আপনহারা প্রাণ,
আমার বাঁধন-ছেঁড়া প্রাণ।

তোমার অশোকে কিংশুকে
অলক্ষ্য রঙ লাগল আমার অকারণের সুখে,
তোমার ঝাউয়ের দোলে
মর্মরিয়া ওঠে আমার দুঃখরাতের গান।

পূর্ণিমাসন্ধ্যায়
তোমার রজনীগন্ধায়
রূপসাগরের পারের পানে উদাসী মন ধায়।
তোমার প্রজাপতির পাখা
আমার আকাশ-চাওয়া মুগ্ধচোখের রঙিন স্বপন -মাখা—
তোমার চাঁদের আলোয়
মিলায় আমার দুঃখসুখের সকল অবসান॥

ভরে দাও, একেবারে ভরে দাও গো, 'প্যালা ভর ভর লায়ী রে'। পূর্ণের উৎসবে দেওয়া আর পাওয়া, একেবারে একই কথা। ঝর্নার এক প্রান্তে কেবলই পাওয়া অভ্রভেদী শিখরের দিক থেকে, আর-এক প্রান্তে কেবলই দেওয়া অতলস্পর্শ সমুদ্রের দিক-পানে। এই ধারার মাঝখানে শেষে বিচ্ছেদ নেই। অন্তহীন পাওয়া আর অন্তহীন দেওয়ার নিরবচ্ছিন্ন আবর্তন এই বিশ্ব। আমাদের গানেও সেই আবৃত্তি, কেননা, গান তো আমরা শুধু কেবল গাই নে, গান-যে আমরা দিই, তাই গান আমরা পাই।

গানের ডালি ভরে দে গো উষার কোলে—
আয় গো তোরা, আয় গো তোরা, আয় গো চলে।
চাঁপার কলি চাঁপার গাছে
সুরের আশায় চেয়ে আছে,
কান পেতেছে নতুন পাতা গাইবি ব'লে।

কমলবরন গগনমাঝে
কমলচরণ ওই বিরাজে।
ওইখানে তোর সুর ভেসে যাক,
নবীন প্রাণের ওই দেশে যাক,
ওই যেখানে সোনার আলোর দুয়ার খোলে॥

মধুরিমা, দেখো দেখো, চন্দ্রমা তিথির পর তিথি পেরিয়ে আজ তার উৎসবের তরণী পূর্ণিমার ঘাটে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। নন্দনবন থেকে কোমল আলোর শুভ্র সুকুমার পারিজাতস্তবকে তার ডালি ভরে আনল। সেই ডালিখানিকে ওই কোলে নিয়ে বসে আছে কোন্ মাধুরীর মহাশ্বেতা। রাজহংসের ডানার মতো তার লঘু মেঘের শুভ্র বসনাঞ্চল স্রস্ত হয়ে পড়েছে ওই আকাশে, আর তার বীণার রুপোর তন্তুগুলিতে অলস অঙ্গুলিক্ষেপে থেকে থেকে গুঞ্জরিত হচ্ছে বেহাগের তান।

নিবিড় অমা-তিমির হতে
বাহির হল জোয়ারস্রোতে
শুক্লরাতে চাঁদের তরণী।
ভরিল ভরা অরূপ ফুলে,
সাজালো ডালা অমরাকুলে
আলোর মালা চামেলিবরণী
শুক্লরাতে চাঁদের তরণী।

তিথির পরে তিথির ঘাটে
আসিছে তরী দোলের নাটে,
নীরবে হাসে স্বপনে ধরণী।
উৎসবের পসরা নিয়ে
পূর্ণিমার কূলেতে কি এ
ভিড়িল শেষে তন্দ্রাহরণী
শুক্লরাতে চাঁদের তরণী॥

দোল লেগেছে এবার। পাওয়া আর না-পাওয়ার মাঝখানে এই দোল। এক প্রান্তে মিলন আর-এক প্রান্তে বিরহ, এই দুই প্রান্ত স্পর্শ করে করে দুলছে বিশ্বের হৃদয়। পরিপূর্ণ আর অপূর্ণের মাঝখানে এই দোলন। আলোতে ছায়াতে ঠেকতে ঠেকতে রূপ জাগছে জীবন থেকে মরণে, বাহির থেকে অন্তরে। এই ছন্দটি বাঁচিয়ে যে চলতে চায় সে তো যাওয়া-আসার দ্বার খোলা রেখে দেয়। কিন্তু, ওই-যে হিসাবি মানুষটা দ্বারে শিকল দিয়ে আঁক পাড়ছে তার শিকল-নাড়া দাও তোমরা। ঘরের লোককে অন্তত আজ একদিনের মতো ঘরছাড়া করো।

ওরে গৃহবাসী, তোরা খোল্ দ্বার খোল্,
লাগল-যে দোল।
স্থলে জলে বনতলে
লাগল-যে দোল।
খোল্ দ্বার খোল্।

রাঙা হাসি রাশি রাশি অশোকে পলাশে,
রাঙা নেশা মেঘে মেশা প্রভাত-আকাশে,
নবীন পাতায় লাগে রাঙা হিল্লোল।
খোল্ দ্বার খোল্।

বেণুবন মর্মরে দখিনবাতাসে,
প্রজাপতি দোলে ঘাসে ঘাসে—
মউমাছি ফিরে যাচি ফুলের দখিনা,
পাখায় বাজায় তার ভিখারির বীণা,
মাধবীবিতানে বায়ু গন্ধে বিভোল।
খোল্ দ্বার খোল্॥

—

আমি সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়,
আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি পথে যে জন ভাসায়।
যে জন দেয় না দেখা, যায় যে দেখে,
ভালোবাসে আড়াল থেকে,
আমার মন মজেছে সেই গভীরের
গোপন ভালোবাসায়॥

সর্বনাশের ব্রত যাদের তাদের ভয় ভাঙিয়ে দাও। কারো কারো যে দ্বিধা ঘোচে না। ওই দেখো-না পাতার আড়ালে মাধবী। ওই অবগুণ্ঠিতাদের সাহস দাও। শুনছ না বকুলগুলো ঝরতে ঝরতে বলছে 'যা হয় তা হোক গে', আমের মুকুল বলে উঠছে 'কিছু হাতে রাখব না'। যারা কৃপণতা করবে তাদের সময় বয়ে যাবে।

হে মাধবী, দ্বিধা কেন— আসিবে কি ফিরিবে কি—
আঙিনাতে বাহিরিতে মন কেন গেল ঠেকি।
বাতাসে লুকায়ে থেকে
কে-যে তোরে গেছে ডেকে,
পাতায় পাতায় তোরে পত্র সে-যে গেছে লেখি।

কখন্ দখিন হতে কে দিল দুয়ার ঠেলি,
চমকি উঠিল জাগি চামেলি নয়ন মেলি।
বকুল পেয়েছে ছাড়া,
করবী দিয়েছে সাড়া,
শিরীষ শিহরি উঠে দূর হতে কারে দেখি॥

—

তুমি কোন্ ভাঙনের পথে এলে সুপ্ত রাতে,
আমার ভাঙল যা তাই ধন্য হল চরণপাতে।

নন্দিনী, ওই দেখে নাও শিশুর লীলা, ওই-যে কচি কিশলয়—

শ্যামল কোমল চিকন রূপের নবীন শোভা— দেখে যা—
কল-উতরোল চঞ্চলদোল ওই-যে বোবা।

শিশু হয়ে এসেছে চিরনবীন, কিশলয়ে তার ছেলেখেলা জমাবার জন্যে। দোসর হয়ে তার সঙ্গে যোগ দিল ওই সূর্যের আলো, সেও সাজল শিশু, সারাবেলা সে কেবল ঝিকিমিকি করছে। সেই তো তার কলপ্রলাপ। ওদের নাচে নাচে মুখরিত হয়ে উঠল প্রাণগীতিকার প্রথম ধুয়োটি।

ওরা অকারণে চঞ্চল।
ডালে ডালে দোলে বায়ুহিল্লোলে
নবপল্লবদল।
ছড়ায়ে ছড়ায়ে ঝিকিমিকি আলো
দিকে দিকে ওরা কী খেলা খেলালো—
মর্মরতানে প্রাণে ওরা আনে
কৈশোরকোলাহল।

ওরা কান পেতে শোনে গগনে গগনে
নীরবের কানাকানি,
নীলিমার কোন্ বাণী।
ওরা প্রাণঝরনার উচ্ছল ধার
ঝরিয়া ঝরিয়া বহে অনিবার,
চিরতাপসিনী ধরণীর ওরা
শ্যামশিখা হোমানল॥

দীর্ঘ শূন্য পথটাকে এতদিন ঠেকেছিল বড়ো কঠিন, বড়ো নিষ্ঠুর। আজ তাকে প্রণাম। পথিককে সে তো অবশেষে এনে পৌঁছিয়ে দিলে। কিন্তু, ভুলব কেমন করে যে, যে পথ কাছে নিয়ে আসে সেই পথই দূরে নিয়ে যায়— তাই মনে হয়, ঘরের মধ্যে নিশ্চল হয়ে মিলন স্থায়ী হয় না, পথে বেরিয়ে পড়লে তবেই পথিকের সঙ্গে বিচ্ছেদ এড়ানো যায়। তাই আজ পথকেই প্রণাম।

মোর পথিকেরে বুঝি এনেছ এবার
করুণ রঙিন পথ।
এসেছে এসেছে অঙ্গনে, মোর
দুয়ারে লেগেছে রথ।
সে-যে সাগরপারের বাণী
মোর পরানে দিয়েছে আনি,
তার আঁখির তারায় যেন গান গায়
অরণ্য পর্বত।

দুঃখসুখের এপারে ওপারে
দোলায় আমার মন,
কেন অকারণ অশ্রুসলিলে
ভরে যায় দু'নয়ন।
ওগো নিদারুণ পথ, জানি,
জানি, পুন নিয়ে যাবে টানি

তারে, চিরদিন মোর যে দিল ভরিয়া
যাবে সে স্বপনবৎ ॥

—

বাতাসের চলার পথে যে মুকুল পড়ে ঝরে,
তা নিয়ে তোমার লাগি রেখেছি ডালি ভরে।

টুকরো টুকরো সুখদুঃখের মালা গাঁথব— সাতনরী হার পরাব তোমাকে মাধুর্যের মুক্তোগুলি চুনে নিয়ে। ফাগুনের ভরা সাজির উদ্‌বৃত্ত থেকে তুলে নেব বনের মর্মর, বাণীর সূত্রে গেঁথে বেঁধে দেব তোমার মণিবন্ধে। হয়তো আবার আর-বসন্তেও সেই আমার দেওয়া ভূষণ প'রেই তুমি আসবে। আমি থাকব না, কিন্তু কী জানি আমার দানের ভূষণ হয়তো থাকবে তোমার দক্ষিণ হাতে।

ফাগুনের নবীন আনন্দে
গানখানি গাঁথিলাম ছন্দে।
দিল তারে বনবীথি
কোকিলের কলগীতি,
ভরি দিল বকুলের গন্ধে।

মাধবীর মধুময় মন্ত্র
রঙে রঙে রাঙালো দিগন্ত।
বাণী মম নিল তুলি
পলাশের কলিগুলি,
বেঁধে দিল তব মণিবন্ধে ॥

দ্বিতীয় পর্ব

কেন ধরে রাখা, ও-যে যাবে চলে
মিলনলগন গত হলে।
স্বপনশেষে নয়ন মেলো,
নিবু নিবু দীপ নিবায়ে ফেলো,
কী হবে শুকানো ফুলদলে।

এখনো কোকিল ডাকছে, এখনো শিরীষবনের পুষ্পাঞ্জলি উঠছে ভরে ভরে, তবু এই চঞ্চলতার অন্তরে অন্তরে একটা বেদনা শিউরিয়ে উঠল। বিদায়দিনের প্রথম হাওয়া অশথগাছের পাতায় পাতায় ঝর ঝর করে উঠছে। সভার বীণা বুঝি নীরব হবে, দিগন্তে পথের একতারার সুর বাঁধা হচ্ছে— মনে হচ্ছে, যেন বসন্তী রঙ ম্লান হয়ে গেরুয়া রঙে নামল।

চলে যায়, মরি হায়, বসন্তের দিন।
দূর শাখে পিক ডাকে বিরামবিহীন।
অধীর সমীরভরে
উচ্ছ্বসি বকুল ঝরে,
গন্ধসনে হল মন সুদূরে বিলীন।

পুলকিত আম্রবীথি ফাল্গুনেরই তাপে,
মধুকরগুঞ্জরণে ছায়াতল কাঁপে।
কেন জানি অকারণে
সারাবেলা আনমনে
পরানে বাজায় বীণা কে গো উদাসীন॥

—

বিদায় দিয়ো মোরে প্রসন্ন আলোকে,
রাতের কালো আঁধার যেন নামে না ওই চোখে।

হে সুন্দর, যে কবি তোমার অভিনন্দন করতে এসেছিল তার ছুটি মঞ্জুর হল। তার প্রণাম তুমি নাও। তার আপন গানের বন্ধনেই চিরদিন সে বাঁধা রইল তোমার দ্বারে। তার সুরের রাখী তুমি গ্রহণ করেছ আমি জানি; তার পরিচয় রইল তোমার ফুলে ফুলে, তোমার পদপাতকম্পিত শ্যামল শষ্পবীথিকায়।

বসন্তে বসন্তে তোমার কবিরে দাও ডাক—
যায় যদি সে যাক।
রইল তাহার বাণী, রইল ভরা সুরে,
রইবে না সে দূরে—
হৃদয় তাহার কুঞ্জে তোমার
রইবে না নির্বাক্‌।

ছন্দ তাহার রইবে বেঁচে
কিশলয়ের নবীন নাচে নেচে নেচে।
তারে তোমার বীণা যায় না যেন ভুলে,
তোমার ফুলে ফুলে
মধুকরের গুঞ্জরণে বেদনা তার থাক্‌॥

—

তবে শেষ করে দাও শেষ গান,
তার পরে যাই চলে।
তুমি ভুলো না গো এ রজনী
আজ রজনী ভোর হলে।

এর ভয় হয়েছে সব কথা বলা হল না। এ দিকে বসন্তের পালা সাঙ্গ হল। ত্বরা কর্‌ গো, ত্বরা কর্‌— বাতাস তপ্ত হয়ে এল, এই বেলা রিক্ত হবার আগে অঞ্জলি পূর্ণ করে দে— তার পরে আছে করুণ ধূলি তার আঁচল বিছিয়ে।

যখন মল্লিকাবনে প্রথম ধরেছে কলি
তোমার লাগিয়া তখনি বন্ধু,
বেঁধেছিনু অঞ্জলি।
তখনো কুহেলিজালে
সখা, তরুণী উষার ভালে
শিশিরে শিশিরে অরুণমালিকা
উঠিতেছে ছলছলি।

এখনো বনের গান
বন্ধু, হয় নি তো অবসান,
তবু এখনি যাবে কি চলি।
ও মোর করুণ বল্লিকা,
তোর শ্রান্ত মল্লিকা
ঝরো-ঝরো হল, এই বেলা তোর
শেষ কথা দিস বলি॥

'শুকনো পাতা কে যে ছড়ায় ওই দূরে'। বসন্তের ভূমিকায় ওই পাতাগুলি একদিন আগমনীর গানে তাল দিয়েছিল, আজ তারা যাবার পথের ধূলিকে ঢেকে দিল, পায়ে পায়ে প্রণাম করতে লাগল বিদায়পথের পথিককে। নবীনকে সন্ন্যাসীর বেশ পরিয়ে দিয়ে বললে, 'তোমার উদয় সুন্দর, তোমার অস্তও সুন্দর।'

ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে।
অনেক হাসি অনেক অশ্রুজলে
ফাগুন দিল বিদায়মন্ত্র
আমার হিয়াতলে।

ঝরা পাতা গো, বসন্তী রঙ দিয়ে
শেষের বেশে সেজেছ তুমি কি এ!
খেলিলে হোলি ধুলায় ঘাসে ঘাসে
বসন্তের এই চরম ইতিহাসে।
তোমারি মতো আমারো উত্তরী
আগুন রঙে দিয়ো রঙিন করি,
অস্তরবি লাগাক পরশমণি
প্রাণের মম শেষের সম্বলে॥

—

সে-যে কাছে এসে চলে গেল তবু জাগি নি।
কী ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী!

মন ছিল সুপ্ত, কিন্তু দ্বার ছিল খোলা, সেইখান দিয়ে কার নিঃশব্দ চরণের আনা-গোনা। জেগে উঠে দেখি ভুঁইচাঁপা ফুলের ছিন্ন পাপড়ি লুটিয়ে আছে তার যাওয়ার পথে। আর দেখি, ললাটে পরিয়ে দিয়ে গেছে বরণমালা, তার শেষ দান, কিন্তু এ-যে বিরহের মালা।

কখন দিলে পরায়ে
স্বপনে বরণমালা, ব্যথার মালা।
প্রভাতে দেখি জেগে
অরুণ মেঘে
বিদায়বাঁশরি বাজে অশ্রু-গালা।

গোপনে এসে গেলে
দেখি নাই আঁখি মেলে।
আঁধারে দুঃখডোরে
বাঁধিল মোরে,
ভূষণ পরালে বিরহবেদন-ঢালা॥

হে বনস্পতি শাল, অবসানের অবসাদকে তুমি দূর করে দিলে। তোমার অক্লান্ত মঞ্জরীর মধ্যে উৎসবের শেষবেলাকার ঐশ্বর্য, নবীনের শেষ জয়ধ্বনি তোমার বীরকণ্ঠে। অরণ্যভূমির শেষ আনন্দিত বাণী তুমি শুনিয়ে দিলে যাবার পথের পথিককে, বললে 'পুনর্দর্শনায়'। তোমার আনন্দের সাহস বিচ্ছেদের সামনে এসে মাথা তুলে দাঁড়াল।

ক্লান্ত যখন আম্রকলির কাল,
মাধবী ঝরিল ভূমিতলে অবসন্ন,
সৌরভধনে তখন তুমি হে শাল,
বসন্তে করো ধন্য।
সান্ত্বনা মাগি দাঁড়ায় কুঞ্জভূমি
রিক্তবেলায় অঞ্চল যবে শূন্য—
বনসভাতলে সবার ঊর্ধ্বে তুমি,
সব অবসানে তোমার দানের পুণ্য॥

এইবার শেষ দেওয়া-নেওয়া চুকিয়ে দাও। দিয়ে যাও তোমার বাহিরের দান, উত্তরীয়ের সুগন্ধ, বাঁশির গান, আর নিয়ে যাও আমার অন্তরের বেদনা নীরবতার ডালি থেকে।

তুমি কিছু দিয়ে যাও
মোর প্রাণে গোপনে গো।
ফুলের গন্ধে, বাঁশির গানে,
মর্মরমুখরিত পবনে।
তুমি কিছু নিয়ে যাও
বেদনা হতে বেদনে—
যে মোর অশ্রু হাসিতে লীন,
যে বাণী নীরব নয়নে॥

দূরের বাণীকে জাগিয়ে দিয়ে গেল পথিক। এমনি করেই বারে বারে সে কাছের বন্ধন আল্‌গা করে দেয়। একটা অপরিচিত ঠিকানার উদ্দেশ বলে দিয়ে যায় কানে কানে, সাহসের সুর এসে পৌঁছয় বিচ্ছেদসমুদ্রের পরপার থেকে— মন উদাস হয়ে যায়।

বাজে করুণ সুরে (হায় দূরে)
তব চরণতলচুম্বিত পন্থবীণা।
মম পান্থচিত চঞ্চল
জানি না কী উদ্দেশে।

যূথীগন্ধ অশান্ত সমীরে
ধায় উতলা উচ্ছ্বাসে,
তেমনি চিত্ত উদাসী রে
নিদারুণ বিচ্ছেদের নিশীথে

৩০ ফাল্গুন ১৩৩৭

—

পরিশিষ্ট

প্রথম অভিনয়কালে 'নবীন' যে আকারে মুদ্রিত হইয়াছিল তাহা এই পরিশিষ্টে সংকলিত হইল। যে গানগুলি প্রচলিত 'নবীন' গ্রন্থে বা অন্য গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে তাহাদের প্রথম ছত্রই কেবল দেওয়া গেল। 'হৃদয় আমার, ওই বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় আসে' গানের পাঠান্তর 'হৃদয় আমার, ওই বুঝি তোর ফাল্গুনী ঢেউ আসে' গানটি পুনর্মুদ্রিত হইল। 'বেদনা কী ভাষায় রে' প্রচলিত গ্রন্থে বর্জিত হইলেও, প্রথম প্রকাশিত নবীনের অন্তর্ভুক্ত নবরচিত গান হিসাবে সম্পূর্ণ উদ্‌ধৃত হইল।

নবীন

প্রথম পর্ব

বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী

শুনেছ অলিমালা, ওরা বড়ো ধিক্কার দিচ্ছে, ওই ওপাড়ার মল্লের দল, উৎসবে তোমাদের চাপল্য ওদের ভালো লাগছে না। শৈবালপুঞ্জিত গুহাদ্বারে কালো কালো শিলাখণ্ডের মতো তমিস্রগহন গাম্ভীর্যে ওরা নিশ্চল হয়ে ভ্রূকুটি করছে, নির্ঝরিণী ওদের সামনে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে এই আনন্দময় বিশ্বের আনন্দপ্রবাহ দিকে দিগন্তে বইয়ে দিতে, নাচে গানে কল্লোলে হিল্লোলে কলহাস্যে— চূর্ণ চূর্ণ সূর্যের আলো উদ্বেল তরঙ্গভঙ্গের ছন্দে ছন্দে বিকীর্ণ করে দিতে। এই আনন্দ-আবেগের অন্তরে অন্তরে যে অক্ষয় শৌর্যের অনুপ্রেরণা আছে, সেটা ওদের শাস্ত্রবচনের বেড়ার বাইরে দিয়ে চলে গেল। ভয় কোরো না তোমরা; যে রসরাজের নিমন্ত্রণে তোমরা এসেছ, তাঁর প্রসন্নতা যেমন নেমেছে আমাদের নিকুঞ্জে অন্তঃস্মিত গন্ধরাজমুকুলের প্রচ্ছন্ন গন্ধরেণুতে তেমনি নামুক তোমাদের কণ্ঠে কণ্ঠে, তোমাদের দেহলতার নিরুদ্ধ নটনোৎসাহে। সেই যিনি সুরের গুরু, তাঁর চরণে তোমাদের নৃত্যের অর্ঘ্য নিবেদন করে দাও।

সুরের গুরু, দাও গো সুরের দীক্ষা

একটা ফর্মাশ এসেছে বসন্ত-উৎসবে নতুন কিছু চাই— কিন্তু যাদের রসবেদনা আছে তারা বলছে, আমরা নতুন চাই নে, আমরা চাই নবীনকে। তারা বলে, মাধবী বছরে বছরে সাজ বদলায় না, অশোক পলাশ পুরাতন রঙেই বারে বারে রঙিন। এই চিরপুরাতন ধরণী সেই চিরপুরাতন নবীনের দিকে তাকিয়ে বলছে, 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল।' সেই নবীনের উদ্দেশে তোমাদের গান শুরু করে দাও।

আন্ গো তোরা কার কী আছে

অশোকবনের রঙমহলে আজ লাল রঙের তানে তানে পঞ্চমরাগে সানাই বাজিয়ে দিলে, কুঞ্জবনের বীথিকায় আজ সৌরভের অবারিত দানসত্র। আমরাও তো শূন্যহাতে

আসি নি। দানের জোয়ার যখন লাগে অতল জলে তখন ঘাটে ঘাটে দানের বোঝাই-তরী রশি খুলে দিয়ে ভেসে পড়ে। আমাদের ভরা নৌকো দখিন হাওয়ায় পাল তুলে সাগর-মুখো হল, সেই কথাটা কণ্ঠ খুলে জানিয়ে দাও।

ফাগুন, তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি-যে দান

ভরে দাও একেবারে ভরে দাও, কোথাও কিছু সংকোচ না থাকে। পূর্ণের উৎসবে দেওয়া আর পাওয়া একই কথা। ঝর্নার এক প্রান্তে পাওয়া রয়েছে অভ্রভেদী শিখরের দিক থেকে, আর-এক প্রান্তে দেওয়া রয়েছে অতলস্পর্শ সাগরের দিকে, এর মাঝখানে তো কোনো বিচ্ছেদ নেই। অন্তহীন পাওয়া আর অন্তহীন দেওয়ার আবর্তন নিয়ে এই বিশ্ব।

গানের ডালি ভরে দে গো উষার কোলে

মধুরিমা, দেখো, দেখো, চাঁদের তরণীতে আজ পূর্ণতা পরিপুঞ্জিত। কত দিন ধরে এক তিথি থেকে আর-এক তিথিতে এগিয়ে এগিয়ে আসছে। নন্দনবন থেকে আলোর পারিজাত ভরে নিয়ে এল— কোন্ মাধুরীর মহাশ্বেতা সেই ডালি কোলে নিয়ে বসে আছে; ক্ষণে ক্ষণে রাজহংসের ডানার মতো তার শুভ্র মেঘের বসনপ্রান্ত আকাশে এলিয়ে পড়ছে। আজ ঘুমভাঙা রাতের বাঁশিতে বেহাগের তান লাগল।

নিবিড় অমা-তিমির হতে

দোল লেগেছে এবার। পাওয়া আর না-পাওয়ার মাঝখানে দোল। এক প্রান্তে বিরহ, আর প্রান্তে মিলন, স্পর্শ করে করে দুলছে বিশ্বের হৃদয়। পরিপূর্ণ আর অপূর্ণের মাঝখানে এই দোলন। আলোতে ছায়াতে ঠেকতে ঠেকতে রূপ জাগছে— জীবন থেকে মরণে, মরণ থেকে জীবনে, অন্তর থেকে বাহিরে, আবার বাহির থেকে অন্তরে। এই দোলার তালে না মিলিয়ে চললেই রসভঙ্গ হয়। ও পাড়ার ওরা-যে দরজার আগল এঁটে বসেই রইল— হিসেবের খাতার উপর ঝুঁকে পড়েছে। একবার ওদের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে দোলের ডাক দাও।

ওরে গৃহবাসী, তোরা খোল্ দ্বার খোল্

কিন্তু পূর্ণিমার চাঁদ-যে ধ্যানস্তিমিতলোচন পুরোহিতের মতো আকাশের বেদীতে বসে উৎসবের মন্ত্র জপ করতে লাগল। ওকে দেখাচ্ছে যেন জ্যোৎস্নাসমুদ্রের ঢেউয়ের চূড়ায় ফেনপুঞ্জের মতো— কিন্তু সে ঢেউ-যে চিত্রার্পিতবৎ স্তব্ধ। এ দিকে আজ বিশ্বের বিচলিত চিত্ত দক্ষিণের হাওয়ায় ভেসে পড়েছে, চঞ্চলের দল মেতেছে বনের শাখায়, পাখির ডানায়— আর ওই কি একা অবিচলিত হয়ে থাকবে নিবাত-নিষ্কম্পমিবপ্রদীপম্? নিজে মাতবে না আর বিশ্বকে মাতাবে, সে কেমন হল?

এর একটা যা-হয় জবাব দিয়ে দাও।

কে দেবে চাঁদ তোমায় দোলা[১]

আজ সব ভীরুদের ভয় ভাঙানো চাই। ওই মাধবীর দ্বিধা-যে ঘোচে না। এ দিকে আকাশে আকাশে প্রগল্‌ভতা অথচ ওরা রইল সসংকোচে ছায়ার আড়ালে। ওই অবগুণ্ঠিতাদের সাহস দাও। বেরিয়ে পড়বার হাওয়া বইল যে— বকুলগুলো রাশি রাশি ঝরতে ঝরতে বলছে 'যা হয় তা হোক গে', আমের মুকুল নির্ভয়ে বলে উঠছে 'দিয়ে ফেলব একেবারে শেষ পর্যন্ত'। যে পথিক আপনাকে বিলিয়ে দেবার জন্যেই পথে বেরিয়েছে তার কাছে আত্মনিবেদনের থালি উপুড় করে দিয়ে তবে তাকে আনতে পারবে নিজের আঙিনায়। কৃপণতা করে সময় বইয়ে দিলে তো চলবে না।

হে মাধবী, দ্বিধা কেন, আসিবে কি ফিরিবে কি

দেখতে দেখতে ভরসা বেড়ে উঠছে, তাকে পাব না তো কী। যখন দেখা দেয় না তখনো যে সাড়া দেয়। যে পথে চলে সেখানে-যে তার চলার রঙ লাগে। যে আড়ালে থাকে তার ফাঁক দিয়ে আসে তার মালার গন্ধ। দুয়ারে অন্ধকার যদি-বা চুপচাপ থাকে, আঙিনায় হাওয়াতে চলে কানাকানি। পড়তে পারি নে সব অক্ষর, কিন্তু চিঠিখানা মনের ঠিকানায় এসে পৌঁছয়। লুকিয়েই ও ধরা দেবে এমনিতরো ওর ভাবখানা।

সে কি ভাবে গোপন রবে লুকিয়ে হৃদয়-কাড়া[১]

এইবার বেড়া ভাঙল, দুর্বার বেগে। অন্ধকারের গুহায় অগোচরে জমে উঠেছিল বন্যার উপক্রমণিকা, হঠাৎ ঝর্না ছুটে বেরোল, পাথর গেল ভেঙে, বাধা গেল ভেসে। চরম যখন আসেন তখন এক-পা এক-পা পথ গুনে গুনে আসেন না। একেবারে বজ্রে-শান-দেওয়া বিদ্যুতের মতো, পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘের বক্ষ এক আঘাতে বিদীর্ণ করে আসেন।

হৃদয় আমার, ওই বুঝি তোর ফাল্গুনী ঢেউ আসে,
বেড়া-ভাঙার মাতন নামে উদ্দাম উল্লাসে।
তোমার মোহন এল সোহন বেশে,
কুয়াশাভার গেল ভেসে,
এল তোমার সাধনধন উদার আশ্বাসে।
অরণ্যে তোর সুর ছিল না, বাতাস হিমে ভরা।
জীর্ণ পাতায় কীর্ণ কানন, পুষ্পবিহীন ধরা।

এবার জাগ্‌ রে হতাশ, আয় রে ছুটে
অবসাদের বাঁধন টুটে,
বুঝি এল তোমার পথের সাথি উতল উচ্ছ্বাসে।[২]

উৎসবের সোনার কাঠি তোমাকে ছুঁয়েছে, চোখ খুলেছে ; এইবার সময় হল চার দিক দেখে নেবার। আজ দেখতে পাবে ওই, শিশু হয়ে এসেছে চির নবীন, কিশলয়ে তার ছেলেখেলা জমাবার জন্যে। তার দোসর হয়ে তার সঙ্গে যোগ দিল ওই সূর্যের আলো, সেও সাজল শিশু, সারাবেলা সে কেবল ঝিকিমিকি করছে। ওই তার কলপ্রলাপ। ওদের নাচে নাচে মর্মরিত হয়ে উঠল প্রাণগীতিকার প্রথম ধুয়োটি।

ওরা অকারণে চঞ্চল

আবার একবার চেয়ে দেখো— অবজ্ঞায় চোখ ঝাপসা হয়ে থাকে, আজ সেই কুয়াশা যদি কেটে যায় তবে যাকে তুচ্ছ বলে দিনে দিনে এড়িয়ে গেছ তাকে দেখে নাও তার আপন মহিমায়। ওই দেখো ওই বনফুল, মহাপথিকের পথের ধারে ও ফোটে, তাঁর পায়ের করুণ স্পর্শে সুন্দর হয়ে ওঠে ওর প্রণতি। সূর্যের আলো ওকে আপন বলে চেনে ; দখিন হাওয়া ওকে শুধিয়ে যায় 'কেমন আছ'। তোমার গানে আজ ওকে গৌরব দিক। এরা যেন কুরুরাজের সভায় শূদ্রার সন্তান বিদুরের মতো, আসন বটে নীচে, কিন্তু সম্মান স্বয়ং ভীষ্মের চেয়ে কম নয়।

আজ দখিন বাতাসে[১]

কাব্যলোকের আদরিণী সহকারমঞ্জরীকে আর চিনিয়ে দিতে হবে না। সে আপনাকে তো লুকোতে জানে না। আকাশের হৃদয় সে অধিকার করেছে, মৌমাছির দল বন্দনা করে তার কাছ থেকে অজস্র দক্ষিণা নিয়ে যাচ্ছে। সকলের আগেই উৎসবের সদাব্রত ও শুরু করে দিয়েছিল, সকলের শেষ পর্যন্ত ওর আমন্ত্রণ রইল খোলা। কোকিল ওর গুণগান দিনে রাতে আর শেষ করতে পারছে না— তোমরাও তান লাগাও।

ও মঞ্জরী, ও মঞ্জরী, আমের মঞ্জরী

দীর্ঘ শূন্য পথটাকে এতদিন ঠেকেছিল বড়ো কঠিন, বড়ো নিষ্ঠুর। আজ তাকে প্রণাম। পথিককে সে তো অবশেষে এনে পৌঁছিয়ে দিলে। তারই সঙ্গে এনে দিলে অসীম সাগরের বাণী। দুর্গম উঠল সেই পথিকের মধ্যে গান গেয়ে। কিন্তু আনন্দ করতে করতেই চোখে জল আসে-যে। ভুলব কেমন করে যে, যে পথ কাছে নিয়ে আসে সেই পথই দূরে নিয়ে যায়। পথিককে ঘরে আটক করে না। বাঁধন ছিঁড়ে

নিজেও বেরিয়ে না পড়লে ওর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঠেকাবে কী করে? আমার ঘর-যে ওর যাওয়া-আসার পথের মাঝখানে; দেখা দেয় যদি-বা, তার পরেই সে দেখা আবার কেড়ে নিয়ে চলে যায়।

মোর পথিকেরে বুঝি এনেছ এবার করুণ রঙিন পথ

তবু ওকে ক্ষণকালের বাঁধন পরিয়ে দিতে হবে। টুকরো টুকরো সুখের হার গাঁথব— পরাব ওকে মাধুর্যের মুক্তোগুলি। ফাগুনের ভরা সাজি থেকে যা-কিছু ঝরে ঝরে পড়ছে কুড়িয়ে নেব, বনের মর্মর, বকুলের গন্ধ, পলাশের রক্তিমা— আমার বাণীর সূত্রে সব গেঁথে বেঁধে দেব তার মণিবন্ধে। হয়তো আবার আর-বসন্তেও সেই আমার-দেওয়া ভূষণ প'রেই সে আসবে। আমি থাকব না, কিন্তু কী জানি, আমার দানের ভূষণ হয়তো থাকবে ওর দক্ষিণ হাতে।

ফাগুনের নবীন আনন্দে

দ্বিতীয় পর্ব

বেদনা কী ভাষায় রে
মর্মে মর্মরি গুঞ্জরি বাজে।
সে বেদনা সমীরে সমীরে সঞ্চারে,
চঞ্চল বেগে বিশ্বে দিল দোলা।
দিবানিশা আছি নিদ্রাহরা বিরহে
তব নন্দনবন-অঙ্গন-দ্বারে, মনোমোহন বন্ধু,
আকুল প্রাণে
পারিজাতমালা সুগন্ধ হানে॥

বিদায়দিনের প্রথম হাওয়াটা এবার উৎসবের মধ্যে নিঃশ্বসিত হয়ে উঠল। এখনো কোকিল ডাকছে, এখনো বকুলবনের সম্বল অজস্র, এখনো আম্রমঞ্জরীর নিমন্ত্রণে মৌমাছিদের আনাগোনা, কিন্তু তবু এই চঞ্চলতার অন্তরে অন্তরে একটা বেদনা শিউরিয়ে উঠল। সভার বীণা বুঝি নীরব হবে, পথের একতারায় এবার সুর বাঁধা হচ্ছে। দূর দিগন্তের নীলিমায় দেখা যায় অশ্রুর আভাস— অবসানের গোধূলিছায়া নামছে।

চলে যায় মরি হায় বসন্তের দিন

হে সুন্দর, যে কবি তোমার অভিনন্দন করতে এসেছিল তার ছুটির দিন এল।

তার প্রণাম তুমি নাও। যে গানগুলি এতদিন গ্রহণ করেছ সেই তার আপন গানের বন্ধনেই সে বাঁধা রইল তোমার দ্বারে— তোমার উৎসবলীলায় সে চিরদিন রয়ে গেল তোমার সাথের সাথি। তোমাকে সে তার সুরের রাখী পরিয়েছে— তার চিরপরিচয় তোমার ফুলে ফুলে, তোমার পদপাতকম্পিত শ্যামল শষ্পবীথিকায়।

বসন্তে বসন্তে তোমার কবিরে দাও ডাক

ওর ভয় হয়েছে সব কথা বলা হল না বুঝি, এ দিকে বসন্তর পালা তো সাঙ্গ হয়ে এল। ওর মল্লিকাবনে এখনি তো পাপড়িগুলি সব পড়বে ঝরে— তখন বাণী পাবে কোথায়। ত্বরা কর্ গো, ত্বরা কর্। বাতাস তপ্ত হয়ে এল, এই বেলা রিক্ত হবার আগে তোর শেষ অঞ্জলি পূর্ণ করে দে; তার পরে আছে করুণ ধূলি, তার আঁচলে সব ঝরা ফুলের বিরাম।

যখন মল্লিকাবনে প্রথম ধরেছে কলি

সুন্দরের বীণার তারে কোমল গান্ধারে মীড় লেগেছে। আকাশের দীর্ঘনিশ্বাস বনে বনে হায় হায় করে উঠল, পাতা পড়ছে ঝরে ঝরে। বসন্তের ভূমিকায় ওই পাতাগুলি একদিন শাখায় শাখায় আগমনীর গানে তাল দিয়েছিল, তারাই আজ যাবার পথের ধূলিকে ঢেকে দিল, পায়ে পায়ে প্রণাম করতে লাগল বিদায়পথের পথিককে। নবীনকে সন্ন্যাসীর বেশ পরিয়ে দিলে; বললে, তোমার উদয় সুন্দর, তোমার অস্তও সুন্দর হোক।

ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে

মন থাকে সুপ্ত, তখনো দ্বার থাকে খোলা, সেইখান দিয়ে কার আনাগোনা হয়; উত্তরীয়ের গন্ধ আসে ঘরের মধ্যে, ভুঁইচাঁপা ফুলের ছিন্ন পাপড়িগুলি লুটিয়ে থাকে তার যাওয়ার পথে; তার বীণা থেকে বসন্তবাহারের রেশটুকু কুড়িয়ে নেয় মধুকর-গুঞ্জরিত দক্ষিণের হাওয়া; কিন্তু জানতে পাই নে, সে এসেছিল। জেগে উঠে দেখি তার আকাশপারের মালা সে পরিয়ে গিয়েছে, কিন্তু এ-যে বিরহের মালা।

কখন্ দিলে পরায়ে

বনবন্ধুর যাবার সময় হল, কিন্তু হে বনস্পতি শাল, অবসানের দিন থেকে তুমি অবসাদ ঘুচিয়ে দিলে। উৎসবের শেষ বেলাকে তোমার অক্লান্ত মঞ্জরী ঐশ্বর্যে দিল ভরিয়ে। নবীনের শেষ জয়ধ্বনি তোমার বীরকণ্ঠে। সেই ধ্বনি আজ আকাশকে পূর্ণ করল, বিষাদের ম্লানতা দূর করে দিলে। অরণ্যভূমির শেষ আনন্দিত বাণী তুমিই শুনিয়ে দিলে যাবার পথের পথিককে, বললে 'পুনর্দর্শনায়'। তোমার আনন্দের সাহস কঠোর বিচ্ছেদের সমুখে দাঁড়িয়ে।

ক্লান্ত যখন আম্রকলির কাল

দূরের ডাক এসেছে। পথিক, তোমাকে ফেরাবে কে। তোমার আসা আর তোমার যাওয়াকে আজ এক করে দেখাও। যে পথ তোমাকে নিয়ে আসে সেই পথই তোমাকে নিয়ে যায়, আবার সেই পথই ফিরিয়ে আনে। হে চিরনবীন, এই বঙ্কিম পথেই চির-দিন তোমার রথযাত্রা; যখন পিছন ফিরে চলে যাও সেই চলে যাওয়ার ভঙ্গিটি আবার এসে মেলে সামনের দিকে ফিরে আসায়— শেষ পর্যন্ত দেখতে পাই নে, হায় হায় করি।

এখন আমার সময় হল[১]

বিদায়বেলার অঞ্জলি যা শূন্য করে দেয় তা পূর্ণ হয় কোন্‌খানে সেই কথাটা শোনা যাক।

এ বেলা ডাক পড়েছে কোন্‌খানে[১]

আসন্ন বিরহের ভিতর দিয়ে শেষ বারের মতো দেওয়া-নেওয়া হয়ে যাক। তুমি দিয়ে যাও তোমার বাহিরের দান, তোমার উত্তরীয়ের সুগন্ধ, তোমার বাঁশীর গান, আর নিয়ে যাও এই অন্তরের বেদনা আমার নীরবতার ডালি থেকে।

তুমি কিছু দিয়ে যাও

খেলা-শুরুও খেলা, খেলা-ভাঙাও খেলা। খেলার আরম্ভে হল বাঁধন, খেলার শেষে হল বাঁধন খোলা। মরণে বাঁচনে হাতে হাতে ধরে এই খেলার নাচন। এই খেলায় পুরোপুরি যোগ দাও— শুরুর সঙ্গে শেষের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলিয়ে নিয়ে জয়ধ্বনি করে চলে যাও।

আজ খেলা-ভাঙার খেলা খেলবি আয়[১]

পথিক চলে গেল সুদূরের বাণীকে জাগিয়ে দিয়ে। এমনি করে কাছের বন্ধনকে বারে বারে সে আলগা করে দেয়। একটা কোন্ অপরিচিত ঠিকানার উদ্দেশ বুকের ভিতর রেখে দিয়ে যায়— জানলায় বসে দেখতে পাই, তার পথ মিলিয়ে গেছে বনরাজি-নীলা দিগন্তরেখার ওপারে। বিচ্ছেদের ডাক শুনতে পাই কোন্ নীলিম কুহেলিকার প্রান্ত থেকে— উদাস হয়ে যায় মন— কিন্তু সেই বিচ্ছেদের বাঁশিতে মিলনেরই সুর তো বাজে করুণ সাহানায়।

বাজে করুণ সুরে, হায় দূরে

এই খেলা-ভাঙার খেলা বীরের খেলা। শেষ পর্যন্ত যে ভঙ্গ দিল না তারই জয়। বাঁধন ছিঁড়ে যে চলে যেতে পারল, পথিকের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল পথে, তারই জন্যে জয়ের মালা। পিছনে ফিরে ভাঙা খেলনার টুকরো কুড়োতে গেল যে কৃপণ তার

খেলা পুরো হল না—খেলা তাকে মুক্তি দিল না, খেলা তাকে বেঁধে রাখলে। এবার তবে ধুলোর সঞ্চয় চুকিয়ে দিয়ে হালকা হয়ে বেরিয়ে পড়ো।

বসন্তে ফুল গাঁথল আমার জয়ের মালা[৩]

এবার প্রলয়ের মধ্যে পূর্ণ হোক লীলা, শমে এসে সব তান মিলুক, শান্তি হোক্, মুক্তি হোক্।

ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক[১]

৩০ ফাল্গুন ১৩৩১

১ দ্রষ্টব্য : বসন্ত। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫শ খণ্ড

২ তুলনীয় : হৃদয় আমার, ওই বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় আসে। নটরাজ। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮শ খণ্ড

৩ দ্রষ্টব্য : ফাল্গুনী। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২শ খণ্ড

শাপমোচন

ভূমিকা

যে বৌদ্ধ আখ্যান অবলম্বন করে রাজা নাটক রচিত তারই আভাসে শাপমোচন কথিকাটি রচনা করা হল। এর গান-গুলি পূর্বরচিত নানা গীতিনাটিকা হতে সংকলিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শাপমোচন

ভূমিকার গান। ভাবটা এই, মনের নানা গভীর আকাঙ্ক্ষা কাহিনীতে রূপকে গানে রূপ নেয় ছন্দে বন্ধে, সজ্জ রচনা করে কল্পনায়, বস্তুজগৎ থেকে ক্ষণকালের ছুটি নিয়ে কল্পজগতে করে লীলা।

এ শুধু অলস মায়া— এ শুধু মেঘের খেলা,
এ শুধু মনের সাধ বাতাসেতে বিসর্জন,
এ শুধু আপনমনে মালা গেঁথে ছিঁড়ে ফেলা,
নিমেষের হাসি কান্না গান গেয়ে সমাপন।
শ্যামল পল্লবপাতে রবিকরে সারা বেলা
আপনারি ছায়া লয়ে খেলা করে ফুলগুলি,
এও সেই ছায়া-খেলা বসন্তের সমীরণে।
কুহকের দেশে যেন সাধ ক'রে পথ ভুলি
হেথা হোথা ঘুরি ফিরি সারাদিন আনমনে।
কারে যেন দেব বলে কোথা যেন ফুল তুলি,
সন্ধ্যায় বনের ফুল উড়ে যায় বনে বনে।
এ খেলা খেলিবে হায়, খেলার সাথী কে আছে।
ভুলে ভুলে গান গাই— কে শোনে কে নাই শোনে—
যদি কিছু মনে পড়ে, যদি কেহ আসে কাছে॥

গন্ধর্ব সৌরসেন সুরসভায় গীতনায়কদের অগ্রণী। সেদিন তার প্রেয়সী মধুশ্রী গেছে সুমেরুশিখরে সূর্যপ্রদক্ষিণে। সৌরসেনের বিরহীচিত্ত ছিল উৎকণ্ঠিত। অনবধানে তার মৃদঙ্গের তাল গেল কেটে, নৃত্যে উর্বশীর শমে পড়ল বাধা, ইন্দ্রাণীর কপোল উঠল রাঙা হয়ে।

পাছে সুর ভুলি এই ভয় হয়,
পাছে ছিন্ন তারের জয় হয়।
পাছে উৎসবক্ষণ তন্দ্রালসে হয় নিমগন,
পুণ্য লগন

হেলায় খেলায় ক্ষয় হয়,
পাছে বিনা গানেই মিলনবেলা ক্ষয় হয়।

যখন তাণ্ডবে মোর ডাক পড়ে,
পাছে তার তালে মোর তাল না মেলে
সেই ঝড়ে।
যখন মরণ এসে ডাকবে শেষে বরণগানে
পাছে প্রাণে
মোর বাণী সব লয় হয়,
পাছে বিনা গানেই বিদায়বেলা লয় হয়॥

স্খলিতচ্ছন্দ সুরসভার অভিশাপে গন্ধর্বের দেহশ্রী হল বিকৃত, অরুণেশ্বর নামে তার জন্ম হল গান্ধাররাজগৃহে।

মধুশ্রী ইন্দ্রাণীর পাদপীঠে মাথা রেখে পড়ে রইল, বললে, "ঘটিয়ো না বিচ্ছেদ দেবী, গতি হোক আমাদের একই লোকে, একই দুঃখভোগে, একই অবমাননায়।"

শচী সকরুণ দৃষ্টিতে ইন্দ্রের পানে তাকালেন। ইন্দ্র বললেন, "তথাস্তু, যাও মর্তে, সেখানে দুঃখ পাবে, দুঃখ দেবে। সেই দুঃখে ছন্দঃপাতন অপরাধের ক্ষয়।"

বিদায়গান

ভরা থাক্ স্মৃতিসুধায়
বিদায়ের পাত্রখানি,
মিলনের উৎসবে তায়
ফিরায়ে দিয়ো আনি।
বিষাদের অশ্রুজলে
নীরবের মর্মতলে
গোপনে উঠুক ফ'লে
হৃদয়ের নূতন বাণী।

যে পথে যেতে হবে
সে পথে তুমি একা,
নয়নে আঁধার রবে
ধেয়ানে আলোকরেখা।

সারাদিন সঙ্গোপনে
সুধারস ঢালবে মনে
পরানের পদ্মবনে
বিরহের বীণাপাণি ॥

—

মধুশ্রী জন্ম নিল মদ্ররাজকুলে, নাম নিল কমলিকা। স্বর্গলোক থেকে যে আত্মবিস্মৃত বিরহবেদনা সঙ্গে এনেছে অরুণেশ্বর, যৌবনে তার তাপ উঠল প্রবল হয়ে।

জাগরণে যায় বিভাবরী,
আঁখি হতে ঘুম নিল হরি।
যার লাগি ফিরি একা একা,
আঁখি পিপাসিত নাহি দেখা,
তারি বাঁশি ওগো তারি বাঁশি
তারি বাঁশি বাজে হিয়া ভরি।

বাণী নাহি তবু কানে কানে
কী যে শুনি তাহা কেবা জানে।
এই হিয়া-ভরা বেদনাতে
বারি-ছলছল আঁখিপাতে
ছায়া দোলে তারি ছায়া দোলে
ছায়া দোলে দিবানিশি ধরি ॥

তাপার্ত মন খুঁজে বেড়ায় অনাবৃষ্টিতে তৃষ্ণার জল, বীণা কোলে নিয়ে গান করে—

এসো এসো হে তৃষ্ণার জল,
ভেদ করো কঠিনের বক্ষস্থল, কলকল ছলছল।
এসো এসো উৎসস্রোতে গূঢ় অন্ধকার হতে,
এসো হে নির্মল, কলকল ছলছল।

রবিকর রহে তব প্রতীক্ষায়,
তুমি যে খেলার সাথি, সে তোমারে চায়।

তাহারি সোনার তান তোমাতে জাগাক গান,
এসো হে উজ্জ্বল, কলকল ছলছল।

হাঁকিছে অশান্ত বায়—
আয় আয় আয়, সে তোমায় খুঁজে যায়।
তাহার মৃদঙ্গরবে করতালি দিতে হবে,
এসো হে চঞ্চল, কলকল ছলছল।

অনাবৃষ্টি কোন্ মায়াবলে
তোমারে করেছে বন্দী পাষাণশৃঙ্খলে,
ভেঙে নীরসের কারা এসো বন্ধহীন ধারা,
এসো হে প্রবল, কলকল ছলছল॥

কেমন করে কমলিকার ছবি এসে পড়ল গান্ধারে রাজ-অন্তঃপুরে। মনে হল, যা হারিয়েছিল এই-জন্মের আড়ালে, তাই যেন ফিরে ধরা দিল অপরূপ স্বপ্নরূপে।

ও আমার চাঁদের আলো, আজ ফাগুনের সন্ধ্যাকালে
ধরা দিয়েছ যে আমার পাতায় পাতায় ডালে ডালে।
যে গান তোমার সুরের ধারায় বন্যা জাগায় তারায় তারায়
মোর আঙিনায় বাজল সে সুর আমার প্রাণের তালে তালে।

সব কুঁড়ি মোর ফুটে ওঠে তোমার হাসির ইশারাতে,
স্বপ্নে-ছাওয়া দখিন হাওয়া আমার ফুলের গন্ধে মাতে।
শুভ্র, তুমি করলে বিলোল আমার প্রাণে রঙের হিলোল;
মর্মরিত মর্ম আমার জড়ায় তোমার হাসির জালে॥

ছবিখানি দিনের চিন্তা রাতের স্বপ্নের 'পরে আপন ভূমিকা রচনা করলে।

তুমি কি কেবলি ছবি, শুধু পটে লিখা।
ওই যে সুদূর নীহারিকা
যারা করে আছে ভিড়
আকাশের নীড়,
ওই যারা দিনরাত্রি
আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী

গ্রহ তারা রবি,
তুমি কি তাদের মতো সত্য নও—
হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি !
নয়নসম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।
নাহি জানি, কেহ নাহি জানে
তব সুর বাজে মোর গানে,
কবির অন্তরে তুমি কবি—
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি ॥

রাজা লিখলেন চিঠি চিত্ররূপিণীর উদ্দেশে। লিখলেন—

কখন দিলে পরায়ে স্বপনে ব্যথার মালা, বরণমালা।
প্রভাতে দেখি জেগে অরুণ মেঘে
বিদায়বাঁশরি বাজে অশ্রুগালা।
গোপনে এসে গেলে, দেখি নাই আঁখি মেলে।
আঁধারে দুঃখডোরে বাঁধিলে মোরে,
ভূষণ পরালে বিরহবেদন-ঢালা ॥

চিঠি পৌঁছল রাজকন্যার হাতে। অজানার আহ্বানে তার মন হল উতলা। সখীদের নিয়ে বারবার করে পড়লে সেই চিঠি।

দে পড়ে দে আমায় তোরা কী কথা আজ লিখেছে সে,
তার দূরের বাণীর পরশমানিক লাগুক আমার প্রাণে এসে।
শস্যখেতের গন্ধখানি একলা ঘরে দিক সে আনি,
ক্লান্তগমন পান্থ হাওয়া লাগুক আমার মুক্তকেশে।

নীল আকাশের সুরটি নিয়ে বাজাক আমার বিজন মনে,
ধূসর পথের উদাস বরন মেলুক আমার বাতায়নে।
সূর্য-ডোবার রাঙা বেলায় ছড়াব প্রাণ রঙের খেলায়,
আপন-মনে চোখের কোণে অশ্রু-আভাস উঠবে ভেসে ॥

গান্ধারের দূত এল মদ্ররাজধানীতে। বিবাহ-প্রস্তাব শুনে রাজা বললে, "আমার কন্যার দুর্লভ ভাগ্য।"

সখীরা রাজকন্যাকে গিয়ে বললে –

বাজিবে, সখী, বাঁশি বাজিবে।
হৃদয়রাজ হৃদে রাজিবে।
বচন রাশি রাশি কোথা যে যাবে ভাসি,
অধরে লাজহাসি সাজিবে।
নয়নে আঁখিজল করিবে ছলছল,
সুখবেদনা মনে বাজিবে।
মরমে মুরছিয়া মিলাতে চাবে হিয়া
সেই চরণযুগরাজীবে ॥

চৈত্রপূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে শুভলগ্ন। সেই বিবাহরাত্রে দূরে একলা বসে রাজার বুকের মধ্যে রক্ত ঢেউ খেলিয়ে উঠল। কেবলই তার মনে হতে লাগল, লোকান্তরে কার সঙ্গে এইরকম জ্যোৎস্নারাত্রে সে যেন এক-দোলায় দুলেছিল। ভুলে-যাওয়ার কুহেলিকার ভিতর থেকে পড়েছে মনে। একটা পদ তার মনে গুঞ্জরিয়া উঠছে 'ভুলো না— ভুলো না – ভুলো না'—

সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে, ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা।
সেই স্মৃতিটুকু কভু খনে খনে যেন জাগে মনে, ভুলো না।
সেদিন বাতাসে ছিল তুমি জান
আমারি মনের প্রলাপ জড়ানো,
আকাশে আকাশে আছিল ছড়ানো তোমার হাসির তুলনা।

যেতে যেতে পথে পূর্ণিমারাতে চাঁদ উঠেছিল গগনে,
দেখা হয়েছিল তোমাতে আমাতে কী জানি কী মহালগনে।

এখন আমার বেলা নাহি আর,
বহিব একাকী বিরহের ভার—
বাঁধিব যে রাখী পরানে তোমার সে রাখী খুলো না, খুলো না ॥

যথালগ্নে রাজহস্তীর পৃষ্ঠে রত্নাসনে রাজার প্রতিনিধি হয়ে এল অরুণেশ্বরের বক্ষো-বিহারিণী বীণা, রাজার অশ্রুত আহ্বান সঙ্গে করে। সখীরা দূরোদ্দিষ্ট বন্ধুর আবাহন-গান গাইলে—

তোমার আনন্দ ওই এল দ্বারে এল গো
ওগো পুরবাসী।
বুকের আঁচলখানি ধুলায় ফেলে
আঙিনাতে মেলো গো।
পথে সেচন করো গন্ধবারি,
মলিন না হয় চরণ তারি,
তোমার সুন্দর ওই এল দ্বারে এল গো—
আকুল হৃদয়খানি সম্মুখে তার ছড়িয়ে ফেলো গো।

সকল ধন্য যে ধন্য হল হল গো,
বিশ্বজনের কল্যাণে আজ ঘরের দুয়ার খোলো গো।
হেরো রাঙা হল সকল গগন,
চিত্ত হল পুলকমগন,
তোমার নিত্য-আলো এল দ্বারে এল গো—
তোমার পরানপ্রদীপ তুলে ধরে ওই আলোতে জ্বেলো গো ॥

অন্তঃপুরিকারা বীণাখানিকে বরণ করে নিয়ে এল বিবাহের আসরে, বধূকে আহ্বান করে গাইলে—

বাজো রে বাঁশরী বাজো।
সুন্দরী, চন্দনমাল্যে মঙ্গলসন্ধ্যায় সাজো।
বুঝি মধুফাল্গুনমাসে চঞ্চল পান্থ সে আসে,
মধুকরপদভরকম্পিত চম্পক
অঙ্গনে ফোটে নি কি আজো।

রক্তিম অংশুক মাথে, কিংশুককঙ্কণ হাতে,
মঞ্জীরঝংকৃত পায়ে, সৌরভমন্থর বায়ে,
বন্দনসংগীতগুঞ্জনমুখরিত
নন্দনকুঞ্জে বিরাজো ॥

বীণার সঙ্গে রাজকুমারীর মালা বদল হল। সখীরা এই বীণা সুন্দরকে উৎসর্গ করে গাইলে—

লহো লহো তুলে লহো নীরব বীণাখানি,
নন্দননিকুঞ্জ হতে সুর দেহো তায় আনি
ওহে সুন্দর হে সুন্দর।
আঁধার বিছায়ে আছি রাতের আকাশে
তোমারি আশ্বাসে,
তারায় তারায় জাগাও তোমার আলোক-ভরা বাণী
ওহে সুন্দর হে সুন্দর।

পাষাণ আমার কঠিন দুখে তোমায় কেঁদে বলে—
পরশ দিয়ে সরস করো, ভাসাও অশ্রুজলে
ওহে সুন্দর হে সুন্দর।
শুষ্ক যে এই নগ্ন মরু নিত্য মরে লাজে
আমার চিত্তমাঝে,
শ্যামল রসের আঁচল তাহার বক্ষে দেহো টানি ॥

বধূ পতিগৃহে যাবার সময় সখীরা সুন্দরকে প্রণাম করে বললে—

রাঙিয়ে দিয়ে যাও গো এবার যাবার আগে।
আপন রাগে, গোপন রাগে,
তরুণ হাসির অরুণ রাগে,
অশ্রুজলের করুণ রাগে।
রঙ যেন মোর মর্মে লাগে— আমার সকল কর্মে লাগে—
সন্ধ্যাদীপের আগায় লাগে—
গভীর রাতের জাগায় লাগে।

যাবার আগে যাও গো আমায় জাগিয়ে দিয়ে,
রক্তে তোমার চরণদোলা লাগিয়ে দিয়ে।
আঁধার নিশার বক্ষে যেমন তারা জাগে,
পাষাণগুহার কক্ষে নিঝর-ধারা জাগে,
মেঘের বুকে যেমন মেঘের মন্দ্র জাগে,
বিশ্বনাচের কেন্দ্রে যেমন ছন্দ জাগে—
তেমনি আমায় দোল দিয়ে যাও যাবার পথে আগিয়ে দিয়ে
কাঁদন বাঁধন ভাগিয়ে দিয়ে ॥

—

রাজবধূ এল পতিগৃহে।

দীপ জ্বলে না, ঘর থাকে অন্ধকার, সেই ঘরে প্রতি রাত্রে স্বামীর কাছে বধূ সমাগম।

কমলিকা বলে, "প্রভু, তোমাকে দেখবার জন্যে আমার দিন, আমার রাত্রি উৎসুক। আমাকে দেখা দাও।"

এসো আমার ঘরে,
বাহির হয়ে এসো তুমি যে আছ অন্তরে।
দুঃখসুখের দোলে এসো,
প্রাণের হিল্লোলে এসো,
স্বপনদুয়ার খুলে এসো অরুণ-আলোকে
মুগ্ধ এ চোখে।
এবার ফুলের প্রফুল্লরূপ এসো বুকের 'পরে ॥

রাজা বলে, "আমার গানেই তুমি আমাকে দেখো। আগে দেখে নাও অন্তরে, বাইরে দেখবার দিন আসবে তার পরে। নইলে ভুল হবে, ছন্দ যাবে ভেঙে।"

কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে হায় রে হায়,
তোমার চপল আঁখি বনের পাখি বনে পালায়।
ওগো, হৃদয়ে যবে মোহন রবে বাজবে বাঁশি
তখন আপনি সেধে ফিরবে কেঁদে, পরবে ফাঁসি—

তখন ঘুচবে ত্বরা, ঘুরিয়া মরা হেথা হোথায়।

চেয়ে দেখিস না রে হৃদয়দ্বারে কে আসে যায়—
তোরা শুনিস কানে বারতা আনে দখিন বায়।
আজি ফুলের বাসে সুখের হাসে আকুল গানে
চির বসন্ত যে তোমারি খোঁজে এসেছে প্রাণে,
তারে বাহিরে খুঁজি ফিরিছ বুঝি পাগলপ্রায়—
আহা আজি সে আঁখি বনের পাখি বনে পালায়॥

অন্ধকারে বীণা বাজে। অন্ধকারে গান্ধর্বীকলায় নৃত্যে বধূকে বর প্রদক্ষিণ করে। সেই নৃত্যকলা নির্বাসনের সঙ্গিনী হয়ে এসেছে তার মর্তদেহে। নৃত্যের বেদনা রানীর বক্ষে আঘাত করে, নিশীথরাত্রে সমুদ্রে জোয়ার এলে তার ঢেউ যেমন লাগে তটভূমিতে, অশ্রুতে দেয় প্লাবিত করে।

একদিন রাত্রির তৃতীয় প্রহর, শুকতারা পূর্বগগনে; কমলিকা তার সুগন্ধি এলোচুলে দিলে রাজার দুই পা ঢেকে; বললে, "আদেশ করো আজ উষার প্রথম আলোকে তোমাকে প্রথম দেখব। নইলে আমি বিদায় নিয়ে যাই, রেখে যাই আমার কান্না এই অন্ধকারের বুকে— যতক্ষণ না আমাকে ফিরে ডেকে আন তোমার আলোর সভায়।"

আমি এলেম তোমার দ্বারে,
ডাক দিলেম অন্ধকারে।
আগল ধরে দিলেম নাড়া, প্রহর গেল পাই নি সাড়া,
দেখতে পেলেম না তোমারে।
তবে যাবার আগে এখান থেকে
এই লিখনখানি যাব রেখে।
দেখা তোমার পাই বা না পাই
দেখতে এলেম জেনো গো তাই,
ফিরে যাই সুদূরের পারে॥

রাজা বললে, "প্রিয়ে, না-দেখার নিবিড় মিলনকে নষ্ট কোরো না, এই মিনতি। এখনো তুমি অন্তমনে আছ, শুভদৃষ্টির সময় তাই এল না।"

আন্‌মনা গো আন্‌মনা,
তোমার কাছে আমার বাণীর মাল্যখানি আনব না।
বার্তা আমার ব্যর্থ হবে, সত্য আমার বুঝবে কবে,
তোমারো মন জানব না।
লগ্ন যদি হয় অনুকূল মৌনমধুর সাঁঝে
নয়ন তোমার মগ্ন যখন ম্লান আলোর মাঝে,
দেব' তোমায় শান্ত সুরের সান্ত্বনা।

ছন্দে গাঁথা বাণী তখন পড়ব তোমার কানে মন্দমৃদুল তানে,
ঝিল্লি যেমন শালের বনে নিদ্রানীরব রাতে
অন্ধকারের জপের মালায় একটানা সুর গাঁথে—
একলা আমি বিজন প্রাণের প্রাঙ্গণে
প্রান্তে বসে একমনে
এঁকে যাব আমার গানের আল্‌পনা॥

মহিষী বললে, "প্রিয়প্রসাদ থেকে আমার দুই চক্ষু চিরদিনই কি থাকবে বঞ্চিত। অন্ধতার চেয়ে এ যে বড়ো অভিশাপ।"

অভিমানে মহিষী মুখ ফেরালে।

রাজা বললে, "কাল চৈত্রসংক্রান্তি। নাগকেশরের বনে নিভৃতে সখাদের সঙ্গে আমার নৃত্যের দিন। প্রাসাদশিখর থেকে দেখো চেয়ে।"

মহিষীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল। বললে, "চিনব কী করে।"

রাজা বললে, "যেমন খুশি কল্পনা করে নিয়ো। সেই কল্পনাই হবে সত্য।"

হায় রে, ওরে যায় না কি জানা।
নয়ন ওরে খুঁজে বেড়ায়, পায় না ঠিকানা।
অলখ পথেই যাওয়া-আসা, শুনি চরণধ্বনির ভাষা,
গন্ধে শুধু হাওয়ায় হাওয়ায় রইল নিশানা।

কেমন করে জানাই তারে, বসে আছি পথের ধারে।
প্রাণে এল সন্ধ্যাবেলা আলোছায়ার রঙিন খেলা,
ঝরে-পড়া বকুলদলে বিছায় বিছানা॥

—

আজি দখিন দুয়ার খোলা,
এসো হে আমার বসন্ত, এসো।
দিব হৃদয়দোলায় দোলা,
এসো হে আমার বসন্ত, এসো।
নব শ্যামল শোভন রথে
এসো বকুল-বিছানো পথে,
এসো বাজায়ে ব্যাকুল বেণু
মেখে পিয়ালফুলের রেণু,
এসো হে আমার বসন্ত, এসো।

এসো ঘনপল্লবপুঞ্জে, এসো হে।
এসো বনমল্লিকাকুঞ্জে, এসো হে।
মৃদু মধুর মদির হেসে
এসো পাগল হাওয়ার দেশে—
তোমার উতলা উত্তরীয়
তুমি আকাশে উড়ায়ে দিয়ো,
এসো হে আমার বসন্ত, এসো॥

চৈত্রসংক্রান্তির রাতে আবার মিলন। মহিষী বললে, "দেখলেম নাচ। যেন মঞ্জরিত শালতরুশ্রেণীতে বসন্তবাতাসের অধৈর্য। যেন চন্দ্রলোকের শুক্লপক্ষে লেগেছে তুফান। কেবল একজন কুশ্রী কেন রসভঙ্গ করলে। ও যেন রাহুর অনুচর। কী গুণে ও পেল প্রবেশের অধিকার।"

রাজা স্তব্ধ হয়ে রইল। তার পরে উঠল গেয়ে, "অসুন্দরের পরম বেদনায় সুন্দরের আহ্বান। সূর্যরশ্মি কালো মেঘের ললাটে পরায় ইন্দ্রধনু, তার লজ্জাকে সান্ত্বনা দেবার তরে। মর্তের অভিশাপে স্বর্গের করুণা যখন নামে তখনি তো সুন্দরের আবির্ভাব। প্রিয়তমে, সেই করুণাই কি তোমার হৃদয়কে কাল মধুর করে নি।"

"না মহারাজ, না" বলে মহিষী দুই হাতে মুখ ঢাকলে।

রাজার কণ্ঠের সুরে লাগল অশ্রুর ছোঁওয়া। বললে, "যাকে দয়া করলে যেত তোমার হৃদয় ভরে, তাকে ঘৃণা করে কেন পাথর করলে মনকে।"

"রসবিকৃতির পীড়া সইতে পারি নে" বলে মহিষী উঠে পড়ল আসন থেকে।

রাজা হাত ধরে বললে, "একদিন সইতে পারবে আপনারই আন্তরিক রসের দাক্ষিণ্যে। কুশ্রীর আত্মত্যাগে সুন্দরের সার্থকতা।"

ভ্রূ কুটিল করে মহিষী বললে, "অসুন্দরের জন্যে তোমার এই অনুকম্পার অর্থ বুঝি নে। ওই শোনো, উষায় প্রথম কোকিলের ডাক। অন্ধকারের মধ্যে তার আলোকের অনুভূতি। আজ সূর্যোদয়মুহূর্তে তোমারও প্রকাশ হোক আমার দিনের মধ্যে, এই আশায় রইলেম।"

রাজা গাইলেন—

বাহিরে ভুল ভাঙবে যখন
অন্তরে ভুল ভাঙবে কি।
বিষাদ বিষে জ্বলে শেষে
রসের প্রসাদ মাঙবে কি।
রৌদ্রদাহ হলে সারা নামবে কি ওর বর্ষাধারা,
লাজের রাঙা মিটলে হৃদয়
প্রেমের রঙে রাঙবে কি।
যতই যাবে দূরের পানে
বাঁধন ততই কঠিন হয়ে টানবে না কি ব্যথার টানে।
অভিমানের কালো মেঘে বাদল হাওয়া লাগবে বেগে,
নয়নজলের আবেগ তখন কোনোই বাধা মানবে কি॥

মহিষী স্তব্ধ হয়ে রইল। রাজা বললে, "আচ্ছা, কথা তোমার রাখব, কিন্তু তাতে ইচ্ছা তোমার পূর্ণ হবে না।"

জ্বলে উঠল আলো, আবরণ গেল ঘুচে, দেখা হল। টলে উঠল যুগলের সংসার। "কী অন্যায়, কী নিষ্ঠুর বঞ্চনা" বলতে বলতে কমলিকা ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে গেল। তাকে ডাক দিলে রাজার জগৎ থেকে—

না, যেয়ো না, যেয়ো নাকো।
মিলনপিয়াসি মোরা, কথা রাখো।
আজও বকুল আপনহারা, হায় রে,
ফুল ফোটানো হয় নি সারা, সাজি ভরে নি,
পথিক ওগো, থাকো থাকো॥

—

গেল বহুদূরে, বনের মধ্যে মৃগয়ার জন্যে যে নির্জন রাজগৃহ আছে সেইখানে। কুয়াশায় শুকতারার মতো লজ্জায় সে আচ্ছন্ন।

রাত্রি যখন দুইপ্রহর, আধোঘুমে সে শুনতে পায় এক বীণাধ্বনির আর্তরাগিণী। স্বপ্নে বহুদূরের আভাস আসে। মনে হয়, এই সুর চিরদিনের চেনা। চিরবিরহের সঞ্চিত অশ্রু বুকের মধ্যে উছলে ওঠে।

সখী, আঁধারে একেলা ঘর মন মানে না।
কিসের পিয়াসে কোথা যে যাবে সে, পথ জানে না।
ঝরঝর নীরে, নিবিড় তিমিরে, সজল সমীরে গো,
যেন কার বাণী কভু প্রাণে আনে কভু আনে না॥

রাতের পর রাত যায়। অন্ধকারে তরুতলে যে মানুষ ছায়ার মতো নাচে তাকে চোখে দেখি নে, তার হৃদয় দেখি— জনশূন্য দেওদার-বনের দোলায়িত শাখায় যেন দক্ষিণ সমুদ্রের হাওয়ার হাহাকার। রানী মনে ভাবে, যখন সে কাছে এল তখন ছিল কৃষ্ণসন্ধ্যা। যখন চাঁদ উঠল তখন তার মালাখানি রইল, সে রইল না।

যখন এসেছিলে অন্ধকারে
চাঁদ ওঠে নি সিন্ধুপারে।
হে অজানা, তোমায় তবে
জেনেছিলেম অনুভবে,
গানে তোমার পরশখানি বেজেছিল প্রাণের তারে।

তুমি গেলে যখন একলা চলে
চাঁদ উঠেছে রাতের কোলে।
তখন দেখি পথের কাছে
মালা তোমার পড়ে আছে,
বুঝেছিলেম অনুমানে এ কণ্ঠহার দিলে কারে॥

কী হল রাজমহিষীর। কোন্ হতাশের বিরহ তার বিরহ জাগিয়ে তোলে। কোন্ রাত-জাগা পাখি নিস্তব্ধ নীড়ের পাশ দিয়ে হুহু করে উড়ে যায়, তার পাখার শব্দে ঘুমন্ত পাখির পাখা উৎসুক হয়ে ওঠে যে।

বীণায় বাজতে থাকে কেদারা বেহাগ, বাজে কালাংড়া। আকাশে আকাশে

তারাগুলি যেন তামসী তপস্বিনীর নীরব জপমন্ত্র। বীণাধ্বনি যেন আজ আর বাইরে নেই; এসেছে তার অন্তরের তন্তুতে তন্তুতে।

ওই বুঝি বাঁশি বাজে বনমাঝে কি মনোমাঝে।
বসন্ত বায় বহিছে কোথায়, কোথায় ফুটেছে ফুল,
বলো গো সজনি, এ সুখরজনী কোন্‌খানে উদিয়াছে—
বনমাঝে কি মনোমাঝে।

যাব কি যাব না মিছে এ ভাবনা, মিছে মরি ভয়ে লাজে।
কী জানি কোথা সে বিরহহুতাশে ফিরে অভিসারসাজে—
বনমাঝে কি মনোমাঝে॥

রাজমহিষী বিছানায় উঠে বসে, স্রস্ত তার বেণী, ত্রস্ত তার বক্ষ। বীণার গুঞ্জরণ আকাশে মেলে দেয় অন্তহীন অভিসারের পথ। রাগিণীবিছানো সেই শূন্যপথে বেরিয়ে পড়ে তার মন।

কার দিকে। দেখার আগে যাকে চিনেছিল, দেখার পরে যাকে ভুলেছিল তারই দিকে।

একদিন নিমফুলের গন্ধ অন্ধকার ঘরে নিয়ে এল অনির্বচনীয়ের আমন্ত্রণ। মহিষী দাঁড়াল বিছানা ছেড়ে বাতায়নের কাছে। নীচে সেই ছায়ামূর্তির নাচ, বিরহের সেই উর্মিদোলা।

ও কি এল, ও কি এল না, বোঝা গেল না।
ও কি মায়া কি স্বপনছায়া, ও কি ছলনা।
ধরা কি পড়ে ও রূপেরই ডোরে,
গানেরই তানে কি বাঁধিবে ওরে,
ও যে চিরবিরহেরই সাধনা।

ওর বাঁশিতে করুণ কী সুর লাগে
বিরহমিলনমিলিত রাগে।
সুখে কি দুখে ও পাওয়া না-পাওয়া,
হৃদয়বনে ও উদাসী হাওয়া,
বুঝি শুধু ও পরমকামনা॥

মহিষীর সমস্ত দেহ কম্পিত। ঝিল্লিঝংকৃত রাত। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ দিগন্তে। অস্পষ্ট আলোয় অরণ্য কথা কয় যেন স্বপ্নে। বোবা বনের ভাষাহীন বাণী লাগল মহিষীর অঙ্গে অঙ্গে। কখন নাচ আরম্ভ হল সে জানে না। এ নাচ কোন্ জন্মান্তরের, কোন্ লোকান্তরের।

বীণায় বাজে পরজের বিহ্বল মীড়। কমলিকা আপন-মনে বলে, 'ওগো কাতর, ওগো হতাশ, আর ডেকো না। আর দেরি নেই, দেরি নেই।'

কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ ডুবেছে অমাবস্যার তলায়। আঁধারের ডাক গভীর। রাজমহিষী উঠে দাঁড়িয়ে বলে, "যাব আজ। আর ভয় করি নে আমার দৃষ্টিকে।"

পথের শুকনো পাতা পায়ে পায়ে বাজিয়ে দিয়ে গেল সে অশথতলায়— সেখানে বীণা বাজছে।

মোর বীণা ওঠে কোন্ সুরে বাজি
কোন্ নব চঞ্চল ছন্দে।
মম অন্তর কম্পিত আজি
নিখিলের হৃদয়স্পন্দে।
আসে কোন্ তরুণ অশান্ত,
উড়ে পীতবসনপ্রান্ত,
আলোকের নৃত্যে বনান্ত
মুখরিত অধীর আনন্দে।

অম্বরপ্রাঙ্গণমাঝে
নিঃস্বর মঞ্জীর গুঞ্জে।
অশ্রুত সেই তালে বাজে
করতালি পল্লবপুঞ্জে।
কার পদপরশন-আশা
তৃণে তৃণে অর্পিল ভাষা,
সমীরণ বন্ধনহারা
উন্মন কোন্ বনগন্ধে॥

বীণা থামল। মহিষী থমকে দাঁড়াল।

রাজা বললে, "ভয় কোরো না, প্রিয়ে, ভয় কোরো না।"

গলার স্বর জলে-ভরা মেঘের দূর গুরুগুরু ধ্বনির মতো।

"কিছু ভয় নেই আমার, জয় হল তোমারই।"

এই বলে মহিষী আঁচলের আড়াল থেকে প্রদীপ বের করলে। ধীরে ধীরে তুলে ধরলে রাজার মুখের কাছে।

কণ্ঠ দিয়ে কথা বেরোতে চায় না। পলক পড়ে না চোখে। বলে উঠল, "প্রভু আমার, প্রিয় আমার, এ কী সুন্দর রূপ তোমার!"

বড়ো বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে।
কোথা হতে এলে তুমি হৃদিমাঝারে।
ওই মুখ ওই হাসি কেন এত ভালোবাসি,
কেন গো নীরবে ভাসি অশ্রুধারে।
তোমারে হেরিয়া যেন জাগে স্মরণে,
তুমি চিরপুরাতন চিরজীবনে।
তুমি না দাঁড়ালে আসি হৃদয়ে বাজে না বাঁশি,
এই আলো এই হাসি ডুবে আঁধারে॥

—

সংযোজন

১

তোমায় সাজাব যতনে কুসুমরতনে
কেয়ূরে কঙ্কণে কুঙ্কুমে চন্দনে।
কুন্তলে বেষ্টিব স্বর্ণজালিকা,
কণ্ঠে দোলাইব মুক্তামালিকা,
সীমন্তে সিন্দুর অরুণবিন্দুর
চরণ রঞ্জিব অলক্ত-অঙ্কনে।

সখীরে সাজাব সখার প্রেমে
অলক্ষ্য প্রাণের অমূল্য হেমে।
সাজাব সকরুণ বিরহবেদনায়,
সাজাব অক্ষয় মিলনসাধনায়,
মধুর লজ্জা রচিব শয্যা
যুগল প্রাণের বাণীর বন্ধনে॥

[১৯৩৩]

২

হে বিরহী, হায়, চঞ্চল হিয়া তব,
নীরবে জাগো একাকী শূন্য মন্দিরে—
কোন্ সে নিরুদ্দেশ লাগি
আছ চাহিয়া।

স্বপনরূপিণী আলোকসুন্দরী
অলক্ষ্য অলকাপুরী-নিবাসিনী
তাহার মুরতি রচিলে বেদনায়
হৃদয়মাঝারে॥

[শান্তিনিকেতন
১৪ নভেম্বর ১৯৩৩]

৩

নমো নমো শচীচিতরঞ্জন সন্তাপভঞ্জন
নবজলধরকান্তি ঘননীল অঞ্জন,
নমো হে, নমো নমো।
নন্দনবীথির ছায়ে
তব পদপাতে নব পারিজাতে
উড়ে পরিমল মধুরাতে,
নমো হে, নমো নমো।
তোমার কটাক্ষের ছন্দে মেনকার মঞ্জীরবন্ধে
জেগে ওঠে গুঞ্জন মধুকরগঞ্জন
নমো হে, নমো নমো॥

[পানাদুরা। সিংহল
২৬ মে ১৯৩৪]

৪

হে সখা, বারতা পেয়েছি মনে মনে
তব নিশ্বাসপরশনে,
এসেছ অদেখা বন্ধু
দক্ষিণসমীরণে।
কেন বঞ্চনা কর মোরে,
কেন বাঁধ অদৃশ্য ডোরে,
দেখা দাও দেহমন ভ'রে
মম নিকুঞ্জবনে।
দেখা দাও চম্পকে রঙ্গনে,
দেখা দাও কিংশুকে কাঞ্চনে।
কেন শুধু বাঁশরীর সুরে
ভুলায়ে লয়ে যাও দূরে,
যৌবন-উৎসবে ধরা দাও
দৃষ্টির বন্ধনে॥

১১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

৫

বঁধু, কোন্ মায়া লাগল চোখে।
বুঝি স্বপ্নরূপে ছিলে চন্দ্রলোকে।
ছিল মন তোমারি প্রতীক্ষা করি
যুগে যুগে দিনরাত্রি ধরি,
ছিল মর্মবেদনঘন অন্ধকারে—
জন্ম জনম গেল বিরহশোকে।

অস্ফুট মঞ্জরি কুঞ্জবনে
সংগীতশূন্য বিষণ্ন মনে
সঙ্গীরিক্ত বধূ দুঃখরাতি
পোহাইল নির্জনে শয়ন পাতি।
সুন্দর হে, সুন্দর হে,
বরমাল্যখানি তারি আনো বহে
তুমি আনো বহে।
অবগুণ্ঠনছায়া ঘুচায়ে দিয়ে
হেরো লজ্জিত স্মিতমুখ শুভ আলোকে॥

২০।৯।৩৪

৬

দূরের বন্ধু সুরের দূতীরে
পাঠালো তোমার ঘরে।
মিলনবীণা যে হৃদয়ের মাঝে
বাজে তব অগোচরে।

মনের কথাটি গোপনে গোপনে
বাতাসে বাতাসে ভেসে আসে মনে,
বনে উপবনে,

বকুলশাখার চঞ্চলতায়
মর্মরে মর্মরে

পুষ্পমালার পরশপুলক
পেয়েছ বক্ষতলে।
রাখো তুমি তারে সিক্ত করিয়া
সুখের অশ্রুজলে।

ধরো সাহানাতে মিলনের পালা,
সাজাও যতনে বরণের ডালা,
মালতীর মালা,
অঞ্চলে ঢেকে কনকপ্রদীপ
আনো তার পথ-'পরে

২১।৯।৩৪

৭

ওরে চিত্ররেখাডোরে বাঁধিল কে—
বহু- পূর্বস্মৃতিসম হেরি ওকে।
কার তুলিকা নিল মন্ত্রে জিনি
এই মঞ্জুল রূপের নির্ঝরিণী,
স্থির নির্ঝরিণী,
যেন ফাল্গুন-উপবনে শুক্লরাতে,
দোলপূর্ণিমাতে,
এল ছন্দমুরতি কার নব অশোকে।

নৃত্যকলা যেন চিত্রে লিখা
কোন্ স্বর্গের মোহিনী মরীচিকা,
শরৎ-নীলাম্বরে তড়িৎলতা
কোথা হারাইল চঞ্চলতা।

হে স্তব্ধবাণী, কারে দিবে আনি
নন্দনমন্দারমাল্যখানি,
বরমাল্যখানি,
প্রিয়- বন্দনগান-জাগানো রাতে
শুভ দর্শন দিবে তুমি কাহার চোখে ॥

২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

৮

মায়াবন-বিহারিণী হরিণী,
গহনস্বপনসঞ্চারিণী,
কেন তারে ধরিবারে করি পণ, অকারণ।
থাক্ থাক্ নিজমনে দূরেতে,
আমি শুধু বাঁশরীর সুরেতে
পরশ করিব ওর প্রাণমন, অকারণ

চমকিবে ফাগুনের পবনে,
পশিবে আকাশবাণী শ্রবণে,
চিত্ত আকুল হবে অনুখন, অকারণ।
দূর হতে আমি তারে সাধিব,
গোপনে বিরহডোরে বাঁধিব,
বাঁধনবিহীন সেই যে বাঁধন, অকারণ ॥

২৯ সেপ্টেম্বর [১৯৩৪]

৯

কাছে থেকে দূর রচিল কেন গো আঁধারে,
মিলনের মাঝে বিরহকারায় বাঁধা রে।
সমুখে রয়েছে সুধাপারাবার,
নাগাল না পায় তবু আঁখি তার,
কেমনে সরাব কুহেলিকার এই বাধা রে।

আড়ালে আড়ালে শুনি শুধু তার বাণী যে,
জানি তারে আমি তবু তারে নাহি জানি যে।
শুধু বেদনায় অন্তরে পাই,
অন্তরে পেয়ে বাহিরে হারাই,
আমার ভুবন রবে কি কেবলি আধা রে॥

৩০ সেপ্টেম্বর [১৯৩৪]

১০

কোন্ গহন অরণ্যে তারে এলেম হারায়ে—
কোন্ দূর জনমের কোন্ স্মৃতিবিস্মৃতিছায়ে।
আজ আলো-আঁধারে
কখন্ বুঝি দেখি কখন্ দেখি না তারে।
কোন্ মিলনসুখের স্বপনসাগর এল পারায়ে।
ধরা-অধরার মাঝে
ছায়ানটের রাগিণীতে আমার বাঁশি বাজে।
বকুলতলায় ছায়ার নাচন ফুলের গন্ধে মিশে
জানি নে মন পাগল করে কিসে—
কোন্ নটিনীর ঘূর্ণি আঁচল লাগে আমার গায়ে॥

৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

—

কালের যাত্রা

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

৫৭ বছর বয়সের জন্মোৎসব উপলক্ষে

কবির সস্নেহ উপহার

৩১ ভাদ্র ১৩৩৯

রথের রশি

রথের রশি

রথযাত্রার মেলায় মেয়েরা

প্রথমা

এবার কী হল ভাই !
উঠেছি কোন্ ভোরে, তখন কাক ডাকে নি।
কঙ্কালিতলার দিঘিতে দুটো ডুব দিয়েই
ছুটে এলুম রথ দেখতে, বেলা হয়ে গেল—
রথের নেই দেখা। চাকার নেই শব্দ।

দ্বিতীয়া

চারি দিকে সব যেন থম্‌থমে হয়ে আছে,
ছম্‌ছম্ করছে গা।

তৃতীয়া

দোকানি পসারিরা চুপচাপ ব'সে,
কেনাবেচা বন্ধ। রাস্তার ধারে ধারে
লোক জটলা করে তাকিয়ে আছে
কখন্ আসবে রথ। যেন আশা ছেড়ে দিয়েছে।

প্রথমা

দেশের লোকের প্রথম যাত্রার দিন আজ—
বেরবেন ব্রাহ্মণঠাকুর শিষ্য নিয়ে—
বেরবেন রাজা, পিছনে চলবে সৈন্যসামন্ত—
পণ্ডিতমশায় বেরবেন, ছাত্ররা চলবে পুঁথিপত্র হাতে।
কোলের ছেলে নিয়ে মেয়েরা বেরবে,
ছেলেদের হবে প্রথম শুভযাত্রা—
কিন্তু কেন সব গেল হঠাৎ থেমে।

দ্বিতীয়া

ওই দেখ্, পুরুতঠাকুর বিড়্ বিড়্ করছে ওখানে।
মহাকালের পাণ্ডা বসে মাথায় হাত দিয়ে।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

সন্ন্যাসী

সর্বনাশ এল।
বাধবে যুদ্ধ, জ্বলবে আগুন, লাগবে মারী,
ধরণী হবে বন্ধ্যা, জল যাবে শুকিয়ে।

প্রথমা

এ কী অকল্যাণের কথা ঠাকুর!
উৎসবে এসেছি মহাকালের মন্দিরে—
আজ রথযাত্রার দিন।

সন্ন্যাসী

দেখতে পাচ্ছ না— আজ ধনীর আছে ধন,
তার মূল্য গেছে ফাঁক হয়ে গজভুক্ত কপিত্থের মতো।
ভরা ফসলের খেতে বাসা করেছে উপবাস।
যক্ষরাজ স্বয়ং তার ভাণ্ডারে বসেছে প্রায়োপবেশনে।
দেখতে পাচ্ছ না— লক্ষ্মীর ভাণ্ড আজ শতছিদ্র,
তাঁর প্রসাদধারা শুষে নিচ্ছে মরুভূমিতে—
ফলছে না কোনো ফল।

তৃতীয়া

হাঁ ঠাকুর, তাই তো দেখি।

সন্ন্যাসী

তোমরা কেবলই করেছ ঋণ,
কিছুই কর নি শোধ,
দেউলে করে দিয়েছ যুগের বিত্ত।
তাই নড়ে না আজ আর রথ—
ওই যে, পথের বুক জুড়ে পড়ে আছে তার অসাড় দড়িটা।

প্রথমা

তাই তো, বাপ রে, গা শিউরে ওঠে—
এ যে অজগর সাপ, খেয়ে খেয়ে মোটা হয়ে আর নড়ে না

সন্ন্যাসী

ওই তো রথের দড়ি, যত চলে না ততই জড়ায়।
যখন চলে, দেয় মুক্তি।

দ্বিতীয়া

বুঝেছি আমাদের পুজো নেবেন ব'লে
হত্যে দিয়ে পড়ে আছেন দড়ি-দেবতা।
পুজো পেলেই হবেন তুষ্ট।

প্রথমা

ও ভাই, পুজো তো আনি নি। ভুল হয়েছে।

তৃতীয়া

পুজোর কথা তো ছিল না—
ভেবেছিলেম রথের মেলায় কেবল বেচব কিনব,
বাজি দেখব জাদুকরের,
আর দেখব বাঁদর-নাচ।
চল্‌-না শিগগির, এখনো সময় আছে,
আনি গে পুজো।

[সকলের প্রস্থান

নাগরিকদের প্রবেশ

প্রথম নাগরিক

দেখ্‌ দেখ্‌ রে, রথের দড়িটা কেমন করে পড়ে আছে।
যুগযুগান্তরের দড়ি, দেশদেশান্তরের হাত পড়েছে ওই দড়িতে,
আজ অনড় হয়ে মাটি কামড়ে আছে
সর্বাঙ্গ কালো ক'রে।

দ্বিতীয় নাগরিক

ভয় লাগছে রে। সরে দাঁড়া, সরে দাঁড়া।
মনে হচ্ছে ওটা এখনি ধরবে ফণা, মারবে ছোবল।

তৃতীয় নাগরিক

একটু একটু নড়ছে যেন রে। আঁকুবাঁকু করছে বুঝি।

প্রথম নাগরিক

বলিস্ নে অমন কথা। মুখে আনতে নেই।
ও যদি আপনি নড়ে তা হলে কি আর রক্ষে আছে।

তৃতীয় নাগরিক

তা হলে ওর নাড়া খেয়ে সংসারের সব জোড়গুলো
বিজোড় হয়ে পড়বে। আমরা যদি না চালাই—
ও যদি আপনি চলে, তা হলে পড়ব যে চাকার তলায়।

প্রথম নাগরিক

ওই দেখ্ ভাই, পুরুতের গেছে মুখ শুকিয়ে,
কোণে বসে বসে পড়ছে মন্তর।

দ্বিতীয় নাগরিক

সেদিন নেই রে
যেদিন পুরুতের মন্তর-পড়া হাতের টানে চলত রথ।
ওরা ছিল কালের প্রথম বাহন।

তৃতীয় নাগরিক

তবু আজ ভোরবেলা দেখি ঠাকুর লেগেছেন টান দিতে—
কিন্তু একেবারেই উলটো দিকে, পিছনের পথে।

প্রথম নাগরিক

সেটাই তো ঠিক পথ, পবিত্র পথ, আদি পথ।
সেই পথ থেকে দূরে এসেই তো কালের মাথার ঠিক থাকছে না।

দ্বিতীয় নাগরিক

মস্ত পণ্ডিত হয়ে উঠলি দেখি। এত কথা শিখলি কোথা।

প্রথম নাগরিক

ওই পণ্ডিতেরই কাছে। তাঁরা বলেন—
মহাকালের নিজের নাড়ীর টান পিছনের দিকে,
পাঁচজনের দড়ির টানে অগত্যা চলেন সামনে।
নইলে তিনি পিছু হটতে হটতে একেবারে পৌঁছতেন
অনাদি কালের অতল গহ্বরে।

তৃতীয় নাগরিক

ওই রশিটার দিকে চাইতে ভয় করে।
ওটা যেন যুগান্তের নাড়ী—
সান্নিপাতিক জ্বরে আজ দব্‌দব্‌ করছে।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

সন্ন্যাসী

সর্বনাশ এল।
গুরুগুরু শব্দ মাটির নীচে।
ভূমিকম্পের জন্ম হচ্ছে।
গুহার মধ্য থেকে আগুন লক্‌লক্‌ মেলছে রসনা।
পূর্বে পশ্চিমে আকাশ হয়েছে রক্তবর্ণ।
প্রলয়দীপ্তির আঙটি পরেছে দিক্‌চক্রবাল।

[প্রস্থান

প্রথম নাগরিক

দেশে পুণ্যাত্মা কেউ নেই কি আজ।
ধরুক-না এসে দড়িটা।

দ্বিতীয় নাগরিক

এক-একটি পুণ্যাত্মাকে খুঁজে বের করতেই
এক-এক যুগ যায় বয়ে—
ততক্ষণ পাপাত্মাদের হবে কী দশা।

তৃতীয় নাগরিক

পাপাত্মাদের কী হবে তা নিয়ে ভগবানের মাথাব্যথা নেই।

দ্বিতীয় নাগরিক

সে কী কথা। সংসার তো পাপাত্মাদের নিয়েই।
তারা না থাকলে তো লোকনাথের রাজত্ব উজাড়।
পুণ্যাত্মা কালেভদ্রে দৈবাৎ আসে,
আমাদের ঠেলায় দৌড় মারে বনে জঙ্গলে গুহায়।

প্রথম নাগরিক

দড়িটার রঙ যেন এল নীল হয়ে।
সামলে কথা কোস।

মেয়েদের প্রবেশ

প্রথমা

বাজা ভাই, শাঁখ বাজা—
রথ না চললে কিছুই চলবে না।
চড়বে না হাঁড়ি, বুলবুলিতে খেয়ে যাবে ধান।
এরই মধ্যে আমার মেজো ছেলের গেছে চাকরি,
তার বউটা শুষছে জ্বরে। কপালে কী আছে জানি নে।

প্রথম নাগরিক

মেয়েমানুষ, তোমরা এখানে কী করতে।
কালের রথযাত্রায় কোনো হাত নেই তোমাদের।
কুটনো কোটো গে ঘরে।

দ্বিতীয়া

কেন, পুজো দিতে তো পারি।
আমরা না থাকলে পুরুতের পেট হত না এত মোটা।
গড় করি তোমায় দড়ি-নারায়ণ! প্রসন্ন হও।
এনেছি তোমার ভোগ। ওলো, ঢাল্ ঢাল্ ঘি,
ঢাল্ দুধ, গঙ্গাজলের ঘটি কোথায়,
ঢেলে দে-না জল। পঞ্চগব্য রাখ্ ওইখানে,
জ্বালা পঞ্চপ্রদীপ। বাবা দড়ি-নারায়ণ,
এই আমার মানত রইল, তুমি যখন নড়বে
মাথা মুড়িয়ে চুল দেব ফেলে।

তৃতীয়া

এক মাস ছেড়ে দেব ভাত, খাব শুধু রুটি।
বলো-না ভাই, সবাই মিলে— জয় দড়ি-নারায়ণের জয়।

প্রথম নাগরিক

কোথাকার মূর্খ তোরা—
দে মহাকালনাথের জয়ধ্বনি।

প্রথমা

কোথায় তোমাদের মহাকালনাথ? দেখি নে তো চক্ষে।
দড়ি-প্রভুকে দেখছি প্রত্যক্ষ—
হনুমানপ্রভুর লঙ্কা-পোড়ানো লেজখানার মতো—
কী মোটা, কী কালো, আহা দেখে চক্ষু সার্থক হল।
মরণকালে ওই দড়ি-ধোওয়া জল ছিটিয়ে দিয়ো আমার মাথায়।

দ্বিতীয়া

গালিয়ে নেব আমার হার, আমার বাজুবন্দ,
দড়ির ডগা দেব সোনা-বাঁধিয়ে।

তৃতীয়া

আহা, কী সুন্দর রূপ গো।

প্রথমা

যেন যমুনানদীর ধারা।

দ্বিতীয়া

যেন নাগকন্যার বেণী।

তৃতীয়া

যেন গণেশঠাকুরের শুঁড় চলেছে লম্বা হয়ে,
দেখে জল আসে চোখে।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

প্রথমা

দড়ি-ঠাকুরের পুজো এনেছি ঠাকুর!
কিন্তু পুরুত যে নড়েন না, মন্তর পড়বে কে।

সন্ন্যাসী

কী হবে মন্তরে।
কালের পথ হয়েছে দুর্গম।

কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু, কোথাও গভীর গর্ত।
করতে হবে সব সমান, তবে ঘুচবে বিপদ।

তৃতীয়া

বাবা, সাতজন্মে শুনি নি এমন কথা।
চিরদিনই তো উঁচুর মান রেখেছে নিচু মাথা হেঁট ক'রে।
উঁচু-নিচুর সাঁকোর উপর দিয়েই তো রথ চলে।

সন্ন্যাসী

দিনে দিনে গর্তগুলোর হাঁ উঠছে বেড়ে।
হয়েছে বাড়াবাড়ি, সাঁকো আর টিঁকছে না।
ভেঙে পড়ল ব'লে।

[প্রস্থান

প্রথমা

চল্ ভাই, তবে পুজো দিই গে রাস্তা-ঠাকুরকে।
আর গর্ত-প্রভুকেও তো সিন্নি দিয়ে করতে হবে খুশি,
কী জানি ওঁরা শাপ দেন যদি। একটি-আধটি তো নন,
আছেন দু-হাত পাঁচ-হাত অন্তর।
নমো নমো দড়ি-ভগবান, রাগ কোরো না ঠাকুর,
ঘরে আছে ছেলেপুলে।

[মেয়েদের প্রস্থান

সৈন্যদলের প্রবেশ

প্রথম সৈনিক

ওরে বাস্ রে। দড়িটা পড়ে আছে পথের মাঝখানে—
যেন একজটা ডাকিনীর জটা।

দ্বিতীয় সৈনিক

মাথা দিল হেঁট করে।
স্বয়ং রাজা লাগালেন হাত, আমরাও ছিলুম পিছনে।
একটু ক্যাচ্‌কোঁচ্‌ও করলে না চাকাটা।

তৃতীয় সৈনিক

ও যে আমাদের কাজ নয়, তাই।
ক্ষত্রিয় আমরা, শূদ্র নই, নই গোরু।
চিরদিন আমরা চড়েই এসেছি রথে।
চিরদিন রথ টানে ওই ওরা— যাদের নাম করতে নেই।

প্রথম নাগরিক

শোনো ভাই, আমার কথা।
কালের অপমান করেছি আমরা, তাই ঘটেছে এ-সব অনাসৃষ্টি।

তৃতীয় সৈনিক

এ মানুষটা আবার বলে কী।

প্রথম নাগরিক

ত্রেতাযুগে শূদ্র নিতে গেল ব্রাহ্মণের মান—
চাইলে তপস্যা করতে, এত বড়ো আস্পর্ধা—
সেদিনও অকাল লাগল দেশে, অচল হল রথ।
দয়াময় রামচন্দ্রের হাতে কাটা গেল তার মাথা,
তবে তো হল আপদশান্তি।

দ্বিতীয় নাগরিক

সেই শূদ্ররা শাস্ত্র পড়ছেন আজকাল,
হাত থেকে কাড়তে গেলে বলেন, আমরা কি মানুষ নই।

তৃতীয় নাগরিক

মানুষ নই! বটে! কতই শুনব কালে কালে।
কোন্‌দিন বলবে, ঢুকব দেবালয়ে।
বলবে, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের সঙ্গে নাইব এক ঘাটে।

প্রথম নাগরিক

এর পরেও রথ যে চলছে না, সে আমাদের প্রতি দয়া করে।
চললে চাকার তলায় গুঁড়িয়ে যেত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

প্রথম সৈনিক

আজ শূদ্র পড়ে শাস্ত্র,
কাল লাঙল ধরবে ব্রাহ্মণ। সর্বনাশ!

দ্বিতীয় সৈনিক

চল্‌-না ওদের পাড়ায় গিয়ে প্রমাণ করে আসি—
ওরাই মানুষ না আমরা।

দ্বিতীয় নাগরিক

এ দিকে আবার কোন্‌ বুদ্ধিমান বলেছে রাজাকে—
কলিযুগে না চলে শাস্ত্র, না চলে শস্ত্র,
চলে কেবল স্বর্ণচক্র। তিনি ডাক দিয়েছেন শেঠজিকে।

প্রথম সৈনিক

রথ যদি চলে বেনের টানে
তবে গলায় অস্ত্র বেঁধে জলে দেব ডুব।

দ্বিতীয় সৈনিক

দাদা, রাগ কর মিছে, সময় হয়েছে বাঁকা।
এ যুগে পুষ্পধনুর ছিলেটাও
বেনের টানেই দেয় মিঠে সুরে টংকার।
তার তীরগুলোর ফলা বেনের ঘরে শানিয়ে না আনলে
ঠিক জায়গায় বাজে না বুকে।

তৃতীয় সৈনিক

তা সত্যি। এ কালের রাজত্বে রাজা থাকেন সামনে,
পিছনে থাকে বেনে। যাকে বলে অর্ধ-বেনে-রাজেশ্বর মূর্তি।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

প্রথম সৈনিক

এই-যে সন্ন্যাসী, রথ চলে না কেন আমাদের হাতে।

সন্ন্যাসী

তোমরা দড়িটাকে করেছ জর্জর।
যেখানে যত তীর ছুঁড়েছ, বিঁধেছে ওর গায়ে।

ভিতরে ভিতরে ফাঁক হয়ে গেছে, আলগা হয়েছে বাঁধনের জোর।
তোমরা কেবল ওর ক্ষত বাড়িয়েই চলবে,
বলের মাতলামিতে দুর্বল করবে কালকে।
সরে যাও, সরে যাও ওর পথ থেকে।

[প্রস্থান

ধনপতির অনুচরবর্গের প্রবেশ

প্রথম ধনিক

এটা কী গো, এখনি হুঁচট খেয়ে পড়েছিলুম।

দ্বিতীয় ধনিক

ওটাই তো রথের দড়ি।

চতুর্থ ধনিক

বীভৎস হয়ে উঠেছে, যেন বাসুকি ম'রে উঠল ফুলে।

প্রথম সৈনিক

কে এরা সব।

দ্বিতীয় সৈনিক

আংটির হীরে থেকে আলোর উচ্চিংড়েগুলো
লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ছে চোখে।

প্রথম নাগরিক

ধনপতি শেঠির দল এরা।

প্রথম ধনিক

আমাদের শেঠজিকে ডেকেছেন রাজা।
সবাই আশা করছে, তাঁর হাতেই চলবে রথ।

দ্বিতীয় সৈনিক

সবাই বলতে বোঝায় কাকে বাপু?
আর তারা আশাই বা করে কিসের।

দ্বিতীয় ধনিক

তারা জানে, আজকাল চলছে যা-কিছু
সব ধনপতির হাতেই চলছে।

প্রথম সৈনিক

সত্যি নাকি! এখনি দেখিয়ে দিতে পারি, তলোয়ার চলে আমাদেরই হাতে।

তৃতীয় ধনিক

তোমাদের হাতখানাকে চালাচ্ছে কে।

প্রথম সৈনিক

চুপ, দুর্বিনীত!

দ্বিতীয় ধনিক

চুপ করব আমরা বটে।
আজ আমাদেরই আওয়াজ ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছে জলে স্থলে আকাশে।

প্রথম সৈনিক

মনে ভাবছ, আমাদের শতঘ্নী ভুলেছে তার বজ্রনাদ।

দ্বিতীয় ধনিক

ভুললে চলবে কেন। তাকে যে আমাদেরই হুকুম
ঘোষণা করতে হয় এক হাট থেকে আর-এক হাটে সমুদ্রের ঘাটে ঘাটে।

প্রথম নাগরিক

ওদের সঙ্গে পারবে না তর্কে।

প্রথম সৈনিক

কী বলো, পারব না!
সবচেয়ে বড়ো তর্কটা ঝন্‌ঝন্‌ করছে খাপের মধ্যে।

প্রথম নাগরিক

তোমাদের তলোয়ারগুলোর কোনোটা খায় ওদের নিমক,
কোনোটা খেয়ে বসেছে ওদের ঘুষ।

প্রথম ধনিক

শুনলেম, নর্মদাতীরের বাবাজিকে আনা হয়েছিল
দড়িতে হাত লাগাবার জন্যে। জান খবর?

দ্বিতীয় ধনিক

জানি বৈকি।
রাজার চর পৌঁছল গুহায়,
তখন প্রভু আছেন চিত হয়ে বুকে দুই পা আটকে।
তূরী ভেরী দামামা জগঝম্পের চোটে ধ্যান যদি বা ভাঙল,
পা-দুখানা তখন আড়ষ্ট কাঠ।

নাগরিক

শ্রীচরণের দোষ কী দাদা!
পঁয়ষট্টি বছরের মধ্যে একবারও নাম করে নি চলাফেরার।
বাবাজি বললেন কী।

দ্বিতীয় ধনিক

কথা কওয়ার বালাই নেই।
জিভটার চাঞ্চল্যে রাগ করে গোড়াতেই সেটা ফেলেছেন কেটে।

ধনিক

তার পরে?

দ্বিতীয় ধনিক

তার পরে দশ জোয়ানে মিলে আনলে তাঁকে রথতলায়।
দড়িতে যেমনি তাঁর হাত পড়া,
রথের চাকা বসে যেতে লাগল মাটির নীচে।

ধনিক

নিজের মনটা যেমন ডুবিয়েছেন রথটাকেও তেমনি তলিয়ে দেবার চেষ্টা।

দ্বিতীয় ধনিক

একদিন উপবাসেই মানুষের পা চায় না চলতে—
পঁয়ষট্টি বছরের উপবাসের ভার পড়ল চাকার 'পরে।

মন্ত্রী ও ধনপতির প্রবেশ

ধনপতি

ডাক পড়ল কেন মন্ত্রীমশায়?

মন্ত্রী

অনর্থপাত হলেই সর্বাগ্রে তোমাকে স্মরণ করি।

ধনপতি

অর্থপাতে যার প্রতিকার, আমার দ্বারা তাই সম্ভব।

মন্ত্রী

মহাকালের রথ চলছে না।

ধনপতি

এ পর্যন্ত আমরা কেবল চাকায় তেল দিয়েছি,
রশিতে টান দিই নি।

মন্ত্রী

অন্য সব শক্তি আজ অর্থহীন,
তোমাদের অর্থবান হাতের পরীক্ষা হোক।

ধনপতি

চেষ্টা করা যাক।
দৈবক্রমে চেষ্টা যদি সফল হয়, অপরাধ নিয়ো না তবে।

দলের লোকের প্রতি

বলো সিদ্ধিরস্তু!

সকলে

সিদ্ধিরস্তু!

ধনপতি

লাগো তবে ভাগ্যবানেরা। টান দেও।

ধনিক

রশি তুলতেই পারি নে। বিষম ভারী।

ধনপতি

এসো কোষাধ্যক্ষ, ধরো তুমি কষে।
বলো সিদ্ধিরস্তু! টানো, সিদ্ধিরস্তু!
টানো, সিদ্ধিরস্তু!

দ্বিতীয় ধনিক

মন্ত্রীমশায়, রশিটা যেন আরো আড়ষ্ট হয়ে উঠল,
আর আমাদের হাতে হল যেন পক্ষাঘাত।

সকলে

দুয়ো দুয়ো!

সৈনিক

যাক, আমাদের মান রক্ষা হল।

পুরোহিত

আমাদের ধর্মরক্ষা হল।

সৈনিক

যদি থাকত সেকাল, আজ তোমার মাথা যেত কাটা।

ধনপতি

ওই সোজা কাজটাই জান তোমরা।
মাথা খাটাতে পার না, কাটতেই পার মাথা।
মন্ত্রীমশায়, ভাবছ কী।

মন্ত্রী

ভাবছি, সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল—
এখন উপায় কী।

ধনপতি

এবার উপায় বের করবেন স্বয়ং মহাকাল।
তাঁর নিজের ডাক যেখানে পৌঁছবে
সেখান থেকে বাহন আসবে ছুটে।
আজ যারা চোখে পড়ে না
কাল তারা দেখা দেবে সবচেয়ে বেশি।
ওহে খাতাঞ্চি, এই বেলা সামলাও গে খাতাপত্র—
কোষাধ্যক্ষ, সিন্ধুকগুলো বন্ধ করো শক্ত তালায়।

[ধনপতি ও তার দলের প্রস্থান

মেয়েদের প্রবেশ

প্রথমা

হাঁ গা, রথ চলল না এখনো, দেশসুদ্ধ রইল উপোস করে!
কলিকালে ভক্তি নেই যে।

মন্ত্রী

তোমাদের ভক্তির অভাব কী বাছা,
দেখি না তার জোর কত।

প্রথমা

নমো নমো,
নমো নমো বাবা দড়ি-ঠাকুর, অন্ত পাই নে তোমার দয়ার।
নমো নমো!

দ্বিতীয়া

তিনকড়ির মা বললে সতেরো বছরের ব্রাহ্মণের মেয়ে,
ঠিকদুক্কুর বেলা, বোম ভোলানাথ ব'লে
তালপুকুরে— ঘাটের থেকে তিন হাতের মধ্যে—
এক ডুবে তিন গোছা পাট-শিয়ালা তুলে
ভিজে চুল দিয়ে বেঁধে দড়ি-প্রভুর কাছে পোড়ালে
প্রভুর টনক নড়বে। জোগাড় করেছি অনেক যত্নে,
সময়ও হয়েছে পোড়াবার।
আগে দড়ি-বাবার গায়ে সিঁদুর-চন্দন লাগা;
ভয় কিসের, ভক্তবৎসল তিনি—
মনে মনে শ্রীগুরুর নাম করে গায়ে হাত ঠেকালে
অপরাধ নেবেন না তিনি।

প্রথমা

তুই দে-না ভাই চন্দন লাগিয়ে, আমাকে বলিস কেন।
আমার দেওরপো পেট-রোগা,
কী জানি কিসের থেকে কী হয়।

তৃতীয়া

ওই তো ধোঁওয়া পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে।
কিন্তু জাগলেন না তো।
দয়াময়!
জয় প্রভু, জয় দড়ি-দয়াল প্রভু, মুখ তুলে চাও।
তোমাকে দেব পরিয়ে পঁয়তাল্লিশ ভরির সোনার আংটি—
গড়াতে দিয়েছি বেণী স্যাকরার কাছে।

দ্বিতীয়া

তিন বছর থাকব দাসী হয়ে, ভোগ দেব তিন বেলা।
ওলো বিনি, পাখাটা এনেছিস তো বাতাস কর্-না—
দেখছিস্ নে রোদ্দুরে তেতে উঠেছে ওঁর মেঘবরন গা।
ঘটি করে গঙ্গাজলটা ঢেলে দে।
ওইখানকার কাদাটা দে তো, ভাই, আমার কপালে মাখিয়ে।
এই তো আমাদের খেঁদি এনেছে খিচুড়ি-ভোগ।
বেলা হয়ে গেল, আহা, কত কষ্ট পেলেন প্রভু!
জয় দড়ীশ্বর, জয় মহাদড়ীশ্বর, জয় দেবদেবদড়ীশ্বর,
গড় করি তোমায়, টলুক তোমার মন।
মাথা কুটছি তোমার পায়ে, টলুক তোমার মন।
পাখা কর্ লো; পাখা কর্, জোরে জোরে।

প্রথমা

কী হবে গো, কী হবে আমাদের—
দয়া হল না যে! আমার তিন ছেলে বিদেশে,
তারা ভালোয় ভালোয় ফিরলে হয়।

চরের প্রবেশ

মন্ত্রী

বাছারা, এখানে তোমাদের কাজ হল—
এখন ঘরে গিয়ে জপতপ ব্রতনিয়ম করো গে।
আমাদের কাজ আমরা করি।

প্রথমা

যাচ্ছি, কিন্তু দেখো মন্ত্রীবাবা,
ওই ধোঁওয়াটা যেন শেষ পর্যন্ত থাকে—
আর ওই বিল্বিপত্রটা যেন পড়ে না যায়।

[মেয়েদের প্রস্থান

চর

মন্ত্রীমশায়, গোল বেধেছে শূদ্রপাড়ায়।

মন্ত্রী

কী হল।

চর

দলে দলে ওরা আসছে ছুটে— বলছে, রথ চালাব আমরা।

সকলে

বলে কী! রশি ছুঁতেই পাবে না।

চর

ঠেকাবে কে তাদের। মারতে মারতে তলোয়ার যাবে ক্ষয়ে।
মন্ত্রীমশায়, বসে পড়লে যে।

মন্ত্রী

দল বেঁধে আসছে বলে ভয় করি নে—
ভয় হচ্ছে পারবে ওরা।

সৈনিক

বল কী মন্ত্রীমহারাজ, শিলা জলে ভাসবে?

মন্ত্রী

নীচের তলাটা হঠাৎ উপরের তলা হয়ে ওঠাকেই বলে প্রলয়,
বরাবর যা প্রচ্ছন্ন তাই প্রকাশ হবার সময়টাই যুগান্তর।

সৈনিক

আদেশ করুন কী করতে হবে, ভয় করি নে আমরা।

মন্ত্রী

ভয় করতেই হবে, তলোয়ারের বেড়া তুলে বন্যা ঠেকানো যায় না।

চর

এখন কী আদেশ বলুন।

মন্ত্রী

বাধা দিয়ো না ওদের।
বাধা পেলে শক্তি নিজেকে নিজে চিনতে পারে—
চিনতে পারলেই আর ঠেকানো যায় না।

চর

ওই-যে এসে পড়েছে ওরা।

মন্ত্রী

কিছু কোরো না তোমরা, থাকো স্থির হয়ে।

শূদ্রদলের প্রবেশ

দলপতি

আমরা এলেম বাবার রথ চালাতে।

মন্ত্রী

তোমরাই তো বাবার রথ চালিয়ে আসছ চিরদিন।

দলপতি

এতদিন আমরা পড়তেম রথের চাকার তলায়,
দ'লে গিয়ে ধুলোয় যেতুম চ্যাপটা হয়ে।
এবার সেই বলি তো নিল না বাবা।

মন্ত্রী

তাই তো দেখলেম।
সকাল থেকে চাকার সামনে ধুলোয় করলে লুটোপুটি—
ভয়ে উপরে তাকালে না, পাছে ঠাকুরের দিকে চোখ পড়ে—
তবু তো চাকার মধ্যে একটুও দেখা গেল না ক্ষুধার লক্ষণ।

পুরোহিত

একেই বলে অগ্নিমান্দ্য,
তেজ ক্ষয় হলেই ঘটে এই দশা।

দলপতি

এবার তিনি ডাক দিয়েছেন তাঁর রশি ধরতে।

পুরোহিত

রশি ধরতে! ভারি বুদ্ধি তোমাদের। জানলে কী করে।

দলপতি

কেমন করে জানা গেল সে তো কেউ জানে না।
ভোরবেলায় উঠেই সবাই বললে সবাইকে,
ডাক দিয়েছেন বাবা। কথাটা ছড়িয়ে গেল পাড়ায় পাড়ায়,
পেরিয়ে গেল মাঠ, পেরিয়ে গেল নদী,
পাহাড় ডিঙিয়ে গেল খবর—
ডাক দিয়েছেন বাবা।

সৈনিক

রক্ত দেবার জন্যে।

দলপতি

না, টান দেবার জন্যে।

পুরোহিত

বরাবর সংসার যারা চালায়, রথের রশি তাদেরই হাতে।

দলপতি

সংসার কি তোমরাই চালাও ঠাকুর?

পুরোহিত

স্পর্ধা দেখো একবার। কথার জবাব দিতে শিখেছে—
লাগল বলে ব্রহ্মশাপ।

দলপতি

মন্ত্রীমশায়, তোমরাই কি চালাও সংসার।

মন্ত্রী

সে কী কথা। সংসার বলতে তো তোমরাই।
নিজগুণেই চল, তাই রক্ষে।
চালাক লোকে বলে আমরাই চালাচ্ছি।
আমরা মান রাখি লোক ভুলিয়ে।

দলপতি

আমরাই তো জোগাই অন্ন, তাই তোমরা বাঁচ—
আমরাই বুনি বস্ত্র, তাতেই তোমাদের লজ্জারক্ষা।

সৈনিক

সর্বনাশ! এতদিন মাথা হেঁট করে বলে এসেছে ওরা—
তোমরাই আমাদের অন্নবস্ত্রের মালিক।
আজ ধরেছে উলটো বুলি, এ তো সহ্য হয় না।

মন্ত্রী
সৈনিকের প্রতি

চুপ করো।
সর্দার, মহাকালের বাহন তোমরাই,
তোমরা নারায়ণের গরুড়।
এখন তোমাদের কাজ সাধন করে যাও তোমরা।
তার পরে আসবে আমাদের কাজের পালা।

দলপতি

আয় রে ভাই, লাগাই টান, মরি আর বাঁচি।

মন্ত্রী

কিন্তু বাবা, সাবধানে রাস্তা বাঁচিয়ে চোলো।
বরাবর যে রাস্তায় রথ চলেছে যেয়ো সেই রাস্তা ধরে।
পোড়ো না যেন একেবারে আমাদের ঘাড়ের উপর।

দলপতি

কখনো বড়ো রাস্তায় চলতে পাই নি, তাই রাস্তা চিনি নে।
রথে আছেন যিনি তিনিই সামলাবেন।
আয় ভাই, দেখছিস রথচূড়ায় কেতনটা উঠছে দুলে।
বাবার ইশারা। ভয় নেই আর, ভয় নেই। ওই চেয়ে দেখ্‌ রে ভাই,
মরা নদীতে যেমন বান আসে
দড়ির মধ্যে তেমনি প্রাণ এসে পৌঁচেছে।

পুরোহিত

ছুঁলো, ছুঁলো দেখছি, ছুঁলো শেষে রশি ছুঁলো পাষণ্ডেরা।

মেয়েদের ছুটিয়া প্রবেশ

সকলে

ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, দোহাই বাবা—
ও গদাধর, ও বনমালী, এমন মহাপাপ কোরো না।
পৃথিবী যাবে যে রসাতলে।
আমাদের স্বামী ভাই বোন ছেলে
কাউকে পারব না বাঁচাতে।
চল্‌ রে চল্‌, দেখলেও পাপ আছে।

[প্রস্থান

পুরোহিত

চোখ বোজো, চোখ বোজো তোমরা।
ভস্ম হয়ে যাবে ক্রুদ্ধ মহাকালের মূর্তি দেখলে।

সৈনিক

এ কি, এ কি, চাকার শব্দ নাকি –
না আকাশটা উঠল আর্তনাদ করে ?

পুরোহিত

হতেই পারে না— কিছুতেই হতে পারে না—
কোনো শাস্ত্রেই লেখে না।

নাগরিক

নড়েছে রে, নড়েছে, ওই তো চলেছে।

সৈনিক

কী ধুলোই উড়ল – পৃথিবী নিশ্বাস ছাড়ছে।
অন্যায়, ঘোর অন্যায়! রথ শেষে চলল যে—
পাপ, মহাপাপ!

শূদ্রদল

জয় জয়, মহাকালনাথের জয়!

পুরোহিত

তাই তো, এও দেখতে হল চোখে!

সৈনিক

ঠাকুর, তুমিই হুকুম করো, ঠেকাব রথ-চলা।
বৃদ্ধ হয়েছেন মহাকাল, তাঁর বুদ্ধিভ্রংশ হল—
দেখলেম সেটা স্বচক্ষে।

পুরোহিত

সাহস হয় না হুকুম করতে।
অবশেষে জাত খোওয়াতেই বাবার যদি খেয়াল গেল
এবারকার মতো চুপ করে থাকো রঞ্জুলাল।
আসছে বারে ওঁকে হবেই প্রায়শ্চিত্ত করতে।
হবেই, হবেই, হবেই।
ওঁর দেহ শোধন করতে গঙ্গা যাবে শুকিয়ে।

সৈনিক

গঙ্গার দরকার হবে না।
ঘড়ার ঢাকনার মতো শূদ্রগুলোর মাথা দেব উড়িয়ে,
ঢালব ওদের রক্ত।

নাগরিক

মন্ত্রীমশায়, যাও কোথায়?

মন্ত্রী

যাব ওদের সঙ্গে রশি ধরতে।

সৈনিক

ছি ছি, ওদের হাতে হাত মেলাবে তুমি!

মন্ত্রী

ওরাই যে আজ পেয়েছে কালের প্রসাদ।
স্পষ্টই গেল দেখা, এ মায়া নয়, নয় স্বপ্ন।
এবার থেকে মান রাখতে হবে ওদের সঙ্গে সমান হয়ে।

সৈনিক

তাই বলে ওদেরই এক সারে রশি ধরা !
ঠেকাবই আমরা, রথ চলুক আর নাই চলুক

মন্ত্রী

এবার দেখছি চাকার তলায় পড়বার পালা তোমাদেরই।

সৈনিক

সেও ভালো। অনেক কাল চণ্ডালের রক্ত শুষে চাকা আছে অশুচি,
এবার পাবে শুদ্ধ রক্ত। স্বাদ বদল করুক।

পুরোহিত

কী হল মন্ত্রী, এ কোন্ শনিগ্রহের ভেলকি ?
রথটা যে এরই মধ্যে নেমে পড়েছে রাজপথে।
পৃথিবী তবু তো নেমে গেল না রসাতলে।
মাতাল রথ কোথায় পড়ে কোন্ পল্লীর ঘাড়ে, কে জানে।

সৈনিক

ওই দেখো, ধনপতির দল আর্তনাদ করে ডাকছে আমাদের।
রথটা একেবারে সোজা চলেছে ওদেরই ভাণ্ডারের মুখে।
যাই ওদের রক্ষা করতে।

মন্ত্রী

নিজেদের রক্ষার কথা ভাবো।
দেখছ না, ঝুঁকেছে তোমাদের অস্ত্রশালার দিকে।

সৈনিক

উপায় ?

মন্ত্রী

ওদের সঙ্গে মিলে ধরো-সে রশি।
বাঁচবার দিকে ফিরিয়ে আনো রথটাকে—
দো-মনা করবার সময় নেই।

[প্রস্থান

সৈনিক

কী করবে ঠাকুর, তুমি কী করবে।

পুরোহিত

বীরগণ, তোমরা কী করবে বলো আগে।

সৈনিক

কী করতে হবে বলো-না ভাইসকল!
সবাই যে একেবারে চুপ করে গেছ!
রশি ধরব না লড়াই করব?
ঠাকুর, তুমি কী করবে বলোই-না।

পুরোহিত

কী জানি, রশি ধরব না শাস্ত্র আওড়াব।

সৈনিক

গেল, গেল সব। রথের এমন হাঁক শুনি নি কোনো পুরুষে।

দ্বিতীয় সৈনিক

চেয়ে দেখো-না, ওরাই কি টানছে রথ
না রথটা আপনিই চলেছে ওদের ঠেলে নিয়ে।

তৃতীয় সৈনিক

এতকাল রথটা চলত যেন স্বপ্নে—
আমরা দিতেম টান আর ও পিছে পিছে আসত দড়িবাঁধা গোরুর মতো।
আজ চলছে জেগে উঠে। বাপ রে, কী তেজ।
মানছে না আমাদের বাপদাদার পথ—
একটা কাঁচা পথে ছুটেছে বুনো মহিষের মতো।
পিঠের উপর চড়ে বসেছে যম।

দ্বিতীয় সৈনিক

ওই যে আসছে কবি, ওকে জিজ্ঞাসা করি ব্যাপারটা কী।

পুরোহিত

পাগলের মতো কথা বলছ তোমরা।
আমরাই বুঝলেম না মানে, বুঝবে কবি?
ওরা তো বানিয়ে বানিয়ে বলে কথা— শাস্ত্র জানে কী?

কবির প্রবেশ

দ্বিতীয় সৈনিক

এ কী উলটোপালটা ব্যাপার কবি।
পুরুতের হাতে চলল না রথ, রাজার হাতে না—
মানে বুঝলে কিছু ?

কবি

ওদের মাথা ছিল অত্যন্ত উঁচু,
মহাকালের রথের চূড়ার দিকেই ছিল ওদের দৃষ্টি—
নীচের দিকে নামল না চোখ,
রথের দড়িটাকেই করলে তুচ্ছ।
মানুষের সঙ্গে মানুষকে বাঁধে যে বাঁধন তাকে ওরা মানে নি।
রাগী বাঁধন আজ উন্মত্ত হয়ে লেজ আছড়াচ্ছে—
দেবে ওদের হাড় গুঁড়িয়ে।

পুরোহিত

তোমার শূদ্রগুলোই কি এত বুদ্ধিমান—
ওরাই কি দড়ির নিয়ম মেনে চলতে পারবে।

কবি

পারবে না হয়তো।
একদিন ওরা ভাববে, রথী কেউ নেই, রথের সর্বময় কর্তা ওরাই।
দেখো, কাল থেকেই শুরু করবে চেঁচাতে—
জয় আমাদের হাল লাঙল চরকা তাঁতের।
তখন এঁরাই হবেন বলরামের চেলা—
হলধরের মাতলামিতে জগৎটা উঠবে টলমলিয়ে।

পুরোহিত

তখন যদি রথ আর-একবার অচল হয়
বোধ করি তোমার মতো কবিরই ডাক পড়বে—
তিনি ফুঁ দিয়ে ঘোরাবেন চাকা।

কবি

নিতান্ত ঠাট্টা নয় পুরুতঠাকুর!
রথযাত্রায় কবির ডাক পড়েছে বারে বারে,
কাজের লোকের ভিড় ঠেলে পারে নি সে পৌঁছতে।

পুরোহিত

রথ তারা চালাবে কিসের জোরে। বুঝিয়ে বলো।

কবি

গায়ের জোরে নয়, ছন্দের জোরে।
আমরা মানি ছন্দ, জানি একঝোঁকা হলেই তাল কাটে।
মরে মানুষ সেই অসুন্দরের হাতে
চাল-চলন যার এক পাশে বাঁকা;
কুম্ভকর্ণের মতো গড়ন যার বেমানান,
যার ভোজন কুৎসিত,
যার ওজন অপরিমিত।
আমরা মানি সুন্দরকে। তোমরা মানো কঠোরকে—
অস্ত্রের কঠোরকে, শাস্ত্রের কঠোরকে।
বাইরে ঠেলা-মারার উপর বিশ্বাস,
অন্তরের তালমানের উপর নয়।

সৈনিক

তুমি তো লম্বা উপদেশ দিয়ে চললে,
ও দিকে যে লাগল আগুন।

কবি

যুগাবসানে লাগেই তো আগুন।
যা ছাই হবার তাই ছাই হয়,
যা টিঁকে যায় তাই নিয়ে সৃষ্টি হয় নবযুগের।

সৈনিক

তুমি কী করবে কবি!

কবি

আমি তাল রেখে রেখে গান গাব।

সৈনিক

কী হবে তার ফল ?

কবি

যারা টানছে রথ তারা পা ফেলবে তালে তালে।
পা যখন হয় বেতালা
তখন ক্ষুদে ক্ষুদে খালখন্দগুলো মারমূর্তি ধরে।
মাতালের কাছে রাজপথও হয়ে ওঠে বন্ধুর।

মেয়েদের প্রবেশ

প্রথমা

এ হল কী ঠাকুর !
তোমরা এতদিন আমাদের কী শিখিয়েছিলে !
দেবতা মানলে না পুজো, ভক্তি হল মিছে।
মানলে কিনা শুদ্দুরের টান, মেলেচ্ছের ছোঁওয়া !
ছি ছি, কী ঘেন্না।

কবি

পুজো তোমরা দিলে কোথায়।

দ্বিতীয়া

এই তো এইখানেই।
ঘি ঢেলেছি, দুধ ঢেলেছি, ঢেলেছি গঙ্গাজল—
রাস্তা এখনো কাদা হয়ে আছে।
পাতায় ফুলে ওখানটা গেছে পিছল হয়ে।

কবি

পুজো পড়েছে ধুলোয়, ভক্তি করেছে মাটি।
রথের দড়ি কি পড়ে থাকে বাইরে।
সে থাকে মানুষে মানুষে বাঁধা, দেহে দেহে প্রাণে প্রাণে।
সেইখানে জমেছে অপরাধ, বাঁধন হয়েছে দুর্বল।

তৃতীয়া

আর ওরা— যাদের নাম করতে নেই ?

কবি

ওদের দিকেই ঠাকুর পাশ ফিরলেন—
নইলে ছন্দ মেলে না। এক দিকটা উঁচু হয়েছিল অতিশয় বেশি,
ঠাকুর নীচে দাঁড়ালেন ছোটোর দিকে,
সেইখান থেকে মারলেন টান, বড়োটাকে দিলেন কাত করে।
সমান করে নিলেন তাঁর আসনটা।

প্রথমা

তার পরে হবে কী।

কবি

তার পরে কোন্‌-এক যুগে কোন্‌-একদিন
আসবে উলটোরথের পালা।
তখন আবার নতুন যুগের উঁচুতে নিচুতে হবে বোঝাপড়া।
এই বেলা থেকে বাঁধনটাতে দাও মন—
রথের দড়িটাকে নাও বুকে তুলে, ধুলোয় ফেলো না;
রাস্তাটাকে ভক্তিরসে দিয়ো না কাদা করে।
আজকের মতো বলো সবাই মিলে—
যারা এতদিন মরে ছিল তারা উঠুক বেঁচে;
যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে, তারা দাঁড়াক একবার মাথা তুলে।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

সন্ন্যাসী

জয়— মহাকালনাথের জয়!

—

কবির দীক্ষা

কবির দীক্ষা

আমি তো ভরতি হয়েছিলেম তোমার দলেই।

দৌড় দিলে কেন।

ভয়ে।

ভয় কিসের।

ভবভয়নিবারিণী সভার সভাপতি—

আহা, পরম ধার্মিক—

বললেন আমাকে, ওই লক্ষ্মীছাড়াটা—

থামলে কেন।
আমি জানি বলেছেন,
লক্ষ্মীছাড়াটা দিচ্ছে তোমাকে রসাতলে।

একেবারে ওই শব্দটাই—
রসাতলে।

অন্যায় তো বলেন নি।

বলো কী কবি!

জীবন আমার যাঁর সাধনায় মগ্ন
সেই দেবতা তলিয়ে আছেন অতলে—

খুড়ো জ্যাঠারা বলেছেন সবাই—
তোমার দীক্ষায় না আছে অর্থের আশা,
না আছে পরমার্থের।

পণ্ডিত মানুষ তোমার খুড়ো জ্যাঠারা,
বলেন ঠিক কথাই।

সর্বনাশ তো তবে।

সত্য কথাটি বেরল মুখে—
সর্বনাশ, ওইটের থেকেই সর্বলাভ—
সর্বনেশেই মন কেড়েছে কবির।

বুঝলেম কথাটা।
মিলছে তত্ত্বানন্দস্বামীর সঙ্গে।
শিবমন্ত্র দেন তিনি প্রলয়সাধনায়।

শিবমন্ত্র দিই আমিও।

অবাক করলে—
তুমি তো জানি কবি,
কবে হলে শৈব।

কালিদাস ছিলেন শৈব।
সেই পথের পথিক কবিরা।

কেন বল বেঠিক কথা।
তোমরা তো মেতে আছ নাচে গানে।

জগৎজোড়া নাচগানেরই পালা আমাদের প্রভুর।
কী বলেন তত্ত্বানন্দস্বামী।

প্রলয় ছাড়া কথা নেই তাঁর মুখে।
তত্ত্বানন্দস্বামীর নাচ!

শুনলে গম্ভীর গণেশ
বৃংহিতধ্বনি করবেন অট্টহাস্যে।
ত্যাগের দীক্ষা নিয়েছি তাঁর কাছে।

যদি পরামর্শ দেন সবই ফুঁকে দিতে
তবে কী করবে ত্যাগ।
উপুড় করবে শূন্য ঘড়াটাকে?

তুমি কাকে বলো ত্যাগ কবি!

ত্যাগের রূপ দেখো ওই ঝর্নায়,
নিয়ত গ্রহণ করে তাই নিয়তই করে দান।
নিজেকে যে শুকিয়েছে যদি সেই হল ত্যাগী,
তবে সব-আগে শিব ত্যাগ করুন অন্নপূর্ণাকে।

কিন্তু সন্ন্যাসী শিব ভিক্ষুক, সেটা তো মানো।
মহত্ত্ব দিলেন তিনি জগতের দরিদ্রকে।

দারিদ্র্যে তাঁরই মহত্ত্ব মহৎ যিনি ঐশ্বর্যে।
মহাদেব ভিক্ষা নেন পাবেন ব'লে নয়—
আমাদের দানকে করতে চান সার্থক।

ভরব কেমন করে তাঁর অসীম ভিক্ষার ঝুলি।

তিনি না চাইলে খুঁজেই পেতেম না দেবার ধন।

বুঝলেম না কথাটা।

কিছু তিনি চান নি কুকুর-বেড়ালের কাছে।
'অন্ন চাই' বলে ডাক দিলেন মানুষের দ্বারে।
বেরল মানুষ লাঙল কাঁধে—
যে মাটি ফাঁকা ছিল, প্রকাশ পেল তাতে অন্ন।

বললেন 'চাই কাপড়'।
হাত পেতেই রইলেন—
বেরল ফলের থেকে তুলো,
তুলোর থেকে সুতো,
সুতোর থেকে কাপড়।
ভাগ্যে তাঁর ভিক্ষার ঝুলি অসীম
তাই মানুষ সন্ধান পায় অসীম সম্পদের।
নইলে দিন কাটত কুকুর-বেড়ালের মতো।
তোমরা কি বলো সব-চেয়ে বড়ো সন্ন্যাসী ওই কুকুর-বেড়াল।
তত্ত্বানন্দস্বামী কী বলেন।

তিনি বলেন, শিবের ভিক্ষার ঝুলির টানে আমরা হব নিষ্কিঞ্চন।
যার কিছু নেই দেবার, তার নেই দেনা।
সংসারের নালিশ একেবারে বন্ধ তার নামে।

মানুষকে যদি দেউলে করেন তিনি,
তবে ভিক্ষু দেবতার ব্যাবসা হবে যে অচল।
তাঁর ভিক্ষের ঝুলির টানে মানুষ হয় ধনী—
যদি দান করতেন ঘটত সর্বনাশ।

তোমার কথা শুনে বোধ হচ্ছে, মিথ্যে নয় পুরাণের কথাটা।
ভিক্ষুক শিবের বরেই রাবণের স্বর্ণলঙ্কা।
কিন্তু আগুন কেন লাগে সে লঙ্কায়।

সে যে করলে ভিক্ষে বন্ধ। লাগল জমাতে।
দিতে যেমনি পারলে না, যেমনি লাগল কাড়তে,
অমনি ঘটল সর্বনাশ।
ভিক্ষু দেবতা দ্বারে বসে হাঁকেন, দেহি দেহি।
তবু আমরা কোণে বসে আছি নেংটি প'রে, দেবো কিই বা!
কেউ বা লোভে পড়ে ভাঙতে চায় না জমানো ধন।

তবে কি য়ুরোপথণ্ডকে বলবে শিবের চেলা।

বলতে হয় বৈকি।
নইলে এত উন্নতি কেন।
মেনেছে ওরা মহাভিক্ষুর দাবি।
তাই বের করে আনছে নব নব সম্পদ—
ধনে প্রাণে জ্ঞানে মানে।

অশান্তিও তো কম দেখছি নে ওদের মধ্যে।

যখন শিবের ভোগ ভেঙে নিজের দিকে চুরি করে
উৎপাত বাধে তখন অশিবের।
ত্যাগের ধনে মানুষ ধনী, চুরির ধনে নয়।
আমরা কুঁড়ে, ভিক্ষুক দেবতাকে দিই নে কিছু।
তাই মরছি সব দিকেই—
খেতে ফসল যায় মরে,
পুকুরে জল যায় শুকিয়ে,
দেহে ধরে রোগ, মনে ধরে অবসাদ,
বিদেশী রাজা দেয় দুই কান মলে।
শিবের ঝুলি ভরব যেদিন, সেদিন আমাদের সব ভরবে।

কিন্তু গোড়ায় বলছিলে যে রসের কথাটা
শিবের ঝুলিতে তো তার খবর মেলে না।

মেলে বৈকি। গাছের ত্যাগ ফল দিয়ে।
ফল ফলে না রস না হলে।
প্রাণের ধনই হল আনন্দ, যাকে বলি রস।
যেখানে রসের দৈন্য, ভরে না সেখানে প্রাণের কমণ্ডলু।

শ্মশানে কেন দেখি তোমার ওই দেবতাকে।

মৃত্যুতে তাঁর বিলাস বলে নয়, মৃত্যুকে জয় করবেন বলে।
যে দেবতারা অমরাবতীতে
দ্বন্দ্বই নেই তাঁদের মৃত্যুর সঙ্গে।
মানুষের যিনি শিব
তিনি বিষপান করেন বিষকে কাটাবেন বলে।
'ভিক্ষা দাও' 'ভিক্ষা দাও' দ্বারে দ্বারে রব উঠল তাঁর কণ্ঠে—
সে মুষ্টিভিক্ষা নয়, নয় অবজ্ঞার ভিক্ষা।
নির্ঝরিণীর স্রোত যখন হয় অলস
তখন তার দানে পঙ্ক হয় প্রধান।
দুর্বল আত্মার তামসিক দানে
দেবতার তৃতীয় নেত্রে আগুন ওঠে জ্বলে।

—

পরিশিষ্ট

রথযাত্রা

আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান প্রমথনাথ বিশীর কোনো রচনা হইতে এই নাট্যদৃশ্যের ভাবটি আমার মনে আসিয়াছিল।

১ নাগরিক। মহাকালের রথযাত্রায় এবার যে রথ অচল হয়ে রইল। কিছুতেই নড়লেন না। কার দোষে হল তা জানি, গণৎকার গুনে বলে দিয়েছেন।

২ নাগরিক। হয়তো কারো দোষ নেই, হয়তো মহাকাল ক্লান্ত, আর চলতে রাজি নন।

১ নাগরিক। আরে বল কী। চলতে রাজি না হলে আমাদের চলবে কী করে। ওই দেখো-না, রথের দড়িটা পড়ে আছে, কত যুগের দড়ি— কত মানুষের হাত পড়েছে ওই দড়িতে, এমন করে তো কোনোদিন ধুলোয় পড়ে থাকে নি।

৩ নাগরিক। রথ যদি না চলে, আর ওই দড়ি যদি পড়ে থাকে, তা হলে ও যে সমস্ত রাজ্যের গলায় দড়ি হবে।

৪ নাগরিক। বাবা রে, ওই দড়িটা দেখে ভয় লাগছে, মনে হচ্ছে ও যেন ক্রমে ক্রমে সাপ হয়ে ফণা ধরে উঠবে।

৩ নাগরিক। দেখ্-না ভাই, একটু একটু যেন নড়ছে মনে হচ্ছে।

১ নাগরিক। আমরা যদি না নড়াতে পারি, ও যদি আপনি নড়ে ওঠে, তা হলে যে সর্বনাশ হবে।

৩ নাগরিক। তা হলে জগতের সব জোড়গুলো বিজোড় হয়ে উঠবে রে। তা হলে রথটা চলবে আমাদের বুকের পাঁজরের উপর দিয়ে। আমরা ওকে নিজে চালাই বলেই তো ওর চাকার তলায় পড়ি নে। এখন উপায়?

১ নাগরিক। ওই দেখ্-না, পুরুতঠাকুর বসে মন্ত্র পড়ছে।

২ নাগরিক। রথযাত্রায় সব আগেই ওই পুরুতঠাকুরের দলরাই তো দড়ি ধরে প্রথম টানটা দিয়ে থাকেন। এবার কি শুধু মন্ত্র পড়েই কাজ সারবেন নাকি।

৪ নাগরিক। চেষ্টার ত্রুটি হয় নি। ভোরের বেলা সেই অন্ধকার থাকতে সবার আগে ওঁরাই তো একচোট টানাটানি করে নিয়েছেন। কলিযুগে ওঁদের কি আর তেজ আছে রে।

৩ নাগরিক। ওই দেখ্, আমার কেমন মনে হচ্ছে ওই রশিটা যেন যুগ-যুগান্তরের নাড়ীর মতো দব্‌দব্ করছে।

১ নাগরিক। আমার মনে হচ্ছে ওই রথ চলবে কোনো এক পুণ্যাত্মা মহাপুরুষের স্পর্শ পেলে।

২ নাগরিক। আরে, রথ চালাতে পুণ্যাত্মা মহাপুরুষের জন্যে বসে থাকলে শুভলগ্নও তো বসে থাকবে না। ততক্ষণে আমাদের মতো পাপাত্মাদের দশা হবে কী।

১ নাগরিক। পাপাত্মাদের দশা কী হবে সেজন্য ভগবানের মাথাব্যথা নেই।

২ নাগরিক। বলিস কী রে। পুণ্যাত্মাদের জন্যে এ জগৎ তৈরি হয় নি। তা হলে যে আমরা অতিষ্ঠ হতুম। সৃষ্টিটা আমাদেরই জন্যে। দৈবাৎ দুটো-একটা পুণ্যাত্মা দেখা দেয়, বেশিক্ষণ টিঁকতে পারে না— আমাদের ঠেলা খেয়ে বনে জঙ্গলে গুহায় তাদের আশ্রয় নিতে হয়।

১ নাগরিক। তা হলে তুমিই দড়াটা ধরে টান দাও-না দাদা— দেখা যাক রথ এগোয় না দড়াটা ছেঁড়ে, না তুমিই পড় মুখ থুবড়ে।

২ নাগরিক। দাদা, আমাদের সঙ্গে পুণ্যাত্মাদের তফাতটা এই যে, গুন্‌তিতে তারা একটা-দুটো, আমরা অনেক। যদি ভরসা করে সেই অনেকে মিলে টান দিতে পারি রথ চলবেই। মিলতে পারলেম না বলে টানতে পারলেম না, পুণ্যাত্মাদের জন্যে শূন্যের দিকে তাকিয়ে রইলেম।

৪ নাগরিক। ওরে ভাই, দড়িটা মনে হল যেন নড়ে উঠল, কথাবার্তা সামলে বলিস রে।

১ নাগরিক। শাস্ত্রে আছে ব্রাহ্মমুহূর্তে রথের প্রথম টানটা পুরোহিতের হাতে, দ্বিতীয় প্রহরে দ্বিতীয় টানটা রাজার— সেও তো হয়ে গেল, রথ এগোল না— এখন তৃতীয় টানটা কার হাতে পড়বে।

সৈন্যদলের প্রবেশ

১ সৈন্য। বড়ো লজ্জা দিলে রে! স্বয়ং রাজা হাত লাগালে, সঙ্গে সঙ্গে আমরা হাজার জনে ধরে টান দিলুম, চাকার একটু ক্যাঁচকোঁচ শব্দও হল না।

২ সৈন্য। আমরা ক্ষত্রিয়, আমরা তো শূদ্রের মতো গোরু নই— রথ টানা আমাদের কাজ নয়, আমাদের কাজ রথে চড়া।

২ সৈনিক। কিম্বা রথ ভাঙা। ইচ্ছে করছে কুড়ুলখানা নিয়ে রথটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলি। দেখি মহাকাল কেমন ঠেকাতে পারেন।

১ নাগরিক। দাদা, তোমাদের অস্ত্রের জোরে রথ চলবেও না, রথ ভাঙবেও না। গণৎকার কী গুনে বলেছে তা শোন নি বুঝি?

১ সৈনিক। কী বল্‌ তো।

১ নাগরিক। ত্রেতাযুগে একবার যে কাণ্ড ঘটেছিল, এখন তাই ঘটবে।

১ সৈনিক। আরে, ত্রেতাযুগে তো লঙ্কাকাণ্ড ঘটেছিল।

১ নাগরিক। সে নয়, সে নয়।

২ সৈনিক। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড?

১ নাগরিক। তারই কাছাকাছি। সেই-যে শূদ্র তপস্যা করতে গিয়েছিল, মহাকাল তাতেই তো সেদিন ক্ষেপে উঠেছিলেন। তার পর রামচন্দ্র শূদ্রের মাথা কেটে তবে বাবাকে শান্ত করেছিলেন।

৩ সৈনিক। আজ তো সে ভয় নেই, আজ ব্রাহ্মণই তপস্যা ছেড়ে দিয়েছে, শূদ্রের তো কথাই নেই।

১ নাগরিক। এখনকার শূদ্রেরা কেউ কেউ লুকিয়ে লুকিয়ে শাস্ত্র পড়তে আরম্ভ করেছে। ধরা পড়লে বলে, আমরা কি মানুষ নই। স্বয়ং কলিযুগ শূদ্রের কানে মন্ত্র দিতে বসেছে যে তারা মানুষ। রথ যে চলে না তাতে মহাকালের দোষ কী— না চললেই ভালো। যদি চলতে শুরু করে তা হলে চন্দ্রসূর্য গুঁড়িয়ে ফেলবে। শূদ্র চোখ রাঙিয়ে বলে কিনা 'আমরা কি মানুষ নই'! কালে কালে কতই শুনব!

১ সৈনিক। আজ শূদ্র পড়ছে শাস্ত্র, কাল ব্রাহ্মণ ধরবে লাঙল! সর্বনাশ!

২ সৈনিক। তা হলে চল্‌, ওদের পাড়ায় গিয়ে একবার কষে হাত চালানো যাক। ওরা মানুষ না আমরা মানুষ, প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিই।

২ নাগরিক। রাজাকে কে গিয়ে বলেছে, কলিযুগে শাস্ত্রও চলে না, অস্ত্রও চলে না, একমাত্র চলে স্বর্ণমুদ্রা। রাজা তাই আমাদের ধনপতি শেঠজিকে তলব করেছেন। ধনপতি টান দিলেই রথ চলবে এইরকম সকলের বিশ্বাস।

১ সৈনিক। বেনের টানে যদি রথ চলে তা হলে আমরা অস্ত্র গলায় বেঁধে জলে ডুবে মরব।

২ সৈনিক। তা, রাগ করলে চলবে কেন। বেনের টান আজকাল সব জায়গাতেই লেগেছে। এমন-কি, পুষ্পধনুর ছিলেটা বেনের টানেই চঞ্চল হয়ে ওঠে। তার তীরগুলো বেনের ঘরেই তৈরি।

৩ সৈনিক। তা সত্যি, আজকাল আমাদের রাজত্বে রাজা থাকেন সামনে, কিন্তু পিছনে থাকে বেনে।

১ সৈনিক। পিছনেই থাকে তো থাক্‌-না— আমরা তো থাকি ডাইনে-বাঁয়ে, মান তো আমাদেরই।

৩ সৈনিক। পাশে যে থাকে তার মান থাকতে পারে, কিন্তু পিছনে যে থাকে ঠেলাটা যে তারই।

ধনপতির অনুচরদের প্রবেশ

১ সৈনিক। এরা সব কে।

২ সৈনিক। আংটির হীরে থেকে আলোর উচ্চিংড়েগুলো চোখের উপর লাফ দিয়ে পড়ছে।

৩ সৈনিক। গলায় সোনার হার নয়তো, সোনার শিকল বললেই হয়। কে এরা।

১ নাগরিক। এরাই তো আমাদের ধনপতি শেঠীর দল। ওই সোনার শিকল দিয়ে এরা মহাকালকে বেঁধে ফেলেছে বলেই তাঁর রথ চলছে না।

১ সৈনিক। তোমরা কি করতে এসেছ।

১ ধনিক। রাজা আমাদের প্রভু ধনপতিকে ডেকে পাঠিয়েছেন। কারো হাতে রথ চলছে না, তাঁর হাতে চলবে বলেই সবাই আশা করে আছে।

২ সৈনিক। সবাই বলতে কে রে বাপু? আর আশাই বা করে কেন।

২ ধনিক। আজকাল যা-কিছু চলছে সবই যে ধনপতির হাতে চলছে।

১ সৈনিক। এখনই দেখিয়ে দিতে পারি তলোয়ার তার হাতে চলে না, আমাদের হাতে চলে।

৩ ধনিক। তোমাদের হাত চালাচ্ছে কে সেটা বুঝি এখনো খবর পাও নি।

১ সৈনিক। চুপ বেয়াদব!

২ ধনিক। আমরা চুপ করব? আজ আমাদেরই আওয়াজ জলে স্থলে আকাশে তা জান?

১ সৈনিক। তোমাদের আওয়াজ? আমাদের শতঘ্নী যখন বজ্রনাদ করে ওঠে—

২ ধনিক। তোমাদের শতঘ্নী বজ্রনাদে আমাদেরই কথা এক ঘাট থেকে আর-এক ঘাটে, এক হাট থেকে আর-এক হাটে ঘোষণা করবার জন্যে আছে।

১ নাগরিক। দাদা, ওদের সঙ্গে ঝগড়া করে পেরে উঠবে না।

১ সৈনিক। কী বল? পারব না!

১ নাগরিক। না, তোমাদের কোনো তলোয়ার ওদের নিমক খেয়েছে, কোনোটা বা ওদের ঘুষ খেয়েছে, খাপ থেকে বের করতে গেলেই তা বুঝতে পারবে।

১ ধনিক। শুনেছিলেম রথের দড়িতে হাত দেবার জন্যে নর্মদাতীরের বাবাজিকে আজ আনা হয়েছিল। কী হল খবর জান?

২ ধনিক। জানি বৈকি। যখন এরা গুহায় গিয়ে পৌঁছল, দেখল, প্রভু পদ্মাসনে দুই পা আটকে চিত হয়ে পড়ে আছেন। সাড়াশব্দ নেই। বহুকষ্টে ধ্যান ভাঙানো হল। কিন্তু পা দুখানা আড়ষ্ট কাঠ হয়ে গেছে, চলে না।

১ নাগরিক। শ্রীচরণের দোষ কী। তারা আজ ৬৫ বছরের মধ্যে একবারও চলার নাম করে নি। তা, বাবাজি বললেন কী?

২ ধনিক। বলা-কওয়ার বালাই নেই। চাঞ্চল্যের অপবাদ দিয়ে জিবটাকে একেবারে কেটেই ফেলেছেন। গোঁ গোঁ করতে লাগলেন, তার থেকে যার যে-রকম খেয়াল সে সেই রকমেরই অর্থ করে নিলে।

১ ধনিক। তার পরে?

২ ধনিক। তার পর ধরাধরি করে বাবাজিকে রথতলা পর্যন্ত আনা গেল। কিন্তু যেমনি দড়ি ধরলেন রথের চাকা মাটির মধ্যে বসে যেতে লাগল।

১ ধনিক। হা, হা, বাবাজি নিজের মনটাকে যেমন গভীরে ডুবিয়েছেন, মহাকালের রথটাকে সুদ্ধ তেমনি তলিয়ে দিচ্ছিলেন বুঝি?

২ ধনিক। ওঁর পঁয়ষট্টি বৎসরের উপবাসের ভারে চাকা বসে গেল। একদিনের উপবাসের ধাক্কাতেই আমাদের পা চলতে চায় না।

১ নাগরিক। উপবাসের ভারের কথা বলছ, তোমাদের অহংকারের ভারটা বড়ো কম নয়।

২ নাগরিক। সে ভার আপনাকেই আপনি চূর্ণ করে। দেখব আজ তোমাদের ধনপতির মাথা কেমন হেঁট না হয়।

১ ধনিক। আচ্ছা দেখো। বাবা মহাকালের ভোগ জোগায় কে। সে তো আমাদের ধনপতি। যদি বন্ধ করে দেয় তা হলে তাঁর যে চলা না-চলা দুই সমান হয়ে উঠবে। পেট চলা হল সব চলার মূলে।

মন্ত্রী ও ধনপতির প্রবেশ

ধনপতি। মন্ত্রীমশায়, আজ আমাকে ডাক পড়ল কেন।

মন্ত্রী। রাজ্যে যখনই কোনো অনর্থপাত হয় তখনই তো তোমাকেই সর্বাগ্রে ডাক পড়ে।

ধনপতি। অর্থপাতে যার প্রতিকার সম্ভব আমার দ্বারা তার ত্রুটি হয় না। কিন্তু আজকের সংকটটা কী রকমের।

মন্ত্রী। শুনেছ বোধ হয়, মহাকালের রথ আজ কারো হাতের টানেই চলছে না।

ধনপতি। শুনেছি। কিন্তু মন্ত্রী এ-সব কাজ তো এতদিন—

মন্ত্রী। জানি, এতদিন আমাদের পুরোহিত ঠাকুররাই এ-সব কাজ চালিয়েছেন। কিন্তু তখন যে এঁরা স্বাধীন সাধনার জোরে নিজে চলতেন, চালাতেও পারতেন। এখন এঁরা তোমাদেরই দ্বারে অচল হয়ে বাঁধা, এখন এঁদের হাতে কিছুই চলবে না।

ধনপতি। অন্য অন্য বারে রাজা সেনাপতি রাজপারিষদ সকলেই রথের রশিতে হাত লাগাতেন, কখনো তো বাধা ঘটে নি। তখন আমরা তো কেবল চাকায় তেল জুগিয়ে এসেছি, রশিতে টান দিই নি তো।

মন্ত্রী। দেখো শেঠজি, রথযাত্রাটা আমাদের একটা পরীক্ষা। কাদের শক্তিতে সংসারটা সত্যিই চলছে বাবা মহাকালের রথচক্র ঘোরার দ্বারা সেইটেরই প্রমাণ হয়ে থাকে। যখন পুরোহিত ছিলেন নেতা তখন তাঁরা রশি ধরতে না-ধরতে রথটা ঘুম-ভাঙা সিংহের মতো ধড়ফড় করে নড়ে উঠত। এবারে যে কিছুতেই সাড়া দিল না। তার থেকে প্রমাণ হচ্ছে শাস্ত্রই বল, শস্ত্রই বল, সমস্ত অর্থহীন হয়ে পড়েছে— অর্থ এখন তোমারই হাতে। সেই তোমার সার্থক হাতটি আজ রথের রশিতে লাগাতে হবে।

ধনপতি। আগে বরঞ্চ আমার দলের লোকে চেষ্টা করে দেখুক, যদি একটুখানি কেঁপেও ওঠে আমিও হাত দেব, নইলে সকল লোকের সামনে—

মন্ত্রী। কেন আর দেরি করা শেঠজি। রাজ্যের সমস্ত লোক উপোস করে আছে, রথ মন্দিরে গিয়ে না পৌঁছলে কেউ জলগ্রহণ করবে না। তোমার চেষ্টাতেও যদি রথ না চলে লজ্জা কিসের, স্বয়ং পুরোহিত রাজা সকলেরই চেষ্টা ব্যর্থ হল, দেশসুদ্ধ লোক তো তা দেখেছে।

ধনপতি। তাঁরা হলেন লোকপাল, আমরা হলুম পালের লোক; জনসাধারণে তাঁদের বিচার করে একরকমে, আমাদের বিচার করে আর-এক রকমে। রথ যদি না চলে আমার লজ্জা আছে, কিন্তু রথ যদি চলে তা হলে আমার ভয়। তা হলে আমার সেই শুভাদৃষ্টের স্পর্ধা কোনো লোক ক্ষমা করতে পারবেই না। তখন কাল থেকে তোমরাই ভাবতে বসবে আমাকে খর্ব করা যায় কী উপায়ে।

মন্ত্রী। যা বলছ সবই সত্য হতে পারে, কিন্তু তবুও রথ চলা চাই। আর বেশিক্ষণ যদি দ্বিধা কর তা হলে দেশের লোক খেপে যাবে।

ধনপতি। আচ্ছা, তবে চেষ্টা করে দেখি। কিন্তু যদি দৈবক্রমে আমার চেষ্টা সফল হয় তা হলে আমার অপরাধ নিয়ো না। (দলের লোকদের প্রতি) বলো সিদ্ধিরস্তু!

সকলে। সিদ্ধিরস্তু!

ধনপতি। বলো, জয় সিদ্ধিদেবী!

সকলে। জয় সিদ্ধিদেবী!

ধনপতি। টানব কী! এ রশি যে তুলতেই পারি নে। মহাকালের রথও যেমন ভারী, রশিও তেমনি, এ ভার বহন কি সহজ লোকের কর্ম। (দলের লোকের প্রতি) এসো, তোমরাও সবাই এসো। সকলে মিলে হাত লাগাও। আমার খাতাঞ্চি কোথায় গেল। এসো, এসো। এসো কোষাধ্যক্ষ! আবার বলো, সিদ্ধিরস্তু— টানো। সিদ্ধিরস্তু, আর-এক টান! সিদ্ধিরস্তু— জোরে! নাঃ, কিছুই হল না। আমাদের হাতে রশিটা ক্রমেই যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠছে।

সকলে। দুয়ো! দুয়ো!

১ সৈনিক। যাক। আমাদের মান রক্ষা হল।

ধনপতি। নমস্কার, মহাকাল! তুমি আমার সহায়, তাই তুমি স্থির হয়ে রইলে। আমার হাতে যদি তুমি টলতে, আমারই ঘাড়ের উপরে টলে পড়তে, একেবারে পিষে যেতুম।

খাতাঞ্চি। প্রভু, এই যুগে আমাদের যে সম্মান সমাদর ক্রমেই বেড়ে উঠছিল সেটার বড়ো ক্ষতি হল।

ধনপতি। দেখো, এতকাল আমরা মহাকালের রথের ছায়ায় দাঁড়িয়ে লোকচক্ষুর অগোচরে বড়ো হয়েছি। আজ রথের সামনে এসে পড়ে আমাদের সংকট ঘটেছে— আশেপাশে লোকের দাঁত-কিড়মিড় অনেক দিন থেকে শুনছি। এখন যদি স্পষ্ট সবাই দেখতে পায় যে, রশি ধরে আমরাই রথ চালাচ্ছি তা হলে আমাদের উপর এমন দৃষ্টি লাগবে যে বেশিক্ষণ টিঁকব না।

১ সৈনিক। যদি সেকাল থাকত তা হলে তোমার হাতে রথ চলল না বলে তোমার মাথা কাটা যেত।

ধনপতি। অর্থাৎ, তোমরা তা হলে হাতে কাজ পেতে। মাথা কাটতে না পেলেই তোমরা বেকার।

১ সৈনিক। আজ কেউ তোমাদের গায়ে হাত দিতে সাহস করে না; রাজাও না। এতে বাবা মহাকালেরই মান খর্ব হয়ে গেছে।

ধনপতি। সত্যি কথা বলি— যখন সবাই গায়ে হাত দিতে সাহস করত তখন ঢের বেশি নিরাপদে ছিলুম। আজ সবাই যে আমাদের মানতে বাধ্য হয়েছে এরই মধ্যে আমাদের মরণ। মন্ত্রীমশায়, চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবছ কী।

মন্ত্রী। ভাবছি সব-রকম চেষ্টাই ব্যর্থ হল, এখন কোনো উপায় তো আর বাকি নেই।

ধনপতি। ভাবনা কী। যখন তোমাদের কোনো উপায় খাটল না তখন মহাকাল নিজের উপায় নিজেই বের করবেন। তাঁর চলবার গরজ তাঁরই, আমাদের নয় ; তাঁর ডাক পড়লেই যেখান থেকে হোক তাঁর বাহন ছুটে আসবে। আজ যাদের দেখাই যাচ্ছে না, কাল তারা সবচেয়ে বেশি চোখে পড়বে। তার আগে আমার খাতাপত্র সামলাই গে। এসো হে কোষাধ্যক্ষ, আজ সিন্ধুকগুলো একটু শক্ত করে বন্ধ করতে হবে।

[ধনপতি ও তার দলের প্রস্থান

চরের প্রবেশ

চর। মন্ত্রীমশায়, আমাদের শূদ্রপাড়ায় ভারি গোল বেধে গেছে।

মন্ত্রী। কেন কী হয়েছে।

চর। দলে দলে আসছে সব ছুটে। তারা বলে, বাবার রথ আমরা চালাব।

সকলে। বলে কী। রশি ছুঁতেই দেব না।

চর। কিন্তু তাদের ঠেকাবে কে।

সৈন্যদল। আমরা আছি।

চর। তোমরা কজনই বা আছ। তাদের মারতে মারতে তোমাদের তলোয়ার ক্ষয়ে যাবে— তবু এত বাকি থাকবে যে রথতলায় তোমাদের আর জায়গাই হবে না।

চর। মন্ত্রীমশায়, তুমি যে একেবারে বসে পড়লে ?

মন্ত্রী। ওরা দল বেঁধে আসছে বলে আমি ভয় করি নে।

চর। তবে ?

মন্ত্রী। আমার মনে ভয় হচ্ছে ওরা পারবে।

সৈনিক দল। বল কী, মন্ত্রী-মহারাজ, ওরা পারবে মহাকালের রথ টানতে! শিলা জলে ভাসবে!

মন্ত্রী। দৈবাৎ যদি পারে তা হলে বিধাতার নূতন বিধি শুরু হবে। নীচের তলাটা হঠাৎ উপরের তলা হয়ে ওঠাকেই বলে প্রলয়। ভূমিকম্পে মাটির মধ্যে সেই চেষ্টাতেই তো বিভীষিকা। যা বরাবর প্রচ্ছন্ন আছে তাই প্রকাশ হবার সময়টাই যুগান্তরের সময়।

সৈনিক দল। কী করতে চান, আমাদের কী করতে বলেন হুকুম করুন। আমরা কিছুই ভয় করি নে।

মন্ত্রী। সাহস দেখাতে গিয়েই সংসারে ভয় বাড়িয়ে তোলা হয়। গোঁয়ার্তমি করে তলোয়ারের বেড়া তুলে দিয়েই মহাকালের বন্যা ঠেকানো যায় না।

চর। তা, কী করতে হবে বলেন।

মন্ত্রী। ওদের কোনো বাধা না দেওয়াই হচ্ছে সৎপরামর্শ। বাধা দিলে শক্তি আপনাকে আপনি চিনতে পারে। সেই চিনতে দিলেই আর রক্ষে নেই।

সৈনিক দল। তা হলে আমরা দাঁড়িয়ে থাকি? ওরা আসুক?

চর। ওই যে এসে পড়েছে।

মন্ত্রী। তোমরা কিচ্ছু কোরো না। স্থির হয়ে থাকো।

শূদ্রদলের প্রবেশ

মন্ত্রী। (দলপতির প্রতি) এই যে সর্দার! তোমাদের দেখে বড়ো খুশি হলুম।

দলপতি। মন্ত্রীমশায় আমরা বাবার রথ চালাতে এসেছি।

মন্ত্রী। চিরদিন তোমরাই তো বাবার রথ চালিয়ে এসেছ, আমরা তো উপলক্ষ-মাত্র। সে কি আর জানি নে।

দলপতি। এতদিন আমরা রথের চাকার তলায় পড়েছি, আমাদের দ'লে দিয়ে রথ চলে গেছে। এবার তো আমাদের বলি বাবা নিল না।

মন্ত্রী। সে তো দেখতে পাচ্ছি। আজ ভোরবেলায় তোমাদের পঞ্চাশজন চাকার সামনে ধুলোয় লুটোপুটি করলে— তবু চাকার মধ্যে একটুও ক্ষুধার লক্ষণ দেখা গেল না, নড়ল না, ক্যাঁ কোঁ করে চীৎকার করে উঠল না— তাদের শুষ্কতা দেখেই তো ভয় পেয়েছি।

দলপতি। এবারে রথের তলাটাতে পড়বার জন্যে মহাকাল আমাদের ডাক দেন নি— তিনি ডেকেছেন তাঁর রথের রশিটাকে টান দিতে।

পুরোহিত। সত্যি নাকি। কেমন করে জানলে।

দলপতি। কেমন করে জানা যায় সে তো কেউ জানে না। কিন্তু আজ ভোরবেলা থেকেই আমাদের মধ্যে হঠাৎ এই কথা নিয়ে কানাকানি পড়ে গেছে। ছেলেমেয়ে বুড়ো জোয়ান সবাই বলছে 'বাবা ডেকেছেন'।

সৈনিক। রক্ত দেবার জন্যে।

দলপতি। না, টান দেবার জন্যে।

পুরোহিত। দেখো বাবা, ভালো করে ভেবে দেখো, সমস্ত সংসার যারা চালায় মহাকালের রথের রশির জিম্মে তাদেরই 'পরে।

দলপতি। ঠাকুর, সংসার কি তোমরাই চালাও।

পুরোহিত। তা দেখো, কাল খারাপ বটে, তবু হাজার হোক আমরা তো ব্রাহ্মণ বটে।

দলপতি। মন্ত্রীমশায়, সংসার কি তোমরাই চালাও।

মন্ত্রী। সংসার বলতে তো তোমরাই। নিজগুণে চল, আমরা চালাক লোকেরা বলে থাকি আমরাই চালাচ্ছি। তোমাদের বাদ দিলে আমরা কজনই বা আছি।

দলপতি। আমাদের বাদ দিলে তোমরা যে কজনাই থাকো-না, থাকবে কী উপায়ে?

মন্ত্রী। হাঁ, হাঁ, সে তো ঠিক কথা।

দলপতি। আমরাই তো জোগাচ্ছি অন্ন, তাই খেয়ে তোমরা বেঁচে আছ। আমরাই বুনছি বস্ত্র, তাতেই তোমাদের লজ্জারক্ষা।

সৈনিক। সর্বনাশ! এতদিন এরা আমাদেরই কাছে হাত জোড় করে বলে আসছিল 'তোমরাই আমাদের অন্নবস্ত্রের মালিক'। আজ এ কী রকমের সব উলটো বুলি। আর তো সহ্য হয় না।

মন্ত্রী। (সৈনিকের প্রতি) চুপ করো। (দলপতিকে) সর্দার, আমরা তো তোমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলুম। মহাকালের বাহন তোমরাই, সে কথা আমরা বুঝি নে, আমরা কি এত মূঢ়। তোমাদের কাজটা তোমরা সাধন করে দিয়ে যাও, তার পরে আমাদের কাজ করবার অবসর আমরা পাব।

দলপতি। আয় রে ভাই, সবাই মিলে টান দে। মরি আর বাঁচি আজ মহাকালের রথ নড়াবই।

মন্ত্রী। কিন্তু সাবধানে রাস্তা বাঁচিয়ে চোলো। যে রাস্তায় বরাবর রথ চলেছে সেই রাস্তায়। আমাদের ঘাড়ের উপর এসে না পড়ে যেন।

দলপতি। রথের 'পরে রথী আছেন, রাস্তা তিনিই ঠাউরে নেবেন, আমরা তো বাহন, আমরা কী বা বুঝি। আয় রে সবাই। ওই দেখছিস রথের চূড়ায় কেতনটা দুলে উঠেছে, স্বয়ং বাবার ইশারা। ভয় নেই, আয় সবাই।

পুরোহিত। ছুঁলে রে ছুঁলে! রশি ছুঁলে! ছি, ছি!

নাগরিকগণ। হায়, হায়, কী সর্বনাশ!

পুরোহিত। চোখ বোজ্‌রে তোরা সব, সবাই চোখ বোজ্‌! ক্রুদ্ধ মহাকালের মূর্তি দেখলে তোরা ভস্ম হয়ে যাবি।

সৈনিক। ও কী ও! এ কি চাকারই শব্দ না কী? না আকাশ আর্তনাদ করে উঠল?

পুরোহিত। হতেই পারে না।

নাগরিক। ওই তো নড়ল যেন।

সৈনিক। ধুলো উড়েছে যে। অন্যায়, ঘোর অন্যায়! রথ চলেছে! পাপ! মহাপাপ!

শূদ্রদল। জয়, জয় মহাকালের জয়!

পুরোহিত। তাই তো, এ কী কাণ্ড হল!

সৈনিক। ঠাকুর, হুকুম করো। আমাদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এই অপবিত্র রথ চলা বন্ধ করে দিই।

পুরোহিত। হুকুম করতে তো সাহস হয় না। বাবা স্বয়ং যদি ইচ্ছে করে জাত খোয়ান, আমাদের হুকুমে তার প্রায়শ্চিত্ত হবে না।

সৈনিক। তা হলে ফেলে দিই আমাদের অস্ত্র!

পুরোহিত। আর আমিও ফেলে দিই আমার পুঁথিপত্র!

নাগরিকগণ। আমরা যাই সব নগর ছেড়ে! মন্ত্রীমশায়, তুমি কী করবে। কোথায় যাচ্ছ।

মন্ত্রী। আমি যাচ্ছি ওদের সঙ্গে মিলে রশি ধরতে।

সৈনিক। ওদের সঙ্গে মিলবে?

মন্ত্রী। তা হলেই বাবা প্রসন্ন হবেন। স্পষ্ট দেখছি ওরা যে আজ তাঁর প্রসাদ পেয়েছে। এ তো স্বপ্ন নয়, মায়া নয়। ওদের থেকে পিছিয়ে পড়ে আজ কেউ মান রক্ষা করতে পারবে না, মান ওদের সঙ্গে থেকে।

সৈনিক। কিন্তু তাই বলে ওদের সঙ্গে সার মিলিয়ে রশি ধরা! ঠেকাবই ওদের। দলবল ডাকতে চললুম। মহাকালের রথের পথ রক্তে কাদা হয়ে যাবে।

পুরোহিত। আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব, মন্ত্রণা দেবার কাজে লাগতে পারব।

মন্ত্রী। ঠেকাতে পারবে না। এবার দেখছি চাকার তলায় তোমাদেরই পড়তে হবে।

সৈনিক। তাই সই। বাবার রথের চাকা এতদিন যত-সব চণ্ডালের মাংস খেয়ে অশুচি হয়ে আছে। আজ শুদ্ধ মাংস পাবে।

পুরোহিত। ওই দেখো, ওই দেখো মন্ত্রী! এরই মধ্যে রথটা রাজপথ থেকে নেমে পড়েছে। কোথায় কোন্ পল্লীর উপরে পড়বে কিছুই বলা যায় না।

সৈনিক। ওই-যে ধনপতির দল ওখান থেকে চীৎকার করে আমাদের ডাকছে। রথটা যেন ওদেরই ভাণ্ডার লক্ষ্য করে চলেছে। ওরা ভয় পেয়ে গেছে। চলো চলো, ওদের রক্ষা করি গে।

মন্ত্রী। নিজেদের রক্ষা করো, তার পরে অন্য কথা। আমার তো মনে হচ্ছে রথটা ঠিক তোমাদের অস্ত্রশালার দিকে ঝুঁকেছে, ওর আর কিছু চিহ্ন বাকি থাকবে না। ওই দেখো।

সৈনিক। উপায়?

মন্ত্রী। ওদের সঙ্গে মিলে রশি ধরো-সে— তা হলে রক্ষা পাবার পথে রথের বেগটাকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। আর দ্বিধা করবার সময় নেই।

[প্রস্থান

সৈনিক। (পরস্পর) কী করবে। ঠাকুর, তুমি কী করবে।

পুরোহিত। বীরগণ, তোমরা কী করবে।

সৈনিক। জানি নে, রশি ধরব না লড়াই করব! ঠাকুর, তুমি কী করবে।

পুরোহিত। জানি নে, রশি ধরব না আবার শাস্ত্র আওড়াতে বসব!

১ সৈনিক। শুনতে পাচ্ছ— হুড়মুড় শব্দে পৃথিবীটা যেন ভেঙেচুরে পড়ছে।

২ সৈনিক। চেয়ে দেখো, ওরা টানছে বলে মনেই হচ্ছে না। রথটাই ওদের ঠেলে নিয়ে চলেছে।

৩ সৈনিক। পুরুতঠাকুর, দেখছ রথটা যেন বেঁচে উঠেছে। কী রকম হেঁকে চলেছে। এতবার রথযাত্রা দেখেছি, ওঁর এরকম সজীবমূর্তি কখনো দেখি নি। এতকাল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চলেছিল, আজ জেগে চলেছে। তাই আমাদের পথ মানছে না, নিজের পথ বানিয়ে নিচ্ছে।

২ সৈনিক। কিন্তু গেল যে সব। রথযাত্রার এমন সর্বনেশে উৎসব তো কোনো-দিন দেখি নি। ওই যে কবি আসছে, ওকে জিজ্ঞাসা করো-না, এ-সবের মানে কী।

পুরোহিত। আমরাই বুঝতে পারলুম না, কবি বুঝতে পারবে? ওরা তো কেবল বানিয়ে কথা বলে, সনাতন শাস্ত্রের কথা জানেই না।

১ সৈনিক। শাস্ত্রের কথাগুলো কোন্‌কালে মরে গেছে ঠাকুর! তাই তোমাদের কথা তো আর খাটে না দেখি। ওদের যে সব তাজা কথা তাই শুনলে বিশ্বাস হয়।

কবির প্রবেশ

২ সৈনিক। কবি, আজ রথযাত্রায় এই যে-সব উলটো-পালটা কাণ্ড হয়ে গেল, কেন বুঝতে পারো ?

কবি। পারি বৈকি।

১ সৈনিক। পুরুতের হাতে, রাজার হাতে রথ চলল না, এর মানে কী।

কবি। ওরা ভুলে গিয়েছিল মহাকালের শুধু রথকে মানলেই হল না, মহাকালের রথের দড়িকেও মানা চাই।

১ সৈনিক। কবি, তোমার কথা শুনলে হঠাৎ মনে হয়, হয়তো বা একটা মানে আছে। খুঁজতে গেলে পাওয়া যায় না।

কবি। ওরা বাঁধন মানতে চায় নি, শুধু চলাকেই মেনেছিল। তাই রাগী বাঁধনটা উন্মত্ত হয়ে ওদের উপর লেজ আছড়াচ্ছে, গুঁড়িয়ে যাবে।

পুরোহিত। আর তোমার শূদ্রগুলোই কি এত বুদ্ধিমান যে দড়ির নিয়ম সামলে চলতে পারবে।

কবি। হয়তো পারবে না। একদিন ভাববে ওরাই রথের কর্তা, তখনই মরবার সময় আসবে। দেখো-না, কালই বলতে শুরু করবে, আমাদেরই হাল লাঙল চরকা তাঁতের জয়। যে বিধাতা মানুষের বুদ্ধিবিদ্যা নিজের হাতে গড়েছেন, অন্তরে বাহিরে অমৃতরস ঢেলে দিয়েছেন, তাঁকে গাল পাড়তে বসবে। তখন এঁরাই হয়ে উঠবেন বলরামের চেলা, হলধরের মাতলামিতে জগৎটা লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।

পুরোহিত। তখন আবার রথ অচল হলে বোধ করি কবিদের ডাক পড়বে।

কবি। ঠাট্টা নয় পুরুতঠাকুর! মহাকাল বারেবারেই রথযাত্রায় কবিদের ডেকেছেন। তারা কাজের লোকের ভিড় ঠেলে পৌছতে পারে নি।

পুরোহিত। তারা চালাবে কিসের জোরে।

কবি। গায়ের জোরে নয়ই। আমরা মানি ছন্দ, আমরা জানি এক-ঝোঁকা হলেই তাল কাটে। আমরা জানি সুন্দরকে কর্ণধার করলেই শক্তির তরী সত্যি বশ মানে। তোমরা বিশ্বাস কর কঠোরকে— শাস্ত্রের কঠোর বা অস্ত্রের কঠোর— সেটা হল ভীরুর বিশ্বাস, দুর্বলের বিশ্বাস, অসাড়ের বিশ্বাস।

সৈনিক। ওহে কবি, তুমি তো উপদেশ দিতে বসলে, ও দিকে যে আগুন লাগল।

কবি। যুগে যুগে কতবার কত আগুন লেগেছে। যা থাকবার তা থাকবেই।

সৈনিক। তুমি কী করবে।

কবি। আমি গান গাব, 'ভয় নেই।'

সৈনিক। তাতে হবে কী।

কবি। যারা রথ টানছে তারা চলবার তাল পাবে। বেতালা টানটাই ভয়ংকর

সৈনিক। আমরা কী করব।

পুরোহিত। আমি কী করব।

কবি। তাড়াতাড়ি কিছু করতেই হবে এমন কথা নেই। দেখো, ভাবো ভিতরে ভিতরে নতুন হয়ে ওঠো। তার পরে ডাক পড়বার জন্যে তৈরি হয়ে থাকো।

—

উপন্যাস ও গল্প

গল্পগুচ্ছ

২২।১৩

গল্পগুচ্ছ

সদর ও অন্দর

বিপিনকিশোর ধনীগৃহে জন্মিয়াছিলেন, সেইজন্য ধন যে পরিমাণে ব্যয় করিতে জানিতেন তাহার অর্ধেক পরিমাণেও উপার্জন করিতে শেখেন নাই। সুতরাং যে গৃহে জন্ম সে গৃহে দীর্ঘকাল বাস করা ঘটিল না।

সুন্দর সুকুমারমূর্তি তরুণ যুবক, গানবাজনায় সিদ্ধহস্ত, কাজকর্মে নিরতিশয় অপটু; সংসারের পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। জীবনযাত্রার পক্ষে জগন্নাথদেবের রথের মতো অচল; যেরূপ বিপুল আয়োজনে চলিতে পারেন সেরূপ আয়োজন সম্প্রতি বিপিনকিশোরের আয়ত্তাতীত।

সৌভাগ্যক্রমে রাজা চিত্তরঞ্জন কোর্ট্ অফ ওয়ার্ড্‌স্ হইতে বিষয় প্রাপ্ত হইয়া শখের থিয়েটার ফাঁদিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং বিপিনকিশোরের সুন্দর চেহারা ও গান গাহিবার ও গান তৈয়ারি করিবার ক্ষমতায় মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে সাদরে নিজের অনুচরশ্রেণীতে ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন।

রাজা বি. এ. পাস। তাঁহার কোনোপ্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল না। বড়োমানুষের ছেলে হইয়াও নিয়মিত সময়ে এমন-কি নির্দিষ্ট স্থানেই শয়ন ভোজন করিতেন। বিপিনকিশোরকে হঠাৎ তাঁহার নেশার মতো লাগিয়া গেল। তাঁহার গান শুনিতে ও তাঁহার রচিত গীতিনাট্য আলোচনা করিতে করিতে ভাত ঠাণ্ডা হইতে থাকে, রাত বাড়িয়া যায়। দেওয়ানজি বলিতে লাগিলেন, তাঁহার সংযতস্বভাব মনিবের চরিত্র-দোষের মধ্যে কেবল ঐ বিপিনকিশোরের প্রতি অতিশয় আসক্তি।

রানী বসন্তকুমারী স্বামীকে তর্জন করিয়া বলিলেন, "কোথাকার এক লক্ষ্মীছাড়া বানর আনিয়া শরীর মাটি করিবার উপক্রম করিয়াছে, ওটাকে দূর করিতে পারিলেই আমার হাড়ে বাতাস লাগে।"

রাজা যুবতী স্ত্রীর ঈর্ষায় মনে মনে একটু খুশি হইতেন, হাসিতেন; ভাবিতেন, মেয়েরা যাহাকে ভালোবাসে কেবল তাহাকেই জানে। জগতে যে আদরের পাত্র অনেক গুণী আছে, স্ত্রীলোকের শাস্ত্রে সে কথা লেখে না। যে লোক তাহার কানে

বিবাহের মন্ত্র পড়িয়াছে সকল গুণ তাহার এবং সকল আদর তাহারই জন্য। স্বামীর আধঘণ্টা খাবার সময় অতীত হইয়া গেলে অসহ্য হয়, আর, স্বামীর আশ্রিতকে দূর করিয়া দিলে তাহার একমুষ্টি অন্ন জুটিবে না, এ সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ উদাসীন। স্ত্রীলোকের এই বিবেচনাহীন পক্ষপাত দূষণীয় হইতে পারে, কিন্তু চিত্তরঞ্জনের নিকট তাহা নিতান্ত অপ্রীতিকর বোধ হইল না। এইজন্য তিনি যখন-তখন বেশিমাত্রায় বিপিনের গুণগান করিয়া স্ত্রীকে খ্যাপাইতেন ও বিশেষ আমোদ বোধ করিতেন।

এই রাজকীয় খেলা বেচারা বিপিনের পক্ষে সুবিধাজনক হয় নাই। অন্তঃপুরের বিমুখতায় তাঁহার আহারাদির ব্যবস্থায় পদে পদে কণ্টক পড়িতে লাগিল। ধনীগৃহের ভৃত্য আশ্রিত ভদ্রলোকের প্রতি স্বভাবতই প্রতিকূল; তাহারা রানীর আক্রোশে সাহস পাইয়া ভিতরে ভিতরে বিপিনকে অনেকপ্রকার উপেক্ষা দেখাইত।

রানী একদিন পুঁটেকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, "তোকে যে কোনো কাজেই পাওয়া যায় না, সমস্ত দিন করিস কী।"

সে কহিল, রাজার আদেশে বিপিনবাবুর সেবাতেই তাহার দিন কাটিয়া যায়।

রানী কহিলেন, "ইস্, বিপিনবাবু যে ভারি নবাব দেখিতেছি।"

পরদিন হইতে পুঁটে বিপিনের উচ্ছিষ্ট ফেলিয়া রাখিত; অনেকসময় তাহার অন্ন ঢাকিয়া রাখিত না। অনভ্যস্ত হস্তে বিপিন নিজের অন্নের থালি নিজে মাজিতে লাগিল এবং মাঝে মাঝে উপবাস দিল; কিন্তু ইহা লইয়া রাজার নিকট নালিশ ফরিয়াদ করা তাহার স্বভাববিরুদ্ধ। কোনো চাকরের সহিত কলহ করিয়া সে আত্মাবমাননা করে নাই। এইরূপে বিপিনের ভাগ্যে সদর হইতে আদর বাড়িতে লাগিল, অন্দর হইতে অবজ্ঞার সীমা রহিল না।

এ দিকে সুভদ্রাহরণ গীতিনাট্য রিহার্শালশেষে প্রস্তুত। রাজবাটির অঙ্গনে তাহার অভিনয় হইল। রাজা স্বয়ং সাজিলেন কৃষ্ণ, বিপিন সাজিলেন অর্জুন। আহা, অর্জুনের যেমন কণ্ঠ তেমনি রূপ। দর্শকগণ 'ধন্য ধন্য' করিতে লাগিল।

রাত্রে রাজা আসিয়া বসন্তকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন অভিনয় দেখিলে।"

রানী কহিলেন, "বিপিন তো বেশ অর্জুন সাজিয়াছিল। বড়োঘরের ছেলের মতো তাহার চেহারা বটে, এবং গলার সুরটিও তো দিব্য।"

রাজা বলিলেন, "আর, আমার চেহারা বুঝি কিছুই নয়, গলাটাও বুঝি মন্দ।"

রানী বলিলেন, "তোমার কথা আলাদা।" বলিয়া পুনরায় বিপিনের অভিনয়ের কথা পাড়িলেন।

রাজা ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্ছ্বসিত ভাষায় রানীর নিকট বিপিনের গুণগান করিয়াছেন ; কিন্তু অদ্য রানীর মুখের এইটুকুমাত্র প্রশংসা শুনিয়া তাঁহার মনে হইল, বিপিনটার ক্ষমতা যে-পরিমাণে অবিবেচক লোকে তদপেক্ষা তাহাকে ঢের বেশি বাড়াইয়া থাকে। উহার চেহারাই বা কী, আর গলাই বা কী এমন। কিয়ৎকাল পূর্বে তিনিও এই অবিবেচকশ্রেণীর মধ্যে ছিলেন ; হঠাৎ কী কারণে তাঁহার বিবেচনা-শক্তি বাড়িয়া উঠিল।

পরদিন হইতে বিপিনের আহারাদির সুব্যবস্থা হইল। বসন্তকুমারী রাজাকে কহিলেন, "বিপিনকে কাছারি ঘরে আমলাদের সহিত বাসা দেওয়া অন্যায় হইয়াছে। হাজার হউক, একসময়ে উহার অবস্থা ভালো ছিল।"

রাজা কেবল সংক্ষেপে উড়াইয়া দিয়া কহিলেন, "হাঃ!"

রানী অনুরোধ করিলেন, "খোকার অন্নপ্রাশন উপলক্ষে আর-একদিন থিয়েটার দেওয়া হউক।" রাজা কথাটা কানেই তুলিলেন না।

একদিন ভালো কাপড় কোঁচানো হয় নাই বলিয়া রাজা পুঁটে চাকরকে ভর্ৎসনা করাতে সে কহিল, "কী করিব, রানীমার আদেশে বিপিনবাবুর বাসন মাজিতে ও সেবা করিতেই সময় কাটিয়া যায়।"

রাজা রাগিয়া উঠিয়া কহিলেন, "ইস্‌, বিপিনবাবু তো ভারি নবাব হইয়াছেন, নিজের বাসন বুঝি নিজে মাজিতে পারেন না।"

বিপিন পুনর্মূষিক হইয়া পড়িল।

রানী রাজাকে ধরিয়া পড়িলেন, সন্ধ্যাবেলায় তাঁহাদের সংগীতালোচনার সময় পাশের ঘরে থাকিয়া পর্দার আড়ালে তিনি গান শুনিবেন, বিপিনের গান তাঁহার ভালো লাগে। রাজা অনতিকাল পরেই পূর্ববৎ অত্যন্ত নিয়মিত সময়ে শয়ন ভোজন আরম্ভ করিলেন। গানবাজনা আর চলে না।

রাজা মধ্যাহ্নে জমিদারি-কাজ দেখিতেন। একদিন সকাল সকাল অন্তঃপুরে গিয়া দেখিলেন, রানী কী একটা পড়িতেছেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কী পড়িতেছ।"

রানী প্রথমটা একটু অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "বিপিনবাবুর একটা গানের খাতা আনাইয়া দুটো-একটা গানের কথা মুখস্থ করিয়া লইতেছি ; হঠাৎ তোমার শখ মিটিয়া গিয়া আর তো গান শুনিবার জো নাই।" বহুপূর্বে শখটাকে সমূলে বিনাশ করিবার জন্য রানী যে বহুবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন সে কথা কেহ তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিল না।

পরদিন বিপিনকে রাজা বিদায় করিয়া দিলেন; কাল হইতে কী করিয়া কোথায় তাঁহার অন্নমুষ্টি জুটিবে সে সম্বন্ধে কোনো বিবেচনা করিলেন না।

দুঃখ কেবল তাহাই নহে, ইতিমধ্যে বিপিন রাজার সহিত অকৃত্রিম অনুরাগে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন; বেতনের চেয়ে রাজার প্রণয়টা তাঁহার কাছে অনেক বেশি দামী হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু, কী অপরাধে যে হঠাৎ রাজার হৃদ্যতা হারাইলেন, অনেক ভাবিয়াও বিপিন তাহা ঠিক করিতে পারিলেন না। এবং দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তাঁহার পুরাতন তম্বুরাটিতে গেলাপ পরাইয়া বন্ধুহীন বৃহৎ সংসারে বাহির হইয়া পড়িলেন; যাইবার সময় রাজভৃত্য পুঁটেকে তাঁহার শেষ সম্বল দুইটি টাকা পুরস্কার দিয়া গেলেন।

আষাঢ় ১৩০৭

উদ্ধার

গৌরী প্রাচীন ধনীবংশের পরমাদরে পালিতা সুন্দরী কন্যা। স্বামী পরেশ হীনাবস্থা হইতে সম্প্রতি নিজের উপার্জনে কিঞ্চিৎ অবস্থার উন্নতি করিয়াছে। যতদিন তাহার দৈন্য ছিল ততদিন কন্যার কষ্ট হইবে ভয়ে শ্বশুর শাশুড়ি স্ত্রীকে তাঁহার বাড়িতে পাঠান নাই। গৌরী বেশ-একটু বয়স্থা হইয়াই পতিগৃহে আসিয়াছিল।

বোধ করি এই-সকল কারণেই পরেশ সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্তগম্য বলিয়া বোধ করিতেন না এবং বোধ করি সন্দিগ্ধ স্বভাব তাঁহার একটা ব্যাধির মধ্যে।

পরেশ পশ্চিমে একটি ক্ষুদ্র শহরে ওকালতি করিতেন; ঘরে আত্মীয়স্বজন বড়ো কেহ ছিল না, একাকিনী স্ত্রীর জন্য তাঁহার চিত্ত উদ্‌বিগ্ন হইয়া থাকিত। মাঝে মাঝে এক-একদিন হঠাৎ অসময়ে তিনি আদালত হইতে বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। প্রথম প্রথম স্বামীর এইরূপ আকস্মিক অভ্যুদয়ের কারণ গৌরী ঠিক বুঝিতে পারিত না।

মাঝে মাঝে অকারণ পরেশ এক-একটা করিয়া চাকর ছাড়াইয়া দিতে লাগিলেন। কোনো চাকর তাঁহার আর দীর্ঘকাল পছন্দ হয় না। বিশেষত অসুবিধার আশঙ্কা করিয়া যে চাকরকে গৌরী রাখিবার জন্য অধিক আগ্রহ প্রকাশ করিত, তাহাকে পরেশ এক মুহূর্ত স্থান দিতেন না। তেজস্বিনী গৌরী ইহাতে যতই আঘাত বোধ করিত স্বামী ততই অস্থির হইয়া এক-এক সময়ে অদ্ভুত ব্যবহার করিতে থাকিতেন।

অবশেষে আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া যখন দাসীকে গোপনে ডাকিয়া পরেশ

নানাপ্রকার সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন তখন সে-সকল কথা গৌরীর কর্ণগোচর হইতে লাগিল। অভিমানিনী স্বল্পভাষিণী নারী অপমানে আহত সিংহিনীর ন্যায় অন্তরে অন্তরে উদ্দীপ্ত হইতে লাগিলেন এবং এই উন্মত্ত সন্দেহ দম্পতির মাঝখানে প্রলয়খড়্গের মতো পড়িয়া উভয়কে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল।

গৌরীর কাছে তাঁহার তীব্র সন্দেহ প্রকাশ পাইয়া যখন একবার লজ্জা ভাঙিয়া গেল, তখন পরেশ স্পষ্টতই প্রতিদিন পদে পদে আশঙ্কা ব্যক্ত করিয়া স্ত্রীর সহিত কলহ করিতে আরম্ভ করিল এবং গৌরী যতই নিরুত্তর অবজ্ঞা এবং কষাঘাতের ন্যায় তীক্ষ্নকটাক্ষ দ্বারা তাঁহাকে আপাদমস্তক যেন ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল, ততই তাঁহার সংশয়মত্ততা আরো যেন বাড়িবার দিকে চলিল।

এইরূপ স্বামীসুখ হইতে প্রতিহত হইয়া পুত্রহীনা তরুণী ধর্মে মন দিল। হরিসভার নবীন প্রচারক ব্রহ্মচারী পরমানন্দস্বামীকে ডাকিয়া মন্ত্র লইল এবং তাঁহার নিকট ভাগবতের ব্যাখ্যা শুনিতে আরম্ভ করিল। নারীহৃদয়ের সমস্ত ব্যর্থ স্নেহ প্রেম কেবল ভক্তি-আকারে পুঞ্জীভূত হইয়া গুরুদেবের পদতলে সমর্পিত হইল।

পরমানন্দের সাধুচরিত্র সম্বন্ধে দেশবিদেশে কাহারো মনে সংশয়মাত্র ছিল না। সকলে তাঁহাকে পূজা করিত। পরেশ ইঁহার সম্বন্ধে মুখ ফুটিয়া সংশয় প্রকাশ করিতে পারিতেন না বলিয়াই তাহা গুপ্ত ক্ষতের মতো ক্রমশ তাঁহার মর্মের নিকট পর্যন্ত খনন করিয়া চলিয়াছিল।

একদিন সামান্য কারণে বিষ উদ্গীরিত হইয়া পড়িল। স্ত্রীর কাছে পরমানন্দকে উল্লেখ করিয়া 'দুশ্চরিত্র ভণ্ড' বলিয়া গালি দিলেন এবং কহিলেন, "তোমার শালগ্রাম স্পর্শ করিয়া শপথপূর্বক বলো দেখি, সেই বকধার্মিককে তুমি মনে মনে ভালোবাস না।"

দলিত ফণিনীর ন্যায় মুহূর্তের মধ্যেই উদগ্র হইয়া মিথ্যা স্পর্ধা দ্বারা স্বামীকে বিদ্ধ করিয়া গৌরী রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "ভালোবাসি, তুমি কী করিতে চাও করো।" পরেশ তৎক্ষণাৎ ঘরে তালাচাবি লাগাইয়া তাহাকে রুদ্ধ করিয়া আদালতে চলিয়া গেল।

অসহ্য রোষে গৌরী কোনোমতে দ্বার উন্মোচন করাইয়া তৎক্ষণাৎ বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল।

পরমানন্দ নিভৃত ঘরে জনহীন মধ্যাহ্নে শাস্ত্রপাঠ করিতেছিলেন। হঠাৎ অমেঘবাহিনী বিদ্যুল্লতার মতো গৌরী ব্রহ্মচারীর শাস্ত্রাধ্যয়নের মাঝখানে আসিয়া ভাঙিয়া পড়িল।

গুরু কহিলেন, "এ কী।"

শিষ্য কহিল, "গুরুদেব, অপমানিত সংসার হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া চলো, তোমার সেবাব্রতে আমি জীবন উৎসর্গ করিব।"

পরমানন্দ কঠোর ভর্ৎসনা করিয়া গৌরীকে গৃহে ফিরিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু, হায় গুরুদেব, সেদিনকার সেই অকস্মাৎ ছিন্নবিচ্ছিন্ন অধ্যয়নসূত্র আর কি তেমন করিয়া জোড়া লাগিতে পারিল।

পরেশ গৃহে আসিয়া মুক্তদ্বার দেখিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কে আসিয়াছিল।"

স্ত্রী কহিল, "কেহ আসে নাই, আমি গুরুদেবের গৃহে গিয়াছিলাম।"

পরেশ মুহূর্তকাল পাংশু এবং পরক্ষণেই রক্তবর্ণ হইয়া কহিলেন, "কেন গিয়াছিলে।"

গৌরী কহিল, "আমার খুশি।"

সেদিন হইতে পাহারা বসাইয়া স্ত্রীকে ঘরে রুদ্ধ করিয়া পরেশ এমনি উপদ্রব আরম্ভ করিলেন যে শহরময় কুৎসা রটিয়া গেল।

এই-সকল কুৎসিত অপমান ও অত্যাচারের সংবাদে পরমানন্দের হরিচিন্তা দূর হইয়া গেল। এই নগর অবিলম্বে পরিত্যাগ করা তিনি কর্তব্য বোধ করিলেন, অথচ উৎপীড়িতকে ফেলিয়া কোনোমতেই দূরে যাইতে পারিলেন না। সন্ন্যাসীর এই কয়দিনকার দিনরাত্রের ইতিহাস কেবল অন্তর্যামীই জানেন।

অবশেষে অবরোধের মধ্যে থাকিয়া গৌরী একদিন পত্র পাইল, "বৎসে, আলোচনা করিয়া দেখিলাম, ইতিপূর্বে অনেক সাধ্বী সাধকরমণী কৃষ্ণপ্রেমে সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। যদি সংসারের অত্যাচারে হরিপাদপদ্ম হইতে তোমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, তবে জানাইলে ভগবানের সহায়তায় তাঁহার সেবিকাকে উদ্ধার করিয়া প্রভুর অভয় পদারবিন্দে উৎসর্গ করিতে প্রয়াসী হইব। ২৬শে ফাল্গুন বুধবারে অপরাহ্ণ ২ ঘটিকার সময় ইচ্ছা করিলে তোমাদের পুষ্করিণীতীরে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিবে।"

গৌরী পত্রখানি কেশে বাঁধিয়া খোঁপার মধ্যে ঢাকিয়া রাখিল। ২৬শে ফাল্গুন মধ্যাহ্নে স্নানের পূর্বে চুল খুলিবার সময় দেখিল, চিঠিখানি নাই। হঠাৎ সন্দেহ হইল, হয়তো চিঠিখানি কখন বিছানায় স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহা তাঁহার স্বামীর হস্তগত হইয়াছে। স্বামী সে পত্র -পাঠে ঈর্ষায় দগ্ধ হইতেছে মনে করিয়া গৌরী মনে মনে একপ্রকার জ্বালাময় আনন্দ অনুভব করিল; কিন্তু তাহার শিরোভূষণ পত্রখানি পাষণ্ডহস্তস্পর্শে লাঞ্ছিত হইতেছে, এ কল্পনাও তাহার সহ্য হইল না। দ্রুতপদে স্বামীগৃহে গেল।

দেখিল, স্বামী ভূতলে পড়িয়া গোঁ গোঁ করিতেছে, মুখ দিয়া ফেনা পড়িতেছে, চক্ষুতারকা কপালে উঠিয়াছে। দক্ষিণ বদ্ধমুষ্টি হইতে পত্রখানি ছাড়াইয়া লইয়া তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকিয়া পাঠাইল।

ডাক্তার আসিয়া কহিল, আপোপ্লেক্সি— তখন রোগীর মৃত্যু হইয়াছে।

সেইদিন মফস্বলে পরেশের একটি জরুরি মকদ্দমা ছিল। সন্ন্যাসীর এতদূর পতন হইয়াছিল যে, তিনি সেই সংবাদ লইয়া গৌরীর সহিত সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

সদ্যবিধবা গৌরী যেমন বাতায়ন হইতে গুরুদেবকে চোরের মতো পুষ্করিণীর তটে দেখিল, তৎক্ষণাৎ বজ্রচকিতের ন্যায় দৃষ্টি অবনত করিল। গুরু যে কোথা হইতে কোথায় নামিয়াছেন, তাহা যেন বিদ্যুতালোকে সহসা এই মুহূর্তে তাহার হৃদয়ে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিল।

গুরু ডাকিলেন, "গৌরী।"

গৌরী কহিল, "আসিতেছি, গুরুদেব।"

মৃত্যুসংবাদ পাইয়া পরেশের বন্ধুগণ যখন সৎকারের জন্য উপস্থিত হইল, দেখিল, গৌরীর মৃতদেহ স্বামীর পার্শ্বে শয়ান। সে বিষ খাইয়া মরিয়াছে। আধুনিক কালে এই আশ্চর্য সহমরণের দৃষ্টান্তে সতীমাহাত্ম্যে সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

শ্রাবণ ১৩০৭

দুর্বুদ্ধি

ভিটা ছাড়িতে হইল। কেমন করিয়া, তাহা খোলসা করিয়া বলিব না, আভাস দিব মাত্র।

আমি পাড়াগেঁয়ে নেটিভ ডাক্তার, পুলিসের থানার সম্মুখে আমার বাড়ি। যমরাজের সহিত আমার যে পরিমাণ আনুগত্য ছিল দারোগাবাবুদের সহিত তাহা অপেক্ষা কম ছিল না, সুতরাং নর ও নারায়ণের দ্বারা মানুষের যত বিবিধ রকমের পীড়া ঘটিতে পারে তাহা আমার সুগোচর ছিল। যেমন মণির দ্বারা বলয়ের এবং বলয়ের দ্বারা মণির শোভা বৃদ্ধি হয় তেমনি আমার মধ্যস্থতায় দারোগার এবং দারোগার মধ্যস্থতায় আমার উত্তরোত্তর আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটিতেছিল।

এই-সকল ঘনিষ্ঠ কারণে হাল নিয়মের কৃতবিদ্য দারোগা ললিত চক্রবর্তীর সঙ্গে

আমার একটু বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহার একটি অরক্ষণীয়া আত্মীয়া কন্যার সহিত বিবাহের জন্য মাঝে মাঝে অনুরোধ করিয়া আমাকেও প্রায় তিনি অরক্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু, শশী আমার একমাত্র কন্যা, মাতৃহীনা, তাহাকে বিমাতার হাতে সমর্পণ করিতে পারিলাম না। বর্ষে বর্ষে নূতন পঞ্জিকার মতে বিবাহের কত শুভলগ্নই ব্যর্থ হইল। আমারই চোখের সম্মুখে কত যোগ্য এবং অযোগ্য পাত্র চতুর্দোলায় চড়িল, আমি কেবল বরযাত্রীর দলে বাহিরবাড়িতে মিষ্টান্ন খাইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

শশীর বয়স বারো হইয়া প্রায় তেরোয় পড়ে। কিছু সুবিধামত টাকার জোগাড় করিতে পারিলেই মেয়েটিকে একটি বিশিষ্ট বড়োঘরে বিবাহ দিতে পারিব, এমন আশা পাইয়াছি। সেই কর্মটি শেষ করিতে পারিলে অবিলম্বে আর-একটি শুভকর্মের আয়োজনে মনোনিবেশ করিতে পারিব।

সেই অত্যাবশ্যক টাকাটার কথা ধ্যান করিতেছিলাম, এমন সময় তুলসীপাড়ার হরিনাথ মজুমদার আসিয়া আমার পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া পড়িল। কথাটা এই, তাহার বিধবা কন্যা রাত্রে হঠাৎ মারা গিয়াছে, শত্রুপক্ষ গর্ভপাতের অপবাদ দিয়া দারোগার কাছে বেনামি পত্র লিখিয়াছে। এক্ষণে পুলিস তাহার মৃতদেহ লইয়া টানাটানি করিতে উদ্যত।

সদ্য কন্যাশোকের উপর এতবড়ো অপমানের আঘাত তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়াছে। আমি ডাক্তারও বটে, দারোগার বন্ধুও বটে, কোনোমতে উদ্ধার করিতে হইবে।

লক্ষ্মী যখন ইচ্ছা করেন তখন এমনি করিয়াই কখনো সদর কখনো খিড়কি দরজা দিয়া অনাহূত আসিয়া উপস্থিত হন। আমি ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, "ব্যাপারটা বড়ো গুরুতর।" দুটো-একটা কল্পিত উদাহরণ প্রয়োগ করিলাম, কম্পমান বৃদ্ধ হরিনাথ শিশুর মতো কাঁদিতে লাগিল।

বিস্তারিত বলা বাহুল্য, কন্যার অন্ত্যেষ্টিসংকারের সুযোগ করিতে হরিনাথ ফতুর হইয়া গেল।

আমার কন্যা শশী করুণ স্বরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, ঐ বুড়ো তোমার পায়ে ধরিয়া কেন অমন করিয়া কাঁদিতেছিল।" আমি তাহাকে ধমক দিয়া বলিলাম, "যা যা, তোর এত খবরে দরকার কী।"

এইবার সৎপাত্রে কন্যাদানের পথ সুপ্রশস্ত হইল। বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। একমাত্র কন্যার বিবাহ, ভোজের আয়োজন প্রচুর করিলাম। বাড়িতে গৃহিণী

নাই, প্রতিবেশীরা দয়া করিয়া আমাকে সাহায্য করিতে আসিল। সর্বস্বান্ত কৃতজ্ঞ হরিনাথ দিনরাত্রি খাটিতে লাগিল।

গায়ে-হলুদের দিনে রাত তিনটার সময় হঠাৎ শশীকে ওলাউঠায় ধরিল। রোগ উত্তরোত্তর কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল। অনেক চেষ্টার পর নিষ্ফল ঔষধের শিশিগুলা ভূতলে ফেলিয়া ছুটিয়া গিয়া হরিনাথের পা জড়াইয়া ধরিলাম। কহিলাম, "মাপ করো দাদা, এই পাষণ্ডকে মাপ করো। আমার একমাত্র কন্যা, আমার আর কেহ নাই।"

হরিনাথ শশব্যস্ত হইয়া কহিল, "ডাক্তারবাবু, করেন কী, করেন কী। আপনার কাছে আমি চিরঋণী, আমার পায়ে হাত দিবেন না।"

আমি কহিলাম, "নিরপরাধে আমি তোমার সর্বনাশ করিয়াছি, সেই পাপে আমার কন্যা মরিতেছে।"

এই বলিয়া সর্বলোকের সমক্ষে আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম, "ওগো, আমি এই বৃদ্ধের সর্বনাশ করিয়াছি, আমি তাহার দণ্ড লইতেছি, ভগবান আমার শশীকে রক্ষা করুন।"

বলিয়া হরিনাথের চটিজুতা খুলিয়া লইয়া নিজের মাথায় মারিতে লাগিলাম, বৃদ্ধ ব্যস্তসমস্ত হইয়া আমার হাত হইতে জুতা কাড়িয়া লইল।

পরদিন দশটা-বেলায় গায়ে-হলুদের হরিদ্রাচিহ্ন লইয়া শশী ইহসংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিল।

তাহার পরদিনেই দারোগাবাবু কহিলেন, "ওহে আর কেন, এইবার বিবাহ করিয়া ফেলো। দেখাশুনার তো একজন লোক চাই?"

মানুষের মর্মান্তিক দুঃখশোকের প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর অশ্রদ্ধা শয়তানকেও শোভা পায় না। কিন্তু, নানা ঘটনায় দারোগার কাছে এমন মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়াছিলাম যে, কোনো কথা বলিবার মুখ ছিল না। দারোগার বন্ধুত্ব সেই দিন যেন আমাকে চাবুক মারিয়া অপমান করিল।

হৃদয় যতই ব্যথিত থাক্‌, কর্মচক্র চলিতেই থাকে। আগেকার মতোই ক্ষুধার আহার, পরিধানের বস্ত্র, এমন-কি, চুলার কাষ্ঠ এবং জুতার ফিতা পর্যন্ত পরিপূর্ণ উদ্যমে নিয়মিত সংগ্রহ করিয়া ফিরিতে হয়।

কাজের অবকাশে যখন একলা ঘরে আসিয়া বসিয়া থাকি তখন মাঝে মাঝে কানে সেই করুণ কণ্ঠের প্রশ্ন বাজিতে থাকে, "বাবা, ঐ বুড়ো তোমার পায়ে ধরিয়া কেন অমন করিয়া কাঁদিতেছিল।" দরিদ্র হরিনাথের জীর্ণ ঘর নিজের ব্যয়ে ছাইয়া দিলাম,

আমার দুগ্ধবতী গাভীটি তাহাকে দান করিলাম, তাহার বন্ধকি জোতজমা মহাজনের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া দিলাম।

কিছুদিন সদ্যশোকের দুঃসহ বেদনায় নির্জন সন্ধ্যায় এবং অনিদ্র রাত্রে কেবলই মনে হইত, আমার কোমলহৃদয়া মেয়েটি সংসারলীলা শেষ করিয়াও তাহার বাপের নিষ্ঠুর দুষ্কর্মে পরলোকে কোনোমতেই শান্তি পাইতেছে না। সে যেন ব্যথিত হইয়া কেবলই আমাকে প্রশ্ন করিয়া ফিরিতেছে, বাবা, কেন এমন করিলে।

কিছুদিন এমনি হইয়াছিল, গরিবের চিকিৎসা করিয়া টাকার জন্য তাগিদ করিতে পারিতাম না। কোনো ছোটো মেয়ের ব্যামো হইলে মনে হইত আমার শশীই যেন পল্লীর সমস্ত রুগ্‌ণা বালিকার মধ্যে রোগ ভোগ করিতেছে।

তখন পুরা বর্ষায় পল্লী ভাসিয়া গেছে। ধানের খেত এবং গৃহের অঙ্গনপার্শ্ব দিয়া নৌকায় করিয়া ফিরিতে হয়। ভোররাত্রি হইতে বৃষ্টি শুরু হইয়াছে, এখনো বিরাম নাই।

জমিদারের কাছারিবাড়ি হইতে আমার ডাক পড়িয়াছে। বাবুদের পান্সির মাঝি সামান্য বিলম্বটুকু সহ্য করিতে না পারিয়া উদ্ধত হইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে।

ইতিপূর্বে এরূপ দুর্যোগে যখন আমাকে বাহির হইতে হইত তখন একটি লোক ছিল যে আমার পুরাতন ছাতাটি খুলিয়া দেখিত তাহাতে কোথাও ছিদ্র আছে কি না, এবং একটি ব্যগ্র কণ্ঠ বাদলার হাওয়া ও বৃষ্টির ছাঁট হইতে সযত্নে আত্মরক্ষা করিবার জন্য আমাকে বারম্বার সতর্ক করিয়া দিত। আজ শূন্য নীরব গৃহ হইতে নিজের ছাতা নিজে সন্ধান করিয়া লইয়া বাহির হইবার সময় তাহার সেই স্নেহময় মুখখানি স্মরণ করিয়া একটুখানি বিলম্ব হইতেছিল। তাহার রুদ্ধ শয়নঘরটার দিকে তাকাইয়া ভাবিতেছিলাম, যে লোক পরের দুঃখকে কিছুই মনে করে না তাহার সুখের জন্য ভগবান ঘরের মধ্যে এত স্নেহের আয়োজন কেন রাখিবেন। এই ভাবিতে ভাবিতে সেই শূন্য ঘরটার দরজার কাছে আসিয়া বুকের মধ্যে হু হু করিতে লাগিল। বাহিরে বড়োলোকের ভৃত্যের তর্জনস্বর শুনিয়া তাড়াতাড়ি শোক সংবরণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

নৌকায় উঠিবার সময় দেখি, থানার ঘাটে ডোঙা বাঁধা, একজন চাষা কৌপীন পরিয়া বৃষ্টিতে ভিজিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কী রে।" উত্তরে শুনিলাম, গতরাত্রে তাহার কন্যাকে সাপে কাটিয়াছে, থানায় রিপোর্ট করিবার জন্য হতভাগ্য তাহাকে দূরগ্রাম হইতে বহিয়া আনিয়াছে। দেখিলাম, সে তাহার নিজের একমাত্র গাত্রবস্ত্র খুলিয়া মৃতদেহ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। জমিদারি কাছারির অসহিষ্ণু মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল।

বেলা একটার সময় বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দেখি, তখনো সেই লোকটা বুকের কাছে হাত পা গুটাইয়া বসিয়া বসিয়া ভিজিতেছে; দারোগাবাবুর দর্শন মেলে নাই। আমি তাহাকে আমার রন্ধন-অন্নের এক অংশ পাঠাইয়া দিলাম। সে তাহা ছুঁইল না।

তাড়াতাড়ি আহার সারিয়া কাছারির রোগীর তাগিদে পুনর্বার বাহির হইলাম। সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিয়া দেখি তখনো লোকটা একেবারে অভিভূতের মতো বসিয়া আছে। কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতে পারে না, মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে। এখন তাহার কাছে, এই নদী, ওই গ্রাম, ওই থানা, এই মেঘাচ্ছন্ন আর্দ্র পঙ্কিল পৃথিবীটা স্বপ্নের মতো। বারম্বার প্রশ্নের দ্বারা জানিলাম, একবার একজন কন্‌স্টেবল আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ট্যাঁকে কিছু আছে কি না। সে উত্তর করিয়াছিল, সে নিতান্তই গরিব, তাহার কিছু নাই। কন্‌স্টেবল বলিয়া গেছে, "থাক্ বেটা, তবে এখন বসিয়া থাক্।"

এমন দৃশ্য পূর্বেও অনেকবার দেখিয়াছি, কখনো কিছুই মনে হয় নাই। আজ কোনোমতেই সহ্য করিতে পারিলাম না। আমার শশীর করুণা-গদ্‌গদ অব্যক্ত কণ্ঠ সমস্ত বাদলার আকাশ জুড়িয়া বাজিয়া উঠিল। ওই কন্যাহারা বাক্যহীন চাষার অপরিমেয় দুঃখ আমার বুকের পাঁজরগুলাতে যেন ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল।

দারোগাবাবু বেতের মোড়ায় বসিয়া আরামে গুড়গুড়ি টানিতেছিলেন। তাঁহার কন্যাদায়গ্রস্ত আত্মীয় মেসোটি আমার প্রতি লক্ষ করিয়াই সম্প্রতি দেশ হইতে আসিয়াছেন; তিনি মাদুরের উপর বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। আমি একদমে ঝড়ের বেগে সেখানে উপস্থিত হইলাম। চীৎকার করিয়া বলিলাম, "আপনারা মানুষ না পিশাচ?" বলিয়া আমার সমস্ত দিনের উপার্জনের টাকা ঝনাৎ করিয়া তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া কহিলাম, "টাকা চান তো এই নিন, যখন মরিবেন সঙ্গে লইয়া যাইবেন; এখন এই লোকটাকে ছুটি দিন, ও কন্যার সংকার করিয়া আসুক।"

বহু উৎপীড়িতের অশ্রুসেচনে দারোগার সহিত ডাক্তারের যে প্রণয় বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা এই ঝড়ে ভূমিসাৎ হইয়া গেল।

অনতিকাল পরে দারোগার পায়ে ধরিয়াছি, তাঁহার মহদাশয়তার উল্লেখ করিয়া অনেক স্তুতি এবং নিজের বুদ্ধিভ্রংশ লইয়া অনেক আত্মধিক্কার প্রয়োগ করিয়াছি, কিন্তু শেষটা ভিটা ছাড়িতে হইল।

ভাদ্র ১৩০৭

ফেল

ল্যাজা এবং মুড়া, রাহু এবং কেতু, পরস্পরের সঙ্গে আড়াআড়ি করিলে যেমন দেখিতে হইত এও ঠিক সেইরকম। প্রাচীন হালদার বংশ দুই খণ্ডে পৃথক হইয়া প্রকাণ্ড বসত-বাড়ির মাঝখানে এক ভিত্তি তুলিয়া পরস্পর পিঠাপিঠি করিয়া বসিয়া আছে; কেহ কাহারো মুখদর্শন করে না।

নবগোপালের ছেলে নলিন এবং ননীগোপালের ছেলে নন্দ একবংশজাত, একবয়সি, এক ইস্কুলে যায় এবং পারিবারিক বিদ্বেষ ও রেষারেষিতেও উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্য।

নলিনের বাপ নবগোপাল অত্যন্ত কড়া লোক। ছেলেকে হাঁপ ছাড়িতে দিতেন না, পড়াশুনা ছাড়া আর কথা ছিল না। খেলা খাদ্য ও সাজসজ্জা সম্বন্ধে ছেলের সর্বপ্রকার শখ তিনি খাতাপত্র ও ইস্কুল-বইয়ের নীচে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন।

নন্দর বাপ ননীগোপালের শাসনপ্রণালী অত্যন্ত শিথিল ছিল। মা তাহাকে অত্যন্ত ফিট্‌ফাট্ করিয়া সাজাইয়া ইস্কুলে পাঠাইতেন, আনা-তিনেক জলপানিও সঙ্গে দিতেন; নন্দ ভাজা মসলা ও কুলপির বরফ, লাঠিম ও মার্বলগুলিকা ইচ্ছামত ভোগবিতরণের দ্বারা যশস্বী হইয়া উঠিয়াছিল।

মনে মনে পরাভব অনুভব করিয়া নলিন কেবলই ভাবিত, নন্দর বাবা যদি আমার বাবা হইত এবং আমার বাবা যদি নন্দর পিতৃস্থান অধিকার করিত, তাহা হইলে নন্দকে মজা দেখাইয়া দিতাম।

কিন্তু, সেরূপ সুযোগ ঘটিবার পূর্বে ইতিমধ্যে নন্দ বৎসরে বৎসরে প্রাইজ পাইতে লাগিল; নলিন রিক্তহস্তে বাড়ি আসিয়া ইস্কুলের কর্তৃপক্ষদের নামে পক্ষপাতের অপবাদ দিতে লাগিল। বাপ তাহাকে অন্য ইস্কুলে দিলেন, বাড়িতে অন্য মাস্টার রাখিলেন, ঘুমের সময় হইতে একঘণ্টা কাটিয়া পড়ার সময়ে যোগ করিলেন, কিন্তু ফলের তারতম্য হইল না। নন্দ পাস করিতে করিতে বি. এ. উত্তীর্ণ হইয়া গেল, নলিন ফেল করিতে করিতে এন্‌ট্রান্‌স্ ক্লাসে জাঁতিকলের ইঁদুরের মতো আটকা পড়িয়া রহিল।

এমন সময় তাহার পিতা তাহার প্রতি দয়া করিলেন। তিনি মরিলেন। তিন বৎসর মেয়াদ খাটিয়া এন্‌ট্রান্‌স্ ক্লাস হইতে তাহার মুক্তি হইল এবং স্বাধীন নলিন আংটি বোতাম ঘড়ির-চেনে আদ্যোপান্ত ঝক্‌মক্ করিয়া নন্দকে নিরতিশয় নিষ্প্রভ

করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এন্‌ট্রান্‌স্‌ ফেলের জুড়ি চৌঘুড়ি বি. এ. পাসের একঘোড়ার গাড়িকে অনায়াসে ছাড়াইয়া যাইতে লাগিল ; বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ওয়েলায় ঘোড়ার সহিত সমান চালে চলিতে পারিল না।

এ দিকে নলিন এবং নন্দের বিবাহের জন্য পাত্রীর সন্ধান চলিতেছে। নলিনের প্রতিজ্ঞা, সে এমন কন্যা বিবাহ করিবে যাহার উপমা মেলা ভার, তাহার জুড়ি এবং তাহার স্ত্রীর কাছে নন্দকে হার মানিতেই হইবে।

সবচেয়ে ভালোর জন্য যাহার আকাঙ্ক্ষা, অনেক ভালো তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। কাছাকাছি কোনো মেয়েকেই নলিন পছন্দ করিয়া খতম করিতে সাহস করিল না ; পাছে আরো ভালো তাহাকে ফাঁকি দিয়া আর-কাহারো ভাগ্যে জোটে।

অবশেষে খবর পাওয়া গেল, রাওলপিণ্ডিতে এক প্রবাসী বাঙালির এক পরমাসুন্দরী মেয়ে আছে। কাছের সুন্দরীর চেয়ে দূরের সুন্দরীকে বেশি লোভনীয় বলিয়া মনে হয়। নলিন মাতিয়া উঠিল, খরচপত্র দিয়া কন্যাকে কলিকাতায় আনানো হইল। কন্যাটি সুন্দরী বটে। নলিন কহিল, "যিনি যাই করুন, ফস্‌ করিয়া রাওলপিণ্ডি ছাড়াইয়া যাইবেন এমন সাধ্য কাহারো নাই। অন্তত এ কথা কেহ বলিতে পারিবেন না যে, এ মেয়ে তো আমরা পূর্বেই দেখিয়াছিলাম, পছন্দ হয় নাই বলিয়া সম্বন্ধ করি নাই।"

কথাবার্তা তো প্রায় একপ্রকার স্থির, পানপত্রের আয়োজন হইতেছে, এমন সময় একদিন প্রাতে দেখা গেল, ননীগোপালের বাড়ি হইতে বিচিত্র থালার উপর বিবিধ উপঢৌকন লইয়া দাসীচাকরের দল সার বাঁধিয়া চলিয়াছে।

নলিন কহিল, "দেখে এসো তো হে, ব্যাপারখানা কী।"

খবর আসিল, নন্দর ভাবী বধূর জন্য পানপত্র যাইতেছে।

নলিন তৎক্ষণাৎ গুড়গুড়ি টানা বন্ধ করিয়া সচকিত হইয়া উঠিয়া বসিল ; বলিল, "খবর নিতে হচ্ছে তো।"

তৎক্ষণাৎ গাড়ি ভাড়া করিয়া ছড়্‌ছড়্‌ শব্দে দূত ছুটিল। বিপিন হাজরা ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "কলকাতার মেয়ে, কিন্তু খাসা মেয়ে।"

নলিনের বুক দমিয়া গেল, কহিল, "বল কী হে।"

হাজরা কেবলমাত্র কহিল, "খাসা মেয়ে।"

নলিন বলিল, "এ তো দেখতে হচ্ছে।"

পারিষদ বলিল, "সে আর শক্তটা কী !" বলিয়া তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠে একটা কাল্পনিক টাকা বাজাইয়া দিল।

সুযোগ করিয়া নলিন মেয়ে দেখিল। যতই মনে হইল, এ মেয়ে নন্দর জন্য একেবারে স্থির হইয়া গেছে ততই বোধ হইতে লাগিল, মেয়েটি রাওলপিণ্ডজার চেয়ে ভালো দেখিতে। দ্বিধাপীড়িত হইয়া নলিন পারিষদকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন ঠেকছে হে।"

হাজরা কহিল, "আজ্ঞে, আমাদের চোখে তো ভালোই ঠেকছে।"

নলিন কহিল, "সে ভালো কি এ ভালো।"

হাজরা বলিল, "এ-ই ভালো।"

তখন নলিনের বোধ হইল, ইহার চোখের পল্লব তাহার চেয়ে আরো একটু যেন ঘন; তাহার রঙটা ইহার চেয়ে একটু যেন বেশি ফ্যাকাশে, ইহার গৌরবর্ণে একটু যেন হলদে আভায় সোনা মিশাইয়াছে। ইহাকে তো হাতছাড়া করা যায় না।

নলিন বিমর্ষভাবে চিত হইয়া গুড়গুড়ি টানিতে টানিতে কহিল, "ওহে হাজরা, কী করা যায় বলো তো।"

হাজরা বলিল, "মহারাজ, শক্তটা কী।" বলিয়া পুনশ্চ অঙ্গুষ্ঠে তর্জনীতে কাল্পনিক টাকা বাজাইয়া দিল।

টাকাটা যখন সত্যই সশব্দে বাজিয়া উঠিল তখন যথোচিত ফল হইতে বিলম্ব হইল না। কন্যার পিতা একটা অকারণ ছুতা করিয়া বরের পিতার সহিত তুমুল ঝগড়া বাধাইলেন। বরের পিতা বলিলেন, "তোমার কন্যার সহিত আমার পুত্রের যদি বিবাহ দিই তবে—" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কন্যার পিতা আরো একগুণ অধিক করিয়া বলিলেন, "তোমার পুত্রের সহিত আমার কন্যার যদি বিবাহ দিই তবে—" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অতঃপর আর বিলম্ব মাত্র না করিয়া নলিন নন্দকে ফাঁকি দিয়া শুভলগ্নে শুভবিবাহ সত্বর সম্পন্ন করিয়া ফেলিল। এবং হাসিতে হাসিতে হাজরাকে বলিল, "বি. এ. পাস করা তো একেই বলে। কী বলো হে হাজরা। এবারে আমাদের ও বাড়ির বড়োবাবু ফেল।"

অনতিকাল পরেই ননীগোপালের বাড়িতে একদিন ঢাক ঢোল সানাই বাজিয়া উঠিল। নন্দর গায়ে হলুদ।

নলিন কহিল, "ওহে হাজরা, খবর লও তো পাত্রীটি কে।"

হাজরা আসিয়া খবর দিল, পাত্রীটি সেই রাওলপিণ্ডির মেয়ে।

রাওলপিণ্ডির মেয়ে! হাঃ হাঃ হাঃ। নলিন অত্যন্ত হাসিতে লাগিল। ও বাড়ির

বড়োবাবু আর কন্যা পাইলেন না, আমাদেরই পরিত্যক্ত পাত্রীটিকে বিবাহ করিতেছেন। হাজরাও বিস্তর হাসিল।

কিন্তু, উত্তরোত্তর নলিনের হাসির আর জোর রহিল না। তাহার হাসির মধ্যে কীট প্রবেশ করিল। একটি ক্ষুদ্র সংশয় তীক্ষ্ণ স্বরে কানে কানে বলিতে লাগিল, 'আহা, হাতছাড়া হইয়া গেল। শেষকালে নন্দর কপালে জুটিল।' ক্ষুদ্র সংশয় ক্রমশই রক্তস্ফীত জোঁকের মতো বড়ো হইয়া উঠিল, তাহার কণ্ঠস্বরও মোটা হইল। সে বলিল, 'এখন আর কোনোমতেই ইহাকে পাওয়া যাইবে না, কিন্তু আসলে ইহাকে দেখিতে ভালো। ভারি ঠকিয়াছ।'

অন্তঃপুরে নলিন যখন খাইতে গেল তখন তাহার স্ত্রীর ছোটোখাটো সমস্ত খুঁত মস্ত হইয়া তাহাকে উপহাস করিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, স্ত্রীটা তাহাকে ভয়ানক ঠকাইয়াছে।

রাওলপিণ্ডিতে যখন সম্বন্ধ হইতেছিল তখন নলিন সেই কন্যার যে ফোটো পাইয়াছিল, সেইখানি বাহির করিয়া দেখিতে লাগিল। "বাহবা, অপরূপ রূপমাধুরী। এমন লক্ষ্মীকে হাতে পাইয়া ঠেলিয়াছি, আমি এত বড়ো গাধা।"

বিবাহসন্ধ্যায় আলো জ্বালাইয়া বাজনা বাজাইয়া জুড়িতে চড়িয়া বর বাহির হইল। নলিন শুইয়া পড়িয়া গুড়গুড়ি হইতে যৎসামান্য সান্ত্বনা আকর্ষণের নিষ্ফল চেষ্টা করিতেছে এমন সময় হাজরা প্রসন্নবদনে হাসিতে হাসিতে আসিয়া নন্দকে লক্ষ্য করিয়া পরিহাস জমাইবার উপক্রম করিল।

নলিন হাঁকিল, "দরোয়ান!"

হাজরা তটস্থ হইয়া দরোয়ানকে ডাকিয়া দিল।

বাবু হাজরাকে দেখাইয়া দিয়া কহিল, "অবৃহি ইস্কো কান পকড়কে বাহার নিকাল দো।"

আশ্বিন ১৩০৭

শুভদৃষ্টি

কান্তিচন্দ্রের বয়স অল্প, তথাপি স্ত্রীবিয়োগের পর দ্বিতীয় স্ত্রীর অনুসন্ধানে ক্ষান্ত থাকিয়া পশুপক্ষী-শিকারেই মনোনিবেশ করিয়াছেন। দীর্ঘ কৃশ কঠিন লঘু শরীর, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, অব্যর্থ লক্ষ্য, সাজসজ্জায় পশ্চিমদেশীর মতো; সঙ্গে সঙ্গে কুস্তিগির হীরা সিং, ছক্কনলাল, এবং গাইয়ে বাজিয়ে খাঁসাহেব, মিঞাসাহেব অনেক ফিরিয়া থাকে; অকর্মণ্য অনুচর-পরিচরেরও অভাব নাই।

দুই-চারিজন শিকারী বন্ধুবান্ধব লইয়া অঘ্রানের মাঝামাঝি কান্তিচন্দ্র নৈদিঘির বিলের ধারে শিকার করিতে গিয়াছেন। নদীতে দুইটি-বড়ো বোটে তাঁহাদের বাস, আরো গোটা-তিনচার নৌকায় চাকরবাকরের দল গ্রামের ঘাট ঘিরিয়া বসিয়া আছে। গ্রামবধূদের জল তোলা, স্নান করা প্রায় বন্ধ। সমস্ত দিন বন্দুকের আওয়াজে জলস্থল কম্পমান, সন্ধ্যাবেলায় ওস্তাদি গলায় তানকর্তবে পল্লীর নিদ্রাতন্দ্রা তিরোহিত।

একদিন সকালে কান্তিচন্দ্র বোটে বসিয়া বন্দুকের চোঙ সযত্নে স্বহস্তে পরিষ্কার করিতেছেন, এমন সময় অনতিদূরে হাঁসের ডাক শুনিয়া চাহিয়া দেখিলেন, একটি বালিকা দুই হাতে দুইটি তরুণ হাঁস বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া ঘাটে আনিয়াছে। নদীটি ছোটো, প্রায় স্রোতহীন, নানাজাতীয় শৈবালে ভরা। বালিকা হাঁস দুইটিকে জলে ছাড়িয়া দিয়া একেবারে আয়ত্তের বাহিরে না যায় এইভাবে ত্রস্তসতর্ক স্নেহে তাহাদের আগলাইবার চেষ্টা করিতেছে। এটুকু বুঝা গেল, অন্য দিন সে তাহার হাঁস জলে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইত, কিন্তু সম্প্রতি শিকারীর ভয়ে নিশ্চিন্ত চিত্তে রাখিয়া যাইতে পারিতেছে না।

মেয়েটির সৌন্দর্য নিরতিশয় নবীন, যেন বিশ্বকর্মা তাহাকে সদ্য নির্মাণ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। বয়স ঠিক করা শক্ত। শরীরটি বিকশিত কিন্তু মুখটি এমন কাঁচা যে, সংসার কোথাও যেন তাহাকে লেশমাত্র স্পর্শ করে নাই। সে যে যৌবনে পা ফেলিয়াছে এখনো নিজের কাছে সে খবরটি তাহার পৌঁছে নাই।

কান্তিচন্দ্র ক্ষণকালের জন্য বন্দুক সাফ করায় ঢিল দিলেন। তাঁহার চমক লাগিয়া গেল। এমন জায়গায় এমন মুখ দেখিবেন বলিয়া কখনো আশা করেন নাই। অথচ, রাজার অন্তঃপুরের চেয়ে এই জায়গাতেই এই মুখখানি মানাইয়াছিল। সোনার ফুলদানির চেয়ে গাছেই ফুলকে সাজে। সেদিন শরতের শিশিরে এবং প্রভাতের রৌদ্রে নদীতীরের বিকশিত কাশবনটি ঝলমল করিতেছিল, তাহারই মধ্যে সেই সরল

নবীন মুখখানি কান্তিচন্দ্রের মুগ্ধ চক্ষে আশ্বিনের আসন্ন আগমনীর একটি আনন্দচ্ছবি আঁকিয়া দিল। মন্দাকিনীতীরে তরুণ পার্বতী কখনো কখনো এমন হংসশিশু বক্ষে লইয়া আসিতেন, কালিদাস সে কথা লিখিতে ভুলিয়াছেন।

এমন সময় হঠাৎ মেয়েটি ভীতত্রস্ত হইয়া কাঁদোকাঁদো মুখে তাড়াতাড়ি হাঁস-দুটিকে বুকে তুলিয়া লইয়া অব্যক্ত আর্তস্বরে ঘাট ত্যাগ করিয়া চলিল। কান্তিচন্দ্র কারণসন্ধানে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার একটি রসিক পারিষদ কৌতুক করিয়া বালিকাকে ভয় দেখাইবার জন্য হাঁসের দিকে ফাঁকা বন্দুক লক্ষ করিতেছে। কান্তিচন্দ্র পশ্চাৎ হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইয়া হঠাৎ তাহার গালে সশব্দে প্রকাণ্ড একটি চপেটাঘাত করিলেন, অকস্মাৎ রসভঙ্গ হইয়া লোকটা সেইখানে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। কান্তি পুনরায় কামরায় আসিয়া বন্দুক সাফ করিতে লাগিলেন।

সেইদিন বেলা প্রহর-তিনেকের সময় গ্রামপথের ঘনচ্ছায়ার মধ্য দিয়া শিকারীর দল শস্যক্ষেত্রের দিকে চলিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজন বন্দুকের আওয়াজ করিয়া দিল। কিছু দূরে বাঁশঝাড়ের উপর হইতে কী একটা পাখি আহত হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ভিতরের দিকে পড়িয়া গেল।

কৌতুহলী কান্তিচন্দ্র পাখির সন্ধানে ঝোপঝাড় ভেদ করিয়া ভিতরে গিয়া দেখিলেন, একটি সচ্ছল গৃহস্থঘর, প্রাঙ্গণে সারি সারি ধানের গোলা। পরিচ্ছন্ন বৃহৎ গোয়ালঘরের কুলগাছতলায় বসিয়া সকালবেলাকার সেই মেয়েটি একটি আহত ঘুঘু বুকের কাছে তুলিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতেছে এবং গামলার জলে অঞ্চল ভিজাইয়া পাখির চঞ্চুপুটের মধ্যে জল নিংড়াইয়া দিতেছে। পোষা বিড়ালটা তাহার কোলের উপর দুই পা তুলিয়া ঊর্ধ্বমুখে ঘুঘুটির প্রতি উৎসুক দৃষ্টিপাত করিতেছে; বালিকা মধ্যে মধ্যে তাহার নাসিকাগ্রভাগে তর্জনী-আঘাত করিয়া লুব্ধ জন্তুর অতিরিক্ত আগ্রহ দমন করিয়া দিতেছে।

পল্লীর নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে একটি গৃহস্থপ্রাঙ্গণের সচ্ছল শান্তির মধ্যে এই করুণচ্ছবি এক মুহূর্তেই কান্তিচন্দ্রের হৃদয়ের মধ্যে আঁকা হইয়া গেল। বিরলপল্লব গাছটির ছায়া ও রৌদ্র বালিকার ক্রোড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে; অদূরে আহারপরিতৃপ্ত পরিপুষ্ট গাভী আলস্যে মাটিতে বসিয়া শৃঙ্গ ও পুচ্ছ-আন্দোলনে পিঠের মাছি তাড়াইতেছে; মাঝে মাঝে বাঁশের ঝাড়ে ফিস্ ফিস্ কথার মতো নূতন উত্তরবাতাসের খস্ খস্ শব্দ উঠিতেছে। সেদিন প্রভাতে নদীতীরে বনের মধ্যে যাহাকে বনশ্রীর মতো দেখিতে হইয়াছিল, আজ মধ্যাহ্নে নিস্তব্ধ গোষ্ঠপ্রাঙ্গণচ্ছায়ায় তাহাকে স্নেহবিগলিত গৃহলক্ষ্মীটির মতো দেখিতে হইল।

কান্তিচন্দ্র বন্দুক-হস্তে হঠাৎ এই ব্যথিত বালিকার সম্মুখে আসিয়া অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। মনে হইল, যেন বমালসুদ্ধ চোর ধরা পড়িলাম। পাখিটি যে আমার গুলিতে আহত হয় নাই, কোনোপ্রকারে এই কৈফিয়তটুকু দিতে ইচ্ছা হইল। কেমন করিয়া কথাটা পাড়িবেন ভাবিতেছেন এমন সময়ে কুটির হইতে কে ডাকিল, "সুধা।" বালিকা যেন চমকিত হইয়া উঠিল। আবার ডাক পড়িল, "সুধা।" তখন সে তাড়াতাড়ি পাখিটি লইয়া কুটিরমুখে চলিয়া গেল। কান্তিচন্দ্র ভাবিলেন নামটি উপযুক্ত বটে। সুধা!

কান্তি তখন দলের লোকের হাতে বন্দুক রাখিয়া সদর পথ দিয়া সেই কুটিরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, একটি প্রৌঢ়বয়স্ক মুণ্ডিতমুখ শান্তমূর্তি ব্রাহ্মণ দাওয়ায় বসিয়া হরিভক্তিবিলাস পাঠ করিতেছেন। ভক্তিমণ্ডিত তাঁহার মুখের সুগভীর স্নিগ্ধ প্রশান্ত ভাবের সহিত কান্তিচন্দ্র সেই বালিকার দয়ার্দ্র মুখের সাদৃশ্য অনুভব করিলেন।

কান্তি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কহিলেন, "তৃষ্ণা পাইয়াছে ঠাকুর, এক ঘটী জল পাইতে পারি কি।"

ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন এবং ভিতর হইতে পিতলের রেকাবিতে কয়েকটি বাতাসা ও কাঁসার ঘটীতে জল লইয়া স্বহস্তে অতিথির সম্মুখে রাখিলেন।

কান্তি জল খাইলে পর ব্রাহ্মণ তাঁহার পরিচয় লইলেন। কান্তি পরিচয় দিয়া কহিলেন, "ঠাকুর, আপনার যদি কোনো উপকার করিতে পারি তো কৃতার্থ হই।"

নবীন বাঁড়ুজ্যে কহিলেন, "বাবা, আমার আর কী উপকার করিবে। তবে সুধা বলিয়া আমার একটি কন্যা আছে, তাহার বয়স হইতে চলিল, তাহাকে একটি সৎপাত্রে দান করিতে পারিলেই সংসারের ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করি। কাছে কোথাও ভালো ছেলে দেখি না, দূরে সন্ধান করিবার মতো সামর্থ্যও নাই; ঘরে গোপীনাথের বিগ্রহ আছে, তাঁহাকে ফেলিয়া কোথাও যাই নাই।"

কান্তি কহিলেন, "আপনি নৌকায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে পাত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিব।"

এ দিকে কান্তির প্রেরিত চরগণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা সুধার কথা যাহাকেই জিজ্ঞাসা করিল সকলেই একবাক্যে কহিল, এমন লক্ষ্মীস্বভাবা কন্যা আর হয় না।

পরদিন নবীন বোটে উপস্থিত হইলে কান্তি তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন এবং জানাইলেন, তিনিই ব্রাহ্মণের কন্যাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক আছেন। ব্রাহ্মণ

এই অভাবনীয় সৌভাগ্যে রুদ্ধকণ্ঠে কিছুক্ষণ কথাই কহিতে পারিলেন না। মনে করিলেন, কিছু একটা ভ্রম হইয়াছে। কহিলেন, "আমার কন্যাকে তুমি বিবাহ করিবে ?"

কান্তি কহিলেন, "আপনার যদি সম্মতি থাকে, আমি প্রস্তুত আছি।"

নবীন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুধাকে ?"— উত্তরে শুনিলেন, "হাঁ।"

নবীন স্থিরভাবে কহিলেন, "তা দেখাশোনা—"

কান্তি যেন দেখেন নাই, ভান করিয়া কহিলেন, "সেই একেবারে শুভদৃষ্টির সময়।"

নবীন গদ্‌গদকণ্ঠে কহিলেন, "আমার সুধা বড়ো সুশীলা মেয়ে, রাঁধাবাড়া ঘরকন্নার কাজে অদ্বিতীয়। তুমি যেমন না দেখিয়াই তাহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছ তেমনি আশীর্বাদ করি, আমার সুধা পতিব্রতা সতীলক্ষ্মী হইয়া চিরকাল তোমার মঙ্গল করুক। কখনো মুহূর্তের জন্য তোমার পরিতাপের কারণ না ঘটুক।"

কান্তি আর বিলম্ব করিতে চাহিলেন না, মাঘ মাসেই বিবাহ স্থির হইয়া গেল।

পাড়ার মজুমদারদের পুরাতন কোঠাবাড়িতে বিবাহের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। বর হাতি চড়িয়া মশাল জ্বালাইয়া বাজনা বাজাইয়া যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত।

শুভদৃষ্টির সময় বর কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন। নতশির টোপর-পরা চন্দনচর্চিত সুধাকে ভালো করিয়া যেন দেখিতে পাইলেন না। উদ্‌বেলিত হৃদয়ের আনন্দে চোখে যেন ধাঁধা লাগিল।

বাসরঘরে পাড়ার সরকারি ঠানদিদি যখন বরকে দিয়া জোর করিয়া মেয়ের ঘোমটা খোলাইয়া দিলেন তখন কান্তি হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন।

এ তো সেই মেয়ে নয়। হঠাৎ বুকের কাছ হইতে একটা কালো বজ্র উঠিয়া তাঁহার মস্তিষ্ককে যেন আঘাত করিল, মুহূর্তে বাসরঘরের সমস্ত প্রদীপ যেন অন্ধকার হইয়া গেল এবং সেই অন্ধকারপ্লাবনে নববধূর মুখখানিকেও যেন কালিমালিপ্ত করিয়া দিল।

কান্তিচন্দ্র দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবেন না বলিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন ; সেই প্রতিজ্ঞা কি এমনি একটা অদ্ভুত পরিহাসে অদৃষ্ট তুড়ি দিয়া ভাঙিয়া দিল! কত ভালো ভালো বিবাহের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন, কত আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবদের সানুনয় অনুরোধ অবহেলা করিয়াছেন ; উচ্চকুটুম্বিতার আকর্ষণ, অর্থের প্রলোভন, রূপখ্যাতির মোহ সমস্ত কাটাইয়া অবশেষে কোন্‌-এক অজ্ঞাত পল্লীগ্রামে বিলের ধারে এক অজ্ঞাত দরিদ্রের ঘরে এতবড়ো বিড়ম্বনা, লোকের কাছে মুখ দেখাইবেন কী করিয়া।

শ্বশুরের উপরে প্রথমটা রাগ হইল। প্রতারক এক মেয়ে দেখাইয়া আর-এক

মেয়ের সহিত আমার বিবাহ দিল। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলেন, নবীন তো তাঁহাকে বিবাহের পূর্বে কন্যা দেখাইতে চান নাই এমন নয়, তিনি নিজেই দেখিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। বুদ্ধির দোষে যে এতবড়ো ঠকাটা ঠকিয়াছেন সে লজ্জার কথাটা কাহারো কাছে প্রকাশ না করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন।

ঔষধ যেন গিলিলেন কিন্তু মুখের তারটা বিগড়াইয়া গেল। বাসরঘরের ঠাট্টা আমোদ কিছুই তাঁহার কাছে রুচিল না। নিজের এবং সর্বসাধারণের প্রতি রাগে তাঁহার সর্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল।

এমন সময় হঠাৎ তাঁহার পার্শ্ববর্তিনী বধূ অব্যক্ত ভীত স্বরে চমকিয়া উঠিল। সহসা তাহার কোলের কাছ দিয়া একটা খরগোশের বাচ্ছা ছুটিয়া গেল। পরক্ষণেই সেদিনকার সেই মেয়েটি শশকশিশুর অনুসরণপূর্বক তাহাকে ধরিয়া গালের কাছে রাখিয়া একান্ত স্নেহে আদর করিতে লাগিল। "ওই রে, পাগলি আসিয়াছে" বলিয়া সকলে তাহাকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিল। সে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া ঠিক বরকন্যার সম্মুখে বসিয়া শিশুর মতো কৌতূহলে কী হইতেছে দেখিতে লাগিল। বাড়ির কোনো দাসী তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইবার চেষ্টা করিলে বর ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "আহা, থাক-না, বসুক।"

মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কী।"

সে উত্তর না দিয়া দুলিতে লাগিল। ঘরসুদ্ধ রমণী হাসিয়া উঠিল।

কান্তি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার হাঁসদুটি কত বড়ো হইল।"

অসংকোচে মেয়েটি নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

হতবুদ্ধি কান্তি সাহসপূর্বক আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সেই ঘুঘু আরাম হইয়াছে তো?" কোনো ফল পাইলেন না। মেয়েরা এমনভাবে হাসিতে লাগিল যেন বর ভারি ঠকিয়াছেন।

অবশেষে প্রশ্ন করিয়া খবর পাইলেন, মেয়েটি কালা এবং বোবা, পাড়ার যত পশুপক্ষীর প্রিয়সঙ্গিনী। সেদিন সে যে সুধা ডাক শুনিয়া উঠিয়া ঘরে গিয়াছিল সে তাঁহার অনুমান মাত্র, তাহার আর কোনো কারণ ছিল।

কান্তি তখন মনে মনে চমকিয়া উঠিলেন। যাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া পৃথিবীতে তাঁহার কোনো সুখ ছিল না, শুভদৈবক্রমে তাহার নিকট হইতে পরিত্রাণ পাইয়া নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিলেন। মনে করিলেন, যদি এই মেয়েটির বাপের কাছে যাইতাম এবং সে ব্যক্তি আমার প্রার্থনা -অনুসারে কন্যাটিকে কোনোমতে আমার হাতে সমর্পণ করিয়া নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করিত!

যতক্ষণ আয়ত্তচ্যুত এই মেয়েটির মোহ তাঁহার মনটিকে আলোড়িত করিতেছিল ততক্ষণ নিজের বধূটি সম্বন্ধে একেবারে অন্ধ হইয়া ছিলেন। নিকটেই আর কোথাও কিছু সান্ত্বনার কারণ ছিল কি না তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তিও ছিল না। যেই শুনিলেন মেয়েটি বোবা ও কালা অমনি সমস্ত জগতের উপর হইতে একটা কালো পর্দা ছিন্ন হইয়া পড়িয়া গেল। দূরের আশা দূর হইয়া নিকটের জিনিসগুলি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। সুগভীর পরিত্রাণের নিশ্বাস ফেলিয়া কান্তি লজ্জাবনত বধূর মুখের দিকে কোনো-এক সুযোগে চাহিয়া দেখিলেন। এতক্ষণে যথার্থ শুভদৃষ্টি হইল। চর্মচক্ষুর অন্তরালবর্তী মনোনেত্রের উপর হইতে সমস্ত বাধা খসিয়া পড়িল। হৃদয় হইতে এবং প্রদীপ হইতে সমস্ত আলোক বিচ্ছুরিত হইয়া একটিমাত্র কোমল সুকুমার মুখের উপরে প্রতিফলিত হইল ; কান্তি দেখিলেন, একটি স্নিগ্ধ শ্রী, একটি শান্ত লাবণ্যে মুখখানি মণ্ডিত। বুঝিলেন, নবীনের আশীর্বাদ সার্থক হইবে।

আশ্বিন ১৩০৭

যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ

এক সময় যজ্ঞেশ্বরের অবস্থা ভালোই ছিল। এখন প্রাচীন ভাঙা কোঠাবাড়িটাকে সাপব্যাঙ-বাদুড়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া খোড়ো ঘরে ভগবদ্গীতা লইয়া কালযাপন করিতেছেন।

এগারো বৎসর পূর্বে তাঁহার মেয়েটি যখন জন্মিয়াছিল তখন বংশের সৌভাগ্যশশী কৃষ্ণপক্ষের শেষকলায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। সেইজন্ত সাধ করিয়া মেয়ের নাম রাখিয়াছিলেন কমলা। ভাবিয়াছিলেন, যদি এই কৌশলে ফাঁকি দিয়া চঞ্চলা লক্ষ্মীকে কন্যারূপে ঘরে ধরিয়া রাখিতে পারেন। লক্ষ্মী সে ফন্দিতে ধরা দিলেন না, কিন্তু মেয়েটির মুখে নিজের শ্রী রাখিয়া গেলেন। বড়ো সুন্দরী মেয়ে।

মেয়েটির বিবাহ সম্বন্ধে যজ্ঞেশ্বরের যে খুব উচ্চ আশা ছিল তাহা নহে। কাছাকাছি যে-কোনো একটি সৎপাত্রে বিবাহ দিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার জ্যাঠাইমা তাঁহার বড়ো আদরের কমলাকে বড়ো ঘর না হইলে দিবেন না, পণ করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার নিজের হাতে অল্প কিছু সংগতি ছিল, ভালো পাত্র পাইলে তাহা বাহির করিয়া দিবেন, স্থির করিয়াছেন।

অবশেষে জ্যাঠাইমার উত্তেজনায় শাস্ত্রাধ্যয়নগুঞ্জিত শান্ত পল্লীগৃহ ছাড়িয়া যজ্ঞেশ্বর

পাত্র-সন্ধানে বাহির হইলেন। রাজশাহিতে তাঁহার এক আত্মীয় উকিলের বাড়িতে গিয়া আশ্রয় লইলেন।

এই উকিলের মক্কেল ছিলেন জমিদার গৌরসুন্দর চৌধুরী। তাঁহার একমাত্র পুত্র বিভূতিভূষণ এই উকিলের অভিভাবকতায় কলেজে পড়াশুনা করিত। ছেলেটি কখন যে মেয়েটিকে আসিয়া দেখিয়াছিল তাহা ভগবান প্রজাপতিই জানিতেন।

কিন্তু প্রজাপতির চক্রান্ত যজ্ঞেশ্বরের বুঝিবার সাধ্য ছিল না। তাই বিভূতি সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোনোপ্রকার দুরাশা স্থান পায় নাই। নিরীহ যজ্ঞেশ্বরের অল্প আশা, অল্প সাহস; বিভূতির মতো ছেলে যে তাঁহার জামাই হইতে পারে এ তাঁহার সম্ভব বলিয়া বোধ হইল না।

উকিলের যত্নে একটি চলনসই পাত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাহার বুদ্ধিসুদ্ধি না থাক্‌, বিষয়-আশয় আছে। পাস একটিও দেয় নাই বটে কিন্তু কালেক্টরিতে ৩,২৭৫৲ টাকা খাজনা দিয়া থাকে।

পাত্রের দল একদিন আসিয়া মেয়েটিকে পছন্দ করিয়া ক্ষীরের ছাঁচ, নারিকেলের মিষ্টান্ন ও নাটোরের কাঁচাগোল্লা খাইয়া গেল। বিভূতি তাহার অনতিকাল পরে আসিয়া খবর শুনিলেন। যজ্ঞেশ্বর মনের আনন্দে তাঁহাকেও কাঁচাগোল্লা খাওয়াইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু ক্ষুধার অত্যন্ত অভাব জানাইয়া বিভূতি কিছু খাইল না। কাহারো সহিত ভালো করিয়া কথাই কহিল না, বাড়ি চলিয়া গেল।

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলায় উকিলবাবু বিভূতির কাছ হইতে এক পত্র পাইলেন। মর্মটা এই, যজ্ঞেশ্বরের কন্যাকে তাহার বড়ো পছন্দ এবং তাহাকে সে বিবাহ করিতে উৎসুক।

উকিল ভাবিলেন, ‘এ তো বিষম মুশকিলে পড়িলাম। গৌরসুন্দরবাবু ভাবিবেন, আমিই আমার আত্মীয়কন্যার সহিত তাঁহার ছেলের বিবাহের চক্রান্ত করিতেছি।’

অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া তিনি যজ্ঞেশ্বরকে দেশে পাঠাইলেন, এবং পূর্বোক্ত পাত্রটির সহিত বিবাহের দিন যথাসম্ভব নিকটবর্তী করিয়া দিলেন। বিভূতিকে ডাকিয়া অভিভাবকমহাশয় পড়াশুনা ছাড়া আর-কোনো দিকে মন দিতে বিশেষ করিয়া নিষেধ করিলেন। শুনিয়া রাগে বিভূতির জেদ চার গুণ বাড়িয়া গেল।

বিবাহের আয়োজন উদ্যোগ চলিতেছে এমন সময় একদিন যজ্ঞেশ্বরের খোড়ো ঘরে বিভূতিভূষণ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত। যজ্ঞেশ্বর ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, “এসো বাবা, এসো।” কিন্তু, কোথায় বসাইবেন, কী খাওয়াইবেন, কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। এখানে নাটোরের কাঁচাগোল্লা কোথায়!

বিভূতিভূষণ যখন স্নানের পূর্বে রোয়াকে বসিয়া তেল মাখিতেছেন তখন জ্যাঠাইমা তাঁহার রজতগিরিনিভ গৌর পুষ্ট দেহটি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। যজ্ঞেশ্বরকে ডাকিয়া কহিলেন, "এই ছেলেটির সঙ্গে আমাদের কমলের বিবাহ হয় না কি।" ভীরু যজ্ঞেশ্বর বিস্ফারিত নেত্রে কহিলেন, "সে কি হয়!"

জ্যাঠাইমা কহিলেন, "কেন হইবে না। চেষ্টা করিলেই হয়।" এই বলিয়া তিনি বাথানপাড়ার গোয়ালাদের ঘর হইতে ভালো ছানা ও ক্ষীর আনাইয়া বিবিধ আকার ও আয়তনের মোদক-নির্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্নানাহারের পর বিভূতিভূষণ সলজ্জে সসংকোচে নিজের বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। যজ্ঞেশ্বর আনন্দে ব্যাকুল হইয়া জ্যাঠাইমাকে সুসংবাদ দিলেন।

জ্যাঠাইমা শান্ত মুখে কহিলেন, "তা বেশ হয়েছে বাপু, কিন্তু তুমি একটু ঠাণ্ডা হও।" তাঁহার পক্ষে এটা কিছুই আশাতীত হয় নাই। যদি কমলার জন্য এক দিক হইতে কাবুলের আমীর ও অন্য দিক হইতে চীনের সম্রাট তাঁহার দ্বারস্থ হইত তিনি আশ্চর্য হইতেন না।

ক্ষীণাশ্বাস যজ্ঞেশ্বর বিভূতিভূষণের হাত ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখো বাবা, আমার সকল দিক যেন নষ্ট না হয়।"

বিবাহের প্রস্তাব পাকা করিয়া বিভূতিভূষণ তাঁহার বাপের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

গৌরসুন্দর নিজে নিরক্ষর ছিলেন বলিয়া শিক্ষিত ছেলেটিকে মনে মনে বিশেষ খাতির করিতেন। তাঁহার কোনো আচরণে বা মতে পাছে তাঁহার ছেলের কাছে সুশিক্ষা বা শিষ্টতার অভাব ধরা পড়ে এই সংকোচ তিনি দূর করিতে পারিতেন না। তাঁহার একমাত্র প্রাণাধিক পুত্র যেন বাপকে মনে মনে ধিক্কার না দেয়, যেন অশিক্ষিত বাপের জন্য তাহাকে লজ্জিত না হইতে হয়, এ চেষ্টা তাঁহার সর্বদা ছিল। কিন্তু তবু যখন শুনিলেন, বিভূতি দরিদ্রকন্যাকে বিবাহ করিতে উদ্যত, তখন প্রথমটা রাগ প্রকাশ করিয়া উঠিলেন। বিভূতি নতশিরে চুপ করিয়া রহিল। তখন গৌরসুন্দর কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া নিজেকে সংশোধন করিয়া লইয়া কহিলেন, "আমি কি পণের লোভে তোমাকে বিবাহ করিতে বলিতেছি। তা মনে করিয়ো না। নিজের ছেলেকে লইয়া বেহাইয়ের সঙ্গে দরদস্তুর করিতে বসিব, আমি তেমন ছোটো লোক নই। কিন্তু বড়ো ঘরের মেয়ে চাই।"

বিভূতিভূষণ বুঝাইয়া দিলেন, যজ্ঞেশ্বর সম্ভ্রান্তবংশীয়, সম্প্রতি গরিব হইয়াছেন।

গৌরসুন্দর দায়ে পড়িয়া মত দিলেন কিন্তু মনে মনে যজ্ঞেশ্বরের প্রতি অত্যন্ত রাগ করিলেন।

তখন দুই পক্ষে কথাবার্তা চলিতে লাগিল। আর সব ঠিক হইল কিন্তু বিবাহ হইবে কোথায় তাহা লইয়া কিছুতেই নিষ্পত্তি হয় না। গৌরসুন্দর এক ছেলের বিবাহে খুব ধুমধাম করিতে চান, কিন্তু বুড়াশিবতলার সেই খোড়ো ঘরে সমস্ত ধুমধাম ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তিনি জেদ করিলেন, তাঁহারই বাড়িতে বিবাহসভা হইবে।

শুনিয়া মাতৃহীনা কন্যার দিদিমা কান্না জুড়িয়া দিলেন। তাঁহাদেরও তো এক সময় সুদিন ছিল, আজ লক্ষ্মী বিমুখ হইয়াছেন বলিয়া কি সমস্ত সাধ জলাঞ্জলি দিতে হইবে, পিতৃপুরুষের মান বজায় থাকিবে না? সে হইবে না; আমাদের ঘর খোড়ো হউক আর যাই হউক, এইখানেই বিবাহ দিতে হইবে।

নিরীহ-প্রকৃতি যজ্ঞেশ্বর অত্যন্ত দ্বিধায় পড়িয়া গেলেন। অবশেষে বিভূতিভূষণের চেষ্টায় কন্যাগৃহেই বিবাহ স্থির হইল।

ইহাতে গৌরসুন্দর এবং তাঁহার দলবল কন্যাকর্তার উপর আরো চটিয়া গেলেন। সকলেই স্থির করিলেন, স্পর্ধিত দরিদ্রকে অপদস্থ করিতে হইবে। বরযাত্র যাহা জোটানো হইল তাহা পল্টনবিশেষ। এ সম্বন্ধে গৌরসুন্দর ছেলের কোনো পরামর্শ লইলেন না।

বৈশাখ মাসে বিবাহের দিন স্থির হইল। যজ্ঞেশ্বর তাহার স্বল্পাবশিষ্ট যথাসর্বস্ব পণ করিয়া আয়োজন করিয়াছে। নূতন আটচালা বাঁধিয়াছে, পাবনা হইতে ঘি ময়দা চিনি দধি প্রভৃতি আনাইয়াছে। জ্যাঠাইমা তাঁহার যে গোপন পুঁজির বলে স্বগৃহেই বিবাহপ্রস্তাবে জেদ করিয়াছিলেন তাহার প্রায় শেষ পয়সাটি পর্যন্ত বাহির করিয়া দিয়াছেন।

এমন সময় দুর্ভাগার অদৃষ্টক্রমে বিবাহের দুই দিন আগে হইতে প্রচণ্ড দুর্যোগ আরম্ভ হইল। ঝড় যদি-বা থামে তো বৃষ্টি থামে না, কিছুক্ষণের জন্য যদি-বা নরম পড়িয়া আসে আবার দ্বিগুণ বেগে আরম্ভ হয়। এমন বর্ষণ বিশ-পঁচিশ বছরের মধ্যে কেহ দেখে নাই।

গৌরসুন্দর পূর্ব হইতেই গুটিকতক হাতি ও পালকি স্টেশনে হাজির রাখিয়াছিলেন। আশপাশের গ্রাম হইতে যজ্ঞেশ্বর ছইওয়ালা গোরুর গাড়ির জোগাড় করিতে লাগিলেন। দুর্দিনে গাড়োয়ানরা নড়িতে চায় না, হাতে পায়ে ধরিয়া দ্বিগুণ মূল্য কবুল করিয়া যজ্ঞেশ্বর তাহাদের রাজি করিলেন। বরযাত্রের মধ্যে যাহাদিগকে গোরুর গাড়িতে চড়িতে হইল তাহারা চটিয়া আগুন হইল।

গ্রামের পথে জল দাঁড়াইয়া গেছে। হাতির পা বসিয়া যায়, গাড়ির চাকা ঠেলিয়া তোলা দায় হইল। তখনো বৃষ্টির বিরাম নাই। বরযাত্রগণ ভিজিয়া কাদা মাখিয়া বিধিবিড়ম্বনার প্রতিশোধ কন্যাকর্তার উপর তুলিবে বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়া রাখিল। হতভাগ্য যজ্ঞেশ্বরকে এই অসাময়িক বৃষ্টির জন্য জবাবদিহি করিতে হইবে।

বর সদলবলে কন্যাকর্তার কুটিরে আসিয়া পৌঁছিলেন। অভাবনীয় লোকসমাগম দেখিয়া গৃহস্বামীর বুক দমিয়া গেল। ব্যাকুল যজ্ঞেশ্বর কাহাকে কোথায় বসাইবেন ভাবিয়া পান না, কপালে করাঘাত করিয়া কেবলই বলিতে থাকেন, "বড়ো কষ্ট দিলাম, বড়ো কষ্ট দিলাম।" যে আটচালা বানাইয়াছিলেন, তাহার চারি দিক হইতে জল পড়িতেছে। বৈশাখ মাসে যে এমন শ্রাবণধারা বহিবে তাহা তিনি স্বপ্নেও আশঙ্কা করেন নাই। গণ্ডগ্রামের ভদ্র অভদ্র সমস্ত লোকই যজ্ঞেশ্বরকে সাহায্য করিতে উপস্থিত হইয়াছিল; সংকীর্ণ স্থানকে তাহারা আরো সংকীর্ণ করিয়া তুলিল এবং বৃষ্টির কল্লোলের উপর তাহাদের কলরব যোগ হইয়া একটি সমুদ্রমন্থনের মতো গোলমালের উৎপত্তি হইল। পল্লীবৃদ্ধগণ ধনী অতিথিদের সম্মাননার উপযুক্ত উপায় না দেখিয়া যাহাকে তাহাকে ক্রমাগতই জোড়হস্তে বিনয় করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বরকে যখন অন্তঃপুরে লইয়া গেল তখন ক্রুদ্ধ বরযাত্রীর দল রব তুলিল, তাহাদের ক্ষুধা পাইয়াছে, আহার চাই। মুখ পাংশুবর্ণ করিয়া যজ্ঞেশ্বর গলায় কাপড় দিয়া সকলকে বলিলেন, "আমার সাধ্যমত যাহা-কিছু আয়োজন করিয়াছিলাম সব জলে ভাসিয়া গেছে।"

দ্রব্যসামগ্রী কতক পাবনা হইতে পথের মধ্যে কতক বা ভগ্নপ্রায় পাকশালায় গলিয়া গুলিয়া উনান নিবিয়া একাকার হইয়া গেছে। সহসা উপযুক্ত পরিমাণ আহার্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে বুড়াশিবতলা এমন গ্রামই নহে।

গৌরসুন্দর যজ্ঞেশ্বরের দুর্গতিতে খুশি হইলেন। কহিলেন, "এতগুলা মানুষকে তো অনাহারে রাখা যায় না, কিছু তো উপায় করিতে হইবে।"

বরযাত্রগণ খেপিয়া উঠিয়া মহা হাঙ্গামা করিতে লাগিল। কহিল, "আমরা স্টেশনে গিয়া ট্রেন ধরিয়া এখনই বাড়ি ফিরিয়া যাই।"

যজ্ঞেশ্বর হাত জোড় করিয়া কহিলেন, "একেবারে উপবাস নয়। শিবতলার ছানা বিখ্যাত। উপযুক্ত পরিমাণে ছানা কদমা সংগ্রহ আছে। আমার অন্তরের মধ্যে যাহা হইতেছে তাহা অন্তর্যামীই জানেন।"

যজ্ঞেশ্বরের দুর্গতি দেখিয়া বাথানপাড়ার গোয়ালারা বলিয়াছিল, "ভয় কী ঠাকুর, ছানা যিনি যত খাইতে পারেন আমরা জোগাইয়া দিব।" বিদেশের বরযাত্রীগণ না

খাইয়া ফিরিলে শিবতলা গ্রামের অপমান ; সেই অপমান ঠেকাইবার জন্য গোয়ালারা প্রচুর ছানার বন্দোবস্ত করিয়াছে।

বরযাত্রগণ পরামর্শ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "যত আবশ্যক ছানা জোগাইতে পারিবে তো ?"

যজ্ঞেশ্বর কথঞ্চিৎ আশান্বিত হইয়া কহিল, "তা পারিব।" "আচ্ছা তবে আনো" বলিয়া বরযাত্রগণ বসিয়া গেল। গৌরসুন্দর বসিলেন না, তিনি নীরবে এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া কৌতুক দেখিতে লাগিলেন।

আহারস্থানের চারি দিকেই পুষ্করিণী ভরিয়া উঠিয়া জলে কাদায় একাকার হইয়া গেছে। যজ্ঞেশ্বর যেমন যেমন পাতে ছানা দিয়া যাইতে লাগিলেন তৎক্ষণাৎ বরযাত্রগণ তাহা কাঁধ ডিঙাইয়া পশ্চাতে কাদার মধ্যে টপ্ টপ্ করিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল।

উপায়বিহীন যজ্ঞেশ্বরের চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল। বারম্বার সকলের কাছে জোড়হাত করিতে লাগিলেন; কহিলেন, "আমি অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, আপনাদের নির্যাতনের যোগ্য নই।"

একজন শুষ্কহাস্য হাসিয়া উত্তর করিল, "মেয়ের বাপ তো বটেন, সে অপরাধ যায় কোথায়।" যজ্ঞেশ্বরের স্বগ্রামের বৃদ্ধগণ বারবার ধিক্কার করিয়া বলিতে লাগিল, "তোমার যেমন অবস্থা সেইমত ঘরে কন্যাদান করিলেই এ দুর্গতি ঘটিত না।"

এ দিকে অন্তঃপুরে মেয়ের দিদিমা অকল্যাণশঙ্কাসত্ত্বেও অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। দেখিয়া মেয়ের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। যজ্ঞেশ্বরের জ্যাঠাইমা আসিয়া বিভূতিকে কহিলেন, "ভাই, অপরাধ যা হইবার তা তো হইয়া গেছে, এখন মাপ করো, আজিকার মতো শুভকর্ম সম্পন্ন হইতে দাও।"

এ দিকে ছানার অন্যায় অপব্যয় দেখিয়া গোয়ালার দল রাগিয়া হাঙ্গামা করিতে উদ্যত। পাছে বরযাত্রদের সহিত তাহাদের একটা বিবাদ বাধিয়া যায় এই আশঙ্কায় যজ্ঞেশ্বর তাহাদিগকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য বহুতর চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমন সময় ভোজনশালায় অসময়ে বর আসিয়া উপস্থিত। বরযাত্ররা ভাবিল, বর বুঝি রাগ করিয়া অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন, তাহাদের উৎসাহ বাড়িয়া উঠিল।

বিভূতি রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "বাবা, আমাদের এ কিরকম ব্যবহার।" বলিয়া একটা ছানার থালা স্বহস্তে লইয়া তিনি পরিবেশনে প্রবৃত্ত হইলেন। গোয়ালাদিগকে বলিলেন, "তোমরা পশ্চাৎ দাঁড়াও, কাহারো ছানা যদি পাঁকে পড়ে তো সেগুলা আবার পাতে তুলিয়া দিতে হইবে।"

গৌরসুন্দরের মুখের দিকে চাহিয়া দুই-একজন উঠিবে কি না ইতস্তত করিতেছিল— বিভূতি কহিলেন, "বাবা, তুমিও বসিয়া যাও, অনেক রাত হইয়াছে।"

গৌরসুন্দর বসিয়া গেলেন। ছানা যথাস্থানে পৌঁছিতে লাগিল।

উলুখড়ের বিপদ

বাবুদের নায়েব গিরিশ বসুর অন্তঃপুরে প্যারী বলিয়া একটি নূতন দাসী নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহার বয়স অল্প; চরিত্র ভালো। দূর বিদেশ হইতে আসিয়া কিছুদিন কাজ করার পরেই একদিন সে বৃদ্ধ নায়েবের অনুরাগদৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষার জন্য গৃহিণীর নিকট কাঁদিয়া গিয়া পড়িল। গৃহিণী কহিলেন, "বাছা, তুমি অন্য কোথাও যাও; তুমি ভালোমানুষের মেয়ে, এখানে থাকিলে তোমার সুবিধা হইবে না।" বলিয়া গোপনে কিছু অর্থ দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন।

কিন্তু পালানো সহজ ব্যাপার নহে, হাতে পথ-খরচও সামান্য, সেইজন্য প্যারী গ্রামে হরিহর ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকটে গিয়া আশ্রয় লইল। বিবেচক ছেলেরা কহিল, "বাবা, কেন বিপদ ঘরে আনিতেছেন।" হরিহর কহিলেন, "বিপদ স্বয়ং আসিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তাহাকে ফিরাইতে পারি না।"

গিরিশ বসু সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কহিল, "ভট্টাচার্যমহাশয়, আপনি আমার ঝি ভাঙাইয়া আনিলেন কেন। ঘরে কাজের ভারি অসুবিধা হইতেছে।" ইহার উত্তরে হরিহর দু-চারটে সত্য কথা খুব শক্ত করিয়াই বলিলেন। তিনি মানী লোক ছিলেন, কাহারো খাতিরে কোনো কথা ঘুরাইয়া বলিতে জানিতেন না। নায়েব মনে মনে উদ্গতপক্ষ পিপীলিকার সহিত তাঁহার তুলনা করিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় খুব ঘটা করিয়া পায়ের ধুলা লইল। দুই-চারি দিনের মধ্যেই ভট্টাচার্যের বাড়িতে পুলিসের সমাগম হইল। গৃহিণীঠাকুরানীর বালিশের নীচে হইতে নায়েবের স্ত্রীর একজোড়া ইয়ারিং বাহির হইল। ঝি প্যারী চোর সাব্যস্ত হইয়া জেলে গেল। ভট্টাচার্যমহাশয় দেশবিখ্যাত প্রতিপত্তির জোরে চোরাই-মাল রক্ষার অভিযোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। নায়েব পুনশ্চ ব্রাহ্মণের পদধূলি লইয়া গেল। ব্রাহ্মণ বুঝিলেন, হতভাগিনীকে তিনি আশ্রয় দেওয়াতেই প্যারীর সর্বনাশ ঘটিল। তাঁহার মনে শেল বিঁধিয়া রহিল। ছেলেরা কহিল, "জমিজমা বেচিয়া কলিকাতায় যাওয়া যাক, এখানে বড়ো মুশকিল দেখিতেছি।" হরিহর কহিলেন, "পৈতৃক ভিটা ছাড়িতে পারিব না, অদৃষ্টে থাকিলে বিপদ কোথায় না ঘটে।"

ইতিমধ্যে নায়েব গ্রামে অতিমাত্রায় খাজনা বৃদ্ধির চেষ্টা করায় প্রজারা বিদ্রোহী হইল। হরিহরের সমস্ত ব্রহ্মোত্তর জমা, জমিদারের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নাই। নায়েব তাহার প্রভুকে জানাইল, হরিহরই প্রজাদিগকে প্রশ্রয় দিয়া বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছে। জমিদার কহিলেন, "যেমন করিয়া পার ভট্টাচার্যকে শাসন করো।" নায়েব ভট্টাচার্যের পদধূলি লইয়া কহিল, "সামনের ওই জমিটা পরগনার ভিটার মধ্যে পড়িতেছে; ওটা তো ছাড়িয়া দিতে হয়।" হরিহর কহিলেন, "সে কী কথা। ও যে আমার বহুকালের ব্রহ্মত্র।" হরিহরের গৃহপ্রাঙ্গণের সংলগ্ন পৈতৃক জমি জমিদারের পরগনার অন্তর্গত বলিয়া নালিশ রুজু হইল। হরিহর বলিলেন, "এ জমিটা তো তবে ছাড়িয়া দিতে হয়, আমি তো বৃদ্ধ বয়সে আদালতে সাক্ষী দিতে পারিব না।" ছেলেরা বলিল, "বাড়ির সংলগ্ন জমিটাই যদি ছাড়িয়া দিতে হয় তবে ভিটায় টিঁকিব কী করিয়া।"

প্রাণাধিক পৈতৃক ভিটার মায়ায় বৃদ্ধ কম্পিতপদে আদালতের সাক্ষ্যমঞ্চে গিয়া দাঁড়াইলেন। মুন্সেফ নবগোপালবাবু তাঁহার সাক্ষ্যই প্রামাণ্য করিয়া মকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিয়া দিলেন। ভট্টাচার্যের খাস প্রজারা ইহা লইয়া গ্রামে ভারি উৎসবসমারোহ আরম্ভ করিয়া দিল। হরিহর তাড়াতাড়ি তাহাদিগকে থামাইয়া দিলেন। নায়েব আসিয়া পরম আড়ম্বরে ভট্টাচার্যের পদধূলি লইয়া গায়ে মাথায় মাখিল এবং আপিল রুজু করিল। উকিলরা হরিহরের নিকট হইতে টাকা লন না। তাঁহারা ব্রাহ্মণকে বারম্বার আশ্বাস দিলেন, এ মকদ্দমায় হারিবার কোনো সম্ভাবনা নাই। দিন কি কখনো রাত হইতে পারে। শুনিয়া হরিহর নিশ্চিন্ত হইয়া ঘরে বসিয়া রহিলেন।

একদিন জমিদারি কাছারিতে ঢাকঢোল বাজিয়া উঠিল, পাঁঠা কাটিয়া নায়েবের বাসায় কালীপূজা হইবে। ব্যাপারখানা কী। ভট্টাচার্য খবর পাইলেন, আপিলে তাঁহার হার হইয়াছে।

ভট্টাচার্য মাথা চাপড়াইয়া উকিলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বসন্তবাবু, করিলেন কী। আমার কী দশা হইবে।"

দিন যে কেমন করিয়া রাত হইল, বসন্তবাবু তাহার নিগূঢ় বৃত্তান্ত বলিলেন, "সম্প্রতি যিনি নূতন অ্যাডিশনাল জজ হইয়া আসিয়াছেন তিনি মুন্সেফ থাকা কালে মুন্সেফ নবগোপালবাবুর সহিত তাঁহার ভারি খিটিমিটি বাধিয়াছিল। তখন কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই; আজ জজের আসনে বসিয়া নবগোপালবাবুর রায় পাইবামাত্র উলটাইয়া দিতেছেন; আপনি হারিলেন সেইজন্য।" ব্যাকুল হরিহর কহিলেন, "হাইকোর্টে ইহার কোনো আপিল নাই?" বসন্ত কহিলেন, "জজবাবু আপিলে

ফল পাইবার সম্ভাবনা মাত্র রাখেন নাই। তিনি আপনাদের সাক্ষীকে সন্দেহ করিয়া বিরুদ্ধ পক্ষের সাক্ষীকেই বিশ্বাস করিয়া গিয়াছেন। হাইকোর্টে তো সাক্ষীর বিচার হইবে না।"

বৃদ্ধ সাশ্রুনেত্রে কহিলেন, "তবে আমার উপায় ?"

উকিল কহিলেন, "উপায় কিছুই দেখি না।"

গিরিশ বসু পরদিন লোকজন সঙ্গে লইয়া ঘটা করিয়া ব্রাহ্মণের পদধূলি লইয়া গেল এবং বিদায়কালে উচ্ছ্বসিত দীর্ঘনিশ্বাসে কহিল, "প্রভু, তোমারই ইচ্ছা।"

প্রতিবেশিনী

আমার প্রতিবেশিনী বালবিধবা। যেন শরতের শিশিরাশ্রুপ্লুত শেফালির মতো বৃন্তচ্যুত ; কোনো বাসরগৃহের ফুলশয্যার জন্য সে নহে, সে কেবল দেবপূজার জন্যই উৎসর্গ-করা।

তাহাকে আমি মনে মনে পূজা করিতাম। তাহার প্রতি আমার মনের ভাবটা যে কী ছিল পূজা ছাড়া তাহা অন্য কোনো সহজ ভাষায় প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না— পরের কাছে তো নয়ই, নিজের কাছেও না।

আমার অন্তরঙ্গ প্রিয়বন্ধু নবীনমাধব, সেও কিছু জানিত না। এইরূপে এই যে আমার গভীরতম আবেগটিকে গোপন করিয়া নির্মল করিয়া রাখিয়াছিলাম, ইহাতে আমি কিছু গর্ব অনুভব করিতাম।

কিন্তু মনের বেগ পার্বতী নদীর মতো নিজের জন্মশিখরে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহে না। কোনো একটা উপায়ে বাহির হইবার চেষ্টা করে। অকৃতকার্য হইলে বক্ষের মধ্যে বেদনার সৃষ্টি করিতে থাকে। তাই ভাবিতেছিলাম, কবিতায় ভাব প্রকাশ করিব। কিন্তু কুণ্ঠিতা লেখনী কিছুতেই অগ্রসর হইতে চাহিল না।

পরমাশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঠিক এই সময়েই আমার বন্ধু নবীনমাধবের অকস্মাৎ বিপুল বেগে কবিতা লিখিবার ঝোঁক আসিল, যেন হঠাৎ ভূমিকম্পের মতো।

সে বেচারার এরূপ দৈববিপত্তি পূর্বে কখনো হয় নাই, সুতরাং সে এই অভিনব আন্দোলনের জন্য লেশমাত্র প্রস্তুত ছিল না। তাহার হাতের কাছে ছন্দ মিল কিছুরই জোগাড় ছিল না, তবু সে দমিল না দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলাম। কবিতা যেন বৃদ্ধ বয়সের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর মতো তাহাকে পাইয়া বসিল। নবীনমাধব ছন্দ মিল সম্বন্ধে সহায়তা ও সংশোধনের জন্য আমার শরণাপন্ন হইল।

কবিতার বিষয়গুলি নূতন নহে; অথচ পুরাতনও নহে। অর্থাৎ তাহাকে চিরনূতনও বলা যায়, চিরপুরাতন বলিলেও চলে। প্রেমের কবিতা, প্রিয়তমার প্রতি। আমি তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে হে, ইনি কে।"

নবীন হাসিয়া কহিল, "এখনো সন্ধান পাই নাই।"

নবীন রচয়িতার সহায়তাকার্যে আমি অত্যন্ত আরাম পাইলাম। নবীনের কাল্পনিক প্রিয়তমার প্রতি আমার রুদ্ধ আবেগ প্রয়োগ করিলাম। শাবকহীন মুরগি যেমন হাঁসের ডিম পাইলেও বুক পাতিয়া তা দিতে বসে, হতভাগ্য আমি তেমনি নবীনমাধবের ভাবের উপরে হৃদয়ের সমস্ত উত্তাপ দিয়া চাপিয়া বসিলাম। আনাড়ির লেখা এমনি প্রবল বেগে সংশোধন করিতে লাগিলাম যে, প্রায় পনেরো-আনা আমারই লেখা দাঁড়াইল।

নবীন বিস্মিত হইয়া বলে, "ঠিক এই কথাই আমি বলিতে চাই, কিন্তু বলিতে পারি না। অথচ তোমার এ-সব ভাব জোগায় কোথা হইতে।"

আমি কবির মতো উত্তর করি, "কল্পনা হইতে। কারণ, সত্য নীরব, কল্পনাই মুখরা। সত্য ঘটনা ভাবস্রোতকে পাথরের মতো চাপিয়া থাকে, কল্পনাই তাহার পথ মুক্ত করিয়া দেয়।"

নবীন গম্ভীরমুখে একটুখানি ভাবিয়া কহিল, "তাই তো দেখিতেছি। ঠিক বটে।" আবার খানিকক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "ঠিক ঠিক।"

পূর্বেই বলিয়াছি আমার ভালোবাসার মধ্যে একটি কাতর সংকোচ ছিল, তাই নিজের জবানিতে কোনোমতে লিখিতে পারিলাম না। নবীনকে পর্দার মতো মাঝখানে রাখিয়া তবেই আমার লেখনী মুখ খুলিতে পারিল। লেখাগুলো যেন রসে ভরিয়া উত্তাপে ফাটিয়া উঠিতে লাগিল।

নবীন বলিল, "এ তো তোমারই লেখা। তোমারই নামে বাহির করি।"

আমি কহিলাম, "বিলক্ষণ। এ তোমারই লেখা, আমি সামান্য একটু বদল করিয়াছি মাত্র।"

ক্রমে নবীনেরও সেইরূপ ধারণা জন্মিল।

জ্যোতির্বিদ যেমন নক্ষত্রোদয়ের অপেক্ষায় আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে আমিও যে তেমনি মাঝে মাঝে আমাদের পাশের বাড়ির বাতায়নের দিকে চাহিয়া দেখিতাম, সে কথা অস্বীকার করিতে পারি না। মাঝে মাঝে ভক্তের সেই ব্যাকুল দৃষ্টিক্ষেপ সার্থকও হইত। সেই কর্মযোগনিরতা ব্রহ্মচারিণীর সৌম্য মুখশ্রী হইতে শান্তস্নিগ্ধ জ্যোতি প্রতিবিম্বিত হইয়া মুহূর্তের মধ্যে আমার সমস্ত চিত্তক্ষোভ দমন করিয়া দিত।

কিন্তু সেদিন সহসা এ কী দেখিলাম। আমার চন্দ্রলোকেও কি এখনো অগ্ন্যুৎপাত আছে। সেখানকার জনশূন্য সমাধিমগ্ন গিরিগুহার সমস্ত বহ্নিদাহ এখনো সম্পূর্ণ নির্বাণ হইয়া যায় নাই কি।

সেদিন বৈশাখ মাসের অপরাহ্ণে ঈশান কোণে মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছিল। সেই আসন্ন ঝঞ্ঝার মেঘবিচ্ছুরিত রুদ্রদীপ্তিতে আমার প্রতিবেশিনী জানালায় একাকিনী দাঁড়াইয়া ছিল। সেদিন তাহার শূন্যনিবিষ্ট ঘনকৃষ্ণ দৃষ্টির মধ্যে কী সুদূরপ্রসারিত নিবিড় বেদনা দেখিতে পাইলাম।

আছে, আমার ওই চন্দ্রলোকে এখনো উত্তাপ আছে! এখনো সেখানে উষ্ণ নিশ্বাস সমীরিত। দেবতার জন্য মানুষ নহে, মানুষের জন্যই সে। তাহার সেই দুটি চক্ষুর বিশাল ব্যাকুলতা সেদিনকার সেই ঝড়ের আলোকে ব্যগ্র পাখির মতো উড়িয়া চলিয়াছিল। স্বর্গের দিকে নহে, মানবহৃদয়নীড়ের দিকে।

সেই উৎসুক আকাঙ্ক্ষা-উদ্দীপ্ত দৃষ্টিপাতটি দেখার পর হইতে অশান্ত চিত্তকে সুস্থির করিয়া রাখা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইল। তখন কেবল পরের কাঁচা কবিতা সংশোধন করিয়া তৃপ্তি হয় না— একটা যে-কোনোপ্রকার কাজ করিবার জন্য চঞ্চলতা জন্মিল।

তখন সংকল্প করিলাম, বাংলাদেশে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য আমার সমস্ত চেষ্টা প্রয়োগ করিব। কেবল বক্তৃতা ও লেখা নহে, অর্থসাহায্য করিতেও অগ্রসর হইলাম।

নবীন আমার সঙ্গে তর্ক করিতে লাগিল; সে বলিল, "চিরবৈধব্যের মধ্যে একটি পবিত্র শান্তি আছে, একাদশীর ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকিত সমাধিভূমির মতো একটি বিরাট রমণীয়তা আছে; বিবাহের সম্ভাবনামাত্রেই কি সেটা ভাঙিয়া যায় না।"

এ-সব কবিত্বের কথা শুনিলেই আমার রাগ হইত। দুর্ভিক্ষে যে লোক জীর্ণ হইয়া মরিতেছে তাহার কাছে আহারপুষ্ট লোক যদি খাদ্যের স্থূলত্বের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া ফুলের গন্ধ এবং পাখির গান দিয়া মুমূর্ষুর পেট ভরাইতে চাহে তাহা হইলে সে কেমন হয়।

আমি রাগিয়া কহিলাম, "দেখো নবীন, আর্টিস্ট্ লোকে বলে, দৃশ্য হিসাবে পোড়ো বাড়ির একটা সৌন্দর্য আছে। কিন্তু বাড়িটাকে কেবল ছবির হিসাবে দেখিলে চলে না, তাহাতে বাস করিতে হয়, অতএব আর্টিস্ট্ যাহাই বলুন, মেরামত আবশ্যক। বৈধব্য লইয়া তুমি তো দূর হইতে দিব্য কবিত্ব করিতে চাও, কিন্তু তাহার মধ্যে একটি আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ মানবহৃদয় আপনার বিচিত্র বেদনা লইয়া বাস করিতেছে, সেটা স্মরণ রাখা কর্তব্য।"

মনে করিয়াছিলাম, নবীনমাধবকে কোনোমতেই দলে টানিতে পারিব না, সেদিন সেইজন্যই কিছু অতিরিক্ত উষ্মার সহিত কথা কহিয়াছিলাম। কিন্তু হঠাৎ দেখিলাম, আমার বক্তৃতা-অবসানে নবীনমাধব একটিমাত্র গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আমার সমস্ত কথা মানিয়া লইল; বাকি আরো অনেক ভালো ভালো কথা বলিবার অবকাশই দিল না।

সপ্তাহখানেক পরে নবীন আসিয়া কহিল, "তুমি যদি সাহায্য কর আমি একটি বিধবাবিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি।"

এমনি খুশি হইলাম— নবীনকে বুকে টানিয়া কোলাকুলি করিলাম; কহিলাম, "যত টাকা লাগে আমি দিব।" তখন নবীন তাহার ইতিহাস বলিল।

বুঝিলাম, তাহার প্রিয়তমা কাল্পনিক নহে। কিছুকাল ধরিয়া একটি বিধবা নারীকে সে দূর হইতে ভালোবাসিত, কাহারো কাছে তাহা প্রকাশ করে নাই। যে মাসিক পত্রে নবীনের, ওরফে আমার, কবিতা বাহির হইত সেই পত্রগুলি যথাস্থানে গিয়া পৌঁছিত। কবিতাগুলি ব্যর্থ হয় নাই। বিনা সাক্ষাৎকারে চিত্ত-আকর্ষণের এই এক উপায় আমার বন্ধু বাহির করিয়াছিলেন।

কিন্তু নবীন বলেন, তিনি চক্রান্ত করিয়া এই-সকল কৌশল অবলম্বন করেন নাই। এমন-কি, তাঁহার বিশ্বাস ছিল বিধবা পড়িতে জানেন না। বিধবার ভাইয়ের নামে কাগজগুলি বিনা স্বাক্ষরে বিনা মূল্যে পাঠাইয়া দিতেন। এ কেবল মনকে সান্ত্বনা দিবার একটা পাগলামি মাত্র। মনে হইত, দেবতার উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি দান করা গেল, তিনি জানুন বা না জানুন, গ্রহণ করুন বা নাই করুন।

নানা ছুতায় বিধবার ভাইয়ের সহিত নবীন যে বন্ধুত্ব করিয়া লইয়াছিলেন, নবীন বলেন, তাহারও মধ্যে কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। যাহাকে ভালোবাসা যায় তাহার নিকটবর্তী আত্মীয়ের সঙ্গ মধুর বোধ হয়।

অবশেষে ভাইয়ের কঠিন পীড়া উপলক্ষে ভগিনীর সহিত কেমন করিয়া সাক্ষাৎ হয় সে সুদীর্ঘ কথা। কবির সহিত কবিতার অবলম্বিত বিষয়টির প্রত্যক্ষ পরিচয় হইয়া কবিতা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়া গেছে। আলোচনা যে কেবল ছাপানো কবিতা-কয়টির মধ্যেই বদ্ধ ছিল তাহাও নহে।

সম্প্রতি আমার সহিত তর্কে পরাস্ত হইয়া নবীন সেই বিধবার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিয়া বসিয়াছে। প্রথমে কিছুতেই সম্মতি পায় নাই। নবীন তখন আমার মুখের সমস্ত যুক্তিগুলি প্রয়োগ করিয়া এবং তাহার সহিত নিজের চোখের দুই-চার ফোঁটা জল মিশাইয়া তাহাকে সম্পূর্ণ হার মানাইয়াছে। এখন

বিধবার অভিভাবক পিসে কিছু টাকা চায়।

আমি বলিলাম, "এখনই লও।"

নবীন বলিল, "তাহা ছাড়া বিবাহের পর প্রথম মাস পাঁচ-ছয় বাবা নিশ্চয় আমার মাসহারা বন্ধ করিয়া দিবেন, তখনকার মতো উভয়ের খরচ চালাইবার জোগাড় করিয়া দিতে হইবে।" আমি কথাটি না কহিয়া চেক লিখিয়া দিলাম। বলিলাম, "এখন তাঁহার নামটি বলো। আমার সঙ্গে যখন কোনো প্রতিযোগিতা নাই তখন পরিচয় দিতে ভয় করিয়ো না। তোমার গা ছুঁইয়া শপথ করিতেছি, আমি তাঁহার নামে কবিতা লিখিব না, এবং যদি লিখি তাঁহার ভাইকে না পাঠাইয়া তোমার কাছে পাঠাইয়া দিব।"

নবীন কহিল, "আরে, সেজন্য আমি ভয় করি না। বিধবাবিবাহের লজ্জায় তিনি অত্যন্ত কাতর, তাই তোমাদের কাছে তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে তিনি অনেক করিয়া নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এখন আর ঢাকিয়া রাখা মিথ্যা। তিনি তোমারই প্রতিবেশিনী, ১৯ নম্বরে থাকেন।"

হৃৎপিণ্ডটা যদি লোহার বয়লার হইত তো এক চমকে ধক্ করিয়া ফাটিয়া যাইত। জিজ্ঞাসা করিলাম, "বিধবাবিবাহে তাঁহার অমত নাই?"

নবীন হাসিয়া কহিল, "সম্প্রতি তো নাই।"

আমি কহিলাম, "কেবল কবিতা পড়িয়াই তিনি মুগ্ধ?"

নবীন কহিল, "কেন, আমার সেই কবিতাগুলি তো মন্দ হয় নাই।"

আমি মনে মনে কহিলাম, 'ধিক্।'

ধিক্ কাহাকে। তাঁহাকে, না আমাকে, না বিধাতাকে। কিন্তু ধিক্।

নষ্টনীড়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভূপতির কাজ করিবার কোনো দরকার ছিল না। তাঁহার টাকা যথেষ্ট ছিল, এবং দেশটাও গরম। কিন্তু গ্রহবশত তিনি কাজের লোক হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে একটা ইংরেজি খবরের কাগজ বাহির করিতে হইল। ইহার পরে সময়ের দীর্ঘতার জন্য তাঁহাকে আর বিলাপ করিতে হয় নাই।

ছেলেবেলা হইতে তাঁর ইংরেজি লিখিবার এবং বক্তৃতা দিবার শখ ছিল। কোনো-প্রকার প্রয়োজন না থাকিলেও ইংরেজি খবরের কাগজে তিনি চিঠি লিখিতেন, এবং বক্তব্য না থাকিলেও সভাস্থলে দু-কথা না বলিয়া ছাড়িতেন না।

তাঁহার মতো ধনী লোককে দলে পাইবার জন্য রাষ্ট্রনৈতিক দলপতিরা অজস্র স্তুতিবাদ করাতে নিজের ইংরেজি রচনাশক্তি সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা যথেষ্ট পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

অবশেষে তাঁহার উকিল শ্যালক উমাপতি ওকালতি ব্যবসায়ে হতোদ্যম হইয়া ভগিনীপতিকে কহিল, 'ভূপতি, তুমি একটা ইংরেজি খবরের কাগজ বাহির করো। তোমার যে রকম অসাধারণ' ইত্যাদি।

ভূপতি উৎসাহিত হইয়া উঠিল। পরের কাগজে পত্র প্রকাশ করিয়া গৌরব নাই, নিজের কাগজে স্বাধীন কলমটাকে পুরাদমে ছুটাইতে পারিবে। শ্যালককে সহকারী করিয়া নিতান্ত অল্প বয়সেই ভূপতি সম্পাদকের গদিতে আরোহণ করিল।

অল্প বয়সে সম্পাদকি নেশা এবং রাজনৈতিক নেশা অত্যন্ত জোর করিয়া ধরে। ভূপতিকে মাতাইয়া তুলিবার লোকও ছিল অনেক।

এইরূপে সে যতদিন কাগজ লইয়া ভোর হইয়া ছিল ততদিনে তাহার বালিকা বধূ চারুলতা ধীরে ধীরে যৌবনে পদার্পণ করিল। খবরের কাগজের সম্পাদক এই মস্ত খবরটি ভালো করিয়া টের পাইল না। ভারত গবর্মেণ্টের সীমান্তনীতি ক্রমশই স্ফীত হইয়া সংযমের বন্ধন বিদীর্ণ করিবার দিকে যাইতেছে, ইহাই তাহার প্রধান লক্ষের বিষয় ছিল।

ধনীগৃহে চারুলতার কোনো কর্ম ছিল না। ফলপরিণামহীন ফুলের মতো পরিপূর্ণ অনাবশ্যকতার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠাই তাহার চেষ্টাশূন্য দীর্ঘ দিনরাত্রির একমাত্র কাজ ছিল। তাহার কোনো অভাব ছিল না।

এমন অবস্থার সুযোগ পাইলে বধূ স্বামীকে লইয়া অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিয়া থাকে, দাম্পত্যলীলার সীমান্তনীতি সংসারের সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করিয়া সময় হইতে অসময়ে এবং বিহিত হইতে অবিহিতে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। চারুলতার সে সুযোগ ছিল না। কাগজের আবরণ ভেদ করিয়া স্বামীকে অধিকার করা তাহার পক্ষে দুরূহ হইয়াছিল।

যুবতী স্ত্রীর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া কোনো আত্মীয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিলে ভূপতি একবার সচেতন হইয়া কহিল, "তাই তো, চারুর একজন কেউ সঙ্গিনী থাকা উচিত, ও বেচারার কিছুই করিবার নাই।"

শ্যালক উমাপতিকে কহিল, "তোমার স্ত্রীকে আমাদের এখানে আনিয়া রাখো-না— সমবয়সি স্ত্রীলোক কেহ কাছে নাই, চারুর নিশ্চয়ই ভারি ফাঁকা ঠেকে।"

স্ত্রীসঙ্গের অভাবই চারুর পক্ষে অত্যন্ত শোকাবহ, সম্পাদক এইরূপ বুঝিল এবং শ্যালকজায়া মন্দাকিনীকে বাড়িতে আনিয়া সে নিশ্চিন্ত হইল।

যে সময়ে স্বামী স্ত্রী প্রেমোন্মেষের প্রথম অরুণালোকে পরস্পরের কাছে অপরূপ মহিমায় চিরনূতন বলিয়া প্রতিভাত হয়, দাম্পত্যের সেই স্বর্ণপ্রভামণ্ডিত প্রত্যূষকাল অচেতন অবস্থায় কখন অতীত হইয়া গেল কেহ জানিতে পারিল না। নূতনত্বের স্বাদ না পাইয়াই উভয়ে উভয়ের কাছে পুরাতন পরিচিত অভ্যস্ত হইয়া গেল।

লেখাপড়ার দিকে চারুলতার একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল বলিয়া তাহার দিনগুলা অত্যন্ত বোঝা হইয়া উঠে নাই। সে নিজের চেষ্টায় নানা কৌশলে পড়িবার বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিল। ভূপতির পিসতুতো ভাই অমল থার্ড-ইয়ারে পড়িতেছিল, চারুলতা তাহাকে ধরিয়া পড়া করিয়া লইত; এই কর্মটুকু আদায় করিয়া লইবার জন্য অমলের অনেক আবদার তাহাকে সহ্য করিতে হইত। তাহাকে প্রায়ই হোটেলে খাইবার খোরাকি এবং ইংরেজি সাহিত্যগ্রন্থ কিনিবার খরচা জোগাইতে হইত। অমল মাঝে মাঝে বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইত, সেই যজ্ঞ-সমাধার ভার গুরুদক্ষিণার স্বরূপ চারুলতা নিজে গ্রহণ করিত। ভূপতি চারুলতার প্রতি কোনো দাবি করিত না, কিন্তু সামান্য একটু পড়াইয়া পিসতুতো ভাই অমলের দাবির অন্ত ছিল না। তাহা লইয়া চারুলতা প্রায় মাঝে মাঝে কৃত্রিম কোপ এবং বিদ্রোহ প্রকাশ করিত; কিন্তু কোনো একটা লোকের কোনো কাজে আসা এবং স্নেহের উপদ্রব সহ্য করা তাহার পক্ষে অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল।

অমল কহিল, "বোঠান, আমাদের কালেজের রাজবাড়ির জামাইবাবু রাজ-অন্তঃপুরের খাস হাতের বুননি কার্পেটের জুতো পরে আসে, আমার তো সহ্য হয় না— একজোড়া কার্পেটের জুতো চাই, নইলে কোনোমতেই পদমর্যাদা রক্ষা করতে পারছি নে।"

চারু। হাঁ, তাই বৈকি! আমি বসে বসে তোমার জুতো সেলাই করে মরি। দাম দিচ্ছি, বাজার থেকে কিনে আনো গে যাও।

অমল বলিল, "সেটি হচ্ছে না।"

চারু জুতা সেলাই করিতে জানে না, এবং অমলের কাছে সে কথা স্বীকার করিতেও চাহে না। কিন্তু তাহার কাছে কেহ কিছু চায় না, অমল চায়— সংসারে সেই একমাত্র প্রার্থীর প্রার্থনা রক্ষা না করিয়া সে থাকিতে পারে না। অমল যে সময়

কালেজে যাইত সেই সময়ে সে লুকাইয়া বহু যত্নে কার্পেটের সেলাই শিখিতে লাগিল। এবং অমল নিজে যখন তাহার জুতার দরবার সম্পূর্ণ ভুলিয়া বসিয়াছে এমন সময় একদিন সন্ধ্যাবেলায় চারু তাহাকে নিমন্ত্রণ করিল।

গ্রীষ্মের সময় ছাদের উপর আসন করিয়া অমলের আহারের জায়গা করা হইয়াছে। বালি উড়িয়া পড়িবার ভয়ে পিতলের ঢাকনায় থালা ঢাকা রহিয়াছে। অমল কালেজের বেশ পরিত্যাগ করিয়া মুখ ধুইয়া ফিট্‌ফাট্ হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

অমল আসনে বসিয়া ঢাকা খুলিল; দেখিল, থালায় একজোড়া নূতন-বাঁধানো পশমের জুতা সাজানো রহিয়াছে। চারুলতা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

জুতা পাইয়া অমলের আশা আরো বাড়িয়া উঠিল। এখন গলাবন্ধ চাই, রেশমের রুমালে ফুলকাটা পাড় সেলাই করিয়া দিতে হইবে, তাহার বাহিরের ঘরে বসিবার বড়ো কেদারায় তেলের দাগ নিবারণের জন্য একটা কাজ-করা আবরণ আবশ্যক।

প্রত্যেক বারেই চারুলতা আপত্তি প্রকাশ করিয়া কলহ করে এবং প্রত্যেক বারেই বহু যত্নে ও স্নেহে শৌখিন অমলের শখ মিটাইয়া দেয়। অমল মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে, "বউঠান, কতদূর হইল।"

চারুলতা মিথ্যা করিয়া বলে, "কিছুই হয় নি।" কখনো বলে, "সে আমার মনেই ছিল না।"

কিন্তু অমল ছাড়িবার পাত্র নয়। প্রতিদিন স্মরণ করাইয়া দেয় এবং আবদার করে। নাছোড়বান্দা অমলের সেই-সকল উপদ্রব উদ্রেক করাইয়া দিবার জন্যই চারু ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া বিরোধের সৃষ্টি করে এবং হঠাৎ একদিন তাহার প্রার্থনা পূরণ করিয়া দিয়া কৌতুক দেখে।

ধনীর সংসারে চারুকে আর কাহারো জন্য কিছুই করিতে হয় না, কেবল অমল তাহাকে কাজ না করাইয়া ছাড়ে না। এই-সকল ছোটোখাটো শখের খাটুনিতেই তাহার হৃদয়বৃত্তির চর্চা এবং চরিতার্থতা হইত।

ভূপতির অন্তঃপুরে যে একখণ্ড জমি পড়িয়া ছিল তাহাকে বাগান বলিলে অনেকটা অত্যুক্তি করা হয়। সেই বাগানের প্রধান বনস্পতি ছিল একটা বিলাতি আমড়া গাছ।

এই ভূখণ্ডের উন্নতিসাধনের জন্য চারু এবং অমলের মধ্যে একটা কমিটি বসিয়াছে। উভয়ে মিলিয়া কিছুদিন হইতে ছবি আঁকিয়া, প্ল্যান করিয়া, মহা উৎসাহে এই জমিটার উপরে একটা বাগানের কল্পনা ফলাও করিয়া তুলিয়াছে।

অমল বলিল, "বউঠান, আমাদের এই বাগানে সেকালের রাজকন্যার মতো তোমাকে নিজের হাতে গাছে জল দিতে হবে।"

চারু কহিল, "আর ওই পশ্চিমের কোণটাতে একটা কুঁড়ে তৈরি করে নিতে হবে, হরিণের বাচ্ছা থাকবে।"

অমল কহিল, "আর-একটি ছোটোখাটো ঝিলের মতো করতে হবে, তাতে হাঁস চরবে।"

চারু সে প্রস্তাবে উৎসাহিত হইয়া কহিল, "আর তাতে নীলপদ্ম দেব, আমার অনেকদিন থেকে নীলপদ্ম দেখবার সাধ আছে।"

অমল কহিল, "সেই ঝিলের উপর একটি সাঁকো বেঁধে দেওয়া যাবে, আর ঘাটে একটি বেশ ছোটো ডিঙি থাকবে।"

চারু কহিল, "ঘাট অবশ্য সাদা মার্বেলের হবে।"

অমল পেনসিল কাগজ লইয়া রুল কাটিয়া কম্পাস ধরিয়া মহা আড়ম্বরে বাগানের একটা ম্যাপ আঁকিল।

উভয়ে মিলিয়া দিনে দিনে কল্পনার সংশোধন পরিবর্তন করিতে করিতে বিশ-পঁচিশখানা নূতন ম্যাপ আঁকা হইল।

ম্যাপ খাড়া হইলে কত খরচ হইতে পারে তাহার একটা এস্‌টিমেট তৈরি হইতে লাগিল। প্রথমে সংকল্প ছিল— চারু নিজের বরাদ্দ মাসহারা হইতে ক্রমে ক্রমে বাগান তৈরি করিয়া তুলিবে; ভূপতি তো বাড়িতে কোথায় কী হইতেছে তাহা চাহিয়া দেখে না; বাগান তৈরি হইলে তাহাকে সেখানে নিমন্ত্রণ করিয়া আশ্চর্য করিয়া দিবে; সে মনে করিবে, আলাদিনের প্রদীপের সাহায্যে জাপান দেশ হইতে একটা আস্ত বাগান তুলিয়া আনা হইয়াছে।

কিন্তু এস্‌টিমেট যথেষ্ট কম করিয়া ধরিলেও চারুর সংগতিতে কুলায় না। অমল তখন পুনরায় ম্যাপ পরিবর্তন করিতে বসিল। কহিল, "তা হলে বউঠান, ঐ ঝিলটা বাদ দেওয়া যাক।"

চারু কহিল, "না না, ঝিল বাদ দিলে কিছুতেই চলবে না, ওতে আমার নীলপদ্ম থাকবে।"

অমল কহিল, "তোমার হরিণের ঘরে টালির ছাদ নাই দিলে। ওটা অমনি একটা সাদাসিধে খোড়ো চাল করলেই হবে।"

চারু অত্যন্ত রাগ করিয়া কহিল, "তা হলে আমার ও ঘরে দরকার নেই— ও থাক্।"

মরিশস হইতে লবঙ্গ, কর্নাট হইতে চন্দন, এবং সিংহল হইতে দারচিনির চারা আনাইবার প্রস্তাব ছিল, অমল তাহার পরিবর্তে মানিকতলা হইতে সাধারণ দিশি

ও বিলাতি গাছের নাম করিতেই চারু মুখ ভার করিয়া বসিল; কহিল, "তা হলে আমার বাগানে কাজ নেই।"

এস্‌টিমেট কমাইবার এরূপ প্রথা নয়। এস্‌টিমেটের সঙ্গে সঙ্গে কল্পনাকে খর্ব করা চারুর পক্ষে অসাধ্য এবং অমল মুখে যাহাই বলুক, মনে মনে তাহারও সেটা রুচিকর নয়।

অমল কহিল, "তবে বউঠান, তুমি দাদার কাছে বাগানের কথাটা পাড়ো; তিনি নিশ্চয় টাকা দেবেন।"

চারু কহিল, "না, তাঁকে বললে মজা কী হল। আমরা দুজনে বাগান তৈরি করে তুলব। তিনি তো সাহেববাড়িতে ফরমাশ দিয়ে ইডেন গার্ডেন বানিয়ে দিতে পারেন — তা হলে আমাদের প্ল্যানের কী হবে।"

আমড়া গাছের ছায়ায় বসিয়া চারু এবং অমল অসাধ্য সংকল্পের কল্পনাসুখ বিস্তার করিতেছিল। চারুর ভাজ মন্দা দোতলা হইতে ডাকিয়া কহিল, "এত বেলায় বাগানে তোরা কী করছিস।"

চারু কহিল, "পাকা আমড়া খুঁজছি।"

লুব্ধা মন্দা কহিল, "পাস যদি আমার জন্যে আনিস।"

চারু হাসিল, অমল হাসিল। তাহাদের সমস্ত সংকল্পগুলির প্রধান সুখ এবং গৌরব এই ছিল যে, সেগুলি তাহাদের দুজনের মধ্যেই আবদ্ধ। মন্দার আর যা-কিছু গুণ থাক্‌, কল্পনা ছিল না; সে এ-সকল প্রস্তাবের রস গ্রহণ করিবে কী করিয়া। সে এই দুই সভ্যের সকলপ্রকার কমিটি হইতে একেবারে বর্জিত।

অসাধ্য বাগানের এস্‌টিমেটও কমিল না, কল্পনাও কোনো অংশে হার মানিতে চাহিল না। সুতরাং আমড়াতলার কমিটি এইভাবেই কিছুদিন চলিল। বাগানের যেখানে ঝিল হইবে, যেখানে হরিণের ঘর হইবে, যেখানে পাথরের বেদি হইবে, অমল সেখানে চিহ্ন কাটিয়া রাখিল।

তাহাদের সংকল্পিত বাগানে এই আমড়াতলার চার দিক কী ভাবে বাঁধাইতে হইবে, অমল একটি ছোটো কোদাল লইয়া তাহারই দাগ কাটিতেছিল— এমন সময় চারু গাছের ছায়ায় বসিয়া বলিল, "অমল, তুমি যদি লিখতে পারতে তা হলে বেশ হত।"

অমল জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বেশ হত।"

চারু। তা হলে আমাদের এই বাগানের বর্ণনা করে তোমাকে দিয়ে একটা গল্প লেখাতুম। এই ঝিল, এই হরিণের ঘর, এই আমড়াতলা, সমস্তই তাতে থাকত—

আমরা দুজনে ছাড়া কেউ বুঝতে পারত না, বেশ মজা হত। অমল, তুমি একবার লেখবার চেষ্টা করে দেখো-না, নিশ্চয় তুমি পারবে।

অমল কহিল, "আচ্ছা, যদি লিখতে পারি তো আমাকে কী দেবে।"

চারু কহিল, "তুমি কী চাও।"

অমল কহিল, "আমার মশারির চালে আমি নিজে লতা এঁকে দেব, সেইটে তোমাকে আগাগোড়া রেশম দিয়ে কাজ করে দিতে হবে।"

চারু কহিল, "তোমার সমস্ত বাড়াবাড়ি। মশারির চালে আবার কাজ!"

মশারি জিনিসটাকে একটা শ্রীহীন কারাগারের মতো করিয়া রাখার বিরুদ্ধে অমল অনেক কথা বলিল। সে কহিল, সংসারের পনেরো-আনা লোকের যে সৌন্দর্যবোধ নাই এবং কুশ্রীতা তাহাদের কাছে কিছুমাত্র পীড়াকর নহে ইহাই তাহার প্রমাণ।

চারু সে কথা তৎক্ষণাৎ মনে মনে মানিয়া লইল এবং 'আমাদের এই দুটি লোকের নিভৃত কমিটি যে সেই পনেরো-আনার অন্তর্গত নহে' ইহা মনে করিয়া সে খুশি হইল।

কহিল, "আচ্ছা বেশ, আমি মশারির চাল তৈরি করে দেব, তুমি লেখো।"

অমল রহস্যপূর্ণভাবে কহিল, "তুমি মনে কর, আমি লিখতে পারি নে?"

চারু অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া কহিল, "তবে নিশ্চয় তুমি কিছু লিখেছ, আমাকে দেখাও।"

অমল। আজ থাক্‌, বউঠান।

চারু। না, আজই দেখাতে হবে— মাথা খাও, তোমার লেখা নিয়ে এসো গে।

চারুকে তাহার লেখা শোনাইবার অতিব্যগ্রতাতেই অমলকে এতদিন বাধা দিতেছিল। পাছে চারু না বোঝে, পাছে তাহার ভালো না লাগে, এ সংকোচ সে তাড়াইতে পারিতেছিল না।

আজ খাতা আনিয়া একটুখানি লাল হইয়া, একটুখানি কাশিয়া, পড়িতে আরম্ভ করিল। চারু গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়া ঘাসের উপর পা ছড়াইয়া শুনিতে লাগিল।

প্রবন্ধের বিষয়টা ছিল 'আমার খাতা'। অমল লিখিয়াছিল— 'হে আমার শুভ্র খাতা, আমার কল্পনা এখনো তোমাকে স্পর্শ করে নাই। সূতিকাগৃহে ভাগ্যপুরুষ প্রবেশ করিবার পূর্বে শিশুর ললাটপট্টের ন্যায় তুমি নির্মল, তুমি রহস্যময়। যেদিন তোমার শেষ পৃষ্ঠার শেষ ছত্রে উপসংহার লিখিয়া দিব, সেদিন আজ কোথায়! তোমার এই শুভ্র শিশুপত্রগুলি সেই চিরদিনের জন্য মসীচিহ্নিত সমাপ্তির কথা আজ স্বপ্নেও কল্পনা করিতেছে না।'— ইত্যাদি অনেকখানি লিখিয়াছিল।

চারু তরুচ্ছায়ায় বসিয়া স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল। পড়া শেষ হইলে ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "তুমি আবার লিখতে পার না!"

সেদিন সেই গাছের তলায় অমল সাহিত্যের মাদকরস প্রথম পান করিল; সাকী ছিল নবীনা, রসনাও ছিল নবীন এবং অপরাহ্নের আলোক দীর্ঘ ছায়াপাতে রহস্যময় হইয়া আসিয়াছিল।

চারু বলিল, "অমল, গোটাকতক আমড়া পেড়ে নিয়ে যেতে হবে, নইলে মন্দাকে কী হিসেব দেব।"

মূঢ় মন্দাকে তাহাদের পড়াশুনা এবং আলোচনার কথা বলিতে প্রবৃত্তিই হয় না, সুতরাং আমড়া পাড়িয়া লইয়া যাইতে হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাগানের সংকল্প তাহাদের অন্যান্য অনেক সংকল্পের ন্যায় সীমাহীন কল্পনাক্ষেত্রের মধ্যে কখন হারাইয়া গেল তাহা অমল এবং চারু লক্ষও করিতে পারিল না।

এখন অমলের লেখাই তাহাদের আলোচনা ও পরামর্শের প্রধান বিষয় হইয়া উঠিল। অমল আসিয়া বলে, "বোঠান, একটা বেশ চমৎকার ভাব মাথায় এসেছে।"

চারু উৎসাহিত হইয়া উঠে; বলে, "চলো, আমাদের দক্ষিণের বারান্দায়— এখানে এখনই মন্দা পান সাজতে আসবে।"

চারু কাশ্মীরি বারান্দায় একটি জীর্ণ বেতের কেদারায় আসিয়া বসে এবং অমল রেলিঙের নিচেকার উচ্চ অংশের উপর বসিয়া পা ছড়াইয়া দেয়।

অমলের লিখিবার বিষয়গুলি প্রায়ই সুনির্দিষ্ট নহে; তাহা পরিষ্কার করিয়া বলা শক্ত। গোলমাল করিয়া সে যাহা বলিত তাহা স্পষ্ট বুঝা কাহারো সাধ্য নহে। অমল নিজেই বারবার বলিত, "বোঠান, তোমাকে ভালো বোঝাতে পারছি নে।"

চারু বলিত, "না, আমি অনেকটা বুঝতে পেরেছি; তুমি এইটে লিখে ফেলো, দেরি কোরো না।"

সে খানিকটা বুঝিয়া, খানিকটা না বুঝিয়া, অনেকটা কল্পনা করিয়া, অনেকটা অমলের ব্যক্ত করিবার আবেগের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া, মনের মধ্যে কী একটা খাড়া করিয়া তুলিত, তাহাতেই সে সুখ পাইত এবং আগ্রহে অধীর হইয়া উঠিত।

চারু সেইদিন বিকালেই জিজ্ঞাসা করিত, "কতটা লিখলে।"

অমল বলিত, "এরই মধ্যে কি লেখা যায়।"

চারু পরদিন সকালে ঈষৎ কলহের স্বরে জিজ্ঞাসা করিত, "কই, তুমি সেটা লিখলে না ?"

অমল বলিত, "রোসো, আর-একটু ভাবি।"

চারু রাগ করিয়া বলিত, "তবে যাও।"

বিকালে সেই রাগ ঘনীভূত হইয়া চারু যখন কথা বন্ধ করিবার জো করিত তখন অমল লেখা কাগজের একটা অংশ রুমাল বাহির করিবার ছলে পকেট হইতে একটু-খানি বাহির করিত।

মুহূর্তে চারুর মৌন ভাঙিয়া গিয়া সে বলিয়া উঠিত, "ওই-যে তুমি লিখেছ! আমাকে ফাঁকি! দেখাও।"

অমল বলিত, "এখনো শেষ হয় নি, আর-একটু লিখে শোনাব।"

চারু। না, এখনই শোনাতে হবে।

অমল এখনই শোনাইবার জন্যই ব্যস্ত; কিন্তু চারুকে কিছুক্ষণ কাড়াকাড়ি না করাইয়া সে শোনাইত না। তার পরে অমল কাগজখানি হাতে করিয়া বসিয়া প্রথমটা একটুখানি পাতা ঠিক করিয়া লইত, পেনসিল লইয়া দুই-এক জায়গায় দুটো-একটা সংশোধন করিতে থাকিত, ততক্ষণ চারুর চিত্ত পুলকিত কৌতূহলে জলভারনত মেঘের মতো সেই কাগজ কয়খানির দিকে ঝুঁকিয়া রহিত।

অমল দুই-চারি প্যারাগ্রাফ যখন যাহা লেখে তাহা যতটুকুই হোক চারুকে সদ্য সদ্য শোনাইতে হয়। বাকি অলিখিত অংশটুকু আলোচনা এবং কল্পনায় উভয়ের মধ্যে মথিত হইতে থাকে।

এতদিন দুজনে আকাশকুসুমের চয়নে নিযুক্ত ছিল, এখন কাব্যকুসুমের চাষ আরম্ভ হইয়া উভয়ে আর-সমস্তই ভুলিয়া গেল।

একদিন অপরাহ্ণে অমল কালেজ হইতে ফিরিলে তাহার পকেটটা কিছু অতিরিক্ত ভরা বলিয়া বোধ হইল। অমল যখন বাড়িতে প্রবেশ করিল তখনই চারু অন্তঃপুরের গবাক্ষ হইতে তাহার পকেটের পূর্ণতার প্রতি লক্ষ করিয়াছিল।

অমল অন্যদিন কালেজ হইতে ফিরিয়া বাড়ির ভিতরে আসিতে দেরি করিত না; আজ সে তাহার ভরা পকেট লইয়া বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিল, শীঘ্র আসিবার নাম করিল না।

চারু অন্তঃপুরের সীমান্তদেশে আসিয়া অনেকবার তালি দিল, কেহ শুনিল না। চারু কিছু রাগ করিয়া তাহার বারান্দায় মন্মথ দত্তর এক বই হাতে করিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

মন্মথ দত্ত নূতন গ্রন্থকার। তাহার লেখার ধরন অনেকটা অমলেরই মতো, এই-জন্য অমল তাহাকে কখনো প্রশংসা করিত না; মাঝে মাঝে চারুর কাছে তাহার লেখা বিকৃত উচ্চারণে পড়িয়া বিদ্রূপ করিত— চারু অমলের নিকট হইতে সে বই কাড়িয়া লইয়া অবজ্ঞাভরে দূরে ফেলিয়া দিত।

আজ যখন অমলের পদশব্দ শুনিতে পাইল তখন সেই মন্মথ দত্তর 'কলকণ্ঠ'-নামক বই মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া চারু অত্যন্ত একাগ্রভাবে পড়িতে আরম্ভ করিল।

অমল বারান্দায় প্রবেশ করিল, চারু লক্ষও করিল না। অমল কহিল, "কী বোঠান, কী পড়া হচ্ছে।"

চারুকে নিরুত্তর দেখিয়া অমল চৌকির পিছনে আসিয়া বইটা দেখিল। কহিল, "মন্মথ দত্তর গলগণ্ড।"

চারু কহিল, "আঃ, বিরক্ত কোরো না, আমাকে পড়তে দাও।" পিঠের কাছে দাঁড়াইয়া অমল ব্যঙ্গস্বরে পড়িতে লাগিল, "আমি তৃণ, ক্ষুদ্র তৃণ; ভাই রক্তাম্বর রাজবেশধারী অশোক, আমি তৃণমাত্র! আমার ফুল নাই, আমার ছায়া নাই, আমার মস্তক আমি আকাশে তুলিতে পারি না, বসন্তের কোকিল আমাকে আশ্রয় করিয়া কুহুস্বরে জগৎ মাতায় না— তবু ভাই অশোক, তোমার ওই পুষ্পিত উচ্চ শাখা হইতে তুমি আমাকে উপেক্ষা করিয়ো না; তোমার পায়ে পড়িয়া আছি আমি তৃণ, তবু আমাকে তুচ্ছ করিয়ো না।"

অমল এইটুকু বই হইতে পড়িয়া তার পরে বিদ্রূপ করিয়া বানাইয়া বলিতে লাগিল, "আমি কলার কাঁদি, কাঁচকলার কাঁদি, ভাই কুষ্মাণ্ড, ভাই গৃহচালবিহারী কুষ্মাণ্ড, আমি নিতান্তই কাঁচকলার কাঁদি।"

চারু কৌতুহলের তাড়নায় রাগ রাখিতে পারিল না; হাসিয়া উঠিয়া বই ফেলিয়া দিয়া কহিল, "তুমি ভারি হিংসুটে, নিজের লেখা ছাড়া কিছু পছন্দ হয় না।"

অমল কহিল, "তোমার ভারি উদারতা, তৃণটি পেলেও গিলে খেতে চাও।"

চারু। আচ্ছা মশায়, ঠাট্টা করতে হবে না— পকেটে কী আছে বের করে ফেলো।

অমল। কী আছে আন্দাজ করো।

অনেকক্ষণ চারুকে বিরক্ত করিয়া অমল পকেট হইতে 'সরোরুহ'-নামক বিখ্যাত মাসিক পত্র বাহির করিল।

চারু দেখিল, কাগজে অমলের সেই 'খাতা'-নামক প্রবন্ধটি বাহির হইয়াছে।

চারু দেখিয়া চুপ করিয়া রহিল। অমল মনে করিয়াছিল, তাহার বোঠান খুব

খুশি হইবে। কিন্তু খুশির বিশেষ কোনো লক্ষণ না দেখিয়া বলিল, "সরোরুহ পত্রে যে-সে লেখা বের হয় না।"

অমল এটা কিছু বেশি বলিল। যে-কোনোপ্রকার চলনসই লেখা পাইলে সম্পাদক ছাড়েন না। কিন্তু অমল চারুকে বুঝাইয়া দিল, সম্পাদক বড়োই কড়া লোক, একশো প্রবন্ধের মধ্যে একটা বাছিয়া লন।

শুনিয়া চারু খুশি হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু খুশি হইতে পারিল না। কিসে যে সে মনের মধ্যে আঘাত পাইল তাহা বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল; কোনো সংগত কারণ বাহির হইল না।

অমলের লেখা অমল এবং চারু দুজনের সম্পত্তি। অমল লেখক এবং চারু পাঠক। তাহার গোপনতাই তাহার প্রধান রস। সেই লেখা সকলে পড়িবে এবং অনেকেই প্রশংসা করিবে, ইহাতে চারুকে যে কেন এতটা পীড়া দিতেছিল তাহা সে ভালো করিয়া বুঝিল না।

কিন্তু লেখকের আকাঙ্ক্ষা একটিমাত্র পাঠকে অধিকদিন মেটে না। অমল তাহার লেখা ছাপাইতে আরম্ভ করিল। প্রশংসাও পাইল।

মাঝে মাঝে ভক্তের চিঠিও আসিতে লাগিল। অমল সেগুলি তাহার বোঠানকে দেখাইত। চারু তাহাতে খুশিও হইল, কষ্টও পাইল। এখন অমলকে লেখায় প্রবৃত্ত করাইবার জন্য একমাত্র তাহারই উৎসাহ ও উত্তেজনার প্রয়োজন রহিল না। অমল মাঝে মাঝে কদাচিৎ নামস্বাক্ষরবিহীন রমণীর চিঠিও পাইতে লাগিল। তাহা লইয়া চারু তাহাকে ঠাট্টা করিত কিন্তু সুখ পাইত না। হঠাৎ তাহাদের কমিটির রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া বাংলাদেশের পাঠকমণ্ডলী তাহাদের দুজনকার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

ভূপতি একদিন অবসরকালে কহিল, "তাই তো চারু, আমাদের অমল যে এমন ভালো লিখতে পারে তা তো আমি জানতুম না।"

ভূপতির প্রশংসায় চারু খুশি হইল। অমল ভূপতির আশ্রিত, কিন্তু অন্য আশ্রিতদের সহিত তাহার অনেক প্রভেদ আছে এ কথা তাহার স্বামী বুঝিতে পারিলে চারু যেন গর্ব অনুভব করে। তাহার ভাবটা এই যে 'অমলকে কেন যে আমি এতটা স্নেহ আদর করি এতদিনে তোমরা তাহা বুঝিলে; আমি অনেকদিন আগেই অমলের মর্যাদা বুঝিয়াছিলাম, অমল কাহারো অবজ্ঞার পাত্র নহে।'

চারু জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি তার লেখা পড়েছ?"

ভূপতি কহিল, "হাঁ— না ঠিক পড়ি নি। সময় পাই নি। কিন্তু আমাদের নিশিকান্ত

প'ড়ে খুব প্রশংসা করছিল। সে বাংলা লেখা বেশ বোঝে।"

ভূপতির মনে অমলের প্রতি একটি সম্মানের ভাব জাগিয়া উঠে, ইহা চারুর একান্ত ইচ্ছা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উমাপদ ভূপতিকে তাহার কাগজের সঙ্গে অন্য পাঁচরকম উপহার দিবার কথা বুঝাইতেছিল। উপহারে যে কী করিয়া লোকসান কাটাইয়া লাভ হইতে পারে তাহা ভূপতি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিল না।

চারু একবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই উমাপদকে দেখিয়া চলিয়া গেল। আবার কিছুক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া ঘরে আসিয়া দেখিল, দুইজনে হিসাব লইয়া তর্কে প্রবৃত্ত।

উমাপদ চারুর অধৈর্য দেখিয়া কোনো ছুতা করিয়া বাহির হইয়া গেল। ভূপতি হিসাব লইয়া মাথা ঘুরাইতে লাগিল।

চারু ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "এখনো বুঝি তোমার কাজ শেষ হল না। দিনরাত ঐ একখানা কাগজ নিয়ে যে তোমার কী করে কাটে, আমি তাই ভাবি।"

ভূপতি হিসাব সরাইয়া রাখিয়া একটুখানি হাসিল। মনে মনে ভাবিল, 'বাস্তবিক, চারুর প্রতি আমি মনোযোগ দিবার সময়ই পাই না, বড়ো অন্যায়। ও বেচারার পক্ষে সময় কাটাইবার কিছুই নাই।'

ভূপতি স্নেহপূর্ণস্বরে কহিল, "আজ যে তোমার পড়া নেই! মাস্টারটি বুঝি পালিয়েছেন? তোমার পাঠশালার সব উলটো নিয়ম— ছাত্রীটি পুঁথিপত্র নিয়ে প্রস্তুত, মাস্টার পলাতক! আজকাল অমল তোমাকে আগেকার মতো নিয়মিত পড়ায় বলে তো বোধ হয় না।"

চারু কহিল, "আমাকে পড়িয়ে অমলের সময় নষ্ট করা কি উচিত। অমলকে তুমি বুঝি একজন সামান্য প্রাইভেট টিউটর পেয়েছ?"

ভূপতি চারুর কটিদেশ ধরিয়া কাছে টানিয়া কহিল, "এটা কি সামান্য প্রাইভেট টিউটারি হল। তোমার মতো বউঠানকে যদি পড়াতে পেতুম তা হলে—"

চারু। ইস্‌ ইস্‌, তুমি আর বোলো না। স্বামী হয়েই রক্ষে নেই তো আরো কিছু!

ভূপতি ঈষৎ একটু আহত হইয়া কহিল, "আচ্ছা, কাল থেকে আমি নিশ্চয় তোমাকে পড়াব। তোমার বইগুলো আনো দেখি, কী তুমি পড় একবার দেখে নিই।"

চারু। ঢের হয়েছে, তোমার আর পড়াতে হবে না। এখনকার মতো তোমার খবরের কাগজের হিসাবটা একটু রাখবে! এখন আর-কোনো দিকে মন দিতে পারবে কি না বলো।

ভূপতি কহিল, "নিশ্চয় পারব। এখন তুমি আমার মনকে যে দিকে ফেরাতে চাও সেই দিকেই ফিরবে।"

চারু। আচ্ছা বেশ, তা হলে অমলের এই লেখাটা একবার পড়ে দেখো কেমন চমৎকার হয়েছে। সম্পাদক অমলকে লিখেছে, এই লেখা পড়ে নবগোপালবাবু তাকে বাংলার রাস্কিন নাম দিয়েছেন।

শুনিয়া ভূপতি কিছু সংকুচিতভাবে কাগজখানা হাতে করিয়া লইল। খুলিয়া দেখিল, লেখাটির নাম 'আষাঢ়ের চাঁদ'। গত দুই সপ্তাহ ধরিয়া ভূপতি ভারত-গবর্মেন্টের বাজেট-সমালোচনা লইয়া বড়ো বড়ো অঙ্কপাত করিতেছিল, সেই-সকল অঙ্ক বহুপদ কীটের মতো তাহার মস্তিষ্কের নানা বিবরের মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতে-ছিল— এমন সময় হঠাৎ বাংলা ভাষায় 'আষাঢ়ের চাঁদ' প্রবন্ধ আগাগোড়া পড়িবার জন্য তাহার মন প্রস্তুত ছিল না। প্রবন্ধটিও নিতান্ত ছোটো নহে।

লেখাটা এইরূপে শুরু হইয়াছে— 'আজ কেন আষাঢ়ের চাঁদ সারা রাত মেঘের মধ্যে এমন করিয়া লুকাইয়া বেড়াইতেছে। যেন স্বর্গলোক হইতে সে কী চুরি করিয়া আনিয়াছে, যেন তাহার কলঙ্ক ঢাকিবার স্থান নাই। ফাল্গুন মাসে যখন আকাশের একটি কোণেও মুষ্টিপরিমাণ মেঘ ছিল না তখন তো জগতের চক্ষের সম্মুখে সে নির্লজ্জের মতো উন্মুক্ত আকাশে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিল— আর আজ তাহার সেই ঢলঢল হাসিখানি— শিশুর স্বপ্নের মতো, প্রিয়ার স্মৃতির মতো, সুরেশ্বরী শচীর অলকবিলম্বিত মুক্তার মালার মতো—'

ভূপতি মাথা চুলকাইয়া কহিল, "বেশ লিখেছে। কিন্তু আমাকে কেন। এ-সব কবিত্ব কি আমি বুঝি।"

চারু সংকুচিত হইয়া ভূপতির হাত হইতে কাগজখানা কাড়িয়া কহিল, "তুমি তবে কী বোঝ।"

ভূপতি কহিল, "আমি সংসারের লোক, আমি মানুষ বুঝি।"

চারু কহিল, "মানুষের কথা বুঝি সাহিত্যের মধ্যে লেখে না?"

ভূপতি। ভুল লেখে। তা ছাড়া মানুষ যখন সশরীরে বর্তমান তখন বানানো কথার মধ্যে তাকে খুঁজে বেড়াবার দরকার ?

বলিয়া চারুলতার চিবুক ধরিয়া কহিল, "এই যেমন আমি তোমাকে বুঝি, কিন্তু সেজন্য কি 'মেঘনাদবধ' 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' আগাগোড়া পড়ার দরকার আছে।"

ভূপতি কাব্য বোঝে না বলিয়া অহংকার করিত। তবু অমলের লেখা ভালো করিয়া না পড়িয়াও তাহার প্রতি মনে মনে ভূপতির একটা শ্রদ্ধা ছিল। ভূপতি ভাবিত, 'বলিবার কথা কিছুই নাই অথচ এত কথা অনর্গল বানাইয়া বলা সে তো আমি মাথা কুটিয়া মরিলেও পারিতাম না। অমলের পেটে যে এত ক্ষমতা ছিল তাহা কে জানিত।'

ভূপতি নিজের রসজ্ঞতা অস্বীকার করিত কিন্তু সাহিত্যের প্রতি তাহার কৃপণতা ছিল না। দরিদ্র লেখক তাহাকে ধরিয়া পড়িলে বই ছাপিবার খরচ ভূপতি দিত, কেবল বিশেষ করিয়া বলিয়া দিত, "আমাকে যেন উৎসর্গ করা না হয়।" বাংলা ছোটো বড়ো সমস্ত সাপ্তাহিক এবং মাসিক পত্র, খ্যাত অখ্যাত পাঠ্য অপাঠ্য সমস্ত বই সে কিনিত। বলিত, "একে পড়ি না, তার পরে যদি না কিনি তবে পাপও করিব প্রায়শ্চিত্তও হইবে না।" পড়িত না বলিয়াই মন্দ বইয়ের প্রতি তাহার লেশমাত্র বিদ্বেষ ছিল না, সেইজন্য তাহার বাংলা লাইব্রেরি গ্রন্থে পরিপূর্ণ ছিল।

অমল ভূপতির ইংরেজি প্রুফ-সংশোধন-কার্যে সাহায্য করিত; কোনো-একটা কাপির দুর্বোধ্য হস্তাক্ষর দেখাইয়া লইবার জন্য সে একতাড়া কাগজপত্র লইয়া ঘরে ঢুকিল।

ভূপতি হাসিয়া কহিল, "অমল, তুমি আষাঢ়ের চাঁদ আর ভাদ্র মাসের পাকা তালের উপর যত খুশি লেখো, আমি তাতে কোনো আপত্তি করি নে— আমি কারো স্বাধীনতায় হাত দিতে চাই নে— কিন্তু আমার স্বাধীনতায় কেন হস্তক্ষেপ। সেগুলো আমাকে না পড়িয়ে ছাড়বেন না, তোমার বোঠানের এ কী অত্যাচার।"

অমল হাসিয়া কহিল, "তাই তো বোঠান— আমার লেখাগুলো নিয়ে তুমি যে দাদাকে জুলুম করবার উপায় বের করবে, এমন জানলে আমি লিখতুম না।"

সাহিত্যরসে বিমুখ ভূপতির কাছে আনিয়া তাহার অত্যন্ত দরদের লেখাগুলিকে অপদস্থ করাতে অমল মনে মনে চারুর উপর রাগ করিল এবং চারু তৎক্ষণাৎ তাহা বুঝিতে পারিয়া বেদনা পাইল। কথাটাকে অন্য দিকে লইয়া যাইবার জন্য ভূপতিকে কহিল, "তোমার ভাইটির একটি বিয়ে দিয়ে দাও দেখি, তা হলে আর লেখার উপদ্রব সহ্য করতে হবে না।"

ভূপতি কহিল, "এখনকার ছেলেরা আমাদের মতো নির্বোধ নয়। তাদের যত কবিত্ব লেখায়, কাজের বেলায় সেয়ানা। কই, তোমার দেওরকে তো বিয়ে করতে রাজি করাতে পারলে না।"

চারু চলিয়া গেলে ভূপতি অমলকে কহিল, "অমল, আমাকে এই কাগজের হাঙ্গামে থাকতে হয়, চারু বেচারা বড়ো একলা পড়েছে। কোনো কাজকর্ম নেই, মাঝে মাঝে আমার এই লেখবার ঘরে উঁকি মেরে চলে যায়। কী করব বলো। তুমি, অমল, ওকে একটু পড়াশুনোয় নিযুক্ত রাখতে পারলে ভালো হয়। মাঝে মাঝে চারুকে যদি ইংরেজি কাব্য থেকে তর্জমা করে শোনাও তা হলে ওর উপকারও হয় ভালোও লাগে। চারুর সাহিত্যে বেশ রুচি আছে।"

অমল কহিল, "তা আছে। বোঠান যদি আরো একটু পড়াশুনো করেন তা হলে আমার বিশ্বাস উনি নিজে বেশ ভালো লিখতে পারবেন।"

ভূপতি হাসিয়া কহিল, "ততটা আশা করি নে, কিন্তু চারু বাংলা লেখার ভালোমন্দ আমার চেয়ে ঢের বুঝতে পারে।"

অমল। ওঁর কল্পনাশক্তি বেশ আছে, স্ত্রীলোকের মধ্যে এমন দেখা যায় না।

ভূপতি। পুরুষের মধ্যেও কম দেখা যায়, তার সাক্ষী আমি। আচ্ছা, তুমি তোমার বউঠাকরুনকে যদি গড়ে তুলতে পার আমি তোমাকে পারিতোষিক দেব।

অমল। কী দেবে শুনি।

ভূপতি। তোমার বউঠাকরুনের জুড়ি একটি খুঁজে-পেতে এনে দেব।

অমল। আবার তাকে নিয়ে পড়তে হবে! চিরজীবন কি গড়ে তুলতেই কাটাব।

দুটি ভাই আজকালকার ছেলে, কোনো কথা তাহাদের মুখে বাধে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পাঠকসমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিয়া অমল এখন মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে। আগে সে স্কুলের ছাত্রটির মতো থাকিত, এখন সে যেন সমাজের গণ্যমান্য মানুষের মতো হইয়া উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে সভায় সাহিত্যপ্রবন্ধ পাঠ করে— সম্পাদক ও সম্পাদকের দূত তাহার ঘরে আসিয়া বসিয়া থাকে, তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ায়, নানা সভার সভ্য ও সভাপতি হইবার জন্য তাহার নিকট অনুরোধ আসে, ভূপতির ঘরে দাসদাসী-আত্মীয়স্বজনের চক্ষে তাহার প্রতিষ্ঠাস্থান অনেকটা উপরে উঠিয়া গেছে।

মন্দাকিনী এতদিন তাহাকে বিশেষ একটা কেহ বলিয়া মনে করে নাই। অমল

ও চারুর হাস্যালাপ-আলোচনাকে সে ছেলেমানুষি বলিয়া উপেক্ষা করিয়া পান সাজিত ও ঘরের কাজকর্ম করিত; নিজেকে সে উহাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং সংসারের পক্ষে আবশ্যক বলিয়াই জানিত।

অমলের পান খাওয়া অপরিমিত ছিল। মন্দার উপর পান সাজিবার ভার থাকাতে সে পানের অযথা অপব্যয়ে বিরক্ত হইত। অমলে চারুতে ষড়যন্ত্র করিয়া মন্দার পানের ভাণ্ডার প্রায়ই লুঠ করিয়া আনা তাহাদের একটা আমোদের মধ্যে ছিল। কিন্তু এই শৌখিন চোর দুটির চৌর্যপরিহাস মন্দার কাছে আমোদজনক বোধ হইত না।

আসল কথা, একজন আশ্রিত অন্য আশ্রিতকে প্রসন্নচক্ষে দেখে না। অমলের জন্য মন্দাকে যেটুকু গৃহকর্ম অতিরিক্ত করিতে হইবে সেটুকুতে সে যেন কিছু অপমান বোধ করিত। চারু অমলের পক্ষপাতী ছিল বলিয়া মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিত না, কিন্তু অমলকে অবহেলা করিবার চেষ্টা তাহার সর্বদাই ছিল। সুযোগ পাইলেই দাসদাসীদের কাছেও গোপনে অমলের নামে খোঁচা দিতে সে ছাড়িত না। তাহারাও যোগ দিত।

কিন্তু অমলের যখন অভ্যুত্থান আরম্ভ হইল তখন মন্দার একটু চমক লাগিল। সে অমল এখন আর নাই। এখন তাহার সংকুচিত নম্রতা একেবারে ঘুচিয়া গেছে। অপরকে অবজ্ঞা করিবার অধিকার এখন যেন তাহারই হাতে। সংসারে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া যে পুরুষ অসংশয়ে অকুণ্ঠিতভাবে নিজেকে প্রচার করিতে পারে, যে লোক একটা নিশ্চিত অধিকার লাভ করিয়াছে, সেই সমর্থ পুরুষ সহজেই নারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। মন্দা যখন দেখিল অমল চারি দিক হইতেই শ্রদ্ধা পাইতেছে তখন সেও অমলের উচ্চ মস্তকের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল। অমলের তরুণ মুখে নবগৌরবের গর্বোজ্জ্বল দীপ্তি মন্দার চক্ষে মোহ আনিল; সে যেন অমলকে নূতন করিয়া দেখিল।

এখন আর পান চুরি করিবার প্রয়োজন রহিল না। অমলের খ্যাতিলাভে চারুর এই আর-একটা লোকসান; তাহাদের ষড়যন্ত্রের কৌতুকবন্ধনটুকু বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল; পান এখন অমলের কাছে আপনি আসিয়া পড়ে, কোনো অভাব হয় না।

তাহা ছাড়া, তাহাদের দুইজনে-গঠিত দল হইতে মন্দাকিনীকে নানা কৌশলে দূরে রাখিয়া তাহারা যে আমোদ বোধ করিত, তাহাও নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। মন্দাকে তফাতে রাখা কঠিন হইল। অমল যে মনে করিবে চারুই তাহার একমাত্র বন্ধু ও সমজদার, ইহা মন্দার ভালো লাগিত না। পূর্বকৃত অবহেলা সে সুদে আসলে শোধ দিতে উদ্যত। সুতরাং অমলে চারুতে মুখোমুখি হইলেই মন্দা কোনো ছলে

মাঝখানে আসিয়া ছায়া ফেলিয়া গ্রহণ লাগাইয়া দিত। হঠাৎ মন্দার এই পরিবর্তন লইয়া চারু তাহার অসাক্ষাতে যে পরিহাস করিবে সে অবসরটুকু পাওয়া শক্ত হইল।

মন্দার এই অনাহূত প্রবেশ চারুর কাছে যত বিরক্তিকর বোধ হইত অমলের কাছে ততটা বোধ হয় নাই, এ কথা বলা বাহুল্য। বিমুখ রমণীর মন ক্রমশ তাহার দিকে যে ফিরিতেছে, ইহাতে ভিতরে ভিতরে সে একটা আগ্রহ অনুভব করিতেছিল।

কিন্তু চারু যখন দূর হইতে মন্দাকে দেখিয়া তীব্র মৃদুস্বরে বলিত "ঐ আসছেন" তখন অমলও বলিত, "তাই তো, জ্বালালে দেখছি।" পৃথিবীর অন্য-সকল সঙ্গের প্রতি অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করা তাহাদের একটা দস্তুর ছিল; অমল সেটা হঠাৎ কী বলিয়া ছাড়ে। অবশেষে মন্দাকিনী নিকটবর্তিনী হইলে অমল যেন বলপূর্বক সৌজন্য করিয়া বলিত, "তার পরে, মন্দা-বউঠান, আজ তোমার পানের বাটায় বাটপাড়ির লক্ষণ কিছু দেখলে!"

মন্দা। যখন চাইলেই পাও ভাই, তখন চুরি করবার দরকার!

অমল। চেয়ে পাওয়ার চেয়ে তাতে সুখ বেশি।

মন্দা। তোমরা কী পড়ছিলে পড়ো-না, ভাই। থামলে কেন। পড়া শুনতে আমার বেশ লাগে।

ইতিপূর্বে পাঠানুরাগের জন্য খ্যাতি অর্জন করিতে মন্দার কিছুমাত্র চেষ্টা দেখা যায় নাই, কিন্তু 'কালোহি বলবত্তরঃ'।

চারুর ইচ্ছা নহে অরসিকা মন্দার কাছে অমল পড়ে, অমলের ইচ্ছা মন্দাও তাহার লেখা শোনে।

চারু। অমল কমলাকান্তের দপ্তরের সমালোচনা লিখে এনেছে, সে কি তোমার—

মন্দা। হলেমই বা মুখ্খু, তবু শুনলে কি একেবারেই বুঝতে পারি নে।

তখন আর-একদিনের কথা অমলের মনে পড়িল। চারুতে মন্দাতে বিন্তি খেলিতেছে, সে তাহার লেখা হাতে করিয়া খেলাসভায় প্রবেশ করিল। চারুকে শুনাইবার জন্য সে অধীর, খেলা ভাঙিতেছে না দেখিয়া সে বিরক্ত। অবশেষে বলিয়া উঠিল, "তোমরা তবে খেলো বউঠান, আমি অখিলবাবুকে লেখাটা শুনিয়ে আসি গে।"

চারু অমলের চাদর চাপিয়া কহিল, "আঃ, বোসো-না, যাও কোথায়।" বলিয়া তাড়াতাড়ি হারিয়া খেলা শেষ করিয়া দিল।

মন্দা বলিল, "তোমাদের পড়া আরম্ভ হবে বুঝি? তবে আমি উঠি।"

চারু ভদ্রতা করিয়া কহিল, "কেন, তুমিও শোনো-না ভাই।"

মন্দা। না ভাই, আমি তোমাদের ও-সব ছাইপাঁশ কিছুই বুঝি নে; আমার

কেবল ঘুম পায়। বলিয়া সে অকালে খেলাভঙ্গে উভয়ের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল।

সেই মন্দা আজ কমলাকান্তের সমালোচনা শুনিবার জন্য উৎসুক। অমল কহিল, "তা বেশ তো মন্দা-বউঠান, তুমি শুনবে সে তো আমার সৌভাগ্য।" বলিয়া পাত উলটাইয়া আবার গোড়া হইতে পড়িবার উপক্রম করিল; লেখার আরম্ভে সে অনেকটা পরিমাণ রস ছড়াইয়াছিল, সেটুকু বাদ দিয়া পড়িতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

চারু তাড়াতাড়ি বলিল, "ঠাকুরপো, তুমি যে বলেছিলে জাহ্নবী লাইব্রেরি থেকে পুরোনো মাসিক পত্র কতকগুলো এনে দেবে।"

অমল। সে তো আজ নয়।

চারু। আজই তো। বেশ। ভুলে গেছ বুঝি।

অমল। ভুলব কেন। তুমি যে বলেছিলে—

চারু। আচ্ছা বেশ, এনো না। তোমরা পড়ো। আমি যাই, পরেশকে লাইব্রেরিতে পাঠিয়ে দিই গে। বলিয়া চারু উঠিয়া পড়িল।

অমল বিপদ আশঙ্কা করিল। মন্দা মনে মনে বুঝিল এবং মুহূর্তের মধ্যেই চারুর প্রতি তাহার মন বিষাক্ত হইয়া উঠিল। চারু চলিয়া গেলে অমল যখন উঠিবে কি না ভাবিয়া ইতস্তত করিতেছিল মন্দা ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "যাও ভাই, মান ভাঙাও গে; চারু রাগ করেছে। আমাকে লেখা শোনালে মুশকিলে পড়বে।"

ইহার পরে অমলের পক্ষে ওঠা অত্যন্ত কঠিন। অমল চারুর প্রতি কিছু রুষ্ট হইয়া কহিল, "কেন, মুশকিল কিসের।" বলিয়া লেখা বিস্তৃত করিয়া ধরিয়া পড়িবার উপক্রম করিল।

মন্দা দুই হাতে তাহার লেখা আচ্ছাদন করিয়া বলিল, "কাজ নেই ভাই, পোড়ো না।" বলিয়া, যেন অশ্রু সম্বরণ করিয়া, অন্যত্র চলিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

চারু নিমন্ত্রণে গিয়াছিল। মন্দা ঘরে বসিয়া চুলের দড়ি বিনাইতেছিল। "বউঠান" বলিয়া অমল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মন্দা নিশ্চয় জানিত যে, চারুর নিমন্ত্রণে যাওয়ার সংবাদ অমলের অগোচর ছিল না; হাসিয়া কহিল, "আহা অমলবাবু, কাকে খুঁজতে এসে কার দেখা পেলে। এমনি তোমার অদৃষ্ট।" অমল কহিল, "বাঁ দিকের বিচালিও যেমন ডান দিকের বিচালিও ঠিক তেমনি, গর্দভের পক্ষে দুইই সমান আদরের।" বলিয়া সেইখানে বসিয়া গেল।

অমল। মন্দা-বোঠান, তোমাদের দেশের গল্প বলো, আমি শুনি।

লেখার বিষয় সংগ্রহ করিবার জন্য অমল সকলের সব কথা কৌতূহলের সহিত শুনিত। সেই কারণে মন্দাকে এখন সে আর পূর্বের ন্যায় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিত না। মন্দার মনস্তত্ত্ব, মন্দার ইতিহাস, এখন তাহার কাছে ঔৎসুক্যজনক। কোথায় তাহার জন্মভূমি, তাহাদের গ্রামটি কিরূপ, ছেলেবেলা কেমন করিয়া কাটিত, বিবাহ হইল কবে, ইত্যাদি সকল কথাই সে খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। মন্দার ক্ষুদ্র জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে এত কৌতূহল কেহ কখনো প্রকাশ করে নাই। মন্দা আনন্দে নিজের কথা বকিয়া যাইতে লাগিল; মাঝে মাঝে কহিল, "কী বকছি তার ঠিক নাই।"

অমল উৎসাহ দিয়া কহিল, "না, আমার বেশ লাগছে, বলে যাও।" মন্দার বাপের এক কানা গোমস্তা ছিল, সে তাহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া এক-একদিন অভিমানে অনশনব্রত গ্রহণ করিত, অবশেষে ক্ষুধার জ্বালায় মন্দাদের বাড়িতে কিরূপে গোপনে আহার করিতে আসিত এবং দৈবাৎ একদিন স্ত্রীর কাছে কিরূপে ধরা পড়িয়াছিল, সেই গল্প যখন হইতেছে এবং অমল মনোযোগের সহিত শুনিতে শুনিতে সকৌতুকে হাসিতেছে, এমন সময় চারু ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল।

গল্পের সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। তাহার আগমনে হঠাৎ একটা জমাট সভা ভাঙিয়া গেল, চারু তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিল।

অমল জিজ্ঞাসা করিল, "বউঠান, এত সকাল-সকাল ফিরে এলে যে।"

চারু কহিল, "তাই তো দেখছি। বেশি সকাল-সকালই ফিরেছি।" বলিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

অমল কহিল, "ভালোই করেছ, বাঁচিয়েছ আমাকে। আমি ভাবছিলুম, কখন না জানি ফিরবে। মন্মথ দত্তর 'সন্ধ্যার পাখি' বলে নূতন বইটা তোমাকে পড়ে শোনাব বলে এনেছি।"

চারু। এখন থাক্, আমার কাজ আছে।

অমল। কাজ থাকে তো আমাকে হুকুম করো, আমি করে দিচ্ছি।

চারু জানিত অমল আজ বই কিনিয়া আনিয়া তাহাকে শুনাইতে আসিবে; চারু ঈর্ষা জন্মাইবার জন্য মন্মথর লেখার প্রচুর প্রশংসা করিবে এবং অমল সেই বইটাকে বিকৃত করিয়া পড়িয়া বিদ্রূপ করিতে থাকিবে। এই-সকল কল্পনা করিয়াই অধৈর্যবশত সে অকালে নিমন্ত্রণগৃহের সমস্ত অনুনয়বিনয় লঙ্ঘন করিয়া অসুখের ছুতায় গৃহে চলিয়া

আসিতেছে। এখন বারবার মনে করিতেছে, 'সেখানে ছিলাম ভালো, চলিয়া আসা অন্যায় হইয়াছে।'

মন্দাও তো কম বেহায়া নয়। একলা অমলের সহিত একঘরে বসিয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে। লোকে দেখিলে কী বলিবে। কিন্তু মন্দাকে এ কথা লইয়া ভর্ৎসনা করা চারুর পক্ষে বড়ো কঠিন। কারণ, মন্দা যদি তাহারই দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া জবাব দেয়। কিন্তু সে হইল এক, আর এ হইল এক। সে অমলকে রচনায় উৎসাহ দেয়, অমলের সঙ্গে সাহিত্যালোচনা করে, কিন্তু মন্দার তো সে উদ্দেশ্য আদবেই নয়। মন্দা নিঃসন্দেহই সরল যুবককে মুগ্ধ করিবার জন্য জাল বিস্তার করিতেছে। এই ভয়ংকর বিপদ হইতে বেচারা অমলকে রক্ষা করা তাহারই কর্তব্য। অমলকে এই মায়াবিনীর মতলব কেমন করিয়া বুঝাইবে। বুঝাইলে তাহার প্রলোভনের নিবৃত্তি না হইয়া যদি উলটা হয়।

বেচারা দাদা! তিনি তাঁহার স্বামীর কাগজ লইয়া দিন রাত খাটিয়া মরিতেছেন, আর মন্দা কিনা কোণটিতে বসিয়া অমলকে ভুলাইবার জন্য আয়োজন করিতেছে। দাদা বেশ নিশ্চিন্ত আছেন। মন্দার উপরে তাঁর অগাধ বিশ্বাস। এ-সকল ব্যাপার চারু কী করিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া স্থির থাকিবে। ভারি অন্যায়।

কিন্তু আগে অমল বেশ ছিল, যেদিন হইতে লিখিতে আরম্ভ করিয়া নাম করিয়াছে সেই দিন হইতেই যত অনর্থ দেখা যাইতেছে। চারুই তো তাহার লেখার গোড়া। কুক্ষণে সে অমলকে রচনায় উৎসাহ দিয়াছিল। এখন কি আর অমলের 'পরে তাহার পূর্বের মতো জোর খাটিবে। এখন অমল পাঁচজনের আদরের স্বাদ পাইয়াছে, অতএব একজনকে বাদ দিলে তাহার আসে যায় না।

চারু স্পষ্টই বুঝিল, তাহার হাত হইতে গিয়া পাঁচজনের হাতে পড়িয়া অমলের সমূহ বিপদ। চারুকে অমল এখন নিজের ঠিক সমকক্ষ বলিয়া জানে না; চারুকে সে ছাড়াইয়া গেছে। এখন সে লেখক, চারু পাঠক। ইহার প্রতিকার করিতেই হইবে।

আহা, সরল অমল, মায়াবিনী মন্দা, বেচারা দাদা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সেদিন আষাঢ়ের নবীন মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন। ঘরের মধ্যে অন্ধকার ঘনীভূত হইয়াছে বলিয়া চারু তাহার খোলা জানালার কাছে একান্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়া কী একটা লিখিতেছে।

অমল কখন নিঃশব্দপদে পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল তাহা সে জানিতে পারিল না। বাদলার স্নিগ্ধ আলোকে চারু লিখিয়া গেল, অমল পড়িতে লাগিল। পাশে অমলেরই দুই-একটা ছাপানো লেখা খোলা পড়িয়া আছে; চারুর কাছে সেইগুলিই রচনার একমাত্র আদর্শ।

"তবে যে বল, তুমি লিখতে পার না!" হঠাৎ অমলের কণ্ঠ শুনিয়া চারু অত্যন্ত চমকিয়া উঠিল; তাড়াতাড়ি খাতা লুকাইয়া ফেলিল; কহিল, "তোমার ভারি অন্যায়।"

অমল। কী অন্যায় করেছি।

চারু। লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিলে কেন।

অমল। প্রকাশ্যে দেখতে পাই নে বলে।

চারু তাহার লেখা ছিঁড়িয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। অমল ফস্ করিয়া তাহার হাত হইতে খাতা কাড়িয়া লইল। চারু কহিল, "তুমি যদি পড় তোমার সঙ্গে জন্মের মতো আড়ি।"

অমল। যদি পড়তে বারণ কর তা হলে তোমার সঙ্গে জন্মের মতো আড়ি।

চারু। আমার মাথা খাও ঠাকুরপো, পোড়ো না।

অবশেষে চারুকেই হার মানিতে হইল। কারণ, অমলকে তাহার লেখা দেখাইবার জন্য মন ছট্‌ফট্ করিতেছিল, অথচ দেখাইবার বেলায় যে তাহার এত লজ্জা করিবে তাহা সে ভাবে নাই। অমল যখন অনেক অনুনয় করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল তখন লজ্জায় চারুর হাত-পা বরফের মতো হিম হইয়া গেল। কহিল, "আমি পান নিয়ে আসি গে।" বলিয়া তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে পান সাজিবার উপলক্ষ করিয়া চলিয়া গেল।

অমল পড়া সাঙ্গ করিয়া চারুকে গিয়া কহিল, "চমৎকার হয়েছে।"

চারু পানে খয়ের দিতে ভুলিয়া কহিল, "যাও, আর ঠাট্টা করতে হবে না। দাও, আমার খাতা দাও।"

অমল কহিল, "খাতা এখন দেব না, লেখাটা কপি করে নিয়ে কাগজে পাঠাব।"

চারু। হাঁ, কাগজে পাঠাবে বৈকি! সে হবে না।

চারু ভারি গোলমাল করিতে লাগিল। অমলও কিছুতে ছাড়িল না। সে যখন বারবার শপথ করিয়া কহিল "কাগজে দিবার উপযুক্ত হইয়াছে" তখন চারু যেন নিতান্ত হতাশ হইয়া কহিল, "তোমার সঙ্গে তো পেরে ওঠবার জো নেই! যেটা ধরবে সে আর কিছুতেই ছাড়বে না!"

অমল কহিল, "দাদাকে একবার দেখাতে হবে।"

শুনিয়া চারু পান সাজা ফেলিয়া আসন হইতে বেগে উঠিয়া পড়িল; খাতা কাড়িবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "না, তাঁকে শোনাতে পাবে না। তাঁকে যদি আমার লেখার কথা বল তা হলে আমি আর এক অক্ষর লিখব না।"

অমল। বউঠান, তুমি ভারি ভুল বুঝছ। দাদা মুখে যাই বলুন, তোমার লেখা দেখলে খুব খুশি হবেন।

চারু। তা হোক, আমার খুশিতে কাজ নেই।

চারু প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছিল সে লিখিবে— অমলকে আশ্চর্য করিয়া দিবে; মন্দার সহিত তাহার যে অনেক প্রভেদ এ কথা প্রমাণ না করিয়া সে ছাড়িবে না। এ কয়দিন বিস্তর লিখিয়া সে ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। যাহা লিখিতে যায় তাহা নিতান্ত অমলের লেখার মতো হইয়া উঠে; মিলাইতে গিয়া দেখে এক-একটা অংশ অমলের রচনা হইতে প্রায় অবিকল উদ্‌ধৃত হইয়া আসিয়াছে। সেইগুলিই ভালো, বাকিগুলা কাঁচা। দেখিলে অমল নিশ্চয়ই মনে মনে হাসিবে, ইহাই কল্পনা করিয়া চারু সে-সকল লেখা কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া পুকুরের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে, পাছে তাহার একটা খণ্ডও দৈবাৎ অমলের হাতে আসিয়া পড়ে।

প্রথমে সে লিখিয়াছিল 'শ্রাবণের মেঘ'। মনে করিয়াছিল, 'ভাবাশ্রুজলে অভিষিক্ত খুব একটা নূতন লেখা লিখিয়াছি।' হঠাৎ চেতনা পাইয়া দেখিল জিনিসটা অমলের 'আষাঢ়ের চাঁদ'-এর এপিঠ-ওপিঠ মাত্র। অমল লিখিয়াছে, 'ভাই চাঁদ, তুমি মেঘের মধ্যে চোরের মতো লুকাইয়া বেড়াইতেছ কেন।' চারু লিখিয়াছিল, 'সখী কাদম্বিনী, হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া তোমার নীলাঞ্চলের তলে চাঁদকে চুরি করিয়া পলায়ন করিতেছ' ইত্যাদি।

কোনোমতেই অমলের গণ্ডি এড়াইতে না পারিয়া অবশেষে চারু রচনার বিষয় পরিবর্তন করিল। চাঁদ, মেঘ, শেফালি, বউ-কথা-কও, এ-সমস্ত ছাড়িয়া সে 'কালীতলা' বলিয়া একটা লেখা লিখিল। তাহাদের গ্রামে ছায়ায়-অন্ধকার পুকুরটির ধারে কালীর মন্দির ছিল; সেই মন্দিরটি লইয়া তাহার বাল্যকালের কল্পনা ভয় ঔৎসুক্য, সেই সম্বন্ধে তাহার বিচিত্র স্মৃতি, সেই জাগ্রত ঠাকুরানীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে গ্রামে চিরপ্রচলিত প্রাচীন গল্প— এই-সমস্ত লইয়া সে একটি লেখা লিখিল। তাহার আরম্ভ-ভাগ অমলের লেখার ছাঁদে কাব্যাড়ম্বরপূর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু খানিকটা অগ্রসর হইতেই তাহার লেখা সহজেই সরল এবং পল্লীগ্রামের ভাষা-ভঙ্গী-আভাসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

এই লেখাটা অমল কাড়িয়া লইয়া পড়িল। তাহার মনে হইল, গোড়ার দিকটা বেশ সরস হইয়াছে, কিন্তু কবিত্ব শেষ পর্যন্ত রক্ষিত হয় নাই। যাহা হউক, প্রথম রচনার পক্ষে লেখিকার উদ্যম প্রশংসনীয়।

চারু কহিল, "ঠাকুরপো, এসো আমরা একটা মাসিক কাগজ বের করি। কী বল।"

অমল। অনেকগুলি রৌপ্যচক্র না হলে সে কাগজ চলবে কী করে।

চারু। আমাদের এ কাগজে কোনো খরচ নেই। ছাপা হবে না তো— হাতের অক্ষরে লিখব। তাতে তোমার আমার ছাড়া আর কারো লেখা বেরবে না, কাউকে পড়তে দেওয়া হবে না। কেবল দু কপি করে বের হবে; একটি তোমার জন্যে, একটি আমার জন্যে।

কিছুদিন পূর্বে হইলে অমল এ প্রস্তাবে মাতিয়া উঠিত; এখন গোপনতার উৎসাহ তাহার চলিয়া গেছে। এখন দশজনকে উদ্দেশ না করিয়া কোনো রচনায় সে সুখ পায় না। তবু সাবেক কালের ঠাট বজায় রাখিবার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করিল। কহিল, "সে বেশ মজা হবে।"

চারু কহিল, "কিন্তু প্রতিজ্ঞা করতে হবে, আমাদের কাগজ ছাড়া আর কোথাও তুমি লেখা বের করতে পারবে না।"

অমল। তা হলে সম্পাদকরা যে মেরেই ফেলবে।

চারু। আর আমার হাতে বুঝি মারের অস্ত্র নেই ?

সেইরূপ কথা হইল। দুই সম্পাদক, দুই লেখক এবং দুই পাঠকে মিলিয়া কমিটি বসিল। অমল কহিল, "কাগজের নাম দেওয়া যাক চারুপাঠ।" চারু কহিল, "না, এর নাম অমলা।"

এই নূতন বন্দোবস্তে চারু মাঝের কয়দিনের দুঃখবিরক্তি ভুলিয়া গেল। তাহাদের মাসিক পত্রটিতে তো মন্দার প্রবেশ করিবার কোনো পথ নাই এবং বাহিরের লোকেরও প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভূপতি একদিন আসিয়া কহিল, "চারু, তুমি যে লেখিকা হয়ে উঠবে, পূর্বে এমন তো কোনো কথা ছিল না।"

চারু চমকিয়া লাল হইয়া উঠিয়া কহিল, "আমি লেখিকা! কে বললে তোমাকে। কখ্‌খনো না।"

ভূপতি। বামালসুদ্ধ গ্রেফ্‌তার। প্রমাণ হাতে-হাতে। বলিয়া ভূপতি একখণ্ড

সরোরুহ বাহির করিল। চারু দেখিল, যে-সকল লেখা সে তাহাদের গুপ্ত সম্পত্তি মনে করিয়া নিজেদের হস্তলিখিত মাসিক পত্রে সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছিল তাহাই লেখক-লেখিকার নামসুদ্ধ সরোরুহে প্রকাশ হইয়াছে।

কে যেন তাহার খাঁচার বড়ো সাধের পোষা পাখিগুলিকে দ্বার খুলিয়া উড়াইয়া দিয়াছে, এমনি তাহার মনে হইল। ভূপতির নিকটে ধরা পড়িবার লজ্জা ভুলিয়া গিয়া বিশ্বাসঘাতী অমলের উপর তাহার মনে মনে অত্যন্ত রাগ হইতে লাগিল।

"আর এইটে দেখো দেখি।" বলিয়া বিশ্ববন্ধু খবরের কাগজ খুলিয়া ভূপতি চারুর সম্মুখে ধরিল। তাহাতে 'হাল বাংলা লেখার ঢং' বলিয়া একটা প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে।

চারু হাত দিয়া ঠেলিয়া দিয়া কহিল, "এ পড়ে আমি কী করব।" তখন অমলের উপর অভিমানে আর কোনো দিকে সে মন দিতে পারিতেছিল না। ভূপতি জোর করিয়া কহিল, "একবার পড়ে দেখোই-না।"

চারু অগত্যা চোখ বুলাইয়া গেল। আধুনিক কোনো কোনো লেখকশ্রেণীর ভাবাড়ম্বরে পূর্ণ গদ্য লেখাকে গালি দিয়া লেখক খুব কড়া প্রবন্ধ লিখিয়াছে। তাহার মধ্যে অমল এবং মন্মথ দত্তর লেখার ধারাকে সমালোচক তীব্র উপহাস করিয়াছে, এবং তাহারই সঙ্গে তুলনা করিয়া নবীনা লেখিকা শ্রীমতী চারুবালার ভাষার অকৃত্রিম সরলতা, অনায়াস সরসতা এবং চিত্ররচনানৈপুণ্যের বহুল প্রশংসা করিয়াছে। লিখিয়াছে, এইরূপ রচনাপ্রণালীর অনুকরণ করিয়া সফলতা লাভ করিলে তবেই অমল-কোম্পানির নিস্তার, নচেৎ তাহারা সম্পূর্ণ ফেল করিবে ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

ভূপতি হাসিয়া কহিল, "একেই বলে গুরুমারা বিদ্যে।"

চারু তাহার লেখার এই প্রথম প্রশংসায় এক-একবার খুশি হইতে গিয়া তৎক্ষণাৎ পীড়িত হইতে লাগিল। তাহার মন যেন কোনোমতেই খুশি হইতে চাহিল না। প্রশংসার লোভনীয় সুধাপাত্র মুখের কাছ পর্যন্ত আসিতেই ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল।

সে বুঝিতে পারিল, তাহার লেখা কাগজে ছাপাইয়া অমল হঠাৎ তাহাকে বিস্মিত করিয়া দিবার সংকল্প করিয়াছিল। অবশেষে ছাপা হইলে পর স্থির করিয়াছিল কোনো-একটা কাগজে প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা বাহির হইলে দুইটা একসঙ্গে দেখাইয়া চারুর রোষশান্তি ও উৎসাহবিধান করিবে। যখন প্রশংসা বাহির হইল তখন অমল কেন আগ্রহের সহিত তাহাকে দেখাইতে আসিল না। এ সমালোচনায় অমল

আঘাত পাইয়াছে এবং চারুকে দেখাইতে চাহে না বলিয়াই এ কাগজগুলি সে একেবারে গোপন করিয়া গেছে। চারু আরামের জন্য অতি নিভৃতে যে একটি ক্ষুদ্র সাহিত্যনীড় রচনা করিতেছিল হঠাৎ প্রশংসা-শিলাবৃষ্টির একটা বড়ো রকমের শিলা আসিয়া সেটাকে একেবারে স্খলিত করিবার জো করিল। চারুর ইহা একেবারেই ভালো লাগিল না।

ভূপতি চলিয়া গেলে চারু তাহার শোবার ঘরের খাটে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; সম্মুখে সরোরুহ এবং বিশ্ববন্ধু খোলা পড়িয়া আছে।

খাতা-হাতে অমল চারুকে সহসা চকিত করিয়া দিবার জন্য পশ্চাৎ হইতে নিঃশব্দপদে প্রবেশ করিল। কাছে আসিয়া দেখিল, বিশ্ববন্ধুর সমালোচনা খুলিয়া চারু নিমগ্নচিত্তে বসিয়া আছে।

পুনরায় নিঃশব্দপদে অমল বাহির হইয়া গেল। 'আমাকে গালি দিয়া চারুর লেখাকে প্রশংসা করিয়াছে বলিয়া আনন্দে চারুর আর চৈতন্য নাই।' মুহূর্তের মধ্যে তাহার সমস্ত চিত্ত যেন তিক্তস্বাদ হইয়া উঠিল। চারু যে মূর্খের সমালোচনা পড়িয়া নিজেকে আপন গুরুর চেয়ে মস্ত মনে করিয়াছে, ইহা নিশ্চয় স্থির করিয়া অমল চারুর উপর ভারি রাগ করিল। চারুর উচিত ছিল কাগজখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া আগুনে ছাই করিয়া পুড়াইয়া ফেলা।

চারুর উপর রাগ করিয়া অমল মন্দার ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া সশব্দে ডাকিল, "মন্দা-বউঠান।"

মন্দা। এসো ভাই, এসো। না চাইতেই যে দেখা পেলুম। আজ আমার কী ভাগ্যি।

অমল। আমার নূতন লেখা দু-একটা শুনবে?

মন্দা। কতদিন থেকে 'শোনাব শোনাব' করে আশা দিয়ে রেখেছ কিন্তু শোনাও না তো। কাজ নেই ভাই— আবার কে কোন্ দিক থেকে রাগ করে বসলে তুমিই বিপদে পড়বে— আমার কী।

অমল কিছু তীব্রস্বরে কহিল, "রাগ করবেন কে। কেনই বা রাগ করবেন। আচ্ছা সে দেখা যাবে, তুমি এখন শোনোই তো।"

মন্দা যেন অত্যন্ত আগ্রহে তাড়াতাড়ি সংযত হইয়া বসিল। অমল সুর করিয়া সমারোহের সহিত পড়িতে আরম্ভ করিল।

অমলের লেখা মন্দার পক্ষে নিতান্তই বিদেশী, তাহার মধ্যে কোথাও সে কোনো কিনারা দেখিতে পায় না। সেইজন্যই সমস্ত মুখে আনন্দের হাসি আনিয়া অতিরিক্ত

ব্যগ্রতার ভাবে সে শুনিতে লাগিল। উৎসাহে অমলের কণ্ঠ উত্তরোত্তর উচ্চ হইয়া উঠিল।

সে পড়িতেছিল— 'অভিমন্যু যেমন গর্ভবাসকালে কেবল ব্যূহ-প্রবেশ করিতে শিখিয়াছিল, ব্যূহ হইতে নির্গমন শেখে নাই— নদীর স্রোত সেইরূপ গিরিদরীর পাষাণ-জঠরের মধ্যে থাকিয়া কেবল সম্মুখেই চলিতে শিখিয়াছিল, পশ্চাতে ফিরিতে শেখে নাই। হায় নদীর স্রোত, হায় যৌবন, হায় কাল, হায় সংসার, তোমরা কেবল সম্মুখেই চলিতে পার— যে পথে স্মৃতির স্বর্ণমণ্ডিত উপলখণ্ড ছড়াইয়া আস সে পথে আর কোনোদিন ফিরিয়া যাও না। মানুষের মনই কেবল পশ্চাতের দিকে চায়, অনন্ত জগৎ-সংসার সে দিকে ফিরিয়াও তাকায় না।'

এমন সময় মন্দার দ্বারের কাছে একটি ছায়া পড়িল, সে ছায়া মন্দা দেখিতে পাইল। কিন্তু যেন দেখে নাই এরূপ ভান করিয়া অনিমেষদৃষ্টিতে অমলের মুখের দিকে চাহিয়া নিবিড় মনোযোগের সহিত পড়া শুনিতে লাগিল।

ছায়া তৎক্ষণাৎ সরিয়া গেল।

চারু অপেক্ষা করিয়া ছিল, অমল আসিলেই তাহার সম্মুখে বিশ্ববন্ধু কাগজটিকে যথোচিত লাঞ্ছিত করিবে, এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া তাহাদের লেখা মাসিক পত্রে বাহির করিয়াছে বলিয়া অমলকেও ভর্ৎসনা করিবে।

অমলের আসিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল তবু তাহার দেখা নাই। চারু একটা লেখা ঠিক করিয়া রাখিয়াছে ; অমলকে শুনাইবার ইচ্ছা ; তাহাও পড়িয়া আছে।

এমন সময়ে কোথা হইতে অমলের কণ্ঠস্বর শুনা যায়। এ যেন মন্দার ঘরে। শরবিদ্ধের মতো সে উঠিয়া পড়িল। পায়ের শব্দ না করিয়া সে দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। অমল যে লেখা মন্দাকে শুনাইতেছে এখনো চারু তাহা শোনে নাই। অমল পড়িতেছিল— 'মানুষের মনই কেবল পশ্চাতের দিকে চায়— অনন্ত জগৎ-সংসার সে দিকে ফিরিয়াও তাকায় না।'

চারু যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল তেমন নিঃশব্দে আর ফিরিয়া যাইতে পারিল না। আজ পরে পরে দুই-তিনটা আঘাতে তাহাকে একেবারে ধৈর্যচ্যুত করিয়া দিল। মন্দা যে একবর্ণও বুঝিতেছে না এবং অমল যে নিতান্ত নির্বোধ মূঢ়ের মতো তাহাকে পড়িয়া শুনাইয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছে, এ কথা তাহার চীৎকার করিয়া বলিয়া আসিতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু না বলিয়া সক্রোধে পদশব্দে তাহা প্রচার করিয়া আসিল। শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিয়া চারু দ্বার সশব্দে বন্ধ করিল।

অমল ক্ষণকালের জন্য পড়ায় ক্ষান্ত দিল। মন্দা হাসিয়া চারুর উদ্দেশে ইঙ্গিত

করিল। অমল মনে মনে কহিল, 'বউঠানের এ কী দৌরাত্ম্য। তিনি কি ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন, আমি তাঁহারই ক্রীতদাস। তাঁহাকে ছাড়া আর কাহাকেও পড়া শুনাইতে পারিব না। এ যে ভয়ানক জুলুম।' এই ভাবিয়া সে আরো উচ্চৈঃস্বরে মন্দাকে পড়িয়া শুনাইতে লাগিল।

পড়া হইয়া গেলে চারুর ঘরের সম্মুখ দিয়া সে বাহিরে চলিয়া গেল। একবার চাহিয়া দেখিল, ঘরের দ্বার রুদ্ধ।

চারু পদশব্দে বুঝিল, অমল তাহার ঘরের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল— একবারও থামিল না। রাগে ক্ষোভে তাহার কান্না আসিল না। নিজের নূতন-লেখা খাতাখানি বাহির করিয়া তাহার প্রত্যেক পাতা বসিয়া বসিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া স্তূপাকার করিল। হায়, কী কুক্ষণেই এই-সমস্ত লেখালেখি আরম্ভ হইয়াছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার সময় বারান্দার টব হইতে জুঁইফুলের গন্ধ আসিতেছিল। ছিন্ন মেঘের ভিতর দিয়া স্নিগ্ধ আকাশে তারা দেখা যাইতেছিল। আজ চারু চুল বাঁধে নাই, কাপড় ছাড়ে নাই। জানলার কাছে অন্ধকারে বসিয়া আছে, মৃদুবাতাসে আস্তে আস্তে তাহার খোলা চুল উড়াইতেছে, এবং তাহার চোখ দিয়া এমন ঝর্ ঝর্ করিয়া কেন জল বহিয়া যাইতেছে তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিতেছে না।

এমন সময় ভূপতি ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার মুখ অত্যন্ত ম্লান, হৃদয় ভারাক্রান্ত। ভূপতির আসিবার সময় এখন নহে। কাগজের জন্য লিখিয়া প্রুফ দেখিয়া অন্তঃপুরে আসিতে প্রায়ই তাহার বিলম্ব হয়। আজ সন্ধ্যার পরেই যেন কোন্ সান্ত্বনা-প্রত্যাশায় চারুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।

ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছিল না। খোলা জানলার ক্ষীণ আলোকে ভূপতি চারুকে বাতায়নের কাছে অস্পষ্ট দেখিতে পাইল; ধীরে ধীরে পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। পদশব্দ শুনিতে পাইয়াও চারু মুখ ফিরাইল না— মূর্তিটির মতো স্থির হইয়া কঠিন হইয়া বসিয়া রহিল।

ভূপতি কিছু আশ্চর্য হইয়া ডাকিল, "চারু।"

ভূপতির কণ্ঠস্বরে সচকিত হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। ভূপতি আসিয়াছে সে তাহা মনে করে নাই। ভূপতি চারুর মাথার চুলের মধ্যে আঙুল বুলাইতে

বুলাইতে স্নেহার্দ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "অন্ধকারে তুমি যে একলাটি বসে আছ, চারু? মন্দা কোথায় গেল।"

চারু যেমনটি আশা করিয়াছিল আজ সমস্ত দিন তাহার কিছুই হইল না। সে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল অমল আসিয়া ক্ষমা চাহিবে— সেজন্য প্রস্তুত হইয়া সে প্রতীক্ষা করিতেছিল, এমন সময় ভূপতির অপ্রত্যাশিত কণ্ঠস্বরে সে যেন আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না— একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল।

ভূপতি ব্যস্ত হইয়া ব্যথিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "চারু, কী হয়েছে, চারু।"

কী হইয়াছে তাহা বলা শক্ত। এমনই কী হয়েছে। বিশেষ তো কিছুই হয় নাই। অমল নিজের নূতন লেখা প্রথমে তাহাকে না শুনাইয়া মন্দাকে শুনাইয়াছে এ কথা লইয়া ভূপতির কাছে কী নালিশ করিবে। শুনিলে কি ভূপতি হাসিবে না? এই তুচ্ছ ব্যাপারের মধ্যে গুরুতর নালিশের বিষয় যে কোন্‌খানে লুকাইয়া আছে তাহা খুঁজিয়া বাহির করা চারুর পক্ষে অসাধ্য। অকারণে সে যে কেন এত অধিক কষ্ট পাইতেছে, ইহাই সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিয়া তাহার কষ্টের বেদনা আরো বাড়িয়া উঠিয়াছে।

ভূপতি। বলো-না চারু, তোমার কী হয়েছে। আমি কি তোমার উপর কোনো অন্যায় করেছি। তুমি তো জানই, কাগজের ঝঞ্ঝাট নিয়ে আমি কিরকম ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছি, যদি তোমার মনে কোনো আঘাত দিয়ে থাকি সে আমি ইচ্ছে করে দিই নি।

ভূপতি এমন বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছে যাহার একটিও জবাব দিবার নাই, সেইজন্য চারু ভিতরে ভিতরে অধীর হইয়া উঠিল; মনে হইতে লাগিল, ভূপতি এখন তাহাকে নিষ্কৃতি দিয়া ছাড়িয়া গেলে সে বাঁচে।

ভূপতি দ্বিতীয়বার কোনো উত্তর না পাইয়া পুনর্বার স্নেহসিক্ত স্বরে কহিল, "আমি সর্বদা তোমার কাছে আসতে পারি নে চারু, সেজন্যে আমি অপরাধী, কিন্তু আর হবে না। এখন থেকে দিনরাত কাগজ নিয়ে থাকব না। আমাকে তুমি যতটা চাও ততটাই পাবে।"

চারু অধীর হইয়া বলিল, "সেজন্যে নয়।"

ভূপতি কহিল, "তবে কী জন্যে।" বলিয়া খাটের উপর বসিল।

চারু বিরক্তির স্বর গোপন করিতে না পারিয়া কহিল, "সে এখন থাক্‌, রাত্রে বলব।"

ভূপতি মুহূর্তকাল স্তব্ধ থাকিয়া কহিল, "আচ্ছা, এখন থাক্‌।" বলিয়া আস্তে

আস্তে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। তাহার নিজের একটা কী কথা বলিবার ছিল, সে আর বলা হইল না।

ভূপতি যে একটা ক্ষোভ পাইয়া গেল, চারুর কাছে তাহা অগোচর রহিল না। মনে হইল, 'ফিরিয়া ডাকি।' কিন্তু ডাকিয়া কী কথা বলিবে। অনুতাপে তাহাকে বিদ্ধ করিল, কিন্তু কোনো প্রতিকার সে খুঁজিয়া পাইল না।

রাত্রি হইল। চারু আজ সবিশেষ যত্ন করিয়া ভূপতির রাত্রের আহার সাজাইল এবং নিজে পাখা হাতে করিয়া বসিয়া রহিল।

এমন সময় শুনিতে পাইল মন্দা উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছে, "ব্রজ, ব্রজ।" ব্রজ চাকর সাড়া দিলে জিজ্ঞাসা করিল, "অমলবাবুর খাওয়া হয়েছে কি।" ব্রজ উত্তর করিল, "হয়েছে।" মন্দা কহিল, "খাওয়া হয়ে গেছে অথচ পান নিয়ে গেলি নে যে।" মন্দা ব্রজকে অত্যন্ত তিরস্কার করিতে লাগিল।

এমন সময়ে ভূপতি অন্তঃপুরে আসিয়া আহারে বসিল, চারু পাখা করিতে লাগিল।

চারু আজ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, ভূপতির সঙ্গে প্রফুল্ল স্নিগ্ধভাবে নানা কথা কহিবে। কথাবার্তা আগে হইতে ভাবিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়া ছিল। কিন্তু মন্দার কণ্ঠস্বরে তাহার বিস্তৃত আয়োজন সমস্ত ভাঙিয়া দিল, আহারকালে ভূপতিকে সে একটি কথাও বলিতে পারিল না। ভূপতিও অত্যন্ত বিমর্ষ অন্যমনস্ক হইয়া ছিল। সে ভালো করিয়া খাইল না, চারু একবার কেবল জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু খাচ্ছ না যে।"

ভূপতি প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "কেন। কম খাই নি তো।"

শয়নঘরে উভয়ে একত্র হইলে ভূপতি কহিল, "আজ রাত্রে তুমি কী বলবে বলেছিলে।"

চারু কহিল, "দেখো, কিছুদিন থেকে মন্দার ব্যবহার আমার ভালো বোধ হচ্ছে না। ওকে এখানে রাখতে আমার আর সাহস হয় না।"

ভূপতি। কেন, কী করেছে।

চারু। অমলের সঙ্গে ও এমনি ভাবে চলে যে, সে দেখলে লজ্জা হয়।

ভূপতি হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "হাঃ, তুমি পাগল হয়েছ! অমল ছেলেমানুষ। সেদিনকার ছেলে—"

চারু। তুমি তো ঘরের খবর কিছুই রাখ না, কেবল বাইরের খবর কুড়িয়ে বেড়াও। যাই হোক, বেচারা দাদার জন্যে আমি ভাবি। তিনি কখন খেলেন না খেলেন মন্দা তার কোনো খোঁজও রাখে না, অথচ অমলের পান থেকে চুন খসে গেলেই চাকরবাকরদের সঙ্গে বকাবকি ক'রে অনর্থ করে।

ভূপতি। তোমরা মেয়েরা কিন্তু ভারি সন্দিগ্ধ তা বলতে হয়। চারু রাগিয়া বলিল, "আচ্ছা বেশ, আমরা সন্দিগ্ধ, কিন্তু বাড়িতে আমি এ-সমস্ত বেহায়াপনা হতে দেব না তা বলে রাখছি।"

চারুর এ-সমস্ত অমূলক আশঙ্কায় ভূপতি মনে মনে হাসিল, খুশিও হইল। গৃহ যাহাতে পবিত্র থাকে, দাম্পত্যধর্মে আনুমানিক কাল্পনিক কলঙ্কও লেশমাত্র স্পর্শ না করে, এজন্য সাধ্বী স্ত্রীদের যে অতিরিক্ত সতর্কতা, যে সন্দেহাকুল দৃষ্টিক্ষেপ, তাহার মধ্যে একটি মাধুর্য এবং মহত্ত্ব আছে।

ভূপতি শ্রদ্ধায় এবং স্নেহে চারুর ললাট চুম্বন করিয়া কহিল, "এ নিয়ে আর কোনো গোল করবার দরকার হবে না। উমাপদ ময়মনসিংহে প্র্যাক্‌টিস্‌ করতে যাচ্ছে, মন্দাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে।"

অবশেষে নিজের দুশ্চিন্তা এবং এই-সকল অপ্রীতিকর আলোচনা দূর করিয়া দিবার জন্য ভূপতি টেবিল হইতে একটা খাতা তুলিয়া লইয়া কহিল, "তোমার লেখা আমাকে শোনাও-না, চারু।"

চারু খাতা কাড়িয়া লইয়া কহিল, "এ তোমার ভালো লাগবে না, তুমি ঠাট্টা করবে।"

ভূপতি এই কথায় কিছু ব্যথা পাইল, কিন্তু তাহা গোপন করিয়া হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা, আমি ঠাট্টা করব না, এমনি স্থির হয়ে শুনব যে তোমার ভ্রম হবে, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি।"

কিন্তু ভূপতি আমল পাইল না— দেখিতে দেখিতে খাতাপত্র নানা আবরণ-আচ্ছাদনের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

সকল কথা ভূপতি চারুকে বলিতে পারে নাই। উমাপদ ভূপতির কাগজখানির কর্মাধ্যক্ষ ছিল। চাঁদা আদায়, ছাপাখানা ও বাজারের দেনা শোধ, চাকরদের বেতন দেওয়া, এ-সমস্তই উমাপদর উপর ভার ছিল।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন কাগজওয়ালার নিকট হইতে উকিলের চিঠি পাইয়া ভূপতি আশ্চর্য হইয়া গেল। ভূপতির নিকট হইতে তাহাদের ২৭০০৲ টাকা পাওনা জানাইয়াছে। ভূপতি উমাপদকে ডাকিয়া কহিল, "এ কী ব্যাপার! এ টাকা তো আমি তোমাকে দিয়ে দিয়েছি। কাগজের দেনা চার-পাঁচশোর বেশি তো হবার কথা নয়।"

উমাপদ কহিল, "নিশ্চয় এরা ভুল করেছে।"

কিন্তু, আর চাপা রহিল না। কিছুকাল হইতে উমাপদ এইরূপ ফাঁকি দিয়া আসিতেছে। কেবল কাগজ সম্বন্ধে নহে, ভূপতির নামে উমাপদ বাজারে অনেক দেনা করিয়াছে। গ্রামে সে যে একটি পাকা বাড়ি নির্মাণ করিতেছে তাহার মালমসলার কতক ভূপতির নামে লিখাইয়াছে, অধিকাংশই কাগজের টাকা হইতে শোধ করিয়াছে।

যখন নিতান্তই ধরা পড়িল তখন সে রুক্ষ স্বরে কহিল, "আমি তো আর নিরুদ্দেশ হচ্ছি নে। কাজ করে আমি ক্রমে ক্রমে শোধ দেব— তোমার সিকি পয়সার দেনা যদি বাকি থাকে তবে আমার নাম উমাপদ নয়।"

তাহার নামের ব্যত্যয়ে ভূপতির কোনো সান্ত্বনা ছিল না। অর্থের ক্ষতিতে ভূপতি তত ক্ষুণ্ণ হয় নাই, কিন্তু অকস্মাৎ এই বিশ্বাসঘাতকতায় সে যেন ঘর হইতে শূন্যের মধ্যে পা ফেলিল।

সেইদিন সে অকালে অন্তঃপুরে গিয়াছিল। পৃথিবীতে একটা যে নিশ্চয় বিশ্বাসের স্থান আছে, সেইটে ক্ষণকালের জন্য অনুভব করিয়া আসিতে তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছিল। চারু তখন নিজের দুঃখে সন্ধ্যাদীপ নিবাইয়া জানলার কাছে অন্ধকারে বসিয়া ছিল।

উমাপদ পরদিনই ময়মনসিংহে যাইতে প্রস্তুত। বাজারের পাওনাদাররা খবর পাইবার পূর্বেই সে সরিয়া পড়িতে চায়। ভূপতি ঘৃণাপূর্বক উমাপদর সহিত কথা কহিল না— ভূপতির সেই মৌনাবস্থা উমাপদ সৌভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করিল।

অমল আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মন্দা-বোঠান, এ কী ব্যাপার। জিনিসপত্র গোছাবার ধুম যে?"

মন্দা। আর ভাই, যেতে তো হবেই। চিরকাল কি থাকব।

অমল। যাচ্ছ কোথায়।

মন্দা। দেশে।

অমল। কেন। এখানে অসুবিধাটা কী হল।

মন্দা। অসুবিধে আমার কী বল। তোমাদের পাঁচজনের সঙ্গে ছিলুম, সুখেই ছিলুম। কিন্তু অন্যের অসুবিধে হতে লাগল যে। বলিয়া চারুর ঘরের দিকে কটাক্ষ করিল।

অমল গম্ভীর হইয়া চুপ করিয়া রহিল। মন্দা কহিল, "ছি ছি, কী লজ্জা। বাবু কী মনে করলেন।"

অমল এ কথা লইয়া আর অধিক আলোচনা করিল না। এটুকু স্থির করিল, চারু তাহাদের সম্বন্ধে দাদার কাছে এমন কথা বলিয়াছে যাহা বলিবার নহে।

অমল বাড়ি হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় বেড়াইতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা হইল এ বাড়িতে আর ফিরিয়া না আসে। দাদা যদি বোঠানের কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহাকে অপরাধী মনে করিয়া থাকেন, তবে মন্দা যে পথে গিয়াছে তাহাকেও সেই পথে যাইতে হয়। মন্দাকে বিদায় এক হিসাবে অমলের প্রতিও নির্বাসনের আদেশ— সেটা কেবল মুখ ফুটিয়া বলা হয় নাই মাত্র। ইহার পরে কর্তব্য খুব সুস্পষ্ট— আর একদণ্ডও এখানে থাকা নয়। কিন্তু দাদা যে তাহার সম্বন্ধে কোনোপ্রকার অন্যায় ধারণা মনে মনে পোষণ করিয়া রাখিবেন সে হইতেই পারে না। এতদিন তিনি অক্ষুণ্ন বিশ্বাসে তাহাকে ঘরে স্থান দিয়া পালন করিয়া আসিতেছেন, সে বিশ্বাসে যে অমল কোনো অংশে আঘাত দেয় নাই সে কথা দাদাকে না বুঝাইয়া সে কেমন করিয়া যাইবে।

ভূপতি তখন আত্মীয়ের কৃতঘ্নতা, পাওনাদারের তাড়না, উচ্ছৃঙ্খল হিসাবপত্র এবং শূন্য তহবিল লইয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছিল। তাহার এই শুষ্ক মনোদুঃখের কেহ দোসর ছিল না— চিত্তবেদনা এবং ঋণের সঙ্গে একলা দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য ভূপতি প্রস্তুত হইতেছিল।

এমন সময় অমল ঝড়ের মতো ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ভূপতি নিজের অগাধ চিন্তার মধ্য হইতে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া চাহিল। কহিল, "খবর কী অমল।" অকস্মাৎ মনে হইল, অমল বুঝি আর-একটা কী গুরুতর দুঃসংবাদ লইয়া আসিল।

অমল কহিল, "দাদা, আমার উপরে তোমার কি কোনোরকম সন্দেহের কারণ হয়েছে।"

ভূপতি আশ্চর্য হইয়া কহিল, "তোমার উপরে সন্দেহ!" মনে মনে ভাবিল, 'সংসার যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে কোনোদিন অমলকেও সন্দেহ করিব আশ্চর্য নাই।'

অমল। বোঠান কি আমার চরিত্রসম্বন্ধে তোমার কাছে কোনোরকম দোষারোপ করেছেন।

ভূপতি ভাবিল, ওঃ, এই ব্যাপার। বাঁচা গেল। স্নেহের অভিমান। সে মনে করিয়াছিল, সর্বনাশের উপর বুঝি আর-একটা কিছু সর্বনাশ ঘটিয়াছে, কিন্তু গুরুতর সংকটের সময়েও এই-সকল তুচ্ছ বিষয়ে কর্ণপাত করিতে হয়। সংসার এ দিকে সাঁকোও নাড়াইবে অথচ সেই সাঁকোর উপর দিয়া তাহার শাকের আঁটিগুলো পার করিবার জন্য তাগিদ করিতেও ছাড়িবে না।

অন্য সময় হইলে ভূপতি অমলকে পরিহাস করিত, কিন্তু আজ তাহার সে প্রফুল্লতা ছিল না। সে বলিল, "পাগল হয়েছ নাকি।"

অমল আবার জিজ্ঞাসা করিল, "বোঠান কিছু বলেন নি ?"

ভূপতি। তোমাকে ভালোবাসেন বলে যদি কিছু বলে থাকেন তাতে রাগ করবার কোনো কারণ নেই।

অমল। কাজকর্মের চেষ্টায় এখন আমার অন্যত্র যাওয়া উচিত।

ভূপতি ধমক দিয়া কহিল, "অমল, তুমি কী ছেলেমানুষি করছ তার ঠিক নেই। এখন পড়াশুনো করো, কাজকর্ম পরে হবে।"

অমল বিমর্ষমুখে চলিয়া আসিল, ভূপতি তাহার কাগজের গ্রাহকদের মূল্যপ্রাপ্তির তালিকার সহিত তিন বৎসরের জমাখরচের হিসাব মিলাইতে বসিয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ

অমল স্থির করিল, বউঠানের সঙ্গে মোকাবিলা করিতে হইবে, এ কথাটার শেষ না করিয়া ছাড়া হইবে না। বোঠানকে যে-সকল শক্ত শক্ত কথা শুনাইবে মনে মনে তাহা আবৃত্তি করিতে লাগিল।

মন্দা চলিয়া গেলে চারু সংকল্প করিল, অমলকে সে নিজে হইতে ডাকিয়া পাঠাইয়া তাহার রোষশান্তি করিবে। কিন্তু একটা লেখার উপলক্ষ করিয়া ডাকিতে হইবে। অমলেরই একটা লেখার অনুকরণ করিয়া 'অমাবস্যার আলো' নামে সে একটা প্রবন্ধ ফাঁদিয়াছে। চারু এটুকু বুঝিয়াছে যে তাহার স্বাধীন ছাঁদের লেখা অমল পছন্দ করে না।

পূর্ণিমা তাহার সমস্ত আলোক প্রকাশ করিয়া ফেলে বলিয়া চারু তাহার নূতন রচনায় পূর্ণিমাকে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করিয়া লজ্জা দিতেছে। লিখিতেছে— অমাবস্যার অতলস্পর্শ অন্ধকারের মধ্যে ষোলোকলা চাঁদের সমস্ত আলোক স্তরে স্তরে আবদ্ধ হইয়া আছে, তাহার এক রশ্মিও হারাইয়া যায় নাই— তাই পূর্ণিমার উজ্জ্বলতা অপেক্ষা অমাবস্যার কালিমা পরিপূর্ণতর— ইত্যাদি। অমল নিজের সকল লেখাই সকলের কাছে প্রকাশ করে এবং চারু তাহা করে না— পূর্ণিমা-অমাবস্যার তুলনার মধ্যে কি সেই কথাটার আভাস আছে।

এ দিকে এই পরিবারের তৃতীয় ব্যক্তি ভূপতি কোনো আসন্ন ঋণের তাগিদ হইতে মুক্তিলাভের জন্য তাহার পরম বন্ধু মতিলালের কাছে গিয়াছিল।

মতিলালকে সংকটের সময় ভূপতি কয়েক হাজার টাকা ধার দিয়াছিল— সেদিন অত্যন্ত বিব্রত হইয়া সেই টাকাটা চাহিতে গিয়াছিল। মতিলাল স্নানের পর গা খুলিয়া পাখার হাওয়া লাগাইতেছিল এবং একটা কাঠের বাক্সর উপর কাগজ মেলিয়া অতি ছোটো অক্ষরে সহস্র দুর্গানাম লিখিতেছিল। ভূপতিকে দেখিয়া অত্যন্ত হৃদ্যতার স্বরে কহিল, "এসো এসো— আজকাল তো তোমার দেখাই পাবার জো নেই।"

মতিলাল টাকার কথা শুনিয়া আকাশপাতাল চিন্তা করিয়া কহিল, "কোন্ টাকার কথা বলছ। এর মধ্যে তোমার কাছ থেকে কিছু নিয়েছি নাকি।"

ভূপতি সাল-তারিখ স্মরণ করাইয়া দিলে মতিলাল কহিল, "ওঃ, সেটা তো অনেকদিন হল তামাদি হয়ে গেছে।"

ভূপতির চক্ষে তাহার চতুর্দিকের চেহারা সমস্ত যেন বদল হইয়া গেল। সংসারের যে অংশ হইতে মুখোশ খসিয়া পড়িল সে দিকটা দেখিয়া আতঙ্কে ভূপতির শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। হঠাৎ বন্যা আসিয়া পড়িলে ভীত ব্যক্তি যেখানে সকলের চেয়ে উচ্চ চূড়া দেখে সেইখানে যেমন ছুটিয়া যায়, সংশয়াক্রান্ত বহিঃসংসার হইতে ভূপতি তেমনি বেগে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল, মনে মনে কহিল, 'আর যাই হোক, চারু তো আমাকে বঞ্চনা করিবে না।'

চারু তখন খাটে বসিয়া কোলের উপর বালিশ এবং বালিশের উপর খাতা রাখিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া একমনে লিখিতেছিল। ভূপতি যখন নিতান্ত তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল তখনই তাহার চেতনা হইল, তাড়াতাড়ি তাহার খাতাটা পায়ের নীচে চাপিয়া বসিল।

মনে যখন বেদনা থাকে তখন অল্প আঘাতেই গুরুতর ব্যথা বোধ হয়। চারু এমন অনাবশ্যক সত্বরতার সহিত তাহার লেখা গোপন করিল দেখিয়া ভূপতির মনে বাজিল।

ভূপতি ধীরে ধীরে খাটের উপর চারুর পাশে বসিল। চারু তাহার রচনাস্রোতে অনপেক্ষিত বাধা পাইয়া এবং ভূপতির কাছে হঠাৎ খাতা লুকাইবার ব্যস্ততায় অপ্রতিভ হইয়া কোনো কথাই জোগাইয়া উঠিতে পারিল না।

সেদিন ভূপতির নিজের কিছু দিবার বা কহিবার ছিল না। সে রিক্তহস্তে চারুর নিকটে প্রার্থী হইয়া আসিয়াছিল। চারুর কাছ হইতে আশঙ্কাধর্মী ভালোবাসার একটা-কোনো প্রশ্ন, একটা-কিছু আদর পাইলেই তাহার ক্ষত-যন্ত্রণায় ঔষধ পড়িত। কিন্তু 'হ্যাদে লক্ষ্মী হৈল লক্ষ্মীছাড়া', এক মুহূর্তের প্রয়োজনে প্রীতিভাণ্ডারের চাবি চারু

যেন কোনোখানে খুঁজিয়া পাইল না। উভয়ের সুকঠিন মৌনে ঘরের নীরবতা অত্যন্ত নিবিড় হইয়া আসিল।

খানিকক্ষণ নিতান্ত চুপচাপ থাকিয়া ভূপতি নিশ্বাস ফেলিয়া খাট ছাড়িয়া উঠিল এবং ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া আসিল।

সেই সময় অমল বিস্তর শক্ত শক্ত কথা মনের মধ্যে বোঝাই করিয়া লইয়া চারুর ঘরে দ্রুতপদে আসিতেছিল, পথের মধ্যে অমল ভূপতির অত্যন্ত শুষ্ক বিবর্ণ মুখ দেখিয়া উদ্‌বিগ্ন হইয়া থামিল, জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, তোমার অসুখ করেছে?"

অমলের স্নিগ্ধস্বর শুনিবামাত্র হঠাৎ ভূপতির সমস্ত হৃদয় তাহার অশ্রুরাশি লইয়া বুকের মধ্যে যেন ফুলিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ কোনো কথা বাহির হইল না। সবলে আত্মসম্বরণ করিয়া ভূপতি আর্দ্রস্বরে কহিল, "কিছু হয় নি, অমল। এবারে কাগজে তোমার কোনো লেখা বেরচ্ছে কি।"

অমল শক্ত শক্ত কথা যাহা সঞ্চয় করিয়াছিল তাহা কোথায় গেল। তাড়াতাড়ি চারুর ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বউঠান, দাদার কী হয়েছে বলো দেখি।"

চারু কহিল, "কই, তা তো কিছু বুঝতে পারলুম না। অন্য কাগজে বোধ হয় ওঁর কাগজকে গাল দিয়ে থাকবে।"

অমল মাথা নাড়িল।

না ডাকিতেই অমল আসিল এবং সহজভাবে কথাবার্তা আরম্ভ করিয়া দিল দেখিয়া চারু অত্যন্ত আরাম পাইল। একেবারেই লেখার কথা পাড়িল— কহিল, "আজ আমি 'অমাবস্যার আলো' বলে একটা লেখা লিখছিলুম; আর একটু হলেই তিনি সেটা দেখে ফেলেছিলেন।"

চারু নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল, তাহার নূতন লেখাটা দেখিবার জন্য অমল পীড়াপীড়ি করিবে। সেই অভিপ্রায়ে খাতাখানা একটু নাড়াচাড়াও করিল। কিন্তু, অমল একবার তীব্রদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চারুর মুখের দিকে চাহিল— কী বুঝিল, কী ভাবিল জানি না। চকিত হইয়া উঠিয়া পড়িল। পর্বতপথে চলিতে চলিতে হঠাৎ এক সময়ে মেঘের কুয়াশা কাটিবামাত্র পথিক যেন চমকিয়া দেখিল, সে সহস্র হস্ত গভীর গহ্বরের মধ্যে পা বাড়াইতে যাইতেছিল। অমল কোনো কথা না বলিয়া একেবারে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

চারু অমলের এই অভূতপূর্ব ব্যবহারের কোনো তাৎপর্য বুঝিতে পারিল না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

পরদিন ভূপতি আবার অসময়ে শয়নঘরে আসিয়া চারুকে ডাকাইয়া আনাইল। কহিল, "চারু, অমলের বেশ একটি ভালো বিবাহের প্রস্তাব এসেছে।"

চারু অন্যমনস্ক ছিল। কহিল, "ভালো কী এসেছে।"

ভূপতি। বিয়ের সম্বন্ধ।

চারু। কেন, আমাকে কি পছন্দ হল না।

ভূপতি উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। কহিল, "তোমাকে পছন্দ হল কি না সে কথা এখনো অমলকে জিজ্ঞাসা করা হয় নি। যদি বা হয়ে থাকে আমার তো একটা ছোটো-খাটো দাবি আছে, সে আমি ফস্‌ করে ছাড়ছি নে।"

চারু। আঃ, কী বকছ তার ঠিক নেই। তুমি যে বললে, তোমার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে। চারুর মুখ লাল হইয়া উঠিল।

ভূপতি। তা হলে কি ছুটে তোমাকে খবর দিতে আসতুম? বকশিশ পাবার তো আশা ছিল না।

চারু। অমলের সম্বন্ধ এসেছে? বেশ তো। তা হলে আর দেরি কেন।

ভূপতি। বর্ধমানের উকিল রঘুনাথবাবু তাঁর মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে অমলকে বিলেত পাঠাতে চান।

চারু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বিলেত?"

ভূপতি। হাঁ, বিলেত।

চারু। অমল বিলেত যাবে? বেশ মজা তো। বেশ হয়েছে, ভালোই হয়েছে। তা তুমি তাকে একবার বলে দেখো।

ভূপতি। আমি বলবার আগে তুমি তাকে একবার ডেকে বুঝিয়ে বললে ভালো হয় না?

চারু। আমি তো তিন হাজার বার বলেছি। সে আমার কথা রাখে না। আমি তাকে বলতে পারব না।

ভূপতি। তোমার কি মনে হয়, সে করবে না?

চারু। আরো তো অনেকবার চেষ্টা দেখা গেছে, কোনোমতে তো রাজি হয় নি।

ভূপতি। কিন্তু এবারকার এ প্রস্তাবটা তার পক্ষে ছাড়া উচিত হবে না। আমার অনেক দেনা হয়ে গেছে, অমলকে আমি তো আর সেরকম করে আশ্রয় দিতে পারব না।

ভূপতি অমলকে ডাকিয়া পাঠাইল। অমল আসিলে তাহাকে বলিল, "বর্ধমানের উকিল রঘুনাথবাবুর মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ের প্রস্তাব এসেছে। তাঁর ইচ্ছে বিবাহ দিয়ে তোমাকে বিলেত পাঠিয়ে দেবেন। তোমার কী মত।"

অমল কহিল, "তোমার যদি অনুমতি থাকে, আমার এতে কোনো অমত নেই।"

অমলের কথা শুনিয়া উভয়ে আশ্চর্য হইয়া গেল। সে যে বলিবামাত্রই রাজি হইবে, এ কেহ মনে করে নাই।

চারু তীব্রস্বরে ঠাট্টা করিয়া কহিল, "দাদার অনুমতি থাকলেই উনি মত দেবেন। কী আমার কথার বাধ্য ছোটো ভাই। দাদার 'পরে ভক্তি এতদিন কোথায় ছিল, ঠাকুরপো?"

অমল উত্তর না দিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিল।

অমলের নিরুত্তরে চারু যেন তাহাকে চেতাইয়া তুলিবার জন্য দ্বিগুণতর ঝাঁজের সঙ্গে বলিল, "তার চেয়ে বলো-না কেন, নিজের ইচ্ছে গেছে। এতদিন ভান করে থাকবার কী দরকার ছিল যে বিয়ে করতে চাও না? পেটে খিদে মুখে লাজ!"

ভূপতি উপহাস করিয়া কহিল, "অমল তোমার খাতিরেই এতদিন খিদে চেপে রেখেছিল, পাছে ভাজের কথা শুনে তোমার হিংসা হয়।"

চারু এই কথায় লাল হইয়া উঠিয়া কোলাহল করিয়া বলিতে লাগিল, "হিংসে! তা বৈকি! কখ্খনো আমার হিংসে হয় না। ওরকম করে বলা তোমার ভারি অন্যায়।"

ভূপতি। ওই দেখো। নিজের স্ত্রীকে ঠাট্টাও করতে পারব না।

চারু। না, ওরকম ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না।

ভূপতি। আচ্ছা, গুরুতর অপরাধ করেছি। মাপ করো। যা হোক, বিয়ের প্রস্তাবটা তা হলে স্থির?

অমল কহিল, "হাঁ।"

চারু। মেয়েটি ভালো কি মন্দ তাও বুঝি একবার দেখতে যাবারও তর সইল না। তোমার যে এমন দশা হয়ে এসেছে তা তো একটু আভাসেও প্রকাশ কর নি।

ভূপতি। অমল, মেয়ে দেখতে চাও তো তার বন্দোবস্ত করি। খবর নিয়েছি মেয়েটি সুন্দরী।

অমল। না, দেখবার দরকার দেখি নে।

চারু। ওর কথা শোন কেন। সে কি হয়। কনে না দেখে বিয়ে হবে? ও না দেখতে চায় আমরা তো দেখে নেব।

অমল। না দাদা, ওই নিয়ে মিথ্যে দেরি করবার দরকার দেখি নে।

চারু। কাজ নেই বাপু— দেরি হলে বুক ফেটে যাবে। তুমি টোপর মাথায় দিয়ে এখনই বেরিয়ে পড়ো। কী জানি, তোমার সাত রাজার ধন মানিকটিকে যদি আর কেউ কেড়ে নিয়ে যায়।

অমলকে চারু কোনো ঠাট্টাতেই কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না।

চারু। বিলেত পালাবার জন্যে তোমার মনটা বুঝি দৌড়চ্ছে? কেন, এখানে আমরা তোমাকে মারছিলুম না ধরছিলুম। হ্যাট কোট পরে সাহেব না সাজলে এখনকার ছেলেদের মন ওঠে না। ঠাকুরপো, বিলেত থেকে ফিরে এসে আমাদের মতো কালা আদমিদের চিনতে পারবে তো?

অমল কহিল, "তা হলে আর বিলেত যাওয়া কী করতে।"

ভূপতি হাসিয়া কহিল, "কালো রূপ ভোলবার জন্যেই তো সাত সমুদ্র পেরোনো। তা, ভয় কী চারু, আমরা রইলুম, কালোর ভক্তের অভাব হবে না।"

ভূপতি খুশি হইয়া তখনই বর্ধমানে চিঠি লিখিয়া পাঠাইল। বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ইতিমধ্যে কাগজখানা তুলিয়া দিতে হইল। ভূপতি খরচ আর জোগাইয়া উঠিতে পারিল না। লোকসাধারণ-নামক একটা বিপুল নির্মম পদার্থের যে সাধনায় ভূপতি দীর্ঘকাল দিনরাত্রি একান্ত মনে নিযুক্ত ছিল সেটা এক মুহূর্তে বিসর্জন দিতে হইল। ভূপতির জীবনে সমস্ত চেষ্টা যে অভ্যস্ত পথে গত বারো বৎসর অবিচ্ছেদে চলিয়া আসিতেছে সেটা হঠাৎ এক জায়গায় যেন জলের মাঝখানে আসিয়া পড়িল। ইহার জন্য ভূপতি কিছুমাত্র প্রস্তুত ছিল না। অকস্মাৎ-বাধাপ্রাপ্ত তাহার এতদিনকার সমস্ত উদ্যমকে সে কোথায় ফিরাইয়া লইয়া যাইবে। তাহারা যেন উপবাসী অনাথ শিশু-সন্তানদের মতো ভূপতির মুখের দিকে চাহিল, ভূপতি তাহাদিগকে আপন অন্তঃপুরে করুণাময়ী শুশ্রূষাপরায়ণা নারীর কাছে আনিয়া দাঁড় করাইল।

নারী তখন কী ভাবিতেছিল। সে মনে মনে বলিতেছিল 'এ কী আশ্চর্য, অমলের বিবাহ হইবে সে তো খুব ভালোই। কিন্তু এতকাল পরে আমাদের ছাড়িয়া পরের ঘরে বিবাহ করিয়া বিলাত চলিয়া যাইবে, ইহাতে তাহার মনে একবারও একটুখানির জন্য দ্বিধাও জন্মিল না? এতদিন ধরিয়া তাহাকে যে আমরা এত যত্ন করিয়া রাখিলাম,

আর যেমনি বিদায় লইবার একটুখানি ফাঁক পাইল অমনি কোমর বাঁধিয়া প্রস্তুত হইল, যেন এতদিন সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিল। অথচ মুখে কতই মিষ্ট, কতই ভালোবাসা। মানুষকে চিনিবার জো নাই। কে জানিত, যে লোক এত লিখিতে পারে তাহার হৃদয় কিছুমাত্র নাই।'

নিজের হৃদয়প্রাচুর্যের সহিত তুলনা করিয়া চারু অমলের শূন্য হৃদয়কে অত্যন্ত অবজ্ঞা করিতে অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। ভিতরে ভিতরে নিয়ত একটা বেদনার উদ্‌বেগ তপ্ত শূলের মতো তাহার অভিমানকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া তুলিতে লাগিল— 'অমল আজ বাদে কাল চলিয়া যাইবে, তবু এ কয়দিন তাহার দেখা নাই। আমাদের মধ্যে যে পরস্পর একটা মনান্তর হইয়াছে সেটা মিটাইয়া লইবার আর অবসরও হইল না।' চারু প্রতিক্ষণে মনে করে অমল আপনি আসিবে— তাহাদের এতদিনকার খেলাধুলা এমন করিয়া ভাঙিবে না, কিন্তু অমল আর আসেই না। অবশেষে যখন যাত্রার দিন অত্যন্ত নিকটবর্তী হইয়া আসিল তখন চারু নিজেই অমলকে ডাকিয়া পাঠাইল।

অমল বলিল,"আর একটু পরে যাচ্ছি।" চারু তাহাদের সেই বারান্দার চৌকিটাতে গিয়া বসিল। সকালবেলা হইতে ঘন মেঘ করিয়া গুমট হইয়া আছে— চারু তাহার খোলা চুল এলো করিয়া মাথায় জড়াইয়া একটা হাতপাখা লইয়া ক্লান্ত দেহে অল্প অল্প বাতাস করিতে লাগিল।

অত্যন্ত দেরি হইল। ক্রমে তাহার হাতপাখা আর চলিল না। রাগ দুঃখ অধৈর্য তাহার বুকের ভিতরে ফুটিয়া উঠিল। মনে মনে বলিল— নাই আসিল অমল, তাতেই বা কী। কিন্তু তবু পদশব্দ মাত্রেই তাহার মন দ্বারের দিকে ছুটিয়া যাইতে লাগিল।

দূর গির্জায় এগারোটা বাজিয়া গেল। স্নানান্তে এখনই ভূপতি খাইতে আসিবে। এখনো আধ ঘণ্টা সময় আছে, এখনো অমল যদি আসে। যেমন করিয়া হোক, তাহাদের কয়দিনকার নীরব ঝগড়া আজ মিটাইয়া ফেলিতেই হইবে— অমলকে এমনভাবে বিদায় দেওয়া যাইতে পারে না। এই সমবয়সি দেওর-ভাজের মধ্যে যে চিরন্তন মধুর সম্বন্ধটুকু আছে— অনেক ভাব, আড়ি, অনেক স্নেহের দৌরাত্ম্য, অনেক বিশ্রব্ধ সুখালোচনায় বিজড়িত একটি চিরচ্ছায়াময় লতাবিতান— অমল সে কি আজ ধুলায় লুটাইয়া দিয়া বহুদিনের জন্য বহুদূরে চলিয়া যাইবে। একটু পরিতাপ হইবে না? তাহার তলে কি শেষ জলও সিঞ্চন করিয়া যাইবে না— তাহাদের অনেকদিনের দেওর-ভাজ সম্বন্ধের শেষ অশ্রুজল!

আধঘণ্টা প্রায় অতীত হয়। এলো খোঁপা খুলিয়া খানিকটা চুলের গুচ্ছ চারু

দ্রুতবেগে আঙুলে জড়াইতে এবং খুলিতে লাগিল। অশ্রু সম্বরণ করা আর যায় না। চাকর আসিয়া কহিল, "মাঠাকরুন, বাবুর জন্যে ডাব বের করে দিতে হবে।"

চারু আঁচল হইতে ভাঁড়ারের চাবি খুলিয়া ঝন্‌ করিয়া চাকরের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিল— সে আশ্চর্য হইয়া চাবি লইয়া চলিয়া গেল।

চারুর বুকের কাছ হইতে কী একটা ঠেলিয়া কণ্ঠের কাছে উঠিয়া আসিতে লাগিল।

যথাসময়ে ভূপতি সহাস্যমুখে খাইতে আসিল। চারু পাখা হাতে আহারস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, অমল ভূপতির সঙ্গে আসিয়াছে। চারু তাহার মুখের দিকে চাহিল না।

অমল জিজ্ঞাসা করিল, "বোঠান, আমাকে ডাকছ?"

চারু কহিল, "না, এখন আর দরকার নেই।"

অমল। তা হলে আমি যাই, আমার আবার অনেক গোছাবার আছে।

চারু তখন দীপ্তচক্ষে একবার অমলের মুখের দিকে চাহিল; কহিল, "যাও।"

অমল চারুর মুখের দিকে একবার চাহিয়া চলিয়া গেল।

আহারান্তে ভূপতি কিছুক্ষণ চারুর কাছে বসিয়া থাকে। আজ দেনাপাওনা-হিসাবপত্রের হাঙ্গামে ভূপতি অত্যন্ত ব্যস্ত— তাই আজ অন্তঃপুরে বেশিক্ষণ থাকিতে পারিবে না বলিয়া কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, "আজ আর আমি বেশিক্ষণ বসতে পারছি নে— আজ অনেক ঝঞ্ঝাট।"

চারু বলিল, "তা যাও-না।"

ভূপতি ভাবিল, চারু অভিমান করিল। বলিল, "তাই বলে যে এখনই যেতে হবে তা নয়; একটু জিরিয়ে যেতে হবে।" বলিয়া বসিল। দেখিল চারু বিমর্ষ হইয়া আছে। ভূপতি অনুতপ্ত চিত্তে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল, কিন্তু কোনোমতেই কথা জমাইতে পারিল না। অনেকক্ষণ কথোপকথনের বৃথা চেষ্টা করিয়া ভূপতি কহিল, "অমল তো কাল চলে যাচ্ছে, কিছুদিন তোমার বোধ হয় খুব একলা বোধ হবে।"

চারু তাহার কোনো উত্তর না দিয়া যেন কী একটা আনিতে চট্‌ করিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল। ভূপতি কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বাহিরে প্রস্থান করিল।

চারু আজ অমলের মুখের দিকে চাহিয়া লক্ষ করিয়াছিল অমল এই কয়দিনেই অত্যন্ত রোগা হইয়া গেছে— তাহার মুখে তরুণতার সেই স্ফূর্তি একেবারে নাই। ইহাতে চারু সুখও পাইল বেদনাও বোধ করিল। আসন্ন বিচ্ছেদই যে অমলকে ক্লিষ্ট করিতেছে, চারুর তাহাতে সন্দেহ রহিল না— কিন্তু তবু অমলের এমন ব্যবহার

কেন। কেন সে দূরে দূরে পালাইয়া বেড়াইতেছে। বিদায়কালকে কেন সে ইচ্ছাপূর্বক এমন বিরোধতিক্ত করিয়া তুলিতেছে।

বিছানায় শুইয়া ভাবিতে ভাবিতে সে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া বসিল। হঠাৎ মন্দার কথা মনে পড়িল। যদি এমন হয়, অমল মন্দাকে ভালোবাসে। মন্দা চলিয়া গেছে বলিয়াই যদি অমল এমন করিয়া— ছি! অমলের মন কি এমন হইবে। এত ক্ষুদ্র? এমন কলুষিত? বিবাহিত রমণীর প্রতি তাহার মন যাইবে? অসম্ভব। সন্দেহকে একান্ত চেষ্টায় দূর করিয়া দিতে চাহিল কিন্তু সন্দেহ তাহাকে সবলে দংশন করিয়া রহিল।

এমনি করিয়া বিদায়কাল আসিল। মেঘ পরিষ্কার হইল না। অমল আসিয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "বোঠান, আমার যাবার সময় হয়েছে। তুমি এখন থেকে দাদাকে দেখো। তাঁর বড়ো সংকটের অবস্থা— তুমি ছাড়া তাঁর আর সান্ত্বনার কোনো পথ নেই।"

অমল ভূপতির বিষণ্ণ ম্লান ভাব দেখিয়া সন্ধান দ্বারা তাহার দুর্গতির কথা জানিতে পারিয়াছিল। ভূপতি যে কিরূপ নিঃশব্দে আপন দুঃখদুর্দশার সহিত একলা লড়াই করিতেছে, কাহারো কাছে সাহায্য বা সান্ত্বনা পায় নাই, অথচ আপন আশ্রিত পালিত আত্মীয়স্বজনদিগকে এই প্রলয়সংকটে বিচলিত হইতে দেয় নাই, ইহা সে চিন্তা করিয়া চুপ করিয়া রহিল। তার পরে সে চারুর কথা ভাবিল, নিজের কথা ভাবিল, কর্ণমূল লোহিত হইয়া উঠিল, সবেগে বলিল, 'চুলোয় যাক আষাঢ়ের চাঁদ আর অমাবস্যার আলো। আমি ব্যারিস্টার হয়ে এসে দাদাকে যদি সাহায্য করতে পারি তবেই আমি পুরুষমানুষ।'

গত রাত্রি সমস্ত রাত জাগিয়া চারু ভাবিয়া রাখিয়াছিল অমলকে বিদায়কালে কী কথা বলিবে— সহাস্য অভিমান এবং প্রফুল্ল ঔদাসীন্যের দ্বারা মাজিয়া মাজিয়া সেই কথাগুলিকে সে মনে মনে উজ্জ্বল ও শানিত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু বিদায় দিবার সময় চারুর মুখে কোনো কথাই বাহির হইল না। সে কেবল বলিল, "চিঠি লিখবে তো, অমল?"

অমল ভূমিতে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল, চারু ছুটিয়া শয়নঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ভূপতি বর্ধমানে গিয়া অমলের বিবাহ-অন্তে তাহাকে বিলাতে রওনা করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল।

নানা দিক হইতে ঘা খাইয়া বিশ্বাসপরায়ণ ভূপতির মনে বহিঃসংসারের প্রতি একটা বৈরাগ্যের ভাব আসিয়াছিল। সভাসমিতি মেলামেশা কিছুই তাহার ভালো লাগিত না। মনে হইল, 'এই-সব লইয়া আমি এতদিন কেবল নিজেকেই ফাঁকি দিলাম— জীবনের সুখের দিন বৃথা বহিয়া গেল এবং সারভাগ আবর্জনাকুণ্ডে ফেলিলাম।'

ভূপতি মনে মনে কহিল, 'যাক, কাগজটা গেল, ভালোই হইল। মুক্তিলাভ করিলাম।' সন্ধ্যার সময় আঁধারের সূত্রপাত দেখিলেই পাখি যেমন করিয়া নীড়ে ফিরিয়া আসে, ভূপতি সেইরূপ তাহার দীর্ঘদিনের সঞ্চরণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরে চারুর কাছে চলিয়া আসিল। মনে মনে স্থির করিল, 'বাস্‌, এখন আর-কোথাও নয়; এইখানেই আমার স্থিতি। যে কাগজের জাহাজটা লইয়া সমস্তদিন খেলা করিতাম সেটা ডুবিল, এখন ঘরে চলি।'

বোধ করি ভূপতির একটা সাধারণ সংস্কার ছিল, স্ত্রীর উপর অধিকার কাহাকেও অর্জন করিতে হয় না, স্ত্রী ধ্রুবতারার মতো নিজের আলো নিজেই জ্বালাইয়া রাখে— হাওয়ায় নেবে না, তেলের অপেক্ষা রাখে না। বাহিরে যখন ভাঙচুর আরম্ভ হইল তখন অন্তঃপুরে কোনো খিলানে ফাটল ধরিয়াছে কি না তাহা একবার পরখ করিয়া দেখার কথাও ভূপতির মনে স্থান পায় নাই।

ভূপতি সন্ধ্যার সময় বর্ধমান হইতে বাড়ি ফিরিয়া আসিল। তাড়াতাড়ি মুখহাত ধুইয়া সকাল সকাল খাইল। অমলের বিবাহ ও বিলাতযাত্রার আদ্যোপান্ত বিবরণ শুনিবার জন্য স্বভাবতই চারু একান্ত উৎসুক হইয়া আছে স্থির করিয়া ভূপতি আজ কিছুমাত্র বিলম্ব করিল না। ভূপতি শোবার ঘরে বিছানায় গিয়া শুইয়া গুড়গুড়ির সুদীর্ঘ নল টানিতে লাগিল। চারু এখনো অনুপস্থিত, বোধ করি গৃহকার্য করিতেছে। তামাক পুড়িয়া শ্রান্ত ভূপতির ঘুম আসিতে লাগিল। ক্ষণে ক্ষণে ঘুমের ঘোর ভাঙিয়া চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়া সে ভাবিতে লাগিল, এখনো চারু আসিতেছে না কেন। অবশেষে ভূপতি থাকিতে না পারিয়া চারুকে ডাকিয়া পাঠাইল। ভূপতি জিজ্ঞাসা করিল, "চারু, আজ যে এত দেরি করলে?"

চারু তাহার জবাবদিহি না করিয়া কহিল, "হাঁ, আজ দেরি হয়ে গেল।"

চারুর আগ্রহপূর্ণ প্রশ্নের জন্য ভূপতি অপেক্ষা করিয়া রহিল; চারু কোনো প্রশ্ন

করিল না। ইহাতে ভূপতি কিছু ক্ষুণ্ণ হইল। তবে কি চারু অমলকে ভালোবাসে না। অমল যতদিন উপস্থিত ছিল ততদিন চারু তাহাকে লইয়া আমোদ-আহ্লাদ করিল, আর যেই চলিয়া গেল অমনি তাহার সম্বন্ধে উদাসীন! এইরূপ বিসদৃশ ব্যবহারে ভূপতির মনে খটকা লাগিল, সে ভাবিতে লাগিল— তবে কি চারুর হৃদয়ের গভীরতা নাই। কেবল সে আমোদ করিতেই জানে, ভালোবাসিতে পারে না? মেয়েমানুষের পক্ষে এরূপ নিরাসক্ত ভাব তো ভালো নয়।

চারু ও অমলের সখিত্বে ভূপতি আনন্দ বোধ করিত। এই দুইজনের ছেলেমানুষি আড়ি ও ভাব, খেলা ও মন্ত্রণা তাহার কাছে সুমিষ্ট কৌতুকাবহ ছিল; অমলকে চারু সর্বদা যে যত্ন আদর করিত তাহাতে চারুর সুকোমল হৃদয়ালুতার পরিচয় পাইয়া ভূপতি মনে মনে খুশি হইত। আজ আশ্চর্য হইয়া ভাবিতে লাগিল, সে সমস্তই কি ভাসা-ভাসা, হৃদয়ের মধ্যে তাহার কোনো ভিত্তি ছিল না? ভূপতি ভাবিল, চারুর হৃদয় যদি না থাকে তবে কোথায় ভূপতি আশ্রয় পাইবে।

অল্পে অল্পে পরীক্ষা করিবার জন্য ভূপতি কথা পাড়িল, "চারু, তুমি ভালো ছিলে তো? তোমার শরীর খারাপ নেই?"

চারু সংক্ষেপে উত্তর করিল, "ভালোই আছি।"

ভূপতি। অমলের তো বিয়ে চুকে গেল।

এই বলিয়া ভূপতি চুপ করিল; চারু তৎকালোচিত একটা কোনো সংগত কথা বলিতে অনেক চেষ্টা করিল, কোনো কথাই বাহির হইল না; সে আড়ষ্ট হইয়া রহিল।

ভূপতি স্বভাবতই কখনো কিছু লক্ষ্য করিয়া দেখে না— কিন্তু অমলের বিদায়শোক তাহার নিজের মনে লাগিয়া আছে বলিয়াই চারুর ঔদাসীন্য তাহাকে আঘাত করিল। তাহার ইচ্ছা ছিল, সমবেদনায় ব্যথিত চারুর সঙ্গে অমলের কথা আলোচনা করিয়া সে হৃদয়ভার লাঘব করিবে।

ভূপতি। মেয়েটিকে দেখতে বেশ।— চারু, ঘুমোচ্ছ?

চারু কহিল, "না।"

ভূপতি। বেচারা অমল একলা চলে গেল। যখন তাকে গাড়িতে উঠিয়ে দিলুম, সে ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে লাগল— দেখে এই বুড়োবয়সে আমি আর চোখের জল রাখতে পারলুম না। গাড়িতে দুজন সাহেব ছিল, পুরুষমানুষের কান্না দেখে তাদের ভারি আমোদ বোধ হল।

নির্বাণদীপ শয়নঘরে বিছানার অন্ধকারের মধ্যে চারু প্রথমে পাশ ফিরিয়া শুইল,

তাহার পর হঠাৎ তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ভূপতি চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "চারু, অসুখ করেছে ?"

কোনো উত্তর না পাইয়া সেও উঠিল। পাশে বারান্দা হইতে চাপা কান্নার শব্দ শুনিতে পাইয়া ত্রস্তপদে গিয়া দেখিল, চারু মাটিতে পড়িয়া উপুড় হইয়া কান্না রোধ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

এরূপ দুরন্ত শোকোচ্ছ্বাস দেখিয়া ভূপতি আশ্চর্য হইয়া গেল। ভাবিল, চারুকে কী ভুল বুঝিয়াছিলাম। চারুর স্বভাব এতই চাপা যে, আমার কাছেও হৃদয়ের কোনো বেদনা প্রকাশ করিতে চাহে না। যাহাদের প্রকৃতি এইরূপ তাহাদের ভালোবাসা সুগভীর এবং তাহাদের বেদনাও অত্যন্ত বেশি। চারুর প্রেম সাধারণ স্ত্রীলোকদের ন্যায় বাহির হইতে তেমন পরিদৃশ্যমান নহে, ভূপতি তাহা মনে মনে ঠাহর করিয়া দেখিল। ভূপতি চারুর ভালোবাসার উচ্ছ্বাস কখনো দেখে নাই; আজ বিশেষ করিয়া বুঝিল, তাহার কারণ অন্তরের দিকেই চারুর ভালোবাসার গোপন প্রসার। ভূপতি নিজেও বাহিরে প্রকাশ করিতে অপটু; চারুর প্রকৃতিতেও হৃদয়াবেগের সুগভীর অন্তঃশীলতার পরিচয় পাইয়া সে একটা তৃপ্তি অনুভব করিল।

ভূপতি তখন চারুর পাশে বসিয়া কোনো কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। কী করিয়া সান্ত্বনা করিতে হয় ভূপতির তাহা জানা ছিল না— ইহা সে বুঝিল না, শোককে যখন কেহ অন্ধকারে কণ্ঠ চাপিয়া হত্যা করিতে চাহে তখন সাক্ষী বসিয়া থাকিলে ভালো লাগে না।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

ভূপতি যখন তাহার খবরের কাগজ হইতে অবসর লইল তখন নিজের ভবিষ্যতের একটা ছবি নিজের মনের মধ্যে আঁকিয়া লইয়াছিল। প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, কোনো প্রকার দুরাশা-দুশ্চেষ্টায় যাইবে না, চারুকে লইয়া পড়াশুনা ভালোবাসা এবং প্রতিদিনের ছোটোখাটো গার্হস্থ্য কর্তব্য পালন করিয়া চলিবে। মনে করিয়াছিল, যে-সকল ঘোরো সুখ সব চেয়ে সুলভ অথচ সুন্দর, সর্বদাই নাড়াচাড়ার যোগ্য অথচ পবিত্র নির্মল, সেই সহজলভ্য সুখগুলির দ্বারা তাহার জীবনের গৃহকোণটিতে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালাইয়া নিভৃত শান্তির অবতারণা করিবে। হাসি গল্প পরিহাস, পরস্পরের মনোরঞ্জনের জন্য প্রত্যহ ছোটোখাটো আয়োজন, ইহাতে অধিক চেষ্টা আবশ্যক হয় না অথচ সুখ অপর্যাপ্ত হইয়া উঠে।

কার্যকালে দেখিল, সহজ সুখ সহজ নহে। যাহা মূল্য দিয়া কিনিতে হয় না তাহা যদি আপনি হাতের কাছে না পাওয়া যায় তবে আর কোনোমতেই কোথাও খুঁজিয়া পাইবার উপায় থাকে না।

ভূপতি কোনোমতেই চারুর সঙ্গে বেশ করিয়া জমাইয়া লইতে পারিল না। ইহাতে সে নিজেকেই দোষ দিল। ভাবিল, 'বারো বৎসর কেবল খবরের কাগজ লিখিয়া, স্ত্রীর সঙ্গে কী করিয়া গল্প করিতে হয় সে বিদ্যা একেবারে খোয়াইয়াছি।' সন্ধ্যাদীপ জ্বালিতেই ভূপতি আগ্রহের সহিত ঘরে যায়— সে দুই-একটা কথা বলে, চারু দুই-একটা কথা বলে, তার পরে কী বলিবে ভূপতি কোনোমতেই ভাবিয়া পায় না। নিজের এই অক্ষমতায় স্ত্রীর কাছে সে লজ্জা বোধ করিতে থাকে। স্ত্রীকে লইয়া গল্প করা সে এতই সহজ মনে করিয়াছিল অথচ মূঢ়ের নিকট ইহা এতই শক্ত! সভাস্থলে বক্তৃতা করা ইহার চেয়ে সহজ।

যে সন্ধ্যাবেলাকে ভূপতি হাস্যে কৌতুকে প্রণয়ে আদরে রমণীয় করিয়া তুলিবে কল্পনা করিয়াছিল, সেই সন্ধ্যাবেলা কাটানো তাহাদের পক্ষে সমস্যার স্বরূপ হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ চেষ্টাপূর্ণ মৌনের পর ভূপতি মনে করে 'উঠিয়া যাই'— কিন্তু উঠিয়া গেলে চারু কী মনে করিবে এই ভাবিয়া উঠিতেও পারে না। বলে, "চারু, তাস খেলবে?" চারু অন্য কোনো গতি না দেখিয়া বলে, আচ্ছা। বলিয়া অনিচ্ছাক্রমে তাস পাড়িয়া আনে, নিতান্ত ভুল করিয়া অনায়াসেই হারিয়া যায়— সে খেলায় কোনো সুখ থাকে না।

ভূপতি অনেক ভাবিয়া একদিন চারুকে জিজ্ঞাসা করিল, "চারু, মন্দাকে আনিয়া নিলে হয় না? তুমি নিতান্ত একলা পড়েছ।"

চারু মন্দার নাম শুনিয়াই জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, "না, মন্দাকে আমার দরকার নেই।"

ভূপতি হাসিল। মনে মনে খুশি হইল। সাধ্বীরা যেখানে সতীধর্মের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখে সেখানে ধৈর্য রাখিতে পারে না।

বিদ্বেষের প্রথম ধাক্কা সামলাইয়া চারু ভাবিল, মন্দা থাকিলে সে হয়তো ভূপতিকে অনেকটা আমোদে রাখিতে পারিবে। ভূপতি তাহার নিকট হইতে যে মনের সুখ চায় সে তাহা কোনোমতে দিতে পারিতেছে না, ইহা চারু অনুভব করিয়া পীড়া বোধ করিতেছিল। ভূপতি জগৎসংসারের আর-সমস্ত ছাড়িয়া একমাত্র চারুর নিকট হইতেই তাহার জীবনের সমস্ত আনন্দ আকর্ষণ করিয়া লইতে চেষ্টা করিতেছে, এই একাগ্র চেষ্টা দেখিয়া ও নিজের অন্তরের দৈন্য উপলব্ধি করিয়া চারু ভীত হইয়া

পড়িয়াছিল। এমন করিয়া কতদিন কিরূপে চলিবে। ভূপতি আর কিছু অবলম্বন করে না কেন। আর-একটা খবরের কাগজ চালায় না কেন। ভূপতির চিত্তরঞ্জন করিবার অভ্যাস এ পর্যন্ত চারুকে কখনো করিতে হয় নাই, ভূপতি তাহার কাছে কোনো সেবা দাবি করে নাই, কোনো সুখ প্রার্থনা করে নাই, চারুকে সে সর্বতোভাবে নিজের প্রয়োজনীয় করিয়া তোলে নাই; আজ হঠাৎ তাহার জীবনের সমস্ত প্রয়োজন চারুর নিকট চাহিয়া বসাতে সে কোথাও কিছু যেন খুঁজিয়া পাইতেছে না। ভূপতির কী চাই, কী হইলে সে তৃপ্ত হয়, তাহা চারু ঠিকমত জানে না এবং জানিলেও তাহা চারুর পক্ষে সহজে আয়ত্তগম্য নহে।

ভূপতি যদি অল্পে অল্পে অগ্রসর হইত তবে চারুর পক্ষে হয়তো এত কঠিন হইত না। কিন্তু হঠাৎ এক রাত্রে দেউলিয়া হইয়া রিক্ত ভিক্ষাপাত্র পাতিয়া বসাতে সে যেন বিব্রত হইয়াছে।

চারু কহিল, "আচ্ছা, মন্দাকে আনিয়ে নাও, সে থাকলে তোমার দেখাশুনোর অনেক সুবিধে হতে পারবে।"

ভূপতি হাসিয়া কহিল, "আমার দেখাশুনো! কিছু দরকার নেই।"

ভূপতি ক্ষুণ্ণ হইয়া ভাবিল, 'আমি বড়ো নীরস লোক, চারুকে কিছুতেই আমি সুখী করিতে পারিতেছি না।'

এই ভাবিয়া সে সাহিত্য লইয়া পড়িল। বন্ধুরা কখনো বাড়ি আসিলে বিস্মিত হইয়া দেখিত, ভূপতি টেনিসন, বাইরন, বঙ্কিমের গল্প এই সমস্ত লইয়া আছে। ভূপতির এই অকাল-কাব্যানুরাগ দেখিয়া বন্ধুবান্ধবেরা অত্যন্ত ঠাট্টাবিদ্রূপ করিতে লাগিল। ভূপতি হাসিয়া কহিল, "ভাই, বাঁশের ফুলও ধরে, কিন্তু কখন ধরে তার ঠিক নেই।"

একদিন সন্ধ্যাবেলায় শোবার ঘরে বড়ো বাতি জ্বালাইয়া ভূপতি প্রথমে লজ্জায় একটু ইতস্তত করিল; পরে কহিল, "একটা কিছু পড়ে শোনাব?"

চারু কহিল, "শোনাও-না।"

ভূপতি। কী শোনাব।

চারু। তোমার যা ইচ্ছে।

ভূপতি চারুর অধিক আগ্রহ না দেখিয়া একটু দমিল। তবু সাহস করিয়া কহিল, "টেনিসন থেকে একটা কিছু তর্জমা করে তোমাকে শোনাই।"

চারু কহিল, "শোনাও।"

সমস্তই মাটি হইল। সংকোচ ও নিরুৎসাহে ভূপতির পড়া বাধিয়া যাইতে

লাগিল, ঠিকমত বাংলা প্রতিশব্দ জোগাইল না। চারুর শূন্যদৃষ্টি দেখিয়া বোঝা গেল, সে মন দিতেছে না। সেই দীপালোকিত ছোটো ঘরটি, সেই সন্ধ্যাবেলাকার নিভৃত অবকাশটুকু তেমন করিয়া ভরিয়া উঠিল না।

ভূপতি আরো দুই-একবার এই ভ্রম করিয়া অবশেষে স্ত্রীর সহিত সাহিত্য-চর্চার চেষ্টা পরিত্যাগ করিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

যেমন গুরুতর আঘাতে স্নায়ু অবশ হইয়া যায় এবং প্রথমটা বেদনা টের পাওয়া যায় না, সেইরূপ বিচ্ছেদের আরম্ভকালে অমলের অভাব চারু ভালো করিয়া যেন উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

অবশেষে যতই দিন যাইতে লাগিল ততই অমলের অভাবে সাংসারিক শূন্যতার পরিমাপ ক্রমাগতই যেন বাড়িতে লাগিল। এই ভীষণ আবিষ্কারে চারু হতবুদ্ধি হইয়া গেছে। নিকুঞ্জবন হইতে বাহির হইয়া সে হঠাৎ এ কোন্ মরুভূমির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে— দিনের পর দিন যাইতেছে, মরুপ্রান্তর ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে। এ মরুভূমির কথা সে কিছুই জানিত না।

ঘুম থেকে উঠিয়াই হঠাৎ বুকের মধ্যে ধক্ করিয়া উঠে— মনে পড়ে, অমল নাই। সকালে যখন সে বারান্দায় পান সাজিতে বসে, ক্ষণে ক্ষণে কেবলই মনে হয়, অমল পশ্চাৎ হইতে আসিবে না। এক-একসময় অন্যমনস্ক হইয়া বেশি পান সাজিয়া ফেলে, সহসা মনে পড়ে, বেশি পান খাইবার লোক নাই। যখনই ভাঁড়ারঘরে পদার্পণ করে মনে উদয় হয়, অমলের জন্য জলখাবার দিতে হইবে না। মনের অধৈর্য অন্তঃপুরের সীমান্তে আসিয়া তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেয়, অমল কলেজ হইতে আসিবে না। কোনো একটা নূতন বই, নূতন লেখা, নূতন খবর, নূতন কৌতুক প্রত্যাশা করিবার নাই; কাহারো জন্য কোনো সেলাই করিবার, কোনো লেখা লিখিবার, কোনো শৌখিন জিনিস কিনিয়া রাখিবার নাই।

নিজের অসহ্য কষ্টে ও চাঞ্চল্যে চারু নিজে বিস্মিত। মনোবেদনার অবিশ্রাম পীড়নে তাহার ভয় হইল। নিজে কেবলই প্রশ্ন করিতে লাগিল, 'কেন। এত কষ্ট কেন হইতেছে। অমল আমার এতই কী যে, তাহার জন্য এত দুঃখ ভোগ করিব। আমার কী হইল, এতদিন পরে আমার এ কী হইল। দাসী চাকর রাস্তার মুটেমজুর-গুলাও নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিতেছে, আমার এমন হইল কেন। ভগবান হরি, আমাকে এমন বিপদে কেন ফেলিলে।'

কেবলই প্রশ্ন করে এবং আশ্চর্য হয়, কিন্তু দুঃখের কোনো উপশম হয় না। অমলের স্মৃতিতে তাহার অন্তর-বাহির এমনি পরিব্যাপ্ত যে, কোথাও সে পালাইবার স্থান পায় না।

ভূপতি কোথায় অমলের স্মৃতির আক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবে, তাহা না করিয়া সেই বিচ্ছেদব্যথিত স্নেহশীল মূঢ় কেবলই অমলের কথাই মনে করাইয়া দেয়।

অবশেষে চারু একেবারে হাল ছাড়িয়া দিল – নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করায় ক্ষান্ত হইল; হার মানিয়া নিজের অবস্থাকে অবিরোধে গ্রহণ করিল। অমলের স্মৃতিকে যত্নপূর্বক হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইল।

ক্রমে এমনি হইয়া উঠিল, একাগ্রচিত্তে অমলের ধ্যান তাহার গোপন গর্বের বিষয় হইল— সেই স্মৃতিই যেন তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরব।

গৃহকার্যের অবকাশে একটা সময় সে নির্দিষ্ট করিয়া লইল। সেই সময় নির্জনে গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া অমলের সহিত তাহার নিজ জীবনের প্রত্যেক ঘটনা চিন্তা করিত। উপুড় হইয়া বালিশের উপর মুখ রাখিয়া বারবার করিয়া বলিত, "অমল, অমল, অমল!" সমুদ্র পার হইয়া যেন শব্দ আসিত, "বোঠান, কী বোঠান।" চারু সিক্ত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিত, "অমল, তুমি রাগ করিয়া চলিয়া গেলে কেন। আমি তো কোনো দোষ করি নাই। তুমি যদি ভালোমুখে বিদায় লইয়া যাইতে, তাহা হইলে বোধ হয় আমি এত দুঃখ পাইতাম না।" অমল সম্মুখে থাকিলে যেমন কথা হইত চারু ঠিক তেমনি করিয়া কথাগুলি উচ্চারণ করিয়া বলিত, "অমল, তোমাকে আমি একদিনও ভুলি নাই। একদিনও না, একদণ্ডও না। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পদার্থ সমস্ত তুমিই ফুটাইয়াছ, আমার জীবনের সারভাগ দিয়া প্রতিদিন তোমার পূজা করিব।"

এইরূপে চারু তাহার সমস্ত ঘরকন্না তাহার সমস্ত কর্তব্যের অন্তঃস্তরের তলদেশে সুড়ঙ্গ খনন করিয়া সেই নিরালোক নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে অশ্রুমালাসজ্জিত একটি গোপন শোকের মন্দির নির্মাণ করিয়া রাখিল। সেখানে তাহার স্বামী বা পৃথিবীর আর-কাহারো কোনো অধিকার রহিল না। সেই স্থানটুকু যেমন গোপনতম, তেমনি গভীরতম, তেমনি প্রিয়তম। তাহারই দ্বারে সে সংসারের সমস্ত ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া নিজের অনাবৃত আত্মস্বরূপে প্রবেশ করে এবং সেখান হইতে বাহির হইয়া মুখোশখানা আবার মুখে দিয়া পৃথিবীর হাস্যালাপ ও ক্রিয়াকর্মের রঙ্গভূমির মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

এইরূপে মনের সহিত দ্বন্দ্ববিবাদ ত্যাগ করিয়া চারু তাহার বৃহৎ বিষাদের মধ্যে একপ্রকার শান্তিলাভ করিল এবং একনিষ্ঠ হইয়া স্বামীকে ভক্তি ও যত্ন করিতে লাগিল। ভূপতি যখন নিদ্রিত থাকিত চারু তখন ধীরে ধীরে তাহার পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া পায়ের ধুলা সীমন্তে তুলিয়া লইত। সেবাশুশ্রূষায় গৃহকর্মে স্বামীর লেশমাত্র ইচ্ছা সে অসম্পূর্ণ রাখিত না। আশ্রিত প্রতিপালিত ব্যক্তিদের প্রতি কোনোপ্রকার অযত্নে ভূপতি দুঃখিত হইত জানিয়া, চারু তাহাদের প্রতি আতিথ্যে তিলমাত্র ত্রুটি ঘটিতে দিত না। এইরূপে সমস্ত কাজকর্ম সারিয়া ভূপতির উচ্ছিষ্ট প্রসাদ খাইয়া চারুর দিন শেষ হইয়া যাইত।

এই সেবা ও যত্নে ভগ্নশ্রী ভূপতি যেন নবযৌবন ফিরিয়া পাইল। স্ত্রীর সহিত পূর্বে যেন তাহার নববিবাহ হয় নাই, এতদিন পরে যেন হইল। সাজসজ্জায় হাস্যে পরিহাসে বিকশিত হইয়া সংসারের সমস্ত দুর্ভাবনাকে ভূপতি মনের একপাশে ঠেলিয়া রাখিয়া দিল। রোগ-আরামের পর যেমন ক্ষুধা বাড়িয়া উঠে, শরীরে ভোগশক্তির বিকাশকে সচেতনভাবে অনুভব করা যায়, ভূপতির মনে এতকাল পরে সেইরূপ একটা অপূর্ব এবং প্রবল ভাবাবেশের সঞ্চার হইল। বন্ধুদিগকে, এমন-কি, চারুকে লুকাইয়া ভূপতি কেবল কবিতা পড়িতে লাগিল। মনে মনে কহিল, 'কাগজখানা গিয়া এবং অনেক দুঃখ পাইয়া এতদিন পরে আমি আমার স্ত্রীকে আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি।'

ভূপতি চারুকে বলিল, "চারু, তুমি আজকাল লেখা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছ কেন।"

চারু বলিল, "ভারি তো আমার লেখা।"

ভূপতি। সত্যি কথা বলছি, তোমার মতো অমন বাংলা এখনকার লেখকদের মধ্যে আমি তো আর কারো দেখি নি। 'বিশ্ববন্ধু'তে যা লিখেছিল আমারও ঠিক তাই মত।

চারু। আঃ, থামো।

ভূপতি "এই দেখো-না" বলিয়া একখণ্ড 'সরোরুহ' বাহির করিয়া চারু ও অমলের ভাষার তুলনা করিতে আরম্ভ করিল। চারু আরক্তমুখে ভূপতির হাত হইতে কাগজ কাড়িয়া লইয়া অঞ্চলের মধ্যে আচ্ছাদন করিয়া রাখিল।

ভূপতি মনে মনে ভাবিল, 'লেখার সঙ্গী একজন না থাকিলে লেখা বাহির হয় না;

রোসো, আমাকে লেখাটা অভ্যাস করিতে হইবে, তাহা হইলে ক্রমে চারুরও লেখার উৎসাহ সঞ্চার করিতে পারিব।'

ভূপতি অত্যন্ত গোপনে খাতা লইয়া লেখা অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিল। অভিধান দেখিয়া পুনঃপুনঃ কাটিয়া, বারবার কাপি করিয়া ভূপতির বেকার অবস্থার দিনগুলি কাটিতে লাগিল। এত কষ্টে এত চেষ্টায় তাহাকে লিখিতে হইতেছে যে, সেই বহু দুঃখের রচনাগুলির প্রতি ক্রমে তাহার বিশ্বাস ও মমতা জন্মিল।

অবশেষে একদিন তাহার লেখা আর-একজনকে দিয়া নকল করাইয়া ভূপতি স্ত্রীকে লইয়া দিল। কহিল, "আমার এক বন্ধু নতুন লিখতে আরম্ভ করেছে। আমি তো কিছু বুঝি নে, তুমি একবার পড়ে দেখো দেখি তোমার কেমন লাগে।"

খাতাখানা চারুর হাতে দিয়া সাধ্বসে ভূপতি বাহিরে চলিয়া গেল। সরল ভূপতির এই ছলনাটুকু চারুর বুঝিতে বাকি রহিল না।

পড়িল; লেখার ছাঁদ এবং বিষয় দেখিয়া একটুখানি হাসিল। হায়! চারু তাহার স্বামীকে ভক্তি করিবার জন্য এত আয়োজন করিতেছে, সে কেন এমন ছেলেমানুষি করিয়া পূজার অর্ঘ্য ছড়াইয়া ফেলিতেছে। চারুর কাছে বাহবা আদায় করিবার জন্য তাহার এত চেষ্টা কেন। সে যদি কিছুই না করিত, চারুর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য সর্বদাই তাহার যদি প্রয়াস না থাকিত, তবে স্বামীর পূজা চারুর পক্ষে সহজসাধ্য হইত। চারুর একান্ত ইচ্ছা, ভূপতি কোনো অংশেই নিজেকে চারুর অপেক্ষা ছোটো না করিয়া ফেলে।

চারু খাতাখানা মুড়িয়া বালিশে হেলান দিয়া দূরের দিকে চাহিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতে লাগিল। অমলও তাহাকে নূতন লেখা পড়িবার জন্য আনিয়া দিত।

সন্ধ্যাবেলায় উৎসুক ভূপতি শয়নগৃহের সম্মুখবর্তী বারান্দায় ফুলের টব-পর্যবেক্ষণে নিযুক্ত হইল, কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না।

চারু আপনি বলিল, "এ কি তোমার বন্ধুর প্রথম লেখা।"

ভূপতি কহিল, "হাঁ।"

চারু। এত চমৎকার হয়েছে— প্রথম লেখা বলে মনেই হয় না।

ভূপতি অত্যন্ত খুশি হইয়া ভাবিতে লাগিল, বেনামি লেখাটায় নিজের নামজারি করা যায় কী উপায়ে।

ভূপতির খাতা ভয়ংকর দ্রুতগতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। নাম প্রকাশ হইতেও বিলম্ব হইল না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বিলাত হইতে চিঠি আসিবার দিন কবে, এ খবর চারু সর্বদাই রাখিত। প্রথমে এডেন হইতে ভূপতির নামে একখানা চিঠি আসিল, তাহাতে অমল বউঠানকে প্রণাম নিবেদন করিয়াছে ; সুয়েজ হইতেও ভূপতির চিঠি আসিল, বউঠান তাহার মধ্যেও প্রণাম পাইল। মাল্টা হইতে চিঠি পাওয়া গেল, তাহাতেও পুনশ্চ নিবেদনে বউঠানের প্রণাম আসিল।

চারু অমলের একখানা চিঠিও পাইল না। ভূপতির চিঠিগুলি চাহিয়া লইয়া উলটিয়া পালটিয়া বারবার করিয়া পড়িয়া দেখিল— প্রণামজ্ঞাপন ছাড়া আর কোথাও তাহার সম্বন্ধে আভাসমাত্রও নাই।

চারু এই কয়দিন যে একটি শান্ত বিষাদের চন্দ্রাতপচ্ছায়ার আশ্রয় লইয়াছিল অমলের এই উপেক্ষায় তাহা ছিন্ন হইয়া গেল। অন্তরের মধ্যে তাহার হৃৎপিণ্ডটা লইয়া আবার যেন ছেঁড়াছেঁড়ি আরম্ভ হইল। তাহার সংসারের কর্তব্যস্থিতির মধ্যে আবার ভূমিকম্পের আন্দোলন জাগিয়া উঠিল।

এখন ভূপতি এক-একদিন অর্ধরাত্রে উঠিয়া দেখে, চারু বিছানায় নাই। খুঁজিয়া খুঁজিয়া দেখে, চারু দক্ষিণের ঘরের জানালায় বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া চারু তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলে, "ঘরে আজ যে গরম, তাই একটু বাতাসে এসেছি।"

ভূপতি উদ্‌বিগ্ন হইয়া বিছানায় পাখা টানার বন্দোবস্ত করিয়া দিল, এবং চারুর স্বাস্থ্যভঙ্গ আশঙ্কা করিয়া সর্বদাই তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিল। চারু হাসিয়া বলিত, "আমি বেশ আছি, তুমি কেন মিছামিছি ব্যস্ত হও।" এই হাসিটুকু ফুটাইয়া তুলিতে তাহার বক্ষের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে হইত।

অমল বিলাতে পৌঁছিল। চারু স্থির করিয়াছিল, পথে তাহাকে স্বতন্ত্র চিঠি লিখিবার যথেষ্ট সুযোগ হয়তো ছিল না, বিলাতে পৌঁছিয়া অমল লম্বা চিঠি লিখিবে। কিন্তু সে লম্বা চিঠি আসিল না।

প্রত্যেক মেল আসিবার দিনে চারু তাহার সমস্ত কাজকর্ম কথাবার্তার মধ্যে ভিতরে ভিতরে ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকিত। পাছে ভূপতি বলে, 'তোমার নামে চিঠি নাই' এইজন্য সাহস করিয়া ভূপতিকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারিত না।

এমন অবস্থায় একদিন চিঠি আসিবার দিনে ভূপতি মন্দগমনে আসিয়া মৃদুহাস্যে কহিল, "একটা জিনিস আছে, দেখবে ?"

চারু ব্যস্তসমস্ত চমকিত হইয়া কহিল, "কই দেখাও।"

ভূপতি পরিহাসপূর্বক দেখাইতে চাহিল না।

চারু অধীর হইয়া ভূপতির চাদরের মধ্য হইতে বাঞ্ছিত পদার্থ কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল। সে মনে মনে ভাবিল, 'সকাল হইতেই আমার মন বলিতেছে, আজ আমার চিঠি আসিবেই— এ কখনো ব্যর্থ হইতে পারে না।'

ভূপতির পরিহাসস্পৃহা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল; সে চারুকে এড়াইয়া খাটের চারি দিকে ফিরিতে লাগিল।

তখন চারু একান্ত বিরক্তির সহিত খাটের উপর বসিয়া চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া তুলিল।

চারুর একান্ত আগ্রহে ভূপতি অত্যন্ত খুশি হইয়া চাদরের ভিতর হইতে নিজের রচনার খাতাখানা বাহির করিয়া তাড়াতাড়ি চারুর কোলে দিয়া কহিল, "রাগ কোরো না। এই নাও।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

অমল যদিও ভূপতিকে জানাইয়াছিল যে, পড়াশুনার তাড়ায় সে দীর্ঘকাল পত্র লিখিতে সময় পাইবে না, তবু দুই-এক মেল তাহার পত্র না আসাতে সমস্ত সংসার চারুর পক্ষে কণ্টকশয্যা হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যাবেলায় পাঁচ কথার মধ্যে চারু অত্যন্ত উদাসীনভাবে শান্তস্বরে তাহার স্বামীকে কহিল, "আচ্ছা দেখো, বিলেতে একটা টেলিগ্রাফ করে জানলে হয় না, অমল কেমন আছে?"

ভূপতি কহিল, "দুই হপ্তা আগে তার চিঠি পাওয়া গেছে, সে এখন পড়ায় ব্যস্ত।"

চারু। ওঃ, তবে কাজ নেই। আমি ভাবছিলুম, বিদেশে আছে, যদি ব্যামোস্যামো হয়— বলা তো যায় না।

ভূপতি। নাঃ, তেমন কোনো ব্যামো হলে খবর পাওয়া যেত। টেলিগ্রাফ করাও তো কম খরচা নয়।

চারু। তাই নাকি। আমি ভেবেছিলুম, বড়ো জোর এক টাকা কি দু টাকা লাগবে।

ভূপতি। বল কী, প্রায় একশো টাকার ধাক্কা।

চারু। তা হলে তো কথাই নেই।

দিন দুয়েক পরে চারু ভূপতিকে বলিল, "আমার বোন এখন চুঁচড়োয় আছে, আজ একবার তার খবর নিয়ে আসতে পার?"

ভূপতি। কেন। কোনো অসুখ করেছে নাকি?

চারু। না, অসুখ না, জানই তো তুমি গেলে তারা কত খুশি হয়।

ভূপতি চারুর অনুরোধে গাড়ি চড়িয়া হাবড়া-স্টেশন-অভিমুখে ছুটিল। পথে একসার গোরুর গাড়ি আসিয়া তাহার গাড়ি আটক করিল।

এমন সময় পরিচিত টেলিগ্রাফের হরকরা ভূপতিকে দেখিয়া তাহার হাতে একখানা টেলিগ্রাফ লইয়া দিল। বিলাতের টেলিগ্রাম দেখিয়া ভূপতি ভারি ভয় পাইল। ভাবিল, অমলের হয়তো অসুখ করিয়াছে। ভয়ে ভয়ে খুলিয়া দেখিল টেলিগ্রামে লেখা আছে, 'আমি ভালো আছি।'

ইহার অর্থ কী। পরীক্ষা করিয়া দেখিল, ইহা প্রী-পেড টেলিগ্রামের উত্তর।

হাওড়া যাওয়া হইল না। গাড়ি ফিরাইয়া ভূপতি বাড়ি আসিয়া স্ত্রীর হাতে টেলিগ্রাম দিল। ভূপতির হাতে টেলিগ্রাম দেখিয়া চারুর মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল।

ভূপতি কহিল, "আমি এর মানে কিছুই বুঝতে পারছি নে।" অনুসন্ধানে ভূপতি মানে বুঝিল। চারু নিজের গহনা বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার করিয়া টেলিগ্রাফ পাঠাইয়াছিল।

ভূপতি ভাবিল, এত করিবার তো দরকার ছিল না। আমাকে একটু অনুরোধ করিয়া ধরিলেই তো আমি টেলিগ্রাফ করিয়া দিতাম, চাকরকে দিয়া গোপনে বাজারে গহনা বন্ধক দিতে পাঠানো— এ তো ভালো হয় নাই।

থাকিয়া থাকিয়া ভূপতির মনে কেবলই এই প্রশ্ন হইতে লাগিল, চারু কেন এত বাড়াবাড়ি করিল। একটা অস্পষ্ট সন্দেহ অলক্ষ্যভাবে তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। সে সন্দেহটাকে ভূপতি প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে চাহিল না, ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বেদনা কোনোমতে ছাড়িল না।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

অমলের শরীর ভালো আছে, তবু সে চিঠি লেখে না! একেবারে এমন নিদারুণ ছাড়াছাড়ি হইল কী করিয়া। একবার মুখোমুখি এই প্রশ্নটার জবাব লইয়া আসিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু মধ্যে সমুদ্র— পার হইবার কোনো পথ নাই। নিষ্ঠুর বিচ্ছেদ, নিরুপায় বিচ্ছেদ, সকল প্রশ্ন সকল প্রতিকারের অতীত বিচ্ছেদ।

চারু আপনাকে আর খাড়া রাখিতে পারে না। কাজকর্ম পড়িয়া থাকে, সকল বিষয়েই ভুল হয়, চাকরবাকর চুরি করে; লোকে তাহার দীনভাব লক্ষ্য করিয়া নানাপ্রকার কানাকানি করিতে থাকে, কিছুতেই তার চেতনামাত্র নাই।

এমনি হইল, হঠাৎ চারু চমকিয়া উঠিত, কথা কহিতে কহিতে তাহাকে কাঁদিবার জন্য উঠিয়া যাইতে হইত, অমলের নাম শুনিবামাত্র তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া যাইত।

অবশেষে ভূপতিও সমস্ত দেখিল, এবং যাহা মুহূর্তের জন্য ভাবে নাই তাহাও ভাবিল— সংসার একেবারে তাহার কাছে বৃদ্ধ শুষ্ক জীর্ণ হইয়া গেল।

মাঝে যে-কয়দিন আনন্দের উন্মেষে ভূপতি অন্ধ হইয়াছিল সেই কয়দিনের স্মৃতি তাহাকে লজ্জা দিতে লাগিল। যে অনভিজ্ঞ বানর জহর চেনে না তাহাকে ঝুঁটা পাথর দিয়া কি এমনি করিয়াই ঠকাইতে হয়।

চারুর যে-সকল কথায় আদরে ব্যবহারে ভূপতি ভুলিয়াছিল সেগুলা মনে আসিয়া তাহাকে 'মূঢ়, মূঢ়, মূঢ়' বলিয়া বেত মারিতে লাগিল।

অবশেষে তাহার বহু কষ্টের বহু যত্নের রচনাগুলির কথা যখন মনে উদয় হইল তখন ভূপতি ধরণীকে দ্বিধা হইতে বলিল। অঙ্কুশতাড়িতের মতো চারুর কাছে দ্রুতপদে গিয়া ভূপতি কহিল, "আমার সেই লেখাগুলো কোথায়।"

চারু কহিল, "আমার কাছেই আছে।"

ভূপতি কহিল, "সেগুলো দাও।"

চারু তখন ভূপতির জন্য ডিমের কচুরি ভাজিতেছিল, কহিল, "তোমার কি এখনই চাই।"

ভূপতি কহিল, "হাঁ, এখনই চাই।"

চারু কড়া নামাইয়া রাখিয়া আলমারি হইতে খাতা ও কাগজগুলি বাহির করিয়া আনিল।

ভূপতি অধীরভাবে তাহার হাত হইতে সমস্ত টানিয়া লইয়া খাতাপত্র একেবারে উনানের মধ্যে ফেলিয়া দিল।

চারু ব্যস্ত হইয়া সেগুলা বাহির করিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "এ কী করলে।"

ভূপতি তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া গর্জন করিয়া বলিল, "থাক্।"

চারু বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সমস্ত লেখা নিঃশেষে পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেল।

চারু বুঝিল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। কচুরিভাজা অসমাপ্ত রাখিয়া ধীরে ধীরে অন্যত্র চলিয়া গেল।

চারুর সম্মুখে খাতা নষ্ট করিবার সংকল্প ভূপতির ছিল না। কিন্তু ঠিক সামনেই আগুনটা জ্বলিতেছিল, দেখিয়া কেমন যেন তাহার খুন চাপিয়া উঠিল। ভূপতি

আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া প্রবঞ্চিত নির্বোধের সমস্ত চেষ্টা বঞ্চনাকারিণীর সম্মুখেই আগুনে ফেলিয়া দিল।

সমস্ত ছাই হইয়া গেলে, ভূপতির আকস্মিক উদ্দামতা যখন শান্ত হইয়া আসিল তখন চারু আপন অপরাধের বোঝা বহন করিয়া যেরূপ গভীর বিষাদে নীরব নতমুখে চলিয়া গেল তাহা ভূপতির মনে জাগিয়া উঠিল— সম্মুখে চাহিয়া দেখিল, ভূপতি বিশেষ করিয়া ভালোবাসে বলিয়াই চারু স্বহস্তে যত্ন করিয়া খাবার তৈরি করিতেছিল।

ভূপতি বারান্দার রেলিঙের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল— তাহার জন্য চারুর এই যে-সকল অশ্রান্ত চেষ্টা, এই যে-সমস্ত প্রাণপণ বঞ্চনা ইহা অপেক্ষা সকরুণ ব্যাপার জগৎসংসারে আর কী আছে। এই-সমস্ত বঞ্চনা, এ তো ছলনাকারিণীর হেয় ছলনামাত্র নহে; এই ছলনাগুলির জন্য ক্ষতহৃদয়ের ক্ষতযন্ত্রণা চতুর্গুণ বাড়াইয়া অভাগিনীকে প্রতি দিন প্রতি মুহূর্তে হৃৎপিণ্ড হইতে রক্ত নিষ্পেষণ করিয়া বাহির করিতে হইয়াছে। ভূপতি মনে মনে কহিল, 'হায় অবলা, হায় দুঃখিনী। দরকার ছিল না, আমার এ-সব কিছুই দরকার ছিল না। এতকাল আমি তো ভালোবাসা না পাইয়াও 'পাই নাই' বলিয়া জানিতেও পারি নাই— আমার তো কেবল প্রুফ দেখিয়া, কাগজ লিখিয়াই চলিয়া গিয়াছিল; আমার জন্য এত করিবার কোনো দরকার ছিল না।'

তখন আপনার জীবনকে চারুর জীবন হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া— ডাক্তার যেমন সাংঘাতিক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীকে দেখে, ভূপতি তেমনি করিয়া নিঃসম্পর্ক লোকের মতো চারুকে দূর হইতে দেখিল! ওই একটি ক্ষীণশক্তি নারীর হৃদয় কী প্রবল সংসারের দ্বারা চারি দিকে আক্রান্ত হইয়াছে। এমন লোক নাই যাহার কাছে সকল কথা ব্যক্ত করিতে পারে, এমন কথা নহে যাহা ব্যক্ত করা যায়, এমন স্থান নাই যেখানে সমস্ত হৃদয় উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়া সে হাহাকার করিয়া উঠিতে পারে— অথচ এই অপ্রকাশ্য অপরিহার্য অপ্রতিবিধেয় প্রত্যহপুঞ্জীভূত দুঃখভার বহন করিয়া নিতান্ত সহজ লোকের মতো, তাহার সুস্থচিত্ত প্রতিবেশিনীদের মতো, তাহাকে প্রতিদিনের গৃহকর্ম সম্পন্ন করিতে হইতেছে।

ভূপতি তাহার শয়নগৃহে গিয়া দেখিল— জানালার গরাদে ধরিয়া অশ্রুহীন অনিমেষদৃষ্টিতে চারু বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে। ভূপতি আস্তে আস্তে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল— কিছু বলিল না, তাহার মাথার উপরে হাত রাখিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

বন্ধুরা ভূপতিকে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপারখানা কী। এত ব্যস্ত কেন।"

ভূপতি কহিল, "খবরের কাগজ—"

বন্ধু। আবার খবরের কাগজ? ভিটেমাটি খবরের কাগজে মুড়ে গঙ্গার জলে ফেলতে হবে নাকি।

ভূপতি। না, আর নিজে কাগজ করছি নে।

বন্ধু। তবে?

ভূপতি। মৈশুরে একটা কাগজ বের হবে, আমাকে তার সম্পাদক করেছে।

বন্ধু। বাড়িঘর ছেড়ে একেবারে মৈশুরে যাবে? চারুকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছ?

ভূপতি। না, মামারা এখানে এসে থাকবেন।

বন্ধু। সম্পাদকি নেশা তোমার আর কিছুতেই ছুটল না।

ভূপতি। মানুষের যা হোক একটা কিছু নেশা চাই।

বিদায়কালে চারু জিজ্ঞাসা করিল, "কবে আসবে?"

ভূপতি কহিল, "তোমার যদি একলা বোধ হয়, আমাকে লিখো, আমি চলে আসব।"

বলিয়া বিদায় লইয়া ভূপতি যখন দ্বারের কাছ পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিল তখন হঠাৎ চারু ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল, কহিল, "আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও। আমাকে এখানে ফেলে রেখে যেয়ো না।"

ভূপতি থমকিয়া দাঁড়াইয়া চারুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মুষ্টি শিথিল হইয়া ভূপতির হাত হইতে চারুর হাত খুলিয়া আসিল। ভূপতি চারুর নিকট হইতে সরিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

ভূপতি বুঝিল, অমলের বিচ্ছেদস্মৃতি যে বাড়িকে বেষ্টন করিয়া জ্বলিতেছে চারু দাবানলগ্রস্ত হরিণীর মতো সে বাড়ি পরিত্যাগ করিয়া পালাইতে চায়।— 'কিন্তু, আমার কথা সে একবার ভাবিয়া দেখিল না? আমি কোথায় পলাইব। যে স্ত্রী হৃদয়ের মধ্যে নিয়ত অন্যকে ধ্যান করিতেছে, বিদেশে গিয়াও তাহাকে ভুলিতে সময় পাইব না? নির্জন বন্ধুহীন প্রবাসে প্রত্যহ তাহাকে সঙ্গদান করিতে হইবে? সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যায় যখন ঘরে ফিরিব তখন নিস্তব্ধ শোকপরায়ণা নারীকে লইয়া সেই সন্ধ্যা কী ভয়ানক হইয়া উঠিবে। যাহার অন্তরের মধ্যে মৃতভার, তাহাকে বক্ষের কাছে ধরিয়া রাখা, সে আমি কতদিন পারিব। আরো কত বৎসর প্রত্যহ আমাকে

এমনি করিয়া বাঁচিতে হইবে! যে আশ্রয় চূর্ণ হইয়া ভাঙিয়া গেছে তাহার ভাঙা ইটকাঠগুলা ফেলিয়া যাইতে পারিব না, কাঁধে করিয়া বহিয়া বেড়াইতে হইবে?'

ভূপতি চারুকে আসিয়া কহিল, "না, সে আমি পারিব না।"

মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত রক্ত নামিয়া গিয়া চারুর মুখ কাগজের মতো শুষ্ক সাদা হইয়া গেল, চারু মুঠা করিয়া খাট চাপিয়া ধরিল।

তৎক্ষণাৎ ভূপতি কহিল, "চলো চারু, আমার সঙ্গেই চলো।"

চারু বলিল, "না, থাক্।"

বৈশাখ-অগ্রহায়ণ ১৩০৮

দর্পহরণ

কী করিয়া গল্প লিখিতে হয়, তাহা সম্প্রতি শিখিয়াছি। বঙ্কিমবাবু এবং সার্ ওয়াল্‌টার স্কট পড়িয়া আমার বিশেষ ফল হয় নাই। ফল কোথা হইতে কেমন করিয়া হইল, আমার এই প্রথম গল্পেই সেই কথাটা লিখিতে বসিলাম।

আমার পিতার মতামত অনেকরকম ছিল; কিন্তু বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে কোনো মত তিনি কেতাব বা স্বাধীনবুদ্ধি হইতে গড়িয়া তোলেন নাই। আমার বিবাহ যখন হয় তখন সতেরো উত্তীর্ণ হইয়া আঠারোয় পা দিয়াছি; তখন আমি কলেজে থার্ড-ইয়ারে পড়ি— এবং তখন আমার চিত্তক্ষেত্রে যৌবনের প্রথম দক্ষিণবাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়া কত অলক্ষ্য দিক হইতে কত অনির্বচনীয় গীতে এবং গন্ধে, কম্পনে এবং মর্মরে আমার তরুণ জীবনকে উৎসুক করিয়া তুলিতেছিল, তাহা এখনো মনে হইলে বুকের ভিতরে দীর্ঘনিশ্বাস ভরিয়া উঠে।

তখন আমার মা ছিলেন না— আমাদের শূন্যসংসারের মধ্যে লক্ষ্মীস্থাপন করিবার জন্য আমার পড়াশুনা শেষ হইবার অপেক্ষা না করিয়াই, বাবা বারো বৎসরের বালিকা নির্ঝরিণীকে আমাদের ঘরে আনিলেন।

নির্ঝরিণী নামটি হঠাৎ পাঠকদের কাছে প্রচার করিতে সংকোচবোধ করিতেছি। কারণ, তাঁহাদের অনেকেরই বয়স হইয়াছে— অনেকে ইস্কুল-মাস্টারি মুন্‌সেফি এবং কেহ কেহ বা সম্পাদকিও করেন, তাঁহারা আমার শ্বশুরমহাশয়ের নামনির্বাচনরুচির অতিমাত্র লালিত্য এবং নূতনত্বে হাসিবেন এমন আশঙ্কা আছে। কিন্তু আমি তখন

অর্বাচীন ছিলাম, বিচারশক্তির কোনো উপদ্রব ছিল না, তাই নামটি বিবাহের সম্বন্ধ হইবার সময়েই যেমনি শুনিলাম অমনি—

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।

এখন বয়স হইয়াছে এবং ওকালতি ছাড়িয়া মুন্‌সেফি-লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছি, তবু হৃদয়ের মধ্যে ওই নামটি পুরাতন বেহালার আওয়াজের মতো আরো বেশি মোলায়েম হইয়া বাজিতেছে।

প্রথম বয়সের প্রথম প্রেম অনেকগুলি ছোটোখাটো বাধার দ্বারা মধুর। লজ্জার বাধা, ঘরের লোকের বাধা, অনভিজ্ঞতার বাধা— এইগুলির অন্তরাল হইতে প্রথম পরিচয়ের যে আভাস দিতে থাকে তাহা ভোরের আলোর মতো রঙিন— তাহা মধ্যাহ্নের মতো সুস্পষ্ট, অনাবৃত এবং বর্ণচ্ছটাবিহীন নহে।

আমাদের সেই নবীন পরিচয়ের মাঝখানে বাবা বিন্ধ্যগিরির মতো দাঁড়াইলেন। তিনি আমাকে হস্টেলে নির্বাসিত করিয়া দিয়া তাঁহার বউমাকে বাংলা লেখাপড়া শিখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। আমার এই গল্পের শুরু হইল সেইখানে।

শ্বশুরমশায় কেবল তাঁহার কন্যার নামকরণ করিয়াই নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, তিনি তাহাকে শিক্ষাদানেরও প্রভূত আয়োজন করিয়াছিলেন। এমন-কি, উপক্রমণিকা তাহার মুখস্থ শেষ হইয়াছিল। মেঘনাদবধ কাব্য পড়িতে হেমবাবুর টীকা তাহার প্রয়োজন হইত না।

হস্টেলে গিয়া তাহার পরিচয় পাইয়াছিলাম। আমি সেখানে থাকিতে নানা উপায়ে বাবাকে লুকাইয়া নববিরহতাপে অত্যন্ত উত্তপ্ত দুই-একখানা চিঠি তাহাকে পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। তাহাতে কোটেশন-মার্কা না দিয়া আমাদের নব্য কবিদের কাব্য ছাঁকিয়া অনেক কবিতা ঢালিয়াছিলাম; ভাবিয়াছিলাম— প্রণয়িনীর কেবল প্রেম আকর্ষণ করাই যথেষ্ট নহে, শ্রদ্ধাও চাই। শ্রদ্ধা পাইতে হইলে বাংলা ভাষায় যেরূপ রচনাপ্রণালীর আশ্রয় লওয়া উচিত সেটা আমার স্বভাবত আসিত না, সেইজন্য, মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ। অর্থাৎ, অন্য জহরিরা যে-সকল মণি ছিদ্র করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমার চিঠি তাহা সূত্রের মতো গাঁথিয়া পাঠাইত। কিন্তু, ইহার মধ্যে মণিগুলি অন্যের, কেবলমাত্র সূত্রটুকুই আমার, এ বিনয়টুকু স্পষ্ট করিয়া প্রচার করা আমি ঠিক সংগত মনে করি নাই— কালিদাসও করিতেন না, যদি সত্যই তাঁহার মণিগুলি চোরাই মাল হইত।

চিঠির উত্তর যখন পাইলাম তাহার পর হইতে যথাস্থানে কোটেশন-মার্কা দিতে

আর কার্পণ্য করি নাই। এটুকু বেশ বোঝা গেল, নববধূ বাংলাভাষাটি বেশ জানেন। তাঁহার চিঠিতে বানান-ভুল ছিল কি না তাহার উপযুক্ত বিচারক আমি নই— কিন্তু সাহিত্যবোধ ও ভাষাবোধ না থাকিলে এমন চিঠি লেখা যায় না, সেটুকু আন্দাজে বুঝিতে পারি।

স্ত্রীর বিদ্যা দেখিয়া সংস্বামীর যতটুকু গর্ব ও আনন্দ হওয়া উচিত তাহা আমার হয় নাই এমন কথা বলিলে আমাকে অন্যায় অপবাদ দেওয়া হইবে, কিন্তু তারই সঙ্গে একটু অন্য ভাবও ছিল। সে ভাবটুকু উচ্চদরের না হইতে পারে, কিন্তু স্বাভাবিক। মুশকিল এই যে, যে উপায়ে আমার বিদ্যার পরিচয় দিতে পারিতাম সেটা বালিকার পক্ষে দুর্গম। সে যেটুকু ইংরেজি জানে তাহাতে বার্ক-মেকলের ছাঁদের চিঠি তাহার উপরে চালাইতে হইলে মশা মারিতে কামান দাগা হইত— মশার কিছুই হইত না, কেবল ধোঁয়া এবং আওয়াজই সার হইত।

আমার যে তিনটি প্রাণের বন্ধু ছিল তাহাদিগকে আমার স্ত্রীর চিঠি না দেখাইয়া থাকিতে পারিলাম না। তাহারা আশ্চর্য হইয়া কহিল, "এমন স্ত্রী পাইয়াছ, ইহা তোমার ভাগ্য।" অর্থাৎ, ভাষান্তরে বলিতে গেলে এমন স্ত্রীর উপযুক্ত স্বামী আমি নই।

নির্ঝরিণীর নিকট হইতে পত্রোত্তর পাইবার পূর্বেই যে কখানি চিঠি লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম তাহাতে হৃদয়োচ্ছ্বাস যথেষ্ট ছিল, কিন্তু বানান-ভুলও নিতান্ত অল্প ছিল না। সতর্ক হইয়া লেখা যে দরকার তাহা তখন মনেও করি নাই। সতর্ক হইয়া লিখিলে বানান-ভুল হয়তো কিছু কম পড়িত, কিন্তু হৃদয়োচ্ছ্বাসটাও মারা যাইত।

এমন অবস্থায় চিঠির মধ্যস্থতা ছাড়িয়া মোকাবিলায় প্রেমালাপই নিরাপদ। সুতরাং, বাবা আপিসে গেলেই আমাকে কালেজ পালাইতে হইত। ইহাতে আমাদের উভয় পক্ষেরই পাঠচর্চায় যে ক্ষতি হইত, আলাপচর্চায় তাহা সুদসুদ্ধ পোষণ করিয়া লইতাম। বিশ্বজগতে যে কিছুই একেবারে নষ্ট হয় না, এক আকারে যাহা ক্ষতি অন্য আকারে তাহা লাভ— বিজ্ঞানের এই তথ্য প্রেমের পরীক্ষাশালায় বারম্বার যাচাই করিয়া লইয়া একেবারে নিঃসংশয় হইয়াছি।

এমন সময়ে আমার স্ত্রীর জাঠ্‌তুতো বোনের বিবাহকাল উপস্থিত— আমরা তো যথানিয়মে আইবুড়োভাত দিয়া খালাস, কিন্তু আমার স্ত্রী স্নেহের আবেগে এক কবিতা রচনা করিয়া লাল কাগজে লাল কালি দিয়া লিখিয়া তাহার ভগিনীকে না পাঠাইয়া থাকিতে পারিল না। সেই রচনাটি কেমন করিয়া বাবার হস্তগত হইল। বাবা তাঁহার বধূমাতার কবিতায় রচনানৈপুণ্য, সদ্ভাবসৌন্দর্য, প্রসাদগুণ, প্রাঞ্জলতা ইত্যাদি

শাস্ত্রসম্মত নানা গুণের সমাবেশ দেখিয়া অভিভূত হইয়া গেলেন। তাঁহার বৃদ্ধ বন্ধুদিগকে দেখাইলেন, তাঁহারাও তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, "খাসা হইয়াছে!" নববধূর যে রচনাশক্তি আছে এ কথা কাহারো অগোচর রহিল না। হঠাৎ এইরূপ খ্যাতিবিকাশে রচয়িত্রীর কর্ণমূল এবং কপোলদ্বয় অরুণবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল; অভ্যাসক্রমে তাহা বিলুপ্ত হইল। পূর্বেই বলিয়াছি, কোনো জিনিস একেবারে বিলুপ্ত হয় না— কী জানি, লজ্জার আভাটুকু তাহার কোমল কপোল ছাড়িয়া আমার কঠিন হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন কোণে হয়তো আশ্রয় লইয়া থাকিবে।

কিন্তু তাই বলিয়া স্বামীর কর্তব্যে শৈথিল্য করি নাই। অপক্ষপাত সমালোচনার দ্বারা স্ত্রীর রচনার দোষ সংশোধনে আমি কখনোই আলস্য করি নাই। বাবা তাহাকে নির্বিচারে যতই উৎসাহ দিয়াছেন, আমি ততই সতর্কতার সহিত ত্রুটি নির্দেশ করিয়া তাহাকে যথোচিত সংযত করিয়াছি। আমি ইংরেজি বড়ো বড়ো লেখকের লেখা দেখাইয়া তাহাকে অভিভূত করিতে ছাড়ি নাই। সে কোকিলের উপর একটা কী লিখিয়াছিল, আমি শেলির স্কাইলার্ক্ ও কীট্সের নাইটিঙ্গেল শুনাইয়া তাহাকে একপ্রকার নীরব করিয়া দিয়াছিলাম। তখন বিদ্যার জোরে আমিও যেন শেলি ও কীট্সের গৌরবের কতকটা ভাগী হইয়া পড়িতাম। আমার স্ত্রীও ইংরেজি সাহিত্য হইতে ভালো ভালো জিনিস তাহাকে তর্জমা করিয়া শুনাইবার জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করিত, আমি গর্বের সহিত তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতাম। তখন ইংরেজি সাহিত্যের মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়া আমার স্ত্রীর প্রতিভাকে কি ম্লান করি নাই। স্ত্রীলোকের কমনীয়তার পক্ষে এই একটু ছায়ার আচ্ছাদন দরকার, বাবা এবং বন্ধুবান্ধবেরা তাহা বুঝিতেন না— কাজেই আমাকে এই কঠোর কর্তব্যের ভার লইতে হইয়াছিল। নিশীথের চন্দ্র মধ্যাহ্নের সূর্যের মতো হইয়া উঠিলে দুই দণ্ড বাহবা দেওয়া চলে, কিন্তু তাহার পরে ভাবিতে হয়, ওটাকে ঢাকা দেওয়া যায় কী উপায়ে।

আমার স্ত্রীর লেখা বাবা এবং অন্যান্য অনেকে কাগজে ছাপাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন। নির্ঝরিণী তাহাতে লজ্জাপ্রকাশ করিত— আমি তাহার সে লজ্জা রক্ষা করিয়াছি। কাগজে ছাপিতে দিই নাই, কিন্তু বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে প্রচার বন্ধ করিতে পারা গেল না।

ইহার কুফল যে কতদূর হইতে পারে, কিছুকাল পরে তাহার পরিচয় পাইয়াছিলাম। তখন উকিল হইয়া আলিপুরে বাহির হই। একটা উইল-কেস লইয়া বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে খুব জোরের সহিত লড়িতেছিলাম। উইলটি বাংলায় লেখা। স্বপক্ষের অনুকূলে তাহার অর্থ যে কিরূপ স্পষ্ট তাহা বিধিমতে প্রমাণ করিতেছিলাম, এমন সময়

বিরোধী পক্ষের উকিল উঠিয়া বলিলেন, "আমার বিদ্বান বন্ধু যদি তাঁহার বিদুষী স্ত্রীর কাছে এই উইলটি বুঝিয়া লইয়া আসিতেন, তবে এমন অদ্ভুত ব্যাখ্যা দ্বারা মাতৃভাষাকে ব্যথিত করিয়া তুলিতেন না।"

চুলায় আগুন ধরাইবার বেলা ফুঁ দিতে দিতে নাকের জলে চোখের জলে হইতে হয়, কিন্তু গৃহদাহের আগুন নেবানোই দায়। লোকের ভালো কথা চাপা থাকে, আর অনিষ্টকর কথাগুলো মুখে মুখে হুহুঃ শব্দে ব্যাপ্ত হইয়া যায়। এ গল্পটিও সর্বত্র প্রচারিত হইল। ভয় হইয়াছিল, পাছে আমার স্ত্রীর কানে ওঠে। সৌভাগ্যক্রমে ওঠে নাই— অন্তত এ সম্বন্ধে তাহার কাছ হইতে কোনো আলোচনা কখনো শুনি নাই।

একদিন একটি অপরিচিত ভদ্রলোকের সহিত আমার পরিচয় হইতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনিই কি শ্রীমতী নির্ঝরিণী দেবীর স্বামী।" আমি কহিলাম, "আমি তাঁহার স্বামী কি না সে কথার জবাব দিতে চাহি না, তবে তিনিই আমার স্ত্রী বটেন।" বাহিরের লোকের কাছে স্ত্রীর স্বামী বলিয়া খ্যাতিলাভ করা আমি গৌরবের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করি না।

সেটা যে গৌরবের বিষয় নহে, সে কথা আমাকে আর-এক ব্যক্তি অনাবশ্যক স্পষ্ট ভাষায় স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। পূর্বেই পাঠকগণ সংবাদ পাইয়াছেন, আমার স্ত্রীর জাঠ্‌তুতো বোনের বিবাহ হইয়াছে। তাহার স্বামীটা অত্যন্ত বর্বর দুর্বৃত্ত। স্ত্রীর প্রতি তাহার অত্যাচার অসহ্য। আমি এই পাষণ্ডের নির্দয়াচরণ লইয়া আত্মীয়সমাজে আলোচনা করিয়াছিলাম, সে কথা অনেক বড়ো হইয়া তাহার কানে উঠিয়াছিল। সে তাহার পর হইতে আমার প্রতি লক্ষ করিয়া সকলের কাছে বলিয়া বেড়াইতেছে যে, নিজের নামে হইতে আরম্ভ করিয়া শ্বশুরের নামে পর্যন্ত উত্তম-মধ্যম-অধম অনেকরকম খ্যাতির বিবরণ শাস্ত্রে লিখিয়াছে, কিন্তু নিজের স্ত্রীর খ্যাতিতে যশস্বী হওয়ার কল্পনা কবির মাথাতেও আসে নাই।

এমন-সব কথা লোকের মুখে মুখে চলিতে আরম্ভ করিলে স্ত্রীর মনে তো দম্ভ জন্মিতেই পারে। বিশেষত বাবার একটা বদ্‌ অভ্যাস ছিল, নির্ঝরিণীর সামনেই তিনি আমাদের পরস্পরের বাংলাভাষাজ্ঞান লইয়া কৌতুক করিতেন। একদিন তিনি বলিলেন, "হরিশ যে বাংলা চিঠিগুলো লেখে তাহার বানানটা তুমি দেখিয়া দাও-না কেন, বউমা— আমাকে এক চিঠি লিখিয়াছে, তাহাতে সে 'জগদিন্দ্র' লিখিতে দীর্ঘ ঈ বসাইয়াছে।" শুনিয়া বাবার বউমা নীরবে একটুখানি স্মিতহাস্য করিলেন। আমিও কথাটাকে ঠাট্টা বলিয়া হাসিলাম, কিন্তু এরকম ঠাট্টা ভালো নয়।

স্ত্রীর দন্তের পরিচয় পাইতে আমার দেরি হইল না। পাড়ার ছেলেদের এক ক্লাব আছে; সেখানে একদিন তাহারা এক বিখ্যাত বাংলা-লেখককে বক্তৃতা দিতে রাজি করিয়াছিল। অপর একটি বিখ্যাত লোককে সভাপতিও ঠিক করা হয়; তিনি বক্তৃতার পূর্বরাত্রে অস্বাস্থ্য জানাইয়া ছুটি লইলেন। ছেলেরা উপায়ান্তর না দেখিয়া আমাকে আসিয়া ধরিল। আমার প্রতি ছেলেদের এই অহৈতুকী শ্রদ্ধা দেখিয়া আমি কিছু প্রফুল্ল হইয়া উঠিলাম; বলিলাম, "তা বেশ তো, বিষয়টা কী বলো তো।"

তাহারা কহিল, "প্রাচীন ও আধুনিক বঙ্গসাহিত্য।"

আমি কহিলাম, "বেশ হইবে, দুটোই আমি ঠিক সমান জানি।"

পরদিন সভায় যাইবার পূর্বে জলখাবার এবং কাপড়চোপড়ের জন্য স্ত্রীকে কিছু তাড়া দিতে লাগিলাম। নির্ঝরিণী কহিল, "কেন গো, এত ব্যস্ত কেন— আবার কি পাত্রী দেখিতে যাইতেছ।"

আমি কহিলাম, "একবার দেখিয়াই নাকে-কানে খত দিয়াছি; আর নয়।"

"তবে এত সাজসজ্জার তাড়া যে।"

স্ত্রীকে সগর্বে সমস্ত ব্যাপারটা বলিলাম। শুনিয়া সে কিছুমাত্র উল্লাস প্রকাশ না করিয়া ব্যাকুলভাবে আমার হাত চাপিয়া ধরিল। কহিল, "তুমি পাগল হইয়াছ? না, না, সেখানে তুমি যাইতে পারিবে না।"

আমি কহিলাম, "রাজপুতনারী যুদ্ধসাজ পরাইয়া স্বামীকে রণক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিত— আর বাঙালির মেয়ে কি বক্তৃতাসভাতেও পাঠাইতে পারে না।"

নির্ঝরিণী কহিল, "ইংরেজি বক্তৃতা হইলে আমি ভয় করিতাম না, কিন্তু— থাক্‌-না, অনেক লোক আসিবে, তোমার অভ্যাস নাই— শেষকালে—"

শেষকালের কথাটা আমিও কি মাঝে মাঝে ভাবি নাই। রামমোহন রায়ের গানটা মনে পড়িতেছিল—

মনে করো শেষের সে দিন ভয়ংকর,
অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।

বক্তার বক্তৃতা-অন্তে উঠিয়া দাঁড়াইবার সময় সভাপতি যদি হঠাৎ 'দৃষ্টিহীন নাড়ীক্ষীণ হিমকলেবর' অবস্থায় একেবারে নিরুত্তর হইয়া পড়েন, তবে কী গতি হইবে। এই-সকল কথা চিন্তা করিয়া পূর্বোক্ত পলাতক সভাপতিমহাশয়ের চেয়ে আমার স্বাস্থ্য যে কোনো অংশে ভালো ছিল, এমন কথা আমি বলিতে পারি না।

বুক ফুলাইয়া স্ত্রীকে কহিলাম, "নিঝর, তুমি কি মনে কর—"

স্ত্রী কহিল, "আমি কিছুই মনে করি না— কিন্তু আমার আজ ভারি মাথা

ধরিয়া আসিয়াছে, বোধ হয় জ্বর আসিবে, তুমি আজ আমাকে ফেলিয়া যাইতে পারিবে না।"

আমি কহিলাম, "সে আলাদা কথা। তোমার মুখটা একটু লাল দেখাইতেছে বটে।"

সেই লালটা সভাস্থলে আমার দুরবস্থা কল্পনা করিয়া লজ্জায়, অথবা আসন্ন জ্বরের আবেশে, সে কথা নিঃসংশয়ে পর্যালোচনা না করিয়াই আমি ক্লাবের সেক্রেটারিকে স্ত্রীর পীড়ার কথা জানাইয়া নিষ্কৃতিলাভ করিলাম।

বলা বাহুল্য, স্ত্রীর জ্বরভাব অতি সত্বর ছাড়িয়া গেল। আমার অন্তরাত্মা কহিতে লাগিল, 'আর-সব ভালো হইল, কিন্তু তোমার বাংলা বিদ্যা সম্বন্ধে তোমার স্ত্রীর মনে এই-যে সংস্কার, এটা ভালো নয়। তিনি নিজেকে মস্ত বিদুষী বলিয়া ঠাওরাইয়াছেন— কোনোদিন বা মশারির মধ্যে নাইটস্কুল খুলিয়া তিনি তোমাকে বাংলা পড়াইবার চেষ্টা করিবেন।'

আমি কহিলাম, "ঠিক কথা— এই বেলা দর্প চূর্ণ না করিলে ক্রমে আর তাহার নাগাল পাওয়া যাইবে না।"

সেই রাত্রেই তাহার সঙ্গে একটু খিটিমিটি বাধাইলাম। অল্প শিক্ষা যে কিরূপ ভয়ংকর জিনিস, পোপের কাব্য হইতে তাহার উদাহরণ উদ্ধার করিয়া তাহাকে শুনাইলাম। ইহাও বুঝাইলাম, কোনোমতে বানান এবং ব্যাকরণ বাঁচাইয়া লিখিলেই যে লেখা হইল তাহা নহে— আসল জিনিসটা হইতেছে আইডিয়া। কাশিয়া বলিলাম, "সেটা উপক্রমণিকায় পাওয়া যায় না— সেটার জন্য মাথা চাই।" মাথা যে কোথায় আছে সে কথা তাহাকে স্পষ্ট করিয়া বলি নাই, কিন্তু তবু বোধ হয় কথাটা অস্পষ্ট ছিল না। আমি কহিলাম, "লিখিবার যোগ্য কোনো লেখা কোনো দেশে কোনোদিন কোনো স্ত্রীলোক লেখে নাই।"

শুনিয়া নির্ঝরিণীর মেয়েলি তার্কিকতা চড়িয়া উঠিল। সে বলিল, "কেন মেয়েরা লিখিতে পারিবে না। মেয়েরা এতই কি হীন।"

আমি কহিলাম, "রাগ করিয়া কী করিবে। দৃষ্টান্ত দেখাও-না।"

নির্ঝরিণী কহিল, "তোমার মতো যদি আমার ইতিহাস পড়া থাকিত তবে নিশ্চয়ই আমি ঢের দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিতাম।"

এ কথাটা শুনিয়া আমার মন একটু নরম হইয়াছিল, কিন্তু তর্ক এইখানেই শেষ হয় নাই। ইহার শেষ যেখানে সেটা পরে বর্ণনা করা যাইতেছে।

'উদ্দীপনা' বলিয়া মাসিক পত্রে ভালো গল্প লিখিবার জন্য পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার

ঘোষণা করিয়াছিল। কথা এই স্থির হইল, আমরা দুজনেই সেই কাগজে দুটা গল্প লিখিয়া পাঠাইব, দেখি কাহার ভাগ্যে পুরস্কার জোটে।

রাত্রের ঘটনা তো এই। পরদিন প্রভাতের আলোকে বুদ্ধি যখন নির্মল হইয়া আসিল তখন দ্বিধা জন্মিতে লাগিল। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিলাম, এ অবসর ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না— যেমন করিয়া হউক, জিতিতেই হইবে। হাতে তখনো দুই মাস সময় ছিল।

প্রকৃতিবাদ অভিধান কিনিলাম, বঙ্কিমের বইগুলাও সংগ্রহ করিলাম। কিন্তু বঙ্কিমের লেখা আমার চেয়ে আমার অন্তঃপুরে অধিক পরিচিত, তাই সে মহদাশ্রয় পরিত্যাগ করিতে হইল। ইংরেজি গল্পের বই দেদার পড়িতে লাগিলাম। অনেকগুলা গল্প ভাঙিয়া-চুরিয়া একটা প্লট দাঁড় করাইলাম। প্লটটা খুবই চমৎকার হইয়াছিল, কিন্তু মুশকিল এই হইল, বাংলা-সমাজে সে-সকল ঘটনা কোনো অবস্থাতেই ঘটিতে পারে না। অতিপ্রাচীন কালের পাঞ্জাবের সীমান্তদেশে গল্পের ভিত্তি ফাঁদিলাম; সেখানে সম্ভব-অসম্ভবের সমস্ত বিচার একেবারে নিরাকৃত হওয়াতে কলমের মুখে কোনো বাধা রহিল না। উদ্দাম প্রণয়, অসম্ভব বীরত্ব, নিদারুণ পরিণাম সার্কাসের ঘোড়ার মতো আমার গল্প ঘিরিয়া অদ্ভুত গতিতে ঘুরিতে লাগিল।

রাত্রে আমার ঘুম হইত না; দিনে আহারকালে ভাতের থালা ছাড়িয়া মাছের ঝোলের বাটিতে ডাল ঢালিয়া দিতাম। আমার অবস্থা দেখিয়া নির্ঝরিণী আমাকে অনুনয় করিয়া কহিল, "আমার মাথা খাও, তোমাকে আর গল্প লিখিতে হইবে না— আমি হার মানিতেছি।"

আমি উত্তেজিত হইয়া বলিলাম, "তুমি কি মনে করিতেছ আমি দিনরাত্রি কেবল গল্প ভাবিয়াই মরিতেছি। কিছুই না। আমাকে মক্কেলের কথা ভাবিতে হয়— তোমার মতো গল্প এবং কবিতা চিন্তা করিবার অবসর পড়িয়া থাকিলে আমার ভাবনা কী ছিল।"

যাহা হউক, ইংরেজি প্লট এবং সংস্কৃত অভিধানে মিলাইয়া একটা গল্প খাড়া করিলাম। মনের কোণে ধর্মবুদ্ধিতে একটু পীড়াবোধ করিতে লাগিলাম— ভাবিলাম, বেচারা নিঝর ইংরেজি সাহিত্য পড়ে নাই, তাহার ভাব সংগ্রহ করিবার ক্ষেত্র সংকীর্ণ; আমার সঙ্গে তাহার এই লড়াই নিতান্ত অসমকক্ষের লড়াই।

উপসংহার

লেখা পাঠানো হইয়াছে। বৈশাখের সংখ্যায় পুরস্কারযোগ্য গল্পটি বাহির হইবে। যদিও আমার মনে কোনো আশঙ্কা ছিল না, তবু সময় যত নিকটবর্তী হইল, মনটা তত চঞ্চল হইয়া উঠিল।

বৈশাখ মাসও আসিল। একদিন আদালত হইতে সকাল-সকাল ফিরিয়া আসিয়া খবর পাইলাম, বৈশাখের 'উদ্দীপনা' আসিয়াছে, আমার স্ত্রী তাহা পাইয়াছে।

ধীরে ধীরে নিঃশব্দপদে অন্তঃপুরে গেলাম। শয়নঘরে উঁকি মারিয়া দেখিলাম, আমার স্ত্রী কড়ায় আগুন করিয়া একটা বই পুড়াইতেছে। দেয়ালের আয়নায় নির্ঝরিণীর মুখের যে প্রতিবিম্ব দেখা যাইতেছে তাহাতে স্পষ্ট বুঝা গেল, কিছু পূর্বে সে অশ্রুবর্ষণ করিয়া লইয়াছে।

মনে আনন্দ হইল, কিন্তু সেইসঙ্গে একটু দয়াও হইল। আহা, বেচারার গল্পটি 'উদ্দীপনা'য় বাহির হয় নাই। কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারে এত দুঃখ! স্ত্রীলোকের অহংকারে এত অল্পেই ঘা পড়ে।

আবার আমি নিঃশব্দপদে ফিরিয়া গেলাম। উদ্দীপনা-আপিস হইতে নগদ দাম দিয়া একটা কাগজ কিনিয়া আনাইলাম। আমার লেখা বাহির হইয়াছে কি না দেখিবার জন্য কাগজ খুলিলাম। সূচীপত্র দেখিলাম, পুরস্কারযোগ্য গল্পটির নাম 'বিক্রমনারায়ণ' নহে, তাহার নাম 'ননদিনী', এবং তাহার রচয়িতার নাম— এ কী! এ যে নির্ঝরিণী দেবী!

বাংলাদেশে আমার স্ত্রী ছাড়া আর কাহারো নাম নির্ঝরিণী আছে কি। গল্পটি খুলিয়া পড়িলাম। দেখিলাম, নির্ঝরের সেই হতভাগিনী জাঠতুতো বোনের বৃত্তান্তটিই ডালপালা দিয়া বর্ণিত। একেবারে ঘরের কথা— সাদা ভাষা, কিন্তু সমস্ত ছবির মতো চোখে পড়ে এবং চক্ষু জলে ভরিয়া যায়। এ নির্ঝরিণী যে আমারই 'নিঝর' তাহাতে সন্দেহ নাই।

তখন আমার শয়নঘরের সেই দাহদৃশ্য এবং ব্যথিত রমণীর সেই ম্লানমুখ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম।

রাত্রে শুইতে আসিয়া স্ত্রীকে বলিলাম, "নিঝর, যে খাতায় তোমার লেখাগুলি আছে সেটা কোথায়।"

নির্ঝরিণী কহিল, "কেন, সে লইয়া তুমি কী করিবে।"

আমি কহিলাম, "আমি ছাপিতে দিব।"

নির্ঝরিণী। আহা, আর ঠাট্টা করিতে হইবে না।

আমি। না, ঠাট্টা করিতেছি না। সত্যিই ছাপিতে দিব।

নির্ঝরিণী। সে কোথায় গেছে আমি জানি না।

আমি কিছু জেদের সঙ্গেই বলিলাম, "না নিঝর, সে কিছুতেই হইবে না। বলো, সেটা কোথায় আছে।"

নির্ঝরিণী কহিল, "সত্যই সেটা নাই।"

আমি। কেন, কী হইল।

নির্ঝরিণী। সে আমি পুড়াইয়া ফেলিয়াছি।

আমি চমকিয়া উঠিয়া কহিলাম, "অ্যাঁ, সে কী। কবে পুড়াইলে।"

নির্ঝরিণী। আজই পুড়াইয়াছি। আমি কি জানি না যে, আমার লেখা ছাই লেখা। স্ত্রীলোকের রচনা বলিয়া লোকে মিথ্যা করিয়া প্রশংসা করে।

ইহার পর হইতে এ পর্যন্ত নিঝরকে সাধ্যসাধনা করিয়াও এক ছত্র লিখাইতে পারি নাই। ইতি শ্রীহরিশচন্দ্র হালদার

উপরে যে গল্পটি লেখা হইয়াছে উহার পনেরো-আনাই গল্প। আমার স্বামী যে বাংলা কত অল্প জানেন, তাহা তাঁহার রচীত উপন্যাশটি পড়িলেই কাহারো বুঝিতে বাকি থাকিবে না। ছি ছি নিজের স্ত্রিকে লইয়া এমনি করিয়া কি গল্প বানাইতে হয়? ইতি শ্রীনির্ঝরিনি দেবী

স্ত্রীলোকের চাতুরী সম্বন্ধে দেশী-বিদেশী শাস্ত্রে-অশাস্ত্রে অনেক কথা আছে— তাহাই স্মরণ করিয়া পাঠকেরা ঠকিবেন না। আমার রচনাটুকুর ভাষা ও বানান কে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, সে কথা আমি বলিব না— না বলিলেও বিজ্ঞ পাঠক অনুমান করিতে পারিবেন। আমার স্ত্রী যে কয়-লাইন লিখিয়াছেন তাহার বানান-ভুলগুলি দেখিলেই পাঠক বুঝিবেন, সেগুলি ইচ্ছাকৃত— তাঁহার স্বামী যে বাংলায় পরমপণ্ডিত এবং গল্পটা যে আষাঢ়ে, ইহাই প্রমাণ করিবার এই অতি সহজ উপায় তিনি বাহির করিয়াছেন— এইজন্যই কালিদাস লিখিয়াছেন, স্ত্রীণামশিক্ষিতপটুত্বম। তিনি স্ত্রীচরিত্র বুঝিতেন। আমিও সম্প্রতি চোখ-ফোটার পর হইতে বুঝিতে শুরু করিয়াছি। কালে হয়তো কালিদাস হইয়া উঠিতেও পারিব। কালিদাসের সঙ্গে আরো একটু সাদৃশ্য দেখিতেছি। শুনিয়াছি, কবিবর নববিবাহের পর তাঁহার বিদুষী

স্ত্রীকে যে শ্লোক রচনা করিয়া শোনান তাহাতে উষ্ট্রশব্দ হইতে রফলাটা লোপ করিয়াছিলেন— শব্দপ্রয়োগ সম্বন্ধে এরূপ দুর্ঘটনা বর্তমান লেখকের দ্বারাও অনেক ঘটিয়াছে— অতএব, সমস্ত গভীরভাবে পর্যালোচনা করিয়া আশা হইতেছে, কালিদাসের যেরূপ পরিণাম হইয়াছিল, আমার পক্ষেও তাহা অসম্ভব নহে। ইতি শ্রীহঃ

এ গল্প যদি ছাপানো হয়, আমি বাপের বাড়ি চলিয়া যাইব। শ্রীমতী নিঃ

আমিও তৎক্ষণাৎ শ্বশুরবাড়ি যাত্রা করিব। শ্রীহঃ

ফাল্গুন ১৩০৯

মাল্যদান

সকালবেলায় শীত-শীত ছিল। দুপুরবেলায় বাতাসটি অল্প-একটু তাতিয়া উঠিয়া দক্ষিণ দিক হইতে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে।

যতীন যে বারান্দায় বসিয়া ছিল সেখান হইতে বাগানের এক কোণে এক দিকে একটি কাঁঠাল ও আর-এক দিকে একটি শিরীষগাছের মাঝখানের ফাঁক দিয়া বাহিরের মাঠ চোখে পড়ে। সেই শূন্য মাঠ ফাল্গুনের রৌদ্রে ধূ ধূ করিতেছিল। তাহারই এক প্রান্ত দিয়া কাঁচা পথ চলিয়া গেছে— সেই পথ বাহিয়া বোঝাই-খালাস গোরুর গাড়ি মন্দগমনে গ্রামের দিকে ফিরিয়া চলিয়াছে, গাড়োয়ান মাথায় গামছা ফেলিয়া অত্যন্ত বেকারভাবে গান গাহিতেছে।

এমন সময় পশ্চাতে একটি সহাস্য নারীকণ্ঠ বলিয়া উঠিল, "কী যতীন, পূর্বজন্মের কারো কথা ভাবিতেছ বুঝি।"

যতীন কহিল, "কেন পটল, আমি এমনিই কি হতভাগা যে, ভাবিতে হইলেই পূর্বজন্ম লইয়া টান পাড়িতে হয়।"

আত্মীয়সমাজে 'পটল' নামে খ্যাত এই মেয়েটি বলিয়া উঠিল, "আর মিথ্যা বড়াই করিতে হইবে না। তোমার ইহজন্মের সব খবরই তো রাখি, মশায়। ছি ছি, এত বয়স হইল, তবু একটা সামান্য বউও ঘরে আনিতে পারিলে না। আমাদের ওই-যে ধনা মালীটা, ওরও একটা বউ আছে— তার সঙ্গে দুইবেলা ঝগড়া করিয়া সে পাড়াসুদ্ধ

লোককে জানাইয়া দেয় যে, বউ আছে বটে। আর তুমি যে মাঠের দিকে তাকাইয়া ভান করিতেছ, যেন কার চাঁদমুখ ধ্যান করিতে বসিয়াছ, এ-সমস্ত চালাকি আমি কি বুঝি না - ও কেবল লোক দেখাইবার ভড়ং মাত্র। দেখো যতীন, চেনা বামুনের পৈতের দরকার হয় না— আমাদের ওই ধনাটা তো কোনোদিন বিরহের ছুতা করিয়া মাঠের দিকে অমন তাকাইয়া থাকে না ; অতিবড়ো বিচ্ছেদের দিনেও গাছের তলায় নিড়ানি হাতে উহাকে দিন কাটাইতে দেখিয়াছি— কিন্তু উহার চোখে তো অমন ঘোর-ঘোর ভাব দেখি নাই। আর তুমি মশায়, সাতজন্ম বউয়ের মুখ দেখিলে না— কেবল হাসপাতালে মড়া কাটিয়া ও পড়া মুখস্থ করিয়া বয়স পার করিয়া দিলে, তুমি অমনতরো দুপুরবেলা আকাশের দিকে গদ্‌গদ হইয়া তাকাইয়া থাক কেন। না, এ-সমস্ত বাজে চালাকি আমার ভালো লাগে না। আমার গা জ্বালা করে।"

যতীন হাতজোড় করিয়া কহিল, "থাক্ থাক্, আর নয়। আমাকে আর লজ্জা দিয়ো না। তোমাদের ধনাই ধন্য। উহারই আদর্শে আমি চলিতে চেষ্টা করিব। আর কথা নয়, কাল সকালে উঠিয়াই যে কাঠকুড়ানি মেয়ের মুখ দেখিব, তাহারই গলায় মালা দিব— ধিক্‌কার আমার আর সহ্য হইতেছে না।"

পটল। তবে এই কথা রহিল ?

যতীন। হাঁ, রহিল।

পটল। তবে এসো।

যতীন। কোথায় যাইব।

পটল। এসোই-না।

যতীন। না না, একটা কী দুষ্টুমি তোমার মাথায় আসিয়াছে। আমি এখন নড়িতেছি না।

পটল। আচ্ছা, তবে এইখানেই বোসো।— বলিয়া সে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

পরিচয় দেওয়া যাক। যতীন এবং পটলের বয়সের একদিন মাত্র তারতম্য। পটল যতীনের চেয়ে একদিনের বড়ো বলিয়া যতীন তাহার প্রতি কোনোপ্রকার সামাজিক সম্মান দেখাইতে নারাজ। উভয়ে খুড়তুতো-জাঠতুতো ভাইবোন। বরাবর একত্রে খেলা করিয়া আসিয়াছে। 'দিদি' বলে না বলিয়া পটল যতীনের নামে বাল্যকালে বাপ-খুড়ার কাছে অনেক নালিশ করিয়াছে, কিন্তু কোনো শাসনবিধির দ্বারা কোনো ফল পায় নাই— একটিমাত্র ছোটো ভাইয়ের কাছেও তাহার পটল-নাম ঘুচিল না।

পটল দিব্য মোটাসোটা গোলগাল, প্রফুল্লতার রসে পরিপূর্ণ। তাহার কৌতুকহাস্য

দমন করিয়া রাখে, সমাজে এমন কোনো শক্তি ছিল না। শাশুড়ির কাছেও সে কোনোদিন গাম্ভীর্য অবলম্বন করিতে পারে নাই। প্রথম-প্রথম তা লইয়া অনেক কথা উঠিয়াছিল। কিন্তু, শেষকালে সকলকেই হার মানিয়া বলিতে হইল— ওর ওই রকম। তার পরে এমন হইল যে, পটলের দুর্নিবার প্রফুল্লতার আঘাতে গুরুজনদের গাম্ভীর্য ধূলিসাৎ হইয়া গেল। পটল তাহার আশেপাশে কোনোখানে মন-ভার মুখ-ভার দুশ্চিন্তা সহিতে পারিত না— অজস্র গল্প-হাসি-ঠাট্টায় তাহার চারি দিকের হাওয়া যেন বিদ্যুৎ-শক্তিতে বোঝাই হইয়া থাকিত।

পটলের স্বামী হরকুমারবাবু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট— বেহার-অঞ্চল হইতে বদলি হইয়া কলিকাতায় আবকারি-বিভাগে স্থান পাইয়াছেন। প্লেগের ভয়ে বালিতে একটি বাগানবাড়ি ভাড়া লইয়া থাকেন, সেখান হইতে কলিকাতায় যাতায়াত করেন। আবকারি-পরিদর্শনে প্রায়ই তাঁহাকে মফস্বলে ফিরিতে হইবে বলিয়া দেশ হইতে মা এবং অন্য দুই-একজন আত্মীয়কে আনিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় ডাক্তারিতে নূতন-উত্তীর্ণ পসারপ্রতিপত্তিহীন যতীন বোনের নিমন্ত্রণে হপ্তাখানেকের জন্য এখানে আসিয়াছে।

কলিকাতার গলি হইতে প্রথম দিন গাছপালার মধ্যে আসিয়া যতীন ছায়াময় নির্জন বারান্দায় ফাল্গুন-মধ্যাহ্নের রসালস্যে আবিষ্ট হইয়া বসিয়া ছিল, এমন সময়ে পূর্বকথিত সেই উপদ্রব আরম্ভ হইল। পটল চলিয়া গেলে আবার খানিকক্ষণের জন্য সে নিশ্চিন্ত হইয়া একটুখানি নড়িয়া-চড়িয়া বেশ আরাম করিয়া বসিল— কাঠকুড়ানি মেয়ের প্রসঙ্গে ছেলেবেলাকার রূপকথার অলিগলির মধ্যে তাহার মন ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এমন সময় আবার পটলের হাসিমাখা কণ্ঠের কাকলিতে সে চমকিয়া উঠিল।

পটল আর-একটি মেয়ের হাত ধরিয়া সবেগে টানিয়া আনিয়া যতীনের সম্মুখে স্থাপন করিল; কহিল, "ও কুড়ানি।"

মেয়েটি কহিল, "কী, দিদি।"

পটল। আমার এই ভাইটি কেমন দেখ্ দেখি।

মেয়েটি অসংকোচে যতীনকে দেখিতে লাগিল। পটল কহিল, "কেমন, ভালো দেখিতে না?"

মেয়েটি গম্ভীরভাবে বিচার করিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "হাঁ, ভালো।"

যতীন লাল হইয়া চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া কহিল, "আঃ পটল, কী ছেলেমানুষি করিতেছ।"

পটল। আমি ছেলেমানুষি করি, না তুমি বুড়োমানুষি কর! তোমার বুঝি বয়সের গাছপাথর নাই!

যতীন পলায়ন করিল। পটল তাহার পিছনে পিছনে ছুটিতে ছুটিতে কহিল, "ও যতীন, তোমার ভয় নাই, তোমার ভয় নাই। এখনই তোমার মালা দিতে হইবে না— ফাগুনচৈত্রে লগ্ন নাই— এখনো হাতে সময় আছে।"

পটল যাহাকে কুড়ানি বলিয়া ডাকে, সেই মেয়েটি অবাক হইয়া রহিল। তাহার বয়স ষোলো হইবে, শরীর ছিপ্‌ছিপে— মুখশ্রী সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার নাই, কেবল মুখে এই একটি অসামান্যতা আছে যে দেখিলে যেন বনের হরিণের ভাব মনে আসে। কঠিন ভাষায় তাহাকে নির্বুদ্ধি বলা যাইতেও পারে— কিন্তু তাহা বোকামি নহে, তাহা বুদ্ধিবৃত্তির অপরিস্ফুরণমাত্র, তাহাতে কুড়ানির মুখের সৌন্দর্য নষ্ট না করিয়া বরঞ্চ একটি বিশিষ্টতা দিয়াছে।

সন্ধ্যাবেলায় হরকুমারবাবু কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া যতীনকে দেখিয়া কহিলেন, "এই যে, যতীন আসিয়াছ, ভালোই হইয়াছে। তোমাকে একটু ডাক্তারি করিতে হইবে। পশ্চিমে থাকিতে দুর্ভিক্ষের সময় আমরা একটি মেয়েকে লইয়া মানুষ করিতেছি— পটল তাহাকে কুড়ানি বলিয়া ডাকে। উহার বাপ-মা এবং ওই মেয়েটি আমাদের বাংলার কাছেই একটি গাছতলায় পড়িয়া ছিল। যখন খবর পাইয়া গেলাম, গিয়া দেখি, উহার বাপ-মা মরিয়াছে, মেয়েটির প্রাণটুকু আছে মাত্র। পটল তাহাকে অনেক যত্নে বাঁচাইয়াছে। উহার জাতের কথা কেহ জানে না— তাহা লইয়া কেহ আপত্তি করিলেই পটল বলে, 'ও তো দ্বিজ; একবার মরিয়া এবার আমাদের ঘরে জন্মিয়াছে, উহার সাবেক জাত কোথায় ঘুচিয়া গেছে।' প্রথমে মেয়েটি পটলকে মা বলিয়া ডাকিতে শুরু করিয়াছিল; পটল তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, 'খবরদার, আমাকে মা বলিস নে— আমাকে দিদি বলিস।' পটল বলে, 'অতবড়ো মেয়ে মা বলিলে নিজেকে বুড়ি বলিয়া মনে হইবে যে।' বোধ করি সেই দুর্ভিক্ষের উপবাসে বা আর-কোনো কারণে উহার থাকিয়া-থাকিয়া শূলবেদনার মতো হয়। ব্যাপারখানা কী তোমাকে ভালো করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। ওরে তুল্‌সি, কুড়ানিকে ডাকিয়া আন্‌ তো।"

কুড়ানি চুল বাঁধিতে বাঁধিতে অসম্পূর্ণ বেণী পিঠের উপরে দুলাইয়া হরকুমারবাবুর ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার হরিণের মতো চোখদুটি দুজনের উপর রাখিয়া সে চাহিয়া রহিল।

যতীন ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া হরকুমার তাহাকে কহিলেন, "বৃথা সংকোচ

করিতেছ, যতীন। উহাকে দেখিতে মস্ত ডাগর, কিন্তু কচি ডাবের মতো উহার ভিতরে কেবল জল ছল্‌ছল্‌ করিতেছে— এখনো শাঁসের রেখা মাত্র দেখা দেয় নাই। ও কিছুই বোঝে না— উহাকে তুমি নারী বলিয়া ভ্রম করিয়ো না, ও বনের হরিণী।"

যতীন তাহার ডাক্তারি কর্তব্য সাধন করিতে লাগিল— কুড়ানি কিছুমাত্র কুণ্ঠা প্রকাশ করিল না। যতীন কহিল, "শরীরযন্ত্রের কোনো বিকার তো বোঝা গেল না।"

পটল ফস্‌ করিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "হৃদয়যন্ত্রেরও কোনো বিকার ঘটে নাই। তার পরীক্ষা দেখিতে চাও?"

বলিয়া কুড়ানির কাছে গিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া কহিল, "ও কুড়ানি, আমার এই ভাইটিকে তোর পছন্দ হইয়াছে?"

কুড়ানি মাথা হেলাইয়া কহিল, "হাঁ।"

পটল কহিল, "আমার ভাইকে তুই বিয়ে করিবি?"

সে আবার মাথা হেলাইয়া কহিল, "হাঁ।"

পটল এবং হরকুমারবাবু হাসিয়া উঠিলেন। কুড়ানি কৌতুকের মর্ম না বুঝিয়া তাঁহাদের অনুকরণে মুখখানি হাসিতে ভরিয়া চাহিয়া রহিল।

যতীন লাল হইয়া উঠিয়া ব্যস্ত হইয়া কহিল, "আঃ পটল, তুমি বাড়াবাড়ি করিতেছ— ভারি অন্যায়। হরকুমারবাবু, আপনি পটলকে বড়ো বেশি প্রশ্রয় দিয়া থাকেন।"

হরকুমার কহিলেন, "নহিলে আমিও যে উঁহার কাছে প্রশ্রয় প্রত্যাশা করিতে পারি না। কিন্তু যতীন, কুড়ানিকে তুমি জান না বলিয়াই অত ব্যস্ত হইতেছ। তুমি লজ্জা করিয়া কুড়ানিকে সুদ্ধ লজ্জা করিতে শিখাইবে দেখিতেছি। উহাকে জ্ঞানবৃক্ষের ফল তুমি খাওয়াইয়ো না। সকলে উহাকে লইয়া কৌতুক করিয়াছে— তুমি যদি মাঝের থেকে গাম্ভীর্য দেখাও, তবে সেটা উহার পক্ষে একটা অসংগত ব্যাপার হইবে।"

পটল। ওইজন্যই তো যতীনের সঙ্গে আমার কোনোকালেই বনিল না, ছেলেবেলা থেকে কেবলই ঝগড়া চলিতেছে— ও বড়ো গম্ভীর।

হরকুমার। ঝগড়া করাটা বুঝি এমনি করিয়া একেবারে অভ্যাস হইয়া গেছে— ভাই সরিয়া পড়িয়াছেন, এখন—

পটল। ফের মিথ্যা কথা। তোমার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া সুখ নাই— আমি চেষ্টাও করি না।

হরকুমার। আমি গোড়াতেই হার মানিয়া যাই।

পটল। বড়ো কর্মই করো। গোড়ায় হার না মানিয়া শেষে হার মানিলে কত খুশি হইতাম।

রাত্রে শোবার ঘরের জানলা-দরজা খুলিয়া দিয়া যতীন অনেক কথা ভাবিল। যে মেয়ে আপনার বাপ-মাকে না খাইতে পাইয়া মরিতে দেখিয়াছে, তাহার জীবনের উপর কী ভীষণ ছায়া পড়িয়াছে। এই নিদারুণ ব্যাপারে সে কত বড়ো হইয়া উঠিয়াছে— তাহাকে লইয়া কি কৌতুক করা যায়। বিধাতা দয়া করিয়া তাহার বুদ্ধিবৃত্তির উপরে একটা আবরণ ফেলিয়া দিয়াছেন— এই আবরণ যদি উঠিয়া যায় তবে অদৃষ্টের রুদ্রলীলার কী ভীষণ চিহ্ন প্রকাশ হইয়া পড়ে। আজ মধ্যাহ্নে গাছের ফাঁক দিয়া যতীন যখন ফাল্গুনের আকাশ দেখিতেছিল, দূর হইতে কাঁঠালমুকুলের গন্ধ মৃদুতর হইয়া তাহার ঘ্রাণকে আবিষ্ট করিয়া ধরিতেছিল, তখন তাহার মনটা মাধুর্যের কুহেলিকায় সমস্ত জগৎটাকে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিয়াছিল— ওই বুদ্ধিহীন বালিকা তাহার হরিণের মতো চোখ-দুটি লইয়া সেই সোনালি কুহেলিকা অপসারিত করিয়া দিয়াছে; ফাল্গুনের এই কূজন-গুঞ্জন-মর্মরের পশ্চাতে যে সংসার ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর দুঃখকঠিন দেহ লইয়া বিরাট মূর্তিতে দাঁড়াইয়া আছে, উদ্‌ঘাটিত যবনিকার শিল্পমাধুর্যের অন্তরালে সে দেখা দিল।

পরদিন সন্ধ্যার সময় কুড়ানির সেই বেদনা ধরিল। পটল তাড়াতাড়ি যতীনকে ডাকিয়া পাঠাইল। যতীন আসিয়া দেখিল, কষ্টে কুড়ানির হাতে পায়ে খিল ধরিতেছে, শরীর আড়ষ্ট। যতীন ঔষধ আনিতে পাঠাইয়া বোতলে করিয়া গরম জল আনিতে হুকুম করিল। পটল কহিল, "ভারি মস্ত ডাক্তার হইয়াছ, পায়ে একটু গরম তেল মালিশ করিয়া দাও-না। দেখিতেছ না, পায়ের তেলো হিম হইয়া গেছে।"

যতীন রোগিণীর পায়ের তলায় গরম তেল সবেগে ঘষিয়া দিতে লাগিল। চিকিৎসা-ব্যাপারে রাত্রি অনেক হইল। হরকুমার কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বারবার কুড়ানির খবর লইতে লাগিলেন। যতীন বুঝিল, সন্ধ্যাবেলায় কর্ম হইতে ফিরিয়া আসিয়া পটল-অভাবে হরকুমারের অবস্থা অচল হইয়া উঠিয়াছে— ঘন ঘন কুড়ানির খবর লইবার তাৎপর্য তাই। যতীন কহিল, "হরকুমারবাবু ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন, তুমি যাও পটল।"

পটল কহিল, "পরের দোহাই দিবে বৈকি। ছট্‌ফট্‌ কে করিতেছে তা বুঝিয়াছি। আমি গেলেই এখন তুমি বাঁচো। এ দিকে কথায় কথায় লজ্জায় মুখচোখ লাল হইয়া উঠে— তোমার পেটে যে এত ছিল, তা কে বুঝিবে।"

যতীন। আচ্ছা, দোহাই তোমার, তুমি এইখানেই থাকো। রক্ষা করো—

তোমার মুখ বন্ধ হইলে বাঁচি। আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম— হরকুমারবাবু বোধ হয় শান্তিতে আছেন, এরকম সুযোগ তাঁর সর্বদা ঘটে না।

কুড়ানি আরাম পাইয়া যখন চোখ খুলিল পটল কহিল, "তোর চোখ খোলাইবার জন্য তোর বর যে আজ অনেকক্ষণ ধরিয়া তোকে পায়ে ধরিয়া সাধিয়াছে— আজ তাই বুঝি এত দেরি করিলি। ছি ছি, ওঁর পায়ের ধুলা নে।"

কুড়ানি কর্তব্যবোধে তৎক্ষণাৎ গম্ভীরভাবে যতীনের পায়ের ধুলা লইল। যতীন দ্রুতপদে ঘর হইতে চলিয়া গেল।

তাহার পরদিন হইতে যতীনের উপরে রীতিমত উপদ্রব আরম্ভ হইল। যতীন খাইতে বসিয়াছে, এমন সময় কুড়ানি আসিয়া অম্লানবদনে পাখা দিয়া তাহার মাছি তাড়াইতে প্রবৃত্ত হইল। যতীন ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "থাক্ থাক্, কাজ নাই।" কুড়ানি এই নিষেধে বিস্মিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া পশ্চাদ্বর্তী ঘরের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল— তাহার পরে আবার পুনশ্চ পাখা দোলাইতে লাগিল। যতীন অন্তরালবর্তিনীর উদ্দেশে বলিয়া উঠিল, "পটল, তুমি যদি এমন করিয়া আমাকে জ্বালাও, তবে আমি খাইব না— আমি এই উঠিলাম।"

বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই কুড়ানি পাখা ফেলিয়া দিল। যতীন বালিকার বুদ্ধিহীন মুখে তীব্র বেদনার রেখা দেখিতে পাইল; তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত হইয়া সে পুনর্বার বসিয়া পড়িল। কুড়ানি যে কিছু বোঝে না, সে যে লজ্জা পায় না, বেদনা বোধ করে না, এ কথা যতীনও বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আজ চকিতের মধ্যে দেখিল, সকল নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে, এবং ব্যতিক্রম কখন হঠাৎ ঘটে আগে হইতে তাহা কেহই বলিতে পারে না। কুড়ানি পাখা ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে যতীন বারান্দায় বসিয়া আছে, গাছপালার মধ্যে কোকিল অত্যন্ত ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়াছে, আমের বোলের গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত— এমন সময় সে দেখিল, কুড়ানি চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া যেন একটু ইতস্তত করিতেছে। তাহার হরিণের মতো চক্ষে একটা সকরুণ ভয় ছিল— সে চা লইয়া গেলে যতীন বিরক্ত হইবে কি না ইহা যেন সে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। যতীন ব্যথিত হইয়া উঠিয়া অগ্রসর হইয়া তাহার হাত হইতে পেয়ালা লইল। এই মানবজন্মের হরিণশিশুটিকে তুচ্ছ কারণে কি বেদনা দেওয়া যায়। যতীন যেমনি পেয়ালা লইল অমনি দেখিল, বারান্দার অপর প্রান্তে পটল সহসা আবির্ভূত হইয়া নিঃশব্দহাস্যে যতীনকে কিল দেখাইল, ভাবটা এই যে, 'কেমন ধরা পড়িয়াছ।'

সেইদিন সন্ধ্যার সময় যতীন একখানি ডাক্তারি কাগজ পড়িতেছিল, এমন সময়

ফুলের গন্ধে চকিত হইয়া উঠিয়া দেখিল, কুড়ানি বকুলের মালা হাতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। যতীন মনে মনে কহিল, 'বড়োই বাড়াবাড়ি হইতেছে— পটলের এই নিষ্ঠুর আমোদে আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হয় না।' কুড়ানিকে বলিল, "ছি ছি কুড়ানি, তোমাকে লইয়া তোমার দিদি আমোদ করিতেছেন, তুমি বুঝিতে পার না।"

কথা শেষ করিতে না করিতেই কুড়ানি ত্রস্ত-সংকুচিত-ভাবে প্রস্থানের উপক্রম করিল। যতীন তখন তাড়াতাড়ি তাহাকে ডাকিয়া কহিল, "কুড়ানি, দেখি তোমার মালা দেখি।" বলিয়া মালাটি তাহার হাত হইতে লইল। কুড়ানির মুখে একটি আনন্দের উজ্জ্বলতা ফুটিয়া উঠিল, অন্তরাল হইতে সেই মুহূর্তে একটি উচ্চহাস্যের উচ্ছ্বাসধ্বনি শুনা গেল।

পরদিন সকালে উপদ্রব করিবার জন্য পটল যতীনের ঘরে গিয়া দেখিল, ঘর শূন্য। একখানি কাগজে কেবল লেখা আছে— 'পালাইলাম। শ্রীযতীন।'

"ও কুড়ানি, তোর বর যে পালাইল। তাহাকে রাখিতে পারিলি নে!" বলিয়া কুড়ানির বেণী ধরিয়া নাড়া দিয়া পটল ঘরকন্নার কাজে চলিয়া গেল।

কথাটা বুঝিতে কুড়ানির একটু সময় গেল। সে ছবির মতো দাঁড়াইয়া স্থিরদৃষ্টিতে সম্মুখে চাহিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে যতীনের ঘরে আসিয়া দেখিল, তাহার ঘর খালি। তার পূর্বসন্ধ্যার উপহারের মালাটা টেবিলের উপর পড়িয়া আছে।

বসন্তের প্রাতঃকালটি স্নিগ্ধসুন্দর; রৌদ্রটি কম্পিত কৃষ্ণচূড়ার শাখার ভিতর দিয়া ছায়ার সহিত মিশিয়া বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। কাঠবিড়ালি লেজ পিঠে তুলিয়া ছুটাছুটি করিতেছে এবং সকল পাখি মিলিয়া নানা সুরে গান গাহিয়া তাহাদের বক্তব্য বিষয় কিছুতেই শেষ করিতে পারিতেছে না। পৃথিবীর এই কোণটুকুতে, এই খানিকটা ঘনপল্লব ছায়া এবং রৌদ্ররচিত জগৎখণ্ডের মধ্যে প্রাণের আনন্দ ফুটিয়া উঠিতেছিল; তাহারই মাঝখানে ওই বুদ্ধিহীন বালিকা তাহার জীবনের, তাহার চারি দিকের সংগত কোনো অর্থ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। সমস্তই কঠিন প্রহেলিকা। কী হইল, কেন এমন হইল, তার পরে এই প্রভাত, এই গৃহ, এই যাহা-কিছু সমস্তই এমন একেবারে শূন্য হইয়া গেল কেন। যাহার বুঝিবার সামর্থ্য অল্প তাহাকে হঠাৎ একদিন নিজ হৃদয়ের এই অতল বেদনার রহস্যগর্ভে কোনো প্রদীপ হাতে না দিয়া কে নামাইয়া দিল। জগতের এই সহজ-উচ্ছ্বসিত প্রাণের রাজ্যে এই গাছপালা-মৃগপক্ষীর আত্মবিস্মৃত কলরবের মধ্যে কে তাহাকে আবার টানিয়া তুলিতে পারিবে।

পটল ঘরকন্নার কাজ সারিয়া কুড়ানির সন্ধান লইতে আসিয়া দেখিল, সে যতীনের

পরিত্যক্ত ঘরে তাহার খাটের খুরা ধরিয়া মাটিতে পড়িয়া আছে— শূন্য শয্যাটাকে যেন পায়ে ধরিয়া সাধিতেছে। তাহার বুকের ভিতরে যে একটি সুধার পাত্র লুকানো ছিল সেইটে যেন শূন্যতার চরণে বৃথা আশ্বাসে উপুড় করিয়া ঢালিয়া দিতেছে— ভূমিতলে পুঞ্জীভূত সেই স্খলিতকেশা লুণ্ঠিতবসনা নারী যেন নীরব একাগ্রতার ভাষায় বলিতেছে, "লও, লও, আমাকে লও। ওগো, আমাকে লও।"

পটল বিস্মিত হইয়া কহিল, "ও কী হইতেছে, কুড়ানি।"

কুড়ানি উঠিল না; সে যেমন পড়িয়া ছিল তেমনি পড়িয়া রহিল। পটল কাছে আসিয়া তাহাকে স্পর্শ করিতেই সে উচ্ছ্বসিত হইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

পটল তখন চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "ও পোড়ারমুখি, সর্বনাশ করিয়াছিস। মরিয়াছিস!"

হরকুমারকে পটল কুড়ানির অবস্থা জানাইয়া কহিল, "এ কী বিপদ ঘটিল। তুমি কী করিতেছিলে, তুমি আমাকে কেন বারণ করিলে না।"

হরকুমার কহিল, "তোমাকে বারণ করা যে আমার কোনোকালে অভ্যাস নাই। বারণ করিলেই কি ফল পাওয়া যাইত।"

পটল। তুমি কেমন স্বামী? আমি যদি ভুল করি, তুমি আমাকে জোর করিয়া থামাইতে পার না? আমাকে তুমি এ খেলা খেলিতে দিলে কেন।

এই বলিয়া সে ছুটিয়া গিয়া ভূপতিতা বালিকার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "লক্ষ্মী বোন আমার, তোর কী বলিবার আছে, আমাকে খুলিয়া বল্‌।"

হায়, কুড়ানির এমন কী ভাষা আছে যে, আপনার হৃদয়ের অব্যক্ত রহস্য সে কথা দিয়া বলিতে পারে। সে একটি অনির্বচনীয় বেদনার উপর তাহার সমস্ত বুক দিয়া চাপিয়া পড়িয়া আছে – সে বেদনাটা কী, জগতে এমন আর কাহারো হয় কি না, তাহাকে লোকে কী বলিয়া থাকে, কুড়ানি তাহার কিছুই জানে না। সে কেবল কান্না দিয়া বলিতে পারে; মনের কথা জানাইবার তাহার আর কোনো উপায় নাই।

পটল কহিল, "কুড়ানি, তোর দিদি বড়ো দুষ্টু; কিন্তু তার কথা যে তুই এমন করিয়া বিশ্বাস করিবি, তা সে কখনো মনেও করে নি। তার কথা কেহ কখনো বিশ্বাস করে না; তুই এমন ভুল কেন করিলি। কুড়ানি, একবার মুখ তুলিয়া তোর দিদির মুখের দিকে চা; তাকে মাপ কর্‌।"

কিন্তু, কুড়ানির মন তখন বিমুখ হইয়া গিয়াছিল, সে কোনোমতেই পটলের মুখের দিকে চাহিতে পারিল না; সে আরো জোর করিয়া হাতের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া রহিল। সে ভালো করিয়া সমস্ত কথা না বুঝিয়াও একপ্রকার মূঢ়ভাবে পটলের প্রতি রাগ

করিয়াছিল। পটল তখন ধীরে ধীরে বাহুপাশ খুলিয়া লইয়া উঠিয়া গেল— এবং জানালার ধারে পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া ফাল্গুনের রৌদ্রচিক্কণ সুপারি-গাছের পল্লবশ্রেণীর দিকে চাহিয়া পটলের দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

পরদিন কুড়ানির আর দেখা পাওয়া গেল না। পটল তাহাকে আদর করিয়া ভালো ভালো গহনা এবং কাপড় দিয়া সাজাইত। নিজে সে এলোমেলো ছিল, নিজের সাজ সম্বন্ধে তাহার কোনো যত্ন ছিল না, কিন্তু সাজগোজের সমস্ত শখ কুড়ানির উপর দিয়াই সে মিটাইয়া লইত। বহুকালসঞ্চিত সেই-সমস্ত বসনভূষণ কুড়ানির ঘরের মেজের উপর পড়িয়া আছে। তাহার হাতের বালাচুড়ি, নাসাগ্রের লবঙ্গফুলটি পর্যন্ত সে খুলিয়া ফেলিয়া গিয়াছে। তাহার পটলদিদির এতদিনের সমস্ত আদর সে যেন গা হইতে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছে।

হরকুমারবাবু কুড়ানির সন্ধানে পুলিসে খবর দিলেন। সেবারে প্লেগ-দমনের বিভীষিকায় এত লোক এত দিকে পলায়ন করিতেছিল যে, সেই-সকল পলাতকদলের মধ্য হইতে একটি বিশেষ লোককে বাছিয়া লওয়া পুলিসের পক্ষে শক্ত হইল। হরকুমারবাবু দুই-চারিবার ভুল লোকের সন্ধানে অনেক দুঃখ এবং লজ্জা পাইয়া কুড়ানির আশা পরিত্যাগ করিলেন। অজ্ঞাতের কোল হইতে তাঁহারা যাহাকে পাইয়াছিলেন অজ্ঞাতের কোলের মধ্যেই সে আবার লুকাইয়া পড়িল।

যতীন বিশেষ চেষ্টা করিয়া সেবার প্লেগ-হাসপাতালে ডাক্তারি-পদ গ্রহণ করিয়াছিল। একদিন দুপুরবেলায় বাসায় আহার সারিয়া হাসপাতালে আসিয়া সে শুনিল, হাসপাতালের স্ত্রী-বিভাগে একটি নূতন রোগিণী আসিয়াছে। পুলিস তাহাকে পথ হইতে কুড়াইয়া আনিয়াছে।

যতীন তাহাকে দেখিতে গেল। মেয়েটির মুখের অধিকাংশ চাদরে ঢাকা ছিল। যতীন প্রথমেই তাহার হাত তুলিয়া লইয়া নাড়ি দেখিল। নাড়িতে জ্বর অধিক নাই, কিন্তু দুর্বলতা অত্যন্ত। তখন পরীক্ষার জন্য মুখের চাদর সরাইয়া দেখিল, সেই কুড়ানি।

ইতিমধ্যে পটলের কাছ হইতে যতীন কুড়ানির সমস্ত বিবরণ জানিয়াছিল। অব্যক্ত হৃদয়ভাবের দ্বারা ছায়াচ্ছন্ন তাহার সেই হরিণচক্ষুদুটি কাজের অবকাশে যতীনের ধ্যানদৃষ্টির উপরে কেবলই অশ্রুহীন কাতরতা বিকীর্ণ করিয়াছে। আজ সেই রোগনিমীলিত চক্ষুর সুদীর্ঘ পল্লব কুড়ানির শীর্ণ কপোলের উপরে কালিমার রেখা টানিয়াছে; দেখিবামাত্র যতীনের বুকের ভিতরটা হঠাৎ কে যেন চাপিয়া ধরিল। এই একটি মেয়েকে বিধাতা এত যত্নে ফুলের মতো সুকুমার করিয়া গড়িয়া দুর্ভিক্ষ

হইতে মারীর মধ্যে ভাসাইয়া দিলেন কেন। আজ এই-যে পেলব প্রাণটি ক্লিষ্ট হইয়া বিছানার উপরে পড়িয়া আছে, ইহার এই অল্প কয়দিনের আয়ুর মধ্যে এত বিপদের আঘাত, এত বেদনার ভার সহিল কী করিয়া, ধরিল কোথায়। যতীনই বা ইহার জীবনের মাঝখানে তৃতীয় আর-একটি সংকটের মতো কোথা হইতে আসিয়া জড়াইয়া পড়িল। রুদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস যতীনের বক্ষোদ্বারে আঘাত করিতে লাগিল— কিন্তু সেই আঘাতের তাড়নায় তাহার হৃদয়ের তারে একটা সুখের মীড়ও বাজিয়া উঠিল। যে ভালোবাসা জগতে দুর্লভ, যতীন তাহা না চাহিতেই, ফাল্গুনের একটি মধ্যাহ্নে একটি পূর্ণবিকশিত মাধবীমঞ্জরির মতো অকস্মাৎ তার পায়ের কাছে আপনি আসিয়া খসিয়া পড়িয়াছে। যে ভালোবাসা এমন করিয়া মৃত্যুর দ্বার পর্যন্ত আসিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়ে, পৃথিবীতে কোন্ লোক সেই দেবভোগ্য নৈবেদ্যলাভের অধিকারী।

যতীন কুড়ানির পাশে বসিয়া তাহাকে অল্প অল্প গরম দুধ খাওয়াইয়া দিতে লাগিল। খাইতে খাইতে অনেকক্ষণ পরে সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চোখ মেলিল। যতীনের মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে সুদূর স্বপ্নের মতো যেন মনে করিয়া লইতে চেষ্টা করিল। যতীন যখন তাহার কপালে হাত রাখিয়া একটুখানি নাড়া দিয়া কহিল, "কুড়ানি"— তখন তাহার অজ্ঞানের শেষ ঘোরটুকু হঠাৎ ভাঙিয়া গেল— যতীনকে সে চিনিল এবং তখনই তাহার চোখের উপরে বাষ্পকোমল আর-একটি মোহের আবরণ পড়িল। প্রথম-মেঘ-সমাগমে সুগম্ভীর আষাঢ়ের আকাশের মতো কুড়ানির কালো চোখদুটির উপর একটি যেন সুদূরব্যাপী সজলস্নিগ্ধতা ঘনাইয়া আসিল।

যতীন সকরুণ যত্নের সহিত কহিল, "কুড়ানি, এই দুধটুকু শেষ করিয়া ফেলো।"

কুড়ানি একটু উঠিয়া বসিয়া পেয়ালার উপর হইতে যতীনের মুখে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া সেই দুধটুকু ধীরে ধীরে খাইয়া ফেলিল।

হাসপাতালের ডাক্তার একটিমাত্র রোগীর পাশে সমস্তক্ষণ বসিয়া থাকিলে কাজও চলে না, দেখিতেও ভালো হয় না। অন্যত্র কর্তব্য সারিবার জন্য যতীন যখন উঠিল তখন ভয়ে ও নৈরাশ্যে কুড়ানির চোখদুটি ব্যাকুল হইয়া পড়িল। যতীন তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, "আমি আবার এখনই আসিব কুড়ানি, তোমার কোনো ভয় নাই।"

যতীন কর্তৃপক্ষদিগকে জানাইল যে, এই নূতন-আনীত রোগিনীর প্লেগ হয় নাই, সে না খাইয়া দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। এখানে অন্য প্লেগরোগীর সঙ্গে থাকিলে তাহার পক্ষে বিপদ ঘটিতে পারে।

বিশেষ চেষ্টা করিয়া যতীন কুড়ানিকে অন্যত্র লইয়া যাইবার অনুমতি লাভ করিল

এবং নিজের বাসায় লইয়া গেল। পটলকে সমস্ত খবর দিয়া একখানি চিঠিও লিখিয়া দিল।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় রোগী এবং চিকিৎসক ছাড়া ঘরে আর কেহ ছিল না। শিয়রের কাছে রঙিন কাগজের আবরণে ঘেরা একটি কেরোসিন ল্যাম্প্ ছায়াচ্ছন্ন মৃদু আলোক বিকীর্ণ করিতেছিল— ব্র্যাকেটের উপরে একটা ঘড়ি নিস্তব্ধ ঘরে টিক্‌টিক্ শব্দে দোলক দোলাইতেছিল।

যতীন কুড়ানির কপালে হাত দিয়া কহিল, "তুমি কেমন বোধ করিতেছ, কুড়ানি।"

কুড়ানি তাহার কোনো উত্তর না করিয়া যতীনের হাতটি আপনার কপালেই চাপিয়া রাখিয়া দিল।

যতীন আবার জিজ্ঞাসা করিল, "ভালো বোধ হইতেছে?"

কুড়ানি একটুখানি চোখ বুজিয়া কহিল, "হাঁ।"

যতীন জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার গলায় এটা কী, কুড়ানি।"

কুড়ানি তাড়াতাড়ি কাপড়টা টানিয়া তাহা ঢাকিবার চেষ্টা করিল। যতীন দেখিল, সে একগাছি শুকনো বকুলের মালা। তখন তাহার মনে পড়িল, সে মালাটা কী। ঘড়ির টিক্‌টিক্ শব্দের মধ্যে যতীন চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। কুড়ানির এই প্রথম লুকাইবার চেষ্টা— নিজের হৃদয়ের ভাব গোপন করিবার এই তাহার প্রথম প্রয়াস। কুড়ানি মৃগশিশু ছিল, সে কখন হৃদয়ভারাতুর যুবতী নারী হইয়া উঠিল। কোন্ রৌদ্রের আলোকে, কোন্ রৌদ্রের উত্তাপে তাহার বুদ্ধির উপরকার সমস্ত কুয়াশা কাটিয়া গিয়া তাহার লজ্জা, তাহার শঙ্কা, তাহার বেদনা এমন হঠাৎ প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

রাত্রি দুটা-আড়াইটার সময় যতীন চৌকিতে বসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ দ্বার খোলার শব্দে চমকিয়া উঠিয়া দেখিল, পটল এবং হরকুমারবাবু এক বড়ো ব্যাগ হাতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

হরকুমার কহিলেন, "তোমার চিঠি পাইয়া কাল সকালে আসিব বলিয়া বিছানায় শুইলাম। অর্ধেক রাত্রে পটল কহিল, 'ওগো, কাল সকালে গেলে কুড়ানিকে দেখিতে পাইব না— আমাকে এখনই যাইতে হইবে।' পটলকে কিছুতেই বুঝাইয়া রাখা গেল না, তখনই একটা গাড়ি করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছি।"

পটল হরকুমারকে কহিল, "চলো, তুমি যতীনের বিছানায় শোবে চলো।"

হরকুমার ঈষৎ আপত্তির আড়ম্বর করিয়া যতীনের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন, তাঁহার নিদ্রা যাইতেও দেরি হইল না।

পটল ফিরিয়া আসিয়া যতীনকে ঘরের এক কোণে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আশা আছে ?"

যতীন কুড়ানির কাছে আসিয়া তাহার নাড়ি দেখিয়া মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইল যে, আশা নাই।

পটল কুড়ানির কাছে আপনাকে প্রকাশ না করিয়া যতীনকে আড়ালে লইয়া কহিল, "যতীন, সত্য বলো, তুমি কি কুড়ানিকে ভালোবাস না।"

যতীন পটলকে কোনো উত্তর না দিয়া কুড়ানির বিছানার পাশে আসিয়া বসিল। তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া নাড়া দিয়া কহিল, "কুড়ানি, কুড়ানি।"

কুড়ানি চোখ মেলিয়া মুখে একটি শান্ত মধুর হাসির আভাসমাত্র আনিয়া কহিল, "কী, দাদাবাবু।"

যতীন কহিল, "কুড়ানি, তোমার এই মালাটি আমার গলায় পরাইয়া দাও।"

কুড়ানি অনিমেষ অবুঝ চোখে যতীনের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

যতীন কহিল, "তোমার মালা আমাকে দিবে না ?"

যতীনের এই আদরের প্রশ্রয়টুকু পাইয়া কুড়ানির মনে পূর্বকৃত অনাদরের একটুখানি অভিমান জাগিয়া উঠিল। সে কহিল, "কী হবে, দাদাবাবু।"

যতীন দুই হাতে তাহার হাত লইয়া কহিল, "আমি তোমাকে ভালোবাসি, কুড়ানি।"

শুনিয়া ক্ষণকালের জন্য কুড়ানি স্তব্ধ রহিল ; তাহার পরে তাহার দুই চক্ষু দিয়া অজস্র জল পড়িতে লাগিল। যতীন বিছানার পাশে নামিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিল, কুড়ানির হাতের কাছে মাথা নত করিয়া রাখিল। কুড়ানি গলা হইতে মালা খুলিয়া যতীনের গলায় পরাইয়া দিল।

তখন পটল তাহার কাছে আসিয়া ডাকিল, "কুড়ানি।"

কুড়ানি তাহার শীর্ণ মুখ উজ্জ্বল করিয়া কহিল, "কী, দিদি।"

পটল তাহার কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "আমার উপর তোর আর কোনো রাগ নাই, বোন ?"

কুড়ানি স্নিগ্ধকোমলদৃষ্টিতে কহিল, "না, দিদি।"

পটল কহিল, "যতীন, একবার তুমি ও ঘরে যাও।"

যতীন পাশের ঘরে গেলে পটল ব্যাগ খুলিয়া কুড়ানির সমস্ত কাপড়-গহনা তাহার মধ্য হইতে বাহির করিল। রোগিণীকে অধিক নাড়াচাড়া না করিয়া একখানি লাল বেনারসি শাড়ি সন্তর্পণে তাহার মলিন বস্ত্রের উপর জড়াইয়া দিল। পরে একে একে

এক একগাছি চুড়ি তাহার হাতে দিয়া দুই হাতে দুই বালা পরাইয়া দিল। তার পরে ডাকিল, "যতীন।"

যতীন আসিতেই তাহাকে বিছানায় বসাইয়া পটল তাহার হাতে কুড়ানির একছড়া সোনার হার দিল। যতীন সেই হারছড়াটি লইয়া আস্তে আস্তে কুড়ানির মাথা তুলিয়া ধরিয়া তাহাকে পরাইয়া দিল।

ভোরের আলো যখন কুড়ানির মুখের উপরে আসিয়া পড়িল তখন সে আলো সে আর দেখিল না। তাহার অম্লান মুখকান্তি দেখিয়া মনে হইল, সে মরে নাই— কিন্তু সে যেন একটি অতলস্পর্শ সুখস্বপ্নের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেছে।

যখন মৃতদেহ লইয়া যাইবার সময় হইল তখন পটল কুড়ানির বুকের উপর পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "বোন, তোর ভাগ্য ভালো। জীবনের চেয়ে তোর মরণ সুখের।"

যতীন কুড়ানির সেই শান্তস্নিগ্ধ মৃত্যুচ্ছবির দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, 'যাঁহার ধন তিনিই নিলেন, আমাকেও বঞ্চিত করিলেন না।'

চৈত্র ১৩০৯

কর্মফল

প্রথম পরিচ্ছেদ

আজ সতীশের মাসি সুকুমারী এবং মেসোমশায় শশধরবাবু আসিয়াছেন— সতীশের মা বিধুমুখী ব্যস্তসমস্তভাবে তাঁহাদের অভ্যর্থনায় নিযুক্ত। "এসো দিদি, বোসো। আজ কোন্ পুণ্যে রায়মশায়ের দেখা পাওয়া গেল! দিদি না আসলে তোমার আর দেখা পাবার জো নেই।"

শশধর। এতেই বুঝবে তোমার দিদির শাসন কিরকম কড়া। দিনরাত্রি চোখে চোখে রাখেন।

সুকুমারী। তাই বটে, এমন রত্ন ঘরে রেখেও নিশ্চিন্ত মনে ঘুমনো যায় না।

বিধুমুখী। নাকডাকার শব্দে!

সুকুমারী। সতীশ, ছি ছি, তুই এ কী কাপড় পরেছিস। তুই কি এইরকম

ধুতি পরে ইস্কুলে যাস নাকি। বিধু, ওকে যে ফ্রকটা কিনে দিয়েছিলেম সে কী হল্।

বিধুমুখী। সে ও কোন্‌কালে ছিঁড়ে ফেলেছে।

সুকুমারী। তা তো ছিঁড়বেই। ছেলেমানুষের গায়ে এক কাপড় কতদিন টেঁকে। তা, তাই বলে কি আর নূতন ফ্রক তৈরি করাতে নেই। তোদের ঘরে সকলই অনাসৃষ্টি।

বিধুমুখী। জানোই তো দিদি, তিনি ছেলের গায়ে সভ্য কাপড় দেখলেই আগুন হয়ে ওঠেন। আমি যদি না থাকতেম তো তিনি বোধ হয় ছেলেকে দোলাই গায়ে দিয়ে কোমরে ঘুনসি পরিয়ে ইস্কুলে পাঠাতেন— মাগো! এমন সৃষ্টিছাড়া পছন্দও কারো দেখি নি।

সুকুমারী। মিছে না। এক বৈ ছেলে নয়— একে একটু সাজাতে গোজাতেও ইচ্ছা করে না! এমন বাপও তো দেখি নি। সতীশ, পরশু রবিবার আছে, তুই আমাদের বাড়ি যাস, আমি তোর জন্যে এক সুট কাপড় র‍্যাম্‌জের ওখান হতে আনিয়ে রাখব। আহা, ছেলেমানুষের কি শখ হয় না।

সতীশ। এক সুটে আমার কী হবে, মাসিমা। ভাদুড়ি-সাহেবের ছেলে আমার সঙ্গে একসঙ্গে পড়ে, সে আমাকে তাদের বাড়িতে পিংপং খেলায় নিমন্ত্রণ করেছে— আমার তো সেরকম বাইরে যাবার মখমলের কাপড় নেই।

শশধর। তেমন জায়গায় নিমন্ত্রণে না যাওয়াই ভালো, সতীশ।

সুকুমারী। আচ্ছা আচ্ছা, তোমার আর বক্তৃতা দিতে হবে না। ওর যখন তোমার মতন বয়স হবে তখন—

শশধর। তখন ওকে বক্তৃতা দেবার অন্য লোক হবে, বৃদ্ধ মেসোর পরামর্শ শোনবার অবসর হবে না।

সুকুমারী। আচ্ছা মশায়, বক্তৃতা করবার অন্য লোক যদি তোমাদের ভাগ্যে না জুটত তবে তোমাদের কী দশা হত বলো দেখি।

শশধর। সে কথা বলে লাভ কী। সে অবস্থা কল্পনা করাই ভালো।

সতীশ। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) না না, এখানে আনতে হবে না, আমি যাচ্ছি।

প্রস্থান

সুকুমারী। সতীশ ব্যস্ত হয়ে পালালো কেন, বিধু।

বিধুমুখী। থালায় করে তার জলখাবার আনছিল কিনা, ছেলের তাই তোমাদের সামনে লজ্জা।

সুকুমারী। আহা, বেচারার লজ্জা হতে পারে। ও সতীশ, শোন্ শোন্; তোর মেসোমশায় তোকে পেলেটির বাড়ি থেকে আইস্‌ক্রীম খাইয়ে আনবেন, তুই ওঁর সঙ্গে যা। ওগো, যাও-না, ছেলেমানুষকে একটু—

সতীশ। মাসিমা, সেখানে কী কাপড় পরে যাব।

বিধুমুখী। কেন, তোর তো চাপকান আছে।

সতীশ। সে বিশ্রী।

সুকুমারী। আর যাই হোক বিধু, তোর ছেলে ভাগ্যে পৈতৃক পছন্দটা পায় নি তাই রক্ষা। বাস্তবিক, চাপকান দেখলেই খানসামা কিম্বা যাত্রার দলের ছেলে মনে পড়ে। এমন অসভ্য কাপড় আর নেই।

শশধর। এ কথাগুলো—

সুকুমারী। চুপিচুপি বলতে হবে? কেন, ভয় করতে হবে কাকে। মন্মথ নিজের পছন্দমত ছেলেকে সাজ করাবেন, আর আমরা কথা কইতেও পাব না!

শশধর। সর্বনাশ। কথা বন্ধ করতে আমি বলি নে। কিন্তু সতীশের সামনে এ-সমস্ত আলোচনা—

সুকুমারী। আচ্ছা আচ্ছা, বেশ। তুমি ওকে পেলেটির ওখানে নিয়ে যাও।

সতীশ। না মাসিমা, আমি সেখানে চাপকান পরে যেতে পারব না।

সুকুমারী। এই যে মন্মথবাবু আসছেন। এখনি সতীশকে নিয়ে বকাবকি করে ওকে অস্থির করে তুলবেন। ছেলেমানুষ, বাপের বকুনির চোটে ওর একদণ্ড শান্তি নেই। আয় সতীশ, তুই আমার সঙ্গে আয়— আমরা পালাই।

সুকুমারীর প্রস্থান। মন্মথর প্রবেশ

বিধু। সতীশ ঘড়ি ঘড়ি করে কয়দিন আমাকে অস্থির করে তুলেছিল। দিদি তাকে একটা রুপোর ঘড়ি দিয়েছেন— আমি আগে থাকতে বলে রাখলেম, তুমি আবার শুনলে রাগ করবে।

বিধুমুখীর প্রস্থান

মন্মথ। আগে থাকতে বলে রাখলেও রাগ করব। শশধর, সে ঘড়িটি তোমাকে নিয়ে যেতে হবে।

শশধর। তুমি তো আচ্ছা লোক। নিয়ে তো গেলেম, শেষকালে বাড়ি গিয়ে জবাবদিহি করবে কে।

মন্মথ। না শশধর, ঠাট্টা নয়, আমি এ-সব ভালোবাসি নে।

শশধর। ভালোবাস না, কিন্তু সহ্যও করতে হয়— সংসারে এ কেবল তোমার একলারই পক্ষে বিধান নয়।

মন্মথ। আমার নিজের সম্বন্ধে হলে আমি নিঃশব্দে সহ্য করতেম। কিন্তু ছেলেকে আমি মাটি করতে পারি না। যে ছেলে চাবা মাত্রই পায়, চাবার পূর্বেই যার অভাবমোচন হতে থাকে, সে নিতান্ত দুর্ভাগা। ইচ্ছা দমন করতে না শিখে কেউ কোনো কালে সুখী হতে পারে না। বঞ্চিত হয়ে ধৈর্যরক্ষা করবার যে বিদ্যা, আমি তাই ছেলেকে দিতে চাই, ঘড়ি ঘড়ির চেন জোগাতে চাই নে।

শশধর। সে তো ভালো কথা, কিন্তু তোমার ইচ্ছামাত্রেই তো সংসারের সমস্ত বাধা তখনই ধূলিসাৎ হবে না। সকলেরই যদি তোমার মতো সদ্‌বুদ্ধি থাকত তা হলে তো কথাই ছিল না; তা যখন নেই তখন সাধুসংকল্পকেও গায়ের জোরে চালানো যায় না, ধৈর্য চাই। স্ত্রীলোকের ইচ্ছার একেবারে উলটামুখে চলবার চেষ্টা করলে অনেক বিপদে পড়বে— তার চেয়ে পাশ কাটিয়ে একটু ঘুরে গেলে সুবিধামত ফল পাওয়া যায়। বাতাস যখন উলটা বয় জাহাজের পাল তখন আড় করে রাখতে হয়, নইলে চলা অসম্ভব।

মন্মথ। তাই বুঝি তুমি গৃহিণীর সকল কথাতেই সায় দিয়ে যাও। ভীরু!

শশধর। তোমার মতো অসমসাহস আমার নেই। যার ঘরকন্নার অধীনে চব্বিশ ঘণ্টা বাস করতে হয় তাঁকে ভয় না করব তো কাকে করব। নিজের স্ত্রীর সঙ্গে বীরত্ব করে লাভ কী। আঘাত করলেও কষ্ট, আঘাত পেলেও কষ্ট। তার চেয়ে তর্কের বেলায় গৃহিণীর মতকে সম্পূর্ণ অকাট্য বলে স্বীকার করে কাজের বেলায় নিজের মত চালানোই সৎপরামর্শ— গোঁয়াতুর্মি করতে গেলেই মুশকিল বাধে।

মন্মথ। জীবন যদি সুদীর্ঘ হত তবে ধীরেসুস্থে তোমার মতে চলা যেত, পরমায়ু যে অল্প।

শশধর। সেইজন্যই তো ভাই, বিবেচনা করে চলতে হয়। সামনে একটা পাথর পড়লে যে লোক ঘুরে না গিয়ে সেটা ডিঙিয়ে পথ সংক্ষেপ করতে চায়, বিলম্ব তারই অদৃষ্টে আছে। কিন্তু তোমাকে এ-সকল বলা বৃথা— প্রতিদিনই তো ঠেকছ, তবু যখন শিক্ষা পাচ্ছ না তখন আমার উপদেশে ফল নেই। তুমি এমনি ভাবে চলতে চাও, যেন তোমার স্ত্রী বলে একটা শক্তির অস্তিত্ব নেই— অথচ তিনি যে আছেন সে সম্বন্ধে তোমার লেশমাত্র সন্দেহ থাকবার কোনো কারণ দেখি নে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দাম্পত্য কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া— শাস্ত্রে এইরূপ লেখে। কিন্তু দম্পতি-বিশেষে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে, অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহা অস্বীকার করেন না।

মন্মথবাবুর সহিত তাঁহার স্ত্রীর মধ্যে মধ্যে যে বাদপ্রতিবাদ ঘটিয়া থাকে তাহা নিশ্চয়ই কলহ, তবু তাহার আরম্ভও বহু নহে, তাহার ক্রিয়াও লঘু নহে— ঠিক অজাযুদ্ধের সঙ্গে তাহার তুলনা করা চলে না।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এ কথার প্রমাণ হইবে।

মন্মথবাবু কহিলেন, "তোমার ছেলেটিকে যে বিলাতি পোশাক পরাতে আরম্ভ করেছ, সে আমার পছন্দ নয়।"

বিধু কহিলেন, "পছন্দ বুঝি একা তোমারই আছে। আজকাল তো সকলেই ছেলেদের ইংরেজি কাপড় ধরিয়েছে।"

মন্মথ হাসিয়া কহিলেন, "সকলের মতেই যদি চলবে তবে সকলকে ছেড়ে একমাত্র আমাকেই বিবাহ করলে কেন।"

বিধু। তুমি যদি কেবল নিজের মতেই চলবে তবে একা না থেকে আমাকেই বা তোমার বিবাহ করবার কী দরকার ছিল।

মন্মথ। নিজের মত চালাবার জন্যও যে অন্য লোকের দরকার হয়।

বিধু। নিজের বোঝা বহাবার জন্য ধোবার দরকার হয় গাধাকে, কিন্তু আমি তো আর—

মন্মথ। (জিব কাটিয়া) আরে রাম রাম, তুমি আমার সংসার-মরুভূমির আরব ঘোড়া। কিন্তু সে প্রাণীবৃত্তান্তের তর্ক এখন থাক্। তোমার ছেলেটিকে সাহেব করে তুলো না।

বিধু। কেন করব না। তাকে কি চাষা করব।

এই বলিয়া বিধু ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

বিধুর বিধবা জা পাশের ঘরে বসিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মনে করিলেন, স্বামী-স্ত্রীতে বিরলে প্রেমালাপ হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মন্মথ। ও কী ও, তোমার ছেলেটিকে কী মাখিয়েছ।

বিধু। মূর্ছা যেয়ো না, ভয়ানক কিছু নয়, একটুখানি এসেন্স্ মাত্র। তাও বিলাতি নয়— তোমাদের সাধের দিশি।

মন্মথ। আমি তোমাকে বারবার বলেছি, ছেলেদের তুমি এ-সমস্ত শৌখিন জিনিস অভ্যাস করাতে পারবে না।

বিধু। আচ্ছা, যদি তোমার আরাম বোধ হয় তো কাল হতে কেরোসিন এবং ক্যাস্টর অয়েল মাখাব।

মন্মথ। সেও বাজে খরচ হবে। যেটা না হলেও চলে সেটা না অভ্যাস করাই ভালো। কেরোসিন, ক্যাস্টর অয়েল, গায় মাথায় মাখা আমার মতে অনাবশ্যক।

বিধু। তোমার মতে আবশ্যক জিনিস কটা আছে তা তো জানি না, গোড়াতেই আমাকে বোধ হয় বাদ দিয়ে বসতে হয়।

মন্মথ। তোমাকে বাদ দিলে যে বাদপ্রতিবাদ একেবারেই বন্ধ হবে। এতকালের দৈনিক অভ্যাস হঠাৎ ছাড়লে এ বয়সে হয়তো সহ্য হবে না। যাই হোক, এ কথা আমি তোমাকে আগে হতে বলে রাখছি, ছেলেটিকে তুমি সাহেব কর বা নবাব কর বা সাহেবি-নবাবির খিচুড়ি পাকাও তার খরচ আমি জোগাব না। আমার মৃত্যুর পরে সে যা পাবে তাতে তার শখের খরচ কুলোবে না।

বিধু। সে আমি জানি। তোমার টাকার উপরে ভরসা রাখলে ছেলেকে কোপ নি পরানো অভ্যাস করাতেম।

বিধুর এই অবজ্ঞাবাক্যে মর্মাহত হইয়াও মন্মথ ক্ষণকালের মধ্যে সামলাইয়া লইলেন; কহিলেন, "আমিও তা জানি। তোমার ভগিনীপতি শশধরের 'পরেই তোমার ভরসা। তার সন্তান নেই বলে ঠিক করে বসে আছ, তোমার ছেলেকেই সে উইলে সমস্ত লিখেপড়ে দিয়ে যাবে। সেইজন্যই যখন-তখন ছেলেটাকে ফিরিঙ্গি সাজিয়ে এক-গা গন্ধ মাখিয়ে তার মেসোর আদর কাড়বার জন্য পাঠিয়ে দাও। আমি দারিদ্র্যের লজ্জা অনায়াসেই সহ্য করতে পারি, কিন্তু ধনী কুটুম্বের সোহাগ-যাচনার লজ্জা আমার সহ্য হয় না।"

এ কথা মন্মথর মনে অনেকদিন উদয় হইয়াছে, কিন্তু কথাটা কঠোর হইবে বলিয়া এ পর্যন্ত কখনো বলেন নাই। বিধু মনে করিতেন, স্বামী তাঁহার গূঢ় অভিপ্রায় ঠিক বুঝিতে পারেন নাই, কারণ স্বামীসম্প্রদায় স্ত্রীর মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে অপরিসীম মূর্খ। কিন্তু

মন্মথ যে বসিয়া বসিয়া তাঁহার চাল ধরিতে পারিয়াছেন, হঠাৎ জানিতে পারিয়া বিধুর পক্ষে মর্মান্তিক হইয়া উঠিল।

মুখ লাল করিয়া বিধু কহিলেন, "ছেলেকে মাসির কাছে পাঠালেও গায়ে সয় না, এতবড়ো মানী লোকের ঘরে আছি সে তো পূর্বে বুঝতে পারি নি।"

এমন সময় বিধবা জা প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "মেজবউ, তোদের ধন্য। আজ সতেরো বৎসর হয়ে গেল তবু তোদের কথা ফুরালো না। রাত্রে কুলায় না, শেষকালে দিনেও দুইজনে মিলে ফিস্‌ফিস্‌। তোদের জিবের আগায় বিধাতা এত মধু দিনরাত্রি জোগান কোথা হতে আমি তাই ভাবি। রাগ কোরো না ঠাকুরপো, তোমাদের মধুরালাপে ব্যাঘাত করব না, একবার কেবল দু মিনিটের জন্য মেজবউয়ের কাছ হতে সেলাইয়ের প্যাটার্নটা দেখিয়ে নিতে এসেছি।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সতীশ। জেঠাইমা।

জেঠাইমা। কী বাপ।

সতীশ। আজ ভাদুড়ি-সাহেবের ছেলেকে মা চা খাওয়াবেন, তুমি যেন সেখানে হঠাৎ গিয়ে পোড়ো-না।

জেঠাইমা। আমার যাবার দরকার কী সতীশ।

সতীশ। যদি যাও তো তোমার এ কাপড়ে চলবে না, তোমাকে—

জেঠাইমা। সতীশ, তোর কোনো ভয় নেই, আমি এই ঘরেই থাকব, যতক্ষণ তোর বন্ধুর চা খাওয়া না হয়, আমি বার হব না।

সতীশ। জেঠাইমা, আমি মনে করছি, তোমার এই ঘরেই তাকে চা খাওয়াবার বন্দোবস্ত করব। এ বাড়িতে আমাদের যে ঠাসাঠাসি লোক— চা খাবার, ডিনার খাবার মতো ঘর একটাও খালি পাবার জো নেই। মার শোবার ঘরে সিন্দুক-ফিন্দুক কত কী রয়েছে, সেখানে কাকেও নিয়ে যেতে লজ্জা করে।

জেঠাইমা। আমার এখানেও তো জিনিসপত্র—

সতীশ। ওগুলো আজকের মতো বার করে দিতে হবে। বিশেষত তোমার এই বঁটি-চুপড়ি-বারকোশগুলো কোথাও না লুকিয়ে রাখলে চলবে না।

জেঠাইমা। কেন বাবা, ওগুলোতে এত লজ্জা কিসের। তাদের বাড়িতে কি কুটনো কুটবার নিয়ম নেই।

সতীশ। তা জানি নে জেঠাইমা, কিন্তু চা খাবার ঘরে ওগুলো রাখা দস্তুর নয়। এ দেখলে নরেন ভাদুড়ি নিশ্চয় হাসবে, বাড়ি গিয়ে তার বোনদের কাছে গল্প করবে।

জেঠাইমা। শোনো একবার, ছেলের কথা শোনো। বঁটি-চুপড়ি তো চিরকাল ঘরেই থাকে। তা নিয়ে গল্প করতে তো শুনি নি।

সতীশ। তোমাকে আর-এক কাজ করতে হবে জেঠাইমা— আমাদের নন্দকে তুমি যেমন করে পার এখানে ঠেকিয়ে রেখো। সে আমার কথা শুনবে না, খালি গায়ে ফস্‌ করে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হবে।

জেঠাইমা। তাকে যেন ঠেকালেম, কিন্তু তোমার বাবা যখন খালি গায়ে—

সতীশ। সে আমি আগেই মাসিমাকে গিয়ে ধরেছিলেম, তিনি বাবাকে আজ পিঠে খাবার নিমন্ত্রণ করেছেন, বাবা এ-সমস্ত কিছুই জানেন না।

জেঠাইমা। বাবা সতীশ, যা মন হয় করিস, কিন্তু আমার ঘরটাতে তোদের ওই খানাটানাগুলো—

সতীশ। সে ভালো করে সাফ করিয়ে দেব এখন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সতীশ। মা, এমন করে তো চলে না।

বিধু। কেন, কী হয়েছে।

সতীশ। চাঁদনির কোট ট্রাউজার পরে আমার বার হতে লজ্জা করে। সেদিন ভাদুড়ি-সাহেবের বাড়ি ইভ্‌নিং পার্টি ছিল, কয়েকজন বাবু ছাড়া আর সকলেই ড্রেস সুট পরে গিয়েছিল, আমি সেখানে এই কাপড়ে গিয়ে ভারি অপ্রস্তুতে পড়েছিলাম। বাবা কাপড়ের জন্য যে সামান্য টাকা দিতে চান তাতে ভদ্রতা রক্ষা হয় না।

বিধু। জান তো সতীশ, তিনি যা ধরেন তা কিছুতেই ছাড়েন না। কত টাকা হলে তোমার মনের মতো পোশাক হয় শুনি।

সতীশ। একটা মর্নিং সুট আর একটা লাউঞ্জ সুটে একশো টাকার কাছাকাছি লাগবে। একটা চলনসই ইভ্‌নিং ড্রেস দেড়শো টাকার কমে কিছুতেই হবে না।

বিধু। বল কী, সতীশ। এ তো তিনশো টাকার ধাক্কা, এত টাকা—

সতীশ। মা, ওই তোমাদের দোষ। এক, ফকিরি করতে চাও সে ভালো, আর যদি ভদ্রসমাজে মিশতে হয় তবে অমন টানাটানি করে চলে না। ভদ্রতা রাখতে

গেলে তো খরচ করতে হবে, তার তো কোনো উপায় নেই। সুন্দরবনে পাঠিয়ে দাও-না কেন, সেখানে ড্রেস কোটের দরকার হবে না।

বিধু। তা তো জানি, কিন্তু— আচ্ছা, তোমার মেসো তো তোমাকে জন্মদিনের উপহার দিয়ে থাকেন, এবারকার জন্য একটা নিমন্ত্রণের পোশাক তাঁর কাছ হতে জোগাড় করে নাও-না। কথায় কথায় তোমার মাসির কাছে একটু আভাস দিলেই হয়।

সতীশ। সে তো অনায়াসেই পারি, কিন্তু বাবা যদি টের পান আমি মেসোর কাছ হতে কাপড় আদায় করেছি, তা হলে রক্ষা থাকবে না।

বিধু। আচ্ছা, সে আমি সামলাতে পারব।

সতীশের প্রস্থান

ভাদুড়ি-সাহেবের মেয়ের সঙ্গে যদি সতীশের কোনোমতে বিবাহের জোগাড় হয় তা হলেও আমি সতীশের জন্য অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। ভাদুড়ি-সাহেব ব্যারিস্টার মানুষ, বেশ দু-দশ টাকা রোজগার করে। ছেলেবেলা হতেই সতীশ তো ওদের বাড়ি আনাগোনা করে, মেয়েটি তো আর পাষাণ নয়, নিশ্চয় আমার সতীশকে পছন্দ করবে। সতীশের বাপ তো এ-সব কথা একবার চিন্তাও করেন না, বলতে গেলে আগুন হয়ে ওঠেন, ছেলের ভবিষ্যতের কথা আমাকেই সমস্ত ভাবতে হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মিস্টার ভাদুড়ির বাড়িতে টেনিস-ক্ষেত্র

নলিনী। ও কী সতীশ, পালাও কোথায়।

সতীশ। তোমাদের এখানে টেনিস পার্টি জানতেম না, আমি টেনিস স্থট পরে আসি নি।

নলিনী। সকল গোরুর তো এক রঙের চামড়া হয় না, তোমার না হয় ওরিজিন্যাল বলেই নাম রটবে। আচ্ছা, আমি তোমার সুবিধা করে দিচ্ছি। মিস্টার নন্দী, আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।

নন্দী। অনুরোধ কেন, হুকুম বলুন-না— আমি আপনারই সেবার্থে।

নলিনী। যদি একবারে অসাধ্য বোধ না করেন তো আজকের মতো আপনারা সতীশকে মাপ করবেন— ইনি আজ টেনিস স্থট পরে আসেন নি। এতবড়ো শোচনীয় দুর্ঘটনা!

নন্দী। আপনি ওকালতি করলে খুন জাল ঘর-জ্বালানোও মাপ করতে পারি।

টেনিস সুট না পরে এলে যদি আপনার এত দয়া হয় তবে আমার এই টেনিস সুটটা মিস্টার সতীশকে দান করে তাঁর এই— এটাকে কী বলি! তোমার এটা কী সুট সতীশ— খিচুড়ি সুটই বলা যাক— তা আমি সতীশের এই খিচুড়ি সুটটা পরে রোজ এখানে আসব। আমার দিকে যদি স্বর্গের সমস্ত সূর্য চন্দ্র তারা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে তবু লজ্জা করব না। সতীশ, এ কাপড়টা দান করতে যদি তোমার আপত্তি থাকে তবে তোমার দরজির ঠিকানাটা আমাকে দিয়ো। ফ্যাশানেবল ছাঁটের চেয়ে মিস ভাদুড়ির দয়া অনেক মূল্যবান।

নলিনী। শোনো শোনো সতীশ, শুনে রাখো। কেবল কাপড়ের ছাঁট নয়, মিষ্ট কথার ছাঁদও তুমি মিস্টার নন্দীর কাছে শিখতে পার। এমন আদর্শ আর পাবে না। বিলাতে ইনি ডিউক ডাচেস ছাড়া আর কারো সঙ্গে কথাও কন নি। মিস্টার নন্দী, আপনাদের সময় বিলাতে বাঙালি ছাত্র কে কে ছিল।

নন্দী। আমি বাঙালিদের সঙ্গে সেখানে মিশি নি।

নলিনী। শুনছ সতীশ। রীতিমত সভ্য হতে গেলে কত সাবধানে থাকতে হয়। তুমি বোধ হয় চেষ্টা করলে পারবে। টেনিস সুট সম্বন্ধে তোমার যেরকম সূক্ষ্ম ধর্মজ্ঞান তাতে আশা হয়।

অন্যত্র গমন

সতীশ। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) নেলিকে আজ পর্যন্ত বুঝতেই পারলেম না। আমাকে দেখে ও বোধ হয় মনে মনে হাসে। আমারও মুশকিল হয়েছে, আমি কিছুতে এখানে এসে সুস্থমনে থাকতে পারি নে— কেবলই মনে হয়, আমার টাইটা বুঝি কলারের উপরে উঠে গেছে, আমার ট্রাউজারে হাঁটুর কাছটায় হয়তো কুঁচকে আছে। নন্দীর মতো কবে আমিও বেশ ওইরকম অনায়াসে স্ফূর্তির সঙ্গে—

নলিনী। (পুনরায় আসিয়া) কী সতীশ, এখনো যে তোমার মনের খেদ মিটল না। টেনিস কোর্তার শোকে তোমার হৃদয়টা যে বিদীর্ণ হয়ে গেল। হায়, কোর্তাহারা হৃদয়ের সান্ত্বনা জগতে কোথায় আছে— দরজির বাড়ি ছাড়া।

সতীশ। আমার হৃদয়টার খবর যদি রাখতে তবে এমন কথা আর বলতে না নেলি।

নলিনী। (করতালি দিয়া) বাহবা। মিস্টার নন্দীর দৃষ্টান্তে মিষ্ট কথার আমদানি এখনই শুরু হয়েছে। প্রশ্রয় পেলে অত্যন্ত উন্নতি হবে ভরসা হচ্ছে। এসো, একটু কেক খেয়ে যাবে, মিষ্ট কথার পুরস্কার মিষ্টান্ন।

সতীশ। না, আজ আর খাব না, আমার শরীরটা—

নলিনী। সতীশ, আমার কথা শোনো— টেনিস কোর্তার খেদে শরীর নষ্ট কোরো না, খাওয়াদাওয়া একেবারে ছাড়া ভালো নয়। কোর্তা জিনিসটা জগতের মধ্যে সেরা জিনিস সন্দেহ নেই, কিন্তু এই তুচ্ছ শরীরটা না হলে সেটা ঝুলিয়ে বেড়াবার সুবিধা হয় না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শশধর। দেখো মন্মথ, সতীশের উপরে তুমি বড়ো কড়া ব্যবহার আরম্ভ করেছ; এখন বয়েস হয়েছে, এখন ওর প্রতি অতটা শাসন ভালো নয়।

বিধু। বলো তো রায়মশায়। আমি তো ওঁকে কিছুতেই বুঝিয়ে পারলেম না।

মন্মথ। দুটো অপবাদ এক মুহূর্তেই। একজন বললেন নির্দয়, আর-একজন বললেন নির্বোধ। যাঁর কাছে হতবুদ্ধি হয়ে আছি তিনি যা বলেন সহ্য করতে রাজি আছি— তাঁর ভগ্নী যা বলবেন তার উপরেও কথা কব না, কিন্তু তাই বলে তাঁর ভগ্নীপতি পর্যন্ত সহিষ্ণুতা চলবে না। আমার ব্যবহারটা কিরকম কড়া শুনি।

শশধর। বেচারা সতীশের একটু কাপড়ের শখ আছে, ও পাঁচ জায়গায় মিশতে আরম্ভ করেছে, ওকে তুমি চাঁদনির—

মন্মথ। আমি তো চাঁদনির কাপড় পরতে বলি নে। ফিরিঙ্গি পোশাক আমার দু-চক্ষের বিষ। ধুতি-চাদর চাপকান-চোগা পরুক, কখনো লজ্জা পেতে হবে না।

শশধর। দেখো মন্মথ, সতীশ যদি এ বয়সে শখ মিটিয়ে না নিতে পারে তবে বুড়োবয়সে খামকা কী করে বসবে, সে আরো বদ দেখতে হবে। আর ভেবে দেখো, যেটাকে আমরা শিশুকাল হতেই সভ্যতা বলে শিখছি তার আক্রমণ ঠেকাবে কী করে।

মন্মথ। যিনি সভ্য হবেন তিনি সভ্যতার মালমসলা নিজের খরচেই জোগাবেন। যে দিক হতে তোমার সভ্যতা আসছে টাকাটা সে দিক হতে আসছে না, বরং এখান হতে সেই দিকেই যাচ্ছে।

বিধু। রায়মশায়, পেরে উঠবেন না— দেশের কথা উঠে পড়লে ওঁকে থামানো যায় না।

শশধর। ভাই মন্মথ, ও-সব কথা আমিও বুঝি। কিন্তু, ছেলেদের আবদারও তো এড়াতে পারি নে। সতীশ ভাদুড়ি-সাহেবদের সঙ্গে যখন মেশামেশি করছে তখন উপযুক্ত কাপড় না থাকলে ও বেচারার বড়ো মুশকিল। আমি র‍্যাঙ্কিনের বাড়িতে ওর জন্য—

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। সাহেববাড়ি হতে এই কাপড় এয়েছে।

মন্মথ। নিয়ে যা কাপড়, নিয়ে যা। এখনি নিয়ে যা।

বিধুর প্রতি

দেখো, সতীশকে যদি আমি এ কাপড় পরতে দেখি তবে তাকে বাড়িতে থাকতে দেব না, মেসে পাঠিয়ে দেব, সেখানে সে আপন ইচ্ছামত চলতে পারবে।

দ্রুত প্রস্থান

শশধর। অবাক কাণ্ড!

বিধু। (সরোদনে) রায়মশায়, তোমাকে কী বলব, আমার বেঁচে সুখ নেই। নিজের ছেলের উপর বাপের এমন ব্যবহার কেউ কোথাও দেখেছে ?

শশধর। আমার প্রতি ব্যবহারটাও তো ঠিক ভালো হল না। বোধ হয় মন্মথর হজমের গোল হয়েছে। আমার পরামর্শ শোনো, তুমি ওকে রোজ সেই একই ডালভাত খাইয়ো না। ও যতই বলুক-না কেন, মাঝে মাঝে মসলাওয়ালা রান্না না হলে মুখে রোচে না, হজমও হয় না। কিছুদিন ওকে ভালো করে খাওয়াও দেখি, তার পরে তুমি যা বলবে ও তাই শুনবে। এ সম্বন্ধে তোমার দিদি তোমার চেয়ে ভালো বোঝেন।

শশধরের প্রস্থান। বিধুমুখীর ক্রন্দন

বিধবা জা। (ঘরে প্রবেশ করিয়া, আত্মগত) কখনো কান্না, কখনো হাসি— কত রকম যে সোহাগ তার ঠিক নেই— বেশ আছে।

দীর্ঘনিশ্বাস

ও মেজবউ, গোসাঘরে বসেছিস! ঠাকুরপোকে ডেকে দিই, মানভঞ্জনের পালা হয়ে যাক।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নলিনী। সতীশ, আমি তোমাকে কেন ডেকে পাঠিয়েছি বলি, রাগ কোরো না।

সতীশ। তুমি ডেকেছ বলে রাগ করব, আমার মেজাজ কি এতই বদ।

নলিনী। না, ও-সব কথা থাক্। সকল সময়েই নন্দী-সাহেবের চেলাগিরি

কোরো না। বলো দেখি, আমার জন্মদিনে তুমি আমাকে অমন দামী জিনিস কেন দিলে।

সতীশ। যাঁকে দিয়েছি তাঁর তুলনায় জিনিসটার দাম এমনই কি বেশি।

নলিনী। আবার ফের নন্দীর নকল!

সতীশ। নন্দীর নকল সাধে করি! তার প্রতি যখন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষপাত—

নলিনী। তবে যাও, তোমার সঙ্গে আর আমি কথা কব না।

সতীশ। আচ্ছা, মাপ করো, আমি চুপ করে শুনব।

নলিনী। দেখো সতীশ, মিস্টার নন্দী আমাকে নির্বোধের মতো একটা দামী ব্রেস্‌লেট পাঠিয়েছিলেন, তুমি অমনি নির্বুদ্ধিতার সুর চড়িয়ে তার চেয়ে দামী একটা নেক্‌লেস পাঠাতে গেলে কেন।

সতীশ। যে অবস্থায় লোকের বিবেচনাশক্তি থাকে না সে অবস্থাটা তোমার জানা নেই বলে তুমি রাগ করছ, নেলি।

নলিনী। আমার সাতজন্মে জেনে কাজ নেই। কিন্তু এ নেক্‌লেস তোমাকে ফিরে নিয়ে যেতে হবে।

সতীশ। ফিরে দেবে?

নলিনী। দেব। বাহাদুরি দেখাবার জন্যে যে দান, আমার কাছে সে দানের কোনো মূল্য নেই।

সতীশ। তুমি অন্যায় বলছ নেলি।

নলিনী। আমি কিছুই অন্যায় বলছি নে— তুমি যদি আমাকে একটি ফুল দিতে আমি ঢের বেশি খুশি হতেম। তুমি যখন-তখন প্রায়ই মাঝে মাঝে আমাকে কিছু-না-কিছু দামী জিনিস পাঠাতে আরম্ভ করেছ। পাছে তোমার মনে লাগে বলে আমি এতদিন কিছুই বলি নি। কিন্তু, ক্রমেই মাত্রা বেড়ে চলেছে, আর আমার চুপ করে থাকা উচিত নয়। এই নাও তোমার নেক্‌লেস।

সতীশ। এ নেক্‌লেস তুমি রাস্তায় টান মেরে ফেলে দাও, কিন্তু আমি এ কিছুতেই নেব না।

নলিনী। আচ্ছা সতীশ, আমি তো তোমাকে ছেলেবেলা হতেই জানি, আমার কাছে ভাঁড়িয়ো না। সত্য করে বলো, তোমার কি অনেক টাকা ধার হয় নি।

সতীশ। কে তোমাকে বলেছে। নরেন বুঝি?

নলিনী। কেউ বলে নি। আমি তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারি। আমার জন্য তুমি এমন অন্যায় কেন করছ।

সতীশ। সময়বিশেষে লোকবিশেষের জন্য মানুষ প্রাণ দিতে ইচ্ছা করে; আজকালকার দিনে প্রাণ দেবার অবকাশ খুঁজে পাওয়া যায় না— অন্তত ধার করবার দুঃখটুকু স্বীকার করবার যে সুখ তাও কি ভোগ করতে দেবে না। আমার পক্ষে যা দুঃসাধ্য আমি তোমার জন্য তাই করতে চাই নেলি, একেও যদি তুমি নন্দী-সাহেবের নকল বল তবে আমার পক্ষে মর্মান্তিক হয়।

নলিনী। আচ্ছা, তোমার যা করবার তা তো করেছ— তোমার সেই ত্যাগস্বীকারটুকু আমি নিলেম— এখন এ জিনিসটা ফিরে নাও।

সতীশ। ওটা যদি আমাকে ফিরিয়ে নিতে হয় তবে ওই নেক্‌লেসটা গলায় ফাঁস লাগিয়ে দম বন্ধ করে আমার পক্ষে মরা ভালো।

নলিনী। দেনা তুমি শোধ করবে কী করে।

সতীশ। মার কাছ হতে টাকা পাব।

নলিনী। ছি ছি, তিনি মনে করবেন আমার জন্যই তাঁর ছেলের দেনা হচ্ছে।

সতীশ। সে কথা তিনি কখনোই মনে করবেন না, তাঁর ছেলেকে তিনি অনেকদিন হতে জানেন।

নলিনী। আচ্ছা সে যাই হোক, তুমি প্রতিজ্ঞা করো, এখন হতে তুমি আমাকে দামী জিনিস দেবে না। বড়োজোর ফুলের তোড়ার বেশি আর কিছু দিতে পারবে না।

সতীশ। আচ্ছা, সেই প্রতিজ্ঞাই করলেম।

নলিনী। যাক, এখন তবে তোমার গুরু নন্দী-সাহেবের পাঠ আবৃত্তি করো। দেখি, স্তুতিবাদ করবার বিদ্যা তোমার কতদূর অগ্রসর হল। আচ্ছা, আমার কানের ডগা সম্বন্ধে কী বলতে পার বলো— আমি তোমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিলেম।

সতীশ। যা বলব তাতে ওই ডগাটুকু লাল হয়ে উঠবে।

নলিনী। বেশ বেশ, ভূমিকাটি মন্দ হয় নি। আজকের মতো ওইটুকুই থাক্, বাকিটুকু আর-একদিন হবে। এখনই কান ঝাঁঝাঁ করতে শুরু হয়েছে।

নবম পরিচ্ছেদ

বিধু। আমার উপর রাগ কর যা কর, ছেলের উপর কোরো না। তোমার পায়ে ধরি, এবারকার মতো তার দেনাটা শোধ করে দাও।

মন্মথ। আমি রাগারাগি করছি নে, আমার যা কর্তব্য তা আমাকে করতেই হবে। আমি সতীশকে বার বার বলেছি, দেনা করলে শোধবার ভার আমি নেব না। আমার সে কথার অন্যথা হবে না।

বিধু। ওগো, এতবড়ো সত্যপ্রতিজ্ঞ যুধিষ্ঠির হলে সংসার চলে না। সতীশের এখন বয়স হয়েছে, তাকে জলপানি যা দাও তাতে ধার না করে তার চলে কী করে বলো দেখি।

মন্মথ। যার যেরূপ সাধ্য তার চেয়ে চাল বড়ো করলে কারোই চলে না—ফকিরেরও না, বাদশারও না।

বিধু। তবে কি ছেলেকে জেলে যেতে দেবে।

মন্মথ। সে যদি যাবার আয়োজন করে এবং তোমরা যদি তার জোগাড় দাও তবে আমি ঠেকিয়ে রাখব কী করে।

মন্মথর প্রস্থান। শশধরের প্রবেশ

শশধর। আমাকে এ বাড়িতে দেখলে মন্মথ ভয় পায়। ভাবে, কালো কোর্তা ফরমাশ দেবার জন্য ফিতা হাতে তার ছেলের গায়ের মাপ নিতে এসেছি। তাই কদিন আসি নি। আজ তোমার চিঠি পেয়ে সুকু কান্নাকাটি করে আমাকে বাড়ি-ছাড়া করেছে।

বিধু। দিদি আসেন নি?

শশধর। তিনি এখনি আসবেন। ব্যাপারটা কী।

বিধু। সবই তো শুনেছ। এখন ছেলেটাকে জেলে না দিলে ওঁর মন স্থির হচ্ছে না। র‍্যাঙ্কিন-হার্মানের পোশাক তাঁর পছন্দ হল না, জেলখানার কাপড়টাই বোধ হয় তাঁর মতে বেশ সুসভ্য।

শশধর। আর যাই বল মন্মথকে বোঝাতে যেতে আমি পারব না। তার কথা আমি বুঝি নে, আমার কথাও সে বোঝে না, শেষকালে—

বিধু। সে কি আমি জানি নে। তোমরা তো তাঁর স্ত্রী নও যে মাথা হেঁট করে সমস্তই সহ্য করবে। কিন্তু এখন এ বিপদ ঠেকাই কী করে।

শশধর। তোমার হাতে কিছু কি—

বিধু। কিছুই নেই— সতীশের ধার শুধতে আমার প্রায় সমস্ত গহনাই বাঁধা পড়েছে, হাতে কেবল বালাজোড়া আছে।

সতীশের প্রবেশ

শশধর। কী সতীশ, খরচপত্র বিবেচনা করে কর না, এখন কী মুশকিলে পড়েছ দেখো দেখি।

সতীশ। মুশকিল তো কিছুই দেখি নে।

শশধর। তবে হাতে কিছু আছে বুঝি! ফাঁস কর নি।

সতীশ। কিছু তো আছেই।

শশধর। কত?

সতীশ। আফিম কেনবার মতো।

বিধু। (কাঁদিয়া উঠিয়া) সতীশ, ও কী কথা তুই বলিস। আমি অনেক দুঃখ পেয়েছি, আমাকে আর দগ্ধাস নে।

শশধর। ছি ছি, সতীশ। এমন কথা যদি-বা কখনো মনেও আসে তবু কি মার সামনে উচ্চারণ করা যায়। বড়ো অন্যায় কথা।

সুকুমারীর প্রবেশ

বিধু। দিদি, সতীশকে রক্ষা করো। ও কোন্‌দিন কী করে বসে আমি তো ভয়ে বাঁচি নে। ও যা বলে শুনে আমার গা কাঁপে।

সুকুমারী। ও আবার কী বলে।

বিধু। বলে কিনা আফিম কিনে আনবে।

সুকুমারী। কী সর্বনাশ! সতীশ, আমার গা ছুঁয়ে বল্‌ এমন কথা মনেও আনবি নে। চুপ করে রইলি যে। লক্ষ্মী বাপ আমার। তোর মা-মাসির কথা মনে করিস।

সতীশ। জেলে বসে মনে করার চেয়ে এ-সমস্ত হাস্যকর ব্যাপার জেলের বাইরে চুকিয়ে ফেলাই ভালো।

সুকুমারী। আমরা থাকতে তোকে জেলে কে নিয়ে যাবে।

সতীশ। পেয়াদা।

সুকুমারী। আচ্ছা, সে দেখব কতবড়ো পেয়াদা; ওগো, এই টাকাটা ফেলে দাও-না, ছেলেমানুষকে কেন কষ্ট দেওয়া।

শশধর। টাকা ফেলে দিতে পারি, কিন্তু মন্মথ আমার মাথায় ইঁট ফেলে না মারে।

সতীশ। মেসোমশায়, সে ইঁট তোমার মাথায় পৌঁছবে না, আমার ঘাড়ে

পড়বে। একে একজামিনে ফেল করেছি, তার উপরে দেনা, এর উপরে জেলে যাবার এতবড়ো সুযোগটা যদি মাটি হয়ে যায় তবে বাবা আমার সে অপরাধ মাপ করবেন না।

বিধু। সত্যি দিদি, সতীশ মেসোর টাকা নিয়েছে শুনলে তিনি বোধ হয় ওকে বাড়ি হতে বার করে দেবেন।

সুকুমারী। তা দিন-না। আর কি কোথাও বাড়ি নেই নাকি। ও বিধু, সতীশকে তুই আমাকেই দিয়ে দে-না। আমার তো ছেলেপুলে নেই, আমি নাহয় ওকেই মানুষ করি। কী বল গো।

শশধর। সে তো ভালোই। কিন্তু সতীশ যে বাঘের বাচ্ছা, ওকে টানতে গেলে তার মুখ থেকে প্রাণ বাঁচানো দায় হবে।

সুকুমারী। বাঘমশায় তো বাচ্ছাটিকে জেলের পেয়াদার হাতেই সমর্পণ করে দিয়েছেন, আমরা যদি তাকে বাঁচিয়ে নিয়ে যাই এখন তিনি কোনো কথা বলতে পারবেন না।

শশধর। বাঘিনী কী বলেন, বাচ্ছাই বা কী বলে।

সুকুমারী। যা বলে সে আমি জানি, সে কথা আর জিজ্ঞাসা করতে হবে না। তুমি এখন দেনাটা শোধ করে দাও।

বিধু। দিদি।

সুকুমারী। আর দিদি দিদি করে কাঁদতে হবে না। চল্‌, তোর চুল বেঁধে দিই গে। এমন ছিরি করে তোর ভগ্নীপতির সামনে বার হতে লজ্জা করে না?

শশধর ব্যতীত সকলের প্রস্থান। মন্মথর প্রবেশ

শশধর। মন্মথ, ভাই, তুমি একটু বিবেচনা করে দেখো—

মন্মথ। বিবেচনা না করে তো আমি কিছুই করি না।

শশধর। তবে দোহাই তোমার, বিবেচনা একটু খাটো করো। ছেলেটাকে কি জেলে দেবে। তাতে কি ওর ভালো হবে।

মন্মথ। ভালোমন্দর কথা কেউই শেষ পর্যন্ত ভেবে উঠতে পারে না। আমি মোটামুটি এই বুঝি যে, বার বার সাবধান করে দেওয়ার পরও যদি কেউ অন্যায় করে তবে তার ফলভোগ হতে তাকে কৃত্রিম উপায়ে রক্ষা করা কারো উচিত হয় না। আমরা যদি মাঝে পড়ে ব্যর্থ করে না দিতেম তবে প্রকৃতির কঠিন শিক্ষায় মানুষ যথার্থ মানুষ হয়ে উঠতে পারত।

শশধর। প্রকৃতির কঠোর শিক্ষাই যদি একমাত্র শিক্ষা হত তবে বিধাতা বাপমায়ের মনে স্নেহটুকু দিতেন না। মন্মথ, তুমি যে দিনরাত কর্মফল কর্মফল করো আমি তা সম্পূর্ণ মানি না। প্রকৃতি আমাদের কাছ হতে কর্মফল কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নিতে চায় কিন্তু প্রকৃতির উপরে যিনি কর্তা আছেন তিনি মাঝে পড়ে তার অনেকটাই মহৎ্কুপ দিয়ে থাকেন, নইলে কর্মফলের দেনা শুধতে শুধতে আমাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিকিয়ে যেত। বিজ্ঞানের হিসাবে কর্মফল সত্য, কিন্তু বিজ্ঞানের উপরেও বিজ্ঞান আছে, সেখানে প্রেমের হিসাবে ফলাফল সমস্ত অন্যরকম। কর্মফল নৈসর্গিক, মার্জনাটা তার উপরের কথা।

মন্মথ। যিনি অনৈসর্গিক মানুষ তিনি যা খুশি করবেন, আমি অতি সামান্য নৈসর্গিক, আমি কর্মফল শেষ পর্যন্তই মানি।

শশধর। আচ্ছা, আমি যদি সতীশের দেনা শোধ করে তাকে খালাস করি, তুমি কী করবে।

মন্মথ। আমি তাকে ত্যাগ করব। দেখো, সতীশকে আমি যে ভাবে মানুষ করতে চেয়েছিলেম প্রথম হতেই বাধা দিয়ে তোমরা তা ব্যর্থ করেছ। এক দিক হতে সংযম আর-এক দিক হতে প্রশ্রয় পেয়ে সে একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। ক্রমাগতই ভিক্ষা পেয়ে যদি তার সম্মানবোধ এবং দায়িত্ববোধ চলে যায়, যে কাজের যে পরিণাম তোমরা যদি মাঝে পড়ে কিছুতেই তাকে তা বুঝতে না দাও, তবে তার আশা আমি ত্যাগ করলেম। তোমাদের মতেই তাকে মানুষ করো— দুই নৌকোয় পা দিয়েই তার বিপদ ঘটেছে।

শশধর। ও কী কথা বলছ মন্মথ— তোমার ছেলে—

মন্মথ। দেখো শশধর, নিজের প্রকৃতি ও বিশ্বাস -মতেই নিজের ছেলেকে আমি মানুষ করতে পারি, অন্য কোনো উপায় তো জানি না। যখন নিশ্চয় দেখছি তা কোনোমতেই হবার নয়, তখন পিতার দায়িত্ব আমি আর রাখব না। আমার যা সাধ্য তার বেশি আমি করতে পারব না।

মন্মথর প্রস্থান

শশধর। কী করা যায়। ছেলেটাকে তো জেলে দেওয়া যায় না। অপরাধ মানুষের পক্ষে যত সর্বনেশেই হোক, জেলখানা তার চেয়ে ঢের বেশি।

দশম পরিচ্ছেদ

ভাদুড়িজায়া। শুনেছ? সতীশের বাপ হঠাৎ মারা গেছে।

মিস্টার ভাদুড়ি। হাঁ, সে তো শুনেছি।

জায়া। সে-যে সমস্ত সম্পত্তি হাসপাতালে দিয়ে গেছে, কেবল সতীশের মার জন্য জীবিতকাল পর্যন্ত ৭৫ টাকা মাসহারা বরাদ্দ করে গেছে। এখন কী করা যায়।

ভাদুড়ি। এত ভাবনা কেন তোমার।

জায়া। বেশ লোক যা হোক তুমি। তোমার মেয়ে যে সতীশকে ভালোবাসে সেটা বুঝি তুমি দুই চক্ষু মেলে দেখতে পাও না! তুমি তো ওদের বিবাহ দিতেও প্রস্তুত ছিলে। এখন উপায় কী করবে।

ভাদুড়ি। আমি তো মন্মথর টাকার উপর বিশেষ নির্ভর করি নি।

জায়া। তবে কি ছেলেটির চেহারার উপরেই নির্ভর করে বসেছিলে। অন্নবস্ত্রটা বুঝি অনাবশ্যক?

ভাদুড়ি। সম্পূর্ণ আবশ্যক। যিনি যাই বলুন, ওর চেয়ে আবশ্যক আর-কিছুই নেই। সতীশের একটি মেসো আছে, বোধ হয় জান।

জায়া। মেসো তো ঢের লোকেরই থাকে, তাতে ক্ষুধাশান্তি হয় না।

ভাদুড়ি। এই মেসোটি আমার মক্কেল— অগাধ টাকা— ছেলেপুলে কিছুই নেই— বয়সও নিতান্ত অল্প নয়। সে তো সতীশকেই পোষ্যপুত্র নিতে চায়।

জায়া। মেসোটি তো ভালো। তা চট্‌পট্ নিক-না। তুমি একটু তাড়া দাও-না।

ভাদুড়ি। তাড়া আমাকে দিতে হবে না, তার ঘরের মধ্যেই তাড়া দেবার লোক আছে। সবই প্রায় ঠিকঠাক, এখন কেবল একটা আইনের খটকা উঠেছে— এক ছেলেকে পোষ্যপুত্র লওয়া যায় কি না— তা ছাড়া সতীশের আবার বয়স হয়ে গেছে।

জায়া। আইন তো তোমাদেরই হাতে— তোমরা চোখ বুজে একটা বিধান দিয়ে দাও-না।

ভাদুড়ি। ব্যস্ত হোয়ো না— পোষ্যপুত্র না নিলেও অন্য উপায় আছে।

জায়া। আমাকে বাঁচালে। আমি ভাবছিলেম, সম্বন্ধ ভাঙি কী করে। আবার, আমাদের নেলি যেরকম জেদালো মেয়ে, সে যে কী করে বসত বলা যায় না। কিন্তু তাই বলে গরিবের হাতে তো মেয়ে দেওয়া যায় না। ওই দেখো, তোমার মেয়ে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে। কাল যখন খেতে বসেছিল এমন সময় সতীশের বাপ-মরার খবর পেল, অমনি তখনি উঠে চলে গেল।

ভাদুড়ি। কিন্তু, নেলি যে সতীশকে ভালোবাসে সে তো দেখে মনে হয় না। ও তো সতীশকে নাকের জলে চোখের জলে করে। আমি আরো মনে করতাম, নন্দীর উপরেই ওর বেশি টান।

জায়া। তোমার মেয়েটির ওই স্বভাব সে যাকে ভালোবাসে তাকেই জ্বালাতন করে। দেখো না বিড়ালছানাটাকে নিয়ে কী কাণ্ডটাই করে! কিন্তু আশ্চর্য এই, তবু তো ওকে কেউ ছাড়তে চায় না।

নলিনীর প্রবেশ

নলিনী। মা, একবার সতীশবাবুর বাড়ি যাবে না? তাঁর মা বোধ হয় খুব কাতর হয়ে পড়েছেন। বাবা, আমি একবার তাঁর কাছে যেতে চাই।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সতীশ। মা, এখানে আমি যে কত সুখে আছি সে তো আমার কাপড়-চোপড় দেখেই বুঝতে পার। কিন্তু মেসোমশায় যতক্ষণ না আমাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হতে পারছি নে। তুমি যে মাসহারা পাও আমার তো তাতে কোনো সাহায্য হবে না। অনেকদিন হতে নেব-নেব করেও আমাকে পোষ্যপুত্র নিচ্ছেন না— বোধ হয় ওঁদের মনে মনে সন্তানলাভের আশা এখনো আছে।

বিধু। (হতাশভাবে) সে আশা সফল হয়-বা, সতীশ।

সতীশ। অ্যাঁ! বলো কী মা!

বিধু। লক্ষণ দেখে তো তাই বোধ হয়।

সতীশ। লক্ষণ অমন অনেক সময় ভুলও তো হয়।

বিধু। না, ভুল নয় সতীশ, এবার তোর ভাই হবে।

সতীশ। কী যে বল মা, তার ঠিক নেই— ভাই হবেই কে বললে! বোন হতে পারে না বুঝি!

বিধু। দিদির চেহারা যেরকম হয়ে গেছে নিশ্চয় তাঁর মেয়ে হবে না, ছেলেই হবে। তা ছাড়া ছেলেই হোক, মেয়েই হোক, আমাদের পক্ষে সমানই।

সতীশ। এত বয়সের প্রথম ছেলে, ইতিমধ্যে অনেক বিঘ্ন ঘটতে পারে।

বিধু। সতীশ, তুই চাকরির চেষ্টা কর্।

সতীশ। অসম্ভব। পাস করতে পারি নি। তা ছাড়া চাকরি করবার অভ্যাস

আমার একেবারে গেছে। কিন্তু, যাই বল মা, এ ভারি অন্যায়। আমি তো এতদিনে বাবার সম্পত্তি পেতেম, তার থেকে বঞ্চিত হলেম, তার পরে যদি আবার—

বিধু। অন্যায় নয় তো কী, সতীশ। এ দিকে তোকে ঘরে এনেছেন, ও দিকে আবার ডাক্তার ডাকিয়ে ওষুধও খাওয়া চলছে। নিজের বোনপোর সঙ্গে এ কিরকম ব্যবহার। শেষকালে দয়াল ডাক্তারের ওষুধ তো খেটে গেল। অস্থির হোস নে সতীশ। একমনে ভগবানকে ডাক— তাঁর কাছে কোনো ডাক্তারই লাগে না। তিনি যদি—

সতীশ। আহা, তিনি যদি এখনো— এখনো সময় আছে। মা, এঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, কিন্তু যেরকম অন্যায় হল, সে ভাব রক্ষা করা শক্ত হয়ে উঠেছে। ঈশ্বরের কাছে এঁদের একটা দুর্ঘটনা না প্রার্থনা করে থাকতে পারছি নে— তিনি দয়া করে যেন—

বিধু। আহা তাই হোক, নইলে তোর উপায় কী হবে সতীশ, আমি তাই ভাবি। হে ভগবান, তুমি যেন—

সতীশ। এ যদি না হয় তবে ঈশ্বরকে আমি আর মানব না। কাগজে নাস্তিকতা প্রচার করব।

বিধু। আরে চুপ চুপ, এখন এমন কথা মুখে আনতে নেই। তিনি দয়াময়, তাঁর দয়া হলে কী না ঘটতে পারে। সতীশ, তুই আজ এত ফিট্‌ফাট্‌ সাজ করে কোথায় চলেছিস। উঁচু কলার পরে মাথা যে আকাশে গিয়ে ঠেকল! ঘাড় হেঁট করবি কী করে।

সতীশ। এমনি করে কলারের জোরে যতদিন মাথা তুলে চলতে পারি চলব, তার পরে ঘাড় হেঁট করবার দিন যখন আসবে তখন এগুলো ফেলে দিলেই চলবে। বিশেষ কাজ আছে মা, চললেম, কথাবার্তা পরে হবে।

প্রস্থান

বিধু। কাজ কোথায় আছে তা জানি। মাগো, ছেলের আর তর সয় না। এ বিবাহটা ঘটবেই। আমি জানি, আমার সতীশের অদৃষ্ট খারাপ নয়; প্রথমে বিঘ্ন যতই ঘটুক, শেষকালটায় ওর ভালো হয়ই, এ আমি বরাবর দেখে আসছি। না হবেই বা কেন। আমি তো জ্ঞাতসারে কোনো পাপ করি নি— আমি তো সতী স্ত্রী ছিলাম, সেইজন্যে আমার খুব বিশ্বাস হচ্ছে দিদির এবারে—

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সুকুমারী। সতীশ।

সতীশ। কী মাসিমা।

সুকুমারী। কাল যে তোমাকে খোকার কাপড় কিনে আনবার জন্য এত করে বললেম, অপমান বোধ হল বুঝি।

সতীশ। অপমান কিসের মাসিমা। কাল ভাদুড়ি-সাহেবের ওখানে আমার নিমন্ত্রণ ছিল তাই—

সুকুমারী। ভাদুড়ি-সাহেবের ওখানে তোমার এত ঘন ঘন যাতায়াতের দরকার কী, তা তো ভেবে পাই নে। তারা সাহেব মানুষ, তোমার মতো অবস্থার লোকের কি তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা সাজে। আমি তো শুনলেম, তোমাকে তারা আজকাল পোঁছে না, তবু বুঝি ওই রঙিন টাইয়ের উপর টাইরিং পরে বিলাতি কার্তিক সেজে তাদের ওখানে আনাগোনা করতেই হবে। তোমার কি একটুও সম্মানবোধ নেই। তাই যদি থাকবে তবে কি কাজকর্মের কোনো চেষ্টা না করে এখানে এমন করে পড়ে থাকতে। তার উপরে আবার একটা কাজ করতে বললে মনে মনে রাগ করা হয়, পাছে ওঁকে কেউ বাড়ির সরকার মনে করে ভুল করে। কিন্তু, সরকারও তো ভালো— সে খেটে উপার্জন করে খায়।

সতীশ। মাসিমা, আমিও হয়তো তা পারতেম, কিন্তু তুমিই তো—

সুকুমারী। তাই বটে। জানি, শেষকালে আমারই দোষ হবে। এখন বুঝছি তোমার বাপ তোমাকে ঠিক চিনতেন। তাই তোমাকে এমন করে শাসনে রেখেছিলেন। আমি আরো ছেলেমানুষ বলে দয়া করে তোমাকে ঘরে স্থান দিলেম, জেল থেকে বাঁচালেম, শেষকালে আমারই দোষ হল। একেই বলে কৃতজ্ঞতা! আচ্ছা, আমারই না হয় দোষ হল, তবু যে কদিন এখানে আমাদের অন্ন খাচ্ছ, দরকার-মত দুটো কাজই না হয় করে দিলে। এমন কি কেউ করে না। এতে কি অত্যন্ত অপমান বোধ হয়।

সতীশ। কিছু না, কিছু না। কী করতে হবে বলো, আমি এখনি করছি।

সুকুমারী। খোকার জন্য সাড়ে সাত গজ রেন্‌বো সিল্ক চাই— আর একটা সেলার সুট—

সতীশের প্রস্থানোদ্যম

শোনো শোনো, ওর মাপটা নিয়ে যেয়ো, জুতো চাই।

সতীশ প্রস্থানোন্মুখ

অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন— সবগুলো ভালো করে শুনেই যাও। আজও বুঝি ভাদুড়ি-সাহেবের রুটি বিস্কুট খেতে যাবার জন্য প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করছে। খোকার জন্যে স্ট্র-হ্যাট এনো— আর তার রুমালও এক ডজন চাই।

সতীশের প্রস্থান। তাহাকে পুনরায় ডাকিয়া

শোনো সতীশ, আর-একটা কথা আছে। শুনলাম, তোমার মেসোর কাছ হতে তুমি নূতন সুট কেনবার জন্য আমাকে না বলে টাকা চেয়ে নিয়েছ। যখন নিজের সামর্থ্য হবে তখন যত খুশি সাহেবিয়ানা কোরো, কিন্তু পরের পয়সায় ভাদুড়ি-সাহেবদের তাক লাগিয়ে দেবার জন্য মেসোকে ফতুর করে দিয়ো না। সে টাকাটা আমাকে ফেরত দিয়ো। আজকাল আমাদের বড়ো টানাটানির সময়।

সতীশ। আচ্ছা, এনে দিচ্ছি।

সুকুমারী। এখন তুমি দোকানে যাও, সেই টাকা দিয়ে কিনে বাকিটা ফেরত দিয়ো। একটা হিসাব রাখতে ভুলো না যেন।

সতীশের প্রস্থানোদ্যম

শোনো সতীশ, এই কটা জিনিস কিনতে আবার যেন আড়াই টাকা গাড়িভাড়া লাগিয়ে বোসো না। ওইজন্যে তোমাকে কিছু আনতে বলতে ভয় করে। দু পা হেঁটে চলতে হলেই অমনি তোমার মাথায় মাথায় ভাবনা পড়ে— পুরুষমানুষ এত বাবু হলে তো চলে না। তোমার বাবা রোজ সকালে নিজে হেঁটে গিয়ে নতুন বাজার হতে কই মাছ কিনে আনতেন — মনে আছে তো? মুটেকেও তিনি এক পয়সা দেন নি।

সতীশ। তোমার উপদেশ মনে থাকবে— আমিও দেব না। আজ হতে তোমার এখানে মুটেভাড়া বেহারার মাইনে যত অল্প লাগে সে দিকে আমার সর্বদাই দৃষ্টি থাকবে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

হরেন। দাদা, তুমি অনেকক্ষণ ধরে ও কী লিখছ, কাকে লিখছ বলো-না।

সতীশ। যা যা, তোর সে খবরে কাজ কী, তুই খেলা কর্‌ গে যা।

হরেন। দেখি-না কী লিখছ— আমি আজকাল পড়তে পারি।

সতীশ। হরেন, তুই আমাকে বিরক্ত করিস নে বলছি— যা তুই।

হরেন। ভয়ে আকার ভা, ল, ভাল, বয়ে আকার বা, সয়ে আকার সা,

ভালোবাসা। দাদা, কী ভালোবাসার কথা লিখছ বলো-না। তুমিও কাঁচা পেয়ারা ভালোবাস বুঝি! আমিও বাসি।

সতীশ। আঃ হরেন, অত চেঁচাস নে, ভালোবাসার কথা আমি লিখি নি।

হরেন। অ্যাঁ! মিথ্যা কথা বলছ! আমি যে পড়লেম ভয়ে আকার ভা, ল, ভাল, বয়ে আকার সয়ে আকার ভালোবাসা। আচ্ছা, মাকে ডাকি, তাঁকে দেখাও।

সতীশ। না না, মাকে ডাকতে হবে না। লক্ষ্মীটি, তুই একটু খেলা করতে যা, আমি এইটে শেষ করি।

হরেন। এটা কী দাদা। এ যে ফুলের তোড়া। আমি নেব।

সতীশ। ওতে হাত দিস নে, হাত দিস নে, ছিঁড়ে ফেলবি।

হরেন। না, আমি ছিঁড়ে ফেলব না, আমাকে দাও-না।

সতীশ। খোকা, কাল তোকে আমি অনেক তোড়া এনে দেব, এটা থাক্।

হরেন। দাদা, এটা বেশ, আমি এইটেই নেব।

সতীশ। না, এ আর-একজনের জিনিস, আমি তোকে দিতে পারব না।

হরেন। অ্যাঁ, মিথ্যে কথা! আমি তোমাকে লজঞ্জুস আনতে বলেছিলেম, তুমি সেই টাকায় তোড়া কিনে এনেছ— তাই বৈকি, আর-একজনের জিনিস বৈকি।

সতীশ। হরেন, লক্ষ্মী ভাই, তুই একটুখানি চুপ কর্, চিঠিখানা শেষ করে ফেলি। কাল তোকে আমি অনেক লজঞ্জুস কিনে এনে দেব।

হরেন। আচ্ছা, তুমি কী লিখছ আমাকে দেখাও।

সতীশ। আচ্ছা দেখাব, আগে লেখাটা শেষ করি।

হরেন। তবে আমিও লিখি।

স্লেট লইয়া চীৎকারস্বরে

ভয়ে আকার ভা, ল, ভাল, বয়ে আকার বা সয়ে আকার সা ভালোবাসা।

সতীশ। চুপ চুপ, অত চীৎকার করিস নে। আঃ, থাম্ থাম্।

হরেন। তবে আমাকে তোড়াটা দাও।

সতীশ। আচ্ছা নে, কিন্তু খবরদার ছিঁড়িস নে— ও কী করলি! যা বারণ করলেম তাই! ফুলটা ছিঁড়ে ফেললি! এমন বদ ছেলেও তো দেখি নি।

তোড়া কাড়িয়া লইয়া চপেটাঘাত করিয়া

লক্ষ্মীছাড়া কোথাকার! যা, এখান থেকে যা বলছি, যা।

হরেনের চীৎকারস্বরে ক্রন্দন, সতীশের সবেগে প্রস্থান

বিধুমুখীর ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ

বিধু। সতীশ বুঝি হরেনকে কাঁদিয়েছে, দিদি টের পেলে সর্বনাশ হবে। হরেন, বাপ আমার, কাঁদিস নে, লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার।

হরেন। (সরোদনে) দাদা আমাকে মেরেছে।

বিধু। আচ্ছা আচ্ছা, চুপ কর্, চুপ কর্। আমি দাদাকে খুব করে মারব এখন।

হরেন। দাদা ফুলের তোড়া কেড়ে নিয়ে গেল।

বিধু। আচ্ছা, সে আমি তার কাছ থেকে নিয়ে আসছি।

হরেনের ক্রন্দন

এমন ছিঁচ্‌কাঁদুনে ছেলেও তো আমি কখনো দেখি নি। দিদি আদর দিয়ে ছেলেটির মাথা খাচ্ছেন। যখন যেটি চায় তখনই সেটি তাকে দিতে হবে। দেখো-না, একবারে দোকান ঝাঁটিয়ে কাপড়ই কেনা হচ্ছে। যেন নবাবপুত্র। ছি ছি, নিজের ছেলেকে কি এমনি করেই মাটি করতে হয়। (সতর্জনে) খোকা, চুপ কর্ বলছি। ওই হামদোবুড়ো আসছে।

সুকুমারীর প্রবেশ

সুকুমারী। বিধু, ও কী ও! আমার ছেলেকে কি এমনি করেই ভূতের ভয় দেখাতে হয়। আমি চাকর-বাকরদের বারণ করে দিয়েছি, কেউ ওর কাছে ভূতের কথা বলতে সাহস করে না। আর তুমি বুঝি মাসি হয়ে ওর এই উপকার করতে বসেছ। কেন বিধু, আমার বাছা তোমার কী অপরাধ করেছে। ওকে তুমি দুটি চক্ষে দেখতে পার না, তা আমি বেশ বুঝেছি। আমি বরাবর তোমার ছেলেকে পেটের ছেলের মতো মানুষ করলেম, আর তুমি বুঝি আজ তারই শোধ নিতে এসেছ।

বিধু। (সরোদনে) দিদি, এমন কথা বোলো না। আমার কাছে আমার সতীশ আর তোমার হরেনে প্রভেদ কী আছে।

হরেন। মা, দাদা আমাকে মেরেছে।

বিধু। ছি ছি খোকা, মিথ্যা বলতে নেই। দাদা তোর এখানে ছিলই না তা মারবে কী করে।

হরেন। বাঃ, দাদা যে এইখানে বসে চিঠি লিখছিল— তাতে ছিল ভয়ে আকার ভা, ল, ভাল, বয়ে আকার সয়ে আকার, ভালোবাসা। মা, তুমি আমার জন্যে দাদাকে লজঞ্জুস আনতে বলেছিলে, দাদা সেই টাকায় ফুলের তোড়া কিনে এনেছে— তাতেই আমি একটু হাত দিয়েছিলেম বলেই অমনি আমাকে মেরেছে।

সুকুমারী। তোমরা মায়ে পোয়ে মিলে আমার ছেলের সঙ্গে লেগেছ বুঝি। ওকে তোমাদের সহ্য হচ্ছে না। ও গেলেই তোমরা বাঁচ। আমি তাই বলি, খোকা রোজ ডাক্তার-ক'বরাজের বোতল বোতল ওষুধ গিলছে, তবু দিন দিন এমন রোগা হচ্ছে কেন। ব্যাপারখানা আজ বোঝা গেল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

সতীশ। আমি তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি, নেলি।

নলিনী। কেন, কোথায় যাবে।

সতীশ। জাহান্নমে।

নলিনী। সে জায়গায় যাবার জন্য কি বিদায় নেবার দরকার হয়। যে লোক সন্ধান জানে সে তো ঘরে বসেই সেখানে যেতে পারে। আজ তোমার মেজাজটা এমন কেন। কলারটা বুঝি ঠিক হাল ফেশানের হয় নি!

সতীশ। তুমি কি মনে কর আমি কেবল কলারের কথাই দিনরাত্রি চিন্তা করি।

নলিনী। তাই তো মনে হয়। সেইজন্যই তো হঠাৎ তোমাকে অত্যন্ত চিন্তাশীলের মতো দেখায়।

সতীশ। ঠাট্টা কোরো না নেলি, তুমি যদি আজ আমার হৃদয়টা দেখতে পেতে—

নলিনী। তা হলে ডুমুরের ফুল এবং সাপের পাঁচ পাও দেখতে পেতাম।

সতীশ। আবার ঠাট্টা! তুমি বড়ো নিষ্ঠুর। সত্যই বলছি নেলি, আজ বিদায় নিতে এসেছি।

নলিনী। দোকানে যেতে হবে?

সতীশ। মিনতি করছি নেলি, ঠাট্টা করে আমাকে দগ্ধ কোরো না। আজ আমি চিরদিনের মতো বিদায় নেব।

নলিনী। কেন, হঠাৎ সেজন্য তোমার এত বেশি আগ্রহ কেন।

সতীশ। সত্য কথা বলি, আমি যে কত দরিদ্র তা তুমি জান না।

নলিনী। সেজন্য তোমার ভয় কিসের। আমি তো তোমার কাছে টাকা ধার চাই নি।

সতীশ। তোমার সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছিল—

নলিনী। তাই পালাবে? বিবাহ না হতেই হৃৎকম্প।

সতীশ। আমার অবস্থা জানতে পেরে মিস্টার ভাদুড়ি আমাদের সম্বন্ধ ভেঙে দিলেন।

নলিনী। অমনি সেই অপমানেই কি নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে হবে। এতবড়ো অভিমানী লোকের কারো সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখা শোভা পায় না। সাধে আমি তোমার মুখে ভালোবাসার কথা শুনলেই ঠাট্টা করে উড়িয়ে দি।

সতীশ। নেলি, তবে কি এখনো আমাকে আশা রাখতে বল।

নলিনী। দোহাই সতীশ, অমন নভেলি ছাঁদে কথা বানিয়ে বোলো না, আমার হাসি পায়। আমি তোমাকে আশা রাখতে বলব কেন। আশা যে রাখে সে নিজের গরজেই রাখে, লোকের পরামর্শ শুনে রাখে না।

সতীশ। সে তো ঠিক কথা। আমি জানতে চাই তুমি দারিদ্র্যকে ঘৃণা কর কি না।

নলিনী। খুব করি, যদি সে দারিদ্র্য মিথ্যার দ্বারা নিজেকে ঢাকতে চেষ্টা করে।

সতীশ। নেলি, তুমি কি কখনো তোমার চিরকালের অভ্যস্ত আরাম ছেড়ে গরিবের ঘরের লক্ষ্মী হতে পারবে।

নলিনী। নভেলে যেরকম ব্যারামের কথা পড়া যায়, সেটা তেমন করে চেপে ধরলে আরাম আপনি ঘরছাড়া হয়।

সতীশ। সে ব্যারামের কোনো লক্ষণ কি তোমার—

নলিনী। সতীশ, তুমি কখনো কোনো পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হতে পারলে না। স্বয়ং নন্দী-সাহেবও বোধ হয় অমন প্রশ্ন তুলতেন না। তোমাদের একচুলও প্রশ্রয় দেওয়া চলে না।

সতীশ। তোমাকে আমি আজও চিনতে পারলেম না, নেলি।

নলিনী। চিনবে কেমন করে। আমি তো তোমার হাল ফেশানের টাই নই, কলার নই— দিনরাত যা নিয়ে ভাব তাই তুমি চেন।

সতীশ। আমি হাত জোড় করে বলছি নেলি, তুমি আজ আমাকে এমন কথা বোলো না। আমি যে কী নিয়ে ভাবি তা তুমি নিশ্চয় জান—

নলিনী। তোমার সম্বন্ধে আমার অন্তর্দৃষ্টি যে এত প্রখর তা এতটা নিঃসংশয়ে স্থির কোরো না। ওই বাবা আসছেন। আমাকে এখানে দেখলে তিনি অনর্থক বিরক্ত হবেন, আমি যাই।

প্রস্থান

সতীশ। মিস্টার ভাদুড়ি, আমি বিদায় নিতে এসেছি।

ভাদুড়ি। আচ্ছা, তবে আজ—

সতীশ। যাবার আগে একটা কথা আছে।

ভাদুড়ি। কিন্তু সময় তো নেই, আমি এখন বেড়াতে বের হব।

সতীশ। কিছুক্ষণের জন্য কি সঙ্গে যেতে পারি।

ভাদুড়ি। তুমি যে পার তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি পারব না। সম্প্রতি আমি সঙ্গীর অভাবে তত অধিক ব্যাকুল হয়ে পড়ি নি।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

শশধর। আঃ, কী বল। তুমি কি পাগল হয়েছ নাকি।

সুকুমারী। আমি পাগল না তুমি চোখে দেখতে পাও না!

শশধর। কোনোটাই আশ্চর্য নয়, দুটোই সম্ভব। কিন্তু—

সুকুমারী। আমাদের হরেনের জন্ম হতেই দেখ নি, ওদের মুখ কেমন হয়ে গেছে। সতীশের ভাবখানা দেখে বুঝতে পার না!

শশধর। আমার অত ভাব বুঝবার ক্ষমতা নেই, সে তো তুমি জানই। মন জিনিসটাকে অদৃশ্য পদার্থ বলেই শিশুকাল হতে আমার কেমন একটা সংস্কার বদ্ধমূল হয়ে গেছে। ঘটনা দেখলে তবু কতকটা বুঝতে পারি।

সুকুমারী। সতীশ যখনই আড়ালে পায় তোমার ছেলেকে মারে, আবার বিধুও তার পিছনে পিছনে এসে খোকাকে জুজুর ভয় দেখায়।

শশধর। ওই দেখো, তোমরা ছোটো কথাকে বড়ো করে তোল। যদিই বা সতীশ খোকাকে কখনো—

সুকুমারী। সে তুমি সহ্য করতে পার, আমি পারব না— ছেলেকে তো তোমার গর্ভে ধরতে হয় নি।

শশধর। সে কথা আমি অস্বীকার করতে পারব না। এখন তোমার অভিপ্রায় কী শুনি।

সুকুমারী। শিক্ষা সম্বন্ধে তুমি তো বড়ো বড়ো কথা বল, একবার তুমি ভেবে দেখো-না, আমরা হরেনকে যেভাবে শিক্ষা দিতে চাই তার মাসি তাকে অন্যরূপ শেখায়— সতীশের দৃষ্টান্তটিই বা তার পক্ষে কিরূপ সেটাও তো ভেবে দেখতে হয়।

শশধর। তুমি যখন অত বেশি করে ভাবছ তখন তার উপরে আমার আর ভাববার দরকার কি আছে। এখন কর্তব্য কী বলো।

সুকুমারী। আমি বলি সতীশকে তুমি বলো, তার মার কাছে থেকে সে এখন

কাজকর্মের চেষ্টা দেখুক। পুরুষমানুষ পরের পয়সায় বাবুগিরি করে, সে কি ভালো দেখতে হয়।

শশধর। ওর মা যে টাকা পায় তাতে সতীশের চলবে কী করে।

সুকুমারী। কেন, ওদের বাড়ি ভাড়া লাগে না, মাসে পঁচাত্তর টাকা কম কী।

শশধর। সতীশের যেরূপ চাল দাঁড়িয়েছে, পঁচাত্তর টাকা তো সে চুরুটের ডগাতেই ফুঁকে দেবে। মার গহনাগাঁটি ছিল, সে তো অনেকদিন হল গেছে; এখন হবিষ্যান্ন বাঁধা দিয়ে তো দেনা শোধ হবে না।

সুকুমারী। যার সামর্থ্য কম তার অত লম্বা চালেই বা দরকার কী।

শশধর। মন্মথ তো সেই কথাই বলত। আমরাই তো সতীশকে অন্যরূপ বুঝিয়েছিলেম। এখন ওকে দোষ দিই কী করে।

সুকুমারী। না, দোষ কি ওর হতে পারে। সব দোষ আমারই! তুমি তো আর কারো কোনো দোষ দেখতে পাও না— কেবল আমার বেলাতেই তোমার দর্শনশক্তি বেড়ে যায়।

শশধর। ওগো, রাগ কর কেন— আমিও তো দোষী।

সুকুমারী। তা হতে পারে। তোমার কথা তুমি জান। কিন্তু, আমি কখনো ওকে এমন কথা বলি নি যে, তুমি তোমার মেসোর ঘরে পায়ের উপর পা দিয়ে গোঁফে তা দাও, আর লম্বা কেদারায় বসে বসে আমার বাছার উপর বিষদৃষ্টি দিতে থাকো।

শশধর। না, ঠিক ওই কথাগুলো তুমি তাকে মাথার দিব্য দিয়ে শপথ করিয়ে নাও নি— অতএব তোমাকে দোষ দিতে পারি নে। এখন কী করতে হবে বলো।

সুকুমারী। সে তুমি যা ভালো বোধ কর তাই করো। কিন্তু আমি বলছি, সতীশ যতক্ষণ এ বাড়িতে থাকবে, আমি খোকাকে কোনোমতে বাইরে যেতে দিতে পারব না। ডাক্তার খোকাকে হাওয়া খাওয়াতে বিশেষ করে বলে দিয়েছে— কিন্তু হাওয়া খেতে গিয়ে ও কখন একলা সতীশের নজরে পড়বে, সে কথা মনে করলে আমার মন স্থির থাকে না। ও তো আমারই আপন বোনের ছেলে, কিন্তু আমি ওকে এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস করি নে— এ আমি তোমাকে স্পষ্টই বললেম।

সতীশের প্রবেশ

সতীশ। কাকে বিশ্বাস কর না মাসিমা। আমাকে? আমি তোমার খোকাকে সুযোগ পেলে গলা টিপে মারব, এই তোমার ভয়? যদি মারি তবে, তুমি তোমার বোনের ছেলের যে অনিষ্ট করেছ, তার চেয়ে ওর কি বেশি অনিষ্ট করা হবে।

কে আমাকে ছেলেবেলা হতে নবাবের মতো শৌখিন করে তুলেছে এবং আজ ভিক্ষুকের মতো পথে বের করলে। কে আমাকে পিতার শাসন হতে কেড়ে এনে বিশ্বের লাঞ্ছনার মধ্যে টেনে আনলে। কে আমাকে—

সুকুমারী। ওগো, শুনছ? তোমার সামনে আমাকে এমনি করে অপমান করে? নিজের মুখে বললে কিনা খোকাকে গলা টিপে মারবে? ওমা, কী হবে গো। আমি কালসাপকে নিজের হাতে দুধকলা দিয়ে পুষেছি।

সতীশ। দুধকলা আমারও ঘরে ছিল— সে দুধকলায় আমার রক্ত বিষ হয়ে উঠত না— তা হতে চিরকালের মতো বঞ্চিত করে তুমি যে দুধকলা আমাকে খাইয়েছ, তাতে আমার বিষ জমে উঠেছে। সত্য কথাই বলছ, এখন আমাকে ভয় করাই চাই— এখন আমি দংশন করতে পারি।

বিধুমুখীর প্রবেশ

বিধু। কী সতীশ, কী হয়েছে, তোকে দেখে যে ভয় হয়। অমন করে তাকিয়ে আছিস কেন। আমাকে চিনতে পারছিস নে? আমি যে তোর মা, সতীশ।

সতীশ। মা, তোমাকে মা বলব কোন্ মুখে। মা হয়ে কেন তুমি আমার পিতার শাসন হতে আমাকে বঞ্চিত করলে। কেন তুমি আমাকে জেল হতে ফিরিয়ে আনলে। সে কি মাসির ঘর হতে ভয়ানক। তোমরা ঈশ্বরকে মা বলে ডাক, তিনি যদি তোমাদের মতো মা হন তবে তাঁর আদর চাই নে, তিনি যেন আমাকে নরকে দেন।

শশধর। আঃ সতীশ! চলো চলো— কী বকছ, থামো। এসো, বাইরে আমার ঘরে এসো।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

শশধর। সতীশ, একটু ঠাণ্ডা হও। তোমার প্রতি অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে, সে কি আমি জানি নে। তোমার মাসি রাগের মুখে কী বলেছেন, সে কি অমন করে মনে নিতে আছে। দেখো, গোড়ায় যা ভুল হয়েছে তা এখন যতটা সম্ভব প্রতিকার করা যাবে, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

সতীশ। মেসোমশায়, প্রতিকারের আর কোনো সম্ভাবনা নেই। মাসিমার সঙ্গে আমার এখন যেরূপ সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে তাতে তোমার ঘরের অন্ন আমার গলা দিয়ে আর গলবে না। এতদিন তোমাদের যা খরচ করিয়েছি তা যদি শেষ কড়িটি পর্যন্ত

শোধ করে না দিতে পারি, তবে আমার মরেও শান্তি নেই। প্রতিকার যদি কিছু থাকে তো সে আমার হাতে, তুমি কী প্রতিকার করবে।

শশধর। না, শোনো সতীশ, একটু স্থির হও। তোমার যা কর্তব্য সে তুমি পরে ভেবো— তোমার সম্বন্ধে আমরা যে অন্যায় করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত তো আমাকেই করতে হবে। দেখো, আমার বিষয়ের এক অংশ আমি তোমাকে লিখে দেব— সেটাকে তুমি দান মনে কোরো না, সে তোমার প্রাপ্য। আমি সমস্ত ঠিক করে রেখেছি— পরশু শুক্রবারে রেজেস্ট্রি করে দেব।

সতীশ। (শশধরের পায়ের ধুলা লইয়া) মেসোমশায়, কী আর বলব— তোমার এই স্নেহে—

শশধর। আচ্ছা, থাক্‌ থাক্‌। ও-সব স্নেহ-ফ্নেহ আমি কিছু বুঝি নে, রসকষ আমার কিছুই নেই— যা কর্তব্য তা কোনোরকমে পালন করতেই হবে এই বুঝি। সাড়ে আটটা বাজল, তুমি আজ কোরিন্থিয়ানে যাবে বলেছিলে, যাও। সতীশ, একটা কথা তোমাকে বলে রাখি। দানপত্রখানা আমি মিস্টার ভাদুড়িকে দিয়েই লিখিয়ে নিয়েছি। ভাবে বোধ হল, তিনি এই ব্যাপারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন— তোমার প্রতি যে তাঁর টান নেই এমন তো দেখা গেল না। এমন-কি, আমি চলে আসবার সময় তিনি আমাকে বললেন, সতীশ আজকাল আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসে না কেন।

সতীশের প্রস্থান

ওরে রামচরণ, তোর মা-ঠাকুরানীকে একবার ডেকে দে তো।

সুকুমারীর প্রবেশ

সুকুমারী। কী স্থির করলে।

শশধর। একটা চমৎকার প্ল্যান ঠাউরেছি।

সুকুমারী। তোমার প্ল্যান যত চমৎকার হবে সে আমি জানি। যা হোক, সতীশকে এ বাড়ি হতে বিদায় করেছ তো ?

শশধর। তাই যদি না করব তবে আর প্ল্যান কিসের। আমি ঠিক করেছি সতীশকে আমাদের তরফ-মানিকপুর লিখেপড়ে দেব— তা হলেই সে স্বচ্ছন্দে নিজের খরচ নিজে চালিয়ে আলাদা হয়ে থাকতে পারবে। তোমাকে আর বিরক্ত করবে না।

সুকুমারী। আহা, কী সুন্দর প্ল্যানই ঠাউরেছ। সৌন্দর্যে আমি একেবারে মুগ্ধ। না না, তুমি অমন পাগলামি করতে পারবে না, আমি বলে দিলেম।

শশধর। দেখো, এক সময়ে তো ওকেই সমস্ত সম্পত্তি দেবার কথা ছিল।

সুকুমারী। তখন তো আমার হরেন জন্মায় নি। তা ছাড়া তুমি কি ভাব, তোমার আর ছেলেপুলে হবে না।

শশধর। সুকু, ভেবে দেখো, আমাদের অন্যায় হচ্ছে। মনেই কর-না কেন, তোমার দুই ছেলে।

সুকুমারী। সে আমি অতশত বুঝি নে— তুমি যদি এমন কাজ কর তবে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব— এই আমি বলে গেলুম।

সুকুমারীর প্রস্থান। সতীশের প্রবেশ

শশধর। কী সতীশ, থিয়েটারে গেলে না।

সতীশ। না মেসোমশায়, আজ আর থিয়েটার না। এই দেখো, দীর্ঘকাল পরে মিস্টার ভাদুড়ির কাছ হতে আমি নিমন্ত্রণ পেয়েছি। তোমার দানপত্রের ফল দেখো। সংসারের উপর আমার ধিক্কার জন্মে গেছে, মেসোমশায়। আমি তোমার সে তালুক নেব না।

শশধর। কেন, সতীশ।

সতীশ। আমি ছদ্মবেশে পৃথিবীর কোনো সুখভোগ করব না। আমার যদি নিজের কোনো মূল্য থাকে তবে সেই মূল্য দিয়ে যতটুকু পাওয়া যায় ততটুকুই ভোগ করব, তার চেয়ে এক কানাকড়িও আমি বেশি চাই না, তা ছাড়া তুমি যে আমাকে তোমার সম্পত্তির অংশ দিতে চাও, মাসিমার সম্মতি নিয়েছ তো ?

শশধর। না, সে তিনি— অর্থাৎ সে একরকম করে হবে। হঠাৎ তিনি রাজি না হতে পারেন, কিন্তু—

সতীশ। তুমি তাঁকে বলেছ ?

শশধর। হাঁ, বলেছি বৈকি! বিলক্ষণ। তাঁকে না বলেই কি আর—

সতীশ। তিনি রাজি হয়েছেন ?

শশধর। তাকে ঠিক রাজি বলা যায় না বটে, কিন্তু ভালো করে বুঝিয়ে—

সতীশ। বৃথা চেষ্টা মেসোমশায়। তাঁর নারাজিতে তোমার সম্পত্তি নিতে চাই নে। তুমি তাঁকে বোলো, আজ পর্যন্ত তিনি আমাকে যে অন্ন খাইয়েছেন তা উদ্‌গার না করে আমি বাঁচব না। তাঁর সমস্ত ঋণ সুদসুদ্ধ শোধ করে তবে আমি হাঁপ ছাড়ব।

শশধর। সে কিছুই দরকার নেই সতীশ— তোমাকে বরঞ্চ কিছু নগদ টাকা গোপনে—

সতীশ। না মেসোমশায়, আর ঋণ বাড়াব না। তোমার কাছে এখন কেবল আমার একটি অনুরোধ আছে। তোমার যে সাহেব-বন্ধুর আপিসে আমাকে কাজ দিতে চেয়েছিলে, সেখানে আমার কাজ জুটিয়ে দিতে হবে।

শশধর। পারবে তো?

সতীশ। এর পরেও যদি না পারি তবে পুনর্বার মাসিমার অন্ন খাওয়াই আমার উপযুক্ত শাস্তি হবে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সুকুমারী। দেখো দেখি, এখন সতীশ কেমন পরিশ্রম করে কাজকর্ম করছে। দেখো, অতবড়ো সাহেব-বাবু আজকাল পুরানো কালো আলপাকার চাপকানের উপরে কোঁচানো চাদর ঝুলিয়ে কেমন নিয়মিত আপিসে যায়!

শশধর। বড়োসাহেব সতীশের খুব প্রশংসা করেন।

সুকুমারী। দেখো দেখি, তুমি যদি তোমার জমিদারিটা তাকে দিয়ে বসতে তবে এতদিনে সে টাই-কলার-জুতা-ছড়ি কিনেই সেটা নিলামে চড়িয়ে দিত। ভাগ্যে আমার পরামর্শ নিয়েছ, তাই তো সতীশ মানুষের মতো হয়েছে।

শশধর। বিধাতা আমাদের বুদ্ধি দেন নি কিন্তু স্ত্রী দিয়েছেন, আর তোমাদের বুদ্ধি দিয়েছেন তেমনি সঙ্গে সঙ্গে নির্বোধ স্বামীগুলাকেও তোমাদের হাতে সমর্পণ করেছেন— আমাদেরই জিত।

সুকুমারী। আচ্ছা আচ্ছা, ঢের হয়েছে, ঠাট্টা করতে হবে না! কিন্তু সতীশের পিছনে এতদিন যে টাকাটা ঢেলেছ সে যদি আজ থাকত— তবে—

শশধর। সতীশ তো বলেছে, কোনো-একদিন সে সমস্তই শোধ করে দেবে।

সুকুমারী। সে যত শোধ করবে আমার গায়ে রইল! সে তো বরাবরই ওইরকম লম্বাচৌড়া কথা বলে থাকে। তুমি বুঝি সেই ভরসায় পথ চেয়ে বসে আছ!

শশধর। এতদিন তো ভরসা ছিল, তুমি যদি পরামর্শ দাও তো সেটা বিসর্জন দিই।

সুকুমারী। দিলে তোমার বেশি লোকসান হবে না, এই পর্যন্ত বলতে পারি। ওই-যে তোমার সতীশবাবু আসছেন। চাকরি হয়ে অবধি একদিনও তো আমাদের চৌকাঠ মাড়ান নি, এমনি তাঁর কৃতজ্ঞতা! আমি যাই।

সতীশের প্রবেশ

সতীশ। মাসিমা, পালাতে হবে না। এই দেখো, আমার হাতে অস্ত্রশস্ত্র কিছুই নেই— কেবল খানকয়েক নোট আছে।

শশধর। ইস্! এ যে একতাড়া নোট! যদি আপিসের টাকা হয় তো এমন করে সঙ্গে নিয়ে বেড়ানো ভালো হচ্ছে না, সতীশ।

সতীশ। আর সঙ্গে নিয়ে বেড়াব না। মাসিমার পায়ে বিসর্জন দিলাম। প্রণাম হই, মাসিমা। বিস্তর অনুগ্রহ করেছিলে— তখন তার হিসাব রাখতে হবে মনেও করি নি, সুতরাং পরিশোধের অঙ্কে কিছু ভুলচুক হতে পারে। এই পনেরো হাজার টাকা গুনে নাও। তোমার খোকার পোলাও-পরমান্নে একটি তণ্ডুলকণাও কম না পড়ুক।

শশধর। এ কী কাণ্ড সতীশ! এত টাকা কোথায় পেলে।

সতীশ। আমি গুন্‌চট আজ ছয় মাস আগাম খরিদ করে রেখেছি— ইতিমধ্যে দর চড়েছে; তাই মুনফা পেয়েছি।

শশধর। সতীশ, এ যে জুয়াখেলা।

সতীশ। খেলা এইখানেই শেষ— আর দরকার হবে না।

শশধর। তোমার এ টাকা তুমি নিয়ে যাও, আমি চাই না।

সতীশ। তোমাকে তো দিই নি মেসোমশায়। এ মাসিমার ঋণশোধ। তোমার ঋণ কোনোকালে শোধ করতে পারব না।

শশধর। কী সুকু, এ টাকাগুলো—

সুকুমারী। গুনে খাতাঞ্চির হাতে দাও-না— ওইখানেই কি ছড়ানো পড়ে থাকবে।

শশধর। সতীশ, খেয়ে এসেছ তো?

সতীশ। বাড়ি গিয়ে খাব।

শশধর। অ্যাঁ, সে কী কথা। বেলা যে বিস্তর হয়েছে। আজ এইখানেই খেয়ে যাও।

সতীশ। আর খাওয়া নয় মেসোমশায়। এক দফা শোধ করলেম, অন্নঋণ আবার নূতন করে ফাঁদতে পারব না।

প্রস্থান

সুকুমারী। বাপের হাত হতে রক্ষা করে এতদিন ওকে খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করলেম, আজ হাতে দু-পয়সা আসতেই ভাবখানা দেখেছ! কৃতজ্ঞতা এমনিই বটে! ঘোর কলি কিনা।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সতীশ। বড়োসাহেব হিসাবের খাতাপত্র কাল দেখবেন। মনে করেছিলেম, ইতিমধ্যে 'গানি'র টাকাটা নিশ্চয় পাওয়া যাবে, তহবিল পুরণ করে রাখব— কিন্তু বাজার নেমে গেল। এখন জেল ছাড়া গতি নেই। ছেলেবেলা হতে সেখানে যাবারই আয়োজন করা গেছে।

কিন্তু, অদৃষ্টকে ফাঁকি দেব। এই পিস্তলে দুটি গুলি পুরেছি— এই যথেষ্ট। নেলি— না না, ও নাম নয়, ও নাম নয়— আমি তা হলে মরতে পারব না। যদি-বা সে আমাকে ভালোবেসে থাকে, সে ভালোবাসা আমি ধূলিসাৎ করে দিয়ে এসেছি। চিঠিতে আমি তার কাছে সমস্তই কবুল করে লিখেছি। এখন পৃথিবীতে আমার কপালে যার ভালোবাসা বাকি রইল সে আমার এই পিস্তল। আমার অন্তিমের প্রেয়সী, ললাটে তোমার চুম্বন নিয়ে চক্ষু মুদব।

মেসোমশায়ের এ বাগানটি আমারই তৈরি। যেখানে যত দুর্লভ গাছ পাওয়া যায় সব সংগ্রহ করে এনেছিলেম। ভেবেছিলেম, এ বাগান একদিন আমারই হবে। ভাগ্য কার জন্য আমাকে দিয়ে এই গাছগুলো রোপণ করে নিচ্ছিল তা আমাকে তখন বলে নি— তা হোক, এই ঝিলের ধারে এই বিলাতি ষ্টিফানোটিস লতার কুঞ্জে আমার এ জন্মের হাওয়া খাওয়া শেষ করব— মৃত্যুর দ্বারা আমি এ বাগান দখল করে নেব— এখানে হাওয়া খেতে আসতে আর কেউ সাহস করবে না।

মেসোমশায়কে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিতে চাই। পৃথিবী হতে ওই ধুলোটুকু নিয়ে যেতে পারলে আমার মৃত্যু সার্থক হত। কিন্তু, এখন সন্ধ্যার সময় তিনি মাসিমার কাছে আছেন— আমার এ অবস্থায় মাসিমার সঙ্গে দেখা করতে আমি সাহস করি নে। বিশেষত পিস্তল ভরা আছে।

মরবার সময় সকলকে ক্ষমা করে শান্তিতে মরার উপদেশ শাস্ত্রে আছে। কিন্তু, আমি ক্ষমা করতে পারলেম না। আমার এ মরবার সময় নয়। আমার অনেক সুখের কল্পনা, ভোগের আশা ছিল— অল্প কয়েক বৎসরের জীবনে তা একে একে সমস্তই টুকরা টুকরা হয়ে ভেঙেছে। আমার চেয়ে অনেক অযোগ্য, অনেক নির্বোধ লোকের ভাগ্যে অনেক অযাচিত সুখ জুটেছে, আমার জুটেও জুটল না— সেজন্য যারা দায়ী তাদের কিছুতেই ক্ষমা করতে পারব না— কিছুতেই না। আমার মৃত্যুকালের অভিশাপ যেন চিরজীবন তাদের পিছনে পিছনে ফেরে— তাদের সকল সুখকে কানা করে দেয়। তাদের তৃষ্ণার জলকে বাষ্প করে দেবার জন্য আমার দগ্ধ

জীবনের সমস্ত দাহকে যেন আমি রেখে যেতে পারি।

হায়! প্রলাপ! সমস্তই প্রলাপ! অভিশাপের কোনো বলই নেই। আমার মৃত্যু কেবল আমাকেই শেষ করে দেবে— আর কারো গায়ে হাত দিতে পারবে না। আঃ— তারা আমার জীবনটাকে একেবারে ছারখার করে দিলে, আর আমি মরেও তাদের কিছুই করতে পারলেম না। তাদের কোনো ক্ষতি হবে না— তারা সুখে থাকবে, তাদের দাঁতমাজা হতে আরম্ভ করে মশারি-ঝাড়া পর্যন্ত কোনো তুচ্ছ কাজটিও বন্ধ থাকবে না— অথচ আমার সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্রের সমস্ত আলোক এক ফুৎকারে নিবল— আমার নেলি - উঃ, ও নাম নয়।

ও কে ও! হরেন! সন্ধ্যার সময় বাগানে বার হয়েছে যে! বাপ-মাকে লুকিয়ে চুরি করে কাঁচা পেয়ারা পাড়তে এসেছে। ওর আকাঙ্ক্ষা ওই কাঁচা পেয়ারার চেয়ে আর অধিক ঊর্ধ্বে চড়ে নি— ওই গাছের নিচু ডালেই ওর অধিকাংশ সুখ ফলে আছে। পৃথিবীতে ওর জীবনের কী মূল্য। গাছের একটা কাঁচা পেয়ারা যেমন, এ সংসারে ওর কাঁচা জীবনটাই বা তার চেয়ে কী এমন বড়ো। এখনি যদি ছিন্ন করা যায় তবে জীবনের কত নৈরাশ্য হতে ওকে বাঁচানো যায় তা কে বলতে পারে। আর মাসিমা— ইঃ! একেবারে লুটাপুটি করতে থাকবে। আঃ!

ঠিক সময়টি, ঠিক স্থানটি, ঠিক লোকটি। হাতকে আর সামলাতে পাচ্ছি নে। হাতটাকে নিয়ে কী করি। হাতটাকে নিয়ে কী করা যায়।

ছড়ি লইয়া সতীশ সবেগে চারাগাছগুলিকে ক্রমাগত আঘাত করিতে লাগিল। তাহাতে তাহার উত্তেজনা ক্রমশ আরো বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে নিজের হাতকে সে সবেগে আঘাত করিল; কিন্তু কোনো বেদনা বোধ করিল না। শেষে পকেটের ভিতর হইতে পিস্তল সংগ্রহ করিয়া লইয়া সে হরেনের দিকে সবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল।

হরেন। (চমকিয়া উঠিয়া) এ কী! দাদা নাকি। তোমার দুটি পায়ে পড়ি দাদা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি— বাবাকে বলে দিয়ো না।

সতীশ। (চীৎকার করিয়া) মেসোমশায়— মেসোমশায়— এইবেলা রক্ষা করো— আর দেরি কোরো না— তোমার ছেলেকে এখনো রক্ষা করো।

শশধর। (ছুটিয়া আসিয়া) কী হয়েছে সতীশ। কী হয়েছে।

সুকুমারী। (ছুটিয়া আসিয়া) কী হয়েছে, আমার বাছার কী হয়েছে।

হরেন। কিছুই হয় নি মা— কিছুই না— দাদা তোমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছেন।

সুকুমারী। এ কিরকম বিশ্রী ঠাট্টা। ছি ছি, সকলই অনাসৃষ্টি! দেখো দেখি। আমার বুক এখনো ধড়াস-ধড়াস করছে। সতীশ মদ ধরেছে বুঝি!

সতীশ। পালাও— তোমাদের ছেলেকে নিয়ে এখনি পালাও। নইলে তোমাদের রক্ষা নেই।

হরেনকে লইয়া ত্রস্তপদে সুকুমারীর পলায়ন

শশধর। সতীশ, অমন উতলা হোয়ো না। ব্যাপারটা কী বলো। হরেনকে কার হাত হতে রক্ষা করবার জন্য ডেকেছিলে।

সতীশ। আমার হাত হতে। (পিস্তল দেখাইয়া) এই দেখো মেসোমশায়।

দ্রুতপদে বিধুমুখীর প্রবেশ

বিধু। সতীশ, তুই কোথায় কী সর্বনাশ করে এসেছিস বল্ দেখি। আপিসের সাহেব পুলিস সঙ্গে নিয়ে আমাদের বাড়িতে থানাতল্লাসি করতে এসেছে। যদি পালাতে হয় তো এই বেলা পালা। হায় ভগবান! আমি তো কোনো পাপ করি নি, আমারই অদৃষ্টে এত দুঃখ ঘটে কেন।

সতীশ। ভয় নেই— পালাবার উপায় আমার হাতেই আছে!

শশধর। তবে কি তুমি—

সতীশ। তাই বটে মেসোমশায়— যা সন্দেহ করছ তাই। আমি চুরি করে মাসির ঋণ শোধ করেছি। আমি চোর। মা, শুনে খুশি হবে, আমি চোর, আমি খুনী। এখন আর কাঁদতে হবে না— যাও যাও, আমার সম্মুখ হতে যাও। আমার অসহ্য বোধ হচ্ছে।

শশধর। সতীশ, তুমি আমার কাছেও তো কিছু ঋণী আছ, তাই শোধ করে যাও।

সতীশ। বলো, কেমন করে শোধ করব। কী আমি দিতে পারি। কী চাও তুমি।

শশধর। ওই পিস্তলটা দাও।

সতীশ। এই দিলাম। আমি জেলেই যাব। না গেলে আমার পাপের ঋণশোধ হবে না।

শশধর। পাপের ঋণ শাস্তির দ্বারা শোধ হয় না সতীশ, কর্মের দ্বারাই শোধ হয়। তুমি নিশ্চয় জেনো আমি অনুরোধ করলে তোমার বড়োসাহেব তোমাকে জেলে দেবেন না। এখন হতে জীবনকে সার্থক করে বেঁচে থাকো।

সতীশ। মেসোমশায়, এখন আমার পক্ষে বাঁচা যে কত কঠিন তা তুমি জান না— মরব নিশ্চয় জেনে পায়ের তলা হতে আমার শেষ সুখের অবলম্বনটা আমি পদাঘাতে ফেলে দিয়ে এসেছি— এখন কী নিয়ে বাঁচব।

শশধর। তবু বাঁচতে হবে, আমার ঋণের এই শোধ— আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারবে না।

সতীশ। তবে তাই হবে।

শশধর। আমার একটা অনুরোধ শোনো। তোমার মাকে আর মাসিকে অন্তরের সহিত ক্ষমা করো।

সতীশ। তুমি যদি আমাকে ক্ষমা করতে পার, তবে এ সংসারে কে এমন থাকতে পারে যাকে আমি ক্ষমা করতে না পারি।

প্রণাম করিয়া

মা, আশীর্বাদ করো, আমি সব যেন সহ্য করতে পারি— আমার সকল দোষগুণ নিয়ে তোমরা আমাকে যেমন গ্রহণ করেছ, সংসারকে আমি যেন তেমনি করে গ্রহণ করি।

বিধু। বাবা, কী আর বলব। মা হয়ে আমি তোকে কেবল স্নেহই করেছি, তোর কোনো ভালো করতে পারি নি— ভগবান তোর ভালো করুন। দিদির কাছে আমি একবার তোর হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করে নিই গে।

প্রস্থান

শশধর। তবে এসো সতীশ, আমার ঘরে আজ আহার করে যেতে হবে।

দ্রুতপদে নলিনীর প্রবেশ

নলিনী। সতীশ!

সতীশ। কী নলিনী।

নলিনী। এর মানে কী। এ চিঠি তুমি আমাকে কেন লিখেছ।

সতীশ। মানে যেমন বুঝেছিলে সেইটেই ঠিক। আমি তোমাকে প্রতারণা করে চিঠি লিখি নি। তবে আমার ভাগ্যক্রমে সকলই উলটা হয়। তুমি মনে করতে পার, তোমার দয়া উদ্রেক করবার জন্যই আমি— কিন্তু মেসোমশায় সাক্ষী আছেন, আমি অভিনয় করছিলেম না— তবু যদি বিশ্বাস না হয়, প্রতিজ্ঞারক্ষা করবার এখনো সময় আছে।

নলিনী। কী তুমি পাগলের মতো বকছ। আমি তোমার কী অপরাধ করেছি যে তুমি আমাকে এমন নিষ্ঠুর ভাবে—

সতীশ। যেজন্য আমি সংকল্প করেছি সে তুমি জান, নলিনী— আমি তো একবর্ণও গোপন করি নি, তবু কি আমার উপর তোমার শ্রদ্ধা আছে।

নলিনী। শ্রদ্ধা! সতীশ, তোমার উপর ওইজন্যই আমার রাগ ধরে। শ্রদ্ধা, ছি ছি, শ্রদ্ধা তো পৃথিবীতে অনেকেই অনেককে করে। তুমি যে কাজ করেছ আমিও তাই করেছি— তোমাতে আমাতে কোনো ভেদ রাখি নি। এই দেখো, আমার গহনাগুলি সব এনেছি— এগুলি এখনো আমার সম্পত্তি নয়— এগুলি আমার বাপ-মায়ের। আমি তাঁদিগকে না বলে এনেছি, এর কত দাম হতে পারে আমি কিছুই জানি নে; কিন্তু এ দিয়ে কি তোমার উদ্ধার হবে না।

শশধর। উদ্ধার হবে, এই গহনাগুলির সঙ্গে আরো অমূল্য যে ধনটি দিয়েছ তা দিয়েই সতীশের উদ্ধার হবে।

নলিনী। এই-যে শশধরবাবু, মাপ করবেন, তাড়াতাড়িতে আপনাকে আমি—

শশধর। মা, সেজন্য লজ্জা কী। দৃষ্টির দোষ কেবল আমাদের মতো বুড়োদেরই হয় না— তোমাদের বয়সে আমাদের মতো প্রবীণ লোক হঠাৎ চোখে ঠেকে না। সতীশ, তোমার আপিসের সাহেব এসেছেন দেখছি। আমি তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে আসি, ততক্ষণ তুমি আমার হয়ে অতিথিসংকার করো। মা, এই পিস্তলটা এখন তোমার জিম্মাতেই থাকতে পারে।

পৌষ ১৩১০

মাস্টারমশায়

ভূমিকা

রাত্রি তখন প্রায় দুটা। কলিকাতার নিস্তব্ধ শব্দসমুদ্রে একটুখানি ঢেউ তুলিয়া একটা বড়ো জুড়িগাড়ি ভবানীপুরের দিক হইতে আসিয়া বির্জিতলাওয়ের মোড়ের কাছে থামিল। সেখানে একটা ঠিকাগাড়ি দেখিয়া, আরোহী বাবু তাহাকে ডাকিয়া আনাইলেন। তাহার পাশে একটি কোট-হ্যাট-পরা বাঙালি বিলাতফের্তা যুবা সম্মুখের আসনে দুই পা তুলিয়া দিয়া একটু মদমত্ত অবস্থায় ঘাড় নামাইয়া ঘুমাইতেছিল। এই যুবকটি নূতন বিলাত হইতে আসিয়াছে। ইহারই অভ্যর্থনা উপলক্ষে বন্ধুমহলে একটা

থানা হইয়া গেছে। সেই থানা হইতে ফিরিবার পথে একজন বন্ধু তাহাকে কিছুদূর অগ্রসর করিবার জন্য নিজের গাড়িতে তুলিয়া লইয়াছেন। তিনি ইহাকে দু-তিনবার ঠেলা দিয়া জাগাইয়া কহিলেন, "মজুমদার, গাড়ি পাওয়া গেছে, বাড়ি যাও।"

মজুমদার সচকিত হইয়া একটা বিলাতি দিব্য গালিয়া ভাড়াটে গাড়িতে উঠিয়া পড়িল। তাহার গাড়োয়ানকে ভালো করিয়া ঠিকানা বাতলাইয়া দিয়া ব্রুহাম গাড়ির আরোহী নিজের গম্যপথে চলিয়া গেলেন।

ঠিকাগাড়ি কিছুদূর সিধা গিয়া পার্ক স্ট্রীটের সম্মুখে ময়দানের রাস্তায় মোড় লইল। মজুমদার আর-একবার ইংরেজি শপথ উচ্চারণ করিয়া আপন মনে কহিল, 'এ কী! এ তো আমার পথ নয়!' তার পরে নিদ্রাজড় অবস্থায় ভাবিল, 'হবেও বা, এইটিই হয়তো সোজা রাস্তা।'

ময়দানে প্রবেশ করিতেই মজুমদারের গা কেমন করিয়া উঠিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল — কোনো লোক নাই তবু তাহার পাশের জায়গাটা যেন ভর্তি হইয়া উঠিতেছে; যেন তাহার আসনের শূন্য অংশের আকাশটা নিরেট হইয়া তাহাকে ঠাসিয়া ধরিতেছে। মজুমদার ভাবিল— এ কী ব্যাপার! গাড়িটা আমার সঙ্গে এ কিরকম ব্যবহার শুরু করিল। "এই গাড়োয়ান, গাড়োয়ান!" গাড়োয়ান কোনো জবাব দিল না। পিছনের খড়খড়ি খুলিয়া ফেলিয়া সহিসটার হাত চাপিয়া ধরিল; কহিল, "তুম্ ভিতর আকে বৈঠো।" সহিস ভীতকণ্ঠে কহিল, "নেহি, সা'ব, ভিতর নেহি জায়েগা!" শুনিয়া মজুমদারের গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল; সে জোর করিয়া সহিসের হাত চাপিয়া কহিল, "জল্‌দি ভিতর আও।"

সহিস সবলে হাত ছিনাইয়া লইয়া নামিয়া দৌড় দিল। তখন মজুমদার পাশের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল; কিছুই দেখিতে পাইল না, তবু মনে হইল, পাশে একটা অটল পদার্থ একেবারে চাপিয়া বসিয়া আছে। কোনোমতে গলায় আওয়াজ আনিয়া মজুমদার কহিল, "গাড়োয়ান, গাড়ি রোখো।" বোধ হইল, গাড়োয়ান যেন দাঁড়াইয়া উঠিয়া দুই হাতে রাশ টানিয়া ঘোড়া থামাইতে চেষ্টা করিল— ঘোড়া কোনোমতেই থামিল না। না থামিয়া ঘোড়া দুটা রেড রোডের রাস্তা ধরিয়া পুনর্বার দক্ষিণের দিকে মোড় লইল। মজুমদার ব্যস্ত হইয়া কহিল, "আরে, কাঁহা যাতা।" কোনো উত্তর পাইল না। পাশের শূন্যতার দিকে রহিয়া রহিয়া কটাক্ষ করিতে করিতে মজুমদারের সর্বাঙ্গ দিয়া ঘাম ছুটিতে লাগিল। কোনোমতে আড়ষ্ট হইয়া নিজের শরীরটাকে যতদূর সংকীর্ণ করিতে হয় তাহা সে করিল, কিন্তু সে যতটুকু জায়গা ছাড়িয়া দিল ততটুকু জায়গা ভরিয়া উঠিল। মজুমদার মনে মনে তর্ক

করিতে লাগিল যে, কোন্ প্রাচীন য়ুরোপীয় জ্ঞানী বলিয়াছেন Nature abhors vacuum— তাই তো দেখিতেছি। কিন্তু এটা কী রে! এটা কি Nature? যদি আমাকে কিছু না বলে তবে আমি এখনি ইহাকে সমস্ত জায়গাটা ছাড়িয়া দিয়া লাফাইয়া পড়ি। লাফ দিতে সাহস হইল না— পাছে পিছনের দিক হইতে অভাবিতপূর্ব একটা কিছু ঘটে। 'পাহারাওয়ালা' বলিয়া ডাক দিবার চেষ্টা করিল— কিন্তু বহুকষ্টে এমনি একটুখানি অদ্ভুত ক্ষীণ আওয়াজ বাহির হইল যে, অত্যন্ত ভয়ের মধ্যেও তাহার হাসি পাইল। অন্ধকারে ময়দানের গাছগুলো ভূতের নিস্তব্ধ পার্লামেন্টের মতো পরস্পর মুখামুখি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এবং গ্যাসের খুঁটিগুলো সমস্তই যেন জানে অথচ কিছুই যেন বলিবে না এমনিভাবে খাড়া হইয়া মিট্‌মিটে আলোকশিখায় চোখ টিপিতে লাগিল। মজুমদার মনে করিল, চট্ করিয়া এক লম্ফে সামনের আসনে গিয়া বসিবে। যেমনি মনে করা অমনি অনুভব করিল, সামনের আসন হইতে কেবলমাত্র একটা চাহনি তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া আছে। চক্ষু নাই, কিছুই নাই, অথচ একটা চাহনি। সে চাহনি যে কাহার তাহা যেন মনে পড়িতেছে অথচ কোনোমতেই যেন মনে আনিতে পারিতেছে না। মজুমদার দুই চক্ষু জোর করিয়া বুজিবার চেষ্টা করিল— কিন্তু ভয়ে বুজিতে পারিল না— সেই অনির্দেশ্য চাহনির দিকে দুই চোখ এমন শক্ত করিয়া মেলিয়া রহিল যে, নিমেষ ফেলিতে সময় পাইল না।

এ দিকে গাড়িটা কেবলই ময়দানের রাস্তার উত্তর হইতে দক্ষিণে ও দক্ষিণ হইতে উত্তরে চক্রপথে ঘুরিতে লাগিল। ঘোড়া দুটো ক্রমেই যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিল— তাহাদের বেগ কেবলই বাড়িয়া চলিল— গাড়ির খড়্‌খড়েগুলো থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিয়া ঝর্‌ঝর্ শব্দ করিতে লাগিল।

এমন সময় গাড়িটা যেন কিসের উপর খুব একটা ধাক্কা খাইয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। মজুমদার চকিত হইয়া দেখিল, তাহাদেরই রাস্তায় গাড়ি দাঁড়াইয়াছে ও গাড়োয়ান তাহাকে নাড়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, "সাহেব, কোথায় যাইতে হইবে বলো।"

মজুমদার রাগিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এতক্ষণ ধরিয়া আমাকে ময়দানের মধ্যে ঘুরাইলি কেন।"

গাড়োয়ান আশ্চর্য হইয়া কহিল, "কই, ময়দানের মধ্যে তো ঘুরাই নাই।"

মজুমদার বিশ্বাস না করিয়া কহিল, "তবে এ কি শুধু স্বপ্ন।"

গাড়োয়ান একটু ভাবিয়া ভীত হইয়া কহিল, "বাবুসাহেব, বুঝি শুধু স্বপ্ন নহে। আমার এই গাড়িতেই আজ তিন বছর হইল একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল।"

মজুমদারের তখন নেশা ও ঘুমের ঘোর সম্পূর্ণ ছাড়িয়া যাওয়াতে গাড়োয়ানের গল্পে কর্ণপাত না করিয়া ভাড়া চুকাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

কিন্তু রাত্রে তাহার ভালো করিয়া ঘুম হইল না— কেবলই ভাবিতে লাগিল, সেই চাহনিটা কার।

১

অধর মজুমদারের বাপ সামান্য শিপ-সরকারি হইতে আরম্ভ করিয়া একটা বড়ো হৌসের মুচ্ছুদ্দিগিরি পর্যন্ত উঠিয়াছিলেন। অধরবাবু বাপের উপার্জিত নগদ টাকা সুদে খাটাইতেছেন, তাঁহাকে আর নিজে খাটিতে হয় না। বাপ মাথায় সাদা ফেটা বাঁধিয়া পালকিতে করিয়া আপিসে যাইতেন, এ দিকে তাঁহার ক্রিয়াকর্ম দানধ্যান যথেষ্ট ছিল। বিপদে-আপদে অভাবে-অনটনে সকল শ্রেণীর লোকেই যে তাঁহাকে আসিয়া ধরিয়া পড়িত, ইহাই তিনি গর্বের বিষয় মনে করিতেন।

অধরবাবু বড়ো বাড়ি ও গাড়ি-জুড়ি করিয়াছেন, কিন্তু লোকের সঙ্গে আর তাঁহার সম্পর্ক নাই; কেবল টাকা-ধারের দালাল আসিয়া তাঁহার বাঁধানো হুঁকায় তামাক টানিয়া যায় এবং অ্যাটর্নি আপিসের বাবুদের সঙ্গে স্ট্যাম্প-দেওয়া দলিলের শর্ত সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া থাকে। তাঁহার সংসারে খরচপত্র সম্বন্ধে হিসাবের এমনি কষাকষি যে পাড়ার ফুটবল ক্লাবের নাছোড়বান্দা ছেলেরাও বহু চেষ্টায় তাঁহার তহবিলে দন্তস্ফুট করিতে পারে নাই।

এমন সময় তাঁহার ঘরকন্নার মধ্যে একটি অতিথির আগমন হইল। ছেলে হল না, হল না, করিতে করিতে অনেকদিন পরে তাঁহার একটি ছেলে জন্মিল। ছেলেটির চেহারা তাহার মার ধরনের। বড়ো বড়ো চোখ, টিকলো নাক, রঙ রজনীগন্ধার পাপড়ির মতো— যে দেখিল সেই বলিল, "আহা ছেলে তো নয়, যেন কার্তিক।" অধরবাবুর অনুগত অনুচর রতিকান্ত বলিল, "বড়ো ঘরের ছেলের যেমনটি হওয়া উচিত তেমনই হইয়াছে।"

ছেলেটির নাম হইল বেণুগোপাল। ইতিপূর্বে অধরবাবুর স্ত্রী ননীবালা সংসার-খরচ লইয়া স্বামীর বিরুদ্ধে নিজের মত তেমন জোর করিয়া কোনোদিন খাটান নাই। দুটো একটা শখের ব্যাপার অথবা লৌকিকতার অত্যাবশ্যক আয়োজন লইয়া মাঝে মাঝে বচসা হইয়াছে বটে, কিন্তু শেষকালে স্বামীর কৃপণতার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া নিঃশব্দে হার মানিয়াছেন।

এবারে ননীবালাকে অধরলাল আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না, বেণুগোপাল সম্বন্ধে

তাঁহার হিসাব এক-এক পা করিয়া হঠিতে লাগিল। তাহার পায়ের মল, হাতের বালা, গলার হার, মাথার টুপি, তাহার দিশি বিলাতি নানা রকমের নানা রঙের সাজসজ্জা সম্বন্ধে ননীবালা যাহা-কিছু দাবি উত্থাপিত করিলেন, সব কটাই তিনি কখনো নীরব অশ্রুপাতে, কখনো সরব বাক্যবর্ষণে জিতিয়া লইলেন। বেণুগোপালের জন্য যাহা দরকার এবং যাহা দরকার নয় তাহা চাইই চাই— সেখানে শূন্য তহবিলের ওজর বা ভবিষ্যতের ফাঁকা আশ্বাস একদিনও খাটিল না।

২

বেণুগোপাল বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। বেণুর জন্য খরচ করাটা অধরলালের অভ্যাস হইয়া আসিল। তাহার জন্য বেশি মাহিনা দিয়া অনেক-পাস-করা এক বুড়ো মাস্টার রাখিলেন। এই মাস্টার বেণুকে মিষ্টভাষায় ও শিষ্টাচারে বশ করিবার অনেক চেষ্টা করিলেন— কিন্তু তিনি নাকি বরাবর ছাত্রদিগকে কড়া শাসনে চালাইয়া আজ পর্যন্ত মাস্টারি মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আসিয়াছেন, সেইজন্য তাঁহার ভাষার মিষ্টতা ও আচারের শিষ্টতায় কেবলই বেসুর লাগিল— সেই শুষ্ক সাধনায় ছেলে ভুলিল না। ননীবালা অধরলালকে কহিলেন, "ও তোমার কেমন মাস্টার। ওকে দেখিলেই যে ছেলে অস্থির হইয়া উঠে। ওকে ছাড়াইয়া দাও।"

বুড়া মাস্টার বিদায় হইল। সেকালে মেয়ে যেমন স্বয়ম্বরা হইত তেমনি ননীবালার ছেলে স্বয়ম্মাস্টার হইতে বসিল— সে যাহাকে না বরিয়া লইবে তাহার সকল পাস ও সকল সার্টিফিকেট বৃথা।

এমনি সময়টিতে গায়ে একখানি ময়লা চাদর ও পায়ে ছেঁড়া ক্যাম্বিসের জুতা পরিয়া মাস্টারির উমেদারিতে হরলাল আসিয়া জুটিল। তাহার বিধবা মা পরের বাড়িতে রাঁধিয়া ও ধান ভানিয়া তাহাকে মফস্বলের এন্‌ট্রেন্স্‌ স্কুলে কোনোমতে এন্‌ট্রেন্স্‌ পাস করাইয়াছে। এখন হরলাল কলিকাতায় কলেজে পড়িবে বলিয়া প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইয়াছে। অনাহারে তাহার মুখের নিম্ন অংশ শুকাইয়া ভারতবর্ষের কন্যাকুমারীর মতো সরু হইয়া আসিয়াছে, কেবল মস্ত কপালটা হিমালয়ের মতো প্রশস্ত হইয়া অত্যন্ত চোখে পড়িতেছে। মরুভূমির বালু হইতে সূর্যের আলো যেমন ঠিকরিয়া পড়ে তেমনি তাহার দুই চক্ষু হইতে দৈন্যের একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি বাহির হইতেছে।

দরোয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কী চাও। কাহাকে চাও।" হরলাল ভয়ে ভয়ে বলিল, "বাড়ির বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে চাই।" দরোয়ান কহিল, "দেখা হইবে না।" তাহার উত্তরে হরলাল কী বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া ইতস্তত

করিতেছিল, এমন সময় সাত বছরের ছেলে বেণুগোপাল বাগানে খেলা সারিয়া দেউড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। দরোয়ান হরলালকে দ্বিধা করিতে দেখিয়া আবার কহিল, "বাবু, চলা যাও।"

বেণুর হঠাৎ জিদ চড়িল— সে কহিল, "নেহি জায়গা!" বলিয়া সে হরলালের হাত ধরিয়া তাহাকে দোতলার বারান্দায় তাহার বাপের কাছে লইয়া হাজির করিল।

বাবু তখন দিবানিদ্রা সারিয়া জড়ালসভাবে বারান্দায় বেতের কেদারায় চুপচাপ বসিয়া পা দোলাইতেছিলেন ও বৃদ্ধ রতিকান্ত একটা কাঠের চৌকিতে আসন হইয়া বসিয়া ধীরে ধীরে তামাক টানিতেছিল। সেদিন এই সময়ে এই অবস্থায় দৈবক্রমে হরলালের মাস্টারি বাহাল হইয়া গেল।

রতিকান্ত জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার পড়া কী পর্যন্ত।"

হরলাল একটুখানি মুখ নিচু করিয়া কহিল, "এন্ট্রেন্স্‌ পাস করিয়াছি।"

রতিকান্ত ভ্রূ তুলিয়া কহিল, "শুধু এন্ট্রেন্স্‌ পাস? আমি বলি কলেজে পড়িয়াছেন। আপনার বয়সও তো নেহাত কম দেখি না।"

হরলাল চুপ করিয়া রহিল। আশ্রিত ও আশ্রয়প্রত্যাশীদিগকে সকল রকমে পীড়ন করাই রতিকান্তের প্রধান আনন্দ ছিল।

রতিকান্ত আদর করিয়া বেণুকে কোলের কাছে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "কত এম. এ. বি. এ. আসিল ও গেল— কাহাকেও পছন্দ হইল না — আর শেষকালে কি সোনাবাবু এন্ট্রেন্স্‌-পাস-করা মাস্টারের কাছে পড়িবেন।"

বেণু রতিকান্তের আদরের আকর্ষণ জোর করিয়া ছাড়াইয়া লইয়া কহিল, "যাও!" রতিকান্তকে বেণু কোনোমতেই সহ্য করিতে পারিত না, কিন্তু রতিও বেণুর এই অসহিষ্ণুতাকে তাহার বাল্যমাধুর্যের একটা লক্ষণ বলিয়া ইহাতে খুব আমোদ পাইবার চেষ্টা করিত, এবং তাহাকে সোনাবাবু চাঁদবাবু বলিয়া খেপাইয়া আগুন করিয়া তুলিত।

হরলালের উমেদারি সফল হওয়া শক্ত হইয়া উঠিয়াছিল; সে মনে মনে ভাবিতেছিল, এইবার কোনো সুযোগে চৌকি হইতে উঠিয়া বাহির হইতে পারিলে বাঁচা যায়। এমন সময়ে অধরলালের সহসা মনে হইল, এই ছোকরাটিকে নিতান্ত সামান্য মাহিনা দিলেও পাওয়া যাইবে। শেষকালে স্থির হইল, হরলাল বাড়িতে থাকিবে, খাইবে ও পাঁচ টাকা করিয়া বেতন পাইবে। বাড়িতে রাখিয়া যেটুকু অতিরিক্ত দাক্ষিণ্য প্রকাশ করা হইবে, তাহার বদলে অতিরিক্ত কাজ আদায় করিয়া লইলেই এটুকু দয়া সার্থক হইতে পারিবে।

৩

এবারে মাস্টার টিঁকিয়া গেল। প্রথম হইতেই হরলালের সঙ্গে বেণুর এমনি জমিয়া গেল যেন তাহারা দুই ভাই। কলিকাতায় হরলালের আত্মীয়বন্ধু কেহই ছিল না— এই সুন্দর ছোটো ছেলেটি তাহার সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া বসিল। অভাগা হরলালের এমন করিয়া কোনো মানুষকে ভালোবাসিবার সুযোগ ইতিপূর্বে কখনো ঘটে নাই। কী করিলে তাহার অবস্থা ভালো হইবে, এই আশায় সে বহু কষ্টে বই জোগাড় করিয়া কেবলমাত্র নিজের চেষ্টায় দিনরাত শুধু পড়া করিয়াছে। মাকে পরাধীন থাকিতে হইয়াছিল বলিয়া ছেলের শিশুবয়স কেবল সংকোচেই কাটিয়াছে— নিষেধের গণ্ডি পার হইয়া দুষ্টামির দ্বারা নিজের বাল্যপ্রতাপকে জয়শালী করিবার সুখ সে কোনোদিন পায় নাই। সে কাহারো দলে ছিল না, সে আপনার ছেঁড়া বই ও ভাঙা স্লেটের মাঝখানে একলাই ছিল। জগতে জন্মিয়া যে ছেলেকে শিশুকালেই নিস্তব্ধ ভালোমানুষ হইতে হয়, তখন হইতেই মাতার দুঃখ ও নিজের অবস্থা যাহাকে সাবধানে বুঝিয়া চলিতে হয়, সম্পূর্ণ অবিবেচক হইবার স্বাধীনতা যাহার ভাগ্যে কোনোদিন জোটে না, আমোদ করিয়া চঞ্চলতা করা বা দুঃখ পাইয়া কাঁদা, এ দুটোই যাহাকে অন্য লোকের অসুবিধা ও বিরক্তির ভয়ে সমস্ত শিশুশক্তি প্রয়োগ করিয়া চাপিয়া যাইতে হয়, তাহার মতো করুণার পাত্র অথচ করুণা হইতে বঞ্চিত জগতে কে আছে!

সেই পৃথিবীর সকল মানুষের নীচে চাপা-পড়া হরলাল নিজেও জানিত না, তাহার মনের মধ্যে এত স্নেহের রস অবসরের অপেক্ষায় এমন করিয়া জমা হইয়া ছিল। বেণুর সঙ্গে খেলা করিয়া, তাহাকে পড়াইয়া, অসুখের সময় তাহার সেবা করিয়া হরলাল স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, নিজের অবস্থার উন্নতি করার চেয়েও মানুষের আর-একটা জিনিস আছে— সে যখন পাইয়া বসে তখন তাহার কাছে আর-কিছুই লাগে না।

বেণুও হরলালকে পাইয়া বাঁচিল। কারণ, ঘরে সে একটি ছেলে; একটি অতি ছোটো ও আর-একটি তিন বছরের বোন আছে— বেণু তাহাদিগকে সঙ্গদানের যোগ্যই মনে করে না। পাড়ার সমবয়সী ছেলের অভাব নাই— কিন্তু অধরলাল নিজের ঘরকে অত্যন্ত বড়ো ঘর বলিয়া নিজের মনে নিশ্চয় স্থির করিয়া রাখাতে মেলামেশা করিবার উপযুক্ত ছেলে বেণুর ভাগ্যে জুটিল না। কাজেই হরলাল তাহার একমাত্র সঙ্গী হইয়া উঠিল। অনুকূল অবস্থায় বেণুর যে-সকল দৌরাত্ম্য দশজনের মধ্যে ভাগ হইয়া একরকম সহনযোগ্য হইতে পারিত তাহা সমস্তই একা হরলালকে বহিতে

হইত। এই-সমস্ত উপদ্রব প্রতিদিন সহ্য করিতে করিতে হরলালের স্নেহ আরো দৃঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল। রতিকান্ত বলিতে লাগিল, "আমাদের সোনাবাবুকে মাস্টার-মশায় মাটি করিতে বসিয়াছেন।" অধরলালেরও মাঝে মাঝে মনে হইতে লাগিল, মাস্টারের সঙ্গে ছাত্রের সম্বন্ধটি ঠিক যেন যথোচিত হইতেছে না। কিন্তু হরলালকে বেণুর কাছ হইতে তফাত করে এমন সাধ্য এখন কাহার আছে।

৪

বেণুর বয়স এখন এগারো। হরলাল এফ. এ. পাস করিয়া জলপানি পাইয়া তৃতীয় বার্ষিকে পড়িতেছে। ইতিমধ্যে কলেজে তাহার দুটি-একটি বন্ধু যে জোটে নাই তাহা নহে, কিন্তু ওই এগারো বছরের ছেলেটিই তাহার সকল বন্ধুর সেরা। কলেজ হইতে ফিরিয়া বেণুকে লইয়া সে গোলদিঘি এবং কোনো-কোনোদিন ইডেন গার্ডেনে বেড়াইতে যাইত। তাহাকে গ্রীক ইতিহাসের বীরপুরুষদের কাহিনী বলিত, তাহাকে স্কট ও ভিক্টর হ্যুগোর গল্প একটু একটু করিয়া বাংলায় শুনাইত— উচ্চৈঃস্বরে তাহার কাছে ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি করিয়া তাহা তর্জমা করিয়া ব্যাখ্যা করিত, তাহার কাছে শেক্‌স্‌পীয়ারের জুলিয়স সীজার মানে করিয়া পড়িয়া তাহা হইতে অ্যাণ্টনির বক্তৃতা মুখস্থ করাইবার চেষ্টা করিত। ওই একটুখানি বালক হরলালের হৃদয়-উদ্‌বোধনের পক্ষে যেন সোনার কাঠির মতো হইয়া উঠিল। একলা বসিয়া যখন পড়া মুখস্থ করিত তখন ইংরেজি সাহিত্য সে এমন করিয়া মনের মধ্যে গ্রহণ করে নাই, এখন সে ইতিহাস বিজ্ঞান সাহিত্য যাহা-কিছু পড়ে তাহার মধ্যে কিছু রস পাইলেই সেটা আগে বেণুকে দিবার জন্য আগ্রহ বোধ করে এবং বেণুর মনে সেই আনন্দ সঞ্চার করিবার চেষ্টাতেই তাহার নিজের বুঝিবার শক্তি ও আনন্দের অধিকার যেন দুইগুণ বাড়িয়া যায়।

বেণু ইস্কুল হইতে আসিয়াই কোনোমতে তাড়াতাড়ি জলপান সারিয়াই হরলালের কাছে যাইবার জন্য একেবারে ব্যস্ত হইয়া উঠিত, তাহার মা তাহাকে কোনো ছুতায় কোনো প্রলোভনে অন্তঃপুরে ধরিয়া রাখিতে পারিত না। ননীবালার ইহা ভালো লাগে নাই। তাহার মনে হইত, হরলাল নিজের চাকরি বজায় রাখিবার জন্যই ছেলেকে এত করিয়া বশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সে একদিন হরলালকে ডাকিয়া পর্দার আড়াল হইতে বলিল, "তুমি মাস্টার, ছেলেকে কেবল সকালে এক ঘণ্টা বিকালে এক ঘণ্টা পড়াইবে— দিনরাত্রি উহার সঙ্গে লাগিয়া থাক কেন। আজকাল ও যে মা বাপ কাহাকেও মানে না। ও কেমন শিক্ষা পাইতেছে। আগে যে ছেলে মা বলিতে

একেবারে নাচিয়া উঠিত আজ যে তাহাকে ডাকিয়া পাওয়া যায় না। বেণু আমার বড়ো ঘরের ছেলে, উহার সঙ্গে তোমার অত মাখামাখি কিসের জন্য।"

সেদিন রতিকান্ত অধরবাবুর কাছে গল্প করিতেছিল যে, তাহার জানা তিন-চার জন লোক, বড়োমানুষের ছেলের মাস্টারি করিতে আসিয়া ছেলের মন এমন করিয়া বশ করিয়া লইয়াছে যে, ছেলে বিষয়ের অধিকারী হইলে তাহারাই সর্বেসর্বা হইয়া ছেলেকে স্বেচ্ছামত চালাইয়াছে। হরলালের প্রতিই ইশারা করিয়া যে এ-সকল কথা বলা হইতেছিল তাহা হরলালের বুঝিতে বাকি ছিল না। তবু সে চুপ করিয়া সমস্ত সহ্য করিয়া গিয়াছিল। কিন্তু আজ বেণুর মার কথা শুনিয়া তাহার বুক ভাঙিয়া গেল। সে বুঝিতে পারিল, বড়োমানুষের ঘরে মাস্টারের পদবীটা কী। গোয়ালঘরের ছেলেকে দুধ জোগাইবার যেমন গোরু আছে তেমনি তাহাকে বিদ্যা জোগাইবার একটা মাস্টারও রাখা হইয়াছে— ছাত্রের সঙ্গে স্নেহপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপন এতবড়ো একটা স্পর্ধা যে, বাড়ির চাকর হইতে গৃহিণী পর্যন্ত কেহই তাহা সহ্য করিতে পারে না, এবং সকলেই সেটাকে স্বার্থসাধনের একটা চাতুরী বলিয়াই জানে।

হরলাল কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "মা, বেণুকে আমি কেবল পড়াইব, তাহার সঙ্গে আমার আর-কোনো সম্পর্ক থাকিবে না।"

সেদিন বিকালে বেণুর সঙ্গে তাহার খেলিবার সময়ে হরলাল কলেজ হইতে ফিরিলই না। কেমন করিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া সে সময় কাটাইল তাহা সেই জানে। সন্ধ্যা হইলে যখন সে পড়াইতে আসিল তখন বেণু মুখ ভার করিয়া রহিল। হরলাল তাহার অনুপস্থিতির কোনো জবাবদিহি না করিয়া পড়াইয়া গেল— সেদিন পড়া সুবিধামত হইলই না।

হরলাল প্রতিদিন রাত্রি থাকিতে উঠিয়া তাহার ঘরে বসিয়া পড়া করিত। বেণু সকালে উঠিয়াই মুখ ধুইয়া তাহার কাছে ছুটিয়া যাইত। বাগানে বাঁধানো চৌবাচ্ছায় মাছ ছিল। তাহাদিগকে মুড়ি খাওয়ানো ইহাদের এক কাজ ছিল। বাগানের এক কোণে কতকগুলা পাথর সাজাইয়া, ছোটো ছোটো রাস্তা ও ছোটো গেট ও বেড়া তৈরি করিয়া বেণু বালখিল্য ঋষির আশ্রমের উপযুক্ত একটি অতি ছোটো বাগান বসাইয়াছিল। সে বাগানে মালীর কোনো অধিকার ছিল না। সকালে এই বাগানের চর্যা করা তাহাদের দ্বিতীয় কাজ। তাহার পরে রৌদ্র বেশি হইলে বাড়ি ফিরিয়া বেণু হরলালের কাছে পড়িতে বসিত। কাল সায়াহ্নে যে গল্পের অংশ শোনা হয় নাই সেইটে শুনিবার জন্য আজ বেণু যথাসাধ্য ভোরে উঠিয়া বাহিরে ছুটিয়া

আসিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল, সকালে ওঠায় সে আজ মাস্টারমশায়কে বুঝি জিতিয়াছে। ঘরে আসিয়া দেখিল, মাস্টারমশায় নাই। দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, মাস্টারমশায় বাহির হইয়া গিয়াছেন।

সেদিনও সকালে পড়ার সময় বেণু ক্ষুদ্র হৃদয়টুকুর বেদনা লইয়া মুখ গম্ভীর করিয়া রহিল। সকালবেলায় হরলাল কেন যে বাহির হইয়া গিয়াছিল তাহা জিজ্ঞাসাও করিল না। হরলাল বেণুর মুখের দিকে না চাহিয়া বইয়ের পাতার উপর চোখ রাখিয়া পড়াইয়া গেল। বেণু বাড়ির ভিতরে তাহার মার কাছে যখন খাইতে বসিল তখন তাহার মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল বিকাল হইতে তোর কী হইয়াছে বল্ দেখি। মুখ হাঁড়ি করিয়া আছিস কেন— ভালো করিয়া খাইতেছিস না— ব্যাপারখানা কী।"

বেণু কোনো উত্তর করিল না। আহারের পর মা তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া অনেক আদর করিয়া যখন তাহাকে বারবার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন তখন সে আর থাকিতে পারিল না— ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, "মাস্টারমশায়—"

মা কহিলেন, "মাস্টারমশায় কী।"

বেণু বলিতে পারিল না মাস্টারমশায় কী করিয়াছেন। কী যে অভিযোগ তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন।

ননীবালা কহিলেন, "মাস্টারমশায় বুঝি তোর মার নামে তোর কাছে লাগাইয়াছেন!"

সে কথার কোনো অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বেণু উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল।

৫

ইতিমধ্যে বাড়িতে অধরবাবুর কতকগুলা কাপড়চোপড় চুরি হইয়া গেল। পুলিসকে খবর দেওয়া হইল। পুলিস খানাতল্লাসিতে হরলালেরও বাক্স সন্ধান করিতে ছাড়িল না। রতিকান্ত নিতান্তই নিরীহভাবে বলিল, "যে লোক লইয়াছে সে কি আর মাল বাক্সর মধ্যে রাখিয়াছে।"

মালের কোনো কিনারা হইল না। এরূপ লোকসান অধরলালের পক্ষে অসহ্য। তিনি পৃথিবীসুদ্ধ লোকের উপর চটিয়া উঠিলেন। রতিকান্ত কহিল, "বাড়িতে অনেক লোক রহিয়াছে, কাহাকেই বা দোষ দিবেন, কাহাকেই বা সন্দেহ করিবেন। যাহার যখন খুশি আসিতেছে যাইতেছে।"

অধরলাল মাস্টারকে ডাকাইয়া বলিলেন, "দেখো হরলাল, তোমাদের কাহাকেও

বাড়িতে রাখা আমার পক্ষে সুবিধা হইবে না। এখন হইতে তুমি আলাদা বাসায় থাকিয়া বেণুকে ঠিক সময়মত পড়াইয়া যাইবে, এই হইলেই ভালো হয়— নাহয় আমি তোমার দুই টাকা মাইনে বৃদ্ধি করিয়া দিতে রাজি আছি।"

রতিকান্ত তামাক টানিতে টানিতে বলিল, "এ তো অতি ভালো কথা— উভয়পক্ষেই ভালো।"

হরলাল মুখ নিচু করিয়া শুনিল। তখন কিছু বলিতে পারিল না। ঘরে আসিয়া অধরবাবুকে চিঠি লিখিয়া পাঠাইল, নানা কারণে বেণুকে পড়ানো তাহার পক্ষে সুবিধা হইবে না— অতএব আজই সে বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।

সেদিন বেণু ইস্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, মাস্টারমশায়ের ঘর শূন্য। তাঁহার সেই ভগ্নপ্রায় টিনের পেঁটরাটিও নাই। দড়ির উপর তাঁহার চাদর ও গামছা ঝুলিত, সে দড়িটা আছে, কিন্তু চাদর ও গামছা নাই। টেবিলের উপর খাতাপত্র ও বই এলোমেলো ছড়ানো থাকিত, তাহার বদলে সেখানে একটা বড়ো বোতলের মধ্যে সোনালি মাছ ঝক্‌ঝক্ করিতে করিতে ওঠানামা করিতেছে। বোতলের গায়ের উপর মাস্টারমশায়ের হস্তাক্ষরে বেণুর নাম লেখা একটা কাগজ আঁটা। আর-একটি নূতন ভালো বাঁধাই করা ইংরেজি ছবির বই, তাহার ভিতরকার পাতায় এক প্রান্তে বেণুর নাম ও তাহার নীচে আজকের তারিখ মাস ও সন দেওয়া আছে।

বেণু ছুটিয়া তাহার বাপের কাছে গিয়া কহিল, "বাবা, মাস্টারমশায় কোথায় গেছেন।" বাপ তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া কহিলেন, "তিনি কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেছেন।"

বেণু বাপের হাত ছাড়াইয়া লইয়া পাশের ঘরে বিছানার উপরে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। অধরবাবু ব্যাকুল হইয়া কী করিবেন কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না।

পরদিন বেলা সাড়ে দশটার সময় হরলাল একটা মেসের ঘরে তক্তপোশের উপর উন্মনা হইয়া বসিয়া কলেজে যাইবে কি না ভাবিতেছে এমন সময় হঠাৎ দেখিল প্রথমে অধরবাবুদের দরোয়ান ঘরে প্রবেশ করিল এবং তাহার পিছনে বেণু ঘরে ঢুকিয়াই হরলালের গলা জড়াইয়া ধরিল। হরলালের গলার স্বর আটকাইয়া গেল; কথা কহিতে গেলেই তাহার দু চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িবে এই ভয়ে সে কোনো কথাই কহিতে পারিল না। বেণু কহিল, "মাস্টারমশায়, আমাদের বাড়ি চলো।"

বেণু তাহাদের বৃদ্ধ দরোয়ান চন্দ্রভানকে ধরিয়া পড়িয়াছিল, যেমন করিয়া হউক, মাস্টারমশায়ের বাড়িতে তাহাকে লইয়া যাইতে হইবে। পাড়ার যে মুটে হরলালের

পেঁটরা বহিয়া আনিয়াছিল তাহার কাছ হইতে সন্ধান লইয়া আজ ইস্কুলে যাইবার গাড়িতে চন্দ্রভান বেণুকে হরলালের মেসে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে।

কেন যে হরলালের পক্ষে বেণুদের বাড়ি যাওয়া একেবারেই অসম্ভব তাহা সে বলিতেও পারিল না, অথচ তাহাদের বাড়িতেও যাইতে পারিল না। বেণু যে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে বলিয়াছিল 'আমাদের বাড়ি চলো'— এই স্পর্শ ও এই কথাটার স্মৃতি কত দিনে কত রাত্রে তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া যেন তাহার নিশ্বাস রোধ করিয়াছে— কিন্তু ক্রমে এমনও দিন আসিল যখন দুই পক্ষেই সমস্ত চুকিয়া গেল— বক্ষের শিরা আঁকড়াইয়া ধরিয়া বেদনা নিশাচর বাদুড়ের মতো আর ঝুলিয়া রহিল না।

৬

হরলাল অনেক চেষ্টা করিয়াও পড়াতে আর তেমন করিয়া মনোযোগ করিতে পারিল না। সে কোনোমতেই স্থির হইয়া পড়িতে বসিতে পারিত না। সে খানিকটা পড়িবার চেষ্টা করিয়াই ধাঁ করিয়া বই বন্ধ করিয়া ফেলিত এবং অকারণে দ্রুতপদে রাস্তায় ঘুরিয়া আসিত। কলেজে লেক্‌চারের নোটের মাঝে মাঝে খুব বড়ো বড়ো ফাঁক পড়িত এবং মাঝে মাঝে যে-সমস্ত আঁকজোঁক পাড়িত তাহার সঙ্গে প্রাচীন ঈজিপ্টের চিত্রলিপি ছাড়া আর কোনো বর্ণমালার সাদৃশ্য ছিল না।

হরলাল বুঝিল, এ-সমস্ত ভালো লক্ষণ নয়। পরীক্ষায় সে যদি-বা পাস হয় বৃত্তি পাইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। বৃত্তি না পাইলে কলিকাতায় তাহার একদিনও চলিবে না। ও দিকে দেশে মাকেও দু-চার টাকা পাঠানো চাই। নানা চিন্তা করিয়া চাকরির চেষ্টায় বাহির হইল। চাকরি পাওয়া কঠিন, কিন্তু না পাওয়া তাহার পক্ষে আরো কঠিন; এইজন্য আশা ছাড়িয়াও আশা ছাড়িতে পারিল না।

হরলালের সৌভাগ্যক্রমে একটি বড়ো ইংরেজ সদাগরের আপিসে উমেদারি করিতে গিয়া হঠাৎ সে বড়োসাহেবের নজরে পড়িল। সাহেবের বিশ্বাস ছিল, তিনি মুখ দেখিয়া লোক চিনিতে পারেন। হরলালকে ডাকিয়া তাহার সঙ্গে দু-চার কথা কহিয়াই তিনি মনে মনে বলিলেন, এ লোকটা চলিবে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাজ জানা আছে?" হরলাল কহিল, "না।" "জামিন দিতে পারিবে?" তাহার উত্তরেও "না"। "কোনো বড়োলোকের কাছ হইতে সার্টিফিকেট আনিতে পার?" কোনো বড়োলোককেই সে জানে না।

শুনিয়া সাহেব আরো যেন খুশি হইয়াই কহিলেন, "আচ্ছা বেশ, পঁচিশ টাকা

বেতনে কাজ আরম্ভ করো, কাজ শিখিলে উন্নতি হইবে।” তার পরে সাহেব তাহার বেশভূষার প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, “পনেরো টাকা আগাম দিতেছি— আপিসের উপযুক্ত কাপড় তৈরি করাইয়া লইবে।”

কাপড় তৈরি হইল, হরলাল আপিসেও বাহির হইতে আরম্ভ করিল। বড়োসাহেব তাহাকে ভূতের মতো খাটাইতে লাগিলেন। অন্য কেরানিরা বাড়ি গেলেও হরলালের ছুটি ছিল না। এক-একদিন সাহেবের বাড়ি গিয়াও তাঁহাকে কাজ বুঝাইয়া দিয়া আসিতে হইত।

এমনি করিয়া কাজ শিখিয়া লইতে হরলালের বিলম্ব হইল না। তাহার সহযোগী কেরানিরা তাহাকে ঠকাইবার অনেক চেষ্টা করিল, তাহার বিরুদ্ধে উপরওয়ালাদের কাছে লাগালাগিও করিল, কিন্তু এই নিঃশব্দ নিরীহ সামান্য হরলালের কোনো অপকার করিতে পারিল না।

যখন তাহার চল্লিশ টাকা মাহিনা হইল, তখন হরলাল দেশ হইতে মাকে আনিয়া একটি ছোটোখাটো গলির মধ্যে ছোটোখাটো বাড়িতে বাসা করিল। এতদিন পরে তাহার মার দুঃখ ঘুচিল। মা বলিলেন, “বাবা, এইবার বউ ঘরে আনিব।” হরলাল মাতার পায়ের ধুলা লইয়া বলিল, “মা, ওইটে মাপ করিতে হইবে।”

মাতার আর-একটি অনুরোধ ছিল। তিনি বলিতেন, “তুই যে দিনরাত তোর ছাত্র বেণুগোপালের গল্প করিস, তাহাকে একবার নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়া। তাহাকে আমার দেখিতে ইচ্ছা করে।”

হরলাল কহিল, “মা, এ বাসায় তাহাকে কোথায় বসাইব। রোসো, একটা বড়ো বাসা করি, তাহার পরে তাহাকে নিমন্ত্রণ করিব।”

৭

হরলালের বেতনবৃদ্ধির সঙ্গে ছোটো গলি হইতে বড়ো গলি ও ছোটো বাড়ি হইতে বড়ো বাড়িতে তাহার বাস-পরিবর্তন হইল। তবু সে কী জানি কী মনে করিয়া, অধরলালের বাড়ি যাইতে বা বেণুকে নিজের বাসায় ডাকিয়া আনিতে কোনোমতেই মন স্থির করিতে পারিল না।

হয়তো কোনোদিনই তাহার সংকোচ ঘুচিত না। এমন সময়ে হঠাৎ খবর পাওয়া গেল বেণুর মা মারা গিয়াছেন। শুনিয়া মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া সে অধরলালের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল।

এই দুই অসমবয়সী বন্ধুতে অনেকদিন পরে আবার একবার মিলন হইল। বেণুর

অশৌচের সময় পার হইয়া গেল— তবু এ বাড়িতে হরলালের যাতায়াত চলিতে লাগিল। কিন্তু ঠিক তেমনটি আর কিছুই নাই। বেণু এখন বড়ো হইয়া উঠিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী-যোগে তাহার নূতন গোঁফের রেখার সাধ্যসাধনা করিতেছে। চালচলনে বাবুয়ানা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখন তাহার উপযুক্ত বন্ধুবান্ধবেরও অভাব নাই। ফোনোগ্রাফে থিয়েটারের নটীদের ইতর গান বাজাইয়া সে বন্ধুমহলকে আমোদে রাখে। পড়িবার ঘরে সেই সাবেক ভাঙা চৌকি ও দাগি টেবিল কোথায় গেল। আয়নাতে, ছবিতে, আসবাবে ঘর যেন ছাতি ফুলাইয়া রহিয়াছে। বেণু এখন কলেজে যায় কিন্তু দ্বিতীয় বার্ষিকের সীমানা পার হইবার জন্য তাহার কোনো তাগিদ দেখা যায় না। বাপ স্থির করিয়া আছেন, দুই-একটা পাস করাইয়া লইয়া বিবাহের হাটে ছেলের বাজারদর বাড়াইয়া তুলিবেন। কিন্তু ছেলের মা জানিতেন ও স্পষ্ট করিয়া বলিতেন, "আমার বেণুকে সামান্য লোকের ছেলের মতো গৌরব প্রমাণ করিবার জন্য পাসের হিসাব দিতে হইবে না— লোহার সিন্দুকে কোম্পানির কাগজ অক্ষয় হইয়া থাক্।" ছেলেও মাতার এ কথাটা বেশ করিয়া মনে মনে বুঝিয়া লইয়াছিল।

যাহা হউক, বেণুর পক্ষে সে যে আজ নিতান্তই অনাবশ্যক তাহা হরলাল স্পষ্টই বুঝিতে পারিল এবং কেবলই থাকিয়া থাকিয়া সেই দিনের কথা মনে পড়িল, যেদিন বেণু হঠাৎ সকালবেলায় তাহার সেই মেসের বাসায় গিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল 'মাস্টারমশায় আমাদের বাড়ি চলো'। সে বেণু নাই, সে বাড়ি নাই, এখন মাস্টারমশায়কে কেই-বা ডাকিবে।

হরলাল মনে করিয়াছিল, এইবার বেণুকে তাহাদের বাসায় মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিবে। কিন্তু তাহাকে আহ্বান করিবার জোর পাইল না। একবার ভাবিল, উহাকে আসিতে বলিব ; তাহার পরে ভাবিল, বলিয়া লাভ কী— বেণু হয়তো নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবে, কিন্তু, থাক্।

হরলালের মা ছাড়িলেন না। তিনি বারবার বলিতে লাগিলেন, তিনি নিজের হাতে রাঁধিয়া তাহাকে খাওয়াইবেন— আহা, বাছার মা মারা গেছে।

অবশেষে হরলাল একদিন তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে গেল। কহিল, "অধরবাবুর কাছ হইতে অনুমতি লইয়া আসি।" বেণু কহিল, "অনুমতি লইতে হইবে না, আপনি কি মনে করেন আমি এখনো সেই খোকাবাবু আছি।"

হরলালের বাসায় বেণু খাইতে আসিল। মা এই কার্তিকের মতো ছেলেটিকে তাঁহার দুই স্নিগ্ধচক্ষুর আশীর্বাদে অভিষিক্ত করিয়া যত্ন করিয়া খাওয়াইলেন। তাঁহার

কেবলই মনে হইতে লাগিল, আহা, এই বয়সের এমন ছেলেকে ফেলিয়া ইহার মা যখন মরিল তখন তাহার প্রাণ না জানি কেমন করিতেছিল।

আহার সারিয়াই বেণু কহিল, "মাস্টারমশায়, আমাকে আজ একটু সকাল-সকাল যাইতে হইবে। আমার দুই-একজন বন্ধুর আসিবার কথা আছে।"

বলিয়া পকেট হইতে সোনার ঘড়ি খুলিয়া একবার সময় দেখিয়া লইল; তাহার পরে সংক্ষেপে বিদায় লইয়া জুড়িগাড়িতে চড়িয়া বসিল। হরলাল তাহার বাসার দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। গাড়ি সমস্ত গলিকে কাঁপাইয়া দিয়া মুহূর্তের মধ্যেই চোখের বাহির হইয়া গেল।

মা কহিলেন, "হরলাল, উহাকে মাঝে মাঝে ডাকিয়া আনিস। এই বয়সে উহার মা মারা গেছে মনে করিলে আমার প্রাণটা কেমন করিয়া উঠে।"

হরলাল চুপ করিয়া রহিল। এই মাতৃহীন ছেলেটিকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সে কোনো প্রয়োজন বোধ করিল না। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিল, 'বাস্, এই পর্যন্ত। আর কখনো ডাকিব না। একদিন পাঁচ টাকা মাইনের মাস্টারি করিয়াছিলাম বটে— কিন্তু আমি সামান্য হরলাল মাত্র।'

৮

একদিন সন্ধ্যার পর হরলাল আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তাহার একতলার ঘরে অন্ধকারে কে একজন বসিয়া আছে। সেখানে যে কোনো লোক আছে তাহা লক্ষ্য না করিয়াই সে বোধ হয় উপরে উঠিয়া যাইত, কিন্তু দরজায় ঢুকিয়াই দেখিল এসেন্সের গন্ধে আকাশ পূর্ণ। ঘরে প্রবেশ করিয়া হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, "কে, মশায়।" বেণু বলিয়া উঠিল, "মাস্টারমশায়, আমি।"

হরলাল কহিল, "এ কী ব্যাপার। কখন আসিয়াছ।"

বেণু কহিল, "অনেকক্ষণ আসিয়াছি। আপনি যে এত দেরি করিয়া আপিস হইতে ফেরেন তাহা তো আমি জানিতাম না।"

বহুকাল হইল সেই-যে নিমন্ত্রণ খাইয়া গেছে তাহার পরে আর একবারও বেণু এ বাসায় আসে নাই। বলা নাই, কহা নাই, আজ হঠাৎ এমন করিয়া সে যে সন্ধ্যার সময় এই অন্ধকার ঘরের মধ্যে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে ইহাতে হরলালের মন উদ্‌বিগ্ন হইয়া উঠিল।

উপরের ঘরে গিয়া বাতি জ্বালিয়া দুইজনে বসিল। হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, "সব ভালো তো? কিছু বিশেষ খবর আছে?"

বেণু কহিল, পড়াশুনা ক্রমে তাহার পক্ষে বড়োই একঘেয়ে হইয়া আসিয়াছে। কাঁহাতক সে বৎসরের পর বৎসর ওই সেকেণ্ড ইয়ারেই আটকা পড়িয়া থাকে। তাহার চেয়ে অনেক বয়সে-ছোটো ছেলের সঙ্গে তাহাকে একসঙ্গে পড়িতে হয়— তাহার বড়ো লজ্জা করে। কিন্তু বাবা কিছুতেই বোঝেন না।

হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কী ইচ্ছা।"

বেণু কহিল, তাহার ইচ্ছা সে বিলাত যায়, বারিস্টার হইয়া আসে। তাহারই সঙ্গে একসঙ্গে পড়িত, এমন-কি, তাহার চেয়ে পড়াশুনায় অনেক কাঁচা একটি ছেলে বিলাতে যাইবে স্থির হইয়া গেছে।

হরলাল কহিল, "তোমার বাবাকে তোমার ইচ্ছা জানাইয়াছ?"

বেণু কহিল, "জানাইয়াছি। বাবা বলেন, পাস না করিলে বিলাতে যাইবার প্রস্তাব তিনি কানে আনিবেন না। কিন্তু আমার মন খারাপ হইয়া গেছে— এখানে থাকিলে আমি কিছুতেই পাস করিতে পারিব না।"

হরলাল চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। বেণু কহিল, "আজ এই কথা লইয়া বাবা আমাকে যাহা মুখে আসিয়াছে তাহাই বলিয়াছেন। তাই আমি বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি। মা থাকিলে এমন কখনোই হইতে পারিত না।" বলিতে বলিতে সে অভিমানে কাঁদিতে লাগিল।

হরলাল কহিল, "চলো আমি-সুদ্ধ তোমার বাবার কাছে যাই, পরামর্শ করিয়া যাহা ভালো হয় স্থির করা যাইবে।"

বেণু কহিল, "না, আমি সেখানে যাইব না।"

বাপের সঙ্গে রাগারাগি করিয়া হরলালের বাড়িতে আসিয়া বেণু থাকিবে, এ কথাটা হরলালের মোটেই ভালো লাগিল না। অথচ 'আমার বাড়ি থাকিতে পারিবে না' এ কথা বলাও বড়ো শক্ত। হরলাল ভাবিল, আর-একটু বাদে মনটা একটু ঠাণ্ডা হইলেই ইহাকে ভুলাইয়া বাড়ি লইয়া যাইব। জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি খাইয়া আসিয়াছ?"

বেণু কহিল, "না, আমার ক্ষুধা নাই— আমি আজ খাইব না।"

হরলাল কহিল, "সে কি হয়।" তাড়াতাড়ি মাকে গিয়া কহিল, "মা, বেণু আসিয়াছে, তাহার জন্য কিছু খাবার চাই।"

শুনিয়া মা ভারি খুশি হইয়া খাবার তৈরি করিতে গেলেন। হরলাল আপিসের কাপড় ছাড়িয়া মুখহাত ধুইয়া বেণুর কাছে আসিয়া বসিল। একটুখানি কাশিয়া একটুখানি ইতস্তত করিয়া সে বেণুর কাঁধের উপর হাত রাখিয়া কহিল, "বেণু, কাজটা

ভালো হইতেছে না। বাবার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া বাড়ি হইতে চলিয়া আসা, এটা তোমার উপযুক্ত নয়।"

শুনিয়া তখনই বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া বেণু কহিল, "আপনার এখানে যদি সুবিধা না হয় আমি সতীশের বাড়ি যাইব।" বলিয়া সে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। হরলাল তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "রোসো, কিছু খাইয়া যাও।"

বেণু রাগ করিয়া কহিল, "না, আমি খাইতে পারিব না।" বলিয়া হাত ছাড়াইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

এমন সময় হরলালের জন্য যে জলখাবার প্রস্তুত ছিল তাহাই বেণুর জন্য থালায় গুছাইয়া মা তাহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কহিলেন, "কোথায় যাও, বাছা।"

বেণু কহিল, "আমার কাজ আছে, আমি চলিলাম।"

মা কহিলেন, "সে কি হয় বাছা, কিছু না খাইয়া যাইতে পারিবে না।" এই বলিয়া সেই বারান্দায় পাত পাড়িয়া তাহাকে হাতে ধরিয়া খাইতে বসাইলেন।

বেণু রাগ করিয়া কিছু খাইতেছে না, খাবার লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিতেছে মাত্র, এমন সময় দরজার কাছে একটা গাড়ি আসিয়া থামিল। প্রথমে একটা দরোয়ান ও তাহার পশ্চাতে স্বয়ং অধরবাবু মচ্‌মচ্‌ শব্দে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে আসিয়া উপস্থিত। বেণুর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

মা ঘরের মধ্যে সরিয়া গেলেন। অধর ছেলের সম্মুখে আসিয়া ক্রোধে কম্পিত কণ্ঠে হরলালের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "এই বুঝি! রতিকান্ত আমাকে তখনি বলিয়াছিল, কিন্তু তোমার পেটে যে এত মতলব ছিল তাহা আমি বিশ্বাস করি নাই। তুমি মনে করিয়াছ বেণুকে বশ করিয়া উহার ঘাড় ভাঙিয়া খাইবে। কিন্তু সে হইতে দিব না। ছেলে চুরি করিবে! তোমার নামে পুলিস-কেস করিব, তোমাকে জেলে ঠেলিব তবে ছাড়িব।" এই বলিয়া বেণুর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "চল্‌। ওঠ্‌।" বেণু কোনো কথাটি না কহিয়া তাহার বাপের পিছনে পিছনে চলিয়া গেল।

সেদিন কেবল হরলালের মুখেই খাবার উঠিল না।

৯

এবারে হরলালের সদাগর-আপিস কী জানি কী কারণে মফস্বল হইতে প্রচুর পরিমাণে চাল ডাল খরিদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই উপলক্ষে হরলালকে প্রতি সপ্তাহেই শনিবার ভোরের গাড়িতে সাত-আট হাজার টাকা লইয়া মফস্বলে যাইতে

হইত। পাইকেরদিগকে হাতে হাতে দাম চুকাইয়া দিবার জন্য মফস্বলের একটা বিশেষ কেন্দ্রে তাহাদের যে আপিস আছে সেইখানে দশ ও পাঁচ টাকার নোট ও নগদ টাকা লইয়া সে যাইত, সেখানে রসিদ ও খাতা দেখিয়া গত সপ্তাহের মোটা হিসাব মিলাইয়া, বর্তমান সপ্তাহের কাজ চালাইবার জন্য টাকা রাখিয়া আসিত। সঙ্গে আপিসের দুইজন দরোয়ান যাইত। হরলালের জামিন নাই বলিয়া আপিসে একটা কথা উঠিয়াছিল, কিন্তু বড়োসাহেব নিজের উপর সমস্ত ঝুঁকি লইয়া বলিয়াছিলেন— হরলালের জামিনের প্রয়োজন নাই।

মাঘ মাস হইতে এইভাবে কাজ চলিতেছে, চৈত্র পর্যন্ত চলিবে এমন সম্ভাবনা আছে। এই ব্যাপার লইয়া হরলাল বিশেষ ব্যস্ত ছিল। প্রায়ই তাহাকে অনেক রাত্রে আপিস হইতে ফিরিতে হইত।

একদিন এইরূপ রাত্রে ফিরিয়া শুনিল বেণু আসিয়াছিল, মা তাহাকে খাওয়াইয়া যত্ন করিয়া বসাইয়াছিলেন— সেদিন তাহার সঙ্গে কথাবার্তা গল্প করিয়া তাহার প্রতি তাঁহার মন আরো স্নেহে আকৃষ্ট হইয়াছে।

এমন আরো দুই-একদিন হইতে লাগিল। মা বলিলেন, "বাড়িতে মা নাই নাকি, সেইজন্য সেখানে তাহার মন টেঁকে না। আমি বেণুকে তোর ছোটো ভাইয়ের মতো, আপন ছেলের মতোই দেখি। সেই স্নেহ পাইয়া আমাকে কেবল মা বলিয়া ডাকিবার জন্য এখানে আসে।" এই বলিয়া আঁচলের প্রান্ত দিয়া তিনি চোখ মুছিলেন।

হরলালের একদিন বেণুর সঙ্গে দেখা হইল। সেদিন সে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল। অনেক রাত পর্যন্ত কথাবার্তা হইল। বেণু বলিল, "বাবা আজকাল এমন হইয়া উঠিয়াছেন যে আমি কিছুতেই বাড়িতে টিঁকিতে পারিতেছি না। বিশেষত শুনিতে পাইতেছি, তিনি বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। রতিবাবু সম্বন্ধ লইয়া আসিতেছেন— তাঁহার সঙ্গে কেবলই পরামর্শ চলিতেছে। পূর্বে আমি কোথাও গিয়া দেরি করিলে বাবা অস্থির হইয়া উঠিতেন, এখন যদি আমি দুই-চারিদিন বাড়িতে না ফিরি তাহা হইলে তিনি আরাম বোধ করেন। আমি বাড়ি থাকিলে বিবাহের আলোচনা সাবধানে করিতে হয় বলিয়া আমি না থাকিলে তিনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন। এ বিবাহ যদি হয় তবে আমি বাড়িতে থাকিতে পারিব না। আমাকে আপনি উদ্ধারের একটা পথ দেখাইয়া দিন— আমি স্বতন্ত্র হইতে চাই।"

স্নেহে ও বেদনায় হরলালের হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সংকটের সময় আর-সকলকে ফেলিয়া বেণু যে তাহার সেই মাস্টারমশায়ের কাছে আসিয়াছে, ইহাতে কষ্টের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আনন্দ হইল। কিন্তু মাস্টারমশায়ের কতটুকুই বা সাধ্য আছে।

বেণু কহিল, "যেমন করিয়া হোক, বিলাতে গিয়া বারিস্টার হইয়া আসিলে এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাই।"

হরলাল কহিল, "অধরবাবু কি যাইতে দিবেন।"

বেণু কহিল, "আমি চলিয়া গেলে তিনি বাঁচেন। কিন্তু টাকার উপরে যেরকম মায়া, বিলাতের খরচ তাঁহার কাছ হইতে সহজে আদায় হইবে না। একটু কৌশল করিতে হইবে।"

হরলাল বেণুর বিজ্ঞতা দেখিয়া হাসিয়া কহিল, "কী কৌশল।"

বেণু কহিল, "আমি হ্যাণ্ডনোটে টাকা ধার করিব। পাওনাদার আমার নামে নালিশ করিলে বাবা তখন দায়ে পড়িয়া শোধ করিবেন। সেই টাকায় পালাইয়া বিলাত যাইব। সেখানে গেলে তিনি খরচ না দিয়া থাকিতে পারিবেন না।"

হরলাল কহিল, "তোমাকে টাকা ধার দিবে কে।"

বেণু কহিল, "আপনি পারেন না?"

হরলাল আশ্চর্য হইয়া কহিল, "আমি!" মুখে আর কোনো কথা বাহির হইল না।

বেণু কহিল, "কেন, আপনার দরোয়ান তো তোড়ায় করিয়া অনেক টাকা ঘরে আনিল।"

হরলাল হাসিয়া কহিল, "সে দরোয়ানও যেমন আমার, টাকাও তেমনি।"

বলিয়া এই আপিসের টাকার ব্যবহারটা কী তাহা বেণুকে বুঝাইয়া দিল। এই টাকা কেবল একটি রাত্রের জন্যই দরিদ্রের ঘরে আশ্রয় লয়, প্রভাত হইলে দশ দিকেতে গমন করে।

বেণু কহিল, "আপনাদের সাহেব আমাকে ধার দিতে পারেন না? নাহয় আমি সুদ বেশি করিয়া দিব।"

হরলাল কহিল, "তোমার বাপ যদি সিকিউরিটি দেন তাহা হইলে আমার অনুরোধে হয়তো দিতেও পারেন।"

বেণু কহিল, "বাবা যদি সিকিউরিটি দিবেন তো টাকা দিবেন না কেন।"

তর্কটা এইখানেই মিটিয়া গেল। হরলাল মনে মনে ভাবিতে লাগিল, 'আমার যদি কিছু থাকিত, তবে বাড়িঘর জমিজমা সমস্ত বেচিয়া-কিনিয়া টাকা দিতাম।' কিন্তু একটিমাত্র অসুবিধা এই যে, বাড়িঘর জমিজমা কিছুই নাই।

১০

একদিন শুক্রবার রাত্রে হরলালের বাসার সম্মুখে জুড়িগাড়ি দাঁড়াইল। বেণু গাড়ি হইতে নামিবামাত্র হরলালের আপিসের দরোয়ান তাহাকে মস্ত একটা সেলাম করিয়া উপরে বাবুকে শশব্যস্ত হইয়া সংবাদ দিতে গেল। হরলাল তখন তাহার শোবার ঘরে মেজের উপর বসিয়া টাকা মিলাইয়া লইতেছিল। বেণু সেই ঘরেই প্রবেশ করিল। আজ তাহার বেশ কিছু নূতন ধরনের। শৌখিন ধুতিচাদরের বদলে নধর শরীরে পার্শি কোট ও প্যান্টলুন আঁটিয়া মাথায় ক্যাপ পরিয়া আসিয়াছে। তাহার দুই হাতের আঙুলে মণিমুক্তার আংটি ঝক্‌মক্ করিতেছে। গলা হইতে লম্বিত মোটা সোনার চেনে আবদ্ধ ঘড়ি বুকের পকেটে নিবিষ্ট। কোটের আস্তিনের ভিতর হইতে জামার হাতায় হীরার বোতাম দেখা যাইতেছে।

হরলাল টাকা গোনা বন্ধ করিয়া আশ্চর্য হইয়া কহিল, "এ কী ব্যাপার। এত রাত্রে এ বেশে যে ?"

বেণু কহিল, "পরশু বাবার বিবাহ। তিনি আমার কাছে তাহা গোপন করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু আমি খবর পাইয়াছি। বাবাকে বলিলাম আমি কিছুদিনের জন্য আমাদের বারাকপুরের বাগানে যাইব। শুনিয়া তিনি ভারি খুশি হইয়া রাজি হইয়াছেন। তাই বাগানে চলিয়াছি ; ইচ্ছা হইতেছে, আর ফিরিব না। যদি সাহস থাকিত তবে গঙ্গার জলে ডুবিয়া মরিতাম।"

বলিতে বলিতে বেণু কাঁদিয়া ফেলিল। হরলালের বুকে যেন ছুরি বিঁধিতে লাগিল। একজন অপরিচিত স্ত্রীলোক আসিয়া বেণুর মার ঘর, মার খাট, মার স্থান অধিকার করিয়া লইলে, বেণুর স্নেহস্মৃতিজড়িত বাড়ি যে বেণুর পক্ষে কিরকম কণ্টকময় হইয়া উঠিবে তাহা হরলাল সমস্ত হৃদয় দিয়া বুঝিতে পারিল। মনে মনে ভাবিল, পৃথিবীতে গরিব হইয়া না জন্মিলেও দুঃখের এবং অপমানের অন্ত নাই। বেণুকে কী বলিয়া যে সান্ত্বনা দিবে তাহা কিছুই ভাবিয়া না পাইয়া বেণুর হাতখানা নিজের হাতে লইল। লইবামাত্র একটা তর্ক তাহার মনে উদয় হইল। সে ভাবিল, এমন একটা বেদনার সময় বেণু কী করিয়া এত সাজ করিতে পারিল।

হরলাল তাহার আংটির দিকে চোখ রাখিয়াছে দেখিয়া বেণু যেন তাহার মনের প্রশ্নটা আঁচিয়া লইল। সে বলিল, "এই আংটিগুলি আমার মায়ের।"

শুনিয়া হরলাল বহু কষ্টে চোখের জল সামলাইয়া লইল। কিছুক্ষণ পরে কহিল, "বেণু, খাইয়া আসিয়াছ ?"

বেণু কহিল, "হাঁ— আপনার খাওয়া হয় নাই ?"

হরলাল কহিল, "টাকাগুলি গনিয়া আয়রন-চেস্টে না তুলিয়া ঘর হইতে বাহির হইতে পারিব না।"

বেণু কহিল, "আপনি খাইয়া আসুন, আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে। আমি ঘরে রহিলাম ; মা আপনার খাবার লইয়া বসিয়া আছেন।"

হরলাল একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, "আমি চট্ করিরা খাইয়া আসিতেছি।"

হরলাল তাড়াতাড়ি খাওয়া সারিয়া মাকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। বেণু তাঁহাকে প্রণাম করিল, তিনি বেণুর চিবুকের স্পর্শ লইয়া চুম্বন করিলেন। হরলালের কাছে সমস্ত খবর পাইয়া তাঁহার বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছিল। নিজের সমস্ত স্নেহ দিয়াও বেণুর অভাব তিনি পূরণ করিতে পারিবেন না এই তাঁহার দুঃখ।

চারি দিকে ছড়ানো টাকার মধ্যে তিনজনে বসিয়া বেণুর ছেলেবেলাকার গল্প হইতে লাগিল। মাস্টারমশায়ের সঙ্গে জড়িত তাহার কত দিনের কত ঘটনা। তাহার মাঝে মাঝে সেই অসংযতস্নেহশালিনী মার কথাও আসিয়া পড়িতে লাগিল।

এমনি করিয়া রাত অনেক হইয়া গেল। হঠাৎ একসময় ঘড়ি খুলিয়া বেণু কহিল, "আর নয়, দেরি করিলে গাড়ি ফেল করিব।"

হরলালের মা কহিলেন, "বাবা, আজ রাত্রে এইখানেই থাকো-না, কাল সকালে হরলালের সঙ্গে একসঙ্গেই বাহির হইবে।"

বেণু মিনতি করিয়া কহিল, "না মা, এ অনুরোধ করিবেন না, আজ রাত্রে যে করিয়া হউক আমাকে যাইতেই হইবে।"

হরলালকে কহিল, "মাস্টারমশায়, এই আংটি-ঘড়িগুলা বাগানে লইয়া যাওয়া নিরাপদ নয়। আপনার কাছেই রাখিয়া যাই, ফিরিয়া আসিয়া লইয়া যাইব। আপনার দরোয়ানকে বলিয়া দিন, আমার গাড়ি হইতে চামড়ার হ্যাণ্ডব্যাগটা আনিয়া দিক। সেইটের মধ্যে এগুলা রাখিয়া দিই।"

আপিসের দরোয়ান গাড়ি হইতে ব্যাগ লইয়া আসিল। বেণু তাহার চেন ঘড়ি আংটি বোতাম সমস্ত খুলিয়া ব্যাগের মধ্যে পুরিয়া দিল। সতর্ক হরলাল সেই ব্যাগটি লইয়া তখনই আয়রন-সেফের মধ্যে রাখিল।

বেণু হরলালের মার পায়ের ধুলা লইল। তিনি রুদ্ধকণ্ঠে আশীর্বাদ করিলেন, "মা জগদম্বা তোমার মা হইয়া তোমাকে রক্ষা করুন।"

তাহার পরে বেণু হরলালের পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। আর-কোনোদিন

সে হরলালকে এমন করিয়া প্রণাম করে নাই। হরলাল কোনো কথা না বলিয়া তাহার পিঠে হাত দিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিয়া আসিল। গাড়ির লণ্ঠনে আলো জ্বলিল, ঘোড়া দুটা অধীর হইয়া উঠিল। কলিকাতার গ্যাসালোকখচিত নিশীথের মধ্যে বেণুকে লইয়া গাড়ি অদৃশ্য হইয়া গেল।

হরলাল তাহার ঘরে আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া টাকা গনিতে গনিতে ভাগ করিয়া এক-একটা থলিতে ভরতি করিতে লাগিল। নোটগুলা পূর্বেই গনা হইয়া থলিবন্দি হইয়া লোহার সিন্দুকে উঠিয়াছিল।

১১

লোহার সিন্দুকের চাবি মাথার বালিশের নীচে রাখিয়া সেই টাকার ঘরেই হরলাল অনেক রাত্রে শয়ন করিল। ভালো ঘুম হইল না। স্বপ্নে দেখিল— বেণুর মা পর্দার আড়াল হইতে তাহাকে উচ্চস্বরে তিরস্কার করিতেছেন; কথা কিছুই স্পষ্ট শুনা যাইতেছে না, কেবল সেই অনির্দিষ্ট কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সঙ্গে বেণুর মার চুনি-পান্না-হীরার অলংকার হইতে লাল সবুজ শুভ্র রশ্মির সূচিগুলি কালো পর্দাটাকে ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া আন্দোলিত হইতেছে। হরলাল প্রাণপণে বেণুকে ডাকিবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু তাহার গলা দিয়া কিছুতেই স্বর বাহির হইতেছে না। এমন সময় প্রচণ্ড শব্দে কী একটা ভাঙিয়া পর্দা ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল— চমকিয়া চোখ মেলিয়া হরলাল দেখিল একটা স্তূপাকার অন্ধকার। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া উঠিয়া সশব্দে জানলায় ঠেলা দিয়া আলো নিবাইয়া দিয়াছে। হরলালের সমস্ত শরীর ঘামে ভিজিয়া গেছে। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেশালাই দিয়া আলো জ্বালিল। ঘড়িতে দেখিল চারটে বাজিয়াছে। আর ঘুমাইবার সময় নাই— টাকা লইয়া মফস্বলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

হরলাল মুখ ধুইয়া ফিরিবার সময় মা তাঁহার ঘর হইতে কহিলেন, "কী বাবা, উঠিয়াছিস?"

হরলাল প্রভাতে প্রথমে মাতার মঙ্গলমুখ দেখিবার জন্য ঘরে প্রবেশ করিল। মা তাহার প্রণাম লইয়া মনে মনে তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, "বাবা, আমি এইমাত্র স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, তুই যেন বউ আনিতে চলিয়াছিস। ভোরের স্বপন কি মিথ্যা হইবে।"

হরলাল হাসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। টাকা ও নোটের থলেগুলো লোহার

সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া প্যাকবাক্সয় বন্ধ করিবার জন্য উদ্‌যোগ করিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার বুকের ভিতর ধড়াস করিয়া উঠিল— দুই-তিনটা নোটের থলি শূন্য। মনে হইল স্বপন দেখিতেছে। থলেগুলা লইয়া সিন্দুকের গায়ে জোরে আছাড় দিল— তাহাতে শূন্য থলের শূন্যতা অপ্রমাণ হইল না। তবু বৃথা আশায় থলের বন্ধনগুলা খুলিয়া খুব করিয়া ঝাড়া দিল, একটি থলের ভিতর হইতে দুইখানি চিঠি বাহির হইয়া পড়িল। বেণুর হাতের লেখা— একটি চিঠি তাহার বাপের নামে, আর-একটি হরলালের।

তাড়াতাড়ি খুলিয়া পড়িতে গেল। চোখে যেন দেখিতে পাইল না। মনে হইল যেন আলো যথেষ্ট নাই। কেবলই বাতি উসকাইয়া দিতে লাগিল। যাহা পড়ে তাহা ভালো বোঝে না, বাংলা ভাষা যেন ভুলিয়া গেছে।

কথাটা এই যে, বেণু তিন হাজার টাকার পরিমাণ দশটাকাওয়ালা নোট লইয়া বিলাতে যাত্রা করিয়াছে, আজ ভোরেই জাহাজ ছাড়িবার কথা। হরলাল যে সময় খাইতে গিয়াছিল সেই সময় বেণু এই কাণ্ড করিয়াছে। লিখিয়াছে যে, 'বাবাকে চিঠি দিলাম, তিনি আমার এই ঋণ শোধ করিয়া দিবেন। তা ছাড়া ব্যাগ খুলিয়া দেখিবেন, তাহার মধ্যে মায়ের যে গহনা আছে তাহার দাম, কত ঠিক জানি না, বোধ হয় তিন হাজার টাকার বেশি হইবে। মা যদি বাঁচিয়া থাকিতেন তবে বাবা আমাকে বিলাতে যাইবার টাকা না দিলেও এই গহনা দিয়াই নিশ্চয় মা আমাকে খরচ জোগাড় করিয়া দিতেন। আমার মায়ের গহনা বাবা যে আর-কাহাকেও দিবেন তাহা আমি সহ্য করিতে পারি নাই। সেইজন্য যেমন করিয়া পারি আমিই তাহা লইয়াছি। বাবা যদি টাকা দিতে দেরি করেন তবে আপনি অনায়াসে এই গহনা বেচিয়া বা বন্ধক দিয়া টাকা লইতে পারিবেন। এ আমার মায়ের জিনিস— এ আমারই জিনিস।' এ ছাড়া আরো অনেক কথা— সে কোনো কাজের কথা নহে।

হরলাল ঘরে তালা দিয়া তাড়াতাড়ি একখানা গাড়ি লইয়া গঙ্গার ঘাটে ছুটিল। কোন্ জাহাজে বেণু যাত্রা করিয়াছে তাহার নামও সে জানে না। মেটিয়াবুরুজ পর্যন্ত ছুটিয়া হরলাল খবর পাইল দুইখানা জাহাজ ভোরে রওনা হইয়া গেছে। দুখানাই ইংলণ্ডে যাইবে। কোন্ জাহাজে বেণু আছে তাহাও তাহার অনুমানের অতীত এবং সে জাহাজ ধরিবার যে কী উপায় তাহাও সে ভাবিয়া পাইল না।

মেটিয়াবুরুজ হইতে তাহার বাসার দিকে যখন গাড়ি ফিরিল তখন সকালের রৌদ্রে কলিকাতা শহর জাগিয়া উঠিয়াছে। হরলালের চোখে কিছুই পড়িল না।

তাহার সমস্ত হতবুদ্ধি অন্তঃকরণ একটা কলেবরহীন নিদারুণ প্রতিকূলতাকে যেন কেবলই প্রাণপণে ঠেলা মারিতেছিল— কিন্তু কোথাও এক তিলও তাহাকে টলাইতে পারিতেছিল না। যে বাসায় তাহার মা থাকেন, এতদিন যে বাসায় পা দিবামাত্র কর্মক্ষেত্রের সমস্ত ক্লান্তি ও সংঘাতের বেদনা মুহূর্তের মধ্যেই তাহার দূর হইয়া গিয়াছে, সেই বাসার সম্মুখে গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল— গাড়োয়ানের ভাড়া চুকাইয়া দিয়া সেই বাসার মধ্যে সে অপরিমেয় নৈরাশ্য ও ভয় লইয়া প্রবেশ করিল।

মা উদ্‌বিগ্ন হইয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, কোথায় গিয়াছিলে।"

হরলাল বলিয়া উঠিল, "মা, তোমার জন্য বউ আনিতে গিয়াছিলাম।" বলিয়া শুষ্ককণ্ঠে হাসিতে হাসিতে সেইখানেই মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

"ও মা, কী হইল গো" বলিয়া মা তাড়াতাড়ি জল আনিয়া তাহার মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে হরলাল চোখ খুলিয়া শূন্যদৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিয়া উঠিয়া বসিল। হরলাল কহিল, "মা, তোমরা ব্যস্ত হইয়ো না। আমাকে একটু একলা থাকিতে দাও।" বলিয়া সে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। মা দরজার বাহিরে মাটির উপর বসিয়া পড়িলেন— ফাল্গুনের রৌদ্র তাঁহার সর্বাঙ্গে আসিয়া পড়িল। তিনি রুদ্ধ দরজার উপর মাথা রাখিয়া থাকিয়া থাকিয়া কেবল ডাকিতে লাগিলেন, "হরলাল, বাবা হরলাল।"

হরলাল কহিল, "মা, একটু পরেই আমি বাহির হইব, এখন তুমি যাও।"

মা রৌদ্রে সেইখানেই বসিয়া জপ করিতে লাগিলেন।

আপিসের দরোয়ান অসিয়া দরজায় ঘা দিয়া কহিল, "বাবু, এখনি না বাহির হইলে আর গাড়ি পাওয়া যাইবে না।"

হরলাল ভিতর হইতে কহিল, "আজ সাতটার গাড়িতে যাওয়া হইবে না।"

দরোয়ান কহিল, "তবে কখন যাইবেন।"

হরলাল কহিল, "সে আমি তোমাকে পরে বলিব।"

দরোয়ান মাথা নাড়িয়া হাত উলটাইয়া নীচে চলিয়া গেল।

হরলাল ভাবিতে লাগিল, 'এ কথা বলি কাহাকে। এ যে চুরি। বেণুকে কি জেলে দিব।'

হঠাৎ সেই গহনার কথা মনে পড়িল। সে কথাটা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। মনে হইল যেন কিনারা পাওয়া গেল। ব্যাগ খুলিয়া দেখে তাহার মধ্যে শুধু আংটি

ঘড়ি বোতাম হার নহে— ব্রেস্‌লেট চিক সিঁথি মুক্তার মালা প্রভৃতি আরো অনেক দামী গহনা আছে। তাহার দাম তিন হাজার টাকার অনেক বেশি। কিন্তু এও তো চুরি। এও তো বেণুর নয়। এ ব্যাগ যতক্ষণ তাহার ঘরে থাকে ততক্ষণ তাহার বিপদ।

তখন আর দেরি না করিয়া অধরলালের সেই চিঠি ও ব্যাগ লইয়া হরলাল ঘর হইতে বাহির হইল।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাও, বাবা।"

হরলাল কহিল, "অধরবাবুর বাড়িতে।"

মার বুক হইতে হঠাৎ অনির্দিষ্ট ভয়ের একটা মস্ত বোঝা নামিয়া গেল। তিনি স্থির করিলেন, ওই-যে হরলাল কাল শুনিয়াছে বেণুর বাপের বিয়ে, তাই শুনিয়া অবধি বাছার মনে শান্তি নাই। আহা, বেণুকে কত ভালোই বাসে।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তবে তোমার আর মফস্বলে যাওয়া হইবে না?"

হরলাল কহিল, "না।" বলিয়াই তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল।

অধরবাবুর বাড়ি পৌঁছিবার পূর্বেই দূর হইতে শোনা গেল রসনচৌকি আলেয়া রাগিণীতে করুণস্বরে আলাপ জুড়িয়া দিয়াছে, কিন্তু হরলাল দরজায় ঢুকিয়াই দেখিল, বিবাহবাড়ির উৎসবের সঙ্গে একটা যেন অশান্তির লক্ষণ মিশিয়াছে। দরোয়ানের পাহারা কড়াক্কড়, বাড়ি হইতে চাকরবাকর কেহ বাহির হইতে পারিতেছে না— সকলেরই মুখে ভয় ও চিন্তার ভাব; হরলাল খবর পাইল, কাল রাত্রে বাড়িতে অনেক টাকার গহনা চুরি হইয়া গেছে। দুই-তিনজন চাকরকে বিশেষভাবে সন্দেহ করিয়া পুলিসের হাতে সমর্পণ করিবার উদ্‌যোগ হইতেছে।

হরলাল দোতলায় বারান্দায় গিয়া দেখিল, অধরবাবু আগুন হইয়া বসিয়া আছেন, ও রতিকান্ত তামাক খাইতেছে। হরলাল কহিল, "আপনার সঙ্গে গোপনে আমার একটু কথা আছে।"

অধরবাবু চটিয়া উঠিয়া কহিলেন, "তোমার সঙ্গে গোপনে আলাপ করিবার এখন আমার সময় নয়— যাহা কথা থাকে এইখানেই বলিয়া ফেলো।"

তিনি ভাবিলেন, হরলাল বুঝি এই সময়ে তাঁহার কাছে সাহায্য বা ধার চাহিতে আসিয়াছে। রতিকান্ত কহিল, "আমার সামনে বাবুকে কিছু জানাইতে যদি লজ্জা করেন, আমি নাহয় উঠি।"

অধর বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "আঃ, বোসো না।"

হরলাল কহিল, "কাল রাত্রে বেণু আমার বাড়িতে এই ব্যাগ রাখিয়া গেছে।"

অধর। ব্যাগে কী আছে।

হরলাল ব্যাগ খুলিয়া অধরবাবুর হাতে দিল।

অধর। মাস্টারে ছাত্রে মিলিয়া বেশ কারবার খুলিয়াছ তো। জানিতে এ চোরাই মাল বিক্রি করিলে ধরা পড়িবে, তাই আনিয়া দিয়াছ— মনে করিতেছ সাধুতার জন্য বকশিশ পাইবে?

তখন হরলাল অধরের পত্রখানা তাঁহার হাতে দিল। পড়িয়া তিনি আগুন হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "আমি পুলিসে খবর দিব। আমার ছেলে এখনো সাবালক হয় নাই— তুমি তাহাকে চুরি করিয়া বিলাত পাঠাইয়াছ। হয়তো পাঁচশো টাকা ধার দিয়া তিন হাজার টাকা লিখাইয়া লইয়াছ। এ ধার আমি শুধিব না।"

হরলাল কহিল, "আমি ধার দিই নাই।"

অধর কহিলেন, "তবে সে টাকা পাইল কোথা হইতে। তোমার বাক্স ভাঙিয়া চুরি করিয়াছে?"

হরলাল সে প্রশ্নের কোনো উত্তর দিল না। রতিকান্ত টিপিয়া টিপিয়া কহিল, "ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন-না, তিন হাজার টাকা কেন, পাঁচশো টাকাও উনি কি কখনো চক্ষে দেখিয়াছেন।"

যাহা হউক, গহনা চুরির মীমাংসা হওয়ার পরেই বেণুর বিলাত পালানো লইয়া বাড়িতে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। হরলাল সমস্ত অপরাধের ভার মাথায় করিয়া লইয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রাস্তায় যখন বাহির হইল তখন তাহার মন যেন অসাড় হইয়া গেছে। ভয় করিবার এবং ভাবনা করিবারও শক্তি তখন ছিল না। এই ব্যাপারের পরিণাম যে কী হইতে পারে মন তাহা চিন্তা করিতেও চাহিল না।

গলিতে প্রবেশ করিয়া দেখিল তাহার বাড়ির সমুখে একটা গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। চমকিয়া উঠিল। হঠাৎ আশা হইল, বেণু ফিরিয়া আসিয়াছে। নিশ্চয়ই বেণু! তাহার বিপদ যে সম্পূর্ণ নিরুপায়রূপে চূড়ান্ত হইয়া উঠিবে এ কথা সে কোনোমতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না।

তাড়াতাড়ি গাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল, গাড়ির ভিতরে তাহাদের আপিসের একজন সাহেব বসিয়া আছে। সাহেব হরলালকে দেখিয়াই গাড়ি হইতে নামিয়া তাহার হাত ধরিয়া বাড়িতে প্রবেশ করিল। জিজ্ঞাসা করিল, "আজ মফস্বলে গেলে না কেন।"

আপিসের দরোয়ান সন্দেহ করিয়া বড়োসাহেবকে গিয়া জানাইয়াছে— তিনি

ইহাকে পাঠাইয়াছেন।

হরলাল বলিল, "তিন হাজার টাকার নোট পাওয়া যাইতেছে না।"

সাহেব জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় গেল ?"

হরলাল 'জানি না' এমন উত্তরও দিতে পারিল না, চুপ করিয়া রহিল।

সাহেব কহিল, "টাকা কোথায় আছে দেখিব চলো।"

হরলাল তাহাকে উপরের ঘরে লইয়া গেল। সাহেব সমস্ত গনিয়া চারি দিক খুঁজিয়া পাতিয়া দেখিল। বাড়ির সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল। এই ব্যাপার দেখিয়া মা আর থাকিতে পারিলেন না— তিনি সাহেবের সামনেই বাহির হইয়া ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওরে হরলাল, কী হইল রে।"

হরলাল কহিল, "মা, টাকা চুরি গেছে।"

মা কহিলেন, "চুরি কেমন করিয়া যাইবে। হরলাল, এমন সর্বনাশ কে করিল।"

হরলাল কহিল, "মা, চুপ করো।"

সন্ধান শেষ করিয়া সাহেব জিজ্ঞাসা করিল, "এ ঘরে রাত্রে কে ছিল।"

হরলাল কহিল, "দ্বার বন্ধ করিয়া আমি একলা শুইয়াছিলাম— আর-কেহ ছিল না।"

সাহেব টাকাগুলা গাড়িতে তুলিয়া হরলালকে কহিল, "আচ্ছা, বড়োসাহেবের কাছে চলো।"

হরলালকে সাহেবের সঙ্গে চলিয়া যাইতে দেখিয়া মা তাহাদের পথ রোধ করিয়া কহিল, "সাহেব, আমার ছেলেকে কোথায় লইয়া যাইবে। আমি না খাইয়া এ ছেলে মানুষ করিয়াছি— আমার ছেলে কখনোই পরের টাকায় হাত দিবে না।"

সাহেব বাংলা কথা কিছু না বুঝিয়া কহিল, "আচ্ছা, আচ্ছা।"

হরলাল কহিল, "মা, তুমি কেন ব্যস্ত হইতেছ। বড়োসাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া আমি এখনি আসিতেছি।"

মা উদ্‌বিগ্ন হইয়া কহিলেন, "তুই যে সকাল থেকে কিছুই খাস নাই।"

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়া হরলাল গাড়িতে উঠিয়া চলিয়া গেল। মা মেজের উপরে লুটাইয়া পড়িয়া রহিলেন।

বড়োসাহেব হরলালকে কহিলেন, "সত্য করিয়া বলো ব্যাপারখানা কী।"

হরলাল কহিল, "আমি টাকা লই নাই।"

বড়োসাহেব। সে কথা আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। কিন্তু তুমি নিশ্চয় জান কে লইয়াছে ?

হরলাল কোনো উত্তর না দিয়া মুখ নিচু করিয়া বসিয়া রহিল।

সাহেব। তোমার জ্ঞাতসারে এ টাকা কেহ লইয়াছে?

হরলাল কহিল, "আমার প্রাণ থাকিতে আমার জ্ঞাতসারে এ টাকা কেহ লইতে পারিত না।"

বড়োসাহেব কহিলেন, "দেখো হরলাল, আমি তোমাকে বিশ্বাস করিয়া কোনো জামিন না লইয়া এই দায়িত্বের কাজ দিয়াছিলাম। আপিসের সকলেই বিরোধী ছিল। তিন হাজার টাকা কিছুই বেশি নয়। কিন্তু তুমি আমাকে বড়ো লজ্জাতেই ফেলিবে। আজ সমস্ত দিন তোমাকে সময় দিলাম— যেমন করিয়া পার টাকা সংগ্রহ করিয়া আনো— তাহা হইলে এ লইয়া কোনো কথা তুলিব না, তুমি যেমন কাজ করিতেছ তেমনি করিবে।"

এই বলিয়া সাহেব উঠিয়া গেলেন। তখন বেলা এগারোটা হইয়া গেছে। হরলাল যখন মাথা নিচু করিয়া বাহির হইয়া গেল তখন আপিসের বাবুরা অত্যন্ত খুশি হইয়া হরলালের পতন লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল।

হরলাল একদিন সময় পাইল। আরো একটা দীর্ঘ দিন নৈরাশ্যের শেষতলের পঙ্ক আলোড়ন করিয়া তুলিবার মেয়াদ বাড়িল।

উপায় কী, উপায় কী, উপায় কী— এই ভাবিতে ভাবিতে সেই রৌদ্রে হরলাল রাস্তায় বেড়াইতে লাগিল। শেষে উপায় আছে কি না সে ভাবনা বন্ধ হইয়া গেল কিন্তু বিনা কারণে পথে ঘুরিয়া বেড়ানো থামিল না। যে কলিকাতা হাজার হাজার লোকের আশ্রয়স্থান তাহাই এক মুহূর্তে হরলালের পক্ষে একটা প্রকাণ্ড ফাঁসকলের মতো হইয়া উঠিল। ইহার কোনো দিকে বাহির হইবার কোনো পথ নাই। সমস্ত জনসমাজ এই অতিক্ষুদ্র হরলালকে চারি দিকে আটক করিয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ তাহাকে জানেও না, এবং তাহার প্রতি কাহারো মনে কোনো বিদ্বেষও নাই, কিন্তু প্রত্যেক লোকেই তাহার শত্রু। অথচ রাস্তার লোক তাহার গা ঘেঁষিয়া তাহার পাশ দিয়া চলিয়াছে; আপিসের বাবুরা বাহিরে আসিয়া ঠোঙায় করিয়া জল খাইতেছেন, তাহার দিকে কেহ তাকাইতেছেন না; ময়দানের ধারে অলস পথিক মাথার নীচে হাত রাখিয়া একটা পায়ের উপর আর-একটা পা তুলিয়া গাছের তলায় পড়িয়া আছে; শ্যাকরাগাড়ি ভরতি করিয়া হিন্দুস্থানী মেয়েরা কালীঘাটে চলিয়াছে; একজন চাপরাসি একখানা চিঠি লইয়া হরলালের সম্মুখে ধরিয়া কহিল, "বাবু, ঠিকানা পড়িয়া দাও"— যেন তাহার সঙ্গে অন্য পথিকের কোনো প্রভেদ নাই; সেও ঠিকানা পড়িয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিল। ক্রমে আপিস বন্ধ হইবার সময় আসিল। বাড়িমুখো গাড়িগুলো

আপিসমহলের নানা রাস্তা দিয়া ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। আপিসের বাবুরা ট্র্যাম ভরতি করিয়া থিয়েটারের বিজ্ঞাপন পড়িতে পড়িতে বাসায় ফিরিয়া চলিল। আজ হইতে হরলালের আপিস নাই, আপিসের ছুটি নাই, বাসায় ফিরিয়া যাইবার জন্য ট্র্যাম ধরিবার কোনো তাড়া নাই। শহরের সমস্ত কাজকর্ম, বাড়িঘর, গাড়িজুড়ি, আনাগোনা হরলালের কাছে কখনো-বা অত্যন্ত উৎকট সত্যের মতো দাঁত মেলিয়া উঠিতেছে, কখনো-বা একেবারে বস্তুহীন স্বপ্নের মতো ছায়া হইয়া আসিতেছে। আহার নাই, বিশ্রাম নাই, আশ্রয় নাই, কেমন করিয়া যে হরলালের দিন কাটিয়া গেল তাহা সে জানিতেও পারিল না। রাস্তায় রাস্তায় গ্যাসের আলো জ্বলিল— যেন একটা সতর্ক অন্ধকার দিকে দিকে তাহার সহস্র ক্রূর চক্ষু মেলিয়া শিকারলুব্ধ দানবের মতো চুপ করিয়া রহিল। রাত্রি কত হইল সে কথা হরলাল চিন্তাও করিল না। তাহার কপালের শিরা দব্ দব্ করিতেছে; মাথা যেন ফাটিয়া যাইতেছে; সমস্ত শরীরে আগুন জ্বলিতেছে; পা আর চলে না। সমস্ত দিন পর্যায়ক্রমে বেদনার উত্তেজনা ও অবসাদের অসাড়তার মধ্যে মার কথা কেবল মনের মধ্যে যাতায়াত করিয়াছে— কলিকাতার অসংখ্য জনশ্রেণীর মধ্যে কেবল ওই একটিমাত্র নামই শুষ্ককণ্ঠ ভেদ করিয়া মুখে উঠিয়াছে— মা, মা, মা। আর কাহাকেও ডাকিবার নাই। মনে করিল, রাত্রি যখন নিবিড় হইয়া আসিবে, কোনো লোকই যখন এই অতি সামান্য হরলালকে বিনা অপরাধে অপমান করিবার জন্য জাগিয়া থাকিবে না, তখন সে চুপ করিয়া তাহার মায়ের কোলের কাছে গিয়া শুইয়া পড়িবে— তাহার পরে ঘুম যেন আর না ভাঙে! পাছে তার মার সম্মুখে পুলিসের লোক বা আর-কেহ তাহাকে অপমান করিতে আসে এই ভয়ে সে বাসায় যাইতে পারিতেছিল না। শরীরের ভার যখন আর বহিতে পারে না এমন সময় হরলাল একটা ভাড়াটে গাড়ি দেখিয়া তাহাকে ডাকিল। গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইবে।"

হরলাল কহিল, "কোথাও না। এই ময়দানের রাস্তায় খানিকক্ষণ হাওয়া খাইয়া বেড়াইব।"

গাড়োয়ান সন্দেহ করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই হরলাল তাহার হাতে আগাম ভাড়া একটা টাকা দিল। সে গাড়ি তখন হরলালকে লইয়া ময়দানের রাস্তায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

তখন শ্রান্ত হরলাল তাহার তপ্ত মাথা খোলা জানলার উপর রাখিয়া চোখ বুজিল। একটু একটু করিয়া তাহার সমস্ত বেদনা যেন দূর হইয়া আসিল। শরীর শীতল হইল। মনের মধ্যে একটি সুগভীর সুনিবিড় আনন্দপূর্ণ শান্তি ঘনাইয়া আসিতে লাগিল।

একটা যেন পরম পরিত্রাণ তাহাকে চারি দিক হইতে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। সে যে সমস্ত দিন মনে করিয়াছিল কোথাও তাহার কোনো পথ নাই, সহায় নাই, নিষ্কৃতি নাই, তাহার অপমানের শেষ নাই, দুঃখের অবধি নাই, সে কথাটা যেন এক মুহূর্তেই মিথ্যা হইয়া গেল। এখন মনে হইল, সে তো একটা ভয় মাত্র, সে তো সত্য নয়। যাহা তাহার জীবনকে লোহার মুঠিতে আঁটিয়া পিষিয়া ধরিয়াছিল, হরলাল তাহাকে আর কিছুমাত্র স্বীকার করিল না— মুক্তি অনন্ত আকাশ পূর্ণ করিয়া আছে, শান্তির কোথাও সীমা নাই। এই অতি সামান্য হরলালকে বেদনার মধ্যে, অপমানের মধ্যে, অন্যায়ের মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিতে পারে এমন শক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনো রাজা-মহারাজারও নাই। যে আতঙ্কে সে আপনাকে আপনি বাঁধিয়াছিল তাহা সমস্তই খুলিয়া গেল। তখন হরলাল আপনার বন্ধনমুক্ত হৃদয়ের চারি দিকে অনন্ত আকাশের মধ্যে অনুভব করিতে লাগিল, যেন তাহার সেই দরিদ্র মা দেখিতে দেখিতে বাড়িতে বাড়িতে বিরাটরূপে সমস্ত অন্ধকার জুড়িয়া বসিতেছেন। তাঁহাকে কোথাও ধরিতেছে না। কলিকাতার রাস্তাঘাট বাড়িঘর দোকানবাজার একটু একটু করিয়া তাঁহার মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে— বাতাস ভরিয়া গেল, আকাশ ভরিয়া উঠিল, একটি একটি করিয়া নক্ষত্র তাঁহার মধ্যে মিলাইয়া গেল— হরলালের শরীরমনের সমস্ত বেদনা, সমস্ত ভাবনা, সমস্ত চেতনা তাঁহার মধ্যে অল্প অল্প করিয়া নিঃশেষ হইয়া গেল— ওই গেল, তপ্ত বাষ্পের বুদ্‌বুদ একেবারে ফাটিয়া গেল— এখন আর অন্ধকারও নাই, আলোকও নাই, রহিল কেবল একটি প্রগাঢ় পরিপূর্ণতা।

গির্জার ঘড়িতে একটা বাজিল। গাড়োয়ান অন্ধকার ময়দানের মধ্যে গাড়ি লইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে বিরক্ত হইয়া কহিল, “বাবু, ঘোড়া তো আর চলিতে পারে না— কোথায় যাইতে হইবে বলো।”

কোনো উত্তর পাইল না। কোচবাক্স হইতে নামিয়া হরলালকে নাড়া দিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল। উত্তর নাই। তখন ভয় পাইয়া গাড়োয়ান পরীক্ষা করিয়া দেখিল হরলালের শরীর আড়ষ্ট, তাহার নিশ্বাস বহিতেছে না।

‘কোথায় যাইতে হইবে’ হরলালের কাছ হইতে এই প্রশ্নের আর উত্তর পাওয়া গেল না।

আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩১৪

গুপ্তধন

১

অমাবস্যার নিশীথ রাত্রি। মৃত্যুঞ্জয় তান্ত্রিক মতে তাহাদের বহুকালের গৃহদেবতা জয়কালীর পূজায় বসিয়াছে। পূজা সমাধা করিয়া যখন উঠিল তখন নিকটস্থ আমবাগান হইতে প্রত্যুষের প্রথম কাক ডাকিল।

মৃত্যুঞ্জয় পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে। তখন সে একবার দেবীর চরণতলে মস্তক ঠেকাইয়া তাঁহার আসন সরাইয়া দিল। সেই আসনের নীচে হইতে একটি কাঁঠালকাঠের বাক্স বাহির হইল। পৈতায় চাবি বাঁধা ছিল। সেই চাবি লাগাইয়া মৃত্যুঞ্জয় বাক্সটি খুলিল। খুলিবামাত্রই চমকিয়া উঠিয়া মাথায় করাঘাত করিল।

মৃত্যুঞ্জয়ের অন্দরের বাগান প্রাচীর দিয়া ঘেরা। সেই বাগানের এক প্রান্তে বড়ো বড়ো গাছের ছায়ায় অন্ধকারে এই ছোটো মন্দিরটি। মন্দিরে জয়কালীর মূর্তি ছাড়া আর-কিছুই নাই; তাহার প্রবেশদ্বার একটিমাত্র। মৃত্যুঞ্জয় বাক্সটি লইয়া অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করিয়া দেখিল। মৃত্যুঞ্জয় বাক্সটি খুলিবার পূর্বে তাহা বন্ধই ছিল— কেহ তাহা ভাঙে নাই। মৃত্যুঞ্জয় দশবার করিয়া প্রতিমার চারি দিকে ঘুরিয়া হাতড়াইয়া দেখিল— কিছুই পাইল না। পাগলের মতো হইয়া মন্দিরের দ্বার খুলিয়া ফেলিল— তখন ভোরের আলো ফুটিতেছে। মন্দিরের চারি দিকে মৃত্যুঞ্জয় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বৃথা আশ্বাসে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সকালবেলাকার আলোক যখন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল তখন সে বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি অনিদ্রার পর ক্লান্তশরীরে একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, এমন সময়ে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া শুনিল, "জয় হোক, বাবা।"

সম্মুখে প্রাঙ্গণে এক জটাজূটধারী সন্ন্যাসী। মৃত্যুঞ্জয় ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, "বাবা, তুমি মনের মধ্যে বৃথা শোক করিতেছ।"

শুনিয়া মৃত্যুঞ্জয় আশ্চর্য হইয়া উঠিল— কহিল, "আপনি অন্তর্যামী, নহিলে আমার শোক কেমন করিয়া বুঝিলেন। আমি তো কাহাকেও কিছু বলি নাই।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "বৎস, আমি বলিতেছি, তোমার যাহা হারাইয়াছে সেজন্য তুমি আনন্দ করো, শোক করিয়ো না।"

মৃত্যুঞ্জয় তাঁহার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "আপনি তবে তো সমস্তই জানিয়াছেন— কেমন করিয়া হারাইয়াছে, কোথায় গেলে ফিরিয়া পাইব, তাহা না বলিলে আমি আপনার চরণ ছাড়িব না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আমি যদি তোমার অমঙ্গল কামনা করিতাম তবে বলিতাম। কিন্তু ভগবতী দয়া করিয়া যাহা হরণ করিয়াছেন সেজন্য শোক করিয়ো না।"

মৃত্যুঞ্জয় সন্ন্যাসীকে প্রসন্ন করিবার জন্য সমস্তদিন বিবিধ উপচারে তাঁহার সেবা করিল। পরদিন প্রত্যুষে নিজের গোহাল হইতে লোটা ভরিয়া সফেন দুগ্ধ দুহিয়া লইয়া আসিয়া দেখিল, সন্ন্যাসী নাই।

২

মৃত্যুঞ্জয় যখন শিশু ছিল, যখন তাহার পিতামহ হরিহর একদিন এই চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া তামাক খাইতেছিল, তখন এমনি করিয়াই একটি সন্ন্যাসী 'জয় হোক, বাবা' বলিয়া এই প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। হরিহর সেই সন্ন্যাসীকে কয়েকদিন বাড়িতে রাখিয়া বিধিমত সেবার দ্বারা সন্তুষ্ট করিল।

বিদায়কালে সন্ন্যাসী যখন জিজ্ঞাসা করিলেন "বৎস, তুমি কী চাও," হরিহর কহিল, "বাবা যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে আমার অবস্থাটা একবার শুনুন। এককালে এই গ্রামে আমরা সকলের চেয়ে বর্ধিষ্ণু ছিলাম। আমার প্রপিতামহ দূর হইতে কুলীন আনাইয়া তাঁহার এক কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার সেই দৌহিত্রবংশ আমাদিগকেই ফাঁকি দিয়া আজকাল এই গ্রামে বড়োলোক হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের এখন অবস্থা ভালো নয়, কাজেই ইহাদের অহংকার সহ্য করিয়া থাকি। কিন্তু আর সহ্য হয় না। কী করিলে আবার আমাদের বংশ বড়ো হইয়া উঠিবে সেই উপায় বলিয়া দিন, সেই আশীর্বাদ করুন।"

সন্ন্যাসী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "বাবা, ছোটো হইয়া সুখে থাকো। বড়ো হইবার চেষ্টায় শ্রেয় দেখি না।"

কিন্তু হরিহর তবু ছাড়িল না, বংশকে বড়ো করিবার জন্য সে সমস্ত স্বীকার করিতে রাজি আছে।

তখন সন্ন্যাসী তাঁহার ঝুলি হইতে কাপড়ে মোড়া একটি তুলট কাগজের লিখন বাহির করিলেন। কাগজখানি দীর্ঘ, কোষ্ঠীপত্রের মতো গুটানো। সন্ন্যাসী সেটি

মেজের উপরে খুলিয়া ধরিলেন। হরিহর দেখিল, তাহাতে নানাপ্রকার চক্রে নানা সাংকেতিক চিহ্ন আঁকা; আর সকলের নিম্নে একটি প্রকাণ্ড ছড়া লেখা আছে, তাহার আরম্ভটা এইরূপ :

পায়ে ধরে সাধা।
রা নাহি দেয় রাধা ॥
শেষে দিল রা,
পাগোল ছাড়ো পা ॥
তেঁতুল-বটের কোলে
দক্ষিণে যাও চলে ॥
ঈশানকোণে ঈশানী,
কহে দিলাম নিশানী। ইত্যাদি।

হরিহর কহিল, "বাবা, কিছুই তো বুঝিলাম না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "কাছে রাখিয়া দাও, দেবীর পূজা করো। তাঁহার প্রসাদে তোমার বংশে কেহ-না-কেহ এই লিখন বুঝিতে পারিবে। তখন সে এমন ঐশ্বর্য পাইবে জগতে যাহার তুলনা নাই।"

হরিহর মিনতি করিয়া কহিল, "বাবা কি বুঝাইয়া দিবেন না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "না। সাধনা দ্বারা বুঝিতে হইবে।"

এমন সময় হরিহরের ছোটো ভাই শংকর আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া হরিহর তাড়াতাড়ি লিখনটি লুকাইবার চেষ্টা করিল। সন্ন্যাসী হাসিয়া কহিলেন, "বড়ো হইবার পথের দুঃখ এখন হইতেই শুরু হইল। কিন্তু গোপন করিবার দরকার নাই। কারণ, ইহার রহস্য কেবল একজনমাত্রই ভেদ করিতে পারিবে, হাজার চেষ্টা করিলেও আর-কেহ তাহা পারিবে না। তোমাদের মধ্যে সেই লোকটি যে কে তাহা কেহ জানে না। অতএব ইহা সকলের সম্মুখেই নির্ভয়ে খুলিয়া রাখিতে পারো।"

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। কিন্তু হরিহর এ কাগজটি লুকাইয়া না রাখিয়া থাকিতে পারিল না। পাছে আর কেহ ইহা হইতে লাভবান হয়, পাছে তাহার ছোটো ভাই শংকর ইহার ফলভোগ করিতে পারে, এই আশঙ্কায় হরিহর এই কাগজটি একটি কাঁঠালকাঠের বাক্সে বন্ধ করিয়া তাহাদের গৃহদেবতা জয়কালীর আসনতলে লুকাইয়া রাখিল। প্রত্যেক অমাবস্যায় নিশীথরাত্রে দেবীর পূজা সারিয়া সে একবার করিয়া সেই কাগজটি খুলিয়া দেখিত, যদি দেবী প্রসন্ন হইয়া তাহাকে অর্থ বুঝিবার শক্তি দেন।

শংকর কিছুদিন হইতে হরিহরকে মিনতি করিতে লাগিল, "দাদা, আমাকে সেই কাগজটা একবার ভালো করিয়া দেখিতে দাও-না।"

হরিহর কহিল, "দূর পাগল। সে কাগজ কি আছে। বেটা ভণ্ডসন্ন্যাসী কাগজে কতকগুলা হিজিবিজি কাটিয়া আমাকে ফাঁকি দিয়া গেল— আমি সে পুড়াইয়া ফেলিয়াছি।"

শংকর চুপ করিয়া রহিল। হঠাৎ একদিন শংকরকে ঘরে দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার পর হইতে সে নিরুদ্দেশ।

হরিহরের অন্য সমস্ত কাজকর্ম নষ্ট হইল— গুপ্ত ঐশ্বর্যের ধ্যান এক মুহূর্ত সে ছাড়িতে পারিল না।

মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে সে তাহার বড়ো ছেলে শ্যামাপদকে এই সন্ন্যাসীদত্ত কাগজখানি দিয়া গেল।

এই কাগজ পাইয়া শ্যামাপদ চাকরি ছাড়িয়া দিল। জয়কালীর পূজায় আর একান্তমনে এই লিখনপাঠের চর্চায় তাহার জীবনটা যে কোন্ দিক দিয়া কাটিয়া গেল তাহা বুঝিতে পারিল না।

মৃত্যুঞ্জয় শ্যামাপদর বড়ো ছেলে। পিতার মৃত্যুর পরে সে এই সন্ন্যাসীদত্ত গুপ্তলিখনের অধিকারী হইয়াছে। তাহার অবস্থা উত্তরোত্তর যতই হীন হইয়া আসিতে লাগিল, ততই অধিকতর আগ্রহের সহিত ওই কাগজখানির প্রতি তাহার সমস্ত চিত্ত নিবিষ্ট হইল। এমন সময় গত অমাবস্যারাত্রে পূজার পর লিখনখানি আর দেখিতে পাইল না— সন্ন্যাসীও কোথায় অন্তর্ধান করিল।

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, এই সন্ন্যাসীকে ছাড়া হইবে না। সমস্ত সন্ধান ইহার কাছ হইতেই মিলিবে।

এই বলিয়া সে ঘর ছাড়িয়া সন্ন্যাসীকে খুঁজিতে বাহির হইল। এক বৎসর পথে পথে কাটিয়া গেল।

৩

গ্রামের নাম ধারাগোল। সেখানে মৃত্যুঞ্জয় মুদির দোকানে বসিয়া তামাক খাইতেছিল, আর অন্যমনস্ক হইয়া নানা কথা ভাবিতেছিল। কিছু দূরে মাঠের ধার দিয়া একজন সন্ন্যাসী চলিয়া গেল। প্রথমটা মৃত্যুঞ্জয়ের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল না। একটু পরে হঠাৎ তাহার মনে হইল, যে লোকটা চলিয়া গেল এই তো সেই সন্ন্যাসী।

তাড়াতাড়ি হুঁকাটি রাখিয়া মুদিকে সচকিত করিয়া একদৌড়ে সে দোকান হইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু সে সন্ন্যাসীকে দেখা গেল না।

তখন সন্ধ্যা অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। অপরিচিত স্থানে কোথায় যে সন্ন্যাসীর সন্ধান করিতে যাইবে তাহা সে ঠিক করিতে পারিল না। দোকানে ফিরিয়া আসিয়া মুদিকে জিজ্ঞাসা করিল, "ওই-যে মস্ত বন দেখা যাইতেছে, ওখানে কী আছে।"

মুদি কহিল, "এককালে ওই বন শহর ছিল কিন্তু অগস্ত্য মুনির শাপে ওখানকার রাজা প্রজা সমস্তই মড়কে মরিয়াছে। লোকে বলে ওখানে অনেক ধনরত্ন আজও খুঁজিলে পাওয়া যায়; কিন্তু দিনদুপুরেও ওই বনে সাহস করিয়া কেহ যাইতে পারে না। যে গেছে সে আর ফেরে নাই।"

মৃত্যুঞ্জয়ের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি মুদির দোকানে মাদুরের উপর পড়িয়া মশার জ্বালায় সর্বাঙ্গ চাপড়াইতে লাগিল, আর ওই বনের কথা, সন্ন্যাসীর কথা, সেই হারানো লিখনের কথা ভাবিতে থাকিল। বার বার পড়িয়া সেই লিখনটি মৃত্যুঞ্জয়ের প্রায় কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল, তাই এই অনিদ্রাবস্থায় কেবলই তাহার মাথায় ঘুরিতে লাগিল—

পায়ে ধরে সাধা।
রা নাহি দেয় রাধা ॥
শেষে দিল রা,
পাগোল ছাড়ো পা ॥

মাথা গরম হইয়া উঠিল— কোনোমতেই এই কটা ছত্র সে মন হইতে দূর করিতে পারিল না। অবশেষে ভোরের বেলায় যখন তাহার তন্দ্রা আসিল তখন স্বপ্নে এই চারি ছত্রের অর্থ অতি সহজে তাহার নিকট প্রকাশ হইল। 'রা নাহি দেয় রাধা' অতএব 'রাধা'র 'রা' না থাকিলে 'ধা' রহিল— 'শেষে দিল রা', অতএব হইল 'ধারা'— 'পাগোল ছাড়ো পা'— 'পাগোল'-এর 'পা' ছাড়িলে 'গোল' বাকি রহিল— অতএব সমস্তটা মিলিয়া হইল 'ধারাগোল'— এ জায়গাটার নাম তো 'ধারাগোল'ই বটে।

স্বপ্ন ভাঙিয়া মৃত্যুঞ্জয় লাফাইয়া উঠিল।

৪

সমস্ত দিন বনের মধ্যে ফিরিয়া সন্ধ্যাবেলায় বহুকষ্টে পথ খুঁজিয়া অনাহারে মৃতপ্রায় অবস্থায় মৃত্যুঞ্জয় গ্রামে ফিরিল।

পরদিন চাদরে চিঁড়া বাঁধিয়া পুনর্বার সে বনের মধ্যে যাত্রা করিল। অপরাহ্নে

একটা দিঘির ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল। দিঘির মাঝখানটা পরিষ্কার জল আর পাড়ের গায়ে গায়ে চারি দিকে পথ আর কুমুদের বন। পাথরে বাঁধানো ঘাট ভাঙিয়া-চুরিয়া পড়িয়াছে, সেইখানে জলে চিঁড়া ভিজাইয়া খাইয়া দিঘির চারি দিক প্রদক্ষিণ করিয়া দেখিতে লাগিল।

দিঘির পশ্চিমপাড়ির প্রান্তে হঠাৎ মৃত্যুঞ্জয় থমকিয়া দাঁড়াইল। দেখিল একটা তেঁতুলগাছকে বেষ্টন করিয়া প্রকাণ্ড বটগাছ উঠিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাহার মনে পড়িল—

তেঁতুল-বটের কোলে,
দক্ষিণে যাও চলে॥

দক্ষিণে কিছুদূর যাইতেই ঘন জঙ্গলের মধ্যে আসিয়া পড়িল। সেখানে সে বেতঝাড় ভেদ করিয়া চলা একেবারে অসাধ্য। যাহা হউক, মৃত্যুঞ্জয় ঠিক করিল, এই গাছটাকে কোনোমতে হারাইলে চলিবে না।

এই গাছের কাছে ফিরিয়া আসিবার সময় গাছের অন্তরাল দিয়া অনতিদূরে একটা মন্দিরের চূড়া দেখা গেল। সেই দিকের প্রতি লক্ষ করিয়া মৃত্যুঞ্জয় এক ভাঙা মন্দিরের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, নিকটে একটা চুলি, পোড়া কাঠ আর ছাই পড়িয়া আছে। অতি সাবধানে মৃত্যুঞ্জয় ভগ্নদ্বার মন্দিরের মধ্যে উঁকি মারিল। সেখানে কোনো লোক নাই, প্রতিমা নাই, কেবল একটি কম্বল, কমণ্ডলু আর গেরুয়া উত্তরীয় পড়িয়া আছে।

তখন সন্ধ্যা আসন্ন হইয়া আসিয়াছে; গ্রাম বহুদূরে, অন্ধকারে বনের মধ্যে পথ সন্ধান করিয়া যাইতে পারিবে কি না, তাই এই মন্দিরে মনুষ্যবসতির লক্ষণ দেখিয়া মৃত্যুঞ্জয় খুশি হইল। মন্দির হইতে একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ভাঙিয়া দ্বারের কাছে পড়িয়া ছিল; সেই পাথরের উপরে বসিয়া নতশিরে ভাবিতে ভাবিতে মৃত্যুঞ্জয় হঠাৎ পাথরের গায়ে কী যেন লেখা দেখিতে পাইল। ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিল একটি চক্র আঁকা, তাহার মধ্যে কতক স্পষ্ট কতক লুপ্তপ্রায় ভাবে নিম্নলিখিত সাংকেতিক অক্ষর লেখা আছে—

এই চক্রটি মৃত্যুঞ্জয়ের সুপরিচিত। কত অমাবস্যা-রাত্রে পূজাগৃহে সুগন্ধ ধূপের ধূমে ঘৃতদীপালোকে তুলট কাগজে অঙ্কিত এই চক্রচিহ্নের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া রহস্যভেদ করিবার জন্য একাগ্রমনে সে দেবীর প্রসাদ যাচ্‌ঞা করিয়াছে। আজ অভীষ্টসিদ্ধির অত্যন্ত সন্নিকটে আসিয়া তাহার সর্বাঙ্গ যেন কাঁপিতে লাগিল। পাছে তীরে আসিয়া তরী ডোবে, পাছে সামান্য একটা ভুলে তাহার সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়, পাছে সেই সন্ন্যাসী পূর্বে আসিয়া সমস্ত উদ্ধার করিয়া লইয়া গিয়া থাকে, এই আশঙ্কায় তাহার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। এখন যে তাহার কী কর্তব্য তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। তাহার মনে হইল, সে হয়তো তাহার ঐশ্বর্যভাণ্ডারের ঠিক উপরেই বসিয়া আছে, অথচ কিছুই জানিতে পাইতেছে না।

বসিয়া বসিয়া সে কালীনাম জপ করিতে লাগিল; সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় হইয়া আসিল; ঝিল্লির ধ্বনিতে বনভূমি মুখর হইয়া উঠিল।

৫

এমন সময় কিছুদূরে ঘন বনের মধ্যে অগ্নির দীপ্তি দেখা গেল। মৃত্যুঞ্জয় তাহার প্রস্তরাসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল আর সেই শিখা লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল।

বহুকষ্টে কিছুদূর গিয়া একটা অশথগাছের গুঁড়ির অন্তরাল হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, তাহার সেই পরিচিত সন্ন্যাসী অগ্নির আলোকে সেই তুলটের লিখন মেলিয়া একটা কাঠি দিয়া ছাইয়ের উপরে একমনে অঙ্ক কষিতেছে।

মৃত্যুঞ্জয়ের ঘরের সেই পৈতৃক তুলটের লিখন! আরে ভণ্ড, চোর! এইজন্যই সে মৃত্যুঞ্জয়কে শোক করিতে নিষেধ করিয়াছিল বটে!

সন্ন্যাসী একবার করিয়া অঙ্ক কষিতেছে আর একটা মাপকাঠি লইয়া জমি মাপিতেছে— কিয়দ্দূর মাপিয়া হতাশ হইয়া ঘাড় নাড়িয়া পুনর্বার আসিয়া অঙ্ক কষিতে প্রবৃত্ত হইতেছে।

এমনি করিয়া রাত্রি যখন অবসানপ্রায়, যখন নিশান্তের শীতবায়ুতে বনস্পতির অগ্রশাখার পল্লবগুলি মর্মরিত হইয়া উঠিল, তখন সন্ন্যাসী সেই লিখনপত্র গুটাইয়া লইয়া চলিয়া গেল।

মৃত্যুঞ্জয় কী করিবে ভাবিয়া পাইল না। ইহা সে নিশ্চয় বুঝিতে পারিল যে, সন্ন্যাসীর সাহায্য ব্যতীত এই লিখনের রহস্য ভেদ করা তাহার সাধ্য হইবে না। লুব্ধ সন্ন্যাসী যে মৃত্যুঞ্জয়কে সাহায্য করিবে না তাহাও নিশ্চিত। অতএব গোপনে সন্ন্যাসীর

প্রতি দৃষ্টি রাখা ছাড়া অন্য উপায় নাই। কিন্তু দিনের বেলায় গ্রামে না গেলে তাহার আহার মিলিবে না; অতএব অন্তত কাল সকালে একবার গ্রামে যাওয়া আবশ্যক।

ভোরের দিকে অন্ধকার একটু ফিকা হইবামাত্র সে গাছ হইতে নামিয়া পড়িল। যেখানে সন্ন্যাসী ছাইয়ের মধ্যে আঁক কষিতেছিল সেখানে ভালো করিয়া দেখিল, কিছুই বুঝিল না। চতুর্দিকে ঘুরিয়া দেখিল, অন্য বনখণ্ডের সঙ্গে কোনো প্রভেদ নাই।

বনতলের অন্ধকার ক্রমে যখন ক্ষীণ হইয়া আসিল তখন মৃত্যুঞ্জয় অতি সাবধানে চারি দিক দেখিতে দেখিতে গ্রামের উদ্দেশে চলিল। তাহার ভয় ছিল পাছে সন্ন্যাসী তাহাকে দেখিতে পায়।

যে দোকানে মৃত্যুঞ্জয় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল তাহার নিকটে একটি কায়স্থগৃহিণী ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া সেদিন ব্রাহ্মণভোজন করাইতে প্রবৃত্ত ছিল। সেইখানে আজ মৃত্যুঞ্জয়ের আহার জুটিয়া গেল। কয়দিন আহারের কষ্টের পর আজ তাহার ভোজনটি গুরুতর হইয়া উঠিল। সেই গুরুভোজনের পর যেমন তামাকটি খাইয়া দোকানের মাদুরটিতে একবার গড়াইয়া লইবার ইচ্ছা করিল, অমনি গত রাত্রির অনিদ্রাকাতর মৃত্যুঞ্জয় ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

মৃত্যুঞ্জয় স্থির করিয়াছিল, আজ সকাল-সকাল আহারাদি করিয়া যথেষ্ট বেলা থাকিতে বাহির হইবে। ঠিক তাহার উলটা হইল। যখন তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন সূর্য অস্ত গিয়াছে। তবু মৃত্যুঞ্জয় দমিল না। অন্ধকারেই বনের মধ্যে সে প্রবেশ করিল।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি ঘনীভূত হইয়া আসিল। গাছের ছায়ার মধ্যে দৃষ্টি আর চলে না, জঙ্গলের মধ্যে পথ অবরুদ্ধ হইয়া যায়। মৃত্যুঞ্জয় যে কোন্ দিকে কোথায় যাইতেছে তাহা কিছুই ঠাহর পাইল না। রাত্রি যখন অবসান হইল তখন দেখিল, সমস্ত রাত্রি সে বনের প্রান্তে একই জায়গায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে।

কাকের দল কা কা শব্দে গ্রামের দিকে উড়িল। এই শব্দ মৃত্যুঞ্জয়ের কানে ব্যঙ্গপূর্ণ ধিক্কারবাক্যের মতো শুনাইল।

৬

গণনায় বারম্বার ভুল আর সেই ভুল সংশোধন করিতে করিতে অবশেষে সন্ন্যাসী সুরঙ্গের পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। সুরঙ্গের মধ্যে মশাল লইয়া তিনি প্রবেশ করিলেন। বাঁধানো ভিত্তির গায়ে শ্যাঁতলা পড়িয়াছে— মাঝে মাঝে এক-এক জায়গায় জল চুঁইয়া পড়িতেছে। স্থানে স্থানে কতকগুলা ভেক গায়ে গায়ে স্তূপাকার

হইয়া নিদ্রা দিতেছে। এই পিছল পথ দিয়া কিছুদূর যাইতেই সন্ন্যাসী দেখিলেন, সম্মুখে দেয়াল উঠিয়াছে, পথ অবরুদ্ধ। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। দেয়ালের সর্বত্র লৌহদণ্ড দিয়া সবলে আঘাত করিয়া দেখিলেন, কোথাও ফাঁকা আওয়াজ দিতেছে না, কোথাও রন্ধ্র নাই, এই পথটার যে এইখানেই শেষ তাহা নিঃসন্দেহ।

আবার সেই কাগজ খুলিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। সে রাত্রি এমনি করিয়া কাটিয়া গেল।

পরদিন পুনর্বার গণনা সারিয়া সুরঙ্গে প্রবেশ করিলেন। সেদিন গুপ্তসংকেত অনুসরণপূর্বক একটি বিশেষ স্থান হইতে পাথর খসাইয়া এক শাখাপথ আবিষ্কার করিলেন। সেই পথে চলিতে চলিতে আবার এক জায়গায় পথ অবরুদ্ধ হইয়া গেল।

অবশেষে পঞ্চম রাত্রে সুরঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সন্ন্যাসী বলিয়া উঠিলেন, "আজ আমি পথ পাইয়াছি, আজ আর আমার কোনোমতেই ভুল হইবে না।"

পথ অত্যন্ত জটিল; তাহার শাখাপ্রশাখার অন্ত নাই— কোথাও এত সংকীর্ণ যে গুঁড়ি মারিয়া যাইতে হয়। বহু যত্নে মশাল ধরিয়া চলিতে চলিতে সন্ন্যাসী একটা গোলাকার ঘরের মতো জায়গায় আসিয়া পৌঁছিলেন। সেই ঘরের মাঝখানে একটা বৃহৎ ইঁদারা। মশালের আলোকে সন্ন্যাসী তাহার তল দেখিতে পাইলেন না। ঘরের ছাদ হইতে একটা মোটা প্রকাণ্ড লৌহশৃঙ্খল ইঁদারার মধ্যে নামিয়া গেছে। সন্ন্যাসী প্রাণপণ বলে ঠেলিয়া এই শৃঙ্খলটাকে অল্প একটুখানি নাড়াইবামাত্র ঠং করিয়া একটা শব্দ ইঁদারার গহ্বর হইতে উত্থিত হইয়া ঘরময় প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সন্ন্যাসী উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "পাইয়াছি।"

যেমন বলা অমনি সেই ঘরের ভাঙা ভিত্তি হইতে একটা পাথর গড়াইয়া পড়িল আর সেইসঙ্গে আর-একটি কী সচেতন পদার্থ ধপ্‌ করিয়া পড়িয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। সন্ন্যাসী এই অকস্মাৎ শব্দে চমকিয়া উঠিতেই তাঁহার হাত হইতে মশাল পড়িয়া নিবিয়া গেল।

৭

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে।" কোনো উত্তর পাইলেন না। তখন অন্ধকারে হাতড়াইতে গিয়া তাঁহার হাতে একটি মানুষের দেহ ঠেকিল। তাহাকে নাড়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি।"

কোনো উত্তর পাইলেন না। লোকটা অচেতন হইয়া গেছে।

তখন চকমকি ঠুকিয়া ঠুকিয়া সন্ন্যাসী অনেক কষ্টে মশাল ধরাইলেন। ইতিমধ্যে

সেই লোকটাও সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইল, আর উঠিবার চেষ্টা করিয়া বেদনায় আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

সন্ন্যাসী কহিলেন, "এ কী, মৃত্যুঞ্জয় যে! তোমার এ মতি হইল কেন।"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "বাবা, মাপ করো। ভগবান আমাকে শাস্তি দিয়াছেন। তোমাকে পাথর ছুঁড়িয়া মারিতে গিয়া সামলাতেই পারি নাই— পিছলে পাথরসুদ্ধ আমি পড়িয়া গেছি। পা-টা নিশ্চয় ভাঙিয়া গেছে।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আমাকে মারিয়া তোমার কী লাভ হইত।"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "লাভের কথা তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ! তুমি কিসের লোভে আমার পূজাঘর হইতে লিখনখানি চুরি করিয়া এই সুরঙ্গের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ। তুমি চোর, তুমি ভণ্ড! আমার পিতামহকে যে সন্ন্যাসী ওই লিখনখানি দিয়াছিলেন তিনি বলিয়াছিলেন, আমাদেরই বংশের কেহ এই লিখনের সংকেত বুঝিতে পারিবে। এই গুপ্ত ঐশ্বর্য আমাদেরই বংশের প্রাপ্য। তাই আমি এ কয়দিন না খাইয়া না ঘুমাইয়া ছায়ার মতো তোমার পশ্চাতে ফিরিয়াছি। আজ যখন তুমি বলিয়া উঠিলে 'পাইয়াছি' তখন আমি আর থাকিতে পারিলাম না। আমি তোমার পশ্চাতে আসিয়া ওই গর্তটার ভিতরে লুকাইয়া বসিয়া ছিলাম। ওখান হইতে একটা পাথর খসাইয়া তোমাকে মারিতে গেলাম, কিন্তু শরীর দুর্বল, জায়গাটাও অত্যন্ত পিছল— তাই পড়িয়া গেছি। এখন তুমি আমাকে মারিয়া ফেলো সেও ভালো— আমি যক্ষ হইয়া এই ধন আগলাইব— কিন্তু তুমি ইহা লইতে পারিবে না, কোনোমতেই না। যদি লইতে চেষ্টা কর, আমি ব্রাহ্মণ, তোমাকে অভিশাপ দিয়া এই কূপের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিব। এ ধন তোমার ব্রহ্মরক্ত গোরক্ততুল্য হইবে— এ ধন তুমি কোনোদিন সুখে ভোগ করিতে পারিবে না। আমাদের পিতা পিতামহ এই ধনের উপরে সমস্ত মন রাখিয়া মরিয়াছেন— এই ধনের ধ্যান করিতে করিতে আমরা দরিদ্র হইয়াছি— এই ধনের সন্ধানে আমি বাড়িতে অনাথা স্ত্রী ও শিশুসন্তান ফেলিয়া আহারনিদ্রা ছাড়িয়া লক্ষ্মীছাড়া পাগলের মতো মাঠে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি —এ ধন তুমি আমার চোখের সম্মুখে কখনো লইতে পারিবে না।"

৮

সন্ন্যাসী কহিলেন, "মৃত্যুঞ্জয়, তবে শোনো। সমস্ত কথা তোমাকে বলি।

"তুমি জান, তোমার পিতামহের এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিল, তাহার নাম ছিল শংকর।"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "হাঁ, তিনি নিরুদ্দেশ হইয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আমি সেই শংকর।"

মৃত্যুঞ্জয় হতাশ হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। এতক্ষণ এই গুপ্তধনের উপর তাহার যে একমাত্র দাবি সে সাব্যস্ত করিয়া বসিয়াছিল, তাহারই বংশের আত্মীয় আসিয়া সে দাবি নষ্ট করিয়া দিল।

শংকর কহিলেন, "দাদা সন্ন্যাসীর নিকট হইতে লিখন পাইয়া অবধি আমার কাছে তাহা বিধিমতে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি যতই গোপন করিতে লাগিলেন, আমার ঔৎসুক্য ততই বাড়িয়া উঠিল। তিনি দেবীর আসনের নীচে বাক্সের মধ্যে ওই লিখনখানি লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, আমি তাহার সন্ধান পাইলাম, আর দ্বিতীয় চাবি বানাইয়া প্রতিদিন অল্প অল্প করিয়া সমস্ত কাগজখানা নকল করিতে লাগিলাম। যেদিন নকল শেষ হইল সেইদিনই আমি এই ধনের সন্ধানে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইলাম। আমারও ঘরে অনাথা স্ত্রী এবং একটি শিশুসন্তান ছিল। আজ তাহারা কেহ বাঁচিয়া নাই।

"কত দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়াছি তাহা বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নাই। সন্ন্যাসীদত্ত এই লিখন নিশ্চয় কোনো সন্ন্যাসী আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারিবেন এই মনে করিয়া অনেক সন্ন্যাসীর আমি সেবা করিয়াছি। অনেক ভণ্ড সন্ন্যাসী আমার ওই কাগজের সন্ধান পাইয়া তাহা হরণ করিবারও চেষ্টা করিয়াছে। এইরূপে কত বৎসরের পর বৎসর কাটিয়াছে, আমার মনে এক মুহূর্তের জন্যও সুখ ছিল না, শান্তি ছিল না।

"অবশেষে পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যের বলে কুমায়ুন পর্বতে বাবা স্বরূপানন্দ স্বামীর সঙ্গ পাইলাম। তিনি আমাকে কহিলেন, 'বাবা, তৃষ্ণা দূর করো তাহা হইলেই বিশ্বব্যাপী অক্ষয় সম্পদ আপনি তোমাকে ধরা দিবে।'

"তিনি আমার মনের দাহ জুড়াইয়া দিলেন। তাঁহার প্রসাদে আকাশের আলোক আর ধরণীর শ্যামলতা আমার কাছে রাজসম্পদ হইয়া উঠিল। একদিন পর্বতের শিলাতলে শীতের সায়াহ্নে পরমহংস বাবার ধুনিতে আগুন জ্বলিতেছিল— সেই আগুনে আমার কাগজখানা সমর্পণ করিলাম। বাবা ঈষৎ একটু হাসিলেন। সে হাসির অর্থ তখন বুঝি নাই, আজ বুঝিয়াছি। তিনি নিশ্চয় মনে মনে বলিয়াছিলেন, কাগজখানা ছাই করিয়া ফেলা সহজ কিন্তু বাসনা এত সহজে ভস্মসাৎ হয় না।

"কাগজখানার যখন কোনো চিহ্ন রহিল না তখন আমার মনের চারি দিক হইতে একটা নাগপাশ-বন্ধন যেন সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া গেল। মুক্তির অপূর্ব আনন্দে আমার

চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আমি মনে করিলাম এখন হইতে আমার আর-কোনো ভয় নাই— আমি জগতে কিছুই চাহি না।

"ইহার অনতিকাল পরে পরমহংস-বাবার সঙ্গ হইতে চ্যুত হইলাম। তাঁহাকে অনেক খুঁজিলাম, কোথাও তাঁহার দেখা পাইলাম না।

"আমি তখন সন্ন্যাসী হইয়া নিরাসক্তচিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। অনেক বৎসর কাটিয়া গেল— সেই লিখনের কথা প্রায় ভুলিয়াই গেলাম।

"এমন সময় একদিন এই ধারাগোলের বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি ভাঙা মন্দিরের মধ্যে আশ্রয় লইলাম। দুই-একদিন থাকিতে থাকিতে দেখিলাম, মন্দিরের ভিতে স্থানে স্থানে নানাপ্রকার চিহ্ন আঁকা আছে। এই চিহ্নগুলি আমার পূর্ব-পরিচিত।

"এককালে বহুদিন যাহার সন্ধানে ফিরিয়াছিলাম তাহার যে নাগাল পাওয়া যাইতেছে তাহাতে আমার সন্দেহ রহিল না। আমি কহিলাম, 'এখানে আর থাকা হইবে না, এ বন ছাড়িয়া চলিলাম।'

"কিন্তু ছাড়িয়া যাওয়া ঘটিল না। মনে হইল, দেখাই যাক-না, কী আছে। কৌতূহল একেবারে নিবৃত্ত করিয়া যাওয়াই ভালো। চিহ্নগুলা লইয়া অনেক আলোচনা করিলাম; কোনো ফল হইল না। বারবার মনে হইতে লাগিল, কেন সে কাগজখানা পুড়াইয়া ফেলিলাম। সেখানা রাখিলেই বা ক্ষতি কী ছিল।

"তখন আবার আমার সেই জন্মগ্রামে গেলাম। আমাদের পৈতৃক ভিটার নিতান্ত দুরবস্থা দেখিয়া মনে করিলাম, আমি সন্ন্যাসী, আমার ধনরত্নে কোনো প্রয়োজন নাই, কিন্তু এই গরিবরা তো গৃহী, সেই গুপ্ত সম্পদ ইহাদের জন্য উদ্ধার করিয়া দিলে তাহাতে দোষ নাই।

"সেই লিখন কোথায় আছে জানিতাম, তাহা সংগ্রহ করা আমার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হইল না।

"তাহার পরে একটি বৎসর ধরিয়া এই কাগজখানা লইয়া এই নির্জন বনের মধ্যে গণনা করিয়াছি আর সন্ধান করিয়াছি। মনে আর কোনো চিন্তা ছিল না। যত বারম্বার বাধা পাইতে লাগিলাম ততই উত্তরোত্তর আগ্রহ আরো বাড়িয়া চলিল— উন্মত্তের মতো অহোরাত্র এই এক অধ্যবসায়ে নিবিষ্ট রহিলাম।

"ইতিমধ্যে কখন তুমি আমার অনুসরণ করিতেছ তাহা জানিতে পারি নাই। আমি সহজ অবস্থায় থাকিলে তুমি কখনোই নিজেকে আমার কাছে গোপন রাখিতে

পারিতে না ; কিন্তু আমি তন্ময় হইয়া ছিলাম, বাহিরের ঘটনা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিত না।

"তাহার পরে, যাহা খুঁজিতেছিলাম আজ এইমাত্র তাহা আবিষ্কার করিয়াছি। এখানে যাহা আছে পৃথিবীতে কোনো রাজরাজেশ্বরের ভাণ্ডারেও এত ধন নাই। আর একটিমাত্র সংকেত ভেদ করিলেই সেই ধন পাওয়া যাইবে।

"এই সংকেতটিই সর্বাপেক্ষা দুরূহ। কিন্তু এই সংকেতও আমি মনে মনে ভেদ করিয়াছি। সেইজন্যই 'পাইয়াছি' বলিয়া মনের উল্লাসে চিৎকার করিয়া উঠিয়াছিলাম। যদি ইচ্ছা করি তবে আর-এক দণ্ডের মধ্যে সেই স্বর্ণমাণিক্যের ভাণ্ডারের মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইতে পারি।"

মৃত্যুঞ্জয় শংকরের পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "তুমি সন্ন্যাসী, তোমার তো ধনের কোনো প্রয়োজন নাই— আমাকে সেই ভাণ্ডারের মধ্যে লইয়া যাও। আমাকে বঞ্চিত করিয়ো না।"

শংকর কহিলেন, "আজ আমার শেষ বন্ধন মুক্ত হইয়াছে। তুমি ওই-যে পাথর ফেলিয়া আমাকে মারিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলে, তাহার আঘাত আমার শরীরে লাগে নাই, কিন্তু তাহা আমার মোহাবরণকে ভেদ করিয়াছে। তৃষ্ণার করালমূর্তি আজ আমি দেখিলাম। আমার গুরু পরমহংসদেবের নিগূঢ় প্রশান্ত হাস্য এতদিন পরে আমার অন্তরের কল্যাণদীপে অনির্বাণ আলোকশিখা জ্বালাইয়া তুলিল।"

মৃত্যুঞ্জয় শংকরের পা ধরিয়া পুনরায় কাতর স্বরে কহিল, "তুমি মুক্ত পুরুষ, আমি মুক্ত নহি, আমি মুক্তি চাহি না, আমাকে এই ঐশ্বর্য হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "বৎস, তবে তুমি তোমার এই লিখনটি লও। যদি ধন খুঁজিয়া লইতে পার তবে লইয়ো।"

এই বলিয়া তাঁহার যষ্টি ও লিখনপত্র মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে রাখিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "আমাকে দয়া করো, আমাকে ফেলিয়া যাইয়ো না— আমাকে দেখাইয়া দাও।"

কোনো উত্তর পাইল না।

তখন মৃত্যুঞ্জয় যষ্টির উপর ভর করিয়া হাতড়াইয়া সুরঙ্গ হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু পথ অত্যন্ত জটিল, গোলকধাঁধার মতো, বারবার বাধা পাইতে লাগিল। অবশেষে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া এক জায়গায় শুইয়া পড়িল এবং নিদ্রা আসিতে বিলম্ব হইল না।

ঘুম হইতে যখন জাগিল তখন রাত্রি কি দিন কি কত বেলা তাহা জানিবার কোনো উপায় ছিল না। অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইলে মৃত্যুঞ্জয় চাদরের প্রান্ত হইতে চিঁড়া খুলিয়া লইয়া খাইল। তাহার পর আর-একবার হাতড়াইয়া সুরঙ্গ হইতে বাহির হইবার পথ খুঁজিতে লাগিল। নানা স্থানে বাধা পাইয়া বসিয়া পড়িল। তখন চিৎকার করিয়া ডাকিল, "ওগো সন্ন্যাসী, তুমি কোথায়।"

তাহার সেই ডাক সুরঙ্গের সমস্ত শাখাপ্রশাখা হইতে বারম্বার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অনতিদূর হইতে উত্তর আসিল, "আমি তোমার নিকটেই আছি– কী চাও বলো।"

মৃত্যুঞ্জয় কাতরস্বরে কহিল, "কোথায় ধন আছে আমাকে দয়া করিয়া দেখাইয়া দাও।"

তখন আর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। মৃত্যুঞ্জয় বারম্বার ডাকিল, কোনো সাড়া পাইল না।

দণ্ডপ্রহরের দ্বারা অবিভক্ত এই ভূতলগত চিররাত্রির মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় আর-একবার ঘুমাইয়া লইল। ঘুম হইতে আবার সেই অন্ধকারের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। চিৎকার করিয়া ডাকিল, "ওগো, আছ কি।"

নিকট হইতেই উত্তর পাইল, "এইখানেই আছি। কী চাও।"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "আমি আর-কিছু চাই না— আমাকে এই সুরঙ্গ হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও।"

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ধন চাও না?"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "না, চাহি না।"

তখন চকমকি ঠোকার শব্দ উঠিল এবং কিছুক্ষণ পরে আলো জ্বলিল।

সন্ন্যাসী কহিলেন, "তবে এসো মৃত্যুঞ্জয়, এই সুরঙ্গ হইতে বাহিরে যাই।"

মৃত্যুঞ্জয় কাতরস্বরে কহিল, "বাবা, নিতান্তই কি সমস্ত ব্যর্থ হইবে। এত কষ্টের পরেও ধন কি পাইব না।"

তৎক্ষণাৎ মশাল নিবিয়া গেল। মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "কী নিষ্ঠুর।" বলিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল। সময়ের কোনো পরিমাণ নাই, অন্ধকারের কোনো অন্ত নাই। মৃত্যুঞ্জয়ের ইচ্ছা করিতে লাগিল তাহার সমস্ত শরীর-মনের বলে এই অন্ধকারটাকে ভাঙিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলে। আলোক আকাশ আর বিশ্বচ্ছবির বৈচিত্র্যের জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল, কহিল, "ওগো সন্ন্যাসী, ওগো নিষ্ঠুর সন্ন্যাসী, আমি ধন চাই না, আমাকে উদ্ধার করো।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "ধন চাও না? তবে আমার হাত ধরো। আমার সঙ্গে চলো।"

এবারে আর আলো জ্বলিল না। এক হাতে যষ্টি ও এক হাতে সন্ন্যাসীর উত্তরীয় ধরিয়া মৃত্যুঞ্জয় ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। বহুক্ষণ ধরিয়া অনেক আঁকাবাঁকা পথ দিয়া অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া এক জায়গায় আসিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন, "দাঁড়াও।"

মৃত্যুঞ্জয় দাঁড়াইল। তাহার পরে একটা মরিচা-পড়া লোহার দ্বার-খোলার উৎকট শব্দ শোনা গেল। সন্ন্যাসী মৃত্যুঞ্জয়ের হাত ধরিয়া কহিলেন, "এসো।"

মৃত্যুঞ্জয় অগ্রসর হইয়া যেন একটা ঘরে প্রবেশ করিল। তখন আবার চকমকি ঠোকার শব্দ শোনা গেল। কিছুক্ষণ পরে যখন মশাল জ্বলিয়া উঠিল তখন, এ কী আশ্চর্য দৃশ্য! চারি দিকে দেয়ালের গায়ে মোটা মোটা সোনার পাত ভূগর্ভরুদ্ধ কঠিন সূর্যালোকপুঞ্জের মতো স্তরে স্তরে সজ্জিত। মৃত্যুঞ্জয়ের চোখ দুটা জ্বলিতে লাগিল। সে পাগলের মতো বলিয়া উঠিল, "এ সোনা আমার— এ আমি কোনোমতেই ফেলিয়া যাইতে পারিব না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আচ্ছা, ফেলিয়া যাইয়ো না; এই মশাল রহিল— আর এই ছাতু, চিঁড়া আর বড়ো এক ঘটি জল রাখিয়া গেলাম।"

দেখিতে দেখিতে সন্ন্যাসী বাহির হইয়া আসিলেন, আর এই স্বর্ণভাণ্ডারের লৌহদ্বারে কপাট পড়িল।

মৃত্যুঞ্জয় বারবার করিয়া এই স্বর্ণপুঞ্জ স্পর্শ করিয়া ঘরময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ছোটো ছোটো স্বর্ণখণ্ড টানিয়া মেজের উপর ফেলিতে লাগিল, কোলের উপর তুলিতে লাগিল, একটার উপরে আর-একটা আঘাত করিয়া শব্দ করিতে লাগিল, সর্বাঙ্গের উপর বুলাইয়া তাহার স্পর্শ লইতে লাগিল। অবশেষে শ্রান্ত হইয়া সোনার পাত বিছাইয়া তাহার উপর শয়ন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, চারি দিকে সোনা ঝক্‌মক্‌ করিতেছে। সোনা ছাড়া আর-কিছুই নাই। মৃত্যুঞ্জয় ভাবিতে লাগিল, পৃথিবীর উপরে হয়তো এতক্ষণে প্রভাত হইয়াছে, সমস্ত জীবজন্তু আনন্দে জাগিয়া উঠিয়াছে।— তাহাদের বাড়িতে পুকুরের ধারের বাগান হইতে প্রভাতে যে একটি স্নিগ্ধ গন্ধ উঠিত তাহাই কল্পনায় তাহার নাসিকায় যেন প্রবেশ করিতে লাগিল। সে যেন স্পষ্ট চোখে দেখিতে পাইল, পাতিহাঁসগুলি দুলিতে দুলিতে কলরব করিতে করিতে সকালবেলায় পুকুরের জলের মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে, আর বাড়ির ঝি বামা কোমরে কাপড় জড়াইয়া ঊর্ধ্বোত্থিত

দক্ষিণহস্তের উপর একরাশি পিতলকাঁসার থালা বাটি লইয়া ঘাটে আনিয়া উপস্থিত করিতেছে।

মৃত্যুঞ্জয় দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিতে লাগিল, "ওগো সন্ন্যাসীঠাকুর, আছ কি।"

দ্বার খুলিয়া গেল। সন্ন্যাসী কহিলেন, "কী চাও।"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "আমি বাহিরে যাইতে চাই— কিন্তু সঙ্গে এই সোনার দুটো-একটা পাতও কি লইয়া যাইতে পারিব না।"

সন্ন্যাসী তাহার কোনো উত্তর না দিয়া নূতন মশাল জ্বালাইলেন— পূর্ণ কমণ্ডলু একটি রাখিলেন আর উত্তরীয় হইতে কয়েক মুষ্টি চিঁড়া মেজের উপর রাখিয়া বাহির হইয়া গেলেন। দ্বার বন্ধ হইয়া গেল।

মৃত্যুঞ্জয় পাতলা একটা সোনার পাত লইয়া তাহা দোমড়াইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙিয়া ফেলিল। সেই খণ্ড সোনাগুলাকে লইয়া ঘরের চারি দিকে লোষ্ট্রখণ্ডের মতো ছড়াইতে লাগিল। কখনো বা দাঁত দিয়া দংশন করিয়া সোনার পাতের উপর দাগ করিয়া দিল। কখনো বা একটা সোনার পাত মাটিতে ফেলিয়া তাহার উপরে বারম্বার পদাঘাত করিতে লাগিল। মনে মনে বলিতে লাগিল, পৃথিবীতে এমন সম্রাট কয়জন আছে যাহারা সোনা লইয়া এমন করিয়া ফেলাছড়া করিতে পারে। মৃত্যুঞ্জয়ের যেন একটা প্রলয়ের রোখ চাপিয়া গেল। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, এই রাশীকৃত সোনাকে চূর্ণ করিয়া ধূলির মতো সে ঝাঁটা দিয়া ঝাঁট দিয়া উড়াইয়া ফেলে— আর এইরূপে পৃথিবীর সমস্ত স্বর্ণলুব্ধ রাজা-মহারাজকে সে অবজ্ঞা করিতে পারে।

এমনি করিয়া যতক্ষণ পারিল মৃত্যুঞ্জয় সোনাগুলাকে লইয়া টানাটানি করিয়া শ্রান্তদেহে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুম হইতে উঠিয়া সে আবার তাহার চারি দিকে সেই সোনার স্তূপ দেখিতে লাগিল। সে তখন দ্বারে আঘাত করিয়া চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওগো সন্ন্যাসী, আমি এ সোনা চাই না— সোনা চাই না!"

কিন্তু দ্বার খুলিল না। ডাকিতে ডাকিতে মৃত্যুঞ্জয়ের গলা ভাঙিয়া গেল, কিন্তু দ্বার খুলিল না— এক-একটা সোনার পিণ্ড লইয়া দ্বারের উপর ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল, কোনো ফল হইল না। মৃত্যুঞ্জয়ের বুক দমিয়া গেল— তবে আর কি সন্ন্যাসী আসিবে না। এই স্বর্ণকারাগারের মধ্যে তিলে তিলে পলে পলে শুকাইয়া মরিতে হইবে!

তখন সোনাগুলাকে দেখিয়া তাহার আতঙ্ক হইতে লাগিল। বিভীষিকার নিঃশব্দ কঠিন হাস্যের মতো ওই সোনার স্তূপ চারি দিকে স্থির হইয়া রহিয়াছে— তাহার মধ্যে স্পন্দন নাই, পরিবর্তন নাই— মৃত্যুঞ্জয়ের যে হৃদয় এখন কাঁপিতেছে, ব্যাকুল হইতেছে, তাহার সঙ্গে উহাদের কোনো সম্পর্ক নাই, বেদনার কোনো সম্বন্ধ নাই। এই সোনার

পিণ্ডগুলা আলোক চায় না, আকাশ চায় না, বাতাস চায় না, প্রাণ চায় না, মুক্তি চায় না। ইহারা এই চির-অন্ধকারের মধ্যে চিরদিন উজ্জ্বল হইয়া কঠিন হইয়া স্থির হইয়া রহিয়াছে।

পৃথিবীতে এখন কি গোধূলি আসিয়াছে। আহা, সেই গোধূলির স্বর্ণ! যে স্বর্ণ কেবল ক্ষণকালের জন্য চোখ জুড়াইয়া অন্ধকারের প্রান্তে কাঁদিয়া বিদায় লইয়া যায়। তাহার পরে কুটিরের প্রাঙ্গণতলে সন্ধ্যাতারা একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। গোষ্ঠে প্রদীপ জ্বালাইয়া বধূ ঘরের কোণে সন্ধ্যাদীপ স্থাপন করে। মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠে।

গ্রামের ঘরের অতি ক্ষুদ্রতম তুচ্ছতম ব্যাপার আজ মৃত্যুঞ্জয়ের কল্পনাদৃষ্টির কাছে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহাদের সেই-যে ভোলা কুকুরটা লেজে মাথায় এক হইয়া উঠানের প্রান্তে সন্ধ্যার পর ঘুমাইতে থাকিত, সে কল্পনাও তাহাকে যেন ব্যথিত করিতে লাগিল। ধারাগোল গ্রামে কয়দিন সে যে মুদির দোকানে আশ্রয় লইয়াছিল সেই মুদি এতক্ষণ রাত্রে প্রদীপ নিবাইয়া দোকানে ঝাঁপ বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে গ্রামে বাড়িমুখে আহার করিতে চলিয়াছে, এই কথা স্মরণ করিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল, মুদি কী সুখেই আছে। আজ কী বার কে জানে। যদি রবিবার হয় তবে এতক্ষণে হাটের লোক যে যার আপন আপন বাড়ি ফিরিতেছে, সঙ্গচ্যুত সাথিকে উর্ধ্বস্বরে ডাক পাড়িতেছে, দল বাঁধিয়া খেয়ানৌকায় পার হইতেছে; মেঠো রাস্তা ধরিয়া, শস্যক্ষেত্রের আল বাহিয়া, পল্লীর শুষ্কবংশপত্রখচিত অঙ্গনপার্শ্ব দিয়া চাষী লোক হাতে দুটো-একটা মাছ ঝুলাইয়া মাথায় একটা চুপড়ি লইয়া অন্ধকারে আকাশভরা তারার ক্ষীণালোকে গ্রামে গ্রামান্তরে চলিয়াছে।

ধরণীর উপরিতলে এই বিচিত্র বৃহৎ চিরচঞ্চল জীবনযাত্রার মধ্যে তুচ্ছতম দীনতম হইয়া নিজের জীবন মিশাইবার জন্য শতস্তর মৃত্তিকা ভেদ করিয়া তাহার কাছে লোকালয়ের আহ্বান আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। সেই জীবন, সেই আকাশ, সেই আলোক, পৃথিবীর সমস্ত মণিমাণিক্যের চেয়ে তাহার কাছে দুর্মূল্য বোধ হইতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, কেবল ক্ষণকালের জন্য একবার যদি আমার সেই শ্যামাজননী ধরিত্রীর ধূলিক্রোড়ে, সেই উন্মুক্ত আলোকিত নীলাম্বরের তলে, সেই তৃণপত্রের গন্ধবাসিত বাতাস বুক ভরিয়া একটিমাত্র শেষ নিশ্বাসে গ্রহণ করিয়া মরিতে পারি তাহা হইলেও জীবন সার্থক হয়।

এমন সময় দ্বার খুলিয়া গেল। সন্ন্যাসী ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "মৃত্যুঞ্জয়, কী চাও।"

সে বলিয়া উঠিল, "আমি আর কিছুই চাই না— আমি এই সুরঙ্গ হইতে, অন্ধকার হইতে, গোলকধাঁধা হইতে, এই সোনার গারদ হইতে, বাহির হইতে চাই। আমি আলোক চাই, আকাশ চাই, মুক্তি চাই।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "এই সোনার ভাণ্ডারের চেয়ে মূল্যবান রত্নভাণ্ডার এখানে আছে। একবার যাইবে না?"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "না, যাইব না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "একবার দেখিয়া আসিবার কৌতূহলও নাই?"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "না, আমি দেখিতেও চাই না। আমাকে যদি কৌপীন পরিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হয় তবু আমি এখানে এক মুহূর্তও কাটাইতে ইচ্ছা করি না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আচ্ছা, তবে এসো।"

মৃত্যুঞ্জয়ের হাত ধরিয়া সন্ন্যাসী তাহাকে সেই গভীর কূপের সম্মুখে লইয়া গেলেন। তাহার হাতে সেই লিখনপত্র দিয়া কহিলেন, "এখানি লইয়া তুমি কী করিবে।"

মৃত্যুঞ্জয় সে পত্রখানি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিল।

কার্তিক ১৩১৪

রাসমণির ছেলে

১

কালীপদর মা ছিলেন রাসমণি— কিন্তু তাঁহাকে দায়ে পড়িয়া বাপের পদ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কারণ, বাপ মা উভয়েই মা হইয়া উঠিলে ছেলের পক্ষে সুবিধা হয় না। তাঁহার স্বামী ভবানীচরণ ছেলেকে একেবারেই শাসন করিতে পারেন না।

তিনি কেন এত বেশি আদর দেন তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যে উত্তর দিয়া থাকেন তাহা বুঝিতে হইলে পূর্ব ইতিহাস জানা চাই।

ব্যাপারখানা এই— শানিয়াড়ির বিখ্যাত বনিয়াদী ধনীর বংশে ভবানীচরণের জন্ম। ভবানীচরণের পিতা অভয়াচরণের প্রথম পক্ষের পুত্র শ্যামাচরণ। অধিক বয়সে স্ত্রীবিয়োগের পর দ্বিতীয়বার যখন অভয়াচরণ বিবাহ করেন তখন তাঁহার শ্বশুর আলন্দি তালুকটি বিশেষ করিয়া তাঁহার কন্যার নামে লিখাইয়া লইয়াছিলেন।

জামাতার বয়স হিসাব করিয়া তিনি মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে, কন্যার বৈধব্য যদি ঘটে তবে খাওয়া-পরার জন্য যেন সপত্নীপুত্রের অধীন তাহাকে না হইতে হয়।

তিনি যাহা কল্পনা করিয়াছিলেন তাহার প্রথম অংশ ফলিতে বিলম্ব হইল না। তাঁহার দৌহিত্র ভবানীচরণের জন্মের অনতিকাল পরেই তাঁহার জামাতার মৃত্যু হইল। তাঁহার কন্যা নিজের বিশেষ সম্পত্তিটির অধিকার লাভ করিলেন ইহা স্বচক্ষে দেখিয়া তিনিও পরলোকযাত্রার সময় কন্যার ইহলোক সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া গেলেন।

শ্যামাচরণ তখন বয়ঃপ্রাপ্ত। এমন-কি, তাঁহার বড়ো ছেলেটি তখনি ভবানীর চেয়ে এক বছরের বড়ো। শ্যামাচরণ নিজের ছেলেদের সঙ্গে একত্রেই ভবানীকে মানুষ করিতে লাগিলেন। ভবানীচরণের মাতার সম্পত্তি হইতে কখনো তিনি নিজে এক পয়সা লন নাই এবং বৎসরে বৎসরে তাহার পরিষ্কার হিসাবটি তিনি বিমাতার নিকট দাখিল করিয়া তাহার রসিদ লইয়াছেন, ইহা দেখিয়া সকলেই তাঁহার সাধুতায় মুগ্ধ হইয়াছে।

বস্তুত প্রায় সকলেই মনে করিয়াছিল এতটা সাধুতা অনাবশ্যক, এমন-কি, ইহা নির্বুদ্ধিতারই নামান্তর। অখণ্ড পৈতৃক সম্পত্তির একটা অংশ দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর হাতে পড়ে ইহা গ্রামের লোকের কাহারো ভালো লাগে নাই। যদি শ্যামাচরণ ছল করিয়া এই দলিলটি কোনো কৌশলে বাতিল করিয়া দিতেন তবে প্রতিবেশীরা তাঁহার পৌরুষের প্রশংসাই করিত, এবং যে উপায়ে তাহা সুচারুরূপে সাধিত হইতে পারে তাহার পরামর্শদাতা প্রবীণ ব্যক্তিরও অভাব ছিল না। কিন্তু শ্যামাচরণ তাঁহাদের চিরকালীন পারিবারিক স্বত্বকে অঙ্গহীন করিয়াও তাঁহার বিমাতার সম্পত্তিটিকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলেন।

এই কারণে এবং স্বভাবসিদ্ধ স্নেহশীলতাবশত বিমাতা ব্রজসুন্দরী শ্যামাচরণকে আপনার পুত্রের মতোই স্নেহ এবং বিশ্বাস করিতেন। এবং তাঁহার সম্পত্তিটিকে শ্যামাচরণ অত্যন্ত পৃথক করিয়া দেখিতেন বলিয়া তিনি অনেকবার তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন; বলিয়াছেন, 'বাবা, এ তো সমস্তই তোমাদের, এ সম্পত্তি সঙ্গে লইয়া আমি তো স্বর্গে যাইব না, এ তোমাদেরই থাকিবে; আমার এত হিসাবপত্র দেখিবার দরকার কী।' শ্যামাচরণ সে কথায় কর্ণপাত করিতেন না।

শ্যামাচরণ নিজের ছেলেদের কঠোর শাসনে রাখিতেন। কিন্তু ভবানীচরণের 'পরে তাঁহার কোনো শাসনই ছিল না। ইহা দেখিয়া সকলেই একবাক্যে বলিত, নিজের ছেলেদের চেয়ে ভবানীর প্রতিই তাঁহার বেশি স্নেহ। এমনি করিয়া ভবানীর পড়াশুনা কিছুই হইল না। এবং বিষয়বুদ্ধি সম্বন্ধে চিরদিন শিশুর মতো থাকিয়া দাদার

উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া তিনি বয়স কাটাইতে লাগিলেন। বিষয়কর্মে তাঁহাকে কোনোদিন চিন্তা করিতে হইত না— কেবল মাঝে মাঝে এক-একদিন সই করিতে হইত। কেন সই করিতেছেন তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতেন না কারণ চেষ্টা করিলে কৃতকার্য হইতে পারিতেন না।

এ দিকে শ্যামাচরণের বড়ো ছেলে তারাপদ সকল কাজে পিতার সহকারীরূপে থাকিয়া কাজে কর্মে পাকা হইয়া উঠিল। শ্যামাচরণের মৃত্যু হইলে পর তারাপদ ভবানীচরণকে কহিল, "খুড়ামহাশয়, আমাদের আর একত্র থাকা চলিবে না। কী জানি কোন্‌দিন সামান্য কারণে মনান্তর ঘটিতে পারে তখন সংসার ছারখার হইয়া যাইবে।"

পৃথক হইয়া কোনোদিন নিজের বিষয় নিজেকে দেখিতে হইবে এ কথা ভবানী স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই। যে সংসারে শিশুকাল হইতে তিনি মানুষ হইয়াছেন সেটাকে তিনি সম্পূর্ণ অখণ্ড বলিয়াই জানিতেন— তাহার যে কোনো-একটা জায়গায় জোড় আছে, এবং সেই জোড়ের মুখে তাহাকে দুইখানা করা যায়, সহসা সে সংবাদ পাইয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

বংশের সম্মানহানি এবং আত্মীয়দের মনোবেদনায় তারাপদকে যখন কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না তখন কেমন করিয়া বিষয় বিভাগ হইতে পারে সেই অসাধ্য চিন্তায় ভবানীকে প্রবৃত্ত হইতে হইল। তারাপদ তাঁহার চিন্তা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "খুড়ামহাশয়, কাণ্ড কী। আপনি এত ভাবিতেছেন কেন। বিষয় ভাগ তো হইয়াই আছে। ঠাকুরদাদা বাঁচিয়া থাকিতেই তো ভাগ করিয়া দিয়া গেছেন।"

ভবানী হতবুদ্ধি হইয়া কহিলেন, "সত্য নাকি। আমি তো তাহার কিছুই জানি না।"

তারাপদ কহিলেন, "বিলক্ষণ! জানেন না তো কী। দেশসুদ্ধ লোক জানে, পাছে আপনাদের সঙ্গে আমাদের কোনো বিবাদ ঘটে এইজন্য আলন্দি তালুক আপনাদের অংশে লিখিয়া দিয়া ঠাকুরদাদা প্রথম হইতেই আপনাদিগকে পৃথক করিয়া দিয়াছেন— সেই ভাবেই তো এ পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে।"

ভবানীচরণ ভাবিলেন, সকলই সম্ভব। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই বাড়ি?"

তারাপদ কহিলেন, "ইচ্ছা করেন তো বাড়ি আপনারাই রাখিতে পারেন। সদর মহকুমায় যে কুঠি আছে সেইটে পাইলেই আমাদের কোনোরকম করিয়া চলিয়া যাইবে।"

তারাপদ এত অনায়াসে পৈতৃক বাড়ি ছাড়িতে প্রস্তুত হইলেন দেখিয়া তাঁহার ঔদার্যে তিনি বিস্মিত হইয়া গেলেন। তাঁহাদের সদর মহকুমার বাড়ি তিনি কোনোদিন দেখেন নাই এবং তাহার প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র মমতা ছিল না।

ভবানী যখন তাঁহার মাতা ব্রজসুন্দরীকে সকল বৃত্তান্ত জানাইলেন, তিনি কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "ওমা, সে কী কথা। আলন্দি তালুক তো আমার খোরপোষের জন্য আমি স্ত্রীধনস্বরূপে পাইয়াছিলাম— তাহার আয়ও তো তেমন বেশি নয়। পৈতৃক সম্পত্তিতে তোমার যে অংশ সে তুমি পাইবে না কেন।"

ভবানী কহিলেন, "তারাপদ বলে, পিতা আমাদিগকে ওই তালুক ছাড়া আর-কিছু দেন নাই।"

ব্রজসুন্দরী কহিলেন, "সে কথা বলিলে আমি শুনিব কেন। কর্তা নিজের হাতে তাঁহার উইল দুই প্রস্থ লিখিয়াছিলেন— তাহার এক প্রস্থ আমার কাছে রাখিয়াছেন; সে আমার সিন্দুকেই আছে।"

সিন্দুক খোলা হইল। সেখানে আলন্দি তালুকের দানপত্র আছে কিন্তু উইল নাই। উইল চুরি গিয়াছে।

পরামর্শদাতাকে ডাকা হইল। লোকটি তাঁহাদের গুরুঠাকুরের ছেলে। নাম বগলাচরণ। সকলেই বলে তাহার ভারি পাকা বুদ্ধি। তাহার বাপ গ্রামের মন্ত্রদাতা আর ছেলেটি মন্ত্রণাদাতা। পিতাপুত্রে গ্রামের পরকাল ইহকাল ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে। অন্যের পক্ষে তাহার ফলাফল যেমনই হউক, তাহাদের নিজেদের পক্ষে কোনো অসুবিধা ঘটে নাই।

বগলাচরণ কহিল, "উইল না-ই পাওয়া গেল। পিতার সম্পত্তিতে দুই ভায়ের তো সমান অংশ থাকিবেই।"

এমন সময় অপর পক্ষ হইতে একটা উইল বাহির হইল। তাহাতে ভবানীচরণের অংশে কিছুই লেখে না। সমস্ত সম্পত্তি পৌত্রদিগকে দেওয়া হইয়াছে। তখন অভয়াচরণের পুত্র জন্মে নাই।

বগলাকে কাণ্ডারী করিয়া ভবানী মকদ্দমার মহাসমুদ্রে পাড়ি দিলেন। বন্দরে আসিয়া লোহার সিন্দুকটি যখন পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন তখন দেখিতে পাইলেন, লক্ষ্মীপেঁচার বাসাটি একেবারে শূন্য— সামান্য দুটো-একটা সোনার পালক খসিয়া পড়িয়া আছে। পৈতৃক সম্পত্তি অপর পক্ষের হাতে গেল। আর আলন্দি তালুকের যে ডগাটুকু মকদ্দমা-খরচার বিনাশতল হইতে জাগিয়া রহিল, কোনোমতে তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকা চলে মাত্র কিন্তু বংশমর্যাদা রক্ষা করা চলে না। পুরাতন বাড়িটা

ভবানীচরণ পাইয়া মনে করিলেন ভারি জিতিয়াছি। তারাপদর দল সদরে চলিয়া গেল। উভয়পক্ষের মধ্যে আর দেখাসাক্ষাৎ রহিল না।

২

শ্যামাচরণের বিশ্বাসঘাতকতা ব্রজসুন্দরীকে শেলের মতো বাজিল। শ্যামাচরণ অন্যায় করিয়া কর্তার উইল চুরি করিয়া ভাইকে বঞ্চিত করিল এবং পিতার বিশ্বাসভঙ্গ করিল ইহা তিনি কোনোমতেই ভুলিতে পারিলেন না। তিনি যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন প্রতিদিনই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বারবার করিয়া বলিতেন, 'ধর্মে ইহা কখনোই সহিবে না।' ভবানীচরণকে প্রায়ই প্রতিদিন তিনি এই বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন যে, 'আমি আইন-আদালত কিছুই বুঝি না, আমি তোমাকে বলিতেছি, কর্তার সে উইল কখনোই চিরদিন চাপা থাকিবে না। সে তুমি নিশ্চয়ই ফিরিয়া পাইবে!'

বরাবর মাতার কাছে এই কথা শুনিয়া ভবানীচরণ মনে অত্যন্ত একটা ভরসা পাইলেন। তিনি নিজে অক্ষম বলিয়া এইরূপ আশ্বাসবাক্য তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত সান্ত্বনার জিনিস। সতীসাধ্বীর বাক্য ফলিবেই, যাহা তাঁহারই তাহা আপনিই তাঁহার কাছে ফিরিয়া আসিবে এ কথা তিনি নিশ্চয় স্থির করিয়া বসিয়া রহিলেন। মাতার মৃত্যুর পরে এ বিশ্বাস তাঁহার আরো দৃঢ় হইয়া উঠিল— কারণ মৃত্যুর বিচ্ছেদের মধ্য দিয়া মাতার পুণ্যতেজ তাঁহার কাছে আরো অনেক বড়ো করিয়া প্রতিভাত হইল। দারিদ্র্যের সমস্ত অভাবপীড়ন যেন তাঁহার গায়েই বাজিত না। মনে হইত, এই-যে অন্নবস্ত্রের কষ্ট, এই-যে পূর্বেকার চালচলনের ব্যত্যয়, এ যেন দুদিনের একটা অভিনয়-মাত্র— এ কিছুই সত্য নহে। এইজন্য সাবেক ঢাকাই ধুতি ছিঁড়িয়া গেলে যখন কম দামের মোটা ধুতি তাঁহাকে কিনিয়া পরিতে হইল তখন তাঁহার হাসি পাইল। পূজার সময় সাবেক কালের ধুমধাম চলিল না, নমোনম করিয়া কাজ সারিতে হইল। অভ্যাগতজন এই দরিদ্র আয়োজন দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সাবেক কালের কথা পাড়িল। ভবানীচরণ মনে মনে হাসিলেন; তিনি ভাবিলেন, ইহারা জানে না এ-সমস্তই কেবল কিছুদিনের জন্য— তাহার পর এমন ধুম করিয়া একদিন পূজা হইবে যে, ইহাদের চক্ষুস্থির হইয়া যাইবে। সেই ভবিষ্যতের নিশ্চিত সমারোহ তিনি এমনি প্রত্যক্ষের মতো দেখিতে পাইতেন যে, বর্তমান দৈন্য তাঁহার চোখেই পড়িত না।

এ সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা করিবার প্রধান মানুষটি ছিল নোটো চাকর। কতবার পুজোৎসবের দারিদ্র্যের মাঝখানে বসিয়া প্রভু-ভৃত্যে, ভাবী সুদিনে কিরূপ আয়োজন করিতে হইবে তাহারই বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এমন-

কি, কাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে না-হইবে এবং কলিকাতা হইতে যাত্রার দল আনিবার প্রয়োজন আছে কি না তাহা লইয়া উভয়পক্ষে ঘোরতর মতান্তর ও তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে। স্বভাবসিদ্ধ অনৌদার্যবশত নটবিহারী সেই ভাবীকালের ফর্দ-রচনায় কৃপণতা প্রকাশ করায় ভবানীচরণের নিকট হইতে তীব্র ভর্ৎসনা লাভ করিয়াছে। এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিত।

মোটের উপরে বিষয়সম্পত্তি সম্বন্ধে ভবানীচরণের মনে কোনোপ্রকার দুশ্চিন্তা ছিল না। কেবল তাঁহার একটিমাত্র উদ্‌বেগের কারণ ছিল, কে তাঁহার বিষয় ভোগ করিবে। আজ পর্যন্ত তাঁহার সন্তান হইল না। কন্যাদায়গ্রস্ত হিতৈষীরা যখন তাঁহাকে আর-একটি বিবাহ করিতে অনুরোধ করিত তখন তাঁহার মন এক-একবার চঞ্চল হইত; তাহার কারণ এ নয় যে নববধূ সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ শখ ছিল— বরঞ্চ সেবক ও অন্নের ন্যায় স্ত্রীকেও পুরাতনভাবেই তিনি প্রশস্ত বলিয়া গণ্য করিতেন— কিন্তু যাহার ঐশ্বর্যসম্ভাবনা আছে তাহার সন্তানসম্ভাবনা না থাকা বিষম বিড়ম্বনা বলিয়াই তিনি জানিতেন।

এমন সময় যখন তাঁহার পুত্র জন্মিল তখন সকলেই বলিল, এইবার এই ঘরের ভাগ্য ফিরিবে, তাহার সূত্রপাত হইয়াছে। স্বয়ং স্বর্গীয় কর্তা অভয়াচরণ আবার এ ঘরে জন্মিয়াছেন, ঠিক সেই রকমেরই টানা চোখ। ছেলের কোষ্ঠীতেও দেখা গেল, গ্রহে নক্ষত্রে এমনিভাবে যোগাযোগ ঘটিয়াছে যে হৃতসম্পত্তি উদ্ধার না হইয়া যায় না।

ছেলে হওয়ার পর হইতে ভবানীচরণের ব্যবহারে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। এতদিন পর্যন্ত দারিদ্র্যকে তিনি নিতান্তই একটা খেলার মতো সকৌতুকে অতি অনায়াসেই বহন করিয়াছিলেন, কিন্তু ছেলের সম্বন্ধে সে ভাবটি তিনি রক্ষা করিতে পারিলেন না। শানিয়াড়ির বিখ্যাত চৌধুরীদের ঘরে নির্বাণপ্রায় কুলপ্রদীপকে উজ্জ্বল করিবার জন্য সমস্ত গ্রহনক্ষত্রের আকাশব্যাপী আনুকূল্যের ফলে যে শিশু ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার প্রতি তো একটা কর্তব্য আছে! আজ পর্যন্ত ধারাবাহিক কাল ধরিয়া এই পরিবারে পুত্রসন্তানমাত্রই আজন্মকাল যে সমাদর লাভ করিয়াছে ভবানীচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্রই প্রথম তাহা হইতে বঞ্চিত হইল, এ বেদনা তিনি ভুলিতে পারিলেন না। 'এ বংশের চিরপ্রাপ্য আমি যাহা পাইয়াছি আমার পুত্রকে তাহা দিতে পারিলাম না', ইহা স্মরণ করিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল, 'আমিই ইহাকে ঠকাইলাম।' তাই কালীপদর জন্য অর্থব্যয় যাহা করিতে পারিলেন না প্রচুর আদর দিয়া তাহা পূরণ করিবার চেষ্টা করিলেন।

ভবানীর স্ত্রী রাসমণি ছিলেন অন্য ধরনের মানুষ। তিনি শানিয়াড়ির চৌধুরীদের

বংশগৌরব সম্বন্ধে কোনোদিন উদ্‌বেগ অনুভব করেন নাই। ভবানী তাহা জানিতেন এবং ইহা লইয়া মনে মনে তিনি হাসিতেন— ভাবিতেন, যেরূপ সামান্য দরিদ্র বৈষ্ণব-বংশে তাঁহার স্ত্রীর জন্ম তাহাতে তাঁহার এ ত্রুটি ক্ষমা করাই উচিত— চৌধুরীদের মানমর্যাদা সম্বন্ধে ঠিকমত ধারণা করাই তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।

. রাসমণি নিজেই তাহা স্বীকার করিতেন— বলিতেন, 'আমি গরিবের মেয়ে, মানসম্ভ্রমের ধার ধারি না, কালীপদ আমার বাঁচিয়া থাক্‌, সেই আমার সকলের চেয়ে বড়ো ঐশ্বর্য।' উইল আবার পাওয়া যাইবে এবং কালীপদর কল্যাণে এ বংশে লুপ্ত সম্পদের শূন্য নদীপথে আবার বান ডাকিবে, এ-সব কথায় তিনি একেবারে কানই দিতেন না। এমন মানুষই ছিল না যাহার সঙ্গে তাঁহার স্বামী হারানো উইল লইয়া আলোচনা না করিতেন। কেবল এই সকলের চেয়ে বড়ো মনের কথাটি তাঁহার স্ত্রীর সঙ্গে হইত না। দুই-একবার তাঁহার সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনো রস পাইলেন না। অতীত মহিমা এবং ভাবী মহিমা এই দুইয়ের প্রতিই তাঁহার স্ত্রী মনোযোগমাত্র করিতেন না, উপস্থিত প্রয়োজনই তাঁহার সমস্ত চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছিল।

সে প্রয়োজনও বড়ো অল্প ছিল না। অনেক চেষ্টায় সংসার চালাইতে হইত। কেননা, লক্ষ্মী চলিয়া গেলেও তাঁহার বোঝা কিছু কিছু পশ্চাতে ফেলিয়া যান, তখন উপায় থাকে না বটে কিন্তু অপায় থাকিয়া যায়। এ পরিবারে আশ্রয় প্রায় ভাঙিয়া গিয়াছে কিন্তু আশ্রিত দল এখনো তাঁহাদিগকে ছুটি দিতে চায় না। ভবানীচরণও তেমন লোক নহেন যে, অভাবের ভয়ে কাহাকেও বিদায় করিয়া দিবেন।

এই ভারগ্রস্ত ভাঙা সংসারটিকে চালাইবার ভার রাসমণির উপরে। কাহারো কাছে তিনি বিশেষ কিছু সাহায্যও পান না। কারণ এ সংসারের সচ্ছল অবস্থার দিনে আশ্রিতেরা সকলেই আরামে ও আলস্যেই দিন কাটাইয়াছে। চৌধুরীবংশের মহাবৃক্ষের তলে ইহাদের সুখশয্যার উপরে ছায়া আপনিই আসিয়া বিস্তীর্ণ হইয়াছে এবং ইহাদের মুখের কাছে পাকাফল আপনিই আসিয়া পড়িয়াছে— সেজন্য ইহাদের কাহাকেও কিছুমাত্র চেষ্টা করিতে হয় নাই। আজ ইহাদিগকে কোনোপ্রকার কাজ করিতে বলিলে ইহারা ভারি অপমান বোধ করে— এবং রান্নাঘরের ধোঁয়া লাগিলেই ইহাদের মাথা ধরে, আর হাঁটাহাঁটি করিতে গেলেই কোথা হইতে এমন পোড়া বাতের ব্যামো আসিয়া অভিভূত করিয়া তোলে যে, কবিরাজের বহুমূল্য তৈলেও রোগ উপশম হইতে চায় না। তা ছাড়া, ভবানীচরণ বলিয়া থাকেন, আশ্রয়ের পরিবর্তে যদি আশ্রিতের কাছ হইতে কাজ আদায় করা হয় তবে সে তো চাকরি

করাইয়া লওয়া— তাহাতে আশ্রয়দানের মূল্যই চলিয়া যায়— চৌধুরীদের ঘরে এমন নিয়মই নহে।

অতএব সমস্ত দায় রাসমণিরই উপর। দিনরাত্রি নানা কৌশলে ও পরিশ্রমে এই পরিবারের সমস্ত অভাব তাঁহাকে গোপনে মিটাইয়া চলিতে হয়। এমন করিয়া দিনরাত্রি দৈন্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া টানাটানি করিয়া দরদস্তুর করিয়া চলিতে থাকিলে মানুষকে বড়ো কঠিন করিয়া তুলে— তাহার কমনীয়তা চলিয়া যায়। যাহাদের জন্য সে পদে পদে খাটিয়া মরে তাহারাই তাহাকে সহ্য করিতে পারে না। রাসমণি যে কেবল পাকশালায় অন্ন পাক করেন তাহা নহে, অন্নের সংস্থানভারও অনেকটা তাঁহার উপর— অথচ সেই অন্ন সেবন করিয়া মধ্যাহ্নে যাঁহারা নিদ্রা দেন তাঁহারা প্রতিদিন সেই অন্নেরও নিন্দা করেন, অন্নদাতারও সুখ্যাতি করেন না।

কেবল ঘরের কাজ নহে, তালুক ব্রহ্মত্র অল্পসল্প যা-কিছু এখনো বাকি আছে তাহার হিসাবপত্র দেখা, খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করা, সমস্ত রাসমণিকে করিতে হয়। তহসিল প্রভৃতি সম্বন্ধে পূর্বে এত কষাকষি কোনোদিন ছিল না— ভবানীচরণের টাকা অভিমন্যুর ঠিক উলটা, সে বাহির হইতেই জানে, প্রবেশ করিবার বিদ্যা তাহার জানা নাই। কোনোদিন টাকার জন্য কাহাকেও তাগিদ করিতে তিনি একেবারেই অক্ষম। রাসমণি নিজের প্রাপ্য সম্বন্ধে কাহাকেও সিকি পয়সা রেয়াত করেন না। ইহাতে প্রজারা তাঁহাকে নিন্দা করে, গোমস্তাগুলো পর্যন্ত তাঁহার সতর্কতার জ্বালায় অস্থির হইয়া তাঁহার বংশোচিত ক্ষুদ্রাশয়তার উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে গালি দিতে ছাড়ে না। এমন-কি, তাঁহার স্বামীও তাঁহার কৃপণতা ও তাঁহার কর্কশতাকে তাঁহাদের বিশ্ববিখ্যাত পরিবারের পক্ষে মানহানিজনক বলিয়া কখনো কখনো মৃদুস্বরে আপত্তি করিয়া থাকেন। এ-সমস্ত নিন্দা ও ভর্ৎসনা তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া নিজের নিয়মে কাজ করিয়া চলেন, দোষ সমস্তই নিজের ঘাড়ে লন; তিনি গরিবের ঘরের মেয়ে, তিনি বড়োমানুষিয়ানার কিছুই বোঝেন না, এই কথা বারবার স্বীকার করিয়া ঘরে বাহিরে সকল লোকের কাছে অপ্রিয় হইয়া, আঁচলের প্রান্তটা কষিয়া কোমরে জড়াইয়া ঝড়ের বেগে কাজ করিতে থাকেন; কেহ তাঁহাকে বাধা দিতে সাহস করে না।

স্বামীকে কোনোদিন তিনি কোনো কাজে ডাকা দূরে থাক্‌, তাঁহার মনে মনে এই ভয় সর্বদা ছিল পাছে ভবানীচরণ সহসা কর্তৃত্ব করিয়া কোনো কাজে হস্তক্ষেপ করিয়া বসেন। 'তোমাকে কিছুই ভাবিতে হইবে না, এ-সব কিছুতে তোমার থাকার প্রয়োজন নাই' এই বলিয়া সকল বিষয়েই স্বামীকে নিরুদ্যম করিয়া রাখাই তাঁহার একটা প্রধান চেষ্টা ছিল। স্বামীরও আজন্মকাল সেটা সুন্দররূপে অভ্যস্ত থাকাতে সে বিষয়ে স্ত্রীকে

অধিক দুঃখ পাইতে হয় নাই। রাসমণির অনেক বয়স পর্যন্ত সন্তান হয় নাই— এই তাঁহার অকর্মণ্য সরলপ্রকৃতি পরমুখাপেক্ষী স্বামীটিকে লইয়া তাঁহার পত্নীপ্রেম ও মাতৃস্নেহ দুই মিটিয়াছিল। ভবানীকে তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত বালক বলিয়াই দেখিতেন। কাজেই শাশুড়ির মৃত্যুর পর হইতে বাড়ির কর্তা এবং গৃহিণী উভয়েরই কাজ তাঁহাকে একলাই সম্পন্ন করিতে হইত। গুরুঠাকুরের ছেলে এবং অন্যান্য বিপদ হইতে স্বামীকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি এমনি কঠোরভাবে চলিতেন যে, তাঁহার স্বামীর সঙ্গীরা তাঁহাকে ভারি ভয় করিত। প্রখরতা গোপন করিয়া রাখিবেন, স্পষ্ট কথাগুলার ধারটুকু একটু নরম করিয়া দিবেন, এবং পুরুষমণ্ডলীর সঙ্গে যথোচিত সংকোচ রক্ষা করিয়া চলিবেন, সেই নারীজনোচিত সুযোগ তাঁহার ঘটিল না।

এ পর্যন্ত ভবানীচরণ তাঁহার বাধ্যভাবেই চলিতেছিলেন। কিন্তু কালীপদর সম্বন্ধে রাসমণিকে মানিয়া চলা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল।

তাহার কারণ এই, রাসমণি ভবানীর পুত্রটিকে ভবানীচরণের নজরে দেখিতেন না। তাঁহার স্বামীর সম্বন্ধে তিনি ভাবিতেন, বেচারা করিবে কী, উহার দোষ কী, ও বড়োমানুষের ঘরে জন্মিয়াছে— ওর তো উপায় নাই। এইজন্য তাঁহার স্বামী যে কোনোরূপ কষ্ট স্বীকার করিবেন, ইহা তিনি আশাই করিতে পারিতেন না। তাই সহস্র অভাব সত্ত্বেও প্রাণপণ শক্তিতে তিনি স্বামীর সমস্ত অভ্যস্ত প্রয়োজন যথাসম্ভব জোগাইয়া দিতেন। তাঁহার ঘরে বাহিরের লোকের সম্বন্ধে হিসাব খুবই কষা ছিল, কিন্তু ভবানীচরণের আহারে ব্যবহারে পারতপক্ষে সাবেক নিয়মের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হইতে পারিত না। নিতান্ত টানাটানির দিনে যদি কোনো বিষয়ে কিছু ত্রুটি ঘটিত তবে সেটা যে অভাববশত ঘটিয়াছে সে কথা তিনি কোনোমতেই স্বামীকে জানিতে দিতেন না— হয়তো বলিতেন, ‘ওই রে, হতভাগা কুকুর খাবারে মুখ দিয়া সমস্ত নষ্ট করিয়া দিয়াছে!’ বলিয়া নিজের কল্পিত অসতর্কতাকে ধিক্‌কার দিতেন। নয়তো লক্ষ্মীছাড়া নোটোর দোষেই নূতন-কেনা কাপড়টা খোওয়া গিয়াছে বলিয়া তাহার বুদ্ধির প্রতি প্রচুর অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন— ভবানীচরণ তখন তাঁহার প্রিয় ভৃত্যটির পক্ষাবলম্বন করিয়া গৃহিণীর ক্রোধ হইতে তাহাকে বাঁচাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। এমন-কি, কখনো এমনও ঘটিয়াছে, যে কাপড় গৃহিণী কেনেন নাই এবং ভবানীচরণ চক্ষেও দেখেন নাই এবং যে কাল্পনিক কাপড়খানা হারাইয়া ফেলিয়াছে বলিয়া নটবিহারী অভিযুক্ত— ভবানীচরণ অম্লানমুখে স্বীকার করিয়াছেন যে, সেই কাপড় নোটো তাঁহাকে কোঁচাইয়া দিয়াছে, তিনি তাহা পরিয়াছেন এবং তাহার পর— তাহার পর কী হইল সেটা হঠাৎ তাঁহার কল্পনাশক্তিতে জোগাইয়া উঠে নাই— রাসমণি

নিজেই সেটুকু পূরণ করিয়া বলিয়াছেন— নিশ্চয়ই তুমি তোমার বাহিরের বৈঠকখানার ঘরে ছাড়িয়া রাখিয়াছিলে, সেখানে যে খুশি আসে যায়, কে চুরি করিয়া লইয়াছে।

ভবানীচরণের সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা। কিন্তু নিজের ছেলেকে তিনি কোনো অংশেই স্বামীর সমকক্ষ বলিয়া গণ্য করিতেন না। সে তো তাঁহারই গর্ভের সন্তান— তাহার আবার কিসের বাবুয়ানা! সে হইবে শক্তসমর্থ কাজের লোক— অনায়াসে দুঃখ সহিবে ও খাটিয়া খাইবে। তাহার এটা নহিলে চলে না, ওটা নহিলে অপমান বোধ হয়, এমন কথা কোনোমতেই শোভা পাইবে না। কালীপদ সম্বন্ধে রাসমণি খাওয়া-পরায় খুব মোটা রকমই বরাদ্দ করিয়া দিলেন। মুড়িগুড় দিয়াই তাহার জলখাবার সারিলেন এবং মাথা-কান ঢাকিয়া দোলাই পরাইয়া তাহার শীতনিবারণের ব্যবস্থা করিলেন। গুরুমশায়কে স্বয়ং ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, ছেলে যেন পড়াশুনায় কিছুমাত্র শৈথিল্য করিতে না পারে, তাহাকে যেন বিশেষরূপ শাসনে সংযত রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়।

এইখানে বড়ো মুশকিল বাধিল। নিরীহস্বভাব ভবানীচরণ মাঝে মাঝে বিদ্রোহের লক্ষণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাসমণি যেন তাহা দেখিয়াও দেখিতে পাইলেন না। ভবানী প্রবলপক্ষের কাছে চিরদিনই হার মানিয়াছেন, এবারেও তাঁহাকে অগত্যা হার মানিতে হইল, কিন্তু মন হইতে তাহার বিরুদ্ধতা ঘুচিল না। এ ঘরের ছেলে দোলাই মুড়ি দিয়া গুড়মুড়ি খায়, এমন বিসদৃশ দৃশ্য দিনের পর দিন কি দেখা যায়।

পূজার সময় তাঁহার মনে পড়ে, কর্তাদের আমলে নূতন সাজসজ্জা পরিয়া তাঁহারা কিরূপ উৎসাহ বোধ করিয়াছেন। পূজার দিনে রাসমণি কালীপদর জন্য যে সস্তা কাপড়জামার ব্যবস্থা করিয়াছেন সাবেক কালে তাঁহাদের বাড়ির ভৃত্যেরাও তাহাতে আপত্তি করিত। রাসমণি স্বামীকে অনেক করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, কালীপদকে যাহা দেওয়া যায় তাহাতেই সে খুশি হয়, সে তো সাবেক দস্তুরের কথা কিছু জানে না— তুমি কেন মিছামিছি মন ভার করিয়া থাক। কিন্তু ভবানীচরণ কিছুতেই ভুলিতে পারেন না যে, বেচারা কালীপদ আপন বংশের গৌরব জানে না বলিয়া তাহাকে ঠকানো হইতেছে। বস্তুত সামান্য উপহার পাইয়া সে যখন গর্বে ও আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে তাঁহাকে ছুটিয়া দেখাইতে আসে তখন তাহাতেই ভবানীচরণকে যেন আরো আঘাত করিতে থাকে। তিনি সে কিছুতেই দেখিতে পারেন না। তাঁহাকে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতে হয়।

ভবানীচরণের মকদ্দমা চালাইবার পর হইতে তাঁহাদের গুরুঠাকুরের ঘরে বেশ কিঞ্চিৎ অর্থসমাগম হইয়াছে। তাহাতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া গুরুপুত্রটি প্রতিবৎসর

পূজার কিছু পূর্বে কলিকাতা হইতে নানাপ্রকার চোখ-ভোলানো সস্তা শৌখিন জিনিস আনাইয়া কয়েক মাসের জন্য ব্যাবসা চালাইয়া থাকেন। অদৃশ্য কালি, ছিপ-ছড়ি-ছাতার একত্র সমবায়, ছবি-আঁকা চিঠির কাগজ, নিলামে-কেনা নানা রঙের পচা রেশম ও সাটিনের থান, কবিতা-লেখা পাড়ওয়ালা শাড়ি প্রভৃতি লইয়া তিনি গ্রামের নরনারীর মন উতলা করিয়া দেন। কলিকাতার বাবুমহলে আজকাল এই-সমস্ত উপকরণ না হইলে ভদ্রতা রক্ষা হয় না শুনিয়া গ্রামের উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিমাত্রই আপনার গ্রাম্যতা ঘুচাইবার জন্য সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয় করিতে ছাড়েন না।

একবার বগলাচরণ একটা অত্যাশ্চর্য মেমের মূর্তি আনিয়াছিলেন। তার কোন্-এক জায়গায় দম দিলে মেম চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রবল বেগে নিজেকে পাখা করিতে থাকে।

এই বীজনপরায়ণ গ্রীষ্মকাতর মেমমূর্তিটির প্রতি কালীপদর অত্যন্ত লোভ জন্মিল। কালীপদ তাহার মাকে বেশ চেনে, এইজন্য মার কাছে কিছু না বলিয়া ভবানীচরণের কাছে করুণকণ্ঠে আবেদন উপস্থিত করিল। ভবানীচরণ তখনি উদারভাবে তাহাকে আশ্বস্ত করিলেন, কিন্তু তাহার দাম শুনিয়া তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল।

টাকাকড়ি আদায়ও করেন রাসমণি, তহবিলও তাঁহার কাছে, খরচও তাঁহার হাত দিয়াই হয়। ভবানীচরণ ভিখারির মতো তাঁহার অন্নপূর্ণার দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথমে বিস্তর অপ্রাসঙ্গিক কথা আলোচনা করিয়া অবশেষে এক সময়ে ধাঁ করিয়া আপনার মনের ইচ্ছাটা বলিয়া ফেলিলেন। রাসমণি অত্যন্ত সংক্ষেপে বলিলেন, "পাগল হইয়াছ!"

ভবানীচরণ চুপ করিয়া খানিকক্ষণ ভাবিতে লাগিলেন। তাহার পরে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা দেখো, ভাতের সঙ্গে তুমি যে রোজ আমাকে ঘি আর পায়স দাও সেটার তো প্রয়োজন নাই।"

রাসমণি বলিলেন, "প্রয়োজন নাই তো কী।"

ভবানীচরণ কহিলেন, "কবিরাজ বলে, উহাতে পিত্ত বৃদ্ধি হয়।"

রাসমণি তীক্ষ্ণভাবে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "তোমার কবিরাজ তো সব জানে!"

ভবানীচরণ কহিলেন, "আমি তো বলি রাত্রে আমার লুচি বন্ধ করিয়া ভাতের ব্যবস্থা করিয়া দিলে ভালো হয়। উহাতে পেট ভার করে।"

রাসমণি কহিলেন, "পেট ভার করিয়া আজ পর্যন্ত তোমার তো কোনো অনিষ্ট হইতে দেখিলাম না। জন্মকাল হইতে লুচি খাইয়াই তো তুমি মানুষ।"

ভবানীচরণ সর্বপ্রকার ত্যাগস্বীকার করিতেই প্রস্তুত— কিন্তু সে দিকে ভারি কড়াক্কড়। ঘিয়ের দর বাড়িতেছে তবু লুচির সংখ্যা ঠিক সমানই আছে। মধ্যাহ্ন-ভোজনে পায়সটা যখন আছেই তখন দইটা না দিলে কোনো ক্ষতিই হয় না— কিন্তু বাহুল্য হইলেও এ বাড়িতে বাবুরা বরাবর দই পায়স খাইয়া আসিয়াছেন। কোনোদিন ভবানীচরণের ভোগে সেই চিরন্তন দধির অনটন দেখিলে রাসমণি কিছুতেই তাহা সহ্য করিতে পারেন না। অতএব গায়ে-হাওয়া-লাগানো সেই মেমমূর্তিটি ভবানীচরণের দই-পায়স-ঘি-লুচির কোনো ছিদ্রপথ দিয়া যে প্রবেশ করিবে এমন উপায় দেখা গেল না।

ভবানীচরণ তাঁহার গুরুপুত্রের বাসায় একদিন যেন নিতান্ত অকারণেই গেলেন এবং বিস্তর অপ্রাসঙ্গিক কথার পর সেই মেমের খবরটা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার বর্তমান আর্থিক দুর্গতির কথা বগলাচরণের কাছে গোপন থাকিবার কোনো কারণ নাই তাহা তিনি জানেন, তবু আজ তাঁহার টাকা নাই বলিয়া ওই একটা সামান্য খেলনা তিনি তাঁহার ছেলের জন্য কিনিতে পারিতেছেন না, এ কথার আভাস দিতেও তাঁহার যেন মাথা ছিঁড়িয়া পড়িতে লাগিল। তবু দুঃসহ সংকোচকেও অধঃকৃত করিয়া তিনি তাঁহার চাদরের ভিতর হইতে কাপড়ে-মোড়া একটি দামী পুরাতন জামিয়ার বাহির করিলেন। রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে কহিলেন, "সময়টা কিছু খারাপ পড়িয়াছে, নগদ টাকা হাতে বেশি নাই— তাই মনে করিয়াছি, এই জামিয়ারটি তোমার কাছে বন্ধক রাখিয়া সেই পুতুলটা কালীপদর জন্য লইয়া যাইব।"

জামিয়ারের চেয়ে অল্প দামের কোনো জিনিস যদি হইত তবে বগলাচরণের বাধিত না— কিন্তু সে জানিত এটা হজম করিয়া উঠিতে পারিবে না— গ্রামের লোকেরা তো নিন্দা করিবেই, তাহার উপরে রাসমণির রসনা হইতে যাহা বাহির হইবে তাহা সরস হইবে না। জামিয়ারটাকে পুনরায় চাদরের মধ্যে গোপন করিয়া হতাশ হইয়া ভবানীচরণকে ফিরিতে হইল।

কালীপদ পিতাকে রোজ জিজ্ঞাসা করে, "বাবা, আমার সেই মেমের কী হইল।" ভবানীচরণ রোজই হাসিমুখে বলেন, "রোস— এখনি কী। সপ্তমী পূজার দিন আগে আসুক।"

প্রতিদিনই মুখে হাসি টানিয়া আনা দুঃসাধ্যকর হইতে লাগিল।

আজ চতুর্থী। ভবানীচরণ অসময়ে অন্তঃপুরে কী একটা ছুতা করিয়া গেলেন। যেন হঠাৎ কথাপ্রসঙ্গে রাসমণিকে বলিয়া উঠিলেন, "দেখো, আমি কয়দিন হইতে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, কালীপদর শরীরটা যেন দিনে দিনে খারাপ হইয়া যাইতেছে।"

রাসমণি কহিলেন, "বালাই! খারাপ হইতে যাইবে কেন। ওর তো আমি কোনো অসুখ দেখি না।"

ভবানীচরণ কহিলেন, "দেখ নাই! ও চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। কী যেন ভাবে।"

রাসমণি কহিলেন, "ও একদণ্ড চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে আমি তো বাঁচিতাম। ওর আবার ভাবনা! কোথায় কী দুষ্টামি করিতে হইবে, ও সেই কথাই ভাবে।"

দুর্গপ্রাচীরের এদিকটাতেও কোনো দুর্বলতা দেখা গেল না— পাথরের উপরে গোলার দাগও বসিল না। নিশ্বাস ফেলিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে ভবানীচরণ বাহিরে চলিয়া আসিলেন। একলা ঘরের দাওয়ায় বসিয়া খুব কষিয়া তামাক খাইতে লাগিলেন।

পঞ্চমীর দিনে তাঁহার পাতে দই পায়স অমনি পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যাবেলায় শুধু একটা সন্দেশ খাইয়াই জল খাইলেন, লুচি ছুঁইতে পারিলেন না। বলিলেন, "ক্ষুধা একেবারেই নাই।"

এবার দুর্গপ্রাচীরে মস্ত একটা ছিদ্র দেখা দিল। ষষ্ঠীর দিনে রাসমণি স্বয়ং কালীপদকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া তাহার আদরের ডাকনাম ধরিয়া বলিলেন, "ভেঁটু, তোমার এত বয়স হইয়াছে, তবু তোমার অন্যায় আবদার ঘুচিল না! ছি ছি! যেটা পাইবার উপায় নাই সেটাকে লোভ করিলে অর্ধেক চুরি করা হয় তা জান!"

কালীপদ নাকীসুরে কহিল, "আমি কী জানি। বাবা যে বলিয়াছেন, ওটা আমাকে দেবেন।"

তখন বাবার বলার অর্থ কী রাসমণি তাহা কালীপদকে বুঝাইতে বসিলেন। পিতার এই বলার মধ্যে যে কত স্নেহ কত বেদনা, অথচ এই জিনিসটা দিতে হইলে তাঁহাদের দরিদ্রঘরের কত ক্ষতি কত দুঃখ তাহা অনেক করিয়া বলিলেন। রাসমণি এমন করিয়া কোনোদিন কালীপদকে কিছু বুঝান নাই— তিনি যাহা করিতেন, খুব সংক্ষেপে এবং জোরের সঙ্গেই করিতেন— কোনো আদেশকে নরম করিয়া তুলিবার আবশ্যকই তাঁর ছিল না। সেইজন্য কালীপদকে তিনি যে আজ এমনি মিনতি করিয়া এত বিস্তারিত করিয়া কথা বলিতেছেন তাহাতে সে আশ্চর্য হইয়া গেল, এবং মাতার মনের এক জায়গায় যে কতটা দরদ আছে বালক হইয়াও একরকম করিয়া সে তাহা বুঝিতে পারিল। কিন্তু মেমের দিক হইতে মন এক মুহূর্তে ফিরাইয়া আনা কত কঠিন তাহা বয়স্ক পাঠকদের বুঝিতে কষ্ট হইবে না। তাই কালীপদ মুখ অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া একটা কাঠি লইয়া মাটিতে আঁচড় কাটিতে লাগিল।

তখন রাসমণি আবার কঠিন হইয়া উঠিলেন— কঠোরস্বরে কহিলেন, "তুমি রাগই কর আর কান্নাকাটিই কর, যাহা পাইবার নয় তাহা কোনোমতেই পাইবে না।" এই বলিয়া আর বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া দ্রুতপদে গৃহকর্মে চলিয়া গেলেন।

কালীপদ বাহিরে গেল। তখন ভবানীচরণ একলা বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন। দূর হইতে কালীপদকে দেখিয়াই তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া যেন একটা বিশেষ কাজ আছে এমনি ভাবে কোথায় চলিলেন। কালীপদ ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "বাবা, আমার সেই মেম—"

আজ আর ভবানীচরণের মুখে হাসি বাহির হইল না। কালীপদর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, "রোস বাবা, আমার একটা কাজ আছে— সেরে আসি, তার পরে সব কথা হবে।" বলিয়া তিনি বাড়ির বাহির হইয়া পড়িলেন। কালীপদর মনে হইল, তিনি যেন তাড়াতাড়ি চোখ হইতে জল মুছিয়া ফেলিলেন।

তখন পাড়ার এক বাড়িতে পরীক্ষা করিয়া উৎসবের বাঁশির বায়না করা হইতেছিল। সেই রসনচৌকিতে সকালবেলাকার করুণসুরে শরতের নবীন রৌদ্র যেন প্রচ্ছন্ন অশ্রুভারে ব্যথিত হইয়া উঠিতেছিল। কালীপদ তাহাদের বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়াইয়া চুপ করিয়া পথের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পিতা যে কোনো কাজেই কোথাও যাইতেছেন না, তাহা তাঁহার গতি দেখিয়াই বুঝা যায়— প্রতি পদক্ষেপেই তিনি যে একটা নৈরাশ্যের বোঝা টানিয়া টানিয়া চলিয়াছেন এবং তাহা কোথাও ফেলিবার স্থান নাই, তাহা তাঁহার পশ্চাৎ হইতেও স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল।

কালীপদ অন্তঃপুরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "মা, আমার সেই পাখা-করা মেম চাই না।"

মা তখন জাঁতি লইয়া ক্ষিপ্রহস্তে সুপারি কাটিতেছিলেন। তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ছেলেতে মায়েতে সেইখানে বসিয়া কী একটা পরামর্শ হইয়া গেল তাহা কেহই জানিতে পারিল না। জাঁতি রাখিয়া ধামা-ভরা কাটা ও আকাটা সুপুরি ফেলিয়া রাসমণি তখনি বগলাচরণের বাড়ি চলিয়া গেলেন।

আজ ভবানীচরণের বাড়ি ফিরিতে অনেক বেলা হইল। স্নান সারিয়া যখন তিনি খাইতে বসিলেন তখন তাঁহার মুখ দেখিয়া বোধ হইল আজও দধি-পায়সের সদ্‌গতি হইবে না, এমন-কি, মাছের মুড়াটা আজ সম্পূর্ণই বিড়ালের ভোগে লাগিবে।

তখন দড়ি দিয়া মোড়া কাগজের এক বাক্স লইয়া রাসমণি তাঁহার স্বামীর সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। আহারের পরে যখন ভবানীচরণ বিশ্রাম করিতে যাইবেন

তখনি এই রহস্যটা তিনি আবিষ্কার করিবেন ইহাই রাসমণির ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দধি পায়স ও মাছের মুড়ার অনাদর দূর করিবার জন্য এখনি এটা বাহির করিতে হইল। বাক্সের ভিতর হইতে সেই মেমমূর্তি বাহির হইয়া বিনা বিলম্বে প্রবল উৎসাহে আপন গ্রীষ্মতাপ-নিবারণে লাগিয়া গেল। বিড়ালকে আজ হতাশ হইয়া ফিরিতে হইল। ভবানীচরণ গৃহিণীকে বলিলেন, "আজ রান্নাটা বড়ো উত্তম হইয়াছে। অনেকদিন এমন মাছের ঝোল খাই নাই। আর দইটা যে কী চমৎকার জমিয়াছে সে আর কী বলিব।"

সপ্তমীর দিন কালীপদ তাহার অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষার ধন পাইল। সেদিন সমস্ত দিন সে মেমের পাখা খাওয়া দেখিল, তাহার সমবয়সী বন্ধুবান্ধবদিগকে দেখাইয়া তাহাদের ঈর্ষার উদ্রেক করিল। অন্য কোনো অবস্থায় হইলে সমস্তক্ষণ এই পুতুলের একঘেয়ে পাখা নাড়ায় সে নিশ্চয়ই একদিনেই বিরক্ত হইয়া যাইত— কিন্তু অষ্টমীর দিনেই এই প্রতিমা বিসর্জন দিতে হইবে জানিয়া তাহার অনুরাগ অটল হইয়া রহিল। রাসমণি তাঁহার গুরুপুত্রকে দুই টাকা নগদ দিয়া কেবল একদিনের জন্য এই পুতুলটি ভাড়া করিয়া আনিয়াছিলেন। অষ্টমীর দিনে কালীপদ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া স্বহস্তে বাক্সসমেত পুতুলটি বগলাচরণের কাছে ফিরাইয়া দিয়া আসিল। এই একদিনের মিলনের সুখস্মৃতি অনেকদিন তাহার মনে জাগরূক হইয়া রহিল; তাহার কল্পনালোকে পাখা চলার আর বিরাম রহিল না।

এখন হইতে কালীপদ মাতার মন্ত্রণার সঙ্গী হইয়া উঠিল এবং এখন হইতে ভবানীচরণ প্রতিবৎসরই এত সহজে এমন মূল্যবান পূজার উপহার কালীপদকে দিতে পারিতেন যে, তিনি নিজেই আশ্চর্য হইয়া যাইতেন।

পৃথিবীতে মূল্য না দিয়া যে কিছুই পাওয়া যায় না এবং সে মূল্য যে দুঃখের মূল্য, মাতার অন্তরঙ্গ হইয়া সে কথা কালীপদ প্রতিদিন যতই বুঝিতে পারিল ততই দেখিতে দেখিতে সে যেন্ ভিতরের দিক হইতে বড়ো হইয়া উঠিতে লাগিল। সকল কাজেই এখন সে তার মাতার দক্ষিণপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। সংসারের ভার বহিতে হইবে, সংসারের ভার বাড়াইতে হইবে না, এ কথা বিনা উপদেশবাক্যেই তাহার রক্তের সঙ্গেই মিশিয়া গেল।

জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্য তাহাকে প্রস্তুত হইতে হইবে, এই কথা স্মরণ রাখিয়া কালীপদ প্রাণপণে পড়িতে লাগিল। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যখন সে ছাত্রবৃত্তি পাইল তখন ভবানীচরণ মনে করিলেন, আর বেশি পড়াশুনার দরকার নাই, এখন কালীপদ তাঁহাদের বিষয়কর্ম দেখায় প্রবৃত্ত হউক।

কালীপদ মাকে আসিয়া কহিল, "কলিকাতায় গিয়া পড়াশুনা না করিতে পারিলে আমি তো মানুষ হইতে পারিব না।"

মা বলিলেন, "সে তো ঠিক কথা বাবা, কলিকাতায় তো যাইতেই হইবে।"

কালীপদ কহিল, "আমার জন্যে কোনো খরচ করিতে হইবে না। এই বৃত্তি হইতেই চালাইয়া দিব— এবং কিছু কাজকর্মেরও জোগাড় করিয়া লইব।"

ভবানীচরণকে রাজি করাইতে অনেক কষ্ট পাইতে হইল। দেখিবার মতো বিষয়সম্পত্তি যে কিছুই নাই সে কথা বলিলে ভবানীচরণ অত্যন্ত দুঃখবোধ করেন, তাই রাসমণিকে সে যুক্তিটা চাপিয়া যাইতে হইল। তিনি বলিলেন, "কালীপদকে তো মানুষ হইতে হইবে।" কিন্তু পুরুষানুক্রমে কোনোদিন শানিয়াড়ির বাহিরে না গিয়াই তো চৌধুরীরা এতকাল মানুষ হইয়াছে। বিদেশকে তাঁহারা যমপুরীর মতো ভয় করেন। কালীপদর মতো বালককে একলা কলিকাতায় পাঠাইবার প্রস্তাবমাত্র কী করিয়া কাহারো মাথায় আসিতে পারে তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। অবশেষে গ্রামের সর্বপ্রধান বুদ্ধিমান ব্যক্তি বগলাচরণ পর্যন্ত রাসমণির মতে মত দিল। সে বলিল, "কালীপদ একদিন উকিল হইয়া সেই উইল-চুরি ফাঁকির শোধ দিবে, নিশ্চয়ই এ তাহার ভাগ্যের লিখন— অতএব কলিকাতায় যাওয়া হইতে কেহই তাহাকে নিবারণ করিতে পারিবে না।"

এ কথা শুনিয়া ভবানীচরণ অনেকটা সান্ত্বনা পাইলেন। গামছায় বাঁধা পুরানো সমস্ত নথি বাহির করিয়া উইল-চুরি লইয়া কালীপদর সঙ্গে বারবার আলোচনা করিতে লাগিলেন। সম্প্রতি মাতার মন্ত্রীর কাজটা কালীপদ বেশ বিচক্ষণতার সঙ্গেই চালাইতেছিল, কিন্তু পিতার মন্ত্রণাসভায় সে জোর পাইল না। কেননা তাহাদের পরিবারের এই প্রাচীন অন্যায়টা সম্বন্ধে তাহার মনে যথেষ্ট উত্তেজনা ছিল না। তবু সে পিতার কথায় সায় দিয়া গেল। সীতাকে উদ্ধার করিবার জন্য বীরশ্রেষ্ঠ রাম যেমন লঙ্কায় যাত্রা করিয়াছিলেন, কালীপদর কলিকাতায় যাত্রাকেও ভবানীচরণ তেমনি খুব বড়ো করিয়া দেখিলেন— সে কেবল সামান্য পাস করার ব্যাপার নয়— ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে ফিরাইয়া আনিবার আয়োজন।

কলিকাতায় যাইবার আগের দিন রাসমণি কালীপদর গলায় একটি রক্ষাকবচ ঝুলাইয়া দিলেন ; এবং তাহার হাতে একটি পঞ্চাশ টাকার নোট দিয়া বলিয়া দিলেন— এই নোটটি রাখিয়ো, আপদে বিপদে প্রয়োজনের সময় কাজে লাগিবে। সংসারখরচ হইতে অনেক কষ্টে জমানো এই নোটটিকেই কালীপদ যথার্থ পবিত্র কবচের ন্যায় জ্ঞান

করিয়া গ্রহণ করিল— এই নোটটিকে মাতার আশীর্বাদের মতো সে চিরদিন রক্ষা করিবে, কোনোদিন খরচ করিবে না, এই সে মনে মনে সংকল্প করিল।

৩

ভবানীচরণের মুখে উইল-চুরির কথাটা এখন আর তেমন শোনা যায় না। এখন তাঁহার একমাত্র আলোচনার বিষয় কালীপদ। তাহারই কথা বলিবার জন্য তিনি এখন সমস্ত পাড়া ঘুরিয়া বেড়ান। তাহার চিঠি পাইলে ঘরে ঘরে তাহা পড়িয়া শুনাইবার উপলক্ষে নাক হইতে চশমা আর নামিতে চায় না। কোনোদিন এবং কোনো পুরুষে কলিকাতায় যান নাই বলিয়াই কলিকাতার গৌরববোধে তাঁহার কল্পনা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। আমাদের কালীপদ কলিকাতায় পড়ে এবং কলিকাতার কোনো সংবাদই তাহার অগোচর নাই— এমন-কি, হুগলির কাছে গঙ্গার উপর দ্বিতীয় আর-একটা পুল বাঁধা হইতেছে, এ-সমস্ত বড়ো বড়ো খবর তাহার কাছে নিতান্ত ঘরের কথা মাত্র। "শুনেছ ভায়া, গঙ্গার উপর আর-একটা যে পুল বাঁধা হচ্ছে— আজই কালীপদর চিঠি পেয়েছি, তাতে সমস্ত খবর লিখেছে"— বলিয়া চশমা খুলিয়া তাহার কাচ ভালো করিয়া মুছিয়া চিঠিখানা অতি ধীরে ধীরে আদ্যোপান্ত প্রতিবেশীকে পড়িয়া শুনাইলেন। "দেখছ ভায়া! কালে কালে কতই যে কী হবে তার ঠিকানা নেই। শেষকালে ধুলোপায়ে গঙ্গার উপর দিয়ে কুকুরশেয়ালগুলোও পার হয়ে যাবে, কলিতে এও ঘটল হে!" গঙ্গার এইরূপ মাহাত্ম্যখর্ব নিঃসন্দেহই শোচনীয় ব্যাপার, কিন্তু কালীপদ যে কলিকালের এতবড়ো একটা জয়বার্তা তাঁহাকে লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইয়াছে এবং গ্রামের নিতান্ত অজ্ঞ লোকেরা এ খবরটা তাহারই কল্যাণে জানিতে পারিয়াছে, সেই আনন্দে তিনি বর্তমান যুগে জীবের অসীম দুর্গতির দুশ্চিন্তাও অনায়াসে ভুলিতে পারিলেন। যাহার দেখা পাইলেন তাহারই কাছে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "আমি বলে দিচ্ছি, গঙ্গা আর বেশি দিন নাই।" মনে মনে এই আশা করিয়া রহিলেন, গঙ্গা যখনি যাইবার উপক্রম করিবেন তখনি সে খবরটা সর্বপ্রথমে কালীপদর চিঠি হইতেই পাওয়া যাইবে।

এ দিকে কলিকাতায় কালীপদ বহুকষ্টে পরের বাসায় থাকিয়া ছেলে পড়াইয়া রাত্রে হিসাবের খাতা নকল করিয়া পড়াশুনা চালাইতে লাগিল। কোনোমতে এন্ট্রেন্স্ পরীক্ষা পার হইয়া পুনরায় সে বৃত্তি পাইল। এই আশ্চর্য ঘটনা উপলক্ষে সমস্ত গ্রামের লোককে প্রকাণ্ড একটা ভোজ দিবার জন্য ভবানীচরণ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিলেন, তরী তো প্রায় কূলে আসিয়া ভিড়িল— সেই সাহসে এখন হইতে মন

খুলিয়া খরচ করা যাইতে পারে। রাসমণির কাছে কোনো উৎসাহ না পাওয়াতে ভোজটা বন্ধ রহিল।

কালীপদ এবার কলেজের কাছে একটি মেসে আশ্রয় পাইল। মেসের যিনি অধিকারী তিনি তাহাকে নীচের তলার একটি অব্যবহার্য ঘরে থাকিতে অনুমতি দিয়াছেন। কালীপদ বাড়িতে তাঁহার ছেলেকে পড়াইয়া দুইবেলা খাইতে পায় এবং মেসের সেই স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘরে তাহার বাসা। ঘরটার একটা মস্ত সুবিধা এই যে, সেখানে কালীপদর ভাগী কেহ ছিল না। সুতরাং, যদিচ সেখানে বাতাস চলিত না তবু পড়াশুনা অবাধে চলিত। যেমনি হউক, সুবিধা-অসুবিধা বিচার করিবার অবস্থা কালীপদর নহে।

এ মেসে যাহারা ভাড়া দিয়া বাস করে, বিশেষত যাহারা দ্বিতীয় তলের উচ্চলোকে থাকে, তাহাদের সঙ্গে কালীপদর কোনো সম্পর্ক নাই। কিন্তু সম্পর্ক না থাকিলেও সংঘাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না। উচ্চের বজ্রাঘাত নিম্নের পক্ষে কতদূর প্রাণান্তিক কালীপদর তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

এই মেসের উচ্চলোকে ইন্দ্রের সিংহাসন যাহার তাহার পরিচয় আবশ্যক। তাহার নাম শৈলেন্দ্র। সে বড়োমানুষের ছেলে; কলেজে পড়িবার সময় মেসে থাকা তাহার পক্ষে অনাবশ্যক— তবু সে মেসে থাকিতেই ভালোবাসিত।

তাহাদের বৃহৎ পরিবার হইতে কয়েকজন স্ত্রী ও পুরুষ -জাতীয় আত্মীয়কে আনাইয়া কলিকাতায় একটা বাসা ভাড়া করিয়া থাকিবার জন্য বাড়ি হইতে অনুরোধ আসিয়াছিল— সে তাহাতে কোনোমতেই রাজি হয় নাই।

সে কারণ দেখাইয়াছিল যে, বাড়ির লোকজনের সঙ্গে থাকিলে তাহার পড়াশুনা কিছুই হইবে না। কিন্তু আসল কারণটা তাহা নহে। শৈলেন্দ্র লোকজনের সঙ্গ খুবই ভালোবাসে কিন্তু আত্মীয়দের মুশকিল এই যে, কেবলমাত্র তাহাদের সঙ্গটি লইয়া খালাস পাওয়া যায় না, তাহাদের নানা দায় স্বীকার করিতে হয়; কাহারো সম্বন্ধে এটা করিতে নাই, কাহারো সম্বন্ধে ওটা না করিলে অত্যন্ত নিন্দার কথা। এইজন্য শৈলেন্দ্রের পক্ষে সকলের চেয়ে সুবিধার জায়গা মেস। সেখানে লোক যথেষ্ট আছে অথচ তাহার উপর তাহাদের কোনো ভার নাই। তাহারা আসে যায়, হাসে, কথা কয়; তাহারা নদীর জলের মতো, কেবলই বহিয়া চলিয়া যায় অথচ কোথাও লেশমাত্র ছিদ্র রাখে না।

শৈলেন্দ্রের ধারণা ছিল, সে লোক ভালো, যাহাকে বলে সহৃদয়। সকলেই জানেন, এই ধারণাটির মস্ত সুবিধা এই যে, নিজের কাছে ইহাকে বজায় রাখিবার জন্য ভালো

লোক হইবার কোনো দরকার করে না। অহংকার জিনিসটা হাতিঘোড়ার মতো নয়; তাহাকে নিতান্তই অল্প খরচে ও বিনা খোরাকে বেশ মোটা করিয়া রাখা যায়।

কিন্তু শৈলেন্দ্রের ব্যয় করিবার সামর্থ্য ও প্রবৃত্তি ছিল— এইজন্য আপনার অহংকারটাকে সে সম্পূর্ণ বিনা খরচে চরিয়া খাইতে দিত না; দামী খোরাক দিয়া তাহাকে সুন্দর সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল।

বস্তুত শৈলেন্দ্রের মনে দয়া যথেষ্ট ছিল। লোকের দুঃখ দূর করিতে সে সত্যই ভালোবাসিত। কিন্তু এত ভালোবাসিত যে, যদি কেহ দুঃখ দূর করিবার জন্য তাহার শরণাপন্ন না হইত তাহাকে সে বিধিমতে দুঃখ না দিয়া ছাড়িত না। তাহার দয়া যখন নির্দয় হইয়া উঠিত তখন বড়ো ভীষণ আকার ধারণ করিত।

মেসের লোকদিগকে থিয়েটার দেখানো, পাঁঠা খাওয়ানো, টাকা ধার দিয়া সে কথাটাকে সর্বদা মনে করিয়া না রাখা— তাহার দ্বারা প্রায়ই ঘটিত। নবপরিণীত মুগ্ধ যুবক পূজার ছুটিতে বাড়ি যাইবার সময় কলিকাতায় বাসাখরচ সমস্ত শোধ করিয়া যখন নিঃস্ব হইয়া পড়িত তখন বধূর মনোহরণের উপযোগী শৌখিন সাবান এবং এসেন্স্, আর তারই সঙ্গে এক-আধখানি হালের আমদানি বিলাতি ছিটের জ্যাকেট সংগ্রহ করিবার জন্য তাহাকে অত্যন্ত বেশি দুশ্চিন্তায় পড়িতে হইত না। শৈলেনের সুরুচির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া সে বলিত, "তোমাকেই কিন্তু ভাই, পছন্দ করিয়া দিতে হইবে।" দোকানে তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া নিজে নিতান্ত সস্তা এবং বাজে জিনিস বাছিয়া তুলিত; তখন শৈলেন তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিত, "আরে ছি ছি, তোমার কিরকম পছন্দ।" বলিয়া সব চেয়ে শৌখিন জিনিসটি টানিয়া তুলিত। দোকানদার আসিয়া বলিত, "হাঁ, ইনি জিনিস চেনেন বটে।" খরিদ্দার দামের কথা আলোচনা করিয়া মুখ বিমর্ষ করিতেই শৈলেন দাম চুকাইবার অকিঞ্চিৎকর ভারটা নিজেই লইত— অপর পক্ষের ভূয়োভূয়ঃ আপত্তিতেও কর্ণপাত করিত না।

এমনি করিয়া, যেখানে শৈলেন ছিল সেখানে সে চারি দিকের সকলেরই সকল বিষয়ে আশ্রয়স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। কেহ তাহার আশ্রয় স্বীকার না করিলে তাহার সেই ঔদ্ধত্য সে কোনোমতেই সহ্য করিতে পারিত না। লোকের হিত করিবার শখ তাহার এতই প্রবল।

বেচারা কালীপদ নীচের স্যাঁতসেঁতে ঘরে ময়লা মাদুরের উপর বসিয়া একখানা ছেঁড়া গেঞ্জি পরিয়া বইয়ের পাতায় চোখ গুঁজিয়া দুলিতে দুলিতে পড়া মুখস্থ করিত। যেমন করিয়া হউক তাহাকে স্কলারশিপ পাইতেই হইবে।

মা তাহাকে কলিকাতায় আসিবার পূর্বে মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন

বড়োমানুষের ছেলের সঙ্গে মেশামেশি করিয়া সে যেন আমোদপ্রমোদে মাতিয়া না ওঠে। কেবল মাতার আদেশ বলিয়া নহে, কালীপদকে যে দৈন্য স্বীকার করিতে হইয়াছিল তাহা রক্ষা করিয়া বড়োমানুষের ছেলের সঙ্গে মেলা তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। সে কোনোদিন শৈলেনের কাছে ঘেঁষে নাই— এবং যদিও সে জানিত, শৈলেনের মন পাইলে তাহার প্রতিদিনের অনেক দুরূহ সমস্যা এক মুহূর্তেই সহজ হইয়া যাইতে পারে তবু কোনো কঠিন সংকটেও তাহার প্রসাদলাভের প্রতি কালীপদর লোভ আকৃষ্ট হয় নাই। সে আপনার অভাব লইয়া আপনার দারিদ্র্যের নিভৃত অন্ধকারের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া বাস করিত।

গরিব হইয়া তবু দূরে থাকিবে শৈলেন এই অহংকারটা কোনোমতেই সহিতে পারিল না। তা ছাড়া অশনে বসনে কালীপদর দারিদ্র্যটা এতই প্রকাশ্য যে তাহা নিতান্ত দৃষ্টিকটু। তাহার অত্যন্ত দীনহীন কাপড়চোপড় এবং মশারি বিছানা যখনি দোতলার সিঁড়ি উঠিতে চোখে পড়িত তখনি সেটা যেন একটা অপরাধ বলিয়া মনে বাজিত। ইহার পরে, তাহার গলায় তাবিজ ঝুলানো, এবং সে দুই সন্ধ্যা যথাবিধি আহ্নিক করিত। তাহার এই-সকল অদ্ভুত গ্রাম্যতা উপরের দলের পক্ষে বিষম হাস্যকর ছিল। শৈলেনের পক্ষের দুই-একটি লোক এই নিভৃতবাসী নিরীহ লোকটির রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবার জন্য দুই-চারিদিন তাহার ঘরে আনাগোনা করিল। কিন্তু এই মুখচোরা মানুষের মুখ তাহারা খুলিতে পারিল না। তাহার ঘরে বেশিক্ষণ বসিয়া থাকা সুখকর নহে, স্বাস্থ্যকর তো নয়ই, কাজেই ভঙ্গ দিতে হইল।

তাহাদের পাঁঠার মাংসের ভোজে এই অকিঞ্চনকে একদিন আহ্বান করিলে সে নিশ্চয়ই কৃতার্থ হইবে, এই কথা মনে করিয়া অনুগ্রহ করিয়া একদা নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হইল। কালীপদ জানাইল, ভোজের ভোজ্য সহ্য করা তাহার সাধ্য নহে, তাহার অভ্যাস অন্যরূপ ; এই প্রত্যাখ্যানে দলবল-সমেত শৈলেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

কিছুদিন তাহার ঠিক উপরের ঘরটাতে এমনি ধুপধাপ শব্দ ও সবেগে গানবাজনা চলিতে লাগিল যে, কালীপদর পক্ষে পড়ায় মন দেওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। দিনের বেলায় সে যথাসম্ভব গোলদিঘিতে এক গাছের তলে বই লইয়া পড়া করিত এবং রাত্রি থাকিতে উঠিয়া খুব ভোরের দিকে একটা প্রদীপ জ্বালিয়া অধ্যয়নে মন দিত।

কলিকাতায় আহার ও বাসস্থানের কষ্টে এবং অতিপরিশ্রমে কালীপদর একটা মাথাধরার ব্যামো উপসর্গ জুটিল। কখনো কখনো এমন হইত তিন-চারিদিন তাহাকে পড়িয়া থাকিতে হইত। সে নিশ্চয় জানিত, এ সংবাদ পাইলে তাহার পিতা তাহাকে কখনোই কলিকাতায় থাকিতে দিবেন না এবং তিনি ব্যাকুল হইয়া হয়তো বা

কলিকাতা পর্যন্ত ছুটিয়া আসিবেন। ভবানীচরণ জানিতেন কলিকাতায় কালীপদ এমন সুখে আছে যাহা গ্রামের লোকের পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব। পাড়াগাঁয়ে যেমন গাছপালা ঝোপঝাড় আপনিই জন্মে কলিকাতার হাওয়ায় সর্বপ্রকার আরামের উপকরণ যেন সেইরূপ আপনিই উৎপন্ন হয় এবং সকলেই তাহার ফলভোগ করিতে পারে এইরূপ তাঁহার একটা ধারণা ছিল। কালীপদ কোনোমতেই তাঁহার সে ভুল ভাঙে নাই। অসুখের অত্যন্ত কষ্টের সময়ও সে একদিনও পিতাকে পত্র লিখিতে ছাড়ে নাই। কিন্তু এইরূপ পীড়ার দিনে শৈলেনের দল যখন গোলমাল করিয়া ভূতের কাণ্ড করিতে থাকিত তখন কালীপদর কষ্টের সীমা থাকিত না। সে কেবল এপাশ ওপাশ করিত এবং জনশূন্য ঘরে পড়িয়া মাতাকে ডাকিত ও পিতাকে স্মরণ করিত। দারিদ্র্যের অপমান ও দুঃখ এইরূপে যতই সে ভোগ করিত ততই ইহার বন্ধন হইতে তাহার পিতামাতাকে মুক্ত করিবেই, এই প্রতিজ্ঞা তাহার মনে কেবলই দৃঢ় হইয়া উঠিত।

কালীপদ নিজেকে অত্যন্ত সংকুচিত করিয়া সকলের লক্ষ্য হইতে সরাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাতে উৎপাত কিছুমাত্র কমিল না। কোনোদিন বা সে দেখিল, তাহার চিনাবাজারের পুরাতন সস্তা জুতার একপাটির পরিবর্তে একটি অতি উত্তম বিলাতি জুতার পাটি। এরূপ বিসদৃশ জুতা পরিয়া কলেজে যাওয়াই অসম্ভব। সে এ সম্বন্ধে কোনো নালিশ না করিয়া পরের জুতার পাটি ঘরের বাহিরে রাখিয়া দিল এবং জুতা-মেরামতওয়ালা মুচির নিকট হইতে অল্প দামের পুরাতন জুতা কিনিয়া কাজ চালাইতে লাগিল। একদিন উপর হইতে একজন ছেলে হঠাৎ কালীপদর ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি ভুলিয়া আমার ঘর হইতে আমার সিগারেটের কেস্‌টা লইয়া আসিয়াছেন। আমি কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছি না।" কালীপদ বিরক্ত হইয়া বলিল, "আমি আপনাদের ঘরে যাই নাই।" "এই যে, এইখানেই আছে" বলিয়া সেই লোকটি ঘরের এক কোণ হইতে মূল্যবান একটি সিগারেটের কেস্‌ তুলিয়া লইয়া আর কিছু না বলিয়া উপরে চলিয়া গেল।

কালীপদ মনে মনে স্থির করিল, 'এফ. এ. পরীক্ষায় যদি ভালোরকম বৃত্তি পাই তবে এই মেস ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।'

মেসের ছেলেরা মিলিয়া প্রতিবৎসর ধুম করিয়া সরস্বতীপূজা করে। তাহার ব্যয়ের প্রধান অংশ শৈলেন বহন করে কিন্তু সকল ছেলেই চাঁদা দিয়া থাকে। গত বৎসর নিতান্তই অবজ্ঞা করিয়া কালীপদর কাছে কেহ চাঁদা চাহিতেও আসে নাই। এ বৎসর কেবল তাহাকে বিরক্ত করিবার জন্যই তাহার নিকট চাঁদার খাতা আনিয়া

ধরিল। যে দলের নিকট হইতে কোনোদিন কালীপদ কিছুমাত্র সাহায্য লয় নাই, যাহাদের প্রায় নিত্য-অনুষ্ঠিত আমোদপ্রমোদে যোগ দিবার সৌভাগ্য সে একেবারে অস্বীকার করিয়াছে, তাহারা যখন কালীপদর কাছে চাঁদার সাহায্য চাহিতে আসিল তখন জানি না সে কী মনে করিয়া পাঁচটা টাকা দিয়া ফেলিল। পাঁচ টাকা শৈলেন তাহার দলের লোক কাহারো নিকট হইতে পায় নাই।

কালীপদর দারিদ্র্যের কৃপণতায় এ পর্যন্ত সকলেই তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আজ তাহার এই পাঁচ টাকা দান তাহাদের একেবারে অসহ্য হইল। 'উহার অবস্থা যে কিরূপ তাহা তো আমাদের অগোচর নাই তবে উহার এত বড়াই কিসের। ও যে দেখি সকলকে টেক্কা দিতে চায়।'

সরস্বতীপূজা ধুম করিয়া হইল— কালীপদ যে পাঁচটা টাকা দিয়াছিল তাহা না দিলেও কোনো ইতরবিশেষ হইত না। কিন্তু কালীপদর পক্ষে সে কথা বলা চলে না। পরের বাড়িতে তাহাকে খাইতে হইত— সকল দিন সময়মত আহার জুটিত না। তা ছাড়া পাকশালার ভৃত্যরাই তাহার ভাগ্যবিধাতা, সুতরাং ভালোমন্দ কমিবেশি সম্বন্ধে কোনো অপ্রিয় সমালোচনা না করিয়া জলখাবারের জন্য কিছু সম্বল তাহাকে হাতে রাখিতেই হইত। সেই সংগতিটুকু গাঁদাফুলের শুষ্ক স্তূপের সঙ্গে বিসর্জিত দেবীপ্রতিমার পশ্চাতে অন্তর্ধান করিল।

কালীপদর মাথাধরার উৎপাত বাড়িয়া উঠিল। এবার পরীক্ষায় সে ফেল করিল না বটে কিন্তু বৃত্তি পাইল না। কাজেই পড়িবার সময় সংকোচ করিয়া তাহাকে আরো একটি টুইশনির জোগাড় করিয়া লইতে হইল। এবং বিস্তর উপদ্রব সত্ত্বেও বিনা ভাড়ার বাসাটুকু ছাড়িতে পারিল না।

উপরিতলবাসীরা আশা করিয়াছিল এবার ছুটির পরে নিশ্চয়ই কালীপদ এ মেসে আর আসিবে না। কিন্তু যথাসময়েই তাহার সেই নীচের ঘরটার তালা খুলিয়া গেল। ধুতির উপর সেই তাহার চিরকেলে চেককাটা চায়নাকোট পরিয়া কালীপদ কোটরের মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং একটা ময়লা কাপড়ে বাঁধা মস্ত পুঁটুলি -সমেত টিনের বাক্স নামাইয়া রাখিয়া শেয়ালদহের মুটে তাহার ঘরের সম্মুখে উবু হইয়া বসিয়া অনেক বাদ-প্রতিবাদ করিয়া ভাড়া চুকাইয়া লইল। ওই পুঁটুলিটার গর্ভে নানা হাঁড়ি খুরি ভাণ্ডের মধ্যে কালীপদর মা কাঁচা আম কুল চালতা প্রভৃতি উপকরণে নানাপ্রকার মুখরোচক পদার্থ তৈরি করিয়া নিজে সাজাইয়া দিয়াছেন। কালীপদ জানিত তাহার অবর্তমানে কৌতুকপরায়ণ উপরতলার দল তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া থাকে। তাহার আর-কোনো ভাবনা ছিল না, কেবল তাহার বড়ো সংকোচ ছিল পাছে তাহার পিতামাতার

কোনো স্নেহের নিদর্শন এই বিদ্রূপকারীদের হাতে পড়ে। তাহার মা তাহাকে যে খাবার জিনিসগুলি দিয়াছেন এ তাহার পক্ষে অমৃত— কিন্তু এ-সমস্তই তাহার দরিদ্র গ্রাম্যঘরের আদরের ধন ; যে আধারে সেগুলি রক্ষিত সেই ময়দা দিয়া আঁটা সরা-ঢাকা হাঁড়ি, তাহার মধ্যেও শহরের ঐশ্বর্যসজ্জার কোনো লক্ষণ নাই, তাহা কাচের পাত্র নয়, তাহা চিনামাটির ভাণ্ডও নহে— কিন্তু এইগুলিকে কোনো শহরের ছেলে যে অবজ্ঞা করিয়া দেখিবে ইহা তাহার পক্ষে একেবারেই অসহ্য। আগের বারে তাহার এই-সমস্ত বিশেষ জিনিসগুলিকে তক্তাপোশের নীচে পুরানো খবরের কাগজ প্রভৃতি চাপা দিয়া প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। এবারে তালাচাবির আশ্রয় লইল। যখন সে পাঁচ-মিনিটের জন্যও ঘরের বাহিরে যাইত ঘরে তালা বন্ধ করিয়া যাইত।

এটা সকলেরই চোখে লাগিল। শৈলেন বলিল, "ধনরত্ন তো বিস্তর! ঘরে ঢুকিলে চোরের চক্ষে জল আসে— সেই ঘরে ঘন ঘন তালা পড়িতেছে— একেবারে দ্বিতীয় ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল হইয়া উঠিল দেখিতেছি। আমাদের কাহাকেও বিশ্বাস নাই— পাছে ওই পাবনার ছিটের চায়নাকোটটার লোভ সামলাইতে না পারি। ওহে রাধু, ওকে একটা ভদ্রগোছের নূতন কোট কিনিয়া না দিলে তো কিছুতেই চলিতেছে না। চিরকাল ওর ওই একমাত্র কোট দেখিতে দেখিতে আমার বিরক্ত ধরিয়া গেছে।"

শৈলেন কোনোদিন কালীপদর ওই লোনাধরা চুনবালি-খসা অন্ধকার ঘরটার মধ্যে প্রবেশ করে নাই। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার সময় বাহির হইতে দেখিলেই তাহার সর্বশরীর সংকুচিত হইয়া উঠিত। বিশেষত সন্ধ্যার সময় যখন দেখিত একটা টিম্‌টিমে প্রদীপ লইয়া একলা সেই বায়ুশূন্য বদ্ধ ঘরে কালীপদ গা খুলিয়া বসিয়া বইয়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া পড়া করিতেছে তখন তাহার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিত। দলের লোককে শৈলেন বলিল, "এবারে কালীপদ কোন্‌ সাতরাজার-ধন মানিক আহরণ করিয়া আনিয়াছে সেটা তোমরা খুঁজিয়া বাহির করো।" এই কৌতুকে সকলেই উৎসাহ প্রকাশ করিল।

কালীপদর ঘরের তালাটি নিতান্তই অল্প দামের তালা— তাহার নিষেধ খুব প্রবল নিষেধ নহে— প্রায় সকল চাবিতেই এ তালা খোলে। একদিন সন্ধ্যার সময় কালীপদ যখন ছেলে পড়াইতে গিয়াছে সেই অবকাশে জনদুই-তিন অত্যন্ত আমুদে ছেলে হাসিতে হাসিতে তালা খুলিয়া একটা লণ্ঠন হাতে তাহার ঘরে প্রবেশ করিল। তক্তাপোশের নীচে হইতে আচার চাটনি আমসত্ত্ব প্রভৃতির ভাণ্ডগুলিকে আবিষ্কার করিল। কিন্তু সেগুলি যে বহুমূল্য গোপনীয় সামগ্রী তাহা তাহাদের মনে হইল না।

খুঁজিতে খুঁজিতে বালিশের নীচে হইতে রিংসমেত এক চাবি বাহির হইল। সেই

চাবি দিয়া টিনের বাক্সটা খুলিতেই কয়েকটা ময়লা কাপড়, বই, খাতা, কাঁচি, ছুরি, কলম ইত্যাদি চোখে পড়িল। বাক্স বন্ধ করিয়া তাহারা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে এমন সময়ে সমস্ত কাপড়চোপড়ের নীচে রুমালে মোড়া একটা কী পদার্থ বাহির হইল। রুমাল খুলিতেই ছেঁড়া কাপড়ের মোড়ক দেখা দিল। সেই মোড়কটি খোলা হইলে একটির পর আর-একটি প্রায় তিন-চারখানা কাগজের আবরণ ছাড়াইয়া ফেলিয়া একখানি পঞ্চাশ টাকার নোট বাহির হইয়া পড়িল।

এই নোটখানা দেখিয়া আর কেহ হাসি রাখিতে পারিল না। হো হো করিয়া উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল। সকলেই স্থির করিল, এই নোটখানারই জন্যে কালীপদ ঘন ঘন ঘরে চাবি লাগাইতেছে, পৃথিবীর কোনো লোককেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। লোকটার কৃপণতা এবং সন্দিগ্ধ প্রকৃতিতে শৈলেনের প্রসাদপ্রত্যাশী সহচরগুলি বিস্মিত হইয়া উঠিল।

এমন সময় হঠাৎ মনে হইল, রাস্তায় কালীপদর মতো যেন কাহার কাশি শোনা গেল। তৎক্ষণাৎ বাক্সটার ডালা বন্ধ করিয়া, নোটখানা হাতে লইয়াই তাহারা উপরে ছুটিল। একজন তাড়াতাড়ি দরজায় তালা লাগাইয়া দিল।

শৈলেন সেই নোটখানা দেখিয়া অত্যন্ত হাসিল। পঞ্চাশ টাকা শৈলেনের কাছে কিছুই নয়, তবু এত টাকাও যে কালীপদর বাক্সে ছিল তাহা তাহার ব্যবহার দেখিয়া কেহ অনুমান করিতে পারিত না। তাহার পরে আবার এই নোটটুকুর জন্য এত সাবধান! সকলেই স্থির করিল, দেখা যাক এই টাকাটা খোয়া গিয়া এই অদ্ভুত লোকটি কিরকম কাণ্ডটা করে।

রাত্রি নটার পর ছেলে পড়াইয়া শ্রান্তদেহে কালীপদ ঘরের অবস্থা কিছুই লক্ষ করে নাই। বিশেষত মাথা তাহার যেন ছিঁড়িয়া পড়িতেছিল। বুঝিয়াছিল এখন কিছুদিন তাহার এই মাথার যন্ত্রণা চলিবে।

পরদিন সে কাপড় বাহির করিবার জন্য তক্তাপোশের নীচে হইতে টিনের বাক্সটা টানিয়া দেখিল বাক্সটা খোলা। যদিচ কালীপদ স্বভাবত অসাবধান নয় তবু তাহার মনে হইল হয়তো সে চাবি বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। কারণ, ঘরে যদি চোর আসিত তবে বাহিরের দরজায় তালা বন্ধ থাকিত না।

বাক্স খুলিয়া দেখে তাহার কাপড়চোপড় সমস্ত উলটপালট। তাহার বুক দমিয়া গেল। তাড়াতাড়ি সমস্ত জিনিসপত্র বাহির করিয়া দেখিল তাহার সেই মাতৃদত্ত নোটখানি নাই। কাগজ ও কাপড়ের মোড়কগুলা আছে। বারবার করিয়া কালীপদ সমস্ত কাপড় সবলে ঝাড়া দিতে লাগিল, নোট বাহির হইল না। এ দিকে উপরের তলায়

দুই-একটি করিয়া লোক যেন আপন কাজে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া সেই ঘরটার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বারবার উঠানামা করিতে লাগিল। উপরে অট্টহাস্যের ফোয়ারা খুলিয়া গেল।

যখন নোটের কোনো আশাই রহিল না এবং মাথার কষ্টে যখন জিনিসপত্র নাড়ানাড়ি করা তাহার পক্ষে আর সম্ভবপর হইল না তখন সে বিছানার উপর উপুড় হইয়া মৃতদেহের মতো পড়িয়া রহিল। এই তাহার মাতার অনেক দুঃখের নোটখানি —জীবনের কত মুহূর্তকে কঠিন যন্ত্রে পেষণ করিয়া দিনে দিনে একটু একটু করিয়া এই নোটখানি সঞ্চিত হইয়াছে। একদা এই দুঃখের ইতিহাস সে কিছুই জানিত না, সেদিন সে তাহার মাতার ভারের উপর ভার কেবল বাড়াইয়াছে, অবশেষে যেদিন মা তাহাকে তাঁহার প্রতিদিনের নিয়ত-আবর্তমান দুঃখের সঙ্গী করিয়া লইলেন সেদিনকার মতো এমন গৌরব সে তাহার বয়সে আর-কখনো ভোগ করে নাই। কালীপদ আপনার জীবনে সব চেয়ে যে বড়ো বাণী, যে মহত্তম আশীর্বাদ পাইয়াছে, এই নোটখানির মধ্যে তাহাই পূর্ণ হইয়া ছিল। সেই তাহার মাতার অতলস্পর্শ স্নেহসমুদ্রমন্থন-করা অমূল্য দুঃখের উপহারটুকু চুরি যাওয়াকে সে একটা পৈশাচিক অভিশাপের মতো মনে করিল। পাশের সিঁড়ির উপর দিয়া পায়ের শব্দ আজ বারবার শোনা যাইতে লাগিল। অকারণ ওঠা এবং নামার আজ আর বিরাম নাই। গ্রামে আগুন লাগিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে আর ঠিক তাহার পাশ দিয়াই কৌতুকে কলশব্দে নদী অবিরত ছুটিয়া চলিয়াছে, এও সেইরকম।

উপরের তলার অট্টহাস্য শুনিয়া এক সময়ে কালীপদর হঠাৎ মনে হইল এ চোরের কাজ নয়; এক মুহূর্তে সে বুঝিতে পারিল শৈলেন্দ্রের দল কৌতুক করিয়া তাহার এই নোট লইয়া গিয়াছে। চোরে চুরি করিলেও তাহার মনে এত বাজিত না। তাহার মনে হইতে লাগিল যেন ধনমদগর্বিত যুবকেরা তাহার মায়ের গায়ে হাত তুলিয়াছে। এতদিন কালীপদ এই মেসে আছে, এই সিঁড়িটুকু বাহিয়া একদিনও সে উপরের তলায় পদার্পণও করে নাই। আজ তাহার গায়ে সেই ছেঁড়া গেঞ্জি, পায়ে জুতা নাই, মনের আবেগে এবং মাথাধরার উত্তেজনায় তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে— সবেগে সে উপরে উঠিয়া পড়িল।

আজ রবিবার— কলেজে যাইবার উপসর্গ ছিল না, কাঠের ছাদওয়ালা বারান্দায় বন্ধুগণ কেহ-বা চৌকিতে, কেহ-বা বেতের মোড়ায় বসিয়া হাস্যালাপ করিতেছিল। কালীপদ তাহাদের মাঝখানে ছুটিয়া পড়িয়া ক্রোধগদ্‌গদস্বরে বলিয়া উঠিল, "দিন, আমার নোট দিন।"

যদি সে মিনতির স্বরে বলিত তবে ফল পাইত সন্দেহ নাই। কিন্তু উন্মত্তবৎ ক্রুদ্ধমূর্তি দেখিয়া শৈলেন অত্যন্ত খাপা হইয়া উঠিল। যদি তাহার বাড়ির দারোয়ান থাকিত তবে তাহাকে দিয়া এই অসভ্যকে কান ধরিয়া দূর করিয়া দিত সন্দেহ নাই। সকলেই দাঁড়াইয়া উঠিয়া একত্রে গর্জন করিয়া উঠিল, "কী বলেন মশায়। কিসের নোট।"

কালীপদ কহিল, "আমার বাক্স থেকে আপনারা নোট নিয়ে এসেছেন।"

"এতবড়ো কথা! আমাদের চোর বলতে চান!"

কালীপদর হাতে যদি কিছু থাকিত তবে সেই মুহূর্তেই সে খুনোখুনি করিয়া ফেলিত। তাহার রকম দেখিয়া চার-পাঁচজনে মিলিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। সে জালবদ্ধ বাঘের মতো গুমরাইতে লাগিল।

এই অন্যায়ের প্রতিকার করিবার তাহার কোনো শক্তি নাই, কোনো প্রমাণ নাই— সকলেই তাহার সন্দেহকে উন্মত্ততা বলিয়া উড়াইয়া দিবে। যাহারা তাহাকে মৃত্যুবাণ মারিয়াছে তাহারা তাহার ঔদ্ধত্যকে অসহ্য বলিয়া বিষম আস্ফালন করিতে লাগিল।

সে রাত্রি যে কালীপদর কেমন করিয়া কাটিল তাহা কেহ জানিতে পারিল না। শৈলেন একখানা একশো টাকার নোট বাহির করিয়া বলিল, "দাও, বাঙালটাকে দিয়ে এসো গে যাও।"

সহচররা কহিল, "পাগল হয়েছ! তেজটুকু আগে মরুক— আমাদের সকলের কাছে একটা রিট্ন অ্যাপলজি আগে দিক, তার পরে বিবেচনা করে দেখা যাবে।"

যথাসময়ে সকলে শুইতে গেল এবং ঘুমাইয়া পড়িতেও কাহারো বিলম্ব হইল না। সকালে কালীপদর কথা প্রায় সকলে ভুলিয়াই গিয়াছিল। সকালে কেহ কেহ সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিবার সময় তাহার ঘর হইতে কথা শুনিতে পাইল। ভাবিল হয়তো উকিল ডাকিয়া পরামর্শ করিতেছে। দরজা ভিতর হইতে খিল-লাগানো। বাহিরে কান পাতিয়া যাহা শুনিল তাহার মধ্যে আইনের কোনো সংস্রব নাই, সমস্ত অসম্বদ্ধ প্রলাপ।

উপরে গিয়া শৈলেনকে খবর দিল। শৈলেন নামিয়া আসিয়া দরজার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। কালীপদ কী যে বকিতেছে ভালো বোঝা যাইতেছে না, কেবল ক্ষণে ক্ষণে 'বাবা' 'বাবা' করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছে।

ভয় হইল, হয়তো সে নোটের শোকে পাগল হইয়া গিয়াছে। বাহির হইতে দুই-তিনবার ডাকিল, "কালীপদবাবু।" কেহ কোনো সাড়া দিল না। কেবল সেই

বিড়্‌বিড়্‌ বকুনি চলিতে লাগিল। শৈলেন পুনশ্চ উচ্চস্বরে কহিল, "কালীপদবাবু, দরজা খুলুন, আপনার সেই নোট পাওয়া গেছে।" দরজা খুলিল না, কেবল বকুনির গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল।

ব্যাপারটা যে এতদূর গড়াইবে তাহা শৈলেন কল্পনাও করে নাই। সে মুখে তাহার অনুচরদের কাছে অনুতাপবাক্য প্রকাশ করিল না, কিন্তু তাহার মনের মধ্যে বিঁধিতে লাগিল। সে বলিল, "দরজা ভাঙিয়া ফেলা যাক।"— কেহ কেহ পরামর্শ দিল, "পুলিস ডাকিয়া আনো— কী জানি পাগল হইয়া যদি হঠাৎ কিছু করিয়া বসে— কাল যেরকম কাণ্ড দেখিয়াছি— সাহস হয় না।"

শৈলেন কহিল, "না, শীঘ্র একজন গিয়া অনাদি ডাক্তারকে ডাকিয়া আনো।"

অনাদি ডাক্তার বাড়ির কাছেই থাকেন। তিনি আসিয়া দরজায় কান দিয়া বলিলেন, "এ তো বিকার বলিয়াই বোধ হয়।"

দরজা ভাঙিয়া ভিতরে গিয়া দেখা গেল— তক্তাপোশের উপর এলোমেলো বিছানা খানিকটা ভ্রষ্ট হইয়া মাটিতে লুটাইতেছে। কালীপদ মেজের উপর পড়িয়া— তাহার চেতনা নাই। সে গড়াইতেছে, ক্ষণে ক্ষণে হাত-পা ছুঁড়িতেছে এবং প্রলাপ বকিতেছে— তাহার রক্তবর্ণ চোখ দুটো খোলা এবং তাহার মুখে যেন রক্ত ফাটিয়া পড়িতেছে।

ডাক্তার তাহার পাশে বসিয়া অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া শৈলেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার আত্মীয় কেহ আছে?"

শৈলেনের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বলুন দেখি।"

ডাক্তার গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "খবর দেওয়া ভালো, লক্ষণ ভালো নয়।"

শৈলেন কহিল, "ইহাদের সঙ্গে আমাদের ভালো আলাপ নাই— আত্মীয়ের খবর কিছুই জানি না। সন্ধান করিব। কিন্তু ইতিমধ্যে কী করা কর্তব্য।"

ডাক্তার কহিলেন, "এ ঘর হইতে রোগীকে এখনি দোতলার কোনো ভালো ঘরে লইয়া যাওয়া উচিত। দিনরাত শুশ্রূষার ব্যবস্থা করাও চাই।"

শৈলেন রোগীকে তাহার নিজের ঘরে লইয়া গেল। তাহার সহচরদের সকলকে ভিড় করিতে নিষেধ করিয়া ঘর হইতে বিদায় করিয়া দিল। কালীপদর মাথায় বরফের পুঁটুলি লাগাইয়া নিজের হাতে বাতাস করিতে লাগিল।

পূর্বেই বলিয়াছি, এই বাড়ির উপরতলার দলে পাছে কোনোপ্রকার অবজ্ঞা বা পরিহাস করে এইজন্য নিজের পিতামাতার সকল পরিচয় কালীপদ ইহাদের নিকট

হইতে গোপন করিয়া চলিয়াছে। নিজে তাঁহাদের নামে যে চিঠি লিখিত তাহা সাবধানে ডাকঘরে দিয়া আসিত এবং ডাকঘরের ঠিকানাতেই তাহার নামে চিঠি আসিত— প্রত্যহ সে নিজে গিয়া তাহা সংগ্রহ করিয়া আনিত।

কালীপদর বাড়ির পরিচয় লইবার জন্য আর-একবার তাহার বাক্স খুলিতে হইল। তাহার বাক্সের মধ্যে দুইতাড়া চিঠি ছিল। প্রত্যেক তাড়াটি অতিযত্নে ফিতা দিয়া বাঁধা। একটি তাড়াতে তাহার মাতার চিঠি— আর একটিতে তাহার পিতার। মায়ের চিঠি সংখ্যায় অল্পই, পিতার চিঠিই বেশি।

চিঠিগুলি হাতে করিয়া আনিয়া শৈলেন দরজা বন্ধ করিয়া দিল এবং রোগীর বিছানার পার্শ্বে বসিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। চিঠিতে ঠিকানা পড়িয়াই একেবারে চমকিয়া উঠিল। শানিয়াড়ি, চৌধুরীবাড়ি, ছয় আনি! নীচে নাম দেখিল, ভবানীচরণ দেবশর্মা। ভবানীচরণ চৌধুরী!

চিঠি রাখিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া সে কালীপদর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুদিন পূর্বে একবার তাহার সহচরদের মধ্যে কে একজন বলিয়াছিল, তাহার মুখের সঙ্গে কালীপদর মুখের অনেকটা আদল আসে। সে কথাটা তাহার শুনিতে ভালো লাগে নাই এবং অন্য-সকলে তাহা একেবারে উড়াইয়া দিয়াছিল। আজ বুঝিতে পারিল, সে কথাটা অমূলক নহে। তাহার পিতামহরা দুই ভাই ছিলেন— শ্যামাচরণ এবং ভবানীচরণ, এ কথা সে জানিত। তাহার পরবর্তীকালের ইতিহাস তাহাদের বাড়িতে কখনো আলোচিত হয় নাই। ভবানীচরণের যে পুত্র আছে এবং তাহার নাম কালীপদ, তাহা সে জানিতই না। এই কালীপদ! এই তাহার খুড়া!

শৈলেনের তখন মনে পড়িতে লাগিল, শৈলেনের পিতামহী, শ্যামাচরণের স্ত্রী যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, শেষ পর্যন্ত পরমস্নেহে তিনি ভবানীচরণের কথা বলিতেন। ভবানীচরণের নাম করিতে তাঁহার দুই চক্ষে জল ভরিয়া উঠিত। ভবানীচরণ তাঁহার দেবর বটে, কিন্তু তাঁহার পুত্রের চেয়ে বয়সে ছোটো— তাহাকে তিনি আপন ছেলের মতোই মানুষ করিয়াছেন। বৈষয়িক বিপ্লবে যখন তাঁহারা স্বতন্ত্র হইয়া গেলেন, তখন ভবানীচরণের একটু খবর পাইবার জন্য তাঁহার বক্ষ তৃষিত হইয়া থাকিত। তিনি বারবার তাঁহার ছেলেদের বলিয়াছেন, 'ভবানীচরণ নিতান্ত অবুঝ ভালোমানুষ বলিয়া নিশ্চয়ই তোরা তাহাকে ফাঁকি দিয়াছিস— আমার শ্বশুর তাহাকে এত ভালোবাসিতেন, তিনি যে তাহাকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়া যাইবেন এ কথা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না।' তাঁহার ছেলেরা এ-সব কথায় অত্যন্ত বিরক্ত হইত এবং শৈলেনের মনে পড়িল সে'ও তাহার পিতামহীর উপর অত্যন্ত রাগ করিত। এমন কি, পিতামহী

তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিতেন বলিয়া ভবানীচরণের উপরেও তাহার ভারি রাগ হইত। বর্তমানে ভবানীচরণের যে এমন দরিদ্র অবস্থা তাহাও সে জানিত না— কালীপদর অবস্থা দেখিয়া সকল কথা সে বুঝিতে পারিল এবং এতদিন সহস্র প্রলোভন সত্ত্বেও কালীপদ যে তাহার অনুচরশ্রেণীতে ভরতি হয় নাই ইহাতে সে ভারি গৌরব অনুভব করিল। যদি দৈবাৎ কালীপদ তাহার অনুবর্তী হইত তবে আজ যে তাহার লজ্জার সীমা থাকিত না।

৪

শৈলেনের দলের লোকেরা এতদিন প্রত্যহই কালীপদকে পীড়ন ও অপমান করিয়াছে। এই বাসাতে তাহাদের মাঝখানে কাকাকে শৈলেন রাখিতে পারিল না। ডাক্তারের পরামর্শ লইয়া অতিযত্নে তাহাকে একটা ভালো বাড়িতে স্থানান্তরিত করিল।

ভবানীচরণ শৈলেনের চিঠি পাইয়া একটি সঙ্গী আশ্রয় করিয়া তাড়াতাড়ি কলিকাতায় ছুটিয়া আসিলেন। আসিবার সময় ব্যাকুল হইয়া রাসমণি তাঁহার কষ্ট-সঞ্চিত অর্থের অধিকাংশই তাঁহার স্বামীর হাতে দিয়া বলিলেন, "দেখো যেন অযত্ন না হয়। যদি তেমন বোঝ আমাকে খবর দিলেই আমি যাব।" চৌধুরীবাড়ির বধূর পক্ষে হট্‌হট্ করিয়া কলিকাতায় যাওয়ার প্রস্তাব এতই অসংগত যে প্রথম সংবাদেই তাঁহার যাওয়া ঘটিল না। তিনি রক্ষাকালীর নিকট মানত করিলেন এবং গ্রহাচার্যকে ডাকিয়া স্বস্ত্যয়ন করাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

ভবানীচরণ কালীপদর অবস্থা দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। কালীপদর তখন ভালো করিয়া জ্ঞান হয় নাই; সে তাঁহাকে মাস্টারমশায় বলিয়া ডাকিল— ইহাতে তাঁহার বুক ফাটিয়া গেল। কালীপদ প্রায় মাঝে মাঝে প্রলাপে 'বাবা' 'বাবা' বলিয়া ডাকিয়া উঠিতেছিল— তিনি তাহার হাত ধরিয়া তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া উচ্চস্বরে বলিতেছিলেন, "এই-যে বাবা, এই-যে আমি এসেছি।" কিন্তু সে যে তাঁকে চিনিয়াছে এমন ভাব প্রকাশ করিল না।

ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, "জ্বর পূর্বের চেয়ে কিছু কমিয়াছে, হয়তো এবার ভালোর দিকে যাইবে।" কালীপদ ভালোর দিকে যাইবে না এ কথা ভবানীচরণ মনেই করিতে পারেন না। বিশেষত তাহার শিশুকাল হইতে সকলেই বলিয়া আসিতেছে কালীপদ বড়ো হইয়া একটা অসাধ্য সাধন করিবে— সেটাকে ভবানীচরণ কেবলমাত্র লোকমুখের কথা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই— সে বিশ্বাস একেবারে তাঁহার সংস্কারগত হইয়া গিয়াছিল। কালীপদকে বাঁচিতেই হইবে, এ তাহার ভাগ্যের লিখন।

এই কারণে, ডাক্তার যতটুকু ভালো বলে তিনি তাহার চেয়ে অনেক বেশি ভালো শুনিয়া বসেন এবং রাসমণিকে যে পত্র লেখেন তাহাতে আশঙ্কার কোনো কথাই থাকে না।

শৈলেন্দ্রের ব্যবহারে ভবানীচরণ একেবারে আশ্চর্য হইয়া গেলেন। সে যে তাঁহার পরমাত্মীয় নহে এ কথা কে বলিবে। বিশেষত কলিকাতার সুশিক্ষিত সুসভ্য ছেলে হইয়াও সে তাঁহাকে যেরকম ভক্তিশ্রদ্ধা করে এমন তো দেখা যায় না। তিনি ভাবিলেন, কলিকাতার ছেলেদের বুঝি এই প্রকারই স্বভাব। মনে মনে ভাবিলেন, সে তো হবারই কথা, আমাদের পাড়াগেঁয়ে ছেলেদের শিক্ষাই বা কী আর সহবতই বা কী।

জ্বর কিছু কিছু কমিতে লাগিল এবং কালীপদ ক্রমে চৈতন্য লাভ করিল। পিতাকে শয্যার পাশে দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল, ভাবিল, তাহার কলিকাতার অবস্থার কথা এইবার তাহার পিতার কাছে ধরা পড়িবে। তাহার চেয়ে ভাবনা এই যে, তাহার গ্রাম্য পিতা শহরের ছেলেদের পরিহাসের পাত্র হইয়া উঠিবেন। চারি দিকে চাহিয়া দেখিয়া সে ভাবিয়া পাইল না, এ কোন্ ঘর। মনে হইল, এ কি স্বপ্ন দেখিতেছি।

তখন তাহার বেশি কিছু চিন্তা করিবার শক্তি ছিল না। তাহার মনে হইল, অসুখের খবর পাইয়া তাহার পিতা আসিয়া একটা ভালো বাসায় আনিয়া রাখিয়াছেন। কী করিয়া আনিলেন, তাহার খরচ কোথা হইতে জোগাইতেছেন, এত খরচ করিতে থাকিলে পরে কিরূপ সংকট উপস্থিত হইবে সে-সব কথা ভাবিবার তাহার সময় নাই। এখন তাহাকে বাঁচিয়া উঠিতে হইবে, সেজন্য সমস্ত পৃথিবীর উপর তাহার যেন দাবি আছে।

একসময়ে যখন তাহার পিতা ঘরে ছিলেন না এমন সময় শৈলেন একটি পাত্রে কিছু ফল লইয়া তাহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। কালীপদ অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল— ভাবিতে লাগিল, ইহার মধ্যে কিছু পরিহাস আছে নাকি। প্রথম কথা তাহার মনে হইল এই যে, পিতাকে তো ইহার হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

শৈলেন ফলের পাত্র টেবিলের উপর রাখিয়া পায়ে ধরিয়া কালীপদকে প্রণাম করিল এবং কহিল, "আমি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি, আমাকে মাপ করুন।"

কালীপদ শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। শৈলেনের মুখ দেখিয়াই সে বুঝিতে পারিল, তাহার মনে কোনো কপটতা নাই। প্রথম যখন কালীপদ মেসে আসিয়াছিল এই

যৌবনের দীপ্তিতে উজ্জ্বল সুন্দর মুখশ্রী দেখিয়া কতবার তাহার মন অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সে আপনার দারিদ্র্যের সংকোচে কোনোদিন ইহার নিকটেও আসে নাই। যদি সে সমকক্ষ লোক হইত, যদি বন্ধুর মতো ইহার কাছে আসিবার অধিকার তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হইত, তবে সে কত খুশিই হইত— কিন্তু পরস্পর অত্যন্ত কাছে থাকিলেও মাঝখানে অপার ব্যবধান লঙ্ঘন করিবার উপায় ছিল না। সিঁড়ি দিয়া যখন শৈলেন উঠিত বা নামিত তখন তাহার শৌখিন চাদরের সুগন্ধ কালীপদর অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিত— তখন সে পড়া ছাড়িয়া একবার এই হাস্যপ্রফুল্ল চিন্তারেখাহীন তরুণ মুখের দিকে না তাকাইয়া থাকিতে পারিত না। সেই মুহূর্তে কেবল ক্ষণকালের জন্য তাহার সেই স্যাঁতসেঁতে কোণের ঘরে দূর সৌন্দর্যলোকের ঐশ্বর্য-বিচ্ছুরিত রশ্মিচ্ছটা আসিয়া পড়িত। তাহার পরে সেই শৈলেনের নির্দয় তারুণ্য তাহার কাছে কিরূপ সাংঘাতিক হইয়া উঠিয়াছিল তাহা সকলেরই জানা আছে। আজ শৈলেন যখন ফলের পাত্র বিছানায় তাহার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল তখন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ওই সুন্দর মুখের দিকে কালীপদ আর-একবার তাকাইয়া দেখিল। ক্ষমার কথা সে মুখে কিছুই উচ্চারণ করিল না— আস্তে আস্তে ফল তুলিয়া খাইতে লাগিল— ইহাতেই যাহা বলিবার তাহা বলা হইয়া গেল।

কালীপদ প্রত্যহ আশ্চর্য হইয়া দেখিতে লাগিল, তাহার গ্রাম্য পিতা ভবানীচরণের সঙ্গে শৈলেনের খুব ভাব জমিয়া উঠিল। শৈলেন তাঁহাকে ঠাকুরদা বলে, এবং পরস্পরের মধ্যে অবাধে ঠাট্টাতামাশা চলে। তাহাদের উভয়পক্ষের হাস্যকৌতুকের প্রধান লক্ষ্য ছিলেন অনুপস্থিত ঠাকরুনদিদি। এতকাল পরে এই পরিহাসের দক্ষিণবায়ুর হিল্লোলে ভবানীচরণের মনে যেন যৌবনস্মৃতির পুলক সঞ্চার করিতে লাগিল। ঠাকরুনদিদির স্বহস্তরচিত আচার আমসত্ত্ব প্রভৃতি সমস্তই শৈলেন রোগীর অনবধানতার অবকাশে চুরি করিয়া নিঃশেষে খাইয়া ফেলিয়াছে এ কথা আজ সে নির্লজ্জভাবে স্বীকার করিল। এই চুরির খবরে কালীপদর মনে বড়ো একটি গভীর আনন্দ হইল। তাহার মায়ের হাতের সামগ্রী সে বিশ্বের লোককে ডাকিয়া খাওয়াইতে চায় যদি তাহারা ইহার আদর বোঝে। কালীপদর কাছে আজ নিজের রোগের শয্যা আনন্দসভা হইয়া উঠিল— এমন সুখ তাহার জীবনে সে অল্পই পাইয়াছে। কেবল ক্ষণে ক্ষণে তাহার মনে হইতে লাগিল, আহা, মা যদি থাকিতেন! তাহার মা থাকিলে এই কৌতুক-পরায়ণ সুন্দর যুবকটিকে যে কত স্নেহ করিতেন সেই কথা সে কল্পনা করিতে লাগিল।

তাহাদের রুগ্ণকক্ষসভায় কেবল একটা আলোচনার বিষয় ছিল যেটাতে আনন্দ-প্রবাহে মাঝে মাঝে বড়ো বাধা দিত। কালীপদর মনে যেন দারিদ্র্যের একটা অভিমান

ছিল— কোনো-এক সময়ে তাহাদের প্রচুর ঐশ্বর্য ছিল এ কথা লইয়া বৃথা গর্ব করিতে তাহার ভারি লজ্জা বোধ হইত। আমরা গরিব, এ কথাটাকে কোনো 'কিন্তু' দিয়া চাপা দিতে সে মোটেই রাজি ছিল না। ভবানীচরণও যে তাঁহাদের ঐশ্বর্যের দিনের কথা গর্ব করিয়া পাড়িতেন তাহা নহে। কিন্তু সে যে তাঁহার সুখের দিন ছিল, তখন তাঁহার যৌবনের দিন ছিল। বিশ্বাসঘাতক সংসারের বীভৎসমূর্তি তখনো ধরা পড়ে নাই। বিশেষত শ্যামাচরণের স্ত্রী, তাঁহার পরমস্নেহশালিনী ভ্রাতৃজায়া রমাসুন্দরী, যখন তাঁহাদের সংসারের গৃহিণী ছিলেন, তখন সেই লক্ষ্মীর ভরা ভাণ্ডারের দ্বারে দাঁড়াইয়া কী অজস্র আদরই তাঁহারা লুটিয়াছিলেন— সেই অস্তমিত সুখের দিনের স্মৃতির ছটাতেই তো ভবানীচরণের জীবনের সন্ধ্যা সোনায় মণ্ডিত হইয়া আছে। কিন্তু এই-সমস্ত সুখস্মৃতি আলোচনার মাঝখানে ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলই সেই উইল-চুরির কথাটা আসিয়া পড়ে। ভবানীচরণ এই প্রসঙ্গে ভারি উত্তেজিত হইয়া পড়েন। এখনো সে উইল পাওয়া যাইবে এ সম্বন্ধে তাঁহার মনে লেশমাত্র সন্দেহ নাই— তাঁহার সতীসাধ্বী মার কথা কখনোই ব্যর্থ হইবে না। এই কথা উঠিয়া পড়িলেই কালীপদ মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিত। সে জানিত এটা তাহার পিতার একটা পাগলামিমাত্র। তাহারা মায়ে ছেলেয় এই পাগলামিকে আপসে প্রশ্রয়ও দিয়াছে, কিন্তু শৈলেনের কাছে তাহার পিতার এই দুর্বলতা প্রকাশ পায় এ তাহার কিছুতেই ভালো লাগে না। কতবার সে পিতাকে বলিয়াছে, "না বাবা, ওটা তোমার একটা মিথ্যা সন্দেহ।" কিন্তু এরূপ তর্কে উলটা ফল হইত। তাঁহার সন্দেহ যে অমূলক নহে তাহা প্রমাণ করিবার জন্য সমস্ত ঘটনা তিনি তন্ন তন্ন করিয়া বিবৃত করিতে থাকিতেন। তখন কালীপদ নানা চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই তাঁহাকে থামাইতে পারিত না।

বিশেষত কালীপদ ইহা স্পষ্ট লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে যে, এই প্রসঙ্গটা কিছুতেই শৈলেনের ভালো লাগে না। এমন-কি, সে'ও বিশেষ একটু যেন উত্তেজিত হইয়া ভবানীচরণের যুক্তি খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিত। অন্য সকল বিষয়েই ভবানীচরণ আর-সকলের মত মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন— কিন্তু এই বিষয়টাতে তিনি কাহারো কাছে হার মানিতে পারেন না। তাঁহার মা লিখিতে পড়িতে জানিতেন— তিনি নিজের হাতে তাঁহার পিতার উইল এবং অন্য দলিলটা বাক্সে বন্ধ করিয়া লোহার সিন্দুকে তুলিয়াছেন; অথচ তাঁহার সামনেই মা যখন বাক্স খুলিলেন তখন দেখা গেল অন্য দলিলটা যেমন ছিল তেমনি আছে অথচ উইলটা নাই, ইহাকে চুরি বলা হইবে না তো কী। কালীপদ তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য বলিত, "তা, বেশ তো বাবা, যারা তোমার বিষয় ভোগ করিতেছে তারা তো তোমারই ছেলেরই মতো, তারা তো

তোমারই ভাইপো। সে সম্পত্তি তোমার পিতার বংশেই রহিয়াছে— ইহাই কি কম সুখের কথা।” শৈলেন এ-সব কথা বেশিক্ষণ সহিতে পারিত না, সে ঘর ছাড়িয়া উঠিয়া চলিয়া যাইত। কালীপদ মনে মনে পীড়িত হইয়া ভাবিত, শৈলেন হয়তো তাহার পিতাকে অর্থলোলুপ বিষয়ী বলিয়া মনে করিতেছে, অথচ তাহার পিতার মধ্যে বৈষয়িকতার নামগন্ধ নাই এ কথা কোনোমতে শৈলেনকে বুঝাইতে পারিলে কালীপদ বড়োই আরাম পাইত।

এতদিনে কালীপদ ও ভবানীচরণের কাছে শৈলেন আপনার পরিচয় নিশ্চয় প্রকাশ করিত। কিন্তু এই উইল-চুরির আলোচনাতেই তাহাকে বাধা দিল। তাহার পিতা পিতামহ যে উইল চুরি করিয়াছেন এ কথা সে কোনোমতেই বিশ্বাস করিতে চাহিল না, অথচ ভবানীচরণের পক্ষে পৈতৃক বিষয়ের ন্যায্য অংশ হইতে বঞ্চিত হওয়ার মধ্যে যে একটা নিষ্ঠুর অন্যায় আছে সে কথাও সে কোনোমতে অস্বীকার করিতে পারিল না। এখন হইতে এই প্রসঙ্গে কোনোপ্রকার তর্ক করা সে বন্ধ করিয়া দিল— একেবারে সে চুপ করিয়া থাকিত— এবং যদি কোনো সুযোগ পাইত তবে উঠিয়া চলিয়া যাইত।

এখনো বিকালে একটু অল্প জ্বর আসিয়া কালীপদর মাথা ধরিত, কিন্তু সেটাকে সে রোগ বলিয়া গণ্যই করিত না। পড়ার জন্য তাহার মন উদ্‌বিগ্ন হইয়া উঠিল। একবার তাহার স্কলারশিপ ফসকাইয়া গিয়াছে, আর তো সেরূপ হইলে চলিবে না। শৈলেনকে লুকাইয়া আবার সে পড়িতে আরম্ভ করিল— এ সম্বন্ধে ডাক্তারের কঠোর নিষেধ আছে জানিয়াও সে তাহা অগ্রাহ্য করিল।

ভবানীচরণকে কালীপদ কহিল, “বাবা, তুমি বাড়ি ফিরিয়া যাও— সেখানে মা একলা আছেন। আমি তো বেশ সারিয়া উঠিয়াছি।”

শৈলেনও বলিল, “এখন আপনি গেলে কোনো ক্ষতি নাই। আর তো ভাবনার কারণ কিছু দেখি না। এখন যেটুকু আছে সে দুদিনেই সারিয়া যাইবে। আর আমরা তো আছি।”

ভবানীচরণ কহিলেন, “সে আমি বেশ জানি; কালীপদর জন্য ভাবনা করিবার কিছুই নাই। আমার কলিকাতায় আসিবার কোনো প্রয়োজনই ছিল না, তবু মন মানে কই ভাই। বিশেষত তোমার ঠাকরুনদিদি যখন যেটি ধরেন সে তো আর ছাড়াইবার জো নাই।”

শৈলেন হাসিয়া কহিল, “ঠাকুরদা, তুমিই তো আদর দিয়া ঠাকরুনদিদিকে একেবারে মাটি করিয়াছ।”

ভবানীচরণ হাসিয়া কহিলেন, "আচ্ছা ভাই, আচ্ছা, ঘরে যখন নাতবউ আসিবে তখন তোমার শাসনপ্রণালীটা কিরকম কঠোর আকার ধারণ করে দেখা যাইবে।"

ভবানীচরণ একান্তভাবে রাসমণির সেবায় পালিত জীব। কলিকাতায় নানাপ্রকার আরাম-আয়োজনও রাসমণির আদরযত্নের অভাব কিছুতেই পূরণ করিতে পারিতেছিল না। এই কারণে ঘরে যাইবার জন্য তাঁহাকে বড়ো বেশি অনুরোধ করিতে হইল না।

সকালবেলায় জিনিসপত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়াছেন এমন সময় কালীপদর ঘরে গিয়া দেখিলেন তাহার মুখচোখ অত্যন্ত লাল হইয়া উঠিয়াছে— তাহার গা যেন আগুনের মতো গরম; কাল অর্ধেক রাত্রি সে লজিক মুখস্থ করিয়াছে, বাকি রাত্রি এক নিমেষের জন্যও ঘুমাইতে পারে নাই।

কালীপদর দুর্বলতা তো সারিয়া উঠে নাই, তাহার উপরে আবার রোগের প্রবল আক্রমণ দেখিয়া ডাক্তার বিশেষ চিন্তিত হইলেন। শৈলেনকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, "এবার তো গতিক ভালো বোধ করিতেছি না।"

শৈলেন ভবানীচরণকে কহিল, "দেখো ঠাকুরদা, তোমারও কষ্ট হইতেছে, রোগীরও বোধ হয় ঠিক তেমন সেবা হইতেছে না, তাই আমি বলি আর দেরি না করিয়া ঠাকুরুনদিদিকে আনানো যাক।"

শৈলেন যতই ঢাকিয়া বলুক, একটা প্রকাণ্ড ভয় আসিয়া ভবানীচরণের মনকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। তাঁহার হাত-পা থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "তোমরা যেমন ভালো বোঝ তাই করো।"

রাসমণির কাছে চিঠি গেল; তিনি তাড়াতাড়ি বগলাচরণকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় আসিলেন। সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় পৌঁছিয়া তিনি কেবল কয়েক ঘণ্টা মাত্র কালীপদকে জীবিত দেখিয়াছিলেন। বিকারের অবস্থায় সে রহিয়া রহিয়া মাকে ডাকিয়াছিল— সেই ধ্বনিগুলি তাঁহার বুকে বিঁধিয়া রহিল।

ভবানীচরণ এই আঘাত সহিয়া যে কেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবেন সেই ভয়ে রাসমণি নিজের শোককে ভালো করিয়া প্রকাশ করিবার আর অবসর পাইলেন না— তাঁহার পুত্র আবার তাঁহার স্বামীর মধ্যে গিয়া বিলীন হইল— স্বামীর মধ্যে আবার দুজনেরই ভার তাঁহার ব্যথিত হৃদয়ের উপর তিনি তুলিয়া লইলেন। তাঁহার প্রাণ বলিল, আর আমার সয় না। তবু তাঁহাকে সহিতেই হইল।

৫

রাত্রি তখন অনেক। গভীর শোকের একান্ত ক্লান্তিতে কেবল ক্ষণকালের জন্য রাসমণি অচেতন হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু ভবানীচরণের ঘুম হইতেছিল না। কিছুক্ষণ বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করিয়া অবশেষে দীর্ঘনিশ্বাস-সহকারে 'দয়াময় হরি' বলিয়া উঠিয়া পড়িয়াছেন। কালীপদ যখন গ্রামের বিদ্যালয়েই পড়িত, যখন সে কলিকাতায় যায় নাই, তখন সে যে-একটি কোণের ঘরে বসিয়া পড়াশুনা করিত ভবানীচরণ কম্পিত হস্তে একটি প্রদীপ ধরিয়া সেই শূন্যঘরে প্রবেশ করিলেন। রাসমণির হাতে চিত্র করা ছিন্ন কাঁথাটি এখনো তক্তাপোশের উপর পাতা আছে, তাহার নানা স্থানে এখনো সেই কালির দাগ রহিয়াছে; মলিন দেয়ালের গায়ে কয়লায় আঁকা সেই জ্যামিতির রেখাগুলি দেখা যাইতেছে; তক্তাপোশের এক কোণে কতকগুলি হাতে-বাঁধা ময়লা কাগজের খাতার সঙ্গে তৃতীয় খণ্ড রয়াল রীডারের ছিন্নাবশেষ আজিও পড়িয়া আছে। আর— হায় হায়— তার ছেলেবয়সের ছোটো পায়ের একপাটি চটি যে ঘরের কোণে পড়িয়া ছিল তাহা এতদিন কেহ দেখিয়াও দেখে নাই, আজ তাহা সকলের চেয়ে বড়ো হইয়া চোখে দেখা দিল— জগতে এমন কোনো মহৎ সামগ্রী নাই যাহা আজ ওই ছোটো জুতাটিকে আড়াল করিয়া রাখিতে পারে।

কুলুঙ্গিতে প্রদীপটি রাখিয়া ভবানীচরণ সেই তক্তাপোশের উপর আসিয়া বসিলেন। তাঁহার শুষ্ক চোখে জল আসিল না, কিন্তু তাঁহার বুকের মধ্যে কেমন করিতে লাগিল— যথেষ্ট পরিমাণে নিশ্বাস লইতে তাঁহার পাঁজর যেন ফাটিয়া যাইতে চাহিল। ঘরের পূর্বদিকের দরজা খুলিয়া দিয়া গরাদে ধরিয়া তিনি বাহিরের দিকে চাহিলেন।

অন্ধকার রাত্রি, টিপ্‌ টিপ্‌ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। সম্মুখে প্রাচীরবেষ্টিত ঘন জঙ্গল। তাহার মধ্যে ঠিক পড়িবার ঘরের সামনে একটুখানি জমিতে কালীপদ বাগান করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এখনো তাহার স্বহস্তে রোপিত ঝুমকালতা কঞ্চির বেড়ার উপর প্রচুর পল্লব বিস্তার করিয়া সজীব আছে— তাহা ফুলে ফুলে ভরিয়া গিয়াছে।

আজ সেই বালকের যত্নলালিত বাগানের দিকে চাহিয়া তাঁহার প্রাণ যেন কণ্ঠের কাছে উঠিয়া আসিল। আর কিছু আশা করিবার নাই; গ্রীষ্মের সময় পূজার সময় কলেজের ছুটি হয়, কিন্তু যাহার জন্য তাঁহার দরিদ্র ঘর শূন্য হইয়া আছে সে আর কোনোদিন কোনো ছুটিতেই ঘরে ফিরিয়া আসিবে না। "ওরে বাপ আমার!" বলিয়া ভবানীচরণ সেইখানেই মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। কালীপদ তাহার বাপের

দারিদ্র্য ঘুচাইবে বলিয়াই কলিকাতায় গিয়াছিল, কিন্তু জগৎসংসারে সে এই বৃদ্ধকে কী একান্ত নিঃসম্বল করিয়াই চলিয়া গেল। বাহিরে বৃষ্টি আরো চাপিয়া আসিল।

এমন সময়ে অন্ধকারে ঘাসপাতার মধ্যে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ভবানীচরণের বুকের মধ্যে ধড়াস করিয়া উঠিল। যাহা কোনোমতেই আশা করিবার নহে তাহাও যেন তিনি আশা করিয়া বসিলেন। তাঁহার মনে হইল কালীপদ যেন বাগান দেখিতে আসিয়াছে। কিন্তু বৃষ্টি যে মুষলধারায় পড়িতেছে— ও যে ভিজিবে, এই অসম্ভব উদ্‌বেগে যখন তাঁহার মনের ভিতরটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে এমন সময়ে কে গরাদের বাহিরে তাঁহার ঘরের সামনে আসিয়া মুহূর্তকালের জন্য দাঁড়াইল। চাদর দিয়া সে মাথা মুড়ি দিয়াছে – তাহার মুখ চিনিবার জো নাই। কিন্তু সে যেন মাথায় কালীপদরই মতো হইবে। "এসেছিস বাপ" বলিয়া ভবানীচরণ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরের দরজা খুলিতে গেলেন। দ্বার খুলিয়া বাগানে আসিয়া সেই ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সেখানে কেহই নাই। সেই বৃষ্টিতে বাগানময় ঘুরিয়া বেড়াইলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। সেই নিশীথরাত্রে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া ভাঙাগলায় একবার "কালীপদ" বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলেন— কাহারো সাড়া পাইলেন না। সেই ডাকে নটু চাকরটা গোহালঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া অনেক করিয়া বৃদ্ধকে ঘরে লইয়া আসিল।

পরদিন সকালে নটু ঘর ঝাঁট দিতে গিয়া দেখিল, গরাদের সামনেই ঘরের ভিতরে পুঁটুলিতে বাঁধা একটা কী পড়িয়া আছে। সেটা সে ভবানীচরণের হাতে আনিয়া দিল। ভবানীচরণ খুলিয়া দেখিলেন একটা পুরাতন দলিলের মতো। চশমা বাহির করিয়া চোখে লাগাইয়া একটু পড়িয়াই তিনি তাড়াতাড়ি ছুটিয়া রাসমণির সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কাগজখানা তাঁহার নিকট মেলিয়া ধরিলেন।

রাসমণি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কী ও।"

ভবানীচরণ কহিলেন, "সেই উইল।"

রাসমণি কহিলেন, "কে দিল।"

ভবানীচরণ কহিলেন, "কাল রাত্রে সে আসিয়াছিল— সে দিয়া গেছে।"

রাসমণি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কী হইবে।"

ভবানীচরণ কহিলেন, "আর আমার কোনো দরকার নাই।" বলিয়া সেই দলিল ছিন্ন ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন।

এ সংবাদটা পাড়ায় যখন রটিয়া গেল তখন বগলাচরণ মাথা নাড়িয়া সগর্বে বলিল, "আমি বলি নাই, কালীপদকে দিয়াই উইল উদ্ধার হইবে?"

রামচরণ মুদি কহিল, "কিন্তু দাদাঠাকুর, কাল যখন রাত দশটার গাড়ি এস্টেশনে পৌঁছিল তখন একটি সুন্দর দেখিতে বাবু আমার দোকানে আসিয়া চৌধুরীদের বাড়ির পথ জিজ্ঞাসা করিল— আমি তাহাকে পথ দেখাইয়া দিলাম। তার হাতে যেন কী একটা দেখিয়াছিলাম।"

'আরে দূর' বলিয়া এ কথাটাকে বগলাচরণ একেবারেই উড়াইয়া দিল।

আশ্বিন ১৩১৮

পণরক্ষা

১

বংশীবদন তাহার ভাই রসিককে যেমন ভালোবাসিত এমন করিয়া সচরাচর মাও ছেলেকে ভালোবাসিতে পারে না। পাঠশালা হইতে রসিকের আসিতে যদি কিছু বিলম্ব হইত তবে সকল কাজ ফেলিয়া সে তাহার সন্ধানে ছুটিত। তাহাকে না খাওয়াইয়া সে নিজে খাইতে পারিত না। রসিকের অল্প কিছু অসুখবিসুখ হইলেই বংশীর দুই চোখ দিয়া ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া জল ঝরিতে থাকিত।

রসিক বংশীর চেয়ে বোলো বছরের ছোটো। মাঝে যে কয়টি ভাইবোন জন্মিয়াছিল সবগুলিই মারা গিয়াছে। কেবল এই সব-শেষেরটিকে রাখিয়া, যখন রসিকের এক বছর বয়স, তখন তাহার মা মারা গেল এবং রসিক যখন তিন বছরের ছেলে তখন সে পিতৃহীন হইল। এখন রসিককে মানুষ করিবার ভার একা এই বংশীর উপর।

তাঁতে কাপড় বোনাই বংশীর পৈতৃক ব্যবসায়। এই ব্যাবসা করিয়াই বংশীর বৃদ্ধ প্রপিতামহ অভিরাম বসাক গ্রামে যে দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছে আজও সেখানে রাধানাথের বিগ্রহ স্থাপিত আছে। কিন্তু সমুদ্রপার হইতে এক কল-দৈত্য আসিয়া বেচারা তাঁতের উপর অগ্নিবাণ হানিল এবং তাঁতির ঘরে ক্ষুধাসুরকে বসাইয়া দিয়া বাষ্পফুৎকারে মুহুর্মুহু জয়শৃঙ্গ বাজাইতে লাগিল।

তবু তাঁতের কঠিন প্রাণ মরিতে চায় না— ঠুক্‌ঠাক্‌ ঠুক্‌ঠাক্‌ করিয়া সুতা দাঁতে লইয়া মাকু এখনো চলাচল করিতেছে— কিন্তু তাহার সাবেক চালচলন চঞ্চলা লক্ষ্মীর মনঃপূত হইতেছে না, লোহার দৈত্যটা কলে-বলে-কৌশলে তাঁহাকে একেবারে বশ করিয়া লইয়াছে।

বংশীর একটু সুবিধা ছিল। থানাগড়ের বাবুরা তাহার মুরুব্বি ছিলেন। তাঁহাদের বৃহৎ পরিবারের সমুদয় শৌখিন কাপড় বংশীই বুনিয়া দিত। একলা সব পারিয়া উঠিত না, সেজন্ত তাহাকে লোক রাখিতে হইয়াছিল।

যদিচ তাহাদের সমাজে মেয়ের দর বড়ো বেশি তবু চেষ্টা করিলে বংশী এতদিনে যেমন-তেমন একটা বউ ঘরে আনিতে পারিত। রসিকের জন্তই সে আর ঘটিয়া উঠিল না। পুজার সময় কলিকাতা হইতে রসিকের যে সাজ আমদানি হইত তাহা যাত্রার দলের রাজপুত্রকেও লজ্জা দিতে পারিত। এইরূপ আর-আর সকল বিষয়েই রসিকের যাহা-কিছু প্রয়োজন ছিল না, তাহা জোগাইতে গিয়া বংশীকে নিজের সকল প্রয়োজনই খর্ব করিতে হইল।

তবু বংশরক্ষা করিতে তো হইবে। তাহাদের বিবাহযোগ্য ঘরের একটি মেয়েকে মনে মনে ঠিক করিয়া বংশী টাকা জমাইতে লাগিল। তিনশো টাকা পণ এবং অলংকার-বাবদ আর একশো টাকা হইলেই মেয়েটিকে পাওয়া যাইবে স্থির করিয়া অল্প-অল্প কিছু-কিছু সে খরচ বাঁচাইয়া চলিল। হাতে যথেষ্ট টাকা ছিল না বটে, কিন্তু যথেষ্ট সময় ছিল। কারণ মেয়েটির বয়স সবে চার— এখনো অন্তত চার-পাঁচ বছর মেয়াদ পাওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু কোষ্ঠীতে তাহার সঞ্চয়ের স্থানে দৃষ্টি ছিল রসিকের। সে দৃষ্টি শুভগ্রহের দৃষ্টি নহে।

রসিক ছিল তাহাদের পাড়ার ছোটো ছেলে এবং সমবয়সীদের দলের সর্দার। যে লোক সুখে মানুষ হয় এবং যাহা চায় তাহাই পাইয়া থাকে ভাগ্যদেবতা কর্তৃক বঞ্চিত হতভাগাদের পক্ষে তাহার ভারি একটা আকর্ষণ আছে। তাহার কাছে ঘেঁষিতে পাওয়াই যেন কতকটা পরিমাণে প্রার্থিত বস্তুকে পাওয়ার সামিল। যাহার অনেক আছে সে যে অনেক দেয় বলিয়াই লোকে তাহার কাছে আনাগোনা করে তাহা নহে —সে কিছু না দিলেও মানুষের লুব্ধ কল্পনাকে তৃপ্ত করে।

শুধু যে রসিকের শৌখিনতাই পাড়ার ছেলেদের মন মুগ্ধ করিয়াছে এ কথা বলিলে তাহার প্রতি অবিচার করা হইবে। সকল বিষয়েই রসিকের এমন একটি আশ্চর্য নৈপুণ্য ছিল যে তাহার চেয়ে উচ্চবংশের ছেলেরাও তাহাকে খাতির না করিয়া থাকিতে পারিত না। সে যাহাতে হাত দেয় তাহাই অতি সুকৌশলে করিতে পারে। তাহার মনের উপর যেন কোনো পূর্বসংস্কারের মূঢ়তা চাপিয়া নাই, সেইজন্ত সে যাহা দেখে তাহাই গ্রহণ করিতে পারে।

রসিকের এই কারুনৈপুণ্যের জন্ত তাহার কাছে ছেলেমেয়েরা; এমন-কি,তাহাদের

অভিভাবকেরা পর্যন্ত উমেদারি করিত। কিন্তু তাহার দোষ ছিল কি, কোনো একটা কিছুতে সে বেশিদিন মন দিতে পারিত না। একটা কোনো বিদ্যা আয়ত্ত করিলেই আর সেটা তাহার ভালো লাগিত না— তখন তাহাকে সে বিষয়ে সাধ্যসাধনা করিতে গেলে সে বিরক্ত হইয়া উঠিত। বাবুদের বাড়িতে দেওয়ালির উৎসবে কলিকাতা হইতে আতসবাজিওয়ালা আসিয়াছিল— তাহাদের কাছ হইতে সে বাজি তৈরি শিখিয়া কেবল দুটো বৎসর পাড়ায় কালীপূজার উৎসবকে জ্যোতির্ময় করিয়া তুলিয়াছিল ; তৃতীয় বৎসরে কিছুতেই আর তুবড়ির ফোয়ারা ছুটিল না— রসিক তখন চাপকান-জোব্বা-পরা মেডেল-ঝোলানো এক নব্য যাত্রাওয়ালার দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া বাক্স-হার্মোনিয়ম লইয়া লক্ষ্ণৌ ঠুংরি সাধিতেছিল।

তাহার ক্ষমতার এই খামখেয়ালি লীলায় কখনো সুলভ কখনো দুর্লভ হইয়া সে লোককে আরো বেশি মুগ্ধ করিত, তাহার নিজের দাদার তো কথাই নাই। দাদা কেবলই ভাবিত, এমন আশ্চর্য ছেলে আমাদের ঘরে আসিয়া জন্মিয়াছে, এখন কোনোমতে বাঁচিয়া থাকিলে হয়— এই ভাবিয়া নিতান্ত অকারণেই তাহার চোখে জল আসিত এবং মনে মনে রাধানাথের কাছে ইহাই প্রার্থনা করিত যে আমি যেন উহার আগে মরিতে পারি।

এমনতরো ক্ষমতাশালী ভাইয়ের নিত্যনূতন শখ মিটাইতে গেলে ভাবী বধূ কেবলই দূরতর ভবিষ্যতে অন্তর্ধান করিতে থাকে, অথচ বয়স চলিয়া যায় অতীতের দিকেই। বংশীর বয়স যখন ত্রিশ পার হইল, টাকা যখন একশতও পুরিল না এবং সেই মেয়েটি অন্যত্র শ্বশুরঘর করিতে গেল তখন বংশী মনে মনে কহিল, আমার আর বড়ো আশা দেখি না, এখন বংশরক্ষার ভার রসিককেই লইতে হইবে।

পাড়ায় যদি স্বয়ম্বর-প্রথা চলিত থাকিত তবে রসিকের বিবাহের জন্য কাহাকেও ভাবিতে হইত না। বিধু, তারা, ননী, শশী, সুধা— এমন কত নাম করিব— সবাই রসিককে ভালোবাসিত। রসিক যখন কাদা লইয়া মাটির মূর্তি গড়িবার মেজাজে থাকিত তখন তাহার তৈরি পুতুলের অধিকার লইয়া মেয়েদের মধ্যে বন্ধুবিচ্ছেদের উপক্রম হইত। ইহাদের মধ্যে একটি মেয়ে ছিল, সৌরভী, সে বড়ো শান্ত— সে চুপ করিয়া বসিয়া পুতুলগড়া দেখিতে ভালোবাসিত এবং প্রয়োজনমত রসিককে কাদা কাঠি প্রভৃতি অগ্রসর করিয়া দিত। তাহার ভারি ইচ্ছা রসিক তাহাকে একটা-কিছু ফরমাশ করে। কাজ করিতে করিতে রসিক পান চাহিবে জানিয়া সৌরভী তাহা জোগাইয়া দিবার জন্য প্রতিদিন প্রস্তুত হইয়া আসিত। রসিক স্বহস্তের কীর্তিগুলি তাহার সামনে সাজাইয়া ধরিয়া যখন বলিত, 'সৈরি, তুই এর কোন্‌টা নিবি বল্‌'—

তখন সে ইচ্ছা করিলে যেটা খুশি লইতে পারিত, কিন্তু সংকোচে কোনোটাই লইত না ; রসিক নিজের পছন্দমত জিনিসটি তাহাকে তুলিয়া দিত। পুতুলগড়ার পর্ব শেষ হইলে যখন হার্মোনিয়ম বাজাইবার দিন আসিল তখন পাড়ার ছেলেমেয়েরা সকলেই এই যন্ত্রটা টেপাটুপি করিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িত— রসিক তাহাদের সকলকেই হুংকার দিয়া খেদাইয়া রাখিত। সৌরভী কোনো উৎপাত করিত না— সে তাহার ডুরে শাড়ি পরিয়া বড়ো বড়ো চোখ মেলিয়া বামহাতের উপর শরীরটার ভর দিয়া হেলিয়া বসিয়া চুপ করিয়া আশ্চর্য হইয়া দেখিত। রসিক ডাকিত, 'আয় সৈরি, একবার টিপিয়া দেখ্'। সে মৃদু মৃদু হাসিত, অগ্রসর হইতে চাহিত না। রসিক অসম্মতিসত্ত্বেও নিজের হাতে তাহার আঙুল ধরিয়া তাহাকে দিয়া বাজাইয়া লইত।

সৌরভীর দাদা গোপালও রসিকের ভক্তবৃন্দের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ছিল। সৌরভীর সঙ্গে তাহার প্রভেদ এই যে, ভালো জিনিস লইবার জন্য তাহাকে কোনোদিন সাধিতে হইত না। সে আপনি ফরমাশ করিত এবং না পাইলে অস্থির করিয়া তুলিত। নূতনগোছের যাহা-কিছু দেখিত তাহাই সে সংগ্রহ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিত। রসিক কাহারো আবদার বড়ো সহিতে পারিত না, তবু গোপাল যেন অন্য ছেলেদের চেয়ে রসিকের কাছে কিছু বেশি প্রশ্রয় পাইত।

বংশী মনে মনে ঠিক করিল, এই সৌরভীর সঙ্গেই রসিকের বিবাহ দিতে হইবে। কিন্তু সৌরভীর ঘর তাহাদের চেয়ে বড়ো— পাঁচশো টাকার কমে কাজ হইবার আশা নাই।

২

এতদিন বংশী কখনো রসিককে তাহার তাঁতবোনায় সাহায্য করিতে অনুরোধ করে নাই। খাটুনি সমস্তই সে নিজের ঘাড়ে লইয়াছিল। রসিক নানাপ্রকার বাজে কাজ লইয়া লোকের মনোরঞ্জন করিত ইহা তাহার দেখিতে ভালোই লাগিত। রসিক ভাবিত, 'দাদা কেমন করিয়া যে রোজই এই এক তাঁতের কাজ লইয়া পড়িয়া থাকে কে জানে। আমি হইলে তো মরিয়া গেলেও পারি না।' তাহার দাদা নিজের সম্বন্ধে নিতান্তই টানাটানি করিয়া চালাইত, ইহাতে সে দাদাকে কৃপণ বলিয়া জানিত। তাহার দাদার সম্বন্ধে রসিকের মনে যথেষ্ট একটা লজ্জা ছিল। শিশুকাল হইতেই সে নিজেকে তাহার দাদা হইতে সকল বিষয়ে ভিন্ন শ্রেণীর লোক বলিয়াই জানিত। তাহার দাদাই তাহার এই ধারণাকে প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছে।

এমন সময়ে বংশী নিজের বিবাহের আশা বিসর্জন দিয়া রসিকেরই বধূ আনিবার

জন্য যখন উৎসুক হইল তখন বংশীর মন আর ধৈর্য মানিতে চাহিল না। প্রত্যেক মাসের বিলম্ব তাহার কাছে অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। বাজনা বাজিতেছে, আলো জ্বালা হইয়াছে, বরসজ্জা করিয়া রসিকের বিবাহ হইতেছে, এই আনন্দের ছবি বংশীর মনে তৃষ্ণার্তের সম্মুখে মৃগতৃষ্ণিকার মতো কেবলই জাগিয়া আছে।

তবু যথেষ্ট দ্রুতবেগে টাকা জমিতে চায় না। যত বেশি চেষ্টা করে ততই যেন সফলতাকে আরো বেশি দূরবর্তী বলিয়া মনে হয়; বিশেষত মনের ইচ্ছার সঙ্গে শরীরটা সমান বেগে চলিতে চায় না, বারবার ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়ে। পরিশ্রমের মাত্রা দেহের শক্তিকে ছাড়াইয়া যাইবার জো করিয়াছে।

যখন সমস্ত গ্রাম নিষুপ্ত, কেবল নিশা-নিশাচরীর চৌকিদারের মতো প্রহরে প্রহরে শৃগালের দল হাঁক দিয়া যাইতেছে, তখনো মিটমিটে প্রদীপে বংশী কাজ করিতেছে এমন কত রাত ঘটিয়াছে। বাড়িতে তাহার এমন কেহই ছিল না যে তাহাকে নিষেধ করে। এ দিকে যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর আহার হইতেও বংশী নিজেকে বঞ্চিত করিয়াছে। গায়ের শীতবস্ত্রখানা জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, তাহা নানা ছিদ্রের খিড়কির পথ দিয়া গোপনে শীতকে ডাকিয়া-ডাকিয়াই আনে। গত দুই বৎসর হইতে প্রত্যেক শীতের সময় বংশী মনে করে, 'এইবারটা একরকম করিয়া চালাইয়া দি, আর একটু হাতে টাকা জমুক, আসছে বছরে যখন কাবুলিওয়ালা তাহার শীতবস্ত্রের বোঝা লইয়া গ্রামে আসিবে তখন একটা কাপড় ধারে কিনিয়া তাহার পরের বৎসরে শোধ করিব, ততদিনে তহবিল ভরিয়া উঠিবে।' সুবিধামত বৎসর আসিল না। ইতিমধ্যে তাহার শরীর টেঁকে না এমন হইয়া আসিল।

এতদিন পরে বংশী তাহার ভাইকে বলিল, "তাঁতের কাজ আমি একলা চালাইয়া উঠিতে পারি না, তুমি আমার কাজে যোগ দাও।" রসিক কোনো জবাব না করিয়া মুখ বাঁকাইল। শরীরের অসুখে বংশীর মেজাজ খারাপ ছিল, সে রসিককে ভর্ৎসনা করিল; কহিল, "বাপ-পিতামহের ব্যাবসা পরিত্যাগ করিয়া তুমি যদি দিনরাত হো হো করিয়া বেড়াইবে তবে তোমার দশা হইবে কী।"

কথাটা অসংগত নহে এবং ইহাকে কটূক্তিও বলা যায় না। কিন্তু রসিকের মনে হইল এতবড়ো অন্যায় তাহার জীবনে সে কোনোদিন সহ্য করে নাই। সেদিন বাড়িতে সে বড়ো একটা কিছু খাইল না; ছিপ হাতে করিয়া চন্দনীদহে মাছ ধরিতে বসিল। শীতের মধ্যাহ্ন নিস্তব্ধ, ভাঙা উঁচু পাড়ির উপর শালিক নাচিতেছে, পশ্চাতের আম-বাগানে ঘুঘু ডাকিতেছে এবং জলের কিনারায় শৈবালের উপর একটি পতঙ্গ তাহার স্বচ্ছ দীর্ঘ দুই পাখা মেলিয়া দিয়া স্থিরভাবে রৌদ্র পোহাইতেছে। কথা ছিল রসিক

আজ গোপালকে লাঠিখেলা শিখাইবে— গোপাল তাহার আশু কোনো সম্ভাবনা না দেখিয়া রসিকের ভাঁড়ের মধ্যেকার মাছ ধরিবার কেঁচোগুলাকে লইয়া অস্থিরভাবে ঘাঁটাঘাঁটি করিতে লাগিল— রসিক তাহার গালে ঠাস্‌ করিয়া এক চড় বসাইয়া দিল। কখন তাহার কাছে রসিক পান চাহিবে বলিয়া সৌরভী যখন ঘাটের পাশে ঘাসের উপর দুই পা মেলিয়া অপেক্ষা করিয়া আছে, এমন সময়ে রসিক হঠাৎ তাহাকে বলিল, "সৈরি, বড়ো ক্ষুধা পাইয়াছে, কিছু খাবার আনিয়া দিতে পারিস?" সৌরভী খুশি হইয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া বাড়ি হইতে আঁচল ভরিয়া মুড়িমুড়কি আনিয়া উপস্থিত করিল। রসিক সেদিন তাহার দাদার কাছেও ঘেঁষিল না।

বংশীর শরীর মন খারাপ ছিল, রাত্রে সে তাহার বাপকে স্বপ্ন দেখিল। স্বপ্ন হইতে উঠিয়া তাহার মন আরো বিকল হইয়া উঠিল। তাহার নিশ্চয় মনে হইল বংশলোপের আশঙ্কায় তাহার বাপের পরলোকেও ঘুম হইতেছে না।

পরদিন বংশী কিছু জোর করিয়াই রসিককে কাজে বসাইয়া দিল। কেননা ইহা তো ব্যক্তিগত সুখদুঃখের কথা নহে, এ যে বংশের প্রতি কর্তব্য। রসিক কাজে বসিল বটে, কিন্তু তাহাতে কাজের সুবিধা হইল না; তাহার হাত আর চলেই না, পদে পদে সুতা ছিঁড়িয়া যায়, সুতা সারিয়া তুলিতে তাহার বেলা কাটিতে থাকে। বংশী মনে করিল, ভালোরূপ অভ্যাস নাই বলিয়াই এমনটা ঘটিতেছে, কিছুদিন গেলেই হাত দুরস্ত হইয়া যাইবে।

কিন্তু স্বভাবপটু রসিকের হাত দুরস্ত হইবার দরকার ছিল না বলিয়াই তাহার হাত দুরস্ত হইতে চাহিল না। বিশেষত তাহার অনুগতবর্গ তাহার সন্ধানে আসিয়া যখন দেখিত সে নিতান্ত ভালোমানুষটির মতো তাহাদের বাপ-পিতামহের চিরকালীন ব্যবসায়ে লাগিয়া গেছে তখন রসিকের মনে ভারি লজ্জা এবং রাগ হইতে লাগিল।

দাদা তাহাকে তাহার এক বন্ধুর মুখ দিয়া খবর দিল যে, সৌরভীর সঙ্গেই রসিকের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করা যাইতেছে। বংশী মনে করিয়াছিল এই সুখবরটায় নিশ্চয়ই রসিকের মন নরম হইবে। কিন্তু সেরূপ ফল তো দেখা গেল না। 'দাদা মনে করিয়াছেন সৌরভীর সঙ্গে বিবাহ হইলেই আমার মোক্ষলাভ হইবে!' সৌরভীর প্রতি হঠাৎ তাহার ব্যবহারের এমনি পরিবর্তন হইল যে, সে বেচারা আঁচলের প্রান্তে পান বাঁধিয়া তাহার কাছে আসিতে আর সাহসই করিত না— সমস্ত রকমসকম দেখিয়া কী জানি এই ছোটো শান্ত মেয়েটির ভারি কান্না পাইতে লাগিল। হার্মোনিয়ম বাজনা সম্বন্ধে অন্য মেয়েদের চেয়ে তাহার যে একটু বিশেষ অধিকার ঘটিয়াছিল, সে তো ঘুচিয়াই গেল— তার পর সর্বদাই রসিকের যে ফাইফরমাশ খাটিবার ভার তাহার

উপর ছিল সেটাও রহিল না। হঠাৎ জীবনটা ফাঁকা এবং সংসারটা নিতান্তই ফাঁকি বলিয়া তাহার কাছে মনে হইতে লাগিল।

এতদিন রসিক এই গ্রামের বনবাদাড়, রথতলা, রাধানাথের মন্দির, নদী, খেয়াঘাট, বিল, দিঘি, কামারপাড়া, ছুতারপাড়া, হাটবাজার সমস্তই আপনার আনন্দে ও প্রয়োজনে বিচিত্রভাবে অধিকার করিয়া লইয়াছিল। সব জায়গাতেই তাহার একটা একটা আড্ডা ছিল, যেদিন যেখানে খুশি কখনো-বা একলা কখনো-বা দলবলে কিছু-না-কিছু লইয়া থাকিত। এই গ্রাম এবং থানাগড়ের বাবুদের বাড়ি ছাড়া জগতের আর যে কোনো অংশ তাহার জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় তাহা সে কোনোদিন মনেও করে নাই। আজ এই গ্রামে তাহার মন আর কুলাইল না। দূর দূর বহুদূরের জন্য তাহার চিত্ত ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। তাহার অবসর যথেষ্ট ছিল— বংশী তাহাকে খুব বেশিক্ষণ কাজ করাইত না। কিন্তু ওই একটুক্ষণ কাজ করিয়াই তাহার সমস্ত অবসর পর্যন্ত যেন বিস্বাদ হইয়া গেল ; এরূপ খণ্ডিত অবসরকে কোনো ব্যবহারে লাগাইতে তাহার ভালো লাগিল না।

৩

এই সময়ে থানাগড়ের বাবুদের এক ছেলে এক বাইসিক্‌ল্‌ কিনিয়া আনিয়া চড়া অভ্যাস করিতেছিল। রসিক সেটাকে লইয়া অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই এমন আয়ত্ত করিয়া লইল যেন সে তাহার নিজেরই পায়ের তলাকার একটা ডানা। কিন্তু কী চমৎকার, কী স্বাধীনতা, কী আনন্দ! দূরত্বের সমস্ত বাধাকে এই বাহনটা যেন তীক্ষ্ণ সুদর্শনচক্রের মতো অতি অনায়াসেই কাটিয়া দিয়া চলিয়া যায়। ঝড়ের বাতাস যেন চাকার আকার ধারণ করিয়া উন্মত্তের মতো মানুষকে পিঠে করিয়া লইয়া ছোটে। রামায়ণ-মহাভারতের সময় মানুষে কখনো কখনো দেবতার অস্ত্র লইয়া যেমন ব্যবহার করিতে পাইত, এ যেন সেইরকম।

রসিকের মনে হইল এই বাইসিক্‌ল্‌ নহিলে তাহার জীবন বৃথা। দাম এমনই কী বেশি। একশো পঁচিশ টাকা মাত্র! এই একশো পঁচিশ টাকা দিয়া মানুষ একটা নূতন শক্তি লাভ করিতে পারে— ইহা তো সস্তা। বিষ্ণুর গরুড়বাহন এবং সূর্যের অরুণসারথি তো সৃষ্টিকর্তাকে কম ভোগ ভোগায় নাই, আর ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবার জন্য সমুদ্রমন্থন করিতে হইয়াছিল— কিন্তু এই বাইসিক্‌ল্‌টি আপন পৃথিবীজয়ী গতিবেগ স্তব্ধ করিয়া কেবল একশো পঁচিশ টাকার জন্যে দোকানের এক কোণে দেয়াল ঠেস দিয়া প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

দাদার কাছে রসিক আর-কিছু চাহিবে না পণ করিয়াছিল কিন্তু সে পণ রক্ষা হইল না। তবে চাওয়াটার কিছু বেশ-পরিবর্তন করিয়া দিল। কহিল, "আমাকে একশো পঁচিশ টাকা ধার দিতে হইবে।"

বংশীর কাছে রসিক কিছুদিন হইতে কোনো আবদার করে নাই, ইহাতে শরীরের অসুখের উপর আর-একটা গভীরতর বেদনা বংশীকে দিনরাত্রি পীড়া দিতেছিল। তাই রসিক তাহার কাছে দরবার উপস্থিত করিবামাত্রই মুহূর্তের জন্য বংশীর মন নাচিয়া উঠিল ; মনে হইল, 'দূর হোক গে ছাই, এমন করিয়া আর টানাটানি করা যায় না— দিয়া ফেলি।' কিন্তু বংশ? সে যে একেবারেই ডোবে! একশো পঁচিশ টাকা দিলে আর বাকি থাকে কী। ধার! রসিক একশো পঁচিশ টাকা ধার শুধিবে! তাই যদি সম্ভব হইত তবে তো বংশী নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারিত।

বংশী মনটাকে একেবারে পাথরের মতো শক্ত করিয়া বলিল, "সে কি হয়, একশো পঁচিশ টাকা আমি কোথায় পাইব।" রসিক বন্ধুদের কাছে বলিল, "এ টাকা যদি না পাই তবে আমি বিবাহ করিবই না।" বংশীর কানে যখন সে কথা গেল তখন সে বলিল, "এও তো মজা মন্দ নয়। পাত্রীকে টাকা দিতে হইবে আবার পাত্রকে না দিলেও চলিবে না। এমন দায় তো আমাদের সাত পুরুষের মধ্যে কখনো ঘটে নাই।"

রসিক সুস্পষ্ট বিদ্রোহ করিয়া তাঁতের কাজ হইতে অবসর লইল। জিজ্ঞাসা করিলে বলে, আমার অসুখ করিয়াছে। তাঁতের কাজ না করা ছাড়া তাহার আহার-বিহারে অসুখের অন্য কোনো লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। বংশী মনে মনে একটু অভিমান করিয়া বলিল, 'থাক্, উহাকে আমি আর কখনো কাজ করিতে বলিব না'— বলিয়া রাগ করিয়া নিজেকে আরো বেশি কষ্ট দিতে লাগিল। বিশেষত সেই বছরেই বয়কটের কল্যাণে হঠাৎ তাঁতের কাপড়ের দর এবং আদর অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। তাঁতিদের মধ্যে যাহারা অন্য কাজে ছিল তাহারা প্রায় সকলে তাঁতে ফিরিল। নিয়তচঞ্চল মাকুগুলা ইঁদুর-বাহনের মতো সিদ্ধিদাতা গণনায়ককে বাংলাদেশের তাঁতির ঘরে দিনরাত কাঁধে করিয়া দৌড়াইতে লাগিল। এখন এক মুহূর্ত তাঁত কামাই পড়িলে বংশীর মন অস্থির হইয়া উঠে ; এই সময়ে রসিক যদি তাহার সাহায্য করে তবে দুই বৎসরের কাজ ছয় মাসে আদায় হইতে পারে, কিন্তু সে আর ঘটিল না। কাজেই ভাঙা শরীর লইয়া বংশী একেবারে সাধ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে লাগিল।

রসিক প্রায় বাড়ির বাহিরে বাহিরেই কাটায়। কিন্তু হঠাৎ একদিন যখন সন্ধ্যার

সময় বংশীর হাত আর চলে না, পিঠের দাঁড়া যেন ফাটিয়া পড়িতেছে, কেবলই কাজের গোলমাল হইয়া যাইতেছে এবং তাহা সারিয়া লইতে বৃথা সময় কাটিতেছে, এমন সময় শুনিতে পাইল, সেই কিছুকালের উপেক্ষিত হার্মোনিয়ম-যন্ত্রে আবার লক্ষ্ণৌ ঠুংরি বাজিতেছে। এমন দিন ছিল যখন কাজ করিতে করিতে রসিকের এই হার্মোনিয়ম বাজনা শুনিলে গর্বে ও আনন্দে বংশীর মন পুলকিত হইয়া উঠিত, আজ একেবারেই সেরূপ হইল না। সে তাঁত ফেলিয়া ঘরের আঙিনার কাছে আসিয়া দেখিল, একজন কোথাকার অপরিচিত লোককে রসিক বাজনা শুনাইতেছে। ইহাতে তাহার জ্বরতপ্ত ক্লান্ত দেহ আরো জ্বলিয়া উঠিল। মুখে তাহার যাহা আসিল তাহাই বলিল। রসিক উদ্ধত হইয়া জবাব করিল, "তোমার অন্নে যদি আমি ভাগ বসাই তবে আমি" ইত্যাদি ইত্যাদি। বংশী কহিল, "আর মিথ্যা বড়াই করিয়া কাজ নাই, তোমার সামর্থ্য যতদুর ঢের দেখিয়াছি! শুধু বাবুদের নকলে বাজনা বাজাইয়া নবাবি করিলেই তো হয় না।" বলিয়া সে চলিয়া গেল— আর তাঁতে বসিতে পারিল না; ঘরে মাদুরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

রসিক যে হার্মোনিয়ম বাজাইয়া চিত্তবিনোদন করিবার জন্য সঙ্গী জুটাইয়া আনিয়াছিল তাহা নহে। থানাগড়ে যে সার্কাসের দল আসিয়াছিল রসিক সেই দলে চাকরির উমেদারি করিতে গিয়াছিল। সেই দলেরই একজনের কাছে নিজের ক্ষমতার পরিচয় দিবার জন্য তাহাকে যতগুলি গৎ জানে একে একে শুনাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল— এমন সময় সংগীতের মাঝখানে নিতান্ত অন্যরকম সুর আসিয়া পৌঁছিল।

আজ পর্যন্ত বংশীর মুখ দিয়া এমন কঠিন কথা কখনো বাহির হয় নাই। নিজের বাক্যে সে নিজেই আশ্চর্য হইয়া গেল। তাহার মনে হইল যেন তাহাকে অবলম্বন করিয়া আর-একজন কে এই নিষ্ঠুর কথাগুলো বলিয়া গেল। এমনতরো মর্মান্তিক ভর্ৎসনার পরে বংশীর পক্ষে আর তাহার সঞ্চয়ের টাকা রক্ষা করা সম্ভবপর নহে। যে টাকার জন্য হঠাৎ এমন অভাবনীয় কাণ্ডটা ঘটিতে পারিল সেই টাকার উপর বংশীর ভারি একটা রাগ হইল— তাহাতে আর তাহার কোনো সুখ রহিল না। রসিক যে তাহার কত আদরের সামগ্রী, এই কথা কেবলই তাহার মনের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। যখন সে 'দাদা' শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করিতে পারিত না, যখন তাহার দুরন্ত হস্ত হইতে তাঁতের সুতাগুলোকে রক্ষা করা এক বিষম ব্যাপার ছিল, যখন তাহার দাদা হাত বাড়াইবামাত্র সে অন্য-সকলের কোল হইতেই ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সবেগে তাহার বুকের উপর আসিয়া পড়িত, এবং তাহার ঝাঁকড়া চুল ধরিয়া টানাটানি করিত, তাহার নাক ধরিয়া দন্তহীন মুখের মধ্যে পুরিবার চেষ্টা করিত, সে-সমস্তই

সুস্পষ্ট মনে পড়িয়া বংশীর প্রাণের ভিতরটাতে হাহা করিতে লাগিল। সে আর শুইয়া থাকিতে পারিল না। রসিকের নাম ধরিয়া বার-কয়েক করুণকণ্ঠে ডাকিল। সাড়া না পাইয়া তাহার জ্বর লইয়াই সে উঠিল। গিয়া দেখিল, সেই হার্মোনিয়মটা পাশে পড়িয়া আছে, অন্ধকারে দাওয়ায় রসিক চুপ করিয়া একলা বসিয়া। তখন বংশী কোমর হইতে সাপের মতো সরু লম্বা এক থলি খুলিয়া ফেলিল; রুদ্ধপ্রায়কণ্ঠে কহিল, "এই নে ভাই— আমার এ টাকা সমস্ত তোরই জন্য। তোরই বউ ঘরে আনিব বলিয়া আমি এ জমাইতেছিলাম। কিন্তু তোকে কাঁদাইয়া আমি জমাইতে পারিব না, ভাই আমার, গোপাল আমার— আমার সে শক্তি নাই— তুই চাকার গাড়ি কিনিস, তোর যা খুশি তাই করিস।" রসিক দাঁড়াইয়া উঠিয়া শপথ করিয়া কঠোর-স্বরে কহিল, "চাকার গাড়ি কিনিতে হয়, বউ আনিতে হয়, আমার নিজের টাকায় করিব— তোমার ও টাকা আমি ছুঁইব না।" বলিয়া বংশীর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। উভয়ের মধ্যে আর এই টাকার কথা বলার পথ রহিল না— কোনো কথা বলাই অসম্ভব হইয়া উঠিল।

৪

রসিকের ভক্তশ্রেষ্ঠ গোপাল আজকাল অভিমান করিয়া দূরে দূরে থাকে। রসিকের সামনে দিয়া তাহাকে দেখাইয়া দেখাইয়া একাই মাছ ধরিতে যায়, আগেকার মতো তাহাকে ডাকাডাকি করে না। আর, সৌরভীর তো কথাই নাই। রসিকদাদার সঙ্গে তাহার আড়ি, একেবারে জন্মের মতো আড়ি— অথচ সে যে এতবড়ো একটা ভয়ংকর আড়ি করিয়াছে সেটা রসিককে স্পষ্ট করিয়া জানাইবার সুযোগ না পাইয়া আপনার মনে ঘরের কোণে অভিমানে ক্ষণে ক্ষণে কেবলই তাহার দুই চোখ ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

এমন সময়ে একদিন রসিক মধ্যাহ্নে গোপালদের বাড়িতে গিয়া তাহাকে ডাক দিল। আদর করিয়া তাহার কান মলিয়া দিল, তাহাকে কাতুকুতু দিতে লাগিল। গোপাল প্রথমটা প্রবল আপত্তি প্রকাশ করিয়া লড়াইয়ের ভাব দেখাইল, কিন্তু বেশিক্ষণ সেটা রাখিতে পারিল না; দুইজনে বেশ হাস্যালাপ জমিয়া উঠিল। রসিক কহিল, "গোপাল, আমার হার্মোনিয়মটি নিবি?"

হার্মোনিয়ম! এতবড়ো দান! কলির সংসারে এও কি কখনো সম্ভব! কিন্তু যে জিনিসটা তাহার ভালো লাগে, বাধা না পাইলে সেটা অসংকোচে গ্রহণ করিবার

শক্তি গোপালের যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। অতএব হার্মোনিয়মটি সে অবিলম্বে অধিকার করিয়া লইল, বলিয়া রাখিল, "ফিরিয়া চাহিলে আর কিন্তু পাইবে না।"

গোপালকে যখন রসিক ডাক দিয়াছিল তখন নিশ্চয় জানিয়াছিল সে ডাক অন্তত আরো একজনের কানে গিয়া পৌঁছিয়াছে। কিন্তু বাহিরে আজ তাহার কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না। তখন রসিক গোপালকে বলিল, "সৈরি কোথায় আছে একবার ডাকিয়া আন্‌ তো।"

গোপাল ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "সৈরি বলিল তাহাকে এখন বড়ি শুকাইতে দিতে হইবে, তাহার সময় নাই।" রসিক মনে মনে হাসিয়া কহিল, "চল্‌ দেখি সে কোথায় বড়ি শুকাইতেছে।" রসিক আঙিনার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, কোথাও বড়ির নামগন্ধ নাই। সৌরভী তাহাদের পায়ের শব্দ পাইয়া আর-কোথাও লুকাইবার উপায় না দেখিয়া তাহাদের দিকে পিঠ করিয়া মাটির প্রাচীরের কোণ ঠেসিয়া দাঁড়াইল। রসিক তাহার কাছে গিয়া তাহাকে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "রাগ করেছিস সৈরি?" সে আঁকিয়া বাঁকিয়া রসিকের চেষ্টাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া দেয়ালের দিকেই মুখ করিয়া রহিল।

একদা রসিক আপন খেয়ালে নানা রঙের সুতা মিলাইয়া নানা চিত্রবিচিত্র করিয়া একটা কাঁথা সেলাই করিতেছিল। মেয়েরা যে কাঁথা সেলাই করিত তাহার কতকগুলা বাঁধা নকশা ছিল— কিন্তু রসিকের সমস্তই নিজের মনের রচনা। যখন এই সেলাইয়ের ব্যাপার চলিতেছিল তখন সৌরভী আশ্চর্য হইয়া একমনে তাহা দেখিত— সে মনে করিত, জগতে কোথাও এমন আশ্চর্য কাঁথা আজ পর্যন্ত রচিত হয় নাই। প্রায় যখন কাঁথা শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময়ে রসিকের বিরক্তি বোধ হইল, সে আর শেষ করিল না। ইহাতে সৌরভী মনে ভারি পীড়া বোধ করিয়াছিল— এইটে শেষ করিয়া ফেলিবার জন্য সে রসিককে কতবার যে কত সানুনয় অনুরোধ করিয়াছে তাহার ঠিক নাই। আর ঘণ্টা দুই-তিন বসিলেই শেষ হইয়া যায়, কিন্তু রসিকের যাহাতে গা লাগে না তাহাতে তাহাকে প্রবৃত্ত করাইতে কে পারে। হঠাৎ এতদিন পরে রসিক কাল রাত্রি জাগিয়া সেই কাঁথাটি শেষ করিয়াছে।

রসিক বলিল, "সৈরি, সেই কাঁথাটা শেষ করিয়াছি, একবার দেখবি না?"

অনেক কষ্টে সৌরভীর মুখ ফিরাইতেই সে আঁচল দিয়া মুখ ঝাঁপিয়া ফেলিল। তখন যে তাহার দুই কপোল বাহিয়া জল পড়িতেছিল, সে জল যে দেখাইবে কেমন করিয়া।

সৌরভীর সঙ্গে তাহার পূর্বের সহজ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে রসিকের যথেষ্ট সময়

লাগিল। অবশেষে উভয়পক্ষে সন্ধি যখন এতদূর অগ্রসর হইল যে সৌরভী রসিককে পান আনিয়া দিল তখন রসিক সেই কাঁথার আবরণ খুলিয়া সেটা আঙিনার উপর মেলিয়া দিল— সৌরভীর হৃদয়টি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। অবশেষে যখন রসিক বলিল "সৈরি, এ কাঁথা তোর জন্যই তৈরি করিয়াছি, এটা আমি তোকেই দিলাম," তখন এতবড়ো অভাবনীয় দান কোনোমতেই সৌরভী স্বীকার করিয়া লইতে পারিল না। পৃথিবীতে সৌরভী কোনো দুর্লভ জিনিস দাবি করিতে শেখে নাই। গোপাল তাহাকে খুব ধমক দিল। মানুষের মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে তাহার কোনো বোধ ছিল না; সে মনে করিল, লোভনীয় জিনিস লইতে লজ্জা একটা নিরবচ্ছিন্ন কপটতামাত্র। গোপাল ব্যর্থ কালব্যয় নিবারণের জন্য নিজেই কাঁথাটা ভাঁজ করিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে রাখিয়া আসিল। বিচ্ছেদ মিটমাট হইয়া গেল। এখন হইতে আবার পূর্বতন প্রণালীতে তাহাদের বন্ধুত্বের ইতিহাসের দৈনিক অনুবৃত্তি চলিতে থাকিবে, দুটি বালকবালিকার মন এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

সেদিন পাড়ায় তাহার দলের সকল ছেলেমেয়ের সঙ্গেই রসিক আগেকার মতোই ভাব করিয়া লইল— কেবল তাহার দাদার ঘরে একবারও প্রবেশ করিল না। যে প্রৌঢ়া বিধবা তাহাদের বাড়িতে আসিয়া রাঁধিয়া দিয়া যায় সে আসিয়া যখন সকালে বংশীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কী রান্না হইবে"— বংশী তখন বিছানায় শুইয়া। সে বলিল, "আমার শরীর ভালো নাই, আজ আমি কিছু খাইব না— রসিককে ডাকিয়া তুমি খাওয়াইয়া দিয়ো।" স্ত্রীলোকটি বলিল, রসিক তাহাকে বলিয়াছে, সে আজ বাড়িতে খাইবে না— অন্যত্র বোধ করি তাহার নিমন্ত্রণ আছে। শুনিয়া বংশী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গায়ের কাপড়টায় মাথা পর্যন্ত মুড়িয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

রসিক যেদিন সন্ধ্যার পর গ্রাম ছাড়িয়া সার্কাসের দলের সঙ্গে চলিয়া গেল সেদিন এমনি করিয়াই কাটিল। শীতের রাত্রি; আকাশে আধখানি চাঁদ উঠিয়াছে। সেদিন হাট ছিল। হাট সারিয়া সকলেই চলিয়া গিয়াছে— কেবল যাহাদের দূর পাড়ায় বাড়ি, এখনো তাহারা মাঠের পথে কথা কহিতে কহিতে চলিয়াছে। একখানি বোঝাইশূন্য গোরুর গাড়িতে গাড়োয়ান র‍্যাপার মুড়ি দিয়া নিদ্রামগ্ন; গোরু দুটি আপন মনে ধীরে ধীরে বিশ্রামশালার দিকে গাড়ি টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। গ্রামের গোয়ালঘর হইতে খড়জ্বালানো ধোঁয়া বায়ুহীন শীতরাত্রে হিমভারাক্রান্ত হইয়া স্তরে স্তরে বাঁশঝাড়ের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে। রসিক যখন প্রান্তরের প্রান্তে গিয়া পৌঁছিল, যখন অস্ফুট চন্দ্রালোকে তাহাদের গ্রামের ঘন গাছগুলির নীলিমাও আর দেখা যায় না, তখন রসিকের মনটা কেমন করিয়া উঠিল। তখনো ফিরিয়া আসার পথ কঠিন ছিল না,

কিন্তু তখনো তাহার হৃদয়ের কঠিনতা যায় নাই। 'উপার্জন করি না অথচ দাদার অন্ন খাই', যেমন করিয়া হউক এ লাঞ্ছনা না মুছিয়া, নিজের টাকায় কেনা বাইসিক্‌লে না চড়িয়া আজন্মকালের এই গ্রামে আর ফিরিয়া আসা চলিবে না— রহিল এখানকার চন্দনীদহের ঘাট, এখানকার সুখসাগর দিঘি, এখানকার ফাল্গুন মাসে সরষে খেতের গন্ধ, চৈত্র মাসে আমবাগানে মৌমাছির গুঞ্জনধ্বনি; রহিল এখানকার বন্ধুত্ব, এখানকার আমোদ-উৎসব— এখন সম্মুখে অপরিচিত পৃথিবী, অনাত্মীয় সংসার এবং ললাটে অদৃষ্টের লিখন।

৫

রসিক একমাত্র তাঁতের কাজেই যত অসুবিধা দেখিয়াছিল; তাহার মনে হইত, আর-সকল কাজই ইহার চেয়ে ভালো। সে মনে করিয়াছিল, একবার তাহার সংকীর্ণ ঘরের বন্ধন ছেদন করিয়া বাহির হইতে পারিলেই তাহার কোনো ভাবনা নাই। তাই সে ভারি আনন্দে পথে বাহির হইয়াছিল। মাঝখানে যে কোনো বাধা, কোনো কষ্ট, কোনো দীর্ঘকালব্যয় আছে, তাহা তাহার মনেও হইল না। বাহিরে দাঁড়াইয়া দূরের পাহাড়কেও যেমন মনে হয় অনতিদূরে— যেমন মনে হয়, আধ ঘণ্টার পথ পার হইলেই বুঝি তাহার শিখরে গিয়া পৌঁছিতে পারা যায়— তাহার গ্রামের বেষ্টন হইতে বাহির হইবার সময় নিজের ইচ্ছার দুর্লভ সার্থকতাকে রসিকের তেমনই সহজগম্য এবং অত্যন্ত নিকটবর্তী বলিয়া বোধ হইল। কোথায় যাইতেছে রসিক কাহাকেও তাহার কোনো খবর দিল না। একদিন স্বয়ং সে খবর বহন করিয়া আসিবে এই তাহার পণ রহিল।

কাজ করিতে গিয়া দেখিল, বেগারের কাজে আদর পাওয়া যায় এবং সেই আদর সে বরাবর পাইয়াছে; কিন্তু যেখানে গরজের কাজ সেখানে দয়ামায়া নাই। বেগারের কাজে নিজের ইচ্ছা -নামক পদার্থটাকে খুব করিয়া দৌড় করানো যায়, সেই ইচ্ছার জোরেই সে কাজে এমন অভাবনীয় নৈপুণ্য জাগিয়া উঠিয়া মনকে এত উৎসাহিত করিয়া তোলে; কিন্তু বেতনের কাজে এই ইচ্ছা একটা বাধা; এই কাজের তরণীতে অনিশ্চিত ইচ্ছার হাওয়া লাগাইবার জন্য পালের কোনো বন্দোবস্ত নাই, দিনরাত কেবল মজুরের মতো দাঁড় টানা এবং লগি ঠেলা। যখন দর্শকের মতো দেখিয়াছিল তখন রসিক মনে করিয়াছিল, সার্কাসে ভারি মজা। কিন্তু ভিতরে যখন প্রবেশ করিল মজা তখন সম্পূর্ণ বাহির হইয়া গিয়াছে। যাহা আমোদের জিনিস যখন তাহা আমোদ দেয় না, যখন তাহার প্রতিদিনের পুনরাবৃত্তি বন্ধ হইলে প্রাণ বাঁচে অথচ তাহা কিছুতেই বন্ধ হইতে চায় না, তখন তাহার মতো অরুচিকর জিনিস আর-কিছুই হইতে

পারে না। এই সার্কাসের দলের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রসিকের প্রত্যেক দিনই তাহার পক্ষে একান্ত বিস্বাদ হইয়া উঠিল। সে প্রায়ই বাড়ির স্বপ্ন দেখে। রাত্রে ঘুম হইতে জাগিয়া অন্ধকারে প্রথমটা রসিক মনে করে, সে তাহার দাদার বিছানার কাছে শুইয়া আছে; মুহূর্তকাল পরেই চমক ভাঙিয়া দেখে, দাদা কাছে নাই। বাড়িতে থাকিতে এক-একদিন শীতের রাত্রে ঘুমের ঘোরে সে অনুভব করিত, দাদা তাহার শীত করিতেছে মনে করিয়া তাহার গাত্রবস্ত্রের উপরে নিজের কাপড়খানা ধীরে ধীরে চাপাইয়া দিতেছে; এখানে পৌষের রাত্রে যখন ঘুমের ঘোরে তাহার শীত শীত করে তখন দাদা তাহার গায়ে ঢাকা দিতে আসিবে মনে করিয়া সে যেন অপেক্ষা করিতে থাকে— দেরি হইতেছে দেখিয়া রাগ হয়। এমন সময় জাগিয়া উঠিয়া মনে পড়ে, দাদা কাছে নাই এবং সেইসঙ্গে ইহাও মনে হয় যে, এই শীতের সময় তাহার গায়ে আপন কাপড়টি টানিয়া দিতে না পারিয়া আজ রাত্রে শূন্যশয্যার প্রান্তে তাহার দাদার মনে শান্তি নাই। তখনি সেই অর্ধরাত্রে সে মনে করে, কাল সকালে উঠিয়াই আমি ঘরে ফিরিয়া যাইব। কিন্তু ভালো করিয়া জাগিয়া উঠিয়া আবার সে শক্ত করিয়া প্রতিজ্ঞা করে; মনে মনে আপনাকে বারবার করিয়া জপাইতে থাকে যে, 'আমি পণের টাকা ভরতি করিয়া বাইসিক্‌লে চড়িয়া বাড়ি ফিরিব তবে আমি পুরুষমানুষ, তবে আমার নাম রসিক।'

একদিন দলের কর্তা তাহাকে তাঁতি বলিয়া বিশ্রী করিয়া গালি দিল। সেইদিন রসিক তাহার সামান্য কয়েকটি কাপড়, ঘটি ও থালাবাটি, নিজের যে-কিছু ঋণ ছিল তাহার পরিবর্তে ফেলিয়া রাখিয়া সম্পূর্ণ রিক্তহস্তে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। সমস্ত-দিন কিছু খাওয়া হয় নাই। সন্ধ্যার সময় যখন নদীর ধারে দেখিল গোরুগুলা আরামে চরিয়া খাইতেছে তখন একপ্রকার ঈর্ষার সহিত তাহার মনে হইতে লাগিল, পৃথিবী যথার্থ এই পশুপক্ষীদের মা— নিজের হাতে তাহাদের মুখে আহারের গ্রাস তুলিয়া দেন— আর মানুষ বুঝি তাঁর কোন্ সতিনের ছেলে, তাই চারি দিকে এতবড়ো মাঠ ধূ ধূ করিতেছে, কোথাও রসিকের জন্য একমুষ্টি অন্ন নাই। নদীর কিনারায় গিয়া রসিক অঞ্জলি ভরিয়া খুব খানিকটা জল খাইল। এই নদীটির ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, কোনো ভাবনা নাই, কোনো চেষ্টা নাই, ঘর নাই তবু ঘরের অভাব নাই, সম্মুখে অন্ধকার রাত্রি আসিতেছে তবু সে নিরুদ্‌বেগে নিরুদ্দেশের অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে— এই কথা ভাবিতে ভাবিতে রসিক একদৃষ্টে জলের স্রোতের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল —বোধ করি তাহার মনে হইতেছিল, দুর্বহ মানবজন্মটাকে এই বন্ধনহীন নিশ্চিন্ত জলধারার সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিতে পারিলেই একমাত্র শান্তি।

এমন সময় একজন তরুণ যুবক মাথা হইতে একটা বস্তা নামাইয়া তাহার পাশে

বসিয়া কোঁচার প্রান্ত হইতে চিঁড়া খুলিয়া লইয়া ভিজাইয়া খাইবার উদ্যোগ করিল। এই লোকটিকে দেখিয়া রসিকের কিছু নূতন রকমের ঠেকিল। পায়ে জুতা নাই, ধুতির উপর একটা জামা, মাথায় পাগড়ি পরা— দেখিবামাত্র স্পষ্ট মনে হয়, ভদ্রলোকের ছেলে— কিন্তু মুটেমজুরের মতো কেন যে সে এমন করিয়া বস্তা বহিয়া বেড়াইতেছে ইহা সে বুঝিতে পারিল না। দুইজনের আলাপ হইতে দেরি হইল না এবং রসিক ভিজা চিঁড়ার যথোচিত পরিমাণে ভাগ লইল। এ ছেলেটি কলিকাতার কলেজের ছাত্র। ছাত্রেরা যে স্বদেশী কাপড়ের দোকান খুলিয়াছে তাহারই জন্য দেশি কাপড় সংগ্রহ করিতে সে এই গ্রামের হাটে আসিয়াছে। নাম সুবোধ, জাতিতে ব্রাহ্মণ। তাহার কোনো সংকোচ নাই, বাধা নাই— সমস্তদিন হাটে ঘুরিয়া সন্ধ্যাবেলায় চিঁড়া ভিজাইয়া খাইতেছে।

দেখিয়া নিজের সম্বন্ধে রসিকের ভারি একটা লজ্জা বোধ হইল। শুধু তাই নয়, তাহার মনে হইল, যেন মুক্তি পাইলাম। এমন করিয়া খালি পায়ে মজুরের মতো যে মাথায় মোট বহিতে পারা যায় ইহা উপলব্ধি করিয়া জীবনযাত্রার ক্ষেত্র এক মুহূর্তে তাহার সম্মুখে প্রসারিত হইয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল, আজ তো আমার উপবাস করিবার কোনো দরকারই ছিল না— আমি তো ইচ্ছা করিলেই মোট বহিতে পারিতাম।

সুবোধ যখন মোট মাথায় লইতে গেল রসিক বাধা দিয়া বলিল, "মোট আমি বহিব।" সুবোধ তাহাতে নারাজ হইলে রসিক কহিল, "আমি তাঁতির ছেলে, আমি আপনার মোট বহিব, আমাকে কলিকাতায় লইয়া যান।" 'আমি তাঁতি' আগে হইলে রসিক এ কথা কখনোই মুখে উচ্চারণ করিতে পারিত না— তাহার বাধা কাটিয়া গেছে।

সুবোধ তো লাফাইয়া উঠিল— বলিল, "তুমি তাঁতি! আমি তো তাঁতি খুঁজিতেই বাহির হইয়াছি। আজকাল তাহাদের দর এত বাড়িয়াছে যে, কেহই আমাদের তাঁতের স্কুলে শিক্ষকতা করিতে যাইতে রাজি হয় না।"

রসিক তাঁতের স্কুলের শিক্ষক হইয়া কলিকাতায় আসিল। এতদিন পরে বাসা-খরচ বাদে সে সামান্য কিছু জমাইতে পারিল, কিন্তু বাইসিক্‌ল্-চক্রের লক্ষ্য ভেদ করিতে এখনো অনেক বিলম্ব আছে। আর বধূর বরমাল্যের তো কথাই নাই। ইতিমধ্যে তাঁতের স্কুলটা গোড়ায় যেমন হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তেমনি হঠাৎ নিবিয়া যাইবার উপক্রম হইল। কমিটির বাবুরা যতক্ষণ কমিটি করিতে থাকেন অতি চমৎকার হয়, কিন্তু কাজ করিতে নামিলেই গণ্ডগোল বাধে। তাঁহারা নানা দিগ্‌দেশ হইতে নানা

প্রকারের তাঁত আনাইয়া শেষকালে এমন একটা অপরূপ জঞ্জাল বুনিয়া তুলিলেন যে, সমস্ত ব্যাপারটা লইয়া যে কোন্ আবর্জনাকুণ্ডে ফেলা যাইতে পারে তাহা কমিটির পর কমিটি করিয়াও স্থির করিতে পারিলেন না।

রসিকের আর সহ্য হয় না। ঘরে ফিরিবার জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। চোখের সামনে সে কেবলই আপনার গ্রামের নানা ছবি দেখিতেছে। অতি তুচ্ছ খুঁটিনাটিও উজ্জ্বল হইয়া তাহার মনের সামনে দেখা দিয়া যাইতেছে। পুরোহিতের আধপাগলা ছেলেটা; তাহাদের প্রতিবেশীর কপিলবর্ণের বাছুরটা; নদীর পথে যাইতে রাস্তার দক্ষিণ ধারে একটা তালগাছকে শিকড় দিয়া আঁটিয়া জড়াইয়া একটা অশথগাছ দুই কুস্তিগির পালোয়ানের মতো প্যাঁচ কষিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহারই তলায় একটা অনেকদিনের পরিত্যক্ত ভিটা; তাহাদের বিলের তিন দিকে আমন ধান, এক পাশে গভীর জলের প্রান্তে মাছধরা জাল বাঁধিবার জন্য বাঁশের খোঁটা পোঁতা, তাহারই উপরে একটি মাছরাঙা চুপ করিয়া বসিয়া; কৈবর্তপাড়া হইতে সন্ধ্যার পরে মাঠ পার হইয়া কীর্তনের শব্দ আসিতেছে; ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে নানাপ্রকার মিশ্রিত গন্ধে গ্রামের ছায়াময় পথে শুব্ধ হাওয়া ভরিয়া রহিয়াছে; আর তারই সঙ্গে মিলিয়া তাহার সেই ভক্তবন্ধুর দল, সেই চঞ্চল গোপাল, সেই আঁচলের-খুঁটে-পান-বাঁধা বড়ো-বড়ো-স্নিগ্ধ-চোখ-মেলা সৌরভী, এই-সমস্ত স্মৃতি ছবিতে গন্ধে শব্দে স্নেহে প্রীতিতে বেদনায় তাহার মনকে প্রতিদিন গভীরতর আবিষ্ট করিয়া ধরিতে লাগিল। গ্রামে থাকিতে রসিকের যে নানাপ্রকার কারুনৈপুণ্য প্রকাশ পাইত এখানে তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া গেছে, এখানে তাহার কোনো মূল্য নাই; এখানকার দোকান-বাজারের কলের তৈরি জিনিস হাতের চেষ্টাকে লজ্জা দিয়া নিরস্ত করে। তাঁতের ইস্কুলে কাজ কাজের বিড়ম্বনামাত্র, তাহাতে মন ভরে না। থিয়েটারের দীপশিখা তাহার চিত্তকে পতঙ্গের মতো মরণের পথে টানিয়াছিল— কেবল টাকা জমাইবার কঠোর নিষ্ঠা তাহাকে বাঁচাইয়াছে। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে কেবলমাত্র তাহার গ্রামটিতে যাইবার পথই তাহার কাছে একেবারে রুদ্ধ। এইজন্যই গ্রামে যাইবার টান প্রতি মুহূর্তে তাহাকে এমন করিয়া পীড়া দিতেছে। তাঁতের ইস্কুলে সে প্রথমটা ভারি ভরসা পাইয়াছিল, কিন্তু আজ যখন সে আশা আর টেঁকে না, যখন তাহার দুই মাসের বেতনই সে আদায় করিতে পারিল না, তখন সে আপনাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারে না এমন হইল। সমস্ত লজ্জা স্বীকার করিয়া, মাথা হেঁট করিয়া, এই এক বৎসর প্রবাসবাসের বৃহৎ ব্যর্থতা বহিয়া দাদার আশ্রয়ে যাইবার জন্য তাহার মনের মধ্যে কেবলই তাগিদ আসিতে লাগিল।

যখন মনটা অত্যন্ত খাই-খাই করিতেছে এমন সময় তাহার বাসার কাছে খুব ধুম করিয়া একটা বিবাহ হইল। সন্ধ্যাবেলায় বাজনা বাজাইয়া বর আসিল। সেইদিন রাত্রে রসিক স্বপ্ন দেখিল, তাহার মাথায় টোপর, গায়ে লাল চেলি, কিন্তু সে গ্রামের বাঁশঝাড়ের আড়ালে দাঁড়াইয়া আছে। পাড়ার ছেলেমেয়েরা 'তোর বর আসিয়াছে' বলিয়া সৌরভীকে খেপাইতেছে, সৌরভী বিরক্ত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছে— রসিক তাহাদিগকে শাসন করিতে ছুটিয়া আসিতে চায়, কিন্তু কেমন করিয়া কেবলই বাঁশের কঞ্চিতে তাহার কাপড় জড়াইয়া যায়, ডালে তাহার টোপর আটকায়, কোনোমতেই পথ করিয়া বাহির হইতে পারে না। জাগিয়া উঠিয়া রসিকের মনের মধ্যে ভারি লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। বধূ তাহার জন্য ঠিক করা আছে অথচ সেই বধূকে ঘরে আনিবার যোগ্যতা তাহার নাই এইটেই তাহার কাপুরুষতার সব চেয়ে চূড়ান্ত পরিচয় বলিয়া মনে হইল। না— এতবড়ো দীনতা স্বীকার করিয়া গ্রামে ফিরিয়া যাওয়া কোনোমতেই হইতে পারে না।

৬

অনাবৃষ্টি যখন চলিতে থাকে তখন দিনের পর দিন কাটিয়া যায় মেঘের আর দেখা নাই, যদি-বা মেঘ দেখা দেয় বৃষ্টি পড়ে না, যদি-বা বৃষ্টি পড়ে তাহাতে মাটি ভেজে না; কিন্তু বৃষ্টি যখন নামে তখন দিগন্তের এক কোণে যেমনি মেঘ দেখা দেয় অমনি দেখিতে দেখিতে আকাশ ছাইয়া ফেলে এবং অবিরল বর্ষণে পৃথিবী ভাসিয়া যাইতে থাকে। রসিকের ভাগ্যে হঠাৎ সেইরকমটা ঘটিল।

জানকী নন্দী মস্ত ধনী লোক। সে একদিন কাহার কাছ হইতে কী একটা খবর পাইল; তাঁতের ইস্কুলের সামনে তাহার জুড়ি আসিয়া থামিল, তাঁতের ইস্কুলের মাস্টারের সঙ্গে তাহার দুই-চারটে কথা হইল এবং তাহার পরদিনেই রসিক আপনার মেসের বাসা পরিত্যাগ করিয়া নন্দীবাবুদের মস্ত তেতালা বাড়ির এক ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

নন্দীবাবুদের বিলাতের সঙ্গে কমিশন এজেন্সির মস্ত কারবার— সেই কারবারে কেন যে জানকীবাবু অযাচিতভাবে রসিককে একটা নিতান্ত সামান্য কাজে নিযুক্ত করিয়া যথেষ্ট পরিমাণে বেতন দিতে লাগিলেন তাহা রসিক বুঝিতেই পারিল না। সেরকম কাজের জন্য লোক সন্ধান করিবার দরকারই হয় না, এবং যদি-বা লোক জোটে তাহার তো এত আদর নহে। বাজারে নিজের মূল্য কত এতদিনে রসিক তাহা বুঝিয়া লইয়াছে, অতএব জানকীবাবু যখন তাহাকে ঘরে রাখিয়া যত্ন করিয়া

খাওয়াইতে লাগিলেন তখন রসিক তাহার এত আদরের মূল কারণ সুদূর আকাশের গ্রহনক্ষত্র ছাড়া আর-কোথাও খুঁজিয়া পাইল না।

কিন্তু তাহার শুভগ্রহটি অত্যন্ত দূরে ছিল না। তাহার একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ বলা আবশ্যক।

একদিন জানকীবাবুর অবস্থা এমন ছিল না। তিনি যখন কষ্ট করিয়া কলেজে পড়িতেন তখন তাঁহার সতীর্থ হরমোহন বসু ছিলেন তাঁহার পরম বন্ধু। হরমোহন ব্রাহ্মসমাজের লোক। এই কমিশন এজেন্সি হরমোহনদেরই পৈতৃক বাণিজ্য— তাঁহাদের একজন মুরুব্বি ইংরেজ সদাগর তাঁহার পিতাকে অত্যন্ত ভালোবাসিতেন। তিনি তাঁহাকে এই কাজে জুড়িয়া দিয়াছিলেন। হরমোহন তাঁহার নিঃস্ব বন্ধু জানকীকে এই কাজে টানিয়া লইয়াছিলেন।

সেই দরিদ্র অবস্থায় নূতন যৌবনে সমাজসংস্কার সম্বন্ধে জানকীর উৎসাহ হরমোহনের চেয়ে কিছুমাত্র কম ছিল না। তাই তিনি পিতার মৃত্যুর পরে তাঁহার ভগিনীর বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙিয়া দিয়া তাহাকে বড়ো বয়স পর্যন্ত লেখাপড়া শিখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে তাঁহাদের তন্তুবায়সমাজে যখন তাঁহার ভগিনীর বিবাহ অসম্ভব হইয়া উঠিল তখন কায়স্থ হরমোহন নিজে তাঁহাকে এই সংকট হইতে উদ্ধার করিয়া এই মেয়েটিকে বিবাহ করিলেন।

তাহার পরে অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে। হরমোহনেরও মৃত্যু হইয়াছে— তাঁহার ভগিনীও মারা গেছে। ব্যাবসাটিও প্রায় সম্পূর্ণ জানকীর হাতে আসিয়াছে। ক্রমে বাসাবাড়ি হইতে তাহার তেতালা বাড়ি হইল, চিরকালের নিকেলের ঘড়িটিকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়া সোনার ঘড়ি সুয়োরানীর মতো তাঁহার বক্ষের পার্শ্বে টিক্‌টিক্ করিতে লাগিল।

এইরূপে তাঁহার তহবিল যতই স্ফীত হইয়া উঠিল, অল্পবয়সের অকিঞ্চন অবস্থার সমস্ত উৎসাহ ততই তাঁহার কাছে নিতান্ত ছেলেমানুষি বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কোনোমতে পারিবারিক পূর্ব-ইতিহাসের এই অধ্যায়টাকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া সমাজে উঠিবার জন্য তাঁহার রোখ চাপিয়া উঠিল। নিজের মেয়েটিকে সমাজে বিবাহ দিবেন এই তাঁহার জেদ। টাকার লোভ দেখাইয়া দুই-একটি পাত্রকে রাজি করিয়াছিলেন, কিন্তু যখনই তাহাদের আত্মীয়েরা খবর পাইল তখনই তাহারা গোলমাল করিয়া বিবাহ ভাঙিয়া দিল। শিক্ষিত সৎপাত্র না হইলেও তাঁহার চলে— কন্যার চিরজীবনের সুখ বলিদান দিয়াও তিনি সমাজদেবতার প্রসাদলাভের জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন।

এমন সময়ে তিনি তাঁতের ইস্কুলের মাস্টারের খবর পাইলেন। সে থানাগড়ের

বসাক-বংশের ছেলে— তাহার পূর্বপুরুষ অভিরাম বসাকের নাম সকলেই জানে— এখন তাহাদের অবস্থা হীন, কিন্তু কুলে তাহারা তাঁহাদের চেয়ে বড়ো।

দূর হইতে দেখিয়া গৃহিণীর ছেলেটিকে পছন্দ হইল। স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলেটির পড়াশুনা কিরকম।" জানকীবাবু বলিলেন, "সে বালাই নাই। আজকাল যাহার পড়াশুনা বেশি, তাহাকে হিন্দুয়ানিতে আঁটিয়া ওঠা শক্ত।" গৃহিণী প্রশ্ন করিলেন, "টাকাকড়ি?" জানকীবাবু বলিলেন, "যথেষ্ট অভাব আছে। আমার পক্ষে সেইটেই লাভ।" গৃহিণী কহিলেন, "আত্মীয়স্বজনদের তো ডাকিতে হইবে।" জানকীবাবু কহিলেন, "পূর্বে অনেকবার সে পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে; তাহাতে আত্মীয়স্বজনেরা দ্রুতবেগে ছুটিয়া আসিয়াছে কিন্তু বিবাহ হয় নাই। এবারে স্থির করিয়াছি আগে বিবাহ দিব, আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে মিষ্টালাপ পরে সময়মত করা যাইবে।"

রসিক যখন দিনে রাত্রে তাহার গ্রামে ফিরিবার কথা চিন্তা করিতেছে— এবং হঠাৎ অভাবনীয়রূপে অতি সত্বর টাকা জমাইবার কী উপায় হইতে পারে তাহা ভাবিয়া কোনো কূলকিনারা পাইতেছে না, এমন সময় আহার ঔষধ দুইই তাহার মুখের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। হাঁ করিতে সে আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করিতে চাহিল না।

জানকীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার দাদাকে খবর দিতে চাও?" রসিক কহিল, "না, তাহার কোনো দরকার নাই।" সমস্ত কাজ নিঃশেষে সারিয়া তাহার পরে সে দাদাকে চমৎকৃত করিয়া দিবে, অকর্মণ্য রসিকের যে সামর্থ্য কিরকম তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণে কোনো ত্রুটি থাকিবে না।

শুভলগ্নে বিবাহ হইয়া গেল। অন্যান্য সকলপ্রকার দানসামগ্রীর আগে রসিক একটা বাইসিক্‌ল্ দাবি করিল।

৭

তখন মাঘের শেষ। সরষে এবং তিসির ফুলে খেত ভরিয়া আছে। আখের গুড় জ্বাল দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে, তাহারই গন্ধে বাতাস যেন ঘন হইয়া উঠিয়াছে। ঘরে ঘরে গোলা-ভরা ধান এবং কলাই; গোয়ালের প্রাঙ্গণে খড়ের গাদা স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে। ওপারে নদীর চরে বাথানে রাখালেরা গোরুমহিষের দল লইয়া কুটির বাঁধিয়া বাস করিতেছে। খেয়াঘাটের কাজ প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে— নদীর জল কমিয়া গিয়া লোকেরা কাপড় গুটাইয়া হাঁটিয়া পার হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

রসিক কলার-পরানো শার্টের উপর মালকোঁচা মারিয়া ঢাকাই ধুতি পরিয়াছে; শার্টের উপরে বোতাম-খোলা কালো বনাতের কোট, পায়ে রঙিন ফুলমোজা ও চকচকে

কালো চামড়ার শৌখিন বিলাতি জুতা। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পাকা রাস্তা বাহিয়া দ্রুতবেগে সে বাইসিক্‌ল্‌ চালাইয়া আসিল; গ্রামের কাঁচা রাস্তায় আসিয়া তাহাকে বেগ কমাইতে হইল। গ্রামের লোকে হঠাৎ তাহার বেশভূষা দেখিয়া তাহাকে চিনিতেই পারিল না। সেও কাহাকেও কোনো সম্ভাষণ করিল না; তাহার ইচ্ছা অন্য লোকে তাহাকে চিনিবার আগেই সর্বাগ্রে সে তাহার দাদার সঙ্গে দেখা করিবে। বাড়ির কাছাকাছি যখন সে আসিয়াছে তখন ছেলেদের চোখ সে এড়াইতে পারিল না। তাহারা এক মুহূর্তেই তাহাকে চিনিতে পারিল। সৌরভীদের বাড়ি কাছেই ছিল— ছেলেরা সেই দিকে ছুটিয়া চেঁচাইতে লাগিল, "সৈরিদিদির বর এসেছে, সৈরিদিদির বর।" গোপাল বাড়িতেই ছিল, সে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিবার পূর্বেই বাইসিক্‌ল্‌ রসিকদের বাড়ির সামনে আসিয়া থামিল।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, ঘর অন্ধকার, বাহিরে তালা লাগানো। জনহীন পরিত্যক্ত বাড়ির যেন নীরব একটা কান্না উঠিতেছে— কেহ নাই, কেহ নাই। এক নিমেষেই রসিকের বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিয়া চোখের সামনে সমস্ত অস্পষ্ট হইয়া উঠিল। তাহার পা কাঁপিতে লাগিল; বন্ধ দরজা ধরিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার গলা শুকাইয়া গেল, কাহাকেও ডাক দিতে সাহস হইল না। দূরে মন্দিরে সন্ধ্যারতির যে কাঁসরঘণ্টা বাজিতেছিল, তাহা যেন কোন্‌ একটি গতজীবনের পরপ্রান্ত হইতে সুগভীর একটা বিদায়ের বার্তা বহিয়া তাহার কানের কাছে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। সামনে যাহা-কিছু দেখিতেছে, এই মাটির প্রাচীর, এই চালাঘর, এই রুদ্ধ কপাট, এই জিগরগাছের বেড়া, এই হেলিয়া-পড়া খেজুরগাছ— সমস্তই যেন একটা হারানো সংসারের ছবিমাত্র, কিছুই যেন সত্য নহে।

গোপাল কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। রসিক পাংশুমুখে গোপালের মুখের দিকে চাহিল, গোপাল কিছু না বলিয়া চোখ নিচু করিল। রসিক বলিয়া উঠিল, "বুঝেছি, বুঝেছি— দাদা নাই।" অমনি সেইখানেই দরজার কাছে সে বসিয়া পড়িল। গোপাল তাহার পাশে বসিয়া কহিল, "ভাই রসিকদাদা, চলো আমাদের বাড়ি চলো।" রসিক তাহার দুই হাত ছাড়াইয়া দিয়া সেই দরজার সামনে উপুড় হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। দাদা! দাদা! দাদা! যে দাদা তাহার পায়ের শব্দটি পাইলে আপনিই ছুটিয়া আসিত কোথাও তাহার কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

গোপালের বাপ আসিয়া অনেক বলিয়া কহিয়া রসিককে বাড়িতে লইয়া আসিল। রসিক সেখানে প্রবেশ করিয়াই মুহূর্তকালের জন্য দেখিতে পাইল, সৌরভী সেই তাহার চিত্রিত কাঁথায় মোড়া কী একটা জিনিস অতি যত্নে রোয়াকের দেয়ালে ঠেসান দিয়া

রাখিতেছে। প্রাঙ্গণে লোকসমাগমের শব্দ পাইবামাত্রই সে ছুটিয়া ঘরের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। রসিক কাছে আসিয়াই বুঝিতে পারিল, এই কাঁথায় মোড়া পদার্থটি একটি নূতন বাইসিক্‌ল্‌। তৎক্ষণাৎ তাহার অর্থ বুঝিতে আর বিলম্ব হইল না। একটা বুকফাটা কান্না বক্ষ ঠেলিয়া তাহার কণ্ঠের কাছে পাকাইয়া পাকাইয়া উঠিতে লাগিল এবং চোখের জলের সমস্ত রাস্তা যেন ঠাসিয়া বন্ধ করিয়া ধরিল।

রসিক চলিয়া গেলে বংশী দিনরাত্রি অবিশ্রাম খাটিয়া সৌরভীর পণ এবং এই বাইসিক্‌ল্‌ কিনিবার টাকা সঞ্চয় করিয়াছিল। তাহার এক মুহূর্ত আর-কোনো চিন্তা ছিল না। ক্লান্ত ঘোড়া যেমন প্রাণপণে ছুটিয়া গম্যস্থানে পৌঁছিয়াই পড়িয়া মরিয়া যায়, তেমনি যেদিন পণের টাকা পূর্ণ করিয়া বংশী বাইসিক্‌ল্‌টি ভি. পি. ডাকে পাইল সেইদিনই আর তাহার হাত চলিল না, তাহার তাঁত বন্ধ হইয়া গেল ; গোপালের পিতাকে ডাকিয়া তাহার হাতে ধরিয়া সে বলিল, "আর-একটি বছর রসিকের জন্য অপেক্ষা করিয়ো— এই তোমার হাতে পণের টাকা দিয়া গেলাম, আর যেদিন রসিক আসিবে তাহাকে এই চাকার গাড়িটি দিয়া বলিয়ো— দাদার কাছে চাহিয়াছিল, তখন হতভাগ্য দাদা দিতে পারে নাই, কিন্তু তাই বলিয়া মনে যেন সে রাগ না রাখে।"

দাদার টাকার উপহার গ্রহণ করিবে না, একদিন এই শপথ করিয়া রসিক চলিয়া গিয়াছিল— বিধাতা তাহার সেই কঠোর শপথ শুনিয়াছিলেন। আজ যখন রসিক ফিরিয়া আসিল তখন দেখিল দাদার উপহার তাহার জন্য এতদিন পথ চাহিয়া বসিয়া আছে— কিন্তু তাহা গ্রহণ করিবার দ্বার একেবারে রুদ্ধ। তাহার দাদা যে তাঁতে আপনার জীবনটি বুনিয়া আপনার ভাইকে দান করিয়াছে, রসিকের ভারি ইচ্ছা করিল সব ছাড়িয়া সেই তাঁতের কাছেই আপনার জীবন উৎসর্গ করে, কিন্তু হায়, কলিকাতা শহরে টাকার হাড়কাঠে চিরকালের মতো সে আপনার জীবন বলি দিয়া আসিয়াছে।

পৌষ ১৩১৮

প্রবন্ধ

পারস্যে

পারস্যে

১

১১ এপ্রেল, ১৯৩২। দেশ থেকে বেরবার বয়স গেছে এইটেই স্থির করে বসেছিলুম। এমন সময় পারস্যরাজের কাছ থেকে নিমন্ত্রণ এল। মনে হল এ নিমন্ত্রণ অস্বীকার করা অকর্তব্য হবে। তবু সত্তর বছরের ক্লান্ত শরীরের পক্ষ থেকে দ্বিধা ঘোচে নি। বোম্বাই থেকে আমার পারসী বন্ধু দিনশা ইরানী ভরসা দিয়ে লিখে পাঠালেন যে, পারস্যের বুশেয়ার বন্দর থেকে তিনিও হবেন আমার সঙ্গী। তা ছাড়া খবর দিলেন যে, বোম্বাইয়ের পারসিক কনসাল কেহান সাহেব পারসিক সরকারের পক্ষ থেকে আমার যাত্রার সাহচর্য ও ব্যবস্থার ভার পেয়েছেন।

এর পরে ভীরুতা করতে লজ্জা বোধ হল। রেলের পথ এবং পারস্য উপসাগর সেই গরমের সময় আমার উপযোগী হবে না বলে ওলন্দাজদের বায়ুপথের ডাকযোগে যাওয়াই স্থির হল। কথা রইল আমার শুশ্রূষার জন্যে বউমা যাবেন সঙ্গে, আর যাবেন কর্মসহায়রূপে কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ও অমিয় চক্রবর্তী। এক বায়ুযানে চারজনের জায়গা হবে না বলে কেদারনাথ এক সপ্তাহ আগেই শূন্যপথে রওনা হয়ে গেলেন।

পূর্বে আর-একবার এই পথের পরিচয় পেয়েছিলুম লণ্ডন থেকে প্যারিসে। কিন্তু সেখানে যে ধরাতল ছেড়ে ঊর্ধ্বে উঠেছিলুম তার সঙ্গে আমার বন্ধন ছিল আলগা। তার জল-স্থল আমাকে পিছুডাক দেয় না, তাই নোঙর তুলতে টানাটানি করতে হয় নি। এবারে বাংলাদেশের মাটির টান কাটিয়ে নিজেকে শূন্যে ভাসান দিলুম, হৃদয় সেটা অনুভব করলে।

কলকাতার বাহিরের পল্লীগ্রাম থেকে যখন বেরলুম তখন ভোরবেলা। তারাখচিত নিস্তব্ধ অন্ধকারের নীচে দিয়ে গঙ্গার স্রোত ছলছল করছে। বাগানের প্রাচীরের গায়ে সুপরিগাছের ডাল দুলছে বাতাসে, লতাপাতা-ঝোপঝাপের বিমিশ্র নিশ্বাসে একটা শ্যামলতার গন্ধ আকাশে ঘনীভূত। নিদ্রিত গ্রামের আঁকাবাঁকা সংকীর্ণ গলির মধ্য দিয়ে মোটর চলল। কোথাও-বা দাগ-ধরা পুরোনো পাকা দালান, তার খানিকটা বাসযোগ্য, খানিকটা ভেঙে-পড়া; আধা-শহুরে দোকানে দ্বার বন্ধ; শিবমন্দির জনশূন্য;

এবড়ো-খেবড়ো পোড়ো জমি; পানাপুকুর; ঝোপঝাড়। পাখিদের বাসায় তখনো সাড়া পড়ে নি, জোয়ার-ভাঁটার সন্ধিকালীন গঙ্গার মতো পল্লীর জীবনযাত্রা ভোর-বেলাকার শেষ ঘুমের মধ্যে থমকে আছে।

গলির মোড়ে নিষুপ্ত বারান্দায় খাটিয়া-পাতা পুলিস-থানার পাশ দিয়ে মোটর পৌঁছল বড়ো রাস্তায়। অমনি নতুন কালের কড়া গন্ধ মেলে ধুলো জেগে উঠল, গাড়ির পেট্রোল-বাষ্পের সঙ্গে তার সগোত্র আত্মীয়তা। কেবল অন্ধকারের মধ্যে দুই সারি বনস্পতি পুঞ্জিত পল্লবস্তবকে প্রাচীন কালের নীরব সাক্ষ্য নিয়ে স্তম্ভিত; সেই যে কালে শতাব্দীপর্যায়ের মধ্যে দিয়ে বাংলার ছায়াস্নিগ্ধ অঙ্গনপার্শ্বে অতীত যুগের ইতিহাসধারা কখনো মন্দগম্ভীর গতিতে কখনো ঘূর্ণাবর্তসংকুল ফেনায়িত বেগে বয়ে চলেছিল। রাজপরম্পরার পদচিহ্নিত এই পথে কখনো পাঠান, কখনো মোগল, কখনো ভীষণ বর্গী, কখনো কোম্পানির সেপাই ধুলোর ভাষায় রাষ্ট্রপরিবর্তনের বার্তা ঘোষণা করে যাত্রা করেছে। তখন ছিল হাতি উট তাঞ্জাম ঘোড়সওয়ারদের অলংকৃত ঘোড়া; রাজপ্রতাপের সেই-সব বিচিত্র বাহন ধুলোর ধূসর অন্তরালে মরীচিকার মতো মিলিয়ে গেছে। একমাত্র বাকি আছে সর্বজনের ভারবাহিনী করুণ-মন্থর গোরুর গাড়ি।

দমদমে উড়ো জাহাজের আড্ডা ওই দেখা যায়। প্রকাণ্ড তার কোটর থেকে বিজলি বাতির আলো বিচ্ছুরিত। তখনো রয়েছে বৃহৎ মাঠজোড়া অন্ধকার। সেই প্রদোষের অস্পষ্টতায় ছায়াশরীরীর মতো বন্ধুবান্ধব ও সংবাদপত্রের দূত জমে উঠতে লাগল।

সময় হয়ে এল। ডানা ঘুরিয়ে, ধুলো উড়িয়ে, হাওয়া আলোড়িত করে ঘর্ঘর গর্জনে যন্ত্রপক্ষীরাজ তার গহ্বর থেকে বেরিয়ে পড়ল খোলা মাঠে। আমি, বউমা, অমিয় উপরে চড়ে বসলুম। ঢাকা রথ, দুই সারে তিনটে করে চামড়ার দোলা-ওয়ালা ছয়টি প্রশস্ত কেদারা, আর পায়ের কাছে আমাদের পথে-ব্যবহার্য সামগ্রীর হালকা বাক্স। পাশে কাঁচের জানলা।

ব্যোমতরী বাংলাদেশের উপর দিয়ে যতক্ষণ চলল ততক্ষণ ছিল মাটির কতকটা কাছাকাছি। পানাপুকুরের চারি ধারে সংসক্ত গ্রামগুলি ধূসর বিস্তীর্ণ মাঠের মাঝে মাঝে ছোটো ছোটো দ্বীপের মতো খণ্ড খণ্ড চোখে পড়ে। উপর থেকে তাদের ছায়াঘনিষ্ঠ শ্যামল মূর্তি দেখা যায় ছাড়া-ছাড়া, কিন্তু বেশ বুঝতে পারি আসন্ন গ্রীষ্মে সমস্ত তৃষাসন্তপ্ত দেশের রসনা আজ শুষ্ক। নির্মল নিরাময় জলগণ্ডূষের জন্যে ইন্দ্রদেবের খেয়ালের উপর ছাড়া আর-কারো 'পরে এই বহু কোটি লোকের যথোচিত ভরসা নেই।

মানুষ পশু পাখি কিছু যে পৃথিবীতে আছে সে আর লক্ষ্য হয় না। শব্দ নেই, গতি নেই, প্রাণ নেই; যেন জীববিধাতার পরিত্যক্ত পৃথিবী তালি-দেওয়া চাদরে ঢাকা। যত উপরে উঠছে ততই পৃথিবীর রূপবৈচিত্র্য কতকগুলো আঁচড়ে এসে ঠেকল। বিস্মৃতনামা প্রাচীন সভ্যতার স্মৃতিলিপি যেন অজ্ঞাত অক্ষরে কোনো মৃতদেশের প্রান্তর জুড়ে খোদিত হয়ে পড়ে আছে; তার রেখা দেখা যায়, অর্থ বোঝা যায় না।

প্রায় দশটা। এলাহাবাদের কাছাকাছি এসে বায়ুযান নামবার মুখে ঝুঁকল। ডাইনের জানলা দিয়ে দেখি নীচে কিছুই নেই, শুধু অতল নীলিমা, বাঁ দিকে আড় হয়ে উপরে উঠে আসছে ভূমিতলটা। খেচর-রথ মাটিতে ঠেকল এসে; এখানে সে চলে লাফাতে লাফাতে, ধাক্কা খেতে খেতে; অপ্রসন্ন পৃথিবীর সম্মতি সে পায় না যেন।

শহর থেকে জায়গাটা দূরে। চার দিক ধূ ধূ করছে। রৌদ্রতপ্ত বিরস পৃথিবী। নামবার ইচ্ছা হল না। কোম্পানির একজন ভারতীয় ও একজন ইংরেজ কর্মচারী আমার ফোটো তুলে নিলে। তার পরে খাতায় দু-চার লাইন স্বাক্ষরের দাবি করল যখন, আমার হাসি পেল। আমার মনের মধ্যে তখন শংকরাচার্যের মোহমুদ্গরের শ্লোক গুঞ্জরিত। ঊর্ধ্ব থেকে এই কিছু আগেই চোখে পড়েছে নির্জীব ধূলিপটের উপর অদৃশ্য জীবলোকের গোটাকতক স্বাক্ষরের আঁচড়। যেন ভাবী যুগাবসানের প্রতিবিম্ব পিছন ফিরে বর্তমানের উপর এসে পড়েছে। যে ছবিটা দেখলেম সে একটা বিপুল রিক্ততা; কালের সমস্ত দলিল অবলুপ্ত; স্বয়ং ইতিবৃত্তবিৎ চিরকালের ছুটিতে অনুপস্থিত; রিসার্চ্-বিভাগের ভিতটা-সুদ্ধ তলিয়ে গেছে মাটির নীচে।

এইখানে যন্ত্রটা পেট ভরে তৈল পান করে নিলে। আধঘণ্টা থেমে আবার আকাশ-যাত্রা শুরু। এতক্ষণ পর্যন্ত রথের নাড়া তেমন অনুভব করি নি, ছিল কেবল তার পাখার দুঃসহ গর্জন। দুই কানে তুলো লাগিয়ে জানলা দিয়ে চেয়ে দেখছিলুম। সামনের কেদারায় ছিলেন একজন দিনেমার, ইনি ম্যানিলা দ্বীপে আখের খেতের তদারক করেন, এখন চলেছেন স্বদেশে। গুটোনো ম্যাপ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যাত্রাপথের পরিচয় নিচ্ছেন; ক্ষণে ক্ষণে চলছে চীজ রুটি, চকোলেটের মিষ্টান্ন, খনিজাত পানীয় জল। কলকাতা থেকে বহুবিধ খবরের কাগজ সংগ্রহ করে এনেছেন, আগাগোড়া তাই তন্ন তন্ন করে পড়ছেন একটার পর একটা। যাত্রীদের মধ্যে আলাপের সম্বন্ধ রইল না। যন্ত্রহুংকারের তুফানে কথাবার্তা যায় তলিয়ে। এক কোণে বেতারবার্তিক কানে ঠুলি লাগিয়ে কখনো কাজে কখনো ঘুমে কখনো পাঠে মগ্ন। বাকি তিনজন পালাক্রমে

তরী-চালনায় নিযুক্ত, মাঝে মাঝে যাত্রার দফ্‌তর লেখা, কিছু-বা আহার, কিছু-বা তন্দ্রা। ক্ষুদ্র এক টুকরো সজনতা নীচের পৃথিবী থেকে ছিটকে পড়ে উড়ে চলেছে অসীম জনশূন্যতায়।

জাহাজ ক্রমে উর্ধ্বতর আকাশে চড়ছে, হাওয়া চঞ্চল, তরী টলোমলো। ক্রমে বেশ একটু শীত করে এল। নীচে পাথুরে পৃথিবী, রাজপুতানার কঠিন বন্ধুরতা শুষ্ক স্রোতঃপথের শীর্ণ রেখাজালে অঙ্কিত, যেন গেরুয়া-পরা বিধবাভূমির নির্জলা একাদশীর চেহারা।

অবশেষে অপরাহ্ণে দূর থেকে দেখা গেল রুক্ষ মরুভূমির পাংশুল বক্ষে যোধপুর শহর। আর তারই প্রান্তরে যন্ত্রপাখির হাঁ-করা প্রকাণ্ড নীড়। নেমে দেখি এখানকার সচিব কুন্‌বার মহারাজ সিং সস্ত্রীক আমাদের অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত, তখনি নিয়ে যাবেন তাঁদের ওখানে চা-জলযোগের আমন্ত্রণে। শরীরের তখন প্রাণধারণের উপযুক্ত শক্তি কিছু ছিল, কিন্তু সামাজিকতার উপযোগী উদ্‌বৃত্ত ছিল না বললেই হয়। কষ্টে কর্তব্য সেরে হোটেলে এলুম।

হোটেলটি বায়ুতরীযাত্রীর জন্যে মহারাজের প্রতিষ্ঠিত। সন্ধ্যাবেলায় তিনি দেখা করতে এলেন। তাঁর সহজ সৌজন্য রাজোচিত। মহারাজ স্বয়ং উড়োজাহাজ-চালনায় সুদক্ষ। তার যতরকম দুঃসাহসী কৌশল আছে প্রায় সমস্তই তাঁর অভ্যস্ত।

পরের দিন ১২ই এপ্রেল ভোর রাত্রে জাহাজে উঠতে হল। হাওয়ার গতিক পূর্ব-দিনের চেয়ে ভালোই। অপেক্ষাকৃত সুস্থ শরীরে মধ্যাহ্নে করাচিতে পুরবাসীদের আদর-অভ্যর্থনার মধ্যে গিয়ে পৌঁছনো গেল। সেখানে বাঙালি গৃহলক্ষ্মীর সযত্নপক্ব অন্ন ভোগ করে আধ ঘণ্টার মধ্যে জাহাজে উঠে পড়লুম।

সমুদ্রের ধার দিয়ে উড়ছে জাহাজ। বাঁ দিকে নীল জল, দক্ষিণে পাহাড়ে মরুভূমি। যাত্রার শেষ অংশে বাতাস মেতে উঠল। ডাঙায় বাতাসের চাঞ্চল্য নানা পদার্থের উপর আপন পরিচয় দেয়। এখানে তার একমাত্র প্রমাণ জাহাজটার ধড়্‌ফড়ানি। বহুদূর নীচে সমুদ্রে ফেনার সাদা রেখায় একটু একটু তুলির পোঁচ দিচ্ছে। তার না শুনি গর্জন, না দেখি তরঙ্গের উত্তালতা।

এইবার মরুদ্বার দিয়ে পারস্যে প্রবেশ। বুশেয়ার থেকে সেখানকার গবর্নর বেতারে দূরলিপিযোগে অভ্যর্থনা পাঠিয়েছেন। করাচি থেকে অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যোমতরী

জাস্কে পৌঁছল। সমুদ্রতীরে মরুভূমিতে এই সামান্য গ্রামটি। কাদায় তৈরি গোটাকতক চৌকো চ্যাপটা-ছাদের ছোটো ছোটো বাড়ি ইতস্ততবিক্ষিপ্ত, যেন মাটির সিন্দুক।

আকাশযাত্রীদের পান্থশালায় আশ্রয় নিলুম। রিক্ত এই ভূখণ্ডে নীলাম্বুচুম্বিত বালুরাশির মধ্যে বৈচিত্র্যসম্পদ কিছুই নেই। সেইজন্যেই বুঝি গোধূলিবেলায় দিগঙ্গনার স্নেহ দেখলুম এই গরিব মাটির 'পরে। কী সুগম্ভীর সূর্যাস্ত, কী তার দীপ্যমান শান্তি, পরিব্যাপ্ত মহিমা। স্নান করে এসে বারান্দায় বসলুম, স্নিগ্ধ বসন্তের হাওয়া ক্লান্ত শরীরকে নিবিড় আরামে বেষ্টন করে ধরলে।

এখানকার রাজকর্মচারীর দল সম্মানসম্ভাষণের জন্যে এলেন। বাইরে বালুতটে আমাদের চৌকি পড়েছে। যে দুই-একজন ইংরেজি জানেন তাঁদের সঙ্গে কথা হল। বোঝা গেল পুরাতনের খোলস বিদীর্ণ করে পারস্য আজ নূতন প্রাণের পালা আরম্ভ করতে প্রস্তুত। প্রাচ্য জাতির মধ্যে যেখানে জাগরণের চাঞ্চল্য সেখানে এই একই ভাব। অতীতের আবর্জনামুক্ত সমাজ, সংস্কারমুক্ত চিত্ত, বাধামুক্ত মানবসম্বন্ধের ব্যাপ্তি, বাস্তব জগতের প্রতি মোহমুক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি, এই তাদের সাধনার প্রধান লক্ষ্য। তারা জানে, হয় বর্তমান কালের শিক্ষা নয় তার সাংঘাতিক আঘাত আমাদের গ্রহণ করতে হবে। অতীত কালের সঙ্গে যাদের দুশ্ছেদ্য গ্রন্থিবন্ধনের জটিলতা, মৃত যুগের সঙ্গে আজ তাদের সহমরণের আয়োজন।

এখানে পরধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি কিরকম ব্যবহার এই প্রশ্নের উত্তরে শুনলুম, পূর্বকালে জরথুস্ত্রীয় ও বাহাইদের প্রতি অত্যাচার ও অবমাননা ছিল। বর্তমান রাজার শাসনে পরধর্মমতের প্রতি অসহিষ্ণুতা দূর হয়ে গেছে; সকলেই ভোগ করছে সমান অধিকার, ধর্মহিংস্রতার নররক্তপঙ্কিল বিভীষিকা কোথাও নেই। ডাক্তার মহম্মদ ইসা খাঁ সাদিকের রচিত আধুনিক পারস্যের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধীয় গ্রন্থে লিখিত আছে – অনতিকাল পূর্বে ধর্মযাজকমণ্ডলীর প্রভাব পারস্যকে অভিভূত করে রেখেছিল। আধুনিক বিদ্যাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রভাবের প্রবলতা কমে এল। এর পূর্বে নানা শ্রেণীর অসংখ্য লোক, কেউ-বা ধর্মবিদ্যালয়ের ছাত্র, কেউ-বা ধর্ম-প্রচারক, কোরানপাঠক, সৈয়দ— এরা সকলেই মোল্লাদের মতো পাগড়ি ও সাজসজ্জা ধারণ করত। যখন দেশের প্রধানবর্গের অধিকাংশ লোক আধুনিক প্রণালীতে শিক্ষিত হলেন তখন থেকে বিষয়বুদ্ধিপ্রবীণ পুরোহিতদের ব্যবসায় সংকুচিত হয়ে এল। এখন যে খুশি মোল্লার বেশ ধরতে পারে না। বিশেষ পরীক্ষা পাস করে অথবা প্রকৃত ধার্মিক ও ধর্মশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতের সম্মতি -অনুসারে তবেই এই সাজ-ধারণের অধিকার

পাওয়া যায়। এই আইনের তাড়নায় শতকরা নব্বই সংখ্যক মানুষের মোল্লার বেশ ঘুচে গেছে। লেখক বলেন :

Such were the results of the contact of Persia with the Western world. They could not have been attained without the leadership of Reza Shah Pehlevi, the greatest man that Persia has produced for many centuries.

অন্তত একবার কল্পনা করে দেখতে দোষ নেই যে, হিন্দুভারতে যত অসংখ্য পাণ্ডা পুরোহিত ও সন্ন্যাসী আছে কোনো নূতন আইনে তাদের উপাধি-পরীক্ষা পাস আবশ্যিক বলে গণ্য হয়েছে। কে যথার্থ সাধু বা সন্ন্যাসী কোনো পরীক্ষার দ্বারা তার প্রমাণ হয় না স্বীকার করি— কিন্তু স্বেচ্ছাগৃহীত উপাধি ও বাহ্য বেশের দ্বারা তার প্রমাণ আরো অসম্ভব। অথচ সেই নিরর্থক প্রমাণ দেশ স্বীকার করে নিয়েছে। কেবলমাত্র অপরীক্ষিত সাজের ও অনায়াসলব্ধ নামের প্রভাবে ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ লোকের মাথা নত হচ্ছে বিনা বিচারে এবং উপবাসপীড়িত দেশের অন্নমুষ্টি অনায়াসে ব্যয় হয়ে যাচ্ছে, যার পরিবর্তে অধিকাংশ স্থলে আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া কোনো প্রতিদান নেই। সাধুতা ও সন্ন্যাস যদি নিজের আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য হয় তা হলে সাজ পরবার বা নাম নেবার দরকার নেই, এমন-কি, নিলে ক্ষতির কারণ আছে; যদি অন্যের জন্য হয় তা হলে যথোচিত পরীক্ষা দেওয়া উচিত। ধর্মকে যদি জীবিকা, এমন-কি, লোকমান্যতার বিষয় করা যায়, যদি বিশেষ বেশ বা বিশেষ ব্যবহারের দ্বারা ধার্মিকতার বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয় তবে সেই বিজ্ঞাপনের সত্যতা বিচার করবার অধিকার আত্মসম্মানের জন্য সমাজের গ্রহণ করা কর্তব্য এ কথা মানতেই হবে।

পরদিন তিনটে-রাত্রে উঠতে হল, চারটের সময় যাত্রা। ১৩ই এপ্রেল তারিখে সকাল সাড়ে-আটটার সময় বুশেয়ারে পৌঁছনো গেল।

বুশেয়ারের গবর্নর আমাদের আতিথ্যভার নিয়েছেন। যত্নের সীমা নেই।

মাটির মানুষের সঙ্গে আকাশের অন্তরঙ্গ পরিচয় হল, মনটা কী বললে এই অবকাশে লিখে রাখি।

ছেলেবেলা থেকে আকাশে যে-সব জীবকে দেখেছি তার প্রধান লক্ষণ গতির অবলীলতা। তাদের ডানার সঙ্গে বাতাসের মৈত্রীর মাধুর্য। মনে পড়ে ছাদের ঘর থেকে দুপুর-রৌদ্রে চিলের ওড়া চেয়ে চেয়ে দেখতেম; মনে হত দরকার আছে বলে উড়ছে না, বাতাসে যেন তার অবাধ গতির অধিকার আনন্দবিস্তার করে চলেছে। সেই আনন্দের প্রকাশ কেবল যে পাখার গতিসৌন্দর্যে তা নয়, তার রূপসৌন্দর্যে। নৌকোর পালটাকে বাতাসের মেজাজের সঙ্গে মানান রেখে চলতে হয়, সেই ছন্দ

রাখবার খাতিরে পাল দেখতে হয়েছে সুন্দর। পাখির পাখাও বাতাসের সঙ্গে মিল করে চলে, তাই এমন তার সুষমা। আবার সেই পাখায় রঙের সামঞ্জস্যও কত। এই তো হল প্রাণীর কথা তার পরে মেঘের লীলা— সূর্যের আলো থেকে কত রকম রঙ ছেঁকে নিয়ে আকাশে বানায় খেয়ালের খেলাঘর! /মাটির পৃথিবীতে চলায় ফেরায় দ্বন্দ্বের চেহারা, সেখানে ভারের রাজত্ব, সকল কাজেই বোঝা ঠেলতে হয়। বায়ুলোকে এতকাল যা আমাদের মন ভুলিয়েছে সে হচ্ছে ভারের অভাব, সুন্দরের সহজ সঞ্চরণ।

এতদিন পরে মানুষ পৃথিবী থেকে ভারটাকে নিয়ে গেল আকাশে। তাই তার ওড়ার যে চেহারা বেরল সে জোরের চেহারা। তার চলা বাতাসের সঙ্গে মিল করে নয়, বাতাসকে পীড়িত করে; এই পীড়া ভূলোক থেকে আজ গেল দ্যুলোকে। এই পীড়ায় পাখির গান নেই, জন্তুর গর্জন আছে। ভূমিতল আকাশকে জয় করে আজ চিৎকার করছে।

সূর্য উঠল দিগন্তরেখার উপরে। উদ্ধত যন্ত্রটা অরুণরাগের সঙ্গে আপন মিল করবার চেষ্টামাত্র করে নি। আকাশনীলিমার সঙ্গে ওর অসবর্ণতা বেসুরো, অন্তরীক্ষের রঙমহলে মেঘের সঙ্গে ওর অমানান রয়ে গেল। আধুনিক যুগের দূত, ওর সেন্টিমেন্টের বালাই নেই; শোভাকে ও অবজ্ঞা করে; অনাবশ্যককে কনুইয়ের ধাক্কা মেরে চলে যায়। যখন পূর্বদিগন্ত রাঙা হয়ে উঠল, পশ্চিমদিগন্তে যখন কোমল নীলের উপর শুক্তিশুভ্র আলো, তখন তার মধ্য দিয়ে ওই যন্ত্রটা প্রকাণ্ড একটা কালো তেলাপোকার মতো ভন্ ভন্ করে উড়ে চলল।

বায়ুতরী যতই উপরে উঠল ততই ধরণীর সঙ্গে আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের যোগ সংকীর্ণ হয়ে একটা মাত্র ইন্দ্রিয়ে এসে ঠেকল, দর্শন-ইন্দ্রিয়ে, তাও ঘনিষ্ঠভাবে নয়। নানা সাক্ষ্য মিলিয়ে যে পৃথিবীকে বিচিত্র ও নিশ্চিত করে জেনেছিলুম সে ক্রমে এল ক্ষীণ হয়ে, যা ছিল তিন আয়তনের বাস্তব তা হয়ে এল দুই আয়তনের ছবি। সংহত দেশকালের বিশেষ বিশেষ কাঠামোর মধ্যেই সৃষ্টির বিশেষ বিশেষ রূপ। তার সীমানা যতই অনির্দিষ্ট হতে থাকে, সৃষ্টি ততই চলে বিলীনতার দিকে। সেই বিলয়ের ভূমিকার মধ্যে দেখা গেল পৃথিবীকে, তার সত্তা হল অস্পষ্ট, মনের উপর তার অস্তিত্বের দাবি এল কমে। মনে হল, এমন অবস্থায় আকাশযানের থেকে মানুষ যখন শতঘ্নী বর্ষণ করতে বেরয় তখন সে নির্মমভাবে ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে; যাদের মারে তাদের অপরাধের হিসাববোধ উদ্যত বাহুকে দ্বিধাগ্রস্ত করে না, কেননা, হিসাবের অঙ্কটা অদৃশ্য হয়ে যায়। যে বাস্তবের 'পরে মানুষের স্বাভাবিক মমতা, সে যখন ঝাপসা হয়ে আসে তখন মমতারও আধার যায় লুপ্ত হয়ে। গীতায় প্রচারিত

জয়োপদেশও এই রকমের উড়ো জাহাজ— অর্জুনের কৃপাকাতর মনকে সে এমন দূরলোকে নিয়ে গেল, সেখান থেকে দেখলে মারেই-বা কে, মরেই-বা কে, কেই-বা আপন, কেই-বা পর। বাস্তবকে আবৃত করবার এমন অনেক তত্ত্বনির্মিত উড়ো জাহাজ মানুষের অস্ত্রশালায় আছে, মানুষের সাম্রাজ্যনীতিতে, সমাজনীতিতে, ধর্মনীতিতে। সেখান থেকে যাদের উপর মার নামে তাদের সম্বন্ধে সান্ত্বনাবাক্য এই যে, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

বোগদাদে ব্রিটিশদের আকাশফৌজ আছে। সেই ফৌজের খ্রীস্টান ধর্মযাজক আমাকে খবর দিলেন, এখানকার কোন্ শেখদের গ্রামে তাঁরা প্রতিদিন বোমা বর্ষণ করছেন। সেখানে আবালবৃদ্ধবনিতা যারা মরছে তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঊর্ধ্বলোক থেকে মার খাচ্ছে ; এই সাম্রাজ্যনীতি ব্যক্তিবিশেষের সত্তাকে অস্পষ্ট করে দেয় বলেই তাদের মারা এত সহজ। খ্রীস্ট এই-সব মানুষকেও পিতার সন্তান বলে স্বীকার করেছেন, কিন্তু খ্রীস্টান ধর্মযাজকের কাছে সেই পিতা এবং তাঁর সন্তান হয়েছে অবাস্তব, তাঁদের সাম্রাজ্যতত্ত্বের উড়ো জাহাজ থেকে চেনা গেল না তাদের, সেইজন্যে সাম্রাজ্য জুড়ে আজ মার পড়ছে সেই খ্রীস্টেরই বুকে। তা ছাড়া উড়ো জাহাজ থেকে এই-সব মরুচারীদের মারা যায় এত অত্যন্ত সহজে, ফিরে মার খাওয়ার আশঙ্কা এতই কম যে, মারের বাস্তবতা তাতেও ক্ষীণ হয়ে আসে। যাদের অতি নিরাপদে মারা সম্ভব মারওয়ালাদের কাছে তারা যথেষ্ট প্রতীয়মান নয়। এই কারণে, পাশ্চাত্য হননবিদ্যা যারা জানে না তাদের মানবসত্তা আজ পশ্চিমের অস্ত্রীদের কাছে ক্রমশই অত্যন্ত ঝাপসা হয়ে আসছে।

ইরাক বায়ুফৌজের ধর্মযাজক তাঁদের বায়ু-অভিযানের তরফ থেকে আমার কাছে বাণী চাইলেন, আমি যে বাণী পাঠালুম সেইটে এইখানে প্রকাশ করা যাক :

From the beginning of our days man has imagined the seat of divinity in the upper air from which comes light and blows the breath of life for all creatures on this earth. The peace of its dawn, the splendour of its sunset, the voice of eternity in its starry silence have inspired countless generations of men with an ineffable presence of the infinite urging their minds away from the sordid interests of daily life. Man has accepted this dust-laden earth for his dwelling place, for the enacting of the drama of his tangled life ever waiting for a call of perfection from the boundless depth of purity surrounding him in a translucent atmosphere. If in an evil moment man's cruel history should spread its black wings to invade that realm of divine dreams with its cannibalistic greed and fratricidal ferocity then God's curse will certainly descend upon us for that hideous desecration and the last curtain will be rung down upon the world of Man for whom God feels ashamed.

নিকটের থেকে আমাদের চোখ যতটা দূরকে একদৃষ্টিতে দেখতে পায়, উপরের থেকে তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যাপক দেশকে দেখে। এইজন্যে বায়ুতরী যখন মিনিটে প্রায় এক ক্রোশ বেগে ছুটছে তখন নীচের দিকে তাকিয়ে মনে হয় না তার চলন এত দ্রুত। বহু দূরত্ব আমাদের চোখে সংহত হয়ে ছোটো হয়ে গেছে বলেই সময়-পরিমাণও আমাদের মনে ঠিক থাকল না। দুইয়ে মিলে আমাদের কাছে বাস্তবের যে প্রতীতি জন্মাচ্ছে সেটা আমাদের সহজ বোধের থেকে অনেক তফাত। জগতের এই যন্ত্র পরিমাপ যদি আমাদের জীবনের সহজ পরিমাপ হত তা হলে আমরা একটা ভিন্ন জগতে বাস করতুম। তাই ভাবছিলুম সৃষ্টিটা ছন্দের লীলা। যে তালের লয়ে আমরা এই জগৎকে অনুভব করি সেই লয়টাকে দুনের দিকে বিলম্বিতের দিকে বদলে দিলেই সেটা আর-এক সৃষ্টি হবে। অসংখ্য অদৃশ্য রশ্মিতে আমরা বেষ্টিত। আমাদের স্নায়ুস্পন্দনের ছন্দ তাদের স্পন্দনের ছন্দের সঙ্গে তাল রাখতে পারে না বলে তারা আমাদের অগোচর। কী করে বলব এই মুহূর্তেই আমাদের চার দিকে ভিন্ন লয়ের এমন অসংখ্য জগৎ নেই যারা পরস্পরের অপ্রত্যক্ষ। সেখানকার মন আপন বোধের ছন্দ অনুসারে যা দেখে যা জানে যা পায় সে আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অগম্য, বিভিন্ন মনের যন্ত্রে বিভিন্ন বিশ্বের বাণী একসঙ্গে উদ্ভূত হচ্ছে সীমাহীন অজানার অভিমুখে।

এই ব্যোমবাহনে চড়ে মনের মধ্যে একটা সংকোচ বোধ না করে থাকতে পারি নে। অতি আশ্চর্য এ যন্ত্র, এর সঙ্গে আমার ভোগের যোগ আছে, কিন্তু শক্তির যোগ নেই। বিমানের কথা শাস্ত্রে লেখে— সে ছিল ইন্দ্রলোকের, মর্তের দুষ্মন্তেরা মাঝে মাঝে নিমন্ত্রিত হয়ে অন্তরীক্ষে পাড়ি দিতেন— আমারও সেই দশা। এ কালের বিমান যারা বানিয়েছে তারা আর-এক জাত। শুধু যদি বুদ্ধির জোর এতে প্রকাশ হত তা হলে কথা ছিল না। কিন্তু চরিত্রের জোর— সেটাই সব-চেয়ে শ্লাঘনীয়। এর পিছনে দুর্দম সাহস, অপরাজেয় অধ্যবসায়। কত ব্যর্থতা, কত মৃত্যুর মধ্য দিয়ে একে ক্রমে সম্পূর্ণ করে তুলতে হচ্ছে, তবু এরা পরাভব মানছে না। এখানে সেলাম করতেই হবে।

এই ব্যোমতরীর চারজন ওলন্দাজ নাবিকের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি। বিপুল বপু, মোটা মোটা হাড়, মূর্তিমান উদ্যম। যে আবহাওয়ায় এদের জন্ম সে এদের প্রতিক্ষণে জীর্ণ করে নি, তাজা রেখে দিয়েছে। মজ্জাগত স্বাস্থ্য ও তেজ কোনো একঘেয়ে বাঁধা ঘাটে এদের স্থির থাকতে দিল না। বহু পুরুষ ধরে প্রভূতবলদায়ী অন্নে এরা পুষ্ট, বহু যুগের সঞ্চিত প্রচুর উদ্‌বৃত্ত এদের শক্তি। ভারতবর্ষে কোটি কোটি মানুষ পুরো পরিমাণ অন্ন পায় না। অভুক্তশরীর বংশানুক্রমে অন্তরে-বাহিরে সকল

রকম শত্রুকে মাশুল দিয়ে দিয়ে সর্বস্বান্ত। মনে প্রাণে সাধনা করে তবেই সম্ভব হয় সিদ্ধি, কিন্তু আমাদের মন যদি-বা থাকে প্রাণ কই? উপবাসে ক্লান্তপ্রাণ শরীর কাজ ফাঁকি না দিয়ে থাকতে পারে না, সেই ফাঁকি সমস্ত জাতের মজ্জায় ঢুকে তাকে মারতে থাকে। আজ পশ্চিম মহাদেশে অন্নাভাবের সমস্যা মেটাবার দুশ্চিন্তায় রাজকোষ থেকে টাকা ঢেলে দিচ্ছে। কেননা, পর্যাপ্ত অন্নের জোরেই সভ্যতার আন্তরিক বাহ্যিক সব রকম কল পুরোদমে চলে। আমাদের দেশে সেই অন্নের চিন্তা ব্যক্তিগত, সে চিন্তার শুধু যে জোর নেই তা নয়, সে বাধাগ্রস্ত। ওদের দেশে সে চিন্তা রাষ্ট্রগত, সে দিকে সমস্ত জাতির সাধনার পথ স্বাধীনভাবে উন্মুক্ত, এমন-কি, নিষ্ঠুর অন্যায়ের সাহায্য নিতেও দ্বিধা নেই। ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তার দৃষ্টি হতে আমরা বহু দূরে, তাই আমাদের পক্ষে শাসন যত অজস্র সুলভ অশন তত নয়।

২

মহামানব জাগেন যুগে যুগে ঠাঁই বদল করে। একদা সেই জাগ্রত দেবতার লীলাক্ষেত্র বহু শতাব্দী ধরে এশিয়ায় ছিল। তখন এখানেই ঘটেছে মানুষের নব নব ঐশ্বর্যের প্রকাশ নব নব শক্তির পথ দিয়ে। আজ সেই মহামানবের উজ্জ্বল পরিচয় পাশ্চাত্য মহাদেশে। আমরা অনেক সময় তাকে জড়বাদপ্রধান বলে খর্ব করবার চেষ্টা করি। কিন্তু কোনো জাত মহত্ত্বে পৌঁছতেই পারে না একমাত্র জড়বাদের ভেলায় চড়ে। বিশুদ্ধ জড়বাদী হচ্ছে বিশুদ্ধ বর্বর। সেই মানুষেই বৈজ্ঞানিক সত্যকে লাভ করবার অধিকারী সত্যকে যে শ্রদ্ধা করে পূর্ণ মূল্য দিতে পারে। এই শ্রদ্ধা আধ্যাত্মিক, প্রাণপণ নিষ্ঠায় সত্যসাধনার শক্তি আধ্যাত্মিক। পাশ্চাত্য জাতি সেই মোহমুক্ত আধ্যাত্মিক শক্তি-দ্বারাই সত্যকে জয় করেছে এবং সেই শক্তিই জয়ী করেছে তাদের। পৃথিবীর মধ্যে পাশ্চাত্য মহাদেশেই মানুষ আজ উজ্জ্বল তেজে প্রকাশমান।

সচল প্রাণের শক্তি যত দুর্বল হয়ে আসে দেহের জড়ত্ব ততই নানা আকারে উৎকট হয়ে ওঠে। একদিন ধর্মে কর্মে জ্ঞানে এশিয়ার চিত্ত প্রাণবান ছিল, সেই প্রাণধর্মের প্রভাবে তার আত্মসৃষ্টি বিচিত্র হয়ে উঠত। তার শক্তি যখন ক্লান্ত ও সুপ্তিমগ্ন হল, তার সৃষ্টির কাজ যখন হল বন্ধ, তখন তার ধর্মকর্ম অভ্যস্ত আচারের যন্ত্রবৎ পুনরাবৃত্তিতে নিরর্থক হয়ে উঠল। একেই বলে জড়ত্ব, এতেই মানুষের সকল দিকে পরাভব ঘটায়।

অপরপক্ষে পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে বিপদের লক্ষণ আজ যা দেখা দিয়েছে সেও একই কারণে। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও শক্তি তাকে প্রভাবশালী করেছে, এই প্রভাব

সত্যের বরদান। কিন্তু সত্যের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার কলুষিত হলেই সত্য তাকে ফিরে মারে। বিজ্ঞানকে দিনে দিনে য়ুরোপ আপন লোভের বাহন করে লাগামে বাঁধছে। তাতে করে লোভের শক্তি হয়ে উঠছে প্রচণ্ড, তার আকার হয়ে উঠছে বিরাট। যে ঈর্ষা হিংসা মিথ্যাচারকে সে বিশ্বব্যাপী করে তুলছে তাতে করে য়ুরোপের রাষ্ট্রসত্তা আজ বিষজীর্ণ। প্রবৃত্তির প্রাবল্যও মানুষের জড়ত্বের লক্ষণ। তার বুদ্ধি তার ইচ্ছা তখন কলের পুতুলের মতো চালিত হয়। এতেই মনুষ্যত্বের বিনাশ। এর কারণ যন্ত্র নয়, এর কারণ আন্তরিক তামসিকতা, লোভ হিংসা পশুবৃত্তি। বাঁধন-খোলা উন্মত্ত যখন আত্মঘাত করে তখন মুক্তিই তার কারণ নয়, তার কারণ মত্ততা।

বয়স যখন অল্প ছিল তখন য়ুরোপীয় সাহিত্য গভীর আনন্দের সঙ্গে পড়েছি, বিজ্ঞানের বিশুদ্ধ সত্য আলোচনা করে তার সাধকের 'পরে ভক্তি হয়েছে মনে। এর ভিতর দিয়ে মানুষের যে পরিচয় আজ চারি দিকে ব্যাপ্ত হয়েছে তার মধ্যেই তো শাশ্বত মানুষের প্রকাশ; এই প্রকাশকে লোভান্ধ মানুষ অবমানিত করতে পারে। সেই পাপে হীনমতি নিজেকেই সে নষ্ট করবে কিন্তু মহৎকে নষ্ট করতে পারবে না। সেই মহৎ, সেই জাগ্রত মানুষকে দেখব বলেই একদিন ঘরের থেকে দূরে বেরিয়েছিলুম, য়ুরোপে গিয়েছিলুম ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে।

এই যাত্রাকে শুভ বলেই গণ্য করি। কেননা, আমরা এশিয়ার লোক, য়ুরোপের বিরুদ্ধে নালিশ আমাদের রক্তে। যখন থেকে তাদের জলদস্যু ও স্থলদস্যু দুর্বল মহাদেশের রক্ত শোষণ করতে বেরিয়েছে সেই আঠারো শতাব্দী থেকে আমাদের কাছে এরা নিজেদের মানহানি করেছে। লজ্জা নেই, কেননা, এরা আমাদের লজ্জা করবার যোগ্য বলেও মনে করে নি। কিন্তু য়ুরোপে এসে একটা কথা আমি প্রথম আবিষ্কার করলুম যে, সহজ মানুষ আর নেশন এক জাতের লোক নয়। যেমন সহজ শরীর এবং বর্ম-পরা শরীরের ধর্মই স্বতন্ত্র। একটাতে প্রাণের স্বভাব প্রকাশ পায়, আর-একটাতে দেহটা যন্ত্রের অনুকরণ করে। দেখলুম সহজ মানুষকে আপন মনে করতে এদের কোথাও বাধে না, তার মধ্যে যে মনুষ্যত্ব দেখা দেয় কখনো তা রমণীয় কখনো-বা বরণীয়। আমি তাকে ভালোবেসেছি, শ্রদ্ধা করেছি, ফিরেও পেয়েছি তার ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। বিদেশে অপরিচিত মানুষের মধ্যে চিরকালের মানুষকে এমন স্পষ্ট দেখা দুর্লভ সৌভাগ্য।

কিন্তু সেই কারণেই একটা কথা মনে করে বেদনা বোধ করি। যে দেশে বহুসংখ্যক লোকের মন পলিটিক্সের যন্ত্রটার মধ্যেই পাক খেয়ে বেড়ায়, তাদের স্বভাবটা যন্ত্রের ছাঁদে পাকা হয়ে ওঠে। কাজ উদ্ধার করবার নৈপুণ্য একান্ত লক্ষ্য হয়।

একেই বলে যান্ত্রিক জড়তা, কেননা, যন্ত্রের চরম সার্থক্য কাজের সাফল্যে। পাশ্চাত্য দেশে মানবচরিত্রে এই যান্ত্রিক বিকার ক্রমেই বেড়ে উঠছে এটা লক্ষ্য না করে থাকা যায় না। মানুষ-যন্ত্রের কল্যাণবুদ্ধি অসাড় হয়ে আসছে তার প্রমাণ পূর্বদেশে আমাদের কাছে আর ঢাকা রইল না। মনে পড়ছে ইরাকে একজন সম্মানযোগ্য সম্ভ্রান্ত লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'ইংরেজ জাতের সম্বন্ধে আপনার কী বিচার।' আমি বললেম, 'তাঁদের মধ্যে যাঁরা best তাঁরা মানবজাতির মধ্যে best।' তিনি একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর যারা next best?' চুপ করে রইলুম। উত্তর দিতে হলে অসংযত ভাষার আশঙ্কা ছিল। এশিয়ার অধিকাংশ কারবার এই next best-এর সঙ্গেই। তাদের সংখ্যা বেশি, প্রভাব বেশি, তাদের স্মৃতি বহুব্যাপক লোকের মনের মধ্যে চিরমুদ্রিত হয়ে থাকে। তাদের সহজ মানুষের স্বভাব আমাদের জন্যে নয়, এবং সে স্বভাব তাদের নিজেদের জন্যেও ক্রমে দুর্লভ হয়ে আসছে।

দেশে ফিরে এলুম। তার অনতিকালের মধ্যেই য়ুরোপে বাধল মহাযুদ্ধ। তখন দেখা গেল বিজ্ঞানকে এরা ব্যবহার করছে মানুষের মহা সর্বনাশের কাজে। এই সর্বনাশা বুদ্ধি যে আগুন দেশে দেশে লাগিয়ে দিল তার শিখা মরেছে কিন্তু তার পোড়া কয়লার আগুন এখনো মরে নি। এতবড়ো বিরাট দুর্যোগ মানুষের ইতিহাসে আর কখনোই দেখা দেয় নি। একেই বলি জড়তত্ত্ব; এর চাপে মনুষ্যত্ব অভিভূত, বিনাশ সামনে দেখেও নিজেকে বাঁচাতে পারে না।

ইতিমধ্যে দেখা যায় এশিয়ার নাড়ি হয়েছে চঞ্চল। তার কারণ, য়ুরোপের চাপটা তার বাইরে থাকলেও তার মনের উপর থেকে সেটা সরে গেছে। একদিন মার খেতে খেতেও য়ুরোপকে সে সর্বতোভাবে আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে ধরে নিয়েছিল। আজ এশিয়ার এক প্রান্ত হতে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত কোথাও তার মনে আর শ্রদ্ধা নেই। য়ুরোপের হিংস্রশক্তি যদিও আজ বহুগুণে বেড়ে গিয়েছে, তৎসত্ত্বেও এশিয়ার মন থেকে আজ সেই ভয় ঘুচে গেছে যার সঙ্গে সম্ভ্রম মিশ্রিত ছিল। য়ুরোপের কাছে অগৌরব স্বীকার করা তার পক্ষে আজ অসম্ভব, কেননা, য়ুরোপের গৌরব তার মনে আজ অতি ক্ষীণ। সর্বত্রই সে ঈষৎ হেসেই জিজ্ঞাসা করছে, 'But the next best?'

আমরা আজ মানুষের ইতিহাসে যুগান্তরের সময়ে জন্মেছি। য়ুরোপের রঙ্গভূমিতে হয়তো-বা পঞ্চম অঙ্কের দিকে পটপরিবর্তন হচ্ছে। এশিয়ার নবজাগরণের লক্ষণ এক দিগন্ত হতে আর-এক দিগন্তে ক্রমশই ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। মানবলোকের উদয়গিরি-শিখরে এই নবপ্রভাতের দৃশ্য দেখবার জিনিস বটে— এই মুক্তির দৃশ্য। মুক্তি কেবল বাইরের বন্ধন থেকে নয়, সুপ্তির বন্ধন থেকে, আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসের বন্ধন থেকে।

আমি এই কথা বলি, এশিয়া যদি সম্পূর্ণ না জাগতে পারে তা হলে য়ুরোপের পরিত্রাণ নেই। এশিয়ার দুর্বলতার মধ্যেই য়ুরোপের মৃত্যুবাণ। এই এশিয়ার ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে যত তার চোখ-রাঙারাঙি, তার মিথ্যা কলঙ্কিত কূট কৌশলের গুপ্তচরবৃত্তি। ক্রমে বেড়ে উঠছে সমরসজ্জার ভার, পণ্যের হাট বহুবিস্তৃত করে অবশেষে আজ অগাধ ধনসমুদ্রের মধ্যে দুঃসহ করে তুলছে তার দারিদ্র্যতৃষ্ণা।

নূতন যুগে মানুষের নবজাগ্রত চৈতন্যকে অভ্যর্থনা করবার ইচ্ছায় একদিন পূর্ব-এশিয়ায় বেরিয়ে পড়েছিলুম। তখন এশিয়ার প্রাচ্যতম আকাশে জাপানের জয়পতাকা উড়েছে, লঘু করে দিয়েছে এশিয়ার অবসাদচ্ছায়াকে। আনন্দ পেলুম, মনে ভয়ও হল। দেখলুম জাপান য়ুরোপের অস্ত্র আয়ত্ত করে এক দিকে নিরাপদ হয়েছে, তেমনি অন্য দিকে গভীরতর আপদের কারণ ঘটল। তার রক্তে প্রবেশ করেছে য়ুরোপের মারী, যাকে বলে ইম্পীরিয়ালিজ্‌ম্, সে নিজের চারি দিকে মথিত করে তুলছে বিদ্বেষ। তার প্রতিবেশীর মনে জ্বালা ধরিয়ে দিল। এই প্রতিবেশীকে উপেক্ষা করবার নয়, আর এই জ্বালায় ভাবীকালের অগ্নিকাণ্ড কেবল সময়ের অপেক্ষা করে। ইতিহাসে ভাগ্যের অনুকূল হাওয়া নিরন্তর বয় না। এমন দিন আসবেই যখন আজ যে দুর্বল তারই কাছে কড়ায় গণ্ডায় হিসাব গনে দিতে হবে। কী করে মিলতে হয় জাপান তা শিখল না, কী করে মারতে হয় য়ুরোপের কাছ থেকে সেই শিক্ষাতেই সে হাত পাকিয়ে নিলে। এই মার মাটির নীচে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে একদিন এসে ছোবল মারবে তারই বুকে।

কিন্তু এতে রাষ্ট্রনৈতিক হিসাবের ভুল হল বলেই এটা শোচনীয় এমন কথা আমি বলি নে। আমি এই বলতে চাই, এশিয়ায় যদি নতুন যুগ এসেই থাকে তবে এশিয়া তাকে নতুন করে আপন ভাষা দিক। তা না করে য়ুরোপের পশুগর্জনের অনুকরণই যদি সে করে সেটা সিংহনাদ হলেও তার হার। ধার-করা রাস্তা যদি গর্তের দিকে যাবার রাস্তা হয় তা হলে তার লজ্জা দ্বিগুণ মাত্রায়। যা হোক, এশিয়ার পশ্চিমপ্রান্ত যে ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছে তার খবর দূর থেকে শোনা যায়। যখন ভাবছিলুম তুরুস্ক এবার ডুবল তখন হঠাৎ দেখা দিলেন কামালপাশা। তখন তাঁদের বড়ো সাম্রাজ্যের জোড়াতাড়া অংশগুলো যুদ্ধের ধাক্কায় গেছে ভেঙে। সেটা শাপে বর হয়েছিল। শক্ত করে নতুন করে রাজ্যটাকে তার স্বাভাবিক ঐক্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গড়ে তোলা সহজ হল ছোটো পরিধির মধ্যে। সাম্রাজ্য বলতে বোঝায়, যারা আত্মীয় নয় তাদের অনেককে দড়ির বাঁধনে বেঁধে কলেবরটাকে অস্বাভাবিক স্থূল করে তোলা। দুঃসময়ে বাঁধন যখন ঢিলে হয় তখন ওই অনাত্মীয়ের সংঘাত বাঁচিয়ে আত্মরক্ষা দুঃসাধ্য হতে থাকে। তুরুস্ক হালকা হয়ে গিয়েই যথার্থ আঁট হয়ে উঠল। তখন ইংলণ্ড তাকে

তাড়া করেছে গ্রীসকে তার উপর লেলিয়ে দিয়ে। ইংলণ্ডের রাষ্ট্রতক্তে তখন বসে আছেন লয়েড জর্জ ও চার্চ্‌হিল। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডে তখনকার মিত্রশক্তিরা একটা সভা ডেকেছিলেন। সেই সভায় আঙ্গোরার প্রতিনিধি বেকির সামী তুরুস্কের হয়ে যে প্রস্তাব করেছিলেন তাতে তাঁদের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ অনেকটা পরিমাণে ত্যাগ করতেই রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু গ্রীস আপন ষোলো-আনা দাবির 'পরেই জেদ ধরে বসে রইল, ইংলণ্ড পশ্চাৎ থেকে তার সমর্থন করলে। অর্থাৎ কালনেমি-মামার লঙ্কাভাগের উৎসাহ তখনো খুব ঝাঁঝালো ছিল।

এই গোলমালের সময় তুরুস্ক মৈত্রী বিস্তার করলে ফ্রান্সের সঙ্গে। পারস্ত এবং আফগানিস্থানের সঙ্গেও তার বোঝাপড়া হয়ে গেল। আফগানিস্থানের সন্ধিপত্রের দ্বিতীয় দফায় লেখা আছে :

The contracting parties recognize the emancipation of the nations of the East and confirm the fact of their unrestricted freedom, their right to be independent and to govern themselves in whatever manner they themselves choose.

এ দিকে চলল গ্রীস তুরুস্কের লড়াই। এখনো আঙ্গোরা-পক্ষ রক্তপাত-নিবারণের উদ্দেশে বারবার সন্ধির প্রস্তাব পাঠালে। কিন্তু ইংলণ্ড ও গ্রীস তার বিরুদ্ধে অবিচলিত রইল। শেষে সকল কথাবার্তা থামল গ্রীসের পরাজয়ে। কামালপাশার নায়কতায় নূতন তুরুস্কের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হল আঙ্গোরা রাজধানীতে।

নব তুরুস্ক এক দিকে য়ুরোপকে যেমন সবলে নিরস্ত করলে আর-এক দিকে তেমনি সবলে তাকে গ্রহণ করলে অন্তরে বাহিরে। কামালপাশা বললেন, মধ্যযুগের অচলায়তন থেকে তুরুস্ককে মুক্তি নিতে হবে। আধুনিক য়ুরোপে মানবিক চিত্তের সেই মুক্তিকে তাঁরা শ্রদ্ধা করেন। এই মোহমুক্ত চিত্তই বিশ্বে আজ বিজয়ী। পরাভবের দুর্গতি থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে এই বৈজ্ঞানিক চিত্তবৃত্তির উদ্‌বোধন সকলের আগে চাই। তুরুস্কের বিচারবিভাগের মন্ত্রী বললেন, 'Mediaeval principles must give way to secular laws. We are creating a modern, civilised nation and we desire to meet contemporary needs. We have the will to live, and nobody can prevent us.' এই পরিপূর্ণভাবে বুদ্ধিসংগতভাবে প্রাণযাত্রানির্বাহের বাধা দেয় মধ্যযুগের পৌরাণিক অন্ধসংস্কার। আধুনিক লোক-ব্যবহারে তার প্রতি নির্মম হতে হবে এই তাঁদের ঘোষণা।

যুদ্ধজয়ের পরে কামালপাশা যখন স্মির্না শহরে প্রবেশ করলেন সেখানে একটি সর্বজন-সভা ডেকে মেয়েদের উদ্দেশে বললেন, 'যুদ্ধে আমরা নিঃসংশয়িত জয়সাধন করেছি, কিন্তু সে জয় নিরর্থক হবে যদি তোমরা আমাদের আনুকূল্য না কর। শিক্ষার

জয়সাধন কর তোমরা, তা হলে আমরা যতটুকু করেছি তোমরা তার চেয়ে অনেক বেশি করতে পারবে। সমস্তই নিষ্ফল হবে যদি আধুনিক প্রাণযাত্রার পথে তোমরা দৃঢ়চিত্তে অগ্রসর না হও। সমস্তই নিষ্ফল হবে যদি তোমরা গ্রহণ না কর আধুনিক জীবননির্বাহনীতি তোমাদের উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছে।'

এ যুগে য়ুরোপ সত্যের একটি বিশেষ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে। সেই সাধনার ফল সকল কালের সকল মানুষের জন্যেই, তাকে যে না গ্রহণ করবে সে নিজেকে বঞ্চিত করবে। এই কথা এশিয়ার পূর্বতম প্রান্তে জাপান স্বীকার করেছে এবং পশ্চিমতম প্রান্তে স্বীকার করেছে তুরুস্ক। ভৌতিক জগতের প্রতি সত্য ব্যবহার করা চাই এই অনুশাসন আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের, না করলেই বুদ্ধিতে এবং সংসারে আমরা ঠকব। এই সত্য ব্যবহার করার সোপান হচ্ছে মনকে সংস্কারমুক্ত করে বিশুদ্ধ প্রণালীতে বিশ্বের অন্তর্নিহিত ভৌতিক তত্ত্বগুলি উদ্ধার করা।

কথাটা সত্য। কিন্তু আরো চিন্তা করবার বিষয় আছে। য়ুরোপ যেখানে সিদ্ধিলাভ করেছে সেখানে আমাদের দৃষ্টি পড়েছে অনেক দিন থেকে, সেখানে তার ঐশ্বর্য বিশ্বের প্রত্যক্ষগোচর। যেখানে করে নি, সে জায়গাটা গভীরে, মূলে, তাই সেটা অনেক কাল থেকে প্রচ্ছন্ন রইল। এইখানে সে বিশ্বের নিদারুণ ক্ষতি করেছে এবং সেই ক্ষতি ক্রমেই ফিরে আসছে তার নিজের অভিমুখে। তার যে লোভ চীনকে আফিম খাইয়েছে সে লোভ তো চীনের মরণের মধ্যেই মরে না। সেই নির্দয় লোভ প্রত্যহ তার নিজেকে মোহান্ধ করছেই, বাইরে থেকে সেটা আমরা স্পষ্ট দেখি বা না দেখি। কেবল ভৌতিক জগতে নয়, মানবজগতেও নিষ্কাম চিত্তে সত্য ব্যবহার মানুষের আত্মরক্ষার চরম উপায়। সেই সত্য ব্যবহারের সাধনার প্রতি পাশ্চাত্য দেশ প্রতিদিন শ্রদ্ধা হারাচ্ছে, তা নিয়ে তার লজ্জাও যাচ্ছে চলে। তাই জটিল হয়ে উঠেছে তার সমস্ত সমস্যা, বিনাশ হয়ে এল আসন্ন। য়ুরোপীয় স্বভাবের অন্ধ অনুবর্তী জাপান সিদ্ধিমদমত্ততায় নিত্যতত্ত্বের কথাটা ভুলেছে তা দেখাই যাচ্ছে, কিন্তু চিরন্তন শ্রেয়স্তত্ত্ব আপন অমোঘ শাসন ভুলবে না এ কথা নিশ্চিত জেনে রাখা চাই।

নবযুগের আহ্বানে পশ্চিম এশিয়া কী রকম সাড়া দিচ্ছে সেটা স্পষ্ট করে জানা ভালো। খুব বড়ো করে সেটা জানবার এখনো সময় হয় নি। এখানে ওখানে একটু একটু লক্ষণ দেখা যায়, সেগুলো প্রবল করে চোখে পড়বার নয়। কিন্তু সত্য ছোটো হয়েই আসে। সেই সত্য এশিয়ার সেই দুর্বলতাকে আঘাত করতে শুরু করেছে যেখানে অন্ধ সংস্কারে, জড় প্রথায় তার চলাচলের পথ বন্ধ। এ পথ এখনো খোলসা হয় নি, কিন্তু দেখা যায় এই দিকে তার মনটা বিচলিত। এশিয়ার নানা দেশেই

এমন কথা উঠেছে যে, সাম্প্রদায়িক ধর্ম মানবের সকল ক্ষেত্র জুড়ে থাকলে চলবে না। প্যালেস্টাইন-শাসনবিভাগের একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীকে বিদায়ভোজ দেওয়ার সভায় তিনি যখন বললেন, Palestine is a Mahommedan country, and its government should, therefore, be in the hands of the Mahommedans, on condition that the Jewish and Christian minorities are represented in it,' তখন জেরুজিলামের মুফ্‌তি হাজি এমিন এল্‌-হুসেইনি উত্তর করলেন, 'For us it is an exclusively Arab, not a Mahommedan question. During your sojourn in this country you have doubtless observed that here there are no distinctions between Mahommedan and Christian Arabs. We regard the Christians not as a minority, but as Arabs.'

জানি এই উদারবুদ্ধি সকলের, এমন-কি, অধিকাংশ লোকের নেই। তবু সে যে ছোটো বীজের মতো অতি ছোটো জায়গা জুড়েই নিজেকে প্রকাশ করতে চাইছে এইটে আশার কথা। বর্তমানে এ ছোটো, কিন্তু ভবিষ্যতে এ ছোটো নয়।

আর-একটা অখ্যাত কোণে কী ঘটছে চেয়ে দেখো। রুশীয় তুর্কিস্থানে সোভিয়েট গবর্মেণ্ট অতি অল্পকালের মধ্যেই এশিয়ার মরুচর জাতির মধ্যে যে নূতন জীবন সঞ্চার করেছে তা আলোচনা করে দেখলে বিস্মিত হতে হয়। এত দ্রুতবেগে এতটা সফলতা লাভের কারণ এই যে, এদের চিত্তোৎকর্ষ সাধন করতে, এদের আত্মশক্তিকে পূর্ণতা দিতে, সেখানকার সরকারের পক্ষে অন্তত লোভের, সুতরাং ঈর্ষার বাধা নেই। মরুতলে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত এই-সব ছোটো ছোটো জাতিকে আপন আপন রিপাব্লিক স্থাপন করতে অধিকার দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া এদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের আয়োজন প্রভূত ও বিচিত্র। পূর্বেই অন্যত্র বলেছি, বহুজাতিসংকুল বৃহৎ সোভিয়েট সাম্রাজ্যে আজ কোথাও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মারামারি কাটাকাটি নেই। জারের সাম্রাজ্যিক শাসনে সেটা নিত্যই ঘটত। মনের মধ্যে যে স্বাস্থ্য থাকলে মানবের আত্মীয়সম্বন্ধে বিকৃতি ঘটে না সেই স্বাস্থ্য জাগে শিক্ষায় এবং স্বাধীনতায়। এই শিক্ষা এবং স্বাধীনতা নতুন বর্ষার বন্যাজলের মতো এশিয়ার নদীনালার মধ্যে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। তাই বহুযুগ পরে এশিয়ার মানুষ আজ আত্মাবমাননার দুর্গতি থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্যে দাঁড়াল। এই মুক্তিপ্রয়াসের আরম্ভে যতই দুঃখযন্ত্রণা থাক্, তবু এই উদ্যম, মনুষ্যগৌরব লাভের জন্যে এই-যে আপন সব-কিছু পণ করা, এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কিছু নেই। আমাদের এই মুক্তির দ্বারাই সমস্ত পৃথিবী মুক্তি পাবে।

এ কথা নিশ্চিত মনে রাখতে হবে, য়ুরোপ আজ নিজের ঘরে এবং নিজের বাইরে আপন বন্দীদের হাতেই বন্দী।

১৯১২ খ্রীস্টাব্দে যখন য়ুরোপে গিয়েছিলুম তখন একজন ইংরেজ কবি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তুমি এখানে কেন এসেছ।' আমি বলেছিলুম, 'য়ুরোপে মানুষকে দেখতে এসেছি।' য়ুরোপে জ্ঞানের আলো জ্বলছে, প্রাণের আলো জ্বলছে, তাই সেখানে মানুষ প্রচ্ছন্ন নয়, সে নিজেকে নিয়ত নানা দিকে প্রকাশ করছে।

সেদিন পারস্যেও আমাকে একজন ঠিক সেই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি বলেছিলাম, 'পারস্যে যে মানুষ সত্যিই পারসিক তাকেই দেখতে এসেছি।' তাকে দেখবার কোনো আশা থাকে না দেশে যদি আলো না থাকে। জ্বলছে আলো জানি। তাই পারস্য থেকে যখন আহ্বান এল তখন আবার একবার দূরের আকাশের দিকে চেয়ে মন চঞ্চল হল।

রোগশয্যা থেকে তখন সবে উঠেছি। ডাক্তারকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলুম না— সাহস ছিল না— গরমের দিনে জলস্থলের উপর দিয়ে রৌদ্রের তাপ এবং কলের নাড়া খেতে খেতে দীর্ঘ পথ বেয়ে চলব সে সাহসেরও অভাব ছিল। আকাশযানে উঠে পড়লুম। ঘরের কোণে একলা বসে যে বালক দিনের পর দিন আকাশের দিকে তাকিয়ে দূরের আহ্বান শুনতে পেত আজ সেই দূরের আহ্বানে সে সাড়া দিল ওই আকাশের পথ বেয়েই। পারস্যের দ্বারে এসে নামলুম দুদিন পরেই। তার পরদিন সকালে পৌঁছলুম বুশেয়ারে।

৩

বুশেয়ার সমুদ্রের ধারে জাহাজ-ঘাটার শহর। পারস্যের অন্তরঙ্গ স্থান এ নয়।

বৈকালে পারসিক পার্লামেন্টের একজন সদস্য আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। জিজ্ঞাসা করতে চাইলেন আমি কী জানতে চাই। বললুম, পারস্যের শাশ্বত স্বরূপটি জানতে চাই, যে পারস্য আপন প্রতিভায় স্বপ্রতিষ্ঠিত।

তিনি বললেন, বড়ো মুশকিল। সে পারস্য কোথায় কে জানে। এ দেশে এক বৃহৎ দল আছে তারা অশিক্ষিত, পুরোনো তাদের মধ্যে অপভ্রষ্ট, নতুন তাদের মধ্যে অনুদ্‌গত। শিক্ষিত বিশেষণে যারা খ্যাত তারা আধুনিক; নতুনকে তারা চিনতে আরম্ভ করেছে, পুরোনোকে তারা চেনে না।

এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য এই যে, সকলেরই মধ্যে দেশ প্রকাশমান নয়, বহুর মধ্যে সে অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট। দেশের যথার্থ প্রকাশ কোনো কোনো বিশেষ মানুষের জীবনে ও

উপলব্ধিতে। দেশের আন্তর্ভৌম প্রাণধারা ভাবধারা অকস্মাৎ একটা-কোনো ফাটল দিয়ে একটি-কোনো উৎসের মুখেই বেরিয়ে পড়ে। যা গভীরের মধ্যে সঞ্চিত তা সর্বত্র বহুলোকের মধ্যে উদ্‌ঘাটিত হয় না। যা অধিকাংশের আবিল চিত্তের আড়ালে থাকে তা কারো কারো প্রকৃতিগত মানসিক স্বচ্ছতার কাছে সহজেই অভিব্যক্ত হয়। তাঁর পুঁথিগত শিক্ষা কতদূর, তাঁকে দেশ মানে কি মানে না, সে কথা অবান্তর। সেরকম কোনো কোনো দৃষ্টিমান লোক পারস্যে নিশ্চয়ই আছে; তারা সম্ভবত নামজাদাদের দলের মধ্যে নয়, এমন-কি, তারা বিদেশীদের কেউ হতেও পারে। কিন্তু পথিক মানুষ কোথায় তাদের খুঁজে পাবে।

যাঁর বাড়িতে আছি তাঁর নাম মাহ্‌মুদ রেজা। তিনি জমিদার ও ব্যবসায়ী। নিজের ঘরদুয়োর ছেড়ে দিয়ে আমাদের জন্য দুঃখ পেয়েছেন কম নয়, নতুন আসবাবপত্র আনিয়ে নিজের অভ্যস্ত আরামের উপকরণকে উলটোপালটা করেছেন। আড়ালে থেকে সমস্তক্ষণ আমাদের প্রয়োজনসাধনে তিনি ব্যস্ত, কিন্তু সর্বদা সমুখে এসে সামাজিকতার অভিঘাতে আমাদের ব্যস্ত করেন না। এঁর বয়স অল্প, শান্ত প্রকৃতি, সর্বদা কর্মপরায়ণ।

সম্মানের সমারোহ এসে অবধি নানা আকারে চলেছে। এই জিনিসটাকে আমার মন সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারে না, নিজের মধ্যে আমি এর হিসাব মিলিয়ে পাই নে। বুশেয়ারের এই জনতার মধ্যে আমি কেই-বা। আমার ব্যক্তিগত ইতিহাসে ভাষায় ভাবে কর্মে আমি যে বহুদূরের অজানা মানুষ। য়ুরোপে যখন গিয়েছি তখন আমার কবির পরিচয় আমার সঙ্গেই ছিল। একটা বিশেষ বিশেষণে তারা আমাকে বিচার করেছে। বিচারের উপকরণ ছিল তাদের হাতে। এরাও আমাকে কবি বলে জানে, কিন্তু সে জানা কল্পনায়; এদের কাছে আমি বিশেষ কবি নই, আমি কবি। অর্থাৎ কবি বলতে সাধারণত এরা যা বোঝে তাই সম্পূর্ণ আমার ’পরে আরোপ করতে এদের বাধে নি। কাব্য পারসিকদের নেশা, কবিদের সঙ্গে এদের আন্তরিক মৈত্রী। আমার খ্যাতির সাহায্যে সেই মৈত্রী আমি কোনো দান না দিয়েই পেয়েছি। অন্য দেশে সাহিত্যরসিক মহলেই সাহিত্যিকদের আদর, পলিটিশিয়নদের দরবারে তার আসন পড়ে না, এখানে সেই গণ্ডী দেখা গেল না। যাঁরা সম্মানের আয়োজন করেছেন তাঁরা প্রধানত রাজদরবারীদের দল। মনে পড়ল ইজিপ্টের কথা। সেখানে যখন গেলেম রাষ্ট্রনেতারা আমার অভ্যর্থনার জন্যে এলেন। বললেন, এই উপলক্ষে তাঁদের পার্লামেন্টের সভা কিছুক্ষণের জন্যে মুলতুবি রাখতে হল। প্রাচ্যজাতীয়ের মধ্যেই এটা সম্ভব। এদের কাছে আমি শুধু কবি নই, আমি প্রাচ্য কবি। সেইজন্যে এরা অগ্রসর

হয়ে আমাকে সম্মান করতে স্বভাবত ইচ্ছা করেছে, কেননা সেই সম্মানের ভাগ এদের সকলেরই। পারসিকদের কাছে আমার পরিচয়ের আরো-একটু বিশিষ্টতা আছে। আমি ইণ্ডো-এরিয়ান। প্রাচীন ঐতিহাসিক কাল থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত পারস্যে নিজেদের আর্য-অভিমানবোধ বরাবর চলে এসেছে, সম্প্রতি সেটা যেন আরো বেশি করে জেগে ওঠবার লক্ষণ দেখা গেল। এদের সঙ্গে আমার রক্তের সম্বন্ধ। তার পরে এখানে একটা জনশ্রুতি রটেছে যে, পারসিক মরমিয়া কবিদের রচনার সঙ্গে আমার লেখার আছে সাজাত্য। যেখানে পাঠকের কাছে কবিকে নিজের পথ নিজে অবারিত করে যেতে হয় সেখানে ভূমি বন্ধুর। কিন্তু যে দেশে আমার পাঠক নেই এখানে আমি সেই নিরাপদ দেশের কবি, এখানকার বহুকালের সকল কবিরই রাজ-পথ আমার পথ। আমার প্রীতির দিক থেকেও এরা আমার কাছে এসেছে সহজ মানুষের সম্বন্ধে এরা আমার বিচারক নয়, বস্তু যাচাই করে মূল্য দেনাপাওনার কারবার এদের সঙ্গে নেই। কাছের মানুষ বলে এরা যখন আমাকে অনুভব করেছে তখন ভুল করে নি এরা, সত্যই সহজেই এদের কাছে এসেছি। বিনা বাধায় এদের কাছে আসা সহজ, সেটা স্পষ্টই অনুভব করা গেল। এরা যে অন্য সমাজের, অন্য ধর্মসম্প্রদায়ের, অন্য সমাজগণ্ডীর, সেটা আমাকে মনে করিয়ে দেবার মতো কোনো উপলক্ষই আমার গোচর হয় নি। য়ুরোপীয় সভ্যতায় সামাজিক বাঁধা নিয়মের বেড়া, ভারতীয় হিন্দুসভ্যতায় সামাজিক সংস্কারের বেড়া আরো কঠিন। বাংলায় নিজের কোণ থেকে বেরিয়ে পশ্চিমেই যাই, দক্ষিণেই যাই, কারো ঘরের মধ্যে আপন স্থান করে নেওয়া দুঃসাধ্য, পায়ে পায়ে সংস্কার বাঁচিয়ে চলতে হয়— এমন-কি, বাংলার মধ্যেও। এখানে অশনে আসনে ব্যবহারে মানুষে মানুষে সহজেই মিশে যেতে পারে। এরা আতিথেয় বলে বিখ্যাত, সে আতিথ্যে পঙ্‌ক্তিভেদ নেই।

১৬ এপ্রেল। সকাল সাতটার সময় শিরাজ অভিমুখে ছাড়বার কথা। শরীর যদিও অসুস্থ ও ক্লান্ত তবু অভ্যাসমত ভোরে উঠেছি, তখন আর-সকলে শয্যাগত। সকলে মিলে প্রস্তুত হয়ে বেরতে নটা পেরিয়ে গেল।

মেঠো রাস্তা। মোটরগাড়ির চালচলনের সঙ্গে রাস্তাটার ভঙ্গিমার বনিবনাও নেই। সেই অসামঞ্জস্যের ধাক্কা যাত্রীরা প্রতিমুহূর্তে বুঝেছিল। যাকে বলে হাড়ে হাড়ে বোঝা।

মাঠের পর মাঠ, তার আর শেষ নেই। কোথাও একটা ঘর বা গাছ বা বসতির

চিহ্ন দেখি নে। পারস্যদেশের বেশির ভাগ উচ্চ মালভূমি, পাহাড়ে বেষ্টিত, আবার মাঝে মাঝে গিরিশ্রেণী। এই মালভূমি সমুদ্র-উপরিতল থেকে পাঁচ-ছয় হাজার ফিট উঁচু। এর মাঝখানটা নেমে গিয়েছে প্রকাণ্ড এক মরুভূমিতে। এই অধিত্যকায় পাহাড় ডিঙিয়ে মেঘ পৌঁছতে বাধা পায়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অতি অল্প। পর্বত থেকে জলস্রোত নেমে মাঝে মাঝে উর্বরতা সৃষ্টি করে। কিন্তু ক্ষীণজল এই স্রোতগুলি সমুদ্র পর্যন্ত প্রায় পৌঁছয় না, মরু নেয় তাদের শুষে কিম্বা জলার মধ্যে তাদের দুর্গতি ঘটে।

বন্ধুর পথে নাড়া খেতে খেতে ক্রমে সেই বিশাল নীরস শূন্যতার মধ্যে দূরে দেখা যায় খেজুরের কুঞ্জ, কোথাও-বা বাবলা। এই জনবিরল জায়গায় দশ মাইল অন্তর সশস্ত্র পুলিস পাহারা। পথে পথিক প্রায় দেখি নে। আমাদের দেশ হলে আর্তনাদ-মুখর গোরুর গাড়ি দেখা যেত। এ দেশে তার জায়গায় পিঠের দুই পাশে বোঝা ঝুলিয়ে গাধা কিম্বা দল-বাঁধা খচ্চর, মাঝে মাঝে ভেড়ার পাল নিয়ে মেষপালক, দুই-এক জায়গায় কাঁটাঝোপের মধ্যে চরে বেড়াচ্ছে উটের দল।

বেলা যায়, রৌদ্র বেড়ে ওঠে। মোটর-চক্রোৎক্ষিপ্ত ধুলো উড়িয়ে বাতাস বইছে, আমাদের শীতের হাওয়ার মতো ঠাণ্ডা। ক্বচিৎ এক-এক জায়গায় দেখি তোরণওয়ালা মাটির ছোটো কেল্লা, সেখানে মোটর দাঁড় করিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানানো হয়। ডান দিগন্তে একটা পাহাড়ের চেহারা ফুটে উঠেছে, যাত্রা-আরম্ভে আকাশের ঘোলা নীলের মধ্যে এ পাহাড় অবগুণ্ঠিত ছিল।

এই অঞ্চলটায় বাখ্‌ক্রি জাতের বাস, তাদের ভাষা তুর্কি। পূর্বতন রাজার আমলে এখানে তাদের বসতি পত্তন হয়। এদের ব্যাবসা ছিল দস্যুবৃত্তি। নূতন আমলে এদের ঠাণ্ডা করা হচ্ছে। শোনা গেল কিছুদিন আগে পথের মধ্যে এরা একটা সাঁকো ভেঙে রেখেছিল। মালবোঝাই মোটরবাস উলটে পড়তেই খুনজখম লুটপাট করে। এই ঘটনার পরে রাজা তাদের প্রধানের ছেলেকে জামিনস্বরূপে তেহেরানে নিয়ে রেখেছেন। শাস্তিটা কঠোর নয়, অথচ কেজো। এই জাতের দলপতি শাকৃরুল্লা খাঁ তাঁর বসতিগ্রাম থেকে এসে আমাদের অভিবাদন জানিয়ে গেলেন। আর কয়েক বছর আগে হলে এই অভিবাদনের ভাষা সম্পূর্ণ অন্যরকম হত, যাকে বলা যেতে পারত মর্মগ্রাহী। বুশেয়ার থেকে বরাবর আমাদের গাড়ির আগে আগে আর-একটি মোটরে বন্দুকধারী পাহারা চলেছে। প্রথমে মনে করেছিলুম বুঝি-বা এটা রাজকায়দার বাহুল্য অলংকার, এখন বোধ হচ্ছে এর একটি জরুরি অর্থ থাকতেও পারে।

মেটে রাস্তা ক্রমে নুড়ি-বিছানো হয়ে এল। বোঝা যায় পাহাড়ের বুকে উঠছি।

পথের প্রান্তে কোথাও-বা গিরিনদী চলেছে পাথরের মধ্য দিয়ে পথ কেটে। কিন্তু তারা তো লোকালয়ের ধাত্রীর কাজ করছে না। মানুষ কোথায়। মাঠে মাঝে মাঝে আকন্দগাছ কুলগাছ উইলো— মাঝে মাঝে গমের খেতে চাষের পরিচয় পাই, কিন্তু চাষীর পরিচয় পাই নে।

মধ্যাহ্ন পেরিয়ে যায়। শিরাজের পথ দীর্ঘ। এক দিনে যেতে কষ্ট হবে বলে স্থির হয়েছে খজেরুনে গবর্নরের আতিথ্যে মধ্যাহ্নভোজন সেরে রাত্রিযাপন করব। কিন্তু বিলম্বে বেরিয়েছি, সময়মত সেখানে পৌঁছবার আশা নেই, তাই পথে কোনারতাখ্‌তে নামে এক জায়গায় প্রহরীদের মেটে আড্ডায় আমাদের মোটর গাড়ি থামল। মাটির মেঝের 'পরে তাড়াতাড়ি কম্বল কার্পেট বিছিয়ে দিলে। সঙ্গে আহার্য ছিল, খেয়ে নিলুম। মনে হল, এ যেন বইয়ে পড়া গল্পের পান্থশালা, খেজুর-কুঞ্জের মাঝখানে।

এবার পাহাড়ে আঁকাবাঁকা চড়াই পথে উঠছি। পাহাড়গুলো সম্পূর্ণ টাক-পড়া, এমন-কি, পাথরেরও প্রাধান্য কম। বড়ো বড়ো মাটির স্তূপ। যেন মুড়িয়ে দেওয়া দৈত্যের মাথা। বোঝা যায় এটা বৃষ্টিবিরল দেশ, নইলে গাছের শিকড় যে মাটিকে বেঁধে রাখে নি বৃষ্টির আঘাতে সে মাটি কতদিন টিঁকতে পারে। স্বল্পপথিক পথে মাঝে মাঝে কেরোসিনের বোঝা নিয়ে গাধা চলেছে। বোঝাই-করা বড়ো বড়ো সরকারি মোটর বাস আমাদের পথ বাঁচিয়ে নড়বড় করে ছুটেছে নীচের দিকে। পাহাড়ের পর পাহাড়, তৃণহীন জনহীন রুক্ষ, যেন পৃথিবীর বুক থেকে একটা তৃষার্ত দৈত্যের অশ্রুহীন কান্না ফুলে ফুলে উঠে শক্ত হয়ে গেছে।

বেলা যায়। এক জায়গায় দেখি পথের মধ্যে খজেরুনের গবর্নর ঘোড়সওয়ার পাঠিয়েছেন আমাদের আগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। বোঝা গেল তাঁরা অনেকক্ষণ ধরে প্রতীক্ষা করছেন।

প্রাসাদে পৌঁছলুম। বড়ো বড়ো কমলালেবুগাছের ঘনসংহত বীথিকা; স্নিগ্ধচ্ছায়ায় চোখ জুড়িয়ে দিলে। সেকালের মনোরম বাগান, নাম বাগ-ই-নজর। নিঃস্ব রিক্ততার মাঝখানে হঠাৎ এইরকম সবুজ ঐশ্বর্যের দানসত্র, এইটেই পারস্যের বিশেষত্ব।

বাগানের তরুতলে আমাদের ভোজের আয়োজন। কিন্তু এখনকার মতো ব্যর্থ হল। আমি নিরতিশয় ক্লান্ত। একটি কার্পেট-বিছানো ছোটো ঘরে খাটের উপর শুয়ে পড়লুম। বাতাসে তাপ নেই, সামনে খোলা দরজা দিয়ে ঘন সবুজের উচ্ছ্বাস চোখে এসে পড়ছে।

কিছুক্ষণ পরে বিছানা ছেড়ে বাগানে গিয়ে দেখি, গাছতলায় বড়ো বড়ো ডেকচিতে

মোটা মোটা পাচক রান্না চড়িয়েছে, আমাদের দেশে যজ্ঞের রান্নার মতো। বুঝলুম রাত্রিভোজের উদ্যোগপর্ব।

অতিথির সম্মানে আজ এখানে সরকারি ছুটি। সেই সুযোগে অনেকক্ষণ থেকে লোক জমায়েত হয়েছিল। আমাদের দেরি হওয়াতে ফিরে গেছে। যাঁরা বাকি আছেন তাঁদের সঙ্গে বসে গেলুম। সকলেরই মুখে তাঁদের রাজার কথা। বললেন, তিনি অসামান্য প্রতিভার জোরে দশ বছরের মধ্যে পারস্যের চেহারা বদলিয়ে দিয়েছেন।

এইখানে আধুনিক পারস্য-ইতিহাসের একটুখানি আভাস দেওয়া যেতে পারে।

কাজার-জাতীয় আগা মহম্মদ খাঁর দানবিক নিষ্ঠুরতায় এই ইতিহাসের বর্তমান অধ্যায় আরম্ভ হল। এরা পারসিক নয়। কাজাররা তুর্কিজাতের লোক। তৈমুরলঙ এদের পারস্যে নিয়ে আসে। বর্তমানে রেজা শা পহ্লবীর আমলের পূর্ব পর্যন্ত পারস্যের রাজসিংহাসন এইজাতীয় রাজাদের হাতেই ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে শা নাসিরউদ্দিন ছিলেন রাজা। তখন থেকে রাষ্ট্রবিপ্লবের সূচনা দেখা দিল। এই সময়ে পারস্যের মন যে জেগে উঠেছে তার একটা নিদর্শন দেখা যায় বাবিপন্থীদের ধর্মবিপ্লবে। ঠিক এই সময়েই রামমোহন রায় বাংলাদেশে প্রচার করেছিলেন ধর্মসংস্কার। নাসিরউদ্দিন অতি নিষ্ঠুরভাবে এই সম্প্রদায়কে দলন করেন।

পারস্যের রাজাদের মধ্যে নাসিরউদ্দিন প্রথম য়ুরোপে যান আর তাঁর আমল থেকেই দেশকে বিদেশীর ঋণজালে জড়িত করা শুরু হল। তাঁর ছেলে মজফ্‌ফর-উদ্দিনের আমলে এই জাল বিস্তৃত হবার দিকে চলল। তামাকের ব্যাবসার একচেটে অধিকার তিনি দিলেন এক ইংরেজ কোম্পানিকে। এটা দেশের লোকের সইল না, তারা তামাক বয়কট করে দিলে। দেশসুদ্ধ তামাকখোরদের তামাক ছাড়া সোজা নয়, কিন্তু তাও ঘটল। এই উপায়ে এটা রদ হয়ে গেল, কিন্তু দণ্ড দিতে হল কোম্পানিকে খুব লম্বা মাপে। তার পরে লাগল রাশিয়া, তার হাতে রেলওয়ে। বেলজিয়ম থেকে কর্মচারী এল পারস্যে ট্যাক্স আদায়ের কাজে, ইংরেজও উঠে পড়ে লাগল পারস্য-বিভাগের কাজে।

এ দিকে দেশের লোকের কাছ থেকে ক্রমাগত তাগিদ আসছে রাষ্ট্রসংস্কারের। শেষকালে রাজাকে মেনে নিতে হল। প্রথম পারসিক পার্লামেন্ট খুলল ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে অক্টোবরে।

এ রাজা মারা গেলেন। ছেলে বসলেন গদিতে, শা মহম্মদ আলি। পারস্যে তখন প্রাদেশিক গবর্নররা ছিল এক-এক নবাববিশেষ, তারা সকল বিষয়েই দেয় বাধা। প্রজারা এদের বরখাস্ত করবার দাবি করলে, আর মাশুল-আদায়ের বেলজিয়ান কর্তাদেরও সরিয়ে দেবার প্রস্তাব পার্লামেন্টে উঠল।

বলা বাহুল্য, দেশের লোক পার্লামেন্ট শাসনপদ্ধতিতে ছিল আনাড়ি। দায়িত্ব হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রমে ক্রমে তাদের হাত পেকে উঠল। কিন্তু রাজকোষ শূন্য, রাজস্ববিভাগ ছারখার।

অবশেষে একদা ইংরেজে রাশিয়ানে আপস হয়ে গেল। দুই কর্তার একজন পারস্যের মুণ্ডের দিকে আর-একজন তার লেজের দিকে দুই হাওদা চড়িয়ে সওয়ার হয়ে বসল, অঙ্কুশরূপে সঙ্গে রইল সৈন্যসামন্ত। উত্তর দিকটা পড়ল রুশীয়ের ভাগে, দক্ষিণ দিকটা ইংরেজের, অল্প একটুখানি বাকি রইল সেখানে পারস্যের বাতি টিম্ টিম্ করে জ্বলছে।

রাজায় প্রজায় তকরার বেড়ে চলল। একদিন রাজার দল মোল্লার দলে মিশে পড়ল গিয়ে শহরের উপর, পার্লামেন্টের বাড়ি দিলে ভূমিসাৎ করে। কিন্তু দেশকে দাবিয়ে দিতে পারল না, আবার একবার নতুন করে কনস্টিট্যুশনের পত্তন হল।

ইংরেজ ও রুশ উভয়েই মনে অত্যন্ত ব্যথা পেয়েছে শাহকে দেশের লোক এমন বিশ্রীরকম ব্যস্ত করছে বলে। বলাই বাহুল্য, নতুন কনস্টিট্যুশনের প্রতি তাদের দরদ ছিল না। রুশীয় কর্নেল লিয়াকভ একদিন সৈন্য নিয়ে পড়ল পার্লামেন্টের উপরে। লড়াই বেধে গেল, বড়ো বড়ো অনেক সদস্য গেলেন মারা, কেউ-বা হলেন বন্দী, কেউ-বা গেলেন পালিয়ে। লণ্ডন টাইম্‌স্ বললেন, স্পষ্টই প্রমাণ হচ্ছে স্বরাজতন্ত্র ওরিয়েন্টালদের ক্ষমতার অতীত।

তেহেরানকে ভীষণ অত্যাচারে নির্জীব করলে বটে, কিন্তু অন্য প্রদেশে যুদ্ধ চলতে লাগল। শেষে পালাতে হল রাজাকে দেশ ছেড়ে, তাঁর এগারো বছরের ছেলে উঠলেন রাজগদিতে। রাজা যাতে মোটা পেনসন পান ইংরেজ এবং রুশ তার ব্যবস্থা করলেন। রুশীয়ের সাহায্যে পলাতক রাজা আবার এসে দেশ আক্রমণ করলেন। হার হল তাঁর।

আমেরিকা থেকে মর্গ্যান শুস্টার এলেন পারস্যের বিধ্বস্ত রাজস্ববিভাগকে খাড়া করে তুলতে। ঠিক যে সময়ে তিনি কৃতকার্য হয়েছেন, রাশিয়া বিরুদ্ধে লাগল। পারস্যের উপর হুকুম জারি হল শুস্টারকে বিদায় করতে হবে। প্রস্তাব হল, ইংরেজ

এবং রুশের সম্মতি ব্যতীত কোনো বিদেশীকে রাষ্ট্রকার্যে আহ্বান করা চলবে না। এ নিয়ে পার্লামেণ্টে বিরুদ্ধ আন্দোলন চলল। কিন্তু টিঁকল না। শুস্টার নিলেন বিদায়, রাষ্ট্রসংস্কারকরা কেউ-বা গেলেন জেলে, কেউ-বা গেলেন বিদেশে। এইসময়কার বিবরণ নিয়ে শুস্টার The Strangling of Persia -নামক যে বই লিখেছেন তার মতো শোকাবহ ইতিহাস অল্পই দেখা যায়।

এ দিকে য়ুরোপের যুদ্ধ বাধল। তখন রুশিয়া সেই সুযোগে পারস্যে আপন আসন আরো ফলাও করে নেবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল। অবশেষে বলশেভিক বিপ্লবের তাড়ায় তারা গেল সরে। এই সুযোগে ইংরেজ বসল উত্তর-পারস্য দখল করে। নিরন্তর লড়াই চলল দেশবাসীদের সঙ্গে।

১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে সার পার্সি কক্স্ এলেন পারস্যে ব্রিটিশ মন্ত্রী। তিনি পারসিক গবর্মেণ্টের এক দলের কাছ থেকে কড়ার করিয়ে নিলেন যে, সমগ্র পারস্যের আধিপত্য থাকবে ইংরেজের হাতে, তার শাসনকার্য ও সৈন্যবিভাগ ইংরেজের অঙ্গুলিসংকেতে চালিত হবে। এ'কে ভদ্রভাষায় বলে প্রোটেক্টোরেট্। এর নিগূঢ় অর্থটা সকলেরই কাছে সুবিদিত— অর্থাৎ, ওর উপক্রমণিকা বৈষ্ণবের ঝুলিতে, ওর উপসংহার শাক্তের কবলে। যাই হোক, সম্পূর্ণ পার্লামেণ্টের কাছে এই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরের জন্যে পেশ করতে কারো সাহস হল না।

এই দুর্যোগের দিনে রেজা খাঁ তাঁর কসাক সৈন্য নিয়ে দখল করলেন তেহেরান। ও দিকে সোভিয়েট গবর্মেণ্ট সৈন্য পাঠিয়ে উত্তর-পারস্যে ইংরেজকে প্রতিরোধ করতে এল। ইংরেজ পারস্য ত্যাগ করলে। এতকালের নিরন্তর নিপীড়নের পর পারস্য সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি লাভ করল। সোভিয়েট রাশিয়ার নূতন রাজদূত রট্স্টাইন এসে এই লেখাপড়া করে দিলেন যে, এত কাল সাম্রাজ্যিক রাশিয়া পারস্যের বিরুদ্ধে যে দলননীতি প্রবর্তন করেছিল সোভিয়েট গবর্মেণ্ট তা সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করতে প্রস্তুত। পারস্যের যে-কোনো স্বত্ব রাশিয়ার কবলে গিয়েছিল সমস্তই তাঁরা ফিরিয়ে দিচ্ছেন; রাশিয়ার কাছে পারস্যের যে ঋণ ছিল তার থেকে তাকে মুক্তি দেওয়া হল এবং রাশিয়া পারস্যে যে-সমস্ত পথ বন্দর প্রভৃতি স্বয়ং নির্মাণ করেছিল কোনো মূল্য দাবি না করে সে সমস্তের স্বত্বই পারস্যকে অর্পণ করা হল।

রেজা খাঁ প্রথমে সামরিক বিভাগের মন্ত্রী, তার পরে প্রধান মন্ত্রী, তার পরে প্রজা-সাধারণের অনুরোধে রাজা হলেন। তাঁর চালনায় পারস্য অন্তরে বাহিরে নূতন বলে বলিষ্ঠ হয়ে উঠছে। রাষ্ট্রের নানা বিভাগে যে-সকল বিদেশীর অধ্যক্ষতা ছিল তারা একে একে গেছে সরে। শোষণ-লুণ্ঠন-বিভ্রাটের শান্তি হয়ে এল, সমস্ত দেশ জুড়ে আজ কড়া

পাহারা দাঁড়িয়ে আছে তর্জনী তুলে। উদ্‌ভ্রান্ত পারস্য আজ নিজের হাতে নিজেকে ফিরে পেয়েছে। জয় হোক রেজা শা পহ্লবীর।

এঁদের কাছে আর-একটা খবর পাওয়া গেল, দেশের টাকা বাইরে যেতে দেওয়া হয় না। বিদেশ থেকে যারা কারবার করতে আসে সমান মূল্যের জিনিস এখান থেকে না কিনলে তাদের মাল বিক্রি বন্ধ। আমদানি রফতানির মধ্যে অসাম্য না থাকে সেই দিকে দৃষ্টি।

৪

আমার শরীর ক্লান্ত তাই রাত্রের আহার একলা আমার ঘরে পাঠাবেন বলে এঁরা ঠিক করেছিলেন। রাজি হলুম না। বাগানে গাছতলায় দীপের আলোকে সকলের সঙ্গে খেতে বসলুম। এখানকার দেশী ভোজ্য। পোলাও কাবাব প্রভৃতিতে আমাদের দেশের মোগলাই খানার সঙ্গে বিশেষ প্রভেদ দেখা গেল না।

ক্লান্ত শরীরে শুতে গেলুম। যথারীতি ভোরের বেলায় প্রস্তুত হয়ে যখন দরজা খুলে দিয়েছি তখন দুটি-একটি পাখি ডাকতে আরম্ভ করেছে।

যাত্রা যখন আরম্ভ হল তখন বেলা সাড়ে-সাতটা। বাইরে আফিমের খেতে ফুল ধরেছে। গেটের সামনে পথের ও পারে দোকান খুলেছে সবেমাত্র। সুন্দর স্নিগ্ধ সকালবেলা। বাঁ ধারে নিবিড় সবুজবর্ণ দাঁড়িমের বন— গমের খেত, তাতে নতুন চারা উঠেছে। এ বৎসর দীর্ঘ অনাবৃষ্টিতে ফসলে তেজ নেই, তবু এ জায়গাটি তৃণে গুল্মে রোমাঞ্চিত।

উপলবিকীর্ণ পথে ঠোকর খেতে খেতে গাড়ি চলেছে। উঁচু পাহাড়ের পথ অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিতে এসে নামল। অন্যত্র সাধারণত নগরের কিছু আগে থাকতেই তার উপক্রমণিকা দেখা যায়, এখানে তেমন নয়, শূন্য মাঠের প্রান্তে অকস্মাৎ শিরাজ বিরাজমান। মাটির তৈরি পাঁচিলগুলোর উপর থেকে মাঝে মাঝে চোখে পড়ল পপলার কমলালেবু চেস্ট্‌নাট এল্‌ম্ গাছের মাথা।

শিরাজের গবর্নর আমাকে সমারোহ করে নিয়ে গেলেন এক বড়ো বাড়িতে সভাগৃহে। কার্পেট-পাতা মস্ত ঘর। দুই প্রান্তের দেয়াল-বরাবর অভ্যাগতেরা বসেছেন, তাঁদের সামনে ফলমিষ্টান্নসহযোগে চায়ের সরঞ্জাম ছোটো ছোটো টেবিলে সাজানো। এখানে শিরাজের সাহিত্যিকদল ও নানা শ্রেণীর প্রতিনিধিরা উপস্থিত। শিরাজ-নাগরিকদের হয়ে একজন যে অভিবাদন পাঠ করলেন তার মর্ম এই— শিরাজ শহর দুটি চিরজীবী মানুষের গৌরবে গৌরবান্বিত। তাঁদের চিত্তের পরিমণ্ডল তোমার

চিত্তের কাছাকাছি। যে উৎস থেকে তোমার বাণী উৎসারিত সেই উৎসধারাতেই এখানকার দুই কবিজীবনের পুষ্পকানন অভিষিক্ত। যে সাদির দেহ এখানকার একটি পবিত্র ভূখণ্ডতলে বহু শতাব্দীকাল চিরবিশ্রামে শয়ান তাঁর আত্মা আজ এই মুহূর্তে এই কাননের আকাশে ঊর্ধ্বে উত্থিত, এবং এখনি কবি হাফেজের পরিতৃপ্ত হাস্য তাঁর স্বদেশবাসীর আনন্দের মধ্যে পরিব্যাপ্ত।

আমি বললেম, যথোচিতভাবে আপনাদের সৌজন্যের প্রতিযোগিতা করি এমন সম্ভাবনা নেই। কারণ, আপনারা যে ভাষায় আমাকে সম্ভাষণ করলেন সে আপনাদের নিজের, আমার এই ভাষা ধার করা। জমার খাতায় আমার তরফে একটিমাত্র অঙ্ক উঠল, সে হচ্ছে এই যে, আমি সশরীরে এখানে উপস্থিত। বঙ্গাধিপতি একদা কবি হাফেজকে বাংলায় নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তিনি যেতে পারেন নি। বাংলার কবি পারস্যাধিপের নিমন্ত্রণ পেলে, সে নিমন্ত্রণ রক্ষাও করলে এবং পারস্যকে তার প্রীতি ও শুভকামনা প্রত্যক্ষ জানিয়ে কৃতার্থ হল।

সভার পালা শেষ হলে পর চললেম গবর্নরের প্রাসাদে। পথে যে শিরাজের পরিচয় হল সে নূতন শিরাজ। রাস্তা ঘরবাড়ি -তৈরি চলছে। পারস্যের শহরে শহরে এই নূতন রচনার কাজ সর্বত্রই জেগে উঠল, নূতন যুগের অভ্যর্থনায় সমস্ত দেশ উৎসাহিত।

সৈনিকপঙ্‌ক্তির মধ্য দিয়ে বৃহৎ প্রাঙ্গণ পার হয়ে গবর্নরের প্রাসাদে প্রবেশ করলেম। মধ্যাহ্নভোজনের আয়োজন সেখানে অপেক্ষা করছে। কিন্তু অন্য সকল অনুষ্ঠানের পূর্বেই যাতে বিশ্রাম করতে পারি সেই প্রার্থনামতই ব্যবস্থা হল। পরিষ্কার হয়ে নিয়ে আশ্রয় নিলুম শোবার ঘরে। তখন বেলা চারটে। রাত্রে নিমন্ত্রিতবর্গের সঙ্গে আহার করে দীর্ঘদিনের অবসান।

সকালে গবর্নর বললেন, কাছে এক ভদ্রলোকের বাগানবাড়ি আছে, সেটা আমাদের বাসের জন্য প্রস্তুত। সেখানেই আমার বিশ্রামের সুবিধা হবে বলে বাসা-বদল স্থির হল।

১৭ এপ্রেল। আজ অপরাহ্ণে সাদির সমাধিপ্রাঙ্গণে আমার অভ্যর্থনার সভা। গবর্নর প্রথমে নিয়ে গেলেন চেম্বার অফ কমার্সে। সেখানে সদস্যদের সঙ্গে বসে চা খেয়ে গেলেম সাদির সমাধিস্থানে। পথের দুই ধারে জনতা। কালো কালো আঙরাখায় মেয়েদের সর্বাঙ্গ ঢাকা, মুখেরও অনেকখানি, কিন্তু বুরখা নয়। সাধারণত পুরুষদের কাপড় য়ুরোপীয়, কচিৎ দেখা গেল পাগড়ি ও লম্বা কাপড়। বর্তমান রাজার

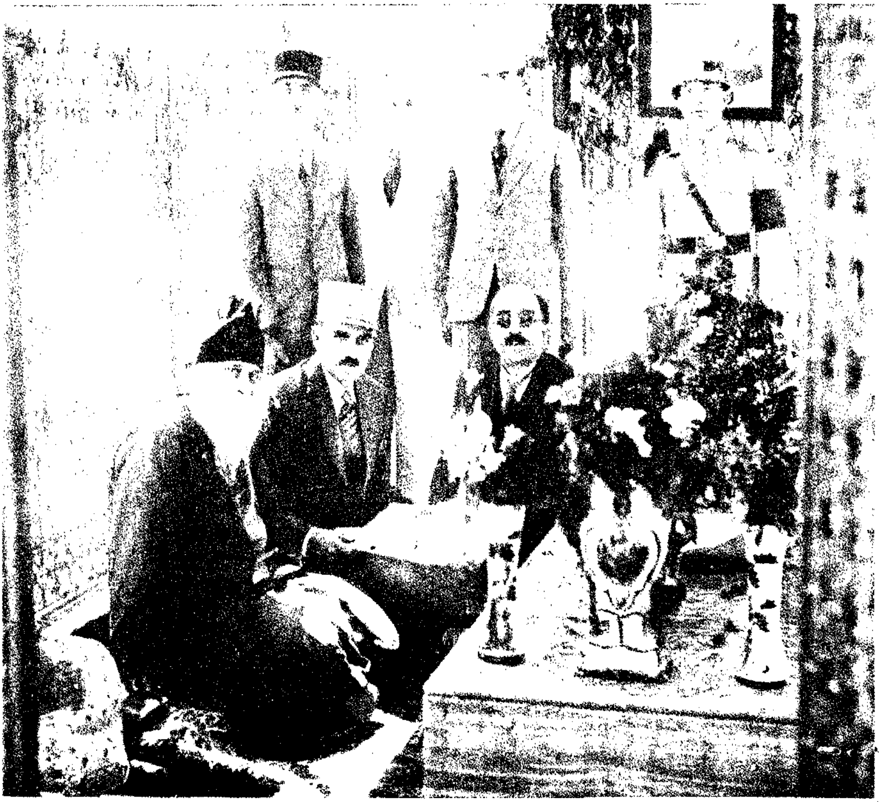

আদেশে দেশের পুরুষেরা যে টুপি পরেছে তার নাম পহ্লবী টুপি। সেটা কপালের সামনে কানা-তোলা ক্যাপ।

আমাদের গান্ধিটুপি যেমন শ্রীহীন ভারতের-প্রথা-বিরুদ্ধ ও বিদেশী-ঘেঁষা এও সেইরকম। কর্মিষ্ঠতার যুগে সাজের বাহুল্য স্বভাবতই খসে পড়ে। তা ছাড়া একেলে বেশ শ্রেণীনির্বিশেষে বড়ো ছোটো সকলেরই সুলভ ও উপযোগী হবার দিকে ঝোঁকে। য়ুরোপে একদা দেশে দেশে, এমন-কি, এক দেশেই, বেশের বৈচিত্র্য যথেষ্ট ছিল। অথচ সমস্ত য়ুরোপ আজ এক পোশাক পরেছে, তার কারণ সমস্ত য়ুরোপের উপর দিয়ে বয়েছে একই হাওয়া। সময় অল্প, কাজের তাড়া বেশি, তার উপর সামাজিক শ্রেণীভেদ হালকা হয়ে এসেছে। আজ য়ুরোপের বেশ শুধু যে শক্ত মানুষের, তৎপর মানুষের তা নয়, এ বেশ সাধারণ মানুষের— যারা সবাই একই বড়োরাস্তায় চলে। আজ পারস্য তুরুস্ক ঈজিপ্ট এবং আরবের যে অংশ জেগেছে সবাই এই সর্বজনীন উর্দি গ্রহণ করেছে, নইলে বুঝি মনের বদল সহজ হয় না। জাপানেও তাই। আমাদেরও ধুতি-পরা ঢিলে মন বদল করতে হলে হয়তো-বা পোশাক বদলানো দরকার। আমরা বহুকাল ছিলুম বাবু, হঠাৎ হয়েছি খণ্ড-ত-ওয়ালা শ্রীযুৎ, অথচ বাবুর দোদুল্যমান বেশই কি চিরকাল থাকবে। ওটাতে যে বসনবাহুল্য আছে সেটা যাই-যাই করছে, হাঁটু পর্যন্ত ছাঁটা পায়জামা দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে। যুগের হুকুম শুধু মনে নয়, গায়ে এসেও লাগল। মেয়েদের বেশে পরিবর্তনের ধাক্কা এমন করে লাগে নি— কেননা মেয়েরা অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সেতু, পুরুষরা বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতের।

সাদির সমাধিতে স্থাপত্যের গুণপনা কিছুই নেই। আজকের মতো ফুল দিয়ে প্রদীপ দিয়ে কবরস্থান সাজানো হয়েছে। সেখান থেকে সমাধির পশ্চাতে প্রশস্ত প্রাঙ্গণে বৃহৎ জনসভার মধ্যে গিয়ে আসন নিলুম। চত্বরের সামনে সমুচ্চ প্রাচীর অতি সুন্দর বিচিত্র কার্পেটে আবৃত করা হয়েছে, মেজের উপরেও কার্পেট পাতা। সভাস্থ সকলেরই সামনে প্রাঙ্গণ ঘিরে ফল মিষ্টান্ন সাজানো। সভার ডান দিকে নীলাভ পাহাড়ের প্রান্তে সূর্য অস্তোন্মুখ। বামে সভার বাইরে পথের ও পারে উচ্চভূমিতে ভিড় জমেছে— অধিকাংশই কালো কাপড়ে আচ্ছন্ন স্ত্রীলোক, মাঝে মাঝে বন্দুকধারী প্রহরী।

তিনটি পারসিক ভদ্রলোক তেহেরান থেকে এসেছেন আমাদের পথের সুবিধা করে দেবার জন্যে। এঁদের মধ্যে একজন আছেন তিনি পররাষ্ট্রবিভাগীয় মন্ত্রীর ভাই ফেরুঘি। সকলে বলেন ইনি ফিলজফার; সৌম্য শান্ত এঁর মূর্তি। ইনি ফ্রেঞ্চ জানেন, কিন্তু ইংরেজি জানেন না। তবু কেবলমাত্র সংসর্গ থেকে এঁর নীরব পরিচয়

আমাকে পরিতৃপ্তি দেয়। ভাষার বাধায় যে-সব কথা ইনি বলতে পারলেন না, অনুমানে বুঝতে পারি সেগুলি মূল্যবান। ইনি আশা প্রকাশ করলেন আমার পারস্যে আসা সার্থক হবে। আমি বললুম, আপনাদের পূর্বতন সুফীসাধক কবি ও রূপকার যাঁরা আমি তাঁদেরই আপন, এসেছি আধুনিক কালের ভাষা নিয়ে; তাই আমাকে স্বীকার করা আপনাদের পক্ষে কঠিন হবে না। কিন্তু নূতন কালের যা দান তাকেও আমি অবজ্ঞা করি নে। এ যুগে য়ুরোপ যে সত্যের বাহনরূপে এসেছে তাকে যদি গ্রহণ করতে না পারি তা হলে তার আঘাতকেই গ্রহণ করতে হবে। তাই বলে নিজের আন্তরিক ঐশ্বর্যকে হারিয়ে বাহিরের সম্পদকে গ্রহণ করা যায় না। যে দিতে পারে সেই নিতে পারে, ভিক্ষুক তা পারে না।

আজ সকালে হাফেজের সমাধি হয়ে বাগানবাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেবার কথা। তার পূর্বে গবর্নরের সঙ্গে এখানকার রাজার সম্বন্ধে আলাপ হল। একদা রেজা শা ছিলেন কসাক সৈন্যদলের অধিপতি মাত্র। বিদ্যালয়ে য়ুরোপের শিক্ষা তিনি পান নি, এমন-কি, পারসিক ভাষাতেও তিনি কাঁচা। আমার মনে পড়ল আমাদের আকবর বাদশাহের কথা। কেবল যে বিদেশীর কবল থেকে তিনি পারস্যকে বাঁচিয়েছেন তা নয়, মোল্লাদের-আধিপত্যজালে-দৃঢ়বদ্ধ পারস্যকে মুক্তি দিয়ে রাষ্ট্রতন্ত্রকে প্রবল ও অচল বাধা থেকে উদ্ধার করেছেন।

আমি বললুম, দুর্ভাগা ভারতবর্ষ, জটিল ধর্মের পাকে আপাদমস্তক জড়ীভূত ভারতবর্ষ। অন্ধ আচারের বোঝার তলে পঙ্গু আমাদের দেশ, বিধিনিষেধের নিরর্থকতায় শতধাবিভক্ত আমাদের সমাজ।

গবর্নর বললেন, সাম্প্রদায়িক ধর্মের বেড়া ডিঙিয়ে যতদিন না ভারত একাত্ম হবে ততদিন গোলটেবিল বৈঠকের বরগ্রহণ করে তার নিষ্কৃতি নেই। অন্ধ যারা তারা ছাড়া পেলেও এগোয় না, এগোতে গেলেও মরে গর্তে পড়ে।

অবশেষে হাফেজের সমাধি দেখতে বেরলুম। নূতন রাজার আমলে এই সমাধির সংস্কার চলছে। পুরোনো কবরের উপর আধুনিক কারখানায় ঢালাই-করা জালির কাজের একটা মণ্ডপ তুলে দেওয়া হয়েছে। হাফেজের কাব্যের সঙ্গে এটা একেবারেই খাপ খায় না। লোহার বেড়ায় ঘেরা কবি-আত্মাকে মনে হল যেন আমাদের পুলিস-রাজত্বের অর্ডিনান্সের কয়েদী।

ভিতরে গিয়ে বসলুম। সমাধিরক্ষক একখানি বড়ো চৌকো আকারের বই এনে উপস্থিত করলে। সেখানি হাফেজের কাব্যগ্রন্থ। সাধারণের বিশ্বাস এই যে, কোনো

একটি বিশেষ ইচ্ছা মনে নিয়ে চোখ বুজে এই গ্রন্থ খুলে যে কবিতাটি বেরবে তার থেকে ইচ্ছার সফলতা নির্ণয় হবে। কিছু আগেই গবর্নরের সঙ্গে যে বিষয় আলোচনা করেছিলুম সেইটেই মনে জাগছিল। তাই মনে মনে ইচ্ছা করলুম ধর্মনামধারী অন্ধতার প্রাণান্তিক ফাঁস থেকে ভারতবর্ষ যেন মুক্তি পায়।

যে পাতা বেরল তার কবিতাকে দুই ভাগ করা যায়। ইরানী ও কয়জনে মিলে যে তর্জমা করেছেন তাই গ্রহণ করা গেল। প্রথম অংশের প্রথম শ্লোকটি মাত্র দিই। কবিতাটিকে রূপকভাবে ধরা হয়, কিন্তু সরল অর্থ ধরলে সুন্দরী প্রেয়সীই কাব্যের উদ্দিষ্ট।

প্রথম অংশ। মুকুটধারী রাজারা তোমার মনোমোহন চক্ষুর দাস, তোমার কণ্ঠ থেকে যে সুধা নিঃসৃত হয় জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমানেরা তার দ্বারা অভিভূত।

দ্বিতীয় অংশ। স্বর্গদ্বার যাবে খুলে, আর সেইসঙ্গে খুলবে আমাদের সমস্ত জটিল ব্যাপারের গ্রন্থি, এও কি হবে সম্ভব। অহংকৃত ধার্মিকনামধারীদের জন্যে যদি তা বন্ধই থাকে তবে ভরসা রেখো মনে ঈশ্বরের নিমিত্তে তা যাবে খুলে।

বন্ধুরা প্রশ্নের সঙ্গে উত্তরের সংগতি দেখে বিস্মিত হলেন।

এই সমাধির পাশে বসে আমার মনের মধ্যে একটা চমক এসে পৌঁছল, এখানকার এই বসন্তপ্রভাতে সূর্যের আলোতে দূরকালের বসন্তদিন থেকে কবির হাস্যোজ্জ্বল চোখের সংকেত। মনে হল আমরা দুজনে একই পানশালার বন্ধু, অনেকবার নানা রসের অনেক পেয়ালা ভরতি করেছি। আমিও তো কতবার দেখেছি আচারনিষ্ঠ ধার্মিকদের কুটিল ভ্রূকুটি। তাদের বচনজালে আমাকে বাঁধতে পারে নি; আমি পলাতক, ছুটি নিয়েছি অবাধপ্রবাহিত আনন্দের হাওয়ায়। নিশ্চিত মনে হল আজ, কত-শত বৎসর পরে জীবনমৃত্যুর ব্যবধান পেরিয়ে এই কবরের পাশে এমন একজন মুসাফির এসেছে যে মানুষ হাফেজের চিরকালের জানা লোক।

ভরপুর মন নিয়ে বাগানবাড়িতে এলুম। যাঁর বাড়ি তাঁর নাম শিরাজী। কলকাতায় ব্যাবসা করেন। তাঁরই ভাইপো খলিলী আতিথ্যভার নিয়েছেন। পরিষ্কার নতুন বাড়ি, সামনেটি খোলা, অদূরে একটি ছোটো পাহাড়। কাঁচের শার্সির মধ্যে দিয়ে প্রচুর আলো এসে সুসজ্জিত ঘর উজ্জ্বল করে রেখেছে। প্রত্যেক ঘরেই ছোটো ছোটো টেবিলে বাদাম কিশ্‌মিশ্‌ মিষ্টান্ন সাজানো।

চা খাওয়া হলে পর এখানকার গান-বাজনার কিছু নমুনা পেলুম। একজনের হাতে কানুন, একজনের হাতে সেতারজাতীয় বাজনা, গায়কের হাতে তাল দেবার যন্ত্র— বাঁয়া-তবলার একত্রে মিশ্রণ। সংগীতের তিনটি ভাগ। প্রথম অংশটা চটুল, মধ্য

অংশ ধীরমন্দ সকরুণ, শেষ অংশটা নাচের তালে। আমাদের দিশি সুরের সঙ্গে স্থানে স্থানে অনেক মিল দেখতে পাই। বাংলাদেশের সঙ্গে একটা ঐক্য দেখছি— এখানকার সংগীত কাব্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন নয়।

ইস্ফাহানে যাত্রা করবার পূর্বে বিশ্রাম করে নিচ্ছি। বসে আছি দোতলায় মাদুর-পাতা লম্বা বারান্দায়। সম্মুখপ্রান্তে রেলিঙের গায়ে গায়ে টবে সাজানো পুষ্পিত জেরেনিয়ম। নীচের বাগানে ফুলের কেয়ারির মাঝখানে ছোটো জলাশয়ে একটি নিষ্ক্রিয় ফোয়ারা, আর সেই কেয়ারিকে প্রদক্ষিণ করে কলশব্দে জলস্রোত বয়ে চলেছে। অদূরে বনস্পতির বীথিকা। আকাশে পাণ্ডুর নীলিমার গায়ে তরুহীন বলি-অঙ্কিত পাহাড়ের তরঙ্গায়িত ধূসর রেখা। দূরে গাছের তলায় কারা একদল বসে গল্প করছে। ঠাণ্ডা হাওয়া, নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন। শহর থেকে দূরে আছি, জনতার সম্পর্ক নেই, পাখিরা কিচিমিচি করে উড়ে বেড়াচ্ছে তাদের নাম জানি নে। সঙ্গীরা শহরে কে কোথায় চলে গেছে, চিরক্লান্ত দেহ চলতে নারাজ তাই একলা বসে আছি। পারস্যে আছি সে কথা বিশেষ করে মনে করিয়ে দেবার কিছুই নেই। এই আকাশ, বাতাস, কম্পমান সবুজ পাতার উপর কম্পমান এই উজ্জ্বল আলো, আমারই দেশের শীতকালের মতো।

শিরাজ শহরটি যে প্রাচীন তা বলা যায় না। আরবেরা পারস্য জয় করার পরে তবে এই শহরের উদ্ভব। সাফাবি-শাসনকালে শিরাজের যে শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল আফগান আক্রমণে তা ধ্বংস হয়ে যায়। আগে ছিল শহর ঘিরে পাথরের তোরণ, সেটা ভূমিসাৎ হয়ে তার জায়গায় উঠেছে মাটির দেয়াল। নিষ্ঠুর ইতিহাসের হাত থেকে পারস্য যেমন বরাবর আঘাত পেয়েছে পৃথিবীতে আর-কোনো দেশ এমন পায় নি, তবু তার জীবনীশক্তি বারবার নিজের পুনঃসংস্কার করেছে। বর্তমান যুগে আবার সেই কাজে সে লেগেছে, জেগে উঠেছে আপন মূর্ছিত দশা থেকে।

৫

চলেছি ইস্ফাহানের দিকে। বেলা সাতটার পর শিরাজের পুরদ্বার দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। গিরিশ্রেণীর মধ্য দিয়ে চলা শুরু হল। পিছনে তাকিয়ে মনে হয় যেন গিরিপ্রকৃতি শিলাঞ্জলিতে শিরাজকে অর্ঘ্যরূপে ঢেলে দিয়েছে।

শিরাজের বাইরে লোকালয় একেবারে অন্তর্হিত, তার পরিশিষ্ট কিছুই নেই, গাছপালাও দেখা যায় না। বৈচিত্র্যহীন রিক্ততার মধ্য দিয়ে যে পথ চলেছে এঁকে-বেঁকে সেটা মোটর-রথের পক্ষে প্রশস্ত ও অপেক্ষাকৃত অবন্ধুর।

প্রায় এক ঘণ্টার পথ পেরিয়ে বাঁয়ে দেখা গেল শস্যখেত, গম এবং আফিম। কিন্তু গ্রাম দেখি নে, দিগন্ত পর্যন্ত অবারিত। মাঝে মাঝে ঝাঁকড়া-লোম-ওয়ালা ভেড়ার পাল, কোথাও-বা ছাগলের কালো রোঁয়ার তৈরি চৌকো তাঁবু। শস্যশ্যামল মাঠ ক্রমে প্রশস্ত হয়ে চলেছে। দূরের পাহাড়গুলো খাটো হয়ে এল, যেন তারা পাহাড়ের শাবক।

এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল অমতিদূরে পর্সিপোলিস। দিগ্‌বিজয়ী দরিয়ুসের প্রাসাদের ভগ্নশেষ। উচ্চ মাটির মঞ্চ, তার উপরে ভাঙা ভাঙা বড়ো বড়ো পাথরের থাম, অতীত মহাযুগ যেন আকাশে অক্ষম বাহু তুলে নির্মম কালকে ধিক্কার দিচ্ছে।

আমাকে চৌকিতে বসিয়ে পাথরের সিঁড়ি বেয়ে তুলে নিয়ে গেল। পিছনে পাহাড়, ঊর্ধ্বে শূন্য, নীচে দিগন্তপ্রসারিত জনশূন্য প্রান্তর, তারই প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে এই পাথরের রুদ্ধবাণীর সংকেত। বিখ্যাত পুরাবশেষবিৎ জর্মান ডাক্তার হর্টজ্‌ফেল্ট্‌ এই পুরাতন কীর্তি উদ্‌ঘাটন করবার কাজে নিযুক্ত। তিনি বললেন, বর্লিনে আমার বক্তৃতা শুনেছেন আর হোটেলেও আমার সঙ্গে তিনি দেখা করতে গিয়েছিলেন।

পাথরের থামগুলো কোনোটা ভাঙা, কোনোটা অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ। নিরর্থক দাঁড়িয়ে ছড়িয়ে, ম্যুজিয়মে অতিকায় জন্তুর অসংলগ্ন অস্থিগুলোর মতো। ছাদের জন্য যে-সব কাঠ লেগেছিল, হিসাবের তালিকায় দেখা গেছে, ভারতবর্ষ থেকে আনীত সেগুন কাঠও ছিল তার মধ্যে। খিলেন বানাবার বিদ্যা তখন জানা ছিল না বলে পাথরের ছাদ সম্ভব হয় নি। কিন্তু যে বিদ্যার জোরে এই-সকল গুরুভার অতি প্রকাণ্ড পাথরগুলি যথাস্থানে বসানো হয়েছিল সে বিদ্যা আজ সম্পূর্ণ বিস্মৃত। দেখে মনে পড়ে মহাভারতের ময়দানবের কথা। বোঝা যায় বিশাল প্রাসাদ-নির্মাণের বিদ্যা যাদের জানা ছিল তারা যুধিষ্ঠিরের স্বজাতি ছিল না। হয়তো-বা এই দিক থেকেই রাজমিস্ত্রি গেছে। যে পুরোচন পাণ্ডবদের জন্যে সুড়ঙ্গ বানিয়েছিল সেও তো যবন।

ডাক্তার বললেন, আলেকজাণ্ডার এই প্রাসাদ পুড়িয়ে ফেলেছিলেন সন্দেহ নেই। আমার বোধ হয় পরকীর্তি-অসহিষ্ণু ঈর্ষাই তার কারণ। তিনি চেয়েছিলেন মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করতে, কিন্তু মহাসাম্রাজ্যের অভ্যুদয় তাঁর আগেই দেখা দিয়েছিল। আলেকজাণ্ডার আকেমেনীয় সম্রাটদের পারস্যকে লণ্ডভণ্ড করে গিয়েছেন।

এই পর্সিপোলিসে ছিল দরিয়ুসের গ্রন্থাগার। বহু সহস্র চর্মপত্রে রুপালি সোনালি অক্ষরে তাঁদের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তা লিপীকৃত হয়ে এইখানে রক্ষিত ছিল। যিনি এটাকে ভস্মসাৎ করেছিলেন তাঁর ধর্ম এর কাছে বর্বরতা। আলেকজান্দার আজ জগতে এমন কিছুই রেখে যান নি যা এই পর্সিপোলিসের ক্ষতিপূরণ-স্বরূপে তুলনীয় হতে পারে। এখানে দেয়ালে ক্ষোদিত মূর্তিশ্রেণীর মধ্যে দেখা যায় দরিয়ুস আছেন রাজছত্রতলে,

আর তাঁর সম্মুখে বন্দী ও দাসেরা অর্ঘ্য বহন করে আনছে। পরবর্তীকালে ইস্ফাহানের কোনো উজির এই শিলালেখ্য ভেঙে বিদীর্ণ বিকলাঙ্গ করে দিয়েছে।

পারস্যে আর-এক জায়গা খনন করে প্রাচীনতর বিস্মৃত যুগের জিনিস পাওয়া গেছে। অধ্যাপক তারই একটি নকশা-কাটা ডিমের খোলার পাত্র আমাকে দেখালেন। বললেন, মহেঞ্জদরোর যেরকম কারুচিত্র এও সেই জাতের। সার্ অরেল্‌স্টাইন মধ্য-এশিয়া থেকেও এমন কিছু কিছু জিনিস পেয়েছেন মহেঞ্জদরোয় যার সাদৃশ্য মেলে। এইরকম বহুদূরবিক্ষিপ্ত প্রমাণগুলি দেখে মনে হয় আধুনিক সকল সভ্যতার পূর্বে একটা বড়ো সভ্যতা পৃথিবীতে তার লীলা বিস্তার করে অন্তর্ধান করেছে।

অধ্যাপক এই ভগ্নশেষের এক অংশ সংস্কার করে নিজের বাসা করে নিয়েছেন। ঘরের চারি দিকে লাইব্রেরি এবং নানাবিধ সংগ্রহ। দরিয়ুস জারাক্সিস এবং আর্টাজারাক্সিস এই তিন-পুরুষ-বাহী সম্রাটের লুপ্তশেষ সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়ে অধ্যাপক নিভৃতে খুব আনন্দে আছেন।

এ দেশে আসবামাত্র সব চেয়ে লক্ষ্য করা যায় পূর্ব-এশিয়ার সঙ্গে পশ্চিম-এশিয়ার প্রাকৃতিক চেহারার সম্পূর্ণ পার্থক্য। উভয়ে একেবারেই বিপরীত বললেই হয়। আফগানিস্থান থেকে আরম্ভ করে মেসোপোটেমিয়া হয়ে আরব পর্যন্ত নির্দয়ভাবে নীরস কঠিন। পূর্ব-এশিয়ার গিরিশ্রেণী ধরণীর প্রতিকূলতা করে নি, তাদেরই প্রসাদ-বর্ষণে সেখানকার সমস্ত দেশ পরিপুষ্ট। কিন্তু পশ্চিমে তারা পৃথিবীকে বন্ধুর করেছে এবং অবরুদ্ধ করেছে আকাশের রসের দৌত্য। মাঝে মাঝে খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত আকারে এখানকার অনাদৃত মাটি উর্বরতার স্পর্শ পায়, দুর্লভ বলেই তার লোভনীয়তা প্রবল, মনোহর তার রমণীয়তা।

সৌভাগ্যক্রমে এরা বাহন পেয়েছে উট এবং ঘোড়া, আর জীবিকার জন্যে পালন করেছে ভেড়ার পাল। এই জীবিকার অনুসরণ করে এখানকার মানুষকে নিরন্তর সচল হয়ে থাকতে হল। এই পশ্চিম-এশিয়ার অধিবাসীরা বহু প্রাচীনকাল থেকেই বারে বারে বড়ো বড়ো সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে— তার মূল প্রেরণা পেয়েছে এখানকার ভূমির কঠোরতা থেকে, যা তাদের বাইরে ঠেলে বের করে দেয়। তারা প্রকৃতির অযাচিত আতিথ্য পায় নি, তাদের কেড়ে খেতে হয়েছে পরের অন্ন, আহার সংগ্রহ করতে হয়েছে নূতন নূতন ক্ষেত্রে এগিয়ে এগিয়ে।

এখানে পল্লীর চেয়ে প্রাধান্য দুর্গরক্ষিত প্রাচীরবেষ্টিত নগরের। কত প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসশেষ পাশ্চাত্য এশিয়ায় ধূলিপরিকীর্ণ। কৃষিজীবীদের স্থান পল্লী, সেখানে ধন স্বহস্তে উৎপাদন করতে হয়। নগর প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জয়জীবী

যোদ্ধাদের প্রতাপের উপরে। সেখানে সম্পদ সংগ্রহ ও রক্ষণ না করলে পরাভব। ভারতবর্ষে কৃষিজীবিকার সহায় গোরু, মধ্য ও পশ্চিম-এশিয়ায় জয়জীবিকার সহায় ঘোড়া। পৃথিবীতে কী মানুষের, কী বাহনের, কী অস্ত্রের ত্বরিত গতিই জয়সাধনের প্রধান উপায়। তাই একদিন মধ্য-এশিয়ার মরুবাহী অশ্বপালক মোগল বর্বরেরা বহুদূর পৃথিবীতে ভীষণ জয়ের সর্বনেশে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। চিরচলিষ্ণুতাই তাদের করে তুলেছিল দুর্ধর্ষ। অন্নসংকোচের জন্যেই এরা এক-একটি জ্ঞাতিজাতিতে বিভক্ত, এই জ্ঞাতিজাতির মধ্যে দুর্ভেদ্য ঐক্য। যে কারণেই হোক, তাদের এই ঐক্য যখন বহু শাখাধারার সম্মিলিত ঐক্যে স্ফীত হয়েছে তখন তাদের জয়বেগকে কিছুতে ঠেকাতে পারে নি। বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন আরবীয় মরুবাসী জ্ঞাতিজাতিরা যখন এক অখণ্ড ধর্মের ঐক্যে এক দেবতার নামে মিলেছিল তখন অচিরকালের মধ্যেই তাদের জয়পতাকা উড়েছিল কালবৈশাখীর রক্তরাগরঞ্জিত মেঘের মতো দূর পশ্চিমদিগন্ত থেকে দূর পূর্বদিক্‌প্রান্ত পর্যন্ত।

একদা আর্যজাতির এক শাখা পর্বতবিকীর্ণ মরুবেষ্টিত পারস্যের উচ্চভূমিতে আশ্রয় নিলে। তখন কোনো-এক অজ্ঞাতনামা সভ্যজাতি ছিল এখানে। তাদের রচিত যে-সকল কারুদ্রব্যের চিহ্নশেষ পাওয়া যায় তার নৈপুণ্য বিস্ময়জনক। বোধ করি বলা যেতে পারে মহেঞ্জদারো-যুগের মানুষ। তাদের সঙ্গে এদের হাতের কাজের মিল আছে। এই মিল এশিয়ায় বহুদূরবিস্তৃত। মহেঞ্জদারোর স্মৃতিচিহ্নের সাহায্যে তৎকালীন ধর্মের যে চেহারা দেখতে পাই অনুমান করা যায়, সে বৃষভবাহন শিবের ধর্ম। রাবণ ছিলেন শিবপূজক, রাম ভেঙেছিলেন শিবের ধনু। রাবণ যে জাতের মানুষ সে জাতি না ছিল অরণ্যচর, না ছিল পশুপালক। রামায়ণগত জনশ্রুতি থেকে বোঝা যায়, সে জাতি পরাভূত দেশ থেকে ঐশ্বর্যসংগ্রহ করে নিজের রাজধানীকে সমৃদ্ধ করেছে এবং অনেকদিন বাহুবলে উপেক্ষা করতে পেরেছে আর্যদেবতা ইন্দ্রকে। সে জাতি নগরবাসী। মহেঞ্জদারোর সভ্যতাও নাগরিক। ভারতের আদিম আরণ্যক বর্বরতর জাতির সঙ্গে যোগ দিয়ে আর্যেরা এই সভ্যতা নষ্ট করে। সেদিনকার দ্বন্দ্বের একটা ইতিহাস আছে পুরাণকথায়, দক্ষযজ্ঞে। একদা বৈদিক হোমের আগুন নিবিয়েছিল শিবের উপাসক, আজও হিন্দুরা সে উপাখ্যান পাঠ করে ভক্তির সঙ্গে। শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের কাছে বৈদিক দেবতার খর্বতার কথা গৌরবের সঙ্গে পৌরাণিক ভারতে আখ্যাত হয়ে থাকে।

খ্রীস্টজন্মের দেড়হাজার বছর পূর্বে ইরানী আর্যরা পারস্যে এসেছিলেন, য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকদের এই মত। তাঁদের হোমাগ্নির জয় হল। ভারতবর্ষ বৃহৎ দেশ, উর্বর,

জনসংকুল। সেখানকার আদিম জাতের নানা ধর্ম, নানা রীতি। তার সঙ্গে জড়িত হয়ে বৈদিক ধর্ম আচ্ছন্ন পরিবর্তিত ও অনেক অংশে পরিবর্জিত হল— বহুবিধ, এমন-কি, পরস্পরবিরুদ্ধ হল তার আচার— নানা দেবদেবী নানা সম্প্রদায়ের সঙ্গে অভ্যাগত হওয়াতে ভারতবর্ষে ধর্মজটিলতার অন্ত রইল না। পারস্যে এবং মোটের উপর পাশ্চাত্য এশিয়ার সর্বত্রই বাসযোগ্য স্থান সংকীর্ণ এবং সেখানে অন্নক্ষেত্রের পরিধি পরিমিত। সেই ছোটো জায়গায় যে আর্যেরা বাসপত্তন করলেন তাঁদের মধ্যে একটি বিশুদ্ধ সংহতি রইল, অনার্যজনতার প্রভাবে তাঁদের ধর্মকর্ম বহু জটিল ও বিকৃত হল না। এশিয়ার এই বিভাগে কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রোপ্রায় জাতির বসতি ছিল তার প্রমাণ পুরাতন সাহিত্যে আছে, কিন্তু ইরানীয়দের আর্যত্বকে তারা অভিভূত করতে পারে নি।

পারস্যের ইতিহাস যখন শাহনামার পুরাণকথা থেকে বেরিয়ে এসে স্পষ্ট হয়ে উঠল তখন পারস্যে আর্যদের আগমন হাজার বছর পেরিয়ে গেছে। তখন দেখি আর্যজাতির দুই শাখা পারস্য-ইতিহাসের আরম্ভকালকে অধিকার করে আছে, মীদিয় এবং পারসিক। মীদিয়েরা প্রথমে এসে উপনিবেশ স্থাপন করে, তার পরে পারসিক। এই পারসিকদের দলপতি ছিলেন হখমানিশ। তাঁরই নাম-অনুসারে এই জাতি গ্রীক-ভাষায় আকেমেনিড (Achaemenid) আখ্যা পায়। খ্রীস্টজন্মের সাড়ে-পাঁচশো বছর পূর্বে আকেমেনীয় পারসিকেরা মীদিয়দের শাসন থেকে সমস্ত পারস্যকে মুক্ত করে নিজেদের অধীনে একচ্ছত্র করে। সমগ্র পারস্যের সেই প্রথম অদ্বিতীয় সম্রাট ছিলেন বিখ্যাত সাইরস, তাঁর প্রকৃত নাম খোরাস। তিনি শুধু যে সমস্ত পারস্যকে এক করলেন তা নয়, সেই পারস্যকে এমন এক বৃহৎ সাম্রাজ্যের চূড়ায় অধিষ্ঠিত করলেন সে যুগে যার তুলনা ছিল না। এই বীরবংশের এক পরম দেবতা ছিলেন অহুরমজ্‌দা। ভারতীয় আর্যদের বরুণদেবের সঙ্গেই তাঁর সাজাত্য। বাহ্যিক প্রতিমার কাছে বাহ্যিক পূজা আহরণের দ্বারা তাঁকে প্রসন্ন করার চেষ্টাই তাঁর আরাধনা ছিল না। তিনি তাঁর উপাসকদের কাছ থেকে চেয়েছিলেন সাধু চিন্তা, সাধু বাক্য ও সাধু কর্ম। ভারতবর্ষের বৈদিক আর্যদেবতার মতোই তাঁর মন্দির ছিল না, এবং এখানকার মতোই ছিল অগ্নিবেদী।

তখনকার কালের সেমেটিক জাতীয়দের যুদ্ধে দয়াধর্ম ছিল না। দেশজোড়া হত্যা লুঠ বিধ্বংসন বন্ধন নির্বাসন, এই ছিল রীতি। কিন্তু সাইরস ও তাঁর পরবর্তী সম্রাটদের রাষ্ট্রনীতি ছিল তার বিপরীত। তাঁরা বিজিত দেশে ন্যায়বিচার সুব্যবস্থা ও শান্তি স্থাপন করে তাকে সমৃদ্ধিশালী করেছেন। য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকেরা বলেন, পারসিক রাজারা যুদ্ধ করেছেন মিতাচারিতার সঙ্গে, বিজিত জাতিদের প্রতি অনির্দয়

হিতৈষণা প্রকাশ করেছেন, তাদের ধর্মে তাদের আচারে হস্তক্ষেপ করেন নি, তাদের স্বাদেশিক দলনায়কদের স্বপদে রক্ষা করেছেন। তার প্রধান কারণ, কী যুদ্ধে, কী দেশজয়ে, তাঁদের ধর্মনীতিকে তাঁরা ভুলতে পারেন নি। ব্যাবিলোনিয়ায় আসীরিয়ায় পূজার ব্যবহারে ছিল দেবমূর্তি। বিজেতারা বিজিত জাতির এই-সব মূর্তি নিয়ে যেত লুঠ করে। সাইরসের ব্যবহার ছিল তার বিপরীত। এইরকম লুঠ-করা মূর্তি তিনি যেখানে যা পেয়েছেন সেগুলি সব তাদের আদিম মন্দিরে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

তার অনতিকাল পরে তাঁরই জাতিবংশীয় দরিয়ুস সাম্রাজ্যকে শত্রুহস্ত থেকে উদ্ধার করে আরো বহুদূর প্রসারিত করেন। পর্সিপোলিসের স্থাপনা এঁরই সময় হতে। এই যুগের আসীরিয়া ব্যাবিলন ঈজিপ্ট্ গ্রীস প্রভৃতি দেশে বহু কীর্তি প্রধানত দেবমন্দির আশ্রয় করে প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু আকেমেনীয় রাজত্বে তার চিহ্ন পাওয়া যায় না। শত্রুজয়ের বিবরণচিত্র যে-যেখানে পাহাড়ের গায়ে ক্ষোদিত সেখানেই জরথুস্ত্রীয়দের বরণীয় দেবতা অহুরমজ্দার ছবি শীর্ষদেশে উৎকীর্ণ, অর্থাৎ নিজেদের সিদ্ধিলাভ যে তাঁরই প্রসাদে এই কথাটি তার মধ্যে স্বীকৃত। কিন্তু মন্দিরে মূর্তিস্থাপন করে পূজা হত তার প্রমাণ নেই। প্রতীকরূপে অগ্নিস্থাপনার চিহ্ন পাওয়া যায়। ইতিহাসের প্রথম আরম্ভ হতেই একদেবতার সরল পূজাপদ্ধতি পারসিক জাতিকে ঐক্য এবং শক্তি দেবার সহায়তা করেছে তাতে সন্দেহ নেই।

বড়ো সাম্রাজ্য হাতে নিয়ে স্থির থাকবার জো নেই। কেবলই তাকে বৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে হয়, বিশেষত চারি দিকে যেখানে প্রতিকূল শক্তি। এইরকম নিত্য প্রয়াসে বলক্ষয় হয়ে ক্লান্তি দেখা দেয়। অবশেষে হঠাৎ আঘাতে অতি স্থূল রাষ্ট্রিক দেহটা চারি দিক থেকে ভেঙে পড়ে। কোনো জাতির মধ্যে বা রাজবংশে সাম্রাজ্যভার অতি দীর্ঘকাল বহন করবার শক্তি টিঁকে থাকতেই পারে না। কেননা সাম্রাজ্য পদার্থটাই অস্বাভাবিক, যে এককগুলির সমষ্টিতে সেটা গঠিত তাদের মধ্যে ঐকান্তিকতা নেই, জবর্দস্তির সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হবার জন্যে ভিতরে ভিতরে নিরন্তর চেষ্টা করে, তা ছাড়া বহু-বিস্তৃত সীমানা বহুবিচিত্র বিবাদের সংস্রবে আসতে থাকে। আকেমেনীয় সাম্রাজ্যও আপন গুরুভারে ক্রমেই হীনবল হয়ে অবশেষে আলেকজাণ্ডারের হাতে চরম আঘাত পেলে। এক আঘাতেই সে পড়ে গেল তার একমাত্র কারণ আলেকজান্দার নয়। অতি বৃহদাকার প্রতাপের দুর্ভর ভার বাহকেরা একদিন নিশ্চিত বর্জন করতে বাধ্য, ভগ্ন-উরু ধূলিশায়ী মৃত দুর্যোধনের মতো ভগ্নাবশিষ্ট পর্সিপোলিস এই তত্ত্ব আজ বহন করছে। আলেকজান্দারের জোড়াতাড়া-দেওয়া সাম্রাজ্যও অল্পকালের আয়ু নিয়েই সেই তত্ত্বের উত্তরাধিকারী হয়েছিল সে কথা সুবিদিত।

এখান থেকে আর এক ঘণ্টার পথ গিয়ে সাদাতাবাদ গ্রামে আমাদের মধ্যাহ্ন-ভোজন। একটি বড়ো রকমের গ্রাম, পথের দুই ধারে ঘনসংলগ্ন কাঁচা ইঁটের ও মাটির ঘর, দোকান ও ভোজনশালা। পেরিয়ে গিয়ে দেখি পথের ধারে ডান পাশে মাটি ছেয়ে নানা রঙের মেঠোফুল ভিড় করে আছে। দীর্ঘ এল্‌ম্‌ বনস্পতির ছায়াতলে তন্বী জলধারা স্নিগ্ধ কলশব্দে প্রবাহিত। এই রমণীয় উপবনে ঘাসের উপর কার্পেট বিছিয়ে আহার হল। পোলাও মাংস ফল ও যথেষ্ট পরিমাণে ঘোল।

আকাশে মেঘ জমে আসছে। এখান থেকে নব্বই মাইল পরে আবাদে-নামক ছোটো শহর, সেখানে রাত্রিযাপনের কথা। দূরে দেখা যাচ্ছে তুষাররেখার-তিলক-কাটা গিরিশিখর। দেহ্‌বিদ গ্রাম ছাড়িয়ে সুর্মাকে পৌঁছলুম। পথের মধ্যে সেখানকার প্রধান রাজকর্মচারী অভ্যর্থনা জানিয়ে আগে চলে গেলেন। বেলা পাঁচটার সময় পৌঁছলুম পুরপ্রাসাদে। কাল ভোরের বেলা রওনা হয়ে ইস্ফাহানে পৌঁছব দ্বিপ্রহরে।

যারা খাঁটি ভ্রমণকারী তারা জাতই আলাদা। এক দিকে তাদের শরীর মন চিরচলিষ্ণু, আর-এক দিকে অনভ্যস্তের মধ্যে তাদের সহজ বিহার। যারা শরীরটাকে স্তব্ধ রেখে মনটাকে চালায় তারা অন্য শ্রেণীর লোক। অথচ রেলগাড়ি-মোটরগাড়ির মধ্যস্থতায় এই দুই জাতের পঙ্‌ক্তিভেদ রইল না। কুনো মানুষের ভ্রমণ আপন কোণ থেকে আপন কোণেই আসবার জন্যে। আমাদের আধ্যাত্মিক ভাষায় যাদের বলে কনিষ্ঠ অধিকারী। তারা বাঁধা রাস্তায় সস্তায় টিকিট কেনে, মনে করে মুক্তিপথে ভ্রমণ সারা হল, কিন্তু ঘটা করে ফিরে আসে সেই আপন সংকীর্ণ আড্ডায়, লাভের মধ্যে, হয়তো সংগ্রহ করে অহংকার।

ভ্রমণের সাধনা আমার ধাতে নেই, অন্তত এই বয়সে। সাধক যারা, দুর্গমতার কৃচ্ছ্রসাধনে তাদের স্বভাবের আনন্দ, পথ খুঁজে বের করবার মহৎ ভার তাদের উপর। তারা শ্রেষ্ঠ অধিকারী, ভ্রমণের চরম ফল তারাই পায়। আমি আপাতত মোটরে চড়ে চললেম ইস্ফাহানে।

সকালবেলা মেঘাচ্ছন্ন, কাল বিকেল থেকেই তার আয়োজন। আজ শীত পড়েছে রীতিমত। একঘেয়ে শূন্যপ্রায় প্রান্তরে আসন্ন বৃষ্টির ছায়া বিস্তীর্ণ। দিগন্ত বেষ্টন করে যে গিরিমালা, নীলাভ অস্পষ্টতায় সে অবগুণ্ঠিত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলেছি অন্তহীন, আলের-চিহ্ন-হীন মাঠের মধ্যে বিসর্পিত পথ দিয়ে। কিন্তু মানুষ কোথায়। চাষী কেন হাল লাঙল নিয়ে মাঠে আসে না। হাটের দিন হাট করতে যায় না কেউ; ফসলের খেত নিড়োবার বুঝি দরকার নেই? দূরে দূরে বন্দুকধারী পাহারাওয়ালা দাঁড়িয়ে, তার থেকে আন্দাজ করা যায় ওই দিগন্তের বাইরে অদৃশ্য নেপথ্যে কোথাও

মানুষের নানাদ্বন্দ্ববিঘট্টিত সংসারযাত্রা চলেছে। মাঠে কোথাও-বা ফসল, কোথাও-বা বহুদূর ধরে আগাছা, তাতে ঊর্ধ্বপুচ্ছ সাদা সাদা ফুলের স্তবক। মাঝে মাঝে ছোটো নদী, কিন্তু তাকে আঁকড়ে নেই গ্রাম। মেয়েরা জল তোলে না, কাপড় কাচে না, স্নান করে না, গোরুবাছুর জল খায় না; নির্জন পাহাড়ের তলা দিয়ে চলে, যেন সন্তানহীন বিধবার মতো। অনেকক্ষণ পরে বিনা ভূমিকায় এসে পড়ে মাটির পাঁচিলে-ঘেরা গ্রাম, একটু পরেই আর তার অনুবৃত্তি নেই। আবার সেই শূন্য মাঠ, আর মাঠের শেষে ঘিরে আছে পাহাড়।

পথে যেতে যেতে এক জায়গায় দেখি এই উচ্চভূমি হঠাৎ বিদীর্ণ হয়ে নেমে গেছে, আর সেই গহ্বরতল থেকে খাড়া একটা পাহাড় উঠেছে। এই পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে খোপে খোপে মানুষের বাসা, ভাঙন-ধরা পদ্মার পাড়িতে গাঙশালিখের বাসার মতো। চারি দিক থেকে বিচ্ছিন্ন এই কোটর-নিবাসগুলিতে প্রবেশের জন্যে কাঠের-তক্তা-ফেলা সংকীর্ণ সাঁকো। মানুষের চাকের মতো এই লোকালয়টির নাম ইয়েজদিখস্ত্।

দুপুর বেজেছে। ইস্ফাহানের পৌরজনের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা বহন করে মোটর-রথে লোক এল। সেই অভ্যর্থনার সঙ্গে এই শা-রেজা গ্রামের একটি কবির কাব্য ছিল মিলিত। সেই কাব্যটির ইংরেজি তর্জমা এইখানে লিখে দিই:

The caravans of India always carry sugar but this time it has the perfume of the muse. O caravan, please stop your march, because burning hearts are following thee like the butterflies which burn around the flame of candles.

O zephyr, softly blow and whisper on the tomb of Saadi. Thereupon in joy Saadi will come to life in his tomb.

Tagore, he is the unique, the philosopher who knows what is past and what the future holds,

Let his arrival be blessed and fortunate in the land of the great Cyrus, an august descendant of whom to-day fortunately wears the crown of Persia.

পথের ধারে দেখা দিল এল্‌ম্ পপ্‌লার অলিভ ও তুঁত গাছের শ্রেণী। সামনে দেখা যায় ঢালু পাহাড়ের গায়ে দূরপ্রসারিত ইস্ফাহান শহর।

৬

পূর্বেই বলে রেখেছিলুম, আমি সম্মাননা চাই নে, আমাকে যেন একটি নিভৃত জায়গায় যথাসম্ভব শান্তিতে রাখা হয়। উপর থেকে সেইরকম হুকুম এসেছে। তাই এসেছি একটি বাগানবাড়িতে। বাগানবাড়ি বললে একে খাটো করা হয়। এ একটি

মস্ত সুসজ্জিত প্রাসাদ। যিনি গবর্নর তিনি ধীর সুগম্ভীর, শান্ত তাঁর সৌজন্য, এঁর মধ্যে প্রাচ্যপ্রকৃতির মিতভাষী অচঞ্চল আভিজাত্য।

শুনতে পাই এই বাড়ির যিনি মালিক তিনি আমাদের দেশের সেকেলে কোনো কোনো ডাকাতে জমিদারদের মতো ছিলেন। একদা এখানে সশস্ত্রে সসৈন্যে অনেক দৌরাত্ম্য করেছেন। এখন অস্ত্র সৈন্য কেড়ে নিয়ে তাঁকে তেহেরানে রাখা হয়েছে, কারাবন্দীরূপে নয়, নজরবন্দীরূপে। তাঁর ছেলেদের য়ুরোপে শিক্ষার জন্যে পাঠানো হয়েছে। ভারত গবর্মেণ্টের শাসননীতির সঙ্গে কিছু প্রভেদ দেখছি। মোহ্‌মেরার শেখ, গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উত্তেজিত করবার চেষ্টা করাতে রাজা সৈন্য নিয়ে তাঁকে আক্রমণের উদ্যোগ করেন। তখন শেখ সন্ধির প্রার্থনা করতেই সে প্রার্থনা মঞ্জুর হল। এখন তিনি তেহেরানে বাসা পেয়েছেন। তাঁর প্রতি নজর রাখা হয়েছে, কিন্তু তাঁর গলায় ফাঁস বা হাতে শিকল চড়ে নি।

অপরাহ্নে যখন শহরে প্রবেশ করেছিলুম তখন ক্লান্ত দৃষ্টি শ্রান্ত মন ভালো করে কিছুই গ্রহণ করতে পারে নি। আজ সকালে নির্মল আকাশ, স্নিগ্ধ রৌদ্র। দোতলায় একটি কোণের বারান্দায় বসেছি। নীচের বাগানে এল্‌ম্ পপ্‌লার উইলো গাছে বেষ্টিত ছোটো জলাশয় ও ফোয়ারা। দূরে গাছপালার মধ্যে একটি মসজিদের চূড়া দেখা যাচ্ছে, যেন নীলপদ্মের কুঁড়ি, সুচিক্কণ নীল পারসিক টালি দিয়ে তৈরি, এই সকালবেলাকার পাতলা মেঘে-ছোঁওয়া আকাশের চেয়ে ঘনতর নীল। সামনেকার কাঁকর-বিছানো রাস্তায় সৈনিক প্রহরী পায়চারি করছে।

এ-পর্যন্ত সমস্ত পারস্যে দেখে আসছি এরা বাগানকে কী ভালোই না বাসে। এখানে চারি দিকে সবুজ রঙের দুর্ভিক্ষ, তাই চোখের ক্ষুধা মেটাবার এই আয়োজন। বাবর ভারতবর্ষে বাগানের অভাব দেখে অবজ্ঞা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি এসেছিলেন মরুপ্রদেশ থেকে, বাগান তাঁদের পক্ষে শুধু কেবল বিলাসের জিনিস ছিল না, ছিল অত্যাবশ্যক। তাকে বহুসাধনায় পেতে হয়েছে বলে এত ভালোবাসা। বাংলাদেশের মেয়েরা পশ্চিমের মেয়েদের মতো পরবার শাড়িতে রঙের সাধনা করে না, চারি দিকেই রঙ এত সুলভ। বাংলায় দোলাই-কাঁথায় রঙ ফলে ওঠে নি, লতাপাতার রঙিন ছাপ-ওয়ালা ছিট পশ্চিমে। বাড়ির দেয়ালে রঙ লাগায় মারোয়াড়ি, বাঙালি লাগায় না।

আজ সকালবেলায় স্নান করবার অবকাশ রইল না। একে একে এখানকার ম্যুনিসিপালিটি, মিলিটারি-বিভাগ, শিক্ষাবিভাগ, বণিক্‌সভা আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানাতে এসেছিলেন।

বেলা তিনটের পর শহর পরিক্রমণে বেরলুম। ইস্পাহানের একটি বিশেষত্ব আছে, সে আমার চোখে সুন্দর লাগল। মানুষের বাসা প্রকৃতিকে একঘরে করে রাখে নি, গাছের প্রতি তার ঘনিষ্ঠ আনন্দ শহরের সর্বত্রই প্রকাশমান। সারিবাঁধা গাছের তলা দিয়ে দিয়ে জলের ধারা চলেছে, সে যেন মানুষেরই দরদের প্রবাহ। গাছপালার সঙ্গে নিবিড় মিলনে নগরটিকে সুস্থ প্রকৃতিস্থ বলে চোখে ঠেকে। সাধারণত উড়ো-জাহাজে চড়ে শহরগুলোকে দেখলে যেন মনে হয় পৃথিবীর চর্মরোগ।

মানুষের নিজের হাতের আশ্চর্য কীর্তি আছে এই শহরের মাঝখানে, একটি বৃহৎ ময়দান ঘিরে। এর নাম ময়দান-ই-শা অর্থাৎ বাদশাহের ময়দান। এখানে এক কালে বাদশাহের পোলো খেলবার জায়গা ছিল। এই চত্বরের দক্ষিণ সীমানার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে মসজিদ-ই-শা। প্রথম শা আব্বাসের আমলে এর নির্মাণ আরম্ভ, আর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় শা আব্বাসের সময়ে তার সমাপ্তি। এখন এখানে ভজনার কাজ হয় না। বর্তমান বাদশাহদের আমলে বহুকালের ধুলো ধুয়ে একে সাফ করা হচ্ছে। এর স্থাপত্য একাধারে সমুচ্চ গম্ভীর ও সযত্নসুন্দর, এর কারুকার্য বলিষ্ঠ শক্তির সুকুমার সুনিপুণ অধ্যবসায়ের ফল। এর পার্শ্ববর্তী আর-একটি মসজিদ মাদ্রাসে-ই-চাহার বাগে প্রবেশ করলুম। এক দিকে উচ্ছ্রিত বিপুলতায় এ সুমহান, যেন স্তবমন্ত্র, আর-এক দিকে সমস্ত ভিত্তিকে খচিত করে বর্ণসংগতির বিচিত্রতায় রমণীয়, যেন গীতিকাব্য। ভিতরে একটি প্রাঙ্গণ, সেখানে প্রাচীন চেনার গাছ এবং তুঁত, দক্ষিণ ধারে অত্যুচ্চ-গুম্বজওয়ালা সুপ্রশস্ত ভজনাগৃহ। যে টালিতে ভিত্তি মণ্ডিত তার কোথাও কোথাও চিক্কণ পাতলা বর্ণপ্রলেপ ক্ষয়প্রাপ্ত, কোথাও-বা পরবর্তীকালে টালি বদল করতে হয়েছে, কিন্তু নূতন যোজনাটা খাপ খায় নি। আগেকার কালের সেই আশ্চর্য নীল রঙের প্রলেপ এ কালে অসম্ভব। এ ভজনালয়ের যে ভাবটি মনকে অধিকার করে সে হচ্ছে এর সুনির্মল সমুদার গাম্ভীর্য। অনাদর-অপরিচ্ছন্নতার চিহ্ন কোথাও নেই। সর্বত্র একটি সসম্ভ্রম সম্মান যথার্থ শুচিতা রক্ষা করে বিরাজ করছে।

এই মসজিদের প্রাঙ্গণে যাদের দেখলেম তাদের মোল্লার বেশ। নিরুৎসুক দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখলে, হয়তো মনে মনে প্রসন্ন হয় নি। শুনলুম আর দশ বছর আগে এখানে আমাদের প্রবেশ সম্ভবপর হত না। শুনে আমি যে বিস্মিত হব সে রাস্তা আমার নেই। কারণ, আর বিশ বছর পরেও পুরীতে জগন্নাথের মন্দিরে আমার মতো কোনো ব্রাত্য যে প্রবেশ করতে পারবে সে আশা করা বিড়ম্বনা।

শহরের মাঝখান দিয়ে বালুশয্যার মধ্যে বিভক্ত-ধারা একটি নদী চলে গেছে। তার নাম জই আন্দেরু, অর্থাৎ জন্মদায়িনী। এই নদীর তলদেশে যেখানে থোঁড়া

যায় সেখান থেকেই উৎস ওঠে, তাই এর এই নাম— উৎসজননী। কলকাতার ধারে গঙ্গা যেরকম ক্লিষ্ট কলুষিত শৃঙ্খলজর্জর, এ সেরকম নয়। গঙ্গাকে কলকাতা কিংকরী করেছে, সখী করে নি, তাই অবমানিত নদী হারিয়েছে তার রূপলাবণ্য। এখানকার এই পুরবাসিনী নদী গঙ্গার তুলনায় অগভীর ও অপ্রশস্ত বটে, কিন্তু এর স্বচ্ছ সৌন্দর্য নগরের হৃদয়ের মধ্যে দিয়ে চলেছে আনন্দ বহন করে।

এই নদীর উপরকার একটি ব্রিজ দেখতে এলুম, তার নাম আলিবর্দী-খাঁর পুল। আলিবর্দী শা-আব্বাসের সেনাপতি, বাদশার হুকুমে এই পুল তৈরি করেছিলেন। পৃথিবীতে আধুনিক ও প্রাচীন অনেক ব্রিজ আছে, তার মধ্যে এই কীর্তিটি অসাধারণ। বহুখিলানওয়ালা তিন-তলা এই পুল; শুধু এটার উপর দিয়ে পথিক পার হয়ে যাবে বলে এ তৈরি হয় নি— অর্থাৎ এ শুধু উপলক্ষ নয়, এও স্বয়ং লক্ষ্য। এ সেই দিলদরিয়া যুগের রচনা যা আপনার কাজের তাড়াতেও আপন মর্যাদা ভুলত না।

ব্রিজ পার হয়ে গেলুম এখানকার আর্মানি গির্জায়। গির্জার বাহিরে ও অঙ্গনে ভিড় জমেছে।

ভিতরে গেলেম। প্রাচীন গির্জা। উপাসনা-ঘরের দেয়াল ও ছাদ চিত্রিত, অলংকৃত। দেয়ালের নীচের দিকটায় সুন্দর পারসিক টালির কাজ, বাকি অংশটায় বাইবেল-বর্ণিত পৌরাণিক ছবি আঁকা। জনশ্রুতি এই যে, কোনো ইটালিয়ন চিত্রকর ভ্রমণ করতে এসে এই ছবিগুলি এঁকেছিলেন।

তিনশো বছর হয়ে গেল, শা-আব্বাস রুশিয়া থেকে বহু সহস্র আর্মানি আনিয়ে ইস্পাহানে বাস করান। তারা কারিগর ছিল ভালো। তখনকার দেশবিজয়ী রাজারা শিল্পদ্রব্যের সঙ্গে শিল্পীদেরও লুঠ করতে ছাড়তেন না। শা-আব্বাসের মৃত্যুর পর তাদের উপর উৎপাত আরম্ভ হল। অবশেষে নাদির শাহের আমলে উপদ্রব এত অসহ্য হয়ে উঠল যে টিঁকতে পারলে না। সেই সময়েই আর্মানিরা প্রথম ভারতবর্ষে পালিয়ে আসে। বর্তমান বাদশাহের আমলে তাদের কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু সে কালে কারুনৈপুণ্য সম্বন্ধে তাদের যে খ্যাতি ছিল এখন তার আর কিছু বাকি আছে বলে বোধ হল না।

বাজারের মধ্য দিয়ে বাড়ি ফিরলুম। আজ কী-একটা পরবে দোকানের দরজা সব বন্ধ। এখানকার সুদীর্ঘ চিনার-বীথিকায় গিয়ে পড়লুম। বাদশাহের আমলে এই রাস্তার মাঝখান দিয়ে টালি-বাঁধানো নালায় জল বইত, মাঝে মাঝে খেলত ফোয়ারা, আর ছিল ফুলের কেয়ারি। দরকারের জিনিসকে করেছিল আদরের জিনিস; পথেরও ছিল আমন্ত্রণ, আতিথ্য।

ইস্পাহানের ময়দানের চারি দিকে যে-সব অত্যাশ্চর্য মসজিদ দেখে এসেছি তার চিন্তা মনের মধ্যে ঘুরছে। এই রচনা যে যুগের সে বহুদূরের, শুধু কালের পরিমাপে নয়, মানুষের মনের পরিমাপে। তখন এক-একজন শক্তিশালী লোক ছিলেন সর্ব-সাধারণের প্রতিনিধি। ভূতলসৃষ্টির আদিকালে ভূমিকম্পের বেগে যেমন বড়ো পাহাড় উঠে পড়েছিল তেমনি। এই পাহাড়কে সংস্কৃত ভাষায় বলে ভূধর, অর্থাৎ সমস্ত ভূমিকে এই এক-একটা উচ্চচূড়া দৃঢ় ক'রে ধারণ করে এইরকম বিশ্বাস। তেমনি মানবসমাজের আদিকালে এক-একজন গণপতি সমস্ত মানুষের বল আপনার মধ্যে সংহত করে জনসাধারণকে নিজের মধ্যে প্রকাশ করেছেন। তাতে সর্বসাধারণ আপনার সার্থকতা দেখে আনন্দ পেত। তাঁরা একলাই যেমন সর্বজনের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন তেমনি তাঁদেরই মধ্যে সর্বজনের গৌরব, বহুজনের কাছে বহুকালের কাছে তাঁদের জবাবদিহি। তাঁদের কীর্তিতে কোনো অংশে দারিদ্র্য থাকলে সেই অমর্যাদা বহুলোকের, বহুকালের। এইজন্যে তখনকার মহৎ ব্যক্তির কীর্তিতে দুঃসাধ্যসাধন হয়েছে। সেই কীর্তি এক দিকে যেমন আপন স্বাতন্ত্র্যে বড়ো তেমনি সর্বজনীনতায়। মানুষ আপন প্রকাশে বৃহতের যে কল্পনা করতে ভালোবাসে তাকে আকার দেওয়া সাধারণ লোকের সাধ্যের মধ্যে নয়। এইজন্য তাকে উপযুক্ত আকারে প্রকাশ দেবার ভার ছিল নরোত্তমের, নরপতির। রাজা বাস করতেন রাজপ্রাসাদে, কিন্তু বস্তুত সে প্রাসাদ সমস্ত প্রজার— রাজার মধ্য দিয়ে সমস্ত প্রজা সেই প্রাসাদের অধিকারী। এইজন্যে রাজাকে অবলম্বন করে প্রাচীনকালে মহাকায় শিল্পসৃষ্টি সম্ভবপর হয়েছিল। পর্সিপোলিসে দরিয়ুস রাজার রাজগৃহে যে ভগ্নাবশেষ দেখা যায় সেটা দেখে মনে হয়, কোনো একজন ব্যক্তিবিশেষের ব্যবহারের পক্ষে সে নিতান্ত অসংগত। বস্তুত একটা বৃহৎ যুগ তার মধ্যে বাসা বেঁধেছিল— সে যুগে সমস্ত মানুষ এক-একটি মানুষে অভিব্যক্ত।

পর্সিপোলিসের যে কীর্তি আজ ভেঙে পড়েছে তাতে প্রকাশ পায়, সেই যুগ গেছে ভেঙে। এরকম কীর্তির আর পুনরাবর্তন অসম্ভব। যে প্রান্তরে আজকের যুগ চাষ করছে, পশু চরাচ্ছে, যে পথ দিয়ে আজকের যুগ তার পণ্য বহন করে চলেছে, সেই প্রান্তরের ধারে, সেই পথের প্রান্তে এই অতিকায় স্তম্ভগুলো আপন সার্থকতা হারিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তবু মনে হয়, দৈবাৎ যদি না ভেঙে যেত তবু আজকেকার সংসারের মাঝখানে থাকতে পেত না। যেমন আছে অজন্তার গুহা, আছে তবু নেই। ওই ভাঙা থামগুলো সেকালের একটা সংকেতমাত্র নিয়ে আছে, ব্যতিব্যস্ত বর্তমানকে পথ ছেড়ে দিয়ে।

সেই সংকেতের সমস্ত সুমহৎ তাৎপর্য অতীতের দিকে। নীচের রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে ইতরের মতো গর্জন করে চলেছে মোটর-রথ। তাকেও অবজ্ঞা করা যায় না, তার মধ্যেও মানবমহিমা আছে। কিন্তু এরা দুই পৃথক জাত, সগোত্র নয়। একটাতে আছে সর্বজনের সুযোগ, আর-একটাতে আছে সর্বজনের আত্মশ্লাঘা। এই শ্লাঘার প্রকাশে আমরা দেখতে পেলুম সেই অতীতকালের মানুষ কেমন করে প্রবল ব্যক্তি-স্বরূপের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে এক-একটি বিরাট আকারে আপনাকে দেখতে চেয়েছে। প্রয়োজনের পরিমাপে সে আকারের মূল্য নয়, প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশিকেই বলে ঐশ্বর্য— সেই ঐশ্বর্যকে তার অসামান্যরূপে মানুষ দেখতে পায় না, যদি কোনো প্রবল শক্তিশালীর মধ্যে আপন শক্তিকে উৎসৃষ্ট করে এই ঐশ্বর্যকে ব্যক্ত করা না হয়। নিজের নিজের ক্ষুদ্র শক্তি ক্ষুদ্র প্রয়োজনের মধ্যে প্রতিদিন খরচ হয়ে যায়, সেই দিনযাত্রা প্রয়োজনের-অতীত মাহাত্ম্যকে বাঁধতে পারে না। সেই ঐশ্বর্য-যুগ, যে ঐশ্বর্য আবশ্যককে অবজ্ঞা করতে পারত, এখন চলে গেছে। তার সাজসজ্জা সমারোহভার এখনকার কাল বহন করতে অস্বীকার করে। অতএব সেই যুগের কীর্তি এখনকার চলতি কালকে যদি চেপে বসে তবে এই কালের অভিব্যক্তির পথকে বাধাগ্রস্ত করবে।

মানুষের প্রতিভা নবনবোন্মেষে, কোনো একটামাত্র আবির্ভাবকেই দীর্ঘায়িত করার দ্বারা নয়, সে আবির্ভাব যতই সুন্দর যতই মহৎ হোক। মাদুরার মন্দির, ইস্পাহানের মসজিদ প্রাচীন কালের অস্তিত্বের দলিল— এখনকার কালকে যদি সে দখল করে তবে তাকে জবরদখল বলব। তারা যে সজীব নয় তার প্রমাণ এই যে, আপন ধারাকে আর তারা চালনা করতে পারছে না। বাইরে থেকে তাদের হয়তো নকল করা যেতে পারে, কিন্তু নিজের ভিতরে তাদের নূতন সৃষ্টির আবেগ ফুরিয়ে গেছে।

এদের কৈফিয়ত এই যে, এরা যে ধর্মের বাহন এখনো সে টিঁকে আছে। কিন্তু আজকের দিনে কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্ম ধর্মের বিশুদ্ধ প্রাণতত্ত্ব নিয়ে টিঁকে নেই। যে-সমস্ত ইটকাঠ নিয়ে সেই-সব সম্প্রদায়কে কালে কালে ঠেকো দিয়ে দিয়ে খাড়া করে রাখা হয়েছে তারা সম্পূর্ণ অন্য কালের আচার বিচার প্রথা বিশ্বাস জনশ্রুতি। তাদের অনুষ্ঠান, তাদের অনুশাসন এক কালের ইতিহাসকে অন্য কালের উপর চাপা দিয়ে তাকে পিছিয়ে রাখে।

সাম্প্রদায়িক ধর্ম জিনিসটাই সাবেক কালের জিনিস। পুরাকালের কোনো একটা বাঁধা মত ও অনুষ্ঠানকে সকল কালেই সকলে মিলে মানতে হবে, এই হচ্ছে সম্প্রদায়ের শাসন। বস্তুত এতকাল রাজশক্তি ও পৌরোহিত্যশক্তি জুড়ি মিলিয়ে চলেছে। উভয়েই

জনসাধারণের আত্মশাসনভার, চিন্তার ভার, পূজার-ভার, তাদের স্বাধীন শক্তি থেকে হরণ করে অন্যত্র এক জায়গায় সংহত করে রেখেছে। ব্যক্তিবিশেষ যদি নিজের চিত্তশক্তির প্রবর্তনায় স্বাতন্ত্র্যের চেষ্টা করে তবে সেটাকে বিদ্রোহের কোঠায় ফেলে তাকে প্রাণান্তকর কঠোরতার সঙ্গে শাসন করে এসেছে। কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক শক্তি ক্রমে এক কেন্দ্রের হাত থেকে সাধারণের পরিধিতে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে, অথচ চির-কালের মতো বাঁধা মতের ধর্মসম্প্রদায় আজকের দিনে সকলেরই চিত্তকে এক শাসনের দ্বারা, ভয়ের দ্বারা, লোভের দ্বারা, মোহের দ্বারা অভিভূত করে স্থাবর করে রেখে দেবে— এ আর চলবে না। এই কারণে এইরকম সাম্প্রদায়িক ধর্মের যা-কিছু প্রতীক তাকে আজ জোর করে রক্ষা করতে গেলে মানুষ নিজের মনের জোর খোওয়াবে; বয়স উত্তীর্ণ হলেও যে ছেলে মায়ের কোল আঁকড়ে মেয়েলি স্বভাব নিয়ে থাকে তারই মতো অপদার্থ হয়ে থাকবে।

প্রাচীন কীর্তি টিঁকে থাকবে না এমন কথা বলি নে। থাক্— কিন্তু সে কেবল স্মৃতির বাহনরূপে, ব্যবহারের ক্ষেত্ররূপে নয়। যেমন আছে স্ক্যাণ্ডিনেবীয় সাগা— তাকে কাব্য বলে স্বীকার করব, ধর্মগ্রন্থ বলে ব্যবহার করব না। যেমন আছে প্যারাডাইস লস্ট্— তাকে ভোগ করবার জন্যে, মানবার জন্যে নয়। য়ুরোপে পুরাতন ক্যাথিড্রাল আছে অনেক, কিন্তু মানুষের মধ্যযুগীয় যে ধর্মবোধ থেকে তার উদ্ভব ভিতরে ভিতরে তার পরিবর্তন হয়ে গেছে। ঘাট আছে, জল গেছে সরে। সে ঘাটে নৌকো বেঁধে রাখতে বাধা নেই, কিন্তু সে নৌকোয় খেয়া চলবে না। যুগে যুগে জ্ঞানের পরিধিবিস্তার, তার অভিজ্ঞতার সংশোধন, তার অবস্থার পরিবর্তন চলছেই; মানুষের মন সেইসঙ্গে যদি অচল আচারে বিজড়িত ধর্মকে শোধন করে না নেয় তা হলে ধর্মের নামে হয় কপটতা নয় মূঢ়তা নয় আত্মপ্রবঞ্চনা জমে উঠতে থাকবেই। এইজন্যে সাম্প্রদায়িক ধর্মবুদ্ধি মানুষের যত অনিষ্ট করেছে এমন বিষয়বুদ্ধি করে নি। বিষয়াসক্তির মোহে মানুষ যত অন্যায়ী যত নিষ্ঠুর হয়, ধর্মমতে আসক্তি থেকে মানুষ তার চেয়ে অনেক বেশি ন্যায়ভ্রষ্ট অন্ধ ও হিংস্র হয়ে ওঠে, ইতিহাসে তার ধারাবাহিক প্রমাণ আছে; আর তার সর্বনেশে প্রমাণ ভারতবর্ষে আমাদের ঘরের কাছে প্রতিদিন যত পেয়ে থাকি এমন আর-কোথাও নয়।

এসঙ্গে এ কথাও আমার মনে এসেছে যে মনুর পরামর্শ ছিল ভালো। সংসারের ধর্মই হচ্ছে সে সরে সরে যায়, অথচ একটা বয়সের পর যাদের মন আর কালের সঙ্গে তাল রেখে সরতে পারে না সংসারের ব্যবহার থেকে তাদের দূরে থাকা উচিত— যেমন দূরে আছে ইলোরার গুহা, খণ্ডগিরির মূর্তি সব। যদি তারা নিজের যুগকে

পূর্ণতা দিয়ে থাকে তবে তাদের মূল্য আছে, কিন্তু সে মূল্য আদর্শের মূল্য। আদর্শ একটা জায়গায় স্থিরত্বে ঠেকেছে বলেই তাকে দিয়ে আমরা পরিমাপের কাজ করি। জলের মধ্যে যদি কোথাও পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে তবে বন্যার উচ্ছলতা কতদূর উঠল সেই পাহাড়ের সঙ্গে তুলনা করে সেটা আমরা বুঝতে পারি, কিন্তু স্রোতের সঙ্গে সে পাহাড়ের কারবার নেই। তেমনি মানুষের কীর্তি ও ব্যক্তিত্ব যখন প্রচলিত জীবনযাত্রার সঙ্গে অসংসক্ত হয়ে পড়ে তখন তারা আমাদের অন্য কোনো কাজ না হোক আদর্শরচনার কাজে লাগে। এই আদর্শ নকল করায় না, শক্তির মধ্যে বেগ সঞ্চার করে। মহামানব নিজেকেই বহুগুণিত করবার জন্যে নয়, প্রত্যেক মানুষকে তার আপন শক্তিস্বাতন্ত্র্যের চরমতার দিকে অগ্রসর করবার জন্যে। পুরাতনকালের বৃদ্ধ যদি সেই আদর্শের কাজে লাগে তা হলে নূতনকালেও সে সার্থক। কিন্তু যদি সে নিজেকে চিরকাল পুনরাবর্তিত করবে বলে পণ করে বসে তবে সে আবর্জনা সৃষ্টি করবে।

অভ্যাসে যে মনকে পেয়ে বসে সে মনের মতগুলো মনন থেকে বিযুক্ত হয়ে যায়, অর্থাৎ চিত্তধারার সঙ্গে চিন্তিত বিষয়ের সম্বন্ধ শিথিল হয়। ফুলের বা ফলের পালা যখন ফুরোয় তখন শাখার রসধারা তাকে বর্জন করতে চেষ্টা করে, কিন্তু তবু সে যদি বৃন্ত আঁকড়িয়ে থাকে তবে সেটা নিছক লোকসান। এইজন্যে মনুর কথা মানি— পঞ্চাশোর্ধ্বং বনং ব্রজেৎ। স্বাধীন শক্তিতে চিন্তা করা, প্রশ্ন করা, পরীক্ষা করার দ্বারাই মানুষের মনোবৃত্তি সুস্থ ও বীর্যবান থাকে। যারা সত্যই জরায়-পাওয়া তারা সমাজের সেই নূতন অধ্যবসায়ী পরীক্ষাপরায়ণ প্রশ্নরত বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যকে নষ্ট না করুক, বাধা না দিক, মনুর এই ছিল অভিপ্রায়। পৃথিবীতে যে সমাজ তরুণ বৃদ্ধ বা প্রবীণ বৃদ্ধের অধিকৃত সে সমাজ পঙ্গু; বৃদ্ধের কর্মশক্তি অস্বাভাবিক, অতএব সে কর্ম স্বাস্থ্যকর নয়। তাদের মনের সক্রিয়তা স্বভাবের নিয়মে বাইরের দিক থেকে সরে এসে অন্তরের দিকে পরিণত হতে থাকে। তাই তাদের নিজের সার্থকতার জন্যেও অভিভাবকের পদ ছেড়ে দিয়ে সংসার থেকে নিভৃতে যাওয়াই কর্তব্য— তাতে ক্ষতি হবে এ কথা মনে করা অহংকার মাত্র।

আজ ছাব্বিশে। পনেরো দিন মাত্র দেশ থেকে চলে এসেছি। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন অনেক দিন হয়ে গেল। ভেবে দেখলুম, তার কারণ এ নয় যে, অনভ্যস্ত প্রবাসবাসের দুঃখ সময়কে চিরায়মান করেছে। আসল কথা এই যে, দেশে থাকি নিজের সঙ্গে নিতান্ত নিকটে আবদ্ধ বহু খুচরো কাজের ছোটো ছোটো সময় নিয়ে।

এখানে অনেকটা পরিমাণে নিজেকে ও নিজকীয়কে ছাড়িয়ে একটা ব্যাপক ভূমিকার উপরে থাকি। ভূমিতল থেকে নিঃসংসক্ত ঊর্ধ্বে যেমন অনেকখানি দেশকে দেখা যায় তেমনি নিজের সুখদুঃখের-জালে বদ্ধ, প্রয়োজনের-স্তূপে-আচ্ছন্ন সময় থেকে দূরে এলে অনেকখানি সময়কে একসঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়। তখন যেন দিনকে দেখি নে, যুগকে দেখি; দেখি ইতিহাসের পৃষ্ঠায়— খবরের কাগজের প্যারাগ্রাফে নয়।

গবর্নরের ব্যবস্থায় এ দুইদিন রাত্রির আহারের পর ঘণ্টাখানেক ধরে এখানকার সংগীত শুনতে পাই। বেশ লাগে। টার বলে যে তারের যন্ত্র, অতি সূক্ষ্ম মৃদুধ্বনি থেকে প্রবল ঝংকার পর্যন্ত তার গতিবিধি। তাল দেবার যন্ত্রটাকে বলে ডম্বক, তার বোলের আওয়াজে আমাদের বাঁয়া-তবলার চেয়ে বৈচিত্র্য আছে।

ইস্পাহানে আজ আমার শেষদিন, অপরাহ্নে পুরসভার তরফ থেকে আমার অভ্যর্থনা। যে প্রাসাদে আমার আমন্ত্রণ সে শা আব্বাসের আমলের, নাম চিহিল সতুন। সমুচ্চ পাথরের স্তম্ভশ্রেণীবিরাজিত এর অলিন্দ, পিছনে সভামণ্ডপ, তার পিছনে প্রশস্ত একটি ঘর— দেয়ালে বিচিত্র ছবি আঁকা। এক সময়ে কোনো-এক কদুৎসাহী শাসনকর্তা চুনকাম করে সমস্তটা ঢেকে দিয়েছিলেন। হাল আমলে ছবিগুলিকে আবার প্রকাশ করা হচ্ছে।

এখানকার কাজ শেষ হল।

দৈবাৎ এক-একটি শহর দেখতে পাওয়া যায় যার স্বরূপটি সুস্পষ্ট, প্রতি মুহূর্তে যার সঙ্গে পরিচয় ঘটতে থাকে। ইস্পাহান সেইরকম শহর। এটি পারস্যদেশের একটি পীঠস্থান। এর মধ্যে বহুযুগের, শুধু শক্তি নয়, প্রেম সজীব হয়ে আছে।

ইস্পাহান পারস্যের একটি অতি প্রাচীন শহর। একজন প্রাচীন ভ্রমণকারীর লিখিত বিবরণে পাওয়া যায় সেলজুক-রাজবংশীয় সুলতান মহম্মদের মাদ্রাসা ও সমাধির সম্মুখে তখন একটি প্রকাণ্ড দেবমূর্তি পড়ে ছিল। কোনো-একজন সুলতান ভারতবর্ষ থেকে এটি এনেছিলেন। তার ওজন ছিল প্রায় হাজার মণ।

দশ শতাব্দীর শেষভাগে সম্রাট শা আব্বাস আর্দাবিল থেকে তাঁর রাজধানী এখানে সরিয়ে নিয়ে আসেন। সাফাবি-বংশীয় এই শা আব্বাস পৃথিবীর রাজাদের মধ্যে একজন স্মরণীয়-ব্যক্তি।

তিনি যখন সিংহাসনে উঠলেন তখন তাঁর বয়স ষোলো, ষাট বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু। যুদ্ধবিপ্লবের মধ্য দিয়েই তাঁর রাজত্বের আরম্ভ। সমস্ত পারস্যকে একীকরণ এঁর মহৎকীর্তি। ন্যায়বিচারে দাক্ষিণ্যে ঐশ্বর্যে তাঁর খ্যাতি ছিল সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। তাঁর ঔদার্য ছিল অনেকটা দিল্লীশ্বর আকবরের মতো। তাঁরা এক সময়ের লোকও

ছিলেন। তাঁর রাজত্বে পরধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি উৎপীড়ন ছিল না। কেবল শাসন-নীতি নয়, তাঁর সময়ে পারস্যে স্থাপত্য ও অন্যান্য শিল্পকলা সর্বোচ্চসীমায় উঠেছিল। ৪৩ বৎসর রাজত্বের পর তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর মহিমার অবসান। অবশেষে একদা তাঁর শেষ বংশধর শা সুলতান হোসেন পারস্যবিজয়ী সুলতান মামুদের আসনতলে প্রণতি করে বললেন, 'পুত্র, যেহেতু জগদীশ্বর আমার রাজত্ব আর ইচ্ছা করেন না, অতএব আমার সাম্রাজ্য এই তোমার হাতে সমর্পণ করি।'

এর পরে আফগান রাজত্ব। শাসনকর্তাদের মধ্যে হত্যা ও গুপ্তহত্যা এগিয়ে চলল। চারি দিকে লুটপাট ভাঙাচোরা। অত্যাচারে জর্জরিত হল ইস্পাহান।

অবশেষে এলেন নাদির শা। বাল্যকালে ছাগল চরাতেন; অবশেষে একদিন ভাগ্যের চক্রান্তে আফগান ও তুর্কিদের তাড়িয়ে দিয়ে এই রাখাল চড়ে বসলেন শা আব্বাসের সিংহাসনে। তাঁর জয়পতাকা দিল্লি পর্যন্ত উড়ল। স্বরাজ্যে যখন ফিরলেন সঙ্গে নিয়ে এলেন বহুকোটি টাকা দামের লুটের মাল ও ময়ূরতক্ত সিংহাসন। শেষবয়সে তাঁর মেজাজ গেল বিগড়ে, আপন বড়োছেলের চোখ উপড়িয়ে ফেললেন। মাথায় খুন চড়ল। অবশেষে নিদ্রিত অবস্থায় তাঁবুর মধ্যে প্রাণ দিলেন তাঁর কোনো-এক অনুচরের ছুরির ঘায়ে; শেষ হয়ে গেল বিজয়ী রাজমহিমা অখ্যাত মৃত্যুশয্যায়।

তার পরে অর্ধশতাব্দী ধরে কাড়াকাড়ি, খুনোখুনি, চোখ-ওপড়ানো। বিপ্লবের আবর্তে রক্তাক্ত রাজমুকুট লাল বুদ্‌বুদের মতো ক্ষণে ক্ষণে ফুটে ওঠে আর ফেটে যায়। কোথা থেকে এল কাজার-বংশীয় তুর্কি আগা মহম্মদ খাঁ। খুন করে, লুঠ করে, হাজার হাজার নারী ও শিশুকে বন্দী করে আপন পাশবিকতার চূড়ো তুললে কর্মান শহরে, নগরবাসীর সত্তর হাজার উৎপাটিত চোখ হিসাব করে গ'নে নিলে। মহম্মদ খাঁর দস্যুবৃত্তির চরমকীর্তি রইল খোরাসানে, সেখানে নাদির শাহের হতভাগ্য অন্ধ পুত্র শা-রুখ ছিল রাজা। হিন্দুস্থান থেকে নাদির শাহের বহুমূল্য লুঠের মাল গুপ্ত রাজকোষ থেকে উদ্গীর্ণ করে নেবার জন্যে দস্যুশ্রেষ্ঠ প্রতিদিন শা-রুখকে যন্ত্রণা দিতে লাগল। অবশেষে একদিন শা-রুখের মুণ্ড ঘিরে একটা মুখোশ পরিয়ে তার মধ্যে সীসে গালিয়ে ঢেলে দিলে। এমনি করে শা-রুখের প্রাণ এবং ঔরঙ্গজেবের চুনি তার হস্তগত হল। তার পরে এশিয়ায় ক্রমে এসে পড়ল য়ুরোপের বণিকদল, ইতিহাসের আর-এক পর্ব আরম্ভ হল পূর্ব পশ্চিমের সংঘাতে। পারস্যে তার চক্রবাত্যা যখন পাক দিয়ে উঠছিল তখন ওই কাজার-বংশীয় রাজা সিংহাসনে। বিদেশীয় ঋণের নাগপাশে দেশকে জড়িয়ে সে ভোগবিলাসে উন্মত্ত, দুর্বল হাতের রাজদণ্ড চালিত হচ্ছিল বিদেশীয় তর্জনীসংকেতে।

এমন সময় দেখা দিলেন রেজা শা। পারস্যের জীর্ণ জর্জর রাষ্ট্রশক্তি সর্বত্র আজ উজ্জ্বল নবীন হয়ে উঠছে। আজ আমি আমার সামনে যে ইস্পাহানকে দেখছি তার উপর থেকে অনেক দিনের কালো কুহেলিকা কেটে গেছে। দেখা যায় এতকালের দুর্যোগে ইস্পাহানের লাবণ্য নষ্ট হয় নি।

আশ্চর্যের কথা এই যে, আরবের হাতে, তুর্কির হাতে, মোগলের হাতে, আফগানের হাতে পারস্য বারবার দলিত হয়েছে, তবু তার প্রাণশক্তি পুনঃপুন নিজেকে প্রকাশ করতে পারলে। আমার কাছে মনে হয় তার প্রধান কারণ— আকেমেনীয়, সাসানীয়, সাফাবি রাজাদের হাতে পারস্যের সর্বাঙ্গীণ ঐক্য বারম্বার সুদৃঢ় হয়েছে। পারস্য সম্পূর্ণ এক, তার সভ্যতার মধ্যে কোনো আকারে ভেদবুদ্ধির ছিদ্র নেই। আঘাত পেলে সে পীড়িত হয়, কিন্তু বিভক্ত হয় না। রুশে ইংরেজে মিলে তার রাষ্ট্রিক সত্তাকে একদা দুখানা করতে বসেছিল। যদি তার ভিতরে ভিতরে বিভেদ থাকত তা হলে য়ুরোপের আঘাতে টুকরো টুকরো হতে দেরি হত না। কিন্তু যে মুহূর্তে শক্তিমান রাষ্ট্রনেতা সামান্যসংখ্যক সৈন্য নিয়ে এসে ডাক দিলেন, অমনি সমস্ত দেশ তাঁকে স্বীকার করতে দেরি করলে না; অবিলম্বে প্রকাশ পেলে যে, পারস্য এক।

পারস্য যে অন্তরে অন্তরে এক, তার প্রধান একটা প্রমাণ তার শিল্পের ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায়। আকেমেনীয় যুগে পারস্যে যে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য উদ্‌ভাবিত হল তার মধ্যে আসীরিয়, ব্যাবিলনীয়, ঈজিপ্‌টীয় প্রভাবের প্রমাণ আছে। এমন-কি, তখনকার প্রাসাদনির্মাণ প্রভৃতি কাজে বিপুলসাম্রাজ্যভুক্ত নানাদেশীয় কারিগর নিযুক্ত হয়েছিল। কিন্তু সেই বিচিত্র প্রভাব বিশিষ্ট ঐক্য লাভ করেছিল পারসিক চিত্তের দ্বারা। রজার ফ্রাই এ সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন এখানে উদ্‌ধৃত করি :

This extreme adaptability is, I think, a constant trait in Persian art. ··· We tend, perhaps, at the present time to exaggerate the importance of originality in an art; we admire in it the expression of an independent and self-contained people, forgetting that originality may arise from a want of flexibility in the artist's make-up as well as from a new imaginative outlook.

নানা প্রভাব চারি দিক থেকে আসে; জড়বুদ্ধি তাকে ঠেকিয়ে রাখে, সচেতন বুদ্ধি তাকে গ্রহণ করে আপনার মধ্যে তাকে ঐক্য দেয়। নিজের মধ্যে একটা প্রাণবান ঐক্যতত্ত্ব থাকলে বাইরের বহুকে মানুষ একে পরিণত করে নিতে পারে। পারস্য তার ইতিহাসে, তার আর্টে বাইরের অভ্যাগমকে আপন অঙ্গীভূত করে নিয়েছে।

পারস্যের ইতিহাসক্ষেত্রে একদিন যখন আরব এল তখন অতি অকস্মাৎ তার

প্রকৃতিতে একটা মূলগত পরিবর্তন ঘটল। এ কথা মনে রাখা দরকার যে, বলপূর্বক ধর্মদীক্ষা দেওয়ার রীতি তখনো আরব গ্রহণ করে নি। আরবশাসনের আরম্ভকালে পারস্যে নানা সম্প্রদায়ের লোক একত্রে বাস করত এবং শিল্পরচনায় ব্যক্তিগত স্বাধীন রুচিকে বাধা দেওয়া হয় নি। পারস্যে ইসলাম ধর্ম অধিবাসীদের স্বেচ্ছানুসারে ক্রমে ক্রমে সহজে প্রবর্তিত হয়েছে। তৎপূর্বে ভারতবর্ষেরই মতো পারস্যে সামাজিক শ্রেণীবিভাগ ছিল কঠিন, তদনুসারে শ্রেণীগত অবিচার ও অবমাননা জনসাধারণের পক্ষে নিশ্চয়ই পীড়ার কারণ হয়েছিল। স্বসম্প্রদায়ের মধ্যে ঈশ্বরপূজার সমান অধিকার ও পরস্পরের নিবিড় আত্মীয়তা এই ধর্মের প্রতি প্রজাদের চিত্ত আকর্ষণ করেছিল সন্দেহ নেই। এই ধর্মের প্রভাবে পারস্যে শিল্পকলার রূপ পরিবর্তন করাতে রেখালংকার ও ফুলের কাজ প্রাধান্য লাভ করেছিল। তার পরে তুর্কিরা এসে আরব সাম্রাজ্য ও সেইসঙ্গে তাদের বহুতর কীর্তি লণ্ডভণ্ড করে দিলে, অবশেষে এল মোগল। এই-সকল কীর্তিনাশার দল প্রথমে যত উৎপাত করুক, ক্রমে তাদের নিজেদেরই মধ্যে শিল্পোৎসাহ সঞ্চারিত হতে লাগল। এমনি করে যুগান্তে যুগান্তে ভাঙচুর হওয়া সত্ত্বেও পারস্যে বারবার শিল্পের নবযুগ এসেছে। আকেমেনীয় সাসানীয় আরবীয় সেলজুক মোগল এবং অবশেষে সাফাবি শাসনের পর্বে পর্বে শিল্পের প্রবাহ বাঁক ফিরে ফিরে চলেছে, তবু লুপ্ত হয় নি, এরকম দৃষ্টান্ত বোধ হয় আর-কোনো দেশে দেখা যায় না।

৭

২৯ এপ্রেল। ইস্ফাহান থেকে যাত্রা করা গেল তেহেরানের দিকে। নগরের বাহিরেও অনেক দূর পর্যন্ত সবুজ খেত, গাছপালা ও জলের ধারা। মাঝে মাঝে গ্রাম। কোথাও-বা তারা পরিত্যক্ত। মাটির প্রাচীর ও দেওয়ালগুলি জীর্ণতার নানা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে, ভিতের উপরে ছাদ নেই। এক জায়গায় এইরকম ভাঙা শূন্য গ্রামের সামনেই পথের ধারে পড়ে আছে উটের কঙ্কাল। ওই ভাঙা ঘরগুলো, আর ওই প্রাণীটার বুকের পাঁজর একই কথা বলছে। প্রাণের ভারবাহী যে-সব বাহন প্রাণহীন কিছুদিন তারাই থাকে বোবার মতো পড়ে, আর প্রাণ যায় চলে। এখানকার মাটির ঘর যেন মাটির তাঁবু— উপস্থিত প্রয়োজনের ক্ষণিক তাগিদে খাড়া করা, তার পরে তার মূল্য ফুরিয়ে যায়। দেখি আর ভাবি, এই তো ভালো। গড়ে তোলাও সহজ, ফেলে যাওয়াও তাই। বাসার সঙ্গে নিজেকে ও অপরিচিত আগামীকালকে বেঁধে রাখবার বিড়ম্বনা নেই। মানুষের কেবল যদি একটামাত্র দেহ থাকত বংশানুক্রমে সকলের জন্যে, খুব মজবুত চতুর্দন্ত হাতির হাড় আর গণ্ডারের সাত-পুরু চামড়া দিয়ে

খুব পাকা করে তৈরি চোদ্দ পুরুষের একটা সরকারি দেহ, যেটা অনেকজনের পক্ষে মোটামুটিভাবে উপযোগী, কিন্তু কোনো-একজনের পক্ষে প্রকৃষ্টভাবে উপযুক্ত নয়, নিশ্চয় সেই দেহদুর্গটা প্রাণপুরুষের পছন্দসই হত না। আপন বসতবাড়িকে বংশানুক্রমে পাকা করে তোলবার চেষ্টা প্রাণধর্মের বিরুদ্ধ। পুরানো বাড়ি আপন যুগ পেরতে না পেরতে পোড়োবাড়ি হতে বাধ্য। পিতৃপুরুষের অপব্যয়কে উপেক্ষা করে নতুন বংশ নতুন পাড়ায় গিয়ে বাসা করে। আশ্চর্য এই যে, সেও ভাবী ভগ্নাবশেষ সৃষ্টি করবার জন্যে দশ পুরুষের মাপে অচল ভিত বানাতে থাকে। অর্থাৎ, মরে গিয়েও সে ভাবীকালকে জুড়ে আপন বাসায় বাস করবে এই কল্পনাতেই মুগ্ধ। আমার মনে হয়, যে-সব ইমারত ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য নয়, স্থায়িত্বকামী স্থাপত্য তাদেরই সাজে।

কিছু দূরে গিয়ে আবার সেই শূন্য শুষ্ক ধরণী, গেরুয়া চাদরে ঢাকা তার নিরলংকৃত নিরাসক্তি। মধ্যাহ্নে গিয়ে পৌঁছলুম দেলিজানে। ইস্ফাহানের গভর্নর এখানে তাঁবু ফেলে আমাদের জন্যে বিশ্রামের ব্যবস্থা করেছেন। এই তাঁবুতে আমাদের আহার হল। কুমশহর এখান থেকে আরো কতকটা দূরে। তার পাশ দিয়ে আমাদের পথ। দূর থেকে দেখতে পাওয়া যায় স্বর্ণমণ্ডিত তার বিখ্যাত মসজিদের চূড়া।

বেলা পাঁচটার সময় গাড়ি পৌঁছল তেহেরানের কাছাকাছি। শুরু হল তার আত্মপরিচয়। নগরপ্রবেশের পূর্বে বর্তমানযুগের শৃঙ্গধ্বনিমুখর নকিবের মতো দেখা গেল একটা কারখানাঘর— এটা চিনির কারখানা। এরই সংলগ্ন বাড়িতে জরথুস্ত্রীয় সম্প্রদায়ের একদল লোক আমাকে অভ্যর্থনার জন্য নামালেন। ক্লান্তদেহের খাতিরে দ্রুত ছুটি নিতে হল। তার পরে তেহেরানের পৌরজনদের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা গ্রহণ করবার জন্য একটি বৃহৎ তাঁবুতে প্রবেশ করলেম। এখানকার শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রী ছিলেন সভাপতি। এখানে চা খেয়ে স্বাগতসম্ভাষণের অনুষ্ঠান যখন শেষ হল সভাপতি আমাকে নিয়ে গেলেন একটি বৃহৎ বাগানবাড়িতে। নানাবর্ণ ফুলে খচিত তার তৃণ-আস্তরণ। গোলাপের গন্ধমাধুর্যে উচ্ছ্বসিত তার বাতাস, মাঝে মাঝে জলাশয় এবং ফোয়ারা এবং স্নিগ্ধচ্ছায়া তরুশ্রেণীর বিচিত্র সমাবেশ। যিনি আমাদের জন্যে এই বাড়ি ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র গেছেন তাকে যে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করব এমন সুযোগ পাই নি। তাঁরই একজন আত্মীয় আগা আসাদি আমাদের শুশ্রূষার ভার নিয়েছেন। ইনি ন্যুয়র্কের কলম্বিয়া য়ুনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট, আমার সমস্ত ইংরেজি রচনার সঙ্গে সুপরিচিত। অভ্যাগতবর্গের সঙ্গে আমার কথোপকথনের সেতুস্বরূপ ছিলেন ইনি।

কয়েক দিন হল ইরাকের রাজা ফইসল এখানে এসেছেন। তাঁকে নিয়ে এখানকার

সচিবেরা অত্যন্ত ব্যস্ত। আজ অপরাহ্ণের মৃদু রৌদ্রে বাগানে যখন বসে আছি ইরাকের দুইজন রাজদূত আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। রাজা বলে পাঠিয়েছেন তিনি আমার সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছা করেন। আমি তাঁদের জানালেম, ভারতবর্ষে ফেরবার পথে বোগদাদে রাজার দর্শন নিয়ে যাব।

আজ সন্ধ্যার সময় একজন ভদ্রলোক এলেন, তাঁর কাছ থেকে বেহালায় পারসিক সংগীত শুনলুম। একটি সুর বাজালেন, আমাদের ভৈরেঁা রামকেলির সঙ্গে প্রায় তার কোনো তফাত নেই। এমন দরদ দিয়ে বাজালেন, তানগুলি পদে পদে এমন বিচিত্র অথচ সংযত ও সুমিত যে আমার মনের মধ্যে মাধুর্য নিবিড় হয়ে উঠল। বোঝা গেল ইনি ওস্তাদ, কিন্তু ব্যাবসাদার নন। ব্যাবসাদারিতে নৈপুণ্য বাড়ে, কিন্তু বেদনাবোধ কমে যায়— ময়রা যে কারণে সন্দেশের রুচি হারায়। আমাদের দেশের গাইয়ে-বাজিয়েরা কিছুতেই মনে রাখে না যে আর্টের প্রধান তত্ত্ব তার পরিমিতি। কেননা রূপকে সুব্যক্ত করাই তার কাজ। বিহিত সীমার দ্বারা রূপ সত্য হয়, সেই সীমা ছাড়িয়ে অতিকৃতিই বিকৃতি। মানুষের নাক যদি আপন মর্যাদা পেরিয়ে হাতির শুঁড় হওয়ার দিকে এগোতে থাকে, তার ঘাড়টা যদি জিরাফের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে মরিয়া হয়ে মেতে ওঠে, তা হলে সেই আতিশয্যে বস্তুগৌরব বাড়ে, রূপগৌরব বাড়ে না। সাধারণত আমাদের সংগীতের আসরে এই অতিকায় আতিশয্য মত্ত করীর মতো নামে পদ্মবনে। তার তানগুলো অনেক স্থলে সামান্য একটু-আধটু হেরফের করা পুনঃপুন পুনরাবৃত্তি মাত্র। তাতে স্তূপ বাড়ে, রূপ নষ্ট হয়। তন্বী রূপসীকে হাজার পাকে জড়িয়ে ঘাগরা এবং ওড়না পরানোর মতো। সেই ওড়না বহুমূল্য হতে পারে, তবু রূপকে অতিক্রম করবার স্পর্ধা তাকে মানায় না। এরকম অদ্ভুত রুচিবিকারের কারণ এই যে, ওস্তাদেরা স্থির করে রেখেছেন সংগীতের প্রধান উদ্দেশ্য সমগ্র গানটিকে তার আপন সুষমায় প্রকাশ করা নয়, রাগরাগিণীকেই বীরবিক্রমে আলোড়িত ফেনিল করে তোলা— সংগীতের ইমারতটিকে আপন ভিত্তিতে সুসংযমে দাঁড় করানো নয়, ইঁটকাঠ-চুনসুরকিকে কণ্ঠ-কামানের মুখে সগর্জনে বর্ষণ করা। ভুলে যায় সুবিহিত সমাপ্তির মধ্যেই আর্টের পর্যাপ্তি। গান যে বানায় আর গান যে করে, উভয়ের মধ্যে যদি-বা দরদের যোগ থাকে তবু সৃষ্টিশক্তির সাম্য থাকা সচরাচর সম্ভবপর নয়। বিধাতা তাঁর জীবসৃষ্টিতে নিজে কেবল যদি কঙ্কালের কাঠামোটুকু খাড়া করেই ছুটি নিতেন, যার-তার উপর ভার থাকত সেই কঙ্কালে যত খুশি মেদমাংস চড়াবার, নিশ্চয়ই তাতে অনাসৃষ্টি ঘটত। অথচ আমাদের দেশে গায়ক কথায় কথায় রচয়িতার অধিকার নিয়ে থাকে, তখন সে সৃষ্টিকর্তার কাঁধের উপর চড়ে ব্যায়ামকর্তার বাহাদুরি প্রচার

করে। উত্তরে কেউ বলতে পারেন, ভালো তো লাগে। কিন্তু পেটুকের ভালো লাগা আর রসিকের ভালো লাগা এক নয়। কী ভালো লাগে তাই নিয়ে তর্ক। যে ময়রা রসগোল্লা তৈরি করে মিষ্টান্নের সঙ্গে যথাপরিমিত রস সে নিজেই জুগিয়ে দেয়। পরিবেশনকর্তা মিষ্টান্ন গড়তে পারে না, কিন্তু দেদার চিনির রস ঢেলে দেওয়া তার পক্ষে সহজ। সেই চিনির রস ভালো লাগে অনেকের; তা হোক গে, তবুও সেই ভালো লাগাতেই আর্টের যথার্থ যাচাই নয়।

ইতিমধ্যে একজন সেকেলে ওস্তাদ এসে আমাকে বাজনা শুনিয়ে গেছেন, তার থেকে বুঝলুম এখানেও গানের পথে সন্ধ্যা হয় এবং বাঘের ভয় ঘটে। এখানেও যে-খুশি সরস্বতীর বীণায় রবারের তার চড়িয়ে তাকে কেবলমাত্র গায়ের জোরে টেনে টেনে দীর্ঘ করতে পারে।

আজ পারস্যরাজের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হল। প্রাসাদের বৃহৎ কার্পেট-পাতা ঘরে আসবাব আড়ম্বর নেই বললেই হয়। রাজার গায়ে খাকি-রঙের সৈনিক-পরিচ্ছদ। অতি অল্পদিনমাত্র হল অতি দ্রুতহস্তে পারস্যরাজস্বকে দুর্গতির তলা হতে উদ্ধার করে ইনি তার হৃদয় অধিকার করে বসে আছেন। এমন অবস্থায় মানুষ আপন সদ্যপ্রতিষ্ঠিত গৌরবকে অতিমাত্র সমারোহদ্বারা ঘোষণা করবার চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু ইনি আপন রাজমহিমাকে অতিসহজেই ধারণ করে আছেন। খুব সহজ মহত্ত্বের মানুষ; এঁর মুখের গড়নে প্রবল দৃঢ়তা, চোখের দৃষ্টিতে প্রসন্ন ঔদার্য। সিংহাসনে না ছিল তাঁর বংশগত অধিকার, না ছিল আভিজাত্যের দাবি; তবু যেমনি তিনি রাজাসনে বসলেন অমনি প্রজার হৃদয়ে তাঁর স্থান অবিলম্বে স্বীকৃত হল। দশ বছর মাত্র তিনি রাজা হয়েছেন কিন্তু সিংহাসনের চারি দিকে আশঙ্কা উদ্‌বেগের দুর্গম বেড়া সতর্কতায় কণ্টকিত হয়ে ওঠে নি। সেদিন অমিয় দেখে এসেছেন নতুন রাস্তা তৈরি হচ্ছে, রাজা স্বয়ং পথে দাঁড়িয়ে বিনা আড়ম্বরে পরিদর্শনে নিযুক্ত।

ইতিমধ্যে একদিন প্রধান রাজমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হল। তাঁকে বললুম, বহুযুগের উগ্র সংস্কারকে নম্র করে দিয়ে তাঁরা এ রাজ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবুদ্ধিকে নির্বিষ করেছেন এই দেখে আমি আনন্দিত।

তিনি বললেন, যতটা আমাদের ইচ্ছা ততটা সফলতা এখনো পাই নি। মানুষ তো আমরা সকলেই, আমাদের মধ্যে মানুষোচিত সম্বন্ধ সহজ ও ভদ্র না হওয়াই অদ্ভুত।

আমি যখন বললুম পারস্যের বর্তমান উন্নতিসাধনা একদিন হয়তো ভারতবর্ষের দৃষ্টান্তস্থল হতে পারে, তিনি বললেন, রাষ্ট্রীয় অবস্থা সম্বন্ধে ভারতবর্ষ ও পারস্যের মধ্যে

প্রভেদ বিস্তর। মনে রাখতে হবে, পারস্যের জনসংখ্যা এক কোটি বিশ লাখ, ভারতবর্ষের ত্রিশ কোটির উপর— এবং সেই ত্রিশ কোটি বহুভাগে বিভক্ত। পারস্যের সমস্যা অনেক বেশি সরল, কেননা আমরা জাতিতে ধর্মে ভাষায় এক। আমাদের প্রধান কাজ হচ্ছে শাসনব্যবস্থাকে নির্দোষ এবং সম্যক উপযোগী করে তোলা।

আমি বললুম, দেশের প্রকাণ্ড আয়তনটাই তার প্রকাণ্ড শত্রু। চীন ভারতবর্ষ তার প্রমাণ। জাপান ছোটো বলে এত শীঘ্র বড়ো হয়েছে। স্বভাবতই ঐক্যবদ্ধ অন্য সভ্যদেশের রাষ্ট্রনীতি ভারতবর্ষে খাটবে না। এখানকার বিশেষ নীতি নানা দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে এখানেই উদ্‌ভাবিত হবে।

তিনি চলে গেলে আমি বসে বসে ভাবতে লাগলুম ঐক্যটাই আমাদের দেশে সব প্রথম ও সব চেয়ে বেশি চাই, অথচ ওইটের বাধা আমাদের হাড়ে হাড়ে। ভারতীয় মুসলমানের গোঁড়ামি নিজের সমাজকে নিজের মধ্যে একান্ত কঠিন করে বাঁধে, বাইরেকে দূরে ঠেকায়; হিন্দুর গোঁড়ামি নিজের সমাজকে নিজের মধ্যে হাজারখানা করে, তার উপরেও বাইরের সঙ্গে তার অনৈক্য। এই দুই বিপরীতধর্মী সম্প্রদায়কে নিয়ে আমাদের দেশ। এ যেন দুই যমজ ভাই পিঠে পিঠে জোড়া; একজনের পা ফেলা আর-একজনের পা ফেলাকে প্রতিবাদ করতেই আছে। দুইজনকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করাও যায় না, সম্পূর্ণ এক করাও অসাধ্য।

কয়েকজন মোল্লা এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। প্রধান মোল্লা প্রশ্ন করলেন, নানা জাতির নানা ধর্মগ্রন্থে নানা পথ নির্দেশ করে, তার মধ্য থেকে সত্যপথ নির্ণয় করা যায় কী উপায়ে।

আমি বললুম, ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ করে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে 'আলো পাব কী উপায়ে' তাকে কেউ উত্তর দেয় চকমকি ঠুকে— কেউ বলে তেলের প্রদীপ, কেউ বলে মোমের বাতি, কেউ বলে ইলেকট্রিক আলো জেলে। সেই-সব উপকরণ ও প্রণালী নানাবিধ, তার ব্যয় যথেষ্ট, তার ফল সমান নয়। যারা পুঁথি সামনে রেখে কথা কয় না, যাঁদের সহজ বুদ্ধি, তারা বলে, দরজা খুলে দাও। ভালো হও, ভালোবাসো, ভালো করো, এইটেই হল পথ। যেখানে শাস্ত্র এবং তত্ত্ব এবং আচারবিচারের কড়াক্কড়ি সেখানে ধার্মিকদের অধ্যবসায় কথা-কাটাকাটি থেকে শুরু করে গলা-কাটাকাটিতে গিয়ে পৌঁছয়।

মোল্লার পক্ষে তর্কের উদ্যম ফুরোয় নি, কিন্তু আমার আর সময় ছিল না।

৮

আজ এই যে তেহেরানের জনসভায় আমার প্রথম বক্তৃতা।

সভা ভঙ্গ হলে আমাদের নিয়ে গেল এখানকার একজন সংগীতগুণীর বাড়িতে। ছোটো একটি গলির ধারে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলুম। শানবাঁধানো চৌকো উঠোন, তারই মধ্যে একটুখানি জলাশয়, গোলাপ ধরেছে গাছে, ছোটো ছোটো টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম। সামনে দালান, সেখানে বাজিয়ের দল অপেক্ষা করছে। বাজনার মধ্যে একটি তারযন্ত্র, একটি বাঁশি, বাকি অনেকগুলি বেহালা। আমরা সেখানে আসন নিলে পর প্রধান গুণী বললেন, আমি জানি আপনি ইচ্ছা করেন দেশপ্রচলিত কলাবিদ্যার স্বরূপ নষ্ট না হয়। আমরাও তাই চাই। সংগীতের স্বদেশী স্বকীয়তা রক্ষা করে আমরা তার সঙ্গে য়ুরোপীয় স্বরসংগতিতত্ত্ব যোগ করতে চেষ্টা করি।

আমি বললুম, ইতিহাসে দেখা যায় পারসিকদের গ্রহণ করবার প্রবলশক্তি আছে। এশিয়ার প্রায় সকল দেশেই আজ পাশ্চাত্য ভাবের সঙ্গে প্রাচ্য ভাবের মিশ্রণ চলছে। এই মিশ্রণে নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনা। এই মিলনের প্রথম অবস্থায় দুই ধারার রঙের তফাতটা থেকে যায়, অনুকরণের জোরটা মরে না। কিন্তু আন্তরিক মিলন ক্রমে ঘটে, যদি সে মিলনে প্রাণশক্তি থাকে; কলমের গাছের মতো নূতনে পুরাতনে ভেদ লুপ্ত হয়ে ফলের মধ্যে রসের বিশিষ্টতা জন্মে। আমাদের আধুনিক সাহিত্যে এটা ঘটেছে, সংগীতেও কেন ঘটবে না বুঝি নে। যে চিত্তের মধ্যে দিয়ে এই মিলন সম্ভবপর হয় আমরা সেই চিত্তের অপেক্ষা করছি, য়ুরোপীয় সাহিত্যচর্চা প্রাচ্য শিক্ষিতসমাজে যে পরিমাণে অনেক দিন ধরে অনেকের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়েছে য়ুরোপীয় সংগীতচর্চাও যদি তেমনি হত তা হলে নিঃসন্দেহই প্রাচ্য সংগীতে রসপ্রকাশের একটি নূতন শক্তিসঞ্চার হত। য়ুরোপের আধুনিক চিত্রকলায় প্রাচ্য চিত্রকলার প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছে এ তো দেখা গেছে; এতে তার আত্মতা পরাভূত হয় না, বিচিত্রতর— প্রবলতর হয়।

তার পরে তিনি একলা একটি সুর তাঁর তারযন্ত্রে বাজালেন। সেটি বিশুদ্ধ ভৈরবী, উপস্থিত সকলেরই সেটি অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করল। ইনি বললেন, জানি, এরকম সুর আমাদেরকে একভাবে মুগ্ধ করে, কিন্তু অন্যরকম জিনিসটারও বিশেষ মূল্য আছে। পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা জন্মিয়ে দিয়ে একটার খাতিরে অন্যকে বর্জন করা নিজের লোকসান করা।

কী জানি, লোকটির যদি শক্তি থাকে তবে পারসিক সংগীতে ইনি যে নূতন বাণিজ্যের প্রবর্তন করছেন ক্রমে হয়তো কলারাজ্যে তা লাভের সামগ্রী হয়ে দাঁড়াবে।

আমাদের রাগরাগিণী স্বরসংগতিকে স্বীকার করেও আত্মরক্ষা করতে একেবারেই পারে না এ কথা জোর করে কে বলতে পারে। সৃষ্টির শক্তি কী লীলা করতে সমর্থ কোনো একটা বাঁধা নিয়মের দ্বারা আমরা আগে হতে তার সীমা নির্ণয় করতে পারি নে। কিন্তু সৃষ্টিতে নূতন রূপের প্রবর্তন বিশেষ শক্তিমান প্রতিভার দ্বারাই সাধ্য, আনাড়ির বা মাঝারি লোকের কর্ম নয়। য়ুরোপীয় সাহিত্যের যেমন তেমনি তার সংগীতেরও মস্ত একটা সম্পদ আছে। সে যদি আমরা বুঝতে না পারি তবে সে আমাদের বোধশক্তিরই দৈন্য; যদি তাকে গ্রহণ করা একেবারেই অসম্ভব হয় তবে তার দ্বারা আভিজাত্যের প্রমাণ হয় না।

আজ ৬ই মে। য়ুরোপীয় পঞ্জিকার মতে আজ আমার জন্মদিন। আমার পারসিক বন্ধুরা এই দিনের উপর সকালবেলা থেকে পুষ্পবৃষ্টি করছেন। আমার চারি দিক ভরে গেছে নানাবর্ণের বসন্তের ফুলে, বিশেষত গোলাপে। উপহারও আসছে নানা রকমের। এখানকার গবর্মেণ্ট থেকে একটি পদক ও সেইসঙ্গে একটি ফর্মান পেয়েছি। বন্ধুদের বললুম, আমি প্রথমে জন্মেছি নিজের দেশে, সেদিন কেবল আত্মীয়েরা আমাকে স্বীকার করে নিয়েছিল। তার পরে তোমরা যেদিন আমাকে স্বীকার করে নিলে আমার সেদিনকার জন্ম সর্বদেশের— আমি দ্বিজ।

অপরাহ্ণে শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রীর বাড়িতে চায়ের মজলিসে নিমন্ত্রণ ছিল। সে সভায় এ দেশের প্রধানগণ ও বিদেশের রাষ্ট্রপ্রতিনিধি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সেখানে একজন পারসিক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপপ্রসঙ্গে কথা উঠল, বহুকাল থেকে বারম্বার বিদেশী আক্রমণকারীদের, বিশেষত মোগল ও আফগানদের, হাত থেকে অতি নিষ্ঠুর আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও পারস্য যে আপন প্রতিভাকে সজীব রেখেছে এ অতি আশ্চর্য। তিনি বললেন, সমস্ত জাতিকে আশ্রয় করে পারস্যে যে ভাষা ও সাহিত্য বহমান তারই ধারাবাহিকতা পারস্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে। অনাবৃষ্টির রুদ্রতা যখন তাকে বাইরে থেকে পুড়িয়েছে তখন তার অন্তরের সম্বল ছিল তার আপন নদী। এতে শুধু যে পারস্যের আত্মস্বরূপকে রক্ষা করেছে তা নয়, যারা পারস্যকে মারতে এসেছিল তারাই পারস্যের কাছ থেকে নূতন প্রাণ পেলে— আরব থেকে আরম্ভ করে মোগল পর্যন্ত।

আরবরা তুর্কিরা মোগলরা এসেছিল দানশূন্য হস্তে, কেবলমাত্র অস্ত্র নিয়ে। আরব পারস্যকে ধর্ম দিয়েছে, কিন্তু পারস্য আরবকে দিয়েছে আপন নানা বিদ্যা ও শিল্পসম্পন্ন সভ্যতা। ইসলামকে পারস্য ঐশ্বর্যশালী করে তুলেছে।

৭ মে। আজ সকালে প্রধান রাজমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম। প্রকাণ্ড বড়ো বৈঠকখানা, স্ফটিকে মণ্ডিত, কিছু কিছু জীর্ণ হয়েছে। মন্ত্রী বৃদ্ধ, আমারই সমবয়সী। আমি তাঁকে বললুম ভারতবর্ষের আবহাওয়া আমাদের জীবনযাত্রার উপরে এখানকার চেয়ে অনেক বেশি মাশুল চড়িয়েছে।

তিনি বললেন, বয়সের উপর কালের দাবি তত বেশি লোকসান করে না যেমন করে আহারে ব্যবহারে অনিয়ম অসংযম। সাবেক কালে আমাদের জীবনযাপনের অভ্যাসগুলি ছিল আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে মানানসই, এখন বিদেশী নতুন অভ্যাস এসে অসামঞ্জস্য ঘটিয়েছে। একটা দৃষ্টান্ত দেখাই। ঘরে কার্পেট পাতা আমাদের চিরকালের অভ্যাস, তারই সঙ্গে জুড়ি অভ্যাস হচ্ছে জুতো খুলে ঘরে ঢোকা। আজকাল য়ুরোপীয় প্রথামত পথের জুতোটাকে ধুলোসুদ্ধ ঘরের মধ্যে টেনে আনি। কার্পেট হয়ে ওঠে অস্বাস্থ্যকর। আগে কার্পেট-পাতা মেঝের উপর বসতুম, এখন সোফা-কেদারার খাতিরে বহুমূল্য বহুবিচিত্র কার্পেটের অর্থ ও সম্মান দিলুম পদদলিত করে।

এখান থেকে গেলেম পার্লামেন্টের সভানায়কের বাড়িতে। এঁরা চিন্তাশীল শিক্ষিত অভিজ্ঞ লোক, এঁদের সঙ্গে কথা কইবার বিষয় অনেক আছে, কিন্তু কথা চলে না। তর্জমার ভিতর দিয়ে আলাপ করা পায়ে পায়ে কোদালি দিয়ে পথ কেটে চলার মতো। যিনি আমার কালকেকার কবিতা[১] পারসিক ভাষা ও ছন্দে তর্জমা করেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা হল। লোকটি হাসিখুশি, গোলগাল, হৃদ্যতায় সমুচ্ছ্বসিত। কবিতা আবৃত্তি করেন প্রবল কণ্ঠে, প্রবল উৎসাহে দেহচালনা করেন। ওখান থেকে চলে আসবার সময় সভাপতিমশায় অতি সুন্দর লিপিনৈপুণ্যে লিখিত কবি আনওয়ারির রচিত একখানি কাব্যগ্রন্থ আমাকে উপহার দিলেন।

রাত্রে গেলেম থিয়েটারে অভিনয় দেখতে। নাটক এবং নাট্যাভিনয় পারস্যে হালের আমদানি। এখনো লোকের মনে ভালো করে বসে নি। তাই সমস্ত ব্যাপারটা কাঁচা রকমের ঠেকল। শাহ্‌নামা থেকে নাটকের গল্পটি নেওয়া। আমাদের দেশের নাটকের মতো প্রায়ই মাঝে মাঝে গান, এবং বোধ করি দেশাভিমানের উচ্ছ্বাস। মেয়েদের ভূমিকা অধিকাংশই মুসলমান মেয়েরা নিয়েছে দেখে বিস্ময় বোধ হল।

অপরাহ্ণে জরথুস্ত্রীয় বিদ্যালয়ের ভিত্তিস্থাপন-অনুষ্ঠান। সেখান থেকে কর্তব্য সেরে ফিরে যখন এলুম তখন আমাদের বাগানে গাছের তলায় একটি জলাশয়ের চার ধারে

১ গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ জনতা অপেক্ষা করছে। এখানকার সাহিত্যসভার নিমন্ত্রণে সকলে আহুত। আমার তরফে ছিল সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে ইংরেজিতে বক্তৃতার ধারা, আর এঁদের তরফে ছিল তারই মাঝে মাঝে এপারে ওপারে পারসিক ভাষার সাঁকো বেঁধে দেওয়া।

পথিকের মতো পথ চলতে চলতে আমি আজ এখানকার ছবি দেখতে দেখতে চলেছি। সম্পূর্ণ করে কিছু দেখবার সময় নেই। আমার মনে যে ধারণাগুলো হচ্ছে সে দ্রুত আভাসের ধারণা। বিচার করে উপলব্ধি নয়, কেবলমাত্র মানসিক হাত বুলিয়ে যাবার অনুভূতি। এই যেমন, সেদিন একজন মানুষের সঙ্গে হঠাৎ অল্পক্ষণের আলাপ হল। একটা ছায়াছবি মনে রয়ে গেল, সেটা নিমেষকালের আলোতে তোলা। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানবিৎ গাণিতিক। সৌম্য তাঁর মূর্তি, মুখে স্বচ্ছচিত্তের প্রকাশ। এঁর বেশ মোল্লার, কিন্তু এঁর বুদ্ধি সংস্কারমোহমুক্ত, ইনি আধুনিক অথচ চিরকালের পারসিক। ক্ষণকালের দেখাতেই এই মানুষের মধ্যে আমি পারস্যের আত্মসমাহিত স্বপ্রকৃতিস্থ মূর্তি দেখলুম, যে পারস্যে একদা আবিসেন্না ছিলেন বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের অদ্বিতীয় সাধক এবং জালালউদ্দিন গভীরতম আত্মোপলব্ধিকে সরসতম সংগীতে প্রবাহিত করেছিলেন। অধ্যাপক ফেরুঘির কথা পূর্বেই বলেছি। তিনিও আমার মনে একটি চিত্র এঁকে দিয়েছেন, সে চিত্রও চিত্তবান পারসিকের। অর্থাৎ এঁর স্বদেশীয় স্বভাব বিদেশীর কাছেও সহজে প্রকাশমান। যে মানুষ সংকীর্ণভাবে একান্তভাবে স্বাদেশিকতার মধ্যে বদ্ধ, তিনি স্বদেশকে প্রকাশ করেন না, কেননা, মূর্তি আপন দেশের মাটিতে গড়া হলেও যে আলো তাকে প্রকাশ করবে সে আলো যে সার্বভৌমিক।

তেহেরান থেকে বিদায় নেবার দিন এল, প্রধান মন্ত্রীবর্গ এসে আমাকে বিদায় দিলেন।

৯

বেলা আড়াইটার সময় যাত্রা করলুম। তেহেরান থেকে বেরিয়ে প্রথমটা পারস্যের নীরস নির্জন চেহারা আবার দেখা দিল, কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। দৃশ্যপরিবর্তন হল। ফসলে সবুজ মাঠ, মাঝে মাঝে তরুসংহতি, যেখানে-সেখানে জলের চঞ্চল ধারা, মেটে ঘরের গ্রাম তেমন বিরল নয়। দিগন্তে বরফের আঙুল-বুলানো গিরিশিখর।

সূর্যাস্তের সময় কাজবিন শহরে পৌঁছলুম। এখানে একটি হোটেলে আমাদের

জায়গা হয়েছে। বাংলাদেশে রেলপথের প্রধান জংশন যেমন আসানসোল, এখানে নানা পথের মোটরের সংগমতীর্থ তেমনি কাজবিন।

কাজবিন সাসানীয় কালের শহর, দ্বিতীয় শাপুর-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় সাফাবি রাজা তামাস্প এই শহরে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। দিল্লির পলাতক মোগল বাদশা হুমায়ুন দশবৎসরকাল এখানে তাঁরই আশ্রয়ে ছিলেন।

সাফাবি বংশের বিখ্যাত শা আব্বাসের সঙ্গে অ্যান্টনি ও রবার্ট্ শার্লি -নামক দুই ইংরেজ ভ্রাতার এইখানেই দেখা হয়। জনশ্রুতি এই যে, এঁরাই কামান প্রভৃতি অস্ত্রসহযোগে আধুনিককালীন যুদ্ধবিত্থায় বাদশাহের সৈন্যদের শিক্ষিত করেন। যাই হোক, বর্তমানে এই ছোটো শহরটিতে সাবেক কালের রাজধানীর মর্যাদা কিছুই চোখে পড়ে না।

ভোরবেলা ছাড়লুম হামাদানের অভিমুখে। চড়াইপথে চলল আমাদের গাড়ি। দুই ধারে ভূমি সুজলা সুফলা, মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো গ্রাম, আঁকাবাঁকা নদী, আঙুরের খেত, আফিমের পুষ্পোচ্ছ্বাস। বেলা দুপুরের সময় হামাদানে পৌঁছিয়ে একটি মনোহর বাগানবাড়ির মধ্যে আশ্রয় পাওয়া গেল— পপ্‌লার-তরুসংঘের ফাঁকের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে বরফের-আঁচড়-কাটা পাহাড়।

তেহেরানে গরম পড়তে আরম্ভ করেছিল, এখানে ঠাণ্ডা। সমুদ্রের উপরিতল থেকে এ শহর ছ-হাজার ফুট উঁচু। এল্‌ভেন্দ পাহাড়ের পাদদেশে এর স্থান। একদা আকেমেনীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল এইখানে। সেই রাজধানীর প্রাচীন নাম ইতিহাসবিখ্যাত একবাতানা, আজ তার ধ্বংসাবশেষ প্রায় কিছু বাকি নেই।

আহার ও বিশ্রামের পর বিকেলবেলা শহর দেখতে বেরলুম। প্রথমে আমাদের নিয়ে গেল ঘনবনের মধ্য দিয়ে গলিপথ বেয়ে একটি পুরোনো বড়ো ইমারতের সামনে। বললে, এর উপরের তলা থেকে চারি দিকের দৃশ্য অবারিত দেখতে পাওয়া যায়। আমার সঙ্গীরা দেখতে গেলেন, কিন্তু আমার সাহস হল না। গাড়িতে বসে দেখতে লাগলুম একদল লোক এসেছে বনের ধারে চড়িভাতি করতে। মেয়েরাও তার মধ্যে আছে; তারা কালো চাদরে মোড়া; কিন্তু দেখছি বাইরে বেরতে রাস্তায় ঘাটে বেড়াতে এদের সংকোচ নেই।

আজ মহরমের ছুটি, সবাই ছুটি উপভোগ করতে বেরিয়েছে। অল্প কয়েক বছর আগে মহরমের ছুটি রক্তাক্ত হয়ে উঠত, আত্মপীড়নের তীব্রতায় মারা যেত কত লোক। বর্তমান রাজার আমলে ধীরে ধীরে তার তীব্রতা কমে আসছে।

বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে শহরে গেলেম। আজ দোকান বাজার বন্ধ, কিন্তু ছুটির দলের খুব ভিড়। পারস্যে এসে অবধি মানুষ কম দেখা আমাদের অভ্যাস, তাই রাস্তায় এত লোক আমাদের চোখে নতুন লাগল। আরো নতুন লাগল এই শহরটি। শহরের এমন চেহারা আর-কোথাও দেখি নি। মাঝখান দিয়ে একটি অপ্রশস্ত খামখেয়ালী ঝরনা নানা ভঙ্গিতে কলশব্দে বহমান— কোথাও-বা উপর থেকে নীচে পড়ছে ঝরে, কোথাও-বা তার সমতলী স্রোত রৌদ্রে ঝলমল করছে, ধারে ধারে পাথরের স্তূপ, মাঝে মাঝে ছোটো ছোটো সাঁকো এপার থেকে ওপারে; ঝর্নার সঙ্গে পথের আঁকাবাঁকা মিল; মানুষের কাজের সঙ্গে প্রকৃতির গলাগলি; বাড়ির সামিল উন্মুক্ত প্রাঙ্গণগুলি উপরের থাকে, নীচের থাকে, এ কোণে, ও কোণে। তারই নানা জায়গায় নানা দল বসে গেছে। বাঁকাচোরা রাস্তায় মোটরগাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, এমন-কি, মোটর বাস ভর্তি করে চলেছে সব ছুটি-সম্ভোগীর দল। গাড়ির ঘোড়াগুলি সুশ্রী সুপুষ্ট। এই ছুটির পরবে মত্ততা কিছুই দেখলুম না, চারি দিকে শান্ত আরামের ছবি এখানকার অরণ্য পর্বত ঝর্নার সঙ্গে মিশে গেছে।

গবর্নর কাল শহরের বাইরে বনের মধ্যে বিকেলে আমাদের চায়ে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। বাঁ ধারে পাহাড়, ডাইনে ঘন অরণ্যের অন্ধকার ছায়ায় ঝর্না ঝরে পড়ছে। পাহাড়ী পথ বেয়ে বহু চেষ্টায় মোটর গেল। সেই বহুযুগের মেষপালকদের ভেড়া-চরা বনের মধ্যে চা খেয়ে সন্ধ্যাবেলায় বাসায় ফিরে এলুম, হামাদানের যে মূর্তি চিরসজীব, শতাব্দীর পর শতাব্দী সেখানে বুলবুল গান করে আসছে, আলেকজাণ্ডারের লুঠের বোঝার সঙ্গে সে অন্তর্ধান করে নি, কিন্তু পথের ধারে প্রান্তরের মধ্যে অনাদরে পড়ে আছে একটি পাথরের পিণ্ড, সম্রাটের সিংহদ্বারের সিংহের এই অপ-ভ্রংশ।

স্নানাহার সেরে দুপুরের পর হামাদান থেকে রওনা হলুম। যেতে হবে কির্মানশা। তখন ঝোড়ো হাওয়ায় ধুলো উড়িয়েছে, আকাশে মেঘ ঘনিয়ে এল। চলেছি আসাদা-বাদ গিরিপথ দিয়ে। দুই ধারে সবুজ খেত ফসলে ভরা, মাঝে মাঝে বনভূমি জলস্রোতে লালিত। মাঠে ভেড়া চরছে। পাহাড়গুলো কাছে এগিয়ে এসে তাদের শিলাবক্ষপট প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে। থেকে থেকে এক-এক পসলা বৃষ্টি নেমে ধুলোকে দেয় পরাভূত করে। আমার কেবল মনে পড়ছিল 'মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্বনভুবঃশ্যামাঃ'… তমালদ্রুমে নয়, কী গাছ ঠিক জানি নে, কিন্তু এই মেঘলা দিনে উপস্থিতমত ওকে তমালগাছ বলতে দোষ নেই।

আমরা যে পথ দিয়ে চলেছি এরই কাছাকাছি কোনো-এক জায়গায় বিখ্যাত

নিহাবন্দের রণক্ষেত্রে সাসানীয় সাম্রাজ্য আরবদের হাতে লীলা সমাপন করে। সেইদিন বহুকালীন প্রাচীন পারস্যের ইতিহাসে হঠাৎ সম্পূর্ণ নূতন অধ্যায় শুরু হল।

অবশেষে আমাদের রাস্তা এসে পড়ল বেহিস্তুনে। এখানে শৈলগাত্রে দরিয়ুসের কীর্তিলিপি পারসিক সুসীয় ও ব্যাবিলোনীয় ভাষায় ক্ষোদিত। এই ক্ষোদিত ভাষার উর্ধ্বে দরিয়ুসের মূর্তি। এই মূর্তির সামনে বন্দীবেশে দশজন বিদ্রোহীর প্রতিরূপ। এরা তাঁর সিংহাসন-অধিরোহণে বাধা দিয়েছিল। দরিয়ুসের পূর্ববর্তী রাজা ক্যাম্বাইসিস (পারসিক উচ্চারণ কাম্ব্যোজিয়) ঈর্ষাবশত গোপনে তাঁর ভ্রাতা স্মর্দিস্‌কে হত্যা করিয়েছিলেন। যখন তিনি ঈজিপ্ট-অভিযানে তখন তাঁর অনুপস্থিতিকালে সৌমতে বলে এক ব্যক্তি নিজেকে স্মর্দিস্ নামে প্রচার করে সিংহাসন দখল করে বসে। ক্যাম্বাইসিস ঈজিপ্ট থেকে ফেরবার পথে মারা যান। তখন আকেমেনীয় বংশের অপরশাখাভুক্ত দরিয়ুস ছদ্মরাজাকে পরাস্ত করে বন্দী করেন। প্রতিমূর্তিতে ভূমিশায়ী সেই মূর্তির বুকে দরিয়ুসের পা, বন্দী উর্ধ্বে দুই হাত তুলে ক্ষমা ভিক্ষা করছে। দরিয়ুসের মাথার উপরে অহুরমজ্‌দার মূর্তি।

অধ্যাপক হর্টজ্‌ফেল্‌ড্‌ বলেন, সম্প্রতি একটি শিলালিপি বেরিয়েছে তাতে দরিয়ুস জানাচ্ছেন, তিনি যখন সিংহাসনে বসেন তখন তাঁর পিতা পিতামহ উভয়েই বর্তমান। এই প্রথাবিরুদ্ধ ব্যাপার কী করে সম্ভব হল তার কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না।

সমুদ্রের মাঝে মাঝে এক-একটা দ্বীপ দেখা যায় যা ভূমিকম্পের হাতে তৈরি। তার সর্বত্র গলিত ধাতু আর অগ্নিস্রাবের চিহ্ন। তেমনি বহুযুগ ধরে ইতিহাসের ভূমিকম্পে এবং অগ্নি-উদ্গীরণে পারস্যের জন্ম। প্রাচীনকাল থেকে পারস্যে সাম্রাজ্য সৃষ্টি হয়ে এসেছে। মানুষের ইতিহাসে সব চেয়ে পুরাতন মহাসাম্রাজ্য সাইরাস স্থাপন করেন, তার পরেও দীর্ঘকাল পারস্যের ইতিহাসক্ষেত্রে সাম্রাজ্যিক দ্বন্দ্ব। তার প্রধান কারণ, পারস্যের চারি দিকেই বড়ো বড়ো প্রাচীন রাজশক্তির স্থান। হয় তাদের সকলকে দমন করে রাখতে হবে, নয় তাদের কেউ-না-কেউ এসে পারস্যকে গ্রাস করবে। নানা জাতির সঙ্গে এই নিরন্তর দ্বন্দ্ব থেকেই পারস্যের ঐতিহাসিক বোধ, ঐতিহাসিক সত্তা এত প্রবল হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষ সমাজ সৃষ্টি করেছে, মহাজাতির ইতিহাস সৃষ্টি করে নি। আর্যের সঙ্গে অনার্যের দ্বন্দ্ব প্রধানত সামাজিক। অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক আর্য বহুসংখ্যক অনার্যের মাঝখানে পড়ে নিজের সমাজকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। রামের সঙ্গে রাবণের যুদ্ধ রাষ্ট্রজয়ের নয়, সমাজরক্ষার— সীতা সেই সমাজনীতির প্রতীক। রাবণ সীতাহরণ করেছিল, রাজ্যহরণ করে নি। মহাভারতেও বস্তুত সমাজনীতির দ্বন্দ্ব, এক পক্ষ কৃষ্ণকে স্বীকার করেছে, কৃষ্ণাকে পণ রেখে তাদের

পাশা খেলা, অন্য পক্ষ কৃষ্ণকে অস্বীকার ও কৃষ্ণাকে করেছে অপমান। শাহ্‌নামায় আছে প্রকৃত ইতিহাসের কথা, রাষ্ট্রীয় বীরদের কাহিনী, ইরানীদের সঙ্গে তাতারীদের বিরোধ। তাতে ভগবদ্গীতার মতো তত্ত্বকথা বা শান্তিপর্বের মতো নীতি-উপদেশ প্রাধান্য পায় নি।

পারস্য বারবার পরজাতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপন পারসিক ঐক্যকে দৃঢ় করবার ও জয়ী করবার চেষ্টা করেছে। গুপ্তরাজাদের আমলে ভারতবর্ষ একবার আপন সাম্রাজ্যিক একসত্তা অনুভব করবার সুযোগ পেয়েছিল, কিন্তু তার প্রভাব গভীর ও স্থায়ী হয় নি। তার প্রধান কারণ, ভারতবর্ষ অন্তরে অন্তরে আর্যে অনার্যে বিভক্ত, সাম্রাজ্যিক ঐক্য সামাজিক ঐক্যের উপর ভিত্ত পাততে পারে নি। দরিয়ুস শিলাবক্ষে এমনভাবে আপন জয়ঘোষণা করেছেন যাতে চিরকাল তা স্থায়ী হয়। কিন্তু এই জয়ঘোষণা প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক, দরিয়ুস পারসিক রাষ্ট্রসত্তার জন্যে বৃহৎ আসন রচনা করেছিলেন; যেমন সাইরাসকে তেমনি দরিয়ুসকে অবলম্বন করে পারস্য আপন অখণ্ড মহিমা বিরাট ভূমিকায় অনুভব করতে পেরেছিল। পারস্যে পর্বে পর্বে এই রাষ্ট্রিক উপলব্ধি পরাভবকে অতিক্রম করে জেগেছে, আজও আবার তার জাগরণ হল। এখানকার প্রধানমন্ত্রী আমাকে যা বলেছিলেন তার মূল কথাটা হচ্ছে এই যে, আপন সমাজনিহিত দুর্বলতার কারণ দূর করাই ভারতবর্ষের সমস্যা, আর পারস্যের সমস্যা আপন শাসনব্যবস্থার অপূর্ণতা মোচন করা। পারস্য সেই কাজে লেগেছে, ভারতবর্ষ এখনো আপনার যথার্থ কাজে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে লাগে নি।

বেহিস্তুন থেকে বেরলুম। অদূরে তাকিবুস্তানের পাহাড়ে উৎকীর্ণ মূর্তি। শহর থেকে মাইল-চারেক দূরে। গবর্নরের দূত এসে পথের মধ্যে থেকে সেখানে আমাদের নিয়ে গেলেন। দূরে থেকেই দেখা যায় অগভীর গুহাগাত্রে খোদাই-করা মূর্তি, তার সামনে কৃত্রিম সরোবরে ঝরে পড়ছে জলস্রোত। দুটি মূর্তি দাঁড়িয়ে, পায়ের তলায় দলিত একজন বন্দী। কোনো লেখা পাওয়া যায় না, কিন্তু সাজসজ্জায় বোঝা যায় এরা সাসানীয়। পাহাড়ের মধ্যে খোদাই করে তোলা একটি গম্বুজাকৃতি কক্ষের ঊর্ধ্বভাগে বাম হাতে অভিষেকের পাত্র ও ডান হাতে মালা নিয়ে পাখা মেলে বিজয়দেবতা দাঁড়িয়ে, তার নীচে এক দাঁড়ানো মূর্তি এবং তার নীচে বর্মপরা অশ্বারোহী। পাশের দেয়ালে শিকারের ছবি। এই মূর্তিগুলিতে আশ্চর্য একটি শক্তি প্রকাশ পেয়েছে, দেখে মন স্তম্ভিত হয়।

সাসানীয় যুগ বলতে কী বোঝায় সংক্ষেপে বলে রাখি।

আলেকজাণ্ডারের আক্রমণে আকেমেনীয় রাজত্বের অবসান হল। পরে যে জাত

পারস্যকে দখল করে তাদের বলে পার্থীয়। তারা সম্ভবত শকজাতীয়; প্রথমে গ্রীকদের প্রভাবে আসে, পরে তারা পারসিক সভ্যতা গ্রহণ করে। অবশেষে ২২৬ খ্রীস্টাব্দে সাসানের পৌত্র আর্দাশির পার্থীয় রাজার হাত থেকে পারস্যকে কেড়ে নিয়ে আর-একবার বিশুদ্ধ পারসিক জাতির সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এঁদের সময়কার প্রবল সম্রাট ছিলেন শাপুর, তিনিই রোমের সম্রাট ভ্যালেরিয়ানকে পরাস্ত ও বন্দী করেন।

আকেমেনীয়দের ধর্ম ছিল জরথুস্ত্রীয়, সাসানীয়দের আমলে আর-একবার প্রবল উৎসাহে এই ধর্মকে জাগিয়ে তোলা হয়।

ঋজু প্রশস্ত নূতন-তৈরি পথ বেয়ে আসছি। অদূরে সামনে পাহাড়ের গায়ে কির্মানশা শহর দেখা দিল। পথের দুই ধারে ফসলের খেত, আফিমের খেত ফুলে আচ্ছন্ন, মেঘের আড়াল থেকে অস্তসূর্যরশ্মির আভা পড়ে সদ্যধৌত গাছের পাতা ঝলমল করছে।

শহরে প্রবেশ করলুম। পরিষ্কার রাস্তার দুই ধারে নানাবিধ পণ্যের দোকান। পথের ধুলো মারবার জন্যে ভিস্তিরা মশকে করে জল ছিটচ্ছে। সুন্দর বাগানের মধ্যে আমাদের বাসা। দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন এখানকার গবর্নর। ঘরে নিয়ে গিয়ে চা খাওয়ালেন। এই পরিষ্কার সুসজ্জিত নূতন বাড়িটি আমাদের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিয়ে গৃহস্বামী চলে গেছেন।

১০

কির্মানশা থেকে যাত্রা করে বেরলুম। আজ যেতে হবে কাস্‌রিশিরিনে, পারস্যের সীমানার কাছে। তার পরে আসবে কানিকিন, আরব-সীমানার রেলওয়ে স্টেশন।

পারস্যে প্রবেশপথে আমরা তার যে নীরস মূর্তি দেখেছিলুম এখন আর তা নেই। পাহাড়ের রাস্তার দুই ধারে খেত ভরে উঠেছে ফসলে, গ্রামও অপেক্ষাকৃত ঘন ঘন, চাষীরা চাষ করছে এ দৃশ্যও চোখে পড়ল, তা ছাড়া এই প্রথম গোরু চরতে দেখলুম।

ঘণ্টাদুয়েক পরে সাহাবাদে পৌঁছলুম। এখানে রাজার একটি প্রাসাদ নতুন তৈরি হয়েছে, গবর্নর সেখানে গাছের ছায়ায় বসিয়ে চা খাওয়ালেন, সঙ্গে চললেন, কেরুন্দ-নামক জায়গায় মধ্যাহ্নভোজন করিয়ে আমাদের বিদায় দেবার জন্যে। বড়ো সুন্দর এই গ্রামের চেহারাটি। তরুচ্ছায়ানিবিড় পাহাড়ের কোলে আশ্রিত লোকালয়, ঝর্না ঝরে পড়ছে এদিক-ওদিক দিয়ে, পাথর ডিঙিয়ে। গ্রামের দোকানগুলির মাঝখান দিয়ে উঁচুনিচু আঁকাবাঁকা পথ, কৌতুহলী জনতা জমেছে।

তার পরের থেকে ধরণীর ক্রমেই সেই আবার শুষ্কনৈরাশ্যের মূর্তি। আমরা পারস্যের উচ্চভূমি থেকে নেমে চলেছি। সকলেই ভয় দেখিয়েছিলেন এখান থেকে আমরা অত্যন্ত গরম পাব। তার কোনো লক্ষণ দেখলুম না। হাওয়াটা আমাদের দেশের মাঘ মাসের মতো। পারস্যের শেষ সীমানায় যখন পৌঁছলুম দেখা গেল বোগদাদ থেকে অনেকে এসেছেন আমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে। কেউ কেউ রাজকর্মচারী, কেউ-বা খবরের কাগজের সম্পাদক, অনেকে আছেন সাহিত্যিক, তা ছাড়া প্রবাসী ভারতীয়। এঁরা কেউ কেউ ইংরেজি জানেন। একজন আছেন যিনি ন্যুয়র্কে আমার বক্তৃতা শুনেছেন। সেখানে শিক্ষাতত্ত্ব অধ্যয়ন শেষ করে ইনি এখানকার শিক্ষা-বিভাগের কাজে নিযুক্ত। স্টেশনের ভোজনশালায় চা খেতে বসলুম। একজন বললেন, যাঁরা এখানে আপনাকে অভ্যর্থনা করতে এসেছেন তাঁদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আছেন। 'আমরা সকলেই এক। ভারতীয় মুসলমানেরা ধর্মের নামে কেন যে এমন বিরোধ সৃষ্টি করছে আমরা একেবারেই বুঝতে পারি নে।' ভারতীয়েরাও বলেন, 'এখানকার মুসলমানদের সঙ্গে আমাদের হৃদ্যতার লেশমাত্র অভাব নেই।' দেখা যাচ্ছে ঈজিপ্টে তুরুস্কে ইরাকে পারস্যে সর্বত্র ধর্ম মনুষ্যত্বকে পথ ছেড়ে দিচ্ছে। কেবল ভারতবর্ষেই চলবার পথের মাঝখানে ঘন হয়ে কাঁটাগাছ উঠে পড়ে, হিন্দুর সীমানায় মুসলমানের সীমানায়। এ কি পরাধীনতার মরুদৈন্যে লালিত ঈর্ষাবুদ্ধি, এ কি ভারতবর্ষের অনার্যচিত্তজাত বুদ্ধিহীনতা।

অভ্যর্থনাদলের মধ্যে একজন বৃদ্ধ কবি ছিলেন, আমার চেয়ে দুই-এক বছরের ছোটো। পঙ্গু হয়ে পড়েছেন, শান্ত শুদ্ধ মানুষটি। তাঁর মুখচ্ছবি ভাবুকতায় আবিষ্ট। ইরাকের মধ্যে ইনিই সব চেয়ে বড়ো কবি বলে এঁর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল।

অনেক দিন পরে মোটর ছেড়ে রেলগাড়িতে চড়া গেল। গাড়িগুলি আরামের। দেহটা এতকাল পথে পথে কেবলই ঠোকর খেয়ে নাড়া খেয়ে একদণ্ড নিজেকে ভুলে থাকতে পারছিল না, আজ বাহনের সঙ্গে অবিশ্রাম দ্বন্দ্ব তার মিটে গেল।

জানালার বাইরে এখনো মাঝে মাঝে ফসলের আভাস দেখা যায়, বোধ হয় যেন কোথাও কোথাও খাল-নালা দিয়ে জলসেকের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু মোটের উপরে কঠিন এখানকার ধূসরবর্ণ মাটি।

মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো স্টেশনে অভ্যর্থনার জনতা পেরিয়ে এলুম। যখন শোনা গেল বোগদাদ আর পনেরো মিনিট পথ দূরে তখনো তার পূর্বসূচনা কিছুই নেই, তখনো শূন্য মাঠ ধূ ধূ করছে।

অবশেষে বোগদাদে এসে গাড়ি থামল। স্টেশনে ভিড়ের অন্ত নেই। নানাশ্রেণীর

প্রতিনিধি এসে আমাকে সম্মান জানিয়ে গেলেন, ভারতীয়েরা দিলেন মালা পরিয়ে। ছোটো ছোটো দুটি মেয়ে দিয়ে গেল ফুলের তোড়া। মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে একটি বাঙালি মেয়েকেও দেখলেম। বোগদাদের রাস্তা কতকটা আমাদেরই দেশের দোকান-বাজার-ওয়ালা পথের মতো। একটা বিশেষত্ব আছে, মাঝে মাঝে পথের ধারে কাঠের বেঞ্চি-পাতা চা খাবার এবং মেলামেশা করবার জায়গা। ছোটোখাটো ক্লাবের মতো। সেখানে আসর জমেছে। এক-এক শ্রেণীর লোক এক-একটি জায়গা অধিকার করে থাকে, সেখানে আলাপের প্রসঙ্গে ব্যাবসার জেরও চলে। শহরের মতো জায়গায় এরকম সামাজিকতাচর্চার কেন্দ্র থাকা বিশেষ আবশ্যক সন্দেহ নেই। আগেকার দিনে গল্প বলবার কথক ছিল, তখন তারা এই-সকল পথপ্রান্তসভায় কথা শোনাত। আমাদের দেশে যেমন কথকের ব্যাবসা প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে, এদের এখানেও তাই। এই বিদ্যাটি ছাপার বইয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারলে না। মানুষ আপন রচিত যন্ত্রগুলোর কাছে আপন সহজ শক্তিকে বিকিয়ে দিচ্ছে।

টাইগ্রিস নদীর ধারে একটি হোটেলে আমাদের জায়গা হয়েছে। আমার ঘরের সামনে মস্ত ছাদ, সেখানে বসে নদী দেখা যায়। টাইগ্রিস প্রায় গঙ্গার মতোই প্রশস্ত, ওপারে ঘন গাছের সার, খেজুরের বন, মাঝে মাঝে ইমারত। আমাদের ডান দিকে নদীর উপর দিয়ে ব্রিজ চলে গেছে। এই কাঠের ব্রিজ সৈন্য-পারাপারের জন্য গত যুদ্ধের সময় জেনারেল মড অস্থায়ীভাবে তৈরি করিয়েছিলেন।

চেষ্টা করছি বিশ্রাম করতে, কিন্তু সম্ভাবনা অল্প। নানারকম অনুষ্ঠানের ফর্দ লম্বা হয়ে উঠছে। সকালে গিয়েছিলুম ম্যুজিয়ম দেখতে; নূতন স্থাপিত হয়েছে, বেশি বড়ো নয়, একজন জর্মান অধ্যাপক এর অধ্যক্ষ। অতি প্রাচীন যুগের যে-সব সামগ্রী মাটির নীচে থেকে বেরিয়েছে সেগুলি দেখালেন। এ-সমস্ত পাঁচ-ছয় হাজার বছর আগেকার পরিশিষ্ট। মেয়েদের গহনা, ব্যবহারের পাত্র প্রভৃতি সুদক্ষ হাতে রচিত ও অলংকৃত। অধ্যাপক বলেন, এই জাতের কারুকার্যে স্থূলতা নেই, সমস্ত সুকুমার ও সুনিপুণ। পূর্ববর্তী দীর্ঘকালের অভ্যাস না হলে এমন শিল্পের উদ্ভব হওয়া সম্ভবপর হত না। এদের কাহিনী নেই জানা, কেবল চিহ্ন আছে। এটুকু বোঝা যায় এরা বর্বর ছিল না। পৃথিবীর দিনরাত্রির মধ্য দিয়ে ইতিহাসের স্মরণভ্রষ্ট এই-সব নরনারীর সুখদুঃখের পর্যায় আমাদেরই মতো বয়ে চলত। ধর্মে কর্মে লোকব্যবহারে এদেরও জীবনযাত্রার আর্থিক-পারমার্থিক সমস্যা ছিল বহুবিচিত্র। অবশেষে, কী আকারে ঠিক জানি নে, কোন্ চরম সমস্যা বিরাটমূর্তি নিয়ে এদের সামনে এসে দাঁড়াল, এদের জ্ঞানী কর্মী ভাবুক, এদের পুরোহিত, এদের সৈনিক, এদের রাজা, তার কোনো সমাধান করতে

পারলে না, অবশেষে ধরণীর হাতে প্রাণযাত্রার সম্বল কিছু কিছু ফেলে রেখে দিয়ে সবাইকে চলে যেতে হল। কোথায় গেল এদের ভাষা, কোথায় এদের সব কবি, এদের প্রতিদিনের বেদনা কোনো ছন্দের মধ্যে কোথাও কি সংগ্রহ করা রইল না। কেবল-মাত্র আর আট-দশ হাজার বছরের প্রান্তে ভাবীকালে দাঁড়িয়ে মানুষের আজকের দিনের বাণীর প্রতি যদি কান পাতি, কোনো ধ্বনি কি পৌঁছবে কানে এসে, যদি-বা পৌঁছয় তার অর্থ কি কিছু বুঝতে পারব।

আজ অপরাহ্ণে আমার নিমন্ত্রণ এখানকার সাহিত্যিকদের তরফ থেকে। বাগানের গাছের ছায়ায় আমাদের আসন। ছোটো ছোটো টেবিলে চায়ের আয়োজন জনতার মধ্যে বিক্ষিপ্ত। একে একে নানা লোকে তাঁদের অভিনন্দন পাঠ শেষ করলে সেই বৃদ্ধ কবি তাঁর কবিতা আবৃত্তি করলেন। বজ্রমন্দ্র তাঁর ছন্দপ্রবাহ, আর উদ্দাম তাঁর ভঙ্গি। আমি তাঁদের বললেম, এমন কবিতার অর্থ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই; এ যেন উত্তাল তরঙ্গিত সমুদ্রের বাণী, এ যেন ঝঞ্ঝাহত অরণ্যশাখার উদ্গাথা।

অবশেষে আমার পালা উপস্থিত হতে আমি বললুম, আজ আমি একটি দরবার নিয়ে আপনাদের কাছে এসেছি। একদা আরবের পরম গৌরবের দিনে পূর্বে পশ্চিমে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক ভূভাগ আরব্যের প্রভাব-অধীনে এসেছিল। ভারতবর্ষে সেই প্রভাব যদিও আজ রাষ্ট্রশাসনের আকারে নেই, তবুও সেখানকার বৃহৎ মুসলমান সম্প্রদায়কে অধিকার করে বিদ্যার আকারে, ধর্মের আকারে আছে। সেই দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে আমি আপনাদের বলছি, আরবসাগর পার করে আরব্যের নববাণী আর-একবার ভারতবর্ষে পাঠান— যাঁরা আপনাদের স্বধর্মী তাঁদের কাছে— আপনাদের মহৎ ধর্মগুরুর পুণ্যনামে, আপনাদের পবিত্রধর্মের সুনামী রক্ষার জন্য। দুঃসহ আমাদের দুঃখ, আমাদের মুক্তির অধ্যবসায় পদে পদে ব্যর্থ; আপনাদের নবজাগ্রত প্রাণের উদার আহ্বান সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা থেকে, অমানুষিক অসহিষ্ণুতা থেকে, উদার ধর্মের অবমাননা থেকে, মানুষে মানুষে মিলনের পথে, মুক্তির পথে নিয়ে যাক হতভাগ্য ভারতবর্ষকে। এক দেশের কোলে যাদের জন্ম অন্তরে বাহিরে তারা এক হোক।

রাজা আমাকে চায়ের নিমন্ত্রণ করেছেন নদীর ওপারে তাঁর একটি বাগানবাড়িতে। রাজা একেবারেই আড়ম্বরশূন্য মানুষ, অত্যন্ত সহজ ব্যবহার। খোলা চাতালে আমরা বসলুম, সামনে নীচে বাগান। রাজার ভাইও আছেন তাঁর সঙ্গে। প্রধানমন্ত্রী আছেন— অল্প বয়স, এখানকার সবাই বলেন, আজ পৃথিবীতে সব চেয়ে অল্প বয়সের মন্ত্রী ইনি। যিনি দোভাষীর কাজ করবেন তিনিও উপস্থিত। রাজা বললেন, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের যে দ্বন্দ্ব বেধেছে নিশ্চয়ই সেটা ক্ষণিক। যখন কোনো

দেশে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্‌বোধন আসে তখন প্রথম অবস্থায় তারা নিজেদের বিশিষ্টতা সম্বন্ধে অত্যন্ত বেশি সচেতন হয়ে ওঠে এবং সেইটেকে রক্ষা করবার জন্যে তাদের চেষ্টা প্রবল হয়। এই আকস্মিক বেগটা কমে গেলে মন আবার সহজ হয়ে আসে। আমি বললেম, আজ তুর্কি ইজিপ্ট পারস্যে নবজাগ্রত জাতির যে পরিচয় আমরা পেয়েছি তাতে দেখলুম, যে বিশিষ্টতাবোধ সংকীর্ণভাবে আত্মনিহিত ও অন্যের প্রতি বিরুদ্ধ, সচেষ্টতার সঙ্গেই তার তীব্রতা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, নইলে সেই অন্ধতার দ্বারা জাতির রাষ্ট্রবুদ্ধি অভিভূত হয়। ভারতবর্ষের উদ্‌বোধনে যদি সেই সর্বজনের হিতজনক শুভবুদ্ধির আবির্ভাব দেখতে পেতেম তা হলে নিশ্চিন্ত হতেম। কিন্তু যখন দেখতে পাই হিন্দু-মুসলমান উভয়পক্ষেই শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মঘাতী ধর্মান্ধতা প্রবল হয়ে উঠে রাষ্ট্রসংঘকে প্রতিহত করছে তখন হতাশ হতে হয়।

এই বাগানের ধারে চায়ের টেবিলে সহজ বাক্যালাপের মধ্যে সেদিনের ছবি মনে আনা দুরূহ, যেদিন এই রাজা পথশূন্য মরুভূমির মধ্যে বেদুয়িনদের বহু উপজাতিকে আপন নেতৃত্বের অধীনে এক করে নিয়ে জর্মানি ও তুরস্কের সম্মিলিত অভিযানকে পদে পদে উদ্‌ভ্রান্ত করে বিধ্বস্ত করেছিলেন। মৃত্যুর মূল্যে কিনেছিলেন জীবনের গৌরব। কঠিন ভীষণ সেই রণপ্রাঙ্গণ, জয়ে-পরাজয়ে নিত্যসংশয়িত দুঃসাধ্য সেই অধ্যবসায়। সেই অক্লান্ত রণরঙ্গের অধিনায়ককে দেখলেম। তখনকার মৃত্যুচ্ছায়াক্রান্ত দিনরাত্রির সেই বিভীষিকার মধ্যে তাঁর উষ্ট্রবাহিনীর সঙ্গে কোথাও কোনো-একটা স্থান পাবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু আজ বসেছি চায়ের টেবিলে এই নূতন ইতিহাসসৃষ্টিকর্তার পাশে সহজভাবে; কেননা আমিও অন্য উপকরণ নিয়ে মানুষের ইতিহাসসৃষ্টিতে আপন শক্তি উৎসর্গ করেছি। সেই স্বতন্ত্র অথচ যথার্থ সহযোগিতার মূল্য যদি না এই বীর বুঝতে পারতেন তবে তাঁর যুদ্ধবিজয়ী শৌর্য আপন মূল্য অনেকখানি হারাত। কর্নেল লরেন্স বলেছেন, আরবের মহৎ লোকদের মধ্যে মহম্মদ ও সালাদিনের নীচেই রাজা ফয়সলের স্থান। এই মহত্ত্বের সরলমূর্তি দেখেছি তাঁর সহজ আতিথ্যে, এবং তাঁকে অভিবাদন করেছি। বর্তমান এশিয়ায় যাঁরা প্রবল শক্তিতে নূতন যুগের প্রবর্তন করেছেন তাঁদের দুজনকেই দেখলুম অল্পকালের ব্যবধানে। দুজনেরই মধ্যে স্বভাবের একটি মিল দেখা গেল— উভয়েই আড়ম্বরহীন স্বচ্ছ সরলতার মধ্যে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশমান।

১১

এখান থেকে বিদায় হয়ে গেলেম এখানকার ছাত্রীদের নিমন্ত্রণসভায়। সংকীর্ণ সুদীর্ঘ আঁকাবাঁকা গলি। পুরাতন বাড়ি দুই ধারে সার বেঁধে উঠেছে, কিন্তু তার ভিতরকার লোকযাত্রা বাইরে থেকে কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। নিমন্ত্রণগৃহের প্রাঙ্গণে সব মেয়েরা বসেছে। এক ধারে কয়েকটি মেয়ে আলাদা স্থান নিয়েছেন, তাঁরা কালো কাপড়ে সম্বৃত, কিন্তু মুখ ঢাকা নয়। বাকি সবাই বিলাতি পোশাক পরা, স্তব্ধ শান্ত হয়ে থাকবার চেষ্টামাত্র নেই, হাসিগল্পে সভা মুখরিত। প্রাঙ্গণের সম্মুখপ্রান্ত আমাদের দেশের চণ্ডীমণ্ডপের মতো। তারই রোয়াকে আমার চৌকি পড়েছে। অনুরোধে পড়ে কিছু আমাকে বলতে হল; বলা হলেই কয়েকজন মেয়ে এসে আমাকে ফরমাশ করলেন আমার কাব্য আবৃত্তি করতে। আগের দিনে এঁরা আবৃত্তি শুনেছিলেন। নিজের লেখা কিছু তো মনে পড়ে না। অনেক চেষ্টা করে 'খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে' কবিতার প্রথম শ্লোক পড়ে গেলেম, একটা জায়গায় ঠেকে যেতেই অর্থহীন শব্দ দিয়ে ছন্দ পূরণ করে দিলুম।

তার পর সন্ধ্যাবেলায় ভোজনের নিমন্ত্রণ। শিক্ষাবিভাগের লোকেরা আয়োজন করেছেন। নদীর ধারের দিকে প্রকাণ্ড একটা ছাদ, সেখানে আলোকমালার নীচে বসে গেছেন অনেক লোক। আমাদের সেই বৃদ্ধ কবিও আমার কাছেই ছিলেন। আহারের পর আমার অভিনন্দন সারা হলে আমাকে কিছু বলতে হল, কেননা শিক্ষা সম্বন্ধে আমার কী মত এঁরা শুনতে চেয়েছিলেন।

শ্রান্তি ঘনীভূত হয়ে আসছে। আমার পক্ষে নড়েচড়ে দেখে শুনে বেড়ানো অসম্ভব হয়ে এল। কথা ছিল সকালে টেসিফোনের (Ctesiphon) ভগ্নাবশেষ দেখতে যেতে হবে। আমি ছাড়া আমার দলের বাকি সবাই দেখতে গেলেন। একদা এই শহরের গৌরব ছিল অসামান্য। পার্থিয়ানেরা এর পত্তন করে। পারস্যে অনেকদিন পর্যন্ত এদের রাজত্ব ছিল। রোমকেরা বারবার এদের হাতে পরাস্ত হয়েছে। পূর্বেই বলেছি পার্থীয়েরা খাঁটি পারসিক ছিল না। তারা তুর্ক ছিল বলে অনুমান করা হয়, শিক্ষাদীক্ষা অনেকটা পেয়েছিল গ্রীকদের কাছ থেকে। ২২৮ খ্রীস্টাব্দে আর্দাশির পার্থীয়দের জয় করে আবার পারস্যকে পারসিক শাসন ও ধর্মের অধীনে এক করে তোলেন। ইনিই সাসানীয় বংশের প্রথম রাজা। তার পরে বারবার রোমানদের উপদ্রব এবং সবশেষে আরবদের আক্রমণ এই শহরকে অভিভূত করেছিল। জায়গাটা অস্বাস্থ্যকর বলে আরবেরা এখান থেকে সমস্ত মালমসলা সরিয়ে বোগদাদে রাজধানী

স্থাপন করে— টেসিফোন ধুলোয় গেল মিলিয়ে, বাকি রইল বৃহৎ প্রাসাদের একটুখানি খিলান। এই প্রাসাদ প্রথম খসরুর আদেশে নির্মিত হয় সাসানীয় যুগের মহাকায় স্থাপত্যশিল্পের একটি অতি আশ্চর্য দৃষ্টান্তরূপে।

সন্ধ্যাবেলায় রাজার ওখানে আহারের নিমন্ত্রণ। ঐশ্বর্যগৌরব প্রমাণ করবার জন্যে কোথাও লেশমাত্র চেষ্টা নেই। রাজার এই অনাড়ম্বর গাম্ভীর্যে আমার চিত্তকে সব চেয়ে আকর্ষণ করে। পারিষদবর্গ যাঁরা একত্রে আহার করছিলেন হাস্যালাপে তাঁদের সকলের সঙ্গে এঁর অতি সহজ সম্বন্ধ। আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরাও বিশেষ ভোজে আহারের পরিমাণে ও আয়োজনে নির্বোধের মতো যে অতিবাহুল্য করে থাকে রাজার ভোজে তা দেখলুম না। লম্বা টেবিলের উপর সাদা চাদর পাতা। বিরলভাবে কয়েকটি ফুলের তোড়া আছে, তা ছাড়া সাজসজ্জার চমক নেই একটুও। এতে আতিথ্যের যথার্থ আরাম পাওয়া যায়।

বউমা রানীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন— ভদ্রঘরের গৃহিণীর মতো আড়ম্বরহীন সরল অমায়িক ব্যবহার, নিজেকে রানী বলে প্রমাণ করবার প্রয়াসমাত্র নেই।

আজ একজন বেদুয়িন দলপতির তাঁবুতে আমার নিমন্ত্রণ আছে। প্রথমটা ভাবলুম পারব না, শরীরটার প্রতি করুণা করে না যাওয়াই ভালো। তার পরে মনে পড়ল, একদা আস্ফালন করে লিখেছিলুম, 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন।' তখন বয়স ছিল তিরিশের কাছ ঘেঁষে, সে তিরিশ আজ পিছনের দিগন্তে বিলীনপ্রায়। তা হোক, কবিতাটাকে কিছু পরিমাণে পরখ করে না এলে মনে পরিতাপ থাকবে। সকালে বেরিয়ে পড়লুম। পথের মধ্যে হঠাৎ নিয়ে গেল ট্রেনিং স্কুলের ছেলেদের মাঝখানে, হঠাৎ তাদের কিছু বলতেও হল। পথে পথে কত কথাই ছড়াতে হয়, সে পাকা ফল নয়, সে ঝরা পাতা, কেবলমাত্র ধুলোর দাবি মেটাবার জন্যে।

তার পরে গাড়ি চলল মরুভূমির মধ্যে দিয়ে। বালুমরু নয়, শক্ত মাটি। মাঝে মাঝে নদী থেকে জল এনেছে নালা কেটে, তাই এখানে ওখানে কিছু কিছু ফসলের আভাস দেখা দিয়েছে। পথের মধ্যে দেখা গেল নিমন্ত্রণকর্তা আর-এক মোটরে করে চলেছেন, তাঁকে আমাদের গাড়িতে তুলে নেওয়া হল। শক্ত মানুষ, তীক্ষ্ণ চক্ষু; বেদুয়িনী পোশাক।

অর্থাৎ, মাথায় একখণ্ড সাদা কাপড় ঘিরে আছে কালো বিড়ের মতো বস্ত্রবেষ্টনী। ভিতরে সাদা লম্বা আঙিয়া, তার উপরে কালো পাতলা জোব্বা। আমার সঙ্গীরা

বললেন, যদিও ইনি পড়াশুনো করেন নি বললেই হয়, কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি। তিনি এখানকার পার্লামেণ্টের একজন মেম্বর।

রৌদ্রে ধূ ধূ করছে ধূসর মাটি, দূরে কোথাও কোথাও মরীচিকা দেখা দিল। কোথাও মেষপালক নিয়ে চলেছে ভেড়ার পাল, কোথাও চরছে উট, কোথাও-বা ঘোড়া। হু হু করে বাতাস বইছে, মাঝে মাঝে ঘুর খেতে খেতে ছুটেছে ধূলির আবর্ত। অনেক দূর পেরিয়ে এঁদের ক্যাম্পে এসে পৌঁছলুম। একটা বড়ো খোলা তাঁবুর মধ্যে দলের লোক বসে গেছে, কফি সিদ্ধ হচ্ছে, খাচ্ছে ঢেলে ঢেলে।

আমরা গিয়ে বসলুম একটা মস্ত মাটির ঘরে। বেশ ঠাণ্ডা। মেঝেতে কার্পেট, এক প্রান্তে তক্তপোশের উপর গদি পাতা। ঘরের মাঝখান বেয়ে কাঠের থাম, তার উপরে ভর দিয়ে লম্বা লম্বা খুঁটির 'পরে মাটির ছাদ। আত্মীয়বান্ধবেরা সব এদিকে-ওদিকে, একটা বড়ো কাঁচের গুড়গুড়িতে একজন তামাক টানছে। ছোটো আয়তনের পেয়ালা আমাদের হাতে দিয়ে তাতে অল্প একটু করে কফি ঢাললে, ঘন কফি, কালো তেতো। দলপতি জিজ্ঞাসা করলেন আহার ইচ্ছা করি কি না, 'না' বললে আনবার রীতি নয়। ইচ্ছা করলেম, অভ্যন্তরে তাগিদও ছিল। আহার আসবার পূর্বে শুরু হল একটু সংগীতের ভূমিকা। গোটাকতক কাঠির উপরে কোনোমতে চামড়া-জড়ানো একটা তেড়াবাঁকা একতারা যন্ত্র বাজিয়ে একজন গান ধরলে। তার মধ্যে বেদুয়িনী তেজ কিছুই ছিল না। অত্যন্ত মিহিচড়া গলায় নিতান্ত কান্নার সুরে গান। একটা বড়ো জাতের পতঙ্গের রাগিণী বললেই হয়। অবশেষে সামনে চিলিম্‌চি ও জলপাত্র এল। সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে প্রস্তুত হয়ে বসলুম। মেঝের উপর জাজিম পেতে দিলে। পূর্ণচন্দ্রের ডবল আকারের মোটা মোটা রুটি, হাতাওয়ালা অতি প্রকাণ্ড পিতলের থালায় ভাতের পর্বত আর তার উপর মস্ত এবং আস্ত একটা সিদ্ধ ভেড়া। দু-তিনজন জোয়ান বহন করে মেঝের উপর রাখলে। পূর্ববর্তী মিহিকরুণ রাগিণীর সঙ্গে এই ভোজের আকৃতি ও প্রকৃতির কোনো মিল পাওয়া যায় না। আহারার্থীরা সব বসল থালা ঘিরে। সেই এক থালা থেকে সবাই হাতে করে মুঠো মুঠো ভাত প্লেটে তুলে নিয়ে আর মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল। ঘোল দিয়ে গেল পানীয়রূপে। গৃহকর্তা বললেন, আমাদের নিয়ম এই যে, অতিথিরা যতক্ষণ আহার করতে থাকে আমরা অভুক্ত দাঁড়িয়ে থাকি, কিন্তু সময়াভাবে আজ সে নিয়ম রাখা চলবে না। তাই অদূরে আর-একটা প্রকাণ্ড থালা পড়ল। তাতে তাঁরা স্বজনবর্গ বসে গেলেন। যে অতিথিদের সম্মান অপেক্ষাকৃত কম আমাদের ভুক্তাবশেষ তাঁদের ভাগে পড়ল। এইবার হল নাচের ফরমাশ। একজন একঘেয়ে সুরে বাঁশি বাজিয়ে

চলল, আর এরা তার তাল রাখলে লাফিয়ে লাফিয়ে। একে নাচ বললে বেশি বলা হয়। যে ব্যক্তি প্রধান, হাতে একখানা রুমাল নিয়ে সেইটে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আগে আগে নাচতে লাগল, তারই কিঞ্চিৎ ভঙ্গির বৈচিত্র্য ছিল। ইতিমধ্যে বউমা গেলেন এদের অন্তঃপুরে। সেখানে মেয়েরা তাঁকে নাচ দেখালেন, তিনি বলেন সে নাচের মতো নাচ বটে— বোঝা গেল য়ুরোপীয় নটীরা প্রাচ্য নাচের কায়দায় এদের অনুকরণ করে, কিন্তু সম্পূর্ণ রস দিতে পারে না।

তার পরে বাইরে এসে যুদ্ধের নাচ দেখলুম। লাঠি ছুরি বন্দুক তলোয়ার নিয়ে আস্ফালন করতে করতে, চিৎকার করতে করতে, চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে, তাদের মাতুনি— ও দিকে অন্তঃপুরের দ্বার থেকে মেয়েরা দিচ্ছে তাদের উৎসাহ। বেলা চারটে পেরিয়ে গেল, আমরা ফেরবার পথে গাড়িতে উঠলুম, সঙ্গে চললেন আমাদের নিমন্ত্রণকর্তা।

এরা মরুর সন্তান, কঠিন এই জাত, জীবনমৃত্যুর দ্বন্দ্ব নিয়ে এদের নিত্য ব্যবহার। এরা কারো কাছে প্রশ্রয়ের প্রত্যাশা রাখে না, কেননা পৃথিবী এদের প্রশ্রয় দেয় নি। জীববিজ্ঞানে প্রকৃতি কর্তৃক বাছাইয়ের কথা বলে; জীবনের সমস্যা সুকঠোর করে দিয়ে এদেরই মাঝে যথার্থ কড়া বাছাই হয়ে গেছে, দুর্বলেরা বাদ পড়ে যারা নিতান্ত টিঁকে গেল এরা সেই জাত। মরণ এদের বাজিয়ে নিয়েছে। এদের যে এক-একটি দল তারা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, এদের মাতৃভূমির কোলের পরিসর ছোটো; নিত্য বিপদে বেষ্টিত জীবনের স্বল্প দান এরা সকলে মিলে ভাগ ক'রে ভোগ করে। এক বড়ো থালে এদের সকলের অন্ন, তার মধ্যে শৌখিন রুচির স্থান নেই; তারা পরস্পরের মোটা রুটি অংশ করে নিয়েছে, পরস্পরের জন্যে প্রাণ দেবার দাবি এই এক রুটি ভাঙার মধ্যেই। বাংলাদেশের নদীবাহুবেষ্টিত সন্তান আমি, এদের মাঝখানে বসে খাচ্ছিলুম আর ভাবছিলুম, সম্পূর্ণ আলাদা ছাঁচে তৈরি মানুষ আমরা উভয়ে। তবুও মনুষ্যত্বের গভীরতর বাণীর যে ভাষা সে ভাষায় আমাদের সকলেরই মন সায় দেয়। তাই এই অশিক্ষিত বেদুয়িন-দলপতি যখন বললেন 'আমাদের আদিগুরু বলেছেন যার বাক্যে ও ব্যবহারে মানুষের বিপদের কোনো আশঙ্কা নেই সেই যথার্থ মুসলমান', তখন সে কথা মনকে চমকিয়ে দিলে। তিনি বললেন, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানে যে বিরোধ চলছে এ পাপের মূল রয়েছে সেখানকার শিক্ষিত লোকদের মনে। এখানে অল্পকাল পূর্বে ভারতবর্ষ থেকে কোনো-কোনো শিক্ষিত মুসলমান গিয়ে ইসলামের নামে হিংস্র-ভেদবুদ্ধি প্রচার করবার চেষ্টা করেছিলেন; তিনি বললেন, আমি তাঁদের সত্যতায় বিশ্বাস করি নে, তাই তাঁদের ভোজের নিমন্ত্রণে যেতে অস্বীকার করেছিলেম, অন্তত

আরবদেশে তাঁরা শ্রদ্ধা পান নি। আমি এঁকে বললেম, একদিন কবিতায় লিখেছি 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন'— আজ আমার হৃদয় বেদুয়িন-হৃদয়ের অত্যন্ত কাছে এসেছে, যথার্থই আমি তাদের সঙ্গে এক অন্ন খেয়েছি অন্তরের মধ্যে।

তার পরে যখন আমাদের মোটর চলল, দুই পাশের মাঠে এদের ঘোড়সওয়াররা ঘোড়া ছোটাবার খেলা দেখিয়ে দিলে। মনে হল মরুভূমির ঘূর্ণা-হাওয়ার দল শরীর নিয়েছে।

বোধ হচ্ছে আমার ভ্রমণ এই 'আরব বেদুয়িনে' এসেই শেষ হল। দেশে যাত্রা করবার আর দু-তিন দিন বাকি, কিন্তু শরীর এত ক্লান্ত যে এর মধ্যে আর-কোনো দেখাশোনা চলবে না। তাই এই মরুভূমির বন্ধুত্বের মধ্যে ভ্রমণের উপসংহারটা ভালোই লাগছে। আমার বেদুয়িন নিমন্ত্রণকর্তাকে বললুম যে, বেদুয়িন-আতিথ্যের পরিচয় পেয়েছি, কিন্তু বেদুয়িন-দস্যুতার পরিচয় না পেলে তো অভিজ্ঞতা শেষ করে যাওয়া হবে না। তিনি হেসে বললেন, তার একটু বাধা আছে। আমাদের দস্যুরা প্রাচীন জ্ঞানীলোকদের গায়ে হস্তক্ষেপ করে না। এইজন্যে মহাজনরা যখন আমাদের মরুভূমির মধ্যে দিয়ে পণ্য নিয়ে আসে তখন অনেক সময় বিজ্ঞ চেহারার প্রবীণ লোককে উটের 'পরে চড়িয়ে তাদের কর্তা সাজিয়ে আনে। আমি তাঁকে বললুম, চীনে ভ্রমণ করবার সময় আমার কোনো চৈনিক বন্ধুকে বলেছিলেম, 'একবার চীনের ডাকাতের হাতে ধরা পড়ে আমার চীনভ্রমণের বিবরণটাকে জমিয়ে তুলতে ইচ্ছা করে।' তিনি বললেন, 'চীনের ডাকাতেরা আপনার মতো বৃদ্ধ কবির 'পরে অত্যাচার করবে না, তারা প্রাচীনকে ভক্তি করে।' সত্তর বছর বয়সে যৌবনের পরীক্ষা চলবে না। নানা স্থানে ঘোরা শেষ হল, বিদেশীর কাছ থেকে কিছু ভক্তি নিয়ে, শ্রদ্ধা নিয়েই দেশে ফিরে যাব, তার পরে আশা করি কর্মের অবসানে শান্তির অবকাশ আসবে। যুবকে যুবকে দ্বন্দ্ব ঘটে, সেই দ্বন্দ্বের আলোড়নে সংসারপ্রবাহের বিকৃতি দূর হয়। দস্যু যখন বৃদ্ধকে ভক্তি করে তখন সে তাকে আপন জগৎ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। যুবকের সঙ্গেই তার শক্তির পরীক্ষা, সেই দ্বন্দ্বের আঘাতে শক্তি প্রবল থাকে, অতএব ভক্তির সুদূর অন্তরালে পঞ্চাশোর্ধ্বং বনং ব্রজেৎ।

গ্রন্থপরিচয়

রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশের তারিখ ও রচনা-সংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য গ্রন্থপরিচয়ে সংকলিত হইল।

প্রান্তিক

'প্রান্তিক' ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়।

এই গ্রন্থের প্রায় সব কয়টি কবিতাই ১৯৩৭ সেপ্টেম্বর মাসের সংকটাপন্ন রোগ হইতে মুক্তিলাভের অব্যবহিত পরে রচিত হয়। ১৪, ১৫ এবং ১৬-সংখ্যক কবিতা কয়েক বৎসর পূর্বের রচনা।

১৪-সংখ্যক কবিতাটি 'চাঁদপুর য়ুনিয়ন ইন্‌স্টিট্যুটে ত্রিসপ্ততিতম রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে কবিগুরুর আশীর্বাদবাণী' রূপে প্রেরিত হয়।

১৫-সংখ্যক কবিতাটি বিচিত্রার ১৩৪১ কার্তিক সংখ্যায় 'শরৎ' নামে মুদ্রিত হয়। শেষসপ্তকের ২৩-সংখ্যক কবিতা ইহার গদ্য পাঠান্তর বলা যাইতে পারে।

১৬-সংখ্যক কবিতাটি 'শেষ সপ্তক' গ্রন্থের ৩৪-সংখ্যক কবিতার সহিত তুলনীয়।

১৩-সংখ্যক কবিতার দুইটি পূর্বপাঠ নিম্নে মুদ্রিত হইল—

জন্মের দিন করেছিল দান তোমারে পরম মূল্য,
রূপমহিমায় হলে মহীয়ান সূর্যতারার তুল্য।
দূর আকাশের পথে যে আলোক এসেছে ধরার বক্ষে
নিমেষে নিমেষে চুমি তব চোখ তোমারে বেঁধেছে সখ্যে।
দূর যুগ হতে আসে কত বাণী কালের পথের যাত্রী,
সে মহাবাণীরে লয় সম্মানি তোমার দিবসরাত্রি।

—প্রবাসী। অগ্রহায়ণ ১৩৪৩, পৃ. ২৫০

জন্মের দিনে দিয়েছিল আজি তোমারে পরম মূল্য
রূপসত্তায় এলে যবে সাজি, সূর্যতারার তুল্য।
দূর আকাশের পথে যে আলোক এসেছে ধরার বক্ষে
নিমেষে নিমেষে চুমি তব চোখ তোমারে বেঁধেছে সখ্যে।

দূর যুগ হতে আসে কত বাণী কালের পথের যাত্রী,
সে মহাবাণীরে লয় সম্মানি তোমার দিবসরাত্রি।
সম্মুখে তব গেছে দূর-পানে জীবযাত্রার পন্থ,
তুমি সেথা চল— বলো কেবা জানে এ রহস্যের অন্ত।

২২।৩।৩৪

—জয়শ্রী। বৈশাখ ১৩৪১

১৮-সংখ্যক কবিতাটির প্রসঙ্গে রবীন্দ্রসদনে-রক্ষিত 'বর্ষামঙ্গল' পাণ্ডুলিপির নিম্নসংকলিত উপসংহারের অংশ তুলনীয়—

নটরাজ। পালার শেষে শান্তিবাচনিকের নিয়ম আছে। আজ বিষধর নাগিনীরা জগতের চার দিকে ফণা তুলে গর্জন করছে। আজ শান্তির কথা পরিহাসের মতো শোনাবে। তাই উপসংহারে ডাক দিয়ে যাই তাদের, অকল্যাণের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্যে যারা প্রস্তুত।

[?১৯৩৭]

সেঁজুতি

'সেঁজুতি' ১৩৪৫ সালের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রসদনের পাণ্ডুলিপির সাহায্যে বর্তমান সংস্করণে কয়েকটি কবিতার রচনা-তারিখ সংশোধিত ও সংযোজিত হইয়াছে।

গ্রন্থারম্ভের 'জন্মদিন' কবিতাটি ১৩৪৫ সালের ২৫ বৈশাখ সন্ধ্যায় কালিম্পঙে গৌরীপুরভবন হইতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জন্মবাসর উপলক্ষে রেডিয়োতে পাঠ করিয়াছিলেন।

'পত্রোত্তর' কবিতাটি স্বরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয়ের প্রেরিত 'কবি নারদ' (প্রবাসী। আষাঢ় ১৩৪৫) কবিতার উত্তরে লিখিত।

'পলায়নী' কবিতাটির প্রথম দুইটি স্তবক ১৩৪৪ জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে অনুরূপ মুদ্রিত হইয়াছিল। প্রথম স্তবকের শেষাংশ ও দ্বিতীয় স্তবকের আরম্ভাংশ 'সেঁজুতি'র পাঠে বর্জিত হইয়াছে। সেই বর্জিত অংশ নিম্নে প্রবাসী হইতে উদ্‌ধৃত হইল —

পলায়নভীরু পুরী দিনরাত
তোমার সমুখে জোড় করে হাত,
বাঁধা ঘাটে ঘাটে রচে প্রণিপাত,
মাথা হেঁট করে তীরে।

মাটির কণ্ঠে যেখানে অভয়
মিথ্যা ভাষায় রটে,
সেথা ভিড় করে যত লোকালয়
ভাঙন-লুকানো তটে।
মুখরিত হয় স্থিতিভিক্ষার
বন্দনাধ্বনি সেথা বার বার,
কল্পিত করে প্রার্থনা তার
শিল্পিত মন্দিরে।

প্রবাসীতে উক্ত কবিতার চতুর্থ স্তবকের পর ('সেঁজুতি'র পাঠে তৃতীয় স্তবকের পর) নিম্নমুদ্রিত একটি সম্পূর্ণ নূতন স্তবক পাওয়া যায়—

উধাও বাতাসে মেঘ ভেসে আসে
বহিয়া রঙিন ছায়া।
তোমারি ছন্দে রচিছে আকাশে
ক্ষণিকের চিরমায়া।
বনের প্রবাহ তব তীরে তীরে
সবুজ পাতার বন্যার নীরে
কভু ঝড়ে কভু শান্ত সমীরে
তোমারি ছন্দ যাচে।
তোমারি ছন্দে পাখির ওড়া সে,
তোমারি ছন্দে ফুল ফোটে ঘাসে,
অনিত্য তারা তব ইতিহাসে
নিত্য নাচনে নাচে।

'তীর্থযাত্রিণী' কবিতাটির উপসংহারে প্রবাসীতে (অগ্রহায়ণ ১৩৪৪) এই দুইটি অতিরিক্ত পঙ্‌ক্তি মুদ্রিত হইয়াছিল—

সংসারে মরীচিকারে বিশ্বাস করিয়াছিল ও যে,
সংসার বাহির-তীরে পুন ফিরে তারি ব্যর্থ খোঁজে।

'জন্মদিন' কবিতাটির চতুর্থ স্তবকের পরে প্রবাসীতে (আষাঢ় ১৩৪৪) এই বর্জিত স্তবকটি পাওয়া যায়—

আজ কেন ওর মনে লাগে, এবার যাত্রাশেষে
নৌকো আবার পাড়ি দিল আরেক ছুটির দেশে।

এ ঘাট থেকে বোঝাই ক'রে চলেছে স্রোত বাহি
সেই পসরা হিসাব যাহার নাহি,
আপনাতে যা আপনি অফুরান,
ভাঙা বাঁশির মৌন-পারে জমেছে যার গান।

নবীন

'নবীন' ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে রচিত হয়। ওই সালের চৈত্র মাসে কলিকাতায় নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে উহা মঞ্চস্থ হইবার উপলক্ষে ওই নামের গীতিনাটিকাটি পুস্তিকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে 'বনবাণী' গ্রন্থে (আশ্বিন ১৩৩৮) পরিবর্তিত আকারে 'নবীন' পুনরায় প্রকাশিত হয়। প্রধানত, অন্যত্র-ব্যবহৃত পুরাতন গানগুলি ও তৎপ্রাসঙ্গিক কথাবস্তু এই সংস্করণে বর্জিত হয়। বর্তমান খণ্ডে 'বনবাণী'র অন্তর্গত সেই শেষ পাঠই মুদ্রিত হইল। পুস্তিকাকারে প্রকাশিত প্রথম পাঠও পরিশিষ্টে মুদ্রিত রহিল।

শাপমোচন

'শাপমোচন' ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের [১৯৩১] ১৫ পৌষ তারিখে 'রবীন্দ্রজয়ন্তী-ছাত্রছাত্রী-উৎসবপরিষৎ'-কর্তৃক পুস্তিকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৫ ও ১৬ পৌষ রাত্রে কবির জোড়াসাঁকো-ভবনে নৃত্যগীত ও পাঠ-সহযোগে ইহা প্রথম-অভিনীত হইয়াছিল।

উক্ত পুস্তিকার কথিকা অংশ ১৩৩৮ সালের মাঘ-সংখ্যা বিচিত্রায় মুদ্রিত হয়, এবং ১৩৩৯ সালের আশ্বিন মাসে স্বতন্ত্র কবিতা আকারে উহা 'পুনশ্চ' গ্রন্থের অন্তর্গত হয় (রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষোড়শ খণ্ড)। পরে ১৩৩৯ সালে ১৫ ও ১৬ চৈত্র রাত্রে [২৯, ৩০ মার্চ ১৯৩৩] এম্পায়ার থিয়েটারে পুনরভিনয়কালে শাপমোচনের একটি পরিমার্জিত নাট্যরূপ প্রকাশিত হয়। তাহাতে গানেরও অনেক অদল-বদল করা হয়। বর্তমান খণ্ডে 'শাপমোচন' সেই পরিমার্জিত নাট্য-আকারে মুদ্রিত হইল।

১৩৩৮ সালের প্রথম নৃত্যাভিনয়ে ব্যবহৃত গানগুলির প্রথম পঙ্‌ক্তি মুদ্রিত পুস্তিকার ক্রম-অনুসারে নিম্নে উল্লেখ করা হইল—

১। পাছে সুর ভুলি এই ভয় হয়
২। ভরা থাক্‌ স্মৃতিসুধায়

৩। তুমি কি কেবল ছবি
৪। তোমার আনন্দ ওই এল দ্বারে
৫। বাজো রে বাঁশরি, বাজো
৬। লহো লহো তুলে লহো নীরব বীণাখানি
৭। যে কেবল পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়
৮। কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে
৯। আন্‌মনা গো আন্‌মনা
১০। আমি এলেম তারি দ্বারে
১১। চোখ যে ওদের ছুটে চলে গো
১২। বসন্তে ফুল গাঁথল আমার জয়ের মালা
১৩। এসো আমার ঘরে
১৪। বাহিরে ভুল হানবে যখন
১৫। পাখি আমার নীড়ের পাখি
১৬। না যেয়ো না যেয়ো নাকো
১৭। সখী, আঁধারে একেলা ঘরে
১৮। অরূপবীণা রূপের আড়ালে
১৯। মোর বীণা ওঠে কোন্ সুরে বাজি

'পরবাসী চলে এসো ঘরে' ও 'দে পড়ে দে আমায় তোরা' এই দুইটি গান পুস্তিকায় মুদ্রিত না থাকিলেও অভিনয়ে সংযোজিত হইয়াছিল।

১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে 'শাপমোচন' মাদ্রাজে মঞ্চস্থ হইবার অনতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি নূতন গান বিশেষভাবে এই নাটিকাটির জন্যই রচনা করেন। গানগুলি বর্তমান খণ্ডে শাপমোচনের সংযোজন-অংশে মুদ্রিত হইল। উহার মধ্যে দুই-একটি গান শেষ পর্যন্ত উক্ত অভিনয়ে ব্যবহৃত হয় নাই বলিয়া মনে হয়। মাদ্রাজের এই অভিনয়প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৪ সালের ৩১ অক্টোবর তারিখের এক পত্রে প্রতিমা দেবীকে লেখেন—

আমাদের এখানকার পালা আজ শেষ হবে। জিনিসটা [শাপমোচন] এবার সবসুদ্ধ অন্যবারের চেয়ে অনেক বেশি সম্পূর্ণতর হয়েছে।

—পত্র ৪৪, চিঠিপত্র, ৩য় খণ্ড

'বঁধু, কোন্ মায়া লাগল চোখে' ও 'মায়াবনবিহারিণী হরিণী' গান দুইটি বাদে

শাপমোচনের এই নূতন গানগুলি ও উহাদের স্বরলিপি ১৩৪১-৪২ সালের প্রবাসী ও বিচিত্রায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৩৪৭ সালের পৌষ মাসে [১৯৪০] শান্তিনিকেতনে শাপমোচনের যে অভিনয় হয় রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় নাটিকাটির উহাই শেষ অভিনয়। উক্ত অভিনয়ে ব্যবহারের জন্য রবীন্দ্রনাথ নিজে যে গানগুলি নির্বাচন করিয়া দেন শ্রীশান্তিদেব ঘোষের সৌজন্যে নিম্নে তাহার তালিকা মুদ্রিত হইল—

প্রথম দৃশ্য। ইন্দ্রসভা

১। নহ মাতা, নহ কন্যা
২। হে মহাদুঃখ, হে রুদ্র
৩। ভরা থাক্ স্মৃতিসুধায়

দ্বিতীয় দৃশ্য। অরুণেশ্বরের প্রাসাদ

১। তিমিরবিভাবরী কাটে কেমনে
২। ওরে চিত্ররেখাডোরে
৩। তুমি কি কেবল ছবি
৪। কখন দিলে পরায়ে

তৃতীয় দৃশ্য। মদ্ররাজগৃহে কমলিকা

১। কেন নয়ন আপনি ভেসে যায়
২। তোমায় সাজাব যতনে
৩। দে পড়ে দে আমায় তোরা
৪। বাজিবে, সখী, বাঁশি বাজিবে
৫। বঁধু, কোন্ মায়া লাগল চোখে
৬। তোমার আনন্দ ওই এল দ্বারে
৭। বাজো রে বাঁশরি, বাজো
৮। লহো লহো তুলে লহো

চতুর্থ দৃশ্য। পতিগৃহে রাজবধূ

১। হে সখা, বারতা পেয়েছি মনে মনে
২। কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে
৩। কাছে থেকে দূর রচিল
৪। আন্‌মনা আন্‌মনা

৫। হায় রে, ওরে যায় না কি জানা
৬। বসন্তে ফুল গাঁথল আমার
৭। অসুন্দরের পরম বেদনায়
৮। একদিন সইতে পারবে, সইতে পারবে
৯। তোমার এ কী অনুকম্পা অসুন্দরের তরে
১০। না, যেয়ো না, যেয়ো নাকো।

পঞ্চম দৃশ্য। নির্জন বনে রানী

১। সখী, আঁধারে একেলা ঘরে
২। কোন্ গহন অরণ্যে তারে
৩। ও কি এল, ও কি এল না
৪। মোর বীণা ওঠে কোন্ সুরে বাজি

উল্লিখিত চতুর্থ দৃশ্যের ৮ ও ৯ -সংখ্যক গানের পাঠ এই গ্রন্থে মুদ্রিত পাঠ হইতে ভিন্ন। তুলনার্থ নিম্নে মুদ্রিত হইল—

রাজা। একদিন সইতে পারবে, সইতে পারবে, তোমার আপনার দাক্ষিণ্যে, রসের দাক্ষিণ্যে।

রানী। তোমার এ কী অনুকম্পা অসুন্দরের তরে, তাহার অর্থ বুঝি নে। ওই শোনো ওই শোনো, উষার কোকিল ডাকে অন্ধকারের মধ্যে, তারে আলোর পরশ লাগে। তেমনি তোমার হোক্-না প্রকাশ আমার দিনের মাঝে, আজি সূর্যোদয়ের কালে।

কালের যাত্রা

'কালের যাত্রা' বাংলা ১৩৩৯ সালের [১৯৩২] ভাদ্র মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

১৩৩০ সালের অগ্রহায়ণ-সংখ্যা প্রবাসীতে (পৃ. ২১৬-২২৫) 'রথযাত্রা' নামে রবীন্দ্রনাথের একটি নাটিকা প্রকাশিত হয়। 'রথের রশি' তাহারই পরিবর্তিত ও আগাগোড়া-পুনর্লিখিত রূপ। বর্তমান সংস্করণে 'কালের যাত্রা'র পরিশিষ্টরূপে 'রথযাত্রা' নাটিকাটি প্রবাসী হইতে মুদ্রিত হইল। স্বতন্ত্র গ্রন্থে বৈশাখ ১৩৭৮ সংস্করণে পরিশিষ্টরূপে মুদ্রিত হইয়াছে।

'কবির দীক্ষা'র পূর্বপাঠ ১৩৩৫ সালের বৈশাখ-সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় (পৃ. ২-৪) 'শিবের ভিক্ষা' নামে প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সপ্তপঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব-উপলক্ষে [ভাদ্র ১৩৩৯] লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রের প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নে উদ্‌ধৃত হইল—

তোমার জন্মদিন উপলক্ষে 'কালের যাত্রা' -নামক একটি নাটিকা তোমার নামে উৎসর্গ করেছি। আশা করি, আমার এ দান তোমার অযোগ্য হয় নি। বিষয়টি এই— রথযাত্রার উৎসবে নরনারী সবাই হঠাৎ দেখতে পেলে, মহাকালের রথ অচল। মানবসমাজের সকলের চেয়ে বড়ো দুর্গতি, কালের এই গতিহীনতা। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধবন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই এই রথ টানবার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানবসম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চলছে না রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, অবমানিত করেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহনরূপে ; তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে।

কালের রথযাত্রার বাধা দূর করবার মহামন্ত্র তোমার প্রবল লেখনীর মুখে সার্থক হোক, এই আশীর্বাদ-সহ তোমার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

—বিচিত্রা। কার্তিক ১৩৩৯, পৃ. ৪৯২

গল্পগুচ্ছ

বর্তমান খণ্ডে প্রকাশিত গল্পগুলির অধিকাংশই সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে প্রকাশসূচী মুদ্রিত হইল—

সদর ও অন্দর	প্রদীপ	আষাঢ়	১৩০৭
উদ্ধার	ভারতী	শ্রাবণ	১৩০৭
দুর্বুদ্ধি	ভারতী	ভাদ্র	১৩০৭
ফেল	ভারতী	আশ্বিন	১৩০৭
শুভদৃষ্টি	প্রদীপ	আশ্বিন	১৩০৭
নষ্টনীড়	ভারতী	বৈশাখ-অগ্রহায়ণ	১৩০৮
দর্পহরণ	বঙ্গদর্শন	ফাল্গুন	১৩০৯
মাল্যদান	বঙ্গদর্শন	চৈত্র	১৩০৯
কর্মফল	কুন্তলীন পুরস্কার বার্ষিকী		১৩১০
মাস্টারমশায়	প্রবাসী	আষাঢ়-শ্রাবণ	১৩১৪

গুপ্তধন	বঙ্গভাষা	কার্তিক	১৩১৪
রাসমণির ছেলে	ভারতী	আশ্বিন	১৩১৮
পণরক্ষা	ভারতী	পৌষ	১৩১৮

'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ', 'উলুখড়ের বিপদ' ও 'প্রতিবেশিনী', এই তিনটি গল্প সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল কি না এখনো জানিতে পারা যায় নাই ; এইজন্য গ্রন্থাকারে প্রকাশের তারিখ-অনুসারে —গল্পগুচ্ছ, মজুমদার এজেন্সি। প্রথম খণ্ড (আশ্বিন ১৩০৭) 'প্রতিবেশিনী', দ্বিতীয় খণ্ডে [১৯০১] 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ' ও 'উলুখড়ের বিপদ'— সেগুলি বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত হইল।

সাময়িক পত্রে প্রকাশিত গল্পগুলি এইরূপে সর্বপ্রথম গ্রন্থভুক্ত হয় : সদর ও অন্দর, উদ্ধার, দুর্বুদ্ধি, ফেল —গল্পগুচ্ছ ১, মজুমদার এজেন্সি, ১ আশ্বিন ১৩০৭। শুভদৃষ্টি —গল্পগুচ্ছ ২, মজুমদার লাইব্রেরি [১৯০১]। নষ্টনীড় —হিতবাদীর উপহার রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী, ১৩১১। দর্পহরণ, মাল্যদান, রাসমণির ছেলে, পণরক্ষা —গল্প চারিটি [১৯১২]। মাস্টারমশায়, গুপ্তধন —গল্পগুচ্ছ ৫, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৩১৫।

'কর্মফল' ১৩১০ সালেই স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারেও মুদ্রিত হয় ; এই গল্পটি কবি-কর্তৃক পুনর্লিখিত হইয়া 'শোধবোধ' নাটকরূপে ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয়।

পারস্যে

'জাপানে-পারস্যে' ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। উহার 'জাপানে' অংশে পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থ 'জাপানযাত্রী' (১৩২৬) এবং 'পারস্যে' অংশে তৎকালীন নূতন রচনা পারস্যভ্রমণের বৃত্তান্ত একত্র গ্রথিত ও মুদ্রিত হয়।

গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশের কালক্রমে 'জাপানযাত্রী' রবীন্দ্র-রচনাবলীর উনবিংশ খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে এবং রবীন্দ্রশতবার্ষিক সংস্করণ রূপে স্বতন্ত্র সংস্করণ পরিশিষ্ট ও গ্রন্থপরিচয় -সংযুক্ত হইয়া জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমান খণ্ডে 'জাপানে-পারস্যে' গ্রন্থের কেবলমাত্র 'পারস্যে' অংশ মুদ্রিত হইল। রবীন্দ্র-শতবর্ষপূর্তির উদ্‌যাপনে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে পরিশিষ্ট ও গ্রন্থপরিচয় -যুক্ত 'পারস্যযাত্রী' ২৫ বৈশাখ ১৩৭০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়।

'পারস্যে'র প্রথম পরিচ্ছেদ ১৩৩৯ সালের আষাঢ়-সংখ্যা প্রবাসীতে 'পারস্য-যাত্রা' নামে বাহির হয়। ২ হইতে ১১ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত অবশিষ্ট অংশ ১৩৩৯ সালের শ্রাবণ হইতে ১৩৪০-এর বৈশাখ-সংখ্যা পর্যন্ত বিচিত্রা মাসিক পত্রে 'পারস্যভ্রমণ' নামে ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশিত হয়।

পত্রিকায় মুদ্রিত প্রথম পাঠ ও রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপির সাহায্যে বর্তমান সংস্করণের পাঠ স্থানে স্থানে সংশোধন করা হইয়াছে।

ভ্রমণবৃত্তান্তটির বিচিত্রায় মুদ্রিত পাঠের কয়েকটি অংশ গ্রন্থপ্রকাশকালে বর্জিত হইয়াছিল। সেই বর্জিত অংশগুলি এখানে সংকলিত হইল। সম্পূর্ণতাসাধনের উদ্দেশ্যে পাণ্ডুলিপি হইতে কয়েকটি প্রয়োজনীয় অংশ বন্ধনীচিহ্নিত আকারে উক্ত রচনাংশের কয়েক স্থানে সংযোজিত হইয়াছে।—

৪৫৯ পৃষ্ঠায় শেষ অনুচ্ছেদের পূর্বে

সভারম্ভে পার্সিভাষায় কিছু বলা হলে পর আমি বললুম :

প্রকৃতিতে নিমন্ত্রণের ভার বসন্তঋতুর পরে। তার সুগন্ধ পুষ্পগুচ্ছে, পাখির গানে সেই নিমন্ত্রণ। তার আহ্বান স্বদেশী বিদেশী নির্বিশেষে, তার বিশ্বভাষা তর্জমা করতে হয় না। কবিরা বসন্তঋতুর প্রতীক। তারা আপন দেশ আপন কালের মধ্যে থেকে সর্বদেশ সর্বকালকে আমন্ত্রণ করে।

একদিন দূর থেকে পারস্যের পরিচয় আমার কাছে পৌচেছিল। তখন আমি বালক। সে পারস্য ভাবরসের পারস্য, কবির পারস্য। তার ভাষা যদিও পারসিক, তার বাণী সকল মানুষের।

আমার পিতা ছিলেন হাফেজের অনুরাগী ভক্ত। তাঁর মুখ থেকে হাফেজের কবিতার আবৃত্তি ও তার অনুবাদ অনেক শুনেছি। সেই কবিতার মাধুর্য দিয়ে পারস্যের হৃদয় আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল।

আজ পারস্যের রাজা আমাকে আমন্ত্রণ করেছেন, সেই সঙ্গে সেই কবিদের আমন্ত্রণও মিলিত। আমি তাঁদের উদ্দেশে আমার সকৃতজ্ঞ অভিবাদন অর্পণ করতে চাই যাঁদের কাব্যসুধা জীবনান্তকাল পর্যন্ত আমার পিতাকে এত সান্ত্বনা এত আনন্দ দিয়েছে।

[কবির আপন ভাষায় যদি দিতে পারতুম তবেই আমার যোগ্য হত। যে ভাষা অগত্যা ব্যবহার করছি আমার ভারতী সে ভাষায় সম্পূর্ণ সায় দেন না। তাই আমি এখানে যেন ম্যুজিয়মে-সাজানো পাখি— তর্জমার আড়ষ্টতায় আমার পাখা বদ্ধ— সে পাখাবিস্তার করে মন উড়তে পারে না, সে পাখায় সজীব প্রাণের বর্ণচ্ছটাময় নৃত্য নেই।

তা হোক, মৌনের মধ্যে যে বাণী অনুচ্চারিত, বন্দনায় তারও ব্যবহার হয়ে থাকে। সেই আন্তরিক বাণীর দ্বারাই পারস্যের অমর কবিদের আমি আজ অভিবাদন করি; সেই সঙ্গে পারস্যের অমর আত্মাকেও আমার নমস্কার, যে আত্মা ইতিহাসের

উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে বিচিত্র সৌন্দর্যে শৌর্যে কল্যাণে ভাবীকালের দূরদিগন্তব্যাপী ক্ষেত্রে নিজেকে গৌরবান্বিত করবে।]*

আমি বলার পর ধন্যবাদ জানিয়ে ও পারস্যরাজের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে ইরানী কিছু বললেন। কৌতূহলী জনতার মধ্য দিয়ে গোধূলির আলোকে গবর্নরের সঙ্গে তাঁর প্রাসাদে ফিরে এলুম।

—বিচিত্রা। আশ্বিন ১৩৩৯, পৃ. ২৯৭-২৯৮

৪৬০ পৃষ্ঠায় ২৩ ছত্রের প্রথম বাক্যটির পূর্ণতর রূপ

অবশেষে হাফেজের সমাধি দেখতে বেরলুম, পিতার তীর্থস্থানে আমার মানস-অর্ঘ্য নিবেদন করতে।

—পাণ্ডুলিপি

৪৮৩ পৃষ্ঠায় দ্বাবিংশ ছত্রের পরে

[এরকম ক্ষেত্রে বস্তুত ভয় ক্ষুদ্রকে— মহত্ত্বকে স্বীকার করার মতো পীড়া তাদের পক্ষে আর কিছু হতে পারে না, বিশেষত যে মহত্ত্ব প্রথার বাঁধাপথে চিরাভ্যস্তভাবে স্বীকৃত নয়।

আমি রাজাকে জানালুম তাঁর রাজত্বে সম্প্রদায়বিরোধের হিংস্র অসভ্যতা এমন আশ্চর্য শৌর্যের সঙ্গে উন্মূলিত হয়েছে, আজকের দিনে এইটেতে আমি সকলের চেয়ে মুগ্ধ। একবার যেন তিনি ভারতবর্ষে আসেন, এই আকাঙ্ক্ষা আমি তাঁকে নিবেদন করলুম। তিনি বললেন, পাশ্চাত্য দেশে ভ্রমণ করতে যাবার পূর্বে নিশ্চয় তিনি যথাসম্ভব এশিয়ার পরিচয় নিয়ে যাবেন।

শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয় নিয়ে ফিরে এলুম। এ কথা সকলের মুখে শুনি, রাজা বিদ্বান নন, য়ুরোপীয় কোনো ভাষাই তাঁর জানা নেই, পারসিক ভাষা লিখতে পড়তে পারেন, কিন্তু ভালোরকম নয়। অর্থাৎ, তাঁর বুদ্ধিশক্তি বিচারশক্তি বইপড়া বিদ্যার অনেক উপরে।]

পারস্যরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ-উপলক্ষে উপহারস্বরূপে আমার নিজের কতকগুলি বই রেশমের আবরণে প্রস্তুত করা ছিল। সেই সঙ্গে নিজের রচিত একটি চিত্রপটে পরপৃষ্ঠায়-উদ্‌ধৃত বাংলা কবিতা ও তার ইংরেজি তর্জমাটি লিখে দিয়েছিলুম—

আমার হৃদয়ে অতীতস্মৃতির
সোনার প্রদীপ এ যে,
মরিচা-ধরানো কালের পরশ
বাঁচায়ে রেখেছি মেজে।

তোমরা জ্বেলেছ, নূতন কালের
উদার প্রাণের আলো—
এসেছি, হে ভাই, আমার প্রদীপে
তোমার শিখাটি জ্বালো।

I carry in my heart a golden lamp of remembrance
of an illumination that is past.
I keep it bright against the tarnishing touch of time.
Thine is a fire of a new magnanimous life.
Allow it, my brother, to kiss my lamp with its flame.

[আজ সকালবেলায় শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রী আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন শীতযাপনের প্রাসাদ দেখাবার জন্যে।

তুষাররেখাঙ্কিত নীলাভ পাহাড়-ঘেরা সুন্দর দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে গাড়ি চলল। প্রাসাদের বাগানটি ঘনশ্যামল উচ্চশীর্ষ তরুচ্ছায়ায় রমণীয়। দু-তিন ভাগে বিভক্ত অনেকগুলি সিঁড়ি ভেঙে প্রথম তলায় যখন উঠলুম তখন আমার নিশ্বাস বড়ো একটা বাকি ছিল না। মাথার উপরে উচ্চ গম্বুজ আগাগোড়া স্ফটিকে খচিত, আলোয় ঝল্‌মল্‌ করছে। ক্লান্তি গোপনের জন্যে স্থির হয়ে খানিকটা দাঁড়িয়ে দেখা গেল। আরো এক তলা উপরে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ওঠবার উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে শান্ত করে হাঁফ ছাড়লুম। প্রশস্ত বারান্দায় বেরিয়ে আসতেই দেখি, চার দিকের উদার দৃশ্য অবারিত। আকাশ নির্মল নীল, নীচের বাগানে নিবিড়নিবদ্ধ বনস্পতির উর্মিল বিস্তার, ডান দিকের দিগন্তে গিরিশ্রেণী, সম্মুখে দূরে তেহেরান নগরী বৃক্ষব্যূহে আবৃত। এখানে বর্তমান রাজা বাস করেন না, কেননা, এ জায়গাটা তাঁর কর্মক্ষেত্র থেকে দূরে। এ প্রাসাদটি প্রাচীন নয়, বছর ত্রিশ আগে তৈরি হয়েছে।]

—বিচিত্রা। পৌষ ১৩৩৯, পৃ. ৭৭০-৭৭১

৪৮৫ পৃষ্ঠায় প্রথম বাক্যের পরে

খানিকটা আমি ইংরেজিতে বলি, তার পরে তার তর্জমা হয় পারসিকে, এইরকম দু-রঙা দু-টুকরো তালি-দেওয়া আমার বক্তৃতা।

আমি যা বলেছিলেম তার মোট কথাটা হচ্ছে এই যে, প্রকৃতির শক্তিভাণ্ডারের দ্বার য়ুরোপ উদ্‌ঘাটন করে প্রাণযাত্রাকে নানা দিক থেকে ঐশ্বর্যশালী করে তুলেছে। এই শক্তির প্রভাবে আজকের দিনে তারা দিগ্বিজয়ী। আমরা প্রাচ্যজাতিরা বস্তুজগতে এই শক্তিসাধনায় শৈথিল্য করেছি, তার ফলে আমাদের দুর্বলতা সমাজের সকল

বিভাগেই ব্যাপ্ত। এই সাধনার দীক্ষা য়ুরোপের কাছ থেকে আমাদের নিতান্তই নেওয়া চাই।

কিন্তু সেই সঙ্গেই মনে রাখতে হবে যে কেবলমাত্র বস্তুগত ঐশ্বর্যে মানুষের পরিত্রাণ নেই, তার প্রমাণ আজ য়ুরোপে মারমূর্তি নিয়ে দেখা দিল। পরস্পর ঈর্ষাবিদ্বেষে এবং বিজ্ঞানবাহিনী হিংস্রতার বিভীষিকায় য়ুরোপীয় সভ্যতায় আজ ভূমিকম্প লেগেছে। য়ুরোপ দেবতার অস্ত্র পেয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে দেবতার চিত্ত পায় নি। এইরকম দুর্যোগেই 'বিমুখ ব্রহ্মাস্ত্র আসি অস্ত্রীকেই বধে'। দেখা যাচ্ছে, য়ুরোপ নিজের মৃত্যুশেল আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক নৈপুণ্যের সঙ্গে তৈরি করে তুলছে।

এশিয়াকে আজ ভার নিতে হবে মানুষের মধ্যে এই দেবত্বকে সম্পূর্ণ করে তুলতে, কর্মশক্তিকে ও ধর্মশক্তিকে এক করে দিয়ে।

পারস্যে আজ নূতন করে জাতিরচনার কাজ আরম্ভ হয়েছে। আমার সৌভাগ্য এই যে, এই নবসৃষ্টির যুগে অতিথিরূপে আমি পারস্যে উপস্থিত, আমি আশা করে এসেছি এখানে সৃষ্টির যে সংকল্পন দেখব তার মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার পূর্ণমিলনের রূপ আছে।

অতীতকালে একদা এশিয়ায় সৃষ্টির যুগ প্রবল শক্তিতে দেখা দিয়েছিল। তখন পারস্য ভারত চীন নিজ নিজ জ্যোতিতে দীপ্যমান হয়ে একটি সম্মিলিত মহাদেশীয় সভ্যতার বিস্তার করেছিল। তখন এশিয়ায় মহতী বাণীর উদ্ভব হয়েছিল এবং মহতী কীর্তির। তখন মাঝে মাঝে এশিয়ার চিত্তে যেন কোটালের বান ডেকে এসেছে, তখন তার বিদ্যার ঐশ্বর্য বহু বাধা অতিক্রম করে বহুকাল ধরে বহুদূরদেশে পরিব্যাপ্ত হয়েছে।

তার পর এল দুর্দিন, ঐশ্বর্যবিনিময়ের বাণিজ্যপথ ক্রমে লুপ্ত হয়ে এল। যুদ্ধে, দুর্ভিক্ষে, বিশ্বনাশা বর্বরতার নিষ্ঠুর আক্রমণে এশিয়ার মহাদেশীয় বন্ধন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তার পর থেকে এশিয়াকে আর মানবিক মহাদেশ বলতে পারি নে— আজ এ কেবল ভৌগোলিক মহাদেশ।

সেই প্রাচীনযুগের গৌরবকাহিনীর স্বপ্নমাত্র নিয়ে অতি দীর্ঘকাল আমাদের দীনভাবে কাটল। আজ এই মহাদেশের নাড়ীতে নাড়ীতে পুনর্‌যৌবনের বেগ যেন আবার স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের কবিকে আজ ইরান যে আহ্বান করেছে এ একটি সুলক্ষণ; এতে প্রমাণ হয় যে, এশিয়ায় আত্মপ্রকাশের দায়িত্ববোধ দেশের সীমানাকে অতিক্রম করে দূরে বিস্তীর্ণ হচ্ছে।

এ কথা বলা বাহুল্য যে, এশিয়ার প্রত্যেক দেশ আপন শক্তি প্রকৃতি ও প্রয়োজন

অনুসারে আপন ঐতিহাসিক সমস্যা স্বয়ং সমাধান করবে, কিন্তু আপন উন্নতির পথে তারা প্রত্যেকে যে প্রদীপ নিয়ে চলবে তার আলোক পরস্পর সম্মিলিত হয়ে জ্ঞানজ্যোতির সমবায় সাধন করবে। চিত্তের প্রকাশ যখন আমাদের থাকে না তখন আমরা আলোকহীন তারার মতো, অন্য জ্যোতিষ্কের সঙ্গে আমাদের জ্ঞাতিত্বসম্বন্ধ অবরুদ্ধ। চিত্তের আলো যখন জ্বলে তখনি মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তা সত্য হয়ে ওঠে। তাই আজ আমি এই কামনা ঘোষণা করি যে, আমাদের মধ্যে সাধনার মিলন ঘটুক। এবং সেই মিলনে প্রাচ্য মহাদেশ মহতী শক্তিতে জেগে উঠুক— তার সাহিত্য, তার কলা, তার নূতন নিরাময় সমাজনীতি, তার অন্ধসংস্কারমুক্ত বিশুদ্ধ ধর্মবুদ্ধি, তার আত্মশক্তিতে অবসাদহীন শ্রদ্ধা।

আমি আপন দুর্বল দেহের অনুনয় অস্বীকার করে এই দেশে এসেছি তার সর্বপ্রধান কারণটি বক্তৃতার উপসংহারে জানিয়ে যেতে চাই। মানবিকতার দিক থেকে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ পূর্বমহাদেশের আমরা স্বভাবতই তার কাছে মাথা নত করি, যান্ত্রিকতায় যা সুনিপুণ তার কাছে নয়। নিজেকে জয় করে যিনি আপন ভাগ্যের উপর জয়ী হন তাঁকেই আমরা বীর বলে স্বীকার করি। বর্তমান পারস্যরাজের চরিতকথা আমার আপন দেশের প্রান্তে বসেও শুনেছি এবং সেই সঙ্গে দেখতে পেয়েছি দূরে দিক্‌সীমায় নবপ্রভাতের সূচনা। বুঝেছি, এশিয়ার কোনোস্থানে যথার্থ একজন লোক-নেতারূপে স্বজাতির ভাগ্যনেতার অভ্যুদয় হয়েছে— তিনি জানেন কী করে বর্তমান যুগের আত্মরক্ষণ-উপযোগী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, কী করে প্রতিকূল শক্তিকে নিরস্ত করতে হবে, বিদেশ থেকে যে সর্বগ্রাসী লোভের চক্রবাত্যা নিষ্ঠুর বলে এশিয়াকে চারি দিকে আঘাত করতে উদ্যত কী করে তাকে প্রতিহত করা সম্ভব। এশিয়ার যে অংশেই থাকি-না কেন এমন মানুষের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, তাঁর চরিত্র আমাদের সকলেরই পক্ষে সম্পদ— বীরশক্তিতে তাঁর স্বজাতির মধ্যে তিনি যে প্রাণসঞ্চার করেছেন তা দূর থেকেও আমাদের উদ্‌বোধনের সহায়তা করবে তাতে সন্দেহ নেই। ভারতবর্ষের হয়ে, এশিয়ার হয়ে আমি তাঁকে অভিবাদন করি এবং তাঁর করস্পর্শের স্মৃতি আমার দেশে বহন করে নিয়ে যাই।

—বিচিত্রা। মাঘ ১৩৩৯, পৃ. ৯-১২

৪৮৬ পৃষ্ঠার শেষ অনুচ্ছেদের পরে

আমার জন্মদিনে এখানকার বহুলোকের কাছ থেকে আমি যে বহু সমাদর পেয়েছি একত্রে তার উত্তর দেবার জন্যে একটি কবিতা রচনা করেছিলুম। এখানকার মজলিস

ভাঙবার পূর্বে সেটা আমি সকলকে শোনালুম। ইংরেজি তর্জমা -সমেত আমার কবিতাটি এইখানে পেশ করা গেল।

ইরান, তোমার যত বুলবুল,
তোমার কাননে যত আছে ফুল
বিদেশী কবির জন্মদিনেরে মানি
শুনালো তাহারে অভিনন্দনবাণী।

ইরান, তোমার বীর সন্তান
প্রণয়-অর্ঘ্য করিয়াছে দান
আজি এ বিদেশী কবির জন্মদিনে,
আপনার বলি নিয়েছে তাহারে চিনে।

ইরান, তোমার সম্মানমালে
নবগৌরব বহি নিজ ভালে
সার্থক হল কবির জন্মদিন।
চিরকাল তারি স্বীকার করিয়া ঋণ
তোমার ললাটে পরানু এ মোর শ্লোক—
ইরানের জয় হোক।[১]

Iran, all the roses in thy garden
and all their lover birds
have acclaimed the birthday
of the poet of a far away shore
and mingled their voices in a pæan of rejoicing.

Iran, thy brave sons have brought
their priceless gifts of friendship
on this birthday of the poet of a far away shore,
for they have known him in their hearts as their own.

Iran, crowned with a new glory
by the honour from thy hand
this birthday of the poet of a far away shore
finds its fulfilment.

১ দ্রষ্টব্য : 'পারস্যে জন্মদিনে', পরিশেষ —রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড।

And in return I bind this wreath of my verse
on thy forehead, and cry : Victory to Iran !

বিচিত্রা। মাঘ ১৩৩৯, পৃ. ১৮-১৯

৪৮৮ পৃষ্ঠায় তৃতীয় ছত্রের পরে

যতই এখানে আমার দিন শেষ হয়ে আসছে ততই নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ ও অভ্যাগতের ভিড় দুর্ভেদ্য হয়ে এল। আমার অবকাশটুকু ঘিরে সপ্তরথীর শরবর্ষণ চলছে। প্রতিদিনের বিবরণ লিখে যাব দিনের মধ্যে এমন ফাঁক পাই নে। ঘটনাগুলো একটার উপর আর-একটা চাপা পড়ে পিণ্ড পাকিয়ে ভেসে চলে যায়, তাদের চেহারা মনে থাকে না। [এর মধ্যে একটি কথা স্মরণীয়। আমি মনে করেছিলুম, পারসিকের জাগরণ তাদের পলিটিক্‌সের চার সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ। আমি তাদের অনেককেই বলেছি, আংশিকভাবে কেবল কর্মশক্তির উদ্‌বোধনই যথেষ্ট নয়, সঙ্গে সঙ্গে পারস্যের চিরন্তন চিত্তশক্তি সৃষ্টিশক্তির জাগরণেই তার সম্পূর্ণ গৌরব। ইতিমধ্যে দেখলুম এখানকার আর্টস্কুলের কাজ। যিনি তার অধ্যক্ষ তিনি যথার্থ গুণী। পারসিকের স্বভাবসিদ্ধ অসামান্য কারুপ্রতিভাকে জাগিয়ে তোলবার সাধনায় তিনি নিযুক্ত, বিদেশের অনুকরণে নয়, স্বদেশের প্রেরণায়। তাঁর বিদ্যালয়ের তাঁতের কাজের যে নমুনা কয়টি তিনি আমাকে দিয়েছেন সেগুলিকে আমি বহুমূল্য বলে মনে করি।]

এখানকার যাঁরা মনীষী তাঁদের মননশক্তির স্বকীয় বিশেষত্ব এবং আধুনিক যুগের সঙ্গে তার সংগতি সম্বন্ধে কোনো ধারণা করবার উপায় আমার নেই, কারণ এঁদের ভাষা আমি জানি নে। তার উদ্‌ভাবনা হয়তো কোথাও না কোথাও দেখা দিয়েছে, হয়তো চিন্তা ও রচনার কাজ আরম্ভ হয়ে থাকবে। এ কথা মনে রাখতে হবে, কিছুকাল পূর্বে বাংলাদেশে যখন রামমোহন রায়ের আবির্ভাব সেই সময়ে পারস্যে বাহাই-ধর্মমত প্রাণান্তিক উৎপীড়নের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সাম্প্রদায়িকতার অতি কঠোর বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে এই ধর্ম আধুনিক যুগের সর্বজনীনতার বাণী ঘোষণা করেছে। এ কখনোই সম্ভবপর হত না যদি সম্পূর্ণভাবে এ জাতির মন সনাতনী জড়তার পাথর-চাপা মন হত। প্রাচীনকালের শাসনে রুদ্ধবুদ্ধি রুদ্ধকণ্ঠ এই দেশ বাধাবন্ধনমুক্ত হয়ে চিত্তসম্পদ্‌শালী হয়ে উঠবে তার লক্ষণ চারি দিকে যেন অনুভব করতে পারছি। আজ দশ বৎসরের মধ্যে পারস্য অচলপ্রথার অন্ধতা থেকে যে এতদূর মুক্তিলাভ করেছে এবং নূতন যুগের কঠিন সমস্যাগুলি সমাধান করবার জন্যে এতটা দূর তার আধুনিক অধ্যবসায়, তার কারণ তার মন স্বভাবতই মননশীল— পারস্যের ইতিহাসে পূর্বেও তার প্রমাণ হয়েছে। অধ্যাপক ব্রাউন বলেছেন,

জরথুস্ত্র এবং বাহাইমত-প্রবর্তক বাবের মাঝখানে অন্তত ২৫ শতাব্দীর ব্যবধান। ইতিমধ্যকালের ঐতিহাসিক সাক্ষ্য যে-পর্যন্ত রক্ষিত হয়েছে তার থেকে দেখা যায়, এই সদাসচেষ্ট অবিরামমননশীল পারসিক চিত্ত মানবজীবন ও মানবভাগ্যের সার্থকতার মহাসমস্যা ভেদ করবার জন্যে নিরন্তর চেষ্টা করেছে।

—বিচিত্রা। মাঘ ১৩৩৯, পৃ. ২০-২১

৪৮৮ পৃষ্ঠার উনবিংশ ছত্রের পরে : অষ্টম অধ্যায়ের শেষ

আর-একটি মানুষের চেহারায় পারস্যের আর-একটি প্রবল রূপ আমার মনে অঙ্কিত হয়ে গেছে। ইনি রাজার সভামন্ত্রী তেমূর্তাশ। আধুনিক কাল বিষম জোরের সঙ্গে এশিয়ার দ্বারে ধাক্কা মেরেছে, এই মানুষ তেমনি জোরের সঙ্গেই তাকে দিয়েছেন সাড়া। দৈবনির্ভরের সাধু বিশেষণধারী নিশ্চেষ্টতার বিরুদ্ধে পুরুষকারের আত্মপ্রভাব -প্রচারের ভার নিয়েছেন ইনি।

ইনি জানেন, বহুকাল থেকে শাস্ত্র ও লোকাচারের মোহে মূর্ছিত আমাদের প্রাচ্যদেশ। মানুষের বুদ্ধি ইচ্ছাপূর্বক নিজেকে অশ্রদ্ধা করে খর্ব করে রেখেছে, সেইজন্যেই চার দিক থেকেই আমাদের এমন পরাভব, এত অপমান। উজ্জ্বল এঁর মুখশ্রী, বলিষ্ঠ এঁর বাহু, অপ্রতিহত এঁর উদ্যম। দেখে আনন্দ হয়; বুঝতে পারি, পারস্যকে তার আত্মগত দুর্বলতা থেকে রক্ষা করবার দীপ্যমান ধীশক্তি এঁর। অন্তরের মূঢ়তা বাহিরের শত্রুর সর্বপ্রধান সহায়। তাই আজ যাঁরা পারস্যের ভাগ্যনিয়ন্তা তাঁদের সতর্কতা দু দিক থেকেই উদ্যত। হালের মাঝি বাহিরের ঢেউয়ের উপর ঝিঁকে মারছে, আবার সংস্কারকর্তা লেগে আছে খোলের ছিদ্র মেরামতের কাজে। যাঁরা সব চেয়ে দুর্জয় আত্মরিপুকে বশে আনবার ভার নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে প্রধান একজন এই তেমূর্তাশ। সেদিন তিনি আমাকে সগর্বে বললেন, 'পারস্যের ভবিষ্যৎকে সৃষ্টি করবার ভার নিয়েছি আমরা, অর্থাৎ ভূতকালের আঁচল-ধরা হয়ে আমরা ঝিমিয়ে থাকতে চাই নে।' আমাদের দেশে প্রবাদ আছে, ভূতের পা উলটোদিকে। আজ এশিয়ার পিছন-ফেরা পা আজও যাদের উলটো পথ নির্দেশ করে তাদের মধ্যে সব চেয়ে অধম হচ্ছি আমরা। জাগ্রতবুদ্ধি অবিচলিতসংকল্প এই তেজস্বী পুরুষকে দেখে মনে মনে এঁকে নমস্কার করেছি; বলেছি, তোমাদের মতো মানুষের জন্যেই ভারতবর্ষ অপেক্ষা করে আছে, কেননা চিত্তের স্বাধীনতাই ন্যাশনাল স্বাধীনতার বাহন।

তেহেরান থেকে বিদায় নেবার দিন এল। আজ এখানকার রাজসরকার আমাকে জানিয়েছেন, শান্তিনিকেতনে তারা পারসিক বিদ্যার আসন প্রতিষ্ঠা করবেন।

এই সুযোগে তাঁদের এই অতিথিকে উপলক্ষ করে পারস্যের সঙ্গে ভারতের

যোগস্থাপন হবে।

প্রধান মন্ত্রীবর্গ আজ এসে আমাকে বিদায় দিলেন।

—বিচিত্রা। মাঘ ১৩৩৯, পৃ. ২১-২২

১৩৩৯ ভাদ্র ও চৈত্র-সংখ্যা বিচিত্রায় নানা-বক্তৃতাদির রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক অনুমোদিত অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রাসঙ্গিকবোধে এখানে সেগুলি সংকলিত হইল।—

বুশেয়ারের সর্বসাধারণ ও বুশেয়ারের গবর্নর -কর্তৃক অভিনন্দন

আজ যে শ্রদ্ধেয় অতিথিকে আমাদের মধ্যে অভ্যর্থনা করবার দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ আমাদের ঘটেছে, এঁর মোহিনীশক্তি অগ্রদূত হয়ে এসে কিছুকাল ধরে আমাদের অধীর আগ্রহান্বিত প্রতীক্ষাকে হর্ষোজ্জ্বল করে রেখেছিল। এঁকে পৃথিবীর সকল জাতি কতখানি শ্রদ্ধার চোখে দেখে সে বিষয়ে কোনো আলোচনা নিষ্প্রয়োজন; যেখানেই মনের উৎকর্ষ আছে, বিদ্যা আছে, সেখানেই এঁর গ্রন্থাবলী যে সমাদর লাভ করেছে, জনে জনে ইনি বিতরণ করেছেন যে প্রেমের ও সমবেদনার বাণী, তাই থেকেই এঁর গুণের প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্যাকাশে ইনি উজ্জ্বলতম তারকারাজির অন্যতম; মানুষের চিন্তার মধ্যে ইনি সঞ্চারিত করেছেন যে কল্যাণের শক্তি তা যেমনি পবিত্র তেমনি নিষ্কলঙ্ক।

ইন্দো-ইরান বংশের প্রতিনিধিদের মধ্যে ডক্টর ঠাকুর আদর্শস্থানীয়, প্রাচ্য মনীষার মধ্যে যা-কিছু সুন্দর ও মহীয়ান তারই প্রাণবান প্রতীক। তাঁর বাণীর ঐশী শক্তি পাশ্চাত্য চিন্তা ও তথাকথিত সভ্যতাকে স্বীকার করিয়েছে যে বর্তমান যুগের এই জড়-চৈতন্যের নিরন্তর দ্বন্দ্বের মীমাংসনে প্রাচ্যের কিছু দেবার আছে, কিছু ক্ষমতা আছে। মনুষ্যত্বের প্রগতিতে তাঁর রচনা ছন্দোরক্ষার সহায়তা করে, কারণ, আজ আমাদের পশ্চিমের ভ্রাতারা যে জড়রূপের মধ্যে একান্তভাবে নিবিষ্ট হয়ে আছেন এবং তার ফলে চরিত্রবিকৃতির যে আশঙ্কা ঘটছে, সেই আশঙ্কা দূর করবার জন্য জড়ের মধ্যে এই ঐকান্তিক অভিনিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রয়োজন।

ডক্টর ঠাকুরের এই পারস্যপরিদর্শন যেমনি সন্তোষের বিষয় তেমনি গুরুফলপ্রসূ—কেননা, এতে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে পারস্যের বুদ্ধিগত কৃতিত্বের প্রতি উদার ভারতীয়দের কৌতূহল কতখানি, আমাদের মানসিক উৎকর্ষ ও সাহিত্যকে তারা কতখানি সমাদর করে। এই শ্রদ্ধেয় সাধু আজ আমাদের চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বাঁধলেন, কেননা অল্পদিনের জন্যে হলেও এমন একজন মহাপুরুষের দীপ্তির কাছাকাছি আসার

সৌভাগ্যটা সাধারণ লোকে যতখানি ভাবে তার চেয়ে অনেক বেশি। আমাদের কবি সাদি এক জায়গায় বলেছেন—

হায় মানুষ! এই জগৎটা শুধু দৈহিক অহং'এর পুষ্টির জন্য নয়;
যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী মানুষের সন্ধান পাওয়া বড়োই কঠিন;
ভোরের পাখির সুরলহরী নিদ্রিত মানুষ জানে না;
মানুষের জগৎটা যে কী তা পশু কেমন করে জানবে।

তেমনি সাধারণ লোকে না বুঝলেও এটা সত্য যে, ডক্টর ঠাকুরের এই পারস্যে আগমন সেই ভারতীয় জাতিরই মানসিক উৎকর্ষ ও নৈতিক আকাঙ্ক্ষার নিদর্শন যে জাতি একটি অপরূপ পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এমন জাতিই তার অতীত গৌরব আর উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ নিয়ে ন্যায্যত দাবি করতে পারে যে, মানুষের চিন্তাকাশে অত্যুজ্জ্বল তারকারাজির মধ্যে অনেকগুলি তারই, আর জগৎকে সে এক অতি গভীর দর্শনশাস্ত্র দান করেছে।

নীতিতত্ত্ব ও সৌন্দর্যতত্ত্বের দিক দিয়ে অতি প্রাচীনকাল থেকে এ দেশ ও ভারতবর্ষের মধ্যে একটা নিবিড় অচ্ছেদ্য যোগ রয়েছে। সাসানীয় যুগের প্রাচীনতম সাহিত্যের যে-সব পুঁথি আজ প্রচলিত আছে তার মধ্যেও পাওয়া যায় এই দুই জাতির পরস্পর আধ্যাত্মিক ভাববিনিময়ের কথা। দেখা যায়, আজকের যুগের মতো প্রাচীন পারস্যবাসীরাও ভারতবর্ষকে সম্ভ্রমের চোখে দেখত, গভীর চিন্তা ও নিগূঢ় তত্ত্বরাজির দেশ হিসেবে। প্রথম সাসানীয় সম্রাট অর্দশির বাবেকানের কার্নামেতে বর্ণিত আছে যে, যখন তিনি তাঁর রাজ্যসম্বন্ধে ভবিষ্যদ্‌বাণী শুনতে চান তখন কোনো ভারতীয় সম্রাটের নিকট তিনি দূত পাঠিয়েছিলেন। ফারদৌসীর শা'নামেতেও এ ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়।

ইরানে ইসলামধর্মের প্রসার ও ভারতে তার প্রভাববিস্তৃতির পর থেকে ভারত-পারস্যের এই মিলনসূত্র পরিবর্তনপরম্পরার ভিতর দিয়ে নব নব তেজে দৃঢ়ীভূত হয়েছে— এবং আশা করা যায়, এর পরিসর ক্রমেই বিস্তৃত হবে।

এইখানে আমাদের অতিথির অবগতির জন্য বলাটা প্রাসঙ্গিক হবে— বর্তমান মহারাজের নিকট পারস্যজাতি কতখানি ঋণী। চিরসতর্ক দৃষ্টি নিয়ে তিনি বিশৃঙ্খলের মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করেছেন; অক্লান্ত উদ্যম ও অত্যাশ্চর্য গঠনশক্তির দ্বারা তিনি এখানে এমন একটা শাসনযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছেন যা সর্ববিষয়েই তাঁর উন্নতিশীল প্রজাদের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। চতুর্দিক যখন ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন, দেশ যখন সর্বনাশের প্রান্তে এসে টলমল করছে, তখন যেন তিনি কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন স্বর্গ

থেকে আদেশ নিয়ে এসে; এবং প্রকৃত দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হয়ে এমন দক্ষতার সঙ্গে সব ব্যবস্থা করলেন যে অনেকেরই মনে হয়েছিল, তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করে তুললেন। শিক্ষা ও মানসিক সংস্কারের ব্যবস্থা এতদিন অবহেলায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, এখন আবার সে-সব মহারাজের উৎসাহ পাচ্ছে। আধুনিক প্রণালীতে অনেক স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা তো হয়েছেই, তা ছাড়া নিয়মিতভাবে যোগ্যতম ছাত্রদের বিদেশে পাঠানো হচ্ছে টেক্‌নিকাল শিক্ষালাভের জন্য।

আমাদের কবি ও ঋষিদের স্মৃতি এতদিন তাঁদের ভক্তদের প্রাণের মধ্যেই বাসা বেঁধে ছিল; এখন সেই স্মৃতিকে বহির্জগতে রূপ দেওয়ার চেষ্টা চলছে। এটা শুভ লক্ষণ; এর থেকে বোঝা যায়, আমাদের অতীত গৌরবের চেতনা জাতির প্রাণের মধ্যে উদ্‌বুদ্ধ হচ্ছে। সমস্ত পারস্যবাসী ও বিদেশী পারস্যবন্ধুদের মনে আশা হয়েছে যে, এই অদ্বিতীয় সম্রাটের সুদক্ষ নেতৃত্বে পারস্যদেশ আবার জগতের কল্যাণসাধনের শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হবে।

আশা করি, ডক্টর ঠাকুরকে এই-যে আমাদের প্রাণভরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করলাম, এর জন্য তাঁর স্পর্শভীরু স্বভাবে কিছু আঘাত লাগলেও তিনি আমাদেরকে ক্ষমা করবেন। যদিও জানি 'অলংকারবিহীন সৌন্দর্যই সুন্দরতম অলংকার' তবুও তাঁর প্রতি আমাদের যে ভক্তি তা একটু নিবেদন না করে পারলাম না।

আমাদের ভরসা আছে, ডক্টর ঠাকুর তাঁর এই ভ্রমণে আনন্দ পাবেন, এবং সত্যকারের শ্রেষ্ঠ জগদ্‌গুরুর প্রাপ্য যে শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা পারস্যে তার কোথাও কোনো অভাবই হবে না।

কবির উত্তর

পারস্যের ভ্রাতৃগণ,

আমার সম্বন্ধে আপনাদের অনুগ্রহবাণীর জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ। আপনাদের কাছে আসাটা আমার জীবনে একটা বড়ো সুযোগ, এ কথা নিশ্চয় করে বলতে পারি। এই প্রথম নিবিড়ভাবে পারস্যের স্পর্শ অনুভব করা গেল। আর যে-কদিন আপনাদের দেশে থাকব তার মধ্যেই পারস্যবাসীদের সঙ্গে আরো গভীরতর পরিচয়-সাধনের আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি।

আমি কবি— আমি সেই কবিসংঘের একজন যাঁদের বাণী মনুষ্যত্বের অন্তরে পৌঁছনোর পথ খুঁজে নেয় কোলাহলময় বক্তৃতার মধ্য দিয়ে নয়, অনন্তের আলয় যে গভীর স্তব্ধতা তারই মধ্য দিয়ে। প্রচার করা বা শিক্ষা দেওয়া আমার কাজ নয়— আমি আছি প্রাণের আহ্বানে সাড়া দেবার কাজে, অনুভূতির ভাষায়, সৌন্দর্যের ভাষায়।

কবিযশের কোনো দাবি যদি আমার থাকে তবে তার উদ্‌ভব হল সেই মৌন নিঃসীমতায় যেখান দিয়ে মানবহৃদয়ের মহাদেশে অনুপ্রেরণা ও ভাবস্পন্দনের প্রাণময় আদান-প্রদান চলতে থাকে।

শৈশব থেকেই আমি মানুষ হয়েছি নির্জনতার আবহাওয়ায়, প্রকৃতির নিবিড় সংস্পর্শে। তার থেকে অনুপ্রেরণা যত পেয়েছি, আমার স্বপ্নে ও কল্পসৃষ্টিতে প্রতিদানও দিয়েছি তেমনি। নিয়তির দুর্বোধ্যলীলায় এই নিঃসঙ্গ কবিকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল এশিয়া ও পশ্চিমমহাদেশের বড়ো বড়ো দেশগুলিতে সহস্র লোকচক্ষুর উজ্জ্বল দৃষ্টির মাঝখানে। তথাপি সে-সব জায়গায় যে-সকল বাণী ও যে-সমস্ত অভিভাষণ আমাকে দিতে হয়েছিল আমার সত্যিকারের ভাষা সেখানকার নয়, সে আছে আমার সৃষ্টিনিরত আত্মার গভীরে— যেখানে আমার চিন্তারাজি বাক্য হারিয়ে ঘুরে বেরিয়েছে সেইখানে।

যদি আজ আপনাদের দেশে না আসতাম তবে আমার তীর্থযাত্রা অসম্পূর্ণ থেকে যেত। আজ আপনাদের দেখা পেয়ে নির্মল আনন্দে আমার জীবনের এই সন্ধ্যা কানায় কানায় ভরে উঠেছে। যে প্রেমসূত্রের নিদর্শন আজকের এই সভা, সেই প্রেমসূত্রে প্রাচ্যের এই দুটি প্রাচীন সভ্যতাকে মিলিত করতে পেরে আজ আমি ধন্য।

কবির সংবর্ধনা-ভোজের অন্তে বুশেয়ারের গবর্নরের বক্তৃতা

জনাব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাচ্যাকাশের উজ্জ্বলতম তারা; তাঁর মনীষার দীপ্তি শুধু এশিয়া মহাদেশকে নয়, সমস্ত বিশ্বকে আলোকিত করেছে। আজ যে তিনি পারস্যদেশে পদার্পণ করেছেন, এতে আমাদের দেশ গৌরবান্বিত হল।

পুরাকালে ভারতবর্ষ ও পারস্যদেশ পরস্পরের কাছাকাছি এসেছিল; ধর্ম শিল্প এবং আরো অনেক উপায় অবলম্বন করে তারা পরস্পরকে অনুপ্রাণিত করেছিল। সেই নিবিড় আত্মীয়তায় দুটি দেশেরই প্রচুর লাভ; সেটাকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে এই মহাপুরুষের আমাদের দেশে পদার্পণ। আজ তাঁর আগমনে সমস্ত ইরানদেশে একটা সাড়া পড়ে গেছে; আমরা সকলেই একান্ত কামনা করি, তাঁর এই ভ্রমণে যেন তিনি আনন্দলাভ করেন, আমাদের মধ্যে যা-কিছু সত্য, যা-কিছু ভালো আছে, আমাদের দেশে ভ্রমণ ও অবস্থান -কালে তাই দিয়ে যেন আমরা তাঁকে খুশি করতে পারি।

কবির উত্তর

চিন্তাসমৃদ্ধ এই প্রাচীন দেশের প্রতি আমি চিরকালই অন্তরে গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে এসেছি; এই দেশ দেখা এবং এ দেশের অধিবাসীদের পরিচয় লাভ করাটা আমার

অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল। বাংলাদেশের কবি আমি আজ ইরানদেশে এসেছি, প্রাণের প্রীতি ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিয়ে। দুঃখ এই, আমার এই বৃদ্ধ বয়স ও ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে আমি ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াতে পারব না, প্রাণ ভরে এখানকার জীবনযাত্রার নিকটসংস্পর্শে আসতে পারব না। তবুও এটা বলতে পারি যে, এখান থেকে আমি প্রচুর অনুপ্রেরণা ও শাশ্বত মূল্যের অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশে ফিরব। পারস্যে এসে আপনাদের নিকট যে বিরাট অভ্যর্থনা পেলুম এর জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

—বিচিত্রা। ভাদ্র ১৩৩৯, পৃ. ১৫৬-১৬০

১৩ এপ্রিল [১৯৩২] তারিখে কবি-কর্তৃক পারস্যসম্রাট রেজা শা পহ্লবীর নিকট প্রেরিত তারের মর্মানুবাদ

মহারাজ,

যে উদার আতিথেয়তা আপনার নিকট পেলেম তার জন্যে ইরান থেকে বিদায় নেবার আগে আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা আপনার কাছে নিবেদন করি। আপনি আপনার নিজস্ব প্রাণশক্তি দেশের জীবনের মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন, আপনার প্রতি আমার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য রেখে যাই। আপনার প্রজাবর্গের প্রতি আমার অন্তরের প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ কয়েকটি কথা বলে আজ বিদায় গ্রহণ করব।

ইরানের বন্ধুবর্গের প্রতি

আজ শেষ পর্যন্ত তোমাদের কাছে বিদায় নেবার সময় এসেছে; কৃতজ্ঞতায় ভরা আমার এই হৃদয়খানি তোমাদের দেশে রেখে গেলেম। তোমাদের সম্রাট তাঁর সাম্রাজ্যে আমাকে নিমন্ত্রণ করে যে সম্মান দিয়েছেন তোমরা রাজভক্ত প্রজার মতো সেই সম্মানের মর্যাদা রেখেছ এবং তোমাদের চিরাচরিত আতিথেয়তার ইতিহাসবিশ্রুত যশ অম্লান রেখেছ। তোমাদের এই উদার অভ্যর্থনা আমি গ্রহণ করেছি অন্তরের সঙ্গে, বিশেষত যখন এর মধ্যে রয়েছে আমার মাতৃভূমির প্রতি আন্তরিক-শ্রদ্ধা-নিবেদন। যে দুটি জাতির মহাস্থান আজ ভারতবর্ষ ও পারস্য, ইতিহাসের প্রথম যুগে তারা যখন অনাগত ভবিষ্যতের মধ্যে তাদের জয়যাত্রা শুরু করেছিল তখন তারা ছিল এক। কালচক্রে তারা পৃথক হয়ে গড়ে তুলল এশিয়ার দুটি বিরাট সভ্যতা, তার মধ্যে প্রকাশের ভঙ্গিমা বিভিন্ন হলেও অন্তরের তেজ ও প্রাণশক্তি একই রকম। যুগে যুগে তাদের মধ্যে চিন্তাসমৃদ্ধ চিত্তের

আদানপ্রদান চলে এসেছে, যতদিন-না এশিয়া তন্দ্রাবেশে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ল।

অবশেষে দেখা গেল নবজাগরণের আলোকরশ্মি। এই মহাদেশের অন্তরের মধ্যে একটা স্পন্দমান জীবনের কম্পন ক্রমেই যেন নিবিড় আত্মোপলব্ধির মধ্যে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠছে। এই পুণ্য মুহূর্তে আজ আমি কবি তোমাদের কাছে এসেছি নবযুগের শুভ্রপ্রভাত ঘোষণা করতে, তোমাদের দিগন্তের অন্ধকার ভেদ করে যে আলোক ফুটে উঠেছে সেই আলোককে অভিনন্দন করতে— আমার জীবনের মহৎ সৌভাগ্য, আজ তোমাদের কাছে এলেম।

জয় হোক ইরানের!

ইরান-সম্রাট রেজা শা পহ্লবী দীর্ঘজীবী হোন!

পারস্য-সম্রাটের উত্তর

জনাব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমরা আপনার টেলিগ্রাম দেখেছি। আপনি পারস্য-প্রবাসে তৃপ্ত হয়েছেন এতে আমরা সুখী হয়েছি। আপনার এই প্রতিবেশী দেশটিতে যদি আরো কিছুকাল থাকতে পারতেন তো আরো খুশি হতেম এবং প্রাচ্যের প্রতি আপনার অন্তরের প্রীতি আরো নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করতে পেয়ে আরো উপকৃত হতেম। আপনি আমাদের সম্বন্ধে যে সাধুবাদ করেছেন তা আমরা কখনো ভুলব না।

রেজা শা

বোগদাদ ম্যুনিসিপালিটি-কর্তৃক ম্যুনিসিপাল-উদ্যানে কবি-সংবর্ধনা উপলক্ষে কবির বক্তৃতা

ইরাক-সম্রাটের সাদর নিমন্ত্রণে আজ যে আমি ইরাকের প্রাচীন ও বিরাট সভ্যতার সঙ্গে ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পেলেম সেজন্য সম্রাটকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

আজ যখন এই প্রাচীন জাতি নবজন্ম লাভ করছে, যখন সৃষ্টির একটা অদম্য বেগ এর চিত্তকে সুস্পষ্ট আত্মপ্রকাশের গরিমা ও মুক্তির পরিপূর্ণ সার্থকতার মধ্যে পরিণত করে তুলছে, তখন এখানে উপস্থিত থাকতে পারাটা আমার জীবনের সত্যই একটা বড়ো অনুপ্রেরণার বিষয়। এখানকার বাতাসে আমি অনুভব করছি যৌবনের সেই উদ্দীপনা যা সমস্ত এশিয়া মহাদেশকে আজ নবযুগের নূতন প্রতিষ্ঠালাভের জন্য ব্যাকুল করে তুলছে।

আপনারা জানেন দুর্ভাগ্যবশত বয়স এবং স্বাস্থ্য দূরত্বের ব্যবধানকে অতিক্রম করতে বাধা দেয়; তাই আপনাদের এই সাদর অভ্যর্থনায় পরিবর্তে আপনারা আমার কাছে যতখানি আশা করেন হয়তো তার সবটুকু সফল করে তোলা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

শুনলেম, আজকের দিনে আমাকে এই নিমন্ত্রণ প্রধানত বোগদাদের সাহিত্যিকদের তরফ থেকে। আমি যে দলের লোক বলে গৌরব অনুভব করি আমাকে সর্বসাধারণে তাঁরাই যে প্রথমে অভিনন্দন করবেন এটা স্বাভাবিক। আজ হৃদয়ে অপরিসীম আনন্দ বোধ করছি এই ভেবে যে, আমার কিছু কিছু রচনা আপনাদের ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং আপনাদের অন্তরে প্রবেশ লাভ করতে পেরেছে। সেই রচনাগুলির মধ্য দিয়ে আমি আগেই আপনাদের নিকট পরিচিত হয়েছি। এতে নূতন করে এই প্রমাণ হয় যে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে জাতির প্রভেদ নেই, আমাদের ভাবরাজি অবাধে মেলামেশা করে পরস্পরের সহযোগিতায় এমন একটা পরিপূর্ণতা সৃষ্টি করতে পারে যার মধ্যে চিরন্তন মানবের কল্যাণ নিহিত আছে।

ইতিহাস মানুষের প্রতি বিশেষ সদয় হয় নি। প্রবল জাতির লোলুপতা দুর্বল জাতিকে অসংখ্য বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছে; অন্যায়ক্ষুধাপরিতৃপ্তির জন্য দুর্বল জাতিকে শোষণ করতে তারা কুণ্ঠিত নয়। তাই আজ মনুষ্যত্ব পরস্পরের প্রতি সন্দেহে, দুঃখে, যন্ত্রণা-জর্জরিত। অসামঞ্জস্যের গ্লানি আমাদের জীবনকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। পরস্পরের এই অস্বাভাবিক সম্বন্ধের বেদনা থেকে মনুষ্যত্বকে উদ্ধার করা, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির জীবনযাত্রাকে উচ্চতর সুরে বেঁধে তোলা— সে তো আমাদেরই কাজ – আমরা যারা সাহিত্যের মন্দিরে আমাদের জীবন উৎসর্গ করেছি। আমরা যে দেশেরই সন্তান হই-না কেন আমাদের জীবনের এই এক উদ্দেশ্য। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন ও মৈত্রীস্থাপনের এই সম্মিলিত চেষ্টার মধ্য দিয়ে আমাদের মনুষ্যত্বের পাকা ভিত গাঁথতে হবে। মানবজাতিকে আত্মঘাতী সংগ্রাম ও উন্মত্ত কুসংস্কারের বর্বরতা থেকে রক্ষা করবে এই মিলনের উপনিবেশ। নূতন যুগের সূচনা করব আমরা— শুভবুদ্ধির যুগ, সহযোগিতার যুগ, যার মধ্যে ভাবের পরস্পর আদান-প্রদানের দ্বারা মনুষ্যত্বের বিপুল ঐশ্বর্য পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

বন্ধুগণ, প্রাণের মধ্যে এই অদম্য আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আজ আমি আপনাদের মাঝখানে এসেছি। আমার প্রাণের এই গোপন কথাটি আজ আপনাদের বলি, যে গোপন উদ্দেশ্য গভীরতম অন্তরে পোষণ করে আজ আপনাদের দেশে বেড়াতে এসেছি। আমার আহ্বান এই— আসুন আমরা পরস্পর মিলিত হয়ে ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক

দ্বন্দ্ববিদ্বেষের মূল ছিন্ন করে দিই, মানুষে মানুষে সহজ বিশ্বাসের নিত্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করি। ইতিহাসের গৌরবের যুগে আপনাদের আরবসভ্যতা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতের অর্ধেকেরও বেশি জায়গা জুড়ে প্রাধান্য লাভ করেছিল ; আজও ভারতবর্ষের মুসলমান অধিবাসীদের আশ্রয় করে আমার দেশের মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে আরবসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত আছে। আজ আরবসাগর পার হয়ে আসুক আপনাদের বাণী বিশ্বজনীন আদর্শ নিয়ে ; আপনাদের পুরোহিতরা আসুন তাঁদের বিশ্বাসের আলো নিয়ে ; জাতিভেদ, সম্প্রদায়ভেদ ও ধর্মভেদ প্রেমের মধ্যে অতিক্রম করে সকল শ্রেণীর মানুষকে আজ সখ্যের সহযোগিতায় মিলিয়ে দিন তাঁরা।

মানুষের মধ্যে যা-কিছু পবিত্র ও শাশ্বত তারই নামে আজ আমি আপনাদের কাছে আমার প্রার্থনা জানাই, আপনাদের মহানুভব ধর্মপ্রতিষ্ঠাতার নামে আজ আমি আপনাদের অনুরোধ করি— মানুষে মানুষে প্রীতির আদর্শ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার-ব্যবহারগত পার্থক্য নির্বিবাদে সহ্য করার আদর্শ, সহযোগিতার উপর সভ্য জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করবার আদর্শ, প্রতিবেশীর প্রতি ভ্রাতৃভাবের আদর্শ আজ আপনারা সকলের সম্মুখে প্রচার করুন। আমাদের ধর্মসমূহ আজ হিংস্র ভ্রাতৃহত্যার বর্বরতায় কলুষিত, তারই বিষে ভারতের জাতীয় চেতনা জর্জরিত, স্বাধীনতার দিকে ভারতের অভিযান আজ বাধাপ্রাপ্ত। তাই আমার প্রার্থনা, তমসাচ্ছন্ন কুবুদ্ধিজনিত সমস্ত কুসংস্কার ও মোহ অতিক্রম করে আজ আপনাদের কবিদের আপনাদের চিন্তাবীরদের বাণী আমার দুর্ভাগা দেশে প্রেরণ করুন, তাকে দেখিয়ে দিন কল্যাণের পথ, দেখিয়ে দিন নৈতিক বিনষ্টি থেকে মুক্তিলাভের পথ।

বন্ধুগণ, আজ আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে, স্বদেশের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক অভাব মোচন করাতেই জাতীয় আত্মপ্রকাশের সকল দায়িত্ব শেষ হয় না— দেশকালের সীমানা অতিক্রম করে আপনাদের বাণী পৌঁছনো চাই সেইখানে যেখানে মনুষ্যত্বের নৈতিক সমস্যাগুলি আপনাদের বিচার ও বিবেচনার জন্য অপেক্ষা করে আছে। প্রয়োজন হলে দ্বিধা না করেই সত্যবাক্য শোনাতে হবে। আজ সেই মহাপ্রয়োজন সমাগত। আপনাদের সমধর্মী ভারতবাসীরা আজ প্রতীক্ষা করে আছে আপনাদের কাছে থেকেই নূতন বাণী শুনবে, বীর্যের বাণী, মিলনের বাণী, সকল ধর্মকে কল্যাণের যোগে শ্রদ্ধা করবার মানবোচিত শুভবুদ্ধির বাণী।

—বিচিত্রা। চৈত্র ১৩৩৯, পৃ. ৩০২-৩০৭

প্রথম পরিচ্ছেদের ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে 'প্রদোষ' শব্দের যে প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথ করিয়াছেন,

পত্রিকায় রচনাটি প্রথম-প্রকাশ-কালে তাহা লইয়া তৎকালীন সাময়িক পত্রে বিতর্ক উপস্থিত হয়। সেই প্রসঙ্গে বিচিত্রার পরিচালক সুশীলচন্দ্র মিত্রকে রবীন্দ্রনাথ যে পত্র লেখেন তাহার প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্‌ধৃত হইল—

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

আমার লেখায় 'প্রদোষ' শব্দের প্রয়োগে অর্থের ভুল ঘটেছে, সেই নিন্দাক্ষালনের জন্য তোমার পত্রিকায় কিছু প্রয়াস দেখা গেল। আমার প্রতি তোমাদের শ্রদ্ধা আছে জেনেই আমি বলছি, এর কোনো প্রয়োজন ছিল না। অজ্ঞতা ও অনবধানতায়, স্বকৃত ও অন্যকৃত দোষে, অনেক ভুল আমার লেখায় থেকে গেছে। মেনে নিতে কখনো কুণ্ঠিত হই নে। পাণ্ডিত্যের অভাব এবং অন্য অনেক ত্রুটি সত্ত্বেও সমাদরের যোগ্য যদি কোনো গুণ আমার রচনায় উদ্‌বৃত্ত থাকে তবে সেইটের 'পরেই আমার একমাত্র ভরসা, নির্ভুলতার 'পরে নয়।

রাত্রির অল্পান্ধকার উপক্রমকেই বলে প্রদোষ, রাত্রির অল্পান্ধকার পরিশেষের বিশেষ কোনো শব্দ আমার জানা নেই। সেই কারণে প্রয়োজন উপস্থিত হলে ওই শব্দটাকে উভয় অর্থেই ব্যবহার করবার ইচ্ছা হয়। এমনি করেই প্রয়োজনের তাগিদে শব্দের অর্থবিস্তৃতি ভাষায় ঘটে থাকে। সংস্কৃত অভিধানে যে শব্দের যে অর্থ, বাংলাভাষায় সর্বত্র তা বজায় থাকে নি। সেই ওজর করেই আলোচিত লেখাটিকে যখন গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করব তখন প্রদোষ কথাটার পরিবর্তন করব না এইরকম স্থির করেছি। সম্ভবত এই অর্থে এই শব্দটার প্রয়োগ আমার রচনায় অন্যত্রও আছে এবং ভাবীকালেও থাকবে। রাত্রির আরম্ভে ও শেষে যে আলো-অন্ধকারের সঙ্গম, তার রূপটি একই, এবং একই নামে তাকে ডাকবার দরকার ঘটে। সংস্কৃতভাষায় সন্ধ্যা শব্দের দুই অর্থই আছে কিন্তু বাংলায় তা চলবে না।

আমার লেখায় এর চেয়ে গুরুতর ভুল, ইস্কুলের নীচের ক্লাসে পড়ছে এমন ছেলে চিঠি লিখে একবার আমাকে জানিয়েছিল। আমি মিথ্যা তর্ক করি নি, তাকে সাধুবাদ দিয়ে স্বীকার করে নিয়েছি। অপবাদের ভাষা ও ভঙ্গি -অনুসারে কোনো কোনো স্থলে স্বীকার করা কষ্টসাধ্য, কিন্তু না করা ক্ষুদ্রতা। আমি পণ্ডিত নই, শোনা কথা বলছি— কালিদাসের মতো কবির কাব্যেও শাব্দিক ত্রুটি ধরা পড়েছে। কিন্তু ভাবিক ত্রুটি নয় বলেই তার সংশোধনও হয় নি, মার্জনাও হয়েছে। য়ুরোপীয় সাহিত্যে এবং চিত্রকলায় এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বৈষ্ণব-পুরাণে কথিত আছে, রাধিকার ঘটে ছিদ্র ছিল, কিন্তু নিন্দুকেরাও সেটা লক্ষ্য করলে না যখন দেখা গেল

তৎসত্ত্বেও জল আনা হয়েছে। সাহিত্যে চিত্রকলায় এই গল্পটির প্রয়োগ খাটে। ইতি ২১ জুলাই ১৯৩২।

—বিচিত্রা। ভাদ্র ১৩৩৯, পৃ. ১৬১

বিচিত্রায় উক্ত পত্র পাঠ করিয়া শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন প্রস্তাব করেন, প্রত্যুষ (বা প্রত্যূষ) শব্দযোগেই 'রাত্রির অল্পান্ধকার পরিশেষ'কে নির্দেশ করা যায়। প্রত্যুত্তরে কবি তাঁহাকে যে পত্র লেখেন তাহার প্রাসঙ্গিক অংশ সংকলিত হইল—

প্রদোষ শব্দের প্রয়োগ নিয়ে তুমি আমার বক্তব্যটি ঠিক হয়তো বোঝো নি।

প্রত্যুষ শব্দটি কালব্যঞ্জক— অর্থাৎ, দিনরাত্রির বিশেষ একটি সময়াংশকে বলে প্রত্যুষ। বাংলাভাষায় 'সন্ধ্যা' শব্দটিও তেমনি। আলো-অন্ধকারের সমবায়ের যে একটি সাধারণ ভাবরূপ আছে, যেটা ইংরেজি twilight শব্দে পাওয়া যায় সাহিত্যে অনেক সময় সেইটেরই বিশেষ প্রয়োজন হয়। প্রদোষ শব্দকে আমি সেই অর্থেই ইচ্ছাপূর্বক ব্যবহার করি। ইতি ২৩ অগস্ট ১৯৩২।

—বিচিত্রা। আশ্বিন ১৩৩৯, পৃ. ৪২৯

কবির পারস্যভ্রমণের অন্যতম সহযাত্রী কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহাদের ভ্রমণের বৃত্তান্ত 'পারস্য-ভ্রমণ' (প্রবাসী। শ্রাবণ-চৈত্র ১৩৩৯) ও 'প্রত্যাবর্তন' (প্রবাসী। বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৪০) নামে প্রবাসী মাসিকপত্রে ধারাবাহিক প্রকাশিত করেন। এই ভ্রমণবৃত্তান্ত পুস্তকাকারে 'রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পারস্য ও ইরাক ভ্রমণ' নামে ৭ পৌষ ১৮৮৪ শকাব্দে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'পারস্যে' প্রসঙ্গে উক্ত প্রবন্ধগুলি প্রণিধানযোগ্য।

বর্ণানুক্রমিক সূচী

অন্ধতামসগহ্বর হতে	...	২৩
অবরুদ্ধ ছিল বায়ু ; দৈত্যসম পুঞ্জমেঘভার	...	১৬
অব্যক্তের অন্তঃপুরে উঠেছিলে জেগে	...	৫৪
অমর্ত	...	৩৪
অসীম আকাশে মহাতপস্বী	...	৫৫
অস্তসিন্ধুকূলে এসে রবি	...	৩
আজ মম জন্মদিন। সদ্যই প্রাণের প্রান্তপথে	...	২৫
আজি দখিন দুয়ার খোলা	...	৯৬
আন্ গো তোরা কার কী আছে	...	৬৯
আনমনা গো আনমনা	...	৯৫
আমার ছুটি আসছে কাছে সকল ছুটির শেষ	...	৬১
আমার মনে একটুও নেই বৈকুণ্ঠের আশা	...	৩৪
আমি এলেম তোমার দ্বারে	...	৯৪
আমি সকল নিয়ে বসে আছি	...	৭২
উদ্ধার	...	১৭৮
উলুখড়ের বিপদ	...	২০১
একদা পরমমূল্য জন্মক্ষণ দিয়েছে তোমায়	...	১৫
একদিন তরীখানা থেমেছিল এই ঘাটে লেগে	...	৫৬
এ কী অকৃতজ্ঞতার বৈরাগ্যপ্রলাপ ক্ষণে ক্ষণে	...	১০
এ জন্মের সাথে লগ্ন স্বপ্নের জটিল সূত্র যবে	...	৬
এ শুধু অলস মায়া— এ শুধু মেঘের খেলা	...	৮৫
এসো আমার ঘরে	...	৯৩
এসো এসো হে তৃষ্ণার জল	...	৮৭
ও আমার চাঁদের আলো, আজ ফাগুনের	...	৮৮
ও কি এল, ও কি এল না	...	৯৯
ওই বুঝি বাঁশি বাজে	...	৯৯
ওরা অকারণে চঞ্চল	...	৭৩
ওরা তো সব পথের মানুষ, তুমি পথের ধারের	...	৫৯
ওরে গৃহবাসী, তোরা খোল্ দ্বার খোল্	...	৭২

ওরে চিরভিক্ষু, তোর আজন্মকালের ভিক্ষাঝুলি ... ৬
ওরে চিত্ররেখাডোরে বাঁধিল কে ... ১০৮
কখন দিলে পরায়ে ... ৭৮, ৮৯
কবির দীক্ষা ... ১৪৯
করেছিনু যত সুরের সাধন ... ৫৯
কর্মফল ... ২৮৬
কলরবমুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণে যে আসন ... ১৩
কাছে থেকে দূর রচিল কেন গো আঁধারে ... ১০৯
কেন ধরে রাখা, ও-যে যাবে চলে ... ৭৫
কোন্ গহন অরণ্যে তারে এলেম হারায়ে ... ১১০
কোন্-সে কালের কণ্ঠ হতে এসেছে এই স্বর ... ৪৪
কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে ... ৯৩
ক্লান্ত যখন আম্রকলির কাল ... ৭৯
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ৬১
গানের ডালি ভরে দে গো উষার কোলে ... ৭০
গুপ্তধন ... ৩৫৪
ঘরছাড়া ... ৪৯
চলতি ছবি ... ৪৭
চলাচল ... ৫৯
চলেছিল সারাপ্রহর ... ৩৯
চলে যায়, মরি হায়, বসন্তের দিন ... ৭৬
চিরপ্রশ্নের বেদীসম্মুখে চিরনির্বাক্ রহে ... ২৯
ছুটি ... ৬১
জন্মদিন ... ২৫, ৫২
জন্মের দিন করেছিল দান ... ৫০৩
জন্মের দিনে দিয়েছিল আজি ... ৫০৩
জাগরণে যায় বিভাবরী ... ৮৭
ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে ... ৭৮
তখন একটা রাত— উঠেছে সে তড়বড়ি ... ৪৯
তবে শেষ ক'রে দাও শেষ গান ... ৭৭

তীরের পানে চেয়ে থাকি পালের নৌকা ছাড়ি	...	৫৮
তীর্থযাত্রিণী	...	৪২
তীর্থের যাত্রিণী ও যে, জীবনের পথে	...	৪২
তুমি কি কেবলি ছবি, শুধু পটে লিখা	...	৮৮
তুমি কিছু দিয়ে যাও	...	৭৯
তুমি কোন্ ভাঙনের পথে এলে সুপ্তরাতে	...	৭৩
তুমি সুন্দর যৌবনঘন	...	৬৮
তোমার আনন্দ ওই এল দ্বারে এল গো	...	৯১
তোমায় সাজাব যতনে কুসুমরতনে	...	১০৫
দর্পহরণ	...	২৬৩
দুর্বুদ্ধি	...	১৮১
দূরের বন্ধু সুরের দূতীরে	...	১০৭
দৃষ্টিজালে জড়ায় ওকে হাজারখানা চোখ	...	৫২
দেখিলাম— অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায়	...	১২
দে পড়ে দে আমায় তোরা	...	৮৯
নতুন কাল	...	৪৪
নমো নমো শচীচিতরঞ্জন সন্তাপভঞ্জন	...	১০৬
নষ্টনীড়	...	২০৭
নাগিনীরা চারি দিকে ফেলিতেছে	...	১৯
না, যেয়ো না, যেয়ো নাকো	...	৯৭
নিঃশেষ	...	৫৫
নিবিড় অমা-তিমির হতে	...	৭১
পণরক্ষা	...	৪০৭
পত্রোত্তর	...	২৯
পথিক দেখেছি আমি পুরাণে-কীর্তিত কত দেশ	...	১৮
পরিচয়	...	৫৬
পলায়নী	...	৩৫
পশ্চাতের নিত্যসহচর, অকৃতার্থ হে অতীত	...	৮
পাছে সুর ভুলি এই ভয় হয়	...	৮৫
পালের নৌকা	...	৫৮

পূর্বযুগে, ভাগীরথী, তোমার চরণে দিল আনি	...	৪১
প্রতিবেশিনী	...	২০৩
প্রতীক্ষা	...	৫৫
প্রাণের দান	...	৫৪
ফাগুন, তোমার হাওয়ায় হাওয়ায়	...	৬৯
ফাগুনের নবীন আনন্দে	...	৭৫
ফেল	...	১৮৬
বঁধু, কোন্ মায়া লাগল চোখে	...	১০৭
বড়ো বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে	...	১০১
বসন্তে বসন্তে তোমার কবিরে দাও ডাক	...	৭৬
বাজিবে, সখী, বাঁশি বাজিবে	...	৯০
বাজে করুণ সুরে	...	৮০
বাজো রে বাঁশরী বাজো	...	৯১
বাতাসের চলার পথে যে মুকুল পড়ে ঝরে	...	৭৫
বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী	...	৬৭
বাহিরে ভুল ভাঙবে যখন	...	৯৭
বিদায় দিয়ো মোরে প্রসন্ন আলোকে	...	৭৬
বিশ্বের আলোকলুপ্ত তিমিরের অন্তরালে এল	...	৫
বেদনা কী ভাষায় রে	...	৮৪ক
ভরা থাক্ স্মৃতিসুধায়	...	৮৬
ভাগীরথী	...	৪১
মায়া	...	৫৯
মায়াবন-বিহারিণী হরিণী	...	১০৯
মাল্যদান	...	২৭৩
মাস্টারমশায়	...	৩২৪
মুক্তি এই— সহজে ফিরিয়া আসা	...	৯
মৃত্যুদূত এসেছিল হে প্রলয়ংকর, অকস্মাৎ	...	১৩
মোর পথিকেরে বুঝি এনেছ এবার	...	৭৪
মোর বীণা ওঠে কোন্ সুরে বাজি	...	১০০
যখন এসেছিলে অন্ধকারে	...	৭৮

যখন মল্লিকাবনে প্রথম ধরেছে কলি	...	৭৭
যখন রব না আমি মর্তকায়ায়	...	৩৭
যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ	...	১৯৫
যাক এ জীবন	...	৩১
যাবার মুখে	...	৩১
যাবার সময় হল বিহঙ্গের। এখনি কুলায়	...	১৬
যেদিন চৈতন্য মোর মুক্তি পেল লুপ্তিগুহা হতে	...	১৮
যে পলায়নের অসীম তরণী	...	৩৫
রঙ্গমঞ্চে একে একে নিবে গেল যবে দীপশিখা	...	১১
রথযাত্রা	...	১৫৭
রথের রশি	...	১১৭
রাঙিয়ে দিয়ে যাও গো এবার	...	৯২
রাসমণির ছেলে	...	৩৭১
রেখার রঙের তীর হতে তীরে	..	৬১
রোদ্‌দুরেতে ঝাপসা দেখায় ওই-যে দূরের গ্রাম	...	৪৭
লহো লহো তুলে লহো নীরব বীণাখানি	...	৯২
শরৎবেলার বিত্তবিহীন মেঘ	...	৫৫
শুভদৃষ্টি	...	১৯০
শেষের অবগাহন সাঙ্গ করো কবি, প্রদোষের	...	১৪
শ্যামল কোমল চিকণ রূপের নবীন শোভা	...	৭৩
সত্য মোর অবলিপ্ত সংসারের বিচিত্র প্রলেপে	...	৭
সদর ও অন্দর	...	১৭৫
সন্ধ্যা	...	৩৯
সুরের গুরু, দাও গো সুরের দীক্ষা	...	৬৮
সখী, আঁধারে একেলা ঘরে মন মানে না	...	৯৮
সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে	...	৯০
সে-যে কাছে এসে চলে গেল তবু জাগি নি	...	৭৮
স্মরণ	...	৩৭
হায় রে, ওরে যায় না কি জানা	...	৯৫
হৃদয় আমার, ওই বুঝি তোর ফাল্গুনী ঢেউ আসে	...	৮৩

হে মাধবী, দ্বিধা কেন ... ৭৩
হে বিরহী, হায়, চঞ্চল হিয়া তব ... ১০৫
হে সখা, বারতা পেয়েছি মনে মনে ... ১০৬

সংশোধন

রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি ও সাময়িক পত্র দৃষ্টে বর্তমান মুদ্রণে কৃত সংশোধন।

কবিতা	পৃষ্ঠা	ছত্র	
তীর্থযাত্রিণী	৪২	১০	‘অর্ঘ্যেরে’ স্থলে ‘অর্থেরে’
নতুন কাল	৪৫	৩৭	‘কিংবা’ স্থলে ‘কিম্বা’

স্বতন্ত্র সেঁজুতি গ্রন্থে বৈশাখ ১৩৭৭ সংস্করণে সংশোধিত।

রবীন্দ্র রচনাবলী

ত্রয়োবিংশ খণ্ড

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

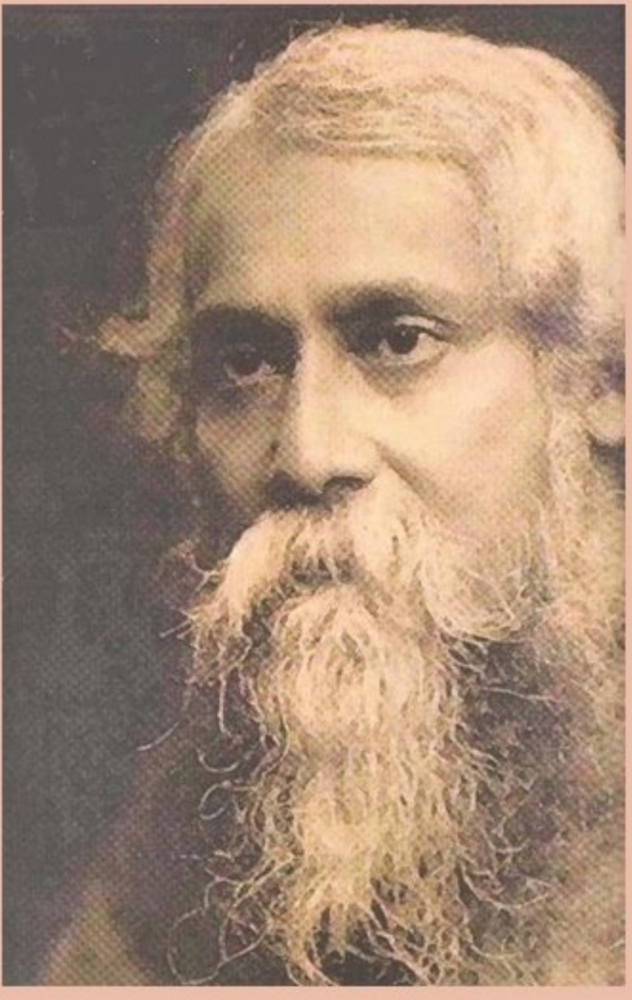

রবীন্দ্র-রচনাবলী

ত্রয়োবিংশ খণ্ড

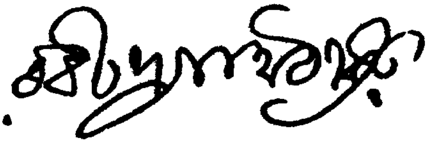

VISVA—BHARATI
92502
LIBRARY.

বিশ্বভারতী
২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা

প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৫৪

পুনর্মুদ্রণ : আষাঢ়, ১৮৮০ শক : জুলাই ১৯৫৮

মূল্য ৯৲, ১২৲ ও ১৩৲

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন

বিশ্বভারতী। ৬৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীবিদ্যুৎরঞ্জন বসু

শান্তিনিকেতন প্রেস। শান্তিনিকেতন। বীরভূম

সূচী

চিত্রসূচী ৮/০

কবিতা ও গান

প্রহাসিনী ১

সংযোজন ৩৯

আকাশপ্রদীপ ৭১

নাটক ও প্রহসন

চণ্ডালিকা ১৩১

তাসের দেশ ১৫৫

উপন্যাস ও গল্প

গল্পগুচ্ছ ১৯৭

প্রবন্ধ

সাহিত্যের পথে ৩৫৩

পরিশিষ্ট ৪৬৫

গ্রন্থপরিচয় ৫২৯

বর্ণানুক্রমিক সূচী ৫৫৯

চিত্রসূচী

প্রতিকৃতি ৩

তাসের দেশের অভিনয় ১৬৯

কবিতা ও গান

প্রহাসিনী

ধূমকেতু মাঝে মাঝে হাসির ঝাঁটায়
দ্যুলোক ঝাঁটিয়ে নিয়ে কৌতুক পাঠায়
বিস্মিত সূর্যের সভা ভরিতে পারাবে—
পরিহাসচ্ছটা ফেলে সুদূরে হারাবে,
সৌর বিদূষক পায় ছুটি।

আমার জীবনকক্ষে জানি না কী হেতু,
মাঝে মাঝে এসে পড়ে খ্যাপা ধূমকেতু—
তুচ্ছ প্রলাপের পুচ্ছ শূন্যে দেয় মেলি,
ক্ষণতরে কৌতুকের ছেলেখেলা খেলি
নেড়ে দেয় গম্ভীরের ঝুঁটি।

এ জগৎ মাঝে মাঝে কোন্‌ অবকাশে
কখনো বা মৃদুস্মিত কভু উচ্চহাসে
হেসে ওঠে, দেখা যায় আলোকে ঝলকে—
তারা কেহ ধ্রুব নয়, পলকে পলকে
চিহ্ন তার নিয়ে যায় মুছে।

তিমির-আসনে যবে ধ্যানমগ্ন রাত্তি
উল্কাবরিষনকর্তা করে মাতামাতি—
দুই হাতে মুঠা মুঠা কৌতুকের কণা
ছড়ায় হরির লুঠ, নাহি যায় গনা,
প্রহর-কয়েকে যায় ঘুচে।

অনেক অদ্ভুত আছে এ বিশ্বসৃষ্টিতে,
বিধাতার স্নেহ তাহে সহাস্য দৃষ্টিতে।
তেমনি হালকা হাসি দেবতার দানে
রয়েছে খচিত হয়ে আমার সম্মানে—
মূল্য তার মনে মনে জানি।

এত বুড়ো কোনোকালে হব নাকো আমি
হাসি-তামাশারে যবে কব ছ্যাব্‌লামি।
এ নিয়ে প্রবীণ যদি করে রাগারাগি
বিধাতার সাথে তারে করি ভাগাভাগি
হাসিতে হাসিতে লব মানি

শ্যামলী। শান্তিনিকেতন
পৌষ, ১৩৪৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রহাসিনী

আধুনিকা

চিঠি তব পড়িলাম, বলিবার নাই মোর,
তাপ কিছু আছে তাহে, সন্তাপ তাই মোর।
কবিগিরি ফলাবার উৎসাহ-বন্যায়
আধুনিকাদের 'পরে করিয়াছি অন্যায়
যদি সন্দেহ কর এত বড়ো অবিনয়,
চুপ ক'রে যে সহিবে সে কখনো কবি নয়।
বলিব দু-চার কথা, ভালো মনে শুনো তা;
পূরণ করিয়া নিয়ো প্রকাশের ন্যূনতা।
পাঁজিতে যে আঁক টানে গ্রহ-নক্ষত্তর
আমি তো তদনুসারে পেরিয়েছি সত্তর।
আয়ুর তবিল মোর কুষ্ঠির হিসাবে
অতি অল্প দিনেই শূন্যেতে মিশাবে।
চলিতে চলিতে পথে আজকাল হর্দম
বুকে লাগে যমরথচক্রের কর্দম।
তবু মোর নাম আজো পারিবে না ওঠাতে
প্রাত্নিক তত্ত্বের গবেষণা-কোঠাতে।
জীর্ণ জীবনে আর রঙ নাই, মধু নাই—
মনে রেখো, তবু আমি জন্মেছি অধুনাই।
সাড়ে আঠারো শতক এ. ডি., সে যে বি. সি. নয়;
মোর বাবা মেয়ে-বোন নায়রের পিসি নয়।
আধুনিকা যারে বল তারে আমি চিনি যে,
কবিধনে তারি কাছে বারো আনা ঋণী যে।

তারি হাতে চিরদিন যৎপরোনাস্তি
পেয়েছি পুরস্কার, পেয়েছিও শাস্তি।
প্রমাণ গিয়েছি রেখে, এ-কালিনী রমণীর
রমণীয় তালে বাঁধা ছন্দ এ ধমনীর।
কাছে পাই হারাই-বা তবু তারি স্মৃতিতে
সুরসৌরভ জাগে আজো মোর গীতিতে।
মনোলোকে দূতী যারা মাধুরীনিকুঞ্জে
গুঞ্জন করিয়াছি তাহাদেরি গুণ যে।
সেকালেও কালিদাস-বররুচি-আদিরা
পুরসুন্দরীদের প্রশস্তিবাদীরা
যাদের মহিমাগানে জাগালেন বীণারে
তারাও সবাই ছিল অধুনার কিনারে।
আধুনিকা ছিল নাকো হেন কাল ছিল না,
তাহাদেরি কল্যাণে কাব্যানুশীলনা।
পুরুষ কবির ভালে আছে কোনো সুগ্রহ,
চিরকাল তাই তারে এত মহানুগ্রহ।
জুতা-পায়ে খালি-পায়ে স্লিপারে বা নূপুরে
নবীনারা যুগে যুগে এল দিনে দুপুরে,
যেথা স্বপনের পাড়া সেথা যায় আগিয়ে,
প্রাণটাকে নাড়া দিয়ে গান যায় জাগিয়ে।
তবু কবি-রচনায় যদি কোনো ললনা
দেখ অকৃতজ্ঞতা, জেনো সেটা ছলনা।
মিঠে আর কটু মিলে, মিছে আর সত্যি,
ঠোকাঠুকি ক'রে হয় রস-উৎপত্তি।
মিষ্ট-কটুর মাঝে কোন্‌টা যে মিথ্যে
সে কথাটা চাপা থাক্ কবির সাহিত্যে।
ঐ দেখো, ওটা বুঝি হল শ্লেষবাক্য।
এরকম বাঁকা কথা ঢাকা দিয়ে রাখ্য।
প্রলোভনরূপে আসে পরিহাসপটুতা,
সামলানো নাহি যায় অকারণ কটুতা।

বারে বারে এইমতো করি অত্যুক্তি
ক্ষমা করে কোরো সেই অপরাধমুক্তি।

আর যা-ই বলি নাকো এ কথাটা বলিবই,
তোমাদের দ্বারে মোরা ভিক্ষার থলি বই।
অন্ন ভরিয়া দাও সুধা তাহে লুকিয়ে,
মূল্য তাহারি আমি কিছু যাই চুকিয়ে।
অনেক গেয়েছি গান মুখ এ প্রাণ দিয়ে—
তোমরা তো শুনেছ তা, অন্তত কান দিয়ে।
পুরুষ পরুষ ভাষে করে সমালোচনা,
সে অকালে তোমাদেরি বাণী হয় রোচনা।
করুণায় ব'লে থাক, "আহা, মন্দ বা কী।"
খুঁটে বের কর না তো কোনো ছন্দ-ফাঁকি।
এইটুকু যা মিলেছে তাই পায় কল্পনা,
এত লোক করেছে তো ভারতীর ভজনা।
এর পর বাঁশি যবে ফেলে যাব ধূলিতে
তখন আমারে তুলো পার যদি ভুলিতে।
সেদিন নূতন কবি দক্ষিণপবনে
মধু ঋতু মুখরিবে তোমাদের ভবনে—
তখন আমার কোনো কীটে-কাটা পাতাতে
একটা লাইনও যদি পারে মন মাতাতে
তাহলে হঠাৎ বুক উঠিবে যে কাঁপিয়া
বৈতরণীতে যবে যাব খেয়া চাপিয়া।

এ কী গেরো। কাজ কী এ কল্পনাবিহারে,
সেন্টিমেন্টালিটি বলে লোকে ইহারে।
ম'রে তবু বাঁচিবার আবদার খোকামি,
সংসারে এর চেয়ে নেই ঘোর বোকামি।
এটা তো আধুনিকার সহিবে না কিছুতেই;
এস্‌টিমেশনে তার পড়ে যাব নিচুতেই।

অতএব, মন, তোর কলসি ও দড়ি আন্,
অতলে যাবিস ডুব মিড্-ভিক্টোরিয়ান।
কোনো ফল ফলিবে না আঁখিজল-সিচনে;
শুকনো হাসিটা তবে রেখে যাই পিছনে।
গদ্‌গদ সুর কেন বিদায়ের পাঠটায়,
শেষ বেলা কেটে যাক ঠাট্টায় ঠাট্টায়।

তোমাদের মুখে থাক্ হাস্যের রোশনাই—
কিছু সীরিয়াস কথা বলি তবু, দোষ নাই।
কখনো দিয়েছে দেখা হেন প্রভাশালিনী
শুধু এ-কালিনী নয়, যারা চিরকালিনী।
এ কথাটা ব'লে যাব মোর কন্‌ফেশানেই
তাদের মিলনে কোনো ক্ষণিকের নেশা নেই।
জীবনের সন্ধ্যায় তাহাদেরি বরণে
শেষ রবিরেখা রবে সোনা-আঁকা স্মরণে।
সুর-সুরধুনীধারে যে অমৃত উথলে
মাঝে মাঝে কিছু তার ঝ'রে পড়ে ভূতলে,
এ জনমে সে কথা জানার সম্ভাবনা
কেমনে ঘটিবে যদি সাক্ষাৎ পাব না।
আমাদের কত ত্রুটি আসনে ও শয়নে,
ক্ষমা ছিল চিরদিন তাহাদের নয়নে।
প্রেমদীপ জ্বেলেছিল পুণ্যের আলোকে,
মধুর করেছে তারা যত কিছু ভালোকে।
নানারূপে ভোগসুধা যা করেছে বরষন
তারে শুচি করেছিল সুকুমার পরশন।
দামি যাহা মিলিয়াছে জীবনের এ পারে
মরণের তীরে তারে নিয়ে যেতে কে পারে।
তবু মনে আশা করি মৃত্যুর রাতেও
তাহাদেরি প্রেম যেন নিতে পারি পাথেয়।

আর বেশি কাজ নেই, গেছে কেটে তিনকাল,
যে কালে এসেছি আজ সে কালটা সিনিকাল!
কিছু আছে যার লাগি সুগভীর নিশ্বাস
জেগে ওঠে— ঢাকা থাক্ তার প্রতি বিশ্বাস।

একটু সবুর করো, আরো কিছু বলে যাই,
কথার চরম পারে তারপরে চলে যাই।
যে গিয়েছে তার লাগি খুঁজিয়ো না চেতনা,
ছায়ারে অতিথি ক'রে আসনটা পেতো না।
বৎসরে বৎসরে শোক করা রীতিটার
মিথ্যার ধাক্কায় ভিত ভাঙে স্মৃতিটার।
ভিড় ক'রে ঘটা-করা ধরা-বাঁধা বিলাপে
পাছে কোনো অপরাধ ঘটে প্রথা-খিলাপে,
ভারতে ছিল না লেশ এই সব খেয়ালের—
কবি-'পরে ভার ছিল নিজ মেমোরিয়ালের।
"ভুলিব না, ভুলিব না" এই ব'লে চীৎকার
বিধি না শোনেন কভু, বলো তাহে হিত কার।
যে ভোলা সহজ ভোলা নিজের অলক্ষ্যে
সে-ই ভালো হৃদয়ের স্বাস্থ্যের পক্ষে।
শুষ্ক উৎস খুঁজে মরুমাটি খোঁড়াটা,
তেলহীন দীপ লাগি দেশালাই পোড়াটা,
যে-ঘোষ কোথাও নেই সেই ঘোষ তাড়ানো,
কাজে লাগিবে না যাহা সেই কাজ বাড়ানো—
শক্তির বাজে ব্যয় এরে কয় জেনো হে,
উৎসাহ দেখাবার সদুপায় এ নহে।
মনে জেনো জীবনটা মরণেরই যজ্ঞ—
স্থায়ী যাহা, আর যাহা থাকার অযোগ্য,
সকলি আহুতিরূপে পড়ে তারি শিখাতে,
টিঁকে না যা কথা দিয়ে কে পারিবে টিঁকাতে

ছাই হয়ে গিয়ে তবু বাকি যাহা রহিবে
আপনার কথা সে তো আপনিই কহিবে

লাহোর
১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৫

নারীপ্রগতি

শুনেছিনু নাকি মোটরের তেল
পথের মাঝেই করেছিল ফেল,
তবু তুমি গাড়ি ধরেছ দৌড়ে—
হেন বীরনারী আছে কি গৌড়ে
নারীপ্রগতির মহাদিনে আজি
নারীপদগতি জিনিল এ বাজি।

হায় কালিদাস, হায় ভবভূতি,
এই গতি আর এই সব জুতি
তোমাদের গজগামিনীর দিনে
কবিকল্পনা নেয় নি তো চিনে ;
কেনে নি ইস্‌টিশনের টিকেট ;
হৃদয়ক্ষেত্রে খেলে নি ক্রিকেট ;
চণ্ড বেগের ডাণ্ডাগোলায় ;—
তারা তো মন্দ-মধুর দোলায়
শান্ত মিলন-বিরহ-বন্ধে
বেঁধেছিল মন শিথিল ছন্দে।

রেলগাড়ি আর মোটরের যুগে
বহু অপঘাত চলিয়াছি ভুগে—
তাহারি মধ্যে এল সম্প্রতি
এ দুঃসাহস, এ তড়িৎগতি ;

পুরুষেরে দিল দুর্দাম তাড়া,
দুর্বার তেজে নিষ্ঠুর নাড়া।—
ভূকম্পনের বিগ্রহবতী
প্রলয়ধাতার নিগ্রহ অতি
বহন করিয়া এসেছে বঙ্গে
পাদুকামুখর চরণভঙ্গে।

সে ধ্বনি শুনিয়া পরলোকে বসি,
কবি কালিদাস, পড়িল কি খসি
উষ্ণীব তব; দুরুদুরু বুকে
ছন্দ কিছু কি জুটিয়াছে মুখে।
একটি প্রশ্ন শুধাব এবার—
অকপটে তারি জবাব দেবার
আগে একবার ভেবে দেখো মনে,
উত্তর পেলে রাখিব গোপনে—
স্নিগ্ধচ্ছায়া ছিলে যে অতীতে
তেয়াগিয়া তাহা তড়িৎগতিতে
নিতে চাও কভু তীব্রভাষণ
আধুনিকাদের কবির আসন?
মেঘদূত ছেড়ে বিদ্যুৎ-দূত
লিখিতে পারে কি ভাষা মজবুত।

রঙ্গ

'এ তো বড়ো রঙ্গ' ছড়াটির অনুকরণে লিখিত

এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ—
চার মিঠে দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ।
বরফি মিঠে, জিলাবি মিঠে, মিঠে শোন-পাপড়ি—
তাহার অধিক মিঠে, কন্যা, কোমল হাতের চাপড়ি।

এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ—
চার সাদা দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ।
ক্ষীর সাদা, নবনী সাদা, সাদা মালাই রাবড়ি—
তাহার অধিক সাদা তোমার পষ্ট ভাষার দাবড়ি।

এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ—
চার তিতো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ।
উচ্ছে তিতো, পলতা তিতো, তিতো নিমের স্বক্ত-
তাহার অধিক তিতো যাহা বিনি ভাষায় উক্ত।

এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ—
চার কঠিন দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ।
লোহা কঠিন, বজ্র কঠিন, নাগরা জুতোর তলা—
তাহার অধিক কঠিন তোমার বাপের বাড়ি চলা।

এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ—
চার মিথ্যে দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ।
মিথ্যে ভেলকি, ভূতের হাঁচি, মিথ্যে কাঁচের পান্না—
তাহার অধিক মিথ্যে তোমার নাকি সুরের কান্না।

পরিণয়মঙ্গল

তোমাদের বিয়ে হল ফাগুনের চৌঠা,
অক্ষয় হয়ে থাক্ সিঁদুরের কৌটা।
সাত চড়ে তবু যেন কথা মুখে না ফোটে,
নাসিকার ডগা ছেড়ে ঘোমটাও না ওঠে;
শাশুড়ি না বলে যেন 'কী বেহায়া বৌটা'।

'পাক প্রণালী'র মতে কোরো তুমি রন্ধন,
জেনো ইহা প্রণয়ের সব-সেরা বন্ধন।
চামড়ার মতো যেন না দেখায় লুচিটা,
স্বরচিত ব'লে দাবি নাহি করে মুচিটা;
পাতে বসে পতি যেন নাহি করে ক্রন্দন।

যা-ই কেন বলুক-না প্রতিবেশী নিন্দুক
খুব ক'ষে আঁটা যেন থাকে তব সিন্দুক।
বন্ধুরা ধার চায়, দাম চায় দোকানি,
চাকর-বাকর চায় মাসহারা-চোকানি—
ত্রিভুবনে এই আছে অতি বড়ো তিন দুখ।

বই-কেনা শখটারে দিয়ো নাকো প্রশ্রয়;
ধার নিয়ে ফিরিয়ো না, তাতে নাহি দোষ রয়।
বোঝ আর না-ই বোঝ কাছে রেখো গীতাটি,
মাঝে মাঝে উলটিয়ো মনুসংহিতাটি:
'স্ত্রী স্বামীর ছায়াসম' মনে যেন হোঁশ রয়।

যদি কোনো শুভদিনে ভর্তা না ভর্ৎসে,
বেশি ব্যয় হয়ে পড়ে পাকা রুই মৎস্যে,
কালিয়ার সৌরভে প্রাণ যবে উতলায়,
ভোজনে দুজনে শুধু বসিবে কি দু'তলায়।
লোভী এ কবির নাম মনে রেখো, বৎসে।

দ্রুত উন্নতিবেগে স্বামীর অদৃষ্ট
দারোগাগিরিতে এসে শেষে পাক্ ইষ্ট।
বহু পুণ্যের ফল যদি তার থাকে রে,
রায়বাহাদুর-খ্যাতি পাবে তবে আখেরে;
তার পরে আরো কী বা রবে অবশিষ্ট।

প্রয়াগ। ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৫

ভাইদ্বিতীয়া

সকলের শেষ ভাই
সাতভাই চম্পার
পথ চেয়ে বসেছিল
দৈবানুকম্পার।
মনে মনে বিধি-সনে
করেছিল মন্ত্রণ,
যেন ভাইদ্বিতীয়ায়
পায় সে নিমন্ত্রণ।
যদি জোটে দরদি
ছোটো-দি বা বড়ো-দি
অথবা মধুরা কেউ
নাতনির র‍্যাঙ্কে,
উঠিবে আনন্দিয়া,
দেহ প্রাণ মন দিয়া
ভাগ্যেরে বন্দিবে
সাধুবাদে থ্যাঙ্কে।

এল তিথি দ্বিতীয়া,
ভাই গেল জিতিয়া
ধরিল পারুল দিদি
হাতা বেড়ি খুন্তি।
নিরামিষে আমিষে
রেঁধে গেল ঘামি সে,
ঝুড়ি ভ'রে জমা হল
ভোজ্য অগুন্তি।
বড়ো থালা কাংসের
মৎস্য ও মাংসের
কানায় কানায় বোঝা

হয়ে গেল পূর্ণ।
সুঘ্রাণ পোলায়ে
প্রাণ দিল দোলায়ে,
লোভের প্রবল স্রোতে
লেগে গেল ঘূর্ণী।
জমে গেল জনতা,
মহা তার ঘনতা
ভাই-ভাগ্যের সবে
হতে চায় অংশী।
নিদারুণ সংশয়
মনটারে দংশয়—
বহুভাগে দেয় পাছে
মোর ভাগ ধ্বংসি।
চোখ বেখে ঘণ্টে
অতি মিঠে কণ্ঠে
কেহ বলে, "দিদি মোর!"
কেহ বলে, "বোন গো,
দেশেতে না থাক্ যশ,
কলমে না থাক্ রস,
রসনা তো রস বোঝে,
করিয়ো স্মরণ গো।"
দিদিটির হাস্য
করিল যা ভাষ্য
পক্ষপাতের তাহে
দেখা দিল লক্ষণ।
ভয় হল মিথ্যে,
আশা হল চিত্তে,
নির্ভাবনায় ব'সে
করিলাম ভক্ষণ।

লিখেছিনু কবিতা
সুরে তালে শোভিতা—
এই দেশ সেরা দেশ
বাঁচতে ও মরতে।
ভেবেছিনু তখুনি,
একি মিছে বকুনি।
আজ তার মর্মটা
পেরেছি যে ধরতে।
যদি জন্মান্তরে
এই দেশেই টান ধরে
ভাইরূপে আর বার
আনে যেন দৈব—
হাঁড়ি হাঁড়ি রন্ধন,
ঘষাঘষি চন্দন,
ভগ্নী হবার দায়
নৈবচ নৈব।
আসি যদি ভাই হয়ে
যা রয়েছি তাই হয়ে
সোরগোল পড়ে যাবে
হুলু আর শঙ্খে—
জুটে যাবে বুড়িরা
পিসি মাসি খুড়িরা,
ধুতি আর সন্দেশ
দেবে লোকজনকে।
বোনটার ধ'রে চুল
টেনে তার দেব তুল,
খেলার পুতুল তার
পায়ে দেব দলিয়া।
শোক তার কে থামায়,
চুমো দেবে মা আমায়,

রাক্ষুসি বলে তার
কান দেবে মলিয়া।
বড়ো হলে নেব তার
পদখানি দেবতার,
দাদা নাম বলতেই
আঁখি হবে সিক্ত।
ভাইটি অমূল্য,
নাই তার তুল্য,
সংসারে বোনটি
নেহাত অতিরিক্ত।

ভাইদ্বিতীয়া, ১৩৪৩

ভোজনবীর

অসংকোচে করিবে ক'ষে ভোজনরসভোগ,
সাবধানতা সেটা যে মহারোগ।
যকৃৎ যদি বিকৃত হয়
স্বীকৃত হবে, কিসের ভয়,
নাহয় হবে পেটের গোলযোগ।

কাপুরুষেরা করিস তোরা দুখভোগের ভয়,
সুখভোগের হারাস অবসর।
জীবন মিছে দীর্ঘ করা
বিলম্বিত মরণে মরা
শুধুই বাঁচা না খেয়ে ক্ষীর সর।

দেহের তামসিকতা ছিছি মাংস হাড় পেশি,
তাহারি 'পরে দরদ এত বেশি।
আত্মা জানে রসের রুচি,
কামনা করে কোফ্‌তা লুচি,
তারেও হেলা বলো তো কোন্ দেশী।

ওজন করি ভোজন করা, তাহারে করি ঘৃণা,
মরণভীরু, এ কথা বুঝিবি না।
রোগে মরার ভাবনা নিয়ে
সাবধানীরা রহে কি জিয়ে—
কেহ কি কভু মরে না রোগ বিনা।

মাথা ধরায় মাথার শিরা হোক-না ঝংকৃত,
পেটের নাড়ি ব্যথায় টংকৃত।
ওডিকলোনে ললাট ভিজে,—
মাদুলি আর তাগা-তাবিজে
সারাটা দেহ হবে অলংকৃত।

যখন আধিভৌতিকের বাজিবে শেষ ঘড়ি,
গলায় যমদৌতিকের দড়ি।
হোমিয়োপ্যাথি বিমুখ যবে,
কবিরাজিও নারাজ হবে,
তখন আবধৌতিকের বড়ি।

তাহার পরে ছেলে তো আছে বাপেরই পথে ঢুকে
অম্লশূলসাধনকৌতুকে।
কাঁচা আমের আচার যত
রহিবে হয়ে বংশগত,
ধরাবে জ্বালা পারিবারিক বুকে।

খাওয়া বাঁচায়ে বাঙালিদের বাঁচিতে হলে ঝোঁক
এ দেশে তবে ধরিত না তো লোক।
অপরিপাকে মরণভয়
গৌড়জনে করেছে জয়,
তাদের লাগি কোরো না কেহ শোক।

লঙ্কা আনো, সর্ষে আনো, সস্তা আনো ঘৃত,
গন্ধে তার হোয়ো না শঙ্কিত।
আঁচলে ঘেরি কোমর বাঁধো,
ঘণ্ট আর ছেঁচকি রাঁধো,
বৈদ্য ডাকো—তাহার পরে মৃত

অপাক-বিপাক

চলতি ভাষায় যারে ব'লে থাকে আমাশা
যত দূর জানা আছে, সেটা নয় তামাশা।
অধ্যাপকের পেটে এল সেই রোগটা তো,
তাহার কারণ ছিল গুরু জলযোগটা তো।

বউমার অবারিত অতিথিসেবার চোটে
কী কাণ্ড ঘটেছিল শুনে বুক ফুলে ওঠে।
টেবিল জুড়িয়া ছিল চর্ব্য ও কত পেয় ;
ডেকে ডেকে বলেছেন, "যত পার তত খেয়ো।"
হায়, এত উদারতা সইল না উদরের—
জঠরে কী কঠোরতা বিজ্ঞানভূধরের ;
রসনায় ভূরি ভূরি পেল এত মিষ্টতা,
অন্তরে নিয়ে তারে করিল না শিষ্টতা।
এই যদি আচরণ হেন খ্যাতনামাদের,
তোমাদেরি লজ্জা সে, ক্ষতি নেই আমাদের।
হেথাকার আয়োজনে নাই কার্পণ্য যে,
প্রবল প্রমাণে তারি পরিবার ধন্য যে।
বিশ্বে ছড়াল খ্যাতি ; বিশ্ববিদ্যাগৃহে
করে সবে কানাকানি, "বলো দেখি, হল কী হে।"
এত বড়ো ঘটনার কারণ ঘটান যিনি
তাঁর কাছে কবি রবি চিরদিন রবে ঋণী ॥

গরঠিকানি

বেঠিকানা তব
আলাপ শব্দভেদী
দিল এ বিজনে
আমার মৌন ছেদি।
দাদুর পদবী
পেয়েছি, তাহার দায়
কোনো ছুতো করে
কভু কি ঠেকানো যায়!
স্পর্ধা করিয়া
ছন্দে লিখেছ চিঠি;
ছন্দেই তার
জবাবটা যাক মিটি।
নিশ্চিত তুমি
জানিতে মনের মধ্যে,—
গর্ব আমার
খর্ব হবে না গদ্যে।
লেখনীটা ছিল
শক্ত জাতেরই ঘোড়া;
বয়সের দোষে
কিছু তো হয়েছে খোঁড়া।
তোমাদের কাছে
সেই লজ্জাটা ঢেকে
মনে সাধ, যেন
যেতে পারি মান রেখে।
তোমার কলম
চলে যে হালকা চালে,
আমারো কলম
চালাব সে ঝাঁপতালে;

হাঁপ ধরে, তবু
এই সংকল্পটা
টেনে রাখি, পাছে
দাও বয়সের খোঁটা।
ভিতরে ভিতরে
তবু জাগ্রত রয়
দর্পহরণ
মধুসূদনের ভয়।
বয়স হলেই
বৃদ্ধ হয়ে যে মরে
বড়ো ঘৃণা মোর
সেই অভাগার 'পরে।
প্রাণ বেরোলেও
তোমাদের কাছে তবু
তাই তো ক্লান্তি
প্রকাশ করি নে কভু।

কিন্তু একটা
কথায় লেগেছে ধোঁকা,
কবি বলেই কি
আমারে পেয়েছ বোকা।
নানা উৎপাত
করে বটে নানা লোকে,
সহ্য তো করি
স্পষ্ট দেখেছ চোখে,—
সেই কারণেই
তুমি থাক দূরে দূরে,
বলেছ সে কথা
অতি সকরুণ সুরে।

বেশ জানি, তুমি
        জান এটা নিশ্চয়—
উৎপাত সে যে
        নানা রকমের হয়।
কবিদের 'পরে
        দয়া করেছেন বিধি—
মিষ্টি মুখের
        উৎপাত আনে দিদি।
চাটু বচনের
        মিষ্টি রচন জানে;
ক্ষীরে সরে কেউ
        মিষ্টি বানিয়ে আনে।
কোকিলকণ্ঠে
        কেউ বা কলহ করে;
কেউ বা ভোলায়
        গানের তানের স্বরে।
তাই ভাবি, বিধি
        যদি দরদের ভুলে
এ উৎপাতের
        বরাদ্দ দেন তুলে,
শুকনো প্রাণটা
        মহা উৎপাত হবে।
উপমা লাগিয়ে
        কথাটা বোঝাই তবে।—
সামনে দেখো-না
        পাহাড়, সাবল ঠুকে
ইলেক্‌ট্রি কের
        খোঁটা পোঁতে তার বুকে;
সন্ধ্যেবেলার
        মসৃণ অন্ধকারে

এখানে সেখানে
　　　　চোখে আলো খোঁচা মারে।
তা দেখে চাঁদের
　　　　ব্যথা যদি লাগে প্রাণে,
বার্তা পাঠায়
　　　　শৈলশিখর-পানে—
বলে, "আজ হতে
　　　　জ্যোৎস্নার উৎপাতে
আলোর আঘাত
　　　　লাগাব না আর রাতে"—
ভেবে দেখো, তবে
　　　　কথাটা কি হবে ভালো।
তাপের জ্বলন
　　　　আনে কি সবারই আলো।

এখানেই চিঠি
　　　　শেষ ক'রে যাই চলে—
ভেবো না যে তাহা
　　　　শক্তি কমেছে ব'লে;
বুদ্ধি বেড়েছে
　　　　তাহারই প্রমাণ এটা;
বুঝেছি, বেদম
　　　　বাণীর হাতুড়ি পেটা
কথারে চওড়া
　　　　করে বকুনির জোরে,
তেমনি যে তাকে
　　　　দেয় চ্যাপটাও ক'রে।
বেশি যাহা তাই
　　　　কম, এ কথাটা মানি—

চেঁচিয়ে বলার
চেয়ে ভালো কানাকানি।
বাঙালি এ কথা
জানে না ব'লেই ঠকে ;
দাম যায় আর
দম যায় যত বকে।
চেঁচানির চোটে
তাই বাংলার হাওয়া
রাতদিন যেন
হিস্‌টিরিয়ায় পাওয়া।
তারে বলে আর্ট
না-বলা যাহার কথা ;
ঢাকা খুলে বলা
সে কেবল বাচালতা।
এই তো দেখো-না
নাম-ঢাকা তব নাম ;
নামজাদা খ্যাতি
ছাপিয়ে যে ওর দাম

এই দেখো দেখি,
ভারতীর ছল কী এ।
বকা ভালো নয়,
এ কথা বোঝাতে গিয়ে
খাতাখানা জুড়ে
বকুনি যা হল জমা
আর্টের দেবী
করিবে কি তারে ক্ষমা
সত্য কথাটা
উচিত কবুল করা—

রব যে উঠেছে
রবিরে ধরেছে জরা,
তারই প্রতিবাদ
করি এই তাল ঠুকে;
তাই ব'কে যাই
যত কথা আসে মুখে।
এ যেন কলপ
চুলে লাগাবার কাজ—
ভিতরেতে পাকা,
বাহিরে কাঁচার সাজ।
ক্ষীণ কণ্ঠেতে
জোর দিয়ে তাই দেখাই,
বকবে কি শুধু
নাতনিজনেরা একাই।
মানব না হার
কোনো মুখরার কাছে,
সেই গুমোরের
আজো ঢের বাকি আছে।

কালিম্পং
৫ আষাঢ়, ১৩৪৫

অনাদৃতা লেখনী

সম্পাদকি তাগিদ নিত্য চলছে বাহিরে,
অন্তরেতে লেখার তাগিদ একটু নাহি রে
মৌন মনের মধ্যে
গদ্যে কিংবা পদ্যে।

পূর্ব যুগে অশোক গাছে নারীর চরণ লেগে
ফুল উঠিত জেগে—
কলিযুগে লেখনীরে সম্পাদকের তাড়া
নিত্যই দেয় নাড়া,
ধাক্কা খেয়ে যে জিনিসটা ফোটে খাতার পাতে
তুলনা কি হয় কভু তার অশোকফুলের সাথে।

দিনের পরে দিন কেটে যায়
গুন্‌গুনিয়ে গেয়ে
শীতের রৌদ্রে মাঠের পানে চেয়ে।
ফিকে রঙের নীল আকাশে
আতপ্ত সমীরে
আমার ভাবের বাষ্প উঠে
ভেসে বেড়ায় ধীরে,
মনের কোণে রচে মেঘের স্তূপ,
নাই কোনো তার রূপ—
মিলিয়ে যায় সে এলোমেলো নানান ভাবনাতে,
মিলিয়ে যায় সে কুয়োর ধারে
শজনেগুচ্ছ-সাথে।

এদিকে যে লেখনী মোর
একলা বিরহিণী;
দৈবে যদি কবি হতেন তিনি,
বিরহ তাঁর পদ্যে বানিয়ে
নিচের লেখার ছাঁদে আমায়
দিতেন জানিয়ে—

বিনয়সহ এই নিবেদন অঙ্গুলিচম্পাসু,
নালিশ জানাই কবির কাছে, জবাবটা চাই আশু

যে লেখনী তোমার হাতের স্পর্শে জীবন লভে
অচলকূটের নির্বাসন সে কেমন ক'রে সবে।
বক্ষ আমার শুকিয়ে এল, বন্ধ মসী-পান,
কেন আমায় ব্যর্থতার এই কঠিন শাস্তি দান।
স্বাধিকারে প্রমত্তা কি ছিলাম কোনোদিন।
করেছি কি চঞ্চু আমার ভোঁতা কিংবা ক্ষীণ।
কোনোদিন কি অপঘাতে তাপে কিংবা চাপে
অপরাধী হয়েছিলাম মসীপাতন-পাপে।
পত্রপটে অক্ষর-রূপ নেবে তোমার ভাষা,
দিনে-রাতে এই ছাড়া মোর আর কিছু নেই আশা।
নীলকণ্ঠ হয়েছি যে তোমার সেবার তরে,
নীল কালিমার তীব্ররসে কণ্ঠ আমার ভরে।
চালাই তোমার কীর্তিপথে রেখার পরে রেখা,
আমার নামটা কোনো খাতায় কোথাও রয় না লেখা।
ভগীরথকে দেশবিদেশে নিয়েছে লোক চিনে,
গোমুখী সে রইল নীরব খ্যাতিভাগের দিনে।
কাগজ সেও তোমার হাতের স্বাক্ষরে হয় দামি,
আমার কাজের পুরস্কারে কিছুই পাই নে আমি।
কাগজ নিত্য শুয়ে কাটায় টেবিল-'পরে লুটি,
বাঁ দিক থেকে ডান দিকেতে আমার ছুটোছুটি।
কাগজ তোমার লেখা জমায়, বহে তোমার নাম—
আমার চলায় তোমার গতি এইটুকু মোর দাম।
অকীর্তিত সেবার কাজে অঙ্গ হবে ক্ষীণ,
আসবে তখন আবর্জনায় বিসর্জনের দিন।
বাচালতায় তিন ভুবনে তুমিই নিরুপম,
এ পত্র তার অনুকরণ; আমায় তুমি ক্ষমো।
নালিশ আমার শেষ করেছি, এখন তবে আসি।
—তোমার কালিদাসী।

পলাতকা

কোথা তুমি গেলে যে মোটরে
শহরের গলির কোটরে,
  এক্‌জামিনেশনের তাড়া।
কেতাবের 'পরে ঝুঁকে থাক,
বেণীর ডগাও দেখি নাকো,
  দিনে রাতে পাই নে যে সাড়া
আমার চায়ের সভা শূন্য,
মনটা নিরতিশয় ক্ষুণ্ণ,
  সুমুখে নফর বনমালী।
'সুমুখ' তাহারে বলা মিছে,
মুখ দেখে মন যায় খিঁচে,
  বিনাদোষে দিই তারে গালি।
ভোজন ওজনে অতি কম—
নাই রুটি, নাই আলুদম,
  নাই রুইমাছের কালিয়া।
জঠর ভরাই শুধু দিয়ে
দু-পেয়ালা Chinese tea-রে
  আধসের দুগ্ধ ঢালিয়া।
উদাস হৃদয়ে খাই একা
টিনের মাখন দিয়ে সেঁকা
  রুটি-তোস্ শুধু খান তিন।
গোটা-দুই কলা খাই গুনে,
তারই সাথে বিলিতি-বেগুনে
  কিছু পাওয়া যায় ভিটামিন।
মাঝে মাঝে পাই পুলিপিঠে,
পার করে দিই দু চারিটে
  খেজুরগুড়ের সাথে মেখে।

পরিচে পেয়াকি যবে আনে
আড়চোখে চেয়ে তার পানে
'পরে খাব' বলে দিই রেখে।
তারপর দুপুর অবধি
না ক্ষীর, না ছানা সর দধি,
ছুঁই নেকো কোফতা কাবাব।
নিজের এ দশা ভেবে ভেবে
বুক যায় সাত হাত নেবে,
কারে বা জানাই মনোভাব।

করছি নে exaggerate—
কিছু আছে সত্য নিরেট,
কবিত্ব সেও অল্প না।
বিরহ যে বুকে ব্যথা দাগে
সাজিয়ে বলতে গেলে লাগে
পনেরো আনাই কল্পনা।
অতএব এই চিঠি-পাঠে
পরান তোমার যদি ফাটে
খুব বেশি হবে না প্রমাণ।
চিঠির জবাব দেবে যবে
ভাষা ভরে দিয়ো হাহারবে
কবি-নাতনির রেখো মান।

পুনশ্চ

বাড়িয়ে বলাটা ভালো নয়
যদি কোনো নীতিবাদী কয়
কোস্ তারে, "অতিশয় উক্তি—
মসলার যোগে যথা রান্না,
আবদারে ছল ক'রে কান্না,
নাকিসুর-যোগে যথা যুক্তি।

ঝুমকোর ফুল ফোটে ডালে,
চোরেও চায় না কোনোকালে,
কানে ঝুমকোর ফুল দামি।
কৃত্রিম জিনিসেরই দাম,
কৃত্রিম উপাধিতে নাম,
জমকালো করেছি তো আমি
অতএব মনে রেখো দড়ো,
এ চিঠির দাম খুব বড়ো,
যে-হেতুক বাড়িয়ে বলায়
বাজারে তুলনা এর নেই—
কেবলই বানানো বচনেই
ভরা এ যে ছলায় কলায়।
পাল্লা যে দিবি মোর সাথে
সে ক্ষমতা নেই তোর হাতে,
তবুও বলিস প্রাণপণ
বাড়িয়ে বাড়িয়ে মিঠে কথা—
ভুলিবে, হবে না অন্যথা,
দাদামশায়ের বোকা মন।
যা হোক, এ কথা চাই শোনা,
তাড়াতাড়ি ছন্দে লিখো না,
না হয় না হলে কবিবর—
অনুকরণের শরাহত
আছি আমি ভীষ্মের মতো,
তাহে তুমি বাড়িয়ো না স্বর।
যে ভাষায় কথা কয়ে থাক
আদর্শ তারে বলে নাকো,
আমার পক্ষে সে তো ঢের—
flatter করিতে যদি পার
গ্রাম্যতাদোষ যত তারো
একটু পাব না আমি টের।

শান্তিনিকেতন
৮ মাঘ, ১৩৪১

কাপুরুষ

নিবেদনম্ অধ্যাপকিনিষু,—
কর্তা তোমার নিতান্ত নন শিশু,
জানিয়ো তো সেই সংখ্যাতত্ত্বনিধিকে,
ব্যর্থ যদি করেন তিনি বিধিকে,
পুরুষজাতির মুখ্যবিজয়কেতু
গুম্ফশ্মশ্রু ত্যজেন বিনা হেতু,
গণ্ডদেশে পাবেন ক্ষুরের শাস্তি
একটুমাত্র সংশয় তায় নাস্তি।
সিংহ যদি কেশর আপন মুড়োয়
সিংহী তারে হেসেই তবে উড়োয়।
কৃষ্ণসার সে বদ্‌খেয়ালে হঠাৎ
শিং জোড়াটা কাটে যদি পটাৎ
কৃষ্ণসারনি সইতে সে কি পারবে—
ছী ছি ব'লে কোন্ দেশে দৌড় মারবে।
উলটো দেখি অধ্যাপকের বেলায়—
গোঁফদাড়ি সে অসংকোচে ফেলায়,
কামানো মুখ দেখেন যখন ঘরনি
বলেন না তো 'দ্বিধা হও, মা ধরণী'।

গৌড়ী রীতি

নাহি চাহিতেই ঘোড়া দেয় যেই,
ফুঁকে দেয় ঝুলি থলি,
লোকে তার 'পরে মহারাগ করে
হাতি দেয় নাই বলি।

বহু সাধনায় যার কাছে পায়
কালো বিড়ালের ছানা

লোকে তারে বলে নয়নের জলে,
"দাতা বটে ষোলো আনা।"

বিপুল ভোজনে মনের ওজনে
ছটাক যদি বা কমে
সেই ছটাকের চাঁটিতে ঢাকের
গালাগালি-বোল জমে।

দেনার হিসাবে ফাঁকিই মিশাবে,
খুঁজিয়া না পাবে চাবি—
পাওনা-যাচাই কঠিন বাছাই,
শেষ নাহি তার দাবি।

রুদ্ধ দুয়ার বহুমান তার
দ্বারীর প্রসাদে খোলে।
মুক্ত ঘরের মহা আদরের
মূল্য সবাই ভোলে।

সামনে আসিয়া নম্র হাসিয়া
স্তবের রবের দৌড়,
পিছনে গোপন নিন্দারোপণ—
ধন্য ধন্য গৌড়।

অটোগ্রাফ

খুলে আজ বলি, ওগো নব্য,
নও তুমি পুরোপুরি সভ্য।
জগৎটা যত লও চিনে
ভদ্র হতেছ দিনে দিনে।
বলি তবু সত্য এ কথা—
বারো আনা অভদ্রতা

কাপড়ে-চোপড়ে ঢাক' তারে,
ধরা তবু পড়ে বারে বারে,
কথা যেই বার হয় মুখে
সন্দেহ যায় সেই চুকে।

ডেস্কেতে দেখিলাম, মাতা
রেখেছেন অটোগ্রাফ-খাতা।
আধুনিক রীতিটার ভানে
যেন সে তোমারই দাবি আনে।
এ ঠকানো তোমার যে নয়
মনে মোর নাই সংশয়।
সংসারে যারে বলে নাম
তার যে একটু নেই দাম
সে কথা কি কিছু ঢাকা আছে
শিশু ফিলজফারের কাছে।
খোকা বলে, বোকা বলে কেউ—
তা নিয়ে কাঁদ না ভেউ-ভেউ।
নাম-ভোলা খুশি নিয়ে আছ,
নামের আদর নাহি যাচ।
খাতাখানা মন্দ এ না গো
পাতা-ছেঁড়া কাজে যদি লাগ।
আমার নামের অক্ষর
চোখে তব দেবে ঠোক্কর।
ভাববে, এ বুড়োটার খেলা,
আঁচড়-পাঁচড় কাটে মেলা।
লজঞ্জুসের যত মূল্য
নাম মোর নহে তার তুল্য।
তাই তো নিজেরে বলি, ধিক্,
তোমারই হিসাব-জ্ঞান ঠিক।

বস্তু-অবস্তুর সেন্স্‌
খাঁটি তব, তার ডিফারেন্স্‌
পষ্ট তোমার কাছে খুবই—
তাই, হে লজঞ্চুস-লুভি,
মতলব করি মনে মনে,
খাতা থাক্‌ টেবিলের কোণে।
বনমালী কো-অপেতে গেলে
টফি-চকোলেট যদি মেলে
কোনোমতে তবে অন্তত
মান রবে আজকের মতো।
ছ বছর পরে নিয়ো খাতা,
পোকায় না কাটে যদি পাতা।

শান্তিনিকেতন
১ পৌষ, ১৩৪৫

মাল্যতত্ত্ব

লাইব্রেরিঘর, টেবিল-ল্যাম্পো জ্বালা,—
লেগেছি প্রুফ-করেক্‌শনে গলায় কুন্দমালা।
ডেস্কে আছে দুই পা তোলা, বিজন ঘরে একা,
এমন সময় নাতনি দিলেন দেখা।

সোনার কাঠির শিহরলাগা বিশবছরের বেগে
আছেন কন্যা দেহে মনে পরিপূর্ণ জেগে।
হঠাৎ পাশে আসি
কটাক্ষেতে ছিটিয়ে দিল হাসি,
বললে বাঁকা পরিহাসের ছলে
"কোন্‌ সোহাগির বরণমালা পরেছ আজ গলে।"
একটু থেমে দ্বিধার ভানে নামিয়ে দিয়ে চোখ
বলে দিলেম, "যেই বা সে-জন হোক
বলব না তার নাম—
কী জানি, ভাই, কী হয় পরিণাম।

মানবধর্ম, ঈর্ষা বড়ো বালাই,
একটুতে বুক জ্বালায়।"
বললে শুনে বিংশতিকা, "এই ছিল মোর ভালে—
বুক ফেটে আজ মরব কি শেষকালে,
কে কোথাকার তার উদ্দেশে করব রাগারাগি
মালা দেওয়ার ভাগ নিয়ে কি, এমনি হতভাগি।"
আমি বললেম "কেনই বা দাও লাজ,
করোই-না আন্দাজ।"
বলে উঠল, "জানি, জানি, ঐ আমাদের ছবি,
আমারই বান্ধবী।
একসঙ্গে পাস করেছি ব্রাহ্ম-গার্ল্‌-স্কুলে,
তোমার নামে চোখ পড়ে তার ঢুলে।
তোমারও তো দেখেছি ওর পানে
মুগ্ধ আঁখি পক্ষপাতের কটাক্ষ সন্ধানে।"
আমি বললেম, "নাম যদি তার শুনবে নিতান্তই—
আমাদের ঐ জগা মালী, মৃদুস্বরে কই।"
নাতান বলে, "হায় কী দুরবস্থা,
বয়স হয়ে গেছে ব'লেই কণ্ঠ এতই সস্তা।
যে গলাটায় আমরা গলগ্রহ
জগামালীর মালা সেথায় কোন্‌ লজ্জায় বহ।"
আমি বললেম, "সত্য কথাই বলি,
তরুণীদের করুণা সব দিলেম জলাঞ্জলি।
নেশার দিনের পারে এসে আজকে লাগে ভালো,
ঐ যে কঠিন কালো।
জগার আঙুল মালা যখন গাঁথে
বোকা মনের একটা কিছু মেশায় তারই সাথে।
তারই পরশ আমার দেহ পরশ করে যবে
রস কিছু তার পাই যে অনুভবে।
এ-সব কথা বলতে মানি ভয়
তোমার মতো নব্যজনের পাছে মনে হয়—

এ বাণী বস্তুত
কেবলমাত্র উচ্চদরের উপদেশের ছুতো,
ডাইডাক্‌টিক্‌ আখ্যা দিয়ে যারে
নিন্দা করে নতুন অলংকারে।
গা ছুঁয়ে তোর কই,
কবিই আমি, উপদেষ্টা নই।
বলি-পড়া বাকলওয়ালা বিদেশী ঐ গাছে
গন্ধবিহীন মুকুল ধরে আছে
আঁকাবাঁকা ডালের ডগা ধূসর রঙে ছেয়ে—
যদি বলি ওটাই ভালো মাধবিকার চেয়ে,
দোহাই তোমার কুরঙ্গনয়নী,
ব্যঙ্গকুটিল দুর্বাক্য-চয়নী,
ভেবো না গো, পূর্ণচন্দ্রমুখী,
হরিজনের প্রপাগ্যাণ্ডা দিচ্ছে বুঝি উঁকি।
এতদিন তো ছন্দে-বাঁধা অনেক কলরবে
অনেকরকম রঙ-চড়ানো স্তবে
সুন্দরীদের জুগিয়ে এলেম মান—
আজকে যদি বলি 'আমার প্রাণ
জগামালীর মালায় পেল একটা কিছু খাঁটি',
তাই নিয়ে কি চলবে ঝগড়াঝাঁটি।"
নাতনি কহেন, "ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিচ্ছ কথা,
আমার মনে সত্যি লাগায় ব্যথা।
তোমার বয়স চারিদিকের বয়সখানা হতে
চলে গেছে অনেক দূরের স্রোতে।
একলা কাটাও ঝাপসা দিবসরাতি,
নাইকো তোমার আপন দরের সাথি।
জগামালীর মালাটা তাই আনে
বর্তমানের অবজ্ঞাভার নীরস অসম্মানে।"
আমি বললেম, "দয়াময়ী, ঐটে তোমার ভুল,
ঐ কথাটার নাইকো কোনো মূল।

জান তুমি, ঐ যে কালো মোষ
আমার হাতে রুটি খেয়ে মেনেছে মোর পোষ,
মিনি-বেড়াল নয় বলে সে আছে কি তার দোষ।
জগামালীর প্রাণে
যে জিনিসটা অবুঝভাবে আমার দিকে টানে
কী নাম দেব তার,
একরকমের সেও অভিসার।
কিন্তু সেটা কাব্যকলায় হয় নি বরণীয়,
সেই কারণেই কণ্ঠে আমার সমাদরণীয়।"
নাতনি হেসে বলে,
"কাব্যকথার ছলে
পকেট থেকে বেরোয় তোমার ভালো কথার থলি,
ওটাই আমি অভ্যাসদোষ বলি।"
আমি বললেম, "যদি কোনোক্রমে
জন্মগ্রহের ভ্রমে
ভালো যেটা সেটাই আমার ভালো লাগে দৈবে,
হয়তো সেটা একালেরও সরস্বতীর সইবে।"
নাতনি বলে, "সত্যি বলো দেখি,
আজকে-দিনের এই ব্যাপারটা কবিতায় লিখবে কি।"
আমি বললেম, "নিশ্চয় লিখবই,
আরম্ভ তার হয়েই গেছে সত্য করেই কই।
বাঁকিয়ো না গো পুষ্পধনুক-ভুরু,
শোনো তবে, এইমতো তার শুরু।—
'শুক্ল একাদশীর রাতে
কলিকাতার ছাতে
জ্যোৎস্না যেন পারিজাতের পাপড়ি দিয়ে ছোঁওয়া,
গলায় আমার কুন্দমালা গোলাপজলে ধোওয়া'—
এইটুকু যেই লিখেছি সেই হঠাৎ মনে প'ল,
এটা নেহাত অসাময়িক হল।
হাল ফ্যাশানের বাণীর সঙ্গে নতুন হল রফা,
একাদশীর চন্দ্র দেবেন কর্মেতে ইস্তফা।

শুধুসভায় যত খুশি করুন বাবুয়ানা,
সভ্য হতে চান যদি তো বাহার-দেওয়া মানা।
তাছাড়া ঐ পারিজাতের ন্যাকামিও ত্যাজ্য,
মধুর করে বানিয়ে বলা নয় কিছুতেই ন্যায্য।
বদল করে হল শেষে নিম্নরকম ভাষা—
'আকাশ সে দন ধুলোয় ধোঁয়ায় নিরেট করে ঠাসা,
রাতটা যেন কুলিমাগি কয়লাখনি থেকে
এল কালো রঙের উপর কালির প্রলেপ মেখে।'
তার পরেকার বর্ণনা এই—'তামাক-সাজার ধন্দে
জগার থ্যাবড়া আঙুলগুলো দোক্তাপাতার গন্ধে
দিনরাত্রি ল্যাপা।
তাই সে জগা খ্যাপা
যে মালাটাই গাঁথে তাতে ছাপিয়ে ফুলের বাস
তামাকেরই গন্ধের হয় উৎকট প্রকাশ।' "
নাতনি বললে বাধা দিয়ে, "আমি জানি জানি,
কী বলে যে শেষ করেছ নিলেম অনুমানি।
যে তামাকের গন্ধ ছাড়ে মালার মধ্যে, ওটায়
সর্বসাধারণের গন্ধ নাড়ীর ভিতর ছোটায়।
বিশ্বপ্রেমিক, তাই তোমার এই তত্ত্ব—
ফুলের গন্ধ আলংকারিক, এ গন্ধটাই সত্য।"
আমি বললেম, "ওগো কন্যে, গলদ আছে মূলেই,
এতক্ষণ যা তর্ক করছি সেই কথাটা ভুলেই।
মালাটাই যে ঘোর সেকেলে, সরস্বতীর গলে
আর কি ওটা চলে।
রিয়ালিস্টিক প্রসাধন যা নব্যশাস্ত্রে পড়ি—
সেটা গলায় দড়ি।"

নাতনি আমার ঝাঁকিয়ে মাথা নেড়ে
এক দৌড়ে চলে গেল আমার আশা ছেড়ে।

শ্যামলী, শান্তিনিকেতন
৩১ ডিসেম্বর, ১৯৩৮

সংযোজন

নাসিক হইতে খুড়ার পত্র

কলকত্তামে চলা গয়ো রে সুরেনবাবু[1] মেরা,
সুরেনবাবু, আসল বাবু, সকল বাবুকো সেরা।
খুড়া সাবকো কায়কো নহি পতিয়া ভেজো বাচ্ছা—
মহিনা-ভর্ কুছ খবর মিলে না ইয়ে তো নহি আচ্ছা।
টপাল্,[2] টপাল্, কঁহা টপাল্‌রে, কপাল হমারা মন্দ,
সকাল বেলাতে নাহি মিলতা টপাল্‌কো নাম গন্ধ!
ঘরকো যাকে কায়কো বাবা, তুম্‌সে হম্‌সে ফর্‌ঘৎ।
দো-চার কলম লীখ্ দেওঙে ইস্‌মে ক্যা হয় হর্‌কৎ!
প্রবাসকো এক সীমা পর হম্ বৈঠ্‌কে আছি একলা—
সুরিবাবাকো বাস্তে আঁখ্‌সে বহুৎ পানি নেক্‌লা।
সর্বদা মন কেমন কর্‌তা, কেঁদে উঠ্‌তা হির্দয়—
ভাত খাতা, ইস্কুল যাতা, সুরেনবাবু নির্দয়!
মন্‌কা দুঃখে হূহু কর্‌কে নিক্‌লে হিন্দুস্থানী—
অসম্পূর্ণ ঠেক্‌তা কানে বাঙলাকো জবানী।
মেরা উপর জুলুম কর্‌তা তেরি বহিন বাই,[3]
কী করেঙ্গা কোথায় যাঙ্গা ভেবে নাহি পাই!
বহুৎ জোরসে গাল টিপ্‌তা দোনো আঙ্‌লি দেকে,
বিলাতী এক পৈনি বাজ্‌না বাজাতা থেকে থেকে,
কভী কভী নিকট আকে ঠোঁটমে চিম্‌টি কাটতা,
কাঁচি লে কর কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া চুলগুলো সব ছাঁটতা,
জজসাহেব[4] কুছ বোল্‌তা নহি রক্ষা করবে কেটা,
কঁহা গয়োরে কঁহা গয়োরে জজসাহেবকি বেটা!

১ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
২ চিঠির ডাক।
৩ শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।
৪ অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথের পিতা।

গাড়ি চড়্‌কে লাঠিন পড়্‌কে তুম্ তো যাতা ইস্কিল্,
ঠোঁটে নাকে চিম্‌টি খাকে হমারা বহুৎ মুস্কিল!
এদিকে আবার party হোতা খেল্‌নেকোবি যাতা,
জিম্‌খানামে হিম্‌ঝিম্ এবং খোড়া বিস্কুট খাতা।
তুম ছাড়া কোই সম্‌জে না তো হম্‌রা দুরাবস্থা,
বহিন তেরি বহুৎ merry খিল্‌খিল্ কর্কে হাস্তা!
চিঠি লিখিও মাকে দিও বহুৎ বহুৎ সেলাম,
আজকের মত তবে বাবা বিদায় হোকে গেলাম।

পত্র

সৃষ্টি-প্রলয়ের তত্ত্ব
লয়ে সদা আছ মত্ত,
দৃষ্টি শুধু আকাশে ফিরিছে;
গ্রহতারকার পথে
যাইতেছ মনোরথে,
ছুটিছ উল্কার পিছে পিছে;
হাঁকায়ে দু-চারিজোড়া
তাজা পক্ষিরাজ-ঘোড়া
কলপনা গগনভেদিনী
তোমারে করিয়া সঙ্গী
দেশকাল যায় লঙ্ঘি,
কোথা প'ড়ে থাকে এ মেদিনী।
সেই তুমি ব্যোমচারী
আকাশ-রবিরে ছাড়ি
ধরার রবিরে কর মনে—
ছাড়িয়া নক্ষত্র গ্রহ
একি আজ অনুগ্রহ
জ্যোতির্হীন মর্ত্যবাসী জনে।

ভুলেছ ভুলেছ কক্ষ,
দূরবীন ভ্রষ্টলক্ষ্য,
কোথা হতে কোথায় পতন।
ত্যজি দীপ্ত ছায়াপথে
পড়িয়াছ কায়াপথে—
মেদ-মাংস মজ্জা-নিকেতন।

বিধি বড়ো অনুকূল,
মাঝে মাঝে হয় ভুল,
ভুল থাক্ জন্ম জন্ম বেঁচে—
তবু তো ক্ষণেকতরে
ধূলিময় খেলাঘরে
মাঝে মাঝে দেখা দাও কেঁচে।
তুমি অন্ত কাশীবাসী,
সম্প্রতি লয়েছ আসি
বাবা ভোলানাথের শরণ;
দিব্য নেশা জমে ওঠে,
দু বেলা প্রসাদ জোটে,
বিধিমতে ধূমোপকরণ।
জেগে উঠে মহানন্দ
খুলে যায় ছন্দোবন্ধ,
ছুটে যায় পেন্সিল উদ্দাম—
পরিপূর্ণ ভাবভরে
লেফাফা ফাটিয়া পড়ে,
বেড়ে যায় ইস্টাম্পের দাম।
আমার সে কর্ম নাস্তি,
দারুণ দৈবের শাস্তি,
শ্লেষ্মা-দেবী চেপেছেন বক্ষে—

সহজেই দম কম
তাহে লাগাইলে দম
কিছুতে রবে না আর রক্ষে।
নাহি গান, নাহি বাঁশি,
দিনরাত্রি শুধু কাশি,
ছন্দ তাল কিছু নাহি তাহে ;
নবরস কবিত্বের
চিত্তে ছিল জমা ঢের,
বহে গেল সর্দির প্রবাহে।
অতএব নমোনম,
অধম অক্ষমে ক্ষম,
ভঙ্গ আমি দিনু ছন্দরণে—
মগধে কলিঙ্গে গৌড়ে
কল্পনার ঘোড়দৌড়ে
কে বলো পারিবে তোমা-সনে

বনক্ষেত্র, শিমলাশৈল
শনিবার, ১৮৯৮

সুসীম চা-চক্র

শান্তিনিকেতনে চা-চক্র প্রবর্তন উপলক্ষ্যে

হায় হায় হায়
দিন চলি যায়।
চা-স্পৃহ চঞ্চল
চাতকদল চল
চল চল হে!
টগবগ উচ্ছল
কাথলিতল জল
কল কল হে

এস চীন-গগন হতে
পূর্বপবনস্রোতে
শ্যামল রসধরপুঞ্জ,
শ্রাবণবাসরে
রস ঝরঝর ঝরে
ভুঞ্জ হে ভুঞ্জ
দলবল হে॰!

এস পুঁথিপরিচারক
তদ্ধিতকারক
তারক তুমি কাণ্ডারী,
এস গণিত-ধুরন্ধর
কাব্য-পুরন্দর
ভূবিবরণ ভাণ্ডারী।
এস বিশ্বভার-নত
শুষ্ক-রুটিনপথ
মরুপরিচারণ ক্লান্ত!
এস হিসাব'পত্তর'ত্রস্ত
তহবিল-মিল-ভুলগ্রস্ত
লোচনপ্রান্ত
ছল ছল হে!

এস গীতিবীথিচর
তম্বুরকরধর
তানতালতলমগ্ন,
এস চিত্রী চটপট
ফেলি তুলিকপট
রেখাবর্ণবিলগ্ন।
এস কনস্টিট্যুশন
নিয়ম-বিভূষণ
তর্কে অপরিশ্রান্ত,

এস কমিটি-পলাতক
বিধানঘাতক
এস দিগ্‌ভ্রান্ত
টলমল হে।

[শান্তিনিকেতন
শ্রাবণ ১৩৩১]

•

চাতক

শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের নিমন্ত্রণে শান্তিনিকেতন চা-চক্রে আহূত অতিথিগণের প্রতি

কী রসসুধা-বরষাদানে মাতিল সুধাকর
তিব্বতীয় শাস্ত্র গিরিশিরে !
তিয়াষিদল সহসা এত সাহসে করি ভর
কী আশা নিয়ে বিধুরে আজি ঘিরে !

পাণিনিরসপানের বেলা দিয়েছে এরা ফাঁকি,
অমরকোষ-ভ্রমর এরা নহে।
নহে তো কেহ সারস্বত-রস-সারসপাখি,
গৌড়পাদ-পাদপে নাহি রহে।

অনুস্বরে ধনুঃশর-টংকারের সাড়া
শঙ্কা করি দূরে দূরেই ফেরে।
শঙ্কর-আতঙ্কে এরা পালায় বাসাছাড়া,
পালি ভাষায় শাসায় ভীরুদেরে।

চা-রস ঘন শ্রাবণধারাপ্লাবন লোভাতুর
কলাসদনে চাতক ছিল এরা—
সহসা আজি কৌমুদীতে পেয়েছে এ কী সুর,
চকোর-বেশে বিধুরে কেন ঘেরা

নিমন্ত্রণ

প্রজাপতি যাঁদের সাথে
পাতিয়ে আছেন সখ্য,
আর যাঁরা সব প্রজাপতির
ভবিষ্যতের লক্ষ্য,
উদয়ায়ণ উদার ক্ষেত্রে
মিলুন উভয় পক্ষ,
রসনাতে রসিয়ে উঠুক
নানারসের ভক্ষ্য।
সত্যযুগে দেবদেবীদের
ডেকেছিলেন দক্ষ
অনাহূত পড়ল এসে
মেলাই যক্ষ রক্ষ,
আমরা সে ভুল করব না তো,
মোদের অন্নকক্ষ
দুই পক্ষেই অপক্ষপাত
দেবে ক্ষুধায় মোক্ষ।
আজো যাঁরা বাঁধন-ছাড়া
ফুলিয়ে বেড়ান বক্ষ
বিদায়কালে দেব তাঁদের
আশিস লক্ষ লক্ষ—
"তাঁদের ভাগ্যে অবিলম্বে
জুটুন কারাধ্যক্ষ।"
এর পরে আর মিল মেলে না
য র ল ব হ ক্ষ।

[? ১৯২৮]

নাতবউ

অন্তরে তার যে মধুমাধুরী পুঞ্জিত
সুপ্রকাশিত সুন্দর হাতে সন্দেশে।
লুব্ধ কবির চিত্ত গভীর গুঞ্জিত,
মত্ত মধুপ মিষ্টরসের গন্ধে সে।
দাদামশায়ের মন ভুলাইল নাতিতে
প্রবাসবাসের অবকাশ ভরি আতিথ্যে,
সে কথাটি কবি গাঁথি রাখে এই ছন্দে সে।

সযতনে যবে সূর্যমুখীর অর্ঘ্যটি
আনে নিশান্তে, সেও নিতান্ত মন্দ না।
এও ভালো যবে ঘরের কোণের স্বর্গটি
মুখরিত করি তানে মানে করে বন্দনা।
তবু আরো বেশি ভালো বলি শুভাদৃষ্টকে
থালাখানি যবে ভরি স্বরচিত পিষ্টকে
মোদক-লোভিত মুগ্ধ নয়ন নন্দে সে।

প্রভাতবেলায় নিরালা নীরব অঙ্গনে
দেখেছি তাহারে ছায়া-আলোকের সম্পাতে।
দেখেছি মালাটি গাঁথিছে চামেলি-রঙ্গনে,
সাজি সাজাইছে গোলাপে জবায় চম্পাতে।
আরো সে করুণ তরুণ তনুর সংগীতে
দেখেছি তাহারে পরিবেশনের ভঙ্গীতে,
স্মিতমুখী মোর লুচি ও লোভের দ্বন্দ্বে সে।

বলো কোন্ ছবি রাখিব স্মরণে অঙ্কিত—
মালতীজড়িত বঙ্কিম বেণীভঙ্গিমা?
দ্রুত-অঙ্গুলে সুরশৃঙ্গার ঝংকৃত?
শুভ্র শাড়ির প্রান্তধারার রঙ্গিমা?

পরিহাসে মোর মৃদু হাসি তার লজ্জিত ?
অথবা ডালিটি দাড়িমে আঙুরে সজ্জিত ?
কিম্বা থালিটি থরে থরে ভরা সন্দেশে ?

দার্জিলিং
বিজয়া দ্বাদশী, ১৬ আশ্বিন ১৩৩৮

মিষ্টান্বিতা

যে মিষ্টান্ন সাজিয়ে দিলে হাঁড়ির মধ্যে
শুধুই কেবল ছিল কি তায় শিষ্টতা।
যত্ন করে নিলেম তুলে গাড়ির মধ্যে,
দূরের থেকেই বুঝেছি তার মিষ্টতা।
সে মিষ্টতা নয় তো কেবল চিনির সৃষ্টি,
রহস্য তার প্রকাশ পায় যে অন্তরে।
তাহার সঙ্গে অদৃশ্য কার মধুর দৃষ্টি
মিশিয়ে গেছে অশ্রুত কোন্ মন্তরে।
বাকি কিছুই রইল না তার ভোজন-অন্তে,
বহুত তবু রইল বাকি মনটাতে—
এমনি করেই দেব্‌তা পাঠান ভাগ্যবন্তে
অসীম প্রসাদ সসীম ঘরের কোণটাতে
সে বর তাঁহার বহন করল যাদের হস্ত
হঠাৎ তাদের দর্শন পাই সুক্ষণেই—
রঙিন করে তারা প্রাণের উদয় অস্ত,
দুঃখ যদি দেয় তবুও দুঃখ নেই।

হেন গুমর নেইকো আমার, স্তুতির বাক্যে
ভোলাব মন ভবিষ্যতের প্রত্যাশায়,
জানি নে তো কোন্ খেয়ালের ক্রূর কটাক্ষে
কখন বজ্র হানতে পারে অত্যাশায়

দ্বিতীয়বার মিষ্ট হাতের মিষ্ট অন্নে
ভাগ্য আমার হয় যদি হোক বঞ্চিত,
নিরতিশয় করব না শোক তাহার জন্যে
ধ্যানের মধ্যে রইল যে ধন সঞ্চিত।
আজ বাদে কাল আদর যত্ন না হয় কমল,
গাছ মরে যায় থাকে তাহার টবটা তো
জোয়ারবেলায় কানায় কানায় যে জল জমল
ভাঁটার বেলায় শুকোয় না তার সবটা তো।
অনেক হারাই, তবু যা পাই জীবনযাত্রা
তাই নিয়ে তো পেরোয় হাজার বিস্মৃতি।
রইল আশা, থাকবে ভরা খুশির মাত্রা
যখন হবে চরম শ্বাসের নিঃসৃতি।

বলবে তুমি, 'বালাই! কেন বকছ মিথ্যে,
প্রাণ গেলেও যত্নে রবে অকুণ্ঠা।'
বুঝি সেটা, সংশয় মোর নেইকো চিত্তে,
মিথ্যে খোঁটায় খোঁচাই তবু আগুনটা।
অকল্যাণের কথা কিছু লিখনু অত্র,
বানিয়ে-লেখা ওটা মিথ্যে দুষ্টুমি।
তদুত্তরে তুমিও যখন লিখবে পত্র
বানিয়ে তখন কোরো মিথ্যে রুষ্টমি।

১ জুন, ১৯৩৫

নামকরণ

দেয়ালের ঘেরে যারা
গৃহকে করেছে কারা,
ঘর হতে আঙিনা বিদেশ,

গুরুভজা বাঁধা বুলি
যাদের পরায় ঠুলি,
মেনে চলে ব্যর্থ নিদেশ,
যাহা কিছু আজগুবি
বিশ্বাস করে খুবই,
সত্য যাদের কাছে হেঁয়ালি,
সামান্য ছুতোনাতা
সকলই পাথরে গাঁথা,
তাহাদেরই বলা চলে দেয়ালি।

আলো যার মিট্‌মিটে,
স্বভাবটা খিট্‌খিটে,
বড়োকে করিতে চায় ছোটো,
সব ছবি ভুষো মেজে
কালো ক'রে নিজেকে যে
মনে করে ওস্তাদ পোটো,
বিধাতার অভিশাপে
ঘুরে মরে ঝোপে-ঝাপে
স্বভাবটা যার বদখেয়ালি,
খ্যাক্ খ্যাক্ করে মিছে,
সব-তাতে দাঁত খিঁচে,
তারে নাম দিব খ্যাক্‌শেয়ালি।

দিনখাটুনির শেষে
বৈকালে ঘরে এসে
আরাম-কেদারা যদি মেলে—
গল্পটি মনগড়া,
কিছু বা কবিতা পড়া,
সময়টা যায় হেসে খেলে—

দিয়ে জুঁই বেল জবা
সাজানো সুহৃদসভা,
আলাপ-প্রলাপ চলে দেদারই—
ঠিক সুরে তার বাঁধা,
মূলতানে তান সাধা,
নাম দিতে পারি তবে কেদারি।

শান্তিনিকেতন
৭ মার্চ, ১৯৩৯

ধ্যানভঙ্গ

পদ্মাসনার সাধনাতে দুয়ার থাকে বন্ধ,
ধাক্কা লাগায় সুধাকান্ত, লাগায় অনিল চন্দ।
ভিজিটবুকে এগিয়ে আনে; অটোগ্রাফের বহি
দশ-বিশটা জমা করে, লাগাতে হয় সহি।
আনে ফটোগ্রাফের দাবি, রেজিস্টারি চিঠি,
বাজে কথা, কাজের তর্ক, নানান খিটিমিটি।
পদ্মাসনের পদ্মে দেবী লাগান মোটরচাকা,
এমন দৌড় মারেন তখন মিথ্যে তাঁরে ডাকা।
ভাঙা ধ্যানের টুকরো যত খাতায় থাকে পড়ি;
অসমাপ্ত চিন্তাগুলোর শূন্যে ছড়াছড়ি।

সত্যযুগে ইন্দ্রদেবের ছিল রসজ্ঞান,
মস্ত মস্ত ঋষিমুনির ভেঙে দিতেন ধ্যান—
ভাঙন কিন্তু আর্টিস্টিক; কবিজনের চক্ষে
লাগত ভালো, শোভন হত দেব্‌তাদিগের পক্ষে।
তপস্যাটার ফলের চেয়ে অধিক হত মিঠা
নিষ্ফলতার রসমগ্ন অমোঘ পদ্ধতিটা।
ইন্দ্রদেবের অধুনাতন মেজাজ কেন কড়া—
তখন ছিল ফুলের বাঁধন, এখন দড়িদড়া

ধাক্কা মারেন সেক্রেটারি, নয় মেনকা-রম্ভা—
রিয়লিস্টিক আধুনিকের এইমতোই ধরম বা।
ধ্যান খোয়াতে রাজি আছি দেবতা যদি চান তা—
সুধাকান্ত না পাঠিয়ে পাঠান সুধাকান্তা।
কিন্তু, জানি, ঘটবে না তা, আছেন অনিল চন্দ—
ইন্দ্রদেবের বাঁকা মেজাজ, আমার ভাগ্য মন্দ।
সইতে হবে স্থূলহস্ত-অবলেপের দুঃখ,
কলিযুগের চালচলনটা একটুও নয় সূক্ষ্ম।

রেলেটিভিটি

তুলনায় সমালোচনাতে
জিভে আর দাঁতে
লেগে গেল বিচারের দ্বন্দ্ব,
কে ভালো কে মন্দ।
বিচারক বলে হেসে,
দাঁতজোড়া কী সর্বনেশে
যবে হয় দেঁতো।
কিন্তু, সে সুধাময় লোকবিশেষে তো
হাসিরশ্মিতে,
যাহারে আদরে ডাকি 'অয়ি সুস্মিতে'
পাণিনির শুদ্ধ নিয়মে।

জিহ্বায় রস খুব জমে,
অথচ তাহার সংস্রবে
দেহখানা যবে
আগাগোড়া উঠে জ্বলি
রস নয়, বিষ তারে বলি।

স্বভাবে কঠিন কেহ, মেজাজে নরম—
বাহিরে শীতল কেহ, ভিতরে গরম।

প্রকাশ্যে এক রূপ যার
ঘোমটায় আর।
তুলনায় দাঁত আর জিভ
সবই রেলেটিভ।
হয়তো দেখিবে, সংসারে
দাঁতালো যা মিঠে লাগে তারে,
আর যেটা ললিত রসালো
লাগে নাকো ভালো।
সৃষ্টিতে পাগলামি এই—
একান্ত কিছু হেথা নেই।

ভালো বা খারাপ লাগা
পদে পদে উলোটা-পালোটা—
কভু সাদা কালো হয়,
কখনো বা সাদাই কালোটা,
মন দিয়ে ভাবো যদ্যপি
জানিবে এ খাঁটি ফিলজফি।

শ্যামলী, শান্তিনিকেতন
৩০।১২।৩৮ সকাল

নারীর কর্তব্য

পুরুষের পক্ষে সব তন্ত্রমন্ত্র মিছে,
মনু-পরাশরদের সাধ্য নাই টানে তারে পিছে।
বুদ্ধি মেনে চলা তার রোগ;
খাওয়া-ছোঁওয়া সব-তাতে তর্ক করে, বাধে গোলযোগ।

মেয়েরা বাঁচাবে দেশ, দেশ যবে ছুটে যায় আগে।
হাই তুলে দুর্গা ব'লে যেন তারা শেষরাত্তে জাগে;
খিড়কির ডোবাটাতে সোজা
ব'হে যেন নিয়ে আসে যত এঁটো বাসনের বোঝা;

মাজা-ঘষা শেষ করে আঙিনায় ছোটে—
ধড়ফড়ে জ্যান্ত মাছ কোটে
দুই হাতে ল্যাজামুড়ো আপটিয়ে ধ'রে
সুনিপুণ কবজির জোরে,
ছাই পেতে বঁটির উপরে চেপে ব'সে,
কোমরে আঁচল বেঁধে ক'ষে।
কুটিকুটি বানায় ইচোড়;
চাকা চাকা করে থোড়,
আঙুলে জড়ায় তার সুতো;
মোচাগুলো ঘস্ ঘস্ কেটে চলে দ্রুত;
চালতারে
বিশ্লেষণ করে খরধারে।
বেগুন পটোল আলু খণ্ড খণ্ড হয় সে অগুন্তি।
তারপরে হাতা বেড়ি খুন্তি;
তিন-চার দফা রান্না সে
নানা ফরমাশে—
আপিসের, ইস্কুলের, পেট-রোগা রুগির কোনোটা,
সিদ্ধ চাল, সরু চাল, ঢেঁকিছাঁটা, কোনোটা বা মোটা
যবে পাবে ছুটি
বেলা হবে আড়াইটা। বিড়ালকে দিয়ে কাঁটাকুটি
পান-দোক্তা মুখে পুরে দিতে যাবে ঘুম;
ছেলেটা চেঁচায় যদি পিঠে কিল দেবে ধুমাধুম,
বলবে "বজ্জাত ভারি"।
তার পরে রাত্রে হবে রুটি আর বাসি তরকারি।

জনার্দন ঠাকুরের
পানাপুকুরের
পাড়ের কাছটা ঢাকা কলমির শাকে।
গা ধুয়ে তাহারই এক ফাঁকে,

ঘড়া কাঁখে, গায়েতে জড়ায়ে ভিজে শাড়ি
ঘন ঘন হাত নাড়ি
খস্‌খস্‌-শব্দ-করা পাতায় বিছানো বাঁশবনে
রাম নাম জপি মনে মনে
ঘরে ফিরে যায় দ্রুতপায়ে
গোধূলির ছম্‌ছমে অন্ধকারছায়ে।
সন্ধ্যেবেলা বিধবা ননদি বসে ছাতে,
জপমালা ঘোরে হাতে।
বউ তার চুলের জটায়
চিরুনি-আঁচড় দিয়ে কানে কানে কলঙ্ক রটায়
পাড়াপ্রতিবেশিনীর— কোনো সূত্রে শুনতে সে পেয়ে
হন্তদন্ত আসে ধেয়ে
ও-পাড়ার বোসগিন্নি; চোখা চোখা বচন বানায়ে
স্বামীপুত্র-খাদনের আশা তারে যায় সে জানায়ে।

কাপড়ে-জড়ানো পুঁথি কাঁখে
তিলক কাটিয়া নাকে
উপস্থিত আচার্যি মশায়—
গিন্নির মধ্যমপুত্র শনির দশায়,
আটক পড়েছে তার বিয়ে;
তাহারই ব্যবস্থা নিয়ে
স্বস্ত্যয়নের ফর্দ মস্ত,
কর্তারে লুকিয়ে তারই খরচের হল বন্দোবস্ত।

এমনি কাটিয়ে যায় সনাতনী দিনগুলি যত
চাটুজ্যেমশা'র অনুমত—
কলহে ও নামজপে, ভবিষ্যৎ জামাতার খোঁজে,
নেশাখোর ব্রাহ্মণের ভোজে।

মেয়েরাও বই যদি নিতান্তই পড়ে
মন যেন একটু না নড়ে।

নূতন বই কি চাই। নূতন পঞ্জিকাখানা কিনে
মাথায় ঠেকায়ে তারে প্রণাম করুক শুভদিনে।
আর আছে পাঁচালির ছড়া,
বুদ্ধিতে জড়াবে জোরে স্থাশস্থাল কাল্‌চারের দড়া।
দুর্গতি দিয়েছে দেখা; বঙ্গনারী ধরেছে শেমিজ,
বি-এ এম-এ পাস ক'রে ছড়াইছে বীজ
যুক্তি-মানা ঘোর ম্লেচ্ছতার।
ধর্মকর্ম হল ছারখার।
শীতলামায়ীরে করে হেলা;
বসন্তের টিকা নেয়; 'গ্রহণের বেলা
গঙ্গাস্নানে পাপ নাশে'
শুনিয়া মূর্খের মতো হাসে।

তবু আজও রক্ষা আছে, পবিত্র এ দেশে
অসংখ্য জন্মেছে মেয়ে পুরুষের বেশে।
মন্দির বাঁধায় তারা জীবরক্তপাতে,
সে-রক্তের ফোঁটা দেয় সন্তানের মাথে।
কিন্তু, যবে ছাড়ে নাড়ী
ভিড় ক'রে আসে দ্বারে ডাক্তারের গাড়ি।
অঞ্জলি ভরিয়া পূজা নেন সরস্বতী,
পরীক্ষা দেবার বেলা নোটবুক ছাড়া নেই গতি।
পুরুষের বিদ্যে নিয়ে কলেজে চলেছে যত নারী
এই ফল তারই।
মেয়েদের বুদ্ধি নিয়ে পুরুষ যখন ঠাণ্ডা হবে,
দেশখানা রক্ষা পাবে তবে।

বুঝি নে একটা কথা, ভয়ের তাড়ায়
দিন দেখে তবে যেথা ঘরের বাহিরে পা বাড়ায়
সেই দেশে দেবতার কুপ্রথা অদ্ভুত,
সবচেয়ে অনাচারী সেথা যমদূত।

ভালো লগ্নে বাধা নেই, পাড়ায় পাড়ায় দেয় ডঙ্কা।
সব দেশ হতে সেথা বেড়ে চলে মরণের সংখ্যা

বেস্পতিবারের বারবেলা
এ কাব্য হয়েছে লেখা, সামলাতে পারব কি ঠেলা।

মধুসন্ধায়ী

পাড়ায় কোথাও যদি কোনো মৌচাকে
একটুকু মধু বাকি থাকে,
যদি তা পাঠাতে পার ডাকে,
বিলাতি স্থগার হতে পাব নিস্তার,
প্রাতরাশে মধুরিমা হবে বিস্তার।
মধুর অভাব যবে অন্তরে বাজে
'গুড়ং দগ্যাৎ' বাণী বলে কবিরাজে।
দায়ে পড়ে তাই
লুচি-পাউরুটিগুলো গুড় দিয়ে খাই ;
বিমর্ষমুখে বলি 'গুড়ং দগ্যাৎ',
সে যেন গন্তের দেশে আসি পশ্চাৎ।
খালি বোতলের পানে চেয়ে চেয়ে চিত্ত
নিশ্বাস ফেলে বলে, সকলই অনিত্য।
সম্ভব হয় যদি এ বোতলটারে
পূর্ণতা এনে দিতে পারে
দূর হতে তোমার আতিথ্য।
গৌড়ী গন্থ হতে মধুময় পন্থ
দর্শন দিতে পারে সন্থ।

১৩ ফাল্গুন, ১৩৪৬

তল্লাস করেছিনু, হেথাকার বৃক্ষের
চারিদিকে লক্ষণ মধু-দুর্ভিক্ষের।
মৌমাছি বলবান পাহাড়ের ঠাণ্ডায়,
সেখানেও সম্প্রতি ক্ষীণ মধুভাণ্ডার—
হেন দুঃসংবাদ পাওয়া গেছে চিঠিতে।
এ বছর বৃথা যাবে মধুলোভ মিটিতে।
তবু কাল মধু-লাগি করেছিনু দরবার,
আজ ভাবি অর্থ কি আছে দাবি করবার।
মৌচাক-রচনায় সুনিপুণ যাহারা
তুমি শুধু ভেদ কর তাহাদের পাহারা।
মৌমাছি কৃপণতা করে যদি গোড়াতেই,
আপত্তি না মেলে তবু খুশি রব থোড়াতেই।
তাও কভু সম্ভব না হয় যদিস্যাৎ
তা হলে তো অবশেষে শুধু গুড় দদ্যাৎ।
অনুরোধ না মিটুক মনে নাহি ক্ষোভ নিয়ো,
দুর্লভ হলে মধু গুড় হয় লোভনীয়।
মধুতে যা ভিটামিন কম বটে গুড়ে তা,
পূরণ করিয়া লব টমেটোয় জুড়ে তা।
এইভাবে করা ভালো সন্তোষ-আশ্রয়—
কোনো অভাবেই কভু তার নাহি নাশ রয়।

২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০

৩

মধুমৎ পার্থিবং রজঃ

শ্যামল আরণ্য মধু বহি এল ডাক-হরকরা—
আজি হতে তিরোহিতা পাণ্ডুবর্ণী বৈলাতী শর্করা
পূর্বাহ্ণে পরাহ্ণে মোর ভোজনের আয়োজন থেকে;
এ মধু করিব ভোগ রোটিকার স্তরে স্তরে মেখে।

যে দাক্ষিণ্য-উৎস হতে উৎসারিত এই মধুরতা
রসনার রসযোগে অন্তরে পশিবে তার কথা।
ভেবেছিনু, অকৃতার্থ হয় যদি তোমার প্রয়াস
সস্নেহ আঘাত দেবে তোমারে আমার পরিহাস;
তখন তো জানি নাই, গিরীন্দ্রের বন্য মধুকরী
তোমার সহায় হয়ে অর্ঘ্যপাত্র দিবে তব ভরি।
দেখিনু, বেদের মন্ত্র সফল হয়েছে তব প্রাণে;
তোমারে বরিল ধরা মধুময় আশীর্বাদ-দানে।

৫ মার্চ, ১৯৪০

৪

দূর হতে কয় কবি,
'জয় জয় মাংপবী,
কমলাকানন তব না হউক শূন্য।
গিরিতটে সমতটে
আজি তব যশ রটে,
আশারে ছাড়ায়ে বাড়ে তব দানপুণ্য।
তোমাদের বনময়
অফুরান যেন রয়
মৌচাক-রচনায় চিরনৈপুণ্য।
কবি প্রাতরাশে তার
না করুক মুখভার,
নীরস রুটির গ্রাসে না হোক সে ক্ষুণ্ণ।'
আরবার কয় কবি,
'জয় জয় মাংপবী,
টেবিলে এসেছে নেমে তোমার কারুণ্য।
রুটি বলে জয়-জয়,
লুচিও যে তাই কয়,
মধু যে ঘোষণা করে তোমারই তারুণ্য।'

৭ মার্চ, ১৯৪০

মাছিতত্ত্ব

মাছিবংশেতে এল অদ্ভুত জ্ঞানী সে
আজন্ম ধ্যানী সে।
সাধনের মন্ত্র তাহার
ভন্‌ভন্‌-ভন্‌ভন্‌কার।
সংসারে দুই পাখা নিয়ে দুই পক্ষ—
দক্ষিণ-বাম আর ভক্ষ্য-অভক্ষ্য—
কাঁপাতে কাঁপাতে পাখা সূক্ষ্ম অদৃশ্য
দ্বৈতবিহীন হয় বিশ্ব।
সুগন্ধ পচা-গন্ধের
ভালো মন্দের
ঘুচে যায় ভেদবোধ-বন্ধন ;
এক হয় পঙ্ক ও চন্দন।
অঘোরপন্থ সে যে শবাসন-সাধনায়
ইঁদুর কুকুর হোক কিছুতেই বাধা নাই—
বসে রয় স্তব্ধ,
মৌনী সে একমনা নাহি করে শব্দ।
ইড়া পিঙ্গলা বেয়ে অদৃশ্য দীপ্তি
ব্রহ্মরন্ধ্রে বহে তৃপ্তি।
লোপ পেয়ে যায় তার আছিত্ব,
ভুলে যায় মাছিত্ব।

মন তার বিজ্ঞাননিষ্ঠ ;
মানুষের বক্ষ বা পৃষ্ঠ
কিংবা তাহার নাসিকান্ত
তাই নিয়ে গবেষণা চলে অক্লান্ত—
বার বার তাড়া খায়, গাল খায়, তবুও
হার না মানিতে চায় কভু ও।

পৃথক করে না কভু ইষ্ট অনিষ্ট,
জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ;
সমবুদ্ধিতে দেখে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট।
সংকোচহীন তার বিজ্ঞানী ধাত ;
পক্ষে বহন করে অপক্ষপাত।
এদের ভাষায় নেই 'ছি ছি',
শৌখিন রুচি নিয়ে খুঁতখুঁত নেই মিছিমিছি।

অকারণ সন্ধানে মন তার গিয়াছে ;
কেবলই ঘুরিয়া দেখে কোথায় যে কী আছে।
বিশ্রামী বলদের পিঠে করে মনোযোগ
রসের রহস্যের যদি পায় কোনো যোগ,
ল্যাজের ঝাপট লাগে পলকেই পলকেই,
বাধাহীন সাধনার ফল পায় বলো কে-ই !

চারিদিকে মানবের বিষম অহংকার,
তারই মাঝে থেকে মনে লেশ নেই শঙ্কার।
আকাশবিহারী তার গতিনৈপুণ্যেই
সকল চপেটাঘাত উড়ে যায় শূন্যেই।
এই তার বিজ্ঞানী কৌশল,
স্পর্শ করে না তারে শত্রুর মৌশল।
মানুষের মারণের লক্ষ্য
ক্ষিপ্র এড়ায়ে যায় নির্ভয়পক্ষ।
নাই লাজ, নাই ঘৃণা, নাই ভয়—
কর্দমে নর্দমা-বিহারীর জয়।
ভন্‌-ভন্‌-ভন্‌কার
আকাশেতে ওঠে তার ধ্বনি জয়ডঙ্কার।

মানবশিশুরে বলি, দেখো দৃষ্টান্ত—
বার বার তাড়া খেয়ো, নাহি হোয়ো ক্লান্ত।

অদৃষ্ট মার দেয় অলক্ষ্যে পশ্চাৎ
কখন অকস্মাৎ—
তবু মনে রেখো নির্বন্ধ,
সুযোগের পেলে নামগন্ধ
চ'ড়ে ব'সো অপরের নিরুপায় পৃষ্ঠ,
ক'রো তারে বিষম অতিষ্ঠ।
সার্থক হতে চাও জীবনে,
কী শহরে, কী বনে,
পাঠ লহ প্রয়োজনসিদ্ধের
বিরক্ত করবার অদম্য বিদ্যের—
নিত্য কানের কাছে ভন্‌ভন্‌ ভন্‌ভন্‌
লুব্ধের অপ্রতিহত অবলম্বন।

উদয়ন, শান্তিনিকেতন
২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০

কালান্তর

তোমার ঘরের সিঁড়ি বেয়ে
যতই আমি নাবছি
আমায় মনে আছে কিনা
ভয়ে ভয়ে ভাবছি।
কথা পাড়তে গিয়ে দেখি,
হাই তুললে ছুটো;
বললে উস্‌খুস্‌ ক'রে,
"কোথায় গেল ছুটো।"
ডেকে তারে ব'লে দিলে,
"ভাইভাবকে বলিস,
আজকে সন্ধ্যা নটার সময়
যাব মেট্রোপলিস।"
কুকুরছানার ল্যাজটা ধ'রে
করলে নাড়াচাড়া;

বললে আমায়, "ক্ষমা করো,
যাবার আছে তাড়া।"

তখন স্পষ্ট বোঝা গেল,
নেই মনে আর নেই।
আরেকটা দিন এসেছিল
একটা শুভক্ষণেই—
মুখের পানে চাইতে তখন,
চোখে রইত মিষ্টি;
কুকুরছানার ল্যাজের দিকে
পড়ত নাকো দৃষ্টি।
সেই সেদিনের সহজ রঙটা
কোথায় গেল ভাসি;
লাগল নতুন দিনের ঠোঁটে
রুজ-মাখানো হাসি।
বুটসুদ্ধ পা-দুখানা
তুলে দিলে সোফায়;
ঘাড় বেঁকিয়ে ঠেসেঠুসে
ঘা লাগালে খোঁপায়।
আজকে তুমি শুকনো ডাঙায়
হালফ্যাশানের কূলে,
ঘাটে নেমে চমকে উঠি
এই কথাটাই ভুলে।

এবার বিদায় নেওয়াই ভালো,
সময় হল যাবার—
ভুলেছ যে ভুলব যখন
আসব ফিরে আবার।

শান্তিনিকেতন
১৩ শ্রাবণ, ১৩৪৭

তুমি

ঐ ছাপাখানাটার ভূত,
আমার ভাগ্যবশে তুমি তারি দূত।
দশটা বাজল তবু আস নাই ;
দেহটা জড়িয়ে আছে আরামের বাসনাই :
মাঝে থেকে আমি খেটে মরি যে—
পণ্য জুটেছে, খেয়াতরী যে
ঘাটে নাই। কাব্যের দধিটা
বেশ করে জমে গেছে, নদীটা
এইবার পার ক'রে প্রেসে লও,
খাতার পাতায় তারে ঠেসে লও।
কথাটা তো একটুও সোজা নয়,
স্টেশন-কুলির এ তো বোঝা নয়।
বচনের ভার ঘাড়ে ধরেছি,
চিরদিন তাই নিয়ে মরেছি ;
বয়স হয়েছে আশি, তবুও
সে ভার কি কমবে না কভুও।

আমার হতেছে মনে বিশ্বাস—
সকালে ভুলাল তব নিশ্বাস
রান্নাঘরের ভাজাভুজিতে,
সেখানে খোরাক ছিলে খুঁজিতে,
উতলা আছিল তব মনটা,
শুনতে পাও নি তাই ঘণ্টা।

শুঁটকিমাছের যারা রাঁধুনিক
হয়তো সে দলে তুমি আধুনিক।

তব নাসিকার গুণ কী যে তা,
বাসি দুর্গন্ধের বিক্রেতা।
সেটা প্রোলিটেরিটের লক্ষণ,
বুর্জোয়া-গর্বের মোক্ষণ।
রৌদ্র যেতেছে চড়ে আকাশে,
কাঁচা ঘুম ভেঙে মুখ ফ্যাকাশে।
ঘন ঘন হাই তুলে গা-মোড়া,
ঘস্‌ঘস্‌ চুলকোনো চামোড়া।
আ-কামানো মুখ ভরা খোঁচাতে—
বাসি ধুতি, পিঠ ঢাকা কোঁচাতে
চোখ দুটো রাঙা যেন টোমাটো,
আলুথালু চুলে নাই পোমাটো।
বাসি মুখে চা খাচ্ছ বাটিতে,
গড়িয়ে পড়ছে ঘাম মাটিতে।
কাঁকড়ার চচ্চড়ি রাত্রে,
এঁটো তারি পড়ে আছে পাত্রে।
'সিনেমার তালিকার কাগজে
কে সরাল ছবি' ব'লে রাগো যে।

যত দেরি হতেছিল ততই যে
এই ছবি মনে এল স্বতই যে।
ভোরে ওঠা ভদ্র সে নীতিটা,
অতিশয় খুঁতখুঁতে রীতিটা।
সাফ্‌সোফ বুর্জোয়া অঙ্গেই
ধব্‌ধবে চাদরের সঙ্গেই
মিল তার জানি অতিমাত্র—
তুমি তো নও সে সৎ-পাত্র।
আজকাল বিড়িটানা শহুরে
যে চাল ধরেছ আটপহুরে,

মাসিকেতে একদিন কে জানে
অধুনাতনের মন-ভেজানে
মানে-হীন কোনো এক কাব্য
নাম করি দিবে অশ্রাব্য।

শান্তিনিকেতন
৪ অগস্ট, ১৯৪০

মিলের কাব্য

নারীকে আর পুরুষকে যেই মিলিয়ে দিলেন বিধি
পদ্য কাব্যে মানবজীবন পেল মিলের নিধি।
কেবল যদি পুরুষ নিয়ে থাকত এ সংসার,
গদ্য কাব্যে এই জীবনটা হ'ত একাকার।
প্রোটন এবং ইলেক্‌ট্রনের যুগল মিলনেই
জগৎটা যে পদ্য তাহার প্রমাণ হল সেই।
জলে এবং স্থলে মিলে ছন্দে লাগায় তাল,
আকাশেতে মহাপদ্য বিছান মহাকাল।
কারণ তিনি তপস্বী যে বিশ্ব তাঁহার জানে,
প্রলয় তাঁহার ধ্যানে।
সৃষ্টিকার্যে আলো এবং আঁধার
অনন্ত কাল ধুয়ো ধরায় মিলের ছন্দ বাঁধার।
জাগরণে আছেন তিনি শুদ্ধ জ্যোতির দেশে,
আলো-আঁধার 'পরে তাঁহার স্বপ্ন বেড়ায় ভেসে।
যারে বলি বাস্তব সে ছায়ার লিখন লিখা,
অন্তবিহীন কল্পনাতে মহান মরীচিকা।
বাস্তব যে অচল অটল বিশ্বকাব্যে তাই,
তড়িৎকণার নৃত্য আছে বাস্তব তো নাই।
গোলাপগুলোর পাপড়ি-চেয়ে শোভাটাই যে সত্য,
কিন্তু শোভা কী পদার্থ কথায় হয় না কথ্য।

বিশুদ্ধ ইঙ্গিত সে মাত্র, তাহার অধিক কী সে,
কিসের বা ইঙ্গিত সে জিনিস, ভেবে কে পায় দিশে।
নিউস্‌পেপার আছে পাবে প্রমাণযোগ্য বাক্য,
মকদ্দমার দলিল আছে ঠিক কথাটার সাক্ষ্য।
কাব্য বলে বেঠিক কথা, এক হয়ে যায় আর—
যেমন বেঠিক কথা বলে নিখিল সংসার।
আজকে যাকে বাষ্প দেখি কালকে দেখি তারা,
কেমন করে বস্তু বলি প্রকাণ্ড ইশারা।
ফোটা-ঝরার মধ্যখানে এই জগতের বাণী
কী যে জানায় কালে কালে স্পষ্ট কি তা জানি।
বিশ্ব থেকে ধার নিয়েছি তাই আমরা কবি
সত্য রূপে ফুটিয়ে তুলি অবাস্তবের ছবি।
ছন্দ ভাষা বাস্তব নয়, মিল যে অবাস্তব—
নাই তাহাতে হাট-বাজারের গন্ধ কলরব।
হাঁ-য়ে না-য়ে যুগল নৃত্য কবির রঙ্গভূমে।
এতক্ষণ তো জাগায় ছিলুম এখন চলি ঘুমে।

উদয়ন, শান্তিনিকেতন
১৯ জানুয়ারি, ১৯৩১। সন্ধ্যা

লিখি কিছু সাধ্য কী

লিখি কিছু সাধ্য কী!
যে দশা এ অভাগার লিখিতে সে বাধ্য কি।
মশা-বুড়ি মরেছিল চাপড়ের যুদ্ধে সে—
পরলোকগত তার আত্মার উদ্দেশে
আমারি লেখার ঘরে আজি তার শ্রাদ্ধ কি!
যেখানে যে কেহ ছিল আত্মীয় পরিজন
অভিজাতবংশীয় কেহ, কেহ হরিজন—

আমারি চরণজাত তাহাদের খাদ্য কি!
বাঁশি নেই, কাঁসি নেই, নাহি দেয় হাঁক সে,
পিঠেতে কাঁপাতে থাকে এক-জোড়া পাখ সে—
দেখিতে যেমনি হোক তুচ্ছ সে বাদ্য কি।
আশ্রয় নিতে চাই মেলে যদি shelter,
এক ফোঁটা বাকি নেই নেবুঘাস-তেলটার—
মশারি দিনের বেলা কভু আচ্ছাদ্য কি!
গাল তারে মিছে দিই অতি অশ্রাব্য,
হাতে পিঠ চাপড়াব সেটা যে অভাব্য—
এ কাজে লাগাব শেষে চটি-জোড়া পাদ্য কি।
পুজোর বাজারে আজি যদি লেখা না জোটাই,
দুটো লাইনেরো মতো কলমটা না ছোটাই—
সম্পাদকের সাথে রবে সৌহার্দ কি।

মশকমঙ্গলগীতিকা

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা—
জানিতাম দীনতার এই শেষ দশা,
আমি স্বপ্নে দেখিলাম হয়ে গেছি মশা!
কী হল যে দশা—
মধ্যরাত্রে স্বপ্নে আমি
হয়ে গেছি মশা।
দীন হতে দীন আমি
ক্ষীণ হতে ক্ষীণ—
একমাত্র নাম জপ করেছি ভরসা।

হিংস্র নীতি নাহি আর,
অতি শান্ত নির্বিকার

ভক্তের নাসাগ্র-'পরে স্তব্ধ হয়ে বসা—
কী হল যে দশা!

মধুর মাধবী বেণু নীরব সহসা।
পাখা করি নাড়াচাড়া,
ভোঁ ভোঁ শব্দে নাই সাড়া—
শুধু 'রাম রাম' ধ্বনি ডানা হতে খসা,
হেন হীন দশা।

জোড়াসাঁকো
৩০।১০।৪০

আকাশপ্রদীপ

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

কল্যাণীয়েষু

বয়সে তোমাকে অনেক দূরে পেরিয়ে এসেছি, তবু তোমাদের কালের সঙ্গে আমার যোগ লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছে, এমনতরো অস্বীকৃতির সংশয়বাক্য তোমার কাছ থেকে শুনি নি! তাই, আমার রচনা তোমাদের কালকে স্পর্শ করবে আশা করে এই বই তোমার হাতের কাছে এগিয়ে দিলুম। তুমি আধুনিক সাহিত্যের সাধনক্ষেত্র থেকে একে গ্রহণ করো।

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আকাশপ্রদীপ

গোধূলিতে নামল আঁধার,
ফুরিয়ে গেল বেলা,
ঘরের মাঝে সাঙ্গ হল
চেনা মুখের মেলা।
দূরে তাকায় লক্ষ্যহারা
নয়ন ছলোছলো,
এবার তবে ঘরের প্রদীপ
বাইরে নিয়ে চলো।
মিলনরাতে সাক্ষী ছিল যারা
আজো জ্বলে আকাশে সেই তারা।
পাণ্ডু-আঁধার বিদায়রাতের শেষে
যে তাকাত শিশিরসজল শূন্যতা-উদ্দেশে
সেই তারকাই তেমনি চেয়েই আছে
অস্তলোকের প্রান্তদ্বারের কাছে।
অকারণে তাই এ প্রদীপ জ্বালাই আকাশ-পানে-
যেখান হতে স্বপ্ন নামে প্রাণে।

[শান্তিনিকেতন]
২৪।৯।৩৮

আকাশপ্রদীপ

ভূমিকা

স্মৃতিরে আকার দিয়ে আঁকা,
বোধে যার চিহ্ন পড়ে ভাষায় কুড়ায়ে তারে রাখা,
কী অর্থ ইহার মনে ভাবি।
এই দাবি
জীবনের এ ছেলেমানুষি,
মরণেরে বঞ্চিবার ভান ক'রে খুশি,
বাঁচা-মরা খেলাটাতে জিতিবার শখ,
তাই মন্ত্র প'ড়ে আনে কল্পনার বিচিত্র কুহক।
কালস্রোতে বস্তুমূর্তি ভেঙে ভেঙে পড়ে,
আপন দ্বিতীয় রূপ প্রাণ তাই ছায়া দিয়ে গড়ে।
"রহিল" বলিয়া যায় অদৃষ্টের পানে ;
মৃত্যু যদি করে তার প্রতিবাদ, নাহি আসে কানে।
আমি বদ্ধ ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্বের জালে,
আমার আপন-রচা কল্পরূপ ব্যাপ্ত দেশে কালে,
এ কথা বিলয়দিনে নিজে নাই জানি
আর কেহ যদি জানে তাহারেই বাঁচা ব'লে মানি।

[শান্তিনিকেতন]
১৬।৩।৩৯

যাত্রাপথ

মনে পড়ে, ছেলেবেলায় যে বই পেতুম হাতে
ঝুঁকে পড়ে যেতুম পড়ে তাহার পাতে পাতে।
কিছু বুঝি, নাই বা কিছু বুঝি,
কিছু না হোক পুঁজি,

হিসাব কিছু না থাক্ নিয়ে লাভ অথবা ক্ষতি,
অল্প তাহার অর্থ ছিল, বাকি তাহার গতি।
মনের উপর ঝরনা যেন চলেছে পথ খুঁড়ি,
কতক জলের ধারা আবার কতক পাথর নুড়ি।
সব জড়িয়ে ক্রমে ক্রমে আপন চলার বেগে
পূর্ণ হয়ে নদী ওঠে জেগে।
শক্ত সহজ এ সংসারটা যাহার লেখা বই
হালকা ক'রে বুঝিয়ে সে দেয় কই।
বুঝছি যত খুঁজছি তত, বুঝছি নে আর ততই—
কিছু বা হাঁ, কিছু বা না, চলছে জীবন স্বতই।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ সে বটতলাতে ছাপা,
দিদিমায়ের বালিশ-তলায় চাপা।
আলগা মলিন পাতাগুলি, দাগি তাহার মলাট
দিদিমায়ের মতোই যেন বলি-পড়া ললাট।
মায়ের ঘরের চৌকাঠেতে বারান্দার এক কোণে
দিন-ফুরানো ক্ষীণ আলোতে পড়েছি একমনে।
অনেক কথা হয় নি তখন বোঝা,
যেটুকু তার বুঝেছিলাম মোট কথাটা সোজা—
ভালোমন্দে লড়াই অনিঃশেষ,
প্রকাণ্ড তার ভালোবাসা, প্রচণ্ড তার দ্বেষ।
বিপরীতের মল্লযুদ্ধ ইতিহাসের রূপ
সামনে এল, রইনু বসে চুপ।

শুরু হতে এইটে গেল বোঝা,
হয়তো বা এক বাঁধা রাস্তা কোথাও আছে সোজা,
যখন-তখন হঠাৎ সে যায় ঠেকে,
আন্দাজে যায় ঠিকানাটা বিষম এঁকেবেঁকে।
সব-জানা দেশ এ নয় কভু, তাই তো তেপান্তরে
রাজপুত্তুর ছোটায় ঘোড়া না-জানা কার তরে।

সদাগরের পুত্র সেও যায় অজানার পার
খোঁজ নিতে কোন্‌ সাত-রাজা-ধন গোপন মানিকটার।
কোটালপুত্র খোঁজে এমন গুহায়-থাকা চোর
যাকে ধরলে সকল চুরির কাটবে বাঁধন-ডোর।

আলমোড়া
৯।৬।৩৭

স্কুল-পালানে

মাস্টারি-শাসনদুর্গে সিঁধকাটা ছেলে
ক্লাসের কর্তব্য ফেলে
জানি না কী টানে
ছুটিতাম অন্দরের উপেক্ষিত নির্জন বাগানে।
পুরোনো আমড়াগাছ হেলে আছে
পাঁচিলের কাছে,
দীর্ঘ আয়ু বহন করিছে তার
পুঞ্জিত নিঃশব্দ স্মৃতি বসন্তবর্ষার।
লোভ করি নাই তার ফলে,
শুধু তার তলে
সে সঙ্গরহস্য আমি করিতাম লাভ
যার আবির্ভাব
অলক্ষ্যে ব্যাপিয়া আছে সর্ব জলে স্থলে।
পিঠ রাখি কুঞ্চিত বল্কলে
যে পরশ লভিতাম
জানি না তাহার কোনো নাম;
হয়তো সে আদিম প্রাণের
আতিথ্যদানের
নিঃশব্দ আহ্বান,
যে প্রথম প্রাণ
একই বেগ জাগাইছে গোপন সঞ্চারে
রসরক্তধারে

মানবশিরায় আর তরুর তন্তুতে,
একই স্পন্দনের ছন্দ উভয়ের অণুতে অণুতে।
সেই মৌনী বনস্পতি
সুবৃহৎ আলস্যের ছদ্মবেশে অলক্ষিতগতি
সূক্ষ্ম সম্বন্ধের জাল প্রসারিছে নিত্যই আকাশে,
মাটিতে বাতাসে,
লক্ষ লক্ষ পল্লবের পাত্র লয়ে
তেজের ভোজের পানালয়ে।
বিনা কাজে আমিও তেমনি বসে থাকি
ছায়ায় একাকী,
আলস্যের উৎস হতে
চৈতন্যের বিবিধ দিগ্‌বাহী স্রোতে
আমার সম্বন্ধ চরাচরে
বিস্তারিছে অগোচরে
কল্পনার সূত্রে বোনা জালে
দূর দেশে দূর কালে।
প্রাণে মিলাইতে প্রাণ
সে বয়সে নাহি ছিল ব্যবধান;
নিরুদ্ধ করে নি পথ ভাবনার স্তূপ;
গাছের স্বরূপ
সহজে অন্তর মোর করিত পরশ।
অনাদৃত সে বাগান চায় নাই যশ
উদ্যানের পদবীতে।
তারে চিনাইতে
মালীর নিপুণতার প্রয়োজন কিছু ছিল নাকো।
যেন কী আদিম সাঁকো
ছিল মোর মনে
বিশ্বের অদৃশ্য পথে যাওয়ার আসার প্রয়োজনে।

কুলগাছ দক্ষিণে কুয়োর ধারে,
পুবদিকে নারিকেল সারে সারে,

বাকি সব জঙ্গল আগাছা।
একটা লাউয়ের মাচা
কবে যত্নে ছিল কারো, ভাঙা চিহ্ন রেখে গেছে পাছে।
বিশীর্ণ গোলকচাঁপা-গাছে
পাতাশূন্য ডাল
অভুক্তের ক্লিষ্ট ইশারার মতো। বাঁধানো চাতাল;
ফাটাফুটো মেঝে তার, তারি থেকে
গরিব লতাটি যেত চোখে-না-পড়ার ফুলে ঢেকে।
পাঁচিল ছ্যাৎলা-পড়া
ছেলেমি খেয়ালে যেন রূপকথা গড়া
কালের লেখনি-টানা নানামতো ছবির ইঙ্গিতে,
সবুজে পাটলে আঁকা কালো সাদা রেখার ভঙ্গীতে।
সদ্য ঘুম থেকে জাগা
প্রতি প্রাতে নূতন করিয়া ভালো-লাগা
ফুরাত না কিছুতেই।
কিসে যে ভরিত মন সে তো জানা নেই।
কোকিল দোয়েল টিয়ে এ বাগানে ছিল না কিছুই,
কেবল চড়ুই,
আর ছিল কাক।
তার ডাক
সময় চলার বোধ
মনে এনে দিত। দশটা বেলার রোদ
সে ডাকের সঙ্গে মিশে নারিকেল-ডালে
দোলা খেত উদাস হাওয়ার তালে তালে।
কালো অঙ্গে চটুলতা, গ্রীবাভঙ্গী, চাতুরী সতর্ক আঁখিকোণে,
পরস্পর ডাকাডাকি ক্ষণে ক্ষণে—
এ রিক্ত বাগানটিরে দিয়েছিল বিশেষ কী দাম।
দেখিতাম, আবছায়া ভাবনায় ভালোবাসিতাম।

[শান্তিনিকেতন]
১৪।১০।৩৮

ধ্বনি

জন্মেছিনু সূক্ষ্ম তারে বাঁধা মন নিয়া,
চারিদিক হতে শব্দ উঠিত ধ্বনিয়া
নানা কম্পে নানা সুরে
নাড়ীর জটিল জালে ঘুরে ঘুরে
বালকের মনের অতলে দিত আনি
পাণ্ডুনীল আকাশের বাণী
চিলের সুতীক্ষ্ণ সুরে
নির্জন দুপুরে,
রৌদ্রের প্লাবনে যবে চারিধার
সময়েরে করে দিত একাকার
নিষ্কর্ম তন্দ্রার তলে।
ওপাড়ায় কুকুরের সুদূর কলহকোলাহলে
মনেরে জাগাত মোর অনির্দিষ্ট ভাবনার পারে
অস্পষ্ট সংসারে।
ফেরিওলাদের ডাক সূক্ষ্ম হয়ে কোথা যেত চলি,
যে-সকল অলিগলি
জানি নি কখনো
তারা যেন কোনো
বোগদাদের বসোরার
পরদেশী পসরার
স্বপ্ন এনে দিত বহি।
রহি রহি
রাস্তা হতে শোনা যেত সহিসের ডাক উর্ধ্বস্বরে,
অন্তরে অন্তরে
দিত সে ঘোষণা কোন্ অস্পষ্ট বার্তার,
অসম্পন্ন উধাও যাত্রার।
একঝাঁক পাতি হাঁস
টলোমলো গতি নিয়ে উচ্চকলভাষ

পুকুরে পড়িত ভেসে।
বটগাছ হতে বাঁকা রৌদ্ররশ্মি এসে
তাদের সাঁতার-কাটা জলে
সবুজ ছায়ার তলে
চিকন সাপের মতো পাশে পাশে মিলি
খেলাত আলোর কিলিবিলি।
বেলা হলে
হলদে গামছা কাঁধে হাত দোলাইয়া যেত চলে
কোন্‌খানে কে যে।
ইস্কুলে উঠিত ঘণ্টা বেজে।
সে ঘণ্টার ধ্বনি
নিরর্থ আহ্বানঘাতে কাঁপাইত আমার ধমনী।
রৌদ্রক্লান্ত ছুটির প্রহরে
আলস্যে-শিথিল শান্তি ঘরে ঘরে;
দক্ষিণে গঙ্গার ঘাট থেকে
গম্ভীরমন্দ্রিত হাঁক হেঁকে
বাষ্পশ্বাসী সমুদ্র-খেয়ার ডিঙা
বাজাইত শিঙা,
রৌদ্রের প্রান্তর বহি
ছুটে যেত দিগন্তে শব্দের অশ্বারোহী।
বাতায়নকোণে
নির্বাসনে
যবে দিন যেত বয়ে
না-চেনা ভুবন হতে ভাষাহীন নানা ধ্বনি লয়ে
প্রহরে প্রহরে দূত ফিরে ফিরে
আমারে ফেলিত ঘিরে।
জনপূর্ণ জীবনের যে আবেগ পৃথ্বীনাট্যশালে
তালে ও বেতালে
করিত চরণপাত,
কভু অকস্মাৎ

কভু মৃদুবেগে ধীরে
ধ্বনিরূপে মোর শিরে
স্পর্শ দিয়ে চেতনারে জাগাইত ধোঁয়ালি চিন্তায়,
নিয়ে যেত সৃষ্টির আদিম ভূমিকায়।
চোখে-দেখা এ বিশ্বের গভীর সুদূরে
রূপের অদৃশ্য অন্তঃপুরে
ছন্দের মন্দিরে বসি রেখা-জাদুকর কাল
আকাশে আকাশে নিত্য প্রসারে বস্তুর ইন্দ্রজাল।
যুক্তি নয়, বুদ্ধি নয়,
শুধু যেথা কত কী যে হয়—
কেন হয় কিসে হয় সে প্রশ্নের কোনো
নাহি মেলে উত্তর কখনো।
যেথা আদিপিতামহী পড়ে বিশ্ব-পাঁচালির ছড়া
ইঙ্গিতের অনুপ্রাসে গড়া—
কেবল ধ্বনির ঘাতে বক্ষস্পন্দে দোলন দুলায়ে
মনেরে ভুলায়ে
নিয়ে যায় অস্তিত্বের ইন্দ্রজাল সেই কেন্দ্রস্থলে,
বোধের প্রত্যূষে যেথা বুদ্ধির প্রদীপ নাহি জ্বলে।

[শান্তিনিকেতন]
২১।১০।৩৮

বধূ

ঠাকুরমা দ্রুততালে ছড়া যেত প'ড়ে—
ভাবখানা মনে আছে—"বউ আসে চতুর্দোলা চ'ড়ে
আম-কাঁঠালের ছায়ে,
গলায় মোতির মালা, সোনার চরণচক্র পায়ে।"

বালকের প্রাণে
প্রথম সে নারীমন্ত্র আগমনীগানে

ছন্দের লাগাল দোল আধোজাগা কল্পনার শিহরদোলায়,
আঁধার-আলোর দ্বন্দ্বে যে প্রদোষে মনেরে ভোলায়,
সত্য-অসত্যের মাঝে লোপ করি সীমা
দেখা দেয় ছায়ার প্রতিমা।
ছড়া-বাঁধা চতুর্দোলা চলেছিল যে-গলি বাহিয়া
চিহ্নিত করেছে মোর হিয়া
গভীর নাড়ীর পথে অদৃশ্য রেখায় এঁকেবেঁকে।
তারি প্রান্ত থেকে
অশ্রুত সানাই বাজে অনিশ্চিত প্রত্যাশার সুরে
দুর্গম চিন্তার দূরে দূরে।
সেদিন সে কল্পলোকে বেহারাগুলোর পদক্ষেপে
বক্ষ উঠেছিল কেঁপে কেঁপে,
পলে পলে ছন্দে ছন্দে আসে তারা আসে না তবুও,
পথ শেষ হবে না কভুও।

সেকাল মিলাল। তার পরে, বধূ-আগমনগাথা
গেয়েছে মর্মরছন্দে অশোকের কচি রাঙা পাতা;
বেজেছে বর্ষণঘন শ্রাবণের বিনিদ্র নিশীথে;
মধ্যাহ্নে করুণ রাগিণীতে
বিদেশী পান্থের শ্রান্ত সুরে।
অতিদূর মায়াময়ী বধূর নূপুরে
তন্দ্রার প্রত্যন্তদেশে জাগায়েছে ধ্বনি
মৃদু রণরণি।
ঘুম ভেঙে উঠেছিনু জেগে,
পূর্বাকাশে রক্ত মেঘে
দিয়েছিল দেখা
অনাগত চরণের অলক্তের রেখা।
কানে কানে ডেকেছিল মোরে
অপরিচিতার কণ্ঠ স্নিগ্ধ নাম ধ'রে—
সচকিতে
দেখে তবু পাই নি দেখিতে।

অকস্মাৎ একদিন কাহার পরশ
রহস্যের তীব্রতায় দেহে মনে জাগাল হরষ;
তাহারে শুধায়েছিনু অভিভূত মুহূর্তেই,
"তুমিই কি সেই,
আঁধারের কোন্ ঘাট হতে
এসেছ আলোতে!"
উত্তরে সে হেনেছিল চকিত বিদ্যুৎ;
ইঙ্গিতে জানায়েছিল, "আমি তারি দূত,
সে রয়েছে সব প্রত্যক্ষের পিছে,
নিত্যকাল সে শুধু আসিছে।
নক্ষত্রলিপির পত্রে তোমার নামের কাছে
যার নাম লেখা রহিয়াছে
অনাদি অজ্ঞাত যুগে সে চড়েছে তার চতুর্দোলা,
ফিরিছে সে চির-পথভোলা
জ্যোতিষ্কের আলোছায়ে,
গলায় মোতির মালা, সোনার চরণচক্র পায়ে।"

[শান্তিনিকেতন]
২৫।১০।৩৮

জল

ধরাতলে
চঞ্চলতা সব-আগে নেমেছিল জলে।
সবার প্রথম ধ্বনি উঠেছিল জেগে
তারি স্রোতোবেগে।
তরঙ্গিত গতিমত্ত সেই জল
কলোল্লোলে উদ্বেল উচ্ছল
শৃঙ্খলিত ছিল স্তব্ধ পুকুরে আমার,
নৃত্যহীন ঔদাসীন্যে অর্থহীন শূন্যদৃষ্টি তার।
গান নাই, শব্দের তরণী হোথা ডোবা,
প্রাণ হোথা বোবা।

জীবনের রঙ্গমঞ্চে ওখানে রয়েছে পর্দা টানা,
ওইখানে কালো বরনের মানা।
ঘটনার স্রোত নাহি বয়,
নিস্তব্ধ সময়।
হোথা হতে তাই মনে দিত সাড়া
সময়ের বন্ধ-ছাড়া
ইতিহাস-পলাতক কাহিনীর কত
সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি নানামতো।
উপরের তলা থেকে
চেয়ে দেখে
না-দেখা গভীরে ওর মায়াপুরী এঁকেছিনু মনে।
নাগকন্যা মানিকদর্পণে
সেথায় গাঁথিছে বেণী,
কুঞ্চিত লহরিকার শ্রেণী
ভেসে যায় বেঁকে বেঁকে
যখন বিকেলে হাওয়া জাগিয়া উঠিত থেকে থেকে।
তীরে যত গাছপালা পশুপাখি
তারা আছে অন্যলোকে, এ শুধু একাকী।
তাই সব
যত কিছু অসম্ভব
কল্পনার মিটাইত সাধ,
কোথাও ছিল না তার প্রতিবাদ।

তার পরে মনে হল একদিন,
সাঁতারিতে পেল যারা পৃথিবীতে তারাই স্বাধীন,
বন্দী তারা যারা পায় নাই।
এ আঘাত প্রাণে নিয়ে চলিলাম তাই
ভূমির নিষেধগণ্ডি হতে পার।
অনাত্মীয় শত্রুতার

সংশয় কাটিল ধীরে ধীরে,
জলে আর তীরে
আমারে মাঝেতে নিয়ে হল বোঝাপড়া।
আঁকড়িয়া সাঁতারের ঘড়া
অপরিচয়ের বাধা উত্তীর্ণ হয়েছি দিনে দিনে,
অচেনার প্রান্তসীমা লয়েছিনু চিনে।
পুলকিত সাবধানে
নামিতাম স্নানে,
গোপন তরল কোন্ অদৃশ্যের স্পর্শ সর্ব গায়ে
ধরিত জড়ায়ে।
হর্ষ-সাথে মিলি ভয়
দেহময়
রহস্য ফেলিত ব্যাপ্ত করি।

পূর্বতীরে বৃদ্ধ বট প্রাচীন প্রহরী
গ্রন্থিল শিকড়গুলো কোথায় পাঠাত নিরালোকে
যেন পাতালের নাগলোকে।
এক দিকে দূর আকাশের সাথে
দিনে রাতে
চলে তার আলোকছায়ার আলাপন,
অন্য দিকে দূর নিঃশব্দের তলে নিমজ্জন
কিসের সন্ধানে
অবিচ্ছিন্ন প্রচ্ছন্নের পানে।
সেই পুকুরের
ছিনু আমি দোসর দূরের
বাতায়নে বসি নিরালায়,
বন্দী মোরা উভয়েই জগতের ভিন্ন কিনারায়;
তার পরে দেখিলাম, এ পুকুর এও বাতায়ন—
এক দিকে সীমা বাঁধা, অন্য দিকে মুক্ত সারাক্ষণ।

করিয়াছি পারাপার
যত শত বার
ততই এ তটে-বাঁধা জলে
গভীরের বক্ষতলে
লভিয়াছি প্রতি ক্ষণে বাধা-ঠেলা স্বাধীনের জয়,
গেছে চলি ভয়।

[শান্তিনিকেতন]
২৬।১০।৩৮

শ্যামা

উজ্জ্বল শ্যামল বর্ণ, গলায় পলার হারখানি।
চেয়েছি অবাক মানি
তার পানে।
বড়ো বড়ো কাজল নয়ানে
অসংকোচে ছিল চেয়ে
নবকৈশোরের মেয়ে,
ছিল তারি কাছাকাছি বয়স আমার।
স্পষ্ট মনে পড়ে ছবি। ঘরের দক্ষিণে খোলা দ্বার,
সকালবেলার রোদে বাদামগাছের মাথা
ফিকে আকাশের নীলে মেলেছে চিকন ঘন পাতা।
একখানি সাদা শাড়ি কাঁচা কচি গায়ে,
কালো পাড় দেহ ঘিরে ঘুরিয়া পড়েছে তার পায়ে।
দুখানি সোনার চুড়ি নিটোল দু হাতে,
ছুটির মধ্যাহ্নে পড়া কাহিনীর পাতে
ওই মূর্তিখানি ছিল। ডেকেছে সে মোরে মাঝে মাঝে
বিধির খেয়াল যেথা নানাবিধ সাজে
রচে মরীচিকালোক নাগালের পারে
বালকের স্বপ্নের কিনারে।
দেহ ধরি মায়া
আমার শরীরে মনে ফেলিল অদৃশ্য ছায়া

স্নিগ্ধ স্পর্শময়ী।
সাহস হল না কথা কই।
হৃদয় ব্যথিল মোর অতিমৃদু গুঞ্জরিত সুরে—
ও যে দূরে, ও যে বহুদূরে,
যত দূরে শিরীষের উর্ধ্বশাখা যেথা হতে ধীরে
ক্ষীণ গন্ধ নেমে আসে প্রাণের গভীরে।

একদিন পুতুলের বিয়ে,
পত্র গেল দিয়ে।
কলরব করেছিল হেসে খেলে
নিমন্ত্রিত দল। আমি মুখচোরা ছেলে
একপাশে সংকোচে পীড়িত। সন্ধ্যা গেল বৃথা,
পরিবেষণের ভাগে পেয়েছিনু মনে নেই কী তা।
দেখেছিনু, দ্রুতগতি দুখানি পা আসে যায় ফিরে,
কালো পাড় নাচে তারে ঘিরে।
কটাক্ষে দেখেছি, তার কাঁকনে নিরেট রোদ
দু হাতে পড়েছে যেন বাঁধা। অনুরোধ উপরোধ
শুনেছিনু তার স্নিগ্ধ স্বরে।
ফিরে এসে ঘরে
মনে বেজেছিল তারি প্রতিধ্বনি
অর্ধেক রজনী।

তার পরে একদিন
জানাশোনা হল বাধাহীন।
একদিন নিয়ে তার ডাকনাম
তারে ডাকিলাম।
একদিন ঘুচে গেল ভয়,
পরিহাসে পরিহাসে হল দোঁহে কথা-বিনিময়।
কখনো বা গড়ে-তোলা দোষ
ঘটায়েছে ছল-করা রোষ।

কখনো বা শ্লেষবাক্যে নিষ্ঠুর কৌতুক
হেনেছিল দুখ।
কখনো বা দিয়েছিল অপবাদ
অনবধানের অপরাধ।
কখনো দেখেছি তার অযত্নের সাজ—
রন্ধনে ছিল সে ব্যস্ত, পায় নাই লাজ।
পুরুষসুলভ মোর কত মূঢ়তারে
ধিক্কার দিয়েছে নিজ স্ত্রীবুদ্ধির তীব্র অহংকারে।
একদিন বলেছিল, "জানি হাত দেখা।"
হাতে তুলে নিয়ে হাত নতশিরে গনেছিল রেখা—
বলেছিল, "তোমার স্বভাব
প্রেমের লক্ষণে দীন।" দিই নাই কোনোই জবাব।
পরশের সত্য পুরস্কার
খণ্ডিয়া দিয়েছে দোষ মিথ্যা সে নিন্দার।

তবু ঘুচিল না
অসম্পূর্ণ চেনার বেদনা।
সুন্দরের দূরত্বের কখনো হয় না ক্ষয়,
কাছে পেয়ে না পাওয়ার দেয় অফুরন্ত পরিচয়।

পুলকে বিষাদে মেশা দিন পরে দিন
পশ্চিমে দিগন্তে হয় লীন।
চৈত্রের আকাশতলে নীলিমার লাবণ্য ঘনাল,
আশ্বিনের আলো
বাজাল সোনার ধানে ছুটির সানাই।
চলেছে মন্থর তরী নিরুদ্দেশে স্বপ্নেতে বোঝাই।

[শান্তিনিকেতন]
৩১।১০।৩৮

পঞ্চমী

ভাবি বসে বসে
গত জীবনের কথা,
কাঁচা মনে ছিল
কী বিষম মূঢ়তা।
শেষে ধিক্কারে বলি হাত নেড়ে,
যাক গে সে-কথা যাক গে।

তরুণ বেলাতে যে খেলা খেলাতে
ভয় ছিল হারবার,
তারি লাগি, প্রিয়ে, সংশয়ে মোরে
ফিরিয়েছ বার বার।
কৃপণ কৃপার ভাঙা কণা একটুক
মনে দেয় নাই সুখ।
সে যুগের শেষে আজ বলি হেসে,
কম কি সে কৌতুক
যতটুকু ছিল ভাগ্যে,
দুঃখের কথা থাক্ গে।

পঞ্চমী তিথি
বনের আড়াল থেকে
দেখা দিয়েছিল
ছায়া দিয়ে মুখ ঢেকে।
মহা আক্ষেপে বলেছি সেদিন,
এ ছল কিসের জন্য।
পরিতাপে জ্বলি আজ আমি বলি,
সিকি চাঁদনীর আলো
দেউলে নিশার অমাবস্যার
চেয়ে যে অনেক ভালো।

বলি আরবার, এসো পঞ্চমী, এসো,
চাপা হাসিটুকু হেসো,
আধখানি বেঁকে ছলনায় ঢেকে
না জানিয়ে ভালোবেসো।
দয়া, ফাঁকি নামে গণ্য,
আমাকে করুক ধন্য।

আজ খুলিয়াছি
পুরানো স্মৃতির ঝুলি,
দেখি নেড়েচেড়ে
ভুলের দুঃখগুলি।
হায় হায় এ কী, যাহা কিছু দেখি
সকলি যে পরিহাস্য।
ভাগ্যের হাসি কৌতুক করি
সেদিন সে কোন্ ছলে
আপনার ছবি দেখিতে চাহিল
আমার অশ্রুজলে।
এসো ফিরে এসো সেই ঢাকা বাঁকা হাসি,
পালা শেষ করো আসি।
মূঢ় বলিয়া করতালি দিয়া
যাও মোরে সম্ভাষি।
আজ করো তারি ভাষ্য
যা ছিল অবিশ্বাস্য।

বয়স গিয়েছে,
হাসিবার ক্ষমতাটি
বিধাতা দিয়েছে,
কুয়াশা গিয়েছে কাটি।
দুখদুর্দিন কালো বরনের
মুখোশ করেছে ছিন্ন।

দীর্ঘ পথের শেষ গিরিশিরে
উঠে গেছে আজ কবি
সেথা হতে তার ভূতভবিষ্য
সব দেখে যেন ছবি
ভয়ের মূর্তি যেন যাত্রার সঙ্,
মেখেছে কুশ্রী রঙ।
দিনগুলি যেন পশুদলে চলে,
ঘণ্টা বাজায়ে গলে।
কেবল ভিন্ন ভিন্ন
সাদা কালো যত চিহ্ন।

[শান্তিনিকেতন]
২৯।১১।৩৮

জানা-অজানা

এই ঘরে আগে পাছে
বোবা কালা বস্তু যত আছে
দলবাঁধা এখানে সেখানে,
কিছু চোখে পড়ে, কিছু পড়ে না মনের অবধানে।
পিতলের ফুলদানিটাকে
বহে নিয়ে টিপাইটা এক কোণে মুখ ঢেকে থাকে।
ক্যাবিনেটে কী যে আছে কত,
না জানারি মতো।
পর্দায় পড়েছে ঢাকা সাসির দুখানা কাঁচ ভাঙা;
আজ চেয়ে অকস্মাৎ দেখা গেল পর্দাখানা রাঙা—
চোখে পড়ে পড়েও না;
জাজিমেতে আঁকে আলপনা
সাতটা বেলার আলো সকালে রোদ্দুরে।
সবুজ একটি শাড়ি ডুরে
ঢেকে আছে ডেস্কোখানা; কবে তারে নিয়েছিনু বেছে,
রঙ চোখে উঠেছিল নেচে,

আজ যেন সে রঙের আগুনেতে পড়ে গেছে ছাই,
আছে তবু ষোলো-আনা নাই।
থাকে থাকে দেরাজের
এলোমেলো ভরা আছে ঢের
কাগজপত্তর নানামতো,
ফেলে দিতে ভুলে যাই কত,
জানি নে কী জানি কোন্ আছে দরকার।
টেবিলে হেলানো ক্যালেণ্ডার,
হঠাৎ ঠাহর হল আটই তারিখ। ল্যাভেণ্ডার
শিশিভরা রোদ্দুরের রঙে। দিনরাত
টিক্‌টিক্ করে ঘড়ি, চেয়ে দেখি কখনো দৈবাৎ।
দেয়ালের কাছে
আলমারিভরা বই আছে;
ওরা বারো-আনা
পরিচয়-অপেক্ষায় রয়েছে অজানা।
ওই যে দেয়ালে
ছবিগুলো হেথা হোথা, রেখেছিনু কোনো-এক কালে;
আজ তারা ভুলে-যাওয়া,
যেন ভূতে-পাওয়া।
কার্পেটের ডিজাইন
স্পষ্টভাষা বলেছিল একদিন;
আজ অন্যরূপ,
প্রায় তারা চুপ।
আগেকার দিন আর আজিকার দিন
পড়ে আছে হেথা হোথা একসাথে সম্বন্ধবিহীন।

এইটুকু ঘর।
কিছু বা আপন তার, অনেক কিছুই তার পর।
টেবিলের ধারে তাই
চোখ-বোজা অভ্যাসের পথ দিয়ে যাই।

দেখি যাহা অনেকটা স্পষ্ট দেখি নাকো
জানা-অজানার মাঝে সরু এক চৈতন্যের সাঁকো,
ক্ষণে ক্ষণে অন্যমনা
তারি 'পরে চলে আনাগোনা।
আয়না-ফ্রেমের তলে ছেলেবেলাকার ফোটোগ্রাফ
কে রেখেছে, ফিকে হয়ে গেছে তার ছাপ।
পাশাপাশি ছায়া আর ছবি।
মনে ভাবি, আমি সেই রবি,
স্পষ্ট আর অস্পষ্টের উপাদানে ঠাসা
ঘরের মতন; ঝাপ্‌সা পুরানো ছেঁড়া-ভাষা
আসবাবগুলো যেন আছে অন্যমনে।
সামনে রয়েছে কিছু, কিছু লুকিয়েছে কোণে কোণে।
যাহা ফেলিবার
ফেলে দিতে মনে নেই। ক্ষয় হয়ে আসে অর্থ তার
যাহা আছে জমে।
ক্রমে ক্রমে
অতীতের দিনগুলি
মুছে ফেলে অস্তিত্বের অধিকার। ছায়া তারা
নূতনের মাঝে পথহারা;
যে অক্ষরে লিপি তারা লিখিয়া পাঠায় বর্তমানে
সে কেহ পড়িতে নাহি জানে।

উদয়ন, শান্তিনিকেতন
১১।৯।৩৮

প্রশ্ন

বাঁশবাগানের গলি দিয়ে মাঠে
চলতেছিলেম হাটে।
তুমি তখন আনতেছিলে জল,
পড়ল আমার ঝুড়ির থেকে
একটি রাঙা ফল।

হঠাৎ তোমার পায়ের কাছে
গড়িয়ে গেল ভুলে,
নিই নি ফিরে তুলে।
দিনের শেষে দিঘির ঘাটে
তুলতে এলে জল,
অন্ধকারে কুড়িয়ে তখন
নিলে কি সেই ফল।
এই প্রশ্নই গানে গেঁথে
একলা বসে গাই,
বলার কথা আর কিছু মোর নাই।

[শান্তিনিকেতন]
৩।১২।৩৮

বঞ্চিত

রাজসভাতে ছিল জ্ঞানী,
ছিল অনেক গুণী।
কবির মুখে কাব্যকথা শুনি
ভাঙল দ্বিধার বাঁধ,
সমস্বরে জাগল সাধুবাদ।
উষ্ণীষেতে জড়িয়ে দিল
মণিমালার মান,
স্বয়ং রাজার দান।
রাজধানীময় যশের বন্যাবেগে
নাম উঠল জেগে।

দিন ফুরাল। খ্যাতিক্লান্ত মনে
যেতে যেতে পথের ধারে
দেখল বাতায়নে,
তরুণী সে, ললাটে তার
কুঙ্কুমেরি ফোঁটা,
অলকেতে সদ্য অশোক ফোটা।

সামনে পদ্মপাতা,
মাঝখানে তার চাঁপার মালা গাঁথা,
সন্ধ্যেবেলার বাতাস গন্ধে ভরে।
নিশ্বাসিয়া বললে কবি,
এই মালাটি নয় তো আমার তরে।

[শান্তিনিকেতন]
৩।১২।৩৮

আমগাছ

এ তো সহজ কথা,
অঘ্রানে এই স্তব্ধ নীরবতা
জড়িয়ে আছে সামনে আমার
আমের গাছে;
কিন্তু ওটাই সবার চেয়ে
দুর্গম মোর কাছে।
বিকেল বেলার রোদ্দুরে এই চেয়ে থাকি,
যে রহস্য ঐ তরুটি রাখল ঢাকি
গুঁড়িতে তার ডালে ডালে
পাতায় পাতায় কাঁপনলাগা তালে
সে কোন্ ভাষা আলোর সোহাগ
শূন্যে বেড়ায় খুঁজি।
মর্ম তাহার স্পষ্ট নাহি বুঝি,
তবু যেন অদৃশ্য তার চঞ্চলতা
রক্তে জাগায় কানে-কানে কথা,
মনের মধ্যে বুলায় যে অঙ্গুলি
আভাস-ছোঁওয়া ভাষা তুলি
সে এনে দেয় অস্পষ্ট ইঙ্গিত
বাক্যের অতীত।

ঐ যে বাকলখানি
রয়েছে ওর পর্দা টানি

ওর ভিতরের আড়াল থেকে আকাশ-দূতের সাথে
বলাকওয়া কী হয় দিনে রাতে,
পরের মনের স্বপ্নকথার সম
পৌঁছবে না কৌতূহলে মম।
দুয়ার-দেওয়া যেন বাসরঘরে
ফুলশয্যার গোপন রাতে কানাকানি করে,
অনুমানেই জানি,
আভাসমাত্র না পাই তাহার বাণী।
ফাগুন আসে বছরশেষের পারে,
দিনে-দিনেই খবর আসে দ্বারে।
একটা যেন চাপা হাসি কিসের ছলে
অবাক শ্যামলতার তলে
শিকড় হতে শাখে শাখে
ব্যাপ্ত হয়ে থাকে।
অবশেষে খুশির দুয়ার হঠাৎ যাবে খুলে
মুকুলে মুকুলে।

শ্যামলী, শান্তিনিকেতন
৫।১২।৩৮

পাখির ভোজ

ভোরে উঠেই পড়ে মনে,
মুড়ি খাবার নিমন্ত্রণে
আসবে শালিখ পাখি।
চাতালকোণে বসে থাকি,
ওদের খুশি দেখতে লাগে ভালো।
স্নিগ্ধ আলো
এ অঘ্রানের শিশিরছোঁওয়া প্রাতে,
সরল লোভে চপল পাখির চটুল নৃত্য-সাথে

শিশুদিনের প্রথম হাসি মধুর হয়ে মেলে—
চেয়ে দেখি সকল কর্ম ফেলে।

ঝাড়ের হাওয়ায় ফুলিয়ে ডানা
একটুকু মুখ ঢেকে
অতিথিরা থেকে থেকে
লাল্‌চে-কালো সাদা রঙের পরিচ্ছন্ন বেশে
দেখা দিচ্ছে এসে।

খানিক পরেই একে একে জোটে পায়রাগুলো,
বুক ফুলিয়ে হেলে-দুলে খুঁটে খুঁটে ধুলো
খায় ছড়ানো ধান।
ওদের সঙ্গে শালিখদলের পঙ্‌ক্তি-ব্যবধান
একটুমাত্র নেই।
পরস্পরে একসমানেই
ব্যস্ত পায়ে বেড়ায় প্রাতরাশে।
মাঝে-মাঝে কী অকারণ ত্রাসে
ত্রস্ত পাখা মেলে
এক মুহূর্তে যায় উড়ে ধান ফেলে।
আবার ফিরে আসে
অহেতু আশ্বাসে।

এমনসময় আসে কাকের দল,
খাদ্যকণায় ঠোকর মেরে দেখে কী হয় ফল।
একটুখানি যাচ্ছে সরে আসছে আবার কাছে,
উড়ে গিয়ে বসছে তেঁতুলগাছে।
বাঁকিয়ে গ্রীবা ভাবছে বারংবার,
নিরাপদের সীমা কোথায় তার।
এবার মনে হয়,
এতক্ষণে পরস্পরের ভাঙল সমন্বয়।

কাকের দলের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিবিৎ মন
সন্দেহ আর সতর্কতায় দুলছে সারাক্ষণ।
প্রথম হল মনে,
তাড়িয়ে দেব ; লজ্জা হল তারি পরক্ষণে—
পড়ল মনে, প্রাণের যজ্ঞে ওদের সবাকার
আমার মতোই সমান অধিকার।
তখন দেখি, লাগছে না আর মন্দ
সকালবেলায় ভোজের সভায়
কাকের নাচের ছন্দ।

এই যে বহায় ওরা
প্রাণস্রোতের পাগ্‌লাঝোরা,
কোথা হতে অহরহ আসছে নাবি
সেই কথাটাই ভাবি।
এই খুশিটার স্বরূপ কী যে, তারি
রহস্যটা বুঝতে নাহি পারি।
চটুলদেহ দলে দলে
দুলিয়ে তোলে যে আনন্দ খাদ্যভোগের ছলে,
এ তো নহে এই নিমেষের সদ্য চঞ্চলতা,
অগণ্য এ কত যুগের অতি প্রাচীন কথা।
রন্ধ্রে রন্ধ্রে হাওয়া যেমন সুরে বাজায় বাঁশি,
কালের বাঁশির মৃত্যুরন্ধ্রে সেই মতো উচ্ছ্বাসি
উৎসারিছে প্রাণের ধারা।
সেই প্রাণেরে বাহন করি আনন্দের এই তত্ত্ব অন্তহারা
দিকে দিকে পাচ্ছে পরকাশ।
পদে পদে ছেদ আছে তার, নাই তবু তার নাশ।
আলোক যেমন অলক্ষ্য কোন্ সুদূর কেন্দ্র হতে
অবিশ্রান্ত স্রোতে
নানা রূপের বিচিত্র সীমায়
ব্যক্ত হতে থাকে নিত্য নানা ভঙ্গে নানা ভঙ্গিমায়

তেমনি যে এই সত্তার উচ্ছ্বাস
চতুর্দিকে ছড়িয়ে ফেলে নিবিড় উল্লাস—
যুগের পরে যুগে তবু হয় না গতিহারা,
হয় না ক্লান্ত অনাদি সেই ধারা।
সেই পুরাতন অনির্বচনীয়
সকালবেলায় রোজ দেখা দেয় কি ও
আমার চোখের কাছে
ভিড়-করা ঐ শালিখগুলির নাচে।
আদিমকালের সেই আনন্দ ওদের নৃত্যবেগে
রূপ ধ'রে মোর রক্তে ওঠে জেগে।
তবুও দেখি কখন কদাচিৎ
বিরূপ বিপরীত—
প্রাণের সহজ সুষমা যায় ঘুচি,
চঞ্চুতে চঞ্চুতে খোঁচাখুচি ;
পরাভূত হতভাগ্য মোর দুয়ারের কাছে
ক্ষত-অঙ্গে শরণ মাগিয়াছে।
দেখেছি সেই জীবন-বিরুদ্ধতা,
হিংসার ক্রুদ্ধতা—
যেমন দেখি কুহেলিকার কুশ্রী অপরাধ,
শীতের প্রাতে আলোর প্রতি কালোর অপবাদ—
অহংকৃত ক্ষণিকতার অলীক পরিচয়,
অসীমতার মিথ্যা পরাজয়।
তাহার পরে আবার করে ছিন্নেরে গ্রন্থন
সহজ চিরন্তন।
প্রাণোৎসবে অতিথিরা আবার পাশাপাশি
মহাকালের প্রাঙ্গণেতে নৃত্য করে আসি।

শ্যামলী, শান্তিনিকেতন
৬।১২।৩৮

বেজি

অনেকদিনের এই ডেস্কো—
আনমনা কলমের কালিপড়া ফ্রেস্কো
দিয়েছে বিস্তর দাগ ভুতুড়ে রেখার।
যমজ সোদর ওরা যে সব লেখার—
ছাপার লাইনে পেল ভদ্রবেশে ঠাঁই,
তাদের স্মরণে এরা নাই।
অক্সফোর্ড ডিক্সনারি, শব্দকল্পতরু,
ইংরেজ মেয়ের লেখা 'সাহারার মরু'
ভ্রমণের বই, ছবি আঁকা,
এগুলোর একপাশে চা রয়েছে ঢাকা
পেয়ালায় মডার্‌ন্ রিভিয়ুতে চাপা।
পড়ে আছে সগুছাপা
প্রুফগুলো কুঁড়েমির উপেক্ষায়।
বেলা যায়,
ঘড়িতে বেজেছে সাড়ে পাঁচ,
বৈকালী ছায়ার নাচ
মেঝেতে হয়েছে শুরু, বাতাসে পর্দায় লেগে দোলা।
খাতাখানি আছে খোলা।—
আধঘণ্টা ভেবে মরি,
প্যাট্রিয়ট্‌ম্ শব্দটাকে বাংলায় কী করি।

পোষা বেজি হেনকালে দ্রুতগতি এখানে সেখানে
টেবিল-চৌকির নিচে ঘুরে গেল কিসের সন্ধানে—
দুই চক্ষু ঔৎসুক্যের দীপ্তিজ্বলা,
তাড়াতাড়ি দেখে গেল আলমারির তলা
দামি দ্রব্য যদি কিছু থাকে;
ঘ্রাণ কিছু মিলিল না তীক্ষ্ণ নাকে

ঈপ্সিত বস্তুর। ঘুরে ফিরে অবজ্ঞায় গেল চলে ;
এ ঘরে সকলি ব্যর্থ আরসুলার খোঁজ নেই ব'লে।

আমার কঠিন চিন্তা এই,
প্যাস্থীজ্‌ম্ শব্দটার বাংলা বুঝি নেই।

[শান্তিনিকেতন]
৪ অক্টোবর, ১৯৩৮

যাত্রা

ইস্‌টিমারের ক্যাবিনটাতে কবে নিলেম ঠাঁই,
স্পষ্ট মনে নাই।
উপরতলার সারে
কামরা আমার একটা ধারে।
পাশাপাশি তারি
আরো ক্যাবিন সারি সারি
নম্বরে চিহ্নিত,
একই রকম খোপ সেগুলোর দেয়ালে ভিত্তিত।
সরকারী যা আইনকানুন তাহার যথাযথ্য
অটুট, তবু যাত্রীজনের পৃথক বিশেষত্ব
রুদ্ধদুয়ার ক্যাবিনগুলোয় ঢাকা ;
এক চলনের মধ্যে চালায় ভিন্ন ভিন্ন চাকা,
ভিন্ন ভিন্ন চাল।
অদৃশ্য তার হাল,
অজানা তার লক্ষ্য হাজার পথেই,
সেথায় কারো আসনে ভাগ হয় না কোনোমতেই।
প্রত্যেকেরই রিজার্ভ-করা কোটর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ;
দরজাটা খোলা হলেই সম্মুখে সমুদ্র
মুক্ত চোখের 'পরে
সমান সবার তরে,

তবুও সে একান্ত অজানা,
তরঙ্গতর্জনী-তোলা অলঙ্ঘ্য তার মানা।

মাঝে মাঝে ঘণ্টা পড়ে। ডিনার-টেবিলে
খাবার গন্ধ, মদের গন্ধ, অঙ্গরাগের সুগন্ধ যায় মিলে—
তারি সঙ্গে নানা রঙের সাজে
ইলেক্‌ট্রিকের আলো-জ্বালা কক্ষমাঝে
একটু জানা অনেকখানি না-জানাতেই মেশা
চক্ষু কানের স্বাদের ঘ্রাণের সম্মিলিত নেশা
কিছুক্ষণের তরে
মোহাবেশে ঘনিয়ে সবায় ধরে।
চেনাশোনা হাসি-আলাপ মদের ফেনার মতো
বুদ্‌বুদিয়া ওঠে আবার গভীরে হয় গত।
বাইরে রাত্রি তারায় তারাময়,
ফেনিল সুনীল তেপান্তরে মরণ-ঘেরা ভয়।

হঠাৎ কেন খেয়াল গেল মিছে,
জাহাজখানা ঘুরে আসি উপর থেকে নিচে।
খানিক যেতেই পথ হারালুম, গলির আঁকেবাঁকে
কোথায় ওরা কোন্ অফিসার থাকে।
কোথাও দেখি সেলুন-ঘরে ঢুকে,
ক্ষুর বোলাচ্ছে নাপিত সে কার ফেনায়-মগ্ন মুখে।
হোথায় রান্নাঘর;
রাঁধুনেরা সার বেঁধেছে পৃথুল-কলেবর।
গা ঘেঁষে কে গেল চলে ড্রেসিং-গাউন-পরা,
স্নানের ঘরে জায়গা পাবার ত্বরা।
নিচের তলায় ডেকের 'পরে কেউ বা করে খেলা,
ডেক-চেয়ারে কারো শরীর মেলা,
বুকের উপর বইটা রেখে কেউ বা নিদ্রা যায়,
পায়চারি কেউ করে ত্বরিত পায়।

স্টুয়ার্ড্ হোথায় জুগিয়ে বেড়ায় বরফী শর্বৎ।
আমি তাকে শুধাই আমার ক্যাবিন-ঘরের পথ
নেহাত থতোমতো।
সে শুধাল, নম্বর তার কত।
আমি বললেম যেই,
নম্বরটা মনে আমার নেই—
একটু হেসে নিরুত্তরে গেল আপন কাজে,
ঘেমে উঠি উদ্‌বেগে আর লাজে।
আবার ঘুরে বেড়াই আগে পাছে,
চেয়ে দেখি কোন্ ক্যাবিনের নম্বর কী আছে।
যেটাই দেখি মনেতে হয়, এইটে হতে পারে;
সাহস হয় না ধাক্কা দিতে দ্বারে।
ভাবছি কেবল, কী যে করি, হল আমার এ কী—
এমন সময় হঠাৎ চমকে দেখি,
নিছক স্বপ্ন এ যে,
এক যাত্রার যাত্রী যারা কোথায় গেল কে যে।

গভীর রাত্রি; বাতাস লেগে কাঁপে ঘরের সাসি,
রেলের গাড়ি অনেক দূরে বাজিয়ে গেল বাঁশি।

[শান্তিনিকেতন]
২৬।২।৩৯

সময়হারা

খবর এল, সময় আমার গেছে
আমার গড়া পুতুল যারা বেচে
বর্তমানে এমনতরো পসারী নেই;
সাবেক কালের দালানঘরের পিছন কোণেই
ক্রমে ক্রমে
উঠছে জমে জমে
আমার হাতের খেলনাগুলো,
টানছে ধুলো।

হাল আমলের ছাড়পত্রহীন
অকিঞ্চনটা লুকিয়ে কাটায় জোড়াতাড়ার দিন।
ভাঙা দেয়াল ঢেকে একটা ছেঁড়া পর্দা টাঙাই ;
ইচ্ছে করে, পৌষমাসের হাওয়ার তোড়টা ভাঙাই ;
ঘুমোই যখন ফড়্‌ফড়িয়ে বেড়ায় সেটা উড়ে,
নিতান্ত ভুতুড়ে।
আধপেটা খাই শালুক-পোড়া ; একলা কঠিন ভুঁয়ে
চেটাই পেতে শুয়ে
ঘুম হারিয়ে ক্ষণে ক্ষণে
আউড়ে চলি শুধু আপন-মনে—
"উড়কি ধানের মুড়কি দেব, বিন্নে ধানের খই,
সরু ধানের চিঁড়ে দেব, কাগমারে দই।"
আমার চেয়ে কম-ঘুমন্ত নিশাচরের দল
খোঁজ নিয়ে যায় ঘরে এসে, হায় সে কী নিষ্ফল।
কখনো বা হিসেব ভুলে আসে মাতাল চোর,
শূন্য ঘরের পানে চেয়ে বলে, "সাঙাত মোর,
আছে ঘরে ভদ্র ভাষায় বলে যাকে দাওয়াই ?"
নেই কিছু তো, দু-এক ছিলিম তামাক সেজে খাওয়াই।
একটু যখন আসে ঘুমের ঘোর
সুড়সুড়ি দেয় আরসুলারা পায়ের তলায় মোর।
দুপুরবেলায় বেকার থাকি অন্যমনা ;
গিরগিটি আর কাঠবিড়ালির আনাগোনা
সেই দালানের বাহির ঝোপে ;
থামের মাথায় খোপে খোপে
পায়রাগুলোর সারাটা দিন বকম্-বকম্।
আঙিনাটার ভাঙা পাঁচিল, ফাটলে তার রকম-রকম
লতাগুল্ম পড়ছে ঝুলে,
হলদে সাদা বেগনি ফুলে
আকাশ-পানে দিচ্ছে উঁকি।
ছাতিমগাছের মরা শাখা পড়ছে ঝুঁকি

শঙ্খমণির থালে,
মাছরাঙারা দুপুরবেলায় তন্দ্রানিঝুম কালে
তাকিয়ে থাকে গভীর জলের রহস্যভেদরত
বিজ্ঞানীদের মতো।
পানাপুকুর, ভাঙনধরা ঘাট,
অফলা এক চালতাগাছের চলে ছায়ার নাট।
চক্ষু বুজে ছবি দেখি—কাৎলা ভেসেছে,
বড়ো সাহেবের বিবিগুলি নাইতে এসেছে।
ঝাউগুঁড়িটার 'পরে
কাঠঠোকরা ঠক্‌ঠকিয়ে কেবল প্রশ্ন করে।
আগে কানে পৌছত না ঝিঁঝিঁপোকার ডাক,
এখন যখন পোড়ো বাড়ি দাঁড়িয়ে হতবাক্
ঝিল্লিরবের তানপুরা-তান স্তব্ধতা-সংগীতে
লেগেই আছে একঘেয়ে সুর দিতে।
আঁধার হতে না হতে সব শেয়াল ওঠে ডেকে
কল্‌মিদিঘির ভাঙা পাড়ির থেকে।
পেঁচার ডাকে বাঁশের বাগান হঠাৎ ভয়ে জাগে,
তন্দ্রা ভেঙে বুকে চমক লাগে।
বাদুড়-ঝোলা তেঁতুলগাছে মনে যে হয় সত্যি,
দাড়িওয়ালা আছে ব্রহ্মদত্যি।
রাতের বেলায় ডোমপাড়াতে কিসের কাজে
তাক্‌ধুমাধুম বাদ্যি বাজে।
তখন ভাবি, একলা ব'সে দাওয়ার কোণে
মনে-মনে,
ঝড়েতে কাত জারুলগাছের ডালে ডালে
পিরৃভু নাচে হাওয়ার তালে।

শহর জুড়ে নামটা ছিল, যেদিন গেল ভাসি
হলুম বনগাঁবাসী।

সময় আমার গেছে ব'লেই সময় থাকে পড়ে,
পুতুল গড়ার শূন্য বেলা কাটাই খেয়াল গ'ড়ে।
সজনেগাছে হঠাৎ দেখি কমলাপুলির টিয়ে—
গোধূলিতে সুয্যিমামার বিয়ে ;
মামি থাকেন, সোনার বরন ঘোমটাতে মুখ ঢাকা,
আলতা পায়ে আঁকা।
এইখানেতে ঘুঘুডাঙার খাঁটি খবর মেলে
কুলতলাতে গেলে।
সময় আমার গেছে ব'লেই জানার সুযোগ হল
'কলুদ ফুল' যে কাকে বলে, ঐ যে থোলো থোলো
আগাছা জঙ্গলে
সবুজ অন্ধকারে যেন রোদের টুকরো জ্বলে।
বেড়া আমার সব গিয়েছে টুটে ;
পরের গোরু যেখান থেকে যখন খুশি ছুটে
হাতার মধ্যে আসে ;
আর কিছু তো পায় না, খিদে মেটায় শুকনো ঘাসে।
আগে ছিল সাটিন্ বীজে বিলিতি মৌসুমি,
এখন মরুভূমি।
সাত পাড়াতে সাত কুলেতে নেইকো কোথাও কেউ
মনিব যেটার, সেই কুকুরটা কেবলি ঘেউ-ঘেউ
লাগায় আমার দ্বারে ; আমি বোঝাই তারে কত,
আমার ঘরে তাড়িয়ে দেবার মতো
ঘুম ছাড়া আর মিলবে না তো কিছু—
শুনে সে লেজ নাড়ে, সঙ্গে বেড়ায় পিছু পিছু।
অনাদরের ক্ষতচিহ্ন নিয়ে পিঠের 'পরে
জানিয়ে দিলে, লক্ষ্মীছাড়ার জীর্ণ ভিটের 'পরে
অধিকারের দলিল তাহার দেহেই বর্তমান।
দুর্ভাগ্যের নতুন হাওয়া-বদল করার স্থান
এমনতরো মিলবে কোথায়। সময় গেছে তারই,
সন্দেহ তার নেইকো একেবারেই।

সময় আমার গিয়েছে, তাই গাঁয়ের ছাগল চরাই ;
রবিশস্যে ভরা ছিল, শূন্য এখন মরাই ।
খুদকুঁড়ো যা বাকি ছিল ইঁদুরগুলো ঢুকে
দিল কখন ফুঁকে ।

হাওয়ার ঠেলায় শব্দ করে আগলভাঙা দ্বার,
সারাদিনে জনামাত্র নেইকো খরিদ্দার ।
কালের অলস চরণপাতে
ঘাস উঠেছে ঘরে আসার বাঁকা গলিটাতে ।
ওরি ধারে বটের তলায় নিয়ে চিঁড়ের থালা
চড়ুইপাখির জন্যে আমার খোলা অতিথশালা ।

সন্ধ্যে নামে পাতাঝরা শিমুলগাছের আগায়,
আধ-ঘুমে আধ-জাগায়
মন চলে যায় চিহ্নবিহীন পস্‌টারিটির পথে
স্বপ্নমনোরথে ;
কালপুরুষের সিংহদ্বারের ওপার থেকে
শুনি কে কয় আমায় ডেকে,—
"ওরে পুতুলওলা
তোর যে ঘরে যুগান্তরের দুয়ার আছে খোলা,
সেথায় আগাম-বায়না-নেওয়া খেলনা যত আছে
লুকিয়ে ছিল গ্রহণ-লাগা ক্ষণিক কালের পাছে ;
আজ চেয়ে দেখ্‌, দেখতে পাবি,
মোদের দাবি
ছাপ-দেওয়া তার ভালে ।
পুরানো সে নতুন আলোয় জাগল নতুন কালে ।
সময় আছে কিংবা গেছে দেখার দৃষ্টি সেই
সবার চক্ষে নেই—
এই কথাটা মনে রেখে ওরে পুতুলওলা,
আপন সৃষ্টি-মাঝখানেতে থাকিস আপন-ভোলা ।

ঐ যে বলিস, বিছানা তোর ভুঁয়ে চেটাই পাতা,
ছেঁড়া মলিন কাঁথা—
ঐ যে বলিস, জোটে কেবল সিদ্ধ কচুর পথ্যি—
এটা নেহাত স্বপ্ন কি নয়, এ কি নিছক সত্যি।
পাস নি খবর, বাহান্ন জন কাহার
পাল্‌কি আনে— শব্দ কি পাস তাহার।
বাঘনাপাড়া পেরিয়ে এল ধেয়ে,
সখীর সঙ্গে আসছে রাজার মেয়ে।
খেলা যে তার বন্ধ আছে তোমার খেলনা বিনে,
এবার নেবে কিনে।
কী জানি বা ভাগ্য তোমার ভালো,
বাসরঘরে নতুন প্রদীপ জ্বালো;
নবযুগের রাজকন্যা আধেক রাজ্যসুদ্ধ
যদি মেলে, তা নিয়ে কেউ বাধায় যদি যুদ্ধ,
ব্যাপারখানা উচ্চতলায় ইতিহাসের ধাপে
উঠে পড়বে মহাকাব্যের মাপে।
বয়স নিয়ে পণ্ডিত কেউ তর্ক যদি করে
বলবে তাকে, একটা যুগের পরে
চিরকালের বয়স আসে সকল-পাঁজি-ছাড়া,
যমকে লাগায় তাড়া।"

এতক্ষণ যা বকা গেল এটা প্রলাপমাত্র—
নবীন বিচারপতি ওগো, আমি ক্ষমার পাত্র;
পেরিয়ে মেয়াদ বাঁচে তবু যে-সব সময়হারা
স্বপ্নে ছাড়া সান্ত্বনা আর কোথায় পাবে তারা

শ্যামলী, শান্তিনিকেতন
১।১।৩৯

নামকরণ

একদিন মুখে এল নূতন এ নাম—
চৈতালিপূর্ণিমা ব'লে কেন যে তোমারে ডাকিলাম
সে কথা শুধাও যবে মোরে
স্পষ্ট ক'রে
তোমারে বুঝাই
হেন সাধ্য নাই।
রসনায় রসিয়েছে, আর কোনো মানে
কী আছে কে জানে।
জীবনের যে সীমায়
এসেছ গম্ভীর মহিমায়
সেথা অপ্রমত্ত তুমি,
পেরিয়েছ ফাল্গুনের ভাঙাভাঙা উচ্ছিষ্টের ভূমি,
পৌঁছিয়াছ তপঃশুচি নিরাসক্ত বৈশাখের পাশে,
এ কথাই বুঝি মনে আসে
না ভাবিয়া আগুপিছু।
কিংবা এ ধ্বনির মাঝে অজ্ঞাত কুহক আছে কিছু।
হয়তো মুকুল-ঝরা মাসে
পরিণতফলনম্র অপ্রগল্‌ভ যে মর্যাদা আসে
আম্রডালে,
দেখেছি তোমার ভালে
সে পূর্ণতা স্তব্ধতামন্থর—
তার মৌন-মাঝে বাজে অরণ্যের চরম মর্মর।
অবসন্ন বসন্তের অবশিষ্ট অন্তিম চাঁপায়
মৌমাছির ডানারে কাঁপায়
নিকুঞ্জের ম্লান মৃদু ঘ্রাণে,
সেই ঘ্রাণ একদিন পাঠায়েছ প্রাণে,
তাই মোর উৎকণ্ঠিত বাণী
জাগায়ে দিয়েছে নামখানি।

সেই নাম থেকে থেকে ফিরে ফিরে
তোমারে গুঞ্জন করি ঘিরে
চারিদিকে,
ধ্বনিলিপি দিয়ে তার বিদায়স্বাক্ষর দেয় লিখে।
তুমি যেন রজনীর জ্যোতিষ্কের শেষ পরিচয়
শুকতারা, তোমার উদয়
অস্তের খেয়ায় চ'ড়ে আসা,
মিলনের সাথে বহি বিদায়ের ভাষা।
তাই বসে একা
প্রথম দেখার ছন্দে ভরি লই সব-শেষ দেখা।
সেই দেখা মম
পরিস্ফুটতম।
বসন্তের শেষমাসে শেষ শুক্লতিথি
তুমি এলে তাহার অতিথি,
উজাড় করিয়া শেষ দানে
ভাবের দাক্ষিণ্য মোর অন্ত নাহি জানে।
ফাল্গুনের অতিতৃপ্তি ক্লান্ত হয়ে যায়,
চৈত্রে সে বিরলরসে নিবিড়তা পায়,
চৈত্রের সে ঘন দিন তোমার লাবণ্যে মূর্তি ধরে;
মিলে যায় সারঙের বৈরাগ্যরাগের শান্তস্বরে,
প্রৌঢ় যৌবনের পূর্ণ পর্যাপ্ত মহিমা
লাভ করে গৌরবের সীমা।

হয়তো এ-সব ব্যাখ্যা স্বপ্ন-অন্তে চিন্তা ক'রে বলা,
দাম্ভিক বুদ্ধিরে শুধু ছলা—
বুঝি এর কোনো অর্থ নাইকো কিছুই।
জ্যৈষ্ঠ-অবসানদিনে আকস্মিক জুঁই
যেমন চমকি জেগে উঠে
সেইমতো অকারণে উঠেছিল ফুটে,

সেই চিত্রে পড়েছিল তার লেখা
বাক্যের তুলিকা যেথা স্পর্শ করে অব্যক্তের রেখা।
পুরুষ যে রূপকার,
আপনার সৃষ্টি দিয়ে নিজেরে উদ্‌ভ্রান্ত করিবার
অপূর্ব উপকরণ
বিশ্বের রহস্যলোকে করে অন্বেষণ।
সেই রহস্যই নারী—
নাম দিয়ে ভাব দিয়ে মনগড়া মূর্তি রচে তারি;
যাহা পায় তার সাথে যাহা নাহি পায়
তাহারে মিলায়।
উপমা তুলনা যত ভিড় করে আসে
ছন্দের কেন্দ্রের চারিপাশে,
কুমোরের ঘুরখাওয়া চাকার সংবেগে
যেমন বিচিত্র রূপ উঠে জেগে জেগে।
বসন্তে নাগকেশরের সুগন্ধে মাতাল
বিশ্বের জাদুর মঞ্চে রচে সে আপন ইন্দ্রজাল।
বনতলে মর্মরিয়া কাঁপে সোনাঝুরি;
চাঁদের আলোর পথে খেলা করে ছায়ার চাতুরী;
গভীর চৈতন্যলোকে
রাঙা নিমন্ত্রণলিপি দেয় লিখি কিংশুকে অশোকে;
হাওয়ায় বুলায় দেহে অনামীর অদৃশ্য উত্তরী,
শিরায় সেতার উঠে গুঞ্জরি গুঞ্জরি।

এই যারে মায়ারথে পুরুষের চিত্ত ডেকে আনে
সে কি নিজে সত্য করে জানে
সত্য মিথ্যা আপনার,
কোথা হতে আসে মন্ত্র এই সাধনার।
রক্তস্রোত-আন্দোলনে জেগে
ধ্বনি উচ্ছ্বসিয়া উঠে অর্থহীন বেগে;
প্রচ্ছন্ন নিকুঞ্জ হতে অকস্মাৎ ঝঞ্ঝায় আহত

ছিন্ন মঞ্জরীর মতো
নাম এল ঘূর্ণবায়ে ঘুরি ঘুরি,
চাঁপার গন্ধের সাথে অন্তরেতে ছড়াল মাধুরী

চৈত্রপূর্ণিমা [২১ চৈত্র], ১৩৪৫
[? শান্তিনিকেতন]

ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে

পাকুড়তলির মাঠে
বামুনমারা দিঘির ঘাটে
আদিবিশ্ব-ঠাকুরমায়ের আস্‌মানি এক চেলা
ঠিক দুক্কুর বেলা
বেগ্‌নি-সোনা দিক্‌-আঙিনার কোণে
ব'সে ব'সে ভুঁইজোড়া এক চাটাই বোনে
হলদে রঙের শুকনো ঘাসে।
সেখান থেকে ঝাপসা স্মৃতির কানে আসে
ঘুম-লাগা রোদ্দুরে
ঝিম্‌ঝিমিনি সুরে—
'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে,
সুন্দরীকে বিয়ে দিলেম ডাকাতদলের মেলে।'

সুদূর কালের দারুণ ছড়াটিকে
স্পষ্ট করে দেখি নে আজ, ছবিটা তার ফিকে।
মনের মধ্যে বেঁধে না তার ছুরি,
সময় তাহার ব্যথার মূল্য সব করেছে চুরি।
বিয়ের পথে ডাকাত এসে হরণ করলে মেয়ে,
এই বারতা ধুলোয়-পড়া শুকনো পাতার চেয়ে
উত্তাপহীন, ঝেঁটিয়ে-ফেলা আবর্জনার মতো।
দুঃসহ দিন দুঃখেতে বিক্ষত

এই-কটা তার শব্দমাত্র দৈবে রইল বাকি,
আগুন-নেভা ছাইয়ের মতন ফাঁকি।
সেই মরা দিন কোন্ খবরের টানে
পড়ল এসে সজীব বর্তমানে।
তপ্ত হাওয়ার বাজপাখি আজ বারে বারে
ছোঁ মেরে যায় ছড়াটারে,
এলোমেলো ভাবনাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে
টুক্‌রো করে ওড়ায় ধ্বনিটাকে।
জাগা মনের কোন্ কুয়াশা স্বপ্নেতে যায় ব্যেপে,
ধোঁয়াটে এক কম্বলেতে ঘুমকে ধরে চেপে,
রক্তে নাচে ছড়ার ছন্দে মিলে—
'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে।'

জমিদারের বুড়ো হাতি হেলে দুলে চলেছে বাঁশতলায়,
ঢঙ্‌ ঢঙিয়ে ঘণ্টা দোলে গলায়।

বিকেলবেলার চিকন আলোর আভাস লেগে
ঘোলা রঙের আলস ভেঙে উঠি জেগে।
হঠাৎ দেখি, বুকে বাজে টন্‌টনানি
পাঁজরগুলোর তলায় তলায় ব্যথা হানি।
চটকা ভাঙে যেন খোঁচা খেয়ে—
কই আমাদের পাড়ার কালো মেয়ে—
ঝুড়ি ভ'রে মুড়ি আনত, আনত পাকা জাম,
সামান্য তার দাম,
ঘরের গাছের আম আনত কাঁচামিঠা,
আনির স্থলে দিতেম তাকে চার-আনিটা।
ঐ যে অন্ধ কলুবুড়ির কান্না শুনি—
কদিন হল জানি নে কোন্ গোঁয়ার খুনি
সমর্থ তার নাতনিটিকে
কেড়ে নিয়ে ভেগেছে কোন্ দিকে।

আজ সকালে শোনা গেল চৌকিদারের মুখে,
যৌবন তার দ'লে গেছে, জীবন গেছে চুকে।
বুক-ফাটানো এমন খবর জড়ায়
সেই সেকালের সামান্য এক ছড়ায়।
শাস্ত্রমানা আস্তিকতা ধুলোতে যায় উড়ে—
'উপায় নাই রে, নাই প্রতিকার' বাজে আকাশ জুড়ে।
অনেক কালের শব্দ আসে ছড়ার ছন্দে মিলে—
'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে।'

জমিদারের বুড়ো হাতি হেলে দুলে চলেছে বাঁশতলায়,
ঢঙ্ ঢঙিয়ে ঘণ্টা দোলে গলায়।

শান্তিনিকেতন
২৮।৩।৩৯

তর্ক

নারীকে দিবেন বিধি পুরুষের অন্তরে মিলায়ে
সেই অভিপ্রায়ে
রচিলেন সূক্ষ্মশিল্পকারুময়ী কায়া—
তারি সঙ্গে মিলালেন অঙ্গের অতীত কোন্ মায়া
যারে নাহি যায় ধরা,
যাহা শুধু জাদুমন্ত্রে ভরা,
যাহারে অন্তরতম হৃদয়ের অদৃশ্য অলোকে
দেখা যায় ধ্যানাবিষ্ট চোখে,
ছন্দোজালে বাঁধে যার ছবি
না-পাওয়া বেদনা দিয়ে কবি।
যার ছায়া সুরে খেলা করে
চঞ্চল দিঘির জলে আলোর মতন থরথরে।
'নিশ্চিত পেয়েছি' ভেবে যারে
অবুঝ আঁকড়ি রাখে আপন ভোগের অধিকারে,

মাটির পাত্রটা নিয়ে বঞ্চিত সে অমৃতের স্বাদে,
ডুবায় সে ক্লান্তি-অবসাদে
সোনার প্রদীপ শিখা-নেভা।
দূর হতে অধরাকে পায় যে বা
চরিতার্থ করে সে'ই কাছের পাওয়ারে,
পূর্ণ করে তারে।

নারীস্তব শুনালেম। ছিল মনে আশা—
উচ্চতত্ত্বে-ভরা এই ভাষা
উৎসাহিত করে দেবে মন ললিতার,
পাব পুরস্কার।
হায় রে, দুর্গ্রহগুণে
কাব্য শুনে
ঝক্‌ঝকে হাসিখানি হেসে
কহিল সে, "তোমার এ কবিত্বের শেষে
বসিয়েছ মহোন্নত যে-কটা লাইন
আগাগোড়া সত্যহীন।
ওরা সব-কটা
বানানো কথার ঘটা,
সদরেতে যত বড়ো অন্দরেতে ততখানি ফাঁকি।
জানি না কি—
দূর হতে নিরামিষ সাত্ত্বিক মৃগয়া,
নাই পুরুষের হাড়ে অমায়িক বিশুদ্ধ এ দয়া।"
আমি শুধালেম, "আর, তোমাদের?"
সে কহিল, "আমাদের চারিদিকে শক্ত আছে ঘের
পরশ-বাঁচানো,
সে তুমি নিশ্চিত জান।"
আমি শুধালেম, "তার মানে?"
সে কহিল, "আমরা পুষি না মোহ প্রাণে,

কেবল বিশুদ্ধ ভালোবাসি।"
কহিলাম হাসি,
"আমি যাহা বলেছিনু সে-কথাটা মস্ত বড়ো বটে,
কিন্তু তবু লাগে না সে তোমার এ স্পর্ধার নিকটে।
মোহ কি কিছুই নেই রমণীর প্রেমে।"
সে কহিল একটুকু থেমে,
"নেই বলিলেই হয়। এ কথা নিশ্চিত—
জোর করে বলিবই—
আমরা কাঙাল কভু নই।"
আমি কহিলাম, "ভদ্রে, তা হলে তো পুরুষের জিত।"
"কেন শুনি"
মাথাটা ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলিল তরুণী।
আমি কহিলাম, "যদি প্রেম হয় অমৃতকলস,
মোহ তবে রসনার রস।
সে সুধার পূর্ণ স্বাদ থেকে
মোহহীন রমণীরে প্রবঞ্চিত বলো করেছে কে।
আনন্দিত হই দেখে তোমার লাবণ্যভরা কায়া,
তাহার তো বারো-আনা আমারি অন্তরবাসী মায়া।
প্রেম আর মোহে
একেবারে বিরুদ্ধ কি দোঁহে।
আকাশের আলো
বিপরীতে-ভাগ-করা সে কি সাদা কালো।
ওই আলো আপনার পূর্ণতারে চূর্ণ করে
দিকে দিগন্তরে,
বর্ণে বর্ণে
তৃণে শস্যে পুষ্পে পর্ণে,
পাখির পাখায় আর আকাশের নীলে,
চোখ ভোলাবার মোহ মেলে দেয় সর্বত্র নিখিলে।
অভাব যেখানে এই মন-ভোলাবার
সেইখানে সৃষ্টিকর্তা বিধাতার হার।

এমন লজ্জার কথা বলিতেও নাই—
তোমরা ভোল না শুধু ভুলি আমরাই।
এই কথা স্পষ্ট দিনু করে,
সৃষ্টি কভু নাহি ঘটে একেবারে বিশুদ্ধেরে লয়ে।
পূর্ণতা আপন কেন্দ্রে স্তব্ধ হয়ে থাকে,
কারেও কোথাও নাহি ডাকে।
অপূর্ণের সাথে দ্বন্দ্বে চাঞ্চল্যের শক্তি দেয় তারে,
রসে রূপে বিচিত্র আকারে।
এরে নাম দিয়ে মোহ
যে করে বিদ্রোহ
এড়ায়ে নদীর টান সে চাহে নদীরে,
পড়ে থাকে তীরে।
পুরুষ যে ভাবের বিলাসী,
মোহতরী বেয়ে তাই সুধাসাগরের প্রান্তে আসি
আভাসে দেখিতে পায় পরপারে অরূপের মায়া
অসীমের ছায়া।
অমৃতের পাত্র তার ভরে ওঠে কানায় কানায়
স্বল্প জানা ভূরি অজানায়।"

কোনো কথা নাহি ব'লে
সুন্দরী ফিরায়ে মুখ দ্রুত গেল চলে।
পরদিন বটের পাতায়
গুটিকত সদ্যফোটা বেলফুল রেখে গেল পায়।
বলে গেল, "ক্ষমা করো, অবুঝের মতো
মিছেমিছি বকেছিনু কত।"

ঢেলা আমি মেরেছিনু চৈত্রে-ফোটা কাঞ্চনের ডালে,
তারি প্রতিবাদে ফুল ঝরিল এ স্পর্ধিত কপালে।
নিয়ে এই বিবাদের দান
এ বসন্তে চৈত্র মোর হল অবসান।

[এপ্রিল, ১৯৩৯]

ময়ূরের দৃষ্টি

দক্ষিণায়নের সূর্যোদয় আড়াল ক'রে
সকালে বসি চাতালে।
অনুকূল অবকাশ ;
তখনো নিরেট হয়ে ওঠে নি কাজের দাবি,
ঝুঁকে পড়ে নি লোকের ভিড়
পায়ে পায়ে সময় দলিত করে দিয়ে।
লিখতে বসি,
কাটা খেজুরের গুঁড়ির মতো
ছুটির সকাল কলমের ডগায় চুঁইয়ে দেয় কিছু রস।

আমাদের ময়ূর এসে পুচ্ছ নামিয়ে বসে
পাশের রেলিংটির উপর।
আমার এই আশ্রয় তার কাছে নিরাপদ,
এখানে আসে না তার বেদরদী শাসনকর্তা বাঁধন হাতে।
বাইরে ডালে ডালে কাঁচা আম পড়েছে ঝুলে,
নেবু ধরেছে নেবুর গাছে,
একটা একলা কুড়চিগাছ
আপনি আশ্চর্য আপন ফুলের বাড়াবাড়িতে।
প্রাণের নিরর্থক চাঞ্চল্যে
ময়ূরটি ঘাড় বাঁকায় এদিকে ওদিকে।
তার উদাসীন দৃষ্টি
কিছুমাত্র খেয়াল করে না আমার খাতা-লেখায় ;
করত, যদি অক্ষরগুলো হত পোকা ;
তাহলে নগণ্য মনে করত না কবিকে।
হাসি পেল ওর ঐ গম্ভীর উপেক্ষায়,
ওরই দৃষ্টি দিয়ে দেখলুম আমার এই রচনা।
দেখলুম, ময়ূরের চোখের ঔদাসীন্য

সমস্ত নীল আকাশে,
কাঁচা-আম-ঝোলা গাছের পাতায় পাতায়,
তেঁতুলগাছের গুঞ্জনমুখর মৌচাকে।
ভাবলুম, মাহেন্দজারোতে
এইরকম চৈত্রশেষের অকেজো সকালে
কবি লিখেছিল কবিতা,
বিশ্বপ্রকৃতি তার কোনোই হিসাব রাখে নি।
কিন্তু, ময়ূর আজও আছে প্রাণের দেনাপাওনায়,
কাঁচা আম ঝুলে পড়েছে ডালে।
নীল আকাশ থেকে শুরু করে সবুজ পৃথিবী পর্যন্ত
কোথাও ওদের দাম যাবে না কমে।
আর, মাহেন্দজারোর কবিকে গ্রাহ্যই করলে না
পথের ধারের তৃণ, আঁধার রাত্রের জোনাকি।

•

নিরবধি কাল আর বিপুলা পৃথিবীতে
মেলে দিলাম চেতনাকে,
টেনে নিলেম প্রকৃতির ধ্যান থেকে বৃহৎ বৈরাগ্য
আপন মনে;
খাতার অক্ষরগুলোকে দেখলুম
মহাকালের দেয়ালিতে
পোকার ঝাঁকের মতো।
ভাবলুম, আজ যদি ছিঁড়ে ফেলি পাতাগুলো
তাহলে পশুদিনের অভ্যাসংকার এগিয়ে রাখব মাত্র।

এমনসময় আওয়াজ এল কানে,
"দাদামশায়, কিছু লিখেছ না কি।"
ঐ এসেছে— ময়ূর না,
ঘরে যার নাম সুনয়নী,
আমি যাকে ডাকি শুনায়নী ব'লে।
ওকে আমার কবিতা শোনাবার দাবি সকলের আগে।

আমি বললেম, "সুরসিকে, খুশি হবে না,
এ গদ্যকাব্য।"
কপালে ভ্রূকুঞ্চনের ঢেউ খেলিয়ে
বললে, "আচ্ছা, তাই সই।"
সঙ্গে একটু স্তুতিবাক্য দিলে মিলিয়ে ;
বললে, "তোমার কণ্ঠস্বরে
গদ্যে রঙ ধরে পদ্যের।"
ব'লে গলা ধরলে জড়িয়ে।
আমি বললেম, "কবিত্বের রঙ লাগিয়ে নিচ্ছ
কবিকণ্ঠ থেকে তোমার বাহুতে ?"
সে বললে, "অকবির মতো হল তোমার কথাটা ;
কবিত্বের স্পর্শ লাগিয়ে দিলেম তোমারই কণ্ঠে,
হয়তো জাগিয়ে দিলেম গান।"

শুনলুম নীরবে, খুশি হলুম নিরুত্তরে।
মনে-মনে বললুম, প্রকৃতির ঔদাসীন্য অচল রয়েছে
অসংখ্য বর্ষকালের চূড়ায়,
তারই উপরে একবারমাত্র পা ফেলে চলে যাবে
আমার শুনায়নী,
ভোরবেলার শুকতারা।
সেই ক্ষণিকের কাছে হার মানবে বিরাটকালের বৈরাগ্য

মাহেন্দজারোর কবি, তোমার সন্ধ্যাতারা
অস্তাচল পেরিয়ে
আজ উঠেছে আমার জীবনের
উদয়াচলশিখরে।

[? শান্তিনিকেতন
এপ্রিল, ১৯৩৯]

কাঁচা আম

তিনটে কাঁচা আম পড়ে ছিল গাছতলায়
চৈত্রমাসের সকালে মৃদু রোদ্দুরে।
যখন দেখলুম অস্থির ব্যগ্রতায়
হাত গেল না কুড়িয়ে নিতে।
তখন চা খেতে খেতে মনে ভাবলুম,
বদল হয়েছে পালের হাওয়া।
পুবদিকের খেয়ার ঘাট ঝাপসা হয়ে এল।
সেদিন গেছে যেদিন দৈবে-পাওয়া দুটি একটি কাঁচা আম
ছিল আমার সোনার চাবি,
খুলে দিত সমস্ত দিনের খুশির গোপন কুঠুরি;
আজ সে তালা নেই, চাবিও লাগে না

গোড়াকার কথাটা বলি।
আমার বয়সে এ বাড়িতে যেদিন প্রথম আসছে বউ
পরের ঘর থেকে,
সেদিন যে-মনটা ছিল নোঙর-ফেলা নৌকো
বান ডেকে তাকে দিলে তোলপাড় ক'রে।
জীবনের বাঁধা বরাদ্দ ছাপিয়ে দিয়ে
এল অদৃষ্টের বদান্যতা।
পুরোনো ছেঁড়া আটপৌরে দিনরাত্রিগুলো
খসে পড়ল সমস্ত বাড়িটা থেকে।
কদিন তিনবেলা রোশনচৌকিতে
চারদিকের প্রাত্যহিক ভাষা দিল বদলিয়ে;
ঘরে ঘরে চলল আলোর গোলমাল
ঝাড়ে লণ্ঠনে।
অত্যন্ত পরিচিতের মাঝখানে
ফুটে উঠল অত্যন্ত আশ্চর্য।

কে এল রঙিন সাজে সজ্জায়,
আলতা-পরা পায়ে পায়ে—
ইঙ্গিত করল যে, সে এই সংসারের পরিমিত দামের মানুষ নয়—
সেদিন সে ছিল একলা অতুলনীয়।
বালকের দৃষ্টিতে এই প্রথম প্রকাশ পেল—
জগতে এমন কিছু যাকে দেখা যায় কিন্তু জানা যায় না।
বাঁশি থামল, বাণী থামল না—
আমাদের বধূ রইল
বিস্ময়ের অদৃশ্য রশ্মি দিয়ে ঘেরা।

তার ভাব, তার আড়ি, তার খেলাধুলো ননদের সঙ্গে।
অনেক সংকোচে মনে একটু কাছে যেতে চাই,
তার ডুরে শাড়িটি মনে ঘুরিয়ে দেয় আবর্ত ;
কিন্তু, ভ্রূকুটিতে বুঝতে দেরি হয় না, আমি ছেলেমানুষ,
আমি মেয়ে নই, আমি অন্য জাতের।
তার বয়স আমার চেয়ে দুই-এক মাসের
বড়োই হবে বা ছোটোই হবে।
তা হোক, কিন্তু এ কথা মানি,
আমরা ভিন্ন মসলায় তৈরি।
মন একান্তই চাইত, ওকে কিছু একটা দিয়ে
সাঁকো বানিয়ে নিতে।
একদিন এই হতভাগা কোথা থেকে পেল
কতকগুলো রঙিন পুঁথি ;
ভাবলে, চমক লাগিয়ে দেবে।
হেসে উঠল সে ; বলল,
"এগুলো নিয়ে করব কী।"
ইতিহাসের উপেক্ষিত এই-সব ট্র্যাজেডি
কোথাও দরদ পায় না,
লজ্জার ভারে বালকের সমস্ত দিনরাত্রির
দেয় মাথা হেঁট ক'রে।

কোন্ বিচারক বিচার করবে যে, মূল্য আছে
সেই পুঁথিগুলোর।

তবু এরই মধ্যে দেখা গেল, শস্তা খাজনা চলে
এমন দাবিও আছে ঐ উচ্চাসনার—
সেখানে ওর পিঁড়ে পাতা মাটির কাছে।
ও ভালোবাসে কাঁচা আম খেতে
শুল্পো শাক আর লঙ্কা দিয়ে মিশিয়ে।
প্রসাদলাভের একটি ছোট্ট দরজা খোলা আছে
আমার মতো ছেলে আর ছেলেমানুষের জন্যেও।

গাছে চড়তে ছিল কড়া নিষেধ।
হাওয়া দিলেই ছুটে যেতুম বাগানে,
দৈবে যদি পাওয়া যেত একটিমাত্র ফল
একটুখানি দুর্লভতার আড়াল থেকে,
দেখতুম, সে কী শ্যামল, কী নিটোল, কী সুন্দর,
প্রকৃতির সে কী আশ্চর্য দান।
যে লোভী চিরে চিরে ওকে খায়
সে দেখতে পায় নি ওর অপরূপ রূপ।

একদিন শিলবৃষ্টির মধ্যে আম কুড়িয়ে এনেছিলুম ;
ও বলল, "কে বলেছে তোমাকে আনতে।"
আমি বললুম, "কেউ না।"
ঝুড়িসুদ্ধ মাটিতে ফেলে চলে গেলুম।
আর-একদিন মৌমাছিতে আমাকে দিলে কামড়ে ;
সে বললে, "এমন ক'রে ফল আনতে হবে না।"
চুপ করে রইলুম।

বয়স বেড়ে গেল।
একদিন সোনার আংটি পেয়েছিলুম ওর কাছ থেকে ;

তাতে স্মরণীয় কিছু লেখাও ছিল।
স্নান করতে সেটা পড়ে গেল গঙ্গার জলে—
খুঁজে পাই নি।
এখনো কাঁচা আম পড়ছে খসে খসে
গাছের তলায়, বছরের পর বছর।
ওকে আর খুঁজে পাবার পথ নেই

[? শান্তিনিকেতন]
৮।৪।৩৯

নাটক ও প্রহসন

চণ্ডালিকা

ভূমিকা

রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্যে শার্দূলকর্ণাবদানের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তাই থেকে এই নাটিকার গল্পটি গৃহীত।

গল্পের ঘটনাস্থল শ্রাবস্তী। প্রভু বুদ্ধ তখন অনাথপিণ্ডদের উদ্যানে প্রবাস যাপন করছেন। তাঁর প্রিয় শিষ্য আনন্দ একদিন এক গৃহস্থের বাড়িতে আহার শেষ করে বিহারে ফেরবার সময় তৃষ্ণা বোধ করলেন। দেখতে পেলেন, এক চণ্ডালের কন্যা, নাম প্রকৃতি, কুয়ো থেকে জল তুলছে। তার কাছ থেকে জল চাইলেন, সে দিল। তাঁর রূপ দেখে মেয়েটি মুগ্ধ হল। তাঁকে পাবার অন্য কোনো উপায় না দেখে মায়ের কাছে সাহায্য চাইলে। মা তার জাদুবিদ্যা জানত। মা আঙিনায় গোবর লেপে একটি বেদী প্রস্তুত করে সেখানে আগুন জ্বালল এবং মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে একে একে ১০৮টি অর্কফুল সেই আগুনে ফেললে। আনন্দ এই জাদুর শক্তি রোধ করতে পারলেন না। রাত্রে তার বাড়িতে এসে উপস্থিত। তিনি বেদীর উপর আসন গ্রহণ করলে প্রকৃতি তাঁর জন্য বিছানা পাততে লাগল। আনন্দের মনে তখন পরিতাপ উপস্থিত হল। পরিত্রাণের জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

ভগবান বুদ্ধ তাঁর অলৌকিক শক্তিতে শিষ্যের অবস্থা জেনে একটি বৌদ্ধমন্ত্র আবৃত্তি করলেন। সেই মন্ত্রের জোরে চণ্ডালীর বশীকরণবিদ্যা দুর্বল হয়ে গেল এবং আনন্দ মঠে ফিরে এলেন।

চণ্ডালিকা

প্রথম দৃশ্য

মা। প্রকৃতি, ও প্রকৃতি! গেল কোথায়! কী জানি কী হল মেয়েটার। ঘরে দেখতেই পাই নে।

প্রকৃতি। এই-যে, মা, এখানেই আছি।

মা। কোথায়!

প্রকৃতি। এই-যে কুয়োতলায়।

মা। আশ্চর্য করলি তুই। বেলা গেল দুপুর পেরিয়ে, কাঠফাটা রোদ, মাটি উঠেছে তেতে, পা ফেলা যায় না। ঘরের জল কোন্ সকালে তোলা হয়ে গেছে। পাড়ার মেয়েরা সবাই জল নিয়ে গেল ঘরে। ঐ দেখ্, ঠোঁট মেলে গরমে কাক ধুঁকছে আমলকিগাছের ডালে। তুই এই বৈশেখের রোদ পোয়াচ্ছিস বিনি কাজে। পুরাণ-কথা শুনেছি, উমা তপ করেছিলেন ঘর ছেড়ে বাইরে, রোদে পুড়ে; তোর কি তাই হল।

প্রকৃতি। হাঁ, মা, তপ করছি তো বটে।

মা। অবাক করলে! কার জন্যে।

প্রকৃতি। যে আমাকে ডাক দিয়েছে।

গান

যে আমারে দিয়েছে ডাক, দিয়েছে ডাক,
বচনহারা আমাকে যে দিয়েছে বাক্।
যে আমারি নাম জেনেছে ওগো তারি
নামখানি মোর হৃদয়ে থাক্॥

মা। কিসের ডাক।

প্রকৃতি। আমার মনের মধ্যে বাজিয়ে দিয়ে গেছে 'জল দাও'।

মা। পোড়া কপাল! তোকে বলেছে 'জল দাও'! কে শুনি। তোর আপন জাতের কেউ?

প্রকৃতি। তাই তো বললেন, তিনি আমার আপন জাতেরই।

মা। জাত লুকোস নি? বলেছিলি যে তুই চণ্ডালিনী?

প্রকৃতি। বলেছিলেম। তিনি বললেন, মিথ্যে কথা। তিনি বললেন, শ্রাবণের কালো মেঘকে চণ্ডাল নাম দিলেই বা কী, তাতে তার জাত বদলায় না, তার জলের ঘোচে না গুণ। তিনি বললেন, নিন্দে কোরো না নিজেকে। আত্মনিন্দা পাপ, আত্মহত্যার চেয়ে বেশি।

মা। তোর মুখে এ-সব কী শুনছি। তোর কি মনে পড়েছে পূর্বজন্মের কোনো কাহিনী।

প্রকৃতি। এ কাহিনী আমার নতুন জন্মের।

মা। হাসালি তুই। নতুন জন্ম! ঘটল কবে।

প্রকৃতি। সেদিন রাজবাড়িতে বাজল বেলা-দুপুরের ঘণ্টা, ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর। মা-মরা বাছুরটাকে নাওয়াচ্ছিলুম কুয়োর জলে। কখন সামনে দাঁড়ালেন বৌদ্ধ ভিক্ষু, পীত বসন তাঁর। বললেন, জল দাও। প্রাণটা উঠল চমকে, শিউরে উঠে প্রণাম করলেম দূর থেকে। ভোর বেলাকার আলো দিয়ে তৈরি তাঁর রূপ। বললেম, আমি চণ্ডালের মেয়ে, কুয়োর জল অশুদ্ধ। তিনি বললেন, যে-মানুষ আমি তুমিও সেই মানুষ; সব জলই তীর্থজল যা তাপিতকে স্নিগ্ধ করে, তৃপ্ত করে তৃষিতকে। প্রথম শুনলুম এমন কথা, প্রথম দিলুম এক গণ্ডুষ জল, যাঁর পায়ের ধুলোর এক কণা নিতে কেঁপে উঠত বুক।

মা। ওরে অবোধ মেয়ে, হঠাৎ এতবড়ো হল তোর বুকের পাটা! এ পাগলামির প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। জানিস নে কোন্ কুলে তোর জন্ম?

প্রকৃতি। কেবল একটি গণ্ডুষ জল নিলেন আমার হাত থেকে, অগাধ অসীম হল সেই জল। সাত সমুদ্র এক হয়ে গেল সেই জলে, ডুবে গেল আমার কুল, ধুয়ে গেল আমার জন্ম।

মা। তোর মুখের কথা সুদ্ধু বদলে গেছে যে! জাদু করেছে তোর কথাকে। কী বলিস নিজে বুঝতে পারিস কিছু?

প্রকৃতি। সমস্ত শ্রাবস্তীনগরে আর কি কোথাও জল ছিল না, মা। এলেন কেন এই কুয়োরই ধারে। একেই তো বলি নতুন জন্মের পালা। আমাকে দান করতে এলেন মানুষের তৃষ্ণা মেটাবার শিরোপা। এই মহাপুণ্যই খুঁজছিলেন। যে-জলে ব্রত হল পূর্ণ সে জল তো আর কোথাও পেতেন না, কোনো তীর্থেই না। তিনি বললেন, বনবাসের গোড়াতেই জানকী এই জলেই স্নান করেছিলেন, সে-জল তুলে এনেছিল

গুহক চণ্ডাল। সেই অবধি নেচে উঠছে আমার মন, গভীর কণ্ঠে শুনতে পাচ্ছি দিনরাত— দাও জল, দাও জল।

গান

বলে দাও জল, দাও জল!
দেব আমি, কে দিয়েছে হেন সম্বল।
কালো মেঘ-পানে চেয়ে
এল ধেয়ে
চাতক বিহ্বল—
দাও জল, দাও জল।

ভূমিতলে হারা
উৎসের ধারা
অন্ধকারে
কারাগারে।
কার সুগভীর বাণী
দিল হানি
কালো শিলাতল—
দাও জল, দাও জল॥

মা। কী জানি, বাছা, ভালো ঠেকছে না। ওদের মন্তরের খেলা আমি বুঝি নে। আজ তোর কথা চিনছি নে, কাল তোর মুখ চিনতেই পারব না। ওদের এ যে প্রাণ-বদলানো মন্তর।

প্রকৃতি। চিনতে পার নি এতদিন। যিনি চিনেছেন তিনি চেনাবেন। তাই আছি তাকিয়ে। রাজদুয়ারে দুপুরের ঘণ্টা বাজে, মেয়েরা জল নিয়ে যায় ঘরে, শঙ্খচিল একলা ওড়ে দূর আকাশে, আমার ঘট নিয়ে এসে বসি কুয়োতলায় পথের ধারে।

মা। কার জন্যে।

প্রকৃতি। পথিকের জন্যে।

মা। তোর কাছে কোন্ পথিক আসবে, পাগলি!

প্রকৃতি। সেই এক পথিক, মা, সেই এক পথিক। তাঁর মধ্যে আছে বিশ্বের সকল পথের সব পথিক। দিনের পর দিন চলে যায়, এলেন না তো। কোনো কথা

না ব'লে তবু কথা দিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু রাখলেন না কেন কথা। আমার মন যে হল মরুভূমির মতো; ধু ধু করে সমস্ত দিন, হু হু করে তপ্ত হাওয়া, সে যে পারছে না জল দিতে। কেউ এসে চাইলে না।

গান

চক্ষে আমার তৃষ্ণা, ওগো
তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে।
আমি বৃষ্টিবিহীন বৈশাখী দিন,
সন্তাপে প্রাণ যায় যে পুড়ে।
ঝড় উঠেছে তপ্ত হাওয়ায়,
মনকে সুদূর শূন্যে ধাওয়ায়,
অবগুণ্ঠন যায় যে উড়ে।
যে-ফুল কানন করত আলো
কালো হয়ে সে শুকাল।
ঝরনারে কে দিল বাধা—
তাপের প্রতাপে বাঁধা
দুঃখের শিখরচূড়ে॥

মা। তোর আজকেকার কথা কিছু বুঝতে পারছি নে, তোকে কী নেশা লেগেছে কী জানি। কী চাস, আমাকে সাদা ক'রে বল্।

প্রকৃতি। আমি চাই তাঁকে। তিনি আচমকা এসে আমাকে জানিয়ে গেলেন, আমার সেবাও চলবে বিধাতার সংসারে, এতবড়ো আশ্চর্য কথা! সেবিকা আমি, এই কথাটি নিন তুলে ধুলোর থেকে তাঁর বুকের কাছে, এই ধুতরো ফুলটাকে।

মা। মনে রাখিস, প্রকৃতি, ওদের কথা কানেই শোনবার, কাজে খাটাবার নয়। অদৃষ্টদোষে যে-কুলে জন্মেছিস তার কাদার বেড়া ভাঙতে পারে এমন লোহার খোন্তাও নেই কোনোখানে। অশুচি তুই, তোর অশুচি হাওয়া ছড়িয়ে বেড়াস নে বাইরে, যেখানে আছিস সেইখানটুকুতেই থাক্ সাবধানে। এই জায়গাটুকুর বাইরে সর্বত্রই তোর অপরাধ।

প্রকৃতি। গান

ফুল বলে, ধন্য আমি মাটির 'পরে,
দেবতা ওগো, তোমার সেবা আমার ঘরে।

জন্ম নিয়েছি ধূলিতে
দয়া করে দাও ভুলিতে,
নাই ধূলি মোর অন্তরে।
নয়ন তোমার নত করো,
দলগুলি কাঁপে থরো থরো।
চরণপরশ দিয়ো দিয়ো,
ধূলির ধনকে করো স্বর্গীয়,
ধরার প্রণাম আমি
তোমার তরে।

মা। বাছা, কিছু কিছু বুঝতে পারি তোর কথা। তুই মেয়েমানুষ, সেবাতেই তোর পুজো, সেবাতেই তোর রাজত্ব। এক নিমিষে জাত ডিঙিয়ে যেতে পারে মেয়েরাই; ধরা পড়ে, সবাই তারা রাজরানীর অংশ, যদি হঠাৎ স'রে পড়ে ভাগ্যের পর্দাটা। সুযোগ তোর তো ঘটেছিল। মৃগয়ায় বেরিয়ে রাজার ছেলে এসেছিল তোরই এই কুয়োতলায়। মনে পড়ে তো?

প্রকৃতি। হাঁ, মনে পড়ে।

মা। কেন গেলি নে রাজার ঘরে। রূপ দেখে সে তো ভুলেছিল।

প্রকৃতি। ভুলেছিল না তো কী। ভুলেইছিল যে, আমি মানুষ। পশু মারতে বেরিয়েছিল; চোখে ঠেকে পশুকেই, তাকেই চায় বাঁধতে সোনার শিকলে।

মা। তবু তো শিকার বলেও ঐ মুখ লক্ষ্য করেছিল সে। আর, ভিক্ষু, সে কি নারী বলে চিনেছে তোমাকে।

প্রকৃতি। বুঝবে না তুমি বুঝবে না। আমি বুঝেছি, এতদিন পরে সে'ই আমাকে প্রথম চিনেছে। সে বড়ো আশ্চর্য।

গান

ওগো, তোমার চক্ষু দিয়ে মেলে সত্যদৃষ্টি
আমার সত্যরূপ প্রথম করেছ সৃষ্টি।
তোমায় প্রণাম, তোমায় প্রণাম,
তোমায় প্রণাম শতবার।
আমি তরুণ অরুণলেখা,
আমি বিমল জ্যোতির রেখা,

আমি নবীন শ্যামল মেঘে
প্রথম প্রসাদবৃষ্টি।
তোমায় প্রণাম, তোমায় প্রণাম,
তোমায় প্রণাম শতবার॥

তাঁকে চাই, মা। নিতান্তই চাই। তাঁর সামনে সাজিয়ে ধরতে চাই আমার এ জন্মের পূজার ডালি। অশুচি হবে না তাতে তাঁর চরণ। দেখুক সবাই আমার স্পর্ধা। গৌরব ক'রে বলতে চাই, আমি তোমার সেবিকা, নইলে সংসারে সবারই পায়ের কাছে চিরদিন বাঁধা পড়ে থাকতে হবে দাসী হয়ে।

মা। মিছে রাগ করিস কেন, বাছা। দাসীজন্মই যে তোর। বিধাতার লিখন খণ্ডাবে কে।

প্রকৃতি। ছি ছি, মা, আবার তোকে বলছি, ভুলিস নে, মিথ্যে নিন্দে রটাস নে নিজের— পাপ সে পাপ! রাজার বংশে কত দাসী জন্মায় ঘরে ঘরে, আমি দাসী নই। ব্রাহ্মণের ঘরে কত চণ্ডাল জন্মায় দেশে দেশে, আমি নই চণ্ডাল।

মা। তোর সঙ্গে কথা কইতে পারি এমন কথা আমি জানি নে। তা ভালো, আমি নিজে যাব তাঁর কাছে। পায়ে ধ'রে বলব, তুমি অন্ন নিয়ে থাক সব ঘর থেকেই, আমার ঘরে কেবল এক গণ্ডূষ জল নিতে এসো।

প্রকৃতি। গান

না না, ডাকব না, ডাকব না অমন করে বাইরে থেকে।
পারি যদি অন্তরে তার ডাক পাঠাব, আনব ডেকে।
দেবার ব্যথা বাজে আমার বুকের তলে,
নেবার মানুষ জানি নে তো কোথায় চলে,
এই দেওয়া-নেওয়ার মিলন আমার ঘটাবে কে।
মিলবে না কি মোর বেদনা তার বেদনাতে
গঙ্গাধারা মিশবে না কি কালো যমুনাতে।
আপনি কী সুর উঠল বেজে
আপনা হতে এসেছে যে,
গেল যখন আশার বচন গেছে রেখে॥

পৃথিবী যখন অনাবৃষ্টিতে ফেটে চৌচির, কী হবে, মা, এক-ঘটি জল সংগ্রহ করে। আপনি আসবে না মেঘ আপন টানে, আকাশ ভরে দিয়ে?

মা। এ-সব কথা বলে লাভ কী। মেঘ আপনি আসে তো আসে, না আসে তো আসেই না। খেত-খন্দ যদি শুকিয়ে যায় তাতে কার কিসের গরজ। আমরা আকাশে তাকিয়ে থাকি, আর কী করতে পারি।

প্রকৃতি। সে হবে না। তাকিয়ে বসে থাকব না, মন্তর জানিস তুই, সেই মন্তর হোক আমার বাহুবন্ধন, আনুক তাঁকে টেনে।

মা। ওরে সর্বনাশী, বলিস কী! সাহস কেবলই বাড়ছে দেখি! আগুন নিয়ে খেলা! এরা কি সাধারণ মানুষ! মন্তর খাটাব এদের 'পরে? শুনে বুক কেঁপে ওঠে।

প্রকৃতি। রাজার ছেলের বেলায় মন্তর পড়তে চেয়েছিলি কোন্ সাহসে।

মা। ভয় করি নে রাজাকে, সে শূলে চড়াতে পারে। কিন্তু এরা যে কিছুই করে না।

প্রকৃতি। আমি আর কোনো ভয় করি নে; ভয় করি, আবার যাব নেমে, আবার আপনাকে ভুলব, আবার ঢুকব আঁধার কোঠায়। সে যে মরণের বাড়া। আনতেই হবে তাঁকে, এতবড়ো কথা এত জোর করে বলছি, এ কি আশ্চর্য নয়— এই আশ্চর্যই তো ঘটিয়েছে সে। আরো আশ্চর্য কি ঘটবে না, আসবে না কি আমার পাশে। আমারি আধো আঁচলে বসবে না?

মা। তাঁকে আনতে পারি হয়তো, তুই তার মূল্য দিতে পারবি? তোর কিচ্ছুই থাকবে না বাকি!

প্রকৃতি। না, কিছুই থাকবে না। আমার জন্মজন্মান্তরের সেই দায়, কিচ্ছুই থাকবে না, একেবারে সমস্তই মিটিয়ে দিতে পারলেই বেঁচে যাব। তাই তো চাই তাঁকে। কিচ্ছু থাকবে না আমার। আমার যুগযুগের অপেক্ষা করে থাকা এই জন্যেই সার্থক হবে, মন কেবলই তাই বলছে। সার্থক হবে। সেইজন্যেই তো শুনলুম এমন আশ্চর্য কথা— জল দাও। আজ জেনেছি, আমিও পারি দিতে। এই কথা সবাই আমাকে ভুলিয়ে রেখেছিল। দেব, দেব, আজ আমার সব কিছু দেব বলেই বসে আছি তাঁর পথ চেয়ে।

মা। তুই ধর্ম মানিস নে?

প্রকৃতি। কী করে বলব! তাঁকেই মানি যিনি আমাকে মানেন। যে-ধর্ম অপমান করে সে ধর্ম মিথ্যে। অন্ধ ক'রে, মুখ বন্ধ ক'রে সবাই মিলে সেই ধর্ম আমাকে মানিয়েছে। কিন্তু, সেদিন থেকে এই ধর্ম মানা আমার বারণ। কোনো ভয় আর নেই আমার— পড়্ তোর মন্তর, ভিক্ষুকে নিয়ে আয় চণ্ডালের মেয়ের পাশে। আমিই দেব তাঁকে সম্মান। এতবড়ো সম্মান আর কেউ দিতে পারবে না।

গান

আমি তারেই জানি তারেই জানি
আমায় যে জন আপন জানে—
তারি দানে দাবি আমার
যার অধিকার আমার দানে।
যে আমারে চিনতে পারে
সেই চেনাতেই চিনি তারে,
একই আলো চেনার পথে
তার প্রাণে আর আমার প্রাণে
আপন মনের অন্ধকারে ঢাকল যারা
আমি তাদের মধ্যে আপনহারা।
ছুঁইয়ে দিল সোনার কাঠি,
ঘুমের ঢাকা গেল ফাটি,
নয়ন আমার ছুটেছে তার
আলো-করা মুখের পানে॥

মা। শাপ লাগার ভয় করিস নে তুই ?

প্রকৃতি। শাপ তো লেগেই আছে জন্মকাল থেকে। এক শাপের বিষে আর-এক শাপের বিষ ক্ষয় হয়ে যায়। কোনো কথাই শুনব না, মা, শুনব না, শুনব না। শুরু করে দে মন্ত্র। পারব না দেরি সইতে।

মা। আচ্ছা, তা হলে কী নাম তাঁর বল্।

প্রকৃতি। তাঁর নাম আনন্দ।

মা। আনন্দ ? ভগবান বুদ্ধের শিষ্য ?

প্রকৃতি। হাঁ, সেই ভিক্ষু।

মা। তুই আমার বুক-চেরা ধন, আমার চোখের মণি— তোর কথাতেই এতবড়ো পাপে হাত দিচ্ছি।

প্রকৃতি। কিসের পাপ! যিনি সবাইকে কাছে আনেন তাঁকে কাছে আনব, তাতে দোষ হয়েছে কী।

মা। ওঁরা পুণ্যের জোরে টেনে আনেন মানুষকে। আমরা মন্তর পড়ে টানি, পশুকে টানে যে-ফাঁসে। আমরা মথন করে তুলি পাঁক।

প্রকৃতি। ভালোই সে ভালোই, নইলে পঙ্কোদ্ধার হয় না।

মা। ওগো, তুমি মহাপুরুষ, অপরাধ করবার শক্তি আমার যত, ক্ষমা করবার শক্তি তোমার তার চেয়ে অনেক বেশি। প্রভু, অসম্মান করতে বসেছি, তবু প্রণাম গ্রহণ করো।

প্রকৃতি। কিসের ভয় তোমার, মা! মন্ত্র আমিই পড়ছি মায়ের মুখ দিয়ে। আমার বেদনা যদি আনে তাঁকে টেনে, আর তাই যদি হয় অপরাধ, তবে করবই অপরাধ, করবই। যে-বিধানে কেবল শাস্তিই আছে, সান্ত্বনা নেই, মানব না সে বিধানকে।

গান

দোষী করো, দোষী করো।
ধুলায়-পড়া ম্লান কুসুম
পায়ের তলায় ধরো।
অপরাধে-ভরা ডালি
নিজ হাতে করো খালি,
তারপরে সেই শূন্য ডালায়
তোমার করুণা ভরো।
তুমি উচ্চ, আমি তুচ্ছ—
ধরব তোমায় ফাঁদে
আমার অপরাধে।
আমার দোষকে তোমার পুণ্য
করবে তো কলঙ্কশূন্য,
ক্ষমায় গেঁথে সকল ত্রুটি
গলায় তোমার পরো।

মা। আচ্ছা সাহস তোর প্রকৃতি!

প্রকৃতি। আমার সাহস! ভেবে দেখ্‌ তাঁর সাহসের জোর! কেউ যে-কথা আমার কাছে বলতে পারে নি তিনি সহজেই বললেন, জল দাও। ঐটুকু বাণী, তার তেজ কত— আলো ক'রে দিলে আমার সমস্ত জন্ম; বুকের উপরে কালো পাথরটা চিরকাল চাপা ছিল, দিলে সেটাকে ঠেলে, উছলে উঠল রসের ধারা। মিথ্যে তোর ভয়, তুই যে তাঁকে দেখিস নি। সমস্ত সকাল বেলা ভিক্ষা শেষ করলেন শ্রাবস্তীনগরে; এলেন মাঠ পেরিয়ে শ্মশান পেরিয়ে, নদীর তীর বেয়ে, প্রখর রৌদ্র মাথায় করে। কিসের জন্যে। আমার মতো মেয়েকেও কেবল ঐ একটি কথা বলবার জন্যে— জল

দাও! মরে যাই, মরে যাই। কোথা থেকে নামল এত দয়া, এত প্রেম! নামল সেই ভীরুর কাছে যে সবার চেয়ে অযোগ্য। আর কিসের ভয় আমার! জল দাও! সেই জল-যে আমার জন্ম ভরে উপচে উঠেছে, না দিতে পারলে তো বাঁচব না। জল দাও! এক নিমেষে জেনেছি, জল আছে আমার, অফুরান জল, সে আমি জানাব কাকে। তাই তো ডাকছি দিনরাত। শুনতে যদি না পান, ভয় নেই, দে তোর মন্তর পড়ে। সইবে তাঁর সইবে।

মা। মাঠপারের রাস্তা দিয়ে ঐ-যে কারা চলেছে, প্রকৃতি, পীতবসন-পরা।

প্রকৃতি। তাই তো, ও যে দেখছি সংঘের সব শ্রমণ। শুনছ না, পড়ছেন মন্ত্র?

পথে শ্রমণেরা। বুদ্ধো সুসুদ্ধো করুণামহাণ্ণবো
যোচ্চন্ত সুদ্ধব্বর-ঞাণলোচনো।
লোকস্স পাপূপকিলেসঘাতকো
বন্দামি বুদ্ধম্ অহমাদরেণ তম্।

প্রকৃতি। মা, ঐ-যে তিনি চলেছেন সবার আগে আগে। এই কুয়োতলার দিকে ফিরে তাকালেন না। আর-একবার তো বলে যেতে পারতেন, জল দাও। মনে হয়েছিল, আমাকে উনি ফেলে যেতে পারবেন না, আমি যে ওঁর নিজের হাতের নতুন সৃষ্টি। (বসে প'ড়ে বার বার মাটিতে মাথা ঠুকে) এই মাটি, এই মাটি, এই মাটিই তোর আপন— হতভাগিনী, কে তোকে আলোতে ফুটিয়ে তুলেছিল এক মুহূর্তের জন্তে। তাকে কি দয়া বলে। শেষে পড়তে হল এই মাটিতেই— চিরদিন মিশিয়ে থাকতে হবে এই মাটিতেই, যত লোক চলে রাস্তায় তাদের পায়ের তলায়।

মা। বাছা, ভুলে যা, ভুলে যা এ সমস্ত-কিছু। তোর এক নিমেষের স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে ওরা যাচ্ছে চলে, যাক যাক। যা টেঁকবার নয় তা যত শীঘ্র যায় ততই ভালো।

প্রকৃতি। এই প্রতিদিনের চাই চাই চাই, এই প্রতি মুহূর্তের অপমান, বুকের ভিতরে এই খাঁচার পাখির পাখা-আছড়ে-মরা, একেই বলে স্বপ্ন? যা বুকের সব শিরা কামড়ে ধ'রে থাকে, ছাড়তে চায় না, তাই স্বপ্ন? আর ঐ ওরা, নেই কোনো বাঁধন, নেই কোনো সুখদুঃখ, নেই কোনো সংসারের বোঝা— ভেসে চলে যায় শরৎকালের মেঘের মতো— ওরাই আছে জেগে, ওরাই স্বপ্ন নয়?

মা। তোর কষ্ট দেখতে পারি নে, প্রকৃতি। ওঠ্, তুই। আনবই তাঁকে মন্ত্র পড়ে। নিয়ে আসব ধুলোর পথ দিয়েই। 'কিছু চাই না' বলার অহংকার ভাঙব তাঁর— 'চাই চাই' বলেই আসতে হবে তাঁকে ছুটে।

প্রকৃতি। মা, তোমার মন্ত্র জীবসৃষ্টির আদিকালের। এদের মন্ত্র কাঁচা, এই

সেদিনকার। ওরা পারবে না তোমার সঙ্গে। তোমার মন্ত্রের টানে খুলবে ওদের মন্ত্রের গাঁঠ। ওঁকে হারতেই হবে, হারতেই হবে।

মা। কোথায় যাচ্ছে ওরা।

প্রকৃতি। ওরা যায় এইমাত্র জানি, ওরা কোনোখানেই যায় না। বর্ষা আসবে কিছুদিন পরে, তখন বসবে চাতুর্মাস্যে। আবার যাবে, কী জানি কোথায়। একেই ওরা বলে জেগে থাকা!

মা। পাগলি, তবে কী বলছিস মন্তরের কথা। চলে যাচ্ছে কত দূরে— কোথা থেকে আনব ফিরিয়ে।

প্রকৃতি। যেখানেই যাক ফেরাতেই হবে, দূর নেই তোর মন্তরের কাছে।

গান

যায় যদি যাক সাগরতীরে।
আবার আসুক, আবার আসুক, আসুক ফিরে।
রেখে দেব আসন পেতে
হৃদয়েতে,
পথের ধুলো ভিজিয়ে দেব অশ্রুনীরে।
যায় যদি যাক শৈলশিরে।
আসুক ফিরে, আসুক ফিরে।
লুকিয়ে রব গিরিগুহায়,
ডাকব উহায়—
আমার স্বপন ওর জাগরণ রইবে ঘিরে॥

আমাকে করলে না দয়া, আমি ওকে দয়া করব না। তোর সব চেয়ে যে নিষ্ঠুর মন্ত্র পড়িস তাই— পাকে পাকে দাগ দিয়ে দিয়ে জড়াক ওর মনকে। যাবে কোথায় আমাকে এড়িয়ে, পারবে কেন।

মা। ভাবনা করিস নে। অসাধ্য হবে না। তোকে দেব মায়াদর্পণ। সেইটি হাতে নিয়ে নাচবি। তার ছায়া পড়বে তাতে। সেই আয়নাতেই দেখতে পাবি কী হল তার, কতদূর সে এল।

প্রকৃতি। ঐ দেখ, পশ্চিমে জমল মেঘ, ঝড়ের মেঘ। মন্ত্র খাটবে, মা, খাটবে। উড়ে যাবে শুষ্ক সাধন, শুকনো পাতার মতো। নিববে বাতি। পথ দেখা যাবে না। ঘুরে ঘুরে এসে পড়বে এই দরজায়, নিশীথরাতে ঝড়ে বাসাভাঙা পাখি যেমন ক'রে এসে

পড়ে অন্ধকার আঙিনায়। বুক দুরদুর্ করছে, মনের মধ্যে ঝিলিক দিচ্ছে বিজুলি, ফেনিয়ে ফেনিয়ে ঢেউ উঠছে যে-সমুদ্রে তার পার দেখি নে।

মা। এখনো ভেবে দেখ্। মাঝখানে তো আঁৎকে উঠবি নে ভয়ে? ধৈর্য থাকবে তোর? মন্ত্রের বেগ চ'ড়ে যাবে যখন, হঠাৎ ঠেকাতে গেলে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাবে। জ্বলবার জিনিস সমস্ত যাবে ছাই হয়ে, তবে নিববে আগুন, এই কথাটা মনে রাখিস।

প্রকৃতি। তুই ডরছিস কার জন্যে। সে কি তেমনি মানুষ। কিছুতে কিছু হবে না তার— শেষ পর্যন্তই আসুক সে চলে, আগুনের পথ মাড়িয়ে মাড়িয়ে। আমি মনের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি, সামনে প্রলয়ের রাত্রি, মিলনের ঝড়, ভাঙনের আনন্দ।

গান

হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরুগুরু,
ঘন মেঘের ভুরু, কুটিল কুঞ্চিত,
হল রোমাঞ্চিত বন বনান্তর;
দুলিল চঞ্চল বক্ষোহিন্দোলে
মিলনস্বপ্নে সে কোন্ অতিথি রে।
সঘন-বর্ষণ-শব্দ-মুখরিত
বজ্রসচকিত ত্রস্ত শর্বরী,
মালতীবল্লরী কাঁপায় পল্লব
করুণ কল্লোলে,
কানন শঙ্কিত ঝিল্লিঝংকৃত।

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রকৃতি। বুক ফেটে যাবে! আমি দেখব না আয়না, দেখতে পারব না। কী ভয়ংকর দুঃখের ঘূর্ণিঝড়। বনস্পতি শেষকালে কি মড়্মড়্ করে লুটোবে ধুলোয়, অভ্রভেদী গৌরব তার পড়বে ভেঙে?

মা। দেখ্, বাছা, এখনো যদি বলিস, ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করি আমার মন্ত্রকে। তাতে আমার নাড়ী ছিঁড়ে যায় যদি, যায় নিজের প্রাণ, সেও ভালো, কিন্তু ঐ মহাপ্রাণ রক্ষে পাক।

প্রকৃতি। সেই ভালো, মা, থাক্‌ তোমার মন্ত্র। আর কাজ নেই।—না না না না— পথ আর কতখানিই বা! শেষ পর্যন্ত আসতে দে তাকে, আসতে দে, আমার এই বুকের কাছ পর্যন্ত। তারপরে সব দুঃখ দেব মিটিয়ে, আমার বিশ্বসংসার উজাড় করে দিয়ে। গভীর রাত্রে এসে পৌঁছবে পথিক, সমস্ত বুকের জ্বালা দিয়ে জ্বালিয়ে দেব প্রদীপ, আছে সুধার ঝরনা গভীর অন্তরে, তারি জলে অভিষেক হবে তার—যে শ্রান্ত, যে তপ্ত, যে ক্ষতবিক্ষত। আর-একবার সে চাইবে, জল দাও— আমার হৃদয়সমুদ্রের জল! আসবে সেইদিন। তোর মন্ত্র চলুক, চলুক।

গান

দুঃখ দিয়ে মেটাব দুঃখ তোমার,
স্নান করাব অতল জলে বিপুল বেদনার।
মোর সংসার দিব যে জ্বালি,
শোধন হবে এ মোহের কালি,
মরণব্যথা দিব তোমার চরণে উপহার॥

মা। এত দেরি হবে জানতুম না, বাছা। আমার মন্ত্র শেষ হল বুঝি। আমার প্রাণ যে কণ্ঠে এসেছে।

প্রকৃতি। ভয় নেই, মা, আর-একটু সয়ে থাক্‌। একটুখানি। বেশি দেরি নেই।

মা। আষাঢ় তো পড়েছে, ওঁদের চাতুর্মাস্য তো আরম্ভ হল।

প্রকৃতি। ওঁরা গেছেন বৈশালীতে গোশিরসংঘে।

মা। কী নিষ্ঠুর তুই! সে যে অনেক দূর।

প্রকৃতি। বহুদূর নয়। সাত দিনের পথ। পনেরো দিন তো কেটে গেল। এতদিনে মনে হচ্ছে, টলেছে আসন, আসছে আসছে, যা বহুদূর, যা লক্ষযোজন দূর, যা চন্দ্রসূর্য পেরিয়ে, আমার দু হাতের নাগাল থেকে যা অসীম দূরে তাই আসছে কাছে। আসছে, কাঁপছে আমার বুক ভূমিকম্পে।

মা। মন্ত্রের সর্ব অঙ্গ পূর্ণ করেছি, এতে বজ্রপাণি ইন্দ্রকে আনতে পারত টেনে। তবু দেরি হচ্ছে। কী মরণান্তিক যুদ্ধই চলছে। কী দেখেছিলি তুই আয়নাতে।

প্রকৃতি। প্রথম দেখেছি, আকাশজোড়া কুয়াশা, দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করে ক্লান্ত দেবতার ফ্যাকাশে মুখের মতো। কুয়াশার ফাঁকে ফাঁকে বেরোচ্ছে আগুন। তারপরে কুয়াশাটা স্তবকে স্তবকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেল— ফুলে-ওঠা ফেটে-পড়া প্রকাণ্ড বিষফোড়ার মতো—লাল হয়ে উঠল রঙ। সেদিন গেল। পরের দিন দেখি, পিছনে ঘন কালো

মেঘ, বিদ্যুৎ খেলছে, সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, জ্বলছে আগুন সর্বাঙ্গ ঘিরে। আমার রক্ত এল হিম হয়ে। ছুটে তোকে বলতে গেলুম, এখনি সে তোর মন্ত্র বন্ধ করে। গিয়ে দেখি তুই শিবনেত্র, কাঠের মতো বসে, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে, জ্ঞান নেই। মনে হল, তোর মধ্যেও কোনোখানে দাউ-দাউ জ্বলছে আগুন। যে-পাবক দিয়ে তিনি ঢেকেছেন আপনাকে তোর অগ্নিনাগিনী ফোঁস্ ফোঁস্ ক'রে তাকে ছোবল মারছে, চলছে দ্বন্দ্বযুদ্ধ। ফিরে এসে আয়না তুলে দেখি, আলো গেছে—শুধু দুঃখ দুঃখ দুঃখ, অসীম দুঃখের মূর্তি।

মা। মরে পড়ে গেলি নে তাই দেখে! তারই তো ঝলক লেগেছিল আমার প্রাণের মধ্যে; মনে হল, আর সইবে না।

প্রকৃতি। যে দুঃখের রূপ দেখেছি সে তো তাঁর একলার নয়, সে আমারও; আমাদের দু-জনের। ভীষণ আগুনে গ'লে মিশেছে সোনার সঙ্গে তাঁবা।

মা। ভয় হল না তোর মনে?

প্রকৃতি। ভয়ের চেয়ে অনেক বেশি— মনে হল দেখলুম, সৃষ্টির দেবতা প্রলয়ের দেবতার চেয়ে ভয়ংকর— আগুনকে চাবকাচ্ছেন তাঁর কাজে, আর আগুন কেবলই গোম্‌রাচ্ছে গর্জাচ্ছে। সপ্তধাতুর কৌটোতে কী আছে তাঁর পায়ের সামনে— প্রাণ না মৃত্যু? আমার মনে ফুলতে লাগল একটা আনন্দ। তাকে কী বলব? নতুন সৃষ্টির বিরাট বৈরাগ্য। ভাবনা নেই, ভয় নেই, দয়া নেই, দুঃখ নেই— ভাঙছে, জ্বলে উঠছে, গলে যাচ্ছে, ছিটকে পড়ছে স্ফুলিঙ্গ। থাকতে পারলুম না, আমার সমস্ত শরীর-মন নেচে নেচে উঠল, অগ্নিশিখার মতো।

গান

হে মহাদুঃখ, হে রুদ্র, হে ভয়ংকর,
ওহে শংকর, হে প্রলয়ংকর।
হোক জটানিঃসৃত অগ্নিভুজঙ্গম-
দংশনে জর্জর স্থাবর জঙ্গম,
ঘন ঘন ঝন-ঝন, ঝন-নন ঝন-নন
পিণাক টংকারো॥

মা। কী রকম দেখলি তোর ভিক্ষুকে।

প্রকৃতি। দেখলুম, তাঁর অনিমেষ দৃষ্টি বহুদূরে তাকিয়ে, গোধূলি-আকাশের তারার মতো। ইচ্ছে হল, আপনার কাছ থেকে চলে যাই অনন্তযোজন দূরে।

মা। তুই আয়নার সামনে তখন নাচছিলি— তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন ?

প্রকৃতি। ধিক্ ধিক্, কী লজ্জা! মনে হচ্ছিল, থেকে থেকে চোখ লাল হয়ে উঠছে, অভিশাপ দিতে যাচ্ছেন। আবার তখনি পা দিয়ে মাড়িয়ে দলে ফেলছেন রাগের অঙ্গারগুলো। শেষকালে দেখলেম, তাঁর রাগ ফিরল কাঁপতে কাঁপতে শেলের মতো নিজের দিকে, বিঁধল গিয়ে মর্মের মধ্যে।

মা। সমস্ত সহ্য করলি তুই ?

প্রকৃতি। আশ্চর্য হয়ে গেলুম। আমি, এই আমি, এই তোমার মেয়ে, কোথাকার কে তার ঠিকানা নেই— তাঁর দুঃখ আর এর দুঃখ আজ এক। কোন্ সৃষ্টির যজ্ঞে এমন ঘটে— এতবড়ো কথা কেউ কোনোদিন ভাবতে পারত !

মা। এই উৎপাত শান্ত হবে কতদিনে।

প্রকৃতি। যতদিন না আমার দুঃখ শান্ত হবে। ততদিন দুঃখ তাঁকে দেবই। আমি মুক্তি যদি না পাই তিনি মুক্তি পাবেন কী করে।

মা। তোর আয়না শেষ দেখেছিস কবে।

প্রকৃতি। কাল সন্ধ্যেবেলায়। বৈশালীর সিংহদরজা পেরিয়েছেন কিছুদিন আগে, গভীর রাত্রে। বোধ হয় গোপনে, শ্রমণদের না জানিয়ে। তার পরে কখনো দেখেছি, নদী পেরলেন খেয়া নৌকোয় ; দেখেছি দুর্গম পাহাড়ে ; দেখেছি সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, মাঠে তিনি একা ; দেখেছি অন্ধকারে, গভীর রাত্রে, বনের পথে। যত যাচ্ছে দিন, স্বপ্নের ঘোর আসছে ঘন হয়ে, চলেছেন কোনো বিচার না করে, নিজের সঙ্গে সমস্ত দ্বন্দ্ব শেষ করে দিয়ে। মুখে একটা বিহ্বলতা, দেহে একটা শৈথিল্য— দুই চোখের সামনে যেন বস্তু নেই ; নেই সত্যমিথ্যা, নেই ভালোমন্দ ; আছে চিন্তাহীন অন্ধ লক্ষ্য, নেই তার কোনো অর্থ।

মা। আজ কোথায় এসেছেন আন্দাজ করতে পারিস ?

প্রকৃতি। কাল সন্ধ্যার সময় দেখেছি উপলী নদীর ধারে পাটল গ্রামে। নববর্ষায় জলের ধারা উন্মত্ত, ঘাটের কাছে পুরোনো পিপুল গাছ, জোনাকি জ্বলছে ডালে ডালে, তলায় শেওলা-ধরা বেদী— সেইখানে এসেই হঠাৎ চমকে দাঁড়ালেন। অনেকদিনের চেনা জায়গা ; শুনেছি, ঐখানে বসে ভগবান বুদ্ধ একদিন রাজা সুপ্রভাসকে উপদেশ দিয়েছিলেন। দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়লেন, স্বপ্ন বুঝি ভাঙল হঠাৎ। তখনি ছুঁড়ে ফেলে দিলেম আয়না, ভয় হল কী জানি কী দেখব। তারপরে গেছে সমস্ত দিন, কিছু জানতে চাই নি, আশা করছি, আশা ছাড়ছি—এমনি করে আছি বসে। এখন রাত আসছে অন্ধকার হয়ে। প্রহরী হাঁক দিয়ে চলেছে রাস্তায়, এক প্রহর গেল বুঝি

কেটে! আর সময় নেই, সময় নেই, মা, এ রাত্ত ব্যর্থ করিস নে। তোর সব জোরটা দে ঐ মন্ত্রে।

মা। আর পারছি নে, বাছা। মন্ত্র দুর্বল হয়ে এল, আমার প্রাণ ও শরীর এসেছে অবশ হয়ে।

প্রকৃতি। দুর্বল হলে চলবে না। দিস নে হাল ছেড়ে। ফেরবার দিকে মুখ ফিরিয়েছেন বা, বাঁধনে শেষ টান পড়েছে— হয়তো টিঁকবে না। হয়তো বেরিয়ে যাবেন আমার এ জন্মের সংসার থেকে, আর পাব না নাগাল কিছুতেই। তখন আমারই স্বপ্নের পালা, আবার চণ্ডালিনীর মায়ামূর্তি। পারব না সইতে সেই মিথ্যে। পায়ে পড়ি, মা, দে একবার তোর সমস্ত শক্তি। এবার শুরু কর্‌ তোর বসুন্ধরামন্ত্র, টলতে থাক্‌ পুণ্যবানদের তুষিত স্বর্গলোক।

গান

আমি তোমারি মাটির কন্যা,
জননী বসুন্ধরা।
তবে আমার মানবজন্ম
কেন বঞ্চিত করা।
পবিত্র জানি যে তুমি
পবিত্র জন্মভূমি—
মানবকন্যা আমি যে ধন্যা
প্রাণের পুণ্যে ভরা।
কোন্‌ স্বর্গের তরে
ওরা তোমায় তুচ্ছ করে,
রহি তোমার বক্ষ-'পরে।
আমি যে তোমারি আছি
নিতান্ত কাছাকাছি—
তোমার মোহিনীশক্তি দাও আমারে
হৃদয়প্রাণ-হরা॥

মা। যেমন বলেছিলেম তেমনি প্রস্তুত হয়েছ তো?

প্রকৃতি। হয়েছি! কাল ছিল শুক্লাদ্বিতীয়ার রাত, করেছি গম্ভীরায় অবগাহন-স্নান। এই তো চাল দিয়ে, দাড়িমের ফুল দিয়ে, সিঁদুর দিয়ে, সাতটি রত্ন দিয়ে, চক্র

এঁকেছি আঙিনায়। পুঁতেছি হলদে কাপড়ের ধ্বজাগুলি, থালায় রেখেছি মালাচন্দন, জ্বালিয়েছি বাতি। স্নানের পর কাপড় পরেছি ধানের অঙ্কুরের রঙ, চাঁপার রঙের ওড়না। পুবদিকে আসন করে সমস্ত রাত ধ্যান করেছি তাঁর মূর্তি। ষোলোটি সোনালি সুতোয় ষোলোটি গ্রন্থি দিয়ে রাখী পরেছি বাঁ হাতে।

মা। আচ্ছা, তবে নাচো তোমার সেই আহ্বানের নাচ—প্রদক্ষিণ করো। আমি বেদীর কাছে মন্ত্র পড়ছি।

প্রকৃতি। গান

মম রুদ্ধ মুকুলদলে এসো
সৌরভ-অমৃতে।
মম অখ্যাত তিমিরতলে এসো
গৌরবনিশীথে।
এই মূল্যহারা মম শুক্তি,
এসো মুক্তাকণায় তুমি মুক্তি।
মম মৌনী বীণার তারে তারে
এসো সংগীতে।
নব-অরুণের এসো আহ্বান—
চিররজনীর হোক অবসান, এসো।
এসো শুভস্মিত শুকতারায়,
এসো শিশির-অশ্রুধারায়,
সিন্দুর পরাও উষারে
তব রশ্মিতে।

মা। প্রকৃতি, এইবার তোমার আয়নাটা নিয়ে দেখো। দেখছ—কালো ছায়া পড়েছে বেদীটার উপরে? আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে, পারছি নে। দেখো আয়নাটা—আর কত দেরি।

প্রকৃতি। না, দেখব না, দেখব না, আমি শুনব মনের মধ্যে—ধ্যানের মধ্যে। হঠাৎ সামনে দেখব যদি দেখা দেন। আর-একটু সয়ে থাকো, মা— দেবেন দেখা, নিশ্চয় দেবেন। ঐ দেখো, হঠাৎ এল ঝড়, আগমনীর ঝড়, পদভরে পৃথিবী কাঁপছে থর্‌থরিয়ে, বুক উঠছে গুর্‌গুর্‌ করে।

মা। আনছে তোর অভিশাপ হতভাগিনী। আমাকে তো মেরে ফেললে! ছিঁড়ল বুঝি শিরাগুলো।

প্রকৃতি। অভিশাপ নয়, অভিশাপ নয়, আনছে আমার জন্মান্তর, মরণের সিংহদ্বার খুলছে, বজ্রের হাতুড়ি মেরে। ভাঙল দরজা, ভাঙল প্রাচীর, ভাঙল আমার এ জন্মের সমস্ত মিথ্যে। ভয়ে কাঁপছে আমার মন, আনন্দে দুলছে আমার প্রাণ। ও আমার সর্বনাশ, ও আমার সর্বস্ব, তুমি এসেছ— আমার সমস্ত অপমানের চূড়ায় তোমাকে বসাব, গাঁথব তোমার সিংহাসন। আমার লজ্জা দিয়ে, ভয় দিয়ে, আনন্দ দিয়ে।

মা। সময় হয়ে আসছে আমার। আর পারছি নে। শিগ্‌গির দেখ্‌ তোর আয়নাটা।

প্রকৃতি। মা, ভয় হচ্ছে। তাঁর পথ আসছে শেষ হয়ে— তার পরে? তার পরে কী। শুধু এই আমি! আর কিছু না! এতদিনের নিষ্ঠুর দুঃখ এতেই ভরবে? শুধু আমি? কিসের জন্যে এত দীর্ঘ, এত দুর্গম পথ! শেষ কোথায় এর! শুধু এই আমাতে!

গান

পথের শেষ কোথায়, শেষ কোথায়,
কী আছে শেষে।
এত কামনা এত সাধনা কোথায় মেশে।
ঢেউ ওঠে-পড়ে কাঁদার,
সম্মুখে ঘন আঁধার—
পার আছে কোন্‌ দেশে।
আজ ভাবি মনে মনে,
মরীচিকা-অন্বেষণে
বুঝি তৃষ্ণার শেষ নেই—
মনে ভয় লাগে সেই,
হাল-ভাঙা পাল-ছেঁড়া ব্যথা
চলেছে নিরুদ্দেশে॥

মা। ও নিষ্ঠুর মেয়ে, দয়া কর্‌ আমাকে। আমার আর সহ্য হয় না। শিগ্‌গির আয়নাটা দেখ্‌।

প্রকৃতি। (আয়নাটা দেখেই ফেলে দিল) মা, ওমা, রাখ্‌ রাখ্‌ রাখ্‌ রাখ্‌, ফিরিয়ে নে ফিরিয়ে নে তোর মন্ত্র! এখনি, এখনি। ওরে ও রাক্ষসী, কী করলি, কী করলি, তুই মরলি নে কেন! কী দেখলেম! ওগো, কোথায় আমার সেই দীপ্ত উজ্জ্বল, সেই শুভ্র নির্মল, সেই সুদূর স্বর্গের আলো! কী ম্লান, কী ক্লান্ত, আত্মপরাজয়ের

কী প্রকাণ্ড বোঝা নিয়ে এল আমার দ্বারে! মাথা হেঁট করে এল! যাক, যাক, এ-সব যাক (পা দিয়ে মন্ত্রের উপকরণ ভেঙে ছড়িয়ে ফেললে)— ওরে, তুই চণ্ডালিনী না হোস যদি, অপমান করিস নে বীরের। জয় হোক তাঁর জয় হোক।

আনন্দের প্রবেশ

প্রভু, এসেছ আমাকে উদ্ধার করতে— তাই এত দুঃখই পেলে— ক্ষমা করো, ক্ষমা করো। অসীম গ্লানি পদাঘাতে দূর করে দাও। টেনে এনেছি তোমাকে মাটিতে, নইলে কেমন করে আমাকে তুলে নিয়ে যাবে তোমার পুণ্যলোকে! ওগো নির্মল, পায়ে তোমার ধুলো লেগেছে, সার্থক হবে সেই ধুলো-লাগা। আমার মায়া-আবরণ পড়বে খসে তোমার পায়ে, ধুলো সব নেবে মুছে। জয় হোক তোমার জয় হোক, তোমার জয় হোক।

মা। জয় হোক, প্রভু। আমার পাপ আর আমার প্রাণ দুই পড়ল তোমার পায়ে, আমার দিন ফুরল ঐখানেই— তোমার ক্ষমার তীরে এসে।

[মৃত্যু

আনন্দ। বুদ্ধো সুসুদ্ধো করুণামহাণ্ণবো
যোচ্চন্ত সুদ্ধব্বর-ঞানলোচনো।
লোকস্স পাপূপকিলেসঘাতকো।
বন্দামি বুদ্ধম্ আহমাদরেণ তম্॥

তাসের দেশ

উৎসর্গ

কল্যাণীয় শ্রীমান সুভাষচন্দ্র,

স্বদেশের চিত্তে নূতন প্রাণ সঞ্চার করবার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ, সেই কথা স্মরণ ক'রে তোমার নামে 'তাসের দেশ' নাটিকা উৎসর্গ করলুম।

শান্তিনিকেতন
মাঘ, ১৩৪৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খর বায়ু বয় বেগে,
চারিদিক ছায় মেঘে,
ওগো নেয়ে, নাওখানি বাইয়ো।
তুমি কষে ধরো হাল,
আমি তুলে বাঁধি পাল—
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো।
শৃঙ্খলে বারবার
ঝন্‌ঝন্‌ ঝংকার,
নয় এ তো তরণীর ক্রন্দন শঙ্কার—
বন্ধন দুর্বার
সহ্য না হয় আর,
টলমল করে আজ তাই ও।
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো
গণি গণি দিন খন
চঞ্চল করি মন
বোলো না, যাই কি নাহি যাই রে।
সংশয়পারাবার
অন্তরে হবে পার,
উদ্‌বেগে তাকায়ো না বাইরে।
যদি মাতে মহাকাল,
উদ্দাম জটাজাল
ঝড়ে হয় লুণ্ঠিত, ঢেউ উঠে উত্তাল,
হোয়ো নাকো কুণ্ঠিত,
তালে তার দিয়ো তাল,
জয়-জয় জয়গান গাইয়ো।
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো।

তাসের দেশ

প্রথম দৃশ্য

রাজপুত্র ও সদাগরপুত্র

রাজপুত্র। আর তো চলছে না, বন্ধু।

সদাগর। কিসের চাঞ্চল্য তোমার, রাজকুমার।

রাজপুত্র। কেমন ক'রে বলব। কিসের চাঞ্চল্য বলো দেখি ঐ হাঁসের দলের, বসন্তে যারা ঝাঁকে ঝাঁকে চলেছে হিমালয়ের দিকে।

সদাগর। সেখানে যে ওদের বাসা।

রাজপুত্র। বাসা যদি, তবে ছেড়ে আসে কেন। না না, ওড়বার আনন্দ, অকারণ আনন্দ।

সদাগর। তুমি উড়তে চাও ?

রাজপুত্র। চাই বই কি।

সদাগর। বুঝতেই পারি নে তোমার কথা। আমি তো বলি অকারণ ওড়ার চেয়ে সকারণ খাঁচায় বন্ধ থাকাও ভালো।

রাজপুত্র। সকারণ বলছ কেন।

সদাগর। আমরা-যে সোনার খাঁচায় থাকি শিকলে বাঁধা দানাপানির লোভে।

রাজপুত্র। তুমি বুঝতে পারবে না, বুঝতে পারবে না।

সদাগর। আমার ও দোষটা আছে, যা বোঝা যায় না তা আমি বুঝতেই পারি নে। একটু স্পষ্ট করেই বলো-না, কী তোমার অসহ্য হল।

রাজপুত্র। রাজবাড়ির এই একঘেয়ে দিনগুলো।

সদাগর। একঘেয়ে বল তাকে ? কতরকম আয়োজন, কত উপকরণ।

রাজপুত্র। নিজেকে মনে হয় যেন সোনার মন্দিরে পাথরের দেবতা। কানের কাছে কেবল একই আওয়াজে বাজছে শঙ্খ কাঁসর ঘণ্টা। নৈবেদ্যের বাঁধা বরাদ্দ, কিন্তু ভোগে রুচি নেই। এ কি সহ্য হয়।

সদাগর। আমাদের মতো লোকের তো খুবই সহ্য হয়। ভাগ্যিস বাঁধা বরাদ্দ। বাঁধন ছিঁড়লেই তো মাথায় হাত দিয়ে পড়তে হয়। যা পাই তাতেই আমাদের ক্ষুধা মেটে। আর, যা পাও না তাই দিয়েই তোমরা মনে মনে ক্ষুধা মেটাতে চাও।

রাজপুত্র। আর, রোজ রোজ ঐ-যে চারণদের স্তব শুনতে হয় একই বাঁধা ছন্দে— সেই শার্দূলবিক্রীড়িত।

সদাগর। আমার তো মনে হয়, স্তব জিনিসটা বারবার যতই শোনা যায় ততই লাগে ভালো। কিছুতেই পুরোনো হয় না।

রাজপুত্র। ঘুম ভাঙতেই সেই এক বৈতালিকের দল। আর, রোজ সকালে সেই এক পুরুতঠাকুরের ধান দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ। আর আসতে যেতে দেখি, সেই বুড়ো কঞ্চুকীটা কাঠের পুতুলের মতো খাড়া দাঁড়িয়ে আছে দরজার পাশে। কোথাও যাবার জন্যে একটু পা বাড়িয়েছি কি অমনি কোথা থেকে প্রতিহারী এসে হাজির, বলে— ইত ইতো, ইত ইতো, ইত ইতো। সবাই মিলে মনটাকে যেন বুলি-চাপা দিয়ে রেখেছে।

সদাগর। কেন, মাঝে মাঝে যখন শিকারে যাও তখন বুনোজন্তু ছাড়া আর-কোনো উৎপাত তো থাকে না।

রাজপুত্র। বুনোজন্তু বলো কাকে। আমার তো সন্দেহ হয়, রাজশিকারী বাঘগুলোকে আফিম খাইয়ে রাখে। ওরা যেন অহিংস্রনীতির দীক্ষা নিয়েছে। এ পর্যন্ত একটাকেও তো ভদ্ররকম লাফ মারতে দেখলুম না।

সদাগর। যাই বল, বাঘের এই আচরণকে আমি তো অসৌজন্য ব'লে মনে করি নে। শিকারে যাবার ধুমধামটা সম্পূর্ণই থাকে, কেবল বুক দুর্‌দুর্‌ করে না।

রাজপুত্র। সেদিন ভালুকটাকে বহুদূর থেকে তীর বিঁধেছিলুম, তা নিয়ে চার দিক থেকে ধন্য-ধন্য পড়ে গেল; বললে, রাজপুত্রের লক্ষ্যভেদের কী নৈপুণ্য! তার পরে কানাকানিতে শুনলুম, একটা মরা ভালুকের চামড়ার মধ্যে খড়বিচিলি ভরে দিয়ে সাজিয়ে রেখেছিল। এতবড়ো পরিহাস সহ্য করতে পারি নি। শিকারীকে কারাদণ্ডের আদেশ করে দিয়েছি।

সদাগর। তার উপকার করেছ। তার সে কারাগারটা রানীমার অন্দরমহলের সংলগ্ন, সে দিব্য সুখে আছে। এই তো সেদিন, তার জন্য তিন মন ঘি আর তেত্রিশটা পাঁঠা পাঠিয়ে দিয়েছি আমাদের গদি থেকে।

রাজপুত্র। এর অর্থ কী।

সদাগর। সে ভালুকটার সৃষ্টি যে রানীমারই আদেশে।

রাজপুত্র। ঐ তো। আমরা পড়েছি অসত্যের বেড়াজালে। নিরাপদের খাঁচায় থেকে থেকে আমাদের ডানা আড়ষ্ট হয়ে গেল। আগাগোড়া সবই অভিনয়। আমাকে যুবরাজী সঙ বানিয়েছে। আমার এই রাজসাজ ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে। ঐ-যে

ফসলখেতে ওদের চাষ করতে দেখি, আর ভাবি, পূর্বপুরুষের পুণ্যে ওরা জন্মেছে চাষী হয়ে।

সদাগর। আর, ওরা তোমার কথা কী ভাবে সে ওদের জিজ্ঞাসা করে দেখো দেখি। রাজপুত্র, তুমি কী সব বাজে কথা বলছ— মনের আসল কথাটা লুকিয়েছ। ওগো পত্রলেখা, আমাদের রাজপুত্রের গোপন কথাটি হয়তো তুমিই আন্দাজ করতে পারবে, একবার শুধিয়ে দেখো-না।

পত্রলেখার প্রবেশ

গান

পত্রলেখা। গোপন কথাটি রবে না গোপনে,
উঠিল ফুটিয়া নীরব নয়নে—
রাজপুত্র। না না না, রবে না গোপনে।
বিভল হাসিতে
বাজিল বাঁশিতে,
স্ফুরিল অধরে নিভৃত স্বপনে—
রাজপুত্র। না না না, রবে না গোপনে।
পত্রলেখা। মধুপ গুঞ্জরিল,
মধুর বেদনায় আলোক-পিয়াসি
অশোক মুঞ্জরিল।
হৃদয়শতদল
করিছে টলমল
অরুণ প্রভাতে করুণ তপনে—
রাজপুত্র। না না না, রবে না গোপনে॥

রাজপুত্র। আছে আমার গোপন কথা, সে কথাটা গোপন রয়েছে দূরের আকাশে। সমুদ্রের ধারে বসে থাকি পশ্চিম দিগন্তের দিকে চেয়ে। সেইখানে আমার অদৃষ্ট যা যক্ষের ধনের মতো গোপন ক'রে রেখেছে যাব তারই সন্ধানে।

গান

যাবই আমি যাবই ওগো
বাণিজ্যেতে যাবই।
লক্ষ্মীরে হারাবই যদি
অলক্ষ্মীরে পাবই।

সদাগর। ও কী কথা। বাণিজ্য? ও যে তুমি সদাগরের মন্ত্র আওড়াচ্ছ।

রাজপুত্র। সাজিয়ে নিয়ে জাহাজখানি
বসিয়ে হাজার দাঁড়ি
কোন্ পুরীতে যাব দিয়ে
কোন্ সাগরে পাড়ি।
কোন্ তারকা লক্ষ্য করি
কূল-কিনারা পরিহরি
কোন্ দিকে যে বাইব তরী
বিরাট কালো নীরে—
মরব না আর ব্যর্থ আশায়
সোনার বালুর তীরে।

সদাগর। অকূলের নাবিকগিরি ক'রে নিরুদ্দেশ হওয়া, এ তো বাণিজ্যের রাস্তা নয়। খবর কিছু পেয়েছ কি।

রাজপুত্র। পেয়েছি বই কি। পেয়েছি আভাসে, পেয়েছি স্বপ্নে।

নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ
প্রবাল দিয়ে ঘেরা।
শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে
সাগরবিহঙ্গেরা।
নারিকেলের শাখে শাখে
ঝোড়ো হাওয়া কেবল ডাকে,
ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে
বইছে নগনদী।
সাত রাজার ধন মানিক পাবই
সেথায় নামি যদি॥

সদাগর। তোমার গানের সুরে বোঝা যাচ্ছে, এ মানিকটি তো সদাগরি মানিক নয়, এ মানিকের নাম বলো তো।

রাজপুত্র। নবীনা! নবীনা!

সদাগর। নবীনা! এতক্ষণে একটা স্পষ্ট কথা পাওয়া গেল।

রাজপুত্র। স্পষ্ট হয়ে রূপ নিতে এখনো দেরি আছে।

গান

হে নবীনা, হে নবীনা।
প্রতিদিনের পথের ধুলায় যায় না চিনা।
শুনি বাণী ভাসে
বসন্তবাতাসে,
প্রথম জাগরণে দেখি সোনার মেঘে লীনা।

সদাগর। তোমার এ স্বপ্নের ধন কিন্তু সংগ্রহ করা শক্ত হবে।

রাজপুত্র। স্বপনে দাও ধরা
কী কৌতুকে ভরা।
কোন্ অলকার ফুলে
মালা গাঁথ চুলে,
কোন্ অজানা সুরে
বিজনে বাজাও বীণা॥

রাজমাতার প্রবেশ

সদাগর। রানীমা, উনি মরীচিকাকে জাল ফেলে ধরবেন, উনি রূপকথার দেশের সন্ধান পেতে চান।

মা। সে কী কথা। আবার ছেলেমানুষ হতে চায় নাকি।

রাজপুত্র। হাঁ, মা, বুড়োমানুষির সুবুদ্ধি-ঘেরা জগতে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে।

মা। বুঝেছি, বাছা, আসলে তোমার অভাবটা অভাবেরই অভাব। পাওয়া জিনিসে তোমার বিতৃষ্ণা জন্মেছে। তুমি চাইতে চাও, আজ পর্যন্ত সে সুযোগ তোমার ঘটে নি।

রাজপুত্র। গান

আমার মন বলে, 'চাই চাই গো
যারে নাহি পাই গো।'
সকল পাওয়ার মাঝে
আমার মনে বেদন বাজে,
'নাই নাই নাই গো।'
হারিয়ে যেতে হবে,
ফিরিয়ে পাব তবে,

সন্ধ্যাতারা যায় যে চলে
ভোরের তারায় জাগবে ব'লে,
বলে সে, 'যাই যাই যাই গো।'

মা। বাছা, তোমাকে ধরে রাখতে গেলেই হারাব। তুমি বইতে পারবে না আরামের বোঝা, সইতে পারবে না সেবার বন্ধন। আমি ভয় ক'রে অকল্যাণ করব না। ললাটে দেব শ্বেতচন্দনের তিলক, শ্বেত উষ্ণীষে পরাব শ্বেতকরবীর গুচ্ছ। যাই কুলদেবতার পুজো সাজাতে। সন্ধ্যায় সময় আরতির কাজল পরাব চোখে। পথে দৃষ্টির বাধা যাবে কেটে।

[রাজমাতার প্রস্থান

রাজপুত্র। গান

হেরো, সাগর উঠে তরঙ্গিয়া
বাতাস বহে বেগে।
সূর্য যেথায় অস্তে নামে
ঝিলিক মারে মেঘে।
দক্ষিণে চাই, উত্তরে চাই,
ফেনায় ফেনা, আর কিছু নাই,
যদি কোথাও কূল নাহি পাই
তল পাব তো তবু।
ভিটার কোণে হতাশমনে
রইব না আর কভু।
অকূল-মাঝে ভাসিয়ে তরী
যাচ্ছি অজানায়।
আমি শুধু একলা নেয়ে
আমার শূন্য নায়।
নব নব পবন-ভরে
যাব দ্বীপে দ্বীপান্তরে,
নেব তরী পূর্ণ ক'রে
অপূর্ব ধন যত—
ভিখারি মন ফিরবে যখন
ফিরবে রাজার মতো॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপুত্র ও সদাগরপুত্র

রাজপুত্র। এক ডাঙা থেকে দিলেম পাড়ি, তরী ডুবল মাঝ সমুদ্রে, ভেসে উঠলেম আর-এক ডাঙায়। এতদিন পরে মনে হচ্ছে, জীবনে নতুন পর্ব শুরু হল।

সদাগর। রাজপুত্র, তুমি তো কেবলই নতুন নতুন করে অস্থির হলে। আমি ভয় করি ঐ নতুনকেই। যাই বল, বন্ধু, পুরোনোটা আরামের।

রাজপুত্র। ব্যাঙের আরাম এঁদো কুয়োর মধ্যে। এটা বুঝলে না, উঠে এসেছি মরণের তলা থেকে। যম আমাদের ললাটে নতুন জীবনের তিলক পরিয়ে দিলেন।

সদাগর। রাজতিলক তোমার ললাটে তো নিয়েই এসেছ জন্মমুহূর্তে।

রাজপুত্র। সে তো অদৃষ্টের ভিক্ষেদানের ছাপ। যমরাজ মহাসমুদ্রের জলে সেটা কপাল থেকে মুছে দিয়ে হুকুম করেছেন, নতুন রাজ্য নতুন শক্তিতে জয় করে নিতে হবে, নতুন দেশে।—

গান

এলেম নতুন দেশে।
তলায় গেল ভগ্ন তরী, কূলে এলেম ভেসে।
অচিন মনের ভাষা
শোনাবে অপূর্ব কোন্ আশা,
বোনাবে রঙিন সুতোয় দুঃখসুখের জাল,
বাজবে প্রাণে নতুন গানের তাল,
নতুন বেদনায় ফিরব কেঁদে হেসে।
নাম-না-জানা প্রিয়া
নাম-না-জানা ফুলের মালা নিয়া
হিয়ায় দেবে হিয়া।
যৌবনেরি নবোচ্ছ্বাসে
ফাগুনমাসে
বাজবে নূপুর ঘাসে ঘাসে,
মাতবে দখিনবায়
মঞ্জরিত লবঙ্গলতায়
চঞ্চলিত এলোকেশে॥

সদাগর। রাজপুত্র, তোমার গানের সুরে কথাটা শোনাচ্ছে ভালো। কিন্তু, জিজ্ঞাসা করি, এদেশে যৌবনের নবীন রূপ দেখলে কোথায়। চারিদিকটা তো একবার ঘুরে এসেছি। দেখে মনে হল, যেন ছুতোরের তৈরি কাঠের কুঞ্জবন। দেখলুম, ওরা চৌকো চৌকো কেঠো চালে চলেছে, বুকে পিঠে চ্যাপটা, পা ফেলছে খিট্‌খুট্‌ খিট্‌খুট্‌ শব্দে, বোধকরি চৌকুনি নূপুর পরেছে পায়ে, তৈরি সেটা তেঁতুল কাঠে। এই মরা দেশকে কি বলে নতুন দেশ।

রাজপুত্র। এর থেকেই বুঝবে, জিনিসটা সত্যি নয়, এটা বানানো, এটা উপর থেকে চাপানো, এদের দেশের পণ্ডিতদের হাতে গড়া খোলোস। আমরা এসেছি কী করতে— খসিয়ে দেব। ভিতর থেকে প্রাণের কাঁচা রূপ যখন বেরিয়ে পড়বে, আশ্চর্য করে দেবে।

সদাগর। আমরা সদাগর মানুষ, যা পষ্ট দেখি তার থেকেই দর যাচাই করি। আর, যা দেখতে পাও না তারই উপর তোমাদের বিশ্বাস। আচ্ছা, দেখা যাক, ছাইয়ের মধ্যে থেকে আগুন বেরোয় কি না। আমার তো মনে হয়, ফুঁ দিতে দিতে দম ফুরিয়ে যাবে। ঐ দেখো-না, এই দিকেই আসছে— এ যেন মরা দেহে ভূতের নৃত্য।

রাজপুত্র। একটু সরে দাঁড়ানো যাক। দেখি-না কাণ্ডটা কী।

তাসের দলের প্রবেশ

তাসের কাওয়াজ

গান

তোলন নামন,
পিছন সামন,
বাঁয়ে ডাইনে
চাই নে চাই নে,
বোসন ওঠন,
ছড়ান গুটন,
উলটো-পালটা
ঘূর্ণি চালটা—
বাস্‌ বাস্‌ বাস্‌।

সদাগর। দেখছ ব্যাপারটা! লাল উর্দি, কালো উর্দি, উঠছে পড়ছে, শুচ্ছে বসছে একেবারে অকারণে— ভারি অদ্ভুত। হা হা হা হা।

শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীগণ কর্তৃক তাসের দেশের অভিনয়

ছক্কা। এ কী ব্যাপার! হাসি!

পঞ্জা। লজ্জা নেই তোমাদের! হাসি!

ছক্কা। নিয়ম মান না তোমরা! হাসি!

রাজপুত্র। হাসির তো একটা অর্থ আছে। কিন্তু, তোমরা যা করছিলে তার অর্থ নেই যে।

ছক্কা। অর্থ? অর্থের কী দরকার। চাই নিয়ম। এটা বুঝতে পার না? পাগল নাকি তোমরা!

রাজপুত্র। খাঁটি পাগল তো চেনা সহজ নয়। চিনলে কী করে।

পঞ্জা। চাল চলন দেখে।

রাজপুত্র। কী রকম দেখলে।

ছক্কা। দেখলেম, কেবল চলনটাই আছে তোমাদের, চালটা নেই।

সদাগর। আর, তোমাদের বুঝি চালটাই আছে, চলনটা নেই?

পঞ্জা। জান না, চালটা অতি প্রাচীন, চলনটাই আধুনিক, অপোগণ্ড, অর্বাচীন, অজাতশ্মশ্রু।

ছক্কা। গুরুমশায়ের হাতে মানুষ হও নি। কেউ বুঝিয়ে দেয় নি, রাস্তায় ঘাটে খানা আছে, ডোবা আছে, কাঁটা আছে খোঁচা আছে— চলন জিনিসটার আপদ বিস্তর।

রাজপুত্র। এ দেশটা তো গুরুমশায়েরই দেশ। শরণ নেব তাঁদের।

ছক্কা। এবার তোমাদের পরিচয়টা?

রাজপুত্র। আমরা বিদেশী।

পঞ্জা। বাস্। আর, বলতে হবে না। তার মানে, তোমাদের জাত নেই, কুল নেই, গোত্র নেই, গাঁই নেই, জ্ঞাত নেই, গুষ্টি নেই, শ্রেণী নেই, পংক্তি নেই।

রাজপুত্র। কিছু নেই, কিছু নেই— সব বাদ দিয়ে এই যা আছে, দেখছই তো। এখন তোমাদের পরিচয়টা?

ছক্কা। আমরা ভুবনবিখ্যাত তাসবংশীয়। আমি ছক্কা শর্মণ।

পঞ্জা। আমি পঞ্জা বর্মণ।

রাজপুত্র। ঐ যারা সংকোচে দূরে দাঁড়িয়ে?

ছক্কা। কালো-হ্যাংলা, ঐ তিরি ঘোষ।

পঞ্জা। আর, রাঙা-মতো এই দুরি দাস।

সদাগর। তোমাদের উৎপত্তি কোথা থেকে।

ছক্কা। ব্রহ্মা হয়রান হয়ে পড়লেন সৃষ্টির কাজে। তখন বিকেল বেলাটায় প্রথম যে হাই তুললেন পবিত্র সেই হাই থেকে আমাদের উদ্ভব।

পঞ্জা। এই কারণে কোনো কোনো ম্লেচ্ছভাষায় আমাদের তাসবংশীয় না ব'লে হাইবংশীয় বলে।

সদাগর। আশ্চর্য।

ছক্কা। শুভ গোধূলিলগ্নে পিতামহ চার মুখে একসঙ্গে তুললেন চার হাই।

সদাগর। বাস্ রে। ফল হল কী।

ছক্কা। বেরিয়ে পড়ল ফস্ ফস্ ক'রে ইস্কাবন, রুইতন, হরতন, চিঁড়েতন। এঁরা সকলেই প্রণম্য। (প্রণাম)

রাজপুত্র। সকলেই কুলীন ?

ছক্কা। কুলীন বই কি। মুখ্য কুলীন। মুখ থেকে উৎপত্তি।

পঞ্জা। তাসবংশের আদিকবি ভগবান তাসরঙ্গনিধি দিনের চার প্রহর ঘুমিয়ে স্বপ্নের ঘোরে প্রথম যে ছন্দ বানালেন সেই ছন্দের মাত্রা গুনে গুনে আমাদের সাড়ে-সাঁইত্রিশ রকমের পদ্ধতির উদ্ভব।

রাজপুত্র। অন্তত তার একটাও তো জানা চাই।

পঞ্জা। আচ্ছা, তাহলে মুখ ফেরাও।

রাজপুত্র। কেন।

পঞ্জা। নিয়ম। ভাই ছক্কা, ঠুং মন্ত্র প'ড়ে ওদের কানে একটা ফুঁ দিয়ে দাও।

রাজপুত্র। কেন।

পঞ্জা। নিয়ম।

তাসের দলের গান

হা-আ-আ-আই।
হাতে কাজ নাই।
দিন যায় দিন যায়।
আয় আয় আয় আয়।
হাতে কাজ নাই॥

রাজপুত্র। আর সহ্য করতে পারছি নে, মুখ ফেরাতে হল।

পঞ্জা। এঃ! ভেঙে দিলে মন্ত্রটা! অশুচি করে দিলে!

রাজপুত্র। অশুচি?

পঞ্জা। অশুচি নয় তো কী। মন্ত্রের মাঝখানটায় বিদেশীর দৃষ্টি পড়ল।

রাজপুত্র। এখন উপায় ?

ছক্কা। বাদুড়ে-খাওয়া গাবের আঁটি পুড়িয়ে তিন দিন চোখে কাজল পরতে হবে, তবেই স্বর্গে পিতামহদের উপোষ ভাঙবে।

রাজপুত্র। বিপদ ঘটিয়েছি তো। তোমাদের দেশে খুব সাবধানে চলতে হবে।

ছক্কা। একেবারে না চললেই ভালো হয়, শুচি থাকতে পারবে।

রাজপুত্র। শুচি থাকলে কী হয়।

পঞ্জা। কী আর হবে, শুচি থাকলে শুচি হয়। বুঝতে পারছ না ?

রাজপুত্র। আমাদের পক্ষে বোঝা অসম্ভব। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ঐ পাড়ির উপরে কী করছিলে দল বেঁধে।

ছক্কা। যুদ্ধ।

রাজপুত্র। তাকে বল যুদ্ধ ?

পঞ্জা। নিশ্চয়! অতি বিশুদ্ধ নিয়মে। তাসবংশোচিত আচার-অনুসারে।

গান

আমরা চিত্র, অতি বিচিত্র,
অতি বিশুদ্ধ, অতি পবিত্র।

সদাগর। তা হোক। যুদ্ধে একটু রাগারাগি না হলে রস থাকে না।

ছক্কা। আমাদের রাগ রঙে।

আমাদের যুদ্ধ—
নহে কেহ ক্রুদ্ধ,
ঐ দেখো গোলাম
অতিশয় মোলাম।

সদাগর। তা হোক-না, তবু কামান-বন্দুকটা যুদ্ধক্ষেত্রে মানায় ভালো।

পঞ্জা।
নাহি কোনো অস্ত্র,
খাকি-রাঙা বস্ত্র।
নাহি লোভ,
নাহি ক্ষোভ,
নাহি লাফ,
নাহি ঝাঁপ।

রাজপুত্র। নাই রইল, তবু একটা নালিশ থাকা চাই তো। তাই নিয়েই তো দুই পক্ষে লড়াই।

ছক্কা। যথারীতি জানি,
সেইমতে মানি,
কে তোমার শত্রু, কে তোমার মিত্র,
কে তোমার টক্কা, কে তোমার ফক্কা॥

পঞ্জা। ওহে বিদেশী, শাস্ত্রমতে তোমাদেরও তো একটা উৎপত্তি ঘটেছিল?

সদাগর। নিশ্চিত। পিতামহ ব্রহ্মা সৃষ্টির গোড়াতেই সূর্যকে যেই শানে চড়িয়েছেন অমনি তাঁর নাকের মধ্যে ঢুকে পড়ল একটা আগুনের স্ফুলিঙ্গ। তিনি কামানের মতো আওয়াজ ক'রে হেঁচে ফেললেন— সেই বিশ্ব-কাঁপানি হাঁচি থেকেই আমাদের উৎপত্তি।

ছক্কা। এখন বোঝা গেল! তাই এত চঞ্চল!

রাজপুত্র। স্থির থাকতে পারি নে, ছিটকে ছিটকে পড়ি।

পঞ্জা। সেটা তো ভালো নয়।

সদাগর। কে বলছে ভালো। আদিযুগের সেই হাঁচির তাড়া আজও সামলাতে পারছি নে।

ছক্কা। একটা ভালো ফল দেখতে পাচ্ছি— এই হাঁচির তাড়ায় তোমরা সকাল-সকাল এই দ্বীপ থেকে ছিটকে পড়বে, টিঁকতে পারবে না।

সদাগর। টেঁকা শক্ত।

পঞ্জা। তোমাদের যুদ্ধটা কী ধরনের।

সদাগর। সেটা দুই দুই পক্ষের চার চার জোড়া হাঁচির মাপে।

ছক্কা। হাঁচির মাপে? বাস্‌ রে, তাহলে মাথা ঠোকাঠুকি হবে তো!

সদাগর। হাঁ, একেবারে দমাদ্দম।

ছক্কা। তোমাদেরও আদিকবির মন্ত্র আছে তো?

সদাগর। আছে বইকি।

গান

হাঁচ্ছোঃ,
ভয় কী দেখাচ্ছ।

ধরি টিপে টুঁটি,
মুখে মারি মুঠি,
বলো দেখি কী আরাম পাচ্ছ ॥

ছক্কা। ওহে ভাই পঞ্জা, একেবারে অসবর্ণ। কী জাতি তোমরা।

সদাগর। আমরা নাশক, নাসা থেকে উৎপন্ন।

পঞ্জা। কোনো উচ্চবংশীয় জাতির অমনতরো নাম তো শুনি নি।

সদাগর। হাইয়ের বাষ্পে তোমরা উড়ে গেছ উচ্চে, পরলোকের পারে; হাঁচির চোটে আমরা পড়েছি নিচে, এই ইহলোকের ধারে।

ছক্কা। পিতামহের নাসিকার অসংযমবশতই তোমরা এমন অদ্ভুত।

রাজপুত্র। এতক্ষণে ঠিক কথাটাই বেরিয়েছে তোমার মুখ থেকে, আমরা অদ্ভুত।

গান

আমরা নূতন যৌবনেরই দূত,
আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্ভুত।
আমরা বেড়া ভাঙি,
আমরা অশোকবনের রাঙা নেশায় রাঙি,
ঝঞ্ঝার বন্ধন ছিন্ন করে দিই,
আমরা বিদ্যুৎ।
আমরা করি ভুল।
অগাধ জলে ঝাঁপ দিয়ে
যুঝিয়ে পাই কূল।
যেখানে ডাক পড়ে
জীবন-মরণ-ঝড়ে
আমরা প্রস্তুত ॥

ছক্কা-পঞ্জা। (পরস্পর মুখ চেয়ে) এ চলবে না, এ চলবে না।

রাজপুত্র। যা চলবে না তাকেই আমরা চালাই।

ছক্কা। কিন্তু, নিয়ম!

রাজপুত্র। বেড়ার নিয়ম ভাঙলেই পথের নিয়ম আপনিই বেরিয়ে পড়ে, নইলে এগোব কী করে।

পঞ্জা। ওরে ভাই, কী বলে এরা। এগোবে! অম্লানমুখে ব'লে বসল, এগোব।

রাজপুত্র। নইলে চলা কিসের জন্তে।

ছক্কা। চলা! চলবে কেন তুমি! চলবে নিয়ম।

গান

চলো নিয়ম-মতে।
দূরে তাকিয়ো নাকো,
ঘাড় বাঁকিয়ো নাকো,
চলো সমান পথে।

রাজপুত্র। হেরো অরণ্য ওই,
হোথা শৃঙ্খলা কই,
পাগল ঝরনাগুলো
দক্ষিণ পর্বতে।

তাসের দল। ওদিকে চেয়ো না চেয়ো না,
যেয়ো না যেয়ো না—
চলো সমান পথে।

পঞ্জা। আর নয়, ঐ আসছেন রাজাসাহেব, আসছেন রানীবিবি। এইখানে আজ সভা। এই নাও ভুঁইকুমড়োর ডাল একটা ক'রে।

রাজপুত্র। ভুঁইকুমড়োর ডাল? হা হা হা হা— কেন।

পঞ্জা। চুপ। হেসো না, নিয়ম। বোসো ঈশান কোণে মুখ ক'রে, খবরদার বায়ুকোণে মুখ ফিরিয়ো না।

রাজপুত্র। কেন।

ছক্কা। নিয়ম।

রাজা রানী টেক্কা গোলাম প্রভৃতির
যথারীতি যথাভঙ্গীতে প্রবেশ

রাজপুত্র। ওহে ভাই, স্তবগান করে রাজাকে খুশি করে দিই। তুমি ভুঁইকুমড়োর ডালটা দোলাও।

গান

জয় জয় তাসবংশ-অবতংস,
তন্দ্রাতীরনিবাসী,
সব-অবকাশ ধ্বংস।

তাসের দল। ভ্যাম্বা ভ্যাম্বা ভ্যাম্বা! অকালে সভা দিলে ভেঙে, বর্বর!

রাজা। শান্ত হও, এরা কারা।

ছক্কা। বিদেশী।

রাজা। বিদেশী! তাহলে নিয়ম খাটবে না। একবার সকলে ঠাই বদল করে নাও, তাহলেই দোষ যাবে কেটে। সর্বাগ্রে তাসমহাসভার জাতীয় সংগীত।

সকলে। গান

চিঁড়েতন, হর্তন, ইস্কাবন—
অতি সনাতন ছন্দে
করতেছে নর্তন
চিঁড়েতন হর্তন।
কেউ বা ওঠে কেউ পড়ে,
কেউ বা একটু নাহি নড়ে,
কেউ শুয়ে শুয়ে ভুঁয়ে
করে কালকর্তন।
নাহি কহে কথা কিছু,
একটু না হাসে,
সামনে যে আসে
চলে তারি পিছু পিছু।
বাঁধা তার পুরাতন চালটা,
নাই কোনো উলটা-পালটা,
নাই পরিবর্তন॥

রাজা। ওহে বিদেশী।

রাজপুত্র। কী রাজাসাহেব।

রাজা। কে তুমি।

রাজপুত্র। আমি সমুদ্রপারের দূত।

গোলাম। ভেট এনেছ কী।

রাজপুত্র। এদেশে সব চেয়ে যা দুর্লভ, তাই এনেছি।

গোলাম। সেটা কী শুনি।

রাজপুত্র। উৎপাত।

ছক্কা। শুনলে তো রাজাসাহেব, কথাটা তো শুনলে? লোকটা এগোতে চায়,

বললে বিশ্বাস করবে না, লোকটা হাসে। দুদিনে এখানকার হাওয়া দেবে হালকা করে।

গোলাম। এখানকার হাওয়া যেমন স্থির, যেমন ভারী, এমন কোনো গ্রহে নেই। ইন্দ্রের বিদ্যুৎ পর্যন্ত একে নাড়া দিতে পারে না, অন্যে পরে কা কথা।

সকলে। (একবাক্যে) অন্যে পরে কা কথা।

গোলাম। লঘুচিত্ত বিদেশী এই হাওয়াকে যদি হালকা করে তাহলে কী হবে।

রাজা। সেটা চিন্তার বিষয়।

সকলে। সেটা চিন্তার বিষয়।

গোলাম। হালকা হাওয়াতেই ঝড় আসে। ঝড় এলেই নিয়ম যায় উড়ে। তখন আমাদের পুরুত-ঠাকুর নহলা গোস্বামী পর্যন্ত বলতে শুরু করবেন, আমরা এগোব।

পঞ্জা। এমন-কি, ভগবান না করুন, হয়তো এখানে হাসিটা সংক্রামক হয়ে উঠবে।

রাজা। ওহে ইস্কাবনের গোলাম।

গোলাম। কী রাজাসাহেব।

রাজা। তুমি তো সম্পাদক।

গোলাম। আমি তাসদ্বীপপ্রদীপের সম্পাদক। আমি তাসদ্বীপের কৃষ্টির রক্ষক।

রাজা। কৃষ্টি! এটা কী জিনিস। মিষ্টি শোনাচ্ছে না তো।

গোলাম। না মহারাজ, এ মিষ্টিও নয়, স্পষ্টও নয়, কিন্তু যাকে বলে নতুন, নবতম অবদান। এই কৃষ্টি আজ বিপন্ন।

সকলে। কৃষ্টি, কৃষ্টি, কৃষ্টি।

রাজা। তোমার পত্রে সম্পাদকীয় স্তম্ভ আছে তো?

গোলাম। দুটো বড়ো বড়ো স্তম্ভ।

রাজা। সেই স্তম্ভের গর্জনে সবাইকে স্তম্ভিত করে দিতে হবে। এখানকার বায়ুকে লঘু করা সইব না।

গোলাম। বাধ্যতামূলক আইন চাই।

রাজা। ওটা আবার কী বললে! বাধ্যতামূলক আইন!

গোলাম। কানমলা আইনের নব্য ভাষা। এও নবতম অবদান।

রাজা। আচ্ছা, পরে হবে। বিদেশী, তোমার কোনো আবেদন আছে?

রাজপুত্র। আছে, কিন্তু তোমার কাছে নয়।

রাজা। কার কাছে।

রাজপুত্র। এই রাজকুমারীদের কাছে।

রাজা। আচ্ছা, বলো।

রাজপুত্র। গান

ওগো, শান্ত পাষাণমুরতি সুন্দরী,
চঞ্চলেরে হৃদয়তলে লও বরি।
কুঞ্জবনে এসো একা,
নয়নে অশ্রু দিক দেখা,
অরুণরাগে হোক রঞ্জিত
বিকশিত বেদনার মঞ্জরী।

রানী। এ কী অনিয়ম, এ কী অবিচার!

পঞ্জা। রাজাসাহেব, নির্বাসন, ওকে নির্বাসন!

রাজা। নির্বাসন! রানীবিবি, তোমার কী মত। চুপ ক'রে রইলে যে। শুনছ আমার কথা? একটা উত্তর দাও। কী বল, নির্বাসন তো?

রানী। না, নির্বাসন নয়।

টেক্কাকুমারীরা। (একে একে) না, নির্বাসন নয়।

রাজা। রানীবিবি, তোমাকে যেন কেমন-কেমন মনে হচ্ছে।

রানী। আমার নিজেরই মনে হচ্ছে কেমন-কেমন।

গোলাম। টেক্কাকুমারী, বিবিসুন্দরী, মনে রেখো, আমার হাতে সম্পাদকীয় স্তম্ভ।

সকলে। কৃষ্টি, কৃষ্টি, তাসদ্বীপের কৃষ্টি। বাঁচাও সেই কৃষ্টি।

গোলাম। জারি করো বাধ্যতামূলক আইন।

রাজা। অর্থাৎ?

গোলাম। কানমলা মোচড়ের আইন।

রাজা। বুঝেছি। রানীবিবি, তোমার কী মত। বাধ্যতামূলক আইন এবার তবে চালাই?

রানী। বাধ্যতামূলক আইন অন্দরমহলে আমরাও চালিয়ে থাকি— দেখব, কে দেয় কাকে নির্বাসন।

টেক্কাকুমারীরা। (সকলে) আমরা চালাব অবাধ্যতামূলক বে-আইন।

গোলাম। এ কী হল। হায় কৃষ্টি, হায় কৃষ্টি, হায় কৃষ্টি।

রাজা। সভা ভেঙে দিলুম। এখনি সবাই চলে এসো। আর এখানে থাকা নিরাপদ নয়। [তাসের দলের প্রস্থান

সদাগর। ভাই সাঙাত, এখানে তো আর সহ্য হচ্ছে না। এরা যে বিধাতার ব্যঙ্গ। এদের মধ্যে প'ড়ে আমরা শুদ্ধ মাটি হয়ে যাব।

রাজপুত্র। ভিতরে ভিতরে কী ঘটছে, সেটা কি তোমার চোখে পড়ে না। পুতুলের মধ্যে প্রথম প্রাণের সঞ্চার কি অনুভব করছ না। আমি তো শেষ পর্যন্ত না দেখে যাচ্ছি নে।

সদাগর। কিন্তু, এ যে জীবন্মৃতের খাঁচা, নিয়মের জারকরসে জীর্ণ এদের মন।

রাজপুত্র। ঐ দিকে চোখ মেলে দেখো দেখি।

সদাগর। তাই তো, বন্ধু, লেগেছে সমুদ্রপারের মন্ত্র। ইস্কাবনের নহলা গাছের তলায় পা ছড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে, দেখছি এখানকার নিয়ম গেল উড়ে।

রাজপুত্র। চিঁড়েতনীর পায়ের শব্দ শুনছে আকাশ থেকে। এ সময়ে বোধহয় আমাদের সঙ্গটা ওর পছন্দ হবে না। চলো, আমরা সরে যাই।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

প্রসাধনে রত ইস্কাবনী। টেক্কানীর প্রবেশ

টেক্কানী। গান

বলো, সখী, বলো তারি নাম
আমার কানে কানে
যে-নাম বাজে তোমার বীণার তানে তানে।
বসন্তবাতাসে বনবীথিকায়
সে-নাম মিলে যাবে,
বিরহী বিহঙ্গ-কলগীতিকায়
সে-নাম মদির হবে-যে বকুলঘ্রাণে।
নাহয় সখীদের মুখে মুখে
সে-নাম দোলা খাবে সকৌতুকে।
পূর্ণিমারাতে একা যবে
অকারণে মন উতলা হবে
সে-নাম শুনাইব গানে গানে॥

ইস্কাবনী। ভাই, এ কী হল বলো তো এই তাসের দেশে। ঐ বিদেশীরা কী খ্যাপামির হাওয়া নিয়ে এল। মনটা কেবলই টলমল করছে।

টেক্কানী। হাঁ, ভাই ইস্কাবনী, আর দু দিন আগে কে জানত তাসেরা আপন জাত খুইয়ে ঠিক যেন মানুষের মতো চালচলন ধরবে। ছী ছী, কী লজ্জা।

ইস্কাবনী। বলো তো, ভাই, মানুষপনা, এ-যে অনাচার। এ কিন্তু শুরু করেছে তোমাদের ঐ হরতনী। দেখিস নি? আজকাল ওর চলন ঠিক থাকে না, একেবারে হুবহু মানুষের ভঙ্গী। কার পাশে কখন দাঁড়াতে হবে তারও সমস্ত ভুল হয়ে যায়, পাড়ায় টী টী পড়ে গেছে। তাসের দেশের নাম ডোবালে।

চিঁড়েতনীর প্রবেশ

চিঁড়েতনী। কী গো টেক্কাঠাকরুন, শুনেছি, আমাদের নিন্দে রটিয়ে বেড়াচ্ছ। বলছ, আমরা আচার খুইয়ে, ওঠবার বেলায় বসি, বসবার বেলায় উঠি।

টেক্কানী। তা, সত্যি কথা বলেছি, দোষ হয়েছে কী। ঐ-যে তোমার গাল দুটি টুকটুক করছে, রঙ্গিনী, সে কোন্ রঙে। আর, ঐ-যে তোমার ভুরুর ভঙ্গিমা, ধার করেছ কোন্ বিদেশী অমাবস্যার কাজললতা থেকে। এটা তো সাতজন্মে তাসের দেশের শাস্তরে লেখে না। তুমি কি ভাব', এ কারো চোখে পড়ে না।

চিঁড়েতনী। মরে যাই! আর, তুমি যে তোমার ঐ সখীটিকে নিয়ে বকুলতলায় বসে দিনরাত কানে কানে ফিস্-ফিস্ করছ, এটাই কি তাসের দেশের শাস্ত্রে লেখে না কি। ওদিকে-যে গোলাম বেচারা তার জুড়ি পায় না, মরে হায়-হায় ক'রে।

ইস্কাবনী। আহা, গুরুঠাকরুন, উপদেশ দিতে হবে না। চুলে যে রাঙা ফিতেটা জড়িয়েছ ঐ ফিতে দিয়ে তাসের দেশের আচার বিচার গলায় দড়ি দিয়ে মরবে। এতবড়ো বেহায়াগিরি তাসরমণী হয়ে!

চিঁড়েতনী। তা, হয়েছে কী। আমি ভয় করি নে কাউকে, তোমাদের মতো লুকোচুরি আমার স্বভাব নয়। ঐ-যে তোমাদের দহলানী সেদিন আমাকে মানবী ব'লে টিট্‌কারী দিতে এসেছিল, আমি তাকে পষ্ট জবাব দিয়েছি, তোমাদের তাসিনী হয়ে মরে থাকার চেয়ে মানবী হতে পারলে বেঁচে যেতুম।

ইস্কাবনী। অত গুমোর কোরো না গো কোরো না— জান? তোমাকে জাতে ঠেলবে ব'লে কথা উঠেছে।

চিঁড়েতনী। তাসের জাত তো, আমি তা নিজের হাতে জলাঞ্জলি দিয়েছি, আমাকে ভয় দেখাবে কিসে।

ইস্কাবনী। সর্বনাশ! এমন ধাষ্টমির কথা তো সাত জন্মে শুনি নি। উনি ঢাক পিটিয়ে মানবী হতে চলেছেন। চল্ ভাই, টেক্কারানী, কে কোথা থেকে দেখবে, ওর সঙ্গে কথা কচ্ছি, আমাদের সুদ্ধ মজাবে।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

শ্রীমতী হরতনী টেক্কার প্রবেশ

হরতনী। গান

আমি ফুল তুলিতে এলেম বনে,
জানি নে কী ছিল মনে।
এ তো ফুল তোলা নয়, এ তো ফুল তোলা নয়,
বুঝি নে কী মনে হয়,
জল ভরে যায় দু নয়নে॥

রুইতনের সাহেবের প্রবেশ

রুইতন। এ কী, হরতনী, তুমি এখানে? খুঁজতে খুঁজতে বেলা হয়ে গেল যে।

হরতনী। কেন, কী হয়েছে, কী চাই।

রুইতন। তোমাকে ডাক পড়েছে রাজসভার গরাবুমগুলে।

হরতনী। বলো গে, আমি হারিয়ে গেছি।

রুইতন। হারিয়ে গেছ?

হরতনী। হাঁ, হারিয়ে গেছি, যাকে খুঁজছ তাকে আর খুঁজে পাবে না, কোনোদিনই।

রুইতন। এ কী কাণ্ড। এ কী দুঃসাহস। এই বনে এসেছ তুমি? জান না— নিয়ম নেই?

হরতনী। নিয়ম তো নেই, কিন্তু কার নিয়মে বর্ষাবিহীন তাসের দেশে আজ এমন ঘনঘটা। হঠাৎ সকালে উঠেই দেখি, নীল মেঘ আকাশ জুড়ে। এতদিন তোমাদের দেশের ময়ূর গুনে গুনে পা ফেলত, নাচত সাবধানে, আজ কেন এমন অনিয়মের নাচ নাচল, সমস্ত পেখম ছড়িয়ে দিয়ে।

রুইতন। কিন্তু, ঘর হতে যার আঙিনা বিদেশ, সেও আজ ফুল তুলতে বেরিয়েছে— এতবড়ো অদ্ভুত কাজ তোমার মাথায় এল কী করে।

হরতনী। হঠাৎ মনে হল, আমি মালিনী, আর-জন্মে ফুল তুলতেম। আজ পুবে হাওয়ায় সেই জন্মের ফুলবাগানের গন্ধ এল। সেই জন্মের মাধবীবন থেকে ভ্রমর এসেছে মনের মধ্যে।

গান

ঘরেতে ভ্রমর এল গুন্‌গুনিয়ে।
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে।
আলোতে কোন্ গগনে মাধবী জাগল বনে,
এল সেই ফুল-জাগানোর খবর নিয়ে।
সারাদিন সেই কথা সে যায় শুনিয়ে।
কেমনে রহি ঘরে, মন যে কেমন করে,
কেমনে কাটে যে দিন দিন গুনিয়ে।
কী মায়া দেয় বুলায়ে, দিল সব কাজ ভুলায়ে,
বেলা যায় গানের সুরে জাল বুনিয়ে॥

রুইতন। আচ্ছা, গরাবুমগুলের জন্তে বিবিসুন্দরীদের খুঁজে বেড়াচ্ছি, তারাও কি তবে—

হরতনী। হাঁ, তারাও এইখানেই, নদীর ধারে ধারে, গাছের তলায় তলায়।

রুইতন। কী করছে।

হরতনী। সাজ বদল করছে, আমারই মতো। কেমন দেখাচ্ছে। পছন্দ হয়?

রুইতন। মনে হচ্ছে, পর্দা খুলে গেছে, চাঁদের থেকে মেঘ গেছে সরে, একেবারে নতুন মানুষ।

হরতনী। তোমাদের ছক্কা পঞ্জা আমাদের শাসাবার জন্তে এসেছিলেন, তাঁদের কী দশা হয়েছে দেখো গে যাও।

রুইতন। কেন। কী হল।

হরতনী। খ্যাপার মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে, এমন কি গুন্-গুন্ করে গানও করছে।

রুইতন। গান! ছক্কা-পঞ্জার গান!

হরতনী। সুরে না হোক, বেসুরে। আমি তখন চুল বাঁধছিলুম। থাকতে পারলুম না, চলে আসতে হল।

রুইতন। আশ্চর্য করলে। চুল বাঁধা! এ বিদ্যে কে শেখালে।

হরতনী। কেউ না। ঐ দেখো-না, এবার হঠাৎ শুকনো ঝরনায় নামল বর্ষা। জলের ধারায় ধারায় শুরু হল বেণীবন্ধন। এ বিদ্যা কে শেখাল তাকে। চলো আমার সঙ্গে, ছক্কা-পঞ্জার গান শুনিয়ে দিই তোমাকে।

[প্রস্থান

বিবিদের প্রবেশ

বিবিরা। নাচ ও গান

অজানা সুর কে দিয়ে যায় কানে কানে,
ভাবনা আমার যায় ভেসে যায় গানে গানে।
বিস্মৃত জন্মের ছায়ালোকে
হারিয়ে-যাওয়া বীণার শোকে
কেঁদে ফিরে পথহারা রাগিণী।
কোন্ বসন্তের মিলনরাতে তারার পানে
ভাবনা আমার যায় ভেসে যায় গানে গানে॥

[প্রস্থান

রুইতন-হরতনীর পুনঃপ্রবেশ

রুইতন। দোষ দেব কাকে। আমারই গাইতে ইচ্ছা করছে।

হরতনী। দেখো, সম্পাদক যেন শুনতে না পায়, শূলে চড়াবে। সে দেখলুম ঘুরে বেড়াচ্ছে এই বনের খবর নিতে।

রুইতন। দেখো, হরতনী, ভয় কিন্তু আমার গেছে ঘুচে, কেন কী জানি। একটা কিছু হুকুম করো, তোমার জন্যে দুঃসাধ্য কিছু একটা করতে চাই।

হরতনী। আর যাই কর গান গেয়ো না, বনে জবা ফুটেছে, তুলে এনে দাও। ফুলের রস দিয়ে রাঙাব পায়ের তলা।

রুইতন। দেখো, সুন্দরী, আজ সকালে উঠেই বুঝেছি, আমাদের এই তাসজন্মটা স্বপ্ন। সেটা হঠাৎ ভাঙল। আমাদের আর-এক জন্ম বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। তারই বাণী আসছে মুখে, তারই গান শুনছি কানে। ঐ শোনো, ঐ শোনো, আমার সেই যুগের রচিত গান আকাশ থেকে ঐ কে বয়ে আনছে।

গান

তোমার পায়ের তলায় যেন গো রঙ লাগে,
আমার মনের বনের ফুলের রাঙা রাগে।

যেন আমার গানের তানে
তোমায় ভূষণ পরাই কানে,
যেন রক্তমণির হার গেঁথে দিই প্রাণের অনুরাগে ॥

হরতনী। এ গান কোনোদিন তুমিই বেঁধেছিলে, আর আমারই জন্যে? কেমন ক'রে বাঁধলে।

রুইতন। যেমন করে তুমি বাঁধলে বেণী।

হরতনী। আচ্ছা, মনে কি আসছে, তোমার গানে আমি নেচেছিলুম কোনো-একটা যুগে।

রুইতন। মনে আসছে, আসছে। এতদিন ভুলে ছিলুম কী করে তাই ভাবি।

গান

উতল হাওয়া লাগল আমার গানের তরণীতে।
দোলা লাগে, দোলা লাগে
তোমার চঞ্চল ঐ নাচের লহরীতে।
যদি কাটে রসি,
যদি হাল পড়ে খসি,
যদি ঢেউ উঠে উচ্ছ্বসি,
সম্মুখেতে মরণ যদি জাগে,
করি নে ভয়, নেবই তারে নেবই তারে জিতে ॥

রুইতন। দেখো হরতনী, মন ছট্‌ফটিয়ে উঠেছে যমরাজের সঙ্গে পাল্লা দিতে। আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি ছবি, তুমি পরিয়ে দিলে আমার কপালে জয়তিলক, আমি বেরলুম বন্দিনীকে উদ্ধার করতে, বন্ধ দুর্গের দ্বারে বাজালুম আমার ভেরী। কানে আসছে বিদায়কালে যে গান তুমি গেয়েছিলে।

গান

বিজয়মালা এনো আমার লাগি।
দীর্ঘ রাত্রি রইব আমি জাগি।
চরণ যখন পড়বে তোমার মরণকূলে
বুকের মধ্যে উঠবে আমার পরান দুলে,
সব যদি যায় হব তোমার সর্বনাশের ভাগী ॥

হরতনী। চলো চলো, বীর, মরণ পণ করে বেরিয়ে পড়ি দুজনে মিলে। দেখতে পাচ্ছি যে, সামনে কী যেন কালো পাথরের ভ্রূকুটি, ভেঙে চুরমার করতে হবে। ভেঙে মাথায় যদি পড়ে পড়ুক। পথ কাটতে হবে পাহাড়ের বুক ফাটিয়ে দিয়ে। কী করতে এসেছি এখানে। ছী ছী, কেন আছি এখানে। একী অর্থহীন দিন, কী প্রাণহীন রাত্রি। কী ব্যর্থতার আবর্তন মুহূর্তে মুহূর্তে।

রুইতন। সাহস আছে তোমার, সুন্দরী?

হরতনী। আছে, আছে।

রুইতন। অজানাকে ভয় করবে না?

হরতনী। না, করব না।

রুইতন। পা যাবে ক্ষতবিক্ষত হয়ে, পথ ফুরোতে চাইবে না।

হরতনী। কোন্ যুগে আমরা চলেছিলুম সেই দুর্গমে। রাত্রে ধরেছি মশাল তোমার সামনে, দিনে বয়েছি জয়ধ্বজা তোমার আগে আগে। আজ আর-একবার উঠে দাঁড়াও, ভাঙতে হবে এখানে এই অলসের বেড়া, এই নির্জীবের গণ্ডি, ঠেলে ফেলতে হবে এই-সব নিরর্থকের আবর্জনা।

রুইতন। ছিঁড়ে ফেলো আবরণ, টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলো। মুক্ত হও, শুভ্র হও, পূর্ণ হও।

[প্রস্থান

ছক্কা-পঞ্জার প্রবেশ

ছক্কা। ওহে পঞ্জা, কী হল বলো দেখি।

পঞ্জা। ভারি লজ্জা হচ্ছে নিজের দিকে তাকিয়ে। মূঢ়, মূঢ়! কী করছিলি এতদিন।

ছক্কা। এতদিন পরে কেন মনে প্রশ্ন জাগছে, এ-সমস্তর অর্থ কী।

পঞ্জা। ঐ-যে দহলা পণ্ডিত আসছেন, ওঁকে জিজ্ঞাসা করি।

দহলার প্রবেশ

ছক্কা। এতকাল যে-সব ওঠাপড়া-শোওয়াবসার কোটুকেনা নিয়ে দিন কাটাচ্ছিলুম তার অর্থ কী।

দহলা। চুপ।

ছক্কা-পঞ্জা। (উভয়ে) করব না চুপ।

দহলা। ভয় নেই?

ছক্কা-পঞ্জা। (উভয়ে) নেই ভয়, বলতে হবে অর্থ কী।

দহলা। অর্থ নেই— নিয়ম।

ছক্কা। নিয়ম যদি নাই মানি ?

দহলা। অধঃপাতে যাবে।

ছক্কা। যাব সেই অধঃপাতেই।

দহলা। কী করতে।

পঞ্জা। সেখানে যদি অগৌরব থাকে তার সঙ্গে লড়াই করতে।

দহলা। এ কেমন গোঁয়ারের কথা শান্তিপ্রিয় দেশে !

পঞ্জা। শান্তিভঙ্গ করব পণ করেছি।

হরতনীর প্রবেশ

দহলা। শুনছ, শ্রীমতী হরতনী ? এরা শান্তি ভাঙতে চায় আমাদের এই অতলস্পর্শ প্রশান্তমহাসাগরের ধারে।

হরতনী। আমাদের শান্তিটা বুড়ো গাছের মতো। পোকা লেগেছে ভিতরে ভিতরে, সেটা নির্জীব, তাকে কেটে ফেলা চাই।

দহলা। ছী ছী ছী ছী, এমন কথা তোমার মুখে বেরোল ! তুমি নারী, রক্ষা করবে শান্তি ; আমরা পুরুষ, রক্ষা করব কৃষ্টি।

হরতনী। অনেকদিন তোমরা আমাদের ভুলিয়েছ, পণ্ডিত। আর নয়, তোমাদের শান্তিরসে হিম হয়ে জমে গেছে আমাদের রক্ত, আর ভুলিয়ো না।

দহলা। সর্বনাশ ! কার কাছ থেকে পেলে এ-সব কথা।

হরতনী। মনে মনে তাকেই তো ডাকছি। আকাশে শুনতে পাচ্ছি তারই গান।

দহলা। সর্বনাশ। আকাশে গান ! এবার মজল তাসের দেশ। আর এখানে নয়।

[প্রস্থান

ছক্কা। সুন্দরী, তুমিই আমাদের পথ দেখাও।

পঞ্জা। অশান্তিমন্ত্র পেয়েছ তুমি, সেই মন্ত্র দাও আমাদের।

হরতনী। বিধাতার ধিক্কারের মধ্যে আছি আমরা, মূঢ়তার অপমানে। চলো, বেরিয়ে পড়ি।

ছক্কা। একটু নড়লেই যে ওরা দোষ ধরে, বলে 'অশুচি'।

হরতনী। দোষ হয় হোক, কিন্তু মরে থাকার মতো অশুচিতা নেই।

[প্রস্থান

ইস্কাবনী ও টেক্কানী ফুল তুলছে

টেক্কানী। ঐ-রে, দহলানী এসেছে। আর রক্ষে নেই।

দহলানীর প্রবেশ

দহলানী। লুকোচ্ছ কোথায়। কে গো, চেনা যায় না যে! এ-যে আমাদের টেক্কানী। আর, উনি কে, উনি যে আমাদের ইস্কাবনী। মরে যাই। কী ছিরি করেছ! মানুষ সেজেছ বুঝি? লজ্জা নেই?

টেক্কানী। সাজি নি, দৈবাৎ সাজ খসে পড়েছে।

দহলানী। তাসের দেশের বন্ধন আঁট বন্ধন— হাজার বছরের হাজার গিরে দেওয়া, খসে পড়ল? কাণ্ডটা ঘটল কী ক'রে।

ইস্কাবনী। একটা হাওয়া দিয়েছিল।

দহলানী। ওমা, কী বলো গো। তাসের দেশের হাওয়ায় বাঁধন ছেঁড়ে! আমাদের পবনদেবের নামে এত বড়ো বদনাম। বলি, এ কি ম্লেচ্ছ দেশ পেয়েছ, যেখানে একটু হাওয়া দিলেই গাছের শুকনো পাতা খসে উড়ে যায়।

ইস্কাবনী। স্বচক্ষেই দেখো-না, দিদি, কী বদল ঘটিয়েছেন আমাদের পবনদেব!

দহলানী। দেখো, ছোটো মুখে বড়ো কথা ভালো নয়। আমাদের সনাতন পবনদেব! তবে কিনা পুঁথিতে লিখছে তাঁর এক মহাবীর পুত্র আছেন, তিনি নাকি লম্বা লম্বা লম্ফ দিয়ে বেড়ান। হয়তো বা তিনিই ভর করেছেন তোমাদের 'পরে।

টেক্কানী। কেবল আমাদের খোঁটা দিচ্ছ কেন। এখনো চোখে বুঝি পড়ে নি? তিনি যে লম্ফ লাগিয়েছেন তাসের দেশময়। তাসিনীদের বুকে আগুন লাগিয়ে বেড়াচ্ছেন।

ইস্কাবনী। সাগরপারের মানুষরা বলছে, তিনিই নাকি ওদের পূর্বপুরুষ।

দহলানী। হতে পারে— ওরা লাফ-মারা বংশেরই সন্তান।

টেক্কানী। আচ্ছা, সত্যি কথা বলো, দিদি— ভিতরে ভিতরে তোমারও মন চঞ্চল হয়েছে? না, চুপ ক'রে থাকলে চলবে না।

দহলানী। কাউকে ব'লে দিবি নে তো?

টেক্কানী। তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, কাউকে বলব না।

দহলানী। কাল ভোর রাত্তিরের ঘুমে স্বপ্ন দেখলুম, হঠাৎ মানুষ হয়ে গেছি, নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছি ঠিক ওদেরই মতো। জেগে উঠে লজ্জায় মরি আর-কি। কিন্তু—

টেক্কানী। কিন্তু কী।

দহলানী। সে কথা থাক্ গে।

ইস্কাবনী। বুঝেছি, বুঝেছি, দিনের বেলাকার বাঁধা পাখি খোলা পেয়েছিল স্বপ্নে।

দহলানী। চুপ চুপ চুপ, নহলাপণ্ডিত শুনলে স্বপ্নেরও প্রায়শ্চিত্ত লাগিয়ে দেবে। ওটা পাপ যে। কিন্তু, স্বপ্নে কী ফুর্তি।

টেক্কানী। যা বলিস, ভাই, তাসের দেশে সাগরপারের হাওয়া দিয়েছে খুব জোরে। কিছু যেন ধরে রাখতে পারছি নে, সব দিচ্ছে উড়িয়ে।

দহলানী। তা হোক, এখনো কিন্তু কিছু উড়ল, কিছু রইল বাকি। মাথার ঘোমটা যদি বা খসল, পায়ের বাঁক-মল তো সোজা করতে পারল না।

ইস্কাবনী। সত্যি বলেছিস, মনটা সমুদ্রের এপারে ওপারে দোলাদুলি করছে। ঐ দেখ্-না, চিঁড়েতনীর মানুষ হবার অসহ্য শখ, পারে না, তাই মানুষের মুখোষ পরেছে— সেটা তাসমহলেরই কারখানাঘরে তৈরি। কী অদ্ভুত দেখতে হয়েছে।

দহলানী। আমাদের কাকে কী রকম দেখতে হয়েছে নিজেরা বুঝতেই পারি নে। গাছের আড়াল থেকে কাল শুনলুম, সদাগরের পুত্তুর বলছিল, এরা যে মানুষের সঙ সাজছে।

টেক্কানী। ওমা, কী লজ্জা। রাজপুত্তুর কী বললেন।

দহলানী। তিনি রেগে উঠে বললেন, সে তো ভালোই— সাজের ভিতর দিয়ে রুচি দেখা দিল। তিনি বললেন, এ দেখে হেসো না, হাসতে চাও তো যাও তাদের কাছে মানুষের মধ্যে যারা তাসের সঙ সেজে বেড়ায়।

ইস্কাবনী। ওমা, তাও কি ঘটে নাকি। মানুষ হয়ে তাসের নকল! আচ্ছা, কী করে তারা।

দহলানী। রাজপুত্তুর বলছিলেন, তারা রঙের কাঠি বুলোয় ঠোঁটে, কালো বাতি দিয়ে আঁকে ভুরু, আরো কত কী, আমাদের রঙ-করা তাসেদেরই মতো। সব চেয়ে মজার কথা, ওরা খুর-ওয়ালা চামড়া লাগায় পায়ের তলায়।

টেক্কানী। কেন।

দহলানী। পদোন্নতি ঘটে, মাটিতে পা পড়ে না। এ সমস্তই তাসের ঢঙ। এঁকে দেওয়া, সাজিয়ে দেওয়া কায়দা।

ইস্কাবনী। এ তো দেখি পবনদেবের উলটোপালটা খেলা— তাসীরা হতে চায় রঙ খসিয়ে মানুষ, মানুষ চায় রঙ মেখে তাসী হতে। আমি কিন্তু, ভাই, ঠিক করেছি, মানুষের মন্তর নেব রাজপুত্তুরের কাছে।

টেক্কানী। আমিও।

দহলানী। আমারও ইচ্ছে করে, কিন্তু ভয়ও করে। শুনেছি মানুষের দুঃখ ঢের, তাদের কোনো বালাই নেই।

ইস্কাবনী। দুঃখের কথা বলছিস, ভাই ? দুঃখ যে এখনি শুরু করেছে তার নৃত্য বুকের মধ্যে।

টেক্কানী। কিন্তু, সেই দুঃখের নেশা ছাড়তে চাই নে। থেকে থেকে চোখ জলে ভেসে যায়, কেন যে ভেবেই পাই নে।

গান

কেন নয়ন আপনি ভেসে যায়,
মন কেন এমন করে—
যেন সহসা কী কথা মনে পড়ে,
মনে পড়ে না গো, তবু মনে পড়ে।
যেন কাহার বচন দিয়েছে বেদন,
যেন কে চলে গিয়েছে অনাদরে—
বাজে তারি অযতন প্রাণের 'পরে।
যেন সহসা কী কথা মনে পড়ে,
মনে পড়ে না গো, তবু মনে পড়ে॥

ইস্কাবনী। পালাও পালাও, সম্পাদক আসছে। কাগজে যদি রটে যায় তাহলে মুখ দেখাতে পারব না।

দহলানী। ঐ-যে দলবল সবাই আসছে। বুড়োনিমতলায় আজ সভা বসবে। এখানে আর নয়।

[প্রস্থান

রাজাসাহেব প্রভৃতির প্রবেশ

রাজা। এ জায়গাটা কেমন ঠেকছে। ওটা কিসের গন্ধ।

পঞ্জা। কদম্বের।

রাজা। কদম্ব ! অদ্ভুত নাম। ওটা কী পাখি ডাকছে।

পঞ্জা। শুনেছি, ওকে বলে ঘুঘু।

রাজা। ঘুঘু! তাসের ভাষায় ওকে একটা ভদ্র নাম দাও, বলো বিনৃতি।— আজ তো কাজ করা দায় হয়েছে। আজ আকাশে কথা শোনা যাচ্ছে, বাতাসে সুর উঠেছে। অনেক কষ্টে মনকে শান্ত রেখেছি। রানীবিবিকে তো ঘরে রাখা শক্ত হল, নেচে

বেড়াচ্ছে ভূতে-পাওয়ার মতো। সভ্যগণ, তোমাদের আজ চেনা যায় না— সভার সাজ নেই, অত্যন্ত অসভ্যের মতো।

সকলে। দোষ নেই। ঢিলে হয়ে গেল আমাদের সাজ, আপনি পড়ল খসে— সেগুলো রাস্তায় রাস্তায় ছড়িয়ে আছে।

রাজা। সম্পাদক, তোমারও যেন গাম্ভীর্যহানি হয়েছে বলে বোধ হচ্ছে।

গোলাম। সকাল থেকে আছি বসে, পলাতকাদের নাম সংগ্রহ করার জন্যে। এখানকার হাওয়া লেগেছে। সম্পাদকীয় স্তম্ভ ভরাতে গিয়ে দেখি, লেখনী দিয়ে ছন্দ ঝরছে। শুনেছি, আধুনিক ডাক্তার এইরকম নিঃসারণকেই বলে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা।

রাজা। কী রকম, একটা নমুনা দেখি।

গোলাম।

যে দেশে বায়ু না মানে
বাধ্যতামূলক বিধি,
সে দেশে দহলা তত্ত্বনিধি
কেমনে করিবে রক্ষা কৃষ্টি—
সে দেশে নিশ্চিত অনাসৃষ্টি॥

রাজা। থাক্‌, আর প্রয়োজন নেই। এটা চতুর্থবর্গের পাঠ্য পুস্তকে চালিয়ে দিয়ো। তাসবংশীয় শিশুরা কণ্ঠস্থ করুক।

ছক্কা। রাজাসাহেব, তোমার চতুর্থবর্গের শিশুবিভাগের ছাত্র নই আমরা। আজ হঠাৎ মনে হচ্ছে, আমাদের বয়স হয়েছে। ও ছন্দ মনে লাগছে না।

পঞ্জা। ওগো বিদেশী, সমুদ্রের ওপারের ছন্দ আমাদের কানে দিতে পার?

রাজপুত্র। পারি, তবে শোনো।

গান

গগনে গগনে যায় হাঁকি
বিদ্যুৎবাণী বজ্রবাহিনী বৈশাখী,
স্পর্ধাবেগের ছন্দ জাগায়
বনস্পতির শাখাতে।
শূন্যমদের নেশায় মাতাল ধায় পাখি,
অচিন পথের ছন্দ উড়ায়
মুক্ত বেগের পাখাতে।

অন্তরতল মন্থন করে ছন্দে
সাদার কালোর দ্বন্দ্বে,
নানা ভালো নানা মন্দে,
নানা সোজা নানা বাঁকাতে।
ছন্দ নাচিল হোমবহ্নির তরঙ্গে,
মুক্তিরণের যোদ্ধ্‌বীরের ভ্রূভঙ্গে,
ছন্দ ছুটিল প্রলয়পথের
রুদ্ররথের চাকাতে॥

রাজা। কিছু বুঝলে তোমরা?

তাসের দল। কিছুই না।

রাজা। তবে?

তাসের দল। মন মেতে উঠল।

রাজা। সেটা তো ভালো নয়। আমাদের সনাতন শাস্ত্রের ছন্দ একটা শোনো:—

শান্ত যেই জন
যম তারে ঠেলে ঠেলে
নেড়েচেড়ে যায় ফেলে;
বলে, "মোর নাহি প্রয়োজন।"

শোনো বিদেশী।

রাজপুত্র। আদেশ করো।

রাজা। তোমরা যে তাসদ্বীপময় অস্থির হয়ে বেড়াচ্ছ— জলে দিচ্ছ ডুব, চড়ছ পাহাড়ের মাথায়, কুড়ুল হাতে বনে কাটছ পথ— এ-সব কেন।

রাজপুত্র। রাজাসাহেব, তোমরা যে কেবলই উঠছ বসছ, পাশ ফিরছ, পিঠ ফেরাচ্ছ, গড়াচ্ছ মাটিতে, সেই বা কেন।

রাজা। সে আমাদের নিয়ম।

রাজপুত্র। এ আমাদের ইচ্ছে।

রাজা। ইচ্ছে? কী সর্বনাশ! এই তাসের দেশে ইচ্ছে! বন্ধুগণ, তোমরা-সবাই কী বল।

ছক্কা-পঞ্জা। আমরা ওর কাছে ইচ্ছেমন্ত্র নিয়েছি।

রাজা। কী মন্ত্র।

ছক্কা-পঞ্জা। গান

।

সেই তো ভাঙছে, সেই তো গড়ছে,
সেই তো দিচ্ছে নিচ্ছে।
সেই তো আঘাত করছে তালায়,
সেই তো বাঁধন ছিঁড়ে পালায়,
বাঁধন পরতে সেই তো আবার ফিরছে॥

রাজা। যাও, যাও, এখান থেকে চলে যাও, শীঘ্র চলে যাও। হরতনী, কানে পৌঁছল না কথাটা? চিঁড়েতনী, দেখছ ওর ব্যবহারটা? হঠাৎ এমন হল কেন।

হরতনী। ইচ্ছে।

অন্য টেক্কারা। ইচ্ছে।

রাজা। ও কী রানীবিবি, তাড়াতাড়ি উঠে পড়লে যে।

রানী। আর বসে থাকতে পারছি নে।

রাজা। রানীবিবি, সন্দেহ হচ্ছে, তোমার মন বিচলিত হয়েছে।

রানী। সন্দেহ নেই, বিচলিত হয়েছে।

রাজা। জান? চাঞ্চল্য তাসের দেশে সব চেয়ে বড়ো অপরাধ।

রানী। জানি, আর এও জানি, এই অপরাধটাই সব চেয়ে বড়ো সম্ভোগের জিনিস।

রাজা। শাস্তির জিনিসকে তুমি বললে ভোগের জিনিস, তাসের দেশের ভাষাও ভুলে গেছ?

রানী। আমাদের তাসের দেশের ভাষায় শিকলকে বলে অলংকার, এ ভাষা ভোলবার সময় এসেছে।

রুইতন। হাঁ বিবিরানী, এদের ভাষায় জেলখানাকে বলে শ্বশুরবাড়ি।

রাজা। চুপ।

হরতনী। এরা হেঁয়ালিকে বলে শাস্তর।

রাজা। চুপ।

হরতনী। বোবাকে বলে সাধু।

রাজা। চুপ।

হরতনী। বোকাকে বলে পণ্ডিত।

রাজা। চুপ।

পঞ্জা। এরা মরাকে বলে বাঁচা।

রাজা। চুপ।

রানী। আর, স্বর্গকে বলে অপরাধ। বলো তোমরা, জয় ইচ্ছের জয়।

সকলে। জয় ইচ্ছের জয়।

রাজা। রানীবিবি, তোমার বনবাস!

রানী। বাঁচি তাহলে।

রাজা। নির্বাসন!— ও কী, চললে যে! কোথায় চললে।

রানী। নির্বাসনে।

রাজা। আমাকে ফেলে রেখে যাবে?

রানী। ফেলে রেখে যাব কেন।

রাজা। তবে?

রানী। সঙ্গে নিয়ে যাব তোমাকে।

রাজা। কোথায়।

রানী। নির্বাসনে।

রাজা। আর এরা, আমার প্রজারা?

সকলে। যাব নির্বাসনে।

রাজা। দহলাপণ্ডিত কী মনে করছ।

দহলা। নির্বাসনটা ভালোই মনে করছি।

রাজা। আর, তোমার পুঁথিগুলো?

দহলা। ভাসিয়ে দেব জলে।

রাজা। বাধ্যতামূলক আইন?

দহলা। আর চলবে না।

সকলে। চলবে না, চলবে না।

রানী। কোথায় গেল সেই মানুষরা।

রাজপুত্র। এই-যে আছি আমরা।

রানী। মানুষ হতে পারব আমরা?

রাজপুত্র। পারবে, নিশ্চয় পারবে।

রাজা। ওগো বিদেশী, আমিও কি পারব।

রাজপুত্র। সন্দেহ করি। কিন্তু, রানী আছেন তোমার সহায়। জয় রানীর।

সকলের গান

বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও,
বাঁধ ভেঙে দাও।
বন্দী প্রাণমন হোক উধাও।
শুকনো গাঙে আসুক
জীবনের বন্যার উদ্দাম কৌতুক;
ভাঙনের জয়গান গাও।
জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক,
যাক ভেসে যাক, যাক ভেসে যাক।
আমরা শুনেছি ঐ
মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ
কোন্ নূতনেরি ডাক।
ভয় করি না অজানারে,
রুদ্ধ তাহারি দ্বারে
দুর্দাড় বেগে ধাও।

শান্তিনিকেতন
১৪।১।৩৯

উপন্যাস ও গল্প

গল্পগুচ্ছ

গল্পগুচ্ছ

হালদারগোষ্ঠী

এই পরিবারটির মধ্যে কোনোরকমের গোল বাধিবার কোনো সংগত কারণ ছিল না। অবস্থাও সচ্ছল, মানুষগুলিও কেহই মন্দ নহে, কিন্তু তবুও গোল বাধিল।

কেননা, সংগত কারণেই যদি মানুষের সব-কিছু ঘটিত তবে তো লোকালয়টা একটা অঙ্কের খাতার মতো হইত, একটু সাবধানে চলিলেই হিসাবে কোথাও কোনো ভুল ঘটিত না; যদি বা ঘটিত সেটাকে রবার দিয়া মুছিয়া সংশোধন করিলেই চলিয়া যাইত।

কিন্তু, মানুষের ভাগ্যদেবতার রসবোধ আছে; গণিতশাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য আছে কিনা জানি না, কিন্তু অনুরাগ নাই; মানবজীবনের যোগবিয়োগের বিশুদ্ধ অঙ্কফলটি উদ্ধার করিতে তিনি মনোযোগ করেন না। এইজন্য তাঁহার ব্যবস্থার মধ্যে একটা পদার্থ তিনি সংযোগ করিয়াছেন, সেটা অসংগতি। যাহা হইতে পারিত সেটাকে সে হঠাৎ আসিয়া লণ্ডভণ্ড করিয়া দেয়। ইহাতেই নাট্যলীলা জমিয়া উঠে, সংসারের দুই কূল ছাপাইয়া হাসিকান্নার তুফান চলিতে থাকে।

এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল— যেখানে পদ্মবন সেখানে মত্তহস্তী আসিয়া উপস্থিত। পঙ্কের সঙ্গে পঙ্কজের একটা বিপরীত রকমের মাখামাখি হইয়া গেল; তা না হইলে এ গল্পটির সৃষ্টি হইতে পারিত না।

যে পরিবারের কথা উপস্থিত করিয়াছি তাহার মধ্যে সব চেয়ে যোগ্য মানুষ যে বনোয়ারিলাল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে নিজেও তাহা বিলক্ষণ জানে এবং সেইটেতেই তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। যোগ্যতা এঞ্জিনের স্টীমের মতো তাহাকে ভিতর হইতে ঠেলে; সামনে যদি সে রাস্তা পায় তো ভালোই, যদি না পায় তবে যাহা পায় তাহাকে ধাক্কা মারে।

তাহার বাপ মনোহরলালের ছিল সাবেককেলে বড়োমানুষি চাল। যে-সমাজ তাঁহার সেই সমাজের মাথাটিকেই আশ্রয় করিয়া তিনি তাহার শিরোভূষণ হইয়া থাকিবেন, এই তাঁহার ইচ্ছা। সুতরাং সমাজের হাত-পায়ের সঙ্গে তিনি কোনো সংস্রব রাখেন না। সাধারণ লোকে কাজকর্ম করে, চলে ফেরে; তিনি কাজ না-করিবার ও না-চলিবার বিপুল আয়োজনটির কেন্দ্রস্থলে ধ্রুব হইয়া বিরাজ করেন।

প্রায় দেখা যায়, এইপ্রকার লোকেরা বিনাচেষ্টায় আপনার কাছে অন্তত দুটি-একটি শক্ত এবং খাঁটি লোককে যেন চুম্বকের মতো টানিয়া আনেন। তাহার কারণ আর কিছু নয়, পৃথিবীতে একদল লোক জন্মায় সেবা করাই তাহাদের ধর্ম। তাহারা আপন প্রকৃতির চরিতার্থতার জন্যই এমন অক্ষম মানুষকে চায় যে-লোক নিজের ভার ষোলো-আনাই তাহাদের উপর ছাড়িয়া দিতে পারে। এই সহজ সেবকেরা নিজের কাজে কোনো সুখ পায় না, কিন্তু আর-একজনকে নিশ্চিন্ত করা, তাহাকে সম্পূর্ণ আরামে রাখা, তাহাকে সকলপ্রকার সংকট হইতে বাঁচাইয়া চলা, লোকসমাজে তাহার সম্মান-বৃদ্ধি করা, ইহাতেই তাহাদের পরম উৎসাহ। ইহারা যেন একপ্রকারের পুরুষ মা; তাহাও নিজের ছেলের নহে, পরের ছেলের।

মনোহরলালের যে চাকরটি আছে, রামচরণ, তাহার শরীররক্ষা ও শরীরপাতের একমাত্র লক্ষ্য বাবুর দেহ রক্ষা করা। যদি সে নিশ্বাস লইলে বাবুর নিশ্বাস লইবার প্রয়োজনটুকু বাঁচিয়া যায় তাহা হইলে সে অহোরাত্র কামারের হাপরের মতো হাঁপাইতে রাজি আছে। বাহিরের লোকে অনেক সময় ভাবে, মনোহরলাল বুঝি তাঁহার সেবককে অনাবশ্যক খাটাইয়া অন্যায় পীড়ন করিতেছেন। কেননা, হাত হইতে গুড়গুড়ির নলটা হয়তো মাটিতে পড়িয়াছে, সেটাকে তোলা কঠিন কাজ নহে, অথচ সেজন্য ডাক দিয়া অন্য ঘর হইতে রামচরণকে দৌড় করানো নিতান্ত বিসদৃশ বলিয়াই বোধ হয়; কিন্তু, এই সকল ভূরি ভূরি অনাবশ্যক ব্যাপারে নিজেকে অত্যাবশ্যক করিয়া তোলাতেই রামচরণের প্রভূত আনন্দ।

যেমন তাঁহার রামচরণ, তেমনি তাঁহার আর-একটি অনুচর নীলকণ্ঠ। বিষয়রক্ষার ভার এই নীলকণ্ঠের উপর। বাবুর প্রসাদপরিপুষ্ট রামচরণটি দিব্য সুচিক্কণ, কিন্তু নীলকণ্ঠের দেহে তাহার অস্থিকঙ্কালের উপর কোনো প্রকার আব্রু নাই বলিলেই হয়। বাবুর ঐশ্বর্যভাণ্ডারের দ্বারে সে মূর্তিমান দুর্ভিক্ষের মতো পাহারা দেয়। বিষয়টা মনোহরলালের কিন্তু তাহার মমতাটা সম্পূর্ণ নীলকণ্ঠের।

নীলকণ্ঠের সঙ্গে বনোয়ারিলালের খিটিমিটি অনেকদিন হইতে বাধিয়াছে। মনে করো, বাপের কাছে দরবার করিয়া বনোয়ারি বড়োবউয়ের জন্য একটা নূতন গহনা গড়াইবার হুকুম আদায় করিয়াছে। তাহার ইচ্ছা, টাকাটা বাহির করিয়া লইয়া নিজের মনোমত করিয়া জিনিসটা ফরমাশ করে। কিন্তু, সে হইবার জো নাই। খরচপত্রের সমস্ত কাজই নীলকণ্ঠের হাত দিয়াই হওয়া চাই। তাহার ফল হইল এই, গহনা হইল বটে, কিন্তু কাহারও মনের মতো হইল না। বনোয়ারির নিশ্চয় বিশ্বাস হইল, স্যাকরার সঙ্গে নীলকণ্ঠের ভাগবাটোয়ারা চলে। কড়া লোকের শত্রুর অভাব নাই। ঢের লোকের কাছে

বনোয়ারি ঐ কথাই শুনিয়া আসিয়াছে যে, নীলকণ্ঠ অন্যকে যে পরিমাণে বঞ্চিত করিতেছে নিজের ঘরে তাহার ততোধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে।

অথচ দুই পক্ষে এই-যে সব বিরোধ জমা হইয়া উঠিয়াছে তাহা সামান্য পাঁচ-দশ টাকা লইয়া। নীলকণ্ঠের বিষয়বুদ্ধির অভাব নাই— এ কথা তাহার পক্ষে বুঝা কঠিন নহে যে, বনোয়ারির সঙ্গে বনাইয়া চলিতে না পারিলে কোনো-না-কোনো দিন তাহার বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। কিন্তু, মনিবের ধন সম্বন্ধে নীলকণ্ঠের একটা কৃপণতার বায়ু আছে। সে যেটাকে অন্যায্য মনে করে মনিবের হুকুম পাইলেও কিছুতেই তাহা সে খরচ করিতে পারে না।

এদিকে বনোয়ারির প্রায়ই অন্যায্য খরচের প্রয়োজন ঘটিতেছে। পুরুষের অনেক অন্যায্য ব্যাপারের মূলে যে কারণ থাকে সেই কারণটি এখানেও খুব প্রবলভাবে বর্তমান। বনোয়ারির স্ত্রী কিরণলেখার সৌন্দর্য সম্বন্ধে নানা মত থাকিতে পারে, তাহা লইয়া আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। তাহার মধ্যে যে মতটি বনোয়ারির, বর্তমান প্রসঙ্গে একমাত্র সেইটেই কাজের। বস্তুত স্ত্রীর প্রতি বনোয়ারির মনের যে পরিমাণ টান সেটাকে বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা বাড়াবাড়ি বলিয়াই মনে করে। অর্থাৎ, তাহারা নিজের স্বামীর কাছ হইতে যতটা আদর চায় অথচ পায় না, ইহা ততটা।

কিরণলেখার বয়স যতই হউক চেহারা দেখিলে মনে হয় ছেলেমানুষটি। বাড়ির বড়োবউয়ের যেমনতর গিন্নিবান্নি ধরনের আকৃতি-প্রকৃতি হওয়া উচিত সে তাহার একেবারেই নহে। সবসুদ্ধ জড়াইয়া সে যেন বড়ো স্বল্প।

বনোয়ারি তাহাকে আদর করিয়া অণু বলিয়া ডাকিত। যখন তাহাতেও কুলাইত না তখন বলিত পরমাণু। রসায়নশাস্ত্রে যাঁহাদের বিচক্ষণতা আছে তাঁহারা জানেন, বিশ্বঘটনায় অণুপরমাণুগুলির শক্তি বড়ো কম নয়।

কিরণ কোনোদিন স্বামীর কাছে কিছুর জন্য আবদার করে নাই। তাহার এমন একটি উদাসীন ভাব, যেন তাহার বিশেষ কিছুতে প্রয়োজন নাই। বাড়িতে তাহার অনেক ঠাকুরঝি, অনেক ননদ; তাহাদিগকে লইয়া সর্বদাই তাহার সমস্ত মন ব্যাপৃত; নবযৌবনের নবজাগ্রত প্রেমের মধ্যে যে একটা নির্জন তপস্যা আছে তাহাতে তাহার তেমন প্রয়োজন-বোধ নাই। এইজন্য বনোয়ারির সঙ্গে ব্যবহারে তাহার বিশেষ একটা আগ্রহের লক্ষণ দেখা যায় না। যাহা সে বনোয়ারির কাছ হইতে পায় তাহা সে শান্তভাবে গ্রহণ করে, অগ্রসর হইয়া কিছু চায় না। তাহার ফল হইয়াছে এই যে, স্ত্রীটি কেমন করিয়া খুশি হইবে সেই কথা বনোয়ারিকে নিজে ভাবিয়া বাহির করিতে হয়। স্ত্রী যেখানে নিজের মুখে ফরমাশ করে সেখানে সেটাকে তর্ক করিয়া কিছু-না-কিছু খর্ব করা

সম্ভব হয়, কিন্তু নিজের সঙ্গে তো দর-কষাকষি চলে না। এমন স্থলে অযাচিত দানে যাচিত দানের চেয়ে খরচ বেশি পড়িয়া যায়।

তাহার পরে স্বামীর সোহাগের উপহার পাইয়া কিরণ যে কতখানি খুশি হইল তাহা ভালো করিয়া বুঝিবার জো নাই। এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে সে বলে— বেশ। ভালো। কিন্তু, বনোয়ারির মনের খটকা কিছুতেই মেটে না; ক্ষণে ক্ষণে তাহার মনে হয়, হয়তো পছন্দ হয় নাই। কিরণ স্বামীকে ঈষৎ ভর্ৎসনা করিয়া বলে, "তোমার ঐ স্বভাব! কেন এমন খুঁৎখুঁৎ করছ। কেন, এ তো বেশ হয়েছে।"

বনোয়ারি পাঠ্যপুস্তকে পড়িয়াছে— সন্তোষগুণটি মানুষের মহৎ গুণ। কিন্তু, স্ত্রীর স্বভাবে এই মহৎ গুণটি তাহাকে পীড়া দেয়। তাহার স্ত্রী তো তাহাকে কেবলমাত্র সন্তুষ্ট করে নাই, অভিভূত করিয়াছে, সেও স্ত্রীকে অভিভূত করিতে চায়। তাহার স্ত্রীকে তো বিশেষ কোনো চেষ্টা করিতে হয় না— যৌবনের লাবণ্য আপনি উছলিয়া পড়ে, সেবার নৈপুণ্য আপনি প্রকাশ হইতে থাকে; কিন্তু পুরুষের তো এমন সহজ সুযোগ নয়; পৌরুষের পরিচয় দিতে হইলে তাহাকে কিছু-একটা করিয়া তুলিতে হয়। তাহার যে বিশেষ একটা শক্তি আছে ইহা প্রমাণ করিতে না পারিলে পুরুষের ভালোবাসা ম্লান হইয়া থাকে। আর-কিছু না-ও যদি থাকে, ধন যে একটা শক্তির নিদর্শন, ময়ূরের পুচ্ছের মতো স্ত্রীর কাছে সেই ধনের সমস্ত বর্ণচ্ছটা বিস্তার করিতে পারিলে তাহাতে মন সান্ত্বনা পায়। নীলকণ্ঠ বনোয়ারির প্রেমনাট্যলীলার এই আয়োজনটাতে বারম্বার ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে। বনোয়ারি বাড়ির বড়োবাবু, তবু কিছুতে তাহার কর্তৃত্ব নাই, কর্তার প্রশ্রয় পাইয়া ভৃত্য হইয়া নীলকণ্ঠ তাহার উপরে আধিপত্য করে, ইহাতে বনোয়ারির যে অসুবিধা ও অপমান সেটা আর-কিছুর জন্য তত নহে যতটা পঞ্চশরের তূণে মনের মতো শর জোগাইবার অক্ষমতাবশত।

একদিন এই ধনসম্পদে তাহারই অবাধ অধিকার তো জন্মিবে। কিন্তু, যৌবন কি চিরদিন থাকিবে? বসন্তের রঙিন পেয়ালায় তখন এ সুধারস এমন করিয়া আপনা-আপনি ভরিয়া ভরিয়া উঠিবে না; টাকা তখন বিষয়ীর টাকা হইয়া খুব শক্ত হইয়া জমিবে, গিরিশিখরের তুষারসংঘাতের মতো; তাহাতে কথায় কথায় অসাবধানের অপব্যয়ের ঢেউ খেলিতে থাকিবে না। টাকার দরকার তো এখনই, যখন আনন্দে তাহা নয়-ছয় করিবার শক্তি নষ্ট হয় নাই।

বনোয়ারির প্রধান শখ তিনটি— কুস্তি, শিকার এবং সংস্কৃতচর্চা। তাহার খাতার মধ্যে সংস্কৃত উদ্ভটকবিতা একেবারে বোঝাই করা। বাদলার দিনে, জ্যোৎস্নারাত্রে, দক্ষিনা হাওয়ায় সেগুলি বড়ো কাজে লাগে। সুবিধা এই, নীলকণ্ঠ এই কবিতাগুলির

অলংকারবাহুল্যকে খর্ব করিতে পারে না। অতিশয়োক্তি যতই অতিশয় হউক, কোনো খাতাঞ্চি-সেরেস্তায় তাহার জন্য জবাবদিহি নাই। কিরণের কানের সোনায় কার্পণ্য ঘটে কিন্তু তাহার কানের কাছে যে মন্দাক্রান্তা গুঞ্জরিত হয় তাহার ছন্দে একটি মাত্রাও কম পড়ে না এবং তাহার ভাবে কোনো মাত্রা থাকে না বলিলেই হয়।

লম্বাচওড়া পালোয়ানের চেহারা বনোয়ারির। যখন সে রাগ করে তখন তাহার ভয়ে লোকে অস্থির। কিন্তু, এই জোয়ান লোকটির মনের ভিতরটা ভারি কোমল। তাহার ছোটো ভাই বংশীলাল যখন ছোটো ছিল তখন সে তাহাকে মাতৃস্নেহে লালন করিয়াছে। তাহার হৃদয়ে যেন একটি লালন করিবার ক্ষুধা আছে।

তাহার স্ত্রীকে সে যে ভালোবাসে তাহার সঙ্গে এই জিনিসটিও জড়িত, এই লালন করিবার ইচ্ছা। কিরণলেখা তরুচ্ছায়ার মধ্যে পথহারা রশ্মিরেখাটুকুর মতোই ছোটো, ছোটো বলিয়াই সে তাহার স্বামীর মনে ভারি একটা দরদ জাগাইয়া রাখিয়াছে; এই স্ত্রীকে বসনে ভূষণে নানারকম করিয়া সাজাইয়া দেখিতে তাহার বড়ো আগ্রহ। তাহা ভোগ করিবার আনন্দ নহে, তাহা রচনা করিবার আনন্দ; তাহা এককে বহু করিবার আনন্দ, কিরণলেখাকে নানা বর্ণে নানা আবরণে নানারকম করিয়া দেখিবার আনন্দ।

কিন্তু, কেবলমাত্র সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বনোয়ারির এই শখ কোনোমতেই মিটিতেছে না। তাহার নিজের মধ্যে একটি পুরুষোচিত প্রভুশক্তি আছে তাহাও প্রকাশ করিতে পারিল না, আর প্রেমের সামগ্রীকে নানা উপকরণে ঐশ্বর্যবান করিয়া তুলিবার যে ইচ্ছা তাহাও তার পূর্ণ হইতেছে না।

এমনি করিয়াই এই ধনীর সন্তান তাহার মানমর্যাদা, তাহার সুন্দরী স্ত্রী, তাহার ভরা যৌবন— সাধারণত লোকে যাহা কামনা করে তাহার সমস্ত লইয়াও সংসারে একদিন একটা উৎপাতের মতো হইয়া উঠিল।

·

সুখদা মধুকৈবর্তের স্ত্রী, মনোহরলালের প্রজা। সে একদিন অন্তঃপুরে আসিয়া কিরণলেখার পা জড়াইয়া ধরিয়া কান্না জুড়িয়া দিল। ব্যাপারটা এই— বছর কয়েক পূর্বে নদীতে বেড়জাল ফেলিবার আয়োজন-উপলক্ষ্যে অন্যান্য বারের মতো জেলেরা মিলিয়া একযোগে খৎ লিখিয়া মনোহরলালের কাছারিতে হাজার টাকা ধার লইয়াছিল। ভালোমতো মাছ পড়িলে সুদে আসলে টাকা শোধ করিয়া দিবার কোনো অসুবিধা ঘটে না; এইজন্য উচ্চ সুদের হারে টাকা লইতে ইহারা চিন্তামাত্র করে না। সে বৎসর তেমন মাছ পড়িল না এবং ঘটনাক্রমে উপরি উপরি তিন বৎসর নদীর বাঁকে মাছ এত কম আসিল যে, জেলেদের খরচ পোষাইল না, অধিকন্তু তাহারা ঋণের জালে বিপরীত রকম

জড়াইয়া পড়িল। যে-সকল জেলে ভিন্ন এলেকার, তাহাদের আর দেখা পাওয়া যায় না; কিন্তু, মধুকৈবর্ত ভিটাবাড়ির প্রজা, তাহার পলাইবার জো নাই বলিয়া সমস্ত দেনার দায় তাহার উপরেই চাপিয়াছে। সর্বনাশ হইতে রক্ষা পাইবার অনুরোধ লইয়া সে কিরণের শরণাপন্ন হইয়াছে। কিরণের শাশুড়ির কাছে গিয়া কোনো ফল নাই তাহা সকলেই জানে; কেননা নীলকণ্ঠের ব্যবস্থায় কেহ যে আঁচড়টুকু কাটিতে পারে, এ কথা তিনি কল্পনা করিতেও পারেন না। নীলকণ্ঠের প্রতি বনোয়ারির খুব একটা আক্রোশ আছে জানিয়াই মধুকৈবর্ত তাহার স্ত্রীকে কিরণের কাছে পাঠাইয়াছে।

বনোয়ারি যতই রাগ এবং যতই আস্ফালন করুক, কিরণ নিশ্চয় জানে যে, নীলকণ্ঠের কাজের উপর হস্তক্ষেপ করিবার কোনো অধিকার তাহার নাই। এইজন্য কিরণ সুখদাকে বার বার করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "বাছা, কী করব বলো। জানই তো এতে আমাদের কোনো হাত নেই। কর্তা আছেন, মধুকে বলো, তাঁকে গিয়ে ধরুক।"

সে চেষ্টা তো পূর্বেই হইয়াছে। মনোহরলালের কাছে কোনো বিষয়ে নালিশ উঠিলেই তিনি তাহার বিচারের ভার নীলকণ্ঠের 'পরেই অর্পণ করেন, কখনোই তাহার অন্যথা হয় না। ইহাতে বিচারপ্রার্থীর বিপদ আরো বাড়িয়া উঠে। দ্বিতীয়বার কেহ যদি তাঁহার কাছে আপীল করিতে চায় তাহা হইলে কর্তা রাগিয়া আগুন হইয়া উঠেন— বিষয়কর্মের বিরক্তিই যদি তাঁহাকে পোহাইতে হইল তবে বিষয় ভোগ করিয়া তাঁহার সুখ কী।

সুখদা যখন কিরণের কাছে কান্নাকাটি করিতেছে তখন পাশের ঘরে বসিয়া বনোয়ারি তাহার বন্দুকের চোঙে তেল মাখাইতেছিল। বনোয়ারি সব কথাই শুনিল। কিরণ করুণকণ্ঠে যে বার বার করিয়া বলিতেছিল যে, তাহারা ইহার কোনো প্রতিকার করিতে অক্ষম, সেটা বনোয়ারির বুকে শেলের মতো বিঁধিল।

সেদিন মাঘীপূর্ণিমা ফাল্গুনের আরম্ভে আসিয়া পড়িয়াছে। দিনের বেলাকার গুমট ভাঙিয়া সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ একটা পাগলা হাওয়া মাতিয়া উঠিল। কোকিল তো ডাকিয়া ডাকিয়া অস্থির; বারবার এক সুরের আঘাতে সে কোথাকার কোন্ ঔদাসীন্যকে বিচলিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। আর, আকাশে ফুলগন্ধের মেলা বসিয়াছে, যেন ঠেলাঠেলি ভিড়; জানলার ঠিক পাশেই অন্তঃপুরের বাগান হইতে মুচুকুন্দফুলের গন্ধ বসন্তের আকাশে নিবিড় নেশা ধরাইয়া দিল। কিরণ সেদিন লটকানের রঙ-করা একখানি শাড়ি এবং খোঁপায় বেলফুলের মালা পরিয়াছে। এই দম্পতির চিরনিয়ম-অনুসারে সেদিন বনোয়ারির জন্যও ফাল্গুন-ঋতুযাপনের উপযোগী একখানি লটকানে-

রঙিন চাদর ও বেলফুলের গড়েমালা প্রস্তুত। রাত্রির প্রথম প্রহর কাটিয়া গেল তবু বনোয়ারির দেখা নাই। যৌবনের ভরা পেয়ালাটি আজ তাহার কাছে কিছুতেই রুচিল না। প্রেমের বৈকুণ্ঠলোকে এতবড়ো কুণ্ঠা লইয়া সে প্রবেশ করিবে কেমন করিয়া। মধুকৈবর্তের দুঃখ দূর করিবার ক্ষমতা তাহার নাই, সে ক্ষমতা আছে নীলকণ্ঠের! এমন কাপুরুষের কণ্ঠে পরাইবার জন্য মালা কে গাঁথিয়াছে।

প্রথমেই সে তাহার বাহিরের ঘরে নীলকণ্ঠকে ডাকাইয়া আনিল এবং দেনার দায়ে মধুকৈবর্তকে নষ্ট করিতে নিষেধ করিল। নীলকণ্ঠ কহিল, মধুকে যদি প্রশ্রয় দেওয়া হয় তাহা হইলে এই তামাদির মুখে বিস্তর টাকা বাকি পড়িবে; সকলেই ওজর করিতে আরম্ভ করিবে। বনোয়ারি তর্কে যখন পারিল না তখন যাহা মুখে আসিল গাল দিতে লাগিল। বলিল, ছোটোলোক। নীলকণ্ঠ কহিল, "ছোটোলোক না হইলে বড়োলোকর শরণাপন্ন হইব কেন।" বলিল, চোর। নীলকণ্ঠ বলিল, "সে তো বটেই, ভগবান যাহাকে নিজের কিছুই দেন নাই, পরের ধনেই তো সে প্রাণ বাঁচায়।" সকল গালিই সে মাথায় করিয়া লইল; শেষকালে বলিল, "উকিলবাবু বসিয়া আছেন, তাঁহার সঙ্গে কাজের কথাটা সারিয়া লই। যদি দরকার বোধ করেন তো আবার আসিব।"

বনোয়ারি ছোটো ভাই বংশীকে নিজের দলে টানিয়া তখনই বাপের কাছে যাওয়া স্থির করিল। সে জানিত, একলা গেলে কোনো ফল হইবে না, কেননা, এই নীলকণ্ঠকে লইয়াই তাহার বাপের সঙ্গে পূর্বেই তাহার খিটিমিটি হইয়াছে। বাপ তাহার উপর বিরক্ত হইয়াই আছেন। একদিন ছিল যখন সকলেই মনে করিত মনোহরলাল তাঁহার বড়ো ছেলেকেই সব চেয়ে ভালোবাসেন। কিন্তু, এখন মনে হয়, বংশীর উপরেই তাঁহার পক্ষপাত। এইজন্যই বনোয়ারি বংশীকেও তাহার নালিশের পক্ষভুক্ত করিতে চাহিল।

বংশী, যাহাকে বলে, অত্যন্ত ভালো ছেলে। এই পরিবারের মধ্যে সে-ই কেবল দুটো এক্‌জামিন পাস করিয়াছে। এবার সে আইনের পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। দিনরাত জাগিয়া পড়া করিয়া করিয়া তাহার অন্তরের দিকে কিছু জমা হইতেছে কি না অন্তর্যামী জানেন কিন্তু শরীরের দিকে খরচ ছাড়া আর কিছুই নাই।

এই ফাল্গুনের সন্ধ্যায় তাহার ঘরে জানলা বন্ধ। ঋতুপরিবর্তনের সময়টাকে তাহার ভারি ভয়। হাওয়ার প্রতি তাহার শ্রদ্ধামাত্র নাই। টেবিলের উপর একটা কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বলিতেছে। কতক বই মেজের উপরে চৌকির পাশে রাশীকৃত, কতক টেবিলের উপরে; দেয়ালে কুলুঙ্গিতে কতকগুলি ঔষধের শিশি।

বনোয়ারির প্রস্তাবে সে কোনোমতেই সম্মত হইল না। বনোয়ারি রাগ করিয়া গর্জিয়া উঠিল, "তুই নীলকণ্ঠকে ভয় করিস!" বংশী তাহার কোনো উত্তর না দিয়া

চুপ করিয়া রহিল। বস্তুতই নীলকণ্ঠকে অনুকূল রাখিবার জন্য তাহার সর্বদাই চেষ্টা। সে প্রায় সমস্ত বৎসর কলিকাতার বাসাতেই কাটায়; সেখানে বরাদ্দ টাকার চেয়ে তাহার বেশি দরকার হইয়াই পড়ে। এই সূত্রে নীলকণ্ঠকে প্রসন্ন রাখাটা তাহার অভ্যস্ত।

বংশীকে ভীরু, কাপুরুষ, নীলকণ্ঠের চরণ-চারণ-চক্রবর্তী বলিয়া খুব একচোট গালি দিয়া বনোয়ারি একলাই বাপের কাছে গিয়া উপস্থিত। মনোহরলাল তাঁহাদের বাগানে দিঘির ঘাটে তাঁহার নধর শরীরটি উদ্ঘাটন করিয়া আরামে হাওয়া খাইতেছেন। পারিষদগণ কাছে বসিয়া কলিকাতার বারিস্টারের জেরায় জেলাকোর্টে অপর পল্লীর জমিদার অখিল মজুমদার যে কিরূপ নাকাল হইয়াছিল তাহারই কাহিনী কর্তাবাবুর শ্রুতিমধুর করিয়া রচনা করিতেছিল। সেদিন বসন্তসন্ধ্যার সুগন্ধ বায়ুসহযোগে সেই বৃত্তান্তটি তাঁহার কাছে অত্যন্ত রমণীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

হঠাৎ বনোয়ারি তাহার মাঝখানে পড়িয়া রসভঙ্গ করিয়া দিল। ভূমিকা করিয়া নিজের বক্তব্য কথাটা ধীরে ধীরে পাড়িবার মতো অবস্থা তাহার ছিল না। সে একেবারে গলা চড়াইয়া শুরু করিয়া দিল, নীলকণ্ঠের দ্বারা তাহাদের ক্ষতি হইতেছে। সে চোর, সে মনিবের টাকা ভাঙিয়া নিজের পেট ভরিতেছে। কথাটার কোনো প্রমাণ নাই এবং তাহা সত্যও নহে। নীলকণ্ঠের দ্বারা বিষয়ের উন্নতি হইয়াছে, এবং সে চুরিও করে না। বনোয়ারি মনে করিয়াছিল, নীলকণ্ঠের সংস্বভাবের প্রতি অটল বিশ্বাস আছে বলিয়াই কর্তা সকল বিষয়েই তাহার 'পরে এমন চোখ বুজিয়া নির্ভর করেন। এটা তাহার ভ্রম। মনোহরলালের মনে নিশ্চয় ধারণা যে নীলকণ্ঠ সুযোগ পাইলে চুরি করিয়া থাকে। কিন্তু, সেজন্য তাহার প্রতি তাঁহার কোনো অশ্রদ্ধা নাই। কারণ, আবহমানকাল এমনি ভাবেই সংসার চলিয়া আসিতেছে। অনুচরগণের চুরির উচ্ছিষ্টেই তো চিরকাল বড়োঘর পালিত। চুরি করিবার চাতুরী যাহার নাই, মনিবের বিষয়রক্ষা করিবার বুদ্ধিই বা তাহার জোগাইবে কোথা হইতে। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে দিয়া তো জমিদারির কাজ চলে না। মনোহর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, নীলকণ্ঠ কী করে না-করে সে কথা তোমাকে ভাবিতে হইবে না।" সেই সঙ্গে ইহাও বলিলেন, "দেখো দেখি, বংশীর তো কোনো বালাই নাই। সে কেমন পড়াশুনা করিতেছে। ঐ ছেলেটা তবু একটু মানুষের মতো।"

ইহার পরে অখিল মজুমদারের দুর্গতিকাহিনীতে আর রস জমিল না। সুতরাং, মনোহরলালের পক্ষে সেদিন বসন্তের বাতাস বৃথা বহিল এবং দিঘির কালো জলের উপর চাঁদের আলোর ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিবার কোনো উপযোগিতা রহিল না। সেদিন সন্ধ্যাটা

কেবল বৃথা হয় নাই বংশী এবং নীলকণ্ঠের কাছে। জানলা বন্ধ করিয়া বংশী অনেক রাত পর্যন্ত পড়িল এবং উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া নীলকণ্ঠ অর্ধেক রাত কাটাইয়া দিল।

কিরণ ঘরের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া জানলার কাছে বসিয়া। কাজকর্ম আজ সে সকাল-সকাল সারিয়া লইয়াছে। রাত্রের আহার বাকি, কিন্তু এখনো বনোয়ারি খায় নাই, তাই সে অপেক্ষা করিতেছে। মধু কৈবর্তের কথা তাহার মনেও নাই। বনোয়ারি যে মধুর দুঃখের কোনো প্রতিকার করিতে পারে না, এ সম্বন্ধে কিরণের মনে ক্ষোভের লেশমাত্র ছিল না। তাহার স্বামীর কাছ হইতে কোনো দিন সে কোনো বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় পাইবার জন্য উৎসুক নহে। পরিবারের গৌরবেই তাহার স্বামীর গৌরব। তাহার স্বামী তাহার শ্বশুরের বড়ো ছেলে, ইহার চেয়ে তাহাকে যে আরো বড়ো হইতে হইবে, এমন কথা কোনোদিন তাহার মনেও হয় নাই। ইহারা যে গোঁসাইগঞ্জের সুবিখ্যাত হালদার-বংশ!

বনোয়ারি অনেক রাত্রি পর্যন্ত বাহিরের বারাণ্ডায় পায়চারি সমাধা করিয়া ঘরে আসিল। সে ভুলিয়া গিয়াছে যে, তাহার খাওয়া হয় নাই। কিরণ যে তাহার অপেক্ষায় না-খাইয়া বসিয়া আছে এই ঘটনাটা সেদিন যেন তাহাকে বিশেষ করিয়া আঘাত করিল। কিরণের এই কষ্টস্বীকারের সঙ্গে তাহার নিজের অকর্মণ্যতা যেন খাপ খাইল না। অন্নের গ্রাস তাহার গলায় বাধিয়া যাইবার জো হইল। বনোয়ারি অত্যন্ত উত্তেজনার সহিত স্ত্রীকে বলিল, "যেমন করিয়া পারি মধুকৈবর্তকে আমি রক্ষা করিব।" কিরণ তাহার এই অনাবশ্যক উগ্রতায় বিস্মিত হইয়া কহিল, "শোনো একবার! তুমি তাহাকে বাঁচাইবে কেমন করিয়া।"

মধুর দেনা বনোয়ারি নিজে শোধ করিয়া দিবে এই তাহার পণ, কিন্তু বনোয়ারির হাতে কোনোদিন তো টাকা জমে না। স্থির করিল, তাহার তিনটে ভালো বন্দুকের মধ্যে একটা বন্দুক এবং একটা দামি হীরার আংটি বিক্রয় করিয়া সে অর্থ সংগ্রহ করিবে। কিন্তু, গ্রামে এ-সব জিনিসের উপযুক্ত মূল্য জুটিবে না এবং বিক্রয়ের চেষ্টা করিলে চারি দিকে লোকে কানাকানি করিবে। এইজন্য কোনো একটা ছুতা করিয়া বনোয়ারি কলিকাতায় চলিয়া গেল। যাইবার সময় মধুকে ডাকিয়া আশ্বাস দিয়া গেল, তাহার কোনো ভয় নাই।

এদিকে বনোয়ারির শরণাপন্ন হইয়াছে বুঝিয়া, নীলকণ্ঠ মধুর উপরে রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিয়াছে। পেয়াদার উৎপীড়নে কৈবর্তপাড়ার আর মানসম্ভ্রম থাকে না।

কলিকাতা হইতে বনোয়ারি যেদিন ফিরিয়া আসিল সেই দিনই মধুর ছেলে স্বরূপ

হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া একেবারে বনোয়ারির পা জড়াইয়া ধরিয়া হাউহাউ করিয়া কান্না জুড়িয়া দিল। "কী রে কী, ব্যাপারখানা কী।" স্বরূপ বলিল তাহার বাপকে নীলকণ্ঠ কাল রাত্রি হইতে কাছারিতে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বনোয়ারির সর্বশরীর রাগে কাঁপিতে লাগিল। কহিল, "এখনি গিয়া থানায় খবর দিয়া আয় গে।"

কী সর্বনাশ! থানায় খবর! নীলকণ্ঠের বিরুদ্ধে! তাহার পা উঠিতে চায় না। শেষকালে বনোয়ারির তাড়নায় থানায় গিয়া সে খবর দিল। পুলিশ হঠাৎ কাছারিতে আসিয়া বন্ধনদশা হইতে মধুকে খালাস করিল এবং নীলকণ্ঠ ও কাছারির কয়েকজন পেয়াদাকে আসামী করিয়া ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে চালান করিয়া দিল।

মনোহর বিষম ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মকদ্দমার মন্ত্রীরা ঘুষের উপলক্ষ্য করিয়া পুলিসের সঙ্গে ভাগ করিয়া টাকা লুটিতে লাগিল। কলিকাতা হইতে এক বারিস্টার আসিল, সে একেবারে কাঁচা, নূতন পাস করা। সুবিধা এই, যত ফি তাহার নামে খাতায় খরচ পড়ে তত ফি তাহার পকেটে উঠে না। ওদিকে মধুকৈবর্তের পক্ষে জেলা-আদালতের একজন মাতব্বর উকিল নিযুক্ত হইল। কে যে তাহার খরচ জোগাইতেছে বোঝা গেল না। নীলকণ্ঠের ছয় মাস মেয়াদ হইল। হাইকোর্টের আপিলেও তাহাই বহাল রহিল।

ঘড়ি এবং বন্দুকটা যে উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে তাহা ব্যর্থ হইল না— আপাতত মধু বাঁচিয়া গেল এবং নীলকণ্ঠের জেল হইল। কিন্তু, এই ঘটনার পরে মধু তাহার ভিটায় টিঁকিবে কী করিয়া? বনোয়ারি তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, "তুই থাক্, তোর কোনো ভয় নাই।" কিসের জোরে যে আশ্বাস দিল তাহা সেই জানে— বোধ করি, নিছক নিজের পৌরুষের স্পর্ধায়।

বনোয়ারি যে এই ব্যাপারের মূলে আছে তাহা সে লুকাইয়া রাখিতে বিশেষ চেষ্টা করে নাই। কথাটা প্রকাশ হইল ; এমন-কি কর্তার কানেও গেল। তিনি চাকরকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "বনোয়ারি যেন কদাচ আমার সম্মুখে না আসে।" বনোয়ারি পিতার আদেশ অমান্য করিল না।

কিরণ তাহার স্বামীর ব্যবহার দেখিয়া অবাক। এ কী কাণ্ড। বাড়ির বড়োবাবু— বাপের সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ! তার উপরে নিজেদের আমলাকে জেলে পাঠাইয়া বিশ্বের লোকের কাছে নিজের পরিবারের মাথা হেঁট করিয়া দেওয়া! তাও এই এক সামান্য মধুকৈবর্তকে লইয়া।

অদ্ভুত বটে! এ বংশে কতকাল ধরিয়া কত বড়োবাবু জন্মিয়াছে এবং কোনোদিন নীলকণ্ঠেরও অভাব নাই। নীলকণ্ঠেরা বিষয়ব্যবস্থার সমস্ত দায় নিজেরা লইয়াছে আর

বড়োবাবুরা সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্টভাবে বংশগৌরব রক্ষা করিয়াছে। এমন বিপরীত ব্যাপার তো কোনোদিন ঘটে নাই।

আজ এই পরিবারের বড়োবাবুর পদের অবনতি ঘটাতে বড়োবউয়ের সম্মানে আঘাত লাগিল। ইহাতে এতদিন পরে আজ স্বামীর প্রতি কিরণের যথার্থ অশ্রদ্ধার কারণ ঘটিল। এতদিন পরে তাহার বসন্তকালের লট্‌কানে রঙের শাড়ি এবং খোঁপার বেলফুলের মালা লজ্জায় ম্লান হইয়া গেল।

কিরণের বয়স হইয়াছে অথচ সন্তান হয় নাই। এই নীলকণ্ঠই একদিন কর্তার মত করাইয়া পাত্রী দেখিয়া বনোয়ারির আর-একটি বিবাহ প্রায় পাকাপাকি স্থির করিয়াছিল। বনোয়ারি হালদারবংশের বড়ো ছেলে, সকল কথায় আগে এ কথা তো মনে রাখিতে হইবে। সে অপুত্রক থাকিবে, ইহা তো হইতেই পারে না। এই ব্যাপারে কিরণের বুক দুরুদুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু, ইহা সে মনে মনে না স্বীকার করিয়া থাকিতে পারে নাই যে, কথাটা সংগত। তখনো সে নীলকণ্ঠের উপরে কিছুমাত্র রাগ করে নাই, সে নিজের ভাগ্যকেই দোষ দিয়াছে। তাহার স্বামী যদি নীলকণ্ঠকে রাগিয়া মারিতে না যাইত এবং বিবাহসম্বন্ধ ভাঙিয়া দিয়া পিতামাতার সঙ্গে রাগারাগি না করিত তবে কিরণ সেটাকে অন্যায় মনে করিত না। এমন-কি, বনোয়ারি যে তাহার বংশের কথা ভাবিল না, ইহাতে অতি গোপনে কিরণের মনে বনোয়ারির পৌরুষের প্রতি একটু অশ্রদ্ধাই হইয়াছিল। বড়ো ঘরের দাবি কি সামান্য দাবি। তাহার যে নিষ্ঠুর হইবার অধিকার আছে। তাহার কাছে কোনো তরুণী স্ত্রীর কিম্বা কোনো দুঃখী কৈবর্তের সুখদুঃখের কতটুকুই বা মূল্য।

সাধারণত যাহা ঘটিয়া থাকে এক-একবার তাহা না ঘটিলে কেহই তাহা ক্ষমা করিতে পারে না, এ কথা বনোয়ারি কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। সম্পূর্ণরূপে এ বাড়ির বড়োবাবু হওয়াই তাহার উচিত ছিল; অন্য কোনো প্রকারের উচিত-অনুচিত চিন্তা করিয়া এখানকার ধারাবাহিকতা নষ্ট করা যে তাহার অকর্তব্য, তাহা সে ছাড়া সকলেরই কাছে অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

এ লইয়া কিরণ তাহার দেবরের কাছে কত দুঃখই করিয়াছে। বংশী বুদ্ধিমান; তাহার খাওয়া হজম হয় না এবং একটু হাওয়া লাগিলেই সে হাঁচিয়া কাশিয়া অস্থির হইয়া উঠে, কিন্তু সে স্থির ধীর বিচক্ষণ। সে তাহার আইনের বইয়ের যে অধ্যায়টি পড়িতেছিল সেইটেকে টেবিলের উপর খোলা অবস্থায় উপুড় করিয়া রাখিয়া কিরণকে বলিল, "এ পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নহে।" কিরণ অত্যন্ত উদ্‌বেগের সহিত মাথা নাড়িয়া কহিল, "জান তো, ঠাকুরপো? তোমার দাদা যখন ভালো আছেন তখন বেশ

আছেন, কিন্তু একবার যদি খ্যাপেন তবে তাঁহাকে কেহ সামলাইতে পারে না। আমি কী করি বলো তো।"

পরিবারের সকল প্রকৃতিস্থ লোকের সঙ্গেই যখন কিরণের মতের সম্পূর্ণ মিল হইল, তখন সেইটেই বনোয়ারির বুকে সকলের চেয়ে বাজিল। এই একটুখানি স্ত্রীলোক, অনতিস্ফুট চাঁপাফুলটির মতো পেলব, ইহার হৃদয়টিকে আপন বেদনার কাছে টানিয়া আনিতে পুরুষের সমস্ত শক্তি পরাস্ত হইল। আজকের দিনে কিরণ যদি বনোয়ারির সহিত সম্পূর্ণ মিলিতে পারিত তবে তাহার হৃদয়ক্ষত দেখিতে দেখিতে এমন করিয়া বাড়িয়া উঠিত না।

মধুকে রক্ষা করিতে হইবে এই অতি সহজ কর্তব্যের কথাটা, চারি দিক হইতে তাড়নার চোটে, বনোয়ারির পক্ষে সত্য-সত্যই একটা খ্যাপামির ব্যাপার হইয়া উঠিল। ইহার তুলনায় অন্য সমস্ত কথাই তাহার কাছে তুচ্ছ হইয়া গেল। এদিকে জেল হইতে নীলকণ্ঠ এমন সুস্থভাবে ফিরিয়া আসিল যেন সে জামাইষষ্ঠীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিল। আবার সে যথারীতি অম্লানবদনে আপনার কাজে লাগিয়া গেল।

মধুকে ভিটাছাড়া করিতে না পারিলে প্রজাদের কাছে নীলকণ্ঠের মান রক্ষা হয় না। মানের জন্য সে বেশি কিছু ভাবে না, কিন্তু প্রজারা তাহাকে না মানিলে তাহার কাজ চলিবে না, এইজন্যই তাহাকে সাবধান হইতে হয়। তাই মধুকে তৃণের মতো উৎপাটিত করিবার জন্য তাহার নিড়ানিতে শান দেওয়া শুরু হইল।

এবার বনোয়ারি আর গোপনে রহিল না। এবার সে নীলকণ্ঠকে স্পষ্টই জানাইয়া দিল যে, যেমন করিয়া হউক মধুকে উচ্ছেদ হইতে সে দিবে না। প্রথমত, মধুর দেনা সে নিজে হইতে সমস্ত শোধ করিয়া দিল; তাহার পরে আর-কোনো উপায় না দেখিয়া সে নিজে গিয়া ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাইয়া আসিল যে, নীলকণ্ঠ অন্যায় করিয়া মধুকে বিপদে ফেলিবার উদ্‌যোগ করিতেছে।

হিতৈষীরা বনোয়ারিকে সকলেই বুঝাইল, যেরূপ কাণ্ড ঘটিতেছে তাহাতে কোন্‌দিন মনোহর তাহাকে ত্যাগ করিবে। ত্যাগ করিতে গেলে যে-সব উৎপাত পোহাইতে হয় তাহা যদি না থাকিত তবে এতদিনে মনোহর তাহাকে বিদায় করিয়া দিত। কিন্তু, বনোয়ারির মা আছেন এবং আত্মীয়স্বজনের নানা লোকের নানাপ্রকার মত, এই লইয়া একটা গোলমাল বাধাইয়া তুলিতে তিনি অত্যন্ত অনিচ্ছুক বলিয়াই এখনো মনোহর চুপ করিয়া আছেন।

এমনি হইতে হইতে একদিন সকালে হঠাৎ দেখা গেল, মধুর ঘরে তালা বন্ধ। রাতারাতি সে যে কোথায় গিয়াছে তাহার খবর নাই। ব্যাপারটা নিতান্ত অশোভন

হইতেছে দেখিয়া নীলকণ্ঠ জমিদার-সরকার হইতে টাকা দিয়া তাহাকে সপরিবারে কাশী পাঠাইয়া দিয়াছে। পুলিশ তাহা জানে, এজন্য কোনো গোলমাল হইল না। অথচ নীলকণ্ঠ কৌশলে গুজব রটাইয়া দিল যে, মধুকে তাহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-সমেত অমাবস্যা-রাত্রে কালীর কাছে বলি দিয়া মৃতদেহগুলি ছালায় পুরিয়া মাঝগঙ্গায় ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভয়ে সকলের শরীর শিহরিয়া উঠিল এবং নীলকণ্ঠের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা পূর্বের চেয়ে অনেক পরিমাণে বাড়িয়া গেল।

বনোয়ারি যাহা লইয়া মাতিয়া ছিল উপস্থিতমতো তাহার শান্তি হইল। কিন্তু, সংসারটি তাহার কাছে আর পূর্বের মতো রহিল না।

বংশীকে একদিন বনোয়ারি অত্যন্ত ভালোবাসিত; আজ দেখিল, বংশী তাহার কেহ নহে, সে হালদারগোষ্ঠীর। আর, তাহার কিরণ, যাহার ধ্যানরূপটি যৌবনারম্ভের পূর্ব হইতেই ক্রমে ক্রমে তাহার হৃদয়ের লতাবিতানটিকে জড়াইয়া জড়াইয়া আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, সেও সম্পূর্ণ তাহার নহে, সেও হালদারগোষ্ঠীর। একদিন ছিল, যখন নীলকণ্ঠের ফরমাশে-গড়া গহনা তাহার এই হৃদয়বিহারিণী কিরণের গায়ে ঠিকমতো মানাইত না বলিয়া বনোয়ারি খুঁৎখুঁৎ করিত। আজ দেখিল, কালিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া অমরু ও চৌর কবির যে-সমস্ত কবিতার সোহাগে সে প্রেয়সীকে মণ্ডিত করিয়া আসিয়াছে আজ তাহা এই হালদারগোষ্ঠীর বড়োবউকে কিছুতেই মানাইতেছে না।

হায় রে, বসন্তের হাওয়া তবু বহে, রাত্রে শ্রাবণের বর্ষণ তবু মুখরিত হইয়া উঠে এবং অতৃপ্ত প্রেমের বেদনা শূন্য হৃদয়ের পথে পথে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়ায়।

প্রেমের নিবিড়তায় সকলের তো প্রয়োজন নাই; সংসারের ছোটো কুন্‌কের মাপের বাঁধা বরাদ্দে অধিকাংশ লোকের বেশ চলিয়া যায়। সেই পরিমিত ব্যবস্থায় বৃহৎ সংসারে কোনো উৎপাত ঘটে না। কিন্তু, এক-একজনের ইহাতে কুলায় না। তাহারা অজাত পক্ষীশাবকের মতো কেবলমাত্র ডিমের ভিতরকার সংকীর্ণ খাদ্যরসটুকু লইয়া বাঁচে না, তাহারা ডিম ভাঙিয়া বাহির হইয়াছে, নিজের শক্তিতে খাদ্য আহরণের বৃহৎ ক্ষেত্র তাহাদের চাই। বনোয়ারি সেই ক্ষুধা লইয়া জন্মিয়াছে, নিজের প্রেমকে নিজের পৌরুষের দ্বারা সার্থক করিবার জন্য তাহার চিত্ত উৎসুক, কিন্তু যেদিকেই সে ছুটিতে চায় সেইদিকেই হালদারগোষ্ঠীর পাকা ভিত; নড়িতে গেলেই তাহার মাথা ঠুকিয়া যায়।

দিন আবার পূর্বের মতো কাটিতে লাগিল। আগের চেয়ে বনোয়ারি শিকারে বেশি মন দিয়াছে, ইহা ছাড়া বাহিরের দিক হইতে তাহার জীবনে আর বিশেষ কিছু পরিবর্তন দেখা গেল না। অন্তঃপুরে সে আহার করিতে যায়, আহারের পর স্ত্রীর সঙ্গে যথাপরিমাণে বাক্যালাপও হয়। মধুকৈবর্তকে কিরণ আজও ক্ষমা করে নাই, কেননা,

এই পরিবারে তাহার স্বামী যে আপন প্রতিষ্ঠা হারাইয়াছে তাহার মূল কারণ মধু। এইজন্য ক্ষণে ক্ষণে কেমন করিয়া সেই মধুর কথা অত্যন্ত তীব্র হইয়া কিরণের মুখে আসিয়া পড়ে। মধুর যে হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি, সে যে শয়তানের অগ্রগণ্য, এবং মধুকে দয়া করাটা যে নিতান্তই একটা ঠকা, এ কথা বার বার বিস্তারিত করিয়াও কিছুতে তাহার শান্তি হয় না। বনোয়ারি প্রথম দুই-একদিন প্রতিবাদের চেষ্টা করিয়া কিরণের উত্তেজনা প্রবল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার পর হইতে সে কিছুমাত্র প্রতিবাদ করে না। এমনি করিয়া বনোয়ারি তাহার নিয়মিত গৃহধর্ম রক্ষা করিতেছে; কিরণ ইহাতে কোনো অভাব-অসম্পূর্ণতা অনুভব করে না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে বনোয়ারির জীবনটা বিবর্ণ, বিরস এবং চির-অভুক্ত।

এমন সময় জানা গেল, বাড়ির ছোটো বউ, বংশীর স্ত্রী গর্ভিণী। সমস্ত পরিবার আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিরণের দ্বারা এই মহদ্‌বংশের প্রতি যে কর্তব্যের ত্রুটি হইয়াছিল, এতদিন পরে তাহা পূরণের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে; এখন ষষ্ঠীর কৃপায় কন্যা না হইয়া পুত্র হইলে রক্ষা।

পুত্রই জন্মিল। ছোটোবাবু কলেজের পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ, বংশের পরীক্ষাতেও প্রথম মার্ক পাইল। তাহার আদর উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছিল, এখন তাহার আদরের সীমা রহিল না।

সকলে মিলিয়া এই ছেলেটিকে লইয়া পড়িল। কিরণ তো তাহাকে এক মুহূর্ত কোল হইতে নামাইতে চায় না। তাহার এমন অবস্থা যে, মধুকৈবর্তের স্বভাবের কুটিলতার কথাও সে প্রায় বিস্মৃত হইবার জো হইল।

বনোয়ারির ছেলে-ভালোবাসা অত্যন্ত প্রবল। যাহা কিছু ছোটো, অক্ষম, সুকুমার, তাহার প্রতি তাহার গভীর স্নেহ এবং করুণা। সকল মানুষেরই প্রকৃতির মধ্যে বিধাতা এমন একটা-কিছু দেন যাহা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ; নহিলে বনোয়ারি যে কেমন করিয়া পাখি শিকার করিতে পারে বোঝা যায় না।

কিরণের কোলে একটি শিশুর উদয় দেখিবে, এই ইচ্ছা বনোয়ারির মনে বহুকাল হইতে অতৃপ্ত হইয়া আছে। এইজন্য বংশীর ছেলে হইলে প্রথমটা তাহার মনে একটু ঈর্ষার বেদনা জন্মিয়াছিল, কিন্তু সেটাকে দূর করিয়া দিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই। এই শিশুটিকে বনোয়ারি খুবই ভালোবাসিতে পারিত, কিন্তু ব্যাঘাতের কারণ হইল এই যে, যত দিন যাইতে লাগিল কিরণ তাহাকে লইয়া অত্যন্ত বেশি ব্যাপৃত হইয়া পড়িল। স্ত্রীর সঙ্গে বনোয়ারির মিলনে বিস্তর ফাঁক পড়িতে লাগিল। বনোয়ারি স্পষ্টই বুঝিতে পারিল, এতদিন পরে কিরণ এমন একটা কিছু পাইয়াছে যাহা তাহার হৃদয়কে সত্যসত্যই পূর্ণ

করিতে পারে। বনোয়ারি যেন তাহার স্ত্রীর হৃদয়হর্ম্যের একজন ভাড়াটে, যতদিন বাড়ির কর্তা অনুপস্থিত ছিল ততদিন সমস্ত বাড়িটা সে ভোগ করিত, কেহ বাধা দিত না, এখন গৃহস্বামী আসিয়াছে তাই ভাড়াটে সব ছাড়িয়া তাহার কোণের ঘরটি মাত্র দখল করিতে অধিকারী। কিরণ স্নেহে যে কতদূর তন্ময় হইতে পারে, তাহার আত্ম-বিসর্জনের শক্তি যে কত প্রবল, তাহা বনোয়ারি যখন দেখিল তখন তাহার মন মাথা নাড়িয়া বলিল, 'এই হৃদয়কে আমি তো জাগাইতে পারি নাই, অথচ আমার যাহা সাধ্য তাহা তো করিয়াছি।'

শুধু তাই নয়, এই ছেলেটির সূত্রে বংশীর ঘরই যেন কিরণের কাছে বেশি আপন হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সমস্ত মন্ত্রণা আলোচনা বংশীর সঙ্গেই ভালো করিয়া জমে। সেই সূক্ষ্মবুদ্ধি সূক্ষ্মশরীর রসরক্তহীন ক্ষীণজীবী ভীরু মানুষটার প্রতি বনোয়ারির অবজ্ঞা ক্রমেই গভীরতর হইতেছিল। সংসারের সকল লোকে তাহাকেই বনোয়ারির চেয়ে সকল বিষয়ে যোগ্য বলিয়া মনে করে তাহা বনোয়ারির সহিয়াছে, কিন্তু আজ সে যখন বারবার দেখিল মানুষ হিসাবে তাহার স্ত্রীর কাছে বংশীর মূল্য বেশি, তখন নিজের ভাগ্য এবং বিশ্বসংসারের প্রতি তাহার মন প্রসন্ন হইল না।

এমন সময়ে পরীক্ষার কাছাকাছি কলিকাতার বাসা হইতে খবর আসিল, বংশী জ্বরে পড়িয়াছে এবং ডাক্তার আরোগ্য অসাধ্য বলিয়া আশঙ্কা করিতেছে। বনোয়ারি কলিকাতায় গিয়া দিনরাত জাগিয়া বংশীর সেবা করিল, কিন্তু তাহাকে বাঁচাইতে পারিল না।

মৃত্যু বনোয়ারির স্মৃতি হইতে সমস্ত কাঁটা উৎপাটিত করিয়া লইল। বংশী যে তাহার ছোটো ভাই এবং শিশুবয়সে দাদার কোলে যে তাহার স্নেহের আশ্রয় ছিল, এই কথাই তাহার মনে অশ্রুধৌত হইয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

এবার ফিরিয়া আসিয়া তাহার সমস্ত প্রাণের যত্ন দিয়া শিশুটিকে মানুষ করিতে সে কৃতসংকল্প হইল। কিন্তু, এই শিশু সম্বন্ধে কিরণ তাহার প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছে। ইহার প্রতি তাহার স্বামীর বিরাগ সে প্রথম হইতেই লক্ষ করিয়াছে। স্বামীর সম্বন্ধে কিরণের মনে কেমন একটা ধারণা হইয়া গেছে যে, অপর সাধারণের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক তাহার স্বামীর পক্ষে ঠিক তাহার উল্টা। তাহাদের বংশের এই তো একমাত্র কুলপ্রদীপ, ইহার মূল্য যে কী তাহা আর-সকলেই বোঝে, নিশ্চয় সেইজন্যই তাহার স্বামী তাহা বোঝে না। কিরণের মনে সর্বদাই ভয়, পাছে বনোয়ারির বিদ্বেষদৃষ্টি ছেলেটির অমঙ্গল ঘটায়। তাহার দেবর বাঁচিয়া নাই, কিরণের সন্তানসম্ভাবনা আছে বলিয়া কেহই আশা করে না, অতএব এই শিশুটিকে কোনোমতে সকলপ্রকার অকল্যাণ

হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলে তবে রক্ষা। এইরূপে বংশীর ছেলেটিকে যত্ন করিবার পথ বনোয়ারির পক্ষে বেশ স্বাভাবিক হইল না।

বাড়ির সকলের আদরে ক্রমে ছেলেটি বড়ো হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার নাম হইল হরিদাস। এত বেশি আদরের আওতায় সে যেন কেমন ক্ষীণ এবং ক্ষণভঙ্গুর আকার ধারণ করিল। তাগা-তাবিজ-মাদুলিতে তাহার সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন, রক্ষকের দল সর্বদাই তাহাকে ঘিরিয়া।

ইহার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে বনোয়ারির সঙ্গে তাহার দেখা হয়। জ্যাঠামশায়ের ঘোড়ায় চড়িবার চাবুক লইয়া আস্ফালন করিতে সে বড়ো ভালোবাসে। দেখা হইলেই বলে 'চাবু'। বনোয়ারি ঘর হইতে চাবুক বাহির করিয়া আনিয়া বাতাসে সাঁই সাঁই শব্দ করিতে থাকে, তাহার ভারি আনন্দ হয়। বনোয়ারি এক-একদিন তাহাকে আপনার ঘোড়ার উপর বসাইয়া দেয়, তাহাতে বাড়িসুদ্ধ লোক একেবারে হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসে। বনোয়ারি কখনো কখনো আপনার বন্দুক লইয়া তাহার সঙ্গে খেলা করে, দেখিতে পাইলে কিরণ ছুটিয়া আসিয়া বালককে সরাইয়া লইয়া যায়। কিন্তু, এই-সকল নিষিদ্ধ আমোদেই হরিদাসের সকলের চেয়ে অনুরাগ। এইজন্য সকল প্রকার বিঘ্ন-সত্ত্বে জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে তাহার খুব ভাব হইল।

বহুকাল অব্যাহতির পর এক সময়ে হঠাৎ এই পরিবারে মৃত্যুর আনাগোনা ঘটিল। প্রথমে মনোহরের স্ত্রীর মৃত্যু হইল। তাহার পরে নীলকণ্ঠ যখন কর্তার জন্য বিবাহের পরামর্শ ও পাত্রীর সন্ধান করিতেছে এমন সময় বিবাহের লগ্নের পূর্বেই মনোহরের মৃত্যু হইল। তখন হরিদাসের বয়স আট। মৃত্যুর পূর্বে মনোহর বিশেষ করিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র এই বংশধরকে কিরণ এবং নীলকণ্ঠের হাতে সমর্পণ করিয়া গেলেন; বনোয়ারিকে কোনো কথাই বলিলেন না।

বাক্স হইতে উইল যখন বাহির হইল তখন দেখা গেল, মনোহর তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি হরিদাসকে দিয়া গিয়াছেন। বনোয়ারি যাবজ্জীবন দুই শত টাকা করিয়া মাসহারা পাইবেন। নীলকণ্ঠ উইলের এক্‌জিক্যুটর, তাহার উপরে ভার রহিল, সে যতদিন বাঁচে হালদার-পরিবারের বিষয় এবং সংসারের ব্যবস্থা সেই করিবে।

বনোয়ারি বুঝিলেন, এ পরিবারে কেহ তাঁহাকে ছেলে দিয়াও ভরসা পায় না, বিষয় দিয়াও না। তিনি কিছুই পারেন না, সমস্তই নষ্ট করিয়া দেন, এ সম্বন্ধে এ বাড়িতে কাহারো দুই মত নাই। অতএব, তিনি বরাদ্দমতো আহার করিয়া কোণের ঘরে নিদ্রা দিবেন, তাঁহার পক্ষে এইরূপ বিধান।

তিনি কিরণকে বলিলেন, "আমি নীলকণ্ঠের পেন্‌সন খাইয়া বাঁচিব না। এ বাড়ি ছাড়িয়া চলো আমার সঙ্গে কলিকাতায়।"

"ওমা! সে কী কথা! এ তো তোমারই বাপের বিষয়, আর হরিদাস তো তোমারই আপন ছেলের তুল্য। ওকে বিষয় লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া তুমি রাগ কর কেন!"

হায় হায়, তাহার স্বামীর হৃদয় কী কঠিন। এই কচি ছেলের উপরেও ঈর্ষা করিতে তাহার মন ওঠে? তাহার শ্বশুর যে উইলটি লিখিয়াছে কিরণ মনে মনে তাহার সম্পূর্ণ সমর্থন করে। তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস, বনোয়ারির হাতে যদি বিষয় পড়িত তবে রাজ্যের যত ছোটোলোক, যত যদু মধু, যত কৈবর্ত এবং মুসলমান জোলার দল তাহাকে ঠকাইয়া কিছু আর বাকি রাখিত না এবং হালদার-বংশের এই ভাবী আশা একদিন অকূলে ভাসিত। শ্বশুরের কুলে বাতি জ্বালিবার দীপটি তো ঘরে আসিয়াছে, এখন তাহার তৈলসঞ্চয় যাহাতে নষ্ট না হয় নীলকণ্ঠই তো তাহার উপযুক্ত প্রহরী।

বনোয়ারি দেখিল, নীলকণ্ঠ অন্তঃপুরে আসিয়া ঘরে ঘরে সমস্ত জিনিসপত্রের লিস্ট্ করিতেছে এবং যেখানে যত সিন্দুক-বাক্স আছে তাহাতে তালাচাবি লাগাইতেছে। অবশেষে কিরণের শোবার ঘরে আসিয়া সে বনোয়ারির নিত্যব্যবহার্য সমস্ত দ্রব্য ফর্দভুক্ত করিতে লাগিল। নীলকণ্ঠের অন্তঃপুরে গতিবিধি আছে, সুতরাং কিরণ তাহাকে লজ্জা করে না। কিরণ শ্বশুরের শোকে ক্ষণে ক্ষণে অশ্রু মুছিবার অবকাশে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বিশেষ করিয়া সমস্ত জিনিস বুঝাইয়া দিতে লাগিল।

বনোয়ারি সিংহগর্জনে গর্জিয়া উঠিয়া নীলকণ্ঠকে বলিল, "তুমি এখনি আমার ঘর হইতে বাহির হইয়া যাও!"

নীলকণ্ঠ নম্র হইয়া কহিল, "বড়োবাবু, আমার তো কোনো দোষ নাই। কর্তার উইল-অনুসারে আমাকে তো সমস্ত বুঝিয়া লইতে হইবে। আসবাবপত্র সমস্তই তো হরিদাসের।"

কিরণ মনে মনে কহিল, 'দেখো একবার, ব্যাপারখানা দেখো। হরিদাস কি আমাদের পর। নিজের ছেলের সামগ্রী ভোগ করিতে আবার লজ্জা কিসের। আর, জিনিসপত্র মানুষের সঙ্গে যাইবে না কি। আজ না হয় কাল ছেলেপুলেরাই তো ভোগ করিবে।'

এ বাড়ির মেঝে বনোয়ারির পায়ের তলায় কাঁটার মতো বিঁধিতে লাগিল, এ বাড়ির দেয়াল তাহার দুই চক্ষুকে যেন দগ্ধ করিল। তাহার বেদনা যে কিসের তাহা বলিবার লোকও এই বৃহৎ পরিবারে কেহ নাই।

এই মুহূর্তেই বাড়িঘর সমস্ত ফেলিয়া বাহির হইয়া যাইবার জন্য বনোয়ারির মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু, তাহার রাগের জ্বালা যে থামিতে চায় না। সে চলিয়া

যাইবে আর নীলকণ্ঠ আরামে একাধিপত্য করিবে, এ কল্পনা সে সহ্য করিতে পারিল না। এখনি কোনো একটা গুরুতর অনিষ্ট করিতে না পারিলে তাহার মন শান্ত হইতে পারিতেছে না। সে বলিল, 'নীলকণ্ঠ কেমন বিষয় রক্ষা করিতে পারে আমি তাহা দেখিব।'

বাহিরে তাহার পিতার ঘরে গিয়া দেখিল, সে ঘরে কেহই নাই। সকলেই অন্তঃপুরের তৈজসপত্র ও গহনা প্রভৃতির খবরদারি করিতে গিয়াছে। অত্যন্ত সাবধান লোকেরও সাবধানতায় ত্রুটি থাকিয়া যায়। নীলকণ্ঠের হুঁস ছিল না যে, কর্তার বাক্স খুলিয়া উইল বাহির করিবার পরে বাক্সয় চাবি লাগানো হয় নাই। সেই বাক্সয় তাড়াবাঁধা মূল্যবান সমস্ত দলিল ছিল। সেই দলিলগুলির উপরেই এই হালদার-বংশের সম্পত্তির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

বনোয়ারি এই দলিলগুলির বিবরণ কিছুই জানে না, কিন্তু এগুলি যে অত্যন্ত কাজের এবং ইহাদের অভাবে মামলা-মকদ্দমায় পদে পদে ঠকিতে হইবে তাহা সে বোঝে। কাগজগুলি লইয়া সে নিজের একটা রুমালে জড়াইয়া তাহাদের বাহিরের বাগানে চাঁপাতলার বাঁধানো চাতালে বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতে লাগিল।

পরদিন শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য নীলকণ্ঠ বনোয়ারির কাছে উপস্থিত হইল। নীলকণ্ঠের দেহের ভঙ্গি অত্যন্ত বিনম্র, কিন্তু তাহার মুখের মধ্যে এমন একটা-কিছু ছিল, অথবা ছিল না, যাহা দেখিয়া অথবা কল্পনা করিয়া বনোয়ারির পিত্ত জ্বলিয়া গেল। তাহার মনে হইল, নম্রতার দ্বারা নীলকণ্ঠ তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছে।

নীলকণ্ঠ বলিল, "কর্তার শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে—"

বনোয়ারি তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিয়া উঠিল, "আমি তাহার কী জানি।"

নীলকণ্ঠ কহিল, "সে কী কথা। আপনিই তো শ্রাদ্ধাধিকারী।"

'মস্ত অধিকার! শ্রাদ্ধের অধিকার! সংসারে কেবল ঐটুকুতে আমার প্রয়োজন আছে— আমি আর কোনো কাজেরই না।' বনোয়ারি গর্জিয়া উঠিল, "যাও, যাও, আমাকে বিরক্ত করিয়ো না।"

নীলকণ্ঠ গেল কিন্তু তাহার পিছন হইতে বনোয়ারির মনে হইল, সে হাসিতে হাসিতে গেল। বনোয়ারির মনে হইল, বাড়ির সমস্ত চাকরবাকর এই অশ্রদ্ধিত, এই পরিত্যক্তকে লইয়া আপনাদের মধ্যে হাসিতামাশা করিতেছে। যে মানুষ বাড়ির অথচ বাড়ির নহে তাহার মতো ভাগ্যকর্তৃক পরিহসিত আর কে আছে। পথের ভিক্ষুকও নহে।

বনোয়ারি সেই দলিলের তাড়া লইয়া বাহির হইল। হালদার-পরিবারের প্রতিবেশী

ও প্রতিযোগী জমিদার ছিল প্রতাপপুরের বাঁড়ুজ্যে জমিদারেরা। বনোয়ারি স্থির করিল, 'এই দলিল-দস্তাবেজ তাহাদের হাতে দিব, বিষয়সম্পত্তি সমস্ত ছারখার হইয়া যাক্।'

বাহির হইবার সময় হরিদাস উপরের তলা হইতে তাহার সুমধুর বালককণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিয়া কহিল, "জ্যাঠামশায়, তুমি বাহিরে যাইতেছ, আমিও তোমার সঙ্গে বাহিরে যাইব।"

বনোয়ারির মনে হইল, বালকের অশুভগ্রহ এই কথা তাহাকে দিয়া বলাইয়া লইল। 'আমি তো পথে বাহির হইয়াছি, উহাকেও আমার সঙ্গে বাহির করিব। যাবে যাবে, সব ছারখার হইবে।'

বাহিরের বাগান পর্যন্ত যাইতেই বনোয়ারি একটা বিষম গোলমাল শুনিতে পাইল। অদূরে হাটের সংলগ্ন একটি বিধবার কুটিরে আগুন লাগিয়াছে। বনোয়ারির চিরাভ্যাসক্রমে এ দৃশ্য দেখিয়া সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার দলিলের তাড়া সে চাঁপাতলায় রাখিয়া আগুনের কাছে ছুটিল।

যখন ফিরিয়া আসিল, দেখিল, তাহার সেই কাগজের তাড়া নাই। মুহূর্তের মধ্যে হৃদয়ে শেল বিঁধাইয়া এই কথাটা মনে হইল, 'নীলকণ্ঠের কাছে আবার আমার হার হইল। বিধবার ঘর জ্বলিয়া ছাই হইয়া গেলে তাহাতে ক্ষতি কী ছিল।' তাহার মনে হইল, চতুর নীলকণ্ঠই ওটা পুনর্বার সংগ্রহ করিয়াছে।

একেবারে ঝড়ের মতো সে কাছারিঘরে আসিয়া উপস্থিত। নীলকণ্ঠ তাড়াতাড়ি বাক্স বন্ধ করিয়া সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বনোয়ারিকে প্রণাম করিল। বনোয়ারির মনে হইল, ঐ বাক্সের মধ্যেই সে কাগজ লুকাইল। কোনোকিছু না বলিয়া একেবারে সেই বাক্সটা খুলিয়া তাহার মধ্যে কাগজ ঘাঁটিতে লাগিল। তাহার মধ্যে হিসাবের খাতা এবং তাহারই জোগাড়ের সমস্ত নথি। বাক্স উপুড় করিয়া ঝাড়িয়া কিছুই মিলিল না।

রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বনোয়ারি কহিল, "তুমি চাঁপাতলায় গিয়াছিলে ?"

নীলকণ্ঠ বলিল, "আজ্ঞা, হাঁ, গিয়াছিলাম বই-কি। দেখিলাম, আপনি ব্যস্ত হইয়া ছুটিতেছেন, কী হইল তাহাই জানিবার জন্য বাহির হইয়াছিলাম।"

বনোয়ারি। আমার রুমালে-বাঁধা কাগজগুলা তুমিই লইয়াছ।

নীলকণ্ঠ নিতান্ত ভালোমানুষের মতো কহিল, "আজ্ঞা, না।"

বনোয়ারি। মিথ্যা কথা বলিতেছ। তোমার ভালো হইবে না, এখনি ফিরাইয়া দাও।

বনোয়ারি মিথ্যা তর্জন গর্জন করিল। কী জিনিস তাহার হারাইয়াছে তাহাও সে বলিতে পারিল না এবং সেই চোরাই মাল সম্বন্ধে তাহার কোনো জোর নাই জানিয়া সে মনে মনে অসাবধান মূঢ় আপনাকেই যেন ছিন্ন ছিন্ন করিতে লাগিল।

কাছারিতে এইরূপ পাগলামি করিয়া সে চাঁপাতলায় আবার খোঁজাখুঁজি করিতে লাগিল। মনে মনে মাতৃদিব্য করিয়া সে প্রতিজ্ঞা করিল, 'যে করিয়া হউক এ কাগজগুলা পুনরায় উদ্ধার করিব তবে আমি ছাড়িব।' কেমন করিয়া উদ্ধার করিবে তাহা চিন্তা করিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না, কেবল ক্রুদ্ধ বালকের মতো বারবার মাটিতে পদাঘাত করিতে করিতে বলিল, 'উদ্ধার করিবই, করিবই, করিবই।'

শ্রান্তদেহে সে গাছতলায় বসিল। কেহ নাই, তাহার কেহ নাই এবং তাহার কিছুই নাই। এখন হইতে নিঃসম্বলে আপন ভাগ্যের সঙ্গে এবং সংসারের সঙ্গে তাহাকে লড়াই করিতে হইবে। তাহার পক্ষে মানসম্ভ্রম নাই, ভদ্রতা নাই, প্রেম নাই, স্নেহ নাই, কিছুই নাই। আছে কেবল মরিবার এবং মারিবার অধ্যবসায়।

এইরূপ মনে মনে ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে নিরতিশয় ক্লান্তিতে চাতালের উপর পড়িয়া কখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। যখন জাগিয়া উঠিল তখন হঠাৎ বুঝিতে পারিল না, কোথায় সে আছে। ভালো করিয়া সজাগ হইয়া উঠিয়া বসিয়া দেখে তাহার শিয়রের কাছে হরিদাস বসিয়া। বনোয়ারিকে জাগিতে দেখিয়া হরিদাস বলিয়া উঠিল, "জ্যাঠামশায়, তোমার কী হারাইয়াছে বলো দেখি।"

বনোয়ারি স্তব্ধ হইয়া গেল— হরিদাসের এ প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিল না।

হরিদাস কহিল, "আমি যদি দিতে পারি আমাকে কী দিবে।"

বনোয়ারির মনে হইল, হয়তো আর-কিছু। সে বলিল, "আমার যাহা আছে সব তোকে দিব।"

এ কথা সে পরিহাস করিয়াই বলিল; সে জানে, তাহার কিছুই নাই।

তখন হরিদাস আপন কাপড়ের ভিতর হইতে বনোয়ারির রুমালে-মোড়া সেই কাগজের তাড়া বাহির করিল। এই রঙিন রুমালটাতে বাঘের ছবি আঁকা ছিল; সেই ছবি তাহার জ্যাঠা তাহাকে অনেকবার দেখাইয়াছে। এই রুমালটার প্রতি হরিদাসের বিশেষ লোভ। সেইজন্যই অগ্নিদাহের গোলমালে ভৃত্যেরা যখন বাহিরে ছুটিয়াছিল সেই অবকাশে বাগানে আসিয়া হরিদাস চাঁপাতলায় দূর হইতে এই রুমালটা দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছিল।

হরিদাসকে বনোয়ারি বুকের কাছে টানিয়া লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; কিছুক্ষণ পরে তাহার চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহার মনে

পড়িল, অনেকদিন পূর্বে সে তাহার এক নূতন-কেনা কুকুরকে শায়েস্তা করিবার জন্য তাহাকে বারম্বার চাবুক মারিতে বাধ্য হইয়াছিল। একবার তাহার চাবুক হারাইয়া গিয়াছিল, কোথাও সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। যখন চাবুকের আশা পরিত্যাগ করিয়া সে বসিয়া আছে এমন সময় দেখিল, সেই কুকুরটা কোথা হইতে চাবুকটা মুখে করিয়া মনিবের সম্মুখে আনিয়া পরমানন্দে লেজ নাড়িতেছে। আর-কোনোদিন কুকুরকে সে চাবুক মারিতে পারে নাই।

বনোয়ারি তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, "হরিদাস, তুই কী চাস আমাকে বল্।"

হরিদাস কহিল, "আমি তোমার ঐ রুমালটা চাই, জ্যাঠামশায়।"

বনোয়ারি কহিল, "আয় হরিদাস, তোকে কাঁধে চড়াই।"

হরিদাসকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া বনোয়ারি তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে চলিয়া গেল। শয়নঘরে গিয়া দেখিল, কিরণ সারাদিন-রৌদ্রে-দেওয়া কম্বলখানি বারান্দা হইতে তুলিয়া আনিয়া ঘরের মেজের উপর পাতিতেছে। বনোয়ারির কাঁধের উপর হরিদাসকে দেখিয়া সে উদ্‌বিগ্ন হইয়া বলিয়া উঠিল, "নামাইয়া দাও, নামাইয়া দাও— উহাকে তুমি ফেলিয়া দিবে।"

বনোয়ারি কিরণের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া কহিল, "আমাকে আর ভয় করিয়ো না, আমি ফেলিয়া দিব না।"

এই বলিয়া সে কাঁধ হইতে নামাইয়া হরিদাসকে কিরণের কোলের কাছে অগ্রসর করিয়া দিল। তাহার পরে সেই কাগজগুলি লইয়া কিরণের হাতে দিয়া কহিল, "এগুলি হরিদাসের বিষয়সম্পত্তির দলিল। যত্ন করিয়া রাখিয়ো।"

কিরণ আশ্চর্য হইয়া কহিল, "তুমি কোথা হইতে পাইলে।"

বনোয়ারি কহিল, "আমি চুরি করিয়াছিলাম।"

তাহার পর হরিদাসকে বুকে টানিয়া কহিল, "এই নে বাবা, তোর জ্যাঠামশায়ের যে মূল্যবান সম্পত্তিটির প্রতি তোর লোভ পড়িয়াছে, এই নে।" বলিয়া রুমালটি তাহার হাতে দিল।

তাহার পর আর-একবার ভালো করিয়া কিরণের দিকে তাকাইয়া দেখিল। দেখিল, সেই তন্বী এখন তো তন্বী নাই, কখন মোটা হইয়াছে সে তাহা লক্ষ্য করে নাই। এতদিনে হালদারগোষ্ঠীর বড়োবউয়ের উপযুক্ত চেহারা তাহার ভরিয়া উঠিয়াছে। আর কেন, এখন অমরুশতকের কবিতাগুলাও বনোয়ারির অন্য সমস্ত সম্পত্তির সঙ্গে বিসর্জন দেওয়াই ভালো।

সেই রাত্রেই বনোয়ারির আর দেখা নাই। কেবল সে একছত্র চিঠি লিখিয়া গেছে যে, সে চাকরি খুঁজিতে বাহির হইল।

বাপের শ্রাদ্ধ পর্যন্ত সে অপেক্ষা করিল না! দেশসুদ্ধ লোক তাই লইয়া তাহাকে ধিক্‌ ধিক্‌ করিতে লাগিল।

বৈশাখ, ১৩২১

হৈমন্তী

কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না। তিনি দেখিলেন, মেয়েটির বিবাহের বয়স পার হইয়া গেছে, কিন্তু আর কিছুদিন গেলে সেটাকে ভদ্র বা অভদ্র কোনো রকমে চাপা দিবার সময়টাও পার হইয়া যাইবে। মেয়ের বয়স অবৈধ রকমে বাড়িয়া গেছে বটে, কিন্তু পণের টাকার আপেক্ষিক গুরুত্ব এখনো তাহার চেয়ে কিঞ্চিৎ উপরে আছে, সেইজন্যই তাড়া।

আমি ছিলাম বর। সুতরাং, বিবাহসম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল। আমার কাজ আমি করিয়াছি, এফ-এ পাশ করিয়া বৃত্তি পাইয়াছি। তাই প্রজাপতির দুই পক্ষ, কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষ ঘন ঘন বিচলিত হইয়া উঠিল।

আমাদের দেশে যে-মানুষ একবার বিবাহ করিয়াছে বিবাহ সম্বন্ধে তাহার মনে আর কোনো উদ্‌বেগ থাকে না। নরমাংসের স্বাদ পাইলে মানুষের সম্বন্ধে বাঘের যে দশা হয়, স্ত্রীর সম্বন্ধে তাহার ভাবটা সেইরূপ হইয়া উঠে। অবস্থা যেমনি ও বয়স যতই হউক, স্ত্রীর অভাব ঘটিবামাত্র তাহা পূরণ করিয়া লইতে তাহার কোনো দ্বিধা থাকে না। যত দ্বিধা ও দুশ্চিন্তা সে দেখি আমাদের নবীন ছাত্রদের। বিবাহের পৌনঃপুনিক প্রস্তাবে তাহাদের পিতৃপক্ষের পাকা চুল কলপের আশীর্বাদে পুনঃপুন কাঁচা হইয়া উঠে, আর প্রথম ঘটকালির আঁচেই ইহাদের কাঁচা চুল ভাবনায় একরাত্রে পাকিবার উপক্রম হয়।

সত্য বলিতেছি, আমার মনে এমন বিষম উদ্‌বেগ জন্মে নাই। বরঞ্চ বিবাহের কথায় আমার মনের মধ্যে যেন দক্ষিনে হাওয়া দিতে লাগিল। কৌতূহলী কল্পনার কিশলয়গুলির মধ্যে একটা যেন কানাকানি পড়িয়া গেল। যাহাকে বার্কের ফ্রেঞ্চ রেভোল্যুশনের নোট পাঁচ-সাত খাতা মুখস্থ করিতে হইবে, তাহার পক্ষে এ ভাবটা দোষের। আমার এ লেখা যদি টেক্‌স্‌ট্‌বুক্‌-কমিটির অনুমোদিত হইবার কোনো আশঙ্কা থাকিত তবে সাবধান হইতাম।

কিন্তু, এ কী করিতেছি। এ কি একটা গল্প যে উপন্যাস লিখিতে বসিলাম। এমন সুরে আমার লেখা শুরু হইবে এ আমি কি জানিতাম। মনে ছিল, কয় বৎসরের বেদনার যে মেঘ কালো হইয়া জমিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে বৈশাখসন্ধ্যার ঝোড়ো বৃষ্টির মতো প্রবল বর্ষণে নিঃশেষ করিয়া দিব। কিন্তু, না পারিলাম বাংলায় শিশুপাঠ্য বই লিখিতে, কারণ সংস্কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আমার পড়া নাই; আর, না পারিলাম কাব্য রচনা করিতে, কারণ মাতৃভাষা আমার জীবনের মধ্যে এমন পুষ্পিত হইয়া উঠে নাই যাহাতে নিজের অন্তরকে বাহিরে টানিয়া আনিতে পারি। সেইজন্যই দেখিতেছি, আমার ভিতরকার শ্মশানচারী সন্ন্যাসীটা অট্টহাস্যে আপনাকে আপনি পরিহাস করিতে বসিয়াছে। না করিয়া করিবে কী। তাহার-যে অশ্রু শুকাইয়া গেছে। জ্যৈষ্ঠের খররৌদ্রই তো জ্যৈষ্ঠের অশ্রুশূন্য রোদন।

আমার সঙ্গে যাহার বিবাহ হইয়াছিল তাহার সত্য নামটা দিব না। কারণ, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার নামটি লইয়া প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে বিবাদের কোনো আশঙ্কা নাই। যে তাম্রশাসনে তাহার নাম খোদাই করা আছে সেটা আমার হৃদয়পট। কোনোকালে সে পট এবং সে নাম বিলুপ্ত হইবে, এমন কথা আমি মনে করিতে পারি না। কিন্তু, যে অমৃতলোকে তাহা অক্ষয় হইয়া রহিল সেখানে ঐতিহাসিকের আনাগোনা নাই।

আমার এ লেখায় তাহার যেমন হউক একটা নাম চাই। আচ্ছা, তাহার নাম দিলাম শিশির। কেননা, শিশিরে কান্নাহাসি একেবারে এক হইয়া আছে, আর শিশিরে ভোরবেলাটুকুর কথা সকালবেলায় আসিয়া ফুরাইয়া যায়।

শিশির আমার চেয়ে কেবল দুই বছরের ছোটো ছিল। অথচ, আমার পিতা যে গৌরীদানের পক্ষপাতী ছিলেন না তাহা নহে। তাঁহার পিতা ছিলেন উগ্রভাবে সমাজবিদ্রোহী; দেশের প্রচলিত ধর্মকর্ম কিছুতে তাঁহার আস্থা ছিল না; তিনি কষিয়া ইংরাজি পড়িয়াছিলেন। আমার পিতা উগ্রভাবে সমাজের অনুগামী; মানিতে তাঁহার বাধে এমন জিনিস আমাদের সমাজে, সদরে বা অন্দরে, দেউড়ি বা খিড়কির পথে খুঁজিয়া পাওয়া দায়, কারণ ইনিও কষিয়া ইংরাজি পড়িয়াছিলেন। পিতামহ এবং পিতা উভয়েরই মতামত বিদ্রোহের দুই বিভিন্ন মূর্তি। কোনোটাই সরল স্বাভাবিক নহে। তবুও বড়ো বয়সের মেয়ের সঙ্গে বাবা যে আমার বিবাহ দিলেন তাহার কারণ, মেয়ের বয়স বড়ো বলিয়াই পণের অঙ্কটাও বড়ো। শিশির আমার শ্বশুরের একমাত্র মেয়ে। বাবার বিশ্বাস ছিল, কন্যার পিতার সমস্ত টাকা ভাবী জামাতার ভবিষ্যতের গর্ভ পূরণ করিয়া তুলিতেছে।

আমার শ্বশুরের বিশেষ কোনো একটা মতের বালাই ছিল না। তিনি পশ্চিমের এক পাহাড়ের কোনো রাজার অধীনে বড়ো কাজ করিতেন। শিশির যখন কোলে তখন তাহার মার মৃত্যু হয়। মেয়ে বৎসর-অন্তে এক-এক বছর করিয়া বড়ো হইতেছে, তাহা আমার শ্বশুরের চোখেই পড়ে নাই। সেখানে তাঁহার সমাজের লোক এমন কেহই ছিল না যে তাঁহাকে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিবে।

শিশিরের বয়স যথাসময়ে ষোলো হইল; কিন্তু সেটা স্বভাবের ষোলো, সমাজের ষোলো নহে। কেহ তাহাকে আপন বয়সের জন্য সতর্ক হইতে পরামর্শ দেয় নাই, সেও আপন বয়সটার দিকে ফিরিয়াও তাকাইত না।

কলেজে তৃতীয় বৎসরে পা দিয়াছি, আমার বয়স উনিশ, এমন সময় আমার বিবাহ হইল। বয়সটা সমাজের মতে বা সমাজসংস্কারকের মতে উপযুক্ত কি না তাহা লইয়া তাহারা দুই পক্ষ লড়াই করিয়া রক্তারক্তি করিয়া মরুক, কিন্তু আমি বলিতেছি, সে বয়সটা পরীক্ষা পাস করিবার পক্ষে যত ভালো হউক, বিবাহের সম্বন্ধ আসিবার পক্ষে কিছুমাত্র কম ভালো নয়।

বিবাহের অরুণোদয় হইল একখানি ফোটোগ্রাফের আভাসে। পড়া মুখস্থ করিতেছিলাম। একজন ঠাট্টার সম্পর্কের আত্মীয়া আমার টেবিলের উপরে শিশিরের ছবিখানি রাখিয়া বলিলেন, "এইবার সত্যিকার পড়া পড়ো— একেবারে ঘাড়মোড় ভাঙিয়া।"

কোনো একজন আনাড়ি কারিগরের তোলা ছবি। মা ছিল না, সুতরাং কেহ তাহার চুল টানিয়া বাঁধিয়া খোঁপায় জরি জড়াইয়া, সাহা বা মল্লিক কোম্পানির জবড়জঙ জ্যাকেট পরাইয়া বরপক্ষের চোখ ভুলাইবার জন্য জালিয়াতির চেষ্টা করে নাই। ভারি একখানি সাদাসিধা মুখ, সাদাসিধা দুটি চোখ, এবং সাদাসিধা একটি শাড়ি। কিন্তু, সমস্তটি লইয়া কী যে মহিমা সে আমি বলিতে পারি না। যেমন তেমন একখানি চৌকিতে বসিয়া, পিছনে একখানা ডোরা-দাগ-কাটা শতরঞ্চ ঝোলানো, পাশে একটা টিপাইয়ের উপরে ফুলদানিতে ফুলের তোড়া। আর, গালিচার উপরে শাড়ির বাঁকা পাড়টির নিচে দুখানি খালি পা।

পটের ছবিটির উপর আমার মনের সোনার কাঠি লাগিতেই সে আমার জীবনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। সেই কালো দুটি চোখ আমার সমস্ত ভাবনার মাঝখানে কেমন করিয়া চাহিয়া রহিল। আর, সেই বাঁকা পাড়ের নিচেকার দুখানি খালি পা আমার হৃদয়কে আপন পদ্মাসন করিয়া লইল।

পঞ্জিকার পাতা উল্টাইতে থাকিল; দুটা-তিনটা বিবাহের লগ্ন পিছাইয়া যায়, শ্বশুরের

ছুটি আর মেলে না। ওদিকে সামনে একটা অকাল চার-পাঁচটা মাস জুড়িয়া আমার আইবড় বয়সের সীমানাটাকে উনিশ বছর হইতে অনর্থক বিশ বছরের দিকে ঠেলিয়া দিবার চক্রান্ত করিতেছে। শ্বশুরের এবং তাঁহার মনিবের উপর রাগ হইতে লাগিল।

যা হউক, অকালের ঠিক পূর্বলগ্নটাতে আসিয়া বিবাহের দিন ঠেকিল। সেদিনকার শানাইয়ের প্রত্যেক তানটি যে আমার মনে পড়িতেছে। সেদিনকার প্রত্যেক মুহূর্তটিকে আমি আমার সমস্ত চৈতন্য দিয়া স্পর্শ করিয়াছি। আমার সেই উনিশ বছরের বয়সটি আমার জীবনে অক্ষয় হইয়া থাক্।

বিবাহসভায় চারি দিকে হট্টগোল; তাহারই মাঝখানে কন্যার কোমল হাতখানি আমার হাতের উপর পড়িল। এমন আশ্চর্য আর কী আছে। আমার মন বারবার করিয়া বলিতে লাগিল, 'আমি পাইলাম, আমি ইহাকে পাইলাম।' কাহাকে পাইলাম। এ যে দুর্লভ, এ যে মানবী, ইহার রহস্যের কি অন্ত আছে।

আমার শ্বশুরের নাম গৌরীশংকর। যে হিমালয়ে বাস করিতেন সেই হিমালয়ের তিনি যেন মিতা। তাঁহার গাম্ভীর্যের শিখরদেশে একটি স্থির হাস্য শুভ্র হইয়া ছিল। আর, তাঁহার হৃদয়ের ভিতরটিতে স্নেহের যে একটি প্রস্রবণ ছিল তাহার সন্ধান যাহারা জানিত তাহারা তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিত না।

কর্মক্ষেত্রে ফিরিবার পূর্বে আমার শ্বশুর আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবা, আমার মেয়েটিকে আমি সতেরো বছর ধরিয়া জানি, আর তোমাকে এই ক'টি দিন মাত্র জানিলাম, তবু তোমার হাতেই ও রহিল। যে ধন দিলাম তাহার মূল্য যেন বুঝিতে পার, ইহার বেশি আশীর্বাদ আর নাই।"

তাঁহার বেহাই বেহান সকলেই তাঁহাকে বারবার করিয়া আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "বেহাই, মনে কোনো চিন্তা রাখিয়ো না। তোমার মেয়েটি যেমন বাপকে ছাড়িয়া আসিয়াছে, এখানে তেমনি বাপ মা উভয়কেই পাইল।"

তাহার পরে শ্বশুরমশায় মেয়ের কাছে বিদায় লইবার বেলা হাসিলেন; বলিলেন, "বুড়ি চলিলাম। তোর একখানি মাত্র এই বাপ, আজ হইতে ইহার যদি কিছু খোওয়া যায় বা চুরি যায় বা নষ্ট হয় আমি তাহার জন্য দায়ী নই।"

মেয়ে বলিল, "তাই বই-কি। কোথাও একটু যদি লোকসান হয় তোমাকে তার ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে।"

অবশেষে নিত্য তাঁহার যে-সব বিষয়ে বিভ্রাট ঘটে বাপকে সে-সম্বন্ধে সে বারবার সতর্ক করিয়া দিল। আহারসম্বন্ধে আমার শ্বশুরের যথেষ্ট সংযম ছিল না; গুটিকয়েক

অপথ্য ছিল, তাহার প্রতি তাঁহার বিশেষ আসক্তি— বাপকে সেই-সমস্ত প্রলোভন হইতে যথাসম্ভব ঠেকাইয়া রাখা মেয়ের এক কাজ ছিল। তাই আজ সে বাপের হাত ধরিয়া উদ্‌বেগের সহিত বলিল, "বাবা, তুমি আমার কথা রেখো— রাখবে ?"

বাবা হাসিয়া কহিলেন, "মানুষ পণ করে পণ ভাঙিয়া ফেলিয়া হাঁফ ছাড়িবার জন্য। অতএব কথা না-দেওয়াই সব চেয়ে নিরাপদ।"

তাহার পরে বাপ চলিয়া আসিলে ঘরে কপাট পড়িল। তাহার পরে কী হইল কেহ জানে না।

বাপ ও মেয়ের অশ্রুহীন বিদায়ব্যাপার পাশের ঘর হইতে কৌতূহলী অন্তঃপুরিকার দল দেখিল ও শুনিল। অবাক কাণ্ড! খোট্টার দেশে থাকিয়া খোট্টা হইয়া গেছে! মায়ামমতা একেবারে নাই!

আমার শ্বশুরের বন্ধু বনমালীবাবুই আমাদের বিবাহের ঘটকালি করিয়াছিলেন। তিনি আমাদের পরিবারেরও পরিচিত। তিনি আমার শ্বশুরকে বলিয়াছিলেন, "সংসারে তোমার তো ঐ একটি মেয়ে। এখন ইহাদেরই পাশে বাড়ি লইয়া এইখানেই জীবনটা কাটাও।"

তিনি বলিলেন, "যাহা দিলাম তাহা উজাড় করিয়াই দিলাম। এখন ফিরিয়া তাকাইতে গেলে দুঃখ পাইতে হইবে। অধিকার ছাড়িয়া দিয়া অধিকার রাখিতে যাইবার মতো এমন বিড়ম্বনা আর নাই।"

সব শেষে আমাকে নিভৃতে লইয়া গিয়া অপরাধীর মতো সসংকোচে বলিলেন, "আমার মেয়েটির বই পড়িবার শখ, এবং লোকজনকে খাওয়াইতে ও বড়ো ভালোবাসে। এজন্য বেহাইকে বিরক্ত করিতে ইচ্ছা করি না। আমি মাঝে মাঝে তোমাকে টাকা পাঠাইব। তোমার বাবা জানিতে পারিলে কি রাগ করিবেন।"

প্রশ্ন শুনিয়া কিছু আশ্চর্য হইলাম। সংসারে কোনো একটা দিক হইতে অর্থসমাগম হইলে বাবা রাগ করিবেন, তাঁহার মেজাজ এত খারাপ তো দেখি নাই।

যেন ঘুষ দিতেছেন এমনিভাবে আমার হাতে একখানা একশো টাকার নোট গুঁজিয়া দিয়াই আমার শ্বশুর দ্রুত প্রস্থান করিলেন; আমার প্রণাম লইবার জন্য সবুর করিলেন না। পিছন হইতে দেখিতে পাইলাম, এইবার পকেট হইতে রুমাল বাহির হইল।

আমি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। মনে বুঝিলাম, ইহারা অন্য জাতের মানুষ।

বন্ধুদের অনেককেই তো বিবাহ করিতে দেখিলাম। মন্ত্র পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রীটিকে

একেবারে এক গ্রাসে গলাধঃকরণ করা হয়। পাকযন্ত্রে পৌঁছিয়া কিছুক্ষণ বাদে এই পদার্থটির নানা গুণাগুণ প্রকাশ হইতে পারে এবং ক্ষণে ক্ষণে আভ্যন্তরিক উদ্‌বেগ উপস্থিত হইয়াও থাকে, কিন্তু রাস্তাটুকুতে কোথাও কিছুমাত্র বাধে না। আমি কিন্তু বিবাহসভাতেই বুঝিয়াছিলাম, দানের মন্ত্রে স্ত্রীকে যেটুকু পাওয়া যায় তাহাতে সংসার চলে, কিন্তু পনেরো-আনা বাকি থাকিয়া যায়। আমার সন্দেহ হয়, অধিকাংশ লোকে স্ত্রীকে বিবাহমাত্র করে, পায় না এবং জানেও না যে পায় নাই; তাহাদের স্ত্রীর কাছেও আমৃত্যুকাল এ খবর ধরা পড়ে না। কিন্তু, সে যে আমার সাধনার ধন ছিল; সে আমার সম্পত্তি নয়, সে আমার সম্পদ।

শিশির— না, এ নামটা আর ব্যবহার করা চলিল না। একে তো এটা তাহার নাম নয়, তাহাতে এটা তাহার পরিচয়ও নহে। সে সূর্যের মতো ধ্রুব; সে ক্ষণজীবিনী উষার বিদায়ের অশ্রুবিন্দুটি নয়। কী হইবে গোপনে রাখিয়া— তাহার আসল নাম হৈমন্তী।

দেখিলাম, এই সতেরো বছরের মেয়েটির উপরে যৌবনের সমস্ত আলো আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু এখনো কৈশোরের কোল হইতে সে জাগিয়া উঠে নাই। ঠিক যেন শৈলচূড়ার বরফের উপর সকালের আলো ঠিকরিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু বরফ এখনো গলিল না। আমি জানি, কী অকলঙ্ক শুভ্র সে, কী নিবিড় পবিত্র।

আমার মনে একটা ভাবনা ছিল যে, লেখাপড়া-জানা বড়ো মেয়ে, কী জানি কেমন করিয়া তাহার মন পাইতে হইবে। কিন্তু, অতি অল্পদিনেই দেখিলাম, মনের রাস্তার সঙ্গে বইয়ের দোকানের রাস্তার কোনো জায়গায় কোনো কাটাকাটি নাই। কবে যে তাহার সাদা মনটির উপরে একটু রঙ ধরিল, চোখে একটু ঘোর লাগিল, কবে যে তাহার সমস্ত শরীর মন যেন উৎসুক হইয়া উঠিল, তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না।

এ তো গেল এক দিকের কথা। আবার অন্য দিকও আছে, সেটা বিস্তারিত বলিবার সময় আসিয়াছে।

রাজসংসারে আমার শ্বশুরের চাকরি। ব্যাঙ্কে যে তাঁহার কত টাকা জমিল সে সম্বন্ধে জনশ্রুতি নানাপ্রকার অঙ্কপাত করিয়াছে, কিন্তু কোনো অঙ্কটাই লাখের নিচে নামে নাই। ইহার ফল হইয়াছিল এই যে, তাহার পিতার দর যেমন-যেমন বাড়িল, হৈমর আদরও তেমনি বাড়িতে থাকিল। আমাদের ঘরের কাজকর্ম রীতিপদ্ধতি শিখিয়া লইবার জন্য সে ব্যগ্র, কিন্তু মা তাহাকে অত্যন্ত স্নেহে কিছুতেই হাত দিতে দিলেন না। এমন-কি, হৈমর সঙ্গে পাহাড় হইতে যে দাসী আসিয়াছিল যদিও তাহাকে নিজেদের ঘরে ঢুকিতে

দিতেন না, তবু তাহার জাত সম্বন্ধে প্রশ্নমাত্র করিলেন না, পাছে বিশ্রী একটা উত্তর শুনিতে হয়।

এমনিভাবেই দিন চলিয়া যাইতে পারিত, কিন্তু হঠাৎ একদিন বাবার মুখ ঘোর অন্ধকার দেখা গেল। ব্যাপারখানা এই— আমার বিবাহে আমার শ্বশুর পনেরো হাজার টাকা নগদ এবং পাঁচ হাজার টাকার গহনা দিয়াছিলেন। বাবা তাঁহার এক দালাল বন্ধুর কাছে খবর পাইয়াছেন, ইহার মধ্যে পনেরো হাজার টাকাই ধার করিয়া সংগ্রহ করিতে হইয়াছে; তাহার সুদও নিতান্ত সামান্য নহে। লাখ টাকার গুজব তো একেবারেই ফাঁকি।

যদিও আমার শ্বশুরের সম্পত্তির পরিমাণ সম্বন্ধে আমার বাবার সঙ্গে তাঁহার কোনোদিন কোনো আলোচনাই হয় নাই, তবু বাবা জানি না কোন্ যুক্তিতে ঠিক করিলেন, তাঁহার বেহাই তাঁহাকে ইচ্ছাপূর্বক প্রবঞ্চনা করিয়াছেন।

তার পরে, বাবার একটা ধারণা ছিল, আমার শ্বশুর রাজার প্রধান মন্ত্রী-গোছের একটা-কিছু। খবর লইয়া জানিলেন, তিনি সেখানকার শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ। বাবা বলিলেন, অর্থাৎ ইস্কুলের হেডমাস্টার— সংসারে ভদ্র পদ যতগুলো আছে তাহার মধ্যে সব চেয়ে ওঁচা। বাবার বড়ো আশা ছিল, শ্বশুর আজ বাদে কাল যখন কাজে অবসর লইবেন তখন আমিই রাজমন্ত্রী হইব।

এমন সময়ে রাস-উপলক্ষ্যে দেশের কুটুম্বরা আমাদের কলিকাতার বাড়িতে আসিয়া জমা হইলেন। কন্যাকে দেখিয়া তাঁহাদের মধ্যে একটা কানাকানি পড়িয়া গেল। কানাকানি ক্রমে অস্ফুট হইতে স্ফুট হইয়া উঠিল। দূর সম্পর্কের কোনো এক দিদিমা বলিয়া উঠিলেন, "পোড়া কপাল আমার! নাতবউ যে বয়সে আমাকেও হার মানাইল।"

আর-এক দিদিমাশ্রেণীয়া বলিলেন, "আমাদেরই যদি হার না মানাইবে তবে অপু বাহির হইতে বউ আনিতে যাইবে কেন।"

আমার মা খুব জোরের সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, "ওমা, সে কি কথা। বউমার বয়স সবে এগারো বই তো নয়, এই আসছে ফাল্গুনে বারোয় পা দিবে। খোট্টার দেশে ডালরুটি খাইয়া মানুষ, তাই অমন বাড়ন্ত হইয়া উঠিয়াছে।"

দিদিমারা বলিলেন, "বাছা, এখনো চোখে এত কম তো দেখি না। কন্যাপক্ষ নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে বয়স ভাঁড়াইয়াছে।"

মা বলিলেন, "আমরা যে কুষ্ঠি দেখিলাম।"

কথাটা সত্য। কিন্তু কোষ্ঠীতেই প্রমাণ আছে, মেয়ের বয়স সতেরো।

প্রবীণারা বলিলেন, "কুষ্ঠিতে কি আর ফাঁকি চলে না।"

এই লইয়া ঘোর তর্ক, এমন-কি, বিবাদ হইয়া গেল।

এমন সময়ে সেখানে হৈম আসিয়া উপস্থিত। কোনো-এক দিদিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাতবউ, তোমার বয়স কত বলো তো।"

মা তাহাকে চোখ টিপিয়া ইশারা করিলেন। হৈম তাহার অর্থ বুঝিল না; বলিল, "সতেরো।"

মা ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি জান না।"

হৈম কহিল, "আমি জানি, আমার বয়স সতেরো।"

দিদিমারা পরস্পর গা-টেপাটেপি করিলেন।

বধূর নির্বুদ্ধিতায় রাগিয়া উঠিয়া মা বলিলেন, "তুমি তো সব জান! তোমার বাবা যে বলিলেন, তোমার বয়স এগার।"

হৈম চমকিয়া কহিল, "বাবা বলিয়াছেন? কখনো না।"

মা কহিলেন, "অবাক করিল। বেহাই আমার সাম্‌নে নিজের মুখে বলিলেন, আর মেয়ে বলে 'কখনো না'!" এই বলিয়া আর-একবার চোখ টিপিলেন!

এবার হৈম ইশারার মানে বুঝিল। স্বর আরো দৃঢ় করিয়া বলিল, "বাবা এমন কথা কখনোই বলিতে পারেন না।"

মা গলা চড়াইয়া বলিলেন, "তুই আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতে চাস?"

হৈম বলিল, "আমার বাবা তো কখনোই মিথ্যা বলেন না।"

ইহার পরে মা যতই গালি দিতে লাগিলেন কথাটার কালি ততই গড়াইয়া ছড়াইয়া চারি দিকে লেপিয়া গেল।

মা রাগ করিয়া বাবার কাছে তাঁহার বধূর মূঢ়তা এবং ততোধিক একগুঁয়েমির কথা বলিয়া দিলেন। বাবা হৈমকে ডাকিয়া বলিলেন, "আইবড়ো মেয়ের বয়স সতেরো, এটা কি খুব একটা গৌরবের কথা, তাই ঢাক পিটিয়া বেড়াইতে হইবে? আমাদের এখানে এ-সব চলিবে না, বলিয়া রাখিতেছি।"

হায় রে, তাঁহার বউমার প্রতি বাবার সেই মধুমাখা পঞ্চম স্বর আজ একেবারে এমন বাজখাঁই খাদে নাবিল কেমন করিয়া।

হৈম ব্যথিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "কেহ যদি বয়স জিজ্ঞাসা করে কী বলিব।"

বাবা বলিলেন, "মিথ্যা বলিবার দরকার নাই, তুমি বলিয়ো 'আমি জানি না, আমার শাশুড়ি জানেন।"

কেমন করিয়া মিথ্যা বলিতে না হয় সেই উপদেশ শুনিয়া হৈম এমন ভাবে

চুপ করিয়া রহিল যে বাবা বুঝিলেন, তাঁহার সদুপদেশটা একেবারে বাজে খরচ হইল।

হৈমর দুর্গতিতে দুঃখ করিব কী, তাহার কাছে আমার মাথা হেঁট হইয়া গেল। সেদিন দেখিলাম, শরৎপ্রভাতের আকাশের মতো তাহার চোখের সেই সরল উদার দৃষ্টি একটা কী সংশয়ে ম্লান হইয়া গেছে। ভীত হরিণীর মতো সে আমার মুখের দিকে চাহিল। ভাবিল, 'আমি ইহাদিগকে চিনি না।'

সেদিন একখানা শৌখিন-বাঁধাই-করা ইংরাজি কবিতার বই তাহার জন্য কিনিয়া আনিয়াছিলাম। বইখানি সে হাতে করিয়া লইল এবং আস্তে আস্তে কোলের উপর রাখিয়া দিল, একবার খুলিয়া দেখিল না।

আমি তাহার হাতখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিলাম, "হৈম, আমার উপর রাগ করিয়ো না। আমি তোমার সত্যে কখনো আঘাত করিব না, আমি যে তোমার সত্যের বাঁধনে বাঁধা।"

হৈম কিছু না বলিয়া একটুখানি হাসিল। সে হাসি বিধাতা যাহাকে দিয়াছেন তাহার কোনো কথা বলিবার দরকার নাই।

পিতার আর্থিক উন্নতির পর হইতে দেবতার অনুগ্রহকে স্থায়ী করিবার জন্য নূতন উৎসাহে আমাদের বাড়িতে পূজার্চনা চলিতেছে। এ পর্যন্ত সে-সমস্ত ক্রিয়াকর্মে বাড়ির বধূকে ডাক পড়ে নাই। নূতন বধূর প্রতি একদিন পূজা সাজাইবার আদেশ হইল; সে বলিল, "মা, বলিয়া দাও কী করিতে হইবে।"

ইহাতে কাহারও মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িবার কথা নয়, কারণ সকলেরই জানা ছিল, মাতৃহীন প্রবাসে কন্যা মানুষ। কিন্তু কেবলমাত্র হৈমকে লজ্জিত করাই এই আদেশের হেতু। সকলেই গালে হাত দিয়া বলিল, "ওমা, এ কী কাণ্ড। এ কোন্ নাস্তিকের ঘরের মেয়ে। এবার এ সংসার হইতে লক্ষ্মী ছাড়িল, আর দেরি নাই।"

এই উপলক্ষ্যে হৈমর বাপের উদ্দেশে যাহা-না-বলিবার তাহা বলা হইল। যখন হইতে কটুকথার হাওয়া দিয়াছে, হৈম একেবারে চুপ করিয়া সমস্ত সহ্য করিয়াছে। একদিনের জন্য কাহারও সামনে সে চোখের জলও ফেলে নাই। আজ তাহার বড়ো বড়ো দুই চোখ ভাসাইয়া দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনারা জানেন— সে দেশে আমার বাবাকে সকলে ঋষি বলে?"

ঋষি বলে! ভারি একটা হাসি পড়িয়া গেল। ইহার পরে তাহার পিতার উল্লেখ করিতে হইলে প্রায়ই বলা হইত, তোমার ঋষিবাবা! এই মেয়েটির সকলের চেয়ে দরদের জায়গাটি যে কোথায় তাহা আমাদের সংসার বুঝিয়া লইয়াছিল।

বস্তুত, আমার শ্বশুর ব্রাহ্মও নন, খৃস্টানও নন, হয়তো বা নাস্তিকও না হইবেন। দেবার্চনার কথা কোনোদিন তিনি চিন্তাও করেন নাই। মেয়েকে তিনি অনেক পড়াইয়াছেন-শুনাইয়াছেন, কিন্তু কোনোদিনের জন্য দেবতা সম্বন্ধে তিনি তাহাকে কোনো উপদেশ দেন নাই। বনমালীবাবু এ লইয়া তাঁহাকে একবার প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি যাহা বুঝি না তাহা শিখাইতে গেলে কেবল কপটতা শেখানো হইবে।"

অন্তঃপুরে হৈমর একটি প্রকৃত ভক্ত ছিল, সে আমার ছোটো বোন নারানী। বউদিদিকে ভালোবাসে বলিয়া তাহাকে অনেক গঞ্জনা সহিতে হইয়াছিল। সংসার-যাত্রায় হৈমর সমস্ত অপমানের পালা আমি তাহার কাছেই শুনিতে পাইতাম। একদিনের জন্যও আমি হৈমর কাছে শুনি নাই। এ-সব কথা সংকোচে সে মুখে আনিতে পারিত না। সে সংকোচ নিজের জন্য নহে।

হৈম তাহার বাপের কাছ হইতে যত চিঠি পাইত সমস্ত আমাকে পড়িতে দিত। চিঠিগুলি ছোটো কিন্তু রসে ভরা। সেও বাপকে যত চিঠি লিখিত সমস্ত আমাকে দেখাইত। বাপের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধটিকে আমার সঙ্গে ভাগ করিয়া না লইলে তাহার দাম্পত্য যে পূর্ণ হইতে পারিত না। তাহার চিঠিতে শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে কোনো নালিশের ইশারাটুকুও ছিল না। থাকিলে বিপদ ঘটিতে পারিত। নারানীর কাছে শুনিয়াছি, শ্বশুরবাড়ির কথা কী লেখে জানিবার জন্য মাঝে মাঝে তাহার চিঠি খোলা হইত।

চিঠির মধ্যে অপরাধের কোনো প্রমাণ না পাইয়া উপরওয়ালাদের মন যে শান্ত হইয়াছিল তাহা নহে। বোধ করি তাহাতে তাঁহারা আশাভঙ্গের দুঃখই পাইয়াছিলেন। বিষম বিরক্ত হইয়া তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "এত ঘন ঘন চিঠিই বা কিসের জন্য? বাপই যেন সব, আমরা কি কেহ নই।" এই লইয়া অনেক অপ্রিয় কথা চলিতে লাগিল। আমি ক্ষুব্ধ হইয়া হৈমকে বলিলাম, "তোমার বাবার চিঠি আর-কাহাকেও না দিয়া আমাকেই দিয়ো। কলেজে যাইবার সময় আমি পোস্ট করিয়া দিব।"

হৈম বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

আমি লজ্জায় তাহার উত্তর দিলাম না।

বাড়িতে এখন সকলে বলিতে আরম্ভ করিল, "এইবার অপুর মাথা খাওয়া হইল। বি. এ. ডিগ্রি শিকায় তোলা রহিল। ছেলেরই বা দোষ কী।"

সে তো বটেই। দোষ সমস্তই হৈমর। তাহার দোষ যে তাহার বয়স সতেরো; তাহার দোষ যে আমি তাহাকে ভালোবাসি; তাহার দোষ যে বিধাতার এই বিধি, তাই আমার হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সমস্ত আকাশ আজ বাঁশি বাজাইতেছে।

বি. এ. ডিগ্রি অকাতরচিত্তে আমি চুলায় দিতে পারিতাম কিন্তু হৈমর কল্যাণে পণ করিলাম, পাস করিবই এবং ভালো করিয়াই পাস করিব। এ পণ রক্ষা করা আমার সে-অবস্থায় যে সম্ভবপর বোধ হইয়াছিল তাহার দুইটি কারণ ছিল—এক তো হৈমর ভালোবাসার মধ্যে এমন একটি আকাশের বিস্তার ছিল যে, সংকীর্ণ আসক্তির মধ্যে সে মনকে জড়াইয়া রাখিত না, সেই ভালোবাসার চারি দিকে ভারি একটি স্বাস্থ্যকর হাওয়া বহিত। দ্বিতীয়, পরীক্ষার জন্য যে বইগুলি পড়ার প্রয়োজন তাহা হৈমর সঙ্গে একত্রে মিলিয়া পড়া অসম্ভব ছিল না।

পরীক্ষা পাসের উদ্‌যোগে কোমর বাঁধিয়া লাগিলাম। একদিন রবিবার মধ্যাহ্নে বাহিরের ঘরে বসিয়া মার্টিনোর চরিত্রতত্ত্ব বইখানার বিশেষ বিশেষ লাইনের মধ্যপথগুলা ফাড়িয়া ফেলিয়া নীল পেন্‌সিলের লাঙল চালাইতেছিলাম, এমন সময় বাহিরের দিকে হঠাৎ আমার চোখ পড়িল।

আমার ঘরের সম্মুখে আঙিনার উত্তর দিকে অন্তঃপুরে উঠিবার একটা সিঁড়ি। তাহারই গায়ে গায়ে মাঝে মাঝে গরাদে-দেওয়া এক-একটা জানলা। দেখি তাহারই একটি জানলায় হৈম চুপ করিয়া বসিয়া পশ্চিমের দিকে চাহিয়া। সেদিকে মল্লিকদের বাগানে কাঞ্চনগাছ গোলাপি ফুলে আচ্ছন্ন।

আমার বুকে ধক্‌ করিয়া একটা ধাক্কা দিল; মনের মধ্যে একটা অনবধানতার আবরণ ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল। এই নিঃশব্দ গভীর বেদনার রূপটি আমি এতদিন এমন স্পষ্ট করিয়া দেখি নাই!

কিছু না, আমি কেবল তাহার বসিবার ভঙ্গীটুকু দেখিতে পাইতেছিলাম। কোলের উপরে একটি হাতের উপর আর-একটি হাত স্থির পড়িয়া আছে, মাথাটি দেয়ালের উপরে হেলানো, খোলা চুল বাম কাঁধের উপর দিয়া বুকের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। আমার বুকের ভিতরটা হুহু করিয়া উঠিল।

আমার নিজের জীবনটা এমনি কানায় কানায় ভরিয়াছে যে, আমি কোথাও কোনো শূন্যতা লক্ষ করিতে পারি নাই। আজ হঠাৎ আমার অত্যন্ত নিকটে অতি বৃহৎ একটা নৈরাশ্যের গহ্বর দেখিতে পাইলাম। কেমন করিয়া কী দিয়া আমি তাহা পূরণ করি।

আমাকে তো কিছুই ছাড়িতে হয় নাই। না আত্মীয়, না অভ্যাস, না কিছু। হৈম-যে সমস্ত ফেলিয়া আমার কাছে আসিয়াছে। সেটা কতখানি তাহা আমি ভালো করিয়া ভাবি নাই। আমাদের সংসারে অপমানের কণ্টকশয়নে সে বসিয়া; সে শয়ন আমিও

তাহার সঙ্গে ভাগ করিয়া লইয়াছি। সেই দুঃখে হৈমর সঙ্গে আমার যোগ ছিল, তাহাতে আমাদিগকে পৃথক করে নাই। কিন্তু, এই গিরিনন্দিনী সতেরো বৎসর-কাল অন্তরে বাহিরে কত বড়ো একটা মুক্তির মধ্যে মানুষ হইয়াছে। কী নির্মল সত্যে এবং উদার আলোকে তাহার প্রকৃতি এমন ঋজু শুভ্র ও সবল হইয়া উঠিয়াছে। তাহা হইতে হৈম যে কিরূপ নিরতিশয় ও নিষ্ঠুররূপে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে এতদিন তাহা আমি সম্পূর্ণ অনুভব করিতে পারি নাই, কেননা সেখানে তাহার সঙ্গে আমার সমান আসন ছিল না।

হৈম যে অন্তরে অন্তরে মুহূর্তে মুহূর্তে মরিতেছিল। তাহাকে আমি সব দিতে পারি কিন্তু মুক্তি দিতে পারি না— তাহা আমার নিজের মধ্যে কোথায়? সেই জন্যই কলিকাতার গলিতে ঐ গরাদের ফাঁক দিয়া নির্বাক্ আকাশের সঙ্গে তাহার নির্বাক্ মনের কথা হয়; এবং এক-একদিন রাত্রে হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া দেখি, সে বিছানায় নাই; হাতের উপর মাথা রাখিয়া আকাশ-ভরা তারার দিকে মুখ তুলিয়া ছাতে শুইয়া আছে।

মার্টিনো পড়িয়া রহিল। ভাবিতে লাগিলাম, কী করি। শিশুকাল হইতে বাবার কাছে আমার সংকোচের অন্ত ছিল না— কখনো মুখামুখি তাঁহার কাছে দরবার করিবার সাহস বা অভ্যাস আমার ছিল না। সেদিন থাকিতে পারিলাম না। লজ্জার মাথা খাইয়া তাঁহাকে বলিয়া বসিলাম, "বউয়ের শরীর ভালো নয়, তাহাকে একবার বাপের কাছে পাঠাইলে হয়।"

বাবা তো একেবারে হতবুদ্ধি। মনে লেশমাত্র সন্দেহ রহিল না যে, হৈমই এরূপ অভূতপূর্ব স্পর্ধায় আমাকে প্রবর্তিত করিয়াছে। তখনই তিনি উঠিয়া অন্তঃপুরে গিয়া হৈমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলি, বউমা, তোমার অসুখটা কিসের।"

হৈম বলিল, "অসুখ তো নাই।"

বাবা ভাবিলেন, এ উত্তরটা তেজ দেখাইবার জন্য।

কিন্তু, হৈমর শরীরও যে দিনে দিনে শুকাইয়া যাইতেছিল তাহা আমরা প্রতিদিনের অভ্যাসবশতই বুঝি নাই। একদিন বনমালীবাবু তাহাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন, "অ্যাঁ, এ কী! হৈমী, এ কেমন চেহারা তোর! অসুখ করে নাই তো?"

হৈম কহিল, "না।"

এই ঘটনার দিনদশেক পরেই, বলা নাই, কহা নাই, হঠাৎ আমার শ্বশুর আসিয়া উপস্থিত। হৈমর শরীরের কথাটা নিশ্চয় বনমালীবাবু তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন।

বিবাহের পর বাপের কাছে বিদায় লইবার সময় মেয়ে আপনার অশ্রু চাপিয়া

নিয়াছিল। এবার মিলনের দিন বাপ যেমনি তাহার চিবুক ধরিয়া মুখটি তুলিয়া ধরিলেন অমনি হৈমর চোখের জল আর মানা মানিল না। বাপ একটি কথা বলিতে পারিলেন না, জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করিলেন না 'কেমন আছিস'। আমার শ্বশুর তাঁহার মেয়ের মুখে এমন একটা-কিছু দেখিয়াছিলেন যাহাতে তাঁহার বুক ফাটিয়া গেল।

হৈম বাবার হাত ধরিয়া তাঁহাকে শোবার ঘরে লইয়া গেল। অনেক কথা যে জিজ্ঞাসা করিবার আছে। তাহার বাবারও যে শরীর ভালো দেখাইতেছে না।

বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বুড়ি, আমার সঙ্গে যাবি ?"

হৈম কাঙালের মতো বলিয়া উঠিল, "যাব।"

বাপ বলিলেন, "আচ্ছা, সব ঠিক করিতেছি।"

শ্বশুর যদি অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন হইয়া না থাকিতেন তাহা হইলে এ-বাড়িতে ঢুকিয়াই বুঝিতে পারিতেন, এখানে তাঁহার আর সেদিন নাই। হঠাৎ তাঁহার আবির্ভাবকে উপদ্রব মনে করিয়া বাবা তো ভালো করিয়া কথাই কহিলেন না। আমার শ্বশুরের মনে ছিল তাঁহার বেহাই একদা তাঁহাকে বারবার করিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, যখন তাঁহার খুশি মেয়েকে তিনি বাড়ি লইয়া যাইতে পারিবেন। এ সত্যের অন্যথা হইতে পারে সে কথা তিনি মনেও আনিতে পারেন নাই।

বাবা তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, "বেহাই, আমি তো কিছু বলিতে পারি না, একবার তাহলে বাড়ির মধ্যে—"

বাড়ির-মধ্যের উপর বরাত দেওয়ার অর্থ কী আমার জানা ছিল। বুঝিলাম, কিছু হইবে না। কিছু হইলও না।

বউমার শরীর ভালো নাই! এত বড়ো অন্যায় অপবাদ!

শ্বশুরমশায় স্বয়ং একজন ভালো ডাক্তার আনিয়া পরীক্ষা করাইলেন। ডাক্তার বলিলেন, "বায়ু-পরিবর্তন আবশ্যক, নহিলে হঠাৎ একটা শক্ত ব্যামো হইতে পারে।"

বাবা হাসিয়া কহিলেন, "হঠাৎ একটা শক্ত ব্যামো তো সকলেরই হইতে পারে। এটা কি আবার একটা কথা।"

আমার শ্বশুর কহিলেন, "জানেন তো, উনি একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার, উঁহার কথাটা কি—"

বাবা কহিলেন, "অমন ঢের ডাক্তার দেখিয়াছি। দক্ষিণার জোরে সকল পণ্ডিতেরই কাছে সব বিধান মেলে এবং সকল ডাক্তারেরই কাছে সব রোগের সার্টিফিকেট পাওয়া যায়!"

এই কথাটা শুনিয়া আমার শ্বশুর একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। হৈম বুঝিল,

তাহার বাবার প্রস্তাব অপমানের সহিত অগ্রাহ্য হইয়াছে। তাহার মন একেবারে কাঠ হইয়া গেল।

আমি আর সহিতে পারিলাম না। বাবার কাছে গিয়া বলিলাম, "হৈমকে আমি লইয়া যাইব।"

বাবা গর্জিয়া উঠিলেন, "বটে রে—" ইত্যাদি ইত্যাদি।

বন্ধুরা কেহ কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, যাহা বলিলাম তাহা করিলাম না কেন। স্ত্রীকে লইয়া জোর করিয়া বাহির হইয়া গেলেই তো হইত। গেলাম না কেন? কেন! যদি লোকধর্মের কাছে সত্যধর্মকে না ঠেলিব, যদি ঘরের কাছে ঘরের মানুষকে বলি দিতে না পারিব, তবে আমার রক্তের মধ্যে বহুযুগের যে শিক্ষা তাহা কী করিতে আছে। জান তোমরা? যেদিন অযোধ্যার লোকেরা সীতাকে বিসর্জন দিবার দাবি করিয়াছিল তাহার মধ্যে আমিও যে ছিলাম। আর সেই বিসর্জনের গৌরবের কথা যুগে যুগে যাহারা গান করিয়া আসিয়াছে আমিও যে তাহাদের মধ্যে একজন। আর, আমিই তো সেদিন লোকরঞ্জনের জন্য স্ত্রীপরিত্যাগের গুণবর্ণনা করিয়া মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়াছি। বুকের রক্ত দিয়া আমাকে যে একদিন দ্বিতীয় সীতাবিসর্জনের কাহিনী লিখিতে হইবে, সে কথা কে জানিত।

পিতায় কন্যায় আর-একবার বিদায়ের ক্ষণ উপস্থিত হইল। এইবারেও দুই-জনেরই মুখে হাসি। কন্যা হাসিতে হাসিতেই ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, "বাবা, আর যদি কখনো তুমি আমাকে দেখিবার জন্য এমন ছুটাছুটি করিয়া এ বাড়িতে আস তবে আমি ঘরে কপাট দিব।"

বাপ হাসিতে হাসিতেই বলিলেন, "ফের যদি আসি তবে সিঁধকাটি সঙ্গে করিয়াই আসিব।"

ইহার পরে হৈমর মুখে তাহার চিরদিনের সেই স্নিগ্ধ হাসিটুকু আর একদিনের জন্যও দেখি নাই।

তাহারও পরে কী হইল সে-কথা আর বলিতে পারিব না।

শুনিতেছি মা পাত্রী সন্ধান করিতেছেন। হয়তো একদিন মার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিব না, ইহাও সম্ভব হইতে পারে। কারণ— থাক্ আর কাজ কী!

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১

বোষ্টমী

আমি লিখিয়া থাকি অথচ লোকরঞ্জন আমার কলমের ধর্ম নয়, এই জন্য লোকেও আমাকে সদাসর্বদা যে রঙে রঞ্জিত করিয়া থাকে তাহাতে কালির ভাগই বেশি। আমার সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনিতে হয়; কপালক্রমে সেগুলি হিতকথা নয়, মনোহারী তো নহেই।

শরীরে যেখানটায় ঘা পড়িতে থাকে সে জায়গাটা যত তুচ্ছই হোক সমস্ত দেহটাকে বেদনার জোরে সেই ছাড়াইয়া যায়। যে লোক গালি খাইয়া মানুষ হয়, সে আপনার স্বভাবকে যেন ঠেলিয়া একঝোঁকা হইয়া পড়ে। আপনার চারিদিককে ছাড়াইয়া আপনাকেই কেবল তাহার মনে পড়ে— সেটা আরামও নয়, কল্যাণও নয়। আপনাকে ভোলাটাই তো স্বস্তি।

আমাকে তাই ক্ষণে ক্ষণে নির্জনের খোঁজ করিতে হয়। মানুষের ঠেলা খাইতে খাইতে মনের চারি দিকে যে টোল খাইয়া যায়, বিশ্বপ্রকৃতির সেবানিপুণ হাতখানির গুণে তাহা ভরিয়া উঠে।

কলিকাতা হইতে দূরে নিভৃতে আমার একটি অজ্ঞাতবাসের আয়োজন আছে; আমার নিজ-চর্চার দৌরাত্ম্য হইতে সেইখানে অন্তর্ধান করিয়া থাকি। সেখানকার লোকেরা এখনো আমার সম্বন্ধে কোনো একটা সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছে নাই। তাহারা দেখিয়াছে— আমি ভোগী নই, পল্লীর রজনীকে কলিকাতার কলুষে আবিল করি না; আবার যোগীও নই, কারণ দূর হইতে আমার যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায় তাহার মধ্যে ধনের লক্ষণ আছে; আমি পথিক নহি, পল্লীর রাস্তায় ঘুরি বটে কিন্তু কোথাও পৌঁছিবার দিকে আমার কোনো লক্ষ্যই নাই; আমি যে গৃহী এমন কথা বলাও শক্ত, কারণ ঘরের লোকের প্রমাণাভাব। এই জন্য পরিচিত জীবশ্রেণীর মধ্যে আমাকে কোনো একটা প্রচলিত কোঠায় না ফেলিতে পারিয়া গ্রামের লোক আমার সম্বন্ধে চিন্তা করা একরকম ছাড়িয়া দিয়াছে, আমিও নিশ্চিন্ত আছি।

অল্পদিন হইল খবর পাইয়াছি, এই গ্রামে একজন মানুষ আছে যে আমার সম্বন্ধে কিছু-একটা মনে ভাবিয়াছে, অন্তত বোকা ভাবে নাই।

তাহার সঙ্গে প্রথম দেখা হইল, তখন আষাঢ়মাসের বিকালবেলা। কান্না শেষ হইয়া গেলেও চোখের পল্লব ভিজা থাকিলে যেমন ভাবটা হয়, সকালবেলাকার বৃষ্টি-অবসানে সমস্ত লতাপাতা আকাশ ও বাতাসের মধ্যে সেই ভাবটা ছিল। আমাদের পুকুরের উঁচু পাড়িটার উপর দাঁড়াইয়া আমি একটি নধর-শ্যামল গাভীর ঘাস খাওয়া দেখিতে-

ছিলাম। তাহার চিক্কণ দেহটির উপর রৌদ্র পড়িয়াছিল দেখিয়া ভাবিতেছিলাম, আকাশের আলো হইতে সভ্যতা আপনার দেহটাকে পৃথক্ করিয়া রাখিবার জন্য যে এত দর্জির দোকান বানাইয়াছে, ইহার মতো এমন অপব্যয় আর নাই।

এমন সময় হঠাৎ দেখি, একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক আমাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তাহার আঁচলে কতকগুলি ঠোঙার মধ্যে করবী, গন্ধরাজ এবং আরো দুই-চার রকমের ফুল ছিল। তাহারই মধ্যে একটি আমার হাতে দিয়া ভক্তির সঙ্গে জোড়হাত করিয়া সে বলিল, "আমার ঠাকুরকে দিলাম।"— বলিয়া চলিয়া গেল।

আমি এমনি আশ্চর্য হইয়া গেলাম যে, তাহাকে ভালো করিয়া দেখিতেই পাইলাম না।

ব্যাপারটা নিতান্তই সাদা অথচ আমার কাছে তাহা এমন করিয়া প্রকাশ হইল যে, সেই যে গাভীটি বিকালবেলাকার ধূসর রৌদ্রে লেজ দিয়া পিঠের মাছি তাড়াইতে তাড়াইতে, নববর্ষার রসকোমল ঘাসগুলি বড়ো বড়ো নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে শান্ত আনন্দে খাইয়া বেড়াইতেছে, তাহার জীবলীলাটি আমার কাছে বড়ো অপরূপ হইয়া দেখা দিল। এ কথা বলিলে লোকে হাসিবে, কিন্তু আমার মন ভক্তিতে ভরিয়া উঠিল। আমি সহজ-আনন্দময় জীবনেশ্বরকে প্রণাম করিলাম। বাগানের আমগাছ হইতে পাতা-সমেত একটি কচি আমের ডাল লইয়া সেই গাভীকে খাওয়াইলাম। আমার মনে হইল, আমি দেবতাকে সন্তুষ্ট করিয়া দিলাম।

ইহার পরবৎসর যখন সেখানে গিয়াছি তখন মাঘের শেষ। সেবার তখনো শীত ছিল; সকালের রৌদ্রটি পুবের জানলা দিয়া আমার পিঠে আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহাকে নিষেধ করি নাই। দোতলার ঘরে বসিয়া লিখিতেছিলাম, বেহারা আসিয়া খবর দিল, আনন্দী বোষ্টমী আমার সঙ্গে দেখা করিতে চায়। লোকটাকে জানি না; অন্যমনস্ক হইয়া বলিলাম, "আচ্ছা, এইখানে নিয়ে আয়।"

বোষ্টমী পায়ের ধুলা লইয়া আমাকে প্রণাম করিল। দেখিলাম, সেই আমার পূর্বপরিচিত স্ত্রীলোকটি। সে সুন্দরী কি না সেটা লক্ষ্যগোচর হইবার বয়স তাহার পার হইয়া গেছে। দোহারা, সাধারণ স্ত্রীলোকের চেয়ে লম্বা; একটি নিয়ত-ভক্তিতে তাহার শরীরটি নম্র, অথচ বলিষ্ঠ নিঃসংকোচ তাহার ভাব। সব চেয়ে চোখে পড়ে তাহার দুই চোখ। ভিতরকার কী-একটা শক্তিতে তাহার সেই বড়ো বড়ো চোখদুটি যেন কোন্ দূরের জিনিসকে কাছে করিয়া দেখিতেছে।

তাহার সেই দুই চোখ দিয়া আমাকে যেন ঠেলা দিয়া সে বলিল, "এ আবার কী কাণ্ড। আমাকে তোমার এই রাজসিংহাসনের তলায় আনিয়া হাজির করা কেন।

তোমাকে গাছের তলায় দেখিতাম, সে যে বেশ ছিল।"

বুঝিলাম, গাছতলায় এ আমাকে অনেকদিন লক্ষ্য করিয়াছে কিন্তু আমি ইহাকে দেখি নাই। সর্দির উপক্রম হওয়াতে কয়েকদিন পথে ও বাগানে বেড়ানো বন্ধ করিয়া ছাদের উপরেই সন্ধ্যাকাশের সঙ্গে মোকাবিলা করিয়া থাকি ; তাই কিছুদিন সে আমাকে দেখিতে পায় নাই।

একটুক্ষণ থামিয়া সে বলিল, "গৌর, আমাকে কিছু-একটা উপদেশ দাও।"

আমি মুশকিলে পড়িলাম। বলিলাম, "উপদেশ দিতে পারি না, নিতেও পারি না। চোখ মেলিয়া চুপ করিয়া যাহা পাই তাহা লইয়াই আমার কারবার। এই যে তোমাকে দেখিতেছি, আমার দেখাও হইতেছে শোনাও হইতেছে।"

বোষ্টমী ভারি খুশি হইয়া 'গৌর গৌর' বলিয়া উঠিল। কহিল, "ভগবানের তো শুধু রসনা নয়, তিনি যে সর্বাঙ্গ দিয়া কথা কন।"

আমি বলিলাম, "চুপ করিলেই সর্বাঙ্গ দিয়া তাঁর সেই সর্বাঙ্গের কথা শোনা যায়। তাই শুনিতেই শহর ছাড়িয়া এখানে আসি।"

বোষ্টমী কহিল, "সেটা আমি বুঝিয়াছি, তাই তো তোমার কাছে আসিয়া বসিলাম।"

যাইবার সময় সে আমার পায়ের ধুলা লইতে গিয়া, দেখিলাম, আমার মোজাতে হাত ঠেকিয়া তাহার বড়ো বাধা বোধ হইল।

পরের দিন ভোরে সূর্য উঠিবার পূর্বে আমি ছাদে আসিয়া বসিয়াছি। দক্ষিণে বাগানের ঝাউগাছগুলার মাথার উপর দিয়া একেবারে দিক্‌সীমা পর্যন্ত মাঠ ধুধু করিতেছে। পূর্বদিকে বাঁশবনে-ঘেরা গ্রামের পাশে আখের খেতের প্রান্ত দিয়া প্রতিদিন আমার সাম্‌নে সূর্য উঠে। গ্রামের রাস্তাটা গাছের ঘন ছায়ার ভিতর হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া খোলা মাঠের মাঝখান দিয়া বাঁকিয়া বহুদূরের গ্রামগুলির কাজ সারিতে চলিয়াছে।

সূর্য উঠিয়াছে কি না জানি না। একখানি শুভ্র কুয়াশার চাদর বিধবার ঘোমটার মতো গ্রামের গাছগুলির উপর টানা রহিয়াছে। দেখিতে পাইলাম, বোষ্টমী সেই ভোরের ঝাপসা আলোর ভিতর দিয়া একটি সচল কুয়াশার মূর্তির মতো করতাল বাজাইয়া হরিনাম গান করিতে করিতে সেই পুব দিকের গ্রামের সমুখ দিয়া চলিয়াছে।

তন্দ্রাভাঙা চোখের পাতার মতো এক সময়ে কুয়াশাটা উঠিয়া গেল এবং ঐ-সমস্ত মাঠের ও ঘরের নানা কাজকর্মের মাঝখানে শীতের রৌদ্রটি গ্রামের ঠাকুরদাদার মতো আসিয়া বেশ করিয়া জমিয়া বসিল।

আমি তখন সম্পাদকের পেয়াদা বিদায় করিবার জন্য লিখিবার টেবিলে আসিয়া

বসিয়াছি। এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দের সঙ্গে একটা গানের সুর শোনা গেল। বোষ্টমী গুন্‌গুন্‌ করিতে করিতে আসিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া কিছু দূরে মাটিতে বসিল। আমি লেখা হইতে মুখ তুলিলাম।

সে বলিল, "কাল আমি তোমার প্রসাদ পাইয়াছি।"

আমি বলিলাম, "সে কী কথা।"

সে কহিল, "কাল সন্ধ্যার সময় কখন তোমার খাওয়া হয় আমি সেই আশায় দরজার বাহিরে বসিয়া ছিলাম। খাওয়া হইলে চাকর যখন পাত্র লইয়া বাহিরে আসিল তাহাতে কী ছিল জানি না কিন্তু আমি খাইয়াছি।"

আমি আশ্চর্য হইলাম। আমার বিলাত যাওয়ার কথা সকলেই জানে। সেখানে কী খাইয়াছি না-খাইয়াছি তাহা অনুমান করা কঠিন নহে, কিন্তু গোবর খাই নাই। দীর্ঘকাল মাছমাংসে আমার রুচি নাই বটে কিন্তু আমার পাচকটির জাতিকুলের কথাটা প্রকাশ্য সভায় আলোচনা না করাই সংগত। আমার মুখে বিস্ময়ের লক্ষণ দেখিয়া বোষ্টমী বলিল, "যদি তোমার প্রসাদ খাইতেই না পারিব, তবে তোমার কাছে আসিবার তো কোনো দরকার ছিল না।"

আমি বলিলাম, "লোকে জানিলে তোমার উপর তো তাদের ভক্তি থাকিবে না।"

সে বলিল, "আমি তো সকলকেই বলিয়া বেড়াইয়াছি। শুনিয়া উহারা ভাবিল, আমার এইরকমই দশা।"

বোষ্টমী যে সংসারে ছিল উহার কাছে তাহার খবর বিশেষ কিছু পাইলাম না। কেবল এইটুকু শুনিয়াছি, তাহার মায়ের অবস্থা বেশ ভালো এবং এখনো তিনি বাঁচিয়া আছেন। মেয়েকে যে বহু লোক ভক্তি করিয়া থাকে সে খবর তিনি জানেন। তাঁহার ইচ্ছা, মেয়ে তাঁর কাছে গিয়া থাকে, কিন্তু আনন্দীর মন তাহাতে সায় দেয় না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার চলে কী করিয়া।"

উত্তরে শুনিলাম, তাহার ভক্তদের একজন তাহাকে সামান্য কিছু জমি দিয়াছে। তাহারই ফসলে সেও খায়, পাঁচজনে খায়, কিছুতে সে আর শেষ হয় না। বলিয়া একটু হাসিয়া কহিল, "আমার তো সবই ছিল— সমস্ত ছাড়িয়া আসিয়াছি, আবার পরের কাছে মাগিয়া সংগ্রহ করিতেছি, ইহার কী দরকার ছিল বলো তো।"

শহরে থাকিতে এ প্রশ্ন উঠিলে সহজে ছাড়তাম না। ভিক্ষাজীবিতায় সমাজের কত অনিষ্ট তাহা বুঝাইতাম। কিন্তু, এ জায়গায় আসিলে আমার পুঁথিপড়া বিদ্যার সমস্ত ঝাঁজ একেবারে মরিয়া যায়। বোষ্টমীর কাছে কোনো তর্কই আমার মুখ দিয়া বাহির হইতে চাহিল না; আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

আমার উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া সে আপনিই বলিয়া উঠিল, "না, না, এই আমার ভালো। আমার মাগিয়া-খাওয়া অন্নই অমৃত।"

তাহার কথার ভাবখানা আমি বুঝিলাম। প্রতিদিনই যিনি নিজে অন্ন জোগাইয়া দেন ভিক্ষার অন্নে তাঁহাকেই মনে পড়ে। আর, ঘরে মনে হয়, আমারই অন্ন আমি নিজের শক্তিতে ভোগ করিতেছি।

ইচ্ছা ছিল তাহার স্বামীর ঘরের কথা জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু সে নিজে বলিল না, আমিও প্রশ্ন করিলাম না।

এখানকার যে-পাড়ায় উচ্চবর্ণের ভদ্রলোকে থাকে সে-পাড়ার প্রতি বোষ্টমীর শ্রদ্ধা নাই। বলে, ঠাকুরকে উহারা কিছুই দেয় না অথচ ঠাকুরের ভোগে উহারাই সব চেয়ে বেশি করিয়া ভাগ বসায়। গরিবরা ভক্তি করে আর উপবাস করিয়া মরে।

এ পাড়ার দুষ্কৃতির কথা অনেক শুনিয়াছি, তাই বলিলাম, "এই-সকল দুর্মতিদের মাঝখানে থাকিয়া ইহাদের মতিগতি ভালো করো, তাহা হইলেই তো ভগবানের সেবা হইবে।"

এই রকমের সব উঁচুদরের উপদেশ অনেক শুনিয়াছি এবং অন্যকে শুনাইতেও ভালোবাসি। কিন্তু, বোষ্টমীর ইহাতে তাক্ লাগিল না। আমার মুখের দিকে তাহার উজ্জ্বল চক্ষু দুটি রাখিয়া সে বলিল, "তুমি বলিতেছ, ভগবান পাপীর মধ্যেও আছেন, তাই উহাদের সঙ্গ করিলেও তাঁহারই পূজা করা হয়। এই তো?"

আমি কহিলাম, "হাঁ।"

সে বলিল, "উহারা যখন বাঁচিয়া আছে তখন তিনিও উহাদের সঙ্গে আছেন বই-কি। কিন্তু, আমার তাহাতে কী। আমার তো পূজা ওখানে চলিবে না; আমার ভগবান যে উহাদের মধ্যে নাই। তিনি যেখানে আমি সেখানেই তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াই।"

বলিয়া সে আমাকে প্রণাম করিল। তাহার কথাটা এই যে, শুধু মত লইয়া কী হইবে— সত্য যে চাই। ভগবান সর্বব্যাপী এটা একটা কথা, কিন্তু যেখানে আমি তাঁহাকে দেখি সেখানেই তিনি আমার সত্য।

এত বড়ো বাহুল্য কথাটাও কোনো কোনো লোকের কাছে বলা আবশ্যক যে, আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া বোষ্টমী যে ভক্তি করে আমি তাহা গ্রহণও করি না, ফিরাইয়াও দিই না।

এখনকার কালের ছোঁয়াচ আমাকে লাগিয়াছে। আমি গীতা পড়িয়া থাকি এবং বিদ্বান লোকদের দ্বারস্থ হইয়া তাহাদের কাছে ধর্মতত্ত্বের অনেক সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা শুনিয়াছি।

কেবল শুনিয়া শুনিয়াই বয়স বহিয়া যাইবার জো হইল, কোথাও তো কিছু প্রত্যক্ষ দেখিলাম না। এতদিন পরে নিজের দৃষ্টির অহংকার ত্যাগ করিয়া এই শাস্ত্রহীনা স্ত্রীলোকের দুই চক্ষুর ভিতর দিয়া সত্যকে দেখিলাম। ভক্তি করিবার ছলে শিক্ষা দিবার এ কী আশ্চর্য প্রণালী।

পরদিন সকালে বোষ্টমী আসিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া দেখিল, তখনো আমি লিখিতে প্রবৃত্ত। বিরক্ত হইয়া বলিল, "তোমাকে আমার ঠাকুর এত মিথ্যা খাটাইতেছেন কেন। যখনি আসি দেখিতে পাই, লেখা লইয়াই আছ!"

আমি বলিলাম, "যে লোকটা কোনো কর্মেরই নয় ঠাকুর তাহাকে বসিয়া থাকিতে দেন না, পাছে সে মাটি হইয়া যায়। যত রকমের বাজে কাজ করিবার ভার তাহারই উপরে।"

আমি যে কত আবরণে আবৃত তাহাই দেখিয়া সে অধৈর্য হইয়া উঠে। আমার সঙ্গে দেখা করিতে হইলে অনুমতি লইয়া দোতলায় চড়িতে হয়, প্রণাম করিতে আসিয়া হাতে ঠেকে মোজাজোড়া, সহজ দুটো কথা বলা এবং শোনার প্রয়োজন কিন্তু আমার মনটা আছে কোন্ লেখার মধ্যে তলাইয়া।

হাত জোড় করিয়া সে বলিল, "গৌর, আজ ভোরে বিছানায় যেমনি উঠিয়া বসিয়াছি অমনি তোমার চরণ পাইলাম। আহা, সেই তোমার দুখানি পা, কোনো ঢাকা নাই— সে কী ঠাণ্ডা। কী কোমল। কতক্ষণ মাথায় ধরিয়া রাখিলাম। সে তো খুব হইল। তবে আর আমার এখানে আসিবার প্রয়োজন কী। প্রভু, এ আমার মোহ নয় তো? ঠিক করিয়া বলো।"

লিখিবার টেবিলের উপর ফুলদানিতে পূর্বদিনের ফুল ছিল। মালী আসিয়া সেগুলি তুলিয়া লইয়া নূতন ফুল সাজাইবার উদ্‌যোগ করিল।

বোষ্টমী যেন ব্যথিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "বাস্? এ ফুলগুলি হইয়া গেল? তোমার আর দরকার নাই? তবে দাও দাও, আমাকে দাও।"

এই বলিয়া ফুলগুলি অঞ্জলিতে লইয়া, কতক্ষণ মাথা নত করিয়া, একান্ত স্নেহে এক দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া বলিল, "তুমি চাহিয়া দেখো না বলিয়াই এ ফুল তোমার কাছে মলিন হইয়া যায়। যখন দেখিবে তখন তোমার লেখাপড়া সব ঘুচিয়া যাইবে।"

এই বলিয়া সে বহু যত্নে ফুলগুলি আপন আঁচলের প্রান্তে বাঁধিয়া লইয়া মাথায় ঠেকাইয়া বলিল, "আমার ঠাকুরকে আমি লইয়া যাই।"

কেবল ফুলদানিতে রাখিলেই যে ফুলের আদর হয় না, তাহা বুঝিতে আমার

বিলম্ব হইল না। আমার মনে হইল, ফুলগুলিকে যেন ইস্কুলের পড়া-না-পারা ছেলেদের মতো প্রতিদিন আমি বেঞ্চের উপর দাঁড় করাইয়া রাখি।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় যখন ছাদে বসিয়াছি, বোষ্টমী আমার পায়ের কাছে আসিয়া বসিল। কহিল, "আজ সকালে নাম শুনাইবার সময় তোমার প্রসাদী ফুলগুলি ঘরে ঘরে দিয়া আসিয়াছি। আমার ভক্তি দেখিয়া বেণী চক্রবর্তী হাসিয়া বলিল, 'পাগলি, কাকে ভক্তি করিস তুই? বিশ্বের লোকে যে তাকে মন্দ বলে।' হাঁগো, সকলে নাকি তোমাকে গালি দেয়?"

কেবল এক মুহূর্তের জন্য মনটা সংকুচিত হইয়া গেল। কালির ছিটা এত দূরেও ছড়ায়!

বোষ্টমী বলিল, "বেণী ভাবিয়াছিল, আমার ভক্তিটাকে এক ফুঁয়ে নিবাইয়া দিবে। কিন্তু, এ তো তেলের বাতি নয়, এ যে আগুন! আমার গৌর, ওরা তোমাকে গালি দেয় কেন গো।"

আমি বলিলাম, "আমার পাওনা আছে বলিয়া। আমি হয়তো একদিন লুকাইয়া উহাদের মন চুরি করিবার লোভ করিয়াছিলাম।"

বোষ্টমী কহিল, "মানুষের মনে বিষ যে কত সে তো দেখিলে। লোভ আর টিঁকিবে না।"

আমি বলিলাম, "মনে লোভ থাকিলেই মারের মুখে থাকিতে হয়। তখন নিজেকে মারিবার বিষ নিজের মনই জোগায়। তাই আমার ওঝা আমারই মনটাকে নির্বিষ করিবার জন্য এত কড়া করিয়া ঝাড়া দিতেছেন।"

বোষ্টমী কহিল, "দয়াল ঠাকুর মারিতে মারিতে তবে মারকে খেদান। শেষ পর্যন্ত যে সহিতে পারে সেই বাঁচিয়া যায়।"

সেইদিন সন্ধ্যার সময় অন্ধকার ছাদের উপর সন্ধ্যাতারা উঠিয়া আবার অস্ত গেল; বোষ্টমী তাহার জীবনের কথা আমাকে শুনাইল।—

আমার স্বামী বড়ো সাদা মানুষ। কোনো কোনো লোকে মনে করিত তাঁহার বুঝিবার শক্তি কম। কিন্তু, আমি জানি, যাহারা সাদা করিয়া বুঝিতে পারে তাহারাই মোটের উপর ঠিক বোঝে।

ইহাও দেখিয়াছি, তাঁহার চাষবাস জমিজমার কাজে তিনি যে ঠকিতেন তাহা নহে। বিষয়কাজ এবং ঘরের কাজ দুইই তাঁহার গোছালো ছিল। ধান-চাল-পাটের সামান্য যে একটু ব্যাবসা করিতেন, কখনো তাহাতে লোকসান করেন নাই। কেননা, তাঁহার

লোভ অল্প। যেটুকু তাঁহার দরকার সেটুকু তিনি হিসাব করিয়া চলিতেন; তার চেয়ে বেশি যা তাহা তিনি বুঝিতেনও না, তাহাতে হাতও দিতেন না।

আমার বিবাহের পূর্বেই আমার শ্বশুর মারা গিয়াছিলেন এবং আমার বিবাহের অল্পদিন পরেই শাশুড়ির মৃত্যু হয়। সংসারে আমাদের মাথার উপরে কেহই ছিল না।

আমার স্বামী মাথার উপরে একজন উপরওয়ালাকে না বসাইয়া থাকিতে পারিতেন না। এমন-কি, বলিতে লজ্জা হয়, আমাকে যেন তিনি ভক্তি করিতেন। তবু আমার বিশ্বাস, তিনি আমার চেয়ে বুঝিতেন বেশি, আমি তাঁহার চেয়ে বলিতাম বেশি।

তিনি সকলের চেয়ে ভক্তি করিতেন তাঁহার গুরুঠাকুরকে। শুধু ভক্তি নয়, সে ভালোবাসা—এমন ভালোবাসা দেখা যায় না।

গুরুঠাকুর তাঁর চেয়ে বয়সে কিছু কম। কী সুন্দর রূপ তাঁর।

বলিতে বলিতে বোষ্টমী ক্ষণকাল থামিয়া তাহার সেই দূরবিহারী চক্ষু দুটিকে বহু দূরে পাঠাইয়া দিল এবং গুন্‌গুন্‌ করিয়া গাহিল—

অরুণকিরণখানি তরুণ অমৃতে ছানি
কোন্‌ বিধি নিরমিল দেহা।

এই গুরুঠাকুরের সঙ্গে বালককাল হইতে তিনি খেলা করিয়াছেন; তখন হইতেই তাঁহাকে আপন মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া দিয়াছেন।

তখন আমার স্বামীকে ঠাকুর বোকা বলিয়াই জানিতেন। সেইজন্য তাঁহার উপর বিস্তর উপদ্রব করিয়াছেন। অন্য সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিয়া পরিহাস করিয়া তাঁহাকে যে কত নাকাল করিয়াছেন তাহার সীমা নাই।

বিবাহ করিয়া এ সংসারে যখন আসিয়াছি তখন গুরুঠাকুরকে দেখি নাই। তিনি তখন কাশীতে অধ্যয়ন করিতে গিয়াছেন। আমার স্বামীই তাঁহাকে সেখানকার খরচ জোগাইতেন।

গুরুঠাকুর যখন দেশে ফিরিলেন তখন আমার বয়স বোধ করি আঠারো হইবে।

পনেরো বছর বয়সে আমার একটি ছেলে হইয়াছিল। বয়স কাঁচা ছিল বলিয়াই আমার সেই ছেলেটিকে আমি যত্ন করিতে শিখি নাই, পাড়ার সই-সাঙাতিদের সঙ্গে মিলিবার জন্যই তখন আমার মন ছুটিত। ছেলের জন্য ঘরে বাঁধা থাকিতে হয় বলিয়া এক-একসময় তাহার উপরে আমার রাগ হইত।

হায় রে, ছেলে যখন আসিয়া পৌঁছিয়াছে, মা তখনো পিছাইয়া পড়িয়া আছে, এমন

বিপদ আর কী হইতে পারে। আমার গোপাল আসিয়া দেখিল, তখনো তাহার জন্য ননী তৈরি নাই, তাই সে রাগ করিয়া চলিয়া গেছে—আমি আজও মাঠে ঘাটে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি।

ছেলেটি ছিল বাপের নয়নের মণি। আমি তাহাকে যত্ন করিতে শিখি নাই বলিয়া তাহার বাপ কষ্ট পাইতেন। কিন্তু, তাঁহার হৃদয় যে ছিল বোবা, আজ পর্যন্ত তাঁহার দুঃখের কথা কাহাকেও কিছু বলিতে পারেন নাই।

মেয়েমানুষের মতো তিনি ছেলের যত্ন করিতেন। রাত্রে ছেলে কাঁদিলে আমার অল্পবয়সের গভীর ঘুম তিনি ভাঙাইতে চাহিতেন না। নিজে রাত্রে উঠিয়া দুধ গরম করিয়া খাওয়াইয়া কতদিন খোকাকে কোলে লইয়া ঘুম পাড়াইয়াছেন, আমি তাহা জানিতে পারি নাই। তাঁহার সকল কাজই এমনি নিঃশব্দে। পূজাপার্বণে জমিদারদের বাড়িতে যখন যাত্রা বা কথা হইত তিনি বলিতেন, "আমি রাত জাগিতে পারি না, তুমি যাও, আমি এখানেই থাকি।" তিনি ছেলেটিকে লইয়া না থাকিলে আমার যাওয়া হইবে না, এইজন্য তাঁহার ছুতা।

আশ্চর্য এই, তবু ছেলে আমাকেই সকলের চেয়ে বেশি ভালোবাসিত। সে যেন বুঝিত, সুযোগ পাইলেই আমি তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইব, তাই সে যখন আমার কাছে থাকিত তখনও ভয়ে ভয়ে থাকিত। সে আমাকে অল্প পাইয়াছিল বলিয়াই আমাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা তাহার কিছুতেই মিটিতে চাহিত না।

আমি যখন নাহিবার জন্য ঘাটে যাইতাম তাহাকে সঙ্গে লইবার জন্য সে আমাকে রোজ বিরক্ত করিত। ঘাটে সঙ্গিনীদের সঙ্গে আমার মিলনের জায়গা, সেখানে ছেলেকে লইয়া তাহার খবরদারি করিতে আমার ভালো লাগিত না। সেইজন্য পারতপক্ষে তাহাকে লইয়া যাইতে চাহিতাম না।

সেদিন শ্রাবণ মাস। থাকে থাকে ঘন কালো মেঘে দুই-প্রহর বেলাটাকে একেবারে আগাগোড়া মুড়ি দিয়া রাখিয়াছে। স্নানে যাইবার সময় খোকা কান্না জুড়িয়া দিল। নিস্তারিণী আমাদের হেঁসেলের কাজ করিত, তাহাকে বলিয়া গেলাম, "বাছা, ছেলেকে দেখিয়ো, আমি ঘাটে একটা ডুব দিয়া আসি গে।"

ঘাটে ঠিক সেই সময়টিতে আর কেহ ছিল না। সঙ্গিনীদের আসিবার অপেক্ষায় আমি সাঁতার দিতে লাগিলাম। দিঘিটা প্রাচীনকালের; কোন্ রানী কবে খনন করাইয়াছিলেন তাই ইহার নাম রানীসাগর। সাঁতার দিয়া এই দিঘি এপার-ওপার করা মেয়েদের মধ্যে কেবল আমিই পারিতাম। বর্ষায় তখন কূলে কূলে জল। দিঘি যখন প্রায় অর্ধেকটা পার হইয়া গেছি এমন সময় পিছন হইতে ডাক শুনিতে পাইলাম, "মা!" ফিরিয়া দেখি,

খোকা ঘাটের সিঁড়িতে নামিতে নামিতে আমাকে ডাকিতেছে। চীৎকার করিয়া বলিলাম, "আর আসিস নে, আমি যাচ্ছি।" নিষেধ শুনিয়া হাসিতে হাসিতে সে আরো নামিতে লাগিল। ভয়ে আমার হাতে পায়ে যেন খিল ধরিয়া আসিল, পার হইতে আর পারিই না। চোখ বুজিলাম। পাছে কী দেখিতে হয়। এমন সময় পিছল ঘাটে সেই দিঘির জলে খোকার হাসি চিরদিনের মতো থামিয়া গেল। পার হইয়া আসিয়া সেই মায়ের কোলের-কাঙাল ছেলেকে জলের তলা হইতে তুলিয়া কোলে লইলাম, কিন্তু আর সে 'মা' বলিয়া ডাকিল না।

আমার গোপালকে আমি এতদিন কাঁদাইয়াছি, সেই সমস্ত অনাদর আজ আমার উপর ফিরিয়া আসিয়া আমাকে মারিতে লাগিল। বাঁচিয়া থাকিতে তাহাকে বরাবর যে ফেলিয়া চলিয়া গেছি, আজ তাই সে দিনরাত আমার মনকে আঁকড়িয়া ধরিয়া রহিল।

আমার স্বামীর বুকে যে কতটা বাজিল সে কেবল তাঁর অন্তর্যামীই জানেন। আমাকে যদি গালি দিতেন তো ভালো হইত; কিন্তু তিনি তো কেবল সহিতেই জানেন, কহিতে জানেন না।

এমনি করিয়া আমি যখন একরকম পাগল হইয়া আছি, এমন সময় গুরুঠাকুর দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

যখন ছেলেবয়সে আমার স্বামী তাঁহার সঙ্গে একত্রে খেলাধুলা করিয়াছেন তখন সে এক ভাব ছিল। এখন আবার দীর্ঘকাল বিচ্ছেদের পর যখন তাঁর ছেলেবয়সের বন্ধু বিদ্যালাভ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহার 'পরে আমার স্বামীর ভক্তি একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কে বলিবে খেলার সাথি, ইঁহার সামনে তিনি যেন একেবারে কথা কহিতে পারিতেন না।

আমার স্বামী আমাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য তাঁহার গুরুকে অনুরোধ করিলেন। গুরু আমাকে শাস্ত্র শুনাইতে লাগিলেন। শাস্ত্রের কথায় আমার বিশেষ ফল হইয়াছিল বলিয়া মনে তো হয় না। আমার কাছে সে-সব কথার যা-কিছু মূল্য সে তাঁহারই মুখের কথা বলিয়া। মানুষের কণ্ঠ দিয়াই ভগবান তাঁহার অমৃত মানুষকে পান করাইয়া থাকেন; অমন সুধাপাত্র তো তাঁর হাতে আর নাই। আবার, ঐ মানুষের কণ্ঠ দিয়াই তো সুধা তিনিও পান করেন।

গুরুর প্রতি আমার স্বামীর অজস্র ভক্তি আমাদের সংসারকে সর্বত্র মৌচাকের ভিতরকার মধুর মতো ভরিয়া রাখিয়াছিল। আমাদের আহারবিহার ধনজন সমস্তই এই ভক্তিতে ঠাসা ছিল, কোথাও ফাঁক ছিল না। আমি সেই রসে আমার সমস্ত মন

লইয়া ডুবিয়া তবে সান্ত্বনা পাইয়াছি। তাই দেবতাকে আমার গুরুর রূপেই দেখিতে পাইলাম।

তিনি আসিয়া আহার করিবেন এবং তার পর তাঁর প্রসাদ পাইব, প্রতিদিন সকালে ঘুম হইতে উঠিয়াই এই কথাটি মনে পড়িত, আর সেই আয়োজনে লাগিয়া যাইতাম। তাঁহার জন্য তরকারি কুটিতাম, আমার আঙুলের মধ্যে আনন্দধ্বনি বাজিত। ব্রাহ্মণ নই, তাঁহাকে নিজের হাতে রাঁধিয়া খাওয়াইতে পারিতাম না, তাই আমার হৃদয়ের সব ক্ষুধাটা মিটিত না।

তিনি যে জ্ঞানের সমুদ্র, সেদিকে তো তাঁর কোনো অভাব নাই। আমি সামান্য রমণী, আমি তাঁহাকে কেবল একটু খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া খুশি করিতে পারি, তাহাতেও এত দিকে এত ফাঁক ছিল।

আমার গুরুসেবা দেখিয়া আমার স্বামীর মন খুশি হইতে থাকিত এবং আমার উপরে তাঁহার ভক্তি আরো বাড়িয়া যাইত। তিনি যখন দেখিতেন, আমার কাছে শাস্ত্রব্যাখ্যা করিবার জন্য গুরুর বিশেষ উৎসাহ, তখন তিনি ভাবিতেন, গুরুর কাছে বুদ্ধিহীনতার জন্য তিনি বরাবর অশ্রদ্ধা পাইয়াছেন, তাঁহার স্ত্রী এবার বুদ্ধির জোরে গুরুকে খুশি করিতে পারিল এই তাঁহার সৌভাগ্য।

এমন করিয়া চার-পাঁচ বছর কোথা দিয়া যে কেমন করিয়া কাটিয়া গেল তাহা চোখে দেখিতে পাইলাম না।

সমস্ত জীবনই এমনি করিয়া কাটিতে পারিত। কিন্তু, গোপনে কোথায় একটা চুরি চলিতেছিল, সেটা আমার কাছে ধরা পড়ে নাই, অন্তর্যামীর কাছে ধরা পড়িল। তারপর একদিনে একটি মুহূর্তে সমস্ত উলটপালট হইয়া গেল।

সেদিন ফাল্গুনের সকালবেলায় ঘাটে যাইবার ছায়াপথে স্নান সারিয়া ভিজা-কাপড়ে ঘরে ফিরিতেছিলাম। পথের একটি বাঁকে আমতলায় গুরুঠাকুরের সঙ্গে দেখা। তিনি কাঁধে একখানি গামছা লইয়া কোন্‌-একটা সংস্কৃত মন্ত্র আবৃত্তি করিতে করিতে স্নানে যাইতেছেন।

ভিজা-কাপড়ে তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়াতে লজ্জায় একটু পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময়ে তিনি আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। আমি জড়োসড়ো হইয়া মাথা নিচু করিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমার মুখের 'পরে দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন, "তোমার দেহখানি সুন্দর।"

ডালে ডালে রাজ্যের পাখি ডাকিতেছিল, পথের ধারে ধারে ঝোপে-ঝাপে ভাঁটি ফুল ফুটিয়াছে, আমের ডালে বোল ধরিতেছে। মনে হইল, সমস্ত আকাশ-পাতাল পাগল

হইয়া আলুথালু হইয়া উঠিয়াছে। কেমন করিয়া বাড়ি গেলাম কিছু জ্ঞান নাই। একেবারে সেই ভিজা কাপড়েই ঠাকুরঘরে ঢুকিলাম, চোখে যেন ঠাকুরকে দেখিতে পাইলাম না—সেই ঘাটের পথের ছায়ার উপরকার আলোর চুম্‌কিগুলি আমার চোখের উপর কেবলই নাচিতে লাগিল।

সেদিন গুরু আহার করিতে আসিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "আন্দী নাই কেন।"

আমার স্বামী আমাকে খুঁজিয়া বেড়াইলেন, কোথাও দেখিতে পাইলেন-না।

ওগো, আমার সে পৃথিবী আর নাই, আমি সে সূর্যের আলো আর খুঁজিয়া পাইলাম না। ঠাকুরঘরে আমার ঠাকুরকে ডাকি, সে আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকে।

দিন কোথায় কেমন করিয়া কাটিল ঠিক জানি না। রাত্রে স্বামীর সঙ্গে দেখা হইবে। তখন যে সমস্ত নীরব এবং অন্ধকার। তখনি আমার স্বামীর মন যেন তারার মতো ফুটিয়া উঠে। সেই আঁধারে এক-একদিন তাঁহার মুখে একটা-আধটা কথা শুনিয়া হঠাৎ বুঝিতে পারি, এই সাদা মানুষটি যাহা বোঝেন তাহা কতই সহজে বুঝিতে পারেন।

সংসারের কাজ সারিয়া আসিতে আমার দেরি হয়। তিনি আমার জন্য বিছানার বাহিরে অপেক্ষা করেন। প্রায়ই তখন আমাদের গুরুর কথা কিছু-না-কিছু হয়।

অনেক রাত করিলাম। তখন তিন প্রহর হইবে, ঘরে আসিয়া দেখি, আমার স্বামী তখনো খাটে শোন নাই, নিচে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। আমি অতি সাবধানে শব্দ না করিয়া তাঁহার পায়ের তলায় শুইয়া পড়িলাম। ঘুমের ঘোরে একবার তিনি পা ছুঁড়িলেন, আমার বুকের উপর আসিয়া লাগিল। সেইটেই আমি তাঁহার শেষদান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

পরদিন ভোরে যখন তাঁর ঘুম ভাঙিল আমি তখন উঠিয়া বসিয়া আছি। জানলার বাহিরে কাঁঠালগাছটার মাথার উপর দিয়া আঁধারের একধারে অল্প একটু রঙ ধরিয়াছে; তখনো কাক ডাকে নাই।

আমি স্বামীর পায়ের কাছে মাথা লুটাইয়া প্রণাম করিলাম। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন এবং আমার মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

আমি বলিলাম, "আর আমি সংসার করিব না।"

স্বামী বোধ করি ভাবিলেন, তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন— কোনো কথাই বলিতে পারিলেন না।

আমি বলিলাম, "আমার মাথার দিব্য, তুমি অন্য স্ত্রী বিবাহ করো। আমি বিদায় লইলাম।"

স্বামী কহিলেন, "তুমি এ কী বলিতেছ। তোমাকে সংসার ছাড়িতে কে বলিল।"

আমি বলিলাম, "গুরুঠাকুর।"

স্বামী হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন; "গুরুঠাকুর! এমন কথা তিনি কখন বলিলেন।"

আমি বলিলাম, "আজ সকালে যখন স্নান করিয়া ফিরিতেছিলাম তাঁহার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। তখনি বলিলেন।"

স্বামীর কণ্ঠ কাঁপিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন আদেশ কেন করিলেন।"

আমি বলিলাম, "জানি না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়ো, পারেন তো তিনিই বুঝাইয়া দিবেন।"

স্বামী বলিলেন, "সংসারে থাকিয়াও তো সংসার ত্যাগ করা যায়, আমি সেই কথা গুরুকে বুঝাইয়া বলিব।"

আমি বলিলাম, "হয়তো গুরু বুঝিতে পারেন, কিন্তু আমার মন বুঝিবে না। আমার সংসার করা আজ হইতে ঘুচিল।"

স্বামী চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। আকাশ যখন ফরসা হইল তিনি বলিলেন, "চলো-না, দুজনে একবার তাঁর কাছেই যাই।"

আমি হাত জোড় করিয়া বলিলাম, "তাঁর সঙ্গে আর আমার দেখা হইবে না।"

তিনি আমার মুখের দিকে চাহিলেন, আমি মুখ নামাইলাম। তিনি আর কোনো কথা বলিলেন না।

আমি জানি, আমার মনটা তিনি একরকম করিয়া দেখিয়া লইলেন।

পৃথিবীতে দুটি মানুষ আমাকে সব-চেয়ে ভালোবাসিয়াছিল, আমার ছেলে আর আমার স্বামী। সে ভালোবাসা আমার নারায়ণ, তাই সে মিথ্যা সহিতে পারিল না। একটি আমাকে ছাড়িয়া গেল, একটিকে আমি ছাড়িলাম। এখন সত্যকে খুঁজিতেছি, আর ফাঁকি নয়।

এই বলিয়া সে গড় করিয়া প্রণাম করিল।

আষাঢ় ১৩২১

স্ত্রীর পত্র

শ্রীচরণকমলেষু

আজ পনেরো বছর আমাদের বিবাহ হয়েছে, আজ পর্যন্ত তোমাকে চিঠি লিখি নি। চিরদিন কাছেই পড়ে আছি— মুখের কথা অনেক শুনেছ, আমিও শুনেছি; চিঠি লেখবার মতো ফাঁকটুকু পাওয়া যায় নি।

আজ আমি এসেছি তীর্থ করতে শ্রীক্ষেত্রে, তুমি আছ তোমার আপিসের কাজে। শামুকের সঙ্গে খোলসের যে-সম্বন্ধ কলকাতার সঙ্গে তোমার তাই; সে তোমার দেহ-মনের সঙ্গে এঁটে গিয়েছে; তাই তুমি আপিসে ছুটির দরখাস্ত করলে না। বিধাতার তাই অভিপ্রায় ছিল; তিনি আমার ছুটির দরখাস্ত মঞ্জুর করেছেন।

আমি তোমাদের মেজোবউ। আজ পনেরো বছরের পরে এই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে জানতে পেরেছি, আমার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও আছে। তাই আজ সাহস করে এই চিঠিখানি লিখছি, এ তোমাদের মেজোবউয়ের চিঠি নয়।

তোমাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কপালে যিনি লিখেছিলেন তিনি ছাড়া যখন সেই সম্ভাবনার কথা আর কেউ জানত না, সেই শিশুবয়সে আমি আর আমার ভাই একসঙ্গেই সান্নিপাতিক জ্বরে পড়ি। আমার ভাইটি মারা গেল, আমি বেঁচে উঠলুম। পাড়ার সব মেয়েরাই বলতে লাগল, "মৃণাল মেয়ে কি না, তাই ও বাঁচল, বেটাছেলে হলে কি আর রক্ষা পেত?" চুরিবিদ্যাতে যম পাকা, দামি জিনিসের 'পরেই তার লোভ।

আমার মরণ নেই। সেই কথাটাই ভালো করে বুঝিয়ে বলবার জন্যে এই চিঠিখানি লিখতে বসেছি।

যেদিন তোমাদের দূরসম্পর্কের মামা তোমার বন্ধু নীরদকে নিয়ে কনে দেখতে এলেন, তখন আমার বয়স বারো। দুর্গম পাড়াগাঁয়ে আমাদের বাড়ি, সেখানে দিনের বেলা শেয়াল ডাকে। স্টেশন থেকে সাত ক্রোশ শ্যাকরা গাড়িতে এসে বাকি তিন মাইল কাঁচা রাস্তায় পাল্‌কি করে তবে আমাদের গাঁয়ে পৌঁছনো যায়। সেদিন তোমাদের কী হয়রানি। তার উপরে আমাদের বাঙাল দেশের রান্না— সেই রান্নার প্রহসন আজও মামা ভোলেন নি।

তোমাদের বড়োবউয়ের রূপের অভাব মেজোবউকে দিয়ে পূরণ করবার জন্যে তোমার মায়ের একান্ত জিদ ছিল। নইলে এত কষ্ট করে আমাদের সে গাঁয়ে তোমরা যাবে কেন? বাংলা দেশে পিলে যকৃৎ অম্লশূল এবং কনের জন্যে তো কাউকে খোঁজ করতে হয় না— তারা আপনি এসে চেপে ধরে, কিছুতে ছাড়তে চায় না।

বাবার বুক দুর্‌দুর্‌ করতে লাগল, মা দুর্গানাম জপ করতে লাগলেন। শহরের দেবতাকে পাড়াগাঁয়ের পূজারি কী দিয়ে সন্তুষ্ট করবে। মেয়ের রূপের উপর ভরসা; কিন্তু, সেই রূপের গুমর তো মেয়ের মধ্যে নেই, যে ব্যক্তি দেখতে এসেছে সে তাকে যে-দামই দেবে সেই তার দাম। তাই তো হাজার রূপে গুণেও মেয়েমানুষের সংকোচ কিছুতে ঘোচে না।

সমস্ত বাড়ির, এমন কি, সমস্ত পাড়ার এই আতঙ্ক আমার বুকের মধ্যে পাথরের মতো চেপে বসল। সেদিনকার আকাশের যত আলো এবং জগতের সকল শক্তি যেন বারো বছরের একটি পাড়াগেঁয়ে মেয়েকে দুইজন পরীক্ষকের দুইজোড়া চোখের সামনে শক্ত করে তুলে ধরবার জন্যে পেয়াদাগিরি করছিল— আমার কোথাও লুকোবার জায়গা ছিল না।

সমস্ত আকাশকে কাঁদিয়ে দিয়ে বাঁশি বাজতে লাগল— তোমাদের বাড়িতে এসে উঠলুম। আমার খুঁৎগুলি সবিস্তারে খতিয়ে দেখেও গিন্নির দল সকলে স্বীকার করলেন, মোটের উপর আমি সুন্দরী বটে। সে-কথা শুনে আমার বড়ো জায়ের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। কিন্তু, আমার রূপের দরকার কী ছিল তাই ভাবি। রূপ-জিনিসটাকে যদি কোনো সেকেলে পণ্ডিত গঙ্গামৃত্তিকা দিয়ে গড়তেন, তাহলে ওর আদর থাকত; কিন্তু, ওটা যে কেবল বিধাতা নিজের আনন্দে গড়েছেন, তাই তোমাদের ধর্মের সংসারে ওর দাম নেই।

আমার যে রূপ আছে, সে-কথা ভুলতে তোমার বেশিদিন লাগে নি। কিন্তু, আমার যে বুদ্ধি আছে, সেটা তোমাদের পদে পদে স্মরণ করতে হয়েছে। ঐ বুদ্ধিটা আমার এতই স্বাভাবিক যে তোমাদের ঘরকন্নার মধ্যে এতকাল কাটিয়েও আজও সে টিঁকে আছে। মা আমার এই বুদ্ধিটার জন্যে বিষম উদ্‌বিগ্ন ছিলেন, মেয়েমানুষের পক্ষে এ এক বালাই। যাকে বাধা মেনে চলতে হবে, সে যদি বুদ্ধিকে মেনে চলতে চায় তবে ঠোকর খেয়ে খেয়ে তার কপাল ভাঙবেই। কিন্তু কী করব বলো। তোমাদের ঘরের বউয়ের যতটা বুদ্ধির দরকার বিধাতা অসতর্ক হয়ে আমাকে তার চেয়ে অনেকটা বেশি দিয়ে ফেলেছেন, সে আমি এখন ফিরিয়ে দিই কাকে। তোমরা আমাকে মেয়ে-জ্যাঠা বলে দুবেলা গাল দিয়েছ। কটু কথাই হচ্ছে অক্ষমের সান্ত্বনা; অতএব সে আমি ক্ষমা করলুম।

আমার একটা জিনিস তোমাদের ঘরকন্নার বাইরে ছিল, সেটা কেউ তোমরা জান নি। আমি লুকিয়ে কবিতা লিখতুম। সে ছাইপাঁশ যাই হোক-না, সেখানে তোমাদের অন্দরমহলের পাঁচিল ওঠে নি। সেইখানে আমার মুক্তি; সেইখানে আমি

আমি। আমার মধ্যে যা-কিছু তোমাদের মেজবউকে ছাড়িয়ে রয়েছে, সে তোমরা পছন্দ কর নি, চিনতেও পার নি; আমি যে কবি, সে এই পনেরো বছরেও তোমাদের কাছে ধরা পড়ে নি।

তোমাদের ঘরের প্রথম স্মৃতির মধ্যে সব চেয়ে যেটা আমার মনে জাগছে সে তোমাদের গোয়ালঘর। অন্দরমহলের সিঁড়িতে ওঠবার ঠিক পাশের ঘরেই তোমাদের গোরু থাকে, সামনের উঠোনটুকু ছাড়া তাদের আর নড়বার জায়গা নেই। সেই উঠোনের কোণে তাদের জাব্‌না দেবার কাঠের গামলা। সকালে বেহারার নানা কাজ; উপবাসী গোরুগুলো ততক্ষণ সেই গামলার ধারগুলো চেটে চেটে চিবিয়ে চিবিয়ে খাব্‌লা করে দিত। আমার প্রাণ কাঁদত। আমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে— তোমাদের বাড়িতে যেদিন নতুন এলুম সেদিন সেই দুটি গোরু এবং তিনটি বাছুরই সমস্ত শহরের মধ্যে আমার চিরপরিচিত আত্মীয়ের মতো আমার চোখে ঠেকল। যতদিন নতুন বউ ছিলুম নিজে না খেয়ে লুকিয়ে ওদের খাওয়াতুম; যখন বড়ো হলুম তখন গোরুর প্রতি আমার প্রকাশ্য মমতা লক্ষ্য করে আমার ঠাট্টার সম্পর্কীয়েরা আমার গোত্র সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগলেন।

আমার মেয়েটি জন্ম নিয়েই মারা গেল। আমাকেও সে সঙ্গে যাবার সময় ডাক দিয়েছিল। সে যদি বেঁচে থাকত তাহলে সেই আমার জীবনে যা-কিছু বড়ো, যা-কিছু সত্য সমস্ত এনে দিত; তখন মেজবউ থেকে একেবারে মা হয়ে বসতুম। মা যে এক-সংসারের মধ্যে থেকেও বিশ্ব-সংসারের। মা হবার দুঃখটুকু পেলুম কিন্তু মা হবার মুক্তিটুকু পেলুম না।

মনে আছে, ইংরেজ ডাক্তার এসে আমাদের অন্দর দেখে আশ্চর্য হয়েছিল এবং আঁতুড়ঘর দেখে বিরক্ত হয়ে বকাবকি করেছিল। সদরে তোমাদের একটুখানি বাগান আছে। ঘরে সাজসজ্জা আসবাবের অভাব নেই। আর, অন্দরটা যেন পশমের কাজের উল্‌টো পিঠ; সেদিকে কোনো লজ্জা নেই, শ্রী নেই, সজ্জা নেই। সেদিকে আলো মিট্‌মিট্‌ করে জ্বলে; হাওয়া চোরের মতো প্রবেশ করে; উঠোনের আবর্জনা নড়তে চায় না; দেয়ালের এবং মেজের সমস্ত কলঙ্ক অক্ষয় হয়ে বিরাজ করে। কিন্তু, ডাক্তার একটা ভুল করেছিল; সে ভেবেছিল, এটা বুঝি আমাদের অহোরাত্র দুঃখ দেয়। ঠিক উল্‌টো— অনাদর জিনিসটা ছাইয়ের মতো, সে ছাই আগুনকে হয়তো ভিতরে ভিতরে জমিয়ে রাখে কিন্তু বাইরে থেকে তার তাপটাকে বুঝতে দেয় না। আত্মসম্মান যখন কমে যায় তখন অনাদরকে তো অন্যায্য বলে মনে হয় না। সেই জন্যে তার বেদনা নেই। তাই তো মেয়েমানুষ দুঃখ বোধ করতেই লজ্জা পায়। আমি তাই বলি, মেয়েমানুষকে

দুঃখ পেতেই হবে, এইটে যদি তোমাদের ব্যবস্থা হয়, তাহলে যতদূর সম্ভব তাকে অনাদরে রেখে দেওয়াই ভালো; আদরে দুঃখের ব্যথাটা কেবল বেড়ে ওঠে।

যেমন করেই রাখ, দুঃখ যে আছে, এ কথা মনে করবার কথাও কোনোদিন মনে আসে নি। আঁতুড়ঘরে মরণ মাথার কাছে এসে দাঁড়াল, মনে ভয়ই হল না। জীবন আমাদের কীই বা যে মরণকে ভয় করতে হবে? আদরে যত্নে যাদের প্রাণের বাঁধন শক্ত করেছে মরতে তাদেরই বাধে। সেদিন যম যদি আমাকে ধরে টান দিত তাহলে আল্‌গা মাটি থেকে যেমন অতি সহজে ঘাসের চাপড়া উঠে আসে সমস্ত শিকড়সুদ্ধ আমি তেমনি করে উঠে আসতুম। বাঙালির মেয়ে তো কথায় কথায় মরতে যায়। কিন্তু, এমন মরায় বাহাদুরিটা কী। মরতে লজ্জা হয়; আমাদের পক্ষে ওটা এতই সহজ।

আমার মেয়েটি তো সন্ধ্যাতারার মতো ক্ষণকালের জন্যে উদয় হয়েই অস্ত গেল। আবার আমার নিত্যকর্ম এবং গোরুবাছুর নিয়ে পড়লুম। জীবন তেমনি করেই গড়াতে গড়াতে শেষ পর্যন্ত কেটে যেত; আজকে তোমাকে এই চিঠি লেখবার দরকারই হত না। কিন্তু, বাতাসে সামান্য একটা বীজ উড়িয়ে নিয়ে এসে পাকা দালানের মধ্যে অশথগাছের অঙ্কুর বের করে; শেষকালে সেইটুকু থেকে ইটকাঠের বুকের পাঁজর বিদীর্ণ হয়ে যায়। আমার সংসারের পাকা বন্দোবস্তের মাঝখানে ছোটো একটুখানি জীবনের কণা কোথা থেকে উড়ে এসে পড়ল; তার পর থেকে ফাটল শুরু হল।

বিধবা মার মৃত্যুর পরে আমার বড়ো জায়ের বোন বিন্দু তার খুড়তুতো ভাইদের অত্যাচারে আমাদের বাড়িতে তার দিদির কাছে এসে যেদিন আশ্রয় নিলে, তোমরা সেদিন ভাবলে, এ আবার কোথাকার আপদ। আমার পোড়া স্বভাব, কী করব বলো— দেখলুম, তোমরা সকলেই মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠেছ, সেইজন্যেই এই নিরাশ্রয় মেয়েটির পাশে আমার সমস্ত মন যেন একেবারে কোমর বেঁধে দাঁড়াল। পরের বাড়িতে পরের অনিচ্ছাতে এসে আশ্রয় নেওয়া— সে কতবড়ো অপমান। দায়ে প'ড়ে সেও যাকে স্বীকার করতে হল, তাকে কি এক পাশে ঠেলে রাখা যায়।

তার পরে দেখলুম আমার বড়ো জায়ের দশা। তিনি নিতান্ত দরদে প'ড়ে বোনটিকে নিজের কাছে এনেছেন। কিন্তু, যখন দেখলেন স্বামীর অনিচ্ছা, তখন এমনি ভাব করতে লাগলেন, যেন এ তাঁর এক বিষম বালাই, যেন একে দূর করতে পারলেই তিনি বাঁচেন। এই অনাথা বোনটিকে মন খুলে প্রকাশ্যে স্নেহ দেখাবেন, সে সাহস তাঁর হল না। তিনি পতিব্রতা।

তাঁর এই সংকট দেখে আমার মন আরও ব্যথিত হয়ে উঠল। দেখলুম, বড়ো জা সকলকে একটু বিশেষ করে দেখিয়ে দেখিয়ে বিন্দুর খাওয়াপরার এমনি মোটারকমের

ব্যবস্থা করলেন এবং বাড়ির সর্বপ্রকার দাসীবৃত্তিতে তাকে এমনভাবে নিযুক্ত করলেন যে আমার, কেবল দুঃখ নয়, লজ্জা বোধ হল। তিনি সকলের কাছে প্রমাণ করবার জন্যে ব্যস্ত যে, আমাদের সংসারে ফাঁকি দিয়ে বিন্দুকে ভারি সুবিধাদরে পাওয়া গেছে। ও কাজ দেয় বিস্তর, অথচ খরচের হিসাবে বেজায় সস্তা।

আমাদের বড়ো জায়ের বাপের বংশে কুল ছাড়া আর বড়ো কিছু ছিল না— রূপও না, টাকাও না। আমার শ্বশুরের হাতে পায়ে ধরে কেমন করে তোমাদের ঘরে তাঁর বিবাহ হল সে তো সমস্তই জান। তিনি নিজের বিবাহটাকে এ বংশের প্রতি বিষম একটা অপরাধ বলেই চিরকাল মনে জেনেছেন। সেইজন্যে সকল বিষয়েই নিজেকে যতদূর সম্ভব সংকুচিত করে তোমাদের ঘরে তিনি অতি অল্প জায়গা জুড়ে থাকেন।

কিন্তু, তাঁর এই সাধু দৃষ্টান্তে আমাদের বড়ো মুশকিল হয়েছে। আমি সকল দিকে আপনাকে অত অসম্ভব খাটো করতে পারি নে। আমি যেটাকে ভালো বলে বুঝি আর-কারও খাতিরে সেটাকে মন্দ বলে মেনে নেওয়া আমার কর্ম নয়— তুমিও তার অনেক প্রমাণ পেয়েছ।

বিন্দুকে আমি আমার ঘরে টেনে নিলুম। দিদি বললেন, "মেজোবউ গরিবের ঘরের মেয়ের মাথাটি খেতে বসলেন।" আমি যেন বিষম একটা বিপদ ঘটালুম, এমনি ভাবে তিনি সকলের কাছে নালিশ করে বেড়ালেন। কিন্তু, আমি নিশ্চয় জানি, তিনি মনে মনে বেঁচে গেলেন। এখন দোষের বোঝা আমার উপরেই পড়ল। তিনি বোনকে নিজে যে-স্নেহ দেখাতে পারতেন না আমাকে দিয়ে সেই স্নেহটুকু করিয়ে নিয়ে তাঁর মনটা হালকা হল। আমার বড়ো জা বিন্দুর বয়স থেকে দু-চারটে অঙ্ক বাদ দিতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু, তার বয়স যে চোদ্দর চেয়ে কম ছিল না, এ কথা লুকিয়ে বললে অন্যায় হত না। তুমি তো জান, সে দেখতে এতই মন্দ ছিল যে পড়ে গিয়ে সে যদি মাথা ভাঙত তবে ঘরের মেজেটার জন্যেই লোকে উদ্‌বিগ্ন হত। কাজেই পিতা-মাতার অভাবে কেউ তাকে বিয়ে দেবার ছিল না, এবং তাকে বিয়ে করবার মতো মনের জোরই বা কজন লোকের ছিল।

বিন্দু বড়ো ভয়ে ভয়ে আমার কাছে এল। যেন আমার গায়ে তার ছোঁয়াচ লাগলে আমি সইতে পারব না। বিশ্বসংসারে তার যেন জন্মাবার কোনো সর্ত ছিল না; তাই সে কেবলই পাশ কাটিয়ে, চোখ এড়িয়ে চলত। তার বাপের বাড়িতে তার খুড়তুতো ভাইরা তাকে এমন একটু কোণও ছেড়ে দিতে চায় নি যে-কোণে একটা অনাবশ্যক জিনিস পড়ে থাকতে পারে। অনাবশ্যক আবর্জনা ঘরের আশে-পাশে অনায়াসে স্থান পায়, কেননা মানুষ তাকে ভুলে যায়, কিন্তু অনাবশ্যক মেয়েমানুষ যে

একে অনাবশ্যক আবার তার উপরে তাকে ভোলাও শক্ত, সেইজন্যে আঁস্তাকুঁড়েও তার স্থান নেই। অথচ বিন্দুর খুড়তুতো ভাইরা যে জগতে পরমাবশ্যক পদার্থ তা বলবার জো নেই। কিন্তু, তারা বেশ আছে।

তাই, বিন্দুকে যখন আমার ঘরে ডেকে আনলুম, তার বুকের মধ্যে কাঁপতে লাগল। তার ভয় দেখে আমার বড়ো দুঃখ হল। আমার ঘরে যে তার একটুখানি জায়গা আছে, সেই কথাটি আমি অনেক আদর করে তাকে বুঝিয়ে দিলুম।

কিন্তু, আমার ঘর শুধু তো আমারই ঘর নয়। কাজেই আমার কাজটি সহজ হল না। দু-চারদিন আমার কাছে থাকতেই তার গায়ে লাল-লাল কী উঠল, হয়তো সে ঘামাচি, নয় তো আর-কিছু হবে। তোমরা বললে বসন্ত। কেননা, ও যে বিন্দু। তোমাদের পাড়ার এক আনাড়ি ডাক্তার এসে বললে, আর দুই-একদিন না গেলে ঠিক বলা যায় না। কিন্তু সেই দুই-একদিনের সবুর সইবে কে। বিন্দু তো তার ব্যামোর লজ্জাতেই মরবার জো হল। আমি বললুম, বসন্ত হয় তো হোক্‌, আমি আমাদের সেই আঁতুড়ঘরে ওকে নিয়ে থাকব, আর-কাউকে কিছু করতে হবে না। এই নিয়ে আমার উপরে তোমরা যখন সকলে মারমূর্তি ধরেছ, এমন-কি বিন্দুর দিদিও যখন অত্যন্ত বিরক্তির ভান করে পোড়াকপালি মেয়েটাকে হাঁসপাতালে পাঠাবার প্রস্তাব করছেন, এমন সময় ওর গায়ের সমস্ত লাল দাগ একদম মিলিয়ে গেল। তোমরা দেখি তাতে আরও ব্যস্ত হয়ে উঠলে। বললে, নিশ্চয়ই বসন্ত বসে গিয়েছে। কেননা, ও যে বিন্দু।

অনাদরে .মানুষ হবার একটা মস্ত গুণ শরীরটাকে তাতে একেবারে অজর অমর করে তোলে। ব্যামো হতেই চায় না— মরার সদর রাস্তাগুলো একেবারেই বন্ধ। রোগ তাই ওকে ঠাট্টা করে গেল, কিছুই হল না। কিন্তু, এটা বেশ বোঝা গেল, পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে অকিঞ্চিৎকর মানুষকে আশ্রয় দেওয়াই সব চেয়ে কঠিন। আশ্রয়ের দরকার তার যত বেশি আশ্রয়ের বাধাও তার তেমনি বিষম।

আমার সম্বন্ধে বিন্দুর ভয় যখন ভাঙল তখন ওকে আর-এক গেরোয় ধরল। আমাকে এমনি ভালোবাসতে শুরু করলে যে, আমাকে ভয় ধরিয়ে দিলে। ভালোবাসার এরকম মূর্তি সংসারে তো কোনোদিন দেখি নি। বইয়েতে পড়েছি বটে, সেও মেয়ে-পুরুষের মধ্যে। আমার যে রূপ ছিল সে-কথা আমার মনে করবার কোনো কারণ বহুকাল ঘটে নি— এতদিন পরে সেই রূপটা নিয়ে পড়ল এই কুশ্রী মেয়েটি। আমার মুখ দেখে তার চোখের আশ আর মিটত না। বলত, "দিদি, তোমার এই মুখখানি আমি ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় নি।" যেদিন আমি নিজের চুল নিজে বাঁধতুম,

সেদিন তার ভারি অভিমান। আমার চুলের বোঝা দুই হাত দিয়ে নাড়তে-চাড়তে তার ভারি ভালো লাগত। কোথাও নিমন্ত্রণে যাওয়া ছাড়া আমার সাজগোজের তো দরকার ছিল না। কিন্তু, বিন্দু আমাকে অস্থির করে রোজই কিছু-না-কিছু সাজ করাত। মেয়েটা আমাকে নিয়ে একেবার পাগল হয়ে উঠল।

তোমাদের অন্দরমহলে কোথাও জমি এক ছটাক নেই। উত্তরদিকের পাঁচিলের গায়ে নর্দমার ধারে কোনোগতিকে একটা গাবগাছ জন্মেছে। যেদিন দেখতুম সেই গাবের গাছের নতুন পাতাগুলি রাঙা টকটকে হয়ে উঠেছে, সেইদিন জানতুম, ধরাতলে বসন্ত এসেছে বটে। আমার ঘরকন্নার মধ্যে ঐ অনাদৃত মেয়েটার চিত্ত যেদিন আগা-গোড়া এমন রঙিন হয়ে উঠল সেদিন আমি বুঝলুম, হৃদয়ের জগতেও একটা বসন্তের হাওয়া আছে—সে কোন্ স্বর্গ থেকে আসে, গলির মোড় থেকে আসে না।

বিন্দুর ভালোবাসার দুঃসহ বেগে আমাকে অস্থির করে তুলেছিল। এক একবার তার উপর রাগ হত, সে-কথা স্বীকার করি, কিন্তু তার এই ভালোবাসার ভিতর দিয়ে আমি আপনার একটি স্বরূপ দেখলুম যা আমি জীবনে আর কোনোদিন দেখি নি। সেই আমার মুক্ত স্বরূপ।

এদিকে, বিন্দুর মতো মেয়েকে আমি যে এতটা আদরযত্ন করছি, এ তোমাদের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি বলে ঠেকল। এর জন্যে খুঁৎখুঁৎ-খিট্‌খিটের অন্ত ছিল না। যেদিন আমার ঘর থেকে বাজুবন্ধ চুরি গেল, সেদিন সেই চুরিতে বিন্দুর যে কোনোরকমের হাত ছিল, এ-কথার আভাস দিতে তোমাদের লজ্জা হল না। যখন স্বদেশী হাঙ্গামায় লোকের বাড়িতল্লাসি হতে লাগল তখন তোমরা অনায়াসে সন্দেহ করে বসলে যে, বিন্দু পুলিসের পোষা মেয়েচর। তার আর কোনো প্রমাণ ছিল না কেবল এই প্রমাণ যে, ও বিন্দু।

তোমাদের বাড়ীর দাসীরা ওর কোনোরকম কাজ করতে আপত্তি করত— তাদের কাউকে ওর কাজ করবার ফরমাশ করলে, ও-মেয়েও একেবারে সংকোচে যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠত। এই-সকল কারণেই ওর জন্তে আমার খরচ বেড়ে গেল। আমি বিশেষ করে একজন আলাদা দাসী রাখলুম। সেটা তোমাদের ভালো লাগে নি। বিন্দুকে আমি যে-সব কাপড় পরতে দিতুম তা দেখে তুমি এত রাগ করেছিলে যে, আমার হাত-খরচের টাকা বন্ধ করে দিলে। তার পরদিন থেকে আমি পাঁচ-সিকে দামের জোড়া মোটা কোরা কলের ধুতি পরতে আরম্ভ করে দিলুম। আর, মতির মা যখন আমার এঁটো ভাতের থালা নিয়ে যেতে এল, তাকে বারণ করে দিলুম। আমি নিজে উঠোনের কলতলায় গিয়ে এঁটো ভাত বাছুরকে খাইয়ে বাসন মেজেছি। একদিন হঠাৎ সেই

দৃশ্যটি দেখে তুমি খুব খুশি হও নি। আমাকে খুশি না করলেও চলে আর তোমাদের খুশি না করলেই নয়, এই সুবুদ্ধিটা আজ পর্যন্ত আমার ঘটে এল না।

এদিকে তোমাদের রাগও যেমন বেড়ে উঠেছে বিন্দুর বয়সও তেমনি বেড়ে চলেছে। সেই স্বাভাবিক ব্যাপারে তোমরা অস্বাভাবিক রকমে বিব্রত হয়ে উঠেছিলে। একটা কথা মনে করে আমি আশ্চর্য হই, তোমরা জোর করে কেন বিন্দুকে তোমাদের বাড়ি থেকে বিদায় করে দাও নি। আমি বেশ বুঝি, তোমরা আমাকে মনে মনে ভয় কর। বিধাতা যে আমাকে বুদ্ধি দিয়েছিলেন, ভিতরে ভিতরে তার খাতির না করে তোমরা বাঁচ না।

অবশেষে বিন্দুকে নিজের শক্তিতে বিদায় করতে না পেরে তোমরা প্রজাপতি দেবতার শরণাপন্ন হলে। বিন্দুর বর ঠিক হল। বড়ো জা বললেন, "বাঁচলুম, মা কালী আমাদের বংশের মুখ রক্ষা করলেন।"

বর কেমন তা জানি নে ; তোমাদের কাছে শুনলুম, সকল বিষয়েই ভালো। বিন্দু আমার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল ; বললে, "দিদি, আমার আবার বিয়ে করা কেন।"

আমি তাকে অনেক বুঝিয়ে বললুম, 'বিন্দু, তুই ভয় করিস নে— শুনেছি, তোর বর ভালো।"

বিন্দু বললে, "বর যদি ভালো হয়, আমার কী আছে যে আমাকে তার পছন্দ হবে।"

বরপক্ষেরা বিন্দুকে তো দেখতে আসবার নামও করলে না। বড়দিদি তাতে বড়ো নিশ্চিন্ত হলেন।

কিন্তু, দিনরাত্রে বিন্দুর কান্না আর থামতে চায় না। সে তার কী কষ্ট, সে আমি জানি। বিন্দুর জন্যে আমি সংসারে অনেক লড়াই করেছি কিন্তু, ওর বিবাহ বন্ধ হোক, এ-কথা বলবার সাহস আমার হল না। কিসের জোরেই বা বলব। আমি যদি মারা যাই তো ওর কী দশা হবে।

একে তো মেয়ে, তাতে কালো মেয়ে— কার ঘরে চলল, ওর কী দশা হবে, সে-কথা না ভাবাই ভালো। ভাবতে গেলে প্রাণ কেঁপে ওঠে।

বিন্দু বললে, "দিদি, বিয়ের আর পাঁচদিন আছে, এর মধ্যে আমার মরণ হবে না কি।"

আমি তাকে খুব ধমকে দিলুম, কিন্তু অন্তর্যামি জানেন, যদি কোনো সহজভাবে বিন্দুর মৃত্যু হতে পারত তাহলে আমি আরাম বোধ করতুম।

বিবাহের আগের দিন বিন্দু তার দিদিকে গিয়ে বললে "দিদি, আমি তোমাদের গোয়ালঘরে পড়ে থাকব, আমাকে যা বলবে তাই করব, তোমার পায়ে পড়ি আমাকে এমন করে ফেলে দিয়ো না।"

কিছুকাল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দিদির চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, সেদিনও পড়ল। কিন্তু, শুধু হৃদয় তো নয়, শাস্ত্রও আছে। তিনি বললেন, "জানিস তো, বিন্দি, পতিই হচ্ছে স্ত্রীলোকের গতি মুক্তি সব। কপালে যদি দুঃখ থাকে তো কেউ খণ্ডাতে পারবে না।"

আসল কথা হচ্ছে, কোনো দিকে কোনো রাস্তাই নেই— বিন্দুকে বিবাহ করতেই হবে, তার পরে যা হয় তা হোক।

আমি চেয়েছিলুম, বিবাহটা যাতে আমাদের বাড়িতেই হয়। কিন্তু, তোমরা ব'লে বসলে, বরের বাড়িতেই হওয়া চাই— সেটা তাদের কৌলিক প্রথা।

আমি বুঝলুম, বিন্দুর বিবাহের জন্যে যদি তোমাদের খরচ করতে হয়, তবে সেটা তোমাদের গৃহদেবতার কিছুতেই সইবে না। কাজেই চুপ করে যেতে হল। কিন্তু, একটি কথা তোমরা কেউ জান না। দিদিকে জানাবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু জানাই নি, কেননা তাহলে তিনি ভয়েই মরে যেতেন— আমার কিছু কিছু গয়না দিয়ে আমি লুকিয়ে বিন্দুকে সাজিয়ে দিয়েছিলুম। বোধ করি দিদির চোখে সেটা পড়ে থাকবে, কিন্তু সেটা তিনি দেখেও দেখেন নি। দোহাই ধর্মের, সেজন্যে তোমরা তাঁকে ক্ষমা কোরো।

যাবার আগে বিন্দু আমাকে জড়িয়ে ধরে বললে, "দিদি, আমাকে তোমরা তাহলে নিতান্তই ত্যাগ করলে?"

আমি বললুম, "না বিন্দি, তোর যেমন দশাই হোক্‌-না কেন, আমি তোকে শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করব না।"

তিন দিন গেল। তোমাদের তালুকের প্রজা খাবার জন্যে তোমাকে যে ভেড়া দিয়েছিল, তাকে তোমার জঠরাগ্নি থেকে বাঁচিয়ে আমি আমাদের একতলায় কয়লা-রাখবার ঘরের এক পাশে বাস করতে দিয়েছিলুম। সকালে উঠেই আমি নিজে তাকে দানা খাইয়ে আসতুম; তোমার চাকরদের প্রতি দুই-একদিন নির্ভর করে দেখেছি, তাকে খাওয়ানোর চেয়ে তাকে খাওয়ার প্রতিই তাদের বেশি ঝোঁক।

সেদিন সকালে সেই ঘরে ঢুকে দেখি, বিন্দু এক কোণে জড়সড় হয়ে বসে আছে। আমাকে দেখেই আমার পা জড়িয়ে ধরে লুটিয়ে পড়ে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

বিন্দুর স্বামী পাগল।

"সত্যি বলছিস, বিন্দি?"

"এত বড়ো মিথ্যা কথা তোমার কাছে বলতে পারি, দিদি? তিনি পাগল। শ্বশুরের এই বিবাহে মত ছিল না— কিন্তু তিনি আমার শাশুড়িকে যমের মতো ভয় করেন। তিনি বিবাহের পূর্বেই কাশী চলে গেছেন। শাশুড়ি জেদ করে তাঁর ছেলের বিয়ে দিয়েছেন।"

আমি সেই রাশ-করা কয়লার উপর বসে পড়লুম। মেয়েমানুষকে মেয়েমানুষ দয়া করে না। বলে, 'ও তো মেয়েমানুষ বই তো নয়। ছেলে হোক-না পাগল, সে তো পুরুষ বটে।'

বিন্দুর স্বামীকে হঠাৎ পাগল বলে বোঝা যায় না, কিন্তু এক-একদিন সে এমন উন্মাদ হয়ে ওঠে যে, তাকে ঘরে তালাবন্ধ করে রাখতে হয়। বিবাহের রাত্রে সে ভালো ছিল কিন্তু রাত-জাগা প্রভৃতি উৎপাতে দ্বিতীয় দিন থেকে তার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে উঠল। বিন্দু দুপুরবেলায় পিতলের থালায় ভাত খেতে বসেছিল, হঠাৎ তার স্বামী থালাসুদ্ধ ভাত টেনে উঠোনে ফেলে দিলে। হঠাৎ কেমন তার মনে হয়েছে, বিন্দু স্বয়ং রানী রাসমণি; বেহারাটা নিশ্চয় সোনার থালা চুরি করে রানীকে তার নিজের থালায় ভাত খেতে দিয়েছে। এই তার রাগ। বিন্দু তো ভয়ে মরে গেল। তৃতীয় রাত্রে শাশুড়ি তাকে যখন স্বামীর ঘরে শুতে বললে, বিন্দুর প্রাণ শুকিয়ে গেল। শাশুড়ি তার প্রচণ্ড, রাগলে জ্ঞান থাকে না। সেও পাগল, কিন্তু পুরো নয় বলেই আরও ভয়ানক। বিন্দুকে ঘরে ঢুকতে হল। স্বামী সে-রাত্রে ঠাণ্ডা ছিল। কিন্তু, ভয়ে বিন্দুর শরীর যেন কাঠ হয়ে গেল। স্বামী যখন ঘুমিয়েছে অনেক রাত্রে সে অনেক কৌশলে পালিয়ে চলে এসেছে, তার বিস্তারিত বিবরণ লেখবার দরকার নেই।

ঘৃণায় রাগে আমার সকল শরীর জ্বলতে লাগল। আমি বললুম, "এমন ফাঁকির বিয়ে বিয়েই নয়। বিন্দু, তুই যেমন ছিলি তেমনি আমার কাছে থাক্, দেখি তোকে কে নিয়ে যেতে পারে।"

তোমরা বললে, "বিন্দু মিথ্যা কথা বলছে।"

আমি বললুম, "ও কখনো মিথ্যা বলে নি।"

তোমরা বললে, "কেমন করে জানলে।"

আমি বললুম. "আমি নিশ্চয় জানি।"

তোমরা ভয় দেখালে, "বিন্দুর শ্বশুরবাড়ির লোকে পুলিশ-কেস করলে মুশকিলে পড়তে হবে।"

আমি বললুম, "ফাঁকি দিয়ে পাগল বরের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়েছে এ-কথা কি আদালত শুনবে না।"

তোমরা বললে, "তবে কি এই নিয়ে আদালত করতে হবে নাকি। কেন, আমাদের দায় কিসের।"

আমি বললুম "আমি নিজের গয়না বেচে যা করতে পারি করব।"

তোমরা বললে, "উকিলবাড়ি ছুটবে নাকি।"

এ কথার জবাব নেই। কপালে করাঘাত করতে পারি, তার বেশি আর কী করব।

ওদিকে বিন্দুর শ্বশুরবাড়ি থেকে ওর ভাসুর এসে বাইরে বিষম গোল বাধিয়েছে। সে বলছে, সে থানায় খবর দেবে।

আমার যে কী জোর আছে জানি নে— কিন্তু কসাইয়ের হাত থেকে যে গোরু প্রাণভয়ে পালিয়ে এসে আমার আশ্রয় নিয়েছে তাকে পুলিসের তাড়ায় আবার সেই কসাইয়ের হাতে ফিরিয়ে দিতেই হবে, এ কথা কোনোমতেই আমার মন মানতে পারল না। আমি স্পর্ধা করে বললুম, "তা দিক্ থানায় খবর!"

এই ব'লে মনে করলুম, বিন্দুকে এইবেলা আমার শোবার ঘরে এনে তাকে নিয়ে ঘরে তালাবন্ধ করে বসে থাকি। খোঁজ করে দেখি, বিন্দু নেই। তোমাদের সঙ্গে আমার বাদপ্রতিবাদ যখন চলছিল তখন বিন্দু আপনি বাইরে গিয়ে তার ভাসুরের কাছে ধরা দিয়েছে। বুঝেছে, এ বাড়িতে যদি সে থাকে তবে আমাকে সে বিষম বিপদে ফেলবে।

মাঝখানে পালিয়ে এসে বিন্দু আপন দুঃখ আরও বাড়ালে। তার শাশুড়ির তর্ক এই যে, তার ছেলে তো ওকে খেয়ে ফেলছিল না। মন্দ স্বামীর দৃষ্টান্ত সংসারে দুর্লভ নয়, তাদের সঙ্গে তুলনা করলে তার ছেলে যে সোনার চাঁদ।

আমার বড়ো জা বললেন, "ওর পোড়া কপাল, তা নিয়ে দুঃখ করে কী করব। তা পাগল হোক, ছাগল হোক, স্বামী তো বটে।"

কুষ্ঠরোগীকে কোলে করে তার স্ত্রী বেশ্যার বাড়িতে নিজে পৌঁছে দিয়েছে সতীসাধ্বীর সেই দৃষ্টান্ত তোমাদের মনে জাগছিল; জগতের মধ্যে অধমতম কাপুরুষতার এই গল্পটা প্রচার করে আসতে তোমাদের পুরুষের মনে আজ পর্যন্ত একটুও সংকোচবোধ হয় নি, সেই জন্যই মানবজন্ম নিয়েও বিন্দুর ব্যবহারে তোমরা রাগ করতে পেরেছ, তোমাদের মাথা হেঁট হয় নি। বিন্দুর জন্যে আমার বুক ফেটে গেল কিন্তু তোমাদের জন্যে আমার লজ্জার সীমা ছিল না। আমি তো পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, তার উপরে তোমাদের ঘরে পড়েছি, ভগবান কোন্ ফাঁক দিয়ে আমার মধ্যে এমন বুদ্ধি দিলেন। তোমাদের এই-সব ধর্মের কথা আমি যে কিছুতেই সইতে পারলুম না।

আমি নিশ্চয় জানতুম, মরে গেলেও বিন্দু আমাদের ঘরে আর আসবে না, কিন্তু

আমি যে তাকে বিয়ের আগের দিন আশা দিয়েছিলুম যে, তাকে শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করব না। আমার ছোটো ভাই শরৎ কলকাতায় কলেজে পড়ছিল; তোমরা জানই তো যত রকমের ভলন্টিয়ারি করা, প্লেগের পাড়ার ইঁদুর মারা, দামোদরের বন্যায় ছোটা, এতেই তার এত উৎসাহ যে উপরি উপরি দুবার সে এফ. এ. পরীক্ষায় ফেল করেও কিছুমাত্র দমে যায় নি। তাকে আমি ডেকে বললুম, "বিন্দুর খবর যাতে আমি পাই তোকে সেই বন্দোবস্ত করে দিতে হবে, শরৎ। বিন্দু আমাকে চিঠি লিখতে সাহস করবে না, লিখলেও আমি পাব না।"

এরকম কাজের চেয়ে যদি তাকে বলতুম, বিন্দুকে ডাকাতি করে আনতে কিম্বা তার পাগল স্বামীর মাথা ভেঙে দিতে তা হলে সে বেশি খুশি হত।

শরতের সঙ্গে আলোচনা করছি এমন সময় তুমি ঘরে এসে বললে, "আবার কী হাঙ্গামা বাধিয়েছ।"

আমি বললুম, "সেই যা-সব গোড়ায় বাধিয়েছিলুম, তোমাদের ঘরে এসেছিলুম— কিন্তু সে তো তোমাদেরই কীর্তি।"

তুমি জিজ্ঞাসা করলে, "বিন্দুকে আবার এনে কোথাও লুকিয়ে রেখেছ?"

আমি বললুম, "বিন্দু যদি আসত তা হলে নিশ্চয় এনে লুকিয়ে রাখতুম। কিন্তু সে আসবে না, তোমাদের ভয় নেই।"

শরৎকে আমার কাছে দেখে তোমার সন্দেহ আরও বেড়ে উঠল। আমি জানতুম, শরৎ আমাদের বাড়ি যাতায়াত করে, এ তোমরা কিছুতেই পছন্দ করতে না। তোমাদের ভয় ছিল, ওর 'পরে পুলিসের দৃষ্টি আছে— কোন্ দিন ও কোন্ রাজনৈতিক মামলায় পড়বে, তখন তোমাদের সুদ্ধ জড়িয়ে ফেলবে। সেইজন্যে আমি ওকে ভাইফোঁটা পর্যন্ত লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিতুম, ঘরে ডাকতুম না।

তোমার কাছে শুনলুম, বিন্দু আবার পালিয়েছে, তাই তোমাদের বাড়িতে তার ভাসুর খোঁজ করতে এসেছে। শুনে আমার বুকের মধ্যে শেল বিঁধল। হতভাগিনীর যে কী অসহ্য কষ্ট তা বুঝলুম অথচ কিছুই করবার রাস্তা নেই।

শরৎ খবর নিতে ছুটল। সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে আমাকে বললে, "বিন্দু তার খুড়তুতো ভাইদের বাড়ি গিয়েছিল, কিন্তু তারা তুমুল রাগ করে তখনই আবার তাকে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেছে। এর জন্যে তাদের খেসারত এবং গাড়িভাড়া দণ্ড যা ঘটেছে, তার ঝাঁজ এখনো তাদের মন থেকে মরে নি।

তোমাদের খুড়িমা শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ করতে যাবেন বলে তোমাদের বাড়িতে এসে উঠেছেন। আমি তোমাদের বললুম, "আমিও যাব।"

আমার হঠাৎ এমন ধর্মে মন হয়েছে দেখে তোমরা এত খুশি হয়ে উঠলে যে, কিছুমাত্র আপত্তি করলে না। এ কথাও মনে ছিল যে, এখন যদি কলকাতায় থাকি তবে আবার কোন্ দিন বিন্দুকে নিয়ে ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসব। আমাকে নিয়ে বিষম ল্যাঠা।

বুধবারে আমাদের যাবার দিন, রবিবারে সমস্ত ঠিক হল। আমি শরৎকে ডেকে বললুম, "যেমন করে হোক, বিন্দুকে বুধবারে পুরী যাবার গাড়িতে তোকে তুলে দিতে হবে।"

শরতের মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠল; সে বললে, "ভয় নেই, দিদি, আমি তাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে পুরী পর্যন্ত চলে যাব— ফাঁকি দিয়ে জগন্নাথ দেখা হয়ে যাবে।"

সেইদিন সন্ধ্যার সময় শরৎ আবার এল। তার মুখ দেখেই আমার বুক দমে গেল। আমি বললুম "কী, শরৎ? সুবিধা হল না বুঝি?"

সে বললে, "না।"

আমি বললুম, "রাজি করতে পারলি নে?"

সে বললে, "আর দরকারও নেই। কাল রাত্তিরে সে কাপড়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করে মরেছে। বাড়ির যে ভাইপোটার সঙ্গে ভাব করে নিয়েছিলুম, তার কাছে খবর পেলুম, তোমার নামে সে একটা চিঠি রেখে গিয়েছিল, কিন্তু সে চিঠি ওরা নষ্ট করেছে।"

যাক্, শান্তি হল।

দেশসুদ্ধ লোক চটে উঠল। বলতে লাগল, "মেয়েদের কাপড়ে আগুন লাগিয়ে মরা একটা ফ্যাশান হয়েছে।"

তোমরা বললে, "এ সমস্ত নাটক করা।" তা হবে। কিন্তু নাটকের তামাসাটা কেবল বাঙালি মেয়েদের শাড়ির উপর দিয়েই হয় কেন, আর বাঙালি বীরপুরুষদের কোঁচার উপর দিয়ে হয় না কেন, সেটাও তো ভেবে দেখা উচিত।

বিন্দিটার এমনি পোড়া কপাল বটে! যতদিন বেঁচে ছিল রূপে গুণে কোনো যশ পায় নি— মরবার বেলাও যে একটু ভেবে চিন্তে এমন একটা নতুন ধরনে মরবে যাতে দেশের পুরুষরা খুশি হয়ে হাততালি দেবে তাও তার ঘটে এল না। মরেও লোকদের চটিয়ে দিলে!

দিদি ঘরের মধ্যে লুকিয়ে কাঁদলেন। কিন্তু সে কান্নার মধ্যে একটা সান্ত্বনা ছিল। যাই হোক্-না কেন, তবু রক্ষা হয়েছে, মরেছে বই তো না! বেঁচে থাকলে কী না হতে পারত।

আমি তীর্থে এসেছি। বিন্দুর আর আসবার দরকার হল না, কিন্তু আমার দরকার ছিল।

দুঃখ বলতে লোকে যা বোঝে তোমাদের সংসারে তা আমার ছিল না। তোমাদের ঘরে খাওয়া-পরা অসচ্ছল নয়; তোমার দাদার চরিত্র যেমন হোক, তোমার চরিত্রে এমন কোনো দোষ নেই যাতে বিধাতাকে মন্দ বলতে পারি। যদি বা তোমার স্বভাব তোমার দাদার মতোই হত তা হলেও হয়তো মোটের উপর আমার এমনি ভাবেই দিন চলে যেত এবং আমার সতীসাধ্বী বড়ো জায়ের মতো পতিদেবতাকে দোষ না দিয়ে বিশ্বদেবতাকেই আমি দোষ দেবার চেষ্টা করতুম। অতএব তোমাদের নামে আমি কোনো নালিশ উত্থাপন করতে চাই নে— আমার এ চিঠি সেজন্যে নয়।

কিন্তু আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না। আমি বিন্দুকে দেখেছি। সংসারের মাঝখানে মেয়েমানুষের পরিচয়টা যে কী তা আমি পেয়েছি। আর আমার দরকার নেই।

তার পরে এও দেখেছি, ও মেয়ে বটে তবু ভগবান ওকে ত্যাগ করেন নি। ওর উপরে তোমাদের যত জোরই থাক্‌-না কেন, সে জোরের অন্ত আছে। ও আপনার হতভাগ্য মানবজন্মের চেয়ে বড়ো। তোমরাই যে আপন ইচ্ছামতো আপন দস্তুর দিয়ে ওর জীবনটাকে চিরকাল পায়ের তলায় চেপে রেখে দেবে, তোমাদের পা এত লম্বা নয়। মৃত্যু তোমাদের চেয়ে বড়ো। সেই মৃত্যুর মধ্যে সে মহান্— সেখানে বিন্দু কেবল বাঙালি ঘরের মেয়ে নয়, কেবল খুড়তুতো ভায়ের বোন নয়, কেবল অপরিচিত পাগল স্বামীর প্রবঞ্চিত স্ত্রী নয়। সেখানে সে অনন্ত।

সেই মৃত্যুর বাঁশি এই বালিকার ভাঙা হৃদয়ের ভিতর দিয়ে আমার জীবনের যমুনাপারে যেদিন বাজল সেদিন প্রথমটা আমার বুকের মধ্যে যেন বাণ বিঁধল। বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করলুম, জগতের মধ্যে যা-কিছু সব চেয়ে তুচ্ছ তাই সব চেয়ে কঠিন কেন? এই গলির মধ্যকার চারি-দিকে-প্রাচীর-তোলা নিরানন্দের অতি সামান্য বুদ্‌বুদটা এমন ভয়ংকর বাধা কেন। তোমার বিশ্বজগৎ তার ছয় ঋতুর সুধাপাত্র হাতে ক'রে যেমন করেই ডাক দিক-না, এক মুহূর্তের জন্যে কেন আমি এই অন্দরমহলটার এইটুকু মাত্র চৌকাঠ পেরতে পারি নে। তোমার এমন ভুবনে আমার এমন জীবন নিয়ে কেন ঐ অতি তুচ্ছ ইঁটকাঠের আড়ালটার মধ্যেই আমাকে তিলে তিলে মরতেই হবে। কত তুচ্ছ আমার এই প্রতিদিনের জীবনযাত্রা, কত তুচ্ছ এর সমস্ত বাঁধা নিয়ম, বাঁধা অভ্যাস, বাঁধা বুলি, এর সমস্ত বাঁধা মার— কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই দীনতার নাগপাশ-বন্ধনেরই হবে জিত— আর হার হল তোমার নিজের সৃষ্টি ঐ আনন্দলোকের?

কিন্তু মৃত্যুর বাঁশি বাজতে লাগল— কোথায় রে রাজমিস্ত্রির গড়া দেয়াল, কোথায় রে তোমাদের ঘোরো আইন দিয়ে গড়া কাঁটার বেড়া; কোন্ দুঃখে কোন্ অপমানে মানুষকে বন্দী করে রেখে দিতে পারে! ঐ তো মৃত্যুর হাতে জীবনের জয়পতাকা উড়ছে! ওরে মেজোবউ, ভয় নেই তোর! তোর মেজোবউয়ের খোলস ছিন্ন হতে এক নিমেষও লাগে না।

তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করি নে। আমার সমুখে আজ নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ।

তোমাদের অভ্যাসের অন্ধকারে আমাকে ঢেকে রেখে দিয়েছিলে। ক্ষণকালের জন্য বিন্দু এসে সেই আবরণের ছিদ্র দিয়ে আমাকে দেখে নিয়েছিল। সেই মেয়েটাই তার আপনার মৃত্যু দিয়ে আমার আবরণখানা আগাগোড়া ছিন্ন করে দিয়ে গেল। আজ বাইরে এসে দেখি, আমার গৌরব রাখবার আর জায়গা নেই। আমার এই অনাদৃত রূপ যাঁর চোখে ভালো লেগেছে, সেই সুন্দর সমস্ত আকাশ দিয়ে আমাকে চেয়ে দেখছেন। এইবার মরেছে মেজোবউ।

তুমি ভাবছ আমি মরতে যাচ্ছি— ভয় নেই, অমন পুরোনো ঠাট্টা তোমাদের সঙ্গে আমি করব না। মীরাবাঈও তো আমারই মতো মেয়েমানুষ ছিল— তার শিকলও তো কম ভারি ছিল না, তাকে তো বাঁচবার জন্যে মরতে হয় নি। মীরাবাঈ তার গানে বলেছিল, 'ছাড়ুক বাপ, ছাড়ুক মা, ছাড়ুক যে যেখানে আছে, মীরা কিন্তু লেগেই রইল, প্রভু— তাতে তার যা হবার তা হোক।' এই লেগে থাকাই তো বেঁচে থাকা।

আমিও বাঁচব। আমি বাঁচলুম।

তোমাদের চরণতলাশ্রয়ছিন্ন—

মৃণাল।

শ্রাবণ, ১৩২১

ভাইফোঁটা

শ্রাবণ মাসটা আজ যেন এক রাত্রে একেবারে দেউলে হইয়া গেছে। সমস্ত আকাশে কোথাও একটা ছেঁড়া মেঘের টুকরাও নাই।

আশ্চর্য এই যে, আমার সকালটা আজ এমন করিয়া কাটিতেছে। আমার বাগানের মেহেদি-বেড়ার প্রান্তে শিরীষগাছের পাতাগুলা ঝল্‌মল্ করিয়া উঠিতেছে, আমি তাহা তাকাইয়া দেখিতেছি। সর্বনাশের যে মাঝ-দরিয়ায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি এটা যখন দূরে ছিল তখন ইহার কথা কল্পনা করিয়া কত শীতের রাত্রে সর্বাঙ্গে ঘাম দিয়াছে, কত

গ্রীষ্মের দিনে হাত-পায়ের তেলো ঠাণ্ডা হিম হইয়া গেছে। কিন্তু আজ সমস্ত ভয়ভাবনা হইতে এমনি ছুটি পাইয়াছি যে, ঐ যে আতাগাছের ডালে একটা গিরগিটি স্থির হইয়া শিকার লক্ষ্য করিতেছে, সেটার দিকেও আমার চোখ রহিয়াছে।

সর্বস্ব খোয়াইয়া পথে দাঁড়াইব, এটা তত কঠিন না— কিন্তু আমাদের বংশে যে সততার খ্যাতি আজ তিন-পুরুষ চলিয়া আসিয়াছে সেটা আমারই জীবনের উপর আছাড় খাইয়া চুরমার হইতে চলিল, সেই লজ্জাতেই আমার দিনরাত্রি স্বস্তি ছিল না; এমন-কি আত্মহত্যার কথাও অনেকবার ভাবিয়াছি। কিন্তু, আজ যখন আর পর্দা রহিল না, খাতাপত্রের গুহাগহ্বর হইতে অখ্যাতিগুলো কালো ক্রিমির মতো কিল্‌বিল্‌ করিয়া বাহির হইয়া আদালত হইতে খবরের কাগজময় ছড়াইয়া পড়িল, তখন আমার একটা মস্ত বোঝা নামিয়া গেল। পিতৃপুরুষের সুনামটাকে টানিয়া বেড়াইবার দায় হইতে রক্ষা পাইলাম। সবাই জানিল, আমি জুয়াচোর। বাঁচা গেল।

উকিলে উকিলে ছেঁড়াছিঁড়ি করিয়া সকল কথাই বাহির করিবে, কেবল সকলের চেয়ে বড়ো কলঙ্কের কথাটা আদালতে প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা নাই— কারণ, স্বয়ং ধর্ম ছাড়া তার আর-কোনো ফরিয়াদি অবশিষ্ট নাই। এইজন্য সেইটে প্রকাশ করিয়া দিব বলিয়াই আজ কলম ধরিলাম।

আমার পিতামহ উদ্ধব দত্ত তাঁর প্রভুবংশকে বিপদের দিনে নিজের সম্পত্তি দিয়া রক্ষা করিয়াছেন। সেই হইতে আমাদের দারিদ্র্যই অন্য লোকের ধনের চেয়ে মাথা উঁচু করিয়াছে। আমার পিতা সনাতন দত্ত ডিরোজিয়োর ছাত্র। মদের সম্বন্ধে তাঁর যেমন অদ্ভুত নেশা ছিল সত্যের সম্বন্ধে ততোধিক। মা আমাদের একদিন নাপিত ভায়ার গল্প বলিয়াছিলেন শুনিয়া পরদিন হইতে সন্ধ্যার পর আমাদের বাড়ির ভিতরে যাওয়া তিনি একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। বাহিরে পড়িবার ঘরে শুইতাম। সেখানে দেয়াল জুড়িয়া ম্যাপগুলা সত্য কথা বলিত, তেপান্তর মাঠের খবর দিত না, এবং সাত সমুদ্র তেরো নদীর গল্পটাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলাইয়া রাখিত। সততা সম্বন্ধেও তাঁর শুচিবায়ু প্রবল ছিল। আমাদের জবাবদিহির অন্ত ছিল না। একদিন একজন 'হকার' দাদাকে কিছু জিনিস বেচিয়াছিল। তারই কোনো একটা মোড়কের একখানা দড়ি লইয়া খেলা করিতেছিলাম। বাবার হুকুমে সেই দড়ি হকারকে ফিরাইয়া দিবার জন্য রাস্তায় আমাকে ছুটিতে হইয়াছিল।

আমরা সাধুতার জেলখানায় সততার লোহার বেড়ি পরিয়া মানুষ। মানুষ বলিলে একটু বেশি বলা হয়— আমরা ছাড়া আর সকলেই মানুষ, কেবল আমরা মানুষের

দৃষ্টান্তস্থল। আমাদের খেলা ছিল কঠিন, ঠাট্টা বন্ধ, গল্প নীরস, বাক্য স্বল্প, হাসি সংযত, ব্যবহার নিখুঁত। ইহাতে বাল্যলীলায় মস্ত যে একটা ফাঁক পড়িয়াছিল লোকের প্রশংসায় সেটা ভর্তি হইত। আমাদের মাস্টার হইতে মুদি পর্যন্ত সকলেই স্বীকার করিত, দত্তবাড়ির ছেলেরা সত্যযুগ হইতে হঠাৎ পথ ভুলিয়া আসিয়াছে।

পাথর দিয়া নিরেট করিয়া বাঁধানো রাস্তাতেও একটু ফাঁক পাইলেই প্রকৃতি তার মধ্য হইতে আপনার প্রাণশক্তির সবুজ জয়পতাকা তুলিয়া বসে। আমার নবীন জীবনে সকল তিথিই একাদশী হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু উহারই মধ্যে উপবাসের একটা কোন্ ফাঁকে আমি একটুখানি সুধার স্বাদ পাইয়াছিলাম।

যে কয়জনের ঘরে আমাদের যাওয়া আসার বাধা ছিল না তার মধ্যে একজন ছিলেন অখিলবাবু। তিনি ব্রাহ্মসমাজের লোক; বাবা তাঁকে বিশ্বাস করিতেন। তাঁর মেয়ে ছিল অনসূয়া, আমার চেয়ে ছয় বছরের ছোটো। আমি তার শাসনকর্তার পদ লইয়াছিলাম।

তার শিশুমুখের সেই ঘন কালো চোখের পল্লব আমার মনে পড়ে। সেই পল্লবের ছায়াতে এই পৃথিবীর আলোর সমস্ত প্রখরতা তার চোখে যেন কোমল হইয়া আসিয়াছিল। কী স্নিগ্ধ করিয়াই সে মুখের দিকে চাহিত। পিঠের উপরে দুলিতেছে তার সেই বেণীটি, সেও আমার মনে পড়ে; আর মনে পড়ে সেই দুইখানি হাত— কেন জানি না, তার মধ্যে বড়ো একটি করুণা ছিল। সে যেন পথে চলিতে আর-কারও হাত ধরিতে চায়; তার সেই কচি আঙুলগুলি যেন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া কার মুঠার মধ্যে ধরা দিবার জন্য পথ চাহিয়া আছে।

ঠিক সেদিন এমন করিয়া তাকে দেখিতে পাইয়াছিলাম, এ কথা বলিলে বেশি বলা হইবে। কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ বুঝিবার আগেও অনেকটা বুঝি। অগোচরে মনের মধ্যে অনেক ছবি আঁকা হইয়া যায়— হঠাৎ একদিন কোনো-এক দিক হইতে আলো পড়িলে সেগুলা চোখে পড়ে।

অনুর মনের দরজায় কড়া পাহারা ছিল না। সে যা-তা বিশ্বাস করিত। একে তো সে তার বুড়ি দাসীর কাছ হইতে বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে যে-সমস্ত শিক্ষা লাভ করিয়াছিল তা আমার সেই ম্যাপ-টাঙানো পড়িবার ঘরের জ্ঞানভাণ্ডারের আবর্জনার মধ্যেও ঠাঁই পাইবার যোগ্য নয়; তার পরে সে আবার নিজের কল্পনার যোগেও কত কী যে সৃষ্টি করিত তার ঠিকানা নাই। এইখানে কেবলই তাকে আমার শাসন করিতে হইত। কেবলই বলিতে হইত, "অনু, এ-সমস্ত মিথ্যা কথা, তা জান! ইহাতে পাপ হয়!" শুনিয়া অনুর দুই চোখে কালো পল্লবের ছায়ার উপরে আবার একটা ভয়ের ছায়া পড়িত। অনু

যখন তার ছোটো বোনের কান্না থামাইবার জন্য কত কী বাজে কথা বলিত— তাকে ভুলাইয়া দুধ খাওয়াইবার সময় যেখানে পাখি নাই সেখানেও পাখি আছে বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে উড়ো খবর দিবার চেষ্টা করিত, আমি তাকে ভয়ংকর গম্ভীর হইয়া সাবধান করিয়া দিয়াছি; বলিয়াছি, "উহাকে যে মিথ্যা বলিতেছ, পরমেশ্বর সমস্ত শুনিতেছেন, এখনই তাঁর কাছে তোমার মাপ চাওয়া উচিত।"

এমনি করিয়া আমি তাকে যত শাসন করিয়াছি, সে আমার শাসন মানিয়াছে। সে নিজেকে যতই অপরাধী মনে করিত আমি ততই খুশি হইতাম। কড়া শাসনে মানুষের ভালো করিবার সুযোগ পাইলে, নিজে যে অনেক শাসনে ভালো হইয়াছি সেটার একটা দাম ফিরিয়া পাওয়া যায়। অনুও আমাকে নিজের এবং পৃথিবীর অধিকাংশের তুলনায় অদ্ভুত ভালো বলিয়া জানিত।

ক্রমে বয়স বাড়িয়াছে, ইস্কুল হইতে কলেজে গিয়াছি। অখিলবাবুর স্ত্রীর মনে মনে ইচ্ছা ছিল, আমার মতো ভালো ছেলের সঙ্গে অনুর বিবাহ দেন। আমারও মনে এটা ছিল, কোনো কন্যার পিতার চোখ এড়াইবার মতো ছেলে আমি নই। কিন্তু একদিন শুনিলাম, বি এল পাশ করা একটি টাটকা মুন্‌সেফের সঙ্গে অনুর সম্বন্ধ পাকা হইয়াছে। আমরা গরিব— আমি তো জানিতাম, সেটাতেই আমাদের দাম বাড়িয়াছে। কিন্তু কন্যার পিতার হিসাবের প্রণালী স্বতন্ত্র।

বিসর্জনের প্রতিমা ডুবিল। একেবারে জীবনের কোন্ আড়ালে সে পড়িয়া গেল। শিশুকাল হইতে যে আমার সকলের চেয়ে পরিচিত, সে একদিনের মধ্যেই এই হাজার লক্ষ অপরিচিত মানুষের সমুদ্রের মধ্যে তলাইয়া গেল। সেদিন মনে যে কী বাজিল তাহা মনই জানে। কিন্তু বিসর্জনের পরেও কি চিনিয়াছিলাম, সে আমার দেবীর প্রতিমা? তা নয়। অভিমান সেদিন ঘা খাইয়া আরও ঢেউ খেলাইয়া উঠিয়াছিল। অনুকে তো চিরকাল ছোটো করিয়াই দেখিয়া আসিয়াছি; সেদিন আমার যোগ্যতার তুলনায় তাকে আরও ছোটো করিয়া দেখিলাম। আমার শ্রেষ্ঠতার যে পূজা হইল না, সেদিন এইটেই সংসারের সকলের চেয়ে বড়ো অকল্যাণ বলিয়া জানিয়াছি।

যাক, এটা বোঝা গেল সংসারে শুধু সৎ হইয়া কোনো লাভ নাই। পণ করিলাম, এমন টাকা করিব যে একদিন অখিলবাবুকে বলিতে হইবে, 'বড়ো ঠকান ঠকিয়াছি।' খুব কষিয়া কাজের লোক হইবার জোগাড় করিলাম।

কাজের লোক হইবার সব চেয়ে বড়ো সরঞ্জাম নিজের 'পরে অগাধ বিশ্বাস, সে পক্ষে আমার কোনোদিন কোনো কমতি ছিল না। এ জিনিসটা ছোঁয়াচে। যে নিজেকে বিশ্বাস করে, অধিকাংশ লোকেই তাকে বিশ্বাস করে। কেজো বুদ্ধিটা যে আমার

স্বাভাবিক এবং অসাধারণ সেটা সকলেই মানিয়া লইতে লাগিল।

কেজো সাহিত্যের বই এবং কাগজে আমার শেল্‌ফ্‌ এবং টেবিল ভরিয়া উঠিল। বাড়ি-মেরামত, ইলেকট্রিক আলো ও পাখার কৌশল, কোন্ জিনিসের কত দর, বাজারদর ওঠাপড়ার গূঢ়তত্ত্ব, এক্স্‌চেঞ্জের রহস্য, প্ল্যান, এস্টিমেট্ প্রভৃতি বিদ্যায় আসর জমাইবার মতো ওস্তাদি আমি একরকম মারিয়া লইয়াছিলাম।

কিন্তু অহরহ কাজের কথা বলি অথচ কিছুতে কোনো কাজেই নামি না, এমনভাবে অনেকদিন কাটিল। আমার ভক্তরা যখনই আমাকে কোনো-একটা স্বদেশী কোম্পানিতে যোগ দিবার প্রস্তাব করিত আমি বুঝাইয়া দিতাম, যতগুলা কারবার চলিতেছে কোনো-টার কাজের ধারা বিশুদ্ধ নহে, সকলেরই মধ্যে গলদ বিস্তর— তা ছাড়া, সততা বাঁচাইয়া চলিতে হইলে ওদের কাছে ঘেঁসিবার যো নাই। সততার লাগামে একটু-আধটু ঢিল না দিলে ব্যাবসা চলে না, এমন কথা আমার কোনো বন্ধু বলাতে তার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হইয়া গেছে।

মৃত্যুকাল পর্যন্ত সর্বাঙ্গসুন্দর প্ল্যান এস্টিমেট্ এবং প্রস্পেক্টস্ লিখিয়া আমার যশ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতাম। কিন্তু বিধির বিপাকে প্ল্যান করা ছাড়িয়া কাজ করায় লাগিলাম। এক তো পিতার মৃত্যু হওয়াতে আমার ঘাড়েই সংসারের দায় চাপিল; তার পরে আর-এক উপসর্গ আসিয়া জুটিল, সে কথাও বলিতেছি।

প্রসন্ন বলিয়া একটি ছেলে আমার সঙ্গে পড়িত। সে যেমন মুখর তেমনি নিন্দুক। আমাদের পৈতৃক সততার খ্যাতিটাকে লইয়া খোঁচা দিবার সে ভারি সুযোগ পাইয়াছিল। বাবা আমার নাম দিয়াছিলেন সত্যধন। প্রসন্ন আমাদের দারিদ্র্য লক্ষ্য করিয়া বলিত, "বাবা দিবার বেলা দিলেন মিথ্যাধন, আর নামের বেলা দিলেন সত্যধন, তার চেয়ে ধনটাকে সত্য দিয়া নামটাকে মিথ্যা দিলে লোকসান হইত না।" প্রসন্নর মুখটাকে বড়ো ভয় করিতাম।

অনেকদিন তার দেখাই ছিল না। ইতিমধ্যে সে বর্মায় লুধিয়ানায় শ্রীরঙ্গপত্তনে নানা রকম-বেরকমের কাজ করিয়া আসিয়াছে। সে হঠাৎ কলিকাতায় আসিয়া আমাকে পাইয়া বসিল। যার ঠাট্টাকে চিরদিন ভয় করিয়া আসিয়াছি, তার শ্রদ্ধা পাওয়া কি কম আরাম!

প্রসন্ন কহিল, "ভাই, আমার এই কথা রইল, দেখে নিয়ো, একদিন তুমি যদি দ্বিতীয় মতি শীল বা দুর্গাচরণ লা' না হও তবে আমি বউবাজারের মোড় হইতে বাগবাজারের মোড় পর্যন্ত বরাবর সমানে নাকে খত দিতে রাজি আছি।"

প্রসন্নর মুখে এত বড়ো কথাটা যে কতই বড়ো, তাহা প্রসন্নর সঙ্গে যারা এক ক্লাসে

না পড়িয়াছে তারা বুঝিতেই পারিবে না। তার উপরে প্রসন্ন পৃথিবীটাকে খুব করিয়া চিনিয়া আসিয়াছে; উহার কথার দাম আছে।

সে বলিল, "কাজ বোঝে এমন লোক আমি ঢের দেখিয়াছি, দাদা— কিন্তু তারাই সব চেয়ে পড়ে বিপদে। তারা বুদ্ধির জোরেই কিস্তি মাত করিতে চায়, ভুলিয়া যায় যে মাথার উপরে ধর্ম আছেন। কিন্তু তোমাতে যে মণিকাঞ্চনযোগ। ধর্মকেও শক্ত করিয়া ধরিয়াছ, আবার কর্মের বুদ্ধিতেও তুমি পাকা।"

তখন ব্যাবসা-খ্যাপা কালটাও পড়িয়াছিল। সকলেই স্থির করিয়াছিল, বাণিজ্য ছাড়া দেশের মুক্তি নাই; এবং ইহাও নিশ্চিত বুঝিয়াছিল যে, কেবলমাত্র মূলধনটার জোগাড় হইলেই উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, শিক্ষক, ছাত্র এবং ছাত্রদের বাপ-দাদা সকলেই এক দিনেই সকল প্রকার ব্যাবসা পুরাদমে চালাইতে পারে।

আমি প্রসন্নকে বলিলাম, "আমার সম্বল নাই যে।"

সে বলিল, "বিলক্ষণ! তোমার পৈতৃক সম্পত্তির অভাব কী।"

তখন হঠাৎ মনে হইল, প্রসন্ন তবে বুঝি এতদিন ধরিয়া আমার সঙ্গে একটা লম্বা ঠাট্টা করিয়া আসিতেছে।

প্রসন্ন কহিল, "ঠাট্টা নয়, দাদা। সততাই তো লক্ষ্মীর সোনার পদ্ম। লোকের বিশ্বাসের উপরই কারবার চলে, টাকায় নয়।"

পিতার আমল হইতেই আমাদের বাড়িতে পাড়ার কোনো কোনো বিধবা মেয়ে টাকা গচ্ছিত রাখিত। তারা সুদের আশা করিত না, কেবল এই বলিয়া নিশ্চিন্ত ছিল যে, মেয়েমানুষের সর্বত্রই ঠকিবার আশঙ্কা আছে, কেবল আমাদের ঘরেই নাই।

সেই গচ্ছিত টাকা লইয়া স্বদেশী এজেন্সি খুলিলাম। কাপড়, কাগজ, কালি, বোতাম, সাবান, যতই আনাই, বিক্রি হইয়া যায়— একেবারে পঙ্গপালের মতো খরিদ্দার আসিতে লাগিল।

একটা কথা আছে— বিদ্যা যতই বাড়ে ততই জানা যায় যে, কিছুই জানি না। টাকারও সেই দশা। টাকা যতই বাড়ে ততই মনে হয়, টাকা নাই বলিলেই হয়। আমার মনের সেইরকম অবস্থায় প্রসন্ন বলিল— ঠিক যে বলিল তাহা নয়, আমাকে দিয়া বলাইয়া লইল যে, খুচরা-দোকানদারির কাজে জীবন দেওয়াটা জীবনের বাজে খরচ। পৃথিবী জুড়িয়া যে সব ব্যাবসা সেই তো ব্যাবসা। দেশের ভিতরেই যে টাকা খাটে সে টাকা ঘানির বলদের মতো অগ্রসর হয় না, কেবল ঘুরিয়া মরে।

প্রসন্ন এমনি ভক্তিতে গদ্‌গদ্‌ হইয়া উঠিল যেন এমন নূতন অথচ গভীর জ্ঞানের কথা সে জীবনে আর কখনো শোনে নাই। তার পরে আমি তাকে ভারতবর্ষের ভিসিন্ন

ব্যাবসার সাত বছরের হিসাব দেখাইলাম। কোথায় তিসি কত পরিমাণে যায়; কোথায় কত দর; দর সব চেয়ে উঠেই বা কত, নামেই বা কত; মাঠে ইহার দাম কত; জাহাজের ঘাটে ইহার দাম কত; চাষাদের ঘর হইতে কিনিয়া একদম সমুদ্র-পারে চালান করিতে পারিলে এক লক্ষে কত লাভ হওয়া উচিত— কোথাও বা তাহা রেখা কাটিয়া, কোথাও বা তাহা শতকরা হিসাবের অঙ্কে ছকিয়া, কোথাও বা অনুলোম-প্রণালীতে, কোথাও বা প্রতিলোম-প্রণালীতে, লাল এবং কালো কালিতে, অতি পরিষ্কার অক্ষরে লম্বা কাগজের পাঁচ-সাত পৃষ্ঠা ভর্তি করিয়া যখন প্রসন্নর হাতে দিলাম তখন সে আমার পায়ের ধুলা লইতে যায় আর-কি।

সে বলিল, "মনে বিশ্বাস ছিল, আমি এ সব কিছু কিছু বুঝি, কিন্তু আজ হইতে, দাদা, তোমার সাক্‌রেদ হইলাম।"

আবার একটু প্রতিবাদও করিল। বলিল, "যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য— মনে আছে তো? কী জানি, হিসাবে ভুল থাকিতেও পারে।"

আমার রোখ চড়িয়া গেল। ভুল যে নাই, কাগজে কাগজে তাহার অকাট্য প্রমাণ বাড়িয়া চলিল। লোক্‌সান যত প্রকারের হইতে পারে সমস্তকে সার বাঁধিয়া খাড়া করিয়াও, মুনফাকে কোনোমতেই শতকরা বিশ-পচিশের নিচে নামাইতে পারা গেল না।

এমনি করিয়া দোকানদারির সরু খাল বাহিয়া কারবারের সমুদ্রে গিয়া যখন পড়া গেল তখন যেন সেটা নিতান্ত আমারই জেদবশত ঘটিল, এমনি একটা ভাব দেখা দিল। দায়িত্ব আমারই।

একে দত্তবংশের সততা, তার উপরে সুদের লোভ; গচ্ছিত টাকা ফাঁপিয়া উঠিল। মেয়েরা গহনা বেচিয়া টাকা দিতে লাগিল।

কাজে প্রবেশ করিয়া আর দিশা পাই না। প্ল্যানে যেগুলো দিব্য লাল এবং কালো কালির রেখায় ভাগ করা, কাজের মধ্যে সে বিভাগ খুঁজিয়া পাওয়া দায়। আমার প্ল্যানের রসভঙ্গ হয়, তাই কাজে সুখ পাই না। অন্তরাত্মা স্পষ্ট বুঝিতে লাগিল, কাজ করিবার ক্ষমতা আমার নাই, অথচ সেটা কবুল করিবার ক্ষমতাও আমার নাই। কাজটা স্বভাবত প্রসন্নর হাতেই পড়িল, অথচ আমিই যে কারবারের হর্তাকর্তা বিধাতা, এ ছাড়া প্রসন্নর মুখে আর কথাই নাই। তার মতলব এবং আমার স্বাক্ষর, তার দক্ষতা এবং আমার পৈতৃক খ্যাতি, এই দুইয়ে মিলিয়া ব্যাবসাটা চার পা তুলিয়া যে কোন্ পথে ছুটিতেছে ঠাহর করিতেই পারিলাম না।

দেখিতে দেখিতে এমন জায়গায় আসিয়া পড়িলাম যেখানে তলও পাই না, কূলও দেখি না। তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া যদি সত্য খবরটা ফাঁস করি তবে সততা রক্ষা হয়,

কিন্তু সততার খ্যাতি রক্ষা হয় না। গচ্ছিত টাকার সুদ জোগাইতে লাগিলাম, কিন্তু সেটা মুনফা হইতে নয়। কাজেই সুদের হার বাড়াইয়া গচ্ছিতের পরিমাণ বাড়াইতে থাকিলাম।

আমার বিবাহ অনেকদিন হইয়াছে। আমি জানিতাম, ঘরকন্না ছাড়া আমার স্ত্রীর আর কোনো-কিছুতেই খেয়াল নাই। হঠাৎ দেখি, অগস্ত্যের মতো এক গণ্ডূষে টাকার সমুদ্র শুষিয়া লইবার লোভ তারও আছে। আমি জানি না কখন আমারই মনের মধ্য হইতে এই হাওয়াটা আমাদের সমস্ত পরিবারে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের চাকর দাসী দরোয়ান পর্যন্ত আমাদের কারবারে টাকা ফেলিতেছে। আমার স্ত্রীও আমাকে ধরিয়া পড়িল, সে কিছু কিছু গহনা বেচিয়া আমার কারবারে টাকা খাটাইবে। আমি ভর্ৎসনা করিলাম, উপদেশ দিলাম। বলিলাম, লোভের মতো রিপু নাই।—স্ত্রীর টাকা লই নাই।

আরও একজনের টাকা আমি লইতে পারি নাই।

অনু একটি ছেলে লইয়া বিধবা হইয়াছে। যেমন কৃপণ তেমনি ধনী বলিয়া তার স্বামীর খ্যাতি ছিল। কেহ বলিত, দেড় লক্ষ টাকা তার জমা আছে; কেহ বলিত আরও অনেক বেশি। লোকে বলিত, কৃপণতায় অনু তার স্বামীর সহধর্মিণী। আমি ভাবিতাম, তা হবেই তো। অনু তো তেমন শিক্ষা এবং সঙ্গ পায় নাই।

এই টাকা কিছু খাটাইয়া দিবার জন্য সে আমাকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিল। লোভ হইল, দরকারও খুব ছিল, কিন্তু ভয়ে তার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করিতে গেলাম না।

একবার যখন একটা বড়ো হুণ্ডির মেয়াদ আসন্ন এমন সময়ে প্রসন্ন আসিয়া বলিল, "অখিলবাবুর মেয়ের টাকাটা এবার না লইলে নয়।"

আমি বলিলাম, "যেরকম দশা সিঁধ-কাটাও আমার দ্বারা সম্ভব, কিন্তু ও টাকাটা লইতে পারিব না।"

প্রসন্ন কহিল, "যখন হইতে তোমার ভরসা গেছে তখন হইতেই কারবারে লোকসান চলিতেছে! কপাল ঠুকিয়া লাগিলেই কপালের জোরও বাড়ে।"

কিছুতেই রাজি হইলাম না।

পরদিন প্রসন্ন আসিয়া কহিল, "দক্ষিণ হইতে এক বিখ্যাত মারাঠি গণৎকার আসিয়াছে, তাহার কাছে কুষ্ঠি লইয়া চলো।"

সনাতন দত্তর বংশে কুষ্ঠি মিলাইয়া ভাগ্যপরীক্ষা! দুর্বলতার দিনে মানবপ্রকৃতির ভিতরকার সাবেককেলে বর্বরটা বল পাইয়া উঠে। যাহা দৃষ্ট তাহা যখন ভয়ংকর তখন

যাহা অদৃষ্ট তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিতে ইচ্ছা করে। বুদ্ধিকে বিশ্বাস করিয়া কোনো আরাম পাইতেছিলাম না, তাই নির্বুদ্ধিতার শরণ লইলাম; জন্মক্ষণ ও সন-তারিখ লইয়া গণাইতে গেলাম।

শুনিলাম, আমি সর্বনাশের শেষ কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। কিন্তু এইবার বৃহস্পতি অনুকূল— এখন তিনি আমাকে কোনো-একটি স্ত্রীলোকের ধনের সাহায্যে উদ্ধার করিয়া অতুল ঐশ্বর্য মিলাইয়া দিবেন।

ইহার মধ্যে প্রসন্নর হাত আছে, এমন সন্দেহ করিতে পারিতাম। কিন্তু সন্দেহ করিতে কোনোমতেই ইচ্ছা হইল না। বাড়ি ফিরিয়া আসিলে প্রসন্ন আমার হাতে একখানা বই দিয়া বলিল, "খোলো দেখি।" খুলিতেই যে পাতা বাহির হইল তাহাতে ইংরাজিতে লেখা, বাণিজ্যে আশ্চর্য সফলতা।

সেইদিনই অনুকে দেখিতে গেলাম।

স্বামীর সঙ্গে মফঃস্বলে ফিরিবার সময় বারবার ম্যালেরিয়া জ্বরে পড়িয়া অনুর এখন এমন দশা যে ডাক্তাররা ভয় করিতেছে তাকে ক্ষয়রোগে ধরিয়াছে। কোনো ভালো জায়গায় যাইতে বলিলে সে বলে, "আমি তো আজ বাদে কাল মরিবই, কিন্তু আমার সুবোধের টাকা আমি নষ্ট করিব কেন।"— এমনি করিয়া সে সুবোধকে ও সুবোধের টাকাটিকে নিজের প্রাণ দিয়া পালন করিতেছে।

আমি গিয়া দেখিলাম, অনুর রোগটি তাকে এই পৃথিবী হইতে তফাত করিয়া দিয়াছে। আমি যেন তাকে অনেক দূর হইতে দেখিতেছি। তার দেহখানি একেবারে স্বচ্ছ হইয়া ভিতর হইতে একটি আভা বাহির হইতেছে। যা-কিছু স্থূল সমস্ত ক্ষয় করিয়া তার প্রাণটি মৃত্যুর বাহির দরজায় স্বর্গের আলোতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আর, সেই তার করুণ দুটি চোখের ঘন পল্লব। চোখের নিচে কালি পড়িয়া মনে হইতেছে, যেন তার দৃষ্টির উপরে জীবনান্তকালের সন্ধ্যার ছায়া নামিয়া আসিয়াছে। আমার সমস্ত মন স্তব্ধ হইয়া গেল, আজ তাহাকে দেবী বলিয়া মনে হইল।

আমাকে দেখিয়া অনুর মুখের উপর একটি শান্ত প্রসন্নতা ছড়াইয়া পড়িল। সে বলিল, "কাল রাত্রে আমার অসুখ যখন বাড়িয়াছিল তখন হইতে তোমার কথাই ভাবিতেছি। আমি জানি, আমার আর বেশি দিন নাই। পরশু ভাইফোঁটার দিন, সেদিন আমি তোমাকে শেষ ভাইফোঁটা দিয়া যাইব।"

টাকার কথা কিছুই বলিলাম না। সুবোধকে ডাকাইয়া আনিলাম। তার বয়স সাত। চোখদুটি মায়েরই মতো। সমস্তটা জড়াইয়া তার কেমন-একটি ক্ষণিকতার ভাব, পৃথিবী যেন তাকে পুরা পরিমাণ স্তন্য দিতে ভুলিয়া গেছে। কোলে টানিয়া

তার কপাল চুম্বন করিলাম। সে চুপ করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিল, "কী হইল।"

আমি বলিলাম, "আজ আর সময় হইল না।"

সে কহিল, "মেয়াদের আর নয় দিন মাত্র বাকি।"

অনুর সেই মুখখানি, সেই মৃত্যুসরোবরের পদ্মটি, দেখিয়া অবধি সর্বনাশকে আমার তেমন ভয়ংকর বলিয়া মনে হইতেছিল না।

কিছুকাল হইতে হিসাবপত্র দেখা ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। কূল দেখা যাইত না বলিয়া ভয়ে চোখ বুজিয়া থাকিতাম। মরীয়া হইয়া সই করিয়া যাইতাম, বুঝিবার চেষ্টা করিতাম না।

ভাইফোঁটার সকালবেলায় একখানা হিসাবের চুম্বক ফর্দ লইয়া জোর করিয়া প্রসন্ন আমাকে কারবারের বর্তমান অবস্থাটা বুঝাইয়া দিল। দেখিলাম, মূলধনের সমস্ত তলা একেবারে ক্ষইয়া গেছে। এখন কেবলই ধারের টাকায় জল সেঁচিয়া না চলিলে নৌকাডুবি হইবে।

কৌশলে টাকার কথাটা পাড়িবার উপায় ভাবিতে ভাবিতে ভাইফোঁটার নিমন্ত্রণে চলিলাম। দিনটা ছিল বৃহস্পতিবার। এখন হতবুদ্ধির তাড়ায় বৃহস্পতিবারকেও ভয় না করিয়া পারি না। যে মানুষ হতভাগা, নিজের বুদ্ধি ছাড়া আর-কিছুকেই না মানিতে তার ভরসা হয় না। যাবার বেলায় মনটা বড়ো খারাপ হইল।

অনুর জ্বর বাড়িয়াছে। দেখিলাম, সে বিছানায় শুইয়া। নিচে মেঝের উপর চুপ করিয়া বসিয়া সুবোধ ইংরাজি ছবির কাগজ হইতে ছবি কাটিয়া আটা দিয়া একটা খাতায় আঁটিতেছিল।

বারবেলা বাঁচাইবার জন্য সময়ের অনেক আগে আসিয়াছিলাম। কথা ছিল, আমার স্ত্রীকেও সঙ্গে আনিব। কিন্তু অনুর সম্বন্ধে আমার স্ত্রীর মনের কোণে বোধ করি একটু-খানি ঈর্ষা ছিল, তাই সে আসিবার সময় ছুতা করিল—আমিও পীড়াপীড়ি করিলাম না।

অনু জিজ্ঞাসা করিল, "বউদিদি এলেন না?"

আমি বলিলাম, "শরীর ভালো নাই।"

অনু একটু নিশ্বাস ফেলিল, আর কিছু বলিল না।

আমার মধ্যে একদিন যেটুকু মাধুর্য দেখা দিয়াছিল সেইটিকে আপনার সোনার আলোয় গলাইয়া শরতের আকাশ সেই রোগীর বিছানার উপর বিছাইয়াছিল। কত কথা আজ উঠিয়া পড়িল। সেই-সব অনেক দিনের অতি ছোটো কথা আমার আসন্ন সর্বনাশকে ছাড়াইয়া আজ কত বড়ো হইয়া উঠিল। কারবারের হিসাব ভুলিয়া গেলাম।

ভাইফোঁটার খাওয়া খাইলাম। আমার কপালে সেই মরণের যাত্রী দীর্ঘায়ুকামনার ফোঁটা পরাইয়া আমার পায়ের ধুলা লইল। আমি গোপনে চোখ মুছিলাম।

ঘরে আসিয়া বসিলে সে একটি টিনের বাক্স আমার কাছে আনিয়া রাখিল। বলিল, "সুবোধের জন্য এই যা-কিছু এতদিন আগলাইয়া রাখিয়াছি তোমাকে দিলাম, আর সেই সঙ্গে সুবোধকেও তোমার হাতে দিলাম। এখন নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারিব।"

আমি বলিলাম, "অনু, দোহাই তোমার, টাকা আমি লইব না। সুবোধের দেখা শুনার কোনো ত্রুটি হইবে না, কিন্তু টাকা আর-কারও কাছে রাখিয়ো।"

অনু কহিল, "এই টাকা লইবার জন্য কত লোক হাত পাতিয়া বসিয়া আছে। তুমি কি তাদের হাতেই দিতে বল ?"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। অনু বলিল, "একদিন আড়াল হইতে শুনিয়াছি, ডাক্তার বলিয়াছে, সুবোধের যেরকম শরীরের লক্ষণ ওর বেশিদিন বাঁচার আশা নাই। শুনিয়া অবধি ভয়ে ভয়ে আছি, পাছে আমার মরিতে দেরি হয়। আজ অন্তত আশা লইয়া মরিব যে, ডাক্তারের কথা ভুল হইতেও পারে। সাতচল্লিশ হাজার টাকা কোম্পানির কাগজে জমিয়াছে— আরও কিছু এদিকে ওদিকে আছে। ঐ টাকা হইতে সুবোধের পথ্য ও চিকিৎসা ভালো করিয়াই চলিতে পারিবে। আর যদি ভগবান অল্প বয়সেই উহাকে টানিয়া লন, তবে এই টাকা উহার নামে একটা কোনো ভালো কাজে লাগাইয়ো।"

আমি কহিলাম, "অনু, আমাকে তুমি যত বিশ্বাস কর আমি নিজেকে তত বিশ্বাস করি না।"

শুনিয়া অনু একটুমাত্র হাসিল। আমার মুখে এমন কথা মিথ্যা বিনয়ের মতো শোনায়।

বিদায়কালে অনু বাক্স খুলিয়া কোম্পানির কাগজ ও কয়েক কেতা নোট বুঝাইয়া দিল। তার উইলে দেখিলাম লেখা আছে, অপুত্রক ও নাবালক অবস্থায় সুবোধের মৃত্যু হইলে আমিই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

আমি বলিলাম, "আমার স্বার্থের সঙ্গে তোমার সম্পত্তি কেন এমন করিয়া জড়াইলে।"

অনু কহিল, "আমি যে জানি, আমার ছেলের স্বার্থে তোমার স্বার্থ কোনোদিন বাধিবে না।"

আমি কহিলাম, "কোনো মানুষকেই এতটা বিশ্বাস করা কাজের দস্তুর নয়।"

অনু কহিল, "আমি তোমাকে জানি, ধর্মকে জানি, কাজের দস্তুর বুঝিবার আমার শক্তি নাই।"

বাক্সের মধ্যে গহনা ছিল, সেগুলি দেখাইয়া সে বলিল, "সুবোধ যদি বাঁচে ও বিবাহ করে, তবে বউমাকে এই গহনা ও আমার আশীর্বাদ দিয়ো। আর এই পান্নার কণ্ঠীটি বউদিদিকে দিয়া বলিয়ো, আমার মাথার দিব্য, তিনি যেন গ্রহণ করেন।"

এই বলিয়া অনু যখন ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকে প্রণাম করিল তার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাড়াতাড়ি সে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল। এই আমি তার শেষ প্রণাম পাইয়াছি। ইহার দুই দিন পরেই সন্ধ্যার সময় হঠাৎ নিশ্বাস বন্ধ হইয়া তার মৃত্যু হইল— আমাকে খবর দিবার সময় পাইল না।

ভাইফোঁটার নিমন্ত্রণ সারিয়া, টিনের বাক্স হাতে, গাড়ি হইতে বাড়ির দরজায় যেমান নামিলাম দেখি, প্রসন্ন অপেক্ষা করিয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, খবর ভালো তো ?"

আমি বলিলাম, "এ টাকায় কেহ হাত দিতে পারিবে না।"

প্রসন্ন কহিল, "কিন্তু—"

আমি বলিলাম, "সে জানি না— যা হয় তা হোক, এ টাকা আমার ব্যবসায়ে লাগিবে না।"

প্রসন্ন বলিল, "তবে তোমার অন্ত্যেষ্টিসৎকারে লাগিবে।"

অনুর মৃত্যুর পর সুবোধ আমার বাড়িতে আসিয়া আমার ছেলে নিত্যধনকে সঙ্গী পাইল।

যারা গল্পের বই পড়ে মনে করে, মানুষের মনের বড়ো বড়ো পরিবর্তন ধীরে ধীরে ঘটে। ঠিক উলটা। টিকায় আগুন ধরিতে সময় লাগে কিন্তু বড়ো বড়ো আগুন হুহু করিয়া ধরে। আমি একথা যদি বলি যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুবোধের উপর আমার মনের একটা বিদ্বেষ দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠিল, তবে সবাই তার বিস্তারিত কৈফিয়ত চাহিবে। সুবোধ অনাথ, সে বড়ো ক্ষীণপ্রাণ, সে দেখিতেও সুন্দর, সকলের উপরে সুবোধের মা স্বয়ং অনু— কিন্তু তার কথাবার্তা, চলাফেরা, খেলাধুলা, সমস্তই যেন আমাকে দিনরাত খোঁচা দিতে লাগিল।

আসল, সময়টা বড়ো খারাপ পড়িয়াছিল। সুবোধের টাকা কিছুতেই লইব না পণ ছিল, অথচ ও টাকাটা না লইলে নয় এমনি অবস্থা। শেষকালে একদিন মহা বিপদে পড়িয়া কিছু লইলাম। ইহাতে আমার মনের কল এমনি বিগড়াইয়া গেল যে, সুবোধের কাছে মুখ-দেখানো আমার দায় হইল। প্রথমটা উহাকে এড়াইতে থাকিলাম, তার পর উহার উপরে বিষম রাগিতে আরম্ভ করিলাম।

রাগিবার প্রথম উপলক্ষ্য হইল উহার স্বভাব। আমি নিজে ব্যস্তবাগীশ, সব কাজ

তড়িঘড়ি করা আমার অভ্যাস। কিন্তু সুবোধের কী একরকমের ভাব, উহাকে প্রশ্ন করিলে হঠাৎ যেন উত্তর করিতেই পারে না— যেখানে সে আছে সেখানে যেন সে নাই, যেন সে আর কোথাও। রাস্তার ধারের জানলার গরাদে ধরিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দেয়; কী দেখে, কী ভাবে, তা সেই জানে। আমার এটা অসহ্য বোধ হয়। সুবোধ বহুকাল হইতে রুগ্ন মায়ের কাছে মানুষ, সমবয়সী খেলার সঙ্গী কেউ ছিল না— তাই সে বরাবর আপনার মনকে লইয়াই আপনি খেলা করিয়াছে। এই-সব ছেলের মুশকিল এই যে, ইহারা যখন শোক পায় তখন ভালো করিয়া কাঁদিতেও জানে না, শোক ভুলিতেও জানে না। এইজন্যই সুবোধকে ডাকিলে হঠাৎ সাড়া পাওয়া যাইত না, এবং কাজ করিতে বলিলে সে ভুলিয়া যাইত। তার জিনিসপত্র সে কেবলই হারাইত, তাহা লইয়া বকিলে চুপ করিয়া মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত— যেন সেই চাহিয়া থাকাই তার কান্না। আমি বলিতে লাগিলাম, এর দৃষ্টান্ত যে আমার ছেলের পক্ষে বড়ো খারাপ। আবার মুশকিল এই যে, ইহাকে দেখিয়া অবধি নিত্যর ইহাকে ভারি ভালো লাগিয়াছে; তার প্রকৃতি সম্পূর্ণ অন্যরকম বলিয়াই ইহার প্রতি টানও যেন তার বেশি হইল।

পরের স্বভাব সংশোধন আমার কৌলিক কাজ; ইহাতে আমার পটুতাও যেমন উৎসাহও তেমনি। সুবোধের স্বভাবটা কর্মপটু নয় বলিয়াই আমি তাকে খুব কষিয়া কাজ করাইতে লাগিলাম। যতবারই সে ভুল করিত ততবারই নিজেকে দিয়া তার সে ভুল শোধরাইয়া লইতাম। আবার তার আর-এক অভ্যাস, সেটা তার মায়েরও ছিল — সে আপনাকে এবং আপনার চারি দিককে নানারকম করিয়া কল্পনা করিত।

জানলার সামনেই যে জামরুল গাছ ছিল সেটাকে সে কী একটা অদ্ভুত নাম দিয়াছিল; স্ত্রীর কাছে শুনিয়াছি একলা দাঁড়াইয়া সেই গাছটার সঙ্গে সে কথা কহিত। বিছানাটাকে মাঠ, আর বালিশগুলাকে গোরুর পাল মনে করিয়া শোবার ঘরে বসিয়া রাখালি করাটা যে কত মিথ্যা, ইহা তার নিজের মুখে কবুল করাইবার অনেক চেষ্টা করিয়াছি— সে জবাবই করে না। আমি যতই তাকে শাসন করি আমার কাছে তার ত্রুটি ততই বাড়িয়া চলে। আমাকে দেখিলেই সে থতমত খাইয়া যায়; আমার মুখের সাদা কথাটাও সে বুঝিতে পারে না।

আর কিছু নয়, হৃদয় যদি রাগ করিতে শুরু করে এবং নিজেকে সামলাইবার মতো বাহির হইতে কোনো ধাক্কা যদি সে না পায় তবে রাগটা আপনাকে আপনিই বাড়াইয়া চলে, নূতন কারণের অপেক্ষা রাখে না। যদি এমন মানুষকে দু-চারবার মূর্খ বলি যার জবাব দিবার সাধ্য নাই তবে সেই দু-চারবার বলাটাই পঞ্চমবারকার বলাটাকে সৃষ্টি

করে, কোনো উপকরণের দরকার হয় না। সুবোধের উপর কেবলই বিরক্ত হইয়া ওঠা আমার মনের এমনি অভ্যাস হইয়াছিল যে, সেটা ত্যাগ করা আমার সাধ্যই ছিল না।

এমনি করিয়া পাঁচ বছর কাটিল। সুবোধের বয়স যখন বারো তখন তার কোম্পানির কাগজ এবং গহনাপত্র গলিয়া গিয়া আমার হিসাবের খাতার গোটাকতক কালীর অঙ্কে পরিণত হইল।

মনকে বুঝাইলাম, অনু তো উইলে আমাকেই টাকা দিয়াছে। মাঝখানে সুবোধ আছে বটে, কিন্তু ও তো ছায়া, নাই বলিলেই হয়। যে টাকাটা নিশ্চয়ই পাইব সেটাকে আগেভাগে খরচ করিলে অধর্ম হয় না।

অল্প বয়স হইতেই আমার বাতের ব্যামো ছিল। কিছুদিন হইতে সেইটে অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। যারা কাজের লোক তাদের স্থির করিয়া রাখিলে তারা চারি দিকের সমস্ত লোককে অস্থির করিয়া তোলে। সে কয়দিন আমার স্ত্রী, আমার ছেলে, সুবোধ, বাড়ির চাকরবাকর কারও শান্তি ছিল না।

এদিকে আমার পরিচিত যে কয়জন বিধবা আমার কাছে টাকা রাখিয়াছিল কয়েক মাস তাদের সুদ বন্ধ। পূর্বে এমন কখনো ঘটিতে দিই নাই। এইজন্য তারা উদ্‌বিগ্ন হইয়া আমাকে তাগিদ করিতেছে। আমি প্রসন্নকে তাগিদ করি, সে কেবলই দিন ফিরায়। অবশেষে যেদিন নিশ্চিত দিবার কথা সেদিন সকাল হইতে পাওনাদাররা বসিয়া আছে, প্রসন্নর দেখা নাই।

নিত্যকে বলিলাম "সুবোধকে ডাকিয়া দাও।"

সে বলিল, "সুবোধ শুইয়া আছে।"

আমি মহা রাগিয়া বলিলাম, "শুইয়া আছে? এখন বেলা এগারোটা, এখন সে শুইয়া আছে!"

সুবোধ ভয়ে ভয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি বলিলাম, "প্রসন্নকে যেখানে পাও ডাকিয়া আনো।"

সর্বদা আমার ফাইফরমাশ খাটিয়া সুবোধ এ-সকল কাজে পাকা হইয়াছিল। কাকে কোথায় সন্ধান করিতে হইবে, সমস্তই তার জানা।

বেলা একটা হইল, দুটা হইল, তিনটা হইল, সুবোধ আর ফেরে না। এদিকে যারা ধন্না দিয়া বসিয়া আছে তাদের ভাষার তাপ এবং বেগ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। কোনোমতেই সুবোধটার গড়িমসি চাল ঘুচাইতে পারিলাম না। যত দিন যাইতেছে ততই তার ঢিলামি আরও যেন বাড়িয়া উঠিতেছে। আজকাল সে বসিতে পারিলে উঠিতে

চায় না, নড়িতে-চড়িতে তার সাত দিন লাগে। এক-একদিন দেখি, বিকালে পাঁচটার সময়েও সে বিছানায় গড়াইতেছে— সকালে তাকে বিছানা হইতে জোর করিয়া উঠাইয়া দিতে হয়— চলিবার সময় যেন পায়ে পায়ে জড়াইয়া চলে। আমি সুবোধকে বলিতাম, জন্মকুঁড়ে, কুঁড়েমির মহামহোপাধ্যায়। সে লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া থাকিত। একদিন তাকে বলিয়াছিলাম, "বল্ দেখি প্রশান্ত মহাসাগরের পরে কোন্ মহাসাগর।" যখন সে জবাব দিতে পারিল না আমি বলিলাম, "সে হচ্ছ তুমি, আলস্যমহাসাগর।" পারৎপক্ষে সুবোধ কোনো দিন আমার কাছে কাঁদে না, কিন্তু সেদিন তার চোখ দিয়া ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে মার গালি সব সহিতে পারিত, কিন্তু বিদ্রূপ তার মর্মে গিয়া বাজিত।

বেলা গেল। রাত হইল। ঘরে কেহ বাতি দিল না। আমি ডাকাডাকি করিলাম, কেহ সাড়া দিল না। বাড়িসুদ্ধ সকলের উপর আমার রাগ হইল। তার পরে হঠাৎ আমার সন্দেহ হইল, হয়তো প্রসন্ন সুদের টাকা সুবোধের হাতে দিয়াছে, সুবোধ তাই লইয়া পালাইয়াছে। আমার ঘরে সুবোধের যে আরাম ছিল না সে আমি জানিতাম। ছেলেবেলা হইতে আরাম জিনিসটাকে অন্যায় বলিয়াই জানি, বিশেষত ছোটো ছেলের পক্ষে। তাই এ সম্বন্ধে আমার মনে কোনো পরিতাপ ছিল না। কিন্তু তাই বলিয়া সুবোধ যে টাকা লইয়া পালাইয়া যাইতে পারে ইহা চিন্তা করিয়া আমি তাকে কপট অকৃতজ্ঞ বলিয়া মনে মনে গালি দিতে লাগিলাম। এই বয়সেই চুরি আরম্ভ করিল, ইহার গতি কী হইবে। আমার কাছে থাকিয়া, আমাদের বাড়িতে বাস করিয়াও ইহার এমন শিক্ষা হইল কী করিয়া। সুবোধ যে টাকা চুরি করিয়া পালাইয়াছে এ-সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ রহিল না। ইচ্ছা হইল, পশ্চাতে ছুটিয়া তাকে যেখানে পাই ধরিয়া আনি, এবং আপাদমস্তক একবার কষিয়া প্রহার করি।

এমন সময়ে আমার অন্ধকার ঘরে সুবোধ আসিয়া প্রবেশ করিল। তখন আমার এমন রাগ হইয়াছে যে চেষ্টা করিয়াও আমার কণ্ঠ দিয়া কথা বাহির হইল না।

সুবোধ বলিল, "টাকা পাই নাই।"

আমি তো সুবোধকে টাকা আনিতে বলি নাই, তবে সে কেন বলিল 'টাকা পাই নাই'। নিশ্চয় টাকা পাইয়া চুরি করিয়াছে— কোথাও লুকাইয়াছে। এই-সমস্ত ভালোমানুষ ছেলেরাই মিট্‌মিটে সয়তান।

আমি বহু কষ্টে কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিলাম, "টাকা বাহির করিয়া দে।"

সেও উদ্ধত হইয়া বলিল, "না, দিব না, তুমি কী করিতে পার করো।"

আমি আর কিছুতেই আপনাকে সামলাইতে পারিলাম না। হাতের কাছে লাঠি

ছিল, সজোরে তার মাথা লক্ষ্য করিয়া মারিলাম। সে আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল। তখন আমার ভয় হইল। নাম ধরিয়া ডাকিলাম, সে সাড়া দিল না। কাছে গিয়া যে দেখিব আমার সে শক্তি রহিল না। কোনো মতেই উঠিতে পারিলাম না। হাৎড়াইতে গিয়া দেখি, জাজিম ভিজিয়া গেছে। এ যে রক্ত! ক্রমে রক্ত ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। ক্রমে আমি যেখানে ছিলাম তার চারি দিক রক্তে ভিজিয়া উঠিল। আমার খোলা জানলার বাহির হইতে সন্ধ্যাতারা দেখা যাইতেছিল; আমি তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইয়া লইলাম— আমার হঠাৎ কেমন মনে হইল, সন্ধ্যাতারাটি ভাইফোঁটার সেই চন্দনের ফোঁটা। সুবোধের উপর আমার এতদিনকার যে অন্যায় বিদ্বেষ ছিল সে কোথায় এক মুহূর্তে ছিন্ন হইয়া গেল। সে যে অমুর হৃদয়ের ধন; মায়ের কোল হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সে যে আমার হৃদয়ে পথ খুঁজিতে আসিয়াছিল। আমি এ কী করিলাম! এ কী করিলাম! ভগবান আমাকে এ কী বুদ্ধি দিলে! আমার টাকার কী দরকার ছিল। আমার সমস্ত কারবার ভাসাইয়া দিয়া সংসারে কেবল এই রুগ্ন বালকটির কাছে যদি ধর্ম রাখিতাম তাহা হইলে যে আমি রক্ষা পাইতাম।

ক্রমে ভয় হইতে লাগিল পাছে কেহ আসিয়া পড়ে, পাছে ধরা পড়ি। প্রাণপণে ইচ্ছা করিতে লাগিলাম কেহ যেন না আসে, আলো যেন না আনে—এই অন্ধকার যেন মুহূর্তের জন্য না ঘোচে, যেন কাল সূর্য না ওঠে, যেন বিশ্বসংসার একেবারে সম্পূর্ণ মিথ্যা হইয়া এমনিতরো নিবিড় কালো হইয়া আমাকে আর এই ছেলেটিকে চিরদিন ঢাকিয়া রাখে।

পায়ের শব্দ শুনিলাম। মনে হইল, কেমন করিয়া পুলিস খবর পাইয়াছে। কী মিথ্যা কৈফিয়ত দিব তাড়াতাড়ি সেইটে ভাবিয়া লইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু মন একেবারেই ভাবিতে পারিল না।

ধড়াস্ করিয়া দরজাটা পড়িল, ঘরে কে প্রবেশ করিল।

আমি আপাদমস্তক চমকিয়া উঠিলাম। দেখিলাম, তখনো রৌদ্র আছে। ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম; সুবোধ ঘরে ঢুকিতেই আমার ঘুম ভাঙিয়াছে।

সুবোধ হাটখোলা বড়োবাজার বেলেঘাটা প্রভৃতি যেখানে যেখানে প্রসন্নর দেখা পাইবার সম্ভাবনা ছিল সমস্ত দিন ধরিয়া সব জায়গায় খুঁজিয়াছে। যে করিয়াই হউক তাহাকে যে আনিতে পারে নাই, এই অপরাধের ভয়ে তার মুখ ম্লান হইয়া গিয়াছিল। এতদিন পরে দেখিলাম, কী সুন্দর তার মুখখানি, কী করুণায় ভরা তার দুইটি চোখ!

আমি বলিলাম, "আয়, বাবা সুবোধ, আয় আমার কোলে আয়।"

সে আমার কথা বুঝিতেই পারিল না; ভাবিল, আমি বিদ্রূপ করিতেছি। ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করিয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল এবং খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়াই মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

মুহূর্তে আমার বাতের পঙ্গুতা কোথায় চলিয়া গেল। আমি ছুটিয়া গিয়া কোলে করিয়া তাহাকে বিছানায় আনিয়া ফেলিলাম। কুঁজায় জল ছিল, তার মুখে মাথায় ছিটা দিয়া কিছুতেই তার চৈতন্য হইল না। ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইলাম।

ডাক্তার আসিয়া তার অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "এ যে একেবারে ক্লান্তির চরম সীমায় আসিয়াছে। কী করিয়া এমন হওয়া সম্ভব হইল।"

আমি বলিলাম, "আজ কোনো কারণে সমস্ত দিন উহাকে পরিশ্রম করিতে হইয়াছে।"

তিনি বলিলেন, "এ তো একদিনের কাজ নয়। বোধ হয় দীর্ঘকাল ধরিয়া ইহার ক্ষয় চলিতেছিল, কেহ লক্ষ্য করে নাই।"

উত্তেজক ঔষধ ও পথ্য দিয়া ডাক্তার তার চৈতন্যসাধন করিয়া চলিয়া গেলেন। বলিলেন, "বহু যত্নে যদি দৈবাৎ বাঁচিয়া যায় তো বাঁচিবে, কিন্তু ইহার শরীরে প্রাণশক্তি নিঃশেষ হইয়া গেছে। বোধ করি শেষ-কয়েকদিন এ ছেলে কেবলমাত্র মনের জোরে চলাফেরা করিয়াছে।"

আমি আমার রোগ ভুলিয়া গেলাম। সুবোধকে আমার বিছানায় শোয়াইয়া দিনরাত তার সেবা করিতে লাগিলাম। ডাক্তারের যে ফি দিব এমন টাকা আমার ঘরে নাই। স্ত্রীর গহনার বাক্স খুলিলাম। সেই পান্নার কণ্ঠীটি তুলিয়া লইয়া স্ত্রীকে দিয়া বলিলাম, "এইটি তুমি রাখো।" বাকি সবগুলি লইয়া বন্ধক দিয়া টাকা লইয়া আসিলাম।

কিন্তু টাকায় তো মানুষ বাঁচে না। উহার প্রাণ যে আমি এতদিন ধরিয়া দলিয়া নিঃশেষ করিয়া দিয়াছি। যে স্নেহের অন্ন হইতে উহাকে দিনের পর দিন বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি আজ যখন তাহা হৃদয় ভরিয়া তাহাকে আনিয়া দিলাম তখন সে আর তাহা গ্রহণ করিতে পারিল না। শূন্য হাতে তার মার কাছে সে ফিরিয়া গেল।

ভাদ্র, ১৩২১

শেষের রাত্রি

"মাসি!"

"ঘুমোও, যতীন, রাত হল যে।"

"হোক-না রাত, আমার দিন তো বেশি নেই। আমি বলছিলুম, মণিকে তার বাপের বাড়ি— ভুলে যাচ্ছি, ওর বাপ এখন কোথায়—"

"সীতারামপুরে।"

"হাঁ সীতারামপুরে। সেইখানে মণিকে পাঠিয়ে দাও, আরও কতদিন ও রোগীর সেবা করবে। ওর শরীর তো তেমন শক্ত নয়।"

"শোনো একবার! এই অবস্থায় তোমাকে ফেলে বউ বাপের বাড়ি যেতে চাইবেই বা কেন।"

"ডাক্তারেরা কী বলেছে সে কথা কি সে—"

"তা সে নাই জানল— চোখে তো দেখতে পাচ্ছে। সেদিন বাপের বাড়ি যাবার কথা যেমন একটু ইশারায় বলা অমনি বউ কেঁদে অস্থির।"

মাসির এই কথাটার মধ্যে সত্যের কিছু অপলাপ ছিল, সে কথা বলা আবশ্যক। মণির সঙ্গে সেদিন তাঁর এই প্রসঙ্গে যে আলাপ হইয়াছিল সেটা নিম্নলিখিত-মতো।

"বউ, তোমার বাপের বাড়ি থেকে কিছু খবর এসেছে বুঝি? তোমার জাঠতুতো ভাই অনাথকে দেখলুম যেন।

"হাঁ, মা ব'লে পাঠিয়েছেন, আসছে শুক্রবারে আমার ছোটো বোনের অন্নপ্রাশন। তাই ভাবছি—"

"বেশ তো বাছা, একগাছি সোনার হার পাঠিয়ে দাও, তোমার মা খুশি হবেন।"

"ভাবছি, আমি যাব। আমার ছোটো বোনকে তো দেখি নি, দেখতে ইচ্ছে করে।"

"সে কী কথা, যতীনকে একলা ফেলে যাবে? ডাক্তার কী বলেছে শুনেছ তো?"

"ডাক্তার তো বলছিল, এখনো তেমন বিশেষ—"

"তা যাই বলুক, ওর এই দশা দেখে যাবে কী ক'রে।"

"আমার তিন ভাইয়ের পরে এই একটি বোন, বড়ো আদরের মেয়ে— শুনেছি, ধুম ক'রে অন্নপ্রাশন হবে— আমি না গেলে মা ভারি—"

"তোমার মায়ের ভাব, বাছা, আমি বুঝতে পারি নে। কিন্তু যতীনের এই সময়ে তুমি যদি যাও, তোমার বাবা রাগ করবেন, সে আমি ব'লে রাখছি।"

"তা জানি। তোমাকে এক লাইন লিখে দিতে হবে, মাসি, যে, কোনো ভাবনার কথা নেই— আমি গেলে বিশেষ কোনো—"

"তুমি গেলে কোনো ক্ষতিই নেই সে কি জানি নে। কিন্তু তোমার বাপকে যদি লিখতেই হয়, আমার মনে যা আছে সব খুলেই লিখব।"

"আচ্ছা, বেশ— তুমি লিখো না। আমি ওঁকে গিয়ে বললেই উনি—"

"দেখো, বউ, অনেক সয়েছি— কিন্তু এই নিয়ে যদি তুমি যতীনের কাছে যাও, কিছুতেই সইব না। তোমার বাবা তোমাকে ভালোরকমই চেনেন, তাঁকে ভোলাতে পারবে না।"

এই বলিয়া মাসি চলিয়া আসিলেন। মণি খানিকক্ষণের জন্য রাগ করিয়া বিছানার উপর পড়িয়া রহিল।

পাশের বাড়ি হইতে সই আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি সই, গোসা কেন।"

"দেখো দেখি ভাই, আমার একমাত্র বোনের অন্নপ্রাশন— এরা আমাকে যেতে দিতে চায় না।"

"ওমা, সে কী কথা, যাবে কোথায়। স্বামী যে রোগে ভুগছে।"

"আমি তো কিছুই করি নে, করতে পারিও নে; বাড়িতে সবাই চুপ চাপ, আমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। এমন ক'রে আমি থাকতে পারি নে, তা বলছি!"

"তুমি ধন্যি মেয়েমানুষ যা হোক।"

"তা আমি, ভাই, তোমাদের মতো লোক-দেখানে ভান করতে পারি নে। পাছে কেউ কিছু মনে করে ব'লে মুখ গুঁজড়ে ঘরের কোণে পড়ে থাকা আমার কর্ম নয়।"

"তা, কী করবে শুনি।"

"আমি যাবই, আমাকে কেউ ধরে রাখতে পারবে না।"

"ইস্, তেজ দেখে আর বাঁচি নে। চললুম, আমার কাজ আছে।"

২

বাপের বাড়ি যাইবার প্রসঙ্গে মণি কাঁদিয়াছে— এই খবরে যতীন বিচলিত হইয়া বালিশটাকে পিঠের কাছে টানিয়া তুলিল এবং একটু উঠিয়া হেলান দিয়া বসিল। বলিল, "মাসি, এই জানলাটা আর-একটু খুলে দাও, আর এই আলোটা এ ঘরে দরকার নেই।"

জানলা খুলিতেই স্তব্ধ রাত্রি অনন্ত তীর্থপথের পথিকের মতো রোগীর দরজার কাছে

চুপ করিয়া দাঁড়াইল। কত যুগের কত মৃত্যুকালের সাক্ষী ঐ তারাগুলি যতীনের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

যতীন এই বৃহৎ অন্ধকারের পটের উপর তাহার মণির মুখখানি দেখিতে পাইল। সেই মুখের ডাগর দুটি চক্ষু মোটা মোটা জলের ফোঁটায় ভরা— সে জল যেন আর শেষ হইল না, চিরকালের জন্য ভরিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ সে চুপ করিয়া আছে দেখিয়া মাসি নিশ্চিন্ত হইলেন। ভাবিলেন, যতীনের ঘুম আসিয়াছে।

এমন সময় হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, "মাসি, তোমরা কিন্তু বরাবর মনে করে এসেছ, মণির মন চঞ্চল, আমাদের ঘরে ওর মন বসে নি। কিন্তু দেখো—"

"না, বাবা, ভুল বুঝেছিলুম— সময় হলেই মানুষকে চেনা যায়!"

"মাসি!"

"যতীন, ঘুমোও, বাবা।"

"আমাকে একটু ভাবতে দাও, একটু কথা কইতে দাও! বিরক্ত হোয়ো না মাসি।"

"আচ্ছা, বলো, বাবা।"

"আমি বলছিলুম, মানুষের নিজের মন নিজে বুঝতেই কত সময় লাগে! একদিন যখন মনে করতুম, আমরা কেউ মণির মন পেলুম না, তখন চুপ ক'রে সহ্য করেছি। তোমরা তখন—"

"না, বাবা, অমন কথা বোলো না— আমিও সহ্য করেছি।"

"মন তো মাটির ঢেলা নয়, কুড়িয়ে নিলেই তো নেওয়া যায় না। আমি জানতুম, মণি নিজের মন এখনো বোঝে নি; কোনো একটা আঘাতে যেদিন বুঝবে সেদিন আর—"

"ঠিক কথা, যতীন।"

"সেইজন্যই ওর ছেলেমানুষিতে কোনোদিন কিছু মনে করি নি।"

মাসি এ কথার কোনো উত্তর করিলেন না; কেবল মনে মনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। কতদিন তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন, যতীন বারান্দায় আসিয়া রাত কাটাইয়াছে, বৃষ্টির ছাট আসিয়াছে তবু ঘরে যায় নাই। কতদিন সে মাথা ধরিয়া বিছানায় পড়িয়া; একান্ত ইচ্ছা, মণি আসিয়া মাথায় একটু হাত বুলাইয়া দেয়। মণি তখন সখীদের সঙ্গে দল বাঁধিয়া থিয়েটার দেখিতে যাইবার আয়োজন করিতেছে। তিনি যতীনকে পাখা করিতে আসিয়াছেন, সে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়াছে। সেই বিরক্তির মধ্যে কত বেদনা তাহা তিনি জানিতেন। কতবার তিনি যতীনকে বলিতে চাহিয়াছেন,

'বাবা, তুমি ঐ মেয়েটার দিকে অত বেশি মন দিয়ো না— ও একটু চাহিতে শিখুক— মানুষকে একটু কাঁদানো চাই।' কিন্তু এ-সব কথা বলিবার নহে, বলিলেও কেহ বোঝে না। যতীনের মনে নারীদেবতার একটি পীঠস্থান ছিল, সেইখানে সে মণিকে বসাইয়াছে। সেই তীর্থক্ষেত্রে নারীর অমৃতপাত্র চিরদিন তাহার ভাগ্যে শূন্য থাকিতে পারে, এ কথা মনে করা তাহার পক্ষে সহজ ছিল না। তাই পূজা চলিতেছিল, অর্ঘ্য ভরিয়া উঠিতেছিল, বরলাভের আশা পরাভব মানিতেছিল না।

মাসি যখন আবার ভাবিতেছিলেন, যতীন ঘুমাইয়াছে এমন সময়ে হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, "আমি জানি, তুমি মনে করেছিলে, মণিকে নিয়ে আমি সুখী হতে পারি নি। তাই তার উপর রাগ করতে। কিন্তু, মাসি, সুখ জিনিসটা ঐ তারাগুলির মতো, সমস্ত অন্ধকার লেপে রাখে না, মাঝে মাঝে ফাঁক থেকে যায়। জীবনে কত ভুল করি, কত ভুল বুঝি, তবু তার ফাঁকে ফাঁকে কি স্বর্গের আলো জ্বলে নি। কোথা থেকে আমার মনের ভিতরটি আজ এমন আনন্দে ভরে উঠেছে।"

মাসি আস্তে আস্তে যতীনের কপালে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। অন্ধকারে তাঁহার দুই চক্ষু বাহিয়া যে জল পড়িতেছিল তাহা কেহ দেখিতে পাইল না।

"আমি ভাবছি, মাসি, ওর অল্প বয়স, ও কী নিয়ে থাকবে।"

"অল্প বয়স কিসের, যতীন ? এ তো ওর ঠিক বয়স। আমরাও তো, বাছা, অল্প বয়সেই দেবতাকে সংসারের দিকে ভাসিয়ে অন্তরের মধ্যে বসিয়েছি— তাতে ক্ষতি হয়েছে কী। তাও বলি, সুখেরই বা এত বেশি দরকার কিসের !"

"মাসি মণির মনটি যেই জাগবার সময় হল অমনি আমি—"

"ভাব কেন, যতীন ? মন যদি জাগে তবে সেই কি কম ভাগ্য !"

হঠাৎ অনেক দিনের শোনা একটা বাউলের গান যতীনের মনে পড়িয়া গেল—

ওরে মন, যখন জাগলি না রে
তখন মনের মানুষ এল দ্বারে।
তার চলে যাবার শব্দ শুনে
ভাঙল রে ঘুম,
ও তোর ভাঙল রে ঘুম অন্ধকারে ॥

"মাসি, ঘড়িতে ক'টা বেজেছে।"

"ন'টা বাজবে।"

"সবে ন'টা ? আমি ভাবছিলুম, বুঝি দুটো, তিনটে, কি ক'টা হবে। সন্ধ্যার পর

থেকেই আমার দুপুর রাত আরম্ভ হয়। তবে তুমি আমার ঘুমের জন্যে অত ব্যস্ত হয়েছিলে কেন।"

"কালও সন্ধ্যার পর এইরকম কথা কইতে কইতে কত রাত পর্যন্ত তোমার আর ঘুম এল না, তাই আজ তোমাকে সকাল-সকাল ঘুমোতে বলছি।"

"মণি কি ঘুমিয়েছে।"

"না, সে তোমার জন্যে মসুরির ডালের সুপ তৈরি ক'রে তবে ঘুমোতে যায়।"

"বলো কী, মাসি, মণি কি তবে—"

"সেই তো তোমার জন্যে সব পথ্যি তৈরি করে দেয়। তার কি বিশ্রাম আছে।"

"আমি ভাবতুম, মণি বুঝি—"

"মেয়েমানুষের কি আর এ-সব শিখতে হয়। দায়ে পড়লেই আপনি করে নেয়।"

"আজ দুপুরবেলা মৌরলা মাছের যে ঝোল হয়েছিল তাতে বড়ো সুন্দর একটি তার ছিল। আমি ভাবছিলুম, তোমারই হাতের তৈরি।"

"কপাল আমার! মণি কি আমাকে কিছু করতে দেয়। তোমার গামছা তোয়ালে নিজের হাতে কেচে শুকিয়ে রাখে। জানে যে, কোথাও কিছু নোংরা তুমি দেখতে পার না। তোমার বাইরের বৈঠকখানা যদি একবার দেখ তবে দেখতে পাবে, মণি দুবেলা সমস্ত ঝেড়ে মুছে কেমন তক্‌তকে ক'রে রেখে দিয়েছে; আমি যদি তোমার এ ঘরে ওকে সর্বদা আসতে দিতুম তা হলে কি আর রক্ষা থাকত! ও তো তাই চায়।"

"মণির শরীরটা বুঝি—"

"ডাক্তাররা বলে, রোগীর ঘরে ওকে সর্বদা আনাগোনা করতে দেওয়া কিছু নয়। ওর মন বড়ো নরম কি না, তোমার কষ্ট দেখলে দুদিনে যে শরীর ভেঙে পড়বে।"

"মাসি, ওকে তুমি ঠেকিয়ে রাখ কী ক'রে।"

"আমাকে ও বড্ডো মানে বলেই পারি। তবু বারবার গিয়ে খবর দিয়ে আসতে হয়— ঐ আমার আর-এক কাজ হয়েছে।"

আকাশের তারাগুলি যেন করুণা-বিগলিত চোখের জলের মতো জল্‌জল্‌ করিতে লাগিল। যে জীবন আজ বিদায় লইবার পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যতীন তাহাকে মনে মনে কৃতজ্ঞতার প্রণাম করিল— এবং সম্মুখে মৃত্যু আসিয়া অন্ধকারের ভিতর হইতে যে দক্ষিণ হাত বাড়াইয়া দিয়াছে যতীন স্নিগ্ধ বিশ্বাসের সহিত তাহার উপরে আপনার রোগক্লান্ত হাতটি রাখিল।

একবার নিশ্বাস ফেলিয়া, একটুখানি উস্‌খুস্‌ করিয়া যতীন বলিল, "মাসি, মণি যদি জেগেই থাকে তা হলে একবার যদি তাকে—"

"এখনি ডেকে দিচ্ছি, বাবা।"

"আমি বেশিক্ষণ তাকে এ ঘরে রাখতে চাই নে— কেবল পাঁচ মিনিট— দুটো-একটা কথা যা বলবার আছে—

মাসি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মণিকে ডাকিতে আসিলেন। এদিকে যতীনের নাড়ী দ্রুত চলিতে লাগিল। যতীন জানে, আজ পর্যন্ত সে মণির সঙ্গে ভালো করিয়া কথা জমাইতে পারে নাই। দুই যন্ত্র দুই সুরে বাঁধা, এক সঙ্গে আলাপ চলা বড়ো কঠিন। মণি তাহার সঙ্গিনীদের সঙ্গে অনর্গল বকিতেছে হাসিতেছে, দূর হইতে তাহাই শুনিয়া যতীনের মন কতবার ঈর্ষায় পীড়িত হইয়াছে। যতীন নিজেকেই দোষ দিয়াছে— সে কেন অমন সামান্য যাহা-তাহা লইয়া কথা কহিতে পারে না। পারে না যে তাহাও তো নহে, নিজের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যতীন সামান্য বিষয় লইয়াই কি আলাপ করে না। কিন্তু পুরুষের যাহা-তাহা তো মেয়েদের যাহা-তাহার সঙ্গে ঠিক মেলে না। বড়ো কথা একলাই একটানা বলিয়া যাওয়া চলে, অন্য পক্ষ মন দিল কি না খেয়াল না করিলেই হয়, কিন্তু তুচ্ছ কথায় নিয়ত দুই পক্ষের যোগ থাকা চাই; বাঁশি একাই বাজিতে পারে, কিন্তু দুইয়ের মিল না থাকিলে করতালের খচমচ জমে না। এইজন্য কত সন্ধ্যা-বেলায় যতীন মণির সঙ্গে যখন খোলা বারান্দায় মাদুর পাতিয়া বসিয়াছে, দুটো-চারটে টানাবোনা কথার পরেই কথার সূত্র একেবারে ছিঁড়িয়া ফাঁক হইয়া গেছে; তাহার পরে সন্ধ্যার নীরবতা যেন লজ্জায় মরিতে চাহিয়াছে। যতীন বুঝিতে পারিয়াছে, মণি পালাইতে পারিলে বাঁচে; মনে মনে কামনা করিয়াছে, এখনই কোনো-একজন তৃতীয় ব্যক্তি যেন আসিয়া পড়ে। কেননা, দুই জনে কথা কহা কঠিন, তিন জনে সহজ।

মণি আসিলে আজ কেমন করিয়া কথা আরম্ভ করিবে, যতীন তাহাই ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে গেলে কথাগুলো কেমন অস্বাভাবিক-রকম বড়ো হইয়া পড়ে— সে-সব কথা চলিবে না। যতীনের আশঙ্কা হইতে লাগিল, আজকের রাত্রের পাঁচ মিনিটও ব্যর্থ হইবে। অথচ, তাহার জীবনে এমনতরো নিরালা পাঁচ মিনিট আর ক'টাই বা বাকি আছে।

৩

"একি, বউ, কোথাও যাচ্ছ না কি।"

"সীতারামপুরে যাব।"

"সে কী কথা। কার সঙ্গে যাবে।"

"অনাথ নিয়ে যাচ্ছে।"

"লক্ষ্মী মা আমার, তুমি যেয়ো, আমি তোমাকে বারণ করব না, কিন্তু আজ নয়।"

"টিকিট কিনে গাড়ি রিজার্ভ করা হয়ে গেছে।"

"তা হোক, ও লোকসান গায়ে সইবে— তুমি কাল সকালেই চলে যেয়ো— আজ যেয়ো না।"

"মাসি, আমি তোমাদের তিথি বার মানি নে, আজ গেলে দোষ কী।"

"যতীন তোমাকে ডেকেছে, তোমার সঙ্গে তার একটু কথা আছে।"

"বেশ তো, এখনো একটু সময় আছে, আমি তাঁকে ব'লে আসছি।"

"না, তুমি বলতে পারবে না যে যাচ্ছ।"

"তা বেশ, কিছু বলব না, কিন্তু আমি দেরি করতে পারব না। কালই অন্নপ্রাশন— আজ যদি না যাই তো চলবে না।"

"আমি জোড়হাত করছি, বউ, আমার কথা আজ একদিনের মতো রাখো। আজ মন একটু শান্ত করে যতীনের কাছে এসে বসো— তাড়াতাড়ি কোরো না।"

"তা, কী করব বলো, গাড়ি তো আমার জন্যে বসে থাকবে না। অনাথ চলে গেছে— দশ মিনিট পরেই সে এসে আমাকে নিয়ে যাবে। এই বেলা তাঁর সঙ্গে দেখা সেরে আসি গে।"

"না, তবে থাক্— তুমি যাও। এমন করে তার কাছে যেতে দেব না। ওরে অভাগিনী, তুই যাকে এত দুঃখ দিলি সে তো সব বিসর্জন দিয়ে আজ বাদে কাল চলে যাবে— কিন্তু যত দিন বেঁচে থাকবি এ দিনের কথা তোকে চিরদিন মনে রাখতে হবে— ভগবান আছেন, ভগবান আছেন, সে কথা একদিন বুঝবি।"

"মাসি, তুমি অমন ক'রে শাপ দিয়ো না বলছি!"

"ওরে বাপ রে, আর কেন বেঁচে আছিস রে বাপ। পাপের যে শেষ নেই— আমি আর ঠেকিয়ে রাখতে পারলুম না।"

মাসি একটু দেরি করিয়া রোগীর ঘরে গেলেন। আশা করিলেন, যতীন ঘুমাইয়া পড়িবে। কিন্তু ঘরে ঢুকিতেই দেখিলেন, বিছানার উপর যতীন নড়িয়া-চড়িয়া উঠিল। মাসি বলিলেন, "এই এক কাণ্ড ক'রে বসেছে।"

"কী হয়েছে। মণি এল না? এত দেরি করলে কেন, মাসি।"

"গিয়ে দেখি, সে তোমার দুধ জ্বাল দিতে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছে ব'লে কান্না। আমি

বলি, 'হয়েছে কী, আরও তো দুধ আছে।' কিন্তু, অসাবধান হয়ে তোমার খাবার দুধ পুড়িয়ে ফেলেছে, বউয়ের এ লজ্জা আর কিছুতেই যায় না। আমি তাকে অনেক ক'রে ঠাণ্ডা ক'রে বিছানায় শুইয়ে রেখে এসেছি। আজ আর তাকে আনলুম না। সে একটু ঘুমোক।"

মণি আসিল না বলিয়া যতীনের বুকের মধ্যে যেমন বাজিল, তেমনি সে আরামও পাইল। তাহার মনে আশঙ্কা ছিল যে, পাছে মণি সশরীরে আসিয়া মণির ধ্যান-মাধুরীটুকুর প্রতি জুলুম করিয়া যায়। কেননা, তাহার জীবনে এমন অনেকবার ঘটিয়াছে। দুধ পুড়াইয়া ফেলিয়া মণির কোমল হৃদয় অনুতাপে ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে, ইহারই রসটুকুতে তাহার হৃদয় ভরিয়া ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

"মাসি!"

"কী, বাবা।"

"আমি বেশ জানছি, আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু, আমার মনে কোনো খেদ নেই। তুমি আমার জন্যে শোক কোরো না।"

"না, বাবা, আমি শোক করব না। জীবনেই যে মঙ্গল আর মরণে যে নয়, এ কথা আমি মনে করি নে।"

"মাসি, তোমাকে সত্য বলছি, মৃত্যুকে আমার মধুর মনে হচ্ছে।"

অন্ধকার আকাশের দিকে তাকাইয়া যতীন দেখিতেছিল, তাহার মণিই আজ মৃত্যুর বেশ ধরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে আজ অক্ষয় যৌবনে পূর্ণ— সে গৃহিণী, সে জননী; সে রূপসী, সে কল্যাণী। তাহারই এলোচুলের উপরে ঐ আকাশের তারাগুলি লক্ষ্মীর স্বহস্তের আশীর্বাদের মালা। তাহাদের দুজনের মাথার উপরে এই অন্ধকারের মঙ্গলবস্ত্রখানি মেলিয়া ধরিয়া আবার যেন নূতন করিয়া শুভদৃষ্টি হইল। রাত্রির এই বিপুল অন্ধকার ভরিয়া গেল মণির অনিমেষ প্রেমের দৃষ্টিপাতে। এই ঘরের বধূ মণি, এই একটুখানি মণি, আজ বিশ্বরূপ ধরিল; জীবনমরণের সংগমতীর্থে ঐ নক্ষত্রবেদীর উপরে সে বসিল; নিস্তব্ধ রাত্রি মঙ্গলঘটের মতো পুণ্যধারায় ভরিয়া উঠিল। যতীন জোড়হাত করিয়া মনে মনে কহিল, 'এতদিনের পর ঘোমটা খুলিল, এই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আবরণ ঘুচিল— অনেক কাঁদাইয়াছ— সুন্দর, হে সুন্দর, তুমি আর ফাঁকি দিতে পারিবে না।'

৪

"কষ্ট হচ্ছে, মাসি, কিন্তু যত কষ্ট মনে করছ তার কিছুই নয়। আমার সঙ্গে আমার কষ্টের ক্রমশই যেন বিচ্ছেদ হয়ে আসছে। বোঝাই নৌকার মতো এতদিন সে আমার

জীবন-জাহাজের সঙ্গে বাঁধা ছিল; আজ যেন বাঁধন কাটা পড়েছে, সে আমার সব বোঝা নিয়ে দূরে ভেসে চলল। এখনও তাকে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তাকে যেন আর আমার ব'লে মনে হচ্ছে না— এ দুদিন মণিকে একবারও দেখি নি, মাসি।"

"পিঠের কাছে আর-একটা বালিশ দেব কি, যতীন।"

"আমার মনে হচ্ছে, মাসি, মণিও যেন চলে গেছে। আমার বাঁধন-ছেড়া দুঃখের নৌকাটির মতো।"

"বাবা, একটু বেদানার রস খাও, তোমার গলা শুকিয়ে আসছে।"

"আমার উইলটা কাল লেখা হয়ে গেছে— সে কি আমি তোমাকে দেখিয়েছি— ঠিক মনে পড়ছে না।"

"আমার দেখবার দরকার নেই, যতীন।"

"মা যখন মারা যান আমার তো কিছুই ছিল না। তোমার খেয়ে তোমার হাতে আমি মানুষ। তাই বলছিলুম—"

"সে আবার কী কথা। আমার তো কেবল এই একখানা বাড়ি আর সামান্য কিছু সম্পত্তি ছিল। বাকি সবই তো তোমার নিজের রোজগার।"

"কিন্তু এই বাড়িটা—"

"কিসের বাড়ি আমার! কত দালান তুমি বাড়িয়েছ, আমার সেটুকু কোথায় আছে খুঁজেই পাওয়া যায় না।"

"মণি তোমাকে ভিতরে ভিতরে খুব—"

"সে কি জানি নে, যতীন। তুই এখন ঘুমো।"

"আমি মণিকে সব লিখে দিলুম বটে, কিন্তু তোমারই সব রইল, মাসি। ও তো তোমাকে কখনো অমান্য করবে না।"

"সেজন্যে অত ভাবছ কেন, বাছা।"

"তোমার আশীর্বাদেই আমার সব, তুমি আমার উইল দেখে এমন কথা কোনোদিন মনে কোরো না—"

"ও কী কথা যতীন। তোমার জিনিস তুমি মণিকে দিয়েছ ব'লে আমি মনে করব? আমার এমনি পোড়া মন? তোমার জিনিস ওর নামে লিখে দিয়ে যেতে পারছ বলে তোমার যে-সুখ সেই তো আমার সকল সুখের বেশি, বাপ।"

"কিন্তু, তোমাকেও আমি—"

"দেখ্, যতীন, এইবার আমি রাগ করব। তুই চলে যাবি, আর তুই আমাকে টাকা দিয়ে ভুলিয়ে রেখে যাবি?"

"মাসি, টাকার চেয়ে আরও বড়ো যদি কিছু তোমাকে—"

"দিয়েছিস, যতীন, ঢের দিয়েছিস। আমার শূন্য ঘর ভ'রে ছিলি, এ আমার অনেক জন্মের ভাগ্য। এতদিন তো বুক ভ'রে পেয়েছি, আজ আমার পাওনা যদি ফুরিয়ে গিয়ে থাকে তো নালিশ করব না। দাও, সব লিখে দাও, লিখে দাও— বাড়িঘর, জিনিসপত্র, ঘোড়াগাড়ি, তালুকমুলুক— যা আছে সব মণির নামে লিখে দাও — এ-সব বোঝা আমার সইবে না।"

"তোমার ভোগে রুচি নেই— কিন্তু মণির বয়স অল্প, তাই—"

"ও কথা বলিস নে, ও কথা বলিস নে। ধনসম্পদ দিতে চাস দে, কিন্তু ভোগ করা—"

"কেন ভোগ করবে না, মাসি।"

"না গো না, পারবে না, পারবে না! আমি বলছি, ওর মুখে রুচবে না! গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে, কিছুতে কোনো রস পাবে না।"

যতীন চুপ করিয়া রহিল। তাহার অভাবে সংসারটা মণির কাছে একেবারে বিস্বাদ হইয়া যাইবে, এ কথা সত্য কি মিথ্যা, সুখের কি দুঃখের, তাহা সে যেন ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। আকাশের তারা যেন তাহার হৃদয়ের মধ্যে আসিয়া কানে কানে বলিল, 'এমনিই বটে— আমরা তো হাজার হাজার বছর হইতে দেখিয়া আসিলাম, সংসার-জোড়া এই-সমস্ত আয়োজন এত-বড়োই ফাঁকি।'

যতীন গভীর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "দেবার মতো জিনিস তো আমরা কিছুই দিয়ে যেতে পারি নে।"

"কম কী দিয়ে যাচ্ছ, বাছা। এই ঘরবাড়ি টাকাকড়ির ছল ক'রে তুমি ওকে যে কী দিয়ে গেলে তার মূল্য ও কি কোনো দিন বুঝবে না। যা তুমি দিয়েছ তাই মাথা পেতে নেবার শক্তি বিধাতা ওকে দিন, এই আশীর্বাদ ওকে করি।"

"আর একটু বেদানার রস দাও, আমার গলা শুকিয়ে এসেছে। মণি কি কাল এসেছিল — আমার ঠিক মনে পড়ছে না।"

"এসে ছিল। তখন তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে। শিয়রের কাছে ব'সে ব'সে অনেকক্ষণ বাতাস ক'রে তার পরে ধোবাকে তোমার কাপড় দিতে গেল।"

"আশ্চর্য! বোধ হয় আমি ঠিক সেই সময়েই স্বপ্ন দেখছিলুম, যেন মণি আমার ঘরে আসতে চাচ্ছে— দরজা অল্প-একটু ফাঁক হয়েছে— ঠেলাঠেলি করছে কিন্তু কিছুতেই সেইটুকুর বেশি আর খুলছে না। কিন্তু, মাসি, তোমরা একটু বাড়াবাড়ি করছ— ওকে দেখতে দাও যে আমি মরছি—নইলে মৃত্যুকে হঠাৎ সইতে পারবে না।"

"বাবা, তোমার পায়ের উপরে এই পশমের শালটা টেনে দিই— পায়ের তেলো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।"

"না, মাসি, গায়ের উপর কিছু দিতে ভালো লাগছে না।"

"জানিস, যতীন? এই শালটা মণির তৈরি, এতদিন রাত জেগে জেগে সে তোমার জন্যে তৈরি করছিল। কাল শেষ করেছে।"

যতীন শালটা লইয়া দুই হাত দিয়া একটু নাড়াচাড়া করিল। মনে হইল পশমের কোমলতা যেন মণির মনের জিনিস; সে যে যতীনকে মনে করিয়া রাত জাগিয়া এইটি বুনিয়াছে, তাহার মনের সেই প্রেমের ভাবনাটি ইহার সঙ্গে গাঁথা পড়িয়াছে। কেবল পশম দিয়া নহে, মণির কোমল আঙুলের স্পর্শ দিয়া ইহা বোনা। তাই মাসি যখন শালটা তাহার পায়ের উপর টানিয়া দিলেন তখন তাহার মনে হইল, মণিই রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া তাহার পদসেবা করিতেছে।

"কিন্তু, মাসি, আমি তো জানতুম, মণি শেলাই করতে পারে না— সে শেলাই করতে ভালোই বাসে না।"

"মন দিলে শিখতে কতক্ষণ লাগে। তাকে দেখিয়ে দিতে হয়েছে— ওর মধ্যে অনেক ভুল শেলাইও আছে।"

"তা, ভুল থাক্-না। ও তো প্যারিস্ এক্‌জিবিশনে পাঠানো হবে না— ভুল শেলাই দিয়ে আমার পা ঢাকা বেশ চলবে।"

শেলাইয়ে যে অনেক ভুল-ত্রুটি আছে সেই কথা মনে করিয়াই যতীনের আরও বেশি আনন্দ হইল। বেচারা মণি পারে না, জানে না, বারবার ভুল করিতেছে, তবু ধৈর্য ধরিয়া রাত্রির পর রাত্রি শেলাই করিয়া চলিয়াছে— এই কল্পনাটি তাহার কাছে বড়ো করুণ, বড়ো মধুর লাগিল। এই ভুলে-ভরা শালটাকে আবার সে একটু নাড়িয়া-চাড়িয়া লইল।

"মাসি, ডাক্তার বুঝি নিচের ঘরে?"

"হাঁ, যতীন, আজ রাত্রে থাকবেন।"

"কিন্তু আমাকে যেন মিছামিছি ঘুমের ওষুধ দেওয়া না হয়। দেখেছ তো, ওতে আমার ঘুম হয় না, কেবল কষ্ট বাড়ে। আমাকে ভালো ক'রে জেগে থাকতে দাও। জান, মাসি? বৈশাখ-দ্বাদশীর রাত্রে আমাদের বিয়ে হয়েছিল—কাল সেই দ্বাদশী আসছে— কাল সেইদিনকার রাত্রের সব তারা আকাশে জ্বালানো হবে। মণির বোধ হয় মনে নেই— আমি তাকে সেই কথাটি আজ মনে করিয়ে দিতে চাই; কেবল তাকে তুমি দু মিনিটের জন্যে ডেকে দাও। চুপ ক'রে রইলে কেন। বোধ হয় ডাক্তার তোমাদের

বলেছে, আমার শরীর দুর্বল, এখন যাতে আমার মনে কোনো— কিন্তু, আমি তোমাকে নিশ্চয় বলছি, মাসি, আজ রাত্রে তার সঙ্গে দুটি কথা কয়ে নিতে পারলে আমার মন খুব শান্ত হয়ে যাবে— তাহলে বোধ হয় আর ঘুমোবার ওষুধ দিতে হবে না। আমার মন তাকে কিছু বলতে চাচ্ছে ব'লেই, এই দু রাত্রি আমার ঘুম হয় নি। মাসি, তুমি অমন করে কেঁদো না। আমি বেশ আছি, আমার মন আজ যেমন ভ'রে উঠেছে, আমার জীবনে এমন আর কখনোই হয় নি। সেইজন্যই আমি মণিকে ডাকছি। মনে হচ্ছে, আজ যেন আমার ভরা হৃদয়টি তার হাতে দিয়ে যেতে পারব। তাকে অনেক দিন অনেক কথা বলতে চেয়েছিলুম, বলতে পারি নি, কিন্তু আর এক মুহূর্ত দেরি করা নয়, তাকে এখনি ডেকে দাও— এর পরে আর সময় পাব না। না, মাসি, তোমার ঐ কান্না আমি সইতে পারি নে। এতদিন তো শান্ত ছিলে, আজ কেন তোমার এমন হল।"

"ওরে যতীন, ভেবেছিলুম, আমার সব কান্না ফুরিয়ে গেছে— কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, এখনো বাকি আছে, আজ আর পারছি নে।"

"মণিকে ডেকে দাও— তাকে ব'লে দেব কালকের রাতের জন্যে যেন—"

"যাচ্ছি, বাবা। শম্ভু দরজার কাছে রইল, যদি কিছু দরকার হয় ওকে ডেকো।"

মাসি মণির শোবার ঘরে গিয়া মেঝের উপর বসিয়া ডাকিতে লাগিলেন, "ওরে, আয়— একবার আয়— আয় রে রাক্ষসী, যে তোকে তার সব দিয়েছে তার শেষ কথাটি রাখ্— সে মরতে বসেছে, তাকে আর মারিস নে।"

যতীন পায়ের শব্দে চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "মণি!"

"না, আমি শম্ভু। আমাকে ডাকছিলেন?"

"একবার তোর বউঠাকরুনকে ডেকে দে।"

"কাকে?"

"বউঠাকরুনকে।"

"তিনি তো এখনো ফেরেন নি।"

"কোথায় গেছেন?"

"সীতারামপুরে।"

"আজ গেছেন?"

"না, আজ তিন দিন হল গেছেন।"

ক্ষণকালের জন্ত যতীনের সর্বাঙ্গ ঝিম্‌ঝিম্‌ করিয়া আসিল— সে চোখে অন্ধকার

দেখিল। এতক্ষণ বালিসে ঠেসান দিয়া বসিয়াছিল, শুইয়া পড়িল। পায়ের উপর সেই পশমের শাল ঢাকা ছিল, সেটা পা দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল।

অনেকক্ষণ পরে মাসি যখন আসিলেন যতীন মণির কথা কিছুই বলিল না। মাসি ভাবিলেন, সে কথা উহার মনে নাই।

হঠাৎ যতীন এক সময়ে বলিয়া উঠিল, "মাসি, তোমাকে কি আমার সেদিনকার স্বপ্নের কথা বলেছি।"

"কোন্ স্বপ্ন।"

"মণি যেন আমার ঘরে আসবার জন্য দরজা ঠেলছিল— কোনোমতেই দরজা এতটুকুর বেশি ফাঁক হল না, সে বাইরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল, কিন্তু কিছুতেই ঢুকতে পারল না। মণি চিরকাল আমার ঘরের বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল। তাকে অনেক ক'রে ডাকলুম, কিন্তু এখানে তার জায়গা হল না।"

মাসি কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। ভাবিলেন, 'যতীনের জন্য মিথ্যা দিয়া যে একটুখানি স্বর্গ রচিতেছিলাম সে আর টিঁকিল না। দুঃখ যখন আসে তাহাকে স্বীকার করাই ভালো— প্রবঞ্চনার দ্বারা বিধাতার মার ঠেকাইবার চেষ্টা করা কিছু নয়।'

"মাসি, তোমার কাছে যে স্নেহ পেয়েছি সে আমার জন্মজন্মান্তরের পাথেয়, আমার সমস্ত জীবন ভ'রে নিয়ে চললুম। আর-জন্মে তুমি নিশ্চয় আমার মেয়ে হয়ে জন্মাবে, আমি তোমাকে বুকে ক'রে মানুষ করব।"

"বলিস কী যতীন, আবার মেয়ে হয়ে জন্মাব? নাহয়, তোরই কোলে ছেলে হয়েই জন্ম হবে— সেই কামনাই কর্-না।"

"না, না, ছেলে না। ছেলেবেলায় তুমি যেমন সুন্দরী ছিলে তেমনি অপরূপ সুন্দরী হয়েই তুমি আমার ঘরে আসবে। আমার মনে আছে, আমি তোমাকে কেমন ক'রে সাজাব।"

"আর বকিস্ নে, যতীন, বকিস্ নে— একটু ঘুমো।"

"তোমার নাম দেব লক্ষ্মীরানী।"

"ও তো একেলে নাম হল না।"

"না, একেলে নাম না। মাসি, তুমি আমার সাবেক-কেলে— সেই সাবেক কাল নিয়েই তুমি আমার ঘরে এসো।"

"তোর ঘরে আমি কন্যাদায়ের দুঃখ নিয়ে আসব, এ কামনা আমি তো করতে পারি নে।"

"মাসি, তুমি আমাকে দুর্বল মনে কর ?— আমাকে দুঃখ থেকে বাঁচাতে চাও ?"

"বাছা, আমার যে মেয়ে মানুষের মন, আমিই দুর্বল— সেইজন্তেই আমি বড়ো ভয়ে ভয়ে তোকে সকল দুঃখ থেকে চিরদিন বাঁচাতে চেয়েছি। কিন্তু, আমার সাধ্য কী আছে। কিছুই করতে পারি নি।"

"মাসি, এ জীবনের শিক্ষা আমি এ জীবনে খাটাবার সময় পেলুম না। কিন্তু, এ সমস্তই জমা রইল, আসছে বারে মানুষ যে কী পারে তা আমি দেখাব। চিরটা দিন নিজের দিকে তাকিয়ে থাকা যে কী ফাঁকি, তা আমি বুঝেছি।"

"যাই বল, বাছা, তুমি নিজে কিছু নাও নি, পরকেই সব দিয়েছ।"

"মাসি, একটা গর্ব আমি করব, আমি সুখের উপরে জবরদস্তি করি নি— কোনোদিন এ কথা বলি নি, যেখানে আমার দাবি আছে সেখানে আমি জোর খাটাব। যা পাই নি তা কাড়াকাড়ি করি নি। আমি সেই জিনিস চেয়েছিলুম যার উপরে কারও স্বত্ব নেই— সমস্ত জীবন হাতজোড় ক'রে অপেক্ষাই করলুম; মিথ্যাকে চাই নি ব'লেই এতদিন এমন ক'রে বসে থাকতে হল— এইবার সত্য হয় তো দয়া করবেন। ও কে ও— মাসি, ও কে।"

"কই, কেউ তো না, যতীন।"

"মাসি, তুমি একবার ও ঘরটা দেখে এসো গে, আমি যেন—"

"না, বাছা, কাউকে তো দেখলুম না।"

"আমি কিন্তু স্পষ্ট যেন—"

"কিচ্ছু না যতীন— ঐ যে ডাক্তারবাবু এসেছেন।"

"দেখুন, আপনি ওঁর কাছে থাকলে উনি বড়ো বেশি কথা কন। কয়রাত্রি এমনি ক'রে তো জেগেই কাটালেন। আপনি শুতে যান, আমার সেই লোকটি এখানে থাকবে।"

"না, মাসি, না তুমি যেতে পাবে না।"

"আচ্ছা, বাছা, আমি নাহয় ঐ কোণটাতে গিয়ে বসছি।"

"না, না, তুমি আমার পাশেই বসে থাকো— আমি তোমার এ হাত কিছুতেই ছাড়ছি নে— শেষ পর্যন্ত না। আমি যে তোমারই হাতের মানুষ, তোমারই হাত থেকে ভগবান আমাকে নেবেন।"

"আচ্ছা বেশ, কিন্তু আপনি কথা কবেন না, যতীনবাবু। সেই ওষুধটা খাওয়াবার সময় হল—"

"সময় হল? মিথ্যা কথা। সময় পার হয়ে গেছে— এখন ওষুধ খাওয়ানো কেবল ফাঁকি দিয়ে সান্ত্বনা করা। আমার তার কোনো দরকার নেই। আমি মরতে ভয় করি নে। মাসি, যমের চিকিৎসা চলছে, তার উপরে আবার সব ডাক্তার জড়ো করেছ কেন— বিদায় ক'রে দাও, সব বিদায় ক'রে দাও। এখন আমার একমাত্র তুমি — আর আমার কাউকে দরকার নেই—কাউকে না— কোনো মিথ্যাকেই না।"

"আপনার এই উত্তেজনা ভালো হচ্ছে না।"

"তা হলে তোমরা যাও, আমাকে উত্তেজিত কোরো না।— মাসি, ডাক্তার গেছে? আচ্ছা, তা হলে তুমি এই বিছানায় উঠে বোসো— আমি তোমার কোলে মাথা দিয়ে একটু শুই।"

"আচ্ছা, শোও, বাবা, লক্ষ্মীটি, একটু ঘুমোও।"

"না, মাসি, ঘুমোতে বোলো না— ঘুমোতে ঘুমোতে হয়তো আর ঘুম ভাঙবে না। এখনো আর-একটু আমার জেগে থাকবার দরকার আছে। তুমি শব্দ শুনতে পাচ্ছ না? ঐ যে আসছে। এখনই আসবে।"

৫

"বাবা যতীন, একটু চেয়ে দেখো— ঐ যে এসেছে। একবারটি চাও।"

"কে এসেছে। স্বপ্ন?"

"স্বপ্ন নয়, বাবা, মণি এসেছে— তোমার শ্বশুর এসেছেন।"

"তুমি কে?"

"চিনতে পারছ না, বাবা, ঐ তো তোমার মণি।"

"মণি, সেই দরজাটা কি সব খুলে গিয়েছে।"

"সব খুলেছে, বাপ আমার, সব খুলেছে।"

"না মাসি, আমার পায়ের উপর ও শাল নয়, ও শাল নয়, ও শাল মিথ্যে, ও শাল ফাঁকি।"

"শাল নয়, যতীন। বউ তোর পায়ের উপর পড়েছে— ওর মাথায় হাত রেখে একটু আশীর্বাদ কর্।— অমন ক'রে কাঁদিস্ নে, বউ, কাঁদবার সময় আসছে— এখন একটুখানি চুপ কর্।"

আশ্বিন, ১৩২১

অপরিচিতা

আজ আমার বয়স সাতাশ মাত্র। এ জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসাবে বড়ো, না গুণের হিসাবে। তবু ইহার একটু বিশেষ মূল্য আছে। ইহা সেই ফুলের মতো যাহার বুকের উপরে ভ্রমর আসিয়া বসিয়াছিল, এবং সেই পদক্ষেপের ইতিহাস তাহার জীবনের মাঝখানে ফলের মতো গুটি ধরিয়া উঠিয়াছে।

সেই ইতিহাসটুকু আকারে ছোটো, তাহাকে ছোটো করিয়াই লিখিব। ছোটোকে যাঁহারা সামান্য বলিয়া ভুল করেন না তাঁহারা ইহার রস বুঝিবেন।

কলেজে যতগুলা পরীক্ষা পাস করিবার সব আমি চুকাইয়াছি। ছেলেবেলায় আমার সুন্দর চেহারা লইয়া পণ্ডিতমশায় আমাকে শিমুল ফুল ও মাকাল ফলের সহিত তুলনা করিয়া বিদ্রূপ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ইহাতে তখন বড়ো লজ্জা পাইতাম; কিন্তু বয়স হইয়া এ কথা ভাবিয়াছি, যদি জন্মান্তর থাকে তবে আমার মুখে সুরূপ এবং পণ্ডিতমশায়দের মুখে বিদ্রূপ আবার যেন এমনি করিয়াই প্রকাশ পায়।

আমার পিতা এককালে গরিব ছিলেন। ওকালতি করিয়া তিনি প্রচুর টাকা রোজগার করিয়াছেন, ভোগ করিবার সময় নিমেষমাত্রও পান নাই। মৃত্যুতে তিনি যে হাঁফ ছাড়িলেন, সেই তাঁর প্রথম অবকাশ।

আমার তখন বয়স অল্প। মার হাতেই আমি মানুষ। মা গরিবের ঘরের মেয়ে; তাই, আমরা যে ধনী এ কথা তিনিও ভোলেন না, আমাকেও ভুলিতে দেন না। শিশুকালে আমি কোলে কোলেই মানুষ— বোধ করি, সেইজন্য শেষপর্যন্ত আমার পুরাপুরি বয়সই হইল না। আজও আমাকে দেখিলে মনে হইবে, আমি অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোটো ভাইটি।

আমার আসল অভিভাবক আমার মামা। তিনি আমার চেয়ে বড়োজোর বছর ছয়েক বড়ো। কিন্তু ফল্গুর বালির মতো তিনি আমাদের সমস্ত সংসারটাকে নিজের অন্তরের মধ্যে শুষিয়া লইয়াছেন। তাঁহাকে না খুঁড়িয়া এখানকার এক গণ্ডূষও রস পাইবার জো নাই। এই কারণে কোনো কিছুর জন্যই আমাকে কোনো ভাবনা ভাবিতেই হয় না।

কন্যার পিতা মাত্রেই স্বীকার করিবেন, আমি সৎপাত্র। তামাকটুকু পর্যন্ত খাই না। ভালোমানুষ হওয়ার কোনো ঝঞ্ঝাট নাই, তাই আমি নিতান্ত ভালোমানুষ। মাতার আদেশ মানিয়া চলিবার ক্ষমতা আমার আছে— বস্তুত না-মানিবার ক্ষমতা আমার

নাই। অন্তঃপুরের শাসনে চলিবার মতো করিয়াই আমি প্রস্তুত হইয়াছি, যদি কোনো কন্যা স্বয়ম্বরা হন তবে এই সুলক্ষণটি স্মরণ রাখিবেন।

অনেক বড়ো ঘর হইতে আমার সম্বন্ধ আসিয়াছিল। কিন্তু মামা, যিনি পৃথিবীতে আমার ভাগ্যদেবতার প্রধান এজেন্ট, বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর একটা বিশেষ মত ছিল। ধনীর কন্যা তাঁর পছন্দ নয়। আমাদের ঘরে যে মেয়ে আসিবে সে মাথা হেঁট করিয়া আসিবে, এই তিনি চান। অথচ টাকার প্রতি আসক্তি তাঁর অস্থিমজ্জায় জড়িত। তিনি এমন বেহাই চান যাহার টাকা নাই অথচ যে টাকা দিতে কসুর করিবে না। যাহাকে শোষণ করা চলিবে অথচ বাড়িতে আসিলে গুড়গুড়ির পরিবর্তে বাঁধা হুকায় তামাক দিলে যাহার নালিশ খাটিবে না।

আমার বন্ধু হরিশ কানপুরে কাজ করে। সে ছুটিতে কলিকাতায় আসিয়া আমার মন উতলা করিয়া দিল। সে বলিল, "ওহে, মেয়ে যদি বল একটি খাসা মেয়ে আছে।"

কিছুদিন পূর্বেই এম্. এ. পাস করিয়াছি। সামনে যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে ছুটি ধূ ধূ করিতেছে; পরীক্ষা নাই, উমেদারি নাই, চাকরি নাই; নিজের বিষয় দেখিবার চিন্তাও নাই, শিক্ষাও নাই, ইচ্ছাও নাই— থাকিবার মধ্যে ভিতরে আছেন মা এবং বাহিরে আছেন মামা।

এই অবকাশের মরুভূমির মধ্যে আমার হৃদয় তখন বিশ্বব্যাপী নারীরূপের মরীচিকা দেখিতেছিল— আকাশে তাহার দৃষ্টি, বাতাসে তাহার নিশ্বাস, তরুমর্মরে তাহার গোপন কথা।

এমন সময় হরিশ আসিয়া বলিল, "মেয়ে যদি বল, তবে—"। আমার শরীর মন বসন্তবাতাসে বকুলবনের নবপল্লবরাশির মতো কাঁপিতে কাঁপিতে আলোছায়া বুনিতে লাগিল। হরিশ মানুষটা ছিল রসিক, রস দিয়া বর্ণনা করিবার শক্তি তাহার ছিল, আর আমার মন ছিল তৃষার্ত।

আমি হরিশকে বলিলাম, "একবার মামার কাছে কথাটা পাড়িয়া দেখো।"

হরিশ আসর জমাইতে অদ্বিতীয়। তাই সর্বত্রই তাহার খাতির। মামাও তাহাকে পাইলে ছাড়িতে চান না। কথাটা তাঁর বৈঠকে উঠিল। মেয়ের চেয়ে মেয়ের বাপের খবরটাই তাঁহার কাছে গুরুতর। বাপের অবস্থা তিনি যেমনটি চান তেমনি। এককালে ইঁহাদের বংশে লক্ষ্মীর মঙ্গলঘট ভরা ছিল। এখন তাহা শূন্য বলিলেই হয়, অথচ তলায় সামান্য কিছু বাকি আছে। দেশে বংশমর্যাদা রাখিয়া চলা সহজ নয় বলিয়া ইনি পশ্চিমে গিয়া বাস করিতেছেন। সেখানে গরিব গৃহস্থের মতোই থাকেন। একটি মেয়ে ছাড়া তাঁর আর নাই। সুতরাং তাহারই পশ্চাতে লক্ষ্মীর ঘটটি একবারে

উপুড় করিয়া দিতে দ্বিধা হইবে না।

এ-সব ভালো কথা। কিন্তু মেয়ের বয়স যে পনেরো, তাই শুনিয়া মামার মন ভার হইল। বংশে তো কোনো দোষ নাই? না, দোষ নাই—বাপ কোথাও তাঁর মেয়ের যোগ্য বর খুঁজিয়া পান না। একে তো বরের হাট মহার্ঘ্য, তাহার পরে ধনুক-ভাঙা পণ, কাজেই বাপ কেবলই সবুর করিতেছেন কিন্তু মেয়ের বয়স সবুর করিতেছে না।

যাই হোক, হরিশের সরস রসনার গুণ আছে। মামার মন নরম হইল। বিবাহের ভূমিকা-অংশটা নির্বিঘ্নে সমাধা হইয়া গেল। কলিকাতার বাহিরে বাকি যে পৃথিবীটা আছে সমস্তটাকেই মামা আণ্ডামান দ্বীপের অন্তর্গত বলিয়া জানেন। জীবনে একবার বিশেষ কাজে তিনি কোন্নগর পর্যন্ত গিয়াছিলেন। মামা যদি মনু হইতেন তবে তিনি হাবড়ার পুল পার হওয়াটাকে তাঁহার সংহিতায় একেবারে নিষেধ করিয়া দিতেন। মনের মধ্যে ইচ্ছা ছিল, নিজের চোখে মেয়ে দেখিয়া আসিব। সাহস করিয়া প্রস্তাব করিতে পারিলাম না।

কন্যাকে আশীর্বাদ করিবার জন্য যাহাকে পাঠানো হইল সে আমাদের বিনুদাদা, আমার পিস্‌তুতো ভাই। তাহার মত, রুচি এবং দক্ষতার' পরে আমি ষোলো-আনা নির্ভর করিতে পারি। বিনুদা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "মন্দ নয় হে! খাঁটি সোনা বটে।"

বিনুদাদার ভাষাটা অত্যন্ত আঁট। যেখানে আমরা বলি 'চমৎকার,' সেখানে তিনি বলেন 'চলনসই'। অতএব বুঝিলাম, আমার ভাগ্যে প্রজাপতির সঙ্গে পঞ্চশরের কোনো বিরোধ নাই।

২

বলা বাহুল্য, বিবাহ-উপলক্ষ্যে কন্যাপক্ষকেই কলিকাতায় আসিতে হইল। কন্যার পিতা শম্ভুনাথবাবু হরিশকে কত বিশ্বাস করেন তাহার প্রমাণ এই যে, বিবাহের তিন দিন পূর্বে তিনি আমাকে প্রথম চক্ষে দেখেন এবং আশীর্বাদ করিয়া যান। বয়স তাঁর চল্লিশের কিছু এপারে বা ওপারে। চুল কাঁচা, গোঁফে পাক ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র। সুপুরুষ বটে। ভিড়ের মধ্যে দেখিলে সকলের আগে তাঁর উপরে চোখ পড়িবার মতো চেহারা।

আশা করি, আমাকে দেখিয়া তিনি খুশি হইয়াছিলেন। বোঝা শক্ত, কেননা তিনি বড়োই চুপ্‌চাপ। যে দুটি-একটি কথা বলেন, যেন তাহাতে পুরা জোর দিয়া বলেন না। মামার মুখ তখন অনর্গল ছুটিতেছিল— ধনে মানে আমাদের স্থান যে শহরের কারও

চেয়ে কম নয়, সেইটেকেই তিনি নানা প্রসঙ্গে প্রচার করিতেছিলেন। শম্ভুনাথবাবু এ কথায় একেবারে যোগই দিলেন না— কোনো ফাঁকে একটা হুঁ বা হাঁ কিছুই শোনা গেল না। আমি হইলে দমিয়া যাইতাম। কিন্তু, মামাকে দমানো শক্ত। তিনি শম্ভুনাথবাবুর চুপচাপ ভাব দেখিয়া ভাবিলেন, লোকটা নিতান্ত নির্জীব, একেবারে কোনো তেজ নাই। বেহাই-সম্প্রদায়ের আর যাই থাক্, তেজ থাকাটা দোষের, অতএব মামা মনে মনে খুশি হইলেন। শম্ভুনাথবাবু যখন উঠিলেন তখন মামা সংক্ষেপে উপর হইতেই তাঁকে বিদায় করিলেন, গাড়িতে তুলিয়া দিতে গেলেন না।

পণ সম্বন্ধে দুই পক্ষে পাকাপাকি কথা ঠিক হইয়া গিয়াছিল। মামা নিজেকে অসামান্য চতুর বলিয়াই অভিমান করিয়া থাকেন। কথাবার্তায় কোথাও তিনি কিছু ফাঁক রাখেন নাই। টাকার অঙ্ক তো স্থির ছিলই, তার পরে গহনা কত ভরির এবং সোনা কত দরের হইবে সেও একেবারে বাঁধাবাঁধি হইয়া গিয়াছিল। আমি নিজে এ-সমস্ত কথার মধ্যে ছিলাম না; জানিতাম না, দেনা-পাওনা কী স্থির হইল। মনে জানিতাম, এই স্থূল অংশটাও বিবাহের একটা প্রধান অংশ, এবং সে অংশের ভার যাঁর উপরে তিনি এক কড়াও ঠকিবেন না। বস্তুত আশ্চর্য পাকা লোক বলিয়া মামা আমাদের সমস্ত সংসারের প্রধান গর্বের সামগ্রী। যেখানে আমাদের কোনো সম্বন্ধ আছে সেখানে সর্বত্রই তিনি বুদ্ধির লড়াইয়ে জিতিবেন, এ একেবারে ধরা কথা। এইজন্য আমাদের অভাব না থাকিলেও এবং অন্য পক্ষের অভাব কঠিন হইলেও জিতিব, আমাদের সংসারের এই জেদ— ইহাতে যে বাঁচুক আর যে মরুক।

গায়ে-হলুদ অসম্ভব রকম ধুম করিয়া গেল। বাহক এত গেল যে তাহার আদম-সুমারি করিতে হইলে কেরানি রাখিতে হয়। তাহাদিগকে বিদায় করিতে অপর পক্ষকে যে নাকাল হইতে হইবে, সেই কথা স্মরণ করিয়া মামার সঙ্গে মা একযোগে বিস্তর হাসিলেন।

ব্যাণ্ড, বাঁশি, শখের কন্সর্ট প্রভৃতি যেখানে যত প্রকার উচ্চ শব্দ আছে সমস্ত এক-সঙ্গে মিশাইয়া বর্বর কোলাহলের মত্তহস্তী দ্বারা সংগীত-সরস্বতীর পদ্মবন দলিত বিদলিত করিয়া, আমি তো বিবাহ-বাড়িতে গিয়া উঠিলাম। আংটিতে হারেতে জরি-জহরাতে আমার শরীর যেন গহনার দোকান নিলামে চড়িয়াছে বলিয়া বোধ হইল। তাঁহাদের ভাবী জামাইয়ের মূল্য কত সেটা যেন কতক পরিমাণে সর্বাঙ্গে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া, ভাবী শ্বশুরের সঙ্গে মোকাবিলা করিতে চলিয়াছিলাম।

মামা বিবাহ-বাড়িতে ঢুকিয়া খুশি হইলেন না। একে তো উঠানটাতে বরযাত্রীদের জায়গা সংকুলান হওয়াই শক্ত, তাহার পরে সমস্ত আয়োজন নিতান্ত মধ্যম রকমের।

ইহার পরে শম্ভুনাথবাবুর ব্যবহারটাও নেহাত ঠাণ্ডা। তাঁর বিনয়টা অজস্র নয়। মুখে তো কথাই নাই। কোমরে চাদর বাঁধা, গলাভাঙা, টাকপড়া, মিস্‌ কালো এবং বিপুল শরীর তাঁর একটি উকিল বন্ধু যদি নিয়ত হাত জোড় করিয়া, মাথা হেলাইয়া, নম্রতার স্মিতহাস্যে ও গদ্‌গদ বচনে কন্সর্ট পার্টির করতাল-বাজিয়ে হইতে শুরু করিয়া বরকর্তাদের প্রত্যেককে বার বার প্রচুররূপে অভিষিক্ত করিয়া না দিতেন তবে গোড়াতেই একটা এস্‌পার-ওস্‌পার হইত।

আমি সভায় বসিবার কিছুক্ষণ পরেই মামা শম্ভুনাথবাবুকে পাশের ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। কী কথা হইল জানি না, কিছুক্ষণ পরেই শম্ভুনাথবাবু আমাকে আসিয়া বলিলেন, "বাবাজি, একবার এই দিকে আসতে হচ্ছে।"

ব্যাপারখানা এই।— সকলের না হউক, কিন্তু কোনো কোনো মানুষের জীবনের একটা-কিছু লক্ষ্য থাকে। মামার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, তিনি কোনোমতেই কারও কাছে ঠকিবেন না। তাঁর ভয়, তাঁর বেহাই তাঁকে গহনায় ফাঁকি দিতে পারেন— বিবাহকার্য শেষ হইয়া গেলে সে ফাঁকির আর প্রতিকার চলিবে না। বাড়িভাড়া, সওগাদ, লোকবিদায় প্রভৃতি সম্বন্ধে যেরকম টানাটানির পরিচয় পাওয়া গেছে তাহাতে মামা ঠিক করিয়াছিলেন, দেওয়া-থোওয়া সম্বন্ধে এ লোকটির শুধু মুখের কথার উপর ভর করা চলিবে না। সেইজন্য বাড়ির স্যাক্‌রাকে সুদ্ধ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। পাশের ঘরে গিয়া দেখিলাম, মামা এক তক্তপোষে এবং স্যাক্‌রা তাহার দাঁড়িপাল্লা কষ্টিপাথর প্রভৃতি লইয়া মেজেয় বসিয়া আছে।

শম্ভুনাথবাবু আমাকে বলিলেন, "তোমার মামা বলিতেছেন, বিবাহের কাজ শুরু হইবার আগেই তিনি কনের সমস্ত গহনা যাচাই করিয়া দেখিবেন, ইহাতে তুমি কী বল।"

আমি মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

মামা বলিলেন, "ও আবার কী বলিবে। আমি যা বলিব তাই হইবে।"

শম্ভুনাথবাবু আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "সেই কথা তবে ঠিক? উনি যা বলিবেন তাই হইবে? এ সম্বন্ধে তোমার কিছুই বলিবার নাই?"

আমি একটু ঘাড়-নাড়ায় ইঙ্গিতে জানাইলাম, এ-সব কথায় আমার সম্পূর্ণ অনধিকার।

"আচ্ছা তবে বোসো, মেয়ের গা হইতে সমস্ত গহনা খুলিয়া আনিতেছি।" এই বলিয়া তিনি উঠিলেন।

মামা বলিলেন, "অনুপম এখানে কী করিবে। ও সভায় গিয়া বসুক।"

শম্ভুনাথ বলিলেন, "না, সভায় নয়, এখানেই বসিতে হইবে।"

কিছুক্ষণ পরে তিনি একখানা গামছায় বাঁধা গহনা আনিয়া তক্তপোষের উপর মেলিয়া ধরিলেন। সমস্তই তাঁহার পিতামহীদের আমলের গহনা— হাল ফেশানের সূক্ষ্ম কাজ নয়— যেমন মোটা, তেমনি ভারি।

স্যাক্‌রা গহনা হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল, "এ আর দেখিব কী। ইহাতে খাদ নাই— এমন সোনা এখনকার দিনে ব্যবহারই হয় না।"

এই বলিয়া সে মকরমুখা মোটা একখানা বালায় একটু চাপ দিয়া দেখাইল, তাহা বাঁকিয়া যায়।

মামা তখনি তাঁর নোটবইয়ে গহনাগুলির ফর্দ টুকিয়া লইলেন, পাছে যাহা দেখানো হইল তাহার কোনোটা কম পড়ে। হিসাব করিয়া দেখিলেন, গহনা যে-পরিমাণ দিবার কথা এগুলি সংখ্যায় দরে এবং ভারে তার অনেক বেশি।

গহনাগুলির মধ্যে একজোড়া এয়ারিং ছিল। শম্ভুনাথ সেইটে স্যাক্‌রার হাতে দিয়া বলিলেন, "এইটে একবার পরখ করিয়া দেখো।"

স্যাক্‌রা কহিল, "ইহা বিলাতি মাল, ইহাতে সোনার ভাগ সামান্যই আছে।"

শম্ভুবাবু এয়ারিংজোড়া মামার হাতে দিয়া বলিলেন, "এটা আপনারাই রাখিয়া দিন।"

মামা সেটা হাতে লইয়া দেখিলেন, এই এয়ারিং দিয়াই কন্যাকে তাঁহারা আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।

মামার মুখ লাল হইয়া উঠিল। দরিদ্র তাঁহাকে ঠকাইতে চাহিবে কিন্তু তিনি ঠকিবেন না, এই আনন্দ-সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত হইলেন এবং তাহার উপরেও কিছু উপরি-পাওনা জুটিল। অত্যন্ত মুখ ভার করিয়া বলিলেন, "অনুপম, যাও তুমি সভায় গিয়া বোসো গে।"

শম্ভুনাথবাবু বলিলেন, "না, এখন সভায় বসিতে হইবে না। চলুন, আগে আপনাদের খাওয়াইয়া দিই।"

মামা বলিলেন, "সে কী কথা। লগ্ন—"

শম্ভুনাথবাবু বলিলেন, "সেজন্য কিছু ভাবিবেন না— এখন উঠুন।"

লোকটি নেহাত ভালোমানুষ ধরণের কিন্তু ভিতরে বেশ একটু জোর আছে বলিয়া বোধ হইল। মামাকে উঠিতে হইল। বরযাত্রদেরও আহার হইয়া গেল। আয়োজনের আড়ম্বর ছিল না। কিন্তু, রান্না ভালো এবং সমস্ত বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলিয়া সকলেরই তৃপ্তি হইল।

বরযাত্রদের খাওয়া শেষ হইলে শম্ভুনাথবাবু আমাকে খাইতে বলিলেন। মামা বলিলেন, "সে কী কথা। বিবাহের পূর্বে বর খাইবে কেমন করিয়া।"

এ সম্বন্ধে মামার কোনো মতপ্রকাশকে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি কী বল। বসিয়া খাইতে দোষ কিছু আছে?"

মূর্তিমতী মাতৃ-আজ্ঞা-স্বরূপে মামা উপস্থিত, তাঁর বিরুদ্ধে চলা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি আহারে বসিতে পারিলাম না।

তখন শম্ভুনাথবাবু মামাকে বলিলেন, "আপনাদিগকে অনেক কষ্ট দিয়াছি। আমরা ধনী নই, আপনাদের যোগ্য আয়োজন করিতে পারি নাই, ক্ষমা করিবেন। রাত হইয়া গেছে, আর আপনাদের কষ্ট বাড়াইতে ইচ্ছা করি না। এখন তবে—"

মামা বলিলেন, "তা, সভায় চলুন, আমরা তো প্রস্তুত আছি।"

শম্ভুনাথ বলিলেন, "তবে আপনাদের গাড়ি বলিয়া দিই?"

মামা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "ঠাট্টা করিতেছেন নাকি?"

শম্ভুনাথ কহিলেন, "ঠাট্টা তো আপনিই করিয়া সারিয়াছেন। ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই।"

মামা দুইচোখ এতবড়ো করিয়া মেলিয়া অবাক হইয়া রহিলেন।

শম্ভুনাথ কহিলেন, "আমার কন্যার গহনা আমি চুরি করিব, এ কথা যারা মনে করে তাদের হাতে আমি কন্যা দিতে পারি না।"

আমাকে একটি কথা বলাও তিনি আবশ্যক বোধ করিলেন না। কারণ, প্রমাণ হইয়া গেছে, আমি কেহই নই।

তার পরে যা হইল সে আমি বলিতে ইচ্ছা করি না। ঝাড়লণ্ঠন ভাঙিয়া-চুরিয়া, জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড করিয়া, বরযাত্রের দল দক্ষযজ্ঞের পালা সারিয়া বাহির হইয়া গেল।

বাড়ি ফিরিবার সময় ব্যাণ্ড রসনচৌকি ও কন্সর্ট একসঙ্গে বাজিল না এবং অভ্রের ঝাড়গুলো আকাশের তারার উপর আপনাদের কর্তব্যের বরাত দিয়া কোথায় যে মহা-নির্বাণ লাভ করিল সন্ধান পাওয়া গেল না।

৩

বাড়ির সকলে তো রাগিয়া আগুন। কন্যার পিতার এত গুমর! কলি যে চারপোয়া হইয়া আসিল! সকলে বলিল, 'দেখি, মেয়ের বিয়ে দেন কেমন করিয়া।' কিন্তু মেয়ের বিয়ে হইবে না, এ ভয় যার মনে নাই তার শাস্তির উপায় কী।

সমস্ত বাংলাদেশের মধ্যে আমিই একমাত্র পুরুষ যাহাকে কন্যার বাপ বিবাহের

আসর হইতে নিজে ফিরাইয়া দিয়াছে। এতবড়ো সৎপাত্রের কপালে এতবড়ো কলঙ্কের দাগ কোন্ নষ্টগ্রহ এত আলো জ্বালাইয়া, বাজনা বাজাইয়া, সমারোহ করিয়া, আঁকিয়া দিল? বরযাত্ররা এই বলিয়া কপাল চাপড়াইতে লাগিল যে, 'বিবাহ হইল না অথচ আমাদের ফাঁকি দিয়া খাওয়াইয়া দিল— পাকযন্ত্রটাকে সমস্ত অন্নসুদ্ধ সেখানে টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া আসিতে পারিলে তবে আফ্‌সোশ মিটিত।'

'বিবাহের চুক্তিভঙ্গ ও মানহানির দাবিতে নালিশ করিব' বলিয়া মামা অত্যন্ত গোল করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। হিতৈষীরা বুঝাইয়া দিল, তাহা হইলে তামাসার যেটুকু বাকি আছে তাহা পুরা হইবে।

বলা বাহুল্য, আমিও খুব রাগিয়াছিলাম। কোনো গতিকে শম্ভুনাথ বিষম জব্দ হইয়া আমাদের পায়ে ধরিয়া আসিয়া পড়েন, গোঁফের রেখায় তা দিতে দিতে এইটেই কেবল কামনা করিতে লাগিলাম।

কিন্তু, এই আক্রোশের কালো রঙের স্রোতের পাশাপাশি আর-একটা স্রোত বহিতেছিল যেটার রঙ একেবারেই কালো নয়। সমস্ত মন যে সেই অপরিচিতার পানে ছুটিয়া গিয়াছিল— এখনো যে তাহাকে কিছুতেই টানিয়া ফিরাইতে পারি না। দেয়ালটুকুর আড়ালে রহিয়া গেল গো। কপালে তার চন্দন আঁকা, গায়ে তার লাল শাড়ি, মুখে তার লজ্জার রক্তিমা, হৃদয়ের ভিতরে কী যে তা কেমন করিয়া বলিব। আমার কল্পলোকের কল্পলতাটি বসন্তের সমস্ত ফুলের ভার আমাকে নিবেদন করিয়া দিবার জন্য নত হইয়া পড়িয়াছিল। হাওয়া আসে, গন্ধ পাই, পাতার শব্দ শুনি— কেবল আর একটিমাত্র পা-ফেলার অপেক্ষা— এমন সময়ে সেই এক পদক্ষেপের দূরত্বটুকু এক মুহূর্তে অসীম হইয়া উঠিল!

এতদিন যে প্রতি সন্ধ্যায় আমি বিনুদার বাড়িতে গিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিলাম। বিনুদার বর্ণনার ভাষা অত্যন্ত সংকীর্ণ বলিয়াই তাঁর প্রত্যেক কথাটি স্ফুলিঙ্গের মতো আমার মনের মাঝখানে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছিল। বুঝিয়াছিলাম, মেয়েটির রূপ বড়ো আশ্চর্য, কিন্তু না দেখিলাম তাহাকে চোখে, না দেখিলাম তার ছবি; সমস্তই অস্পষ্ট হইয়া রহিল; বাহিরে তো সে ধরা দিলই না, তাহাকে মনেও আনিতে পারিলাম না— এইজন্য মন সেদিনকার সেই বিবাহসভার দেয়ালটার বাহিরে ভূতের মতো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

হরিশের কাছে শুনিয়াছি, মেয়েটিকে আমার ফোটোগ্রাফ দেখানো হইয়াছিল। পছন্দ করিয়াছে বই-কি। না করিবার তো কোনো কারণ নাই। আমার মন বলে, সে ছবি তার কোনো-একটি বাক্সের মধ্যে লুকানো আছে। একলা ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া এক-

একদিন নিরালা দুপুরবেলায় সে কি সেটি খুলিয়া দেখে না। যখন ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখে তখন ছবিটির উপরে কি তার মুখের দুই ধার দিয়া এলোচুল আসিয়া পড়ে না। হঠাৎ বাহিরে কারও পায়ের শব্দ পাইলে সে কি তাড়াতাড়ি তার সুগন্ধ আঁচলের মধ্যে ছবিটিকে লুকাইয়া ফেলে না।

দিন যায়। একটা বৎসর গেল। মামা তো লজ্জায় বিবাহসম্বন্ধের কথা তুলিতেই পারেন না। মার ইচ্ছা ছিল, আমার অপমানের কথা যখন সমাজের লোকে ভুলিয়া যাইবে তখন বিবাহের চেষ্টা দেখিবেন।

এদিকে আমি শুনিলাম, সে মেয়ের নাকি ভালো পাত্র জুটিয়াছিল কিন্তু সে পণ করিয়াছে, বিবাহ করিবে না। শুনিয়া আমার মন পুলকের আবেশে ভরিয়া গেল। আমি কল্পনায় দেখিতে লাগিলাম, সে ভালো করিয়া খায় না; সন্ধ্যা হইয়া আসে, সে চুল বাঁধিতে ভুলিয়া যায়। তার বাপ তার মুখের পানে চান আর ভাবেন, 'আমার মেয়ে দিনে দিনে এমন হইয়া যাইতেছে কেন।' হঠাৎ কোনোদিন তার ঘরে আসিয়া দেখেন, মেয়ের দুই চক্ষু জলে ভরা। জিজ্ঞাসা করেন, 'মা, তোর কী হইয়াছে বল্ আমাকে।' মেয়ে তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া বলে, 'কই, কিছুই তো হয় নি, বাবা।' বাপের এক মেয়ে যে— বড়ো আদরের মেয়ে। যখন অনাবৃষ্টির দিনের ফুলের কুঁড়িটির মতো মেয়ে একেবারে বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছে তখন বাপের প্রাণে আর সহিল না। তখন অভিমান ভাসাইয়া দিয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন আমাদের দ্বারে। তার পরে? তার পরে মনের মধ্যে সেই যে কালো রঙের ধারাটা বহিতেছে সে যেন কালো সাপের মতো রূপ ধরিয়া ফোঁস করিয়া উঠিল। সে বলিল, 'বেশ তো, আর-একবার বিবাহের আসর সাজানো হোক, আলো জ্বলুক, দেশ-বিদেশের লোকের নিমন্ত্রণ হোক, তার পরে তুমি বরের টোপর পায়ে দলিয়া দলবল লইয়া সভা ছাড়িয়া চলিয়া এসো।' কিন্তু, যে ধারাটি চোখের জলের মতো শুভ্র সে রাজহংসের রূপ ধরিয়া বলিল, 'যেমন করিয়া আমি একদিন দময়ন্তীর পুষ্পবনে গিয়াছিলাম তেমনি করিয়া আমাকে একবার উড়িয়া যাইতে দাও— আমি বিরহিণীর কানে কানে একবার সুখের খবরটা দিয়া আসি গে।' তার পরে? তার পরে দুঃখের রাত পোহাইল, নববর্ষার জল পড়িল, ম্লান ফুলটি মুখ তুলিল— এবারে সেই দেয়ালটার বাহিরে রহিল সমস্ত পৃথিবীর আর-সবাই, আর ভিতরে প্রবেশ করিল একটি-মাত্র মানুষ। তার পরে? তার পরে আমার কথাটি ফুরালো।

৪

কিন্তু, কথা এমন করিয়া ফুরাইল না। যেখানে আসিয়া তাহা অফুরান হইয়াছে সেখানকার বিবরণ একটুখানি বলিয়া আমার এ লেখা শেষ করিয়া দিই।

মাকে লইয়া তীর্থে চলিয়াছিলাম। আমার উপরেই ভার ছিল। কারণ, মামা এবারেও হাবড়ার পুল পার হন নাই। রেলগাড়িতে ঘুমাইতেছিলাম। ঝাঁকানি খাইতে খাইতে মাথার মধ্যে নানাপ্রকার এলোমেলো স্বপ্নের ঝুমঝুমি বাজিতেছিল। হঠাৎ একটা কোন্ স্টেশনে জাগিয়া উঠিলাম। আলোতে অন্ধকারে মেশা সেও এক স্বপ্ন; কেবল আকাশের তারাগুলি চিরপরিচিত— আর সবই অজানা অস্পষ্ট; স্টেশনের দীপ-কয়টা খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আলো ধরিয়া এই পৃথিবীটা যে কত অচেনা, এবং যাহা চারি দিকে তাহা যে কতই বহুদূরে, তাহাই দেখাইয়া দিতেছে। গাড়ির মধ্যে মা ঘুমাইতেছেন; আলোর নিচে সবুজ পর্দা টানা; তোরঙ্গ বাক্স জিনিসপত্র সমস্তই কে কার ঘাড়ে এলোমেলো হইয়া রহিয়াছে, তাহারা যেন স্বপ্নলোকের উলট-পালট আসবাব, সবুজ প্রদোষের মিট্‌মিটে আলোতে থাকা এবং না-থাকার মাঝখানে কেমন-একরকম হইয়া পড়িয়া আছে।

এমন সময়ে সেই অদ্ভুত পৃথিবীর অদ্ভুত রাত্রে কে বলিয়া উঠিল, "শিগ্‌গির চলে আয়, এই গাড়িতে জায়গা আছে।"

মনে হইল, যেন গান শুনিলাম। বাঙালি মেয়ের গলায় বাংলা কথা যে কী মধুর তাহা এমনি করিয়া অসময়ে অজায়গায় আচম্‌কা শুনিলে তবে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু, এই গলাটিকে কেবলমাত্র মেয়ের গলা বলিয়া একটা শ্রেণীভুক্ত করিয়া দেওয়া চলে না, এ কেবল একটি-মানুষের গলা; শুনিলেই মন বলিয়া ওঠে, 'এমন তো আর শুনি নাই।'

চিরকাল গলার স্বর আমার কাছে বড়ো সত্য। রূপ জিনিসটি বড়ো কম নয় কিন্তু মানুষের মধ্যে যাহা অন্তরতম এবং অনির্বচনীয়, আমার মনে হয়, কণ্ঠস্বর যেন তারই চেহারা। আমি তাড়াতাড়ি গাড়ির জানলা খুলিয়া বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দিলাম; কিছুই দেখিলাম না। প্ল্যাট্‌ফর্মের অন্ধকারে দাঁড়াইয়া গার্ড তাহার একচক্ষু লণ্ঠন নাড়িয়া দিল, গাড়ি চলিল; আমি জানলার কাছে বসিয়া রহিলাম। আমার চোখের সামনে কোনো মূর্তি ছিল না, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমি একটি হৃদয়ের রূপ দেখিতে লাগিলাম। সে যেন এই তারাময়ী রাত্রির মতো, আবৃত করিয়া ধরে কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারা যায় না। ওগো স্বর, অচেনা কণ্ঠের স্বর, এক নিমেষে তুমি যে আমার চিরপরিচয়ের আসনটির উপরে আসিয়া বসিয়াছ। কী আশ্চর্য পরিপূর্ণ

তুমি— চঞ্চল কালের ক্ষুব্ধ হৃদয়ের উপরে ফুলটির মতো ফুটিয়াছ অথচ তার ঢেউ লাগিয়া একটি পাপড়িও টলে নাই, অপরিমেয় কোমলতায় এতটুকু দাগ পড়ে নাই।

গাড়ি লোহার মৃদঙ্গে তাল দিতে দিতে চলিল; আমি মনের মধ্যে গান শুনিতে শুনিতে চলিলাম। তাহার একটিমাত্র ধুয়া— 'গাড়িতে জায়গা আছে।' আছে কি, জায়গা আছে কি। জায়গা যে পাওয়া যায় না, কেউ যে কাকেও চেনে না। অথচ সেই না-চেনাটুকু যে কুয়াশামাত্র, সে যে মায়া, সেটা ছিন্ন হইলেই যে চেনার আর অন্ত নাই। ওগো সুধাময় সুর, যে হৃদয়ের অপরূপ রূপ তুমি সে কি আমার চিরকালের চেনা নয়। জায়গা আছে, আছে— শীঘ্র আসিতে ডাকিয়াছ, শীঘ্রই আসিয়াছি, এক নিমেষও দেরি করি নাই।

রাত্রে ভালো করিয়া ঘুম হইল না। প্রায় প্রতি স্টেশনেই একবার করিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, ভয় হইতে লাগিল, যাহাকে দেখা হইল না সে পাছে রাত্রেই নামিয়া যায়।

পরদিন সকালে একটা বড়ো স্টেশনে গাড়ি বদল করিতে হইবে। আমাদের ফার্স্ট্ক্লাসের টিকিট— মনে আশা ছিল, ভিড় হইবে না। নামিয়া দেখি, প্ল্যাট্ফর্মে সাহেবদের আর্দালি-দল আসবাবপত্র লইয়া গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কোন্-এক ফৌজের বড়ো জেনারেল-সাহেব ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। দুই-তিন মিনিট পরেই গাড়ি আসিল। বুঝিলাম, ফার্স্ট্ক্লাসের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। মাকে লইয়া কোন্ গাড়িতে উঠি সে এক বিষম ভাবনায় পড়িলাম। সব গাড়িতেই ভিড়। দ্বারে দ্বারে উঁকি মারিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এমনসময় সেকেণ্ড-ক্লাসের গাড়ি হইতে একটি মেয়ে আমার মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনারা আমাদের গাড়িতে আসুন-না— এখানে জায়গা আছে।"

আমি তো চমকিয়া উঠিলাম। সেই আশ্চর্যমধুর কণ্ঠ এবং সেই গানেরই ধুয়া— 'জায়গা আছে।' ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া মাকে লইয়া গাড়িতে উঠিয়া পড়িলাম। জিনিসপত্র তুলিবার প্রায় সময় ছিল না। আমার মতো অক্ষম দুনিয়ায় নাই। সেই মেয়েটিই কুলিদের হাত হইতে তাড়াতাড়ি চল্তি গাড়িতে আমাদের বিছানাপত্র টানিয়া লইল। আমার একটা ফোটোগ্রাফ তুলিবার ক্যামেরা স্টেশনেই পড়িয়া রহিল— গ্রাহ্যই করিলাম না।

তার পরে— কী লিখিব জানি না। আমার মনের মধ্যে একটি অখণ্ড আনন্দের ছবি আছে, তাহাকে কোথায় শুরু করিব, কোথায় শেষ করিব? বসিয়া বসিয়া বাক্যের পর বাক্য যোজনা করিতে ইচ্ছা করে না।

এবার সেই সুরটিকে চোখে দেখিলাম। তখনো তাহাকে সুর বলিয়াই মনে হইল। মায়ের মুখের দিকে চাহিলাম; দেখিলাম, তাঁর চোখে পলক পড়িতেছে না। মেয়েটির বয়স ষোলো কি সতেরো হইবে, কিন্তু নবযৌবন ইহার দেহে মনে কোথাও যেন একটুও ভার চাপাইয়া দেয় নাই। ইহার গতি সহজ, দীপ্তি নির্মল, সৌন্দর্যের শুচিতা অপূর্ব, ইহার কোনো জায়গায় কিছু জড়িমা নাই।

আমি দেখিতেছি, বিস্তারিত করিয়া কিছু বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। এমন-কি, সে যে কী রঙের কাপড় কেমন করিয়া পরিয়াছিল তাহাও ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না। এটা খুব সত্য যে, তার বেশে ভূষায় এমন কিছুই ছিল না যেটা তাহাকে ছাড়াইয়া বিশেষ করিয়া চোখে পড়িতে পারে। সে নিজের চারি দিকের সকলের চেয়ে অধিক— রজনীগন্ধার শুভ্র মঞ্জরীর মতো সরল বৃন্তটির উপরে দাঁড়াইয়া, যে গাছে ফুটিয়াছে সে গাছকে সে একেবারে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে দুটি-তিনটি ছোটো ছোটো মেয়ে ছিল, তাহাদিগকে লইয়া তাহার হাসি এবং কথার আর অন্ত ছিল না। আমি হাতে একখানা বই লইয়া সেদিকে কান পাতিয়া রাখিয়াছিলাম। যেটুকু কানে আসিতেছিল সে তো সমস্তই ছেলেমানুষদের সঙ্গে ছেলেমানুষি কথা। তাহার বিশেষত্ব এই যে, তাহার মধ্যে বয়সের তফাত কিছুমাত্র ছিল না— ছোটোদের সঙ্গে সে অনায়াসে এবং আনন্দে ছোটো হইয়া গিয়াছিল। সঙ্গে কতকগুলি ছবিওয়ালা ছেলেদের গল্পের বই— তাহারই কোন্ একটা বিশেষ গল্প শোনাইবার জন্য মেয়েরা তাহাকে ধরিয়া পড়িল। এ গল্প নিশ্চয় তারা বিশ-পঁচিশ বার শুনিয়াছে। মেয়েদের কেন যে এত আগ্রহ তাহা বুঝিলাম। সেই সুধাকণ্ঠের সোনার কাঠিতে সকল কথা যে সোনা হইয়া ওঠে। মেয়েটির সমস্ত শরীর মন যে একেবারে প্রাণে ভরা, তার সমস্ত চলায় বলায় স্পর্শে প্রাণ ঠিকরিয়া ওঠে। তাই মেয়েরা যখন তার মুখে গল্প শোনে তখন, গল্প নয়, তাহাকেই শোনে; তাহাদের হৃদয়ের উপর প্রাণের ঝরনা ঝরিয়া পড়ে। তার সেই উদ্ভাসিত প্রাণ আমার সেদিনকার সমস্ত সূর্যকিরণকে সজীব করিয়া তুলিল; আমার মনে হইল, আমাকে যে-প্রকৃতি তাহার আকাশ দিয়া বেষ্টন করিয়াছে সে ঐ তরুণীরই অক্লান্ত অম্লান প্রাণের বিশ্বব্যাপী বিস্তার।— পরের স্টেশনে পৌঁছিতেই খাবারওয়ালাকে ডাকিয়া সে খুব খানিকটা চানা-মুঠ কিনিয়া লইল, এবং মেয়েদের সঙ্গে মিলিয়া নিতান্ত ছেলেমানুষের মতো করিয়া কলহাস্য করিতে করিতে অসংকোচে খাইতে লাগিল। আমার প্রকৃতি যে জাল দিয়া বেড়া— আমি কেন বেশ সহজে হাসিমুখে মেয়েটির কাছে এই চানা একমুঠা চাহিয়া লইতে পারিলাম না। হাত বাড়াইয়া দিয়া কেন আমার লোভ স্বীকার করিলাম না।

মা ভালো-লাগা এবং মন্দ-লাগার মধ্যে দোমনা হইয়া ছিলেন। গাড়িতে আমি পুরুষ মানুষ, তবু ইহার কিছুমাত্র সংকোচ নাই, বিশেষত এমন লোভীর মতো খাইতেছে, সেটা ঠিক তাঁর পছন্দ হইতেছিল না; অথচ ইহাকে বেহায়া বলিয়াও তাঁর ভ্রম হয় নাই। তাঁর মনে হইল, এ মেয়ের বয়স হইয়াছে কিন্তু শিক্ষা হয় নাই। মা হঠাৎ কারও সঙ্গে আলাপ করিতে পারেন না। মানুষের সঙ্গে দূরে দূরে থাকাই তাঁর অভ্যাস। এই মেয়েটির পরিচয় লইতে তাঁর খুব ইচ্ছা, কিন্তু স্বাভাবিক বাধা কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না।

এমন সময়ে গাড়ি একটা বড়ো স্টেশনে আসিয়া থামিল। সেই জেনারেল-সাহেবের একদল অনুসঙ্গী এই স্টেশন হইতে উঠিবার উদ্যোগ করিতেছে। গাড়িতে কোথাও জায়গা নাই। বারবার আমাদের গাড়ির সামনে দিয়া তারা ঘুরিয়া গেল। মা তো ভয়ে আড়ষ্ট, আমিও মনের মধ্যে শান্তি পাইতেছিলাম না।

গাড়ি ছাড়িবার অল্পকাল পূর্বে একজন দেশী রেলোয়ে কর্মচারী, নাম-লেখা দুইখানা টিকিট গাড়ির দুই বেঞ্চের শিয়রের কাছে লট্‌কাইয়া দিয়া আমাকে বলিল, "এ গাড়ির এই দুই বেঞ্চ আগে হইতেই দুই সাহেব রিজার্ভ করিয়াছেন, আপনাদিগকে অন্য গাড়িতে যাইতে হইবে।"

আমি তো তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলাম। মেয়েটি হিন্দিতে বলিল, "না, আমরা গাড়ি ছাড়িব না।"

সে লোকটি রোখ করিয়া বলিল, "না ছাড়িয়া উপায় নাই।"

কিন্তু মেয়েটির চলিষ্ণুতার কোনো লক্ষণ না দেখিয়া সে নামিয়া গিয়া ইংরেজ স্টেশন-মাস্টারকে ডাকিয়া আনিল। সে আসিয়া আমাকে বলিল, "আমি দুঃখিত, কিন্তু—"

শুনিয়া আমি 'কুলি কুলি' করিয়া ডাক ছাড়িতে লাগিলাম। মেয়েটি উঠিয়া দুই চক্ষে অগ্নিবর্ষণ করিয়া বলিল, "না, আপনি যাইতে পারিবেন না, যেমন আছেন বসিয়া থাকুন।"

বলিয়া সে দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া স্টেশন-মাস্টারকে ইংরেজি ভাষায় বলিল, "এ গাড়ি আগে হইতে রিজার্ভ করা, এ কথা মিথ্যাকথা।"

বলিয়া নাম-লেখা টিকিট খুলিয়া প্ল্যাট্‌ফর্মে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

ইতিমধ্যে আর্দালি-সমেত ইউনিফর্ম-পরা সাহেব দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গাড়িতে সে তার আসবাব উঠাইবার জন্য আর্দালিকে প্রথমে ইশারা করিয়াছিল। তাহার পরে মেয়েটির মুখে তাকাইয়া, তার কথা শুনিয়া, ভাব দেখিয়া স্টেশন-মাস্টারকে একটু স্পর্শ করিল এবং তাহাকে আড়ালে লইয়া গিয়া কী কথা হইল জানি না। দেখা

গেল, গাড়ি ছাড়িবার সময় অতীত হইলেও আর-একটা গাড়ি জুড়িয়া তবে ট্রেন ছাড়িল। মেয়েটি তার দলবল লইয়া আবার একপত্তন চানা-মুঠ খাইতে শুরু করিল, আর আমি লজ্জায় জানলার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া প্রকৃতির শোভা দেখিতে লাগিলাম।

কানপুরে গাড়ি আসিয়া থামিল। মেয়েটি জিনিসপত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত— স্টেশনে একটি হিন্দুস্থানি চাকর ছুটিয়া আসিয়া ইহাদিগকে নামাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

মা তখন আর থাকিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কী, মা।"

মেয়েটি বলিল, "আমার নাম কল্যাণী।"

শুনিয়া মা এবং আমি দুইজনেই চমকিয়া উঠিলাম।

"তোমার বাবা—"

"তিনি এখানকার ডাক্তার, তাঁর নাম শম্ভুনাথ সেন।"

তার পরেই সবাই নামিয়া গেল।

উপসংহার

মামার নিষেধ অমান্য করিয়া, মাতৃ-আজ্ঞা ঠেলিয়া, তার পরে আমি কানপুরে আসিয়াছি। কল্যাণীর বাপ এবং কল্যাণীর সঙ্গে দেখা হইয়াছে। হাত জোড় করিয়াছি, মাথা হেঁট করিয়াছি; শম্ভুনাথবাবুর হৃদয় গলিয়াছে। কল্যাণী বলে, "আমি বিবাহ করিব না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন।"

সে বলিল, "মাতৃ-আজ্ঞা।"

কী সর্বনাশ! এ পক্ষেও মাতুল আছে নাকি।

তার পরে বুঝিলাম, মাতৃভূমি আছে। সেই বিবাহ-ভাঙার পর হইতে কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে।

কিন্তু, আমি আশা ছাড়িতে পারিলাম না। সেই সুরটি যে আমার হৃদয়ের মধ্যে আজও বাজিতেছে— সে যেন কোন্ ওপারের বাঁশি— আমার সংসারের বাহির হইতে আসিল— সমস্ত সংসারের বাহিরে ডাক দিল। আর, সেই যে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে আমার কানে আসিয়াছিল 'জায়গা আছে', সে যে আমার চিরজীবনের গানের ধুয়া হইয়া রহিল। তখন আমার বয়স ছিল তেইশ, এখন হইয়াছে সাতাশ। এখনো আশা ছাড়ি নাই, কিন্তু মাতুলকে ছাড়িয়াছি। নিতান্ত এক ছেলে বলিয়া মা আমাকে ছাড়িতে পারেন নাই।

তোমরা মনে করিতেছ, আমি বিবাহের আশা করি? না, কোনোকালেই না। আমার মনে আছে, কেবল সেই একরাত্রির অজানা কণ্ঠের মধুর সুরের আশা— জায়গা আছে। নিশ্চয়ই আছে। নইলে দাঁড়াব কোথায়? তাই বৎসরের পর বৎসর যায়— আমি এইখানেই আছি। দেখা হয়, সেই কণ্ঠ শুনি, যখন সুবিধা পাই কিছু তার কাজ করিয়া দিই— আর মন বলে, এই তো জায়গা পাইয়াছি। ওগো অপরিচিতা, তোমার পরিচয়ের শেষ হইল না, শেষ হইবে না; কিন্তু ভাগ্য আমার ভালো, এই তো আমি জায়গা পাইয়াছি।

কার্তিক, ১৩২১

তপস্বিনী

বৈশাখ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। প্রথমরাত্রে গুমট গেছে, বাঁশগাছের পাতাটা পর্যন্ত নড়ে না, আকাশের তারাগুলো যেন মাথা-ধরার বেদনার মতো দব্‌দব্‌ করিতেছে। রাত্রি তিনটের সময় ঝির্‌ঝির্‌ করিয়া একটুখানি বাতাস উঠিল। ষোড়শী শূন্য মেঝের উপর খোলা জানালার নিচে শুইয়া আছে, একটা কাপড়ে-মোড়া টিনের বাক্স তার মাথার বালিশ। বেশ বোঝা যায়, খুব উৎসাহের সঙ্গে সে কৃচ্ছ্রসাধন করিতেছে।

প্রতিদিন ভোর চারটের সময় উঠিয়া স্নান সারিয়া ষোড়শী ঠাকুরঘরে গিয়া বসে। আহ্নিক করিতে বেলা হইয়া যায়। তার পরে বিদ্যারত্নমশায় আসেন; সেই ঘরে বসিয়াই তাঁর কাছে সে গীতা পড়ে। সংস্কৃত সে কিছু কিছু শিখিয়াছে। শংকরের বেদান্তভাষ্য এবং পাতঞ্জলদর্শন মূল গ্রন্থ হইতে পড়িবে, এই তার পণ। বয়স তার তেইশ হইবে।

ঘরকন্নার কাজ হইতে ষোড়শী অনেকটা তফাত থাকে— সেটা যে কেন সম্ভব হইল তার কারণটা লইয়াই এই গল্প। নামের সঙ্গে মাখনবাবুর স্বভাবের কোনো সাদৃশ্য ছিল না। তাঁর মন গলানো বড়ো শক্ত ছিল। তিনি ঠিক করিয়াছিলেন, যতদিন তাঁর ছেলে বরদা অন্তত বি. এ. পাশ না করে ততদিন তাঁর বউমার কাছ হইতে সে দূরে থাকিবে। অথচ পড়াশুনাটা বরদার ঠিক ধাতে মেলে না, সে মানুষটি শৌখিন। জীবননিকুঞ্জের মধুসঞ্চয়ের সম্বন্ধে মৌমাছির সঙ্গে তার মেজাজটা মেলে, কিন্তু মৌচাকের পালায় যে পরিশ্রমের দরকার সেটা তার একেবারেই সয় না। বড়ো আশা করিয়াছিল, বিবাহের পর হইতে গোঁফে তা দিয়া সে বেশ একটু আরামে থাকিবে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে

সিগারেটগুলো সদরেই ফুঁকিবার সময় আসিবে। কিন্তু কপালক্রমে বিবাহের পরে তার মঙ্গলসাধনের ইচ্ছা তার বাপের মনে আরও বেশি প্রবল হইয়া উঠিল।

ইস্কুলের পণ্ডিতমশায় বরদার নাম দিয়াছিলেন, গোতমমুনি। বলা বাহুল্য, সেটা বরদার ব্রহ্মতেজ দেখিয়া নয়। কোনো প্রশ্নের সে জবাব দিত না বলিয়াই তাকে তিনি মুনি বলিতেন এবং যখন জবাব দিত তখন তার মধ্যে এমন কিছু গব্য পদার্থ পাওয়া যাইত যাতে পণ্ডিতমশায়ের মতে তার গোতম উপাধি সার্থক হইয়াছিল।

মাখন হেড মাস্টারের কাছে সন্ধান লইয়া জানিলেন, ইস্কুল এবং ঘরের শিক্ষক, এইরূপ বড়ো বড়ো দুই এঞ্জিন আগে পিছে জুড়িয়া দিলে তবে বরদার সদ্গতি হইতে পারে। অধম ছেলেদের যাঁরা পরীক্ষাসাগর তরাইয়া দিয়া থাকেন এমন-সব নামজাদা মাস্টার রাত্রি দশটা সাড়ে-দশটা পর্যন্ত বরদার সঙ্গে লাগিয়া রহিলেন। সত্যযুগে সিদ্ধি লাভের জন্য বড়ো বড়ো তপস্বী যে-তপস্যা করিয়াছে সে ছিল একলার তপস্যা, কিন্তু মাস্টারের সঙ্গে মিলিয়া বরদার এই-যে যৌথতপস্যা এ তার চেয়ে অনেক বেশি দুঃসহ। সে কালের তপস্যার প্রধান উত্তাপ ছিল অগ্নিকে লইয়া; এখনকার এই পরীক্ষা-তাপসের তাপের প্রধান কারণ অগ্নিশর্মারা; তারা বরদাকে বড়ো জ্বালাইল। তাই এত দুঃখের পর যখন সে পরীক্ষায় ফেল করিল তখন তার সান্ত্বনা হইল এই যে, সে যশস্বী মাস্টার-মশায়দের মথা হেঁট করিয়াছে। কিন্তু এমন অসামান্য নিষ্ফলতাতেও মাখনবাবু হাল ছাড়িলেন না। দ্বিতীয় বছরে আর এক দল মাষ্টার নিযুক্ত হইল, তাঁদের সঙ্গে রফা হইল এই যে, বেতন তো তাঁরা পাইবেনই, তার পরে বরদা যদি ফাস্ট ডিবিজনে পাশ করিতে পারে তবে তাঁদের বক্‌শিস্‌ মিলিবে। এবারেও বরদা যথাসময়ে ফেল করিত, কিন্তু এই আসন্ন দুর্ঘটনাকে একটু বৈচিত্র্য দ্বারা সরস করিবার অভিপ্রায়ে এক্‌জামিনের ঠিক আগের রাত্রে পাড়ার কবিরাজের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সে একটা কড়া রকমের জোলাপের বড়ি খাইল এবং ধন্বন্তরীর কৃপায় ফেল্‌ করিবার জন্য তাকে আর সেনেট-হল পর্যন্ত ছুটিতে হইল না, বাড়ি বসিয়াই সে কাজটা বেশ সুসম্পন্ন হইতে পারিল। রোগটা উচ্চ অঙ্গের সাময়িক পত্রের মতো এমনি ঠিক দিনে ঠিক সময়ে প্রকাশ হইল যে, মাখন নিশ্চয় বুঝিল, এ কাজটা বিনা সম্পাদকতায় ঘটিতেই পারে না। এ সম্বন্ধে কোনো আলোচনা না করিয়া তিনি বরদাকে বলিলেন যে, তৃতীয়বার পরীক্ষার জন্য তাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। অর্থাৎ, তার সশ্রম কারাদণ্ডের মেয়াদ আরও একটা বছর বাড়িয়া গেল।

অভিমানের মাথায় বরদা একদিন খুব ঘটা করিয়া ভাত খাইল না। তাহাতে ফল হইল এই, সন্ধ্যাবেলাকার খাবারটা তাকে আরও বেশি করিয়া খাইতে হইল। মাখনকে

সে বাঘের মতো ভয় করিত, তবু মরিয়া হইয়া তাঁকে গিয়া বলিল, "এখানে থাকলে আমার পড়াশুনো হবে না।"

মাখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় গেলে সেই অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হতে পারবে?"

সে বলিল "বিলাতে।"

মাখন তাকে সংক্ষেপে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, এ সম্বন্ধে তার যে গোলটুকু আছে সে ভূগোলে নয়, সে মগজে। স্বপক্ষের প্রমাণস্বরূপে বরদা বলিল, তারই একজন সতীর্থ এন্‌ট্রেন্স স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর শেষ বেঞ্চিটা হইতে একেবারে এক লাফে বিলাতের একটা বড়ো একজামিন মারিয়া আনিয়াছে। মাখন বলিলেন, বরদাকে বিলাতে পাঠাইতে তাঁর কোনো আপত্তি নাই কিন্তু তার আগে তার বি. এ. পাশ করা চাই।

এও তো বড়ো মুশকিল! বি. এ. পাশ না করিয়াও বরদা জন্মিয়াছে, বি. এ. পাশ না করিলেও সে মরিবে, অথচ জন্মমৃত্যুর মাঝখানটাতে কোথাকার এই বি. এ. পাশ বিন্ধ্য-পর্বতের মতো খাড়া হইয়া দাঁড়াইল; নড়িতে-চড়িতে সকল কথায় ঐখানটাতে গিয়াই ঠোকর খাইতে হইবে? কলিকালে অগস্ত্য মুনি করিতেছেন কী। তিনিও কি জটা মুড়াইয়া বি. এ. পাশে লাগিয়াছেন।

খুব একটা বড়ো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বরদা বলিল, 'বার বার তিনবার; এইবার কিন্তু শেষ।' আর-একবার পেন্সিলের দাগ-দেওয়া কী-বইগুলা তাকের উপর হইতে পাড়িয়া লইয়া বরদা কোমর বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইতেছে, এমনসময় একটা আঘাত পাইল, সেটা আর তার সহিল না। স্কুলে যাইবার সময় গাড়ির খোঁজ করিতে গিয়া সে খবর পাইল যে, স্কুলে যাইবার গাড়ি-ঘোড়াটা মাখন বেচিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বলেন, 'দুই বছর লোকসান গেল, কত আর এই খরচ টানি!' স্কুলে হাঁটিয়া যাওয়া বরদার পক্ষে কিছুই শক্ত নয়, কিন্তু লোকের কাছে এই অপমানের সে কী কৈফিয়ত দিবে।

অবশেষে অনেক চিন্তার পর একদিন ভোরবেলায় তার মাথায় আসিল, এ সংসারে মৃত্যু ছাড়া আর-একটা পথ খোলা আছে যেটা বি. এ. পাশের অধীন নয়, এবং যেটাতে দারা সুত ধন জন সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। সে আর কিছু নয়, সন্ন্যাসী হওয়া। এই চিন্তাটার উপর কিছুদিন ধরিয়া গোপনে সে বিস্তর সিগারেটের ধোঁয়া লাগাইল, তার পর একদিন দেখা গেল, স্কুলঘরের মেঝের উপর তার কী-বইয়ের ছেঁড়া টুকরোগুলো পরীক্ষা-দুর্গের ভগ্নাবশেষের মতো ছড়ানো পড়িয়া আছে— পরীক্ষার্থীর দেখা নাই। টেবিলের

উপর এক টুকরা কাগজ ভাঙা কাঁচের গেলাস দিয়া চাপা, তাহাতে লেখা—

"আমি সন্ন্যাসী— আমার আর গাড়ির দরকার হইবে না।

শ্রীযুক্ত বরদানন্দস্বামী।"

মাখনবাবু কিছুদিন কোনো খোঁজই করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, বরদাকে নিজের গরজেই ফিরিতে হইবে, খাঁচার দরজা খোলা রাখা ছাড়া আর-কোনো আয়োজনের দরকার নাই। দরজা খোলাই রহিল, কেবল সেই কী-বইগুলার ছেঁড়া টুকরা সাফ হইয়া গেছে— আর-সমস্তই ঠিক আছে। ঘরের কোণে সেই জলের কুঁজার উপরে কানা-ভাঙা গেলাসটা উপুড় করা, তেলের-দাগে-মলিন চৌকিটার আসনের জায়গার ছারপোকার উৎপাত ও জীর্ণতার ত্রুটি মোচনের জন্য একটা পুরাতন এট্‌লাসের মলাট পাতা ; এক ধারে একটা শূন্য প্যাক্‌বাক্সের উপর একটা টিনের তোরঙ্গে বরদার নাম আঁকা ; দেয়ালের গায়ে তাকের উপর একটা মলাট-ছেঁড়া ইংরেজি-বাংলা ডিক্সনারি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভারতবর্ষের ইতিহাসের কতকগুলা পাতা, এবং মলাটে রানী ভিক্টোরিয়ার মুখ-আঁকা অনেকগুলো এক্সেসাইজ বই। এই খাতা ঝাড়িয়া দেখিলে ইহার অধিকাংশ হইতে অগ্‌ডেন কোম্পানির সিগারেট-বাক্স-বাহিনী বিলাতি নটীদের মূর্তি ঝরিয়া পড়িবে। সন্ন্যাস-আশ্রয়ের সময় পথের সান্ত্বনার জন্য এগুলো যে বরদা সঙ্গে লয় নাই, তাহা হইতে বুঝা যাইবে, তার মন প্রকৃতিস্থ ছিল না।

আমাদের নায়কের তো এই দশা ; নায়িকা ষোড়শী তখন সবেমাত্র ত্রয়োদশী। বাড়িতে শেষ পর্যন্ত সবাই তাকে খুকি বলিয়া ডাকিত, শ্বশুরবাড়িতেও সে আপনার এই চিরশৈশবের খ্যাতি লইয়া আসিয়াছিল, এইজন্য তার সামনেই বরদার চরিত্র-সমালোচনায় বাড়ির দাসীগুলোর পর্যন্ত বাধিত না। শাশুড়ি ছিলেন চিররুগ্ণা— কর্তার কোনো বিধানের উপরে কোনো কথা বলিবার শক্তি তাঁর ছিল না, এমন-কি, মনে করিতেও তাঁর ভয় করিত। পিস্‌শাশুড়ির ভাষা ছিল খুব প্রখর ; বরদাকে লইয়া তিনি খুব শক্ত শক্ত কথা খুব চোখা চোখা করিয়া বলিতেন। তার বিশেষ একটু কারণ ছিল। পিতামহদের আমল হইতে কৌলীন্যের অপদেবতার কাছে বংশের মেয়েদের বলি দেওয়া, এ বাড়ির একটা প্রথা। এই পিসি যার ভাগে পড়িয়াছিলেন সে একটা প্রচণ্ড গাঁজাখোর। তার গুণের মধ্যে এই যে, সে বেশিদিন বাঁচে নাই। তাই আদর করিয়া ষোড়শীকে তিনি যখন মুক্তাহারের সঙ্গে তুলনা করিতেন তখন অন্তর্যামী বুঝিতেন, ব্যর্থ মুক্তাহারের জন্য যে-আক্ষেপ সে একা ষোড়শীকে লইয়া নয়।

এ ক্ষেত্রে মুক্তাহারের যে বেদনাবোধ আছে, সে-কথা সকলে ভুলিয়াছিল। পিসি

বলিতেন, 'দাদা কেন যে এত মাস্টার-পণ্ডিতের পিছনে খরচ করেন তা তো বুঝি নে। লিখে পড়ে দিতে পারি, বরদা কখনোই পাশ করতে পারবে না।' পারিবে না এ বিশ্বাস ষোড়শীরও ছিল, কিন্তু সে একমনে কামনা করিত, যেন কোনো গতিকে পাস করিয়া বরদা অন্তত পিসির মুখের ঝাঁজটা মারিয়া দেয়। বরদা প্রথমবার ফেল করিবার পর মাখন যখন দ্বিতীয়বার মাস্টারের ব্যূহ বাঁধিবার চেষ্টায় লাগিলেন, পিসি বলিলেন, 'ধন্য বলি দাদাকে! মানুষ ঠেকেও তো শেখে।' তখন ষোড়শী দিনরাত কেবল এই অসম্ভব-ভাবনা ভাবিতে লাগিল, বরদা এবার যেন হঠাৎ নিজের আশ্চর্য গোপন শক্তি প্রকাশ করিয়া অবিশ্বাসী জগৎটাকে স্তম্ভিত করিয়া দেয়; সে যেন প্রথম শ্রেণীতে সব-প্রথমের চেয়েও আরও আরও আরও অনেক বড়ো হইয়া পাস করে— এত বড়ো যে, স্বয়ং লাটসাহেব সওয়ার পাঠাইয়া দেখা করিবার জন্য তাহাকে তলব করেন। এমন সময়ে কবিরাজের অব্যর্থ বড়িটা ঠিক পরীক্ষাদিনের মাথার উপর যুদ্ধের বোমার মতো আসিয়া পড়িল। সেটাও মন্দের ভালো হইত যদি লোকে সন্দেহ না করিত। পিসি বলিলেন, 'ছেলের এদিকে বুদ্ধি নেই, ওদিকে আছে।' লাটসাহেবের তলব পড়িল না। ষোড়শী মাথা হেঁট করিয়া লোকের হাসাহাসি সহ্য করিল। সময়োচিত জোলাপের প্রহসনটায় তার মনেও যে সন্দেহ হয় নাই, এমন কথা বলিতে পারি না।

এমন সময় বরদা ফেরার হইল। ষোড়শী বড়ো আশা করিয়াছিল, অন্তত এই ঘটনাকেও বাড়ির লোকে দুর্ঘটনা জ্ঞান করিয়া অনুতাপ পরিতাপ করিবে। কিন্তু তাহাদের সংসার বরদার চলিয়া যাওয়াটাকেও পুরা দাম দিল না। সবাই বলিল, 'এই দেখো-না, এল ব'লে!' ষোড়শী মনে মনে বলিতে লাগিল, 'কখ্খনো না! ঠাকুর, লোকের কথা মিথ্যা হোক্! বাড়ির লোককে যেন হায়-হায় করতে হয়!'

এইবার বিধাতা ষোড়শীকে বর দিলেন; তার কামনা সফল হইল। এক মাস গেল, বরদার দেখা নাই; কিন্তু তবু কারও মুখে কোনো উদ্‌বেগের চিহ্ন দেখা যায় না। দুই মাস গেল, তখন মাখনের মনটা একটু চঞ্চল হইয়াছে, কিন্তু বাহিরে সেটা কিছুই প্রকাশ করিলেন না। বউমার সঙ্গে চোখোচোখি হইলে তাঁর মুখে যদিবা বিষাদের মেঘ-সঞ্চার দেখা যায়, পিসির মুখ একেবারে জ্যৈষ্ঠমাসের অনাবৃষ্টির আকাশ বলিলেই হয়। কাজেই সদর দরজার কাছে একটা মানুষ দেখিলেই ষোড়শী চমকিয়া ওঠে; আশঙ্কা, পাছে তার স্বামী ফিরিয়া আসে! এমনি করিয়া যখন তৃতীয় মাস কাটিল, তখন ছেলেটা বাড়ির সকলকে মিথ্যা উদ্‌বিগ্ন করিতেছে বলিয়া পিসি নালিশ শুরু করিলেন। এও ভালো, অবজ্ঞার চেয়ে রাগ ভালো। পরিবারের মধ্যে ক্রমে ভয় ও দুঃখ ঘনাইয়া আসিতে

লাগিল। খোঁজ করিতে করিতে ক্রমে এক বছর যখন কাটিল তখন, মাখন যে বরদার প্রতি অনাবশ্যক কঠোরাচরণ করিয়াছেন, সে-কথা পিসিও বলিতে শুরু করিলেন। দুই বছর যখন গেল তখন পাড়া-প্রতিবেশীরাও বলিতে লাগিল, বরদার পড়াশুনায় মন ছিল না বটে, কিন্তু মানুষটি বড়ো ভালো ছিল। বরদার অদর্শনকাল যতই দীর্ঘ হইল ততই, তার স্বভাব যে অত্যন্ত নির্মল ছিল, এমন-কি সে যে তামাকটা পর্যন্ত খাইত না, এই অন্ধ বিশ্বাস পাড়ার লোকের মনে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। স্কুলের পণ্ডিতমশায় স্বয়ং বলিলেন, এইজন্যই তো তিনি বরদাকে গোতম মুনি নাম দিয়াছিলেন, তখন হইতেই উহার বুদ্ধি বৈরাগ্যে একেবারে নিরেট হইয়া ছিল। পিসি প্রত্যহই অন্তত একবার করিয়া তাঁর দাদার জেদী মেজাজের 'পরে দোষারোপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'বরদার এত লেখাপড়ার দরকারই বা কী ছিল। টাকার তো অভাব নাই। যাই বল, বাপু, তার শরীরে কিন্তু দোষ ছিল না। আহা, সোনার টুকরো ছেলে!' তার স্বামী যে পবিত্রতার আদর্শ ছিল এবং সংসারসুদ্ধ সকলেই তার প্রতি অন্যায় করিয়াছে, সকল দুঃখের মধ্যে এই সান্ত্বনায়, এই গৌরবে ষোড়শীর মন ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

এদিকে বাপের ব্যথিত হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ দ্বিগুণ করিয়া ষোড়শীর উপর আসিয়া পড়িল। বউমা যাতে সুখে থাকে, মাখনের এই একমাত্র ভাবনা। তাঁর বড়ো ইচ্ছা, ষোড়শী তাঁকে এমন কিছু ফরমাশ করে যেটা দুর্লভ— অনেকটা কষ্ট করিয়া, লোকসান করিয়া তিনি তাকে একটু খুশি করিতে পারিলে যেন বাঁচেন—তিনি এমন করিয়া ত্যাগ স্বীকার করিতে চান যেটা তাঁর পক্ষে প্রায়শ্চিত্তের মতো হইতে পারে।

২

ষোড়শী পনেরো বছরে পড়িল। ঘরের মধ্যে একলা বসিয়া যখন-তখন তার চোখ জলে ভরিয়া আসে। চিরপরিচিত সংসারটা তাকে চারি দিকে যেন আঁটিয়া ধরে, তার প্রাণ হাঁপাইয়া ওঠে। তার ঘরের প্রত্যেক জিনিসটা, তার বারান্দার প্রত্যেক রেলিঙটা, আলিসার উপর যে-কয়টা ফুলের গাছের টব চিরকাল ধরিয়া খাড়া দাঁড়াইয়া আছে, তারা সকলেই যেন অন্তরে অন্তরে তাকে বিরক্ত করিতে থাকিত। পদে পদে ঘরের খাটটা, আল্‌নাটা, আল্‌মারিটা— তার জীবনের শূন্যতাকে বিস্তারিত করিয়া ব্যাখ্যা করে; সমস্ত জিনিসপত্রের উপর তার রাগ হইতে থাকে।

সংসারে তার একমাত্র আরামের জায়গা ছিল ঐ জানালার কাছটা। যে-বিশ্বটা তার বাহিরে সেইটেই ছিল তার সব-চেয়ে আপন। কেননা, তার 'ঘর হৈল বাহির, বাহির হৈল ঘর'।

একদিন যখন বেলা দশটা— অন্তঃপুরে যখন বাটি, বারকোষ, ধামা, চুপড়ি, শিল-নোড়া ও পানের বাক্সের ভিড় জমাইয়া ঘরকন্নার বেগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে—এমন সময় সংসারের সমস্ত ব্যস্ততা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া জানালার কাছে ষোড়শী আপনার উদাস মনকে শূন্য আকাশে দিকে দিকে রওনা করিয়া দিতেছিল। হঠাৎ 'জয় বিশ্বেশ্বর' বলিয়া হাঁক দিয়া এক সন্ন্যাসী তাহাদের গেটের কাছে অশথতলা হইতে বাহির হইয়া আসিল। ষোড়শীর সমস্ত দেহতন্তু মীড়টানা বীণার তারের মতো চরম ব্যাকুলতায় বাজিয়া উঠিল। সে ছুটিয়া আসিয়া পিসিকে বলিল, "পিসিমা, ঐ সন্ন্যাসীঠাকুরের ভোগের আয়োজন করো।"

এই শুরু হইল। সন্ন্যাসীর সেবা ষোড়শীর জীবনের লক্ষ্য হইয়া উঠিল। এতদিন পরে শ্বশুরের কাছে বধূর আব্‌দারের পথ খুলিয়াছে। মাখন উৎসাহ দেখাইয়া বলিলেন, বাড়িতে বেশ ভালোরকম একটা অতিথিশালা খোলা চাই। মাখনবাবুর কিছুকাল হইতে আয় কমিতেছিল; কিন্তু তিনি বারো টাকা সুদে ধার করিয়া সৎকর্মে লাগিয়া গেলেন।

সন্ন্যাসীও যথেষ্ট জুটিতে লাগিল। তাদের মধ্যে অধিকাংশ যে খাঁটি নয়, মাখনের সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু বউমার কাছে তার আভাস দিবার জো কী! বিশেষত জটাধারীরা যখন আহার-আরামের অপরিহার্য ত্রুটি লইয়া গালি দেয়, অভিশাপ দিতে ওঠে, তখন এক-একদিন ইচ্ছা হইত, তাদের ঘাড়ে ধরিয়া বিদায় করিতে। কিন্তু ষোড়শীর মুখ চাহিয়া তাহাদের পায়ে ধরিতে হইত। এই ছিল তাঁর কঠোর প্রায়শ্চিত্ত।

সন্ন্যাসী আসিলেই প্রথমে অন্তঃপুরে একবার তার তলব পড়িত। পিসি তাকে লইয়া বসিতেন, ষোড়শী দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া দেখিত। এই সাবধানতার কারণ ছিল এই, পাছে সন্ন্যাসী তাকে প্রথমেই মা বলিয়া ডাকিয়া বসে। কেননা, কী জানি!—বরদার যে-ফোটোগ্রাফখানি ষোড়শীর কাছে ছিল সেটা তার ছেলে বয়সের। সেই বালক-মুখের উপর গোঁফদাড়ি জটাজুট ছাইভস্ম যোগ করিয়া দিলে সেটার যে কিরকম অভিব্যক্তি হইতে পারে তা বলা শক্ত। কতবার কত মুখ দেখিয়া মনে হইয়াছে, বুঝি কিছু কিছু মেলে; বুকের মধ্যে রক্ত দ্রুত বহিয়াছে, তার পরে দেখা যায়— কণ্ঠস্বরে ঠিক মিল নাই, নাকের ডগার কাছটা অন্যরকম।

এমনি করিয়া ঘরের কোণে বসিয়াও নূতন নূতন সন্ন্যাসীর মধ্য দিয়া ষোড়শী যেন বিশ্বজগতে সন্ধানে বাহির হইয়াছে। এই সন্ধানই তার সুখ। এই সন্ধানই তার স্বামী, তার জীবনযৌবনের পরিপূর্ণতা। এই সন্ধানটিকেই ঘেরিয়া তার সংসারের সমস্ত

আয়োজন। সকালে উঠিয়াই ইহারই জন্য তার সেবার কাজ আরম্ভ হয়— এর আগে রান্নাঘরের কাজ সে কখনো করে নাই, এখন এই কাজেই তার বিলাস। সমস্তক্ষণই মনের মধ্যে তার প্রত্যাশার প্রদীপ জ্বালানো থাকে। রাত্রে শুইতে যাইবার আগে, 'কাল হয়তো আমার সেই অতিথি আসিয়া পৌঁছিবে' এই চিন্তাটিই তার দিনের শেষ চিন্তা। এই যেমন সন্ধান চলিতেছে, অমনি সেই সঙ্গে যেমন করিয়া বিধাতা তিলোত্তমাকে গড়িয়াছিলেন তেমনি করিয়া ষোড়শী নানা সন্ন্যাসীর শ্রেষ্ঠ উপকরণ মিলাইয়া বরদার মূর্তিটিকে নিজের মনের মধ্যে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছিল। পবিত্র তার সত্তা, তেজঃপুঞ্জ তার দেহ, গভীর তার জ্ঞান, অতি কঠোর তার ব্রত। এই সন্ন্যাসীকে অবজ্ঞা করে এমন সাধ্য কার। সকল সন্ন্যাসীর মধ্যে এই এক সন্ন্যাসীরই তো পূজা চলিতেছে। স্বয়ং তার শ্বশুরও যে এই পূজার প্রধান পূজারি, ষোড়শীর কাছে এর চেয়ে গৌরবের কথা আর কিছু ছিল না।

কিন্তু, সন্ন্যাসী প্রতিদিনই তো আসে না। সেই ফাঁকগুলো বড়ো অসহ্য। ক্রমে সে ফাঁকও ভরিল। ষোড়শী ঘরে থাকিয়াই সন্ন্যাসের সাধনায় লাগিয়া গেল। সে মেঝের উপর কম্বল পাতিয়া শোয়, এক বেলা যা খায় তার মধ্যে ফলমূলই বেশি। গায়ে তার গেরুয়া রঙের তশর, কিন্তু সাধব্যের লক্ষণ ফুটাইয়া তুলিবার জন্য চওড়া তার লাল পাড়, এবং কল্যাণীর সিঁথির অর্ধেকটা জুড়িয়া মোটা একটা সিন্দুরের রেখা। ইহার উপরে শ্বশুরকে বলিয়া সংস্কৃত পড়া শুরু করিল। মুগ্ধবোধ মুখস্থ করিতে তার অধিক দিন লাগিল না; পণ্ডিতমশায় বলিলেন, "একেই বলে পূর্বজন্মার্জিত বিদ্যা।"

পবিত্রতায় সে যতই অগ্রসর হইবে সন্ন্যাসীর সঙ্গে তার অন্তরের মিলন ততই পূর্ণ হইতে থাকিবে, এই সে মনে মনে ঠিক করিয়াছিল। বাহিরের লোকে সকলেই ধন্য-ধন্য করিতে লাগিল; এই সন্ন্যাসী সাধুর সাধ্বী স্ত্রীর পায়ের ধুলা ও আশীর্বাদ লইবার লোকের ভিড় বাড়িতে থাকিল— এমন-কি, স্বয়ং পিসিও তার কাছে ভয়ে সম্ভ্রমে চুপ করিয়া থাকেন।

কিন্তু, ষোড়শী যে নিজের মন জানিত। তার মনের রঙ তো তার গায়ের তশরের রঙের মতো সম্পূর্ণ গেরুয়া হইয়া উঠিতে পারে নাই। আজ ভোর বেলাটাতে ঐ যে ঝির্‌ঝির্ করিয়া ঠাণ্ডা হাওয়া দিতেছিল সেটা যেন তার সমস্ত দেহমনের উপর কোন্ একজনের কানে কানে কথার মতো আসিয়া পৌঁছিল। উঠিতে আর ইচ্ছা করিতেছিল না। জোর করিয়া উঠিল, জোর করিয়া কাজ করিতে গেল। ইচ্ছা করিতেছিল, জানালার কাছে বসিয়া তার মনের দূর দিগন্ত হইতে যে বাঁশির সুর আসিতেছে সেইটে চুপ করিয়া শোনে। এক-একদিন তার সমস্ত মন যেন অতিচেতন

হইয়া ওঠে, রৌদ্রে নারিকেলের পাতাগুলো ঝিল্‌মিল্ করে, সে যেন তার বুকের মধ্যে কথা কহিতে থাকে। পণ্ডিতমশায় গীতা পড়িয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, সেটা ব্যর্থ হইয়া যায়; অথচ সেই সময়ে তার জানালার বাহিরের বাগানে শুকনো পাতার উপর দিয়া যখন কাঠবিড়ালি খস্ খস্ করিয়া গেল, বহুদূর আকাশের হৃদয় ভেদ করিয়া চিলের একটা তীক্ষ্ণ ডাক আসিয়া পৌঁছিল, ক্ষণে ক্ষণে পুকুরপাড়ের রাস্তা দিয়া গোরুর গাড়ি চলার একটা ক্লান্ত শব্দ বাতাসকে আবিষ্ট করিল, এই সমস্তই তার মনকে স্পর্শ করিয়া অকারণে ব্যাকুল করে। এ'কে তো কিছুতেই বৈরাগ্যের লক্ষণ বলা যায় না। যে বিস্তীর্ণ জগৎটা তপ্ত প্রাণের জগৎ— পিতামহ ব্রহ্মার রক্তের উত্তাপ হইতেই যার আদিম বাষ্প আকাশকে ছাইয়া ফেলিতেছিল; যা তাঁর চতুর্মুখের বেদবেদান্ত-উচ্চারণের অনেক পূর্বের সৃষ্টি; যার রঙের সঙ্গে, ধ্বনির সঙ্গে, গন্ধের সঙ্গে সমস্ত জীবের নাড়ীতে নাড়ীতে বোঝাপড়া হইয়া গেছে; তারই ছোটো বড়ো হাজার হাজার দূত জীব-হৃদয়ের খাস্‌মহলে আনাগোনার গোপন পথটা জানে— ষোড়শী তো কৃচ্ছ্রসাধনের কাঁটা গাড়িয়া আজও সে-পথ বন্ধ করিতে পারিল না।

কাজেই গেরুয়া রঙ্‌কে আরও ঘন করিয়া গুলিতে হইবে। ষোড়শী পণ্ডিতমশায়কে ধরিয়া পড়িল, "আমাকে যোগাসনের প্রণালী বলিয়া দিন।"

পণ্ডিত বলিলেন, "মা, তোমার তো এ-সকল পন্থায় প্রয়োজন নাই। সিদ্ধি তো পাকা আমলকীর মতো আপনি তোমার হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।"

তার পুণ্যপ্রভাব লইয়া চারি দিকে লোকে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকে, ইহাতে ষোড়শীর মনে একটা স্তবের নেশা জমিয়া গেছে। এমন একদিন ছিল, বাড়ির ঝি চাকর পর্যন্ত তাকে কৃপাপাত্রী বলিয়া মনে করিয়াছে। তাই আজ যখন তাকে পুণ্যবতী বলিয়া সকলে ধন্য-ধন্য করিতে লাগিল, তখন তার বহুদিনের গৌরবের তৃষ্ণা মিটিবার সুযোগ হইল। সিদ্ধি যে সে পাইয়াছে, এ কথা অস্বীকার করিতে তার মুখে বাধে— তাই পণ্ডিতমশায়ের কাছে সে চুপ করিয়া রহিল।

মাখনের কাছে ষোড়শী আসিয়া বলিল, "বাবা, আমি কার কাছে প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে শিখি বলো তো।"

মাখন বলিলেন, "সেটা না শিখিলেও তো বিশেষ অসুবিধা দেখি না। তুমি যত দূরে গেছ, সেইখানেই তোমার নাগাল ক-জন লোকে পায়।"

তা হউক, প্রাণায়াম অভ্যাস করিতেই হইবে। এমনি দুর্দৈব যে, মানুষও জুটিয়া গেল। মাখনের বিশ্বাস ছিল, আধুনিক কালের অধিকাংশ বাঙালিই মোটামুটি তাঁরই মতো— অর্থাৎ খায়-দায় ঘুমায়, এবং পরের কুৎসাঘটিত ব্যাপার ছাড়া জগতে আর

কোনো অসম্ভবকে বিশ্বাস করে না। কিন্তু, প্রয়োজনের তাগিদে সন্ধান করিতে গিয়া দেখিল, বাংলাদেশে এমন মানুষও আছে যে ব্যক্তি খুলনা জেলায় ভৈরব নদের ধারে খাঁটি নৈমিষারণ্য আবিষ্কার করিয়াছে। এই আবিষ্কারটা যে সত্য তার প্রধান প্রমাণ, ইহা কৃষ্ণপ্রতিপদের ভোরবেলায় স্বপ্নে প্রকাশ পাইয়াছে। স্বয়ং সরস্বতী ফাঁস করিয়া দিয়াছেন। তিনি যদি নিজবেশে আসিয়া আবির্ভূত হইতেন তাহা হইলেও বরঞ্চ সন্দেহের কারণ থাকিত— কিন্তু তিনি তাঁর আশ্চর্য দেবীলীলায় হাঁড়িচাঁচা পাখি হইয়া দেখা দিলেন। পাখির লেজে তিনটি মাত্র পালক ছিল, একটি সাদা, একটি সবুজ, মাঝেরটি পাট্‌কিলে। এই পালক তিনটি যে, সত্ত্ব, রজ, তম; ঋক, যজুঃ, সাম; সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়; আজ, কাল, পর্শু প্রভৃতি যে তিন সংখ্যার ভেল্কি লইয়া এই জগৎ তাহারই নিদর্শন তাহাতে সন্দেহ ছিল না। তার পর হইতে এই নৈমিষারণ্যে যোগী তৈরি হইতেছে। দুইজন এম. এস্‌-সি. ক্লাসের ছেলে কলেজ ছাড়িয়া এখানে যোগ অভ্যাস করেন; একজন সাব্‌জজ তাঁর সমস্ত পেন্সেন্‌ এই নৈমিষারণ্য-ফণ্ডে উৎসর্গ করিয়াছেন, এবং তাঁর পিতৃমাতৃহীন ভাগনেটিকে এখানকার যোগী ব্রহ্মচারীদের সেবার জন্য নিযুক্ত করিয়া দিয়া মনে আশ্চর্য শান্তি পাইয়াছেন।

এই নৈমিষারণ্য হইতে ষোড়শীর জন্য যোগ-অভ্যাসের শিক্ষক পাওয়া গেল। সুতরাং মাখনকে নৈমিষারণ্য-কমিটির গৃহী সভ্য হইতে হইল। গৃহী সভ্যের কর্তব্য নিজের আয়ের ষষ্ঠ অংশ সন্ন্যাসী সভ্যদের ভরণপোষণের জন্য দান করা। গৃহী সভ্যদের শ্রদ্ধার পরিমাণ-অনুসারে এই ষষ্ঠ অংশ অনেক সময় থার্মোমিটরের পারার মতো সত্য অঙ্কটার উপরে নিচে ওঠানামা করে। অংশ কষিবার সময় মাখনেরও ঠিকে ভুল হইতে লাগিল। সেই ভুলটার গতি নিচের অঙ্কের দিকে। কিন্তু, এই ভুলচুকে নৈমিষারণ্যের যে ক্ষতি হইতেছিল ষোড়শী তাহা পূরণ করিয়া দিল। ষোড়শীর গহনা আর বড়োকিছু বাকি রহিল না, এবং তার মাসহারার টাকা প্রতি মাসে সেই অন্তর্হিত গহনাগুলোর অনুসরণ করিল।

বাড়ির ডাক্তার অনাদি আসিয়া মাখনকে কহিলেন, "দাদা, করছ কী। মেয়েটা যে মারা যাবে।"

মাখন উদ্‌বিগ্ন মুখে বলিলেন, "তাই তো, কী করি।"

ষোড়শীর কাছে তাঁর আর সাহস নাই। এক সময়ে অত্যন্ত মৃদুস্বরে তাকে আসিয়া বলিলেন, "মা, এত অনিয়মে কি তোমার শরীর টিঁকবে।"

ষোড়শী একটুখানি হাসিল। তার মর্মার্থ এই, এমন সকল বৃথা উদ্‌বেগ সংসারী বিষয়ী লোকেরই যোগ্য বটে।

৩

বরদা চলিয়া যাওয়ার পরে বারো বৎসর পার হইয়া গেছে ; এখন ষোড়শীর বয়স পঁচিশ। একদিন ষোড়শী তার যোগী শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, আমার স্বামী জীবিত আছেন কিনা, তা আমি কেমন করে জানব।"

যোগী প্রায় দশ মিনিট কাল স্তব্ধ হইয়া চোখ বুঝিয়া রহিলেন ; তার পরে চোখ খুলিয়া বলিলেন, "জীবিত আছেন।"

"কেমন ক'রে জানলেন।"

"সে কথা এখনো তুমি বুঝবে না। কিন্তু, এটা নিশ্চয় জেনো, স্ত্রীলোক হয়েও সাধনার পথে তুমি যে এতদূর অগ্রসর হয়েছ সে কেবল তোমার স্বামীর অসাধারণ তপোবলে। তিনি দূরে থেকেও তোমাকে সহধর্মিণী ক'রে নিয়েছেন।"

ষোড়শীর শরীর মন পুলকিত হইয়া উঠিল। নিজের সম্বন্ধে তার মনে হইল, ঠিক যেন শিব তপস্যা করিতেছেন আর পার্বতী পদ্মবীজের মালা জপিতে জপিতে তাঁর জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন।

ষোড়শী আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কোথায় আছেন তা কি জানতে পারি।"

যোগী ঈষৎ হাস্য করিলেন ; তার পরে বলিলেন, "একখানা আয়না নিয়ে এসো।"

ষোড়শী আয়না আনিয়া যোগীর নির্দেশমতো তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল।

আধ ঘণ্টা গেলে যোগী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু দেখতে পাচ্ছ ?"

ষোড়শী দ্বিধার স্বরে কহিল, "হাঁ যেন কিছু দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সেটা যে কী তা স্পষ্ট বুঝতে পারছি নে।"

"সাদা কিছু দেখছ কি।"

"সাদাই তো বটে।"

"যেন পাহাড়ের উপর বরফের মতো ?"

"নিশ্চয়ই বরফ ! কখনো পাহাড় তো দেখি নি, তাই এতক্ষণ ঝাপসা ঠেকছিল।"

এইরূপ আশ্চর্য উপায়ে ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, বরদা হিমালয়ের অতি দুর্গম জায়গায় লংচু পাহাড়ে বরফের উপর অনাবৃত দেহে বসিয়া আছেন। সেখান হইতে তপস্যার তেজ ষোড়শীকে আসিয়া স্পর্শ করিতেছে, এই এক আশ্চর্য কাণ্ড।

সেদিন ঘরের মধ্যে একলা বসিয়া ষোড়শীর সমস্ত শরীর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। তার স্বামীর তপস্যা যে তাকে দিনরাত ঘেরিয়া আছে, স্বামী কাছে থাকিলে মাঝে মাঝে যে বিচ্ছেদ ঘটিতে পারিত সে বিচ্ছেদও যে তার নাই, এই আনন্দে তার

মন ভরিয়া উঠিল। তার মনে হইল, সাধনা আরও অনেক বেশি কঠোর হওয়া চাই। এতদিন এবং পৌষ মাসটাতে যে কম্বল সে গায়ে দিতেছিল এখনি সেটা ফেলিয়া দিতেই শীতে তার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। ষোড়শীর মনে হইল, সেই লংচু পাহাড়ের হাওয়া তার গায়ে আসিয়া লাগিতেছে। হাত জোড় করিয়া চোখ বুজিয়া সে বসিয়া রহিল, চোখের কোণ দিয়া অজস্র জল পড়িতে লাগিল।

সেইদিনই মধ্যাহ্নে আহারের পর মাখন ষোড়শীকে তাঁর ঘরে ডাকিয়া আনিয়া বড়োই সংকোচের সঙ্গে বলিলেন, "মা, এতদিন তোমার কাছে বলি নি, ভেবেছিলুম, দরকার হবে না, কিন্তু আর চলছে না। আমার সম্পত্তির চেয়ে আমার দেনা অনেক বেড়েছে, কোন্‌দিন আমার বিষয় ক্রোক করে বলা যায় না।"

ষোড়শীর মুখ আনন্দে দীপ্ত হইয়া উঠিল। তার মনে সন্দেহ রহিল না যে, এ-সমস্তই তার স্বামীর কাজ। তার স্বামী তাকে পূর্ণভাবে আপন সহধর্মিণী করিতেছেন—বিষয়ের যেটুকু ব্যবধান মাঝে ছিল সেও বুঝি এবার ঘুচাইলেন। কেবল উত্তুরে হাওয়া নয়, এই-যে দেনা এও সেই লংচু পাহাড় হইতে আসিয়া পৌঁছিতেছে; এ তার স্বামীরই দক্ষিণ হাতের স্পর্শ।

সে হাসিমুখে বলিল, "ভয় কী, বাবা।"

মাখন বলিলেন, "আমরা দাঁড়াই কোথায়?"

ষোড়শী বলিল, "নৈমিষারণ্যে চালা বেঁধে থাকব।"

মাখন বুঝিলেন, ইহার সঙ্গে বিষয়ের আলোচনা বৃথা। তিনি বাহিরের ঘরে বসিয়া চুপ করিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে মোটর গাড়ি দরজার কাছে আসিয়া থামিল। সাহেবি কাপড়-পরা এক যুবা টপ করিয়া লাফাইয়া নামিয়া মাখনের ঘরে আসিয়া একটা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ভাবের নমস্কারের চেষ্টা করিয়া বলিল, "চিনতে পারছেন না?"

"এ কী। বরদা নাকি।"

বরদা জাহাজের লস্কর হইয়া আমেরিকায় গিয়াছিল। বারো বৎসর পরে সে আজ কোন্‌ এক কাপড়-কাচা কল-কোম্পানির ভ্রমণকারী এজেন্ট হইয়া ফিরিয়াছে। বাপকে বলিল, "আপনার যদি কাপড়-কাচা কলের দরকার থাকে খুব সস্তায় ক'রে দিতে পারি।"

বলিয়া ছবি-আঁকা ক্যাটলগ পকেট হইতে বাহির করিল।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪

পয়লা নম্বর

আমি তামাকটা পর্যন্ত খাই নে। আমার এক অভ্রভেদী নেশা আছে, তারই আওতায় অন্য সকল নেশা একেবারে শিকড় পর্যন্ত শুকিয়ে মরে গেছে। সে আমার বই-পড়ার নেশা। আমার জীবনের মন্ত্রটা ছিল এই—

যাবজ্জীবেৎ নাই-বা জীবেৎ
ঋণং কৃত্বা বহিং পঠেৎ।

যাদের বেড়াবার শখ বেশি অথচ পাথেয়ের অভাব, তারা যেমন ক'রে টাইম্‌টেব্‌ল্‌ পড়ে, অল্প বয়সে আর্থিক অসদ্ভাবের দিনে আমি তেমনি ক'রে বইয়ের ক্যাটালগ পড়তুম। আমার দাদার এক খুড়শ্বশুর বাংলা বই বেরবা-মাত্র নির্বিচারে কিনতেন এবং তাঁর প্রধান অহংকার এই যে, সে বইয়ের একখানাও তাঁর আজ পর্যন্ত খোওয়া যায় নি। বোধ হয় বাংলাদেশে এমন সৌভাগ্য আর কারও ঘটে না। কারণ, ধন বল, আয়ু বল, অন্যমনস্ক ব্যক্তির ছাতা বল, সংসারে যতকিছু সরণশীল পদার্থ আছে বাংলা বই হচ্ছে সকলের চেয়ে সেরা। এর থেকে বোঝা যাবে, দাদার খুড়শ্বশুরের বইয়ের আলমারির চাবি দাদার খুড়শাশুড়ির পক্ষেও দুর্লভ ছিল। 'দীন যথা রাজেন্দ্রসংগমে' আমি যখন ছেলেবেলায় দাদার সঙ্গে তাঁর শ্বশুরবাড়ি যেতুম ঐ রুদ্ধদ্বার আলমারিগুলোর দিকে তাকিয়ে সময় কাটিয়েছি। তখন আমার চক্ষুর জিভে জল এসেছে। এই বললেই যথেষ্ট হবে, ছেলেবেলা থেকেই এত অসম্ভব-রকম বেশি পড়েছি যে পাশ করতে পারি নি। যতখানি কম পড়া পাস করার পক্ষে অত্যাবশ্যক, তার সময় আমার ছিল না।

আমি ফেল-করা ছেলে বলে আমার একটা মস্ত সুবিধে এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘড়ায় বিদ্যার তোলা জলে আমার স্নান নয়— স্রোতের জলে অবগাহনই আমার অভ্যাস। আজকাল আমার কাছে অনেক বি-এ, এম-এ এসে থাকে; তারা যতই আধুনিক হোক, আজও তারা ভিক্টোরীয় যুগের নজরবন্দী হয়ে বসে আছে। তাদের বিদ্যার জগৎ টলেমির পৃথিবীর মতো, আঠারো-উনিশ শতাব্দীর সঙ্গে একেবারে যেন ইস্ক্রু দিয়ে আঁটা; বাংলাদেশের ছাত্রের দল পুত্রপৌত্রাদিক্রমে তাকেই যেন চিরকাল প্রদক্ষিণ করতে থাকবে। তাদের মানস-রথযাত্রার গাড়িখানা বহু কষ্টে মিল বেন্থাম পেরিয়ে কার্লাইল-রাস্কিনে এসে কাত হয়ে পড়েছে। মাস্টারমশায়ের বুলির বেড়ার বাইরে তারা সাহস করে হাওয়া খেতে বেরোয় না।

কিন্তু, আমরা যে-দেশের সাহিত্যকে খোঁটার মতো করে মনটাকে বেঁধে রেখে জাওর

কাটাচ্ছি সে-দেশে সাহিত্যটা তো স্থাণু নয়— সেটা সেখানকার প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে চলছে। সেই প্রাণটা আমার না থাকতে পারে, কিন্তু সেই চলাটা আমি অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছি। আমি নিজের চেষ্টায় ফরাসি, জর্মান, ইটালিয়ান শিখে নিলুম; অল্পদিন হল রাশিয়ান শিখতে শুরু করেছিলুম। আধুনিকতার যে এক্স্‌প্রেস গাড়িটা ঘণ্টায় ষাট মাইলের চেয়ে বেগে ছুটে চলেছে, আমি তারই টিকিট কিনেছি। তাই আমি হাক্স্‌লি-ডারুয়িনে এসেও ঠেকে যাই নি, টেনিসন্‌কেও বিচার করতে ডরাই নে, এমন-কি, ইব্‌সেন-মেটার্‌লিঙ্কের নামের নৌকা ধরে আমাদের মাসিক সাহিত্যে সস্তা খ্যাতির বাঁধা কারবার চালাতে আমার সংকোচ বোধ হয়।

আমাকেও কোনোদিন একদল মানুষ সন্ধান করে চিনে নেবে, এ আমার আশার অতীত ছিল। আমি দেখছি, বাংলাদেশে এমন ছেলেও দু-চারটে মেলে যারা কলেজও ছাড়ে না অথচ কলেজের বাইরে সরস্বতীর যে বীণা বাজে তার ডাকেও উতলা হয়ে ওঠে। তারাই ক্রমে ক্রমে দুটি-একটি করে আমার ঘরে এসে জুটতে লাগল।

এই আমার এক দ্বিতীয় নেশা ধরল— বকুনি। ভদ্রভাষায় তাকে আলোচনা বলা যেতে পারে। দেশের চারি দিকে সাময়িক ও অসাময়িক সাহিত্যে যে-সমস্ত কথাবার্তা শুনি তা এক দিকে এত কাঁচা, অন্য দিকে এত পুরানো যে মাঝে মাঝে তার হাঁফ-ধরানো ভাপ্‌সা গুমোটটাকে উদার চিন্তার খোলা হাওয়ায় কাটিয়ে দিতে ইচ্ছা করে। অথচ লিখতে কুঁড়েমি আসে। তাই মন দিয়ে কথা শোনে এমন লোকের নাগাল পেলে বেঁচে যাই।

দল আমার বাড়তে লাগল। আমি থাকতুম আমাদের গলির দ্বিতীয় নম্বর বাড়িতে, এদিকে আমার নাম হচ্ছে অদ্বৈতচরণ, তাই আমাদের দলের নাম হয়ে গিয়েছিল দ্বৈতাদ্বৈতসম্প্রদায়। আমাদের এই সম্প্রদায়ের কারও সময়-অসময়ের জ্ঞান ছিল না। কেউ-বা পাঞ্চ-করা ট্রামের টিকিট দিয়ে পত্র-চিহ্নিত একখানা নূতন-প্রকাশিত ইংরেজি বই হাতে করে সকালে এসে উপস্থিত— তর্ক করতে করতে একটা বেজে যায়; তবু তর্ক শেষ হয় না। কেউ-বা সদ্য কলেজের নোট-নেওয়া খাতাখানা নিয়ে বিকেলে এসে হাজির, রাত যখন দুটো তখনো ওঠবার নাম করে না। আমি প্রায় তাদের খেতে বলি। কারণ, দেখেছি, সাহিত্যচর্চা যারা করে তাদের রসজ্ঞতার শক্তি কেবল মস্তিষ্কে নয়, রসনাতেও খুব প্রবল। কিন্তু, যাঁর ভরসায় এই-সমস্ত ক্ষুধিতদের যখন-তখন খেতে বলি তাঁর অবস্থা যে কী হয়, সেটাকে আমি তুচ্ছ বলেই বরাবর মনে করে আসতুম। সংসারে ভাবের ও জ্ঞানের যে-সকল বড়ো বড়ো কুলালচক্র ঘুরছে, যাতে মানবসভ্যতা কতক-বা তৈরি হয়ে আগুনের পোড় খেয়ে শক্ত হয়ে উঠছে, কতক-বা

কাঁচা থাকতে থাকতেই ভেঙে ভেঙে পড়ছে, তার কাছে ঘরকন্নার নড়াচড়া এবং রান্নাঘরের চুলোর আগুন কি চোখে পড়ে।

ভবানীর ভ্রূকুটিভঙ্গী ভবই জানেন, এমন কথা কাব্যে পড়েছি। কিন্তু ভবের তিন চক্ষু; আমার একজোড়া মাত্র, তারও দৃষ্টিশক্তি বই পড়ে পড়ে ক্ষীণ হয়ে গেছে। সুতরাং অসময়ে ভোজের আয়োজন করতে বললে আমার স্ত্রীর ভ্রূচাপে কিরকম চাপল্য উপস্থিত হত, তা আমার নজরে পড়ত না। ক্রমে তিনি বুঝে নিয়েছিলেন, আমার ঘরে অসময়ই সময় এবং অনিয়মই নিয়ম। আমার সংসারের ঘড়ি তালকানা এবং আমার গৃহস্থালির কোটরে কোটরে উনপঞ্চাশ পবনের বাসা। আমার যাকিছু অর্থ সামর্থ্য তার একটিমাত্র খোলা ড্রেন ছিল, সে হচ্ছে বই-কেনার দিকে; সংসারের অন্য প্রয়োজন হ্যাংলা কুকুরের মতো এই আমার শখের বিলিতি কুকুরের উচ্ছিষ্ট চেটে ও শুঁকে কেমন করে যে বেঁচে ছিল, তার রহস্য আমার চেয়ে আমার স্ত্রী বেশি জানতেন।

নানা জ্ঞানের বিষয়ে কথা কওয়া আমার মতো লোকের পক্ষে নিতান্ত দরকার। বিদ্যা জাহির করবার জন্যে নয়, পরের উপকার করবার জন্যেও নয়; ওটা হচ্ছে কথা কয়ে কয়ে চিন্তা করা, জ্ঞান হজম করবার একটা ব্যায়ামপ্রণালী। আমি যদি লেখক হতুম, কিম্বা অধ্যাপক হতুম, তা হলে বকুনি আমার পক্ষে বাহুল্য হত। যাদের বাঁধা খাটুনি আছে খাওয়া হজম করবার জন্যে তাদের উপায় খুঁজতে হয় না— যারা ঘরে বসে খায় তাদের অন্তত ছাতের উপর হন্‌হন্ করে পায়চারি করা দরকার। আমার সেই দশা। তাই যখন আমার দ্বৈতদলটি জমে নি— তখন আমার একমাত্র দ্বৈত ছিলেন আমার স্ত্রী। তিনি আমার এই মানসিক পরিপাকের সশব্দ প্রক্রিয়া দীর্ঘকাল নিঃশব্দে বহন করেছেন। যদিচ তিনি পরতেন মিলের শাড়ি এবং তাঁর গয়নার সোনা খাঁটি এবং নিরেট ছিল না, কিন্তু স্বামীর কাছ থেকে যে আলাপ শুনতেন— সৌজাত্য-বিদ্যাই (Eugenics) বল, মেণ্ডেল-তত্ত্বই বল, আর গাণিতিক যুক্তিশাস্ত্রই বল, তার মধ্যে সস্তা কিম্বা ভেজাল-দেওয়া কিছুই ছিল না। আমার দলবৃদ্ধির পর হতে এই আলাপ থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন, কিন্তু সেজন্যে তাঁর কোনো নালিশ কোনোদিন শুনি নি।

আমার স্ত্রীর নাম অনিলা। ঐ শব্দটার মানে কী তা আমি জানি নে, আমার শ্বশুরও যে জানতেন তা নয়। শব্দটা শুনতে মিষ্ট এবং হঠাৎ মনে হয়, ওর একটা-কোনো মানে আছে। অভিধানে যাই বলুক, নামটার আসল মানে— আমার স্ত্রী তাঁর বাপের আদরের মেয়ে। আমার শাশুড়ি যখন আড়াই বছরের একটি ছেলে রেখে মারা যান তখন সেই ছোটো ছেলেকে যত্ন করবার মনোরম উপায়স্বরূপে আমার

শ্বশুর আর-একটি বিবাহ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য যে কিরকম সফল হয়েছিল তা এই বললেই বোঝা যাবে যে, তাঁর মৃত্যুর দুদিন আগে তিনি অনিলার হাত ধরে বললেন, "মা, আমি তো যাচ্ছি, এখন সরোজের কথা ভাববার জন্যে তুমি ছাড়া আর কেউ রইল না।" তাঁর স্ত্রী ও দ্বিতীয়পক্ষের ছেলেদের জন্যে কী ব্যবস্থা করলেন তা আমি ঠিক জানি নে। কিন্তু, অনিলার হাতে গোপনে তিনি তাঁর জমানো টাকা প্রায় সাড়ে সাত হাজার দিয়ে গেলেন। বললেন, "এ টাকা সুদে খাটাবার দরকার নেই— নগদ খরচ করে এর থেকে তুমি সরোজের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দিয়ো।"

আমি এই ঘটনায় কিছু আশ্চর্য হয়েছিলুম। আমার শ্বশুর কেবল বুদ্ধিমান ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন যাকে বলে বিজ্ঞ। অর্থাৎ, ঝোঁকের মাথায় কিছুই করতেন না, হিসেব করে চলতেন। তাই তাঁর ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তোলার ভার যদি কারও উপর তাঁর দেওয়া উচিত ছিল সেটা আমার উপর, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তাঁর মেয়ে তাঁর জামাইয়ের চেয়ে যোগ্য এমন ধারণা যে তাঁর কী করে হল তা তো বলতে পারি নে। অথচ টাকাকড়ি সম্বন্ধে তিনি যদি আমাকে খুব খাঁটি বলে না জানতেন তা হলে আমার স্ত্রীর হাতে এত টাকা নগদ দিতে পারতেন না। আসল, তিনি ছিলেন ভিক্টোরীয় যুগের ফিলিস্‌টাইন, আমাকে শেষ পর্যন্ত চিনতে পারেন নি।

মনে মনে রাগ করে আমি প্রথমটা ভেবেছিলুম, এ সম্বন্ধে কোনো কথাই কব না। কথা কইও নি। বিশ্বাস ছিল, কথা অনিলাকেই প্রথম কইতে হবে, এ সম্বন্ধে আমার শরণাপন্ন না হয়ে তার উপায় নেই। কিন্তু, অনিলা যখন আমার কাছে কোনো পরামর্শ নিতে এল না তখন মনে করলুম, ও বুঝি সাহস করছে না। শেষে একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলুম, "সরোজের পড়াশুনোর কী করছ।" অনিলা বললে, "মাস্টার রেখেছি, ইস্কুলেও যাচ্ছে।" আমি আভাস দিলুম, সরোজকে শেখাবার ভার আমি নিজেই নিতে রাজি আছি। আজকাল বিদ্যাশিক্ষার যে-সকল নতুন প্রণালী বেরিয়েছে তার কতক কতক ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম। অনিলা হাঁ'ও বললে না, না'ও বললে না। এতদিন পরে আমার প্রথম সন্দেহ হল, অনিলা আমাকে শ্রদ্ধা করে না। আমি কলেজে পাশ করি নি, সেইজন্য সম্ভবত ও মনে করে, পড়াশুনো সম্বন্ধে পরামর্শ দেবার ক্ষমতা এবং অধিকার আমার নেই। এতদিন ওকে সৌজাত্য, অভিব্যক্তিবাদ এবং রেডিয়ো-চাঞ্চল্য সম্বন্ধে যাকিছু বলেছি নিশ্চয়ই অনিলা তার মূল্য কিছুই বোঝে নি। ও হয়তো মনে করেছে, সেকেণ্ড ক্লাসের ছেলেও এর চেয়ে বেশি জানে। কেননা, মাস্টারের হাতের কান-মলার প্যাঁচে প্যাঁচে বিদ্যেগুলো আঁট হয়ে তাদের

মনের মধ্যে বসে গেছে। রাগ করে মনে মনে বললুম, মেয়েদের কাছে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করবার আশা সে যেন ছাড়ে বিদ্যাবুদ্ধিই যার প্রধান সম্পদ্।

সংসারে অধিকাংশ বড়ো বড়ো জীবননাট্য যবনিকার আড়ালেই জমতে থাকে, পঞ্চমাঙ্কের শেষে সেই যবনিকা হঠাৎ উঠে যায়। আমি যখন আমার দ্বৈতদের নিয়ে বের্গ্‌সঁর তত্ত্বজ্ঞান ও ইব্‌সেনের মনস্তত্ত্ব আলোচনা করছি তখন মনে করেছিলুম, অনিলার জীবনযজ্ঞবেদীতে কোনো আগুনই বুঝি জ্বলে নি। কিন্তু, আজকে যখন সেই অতীতের দিকে পিছন ফিরে দেখি তখন স্পষ্ট দেখতে পাই, যে-সৃষ্টিকর্তা আগুনে পুড়িয়ে, হাতুড়ি পিটিয়ে, জীবনের প্রতিমা তৈরি করে থাকেন অনিলার মর্মস্থলে তিনি খুবই সজাগ ছিলেন। সেখানে একটি ছোটো ভাই, একটি দিদি এবং একটি বিমাতার সমাবেশে নিয়তই একটা ঘাতপ্রতিঘাতের লীলা চলছিল। পুরাণের বাসুকী যে পৌরাণিক পৃথিবীকে ধরে আছে সে পৃথিবী স্থির। কিন্তু, সংসারে যে-মেয়েকে বেদনার পৃথিবী বহন করতে হয় তার সে-পৃথিবী মুহূর্তে মুহূর্তে নূতন নূতন আঘাতে তৈরি হয়ে উঠছে। সেই চলতি ব্যথার ভার বুকে নিয়ে যাকে ঘরকন্নার খুঁটিনাটির মধ্যে দিয়ে প্রতিদিন চলতে হয়, তার অন্তরের কথা অন্তর্যামী ছাড়া কে সম্পূর্ণ বুঝবে। অন্তত, আমি তো কিছুই বুঝি নি। কত উদ্‌বেগ, কত অপমানিত প্রয়াস, পীড়িত স্নেহের কত অন্তর্গূঢ় ব্যাকুলতা, আমার এত কাছে নিঃশব্দতার অন্তরালে মথিত হয়ে উঠছিল আমি তা জানিই নি। আমি জানতুম, যেদিন দ্বৈতদলের ভোজের বার উপস্থিত হত সেইদিনকার উদ্যোগপর্বই অনিলার জীবনের প্রধান পর্ব। আজ বেশ বুঝতে পারছি, পরম ব্যথার ভিতর দিয়েই এ সংসারে এই ছোটো ভাইটিই দিদির সব-চেয়ে অন্তরতম হয়ে উঠেছিল। সরোজকে মানুষ করে তোলা সম্বন্ধে আমার পরামর্শ ও সহায়তা এরা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বলে উপেক্ষা করাতে আমি ওদিকটাতে একেবারে তাকাই নি, তার যে কিরকম চলছে সে-কথা কোনোদিন জিজ্ঞাসাও করি নি।

ইতিমধ্যে আমাদের গলির পয়লা-নম্বর বাড়িতে লোক এল। এ বাড়িটি সেকালের বিখ্যাত ধনী মহাজন উদ্ধব বড়ালের আমলে তৈরি। তার পরে দুই পুরুষের মধ্যে সে বংশের ধন জন প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে, দুটি-একটি বিধবা বাকি আছে। তারা এখানে থাকে না, তাই বাড়িটা পোড়ো অবস্থাতেই আছে। মাঝে মাঝে বিবাহ প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ডে এ বাড়ি কেউ কেউ অল্পদিনের জন্যে ভাড়া নিয়ে থাকে, বাকি সময়টা এত বড়ো বাড়ির ভাড়াটে প্রায় জোটে না। এবারে এলেন, মনে করো, তাঁর নাম রাজা সিতাংশুমৌলী, এবং ধরে নেওয়া যাক, তিনি নরোত্তমপুরের জমিদার।

আমার বাড়ির ঠিক পাশেই অকস্মাৎ এতবড়ো একটা আবির্ভাব আমি হয়তো

জানতেই পারতুম না। কারণ, কর্ণ যেমন একটি সহজ কবচ গায়ে দিয়েই পৃথিবীতে এসেছিলেন আমারও তেমনি একটি বিধিদত্ত সহজ কবচ ছিল। সেটি হচ্ছে আমার স্বাভাবিক অন্যমনস্কতা। আমার এ বর্মটি খুব মজবুত ও মোটা। অতএব সচরাচর পৃথিবীতে চারি দিকে যে-সকল ঠেলাঠেলি গোলমাল গালমন্দ চলতে থাকে তার থেকে আত্মরক্ষা করবার উপকরণ আমার ছিল।

কিন্তু, আধুনিক কালের বড়োমানুষরা স্বাভাবিক উৎপাতের চেয়ে বেশি, তারা অস্বাভাবিক উৎপাত। দু হাত, দু পা, এক মুণ্ড যাদের আছে তারা হল মানুষ; যাদের হঠাৎ কতকগুলো হাত পা মাথামুণ্ড বেড়ে গেছে তারা হল দৈত্য। অহরহ দুদ্দাড় শব্দে তারা আপনার সীমাকে ভাঙতে থাকে এবং আপন বাহুল্য দিয়ে স্বর্গমর্তকে অতিষ্ঠ করে তোলে। তাদের প্রতি মনোযোগ না দেওয়া অসম্ভব। যাদের 'পরে মন দেবার কোনোই প্রয়োজন নেই অথচ মন না দিয়ে থাকবারও জো নেই তারাই হচ্ছে জগতের অস্বাস্থ্য, স্বয়ং ইন্দ্র পর্যন্ত তাদের ভয় করেন।

মনে বুঝলুম, সিতাংশুমৌলী সেই দলের মানুষ। একা একজন লোক যে এত বেজায় অতিরিক্ত হতে পারে, তা আমি পূর্বে জানতুম না। গাড়ি ঘোড়া লোক লস্কর নিয়ে সে যেন দশ-মুণ্ড বিশ-হাতের পালা জমিয়েছে। কাজেই তার জ্বালায় আমার সারস্বত স্বর্গলোকটির বেড়া রোজ ভাঙতে লাগল।

তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় আমাদের গলির মোড়ে। এ গলিটার প্রধান গুণ ছিল এই যে, আমার মতো আনমনা লোক সামনের দিকে না তাকিয়ে, পিঠের দিকে মন না দিয়ে, ডাইনে বাঁয়ে ভ্রূক্ষেপমাত্র না ক'রেও এখানে নিরাপদে বিচরণ করতে পারে। এমন-কি, এখানে সেই পথ-চলতি অবস্থায় মেরেডিথের গল্প, ব্রাউনিঙের কাব্য অথবা আমাদের কোনো আধুনিক বাঙালি কবির রচনা সম্বন্ধে মনে মনে বিতর্ক করেও অপঘাত-মৃত্যু বাঁচিয়ে চলা যায়। কিন্তু, সেদিন খামকা একটা প্রচণ্ড 'হেইয়ো' গর্জন শুনে পিঠের দিকে তাকিয়ে দেখি, একটা খোলা ব্রুহাম গাড়ির প্রকাণ্ড একজোড়া লাল ঘোড়া আমার পিঠের উপর পড়ে আর-কি! যাঁর গাড়ি তিনি স্বয়ং হাঁকাচ্ছেন, পাশে তাঁর কোচম্যান ব'সে। বাবু সবলে দুই হাতে রাশ টেনে ধরেছেন। আমি কোনো-মতে সেই সংকীর্ণ গলির পার্শ্ববর্তী একটা তামাকের দোকানের হাঁটু আঁকড়ে ধরে আত্ম-রক্ষা করলুম। দেখলুম, আমার উপর বাবু ক্রুদ্ধ। কেননা, যিনি অসতর্কভাবে রথ হাঁকান অসতর্ক পদাতিককে তিনি কোনোমতেই ক্ষমা করতে পারেন না। এর কারণটা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। পদাতিকের দুটি মাত্র পা, সে হচ্ছে স্বাভাবিক মানুষ। আর, যে-ব্যক্তি জুড়ি হাঁকিয়ে ছোটে তার আট পা; সে হল দৈত্য। তার এই অস্বাভাবিক

বাহুল্যের দ্বারা জগতে সে উৎপাতের সৃষ্টি করে। দুই-পা-ওয়ালা মানুষের বিধাতা এই আট-পা-ওয়ালা আকস্মিকটার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না।

স্বভাবের স্বাস্থ্যকর নিয়মে এই অশ্বরথ ও সারথি সবাইকেই যথাসময়ে ভুলে যেতুম। কারণ, এই পরমাশ্চর্য জগতে এরা বিশেষ ক'রে মনে রাখবার জিনিস নয়। কিন্তু, প্রত্যেক মানুষের যে পরিমাণ গোলমাল করবার স্বাভাবিক বরাদ্দ আছে এঁরা তার চেয়ে ঢের বেশি জবর দখল করে বসে আছেন। এইজন্যে যদিচ ইচ্ছা করলেই আমার তিন-নম্বর প্রতিবেশীকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ভুলে থাকতে পারি কিন্তু আমার এই পয়লা-নম্বরের প্রতিবেশীকে এক মুহূর্ত আমার ভুলে থাকা শক্ত। রাত্রে তার আট-দশটা ঘোড়া আস্তাবলের কাঠের মেঝের উপর বিনা সংগীতের যে-তাল দিতে থাকে তাতে আমার ঘুম সর্বাঙ্গে টোল খেয়ে তুবড়ে যায়। তার উপর ভোরবেলায় সেই আট-দশটা ঘোড়াকে আট-দশটা সহিস যখন সশব্দে মলতে থাকে তখন সৌজন্য রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তার পরে তাঁর উড়ে বেহারা, ভোজপুরি বেহারা, তাঁর পাঁড়ে তেওয়ারি দরোয়ানের দল কেউই স্বরসংযম কিম্বা মিতভাষিতার পক্ষপাতী নয়। তাই বলছিলুম, ব্যক্তিটি একটিমাত্র কিন্তু তার গোলমাল করবার যন্ত্র বিস্তর। এইটেই হচ্ছে দৈত্যের লক্ষণ। সেটা তার নিজের পক্ষে অশান্তিকর না হতে পারে। নিজের কুড়িটা নাসারন্ধ্রে নাক ডাকবার সময় রাবণের হয়তো ঘুমের ব্যাঘাত হত না, কিন্তু তার প্রতিবেশীর কথাটা চিন্তা করে দেখো। স্বর্গের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে পরিমাণসুষমা, অপর পক্ষে একদা যে-দানবের দ্বারা স্বর্গের নন্দনশোভা নষ্ট হয়েছিল তাদের প্রধান লক্ষণ ছিল অপরিমিতি। আজ সেই অপরিমিতি দানবটাই টাকার থলিকে বাহন ক'রে মানবের লোকালয়কে আক্রমণ করেছে। তাকে যদি-বা পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যেতে চাই সে চার ঘোড়া হাঁকিয়ে ঘাড়ের উপর এসে পড়ে— এবং উপরন্তু চোখ রাঙায়।

সেদিন বিকেলে আমার দ্বৈতগুলি তখনো কেউ আসে নি। আমি বসে বসে জোয়ার-ভাঁটার তত্ত্ব সম্বন্ধে একখানা বই পড়ছিলুম, এমন সময়ে আমাদের বাড়ির প্রাচীর ডিঙিয়ে, দরজা পেরিয়ে আমার প্রতিবেশীর একটা স্মারকলিপি ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে আমার শার্সির উপর এসে পড়ল। সেটা একটি টেনিসের গোলা। চন্দ্রমার আকর্ষণ, পৃথিবীর নাড়ীর চাঞ্চল্য, বিশ্বগীতিকাব্যের চিরন্তন ছন্দতত্ত্ব প্রভৃতি সমস্তকে ছাড়িয়ে মনে পড়ল, আমার একজন প্রতিবেশী আছেন, এবং অত্যন্ত বেশি করে আছেন, আমার পক্ষে তিনি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক অথচ নিরতিশয় অবশ্যম্ভাবী। পরক্ষণেই দেখি, আমার বুড়ো অযোধ্যা বেহারাটা দৌড়তে দৌড়তে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উপস্থিত। এই আমার একমাত্র অনুচর। একে ডেকে পাই নে, হেঁকে বিচলিত করতে পারি নে— দুর্লভতার কারণ

জিজ্ঞাসা করলে বলে, একা মানুষ কিন্তু কাজ বিস্তর। আজ দেখি, বিনা তাগিদেই গোলা কুড়িয়ে সে পাশের বাড়ির দিকে ছুটছে। খবর পেলুম, প্রত্যেকবার গোলা কুড়িয়ে দেবার জন্যে সে চার পয়সা করে মজুরি পায়।

দেখলুম, কেবল যে আমার শার্সি ভাঙছে, আমার শান্তি ভাঙছে, তা নয়, আমার অনুচর-পরিচরদের মন ভাঙতে লাগল। আমার অকিঞ্চিৎকরতা সম্বন্ধে অযোধ্যা বেহারার অবজ্ঞা প্রত্যহ বেড়ে উঠছে, সেটা তেমন আশ্চর্য নয় কিন্তু আমার দ্বৈত-সম্প্রদায়ের প্রধান সর্দার কানাইলালের মনটাও দেখছি পাশের বাড়ির প্রতি উৎসুক হয়ে উঠল। আমার উপর তার যে নিষ্ঠা ছিল সেটা উপকরণমূলক নয়, অন্তঃকরণমূলক, এই জেনে আমি নিশ্চিন্ত ছিলুম, এমন সময় একদিন লক্ষ্য করে দেখলুম, সে আমার অযোধ্যাকে অতিক্রম ক'রে টেনিসের পলাতক গোলাটা কুড়িয়ে নিয়ে পাশের বাড়ির দিকে ছুটছে। বুঝলুম, এই উপলক্ষ্যে প্রতিবেশীর সঙ্গে আলাপ করতে চায়। সন্দেহ হল, ওর মনের ভাবটা ঠিক ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর মতো নয়— শুধু অমৃতে ওর পেট ভরবে না।

আমি পয়লা-নম্বরের বাবুগিরিকে খুব তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ করবার চেষ্টা করতুম। বলতুম, সাজসজ্জা দিয়ে মনের শূন্যতা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা ঠিক যেন রঙিন মেঘ দিয়ে আকাশ মুড়ি দেবার দুরাশা। একটু হাওয়াতেই মেঘ যায় স'রে, আকাশের ফাঁকা বেরিয়ে পড়ে। কানাইলাল একদিন প্রতিবাদ করে বললে, মানুষটা একেবারে নিছক ফাঁপা নয়, বি-এ পাশ করেছে। কানাইলাল স্বয়ং বি এ পাশ-করা, এজন্য ঐ ডিগ্রীটা সম্বন্ধে কিছু বলতে পারলুম না।

পয়লা-নম্বরের প্রধান গুণগুলি সশব্দ। তিনি তিনটে যন্ত্র বাজাতে পারেন, কর্নেট, এসরাজ এবং চেলো। যখন-তখন তার পরিচয় পাই। সংগীতের সুর সম্বন্ধে আমি নিজেকে সুরাচার্য বলে অভিমান করি নে। কিন্তু, আমার মতে গানটা উচ্চ অঙ্গের বিদ্যা নয়। ভাষার অভাবে মানুষ যখন বোবা ছিল তখনই গানের উৎপত্তি— তখন মানুষ চিন্তা করতে পারত না বলে চীৎকার করত। আজও যে-সব মানুষ আদিম অবস্থায় আছে তারা শুধু শুধু শব্দ করতে ভালোবাসে। কিন্তু দেখতে পেলুম, আমার দ্বৈতদলের মধ্যে অন্তত চারজন ছেলে আছে, পায়লা-নম্বরে চেলো বেজে উঠলেই যারা গাণিতিক ন্যায়শাস্ত্রের নব্যতম অধ্যায়েও মন দিতে পারে না।

আমার দলের মধ্যে অনেক ছেলে যখন পয়লা-নম্বরের দিকে হেলছে এমন সময়ে অনিলা একদিন আমাকে বললে, "পাশের বাড়িতে একটা উৎপাত জুটেছে, এখন আমরা এখান থেকে অন্য কোনো বাসায় গেলেই তো ভালো হয়।"

বড়ো খুশি হলুম। আমার দলের লোকদের বললুম, "দেখেছ মেয়েদের কেমন একটা সহজ বোধ আছে? তাই যে-সব জিনিস প্রমাণযোগে বোঝা যায় তা ওরা বুঝতেই পারে না, কিন্তু যে-সব জিনিসের কোনো প্রমাণ নেই তা বুঝতে ওদের একটুও দেরি হয় না।"

কানাইলাল হেসে বললে, "যেমন পেঁচো, ব্রহ্মদৈত্য, ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলোর মাহাত্ম্য, পতিদেবতা-পূজার পুণ্যফল ইত্যাদি ইত্যাদি।"

আমি বললুম, "না হে, এই দেখো-না, আমরা এই পয়লা-নম্বরের জাঁকজমক দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছি, কিন্তু অনিলা ওর সাজসজ্জায় ভোলে নি।"

অনিলা দু-তিনবার বাড়ি-বদলের কথা বললে। আমার ইচ্ছাও ছিল, কিন্তু কলকাতার গলিতে গলিতে বাসা খুঁজে বেড়াবার মতো অধ্যবসায় আমার ছিল না। অবশেষে একদিন বিকেলবেলায় দেখা গেল, কানাইলাল এবং সতীশ পয়লা-নম্বরে টেনিস খেলছে। তারপরে জনশ্রুতি শোনা গেল, যতী আর হরেন পয়লা-নম্বরে সংগীতের মজলিসে একজন বক্স-হার্মোনিয়ম বাজায় এবং একজন বাঁয়া-তবলায় সংগত করে, আর অরুণ নাকি সেখানে কমিক গান করে খুব প্রতিপত্তি লাভ করেছে। এদের আমি পাঁচ-ছ বছর ধরে জানি কিন্তু এদের যে এ-সব গুণ ছিল তা আমি সন্দেহও করি নি। বিশেষত আমি জানতুম, অরুণের প্রধান শখের বিষয় হচ্ছে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব। সে যে কমিক গানে ওস্তাদ তা কী করে বুঝব।

সত্য কথা বলি, আমি এই পয়লা-নম্বরকে মুখে যতই অবজ্ঞা করি মনে মনে ঈর্ষা করেছিলুম। আমি চিন্তা করতে পারি, বিচার করতে পারি, সকল জিনিসের সার গ্রহণ করতে পারি, বড়ো বড়ো সমস্যার সমাধান করতে পারি— মানসিক সম্পদে সিতাংশুমৌলীকে আমার সমকক্ষ বলে কল্পনা করা অসম্ভব। কিন্তু তবু ঐ মানুষটিকে আমি ঈর্ষা করেছি। কেন সে কথা যদি খুলে বলি তো লোকে হাসবে। সকাল বেলায় সিতাংশু একটা দুরন্ত ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরোত— কী আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে রাশ বাগিয়ে এই জন্তুটাকে সে সংযত করত। এই দৃশ্যটি রোজই আমি দেখতুম, আর ভাবতুম, 'আহা, আমি যদি এইরকম অনায়াসে ঘোড়া হাঁকিয়ে যেতে পারতুম!' পটুত্ব বলে যে জিনিসটি আমার একেবারেই নেই সেইটের 'পরে আমার ভারি একটা গোপন লোভ ছিল। আমি গানের সুর ভালো বুঝি নে কিন্তু জানলা থেকে কতদিন গোপনে দেখেছি সীতাংশু এস্রাজ বাজাচ্ছে। ঐ যন্ত্রটার 'পরে তার একটি বাধাহীন সৌন্দর্যময় প্রভাব আমার কাছে আশ্চর্য মনোহর বোধ হত। আমার মনে হত, যন্ত্রটা যেন প্রেয়সী-নারীর মতো ওকে ভালোবাসে— সে আপনার সমস্ত সুর ওকে ইচ্ছা করে বিকিয়ে

দিয়েছে। জিনিস-পত্র বাড়ি-ঘর জন্তু-মানুষ সকলের 'পরেই সিতাংশুর এই সহজ প্রভাব ভারি একটি শ্রী বিস্তার করত। এই জিনিসটি অনির্বচনীয়, আমি একে নিতান্ত দুর্লভ না মনে করে থাকতে পারতুম না। আমি মনে করতুম, পৃথিবীতে কোনো কিছু প্রার্থনা করা এ লোকটির পক্ষে অনাবশ্যক, সবই আপনি এর কাছে এসে পড়বে এ ইচ্ছা করে যেখানে গিয়ে বসবে সেইখানেই এর আসন পাতা।

তাই যখন একে একে আমার দ্বৈতগুলির অনেকেই পয়লা-নম্বরে টেনিস খেলতে, কন্সর্ট বাজাতে লাগল, তখন স্থানত্যাগের দ্বারা এই লুব্ধদের উদ্ধার করা ছাড়া আর কোনো উপায় খুঁজে পেলুম না। দালাল এসে খবর দিলে, মনের মতো অন্য বাসা বরানগর-কাশীপুরের কাছাকাছি এক জায়গায় পাওয়া যাবে। আমি তাতে রাজি। সকাল তখন সাড়ে ন'টা। স্ত্রীকে প্রস্তুত হতে বলতে গেলুম। তাঁকে ভাঁড়ারঘরেও পেলুম না, রান্নাঘরেও না। দেখি, শোবার ঘরে জানলার গরাদের উপর মাথা রেখে চুপ করে বসে আছেন। আমাকে দেখেই উঠে পড়লেন। আমি বললুম, "পর্শুই নতুন বাসায় যাওয়া যাবে।"

তিনি বললেন, "আর দিন পনেরো সবুর করো।"

জিজ্ঞাসা করলুম, "কেন।"

অনিলা বললেন, "সরোজের পরীক্ষার ফল শীঘ্র বেরোবে— তার জন্য মনটা উদ্‌বিগ্ন আছে, এ কয়দিন আর নড়াচড়া করতে ভালো লাগছে না।"

অন্যান্য অসংখ্য বিষয়ের মধ্যে এই একটি বিষয় আছে যা নিয়ে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমি কখনো আলোচনা করি নে। সুতরাং আপাতত কিছুদিন বাড়িবদল মুলতবি রইল। ইতিমধ্যে খবর পেলুম, সিতাংশু শীঘ্রই দক্ষিণভারতে বেড়াতে বেরোবে, সুতরাং দুই-নম্বরের উপর থেকে মস্ত ছায়াটা সরে যাবে।

অদৃষ্ট নাট্যের পঞ্চমাঙ্কের শেষ দিকটা হঠাৎ দৃষ্ট হয়ে ওঠে। কাল আমার স্ত্রী তাঁর বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন; আজ ফিরে এসে তাঁর ঘরে দরজা বন্ধ করলেন। তিনি জানেন, আজ রাত্রে আমাদের দ্বৈতদলের পূর্ণিমার ভোজ। তাই নিয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করবার অভিপ্রায়ে দরজায় ঘা দিলুম। প্রথমে সাড়া পাওয়া গেল না। ডাক দিলুম, "অনু!" খানিক বাদে অনিলা এসে দরজা খুলে দিলে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "আজ রাত্রে রান্নার জোগাড় সব ঠিক আছে তো?"

সে কোনো জবাব না দিয়ে মাথা হেলিয়ে জানালে যে, আছে।

আমি বললুম "তোমার হাতের তৈরি মাছের কচুরি আর বিলাতি আমড়ার চাট্‌নি ওদের খুব ভালো লাগে, সেটা ভুলো না।"

এই বলে বাইরে এসেই দেখি কানাইলাল বসে আছে।

আমি বললুম, "কানাই, আজ তোমরা একটু সকাল-সকাল এসো।"

কানাই আশ্চর্য হয়ে বললে, "সে কী কথা। আজ আমাদের সভা হবে না কি।"

আমি বললুম, "হবে বই-কি। সমস্ত তৈরি আছে— ম্যাক্সিম গর্কির নতুন গল্পের বই, বের্গসঁর উপর রাসেলের সমালোচনা, মাছের কচুরি, এমন-কি আমড়ার চাট্‌নি পর্যন্ত।"

কানাই অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। খানিক বাদে বললে, "অদ্বৈতবাবু, আমি বলি, আজ থাক্‌।"

অবশেষে প্রশ্ন করে জানতে পারলুম, আমার শ্যালক সরোজ কাল বিকেল বেলায় আত্মহত্যা করে মরেছে। পরীক্ষায় সে পাশ হতে পারে নি, তাই নিয়ে বিমাতার কাছ থেকে খুব গঞ্জনা পেয়েছিল— সইতে না পেরে গলায় চাদর বেঁধে মরেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "তুমি কোথা থেকে শুনলে?"

সে বললে, "পয়লা-নম্বর থেকে।"

পয়লা-নম্বর থেকে! বিবরণটা এই— সন্ধ্যার দিকে অনিলার কাছে যখন খবর এল তখন সে গাড়ি ডাকার অপেক্ষা না ক'রে অযোধ্যাকে সঙ্গে নিয়ে পথের মধ্যে থেকে গাড়ি ভাড়া করে বাপের বাড়িতে গিয়েছিল। অযোধ্যার কাছ থেকে রাত্রে সিতাংশুমৌলী এই খবর পেয়েই তখনি সেখানে গিয়ে পুলিশকে ঠাণ্ডা ক'রে নিজে শ্মশানে উপস্থিত থেকে মৃতদেহের সংকার করিয়ে দেন।

ব্যতিব্যস্ত হয়ে তখনি অন্তঃপুরে গেলুম। মনে করেছিলুম, অনিলা বুঝি দরজা বন্ধ ক'রে আবার তার শোবার ঘরের আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু, এবারে গিয়ে দেখি, ভাঁড়ারের সামনের বারান্দায় বসে সে আমড়ার চাট্‌নির আয়োজন করছে। যখন লক্ষ্য করে তার মুখ দেখলুম তখন বুঝলুম, এক রাত্রে তার জীবনটা উলট-পালট হয়ে গেছে।

আমি অভিযোগ করে বললুম, "আমাকে কিছু বল নি কেন।"

সে তার বড়ো বড়ো দুই চোখ তুলে একবার আমার মুখের দিকে তাকালে— কোনো কথা কইলে না। আমি লজ্জায় অত্যন্ত ছোটো হয়ে গেলুম। যদি অনিলা বলত 'তোমাকে ব'লে লাভ কী', তা হলে আমার জবাব দেবার কিছুই থাকত না। জীবনের এই-সব বিপ্লব— সংসারের সুখ দুঃখ— নিয়ে কী ক'রে যে ব্যবহার করতে হয়, আমি কি তার কিছুই জানি।

আমি বললুম, "অনিল, এ-সব রাখো, আজ আমাদের সভা হবে না।"

অনিলা আমড়ার খোসা ছাড়াবার দিকে দৃষ্টি রেখে বললে, "কেন হবে না। খুব হবে। আমি এত ক'রে সমস্ত আয়োজন করেছি, সে আমি নষ্ট হতে দিতে পারব না।"

আমি বললুম, "আজ আমাদের সভার কাজ হওয়া অসম্ভব।"

সে বললে, "তোমাদের সভা না হয় না হবে, আজ আমার নিমন্ত্রণ।"

আমি মনে একটু আরাম পেলুম। ভাবলুম, অনিলের শোকটা তত বেশি কিছু নয়। মনে করলুম, সেই-যে এক সময়ে ওর সঙ্গে বড়ো বড়ো বিষয়ে কথা কইতুম তারই ফলে ওর মনটা অনেকটা নিরাসক্ত হয়ে এসেছে। যদিচ সব কথা বোঝবার মতো শিক্ষা এবং শক্তি ওর ছিল না, কিন্তু তবু পার্সোনাল ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্ ব'লে একটা জিনিস আছে তো।

সন্ধ্যায় সময় আমার দ্বৈতদলের দুই-চারজন কম পড়ে গেল। কানাই তো এলই না। পয়লা-নম্বরে যারা টেনিসের দলে যোগ দিয়েছিল তারাও কেউ আসে নি। শুনলুম, কাল ভোরের গাড়িতে সিতাংশুমৌলী চলে যাচ্ছে, তাই এরা সেখানে বিদায়-ভোজ খেতে গেছে। এ দিকে অনিলা আজ যেরকম ভোজের আয়োজন করেছিল এমন আর কোনো দিনই করে নি। এমন-কি, আমার মতো বেহিসাবি লোকেও এ কথা না মনে করে থাকতে পারে নি যে, খরচটা অতিরিক্ত করা হয়েছে।

সেদিন খাওয়াদাওয়া করে সভাভঙ্গ হতে রাত্রি একটা-দেড়টা হয়ে গেল। আমি ক্লান্ত হয়ে তখনি শুতে গেলুম। অনিলাকে জিজ্ঞাসা করলুম "শোবে না?"

সে বললে "বাসনগুলো তুলতে হবে।"

পরের দিন যখন উঠলুম তখন বেলা প্রায় আটটা হবে। শোবার ঘরে টিপাইয়ের উপর যেখানে আমার চশমাটা খুলে রাখি সেখানে দেখি, আমার চশমা চাপা দেওয়া এক-টুকরা কাগজ, তাতে অনিলের হাতের লেখাটি আছে 'আমি চললুম। আমাকে খুঁজতে চেষ্টা কোরো না। করলেও খুঁজে পাবে না।'

কিছু বুঝতে পারলুম না। টিপাইয়ের উপরে একটা টিনের বাক্স— সেটা খুলে দেখি, তার মধ্যে অনিলার সমস্ত গয়না— এমন-কি, তার হাতের চুড়ি বালা পর্যন্ত, কেবল তার শাঁখা এবং হাতের লোহা ছাড়া। একটা খোপের মধ্যে চাবির গোছা, অন্য অন্য খোপে কাগজের মোড়কে-করা কিছু টাকা সিকি দুয়ানি। অর্থাৎ, মাসের খরচ বাঁচিয়ে অনিলের হাতে যা কিছু জমেছিল তার শেষ পয়সাটি পর্যন্ত রেখে গেছে। একটি খাতায় বাসন-কোসন জিনিসপত্রের ফর্দ, এবং ধোবার বাড়িতে যে-সব কাপড় গেছে তার সব হিসাব। এই সঙ্গে গয়লাবাড়ির এবং মুদির দোকানের দেনার হিসাবও টোকা আছে, কেবল তার নিজের ঠিকানা নেই।

এইটুকু বুঝতে পারলুম, অনিল চলে গেছে। সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করে দেখলুম— আমার শ্বশুরবাড়িতে খোঁজ নিলুম— কোথাও সে নেই। কোনো একটা বিশেষ ঘটনা

ঘটলে সে সম্বন্ধে কিরকম বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয়, কোনোদিন আমি তার কিছুই ভেবে পাই নে। বুকের ভিতরটা হা-হা করতে লাগল। হঠাৎ পয়লা-নম্বরের দিকে তাকিয়ে দেখি, সে বাড়ির দরজা জানলা বন্ধ। দেউড়ির কাছে দরোয়ানজি গড়গড়ায় তামাক টানছে। রাজাবাবু ভোররাত্রে চলে গেছেন। মনটার মধ্যে ছ্যাক্ করে উঠল। হঠাৎ বুঝতে পারলুম, আমি যখন একমনে নব্যতম ন্যায়ের আলোচনা করছিলুম তখন মানব-সমাজের পুরাতনতম একটি অন্যায় আমার ঘরে জাল বিস্তার করছিল। ফ্লোবেয়ার্, টলস্টয়, টুর্গেনিভ প্রভৃতি বড়ো বড়ো গল্পলিখিয়েদের বইয়ে যখন এইরকমের ঘটনার কথা পড়েছি তখন বড়ো আনন্দে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ক'রে তার তত্ত্বকথা বিশ্লেষণ করে দেখেছি। কিন্তু, নিজের ঘরেই যে এটা এমন সুনিশ্চিত করে ঘটতে পারে, তা কোনোদিন স্বপ্নেও কল্পনা করি নি।

প্রথম ধাক্কাটাকে সামলে নিয়ে আমি প্রবীণ তত্ত্বজ্ঞানীর মতো সমস্ত ব্যাপারটাকে যথোচিত হালকা করে দেখবার চেষ্টা করলুম। যেদিন আমার বিবাহ হয়েছিল সেইদিনকার কথাটা মনে করে শুষ্ক হাসি হাসলুম। মনে করলুম, মানুষ কত আকাঙ্ক্ষা, কত আয়োজন, কত আবেগের অপব্যয় করে থাকে। কত দিন, কত রাত্রি, কত বৎসর নিশ্চিন্ত মনে কেটে গেল; স্ত্রী বলে একটা সজীব পদার্থ নিশ্চয় আছে ব'লে চোখ বুজে ছিলুম; এমন সময় আজ হঠাৎ চোখ খুলে দেখি, বুদ্‌বুদ্ ফেটে গিয়েছে। গেছে যাক্ গে— কিন্তু জগতে সবই ত বুদ্‌বুদ্ নয়। যুগযুগান্তরের জন্মমৃত্যুকে অতিক্রম করে টিঁকে রয়েছে এমন-সব জিনিসকে আমি কি চিনতে শিখি নি।

কিন্তু দেখলুম, হঠাৎ এই আঘাতে আমার মধ্যে নব্যকালের জ্ঞানীটা মূর্ছিত হয়ে পড়ল, আর কোন্ আদিকালের প্রাণীটা জেগে উঠে ক্ষুধায় কেঁদে বেড়াতে লাগল। বারান্দায় ছাতে পায়চারি করতে করতে, শূন্য বাড়িতে ঘুরতে ঘুরতে, শেষকালে, যেখানে জানালার কাছে কতদিন আমার স্ত্রীকে একলা চুপ করে বসে থাকতে দেখেছি, একদিন আমার সেই শোবার ঘরে গিয়ে পাগলের মতো সমস্ত জিনিসপত্র ঘাঁটতে লাগলুম। অনিলের চুল বাঁধবার আয়নার দেরাজটা হঠাৎ টেনে খুলতেই রেশমের লাল ফিতেয় বাঁধা একতাড়া চিঠি বেরিয়ে পড়ল। চিঠিগুলি পয়লা-নম্বর থেকে এসেছে। বুকটা জ্বলে উঠল। একবার মনে হল, সবগুলো পুড়িয়ে ফেলি। কিন্তু, যেখানে বড়ো বেদনা সেইখানেই ভয়ংকর টান। এ চিঠিগুলো সমস্ত না পড়ে আমার থাকবার জো নেই।

এই চিঠিগুলি পঞ্চাশবার পড়েছি। প্রথম চিঠিখানা তিন-চার টুক্‌রো করে ছেঁড়া। মনে হল, পাঠিকা পড়েই সেটি ছিঁড়ে ফেলে তার পরে আবার যত্ন করে একখানা কাগজের উপরে গঁদ দিয়ে জুড়ে রেখেছে। সে চিঠিখানা এই—

'আমার এ চিঠি না পড়েই যদি তুমি ছিঁড়ে ফেলো তবু আমার দুঃখ নেই। আমার যা বলবার কথা তা আমাকে বলতেই হবে।

'আমি তোমাকে দেখেছি। এতদিন এই পৃথিবীতে চোখ মেলে বেড়াচ্ছি, কিন্তু দেখবার মতো দেখা আমার জীবনে এই বত্রিশ বছর বয়সে প্রথম ঘটল। চোখের উপরে ঘুমের পর্দা টানা ছিল; তুমি সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছ— আজ আমি নবজাগরণের ভিতর দিয়ে তোমাকে দেখলুম, যে-তুমি স্বয়ং তোমার সৃষ্টিকর্তার পরম বিস্ময়ের ধন সেই অনির্বচনীয় তোমাকে। আমার যা পাবার তা পেয়েছি, আর কিছু চাই নে, কেবল তোমার স্তব তোমাকে শোনাতে চাই। যদি আমি কবি হতুম তা হলে আমার এই স্তব চিঠিতে তোমাকে লেখবার দরকার হত না, ছন্দের ভিতর দিয়ে সমস্ত জগতের কণ্ঠে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে যেতুম। আমার এ চিঠির কোনো উত্তর দেবে না, জানি— কিন্তু, আমাকে ভুল বুঝো না। আমি তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারি, এমন সন্দেহমাত্র মনে না রেখে আমার পূজা নীরবে গ্রহণ কোরো। আমার এই শ্রদ্ধাকে যদি তুমি শ্রদ্ধা করতে পার তাতে তোমারও ভালো হবে। আমি কে, সে কথা লেখবার দরকার নেই, কিন্তু নিশ্চয়ই তা তোমার মনের কাছে গোপন থাকবে না।'

এমন পঁচিশখানি চিঠি। এর কোনো চিঠির উত্তর যে অনিলের কাছ থেকে গিয়েছিল, এ চিঠিগুলির মধ্যে তার কোনো নিদর্শন নেই। যদি যেত তা হলে তখনি বেসুর বেজে উঠত— কিম্বা তা হলে সোনার কাঠির জাদু একেবারে ভেঙে স্তবগান নীরব হত।

কিন্তু, এ কী আশ্চর্য। সিতাংশু যাকে ক্ষণকালের ফাঁক দিয়ে দেখেছে, আজ আট বছরের ঘনিষ্ঠতার পর এই পরের চিঠিগুলির ভিতর দিয়ে তাকে প্রথম দেখলুম। আমার চোখের উপরকার ঘুমের পর্দা কত মোটা পর্দা না জানি! পুরোহিতের হাত থেকে অনিলাকে আমি পেয়েছিলুম, কিন্তু তার বিধাতার হাত থেকে তাকে গ্রহণ করবার মূল্য আমি কিছুই দিই নি। আমি আমার দ্বৈতদলকে এবং নব্যন্যায়কে তার চেয়ে অনেক বড়ো করে দেখেছি। সুতরাং যাকে আমি কোনো দিনই দেখি নি, এক নিমেষের জন্যও পাই নি, তাকে আর-কেউ যদি আপনার জীবন উৎসর্গ করে পেয়ে থাকে তবে কী বলে কার কাছে আমার ক্ষতির নালিশ করব।

শেষ চিঠিখানা এই—

'বাইরে থেকে আমি তোমার কিছুই জানি নে, কিন্তু অন্তরের দিক থেকে আমি দেখেছি তোমার বেদনা। এইখানে বড়ো কঠিন আমার পরীক্ষা। আমার এই পুরুষের বাহু নিশ্চেষ্ট থাকতে চায় না। ইচ্ছা করে, স্বর্গমর্তের সমস্ত শাসন বিদীর্ণ করে তোমাকে তোমার জীবনের ব্যর্থতা থেকে উদ্ধার করে আনি। তার পরে এও মনে হয়, তোমার

দুঃখই তোমার অন্তর্যামীর আসন। সেটি হরণ করবার অধিকার আমার নেই। কাল ভোরবেলা পর্যন্ত মেয়াদ নিয়েছি। এর মধ্যে যদি কোনো দৈববাণী আমার এই দ্বিধা মিটিয়ে দেয় তা হলে যা হয় একটা কিছু হবে। বাসনার প্রবল হাওয়ায় আমাদের পথ চলবার প্রদীপকে নিবিয়ে দেয়। তাই আমি মনকে শান্ত রাখব— একমনে এই মন্ত্র জপ করব যে, তোমার কল্যাণ হোক।'

বোঝা যাচ্ছে দ্বিধা দূর হয়ে গেছে— দুজনার পথ এক হয়ে মিলেছে। মাঝের থেকে সিতাংশুর লেখা এই চিঠিগুলি আমারই চিঠি হয়ে উঠল— ওগুলি আজ আমারই প্রাণের স্তবমন্ত্র।

কত কাল চলে গেল, বই পড়তে আর ভালো লাগে না। অনিলকে একবার কোনোমতে দেখবার জন্যে মনের মধ্যে এমন বেদনা উপস্থিত হল, কিছুতেই স্থির থাকতে পারলুম না। খবর নিয়ে জানলুম সিতাংশু তখন মসুরি-পাহাড়ে।

সেখানে গিয়ে সিতাংশুকে অনেকবার পথে বেড়াতে দেখেছি, কিন্তু তার সঙ্গে তো অনিলকে দেখি নি। ভয় হল পাছে তাকে অপমান ক'রে ত্যাগ করে থাকে। আমি থাকতে না পেরে একেবারে তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করলুম। সব কথা বিস্তারিত করে লেখবার দরকার নেই। সিতাংশু বললে, "আমি তাঁর কাছ থেকে জীবনে কেবল একটি-মাত্র চিঠি পেয়েছি— সেটি এই দেখুন।"

এই ব'লে সিতাংশু তার পকেট থেকে একটি ছোটো এনামেল- করা সোনার কার্ড-কেস খুলে তার ভিতর থেকে এক-টুকরো কাগজ বের করে দিলে। তাতে লেখা আছে, 'আমি চললুম, আমাকে খুঁজতে চেষ্টা কোরো না। করলেও খোঁজ পাবে না।'

সেই অক্ষর, সেই লেখা, সেই তারিখ এবং যে নীলরঙের চিঠির কাগজের অর্ধেকখানা আমার কাছে এই টুকরোটি তারই বাকি অর্ধেক।

আষাঢ়, ১৩২৪

পাত্র ও পাত্রী

ইতিপূর্বে প্রজাপতি কখনো আমার কপালে বসেন নি বটে, কিন্তু একবার আমার মানসপদ্মে বসেছিলেন। তখন আমার বয়স ষোলো। তার পরে, কাঁচা ঘুমে চমক লাগিয়ে দিলে যেমন ঘুম আর আসতে চায় না, আমার সেই দশা হল। আমার বন্ধুবান্ধবরা কেউ কেউ দারপরিগ্রহ ব্যাপারে দ্বিতীয়, এমন-কি, তৃতীয় পক্ষে প্রোমোশন

পেলেন ; আমি কৌমার্যের লাস্ট্ বেঞ্চিতে বসে শূন্য সংসারের কড়িকাঠ গণনা করে কাটিয়ে দিলুম।

আমি চোদ্দ বছর বয়সে এন্‌ট্রেন্স পাস করেছিলুম। তখন বিবাহ কিম্বা এন্‌ট্রেন্স পরীক্ষায় বয়সবিচার ছিল না। আমি কোনোদিন পড়ার বই গিলি নি, সেইজন্যে শারীরিক বা মানসিক অজীর্ণ রোগে আমাকে ভুগতে হয় নি। ইঁদুর যেমন দাঁত বসাবার জিনিস পেলেই সেটাকে কেটে-কুটে ফেলে, তা সেটা খাদ্যই হোক আর অখাদ্যই হোক, শিশুকাল থেকেই তেমনি ছাপার বই দেখলেই সেটা পড়ে ফেলা আমার স্বভাব ছিল। সংসারে পড়ার বইয়ের চেয়ে না-পড়ার বইয়ের সংখ্যা ঢের বেশি, এইজন্যে আমার পুঁথির সৌরজগতে স্কুল-পাঠ্য পৃথিবীর চেয়ে বেস্কুল-পাঠ্য সূর্য চোদ্দ লক্ষগুণে বড়ো ছিল। তবু, আমার সংস্কৃত-পণ্ডিতমশায়ের নিদারুণ ভবিষ্যদ্‌বাণী সত্ত্বেও, আমি পরীক্ষায় পাস করেছিলুম।

আমার বাবা ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তখন আমরা ছিলেম সাতক্ষীরায় কিম্বা জাহানাবাদে কিম্বা ঐরকম কোনো-একটা জায়গায়। গোড়াতেই ব'লে রাখা ভালো, দেশ কাল এবং পাত্র সম্বন্ধে আমার এই ইতিহাসে যে-কোনো স্পষ্ট উল্লেখ থাকবে তার সবগুলোই সুস্পষ্ট মিথ্যা; যাঁদের রসবোধের চেয়ে কৌতূহল বেশি তাঁদের ঠকতে হবে। বাবা তখন তদন্তে বেরিয়েছিলেন। মায়ের ছিল কী-একটা ব্রত ; দক্ষিণা এবং ভোজনব্যবস্থার জন্য ব্রাহ্মণ তাঁর দরকার। এইরকম পারমার্থিক প্রয়োজনে আমাদের পণ্ডিতমশায় ছিলেন মায়ের প্রধান সহায়। এইজন্য মা তাঁর কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন, যদিচ বাবার মনের ভাব ছিল ঠিক তার উলটো।

আজ আহারান্তে দানদক্ষিণার যে ব্যবস্থা হল তার মধ্যে আমিও তালিকাভুক্ত হলুম। সে পক্ষে যে-আলোচনা হয়েছিল তার মর্মটা এই— আমার তো কল্‌কাতায় কলেজে যাবার সময় হল। এমন অবস্থায় পুত্রবিচ্ছেদদুঃখ দূর করবার জন্যে একটা সদুপায় অবলম্বন করা কর্তব্য। যদি একটি শিশুবধূ মায়ের কোলের কাছে থাকে তবে তাকে মানুষ ক'রে, যত্ন ক'রে তাঁর দিন কাটতে পারে। পণ্ডিতমশায়ের মেয়ে কাশীশ্বরী এই কাজের পক্ষে উপযুক্ত— কারণ, সে শিশুও বটে, সুশীলাও বটে, আর কুলশাস্ত্রের গণিতে তার সঙ্গে আমার অঙ্কে অঙ্কে মিল। তা ছাড়া ব্রাহ্মণের কন্যাদায়মোচনের পারমার্থিক ফলও লোভের সামগ্রী।

মায়ের মন বিচলিত হল। মেয়েটিকে একবার দেখা কর্তব্য এমন আভাস দেবামাত্র পণ্ডিতমশায় বললেন, তাঁর 'পরিবার' কাল রাত্রেই মেয়েটিকে নিয়ে বাসায় এসে পৌঁচেছেন। মায়ের পছন্দ হতে দেরি হল না; কেননা, রুচির সঙ্গে পুণ্যের

বাটখারার যোগ হওয়াতে সহজেই ওজন ভারি হল। মা বললেন, মেয়েটি সুলক্ষণা—অর্থাৎ, যথেষ্টপরিমাণ সুন্দরী না হলেও সান্ত্বনার কারণ আছে।

কথাটা পরম্পরায় আমার কানে উঠল। যে-পণ্ডিতমশায়ের ধাতুরূপকে বরাবর ভয় করে এসেছি তাঁরই কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ— এরই বিসদৃশতা আমার মনকে প্রথমেই প্রবল বেগে আকর্ষণ করলে। রূপকথার গল্পের মতো হঠাৎ সুবন্ত-প্রকরণ যেন তার সমস্ত অনুস্বার বিসর্গ ঝেড়ে ফেলে একেবারে রাজকন্যা হয়ে উঠল।

একদিন বিকেলে মা তাঁর ঘরে আমাকে ডাকিয়ে বললেন, "সনু, পণ্ডিতমশায়ের বাসা থেকে আম আর মিষ্টি এসেছে, খেয়ে দেখ্।"

মা জানতেন, আমাকে পঁচিশটা আম খেতে দিলে আর-পঁচিশটার দ্বারা তার পাদপূরণ করলে তবে আমার ছন্দ মেলে। তাই তিনি রসনার সরস পথ দিয়ে আমার হৃদয়কে আহ্বান করলেন। কাশীশ্বরী তাঁর কোলে বসেছিল। স্মৃতি অনেকটা অস্পষ্ট হয়ে এসেছে, কিন্তু মনে আছে—রাঙতা দিয়ে তার খোঁপা মোড়া, আর গায়ে কলকাতার দোকানের এক সাটিনের জ্যাকেট— সেটা নীল এবং লাল এবং লেস্ এবং ফিতের একটা প্রত্যক্ষ প্রলাপ। যতটা মনে পড়ছে— রঙ শামলা; ভুরু-জোড়া খুব ঘন; এবং চোখদুটো পোষা প্রাণীর মতো, বিনা সংকোচে তাকিয়ে আছে। মুখের বাকি অংশ কিছুই মনে পড়ে না— বোধ হয় বিধাতার কারখানায় তার গড়ন তখনো সারা হয় নি, কেবল একমেটে করে রাখা হয়েছে। আর যাই হোক, তাকে দেখতে নেহাত ভালোমানুষের মতো।

আমার বুকের ভিতরটা ফুলে উঠল। মনে মনে বুঝলুম, ঐ রাঙতা-জড়ানো বেণীওয়ালা জ্যাকেট-মোড়া সামগ্রীটি ষোলো-আনা আমার— আমি ওর প্রভু, আমি ওর দেবতা। অন্য সমস্ত দুর্লভ সামগ্রীর জন্যেই সাধনা করতে হয়, কেবল এই একটি জিনিসের জন্য নয়; আমি কড়ে আঙুল নড়ালেই হয়; বিধাতা এই বর দেবার জন্যে আমাকে সেধে বেড়াচ্ছেন। মা'কে যে আমি বরাবর দেখে আসছি, স্ত্রী বলতে কী বোঝায় তা আমার ঐ সূত্রে জানা ছিল। দেখেছি, বাবা অন্য সমস্ত ব্রতের উপর চটা ছিলেন কিন্তু সাবিত্রীব্রতের বেলায় তিনি মুখে যাই বলুন, মনে মনে বেশ একটু আনন্দ বোধ করতেন। মা তাঁকে ভালোবাসতেন তা জানি, কিন্তু কিসে বাবা রাগ করবেন, কিসে তাঁর বিরক্তি হবে, এইটেকে মা যে একান্ত মনে ভয় করতেন, এরই রসটুকু বাবা তাঁর সমস্ত পৌরুষ দিয়ে সব-চেয়ে উপভোগ করতেন। পূজাতে দেবতাদের বোধ হয় বড়ো-একটা-কিছু আসে যায় না, কেননা সেটা তাঁদের বৈধ বরাদ্দ। কিন্তু মানুষের নাকি ওটা অবৈধ পাওনা, এইজন্যে ঐটের লোভে তাদের অসামাল করে। সেই বালিকার

রূপগুণের টান সেদিন আমার উপরে পৌঁছয় নি, কিন্তু আমি যে পূজনীয় সে কথাটা সেই চোদ্দ বছর বয়সে আমার পুরুষের রক্তে গাঁজিয়ে উঠল। সেদিন খুব গৌরবের সঙ্গেই আমগুলো খেলুম, এমন-কি সগর্বে তিনটে আম পাতে বাকি রাখলুম, যা আমার জীবনে কখনো ঘটে নি; এবং তার জন্যে সমস্ত অপরাহ্ণকালটা অনুশোচনায় গেল।

সেদিন কাশীশ্বরী খবর পায় নি আমার সঙ্গে তার সম্বন্ধটা কোন্ শ্রেণীর— কিন্তু বাড়ি গিয়েই বোধ হয় জানতে পেরেছিল। তার পরে যখনই তার সঙ্গে দেখা হত সে শশব্যস্ত হয়ে লুকোবার জায়গা পেত না। আমাকে দেখে তার এই ত্রস্ততা আমার খুব ভালো লাগত। আমার আবির্ভাব বিশ্বের কোনো-একটা জায়গায় কোনো-একটা আকারে খুব একটা প্রবল প্রভাব সঞ্চার করে, এই জৈব-রাসায়নিক তথ্যটা আমার কাছে বড়ো মনোরম ছিল। আমাকে দেখেও যে কেউ ভয় করে বা লজ্জা করে, বা কোনো একটা-কিছু করে, সেটা বড়ো অপূর্ব। কাশীশ্বরী তার পালানোর দ্বারাই আমাকে জানিয়ে যেত, জগতের মধ্যে সে বিশেষভাবে সম্পূর্ণভাবে এবং নিগূঢ়ভাবে আমারই।

এতকালের অকিঞ্চিৎকরতা থেকে হঠাৎ এক মুহূর্তে এমন একান্ত গৌরবের পদ লাভ ক'রে কিছুদিন আমার মাথার মধ্যে রক্ত ঝাঁঝাঁ করতে লাগল। বাবা যেরকম মাকে কর্তব্যের বা রন্ধনের বা ব্যবস্থার ত্রুটি নিয়ে সর্বদা ব্যাকুল করে তুলেছেন, আমিও মনে মনে তারই ছবির উপরে দাগা বুলোতে লাগলুম। বাবার অনভিপ্রেত কোনো-একটা লক্ষ্য সাধন করবার সময় মা যে-রকম সাবধানে নানাপ্রকার মনোহর কৌশলে কাজ উদ্ধার করতেন, আমি কল্পনায় কাশীশ্বরীকেও সেই পথে প্রবৃত্ত হতে দেখলুম। মাঝে মাঝে মনে মনে তাকে অকাতরে এবং অকস্মাৎ মোটা অঙ্কের ব্যাঙ্‌নোট থেকে আরম্ভ ক'রে হীরের গয়না পর্যন্ত দান করতে আরম্ভ করলুম। এক-একদিন ভাত খেতে ব'সে তার খাওয়াই হল না এবং জানলার ধারে ব'সে আঁচলের খুঁট দিয়ে সে চোখের জল মুছছে, এই করুণ দৃশ্যও আমি মনশ্চক্ষে দেখতে পেলুম এবং এটা যে আমার কাছে অত্যন্ত শোচনীয় বোধ হল তা বলতে পারি নে। ছোটো ছেলেদের আত্মনির্ভরতার সম্বন্ধে বাবা অত্যন্ত বেশি সতর্ক ছিলেন। নিজের ঘর ঠিক করা, নিজের কাপড়চোপড় রাখা, সমস্তই আমাকে নিজের হাতে করতে হত। কিন্তু আমার মনের মধ্যে গার্হস্থ্যের যে-চিত্রগুলি স্পষ্ট রেখায় জেগে উঠল, তার মধ্যে একটি নিচে লিখে রাখছি। বলা বাহুল্য, আমার পৈতৃক ইতিহাসে ঠিক এইরকম ঘটনাই পূর্বে একদিন ঘটেছিল; এই কল্পনার মধ্যে আমার ওরিজিন্যালিটি কিছুই নেই। চিত্রটি এই— রবিবারে মধ্যাহ্নভোজনের পর আমি খাটের উপর বালিশে ঠেসান দিয়ে পা ছড়িয়ে আধ-শোওয়া অবস্থায় খবরের কাগজ পড়ছি। হাতে গুড়গুড়ির নল। ঈষৎ তন্দ্রাবেশে নলটা নিচে পড়ে গেল।

বারান্দায় বসে কাশীশ্বরী ধোবাকে কাপড় দিচ্ছিল, আমি তাকে ডাক দিলুম; সে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে আমার হাতে নল তুলে দিলে। আমি তাকে বললুম, 'দেখো, আমার বসবার ঘরের বাঁদিকের আল্‌মারির তিনের থাকে একটা নীল রঙের মলাট-দেওয়া মোটা ইংরাজি বই আছে, সেইটে নিয়ে এসো তো।' কাশী একটা নীল রঙের বই এনে দিলে; আমি বললুম 'আঃ, এটা নয়; সে এর চেয়ে মোটা, আর তার পিঠের দিকে সোনালি অক্ষরে নাম লেখা।' এবারে সে একটা সবুজ রঙের বই আনলে— সেটা আমি ধপাস্‌ করে মেঝের উপর ফেলে দিয়ে রেগে উঠে পড়লুম। তখন কাশীর মুখ এতটুকু হয়ে গেল এবং তার চোখ ছল্‌ছল্‌ করে উঠল। আমি গিয়ে দেখলুম, তিনের শেল্‌ফে বইটা নেই, সেটা আছে পাঁচের শেল্‌ফে। বইটা হাতে করে নিয়ে এসে নিঃশব্দে বিছানায় শুলুম কিন্তু কাশীকে ভুলের কথা কিছু বললুম না। সে মাথা হেঁট করে বিমর্ষ হয়ে ধোবাকে কাপড় দিতে লাগল এবং নির্বুদ্ধিতার দোষে স্বামীর বিশ্রামে ব্যাঘাত করেছে, এই অপরাধ কিছুতেই ভুলতে পারলে না।

বাবা ডাকাতি তদন্ত করছেন, আর আমার এইভাবে দিন যাচ্ছে। এ দিকে আমার সম্বন্ধে পণ্ডিতমশায়ের ব্যবহার আর ভাষা এক মুহূর্তে কর্তৃবাচ্য থেকে ভাববাচ্যে এসে পৌঁছল এবং সেটা নিরতিশয় সম্ভাববাচ্য।

এমন সময় ডাকাতি তদন্ত শেষ হয়ে গেল, বাবা ঘরে ফিরে এলেন। আমি জানি, মা আস্তে আস্তে সময় নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বাবার বিশেষ প্রিয় তরকারি-রান্নার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে সইয়ে সইয়ে কথাটাকে পাড়বেন বলে প্রস্তুত হয়ে ছিলেন। বাবা পণ্ডিতমশায়কে অর্থলুব্ধ ব'লে ঘৃণা করতেন; মা নিশ্চয়ই প্রথমে পণ্ডিতমশায়ের মৃদুরকম নিন্দা অথচ তাঁর স্ত্রী ও কন্যার প্রচুর রকমের প্রশংসা করে কথাটার গোড়াপত্তন করতেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে পণ্ডিতমশায়ের আনন্দিত প্রগল্‌ভতায় কথাটা চারি দিকে ছড়িয়ে গিয়েছিল। বিবাহ যে পাকা, দিনক্ষণ দেখা চলছে, এ কথা তিনি কাউকে জানাতে বাকি রাখেন নি। এমন-কি, বিবাহকালে সেরেস্তাদার বাবুর পাকা দালানটি কয়দিনের জন্যে তাঁর প্রয়োজন হবে, যথাস্থানে সে আলোচনাও তিনি সেরে রেখেছেন। শুভকর্মে সকলেই তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে সম্মত হয়েছে। বাবার আদালতের উকিলের দল চাঁদা করে বিবাহের ব্যয় বহন করতেও রাজি। স্থানীয় এন্‌ট্রেন্স-স্কুলের সেক্রেটারি বীরেশ্বরবাবুর তৃতীয় ছেলে তৃতীয় ক্লাসে পড়ে, সে চাঁদ ও কুমুদের রূপক অবলম্বন করে এরই মধ্যে বিবাহসম্বন্ধে ত্রিপদীছন্দে একটা কবিতা লিখেছে। সেক্রেটারিবাবু সেই কবিতাটা নিয়ে রাস্তায় ঘাটে যাকে পেয়েছেন তাকে ধরে ধরে শুনিয়েছেন। ছেলেটির সম্বন্ধে গ্রামের লোক খুব আশান্বিত হয়ে উঠেছে।

সুতরাং ফিরে এসেই বাইরে থেকেই বাবা শুভসংবাদ শুনতে পেলেন। তার পরে মায়ের কান্না এবং অনাহার, বাড়ির সকলের ভীতিবিহ্বলতা, চাকরদের অকারণ জরিমানা, এজ্‌লাসে প্রবলবেগে মামলা ডিস্‌মিস এবং প্রচণ্ড তেজে শাস্তিদান, পণ্ডিত-মশায়ের পদচ্যুতি এবং বাণ্ডতা-জড়ানো বেণী-সহ কাশীশ্বরীকে নিয়ে তাঁর অন্তর্ধান; এবং ছুটি ফুরোবার পূর্বেই মাতৃসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আমাকে সবলে কলকাতায় নির্বাসন। আমার মনটা ফাটা ফুটবলের মতো চুপসে গেল— আকাশে আকাশে, হাওয়ার উপরে তার লাফালাফি একেবারে বন্ধ হল।

আমার পরিণয়ের পথে গোড়াতেই এই বিঘ্ন-- তার পরে আমার প্রতি বারে-বারেই প্রজাপতির ব্যর্থ-পক্ষপাত ঘটেছে। তার বিস্তারিত বিবরণ দিতে ইচ্ছা করি নে — আমার এই বিফলতার ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত নোট দুটো-একটা রেখে যাব। বিশ বছর বয়সের পূর্বেই আমি পুরা দমে এম্‌-এ পরীক্ষা পাস করে চোখে চশমা পরে এবং গোঁফের রেখাটাকে তা দেবার যোগ্য করে বেরিয়ে এসেছি। বাবা তখন রামপুরহাট কিম্বা নোয়াখালি কিম্বা বারাসত কিম্বা ঐরকম কোনো-একটা জায়গায়। এতদিন তো শব্দসাগর মন্থন করে ডিগ্রিরত্ন পাওয়া গেল, এবার অর্থসাগর-মন্থনের পালা। বাবা তাঁর বড়ো বড়ো পেট্রন সাহেবদের স্মরণ করতে গিয়ে দেখলেন, তাঁর সব-চেয়ে বড়ো সহায় যিনি তিনি পরলোকে, তাঁর চেয়ে যিনি কিছু কম তিনি পেন্সন নিয়ে বিলেতে, যিনি আরও কমজোরী তিনি পাঞ্জাবে বদলি হয়েছেন, আর যিনি বাংলাদেশে বাকি আছেন তিনি অধিকাংশ উমেদারকেই উপক্রমণিকায় আশ্বাস দেন কিন্তু উপসংহারে সেটা সংহরণ করেন। আমার পিতামহ যখন ডিপুটি ছিলেন তখন মুরুব্বির বাজার এমন কষা ছিল না তাই তখন চাকরি থেকে পেন্‌সন্‌ এবং পেন্‌সন্‌ থেকে চাকরি একই বংশে খেয়া-পারাপারের মতো চলত। এখন দিন খারাপ, তাই বাবা যখন উদ্‌বিগ্ন হয়ে ভাবছিলেন যে, তাঁর বংশধর গভর্মেণ্ট আপিসের উচ্চ খাঁচা থেকে সওদাগরি আপিসের নিম্ন দাঁড়ে অবতরণ করবে কি না, এমন সময় এক ধনী ব্রাহ্মণের একমাত্র কন্যা তাঁর নোটিশে এল। ব্রাহ্মণটি কন্‌ট্র্যাক্টর, তাঁর অর্থাগমের পথটি প্রকাশ্য ভূতলের চেয়ে অদৃশ্য রসাতলের দিক দিয়েই প্রশস্ত ছিল। তিনি সে সময়ে বড়োদিন উপলক্ষ্যে কমলা লেবু ও অন্যান্য উপহারসামগ্রী যথাযোগ্য পাত্রে বিতরণ করতে ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময়ে তাঁর পাড়ায় আমার অভ্যুদয় হল। বাবার বাসা ছিল তাঁর বাড়ির সামনেই, মাঝে ছিল এক রাস্তা। বলা বাহুল্য, ডেপুটির এম-এ-পাস-করা ছেলে কন্যাদায়িকের পক্ষে খুব

'প্রাংশুলভ্য ফল'। এইজন্যে কন্‌ট্র্যাক্টর বাবু আমার প্রতি 'উদ্বাহু' হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর বাহু আধুলিলম্বিত ছিল সে পরিচয় পূর্বেই দিয়েছি— অন্তত সে বাহু ডেপুটিবাবুর হৃদয় পর্যন্ত অতি অনায়াসে পৌঁছল। কিন্তু, আমার হৃদয়টা তখন আরও অনেক উপরে ছিল।

কারণ, আমার বয়স তখন কুড়ি পেরোয়-পেরোয়; তখন খাঁটি স্ত্রীরত্ন ছাড়া অন্য কোনো রত্নের প্রতি আমার লোভ ছিল না। শুধু তাই নয়, তখনো ভাবুকতার দীপ্তি আমার মনে উজ্জ্বল। অর্থাৎ, সহধর্মিণী শব্দের যে-অর্থ আমার মনে ছিল সে-অর্থটা বাজারে চলিত ছিল না। বর্তমান কালে আমাদের দেশে সংসারটা চার দিকেই সংকুচিত; মননসাধনের বেলায় মনকে জ্ঞান ও ভাবের উদার ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত করে রাখা আর ব্যবহারের বেলায় তাকে সেই সংসারের অতি ছোটো মাপে কৃশ করে আনা, এ আমি মনে মনেও সহ্য করতে পারতুম না। যে-স্ত্রীকে আইডিয়ালের পথে সঙ্গিনী করতে চাই সেই স্ত্রী ঘরকন্নার গারদে পায়ের বেড়ি হয়ে থাকবে এবং প্রত্যেক চলাফেরায় ঝংকার দিয়ে পিছনে টেনে রাখবে, এমন দুর্গ্রহ আমি স্বীকার করে নিতে নারাজ ছিলুম। আসল কথা, আমাদের দেশের প্রহসনে যাদের আধুনিক বলে বিদ্রূপ করে কলেজ থেকে টাটকা বেরিয়ে আমি সেইরকম নিরবচ্ছিন্ন আধুনিক হয়ে উঠেছিলুম। আমাদের কালে সেই আধুনিকের দল এখনকার চেয়ে অনেক বেশি ছিল। আশ্চর্য এই যে, তারা সত্যই বিশ্বাস করত যে, সমাজকে মেনে চলাই দুর্গতি এবং তাকে টেনে চলাই উন্নতি।

এ-হেন আমি শ্রীযুক্ত সনৎকুমার, একটি বলশালী কন্যাদায়িকের টাকার থলির হাঁ-করা মুখের সামনে এসে পড়লুম। বাবা বললেন, শুভস্য শীঘ্রং। আমি চুপ করে রইলুম; মনে মনে ভাবলুম, একটু দেখে-শুনে বুঝে-পড়ে নিই। চোখ কান খুলে রাখলুম— কিছু পরিমাণ দেখা এবং অনেকটা পরিমাণ শোনা গেল। মেয়েটি পুতুলের মতো ছোটো এবং সুন্দর— সে যে স্বভাবের নিয়মে তৈরি হয়েছে তা তাকে দেখে মনে হয় না—কে যেন তার প্রত্যেক চুলটি পাট ক'রে, তার ভুরুটি এঁকে, তাকে হাতে করে গ'ড়ে তুলেছে। সে সংস্কৃতভাষায় গঙ্গার স্তব আবৃত্তি করে পড়তে পারে। তার মা পাথুরে কয়লা পর্যন্ত গঙ্গার জলে ধুয়ে তবে রাঁধেন; জীবধাত্রী বসুন্ধরা নানা জাতকে ধারণ করেন বলে পৃথিবীর সংস্পর্শ সম্বন্ধে তিনি সর্বদাই সংকুচিত; তাঁর অধিকাংশ ব্যবহার জলেরই সঙ্গে, কারণ জলচর মৎস্যরা মুসলমান-বংশীয় নয় এবং জলে পেঁয়াজ উৎপন্ন হয় না। তাঁর জীবনের সর্বপ্রধান কাজ আপনার দেহকে গৃহকে কাপড়চোপড় হাঁড়িকুঁড়ি খাটপালঙ্ক বাসনকোসনকে শোধন এবং মার্জন করা।

তাঁর সমস্ত কৃত্য সমাপন করতে বেলা আড়াইটে হয়ে যায়। তাঁর মেয়েটিকে তিনি স্বহস্তে সর্বাংশে এমনি পরিশুদ্ধ করে তুলেছেন যে, তার নিজের মত বা নিজের ইচ্ছা বলে কোনো উৎপাত ছিল না। কোনো ব্যবস্থায় যত অসুবিধাই হোক, সেটা পালন করা তার পক্ষে সহজ হয় যদি তার কোনো সংগত কারণ তাকে বুঝিয়ে না দেওয়া যায়। সে খাবার সময় ভালো কাপড় পরে না পাছে সকড়ি হয়; সে ছায়া সম্বন্ধেও বিচার করতে শিখেছে। সে যেমন পাল্কির ভিতরে বসেই গঙ্গাস্নান করে, তেমনি অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে আবৃত থেকে সংসারে চলে ফেরে। বিধি-বিধানের 'পরে আমারও মায়ের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল কিন্তু তাঁর চেয়ে আরও বেশি শ্রদ্ধা যে আর-কারও থাকবে এবং তাই নিয়ে সে মনে মনে গুমর করবে, এটা তিনি সইতে পারতেন না। এইজন্যে আমি যখন তাঁকে বললুম "মা, এ মেয়ের যোগ্যপাত্র আমি নই", তিনি হেসে বললেন, "না, কলিযুগে তেমন পাত্র মেলা ভার!"

আমি বললুম, "তা হলে আমি বিদায় নিই।"

মা বললেন, "সে কি, সুনু, তোর পছন্দ হল না? কেন, মেয়েটিকে তো দেখতে ভালো।"

আমি বললুম, "মা, স্ত্রী তো কেবল চেয়ে চেয়ে দেখবার জন্যে নয়, তার বুদ্ধি থাকাও চাই।"

মা বললেন, "শোনো একবার। এরই মধ্যে তুই তার কম বুদ্ধির পরিচয় কী পেলি।"

আমি বললুম, "বুদ্ধি থাকলে মানুষ দিনরাত এই-সব অনর্থক অকাজের মধ্যে বাঁচতেই পারে না। হাঁপিয়ে মরে যায়।"

মায়ের মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি জানেন, এই বিবাহ সম্বন্ধে বাবা অপর পক্ষে প্রায় পাকা কথা দিয়েছেন। তিনি আরও জানেন যে, বাবা এটা প্রায়ই ভুলে যান যে, অন্য মানুষেরও ইচ্ছে বলে একটা বালাই থাকতে পারে। বস্তুত, বাবা যদি অত্যন্ত বেশি রাগারাগি জবরদস্তি না করতেন তা হলে হয়তো কালক্রমে ঐ পৌরাণিক পুতুলকে বিবাহ করে আমিও একদিন প্রবল রোখে স্নান আহ্নিক এবং ব্রত-উপবাস করতে করতে গঙ্গাতীরে সদ্গতি লাভ করতে পারতুম। অর্থাৎ, মায়ের উপর যদি এই বিবাহ দেবার ভার থাকত তা হলে তিনি সময় নিয়ে, অতি ধীর মন্দ সুযোগে ক্ষণে ক্ষণে কানে মন্ত্র দিয়ে, ক্ষণে ক্ষণে অশ্রুপাত ক'রে কাজ উদ্ধার করে নিতে পারতেন। বাবা যখন কেবলই তর্জন গর্জন করতে লাগলেন আমি তাঁকে মরিয়া হয়ে বললুম, 'ছেলেবেলা থেকে খেতে-শুতে চলতে-ফিরতে আমাকে আত্মনির্ভরতার উপদেশ দিয়েছেন, কেবল বিবাহের বেলাতেই কি আত্মনির্ভর চলবে না।' কলেজে

লজিকে পাশ করবার বেলায় ছাড়া ন্যায়শাস্ত্রের জোরে কেউ কোনো দিন সফলতা লাভ করেছে, এ আমি দেখি নি। সংগত যুক্তি কুতর্কের আগুনে কখনো জলের মতো কাজ করে না, বরঞ্চ তেলের মতোই কাজ করে থাকে। বাবা ভেবে রেখেছেন তিনি অন্য পক্ষকে কথা দিয়েছেন, বিবাহের ঔচিত্য সম্বন্ধে এর চেয়ে বড়ো প্রমাণ আর কিছুই নেই। অথচ আমি যদি তাঁহাকে স্মরণ করিয়ে দিতুম যে, পণ্ডিতমশায়কে মাও একদিন কথা দিয়েছিলেন তবু সে কথায় শুধু যে আমার বিবাহ ফেঁসে গেল তা নয়, পণ্ডিতমশায়ের জীবিকাও তার সঙ্গে সহমরণে গেল— তা হলে এই উপলক্ষে একটা ফৌজদারি বাধত। বুদ্ধি বিচার এবং রুচির চেয়ে শুচিতা মন্ত্রতন্ত্র ক্রিয়াকর্ম যে ঢের ভালো, তার কবিত্ব যে সুগভীর ও সুন্দর, তার নিষ্ঠা যে অতি মহৎ, তার ফল যে অতি উত্তম, সিম্বলিজ্‌ম্‌টাই যে আইডিয়ালিজ্‌ম্‌, এ কথা বাবা আজকাল আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে সময়ে অসময়ে আলোচনা করেছেন। আমি রসনাকে থামিয়ে রেখেছি কিন্তু মনকে তো চুপ করিয়ে রাখতে পারি নি। যে-কথাটা মুখের আগার কাছে এসে ফিরে যেত সেটা হচ্ছে এই যে, 'এ-সব যদি আপনি মানেন তবে পালবার বেলায় মুরগি পালেন কেন।' আরও একটা কথা মনে আসত; বাবাই একদিন দিনক্ষণ পালপার্বণ বিধিনিষেধ দানদক্ষিণা নিয়ে তাঁর অসুবিধা বা ক্ষতি ঘটলে মাকে কঠোর ভাষায় এ-সব অনুষ্ঠানের পণ্ডতা নিয়ে তাড়না করেছেন। মা তখন দীনতা স্বীকার করে অবলাজাতি স্বভাবতই অবুঝ ব'লে মাথা হেঁট ক'রে বিরক্তির ধাক্কাটা কাটিয়ে দিয়ে ব্রাহ্মণভোজনের বিস্তারিত আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়েছেন। কিন্তু বিশ্বকর্মা লজিকের পাকা ছাঁচে ঢালাই করে জীব সৃজন করেন নি। অতএব কোনো মানুষের কথায় বা কাজে সংগতি নেই এ কথা বলে তাকে বাগিয়ে নেওয়া যায় না, রাগিয়ে দেওয়া হয় মাত্র। ন্যায়শাস্ত্রের দোহাই পাড়লে অন্যায়ের প্রচণ্ডতা বেড়ে ওঠে— যারা পোলিটিকাল বা গার্হস্থ্য অ্যাজিটেশনে শ্রদ্ধাবান তাদের এ কথাটা মনে রাখা উচিত। ঘোড়া যখন তার পিছনের গাড়িটাকে অন্যায় মনে ক'রে তার উপরে লাথি চালায় তখন অন্যায়টা তো থেকেই যায়, মাঝের থেকে তার পা'কেও জখম করে। যৌবনের আবেগে অল্প একটুখানি তর্ক করতে গিয়ে আমার সেই দশা হল। পৌরাণিকী মেয়েটির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেল বটে, কিন্তু বাবার আধুনিক যুগের তহবিলের আশ্রয়ও খোওয়ালুম। বাবা বললেন, "যাও, তুমি আত্মনির্ভর করো গে।"

আমি প্রণাম করে বললুম, "যে আজ্ঞে।"

মা বসে বসে কাঁদতে লাগলেন।

বাবার দক্ষিণ হস্ত বিমুখ হল বটে কিন্তু মাঝখানে মা থাকাতে ক্ষণে ক্ষণে

মানি-অর্ডারের পেয়াদার দেখা পাওয়া যেত। মেঘ বর্ষণ বন্ধ করে দিলে, কিন্তু গোপনে স্নিগ্ধ রাত্রে শিশিরের অভিষেক চলতে লাগল। তারই জোরে ব্যবসা শুরু করে দিলুম। ঠিক উন-আশি টাকা দিয়ে গোড়াপত্তন হল; আজ সেই কারবারে যে-মূলধন খাটছে তা ঈর্ষাকাতর জনশ্রুতির চেয়ে অনেক কম হলেও, বিশ লক্ষ টাকার চেয়ে কম নয়।

প্রজাপতির পেয়াদারা আমার পিছন পিছন ফিরতে লাগল। আগে যে-সব দ্বার বন্ধ ছিল এখন তার আর আগল রইল না। মনে আছে, একদিন যৌবনের দুর্নিবার দুরাশায় একটি ষোড়শীর প্রতি (বয়সের অঙ্কটা এখনকার নিষ্ঠাবান পাঠকদের ভয়ে কিছু সহনীয় করে বললুম) আমার হৃদয়কে উন্মুখ করেছিলুম কিন্তু খবর পেয়েছিলুম, কন্যার মাতৃপক্ষ লক্ষ্য করে আছেন সিবিলিয়ানের প্রতি— অন্তত ব্যারিস্টারের নিচে তাঁর দৃষ্টি পৌঁছয় না। আমি তাঁর মনোযোগ-মীটরের জিরো-পয়েন্টের নিচে ছিলুম। কিন্তু, পরে সেই ঘরেই অন্য একদিন শুধু চা নয়, লাঞ্চ খেয়েছি, রাত্রে ডিনারের পর মেয়েদের সঙ্গে হুইস্‌ট্‌ খেলেছি, তাদের মুখে বিলেতের একেবারে খাস মহলের ইংরেজি ভাষার কথাবার্তা শুনেছি। আমার মুশকিল এই যে, র‍্যাসেলাস, ডেজার্টেড ভিলেজ এবং অ্যাডিসন্‌ স্টীল প'ড়ে আমি ইংরিজি পাকিয়েছি, এই মেয়েদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া আমার কর্ম নয়। O my, O dear O dear প্রভৃতি উদ্ভাষণগুলো আমার মুখ দিয়ে ঠিক সুরে বেরোতেই চায় না। আমার যতটুকু বিদ্যা তাতে আমি অত্যন্ত হাল ইংরেজি ভাষায় বড়োজোর হাটে-বাজারে কেনা-বেচা করতে পারি, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর ইংরিজিতে প্রেমালাপ করার কথা মনে করলে আমার প্রেমই দৌড় মারে। অথচ এদের মুখে বাংলাভাষার যেরকম দুর্ভিক্ষ তাতে এদের সঙ্গে খাঁটি বঙ্কিমি সুরে মধুরালাপ করতে গেলে ঠকতে হবে। তাতে মজুরি পোষাবে না। তা যাই হোক, এই-সব বিলিতি গিল্‌ট-করা মেয়ে একদিন আমার পক্ষে সুলভ হয়েছিল। কিন্তু রুদ্ধ দরজার ফাঁকের থেকে যে মায়াপুরী দেখেছিলুম দরজা যখন খুলল তখন আর তার ঠিকানা পেলুম না। তখন আমার কেবল মনে হতে লাগল, সেই যে আমার ব্রতচারিণী নিরর্থক নিয়মের নিরন্তর পুনরাবৃত্তির পাকে অহোরাত্র ঘুরে ঘুরে আপনার জড়বুদ্ধিকে তৃপ্ত করত, এই মেয়েরাও ঠিক সেই বুদ্ধি নিয়েই বিলিতি চালচলন আদবকায়দার সমস্ত তুচ্ছাতিতুচ্ছ উপসর্গগুলিকে প্রদক্ষিণ করে দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, অনায়াসে অক্লান্তচিত্তে কাটিয়ে দিচ্ছে। তারাও যেমন ছোঁয়া ও নাওয়ার লেশমাত্র স্খলন দেখলে অশ্রদ্ধায় কণ্টকিত হয়ে উঠত, এরাও তেমনি এক্‌সেন্টের একটু খুঁত কিম্বা কাঁটা-চাম্‌চের অল্প বিপর্যয় দেখলে ঠিক তেমনি করেই অপরাধীর মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে ওঠে। তারা দিশি পুতুল, এরা

বিলিতি পুতুল। মনের গতিবেগে এরা চলে না, অভ্যাসের দম-দেওয়া কলে এদের চালায়। ফল হল এই যে, মেয়েজাতের উপরেই আমার মনে মনে অশ্রদ্ধা জন্মাল; আমি ঠিক করলুম, ওদের বুদ্ধি যখন কম তখন স্নান-আচমন-উপবাসের অকর্ম-কাণ্ড প্রকাণ্ড না হলে ওরা বাঁচে কী করে। বইয়ে পড়েছি, একরকম জীবাণু আছে সে ক্রমাগতই ঘোরে। কিন্তু, মানুষ ঘোরে না, মানুষ চলে। সেই জীবাণুর পরিবর্ধিত সংস্করণের সঙ্গেই কি বিধাতা হতভাগ্য পুরুষমানুষের বিবাহের সম্বন্ধ পাতিয়েছেন।

এ দিকে বয়স যত বাড়তে চলল বিবাহ সম্বন্ধে দ্বিধাও তত বেড়ে উঠল। মানুষের একটা বয়স আছে যখন সে চিন্তা না করেও বিবাহ করতে পারে। সে বয়স পেরোলে বিবাহ করতে দুঃসাহসিকতার দরকার হয়। আমি সেই বেপরোয়া দলের লোক নই। তা ছাড়া কোনো প্রকৃতিস্থ মেয়ে বিনা কারণে এক নিশ্বাসে আমাকে কেন যে বিয়ে করে ফেলবে আমি তা কিছুতেই ভেবে পাই নে। শুনেছি, ভালোবাসা অন্ধ, কিন্তু এখানে সেই অন্ধের উপর তো কোনো ভার নেই। সংসারবুদ্ধির দুটো চোখের চেয়ে আরও বেশি চোখ আছে— সেই চক্ষু যখন বিনা নেশায় আমার দিকে তাকিয়ে দেখে তখন আমার মধ্যে কী দেখতে পায় আমি তাই ভাবি। আমার গুণ নিশ্চয়ই অনেক আছে, কিন্তু সেগুলো তো ধরা পড়তে দেরি লাগে, এক চাহনিতেই বোঝা যায় না। আমার নাসার মধ্যে যে খর্বতা আছে বুদ্ধির উন্নতি তা পূরণ করেছে জানি, কিন্তু নাসাটাই থাকে প্রত্যক্ষ হয়ে, আর ভগবান বুদ্ধিকে নিরাকার করে রেখে দিলেন। যাই হোক, যখন দেখি, কোনো সাবালক মেয়ে অত্যল্প কালের নোটিশেই আমাকে বিয়ে করতে অত্যল্পমাত্র আপত্তি করে না, তখন মেয়েদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও কমে। আমি যদি মেয়ে হতুম তা হলে শ্রীযুৎ সনৎকুমারের নিজের খর্ব নাসার দীর্ঘনিশ্বাসে তার আশা এবং অহংকার ধূলিসাৎ হতে থাকত।

এমনি করে আমার বিবাহের বোঝাই-হীন নৌকাটা মাঝে মাঝে চড়ায় ঠেকেছে কিন্তু ঘাটে এসে পৌঁছয় নি। স্ত্রী ছাড়া সংসারের অন্যান্য উপকরণ ব্যাবসার উন্নতির সঙ্গে বেড়ে চলতে লাগল। একটা কথা ভুলে ছিলুম, বয়সও বাড়ছে। হঠাৎ একটা ঘটনায় সে কথা মনে করিয়ে দিলে।

অভ্রের খনির তদন্তে ছোটোনাগপুরের এক শহরে গিয়ে দেখি, পণ্ডিতমশায় সেখানে শালবনের ছায়ায় ছোট্ট একটি নদীর ধারে দিব্যি বাসা বেঁধে বসে আছেন। তাঁর ছেলে সেখানে কাজ করে। সেই শালবনের প্রান্তে আমার তাঁবু পড়েছিল। এখন দেশ জুড়ে আমার ধনের খ্যাতি। পণ্ডিতমশায় বললেন, কালে আমি যে অসামান্য হয়ে উঠব, এ তিনি পূর্বেই জানতেন। তা হবে, কিন্তু আশ্চর্যরকম গোপন করে রেখেছিলেন।

তা ছাড়া কোন্ লক্ষণের দ্বারা জেনেছিলেন আমি তো তা বলতে পারি নে। বোধ করি অসামান্য লোকদের ছাত্র-অবস্থায় যত্নতত্ত্ব জ্ঞান থাকে না। কাশীশ্বরী শ্বশুরবাড়িতে ছিল, তাই বিনা বাধায় আমি পণ্ডিতমশায়ের ঘরের লোক হয়ে উঠলুম। কয়েক বৎসর পূর্বে তাঁর স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে— কিন্তু তিনি নাতনিতে পরিবৃত। সবগুলি তাঁর স্বকীয়া নয়, তার মধ্যে দুটি ছিল তাঁর পরলোকগত দাদার। বৃদ্ধ এদের নিয়ে আপনার বার্ধক্যের অপরাহ্ণকে নানা রঙে রঙিন করে তুলেছেন। তাঁর অমরুশতক আর্যাসপ্তশতী হংসদূত পদাঙ্কদূতের শ্লোকের ধারা নুড়িগুলির চার দিকে গিরিনদীর ফেনোচ্ছল প্রবাহের মতো এই মেয়েগুলিকে ঘিরে ঘিরে সহাস্যে ধ্বনিত হয়ে উঠছে।

আমি হেসে বললুম, "পণ্ডিতমশায়, ব্যাপারখানা কী!"

তিনি বললেন, "বাবা, তোমাদের ইংরাজি শাস্ত্রে বলে যে, শনিগ্রহ চাঁদের মালা পরে থাকেন— এই আমার সেই চাঁদের মালা।"

সেই দরিদ্র ঘরের এই দৃশ্যটি দেখে হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল, আমি একা। বুঝতে পারলুম, আমি নিজের ভারে নিজে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। পণ্ডিতমশায় জানেন না যে তাঁর বয়স হয়েছে, কিন্তু আমার যে হয়েছে সে আমি স্পষ্ট জানলুম। বয়স হয়েছে বলতে এইটে বোঝায়, নিজের চারি দিককে ছাড়িয়ে এসেছি— চার পাশে ঢিলে হয়ে ফাঁক হয়ে গেছে। সে ফাঁক টাকা দিয়ে, খ্যাতি দিয়ে, বোজানো যায় না। পৃথিবী থেকে রস পাচ্ছি নে, কেবল বস্তু সংগ্রহ করছি, এর ব্যর্থতা অভ্যাসবশত ভুলে থাকা যায়। কিন্তু, পণ্ডিতমশায়ের ঘর যখন দেখলুম তখন বুঝলুম, আমার দিন শুষ্ক, আমার রাত্রি শূন্য। পণ্ডিতমশায় নিশ্চয় ঠিক করে বসে আছেন যে, আমি তাঁর চেয়ে ভাগ্যবান পুরুষ— এই কথা মনে করে আমার হাসি এল। এই বস্তুজগৎকে ঘিরে একটি অদৃশ্য আনন্দলোক আছে। সেই আনন্দলোকের সঙ্গে আমাদের জীবনের যোগসূত্র না থাকলে আমরা ত্রিশঙ্কুর মতো শূন্যে থাকি। পণ্ডিতমশায়ের সেই যোগ আছে, আমার নেই, এই তফাত। আমি আরাম-কেদারার দুই হাতায় দুই পা তুলে দিয়ে সিগারেট খেতে খেতে ভাবতে লাগলুম, পুরুষের জীবনের চার আশ্রমের চার অধিদেবতা। বাল্যে মা; যৌবনে স্ত্রী; প্রৌঢ়ে কন্যা, পুত্রবধূ; বার্ধক্যে নাতনি, নাতবউ। এমনি করে মেয়েদের মধ্য দিয়ে পুরুষ আপনার পূর্ণতা পায়। এই তত্ত্বটা মর্মরিত শালবনে আমাকে আবিষ্ট করে ধরল। মনের সামনে আমার ভাবী বৃদ্ধবয়সের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত তাকিয়ে দেখলুম— দেখে তার নিরতিশয় নীরসতায় হৃদয়টা হাহাকার করে উঠল। ঐ মরুপথের মধ্য দিয়ে মুনফার বোঝা ঘাড়ে করে নিয়ে কোথায় গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে মরতে হবে! আর দেরি করলে তো চলবে না। সম্প্রতি চল্লিশ পেরিয়েছি— যৌবনের শেষ থলিটি ঝেড়ে নেবার জন্যে পঞ্চাশ রাস্তার

ধারে বসে আছে, তার লাঠির ডগাটা এইখান থেকে দেখা যাচ্ছে। এখন পকেটের কথাটা বন্ধ রেখে জীবনের কথা একটুখানি ভেবে দেখা যাক। কিন্তু, জীবনের যে-অংশে মুলতুবি পড়েছে সে-অংশে আর তো ফিরে যাওয়া চলবে না। তবু তার ছিন্নতায় তালি লাগাবার সময় এখনো সম্পূর্ণ যায় নি।

এখান থেকে কাজের গতিকে পশ্চিমের এক শহরে যেতে হল। সেখানে বিশ্বপতিবাবু ধনী বাঙালি মহাজন। তাঁকে নিয়ে আমার কাজের কথা ছিল। লোকটি খুব হুঁশিয়ার, সুতরাং তাঁর সঙ্গে কোনো কথা পাকা করতে বিস্তর সময় লাগে। এক-দিন বিরক্ত হয়ে যখন ভাবছি 'একে নিয়ে আমার কাজের সুবিধা হবে না', এমন-কি, চাকরকে আমার জিনিসপত্র প্যাক করতে বলে দিয়েছি, হেনকালে বিশ্বপতিবাবু সন্ধ্যার সময় এসে আমাকে বললেন, "আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই অনেকরকম লোকের আলাপ আছে, আপনি একটু মনোযোগ করলে একটি বিধবা বেঁচে যায়।"

ঘটনাটি এই।—

নন্দকৃষ্ণবাবু বেরেলিতে প্রথমে আসেন একটি বাঙালি-ইংরাজি স্কুলের হেডমাস্টার হয়ে। কাজ করেছিলেন খুব ভালো। সকলেই আশ্চর্য হয়েছিল— এমন সুযোগ্য সুশিক্ষিত লোক দেশ ছেড়ে, এত দূরে সামান্য বেতনে চাকরি করতে এলেন কী কারণে। কেবল যে পরীক্ষা পাস করাতে তাঁর খ্যাতি ছিল তা নয়, সকল ভালো কাজেই তিনি হাত দিয়েছিলেন। এমন সময় কেমন করে বেরিয়ে পড়ল, তাঁর স্ত্রীর রূপ ছিল বটে কিন্তু কুল ছিল না; সামান্য কোন্ জাতের মেয়ে, এমন-কি তাঁর ছোঁওয়া লাগলে পানীয় জলের পানীয়তা এবং অন্যান্য নিগূঢ় সাত্ত্বিক গুণ নষ্ট হয়ে যায়। তাঁকে যখন সবাই চেপে ধরলে তিনি বললেন, হাঁ, জাতে ছোটো বটে, কিন্তু তবু সে তাঁর স্ত্রী। তখন প্রশ্ন উঠল, এমন বিবাহ বৈধ হয় কী করে। যিনি প্রশ্ন করেছিলেন নন্দকৃষ্ণবাবু তাঁকে বললেন, "আপনি তো শালগ্রাম সাক্ষী করে পরে পরে দুটি স্ত্রী বিবাহ করেছেন, এবং দ্বিবচনেও সন্তুষ্ট নেই তার বহু প্রমাণ দিয়েছেন। শালগ্রামের কথা বলতে পারি নে কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, আমার বিবাহ আপনার বিবাহের চেয়ে বৈধ, প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে বৈধ—এর চেয়ে বেশি কথা আমি আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাই নে।"

যাকে নন্দকৃষ্ণ এই কথাগুলি বললেন তিনি খুশি হয় নি। তার উপরে লোকের অনিষ্ট করবার ক্ষমতাও তাঁর অসামান্য ছিল। সুতরাং সেই উপদ্রবে নন্দকৃষ্ণ বেরিলি ত্যাগ করে এই বর্তমান শহরে এসে ওকালতি শুরু করলেন। লোকটা অত্যন্ত খুঁৎখুঁতে ছিলেন— উপবাসী থাকলেও অন্যায় মকদ্দমা তিনি কিছুতেই নিতেন না।

প্রথমটা তাতে তাঁর যত অসুবিধা হোক, শেষকালে উন্নতি হতে লাগল। কেননা, হাকিমরা তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেন। একখানি বাড়ি করে একটু জমিয়ে বসেছেন এমন সময় দেশে মন্বন্তর এল। দেশ উজাড় হয়ে যায়। যাদের উপর সাহায্য বিতরণের ভার ছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ চুরি করছিল বলে তিনি ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাতেই ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, "সাধুলোক পাই কোথায় ?"

তিনি বললেন, "আমাকে যদি বিশ্বাস করেন আমি এ কাজের কতক ভার নিতে পারি।"

তিনি ভার পেলেন এবং এই ভার বহন করতে করতেই একদিন মধ্যাহ্নে মাঠের মধ্যে এক গাছতলায় মারা যান। ডাক্তার বললে, তাঁর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে।

গল্পের এতটা পর্যন্ত আমার পূর্বেই জানা ছিল। কেমন একটা উচ্চ ভাবের মেজাজে এঁরই কথা তুলে আমাদের ক্লাবে আমি বলেছিলুম, "এই নন্দকৃষ্ণের মতো লোক যারা সংসারে ফেল করে শুকিয়ে মরে গেছে— না রেখেছে নাম, না রেখেছে টাকা—তারাই ভগবানের সহযোগী হয়ে সংসারটাকে উপরের দিকে—"

এইটুকু মাত্র বলতেই ভরা পালের নৌকা হঠাৎ চড়ায় ঠেকে যাওয়ার মতো, আমার কথা মাঝখানে বন্ধ হয়ে গেল। কারণ, আমাদের মধ্যে খুব একজন সম্পত্তি ও প্রতিপত্তিশালী লোক খবরের কাগজ পড়ছিলেন— তিনি তাঁর চশমার উপর থেকে আমার প্রতি দৃষ্টি হেনে বলে উঠলেন, "হিয়ার হিয়ার !"

যাক গে। শোনা গেল, নন্দকৃষ্ণর বিধবা স্ত্রী তাঁর একটি মেয়েকে নিয়ে এই পাড়াতেই থাকেন। দেয়ালির রাত্রে মেয়েটির জন্ম হয়েছিল বলে বাপ তার নাম দিয়েছিলেন দীপালি। বিধবা কোনো সমাজে স্থান পান না বলে সম্পূর্ণ একলা থেকে এই মেয়েটিকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছেন। এখন মেয়েটির বয়স পঁচিশের উপর হবে। মায়ের শরীর রুগ্ন এবং বয়সও কম নয়— কোন্‌দিন তিনি মারা যাবেন, তখন এই মেয়েটির কোথাও কোনো গতি হবে না। বিশ্বপতি আমাকে বিশেষ অনুনয় করে বললেন, "যদি এর পাত্র জুটিয়ে দিতে পারেন তো সেটা একটা পুণ্যকর্ম হবে।"

আমি বিশ্বপতিকে শুকনো স্বার্থপর নিরেট কাজের লোক বলে মনে মনে একটু অবজ্ঞা করেছিলুম। বিধবার অনাথা মেয়েটির জন্য তাঁর এই আগ্রহ দেখে আমার মন গলে গেল। ভাবলুম, প্রাচীন পৃথিবীর মৃত ম্যামথের পাকযন্ত্রের মধ্যে থেকে খাদ্যবীজ

বের করে পুঁতে দেখা গেছে, তার থেকে অঙ্কুর বেরিয়েছে— তেমনি মানুষের মনুষ্যত্ব বিপুল মৃতস্তূপের মধ্যে থেকেও সম্পূর্ণ মরতে চায় না।

আমি বিশ্বপতিকে বললুম, "পাত্র আমার জানা আছে, কোনো বাধা হবে না। আপনারা কথা এবং দিন ঠিক করুন।"

"কিন্তু মেয়ে না দেখেই তো আর—"

"না দেখেই হবে।"

"কিন্তু, পাত্র যদি সম্পত্তির লোভ করে সে বড়ো বেশি নেই। মা মরে গেলে কেবল ঐ বাড়িখানি পাবে, আর সামান্য যদি কিছু পায়।"

"পাত্রের নিজের সম্পত্তি আছে, সেজন্যে ভাবতে হবে না।"

"তাঁর নাম বিবরণ প্রভৃতি—"

"সে এখন বলব না, তা হলে জানাজানি হয়ে বিবাহ ফেঁসে যেতে পারে।"

"মেয়ের মাকে তো তার একটা বর্ণনা দিতে হবে।"

"বলবেন, লোকটা অন্য সাধারণ মানুষের মতো দোষে গুণে জড়িত। দোষ এত বেশি নেই যে ভাবনা হতে পারে; গুণও এতবেশি নেই যে লোভ করা চলে। আমি যতদূর জানি তাতে কন্যার পিতামাতারা তাকে বিশেষ পছন্দ করে, স্বয়ং কন্যাদের মনের কথা ঠিক জানা যায় নি।"

বিশ্বপতিবাবু এই ব্যাপারে যখন অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হলেন তখন তাঁর উপরে আমার ভক্তি বেড়ে গেল। যে-কারবারে ইতিপূর্বে তাঁর সঙ্গে আমার দরে বনছিল না, সেটাতে লোকসান দিয়েও রেজিস্ট্রী দলিল সই করবার জন্যে আমার উৎসাহ হল। তিনি যাবার সময় বলে গেলেন, "পাত্রটিকে বলবেন, অন্য সব বিষয়ে যাই হোক, এমন গুণবতী মেয়ে কোথাও পাবেন না।"

যে-মেয়ে সমাজের আশ্রয় থেকে এবং শ্রদ্ধা থেকে বঞ্চিত তাকে যদি হৃদয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করা যায় তা হলে সে মেয়ে কি আপনাকে উৎসর্গ করতে কিছুমাত্র কৃপণতা করবে। যে মেয়ের বড়ো রকমের আশা আছে তারই আশার অন্ত থাকে না। কিন্তু, এই দীপালির দীপটি মাটির, তাই আমার মতো মেটে ঘরের কোণে তার শিখাটির অমর্যাদা হবে না।

সন্ধ্যার সময় আলো জেলে বিলিতি কাগজ পড়ছি, এমন সময় খবর এল, একটি মেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। বাড়িতে স্ত্রীলোক কেউ নেই, তাই ব্যস্ত হয়ে পড়লুম। কোনো ভদ্র উপায় উদ্ভাবনের পূর্বেই মেয়েটি ঘরের মধ্যে ঢুকে প্রণাম করলে। বাইরে থেকে কেউ বিশ্বাস করবে না, কিন্তু আমি অত্যন্ত লাজুক মানুষ। আমি

না তার মুখের দিকে চাইলুম, না তাকে কোনো কথা বললুম। সে বললে, "আমার নাম দীপালি।"

গলাটি ভারি মিষ্টি। সাহস করে মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম, সে মুখ বুদ্ধিতে কোমলতাতে মাখানো। মাথায় ঘোমটা নেই— সাদা দিশি কাপড়, এখনকার ফেশানে পরা। কী বলি ভাবছি, এমন সময় সে বললে, "আমাকে বিবাহ দেবার জন্যে আপনি কোনো চেষ্টা করবেন না।"

আর যাই হোক, দীপালির মুখে এমন আপত্তি আমি প্রত্যাশাই করি নি। আমি ভেবে রেখেছিলুম, বিবাহের প্রস্তাবে তার দেহ মন প্রাণ কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেছে।

জিজ্ঞাসা করলুম "জানা অজানা কোনো পাত্রকেই তুমি বিবাহ করবে না?"

সে বললে, "না, কোনো পাত্রকেই না।"

যদিচ মনস্তত্ত্বের চেয়ে বস্তুতত্ত্বেই আমার অভিজ্ঞতা বেশি— বিশেষত নারীচিত্ত আমার কাছে বাংলা বানানের চেয়ে কঠিন, তবু কথাটার সাদা অর্থ আমার কাছে সত্য অর্থ ব'লে মনে হল না। আমি বললুম, "যে-পাত্র আমি তোমার জন্যে বেছেছি সে অবজ্ঞা করবার যোগ্য নয়।"

দীপালি বললে, "আমি তাঁকে অবজ্ঞা করি নে, কিন্তু আমি বিবাহ করব না।"

আমি বললুম, "সে লোকটিও তোমাকে মনের সঙ্গে শ্রদ্ধা করে।"

"কিন্তু, না, আমাকে বিবাহ করতে বলবেন না।"

"আচ্ছা, বলব না, কিন্তু আমি কি তোমাদের কোনো কাজে লাগতে পারি নে।"

"আমাকে যদি কোনো মেয়ে-ইস্কুলে পড়াবার কাজ জুটিয়ে দিয়ে এখান থেকে কল্‌কাতায় নিয়ে যান তা হলে ভারি উপকার হয়।"

বললুম, "কাজ আছে, জুটিয়ে দিতে পারব।"

এটা সম্পূর্ণ সত্য কথা নয়। মেয়ে-ইস্কুলের খবর আমি কী জানি। কিন্তু, মেয়ে-ইস্কুল স্থাপন করতে তো দোষ নেই।

দীপালি বললে, "আপনি আমাদের বাড়ি গিয়ে একবার মায়ের সঙ্গে এ কথার আলোচনা করে দেখবেন?"

আমি বললুম, "আমি কাল সকালেই যাব।"

দীপালি চলে গেল। কাগজ-পড়া আমার বন্ধ হল। ছাতের উপর বেরিয়ে এসে চৌকিতে বসলুম। তারাগুলোকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কোটি কোটি যোজন দূরে থেকে তোমরা কি সত্যই মানুষের জীবনের সমস্ত কর্মসূত্র ও সম্বন্ধসূত্র নিঃশব্দে বসে বসে বুনছ।'

এমন সময়ে কোনো খবর না দিয়ে হঠাৎ বিশ্বপতির মেজো ছেলে শ্রীপতি ছাতে এসে উপস্থিত। তার সঙ্গে যে-আলোচনাটা হল, তার মর্ম এই—

শ্রীপতি দীপালিকে বিবাহ করবার আগ্রহে সমাজ ত্যাগ করতে প্রস্তুত। বাপ বলেন, এমন দুষ্কার্য করলে তিনি তাকে ত্যাগ করবেন। দীপালি বলে, তার জন্যে এত বড়ো দুঃখ অপমান ও ত্যাগ স্বীকার কেউ করবে, এমন যোগ্যতা তার নেই। তা ছাড়া শ্রীপতি শিশুকাল থেকে ধনীগৃহে লালিত; দীপালির মতে, সে সমাজচ্যুত এবং নিরাশ্রয় হয়ে দারিদ্র্যের কষ্ট সহ্য করতে পারবে না। এই নিয়ে তর্ক চলছে, কিছুতে তার মীমাংসা হচ্ছে না। ঠিক এই সংকটের সময় আমি মাঝখানে প'ড়ে এদের মধ্যে আর-একটা পাত্রকে খাড়া ক'রে সমস্যার জটিলতা অত্যন্ত বাড়িয়ে তুলেছি। এইজন্যে শ্রীপতি আমাকে এই নাটকের থেকে প্রুফশিটের কাটা অংশের মতো বেরিয়ে যেতে বলছে।

আমি বললুম, "যখন এসে পড়েছি তখন বেরোচ্ছি নে। আর, যদি বেরোই তা হলে গ্রন্থি কেটে তবে বেরিয়ে পড়ব।"

বিবাহের দিনপরিবর্তন হল না। কেবলমাত্র পাত্রপরিবর্তন হল। বিশ্বপতির অনুনয় রক্ষা করেছি কিন্তু তাতে তিনি সন্তুষ্ট হন নি। দীপালির অনুনয় রক্ষা করি নি কিন্তু ভাবে বোধ হল, সে সন্তুষ্ট হয়েছে। ইস্কুলে কাজ খালি ছিল কিনা জানি নে কিন্তু আমার ঘরে কন্যার স্থান শূন্য ছিল, সেটা পূর্ণ হল। আমার মতো বাজে লোক যে নিরর্থক নয় আমার অর্থই সেটা শ্রীপতির কাছে প্রমাণ করে দিলে। তার গৃহদীপ আমার কলকাতার বাড়িতেই জ্বলল। ভেবেছিলুম, সময়মতো বিবাহ না সেরে রাখার মুলতবি অসময়ে বিবাহ করে পূরণ করতে হবে, কিন্তু দেখলুম, উপরওয়ালা প্রসন্ন হলে দুটো-একটা ক্লাস ডিঙিয়েও প্রোমোশন পাওয়া যায়। আজ পঞ্চান্ন বছর বয়সে আমার ঘর নাতনিতে ভরে গেছে, উপরন্তু একটি নাতিও জুটেছে। কিন্তু, বিশ্বপতি বাবুর সঙ্গে আমার কারবার বন্ধ হয়ে গেছে— কারণ, তিনি পাত্রটিকে পছন্দ করেন নি।

পৌষ, ১৩২৪

প্রবন্ধ

সাহিত্যের পথে

উৎসর্গ

কল্যাণীয়

শ্রীমান অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে

শ্রীমান অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী

কল্যাণীয়েষু

রসসাহিত্যের রহস্য অনেক কাল থেকেই আগ্রহের সঙ্গে আলোচনা করে এসেছি, ভিন্ন ভিন্ন তারিখের এই লেখাগুলি থেকে তার পরিচয় পাবে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বার বার নানারকম করে বলেছি। সেটা এই বইয়ের ভূমিকায় জানিয়ে রাখি।

মন নিয়ে এই জগৎটাকে কেবলই আমরা জানছি। সেই জানা দুই জাতের।

জ্ঞানে জানি বিষয়কে। এই জানায় জ্ঞাতা থাকে পিছনে, আর জ্ঞেয় থাকে তার লক্ষ্যরূপে সামনে।

ভাবে জানি আপনাকেই, বিষয়টা থাকে উপলক্ষ্যরূপে সেই আপনার সঙ্গে মিলিত।

বিষয়কে জানার কাজে আছে বিজ্ঞান। এই জানার থেকে নিজের ব্যক্তিত্বকে সরিয়ে রাখার সাধনাই বিজ্ঞানের। মানুষের আপনাকে দেখার কাজে আছে সাহিত্য। তার সত্যতা মানুষের আপন উপলব্ধিতে, বিষয়ের যাথার্থ্যে নয়। সেটা অদ্ভুত হোক, অতথ্য হোক, কিছুই আসে-যায় না। এমন-কি, সেই অদ্ভুতের সেই অতথ্যের উপলব্ধি যদি নিবিড় হয় তবে সাহিত্যে তাকেই সত্য বলে স্বীকার করে নেবে। মানুষ শিশুকাল থেকেই নানা ভাবে আপন উপলব্ধির ক্ষুধায় ক্ষুধিত; রূপকথার উদ্ভব তারই থেকে। কল্পনার জগতে চায় সে হতে নানাখানা; রামও হয়, হনুমানও হয়, ঠিকমতো হতে পারলেই খুশি। তার মন গাছের সঙ্গে গাছ হয়, নদীর সঙ্গে নদী। মন চায় মিলতে, মিলে হয় খুশি। মানুষের আপনাকে নিয়ে এই বৈচিত্র্যের লীলা সাহিত্যের কাজ। সে লীলায় সুন্দরও আছে, অসুন্দরও আছে।

একদিন নিশ্চিত স্থির করে রেখেছিলেম, সৌন্দর্যরচনাই সাহিত্যের প্রধান কাজ। কিন্তু, এই মতের সঙ্গে সাহিত্যের ও আর্টের অভিজ্ঞতাকে মেলানো যায় না দেখে মনটাতে অত্যন্ত খটকা লেগেছিল। ভাঁড়ুদত্তকে সুন্দর বলা যায় না— সাহিত্যের সৌন্দর্যকে প্রচলিত সৌন্দর্যের ধারণায় ধরা গেল না।

তখন মনে এল, এতদিন যা উলটো করে বলছিলুম তাই সোজা করে বলার দরকার। বলতুম, সুন্দর আনন্দ দেয়, তাই সাহিত্যে সুন্দরকে নিয়ে কারবার। বস্তুত বলা চাই, যা আনন্দ দেয় তাকেই মন সুন্দর বলে, আর সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী। সাহিত্যে কী দিয়ে এই সৌন্দর্যের বোধকে জাগায় সে কথা গৌণ, নিবিড় বোধের দ্বারাই প্রমাণ হয় সুন্দরের। তাকে সুন্দর বলি বা না-বলি তাতে কিছু আসে-যায় না, বিশ্বের অনেক উপেক্ষিতের মধ্যে মন তাকেই অঙ্গীকার করে নেয়।

সাহিত্যের বাইরে এই সুন্দরের ক্ষেত্র সংকীর্ণ। সেখানে প্রাণতত্ত্বের অধিকৃত মানুষকে অনিষ্টকর কিছুতে আনন্দ দেয় না। সাহিত্যে দেয়, নইলে 'ওথেলো' নাটককে কেউ ছুঁতে পারত না। এই প্রশ্ন আমার মনকে উদবেজিত করেছিল যে, সাহিত্যে দুঃখকর কাহিনী কেন আনন্দ দেয় এবং সেই কারণে কেন তাকে সৌন্দর্যের কোঠায় গণ্য করি।

মনে উত্তর এল, চারি দিকের রসহীনতায় আমাদের চৈতন্যে যখন সাড় থাকে না তখন সেই অস্পষ্টতা দুঃখকর। তখন আত্মোপলব্ধি ম্লান। আমি যে আমি, এইটে খুব করে যাতেই উপলব্ধি করায় তাতেই আনন্দ। যখন সামনে বা চারি দিকে এমন-কিছু থাকে যার সম্বন্ধে উদাসীন নই, যার উপলব্ধি আমার চৈতন্যকে উদ্‌বোধিত করে রাখে, তার আস্বাদনে আপনাকে নিবিড় করে পাই। এইটের অভাবে অবসাদ। বস্তুত, মন নাস্তিত্বের দিকে যতই যায় ততই তার দুঃখ।

দুঃখের তীব্র উপলব্ধিও আনন্দকর, কেননা সেটা নিবিড় অস্মিতাসূচক; কেবল অনিষ্টের আশঙ্কা এসে বাধা দেয়। সে আশঙ্কা না থাকলে দুঃখকে বলতুম সুন্দর। দুঃখে আমাদের স্পষ্ট করে তোলে, আপনার কাছে আপনাকে ঝাপসা থাকতে দেয় না। গভীর দুঃখ ভূমা; ট্র্যাজেডির মধ্যে সেই ভূমা আছে, সেই ভূমৈব সুখম্। মানুষ বাস্তব জগতে ভয় দুঃখ বিপদকে সর্বতোভাবে বর্জনীয় বলে জানে, অথচ তার আত্ম-অভিজ্ঞতাকে প্রবল এবং বহুল করবার জন্যে এদের না পেলে তার স্বভাব বঞ্চিত হয়। আপন স্বভাবগত এই চাওয়াটাকে মানুষ সাহিত্যে আর্টে উপভোগ করছে। একে বলা যায় লীলা, কল্পনায় আপনার অবিমিশ্র উপলব্ধি। রামলীলায় মানুষ যোগ দিতে যায় খুশি হয়ে; লীলা যদি না হত তবে বুক যেত ফেটে।

এই কথাটা যেদিন প্রথম স্পষ্ট করে মনে এল সেদিন কবি কীট্‌সের বাণী মনে পড়ল: Truth is beauty, beauty truth। অর্থাৎ, যে সত্যকে আমরা 'হৃদা মনীষা মনসা' উপলব্ধি করি তাই সুন্দর। তাতেই আমরা আপনাকে পাই। এই কথাই যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন যে, যে-কোনো জিনিস আমার প্রিয় তার মধ্যে আমি আপনাকেই সত্য করে পাই ব'লেই তা প্রিয়, তাই সুন্দর।

মানুষ আপনার এই প্রিয়ের ক্ষেত্রকে, অর্থাৎ আপন সুস্পষ্ট উপলব্ধির ক্ষেত্রকে, সাহিত্যে প্রতিদিন বিস্তীর্ণ করছে। তার বাধাহীন বিচিত্র বৃহৎ লীলার জগৎ সাহিত্যে।

সৃষ্টিকর্তাকে আমাদের শাস্ত্রে বলেছে লীলাময়। অর্থাৎ, তিনি আপনার রসবিচিত্র পরিচয় পাচ্ছেন আপন সৃষ্টিতে। মানুষও আপনার মধ্যে থেকে আপনাকে সৃষ্টি করতে করতে নানা ভাবে নানা রসে আপনাকে পাচ্ছে। মানুষও লীলাময়। মানুষের সাহিত্যে আর্টে সেই লীলার ইতিহাস লিখিত অঙ্কিত হয়ে চলেছে।

ইংরেজিতে যাকে বলে real সাহিত্যে আর্টে সেটা হচ্ছে তাই যাকে মানুষ আপন অন্তর থেকে অব্যবহিতভাবে স্বীকার করতে বাধ্য। তর্কের দ্বারা নয়, প্রমাণের দ্বারা নয়, একান্ত উপলব্ধির দ্বারা। মন যাকে বলে 'এই তো নিশ্চিত দেখলুম, অত্যন্ত বোধ করলুম,' জগতের হাজার অচিহ্নিতের মধ্যে যার উপর সে আপন স্বাক্ষরের শিলমোহর দিয়ে দেয়, যাকে আপন চিরস্বীকৃত সংসারের মধ্যে ভুক্ত করে নেয়— সে অসুন্দর হলেও মনোরম ; সে রসস্বরূপের সনন্দ নিয়ে এসেছে।

সৌন্দর্যপ্রকাশই সাহিত্যের বা আর্টের মুখ্য লক্ষ্য নয়। এ সম্বন্ধে আমাদের দেশে অলংকারশাস্ত্রে চরম কথা বলা হয়েছে : বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।

মানুষ নানারকম আস্বাদনেই আপনাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছে বাধাহীন লীলার ক্ষেত্রে। সেই বৃহৎ বিচিত্র লীলাজগতের সৃষ্টি সাহিত্য।

কিন্তু, এর মধ্যে মূল্যভেদের কথা আছে, কেননা এ তো বিজ্ঞান নয়। সকল উপলব্ধিরই নির্বিচারে এক মূল্য নয়। আনন্দসম্ভোগে মানুষের নির্বাচনের কর্তব্য তো আছে। মনস্তত্ত্বের কৌতূহল চরিতার্থ করা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির কাজ। সেই বুদ্ধিতে মাতলামির অসংলগ্ন এলোমেলো অসংযম এবং অপ্রমত্ত আনন্দের গভীরতা প্রায় সমান আসন পায়। কিন্তু, আনন্দ-সম্ভোগে স্বভাবতই মানুষের বাছবিচার আছে। কখনো কখনো অতিতৃপ্তির অস্বাস্থ্য ঘটলে মানুষ এই সহজ কথাটা ভুলব-ভুলব করে। তখন সে বিরক্ত হয়ে স্পর্ধার সঙ্গে কুপথ্য দিয়ে মুখ বদলাতে চায়। কুপথ্যের ঝাঁজ বেশি, তাই মুখ যখন মরে তখন তাকেই মনে হয় ভোজের চরম আয়োজন। কিন্তু, মন একদা সুস্থ হয়, মানুষের চিরকালের স্বভাব

ফিরে আসে, আবার আসে সহজ সম্ভোগের দিন, তখনকার সাহিত্য ক্ষণিক আধুনিকতার ভঙ্গিমা ত্যাগ করে চিরকালীন সাহিত্যের সঙ্গে সরলভাবে মিশে যায়।

শান্তিনিকেতন
৮ আশ্বিন, ১৩৪৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাহিত্যের পথে

বাস্তব

লোকেরা কিছুই ঠিকমতো করিতেছে না, সংসারে যেমন হওয়া উচিত ছিল তেমন হইতেছে না, সময় খারাপ পড়িয়াছে— এই-সমস্ত দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিয়া মানুষ দিব্য আরামে থাকে, তাহার আহারনিদ্রার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় না, এটা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। দুশ্চিন্তা-আগুনটা শীতের আগুনের মতো উপাদেয়, যদি সেটা পাশে থাকে কিন্তু নিজের গায়ে না লাগে।

অতএব, যদি এমন কথা কেহ বলিত যে, আজকাল বাংলাদেশে কবিরা যে সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছে তাহাতে বাস্তবতা নাই, তাহা জনসাধারণের উপযোগী নহে, তাহাতে লোকশিক্ষার কাজ চলিবে না, তবে খুব সম্ভব, আমিও দেশের অবস্থা সম্বন্ধে উদ্‌বেগ প্রকাশ করিয়া বলিতাম, কথাটা ঠিক বটে; এবং নিজেকে এই দলের বাহিরে ফেলিতাম।

কিন্তু, একেবারে আমারই নাম ধরিয়া এই কথাগুলি প্রয়োগ করিলে অন্তের তাহাতে যতই আমোদ হোক, আমি সে আমোদে খোলা মনে যোগ দিতে পারি না।

তবে কিনা, বাসরঘরে বর এবং পাঠকসভায় লেখকের প্রায় একই দশা। কর্ণমূলে অনেক কঠিন কৌতুক উভয়কে নিঃশব্দে সহ্য করিতে হয়। সহ্য যে করে তাহার কারণ এই, একটা জায়গায় তাহাদের জিত আছে। যে যতই উৎপীড়ন করুক, যে বর তাহার কনেটিকে কেহ হরণ করিবে না; এবং যে লেখক তাহার লেখাটা তো রইলই।

অতএব, নিজের সম্বন্ধে কিছু বলিব না। কিন্তু, এই অবকাশে সাধারণভাবে সাহিত্য-সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে। তাহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কেননা, যদিচ প্রথম নম্বরেই আমার লেখাটাকেই সেসনে সোপরদ্দ করা হইয়াছে তবু এ খবরটারও আভাস আছে যে, আজকালকার প্রায় সকল লেখকেরই এই একই অপরাধ।

বাস্তবতা না থাকা নিশ্চয়ই একটা মস্ত ফাঁকি। বস্তু কিছুই পাইল না অথচ দাম দিল এবং খুশি হইয়া হাসিতে হাসিতে গেল, এমন-সব হতবুদ্ধি লোকের জন্য পাকা অভিভাবক নিযুক্ত হওয়া উচিত। সেই লোকেই অভিভাবকের উপযুক্ত, কবিরা ফস্ করিয়া যাহাদিগকে কলাকৌশলে ঠকাইতে না পারে, কটাক্ষে যাহারা বুঝিতে পারে বস্তু

কোথায় আছে এবং কোথায় নাই। অতএব, যাঁহারা অবাস্তব-সাহিত্য সম্বন্ধে দেশকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন, তাঁহারা নাবালক ও নালায়েক পাঠকদের জন্য কোর্ট্ অফ ওয়ার্ড্স্ খুলিবার কাজ করিতেছেন।

কিন্তু, সমালোচক যত বড়ো বিচক্ষণ হোন-না কেন চিরকালই তাঁহারা পাঠকদের কোলে তুলিয়া সামলাইবেন সেটা তো ধাত্রী এবং ধৃত কাহারও পক্ষে ভালো নয়। পাঠকদিগকে স্পষ্ট করিয়া সমজাইয়া দেওয়া উচিত কোন্‌টা বস্তু এবং কোন্‌টা বস্তু নয়।

মুশকিল এই যে, বস্তু একটা নহে এবং সব জায়গায় আমরা একই বস্তুর তত্ত্ব করি না। মানুষের বহুধা প্রকৃতি, তাহার আয়োজন নানা এবং বিচিত্র বস্তুর সন্ধানে তাহাকে ফিরিতে হয়।

এখন কথা এই, সাহিত্যের মধ্যে কোন্ বস্তুকে আমরা খুঁজি। ওস্তাদেরা বলিয়া থাকেন, সেটা রসবস্তু। বলা বাহুল্য, এখানে রসসাহিত্যের কথাই হইতেছে। এই রসটা এমন জিনিস যাহার বাস্তবতা সম্বন্ধে তর্ক উঠিলে হাতাহাতি পর্যন্ত গড়ায় এবং এক পক্ষ অথবা উভয় পক্ষ ভূমিসাৎ হইলেও কোনো মীমাংসা হয় না।

রস জিনিসটা রসিকের অপেক্ষা রাখে, কেবলমাত্র নিজের জোরে নিজেকে সে সপ্রমাণ করিতে পারে না। সংসারে বিদ্বান, বুদ্ধিমান, দেশহিতৈষী, লোকহিতৈষী প্রভৃতি নানা প্রকারের ভালো ভালো লোক আছেন, কিন্তু দময়ন্তী যেমন সকল দেবতাকে ছাড়িয়া নলের গলায় মালা দিয়াছিলেন, তেমনি রসভারতী স্বয়ম্বরসভায় আর-সকলকেই বাদ দিয়া কেবল রসিকের সন্ধান করিয়া থাকেন।

সমালোচক বুক ফুলাইয়া তাল ঠুকিয়া বলেন, 'আমিই সেই রসিক।' প্রতিবাদ করিতে সাহস হয় না, কিন্তু অরসিক আপনাকে অরসিক বলিয়া জানিয়াছে, সংসারে এই অভিজ্ঞতাটা দেখা যায় না। আমার কোন্‌টা ভালো লাগিল এবং আমার কোন্‌টা ভালো লাগিল না সেইটেই যে রসপরীক্ষার চূড়ান্ত মীমাংসা, পনেরো-আনা লোক সে সম্বন্ধে নিঃসংশয়। এইজন্যই সাহিত্যসমালোচনায় বিনয় নাই। মূলধন না থাকিলেও দালালির কাজে নামিতে কাহারও বাধে না, তেমনি সাহিত্যসমালোচনায় কোনোপ্রকার পুঁজির জন্য কেহ সবুর করে না। কেননা, সমালোচকের পদটা সম্পূর্ণ নিরাপদ।

সাহিত্যের যাচাই-ব্যাপারটা এতই যদি অনিশ্চিত, তবে সাহিত্য যাহারা রচনা করে তাহাদের উপায় কী। আশু উপায় দেখি না। অর্থাৎ, তাহারা যদি নিশ্চিত ফল জানিতে চায় তবে সেই জানিবার বরাত তাহাদের প্রপৌত্রের উপর দিতে হয়। নগদ-বিদায় যেটা তাহাদের ভাগ্যে জোটে সেটার উপর অত্যন্ত ভর দেওয়া চলিবে না।

রসবিচারে ব্যক্তিগত এবং কালগত ভুল সংশোধন করিয়া লইবার জন্য বহু ব্যক্তি ও দীর্ঘ সময়ের ভিতর দিয়া বিচার্য পদার্থটিকে বহিয়া লইয়া গেলে তবে সন্দেহ মেটে।

কোনো কবির রচনার মধ্যে সাহিত্যবস্তুটা আছে কি না তাহার উপযুক্ত সমজদার কবির সমসাময়িকদের মধ্যে নিশ্চয়ই অনেক আছে, কিন্তু তাহারাই উপযুক্ত কি না তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি দাবি করিলে ঠকা অসম্ভব নয়।

এমন অবস্থায় লেখকের একটা সুবিধা আছে এই যে, তাঁহার লেখা যে-লোক পছন্দ করে সেই যে সমজদার তাহা ধরিয়া লইতে বাধা নাই। অপর পক্ষকে তিনি যদি উপযুক্ত বলিয়া গণ্যই না করেন তবে এমন বিচারালয় হাতের কাছে নাই যেখানে তাহারা নালিশ রুজু করিতে পারে। অবশ্য, কালের আদালতে ইহার বিচার চলিতেছে, কিন্তু সেই দেওয়ানি আদালতের মতো দীর্ঘসূত্রী আদালত ইংরেজের মুল্লুকেও নাই। এস্থলে কবিরই জিত রহিল, কেননা আপাতত দখল যে তাহারই। কালের পেয়াদা যেদিন তাহার খ্যাতি-সীমানার খুঁটি উপড়াইতে আসিবে সেদিন সমালোচক সেই তামাশা দেখিবার জন্য সবুর করিতে পারিবে না।

যাঁহারা আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে বাস্তবতার তল্লাস করিয়া একেবারে হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছেন তাঁহারা আমার কথার উত্তরে বলিবেন, 'দাঁড়িপাল্লায় চড়াইয়া রস-জিনিসটার বস্তু পরিমাণ করা যায় না, এ কথা সত্য, কিন্তু রস-পদার্থ কোনো একটা বস্তুকে আশ্রয় করিয়া তো প্রকাশ পায়। সেইখানেই আমরা বাস্তবতার বিচার করিবার সুযোগ পাইয়া থাকি।'

নিশ্চয়ই রসের একটা আধার আছে। সেটা মাপকাঠির আয়ত্তাধীন সন্দেহ নাই। কিন্তু, সেইটেরই বস্তুপিণ্ড ওজন করিয়া কি সাহিত্যের দর যাচাই হয়।

রসের মধ্যে একটা নিত্যতা আছে। মান্ধাতার আমলে মানুষ যে-রসটি উপভোগ করিয়াছে আজও তাহা বাতিল হয় নাই। কিন্তু, বস্তুর দর বাজার-অনুসারে এবেলা ওবেলা বদল হইতে থাকে।

আচ্ছা, মনে করা যাক, কবিতাকে বাস্তব করিবার লোভ আমি আর সামলাইতে পারিতেছি না। খুঁজিতে লাগিলাম, দেশে সব-চেয়ে কোন্ ব্যাপারটা বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে। দেখিলাম, ব্রাহ্মণসভাটা দেশের মধ্যে রেলোয়ে-সিগ্নালের স্তম্ভটার মতো চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া আপনার একটিমাত্র পায়ে ভর দিয়া খুব উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কায়স্থেরা পৈতা লইবেই আর ব্রাহ্মণসভা তাহার পৈতা কাড়িবে, এই ঘটনাটা বাংলাদেশে বিশ্ব-ব্যাপারের মধ্যে সব-চেয়ে বড়ো। অতএব, বাঙালি কবি যদি ইহাকে তাহার রচনায় আমল না দেয় তবে বুঝিতে হইবে, বাস্তবতা সম্বন্ধে তাহার বোধশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ।

এই বুঝিয়া লিখিলাম পৈতাসংহার-কাব্য। তাহার বস্তুপিণ্ডটা ওজনে কম হইল না, কিন্তু হায় রে, সরস্বতী কি বস্তুপিণ্ডের উপরে তাঁহার আসন রাখিয়াছেন না পদ্মের উপরে ?

এই দৃষ্টান্তটি দিবার একটু হেতু আছে। বিচারকদের মতে, বাস্তবতা জিনিসটা কী তাহার একটা সূত্র ধরিতে পারিয়াছি। আমার বিরুদ্ধে একজন ফরিয়াদি বলিয়াছেন, আমার সমস্ত রচনার মধ্যে বাস্তবতার উপকরণ একটু যেখানে জমা হইয়াছে সে কেবল 'গোরা' উপন্যাসে।

গোরা উপন্যাসে কী বস্তু আছে না-আছে উক্ত উপন্যাসের লেখক তাহা সব-চেয়ে কম বোঝে। লোকমুখে শুনিয়াছি, প্রচলিত হিঁদুয়ানির ভালো ব্যাখ্যা তাহার মধ্যে পাওয়া যায়। ইহা হইতে আন্দাজ করিতেছি, ওটাই একটা বাস্তবতার লক্ষণ।

বর্তমান সময়ে কতকগুলি বিশেষ কারণে হিন্দু আপনার হিন্দুত্ব লইয়া ভয়ংকর রুখিয়া উঠিয়াছে। সেটা সম্বন্ধে তাহার মনের ভাব বেশ সহজ অবস্থায় নাই। বিশ্ব-রচনায় এই হিন্দুত্বই বিধাতার চরম কীর্তি এবং এই সৃষ্টিতেই তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করিয়া আর-কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না, এইটে আমাদের বুলি। সাহিত্যের বাস্তবতা ওজনের সময়ে এই বুলিটা হয় বাটখারা। কালিদাসকে আমরা ভালো বলি, কেননা তাঁহার কাব্যে হিন্দুত্ব আছে। বঙ্কিমকে আমরা ভালো বলি, কেননা স্বামীর প্রতি হিন্দুরমণীর যেরূপ মনোভাব হিন্দুশাস্ত্রসম্মত তাহা তাঁহার নায়িকাদের মধ্যে দেখা যায়; অথবা নিন্দা করি, সেটা যথেষ্ট পরিমাণে নাই বলিয়া।

অন্য দেশেও এমন ঘটে। ইংলণ্ডে ইম্পীরিয়ালিজ্‌মের জ্বরোত্তাপ যখন ঘণ্টায় ঘণ্টায় চড়িয়া উঠিতেছিল তখন একদল ইংরেজ কবির কাব্যে তাহারই রক্তবর্ণ বাস্তবতা প্রলাপ বকিতেছিল।

তাহার সঙ্গে যদি তুলনা করা যায় তবে ওয়ার্ড্‌স্বার্থের কবিতায় বাস্তবতা কোথায়। তিনি বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে একটি আনন্দময় আবির্ভাব দেখিতে পাইয়াছিলেন তাহার সঙ্গে ব্রিটিশ জনসাধারণের শিক্ষা-দীক্ষা-অভ্যাস-আচার-বিচারের যোগ ছিল কোথায়। তাঁহার ভাবের রাগিণীটি নির্জনবাসী একলা-কবির চিত্তবাঁশিতে বাজিয়াছিল—ইংরেজের স্বদেশী হাটে ওজনদরে যাহা বিক্রি হয় এমনতরো বস্তুপিণ্ড তাহার মধ্যে কী আছে জানিতে চাই।

আর, কীট্‌স্‌, শেলি— ইহাদের কাব্যের বাস্তবতা কী দিয়া নির্ধারণ করিব। ইংরেজের জাতীয় চিত্তের সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়া কি ইহারা বক্‌শিশ ও বাহবা পাইয়াছিলেন। যে-সমস্ত সমালোচক সাহিত্যের হাটে বাস্তবতার দালালি করিয়া

থাকেন তাঁহারা ওয়ার্ড্‌স্বার্থের কবিতার কিরূপ সমাদর করিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসে আছে। শেলিকে অস্পৃশ্য অন্ত্যজের মতো তাঁহার দেশ সেদিন ঘরে ঢুকিতে দেয় নাই এবং কীট্‌স্‌কে মৃত্যুবাণ মারিয়াছিল।

আরও আধুনিক দৃষ্টান্ত টেনিসন। তিনি ভিক্টোরীয় যুগের প্রচলিত লোকধর্মের কবি। তাই তাঁহার প্রভাব দেশের মধ্যে সর্বব্যাপী ছিল। কিন্তু, ভিক্টোরীয় যুগের বাস্তবতা যত ক্ষীণ হইতেছে টেনিসনের আসনও তত সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে। তাঁহার কাব্য যে গুণে টিঁকিবে তাহা নিত্যরসের গুণে, তাহাতে ভিক্টোরীয় ব্রিটিশ-বস্তু বহুল পরিমাণে আছে বলিয়া নহে— সেই স্থূল বস্তুটাই প্রতিদিন খসিয়া পড়িতেছে।

আমাদের কালের লেখকদের মোটা অপরাধটা এই যে, আমরা ইংরেজি পড়িয়াছি। ইংরেজি শিক্ষা বাঙালির পক্ষে বাস্তব নহে, অতএব তাহা বাস্তবতার কারণও নহে, আর সেইজন্যই এখনকার সাহিত্য দেশের লোকসাধাণকে শিক্ষা ও আনন্দ দিতে পারে না।

উত্তম কথা। কিন্তু, দেশের যে-সব লোক ইংরেজি শেখে নাই তাহাদের তুলনায় আমাদের সংখ্যা তো নগণ্য। কেহ তাহাদের তো কলম কাড়িয়া লয় নাই। আমরা কেবল আমাদের অবাস্তবতার জোরে দেশের সমস্ত বাস্তবিকদের চেয়ে জিতিয়া যাইব, ইহা স্বভাবের নিয়ম নহে।

হয়তো উত্তরে শুনিব, আমরা হারিতেছি। ইংরেজি যাহারা শেখে নাই তাহারাই দেশের বাস্তব-সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছে, তাহাই টিঁকিবে এবং তাহাতেই লোকশিক্ষা হইবে।

তাই যদি হয় তবে আর ভাবনা কিসের। বাস্তব-সাহিত্যের বিপুল ক্ষেত্র ও আয়োজন দেশ জুড়িয়া রহিয়াছে; তাহার মধ্যে ছিটাফোঁটা অবাস্তব মুহূর্তকালও টিঁকিতে পারিবে না।

কিন্তু, সেই বৃহৎ বাস্তব-সাহিত্যকে চোখে দেখিলে কাজে লাগিত, একটা আদর্শ পাওয়া যাইত। যতক্ষণ তাহার পরিচয় নাই ততক্ষণ যদি গায়ের জোরে তাহাকে মানিয়া লই তবে সেটা বাস্তবিক হইবে না, কাল্পনিক হইবে।

অথচ, এ দিকে ইংরেজি-পোড়োরা যে-সাহিত্য সৃষ্টি করিল, রাগিয়া তাহাকে গালি দিলেও, সে বাড়িয়া উঠিতেছে; নিন্দা করিলেও তাহাকে অস্বীকার করিবার জো নাই। ইহাই বাস্তবের প্রকৃত লক্ষণ। এই-যে কোনো কোনো মানুষ খামখা রাগিয়া ইহাকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে তাহারও কারণ, এ স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, এ বাস্তব। দেখ

নাই কি, এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজরা কথায় কথায় বলিয়া থাকে, ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙালি জাতটা গণ্যই নহে? তাহাদের কথার ঝাঁজ দেখিলেই বুঝা যায়, তাহারা বাঙালিকেই বিশেষভাবে গণ্য করিয়াছে, কোনোমতেই ভুলিতে পারিতেছে না।

ইংরেজি শিক্ষা সোনার কাঠির মতো আমাদের জীবনকে স্পর্শ করিয়াছে; সে আমাদের ভিতরকার বাস্তবকেই জাগাইল। এই বাস্তবকে যে-লোক ভয় করে, যে-লোক বাঁধা-নিয়মের শিকলটাকেই শ্রেয় বলিয়া জানে, তাহারা ইংরেজই হউক আর বাঙালিই হউক, এই শিক্ষাকে ভ্রম এবং এই জাগরণকে অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া দিবার ভান করিতে থাকে। তাহাদের বাঁধা তর্ক এই যে, এক দেশের আঘাত আর-এক দেশকে সচেতন করে না। কিন্তু, দূর দেশের দক্ষিণে হাওয়ায় দেশান্তরে সাহিত্যকুঞ্জে ফুলের উৎসব জাগাইয়াছে, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে। যেখান হইতে যেমন করিয়াই হউক, জীবনের আঘাতে জীবন জাগিয়া উঠে, মানবচিত্ততত্ত্বে ইহা একটি চিরকালের বাস্তব ব্যাপার।

কিন্তু, লোকশিক্ষার কী হইবে।

সে কথার জবাবদিহি সাহিত্যের নহে।

লোক যদি সাহিত্য হইতে শিক্ষা পাইতে চেষ্টা করে তবে পাইতেও পারে, কিন্তু সাহিত্য লোককে শিক্ষা দিবার জন্য কোনো চিন্তাই করে না। কোনো দেশেই সাহিত্য ইস্কুল-মাস্টারির ভার লয় নাই। রামায়ণ মহাভারত দেশের সকল লোকে পড়ে তাহার কারণ এ নয় যে, তাহা কৃষাণের ভাষায় লেখা বা তাহাতে দুঃখি-কাঙালের ঘরকন্নার কথা বর্ণিত। তাহাতে বড়ো বড়ো রাজা, বড়ো বড়ো রাক্ষস, বড়ো বড়ো বীর এবং বড়ো বড়ো বানরের বড়ো বড়ো লেজের কথাই আছে। আগাগোড়া সমস্তই অসাধারণ। সাধারণ লোক আপনার গরজে এই সাহিত্যকে পড়িতে শিখিয়াছে।

সাধারণ লোক মেঘদূত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা পড়ে না। খুব সম্ভব দিঙ্‌নাগাচার্য এই-ক'টা বইয়ের মধ্যে বাস্তবের অভাব দেখিয়াছিলেন। মেঘদূতের তো কথাই নাই। কালিদাস স্বয়ং এই বাস্তববাদীদের ভয়ে এক জায়গায় নিতান্ত অকবিজনোচিত কৈফিয়ত দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন— কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু।

আমি অকবিজনোচিত এইজন্য বলিতেছি যে, কবিমাত্রই চেতন-অচেতনের মিল ঘটাইয়া থাকেন, কেননা তাঁহারা বিশ্বের মিত্র, তাঁহারা ন্যায়ের অধ্যাপক নহেন। শকুন্তলার চতুর্থ অঙ্ক পড়িলেই সেটা বুঝিতে বাকি থাকিবে না।

কিন্তু আমি বলিতেছি, যদি কালিদাসের কাব্য ভালো হয় তবে সমস্ত মানুষের জন্যই তাহা সকল কালের ভাণ্ডারে সঞ্চিত রহিল— আজকের সাধারণ মানুষ যাহা বুঝিল না

কালকের সাধারণ মানুষ হয়তো তাহা বুঝিবে, অন্তত সেইরূপ আশা করি। কিন্তু, কালিদাস যদি কবি না হইয়া লোকহিতৈষী হইতেন তবে সেই পঞ্চম শতাব্দীর উজ্জয়িনীর কৃষাণদের জন্য হয়তো প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী কয়েকখানা বই লিখিতেন— তাহা হইলে তারপর হইতে এতগুলা শতাব্দীর কী দশা হইত।

তুমি কি মনে কর, লোকহিতৈষী তখন কেহ ছিল না। লোকসাধারণের নৈতিক ও জাঠরিক উন্নতি কী করিয়া হইতে পারে, সে কথা ভাবিয়া কেহ কি তখন কোনো বই লেখে নাই। কিন্তু, সে কি সাহিত্য। ক্লাসের পড়া শেষ হইলেই বৎসর-অন্তর ইস্কুলের বইয়ের যে দশা হয় তাহাদেরও সেই দশা হইয়াছে, অর্থাৎ স্বেদ-কম্প-রোমাঞ্চর ভিতর দিয়া একেবারেই দশম দশা।

যাহা ভালো তাহাকে পাইবার জন্য সাধনা করিতেই হইবে— রাজার ছেলেকেও করিতে হইবে, কৃষাণের ছেলেকেও। রাজার ছেলের সুবিধা এই যে, তাহার সাধনা করিবার সময় আছে, কৃষাণের ছেলের নাই। কিন্তু, সেটা সামাজিক ব্যবস্থার তর্ক— যদি প্রতিকার করিতে পার, করিয়া দাও, কাহারও আপত্তি হইবে না। তানসেন তাই বলিয়া মেঠো-সুর তৈরি করিতে বসিবেন না। তাঁহার সৃষ্টি আনন্দের সৃষ্টি, সে যাহা তাহাই; আর-কোনো মতলবে সে আর-কিছু হইতে পারেই না। যাহারা রসপিপাসু তাহারা যত্ন করিয়া শিক্ষা করিয়া সেই ধ্রুপদগুলির নিগূঢ় মধুকোষের মধ্যে প্রবেশ করিবে। অবশ্য, লোক-সাধারণ যতক্ষণ সেই মধুকোষের পথ না জানিবে ততক্ষণ তানসেনের গান তাহাদের কাছে সম্পূর্ণ অবাস্তব, এ কথা মানিতেই হইবে। তাই বলিতেছিলাম, কোথায় কোন্ বস্তুর খোঁজ করিতে হইবে, কেমন করিয়া খোঁজ করিতে হইবে, কে তাহার খোঁজ পাইবার অধিকারী, সেটা তো নিজের খেয়াল-মতো এক কথায় প্রমাণ বা অপ্রমাণ করা যায় না।

তবে কবিদের অবলম্বনটা কী। একটা-কিছুর 'পরে জোর করিয়া তাঁহারা তো ভর দিয়াছেন। নিশ্চয়ই দিয়াছেন। সেটা অন্তরের অনুভূতি এবং আত্মপ্রসাদ। কবি যদি একটি বেদনাময় চৈতন্য লইয়া জন্মিয়া থাকেন, যদি তিনি নিজের প্রকৃতি দিয়াই বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির সহিত আত্মীয়তা করিয়া থাকেন যদি শিক্ষা অভ্যাস প্রথা শাস্ত্র প্রভৃতি জড় আবরণের ভিতর দিয়া কেবলমাত্র দশের নিয়মে তিনি বিশ্বের সঙ্গে ব্যবহার না করেন, তবে তিনি নিখিলের সংস্রবে যাহা অনুভব করিবেন তাহার একান্ত বাস্তবতা সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোনো সন্দেহ থাকিবে না। বিশ্ববস্তু ও বিশ্বরসকে একেবারে অব্যবহিত ভাবে তিনি নিজের জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন, এইখানেই তাঁহার জোর। পূর্বেই বলিয়াছি, বাহিরের হাটে বস্তুর দর কেবলই উঠা-নামা করিতেছে

সেখানে নানা মুনির নানা মত, নানা লোকের নানা ফরমাশ, নানা কালের নানা ফেশান। বাস্তবের সেই হট্টগোলের মধ্যে পড়িলে কবির কাব্য হাটের কাব্য হইবে। তাঁহার অন্তরের মধ্যে যে ধ্রুব আদর্শ আছে তাহারই 'পরে নির্ভর করা ছাড়া অন্য উপায় নাই। সে আদর্শ হিন্দুর আদর্শ বা ইংরেজের আদর্শ নয়, তাহা লোকহিতের এবং ইস্কুল-মাস্টারির আদর্শ নহে। তাহা আনন্দময় সুতরাং অনির্বচনীয়। কবি জানেন, যেটা তাঁহার কাছে এতই সত্য সেটা কাহারও কাছে মিথ্যা নহে। যদি কাহারও কাছে তাহা মিথ্যা হয় তবে সেই মিথ্যাটাই মিথ্যা; যে-লোক চোখ বুজিয়া আছে তাহার কাছে আলোক যেমন মিথ্যা এও তেমনি মিথ্যা। কাব্যের বাস্তবতা সম্বন্ধে কবির নিজের মধ্যে যে-প্রমাণ, তিনি জানেন, বিশ্বের মধ্যেই সেই প্রমাণ আছে। সেই প্রমাণের অনুভূতি সকলের নাই—সুতরাং বিচারকের আসনে যে-খুশি বসিয়া যেমন-খুশি রায় দিতে পারেন, কিন্তু ডিক্রিজারির বেলায় যে তাহা খাটিবেই এমন কোনো কথা নাই।

কবির আত্মানুভূতির যে-উপাদানটার কথা বলিলাম এটা সকল কবির সকল সময়েই যে বিশুদ্ধ থাকে তাহা নহে। তাহা নানা কারণে কখনো আবৃত হয়, কখনো বিকৃত হয়, নগদ মূল্যের প্রলোভনে কখনো তাহার উপর বাজারে-চলিত আদর্শের নকলে কৃত্রিম নকশা কাটা হয়— এইজন্য তাহার সকল অংশ নিত্য নহে এবং সকল অংশের সমান আদর হইতেই পারে না। অতএব, কবি রাগই করুন আর খুশিই হউন, তাঁহার কাব্যের একটা বিচার করিতেই হইবে— এবং যে-কেহ তাঁহার কাব্য পড়িবে সকলেই তাঁহার বিচার করিবে—সে বিচারে সকলে একমত হইবে না। মোটের উপরে, যদি নিজের মনে তিনি যথার্থ আত্মপ্রসাদ পাইয়া থাকেন তবে তাঁহার প্রাপ্যটি হাতে হাতে চুকাইয়া লইয়াছেন। অবশ্য, পাওনার চেয়ে উপরি-পাওনায় মানুষের লোভ বেশি। সেইজন্যই বাহিরে আশে-পাশে আড়ালে-আবডালে এত করিয়া হাত পাতিতে হয়। ঐখানেই বিপদ। কেননা লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

১৩২১

কবির কৈফিয়ত

আমরা যে-ব্যাপারটাকে বলি জীবলীলা পশ্চিমসমুদ্রের ওপারে তাকেই বলে জীবনসংগ্রাম।

ইহাতে ক্ষতি ছিল না। একটা জিনিসকে আমি যদি বলি নৌকা-চালানো আর তুমি যদি বল দাঁড়-টানা, একটি কাব্যকে আমি যদি বলি রামায়ণ আর তুমি যদি বল রামরাবণের লড়াই, তাহা লইয়া আদালত করিবার দরকার ছিল না।

কিন্তু, মুশকিল হইয়াছে এই যে, কথাটা ব্যবহার করিতে আমাদের আজকাল লজ্জা বোধ হইতেছে। জীবনটা কেবলই লীলা! এ কথা শুনিলে জগতের সমস্ত পালোয়ানের দলেরা কী বলিবে যাহারা তিন ভুবনে কেবলই তাল ঠুকিয়া লড়াই করিয়া বেড়াইতেছে!

আমি কবুল করিতেছি, আমার এখানে লজ্জা নাই। ইহাতে আমার ইংরেজি-মাস্টার তাঁর সব-চেয়ে বড়ো শব্দভেদী বাণটা আমাকে মারিতে পারেন— বলিতে পারেন, 'ওহে, তুমি নেহাত ওরিয়েণ্টাল।' কিন্তু, তাহাতে আমি মারা পড়িব না।

'লীলা' বলিলে সবটাই বলা হইল, আর 'লড়াই' বলিলে লেজামুড়া বাদ পড়ে। এ লড়াইয়ের আগাই বা কোথায় আর গোড়াই বা কোথায়। ভাঙখোর বিধাতার ভাঙের প্রসাদ টানিয়া এ কি হঠাৎ আমাদের একটা মত্ততা। কেন রে বাপু, কিসের জন্যে খামকা লড়াই।

বাঁচিবার জন্য।

আমার না-হক বাঁচিবার দরকার কী।

না বাঁচিলে যে মরিবে।

নাহয় মরিলাম।

মরিতে যে চাও না।

কেন চাই না।

চাও না বলিয়াই চাও না।

এই জবাবটাকে এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, লীলা। জীবনের মধ্যে বাঁচিবার একটা অহেতুক ইচ্ছা আছে। সেই ইচ্ছাটাই চরম কথা। সেইটে আছে বলিয়াই আমরা লড়াই করি, দুঃখকে মানিয়া লই। সমস্ত জোর-জবরদস্তির সব শেষে একটা খুশি আছে— তার ওদিকে আর যাইবার জো নাই, দরকারও নাই। শতরঞ্চ খেলার আগাগোড়াই খেলা— মাঝখানে দাবাবড়ে চালাচালি এবং মহাভাবনা। সেই দুঃখ না থাকিলে খেলার কোনো অর্থই থাকে না। অপর পক্ষে খেলার আনন্দ না থাকিলে দুঃখের মতো এমন নিদারুণ নিরর্থকতা আর-কিছু নাই। এমন স্থলে শতরঞ্চকে আমি যদি বলি খেলা আর তুমি যদি বল দাবাবড়ের লড়াই, তবে তুমি আমার চেয়ে কম বই যে বেশি বলিলে এমন কথা আমি মানিব না।

কিন্তু, এ-সব কথা বলা কেন। জীবনটা কিম্বা জগৎটা যে লীলা, এ কথা শুনিতে পাইলেই যে মানুষ একদম কাজকর্মে ঢিল দিয়া বসিবে।

এই কথাটা শোনা না-শোনার উপরই যদি মানুষের কাজ করা না-করা নির্ভর

করিত তবে যিনি বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন গোড়ায় তাঁরই মুখ বন্ধ করিয়া দিতে হয়। সামান্য কবির উপরে রাগ করায় বাহাদুরি নাই।

কেন, সৃষ্টিকর্তা বলেন কী।

তিনি আর যাই বলুন, লড়াইয়ের কথাটা যত পারেন চাপা দেন। মানুষের বিজ্ঞান বলিতেছে, জগৎ জুড়িয়া অণুতে পরমাণুতে লড়াই। কিন্তু, আমরা যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে তাকাইয়া দেখি, সেই যুদ্ধ-ব্যাপার ফুল হইয়া ফোটে, তারা হইয়া জ্বলে, নদী হইয়া চলে, মেঘ হইয়া ওড়ে। সমস্তটার দিকে সমগ্রভাবে যখন দেখি তখন দেখি, ভূমার ক্ষেত্রে সুরের সঙ্গে সুরের মিল, রেখার সঙ্গে রেখার যোগ, রঙের সঙ্গে রঙের মালাবদল। বিজ্ঞান সেই সমগ্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দলাদলি ঠেলাঠেলি হানাহানি দেখিতে পায়। সেই অবচ্ছিন্ন সত্য বিজ্ঞানের সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহা কবির সত্যও নহে, কবিগুরুর সত্যও নয়।

অন্য কবির কথা রাখিয়া দাও, তুমি নিজের হইয়া বলো।

আচ্ছা, ভালো। তোমাদের নালিশ এই যে, খেলা, ছুটি, আনন্দ, এই-সব কথা আমার কাব্যে বারবার আসিয়া পড়িতেছে। কথাটা যদি ঠিক হয় তবে বুঝিতে হইবে, একটা কোনো সত্যে আমাকে পাইয়াছে। তার হাত আমার আর এড়াইবার জো নাই। অতএব, এখন হইতে আমি বিধাতার মতোই বেহায়া হইয়া এক কথা হাজার বার বলিব। যদি আমাকে বানাইয়া বলিতে হইত তবে ফি বারে নূতন কথা না বলিলে লজ্জা হইত। কিন্তু, সত্যের লজ্জা নাই, ভয় নাই, ভাবনা নাই। সে নিজেকেই প্রকাশ করে; নিজেকেই প্রকাশ করা ছাড়া তার আর গতি নাই, এইজন্যই সে বেপরোয়া।

এটা যেন তোমার অহংকারের মতো শোনাইতেছে।

সত্যের দোহাই দিয়া নিন্দা করিলে যদি দোষ না হয়, তবে সত্যের দোহাই দিয়া অহংকার করিলেও দোষ নাই। অতএব, এখানে তোমাতে আমাতে শোধবোধ হইল।

বাজে কথা আসিল। যে-কথা লইয়া তর্ক চইতেছিল সেটা—

সেটা এই যে, জগতে শক্তির লড়াইটাকেই প্রধান করিয়া দেখা অবচ্ছিন্ন দেখা— অর্থাৎ গানকে বাদ দিয়া সুরের কসরতকে দেখা। আনন্দকে দেখাই সম্পূর্ণকে দেখা। এ কথা আমাদেরই দেশের সব-চেয়ে বড়ো কথা। উপনিষদের চরম কথাটি এই যে, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং সম্প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। আনন্দ হতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়, সমস্ত বাঁচে, আনন্দের দিকেই সমস্ত চলে।

এই যদি উপনিষদের চরম কথা হয় তবে কি ঋষি বলিতে চান, জগতে পাপ নাই, দুঃখ নাই, রেষারেষি নাই? আমরা তো ঐগুলোর উপরেই বেশি করিয়া জোর দিতে চাই; নহিলে মানুষের চেতনা হইবে কেমন করিয়া।

উপনিষৎ ইহার উত্তর দিয়াছেন, কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। কেইবা শরীরের চেষ্টা প্রাণের চেষ্টা করিত— অর্থাৎ, কেইবা দুঃখদ্বন্দ্ব লেশমাত্র স্বীকার করিত— আনন্দ যদি আকাশ ভরিয়া না থাকিত। অর্থাৎ, আনন্দই শেষ কথা বলিয়াই জগৎ দুঃখদ্বন্দ্ব সহিতে পারে। শুধু তাই নয়, দুঃখের পরিমাপেই আনন্দের পরিমাপ। আমরা প্রেমকে ততখানিই সত্য জানি যতখানি সে দুঃখ বহন করে। অতএব, দুঃখ তো আছেই কিন্তু তাহার উপরে আনন্দ আছে বলিয়াই সে আছে। নহিলে কিছুই থাকিত না, হানাহানি মারামারিও না। তোমরা যখন দুঃখকেই স্বীকার কর তখন আনন্দকে বাদ দাও, কিন্তু আনন্দকে স্বীকার করিলে দুঃখকে বাদ দেওয়া হয় না। অতএব, তোমরা যখন বল, হানাহানি করিতে করিতে যাহা টি঳কিল তাহাই সৃষ্টি, সেটা একটা অবচ্ছিন্ন কথা, ইংরেজিতে যাকে বলে অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্‌শন্— আর আনন্দ হইতেই সমস্ত হইতেছে ও টি঳কিতেছে, এইটেই হইল পুরা সত্য।

আচ্ছা, তোমার কথাই মানিয়া লইলাম, কিন্তু এটা তো একটা তত্ত্বজ্ঞানের কথা। সংসারের কাজে ইহার দাম কী।

সে জবাবদিহি কবির নয়, এমন-কি, বৈজ্ঞানিকেরও নয়। কিন্তু, যেরকম দিনকাল পড়িয়াছে কবিদের মতো সংসারের নেহাত অনাবশ্যক লোকেরও হিসাবনিকাশের দায় এড়াইয়া চলিবার জো নাই। আমাদের দেশের অলংকারশাস্ত্রে রসকে চিরদিন অহেতুক অনির্বচনীয় বলিয়া আসিয়াছে, সুতরাং যারা রসের কারবারী তাহাদিগকে এ দেশে প্রয়োজনের হাটের মাসুল দিতে হয় নাই। কিন্তু, শুনিতে পাই, পশ্চিমের কোনো কোনো নামজাদা পাকা লোক রসকে কাব্যের চরম পদার্থ বলিয়া মানিতে রাজি নন, রসের তলায় কোনো তলানি পড়ে কি না সেইটে দেখিয়া নিক্তিতে মাপিয়া তাঁরা কাব্যের দাম ঠিক করিতে চান। সুতরাং, কোনো কথাতেই অনির্বচনীয়তার দোহাই দিতে গেলে আজকাল আমাদের দেশেও লোকে সেকেলে এবং ওরিয়েণ্টাল বলিয়া নিন্দা করিতে পারে। সে নিন্দা অসহ্য নয়, তবু কাজের লোকদিগকে যতটুকু খুশি করিতে পারা যায় চেষ্টা করা ভালো। যদিচ আমি কবি মাত্র, তবুও এ সম্বন্ধে আমার বুদ্ধিতে যা আসে তা একটু গোড়ার দিক হইতে বলিতে চাই।

জগতে সৎ চিৎ ও আনন্দের প্রকাশকে আমরা জ্ঞানের ল্যাবরেটরিতে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখিতে পারি, কিন্তু তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া নাই। কাষ্ঠবস্তু গাছ নয়, তার রস টানিবার

ও প্রাণ ধরিবার শক্তিও গাছ নয় ; বস্তু ও শক্তিকে একটি সমগ্রতার মধ্যে আবৃত করিয়া যে একটি অখণ্ড প্রকাশ তাহাই গাছ— তাহা একই কালে বস্তুময়, শক্তিময়, সৌন্দর্যময়। গাছ আমাদিগকে যে আনন্দ দেয় সে এইজন্যই। এইজন্যই গাছ বিশ্বপৃথিবীর ঐশ্বর্য। গাছের মধ্যে ছুটির সঙ্গে কাজের, কাজের সঙ্গে খেলার কোনো বিচ্ছেদ নাই। এইজন্যই গাছপালার মধ্যে চিত্ত এমন বিরাম পায়, ছুটির সত্য রূপটি দেখিতে পায়। সে রূপ কাজের বিরুদ্ধ রূপ নয়। বস্তুত তাহা কাজেরই সম্পূর্ণ রূপ। এই কাজের সম্পূর্ণ রূপটিই আনন্দরূপ, সৌন্দর্যরূপ। তাহা কাজ বটে কিন্তু তাহা লীলা, কারণ তাহার কাজ ও বিশ্রাম এক সঙ্গেই আছে।

সৃষ্টির সমগ্রতার ধারাটা মানুষের মধ্যে আসিয়া ভাঙিয়া-চুরিয়া গেছে। তার প্রধান কারণ, মানুষের নিজের একটা ইচ্ছা আছে, জগতের লীলার সঙ্গে সে সমান তালে চলে না। বিশ্বের তালটা সে আজও সম্পূর্ণ কায়দা করিতে পারিল না। কথায় কথায় তাল কাটিয়া যায়। এইজন্য নিজের সৃষ্টিকে সে টুকরা টুকরা করিয়া ছোটো ছোটো গণ্ডির মধ্যে তাহাকে কোনোপ্রকারে তালে বাঁধিয়া লইতে চায়। কিন্তু তাহাতে পুরা সংগীতের রস ভাঙিয়া যায় এবং সেই টুকরাগুলার মধ্যেও তালরক্ষা হয় না। ইহাতে মানুষের প্রায় সকল কাজেই বোঝাবুঝিটাই সব-চেয়ে প্রকাশ পাইতে থাকে।

একটা দৃষ্টান্ত, ছেলেদের শিক্ষা। মানবসন্তানের পক্ষে এমন নিদারুণ দুঃখ আর কিছুই নাই। পাখি উড়িতে শেখে, মা-বাপের গান শুনিয়া গান অভ্যাস করে, সেটা তার জীবলীলার অঙ্গ— বিদ্যার সঙ্গে প্রাণের ও মনের প্রাণান্তিক লড়াই নয়। সে-শিক্ষা আগাগোড়াই ছুটির দিনের শিক্ষা, তাহা খেলার বেশে কাজ। গুরুমশায় এবং পাঠশালা কী জিনিস ছিল একবার ভাবিয়া দেখো। মানুষের ঘরে শিশু হইয়া জন্মানো যেন এমন অপরাধ যে, বিশ বছর ধরিয়া তার শাস্তি পাইতে হইবে। এ সম্বন্ধে কোনো তর্ক না করিয়া আমি কেবলমাত্র কবিত্বের জোরেই বলিব, এটা বিষম গলদ। কেননা, সৃষ্টিকর্তার মহলে বিশ্বকর্মার দলবল জগৎ জুড়িয়া গান গাহিতেছে—

মোদের, যেমন খেলা তেমনি যে কাজ জানিস নে কি, ভাই।

একদিন নীতিবিৎরা বলিয়াছিল, লালনে বহবো দোষাস্তাড়নে বহবো গুণাঃ। বেত বাঁচাইলে ছেলে মাটি করা হয়, এ কথা সুপ্রসিদ্ধ ছিল। অথচ আজ দেখিতেছি, শিক্ষার মধ্যে বিশ্বের আনন্দসুর ক্রমে লাগিতেছে— সেখানে বাঁশের জায়গা ক্রমেই বাঁশি দখল করিল।

আর একটা দৃষ্টান্ত দেখাই। বিলাত হইতে জাহাজে করিয়া যখন দেশে ফিরিতেছিলাম দুইজন মিশনারি আমার পাছু ধরিয়াছিল। তাহাদের মুখ হইতে আমার

দেশের নিন্দায় সমুদ্রের হাওয়া পর্যন্ত দূষিয়া উঠিল। কিন্তু, তাহারা নিজের স্বার্থ ভুলিয়া আমার দেশের লোকের যে কত অবিশ্রাম উপকার করিতেছে তাহার লম্বা ফর্দ আমার কাছে দাখিল করিত। তাহাদের ফর্দটি জাল ফর্দ নয়, অঙ্কেও ভুল নাই। তাহারা সত্যই আমাদের উপকার করে, কিন্তু সেটার মতো নিষ্ঠুর অন্যায় আমাদের প্রতি আর কিছুই হইতে পারে না। তার চেয়ে আমাদের পাড়ায় গুর্খাফৌজ লাগাইয়া দেওয়াই ভালো। আমি এই কথা বলি, কর্তব্যনীতি যেখানে কর্তব্যের মধ্যেই বদ্ধ, অর্থাৎ যেখানে তাহা অ্যাবস্ট্র্যাক্‌শন্, সেখানে সজীব প্রাণীর প্রতি তাহার প্রয়োগ অপরাধ। এইজন্যই আমাদের শাস্ত্রে বলে, শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। কেননা, দানের সঙ্গে শ্রদ্ধা বা প্রেম মিলিলে তবেই তাহা সুন্দর ও সমগ্র হয়।

কিন্তু, এমনি আমাদের অভ্যাস কদর্য হইয়াছে যে, আমরা নির্লজ্জের মতো বলিতে পারি যে, কর্তব্যের সরস না হইলেও চলে, এমন কি, না হইলেই ভালো চলে। লড়াই, লড়াই, লড়াই! আমাদিগকে বড়াই করিতে হইবে যে, আনন্দকে অবজ্ঞা করি আমরা এমনি বাহাদুর! চন্দন মাখিতে আমাদের লজ্জা, তাই রাই-সরিষার বেলেস্তারা মাখিয়া আমরা দাপাদাপি করি। আমার লজ্জা ঐ বেলেস্তারাটাকে।

আসলে, মানুষের গলদটা এইখানে যে, পনেরো-আনা লোক ঠিক নিজেকে প্রকাশ করিতে পায় না। অথচ নিজের পূর্ণ প্রকাশেই আনন্দ। গুণী যেখানে গুণী সেখানে তার কাজ যতই কঠিন হোক, সেখানেই তার আনন্দ; মা যেখানে মা সেখানে তার ঝঞ্ঝাট যত বেশিই হোক-না, সেখানেই তার আনন্দ। কেননা, পূর্বেই বলিয়াছি, যথার্থ আনন্দই সমস্ত দুঃখকে শিবের বিষপানের মতো অনায়াসে আত্মসাৎ করিতে পারে। তাই কার্লাইল প্রতিভাকে উলটা দিক দিয়া দেখিয়া বলিয়াছেন, অসীম দুঃখ স্বীকার করিবার শক্তিকেই বলে প্রতিভা।

কিন্তু, মানুষ যে কাজ করে তার অধিকাংশই নিজেকে প্রকাশের জন্য নয়। সে হয় নিজের মনিবকে নয় কোনো প্রবল পক্ষকে, নয় কোনো বাঁধা দস্তরের কর্মপ্রণালীকে পেটের দায়ে বা পিঠের দায়ে প্রকাশ করে। পনেরো-আনা মানুষের কাজ অন্যের কাজ। জোর করিয়া মানুষ নিজেকে আর-কেহ কিম্বা আর-কিছুর মতো করিতে বাধ্য। চীনের মেয়ের জুতা তার পায়ের মতো নহে, তার পা তার জুতার মতো। কাজেই পাকে দুঃখ পাইতে হয় এবং কুৎসিত হইতে হয়। কিন্তু, এমনতরো কুৎসিত হইবার মস্ত সুবিধা এই যে, সকলেরই সমান কুৎসিত হওয়া সহজ। বিধাতা সকলকে সমান করেন নাই; কিন্তু, নীতিতত্ত্ববিৎ যদি সকলকেই সমান করিতে চায় তবে তো লড়াই ছাড়া, কৃচ্ছ্রসাধন ছাড়া, কুৎসিত হওয়া ছাড়া আর কথা নাই।

সকল মানুষকেই রাজার, সমাজের, পরিবারের, মনিবের দাসত্ব করিতে হইতেছে। কেমন গোলমালে দায়ে পড়িয়া এইরকমটা ঘটিয়াছে। এইজন্যই লীলা কথাটাকে আমরা চাপা দিতে চাই। আমরা বুক ফুলাইয়া বলি, জিন-লাগাম পরিয়া ছুটিতে ছুটিতে রাস্তায় মুখ থুব্‌ড়াইয়া মরাই মানুষের পরম গৌরব। এ-সমস্ত দাসের জাতির দাসত্বের বড়াই। এমনি করিয়া দাসত্বের মন্ত্র আমাদের কানে আওড়ানো হয় পাছে এক মুহূর্তের জন্য আমাদের আত্মা আত্মগৌরবে সচেতন হইয়া উঠে। না, আমরা ঠাক্‌রা গাড়ির ঘোড়ার মতো লাগাম-বাঁধা মরিবার জন্য জন্মাই নাই। আমরা রাজার মতো বাঁচিব, রাজার মতো মরিব।

আমাদের সব-চেয়ে বড়ো প্রার্থনা এই যে, আবিরাবীর্ম এধি। হে আবি, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও। তুমি পরিপূর্ণ, তুমি আনন্দ। তোমার রূপই আনন্দরূপ। সেই আনন্দরূপ গাছের চ্যালা কাঠ নহে, তাহা গাছ। তার মধ্যে হওয়া এবং করা একই।

আমার কথার জবাবে এ কথা বলা চলে যে, আনন্দরূপ মানুষের মধ্যে একবার ভাঙচুরের মধ্যে দিয়া তবে আবার আপনার অখণ্ড পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে। যতদিন তা না হয় ততদিন লড়াইয়ের মন্ত্র দিনরাত জপিতে হইবে; ততদিন লাগাম পরিয়া মুখ থুব্‌ড়িয়া মরিতে হইবে। ততদিন ইস্কুলে আপিসে আদালতে হাটে বাজারে কেবলই নরমেধযজ্ঞ চলিতে থাকিবে। সেই বলির পশুদের কানে বলিদানের ঢাক-ঢোলই খুব উচ্চৈঃস্বরে বাজাইয়া তাহাদের বুদ্ধিকে ঘুলাইয়া দেওয়া ভালো— বলা ভালো, এই হাড়কাঠই পরম দেবতা, এই খড়্গাঘাতই আশীর্বাদ, আর জল্লাদই আমাদের ত্রাণকর্তা।

তা হোক, বলিদানের ঢাক-ঢোল বাজুক আপিসে, বাজুক আদালতে, বাজুক বন্দীদের শিকলের ঝংকারের সঙ্গে তাল রাখিয়া। মরুক সকলে গলদ্‌ঘর্ম হইয়া, শুষ্কতালু লইয়া, লাগাম কামড়াইয়া রাস্তার ধুলার উপরে। কিন্তু, কবির বীণায় বরাবর বাজিবে: আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। কবির ছন্দে এই মন্ত্রের উচ্চারণ শেষ হইবে না: Truth is beauty, beauty truth। ইহাতে আপিস আদালত কলেজ লাঠি হাতে তাড়া করিয়া আসিলেও সকল কোলাহলের উপরেও এই সুর বাজিবে— সমুদ্রের সঙ্গে, অরণ্যের সঙ্গে, আকাশের আলোকবীণার সঙ্গে সুর মিলাইয়া বাজিবে: আনন্দং সম্প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি— যাহা কিছু সমস্তই পরিপূর্ণ আনন্দের দিকেই চলিয়াছে, ধুঁকিতে ধুঁকিতে রাস্তার ধুলার উপরে মুখ থুবড়াইয়া মরিবার দিকে নহে।

১৩২২

সাহিত্য

উপনিষদ্ ব্রহ্মস্বরূপের তিনটি ভাগ করেছেন— সত্যম্, জ্ঞানম্, এবং অনন্তম্। চিরন্তনের এই তিনটি স্বরূপকে আশ্রয় ক'রে মানব-আত্মারও নিশ্চয় তিনটি রূপ আছে। তার একটি হল, আমরা আছি; আর-একটি, আমরা জানি; আর-একটি কথা তার সঙ্গে আছে তাই নিয়েই আজকের সভায় আমার আলোচনা। সেটি হচ্ছে, আমরা ব্যক্ত করি। ইংরেজিতে বলতে গেলে বলা যায়— I am, I know, I express, মানুষের এই তিন দিক এবং এই তিন নিয়েই একটি অখণ্ড সত্য। সত্যের এই তিন ভাব আমাদের নানা কাজে ও প্রবর্তনায় নিয়ত উদ্যত করে। টি'কতে হবে তাই অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, বাসস্থান চাই, স্বাস্থ্য চাই। এই নিয়ে তার নানারকমের সংগ্রহ রক্ষণ ও গঠনকার্য। 'আমি আছি' সত্যের এই ভাবটি তাকে নানা কাজ করায়। এই সঙ্গে আছে 'আমি জানি'। এরও তাগিদ কম নয়। মানুষের জানার আয়োজন অতি বিপুল, আর তা কেবলই বেড়ে চলেছে, তার মূল্য মানুষের কাছে খুব বড়ো। এই সঙ্গে মানবসত্যের আর-একটি দিক আছে 'আমি প্রকাশ করি'। 'আমি আছি' এইটি হচ্ছে ব্রহ্মের সত্য-স্বরূপের অন্তর্গত; 'আমি জানি' এটি ব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপের অন্তর্গত; 'আমি প্রকাশ করি' এটি ব্রহ্মের অনন্তস্বরূপের অন্তর্গত।

'আমি আছি' এই সত্যকে রক্ষা করাও যেমন মানুষের আত্মরক্ষা, তেমনি 'আমি জানি' এই সত্যকে রক্ষা করাও মানুষের আত্মরক্ষা— কেননা, মানুষের স্বরূপ হচ্ছে জ্ঞান-স্বরূপ। অতএব, মানুষ যে কেবলমাত্র জানবে কী দিয়ে, কী খাওয়ার দ্বারা আমাদের পুষ্টি হয়, তা নয়। তাকে নিজের জ্ঞানস্বরূপের গরজে রাত্রির পর রাত্রি জিজ্ঞাসা করতে হবে, মঙ্গলগ্রহে যে-চিহ্নজাল দেখা যায় সেটা কী। জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে হয়তো তাতে তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অত্যন্ত পীড়িত হয়। অতএব, মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে তার জ্ঞানময় প্রকৃতির সঙ্গে সংগত ক'রে জানাই ঠিক জানা, তার প্রাণময় প্রকৃতির সঙ্গে একান্ত যুক্ত করে জানা ঠিক জানা নয়।

আমি আছি, আমাকে টি'কে থাকতে হবে, এই কথাটি যখন সংকীর্ণ সীমায় থাকে, তখন আত্মরক্ষা বংশরক্ষা কেবল আমাদের অহংকে আঁকড়ে থাকে। কিন্তু, যে-পরিমাণে মানুষ বলে যে, অন্যের টি'কে থাকার মধ্যেই আমার টি'কে থাকা, সেই পরিমাণে সে নিজের জীবনের মধ্যে অনন্তের পরিচয় দেয়; সেই পরিমাণে 'আমি আছি' এবং 'অন্য সকলে আছে' এই ব্যবধানটা তার ঘুচে যায়। এই অন্যের সঙ্গে ঐক্যবোধের দ্বারা যে মাহাত্ম্য ঘটে সেইটেই হচ্ছে আত্মার ঐশ্বর্য; সেই মিলনের প্রেরণায় মানুষ নিজেকে

নানা-প্রকারে প্রকাশ করতে থাকে। যেখানে একলা মানুষ সেখানে তার প্রকাশ নেই। টিঁকে থাকার অসীমতা-বোধকে অর্থাৎ 'আপনার থাকা অন্যের থাকার মধ্যে' এই অনুভূতিকে মানুষ নিজেরই ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র দৈনিক ব্যবহারের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রাখতে পারে না। তখন সেই মহাজীবনের প্রয়োজনসাধনের উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার সেবায় ত্যাগে সে প্রবৃত্ত হয়, এবং সেই মহাজীবনের আনন্দকে আবেগকে সে নানা সাহিত্যে স্থাপত্যে মূর্তিতে চিত্রে গানে প্রকাশ করতে থাকে।

পূর্বে বলেছি, কেবলমাত্র নিজে নিজে একান্ত টিঁকে থাকবার ব্যাপারেও জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। কিন্তু, সে জ্ঞানের দীপ্তি নেই। জ্ঞানের রাজ্যে যেখানে অসীমের প্রেরণা সেখানে মানুষের শিক্ষার কত উদ্যোগ, কত পাঠশালা, কত বিশ্ববিদ্যালয়, কত বীক্ষণ, কত পরীক্ষণ, কত আবিষ্কার, কত উদ্ভাবনা। সেখানে মানুষের জ্ঞান সর্বজনীন ও সর্বকালীন হয়ে মানবাত্মার সর্বত্র প্রবেশের অধিকারকে ঘোষণা করে। এই অধিকারের বিচিত্র আয়োজন বিজ্ঞানে দর্শনে বিস্তৃত হতে থাকে। কিন্তু, তার বিশুদ্ধ আনন্দরসটি নানা রচনায় সাহিত্যে ও আর্টে প্রকাশ পায়।

তবেই একটা কথা দেখছি যে, পশুদের মতো মানুষেরও যেমন নিজে টিঁকে থাকবার ইচ্ছা প্রবল, পশুদের মতো মানুষেরও যেমন প্রয়োজনীয় জ্ঞানের কৌতূহল সর্বদা সচেষ্ট, তেমনি মানুষের আর-একটি জিনিস আছে যা পশুদের নেই— সে ক্রমাগতই তাকে কেবলমাত্র-প্রাণধারণের সীমার বাইরে নিয়ে যায়। এইখানেই আছে প্রকাশতত্ত্ব।

প্রকাশটা একটা ঐশ্বর্যের কথা। যেখানে মানুষ দীন সেখানে তো প্রকাশ নেই, সেখানে সে যা আনে তাই খায়। যাকে নিজেই সম্পূর্ণ শোষণ ক'রে নিয়ে নিঃশেষ না করতে পারি, তাই দিয়েই তো প্রকাশ। লোহা গরম হতে হতে যতক্ষণ না দীপ্ত তাপ পর্যন্ত যায় ততক্ষণ তার প্রকাশ নেই। আলো হচ্ছে তাপের ঐশ্বর্য। মানুষের যে-সকল ভাব স্বকীয় প্রয়োজনের মধ্যেই ভুক্ত হয়ে না যায়, যার প্রাচুর্যকে আপনার মধ্যেই আপনি রাখতে পারে না, যা স্বভাবতই দীপ্যমান তারই দ্বারা মানুষের প্রকাশের উৎসব। টাকার মধ্যে এই ঐশ্বর্য আছে কোন্‌খানে। যেখানে সে আমার একান্ত প্রয়োজনকে উত্তীর্ণ হয়ে যায়, যেখানে সে আমার পকেটের মধ্যে প্রচ্ছন্ন নয়, যেখানে তার সমস্ত রশ্মিই আমার কৃষ্ণবর্ণ অহংটার দ্বারা সম্পূর্ণ শোষিত না হয়ে যাচ্ছে, সেই-খানেই তার মধ্যে অশেষের আবির্ভাব এবং এই অশেষই নানারূপে প্রকাশমান। সেই প্রকাশের প্রকৃতিই এই যে, আমরা সকলেই বলতে পারি— 'এ যে আমার'। সে যখন অশেষকে স্বীকার করে তখনই সে কোনো একজন অমুক বিশেষ লোকের ভোগ্যতার

মলিন সম্বন্ধ হতে মুক্ত হয়। অশেষের প্রসাদ-বঞ্চিত সেই বিশেষভোগ্য টাকার বর্বরতায় বসুন্ধরা পীড়িতা। দৈত্যের ভারের মতো আর ভার নেই। টাকা যখন দৈত্যের বাহন হয় তখন তার চাকার তলায় কত মানুষ ধূলিতে ধূলি হয়ে যায়। সেই দৈত্যেরই নাম প্রতাপ, তা আলোক নয়, তা কেবলমাত্র দাহ— সে যার কেবলমাত্র তারই, এইজন্যে তাকে অনুভব করা যায় কিন্তু স্বীকার করা যায় না। নিখিলের সেই স্বীকার-করাকেই বলে প্রকাশ।

এই প্রতাপের রক্তপঙ্কিল অশুচি স্পর্শকে প্রকৃতি তার শ্যামল অমৃতের ধারা দিয়ে মুছে মুছে দিচ্ছে। ফুলগুলি সৃষ্টির অন্তঃপুর থেকে সৌন্দর্যের ডালি বহন করে নিয়ে এসে প্রতাপের কলুষিত পদচিহ্নগুলোকে লজ্জায় কেবলই ঢাকা দিয়ে দিয়ে চলেছে। জানিয়ে দিচ্ছে যে, 'আমরা ছোটো, আমরা কোমল, কিন্তু আমরাই চিরকালের। কেননা, সকলেই আমাদের বরণ ক'রে নিয়েছে— আর, ঐ-যে উদ্যতমুষ্টি বিভীষিকা, যে পাথরের 'পরে পাথর চাপিয়ে আপনার কেল্লাকে অভ্রভেদী ক'রে তুলছে সে কিছুই নয়, কেননা ওর নিজে ছাড়া আর কেউই ওকে স্বীকার করছে না—মাধবীবিতানের সুন্দরী ছায়াটিও ওর চেয়ে সত্য।'

এই যে তাজমহল— এমন তাজমহল, তার কারণ সাজাহানের হৃদয়ে তাঁর প্রেম, তাঁর বিরহবেদনার আনন্দ অনন্তকে স্পর্শ করেছিল; তাঁর সিংহাসনকে তিনি যে-কোঠাতেই রাখুন তিনি তাঁর তাজমহলকে তাঁর আপন থেকে মুক্ত ক'রে দিয়ে গেছেন। তার আর আপন-পর নেই, সে অনন্তের বেদি। সাজাহানের প্রতাপ যখন দস্যুবৃত্তি করে তখন তার লুঠের মাল যতই প্রভূত হোক তাতে ক'রে তার নিজের থলিটারও পেট ভরে না, সুতরাং ক্ষুধার অন্ধকারের মধ্যে তলিয়ে লুপ্ত হয়ে যায়। আর, যেখানে পরিপূর্ণতার উপলব্ধি তার চিত্তে আবির্ভূত হয় সেখানে সেই দৈববাণীটিকে নিজের কোষাগারে নিজের বিপুল রাজ্যে সাম্রাজ্যে কোথাও সে আর ধ'রে রেখে দিতে পারে না। সর্বজনের ও নিত্যকালের হাতে তাকে সমর্পণ করা ছাড়া আর গতি নেই। একেই বলে প্রকাশ। আমাদের সমস্ত মঙ্গল-অনুষ্ঠানে গ্রহণ করবার মন্ত্র হচ্ছে ওঁ— অর্থাৎ, হাঁ। তাজমহল হচ্ছে সেই নিত্য-উচ্চারিত ওঁ— নিখিলের সেই গ্রহণ-মন্ত্র মূর্তিমান। সাজাহানের সিংহাসনে সেই মন্ত্র পড়া হয় নি; একদিন তার যতই শক্তি থাক্-না কেন, সে তো 'না' হয়ে কোথায় তলিয়ে গেল। তেমনি কত কত বড়ো বড়ো নামধারী 'না'এর দল আজ দম্ভভরে বিলুপ্তির দিকে চলেছে, তাদের কামান-গর্জিত ও বন্দীদের শৃঙ্খল-ঝংকৃত কলরবে কান বধির হয়ে গেল, কিন্তু তারা মায়া, তারা নিজেরই মৃত্যুর নৈবেদ্য নিয়ে কালরাত্রিপারাবারের কালীঘাটে সব যাত্রা ক'রে

চলেছে। কিন্তু, ঐ শাজাহানের কন্যা জাহানারার একটি কান্নার গান? তাকে নিয়ে আমরা বলেছি, ওঁ।

কিন্তু, আমরা দান করতে চাইলেই কি দান করতে পারি। যদি বলি 'তুভ্যমহং সম্প্রদদে', তা হলেই কি বর এসে হাত পাতেন। নিত্যকাল এবং নিখিলবিশ্ব এই কথাই বলেন— 'যদেতৎ হৃদয়ং মম' তার সঙ্গে তোমার সম্প্রদানের মিল থাকা চাই। তোমার অনন্তম্ যা দেবেন আমি তাই নিতে পারি। তিনি মেঘদূতকে নিয়েছেন—তা উজ্জয়িনীর বিশেষ সম্পত্তি না, তাকে বিক্রমাদিত্যের সিপাই শান্ত্রী পাহারা দিয়ে তাঁর অন্তঃপুরের হংসপদিকাদের মহলে আটকে রাখতে পারে নি। পণ্ডিতরা লড়াই করতে থাকুন, তা খৃস্টজন্মের পাঁচশো বছর পূর্বে কি পরে রচিত। তার গায়ে সকল তারিখেরই ছাপ আছে। পণ্ডিতেরা তর্ক করতে থাকুন, তা শিপ্রাতীরে রচিত হয়েছিল না গঙ্গাতীরে। তার মন্দাক্রান্তার মধ্যে পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সকল নদীরই কলধ্বনি মুখরিত। অপর পক্ষে এমন-সব পাঁচালি আছে যার অনুপ্রাসছটার চকমকি ঠোকা স্ফুলিঙ্গবর্ষণে সভাস্থ হাজার হাজার লোকে মুগ্ধ হয়ে গেছে; তাদের বিশুদ্ধ স্বাদেশিকতায় আমরা যতই উত্তেজিত হই-না কেন, সে-সব পাঁচালির দেশ ও কাল সুনির্দিষ্ট; কিন্তু সর্বদেশ ও সর্বকাল তাদের বর্জন করাতে তারা কুলীনের অনূঢ়া মেয়ের মতো ব্যর্থ কুল-গৌরবকে কলাগাছের কাছে সমর্পণ ক'রে নিঃসন্ততি হয়ে চলে যাবে।

উপনিষদ যেখানে ব্রহ্মের স্বরূপের কথা বলেছেন অনন্তম্, সেখানে তাঁর প্রকাশের কথা কী বলেছেন। বলেছেন, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। এইটে হল আমাদের আসল কথা। সংসারটা যদি গারদখানা হত তা হলে সকল সিপাই মিলে রাজদণ্ডের ঠেলা মেরেও আমাদের টলাতে পারত না। আমরা হরতাল নিয়ে বসে থাকতেম, বলতেম 'আমাদের পানাহার বন্ধ'। কিন্তু, আমি তো স্পষ্টই দেখছি, কেবল যে চারি দিকে তাগিদ আছে তা নয়।

বারে বারে আমার হৃদয় যে মুগ্ধ হয়েছে। এর কী দরকার ছিল। টিটাগড়ের পাটকলের কারখানায় যে মজুরেরা খেটে মরে তারা মজুরি পায়, কিন্তু তাদের হৃদয়ের জন্যে তো কারও মাথাব্যথা নেই। তাতে তো কল বেশ ভালোই চলে। যে-মালিকেরা শতকরা ৪০০ টাকা হারে মুনাফা নিয়ে থাকে তারা তো মনোহরণের জন্য এক পয়সাও অপব্যয় করে না। কিন্তু, জগতে তো দেখছি, সেই মনোহরণের আয়োজনের অন্ত নেই। অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে, এ কেবল বোপদেবের মুগ্ধবোধের সূত্রজাল নয়, এ যে দেখি কাব্য। অর্থাৎ, দেখছি ব্যাকরণটা রয়েছে দাসীর মতো পিছনে, আর রসের লক্ষ্মী রয়েছেন সামনেই। তা হলে কি এর প্রকাশের মধ্যে দণ্ডীর দণ্ডই রয়েছে না রয়েছে কবির আনন্দ?

এই-যে সূর্যোদয় সূর্যাস্ত, এই-যে আকাশ থেকে ধরণী পর্যন্ত সৌন্দর্যের প্লাবন, এর মধ্যে তো কোনো জবরদস্ত্ পাহারাওয়ালার তকমার চিহ্ন দেখতে পাই নে। ক্ষুধার মধ্যে একটা তাগিদ আছে বটে, কিন্তু ওটা তো স্পষ্টই একটা 'না'এর ছাপ-মারা জিনিস। 'হাঁ' আছে বটে ক্ষুধা-মেটাবার সেই ফলটির মধ্যে, রসনা যাকে সরস আগ্রহের সঙ্গে আত্মীয় বলে অভ্যর্থনা করে নেয়। তা হলে কোন্‌টাকে সামনে দেখব আর কোন্‌টাকে পিছনে? ব্যাকরণটাকে না কাব্যটিকে? পাকশালকে না ভোজের নিমন্ত্রণকে? গৃহকর্তার উদ্দেশ্যটি কোন্‌খানে প্রকাশ পায়— যেখানে, নিমন্ত্রণপত্র হাতে, ছাতা মাথায় হেঁটে এলেম না যেখানে আমার আসন পাতা হয়েছে? সৃষ্টি আর সর্জন হল একই কথা। তিনি আপনাকে পরিপূর্ণভাবে বিসর্জন করেছেন, বিলিয়ে দিয়েছেন ব'লেই আমাদের প্রাণ জুড়িয়ে দিয়েছেন— তাই আমাদের হৃদয় বলে 'আঃ বাঁচলেম'।

শুক্ল সন্ধ্যার আকাশ জ্যোৎস্নায় উপছে পড়েছে— যখন কমিটি-মিটিংয়ে তর্ক বিতর্ক চলেছে তখন সেই আশ্চর্য খবরটি ভুলে থাকতে পারি, কিন্তু তারপর যখন দশটা রাত্রে ময়দানের সামনে দিয়ে বাড়ি ফিরি তখন ঘন চিন্তার ফাঁকের মধ্যে দিয়ে যে প্রকাশটি আমার মনের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ায় তাকে দেখে আর কী বলব। বলি, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। সেই যে যৎ আনন্দরূপে যার প্রকাশ, সে কোন্ পদার্থ। সে কি শক্তি-পদার্থ।

রান্নাঘরে শক্তির প্রকাশ লুকিয়ে আছে। কিন্তু, ভোজের থালায় সে কি শক্তির প্রকাশ। মোগলসম্রাট প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন শক্তিকে। সেই বিপুল কাঠ-খড়ের প্রকাশকে কি প্রকাশ বলে। তার মূর্তি কোথায়। আওরঙজেবের নানা আধুনিক অবতাররাও রক্তরেখায় শক্তিকে প্রকাশ করবার জন্যে অতি বিপুল আয়োজন করেছেন। কিন্তু যিনি আবিঃ, যিনি প্রকাশস্বরূপ, আনন্দরূপে যিনি ব্যক্ত হচ্ছেন, তিনি সেই রক্তরেখার উপরে রবার বুলোতে এখনি শুরু করেছেন। আর, তাঁর আলোক-রশ্মির সম্মার্জনী তাদের আয়োজনের আবর্জনার উপর নিশ্চয় পড়তে আরম্ভ হয়েছে। কেননা, তাঁর আনন্দ যে প্রকাশ, আর আনন্দই যে তাঁর প্রকাশ।

এই প্রকাশটিকে আচ্ছন্ন করে তাঁর শক্তিকে যদি তিনি সামনে রাখতেন তা হলে তাঁকে মানার মতো অপমান আমার পক্ষে আর কিছু হতে পারে না। যখন জাপানে যাচ্ছিলাম জাহাজ পড়ল দারুণ ঝড়ে। আমি ছিলেম ডেকে বসে। আমাকে ডুবিয়ে মারার পক্ষে পবনের একটা ছোটো নিশ্বাসই যথেষ্ট; কিন্তু কালো সাগরের বুকের উপরে পাগলা ঝড়ের যে-নৃত্য তার আয়োজন হচ্ছে আমার ভিতরে যে পাগল মন আছে তাকে মাতিয়ে তোলবার জন্যে। ঐ বিপুল সমারোহের দ্বারাই পাগলের সঙ্গে পাগলের

মোকাবিলায় রহস্যালাপ হতে পারল। নাহয় ডুবেই মরতেম— সেটা কি এর চেয়ে বড়ো কথা। রুদ্রবীণার ওস্তাদজি তাঁর এই রুদ্রবীণার শাক্রেদকে ফেনিল তরঙ্গ-তাণ্ডবের মধ্যে দুটো-একটা চক্র-হাওয়ার দ্রুত-তালের তান শুনিয়ে দিলেন। সেইখানে বলতে পারলেম, 'তুমি আমার আপনার।'

অমৃতের দুটি অর্থ— একটি যার মৃত্যু নেই, এবং যা পরম রস। আনন্দ যে রূপ ধরেছে এই তো হল রস। অমৃতও যদি সেই রসই হয় তবে রসের কথা পুনরুক্ত হয় যায়। কাজেই এখানে বলব অমৃত মানে যা মৃত্যুহীন— অর্থাৎ আনন্দ যেখানে রূপ ধরেছে সেইখানেই সেই প্রকাশ মৃত্যুকে অতিক্রম করেছে। সবাই দেখাচ্ছে কালের ভয়। কালের রাজত্বে থেকেও কালের সঙ্গে যার অসহযোগ সে কোথায়।

এইবারে আমাদের কথা। কাব্য যেটি ছন্দে গাঁথা হয়, রূপদক্ষ যে-রূপ রচনা করেন, সেটি যদি আনন্দের প্রকাশ হয় তবে সে মৃত্যুঞ্জয়।— এই 'রূপদক্ষ' কথাটি আমার নূতন পাওয়া। ইন্‌স্‌ক্রিপ্‌শন্‌ অর্থাৎ একটা প্রাচীনলিপিতে পাওয়া গেছে, আর্টিস্টের একটা চমৎকার প্রতিশব্দ।—

কাব্যের বা চিত্রের তো সমাপ্তিতে সমাপ্তি নেই। মেঘদূত শোনা হয়ে গেল, ছবি দেখে বাড়ি ফিরে এলেম, কিন্তু মনের মধ্যে একটা অবসাদকে তো নিয়ে এলেম না। গান যখন সমে এসে থামল তখন ভারি আনন্দে মাথা ঝাকা দিলেম। সম মানে তো থামা, তাতে আনন্দ কেন— তার কারণ হচ্ছে, আনন্দরূপ থামাতে থামে না। কিন্তু, টাকাটা যেই ফুরিয়ে গেল তখন তো সমে মাথা নেড়ে বলি নে— 'আঃ'।

গান থামল— তবু সে শূন্যের মতো অন্ধকারের মতো থামল না কেন। তার কারণ, গানের মধ্যে একটি তত্ত্ব আছে যা সমগ্র বিশ্বের আত্মার মধ্যে আছে— কাজেই সে সেই 'ওঁ'কে আশ্রয় করে থেকে যায়; তার জন্যে কোনো গর্ত কোথাও নেই। এই গান আমি শুনি বা নাই শুনি, তাকে প্রত্যক্ষত কেউ নিল বা নাই নিল, তাতে কিছুই আসে-যায় না। কত অমূল্যধন চিত্রে কাব্যে হারিয়ে গেছে কিন্তু সেটা একটা বাহ্য ঘটনা, একটা আকস্মিক ব্যাপার। আসল কথা হচ্ছে এই যে, তারা আনন্দের ঐশ্বর্যকে প্রকাশ করেছে, প্রয়োজনের দৈন্যকে করে নি। সেই দৈন্যের রূপটা যদি দেখতে চাও তবে পাটকলের কারখানায় গিয়ে ঢোকো যেখানে গরিব চাষার রক্তকে ঘূর্ণীচাকার পাক দিয়ে বহুশতকরা হারের মুনাফায় পরিণত করা হচ্ছে। গঙ্গাতীরের বটচ্ছায়াসমাশ্রিত যে-দেউলটিকে লোপ ক'রে দিয়ে ঐ প্রকাণ্ড-হাঁ-করা কারখানা কালো ধোঁয়া উদ্‌গীর্ণ করছে সেই লুপ্ত দেউলের চেয়েও ঐ কারখানা-ঘর মিথ্যা। কেননা, আনন্দলোকে ওর স্থান নেই।

বসন্তে ফুলের মুকুল রাশি রাশি ঝরে যায়; ভয় নেই, কেননা ক্ষয় নেই। বসন্তের

ডালিতে অমৃতমন্ত্র আছে। রূপের নৈবেদ্য ভরে ভরে ওঠে। সৃষ্টির প্রথম যুগে যে-সব ভূমিকম্পের মহিষ তার শিঙের আক্ষেপে ভূতল থেকে তপ্তপঙ্ক উৎক্ষিপ্ত করে দিচ্ছিল তারা আর ফিরে এল না; যে-সব অগ্নিনাগিনী রসাতলের আবরণ ফুঁড়ে ক্ষণে ক্ষণে ফণা তুলে পৃথিবীর মেঘাচ্ছন্ন আকাশকে দংশন করতে উদ্যত হয়েছিল তারা কোন্ বাঁশি শুনে শান্ত হয়ে গেল। কিন্তু, কচি কচি শ্যামল ঘাসের কোমল চুম্বন আকাশের নীল চোখকে বারে বারে জুড়িয়ে দিচ্ছে। তারা দিনে দিনে ফিরে ফিরে আসে। আমার ঘরের দরজার কাছে কয়েকটি কাঁটাগাছে বসন্তের সোহাগে ফুল ফুটে ওঠে। সে হল কণ্টিকারীর ফুল। তার বেগুনি রঙের কোমল বুকের মাঝখানে একটুখানি হলদে সোনা। আকাশে তাকিয়ে যে-সূর্যের কিরণকে সে ধ্যান করে সেই ধ্যানটুকু তার বুকের মাঝখানটিতে যেন মধুর হয়ে রইল। এই ফুলের কি খ্যাতি আছে। আর, এ কি ঝরে ঝরে পড়ে না। কিন্তু, তাতে ক্ষতি হল কী। পৃথিবীর অতি বড়ো বড়ো পালোয়ানের চেয়ে সে নির্ভয়। অন্তরের আনন্দের মধ্যে সে রয়েছে, সে অমৃত। যখন বাইরে সে নেই তখনও রয়েছে।

মৃত্যুর হাতুড়ি পিটিয়েই মহাকালের দরবারে অমৃতের যাচাই হতে থাকে। খৃস্টের মৃত্যুসংবাদে এই কথাটাই না খৃস্টীয় পুরাণে আছে। মৃত্যুর আঘাতেই তাঁর অমৃতের শিখা উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ হল না কি। কিন্তু, একটি কথা মনে রাখতে হবে— আমার কাছে বা তোমার কাছে ঘাড়-নাড়া পাওয়াকেই অমৃতের প্রকাশ বলে না। যেখানে সে রয়ে গেল সেখানে আমাদের দৃষ্টি না যেতেও পারে, আমাদের স্মৃতির পরিমাণে তার অমৃতত্বের পরিমাণ নয়। পূর্ণতার আবির্ভাবকে বুকে করে নিয়ে সে যদি এসে থাকে তা হলে মুহূর্তকালের মধ্যেই সে নিত্যকে দেখিয়ে দিয়েছে— আমার ধারণার উপরে তার আশ্রয় নয়।

হয়তো এ-সব কথা তত্ত্বজ্ঞানের কোঠায় পড়ে— আমার মতো আনাড়ির পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনায় অবতীর্ণ হওয়া অসংগত। কিন্তু, আমি সেই শিক্ষকের মঞ্চে দাঁড়িয়ে কথা বলছি নে। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় অন্তরে বাহিরে রসের যে-পরিচয় পেয়েছি আমি তারই কাছ থেকে ক্ষণে ক্ষণে আমার প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করেছি। তাই আমি এখানে আহরণ করছি। আমাদের দেশে পরমপুরুষের একটি সংজ্ঞা আছে; তাঁকে বলা হয়েছে সচ্চিদানন্দ। এর মধ্যে আনন্দটিই হচ্ছে সব-শেষের কথা, এর পরে আর-কোনো কথা নেই। সেই আনন্দের মধ্যেই যখন প্রকাশের তত্ত্ব তখন এ প্রশ্নের কোনো অর্থ ই নেই যে, আর্টের দ্বারা আমাদের কোনো হিতসাধন হয় কিনা।

১৩৩০

তথ্য ও সত্য

সাহিত্য বা কলা-রচনায় মানুষের যে-চেষ্টার প্রকাশ, তার সঙ্গে মানুষের খেলা করবার প্রবৃত্তিকে কেউ কেউ এক করে দেখেন। তাঁরা বলেন, খেলার মধ্যে প্রয়োজন-সাধনের কোনো কথা নেই, তার উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ অবসরবিনোদন; সাহিত্য ও ললিত-কলারও সেই উদ্দেশ্য। এ সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার আছে।

আমি কাল বলেছি যে, আমাদের সত্তার একটা দিক হচ্ছে প্রাণধারণ, টিঁকে থাকা। সেজন্যে আমাদের কতকগুলি স্বাভাবিক বেগ আবেগ আছে। সেই তাগিদেই শিশুরা বিছানায় শুয়ে শুয়ে হাত পা নাড়ে, আরও একটু বড়ো হলে অকারণে ছুটোছুটি করতে থাকে। জীবনযাত্রায় দেহকে ব্যবহার করবার প্রয়োজনে প্রকৃতি এইরকম অনর্থকতার ভান করে আমাদের শিক্ষা দিতে থাকেন। ছোটো মেয়ে যে-মাতৃভাব নিয়ে জন্মেছে তার পরিচালনার জন্যেই সে পুতুল নিয়ে খেলে। প্রাণধারণের ক্ষেত্রে জিগীষাবৃত্তি একটি প্রধান অস্ত্র; বালকেরা তাই প্রকৃতির প্রেরণায় প্রতিযোগিতার খেলায় সেই বৃত্তিতে শান দিতে থাকে।

এইরকম খেলাতে আমাদের বিশেষ আনন্দ আছে; তার কারণ এই যে, প্রয়োজন-সাধনের জন্য আমরা যে-সকল প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মেছি, প্রয়োজনের উপস্থিত দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে নিয়ে তাদের খেলায় প্রকাশ করতে পাই। এই হচ্ছে ফলাসক্তিহীন কর্ম; এখানে কর্মই চরম লক্ষ্য, খেলাতেই খেলার শেষ। তৎসত্ত্বেও খেলার বৃত্তি আর প্রয়োজনসাধনের বৃত্তি মূলে একই। সেইজন্যে খেলার মধ্যে জীবনযাত্রার নকল এসে পড়ে। কুকুরের জীবনযাত্রায় যে-লড়াইয়ের প্রয়োজন আছে দুই কুকুরের খেলার মধ্যে তারই নকল দেখতে পাই। বিড়ালের খেলা ইঁদুর-শিকারের নকল। খেলার ক্ষেত্র জীবযাত্রা ক্ষেত্রের প্রতিরূপ।

অপর পক্ষে, যে-প্রকাশচেষ্টার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে, আপন প্রয়োজনের রূপকে নয়, বিশুদ্ধ আনন্দরূপকে ব্যক্ত করা, সেই চেষ্টারই সাহিত্যগত ফলকে আমি রসসাহিত্য নাম দিয়েছি। বেঁচে থাকবার জন্যে আমাদের যে-মূলধন আছে তারই একটা উদ্‌বৃত্ত অংশকে নিয়ে সাহিত্যে আমরা জীবন-ব্যবসায়েরই নকল করে থাকি, এ কথা বলতে তো মন সায় দেয় না। কবিতার বিষয়টি যাই হোক-না কেন, এমন-কি, সে যদি দৈনিক একটা তুচ্ছ ব্যাপারই হয়, তবু সেই বিষয়টিকে শব্দচিত্রে নকল করে ব্যক্ত করা তার উদ্দেশ্য কখনোই নয়।

বিদ্যাপতি লিখছেন—

যব গোধূলিসময় বেলি
ধনি মন্দিরবাহির ভেলি,
নব জলধরে বিজুরিরেহা দ্বন্দ্ব পসারি গেলি।

গোধূলি-বেলায় পূজা শেষ করে বালিকা মন্দির থেকে বাহির হয়ে ঘরে ফেরে— আমাদের দেশে সংসার-ব্যাপারে এ ঘটনা প্রত্যহই ঘটে। এ কবিতা কি শব্দরচনার দ্বারা তারই পুনরাবৃত্তি। জীবন-ব্যবহারে যেটা ঘটে, ব্যবহারের দায়িত্বমুক্ত ভাবে সেইটেকেই কল্পনায় উপভোগ করাই কি এই কবিতার লক্ষ্য। তা কখনোই স্বীকার করতে পারি নে। বস্তুত, মন্দির থেকে বালিকা বাহির হয়ে ঘরে চলেছে, এই বিষয়টি এই কবিতার প্রধান বস্তু নয়। এই বিষয়টিকে উপলক্ষ্যমাত্র করে ছন্দে-বন্ধে বাক্য-বিন্যাসে উপমাসংযোগে যে একটি সমগ্র বস্তু তৈরি হয়ে উঠছে সেইটেই হচ্ছে আসল জিনিস। সে জিনিসটি মূল বিষয়ের অতীত, তা অনির্বচনীয়।

ইংরেজ কবি কীট্‌স্‌ একটি গ্রীক পূজাপাত্রকে উদ্দেশ্য করে কবিতা লিখেছেন। যে-শিল্পী সেই পাত্রকে রচনা করেছিল সে তো কেবলমাত্র একটি আধারকে রচনা করে নি। মন্দিরে অর্ঘ্য নিয়ে যাবার সুযোগ মাত্র ঘটাবার জন্যে এই পাত্রের সৃষ্টি নয়। অর্থাৎ, মানুষের প্রয়োজনকে রূপ দেওয়া এর উদ্দেশ্য ছিল না। প্রয়োজনসাধন এর দ্বারা নিশ্চয়ই হয়েছিল, কিন্তু প্রয়োজনের মধ্যেই এ নিঃশেষ হয় নি। তার থেকে এ অনেক স্বতন্ত্র, অনেক বড়ো। গ্রীক শিল্পী সুষমাকে, পূর্ণতার একটি আদর্শকে, প্রত্যক্ষতা দান করেছে; রূপলোকে অপরূপকে ব্যক্ত করেছে। সে কোনো সংবাদ দেয় নি, বহিঃসংসারের কোনো-কিছুর পুনরাবৃত্তি করে নি। অন্তরের অহেতুক আনন্দকে বাহিরে প্রত্যক্ষগোচর করার দ্বারা তাকে পর্যাপ্তি দান করবার যে-চেষ্টা তাকে খেলা না বলে লীলা বলা যেতে পারে। সে হচ্ছে আমাদের রূপ সৃষ্টি করবার বৃত্তি; প্রয়োজন-সাধনের বৃত্তি নয়। তাতে মানুষের নিত্যকর্মের, দৈনিক জীবনের সম্বন্ধ থাকতেও পারে। কিন্তু, সেটা অবান্তর।

আমাদের আত্মার মধ্যে অখণ্ড ঐক্যের আদর্শ আছে। আমরা যা-কিছু জানি কোনো-না-কোনো ঐক্যসূত্রে জানি। কোনো জানা আপনাতেই একান্ত স্বতন্ত্র নয়। যেখানে দেখি আমাদের পাওয়া বা জানার অস্পষ্টতা সেখানে জানি, মিলিয়ে জানতে না পারাই তার কারণ। আমাদের আত্মার মধ্যে জ্ঞানে ভাবে এই-যে একের বিহার, সেই এক যখন লীলাময় হয় যখন সে সৃষ্টির দ্বারা আনন্দ পেতে চায়, সে তখন এককে বাহিরে সুপরিস্ফুট করে তুলতে চায়। তখন বিষয়কে উপলক্ষ্য ক'রে, উপাদানকে

আশ্রয় ক'রে একটি অখণ্ড এক ব্যক্ত হয় ওঠে। কাব্যে চিত্রে গীতে শিল্পকলায় গ্রীক শিল্পীর পূজাপাত্রে বিচিত্র রেখার আবর্তনে যখন আমরা পরিপূর্ণ একেকে চরম রূপে দেখি, তখন আমাদের অন্তরাত্মার একের সঙ্গে বহির্লোকের একের মিলন হয়। যে-মানুষ অরসিক সে এই চরম একেকে দেখতে পায় না; সে কেবল উপাদানের দিক থেকে, প্রয়োজনের দিক থেকে এর মূল্য নির্ধারণ করে।—

শরদ-চন্দ পবন মন্দ
বিপিনে বহল কুসুমগন্ধ,
ফুল্ল মল্লি মালতী যূথি
মত্তমধুপভোরনী।

বিষয়ে ভাবে বাক্যে ছন্দে নিবিড় সম্মিলনের দ্বারা যদি এই কাব্যে একের রূপ পূর্ণ হয়ে দেখা দেয়, যদি সেই একের আবির্ভাবই চরম হয়ে আমাদের চিত্তকে অধিকার করে, যদি এই কাব্য খণ্ড খণ্ড হয়ে উল্কাবৃষ্টির দ্বারা আমাদের মনকে আঘাত না করতে থাকে, যদি ঐক্যরসের চরমতাকে অতিক্রম করে আর-কোনো উদ্দেশ্য উগ্র হয়ে না ওঠে, তা হলেই এই কাব্যে আমরা সৃষ্টিলীলাকে স্বীকার করব।

গোলাপ-ফুলে আমরা আনন্দ পাই। বর্ণে গন্ধে রূপে রেখায় এই ফুলে আমরা একের সুষমা দেখি। এর মধ্যে আমাদের আত্মারূপী এক আপন আত্মীয়তা স্বীকার করে, তখন এর আর-কোনো মূল্যের দরকার হয় না। অন্তরের এক বাহিরের একের মধ্যে আপনাকে পায় বলে এরই নাম দিই আনন্দরূপ।

গোলাপের মধ্যে সুনিহিত সুবিহিত সুষমাযুক্ত যে-ঐক্য নিখিলের অন্তরের মধ্যেও সেই ঐক্য। সমস্তের সংগীতের সঙ্গে এই গোলাপের সুরটুকুর মিল আছে; নিখিল এই ফুলের সুষমাটিকে আপন বলে গ্রহণ করেছে।

এই কথাটাকে আর-এক দিক থেকে বোঝাবার চেষ্টা করি। আমি যখন টাকা করতে চাই তখন আমার টাকা করবার নানা প্রকার চেষ্টা ও চিন্তার মধ্যে একটি ঐক্য বিরাজ করে। বিচিত্র প্রয়াসের মধ্যে একটিমাত্র লক্ষ্যের ঐক্য অর্থকামীকে আনন্দ দেয়। কিন্তু, এই ঐক্য আপন উদ্দেশ্যের মধ্যেই খণ্ডিত, নিখিলের সৃষ্টিলীলার সঙ্গে যুক্ত নয়। ধনলোভী বিশ্বকে টুকরো টুকরো করে খাবলে নিয়ে আপন মুনফার মধ্যে সঞ্চিত করতে থাকে। অর্থকামনার ঐক্য বড়ো ঐক্যকে আঘাত করতে থাকে। সেইজন্তে উপনিষদ যেখানে বলেছেন, নিখিল বিশ্বকে একের দ্বারা পূর্ণ করে দেখবে, সেইখানেই বলেছেন, মা গৃধঃ— লোভ করবে না। কারণ, লোভের দ্বারা একের ধারণা থেকে, একের আনন্দ থেকে, বঞ্চিত হতে হয়। লোভীর হাতে কামনার

সেই লণ্ঠন যা কেবল একটি বিশেষ সংকীর্ণ জায়গায় তার সমস্ত আলো সংহত করে; বাকি সব জায়গার সঙ্গে তার অসামঞ্জস্য গভীর অন্ধকারে ঘনীভূত হয়ে ওঠে। অতএব, লোভের এই সংকীর্ণ ঐক্যের সঙ্গে সৃষ্টির ঐক্যের, রস-সাহিত্য ও ললিতকলার ঐক্যের সম্পূর্ণ তফাত। নিখিলকে ছিন্ন করে হয় লাভ, নিখিলকে এক করে হয় রস। লক্ষপতি টাকার থলি নিয়ে ভেদ ঘোষণা করে; আর গোলাপ নিখিলের দূত, একের বার্তাটি নিয়ে সে ফুটে ওঠে। যে এক অসীম, গোলাপের হৃদয়টুকু পূর্ণ করে সেই তো বিরাজ করে। কীট্‌স্ তাঁর কবিতায় নিখিল একের সঙ্গে গ্রীকপাত্রটির ঐক্যের কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

Thou silent form, dost tease us out of thought,
As doth eternity.

হে নীরব মূর্তি, তুমি আমাদের মনকে ব্যাকুল করে সকল চিন্তার বাইরে নিয়ে যাও, যেমন নিয়ে যায় অসীম।

কেননা, অখণ্ড একের মূর্তি যে-আকারেই থাক্-না অসীমকেই প্রকাশ করে; এইজন্যই সে অনির্বচনীয়, মন এবং বাক্য তার কিনারা না পেয়ে ফিরে ফিরে আসে।

অসীম একের সেই আকৃতি যা ঋতুদের ডালায় ডালায় ফুলে ফুলে বারে বারে পূর্ণ হয়েও নিঃশেষিত হল না, সেই সৃষ্টির আকৃতিই তো রূপদক্ষের কারুকলার মধ্যে আবির্ভূত হয়ে আমাদের চিত্তকে চিন্তার বাইরে উদাস ক'রে নিয়ে যায়। অসীম একের আকৃতিই তো সেই বেদনা যা বেদ বলেছেন, সমস্ত আকাশকে ব্যথিত করে রয়েছে। সে 'রোদসী', 'ক্রন্দসী'— সে কাঁদছে। সৃষ্টির কান্না রূপে রূপে, আলোয় আলোয়, আকাশে আকাশে নানা আবর্তনে আবর্তিত— সূর্যে চন্দ্রে গ্রহে নক্ষত্রে, অণুতে পরমাণুতে, সুখে দুঃখে, জন্মে মরণে। সমস্ত আকাশের সেই কান্না মানুষের অন্তরে এসে বেজেছে। সমস্ত আকাশের সেই কান্নাই একটি সুন্দর জলপাত্রের রেখায় রেখায় নিঃশব্দ হয়ে দেখা দেয়। এই পাত্র দিয়ে অসীম আকাশের অমৃতনির্ঝরের রসধারা ভরতে হবে ব'লেই শিল্পীর মনে ডাক পড়েছিল; অব্যক্তের গভীরতা থেকে অনির্বচনীয়ের রসধারা। এতে ক'রে যে-রস মানুষের কাছে এসে পৌঁছবে সে তো শরীরের তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে নয়। শরীরের পিপাসা মেটাবার যে-জল তার জন্যে, ভাঁড় হোক, গণ্ডূষ হোক, কিছুতেই আসে যায় না। এমন অপরূপ পাত্রের প্রয়োজন কী; কী বিচিত্র এর গড়ন, কত রঙ দিয়ে আঁকা। এ'কে সময় নষ্ট করা বললে প্রতিবাদ করা যায় না। রূপদক্ষ আপনার চিত্তকে এই একটি ঘটের উপর

উজাড় ক'রে ঢেলে দিয়েছে ; বলতে পার, সমস্তই বাজে খরচ হল। সে কথা মানি ; সৃষ্টির বাজে খরচের বিভাগেই অসীমের খাস-তহবিল। ঐখানেই যত রঙের রঙ্গিমা, রূপের ভঙ্গি। যারা মুনফার হিসাব রাখে তারা বলে, এটা লোকসান ; যারা সন্ন্যাসী তারা বলে, এটা অসংযম। বিশ্বকর্মা তাঁর হাপর হাতুড়ি নিয়ে ব্যস্ত, এর দিকে তাকান না। বিশ্বকবি এই বাজে-খরচের বিভাগে তাঁর থলি ঝুলি কেবলই উজাড় ক'রে দিচ্ছেন, অথচ রসের ব্যাপার আজও দেউলে হল না।

শরীরের পিপাসা ছাড়া আর-এক পিপাসাও মানুষের আছে। সংগীত চিত্র সাহিত্য মানুষের হৃদয়ের সম্বন্ধে সেই পিপাসাকেই জানান দিচ্ছে। ভোলবার জো কী। সে যে অন্তরবাসী একের বেদনা। সে বলছে, 'আমাকে বাহিরে প্রকাশ করো, রূপে রঙে সুরে বাণীতে নৃত্যে। যে যেমন করে পার আমার অব্যক্ত ব্যথাটিকে ব্যক্ত করে দাও।' এই ব্যাকুল প্রার্থনা যার হৃদয়ের গভীরে এসে পৌঁচেছে সে আপিসের তাড়া, ব্যবসায়ের তাগিদ, হিতৈষীর কড়া হুকুম ঠেলে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। কিছু না, একখানি তম্বুরা হাতে নিয়ে ঘড় ছেড়ে বাইরে এসেছে। কী যে করবে কে জানে। সুরের পর সুর, রাগের পর রাগ যে তার অন্তরে বাজিয়ে তুলবে সে কে। সে তো বিজ্ঞানে যাকে প্রকৃতি ব'লে থাকে সেই প্রকৃতি নয়। প্রাকৃতিক নির্বাচনের জমা-খরচের খাতায় তার হিসাব মেলে না। প্রাকৃতিক নির্বাচন তার জঠরের মধ্যে হুকুম জাহির করছে। কিন্তু, মানুষ কি পশু যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের চাবুকের চোটে প্রকৃতির নির্দিষ্ট পথে চলবে। লীলাময় মানুষ প্রকৃতিকে ডেকে বললে, 'আমি রসে ভোর, আমি তোমার তাঁবেদার নই, চাবুক লাগাও তোমার পশুদের পিঠে। আমি তো ধনী হতে চাই নে, আমি তো পালোয়ান হতে চাই নে, আমার মধ্যে সেই বেদনা আছে যা নিখিলের অন্তরে। আমি লীলাময়ের শরিক।'

এই কথাটি জানতে হবে— মানুষ কেন ছবি আঁকতে বসে, কেন গান করে। কখনো কখনো যখন আপন-মনে গান গেয়েছি তখন কীট্‌সের মতোই আমাকেও একটা গভীর প্রশ্ন ব্যাকুল করে তুলেছে, জিজ্ঞাসা করেছি— এ কি একটা মায়ামাত্র না এর কোনো অর্থ আছে। গানের সুরে নিজেকে ভাসিয়ে দিলেম, আর সব জিনিসের মূল্য যেন এক মুহূর্তে বদলে গেল। যা অকিঞ্চিৎকর ছিল তাও অপরূপ হয়ে উঠল। কেন। কেননা, গানের সুরের আলোয় এতক্ষণে সত্যকে দেখলুম। অন্তরে সর্বদা এই গানের দৃষ্টি থাকে না ব'লেই সত্য তুচ্ছ হয়ে সরে যায়। সত্যের ছোটো বড়ো সকল রূপই যে অনির্বচনীয় তা আমরা অনুভব করতে পারি নে। নিত্য-অভ্যাসের স্থূল পর্দায় তার দীপ্তিকে আবৃত করে দেয়। সুরের বাহন সেই পর্দার আড়ালে সত্যলোকে আমাদের

নিয়ে যায়; সেখানে পায়ে হেঁটে যাওয়া যায় না, সেখানে যাবার পথ কেউ চোখে দেখে নি।

একটু বেশি কবিত্ব লাগছে? শ্রোতারা মনে ভাবছেন, বাড়াবাড়ি হচ্ছে। একটু বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করা যাক। আমাদের মন যে জ্ঞানরাজ্যে বিচরণ করে সেটা দুইমুখো পদার্থ; তার একটা দিক হচ্ছে তথ্য, আর-একটা দিক হচ্ছে সত্য। যেমনটি আছে তেমনটির ভাব হচ্ছে তথ্য; সেই তথ্য যাকে অবলম্বন ক'রে থাকে সেই হচ্ছে সত্য।

আমার ব্যক্তিস্বরূপটি হচ্ছে আমাতে বদ্ধ আমি। এই-যে তথ্যটি এ অন্ধকারবাসী, এ আপনাকে আপনি প্রকাশ করতে পারে না। যখনই এর পরিচয় কেউ জিজ্ঞাসা করবে তখনই একটি বড়ো সত্যের দ্বারা এর পরিচয় দিতে হবে, যে সত্যকে সে আশ্রয় করে আছে। বলতে হবে, আমি বাঙালি। কিন্তু, বাঙালি কী। ও তো একটা অবাচ্ছিন্ন পদার্থ, ধরা যায় না, ছোঁওয়া যায় না। তা হোক, ঐ ব্যাপক সত্যের দ্বারাই তথ্যের পরিচয়। তথ্য খণ্ডিত, স্বতন্ত্র— সত্যের মধ্যে সে আপন বৃহৎ ঐক্যকে প্রকাশ করে। আমি ব্যক্তিগত আমি এই তথ্যটুকুর মধ্যে, আমি মানুষ এই সত্যটিকে যখন আমি প্রকাশ করি তখনই বিরাট একের আলোকে আমি নিত্যতায় উদ্ভাসিত হই। তথ্যের মধ্যে সত্যের প্রকাশই হচ্ছে প্রকাশ।

যেহেতু সাহিত্য ও ললিতকলার কাজই হচ্ছে প্রকাশ, এইজন্যে তথ্যের পাত্রকে আশ্রয় ক'রে আমাদের মনকে সত্যের স্বাদ দেওয়াই তার প্রধান কাজ। এই স্বাদটি হচ্ছে একের স্বাদ, অসীমের স্বাদ। আমি ব্যক্তিগত আমি, এটা হল আমার সীমার দিকের কথা; এখানে আমি ব্যাপক একের থেকে বিচ্ছিন্ন। আমি মানুষ, এটা হল আমার অসীমের অভিমুখী কথা; এখানে আমি বিরাট একের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রকাশমান।

চিত্রী যখন ছবি আঁকতে বসেন তখন তিনি তথ্যের খবর দেবার কাজে বসেন না। তখন তিনি তথ্যকে ততটুকু মাত্র স্বীকার করেন যতটুকুর দ্বারা তাকে উপলক্ষ্য ক'রে কোনো একটা সুষমার ছন্দ বিশুদ্ধ হয়ে দেখা দেয়। এই ছন্দটি বিশ্বের নিত্যবস্তু; এই ছন্দের ঐক্যসূত্রেই তথ্যের মধ্যে আমরা সত্যের আনন্দ পাই। এই বিশ্বছন্দের দ্বারা উদ্ভাসিত না হলে তথ্য আমাদের কাছে অকিঞ্চিৎকর।

গোধূলিবেলায় একটি বালিকা মন্দির থেকে বাহির হয়ে এল, এই তথ্যটি মাত্র আমাদের কাছে অতি সামান্য। এই সংবাদমাত্রের দ্বারা এই ছবিটি আমাদের কাছে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না, আমরা শুনেও শুনি নে; একটি চিরন্তন এক-রূপে এটি আমাদের

চক্ষে স্থান পায় না। যদি কোনো নাছোড়বান্দা বক্তা আমাদের মনোযোগ জাগাবার জন্যে এই খবরটির পুনরাবৃত্তি করে, তা হলে আমি বিরক্ত হয়ে বলি, 'না হয় বালিকা মন্দির থেকে বাহির হয়ে এল, তাতে আমার কী।' অর্থাৎ, আমার সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ অনুভব করি নে ব'লে এ ঘটনাটি আমার কাছে সত্যই নয়। কিন্তু, যে-মুহূর্তে ছন্দে সুরে উপমার যোগে এই সামান্য কথাটাই একটি সুষমার অখণ্ড ঐক্যে সম্পূর্ণ হয়ে দেখা দিল অমনি এ প্রশ্ন শান্ত হয়ে গেল যে, 'তাতে আমার কী।' কারণ, সত্যের পূর্ণরূপ যখন আমরা দেখি তখন তার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধের দ্বারা আকৃষ্ট হই নে, সত্যগত সম্বন্ধের দ্বারা আকৃষ্ট হই। গোধূলিবেলায় বালিকা মন্দির হতে বাহির হয়ে এল, এই কথাটিকে তথ্য হিসাবে যদি সম্পূর্ণ করতে হত তা হলে হয়তো আরও অনেক কথা বলতে হত; আশপাশের অধিকাংশ খবরই বাদ গিয়েছে। কবি হয়তো বলতে পারতেন, সে সময়ে বালিকার খিদে পেয়েছিল এবং মনে মনে মিষ্টান্নবিশেষের কথা চিন্তা করছিল। হয়তো সেই সময়ে এই চিন্তাই বালিকার পক্ষে সকলের চেয়ে প্রবল ছিল। কিন্তু, তথ্যসংগ্রহ কবির কাজ নয়। এইজন্যে খুব বড়ো বড়ো কথাই ছাঁটা পড়েছে। সেই তথ্যের বাহুল্য বাদ পড়েছে ব'লেই সংগীতের বাঁধনে ছোটো কথাটি এমন একত্বে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, কবিতাটি এমন সম্পূর্ণ অখণ্ড হয়ে জেগেছে, পাঠকের মন এই সামান্য তথ্যের ভিতরকার সত্যকে এমন গভীরভাবে অনুভব করতে পেরেছে। এই সত্যের ঐক্যকে অনুভব করবামাত্র আমরা আনন্দ পাই।

যথার্থ গুণী যখন একটা ঘোড়া আঁকেন তখন বর্ণ ও রেখা সংস্থানের দ্বারা একটি সুষমা উদ্ভাবন ক'রে সেই ঘোড়াটিকে একটি সত্যরূপে আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেন, তথ্যরূপে নয়। তার থেকে সমস্ত বাজে খুঁটিনাটির বিক্ষিপ্ততা বাদ পড়ে যায়, একখানা ছবি আপনার নিরতিশয় ঐক্যটিকে প্রকাশ করে। তথ্যগত ঘোড়ার বহুল আত্মত্যাগের দ্বারা তবে এই ঐক্যটি বাধামুক্ত বিশুদ্ধরূপে ব্যক্ত হয়।

কিন্তু, তথ্যের সুবিধা এই যে, তার পরীক্ষা সহজ। ঘোড়ার ছবি যে ঠিক ঘোড়ার মতোই হয়েছে তা প্রমাণ করতে দেরি লাগে না। ঘোর অরসিক ঘোড়ার কানের ডগা থেকে আরম্ভ করে তার লেজের শেষ পর্যন্ত হিসাব করে মিলিয়ে দেখতে পারে। হিসাবে ত্রুটি হলে গম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে মার্কা কেটে দেয়। ছবিতে ঘোড়াকে যদি ঘোড়ামাত্রই দেখানো হয় তা হলে পুরাপুরি হিসাব মেলে। আর, ঘোড়া যদি উপলক্ষ্য হয় আর ছবিই যদি লক্ষ্য হয় তা হলে হিসাবের খাতা বন্ধ করতে হয়।

বৈজ্ঞানিক যখন ঘোড়ার পরিচয় দিতে চান তখন তাঁকে একটা শ্রেণীগত সত্যের আশ্রয় নিতে হয়। এই ঘোড়াটি কী। না, একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত স্তন্যপায়ী চতুষ্পদ।

এইরকম ব্যাপক ভূমিকার মধ্যে না আনলে পরিচয় দেবার কোনো উপায় নেই।

সাহিত্যে ও আর্টেও একটি ব্যাপক ভূমিকা আছে। সাহিত্যে ও আর্টে কোনো বস্তু যে সত্য তার প্রমাণ হয় রসের ভূমিকায়। অর্থাৎ, সে বস্তু যদি এমন একটি রূপরেখা-গীতের সুষমা-যুক্ত ঐক্য লাভ করে যাতে ক'রে আমাদের চিত্ত আনন্দের মূল্যে তাকে সত্য ব'লে স্বীকার করে, তা হলেই তার পরিচয় সম্পূর্ণ হয়। তা যদি না হয় অথচ যদি তথ্য হিসাবে সে বস্তু একেবারে নিখুঁত হয়, তা হলে অরসিক তাকে বরমাল্য দিলেও রসজ্ঞ তাকে বর্জন করেন।

জাপানি কোনো ওস্তাদের ছবিতে দেখেছিলুম, একটি মূর্তির সামনে সূর্য কিন্তু পিছনে ছায়া নেই। এমন অবস্থায় যে লম্বা ছায়া পড়ে, এ কথা শিশুও জানে। কিন্তু বস্তুবিদ্যার খবর দেবার জন্যে তো ছবির সৃষ্টি নয়। কলা-রচনাতেও যারা ভয়ে ভয়ে তথ্যের মজুরি করে তারা কি ওস্তাদ।

অতএব, রূপের মহলে রসের সত্যকে প্রকাশ করতে গেলে, তথ্যের দাসখত থেকে মুক্তি নিতে হয়। একটা ছেলে-ভোলানো ছড়া থেকে এর উদাহরণ দিতে চাই—

খোকা এল নায়ে
লাল জুতুয়া পায়ে।

জুতা জিনিসটা তথ্যের কোঠায় পড়ে, এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। চীনে মুচির দোকানে নগদ কড়ি দিলেই মাপসই জুতা পছন্দসই আকারে পেতে সবাই পারে। কিন্তু, জুতুয়া? চীনেম্যান দূরে থাক্, বিলিতি দোকানের বড়ো ম্যানেজারও তার খবর রাখে না। জুতুয়ার খবর রাখে মা, আর রাখে খোকা। এইজন্যই এই সত্যটিকে প্রকাশ করতে হবে ব'লে জুতা শব্দের ভদ্রতা নষ্ট করতে হল। তাতে আমাদের শব্দাম্বুধি বিক্ষুব্ধ হতে পারে, কিন্তু তথ্যের জুতা সত্যের মহলে চলে না ব'লেই ব্যাকরণের আক্রোশকেও উপেক্ষা করতে হয়।

কবিতা যে-ভাষা ব্যবহার করে সেই ভাষার প্রত্যেক শব্দটির অভিধাননির্দিষ্ট অর্থ আছে। সেই বিশেষ অর্থেই শব্দের তথ্যসীমা। এই সীমাকে ছাড়িয়ে শব্দের ভিতর দিয়েই তো সত্যের অসীমতাকে প্রকাশ করতে হবে। তাই কত ইশারা, কত কৌশল, কত ভঙ্গি।

জ্ঞানদাসের একটি পদ মনে পড়ছে—

রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল,
যৌবনের বনে মন পথ হারাইল।

তথ্যবাগীশ এই কবিতা শুনে কী বলবেন। ডুবেই যদি মরতে হয় তো জলের পাথার

আছে ; রূপের পাথার বলতে কী বোঝায়। আর, চোখ যদি ডুবেই যায় তবে রূপ দেখবে কী দিয়ে। আবার যৌবনের বন কোন দেশের বন। সেখানে পথ পায়ই বা কে আর হারায়ই বা কী উপায়ে। যাঁরা তথ্য খোঁজেন তাঁদের এই কথাটা বুঝতে হবে যে, নির্দিষ্ট শব্দের নির্দিষ্ট অর্থ যে-তথ্যের দুর্গ ফেঁদে বসে আছে ছলে বলে কৌশলে তারই মধ্যে ছিদ্র ক'রে নানা ফাঁকে, নানা আড়ালে সত্যকে দেখাতে হবে। দুর্গের পাথরের গাঁথুনি দেখাবার কাজ তো কবির নয়।

যারা তথ্যের দিকে দৃষ্টি রাখে তাদের হাতে কবিদের কী দুর্গতি ঘটে তার একটা দৃষ্টান্ত দিই।

আমি কবিতায় একটি বৌদ্ধকাহিনী লিখেছিলেম। বিষয়টি হচ্ছে এই—

একদা প্রভাতে অনাথপিণ্ডদ প্রভু বুদ্ধের নামে শ্রাবস্তীনগরের পথে ভিক্ষা মেগে চলেছেন। ধনীরা এনে দিলে ধন, শ্রেষ্ঠীরা এনে দিলে রত্ন, রাজঘরের বধূরা এনে দিলে হীরামুক্তার কণ্ঠী। সব পথে প'ড়ে রইল, ভিক্ষার ঝুলিতে উঠল না। বেলা যায়, নগরের বাহিরে পথের ধারে গাছের তলায় অনাথপিণ্ডদ দেখলেন এক ভিক্ষুক মেয়ে। তার আর কিছুই নেই, গায়ে একখানি জীর্ণ চীর। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে এই মেয়ে সেই চীরখানি প্রভুর নামে দান করলে। অনাথপিণ্ডদ বললেন, "অনেকে অনেক দিয়েছে, কিন্তু সব তো কেউ দেয় নি। এতক্ষণে আমার প্রভুর যোগ্য দান মিলল, আমি ধন্য হলুম।"

একজন প্রবীণ বিজ্ঞ ধার্মিক খ্যাতিমান লোক এই কবিতা প'ড়ে বড়ো লজ্জা পেয়েছিলেন ; বলেছিলেন, "এ তো ছেলেমেয়েদের পড়বার যোগ্য কবিতা নয়।" এমনি আমার ভাগ্য, আমার খোঁড়া কলম খানায় মধ্যে পড়তেই আছে। যদি-বা বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ থেকে আমার গল্প আহরণ করে আনলুম, সেটাতেও সাহিত্যের আব্রু নষ্ট হল। নীতিনিপুণের চক্ষে তথ্যটাই বড়ো হয়ে উঠল, সত্যটা ঢাকা পড়ে গেল। হায় রে কবি, একে তো ভিখারিনীর কাছ থেকে দান নেওয়াটাই তথ্য হিসাবে অধর্ম, তার পরে নিতান্ত নিতেই যদি হয় তা হলে তার পাতার কুঁড়ের ভাঙা ঝাঁপটা কিম্বা একমাত্র মাটির হাঁড়িটা নিলে তো সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা হতে পারত। তথ্যের দিক থেকে এ কথা নতশিরে মানতেই হবে। এমন কি, আমার মতো কবি যদি তথ্যের জগতে ভিক্ষা করতে বেরত তবে কখনোই এমন গর্হিত কাজ করত না এবং তথ্যের জগতে পাগলা-গারদের বাইরে এমন ভিক্ষুক মেয়ে কোথাও মিলত না রাস্তার ধারে নিজের গায়ের একখানিমাত্র কাপড় যে ভিক্ষা দিত ; কিন্তু, সত্যের জগতে স্বয়ং ভগবান বুদ্ধের প্রধান শিষ্য এমন ভিক্ষা নিয়েছেন এবং ভিখারিনী এমন অদ্ভুত ভিক্ষা দিয়েছে ; এবং তার পরে

সে মেয়ে যে কেমন ক'রে রাস্তা দিয়ে ঘরে ফিরে যাবে সে তর্ক সেই সত্যের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তথ্যের এতবড়ো অপলাপ ঘটে, ও সত্যের কিছুমাত্র খর্বতা হয় না— সাহিত্যের ক্ষেত্রটা এমনি। রসবস্তুর এবং তথ্যবস্তুর এক ধর্ম এবং এক মূল্য নয়। তথ্যজগতের যে আলোকরশ্মি দেয়ালে এসে ঠেকে যায়, রসজগতে সে রশ্মি স্থূলকে ভেদ ক'রে অনায়াসে পার হয়ে যায়; তাকে মিস্ত্রি ডাকতে বা সিঁধ কাটতে হয় না। রসজগতে ভিখারির জীর্ণ চীরখানা থেকেও নেই, তার মূল্যও তেমনি লক্ষপতির সমস্ত ঐশ্বর্যের চেয়ে বড়ো। এমনি উলটো-পালটা কাণ্ড।

তথ্যজগতে একজন ভালো ডাক্তার সব হিসাবেই খুব যোগ্য ব্যক্তি। কিন্তু, তাঁর পয়সা এবং পসার যতই অপর্যাপ্ত হোক-না কেন, তার উপরে চোদ্দ লাইনের কবিতা লেখাও চলে না। নিতান্ত যে উমেদার সে যদি বা লিখে বসে তা হলে বড়ো ডাক্তারের সঙ্গে যোগ থাকা সত্ত্বেও চোদ্দ দিনও সে কবিতার আয়ুরক্ষা হয় না। অতএব, রসের জগতের আলোকরশ্মি এতবড়ো ডাক্তারের মধ্য দিয়েও পার হয়ে যায়। কিন্তু, এই ডাক্তারকে যে তার সমস্ত প্রাণমন দিয়ে ভালো বেসেছে তার কাছে ডাক্তার রসবস্তু হয়ে প্রকাশ পায়। হবামাত্র ডাক্তারকে লক্ষ্য ক'রে তার প্রেমাসক্ত অনায়াসে বলতে পারে—

জনমঅবধি হাম রূপ নেহারনু নয়ন ন তিরপিত ভেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়ে জুড়ন ন গেল।

আন্বিক বলছেন, লাখ লাখ যুগ পূর্বে ডারুয়িনের মতে ডাক্তারের পূর্বতন সত্তা যে কী ছিল সে কথা উত্থাপন করা নীতিবিরুদ্ধ না হলেও রুচিবিরুদ্ধ। যা হোক, সোজা কথা হচ্ছে, ডাক্তারের কুষ্ঠিতে লাখ লাখ যুগের অঙ্কপাত হতেই পারে না।

তর্ক করা মিছে, কারণ শিশুও এ কথা জানে। ডাক্তার যে সে তো সেদিন জন্মেছে; কিন্তু বন্ধু যে সে নিত্যকালের হৃদয়ের ধন। সে যে কোনো-এক কালে ছিল না, আর কোনো-এক কালে থাকবে না, সে কথা মনেও করতে পারি নে।

জ্ঞানদাসের দুটি পংক্তি মনে পড়ছে—

এক দুই গণইতে অন্ত নাহি পাই,
রূপে গুণে রসে প্রেমে আরতি বাঢ়াই।

এক-দুইয়ের ক্ষেত্র হল বিজ্ঞানের ক্ষেত্র। কিন্তু, রসসত্যের ক্ষেত্রে যে-প্রাণের আরতি বাড়তে থাকে সে তো অঙ্কের হিসাবে বাড়ে না। সেখানে এক-দুইয়ের বালাই নেই, নামতার দৌরাত্ম্য নেই।

অতএব, কাব্যের বা চিত্রের ক্ষেত্রে যারা সার্ভে-বিভাগের মাপকাঠি নিয়ে সত্যের

চার দিকে তথ্যের সীমানা এঁকে পাকা পিল্‌পে গেঁথে তুলতে চায়, গুণীরা চিরকাল তাদের দিকে তাকিয়ে বিধাতার কাছে দরবার করেছে—

ইতর তাপশতানি যথেচ্ছয়া বিতর তানি সহে চতুরানন।
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ।

বিধি হে, যত তাপ মোর দিকে হানিবে, অবিচল রব তাহে।
রসের নিবেদন অরসিকে ললাটে লিখো না হে, লিখো না হে॥

সৃষ্টি

আজ এই বক্তৃতাসভায় আসব ব'লে যখন প্রস্তুত হচ্ছি তখন শুনতে পেলুম, আমাদের পাড়ার গলিতে সানাই বাজছে। কী জানি কোন্‌ বাড়িতে বিবাহ। খাম্বাজের করুণ তান শহরের আকাশে আঁচল বিছিয়ে দিল।

উৎসবের দিনে বাঁশি কেন বাজে। সে কেবল সুরের লেপ দিয়ে প্রত্যহের সমস্ত ভাঙাচোরা মলিনতা নিকিয়ে দিতে চায়। যেন আপিসের প্রয়োজনে লৌহপথে কুশ্রীতার রথযাত্রা চলছে না, যেন দরদাম কেনাবেচা ও-সমস্ত কিছুই না। সব ঢেকে দিলে।

ঢেকে দিলে কথাটা ঠিক হল না; পর্দাটা তুলে দিলে— এই ট্রাম-চলাচলের, কেনা-বেচার, হাঁক-ডাকের পর্দা। বরবধূকে নিয়ে গেল নিত্যকালের অন্তঃপুরে, রসলোকে।

তুচ্ছতার সংসারে, কেনাবেচার জগতে, বরবধূরাও তুচ্ছ; কেই বা জানে তাদের নাম, কেই বা তাদের আসন ছেড়ে দেয়। কিন্তু, রসের নিত্যলোকে তারা রাজারানী। চারি দিকের ছোটো বড়ো সমস্ত থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে কিংখাবের সিংহাসনে তাদের বরণ করে নিতে হবে। প্রতিদিন তারা তুচ্ছতার অভিনয় করে, এইজন্যেই প্রতিদিন তারা ছায়ার মতো অকিঞ্চিৎকর। আজ তারা সত্যরূপে প্রকাশমান; তাদের মূল্যের সীমা নেই; তাদের জন্যে দীপমালা সাজানো, ফুলের ডালি প্রস্তুত, বেদমন্ত্রে চিরন্তন কাল তাদের আশীর্বাদ করবার জন্যে উপস্থিত।

এই বরবধূ, এই দুটি মানুষ যে সত্য, কোনো রাজা-মহারাজার চেয়ে কম সত্য নয়, সমস্ত সংসার তাদের এই পরিচয়টি গোপন করে রাখে। কিন্তু, সেই নিত্যপরিচয় প্রকাশ করবার ভার নিয়েছে বাঁশি। মনে করো-না কেন, এক কালে তপোবনে থাকত একটি মেয়ে; সেদিনকার হাজার হাজার মেয়ের মধ্যে সেও ছিল সামান্যতার কুহেলিকায় ঢাকা। তাকে দেখে একদিন রাজার মন ভুলেছিল, আর-একদিন রাজা তাকে ত্যাগ

করেছিল। সেদিন এমন কত ঘটেছে তার খবর কে রাখে। তাই তো রাজা নিজেকে লক্ষ্য করে বলেছে, 'সকৃৎকৃতপ্রণয়োঽয়ং জনঃ।' রাজার সকৃৎপ্রণয়ের প্রাত্যহিক উচ্ছিষ্টদের লক্ষ্য ক'রে দেখবার, মনে ক'রে রাখবার, এত সময় আছে কার। কাজকর্ম তো থেমে থাকে না, কেনাবেচা তো চলছেই, হাটের মধ্যে যে ঠেলাঠেলি ভিড়। সেই সংসারের পথে হংসপদিকাদের পদচিহ্ন কোথাও পড়ে না, তাদের ঠেলে সরিয়ে ফেলে জীবনযাত্রার অসংখ্য যাত্রী ব্যস্ত হয়ে চলে যায়। কিন্তু, একটি তপোবনের বালিকাকে অসংখ্যের তুচ্ছলোক থেকে একের সত্যলোকে সুস্পষ্ট ক'রে দাঁড় করালে কে। সেও একটি কবির বাঁশি। যে সত্য প্রতিদিন ট্রামের ঘর্ঘরধ্বনি ও দরদামের হট্টগোলের মধ্যে চাপা পড়ে থাকে, খাম্বাজের করুণ রাগিণী আমাদের গলির মোড়ে সেই সত্যকে উদ্ধার করবার জন্যে সুরের অমৃত বর্ষণ করছে।

তথ্যের সংকীর্ণতার থেকে মানুষ যেমনি সত্যের অসীমতায় প্রবেশ করে অমনি তার মূল্যের কত পরিবর্তন হয়, সে কি আমরা দেখি নে। রাখাল যখন ব্রজের রাখাল হয়ে দেখা দেয় তখন কি মথুরার রাজপুত্র ব'লে তার মূল্য। তখন কি তার পাঁচনির মহিমা গদাচক্রের চেয়ে কম। তার বাঁশি কি পাঞ্চজন্যের কাছে লজ্জা পায়। সত্য যে সে কি মণিমালা ফেলে দিয়ে বনফুলের মালা পরতে কুণ্ঠিত। সেই রাখালবেশের সত্যকে প্রকাশ করতে পারে কে। সে তো কবির বাঁশি। রাজাধিরাজ মহারাজ নিজের মহিমা প্রকাশ করবার জন্যে কী আয়োজনই না করলে। তবু আজ বাদে কাল সেই বিপুল আয়োজনের বোঝা নিয়ে ঝঞ্ঝাশেষের মেঘের মতো দিগন্তরালে সে যায় মিলিয়ে। কিন্তু, সাহিত্যের অমরাবতীতে কলার নিত্য-নিকেতনে একটি পথের ভিক্ষু যে অখণ্ড সত্যে বিরাজ করে সেই সত্যের ক্ষয় নেই। রোমিয়ো-জুলিয়েটকে যখন সাহিত্যভুবনে দেখি তখন কোনো মূঢ় জিজ্ঞাসা করে না, ব্যাঙ্কে তাদের কত টাকা জমা আছে, ষড়্‌দর্শনে তাদের ব্যুৎপত্তি কত দূর, এমন-কি দেবদ্বিজে তারা ভক্তিমান কি না এবং নিত্য নিয়মিত সন্ধ্যাহ্নিকে তাদের কী পরিমাণ নিষ্ঠা। তারা সত্য এইমাত্র তাদের মহিমা; সাহিত্য সেই কথাই প্রমাণ করে। সেই সত্যে যদি তিলমাত্র ব্যত্যয় ঘটে, অথচ নায়ক নায়িকা দোঁহে মিলে যদি দশাবতারের সুনিপুণ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বা গীতার শ্লোক থেকে দেশাত্মবোধের আশ্চর্য অর্থ উদ্‌ঘাটন করতে পারে, তবু তাদের কেউ বাঁচাতে পারবে না।

শুধু কেবল মানুষ কেন, অজীব সামগ্রীকে যখন আমরা কাব্যকলার রথে তুলে তথ্যসীমার বাহিরে নিয়ে যাই তখন সত্যের মূল্যে সে মূল্যবান্ হয়ে ওঠে। কলকাতায় আমার এক কাঠা জমির দাম পাঁচ-দশ হাজার টাকা হতে পারে, কিন্তু সত্যের রাজত্বে সেই

দামকে আমরা দাম ব'লেই মানি নে—সে দাম সেখানে টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে যায়। বৈষয়িক মূল্য সেখানে পরিহাসের দ্বারা অপমানিত। নিত্যলোকে রসলোকে তথ্যবন্ধন থেকে মানুষের এই-যে মুক্তি এ কি কম মুক্তি। এই মুক্তির কথা আপনাকে আপনি স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে মানুষ গান গেয়েছে, ছবি এঁকেছে; আপন সত্য ঐশ্বর্যকে হাট-বাজার থেকে বাঁচিয়ে এনে সুন্দরের নিত্য ভাণ্ডারে সাজিয়ে রেখেছে; তার নিকড়িয়া ধনকে নিকড়িয়া বাঁশির সুরে গেঁথে রেখেছে। আপনাকে আপনি বারবার বলেছে, 'ঐ আনন্দলোকেই তোমার সত্য প্রকাশ।'

আমি কী বোঝাব তোমাদের কাকে বলে সাহিত্য, কাকে বলে চিত্রকলা। বিশ্লেষণ ক'রে কি এর মর্মে গিয়ে পৌঁছতে পারি। কোন্ আদি উৎস থেকে এর স্রোতের ধারা বাহির হয়েছে এক মুহূর্তে তা বোঝা যায়, যখন সেই স্রোতে মন আপনার গা ভাসিয়ে দেয়। আজ সেই বাঁশির সুরে যখন মন ভেসেছিল তখন বুঝেছিলেম, বুঝিয়ে দেবার কথা এর মধ্যে কিছু নেই; এর মধ্যে ডুব দিলেই সব সহজ হয়ে আসে। নীলাকাশের ইশারা আমাদের প্রতিদিন বলেছে, 'আনন্দধামের মাঝখানে তোমাদের প্রত্যেকের নিমন্ত্রণ।' এ কথা বলেছে, বসন্তের হাওয়ায় বিরহের মরমিয়া কবি। সকালবেলায় প্রভাতকিরণের দূত এসে ধাক্কা দিল। কী। না, নিমন্ত্রণ আছে। উদাস মধ্যাহ্নে মধুকরগুঞ্জিত বনচ্ছায়া দূত হয়ে এসে ধাক্কা দিল, নিমন্ত্রণ আছে। সন্ধ্যামেঘে অস্ত-সূর্যচ্ছটায় সে দূত আবার বললে, নিমন্ত্রণ আছে। এত সাজসজ্জা এই দূতের, এত ফুলের মালা, এত গৌরবের মুকুট। কার জন্যে। আমার জন্যে। আমি রাজা নই, জ্ঞানী নই, গুণী নই— আমি সত্য, তাই আমার জন্যে সমস্ত আকাশের রঙ নীল ক'রে, সমস্ত পৃথিবীর আঁচল শ্যামল ক'রে, সমস্ত নক্ষত্রের অক্ষর উজ্জ্বল ক'রে আহ্বানের বাণী মুখরিত। এই নিমন্ত্রণের উত্তর দিতে হবে না কি। সে উত্তর ঐ আনন্দধামের বাণীতেই যদি না লিখি তা হলে কি গ্রাহ্য হবে। মানুষ তাই মধুর করেই বললে, 'আমার হৃদয়ের তারে তোমার নিমন্ত্রণ বাজল। রূপে বাজল, ভাবনায় বাজল, কর্মে বাজল; হে চিরসুন্দর, আমি স্বীকার ক'রে নিলেম। আমিও তেমনি সুন্দর ক'রে তোমাকে চিঠি পাঠাব, যেমন ক'রে তুমি পাঠালে। যেমন তুমি তোমার অনির্বাণ তারকার প্রদীপ জ্বেলে তোমার দূতের হাতে দিয়েছ, আমাকেও তেমনি করে আলো জ্বালতে হবে যে-আলো নেবে না, মালা গাঁথতে হবে যে-মালা শুকোতে জানে না। আমি মানুষ, আমার ভিতর যদি অনন্তের শক্তি থাকে তবে সেই শক্তির ঐশ্বর্য দিয়েই তোমার আমন্ত্রণের উত্তর দেব।' মানুষ এমন কথা সাহস করে বলেছে, এতেই তার সকলের চেয়ে বড়ো গৌরব।

আজ যখন আমাদের গলিতে বরবধূর সত্যস্বরূপ অর্থাৎ আনন্দস্বরূপ প্রকাশ করবার ভার নিলে ঐ বাঁশি, তখন আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করলেম, কী মন্ত্রে বাঁশি আপনার কাজ সমাধা করে। আমাদের তত্ত্বজ্ঞানী তো বলে, অনিশ্চিতের দোলায় সমস্ত সংসার দোদুল্যমান ; বলে, যা দেখ কিছুই সত্য নয়। আমাদের নীতিনিপুণ বলে, ঐ-যে ললাটে ওরা চন্দন পরেছে, ও তো ছলনা, ওর ভিতর আছে মাথার খুলি। ঐ-যে মধুর হাসি দেখতে পাচ্ছ, ঐ হাসির পর্দা তুলে দেখো, বেরিয়ে পড়বে শুকনো দাঁতের পাটি। বাঁশি তর্ক ক'রে তার কোনো জবাব দেয় না ; কেবল তার খাম্বাজের সুরে বলতে থাকে, খুলি বল, দাঁতের পাটি বল, যত কালই টিঁকে থাক্-না কেন, ওরা মিছে ; কিন্তু ললাটে যে আনন্দের সুগন্ধলিপি আছে, মুখে যে লজ্জার হাসির আভা দিচ্ছে, যা এখন আছে তখন নেই, যা ছায়ার মতো মায়ার মতো, যাকে ধরতে গেলে ধরা যায় না, তাই সত্য, করুণ সত্য, মধুর সত্য, গভীর সত্য। সেই সত্যকেই সংসারের সমস্ত আনাগোনার উপরে উজ্জ্বল ক'রে ধরে বাঁশি বলছে, 'সত্যকে যেদিন প্রত্যক্ষ দেখবে সেই দিনই উৎসব।'

বুঝলুম। কিন্তু, বিনা তর্কে বাঁশি এতবড়ো কথাটাকে সপ্রমাণ করে কী করে। এ কথাটা কাল আলোচনা করেছিলুম। বাঁশি একের আলো জ্বালিয়েছে। আকাশে রাগিণী দিয়ে এমন একটি রূপের সৃষ্টি করেছে যার আর-কোনো উদ্দেশ্য নেই, কেবল ছন্দে সুরে সুসম্পূর্ণ এককে চরমরূপে দেখানো। সেই একের জীয়নকাটি যার উপরে পড়ল আপনার মধ্যে গভীর নিত্যসত্যের চিরজাগ্রত চিরসজীব স্বরূপটি সে দেখিয়ে দিলে ; বরবধূ বললে, 'আমরা সামান্য নই, আমরা চিরকালের।' বললে, 'মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যারা আমাদের দেখে তারা মিথ্যা দেখে। আমরা অমৃতলোকের, তাই গান ছাড়া আমাদের পরিচয় আর কিছুতে দিতে পারি না।' বরকনে আজ সংসারের স্রোতে ভাসমান খাপছাড়া পদার্থ নয় ; আজ তারা মধুরের ছন্দে একখানি কবিতার মতো, গানের মতো, ছবির মতো আপনাদের মধ্যে একের পরিপূর্ণতা দেখাচ্ছে। এই একের প্রকাশতত্ত্বই হল সৃষ্টির তত্ত্ব, সত্যের তত্ত্ব।

সংগীত কোনো-একটি রাগিণীতে যতই রমণীয় সম্পূর্ণ রূপ গ্রহণ করুক-না কেন, সাধারণ ভাষায় এবং বাহিরের দিক থেকে তাকে অসীম বলা যায় না। রূপের সীমা আছে। কিন্তু, রূপ যখন সেই সীমামাত্রকে দেখায় তখন সত্যকে দেখায় না। তার সীমাই যখন প্রদীপের মতো অসীমের আলো জ্বালিয়ে ধরে তখনি সত্য প্রকাশ পায়।

আজকেকার সানাই বাজনাতেই এ কথা আমি অনুভব করছি। প্রথম দুই-একটা তালের পরই বুঝতে পারলুম, এ বাঁশিটা আনাড়ির হাতে বাজছে, সুরটা খেলো সুর।

বার বার পুনরাবৃত্তি, তার স্বরের মধ্যে কোথাও সুরের নম্রতা নেই, তরুহীন মাটির মধ্যে ছায়াহীন মধ্যাহ্নরৌদ্রের মতো। যত ঝোঁক সমস্তই আওয়াজের প্রখরতার উপর। সংগীতের আয়তনটাকেই বড়ো ক'রে তোলবার দিকে বলবান প্রয়াস। অর্থাৎ, সীমা এখানে আপনাকেই বড়ো করে দেখাতে চাচ্ছে— তারই 'পরে আমাদের মন না দিয়ে উপায় নেই। তার চরমকে সে আপনার পালোয়ানির দ্বারা ঢেকে ফেলছে। সীমা-আপন সংযমের দ্বারা আপনাকে আড়াল ক'রে সত্যকে প্রকাশ করে। সেইজন্তে সকল কলাসৃষ্টিতেই সরলতার সংযম একটা প্রধান বস্তু। সংযমই হচ্ছে সীমার তর্জনী দিয়ে অসীমকে নির্দেশ করা। কোনো জিনিসের অংশগুলিই যখন সমগ্রের তুলনায় বড়ো হয়ে ওঠে তখনই তাকে বলে অসংযম। সেটাই হল একের বিরুদ্ধে অনেকের বিদ্রোহ। সেই বাহ্য অনেকের পরিমাণ যতই বড়ো হতে থাকে অন্তর্যামী এক ততই আচ্ছন্ন হয়। যিশু বলেছেন, 'বরঞ্চ উট ছুঁচের ছিদ্র দিয়ে গলতে পারে কিন্তু ধনের আতিশয্য নিয়ে কোনো মানুষ দিব্যধামে প্রবেশ করতে পারে না।' তার মানে হচ্ছে, অতিমাত্রায় ধন জিনিসটা মানুষের বাহ্য অসংযম। উপকরণের বাহুল্য দ্বারা মানুষ আত্মার সুসম্পূর্ণ ঐক্য-উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত হয়। তার অধিকাংশ চিন্তা চেষ্টা খণ্ডিত ভাবে বহুল সঞ্চয়ের মধ্যে বাহিরে বিক্ষিপ্ত হতে থাকে। যে-এক সম্পূর্ণ, যে-এক সত্য, যে-এক অসীম, আপনার মধ্যে তার প্রকাশকে ধনী বহুবিচিত্রের মধ্যে ছড়াছড়ি ক'রে নষ্ট করে। জীবন-বাঁশিতে সেই তো খেলো সুর বাজায়— তানের অদ্ভুত কসরত, দুন-চৌদুনের মাতামাতি, তারস্বরের অসহ্য দাম্ভিকতা; এতেই অরসিকের চিত্ত বিস্ময়ে অভিভূত হয়। রূপের সংযমের মধ্যে যারা সত্যের পূর্ণরূপ দেখতে চায় তারা রূপের জঙ্গলের প্রবলতায় দস্যুবৃত্তি দেখে পালাবার পথ খুঁজে বেড়ায়। সেখানে রূপ হাঁক দিয়ে দিয়ে বলে, 'আমাকে দেখো'। কেন দেখব। জগতে রূপের সিংহাসনে অরূপকে দেখব বলেই এসেছি। কিন্তু, জগতে বিজ্ঞান যেমন অবস্তুকে খুঁজে বের করে বলছে 'এই তো সত্য', রূপজগতে কলা তেমনি অরূপ রসকে দেখিয়ে বলছে 'ঐ তো আমার সত্য'। যখন দেখলুম সেই সত্য তখন রূপ আর আমাকে লোভ দেখাতে পারে না, তখন কসরতকে বলি 'ধিক্'।

পেটুক মানুষের যখন পেটের ক্ষুধা ঘোচে তখনও তার মনের ক্ষুধা ঘোচে না। মেয়েরা খুশি হয়ে তার পাতে যত পারে পিটেপুলি চাপাতে থাকে। অবশেষে একদিন অম্লশূলরোগীর সেবার জন্ত সেই মেয়েদের 'পরেই ডাক পড়ে। সাহিত্যকলার ক্ষেত্রে যারা পেটুক তারাই রূপের লোভে অতিভোগের সন্ধান করে— তাদের মুক্তি নেই। কারণ, রূপের মধ্যে সত্যের আবির্ভাব হলে সত্য সেই রূপ থেকেই মুক্তি দেয়। যারা

ফর্মা গণনা ক'রে পুঁথির দাম দেয় তাদের মন পুঁথি চাপা পড়ে কবরস্থ হয়।

কলাসৃষ্টিতে রসসত্যকে প্রকাশ করবার সমস্যা হচ্ছে— রূপের দ্বারাই অরূপকে প্রকাশ করা; অরূপের দ্বারা রূপকে আচ্ছন্ন ক'রে দেখা; ঈশোপনিষদের সেই বাণীটিকে গ্রহণ করা, পূর্ণের দ্বারা সমস্ত চঞ্চলকে আবৃত ক'রে দেখা, এবং মা গৃধঃ—লোভ কোরো না— এই অনুশাসন গ্রহণ করা। সৃষ্টির তত্ত্বই এই; জগৎসৃষ্টিই বল আর কলাসৃষ্টিই বল। রূপকে মানতেও হবে, না'ও মানতে হবে, তাকে ধরতেও হবে, তাকে ঢাকতেও হবে। রূপের প্রতি লোভ না থাকে যেন।

এই যে আমাদের একটা আশ্চর্য দেহ, এর ভিতরে আশ্চর্য কতকগুলো কল— হজম করবার কল, রক্তচালনার কল, নিশ্বাস নেবার কল, চিন্তা করবার কল। এই কলগুলোর সম্বন্ধে ভগবানের যেন বিষম একটা লজ্জা আছে। তিনি সবগুলোই খুব ক'রে ঢাকা দিয়েছেন। আমরা মুখের মধ্যে খাবার পুরে দাঁত দিয়ে চিবিয়ে খাই, এ কথাটাকে প্রকাশ করবার জন্যে আমাদের আগ্রহ নেই। আমাদের মুখ ভাবের লীলাভূমি, অর্থাৎ মুখে এমন কিছু প্রকাশ পায় যা রক্তমাংসের অতীত, যা অরূপ ক্ষেত্রের; এইটেতেই মুখের মুখ্য পরিচয়। মাংসপেশী খুবই দরকারি, তার বিস্তর কাজ, কিন্তু মুখ হলুম কখন। যখন আমাদের সমস্ত দেহের সংগীতকে তারা গতিলীলায় প্রকাশ করে দেখালে। মেডিকেল কলেজে যারা দেহ বিশ্লেষণ ক'রে শরীরতত্ত্ব জেনেছে সৃষ্টিকর্তা তাদের বলেন, 'তোমাদের প্রশংসা আমি চাই নে।' কেননা, সৃষ্টির চরমতা কৌশলের মধ্যে নেই। তিনি বলেন, 'জগৎ-যন্ত্রের যন্ত্রীরূপে আমি যে ভালো এঞ্জিনিয়ার এটা নাই বা জানলে।' তবে কী জানব। 'আনন্দরূপে আমাকে জানো।' ভূস্তরসংস্থানে বড়ো বড়ো পাথরের শিলালিপিতে তার নির্মাণের ইতিহাস গুপ্ত অক্ষরে খোদিত আছে। মাটির উপর মাটি দিয়ে সে সমস্তই বিধাতা চাপা দিয়েছেন। কিন্তু উপরটিতে যেখানে প্রাণের নিকেতন, আনন্দনিকেতন, সেইখানেই তাঁর সূর্যের আলো চাঁদের আলো ফেলে কত লীলাই চলছে তার সীমা নেই। এই ঢাকাটা যখন ছিল না তখন সে কী ভয়ংকর কাণ্ড। বিশ্বকর্মার কী হাতুড়ি-ঠোকাঠুকি, বড়ো বড়ো চাকার সে কী ঘুরপাক, কী অগ্নিকুণ্ড, কী বাষ্পনিশ্বাস। তার পরে কারখানাঘরের সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ করে দিয়ে, সবুজ নীল সোনার ধারায় সমস্ত ধুয়ে মুছে দিয়ে, তারার মালা মাথায় প'রে, ফুলের পাদপীঠে পা রেখে, তিনি আনন্দে রূপের আসন গ্রহণ করলেন।

এই প্রসঙ্গে আর-একটি কথা মনে পড়ল। পৃথিবীর যে-সভ্যতা তাল ঠুকে মাংসপেশীর গুমর ক'রে পৃথিবী কাঁপিয়ে বেড়াচ্ছে, কারখানাঘরের চোঙাগুলোকে ধূমকেতুর ধ্বজদণ্ড বানিয়ে আলোকের আঙিনায় কালী লেপে দিচ্ছে, সেই বেআব্রু

সভ্যতার 'পরে সৃষ্টিকর্তার লজ্জা দেখতে পাচ্ছ না কি। ঐ বেহায়া যে আজ দেশে বিদেশে আপন দল জমিয়ে ঢাক বাজিয়ে বেড়াচ্ছে। নিউইয়র্ক থেকে টোকিও পর্যন্ত ঘাটে ঘাটে, ঘাটিতে ঘাটিতে, তার উদ্ধত যন্ত্রগুলো উৎকট শৃঙ্গধ্বনি দ্বারা সৃষ্টির মঙ্গলশঙ্খধ্বনিকে ব্যঙ্গ করছে। উলঙ্গশক্তির এই দৃপ্ত আত্মম্ভরিতা আপন কলুষ-কুৎসিত মুষ্টিতে অমৃতলোকের সম্মান লুট করে নিতে চায়। মানবসংসারে আজকের দিনের সব-চেয়ে মহৎ দুঃখ, মহৎ অপমান এই নিয়েই।

মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয় হচ্ছে মানুষ সৃষ্টিকর্তা। আজকের দিনের সভ্যতা মানুষকে মজুর করছে, মিস্ত্রি করছে, মহাজন করছে, লোভ দেখিয়ে সৃষ্টিকর্তাকে খাটো করে দিচ্ছে। মানুষ নির্মাণ করে ব্যবসায়ের প্রয়োজনে, সৃষ্টি করে আত্মার প্রেরণায়। ব্যবসায়ের প্রয়োজন যখন অত্যন্ত বেশি হয়ে উঠতে থাকে তখন আত্মার বাণী নিরস্ত হয়ে যায়। ধনী তখন দিব্যধামের পথের চিহ্ন লোপ করে দেয়, সকল পথকেই হাটের দিকে নিয়ে আসে।

কোন্‌খানে মানুষের শেষ কথা। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ বাহ্য প্রকৃতির তথ্য-রাজ্যের সীমা অতিক্রম ক'রে আত্মার চরম সম্বন্ধে নিয়ে যায়—যা সৌন্দর্যের সম্বন্ধ, কল্যাণের সম্বন্ধ, প্রেমের সম্বন্ধ, তারই মধ্যে। সেইখানেই মানুষের সৃষ্টির রাজ্য। সেখানে প্রত্যেক মানুষ আপন অসীম গৌরব লাভ করে, সেখানে প্রত্যেক মানুষের জন্যে সমগ্র মানুষের তপস্যা। যেখানে মহাসাধকেরা সাধন করছেন প্রত্যেক মানুষের জন্যে, মহাবীরেরা প্রাণ দিয়েছেন প্রত্যেক মানুষের জন্যে, মহাজ্ঞানীরা জ্ঞান এনেছেন প্রত্যেক মানুষের জন্যে। যেখানে একজন ধনী দশ জনকে শোষণ করছে, যেখানে হাজার হাজার মানুষের স্বাতন্ত্র্যকে হরণ ক'রে একজন শক্তিশালী হচ্ছে, যেখানে বহু লোকের ক্ষুধার অন্ন একজন লোকের ভোগবাহুল্যে পরিণত হচ্ছে, সেখানে মানুষের সত্যরূপ, শান্তিরূপ আপন সুন্দর সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ পেল না।

যে মানুষ লোভী চিরদিনই সে নির্লজ্জ; যে লোক শক্তির অভিমানী, সত্যযুগেও নিখিলের সঙ্গে আপন অসামঞ্জস্য নিয়েই সে দম্ভ করেছে। কিন্তু সেকালে তার লজ্জা-হীনতাকে, তার দম্ভকে তিরস্কৃত করবার লোক ছিল। মানুষ সেদিন লোভীকে, শক্তি-শালীকে, এ কথা বলতে কুণ্ঠিত হয় নি— 'পৃথিবীতে সুন্দরের বাণী এসেছে, তুমি তাতে বেসুর লাগিয়ো না; জগতে আনন্দলক্ষ্মীর যে সিংহাসন সে যে শতদল পদ্ম, মত্ত করীর মতো তাকে দলতে যেয়ো না।' এই কথাই বলছে কবির কাব্য, চিত্রীর চিত্রকলা। আজ বিবাহের দিনে বাঁশি বলছে, 'বরবধূ, তোমরা যে সত্য এই কথাটাই অন্য সকল কথার চেয়ে বড়ো করে আপনাদের মধ্যে প্রকাশ করো। লাখ দু-লাখ টাকা ব্যাঙ্কে

জমছে বলেই যে সত্য তা নয়; যে-সত্যের বাণী আমি ঘোষণা করি সে সত্য বিশ্বের ছন্দের ভিতর, চেক-বইয়ের অঙ্কের মধ্যেই নয়। সে-সত্য পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের অমৃত সম্বন্ধে— গৃহ সজ্জার উপকরণে নয়। সেই হচ্ছে সম্পূর্ণের সত্য, একের সত্য।'

আজ আমি সাহিত্যের কারুকারিতা সম্বন্ধে, তার ছন্দতত্ত্ব, তার রচনারীতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব মনে স্থির করেছিলুম। এমন সময় বাজল বাঁশি। ইন্দ্রদেব সুন্দরকে দিয়ে বলে পাঠালেন, 'ব্যাখ্যা করেই যে সব কথা বলা যায়, আর তপস্যা করেই যে সব সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় এমন-সব লোক-প্রচলিত কথাকে তুমি কি কবি হয়েও বিশ্বাস কর। ব্যাখ্যা বন্ধ ক'রে তপস্যা ভঙ্গ ক'রে যে ফল পাওয়া যায় সেই হল অখণ্ড। সে তৈরি-করা জিনিস নয়, সে আপনি ফলে-ওঠা জিনিস।' ধর্মশাস্ত্রে বলে, ইন্দ্রদেব কঠোর সাধনার ফল নষ্ট করবার জন্যেই মধুরকে পাঠিয়ে দেন। আমি দেবতার এই ঈর্ষা, এই প্রবঞ্চনা বিশ্বাস করি নে। সিদ্ধির পরিপূর্ণ অখণ্ড মূর্তিটি যে কিরকম তাই দেখিয়ে দেবার জন্যেই ইন্দ্র মধুরকে পাঠিয়ে দেন। বলেন, 'এ জিনিস লড়াই ক'রে তৈরি ক'রে তোলবার জিনিস নয়; এ ক্রমে ক্রমে থাকে থাকে গ'ড়ে ওঠে না। সত্য সুরে গানটিকে যদি সম্পূর্ণ ক'রে তুলতে চাও, তা হলে রাতদিন বাঁও-কষাকষি ক'রে তা হবে না। তম্বুরার এই খাঁটি মধ্যম-পঞ্চম সুরটিকে প্রত্যক্ষ গ্রহণ করো এবং অখণ্ড সম্পূর্ণতাটিকে অন্তরে লাভ করো, তা হলে সমগ্র গানের ঐক্যটি সত্য হবে।' মেনকা উর্বশী এরা হল ঐ তম্বুরার মধ্যম-পঞ্চম সুর— পরিপূর্ণতার অখণ্ড প্রতিমা। সন্ন্যাসীকে মনে করিয়ে দেয় সিদ্ধির ফল জিনিসটা কী রকমের। স্বর্গকামী, তুমি স্বর্গ চাও? তাই তোমার তপস্যা? কিন্তু, স্বর্গ তো পরিশ্রম ক'রে মিস্ত্রি দিয়ে তৈরি হয় নি। স্বর্গ যে সৃষ্টি। উর্বশীর ওষ্ঠপ্রান্তে যে-হাসিটুকু লেগে আছে তার দিকে চেয়ে দেখো, স্বর্গের সহজ সুরটুকুর স্বাদ পাবে। তুমি মুক্তিকামী মুক্তি চাও? একটু একটু ক'রে অস্তিত্বের জাল ছিঁড়ে ফেলাকে তো মুক্তি বলে না। মুক্তি তো বন্ধনহীন শূন্যতা নয়। মুক্তি যে সৃষ্টি। মেনকার কবরীতে যে-পারিজাত ফুলটি রয়েছে তার দিকে চেয়ে দেখো, মুক্তির পূর্ণরূপের মূর্তিটি দেখতে পাবে। বিধাতার রুদ্ধ আনন্দ ঐ পারিজাতের মধ্যে মুক্তি পেয়েছে— সেই অরূপ আনন্দ রূপের মধ্যে প্রকাশ লাভ ক'রে সম্পূর্ণ হয়েছে।

বুদ্ধদেব যখন বোধিদ্রুমের তলায় ব'সে কৃচ্ছ্রসাধন করেছেন তখন তাঁর পীড়িত চিত্ত বলেছে 'হল না', 'পেলুম না'। তাঁর পাওয়ার পূর্ণ রূপের প্রতিমা বাইরে দেখতে পেলেন কখন। যখন সুজাতা অন্ন এনে দিলে। সে কি কেবল দেহের অন্ন। তার মধ্যে যে ভক্তি ছিল, প্রীতি ছিল, সেবা ছিল, সৌন্দর্য ছিল— সেই পায়স-অন্নের মধ্যেই অমৃত অতি সহজে প্রকাশ পেল। ইন্দ্রদেব কি সুজাতাকে পাঠান নি। সেই সুজাতার

মধ্যেই কি অমরাবতীর সেই বাণী ছিল না যে, কৃচ্ছ্রসাধনে মুক্তি নেই, মুক্তি আছে প্রেমে। সেই ভক্তহৃদয়ের অন্ন-উৎসর্গের মধ্যে মাতৃপ্রাণের যে-সত্য ছিল সেই সত্যটি থেকেই কি বুদ্ধ বলেন নি 'এক পুত্রের প্রতি মাতার যে-প্রেম সেই অপরিমেয় প্রেমে সমস্ত বিশ্বকে আপন ক'রে দেখাকেই বলে ব্রহ্মবিহার'? অর্থাৎ, মুক্তি শূন্যতায় নয়, পূর্ণতায়; এই পূর্ণতাই সৃষ্টি করে, ধ্বংস করে না।

মানবাত্মার যে প্রেম অসীম আত্মার কাছে আপনাকে একান্ত নিবেদন ক'রে দিয়েই আনন্দ পায়, তার চেয়ে আর কিছুই চায় না, যিশুখৃস্ট তারই সহজ স্বরূপটিকে বাহিরের মূর্তিতে কোথায় দেখেছিলেন। ইন্দ্রদেব আপন সৃষ্টি থেকে এই মূর্তিটিকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন। মার্থা আর ম্যারি দুজনে তাঁর সেবা করতে এসেছিল। মার্থা ছিল কর্তব্যপরায়ণা, সেবার কঠোরতায় সে নিত্যনিয়ত ব্যস্ত। ম্যারি সেই ব্যস্ততার ভিতর দিয়ে আত্মনিবেদনের পূর্ণতাকে বহু প্রয়াসে প্রকাশ করে নি। সে আপন বহুমূল্য গন্ধতৈল খৃস্টের পায়ে উজাড় করে ঢেলে দিলে। সকলে বলে উঠল, 'এ যে অন্যায় অপব্যয়।' খৃস্ট বললেন, 'না, না, ওকে নিবারণ কোরো না।' সৃষ্টিই কি অপব্যয় নয়। গানে কি কারও কোনো লাভ আছে। চিত্রকলায় কি অন্নবস্ত্রের অভাব দূর হয়। কিন্তু, রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে মানুষ আপন পূর্ণতাকে উৎসর্গ ক'রে দিয়েই পূর্ণতার ঐশ্বর্য লাভ করে। সেই ঐশ্বর্য শুধু তার সাহিত্যে ললিতকলায় নয়, তার আত্মবিসর্জনের লীলাভূমি সমাজে নানা সৃষ্টিতেই প্রকাশ পায়। সেই সৃষ্টির মূল্য জীবনযাত্রার উপযোগিতায় নয়, মানবাত্মার পূর্ণস্বরূপের বিকাশে— তা অহৈতুক, তা আপনাতে আপনি পর্যাপ্ত। যিশুখৃস্ট ম্যারির চরম আত্মনিবেদনের সহজ রূপটি দেখলেন; তখন তিনি নিজের অন্তরের পূর্ণতাকেই বাহিরে দেখলেন: ম্যারি যেন তাঁর আত্মার সৃষ্টিরূপেই তাঁর সম্মুখে অপরূপ মাধুর্যে প্রকাশিত হল। এমনি করেই মানুষ আপন সৃষ্টিকার্যে আপন পূর্ণতাকে দেখতে চাচ্ছে। কৃচ্ছ্রসাধনে নয়, উপকরণসংগ্রহে নয়। তার আত্মার আনন্দ থেকে তাকে উদ্ভাবিত করতে হবে স্বর্গলোক— লক্ষপতির কোষাগার নয়, পৃথ্বীপতির জয়স্তম্ভ নয়। তাকে যেন লোভে না ভোলায়, দম্ভে অভিভূত না করে; কেননা সে সংগ্রহকর্তা নয়, নির্মাণকর্তা নয়, সে সৃষ্টিকর্তা।

১৩৩৭

সাহিত্যধর্ম

কোটালের পুত্র, সওদাগরের পুত্র, রাজপুত্র, এই তিনজনে বাহির হন রাজকন্যার সন্ধানে। বস্তুত রাজকন্যা ব'লে যে একটি সত্য আছে তিন রকমের বুদ্ধি তাকে তিন পথে সন্ধান করে।

কোটালের পুত্রের ডিটেক্‌টিভ-বুদ্ধি, সে কেবল জেরা করে। করতে করতে কন্যার নাড়ীনক্ষত্র ধরা পড়ে; রূপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে শরীরতত্ত্ব, গুণের আবরণ থেকে মনস্তত্ত্ব। কিন্তু এই তত্ত্বের এলেকায় পৃথিবীর সকল কন্যাই সমান দরের মানুষ— ঘুঁটেকুড়োনির সঙ্গে রাজকন্যার প্রভেদ নেই। এখানে বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক তাঁকে যে-চক্ষে দেখেন সে-চক্ষে রসবোধ নেই, আছে কেবল প্রশ্নজিজ্ঞাসা।

আর-একদিকে রাজকন্যা কাজের মানুষ। তিনি রাঁধেন বাড়েন, সুতো কাটেন, ফুলকাটা কাপড় বোনেন। এখানে সওদাগরের পুত্র তাঁকে যে চক্ষে দেখেন সে চক্ষে না আছে রস, না আছে প্রশ্ন; আছে মুনফার হিসাব।

রাজপুত্র বৈজ্ঞানিক নন— অর্থশাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নি— তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন, বোধ করি, চব্বিশ বছর বয়স এবং তেপান্তরের মাঠ। দুর্গম পথ পার হয়েছেন জ্ঞানের জন্যে না, ধনের জন্যে না, রাজকন্যারই জন্যে। এই রাজকন্যার স্থান ল্যাবরেটরিতে নয়, হাটবাজারে নয়, হৃদয়ের সেই নিত্য বসন্তলোকে যেখানে কাব্যের কল্পলতায় ফুল ধরে। যাকে জানা যায় না, যার সংজ্ঞানির্ণয় করা যায় না, বাস্তব ব্যবহারে যার মূল্য নেই, যাকে কেবল একান্তভাবে বোধ করা যায়, তারই প্রকাশ সাহিত্যকলায়, রসকলায়। এই কলাজগতে যার প্রকাশ কোনো সমজদার তাকে ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞাসা করে না, 'তুমি কেন।' সে বলে 'তুমি যে তুমিই, এই আমার যথেষ্ট।' রাজপুত্রও রাজকন্যার কানে-কানে এই কথাই বলেছিলেন। এই কথাটা বলবার জন্যে সাজাহানকে তাজমহল বানাতে হয়েছিল।

যাকে সীমায় বাঁধতে পারি তার সংজ্ঞানির্ণয় চলে; কিন্তু, যা সীমার বাইরে, যাকে ধরে ছুঁয়ে পাওয়া যায় না, তাকে বুদ্ধি দিয়ে পাই নে, বোধের মধ্যে পাই। উপনিষদ ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলেছেন, তাকে না পাই মনে, না পাই বচনে, তাঁকে যখন পাই আনন্দ-বোধে, তখন আর ভাবনা থাকে না।— আমাদের এই বোধের ক্ষুধা আত্মার ক্ষুধা। সে এই বোধের দ্বারা আপনাকে জানে। যে-প্রেমে, যে-ধ্যানে, যে-দর্শনে কেবলমাত্র এই বোধের ক্ষুধা মেটে তাই স্থান পায় সাহিত্যে, রূপকলায়।

দেয়ালে-বাঁধা খণ্ড আকাশ আমার আপিস-ঘরটার মধ্যে সম্পূর্ণ ধরা পড়ে গেছে।

কাঠা-বিঘের দরে তার বেচাকেনা চলে, তার ভাড়াও জোটে। তার বাইরে গ্রহতারার মেলা যে অখণ্ড আকাশে তার অসীমতার আনন্দ কেবলমাত্র আমার বোধে। জীব-লীলার পক্ষে ঐ আকাশটা যে নিতান্তই বাহুল্য, মাটির নিচেকার কীট তারই প্রমাণ দেয়। সংসারে মানবকীটও আছে, আকাশের রূপণতায় তার গায়ে বাজে না। যে-মনটা গরজের সংসারের গরাদের বাইরে পাখা না মেলে বাঁচে না সে-মনটা ওর মরেছে। এই মরা-মনের মানুষটারই ভূতের কীর্তন দেখে ভয় পেয়ে কবি চতুরাননের দোহাই পেড়ে বলেছিলেন—

অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্
শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ।

কিন্তু, রূপকথার রাজপুত্রের মন তাজা। তাই নক্ষত্রের নিত্যদীপবিভাসিত মহাকাশের মধ্যে যে অনির্বচনীয়তা তাই সে দেখেছিল ঐ রাজকন্যায়। রাজকন্যার সঙ্গে তার ব্যবহারটা এই বোধেরই অনুসারে। অন্যদের ব্যবহার অন্যরকম। ভালোবাসায় রাজকন্যার হৃৎস্পন্দন কোন্ ছন্দের মাত্রায় চলে তার পরিমাপ করবার জন্যে বৈজ্ঞানিক অভাবপক্ষে একটা টিনের চোঙ ব্যবহার করতে একটুও পীড়া বোধ করেন না। রাজকন্যা নিজের হাতে দুধের থেকে যে নবনী মন্থন ক'রে তোলেন সওদাগরের পুত্র তাকে চৌকো টিনের মধ্যে বন্ধ ক'রে বড়োবাজারে চালান দিয়ে দিব্য মনের তৃপ্তি পান। কিন্তু, রাজপুত্র ঐ রাজকন্যার জন্যে টিনের বাজুবন্ধ গড়াবার আভাস স্বপ্নে দেখলেও নিশ্চয় দম আটকে ঘেমে উঠবেন। ঘুম থেকে উঠেই সোনা যদি নাও জোটে, অন্তত চাঁপাকুঁড়ির সন্ধানে তাঁকে বেরোতেই হবে।

এর থেকেই বোঝা যাবে, সাহিত্যতত্ত্বকে অলংকারশাস্ত্র কেন বলা হয়। সেই ভাব, সেই ভাবনা, সেই আবির্ভাব, যাকে প্রকাশ করতে গেলেই অলংকার আপনি আসে, তর্কে যার প্রকাশ নেই, সেই হল সাহিত্যের।

অলংকার জিনিসটাই চরমের প্রতিরূপ। মা শিশুর মধ্যে পান রসবোধের চরমতা—তাঁর সেই একান্ত বোধটিকে সাজে সজ্জাতেই শিশুর দেহে অনুপ্রকাশিত করে দেন। ভৃত্যকে দেখি প্রয়োজনের বাঁধা সীমানায়, বাঁধা বেতনেই তার মূল্য শোধ হয়। বন্ধুকে দেখি অসীমে, তাই আপনি জেগে ওঠে ভাষায় অলংকার, কণ্ঠের সুরে অলংকার, হাসিতে অলংকার, ব্যবহারে অলংকার। সাহিত্যে এই বন্ধুর কথা অলংকৃত বাণীতে। সেই বাণীর সংকেতঝংকারে বাজতে থাকে 'অলম্'— অর্থাৎ, 'বাস, আর কাজ নেই।' এই অলংকৃত বাক্যই হচ্ছে রসাত্মক বাক্য।

ইংরেজিতে যাকে real বলে, বাংলায় তাকে বলি যথার্থ, অথবা সার্থক। সাধারণ

সত্য হল এক, আর সার্থক সত্য হল আর। সাধারণ সত্যে একেবারে বাছ-বিচার নেই, সার্থক সত্য আমাদের বাছাই-করা। মানুষমাত্রেই সাধারণ সত্যের কোঠায়, কিন্তু যথার্থ মানুষ 'লাখে না মিলল এক'। করুণার আবেগে বাল্মীকির মুখে যখন ছন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল তখন সেই ছন্দকে ধন্য করবার জন্যে নারদঋষির কাছ থেকে তিনি একজন যথার্থ মানুষের সন্ধান করেছিলেন। কেননা, ছন্দ অলংকার। যথার্থ সত্য যে বস্তুতই বিরল তা নয়, কিন্তু আমার মন যার মধ্যে অর্থ পায় না আমার পক্ষে তা অযথার্থ। কবির চিত্তে, রূপকারের চিত্তে, এই যথার্থ-বোধের সীমানা বৃহৎ ব'লে সত্যের সার্থকরূপ তিনি অনেক ব্যাপক ক'রে দেখাতে পারেন। যে-জিনিসের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণকে দেখি সেই জিনিসই সার্থক। এক টুকরো কাঁকর আমার কাছে কিছুই নয়, একটি পদ্ম আমার কাছে সুনিশ্চিত। অথচ কাঁকর পদে পদে ঠেলে ঠেলে নিজেকে স্মরণ করিয়ে দেয়, চোখে পড়লে তাকে তোলবার জন্যে বৈদ্য ডাকতে হয়, ভাতে পড়লে দাঁত-গুলো আঁত্কে ওঠে— তবু তার সত্যের পূর্ণতা আমার কাছে নেই। পদ্ম কনুই দিয়ে বা কটাক্ষ দিয়ে ঠেলাঠেলির উপদ্রব একটুও করে না, তবু আমার সমস্ত মন তাকে আপনি এগিয়ে গিয়ে স্বীকার করে।

যে-মন বরণীয়কে বরণ ক'রে নেয় তার শুচিবায়ুর পরিচয় দিই। সজ্‌নে ফুলে সৌন্দর্যের অভাব নেই। তবু ঋতুরাজের রাজ্যাভিষেকের মন্ত্রপাঠে কবিরা সজ্‌নে ফুলের নাম করেন না। ও যে আমাদের খাদ্য, এই খর্বতায় কবির কাছেও সজনে আপন ফুলের যাথার্থ্য হারালো। বক ফুল, বেগুনের ফুল, কুমড়ো ফুল, এই সব রইল কাব্যের বাহির-দরজায় মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে ; রান্নাঘর ওদের জাত মেরেছে। কবির কথা ছেড়ে দাও, কবির সীমন্তিনীও অলকে সজ্‌নেমঞ্জরি পরতে দ্বিধা করেন, বক ফুলের মালায় তাঁর বেণী জড়ালে ক্ষতি হত না, কিন্তু সে কথাটা মনেও আমল পায় না। কুন্দ আছে, টগর আছে, তাদেরও গন্ধ নেই, তবু অলংকার-মহলে তাদের দ্বার খোলা— কেননা, পেটের ক্ষুধা তাদের গায়ে হাত দেয় নি। বিম্ব যদি ঝোলে-ডাল্‌নায় লাগত তা হলে সুন্দরীর অধরের সঙ্গে তার উপমা অগ্রাহ্য হত। তিসিফুল শর্ষে ফুলের রূপের ঐশ্বর্য প্রচুর, তবু হাটের রাস্তায় তাদের চরম গতি বলেই কবিকল্পনা তাদের নম্র নমস্কারের প্রতিদান দিতে চায় না। শিরীষ ফুলের সঙ্গে গোলাপজাম ফুলের রূপে গুণে ভেদ নেই, তবু কাব্যের পংক্তিতে ওর কৌলীন্য গেল ; কেননা গোলাপজাম নামটা ভোজনলোভের দ্বারা লাঞ্ছিত। যে-কবির সাহস আছে সুন্দরের সমাজে তিনি জাতবিচার করেন না। তাই কালিদাসের কাব্যে কদম্বনের একশ্রেণীতে দাঁড়িয়ে শ্যামজম্বুবনান্তও আষাঢ়ের অভ্যর্থনাভার নিল। কাব্যে সৌভাগ্যক্রমে কোনো শুভক্ষণে রসজ্ঞ দেবতাদের বিচারে মদনের তূণে আমের

মুকুল স্থান পেয়েছে। বোধ করি, অমৃতে অনটন ঘটে না বলেই আমের প্রতি দেবতাদের আহারে লোভ নেই। স্বচ্ছ জলের তলে রুইমাছের সন্তরণলীলা আকাশে পাখি ওড়ার চেয়ে কম সুন্দর নয়; কিন্তু, রুইমাছের নাম করবামাত্র পাঠকের রসবোধ পাছে নিঃশেষে রসনার দিকেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, এই ভয়ে ছন্দোবন্ধনে বেঁধে ওকে কাব্যের তীরে উত্তীর্ণ করা দুঃসাধ্য হল। সকল ব্যবহারের অতীত বলেই মকর বেঁচে গেছে— ওকে বাহনভুক্ত ক'রে নিতে দেবী জাহ্নবীর গৌরবহানি হল না, নির্বাচনের সময় রুই কাত্‌লাটার নাম মুখে বেধে গেল। তার পিঠে স্থানাভাব বা পাখনায় জোর কম বলেই এমনটা ঘটেছে তা তো মানতে পারি নে। কেননা, লক্ষ্মী সরস্বতী যখন পদ্মকে আসন বলে বেছে নিলেন তার দৌর্বল্য বা অপ্রশস্ততার কথা চিন্তাও করেন নি।

এইখানে চিত্রকলার সুবিধা আছে। কচু গাছ আঁকতে রূপকারের তুলিতে সংকোচ নেই। কিন্তু, বনশোভাসজ্জায় কাব্যে কচু গাছের নাম করা মুশকিল। আমি নিজে জাত-মানা কবির দলে নই, তবু বাঁশবনের কথা পাড়তে গেলে অনেক সময় বেণুবন ব'লে সামলে নিতে হয়। শব্দের সঙ্গে নিত্যব্যবহারগত নানা ভাব জড়িয়ে থাকে। তাই কাব্যে কুর্‌চি ফুলের নাম করবার বেলা কিছু ইতস্তত করেছি, কিন্তু কুর্‌চি ফুল আঁকতে চিত্রকরের তুলির মানহানি হয় না।

এইখানে এ কথাটা বলা দরকার, য়ুরোপীয় কবিদের মনে শব্দ সম্বন্ধে শুচিতার সংস্কার এত প্রবল নয়। নামের চেয়ে বস্তুটা তাঁদের কাছে অনেক বেশি, তাই কাব্যে নাম-ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁদের লেখনীতে আমাদের চেয়ে বাধা কম।

যা হোক এটা দেখা গেছে যে, যে-জিনিসটাকে কাজে খাটাই তাকে যথার্থ ক'রে দেখি নে। প্রয়োজনের ছায়াতে সে রাহুগ্রস্ত হয়। রান্নাঘরে ভাঁড়ারঘরে গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজন, কিন্তু বিশ্বজনের কাছে গৃহস্থ ঐ দুটো ঘর গোপন ক'রে রাখে। বৈঠকখানা না হলেও চলে, তবু সেই ঘরেই যত সাজসজ্জা, যত মালমসলা; গৃহকর্তা সেই ঘরে ছবি টাঙিয়ে, কার্পেট পেতে, তার উপরে নিজের সাধ্যমতো সর্বকালের ছাপ মেরে দিতে চায়। সেই ঘরটিকে সে বিশেষভাবে বাছাই করেছে; তার দ্বারাই সে সকলের কাছে পরিচিত হতে চায় আপন ব্যক্তিগত মহিমায়। সে যে খায় বা খাদ্যসঞ্চয় করে, এটাতে তার ব্যক্তিস্বরূপের সার্থকতা নেই। তার একটি বিশিষ্টতার গৌরব আছে, এই কথাটি বৈঠকখানা দিয়েই জানাতে পারে। তাই বৈঠকখানা অলংকৃত।

জীবধর্মে মানুষের সঙ্গে পশুর প্রভেদ নেই। আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার প্রবৃত্তি তাদের উভয়ের প্রকৃতিতেই প্রবল। এই প্রবৃত্তিতে মনুষ্যত্বের সার্থকতা মানুষ উপলব্ধি করে না। তাই ভোজনের ইচ্ছা ও সুখ যতই প্রবল হোক ব্যাপক হোক, সাহিত্যে

ও অন্য কলায় ব্যঙ্গের ভাবে ছাড়া শ্রদ্ধার ভাবে তাকে স্বীকার করা হয় নি। মানুষের আহারের ইচ্ছা প্রবল সত্য, কিন্তু সার্থক সত্য নয়। পেট-ভরানো ব্যাপারটা মানুষ তার কলালোকের অমরাবতীতে স্থান দেয় নি।

স্ত্রীপুরুষের মিলন আহার ব্যাপারের উপরের কোঠায়; কেননা, ওর সঙ্গে মনের মিলনের নিবিড় যোগ। জীবধর্মের মূল প্রয়োজনের দিক থেকে এটা গৌণ, কিন্তু মানুষের জীবনে তা মুখ্যকে বহু দূরে ছাড়িয়ে গেছে। প্রেমের মিলন আমাদের অন্তর বাহিরকে নিবিড় চৈতন্যের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত ক'রে তোলে। বংশরক্ষার মুখ্য তত্ত্বটুকুতে সেই দীপ্তি নেই। তাই শরীরবিজ্ঞানের কোঠাতেই তার প্রধান স্থান। স্ত্রীপুরুষের মনের মিলনকে প্রকৃতির আদিম প্রয়োজন থেকে ছাড়িয়ে ফেলে তাকে তার নিজের বিশিষ্টতাতেই দেখতে পাই। তাই কাব্যে ও সকল প্রকার কলায় সে এতটা জায়গা জুড়ে বসেছে।

যৌনমিলনের যে চরম সার্থকতা মানুষের কাছে তা 'প্রজনার্থং' নয়, কেননা সেখানে সে পশু; সার্থকতা তার প্রেমে, এইখানে সে মানুষ। তবু যৌনমিলনের জীবধর্ম ও মানুষের চিত্তধর্ম উভয়ের সীমানা-বিভাগ নিয়ে সহজেই গোলমাল বাধে। সাহিত্যে আপন পুরো খাজনা আদায়ের দাবি ক'রে পশুর হাত মানুষের হাত উভয়ে একসঙ্গেই অগ্রসর হয়ে আসে। আধুনিক সাহিত্যে এই নিয়ে দেওয়ানি ফৌজদারি মামলা চলছেই।

উপরে যে পশু শব্দটা ব্যবহার করেছি ওটা নৈতিক ভালোমন্দ বিচারের দিক থেকে নয়; মানুষের আত্মবোধের বিশেষ সার্থকতার দিক থেকে। বংশরক্ষাঘটিত পশুধর্ম মানুষের মনস্তত্ত্বে ব্যাপক ও গভীর, বৈজ্ঞানিক এমন কথা বলেন। কিন্তু, সে হল বিজ্ঞানের কথা; মানুষের জ্ঞানে ও ব্যবহারে এর মূল্য আছে। কিন্তু, রসবোধ নিয়ে যে সাহিত্য ও কলা সেখানে এর সিদ্ধান্ত স্থান পায় না। অশোকবনে সীতার দুরারোগ্য ম্যালেরিয়া হওয়া উচিত ছিল, এ কথাও বিজ্ঞানের; সংসারে এ কথার জোর আছে, কিন্তু কাব্যে নেই। সমাজের অনুশাসন সম্বন্ধেও সেই কথা। সাহিত্যে যৌন-মিলন নিয়ে যে তর্ক উঠেছে সামাজিক হিতবুদ্ধির দিক থেকে তার সমাধান হবে না, তার সমাধান কলারসের দিক থেকে। অর্থাৎ, যৌনমিলনের মধ্যে যে দুটি মহল আছে মানুষ তার কোন্‌টিকে অলংকৃত ক'রে নিত্যকালের গৌরব দিতে চায়, সেইটিই হল বিচার্য।

মাঝে মাঝে এক-একটা যুগে বাহ্য কারণে বিশেষ কোনো উত্তেজনা প্রবল হয়ে ওঠে। সেই উত্তেজনা সাহিত্যের ক্ষেত্র অধিকার ক'রে তার প্রকৃতিকে অভিভূত করে দেয়।

য়ুরোপীয় যুদ্ধের সময় সেই যুদ্ধের চঞ্চলতা কাব্যে আন্দোলিত হয়েছিল। সেই সাময়িক আন্দোলনের অনেকটাই সাহিত্যের নিত্যবিষয় হতেই পারে না; দেখতে দেখতে তা বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ইংলণ্ডে পিউরিটান যুগের পরে যখন চরিত্রশৈথিল্যের সময় এল তখন সেখানকার সাহিত্যসূর্য তারই কলঙ্কলেখায় আচ্ছন্ন হয়েছিল। কিন্তু, সাহিত্যের সৌরকলঙ্ক নিত্যকালের নয়। যথেষ্ট পরিমাণে সেই কলঙ্ক থাকলেও প্রতি মুহূর্তে সূর্যের জ্যোতিস্বরূপ তার প্রতিবাদ করে, সূর্যের সত্তায় তার অবস্থিতিসত্ত্বেও তার সার্থকতা নেই। সার্থকতা হচ্ছে আলোতে।

মধ্যযুগে এক সময়ে য়ুরোপে শাস্ত্রশাসনের খুব জোর ছিল। তখন বিজ্ঞানকে সেই শাসন অভিভূত করেছে। সূর্যের চারি দিকে পৃথিবী ঘোরে, এ কথা বলতে গেলে মুখ চেপে ধরেছিল; ভুলেছিল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের একাধিপত্য, তার সিংহাসন ধর্মের রাজত্বসীমার বাইরে। আজকের দিনে তার বিপরীত হল। বিজ্ঞান প্রবল হয়ে উঠে কোথাও আপনার সীমা মানতে চায় না। তার প্রভাব মানবমনের সকল বিভাগেই আপন পেয়াদা পাঠিয়েছে। নূতন ক্ষমতার তকমা প'রে কোথাও সে অনধিকার প্রবেশ করতে কুণ্ঠিত হয় না।

বিজ্ঞান পদার্থটা ব্যক্তিস্বভাববর্জিত; তার ধর্মই হচ্ছে সত্য সম্বন্ধে অপক্ষপাত কৌতূহল। এই কৌতূহলের বেড়াজাল এখনকার সাহিত্যকেও ক্রমে ক্রমে ঘিরে ধরছে। অথচ সাহিত্যের বিশেষত্বই হচ্ছে তার পক্ষপাতধর্ম; সাহিত্যের বাণী স্বয়ম্বরা। বিজ্ঞানের নির্বিচার কৌতূহল সাহিত্যের সেই বরণ ক'রে নেবার স্বভাবকে পরাস্ত করতে উদ্যত। আজকালকার য়ুরোপীয় সাহিত্যে যৌনমিলনের দৈহিকতা নিয়ে খুব যে একটা উপদ্রব চলছে সেটার প্রধান প্রেরণা বৈজ্ঞানিক কৌতূহল, রেস্‌টোরেশন-যুগে সেটা ছিল লালসা। কিন্তু, সেই যুগের লালসার উত্তেজনাও যেমন সাহিত্যের রাজটিকা চিরদিনের মতো পায় নি, আজকালকার দিনের বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের ঔৎসুক্যও সাহিত্যে চিরকাল টিঁকতে পারে না।

একদিন আমাদের দেশে নাগরিকতা যখন খুব তপ্ত ছিল তখন ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের যথেষ্ট আদর দেখেছি। মদনমোহন তর্কালংকারের মধ্যেও সে ঝাঁজ ছিল। তখনকার দিনের নাগরিক-সাহিত্যে এ জিনিসটার ছড়াছড়ি দেখা গেছে। যারা এই নেশায় বুঁদ হয়ে ছিল তারা মনে করতে পারত না যে, সেদিনকার সাহিত্যের রসা-কাঠের এই ধোঁয়াটাই প্রধান ও স্থায়ী জিনিস নয়, তার আগুনের শিখাটাই আসল। কিন্তু আজ দেখা গেল, সেদিনকার সাহিত্যের গায়ে যে কালার ছাপ পড়েছিল সেটা তার চামড়ার রঙ নয়, কালস্রোতের ধারায় আজ তার চিহ্ন নেই। মনে তো আছে, যেদিন

ঈশ্বরগুপ্ত পাঁঠার উপর কবিতা লিখেছিলেন সেদিন নূতন ইংরেজরাজের এই হঠাৎ-শহর কলকাতার বাবুমহলে কিরকম তার প্রশংসাধ্বনি উঠেছে। আজকের দিনে পাঠক তাকে কাব্যের পংক্তিতে স্বভাবতই স্থান দেবে না; পেটুকতার নীতিবিরুদ্ধ অসংযম বিচার ক'রে নয়, ভোজনলালসার চরম মূল্য তার কাছে নেই ব'লেই।

সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানি যে-একটা বে-আব্রুতা এসেছে সেটাকেও এখানকার কেউ-কেউ মনে করছেন নিত্যপদার্থ; ভুলে যান, যা নিত্য তা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না। মানুষের রসবোধে যে-আব্রু আছে সেইটেই নিত্য; যে-আভিজাত্য আছে রসের ক্ষেত্রে সেইটেই নিত্য। এখনকার বিজ্ঞানমদমত্ত ডিমোক্রাসি তাল ঠুকে বলছে, ঐ আব্রুটাই দৌর্বল্য, নির্বিচার অলজ্জতাই আর্টের পৌরুষ।

এই ল্যাঙট-পরা গুলি-পাকানো ধুলো-মাখা আধুনিকতারই একটা স্বদেশী দৃষ্টান্ত দেখেছি হোলিখেলার দিনে চিৎপুর রোডে। সেই খেলায় আবির নেই, গুলাল নেই, পিচকারি নেই, গান নেই, লম্বা লম্বা ভিজে কাপড়ের টুকরো দিয়ে রাস্তার ধুলোকে পাঁক ক'রে তুলে তাই চিৎকারশব্দে পরস্পরের গায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাগলামি করাকেই জনসাধারণ বসন্ত-উৎসব ব'লে গণ্য করেছে। পরস্পরকে মলিন করাই তার লক্ষ্য, রঙিন করা নয়। মাঝে মাঝে এই অবারিত মালিন্যের উন্মত্ততা মানুষের মনস্তত্ত্বে মেলে না, এমন কথা বলি নে। অতএব সাইকো-এনালিসিসে এর কার্যকারণ বহুযত্নে বিচার্য। কিন্তু, মানুষের রসবোধই যে-উৎসবের মূল প্রেরণা সেখানে যদি সাধারণ মলিনতায় সকল মানুষকে কলঙ্কিত করাকেই আনন্দপ্রকাশ বলা হয়, তবে সেই বর্বরতার মনস্তত্ত্বকে এ ক্ষেত্রে অসংগত ব'লেই আপত্তি করব, অসত্য ব'লে নয়।

সাহিত্যে রসের হোলিখেলায় কাদা-মাখামাখির পক্ষ সমর্থন উপলক্ষে অনেকে প্রশ্ন করেন, সত্যের মধ্যে এর স্থান নেই কি। এ প্রশ্নটাই অবৈধ। উৎসবের দিনে ভোজপুরীর দল যখন মাতলামির ভূতে-পাওয়া মাদল-করতালের খচোখচোখচকার যোগে একঘেয়ে পদের পুনঃ পুনঃ আবর্তিত গর্জনে পীড়িত সুরলোককে আক্রমণ করতে থাকে, তখন আর্ত ব্যক্তিকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাই অনাবশ্যক যে এটা সত্য কি না, যথার্থ প্রশ্ন হচ্ছে এটা সংগীত কি না। মত্ততার আত্মবিস্মৃতিতে একরকম উল্লাস হয়; কণ্ঠের অক্লান্ত উত্তেজনায় খুব-একটা জোরও আছে। মাধুর্যহীন সেই রূঢ়তাকেই যদি শক্তির লক্ষণ ব'লে মানতে হয় তবে এই পালোয়ানির মাতামাতিকে বাহাদুরি দিতে হবে সে-কথা স্বীকার করি। কিন্তু, ততঃ কিম্! এ পৌরুষ চিৎপুর রাস্তার, অমরপুরীর সাহিত্যকলার নয়।

উপসংহারে এ কথাও বলা দরকার যে, সম্প্রতি যে-দেশে বিজ্ঞানের অপ্রতিহত প্রভাবে অলজ্জ কৌতূহলবৃত্তি দুঃশাসনমূর্তি ধরে সাহিত্যলক্ষ্মীর বস্ত্রহরণের অধিকার দাবি করছে, সে-দেশের সাহিত্য অন্তত বিজ্ঞানের দোহাই পেড়ে এই দৌরাত্ম্যের কৈফিয়ত দিতে পারে। কিন্তু, যে-দেশে অন্তরে-বাহিরে বুদ্ধিতে-ব্যবহারে বিজ্ঞান কোনোখানেই প্রবেশাধিকার পায় নি সে-দেশের সাহিত্যে ধার-করা নকল নির্লজ্জতাকে কার দোহাই দিয়ে চাপা দেবে। ভারতসাগরের ওপারে যদি প্রশ্ন করা যায় 'তোমাদের সাহিত্যে এত হট্টগোল কেন,' উত্তর পাই, 'হট্টগোল সাহিত্যের কল্যাণে নয়, হাটেরই কল্যাণে। হাটে যে ঘিরেছে!' ভারতসাগরের এপারে যখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি তখন জবাব পাই, 'হাট ত্রিসীমানায় নেই বটে, কিন্তু হট্টগোল যথেষ্ট আছে। আধুনিক সাহিত্যের ঐটেই বাহাদুরি।'

১৩৩৪

সাহিত্যে নবত্ব

সকল দেশের সাহিত্যেরই প্রধান কাজ হচ্ছে শোনবার লোকের আসনটি বড়ো ক'রে তোলা, যেখান থেকে দাবি আসে। নইলে লেখবার লোকের শক্তি খাটো হয়ে যায়। যে-সব সাহিত্য বনেদি তারা বহু কালের আর বহু মানুষের কানে কথা কয়েছে। তাদের কথা দিন-আনি-দিন-খাই তহবিলের ওজনে নয়। বনেদি সাহিত্যে সেই শোনবার কান তৈরি ক'রে তোলে। যে-সমাজে অনেক পাঠকের সেই শোনবার কান তৈরি হয়েছে সে-সমাজে বড়ো ক'রে লেখবার শক্তি অনেক লেখকের মধ্যে আপনিই দেখা দেয়, কেবলমাত্র খুচরো মালের ব্যাবসা সেখানে চলে না। সেখানকার বড়ো মহাজনদের কারবার আধা নিয়ে নয়, পুরো নিয়ে। তাদের 'আধা'র ব্যাপারী বলব না, সুতরাং জাহাজের খবর তাদের মেলে।

বাংলাদেশে প্রথম ইংরেজি শিক্ষার যোগে এমন সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের চেনাশোনা হল যার স্থান বিপুল দেশের ও নিরবধি কালের। সে সাহিত্যের বলবার বিষয়টা যতই বিদেশী হোক-না, তার বলবার আদর্শটা সর্বকালীন ও সর্বজনীন। হোমরের মহাকাব্যের কাহিনীটা গ্রীক, কিন্তু তার মধ্যে কাব্যরচনার যে-আদর্শটা আছে যেহেতু তা সার্বভৌমিক এইজন্যেই সাহিত্যপ্রিয় বাঙালিও সেই গ্রীক কাব্য প'ড়ে তার রস পায়। আপেল ফল আমাদের দেশের অনেক লোকের পক্ষেই অপরিচিত, ওটা সর্বাংশেই বিদেশী, কিন্তু ওর মধ্যে যে ফলত্ব আছে সেটাকে আমাদের অত্যন্ত স্বাদেশিক

রসনাও মুহূর্তের মধ্যে সাদরে স্বীকার ক'রে নিতে বাধা পায় না। শরৎ চাটুজ্জের গল্পটা বাঙালির, কিন্তু গল্প বলাটা একান্ত বাঙালির নয়; সেইজন্যে তাঁর গল্প-সাহিত্যের জগন্নাথ-ক্ষেত্রে জাত-বিচারের কথা উঠতেই পারে না। গল্প-বলার সর্বজনীন আদর্শটাই কলাও ক্ষেত্রে সকল লোককে ডাক দিয়ে আনে। সেই আদর্শটা খাটো হলেই নিমন্ত্রণটা ছোটো হয়; সেটা পারিবারিক ভোজ হতে পারে, স্বজাতের ভোজ হতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের যে-তীর্থে সকল দেশের যাত্রী এসে মেলে সে-তীর্থের মহাভোজ হবে না।

কিন্তু, মানুষের কানের কাছে সর্বদাই যারা ভিড় ক'রে থাকে, যাদের ফরমাশ সব-চেয়ে চড়া গলায়, তাদের পাতে জোগান দেবার ভার নিতে গেলেই ঠকতে হবে; তারা গাল পাড়তে থাকলেও তাদের এড়িয়ে যাবার মতো মনের জোর থাকা চাই। যাদের চিত্ত অত্যন্ত ক্ষণকালবিহারী, যাদের উপস্থিত গরজের দাবি অত্যন্ত উগ্র, তাদেরই হট্টগোল সব-চেয়ে বেশি শোনা যায়। সকালবেলার সূর্যালোকের চেয়ে বেশি দৃষ্টিতে পড়ে যে-আলোটা ল্যাম্প-পোস্টের উপরকার কাচফলক থেকে ঠিকরে চোখে এসে বেঁধে। আবদারের প্রাবল্যকেই প্রামাণ্য মনে করার বিপদ আছে।

যে-লেখকের অন্তরেই বিশ্বশ্রোতার আসন তিনিই বাইরের শ্রোতার কাছ থেকে নগদ বিদায়ের লোভ সামলাতে পারেন। ভিতরের মহাগৌরব যদি তাঁকে বরণমালা দেয় তা হলে তাঁর আর ভাবনা থাকে না, তা হলে বাইরের নিত্যমুখরকে তিনি দূর থেকে নমস্কার ক'রে নিরাপদে চলে যেতে পারেন।

ইংরেজি শিক্ষার গোড়াতেই আমরা যে-সাহিত্যের পরিচয় পেয়েছি তার মধ্যে বিশ্ব-সাহিত্যের আদর্শ ছিল এ কথা মানতেই হবে। কিন্তু, তাই ব'লে এ কথা বলতে পারব না যে, এই আদর্শ য়ুরোপে সকল সময়েই সমান উজ্জ্বল থাকে। সেখানেও কখনো কখনো গরজের ফরমাশ যখন অত্যন্ত বড়ো হয়ে ওঠে তখন সাহিত্যে খর্বতার দিন আসে। তখন ইকনমিক্‌সের অধ্যাপক, বায়োলজির লেক্‌চারার, সোসিয়লজির গোল্‌ড্‌ মেডালিস্‌ট্‌ সাহিত্যের প্রাঙ্গণে ভিড় ক'রে ধর্না দিয়ে বসেন।

সকল দেশের সাহিত্যেই দিন একটানা চলে না; মধ্যাহ্ন পেরিয়ে গেলেই বেলা পড়ে আসতে থাকে। আলো যখন ক্ষীণ হয়ে আসে তখনি অদ্ভুতের প্রাদুর্ভাব হয়। অন্ধকারের কালটা হচ্ছে বিকৃতির কাল। তখন অলিতে-গলিতে আমরা কন্ধকাটাকে দেখতে পাই, আর তার কুৎসিত কল্পনাটাকেই একান্ত ক'রে তুলি।

বস্তুত সাহিত্যের সায়াহ্নে কল্পনা ক্লান্ত হয়ে আসে ব'লেই তাকে বিকৃতিতে পেয়ে বসে; কেননা, যা-কিছু সহজ তাতে তার আর সানায় না। যে-অক্লিষ্ট শক্তি থাকলে আনন্দসম্ভোগ স্বভাবতই সম্ভবপর সেই শক্তির ক্ষীণতায় উত্তেজনার প্রয়োজন ঘটে।

তখন মাত্‌লামিকেই পৌরুষ ব'লে মনে হয়। প্রকৃতিস্থকেই মাতাল অবজ্ঞা করে; তার সংযমকে হয় মনে করে ভান, নয় মনে করে দুর্বলতা।

বড়ো সাহিত্যের একটা গুণ হচ্ছে অপূর্বতা, ওরিজিন্যালিটি। সাহিত্য যখন অক্লান্ত শক্তিমান থাকে তখন সে চিরন্তনকেই নূতন ক'রে প্রকাশ করতে পারে। এই তার কাজ। এ'কেই বলে ওরিজিন্যালিটি। যখনি সে আজগবিকে নিয়ে গলা ভেঙে, মুখ লাল ক'রে, কপালের শিরগুলোকে ফুলিয়ে তুলে, ওরিজিন্যাল হতে চেষ্টা করে, তখনি বোঝা যায় শেষ দশায় এসেছে। জল যাদের ফুরিয়েছে তাদের পক্ষে আছে পাঁক। তারা বলে সাহিত্যধারায় নৌকো-চলাচলটা অত্যন্ত সেকেলে; আধুনিক উদ্ভাবনা হচ্ছে পাঁকের মাতুনি— এতে মাঝিগিরির দরকার নেই— এটা তলিয়ে-যাওয়া রিয়ালিটি। ভাষাটাকে বেঁকিয়ে-চুরিয়ে, অর্থের বিপর্যয় ঘটিয়ে, ভাবগুলোকে স্থানে অস্থানে ডিগ্‌বাজি খেলিয়ে, পাঠকের মনকে পদে পদে ঠেলা মেরে, চমক লাগিয়ে দেওয়াই সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ। চরম সন্দেহ নেই। সেই চরমের নমুনা য়ুরোপীয় সাহিত্যের ডাডায়িজ্‌ম্‌। এর একটিমাত্র কারণ হচ্ছে এই, আলাপের সহজ শক্তি যখন চলে যায় সেই বিকারের দশায় প্রলাপের শক্তি বেড়ে ওঠে। বাইরের দিক থেকে বিচার করতে গেলে প্রলাপের জোর আলাপের চেয়ে অনেক বেশি, এ কথা মানতেই হয়। কিন্তু, তা নিয়ে শঙ্কা না ক'রে লোকে যখন গর্ব করতে থাকে তখনি বুঝি, সর্বনাশ হল ব'লে।

য়ুরোপের সাহিত্যে চিত্রকলায় এই-যে বিহ্বলতা ক্ষণে ক্ষণে ও স্থানে স্থানে বীভৎস হয়ে উঠছে এটা হয়তো একদিন কেটে যাবে, যেমন ক'রে বলিষ্ঠ লোক মারাত্মক ব্যামোকেও কাটিয়ে ওঠে। আমার ভয়, দুর্বলকে যখন ছোঁয়াচ লাগবে তখন তার অন্যান্য নানা দুর্গতির মধ্যে এই আর-একটা উপদ্রবের বোঝা হয়তো দুঃসহ হয়ে উঠবে।

ভাবনার বিশেষ কারণ হচ্ছে এই যে, আমাদের শাস্ত্র-মানা ধাত। এইরকম মানুষরা যখন আচার মানে তখন যেমন গুরুর মুখের দিকে চেয়ে মানে, যখন আচার ভাঙে তখনো গুরুর মুখের দিকে চেয়েই ভাঙে। রাশিয়া বা আর কোনো পশ্চিম দিগন্তে যদি গুরু নবীন বেশে দেখা দেন, লাল টুপি প'রে বা যে কোনো উগ্রসাজেই হোক তবে আমাদের দেশের ইস্কুল-মাস্টাররা অভিভূত হয়ে পড়েন। শাশুড়ির শাসনে যার চামড়া শক্ত হয়েছে সেই বউ শাশুড়ি হয়ে উঠে নিজের বধূর 'পরে শাসন জারি ক'রে যেমন আনন্দ পান, এঁরাও তেমনি স্বদেশের যে-সব নিরীহ মানুষকে নিজেদের স্কুলবয় ব'লে ভাবতে চিরদিন অভ্যস্ত তাদের উপর উপরওয়ালা রাশিয়ান হেড্‌মাস্টারদের কড়া বিধান জারি ক'রে পদোন্নতির গৌরব কামনা করেন। সেই হেড্‌মাস্টারের গদ্‌গদ ভাষার অর্থ

কী ও তার কারণ কী, সে কথা বিচার করবার অভ্যাস নেই, কেননা সেই হল আধুনিক কালের আপ্তবাক্য।

আমাদের দেশের নবীন লেখকদের সঙ্গে আমার পরিচয় পাকা হবার মতো যথেষ্ট সময় পাই নি, এ কথা আমাকে মানতেই হবে। মাঝে মাঝে ক্ষণকালের দেখাশোনা হয়েছে তাতে বারবার তাঁদের বলিষ্ঠ কল্পনা ও ভাষা সম্বন্ধে সাহসিক অধ্যবসায় দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। যথার্থ যে বীর সে সার্কাসের খেলোয়াড় হতে লজ্জা বোধ করে। পৌরুষের মধ্যে শক্তির আড়ম্বর নেই, শক্তির মর্যাদা আছে; সাহস আছে, বাহাদুরি নেই। অনেক নবীন কবির লেখায় এই সবলতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে; বোঝা যায় যে, বঙ্গসাহিত্যে একটি সাহসিক সৃষ্টি-উৎসাহের যুগ এসেছে। এই নব অভ্যুদয়ের অভিনন্দন করতে আমি কুণ্ঠিত হই নে।

কিন্তু, শক্তির একটা নূতন স্ফূর্তির দিনেই শক্তিহীনের কৃত্রিমতা সাহিত্যকে আবিল ক'রে তোলে। সন্তরণপটু যেখানে অবলীলাক্রমে পার হয়ে যাচ্ছে, অপটুর দল সেইখানেই উদ্দাম ভঙ্গিতে কেবল জলের নিচেকার পাঁককে উপরে আলোড়িত করতে থাকে। অপটুই কৃত্রিমতা দ্বারা নিজের অভাব পূরণ করতে প্রাণপণে চেষ্টা করে; সে রূঢ়তাকে বলে শৌর্য, নির্লজ্জতাকে বলে পৌরুষ। বাঁধিগতের সাহায্য ছাড়া তার চলবার শক্তি নেই ব'লেই সে হাল-আমলের নূতনত্বেরও কতকগুলো বাঁধি বুলি সংগ্রহ ক'রে রাখে। বিলিতি পাকশালায় ভারতীয় কারির যখন নকল করে, শিশিতে কারি-পাউডর বাঁধা নিয়মে তৈরি ক'রে রাখে; যাতে-তাতে মিশিয়ে দিলেই পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কারি হয়ে ওঠে; লঙ্কার গুঁড়ো বেশি থাকাতে তার দৈন্য বোঝা শক্ত হয়। আধুনিক সাহিত্যে সেইরকম শিশিতে-সাজানো বাঁধিবুলি আছে—অপটু লেখকদের পাকশালায় সেইগুলো হচ্ছে 'রিয়ালিটির কারি-পাউডর'। ওর মধ্যে একটা হচ্ছে দারিদ্র্যের আস্ফালন, আর-একটা লালসার অসংযম।

অন্যান্য সকল বেদনার মতোই সাহিত্যে দারিদ্র্যবেদনারও যথেষ্ট স্থান আছে। কিন্তু ওটার ব্যবহার একটা ভঙ্গিমার অঙ্গ হয়ে উঠেছে; যখন-তখন সেই প্রয়াসের মধ্যে লেখকেরই শক্তির দারিদ্র্য প্রকাশ পায়। 'আমরাই রিয়ালিটির সঙ্গে কারবার ক'রে থাকি, আমরাই জানি কাকে বলে লাইফ' এই আস্ফালন করবার ওটা একটা সহজ এবং চলতি প্রেস্‌ক্রিপ্‌শনের মতো হয়ে উঠেছে। অথচ এঁদের মধ্যে অনেকেই দেখা যায় নিজেদের জীবনযাত্রায় 'দরিদ্র-নারায়ণের' ভোগের ব্যবস্থা বিশেষ কিছুই রাখেন নি; ভালোরকম উপার্জনও করেন, সুখে স্বচ্ছন্দেও থাকেন; দেশের দারিদ্র্যকে এঁরা কেবল নব্যসাহিত্যের নূতনত্বের ঝাঁজ বাড়াবার জন্যে সর্বদাই

ঝাল-মসলার মতো ব্যবহার করেন। এই ভাবুকতার কারি-পাউডরের যোগে একটা কৃত্রিম সস্তা সাহিত্যের সৃষ্টি হয়ে উঠছে। এই উপায়ে বিনা প্রতিভায় এবং অল্প শক্তিতেই বাহবা পাওয়া যায়, এইজন্যেই অপটু লেখকের পক্ষে এ একটা মস্ত প্রলোভন এবং অবিচারক পাঠকের পক্ষে একটা সাহিত্যিক অপথ্য।

সাহিত্যে লালসা ইতিপূর্বে স্থান পায় নি বা এর পরে স্থান পাবে না, এমন কথা সত্যের খাতিরে বলতে পারি নে। কিন্তু, ও জিনিসটা সাহিত্যের পক্ষে বিপদ্‌জনক। বলা বাহুল্য, সামাজিক বিপদের কথাটা আমি তুলছি নে। বিপদের কারণটা হচ্ছে, ওটা অত্যন্ত সস্তা, ধুলোর উপরে শুয়ে পড়ার মতোই সহজসাধ্য। অর্থাৎ, ধুলোয় যার লুটোতে সংকোচ নেই তার পক্ষে একেবারেই সহজ। পাঠকের মনে এই আদিম প্রবৃত্তির উত্তেজনা সঞ্চার করা অতি অল্পেই হয়। এই জন্যেই, পাঠকসমাজে এমন একটা কথা যদি ওঠে যে, সাহিত্যে লালসাকে একান্ত উন্মথিত করাটাই আধুনিক যুগের একটা মস্ত ওস্তাদি, তা হলে এজন্যে বিশেষ শক্তিমান লেখকের দরকার হবে না—সাহস দেখিয়ে বাহাদুরি করবার নেশা যাদের লাগবে তারা এতে অতি সহজেই মেতে উঠতে পারবে। সাহসটা সমাজেই কী, সাহিত্যেই কী, ভালো জিনিস। কিন্তু, সাহসের মধ্যেও শ্রেণীবিচার, মূল্যবিচার আছে। কোনো-কিছুকে কেয়ার করি নে ব'লেই যে সাহস, তার চেয়ে বড়ো জিনিস হচ্ছে একটা-কিছুকে কেয়ার করি ব'লেই যে সাহস। মানুষের শরীর-ঘেঁষা যে সব সংস্কার জীবসৃষ্টির ইতিহাসে সেইগুলো অনেক পুরোনো, প্রথম অধ্যায় থেকেই তাদের আরম্ভ। একটু ছুঁতে-না ছুঁতেই তারা ঝন্‌ঝন্‌ ক'রে বেজে ওঠে। মেঘনাদবধের নরকবর্ণনায় বীভৎস রসের অবতারণা উপলক্ষ্যে মাইকেল এক জায়গায় বর্ণনা করেছেন, নারকী বমন ক'রে উদ্‌গীর্ণ পদার্থ আবার খাচ্ছে—এ বর্ণনায় পাঠকের মনে ঘৃণা সঞ্চার করতে কবিত্বশক্তির প্রয়োজন করে না, কিন্তু আমাদের মানসিকতার মধ্যে যে সব ঘৃণ্যতার মূল তার প্রতি ঘৃণা জাগিয়ে তুলতে কল্পনাশক্তির দরকার। ঘৃণাবৃত্তির প্রকাশটা সাহিত্যে জায়গা পাবে না, এ কথা বলব না কিন্তু সেটা যদি একান্তই একটা দৈহিক সস্তা জিনিস হয় তা হলে তাকে অবজ্ঞা করার অভ্যাসটাকে নষ্ট না করলেই ভালো হয়।

তুচ্ছ ও মহতের, ভালো ও মন্দের, কাঁকর ও পদ্মের ভেদ অসীমের মধ্যে নেই অতএব সাহিত্যেই বা কেন থাকবে, এমন একটা প্রশ্ন পরম্পরায় কানে উঠল। এমন কথারও কি উত্তর দেওয়ার দরকার আছে। যাঁরা তুরীয় অবস্থায় উঠেছেন তাঁদের কাছে সাহিত্যও নেই, আর্টও নেই; তাঁদের কথা ছেড়েই দেওয়া যায়। কিন্তু, কিছুর সঙ্গে কিছুরই মূল্যভেদ যদি সাহিত্যেও না থাকে তা হলে পৃথিবীতে সকল লেখাই তো

সমান দামের হয়ে ওঠে। কেননা, অসীমের মধ্যে নিঃসন্দেহই তাদের সকলেরই এক অবস্থা— খণ্ড দেশকালপাত্রের মধ্যেই তাদের মূল্যভেদ। আম এবং মাকাল অসীমের মধ্যে একই, কিন্তু আমরা খেতে গেলেই দেখি তাদের মধ্যে অনেক প্রভেদ। এইজন্তে অতি বড়ো তত্ত্বজ্ঞানী অধ্যাপকদেরও যখন ভোজে নিমন্ত্রণ করি তখন তাঁদের পাতে আমের অকুলোন হলে মাকাল দিতে পারি নে। তত্ত্বজ্ঞানের দোহাই পেড়ে মাকাল যদি দিতে পারতুম এবং দিয়ে যদি বাহাবা পাওয়া যেত, তাহলে সস্তায় ব্রাহ্মণভোজন করানো যেত, কিন্তু পুণ্য খতিয়ে দেখবার বেলায় চিত্রগুপ্ত নিশ্চয় পাত্তজ্ঞদর্শনের মতে হিসাব করতেন না। পুণ্যলাভ করতে শক্তির দরকার। সাহিত্যেও একটা পুণ্যের খাতা খোলা আছে।

ভালোরকম বিদ্যাশিক্ষার জন্তে মানুষকে নিয়ত যে-প্রয়াস করতে হয় সেটাতে মস্তিষ্কের ও চরিত্রের শক্তি চাই। সমাজে এই বিদ্যাশিক্ষার বিশেষ একটা আদর আছে ব'লেই সাধারণত এত ছাত্র এতটা শক্তি জাগিয়ে রাখে। সেই সমাজই যদি কোনো কারণে কোনো একদিন ব'লে বসে বিদ্যাশিক্ষা ত্যাগ করাটাই আদরণীয়, তা হলে অধিকাংশ ছাত্র অতি সহজেই সাহস প্রকাশ করবার অহংকার করতে পারে। এই রকম সস্তা বীরত্ব করবার উপলক্ষ্য সাধারণ লোককে দিলে তাদের কর্তব্যবুদ্ধিকে দুর্বল করাই হয়। বীর্যসাধ্য সাধনা বহুকাল বহু লোকেই অবলম্বন করেছে ব'লে তাকে সামান্ত ও সেকেলে ব'লে উপেক্ষা করবার স্পর্ধা একবার প্রশ্রয় পেলে অতি সহজেই তা সংক্রামিত হতে পারে— বিশেষভাবে, যারা শক্তিহীন তাদেরই মধ্যে। সাহিত্যে এইরকম কৃত্রিম দুঃসাহসের হাওয়া যদি ওঠে তা হলে বিস্তর অপটু লেখকের লেখনী মুখর হয়ে উঠবে, এই আমাদের আশঙ্কা।

আমি দেখেছি কেউ কেউ বলছেন, এই-সব তরুণ লেখকের মধ্যে নৈতিক চিত্তবিকার ঘটেছে ব'লেই এইরকম সাহিত্যের সৃষ্টি হঠাৎ এমন দ্রুতবেগে প্রবল হয়ে উঠেছে। আমি নিজে তা বিশ্বাস করি না। এঁরা অনেকেই সাহিত্যে সহজিয়া সাধন গ্রহণ করেছেন, তার প্রধান কারণ এটাই সহজ। অথচ দুঃসাহসিক ব'লে এতে বাহবাও পাওয়া যায়, তরুণের পক্ষে সেটা কম প্রলোভনের কথা নয়। তারা বলতে চায় 'আমরা কিছু মানি নে'— এটা তরুণের ধর্ম। কেননা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই না মানতে শক্তির দরকার করে; সেই শক্তির অহংকার তরুণের পক্ষে স্বাভাবিক। এই অহংকারের আবেগে তারা ভুল করেও থাকে; সেই ভুলের বিপদ সত্ত্বেও তরুণের এই স্পর্ধাকে আমি শ্রদ্ধাই করি। কিন্তু, যেখানে না মানাই হচ্ছে সহজ পন্থা, সেখানে সেই অশক্তের সস্তা অহংকার তরুণের পক্ষেই সব-চেয়ে অযোগ্য। ভাষাকে মানি নে যদি বলতে পারি

তা হলে কবিতা লেখা সহজ হয়, দৈহিক সহজ উত্তেজনাকে কাব্যের মুখ্য বিষয় করতে যদি না বাধে তা হলে সামান্য খরচাতেই উপস্থিতমতো কাজ চালানো যায়, কিন্তু এইটেই সাহিত্যিক কাপুরুষতা।

প্রান্‌সিউজ জাহাজ
২৩ আগস্ট, ১৯২৭

সাহিত্যবিচার

সাহিত্যের বিষয়টি ব্যক্তিগত; শ্রেণীগত নয়। এখানে 'ব্যক্তি' শব্দটাতে তার ধাতুমূলক অর্থের উপরেই জোর দিতে চাই; স্বকীয় বিশেষত্বের মধ্যে যা ব্যক্ত হয়ে উঠছে, তাই ব্যক্তি। সেই ব্যক্তি স্বতন্ত্র। বিশ্বজগতে তার সম্পূর্ণ অনুরূপ আর দ্বিতীয় নেই।

ব্যক্তিরূপের এই ব্যক্ততা সকলের সমান নয়, কেউ-বা সুস্পষ্ট, কেউ-বা অস্পষ্ট। অন্তত, যে-মানুষ উপলব্ধি করে তার পক্ষে। সাহিত্যের ব্যক্তি কেবল মানুষ নয়; বিশ্বের যে-কোনো পদার্থই সাহিত্যে সুস্পষ্ট তাই ব্যক্তি; জীবজন্তু, গাছপালা, নদী, পর্বত, সমুদ্র, ভালো জিনিস, মন্দ জিনিস, বস্তুর জিনিস, ভাবের জিনিস, সমস্তই ব্যক্তি— নিজের ঐকান্তিকতায় সে যদি ব্যক্ত না হল তা হলে সাহিত্যে সে লজ্জিত।

যে গুণে এরা সাহিত্যে সেই পরিমাণে ব্যক্ত হয়ে ওঠে, যাতে আমাদের চিত্ত তাকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়, সেই গুণটি দুর্লভ— সেই গুণটিই সাহিত্যরচয়িতার। তা রজোগুণও নয়, তমোগুণও নয়, তা কল্পনাশক্তির ও রচনাশক্তির গুণ।

পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষকে, অসংখ্য জিনিসকে আমরা পুরোপুরি দেখতে পাই নে। প্রয়োজন হিসাবে বা সাংসারিক প্রভাব হিসাবে তারা পুলিস ইন্‌স্পেক্টর বা ডিষ্ট্রিক্‌ট্ ম্যাজিস্ট্রেটের মতোই অত্যন্ত পরিদৃষ্ট এবং পরিস্পৃষ্ট হতে পারে, কিন্তু ব্যক্তি হিসাবে তারা হাজার হাজার পুলিস ইন্‌স্পেক্টর এবং ডিষ্ট্রিক্‌ট্ ম্যাজিস্ট্রেটের মতোই অকিঞ্চিৎকর, এমন-কি, যাদের প্রতি তারা কর্তৃত্ব করে তাদের অনেকের চেয়ে। সুতরাং তারা অচিরকালীন বর্তমান অবস্থার বাইরে মানুষের অন্তরঙ্গরূপে প্রকাশমান নয়।

কিন্তু, সাহিত্যরচয়িতা আপন সৃষ্টিশক্তির গুণে তাদেরও চিরকালীন রূপে ব্যক্ত করে দাঁড় করাতে পারে। তখন তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দণ্ডবিধাতারূপে কোনো শ্রেণী বা পদের প্রতিনিধিরূপে নয়, কেবলমাত্র আপন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের মূল্যে মূল্যবান। ধনী বলে নয়, মানী বলে নয়, জ্ঞানী বলে নয়, সৎ বলে নয়, সত্ত্ব রজ বা তমোগুণান্বিত বলে নয়,

তারা স্পষ্ট ব্যক্ত হতে পেরেছে বলেই সমাদৃত। এই ব্যক্ত রূপের সাহিত্যমূল্যটি নির্ণয় ও ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। এইজন্যেই সাহিত্যবিচারে অনেকেই ব্যক্তিপরিচয়ের দুরূহ কর্তব্যে ফাঁকি দিয়ে শ্রেণীর পরিচয় দিয়ে থাকেন। এই সহজ পন্থাকে সাধারণত আমাদের দেশের পাঠকেরা অশ্রদ্ধা করেন না; বোধ করি তার প্রধান কারণ, আমাদের দেশ জাত-মানার দেশ। মানুষের পরিচয়ের চেয়ে জাতের পরিচয়ে আমাদের চোখ পড়ে বেশি। আমরা বড়োলোক বলি যার বড়ো পদ, বড়োমানুষ বলি যার অনেক টাকা। আমরা জাতের চাপ, শ্রেণীর চাপ দীর্ঘকাল ধরে পিঠের উপর সহ্য করেছি; ব্যক্তিগত মানুষ পংক্তিপূজক সমাজের তাড়নায় আমাদের দেশে চিরদিন সংকুচিত। বাঁধা রীতির বন্ধন আমাদের দেশে সর্বত্রই। এই কারণেই যে সাধু-সাহিত্য আমাদের দেশে একদা প্রচলিত ছিল তাতে ব্যক্তির বর্ণনা ছিল শিষ্টসাহিত্যপ্রথাসম্মত, শ্রেণীগত। তখন ছিল কুমুদকহ্লারশোভিত সরোবর; যূথীজাতি-মল্লিকামালতীবিকশিত বসন্তঋতু; তখনকার সকল সুন্দরীরই গমন গজেন্দ্রগমন, তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিম্ব দাড়িম্ব সুমেরুর বাঁধা ছাঁদে। শ্রেণীর কুহেলিকার মধ্যে ব্যক্তি অদৃশ্য। সেই ঝাপসা দৃষ্টির মনোবৃত্তি আমাদের চলে গেছে তা বলতে পারি নে। এই ঝাপসা দৃষ্টিই সাহিত্য-রচনায় ও অনুভূতিতে সকলের চেয়ে বড়ো শত্রু। কেননা সাহিত্যে রসরূপের সৃষ্টি। সৃষ্টি মাত্রের আসল কথাই হচ্ছে প্রকাশ।

সেইজন্যেই দেখি, আমাদের দেশের সাহিত্যবিচারে ব্যক্তির পরিচয় বাদ দিয়ে শ্রেণীর পরিচয়ের দিকেই ঝোঁক দেওয়া হয়।

সাহিত্যে ভালো-লাগা মন্দ-লাগা হল শেষ কথা। বিজ্ঞানে সত্যমিথ্যার বিচারই শেষ বিচার। এই কারণে বিচারকের ব্যক্তিগত সংস্কারের উপরে বৈজ্ঞানিকের চরম আপিল আছে প্রমাণে। কিন্তু, ভালো মন্দ লাগাটা রুচি নিয়ে; এর উপরে আর-কোনো আপিল অযোগ্যতম লোকও অস্বীকার করতে পারে। এই কারণে জগতে সকলের চেয়ে অরক্ষিত অসহায় জীব হল সাহিত্যরচয়িতা। মৃদুস্বভাব হরিণ পালিয়ে বাঁচে, কিন্তু কবি ধরা পড়ে ছাপার অক্ষরের কালো জালটায়। এ নিয়ে আক্ষেপ ক'রে লাভ নেই; নিজের অনিবার্য কর্মফলের উপরে জোর খাটে না।

রুচির মার যখন খাই তখন চুপ ক'রে সহ্য করাই ভালো; কেননা সাহিত্যরচয়িতার ভাগ্যচক্রের মধ্যেই রুচির কুগ্রহ-সুগ্রহের চিরনির্দিষ্ট স্থান। কিন্তু, বাইরে থেকে যখন আসে উল্কাবৃষ্টি, সম্মার্জনী হাতে আসে ধূমকেতু, আসে উপগ্রহের উপসর্গ, তখন মাথা চাপড়ে বলি, এ যে মারের উপরি-পাওনা। বাংলাসাহিত্যের অন্তঃপুরে শ্রেণীর যাচনদার বাহির হতে ঢুকে পড়েছে; কেউ তাদের দ্বাররোধ করবার নেই। বাউলকবি দুঃখ

ক'রে বলেছে, ফুলের বনে জহরী ঢুকেছে, সে পদ্মফুলকে নিকষে ঘষে ঘষে বেড়ায় ফুলকে দেয় লজ্জা।

আমরা সহজেই ভুলি যে, জাতিনির্ণয় বিজ্ঞানে, জাতির বিবরণ ইতিহাসে, কিন্তু সাহিত্যে জাতিবিচার নেই, সেখানে আর-সমস্তই ভুলে ব্যক্তির প্রাধান্য স্বীকার ক'রে নিতে হবে। অমুক কুলীন ব্রাহ্মণ, এই পরিচয়েই অতি অযোগ্য মানুষও ঘরে ঘরে বরমাল্য লুটে বেড়াতে পারে, কিন্তু তাতে ব্যক্তি হিসাবে তার যোগ্যতা সপ্রমাণ হয় না। লোকটা কুলীন কিনা কুলপঞ্জিকা দেখলেই সকলেই সেটা বলতে পারে, অথচ ব্যক্তিগত যোগ্যতা নির্ণয় করতে যে সমজদারের প্রয়োজন তাঁকে খুঁজে মেলা ভার। এইজন্যে সমাজে সাধারণত শ্রেণীর কাঠামোতেই মানুষকে বিভক্ত করে; জাতিকুলের মর্যাদা দেওয়া, ধনের মর্যাদা দেওয়া সহজ। সেই বিচারেই ব্যক্তির প্রতি সর্বদাই সমাজে অবিচার ঘটে, শ্রেণীর বেড়ার বাইরে যোগ্যব্যক্তির স্থান অযোগ্যব্যক্তির পংক্তির নিচে পড়ে। কিন্তু, সাহিত্যে জগন্নাথের ক্ষেত্র; এখানে জাতির খাতিরে ব্যক্তির অপমান চলবে না। এমন-কি, এখানে বর্ণসংকর দোষও দোষ নয়; মহাভারতের মতোই উদারতা। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের জন্ম-ইতিহাস নিয়ে এখানে কেউ তাঁর সম্মান অপহরণ করে না; তিনি তাঁর নিজের মহিমাতেই মহীয়ান। অথচ আমাদের দেশে দেবমন্দিরপ্রবেশেও যেমন জাতিবিচারকে কেউ নাস্তিকতা মনে করে না, তেমনি সাহিত্যের সরস্বতীর মন্দিরের পাণ্ডারা দ্বারের কাছে কুলের বিচার করতে সংকোচ করে না। হয়তো ব'লে বসে, এ লেখাটার চাল কিম্বা স্বভাব বিশুদ্ধ ভারতীয় নয়, এর কুলে যবনস্পর্শ দোষ আছে। দেবী ভারতী স্বয়ং এরকমের মেল-বন্ধন মানেন না, কিন্তু পাণ্ডারা এই নিয়ে তুমুল তর্ক তোলে। চৈন চিত্র-বিশ্লেষণে প্রমাণ হতে পারে যে, তার কোনো অংশে ভারতীয় বৌদ্ধ সংস্রব ঘটেছে; কিন্তু সেটা নিছক ইতিহাসের কথা, সারস্বত বিচারের কথা নয়। সে চিত্রের ব্যক্তিস্বটি দেখো, যদি রূপব্যক্ততায় কোনো দোষ না থাকে তা হলে সেইখানেই তার ইতিহাসের কলঙ্কভঞ্জন হয়ে গেল। মানুষের মনে মানুষের প্রভাব চারি দিক থেকেই এসে থাকে। যদি অযোগ্য প্রভাব না হয় তবে তাকে স্বীকার করবার ও গ্রহণ করবার ক্ষমতা না থাকাই লজ্জার বিষয়— তাতে চিত্তের নির্জীবতা প্রমাণ হয়। নীল নদীর তীর থেকে বর্ষার মেঘ উঠে আসে। কিন্তু, যথাসময়ে সে হয় ভারতেরই বর্ষা। তাতে ভারতের ময়ূর যদি নেচে ওঠে তবে কোনো শুচিবায়ুগ্রস্ত স্বাদেশিক তাকে যেন ভর্ৎসনা না করেন; যদি সে না নাচত তবেই বুঝতুম, ময়ূরটা মরেছে বুঝি। এমন মরুভূমি আছে যে সেই মেঘকে তিরস্কার ক'রে আপন সীমানা থেকে বের করে দিয়েছে। সে মরু থাক্‌ আপন বিশুদ্ধ শুচিতা নিয়ে একেবারে শুভ্র আকারে, তার উপরে রসের

বিধাতা শাপ দিয়ে রেখেছেন, সে কোনোদিন প্রাণবান হয়ে উঠবে না। বাংলাদেশেই এমন মন্তব্য শুনতে হয়েছে যে, দাশুরায়ের পাঁচালি শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তা বিশুদ্ধ স্বাদেশিক।

এটা অন্ধ অভিমানের কথা। এই অভিমানে একদিন শ্রীমতী বলেছিলেন, 'কালো মেঘ আর হেরব না গো দূতী।' অবস্থাবৈগুণ্যে এরকম মনের ভাব ঘটে সে কথা স্বীকার করা যাক— ওটা হল খণ্ডিতা নারীর মুখের কথা, মনের কথা নয়। কিন্তু, যখন তত্ত্বজ্ঞানী এসে বলেন, সাত্ত্বিকতা হল ভারতীয়ত্ব, রাজসিকতা হল য়ুরোপীয়ত্ব— এই ব'লে সাহিত্যে খানাতল্লাশি করতে থাকেন, লাইন চুনে চুনে রাজসিকতার প্রমাণ বের ক'রে কাব্যের উপরে একঘরে করবার দাগা দিয়ে দেন, কাউকে জাতে রাখেন, কাউকে জাতে ঠেলেন, তখন একেবারে হতাশ হতে হয়।

এক সময়ে ভারতীয় প্রভাব যখন প্রাণপূর্ণ ছিল তখন মধ্য এবং পূর্ব এশিয়া তার নিকট-সংস্পর্শে এসে দেখতে দেখতে প্রভূত শিল্পসম্পদে আশ্চর্যরূপে চরিতার্থ হয়েছিল। তাতে এশিয়ায় এনেছিল নবজাগরণ। এজন্য ভারতের বহির্বর্তী এসিয়ার কোনো অংশ যেন কিছুমাত্র লজ্জিত না হয়। কারণ, যে-কোনো দানের মধ্যে শাশ্বত সত্য আছে তাকে যে-কোনো লোক যদি যথার্থভাবে আপন ক'রে স্বীকার করতে পারে তবে সে দান সত্যই তার আপনার হয়। অনুকরণই চুরি, স্বীকরণ চুরি নয়। মানুষের সমস্ত বড়ো বড়ো সভ্যতা এই স্বীকরণশক্তির প্রভাবেই পূর্ণ মাহাত্ম্য লাভ করেছে।

বর্তমান যুগে য়ুরোপ সর্ববিধ বিদ্যায় ও সর্ববিধ কলায় মহীয়ান। চারি দিকে তার প্রভাব নানা আকারে বিকীর্ণ। সেই প্রভাবের প্রেরণায় য়ুরোপের বহির্ভাগেও দেশে দেশে চিত্তজাগরণ দেখা দিয়েছে। এই জাগরণকে নিন্দা করা অবিমিশ্র মূঢ়তা। য়ুরোপ যে-কোনো সত্যকে প্রকাশ করেছে তাতে সকল মানুষেরই অধিকার। কিন্তু, সেই অধিকারকে আত্মশক্তির দ্বারাই প্রমাণ করতে হয়— তাকে স্বকীয় ক'রে নিজের প্রাণের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া চাই। আমাদের স্বদেশানুভূতি, আমাদের সাহিত্য, য়ুরোপের প্রভাবে উজ্জীবিত, বাংলাদেশের পক্ষে এটা গৌরবের কথা। শরৎ চাটুজ্জের গল্প বেতালপঞ্চবিংশতি, হাতেম-তাই গোলেবকাওয়ালী অথবা কাদম্বরী-বাসবদত্তার মতো যে হয় নি, হয়েছে য়ুরোপীয় কথাসাহিত্যের ছাঁদে, তাতে ক'রে অবাঙালিত্ব বা রজোগুণ প্রমাণ হয় না ; তাতে প্রমাণ হয় প্রতিভার প্রাণবত্তা। বাতাসে সত্যের যে-প্রভাব ভেসে বেড়ায় তা দূরের থেকেই আসুক বা নিকটের থেকে, তাকে সর্বাগ্রে অনুভব করে এবং স্বীকার করে প্রতিভাসম্পন্ন চিত্ত ; যারা নিষ্প্রতিভ তারাই সেটাকে ঠেকাতে চায়, এবং যেহেতু তারা দলে ভারী এবং তাদের অসাড়তা ঘুচতে অনেক দেরি হয় এই কারণেই প্রতিভার ভাগ্যে দীর্ঘকাল দুঃখভোগ থাকে। তাই বলি,

সাহিত্যবিচারকালে বিদেশী প্রভাবের বা বিদেশী প্রকৃতির খোঁটা দিয়ে বর্ণসংকরতা বা ব্রাত্যতার তর্ক যেন না তোলা হয়।

আরও একটা শ্রেণীবিচারের কথা এই উপলক্ষ্যে আমার মনে পড়ল। মনে পড়বার কারণ এই যে, কিছুদিন পূর্বেই আমার যোগাযোগ উপন্যাসের কুমুর চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে কোনো লেখিকা আমাকে পত্র লিখেছেন। তাতে বুঝতে পারা গেল, সাহিত্যে নারীকেও একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে দাঁড় করিয়ে দেখবার একটা উত্তেজনা সম্প্রতি প্রবল হয়ে উঠেছে। যেমন আজকাল তরুণবয়স্কের দল হঠাৎ ব্যক্তির সীমা অতিক্রম ক'রে দলপতিদের চাটুক্তির চোটে বিনামূল্যে একটা অত্যন্ত উচ্চ এবং বিশেষ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, নারীদেরও সেই দশা। সাহিত্যের নারীতে নারীত্ব নামক একটা শ্রেণীগত সাধারণ গুণ আছে কি না, এই তর্কটা সাহিত্যবিচারে প্রাধান্যলাভের চেষ্টা করছে। এরই ফলে কুমু ব্যক্তিগত ভাবে সম্পূর্ণ কুমু কিনা এই সাহিত্যসংগত প্রশ্নটা কারও কারও লেখনীতে বদলে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, কুমু মানবসমাজে নারী-নামক জাতির প্রতিনিধির পদ নিতে পারছে কিনা—অর্থাৎ তাকে নিয়ে সমস্ত নারীপ্রকৃতির উৎকর্ষ স্থাপন করা হয়েছে কিনা। মানবপ্রকৃতির যা কিছু সাধারণ গুণ তারই প্রতি লক্ষ্য মনোবিজ্ঞানের, আর ব্যক্তিবিশেষের যে অনন্যসাধারণ প্রকৃতি তারই প্রতি লক্ষ্য সাহিত্যের। অবশ্য, এ কথা বলাই বাহুল্য, নারীকে আঁকতে গিয়ে তাকে অ-নারী ক'রে আঁকা পাগলামি। বস্তুত, সে কথা আলোচনা করাই অনাবশ্যক। সাহিত্যে কুমুর যদি কোনো আদর হয় তো সে হবে সে ব্যক্তিগত কুমু ব'লেই, সে নারীশ্রেণীর প্রতিনিধি ব'লে নয়।

কথা উঠেছে, সাহিত্যবিচারে বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি শ্রেয় কিনা। এ প্রশ্নের উত্তর দেবার পূর্বে আলোচ্য এই— কী সংগ্রহ করার জন্যে বিশ্লেষণ। আলোচ্য সাহিত্যের উপাদান-অংশগুলি? আমি বলি সেটা অত্যাবশ্যক নয়; কারণ, উপাদানকে একত্র করার দ্বারা সৃষ্টি হয় না। সমগ্র সৃষ্টি আপন সমস্ত অংশের চেয়ে অনেক বেশি। সেই বেশিটুকু পরিমাণগত নয়। তাকে মাপা যায় না, ওজন করা যায় না, সেটা হল রূপরহস্য, সকল সৃষ্টির মূলে প্রচ্ছন্ন। প্রত্যেক সৃষ্টির মধ্যে সেটাই হল অদ্বৈত, বহুর মধ্যে সে ব্যাপ্ত, অথচ বহুর দ্বারা তার পরিমাপ হয় না। সে স-কল অর্থাৎ তার মধ্যে সমস্ত অংশ আছে, তবু সে নিষ্কল, তাকে অংশে খণ্ডিত করলেই সে থাকে না। অতএব সাহিত্যে সমগ্রকে সমগ্রদৃষ্টি দিয়েই দেখতে হবে। আজকাল সাইকো-এনালিসিসের বুলি অনেকের মনকে পেয়ে বসে। সৃষ্টিতে অবিশ্লেষ্য সমগ্রতার গৌরব খর্ব করবার মনোভাব জেগে উঠেছে। মানুষের চিত্তের উপকরণে নানাপ্রকার প্রবৃত্তি আছে, কাম

ক্রোধ অহংকার ইত্যাদি। ছিন্ন ক'রে দেখলে যে বস্তুপরিচয় পাওয়া যায় সম্মিলিত আকারে তা পাওয়া যায় না। প্রবৃত্তিগুলির গূঢ় অস্তিত্ব দ্বারা নয়, সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার অভাবনীয় যোগসাধনের দ্বারাই চরিত্রের বিকাশ। সেই যোগের রহস্যকে আজকাল অংশের বিশ্লেষণ লঙ্ঘন করবার উপক্রম করছে। বুদ্ধদেবের চরিত্রের বিচিত্র উপাদানের মধ্যে কামপ্রবৃত্তিও ছিল, তাঁর যৌবনের ইতিহাস থেকে সেটা প্রমাণ করা সহজ। যেটা থাকে সেটা যায় না, গেলে তাতে স্বভাবের অসম্পূর্ণতা ঘটে। চরিত্রের পরিবর্তন বা উৎকর্ষ ঘটে বর্জনের দ্বারা নয়, যোগের দ্বারা। সেই যোগের দ্বারা যে-পরিচয় সমগ্রভাবে প্রকাশমান সেইটেই হল বুদ্ধদেবের চরিত্রগত সত্য। প্রচ্ছন্নতার মধ্য থেকে বিশেষ উপকরণ টেনে বের করে তাঁর সত্য পাওয়া যায় না। বিশ্লেষণে হীরকে অঙ্গারে প্রভেদ নেই, সৃষ্টির ইন্দ্রজালে আছে। সন্দেশে কার্বন আছে, নাইট্রোজেন আছে, কিন্তু সেই উপকরণের দ্বারা সন্দেশের চরম বিচার করতে গেলে বহুতর বিসদৃশ ও বিস্বাদ পদার্থের সঙ্গে তাকে এক শ্রেণীতে ফেলতে হয়; কিন্তু এতে করেই সন্দেশের চরম পরিচয় আচ্ছন্ন হয়। কার্বন ও নাইট্রোজেন উপাদানের মধ্যে ধরা পড়া সত্ত্বেও জোর ক'রে বলতে হবে যে, সন্দেশ পচা মাংসের সঙ্গে একশ্রেণীভুক্ত হতে পারে না। কেননা, উভয়ে উপাদানে এক কিন্তু প্রকাশে স্বতন্ত্র। চতুর লোক বলবে, প্রকাশটা চাতুরী; তার উত্তরে বলতে হয়, বিশ্বজগৎটাই সেই চাতুরী।

তা হোক, তবু রসভোগকে বিশ্লেষণ করা চলে। মনে করা যাক, আম। যে-ভাবে সেটা ভোগ্য সে-ভাবে উদ্ভিদবিজ্ঞানের সে অতীত। ভোগ সম্বন্ধে তার রমণীয়তা ব্যাখ্যা করবার উপলক্ষ্যে বলা চলে যে, এই ফলে সব-প্রথমে যেটা মনকে টানে সে হচ্ছে ওর প্রাণের লাবণ্য; এইখানে সন্দেশের চেয়ে তার শ্রেষ্ঠতা। আমের যে বর্ণমাধুরী তা জীববিধাতার প্রেরণায় আমের অন্তর থেকে উদ্ভাসিত, সমস্ত ফলটির সঙ্গে সে অবিচ্ছেদে এক। চোখ ভোলাবার জন্যে সন্দেশে জাফ্‌রান দিয়ে রঙ ফলানো যেতে পারে; কিন্তু সেটা জড় পদার্থের বর্ণযোজন, প্রাণপদার্থের বর্ণ-উদ্ভাবনা নয়। তার সঙ্গে আমের আছে স্পর্শের সৌকুমার্য, সৌরভের সৌজন্য। তার পরে তার আচ্ছাদন উদ্‌ঘাটন করলে প্রকাশ পায় তার রসের অকৃপণতা। এইরূপে আম সম্বন্ধে রসভোগের বিশেষত্বটিকে বুঝিয়ে বলাকে বলব আমের রসবিচার। এইখানে স্বাদেশিক এসে পরিচয়পত্রে বলতে পারেন, আম প্রকৃত ভারতবর্ষীয়, সেটা ওর প্রচুর ত্যাগের দাক্ষিণ্যমূলক সাত্ত্বিকতায় প্রমাণ হয়; আর র‍্যাস্‌পবেরি গুস্‌বেরি বিলাতি, কেননা তার রসের ভাগ তার বীজের ভাগের চেয়ে বেশি নয়, পরের তুষ্টির চেয়ে ওরা আপন প্রয়োজনকেই বড়ো করেছে, অতএব ওরা রাজসিক। এই কথাটা দেশাত্মবোধের

অনুকূল কথা হতে পারে; কিন্তু, এইরকমের অমূলক কি সমূলক তত্ত্বালোচনা রসশাস্ত্রে সম্পূর্ণই অসংগত।

সংক্ষেপে আমার কথাটা দাঁড়ালো এই— সাহিত্যের বিচার হচ্ছে সাহিত্যের ব্যাখ্যা, সাহিত্যের বিশ্লেষণ নয়। এই ব্যাখ্যা মুখ্যত সাহিত্যবিষয়ের ব্যক্তিকে নিয়ে, তার জাতিকুল নিয়ে নয়। অবশ্য সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিচার কিম্বা তাত্ত্বিক বিচার হতে পারে। সেরকম বিচারে শাস্ত্রীয় প্রয়োজন থাকতে পারে, কিন্তু তার সাহিত্যিক প্রয়োজন নেই।

১৩৩৬

আধুনিক কাব্য

মডার্ন্ বিলিতি কবিদের সম্বন্ধে আমাকে কিছু লিখতে অনুরোধ করা হয়েছে। কাজটা সহজ নয়। কারণ, পাঁজি মিলিয়ে মডার্নের সীমানা নির্ণয় করবে কে। এটা কালের কথা ততটা নয় যতটা ভাবের কথা।

নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সিধে চলে না। যখন সে বাঁক নেয় তখন সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডার্ন্। বাংলায় বলা যাক আধুনিক। এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।

বাল্যকালে যে ইংরেজি কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয় হল তখনকার দিনে সেটাকে আধুনিক ব'লে গণ্য করা চলত। কাব্য তখন একটা নতুন বাঁক নিয়েছিল, কবি বার্ন্‌স্ থেকে তার শুরু। এই ঝোঁকে একসঙ্গে অনেকগুলি বড়ো বড়ো কবি দেখা দিয়েছিলেন। যথা ওয়ার্ড্‌স্বার্থ্, কোল্‌রিজ শেলি কীট্‌স্।

সমাজে সর্বসাধারণের প্রচলিত ব্যবহাররীতিকে আচার বলে। কোনো কোনো দেশে এই আচার ব্যক্তিগত অভিরুচির স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্যকে সম্পূর্ণ চাপা দিয়ে রাখে। সেখানে মানুষ হয়ে ওঠে পুতুল, তার চালচলন হয় নিখুঁত কেতা-দুরস্ত। সেই সনাতন অভ্যস্ত চালকেই সমাজের লোকে খাতির করে। সাহিত্যকেও এক-এক সময়ে দীর্ঘকাল আচারে পেয়ে বসে— রচনায় নিখুঁত রীতির কোঁটাতিলক কেটে চললে লোকে তাকে বলে সাধু। কবি বার্ন্‌সের পরে ইংরেজি কাব্যে যে যুগ এল সে-যুগে রীতির বেড়া ভেঙে মানুষের মর্জি এসে উপস্থিত। 'কুমুদকহ্লারসেবিত সরোবর' হচ্ছে সাধু-কারখানায় তৈরি সরকারি ঠুলির বিশেষ ছিদ্র দিয়ে দেখা সরোবর। সাহিত্যে কোনো সাহসিক সেই ঠুলি খুলে ফেলে, বুলি সরিয়ে, পুরো চোখ দিয়ে যখন সরোবর দেখে তখন

টুলির সঙ্গে সঙ্গে সে এমন একটা পথ খুলে দেয় যাতে ক'রে সরোবর নানা দৃষ্টিতে নানা খেয়ালে নানাবিধ হয়ে ওঠে। সাধু বিচারবুদ্ধি তাকে বলে, 'ধিক্।'

আমরা যখন ইংরেজি কাব্য পড়া শুরু করলুম তখন সেই আচার-ভাঙা ব্যক্তিগত মর্জিকেই সাহিত্য স্বীকার ক'রে নিয়েছিল। এণ্ডিমিয়ন্ রিভিয়ুতে যে-তর্জনধ্বনি উঠেছিল সেটা তখন শান্ত। যাই হোক, আমাদের সেকাল আধুনিকতার একটা যুগান্তকাল।

তখনকার কালে কাব্যে আধুনিকতার লক্ষণ হচ্ছে ব্যক্তিগত খুশির দৌড়। ওয়ার্ড্‌স্বার্থ্ বিশ্বপ্রকৃতিতে যে-আনন্দময় সত্তা উপলব্ধি করেছিলেন সেটাকে প্রকাশ করেছিলেন নিজের ছাঁদে। শেলির ছিল প্ল্যাটোনিক ভাবুকতা, তার সঙ্গে রাষ্ট্রগত ধর্মগত সকলপ্রকার স্থূল বাধার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। রূপসৌন্দর্যের ধ্যান ও সৃষ্টি নিয়ে কীট্‌সের কাব্য। ঐ যুগে বাহ্যিকতা থেকে আন্তরিকতার দিকে কাব্যের স্রোত বাঁক ফিরিয়েছিল।

কবিচিত্তে যে-অনুভূতি গভীর, ভাষায় সুন্দর রূপ নিয়ে সে আপন নিত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। প্রেম আপনাকে সজ্জিত করে। অন্তরে তার যে-আনন্দ বাইরে সেটাকে সে প্রমাণ করতে চায় সৌন্দর্যে। মানুষের একটা কাল গেছে যখন সে অবসর নিয়ে নিজের সম্পর্কীয় জগৎটাকে নানারকম করে সাজিয়ে তুলত। বাইরের সেই সজ্জাই তার ভিতরের অনুরাগের প্রকাশ। যেখানে অনুরাগ সেখানে উপেক্ষা থাকতে পারে না। সেই যুগে নিত্যব্যবহার্য জিনিসগুলিকে মানুষ নিজের রুচির আনন্দে বিচিত্র ক'রে তুলেছে। অন্তরের প্রেরণা তার আঙুলগুলিকে সৃষ্টিকুশলী করেছিল। তখন দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ঘটিবাটি গৃহসজ্জা দেহসজ্জা রঙে রূপে মানুষের হৃদয়কে জড়িয়ে দিয়েছিল তার বহিরূপকরণে। মানুষ কত অনুষ্ঠান সৃষ্টি করেছিল জীবনযাত্রাকে রস দেবার জন্যে। কত নূতন নূতন সুর; কাঠে ধাতুতে মাটিতে পাথরে রেশমে পশমে তুলোয় কত নূতন নূতন শিল্পকলা। সেই যুগে স্বামী তার স্ত্রীর পরিচয় দিয়েছে, প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ। যে দাম্পত্যসংসার রচনা করত তার রচনাকার্যের জন্য ব্যাঙ্কে-জমানো টাকাটাই প্রধান জিনিস ছিল না, তার চেয়ে প্রয়োজন ছিল ললিতকলার। যেমন-তেমন ক'রে মালা গাঁথলে চলত না; চীনাংশুকের অঞ্চলপ্রান্তে চিত্রবয়ন জানত তরুণীরা; নাচের নিপুণতা ছিল প্রধান শিক্ষা; তার সঙ্গে ছিল বীণা বেণু, ছিল গান। মানুষে মানুষে যে-সম্বন্ধ সেটার মধ্যে আত্মিকতার সৌন্দর্য ছিল।

প্রথম বয়সে যে ইংরেজ কবিদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল তাঁরা বাহিরকে নিজের অন্তরের যোগে দেখছিলেন; জগৎটা হয়েছিল তাঁদের নিজের ব্যক্তিগত। আপন কল্পনা মত ও রুচি সেই বিশ্বকে শুধু যে কেবল মানবিক ও মানসিক করেছিল তা নয়,

তাকে করেছিল বিশেষ কবির মনোগত। ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের জগৎ ছিল বিশেষভাবে ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থীয়, শেলির ছিল শেলীয়, বাইরনের ছিল বাইরনিক। রচনার ইন্দ্রজালে সেটা পাঠকেরও নিজের হয়ে উঠত। বিশেষ কবির জগতে যেটা আমাদের আনন্দ দিত সেটা বিশেষ ঘরের রসের আতিথ্যে। ফুল তার আপন রঙের গন্ধের বৈশিষ্ট্যদ্বারায় মৌমাছিকে নিমন্ত্রণ পাঠায়; সেই নিমন্ত্রণলিপি মনোহর। কবির নিমন্ত্রণেও স্বভাবতই সেই মনোহারিতা ছিল। যে-যুগে সংসারের সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিত্ব-সম্বন্ধটা প্রধান সে-যুগে ব্যক্তিগত আমন্ত্রণকে সযত্নে জাগিয়ে রাখতে হয়; সে-যুগে বেশে ভূষায় শোভনরীতিতে নিজের পরিচয়কে উজ্জ্বল করবার একটা যেন প্রতিযোগিতা থাকে।

দেখা যাচ্ছে, উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইংরেজি কাব্যে পূর্ববর্তীকালের আচারের প্রাধান্য ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের দিকে বাঁক ফিরিয়েছিল। তখনকার কালে সেইটেই হল আধুনিকতা।

কিন্তু, আজকের দিনে সেই আধুনিকতাকে মধ্যভিক্টোরীয় প্রাচীনতা সংজ্ঞা দিয়ে তাকে পাশের কামরায় আরাম-কেদারায় শুইয়ে রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখনকার দিনে ছাঁটা কাপড় ছাঁটা চুলের খট্‌খটে আধুনিকতা। ক্ষণে ক্ষণে গালে পাউডার, ঠোঁটে রঙ লাগানো হয় না তা নয়; কিন্তু সেটা প্রকাশ্যে, উদ্ধত অসংকোচে। বলতে চায় মোহ জিনিসটাতে আর-কোনো দরকার নেই। সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিতে পদে পদে মোহ; সেই মোহের বৈচিত্র্যই নানা রূপের মধ্য দিয়ে নানা সুর বাজিয়ে তোলে। কিন্তু, বিজ্ঞান তার নাড়ীনক্ষত্র বিচার ক'রে দেখেছে; বলছে, মূলে মোহ নেই, আছে কার্বন, আছে নাইট্রোজেন, আছে ফিজিয়লজি, আছে সাইকলজি। আমরা সেকালের কবি, আমরা এইগুলোকেই গৌণ জানতুম, মায়াকেই জানতুম মুখ্য। তাই সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছন্দে বন্ধে ভাষায় ভঙ্গিতে মায়া বিস্তার ক'রে মোহ জন্মাবার চেষ্টা করেছি, এ কথা কবুল করতেই হবে। ইশারা-ইঙ্গিতে কিছু লুকোচুরি ছিল; লজ্জার যে-আবরণ সত্যের বিরুদ্ধ নয়, সত্যের আভরণ, সেটাকে ত্যাগ করতে পারি নি। তার ঈষৎ বাষ্পের ভিতর দিয়ে যে রঙিন আলো এসেছে সেই আলোতে উষা ও সন্ধ্যার একটি রূপ দেখেছি, নববধূর মতো তা সকরুণ। আধুনিক দুঃশাসন জনসভায় বিশ্বদ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করতে লেগেছে; ও দৃশ্যটা আমাদের অভ্যস্ত নয়। সেই অভ্যাসপীড়ার জন্যেই কি সংকোচ লাগে। এই সংকোচের মধ্যে কোনো সত্য কি নেই। সৃষ্টিতে যে-আবরণ প্রকাশ করে, আচ্ছন্ন করে না, তাকে ত্যাগ করলে সৌন্দর্যকে কি নিঃস্ব হতে হয় না।

কিন্তু, আধুনিক কালের মনের মধ্যেও তাড়াহুড়ো, সময়েরও অভাব। জীবিকা জিনিসটা জীবনের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে। তাড়া-লাগানো যন্ত্রের ভিড়ের মধ্যেই

মানুষের হু হু ক'রে কাজ, হুড়মুড় ক'রে আমোদ-প্রমোদ। যে-মানুষ একদিন রয়ে-বসে আপনার সংসারকে আপনার ক'রে সৃষ্টি করত সে আজ কারখানার উপর বরাত দিয়ে প্রয়োজনের মাপে তড়িঘড়ি একটা সরকারি আদর্শে কাজ-চালানো কাণ্ড খাড়া ক'রে তোলে। ভোজ উঠে গেছে, ভোজনটা বাকি। মনের সঙ্গে মিল হল কিনা সে কথা ভাববার তাগিদ নেই, কেননা মন আছে অতি প্রকাণ্ড জীবিকা-জগন্নাথের রথের দড়ি ভিড়ের লোকের সঙ্গে মিলে টানবার দিকে। সংগীতের বদলে তার কণ্ঠে শোনা যায়, 'মারো ঠেলা হেঁইয়োঁ।' জনতার জগতেই তাকে বেশির ভাগ সময় কাটাতে হয়, আত্মীয়সম্বন্ধের জগতে নয়। তার চিত্তবৃত্তিটা ব্যস্তবাগীশের চিত্তবৃত্তি। হুড়োহুড়ির মধ্যে অসজ্জিত কুৎসিতকে পাশ কাটিয়ে চলবার প্রবৃত্তি তার নেই।

কাব্য তা হলে আজ কোন্ লক্ষ্য ধরে কোন্ রাস্তায় বেরোবে। নিজের মনের মতো ক'রে পছন্দ করা, বাছাই করা, সাজাই করা, এ এখন আর চলবে না। বিজ্ঞান বাছাই করে না, যা কিছু আছে তাকে আছে ব'লেই মেনে নেয়, ব্যক্তিগত অভিরুচির মূল্যে তাকে যাচাই করে না, ব্যক্তিগত অনুরাগের আগ্রহে তাকে সাজিয়ে তোলে না। এই বৈজ্ঞানিক মনের প্রধান আনন্দ কৌতূহলে, আত্মীয়সম্বন্ধ-বন্ধনে নয়। আমি কী ইচ্ছে করি সেটা তার কাছে বড়ো নয়, আমাকে বাদ দিয়ে জিনিসটা স্বয়ং ঠিক মতো কী সেইটেই বিচার্য। আমাকে বাদ দিলে মোহের আয়োজন অনাবশ্যক।

তাই এই বৈজ্ঞানিক যুগের কাব্যব্যবস্থায় যে-ব্যয়সংক্ষেপ চলছে তার মধ্যে সব-চেয়ে প্রধান ছাঁট পড়ল প্রসাধনে। ছন্দে বন্ধে ভাষায় অতিমাত্র বাছাবাছি চুকে যাবার পথে। সেটা সহজভাবে নয়, অতীত যুগের নেশা কাটাবার জন্যে তাকে কোমর বেঁধে অস্বীকার করাটা হয়েছে প্রথা। পাছে অভ্যাসের টানে বাছাই-বুদ্ধি পাঁচিল ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে এইজন্যে পাঁচিলের উপর রূঢ় কুশ্রীভাবে ভাঙা কাঁচ বসানোর চেষ্টা। একজন কবি লিখছেন: I am the greatest laugher of all। বলছেন, 'আমি সবার চেয়ে বড়ো হাসিয়ে, সূর্যের চেয়ে বড়ো, ওক গাছের চেয়ে, ব্যাঙের চেয়ে, অ্যাপলো দেবতার চেয়ে।' Than the frog and Apollo এটা হল ভাঙা কাঁচ। পাছে কেউ মনে করে কবি মিঠে ক'রে সাজিয়ে কথা কইছে। ব্যাঙ না ব'লে যদি বলা হত সমুদ্র, তা হলে এখনকার যুগ আপত্তি ক'রে বলতে পারত, ওটা দস্তুরমতো কবিয়ানা। হতে পারে, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি উলটো ছাঁদের দস্তুরমতো কবিয়ানা হল ঐ ব্যাঙের কথা। অর্থাৎ, ওটা সহজ কলমের লেখা নয়, গায়ে পড়ে পা মাড়িয়ে দেওয়া। এইটেই হালের কায়দা।

কিন্তু, কথা এই যে, ব্যাঙ জীবটা ভদ্র কবিতায় জল-আচরণীয় নয়, এ কথা মানবার

দিন গেছে। সত্যের কোঠায় ব্যাঙ এ্যাপলোর চেয়ে বড়ো বই ছোটো নয়। আমিও ব্যাঙকে অবজ্ঞা করতে চাই নে। এমন-কি, যথাস্থানে কবিপ্রেয়সীর হাসির সঙ্গে ব্যাঙের মক্‌মক্‌ হাসিকে এক পংক্তিতেও বসানো যেতে পারে, প্রেয়সী আপত্তি করলেও। কিন্তু, অতিবড়ো বৈজ্ঞানিক সাম্যতত্ত্বেও যে-হাসি সূর্যের, যে-হাসি ওক্‌বনস্পতির, যে-হাসি এ্যাপলোর, সে-হাসি ব্যাঙের নয়। এখানে ওকে আনা হয়েছে জোর ক'রে মোহ ভাঙবার জন্যে।

মোহের আবরণ তুলে দিয়ে যেটা যা সেটাকে ঠিক তাই দেখতে হবে। উনবিংশ শতাব্দীতে মায়ার রঙে যেটা রঙিন ছিল আজ সেটা ফিকে হয়ে এসেছে; সেই মিঠের আভাসমাত্র নিয়ে ক্ষুধা মেটে না, বস্তু চাই। 'ঘ্রাণেন অর্ধভোজনং' বললে প্রায় বারো আনা অত্যুক্তি করা হয়। একটি আধুনিকা মেয়ে কবি গত যুগের সুন্দরীকে খুব স্পষ্ট ভাষায় যে-সম্ভাষণ করেছেন সেটাকে তর্জমা ক'রে দিই। তর্জমায় মাধুরী সঞ্চার করলে বেখাপ হবে, চেষ্টাও সফল হবে না—

তুমি সুন্দরী এবং তুমি বাসি
যেন পুরোনো একটা যাত্রার সুর
বাজছে সেকেলে একটা সারিন্দি যন্ত্রে।
কিম্বা তুমি সাবেক আমলের বৈঠকখানায়
যেন রেশমের আসবাব, তাতে রোদ পড়েছে।
তোমার চোখে আয়ুহারা মুহূর্তের
ঝরা গোলাপের পাপড়ি যাচ্ছে জীর্ণ হয়ে।
তোমার প্রাণের গন্ধটুকু অস্পষ্ট, ছড়িয়ে পড়া,
ভাঁড়ের মধ্যে ঢেকে-রাখা মাথাঘষা মসলার মতো তার ঝাঁজ।
তোমার অতিকোমল সুরের আমেজ আমার লাগে ভালো—
তোমার ঐ মিলে মিশে-যাওয়া রঙগুলির দিকে তাকিয়ে আমার মন ওঠে মেতে।
আর আমার তেজ যেন টাঁকশালের নতুন পয়সা
তোমার পায়ের কাছে তাকে দিলেম ফেলে।
ধুলো থেকে কুড়িয়ে নাও,
তার ঝক্‌মকানি দেখে হয়তো তোমার মজা লাগবে।

এই আধুনিক পয়সাটার দাম কম কিন্তু জোর বেশি, আর এ খুব স্পষ্ট, টং ক'রে

বেজে ওঠে হাসের সুরে। সাবেককালের যে-মাধুরী তার একটা নেশা আছে, কিন্তু এর আছে স্পর্ধা। এর মধ্যে ঝাপসা কিছুই নেই।

এখনকার কাব্যের যা বিষয় তা লালিত্যে মন ভোলাতে চায় না। তা হলে সে কিসের জোরে দাঁড়ায়। তার জোর হচ্ছে আপন সুনিশ্চিত আত্মতা নিয়ে, ইংরেজিতে যাকে বলে ক্যারেক্টার। সে বলে, 'অয়মহং ভোঃ, আমাকে দেখো।' ঐ মেয়ে কবি, তাঁর নাম এমি লোয়েল, একটি কবিতা লিখেছেন লাল চটিজুতোর দোকান নিয়ে। ব্যাপারখানা এই যে, সন্ধ্যাবেলায় বাইরে বরফের ঝাপটা উড়িয়ে হাওয়া বইছে, ভিতরে পালিশ-করা কাঁচের পিছনে লম্বা সার করে ঝুলছে লাল চটিজুতোর মালা— like stalactites of blood, flooding the eyes of passers-by with dripping color, jamming their crimson reflections against the windows of cabs and tramcars, screaming their claret and salmon into the teeth of the sleet, plopping their little round maroon lights upon the tops of umbrellas. The row of white, sparkling shop fronts is gashed and bleeding, it bleeds red slippers। সমস্তটা এই চটি-জুতো নিয়ে।

একেই বলা যায় নৈর্ব্যক্তিক, impersonal। ঐ চটিজুতোর মালার উপর বিশেষ আসক্তির কোনো কারণ নেই, না খরিদ্দার না দোকানদার ভাবে। কিন্তু, দাঁড়িয়ে দেখতে হল, সমস্ত ছবির একটা আত্মতা যেই ফুটে উঠল অমনি তার তুচ্ছতা আর রইল না। যারা মানে-কুড়ানিয়া তারা জিজ্ঞাসা করবে, 'মানে কী হল, মশায়। চটিজুতো নিয়ে এত হল্লা কিসের, নাহয় হলই বা তার রঙ লাল।' উত্তরে বলতে হয়, 'চেয়েই দেখো-না'। 'দেখে লাভ কী' তার কোনো জবাব নাই।

নন্দনতত্ত্ব (Aesthetics) সম্বন্ধে এজ্‌রা পৌণ্ডের একটি কবিতা আছে। বিষয়টি এই যে, একটি মেয়ে চলেছিল রাস্তা দিয়ে, একটা ছোটো ছেলে, তালি দেওয়া কাপড় পরা, তার মন উঠল জেগে, সে থাকতে পারল না; বলে উঠল, "দেখ্‌ চেয়ে রে, কী সুন্দর।' এই ঘটনার তিন বৎসর পরে ঐ ছেলেটারই সঙ্গে আবার দেখা। সে বছর জালে সার্ডিন মাছ পড়েছিল বিস্তর। বড়ো বড়ো কাঠের বাক্সে ওর দাদাখুড়োরা মাছ সাজাচ্ছিল, ব্রেস্‌চিয়ার হাটে বিক্রি করতে পাঠাবে। ছেলেটা মাছ ঘাঁটাঘাঁটি করে লাফালাফি করতে লাগল। বুড়োরা ধমক দিয়ে বললে, 'স্থির হয়ে বোস্‌।' তখন সে সেই সাজানো মাছগুলোর উপর হাত বুলোতে বুলোতে তৃপ্তির সঙ্গে ঠিক সেই একই কথা আপন মনে বলে উঠল, 'কী সুন্দর।' কবি বল্‌ছেন, 'শুনে I was mildly abashed।'

সুন্দরী মেয়েকেও দেখো, সার্ডিন মাছকেও; একই ভাষায় বলতে কুণ্ঠিত হয়ো না, কী সুন্দর। এ দেখা নৈর্ব্যক্তিক—নিছক দেখা; এর পঙ্‌ক্তিতে চটিজুতোর দোকানকেও বাদ দেওয়া যায় না।

কাব্যে বিষয়ীর আত্মতা ছিল উনিশ শতাব্দীতে, বিশ শতাব্দীতে বিষয়ের আত্মতা। এইজন্যে কাব্যবস্তুর বাস্তবতার উপরেই ঝোঁক দেওয়া হয়, অলংকারের উপর নয়। কেননা, অলংকারটা ব্যক্তির নিজেরই রুচিকে প্রকাশ করে, খাঁটি বাস্তবতার জোর হচ্ছে বিষয়ের নিজের প্রকাশের জন্যে।

সাহিত্যে আবির্ভাবের পূর্বেই এই আধুনিকতা ছবিতে ভর করেছিল। চিত্রকলা যে ললিতকলার অঙ্গ, এই কথাটাকে অস্বীকার করবার জন্যে সে বিবিধপ্রকারে উৎপাত শুরু করে দিলে। সে বললে, আর্টের কাজ মনোহারিতা নয়, মনোজয়িতা; তার লক্ষণ লালিত্য নয়, যাথার্থ্য। চেহারার মধ্যে মোহকে মানলে না, মানলে ক্যারেক্টার্‌কে অর্থাৎ একটা সমগ্রতার আত্মঘোষণাকে। নিজের সম্বন্ধে সেই চেহারা আর-কিছু পরিচয় দিতে চায় না, কেবল জোরের সঙ্গে বলতে চায় 'আমি দ্রষ্টব্য'। তার এই দ্রষ্টব্যতার জোর হাবভাবের দ্বারা নয়, প্রকৃতির নকলনবিশির দ্বারা নয়, আত্মগত সৃষ্টিসত্যের দ্বারা। এই সত্য ধর্মনৈতিক নয়, ব্যবহারনৈতিক নয়, ভাবব্যঞ্জক নয়, এ সত্য সৃষ্টিগত। অর্থাৎ, সে হয়ে উঠেছে ব'লেই তাকে স্বীকার করতে হয়। যেমন আমরা ময়ূরকে মেনে নিই, শকুনিকেও মানি, শুয়োরকে অস্বীকার করতে পারি নে, হরিণকেও তাই।

কেউ সুন্দর, কেউ অসুন্দর; কেউ কাজের, কেউ অকাজের; কিন্তু সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোনো ছুতোয় কাউকে বাতিল করে দেওয়া অসম্ভব। সাহিত্যে, চিত্রকলাতেও সেই-রকম। কোনো রূপের সৃষ্টি যদি হয়ে থাকে তো আর-কোনো জবাবদিহি নেই; যদি না হয়ে থাকে, যদি তার সত্তার জোর না থাকে, শুধু থাকে ভাবলালিত্য, তা হলে সেটা বর্জনীয়।

এইজন্যে আজকের দিনে যে-সাহিত্য আধুনিকের ধর্ম মেনেছে, সে সাবেক-কালের কৌলীন্যের লক্ষণ সাবধানে মিলিয়ে জাত বাঁচিয়ে চলাকে অবজ্ঞা করে, তার বাছবিচার নেই। এলিয়টের কাব্য এইরকম হালের কাব্য, ব্রিজেসের কাব্য তা নয়। এলিয়ট লিখছেন—

> এ-ঘরে ও-ঘরে যাবার রাস্তায় সিদ্ধ মাংসর গন্ধ,
> তাই নিয়ে শীতের সন্ধ্যা জমে এল।
> এখন ছ'টা—

ধোঁয়াটে দিন পোড়া বাতি, শেষ অংশে ঠেকল
বাদলের হাওয়া পায়ের কাছে উড়িয়ে আনে
পোড়ো জমি থেকে ঝুলমাখা শুক্‌নো পাতা
আর ছেঁড়া খবরের কাগজ।
ভাঙা সার্শি আর চিম্‌নির চোঙের উপর
বৃষ্টির ঝাপট লাগে,
আর রাস্তার কোণে একা দাঁড়িয়ে এক ভাড়াটে গাড়ির ঘোড়া,
ভাপ উঠছে তার গা দিয়ে আর সে মাটিতে ঠুকছে খুর।

তার পরে বাসি বিয়ার-মদের গন্ধ-ওয়ালা কাদামাখা সকালের বর্ণনা। এই সকালে একজন মেয়ের উদ্দেশে বলা হচ্ছে—

বিছানা থেকে তুমি ফেলে দিয়েছ কম্বলটা,
চীৎ হয়ে পড়ে অপেক্ষা করে আছ,
কখনো ঝিমচ্ছ, দেখছ রাত্রিতে প্রকাশ পাচ্ছে
হাজার খেলো খেয়ালের ছবি
যা দিয়ে তোমার স্বভাব তৈরি।

তার পরে পুরুষটার খবর এই—

His soul stretched tight across the skies
That fade behind a city block,
Or trampled by insistent feet
At four and five and six o'clock ;
And short square fingers stuffing pipes,
And evening newspapers, and eyes
Assured of certain certainties,
The conscience of a blackened street
Impatient to assume the world.

এই ধোঁয়াটে, এই কাদামাখা, এই নানা বাসি গন্ধ ও ছেঁড়া আবর্জনাওয়ালা নিতান্ত খেলো সন্ধ্যা, খেলো সকালবেলার মাঝখানে কবির মনে একটা বিপরীত জাতের ছবি জাগল। বললেন—

I am moved by fancies that are curled
Around these images, and cling ;

The notion of some infinitely gentle
Infinitely suffering thing.

এইখানেই অ্যাপলোর সঙ্গে ব্যাঙের মিল আর টি঳কল না। এইখানে কূপমণ্ডুকের মক্‌মক্‌ শব্দ অ্যাপলোর হাসিকে পীড়া দিল। একটা কথা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, কবি নিতান্তই বৈজ্ঞানিকভাবে নির্বিকার নন। খেলো সংসারটার প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা এই খেলো সংসারের বর্ণনার ভিতর দিয়েই প্রকাশ পাচ্ছে। তাই কবিতাটির উপসংহারে যে কথা বলেছেন সেটা এত কড়া—

মুখের উপরে একবার হাত বুলিয়ে হেসে নাও।
দেখো, সংসারটা পাক খাচ্ছে যেন বুড়িগুলো
ঘুঁটে কুড়োচ্ছে পোড়ো জমি থেকে।

এই ঘুঁটে-কুড়োনো বুড়ো সংসারটার প্রতি কবির অনভিরুচি স্পষ্টই দেখা যায়। সাবেক কালের সঙ্গে প্রভেদটা এই যে, রঙিন স্বপ্ন দিয়ে মনগড়া সংসারে নিজেকে ভুলিয়ে রাখার ইচ্ছেটা নেই। কবি এই কাদা-ঘাঁটাঘাঁটির মধ্যে দিয়েই কাব্যকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছেন, ধোপ-দেওয়া কাপড়টার উপর মমতা না ক'রে। কাদার উপর অনুরাগ আছে ব'লে নয়, কিন্তু কাদার সংসারে চোখ চেয়ে কাদাটাকেও জানতে হবে, মানতে হবে ব'লেই। যদি তার মধ্যেও অ্যাপলোর হাসি কোথাও ফোটে সে তো ভালোই, যদি না'ও ফোটে, তা হলে ব্যাঙের লম্ফমান অট্টহাস্যকে উপেক্ষা করবার প্রয়োজন নেই। ওটাও একটা পদার্থ তো বটে— এই বিশ্বের সঙ্গে মিলিয়ে ওর দিকেও কিছুক্ষণ চেয়ে দেখা যায়, এর তরফেও কিছু বলবার আছে। সুসজ্জিত ভাষার বৈঠকখানায় ঐ ব্যাঙটাকে মানাবে না, কিন্তু অধিকাংশ জগৎসংসার ঐ বৈঠকখানার বাইরে।

সকালবেলায় প্রথম জাগরণ। সেই জাগরণে প্রথমটা নিজের উপলব্ধি, চৈতন্যের নূতন চাঞ্চল্য। এই অবস্থাটাকে রোমান্টিক বলা যায়। সদ্য-জাগা চৈতন্য বাইরে নিজেকে বাজিয়ে দেখতে বেরোয়। মন বিশ্বসৃষ্টিতে এবং নিজের রচনায় নিজের চিন্তাকে, নিজের বাসনাকে রূপ দেয়। অন্তরে যেটাকে চায় বাইরে সেটাকে নানা মায়া দিয়ে গড়ে। তার পরে আলো তীব্র হয়, অভিজ্ঞতা কঠোর হতে থাকে, সংসারের আন্দোলনে অনেক মায়াজাল ছিন্ন হয়ে যায়। তখন অনাবিল আলোকে, অনাবৃত আকাশে, পরিচয় ঘটতে থাকে স্পষ্টতর বাস্তবের সঙ্গে। এই পরিচিত বাস্তবকে ভিন্ন কবি ভিন্নরকম ক'রে অভ্যর্থনা করে। কেউ দেখে এ'কে অবিশ্বাসের চোখে বিদ্রোহের ভাবে; কেউ বা এ'কে এমন অশ্রদ্ধা করে যে, এর প্রতি রূঢ়ভাবে নির্লজ্জ ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হয় না। আবার খর আলোকে অতিপ্রকাশিত এর যে-আকৃতি তারও

অন্তরে কেউ-বা গভীর রহস্য উপলব্ধি করে ; মনে করে না, গূঢ় ব'লে কিছুই নেই ; মনে করে না, যা প্রতীয়মান তাতেই সব-কিছু নিঃশেষে ধরা পড়ছে। গত য়ুরোপীয় যুদ্ধে মানুষের অভিজ্ঞতা এত কর্কশ, এত নিষ্ঠুর হয়েছিল, তার বহুযুগপ্রচলিত যত-কিছু আদব ও আব্রু তা সাংঘাতিক সংকটের মধ্যে এমন অকস্মাৎ ছারখার হয়ে গেল ; দীর্ঘকাল যে-সমাজস্থিতিকে একান্ত বিশ্বাস ক'রে সে নিশ্চিন্ত ছিল তা এক মুহূর্তে দীর্ণবিদীর্ণ হয়ে গেল ; মানুষ যে-সকল শোভন রীতি কল্যাণনীতিকে আশ্রয় করেছিল তার বিধ্বস্ত রূপ দেখে এতকাল যা-কিছুকে সে ভদ্র ব'লে জানত তাকে দুর্বল ব'লে, আত্মপ্রতারণার কৃত্রিম উপায় ব'লে, অবজ্ঞা করাতেই যেন সে একটা উগ্র আনন্দ বোধ করতে লাগল ; বিশ্বনিন্দুকতাকেই সে সত্যনিষ্ঠতা ব'লে আজ ধরে নিয়েছে।

কিন্তু, আধুনিকতার যদি কোনো তত্ত্ব থাকে, যদি সেই তত্ত্বকে নৈর্ব্যক্তিক আখ্যা দেওয়া যায়, তবে বলতেই হবে, বিশ্বের প্রতি এই উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুৎসার দৃষ্টি এও আকস্মিক বিপ্লবজনিত একটা ব্যক্তিগত চিত্তবিকার। এও একটা মোহ, এর মধ্যেও শান্ত নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে সহজভাবে গ্রহণ করবার গভীরতা নেই। অনেকে মনে করেন, এই উগ্রতা, এই কালাপাহাড়ি তাল-ঠোকাই আধুনিকতা। আমি তা মনে করি নে। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা আজ হাজার হাজার লোককে আক্রমণ করলেও বলব না, ইনফ্লুয়েঞ্জাটাই দেহের আধুনিক স্বভাব। এহ বাহ্য। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাটার অন্তরালেই আছে সহজ দেহস্বভাব।

আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী, তা হলে আমি বলব, বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদ্‌গতভাবে দেখা। এই দেখাটাই উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ ; এই মোহমুক্ত দেখাতেই খাঁটি আনন্দ। আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্তচিত্তে বিশ্বকে সমগ্রদৃষ্টিতে দেখবে, এইটেই শাশ্বতভাবে আধুনিক।

কিন্তু, এ'কে আধুনিক বলা নিতান্ত বাজে কথা। এই-যে নিরাসক্ত সহজ দৃষ্টির আনন্দ এ কোনো বিশেষ কালের নয়। যার চোখ এই অনাবৃত জগতে সঞ্চরণ করতে জানে এ তারই। চীনের কবি লি-পো যখন কবিতা লিখছিলেন সে তো হাজার বছরের বেশি হল। তিনি ছিলেন আধুনিক ; তাঁর ছিল বিশ্বকে সগু-দেখা চোখ। চারটি লাইনে সাদা ভাষায় তিনি লিখছেন—

এই সবুজ পাহাড়গুলোর মধ্যে থাকি কেন।
প্রশ্ন শুনে হাসি পায়, জবাব দিই নে। আমার মন নিস্তব্ধ।
যে আর-এক আকাশে আর-এক পৃথিবীতে বাস করি—

সে জগৎ কোনো মানুষের না।
পীচগাছে ফুল ধরে, জলের স্রোত যায় বয়ে।

আর একটা ছবি—

নীল জল…নির্মল চাঁদ,
চাঁদের আলোতে সাদা সারস উড়ে চলেছে।
ঐ শোনো, পানফল জড়ো করতে মেয়েরা এসেছিল;
তারা বাড়ি ফিরছে রাত্রে গান গাইতে গাইতে।

আর একটা—

নগ্ন দেহে শুয়ে আছি বসন্তে সবুজ বনে।
এতই আলস্য যে সাদা পালকের পাখাটা নড়াতে গা লাগছে না।
টুপিটা রেখে দিয়েছি ঐ পাহাড়ের আগায়,
পাইনগাছের ভিতর দিয়ে হাওয়া আসছে
আমার খালি মাথার 'পরে।

একটি বধূর কথা—

আমার ছাঁটা চুল ছিল খাটো, তাতে কপাল ঢাকত না।
আমি দরজার সামনে খেলা করছিলুম, তুলছিলুম ফুল।
তুমি এলে আমার প্রিয়, বাঁশের খেলা-ঘোড়ায় চ'ড়ে,
কাঁচা কুল ছড়াতে ছড়াতে।
চাঙ্‌কানের গলিতে আমরা থাকতুম কাছে কাছে।
আমাদের বয়স ছিল অল্প, মন ছিল আনন্দে ভরা।
তোমার সঙ্গে বিয়ে হল যখন আমি পড়লুম চোদ্দয়।
এত লজ্জা ছিল যে হাসতে সাহস হত না,
অন্ধকার কোণে থাকতুম মাথা হেঁট ক'রে,
তুমি হাজার বার ডাকলেও মুখ ফেরাতুম না।
পনেরো বছরে পড়তে আমার ভ্রূকুটি গেল ঘুচে,
আমি হাসলুম।…
আমি যখন ষোলো তুমি গেলে দূর প্রবাসে—
চ্যুটাঙের গিরিপথে, ঘূর্ণিজল আর পাথরের ঢিবির ভিতর দিয়ে।
পঞ্চম মাস এল, আমার আর সহ্য হয় না।

আমাদের দরজার সামনে রাস্তা দিয়ে তোমাকে যেতে দেখেছিলুম,
সেখানে তোমার পায়ের চিহ্ন সবুজ শ্যাওলায় চাপা পড়ল—
সে শ্যাওলা এত ঘন যে ঝাঁট দিয়ে সাফ করা যায় না।
অবশেষে শরতের প্রথম হাওয়ায় তার উপরে জমে উঠল ঝরা পাতা।
এখন অষ্টম মাস, হলদে প্রজাপতিগুলো
আমাদের পশ্চিম-বাগানের ঘাসের উপর ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।
আমার বুক যে ফেটে যাচ্ছে, ভয় হয় পাছে আমার রূপ যায় ম্লান হয়ে।
ওগো, যখন তিনটে জেলা পার হয়ে তুমি ফিরবে
আগে থাকতে আমাকে খবর পাঠাতে ভুলো না।
চাঙফেঙ্-শার দীর্ঘ পথ বেয়ে আমি আসব, তোমার সঙ্গে দেখা হবে।
দূর ব'লে একটুও ভয় করব না।

এই কবিতায় সেন্টিমেন্টের সুর একটুও চড়ানো হয় নি, তেমনি তার 'পরে বিদ্রূপ বা অবিশ্বাসের কটাক্ষপাত দেখছি নে। বিষয়টা অত্যন্ত প্রচলিত, তবু এতে রসের অভাব নেই। স্টাইল বেঁকিয়ে দিয়ে একে ব্যঙ্গ করলে জিনিসটা আধুনিক হত। কেননা, সবাই যাকে অনায়াসে মেনে নেয় আধুনিকেরা কাব্যে তাকে মানতে অবজ্ঞা করে। খুব সম্ভব, আধুনিক কবি ঐ কবিতার উপসংহারে লিখত, স্বামী চোখের জল মুছে পিছন ফিরে তাকাতে তাকাতে চলে গেল, আর মেয়েটি তখনি লাগল শুকনো চিংড়িমাছের বড়া ভাজতে। কার জন্যে। এই প্রশ্নের উত্তরে থাকত দেড় লাইন ভরে ফুট্‌কি। সেকেলে পাঠক জিজ্ঞাসা করত, 'এটা কী হল।' একেলে কবি উত্তর করত, 'এমনতরো হয়েই থাকে।' 'অন্যটাও তো হয়।' 'হয় বটে, কিন্তু বড়ো বেশি ভদ্র। কিছু দুর্গন্ধ না থাকলে ওর শৌখিন ভাব ঘোচে না, আধুনিক হয় না।' সেকালে কাব্যের বাবুগিরি ছিল, সৌজন্যের সঙ্গে জড়িত। একেলে কাব্যেরও বাবুগিরি আছে, সেটা পচা মাংসের বিলাসে।

চীনে কবিতাটির পাশে বিলিতি কবিদের আধুনিকতা সহজ ঠেকে না। সে আবিল। তাদের মনটা পাঠককে কনুই দিয়ে ঠেলা মারে। তারা যে-বিশ্বকে দেখছে এবং দেখাচ্ছে সেটা ভাঙন-ধরা, রাবিশ-জমা, ধুলো-ওড়া। ওদের চিত্ত যে আজ অসুস্থ, অসুখী, অব্যবস্থিত। এ অবস্থায় বিশ্ববিষয় থেকে ওরা বিশুদ্ধভাবে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারে না। ভাঙা প্রতিমার কাঠ খড় দেখে ওরা অট্টহাস্য করে; বলে, আসল জিনিসটা এতদিনে ধরা পড়েছে। সেই ঢেলা, সেই কাঠখড়গুলোকে খোঁচা মেরে কড়া কথা বলাকেই ওরা বলে খাঁটি সত্যকে জোরের সঙ্গে স্বীকার করা।

এই প্রসঙ্গে এলিয়টের একটি কবিতা মনে পড়ছে। বিষয়টি এই : বুড়ি মারা গেল, সে বড়ো ঘরের মহিলা। যথানিয়মে ঘরের ঝিলিমিলিগুলো নাবিয়ে দেওয়া, শববাহকেরা এসে দস্তুরমতো সময়োচিত ব্যবস্থা করতে প্রবৃত্ত। এ দিকে খাবার ঘরে বাড়ির বড়ো-খানসামা ডিনার-টেবিলের ধারে বসে, বাড়ির মেজো-ঝিকে কোলের উপর টেনে নিয়ে।

ঘটনাটা বিশ্বাসযোগ্য এবং স্বাভাবিক সন্দেহ নাই। কিন্তু, সেকেলে মেজাজের লোকের মনে প্রশ্ন উঠবে, তা হলেই কি যথেষ্ট হল। এ কবিতাটা লেখবার গরজ কী নিয়ে, এটা পড়তেই বা যাব কেন। একটি মেয়ের সুন্দর হাসির খবর কোনো কবির লেখায় যদি পাই তা হলে বলব, এ খবরটা দেবার মতো বটে। কিন্তু, তার পরেই যদি বর্ণনায় দেখি, ডেন্টিস্ট্ এল, সে তার যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলে মেয়েটির দাঁতে পোকা পড়েছে, তা হলে বলতে হবে, নিশ্চয়ই এটাও খবর বটে কিন্তু সবাইকে ডেকে ডেকে বলবার মতো খবর নয়। যদি দেখি কারও এই কথাটা প্রচার করতেই বিশেষ ঔৎসুক্য, তা হলে সন্দেহ করব, তারও মেজাজে পোকা পড়েছে। যদি বলা হয়, আগেকার কবিরা বাছাই ক'রে কবিতা লিখতেন, অতি-আধুনিকরা বাছাই করেন না, সে কথা মানতে পারি নে; এঁরাও বাছাই করেন। তাজা ফুল বাছাই করাও বাছাই, আর শুকনো পোকায়-খাওয়া ফুল বাছাইও বাছাই। কেবল তফাত এই যে, এঁরা সর্বদাই ভয় করেন পাছে এঁদের কেউ বদনাম দেয় যে এঁদের বাছাই করার শখ আছে। অঘোরপন্থীরা বেছে বেছে কুৎসিত জিনিস খায়, দূষিত জিনিস ব্যবহার করে, পাছে এটা প্রমাণ হয় ভালো জিনিসে তাদের পক্ষপাত। তাতে ফল হয়, অ-ভালো জিনিসেই তাদের পক্ষপাত পাকা হয়ে ওঠে। কাব্যে অঘোরপন্থীর সাধনা যদি প্রচলিত হয়, তা হলে শুচি জিনিসে যাদের স্বাভাবিক রুচি তারা যাবে কোথায়। কোনো কোনো গাছে ফুলে পাতায় কেবলই পোকা ধরে, আবার অনেক গাছে ধরে না— প্রথমটাকেই প্রাধান্য দেওয়াকেই কি বাস্তব-সাধনা ব'লে বাহাদুরি করতে হবে।

একজন কবি একটি সম্রান্ত ভদ্রলোকের বর্ণনা করছেন—

রিচার্ড কোডি যখন শহরে যেতেন
পায়ে-চলা পথের মানুষ আমরা তাকিয়ে থাকতুম তাঁর দিকে।
ভদ্র যাকে বলে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত,
ছিপছিপে যেন রাজপুত্র।
সাদাসিধে চালচলন, সাদাসিধে বেশভূষা—
কিন্তু যখন বলতেন 'গুড্‌মর্নিং', আমাদের নাড়ী উঠত চঞ্চল হয়ে।
চলতেন যখন ঝলমল করত।

ধনী ছিলেন অসম্ভব।
ব্যবহারে প্রসাদগুণ ছিল চমৎকার।
যা-কিছু এঁর চোখে পড়ত মনে হত,
আহা, আমি যদি হতুম ইনি।
এ দিকে আমরা যখন মরছি খেটে খেটে,
তাকিয়ে আছি কখন জ্বলবে আলো,
ভোজনের পালায় মাংস জোটে না,
গাল পাড়ছি মোটা রুটিকে—
এমন সময় একদিন শান্ত বসন্তের রাত্রে
রিচার্ড কোড়ি গেলেন বাড়িতে,
মাথার মধ্যে চালিয়ে দিলেন এক গুলি।[১]

এই কবিতার মধ্যে আধুনিকতার ব্যঙ্গকটাক্ষ বা অট্টহাস্য নেই, বরঞ্চ কিছু করুণার আভাস আছে। কিন্তু, এর মধ্যে একটা নীতিকথা আছে, সেটা আধুনিক নীতি। সে হচ্ছে এই যে, যা সুস্থ ব'লে সুন্দর ব'লে প্রতীয়মান তার অন্তরে কোথাও একটা সাংঘাতিক রোগ হয়তো আছে। যাকে ধনী ব'লে মনে হয় তার পর্দার আড়ালে লুকিয়ে ব'সে আছে উপবাসী। যাঁরা সেকেলে বৈরাগ্যপন্থী তাঁরাও এই ভাবেই কথা বলেছেন। যারা বেঁচে আছে তাদের তাঁরা মনে করিয়ে দেন, একদিন বাঁশের দোলায় চড়ে শ্মশানে যেতে হবে। য়ুরোপীয় সন্ন্যাসী উপদেষ্টারা বর্ণনা করেছেন মাটির নিচে গলিত দেহকে কেমন ক'রে পোকায় খাচ্ছে। যে দেহকে সুন্দর ব'লে মনে করি সে যে অস্থিমাংস-রসরক্তের কদর্য সমাবেশ, সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমাদের চটকা ভাঙিয়ে দেবার চেষ্টা নীতিশাস্ত্রে দেখা গেছে। বৈরাগ্যসাধনার পক্ষে প্রকৃষ্ট উপায়, এইরকম প্রত্যক্ষ বাস্তবের প্রতি বারে বারে অশ্রদ্ধা জন্মিয়ে দেওয়া। কিন্তু কবি তো বৈরাগীর চেলা নয়, সে তো অনুরাগেরই পক্ষ নিতে এসেছে। কিন্তু, এই আধুনিক যুগ কি এমনি জরাজীর্ণ যে সেই কবিকেও লাগল শ্মশানের হাওয়া— এমন কথা সে খুশি হয়ে বলতে শুরু করেছে, যাকে মহৎ ব'লে মনে করি সে ঘুণে ধরা, যাকে সুন্দর ব'লে আদর করি তারই মধ্যে অস্পৃশ্যতা?

মন যাদের বুড়িয়ে গেছে তাদের মধ্যে বিশুদ্ধ স্বাভাবিকতার জোর নেই। সে মন অশুচি অসুস্থ হয়ে ওঠে। বিপরীত পন্থায় সে মন নিজের অসাড়তাকে দূর করতে চায়,

১ মূল কবিতাটি হাতের কাছে না থাকাতে স্মরণ ক'রে তর্জমা করতে হল, কিছু ত্রুটি ঘটতে পারে।

গাঁজিয়ে-ওঠা পচা জিনিসের মতো যত-কিছু বিকৃতি নিয়ে সে নিজেকে ঝাঁঝিয়ে তোলে লজ্জা এবং ঘৃণা ত্যাগ ক'রে তবে তার বলিরেখাগুলোর মধ্যে হাসির প্রবাহ বইতে পারে।

মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগ বাস্তবকে সম্মান ক'রে তাকে শ্রদ্ধেয়রূপেই অনুভব করতে চেয়েছিল, এ যুগ বাস্তবকে অবমানিত ক'রে সমস্ত আব্রু ঘুচিয়ে দেওয়াকেই সাধনার বিষয় ব'লে মনে করে।

বিশ্ববিষয়ের প্রতি অতিমাত্র শ্রদ্ধাকে যদি বলো সেন্টিমেণ্টালিজ্‌ম্‌, তার প্রতি গায়ে-পড়া বিরুদ্ধতাকেও সেই একই নাম দেওয়া যেতে পারে। যে কারণেই হোক, মন এমন বিগড়ে গেলে দৃষ্টি সহজ হয় না। অতএব মধ্যে-ভিক্টোরীয় যুগকে যদি আতভত্রয়ানার পাণ্ডা ব'লে ব্যঙ্গ কর তবে এডোয়ার্ডি যুগকেও ব্যঙ্গ করতে হয় উলটো বিশেষণ দিয়ে। ব্যাপারখানা স্বাভাবিক নয় অতএব শাশ্বত নয়। 'সায়ান্সেই বল আর আর্টেই বল, নিরাসক্ত মনই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন; য়ুরোপ সায়ান্সে সেটা পেয়েছে কিন্তু সাহিত্যে পায় নি।

১৩৩৯

সাহিত্যতত্ত্ব

আমি আছি এবং আর-সমস্ত আছে, আমার অস্তিত্বের মধ্যে এই যুগল-মিলন। আমার বাইরে কিছুই যদি অনুভব না করি তবে নিজেকেও অনুভব করি নে। বাইরের অনুভূতি যত প্রবল হয় অন্তরের সত্তাবোধও তত জোর পায়।

আমি আছি, এই সত্যটি আমার কাছে চরম মূল্যবান। সেইজন্য যাতে আমার সেই বোধকে বাড়িয়ে তোলে তাতে আমার আনন্দ। বাইরের যে-কোনো জিনিসের 'পরে আমি উদাসীন থাকতে পারি নে, যাতে আমার ঔৎসুক্য অর্থাৎ যা আমার চেতনাকে জাগিয়ে রাখে, সে যতই তুচ্ছ হোক তাতেই মন হয় খুশি— তা সে হোক-না ঘুড়ি-ওড়ানো, হোক-না লাটিম-ঘোরানো। কেননা, সেই আগ্রহের আঘাতে আপনাকেই অত্যন্ত অনুভব করি।

আমি আছি এক, বাইরে আছে বহু। এই বহু আমার চেতনাকে বিচিত্র ক'রে তুলছে, আপনাকে নানা কিছুর মধ্যে জানছি নানা ভাবে। এই বৈচিত্র্যের দ্বারা আমার আত্মবোধ সর্বদা উৎসুক হয়ে থাকে। বাইরের অবস্থা একঘেয়ে হলে মানুষকে মন-মরা করে।

শাস্ত্রে আছে, এক বললেন, বহু হব। নানার মধ্যে এক আপন ঐক্য উপলব্ধি করতে চাইলেন। এঁকেই বলে সৃষ্টি। আমাতে যে-এক আছে সেও নিজেকে বহুর মধ্যে পেতে চায়; উপলব্ধির ঐশ্বর্য সেই তার বহুলত্বে। আমাদের চৈতন্যে নিরন্তর প্রবাহিত হচ্ছে বহুর ধারা, রূপে রসে নানা ঘটনার তরঙ্গে; তারই প্রতিঘাতে স্পষ্ট করে তুলছে 'আমি আছি' এই বোধ। আপনার কাছে আপনার প্রকাশের এই স্পষ্টতাতেই আনন্দ। অস্পষ্টতাতেই অবসাদ।

একলা কারাগারের বন্দীর আর-কোনো পীড়ন যদি নাও থাকে তবু আবছায়া হয়ে আসে তার আপনার বোধ, সে যেন নেই-হওয়ার কাছাকাছি আসে। 'আমি আছি' এবং 'না-আমি আছে' এই দুই নিরন্তর ধারা আমার মধ্যে ক্রমাগতই একীভূত হয়ে আমাকে সৃষ্টি করে চলেছে; অন্তর-বাহিরের এই সম্মিলনের বাধায় আমার আপন-সৃষ্টিকে কৃশ বা বিকৃত ক'রে দিলে নিরানন্দ ঘটায়।

এইখানে তর্ক উঠতে পারে যে, আমির সঙ্গে না-আমির মিলনে দুঃখেরও তো উদ্ভব হয়। তা হতে পারে। কিন্তু, এটা মনে রাখা চাই যে, সুখেরই বিপরীত দুঃখ, কিন্তু আনন্দের বিপরীত নয়; বস্তুত দুঃখ আনন্দেরই অন্তর্ভূত। কথাটা শুনতে স্বতোবিরুদ্ধ কিন্তু সত্য। যা হোক, এ আলোচনাটা আপাতত থাক্, পরে হবে।

আমাদের জানা দু-রকমের, জ্ঞানে জানা আর অনুভবে জানা। অনুভব শব্দের ধাতুগত অর্থের মধ্যে আছে অন্য-কিছুর অনুসারে হয়ে ওঠা; শুধু বাইরে থেকে সংবাদ পাওয়া নয়, অন্তরে নিজেরই মধ্যে একটা পরিণতি ঘটা। বাইরের পদার্থের যোগে কোনো বিশেষ রঙে বিশেষ রসে বিশেষ রূপে আপনাকেই বোধ করাকে বলে অনুভব করা। সেইজন্যে উপনিষদ বলেছেন, পুত্রকে কামনা করি বলেই যে পুত্র আমাদের প্রিয় তা নয়, আপনাকেই কামনা করি বলেই পুত্র আমাদের প্রিয়। পুত্রের মধ্যে পিতা নিজেকেই উপলব্ধি করে, সেই উপলব্ধিতেই আনন্দ।

আমরা যাকে বলি সাহিত্য, বলি ললিতকলা, তার লক্ষ্য এই উপলব্ধির আনন্দ, বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ী এক হয়ে যাওয়াতে যে-আনন্দ। অনুভূতির গভীরতা দ্বারা বাহিরের সঙ্গে অন্তরের একাত্মবোধ যতটা সত্য হয় সেই পরিমাণে জীবনে আনন্দের সীমানা বেড়ে চলতে থাকে, অর্থাৎ নিজেরই সত্তার সীমানা। প্রাতদিনের ব্যবহারিক ব্যাপারে ছোটো ছোটো ভাগের মধ্যে আমাদের আত্মপ্রসারণকে অবরুদ্ধ করে, মনকে বেঁধে রাখে বৈষয়িক সংকীর্ণতায়, প্রয়োজনের সংসারটা আমাদের আপনাকে ঘিরে রাখে কড়া পাহারায়; অবরোধের নিত্য অভ্যাসের জড়তায় ভুলে যাই যে, নিছক বিষয়ী মানুষ অত্যন্তই কম মানুষ— সে প্রয়োজনের কাঁচি-ছাঁটা মানুষ।

প্রয়োজনের দাবি প্রবল এবং তা অসংখ্য। কেননা, যতটা আয়োজন আমাদের জরুরি তা আপন পরিমাণ রক্ষা করে না। অভাবমোচন হয়ে গেলেও তৃপ্তিহীন কামনা হাত পেতে থাকে ; সঞ্চয়ের ভিড় জমে, সন্ধানের বিশ্রাম থাকে না। সংসারের সকল বিভাগেই এই যে 'চাই-চাই'য়ের হাট বসে গেছে, এরই আশেপাশে মানুষ একটা ফাঁক খোঁজে যেখানে তার মন বলে 'চাই নে', অর্থাৎ এমন কিছু চাই নে যেটা লাগে সঞ্চয়ে। তাই দেখতে পাই প্রয়োজনের এত চাপের মধ্যেও মানুষ অপ্রয়োজনের উপাদান এত প্রভূত ক'রে তুলেছে, অপ্রয়োজনের মূল্য তার কাছে এত বেশি। তার গৌরব সেখানে, ঐশ্বর্য সেখানে, যেখানে সে প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে গেছে।

বলা বাহুল্য, বিশুদ্ধ সাহিত্য অপ্রয়োজনীয় ; তার যে-রস সে অহৈতুক। মানুষ সেই দায়মুক্ত বৃহৎ অবকাশের ক্ষেত্রে কল্পনার সোনার-কাঠি-ছোঁওয়া সামগ্রীকে জাগ্রত ক'রে জানে আপনারই সত্তায়। তার সেই অনুভবে অর্থাৎ আপনারই বিশেষ উপলব্ধিতে তার আনন্দ। এই আনন্দ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে ব'লে জানি নে।

লোকে বলে, সাহিত্য যে আনন্দ দেয় সেটা সৌন্দর্যের আনন্দ। সে-কথা বিচার ক'রে দেখবার যোগ্য। সৌন্দর্যরহস্যকে বিশ্লেষণ ক'রে ব্যাখ্যা করবার অসাধ্য চেষ্টা করব না। অনুভূতির বাইরে দেখতে পাই, সৌন্দর্য অনেকগুলি তথ্যমাত্রকে অর্থাৎ ফ্যাক্ট্স্‌কে অধিকার করে আছে। সেগুলি সুন্দরও নয়, অসুন্দরও নয়। গোলাপের আছে বিশেষ আকার-আয়তনের কতকগুলি পাপড়ি, বোঁটা ; তাকে ঘিরে আছে সবুজ পাতা। এই-সমস্তকে নিয়ে বিরাজ করে এই-সমস্তের অতীত একটি ঐক্যতত্ত্ব, তাকে বলি সৌন্দর্য। সেই ঐক্য উদ্‌বোধিত করে তাকেই যে আমার অন্তরতম ঐক্য, যে আমার ব্যক্তিপুরুষ। অসুন্দর সামগ্রীরও প্রকাশ আছে, সেও একটা সমগ্রতা, একটা ঐক্য, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু, তার বস্তুরূপী তথ্যটাই মুখ্য, ঐক্যটা গৌণ। গোলাপের আকারে আয়তনে, তার সুষমায়, তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরস্পর সামঞ্জস্যে, বিশেষভাবে নির্দেশ করে দিচ্ছে তার সমগ্রের মধ্যে পরিব্যাপ্ত এককে ; সেইজন্যে গোলাপ আমাদের কাছে কেবল একটি তথ্যমাত্র নয়, সে সুন্দর।

কিন্তু শুধু সুন্দর কেন, যে-কোনো পদার্থই আপন তথ্যমাত্রকে অতিক্রম করে সে আমার কাছে তেমনি সত্য হয় যেমন সত্য আমি নিজে। আমি নিজেও সেই পদার্থ যা বহু তথ্যকে আবৃত ক'রে অখণ্ড এক।

উচ্চ-অঙ্গের গণিতের মধ্যে যে-একটি গভীর সৌষম্য, যে-একটি ঐক্যরূপ আছে, নিঃসন্দেহ গাণিতিক তার মধ্যে আপনাকে নিমগ্ন করে। তার সামঞ্জস্যের তথ্যটি শুধু

জ্ঞানের নয়, তা নিবিড় অনুভূতির ; তাতে বিশুদ্ধ আনন্দ। কারণ, জ্ঞানের যে উচ্চ শিখরে তার প্রকাশ সেখানে সে সর্বপ্রকার প্রয়োজননিরপেক্ষ, সেখানে জ্ঞানের মুক্তি। এ কেন কাব্যসাহিত্যের বিষয় হয় নি এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে আসে। হয় নি যে তার কারণ এই যে, এর অভিজ্ঞতা অতি অল্প লোকের মধ্যে বদ্ধ, এ সর্বসাধারণের অগোচর। যে-ভাষার যোগে এর পরিচয় সম্ভব তা পারিভাষিক, বহু লোকের হৃদয়বোধের স্পর্শের দ্বারা সে সজীব উপাদানরূপে গড়ে ওঠে নি। যে-ভাষা হৃদয়ের মধ্যে অব্যবহিত আবেগে প্রবেশ করতে পারে না সে-ভাষায় সাহিত্যরসের সাহিত্যরূপের সৃষ্টি সম্ভব নয়। অথচ আধুনিক কাব্যে সাহিত্যে কলকারখানা স্থান নিতে আরম্ভ করেছে। যন্ত্রের বিশেষ প্রয়োজনগত তথ্যকে ছাড়িয়ে তার একটা বিরাট শক্তিরূপ আমাদের কল্পনায় প্রকাশ পেতে পারে, সে আপন অন্তর্নিহিত সুঘটিত সুসংগতিকে অবলম্বন ক'রে আপন উপাদানকে ছাড়িয়ে আবির্ভূত। কল্পনাদৃষ্টিতে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গভীরে যেন তার একটি আত্মস্বরূপকে প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে। সেই আত্মস্বরূপ আমাদেরই ব্যক্তিস্বরূপের দোসর। যে-মানুষ তাকে, যান্ত্রিক জ্ঞানের দ্বারা নয়, অনুভূতির দ্বারা একান্ত বোধ করে সে তার মধ্যে আপনাকে পায়, কলের জাহাজের কাপ্তেন কলের জাহাজের অন্তরে যেমন পরম অনুরাগে আপন ব্যক্তিপুরুষকে অনুভব করতে পারে। কিন্তু, প্রাকৃতিক নির্বাচন বা যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন-তত্ত্ব এ জাতের নয়। এ-সব তত্ত্ব জানার দ্বারা নিষ্কাম আনন্দ হয় না তা নয়। কিন্তু, সে আনন্দটি হওয়ার আনন্দ নয়, তা পাওয়ার আনন্দ ; অর্থাৎ এই জ্ঞান জ্ঞানীর থেকে পৃথক, এ তার ব্যক্তিগত সত্তার অন্দর-মহলের জিনিস নয়, ভাণ্ডারের জিনিস।

আমাদের অলংকারশাস্ত্রে বলেছে, বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্। সৌন্দর্যের রস আছে ; কিন্তু এ কথা বলা চলে না যে, সব রসেরই সৌন্দর্য আছে। সৌন্দর্যরসের সঙ্গে অন্য সকল রসেরই মিল হচ্ছে ঐখানে, যেখানে সে আমাদের অনুভূতির সামগ্রী। অনুভূতির বাইরে রসের কোনো অর্থই নেই। রসমাত্রই তথ্যকে অধিকার ক'রে তাকে অনির্বচনীয় ভাবে অতিক্রম করে। রসপদার্থ বস্তুর অতীত এমন একটি ঐক্যবোধ যা আমাদের চৈতন্যে মিলিত হতে বিলম্ব করে না। এখানে তার প্রকাশ আর আমার প্রকাশ একই কথা।

বস্তুর ভিড়ের একান্ত আধিপত্যকে লাঘব করতে লেগেছে মানুষ। সে আপন অনুভূতির জন্যে অবকাশ রচনা করছে। তার একটা সহজ দৃষ্টান্ত দিই। ঘড়ায় ক'রে সে জল আনে, এই জল আনায় তার নিত্য প্রয়োজন। অগত্যা বস্তুর দৌরাত্ম্য তাকে কাঁধে ক'রে মাথায় ক'রে বইতেই হয়। প্রয়োজনের শাসনই যদি একমাত্র হয়ে ওঠে

তাহলে ঘড়া হয় আমাদের অনাত্মীয়। মানুষ তাকে সুন্দর ক'রে গ'ড়ে তুলল। জল বহনের জন্য সৌন্দর্যের কোনো অর্থই নেই। কিন্তু, এই শিল্পসৌন্দর্য প্রয়োজনের রূঢ়তার চারি দিকে ফাঁকা এনে দিল। যে-ঘড়াকে দায়ে পড়ে মেনেছিলেম, নিলেম তাকে আপন ক'রে। মানুষের ইতিহাসে আদিম যুগ থেকেই এই চেষ্টা। প্রয়োজনের জিনিসকে সে অপ্রয়োজনের মূল্য দেয়, শিল্পকলার সাহায্যে বস্তুকে পরিণত করে বস্তুর অতীতে। সাহিত্যসৃষ্টি শিল্পসৃষ্টি সেই প্রলয়লোকে যেখানে দায় নেই, ভার নেই, যেখানে উপকরণ মায়া, তার ধ্যানরূপটাই সত্য, যেখানে মানুষ আপনাতে সমস্ত আত্মসাৎ ক'রে আছে।

কিন্তু, বস্তুকে দায়ে পড়ে মেনে নিয়ে তার কাছে মাথা হেঁট করা কাকে বলে যদি দেখতে চাও তবে ঐ দেখো কেরোসিনের টিনে ঘটস্থাপনা, বাঁকের দুই প্রান্তে টিনের ক্যানেস্রা বেঁধে জল আনা। এতে অভাবের কাছেই মানুষের একান্ত পরাভব। যে-মানুষ সুন্দর ক'রে ঘড়া বানিয়েছে সে-ব্যক্তি তাড়াতাড়ি জলপিপাসাকেই মেনে নেয় নি, সে যথেষ্ট সময় নিয়েছে নিজের ব্যক্তিত্বকে মানতে।

বস্তুর পৃথিবী ধুলোমাটি পাথর লোহায় ঠাসা হয়ে পিণ্ডীকৃত। বায়ুমণ্ডল তার চার দিকে বিরাট অবকাশ বিস্তার করেছে। এরই পরে তার আত্মপ্রকাশের ভূমিকা। এইখান থেকে প্রাণের নিশ্বাস বহমান; সেই প্রাণ অনির্বচনীয়। সেই প্রাণশিল্পকারের তুলি এইখান থেকেই আলো নিয়ে, রঙ নিয়ে, তাপ নিয়ে, চলমান চিত্রে বার-বার ভরে দিচ্ছে পৃথিবীর পট। এইখানে পৃথিবীর লীলার দিক, এইখানে তার সৃষ্টি; এইখানে তার সেই ব্যক্তিরূপের প্রকাশ যাকে বিশ্লেষণ করা যায় না, ব্যাখ্যা করা যায় না; যার মধ্যে তার বাণী, তার যাথার্থ্য, তার রস, তার শ্যামলতা, তার হিল্লোল। মানুষও নানা জরুরি কাজের দায় পেরিয়ে চায় আপন আকাশমণ্ডল যেখানে তার অবকাশ, যেখানে বিনা প্রয়োজনের লীলায় আপন সৃষ্টিতে আপনাকে প্রকাশই তার চরম লক্ষ্য— যে-সৃষ্টিতে জানা নয়, পাওয়া নয়, কেবল হওয়া। পূর্বেই বলেছি, অনুভব মানেই হওয়া। বাহিরের সত্তার অভিঘাতে সেই হওয়ার বোধে বান ডেকে এলে মন সৃষ্টিলীলায় উদ্‌বেল হয়ে ওঠে। আমাদের হৃদয়বোধের কাজ আছে জীবিকানির্বাহের প্রয়োজনে। আমরা আত্মরক্ষা করি, শত্রু হনন করি, সন্তান পালন করি; আমাদের হৃদয়বৃত্তি সেই-সকল কাজে বেগ সঞ্চার করে, অভিরুচি জাগায়। এই সীমাটুকুর মধ্যে জন্তুর সঙ্গে মানুষের প্রভেদ নেই। প্রভেদ ঘটেছে সেইখানেই যেখানে মানুষ আপন হৃদয়ানুভূতিকে কর্মের দায় থেকে স্বতন্ত্র ক'রে নিয়ে কল্পনার সঙ্গে যুক্ত ক'রে দেয়, যেখানে অনুভূতির রসটুকুই তার নিঃস্বার্থ উপভোগের লক্ষ্য, যেখানে আপন অনুভূতিকে প্রকাশ

করবার প্রেরণায় ফললাভের অত্যাবশ্যকতাকে সে বিস্মৃত হয়ে যায়। এই মানুষই যুদ্ধ করবার উপলক্ষ্যে কেবল অস্ত্রচালনা করে না, যুদ্ধের বাজনা বাজায়, যুদ্ধের নাচ নাচে। তার হিংস্রতা যখন নিদারুণ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত তখনও সেই হিংস্রতার অনুভূতিকে ব্যবহারের ঊর্ধ্বে নিয়ে গিয়ে তাকে অনাবশ্যক রূপ দেয়। হয়তো সেটা তার সিদ্ধিলাভে ব্যাঘাত করতেও পারে। শুধু নিজের সৃষ্টিতে নয়, বিশ্বসৃষ্টিতে সে আপন অনুভূতির প্রতীক খুঁজে বেড়ায়। তার ভালোবাসা ফেরে ফুলের বনে, তার ভক্তি তীর্থযাত্রা করতে বেরোয় সাগরসংগমে পর্বতশিখরে। সে আপন ব্যক্তিরূপের দোসরকে পায় বস্তুতে নয়, তত্ত্বে নয়; লীলাময়কে সে পায় আকাশ যেখানে নীল, শ্যামল যেখানে নবদূর্বাদল। ফুলে যেখানে সৌন্দর্য, ফলে যেখানে মধুরতা, জীবের প্রতি যেখানে আছে করুণা, ভূমার প্রতি যেখানে আছে আত্মনিবেদন, সেখানে বিশ্বের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধের চিরন্তন যোগ অনুভব করি হৃদয়ে। একেই বলি বাস্তব, যে বাস্তবে সত্য হয়েছে আমার আপন।

যেখানে আমরা এই আপনকে প্রকাশের জন্য উৎসুক, যেখানে আমরা আপনের মধ্যে অপরিমিতকে উপলব্ধি করি সেখানে আমরা অমিতব্যয়ী, কী অর্থে কী সামর্থ্যে। যেখানে অর্থকে চাই অর্জন করতে সেখানে প্রত্যেক সিকি পয়সার হিসাব নিয়ে উদ্‌বিগ্ন থাকি; যেখানে সম্পদকে চাই প্রকাশ করতে সেখানে নিজেকে দেউলে ক'রে দিতেও সংকোচ নেই। কেননা, সেখানে সম্পদের প্রকাশে আপন ব্যক্তিপুরুষেরই প্রকাশ। বস্তুত, 'আমি ধনী' এই কথাটি উপযুক্তরূপে ব্যক্ত করবার মতো ধন পৃথিবীতে কারও নেই। শত্রুর হাত থেকে প্রাণরক্ষা যখন আমাদের উদ্দেশ্য তখন দেহের প্রত্যেক চাল প্রত্যেক ভঙ্গি সম্বন্ধে নিরতিশয় সাবধান হতে হয়; কিন্তু, যখন নিজের সাহসিকতা প্রকাশই উদ্দেশ্য তখন নিজের প্রাণপাত পর্যন্ত সম্ভব, কেননা এই প্রকাশে ব্যক্তিপুরুষের প্রকাশ। প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় আমরা খরচা করি বিবেচনাপূর্বক, উৎসবের সময় যখন আপনার আনন্দকে প্রকাশ করি তখন তহবিলের সসীমতা সম্বন্ধে বিবেচনাশক্তি বিলুপ্ত হয়ে যায়। কারণ, যখন আমরা আপন ব্যক্তিসত্তা সম্বন্ধে প্রবলরূপে সচেতন হই, সাংসারিক তথ্যগুলোকে তখন গণ্যই করিনে। সাধারণত মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে আমরা পরিমাণ রক্ষা করেই চলি। কিন্তু, যাকে ভালোবাসি অর্থাৎ যার সঙ্গে আমার ব্যক্তিপুরুষের পরম সম্বন্ধ তার সম্বন্ধে পরিমাণ থাকে না। তার সম্বন্ধে অনায়াসেই বলতে পারি—

> জনম অবধি হম রূপ নেহারনু, নয়ন না তিরপিত ভেল।
> লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু, তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

তথ্যের দিক থেকে এতবড়ো অদ্ভুত অত্যুক্তি আর-কিছু হতে পারে না, কিন্তু ব্যক্তিপুরুষের অনুভূতির মধ্যে ক্ষণকালের সীমায় সংহৃত হতে পারে চিরকাল। 'পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে' বস্তুজগতে এ কথাটা অতথ্য, কিন্তু ব্যক্তিজগতে তথ্যের খাতিরে এর চেয়ে কম করে যা বলতে যাই তা সত্যে পৌঁছয় না।

বিশ্বসৃষ্টিতেও তাই। সেখানে বস্তু বা জাগতিক শক্তির তথ্য হিসাবে কড়াক্রান্তির এদিক-ওদিক হবার জো নেই। কিন্তু, সৌন্দর্য তথ্যসীমা ছাপিয়ে ওঠে; তার হিসাবের আদর্শ নেই, পরিমাণ নেই।

ঊর্ধ্ব-আকাশের বায়ুস্তরে ভাসমান বাষ্পপুঞ্জ একটা সামান্য তথ্য, কিন্তু উদয়াস্তকালের সূর্যরশ্মির স্পর্শে তার মধ্যে যে অপরূপ বর্ণলীলার বিকাশ হয় সে অসামান্য, সে 'ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ' মাত্র নয়, সে যেন প্রকৃতির একটা অকারণ অত্যুক্তি, একটা পরিমিত বস্তুগত সংবাদ-বিশেষকে সে যেন একটা অপরিমিত অনির্বচনীয়তায় পরিণত করে দেয়। ভাষার মধ্যেও যখন প্রবল অনুভূতির সংঘাত লাগে তখন তা শব্দার্থের আভিধানিক সীমা লঙ্ঘন করে।

এইজন্যে সে যখন বলে 'চরণনখরে পড়ি দশ চাঁদ কাঁদে', তখন তাকে পাগলামি ব'লে উড়িয়ে দিতে পারি নে। এইজন্য সংসারের প্রাত্যহিক তথ্যকে একান্ত যথাযথভাবে আর্টের বেদির উপরে চড়ালে তাকে লজ্জা দেওয়া হয়। কেননা আর্টের প্রকাশকে সত্য করতে গেলেই তার মধ্যে অতিশয়তা লাগে, নিছক তথ্যে তা সয় না। তাকে যতই ঠিকঠাক ক'রে বলা যাক না, শব্দের নির্বাচনে, ভাষার ভঙ্গিতে, ছন্দের ইশারায় এমন-কিছু থাকে যেটা সেই ঠিকঠাককে ছাড়িয়ে যায়, যেটা অতিশয়। তথ্যের জগতে ব্যক্তিস্বরূপ হচ্ছে সেই অতিশয়। কেজো ব্যবহারের সঙ্গে সৌজন্যের প্রভেদ ঐখানে; কেজো ব্যবহারে হিসেব করা কাজের তাগিদ, সৌজন্যে আছে সেই অতিশয় যা ব্যক্তি-পুরুষের মহিমার ভাষা।

প্রাচীন গ্রীসের প্রাচীন রোমের সভ্যতা গেছে অতীতে বিলীন হয়ে। যখন বেঁচে ছিল তাদের বিস্তর ছিল বৈষয়িকতার দায়। প্রয়োজনগুলি ছিল নিরেট নিবিড় গুরুভার; প্রবল উদ্‌বেগ, প্রবল উদ্যম ছিল তাদের বেষ্টন ক'রে। আজ তার কোনো চিহ্ন নেই। কেবল এমন সব সামগ্রী আজও আছে যাদের ভার ছিল না, বস্তু ছিল না, দায় ছিল না, সৌজন্যের অত্যুক্তি দিয়ে সমস্ত দেশ যাদের অভ্যর্থনা করেছে— যেমন ক'রে আমরা সম্ভ্রমবোধের পরিতৃপ্তি সাধন করি রাজচক্রবর্তীর নামের আদিতে পাঁচটা শ্রী যোগ ক'রে। দেশ তাদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল অতিশয়ের চূড়ায়, সেই নিম্নভূমির সমতলক্ষেত্রে নয় যেখানে প্রাত্যহিক ব্যবহারের ভিড়। মানুষের ব্যক্তিস্বরূপের যে-পরিচয় চিরকালের

দৃষ্টিপাত সয়, পাথরের রেখায়, শব্দের ভাষায় তারই সম্বর্ধনাকে স্থায়ী রূপ ও অসীম মূল্য দিয়ে রেখে গেছে।

যা কেবলমাত্র স্থানিক, সাময়িক, বর্তমান কাল তাকে যত প্রচুর মূল্যই দিক, দেশের প্রতিভার কাছ থেকে অতিশয়ের সমাদর সে স্বভাবতই পায় নি, যেমন পেয়েছে জ্যোৎস্নারাতে ভেসে-যাওয়া নৌকোর সেই সারিগান—

মাঝি, তোর বৈঠা নে রে,
আমি আর বাইতে পারলাম না।

যেমন পেয়েছে নাইটিঙ্গেল পাখির সেই গান, যে-গান শুনতে শুনতে কবি বলেছেন তাঁর প্রিয়াকে—

Listen Eugenia,
How thick the burst comes crowding through the leaves.
Again— thou hearest ?
Eternal passion !
Eternal pain !

পূর্বেই বলেছি, রসমাত্রেই অর্থাৎ সকলরকম হৃদয়বোধেই আমরা বিশেষভাবে আপনাকেই জানি, সেই জানাতেই বিশেষ আনন্দ। এইখানেই তর্ক উঠতে পারে, যে-জানায় দুঃখ সেই জানাতেও আনন্দ এ কথা স্বতোবিরুদ্ধ। দুঃখকে, ভয়ের বিষয়কে আমরা পরিহার্য মনে করি তার কারণ, তাতে আমাদের হানি হয়, আমাদের প্রাণে আঘাত দেয়, তা আমাদের স্বার্থের প্রতিকূলে যায়। প্রাণরক্ষার স্বার্থরক্ষার প্রবৃত্তি আমাদের অত্যন্ত প্রবল, সেই প্রবৃত্তি ক্ষুণ্ণ হলে সেটা দুঃসহ হয়। এইজন্যে দুঃখবোধ আমাদের ব্যক্তিগত আত্মবোধকে উদ্দীপ্ত করে দেওয়া সত্ত্বেও সাধারণত তা আমাদের কাছে অপ্রিয়। এটা দেখা গেছে, যে-মানুষের স্বভাবে ক্ষতির ভয়, প্রাণের ভয় যথেষ্ট প্রবল নয় বিপদকে সে ইচ্ছাপূর্বক আহ্বান করে, দুর্গমের পথে যাত্রা করে, দুঃসাধ্যের মধ্যে পড়ে ঝাঁপ দিয়ে। কিসের লোভে। কোনো দুর্লভ ধন অর্জন করবার জন্যে নয়, ভয়-বিপদের সংঘাতে নিজেকেই প্রবল আবেগে উপলব্ধি করবার জন্যে। অনেক শিশুকে নিষ্ঠুর হতে দেখা যায়; কীট পতঙ্গ পশুকে যন্ত্রণা দিতে তারা তীব্র আনন্দ বোধ করে। শ্রেয়োবুদ্ধি প্রবল হলে এই আনন্দ সম্ভব হয় না; তখন শ্রেয়োবুদ্ধি বাধারূপে কাজ করে। স্বভাবত বা অভ্যাসবশত এই বুদ্ধি হ্রাস হলেই দেখা যায়, হিংস্রতার আনন্দ অতিশয় তীব্র; ইতিহাসে তার বহু প্রমাণ আছে এবং জেলখানার এক শ্রেণীর কর্মচারীর মধ্যেও তার দৃষ্টান্ত নিশ্চয়ই দুর্লভ নয়। এই হিংস্রতারই অহৈতুক আনন্দ নিন্দুকদের;

নিজের কোনো বিশেষ ক্ষতির উত্তেজনাতেই যে মানুষ নিন্দা করে, তা নয়। যাকে সে জানে না, যে তার কোনো অপকার করে নি, তার নামে অকারণ কলঙ্ক আরোপ করায় যে নিঃস্বার্থ দুঃখজনকতা আছে দলে-বলে নিন্দাসাধনার ভৈরবীচক্রে বসে নিন্দুক ভোগ করে তাই। ব্যাপারটা নিষ্ঠুর এবং কদর্য, কিন্তু তীব্র তার আস্বাদন। যার প্রতি আমরা উদাসীন সে আমাদের সুখ দেয় না, কিন্তু নিন্দার পাত্র আমাদের অনুভূতিকে প্রবলভাবে উদ্দীপ্ত করে রাখে। এইহেতুই পরের দুঃখকে উপভোগ্য সামগ্রী করে নেওয়া মানুষ-বিশেষের কাছে কেন বিলাসের অঙ্গরূপে গণ্য হয়, কেন মহিষের মতো অত বড়ো প্রকাণ্ড প্রবল জন্তুকে বলি দেবার সঙ্গে সঙ্গে রক্তমাখা উন্মত্ত নৃত্য সম্ভবপর হতে পারে, তার কারণ বোঝা সহজ। দুঃখের অভিজ্ঞতায় আমাদের চেতনা আলোড়িত হয়ে ওঠে। দুঃখের কটুস্বাদে দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকলেও তা উপাদেয়। দুঃখের অনুভূতি সহজ আরামবোধের চেয়ে প্রবলতর। ট্রাজেডির মূল্য এই নিয়ে। কৈকেয়ীর প্ররোচনায় রামচন্দ্রের নির্বাসন, মন্থরার উল্লাস, দশরথের মৃত্যু, এর মধ্যে ভালো কিছুই নেই। সহজ ভাষায় যাকে আমরা সুন্দর বলি এ ঘটনা তার সমশ্রেণীর নয়, এ কথা মানতেই হবে। তবু এই ঘটনা নিয়ে কত কাব্য নাটক ছবি গান পাঁচালি বহুকাল থেকে চলে আসছে; ভিড় জমছে কত; আনন্দ পাচ্ছে সবাই। এতেই আছে বেগবান অভিজ্ঞতায় ব্যক্তিপুরুষের প্রবল আত্মানুভূতি। বদ্ধ জল যেমন বোবা, গুমট হাওয়া যেমন আত্মপরিচয়হীন, তেমনি প্রাত্যহিক আধমরা অভ্যাসের একটানা আবৃত্তি ঘা দেয় না চেতনায়, তাতে সত্তাবোধ নিস্তেজ হয়ে থাকে। তাই দুঃখে বিপদে বিদ্রোহে বিপ্লবে অপ্রকাশের আবেশ কাটিয়ে মানুষ আপনাকে প্রবল আবেগে উপলব্ধি করতে চায়।

একদিন এই কথাটি আমার কোনো একটি কবিতায় লিখেছিলেম। বলেছিলেম, আমার অন্তরতম আমি আলস্যে আবেশে বিলাসের প্রশ্রয়ে ঘুমিয়ে পড়ে; নির্দয় আঘাতে তার অসাড়তা ঘুচিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলে তবেই সেই আমার আপনাকে নিবিড় ক'রে পাই, সেই পাওয়াতেই আনন্দ।

এত কাল আমি রেখেছিনু তারে যতনভরে
শয়ন-'পরে;
ব্যথা পাছে লাগে, দুখ পাছে জাগে,
নিশিদিন তাই বহু অনুরাগে
বাসরশয়ন করেছি রচন কুসুমথরে,
দুয়ার রুধিয়া রেখেছিনু তারে গোপন ঘরে

স্তনভরে।
শেষে স্থখের শয়নে শ্রান্ত পরান আলসরসে
আবেশবশে।
পরশ করিলে জাগে না সে আর,
কুস্থমের হার লাগে গুরুভার,
ঘুমে জাগরণে মিশি একাকার নিশিদিবসে;
বেদনাবিহীন অসাড় বিরাগ মরমে পশে
আবেশবশে।
তাই ভেবেছি আজিকে খেলিতে হইবে নূতন খেলা
রাত্রিবেলা।
মরণদোলায় ধরি রশিগাছি
বসিব দুজনে বড়ো কাছাকাছি,
ঝঞ্জা আসিয়া অট্ট হাসিয়া মারিবে ঠেলা,
প্রাণেতে আমাতে খেলিব দুজনে ঝুলন-খেলা
নিশীথ বেলা।

আমাদের শাস্ত্র বলেন—

তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ।

সেই বেদনীয় পুরুষকে জানো যাতে মৃত্যু তোমাকে ব্যথা না দেয়।

বেদনা অর্থাৎ হৃদয়বোধ দিয়েই যাঁকে জানা যায় জানো সেই পুরুষকে অর্থাৎ পার্সোন্যালিটিকে। আমার ব্যক্তিপুরুষ যখন অব্যবহিত অনুভূতি দিয়ে জানে অসীম পুরুষকে, জানে হৃদা মনীষা মনসা, তখন তাঁর মধ্যে নিঃসংশয়রূপে জানে আপনাকেও। তখন কী হয়। মৃত্যু অর্থাৎ শূন্যতার ব্যথা চলে যায়, কেননা বেদনীয় পুরুষের বোধ পূর্ণতার বোধ, শূন্যতার বোধের বিরুদ্ধ।

এই আধ্যাত্মিক সাধনার কথাটাকেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে নামিয়ে আনা চলে। জীবনে শূন্যতাবোধ আমাদের ব্যথা দেয়, সত্তাবোধের ম্লানতায় সংসারে এমন-কিছু অভাব ঘটে যাতে আমাদের অনুভূতির সাড়া জাগে না, যেখানে আমাদের ব্যক্তিবোধকে জাগ্রত রাখবার মতো এমন কোনো বাণী নেই যা স্পষ্ট ভাষায় বলছে 'আমি আছি'। বিরহের শূন্যতায় যখন শকুন্তলার মন অবসাদগ্রস্ত তখন তাঁর দ্বারে উঠেছিল ধ্বনি, 'অয়মহং ভোঃ।' এই-যে আমি আছি। সে বাণী পৌঁছল না তাঁর কানে, তাই তাঁর অন্তরাত্মা জবাব দিল না, 'এই যে আমিও আছি।' দুঃখের কারণ ঘটল সেইখানে। সংসারে

'আমি আছি' এই বাণী যদি স্পষ্ট থাকে তা হলেই আমার আপনার মধ্য থেকে তার নিশ্চিত উত্তর মেলে, 'আমি আছি।' 'আমি আছি' এই বাণী প্রবল সুরে ধ্বনিত হয় কিসে। এমন সত্যে যাতে রস আছে পূর্ণ। আপন অন্তরে ব্যক্তিপুরুষকে নিবিড় করে অনুভব করি যখন আপন বাইরে গোচর হয়েছে রসাত্মক রূপ। তাই বাউল গেয়ে বেড়িয়েছে—

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।

কেননা, আমার মনের মানুষকেই একান্ত করে পাবার জন্যে পরম মানুষকে চাই, চাই তং বেদ্যং পুরুষং ; তা হলে শূন্যতা ব্যথা দেয় না।

আমাদের পেট ভরাবার জন্যে, জীবনযাত্রার অভাব মোচন করবার জন্যে, আছে নানা বিদ্যা, নানা চেষ্টা ; মানুষের শূন্য ভরাবার জন্যে, তার মনের মানুষকে নানা ভাবে নানা রসে জাগিয়ে রাখবার জন্যে, আছে তার সাহিত্য, তার শিল্প। মানুষের ইতিহাসে এর স্থান কী বৃহৎ, এর পরিমাণ কী প্রভূত। সভ্যতার কোনো প্রলয়ভূমিকম্পে যদি এর বিলোপ সম্ভব হয় তবে মানুষের ইতিহাসে কী প্রকাণ্ড শূন্যতা কালো মরুভূমির মতো ব্যাপ্ত হয়ে যাবে। তার 'কৃষ্টি'র ক্ষেত্র আছে তার চাষে বাসে আপিসে কারখানায় ; তার সংস্কৃতির ক্ষেত্র সাহিত্যে, এখানে তার আপনারই সংস্কৃতি, সে তাতে আপনাকেই সম্যকরূপে করে তুলছে, সে আপনিই হয়ে উঠছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ তাই বলেছেন, আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি।

ক্লাসঘরের দেয়ালে মাধব আর-এক ছেলের নামে বড়ো বড়ো অক্ষরে লিখে রেখেছে 'রাখালটা বাঁদর'। খুবই রাগ হয়েছে। এই রাগের বিষয়ের তুলনায় অন্য-সকল ছেলেই তার কাছে অপেক্ষাকৃত অগোচর। অস্তিত্ব হিসাবে রাখাল যে কত বড়ো হয়েছে তা অক্ষরের ছাঁদ দেখলেই বোঝা যাবে। মাধব আপন স্বল্প শক্তি-অনুসারে আপন রাগের অনুভূতিকে আপনার থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সেইটে দিয়ে দেয়ালের উপর এমন একটা কালো অক্ষরের রূপ সৃষ্টি করেছে যা খুব বড়ো করে জানাচ্ছে, মাধব রাগ করেছে ; যা মাধব চাচ্ছে সমস্ত জগতের কাছে গোচর করতে। ঐটেকে একটা গীতি-কবিতার বামন অবতার বলা যেতে পারে। মাধবের অন্তরে যে অপরিণত পঙ্গু কবি আছে, রাখালের সঙ্গে বানরের উপমার বেশি তার কলমে আর এগোল না। বেদব্যাস ঐ কথাটাই লিখেছিলেন মহাভারতের পাতায় শকুনির নামে। তার ভাষা স্বতন্ত্র, তা ছাড়া তার কয়লার অক্ষর মুছবে না যতই চুনকাম করা যাক। পুরাতত্ত্ববিদ নানা সাক্ষ্যের জোরে প্রমাণ করে দিতে পারেন, শকুনি নামে কোনো ব্যক্তি কোনো কালেই

ছিল না। আমাদের বুদ্ধিও সে কথা মানবে, কিন্তু আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি সাক্ষ্য দেবে, সে নিশ্চিত আছে। ভাঁড়ুদত্তও বাঁদর বই-কি। কবিকঙ্কণ সেটা কালো অক্ষরে ঘোষণা করে দিয়েছেন। কিন্তু, এই বাঁদরগুলোর উপরে আমাদের যে অবজ্ঞার ভাব আসে সেই ভাবটাই উপভোগ্য।

আমাদের দেশে এক প্রকারের সাহিত্যবিচার দেখি যাতে নানা অবান্তর কারণ দেখিয়ে সাহিত্যের এই প্রত্যক্ষগোচরতার মূল্য লাঘব করা হয়। হয়তো কোনো মানবচরিত্রজ্ঞ বলেন, শকুনির মতো অমন অবিমিশ্র দুর্বৃত্ততা স্বাভাবিক নয়, ইঁহাগোর অহৈতুক বিদ্বেষবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মহদ্‌গুণ থাকা উচিত ছিল; বলেন, যেহেতু কৈকেয়ী বা লেডি ম্যাক্‌বেথ, হিড়িম্বা বা শূর্পনখা, নারী, 'মায়ের জাত', এইজন্যে এদের চরিত্রে ঈর্ষা বা কদাশয়তার অত নিবিড় কালিমা আরোপ করা অশ্রদ্ধেয়। সাহিত্যের তরফ থেকে বলবার কথা এই যে, এখানে আর কোনো তর্কই গ্রাহ্য নয়; কেবল এই জবাবটা পেলেই হল, যে-চরিত্রের অবতারণা হয়েছে তা সৃষ্টির কোঠায় উঠেছে, তা প্রত্যক্ষ। কোনো-এক খেয়ালে সৃষ্টিকর্তা জিরাফ জন্তুটাকে রচনা করলেন। তাঁর সমালোচক বলতে পারে, এর গলাটা না গোরুর মতো, না হরিণের মতো, বাঘ ভালুকের মতো তো নয়ই, এর পশ্চাদ্‌ভাগের ঢালু ভঙ্গিটা সাধারণ চতুষ্পদ-সমাজে চলতি নেই, অতএব, ইত্যাদি। সমস্ত আপত্তির বিরুদ্ধে একটিমাত্র জবাব এই যে, ঐ জন্তুটা জীবসৃষ্টিপর্যায়ে সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ। ও বলছে 'আমি আছি'; 'না থাকাই উচিত ছিল' বলাটা টিঁকবে না। যাকে সৃষ্টি বলি তার নিঃসংশয় প্রকাশই তার অস্তিত্বের চরম কৈফিয়ত। সাহিত্যের সৃষ্টির সঙ্গে বিধাতার সৃষ্টির এইখানেই মিল; সেই সৃষ্টিতে উট জন্তুটা হয়েছে বলেই হয়েছে, উটপাখিরও হয়ে ওঠা ছাড়া অন্য জবাবদিহি নেই।

মানুষও একেবারে শিশুকাল থেকেই এই আনন্দ পেয়েছে, প্রত্যক্ষ বাস্তবতার আনন্দ। এই বাস্তবতার মানে এমন নয় যা সদাসর্বদা হয়ে থাকে, যুক্তিসংগত। যে-কোনো রূপ নিয়ে যা স্পষ্ট করে চেতনাকে স্পর্শ করে তাই বাস্তব। ছন্দে ভাষায় ভঙ্গিতে ইঙ্গিতে যখন সেই বাস্তবতা জাগিয়ে তোলে, সে তখন ভাষায় রচিত একটি শিল্পবস্তু হয়ে ওঠে। তার কোনো ব্যাবহারিক অর্থ না থাকতে পারে, তাতে এমন একটা কিছু প্রকাশ পায় যা tease us out of thought as doth eternity।

ওপারেতে কালো রঙ।
বৃষ্টি পড়ে ঝম্‌ঝম্‌,
এ পারেতে লঙ্কা গাছটি রাঙা টুক্‌টুক্‌ করে—
গুণবতী ভাই, আমার মন কেমন করে।

এর বিষয়টি অতি সামান্য। কিন্তু, ছন্দের দোল খেয়ে এ যেন একটা স্পর্শযোগ্য পদার্থ হয়ে উঠেছে ব্যাকরণের ভুল থাকা সত্ত্বেও।

ডালিমগাছে পর্‌ভু নাচে,
তাক্‌ধুমাধুম বাদ্যি বাজে।

শুনে শিশু খুশি হয়ে ওঠে। এ একটা সুস্পষ্ট চলন্ত জিনিস, যেন একটা ছন্দে-গড়া পতঙ্গ; সে আছে, সে উড়ছে, আর কিছুই নয়, এতেই কৌতুক।

তাই শিশুকাল থেকে মানুষ বলছে 'গল্প বলো'; সেই গল্পকে বলে রূপকথা। রূপ-কথাই সে বটে; তাতে না থাকতে পারে ঐতিহাসিক তথ্য, না থাকতে পারে আবশ্যক সংবাদ, সম্ভবপরতা সম্বন্ধেও তার হয়তো কোনো কৈফিয়ত নেই। সে কোনো-একটা রূপ দাঁড় করায় মনের সামনে, তার প্রতি ঔৎসুক্য জাগিয়ে তোলে, তাতে শূন্যতা দূর করে; সে বাস্তব। গল্প শুরু করা গেল—

এক ছিল মোটা কেঁদো বাঘ,
গায়ে তার কালো কালো দাগ।
বেহারাকে খেতে গিয়ে ঘরে
আয়নাটা পড়েছে নজরে।
এক ছুটে পালালো বেহারা,
বাঘ দেখে আপন চেহারা।
গাঁ গাঁ ক'রে রেগে ওঠে ডেকে,
গায়ে দাগ কে দিয়েছে এঁকে।
ঢেঁকিশালে মাসি ধান ভানে,
বাঘ এসে দাঁড়ালো সেখানে।
পাকিয়ে ভীষণ দুই গোঁফ
বলে, 'চাই গ্লিসেরিন সোপ!'

ছোটো মেয়ে চোখ দুটো মস্ত ক'রে হাঁ ক'রে শোনে। আমি বলি, 'আজ এই পর্যন্ত।' সে অস্থির হয়ে বলে, 'না, বলো, তারপরে।' সে নিশ্চিত জানে, সাবানের চেয়ে, যারা সাবান মাখে বাঘের লোভ তাদেরই 'পরে বেশি। তবু এই সম্পূর্ণ আজগবি গল্প তার কাছে সম্পূর্ণ বাস্তব, প্রাণীবৃত্তান্তের বাঘ তার কাছে কিছুই না। ঐ আয়না-দেখা খ্যাপা বাঘকে তার সমস্ত মনপ্রাণ একান্ত অনুভব করাতেই সে খুশি হয়ে উঠছে। এ'কেই বলি মনের লীলা, কিছুই-না নিয়ে তার সৃষ্টি, তার আনন্দ।

সুন্দরকে প্রকাশ করাই রসসাহিত্যের একমাত্র লক্ষ্য নয়, সে কথা পূর্বেই বলেছি।

সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতায় একটা স্তর আছে, সেখানে সৌন্দর্য খুবই সহজ। ফুল সুন্দর, প্রজাপতি সুন্দর, ময়ূর সুন্দর। এ সৌন্দর্য একতলাওয়ালা, এর মধ্যে সদর-অন্দরের রহস্য নেই, এক নিমেষেই ধরা দেয়, সাধনার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু, এই প্রাণের কোঠায় যখন মনের দান মেশে, চরিত্রের সংস্রব ঘটে, তখন এর মহল বেড়ে যায়; তখন সৌন্দর্যের বিচার সহজ হয় না। যেমন মানুষের মুখ। এখানে শুধু চোখে চেয়ে সরাসরি রায় দিতে গেলে ভুল হবার আশঙ্কা। সেখানে সহজ আদর্শে যা অসুন্দর তাকেও মনোহর বলা অসম্ভব নয়। এমন-কি, সাধারণ সৌন্দর্যের চেয়েও তার আনন্দজনকতা হয়তো গভীরতর। ঠুংরির টপ্পা শোনাবামাত্র মন চঞ্চল হয়ে থাকে, টোড়ির চৌতাল চৈতন্যকে গভীরতায় উদ্‌বুদ্ধ করে। 'ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলন' মধুর হতে পারে, কিন্তু 'বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী' মনোহর। একটা কানের, আর-একটা মনের; একটাতে চরিত্র নেই, লালিত্য আছে, আর-একটাতে চরিত্রই প্রধান। তাকে চিনে নেবার জন্যে অনুশীলনের দরকার করে।

যাকে সুন্দর বলি তার কোঠা সংকীর্ণ, যাকে মনোহর বলি তা বহুদূরপ্রসারিত। মন ভোলাবার জন্যে তাকে অসামান্য হতে হয় না, সামান্য হয়েও সে বিশিষ্ট। যা আমাদের দেখা অভ্যস্ত ঠিক সেইটেকেই যদি ভাষায় আমাদের কাছে অবিকল হাজির ক'রে দেয়, তবে তাকে বলব সংবাদ। কিন্তু, আমাদের সেই সাধারণ অভিজ্ঞতার জিনিসকেই সাহিত্য যখন বিশেষ ক'রে আমাদের সামনে উপস্থিত করে তখন সে আসে অভূতপূর্ব হয়ে, সে হয় সেই একমাত্র, আপনাতে আপনি স্বতন্ত্র। সন্তানস্নেহে কর্তব্যবিস্মৃত মানুষ অনেক দেখা যায়, মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্র আছেন সেই অতি সাধারণ বিশেষণ নিয়ে। কিন্তু, রাজ্যাধিকারবঞ্চিত এই অন্ধ রাজা কবিলেখনীর নানা সূক্ষ্ম স্পর্শে দেখা দিয়েছেন সম্পূর্ণ একক হয়ে। মোটা গুণটা নিয়ে তাঁর সমজাতীয় লোক অনেক আছে, কিন্তু জগতে ধৃতরাষ্ট্র অদ্বিতীয়; এই মানুষের একান্ততা তাঁর বিশেষ ব্যবহারে নয়, কোনো আংশিক পরিচয়ে নয়, সমগ্রভাবে। কবির সৃষ্টিমন্ত্রে প্রকাশিত এই তাঁর অনন্যসদৃশ স্বকীয় রূপ প্রতিভার কোন্ সহজ নৈপুণ্যে সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে, ক্ষুদ্র সমালোচকের বিশ্লেষণী লেখনী তার অন্ত পাবে না।

সংসারে অধিকাংশ পদার্থ প্রত্যক্ষত আমাদের কাছে সাধারণশ্রেণীভুক্ত। রাস্তা দিয়ে হাজার লোক চলে; তারা যদিচ প্রত্যেকেই বিশেষ লোক তবু আমার কাছে তারা সাধারণ মানুষমাত্র, এক বৃহৎ সাধারণতার আবরণে তারা আবৃত, তারা অস্পষ্ট। আমার আপনার কাছে আমি সুনিশ্চিত, আমি বিশেষ; অন্য কেউ যখন তার বিশিষ্টতা নিয়ে আসে তখন তাকে আমারই সমপর্যায়ে ফেলি, আনন্দিত হই।

একটা কথা স্পষ্ট করা দরকার। আমার ধোবা আমার কাছে নিশ্চিত সত্য সন্দেহ নেই, এবং তার অনুবর্তী যে-বাহন সেও। ধোবা ব'লেই প্রয়োজনের যোগে সে আমার খুব কাছে, কিন্তু আমার ব্যক্তিপুরুষের সম্যক্ অনুভূতির বাইরে।

পূর্বে অন্যত্র এক জায়গায় বলেছি যে, যে-কোনো পদার্থের সঙ্গে আমাদের ব্যবহারের সম্বন্ধই প্রধান সে-পদার্থ সাধারণশ্রেণীভুক্ত হয়ে যায়, তার বিশিষ্টতা আমাদের কাছে অগোচর হয়ে পড়ে। কবিতায় প্রবেশ করতে সজনে ফুলের বিলম্ব হয়েছে এই কারণেই, তাকে জানি ভোজ্য ব'লে একটা সাধারণ ভাবে। চালতা-ফুল এখনও কাব্যের দ্বারের কাছেও এসে পৌঁছয় নি। আমরুলের ফুল শিরীষ ফুলের চেয়ে অযোগ্য নয়; কিন্তু তার দিকে যখন দৃষ্টিপাত করি তখন সে আপন চরমরূপে প্রকাশ পায় না, তার পরপর্যায়ের খাদ্য ফলেরই পূর্বপরিচয় রূপে তাকে দেখি। তার নিজেরই বিশিষ্টতার ঘোষণা যদি তার মধ্যে মুখ্য হত তা হলে সে এতদিনে কাব্যে আদর পেত। মুরগি পাখির সৌন্দর্য বঙ্গসাহিত্যে কেন যে অস্বীকৃত, সে কথা একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে। আমাদের চিত্ত এদেরকে নিজেরই স্বরূপে দেখে না, অন্য-কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে তার দ্বারা আবৃত ক'রে দেখে।

যাঁরা আমার কবিতা পড়েছেন তাঁদের কাছে পুনরুক্তি হলেও একটা খবর এখানে বলা চলে। ছিলেম মফস্বলে, সেখানে আমার এক চাকর ছিল, তার বুদ্ধি বা চেহারা লক্ষ্য করবার যোগ্য ছিল না। রাত্রে বাড়ি চলে যায়, সকালে এসে ঝাড়ন কাঁধে কাজকর্ম করে। তার প্রধান গুণ, সে কথা বেশি বলে না। সে যে আছে সে তথ্যটা অনুভব করলুম যেদিন সে হল অনুপস্থিত। সকালে দেখি, স্নানের জল তোলা হয় নি, ঝাড়পোঁছ বন্ধ। এল বেলা দশটার কাছাকাছি। বেশ একটু রূঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কোথায় ছিলি।' সে বললে, 'আমার মেয়েটি মারা গেছে কাল রাতে।' ব'লেই ঝাড়ন নিয়ে নিঃশব্দে কাজে লেগে গেল। বুকটা ধক্ ক'রে উঠল। ভৃত্যরূপে যে ছিল প্রয়োজনীয়তার আবরণে ঢাকা, তার আবরণ উঠে গেল; মেয়ের বাপ ব'লে তাকে দেখলুম, আমার সঙ্গে তার স্বরূপের মিল হয়ে গেল; সে হল প্রত্যক্ষ, সে হল বিশেষ।

সুন্দরের হাতে বিধাতার পাস্‌পোর্ট আছে; সর্বত্রই তার প্রবেশ সহজ। কিন্তু, এই মোমিন মিঞা, একে কী বলব। সুন্দর বলা তো চলে না। মেয়ের বাপও তো সংসারে অসংখ্য; সেই সাধারণ তথ্যটা সুন্দরও না, অসুন্দরও না। কিন্তু, সেদিন করুণ-রসের ইঙ্গিতে গ্রাম্য মানুষটা আমার মনের মানুষের সঙ্গে মিলল; প্রয়োজনের বেড়া অতিক্রম ক'রে কল্পনার ভূমিকায় মোমিন মিঞা আমার কাছে হল বাস্তব।

লক্ষপতির ঘরে মেজো মেয়ের বিবাহ। এমন খুব পাড়ার অতিবৃদ্ধেরাও বলে অভূতপূর্ব। তার ঘোষণার তরঙ্গ খবরের কাগজের সংবাদবীথিকায় উদ্‌বেল হয়ে উঠেছে। জনশ্রুতির কোলাহলে ঘটনাটা যতই গুরুতর প্রতিভাত হোক, তবু এই বহুব্যয়সাধ্য বিপুল সমারোহেও ব্যাপারটাকে 'মেয়ের বিয়ে' নামক সংবাদের নিতান্ত সাধারণতা থেকে উপরে তুলতে পারে না। সাময়িক উন্মুখরতার জোরে এ স্মরণীয় হয়ে ওঠে না। কিন্তু, 'কন্যার বিবাহ' নামক অত্যন্ত সাধারণ ঘটনাকে তার সাময়িক ও স্থানিক আত্মপ্রচারের আত্মম্লানতা থেকে যদি কোনো কবি তাঁর ভাষায় ছন্দে দীপ্তিমান সাহিত্যের সামগ্রী করে তোলেন, তা হলে প্রতিদিনের হাজার-লক্ষ মেয়ের বিবাহের কুহেলিকা ভেদ ক'রে এ দেখা দেবে একটি অদ্বিতীয় মেয়ের বিবাহরূপে, যেমন বিবাহ কুমারসম্ভবের উমার, যেমন বিবাহ রঘুবংশের ইন্দুমতীর। সাংকোপাঞ্জা ডন্‌কুইক্‌-সোটের ভৃত্যমাত্র, সংসারের প্রবহমান তথ্যপুঞ্জের মধ্যে তাকে তর্জমা করে দিলে সে চোখেই পড়বে না— তখন হাজার-লক্ষ চাকরের সাধারণ-শ্রেণীর মাঝখানে তাকে সনাক্ত করবে কে। ডন্‌কুইক্‌সোটের চাকর আজ চিরকালের মানুষের কাছে চিরকালের চেনা হয়ে আছে, সবাইকে দিচ্ছে তার একান্ত প্রত্যক্ষতার আনন্দ; এপর্যন্ত ভারতের যতগুলি বড়লাট হয়েছে তাদের সকলের জীবনবৃত্তান্ত মেলালেও এই চাকরটির পাশে তারা নিষ্প্রভ। বড়ো বড়ো বুদ্ধিমান রাজনৈতিকের দল মিলে অস্ত্রলাঘব ব্যাপার নিয়ে যে বাদবিতণ্ডা তুলেছেন তথ্যহিসাবে সে একটা মস্ত তথ্য; কিন্তু যুদ্ধে-পঙ্গু একটি-মাত্র সৈনিকের জীবন যে-বেদনায় জড়িত তাকে সুস্পষ্ট প্রকাশমান করতে পারলে সকল কালের মানুষ রাষ্ট্রনৈতিকের গুরুতর মন্ত্রণা-ব্যাপারের চেয়ে তাকে প্রধান স্থান দেবে। এ কথা নিশ্চিত জানি, যে-সময়ে শকুন্তলা রচিত হয়েছিল তখন রাষ্ট্রিক আর্থিক অনেক সমস্যা উঠেছিল যার গুরুত্ব তখনকার দিনে অতি প্রকাণ্ড উদ্‌বেগরূপে ছিল; কিন্তু সে-সমস্তের আজ চিহ্নমাত্র নেই, আছে শকুন্তলা।

মানবের সামাজিক জগৎ দ্যুলোকের ছায়াপথের মতো। তার অনেকখানিই নানাবিধ অবচ্ছিন্ন তত্ত্বের অর্থাৎ অ্যাব্‌স্ট্রাক্‌শনের বহুবিস্তৃত নীহারিকায় অবকীর্ণ; তাদের নাম হচ্ছে সমাজ, রাষ্ট্র, নেশন, বাণিজ্য, এবং আরও কত কী। তাদের রূপহীনতার কুহেলিকায় ব্যক্তিগত মানবের বেদনাময় বাস্তবতা আচ্ছন্ন। যুদ্ধ-নামক একটিমাত্র বিশেষ্যের তলায় হাজার হাজার ব্যক্তিবিশেষের হৃদয়দাহকর দুঃখের জলন্ত অঙ্গার বাস্তবতার অগোচরে ভস্মাবৃত। নেশন-নামক একটা শব্দ চাপা দিয়েছে যত পাপ ও বিভীষিকা তার আবরণ তুলে দিলে মানুষের জন্যে লজ্জা রাখবার জায়গা থাকে না। সমাজ-নামক পদার্থ যত বিচিত্র রকমের মূঢ়তা ও দাসত্বশৃঙ্খল গড়েছে তার স্পষ্টতা

আমাদের চোখ এড়িয়ে থাকে; কারণ, সমাজ একটা অবচ্ছিন্ন তত্ত্ব, তাতে মানুষের বাস্তবতার বোধ আমাদের মনে অসাড় করেছে— সেই অচেতনতার বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে রামমোহন রায়কে, বিদ্যাসাগরকে। ধর্ম-শব্দের মোহযবনিকার অন্তরালে যে-সকল নিদারুণ ব্যাপার সাধিত হয়ে থাকে তাতে সকল শাস্ত্রে বর্ণিত সকল নরকের দণ্ডবিধিকে ক্লান্ত করে দিতে পারে। ইস্কুলে ক্লাস-নামক একটা অবচ্ছিন্ন তত্ত্ব আছে; সেখানে ব্যক্তিগত ছাত্র অগোচর থাকে শ্রেণীগত সাধারণতার আড়ালে, সেই কারণে যখন তাদের মন-নামক সজীব পদার্থ মুখস্থ-বিদ্যার পেষণে গ্রন্থের পাতার মধ্যে পিষ্ট ফুলের মতো শুকোতে থাকে, আমরা থাকি উদাসীন। গবর্মেন্টের আমলাতন্ত্র নামক অবচ্ছিন্ন তত্ত্ব মানুষের ব্যক্তিগত সত্যবোধের বাহিরে; সেইজন্য রাষ্ট্রশাসনের হৃদয়সম্পর্কহীন নামের নিচে প্রকাণ্ড আয়তনের নির্দয়তা কোথাও বাধে না।

মানবচিত্তের এই-সকল বিরাট অসাড়তার নীহারিকাক্ষেত্রে বেদনাবোধের বিশিষ্টতাকে সাহিত্য দেদীপ্যমান করে তুলছে। রূপে সেই-সকল সৃষ্টি সসীম, ব্যক্তিপুরুষের আত্মপ্রকাশে সীমাতীত। এই ব্যক্তিপুরুষ মানুষের অন্তরতম ঐক্যতত্ত্ব; এই মানুষের চরম রহস্য। এ তার চিত্তের কেন্দ্র থাকে বিকীর্ণ হয়ে বিশ্বপরিধিতে পরিব্যাপ্ত— আছে তার দেহে, কিন্তু দেহকে উত্তীর্ণ হয়ে; আছে তার মনে, কিন্তু মনকে অতিক্রম ক'রে; তার বর্তমানকে অধিকার ক'রে অতীত ও ভবিষ্যতের উপকূলগুলিকে ছাপিয়ে চলেছে। এই ব্যক্তিপুরুষ প্রতীয়মানরূপে যে-সীমায় অবস্থিত সত্যরূপে কেবলই তাকে ছাড়িয়ে যায়, কোথাও থামতে চায় না; তাই এ আপন সত্তার প্রকাশকে এমন রূপ দেবার জন্যে উৎকণ্ঠিত যে-রূপ আনন্দময়, যা মৃত্যুহীন। সেই-সকল রূপসৃষ্টিতে ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বের একাত্মতা। এই-সকল সৃষ্টিতে ব্যক্তিপুরুষ পরমপুরুষের বাণীর প্রত্যুত্তর পাঠাচ্ছে, যে পরমপুরুষ আলোকহীন তথ্যপুঞ্জের অভ্যন্তর থেকে আমাদের দৃষ্টিতে আপন প্রকাশকে নিরন্তর উদ্ভাসিত করেছেন সত্যের অসীম রহস্যে, সৌন্দর্যের অনির্বচনীয়তায়।

১৩৪০

সাহিত্যের তাৎপর্য

উদ্ভিদের দুই শ্রেণী, ওষধি আর বনস্পতি। ওষধি ক্ষণকালের ফসল ফলাতে ফলাতে ক্ষণে জন্মায়, ক্ষণে মরে। বনস্পতির আয়ু দীর্ঘ, তার দেহ বিচিত্র রূপে আকৃতিবান, শাখান্বিত তার বিস্তার।

ভাষার ক্ষেত্রেও প্রকাশ দুই শ্রেণীর। একটাতে প্রতিদিনের প্রয়োজন সিদ্ধ হতে

হতে তা লুপ্ত হয়ে যায়; ক্ষণিক ব্যবহারের সংবাদবহনে তার সমাপ্তি। আর-একটাতে প্রকাশের পরিণাম তার নিজের মধ্যেই। সে দৈনিক আশুপ্রয়োজনের ক্ষুদ্র সীমায় নিঃশেষিত হতে হতে মিলিয়ে যায় না। সে শাল-তমালেরই মতো; তার কাছ থেকে দ্রুত ফসল ফলিয়ে নিয়ে তাকে বরখাস্ত করা হয় না। অর্থাৎ, বিচিত্র ফুলে ফলে পল্লবে শাখায় কাণ্ডে, ভাবের এবং রূপের সমবায়ে, সমগ্রতায় সে আপনার অস্তিত্বেরই চরম গৌরব ঘোষণা করতে থাকে স্থায়ী কালের বৃহৎ ক্ষেত্রে। এ'কেই আমরা ব'লে থাকি সাহিত্য।

ভাষার যোগে আমরা পরস্পরকে তথ্যগত সংবাদ জানাচ্ছি, তা ছাড়া জানাচ্ছি ব্যক্তিগত মনোভাব। ভালো লাগছে, মন্দ লাগছে, রাগ করছি, ভালোবাসছি, এটা যথাস্থানে ব্যক্ত না ক'রে থাকতে পারি নে। মূক পশুপাখিরও আছে অপরিণত ভাষা; তাতে কিছু আছে ধ্বনি, কিছু আছে ভঙ্গি; এই ভাষায় তারা পরস্পরের কাছে কিছু খবরও জানায়, কিছু ভাবও জানায়। মানুষের ভাষা তার এই প্রয়োগসীমা অনেক দূরে ছাড়িয়ে গেছে। সন্ধান ও যুক্তির জোরে তথ্যগত সংবাদ পরিণত হয়েছে বিজ্ঞানে। হবা-মাত্র তার প্রাত্যহিক ব্যক্তিগত বন্ধন ঘুচে গেল। যে জগৎটা 'আমি আছি' এইমাত্র ব'লে আপনাকে জানান দিয়েছে, মানুষ তাকে নিয়ে বিরাট জ্ঞানের জগৎ রচনা করলে। বিশ্বজগতে মানুষের যে-যোগটা ছিল ইন্দ্রিয়বোধের দেখাশোনায়, সেইটেকে জ্ঞানের যোগে বিশেষভাবে অধিকার ক'রে নিলে সকল দেশের সকল কালের মানুষের বুদ্ধি।

ভাবপ্রকাশের দিকেও মানুষের সেই দশা ঘটল। তার খুশি, তার দুঃখ, তার রাগ, তার ভালোবাসাকে মানুষ কেবলমাত্র প্রকাশ করল তা নয়, তাকে প্রকাশের উৎকর্ষ দিতে লাগল; তাতে সে আশু উদ্‌বেগের প্রবর্তনা ছাড়িয়ে গেল, তাতে মানুষ লাগালে ছন্দ, লাগালে সুর, ব্যক্তিগত বেদনাকে দিলে বিশ্বজনীন রূপ। তার আপন ভালোমন্দ-লাগার জগৎকে অন্তরঙ্গ ভাবে সকল মানুষের সাহিত্যজগৎ করে নিলে।

সাহিত্য শব্দটার কোনো ধাতুগত অর্থব্যাখ্যা কোনো অলংকারশাস্ত্রে আছে কিনা জানি না। ঐ শব্দটার যখন প্রথম উদ্ভাবন হয়েছিল তখন ঠিক কী বুঝে হয়েছিল তা নিশ্চিত বলবার মতো বিদ্যা আমার নেই। কিন্তু, আমি যাকে সাহিত্য বলে থাকি তার সঙ্গে ঐ শব্দটার অর্থের মিল করে যদি দেখাই তবে তাতে বোধ করি দোষ হবে না।

সাহিত্যের সহজ অর্থ যা বুঝি সে হচ্ছে নৈকট্য, অর্থাৎ সম্মিলন। মানুষকে মিলতে হয় নানা প্রয়োজনে, আবার মানুষকে মিলতে হয় কেবল মেলবারই জন্যে, অর্থাৎ সাহিত্যেরই উদ্দেশে। শাকসব্জির খেতের সঙ্গে মানুষের যোগ ফসল-ফলানোর যোগ।

ফুলের বাগানের সঙ্গে যোগ সম্পূর্ণ পৃথক জাতের। সব্‌জি খেতের শেষ উদ্দেশ্য খেতের বাইরে, সে হচ্ছে ভোজ্যসংগ্রহ। ফুলের বাগানের যে-উদ্দেশ্য তাকে এক হিসাবে সাহিত্য বলা যেতে পারে। অর্থাৎ, মন তার সঙ্গে মিলতে চায়— সেখানে গিয়ে বসি, সেখানে বেড়াই, সেখানকার সঙ্গে যোগে মন খুশি হয়।

এর থেকে বুঝতে পারি, ভাষার ক্ষেত্রে সাহিত্য শব্দের তাৎপর্য কী। তার কাজ হচ্ছে হৃদয়ের যোগ ঘটানো, যেখানে যোগটাই শেষ লক্ষ্য।

ব্যাবসাদার গোলাপ-জলের কারখানা করে, শহরের হাটে বিক্রি করতে পাঠায় ফুল। সেখানে ফুলের সৌন্দর্যমহিমা গৌণ, তার বাজারদরের হিসাবটাই মুখ্য। বলা বাহুল্য, এই হিসাবটাতে আগ্রহ থাকতে পারে, কিন্তু রস নেই। ফুলের সঙ্গে অহৈতুক মিলনে এই হিসাবের চিন্তাটা আড়াল তুলে দেয়। গোলাপ-জলের কারখানাটা সাহিত্যের সামগ্রী হল না। হতেও পারে কবির হাতে, কিন্তু মালেকের হাতে নয়।

সে অনেক দিনের কথা, বোটে চলেছি পদ্মায়। শরৎকালের সন্ধ্যা; সূর্য মেঘ-স্তবকের মধ্যে তাঁর শেষ ঐশ্বর্যের সর্বস্বদান পণ ক'রে সদ্য অস্ত গেছেন। আকাশের নীরবতা অনির্বচনীয় শান্তরসে কানায় কানায় পূর্ণ; ভরা নদীতে কোথাও একটু চাঞ্চল্য নেই; স্তব্ধ চিক্কণ জলের উপর সন্ধ্যাভ্রের নানা বর্ণের দীপ্তিচ্ছায়া ম্লান হয়ে মিলিয়ে আসছে। পশ্চিম দিকের তীরে দিগন্তপ্রসারিত জনশূন্য বালুচর প্রাচীন যুগান্তরের অতিকায় সরীসৃপের মতো পড়ে আছে। বোট চলেছে অন্য পারের প্রান্ত বেয়ে, ভাঙন-ধরা খাড়া পাড়ির তলা দিয়ে দিয়ে; পাড়ির গায়ে শত শত গর্তে গাঙশালিকের বাসা; হঠাৎ একটা বড়ো মাছ জলের তলা থেকে ক্ষণিক কলশব্দে লাফ দিয়ে উঠে বঙ্কিম ভঙ্গিতে তখনই তলিয়ে গেল। আমাকে চকিত আভাসে জানিয়ে দিয়ে গেল এই জলযবনিকার অন্তরালে নিঃশব্দ জীবলোকে নৃত্যপর প্রাণের আনন্দের কথা, আর সে যেন নমস্কার নিবেদন করে গেল বিলীয়মান দিনান্তের কাছে। সেই মুহূর্তেই তপসিমাঝি চাপা আক্ষেপের সুরে সনিশ্বাসে বলে উঠল, 'ওঃ! মস্ত মাছটা।' মাছটা ধরা পড়েছে আর সেটা তৈরি হচ্ছে রান্নার জন্যে, এই ছবিটাই তার মনে জেগে উঠল; চার দিকের অন্য ছবিটা খণ্ডিত হয়ে দূরে গেল স'রে। বলা যেতে পারে, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তার সাহিত্য গেল নষ্ট হয়ে। আহারে তার আসক্তি তাকে আপন জঠরগহ্বরের কেন্দ্রে টেনে রাখল। আপনাকে না ভুললে মিলন হয় না।

মানুষের নানা চাওয়া আছে, সেই চাওয়ার মধ্যে একটি হচ্ছে খাবার জন্যে এই মাছকে চাওয়া। কিন্তু, তার চেয়ে তার বড়ো চাওয়া, বিশ্বের সঙ্গে সাহিত্য অর্থাৎ সম্মিলন চাওয়া— নদীতীরে সেই সূর্যাস্ত-আলোকে-মহিমান্বিত দিনাবসানকে সমস্ত

মনের সঙ্গে মিলিত করতে চাওয়া। এই চাওয়া আপনার অবরোধের মধ্য থেকে আপনাকে বাইরে আনতে চাওয়া। বক দাঁড়িয়ে আছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বনের প্রান্তে সরোবরের তটে, সূর্য উঠছে আকাশে, আরক্ত রশ্মির স্পর্শপাতে জল উঠছে ঝলমল করে— এই দৃশ্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্মিলিত আপনার মনটিকে ঐ বক কি চাইতে জানে। এই আশ্চর্য চাওয়ার প্রকাশ মানুষের সাহিত্যে। তাই ভর্তৃহরি বলেছেন, যে-মানুষ সাহিত্যসংগীতকলাবিহীন সে পশু, কেবল তার পুচ্ছবিষাণ নেই এইমাত্র প্রভেদ। পশুপক্ষীর চৈতন্য প্রধানত আপন জীবিকার মধ্যেই বদ্ধ— মানুষের চৈতন্য বিশ্বে মুক্তির পথ তৈরি করছে, বিশ্বে প্রসারিত করছে নিজেকে, সাহিত্য তারই একটি বড়ো পথ।

আমি যে-টেবিলে বসে লিখছি তার এক ধারে এক পুষ্পপাত্রে আছে রজনীগন্ধার গুচ্ছ, আর-একটাতে আছে ঘন সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে সাদা গন্ধরাজ। লেখবার কাজে এর প্রয়োজন নেই। এই অপ্রয়োজনের আয়োজনে আমার একটা আত্মসম্মানের ঘোষণা আছে মাত্র। ঐটেতে আমার একটা কথা নীরবে রয়ে গেছে; সে এই যে, জীবনযাত্রার প্রয়োজন আমার চার দিকে আপন নীরন্ধ্র প্রাচীর তুলে আমাকে আটক করে নি। আমার মুক্ত স্বরূপ আপনাকে প্রমাণ করছে ঐ ফুলের পাত্রে। চৈতন্য যার বন্দী, বিশ্বের সঙ্গে যথার্থ সাহিত্যলাভের মাঝখানে তার বাধা আছে— তার রিপু, তার দুর্বলতা, তার কল্পনাদৃষ্টির অন্ধতা। আমি বন্দী নই, আমার দ্বার খোলা, তার প্রমাণ দেবে ঐ অনাবশ্যক ফুল; ওর সঙ্গে যোগ বিশ্বের সঙ্গে যোগেরই একটি মুক্ত বাতায়ন। ওকে চেয়েছি সেই অহৈতুক চাওয়ায় মানুষ যাতে মুক্ত হয় একান্ত আবশ্যিকতা থেকে। এই আপন নিজায় সম্বন্ধটি স্বীকার করবার জন্যে মানুষের কত উদ্যোগ তার সংখ্যা নেই। এই কথাটাই ভালো করে প্রকাশ করবার জন্যে মানবসমাজে রয়েছে কত কবি, কত শিল্পী।

সদ্য-তৈরি নতুন মন্দির, চুনকাম-করা। তার চার দিকে গাছপালা। মন্দিরটা তার আপন শ্যামল পরিবেষের সঙ্গে মিলছে না। সে আছে উদ্ধত হয়ে, স্বতন্ত্র হয়ে। তার উপর দিয়ে কালের প্রবাহ বইতে থাক্, বৎসরের পর বৎসর এগিয়ে চলুক। বর্ষার জলধারায় প্রকৃতি তার অভিষেক করুক, রৌদ্রের তাপে তার বালির বাঁধন কিছু কিছু খসতে থাক্, অদৃশ্য শৈবালের বীজ লাগুক তার গায়ে এসে; তখন ধীরে ধীরে বন-প্রকৃতির রঙ লাগবে এর সর্বাঙ্গে, চারি দিকের সঙ্গে এর সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ হতে থাকবে। বিষয়ী লোক আপনার চার দিকের সঙ্গে মেলে না, সে আপনাতে আপনি পৃথক; এমন-কি জ্ঞানী লোকও মেলে না, সে স্বতন্ত্র; মেলে ভাবুক লোক। সে আপন ভাবরসে

বিশ্বের দেহে আপন রঙ লাগায়, মানুষের রঙ। স্বভাবত বিশ্বজগৎ আমাদের কাছে তার বিশুদ্ধ প্রাকৃতিকতায় প্রকাশ পায়। কিন্তু, মানুষ তো কেবল প্রাকৃতিক নয়, সে মানসিক। মানুষ তাই বিশ্বের উপর অহরহ আপন মন প্রয়োগ করতে থাকে। বস্তুবিশ্বের সঙ্গে মনের সামঞ্জস্য ঘটিয়ে তোলে। জগৎটা মানুষের ভাবানুষঙ্গে অর্থাৎ তার এসোশিয়েশনে মণ্ডিত হয়ে ওঠে। মানুষের ব্যক্তিস্বরূপের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির মানবিক পরিণতির পরিবর্তন পরিবর্ধন ঘটে। আদিযুগের মানুষের কাছে বিশ্বপ্রকৃতি যা ছিল আমাদের কাছে তা নেই। প্রকৃতিকে আমাদের মানবভাবের যতই অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছি আমাদের মনের পরিণতিও ততই বিস্তার ও বিশেষত্ব লাভ করেছে।

আমাদের জাহাজ এসে লাগছে জাপান-বন্দরে। চেয়ে দেখলুম দেশটার দিকে— নতুন লাগল, সুন্দর লাগল। জাপানি এসে দাঁড়ালো ডেকের রেলিং ধরে। সে কেবল সুন্দর দেশ দেখলে না; সে দেখলে যে-জাপানের গাছপালা নদী পর্বত যুগে যুগে মানবমনের সংস্পর্শে বিশেষ রসের রূপ নিয়েছে সেটা প্রকৃতির নয়, সেটা মানুষের। এই রসরূপটি মানুষই প্রকৃতিকে দিয়েছে, দিয়ে তার সঙ্গে মানবজীবনের একান্ত সাহিত্য ঘটিয়েছে। মানুষের দেশ যেমন কেবলমাত্র প্রাকৃতিক নয়, তা মানবিক, সেইজন্যে দেশ তাকে বিশেষ আনন্দ দেয়— তেমনি মানুষ সমস্ত জগৎকে হৃদয়রসের যোগে আপন মানবিকতায় আবৃত করছে, অধিকার করছে, তার সাহিত্য ঘটছে সর্বত্রই। মানুষেরা সর্বমেবাবিশন্তি।

বাহিরের তথ্য বা ঘটনা যখন ভাবের সামগ্রী হয়ে আমাদের মনের সঙ্গে রসের প্রভাবে মিলে যায় তখন মানুষ স্বভাবতই ইচ্ছা করে, সেই মিলনকে সর্বকালের সর্বজনের অঙ্গীকারভুক্ত করতে। কেননা, রসের অনুভূতি প্রবল হলে সে ছাপিয়ে যায় আমাদের মনকে। তখন তাকে প্রকাশ করতে চাই নিত্যকালের ভাষায়; কবি সেই ভাষাকে মানুষের অনুভূতির ভাষা ক'রে তোলে; অর্থাৎ জ্ঞানের ভাষা নয়, হৃদয়ের ভাষা, কল্পনার ভাষা। আমরা যখনই বিশ্বের যে-কোনো বস্তুকে বা ব্যাপারকে ভাবের চক্ষে দেখি তখনই সে আর যন্ত্রের দেখা থাকে না; ফোটোগ্রাফিক লেন্সের যে যথাতথ দেখা তার থেকে তার স্বতই প্রভেদ ঘটে। সেই প্রভেদটাকে অবিকল বর্ণনার ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মায়ের চোখে দেখা খোকার পায়ে ছোট্টো লাল জুতোকে জুতো বললে তাকে যথার্থ করে বলাই হয় না। মাকে তাই বলতে হল—

খোকা যাবে নায়ে,
লাল জুতুয়া পায়ে।

অভিধানের কোথাও এ শব্দ নেই। বৈষ্ণবপদাবলীতে যে মিশ্রিত ভাষা চলে গেছে সেটা যে কেবলমাত্র হিন্দিভাষার অপভ্রংশ তা নয়, সেটাকে পদকর্তারা ইচ্ছা ক'রেই রক্ষা করেছেন, কেননা অনুভূতির অসাধারণতা ব্যক্ত করবার পক্ষে সাধারণ ভাষা সহজ নয়। ভাবের সাহিত্য মাত্রেই এমন একটা ভাষার সৃষ্টি হয় যে-ভাষা কিছু বা বলে, কিছু বা গোপন করে; কিছু যার অর্থ আছে, কিছু আছে সুর। এই ভাষাকে কিছু আড় ক'রে, বাঁকা ক'রে, এর সঙ্গে রূপক মিশিয়ে, এর অর্থকে উলোট-পালোট্ ক'রে তবেই বস্তুবিশ্বের প্রতিঘাতে মানুষের মধ্যে যে ভাবের বিশ্ব সৃষ্টি হতে থাকে তাকে সে প্রকাশ করতে পারে। নইলে কবি বলবে কেন 'দেখিবারে আঁখিপাখি ধায়।' দেখবার আগ্রহ একটা সাধারণ ঘটনা মাত্র। সেই ঘটনাকে বাইরের জিনিস ক'রে না রেখে তাকে মনের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হল যখন, কবি একটা অদ্ভুত কথা বললে, দেখিবারে আঁখিপাখি ধায়। আগ্রহ যে পাখির মতন ধায় এটা মনের সৃষ্ট ভাষা, বিবরণের ভাষা নয়।

গোধূলিবেলার অন্ধকারে রূপসী মন্দির থেকে বাইরে এল, এ ঘটনাটা বাহ্য ঘটনা এবং অত্যন্ত সাধারণ। কবি বললেন, নববর্ষার মেঘে বিদ্যুতের রেখা যেন দ্বন্দ্ব প্রসারিত করে দিয়ে গেল। এই উপমার যোগে বাহিরের ঘটনা আপন চিহ্ন এঁকে দিয়ে গেল। আমাদের অন্তরে মন এঁকে সৃষ্টির বিষয় করে তুলে আপন করে নিলে।

কোনো এক অজ্ঞাতনামা গ্রীক কবির লিখিত কোনো-একটি শ্লোকের গদ্য অনুবাদ দিচ্ছি, ইংরেজি তর্জমার থেকে: আপেল গাছের ডালের ফাঁকে ফাঁকে ঝুরুঝুরু বইছে শরতের হাওয়া; থর্‌থর্ ক'রে কেঁপে-ওঠা পাতার মধ্যে থেকে ঘুম আসছে অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীর দিকে— ছড়িয়ে পড়ছে নদীর ধারার মতো। এই-যে কম্পমান ডালপালার মধ্যে মর্মরমুখর স্নিগ্ধ হাওয়ায় নিঃশব্দ নদীর মতো ব্যাপ্ত হয়ে পড়া ঘুমের রাত্রি, এ আমাদের মনের রাত্রি। এই রাত্রিকে আমরা আপন ক'রে তুলে তবেই পূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারি।

কোনো চীনদেশীয় কবি বলছেন—

পাহাড় একটানা উঠে গেছে বহুশত হাত উচ্চে;
সরোবর চলে গেছে শত মাইল,
কোথাও তার ঢেউ নেই;
বালি ধু ধু করছে নিষ্কলঙ্ক শুভ্র;
শীতে গ্রীষ্মে সমান অক্ষুণ্ন সবুজ দেওদার-বন;
নদীর ধারা চলেইছে, বিরাম নেই তার;

গাছগুলো বিশ হাজার বছর
আপন পণ সমান রক্ষা ক'রে এসেছে—
হঠাৎ এরা একটি পথিকের মন থেকে
জুড়িয়ে দিল সব দুঃখবেদনা,
একটি নতুন গান বানাবার জন্যে
চালিয়ে দিল তার লেখনীকে।

মানুষের দুঃখ জুড়িয়ে দিল নদী পর্বত সরোবর। সম্ভব হয় কী ক'রে। নদী-পর্বতের অনেক প্রাকৃতিক গুণ আছে কিন্তু সান্ত্বনার মানসিক গুণ তো নেই। মানুষের আপন মন তার মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে নিজের সান্ত্বনা সৃষ্টি করে। যা বস্তুগত জিনিস তা মানুষের মনের স্পর্শে তারই মনের জিনিস হয়ে ওঠে। সেই মনের বিশ্বের সম্মিলনে মানুষের মনের দুঃখ জুড়িয়ে যায়, তখন সেই সাহিত্য থেকেই সাহিত্য জাগে।

বিশ্বের সঙ্গে এই মিলনটি সম্পূর্ণ অনুভব করার এবং ভোগ করার ক্ষমতা সকলের সমান নয়। কারণ, যে-শক্তির দ্বারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের মিলনটা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের মিলন না হয়ে মনের মিলন হয়ে ওঠে সে-শক্তি হচ্ছে কল্পনাশক্তি; এই কল্পনাশক্তিতে মিলনের পথকে আমাদের অন্তরের পথ ক'রে তোলে, যা-কিছু আমাদের থেকে পৃথক এই কল্পনার সাহায্যেই তাদের সঙ্গে আমাদের একাত্মতার বোধ সম্ভবপর হয়, যা আমাদের মনের জিনিস নয় তার মধ্যেও মন প্রবেশ ক'রে তাকে মনোময় ক'রে তুলতে পারে। এই লীলা মানুষের, এই লীলায় তার আনন্দ। যখন মানুষ বলে 'কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে' তখন বুঝতে হবে, যে-মানুষকে মন দিয়ে নিজেরই ভাবরসে আপন ক'রে তুলতে হয় তাকেই আপন করা হয় নি—সেইজন্যে 'হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে।' মন তাকে মনের ক'রে নিতে পারে নি ব'লেই বাইরে বাইরে ঘুরছে। মানুষের বিশ্ব মানুষের মনের বাইরে যদি থাকে সেটাই নিরানন্দের কারণ হয়। মন যখন তাকে আপন ক'রে নেয় তখনই তার ভাষায় শুরু হয় সাহিত্য, তার লেখনী বিচলিত হয় নতুন গানের বেদনায়।

মানুষও বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্গত। নানা অবস্থার ঘাতে প্রতিঘাতে বিশ্ব জুড়ে মানবলোকে হৃদয়াবেগের ঢেউখেলা চলেছে। সমগ্র ক'রে, একান্ত ক'রে, স্পষ্ট ক'রে তাকে দেখার দুটি মস্ত ব্যাঘাত আছে। পর্বত বা সরোবর বিরাজ করে অক্রিয় অর্থাৎ প্যাসিভ্ ভাবে; আমাদের সঙ্গে তাদের যে-ব্যবহার সেটা প্রাকৃতিক, তার মধ্যে মানসিক কিছু নেই, এইজন্যে মন তাকে সম্পূর্ণ অধিকার ক'রে আপন ভাবে ভাবিত করতে পারে সহজেই। কিন্তু, মানবসংসারের বাস্তব ঘটনাবলীর সঙ্গে আমাদের মনের যে-সম্পর্ক

ঘটে সেটা সক্রিয়। দুঃশাসনের হাতে কৌরবসভায় দ্রৌপদীর যে-অসম্মান ঘটেছিল তদনুরূপ ঘটনা যদি পাড়ায় ঘটে তা হলে তাকে আমরা মানবভাগ্যের বিরাট শোকাবহ লীলার অঙ্গরূপে বড়ো ক'রে দেখতে পারি নে। নিত্যঘটনাবলীর ক্ষুদ্র সীমায় বিচ্ছিন্ন একটা অন্যায় ব্যাপার ব'লেই তাকে জানি, সে একটা পুলিস-কেস রূপেই আমাদের চোখে পড়ে— ঘৃণার সঙ্গে ধিক্কারের সঙ্গে প্রাত্যহিক সংবাদ-আবর্জনার মধ্যে তাকে ঝেঁটিয়ে ফেলি। মহাভারতের খাণ্ডববন-দাহ বাস্তবতার একান্ত নৈকট্য থেকে বহু দূরে গেছে— সেই দূরত্ববশত সে অকর্তৃক হয়ে উঠেছে। মন তাকে তেমনি ক'রেই সম্ভোগদৃষ্টিতে দেখতে পারে যেমন ক'রে সে দেখে পর্বতকে সরোবরকে। কিন্তু, যদি খবর পাই, অগ্নিগিরিস্রাবে শত শত লোকালয় শস্যক্ষেত্র পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, দগ্ধ হচ্ছে শত শত মানুষ পশুপক্ষী, তবে সেটা আমাদের করুণা অধিকার ক'রে চিত্তকে পীড়িত করে। ঘটনা যখন বাস্তবের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে কল্পনার বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে উত্তীর্ণ হয় তখনই আমাদের মনের কাছে তার সাহিত্য হয় বিশুদ্ধ ও বাধাহীন।

মানবঘটনাকে সুস্পষ্ট ক'রে দেখবার আর-একটি ব্যাঘাত আছে। সংসারে অধিকাংশ স্থলেই ঘটনাগুলি সুসংলগ্ন হয় না, তার সমগ্রতা দেখতে পাই নে। আমাদের কল্পনার দৃষ্টি ঐক্যকে সন্ধান করে এবং ঐক্যস্থাপন করে। পাড়ায় কোনো দুঃশাসনের দৌরাত্ম্য হয়তো জেনেছি বা খবরের কাগজে পড়েছি। কিন্তু, এই ঘটনাটি তার পূর্ব-বর্তী পরবর্তী দূর-শাখা-প্রশাখাবর্তী একটা প্রকাণ্ড ট্রাজেডিকে অধিকার ক'রে হয়তো রয়েছে— আমাদের সামনে সেই ভূমিকাটি নেই— এই ঘটনাটি হয়তো সমস্ত বংশের মধ্যে পিতামাতার চরিত্রের ভিতর দিয়ে অতীতের মধ্যেও প্রসারিত, কিন্তু সে আমাদের কাছে অগোচর। আমরা তাকে দেখি টুকরো টুকরো ক'রে, মাঝখানে বহু অবান্তর বিষয় ও ব্যাপারের দ্বারা সে পরিচ্ছিন্ন; সমস্ত ঘটনাটির সম্পূর্ণতার পক্ষে তাদের কোন্‌গুলি সার্থক, কোন্‌গুলি নিরর্থক, তা আমরা বাছাই ক'রে নিতে পারি নে। এইজন্যে তার বৃহৎ তাৎপর্য ধরা পড়ে না। যাকে বলছি বৃহৎ তাৎপর্য তাকে যখন সমগ্র ক'রে দেখি তখনই সাহিত্যের দেখা সম্ভব হয়। ফরাসি-রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় প্রতিদিন যে-সকল খণ্ড খণ্ড ঘটনা ঘটছিল সেদিন তাদের চরম অর্থ কেই বা দেখতে পেয়েছে; কার্লাইল তাদের বাছাই ক'রে নিয়ে আপনার কল্পনার পটে সাজিয়ে একটি সমগ্রতার ভূমিকায় যখন দেখালেন, তখন আমাদের মন এই-সকল বিচ্ছিন্নকে নিরবচ্ছিন্নরূপে অধিকার করতে পেরে নিকটে পেলে। খাঁটি ইতিহাসের পক্ষ থেকে তাঁর বাছাইয়ে অনেক দোষ থাকতে পারে, অনেক অত্যুক্তি অনেক ঊনোক্তি হয়তো আছে এর মধ্যে; বিশুদ্ধ তথ্যবিচারের পক্ষে যে-সব দৃষ্টান্ত অত্যাবশ্যক তার হয়তো অনেক বাদ পড়ে গেছে।

কিন্তু, কার্লাইলের রচনায় যে সুনিবিড় সমগ্রতার ছবি আঁকা হয়েছে তার উপরে আমাদের মন অব্যবহিতভাবে যুক্ত ও ব্যাপ্ত হতে বাধা পায় না; এইজন্যে ইতিহাসের দিক থেকে যদি বা সে অসম্পূর্ণ হয় তবু সাহিত্যের দিক থেকে সে পরিপূর্ণ।

এই বর্তমানকালেই আমাদের দেশে চার দিকে খণ্ড খণ্ড ভাবে রাষ্ট্রিক উদ্যোগের নানা প্রয়াস নানা ঘটনায় উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে। ফৌজদারি শাসনতন্ত্রের বিশেষ বিশেষ আইনের কোঠায় তাদের বিবরণ শুনছি সংবাদপত্রের নানাজাতীয় আশুবিলীয়মান মর্মরধ্বনির মধ্যে। ভারতবর্ষের এ যুগের সমগ্র রাষ্ট্ররূপের মধ্যে, তাদের পূর্ণভাবে দেখবার সুযোগ হয় নি; যখন হবে তখন তারা মানুষের সমস্ত বীর্য, সমস্ত বেদনা, সমস্ত ব্যর্থতা বা সার্থকতা, সমস্ত ভুলত্রুটি নিয়ে সংবাদপত্রের ছায়ালোক থেকে উঠবে সাহিত্যের জ্যোতিষ্কলোকে। তখন জজ ম্যাজিস্ট্রেট, আইনের বই, পুলিসের যষ্টি, সমস্ত হবে গৌণ; তখন আজকের দিনের ছিন্নবিচ্ছিন্ন ছোটোবড়ো দ্বন্দ্ববিরোধ একটা বৃহৎ ভূমিকায় ঐক্য লাভ ক'রে নিত্যকালের মানবমনে বিরাটমূর্তিতে প্রত্যক্ষ হবার অধিকারী হবে।

মানুষের সঙ্গে মানুষের নানাবিধ সম্বন্ধ ও সংঘাত নিয়ে পৃথিবী জুড়ে আমাদের অভিজ্ঞতা বিচিত্র হয়ে চলেছে। সে একটা মানসজগৎ, বহু যুগের রচনা। তাকে আমরা নৃতত্ত্বের দিক থেকে, মনস্তত্ত্বের দিক থেকে, ঐতিহাসিক দিক থেকে, বিচার ক'রে মানুষের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে পারি। সে হল তথ্য-সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজ। কিন্তু, এই অভিজ্ঞতার জগতে আমরা প্রকাশবৈচিত্র্যবান মানুষের নৈকট্য কামনা করি। এই চাওয়াটা আমাদের মনে অত্যন্ত গভীর ও প্রবল। শিশুকাল থেকে মানুষ বলেছে 'গল্প বলো'; সেই গল্প তথ্যের প্রদর্শনী নয়, কোনো-একটা মানবপরিচয়ের সমগ্র ছবি, আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা দানা বেঁধেছে তার মধ্যে। রূপের মোহিনী শক্তি, বিপদের পথে বীরত্বের অধ্যবসায়, দুর্লভের সন্ধানে দুঃসাধ্য উদ্যম, মন্দের সঙ্গে ভালোর লড়াই, ভালোবাসার সাধনা, ঈর্ষায় তার বিঘ্ন, এ-সমস্ত হৃদয়বোধ নানা অবস্থায় নানা আকারে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে আছে; এর কোনোটা সুখের কোনোটা দুঃখের, এদের সাজিয়ে গল্পের ছবিতে রূপ দিয়ে রূপকথায় ছেলেদের জন্যে জোগানো হচ্ছে আদিকাল থেকে। এর মধ্যে অলৌকিক জীবের কথাও আছে, কিন্তু তারা মানুষেরই প্রতীক। আছে দৈত্য-দানব, বস্তুত তারা মানুষ; ব্যাঙমা-বেঙমি, তারাও তাই। এই-সব গল্পে মানুষের বাস্তব জগৎ কল্পনায় রূপান্তরিত হয়ে শিশুমনের জগৎ-রূপে দেখা দেয়; শিশু আনন্দিত হয়ে ওঠে। মানুষ যে স্বভাবত সৃষ্টিকর্তা তাই সে সব-কিছুকে আপন সৃষ্টিতে পরিণত ক'রে তাতে বাসা বাঁধে; নিছক বিধাতার সৃষ্টিতে তাকে কুলোয় না।

মানুষ আপন হাতে আপনাকে, আপন সংসারকে তৈরি ক'রে, সেই সংসারের ছবি বানায় আপন হাতে— তাতে তাকে নিবিড় আনন্দ দেয়, কেননা সেই ছবি তার মনের নিতান্ত কাছে আসে। যে-শকুন্তলার ঘটনা মানবসংসারে ঘটতে পারে তাকেই কবি আমাদের মনের কাছে নিবিড়তর সত্য ক'রে দেখিয়ে দেন। রামায়ণ রচিত হল, রচিত হল মহাভারত। রামকে পেলুম; সে তো একটি মাত্র মানুষের রূপ নয়, অনেক কাল থেকে অনেক মানুষের মধ্যে যে-সকল বিশেষ গুণের ক্ষণে ক্ষণে কিছু কিছু স্বাদ পাওয়া গেছে কবির মনে সে-সমস্তই দানা বেঁধে উঠল রামচন্দ্রের মূর্তিতে। রামচন্দ্র হয়ে উঠলেন আমাদের মনের মানুষ। বাস্তব সংসারে অনেক বিক্ষিপ্ত ভালো লোকের চেয়ে রামচন্দ্র আমাদের মনের কাছে সত্যমানুষ হয়ে ওঠেন। মন তাঁকে যেমন ক'রে স্বীকার করে প্রত্যক্ষ হাজার হাজার লোককে তেমন ক'রে স্বীকার করে না। মনের মানুষ বলতে যে বুঝতে হবে আদর্শ ভালো লোক তা নয়। সংসারে মন্দ লোকও আছে ছড়িয়ে, নানা-কিছুর সঙ্গে মিশিয়ে; আমাদের পাঁচ-মিশোলি অভিজ্ঞতার মধ্যে তাদের মন্দত্ব অসংলগ্ন হয়েই দেখা দেয়। সেই বহু লোকের বহুবিধ মন্দত্বের খণ্ড খণ্ড পরিচয় সংসারে আমাদের কাছে ক্ষণে ক্ষণে এসে পড়ে; তারা আসে, তারা যায়, তারা আঘাত করে, নানা ঘটনায় চাপা প'ড়ে তারা অগোচর হতে থাকে। সাহিত্যে তারা সংহত আকারে ঐক্য লাভ ক'রে আমাদের নিত্যমনের সামগ্রী হয়ে ওঠে; তখন তাদের আর ভুলতে পারি নে। শেক্স্‌পীয়রের রচিত ফল্‌স্‌টাফ্‌ একটি বিশিষ্ট মানুষ সন্দেহ নেই। তবু বলতে হবে, আমাদের অভিজ্ঞতায় অনেক মানুষের কিছু কিছু আভাস আছে, শেক্স্‌পীয়রের প্রতিভার গুণে তাদের সমবায় ঘনীভূত হয়েছে ফল্‌স্‌টাফ্‌ চরিত্রে। জোড়া লাগিয়ে তৈরি নয়, কল্পনার রসে জারিত ক'রে তার সৃষ্টি; তার সঙ্গে আমাদের মনের মিল খুব সহজ, এইজন্যে তাতে আমাদের আনন্দ।

এমন কথা মনে হতে পারে, সাবেক কালের কাব্য-নাটকে আমরা যাদের দেখতে পাই তারা এক-একটা টাইপ, তারা শ্রেণীগত; তাই তারা একই-জাতীয় অনেকগুলি মানুষের ভাঙাচোরা উপকরণ নিয়ে তৈরি। কিন্তু, আধুনিক কালে সাহিত্যে আমরা যে-চরিত্র দেখি তা ব্যক্তিগত।

প্রথম কথা এই যে, ব্যক্তিগত মানুষেরও শ্রেণীগত ভিত্তি আছে, একান্ত শ্রেণীবিচ্ছিন্ন মানুষ নেই। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে বহু মানুষ, আর সেই সঙ্গেই জড়িত হয়ে আছে সেই এক মানুষ যে বিশেষ। চরিত্রসৃষ্টিতে শ্রেণীকে লঘু ক'রে ব্যক্তিকেই যদিবা প্রাধান্য দিই তবু সেই ব্যক্তিকে আমাদের ধারণার সম্পূর্ণ অধিগম্য করতে হলে তাতে আর্টিস্টের হাত পড়া চাই। এই আর্টিস্টের সৃষ্টি প্রকৃতির সৃষ্টির ধারা অনুসরণ করে না।

এই সৃষ্টিতে যে-মানুষকে দেখি, প্রকৃতির হাতে যদি সে তৈরি হত তা হলে তার মধ্যে অনেক বাহুল্য থাকত; সে বাস্তব যদি হত তবু সত্য হত না, অর্থাৎ আমাদের হৃদয় তাকে নিঃসংশয় প্রামাণিক ব'লে মানত না। তার মধ্যে অনেক ফাঁক থাকত, অনেক-কিছু থাকত যা নিরর্থক, আগে-পিছের ওজন ঠিক থাকত না। তার ঐক্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হত না। শতদল পদ্মে যে-ঐক্য দেখে আমরা তাকে মুহূর্তেই বলি সুন্দর, তা সহজ— তার সংকীর্ণ বৈচিত্র্যের মধ্যে কোথাও পরস্পর দ্বন্দ্ব নেই, এমন-কিছু নেই যা অযথা; আমাদের হৃদয় তাকে অধিকার করতে পারে অনায়াসে, কোথাও বাধা পায় না। মানুষের সংসারে দ্বন্দ্ববহুল বৈচিত্র্য আমাদের উদ্‌ভ্রান্ত করে দেয়। যদি তার কোনো একটি প্রকাশকে স্পষ্টরূপে হৃদয়গম্য করতে হয় তা হলে আর্টিস্টের সুনিপুণ কল্পনা চাই। অর্থাৎ, বাস্তবে যা আছে বাইরে তাকে পরিণত ক'রে তুলতে হবে মনের জিনিস ক'রে। আর্টিস্টের সামনে উপকরণ আছে বিস্তর— সেগুলির মধ্যে গ্রহণ বর্জন করতে হবে কল্পনার নির্দেশমতো। তার কোনোটাকে বাড়াতে হবে, কোনোটাকে কমাতে; কোনোটাকে সামনে রাখতে হবে, কোনোটাকে পিছনে। বাস্তবে যা বাহুল্যের মধ্যে বিক্ষিপ্ত তাকে এমন ক'রে সংহত করতে হবে যাতে আমাদের মন তাকে সহজে গ্রহণ ক'রে তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। প্রকৃতির সৃষ্টির দূরত্ব থেকে মানুষের ভাষায় সেতু বেঁধে তাকে মর্মক্রম নৈকট্য দিতে হবে; সেই নৈকট্য ঘটায় ব'লেই সাহিত্যকে আমরা সাহিত্য বলি।

মানুষ যে-বিশ্বে জন্মেছে, তাকে দুই দিক থেকে কেবলই আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করছে, ব্যবহারের দিক থেকে আর ভাবের দিক থেকে। আগুন যেখানে প্রচ্ছন্ন সেখানে মানুষ জ্বালল আগুন নিজের হাতে; আকাশের আলো যেখানে অগোচর সেখানে সে বৈদ্যুতিক আলোকে প্রকাশ করলে নিজের কৌশলে; প্রকৃতি আপনি যে-ফলমূল-ফসল বরাদ্দ করে দিয়েছে তার অনিশ্চয়তা ও অসচ্ছলতা সে দূর করেছে নিজের লাঙলের চাষে; পর্বতে অরণ্যে গুহাগহ্বরে সে বাস করতে পারত, করে নি—সে নিজের সুবিধা ও রুচি অনুসারে আপন বাসা আপনি নির্মাণ করেছে। পৃথিবীকে সে অযাচিত পেয়েছিল। কিন্তু, সে পৃথিবী তার ইচ্ছার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল খায় নি; তাই আদিকাল থেকেই প্রাকৃতিক পৃথিবীকে মানব বুদ্ধিকৌশলে আপন ইচ্ছানুগত মানবিক পৃথিবী ক'রে তুলছে— সেজন্যে তার কত কলবল, কত নির্মাণনৈপুণ্য। এখানকার জলে স্থলে আকাশে পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ আপন ইচ্ছাকে প্রসারিত ক'রে দিচ্ছে। উপকরণ পাচ্ছে সেই পৃথিবীরই কাছ থেকে, শক্তি ধার করছে তারই গুপ্ত ভাণ্ডারে প্রবেশ ক'রে। সেগুলিকে আপন পথে আপন মতে চালনা ক'রে পৃথিবীর রূপান্তর ঘটিয়ে

দিচ্ছে। মানুষের নগরপল্লী, শস্যক্ষেত্র, উদ্যান, হাট-ঘাট, যাতায়াতের পথ, প্রকৃতির সহজ অবস্থাকে ছাপিয়ে স্বতন্ত্র হয়ে উঠছে। পৃথিবীর নানা দেশে ছড়ানো ধনকে মানুষ এক করেছে, নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত শক্তিকে সে সংহত করেছে; এমনি করে দেশ-দেশান্তরে পৃথিবী ক্রমশই অভিভূত হয়ে আত্মসমর্পণ করে আসছে মানুষের কাছে। মানুষের বিশ্বজয়ের এই একটা পালা বস্তুজগতে; ভাবের জগতে তার আছে আর-একটা পালা। ব্যাবহারিক বিজ্ঞানে এক দিকে তার জয়স্তম্ভ, আর-এক দিকে শিল্পে সাহিত্যে।

যে-দিন থেকে মানুষের হাত পেয়েছে নৈপুণ্য, তার ভাষা পেয়েছে অর্থ, সেই দিন থেকেই মানুষ তার ইন্দ্রিয়বোধগম্য জগৎ থেকে নানা উপাদানে উদ্ভাবিত করছে তার ভাবগম্য জগৎকে। তার স্বরচিত ব্যাবহারিক জগতে যেমন এখানেও তেমনি; অর্থাৎ তার চার দিকে যা-তা যেমন-তেমন ভাবে রয়েছে তাকেই সে অগত্যা স্বীকার করে নেয় নি। কল্পনা দিয়ে তাকে এমন রূপ দিয়েছে, হৃদয় দিয়ে তাতে এমন রস দিয়েছে, যাতে সে মানুষের মনের জিনিস হয়ে তাকে দিতে পারে আনন্দ।

ভাবের জগৎ বলতে আমরা কী বুঝি। হৃদয় যাকে উপলব্ধি করে বিশেষ রসের যোগে; অনতিলক্ষ্য বহু অবিশেষের মধ্য থেকে কল্পনার দৃষ্টিতে যাকে আমরা বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করি; সেই উপলব্ধি করা, সেই লক্ষ্য করাটাই যেখানে চরম বিষয়। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলছি, জ্যোৎস্নারাত্রি। সে রাত্রির বিশেষ একটি রস আছে, মনকে তা অধিকার করে। শুধু রস নয়, রূপ আছে তার— দেখি তা কল্পনার চোখে। গাছের ডালে, বনের পথে, বাড়ির ছাদে, পুকুরের জলে নানা ভঙ্গিতে তার আলোছায়ার কোলাকুলি। সেই সঙ্গে নানা ধ্বনির মিলন—পাখির বাসায় হঠাৎ পাখা ঝাড়ার শব্দ, বাতাসে বাঁশপাতার ঝর্‌ঝরানি, অন্ধকারে আচ্ছন্ন ঝোপের মধ্য থেকে উঠছে ঝিল্লিধ্বনি, নদী থেকে শোনা যায় ডিঙি চলেছে তারই দাঁড়ের ঝপ্‌ঝপ্‌, দূরে কোন্ বাড়িতে কুকুরের ডাক। বাতাসে অদেখা অজানা ফুলের মৃদু গন্ধ যেন পা টিপে টিপে চলেছে, কখনো তারই মাঝে মাঝে নিশ্বসিত হয়ে উঠছে জানা ফুলের পরিচয়। বহুপ্রকারের স্পষ্ট ও অস্পষ্টকে এক ক'রে নিয়ে জ্যোৎস্নারাত্রির একটা স্বরূপ দেখতে পায় আমাদের কল্পনার দৃষ্টি। এই কল্পনাদৃষ্টিতে বিশেষ ক'রে সমগ্র ক'রে দেখার জ্যোৎস্নারাত্রি মানুষের হৃদয়ের খুব কাছাকাছি জিনিস। তাকে নিয়ে মানুষের সেই অত্যন্ত কাছে পাওয়ার, মিলে যাওয়ার আনন্দ।

গোলাপ-ফুল অসামান্য; সে আপন সৌন্দর্যেই আমাদের কাছে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে, সে স্বতই আমাদের মনের সামগ্রী। কিন্তু, যা সামান্য, যা অসুন্দর, তাকে আমাদের মন কল্পনার ঐক্যদৃষ্টিতে বিশিষ্ট ক'রে দেখাতে পারে; বাইরে থেকে তাকে আতিথ্য দিতে পারে ভিতরের মহলে। জঞ্জালে-আবিষ্ট ভাঙা ফেটে পাঁচিলের গা থেকে বাস্‌দি বুড়ি

বিকেলের পড়ন্ত রৌদ্রে ঘুঁটে সংগ্রহ ক'রে আপন ঝুড়িতে তুলছে, আর পিছনে পিছনে তার পোষা নেড়ি কুকুরটা লাফালাফি ক'রে বিরক্ত করছে— এই ব্যাপারটি যদি বিশিষ্ট স্বরূপ নিয়ে আমাদের চোখে পড়ে, এ'কে যদি তথ্যমাত্রের সামান্যতা থেকে পৃথক ক'রে এর নিজের অস্তিত্বগৌরবে দেখি, তা হলে এও জায়গা নেবে ভাবের নিত্যজগতে।

বস্তুত, আর্টিস্‌ট্‌রা বিশেষ আনন্দ পায় এইরকম সৃষ্টিতেই। যা সহজেই সাধারণের চোখ ভোলায় তাতে তার নিজের সৃষ্টির গৌরব জোর পায় না। যা আপনিই ডাক দেয় না তার মুখে সে আমন্ত্রণ জাগিয়ে তোলে; বিধাতার হাতের পাস্‌পোর্ট্‌ নেই যার কাছে তাকে সে উত্তীর্ণ ক'রে দেয় মনোলোকে। অনেক সময় বড়ো আর্টিস্ট্‌ অবজ্ঞা করে সহজ মনোহরকে আপন সৃষ্টিতে ব্যবহার করতে। মানুষ বস্তুজগতের উপর আপন বুদ্ধিকৌশল বিস্তার ক'রে নিজের জীবনযাত্রার একান্ত অনুগত একটি ব্যাবহারিক জগৎ সর্বদাই তৈরি করতে লেগেছে। তেমনি মানুষ আপন ইন্দ্রিয়বোধের জগৎকে পরিব্যাপ্ত ক'রে বিচিত্র কলাকৌশলে আপন ভাবরসভোগের জগৎ সৃষ্টি করতে প্রবৃত্ত। সেই তার সাহিত্য। ব্যাবহারিক বুদ্ধিনৈপুণ্যে মানুষ কলে বলে কৌশলে বিশ্বকে আপন হাতে পায়, আর কলানৈপুণ্যে কল্পনাশক্তিতে বিশ্বকে সে আপন কাছে পায়। প্রয়োজনসাধনে এর মূল্য নয়; এর মূল্য আত্মীয়তাসাধনে, সাহিত্যসাধনে।

একবার সেকালের দিকে তাকিয়ে দেখা যাক। সাহিত্যসাধনা সম্বন্ধে তখনকার দিনের মনোভাবের পরিচয় আছে একটি কাহিনীতে; সেটা আলোচনার যোগ্য। ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্যে একটিকে ব্যাধ যখন হত্যা করলে তখন ঘৃণার আবেগে কবির কণ্ঠ থেকে অনুষ্টুভ ছন্দ সহসা উচ্চারিত হল।

কল্পনা করা যাক, বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে সৃষ্টিকর্তার ধ্যানে সহসা জ্যোতি উঠল জেগে। এই জ্যোতির আছে অফুরান বেগ, আছে প্রকাশশক্তি। স্বতই প্রশ্ন উঠল, অনন্তের মধ্যে এই জ্যোতি নিয়ে কী করা যাবে। তারই উত্তরে জ্যোতিরাত্মক অণুপরমাণুর সংঘ নিত্য-অভিব্যক্ত বিচিত্র রূপ ধরে আকাশে আকাশে আবর্তিত হয়ে চলল— এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহিমা সেই আদিজ্যোতিরই উপযুক্ত।

কবিঋষির মনে যখন সহসা সেই বেগবান শক্তিমান ছন্দের আবির্ভাব হল তখন স্বতই প্রশ্ন জাগল, এরই উপযুক্ত সৃষ্টি হওয়া চাই। তারই উত্তরে রচিত হল রামচরিত। অর্থাৎ, এমন-কিছু যা নিত্যতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হবার যোগ্য। যার সান্নিধ্য অর্থাৎ যার সাহিত্য মানুষের কাছে আদরণীয়।

মানুষের নির্মাণশক্তি বলশালী, আশ্চর্য তার নৈপুণ্য। এই শক্তি নিয়ে, এই নৈপুণ্য নিয়ে, সে বড়ো বড়ো নগর নির্মাণ করেছে। এই নগরের মূর্তি যেন মানুষের গৌরব

করবার যোগ্য হয়, এ কথা সেই জাতির মানুষ না ইচ্ছা ক'রে থাকতে পারে নি যাদের শক্তি আছে, যাদের আত্মসম্মানবোধ আছে, যারা সভ্য। সাধারণত সেই ইচ্ছা থাকা-সত্ত্বেও নানা রিপু এসে ব্যাঘাত ঘটায়— মুনফা করবার লোভ আছে, সস্তায় কাজ সারবার কৃপণতা আছে, দরিদ্রের প্রতি ধনী কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য আছে, অশিক্ষিত বিকৃতিরুচি বর্বরতাও এসে পড়ে এর মধ্যে; তাই নির্লজ্জ নির্মমতায় কুৎসিত পাটকল উঠে দাঁড়ায় গঙ্গাতীরের পবিত্র শ্যামলতাকে পদদলিত ক'রে, তাই প্রাসাদশ্রেণীর অন্তরালে নানাজাতীয় দুর্দৃশ্য বস্তিপাড়া অস্বাস্থ্য ও অশোভনতাকে পালন করতে থাকে আপন কলুষিত আশ্রয়ে, যেমন-তেমন কদর্যভাবে যেখানে-সেখানে ঘরবাড়ি তেলকল নোংরা-দোকান গলিঘুঁজি চোখের ও মনের পীড়া বিস্তারপূর্বক দেশে ও কালে আপন স্বত্বাধিকার পাকা করতে থাকে। কিন্তু, রিপুর প্রবলতা ও অক্ষমতার নিদর্শনস্বরূপে এই-সমস্ত ব্যত্যয়কে স্বীকার ক'রে তবুও মোটের উপরে এ কথা মানতে হবে যে, সমস্ত শহরটা শহরবাসীর গৌরব করবার উপযুক্ত যাতে হয় এই ইচ্ছাটাই সত্য। কেউ বলবে না, শহরের সত্য তার কদর্য বিকৃতিগুলো। কেননা, শহরের সঙ্গে শহরবাসীর অত্যন্ত নিকটের যোগ; সে যোগ স্থায়ী যোগ, সে-যোগ আত্মীয়তার যোগ, এমন যোগ নয় যাতে তার আত্মাবমাননা।

সাহিত্য সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই বলা চলে। তার মধ্যে রিপুর আক্রমণ এসে পড়ে, ভিতরে ভিতরে দুর্বলতার নানা চিহ্ন দেখা দিতে থাকে, মলিনতার কলঙ্ক লাগতে থাকে যেখানে সেখানে; কিন্তু, তবু সকল হীনতা-দীনতাকে ছাড়িয়ে উঠে যে-সাহিত্যে সমগ্র ভাবে মানুষের মহিমা প্রকাশ না হয় তাকে নিয়ে গৌরব করা চলবে না, কেননা সাহিত্যে মানুষ আপনারই সঙ্গকে, আপনার সাহিত্যকে প্রকাশ করে স্থায়িত্বের উপাদানে। কেননা চিরকালের মানুষ বাস্তব নয়, চিরকালের মানুষ ভাবুক; চিরকালের মানুষের মনে যে-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে কাজ করেছে তা অভ্রভেদী, তা স্বর্গাভিমুখী, তা অপরাহত পৌরুষের তেজে জ্যোতির্ময়। সাহিত্যে সেই পরিচয়ের ক্ষীণতা যদি কোনো ইতিহাসে দেখা যায় তা হলে লজ্জা পেতে হবে; কেননা সাহিত্যে মানুষ নিজেরই অন্তরতম পরিচয় দেয় নিজের অগোচরে, যেমন পরিচয় দেয় ফুল তার গন্ধে, নক্ষত্র তার আলোকে। এই পরিচয় সমস্ত জাতির জীবনযজ্ঞে জ্বালিয়ে তোলা অগ্নিশিখার মতো; তারই থেকে জ্বলে তার ভাবীকালের পথের মশাল, তার ভাবীকালের গৃহের প্রদীপ।

শান্তিনিকেতন

১২. ৭. ৩৪

পরিশিষ্ট

সভাপতির অভিভাষণ

সাহিত্যসাধনার ভিন্ন ভিন্ন মার্গ আছে। একটি হচ্ছে কর্মকাণ্ড। সভাসমিতির সভাপতিত্ব করে দরবার জমানো, গ্রন্থাবলী সম্পাদন করা, সংবাদপত্র পরিচালনা করা, এগুলি হল কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত। এই মার্গের যাঁরা পথিক তাঁরা জানেন কেমন করে স্বচ্ছন্দে সাহিত্যসংসারের কাজ চালাতে হয়। তার পরের মার্গ হচ্ছে জ্ঞানকাণ্ড, যেমন ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, দর্শন প্রভৃতির আলোচনা। এর দ্বারাও সাহিত্যিক সভা জমিয়ে তুলে কীর্তিখ্যাতি হাততালি লাভ করা যায়।

আমি শিশুকাল থেকেই এই উভয় মার্গ থেকে ভ্রষ্ট। এখন বাকি রইল আর-এক মার্গ, সেটি হচ্ছে রসমার্গ। এই মার্গ অবলম্বন করে রসসাহিত্যের আলোচনা, আমি পারি বা না পারি, করে যে এসেছি সে কথা আর গোপন রইল না। বহুকাল পূর্বে নির্জনে বিরলপথে এই রসাভিসারে বার হয়েছিলুম, দূরে বংশীধ্বনি শুনতে পেয়ে। কিন্তু, এই অভিসারপথ যে নিকটের লোকনিন্দা ও লাঞ্ছনার দ্বারা দুর্গম, তা যাঁরা রসচর্চা করেছেন তাঁরাই জানেন।

ঘরের সীমা হতে, প্রয়োজনের শাসন থেকে, অনেক দূরে বের করে নিয়ে যায় যে-তান সেই তান কানে এসে পৌচেছিল, তাই নিকটের বাধা সত্ত্বেও বাহির হতে হয়েছিল। তাই আজ এত বয়স পর্যন্ত বংশীধ্বনি ও গঞ্জনা দুই-ই শুনে এসেছি। যে-পথে চলে-ছিলাম তা হাট-ঘাটের পথ নয়। তাই আমি নিয়মের রাজ্যের ব্যবস্থা ভালো বুঝি নে। রসমার্গের পথিককে পদে পদে নিয়ম লঙ্ঘন করে চলতে হয়, সেই কু-অভ্যাসটি আমার অস্থিমজ্জাগত। তাই নিয়মের ক্ষেত্রে আমাকে টেনে আনলে আমি কর্মের সৌষ্ঠব রক্ষা করতে পারি নে।

তবে কেন সভাপতির পদ গ্রহণ করতে রাজি হওয়া। এর প্রথম কারণ হচ্ছে যে, যিনি[১] আমাকে এই পদে আহ্বান করেন তিনি আমার সম্মানার্হ, তাঁর নিমন্ত্রণ আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারি নি।

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে যে, বাংলার বাইরে বাঙালির আহ্বান যখন আমার কাছে পৌচল, তখন আমি সে আমন্ত্রণ নাড়ীর টানে অস্বীকার করতে পারি নি। এই ডাক শুনে আমার মন কী বলেছিল, আজকার অভিভাষণে সেই কথাটাই সবিস্তারে জানাব।

আজ যেমন বসন্ত-উৎসবের দিনে দক্ষিণসমীরণের অভ্যর্থনায় বিশ্বপ্রকৃতি পুলকিত

১ প্রমথনাথ তর্কভূষণ, সম্মিলনের অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি

হয়ে উঠেছে, ধরণীর বক্ষে নবকিশলয়ের উৎস উৎসারিত হয়েছে, আজকার সাহিত্য-সম্মিলনের উৎসবে তেমনি একটি বসন্তেরই ডাক আছে। এ ডাক আজকের ডাক নয়।

কত কাল হল একদা একটি প্রাণসমীরণের হিল্লোল বঙ্গদেশের চিত্তের উপর দিয়ে বয়ে গেল, আর দেখতে দেখতে সাহিত্যের মুদ্রিত দলগুলি বাধাবন্ধ বিদীর্ণ করে বিকশিত হয়ে উঠল। বাধাও ছিল বিস্তর। ইংরাজিসাহিত্যের রসমত্ততায় নূতন মাতাল ইংরাজি-শিক্ষিত ছাত্রেরা সেদিন বঙ্গভাষাকে অবজ্ঞা করেছিল। আবার সংস্কৃতসাহিত্যের ঐশ্বর্যগর্বে গর্বিত সংস্কৃত পণ্ডিতেরাও মাতৃভাষাকে অবহেলা করতে ত্রুটি করেন নি। কিন্তু, বহুকালের উপেক্ষিত ভিখারি মেয়ে যেমন বাহিরের সমস্ত অকিঞ্চনতা সত্ত্বেও হঠাৎ একদিন নিজের অন্তর হতে উন্মেষিত যৌবনের পরিপূর্ণতায় অপরূপ গৌরবে বিশ্বের সৌন্দর্যলোকে আপন আসন অধিকার করে, অনাদৃত বাংলাভাষা তেমনি করে একদিন সহসা কোন্ ভাবাবেগের ঔৎসুক্যে আপন বহুদিনের দীনতার কূল ছাপিয়ে দিয়ে মহিমান্বিত হয়ে উঠল। তার সেদিনকার সেই দৈন্যবিজয়ী ভাবযৌবনের স্বরূপটিকেই আজকার নিমন্ত্রণপত্র আমার স্মৃতিমন্দিরে বহন করে এনেছে।

মানুষের পরিচয় তখনই সম্পূর্ণ হয় যখন সে যথার্থভাবে আপনাকে প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু, প্রকাশ তো একান্ত নিজের মধ্যে হতে পারে না। প্রকাশ হচ্ছে নিজের সঙ্গে অন্য-সকলের সত্য সম্বন্ধে। ঐক্য একের মধ্যে নয়, অনেকের মধ্যে সম্বন্ধের ঐক্যই ঐক্য। সেই ঐক্যের ব্যাপ্তি ও সত্যতা নিয়েই, কি ব্যক্তিবিশেষের কি সমূহবিশেষের যথার্থ পরিচয়। এই ঐক্যকে ব্যাপক ক'রে, গভীর ক'রে পেলেই আমাদের সার্থকতা।

ভূবিবরণের অর্থগত যে-বাংলা তার মধ্যে কোনো গভীর ঐক্যকে পাই না, কেননা বাংলাদেশ কেবল মৃণ্ময় পদার্থ নয়, তা চিন্ময়ও বটে। তা যে কেবল বিশ্বপ্রকৃতিতে আছে তা নয়, তার চেয়ে সত্যরূপে আমাদের চিৎলোকে আছে। মনে রাখতে হবে যে, অনেক পশুপক্ষীও বাংলার মাটিতে জন্মেছে। অথচ রয়েল বেঙ্গল টাইগারের হৃদয়ের মধ্যে বাঙালির সঙ্গে একাত্মিকতার বোধ আত্মীয়তার রসযুক্ত নয় বলেই বাঙালিকে ভক্ষণ করতে তার যেমন আনন্দ তেমন আর কিছুতে নয়। কোনো সাধারণ ভূখণ্ডে জন্মলাভ নামক ব্যাপারের মধ্য দিয়েই কোনো মানুষের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় না।

তার পর মানুষ জাতিগত ঐক্যের মধ্য দিয়েও আপন পরিচয়কে ব্যক্ত করতে চেয়েছে। যে সব মানুষ স্বনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রীয় বিধিবিধানের যোগে এমন একটি রাজতন্ত্র রচনা করে যার দ্বারা পররাজ্যের সঙ্গে স্বরাজ্যের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারে, এবং সেই স্বরাজ্যসীমায় শাসন ও পরস্পর সহকারিতার দ্বারা নিজেদের সর্বজনীন স্বার্থকে নিয়মে

বিস্তৃত ও বিস্তীর্ণ করতে পারে, তারাই হল এক নেশন। তাদের মধ্যে অন্য যতরকম ভেদ থাক্ তাতে কিছুই আসে যায় না। বাঙালিকে নেশন বলা যায় না, কেননা বাঙালি এখনো আপন রাষ্ট্রীয় ভাগ্যবিধাতা হয়ে ওঠে নি। অপর দিকে সামাজিক ধর্ম-সম্প্রদায়-গত ঐক্যের মধ্যেও বিশেষ দেশের অধিবাসী আত্মপরিচয় দিতে পারে; যেমন, বলতে পারে, আমরা হিন্দু, বা মুসলমান। কিন্তু বলা বাহুল্য, এ সম্বন্ধেও বাংলায় অনৈক্য রয়েছে। তেমনি বর্ণভেদ হিসাবে যে-জাতি সেখানেও বাংলায় ভেদের অন্ত নেই। তার পরে বিজ্ঞানবাদ-অনুসারে বংশগত যে-জাতি তার নির্ণয় করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা মানুষের দৈর্ঘ্য, বর্ণ, নাকের উচ্চতা, মাথার বেড় প্রভৃতি নানা বৈচিত্র্যের মাপজোখ করে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। সে-হিসাবে আমরা বাঙালিরা যে কোন্ বংশে জন্মেছি, পণ্ডিতের মত নিয়ে তা ভাবতে গেলে দিশেহারা হয়ে যেতে হবে।

জন্মলাভের দ্বারা আমরা একটা প্রকাশলাভ করি। এই প্রকাশের পূর্ণতা জীবনের পূর্ণতা। রোগতাপ দুর্বলতা অনশন প্রভৃতি বাধা কাটিয়ে যতই সম্পূর্ণরূপে জীবধর্ম পালন করতে পারি ততই আমার জৈব ব্যক্তিত্বের বিকাশ। আমার এই জৈব-প্রকাশের আধার হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতি।

কিন্তু, জলস্থল-আকাশ-আলোকের সম্বন্ধসূত্রে বিশ্বলোকে আমাদের যে-প্রকাশ সেই তো আমাদের একমাত্র প্রকাশ নয়। আমরা মানুষের চিত্তলোকেও জন্মগ্রহণ করেছি। সেই সর্বজনীন চিত্তলোকের সঙ্গে সম্বন্ধযোগে ব্যক্তিগত চিত্তের পূর্ণতা দ্বারা আমাদের চিন্ময় প্রকাশ পূর্ণ হয়। এই চিন্ময় প্রকাশের বাহন হচ্ছে ভাষা। ভাষা না থাকলে পরস্পরের সঙ্গে মানুষের অন্তরের সম্বন্ধ অত্যন্ত সংকীর্ণ হত।

তাই বলছি, বাঙালি বাংলাদেশে জন্মেছে বলেই যে বাঙালি তা নয়; বাংলাভাষার ভিতর দিয়ে মানুষের চিত্তলোকে যাতায়াতের বিশেষ অধিকার পেয়েছে বলেই সে বাঙালি। ভাষা আত্মীয়তার আধার, তা মানুষের জৈব-প্রকৃতির চেয়ে অন্তরতর। আজকার দিনে মাতৃভাষার গৌরববোধ বাঙালির পক্ষে অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হয়েছে; কারণ, ভাষার মধ্যে দিয়ে তাদের পরস্পরের পরিচয়সাধন হতে পেরেছে এবং অপরকেও তারা আপনার যথার্থ পরিচয় দান করতে পারছে।

মানুষের প্রকাশের দুই পিঠ আছে। এক পিঠে তার স্বানুভূতি; আর-এক পিঠে অন্য সকলের কাছে আপনাকে জানানো। সে যদি অগোচর হয় তবে সে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হয়ে যায়। যদি নিজের কাছেই তার প্রকাশ ক্ষীণ হল তবে সে অন্যের কাছেও নিজেকে গোচর করতে পারল না। যেখানে তার অগোচরতা সেখানেই সে

ক্ষুদ্র হয়ে রইল। আর যেখানে সে আপনাকে প্রকাশ করতে পারল সেখানেই তার মহত্ত্ব পরিস্ফুট হল।

এই পরিচয়ের সফলতা লাভ করতে হলে ভাষা সবল ও সতেজ হওয়া চাই। ভাষা যদি অস্বচ্ছ হয়, দরিদ্র হয়, জড়তাগ্রস্ত হয়, তা হলে মনোবিশ্বে মানুষের যে-প্রকাশ তা অসম্পূর্ণ হয়। বাংলাভাষা এক সময়ে গেঁয়োরকমের ছিল। তার সহযোগে তত্ত্বকথা ও গভীর ভাব প্রকাশ করবার অনেক বাধা ছিল। তাই বাঙালিকে সেদিন সকলে গ্রাম্য বলে জেনেছিল। তাই যাঁরা সংস্কৃতভাষার চর্চা করেছিলেন এবং সংস্কৃতশাস্ত্রের মধ্য দিয়ে বিশ্বসত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন তাঁরা বঙ্গভাষায় একান্ত-আবদ্ধ চিত্তের সম্মান করতে পারেন নি। বাংলার পাঁচালি-সাহিত্য ও পয়ারের কথা তাঁদের কাছে নগণ্য ছিল। অনাদরের ফল কী হয়। অনাদৃত মানুষ নিজেকে অনাদরণীয় বলে বিশ্বাস করে; মনে করে, স্বভাবতই সে জ্যোতির্হীন। কিন্তু, এ কথাটা তো গভীর ভাবে সত্য নয়; আত্মপ্রকাশের অভাবেই তার আত্মবিস্মৃতি। যখন সে আপনাকে প্রকাশ করবার উপযুক্ত উপলক্ষ্য পায় তখন সে আর আপনার কাছে আপনি প্রচ্ছন্ন থাকে না। উপযুক্ত আধারটি না পেলে প্রদীপ আপনার শিখা সম্বন্ধে আপনি অন্ধ থাকে। অতএব, যে-হেতু মানুষের আত্মপ্রকাশের প্রধান বাহন হচ্ছে তার ভাষা তাই তার সকলের চেয়ে বড়ো কাজ— ভাষার দৈন্য দূর করে আপনার যথার্থ পরিচয় লাভ করা এবং সেই পূর্ণ পরিচয়টি বিশ্বের সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করা। আমার মনে পড়ে, আমাদের বাল্যকালে বাংলাদেশে একদিন ভাবের তাপস বঙ্কিমচন্দ্র কোন্ এক উদ্‌বোধনমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, তাতে হঠাৎ যেন বহু দিনের কৃষ্ণপক্ষ তার কালো পৃষ্ঠা উল্‌টিয়ে দিয়ে শুক্লপক্ষরূপে আবির্ভূত হল। তখন যে-সম্পদ আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল শুধু তার জন্যেই যে আমাদের আনন্দ ছিল তা নয়। কিন্তু, হঠাৎ সম্মুখে দেখা গেল, একটি অপরিসীম আশার ক্ষেত্র বিস্তারিত। কী যে হবে, কত যে পাব, ভাবীকাল যে কোন্ অভাবনীয়কে বহন করে আনবে, সেই ঔৎসুক্যে মন ভরে উঠল।

এই-যে মনে অনুভূতি জাগে যে, সৌভাগ্যের বুঝি কোথাও শেষ নেই, এই-যে হৃৎস্পন্দনের মধ্যে আগন্তুক অসীমের পদশব্দ শুনতে পাওয়া যায়, এতেই সৃষ্টিকার্য অগ্রসর হয়। সকল বিভাগেই এই ব্যাপারটি ঘটে থাকে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে একদিন বাঙালির এবং ভারতবাসীর আশা সংকীর্ণ সীমায় বদ্ধ ছিল। তাই কংগ্রেস মনে করেছিল যে, যতটুকু ইংরাজ হাতে তুলে দেবে সেই প্রসাদটুকু লাভ করেই বড়ো হওয়া যাবে। কিন্তু, এই সীমাবদ্ধ আশা যেদিন ঘুচে গেল সেদিন মনে হল যে, আমার আপনার মধ্যে যে-

শক্তি আছে তার দ্বারাই দেশের সকল সম্পদকে আবাহন করে আনতে পারব। এইরূপ অসীম আশার দ্বারাই অসাধ্য সাধন হয়। আশাকে নিগড়বদ্ধ করলে কোনো বড়ো কাজ হয় না। বাঙালি কোথায় এই অসীমতার পরিচয় পেয়েছে। সেখানেই যেখানে নিজের জগৎকে নিজে সৃষ্টি করে তার মধ্যে বিরাজ করতে পেরেছে। মানুষ নিজের জগতে বিহার করতে না পারলে, পরান্নভোজী পরাবসথশায়ী হলে তার আর দুঃখের অন্ত থাকে না। তাই তো কথা আছে, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ। আমার যা ধর্ম তাই আমার সৃষ্টির মূলশক্তি, আমিই স্বয়ং আমার আশ্রয়স্থল তৈরি করে তার মধ্যে বিরাজ করব। প্রত্যেক জাতির স্বকীয় সৃষ্টি তার স্বকীয় প্রকৃতি অনুসারে বিচিত্র আকার ধারণ করে থাকে। সে রাষ্ট্র, সমাজ, সাহিত্য, শিল্পকলা প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে আপন জগৎকে বিশেষভাবে রচনা ক'রে তাতে সঞ্চরণ করার অধিকার লাভ করে থাকে। বাঙালিজাতি তার আনন্দময় সত্তাকে প্রকাশ করবার একমাত্র ক্ষেত্র লাভ করেছে বাংলাভাষার মধ্যে। সেই ভাষাতে একদা এমন এক শক্তির সঞ্চার হয়েছিল যাতে করে সে নানা রচনারূপের মধ্যে যেন অসম্বৃত হয়ে উঠেছিল; বীজ যেমন আপন প্রাণশক্তির উদ্‌বেলতায় নিজের আবরণ বিদীর্ণ করে অঙ্কুরকে উদ্ভিন্ন করে তেমনি আর কি। যদি তার এই শক্তি নিতান্ত ক্ষীণ হত তবে তার সাহিত্য ভালো করে আত্মসমর্থন করতে পারত না। বিদেশ থেকে বন্যার স্রোতের মতো আগত ভাবধারা তাকে ধুয়ে মুছে দিত।

এমন বিলুপ্তির পরিচয় আমরা অন্যত্র পেয়েছি। ভারতবর্ষের অন্য অনেক জায়গায় ইংরাজি-চর্চা খুব প্রবল। সেখানে ইংরাজিভাষায় স্বজাতীয়ের মধ্যে, পরমাত্মীয়ের মধ্যে পত্রব্যবহার হয়ে থাকে। এমন দৈন্যদশা যে, পিতাপুত্রের পরস্পরের মধ্যে শুধু ভাবের নয় সামান্য সংবাদের আদানপ্রদানও বিদেশী ভাষার সহায়তায় ঘটে। রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের আগ্রহ প্রকাশ করে যে-মুখে বলে বন্দেমাতরম্ সেই মুখেই মাতৃদত্ত পরম অধিকার যে মাতৃভাষা তার অসম্মান করতে মনে কোনো আক্ষেপ বোধ করে না।

বাংলাদেশেও যে এই আত্মাবমাননার লক্ষণ একেবারে নেই তা বলতে পারি নে। তবে কিনা এ সম্বন্ধে বাঙালির মনে একটা লজ্জার বোধ জন্মেছে। আজকের দিনে বাঙালির ডাকঘরের রাস্তায় বাংলা চিঠিরই ভিড় সব চেয়ে বেশি।

বাস্তবিক মাতৃভাষার প্রতি যদি সম্মানবোধ জন্মে থাকে তবে স্বদেশীকে আত্মীয়কে ইংরাজি লেখার মতো কুকীর্তি কেউ করতে পারে না।

এক সময়ে বাংলাদেশে এমন হয়েছিল যে, ইংরাজি কাব্য লিখতে লোকের আগ্রহের সীমা ছিল না। তখন ইংরাজি রচনা, ইংরাজি বক্তৃতা, অসামান্য গৌরবের বিষয় ছিল।

আজকাল আবার বাংলাদেশে তারই পাল্টা ব্যাপার ঘটছে। এখন কেউ কেউ আক্ষেপ করে থাকেন যে, মাদ্রাজিরা বাঙালিদের চেয়ে ভালো ইংরাজি বলতে পারে। এই অপবাদ যেন আমরা মাথার মুকুট করে পরি।

আজকে প্রবাসের এই বঙ্গসাহিত্যসম্মিলনী হঠাৎ আত্মপ্রকাশের জন্য উৎসুক হয়েছে; এই আগ্রহের কারণ হচ্ছে, বাঙালি আপন প্রাণ দিয়ে একটি প্রাণবান্ সাহিত্যকে গড়ে তুলেছে। যেখানে বাংলার শুধু ভৌগোলিক অধিকার সেখানে সে মানচিত্রের সীমাপরিধিকে ছাড়াতে পারে না। সেখানে তার দেশ বিধাতার সৃষ্ট দেশ; সম্পূর্ণ তার স্বদেশ নয়। কিন্তু, ভাষা-বসুন্ধরাকে আশ্রয় করে যে মানসদেশে তার চিত্ত বিরাজ করে সেই দেশ তার ভূসীমানার দ্বারা বাধাগ্রস্ত নয়, সেই দেশ তার স্বজাতির সৃষ্ট দেশ। আজ বাঙালি সেই দেশটিকে নদী প্রান্তর পর্বত অতিক্রম করে সুদূর-প্রসারিতরূপে দেখতে পাচ্ছে, তাই বাংলার সীমার মধ্য থেকে বাংলার সীমার বাহির পর্যন্ত তার আনন্দ বিস্তীর্ণ হচ্ছে। খণ্ড দেশকালের বাহিরে সে আপন চিত্তের অধিকারকে উপলব্ধি করছে।

ইতিহাস পড়লে জানা যায় যে, ইংলণ্ডে ও স্কট্‌লণ্ডে এক সময়ে বিরোধের অন্ত ছিল না। এই দ্বন্দ্বের সমাধান কেমন করে হয়েছিল। শুধু কোনো একজন স্কট্‌ল্যাণ্ডের রাজপুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে তা হয় নি। আসলে যখন চ্যসার প্রভৃতি কবিদের সময়ে ইংরাজি ভাষা সাহিত্যসম্পদশালী হয়ে উঠল তখন তার প্রভাব বিস্তৃত হয়ে স্কট্‌লণ্ডকে আকৃষ্ট করেছিল। সে-ভাষা আপন ঐশ্বর্যের শক্তিতে স্কট্‌ল্যাণ্ডের বরমাল্য অধিকার করে নিয়েছিল। এমনি করেই দুই বিরোধী জাতি ভাষার ক্ষেত্রে একত্র মিলিত হল, জ্ঞানের ভাবের একই পথে সহযাত্রী হয়ে আত্মীয়তার বন্ধনকে অন্তরে স্বীকার করায় তাদের বাহিরের ভেদ দূর হল। দূরপ্রদেশবাসী বাঙালী যে বাংলা-ভাষাকে আঁকড়ে থাকতে চাচ্ছে, প্রবাসের ভাষাকে যে স্বীকার করে নিতে ইচ্ছে করছে না, তারও কারণ এই যে, সাহিত্যসম্পদশালী বাংলাভাষার শক্তি তার মনকে জিতে নিয়েছে। এই জন্যেই, সে যত দূরেই থাক্, আপন ভাষার গৌরববোধের সূত্রে বাংলার বাঙালির সঙ্গে তার যোগ সুগভীর হয়ে রয়েছে। এই যোগকে ছেদন করতে তার ব্যথা বোধ হয়, একে উপলব্ধি করতে তার আনন্দ।

বাল্যকালে এমন আলোচনাও আমি শুনেছি যে, বাঙালি যে বঙ্গভাষার চর্চায় মন দিয়েছে এতে করে ভারতীয় ঐক্যের অন্তরায় সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ, ভাষার শক্তি বাড়তে থাকলে তার দৃঢ় বন্ধনকে শিথিল করা কঠিন হয়। তখনকার দিনে বঙ্গসাহিত্য যদি উৎকর্ষ লাভ না করত তবে আজকে হয়তো তার প্রতি মমতা ছেড়ে দিয়ে আমরা

নির্বিকার চিত্তে কোনো একটি সাধারণ ভাষা গ্রহণ করে বসতাম। কিন্তু, ভাষা জিনিসের জীবনধর্ম আছে। তাকে ছাঁচে ঢেলে কলে ফেলে ফরমাশে গড়া যায় না। তার নিয়মকে স্বীকার করে নিয়ে তবেই তার কাছ থেকে সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায়। তার বিরুদ্ধগামী হলে সে বন্ধ্যা হয়। একদিন মহা-ফ্রেডরিকের সময় ফ্রান্সের ভাষার প্রতি জর্মানির লোলুপতা দেখা গিয়েছিল, কিন্তু সে টিঁকল না। কেননা ফ্রান্সের প্রকৃতি থেকে ফ্রান্সের ভাষাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে তাতে প্রাণের কাজ চালানো যায় না। সিংহের চামড়া নিয়ে আসন বা গৃহসজ্জা করতে পারি, কিন্তু সিংহের সঙ্গে চামড়া বদল করতে পারি না।

আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, আমরা যেমন মাতৃক্রোড়ে জন্মেছি তেমনি মাতৃভাষার ক্রোড়ে আমাদের জন্ম, এই উভয় জননীই আমাদের পক্ষে সজীব ও অপরিহার্য।

মাতৃভাষায় আমাদের আপন ব্যবহারের অতীত আর-একটি বড়ো সার্থকতা আছে। আমার ভাষা যখন আমার নিজের মনোভাবের প্রকৃষ্ট বাহন হয় তখনই অন্য ভাষার মর্মগত ভাবের সঙ্গে আমার সহজ ও সত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারে। আমি যদিচ বাল্যকালে ইস্কুল পালিয়েছি কিন্তু বুড়ো বয়সে সেই ইস্কুল আবার আমাকে ফিরিয়ে এনেছে। আমি তাই ছেলে পড়িয়ে কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। আমার বিদ্যালয়ে নানা শ্রেণীর ছাত্র এসেছে, তার মধ্যে ইংরেজি-শেখা বাঙালি ছেলেও কখনও কখনও আমরা পেয়েছি। আমি দেখেছি, তাদেরই ইংরেজি শেখানো সব চেয়ে কঠিন ব্যাপার। যে-বাঙালির ছেলে বাংলা জানে না, তাকে ইংরেজি শেখাই কী অবলম্বন করে। ভিক্ষুকের সঙ্গে দাতার যে-সম্বন্ধ তা পরস্পরের আন্তরিক মিলনের সম্বন্ধ নয়। ভাষাশিক্ষায় সেইটে যদি ঘটে, অর্থাৎ এক দিকে শূন্য ঝুলি আর-এক দিকে দানের অন্ন, তা হলে তাতে করে গ্রহীতাকে একেবারে গোড়া থেকে শুরু করতে হয়। কিন্তু, এই ভিক্ষাবৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত উপজীবিকাতে কখনও কল্যাণ হয় না। নিজের ভাষা থেকে দাম দিয়ে দিয়ে তার প্রতিদানে অন্য ভাষাকে আয়ত্ত করাই সহজ।

সুতরাং প্রত্যেক দেশ যখন তার স্বকীয় ভাষাতে পূর্ণতা লাভ করবে তখনই অন্য দেশের ভাষার সঙ্গে তার সত্যসম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। ভাষার এই সহযোগিতায় প্রত্যেক জাতির সাহিত্য উজ্জ্বলতর হয়ে প্রকাশমান হবার সুযোগ পায়। যে-নদী আমার গ্রামের কাছ দিয়ে বহমান, তাতে যেমন গ্রামের এপারে ওপারে খেয়া-পারাপার চলে তেমনি আবার তাতে পণ্যদ্রব্য বহন করে বিদেশের সঙ্গে কারবার হতে পারে। কেননা সেই বহমান নদীর সঙ্গে অন্যান্য নানা নদীর সম্বন্ধ সচল।

২৩।৩১

য়ুরোপে এক সময়ে লাটিন ভাষা জ্ঞানচর্চার একমাত্র সাধারণ ভাষা ছিল। যতদিন তা ছিল ততদিন য়ুরোপের ঐক্য ছিল বাহ্যিক আর অগভীর। কিন্তু, আজকার দিনে য়ুরোপ নানা বিদ্যাধারার সম্মিলনের দ্বারা যে-মহত্ব লাভ করেছে সেটি আজ পর্যন্ত অন্য কোনো মহাদেশে ঘটে নি। এই ভিন্ন-ভিন্ন-দেশীয় বিদ্যার নিরন্তর সচল সম্মিলন কেবলমাত্র য়ুরোপের নানা দেশের নানা ভাষার যোগেই ঘটেছে, এক ভাষার দ্বারা কখনও ঘটতে পারত না। আজকার দিনে য়ুরোপে রাষ্ট্রীয় অসাম্যের অন্ত নেই কিন্তু তার বিদ্যার সাম্য আজও প্রবল। এই জ্ঞান-সম্মিলনের উজ্জ্বলতায় দিক্‌বিদিক্‌ অভিভূত হয়ে গেছে। সেই মহাদেশে দেয়ালি-উৎসবের যে বিরাট আয়োজন হয়েছে তা সমাধা করতে সেখানকার প্রত্যেক দেশ তার দীপশিখাটি জ্বালিয়ে এনেছে। যেখানে যথার্থ মিলন সেইখানেই যথার্থ শক্তি। আজকের দিনে য়ুরোপের যথার্থ শক্তি তার জ্ঞানসমবায়ে।

আমাদের দেশেও সেই কথাটি মনে রাখতে হবে। ভারতবর্ষে আজকাল পরস্পরের ভাবের আদানপ্রদানের ভাষা হয়েছে ইংরাজি ভাষা। অন্য একটি ভাষাকেও ভারতব্যাপী মিলনের বাহন করবার প্রস্তাব হয়েছে। কিন্তু, এতে করে যথার্থ সমন্বয় হতে পারে না; হয়তো একাকারত্ব হতে পারে, কিন্তু একত্ব হতে পারে না। কারণ, এই একাকারত্ব কৃত্রিম ও অগভীর, এ শুধু বাইরে থেকে দড়ি দিয়ে বাঁধা মিলনের প্রয়াস মাত্র। যেখানে হৃদয়ের বিনিময় হয়, সেখানে স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য থাকলেই তবে যথার্থ মিলন হতে পারে। কিন্তু, যদি বাহ্য বন্ধনপাশের দ্বারা মানুষকে মিলিত করতে বাধ্য করা যায়, তবে তার পরিণাম হয় পরম শত্রুতা। কারণ, সে মিলন শৃঙ্খলের মিলন, অথবা শৃঙ্খলার মিলনমাত্র।

রাশিয়া তার অধিকৃত ছোটো ছোটো দেশের ভাষাকে মেরে রাশীয় ভাষার অধিকারভুক্ত করবার চেষ্টা করেছিল, বেলজিয়ান ফ্লেমিশ্‌দের ভাষা ভোলাতে পারলে বাঁচে। কিন্তু, ভাষার অধিকার যে ভৌগোলিক অধিকারের চেয়ে বড়ো, তাই এখানে জবরদস্তি খাটে না। বেলজিয়াম ফ্লেমিশ্‌দের অনৈক্য সইতে পারে নি, তাই রাষ্ট্রীয় ঐক্যবন্ধনে তাদের বাঁধতে চেয়েছে। কিন্তু, সে-ঐক্য অগভীর বলে তা স্থায়ী ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারে না। সাম্রাজ্যবন্ধনের দোহাই দিয়ে যে-ঐক্যসাধনের চেষ্টা তা বিষম বিড়ম্বনা। আজ য়ুরোপের বড়ো বড়ো দাসব্যবসায়ী নেশনরা আপন অধীন গণবর্গকে এক জোয়ালে জুড়ে দিয়ে বিষম কষাঘাত করে তার ইম্পীরিয়ালিজ্‌মের রথ চালিয়ে দিয়েছে। রথের বাহন যে-ঘোড়াকয়টি তাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো আত্মীয়তা নেই। কিন্তু, সারথির তাতে আসে যায় না। তার মন রয়েছে এগিয়ে চলার দিকে, তাই সে রথের ঘোড়াকটাকে

কষে বেঁধে, টেনে-হিঁচড়ে প্রাণপণে চাবকাচ্ছে। নইলে তার গতিবেগ যে থেমে যায়। এমন বাহ্য সাম্যকে যারা চায় তারা ভাষা-বৈচিত্র্যের উপর স্টীম-রোলার চালিয়ে দিয়ে আপন রাজরথের পথ সমভূম করতে চায়। কিন্তু, পাঁচটি বিভিন্ন ফুলকে ফুটে দলা পাকালেই তাকে শতদল বলা যেতে পারে না। অরণ্যের বিভিন্ন পত্রপুষ্পের মধ্যে যে-ঐক্য আছে তা হল বসন্তের ঐক্য। কারণ, বসন্তসমাগমে ফাল্গুনের সমীরণে তাদের সকলেরই মঞ্জরী মুকুলিত হয়ে ওঠে। তাদের বৈচিত্র্যের অন্তরালে যে বসন্তের একই বাণীর চলাচলের পথ, সেখানেই তারা এক ও মিলিত। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে জবরদস্ত লোকেরা বলে থাকে যে, মানুষকে বড়োরকমের বাঁধনে বেঁধেছেঁদে মেরে কেটেকুটে প্রয়োজন সাধন করতে হবে—এমন দড়াদড়ি দিয়ে বাঁধলেই নাকি ঐক্য সাধিত হতে পারে। অদ্বৈতের মধ্যে যে পরমমুক্ত শিব রয়েছেন তাঁকে তারা চায় না। তারা বেঁধেছেঁদে দ্বৈতকে বস্তাবন্দী করে যে অদ্বৈতের ভান তাকেই মেনে থাকে। কিন্তু যাঁরা যথার্থ অদ্বৈতকে অন্তরে লাভ করেছেন তাঁরা তো তাঁকে বাইরে খোঁজেন না। বাইরের যে-এক তা হচ্ছে প্রলয়, তাই একাকারত্ব; আর অন্তরের যে-এক তা হল সৃষ্টি, তাই ঐক্য। একটা হল পঞ্চত্ব, আর-একটা হল পঞ্চায়েৎ।

আজকার এই সাহিত্যসম্মিলনে বাংলাদেশের প্রতিবেশী অনেক বন্ধুও সমাগত হয়েছেন। তাঁরা যদি এই সম্মিলনে সমাগত হয়ে নিমন্ত্রণের গৌরবলাভে মনের মধ্যে কোনো বাধাবোধ না করে থাকেন তবে তাতে অনেক কাজ হয়েছে। আমরা যেন বাঙালির স্বাজাত্য-অভিমানের অতিমাত্রায় মিলনযজ্ঞে বিঘ্ন না বাধাই। দক্ষ তো আপন আভিজাত্যের অভিমানেই শিবকে রাগিয়ে দিয়েছিলেন।

যে-দেশে হিন্দি ভাষার প্রচলন সে-দেশে প্রবাসী বাঙালি বাংলাভাষার কেন্দ্র তৈরি করেছে, এতে বাঙালিদের এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। এই উত্তর-ভারতে কাশীতে তাঁরা কী পেলেন, দেখলেন, আত্মীয়দের সহযোগিতায় কী লাভ করলেন, তা আমাদের জানতে হবে। আমরা দূরে যারা বাস করি তারা এখানকার এ-সবের সঙ্গে পরিচিত নই; উত্তরভারতের লোককে আমরা মানচিত্র বা গেজেটিয়ারের সহযোগে দেখেছি। বাঙালি যখন আপন ভাষার মধ্য দিয়ে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় বিস্তার করে সৌহার্দের পথ মুক্ত করবেন তাতে কল্যাণ হবে। ভালোবাসার সাধনার একটা প্রধান সোপান হচ্ছে জ্ঞানের সাধনা।

পরস্পরের পরিচয়ের অভাবই মানুষের প্রভেদকে বড়ো করে তোলে। যখন অন্তরের পরিচয় না হয় তখন বাইরের অনৈক্যই চোখে পড়ে, আর তাতে পদে পদে অবজ্ঞার সঞ্চার হয়ে থাকে। আজ বাংলাভাষাকে অবলম্বন করে উত্তরভারতের সঙ্গে সেই

আন্তরিক পরিচয়ের প্রবাহ বাংলার অভিমুখে ধাবিত হোক। এখানকার সাহিত্যিকেরা আধুনিক ও প্রাচীন উত্তরভারতীয় সাহিত্যের যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ, যা সকলের শ্রদ্ধা উৎপাদন করবার যোগ্য, তা সংগ্রহ করে দূরে বাংলাদেশে পাঠাবেন— এমনিভাবে ভাষার মধ্য দিয়ে বাংলার সঙ্গে উত্তরভারতের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হবে।

আমি হিন্দি জানি না, কিন্তু আমাদের আশ্রমের একটি বন্ধুর কাছ থেকে প্রথমে আমি প্রাচীন হিন্দি সাহিত্যের আশ্চর্য রত্নসমূহের কিছু কিছু পরিচয় লাভ করেছি। প্রাচীন হিন্দি কবিদের এমন-সকল গান তাঁর কাছে শুনেছি যা শুনে মনে হয় সেগুলি যেন আধুনিক যুগের। তার মানে হচ্ছে, যে-কাব্য সত্য তা চিরকালই আধুনিক। আমি বুঝলুম, যে-হিন্দিভাষার ক্ষেত্রে ভাবের এমন সোনার ফসল ফলেছে সে-ভাষা যদি কিছুদিন অকৃষ্ট হয়ে পড়ে থাকে তবু তার স্বাভাবিক উর্বরতা মরতে পারে না; সেখানে আবার চাষের সুদিন আসবে এবং পৌষমাসে নবান্ন-উৎসব ঘটবে। এমনি করে এক সময়ে আমার বন্ধুর সাহায্যে এ দেশের ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে আমার শ্রদ্ধার যোগ স্থাপিত হয়েছিল। উত্তর-পশ্চিমের সঙ্গে সেই শ্রদ্ধার সম্বন্ধটি যেন আমাদের সাধনার বিষয় হয়। মা বিদ্বিষাবহৈ।

আজ বসন্তসমাগমে অরণ্যের পাতায় পাতায় পুলকের সঞ্চার হয়েছে। গাছের যা শুকনো পাতা ছিল তা ঝরে গেল। এমন দিনে যারা হিসাবের নীরস পাতা উল্টাতে ব্যস্ত আছে তারা এই দেশব্যাপী বসন্ত-উৎসবের ছন্দে যোগ দিতে পারল না। তারা পিছনে পড়ে রইল। দেশে আজ যে পোলিটিকাল উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছে তার যতই মূল্য থাক্, 'এহ বাহ্য'। এর সমস্ত লাভ-লোকসানের হিসাবের চেয়ে অনেক বড়ো কথা রয়ে গেছে সেই সুগভীর আত্মিক-প্রেরণার মধ্যে যার প্রভাবে এই বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের এমন স্বচ্ছন্দবিকাশ হয়েছে। স্বাস্থ্যের যে স্বাভাবিক প্রাণগত ক্রিয়া আছে, তা অগোচরে কাজ করে বলে ব্যস্তবাগীশ লোকেরা তার চেয়ে দাওয়াইখানার জয়েন্ট্ স্টক্ কোম্পানিকে ঢের বড়ো বলে মনে করে— এমন কি, তার জন্তে স্বাস্থ্য বিসর্জন করতেও রাজি হয়। সম্মানের জন্তে মানুষ শিরোপা প্রার্থনা করে, এবং তার প্রয়োজনও থাকতে পারে, কিন্তু শিরোপা দ্বারা মানুষের মাথা বড়ো হয় না। আসল গৌরবের বার্তা মস্তিষ্কেই আছে, শিরোপায় নেই; প্রাণের সৃষ্টিঘরে আছে, দোকানের কারখানাঘরে নেই। বসন্ত বাংলার চিত্ত-উপবনে প্রাণদেবতার দাক্ষিণ্য নিয়ে এসে পৌঁচেছে, এ হল একেবারে ভিতরকার খবর, খবরের কাগজের খবর নয়; এর ঘোষণার ভার কবিদের উপর। আমি আজ সেই কবির কর্তব্য করতে এসেছি; আমি বলতে এসেছি, অহল্যাপাষাণীর উপর রামচন্দ্রের পদস্পর্শ হয়েছে— এই দৃশ্য দেখা গেছে বাংলাসাহিত্যে, এইটেই

আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো আশার কথা। আজ বাংলা হতে দূরেও বাঙালিদের হৃদয়ক্ষেত্রে সেই আশা ও পুলকের সঞ্চার হোক। খুব বেশি দিনের কথা নয়, বড়ো জোর ষাট বছরের মধ্যে বাংলাসাহিত্য কথায় ছন্দে গানে ভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এই শক্তির এইখানেই শেষ নয়। আমাদের মনে আশা ও বিশ্বাসের সঞ্চার হোক। আমরা এই শক্তিকে চিরজীবিনী করি। যেখানেই মানবশক্তি ভাষায় ও সাহিত্যে প্রকাশমান হয়েছে সেইখানেই মানুষ অমরতা লাভ করেছে ও সর্বমানবসভায় আপন আসন ও বরমাল্য পেয়েছে।

অল্প কয়েকদিন পূর্বেই মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেখানকার অধ্যাপক ডাক্তার অটো আমাকে লিখেছেন যে, তাঁরা শান্তিনিকেতনে বাংলাসাহিত্যের চর্চা করবার জন্য একজন অধ্যাপককে পাঠাতে চান। তিনি এখান থেকে শিক্ষালাভ করে ফিরে গেলে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষার 'চেয়ার' সৃষ্টি করা হবে। এই ইচ্ছা দশ বছর আগে কোনো বিদেশীর মনে জাগে নি।

আজ বঙ্গবাণীর উৎস খুলে গেল। যারা তার ধারার সন্ধানে ছুটে এল তাদের পরিবেষণের ভার আমাদের উপর রয়েছে। আমাদের আশা ও সাহস থাকলে এই ব্যাপারটি নিশ্চয়ই ঘটতে পারবে। আমরা সকলে মিলিত হয়ে সেই ভাবীকালের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকব। এই অধ্যবসায়ে বাংলা যদি বিশেষ গৌরব অর্জন করে সে কি সমগ্র ভারতবর্ষের সামগ্রী হবে না। গাছের যে-শাখাতেই ফুল ফুটুক সে কি সকল গাছের নয়। অরণ্যের যে-বনস্পতিটি ফুলে ফলে ভরে উঠল যদি তারই উদ্দেশে মধুকরেরা ছুটে আসে তবে সমগ্র অরণ্য তাদের সমাদরে বরণ করে লয়। আজ বাংলার প্রাঙ্গণেই যদি অতিথিদের সমাগম হয়ে থাকে তবে তাতে ক্ষতি কী। তাঁরা যে ভারতবর্ষেরই ক্ষেত্রে এসে মিলিত হয়েছেন, ভারতবাসীদের তা মানতে হবে। বঙ্গসাহিত্য আজ পরম শ্রদ্ধায় সেই মধুব্রতদের আহ্বান করুক।

১৩৩০

সভাপতির শেষ বক্তব্য

আমাদের দৈহিক প্রকৃতিতে আমরা দেখতে পাই যে, তার কতকগুলি বিশেষ মর্মস্থান আছে— যেমন, প্রাণের যে-প্রবাহ রক্তচলাচলের সহযোগে অঙ্গের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয় তার মর্মস্থান হচ্ছে হৃৎপিণ্ড; আর, ইন্দ্রিয়বোধের যে-ধারা স্নায়ুতন্তু অবলম্বন ক'রে দেহে বিস্তৃত হয়েছে, তার কেন্দ্র হচ্ছে মস্তিষ্ক। তেমনি প্রত্যেক দেশের

চিত্তে যে জ্ঞান ও ভাবের ধারা প্রবহমান, তার এক-একটি মর্মস্থান আপনিই সৃষ্ট হয়ে থাকে।

পশ্চিম-মহাদেশে আমরা দেখতে পাই যে, ফ্রান্সের চিত্তের কেন্দ্রভূমি প্যারিস, ইতালীর রোম, ও প্রাচীন গ্রীসের এথেন্স। হিন্দু-ভারতবর্ষের ইতিহাসেও তেমনি দূরে দূরে যত বিদ্যার উৎস উৎসারিত হয়েছে তার ধারা সর্বদাই কোনো না কোনো উপলক্ষ্যে কাশীতে এসে মিলিত হয়েছে। ইতিপূর্বে রাধাকুমুদবাবু তাঁর প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, বৈদিক যুগে কাশী ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনার কেন্দ্র ছিল, তার পরে বৌদ্ধযুগে যখন বুদ্ধদেব ধর্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হলেন তখন তিনি কাশীতেই ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন। মধ্যযুগেও যত কবি, ভক্ত, সাধু, কোনো না কোনো সূত্রে এই নগরীর সঙ্গে তাঁদের জীবন ও কর্মকে মিলিত করেছেন। আজকার দিনে আমাদের বঙ্গসাহিত্যের যে-উদ্যম বঙ্গভাষায় প্রকাশ পেয়েছে ও বাংলায় নবজীবনের সঞ্চার করেছে, এটি কেবল সংকীর্ণ ভাবে বাংলার জিনিস নয়, ভারতবর্ষের ইতিহাসে এ একটি বড়ো উদ্যমের প্রকাশ। সুতরাং স্বতই যদি এর একটা বেগ কাশীতে এসে পৌঁছয়, তবে তাতে ক'রে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা হবে।

নবজাত শিশু জন্মলাভ করে প্রথমে আপন গৃহে, কিন্তু তার পর ক্রমে ক্রমে জাত-সংস্কারের দ্বারা সে সমাজে স্থান পায়। তেমনি ভারতবর্ষের সকল প্রচেষ্টাগুলির যেখানে জন্ম সেখানেই তারা পূর্ণ পরিণতি লাভ করে না, তাদের অন্য সংস্কারের প্রয়োজন যার দ্বারা সেগুলি সর্বভারতের জিনিস ব'লে নিজের ও অন্যের কাছে প্রমাণিত হতে পারে। ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা আপন ভূগোলগত সীমায় স্বীয় বিশেষত্বকে আপন সাহিত্যে চিত্রকলায় প্রকাশ করুক, তাকে উজ্জ্বল করতে থাক্‌, কিন্তু তার প্রাণের প্রাচুর্য বাংলার বাইরেও নানা প্রতিষ্ঠান অবলম্বন ক'রে আপন শাখা বিস্তার যদি করে তবে কাশী তার সেই আত্মপ্রসার-উদ্যমের একটি প্রধান কেন্দ্রস্থান হতে পারে। কারণ, কাশী বস্তুত ভারতবর্ষের কোনো বিশেষ প্রদেশভুক্ত নয়, কাশী ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেরই।

এই প্রবাসে বঙ্গসাহিত্যের যে বিশেষ প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত হল তার প্রধান আকাঙ্ক্ষাটি কী। তা হচ্ছে এই যে, বঙ্গসাহিত্যের ফল যেন ভারতবর্ষের অন্যান্য সকল প্রদেশের হস্তে সহজে নিবেদন করে দেওয়া যেতে পারে। ভারতবর্ষে যে-সকল তীর্থস্থান আছে তার সর্বপ্রধান কাজই হচ্ছে এই যে, সেখানে যাতে সকল প্রদেশের লোক আপন প্রাদেশিক সত্তার চেয়ে বড়ো সত্তাকে উপলব্ধি করে। সমস্ত হিন্দু-ভারতবর্ষের যে-একটি বিরাট ঐক্য আছে সেটি প্রত্যক্ষ অনুভব করবার স্থান হচ্ছে এই-সব তীর্থ। পুরী

প্রভৃতি অন্যান্য তীর্থের চেয়ে কাশীর বিশেষত্ব এই যে, এখানে যে কেবল ভক্তিধারার সঙ্গমস্থান তা নয়, এখানে ভারতীয় সমস্ত বিদ্যার মিলন হয়েছে। বাংলাপ্রদেশ আপনার শ্রেষ্ঠ সম্পদকে যদি কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের যোগে কাশীর সঙ্গে যুক্ত করতে পারেন তবে সে জিনিসটিকে ভারতের ভারতী প্রসন্নমনে গ্রহণ করবেন।

বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে শুধু বাংলারই শক্তি বদ্ধ হয়ে রয়েছে, এ কথা বললে সম্পূর্ণ সত্য বলা হয় না; কেননা সমগ্র ভারতবর্ষের নাড়ীর মধ্য দিয়েই বাংলার হৃদয়ে শক্তির সঞ্চার হয়েছে, তাই বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তা ভারতচিত্তশক্তিরই বিশেষ প্রকাশ বলে জানতে হবে। এই কথা স্মরণ করবার স্থান হোক সেই বারাণসী যেখানে বাংলার ন্যায়ের অধ্যাপক দ্রবিড়ের শ্রুতির অধ্যাপকের সঙ্গে একত্র বসে ভারতের একই ডালিতে বিদ্যার অর্ঘকে সম্মিলিত ক'রে সাজিয়ে তুলছেন।

পরিশেষে আমি একটি কাজের কথা বলতে চাই। বাঙালিরা যে এ দেশে বাস করছেন আমরা বাংলা ভাষার মধ্যে তার পরিচয় পাব এই আশা করি। বাঙালি কি সেই পরিচয় দিয়েছে। না, দেয় নি। এটা কি আমাদের চিত্তের অসাড়তার লক্ষণ নয়। যে-চিত্ত যথার্থ প্রাণবান্ তার ঔৎসুক্য চির-উদ্যমশীল। নির্জীব মনেরই দেখবার ইচ্ছা নেই, দেখবার শক্তি নেই। যা-কিছু তার থেকে পৃথক, সমবেদনার দুর্বলতাবশত তাকে সে অবজ্ঞা করে। এই অবজ্ঞা অজ্ঞতারই নামান্তর। জানবার শক্তির অভাব এবং ভালোবাসবার শক্তির অভাব একসঙ্গেই ঘটে। যে-মানুষ মানুষের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে সেই তো মানুষকে শ্রদ্ধা করতে পারে; আত্মার ক্ষীণতা-বশতই যার সেই মহৎ অধিকার নেই, দরজা পর্যন্ত গিয়ে আর বেশি যে এগোতে পারে না, অহংকারের দ্বারা সেই তো আপনার দৈন্যকেই প্রকাশ করে। মমত্বের অভাব মাহাত্ম্যেরই অভাব।

বাঙালির প্রধান রিপু হচ্ছে এই আত্মাভিমান, যে-জন্য নিরন্তর নিজের প্রশংসাবাদ না শুনতে পেলে সে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তাকে অহরহই স্তুতির মদ ঢোঁকে ঢোঁকে গেলাতে হয়, তার কমতি হলেই তার অসুখ বোধ হয়। এই চাটুলোলুপ আত্মাভিমান সত্যের অপলাপ বলেই এতে যে মোহান্ধকার সৃষ্টি করে তাতে অন্যকে স্পষ্ট দেখতে দেয় না। এই অন্ধতা দ্বারা আমরা নিজেকে বঞ্চিত করি। আমি জাপানে বাঙালি ছাত্রদের দেখেছি, তারা জাপানে বোতাম-তৈরি সাবান-তৈরি শিখতে গেছে, কেউ কেউ বা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত, কিন্তু জাপানকে সম্পূর্ণ চোখ মেলে দেখবার আগ্রহ তাদের মনের মধ্যে গভীর ভাবে নেই। যদি থাকত তা হলে বোতাম-শিক্ষার চেয়ে বড়ো শিক্ষা তাদের হ'ত। তারা জাপানকে শ্রদ্ধা করতে না পারার দ্বারা নিজেদের অশ্রদ্ধেয় করেছে। যে-সব বাঙালি

উত্তরপশ্চিম ভারতে দীর্ঘকাল বা অল্পকাল বাস করছে তারা যদি এই মোহাচ্ছন্নতার বেষ্টন থেকে নিজেদের মুক্ত না করে, তা হলে এখানকার মানবসংস্রব থেকে তাদের সাহিত্য কিছুই সংগ্রহ করতে পারবে না। যে-কয়েদি গারদের বাইরে রাস্তায় এসে কাজ করে সেও যেমন বন্দী, তেমনি যে-বাঙালি আপন ঘর থেকে দূরে সঞ্চরণ করতে আসে তারও মনের পায়ে অভিমান ও অশ্রদ্ধার বেড়ি পরানো। এই উপেক্ষার ভাবকে মন থেকে না তাড়াতে পারলে কাশীর মতো স্থানে সাহিত্য সম্বন্ধে বাঙালির প্রতিষ্ঠান নিরর্থক হবে। বাঙালির চিন্তাপরায়ণ বীক্ষণশীল মন যে উত্তরপশ্চিম ভারতের সংস্পর্শে এসেছে তারই প্রমাণ বঙ্গসাহিত্যে ফলবান হয়ে দেখা দেবে, তবেই এখানকার বঙ্গ-সাহিত্যপরিষৎ নিতান্ত একটা বাহুল্য ব্যাপার বলে গণ্য হবে না। এখানকার ভাষা, সাহিত্য, এখানকার স্থানীয় অভিজ্ঞতা থেকে যা-কিছু তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করা সম্ভব তা সমস্তই বাংলাসাহিত্যের পুষ্টিসাধনে নিযুক্ত হবে এখানকার বাঙালি-সাহিত্যিক-সংঘ থেকে এই আমরা বিশেষভাবে আশা করি।

এ দেশে যে-সব বহুমূল্য পুঁথি আছে তা ক্রমে ক্রমে চলে যাচ্ছে। আমি জানি, একজন জাপানি পুরোহিত নেপাল থেকে তিন-চার সিন্ধুক বোঝাই করে মহাযান-বৌদ্ধশাস্ত্র জাপানে চালান করে দিয়েছেন। এজন্য সংগ্রহকারকে দোষ দেব কী করে। যারা চেয়েছিল তারা পেয়েছে, যারা চায় নি তারা হারালো, এই তো সংগত। কিন্তু, এইবেলা সতর্ক হ'তে হবে। প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ এবং রক্ষা করবার একটি প্রশস্ত স্থান হচ্ছে কাশী। এখানকার বঙ্গসাহিত্যপরিষদের সভ্যেরা এই কাজকে নিজের কাজ বলে গণ্য করবেন, এই আমি আশা করি।

আমাদের প্রাচীন কীর্তির যা ভগ্নাবশেষ চারি দিকে ছড়িয়ে আছে আন্তরিক শ্রদ্ধার দ্বারা তাদের রক্ষা করতে হবে। আমি দেখেছি, কত ভালো ভালো মূর্তির টুকরো অনেক জায়গায় পা-ধোবার পিঁড়ি বা সিঁড়ির ধাপে পরিণত করা হয়েছে। এই পদাঘাত থেকে এদের বাঁচাতে হবে। আধুনিক কালে পুরাতন শিল্পের যা কিছু নিদর্শন তার অধিকাংশ পশ্চিমভারতেই বিদ্যমান আছে। বাংলার নরম মাটিতে তার অধিকাংশ তলিয়ে গেছে। কিন্তু, এখানকার পাথুরে জায়গায়, কঠিন ভূমিতে, পুরাতন কীর্তি রক্ষিত হয়েছে; তার ভগ্নাবশেষ ছড়াছড়ি যাচ্ছে। আপনারা শ্রদ্ধা সহকারে তা সংগ্রহ করুন, এখানে যে 'সারস্বত-ভাণ্ডার' স্থাপনের প্রস্তাব হয়েছে তা যেন আপনাদের স্থায়ী কাজে প্রবৃত্ত করে, আজকের সভায় এই আমার অনুরোধ। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত আমরা ভারতীয় চিত্রকলার সমাদর করি নি। তাকে আপনার জিনিস বলে বরণ করে নিই নি। তাই আশ্চর্য অমূল্য ছবি-সব পথে-ঘাটে সামান্য দরে বিকিয়ে যেত, আমরা চেয়ে দেখি নি।

এক সময়ে, মনে আছে, জাপান থেকে কলাসৌন্দর্যের রসজ্ঞ ওকাকুরা বাংলাদেশে এসে এ দেশের চিত্রকলা ও কারুশিল্পের যথার্থ মূল্য আমাদের অশিক্ষিত দৃষ্টির কাছে প্রকাশ করলেন। এ সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করবার পক্ষে কলিকাতার আর্ট্‌ স্কুলের তৎকালীন অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেব যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু, ভারতের চিত্রকলা সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতাজনিত যে-অবজ্ঞা সে আজও সম্পূর্ণ ঘোচে নি। এইজন্তেই আমাদের দেশের উদাসীন মুষ্টি থেকে ভারতের চিত্রসম্পদ অতি সহজে স্খলিত হয়ে বিদেশে চলে যাচ্ছে। এখানকার পরিষৎ এইগুলিকে সংগ্রহ করাকে যদি নিজের কর্তব্য বলে স্থির করেন তা হলে ধন্য হবেন।

সকল দেশেই বিদ্যার একটা ধারাবাহিকতা আছে। মূল-উৎস থেকে নদীর ধারা বন্ধ হয়ে গেলে যেমন তা বদ্ধ জলের কুণ্ডে পরিণত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়, তেমনি জ্ঞানের তপস্যা বা কলার সাধনায় অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগ যদি অবরুদ্ধ হয়ে যায় তা হলে সে-সমস্ত ক্ষীণ হয়ে বিলুপ্ত হতে থাকে। ভারতীয় আর্ট সম্বন্ধে আমরা তার যথেষ্ট প্রমাণ পাই। অজন্তার চিত্রকলায় যে-ধারা ছিল সে ধারা অনেক দিন বয় নি, তাই ভারতের চিত্রকলা পঙ্ককুণ্ডে অবরুদ্ধ হয়ে ক্রমে তলার পাঁকে এসে ঠেকেছে। এই ধারাকে যথাসাধ্য উন্মুক্ত করা চাই তো। কিন্তু, প্রাচীন ভারতের ভালো ভালো সব ছবিই যদি বিদেশে চালান যায়, তা হলে আমাদের দেশে চিত্রকলার বিদ্যাকে সজীব ও সচল রাখা কঠিন হবে। আমাদের আধুনিক চিত্রে প্রাচীন চিত্রকলার অনুকরণ করতে হবে, এমন কথা বলি নে। কিন্তু, অতীতের সাধনার মধ্যে যে-একটি প্রাণের বেগ আছে সেই বেগটি আমাদের চিত্তের প্রাণশক্তিকে জাগিয়ে তোলে। অতীতের সৃষ্টিপ্রবাহকে বর্তমান কালের সৃষ্টির উদ্যমের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করলে সেই উদ্যমকে সহায়হীন করা হয়। শুধু নিজেদের অতীত কেন, অন্য দেশের বিদ্যা থেকে আমরা যা পাই তার প্রধান দান হচ্ছে এই উদ্যম। এইজন্তে য়ুরোপে, যেখানে দেশ-বিদেশের সমস্ত মানবসংসার থেকে সকলরকম বিদ্যার সমবায় ঘটছে, সেখানে সাধনার উদ্যম এমন আশ্চর্যরূপে বেড়ে উঠছে। এই কথাটি মনে ক'রে আমাদের দেশের অতীতের লুপ্তপ্রায় সমস্ত কীর্তির যথাসম্ভব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা যেন করি, তাদের পুনরাবৃত্তি করবার জন্তে নয়, নিজেদের চিত্তকে সাধনার বৃহৎ ক্ষেত্রে জাগরুক রাখবার জন্তে।

১৩৩০

সাহিত্যসম্মিলন

যখন আমরা কোনো সত্যবস্তুকে পাই তাহাকে রক্ষণপালনের জন্য বাহির হইতে উপরোধ বা উপদেশের প্রয়োজন হয় না। কোলের ছেলে মানুষ করিবার জন্য মাতাকে গুরুর মন্ত্র বা স্মৃতিসংহিতার অনুশাসন গ্রহণ করিতে বলা অনাবশ্যক।

বাঙালি একটি সত্য বস্তু পাইয়াছে, ইহা তাহার সাহিত্য। এই সাহিত্যের প্রতি গভীর মমত্ব স্বতই বাঙালির চিত্তকে অধিকার করিয়াছে। এইরূপ একটি সাধারণ প্রীতির সামগ্রী সমগ্র জাতিকে যেরূপ স্বাভাবিক ঐক্য দেয় এমন আর কিছুই না। স্বদেশে বিদেশে আজ যেখানে বাঙালি আছে সেখানেই বাংলাসাহিত্যকে উপলক্ষ্য করিয়া যে সম্মিলন ঘটিতেছে, তাহার মতো অকৃত্রিম আনন্দকর ব্যাপার আর কী আছে।

ভিক্ষা করিয়া যাহা আমরা পাই তাহা আমাদের আপন নহে, উপার্জন করিয়া যাহা পাই তাহাতেও আমাদের আংশিক অধিকার ; নিজের শক্তিতে যাহা আমরা সৃষ্টি করি, অর্থাৎ যাহাতে আমাদের আত্মপ্রকাশ, তাহার 'পরেই আমাদের পূর্ণ অধিকার। যে-দেশে আমাদের জন্ম সেই দেশে যদি সর্বত্র আমাদের আত্মা আপন বহুধা শক্তিকে নানা বিভাগে নানারূপে সৃষ্টিকার্যে প্রয়োগ করিতে পারিত, তবে দেশকে ভালোবাসিবার পরামর্শ এত উচ্চস্বরে এবং এমন নিষ্ফলভাবে দিতে হইত না। দেশে আমরা আত্মপ্রকাশ করি না বলিয়াই দেশকে আমরা অকৃত্রিম আনন্দে আপন বলিয়া জানি না।

বাংলাসাহিত্য আমাদের সৃষ্টি। এমন-কি, ইহা আমাদের নূতন সৃষ্টি বলিলেও হয়। অর্থাৎ, ইহা আমাদের দেশের পুরাতন সাহিত্যের অনুবৃত্তি নয়। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের ধারা যে-খাতে বহিত বর্তমান সাহিত্য সেই খাতে বহে না। আমাদের দেশের অধিকাংশ আচার-বিচার পুরাতনের নির্জীব পুনরাবৃত্তি। বর্তমান অবস্থার সঙ্গে তাহার অসংগতির সীমা নাই। এইজন্য তাহার অধিকাংশই আমাদিগকে পদে পদে পরাভবের দিকে লইয়া যাইতেছে। কেবল আমাদের সাহিত্যই নূতন রূপ লইয়া নূতন প্রাণে নূতন কালের সঙ্গে আপন যোগসাধন করিতে প্রবৃত্ত। এইজন্য বাঙালিকে তাহার সাহিত্যই যথার্থভাবে ভিতরের দিক হইতে মানুষ করিয়া তুলিতেছে। যেখানে তাহার সমাজের আর-সমস্তই স্বাধীন পন্থার বিরোধী, যেখানে তাহার লোকাচার তাহাকে নির্বিচার অভ্যাসের দাসত্বপাশে অচল করিয়া বাঁধিয়াছে, সেখানে তাহার সাহিত্যই তাহার মনকে মুক্তি দিবার একমাত্র শক্তি। বাহিরে যখন সে জড়পুত্তলীর মতো হাজার বৎসরের দড়ির টানে বাঁধা কায়দায় চলাফেরা করিতেছে, সেখানে কেবল সাহিত্যেই তাহার মন বেপরোয়া হইয়া ভাবিতে পারে ; সেখানে সাহিত্যেই অনেক

সময়ে তাহার অগোচরেও জীবনসমস্তার নূতন নূতন সমাধান, প্রথার গণ্ডি পার হইয়া আপনিই প্রকাশ হইতেছে। এই অন্তরের মুক্তি একদা তাহাকে বাহিরেও মুক্তি দিবে। সেই মুক্তিই তাহার দেশের মুক্তির সত্যকার ভিত্তি। চিত্তের মধ্যে যে-মানুষ বন্দী বাহিরের কোনো প্রক্রিয়ার দ্বারা সে কখনোই মুক্ত হইতে পারে না। আমাদের নব সাহিত্য সকল দিক হইতে আমাদের মনের নাগপাশবন্ধন মোচন করুক; জ্ঞানের ক্ষেত্রে, ভাবের ক্ষেত্রে শক্তির স্বাতন্ত্র্যকে সাহস দিক; তাহা হইলেই একদা কর্মের ক্ষেত্রেও সে সত্যের বলে স্বাধীন হইতে পারিবে। ইন্ধনের নিজের মধ্যে আগুন প্রচ্ছন্ন আছে বলিয়াই বাহিরের আগুনের স্পর্শে সে জ্বলিয়া ওঠে; পাথরের উপর বাহির হইতে আগুন রাখিলে সে ক্ষণকালের জন্ত তাতিয়া উঠে, কিন্তু সে জ্বলে না। বাংলাসাহিত্য বাঙালির মনের মধ্যে সেই ভিতরের আগুনকে সত্য করিয়া তুলিতেছে; ভিতরের দিক হইতে তাহার মনের দাসত্বের জাল ছেদন করিতেছে। একদিন যখন এই আগুন বাহিরের দিকে জ্বলিবে; তখন ঝড়ের ফুৎকারে সে নিবিবে না, বরং বাড়িয়া উঠিবে। এখনই বাংলাদেশে আমরা তাহার প্রমাণ পাইয়াছি; বর্তমান কালের রাষ্ট্রিক আন্দোলনের দিনে মত্ততার তাড়নায় বাঙালি যুবকেরা যদি-বা ব্যর্থতার পথেও গিয়া থাকে, তবু আগুন যদি ভারতবর্ষের কোথাও জ্বলিয়া থাকে সে বাংলাদেশে; কোথাও যদি দলে দলে দুঃসাহসিকেরা দারুণ দুঃখের পথে আত্মহননের দিকে আগ্রহের সহিত ছুটিয়া গিয়া থাকে সে বাংলাদেশে। ইহার অন্যান্য যে-কোনো কারণ থাক্, একটা প্রধান কারণ এই যে, বাঙালির অন্তরের মধ্যে বাংলাসাহিত্য অনেক দিন হইতে অগ্নিসঞ্চয় করিতেছে— তাহার চিত্তের ভিতরে চিন্তার সাহস আনিয়াছে, তাই কর্মের মধ্যে তাহার নির্ভীকতা স্বভাবতই প্রকাশ পায়। শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নহে, তাহার চেয়ে দুঃসাধ্য সমাজক্ষেত্রেও বাঙালিই সকলের চেয়ে কঠোর অধ্যবসায়ে মুক্তির জন্ত সংগ্রাম করিয়াছে। পূর্ণ বয়সে বিবাহ, বিধবাবিবাহ, অসবর্ণবিবাহ, ভোজনপঙ্‌ক্তির বন্ধনচ্ছেদন, সাম্প্রদায়িক ধর্মের বাধামোচন প্রভৃতি ব্যাপারে বাঙালিই সকলের আগে ও সকলের চেয়ে বেশি করিয়া আপন ধর্মবুদ্ধির স্বাতন্ত্র্যকে জয়যুক্ত করিতে চাহিয়াছে। তাহার চিন্তার জ্যোতির্ময় বাহন সাহিত্যই সর্বদা তাহাকে বল দিয়াছে। সে যদি একমাত্র কৃত্তিবাসের রামায়ণ লইয়াই আবহমান কাল সুর করিয়া পড়িয়া যাইত— মনের উদার সঞ্চরণের জন্ত যদি তাহার মুক্ত হাওয়া, মুক্ত আলো, মুক্ত ক্ষেত্র না থাকিত— তবে তাহার মনের অসাড়তাই তাহার পক্ষে সকলের চেয়ে প্রবল বেড়ি হইয়া তাহাকে চিন্তায় ও কর্মে সমান অচল করিয়া রাখিত।

মনে আছে, আমাদের দেশের স্বাদেশিকতার একজন লোকপ্রসিদ্ধ নেতা একদা

আমার কাছে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, বাংলাসাহিত্য যে ভাবসম্পদে এমন বহুমূল্য হইয়া উঠিতেছে দেশের পক্ষে তাহা দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। অর্থাৎ, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রতি এই কারণে বাঙালির মমত্ব বাড়িয়া চলিয়াছে— সাধারণ দেশহিতের উদ্দেশেও বাঙালি এই কারণে নিজের ভাষাকে ত্যাগ করিতে চাহিবে না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ভারতের ঐক্যসাধনের উপায়স্বরূপে অন্য কোনো ভাষাকে আপন ভাষার পরিবর্তে বাঙালির গ্রহণ করা উচিত ছিল। দেশের ঐক্য ও মুক্তিকে যাঁহারা বাহিরের দিক হইতে দেখেন, তাঁহারা এমনি করিয়াই ভাবেন। তাঁহারা এমনও মনে করিতে পারিতেন যে, দেশের সকল লোকের বিভিন্ন দেহগুলিকে কোনো মন্ত্রবলে একটিমাত্র প্রকাণ্ড দৈত্যদেহ করিয়া তুলিলে আমাদের ঐক্য পাকা হইবে, আমাদের শক্তির বিক্ষেপ ঘটিবে না। শ্যামদেশের জোড়া যমজ যে দৈহিক শক্তির স্বাধীন প্রয়োগে আমাদের চেয়ে জোর বেশি পায় নাই, সে কথা বলা বাহুল্য। নিজের দেহকে তাহার নিজের স্বতন্ত্র জীবনীশক্তি দ্বারা স্বাতন্ত্র্য দিতে পারিলেই তবে অন্য দেহধারীর সঙ্গে আমাদের যোগ একটা বন্ধন হইয়া উঠে না। বাংলাভাষাকে নির্বাসিত করিয়া অন্য যে-কোনো ভাষাকেই আমরা গ্রহণ করি না কেন, তাহাতে আমাদের মনের স্বাতন্ত্র্যকে দুর্বল করা হইবে। সেই দুর্বলতাই যে আমাদের পক্ষে রাষ্ট্রীয় বললাভের প্রধান উপায় হইতে পারে, এ কথা একেবারেই অশ্রদ্ধেয়। যেখানে আমাদের আত্মপ্রকাশ বাধাহীন সেখানেই আমাদের মুক্তি। বাঙালির চিত্তের আত্মপ্রকাশ একমাত্র বাংলাভাষায়, এ কথা বলাই বাহুল্য। কোনো বাহ্যিক উদ্দেশ্যের খাতিরে সেই আত্মপ্রকাশের বাহনকে বর্জন করা, আর মাংস সিদ্ধ করার জন্য ঘরে আগুন দেওয়া, একই-জাতীয় মূঢ়তা। বাংলাসাহিত্যের ভিতর দিয়া বাঙালির মন যতই বড়ো হইবে, ভারতের অন্য জাতির সঙ্গে মিলন তাহার পক্ষে ততই সহজ হইবে। আপনাকে ভালো করিয়া প্রকাশ করিতে না পারার দ্বারাই মনের পঙ্গুতা, মনের অপরিণতি ঘটে; যে-অঙ্গ ভালো করিয়া চালনা করিতে পারি না সেই অঙ্গই অসাড় হইয়া যায়।

সম্প্রতি হিন্দুর প্রতি আড়ি করিয়া বাংলাদেশের কয়েকজন মুসলমান বাঙালি-মুসলমানের মাতৃভাষা কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইয়াছেন। এ যেন ভায়ের প্রতি রাগ করিয়া মাতাকে তাড়াইয়া দিবার প্রস্তাব। বাংলাদেশের শতকরা নিরানব্বইয়ের অধিক-সংখ্যক মুসলমানের ভাষা বাংলা। সেই ভাষাটাকে কোণঠেসা করিয়া তাহাদের উপর যদি উর্দু চাপানো হয়, তাহা হইলে তাহাদের জিহ্বার আধখানা কাটিয়া দেওয়ার মতো হইবে না কি। চীনদেশে মুসলমানের সংখ্যা অল্প নহে, সেখানে আজ পর্যন্ত এমন অদ্ভুত কথা কেহ বলে না যে, চীনভাষা ত্যাগ না করিলে তাহাদের

মুসলমানির খর্বতা ঘটিবে। বস্তুতই খর্বতা ঘটে যদি অবরদস্তির দ্বারা তাহাদিগকে ফার্সি শেখাইবার আইন করা হয়। বাংলা যদি বাঙালি-মুসলমানের মাতৃভাষা হয়, তবে সেই ভাষার মধ্য দিয়াই তাহাদের মুসলমানিও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ হইতে পারে। বর্তমান বাংলাসাহিত্যে মুসলমান লেখকেরা প্রতিদিন তাহার প্রমাণ দিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা প্রতিভাশালী তাঁহারা এই ভাষাতেই অমরতা লাভ করিবেন। শুধু তাই নয়, বাংলাভাষাতে তাঁহারা মুসলমানি মালমসলা বাড়াইয়া দিয়া ইহাকে আরও জোরালো করিয়া তুলিতে পারিবেন। বাংলাভাষার মধ্যে তো সেই উপাদানের কম্‌তি নাই— তাহাতে আমাদের ক্ষতি হয় নাই তো। যখন প্রতিদিন মেহন্নৎ করিয়া আমরা হয়রান্ হই, তখন কি সেই ভাষায় আমাদের হিন্দুভাবের কিছুমাত্র বিকৃতি ঘটে। যখন কোনো কৃতজ্ঞ মুসলমান রায়ৎ তাহার হিন্দুজমিদারের প্রতি আল্লার দোয়া প্রার্থনা করে, তখন কি তাহার হিন্দুহৃদয় স্পর্শ করে না। হিন্দুর প্রতি বিরক্ত হইয়া, ঝগড়া করিয়া, যদি সত্যকে অস্বীকার করা যায়, তাহাতে কি মুসলমানেরই ভালো হয়। বিষয়সম্পত্তি লইয়া ভাইয়ে ভাইয়ে পরস্পরকে বঞ্চিত করিতে পারে, কিন্তু ভাষাসাহিত্য লইয়া কি আত্মঘাতকর প্রস্তাব কখনও চলে।

কেহ কেহ বলেন, মুসলমানের ভাষা বাংলা বটে, কিন্তু তাহা মুসলমানি বাংলা, কেতাবি বাংলা নয়। স্কট্‌লণ্ডের চল্‌তি ভাষাও তো কেতাবি ইংরেজি নয়, স্কট্‌লণ্ড্ কেন, ইংলণ্ডের ভিন্ন-ভিন্ন প্রদেশের প্রাকৃত ভাষা সংস্কৃত ইংরেজি নয়। কিন্তু, তা লইয়া তো শিক্ষাব্যবহারে কোনোদিন দলাদলির কথা শুনি নাই। সকল দেশেই সাহিত্যিক-ভাষার বিশিষ্টতা থাকেই। সেই বিশিষ্টতার নিয়মবন্ধন যদি ভাঙিয়া দেওয়া হয়, তবে হাজার হাজার গ্রাম্যতার উচ্ছৃঙ্খলতায় সাহিত্য খান্‌খান্ হইয়া পড়ে।

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, বাংলাদেশেও হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ আছে। কিন্তু, দুই তরফের কেহই এ কথা বলিতে পারেন না যে এটা ভালো। মিলনের অস্ত্র প্রশস্ত ক্ষেত্র আজও প্রস্তুত হয় নাই। পলিটিক্‌স্‌কে কেহ কেহ এইরূপ ক্ষেত্র বলিয়া মনে করেন, সেটা ভুল। আগে মিলনটা সত্য হওয়া চাই, তার পরে পলিটিক্‌স্ সত্য হইতে পারে। খানকতক বেজোড় কাঠ লইয়া ঘোড়া দিয়া টানাইলেই যে কাঠ আপনি গাড়িরূপে ঐক্য লাভ করে, এ কথা ঠিক নহে। খুব একটা খড়্‌খড়ে ঝড়্‌ঝড়ে গাড়ি হইলেও সেটা গাড়ি হওয়া চাই। পলিটিক্‌স্‌ও সেইরকমের একটা যানবাহন। যেখানে সেটার জোয়ালে ছাপরে চাকায় কোনোরকমের একটা সংগতি আছে সেখানে সেটা আমাদের ঘরের ঠিকানায় পৌঁছাইয়া দেয়, নইলে সওয়ারকে বহন না করিয়া সওয়ারের পক্ষে সে একটা বোঝা হইয়া উঠে।

বাংলাদেশে সৌভাগ্যক্রমে আমাদের একটা মিলনের ক্ষেত্র আছে। সে আমাদের ভাষা ও সাহিত্য। এইখানে আমাদের আদানে প্রদানে জাতিভেদের কোনো ভাবনা নাই। সাহিত্যে যদি সাম্প্রদায়িকতা ও জাতিভেদ থাকিত তবে গ্রীক্‌সাহিত্যে গ্রীক্‌-দেবতার লীলার কথা পড়িতে গেলেও আমাদের ধর্মহানি হইতে পারিত। মধুসূদন দত্ত খৃস্টান ছিলেন। তিনি শ্বেতভুজা ভারতীর যে-বন্দনা করিয়াছেন সে সাহিত্যিক-বন্দনা, তাহাতে কবির ঐহিক পারত্রিক কোনো লোকসানের কারণ ঘটে নাই। একদা নিষ্ঠাবান হিন্দুরাও মুসলমান আমলে আরবি ফারসি ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন; তাহাতে তাঁহাদের ফোঁটা ক্ষীণ বা টিকি খাটো হইয়া যায় নাই। সাহিত্য পুরীর জগন্নাথক্ষেত্রের মতো, সেখানকার ভোজে কাহারও জাতি নষ্ট হয় না।

অতএব, সাহিত্যে বাংলাদেশে যে একটি বিপুল মিলনযজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে, যাহার বেদী আমাদের চিত্তের মধ্যে, সত্যের উপরে ভাবের উপরে যাহার প্রতিষ্ঠা, সেখানেও হিন্দু-মুসলমানকে যাঁহারা কৃত্রিম বেড়া তুলিয়া পৃথক করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা মুসলমানেরও বন্ধু নহেন। দুই প্রতিবেশীর মধ্যে একটা স্বাভাবিক আত্মীয়তার যোগসূত্রকেও যাঁহারা ছেদন করিতে চাহেন তাঁহাদের অন্তর্যামীই জানেন, তাঁহারা ধর্মের নামে দেশের মধ্যে অধর্মকে আহ্বান করিবার পথ খনন করিতেছেন। কিন্তু, আশা করিতেছি, তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। কারণ, প্রথমেই বলিয়াছি, বাংলাদেশের সাধনা একটি সত্যবস্তু পাইয়াছে; সেটি তাহার সাহিত্য। এই সাহিত্যের প্রতি আন্তরিক মমত্ববোধ না হওয়াই হিন্দু বা মুসলমানের পক্ষে অসংগত। কোনো অস্বাভাবিক কারণে ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে তাহা সম্ভবপর হইতেও পারে, কিন্তু সর্বসাধারণের সহজ বুদ্ধি কখনোই ইহাদের আক্রমণে পরাভূত হইবে না।

১৩৩৩

কবির অভিভাষণ

এই পরিষদে[১] কবির অভ্যর্থনা পূর্বেই হয়ে গেছে। সেই কবি বৈদেহিক; সে বাণীমূর্তিতে ভাবরূপে সম্পূর্ণ। দেহের মধ্যে তার প্রকাশ সংকীর্ণ এবং নানা অপ্রাসঙ্গিক উপাদানের সঙ্গে মিশ্রিত।

আমার বন্ধু[২] এইমাত্র যমের সঙ্গে কবির তুলনা ক'রে বলেছেন, যমরাজ আর

১ প্রেসিডেন্সি কলেজের রবীন্দ্র-পরিষদ্

২ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

কবিরাজ দুটি বিপরীত পদার্থ। বোধ হয় তিনি বলতে চান, যমরাজ নাশ করে আর কবিরাজ সৃষ্টি করে। কিন্তু, এরা উভয়েই যে এক দলের লোক, একই ব্যবসায়ে নিযুক্ত, সে-কথা অমন ক'রে চাপা দিলে চলবে কেন।

নাটকসৃষ্টির সর্বপ্রধান অংশ তার পঞ্চম অঙ্কে। নাটকের মধ্যে যা-কিছু চঞ্চল তা ঝরে পড়ে গিয়ে তার যেটুকু স্থায়ী সেইটুকুই পঞ্চম অঙ্কের চরম তিরস্করণীর ভিতর দিয়ে হৃদয়ের মধ্যে এসে প্রবেশ করে। বিশ্বনাট্যসৃষ্টিতেও পঞ্চম অঙ্কের প্রাধান্য ঋষিরা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন— সেইজন্য সৃষ্টিলীলায় অগ্নি, সূর্য, বৃষ্টিধারা, বায়ুর নাট্যনৈপুণ্য স্বীকার ক'রে সব শেষে বলেছেন, মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ। ইনি না থাকলে যা-কিছু ক্ষণকালের তাই জমে উঠে যেটি চিরকালের তাকে আচ্ছন্ন ক'রে দেয়। যেটা স্থূল যেটা স্থাবর, সেটাকে ঠেলে ফেলবার কাজে মৃত্যু নিয়ত ধাবমান।

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চবায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

এই যদি হয় যমরাজের কাজ, তবে কবির কাজের সঙ্গে এর মিল আছে বই কি। ক্ষণকালের তুচ্ছতা থেকে, জীর্ণতা থেকে, নিত্যকালের আনন্দরূপকে আবরণমুক্ত ক'রে দেখাবার ভার কবির। সংসারে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ অঙ্কে নানাপ্রকার কাজের লোক নানাপ্রকার প্রয়োজনসাধনে প্রবেশ করেন; কিন্তু কবি আসেন 'পঞ্চমঃ'; আশু-প্রয়োজনের সন্তঃপাতী আয়োজনের যবনিকা সরিয়ে ফেলে অহৈতুকের রসস্বরূপকে বিশুদ্ধ ক'রে দেখাতে।

আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি। আনন্দরূপের অমৃতবাণী বিশ্বে প্রকাশ পাচ্ছে, জলে স্থলে, ফুলে ফলে, বর্ণে গন্ধে, রূপে সংগীতে নৃত্যে, জ্ঞানে ভাবে কর্মে। কবির কাব্যেও সেই বাণীরই ধারা। যে চিত্তযন্ত্রের ভিতর দিয়ে সেই বাণী ধ্বনিত, তার প্রকৃতি-অনুসারে এই প্রকাশ আপন বিশেষত্ব লাভ করে। এই বিশেষত্বই অসীমকে বিচিত্র সীমা দেয়। এই সীমার সাহায্যেই সীমার অতীতকে আপন ক'রে নিয়ে তার রস পাই। এই আপন ক'রে নেওয়াটি ব্যক্তিভেদে কিছু না কিছু ভিন্নতা পায়। তাই একই কাব্য কত লোকে আপন মনে কত রকম ক'রে বুঝেছে। সেই বোঝার সম্পূর্ণতা কোথাও বেশি, কোথাও কম, কোথাও অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ, কোথাও অশুদ্ধ। প্রকাশের উৎকর্ষেও যেমন তারতম্য, উপলব্ধির স্পষ্টতাতেও তেমনি। এইজন্যেই কাব্য বোঝবার আনন্দেরও সাধনা করতে হয়।

এই বোঝবার কাজে কেউ কেউ কবির সাহায্য চেয়ে থাকেন। তাঁরা ভুলে যান যে, যে-কবি কাব্য লেখেন তিনি এক মানুষ, আর যিনি ব্যাখ্যা করেন তিনি আর-এক

জন। এই ব্যাখ্যাকর্তা পাঠকদেরই সমশ্রেণীয়। তাঁর মুখে ভুল ব্যাখ্যা অসম্ভব নয়।

আমার কাব্য ঠিক কী কথাটি বলছে, সেটি শোনবার জন্তে আমাকে যাইয়ে যেতে হবে— যাঁরা শুনতে পেয়েছেন তাঁদের কাছে। সম্পূর্ণ ক'রে শোনবার ক্ষমতা সকলের নেই। যেমন অনেক মানুষ আছে যাদের গানের কান থাকে না— তাদের কানে সুর-গুলো পৌঁছয়, গান পৌঁছয় না, অর্থাৎ সুরগুলির অবিচ্ছিন্ন ঐক্যটি তারা স্বভাবত ধরতে পারে না। কাব্য সম্বন্ধে সেই ঐক্যবোধের অভাব অনেকেরই আছে। তারা যে একেবারেই কিছু পায় না তা নয়— সন্দেশের মধ্যে তারা খাণ্ডকে পায়, সন্দেশকেই পায় না। সন্দেশ চিনি-ছানার চেয়ে অনেক বেশি, তার মধ্যে স্বাদের যে-সমগ্রতা আছে সেটি পাবার জন্তে রসবোধের শক্তি থাকা চাই। বহু ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার দ্বারা, চর্চার দ্বারা, এই সমগ্রতার অনির্বচনীয় রসবোধের শক্তি পরিণতি লাভ করে। যে-ব্যক্তি সেরা যাচনদার এক দিকে তার স্বাভাবিক সূক্ষ্ম অনুভূতি, আর-এক দিকে ব্যাপক অভিজ্ঞতা, দুয়েরই প্রয়োজন।

এই কারণেই এই-যে পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়েছে তার সার্থকতা আছে। এখানে কয়েকজন যে একত্র হয়েছেন তার একটিমাত্র কারণ, কাব্য থেকে তাঁরা কিছু না কিছু শুনতে পেয়েছেন, তাঁরা উদাসীন নন। এই পরস্পরের শোনা নানা দিক থেকে মিলিয়ে নেবার আনন্দ আছে। আর, যাঁরা স্বভাবশ্রোতা, যাঁরা সম্পূর্ণকে সহজে উপলব্ধি করেন, তাঁরা এই পরিষদে আপন যোগ্য আসনটি লাভ করতে পারবেন।

এই পরিষদটি যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এতে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। কবির পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো সুযোগ, পাঠকের শ্রদ্ধা। যুক্তিসিদ্ধ বিষয়ের প্রধান সহায় প্রমাণ, রসসৃষ্টি-পদার্থের প্রধান সহায় শ্রদ্ধা। সুন্দরকে দেখবার পক্ষে অশ্রদ্ধার মতো অন্ধতা আর নেই। এই বিশ্বরচনায় সুন্দরের ধৈর্য অপরিসীম। চিত্তে যখন উপেক্ষা, শ্রদ্ধা যখন অসাড়, তখনও প্রভাতে সন্ধ্যায় ঋতুতে ঋতুতে সুন্দর আসেন, কোনো অর্ঘ্য না নিয়ে চলে যান, তাঁকে যে গ্রহণ করতে না পারলে সে জানতেও পারে না যে সে বঞ্চিত। যুগে যুগে মানুষের সৃষ্টিতেও এমন ঘটনা ঘটেছে, অশ্রদ্ধার অন্ধকার রাত্রে সুন্দর অলক্ষ্যে এসেছেন, দীপ জ্বালা হয় নি, অলক্ষ্যে চলে গিয়েছেন। সাহিত্যে ও কলারচনায় আজ আমাদের যে সঞ্চয় তা যুগযুগান্তরের বহু অপচয়ের পরিশিষ্ট তাতে সন্দেহ নেই। অনেক অতিথি ফিরে যায় রুদ্ধদ্বারে বৃথা আঘাত ক'রে, কেউ-বা দৈবক্রমে এসে পড়ে যখন গৃহস্থ জেগে আছে। কেউ-বা অনেক দ্বার থেকে ফিরে গিয়ে হঠাৎ দেখে একটা গৃহের দ্বার খোলা। আমার সৌভাগ্য এই যে, এখানে দ্বার খোলা পেয়েছি, আহ্বান শুনতে পাচ্ছি 'এসো'। এই পরিষদ আমাকে শ্রদ্ধার আসন

দেবার জন্যে প্রস্তুত; স্বদেশের আতিথ্য এইখানে অকৃপণ; এই সভার সভ্যদের কাছে আমার পরিচয় অন্তত ঔদাসীন্যের দ্বারা ক্ষুণ্ণ হবে না।

দেশবিদেশে আমার সম্মানের বিবরণ আমার বন্ধু এইমাত্র বর্ণনা করেছেন। বাইরের দিক থেকে বিদেশের কাছে আমার পরিচয় পরিমাণ-হিসাবে অতি অল্প। আমার লেখার সামান্য এক অংশের তর্জমা তাঁদের কাছে পৌঁচেছে, সে তর্জমারও অনেকখানি যথেষ্ট স্বচ্ছ নয়। কিন্তু সাহিত্যে, কলারচনায়, পরিমাণের হিসাবটা বড়ো হিসাব নয়, সে ক্ষেত্রে অল্প হয়তো বেশির চেয়ে বেশি হ'তেও পারে। সাহিত্যকে ঠিক ভাবে যে দেখে সে মেপে দেখে না, তলিয়ে দেখে; লম্বা পাড়ি দিয়ে সাঁতার না কাটলেও তার চলে, সে ডুব দিয়ে পরিচয় পায়, সেই পরিচয় অন্তরতর। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা ঐতিহাসিক তথ্যের জন্যে পরিমাণের দরকার, স্বাদের বিচারের জন্যে এক গ্রাসের মূল্য দুই গ্রাসের চেয়ে কম নয়। বস্তুত এই ক্ষেত্রে অধিক অনেক সময়ে স্বরের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়; অনেককে দেখতে গিয়ে যে চিত্তবিক্ষেপ ঘটে তাতে একেকে দেখবার বাধা ঘটায়। রসসাহিত্যে এই একেকে দেখাই আসল দেখা।

একজন য়ুরোপীয় আর্টিস্ট্‌কে একদিন বলেছিলুম যে, ইচ্ছা করে ছবি আঁকার চর্চা করি, কিন্তু আমার দৃষ্টি ক্ষীণ বলে চেষ্টা করতে সাহস হয় না। তিনি বললেন, "ও ভয়টা কিছুই নয়, ছবি আঁকতে গেলে চোখে একটু কম দেখাই দরকার; পাছে অতিরিক্ত দেখে ফেলি এই আশঙ্কায় চোখের পাতা ইচ্ছে ক'রেই কিছু নামিয়ে দিতে হয়। ছবির কাজ হচ্ছে সার্থক দেখা দেখানো; যারা নিরর্থক অধিক দেখে তারা বস্তু দেখে বেশি, ছবি দেখে কম।"

দেশের লোক কাছের লোক—তাঁদের সম্বন্ধে আমার ভয়ের কথাটা এই যে, তাঁরা আমাকে অনেকখানি দেখে থাকেন, সমগ্রকে সার্থককে দেখা তাঁদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। আমার নানা মত আছে, নানা কর্ম আছে, সংসারে নানা লোকের সঙ্গে আমার নানা সম্বন্ধ আছে; কাছের মানুষের কোনো দাবি আমি রক্ষা করি, কোনো দাবি আমি রক্ষা করতে অক্ষম; কেউ-বা আমার কাছ থেকে তাঁদের কাজের ভাবের চিন্তার সম্মতি বা সমর্থন পান কেউ-বা পান না, এই সমস্তকে জড়িয়ে আমার পরিচয় তাঁদের কাছে নানাখানা হয়ে ওঠে— নানা লোকের ব্যক্তিগত রুচি, অনভিরুচি ও রাগদ্বেষের ধূলি-নিবিড় আকাশে আমি দৃশ্যমান। যে-দূরত্ব দৃশ্যতার অনাবশ্যক আতিশয্য সরিয়ে দিয়ে দৃষ্টিবিষয়ের সত্যকে স্পষ্ট করে তোলে, দেশের লোকের চোখের সামনে সেই দূরত্ব দুর্লভ। মুক্তকালের আকাশের মধ্যে সঞ্চরণশীল যে-সত্যকে দেখা আবশ্যক, নিকটের লোক সেই সত্যকে প্রায়ই একান্ত বর্তমান কালের আল্‌পিন দিয়ে রুদ্ধ ক'রে ধরে;

তার পাখার পরিধির পরিমাণ দেখে, কিন্তু ওড়ার মধ্যে সেই পাখার সম্পূর্ণ ও যথার্থ পরিচয় দেখে না। এইরকম দেশের লোকের অতি নিকট দৃষ্টির কাছে নিজের যে খর্বতা তা আমি অনেককাল থেকে অনুভব করে এসেছি। দেশের লোকের সভায় এরই সংকোচ আমি এড়াতে পারি নে। অন্যত্র জগদ্‌বরেণ্য লোকদের সামনে আমাকে কথা বলতে হয়েছে, কিছুমাত্র দ্বিধা আমার মনে কোনোদিন আসে নি; নিশ্চয় জেনেছি, তাঁরা আমাকে স্পষ্ট ক'রে বুঝবেন, একটি নির্মল ও প্রশস্ত ভূমিকার মধ্যে আমার কথাগুলিকে তাঁরা ধ'রে দেখতে পারবেন। এ দেশে এমন-কি অল্পবয়স্ক ছাত্রদের সামনেও দাঁড়াতে আমার সংকোচ বোধ হয়— জানি যে, কত কী ঘরাও কারণে ও ঘরগড়া অসত্যের ভিতর দিয়ে আমার সম্বন্ধে তাঁদের বিচারের আদর্শ উদার হওয়া সম্ভবপর হয় না।

এই জন্যেই যমরাজের নিন্দার প্রতিবাদ করতে বাধ্য হয়েছি; কারণ, তাঁর উপরে আমার মস্ত ভরসা। তিনি নৈকট্যের অন্তরাল ঘুচিয়ে দেবেন; আমার মধ্যে যা-কিছু অবান্তর নিরর্থক ক্ষণকালীন, আর আমার সম্বন্ধে যা কিছু মিথ্যা সৃষ্টি, সে সমস্তই তিনি এক অন্তিম নিশ্বাসে উড়িয়ে দেবেন। বাহিরের নৈকট্যকে সরিয়ে ফেলে অন্তরের নৈকট্যকে তিনি সুগম করবেন। কবিরাজদের পরম সুহৃদ যমরাজ। যেদিন তিনি আমাকে তাঁর দরবারে ডেকে নেবেন সেদিন তোমাদের এই রবীন্দ্র-পরিষদ খুব বমে উঠবে।

কিন্তু এ কথা ব'লে বিশেষ কোনো সান্ত্বনা নেই। মানুষ মানুষের নগদ প্রীতি চায়। মৃত্যুর পরে স্মরণসভার সভাপতির গদগদ ভাষায় করুণ রস যেখানে উচ্ছ্বসিত, সেখানে তৃষার্তের পাত্র পৌঁছয় না। যে জীবলোকে এসেছি এখানে নানা রসের উৎস আছে, সেই সুধারসে মর্তলোকেই আমরা অমৃতের স্বাদ পাই; বুঝতে পারি, এই মাটির পৃথিবীতেও অমরাবতী আছে। মানুষের কাছে মানুষের প্রীতি তারই মধ্যে একটি প্রধান অমৃতরস—মরবার পূর্বে এ যদি অঞ্জলি ভরে পান করতে পাই তা হলে মৃত্যু অপ্রমাণ হয়ে যায়। অনেক দিনের কথা বলছি, তখন আমার অল্প বয়স। একদিন স্বপ্ন দেখেছিলেম, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুশয্যার পাশে আমি বসে আছি। তিনি বললেন, 'রবি, তোমার হাতটা আমাকে দাও দেখি।' হাত বাড়িয়ে দিলেম, কিন্তু তাঁর এই অনুরোধের ঠিক মানেটি বুঝতে পারলেম না। অবশেষে তিনি আমার হাত ধরে বললেন, 'আমি এই যে জীবলোক থেকে বিদায় নিচ্ছি, তোমার হাতের স্পর্শে তারই শেষস্পর্শ নিয়ে যেতে চাই।'

সেই জীবলোকের স্পর্শের জন্যে মনে আকাঙ্ক্ষা থাকে। কেননা, চলে যেতে হবে। আমার কাছে সেই স্পর্শটি কোথায় স্পষ্ট, কোথায় নিবিড়। যেখান থেকে এই

কথাটি আসছে, 'তুমি আমাকে খুশি করেছ, তুমি যে জন্মেছ-সেটা আমার কাছে সার্থক, তুমি আমাকে যা দিয়েছ তার মূল্য আমি মানি।' বর্তমানের এই বাণীর মধ্যে ভাবীকালের দানও প্রচ্ছন্ন; যে-প্রীতি, যে-শ্রদ্ধা সত্য ও গভীর, সকল কালের সীমা সে অতিক্রম করে; ক্ষণকালের মধ্যে সে চিরকালের সম্পদ দেয়। আমার বিদায়কাল অধিক দূরে নেই: এই সময়ে জীবলোকের আনন্দস্পর্শ তোমাদের এই পরিষদে আমার জন্য তোমরা প্রস্তুত রেখেছ, তোমাদের যা দেয় ভাবীকালের উপরে তার বরাত দাও নি।

ভাবীকালকে অত্যন্ত বেশি করে জুড়ে বসে থাকব, এমন আশাও নেই, আকাঙ্ক্ষাও নেই। ভবিষ্যতের কবি ভবিষ্যতের আসন সগৌরবে গ্রহণ করবে। আমাদের কাজ তাদেরই স্থান প্রশস্ত করে দেওয়া। মেয়াদ ফুরোলে যে-গাছ মরে যায় অনেক দিন থেকে ঝরা পাতায় সে মাটি তৈরি করে; সেই মাটিতে খাদ্য জমে থাকে পরবর্তী গাছের জন্যে। ভবিষ্যতের সাহিত্যে আমার জন্যে যদি জায়গার টানাটানিও হয় তবু এ কথা সবাইকে মানতে হবে যে, সাহিত্যের মাটির মধ্যে গোচরে অগোচরে প্রাণের বস্তু কিছু রেখে গেছি। নতুন প্রাণ নতুন রূপ সৃষ্টি করে, কিন্তু পুরাতনের জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হলে সে প্রাণশক্তি পায় না; আমাদের বাণীর সপ্তকে প্রতিষ্ঠা লাভ করে তবেই ভবিষ্যতের বাণী উপরের সপ্তকে চড়তে পারে। সে সপ্তকের রাগিণী তখন নূতন হবে, কিন্তু পুরাতনকে অশ্রদ্ধা করবার স্পর্ধা যেন তার না হয়। মনে যেন থাকে, তখনকার কালের পুরাতন এখনকার কালে নূতনের গৌরবেই আবির্ভূত হয়েছিল।

নবযুগ একটা কথা মাঝে মাঝে ভুলে যায়— তার বুঝতে সময় লাগে যে, নূতনত্বে আর নবীনত্বে প্রভেদ আছে। নূতনত্ব কালের ধর্ম, নবীনত্ব কালের অতীত। মহারাজা-বাহাদুর আকাশে যে-জয়ধ্বজা ওড়ান আজ সে নতুন, কাল সে পুরানো। কিন্তু সূর্যের রথে যে অরুণধ্বজা ওড়ে কোটি কোটি যুগ ধরে প্রতিদিনই সে নবীন। একটি বালিকা তার স্বাক্ষরখাতায় আমার কাছ থেকে একটি বাংলা শ্লোক চেয়েছিল। আমি লিখে দিয়েছিলুম—

নূতন সে পলে পলে অতীতে বিলীন,
যুগে যুগে বর্তমান সেই তো নবীন।
তৃষ্ণা বাড়াইয়া তোলে নূতনের সুরা,
নবীনের নিত্যসুধা তৃপ্তি করে পুরা।

সৃষ্টিশক্তিতে যখন দৈন্য ঘটে তখনই মানুষ তাল ঠুকে নূতনত্বের আস্ফালন করে। পুরাতনের পাত্রে নবীনতার অমৃতরস পরিবেশন করবার শক্তি তাদের নেই, তারা

শক্তির অপূর্বতা চড়া গলায় প্রমাণ করবার জন্যে সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুতের সন্ধান করতে থাকে। সেদিন কোনো একজন বাঙালি হিন্দু কবির কাব্যে দেখলুম, তিনি রক্ত শব্দের জায়গায় ব্যবহার করেছেন 'খুন'। পুরাতন 'রক্ত' শব্দে তাঁর কাব্যে রাঙা রঙ যদি না ধরে তা হলে বুঝব, সেটাতে তাঁরই অকৃতিত্ব। তিনি রঙ লাগাতে পারেন না বলেই তাক লাগাতে চান। নতুন আসে অকস্মাতের খোঁচা দিতে, নবীন আসে চিরদিনের আনন্দ দিতে।

সাহিত্যে এইরকম নতুন হয়ে ওঠবার জন্যে যাঁদের প্রাণপণ চেষ্টা তাঁরাই উচ্চৈঃস্বরে নিজেদের তরুণ বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু, আমি তরুণ বলব তাঁদেরই যাঁদের কল্পনার আকাশ চিরপুরাতন রক্তরাগে অরুণবর্ণে সহজে নবীন, চরণ রাঙাবার জন্যে যাঁদের উষাকে নিয়ুমার্কেটে 'খুন' ফরমাশ করতে হয় না। আমি সেই তরুণদের বন্ধু, তাঁদের বয়স যতই প্রাচীন হোক। আর যে-বৃদ্ধদের মরচে-ধরা চিত্তবীণায় পুরাতনের স্পর্শে নবীন রাগিণী বেজে ওঠে না তাঁদের সঙ্গে আমার মিল হবে না, তাঁদের বয়স নিতান্ত কাঁচা হলেও।

এই পরিষদ সকল বয়সের সেই তরুণদের পরিষদ হোক। পুরাতনের নবীনতা বুঝতে তাঁদের যেন কোনো বাধা না থাকে।

১৩৩৪

সাহিত্যরূপ

আজ এই সভা আহ্বান করা হয়েছে এই ইচ্ছা করে যে, নবীন প্রবীণ সকলে মিলে সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনা করব; কোনো চরম সিদ্ধান্ত পাকা করে দেওয়া যাবে তা মনে করে নয়। অনেক সময়ে আমরা ঝগড়া করি পরস্পরের কথা স্পষ্ট বুঝি না বলে। শুধু তাই নয়, প্রতিপক্ষের মনে ব্যক্তিগত বিরুদ্ধতা আমরা অনেক সময়ে কল্পনা করে নিই; তাতে করে মতান্তরের সঙ্গে মনান্তর মিশে যায়, তখন কোনো-প্রকার আপোষ হওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। মোকাবিলায় যখন আলোচনায় প্রবৃত্ত হব তখন আশা করি এ কথা বুঝতে কারও বিলম্ব হবে না যে, যে-জিনিসটা নিয়ে তর্ক করছি সেটা আমাদের দুই পক্ষেরই দরদের জিনিস, সেটা বাংলাসাহিত্য। এই মূল জায়গায় আমাদের মিল আছে; এখন অমিলটা কোথায় সেটা শান্তভাবে স্থির করে দেখা দরকার।

আমার বয়স একদা অল্প ছিল, তখন সেকালের অল্পবয়সীদের সঙ্গে একাসনে বসে আলাপ করা সহজ ছিল। দীর্ঘকাল সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। তার কারণ এ নয় যে, আমার পক্ষে কোনো বাধা আছে। এখনকার কালে যাঁরা চিন্তা করছেন, রচনা করছেন, বাংলাসাহিত্যে নেতৃত্ব নেবার যাঁরা উপযুক্ত হয়েছেন বা হবেন, তাঁরা কী মনের ভাব নিয়ে আসরে নেবেছেন সে সম্বন্ধে আমার সঙ্গে সহজভাবে আলাপ-আলোচনা করবার পক্ষে তাঁদের মনের মধ্যে হয়তো কোনো অন্তরায় আছে। এ নিয়ে অনেকে আমাকেই অপরাধী করেন। তাঁরা বলেন, আমি না জেনে অনেক সময় অনেক কথা বলে থাকি। এটা অসম্ভব নয়। আজকের দিনে বাংলা ভাষায় প্রতিদিন যে-সব লেখা প্রকাশিত হচ্ছে তা সমস্ত পড়া আমার পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। সে শক্তিও নেই, অবকাশেরও অভাব আছে। সেই কারণেই আজকের মতো এই-রকম উপলক্ষ্যে নূতন লেখকদের কাছ থেকে রচনানীতি ও রীতি সম্বন্ধে তাঁদের অন্তরের কথা কিছু শুনে নেব, এই ইচ্ছা করি।

আলোচনাটাকে এগিয়ে দেবার জন্য প্রসঙ্গটার একটা গোড়াপত্তন করে দেওয়া ভালো।

এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদের অনেকের চেয়ে আমার বয়স বেশি। আধুনিক বঙ্গসাহিত্য যে-যুগে আরম্ভ হয়েছিল সে আমার জন্মের অদূরবর্তী পূর্বকালে। সেইজন্যে এই সাহিত্যসূত্রপাতের চিত্রটি আমার কাছে সুস্পষ্ট।

আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্য শুরু হয়েছে মধুসূদন দত্ত থেকে। তিনিই প্রথমে ভাঙনের এবং সেই ভাঙনের ভূমিকার উপরে গড়নের কাজে লেগেছিলেন খুব সাহসের সঙ্গে। ক্রমে ক্রমে নয়, ধীরে ধীরে নয়। পূর্বকার ধারাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে তিনি এক মুহূর্তেই নূতন পন্থা নিয়েছিলেন। এ যেন এক ভূমিকম্পে একটা ডাঙা উঠে পড়ল জলের ভিতর থেকে।

আমরা দেখলুম কী। কোনো একটা নূতন বিষয়? তা নয়, একটা নূতন রূপ। সাহিত্যে যখন কোনো জ্যোতিষ্ক দেখা দেন তখন তিনি নিজের রচনায় একটি বিশেষ রূপ নিয়ে আসেন। তিনি যে-ভাবকে অবলম্বন করে লেখেন তারও বিশেষত্ব থাকতে পারে, কিন্তু সেও গৌণ; সেই ভাবটি যে বিশেষরূপ অবলম্বন করে প্রকাশ পায় সেটিতেই তার কৌলীন্য। বিষয়ে কোনো অপূর্বতা না থাকতে পারে, সাহিত্যে হাজার বার বার পুনরাবৃত্তি হয়েছে এমন বিষয় হলেও কোনো দোষ নেই, কিন্তু সেই বিষয়টি যে-একটি বিশেষ রূপ গ্রহণ করে তাতেই তার অপূর্বতা। পানপাত্র তৈরির বেলায় পাথরের যুগে পাথর ও সোনার যুগে সোনাটা উপাদানরূপে নেওয়া হয়েছে,

পণ্যের দিক থেকে বিচার করলে তার দামের ইতরবিশেষ থাকতে পারে, কিন্তু শিল্পের দিক থেকে বিচার করবার বেলায় আমরা তার রূপটাই দেখি। রসসাহিত্যে বিষয়টা উপাদান, তার রূপটাই চরম। সেইটেই আমাদের ভাষায় এবং সাহিত্যে নূতন শক্তি সঞ্চার করে, সাধনার নূতন পথ খুলে দেয়। বলা বাহুল্য, মধুসূদন দত্তের প্রতিভা আত্মপ্রকাশের জন্যে সাহিত্যে একটি রূপের প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছিল। যাতে সেই লক্ষ্যের দিকে আপন কলমকে নিয়ে যেতে পারেন এমন একটা ছন্দের প্রশস্ত রাজপথ মাইকেল তৈরি করে তুললেন। রূপটিকে মনের মতো গাম্ভীর্য দেবেন বলে ধ্বনিবান শব্দ বেছে বেছে জড়ো করলেন। তাঁর বর্ণনীয় বিষয় যে-রূপের সম্পদ পেল সেইটেতেই সে ধন্য হল। মিল্‌টন ইংরেজিভাষায় লাটিন-ধাতুমূলক শব্দ বহু পরিমাণে ব্যবহার করার দ্বারায় তার ধ্বনিরূপের যে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিলেন, মাইকেলেরও তদনুরূপ আকাঙ্ক্ষা ছিল। যদি বিষয়ের গাম্ভীর্যই যথেষ্ট হত তা হলে তার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

এ কথা সত্য, বাংলাসাহিত্যে মেঘনাদবধ কাব্য তার দোহার পেল না। সম্পূর্ণ একলা রয়ে গেল। অর্থাৎ, মাইকেল বাংলাভাষায় এমন একটি পথ খুলেছিলেন যে পথে কেবলমাত্র তাঁরই একটিমাত্র মহাকাব্যের রথ চলেছিল। তিনি বাংলাভাষার স্বভাবকে মেনে চলেন নি। তাই তিনি যে-ফল ফলালেন তাতে বীজ ধরল না, তাঁর লেখা সন্ততিহীন হল, উপযুক্ত বংশাবলী সৃষ্টি করল না। তাঁর পরে হেম বাড়ুয্যে বৃত্রসংহার, নবীন সেন রৈবতক লিখলেন; এ দুটিও মহাকাব্য, কিন্তু তাঁদের কাব্যের রূপ হল স্বতন্ত্র। তাঁদের মহাকাব্যও রূপের বিশিষ্টতার দ্বারা উপযুক্তভাবে মূর্তিমান হয়েছে কিনা, এবং তাঁদের এই রূপের ছাঁদ ভাষায় চিরকালের মতো রয়ে গেল কিনা, সে তর্ক এখানে করতে চাই নে— কিন্তু রূপের সম্পূর্ণতা-বিচারেই তাঁদেরও কাব্যের বিচার চলবে; তাঁরা চিন্তাক্ষেত্রে অর্থনীতি ধর্মনীতি বা রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে কোন্‌ কোঠা খুলে দিয়েছেন সেটা কাব্যসাহিত্যের মুখ্য বিচার্য নয়। বিষয়ের গৌরব বিজ্ঞানে দর্শনে, কিন্তু রূপের গৌরব রসসাহিত্যে।

মাইকেল তাঁর নবসৃষ্টির রূপটিকে সাহিত্যে চিরপ্রতিষ্ঠা দেন নি বটে, কিন্তু তিনি সাহস দিয়ে গেলেন, নতুন লেখকদের উৎসাহ দিলেন। তিনি বললেন, প্রতিভা আপন-সৃষ্ট নব নব রূপের পথে সাহিত্যকে নব নব ধারায় প্রবাহিত করে দেয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের দিকে তাকালে দেখি সেই একই কথা। তিনি গল্পসাহিত্যের এক নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিলেন। বিজয়বসন্ত বা গোলেবকাওলির যে-চেহারা ছিল সে চেহারা আর রইল না। তাঁর পূর্বেকার গল্পসাহিত্যের ছিল মুখোশ-পরা রূপ, তিনি

সেই মুখোশ ঘুচিয়ে দিয়ে গল্পের একটি সজীব মুখশ্রীর অবতারণা করলেন। হোমার, বর্জিল, মিল্‌টন প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবিদের কাছ থেকে মাইকেল তাঁর সাধনার পথে উৎসাহ পেয়েছিলেন; বঙ্কিমচন্দ্রও কথাসাহিত্যের রূপের আদর্শ পাশ্চাত্য লেখকদের কাছ থেকে নিয়েছেন। কিন্তু, এঁরা অনুকরণ করেছিলেন বললে জিনিসটাকে সংকীর্ণ করে বলা হয়। সাহিত্যের কোনো-একটি প্রাণবান রূপে মুগ্ধ হয়ে সেই রূপটিকে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন; সেই রূপটিকে নিজের ভাষায় প্রতিষ্ঠিত করবার সাধনায় তাঁরা সৃষ্টিকর্তার আনন্দ পেয়েছিলেন, সেই আনন্দে তাঁরা বন্ধন ছিন্ন করেছেন, বাধা অতিক্রম করেছেন। এক দিক থেকে এটা অনুকরণ, আর-এক দিক থেকে এটা আত্মীকরণ। অনুকরণ করবার অধিকার আছে কার। যার আছে সৃষ্টি করবার শক্তি। আদান-প্রদানের বাণিজ্য চিরদিনই আর্টের জগতে চলেছে। মূলধন নিজের না হতে পারে, ব্যাঙ্কের থেকে টাকা নিয়ে ব্যাবসা নাহয় শুরু হল, তা নিয়ে যতক্ষণ কেউ মুনফা দেখাতে পারে ততক্ষণ সে মূলধন তার আপনারই। যদি ফেল্ করে তবেই প্রকাশ পায় ধনটা তার নিজের নয়। আমরা জানি, এসিয়াতে এমন এক যুগ ছিল যখন পারস্যে চীনে গ্রীসে রোমে ভারতে আর্টের আদর্শ চালাচালি হয়েছিল। এই ঋণ-প্রতিঋণের আবর্তন-আলোড়নে সমস্ত এসিয়া জুড়ে নবনবোন্মেষশালী একটি আর্টের যুগ এসেছিল — তাতে আর্টিস্টের মন জাগরূক হয়েছিল, অভিভূত হয় নি। অর্থাৎ, সেদিন চীন পারস্য ভারত কে কার কাছ থেকে কী পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করেছে সে কথাটা চাপা পড়েছে, তাদের প্রত্যেকের স্বকীয় মুনফার হিসাবটাই আজও বড়ো হয়ে রয়েছে। অবশ্য, ঋণ-করা ধনে ব্যাবসা করবার প্রতিভা সকলের নেই। যার আছে সে ঋণ করলে একটুও দোষের হয় না। সেকালের পাশ্চাত্য সাহিত্যিক স্কট বা বুলোয়ার লিটনের কাছ থেকে বঙ্কিম যদি ধার করে থাকেন সেটাতে আশ্চর্যের কথা কিছু নেই। আশ্চর্য এই যে, বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে তার থেকে তিনি ফসল ফলিয়ে তুললেন। অর্থাৎ, তাঁর হাতে সেটা মরা বীজের মতো শুকনো হয়ে ব্যর্থ হল না। কথাসাহিত্যের নতুন রূপ প্রবর্তন করলেন; তাকে ব্যবহার করে বাংলাদেশের পাঠকদের পরমানন্দ দিলেন। তারা বললে না যে, এটা বিদেশী; এই রূপকে তারা স্বীকার করে নিলে। তার কারণ, বঙ্কিম এমন একটি সাহিত্য-রূপে আনন্দ পেয়েছিলেন, এবং সেই রূপকে আপন ভাষায় গ্রহণ করলেন, যার মধ্যে সর্বজনীন আনন্দের সত্য ছিল। বাংলাভাষায় কথাসাহিত্যের এই রূপের প্রবর্তনে বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রণী। রূপের এই প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে তারই পূজা চালালেন তিনি বাংলাসাহিত্যে। তার কারণ, তিনি এই রূপের রসে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এ নয় যে, গল্পের কোনো একটি থিওরি প্রচার করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। 'বিষবৃক্ষ' নামের দ্বারাই

মনে হতে পারে যে, ঐ গল্প লেখার আনুষঙ্গিকভাবে একটা সামাজিক মতলব তাঁর মাথায় এসেছিল। কুন্দনন্দিনী সূর্যমুখীকে নিয়ে যে একটা উৎপাতের সৃষ্টি হয়েছিল সেটা গৃহধর্মের পক্ষে ভালো নয়, এই অতি জীর্ণ কথাটাকে প্রমাণ করবার উদ্দেশ্য রচনাকালে সত্যই যে তাঁর মনে ছিল, এ আমি বিশ্বাস করি নে— ওটা হঠাৎ পুনশ্চ-নিবেদন; বস্তুত তিনি রূপমুগ্ধ রূপস্রষ্টা রূপস্রষ্টা রূপেই বিষবৃক্ষ লিখেছিলেন।

নবযুগের কোনো সাহিত্যনায়ক যদি এসে থাকেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করব, সাহিত্যে তিনি কোন্ নবরূপের অবতারণা করেছেন।

ইংরেজি সাহিত্যের থেকে দেখা যাক। একদিন সাহিত্যের আসরে পোপ ছিলেন নেতা। তাঁর ছিল ঝক্‌ঝকে পালিস-করা লেখা; কাটাকোটা ছাঁটাছোঁটা জোড়া-দেওয়া দ্বিপদীর গাঁথনি। তাতে ছিল নিপুণ ভাষা ও তীক্ষ্ণ ভাবের উজ্জ্বলতা, রসধারার প্রবাহ ছিল না। শক্তি ছিল তাতে, তখনকার লোকে তাতে প্রচুর আনন্দ পেয়েছিল।

এমন সময়ে এলেন বার্‌ন্‌স্। তখনকার শান-বাঁধানো সাহিত্যের রাস্তা, যেখানে তক্‌মা-পরা কায়দাকানুনের চলাচল, তার উপর দিয়ে হঠাৎ তিনি প্রাণের বসন্ত-উৎসবের যাত্রীদের চালিয়ে নিলেন। এমন একটি সাহিত্যের রূপ আনলেন যেটা আগেকার সঙ্গে মিলল না। তার পর থেকে ওয়ার্ড্‌স্বার্থ, কোল্‌রিজ, শেলি, কীট্‌স্ আপন আপন কাব্যের স্বকীয় রূপ সৃষ্টি করে চললেন। সেই রূপের মধ্যে ভাবের বিশিষ্টতাও আছে, কিন্তু ভাবগুলি রূপবান হয়েছে ব'লেই তার গৌরব। কাব্যের বিষয় ভাষা ও রূপ সম্বন্ধে ওয়ার্ড্‌স্বার্থের বাঁধা মত ছিল, কিন্তু সেই বাঁধা মতের মানুষটি কবি নন; যেখানে সেই-সমস্ত মতকে বেমালুম পেরিয়ে গেছেন সেইখানেই তিনি কবি। মানবজীবনের সহজ সুখদুঃখে প্রকৃতির সহজ সৌন্দর্যে আনন্দই সাধারণত ওয়ার্ড্‌স্বার্থের কাব্যের অবলম্বন বলা যেতে পারে। কিন্তু, টম্‌সন্ একেন্‌সাইড প্রভৃতি তৃতীয় শ্রেণীর কবিদের রচনার মধ্যেও এই বিষয়টি পাওয়া যায়। কিন্তু, বিষয়ের গৌরব তো কাব্যের গৌরব নয়; বিষয়টি রূপে মূর্তিমান যদি হয়ে থাকে তা হলেই কাব্যের অমরলোকে সে থেকে গেল। শরৎকালকে সম্বোধন করে কীটস্ যে-কবিতা লিখেছেন তার বিষয় বিশ্লেষণ করে কীই বা পাওয়া যায়; তার সমস্তটাতেই রূপের জাদু।

য়ুরোপীয় সাহিত্য আমার যে বিশেষ জানা আছে, এমন অহংকার আমি করি নে। শুনতে পাই, দান্তে, গ্যেটে, ভিক্টর হ্যুগো আপন আপন রূপের জগৎ সৃষ্টি করে গেছেন। সেই রূপের লীলায় ঢেলে দিয়েছেন তাঁদের আনন্দ। সাহিত্যে এই নব নব রূপস্রষ্টার সংখ্যা বেশি নয়।

এই উপলক্ষ্যে একটা কথা বলতে চাই। সম্প্রতি সাহিত্যের যুগ-যুগান্তর কথাটার

উপর অত্যন্ত বেশি ঝোঁক দিতে আরম্ভ করেছি। যেন কালে কালে 'যুগ' বলে এক-একটা মৌচাক তৈরি হয়, সেই সময়ের বিশেষ চিহ্ন-ওয়ালা কতকগুলি মৌমাছি তাতে একই রঙের ও স্বাদের মধু বোঝাই করে— বোঝাই সারা হলে তারা চাক ছেড়ে কোথায় পালায় ঠিকানা পাওয়া যায় না। তার পরে আবার নতুন মৌমাছির দল এসে নতুন যুগের মৌচাক বানাতে লেগে যায়।

সাহিত্যের যুগ বলতে কী বোঝায় সেটা বোঝাপড়া করবার সময় হয়েছে। কয়লার খনিক বা পানওয়ালীদের কথা অনেকে মিলে লিখলেই কি নবযুগ আসে। এইরকমের কোনো একটা ভঙ্গিমার দ্বারা যুগান্তরকে সৃষ্টি করা যায়, এ কথা মানতে পারব না। সাহিত্যের মতো দলছাড়া জিনিস আর কিছু নেই। বিশেষ একটা চাপরাশ-পরা সাহিত্য দেখলেই গোড়াতেই সেটাকে অবিশ্বাস করা উচিত। কোনো-একটা চাপরাশের জোরে যে-সাহিত্য আপন বিশিষ্টতার গৌরব খুব চড়া গলায় প্রমাণ করতে দাঁড়ায়, জানব, তার গোড়ায় একটা দুর্বলতা আছে। তার ভিতরকার দৈন্য আছে বলেই চাপরাশের দেমাক বেশি হয়। য়ুরোপের কোনো কোনো লেখক শ্রমজীবীদের দুঃখের কথা লিখেছে, কিন্তু সেটা যে-ব্যক্তি লিখেছে সেই লিখেছে। দীনবন্ধু মিত্র লিখেছিলেন নীলদর্পণ নাটক, দীনবন্ধু মিত্রই তার সৃষ্টিকর্তা। ওর মধ্যে যুগের তকমাটাই সাহিত্যের লক্ষণ বানিয়ে বসে নি। আজকের দিনের বারো-আনা লোক যদি চরকা নিয়েই কাব্য ও গল্প লিখতে বসে তা হলেও যুগসাহিত্যের সৃষ্টি হবে না—কেননা তার পনেরো আনাই হবে অসাহিত্য। খাঁটি সাহিত্যিক যখন একটা সাহিত্য রচনা করতে বসেন তখন তাঁর নিজের মধ্যে একটা একান্ত তাগিদ আছে বলেই করেন; সেটা সৃষ্ট করবার তাগিদ, সেটা ভিন্ন লোকের ভিন্নরকম। তার মধ্যে পানওয়ালী বা খনিক আপনিই এসে পড়ল তো ভালোই। কিন্তু, সেই এসে পড়াটা যেন যুগধর্মের একটা কায়দার অন্তর্গত না হয়। কোনো-একটা উদ্ভটরকমের ভাষা বা রচনার ভঙ্গী বা সৃষ্টিছাড়া ভাবের আমদানির দ্বারা যদি এ কথা বলবার চেষ্টা হয় যে, যেহেতু এমনতরো ব্যাপার ইতিপূর্বে কখনো হয় নি সেইজন্যেই এটাতে সম্পূর্ণ নূতন যুগের সূচনা হল, সেও অসংগত। পাগলামির মতো অপূর্ব আর কিছুই নেই, কিন্তু তাকেও ওরিজিন্যালিটি বলে গ্রহণ করতে পারি নে। সেটা নূতন কিন্তু কখনোই চিরন্তন নয়— যা চিরন্তন নয় তাকে সাহিত্যের জিনিস বলা যায় না।

কোনো ব্যক্তিবিশেষ নিজের সাহিত্যিক পালাটা সাঙ্গ করে চলে যেতে পারেন; কিন্তু তিনি যে একটা-কোনো যুগকে চুকিয়ে দিয়ে যান কিম্বা আর-একজন যখন তাঁর নিজের ব্যক্তিগত প্রতিভাকে প্রকাশ করেন তিনি আর-একটা যুগকে এনে হাজির

করে দেন, এটা অদ্ভুত কথা। একজন সাহিত্যিক আর-একজন সাহিত্যিককে লুপ্ত করে দিয়ে যান না, তাঁরা একটা পাতার পরে আর-একটা পাতা যুক্ত করে দেন। প্রাচীন কালে যখন কাগজ যথেষ্ট পরিমাণে ছিল না তখন একজনের লেখা চেঁচে মেজে তারই উপরে আর-একজন লিখত— তাতে পূর্বলেখকের চেয়ে দ্বিতীয় লেখকের অধিকতর যোগ্যতা প্রমাণ হত না, এইমাত্র প্রমাণ হত যে, দ্বিতীয় লেখকটি পরবর্তী। এক যুগ আর-এক যুগকে লুপ্ত না করে আপনার স্থান পায় না, এইটেই যদি সত্য হয় তবে তাতে কেবল কালেরই পূর্বাপরতা প্রমাণ হয়; তার চেয়ে বেশি কিছু নয়— হয়তো দেখা যাবে, ভাবীকাল উপরিবর্তী লেখ াটাকে মুছে ফেলে তলবর্তীটাকেই উদ্ধার করবার চেষ্টা করবে। নূতন কাল উপস্থিতমতো খুবই প্রবল— তার তুচ্ছতাও স্পর্ধিত; সে কিছুতেই মনে করতে পারে না যে, তার মেয়াদ বেশিক্ষণের হয়তো নয়। কোনো-এক ভবিষ্যতে সে যে তার অতীতের চেয়েও জীর্ণতর প্রমাণিত হতে পারে, এ কথা বিশ্বাস করা তার পক্ষে কঠিন। এই জন্যেই অতি অনায়াসেই সে দম্ভ করে যে, সেই চরম সত্যের পূর্বতন ধারাকে সে অগ্রাহ্য করে দিয়েছে। এ কথা মনে রাখা দরকার, সাহিত্যের সম্পদ চিরযুগের ভাণ্ডারের সামগ্রী— কোনো বিশেষ যুগের ছাড়পত্র দেখিয়ে সে আপনার স্থান পায় না।

যদি নিজের সাহিত্যিক অভিজ্ঞতার কথা কিছু বলি, আশা করি, আপনারা মাপ করবেন। আমার বাল্যকালে আমি দুই-একজন কবিকে জানতুম। তাঁদের মতো লিখতে পারব, এই আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল। লেখবার চেষ্টাও করেছি, মনে কখনও কখনও নিশ্চয়ই অহংকারও হয়েছে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটা অতৃপ্তিও ছিল। সাহিত্যের যে-রূপটা অন্যের, আমার আত্মপ্রকাশকে কোনোমতে সেই মাপের সঙ্গে মিলিয়ে তোলবার চেষ্টা করে কখনোই যথার্থ আনন্দ হতে পারে না। যা হোক, বাল্যকালে যখন নিজের অন্তরে কোনো আদর্শ উপলব্ধি করতে পারি নি, তখন বাইরের আদর্শের অনুবর্তন করে যতটুকু ফল লাভ করা যেত সেইটেকেই সার্থকতা বলে মনে করতুম।

এক সময়ে যখন আপন মনে একলা ছিলুম, একখানা স্লেট হাতে মনের আবেগে দৈবাৎ একটা কবিতা লিখতেই অপূর্ব একটা গৌরব বোধ হল। যেন আপন প্রদীপের শিখা হঠাৎ জ্বলে উঠল। যে লেখাটা হল সেইটের মধ্যেই কোনো উৎকর্ষ অনুভব করে যে আনন্দ তা নয়। আমার অন্তরের শক্তি সেই প্রথম আপন রূপ নিয়ে দেখা দিল। সেই মুহূর্তেই এতদিনের বাইরের বন্ধন থেকে মুক্তি পেলুম। তখনকার দিনের প্রবীণ সাহিত্যিকরা আমার সেই কাব্যরূপটিকে সমাদর করেন নি, পরিহাসও করেছিলেন। তাতে আমি ক্ষুব্ধ হই নি, কেননা আমার আদর্শের সমর্থন আমার নিজেরই মধ্যে,

বাইরেকার মাপকাঠির সাক্ষ্যকে স্বীকার করবার কোনো দরকারই ছিল না। সেদিন যে-কাব্যরূপের দর্শন পেলুম সে নিঃসন্দেহই কোনো-একটা বিষয় অবলম্বন করে এসেছিল, কিন্তু আনন্দ সেই বিষয়টিকে নিয়ে নয়; সেই বিষয়ের মধ্যে কোনো অসামান্যতা ছিল বলেই তৃপ্তি বোধ করেছি তাও নয়। আত্মশক্তিকে অনুভব করেছিলুম কোনো-একটি প্রকাশরূপের স্বকীয় বিশিষ্টতায়। সে-লেখাটি মোটের উপর নিতান্তই কাঁচা; আজকের দিনে তা নিয়ে গৌরব করতে পারি নে। সেদিন আমার যে-বয়স ছিল আজ সে বয়সের যে-কোনো বালক কবি তার চেয়ে অনেক ভালো লিখতে পারেন। তখনকার কালের ইংরেজি বা স্বাদেশীয় বিশেষ একটা পদ্ধতির সঙ্গে আমার সেই লেখাটা খাপ খেয়ে গেল এমন কথা বলতে পারি নে। আজ পর্যন্ত জানি নে, কোনো একটা যুগ-যুগান্তরের কোঠায় তাকে ফেলা যায় কিনা। আমার নিজেরই রচনার স্বকীয় যুগের আরম্ভসংকেত ব'লে তাকে গণ্য করা যেতে পারে।

এই রূপসৃষ্টির আবির্ভাব একই কবির জীবনে বারবার ঘটে থাকে। রচনার আনন্দের প্রকাশই হচ্ছে নব নব রূপে। সেই নবরূপ-আবির্ভাবের দিনে প্রত্যেক বারেই অন্তরের প্রাঙ্গণে শাঁখ বেজে ওঠে, এ কথা সকল কবিই জানে। আমার জীবনে, মানসী, সোনার তরী, কণিকা, পলাতকা আপন বিশেষ বিশেষ রূপ নিয়েই উৎসব করেছে। সেই রূপের আনন্দেই রচনায় বিষয়গুলি হয়েছে সার্থক। বিষয়গুলি অনিবার্য কারণে আপনিই কালোচিত হয়ে ওঠে। মানবজীবনের মোটা মোটা কথাগুলো আন্তরিক ভাবে সকল সময়েই সমান থাকে বটে কিন্তু তার বাইরের আকৃতি-প্রকৃতির বদল হয়। মানুষের আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্র কালে কালে বিস্তৃত হতে থাকে। আগে হয়তো কেবল ঋষি মুনি রাজা প্রভৃতির মধ্যেই মনুষ্যত্বের প্রকাশ কবিদের কাছে স্পষ্ট ছিল; এখন তার পরিধি সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে গেছে। অতএব, বিষয়ের বৈচিত্র্য কালে কালে ঘটতে বাধ্য। কিন্তু, যখন সাহিত্যে আমরা তার বিচার করি তখন কোন্ কথাটা বলা হয়েছে তার উপরে ঝোঁক থাকে না, কেমন করে বলা হয়েছে সেইটের উপরেই বিশেষ দৃষ্টি দিই। ডারুয়িনের অভিব্যক্তিবাদের মূল কথাটা হয়তো মানবসাহিত্যে কখনো-না-কখনো বলা হয়েছে, জগদীশচন্দ্র বৃক্ষের মধ্যে প্রাণের যে-স্বরূপটি দেখাচ্ছেন হয়তো মোটামুটি-ভাবে কোনো একটা সংস্কৃত শ্লোকের মধ্যে তার আভাস থাকতে পারে— কিন্তু তাকে সায়ান্স্ বলে না; সায়ান্সের একটা ঠাট আছে, যতক্ষণ সেই ঠাটের মধ্যে কোনো একটা তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা না যায় ততক্ষণ তার বৈজ্ঞানিক মূল্য কিছুই নেই। তেমনি বিষয়টি যত বড়োই হিতকর বা অপূর্ব হোক না কেন যতক্ষণ সে কোনো-একটা সাহিত্যরূপের মধ্যে চিরপ্রাণের শক্তি লাভ না করে ততক্ষণ কেবলমাত্র

বিষয়ের দামে তাকে সাহিত্যের দাম দেওয়া যায় না। রচনার বিষয়টি কালোচিত যুগোচিত, এইটেতেই যাঁর একমাত্র গৌরব তিনি উঁচুদরের মানুষ হতে পারেন, কিন্তু তিনি কবি নন, সাহিত্যিক নন।

আমাদের দেশের লেখকদের একটা বিপদ আছে। য়ুরোপীয় সাহিত্যের এক-একটা বিশেষ মেজাজ যখন আমাদের কাছে প্রকাশ পায় তখন আমরা অত্যন্ত বেশি অভিভূত হই। কোনো সাহিত্যই একেবারে শুদ্ধ নয়। তার চলতি ধারা বেয়ে অনেক পণ্য ভেসে আসে; আজকের হাটে যা নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায় কালই তা আবর্জনাকুণ্ডে স্থান পায়। অথচ আমরা তাকে স্থাবর ব'লে গণ্য করি ও তাকে চরম মূল্য দিয়ে সেটাকে কাল্‌চারের লক্ষণ বলে মানি। চলতি স্রোতে যা-কিছু সব-শেষে আসে তারই যে সব-চেয়ে বেশি গৌরব, তার দ্বারাই যে পূর্ববর্তী আদর্শ বাতিল হয়ে যায় এবং ভাবীকালের সমস্ত আদর্শ ধ্রুব রূপ পায়, এমনতরো মনে করা চলে না। সকল দেশের সাহিত্যেই জীবনধর্ম আছে, এই জন্যে মাঝে মাঝে সে সাহিত্যে অবসাদ ক্লান্তি রোগ মূর্ছা আক্ষেপ দেখা দেয়— তার মধ্যে যদি প্রাণের জোর থাকে তবে এ-সমস্তই সে আবার কাটিয়ে যায়। কিন্তু, দূরে থেকে আমরা তার রোগকেও স্বাস্থ্যের দরে স্বীকার করে নিই। মনে করি, তার প্রকৃতিস্থ অবস্থার চেয়েও এই লক্ষণগুলো বলবান ও স্থায়ী, যেহেতু এটা আধুনিক। সাহিত্যের মধ্যে অপ্রকৃতিস্থতার লক্ষণ তখনই প্রকাশ পায় যখনই দেখি বিষয়টা অত্যন্ত বেশি প্রবল হয়ে উঠেছে। আজকালকার দিনে য়ুরোপে নানা কারণে তার ধর্ম সমাজ লোকব্যবহার স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ অত্যন্ত বেশি নাড়া খাওয়াতে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। সেই সমস্ত সমস্যার মীমাংসা না হলে তার বাঁচাও নেই। এই একান্ত উৎকণ্ঠার দিনে এই সমস্যার দল বাছবিচার করতে পারছে না। যুদ্ধের সময় সৈনিকেরা যেমন প্রয়োজনের দায়ে গৃহস্থের ঘর ও ভাণ্ডার দখল করে বসে, তেমনি প্রব্লেমের রেজিমেন্ট্ তাদের নিজের বারিক ছাপিয়েও সাহিত্যের সর্বত্রই ঢুকে পড়ছে। লোকে আপত্তি করছে না, কেননা সমস্যাসমাধানের দায় তাদের অত্যন্ত বেশি। এই উৎপাতে সাহিত্যের বাসা যদি প্রব্লেমের বারিক হয়ে ওঠে তবে এ প্রশ্ন মারা যায় যে, স্থাপত্য-কলার আদর্শে এই ঘরের রূপটি কী। প্রয়োজনের গরজ যেখানে অত্যন্ত বেশি সেখানে রূপ জিনিসটা অবান্তর। য়ুরোপে সাহিত্যের সব ঘরই প্রব্লেমের ভাণ্ডারঘর হয়ে উঠতে চেষ্টা করছে; তাই প্রতিদিনই দেখছি, সাহিত্যে রূপের মূল্যটা গৌণ হয়ে আসছে। কিন্তু, এটা একটা ক্ষণকালীন অবস্থা— আশা করা যেতে পারে যে, বিষয়ের দল বর্তমানের গরজের দাবি ক্রমে ত্যাগ করবে এবং সাহিত্যে রূপের স্বরাজ আবার ফিরে আসবে। মার্শাল ল যেখানে কোনো কারণে চিরকালের হয়ে ওঠে সেখান থেকে গৃহস্থকে

দেশান্তরে যাবার ব্যবস্থা করাই কর্তব্য। বিষয়প্রধান সাহিত্যই যদি এই যুগের সাহিত্য হয় তা হলে বলতেই হবে, এটা সাহিত্যের পক্ষে যুগান্ত।

সভায় আমার বক্তব্য শেষ হলে পর অধ্যাপক অপূর্বকুমার চন্দ বললেন: কাব্য-সাহিত্যের বিশিষ্টতা ভাবের প্রগাঢ়তায় (intensity)। কবি টম্‌সন্‌ ঋতুবর্ণনাচ্ছলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেছেন, এইখানে ওয়ার্ড্‌স্বার্থের সঙ্গে তাঁর কাব্যবিষয়ের মিল আছে, কিন্তু পরস্পরের প্রভেদের কারণ হচ্ছে এই যে, টম্‌সনের কবিতায় কাব্যের বিষয়টির গভীরতা নেই, বেগ নেই, ওয়ার্ড্‌স্বার্থের সেটি আছে।

আমি বললুম: তুমি যাকে প্রগাঢ়তা বলছ সেটা বস্তুত রূপসৃষ্টিরই অঙ্গ। সুন্দর দেহের রূপের কথা যখন বলি তখন বুঝতে হবে, সেই রূপের মধ্যে অনেকগুলি গুণের মিলন আছে। দেহটি শিথিল নয়, বেশ আঁটসাট, তা প্রাণের তেজে ও বেগে পরিপূর্ণ, স্বাস্থ্যসম্পদে তা সারবান, ইত্যাদি। অর্থাৎ এইরকমের যতগুলি গুণ তার বেশি তার রূপের মূল্যও তত বেশি। এই-সব গুণগুলি একটি রূপের মধ্যে মূর্তিমান হয়ে যখন অবিচ্ছিন্ন ঐক্য পায় তখন তাতে আমরা আনন্দ পেয়ে থাকি। নাইটিঙ্গেল পাখিকে উদ্দেশ করে কীট্‌স্‌ একটি কবিতা লিখেছেন। তার মাঝখানটায় মানবজীবনের দুঃখতাপ ও নশ্বরতা নিয়ে বিশেষ একটি বেদনা প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু, সেই বেদনার তীব্রতাই কবিতার চরম কথা নয়; মানবজীবন যে দুঃখময়, এই কথাটার সাক্ষ্য নেবার জন্যে কবির দ্বারে যাবার কোনো প্রয়োজন নেই— তা ছাড়া, কথাটা একটা সর্বাঙ্গীণ ও গভীর সত্যও নয়— কিন্তু এই নৈরাশ্যবেদনাকে উপলক্ষ্যমাত্র করে ঐ কবিতাটি যে একটি বিশেষ রূপ ধরে সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে সেইটেই হচ্ছে ওর কাব্য-হিসাবে সার্থকতা। কবি পৃথিবী সম্বন্ধে বলছেন—

Here, where men sit and hear each other groan ;
Where palsy shakes a few, sad, last gray hairs ;
Where youth grows pale, and spectre-thin, and dies ;
Where but to think is to be full of sorrow
And leaden-eyed despairs ;
Where Beauty cannot keep her lustrous eyes,
Or new Love pine at them beyond to-morrow.

একে ইন্‌টেন্সিটি বলা চলে না, এ রূপ চিত্তের অত্যুক্তি, এতে অস্বাস্থ্যের দুর্বলতাই প্রকাশ পাচ্ছে— তৎসত্ত্বেও মোটের উপর সমস্তটা নিয়ে এই কবিতাটি রূপবান কবিতা।

যে ভাবটিকে নিয়ে কবি কাব্য সৃষ্টি করলেন সেটি কবিতাকে আকার দেবার একটা উপাদান।

দেবালয় থেকে বাহির হয়ে গোধূলির অন্ধকারের ভিতর দিয়ে সুন্দরী চলে গেল, এই একটি তথ্যকে কবি ছন্দে বাঁধলেন—

যব গোধূলিসময় বেলি
ধনী মন্দিরবাহির ভেলি,
নবজলধরে বিজুরিরেহা দ্বন্দ্ব পসারি গেলি।

তিন লাইনে আমরা একটি সম্পূর্ণ রূপ দেখলুম— সামান্য একটি ঘটনা কাব্যে অসামান্য হয়ে রয়ে গেল। আর-একজন কবি দারিদ্র্যদুঃখ বর্ণনা করছেন। বিষয়-হিসাবে স্বভাবতই মনের উপর তার প্রভাব আছে। দরিদ্র ঘরের মেয়ে, অন্নের অভাবে আমানি খেয়ে তাকে পেট ভরাতে হয়— তাও যে পাত্রে করে খাবে এমন সম্বল নেই, মেজেতে গর্ত করে আমানি ঢেলে খায়— দরিদ্র-নারায়ণকে আর্তস্বরে দোহাই পাড়বার মতো ব্যাপার। কবি লিখলেন—

দুঃখ করো অবধান,
দুঃখ করো অবধান,
আমানি খাবার গর্ত দেখো বিদ্যমান।

কথাটা রিপোর্ট করা হল মাত্র, তা রূপ ধরল না। কিন্তু, সাহিত্যে ধনী বা দরিদ্রকে বিষয় করা দ্বারায় তার উৎকর্ষ ঘটে না; ভাব ভাষা ভঙ্গী সমস্তটা জড়িয়ে একটি মূর্তি সৃষ্টি হল কিনা এইটেই লক্ষ্য করবার যোগ্য। 'তুমি খাও ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে'— দারিদ্র্যদুঃখের বিষয়-হিসাবে এর শোচনীয়তা অতি নিবিড়, কিন্তু তবু কাব্য-হিসাবে এতে অনেকখানি বাকি রইল।

বঙ্কিমের উপন্যাসে চন্দ্রশেখরের অসামান্য পাণ্ডিত্য; সেইটি অপর্যাপ্তভাবে প্রমাণ করবার জন্যে বঙ্কিম তার মুখে ষড়্‌দর্শনের আস্ত আস্ত তর্ক বসিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু, পাঠক বলত, আমি পাণ্ডিত্যের নিশ্চিত প্রমাণ চাই নে, আমি চন্দ্রশেখরের সমগ্র ব্যক্তি-রূপটি স্পষ্ট করে দেখতে চাই। সেই রূপটি প্রকাশ পেয়ে ওঠে ভাষায় ভঙ্গীতে আভাসে, ঘটনাবলীর নিপুণ নির্বাচনে, বলা এবং না-বলার অপরূপ ছন্দে। সেইখানেই বঙ্কিম হলেন কারিগর, সেইখানে চন্দ্রশেখর-চরিত্রের বিবরণগত উপাদান নিয়ে রূপস্রষ্টার ইন্দ্রজাল আপন সৃষ্টির কাজ করে। আনন্দমঠে সত্যানন্দ ভবানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসীরা সাহিত্যে দেশাত্মবোধের নবযুগ অবতারণ করেছেন কি না তা নিয়ে সাহিত্যের তরফে আমরা প্রশ্ন করব না; আমাদের প্রশ্ন এই যে, তাঁদের নিয়ে সাহিত্যে নিঃসংশয় সুপ্রত্যক্ষ কোনো

একটি চারিত্ররূপ জাগ্রত করা হল কিনা। পূর্বযুগের সাহিত্যেই হোক, নবযুগের সাহিত্যেই হোক, চিরকালের প্রশ্নটি হচ্ছে এই যে : হে গুণী, কোন্ অপূর্ব রূপটি তুমি সকল কালের জন্যে সৃষ্টি করলে।

১৩৩৫

সাহিত্যসমালোচনা

আমার দুটি কথা বলবার আছে। এক, আমরা গেল বারে যে আলোচনা করেছি তার একটা রিপোর্ট বেরিয়েছে।[১] সে রিপোর্ট যথাযথ হয় নি। অনেক দিন এ সম্বন্ধে দুঃখ বোধ করেছি, কখনো কোনো রিপোর্ট্ ঠিকমতো পাই নি। সেদিন নানা আলোচনার ভিতর সব কথা ঠিক ধরা পড়েছে কি না জানি নে। আর-একটা বিপদ আছে, কোনো-কিছু সম্বন্ধে যখন যে-কেউ রিপোর্ট নিতে ইচ্ছা করেন তাঁর নিজের মতামত খানিকটা সেটাকে বিচলিত করে থাকে। এটুকু জানিয়ে রাখছি যে, যদি এ সম্বন্ধে রিপোর্ট্ বেরোয় আমাকে দেখিয়ে নিলে ভালো হয়। তারও প্রয়োজন নেই, একটু সংযতভাবে চিত্তকে স্থির রেখে যদি লেখেন। এর দরকার আছে, কেননা এ সম্বন্ধে এখনও উত্তেজনা আছে— সেজন্য অল্পমাত্র যদি বিকৃতি ঘটে তা হলে অন্যায় হবে।

দ্বিতীয় কথা, আমি সতর্ক করতে চাই, ব্যক্তিগতভাবে এই তর্কে আমার কোনো স্থান নাই। এমন কথা নয় যে, আমি এক পক্ষে আছি, আর আধুনিক সাহিত্য আর-এক পক্ষে আছে। এরকম ভাবে তর্ক উঠলে আমি কুণ্ঠিত হব। বর্তমান কালে আমার লেখা মুখরোচক হোক বা না হোক, আমি কিছুমাত্র আক্ষেপ করি নে। লোকমতের কী মূল্য আজকের দিনে আমার বুঝবার মতো বয়স হয়েছে। অল্প বয়স যখন ছিল তখন অবশ্য বুঝি নি, তখন লোকমতকে অত্যন্ত বেশি মূল্য দিতাম। অন্যের মত-অনুযায়ী লিখতে পারলে, অন্যকে অনুকরণ করতে পারলে, সত্য কাজ কিছু করা গেল কল্পনা করেছি— সে যে কত বড়ো অসত্য, বারবার, হাজার বার তা প্রমাণ হয়ে গেছে আমার এই জীবনে। আমি তার উপর বিশেষ কোনো আস্থা রাখি না। আমাকে কেউ পছন্দ করুন বা না করুন, এখন আমার চেয়ে ভালো লিখতে পারুন বা না পারুন, সে আলোচনা অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে করি।

আমি সেদিন যে-আলোচনা উত্থাপিত করেছিলাম সে-প্রসঙ্গে আমার মত আমি

১ বাংলার কথা। ৩ চৈত্র, সোমবার, ১৩৩৫

ব্যক্ত করেছি। সাহিত্যের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে, নীতি সম্বন্ধে, যা বক্তব্য সে আমার লেখায় বারবার বলেছি। গত বারে সে কথা কিছু কিছু আলোচিত হয়েছে। এখনকার যাঁরা তরুণ সাহিত্যিক তাঁরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, আমি কেন তাঁদের বিরুদ্ধে লিখেছিলাম কিম্বা তাঁদের মতের প্রতিবাদ করেছিলাম। আমি জানি, আমি কোনো ব্যক্তিবিশেষকে উপলক্ষ্য করে লিখি নি। কতকগুলি লেখা আমার চোখে পড়েছিল যেগুলিকে সাহিত্যধর্ম-বিগর্হিত মনে হয়েছিল। তাতে সমাজধর্মের যদি কোনো ক্ষতি করে থাকে, সমাজরক্ষার ব্রত যাঁরা নিয়েছেন তাঁরা সে-বিষয়ে চিন্তা করবেন; আমি সে-দিক থেকে কখনো আলোচনা করি নি। আমি দেখাবার চেষ্টা করেছি, মানুষ যে-সকল মনের সৃষ্টিকে চিরন্তন মূল্য দিয়ে থাকে, চিরকাল রক্ষা করবার যোগ্য ও গৌরবের বিষয় বলে মনে করে, তাকে সাহিত্যে এবং আর্টে চিরকালের ভাষায়, চিরকালের চিত্রে চিত্রিত করে। আমাদের সব সাহিত্যের গোড়াতেই যে-মহাকাব্য, স্পষ্টই দেখি, তার লক্ষ্য মানুষের দৈন্য প্রচার, মানুষের লজ্জা ঘোষণা করা নয়— তার মাহাত্ম্য স্বীকার করা।

সংসারধর্মে মানবচরিত্রে সত্যের সেই-সব প্রকাশকে তাঁরা চিরকালের মূল্য দিয়েছেন, যাকে তাঁরা সর্বকাল ও সর্বজনের কাছে ব্যক্ত করবার ও রক্ষা করবার যোগ্য মনে করেছেন। যার মধ্যে তাঁরা সৌন্দর্য দেখেছেন, মহিমা দেখেছেন, তাই তাঁদের রচনার আনন্দকে জাগিয়েছে। বাল্মীকি যেদিন ছন্দ পেলেন সেদিন অনুভব করলেন; এ ছন্দ কোনো মহৎ চরিত্র, কোনো পরম অনুভূতি প্রকাশ করবার জন্যে, এমন কিছু যাতে মানবজীবনের পূর্ণতা, যাতে তার গৌরব। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি, তখনকার লোক মনুষ্যত্বের কোন্‌ রূপকে শ্রেষ্ঠ বলে জানতেন। কল্যাবান বাক্য যে-বিষয়কে প্রকাশ করে তাকে আপন অলংকারের দ্বারা স্থায়ী মূল্য দেয়। সেকালের কবি খুব প্রকাণ্ড পটের উপর খুব বড়ো ছবি এঁকেছেন এবং তাতে মানুষকে বড়ো দেখে মানুষ আনন্দ পেয়েছে। আমাদের মনের ভিতর যে-সব বেদনা, যে-সব আকাঙ্ক্ষা থাকে এবং আমরা যাকে অন্তরে অন্তরে খুব আদর করি, সেই আদরের যোগ্য ভাষা পাই না ব'লে বাইরে প্রকাশ করতে পারি না, পূজা করতে পারি না, অর্ঘ্য দিতে পারি না। আমাদের সে-সম্পদ নেই, আমরা মন্দির রচনা করতে জানি না, যাঁরা রচনা করেন ও যাঁরা দেবতার প্রতিষ্ঠা করেন আমরা তাঁদের কাছ থেকে সুযোগ গ্রহণ করে আমাদের পূজা সেখানে দিই। বড়ো বড়ো জাতি সাহিত্যে বড়ো বড়ো পূজার জন্যে আমাদের অবকাশ রচনা করে দিয়েছেন। সমস্ত মানুষ সেখানে তাঁদের অর্ঘ্য নিয়ে যাবার সুযোগ লাভ করে তাঁদের কাছে

কৃতজ্ঞ হয়েছে। সমাজের প্রভাতকালে প্রকাণ্ড একটা বীরত্বদৃপ্ত প্রাণসম্পদপূর্ণ মনুষ্যত্বের আনন্দময় চিত্র মনের মধ্যে জাগিয়ে রেখে কবিরা রচনা করতে বেরিয়েছেন। অনেকসময় সমাজের পাথেয় নিঃশেষিত হয়ে যায় এবং বাইরের নানাপ্রকার ঘাত-প্রতিঘাতে ক্রমে ক্রমে পতন ঘটে। এইজন্য যেটা মানুষের সভ্যতার অতি-পরিণতি তাতে বিকৃতি আসে, এরূপ পরিচয় আমরা প্রাচীন গ্রীস রোম ও অন্যান্য দেশের ইতিহাসে বারংবার পেয়েছি। অবসাদের সময়ে কলুষটাই প্রবল হয়ে ওঠে। আমাদের দেহপ্রকৃতিতে অনেক রোগের বীজ আছে। শরীরের সবল অবস্থায় সেগুলি পরাহত হয়েই থাকে। এমন নয় যে তারা নেই। তাদের পরাভূত করে আরোগ্যশক্তি অব্যাহত থাকে। যে-মুহূর্তে শরীর ক্লান্ত হয়, জীর্ণ হয়, দুর্বল হয়, তখনই সেগুলি প্রবল হয়ে দেখা দেয়। ইতিহাসেও বারংবার এটা দেখেছি। যখন কোনো-একটা প্রবৃত্তি বা মনের ভাব প্রবল হয় তখন তার প্রবলতাকে চিরন্তন সত্য বলে বিশ্বাস না করে থাকতে পারি না, তাকে একান্তভাবে অনুভব করি ব'লেই। সেই অনুভূতির জোরে প্রবৃত্তিকে নিয়ে আমরা বড়াই করতে শুরু করি। এইজন্য এক-একটা সময় আসে যখন এক-একটা জাতির মধ্যে মানুষের ভিতরকার বিকৃতি-গুলিই উগ্র হয়ে দেখা দেয়। ইংরেজিসাহিত্যের ভিতর যখন অত্যন্ত একটা কলুষ এসেছিল সে উদ্ধত হয়েই নির্লজ্জ হয়েই আপনাকে প্রকাশ করেছিল। তার পর আবার সেটা কেটে গেছে। ফরাসীবিপ্লবের সময় ইংরেজ কবিদের মধ্যে অনেকে বিদ্রোহের কথা বলেছেন; প্রচলিত সমাজনীতি, প্রচলিত ধর্মনীতিকে গুরুতর আঘাত করেছেন। মানুষের মনকে কর্মকে মোহমুক্ত করে পূর্ণতা দান করবার জন্যে তাঁদের কাব্যে সাহিত্যে খুব একটা আগ্রহ দেখা গেছে। তখনকার সমাজে তাঁদের কাব্য নিন্দিত হয়েছে, কিন্তু কালের হাতে তার সমাদর বেড়ে গেল। এ দিকে বিশেষ কোনো যুগে যে-সব লালসার কাব্যকীর্তন প্রকাশিত হয়েছিল তারা সেকালের বিদগ্ধদের কাছে সম্মান পেয়েছে; মনে হয়তো হয়েছিল, এইটেই সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ। তবু পরে প্রকাশ পেয়েছে, এ জিনিসটা সেই যুগের ক্ষণকালীন উপসর্গ।

আমাদের সংস্কৃতসাহিত্যেও এই বিকৃতি অনেক দেখা গিয়েছে। যখন সংস্কৃত-সাহিত্যে সাধনার দৈন্য এসেছিল তখন কাব্যে তার পরিচয় ফুটে উঠেছে। বর্তমান কালের আরম্ভে কবির লড়াই, পাঁচালি, তর্জা প্রভৃতিতে সাহিত্যের যে-বিকার দেখা দিয়েছিল সেগুলিতে বীর্যবান জাতির প্রবল উন্নতির বা মহৎ আকাঙ্ক্ষার পরিচয় নেই। তার ভিতর অত্যন্ত পঙ্কিলতা আছে। সমাজের পথযাত্রার পাথেয় হচ্ছে উৎকর্ষের জন্যে আকাঙ্ক্ষা। জীবনের মধ্যে ব্যবহারে তার প্রকাশ খণ্ডিত হয়ে যায় বলেই

মনে তার জন্যে যে-আকাঙ্ক্ষা আছে তাকে রত্নের মতো সাহিত্যের বহুমূল্য কৌটোর মধ্যে রেখে দিই— তাকে সংসারযাত্রায় ব্যক্ত সত্যের চেয়ে সম্পূর্ণতর করে উপলব্ধি করি। এই আকাঙ্ক্ষা যতক্ষণ মহৎ থাকে এবং এই আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ যতক্ষণ লোকের কাছে মূল্য পায়, ততক্ষণ সে জাতির মধ্যে যতই দোষ থাক্, তার বিনাশ নেই। য়ুরোপীয় জাতির ভিতর যে-অস্বাস্থ্য রয়েছে তার প্রতিকারও তাদের মধ্যে আছে। যেখানে স্বাস্থ্যের প্রবলতা সেখানে রোগও আপাতত প্রবল হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু, তৎসত্ত্বেও মানুষ বাঁচে। দুর্বল শরীরে তার প্রকাশ হলে সে মরে।

আমরা এখন একটা নবযুগের আরম্ভকালে আছি। এখন নূতন কালের উপযোগী বল সংগ্রহ করতে হবে, যুদ্ধ করতে হবে প্রতিকূলতার সঙ্গে। আমাদের সমস্ত চিত্তকে ও শক্তিকে জাগরূক করে আমরা যদি দাঁড়াতে পারি তা হলেই আমরা বাঁচব। নইলে পদে পদে আমাদের পরাভব। আমাদের মজ্জার ভিতর জীর্ণতা; এইজন্য অত্যন্ত প্রয়োজন হয়েছে আমাদের যেটা তপস্যার দান সেটাকে যেন আমরা নষ্ট না করি, তপোভঙ্গ যেন আমাদের না হয়। মানবজীবনকে বড়ো করে দেখার শক্তি সব চাইতে বড়ো শক্তি। সেই শক্তিকে আমরা যেন রক্ষা করি। সংকীর্ণতা প্রাদেশিকতার দ্বারা সে-শক্তিকে আমরা খর্ব করব না। এ জন্যে আমাদের অনেক লড়াই করতে হবে। সে লড়াই করতে না পারলে আমাদের মৃত্যু নিশ্চয়। যুদ্ধের পথেই আমরা বীর্য পাব। যে-আত্মসংযমের দ্বারা মানুষ বড়ো শক্তি পেয়েছে তাকে অবিশ্বাস করে যদি বলি, সেটা পুরানো ফ্যাশন, এখন তার সময় গেছে, তা হলে আমাদের মৃত্যু। যে-ফল এখনও পাকবার সময় হয় নি তার ভিতর পোকা ঢুকেছে, এই আক্ষেপ মনের ভিতর যখন জাগে তখন সেটাকে কেউ যেন ব্যক্তিগত কলহের কথা বলে না মনে করেন।

যে-সমস্ত লেখা সমাজের কাছে তিরস্কৃত হতে পারত যখন দেখি তাও সম্ভব হয়েছে, তখন নিঃসন্দেহে বুঝতে হবে, বাতাসে কিছু ঘোরতর বিষসঞ্চার হয়েছে। এই মনের আক্ষেপ নিয়ে হয়তো কিছু বলে থাকব। বেদনা কিছু ছিল দেশের দিকে, কালের দিকে, সাহিত্যের দিকে তাকিয়ে। যদি কেউ মনে করেন, এই বেদনা প্রকাশের অধিকার আমাদের নাই, অসংযতভাবে তাঁরা যা বলেন সেটা এখনকার ডেমোক্রাটিক সাহিত্যে সত্য বলে গ্রহণ করতে হবে, তা হলে বলতে হবে, তাঁদের মতের সঙ্গে আমার মতের মিল নেই। যদি কেউ বলেন, আমরা সে দলের নই, আমি খুশি হব। মানুষের জন্য, দেশের জন্য, সমাজের জন্য যাঁরা কাজ করেন,

ত্যাগের ভিতর দিয়ে, সংযমের ভিতর দিয়েই করেন। কেউ যেন কখনও না বলেন, উন্মত্ততার দ্বারা পৃথিবীর উপকার করব।

যাকে শ্রদ্ধা বলে তা সৃষ্টি করে, অশ্রদ্ধা নষ্ট করে। যদি বলি, আমি বড়োকে শ্রদ্ধা করি না, তা হলে শুধু যে বড়োকে আঘাত করি তা নয়, সৃষ্টির শক্তিকে একেবারে নষ্ট করি, সেটা আমাদের পতনের কারণ হয়। যারা বিজয়ী হয়েছে তারা শ্রদ্ধার উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে জয় করেছে। বড়ো বড়ো যুদ্ধে যে-সকল সেনাপতিরা জিতেছেন তাঁরা হারতে হারতেও বলেছেন 'আমরা জিতেছি', কখনও হারকে স্বীকার করতে চান নি। সেটা উপস্থিত তথ্যের বিরোধী হতে পারে। হয়তো হেরেছিলেন। কিন্তু, যেহেতু তাঁরা নিজেকে শ্রদ্ধা করেছেন, তার দ্বারা হারের ভিতর দিয়ে জয়কে সৃষ্টি করেছেন। শ্রদ্ধার দ্বারা সমস্ত জাতির জয়সম্পদকে সৃষ্টি করা যায়। যখন দেখি, জাতির মনে অশ্রদ্ধা আসন পেতে মহৎকে অট্টহাসির দ্বারা বিদ্রূপ করতে থাকে, তখন সব-চাইতে বেশি আশঙ্কা হয়, তখন হতাশ হয়ে বলতে হয়, পরাভবের সময় এল। আমাদের সিদ্ধি সে তো দূরে রয়েছে, কিন্তু তার অগ্রগামী দূত যে-শ্রদ্ধা সেও যদি না থাকে তা হলে তার চেয়ে এমনতরো সর্বনাশ আর কিছু হতে পারে না।

আমার নিজের লেখাতে যেটা বিকৃত সেটার নজির দেখাতে পারেন, অসম্ভব কিছু নয়। দীর্ঘকালের লেখার ভিতরে কখনও কলুষ লাগে নি, এ কথা বলতে পারব না। যদি বলি, যা কিছু লিখেছি সমস্ত শ্রদ্ধেয়, সমস্ত ভালো, অতবড়ো দাম্ভিকতা আর-কিছু হতে পারে না। অনেক রকমের অনেক লেখার মধ্য থেকে খুঁটে খুঁটে যেগুলি নিজের পক্ষ সমর্থন করে সেগুলিই যদি গ্রহণ করি তবে তার দ্বারা শেষ কথা বা সম্পূর্ণ কথা বলা হবে না।

আজকের সভায় ব্যক্তিগত আক্রমণ নয়, নিন্দা-প্রশংসার কথা নয়— ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে যাঁরা সাহিত্যের সত্যকে মনের ভিতর দেখতে পেয়েছেন তাঁরা আপনাদের মনের কথা বলবেন, এই বিশ্বাসেই এই সভা আহ্বান করেছিলাম। আমি আশা করেছিলাম, সাহিত্য সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত যাঁদের আছে তাঁরা সেটা সুস্পষ্ট করে ব্যক্ত করবেন। কোন্ নীতির ভিত্তির উপর সাহিত্য রচিত হয়ে থাকে, কোন্ সাহিত্য মানুষের কাছে চিরকালের গৌরব পাওয়ার যোগ্য, সেই সম্বন্ধে কারও কিছু বিশেষ ভাবে বলবার থাকে সেইটাই বলবেন, এই সংকল্প করেই আমি আপনাদের ডেকেছি। আমি কখনও মনে করি নি, আমার পক্ষের কথা বলে সকলের কথাকে চাপা দেব। আমার নিবেদন এই যে, আপনারা আমার উপর রাগ না করে আপনাদের মত সভায় ব্যক্ত করুন। আমার যেটা মত সেটা আমারই মত। যদি বলেন,

এ মত সেকেলে, পুরোনো, তা হলে সেটাকে অনিবার্য বলে মেনে নিতে রাজি আছি। যে-মত নিয়ে কাজ করেছি, লিখেছি, সেটা সত্য জেনেই করেছি, তাকে যদি মূঢ়তা বলে বিচার করেন করুন। আমার সাফাই জবাব থাকে দিতে চেষ্টা করব। আমরা এতদিন যা ভেবে এসেছি সেটা চিরকালের সাহিত্যে স্থান না পাবার যোগ্য হতেও পারে। এতকাল যা হয়েছে এখন থেকে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত তার সম্পূর্ণ উল্টা রকমের ব্যাপার হবে, এরকমই যদি আপনাদের মত হয় বলুন। সেদিন আপনাদের কেউ কেউ বললেন, আমার সঙ্গে তাঁদের মতের পার্থক্য নেই, সেটাও স্পষ্ট করে বলা দরকার।

সুনীতি চট্টোপাধ্যায় : সামাজিক প্রাণী হিসাবে সাহিত্যিকের সামাজিক বিধি-ব্যবস্থাকে ভাঙবার কতটা অধিকার আছে আপনি বিচার করবেন।

রবীন্দ্রনাথ : সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন হয় কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। যেমন এক সময় আমাদের দেশে একান্নবর্তী ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, অবস্থাপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার ভিত্তি শিথিল হয়েছে। সমাজব্যবস্থার যখন পরিবর্তন হয়, সে-পরিবর্তন যে কারণেই হোক— ধর্মনৈতিক কারণেই যে সব সময় হয় তা নয়, অধিকাংশ স্থলে অর্থনৈতিক কারণেও হয়— তখন একটি কথা ভাববার আছে। তৎকালীন যে-সমস্ত ব্যবস্থা প্রবল ছিল, যার প্রয়োজন ছিল, তখন সেগুলোকে রক্ষা করবার জন্য কতকগুলো বিধিনিষেধ পাকা করে দেওয়া হয়। সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলে প্রয়োজন চলে যায়, অথচ নিয়ম শিথিল হতে চায় না। সমাজ অন্ধভাবেই আপন নিয়ম আঁকড়ে থাকে। সে বলে, যে-কারণেই হোক, একটাও নিয়ম আলগা হলেই সব নিয়মের জোর চলে যায়। সকল মানুষই সামাজিক প্রথা সম্বন্ধে বিচার-বুদ্ধি খাটাবার অধিকার দাবি করলে সমাজ টিকতে পারে না। সমাজের পক্ষে এই কথা। সাহিত্য সমাজের এই সতর্কতাকে সম্মান করে না। সর্বকালের নীতির দিকে তাকিয়ে সাহিত্য অনেক সময় তাকে বিদ্রূপ করে তার বিরুদ্ধবাক্য ব'লে। অবশ্য সমাজের এমনও অনেক বিধি আছে যার আয়ু অল্প নয়। রীতির চেয়ে নীতির উপরে যার ভিত্তি। যেমন আমাদের হিন্দু-সমাজে গোহত্যা পাপ বলে গণ্য, অথচ সেই উপলক্ষ্যে মানুষ-হত্যা ততদূর পাপ বলে মনে করি না। মুসলমানের অন্ন খেয়েছে বলে শাস্তি দিই, মুসলমানের সর্বনাশ করেছে বলে শাস্তি দিই নে। সমাজ-ব্যবস্থার জন্য বাঁধাবাঁধি যে-নিয়ম হয়েছে সাহিত্য যদি তাকে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা না করে সাহিত্যকে দোষ দিতে পারি না। কিন্তু, যে-সমস্ত নীতি মানুষের চরিত্রের মর্মগত

সত্য, যেমন লোককে প্রতারণা করব না, ইত্যাদি, সেগুলির ব্যতিক্রম কোনোকালে হতে পারে বলে মনে করি না।

প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায়: কিন্তু তরুণরা এই যে লিখেছেন, ভগবান প্রেম আর ভূত মানি না, সাহিত্যে তার স্থান আছে কি।

রবীন্দ্রনাথ: এ কথা পূর্বে বলেছি। মানুষ যেখানে জয়ী হয়েছে সেখানে সে যা পেয়েছে তার বেশি দিয়েছে। ঐশ্বর্য বলতে এই বোঝায়, সে তার মূলধনের বাড়া। সেই ঐশ্বর্যই প্রকাশ পায় সাহিত্যে। স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধের মধ্যে ঐশ্বর্যই হচ্ছে প্রেম, কামনা নয়। কামনায় উদ্‌বৃত্ত কিছু থাকে না। উদ্‌বৃত্তটাই নানা বর্ণে রূপে প্রেমে প্রকাশ পায়। লোভ-ক্রোধের প্রবলতার মধ্যেও প্রকাশের শক্তি আছে। যুদ্ধের মধ্যে, আঘাতের মধ্যে, নিষ্ঠুরতার মধ্যে আপনাকে সে প্রকাশ করতে পারে। বর্বরতার মধ্যেও সাহিত্যের প্রকাশযোগ্য কিছু আছে, সেটা কলুষ নয়, সেটা তেজ, শক্তি। অনেক সময় অতি সভ্য জাতির প্রাণশক্তিতে শৈথিল্য যখন আসে তখন বাহির হতে বর্বরতার ক্রোধ ও হিংসা কাজে লাগে। অতিসভ্য জাতির চিত্ত যখন ম্লান হয়ে আসে, চিরকালের জিনিস সে যখন কিছু দিতে পারে না, তখন তার দুর্গতি। গ্রীস যখন উন্নতির মধ্যগগনে ছিল তখন সে চিত্তেরই ঐশ্বর্য দিয়েছে, কামনা বা লালসার আভাস সেই সঙ্গে থাকলেও সেটা নগণ্য। স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে যেমন পঙ্কিলতা প্রকাশ পায় এও সেইরূপ। স্রোত ক্ষীণ হয়ে পাঁক বড়ো হলেই বিপদ।

একজন প্রশ্ন করলেন: আপনি সাহিত্য-সৃষ্টির আদর্শের কথা বললেন। সমালোচনারও এরকম কোনো আদর্শ আছে কি না। সাহিত্য-সমালোচনায় লগুড় ও ব্যক্তিগত গালাগালিই যদি একমাত্র জিনিস হয় তা হলে সেটা সাহিত্যের পক্ষে হিতজনক কি না।

রবীন্দ্রনাথ: এটা সাহিত্যিক নীতি-বিগর্হিত। যে-সমালোচনার মধ্যে শান্তি নাই, যা কেবলমাত্র আঘাত দেয়, কেবলমাত্র অপরাধটুকুর প্রতিই সমস্ত চিত্ত নিবিষ্ট করে, আমি তাকে ঠিক মনে করি নে। এরূপ সমালোচনার ভিতর একটা জিনিস আছে যা বস্তুত নিষ্ঠুরতা— এটা আমাকে পীড়ন করে। সাহিত্যিক অপরাধের বিচার সাহিত্যিক ভাবেই হওয়া উচিত। অর্থাৎ, রচনাকে তার সমগ্রতার দিক থেকে দেখতে হবে। অনেক সময়ে টুকরো করতে গেলেই এক জিনিস আর হয়ে যায়। সমগ্র পটের মধ্যে যে-ছবি আছে পটটাকে ছিঁড়ে তার বিচার করা চলে না— অন্তত সেটা আর্টের বিচার নয়। সুবিচার করতে হলে যে-শান্তি মানুষের থাকা উচিত

সেটা রক্ষা করে আমরা যদি আমাদের মত প্রকাশ করি তা হলে সে মতের প্রভাব অনেক বেশি হয়। বিচারশক্তির প্রেস্‌টিজ শাসনশক্তির প্রেস্‌টিজের চেয়ে অনেক বেশি। আমাদের গভর্মেণ্টের কোনো কোনো ব্যবহারে প্রকাশ পায় যে, তার মতে শাসনের প্রবলতা প্রমাণ করবার জন্যে মারের মাত্রাটা ন্যায়ের মাত্রার চেয়ে বাড়ানো ভালো। আমরা বলি, সুবিচার করবার ইচ্ছাটা দণ্ডবিধান করবার ইচ্ছার চেয়ে প্রবল থাকা উচিত।

সজনীকান্ত দাস: এখানে যে-আলোচনা হচ্ছে সেটা সম্ভবতঃ 'শনিবারের চিঠি' নিয়েই ?

রবীন্দ্রনাথ: হাঁ, 'শনিবারের চিঠি' নিয়েই কথা হচ্ছে।

ইহার পর 'শনিবারের চিঠি'র আদর্শ, 'শনিবারের চিঠি'র 'মণিমুক্তা'য় আধুনিক সাহিত্যিকদের সাহিত্যিক ও সামাজিক doctrine, তাঁহারা যাহা সৃষ্টি করিতেছেন তাহা আদপে সাহিত্য কি না, ইত্যাদি বিষয়ে নানা ভাবের আলোচনা হয়। এই আলোচনায় শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ, শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীঅমলচন্দ্র হোম, শ্রীপ্রমথ চৌধুরী, শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি যোগদান করেন। রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে যাহা বলিয়াছেন তাহা পর পর লিখিত হইল।

মণিমুক্তা সম্বন্ধে

যা মনকে বিকৃত করে সেগুলিকে সংগ্রহ করে সকলের কাছে প্রকাশ করলে উদ্দেশ্যের বিপরীত দিকে যাওয়া হয়।

আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে

যে-জিনিস বরাবর সাহিত্যে বর্জিত হয়ে এসেছে, যাকে কলুষ বলি, তাকেই চরম বর্ণনীয় বিষয় করে দেখানো এক শ্রেণীর আধুনিক সাহিত্যিকদের একটা বিশেষ লক্ষ্য। এবং এইটে অনেকে স্পর্ধার বিষয় মনে করেন। কেউ কেউ বলছেন, এ-সব প্রতিক্রিয়ার ফল। আমি বলব প্রতিক্রিয়া কখনোই প্রকৃতিস্থতা নয়। তা ক্ষণস্থায়ী অবস্থা মাত্র প্রকাশ করে, তা চিরন্তন হতে পারে না। যেমনতরো কোনোসময় বাতাস গরম হয়ে প্রতিক্রিয়ায় ঝড় আসতে পারে অথচ কেউ বলতে পারেন না, এর পর থেকে বরাবর কেবল ঝড়ই উঠবে।

ঈশ্বরকে মানি নে, ভালবাসা মানি নে, সুতরাং আমরা সাহিত্যে বিশেষ কৌলীন্য লাভ করেছি, এমন কথা মনে করার চেয়ে মূঢ়তা আর কিছু হতে পারে না। ঈশ্বরকে মানি না বা বিশ্বাস করি না, সেটাতে সাহিত্যিকতা কোথায়। ভালোবাসা মানছি না,

অতএব যারা ভালোবাসা মানে তাদেরকে অনেক দূর ছাড়িয়ে গিয়েছি, সাহিত্য প্রসঙ্গে এ কথা বলে লাভ কী।

'শনিবারের চিঠি'র সমালোচনা সম্বন্ধে

'শনিবারের চিঠি' যদি সাহিত্যের সীমার মধ্যে থেকে বিশুদ্ধভাবে সম্পূর্ণভাবে সমালোচনার পথে অগ্রসর হন, তা হলে বেশি ফললাভ করবেন এই আমার বিশ্বাস। যদি একান্তভাবে দোষ নির্ণয় করবার দিকে সমস্ত চিত্ত নিবিষ্ট করি তা হলে সেটা মাথায় চেপে যায়, তাতে শক্তির অপচয় ঘটে। 'শনিবারের চিঠি'তে এমন সব লোকের সম্বন্ধে আলোচনা দেখেছি যাঁরা সাহিত্যিক নন এবং জনগণের মধ্যেও যাঁদের বিশেষ প্রাধান্য নেই। তাঁদের ব্যক্তিগত বিশেষত্বকে অতি প্রকট করে যে সব ছবি আঁকা হয় তাতে না সাহিত্যের না সমাজের কোনো উপকার ঘটে। এর ফল হয় এই যে, যেখানে সাধারণের হিতের প্রতি লক্ষ্য করে লেখকেরা কঠিন কথা বলেন তার দাম কমে যায়। মনে হয়, কঠিন কথা বলাতেই লেখকের বিশেষ আনন্দ, তাঁর লক্ষ্য যেই হোক আর যাই হোক।

কর্তব্যপালনের যে অবশ্যম্ভাবী কঠোরতা আছে নিজেরও সম্বন্ধে সেটাকে অত্যন্ত দৃঢ় রাখা চাই। 'শনিবারের চিঠি'র লেখকদের সুতীক্ষ্ণ লেখনী, তাঁদের রচনা-নৈপুণ্যেরও আমি প্রশংসা করি, কিন্তু এই কারণেই তাঁদের দায়িত্ব অত্যন্ত বেশি; তাঁদের খড়্গের প্রখরতা প্রমাণ করবার উপলক্ষ্যে অনাবশ্যক হিংস্রতা লেশমাত্র প্রকাশ না পেলে তবেই তাঁদের শৌর্যের প্রমাণ হবে। সাহিত্যসংস্কার কার্যে তাঁদের কর্তব্যের ক্ষেত্র আছে— কিন্তু কর্তব্যটি অপ্রিয় বলেই এই ক্ষেত্রের সীমা তাঁদেরকে একান্তভাবে রক্ষা করতে হবে। অস্ত্রচিকিৎসায় অস্ত্রচালনার সতর্কতা অত্যন্ত বেশি দরকার, কেননা আরোগ্যবিধানই এর লক্ষ্য, মারা এর লক্ষ্য নয়। সাহিত্যের চিকিৎসাই 'শনিবারের চিঠি'র লক্ষ্য, এই কারণেই এই লক্ষ্যের একটুমাত্র বাইরে গেলেও তাঁদের প্রতিপত্তি নষ্ট হবে। চিকিৎসকের পক্ষে অস্ত্রচালনার কৌশলই একমাত্র জিনিস নয়। প্রতিপত্তিও মহামূল্য। সেই প্রতিপত্তি রক্ষা করে 'শনিবারের চিঠি' যদি কর্তব্যের খাতিরে নিষ্ঠুরও হন তাকে কেউ নিন্দা করতে পারবে না। যাঁদের শক্তি আছে তাঁদের কাছেই আমরা যথাস্থানে ক্ষান্তি দাবি করি। কর্তব্য যেখানে বড়ো সেখানেই তার পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষ শুচি রক্ষার প্রয়োজন।

আধুনিক সাহিত্যের doctrine সম্বন্ধে পুনরায়

কেবলমাত্র না-মানার দ্বারা সাহিত্যিক হওয়া যায় না। শুধু ভগবান প্রেম আর ভূত কেন তোমরা আরও অনেক কিছু না মানতে পার। যেমন, হোমিওপ্যাথি

চিকিৎসা। কিন্তু, এই প্রসঙ্গে যদি সে কথাও লিখতে তা হলে বুঝতেম সেটাতে সাহিত্য-বহির্বর্তী বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য আছে। সাহিত্য-আলোচনায় যদি বল, অনেকে বলে ভীমনাগের সন্দেশ ভালো, আমি বলি ভালো নয়, তার দ্বারা সাহিত্যিক সাহসিকতা বা অপূর্বতার প্রমাণ হয় না।

সর্বশেষে

অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করে কেউ লিখতে পারে না। তোমরা বলতে পার, দরিদ্রের মনোবৃত্তি আমি বুঝি না, এ কথা মেনে নিতে আমার আপত্তি নেই। তোমরা যদি বল, তোমাদের সাহিত্যের বিশেষত্ব দারিদ্র্যের অনুভূতি, আমি বলব সেটা গৌণ। তোমরা যদি সর্বদা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে 'দরিদ্রনারায়ণ' 'দরিদ্রনারায়ণ' কর তাতে ক'রে এমন একটা বায়ুবৃদ্ধি হবে যাতে সাধারণ পাঠকেরা দরিদ্রনারায়ণ বললেই চোখের জলে ভেসে যাবে। তোমরা কথায় কথায় আধুনিক মাসিকপত্রে বল, আমরা আধুনিক কালের লোক, অতএব গরিবের জন্যে কাঁদব। এরকম ভঙ্গিমাবিস্তারের প্রশ্রয় সাহিত্যে অপকার করে। আমরা অর্থশাস্ত্র শেখবার জন্য গল্প পড়ি না। গল্পের জন্য গল্প পড়ি। 'গরিবিয়ানা' 'দরিদ্রিয়ানা'কে সাহিত্যের অলংকার করে তুলো না। ভঙ্গী মাত্রেরই অসুবিধা এই যে, অতি সহজেই তার অনুকরণ করা যায়— অল্পবুদ্ধি লেখকের সেটা আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে। যখন তোমাদের লেখা পড়ব তখন এই বলে পড়ব না যে, এইবার গরিবের কথা পড়া যাক। গোড়ার থেকে ছাপ মেরে চিহ্নিত করে তোমরা নিজেদের দাম কমিয়ে দাও। দল বেঁধে সাহিত্য হয় না। সাহিত্য হচ্ছে একমাত্র সৃষ্টি যা মানুষ একলাই করেছে। যখন সেটা দল বাঁধার কোঠায় গিয়ে পড়ে তখন সেটা আর সাহিত্য থাকে না। প্রত্যেকের নিজের ভিতর অভিমান থাকা উচিত যে, আমি যা লিখছি 'গরিবিয়ানা' বা 'যুগ' প্রচার করবার জন্য নয়, একমাত্র আমি যেটা বলতে পারি সেটাই আমি লিখছি। এ কথা বললেই লেখক যথার্থ সাহিত্যিকের আসন পায়। উপসংহারে এ কথাও আমি বলে রাখতে চাই, তোমাদের অনেক লেখকের মধ্যে আমি প্রতিভার লক্ষণ দেখেছি। আমি কামনা করি, তাঁরা যুগ-প্রবর্তনের লোভে প'ড়ে তাঁদের লেখার সর্বাঙ্গে কোনো দলের ছাপের উল্‌কি পরিয়ে তাকে সজ্জিত করা হল বলে না মনে করেন। তাঁদের শক্তির বিশুদ্ধ স্বকীয় রূপটি জগতে জয়ী হোক।

১৩৩৫

পঞ্চাশোর্ধ্বম্

পঞ্চাশ বছরের পরে সংসার থেকে সরে থাকার জন্ত মনু আদেশ করেছেন।

যাকে তিনি পঞ্চাশ বলেছেন, সে একটা গণিতের অঙ্ক নয়, তার সম্বন্ধে ঠিক ঘড়িধরা হিসাব চলে না। ভাবখানা এই যে, নিরন্তরপরিণতি জীবনের ধর্ম নয়। শক্তির পরিব্যাপ্তি কিছুদিন পর্যন্ত এগিয়ে চলে, তার পরে পিছিয়ে আসে। সেই সময়টাতেই কর্মে যতি দেবার সময়; না যদি মানা যায়, তবে জীবনযাত্রার ছন্দোভঙ্গ হয়।

জীবনের ফসল সংসারকে দিয়ে যেতে হবে। কিন্তু যেমন-তেমন করে দিলেই হল না। শাস্ত্র বলে, 'শ্রদ্ধয়া দেয়ম্'; যা আমাদের শ্রেষ্ঠ তাই দেওয়াই শ্রদ্ধার দান— সে না কুঁড়ির দান, না ঝরা ফুলের। ভরা ইন্দারায় নির্মল জলের দাক্ষিণ্য, সেই পূর্ণতার সুযোগেই জলদানের পুণ্য; দৈন্য যখন এসে তাকে তলার দিকে নিয়ে যায়, তখন যতই টানাটানি করি ততই ঘোলা হয়ে ওঠে। তখন এ কথা যেন প্রসন্ন মনে বলতে পারি যে, থাক্, আর কাজ নেই।

বর্তমান কালে আমরা বড়োবেশি লোকচক্ষুর গোচরে। আর পঞ্চাশবছর পূর্বেও এত বেশি দৃষ্টির ভিড় ছিল না। তখন আপন মনে কাজ করার অবকাশ ছিল, অর্থাৎ কাজ না-করাটাও আপন মনের উপরই নির্ভর করত, হাজার লোকের কাছে তার জবাবদিহি ছিল না। মনু যে 'বনং ব্রজেৎ' বলেন, সেই ছুটি নেবার বনটা হাতের কাছেই ছিল; আজ সেটা আগাগোড়া নির্মূল। আজ মন যখন বলে 'আর কাজ নেই', বহু দৃষ্টির অনুশাসন দরজা আগলে বলে 'কাজ আছে বই কি'— পালাবার পথ থাকে না। জনসভায় ঠাসা ভিড়ের মধ্যে এসে পড়া গেছে; পাশ কাটিয়ে চুপি-চুপি সরে পড়বার জো নেই। ঘরজোড়া বহু চক্ষুর ভর্ৎসনা এড়াবে, কার সাধ্য? চারি দিক থেকে রব ওঠে, 'যাও কোথায় এরই মধ্যে?' ভগবান মনুর কণ্ঠ সম্পূর্ণ চাপা পড়ে যায়।

যে কাজটা নিজের অন্তরের ফরমাশে তা নিয়ে বাহিরের কাছে কোনো দায় নেই। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে সাহিত্যে বাহিরের দাবি দুর্বার। যে-মাছ জলে আছে তার কোনো বালাই নেই, যে-মাছ হাটে এসেছে তাকে নিয়েই মেছোবাজার। সত্য করেই হোক, ছল করেই হোক, রাগের ঝাঁজে হোক, অনুরাগের ব্যথায় হোক, যোগ্য ব্যক্তিই হোক, অযোগ্য ব্যক্তিই হোক, যে-সে যখন-তখন যাকে-তাকে বলে উঠতে পারে, 'তোমার রসের জোগান কমে আসছে, তোমার রূপের ডালিতে রঙের রেশ

ফিকে হয়ে এল।' তর্ক করতে যাওয়া বৃথা; কারণ শেষ যুক্তিটা এই যে, 'আমার পছন্দ-মাফিক হচ্ছে না।' 'তোমার পছন্দের বিকার হতে পারে, তোমার সুরুচির অভাব থাকতে পারে' এ কথা বলে লাভ নেই। কেননা, এ হল রুচির বিরুদ্ধে রুচির তর্ক; এ তর্কে দেশকালপাত্রবিশেষে কটুভাষার পঙ্কিলতা মথিত হয়ে ওঠে, এমন অবস্থায় শান্তির কটুত্ব কমাবার জন্মে সবিনয় দীনতা স্বীকার করে বলা ভালো যে, স্বভাবের নিয়মেই শক্তির হ্রাস; অতএব শক্তির পূর্ণতাকালে যে-উপহার দেওয়া গেছে তারই কথা মনে রেখে, অনিবার্য অভাবের সময়কার ত্রুটি ক্ষমা করাই সৌজন্যের লক্ষণ। শ্রাবণের মেঘ আশ্বিনের আকাশে বিদায় নেবার বেলায় ধারাবর্ষণে যদি ক্লান্তি প্রকাশ করে তবে জনপদবধূরা তাই নিয়ে কি তাকে দুয়ো দেয়। আপন নবশ্যামল ধানের খেতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মনে কি করে না আষাঢ়ে এই মেঘেরই প্রথম সমাগমের দাক্ষিণ্যসমারোহের কথা।

কিন্তু, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সাহিত্যের ক্ষেত্রেই এই সৌজন্যের দাবি প্রায় ব্যর্থ হয়। বৈষয়িক ক্ষেত্রেও পূর্বকৃত কর্মের প্রতি কৃতজ্ঞতার ভদ্ররীতি আছে। পেন্‌শনের প্রথা তার প্রমাণ। কিন্তু, সাহিত্যেই পূর্বের কথা স্মরণ ক'রে শক্তির হ্রাস ঘটাকে অনেকেই ক্ষমা করতে চায় না। এই তীব্র প্রতিযোগিতার দিনে অনেকেই এতে উল্লাস অনুভব করে। কষ্টকল্পনার জোরে হালের কাজের ত্রুটি প্রমাণ ক'রে সাবেক কাজের মূল্যকে খর্ব করবার জন্মে তাদের উত্তপ্ত আগ্রহ। শোনা যায়, কোনো কোনো দেশে এমন মানুষ আছে যারা তাদের সমাজের প্রবীণ লোকের শক্তির কৃশতা অনুমান করলে তাকে বিনা বিলম্বে চালের উপর থেকে নিচে গড়িয়ে মারে। মানুষকে উচ্চ চালের থেকে নিচে ভূমিসাৎ করবার ছুতো খুঁজে বেড়ানো, কেবল আফ্রিকায় নয়, আমাদের সাহিত্যেও প্রচলিত। এমনতর সংকটসংকুল অবস্থায় জনসভার প্রধান আসন থেকে নিষ্কৃতি লওয়া সংগত; কেননা, এই প্রধান আসনগুলোই চালের উপরিতল, হিংস্রতা-উদ্‌বোধন করবার জায়গা।

আমাদের ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি কেবলমাত্র সাহিত্যের কৃতিত্বকে কোনো মানুষের পক্ষেই চরম লক্ষ্য বলে মানতে চায় না। একদা তাকে অতিক্রম করবার সাধনাও মনে রাখতে হবে। জীবনের পঁচিশ বছর লাগে কর্মের জন্মে প্রস্তুত হতে, কাঁচা হাতকে পাকাবার কাজে। তার পরে পঁচিশ বছর পূর্ণ শক্তিতে কাজ করবার সময়। অবশেষে ক্রমে ক্রমে সেই কর্মের বন্ধন থেকে মুক্তি নেবার জন্মে আরও পঁচিশ বছর দেওয়া চাই। সংসারের পুরোপুরি দাবি মাঝখানটাতে; আরম্ভেও নয়, শেষেও নয়।

এই ছিল আমাদের দেশের বিধান। কিন্তু পশ্চিমের নীতিতে কর্তব্যটাই শেষ লক্ষ্য, যে-মানুষ কর্তব্য করে সে নয়। আমাদের দেশে কর্মের যন্ত্রটাকে স্বীকার করা হয়েছে, কর্মীর আত্মাকেও। সংসারের জন্যে মানুষকে কাজ করতে হবে, নিজের জন্যে মানুষকে মুক্তি পেতেও হবে।

কর্ম করতে করতে কর্মের অভ্যাস কঠিন হয়ে ওঠে এবং তার অভিমান। এক সময়ে কর্মের চলতি স্রোত আপন বালির বাঁধ আপনি বাঁধে, আর সেই বন্ধনের অহংকারে মনে করে সেই সীমাই চরম সীমা, তার ঊর্ধ্বে আর গতি নেই। এমনি করে ধর্মতন্ত্র যেমন সাম্প্রদায়িকতার প্রাচীর পাকা করে আপন সীমা নিয়েই গর্বিত হয়, তেমনি সকল প্রকার কর্মই একটা সাম্প্রদায়িকতার ঠাট গড়ে তুলে সেই সীমাটার শ্রেষ্ঠত্ব কল্পনা ও ঘোষণা করতে ভালোবাসে।

সংসারে যতকিছু বিরোধ এই সীমায় সীমায় বিরোধ, পরস্পরের বেড়ার ধারে এসে লাঠালাঠি। এইখানেই যত ঈর্ষা বিদ্বেষ ও চিত্তবিকার। এই কলুষ থেকে সংসারকে রক্ষা করবার উপায় কর্ম হতে বেরিয়ে পড়বার পথকে বাধামুক্ত রেখে দেওয়া। সাহিত্যে একটা ভাগ আছে যেখানে আমরা নিজের অধিকারে কাজ করি, সেখানে বাহিরের সঙ্গে সংঘাত নেই। আর-একটা ভাগ আছে যেখানে সাহিত্যের পণ্য আমরা বাহিরের হাটে আনি, সেইখানেই হট্টগোল। একটা কথা স্পষ্ট বুঝতে পারছি, এমন দিন আসে যখন এইখানে গতিবিধি যথাসম্ভব কমিয়ে আনাই ভালো; নইলে বাইরে ওড়ে ধুলোর ঝড়, নিজের ঘটে অশান্তি, নইলে জোয়ান লোকদের কনুয়ের ঠেলা গায়ে প'ড়ে পাঁজরের উপর অত্যাচার করতে থাকে।

সাহিত্যলোকে বাল্যকাল থেকেই কাজে লেগেছি। আরম্ভে খ্যাতির চেহারা অনেককাল দেখি নি। তখনকার দিনে খ্যাতির পরিসর ছিল অল্প; এইজন্যই বোধ করি, প্রতিযোগিতার পরুষতা তেমন উগ্র ছিল না। আত্মীয়মহলে যে-কয়জন কবির লেখা সুপরিচিত ছিল, তাঁদের কোনোদিন লঙ্ঘন করব বা করতে পারব, এমন কথা মনেও করি নি। তখন এমন কিছু লিখি নি যার জোরে গৌরব করা চলে, অথচ এই শক্তিদৈন্যের অপরাধে ব্যক্তিগত বা কাব্যগত এমন কটুকাটব্য শুনতে হয় নি যাতে সংকোচের কারণ ঘটে।

সাহিত্যের সেই শিথিল শাসনের দিন থেকে আরম্ভ করে গদ্যে পদ্যে আমার লেখা এগিয়ে চলেছে, অবশেষে আজ সত্তর বছরের কাছে এসে পৌঁছলেম। আমার দ্বারা যা করা সম্ভব সমস্ত অভাব ত্রুটি সত্ত্বেও তা করেছি। তবু যতই করি-না কেন আমার শক্তির একটা স্বাভাবিক সীমা আছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। কারই বা নেই

এই সীমাটি দুই উপকূলের সীমা। একটা আমার নিজের প্রকৃতিগত, আর-একটা আমার সময়ের প্রকৃতিগত। জেনে এবং না-জেনে আমরা এক দিকে প্রকাশ করি নিজের স্বভাবকে এবং অন্য দিকে নিজের কালকে। রচনার ভিতর দিয়ে আপন হৃদয়ের যে-পরিতৃপ্তি সাধন করা যায় সেখানে কোনো হিসাবের কথা চলে না। যেখানে কালের প্রয়োজন সাধন করি সেখানে হিসাবনিকাশের দায়িত্ব আপনি এসে পড়ে। সেখানে বৈতরণীর পারে চিত্রগুপ্ত খাতা নিয়ে বসে আছেন। ভাষায় ছন্দে নূতন শক্তি এবং ভাবে চিন্তের নূতন প্রসার সাহিত্যে নূতন যুগের অবতারণা করে। কী পরিমাণে তারই আয়োজন করা গেছে তার একটা জবাবদিহি আছে।

কখন কালের পরিবর্তন ঘটে, সব সময়ে ঠিক বুঝতে পারি নি। নূতন ঋতুতে হঠাৎ নূতন ফুল-ফল-ফসলের দাবি এসে পড়ে। যদি তাতে সাড়া দিতে না পারা যায় তবে সেই স্থাবরতাই স্থবিরত্ব প্রমাণ করে; তখন কালের কাছ থেকে পারিতোষিকের আশা করা চলে না, তখনই কালের আসন ত্যাগ করবার সময়।

যাকে বলছি কালের আসন সে চিরকালের আসন নয়। স্থায়ী প্রতিষ্ঠা স্থির থাকা সত্ত্বেও উপস্থিত কালের মহলে ঠাঁইবদলের হুকুম যদি আসে, তবে সেটাকে মানতে হবে। প্রথমটা গোলমাল ঠেকে। নতুন অভ্যাগতের নতুন আকারপ্রকার দেখে তাকে অভ্যর্থনা করতে বাধা লাগে, সহসা বুঝতে পারি নে—সেও এসেছে বর্তমানের শিখর অধিকার করে চিরকালের আসন জয় করে নিতে। একদা সেখানে তারও স্বত্ব স্বীকৃত হবে, গোড়ায় তা মনে করা কঠিন হয় ব'লে এই সন্ধিক্ষণে একটা সংঘাত ঘটতেও পারে।

মানুষের ইতিহাসে কাল সব সময়ে নূতন ক'রে বাসা বদল করে না। যতক্ষণ দ্বারে একটা প্রবল বিপ্লবের ধাক্কা না লাগে ততক্ষণ সে খরচ বাঁচাবার চেষ্টায় থাকে, আপন পূর্বদিনের অনুবৃত্তি ক'রে চলে, দীর্ঘকালের অভ্যস্ত রীতিকেই মাল্যচন্দন দিয়ে পূজা করে, অলসভাবে মনে করে সেটা সনাতন। তখন সাহিত্য পুরাতন পথেই পণ্য বহন ক'রে চলে, পথনির্মাণের জন্য তার ভাবনা থাকে না। হঠাৎ একদিন পুরাতন বাসায় তার আর সংকুলান হয় না। অতীতের উত্তর দিক থেকে হাওয়া বওয়া বন্ধ হয়, ভবিষ্যতের দিক থেকে দক্ষিণ-হাওয়া চলতে শুরু করে। কিন্তু, বদলের হাওয়া বইল বলেই যে নিন্দার হাওয়া তুলতে হবে, তার কোনো কারণ নেই। পুরাতন আশ্রয়ের মধ্যে সৌন্দর্যের অভাব আছে, যে-অকৃতজ্ঞ অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সেই কথা বলবার উপলক্ষ খোঁজে তার মন সংকীর্ণ, তার স্বভাব রূঢ়। আকবরের সভায় যে দরবারি আসর জমেছিল, নবদ্বীপের কীর্তনে তাকে খাটানো গেল না। তাই

ব'লে দরবারি তোড়িকে গ্রাম্যভাষায় গাল পাড়তে বসা বর্বরতা। নূতন কালকে বিশেষ আসন ছেড়ে দিলেও দরবারি তোড়ির নিত্য আসন আপন মর্যাদায় অক্ষুণ্ণ থাকে। গোঁড়া বৈষ্ণব তাকে তাচ্ছিল্য ক'রে যদি খাটো করতে চায় তবে নিজেকেই খাটো করে। বস্তুত নূতন আগন্তুককেই প্রমাণ করতে হবে, সে নূতন কালের জন্য নূতন অর্ঘ্য সাজিয়ে এনেছে কি না।

কিন্তু, নূতন কালের প্রয়োজনটি ঠিক যে কী সে তার নিজের মুখের আবেদন শুনে বিচার করা চলে না, কারণ, প্রয়োজনটি অন্তর্নিহিত। হয়তো কোনো আশু উত্তেজনা, বাইরের কোনো আকস্মিক মোহ, তার অন্তর্গূঢ় নীরব আবেদনের উল্টো কথাই বলে; হয়তো হঠাৎ একটা আগাছার দুর্দমতা তার ফসলের খেতের প্রবল প্রতিবাদ করে; হয়তো একটা মুদ্রাদোষে তাকে পেয়ে বসে, সেইটেকেই সে মনে করে শোভন ও স্বাভাবিক। আত্মীয়সভায় সেটাতে হয়তো বাহাবা মেলে, কিন্তু সর্বকালের সভায় সেটাতে তার অসম্মান ঘটে। কালের মান রক্ষা ক'রে চললেই যে কালের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করা হয়, এ কথা বলব না। এমন দেখা গেছে, যাঁরা কালের জন্য সত্য অর্ঘ্য এনে দেন তাঁরা সেই কালের হাত থেকে বিরুদ্ধ আঘাত পেয়েই সত্যকে সপ্রমাণ করেন।

আধুনিক যুগে, য়ুরোপের চিত্তাকাশে যে হাওয়ার মেজাজ বদল হয় আমাদের দেশের হাওয়ায় তারই ঘূর্ণি-আঘাত লাগে। ভিক্টোরিয়া-যুগ জুড়ে সেদিন পর্যন্ত ইংলণ্ডে এই মেজাজ প্রায় সমভাবেই ছিল। এই দীর্ঘকালের অধিক সময় সেখানকার সমাজনীতি ও সাহিত্যরীতি একটানা পথে এমনভাবে চলেছিল যে মনে হয়েছিল যে, এ ছাড়া আর গতি নেই। উৎকর্ষের আদর্শ একই কেন্দ্রের চারি দিকে আবর্তিত হয়ে প্রাগ্রসর উদ্যমকে যেন নিরস্ত করে দিলে। এই কারণে কিছুকাল থেকে সেখানে সমাজে, সাহিত্যকলাসৃষ্টিতে, একটা অধৈর্যের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। সেখানে বিদ্রোহী চিত্ত সবকিছু উলট-পালট করবার জন্য কোমর বাঁধল, গানেতে ছবিতে দেখা দিল যুগান্তের তাণ্ডবলীলা। কী চাই সেটা স্থির হল না, কেবল হাওয়ায় একটা রব উঠল 'আর ভালো লাগছে না'। যা-করে হোক আর-কিছু-একটা ঘটা চাই। যেন সেখানকার ইতিহাসের একটা বিশেষ পর্ব মনুর বিধান মানতে চায় নি, পঞ্চাশ পেরিয়ে গেল তবু ছুটি নিতে তার মন ছিল না। মহাকালের উন্মত্ত চরগুলো একটি একটি করে তার অঙ্গনে ক্রমে জুটতে লাগল; ভাবখানা এই যে, উৎপাত করে ছুটি নেওয়াবেই। সেদিন তার আর্থিক জমার খাতায় ঐশ্বর্যের অঙ্কপাত

নিরবচ্ছিন্ন বেড়ে চলছিল। এই সমৃদ্ধির সঙ্গে শান্তি চিরকালের জন্যে বাঁধা, এই ছিল তার বিশ্বাস। মোটা মোটা লোহার সিন্ধুকগুলোকে কোনো-কিছুতে নড়্‌চড়্‌ করতে পারবে, এ কথা সে ভাবতেই পারে নি। এইজন্য একঘেয়ে উৎকর্ষের বিরুদ্ধে অনিবার্য চাঞ্চল্যকে সে-দিনের মানুষ ঐ লোহার সিন্ধুকের ভরসায় দমন করবার চেষ্টায় ছিল।

এমন সময় হাওয়ায় এ কী পাগলামি জাগল। একদিন অকালে হঠাৎ জেগে উঠে সবাই দেখে, লোহার সিন্ধুকে সিন্ধুকে ভয়ংকর মাথা-ঠোকাঠুকি; বহুদিনের সুরক্ষিত শান্তি ও পুঞ্জীভূত সম্বল ধুলোয় ধুলোয় ছড়াছড়ি; সম্পদের জয়তোরণ তলার উপর তলা গেঁথে ইন্দ্রলোকের দিকে চূড়া তুলেছিল, সেই ঔদ্ধত্য ধরণীর ভারাকর্ষণ সইতে পারল না, এক মুহূর্তে হল ভূমিসাৎ। পুষ্টদেহধারী তুষ্টচিত্ত পুরাতনের মর্যাদা আর রইল না। নূতন যুগ আলুথালু বেশে অত্যন্ত হঠাৎ এসে পড়ল, তাড়াহুড়ো বেধে গেল, গোলমাল চলছে— সাবেক কালের কর্তাব্যক্তির ধমকানি আর কানে পৌঁছায় না।

অস্থায়িত্বের এই ভয়ংকর চেহারা অকস্মাৎ দেখতে পেয়ে কোনো-কিছুর স্থায়িত্বের প্রতি শ্রদ্ধা লোকের একেবারে আলগা হয়ে গেছে। সমাজে সাহিত্যে কলারচনায় অবাধে নানাপ্রকারের অনাসৃষ্টি শুরু হল। কেউ বা ভয় পায়, কেউ বা উৎসাহ দেয়, কেউ বলে 'ভালো মানুষের মতো থামো,' কেউ বলে 'মরীয়া হয়ে চলো'। এই যুগান্তরের ভাঙচুরের দিনে যাঁরা নূতন কালের নিগূঢ় সত্যটিকে দেখতে পেয়েছেন ও প্রকাশ করছেন তাঁরা যে কোথায়, তা এই গোলমালের দিনে কে নিশ্চিত করে বলতে পারে। কিন্তু, এ কথা ঠিক যে, যে-যুগ পঞ্চাশ পেরিয়েও তক্ত আঁকড়ে গদিয়ান হয়ে বসে ছিল, নূতনের তাড়া খেয়ে লোটাকম্বল হাতে বনের দিকে সে দৌড় দিয়েছে। সে ভালো কি এ ভালো সে তর্ক তুলে ফল নেই; আপাতত এই কালের শক্তিকে সার্থক করবার উপলক্ষে নানা লোকে নব নব প্রণালীর প্রবর্তন করতে বসল। সাবেক প্রণালীর সঙ্গে মিল হচ্ছে না ব'লে যারা উদ্‌বেগ প্রকাশ করছে তারাও ঐ পঞ্চাশোর্ধ্বের দল, বনের পথ ছাড়া তাদের গতি নেই।

তাই বলছিলেম, ব্যক্তিগত হিসাবে যেমন পঞ্চাশোর্ধ্বং আছে, কালগত হিসাবেও তেমনি। সময়ের সীমাকে যদি অতিক্রম করে থাকি তবে সাহিত্যে অসহিষ্ণুতা মথিত হয়ে উঠবে। নবাগত যাঁরা তাঁরা যে-পর্যন্ত নবযুগে নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করে নিজেরা প্রতিষ্ঠালাভ না করবেন সে-পর্যন্ত শান্তিহীন সাহিত্য কলুষলিপ্ত

হবে। পুরাতনকে অতিক্রম করে নূতনকে অভূতপূর্ব করে তুলবই, এই পণ করে বসে নবসাহিত্যিক যতক্ষণ নিজের মনটাকে ও লেখনীটাকে নিয়ে অত্যন্ত বেশি টানাটানি করতে থাকবেন, ততক্ষণ সেই অতিমাত্র উদ্‌বেজনায় ও আলোড়নে সৃষ্টিকার্য অসম্ভব হয়ে উঠবে।

যেটাকে মানুষ পেয়েছে সাহিত্য তাকেই যে প্রতিবিম্বিত করে, তা নয়; যা তার অনুপলব্ধ, তার সাধনার ধন, সাহিত্যে প্রধানত তারই জন্য কামনা উজ্জ্বল হয়ে ব্যক্ত হতে থাকে। বাহিরের কর্মে যে-প্রত্যাশা সম্পূর্ণ আকার লাভ করতে পারে নি, সাহিত্যে কলারচনায় তারই পরিপূর্ণতার কল্পরূপ নানা ভাবে দেখা দেয়। শাস্ত্র বলে, ইচ্ছাই সত্তার বীজ। ইচ্ছাকে মারলে ভববন্ধন ছিন্ন হয়। ইচ্ছার বিশেষত্ব অনুসরণ করে আত্মা বিশেষ দেহ ও গতি লাভ করে। বিশেষ যুগের ইচ্ছা, বিশেষ সমাজের ইচ্ছা, সেই যুগের সেই সমাজের আত্মরূপসৃষ্টির বীজশক্তি। এই কারণেই যাঁরা রাষ্ট্রিক লোকগুরু তাঁরা রাষ্ট্রীয় মুক্তির ইচ্ছাকে সর্বজনের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করতে চেষ্টা করেন, নইলে মুক্তির সাধনা দেশে সত্যরূপ গ্রহণ করে না।

সাহিত্যে মানুষের ইচ্ছারূপ এমন ক'রে প্রকাশ পায় যাতে সে মনোহর হয়ে ওঠে, এমন পরিস্ফুট মূর্তি ধরে যাতে সে ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়ের চেয়ে প্রত্যয়গম্য হয়। সেই কারণেই সমাজকে সাহিত্য একটি সজীব শক্তি দান করে; যে ইচ্ছা তার শ্রেষ্ঠ ইচ্ছা সাহিত্যযোগে তা শ্রেষ্ঠ ভাষায় ও ভঙ্গীতে দীর্ঘকাল ধরে মানুষের মনে কাজ করতে থাকে এবং সমাজের আত্মসৃষ্টিকে বিশিষ্টতা দান করে। রামায়ণ মহাভারত ভারতবাসী হিন্দুকে বহুযুগ থেকে মানুষ করে এসেছে। একদা ভারতবর্ষ যে-আদর্শ কামনা করেছে তা ঐ দুই কাব্যে চিরজীবী হয়ে গেল। এই কামনাই সৃষ্টিশক্তি। বঙ্গদর্শনে এবং বঙ্কিমের রচনায় বাংলাসাহিত্যে প্রথম আধুনিক যুগের আদর্শকে প্রকাশ করেছে। তাঁর প্রতিভার দ্বারা অধিকৃত সাহিত্য বাংলাদেশের মেয়েপুরুষের মনকে এক কাল থেকে অন্য কালের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে; এদের ব্যবহারে ভাষায় রুচিতে পূর্বকালবর্তী ভাবের অনেক পরিবর্তন হয়ে গেল। যা আমাদের ভালো লাগে, অগোচরে তাই আমাদের গড়ে তোলে। সাহিত্যে শিল্পকলায় আমাদের সেই ভালো-লাগার প্রভাব কাজ করে। সমাজসৃষ্টিতে তার ক্রিয়া গভীর। এই কারণেই সাহিত্যে যাতে ভদ্রসমাজের আদর্শ বিকৃত না হয়, সকল কালেরই এই দায়িত্ব।

বঙ্কিম যে-যুগ প্রবর্তন করেছেন আমার বাস সেই যুগেই। সেই যুগকে তার

সৃষ্টির উপকরণ জোগানো এ-পর্যন্ত আমার কাজ ছিল। য়ুরোপের যুগান্তর-ঘোষণার প্রতিধ্বনি ক'রে কেউ কেউ বলছেন, আমাদের সেই যুগেরও অবসান হয়েছে। কথাটা খাঁটি না হতেও পারে। যুগান্তরের আরম্ভে প্রদোষান্ধকারে তাকে নিশ্চিত করে চিনতে বিলম্ব ঘটে। কিন্তু, সংবাদটা যদি সত্যই হয় তবে এই যুগসন্ধ্যার যাঁরা অগ্রদূত তাঁদের ঘোষণাবাণীতে শুকতারার সুরম্য দীপ্তি ও প্রত্যূষের সুনির্মল শান্তি আসুক; নবযুগের প্রতিভা আপন পরিপূর্ণতার দ্বারাই আপনাকে সার্থক করুক, বাক্‌চাতুর্যের দ্বারা নয়। রাত্রির চন্দ্রকে যখন বিদায় করবার সময় আসে তখন কুয়াশার কলুষ দিয়ে তাকে অপমানিত করবার প্রয়োজন হয় না, নবপ্রভাতের সহজ মহিমার শক্তিতেই তার অন্তর্ধান ঘটে।

পথে চলতে চলতে মর্তলীলার প্রান্তবর্তী ক্লান্ত পথিকের এই নিবেদনপত্র সসংকোচে 'তরুণসভায়' প্রেরণ করলেম। এই কালের যাঁরা অগ্রণী তাঁদের কৃতার্থতা একান্তমনে কামনা করি। নবজীবনের অমৃতপাত্র যদি সত্যই তাঁরা পূর্ণ ক'রে এনে থাকেন, আমাদের কালের ভাণ্ড আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে যদি রিক্ত হয়েই থাকে, আমাদের দিনের ছন্দ যদি এখনকার দিনের সঙ্গে নাই মেলে, তবে তার যাথার্থ্য নূতন কাল সহজেই প্রমাণ করবেন— কোনো হিংস্রনীতির প্রয়োজন হবে না। নিজের আয়ুর্দৈর্ঘ্যের অপরাধের জন্য আমি দায়ী নই; তবে সান্ত্বনার কথা এই যে, সমাপ্তির জন্য বিলুপ্তি অনাবশ্যক। সাহিত্যে পঞ্চাশোর্ধ্বং নিজের তিরোধানের বন নিজেই সৃষ্টি করে, তাকে কর্কশকণ্ঠে তাড়না ক'রে বনে পাঠাতে হয় না।

অবশেষে যাবার সময় বেদমন্ত্রে এই প্রার্থনাই করি— যদ্ ভদ্রং তন্ন আসুব: যাহা ভদ্র তাহাই আমাদের প্রেরণ করো।

১৩৩৬

বাংলাসাহিত্যের ক্রমবিকাশ

একদিন কলিকাতা ছিল অখ্যাত অসংস্কৃত পল্লী; সেখানে বসল বিদেশী বাণিজ্যের হাট, গ্রামের শ্যামল আবেষ্টন সরিয়ে দিয়ে শহরের উদ্ধত রূপ প্রকাশ পেতে লাগল। সেই শহর আধুনিক কালকে দিল আসন পেতে; বাণিজ্য এবং রাষ্ট্রের পথে দিগন্তের পর দিগন্তে সেই আসন বিস্তৃত হয়ে চলল।

এই উপলক্ষ্যে বর্তমান যুগের বেগমান চিত্তের সংস্রব ঘটল বাংলাদেশে। বর্তমান

যুগের প্রধান লক্ষণ এই যে, সে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতায় বদ্ধ বা ব্যক্তিগত মূঢ় কল্পনায় জড়িত নয়। কি বিজ্ঞানে কি সাহিত্যে, সমস্ত দেশে সমস্ত কালে তার ভূমিকা। ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক সভ্যতা সর্বমানবচিত্তের সঙ্গে মানসিক দেনা-পাওনার ব্যবহার প্রশস্ত করে চলেছে।

এক দিকে পণ্য এবং রাষ্ট্র-বিস্তারে পাশ্চাত্যমানুষ এবং তার অনুবর্তীদের কঠোর শক্তিতে সমস্ত পৃথিবী অভিভূত, অন্য দিকে পূর্বপশ্চিমে সর্বত্রই আধুনিক কালের প্রধান বাহন পাশ্চাত্যসংস্কৃতির অমোঘ প্রভাব বিস্তীর্ণ। বৈষয়িক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের আক্রমণ আমরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রতিরোধ করতে পারি নি, কিন্তু পাশ্চাত্যসংস্কৃতিকে আমরা ক্রমে ক্রমে স্বতঃই স্বীকার করে নিচ্ছি। এই ইচ্ছাকৃত অঙ্গীকারের স্বাভাবিক কারণ এই সংস্কৃতির বন্ধনহীনতা, চিত্তলোকে এর সর্বত্রগামিতা— নানা ধারায় এর অবাধ প্রবাহ, এর মধ্যে নিত্য-উদ্যমশীল বিকাশধর্ম নিয়ত উন্মুখ, কোনো দুর্মা কঠিন নিশ্চল সংস্কারের জালে এ পৃথিবীর কোণে কোণে স্থবিরভাবে বদ্ধ নয়, রাষ্ট্রিক ও মানসিক স্বাধীনতার গৌরবকে এ ঘোষণা করেছে— সকলপ্রকার যুক্তিহীন অন্ধবিশ্বাসের অবমাননা থেকে মানুষের মনকে মুক্ত করবার জন্যে এর প্রয়াস। এই সংস্কৃতি আপন বিজ্ঞানে দর্শনে সাহিত্যে বিশ্ব ও মানব-লোকের সকল বিভাগভুক্ত সকল বিষয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত, সকল কিছুই পরীক্ষা করেছে, বিশ্লেষণ সংঘটন বর্ণন করেচে, মনোবৃত্তির গভীরে প্রবেশ করে সূক্ষ্ম স্থূল যতকিছু রহস্যকে অবারিত করছে। তার অন্তহীন জিজ্ঞাসাবৃত্তি প্রয়োজন অপ্রয়োজনে নির্বিচার, তার রচনা তুচ্ছ মহৎ সকল ক্ষেত্রেই উপাদানসংগ্রহে নিপুণ। এই বিরাট সাধনা আপন বেগবান প্রশস্ত গতির দ্বারাই আপন ভাষা ও ভঙ্গীকে যথাযথ, অত্যুক্তিবিহীন, এবং কৃত্রিমতার-জঞ্জাল-বিমুক্ত করে তোলে।

এই সংস্কৃতির সোনার কাঠি প্রথম যেই তাকে স্পর্শ করল অমনি বাংলাদেশ সচেতন হয়ে উঠল। এ নিয়ে বাঙালি যথার্থ ই গৌরব করতে পারে। সজল মেঘ নীলনদীর তট থেকেই আসুক আর পূর্বসমুদ্রের বক্ষ থেকেই বাহিত হোক, তার বর্ষণে মুহূর্তেই অন্তর থেকে সাড়া দেয় উর্বরা ভূমি— মরুক্ষেত্র তাকে অস্বীকার করার দ্বারা যে অহংকার করে সেই অহংকারের নিষ্ফলতা শোচনীয়। মানুষের চিত্তসম্ভূত যাকিছু গ্রহণীয় তাকে সম্মুখে আসবামাত্র চিনতে পারা ও অভ্যর্থনা করতে পারার উদারশক্তিকে শ্রদ্ধা করতেই হবে। চিত্তসম্পদকে সংগ্রহ করার অক্ষমতাই বর্বরতা, সেই অক্ষমতাকেই মানসিক আভিজাত্য বলে যে-মানুষ কল্পনা করে সে কৃপাপাত্র।

প্রথম আরম্ভে ইংরেজি শিক্ষাকে ছাত্ররূপেই বাঙালি যুবক গ্রহণ করেছে। সেটা

ধার-করা সাজসজ্জার মতোই তাকে অস্থির করে রাখলে, বাইরে থেকে পাওয়া জিনিসের অহংকার নিয়ত উদ্যত হয়ে রইল। ইংরেজিসাহিত্যের ঐশ্বর্যভোগের অধিকার তখন ছিল দুর্লভ এবং অল্পসংখ্যক লোকের আয়ত্তগম্য, সেই কারণেই এই সংকীর্ণশ্রেণীগত ইংরেজি-পোড়োর দল নূতনলব্ধ শিক্ষাকে অস্বাভাবিক আড়ম্বরের সঙ্গেই ব্যবহার করতেন।

কথায়-বার্তায় পত্রব্যবহারে সাহিত্যরচনায় ইংরেজিভাষার বাইরে পা বাড়ানো তখনকার শিক্ষিতদের পক্ষে ছিল অকৌলীন্যের লক্ষণ। বাংলাভাষা তখন সংস্কৃত-পণ্ডিত ও বাংলা-পণ্ডিত দুই দলের কাছেই ছিল অপাঙ্‌ক্তেয়। এ ভাষার দারিদ্র্যে তাঁরা লজ্জাবোধ করতেন। এই ভাষাকে তাঁরা এমন একটি অগভীর শীর্ণ নদীর মতো মনে করতেন যার হাঁটুজলে পাড়াগেঁয়ে মানুষের প্রতিদিনের সামান্য ঘোরো কাজ চলে মাত্র, কিন্তু দেশবিদেশের পণ্যবাহী জাহাজ চলতে পারে না।

তবু এ কথা মানতে হবে, এই অহংকারের মূলে ছিল পশ্চিম-মহাদেশ হতে আহরিত নূতন-সাহিত্যরস-সম্ভোগের সহজ শক্তি। সেটা বিস্ময়ের বিষয়, কেননা, তাঁদের পূর্বতন সংস্কারের সঙ্গে এর সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ছিল। অনেককাল মনের জমি ঠিকমতো চাষের অভাবে ভরা ছিল আগাছায়, কিন্তু তার অন্তরে অন্তরে সফলতার শক্তি ছিল প্রচ্ছন্ন; তাই কৃষির সূচনা হবামাত্রই সাড়া দিতে সে দেরি করলে না। পূর্বকালের থেকে তার বর্তমান অবস্থার যে-প্রভেদ দেখা গেল তা দ্রুত এবং বৃহৎ। তার একটা বিস্ময়কর প্রমাণ দেখি রামমোহন রায়ের মধ্যে। সেদিন তিনি যে বাংলাভাষায় ব্রহ্মসূত্রের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতে প্রবৃত্ত হলেন সে-ভাষার পূর্ব-পরিচয় এমন-কিছুই ছিল না যাতে করে তার উপরে এত বড়ো দুরূহ ভার অর্পণ সহজে সম্ভবপর মনে হতে পারত। বাংলাভাষায় তখন সাহিত্যিক গদ্য সবে দেখা দিতে আরম্ভ করেছে নদীর তটে সদ্যশায়িত পলিমাটির স্তরের মতো। এই অপরিণত গদ্যেই দুর্বোধ তত্ত্বালোচনার ভারবহ ভিত্তি সংঘটন করতে রামমোহন কুণ্ঠিত হলেন না।

এই যেমন গদ্যে, পদ্যে তেমনি অসম সাহস প্রকাশ করলেন মধুসূদন। পাশ্চাত্য হোমর-মিল্‌টন-রচিত মহাকাব্যসঞ্চারী মন ছিল তাঁর। তার রসে তিনি একান্তভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন বলেই তার ভোগমাত্রেই স্তব্ধ থাকতে পারেন নি। আষাঢ়ের আকাশে সজলনীল মেঘপুঞ্জ থেকে গর্জন নামল, গিরিগুহা থেকে তার অনুকরণে প্রতিধ্বনি উঠল মাত্র, কিন্তু আনন্দচঞ্চল ময়ূর আকাশে মাথা তুলে সাড়া দিলে আপন কেকাধ্বনিতেই। মধুসূদন সংগীতের দুর্নিবার উৎসাহ ঘোষণা করবার জন্যে

আপন ভাষাকেই বক্ষে টেনে নিলেন। যে-যন্ত্র ছিল ক্ষীণধ্বনি একতারা তাকে অবজ্ঞা করে ত্যাগ করলেন না, তাতেই তিনি গম্ভীর স্বরের নানা তার চড়িয়ে তাকে রুদ্রবীণা করে তুললেন। এ যন্ত্র একেবারে নতুন, একমাত্র তাঁরই আপন-গড়া। কিন্তু, তাঁর এই সাহস তো ব্যর্থ হল না। অপরিচিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের ঘনঘর্ঘরমন্দ্রিত রথে চড়ে বাংলাসাহিত্যে সেই প্রথম আবির্ভূত হল আধুনিক কাব্য 'রাজবত্নন্নত-ধ্বনি'— কিন্তু, তাকে সমাদরে আহ্বান করে নিতে বাংলাদেশে অধিক সময় তো লাগে নি। অথচ এর অনতিপূর্বকালবর্তী সাহিত্যের যে-নমুনা পাওয়া যায় তার সঙ্গে এর কি সুদূর তুলনাও চলে।

আমি জানি, এখনও আমাদের দেশে এমন মানুষ পাওয়া যায় যারা সেই পুরাতনকালের অনুপ্রাসকণ্টকিত শিথিল ভাষার পৌরাণিক পাঁচালি প্রভৃতি গানকেই বিশুদ্ধ ন্যাশনাল সাহিত্য আখ্যা দিয়ে আধুনিক সাহিত্যের প্রতি প্রতিকূল কটাক্ষপাত করে থাকেন। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ স্থলেই সেটা একটা ভান মাত্র। তাঁরা যে স্বয়ং যথার্থতঃ সেই সাহিত্যেরই রসসম্ভোগে একান্ত নিবিষ্ট থাকেন, রচনায় বা আলোচনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। ভূনির্মাণের কোনো এক আদিপর্বে হিমালয়পর্বতশ্রেণী স্থিতিলাভ করেছিল, আজ পর্যন্ত সে আর বিচলিত হয় নি; পর্বতের পক্ষেই এটা সম্ভবপর। মানুষের চিত্ত তো স্থাণু নয়; অন্তরে বাহিরে চার দিক থেকেই নানা প্রভাব তার উপর নিয়ত কাজ করছে, তার অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি এবং অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে নিরন্তর; সে যদি জড়বৎ অসাড় না হয় তা হলে তার আত্মপ্রকাশে বিচিত্র পরিবর্তন ঘটবেই, ন্যাশনাল আদর্শ নাম দিয়ে কোনো-একটি সুদূর ভূতকালবর্তী আদর্শবন্ধনে নিজেকে নিশ্চল করে রাখা তার পক্ষে স্বাভাবিক হতেই পারে না, যেমন স্বাভাবিক নয় চীনে মেয়েদের পায়ের বন্ধন। সেই বন্ধনকে ন্যাশনাল নামের ছাপ দিয়ে গর্ব করা বিড়ম্বনা। সাহিত্যে বাঙালির মন অনেক কালের আচারসংকীর্ণতা থেকে অবিলম্বে মুক্তি যে পেয়েছিল, তাতে তার চিৎশক্তির অসামান্যতাই প্রমাণ করেছে।

নবযুগের প্রাণবান সাহিত্যের স্পর্শে কল্পনাবৃত্তি যেই নবপ্রভাতে উদ্‌বোধিত হল অমনি মধুসূদনের প্রতিভা তখনকার বাংলাভাষার পায়ে-চলা পথকে আধুনিক কালের রথযাত্রার উপযোগী করে তোলাকে দুরাশা বলে মনে করলে না। আপন শক্তির 'পরে শ্রদ্ধা ছিল বলেই বাংলাভাষার 'পরে কবি শ্রদ্ধা প্রকাশ করলেন; বাংলাভাষাকে নির্ভীকভাবে এমন আধুনিকতায় দীক্ষা দিলেন যা তার পূর্বানুবৃত্তি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বঙ্গবাণীকে গম্ভীর স্বরনির্ঘোষে মন্দ্রিত করে তোলবার জন্যে সংস্কৃতভাণ্ডার

থেকে মধুসূদন নিঃসংকোচে যে-সব শব্দ আহরণ করতে লাগলেন সেও নূতন, বাংলা পয়ারের সনাতন সমদ্বিভক্ত আল ভেঙে দিয়ে তার উপর অমিত্রাক্ষরের যে-বন্যা বইয়ে দিলেন সেও নূতন, আর মহাকাব্য-খণ্ডকাব্য-রচনায় যে-রীতি অবলম্বন করলেন তাও বাংলাভাষায় নূতন। এটা ক্রমে ক্রমে পাঠকের মনকে সইয়ে সইয়ে সাবধানে ঘটল না; শাস্ত্রিক প্রথায় মঙ্গলাচরণের অপেক্ষা না রেখে কবিতাকে বহন করে নিয়ে এলেন এক মুহূর্তে ঝড়ের পিঠে— প্রাচীন সিংহদ্বারের আগল গেল ভেঙে।

মাইকেল সাহিত্যে যে-যুগান্তর আনলেন তার অনতিকাল পরেই আমার জন্ম। আমার যখন বয়স অল্প তখন দেখেছি, কত যুবক ইংরেজিসাহিত্যের সৌন্দর্যে ভাববিহ্বল। সেক্স্‌পিয়র, মিল্‌টন, বায়্‌রন, মেকলে, বার্ক্‌ তাঁরা প্রবল উত্তেজনায় আবৃত্তি করে যেতেন পাতার পর পাতা। অথচ তাঁদের সমকালেই বাংলাসাহিত্যে যে নূতন প্রাণের উদ্যম সদ্য জেগে উঠেছে, সে তাঁরা লক্ষ্যই করেন নি। সেটা যে অবধানের যোগ্য তাও তাঁরা মনে করতেন না। সাহিত্যে তখন যেন ভোরের বেলা কারও ঘুম ভেঙেছে, অনেকেরই ঘুম ভাঙে নি। আকাশে অরুণালোকের স্বাক্ষরে তখনও ঘোষিত হয়নি প্রভাতের জ্যোতির্ময়ী প্রত্যাশা।

বঙ্কিমের লেখনী তার কিছু পূর্বেই সাহিত্যের অভিযানে যাত্রা আরম্ভ করেছে। তখন অন্তঃপুরে বটতলার ফাঁকে ফাঁকে দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, কপালকুণ্ডলা সঞ্চরণ করছে দেখতে পাই। যাঁরা তার রস পেয়েছেন তাঁরা তখনকার কালের নবীনা হলেও প্রাচীনকালীন সংস্কারের বাহিরে তাঁদের গতি ছিল অনভ্যস্ত। আর কিছু না হোক, ইংরেজি তাঁরা পড়েন নি। এ কথা মানতেই হবে, বঙ্কিম তাঁর নভেলে আধুনিক রীতিরই রূপ ও রস এনেছিলেন। তাঁর ভাষা পূর্ববর্তী প্রাকৃত বাংলা ও সংস্কৃত বাংলা থেকে অনেক ভিন্ন। তাঁর রচনার আদর্শ কি বিষয়ে কি ভাবে কি ভঙ্গিতে পাশ্চাত্যের আদর্শের অনুগত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সেকালে ইংরেজিভাষায় বিদ্বান বলে যাঁদের অভিমান তাঁরা তখনও তাঁর লেখায় যথেষ্ট সমাদর করেন নি; অথচ সে-লেখা ইংরেজি শিক্ষা-হীন তরুণীদের হৃদয়ে প্রবেশ করতে বাধা পায় নি, এ আমরা দেখেছি। তাই সাহিত্যে আধুনিকতার আবির্ভাবকে আর তো ঠেকানো গেল না। এই নব্য রচনারীতির ভিতর দিয়ে সেদিনকার বাঙালি-মন মানসিক চিরাভ্যাসের অপ্রশস্ত বেষ্টনকে অতিক্রম করতে পারলে— যেন অসূর্যম্পশ্যরূপা অন্তঃপুরচারিণী আপন

প্রাচীর-ঘেরা প্রাঙ্গণের বাইরে এসে দাঁড়াতে পেরেছিল। এই মুক্তি সনাতন রীতির অনুকূল না হতে পারে কিন্তু সে যে চিরন্তন মানবপ্রকৃতির অনুকূল, দেখতে দেখতে তার প্রমাণ পড়ল ছড়িয়ে।

এমন সময়ে বঙ্গদর্শন মাসিকপত্র দেখা দিল। তখন থেকে বাঙালির চিত্তে নব্য বাংলাসাহিত্যের অধিকার দেখতে দেখতে অবারিত হল সর্বত্র। ইংরেজি-ভাষায় যাঁরা প্রবীণ তাঁরাও একে সবিস্ময়ে স্বীকার করে নিলেন। নব্যসাহিত্যের হাওয়ায় তখনকার তরুণী পাঠিকাদের মনঃপ্রকৃতির যে পরিবর্তন হতে আরম্ভ হয়েছিল, সে কথা নিঃসন্দেহ। তরুণীরা সবাই রোমান্টিক হয়ে উঠছে, এইটেই তখনকার দিনের ব্যঙ্গরসিকদের প্রহসনের বিষয় হয়ে উঠল। কথাটা সত্য। ক্লাসিকের অর্থাৎ চিরাগত রীতির বাইরেই রোমান্টিকের লীলা। রোমান্টিকে মুক্ত ক্ষেত্রে হৃদয়ের বিহার। সেখানে অনভ্যস্ত পথে ভাবাবেগের আতিশয্য ঘটতে পারে। তাতে করে পূর্ববর্তী বাঁধা নিয়মানুবর্তনের তুলনায় বিপজ্জনক এমন-কি হাস্যজনক হয়ে উঠবার আশঙ্কা থাকে। দাঁড় থেকে ছাড়া পাওয়া কল্পনার পায়ে শিকল বাঁধা না থাকাতে ক্ষণে ক্ষণে হয়তো সে ঝাঁপিয়ে পড়ে অশোভনতায়। কিন্তু, বড়ো পরিপ্রেক্ষণিকায় ছড়িয়ে দেখলে দেখা যায়, অভিজ্ঞতার বিচিত্র শিক্ষার মুক্তি মোটের উপরে সকল-প্রকার স্খলনকে অতিকৃতিকে সংশোধন করে চলে।

যাই হোক, আধুনিক বাংলাসাহিত্যের গতিবেগ বাংলার ছেলেমেয়েকে কোন্ পথে নিয়ে চলেছে, এ সভায় তার আলোচনার উপলক্ষ্য নেই। এই সভাতেই বাংলাসাহিত্যের বিশেষ সফলতার যে প্রমাণ স্পষ্ট হয়েছে, সভার কার্যারম্ভের পূর্বে সূত্রধাররূপে আজ তারই কথা জানিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য বলে মনে করি।

এমন একদিন ছিল যখন বাংলাপ্রদেশের বাইরে বাঙালি-পরিবার দুই-এক পুরুষ যাপন করতে করতেই বাংলাভাষা ভুলে যেত। ভাষার যোগই অন্তরের নাড়ীর যোগ— সেই যোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হলেই মানুষের পরম্পরাগত বুদ্ধিশক্তি ও হৃদয়বৃত্তির সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে যায়। বাঙালিচিত্তের যে-বিশেষত্ব মানব-সংসারে নিঃসন্দেহ তার একটা বিশেষ মূল্য আছে। যেখানেই তাকে হারাই সেখানেই সমস্ত বাঙালিজাতির পক্ষে বড়ো ক্ষতির কারণ ঘটা সম্ভব। নদীর ধারে যে-জমি আছে তার মাটিতে যদি বাঁধন না থাকে তবে তট কিছু কিছু করে ধ্বসে পড়ে। ফসলের আশা হারাতে থাকে। যদি কোনো মহাবৃক্ষ সেই মাটির গভীর অন্তরে দূরব্যাপী শিকড় ছড়িয়ে দিয়ে তাকে এঁটে ধরে তা হলে স্রোতের আঘাত থেকে সে ক্ষেত্র রক্ষা পায়। বাংলাদেশের চিত্তক্ষেত্রকে তেমনি

করেই ছায়া দিয়েছে, ফল দিয়েছে, নিবিড় ঐক্য ও স্থায়িত্ব দিয়েছে বাংলাসাহিত্য। অল্প আঘাতেই সে খণ্ডিত হয় না। একদা আমাদের রাষ্ট্রপতিরা বাংলাদেশের মাঝখানে বেড়া তুলে দেবার যে-প্রস্তাব করেছিলেন সেটা যদি আরও পঞ্চাশ বছর পূর্বে ঘটত, তবে তার আশঙ্কা আমাদের এত তীব্র আঘাতে বিচলিত করতে পারত না। ইতিমধ্যে বাংলার মর্মস্থলে যে অখণ্ড আত্মবোধ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তার প্রধানতম কারণ বাংলাসাহিত্যে। বাংলাদেশকে রাষ্ট্রব্যবস্থায় খণ্ডিত করার ফলে তার ভাষা তার সংস্কৃতি খণ্ডিত হবে, এই বিপদের সম্ভাবনায় বাঙালি উদাসীন থাকতে পারে নি। বাঙালিচিত্তের এই ঐক্যবোধ সাহিত্যের যোগে বাঙালির চৈতন্যকে ব্যাপকভাবে গভীরভাবে অধিকার করেছে। সেই কারণেই আজ বাঙালি যত দূরে যেখানেই যাক বাংলাভাষা ও সাহিত্যের বন্ধনে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত থাকে। কিছুকাল পূর্বে বাঙালির ছেলে বিলাতে গেলে ভাষায় ভাবে ও ব্যবহারে যেমন স্পর্ধাপূর্বক অবাঙালিত্বের আড়ম্বর করত, এখন তা নেই বললেই চলে— কেননা বাংলাভাষায় যে-সংস্কৃতি আজ উজ্জ্বল তার প্রতি শ্রদ্ধা না প্রকাশ করা এবং তার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতাই আজ লজ্জার বিষয় হয়ে উঠেছে।

রাষ্ট্রীয় ঐক্যসাধনার তরফ থেকে ভারতবর্ষে বঙ্গেতর প্রদেশের প্রতি প্রবাস শব্দ প্রয়োগ করায় আপত্তি থাকতে পারে। কিন্তু, মুখের কথা বাদ দিয়ে বাস্তবিকতার যুক্তিতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে অকৃত্রিম আত্মীয়তার সাধারণ ভূমিকা পাওয়া যায় কি না, সে তর্ক ছেড়ে দিয়েও সাহিত্যের দিক থেকে ভারতের অন্য প্রদেশ বাঙালির পক্ষে প্রবাস সে কথা মানতে হবে। এ সম্বন্ধে আমাদের পার্থক্য এত বেশি যে, অন্য প্রদেশের বর্তমান সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলাসংস্কৃতির সামঞ্জস্যসাধন অসম্ভব। এ ছাড়া সংস্কৃতির প্রধান যে বাহন ভাষা সে সম্বন্ধে বাংলার সঙ্গে অন্যপ্রদেশীয় ভাষার কেবল ব্যাকরণের প্রভেদ নয় অভিব্যক্তির প্রভেদ। অর্থাৎ ভাবের ও সত্যের প্রকাশকল্পে বাংলাভাষা নানা প্রতিভাশালীর সাহায্যে যে রূপ এবং শক্তি উদ্ভাবন করেছে, অন্য প্রদেশের ভাষায় তা পাওয়া যায় না, অথবা তার অভিমুখিতা অন্য দিকে। অথচ সে-সকল ভাষার মধ্যে হয়তো নানা বিষয়ে বাংলার চেয়ে শ্রেষ্ঠতা আছে। অন্য প্রদেশবাসীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে বাঙালি-হৃদয়ের মিলন অসম্ভব নয় আমরা তার অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখেছি, যেমন পরলোকগত অতুলপ্রসাদ সেন। উত্তরপশ্চিমে যেখানে তিনি ছিলেন, মানুষ হিসাবে সেখানকার লোকের সঙ্গে তাঁর হৃদয়ে হৃদয়ে মিল ছিল, কিন্তু সাহিত্যরচয়িতা বা সাহিত্যরসিক হিসাবে সেখানে তিনি প্রবাসীই ছিলেন এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই।

তাই বলছি, আজ প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলন বাঙালির অন্তরতম ঐক্যচেতনাকে সপ্রমাণ করছে। নদী যেমন স্রোতের পথে নানা বাঁকে বাঁকে আপন নানাদিক-গামী তটকে এক করে নেয়, আধুনিক বাংলাভাষা ও সাহিত্য তেমনি করেই নানা দেশ-প্রদেশের বাঙালির হৃদয়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তাকে এক প্রাণধারায় মিলিয়েছে। সাহিত্যে বাঙালি আপনাকে প্রকাশ করেছে ব'লেই, আপনার কাছে আপনি সে আর অগোচর নেই ব'লেই, যেখানে যাক আপনাকে আর সে ভুলতে পারে না। এই আত্মানুভূতিতে তার গভীর আনন্দ বৎসরে বৎসরে নানা স্থানে নানা সম্মিলনীতে বারম্বার উচ্ছ্বসিত হচ্ছে।

অথচ সাহিত্য ব্যাপারে সম্মিলনীর কোনো প্রকৃত অর্থ নেই। পৃথিবীতে দশে মিলে অনেক কাজ হয়ে থাকে, কিন্তু সাহিত্য তার অন্তর্গত নয়। সাহিত্য একান্তই একলা মানুষের সৃষ্টি। রাষ্ট্রিক বাণিজ্যিক সামাজিক বা ধর্ম-সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানে দল বাঁধা আবশ্যক হয়। কিন্তু, সাহিত্যসাধনা যার, যোগীর মতো তপস্বীর মতো সে একা। অনেক সময়ে তার কাজ দশের মতের বিরুদ্ধে। মধুসূদন বলেছিলেন 'বিরচিব মধুচক্র'। সেই কবির মধুচক্র একলা মধুকরের। মধুসূদন যেদিন মৌচাক মধুতে ভরছিলেন, সেদিন বাংলায় সাহিত্যের কুঞ্জবনে মৌমাছি ছিলই বা কয়টি। তখন থেকে নানা খেয়ালের বশবর্তী একলা মানুষে মিলে বাংলাসাহিত্যকে বিচিত্র করে গড়ে তুলল। এই বহু স্রষ্টার নিভৃত-তপো-জাত সাহিত্যলোকে বাংলার চিত্ত আপন অন্তরতম আনন্দভবন পেয়েছে, সম্মিলনীগুলি তারই উৎসব। বাংলা-সাহিত্য যদি দল-বাঁধা মানুষের সৃষ্টি হত তা হলে আজ তার কী দুর্গতিই ঘটত তা মনে করলেও বুক কেঁপে ওঠে। বাঙালি চিরদিন দলাদলি করতেই পারে, কিন্তু দল গড়ে তুলতে পারে না। পরস্পরের বিরুদ্ধে ঘোঁট করতে, চক্রান্ত করতে, জাত মারতে তার স্বাভাবিক আনন্দ— আমাদের সনাতন চণ্ডীমণ্ডপের উৎপত্তি সেই 'আনন্দাদ্ধ্যেব'। মানুষের সব-চেয়ে নিকটতম যে-সম্বন্ধবন্ধন বিবাহব্যাপারে, গোড়াতেই সেই বন্ধনকে অহৈতুক অপমানে জর্জরিত করবার বরযাত্রিক মনোবৃত্তিই তো বাংলা দেশের সনাতন বিশেষত্ব। তার পরে কবির লড়াইয়ের প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি ব্যক্তিগত অশ্রাব্য গালিবর্ষণকে যারা উপভোগ করবার জন্তে একদা ভিড় করে সমবেত হত, কোনো পক্ষের প্রতি বিশেষ শত্রুতাবশতই যে তাদের সেই দুয়ো দেবার উচ্ছ্বসিত উল্লাস তা তো নয়, নিন্দার মাদক রসভোগের নৈর্ব্যক্তিক প্রবৃত্তিই এর মূলে। আজ বর্তমান সাহিত্যেও বাঙালির ভাঙন-ধরানো মনের কুৎসামুখরিত নিষ্ঠুর পীড়ননৈপুণ্য সর্বদাই উদ্যত। সেটা আমাদের ক্রূর অট্টহাস্যোদ্বেল গ্রাম্য

অসৌজন্যসম্ভোগের সামগ্রী। আজ তো দেখতে পাই বাংলাদেশের ছোটো বড়ো খ্যাত অখ্যাত গুপ্ত প্রকাশ্য নানা কণ্ঠের তূণ থেকে শব্দভেদী রক্তপিপাসু বাণে আকাশ ছেয়ে ফেলল। এই অদ্ভুত আত্মশ্লাঘবকারী মহোৎসাহে বাঙালি আপন সাহিত্যকে খান খান করে ফেলতে পারত, পরস্পরকে তারস্বরে দুয়ো দিতে দিতে সাহিত্যের মহাশ্মশানে ভূতের কীর্তন করতে তার দেরি লাগত না— কিন্তু সাহিত্য যেহেতু কো-অপারেটিভ বাণিজ্য নয়, জয়েণ্ট্‌স্টক্ কোম্পানি নয়, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন নয়, যেহেতু সে নির্জনচর একলা মানুষের, সেইজন্যে সকল প্রকার আঘাত এড়িয়ে ও বেঁচে গেছে। এই একটা জিনিস ঈর্ষাপরায়ণ বাঙালি সৃষ্টি করতে পেরেছে, কারণ সেটা বহুজনে মিলে করতে হয় নি। এই সাহিত্যরচনায় বাঙালি নিজের একমাত্র কীর্তিকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছে ব'লেই এই নিয়ে তার এত আনন্দ। আপন সৃষ্টির মধ্যে বৃহৎ ঐক্যক্ষেত্রে বাঙালি আজ এসেছে গৌরব করবার জন্যে। বিচ্ছিন্ন যারা তারা মিলিত হয়েছে, দূর যারা তারা পরস্পরের নৈকট্যে স্বদেশের নৈকট্য অনুভব করছে। মহৎসাহিত্যপ্রবাহিনীতে বাঙালিচিত্তের পঙ্কিলতাও মিশ্রিত হচ্ছে ব'লে দুঃখ ও লজ্জার কারণ সত্ত্বেও ভাবনার কারণ অধিক নাই। কারণ, সর্বত্রই ভদ্রসাহিত্য স্বভাবতই সকল দেশের সকল কালের, যা-কিছু স্থায়িত্বধর্মী তাই আপনিই বাছাই হয়ে তার মধ্যে থেকে যায়; আর-সমস্তই ক্ষণজীবী, তারা গ্লানি-জনক উৎপাত করতে পারে কিন্তু নিত্যকালের বাসা বাঁধবার অধিকার তাদের নেই। গঙ্গার পুণ্যধারায় রোগের বীজও ভেসে আসে বিস্তর; কিন্তু স্রোতের মধ্যে তার প্রাধান্য দেখতে পাই নে, আপনি তার শোধন এবং বিলোপ হতে থাকে। কারণ মহানদী তো মহানর্দমা নয়। বাঙালির যা-কিছু শ্রেষ্ঠ, শাশ্বত, যা সর্বমানবের বেদীমূলে উৎসর্গ করবার উপযুক্ত, তাই আমাদের বর্তমানকাল রেখে দিয়ে যাবে ভাবীকালের উত্তরাধিকার রূপে। সাহিত্যের মধ্যে বাঙালির যে-পরিচয় সৃষ্ট হচ্ছে বিশ্বসভায় আপন আত্মসম্মান সে রাখবে, কলুষের আবর্জনা সে বর্জন করবে, বিশ্ব-দেবতার কাছে বাংলাদেশের অর্ঘ্যরূপেই সে আপন সমাদর লাভ করবে। বাঙালি সেই মহৎ প্রত্যাশাকে আজ আপন নাড়ীর মধ্যে অনুভব করছে বলেই বৎসরে বৎসরে নানা স্থানে সম্মিলনী-আকারে পুনঃ পুনঃ বঙ্গভারতীর জয়ধ্বনি ঘোষণা করতে সে প্রবৃত্ত। তার আশা সার্থক হোক, কালে কালে আসুক বাণীতীর্থপথযাত্রীরা, বাংলাদেশের হৃদয়ে বহন করে আনুক উদারতর মনুষ্যত্বের আকাঙ্ক্ষা, অন্তরে বাহিরে সকলপ্রকার বন্ধনমোচনের সাধনমন্ত্র।

১৩৪১

গ্রন্থপরিচয়

[রচনাবলীর ত্রয়োবিংশ খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশের তারিখ ও রচনা-সংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য বর্তমান গ্রন্থপরিচয়ে পাওয়া যাইবে। কোনো কোনো রচনার পাণ্ডুলিপিতে, সাময়িক পত্রে, এবং প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশ-কালে, এক রূপ পাঠ দেখা যায় না। প্রয়োজনবোধে, সেরূপ পাঠভেদ-সম্পর্কিত কিছু কিছু তথ্য এখানে সংকলিত হইল। কোনো কোনো রচনায় প্রসঙ্গ ধরিয়া কবির যে-সব প্রণিধেয় উক্তি পাওয়া যায় তাহাও সংগৃহীত হইয়াছে। অধিকতর পূর্ণাঙ্গ তথ্যসংকলন রচনাবলীর সর্বশেষ খণ্ডে পঞ্জী আকারে মুদ্রিত হইবে।]

প্রহাসিনী

'প্রহাসিনী' ১৩৪৫ সালের পৌষ মাসে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলী সংস্করণে গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের 'খাপছাড়া' অংশ বাদ দেওয়া হইল। উক্ত কবিতা তিনটি রবীন্দ্র-রচনাবলীর একবিংশ খণ্ডে 'খাপছাড়া' গ্রন্থের সংযোজনাংশে (৫৭-৫৮ পৃষ্ঠায় ১, ২, ৩ সংখ্যক কবিতা দ্রষ্টব্য) ইতিপূর্বেই মুদ্রিত হইয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই প্রথমে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে প্রকাশসূচী প্রদত্ত হইল—

আধুনিকা	প্রবাসী	১৩৪১ চৈত্র
নারীপ্রগতি	বিচিত্রা	১৩৪১ মাঘ
রঙ্গ	বঙ্গলক্ষ্মী	১৩৪২ কার্তিক
পরিণয়মঙ্গল	বিচিত্রা	১৩৪২ জ্যৈষ্ঠ
ভাইদ্বিতীয়া	প্রবাসী	১৩৪৩ পৌষ
ভোজনবীর	পরিচয়	১৩৩৯ বৈশাখ
গরঠিকানি	প্রবাসী	১৩৪৫ আশ্বিন
অনাদৃতা লেখনী	বিচিত্রা	১৩৪৪ বৈশাখ
পলাতকা	বিচিত্রা	১৩৪১ চৈত্র
গৌড়ী রীতি	পরিচয়	১৩৩৯ বৈশাখ

১৩৪১ সালের মাঘের 'বিচিত্রা'য় 'নারীপ্রগতি' কবিতাটি বাহির হইলে 'অপরাজিতা দেবী' রবীন্দ্রনাথকে অনুরূপ ছন্দে একটি উত্তর লিখিয়া পাঠান। 'আধুনিকা'

কবিতাটি তাহারই প্রত্যুত্তরে রচিত। অপরাজিতা দেবীর উত্তর 'সে-কালিনী ও আধুনিকা' এবং রবীন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তর ১৩৪১ সালে চৈত্রের 'প্রবাসী'তে (পৃ ৮২৯-৩৪) একত্র প্রকাশিত হইয়াছিল।

'রঙ্গ' কবিতাটি যে পুরাতন ছড়ার অনুকরণে লিখিত রবীন্দ্রনাথ তাহা 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্গত 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রসঙ্গে উদ্ধার করিয়াছেন। উক্ত ছড়াটি নিম্নে আগাগোড়া মুদ্রিত হইল—

জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার কালো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ।
কাক কালো, কোকিল কালো, কালো ফিঙের বেশ।
তাহার অধিক কালো, কন্যে, তোমার মাথার কেশ।

জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার ধলো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ।
বক ধলো, বস্ত্র ধলো, ধলো রাজহংস।
তাহার অধিক ধলো, কন্যে, তোমার হাতের শঙ্খ।

জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার রাঙা দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ।
জবা রাঙা, করবী রাঙা, রাঙা কুসুমফুল।
তাহার অধিক রাঙা, কন্যে, তোমার মাথার সিঁদুর।

জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো রঙ্গ।
চার তিতো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ।
নিম তিতো, নিসুন্দে তিতো, তিতো মাকাল ফল।
তাহার অধিক তিতো, কন্যে, বোন-সতিনের ঘর।

জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার হিম দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ।
হিম জল, হিম স্থল, হিম শীতলপাটি।
তাহার অধিক হিম, কন্যে, তোমার বুকের ছাতি।

উদ্ধৃত ছড়াটি সম্বন্ধে কৌতুকজনক বিস্তৃত আলোচনাও উক্ত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ করিয়াছেন। রবীন্দ্র-রচনাবলীর ষষ্ঠ খণ্ডে পৃ ৫৯৫-৯৬ দ্রষ্টব্য।

'পরিণয়মঙ্গল' কবিতাটি সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী জয়শ্রী দেবী ও শ্রীকুলপ্রসাদ সেনগুপ্তের বিবাহ ('জয়া-মটক্ক-শুভসম্মিলন') উপলক্ষ্যে রচিত হয়।

বরাহনগরের শ্রীমতী পারুল দেবী রবীন্দ্রনাথকে নাতনিরূপে কয়েকবার ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ফোঁটা ও শ্রদ্ধার্ঘ্য পাঠাইয়াছিলেন।[১] 'ভাইদ্বিতীয়া' কবিতাটি ১৩৪৩ সালের (ইং ১৯৩৬) ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় আশীর্বাদস্বরূপ শ্রীমতী পারুল দেবীকে প্রেরিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি ১৯৩৭ সালের ১৪ জানুয়ারি তারিখে শান্তিনিকেতন হইতে তাঁহাকে যে পত্র লেখেন তাহার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি আলোচ্য কবিতা-প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য—

বাংলাদেশের সমস্ত দিদি-জাতীয়ার স্তবগানকে তোমার বন্দনাগানের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছি। এটা তোমার পছন্দ হয় নি। তবু বরানাগরিকাই অগ্রগণ্যা হয়ে রইল, এটা তুমি উপলব্ধি করলে না কেন। দেবীর কোপ দূর হোক, প্রসন্ন হয়ে তিনি বরদান-স্বরূপে বড়ি দান করুন, এই আমার প্রত্যাশা।

—দেশ, ৯ মাঘ ১৩৪৯, পৃ ৩৬১

শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর দৌত্যে রবীন্দ্রনাথ 'অপরাজিতা দেবী'র ১৬ জুন ১৯৩৮ তারিখের একটি কবিতায়-লেখা নাতিদীর্ঘ পত্র পান। পত্রটির শেষাংশে লেখিকা জানাইয়াছিলেন—

রবিরাগ জানি, কবি, বাদলেও ফিকা না—
তাই চাই উত্তর। (না জানিয়ে ঠিকানা)।

'অপরাজিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' স্বাক্ষরে 'গরঠিকানি' কবিতাটি উক্ত পত্রের জবাবে লিখিয়া নিম্নোদ্‌ধৃত 'পত্রদূতী' কবিতা-সহ রবীন্দ্রনাথ উহা শ্রীমতী রাধারাণী দেবীকে পাঠান। ১৩৪৫ সালের আশ্বিনের 'প্রবাসী'তে (পৃ ৭৬০-৬৫) অপরাজিতা দেবীর 'নাৎনির পত্র' এবং রবীন্দ্রনাথের 'পত্রদূতী' ও 'গর্-ঠিকানী' একত্র প্রকাশিত হয়।—

পত্রদূতী

শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর প্রতি

গর-ঠিকানিয়া বন্ধু তোমার ছন্দে লিখেছে পত্র,
ছন্দেই তার ইনিয়ে-বিনিয়ে জবাব লিখেছি অত্র।
যন্ত্রের যুগে মেঘদূত তার পদ করিয়াছে নষ্ট,
তাই মাঝে প'ড়ে খামাখা অকাজে তোমারে দিলেম কষ্ট।

১ এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি পত্র ('রবীন্দ্রনাথের চিঠি', দেশ: ২৪ পৌষ, ২ মাঘ ও ৯ মাঘ ১৩৪৯) দ্রষ্টব্য।

আজি আষাঢ়ের মেঘলা আকাশে মন যেন উড়ো পক্ষী,
বাদলা-হাওয়ায় কোথা উড়ে যায় অজানা কাদেরে লক্ষি।
ঠিকানা তাদের রঙিন মেঘেতে লিখে দেয় দূর শূন্য,
খামে-ভরা চিঠি না যদি পাঠাই হয় না তাহারা ক্ষুণ্ণ।
তাহাদের চিঠি আন্‌মনাদের আসে জানালার পার্শ্বে,
যে পড়িতে জানে সেই বোঝে মানে— চিঠিখানি সবাকার সে।
উত্তর তার কখনো কখনো গেয়েছি আমারি ছন্দে,
গুঞ্জন তারি ছড়িয়ে গিয়েছে সিক্ত মাটির গন্ধে।
অচিন মিতার সাথে কারবার সে তো কবিদেরই জন্য,
সে অধরা দেয় সংগীতে ধরা, কিন্তু তারা যে অন্য।
জানা-অজানার মাঝখানটাতে নাৎনি করেছে সন্ধি,
কবির সাধ্য নাই তারে করে পোস্টাফিসের বন্দী।
মর্তের দেহে মেনে যে নিয়েছে বাঁধন পাঞ্চভৌত্যে,
তুমি ছাড়া কারে লাগাব তাহার চার পয়সার দৌত্যে?
জানি এ সুযোগে চাও কিছু কিছু হাল খবরের অংশ,
হায় রে আয়ুতে খবরের কোঠা প্রায় হয়ে এল ধ্বংস।
সেদিন ছিলাম সাতাশ-আটাশ, আশি আজি সমাসন্ন,
আমার জীবনে এই সংবাদ সবার অগ্রগণ্য।

গৌরীপুর ভবন, কালিম্পঙ

৫ আষাঢ় ১৩৪৫

পাণ্ডুলিপিতে কবিতাটির নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি বর্জিত ছত্র পাওয়া যায়—

রবীন্দ্র-রচনাবলীর ২৪ পৃষ্ঠায় 'হিস্‌টিরিয়ার পাওয়া' ছত্রটির পর

তলোয়ার থাকে সংক্ষেপে তার খাপে,
গদার গুরুতা শুধু তার মোটা মাপে।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর ২৪ পৃষ্ঠায় 'ছাপিয়ে যে ওর দাম' ছত্রটির পর

'রবি' নাম যদি বলি নাম নহে ওটা,
ললাটের 'পরে জয়তিলকের ফোঁটা,
তা হলে শোনাবে অহংকার সে কত,
'অপরাজিতা'ও নহে কি তাহারি মতো।

ঝগড়া বাধিয়ে এইখানে লিখি ইতি,
সন্দেহ করি, ভালো নহে এই রীতি—
শান্তিভঙ্গ করে দেবে এই ভাষা,
পুরো শান্তির চেয়ে তারি 'পরে আশা।

'অনাদৃতা লেখনী' কবিতার পঞ্চম হইতে দশম ছত্র পর্যন্ত অংশ ১৪ মাঘ ১৩৪৩ তারিখে স্বতন্ত্র আকারে প্রথম রচিত হয়। কবিতাটির 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত (বৈশাখ ১৩৪৪) প্রাক্তন পাঠে উক্ত ছয়টি ছত্র পাওয়া যায় না।

'পলাতকা' কবিতাটি শ্রীমতী নন্দিতা দেবীর উদ্দেশে রচিত। পাণ্ডুলিপিতে পত্রের আকারে উহার আরম্ভে সম্বোধন 'বুড়ী', এবং পত্রশেষের স্বাক্ষর 'দাদামশায়'। কবিতাটির 'পুনশ্চ' অংশ 'দাদামশায়ের চিঠি' নামে ১৯৩৬ নভেম্বরের 'শ্রীহর্ষ' পত্রেও প্রকাশিত হইয়াছিল।

'কাপুরুষ' কবিতাটি, পাণ্ডুলিপি অনুসারে, শান্তিনিকেতন হইতে শ্রীমতী রানী মহলানবীশকে 'কবিসম্রাট' স্বাক্ষরে লেখা হইয়াছিল।

'গৌড়ীরীতি' কবিতাটি ১৩৩৯ সালে 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হইবার পূর্বে নিম্নোদ্ধৃত সংক্ষিপ্ত আকারে ১৩৩৬ চৈত্রের 'বিচিত্রা'য় (পৃ ৪৫৪) বিনা স্বাক্ষরে বাহির হয়—

নাহি চাহিতেই ঘোড়া দেয় যেই ফুঁকে দেয় তার থলে,
লোকে তার 'পরে মহা রাগ করে হাতি দেয় নাই ব'লে।
বহু সাধনায় বিড়াল যে পায় ফুকারে সে "ওহো ওহো",
বলে আঁখি মেজে, "যথেষ্ট এ যে, পরম অনুগ্রহ।"

বিপুল ভোজনে মণের ওজনে ছটাক যদি বা কমে,
সেই ছটাকের চাটিতে ঢাকের গালাগালি-বোল জমে।
সমুখে আসিয়া পকেট ঠাসিয়া স্তবের লম্বা দৌড়,
পিছনে গোপন নিন্দা-রোপণ— ধন্য ধন্য গৌড়।

কবিতাটির আরম্ভের দুই স্তবক বস্তুতঃ আরও কয়েক বৎসর পূর্বের রচনা। ১৯২৬ সালে য়ুরোপ-প্রবাস-কালে বেলগ্রেড হইতে রবীন্দ্রনাথ শ্রীদিলীপকুমার রায়কে যে-পত্র লেখেন, ১৩৩৮ সালের রবীন্দ্রজয়ন্তী-সংখ্যা 'বাতায়ন' হইতে তাহা এই প্রসঙ্গে মুদ্রিত হইল—

বেলগ্রেড,
৭ই নভেম্বর ১৯২৫[১]

কল্যাণীয়বরেষু

মণ্টু, তোমার চিঠিখানা পড়ে, খুব খুশি হলুম। সাধারণ তো আমাকে অহংকৃত এবং হৃদ্যতাবিহীন বলেই মনে করে। সেই জন্যেই জনসমাজে আমি যত প্রশংসা পেয়েছি তত প্রীতি পাই নি। আর সেই জন্যেই লোকে আমার ন্যায্য প্রাপ্য থেকেও যতটা পারে দাম কমাতে চেষ্টা করে। এর ঠিক কারণটা কী আমি তো ভালো বুঝতেই পারি নে। আমি যদি স্বভাবতই কঠিনহৃদয় ও স্নেহসম্পদে কৃপণ হতুম তা হলে কবি হতেই পারতুম না। অন্তরে যার রসের অভাব সে কখনোই রসসাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু, যখন অনেক লোকের একই ধারণা হচ্ছে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তখন বলতেই হবে যে, আমার মধ্যে একটা কিছু অভাব আছে যাতে করে আমার দেশের লোক আমার হৃদয় স্পষ্ট দেখতে পায় না। সম্ভবত আমাদের দেশে হৃদয়াবেগ-প্রকাশের যে বিশেষ রীতি ও ভঙ্গী সাধারণে প্রচলিত আমার তা অভ্যাস নেই। তার দুটো কারণ আছে। প্রথমত আমাদের পরিবার একঘরে, সমাজের সঙ্গে আমাদের অন্তরঙ্গতা ঘটতেই পারে নি। দ্বিতীয়ত ছেলেবেলা থেকে আমি আমাদের পরিবারের কোণে কোণে অত্যন্ত লাজুক ও মুখচোরা ভাবেই কাটিয়েছি। আমাদের আত্মীয়বন্ধুর পরিধি অত্যন্ত সংকীর্ণ, তা ছাড়া আমাদের বাড়ির রীতি পদ্ধতি ব্যবহারে একটা স্বভাবসিদ্ধ বিশেষত্ব দাঁড়িয়ে গেছে কেননা আমরা সমাজের বহির্বর্তী। এইজন্যে আমাদের দেশে আত্মীয়তা-প্রকাশের যে-সব গলাগলি কোলাকুলি ধরন আছে তাতে আমার হাত পাকে নি। এই-সব কারণে দেশে জনসাধারণ যদি আমাকে ভুল বোঝে সে আমার ভাগ্যের দোষ। কিন্তু, একটা কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া ভালো। বঙ্কিম একদিন সাহিত্যে অগ্রণী ছিলেন। কিন্তু, আমি তো জানি তাঁর কাছে ঘেঁষতে কেউ সাহস করত না— আমরা কেউ কেউ তাঁর কাছ থেকে কিছু প্রশ্রয় পেয়েছিলুম, কিন্তু তাঁর গা-ঘেঁষা হবার জো ছিল না। কিন্তু, আমার ঘরে চড়াও হয়ে উপদ্রব করতে না পারে এমন অপোগণ্ড বা নগণ্য ব্যক্তি তো বাংলাদেশে কেউ নেই। অথচ বঙ্কিমকে কেউ উদ্ধত বা কঠিনহৃদয় বলে নি। কেননা যাঁর কাছে কেউ সহজে কিছুই পায় না তাঁর অনুগ্রহের কণা পেলেও লোকে কৃতার্থ হয়। কিন্তু, যার কাছে কোনো বাধা নেই তার কাছেই দাবির ষোলো আনা পূরণ করতে না পারলে আট আনারও রসিদ পাওয়া যায় না।

১ তারিখ সম্ভবতঃ— ১৭ নভেম্বর ১৯২৬

নাহি চাহিতেই ঘোড়া দেয় যেই ফুঁকে দেয় ঝুলি থলি,
লোকে তার 'পরে ভারি রাগ করে হাতি দেয় নাই বলি।
বহু সাধনায় যার কাছে পায় কালো বেড়ালের ছানা
লোকে তারে বলে নয়নের জলে, 'দাতা বটে ষোলো আনা!'

—বাতায়ন, ১৩৩৮ রবীন্দ্রজয়ন্তী

'অটোগ্রাফ' কবিতাটি শ্রীমান অভিজিৎ চন্দের প্রতি 'দাদু' রবীন্দ্রনাথের স্নেহোপহার।

সংযোজন

'প্রহাসিনী'র রচনাবলী-সংস্করণে 'সংযোজন' অংশে বিভিন্ন সাময়িকপত্র হইতে সংকলন করিয়া কতকগুলি নূতন কবিতা যোগ করা হইল। রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি হইতেও দুইটি কবিতা গ্রহণ করা হইয়াছে। সাময়িক পত্রে প্রকাশিত কবিতাগুলির প্রকাশকাল নিম্নে প্রদত্ত হইল—

নাসিক হইতে খুড়ার পত্র	ভারতী	১২৯৩ ভাদ্র-আশ্বিন
পত্র	ভারতী	১৩১২ জ্যৈষ্ঠ
সুসীম চা-চক্র	শান্তিনিকেতন	১৩৩১ শ্রাবণ
চাতক	বিশ্বভারতী পত্রিকা	১৩৫০ কার্তিক-পৌষ
নাতবউ	বিচিত্রা	১৩৩৮ অগ্রহায়ণ
মিষ্টান্বিতা	পরিচয়	১৩৪২ শ্রাবণ
নামকরণ	প্রবাসী	১৩৪৬ পৌষ
ধ্যানভঙ্গ	বঙ্গলক্ষ্মী	১৩৪৬ ভাদ্র
রেলেটিভিটি	অলকা	১৩৪৬ ভাদ্র
নারীর কর্তব্য	অলকা	১৩৪৬ অগ্রহায়ণ
মধুসন্ধায়ী	প্রবাসী	১৩৪৭ বৈশাখ
মাছিতত্ত্ব	শনিবারের চিঠি	১৩৪৬ চৈত্র
কালান্তর	যুগান্তর	১৩৪৭ শারদীয়া সংখ্যা
তুমি	নিরুক্ত	১৩৪৭ আশ্বিন
মিলের কাব্য	কবিতা	১৩৪৭ চৈত্র
মশকমঙ্গল গীতিকা	বঙ্গলক্ষ্মী	১৩৪৭ অগ্রহায়ণ

'নিমন্ত্রণ' (পৃ ৪৭) ও 'লিখি কিছু সাধ্য কী' (পৃ ৬৮) কবিতা দুইটি পাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে 'নিমন্ত্রণ' কবিতাটি 'বাঁশরী' নাটকে (১৩৪০ অগ্রহায়ণ) ব্যবহার করা হইয়াছে।

'পত্র' কবিতাটি প্রথমসংস্করণ 'পূরবী'র 'সঞ্চিতা' অংশে ১৩৩২ সালে প্রথম সংকলিত হইয়াছিল। (পরবর্তী সংস্করণে 'সঞ্চিতা' অংশ 'পূরবী' হইতে সম্পূর্ণ বর্জিত হইয়াছে।) রচনাস্থান-নির্দেশক 'বনক্ষেত্র' শব্দটি Woodfield-এর কবিকৃত বঙ্গানুবাদ।

'সুসীম চা-চক্র' কবিতাটির সম্পর্কে অধুনালুপ্ত 'শান্তিনিকেতন পত্রিকা' হইতে (১৩৩১ শ্রাবণ) 'সুসীম চা-চক্র প্রবর্তনা'র বর্ণনাটুকু উদ্‌ধৃত হইল—

পূজনীয় গুরুদেব চীন হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া একটি চা-বৈঠকের প্রবর্তনা করিয়াছেন— ইহার নাম সুসীম চা-চক্র। সু-সুমো নামে বিশ্বভারতীর একজন বিশিষ্ট চীনীয় বন্ধু আশ্রমে একটি চা বৈঠক স্থাপনের জন্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তাঁহারই নাম অনুসারে ইহার নামকরণ করা হইয়াছে।

পূজনীয় গুরুদেব প্রথমে এই চক্রের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। প্রথমত, ইহা আশ্রমের কর্মী ও অধ্যাপকগণের অবসরসময়ে একটি মিলনের ক্ষেত্রের মতো হইবে— যেখানে সকলে একত্র হইয়া আলাপ-আলোচনায় পরস্পরের যোগসূত্র দৃঢ় করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয়ত, চীনদেশে চা-পান একটি আর্টের মধ্যে গণ্য। সেখানে ইহা আমাদের দেশের মতো যেমন-তেমন ভাবে সম্পন্ন হয় না। তিনি আশা করেন, চীনের এই দৃষ্টান্ত আমাদের ব্যবহারের মধ্যে একটি সৌষ্ঠব ও সুসংগতি দান করিবে।

বর্ষাঋতুর জন্য শ্রীযুত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় চা-চক্রের চক্রবর্তী পদে অভিষিক্ত হইলেন। তৎপরে গুরুদেবের নবরচিত একটি গান হয়। ইহার পরে সমাগত নিমন্ত্রিতগণ চীন হইতে আনীত খাদ্য আনন্দের সহিত ভোজন করেন।

'সুসীম চা-চক্র' উল্লিখিত সেই 'নবরচিত গান'— সুরে গেয়, অথচ সংস্কৃতের ন্যায় স্বরবর্ণের লঘু গুরু উচ্চারণ-সহ কবিতারূপেও পাঠের যোগ্য।

'চাতক' কবিতা প্রসঙ্গে, 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় কবিতাটির পরিচয়স্বরূপ মুদ্রিত শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য মহাশয়ের বক্তব্যটুকু প্রণিধানযোগ্য—

এ কবিতাটি গুরুদেব যে প্রসঙ্গে লেখেন তাহা আমার মনে আছে। অধ্যাপকেরা বিদ্যাভবনের বারাণ্ডায় চা পান করিতেন। গুরুদেব মধ্যে মধ্যে সেখানে আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে গল্প করিতেন, এবং বলাই বাহুল্য তাহাতে আনন্দের মাত্রা বাড়িয়া উঠিত। আমি বিদ্যাভবনে আমার কাজ নিয়া থাকিতাম, অত কাছে থাকিলেও আমি খুব কমই ঐ 'চা-চক্রে' বসিতাম, চা পান তো করিতামই না। একদিন অধ্যাপকেরা 'চা-চক্রে'র জন্য আমার নিকট হইতে ১৻ আদায় করেন। ইহাতে আমার ঐ বন্ধু

'চা-চাতক'গণ (এ নাম গুরুদেবেরই দেওয়া) 'চা-চক্রে'র এক বিশেষ ব্যবস্থা করেন। আর, গুরুদেব সেদিন 'চক্রেশ্বর' হইয়া এই আলোচ্য কবিতাটি পাঠ করেন।

—বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩১০ কার্তিক-পৌষ, পৃ ১৩৮

'মিষ্টান্বিতা' কবিতাটি শ্রীমতী পারুল দেবীকে পত্রাকারে লিখিত হয়। কবিতার শেষ স্তবকটুকু রহস্যচ্ছলে প্রথমবারে প্রেরিত হয় নাই। ১৯৩৫ সালের ৫ জুন তারিখে নিম্নোদ্ধৃত ভূমিকার পর উক্ত অংশ প্রেরিত হয়—

আমি আশা করেই ছিলুম যে তুমি আমার উপর খুব রাগ করবে, কেননা রাগটা সকল ক্ষেত্রে মন্দ জিনিস নয়— না রাগ করা ঔদাসীন্যের লক্ষণ। তোমাকে রাগাব বলেই কবিতাটির শেষ দুটো শ্লোক তোমাকে পাঠাই নি— উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, অতএব এখন পাঠাই। কবিতার প্রথম অংশের সঙ্গে জুড়ে নিয়ে পাঠ কোরো।

—বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৪৯ পৌষ, পৃ ৩৭৫

'নামকরণ' কবিতার দ্বিতীয় স্তবক 'গল্পসল্প' গ্রন্থের 'চণ্ডী' গল্পে ব্যবহৃত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের 'চন্দনী' গল্পের শেষে যে কবিতা আছে তাহা এই কবিতার শেষ স্তবকটির কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত নূতনরূপ।

'নারীর কর্তব্য' কবিতাটি 'আন্নাকালী পাকড়াশী'র ছদ্ম-স্বাক্ষরে 'অলকা' পত্রিকায় বাহির হয়। এই উপলক্ষ্যে অন্য বহু ছদ্মনামও ভাবা হইয়াছিল। এই কবিতা সম্পর্কে কিছু তথ্য 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' (বৈশাখ ১৩৬৪) গ্রন্থের ২১০-১১ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।

'মধুসন্ধায়ী' কবিতা কয়টি 'মংপু-নিবাসিনী শ্রীমৈত্রেয়ী দেবীকে লিখিত'। আলোচ্য কবিতাধারার পরিশেষ-স্বরূপ নিম্নমুদ্রিত কবিতাটি শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী কর্তৃক সম্পাদিত 'পঁচিশে বৈশাখ' হইতে সংকলন করা হইল—

বিবিধজাতীয় মধু গেল যদি পাওয়া
তবুও রয়েছে কিছু বাকি দাবি-দাওয়া।
এখন স্বয়ং যদি আসিবারে পার'
তা হলে মাধব ঋণ বেড়ে যাবে আরো।
আহারের কালে মধু রহে বটে পাতে,
কিন্তু কোথা, দান করেছিলে যেই হাতে।
ডাকযোগে সাড়া পাই, থাক দূরদেশী—
মোকাবিলা দেখাশোনা দাম ঢের বেশি।

পঞ্চশিখরের পানে কবি মধু-সখা
উড়েছিল মধুগন্ধে, গন্ধ উপত্যকা
করিবে আশ্রয় আজি স্পষ্টভাষণের
প্রয়োজনে। দুরারোহ তব আসনের
ঠাঁই-বদলের আমি করিতেছি আশা,
সংশয় না থাকে কিছু তাই এই ভাষা।

১১ মার্চ, ১৯৪০

'মিলের কাব্য' নিম্নোদ্ধৃত গদ্য ভূমিকা-সহ 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল—

১৯।১।৪১ তারিখের কথা। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বসে আছি শয়নকক্ষে কেদারায় হেলান দিয়ে। আমি ঠাট্টা করে বলে থাকি, আমার জীবনের প্রথম পালা কল্যাণরাগে, তখন সুস্থ শরীরে চলাফেরা চলত; দ্বিতীয় পালা এই কেদারা রাগিণীতে অচল ঠাটে বাঁধা। আকাশ ছিল মেঘলা, ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, বৃষ্টি হচ্ছে টিপ টিপ করে। সুধাকান্ত বসে আছে পাশের চৌকিতে। হঠাৎ আমাকে বকুনি পেয়ে বসল। একটা কথা শুরু করলুম অকারণে, বলে গেলুম:

যখন মনে ভাবি কিছু একটা হল, সুখদুঃখের তীব্রতা নিয়ে এমন করে হল যে কোনো কালে তার ক্ষয় হবে বলে ধারণাই হয় না, ঠিক সেই মুহূর্তেই মহাকাল পিছনে ব'সে ব'সে মুখ ঢেকে তার চিহ্নগুলো মুছতে শুরু করে দিয়েছেন। কিছুকাল পরে দেখি, সাদা হয়ে গেছে; মনে যদি বা স্মৃতি থাকে তবু যে-অনুভূতি তার সত্যতার প্রমাণ আজ লেশমাত্র তার বেদনা নাই। তা হলে যেটা হল শেষ পর্যন্ত সেটা কী। সংস্কৃত শ্লোকে প্রশ্ন আছে, রঘুপতির অযোধ্যাপুরী গেল কোথায়। রঘুপতির অযোধ্যা বহু লোকের বহু কালের নানাবিধ সুস্পষ্ট অনুভূতিতেই প্রতিষ্ঠিত, সেই বিপুল অনুভূতি গেল শূন্য হয়ে। তা হলে যা ছিল সে কী ছিল। মস্ত একটা 'না' প্রকাণ্ড একটা 'হাঁ'য়ের আকার ধরেছিল। নাস্তিত্ব সে অস্তিত্বের জাল গেঁথেই চলেছে, আবার সে জাল গুটিয়ে নিচ্ছে নিজের মধ্যে। এই দুর্বোধ রহস্যকে বাস্তব বলব কেমন করে। এই যে ইন্দ্রজাল এর মধ্যে দুইয়ের মিল চলেইছে, তাই একে মিত্রাক্ষর কাব্য বলতে হবে— একের উপাদানে সৃষ্টি হয়ই না। সৃষ্টি জোড়-মিলনের কাব্য।

গল্পের ধারা শেষকালে মুখে মুখে ছড়ার ছন্দে লাইনে লাইনে গাঁট বেঁধে চলল। অসুস্থ শরীরে ও আমার একটা অপ্রকৃতিস্থতার লক্ষণ হয়ে উঠেছে। সুধাকান্ত এরই

ফলের প্রত্যাশায় বসে থাকেন। আজ বাদলসন্ধ্যায় হাজরে দেওয়া তিনি কাজে লাগিয়েছেন তার প্রমাণ দিই…

—কবিতা, ১৩৪৭, চৈত্র, পৃ ১

আকাশপ্রদীপ

'আকাশপ্রদীপ' ১৩৪৬ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রে মুদ্রণপ্রমাদের ফলে প্রকাশকাল '১৩৪৫' ছাপা হইয়াছিল। রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি প্রভৃতির সাহায্যে কয়েকটি কবিতায় রচনার কাল ও স্থান সংযোজিত, এবং প্রয়োজনবোধে সংশোধিত হইয়াছে ; 'বেজি' কবিতা দ্রষ্টব্য।

১৩৪৭ সালের গ্রীষ্মে আলমোড়ায় অবস্থানকালে রচিত 'যাত্রাপথ' কবিতাটি বাদে 'আকাশপ্রদীপ'এর অন্যান্য প্রায় সমস্ত কবিতা ১৩৪৫ সালের আশ্বিন হইতে চৈত্র পর্যন্ত সাত মাস কালের মধ্যে শান্তিনিকেতনে রচিত। অধিকাংশ কবিতাই সাময়িক পত্রে প্রথম প্রচারিত না হইয়া একেবারে গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়। চারটিমাত্র কবিতার পত্রিকায় প্রকাশের সূচী নিম্নে দেওয়া হইল—

জানা-অজানা	প্রবাসী	১৩৪৫ কার্তিক
পাখির ভোজ	প্রবাসী	১৩৪৫ ফাল্গুন
সময়হারা	প্রবাসী	১৩৪৫ মাঘ
'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে'	প্রবাসী	১৩৪৬ বৈশাখ

'যাত্রাপথ', 'স্কুল-পালানে', 'ধ্বনি', 'বধূ', 'জল', 'শ্যামা', 'কাঁচা আম'— এই কয়টি কবিতা প্রসঙ্গে 'জীবনস্মৃতি'র আরম্ভের কয়েক পরিচ্ছেদ (রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড দ্রষ্টব্য) ও 'ছেলেবেলা' গ্রন্থটির কোনো কোনো অংশ বিশেষভাবে তুলনীয়।

'বধূ' কবিতার প্রথম ছত্রটির পূর্ববর্তী কোনো-এক পাঠে পাণ্ডুলিপিতে 'ঠাকুরমা' স্থলে 'মুখুজ্জে' পাওয়া যায়। 'জীবনস্মৃতি'তে উল্লিখিত খাজাঞ্চি কৈলাস মুখুজ্যের ছড়া বলার বিবরণটুকু এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য—

সেই কৈলাস মুখুজ্যে আমার শিশুকালে অতি দ্রুত বেগে মস্ত একটা ছড়ার মতো বলিয়া আমার মনোরঞ্জন করিত। সেই ছড়াটার প্রধান নায়ক ছিলাম আমি এবং তাহার মধ্যে একটি ভাবী নায়িকার নিঃসংশয় সমাগমের আশা অতিশয় উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত ছিল। এই-যে ভুবনমোহিনী বধূটি ভবিতব্যতার কোল আলো করিয়া বিরাজ করিতেছিল, ছড়া শুনিতে শুনিতে তাহার চিত্রটিতে মন ভাবি উৎসুক হইয়া উঠিত।

আপাদমস্তক তাহার যে বহুমূল্য অলংকারের তালিকা পাওয়া গিয়াছিল এবং মিলনোৎসবের যে অভূতপূর্ব সমারোহের বর্ণনা শুনা যাইত, তাহাতে অনেক প্রবীণবয়স্ক সুবিবেচক ব্যক্তির মন চঞ্চল হইতে পারিত— কিন্তু বালকের মন যে মাতিয়া উঠিত এবং চোখের সামনে নানা বর্ণে বিচিত্র আশ্চর্য সুখচ্ছবি দেখিতে পাইত তাহার মূল কারণ ছিল সেই দ্রুত-উচ্চারিত অনর্গল শব্দচ্ছটা এবং ছন্দের দোলা।

—জীবনস্মৃতি, শিক্ষারম্ভ অধ্যায়

'শ্যামা' ও 'কাঁচা আম' কবিতা দুইটি তথ্যের বিচারে জুড়ি কবিতা। এই প্রসঙ্গে 'জীবনস্মৃতি'তে বধূসমাগমের সংক্ষিপ্ত বিবরণটুকু তুলনীয়—

তাহার পরে গলায় সোনার হারটি পরিয়া বাড়িতে যখন নববধূ আসিলেন তখন অন্তঃপুরের রহস্য আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল। যিনি বাহির হইতে আসিয়াছেন অথচ যিনি ঘরের, যাঁহাকে কিছুই জানি না অথচ যিনি আপনার, তাঁহার সঙ্গে ভাব করিয়া লইতে ভারি ইচ্ছা করিত।

—জীবনস্মৃতি, প্রত্যাবর্তন অধ্যায়

পাণ্ডুলিপিতে 'শ্যামা' কবিতার ষষ্ঠ ও সপ্তম পঙ্‌ক্তির নিম্নরূপ আদিপাঠ পাওয়া যায়—

তেরো-চোদ্দ বছরের মেয়ে,
বারো ছিল বয়স আমার।

'জানা-অজানা' কবিতার 'প্রবাসী'তে-প্রকাশিত পাঠে সর্বশেষে দুইটি অতিরিক্ত ছত্র মুদ্রিত হইয়াছিল—

তাহাতে আভাসে থাকে চরমের কথা,
অস্তগিরিশিখরের নক্ষত্রের রহস্যবারতা।

'যাত্রা' কবিতাটিতে যে স্মৃতিচিত্র বর্ণিত হইয়াছে সেই প্রসঙ্গে 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড বা ভ্রমণের ডায়ারির (বিচিত্র প্রবন্ধ: য়ুরোপ-যাত্রী) 'শুক্রবার। ২২শে আগস্ট ১৮৯০' তারিখের অংশটি রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে ৫৮৭-৮৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

'সময়হারা' কবিতার 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত পাঠের সূচনায় ছিল—

ডাক্তারেতে বলে যখন 'মরেছে এই লোক'
তাহার তরে মিথ্যা করা শোক,

কিন্তু যখন বলে 'জীবন্মৃত'
সেটা শোনায় তিতো।
আমার ঘটল তাই,
নালিশ তবু নাই।

বর্তমান গ্রন্থের ১০৭ পৃষ্ঠার 'কখনো বা হিসাব ভুলে' ইত্যাদি ১৫-১৮ সংখ্যক ছত্র 'প্রবাসী'তে নাই ; অপর পক্ষে ১১০ পৃষ্ঠার প্রথম দুই ছত্রে যে-স্তবকের শেষ তাহার অনুবৃত্তিস্বরূপ পাওয়া যায়—

শোচনীয় এই যে খবরখানা
আছে শুধু এক মহলেই জানা।
বাকি রইল অনেক অবোধ যাদের আশা আছে,
ঘোরে আমার আনাচে-কানাচে।

ইংরেজি ১৯৩৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে শান্তিনিকেতন হইতে শ্রীঅমলকৃষ্ণ গুপ্তকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রের একটি অংশ আলোচ্য কবিতাটির প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য : আমার 'সময়হারা' কবিতাটি কোনো পক্ষর সঙ্গে ঝগড়া করতে লিখি নি, ওটা যে একটা সকৌতুক কবিতা সে কথাটা প্রায় সকলেরই দৃষ্টি এড়িয়েছে।

'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে' কবিতাটি প্রকাশের পর, যে পুরাতন ছড়া অবলম্বনে উহা রচিত তাহার ঢাকা-ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত পাঠ 'প্রবাসী'তে (১৩৪৬ আষাঢ়, পৃ ৩৭৩) সংগ্রহের চেষ্টা হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজে উহার একটি পাঠ বহুকাল পূর্বেই সংগ্রহ করিয়া ১৩০১-০২ সালের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় প্রকাশ করিয়াছিলেন। আলোচ্য কবিতা প্রসঙ্গে কবির সংগৃহীত সেই ছড়া রবীন্দ্র-রচনাবলীর ষষ্ঠ খণ্ড হইতে (পৃ ৬২৭) নিম্নে সংকলিত হইল—

ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে আর বিলে,
সুন্দরীরে বিয়া দিলাম ডাকাতের মেলে।
ডাকাত আলো মা,
পাট কাপড় দিয়ে যেড়ে নিলে
দেখতে দিলে না।
আগে যদি জানতাম
ভুলি ধরে কানতাম।

'কাঁচা আম' কবিতার শেষ স্তবকে যে ঘটনাটির উল্লেখ আছে সেই প্রসঙ্গে শ্রীমৈত্রেয়ী দেবীর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের নিম্নোদ্ধৃত রবীন্দ্র-বাক্যটুকু প্রণিধানযোগ্য—

জানো, একবার মাত্র জীবনে গয়না পেয়েছিলুম, আংটি। নতুন বৌঠান দিয়েছিলেন, গাজিপুরে গঙ্গায় চান করতে গিয়ে জলে পড়ে গেল, খুব দুঃখ হয়েছিল।

—মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, সং ১, পৃ ২০৫

চণ্ডালিকা

'চণ্ডালিকা' নাটিকাটি ১৩৪০ সালের ভাদ্র মাসে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। ভাদ্রের শেষে কলিকাতায় ম্যাডান থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথ উহা আগাগোড়া আবৃত্তি করিয়া শুনাইয়াছিলেন। ইহার আখ্যান-অংশ রাজেন্দ্রলাল মিত্র-কর্তৃক সম্পাদিত The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal (Published by the Asiatic Society of Bengal, 57, Park Street. 1882) গ্রন্থের ২২৩-২৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত বিবরণ হইতে গৃহীত। 'ভূমিকা'য় গল্পটির যে-অংশটুকু রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন তাহা প্রথমার্ধমাত্র। গল্পের শেষার্ধ মূল গ্রন্থ হইতে কৌতূহলী পাঠকদের জন্য নিম্নে মুদ্রিত হইল—

Matters, however, did not progress so satisfactorily as could be wished. The girl, disappointed at night, rose early the next morning, put on her finest apparel, and stood on the road by which Ānanda daily went to the city for alms. Ānanda came, and she followed him to every house he went for alms. This caused a great scandal, and Ānanda, followed by the girl, ran back to the hermitage, and reported the occurence to the Lord. The Lord was then called upon to exercise diplomacy to save the character of his disciple. He said to Prakriti, "You want to marry Ānanda. Have you got the permission of your parents? Go, and get their permission." This afforded but slight respite, for Prakriti soon returned from the city with her parents' permission. The Lord then said, 'Should you wish to marry Ānanda, you must put on the same kind of ochre-coloured vestment which he uses." She agreed, and thereupon her head was shaved, she was made to put on ochre-coloured cloth, divested of her vicious motives, and had all her former sins removed by the mantra called

sarva dúrgati-śodhana-dhárani, the destroyer of all evils. Thus did the Lord convert her into a Bhikshuni.

—The Sanskrit Buddhist Literature, p 224

প্রসঙ্গতঃ ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই বৌদ্ধ উপাখ্যান অবলম্বনেই পরলোকগত কবি সতীশচন্দ্র রায় 'চণ্ডালী' নামে সুদীর্ঘ একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় (১৩১০ মাঘ, পৃ ৪৪৯-৫৪) কবিতাটি প্রকাশিত হইয়াছিল।

'চণ্ডালিকা' প্রকাশের প্রায় চার বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ উহাকে নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করেন। ১৩৪৪ সালের ফাল্গুনে 'চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য' প্রথম প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলীর পরবর্তী পঞ্চবিংশ খণ্ডে 'চণ্ডালিকা'র উক্ত রূপান্তর মুদ্রিত হইয়াছে।

তাসের দেশ

'তাসের দেশ' বাংলা ১৩৪০ সালের ভাদ্র মাসে, চণ্ডালিকার সহিত একই সময়ে, প্রথম বাহির হয়। উক্ত সংস্করণে মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় নাটিকাটির সমসাময়িক অভিনয়-সংবাদটুকুও মুদ্রিত হইয়াছিল—

প্রথম অভিনয়
ম্যাডান থিয়েটার
২৭শে, ২৮শে, ও ৩০শে ভাদ্র
১৩৪০

১৩৪৫ সালের মাঘ মাসে 'তাসের দেশ'এর যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় তাহা বহুল পরিমাণে 'সংশোধিত ও পরিবর্ধিত' সংস্করণ। রবীন্দ্র-রচনাবলীতে নাটিকাটির অধুনাপ্রচলিত উক্ত পরিবর্ধিত পাঠই মুদ্রিত হইল। দ্বিতীয়সংস্করণ 'তাসের দেশ' সুভাষচন্দ্র বসুকে উৎসর্গীকৃত হয়।

প্রথম সংস্করণের 'ভূমিকা' অংশ দ্বিতীয় সংস্করণে পরিবর্ধিত ও পরিশোধিত আকারে 'প্রথম দৃশ্যে' পরিণত হইয়াছে। পত্রলেখা চরিত্র (বর্তমান গ্রন্থের পৃ ১৬৩) নূতন সংযোজিত হইয়াছে। রাজপুত্রের 'আমার মন বলে চাই চাই গো' (পৃ ১৬৩) গানটি প্রথম সংস্করণে 'তোমার মন বলে চাই চাই গো' ইত্যাদি পাঠান্তরে রাজপুত্রের

মায়ের গানরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে, সম্পূর্ণ তৃতীয় দৃশ্যটি এবং নিম্নে নির্দেশিত আটটি গান নূতন যোগ করা হয়—

১। খর বায়ু বয় বেগে
২। গোপন কথাটি রবে না গোপনে
৩। তোলন নামন (তাসের কাওয়াজ)
৪। বলো, সখী, বলো তারি নাম
৫। অজানা সুর কে দিয়ে যায় কানে কানে
৬। কেন নয়ন আপনি ভেসে যায়
৭। গগনে গগনে যায় হাঁকি
৮। বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও

রাজার মুখের ছড়া বা 'শাস্ত্রের ছন্দ'টিও ('শান্ত হেই স্বন', পৃ ১৯০) নূতন। প্রথম সংস্করণে ব্যবহৃত এই চারটি গান দ্বিতীয় সংস্করণে বর্জিত হইয়াছে—

১। হারে রে রে রে রে
২। হে মাধবী, দ্বিধা কেন
৩। হে নিরুপমা
৪। তুমি কোন পথে যে এলে, পথিক

১৭৪ পৃষ্ঠার শেষে মুদ্রিত রাজপুত্রের স্তবগানটি প্রথম সংস্করণে পূর্ণতর আকারে এইরূপ ছিল—

জয় জয় তাসবংশ-অবতংস।
ক্রীড়াসরসীনীরে রাজহংস।
তাম্রকূট-ঘন-ধূম-বিলাসী,
তন্দ্রাতীরনিবাসী—
সব-অবকাশ-ধ্বংস
যমরাজেরই অংশ॥

'তাসের দেশ' রচনাটি, ১২৯৯ আষাঢ়ের 'সাধনা' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত ও 'গল্পগুচ্ছ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'একটা আষাঢ়ে গল্প' অবলম্বনে রচিত। রবীন্দ্র-রচনাবলীর সপ্তদশ খণ্ডের ১৭২-৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

গল্পগুচ্ছ

সংকলিত সকল গল্পই 'সবুজপত্র' মাসিক পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম সাতটি গল্প যথাক্রমে বাংলা ১৩২১ সনের বৈশাখ-কার্তিক সাত মাসে এবং বাকি তিনটি গল্প ১৩২৪ সনের জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় এবং পৌষ মাসে। প্রথম সাতটি গল্প প্রথমতঃ গল্পসপ্তক (১৩২৩) গ্রন্থে সংকলন করা হয় এবং পয়লা নম্বর (১৩২৭) গ্রন্থে সংকলিত হয় 'তপস্বিনী' ও 'পয়লা নম্বর'। 'পাত্র ও পাত্রী'র প্রথম সংকলন বিশ্বভারতীসংস্করণ গল্পগুচ্ছের তৃতীয় খণ্ডে (১৩৩৩) ; উহাতে পূর্বোক্ত নয়টি গল্পও পুনর্মুদ্রিত হয়।

'স্ত্রীর পত্র' প্রকাশিত হইলে উহা বঙ্গসাহিত্যসমাজে বিশেষ আন্দোলনের কারণ হইয়াছিল ; তৎকালীন নারায়ণ প্রভৃতি পত্রে তাহার নিদর্শন আছে।

'শেষের রাত্রি' গল্পটিকে 'গৃহপ্রবেশ' (১৩৩২) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ নাট্যরূপ দান করিয়াছেন। রবীন্দ্র-রচনাবলীর সপ্তদশ খণ্ড দ্রষ্টব্য।

'বোষ্টমী' গল্পের বোষ্টমীর উল্লেখ রবীন্দ্রসাহিত্যে অনেক স্থানেই পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গল্প-উপন্যাস সম্পূর্ণ ই কল্পনাপ্রসূত না বাস্তবে তাহার কিছু মূল আছে, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু কোনো পাঠিকার প্রশ্নোত্তরে লিখিত এই পত্রখণ্ড এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য—

বোষ্টমী অনেকখানিই সত্যি। এই বোষ্টমী স্বয়ং আমার কাছে এসে গল্প বলত। শেষ অংশটায় কিছু বদল করেচি। বোষ্টমী গুরুকে যে ত্যাগ করেছিল সেটা সত্য নয় —সংসার ত্যাগ করেছিল বটে।

—পত্রধারা, প্রবাসী, ১৩৩৯ শ্রাবণ, পৃ ৪৫১

সাহিত্যের পথে

'সাহিত্যের পথে' বাংলা ১৩৪৩ সালের আশ্বিন মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৩৫২ সালের চৈত্র মাসে গ্রন্থটির যে দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে সেই অনুসারে রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান সংস্করণে প্রবন্ধগুলি সাময়িক পত্রে প্রকাশের কালানুক্রমে মুদ্রিত হইল। সাময়িকপত্রে প্রবন্ধগুলির প্রকাশের সূচী নিম্নে প্রদত্ত হইল—

বাস্তব	সবুজ পত্র	১৩২১ শ্রাবণ
কবির কৈফিয়ত	সবুজ পত্র	১৩২২ জ্যৈষ্ঠ
সাহিত্য	বঙ্গবাণী	১৩৩১ বৈশাখ
তথ্য ও সত্য	বঙ্গবাণী	১৩৩১ ভাদ্র
সৃষ্টি	বঙ্গবাণী	১৩৩১ কার্তিক

সাহিত্যধর্ম	বিচিত্রা	১৩৩৪ শ্রাবণ
সাহিত্যে নবত্ব[১]	প্রবাসী	১৩৩৪ অগ্রহায়ণ
সাহিত্যবিচার	প্রবাসী	১৩৩৬ কার্তিক
আধুনিক কাব্য	পরিচয়	১৩৩৯ বৈশাখ
সাহিত্যতত্ত্ব	প্রবাসী	১৩৪১ বৈশাখ
সাহিত্যের তাৎপর্য	প্রবাসী	১৩৪১ ভাদ্র

'বাস্তব' ও 'কবির কৈফিয়ত' প্রবন্ধ দুইটির প্রথমসংস্করণে-মুদ্রিত চলতি ভাষার পাঠের পরিবর্তে 'সবুজ পত্র' মাসিকে প্রকাশিত সাধুভাষায়-লিখিত মূলপাঠ সংকলিত হইয়াছে। 'বাস্তব' প্রবন্ধের আরম্ভের নূতন অনুচ্ছেদটিও 'সবুজ পত্র' হইতে। উক্ত প্রবন্ধটির গোড়াতেই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, "আজকাল বাংলাদেশে কবিরা যে-সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছে তাহাতে বাস্তবতা নাই, তাহা জনসাধারণের উপযোগী নহে, তাহাতে লোকশিক্ষার কাজ চলিবে না" এমন কথা "একেবারে আমারই নাম ধরিয়া" কেহ কেহ প্রয়োগ করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত (১৩২১ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ১৯৫-২০৩) 'লোকশিক্ষক বা জননায়ক' এবং 'সবুজ পত্র' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত (১৩২১ মাঘ, পৃ ৬৯৮-৭১০) 'সাহিত্যে বাস্তবতা' প্রবন্ধ দুইটি দ্রষ্টব্য।[২] 'প্রবাসী'র প্রবন্ধটিতে লেখক সুস্পষ্ট অভিযোগ করিয়াছিলেন যে, "রবীন্দ্র-সাহিত্য সার্বজনীন নহে"; "রবীন্দ্রনাথ দরিদ্রের ক্রন্দন শুনিয়াছেন। তিনি দৈন্যের মধ্যে 'বিশ্বাসের ছবি' আঁকিয়াছেন। তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সংগীত গাহিয়াছেন। কিন্তু সে ছবি, সে সংগীত, জনসাধারণকে, সমগ্র জাতিকে, স্পর্শ করিতে পারে নাই।"

'সাহিত্য', 'তথ্য ও সত্য' এবং 'সৃষ্টি'— এই তিনটি প্রবন্ধ ১৩৩০ সালের ১৮, ১৯ ও ২০ ফাল্গুন তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাক্রমে প্রদত্ত তিনটি বক্তৃতা। সেনেট হলে বক্তৃতা হইবার অব্যবহিত পরে প্রথম দুইটি বক্তৃতার অনুলিখন 'সাহিত্যের মূলতত্ত্ব' ও 'সাহিত্যের রসতত্ত্ব' নামে ১৩৩০ ফাল্গুনের 'পরিচারিকা' পত্রিকায় সর্বাগ্রে বাহির হয়। তৃতীয় বক্তৃতাটি 'সাহিত্য' নামে ১৩৩১ বৈশাখের 'পল্লীশ্রী'তে প্রকাশিত হয়। ১৩৩১ সালে 'প্রবাসী'র জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যায় 'কষ্টিপাথর' অংশ (পৃ ২০১-০৩ ও ৩৪৮-৫২) এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। সম্ভবত উক্ত অনুলিখন যথাযথ হয় নাই বিবেচনা করিয়া 'বঙ্গবাণী'র জন্য রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বক্তৃতা তিনটি লিখিয়া

১ 'প্রবাসী'তে প্রবন্ধের মূল নাম 'যাত্রীর ডায়ারি'

২ শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত 'বর্তমান বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে সংকলিত

দিয়াছিলেন। 'সাহিত্য' প্রবন্ধটির কয়েকটি বর্জিতাংশ 'বঙ্গবাণী' হইতে নিয়ে মুদ্রিত হইল।—

সূচনাংশ

আমি অনেক দিন থেকেই প্রতিশ্রুত আছি যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়মন্দিরে কিছু বলব। এতদিন সেই প্রতিশ্রুতি আমি রক্ষা করতে পারি নি, তার কারণটা আমার প্রকৃতিগত।

আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন যে, বাল্যকাল হতেই আমি স্কুল পালিয়ে বেড়িয়েছি, পারৎপক্ষে বিদ্যামন্দিরের সীমানায় ধরা দিতে চাই নি। এখন আমার এই বয়সে যখন আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে ধরা পড়বার সম্ভাবনা হল তখন দিনের পর দিন কেবলই আমার প্রতিশ্রুতির দিন পিছিয়ে দিচ্ছি— ওটা শুদ্ধ ভীরুতাবশত।

আজকার দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু বলতে হলে শ্রোতা ও বক্তার সম্মান-রক্ষার্থে লিখে বলাই উচিত। নিজে নানা দিক থেকে চিন্তা ক'রে, আর এই বিষয়ে অন্য অন্য সবাই কে কী বলেছেন তা সংগ্রহ ও তুলনা ক'রে, আলোচনাটা বেশ ভালো রকম ক'রে করা উচিত। এই-সব নানা কথা ভেবেই তো আমি দীর্ঘকাল অপেক্ষা করেছি।

ক্রমশই দেখছি, লেখার বয়স চলে যাচ্ছে। কতকাল থেকে ক্রমাগত লেখনী চালাচ্ছি, এখন লিখে লিখে একটা ক্লান্তি আমাকে অভিভূত ক'রে ফেলেছে। তা ছাড়া আমি কর্মজালে বিজড়িত হয়ে পড়েছি।

এবার যখন সুদূর চীন-যাত্রা করবার নিমন্ত্রণ পেয়েছি, তখন বহুমানভাজন আমাদের সভাপতি-মশায়[১] আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন আমার প্রতিশ্রুতির কথা। তিনি জানালেন যে, আমার তিনটি বক্তৃতার মধ্যে অন্তত একটা যেন বলে যাই। আমি তখন বললেম, 'আমার যা বলবার তা যদি আপনারা মুখে বলতে দেন তবে হয়তো আমি চেষ্টা করতে পারি।' তিনি তাতেই সম্মতি দিলেন। তাই আজ সাহস ক'রে আপনাদের কাছে দাঁড়িয়েছি, আপনাদের কাছে মুখে বলবার স্পর্ধা আমার স্বভাব-সংগত নয়।

মনে করেছিলেম, আমি তরুণ ছাত্রমণ্ডলীর সঙ্গে ব'সে ব'সে কিছু বলব। হয়তো দুই-তিন শো ছাত্র হবে— তাদের মোকাবিলায় সাহিত্যপ্রসঙ্গ নিয়ে সহজভাবে কিছু আলাপ ক'রে যাব। তাই সাহস ক'রে রাজি হয়েছিলাম।

১ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

যখন মুখে বলি তখন অনেক সময়ই চিন্তা ক'রে বলতে পারি নে— তার কারণ আমার স্মরণশক্তির দুর্বলতা। লোকে যাকে পয়েন্ট্ বা ব্যাখ্যানসূচি বলে সে-সব আমি মনে ধারণ করে রাখতে পারি নে। বলবার সময় সূচিগুলি হারিয়ে তার পরে সেই হারাধনের পিছনে পিছনে মনকে হঠাৎ দৌড় করতে পাঠালে, আসল কাজটার বড়ো ব্যাঘাত ঘটে। তাই দুর্দৈবক্রমে বক্তৃতাসভায় আমার ডাক পড়লে আমার রসনাকে আমার ভাগ্যের হাতে সমর্পণ ক'রে দিই। অর্থাৎ, সেই সময় যেমন চিন্তার ধারা আসে তারই অনুবর্তন করে যাই। এ ছাড়া অন্য উপায় আমার হাতে নেই।

আজ আমার বলবার বিষয়টি হচ্ছে সাহিত্য। আর-কিছু না হোক, অন্তত পঞ্চাশ বছর ধরে বাল্যকাল থেকেই হাতে-কলমে সাহিত্য নিয়েই আছি। এই সম্বন্ধে অন্য মনীষীদের আলোচিত উপদেশে যদিও কিছু শিক্ষা করতে পারি নি, তবু ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এই বিষয়ে আমার কিছু বলবার অধিকার আছে। নিরন্তর সাহিত্যপ্রবাহ ব'য়ে ব'য়ে আমার অন্তর-প্রকৃতির মধ্যে যে-পথ তৈরি হয়েছে সেই পথ দিয়ে আজকার দিনের আলোচনা হয়তো একটা ধারাবাহিক রূপ ধারণ করতেও পারে। আপনা হতেই সেটা হবে এই আশাতেই আজ এখানে এসেছি।

অল্প কিছুদিন হল একটি ছাত্র— ভারতেরই একটু পশ্চিমের কোনো কলেজের ছাত্র— হঠাৎ একদিন আমার প্রভাতভ্রমণের সময় আমার সঙ্গ ধরলেন। তিনি বললেন, একটি প্রশ্ন আছে। ব'লে ইংরেজিতে শুরু করলেন: Is art too good for human nature's daily food?

বুঝলেম এই প্রশ্নের মূলে বহুলোকের মধ্যে প্রচলিত একটি তর্ক আছে। সে তর্কটি এই যে, যে-সকল সাহিত্য বা শিল্পরচনার প্রয়াস আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার আনুকূল্য করে, মানুষকে ভালো করে বা সমৃদ্ধ করে বা সুদক্ষ করে, তার সামাজিক বা অন্য কোনোপ্রকার সমস্যাপূরণের সহায়তা করে, সেই আর্টই শ্রেষ্ঠ কি না। অর্থাৎ, কেবলমাত্র চিত্তবিনোদনই আর্টের উৎকর্ষের আদর্শ কি না। সেই ছাত্রটির এই প্রশ্নই আমি আজকের সভায় মনের মধ্যে ক'রে নিয়ে এসেছি। এই প্রশ্নের সূত্রটিকেই অবলম্বন ক'রে, চিন্তা ও ব্যাখ্যা ক'রে যাওয়া আমার পক্ষে সহজ হবে।

এর উত্তর দিতে গেলে আর্ট সম্বন্ধে আমার সাধ্যমত গোড়া ঘেঁষে কথাটা বলতে হবে। নইলে কোনো ছোটো নিষ্পত্তিতে চলবে না। নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে কলাকারু সম্বন্ধে মানুষের এত বিচিত্র প্রয়াসের তাৎপর্যটা কোথায় আছে। যুগযুগান্তর থেকে মানব এই যে-সকল রূপরচনায় প্রবৃত্ত হয়ে আছে, যে-রচনা চিরকাল ধ'রে সকলের বহুপুরস্কৃত, মানবের সেই চেষ্টার মূল উৎস কোথায়। তা যদি ঠিকমতো নির্ণয়

করতে পারি তা হলেই বুঝতে পারব, আর্টের সঙ্গে মানবজীবনের সম্বন্ধ কী এবং মানুষের প্রাণধারণের চেষ্টার পক্ষে তার উপযোগিতা কতটুকু।

এই মূল অনুসরণ করতে গেলে মধ্যপথে থামবার জো নেই, একেবারে তত্ত্বজ্ঞানের কোঠায় গিয়ে পৌঁছতে হয় এবং সেই তত্ত্বজ্ঞানের আশ্রয় অসীমের রাজ্যে। সত্যের সন্ধানে অসীমের পথে অভিযান আমাদের ভারতীয় প্রকৃতিগত; হয়তো কোনো ইংরেজ শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে আর্ট সম্বন্ধে আলোচনাকে এত সুদূরে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাতে আমার সংকোচ হত। যদি বা সাহস ক'রে এ কাজে প্রবৃত্ত হতেম তা হলে গোড়াতেই 'ওরিএণ্ট্যাল মিস্টিসিজ্‌ম্' নামধারী এক স্বরচিত কুহেলিকার অন্তরাল থেকে হয়তো আমার কথাগুলিকে তাঁরা কিঞ্চিৎ অশ্রদ্ধামিশ্রিত কৌতূহলের সঙ্গে অস্পষ্ট ক'রে শুনতেন। কিন্তু, বর্তমান ক্ষেত্রে আমার ভরসার কারণ এই যে, আমাদের পিতামহেরা আমাদের সমস্ত সম্বন্ধকেই একটি চিরন্তন সত্যের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করে দেখতে চেষ্টা করেছেন।

এই অনুশীলনায় তাঁদের সাহসের অন্ত ছিল না। যে-কোনো অভিব্যক্তি কলায় সংগীতে সাহিত্যে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তাকে অনন্ততত্ত্বের পটভূমিকার উপর রেখে দেখতে পারলেই সত্যকে পাওয়া যায়— এই কথাটি গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে কঠিন নয়।

মানবীয় সত্যকে তিন ভাগে ভাগ করে দেখা যেতে পারে। সেই তিন বিভাগের শাশ্বত ভিত্তি সন্ধান করতে গেলেই উপনিষদের বাণীকে আশ্রয় করা ছাড়া আমাদের পক্ষে আর কোনো উপায় নেই।

—বঙ্গবাণী, ১৩৩১ বৈশাখ, পৃ ৩০৩-০৫

রচনাবলী পৃ ৩৭৫, প্রথম অনুচ্ছেদের শেষাংশ

এই শেষোক্ত কথাটি আজ বিশেষ ভাবে আলোচ্য। যিনি বলেন আর্টের পরিচয় মানবের সংসারযাত্রার সঙ্গে একান্তভাবে সংগত, অর্থাৎ 'আমি আছি' এই ভাবের সূত্রটিই তার প্রধান অবলম্বন— তাঁর এ কথাটা কি গ্রহণ করা চলে। প্রাত্যহিক প্রাণধারণ-ব্যাপারের সঙ্গে সংগত ক'রে দেখলেই কি তাকে সত্যরূপে দেখা হয়।

—বঙ্গবাণী, ১৩৩১ বৈশাখ, পৃ ৩০৫

রচনাবলী পৃ ৩৭৫, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের সূচনাংশ

প্রাত্যহিক প্রাণধারণের নানা ব্যাপারের সঙ্গে যে আর্ট মেলে না— এ কথা বলা চলে না। পূর্বেই বলেছি, সত্যের তিন ভাগের মধ্যে আদান-প্রদানের ঐক্যপথ আছে। অর্থাৎ, তাদের মিলের মধ্যে সত্য আছে। তেমনি আবার তাদের বিভাগের মধ্যেও

সত্য আছে। আমাদের জ্ঞান এক দিকে আমাদের প্রাণধারণ-ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। টি'কে থাকবার জন্যই আমাদের অনেক কিছু জানা চাই। কিন্তু, তাই ব'লে এ কথা বলতে পারি নে যে, যে-সকল জানা আমাদের টি'কে থাকার পক্ষে একান্ত উপযোগী নয় সেই-সকল জানা নিকৃষ্ট। বস্তুত...

—বঙ্গবাণী, ১৩৩১ বৈশাখ, পৃ ৩০৫-০৬

রচনাবলী পৃ ৩৭৫, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের পরে স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদ

ব্রহ্মকে যে অনন্তস্বরূপ বলা হয়েছে মানুষের মধ্যে তারও পরিচয় আছে। এই পরিচয়ের দ্বারা মানুষ আপনার প্রয়োজনের গণ্ডী উত্তীর্ণ হয়।

—বঙ্গবাণী, ১৩৩১ বৈশাখ, পৃ ৩০৬

রচনাবলী পৃ ৩৭৫, তৃতীয় অনুচ্ছেদে দ্বিতীয় বাক্যের পর

এমন কি, 'যেমন ক'রে হোক আমি নিজে টি'কব', 'অন্যের যা হয় হোক'— এ ইচ্ছাটা থাকে না।

বঙ্গবাণী, ১৩৩১ বৈশাখ, পৃ ৩০৬

রচনাবলী পৃ ৩৭৬, তৃতীয় অনুচ্ছেদের শেষাংশ

পৃথিবীতে যে-মানুষ বলেছে 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম', সেই কৃপণ দীর্ঘজীবী হতে পারে, ধনী হতে পারে, কৃচ্ছ্রসাধনে আশ্চর্য শক্তি দেখাতে পারে— কিন্তু সে কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। ভূমা আমাদের ঐক্যবোধের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা, যে-সত্যের সমৃদ্ধিকে প্রভূত ও সমুজ্জ্বল করে তোলে সেই সত্য-ক্ষেত্রেই আর্টের ফসল ফলে।

—বঙ্গবাণী, ১৩৩১ বৈশাখ, পৃ ৩০৬

রচনাবলী পৃ ৩৭৬, তৃতীয় অনুচ্ছেদের শেষাংশে

আপনাদের মধ্যে কোনো কোনো পরিহাসরসিকের মুখে ঈষৎ হাসির চিহ্ন দেখছি— তবু উপনিষদের বাণী আমি এড়াতে পারলেম না। উপায় যে নেই। বহু শতাব্দীর এই-সব মহামন্ত্র, ভারতবর্ষের সমস্ত ভাব ও সাধনার বীজমন্ত্র, আজও যে এরা আমার প্রাণের আশ্রয়। সেই উপনিষদ্ ব্রহ্মের আর-একটি স্বরূপের উল্লেখ ক'রে বলেছেন— অনন্তম্। এইখানেই আছে প্রকাশতত্ত্ব।

—বঙ্গবাণী, ১৩৩১ বৈশাখ, পৃ ৩১০

রচনাবলী পৃ ৩৭৭, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের শেষাংশে

এই জগতে আওরঙ্‌জেব একদা সুদীর্ঘকাল প্রবল প্রতাপে রাজত্ব ক'রে ভারতকে কম্পান্বিত ক'রে দিয়ে গেছে; কিন্তু তাকে কি কেউ গ্রহণ করেছে। তা হলে পুঁথির

কালো অক্ষরের কীট-দংষ্ট্রার নিত্যদংশনের মধ্যে ছাড়া আর কোথায় সে আছে? কিন্তু তার যে ভাই দারাকে অকালে বধ ক'রে নিজের সিংহাসনের সোপানকে সে রক্তকলঙ্কিত করেছে তাকে যে আমরা আমার ব'লে আমাদের অশ্রুসিক্ত হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করেছি। সেই দারার জীবনটিই কি কাব্য নয়, সংগীত নয়। কেন তাকে কাব্যের সঙ্গে, সংগীতের সঙ্গে তুলনা করছি। কেননা, তার আসন যে নিখিলের করুণার মধ্যে।

—বঙ্গবাণী, ১৩৩১ বৈশাখ, পৃ ৩০৮

রচনাবলী পৃ ৩৮১, সর্বশেষ অনুচ্ছেদের শেষে

যদি হয় তো হোক্ সেটা অবান্তর কথা। তাতে যদি লজ্জা পাবার কোনো কারণ থাকে তবে সে লজ্জা কবির নয়, রূপদক্ষের নয়, সে লজ্জা তাঁরই যিনি অনন্তং, আনন্দ-রূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি— সেই লজ্জা পরমসুন্দরের— সেই লজ্জায় বিশ্বের প্রকাশ!

—বঙ্গবাণী, ১৩৩১ বৈশাখ, পৃ ৩১২

বর্তমান গ্রন্থে ৩৮০ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটি (অমৃতের দুটি অর্থ ইত্যাদি) 'বঙ্গবাণী'র। প্রথম সংস্করণে উক্ত অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নোদ্‌ধৃত অনুচ্ছেদটি সংযোজিত হইয়াছিল—

এই ঝড়ের মূর্তি তো মিলিয়ে গেল। একদা আমার স্মৃতিও লুপ্ত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু, সেদিন বিরাট আকাশপটে যে-প্রমত্ততার প্রলয়চিত্র রচিত হয়েছিল, সে বাহ্যত যত স্বল্পস্থায়ী হোক, সেই ক্ষণকালের মধ্যেই ছিল অমৃতের প্রকাশ। চটকলের পাশে যে নোংরা বসতি আছে সময়ের পরিমাপে সে বড়ো হলেও সে মরেই আছে।

—সাহিত্যের পথে, প্রথম সংস্করণ, পৃ ৯

৩৭৯ পৃষ্ঠার শেষ অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ জাপানযাত্রার পথে যে 'দারুণ ঝড়ে'র উল্লেখ করিয়াছেন তাহার সমসাময়িক বিবরণ রবীন্দ্র-রচনাবলীর উনবিংশ খণ্ডে ৩২৯ পৃষ্ঠায় (জাপানযাত্রী। ৯ই জ্যৈষ্ঠ) পাওয়া যাইবে। চীনসমুদ্রে উক্ত ঝড়ের প্রেরণাতেই তিনি 'তোমার ভুবন-জোড়া আসনখানি' গানটি রচনা করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে তোসামারু জাহাজ হইতে ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ তারিখে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রের কিয়দংশ উদ্‌ধৃত হইল—

কাল রাত্রে ঘোরতর বৃষ্টিবাদল শুরু হল— ডেকে কোথাও শোবার জো রইল না। অল্প একটুখানি শুকনো জায়গা বেছে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান গেয়ে অর্ধেক রাত্রি কেটে গেল। প্রথমে ধরলুম, 'শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝ'রে, পড়ুক ঝ'রে',

তার পরে 'বীণা বাজাও', তার পরে 'পূর্ণ আনন্দ'— কিন্তু বৃষ্টি আমার সঙ্গে সমান টক্কর দিয়ে চলল, তখন একটা নতুন গান বানিয়ে গাইতে শুরু করলুম, শেষকালে আকাশের কাছে হার মেনে রাত্রি দেড়টার সময় ক্যাবিনে এসে শুলুম। গানটা সকালেও মনে ছিল। সেটা নিচে লিখে দিচ্ছি। বেহাগ, তেওরা।

—প্রবাসী, ১৩৪২ আশ্বিন, পৃ ৮৫৪

'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ ১৯২৭ সালের জুলাই মাসে (১৩৩৪ আষাঢ়) পূর্বদ্বীপপুঞ্জ-ভ্রমণে বাহির হইবার অব্যবহিত পূর্বে রচনা করেন। ইহার কয়েক মাস আগে (১৯২৬ ডিসেম্বর) দিল্লিতে প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে শ্রীঅমলচন্দ্র হোম তাঁর পঠিত অভিভাষণে 'অতি আধুনিক বাংলাকথাসাহিত্য' সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। 'বিচিত্রা'য় রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইলে সাহিত্যিক মহলে নানা দিক হইতে উহার সমালোচনা হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'সাহিত্যধর্মের সীমানা' (বিচিত্রা, ১৩৩৪ ভাদ্র, পৃ ৩৮৩-৯০) ও 'কৈফিয়ৎ' (বিচিত্রা, ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ, পৃ ৮৯২-৯৫), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যের রীতিনীতি' (বঙ্গবাণী, ১৩৩৪ আশ্বিন, পৃ ২৩৭-৪৬), এবং দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচীর 'সাহিত্যধর্মের সীমানা-বিচার' (বিচিত্রা, ১৩৩৪ আশ্বিন, পৃ ৫৮৭-৬০৬) বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধটি 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধের অব্যবহিত পরের রচনা। রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরিবার পর উহা প্রকাশিত হইলেও (প্রবাসী, ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ), প্রবন্ধটি বিদেশে জাভা হইতে বালি যাইবার পথে প্লান্‌সিউজ জাহাজে 'যাত্রীর ডায়ারি' আকারে ১৩৩৪ সনের ভাদ্র মাসেই লিখিত। এটি এক হিসাবে 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধের পরিপূরক। 'প্রবাসী' হইতে কয়েকটি বর্জিত অনুচ্ছেদ উদ্‌ধৃত হইল—

রচনাবলী পৃ ৪০৮, প্রবন্ধের সূচনাংশ

শাস্ত্রে আছে, এক বললেন বহু হব— সৃষ্টির মূলবাণী এই।

কিন্তু, এই বলার মধ্যেই আছেন দুই— যিনি বললেন আর যিনি শুনলেন,. সৃষ্টিকর্তার নিজের অন্তরেই এই বলিয়ে আর এই শুনিয়ে, দু পারে দুজন— মাঝখানে সৃষ্টিবচন।

মর্তলোকের লেখার মধ্যেও সেই একই কথা। সামনা-সামনি আছে দুজনে— একজন বলে, একজন শোনে। যে শোনে তারই দাবির ছাঁচে বলার আকৃতি-প্রকৃতি অনেকখানিই ঢালাই হয়, তাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলা শক্ত। যদি পুঁইশাকের খেতের মালিক তার ঝুড়ি নিয়ে ঘাটে এসে দাঁড়ায় তা হলে ব্যাবসাদার কখনো জাহাজের

কাপ্তেনকে খবর দেবার কথা মনেই আনতে পারে না ; তার দাবি আপনিই হাটে যাবার ভিত্তি বা ডোঙার তলব করে।

—প্রবাসী, ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ, পৃ ২১৫

রচনাবলী পৃ ৪১১, ষষ্ঠ ছত্রে 'যথার্থ যে বীর' ইত্যাদির পূর্বে

তাঁদের মধ্যে মোহিতলাল সাধারণের কাছে ইতিমধ্যেই খ্যাতিলাভ করেছেন। এই খ্যাতির কারণ তাঁর কাব্যের অকৃত্রিম পৌরুষ। অকৃত্রিম বলছি এইজন্যে, তাঁর লেখায় তাল-ঠোকা পাঁয়তাড়া-মারা পালোয়ানি নেই।

—প্রবাসী, ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ, পৃ ২১৭

রচনাবলী পৃ ৪১২, চতুর্থ ছত্রের পর স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদ

শৈলজানন্দের গল্প আমি কিছু কিছু পড়েছি। দেখেছি, দরিদ্র-জীবনের যথার্থ অভিজ্ঞতা এবং সেই সঙ্গে লেখবার শক্তি তাঁর আছে ব'লেই তাঁর রচনায় দারিদ্র্যঘোষণার কৃত্রিমতা নেই। তাঁর বিষয়গুলি সাহিত্যসভার মর্যাদা অতিক্রম ক'রে নকল দারিদ্র্যের শখের যাত্রার পালায় এসে ঠেকে নি। 'নবযুগের সাহিত্যে নতুন একটা কাণ্ড করছি' জানিয়ে পদভরে ধরণী কম্পমান করবার দাপট আমি তাঁর দেখি নি— দরিদ্রনারায়ণের পূজারির মস্ত একটা তিলক তাঁর কপালে কাটা নেই। তাঁর কলমে গ্রামের যে-সব চিত্র দেখেছি তাতে তিনি সহজে ঠিক কথাটি বলেছেন ব'লেই ঠিক কথা বলবার কারি-পাউডারি ভঙ্গীটা তাঁর মধ্যে দেখা দেয় নি।

—প্রবাসী, ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ, পৃ ২১৭

পূর্বদ্বীপপুঞ্জ হইতে দেশে ফিরিয়া ১০ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ তারিখে শ্রীদিলীপকুমার রায়কে রবীন্দ্রনাথ একটি পত্র লেখেন ; প্রাসঙ্গিকবোধে উহার শেষাংশ নিম্নে সংকলিত হইল—

'সাহিত্যধর্ম' ব'লে একটা প্রবন্ধ লিখেছি। তার কর্মফল চলছে। তার ভোগ ফুরোতে না ফুরোতেই 'সাহিত্যে নবত্ব' ব'লে আরও একটা লেখা হয়েছে। তোমার সঙ্গে বাক্যালোচনাতেও সাহিত্যতত্ত্বচর্চা কিছু পরিমাণে আছে— এতে ক'রে যে একটা আলোড়ন জাগিয়েছে তাতে ক্ষতি নেই। কেননা, পূর্বেই বলেছি, সাহিত্যলোকে চাঞ্চল্যটার খুব প্রয়োজন আছে। সিদ্ধান্তে পৌঁছনোটা খুব বেশি দরকারি নয়— দেখতেই পাচ্ছি, এক যুগের সিদ্ধান্ত আর-এক যুগে উলট-পালট হয়ে যায়, কেবল মনের মধ্যে নিরতচিন্তার চাঞ্চল্যটাই থাকে। মানুষের মন শেষ কথায় যখন এসে

পৌঁছয় তখন নীরবতার সমুদ্র। সেখানে তার কথার কারবার বন্ধ করতে মানুষের আপত্তি আছে ; কেননা, মনটা নাড়া না পেলে একেবারে সে বেকার। এইজন্যে বারে বারে সত্য সিদ্ধান্তকেও মানুষ তার সংশয়ের খোঁচা মেরে বিপর্যস্ত ক'রে তোলে— যুগে যুগে তাই চলছে। আমরা সত্যকে পেতে চাই শুধু কেবল পাওয়ার জন্যে নয়, চাওয়ার জন্যেও। এই কারণে আমাদের ভালোবাসার মধ্যে ঝগড়ার স্থানটা খুব বড়ো; হারানোটা পাওয়ার প্রধান বন্ধু— কেননা, ফিরে ফিরে না পেতে থাকলে সম্পূর্ণ পাওয়া হয় না। অতএব, সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে সাবেক কালের সঙ্গে হাল আমলের যে ঝগড়া চলছে তার মূলে মানুষের এই স্বভাবটাই কাজ করছে, যাকে আশ্রয় করে তাকে সে আঘাত ক'রে সন্দেহ করে— তার পরে আবার দ্বিগুণ জোরের সঙ্গে তার কাছে ফিরে আসে।

—অনামী, পত্রগুচ্ছ, পৃ ৩৪৩

'সাহিত্যবিচার' প্রবন্ধটি কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে রবীন্দ্রপরিষৎ-সভায় প্রদত্ত মৌখিক ভাষণের কবির স্বকৃত স্মৃতিলেখন। প্রবন্ধটির বর্জিত আরম্ভভাগ 'প্রবাসী' হইতে সংকলিত হইল—

রবীন্দ্রপরিষৎ সভায় 'সাহিত্যবিচার' সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছি, সেইটি লিখে দেবার জন্যে আমার 'পরে অনুরোধ আছে। মুখে-বলা কথা লিখে বলায় নূতন আকার ধারণ করে। তা ছাড়া আমার মতো অসাধারণ বিস্মৃতি-শক্তিশালী লোক এক দিনের কথিত বাণীকে অন্য দিনে যথাযথরূপে অনুলেখনে অক্ষম। অতএব সেদিনকার বাক্যের ইতিহাস অনুধাবনের বৃথা চেষ্টা না ক'রে বক্তব্য বিষয়টার প্রতিই লক্ষ্য করব।

প্রথমে বলে রাখি, যাকে সাধারণত আমরা সাহিত্য-সমালোচনা বলি সাহিত্যবিচার শব্দটাকে আমি সেই অর্থে ব্যবহার করেছি। আলোচনা অর্থে বুঝি পরিক্রমা, বিষয়টির উপর পায়চারি করে বেড়ানো; আর বিচারটি হল পরিচয়— তাকে যাচাই করা। বিশেষ রচনার পরিচয় দেওয়াই সাহিত্যবিচারের লক্ষ্য। কিন্তু, পরিচয় তো অনেকরকম আছে। আমরা প্রায়ই ভুল করি, এক পরিচয়ের জায়গায় আর-এক পরিচয় দাখিল করি, যেখানে এক গ্লাস জল আনা আবশ্যক সেখানে 'তাড়াতাড়ি এনে দিই আধখানা বেল'। জলের চেয়ে বেলে ভার আছে, সার আছে, সেই কারণে বাজারে তার দামও বেশি, কিন্তু যে তৃষার্ত মানুষ জল চায় সে মাথায় হাত দিয়ে পড়ে।

সাহিত্যবিচারে পরিচয়টি সাহিত্যিক পরিচয় হওয়া চাই, এ কথা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু, ভাগ্যদোষে আমাদের দেশে বাহুল্য নয়। কল্পনা করা যাক, আমাদের সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয় সাহিত্যের বিষয়। পরিচয় দেবার উপলক্ষ্যে বিচারক হয়তো গর্ব ক'রে বলে উঠবেন, জাতিতে উনি বৈদ্য। জিজ্ঞাসু বলবেন, 'এহ বাহ্য'। তখন বিচারক আবার গর্ব করে বলতে পারেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে উনি অধ্যাপনা করেন, তার পদগৌরব এবং অর্থগৌরব প্রচুর। জিজ্ঞাসু আবার বলবেন, 'এহ বাহ্য'। তখন বিচারক সুর আরও চড়িয়ে বলবেন, উনি তত্ত্বশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত। হায় রে, এও সেই আধখানা বেল। ঐতিহাসিক সাহিত্যে এ-সব তথ্য সযত্নে সংগ্রহ করা চাই, কিন্তু রসসাহিত্যে এগুলিকে সযত্নেই বর্জন করতে হবে। উৎসাহী হোমিওপ্যাথ বাল্মীকিকে প্রশ্ন করে যে, বনবাসকালে নিঃসন্দেহ মাঝে মাঝে রামচন্দ্রের ম্যালেরিয়া হয়েছে, তখন তিনি নিজের কিরকম চিকিৎসা করতেন। বাল্মীকি তাঁর জটাশ্মশ্রু নিয়ে চুপ ক'রে থাকেন, কোনো উত্তর দেন না। ঐতিহাসিক রামচরিতে রামচন্দ্রের সমর্থিত চিকিৎসাপদ্ধতি মূল্যবান তথ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু সাহিত্যিক রামচরিতে ওকে স্থান দেওয়া অসম্ভব। এমনতরো বহুসহস্র অতি প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই রামায়ণ সম্ভবপর হয়েছে, তথাপি সেটা সপ্ত কাণ্ডর কম হল না।

আমি যে-কথাটি বলতে গিয়েছি সে হচ্ছে এই যে, সাহিত্যের বিষয়টি ব্যক্তিগত, শ্রেণীগত নয়।

—প্রবাসী, ১৩৩৬ কার্তিক, পৃ ১৩১

এই গ্রন্থের ৪১৫ পৃষ্ঠার অষ্টাদশ ছত্রের পরে একটি অতিরিক্ত বাক্য 'প্রবাসী'তে পাওয়া যায় : তৃষ্ণার্তের জন্যে আধখানা বেলের প্রভূত আয়োজন।

—প্রবাসী, ১৩৩৬ কার্তিক, পৃ ১৩২

এই গ্রন্থের ৪১৬ পৃষ্ঠার শুরুতে যে অনুচ্ছেদ শেষ হইয়াছে তাহার অনুবৃত্তিস্বরূপ 'প্রবাসী'তে পাওয়া যায়—

কথা যখন উঠল, নিজের অভিজ্ঞতার কথাটা বললে আশা করি কেউ দোষ নেবেন না। কিছুদিন পূর্বে একটি প্রবন্ধে সংবাদ পাওয়া গেল, আমার কবিতায় সত্ত্ব রজঃ এবং তম এই তিন গুণের মধ্যে রজোগুণটাই সাহিত্যিক ল্যাবরেটরিতে অধিক পরিমাণে ধরা পড়েছে। এরকম তাত্ত্বিক কাকুক্তি প্রমাণ করা যায় না, কিন্তু অস্পষ্ট বলেই সেটা শুনতে হয় খুব মস্ত। এ-সব কথা ভারি ওজনের কথা। আমাদের শাস্ত্র-মানা দেশে এতে ক'রে লোকেও স্তম্ভিত হয়। আমার আপত্তি এই যে, সাহিত্যবিচারে এ-সব শব্দের কোনো স্থান নেই। তবু যদি গুণের কথা উঠলই, তা হলে এ কথা

মানতেই হবে আমি ত্রিগুণাতীত নই, দ্বিগুণাতীতও নই, সম্ভবত সাধারণ মানুষের মতো আমার মধ্যে তিন গুণেরই স্থান আছে। নিশ্চয়ই আমার লেখায় কোথাও দেখা দেয় তম, কোথাও বা রজ, কোথাও বা সত্ত্ব। পরিমাণে রজটাই সব-চেয়ে বেশি এ কথা প্রমাণ করতে যাঁরা কোমর বাঁধেন তাঁরা এ লেখা ও লেখা, এ লাইন ও লাইন থেকে তার প্রমাণ ছেঁটে কেটে আনতে পারেন। আবার যিনি আমার কাব্যকে সাত্ত্বিক ব'লে প্রমাণ করতে চান তিনিও বেছে বেছে সাত্ত্বিক লাইনের সাক্ষী সারবন্দী ক'রে দাঁড় করাতে যদি চান মিথ্যা সাক্ষ্য সাজাবার দরকার হবে না। কিন্তু, সাহিত্যের তরফে এ তর্কে লাভ কী। উপাদান নিয়ে সাহিত্য নয়, রসময় ভাষারূপ নিয়েই সাহিত্য। ম্যাক্‌বেথ নাটকে তমোগুণ বেশি কিম্বা রজোগুণ বেশি, কিম্বা সাংখ্যদর্শনের সব গুণেরই তাতে আবির্ভাব কিম্বা অভাব, এ কথা উত্থাপন করা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। তাত্ত্বিক যে-কোনো গুণই তাতে থাক্ বা না থাক্ সবসুদ্ধ মিলে ঐ রচনা একটি পরিপূর্ণ নাটক হয়ে উঠেছে। প্রতিভার কোন্ মন্ত্রবলে তা হল তা কেউ বলতে পারে না। সৃষ্টি আপনাকে আপনিই প্রমাণ করে, উপাদানবিশ্লেষণ দ্বারা নয়, নিজের সমগ্র সম্পূর্ণ রূপটি প্রকাশ ক'রে। রজোগুণের চেয়ে সত্ত্বগুণ ভালো, এ নিয়ে মুক্তিতত্ত্ব-ব্যাখ্যায় তর্ক চলতে পারে; কিন্তু সাহিত্যে সাহিত্যিক ভালো ছাড়া অন্য কোনো ভালো নেই।

কাঁটাগাছে গোলাপ ফোটে, এটাতে বোধ করি রজোগুণের প্রমাণ হয়। গোলাপ-গাছের প্রকৃতিটা অস্ত্রধারী, জগতে শত্রু আছে এ কথা সে ভুলতে পারে না। এই সন্দেহচঞ্চল ভাবটা সাত্ত্বিক শান্তির বিরোধী, তবুও গোলাপকে ফুল হিসাবে নিন্দা করা যায় না; নিষ্কণ্টক অতিশুভ্র ব্যাঙের ছাতার চেয়ে সে যে রমণীয়তায় হেয় এ কথা তত্ত্বজ্ঞানী ছাড়া আর কেউ বলবে না। ভুঁইচাঁপা ওঠে মাটি ফুঁড়ে, থাকে মাটির কাছে, কিন্তু ফুলের সমজদার এই রজো বা তমোগুণের লক্ষণটা স্মরণ করিয়ে তাকে সাংখ্য-তত্ত্বের শ্রেণীভুক্ত করবার চেষ্টা করে না।

আমার কাব্য সম্বন্ধে উপরিলিখিত বিশেষ তর্কটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু, আমাদের সাহিত্য-সমালোচনায় যে-দোষটা সর্বদা দেখতে পাওয়া যায় এটা তারই একটা নিদর্শন। আমরা সহজেই ভুলি ইত্যাদি

—প্রবাসী, ১৩৩৬ কার্তিক, পৃ ১৩৩

'সাহিত্যতত্ত্ব' ও 'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধ দুইটি রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করিয়াছিলেন। প্রথম প্রবন্ধটি ১৩৪০ সালের শেষে (ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪) এবং দ্বিতীয় প্রবন্ধটি ১৩৪১ সালের আরম্ভে (১৬ জুলাই ১৯৩৪) পঠিত হয়।

'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধটির 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত পাঠের কয়েকটি অংশ গ্রন্থ-প্রকাশকালে প্রথম সংস্করণে বর্জিত হইয়াছিল। বর্তমান সংস্করণে প্রবন্ধটির উক্ত সাময়িক পত্রে প্রকাশিত পূর্ণতর পাঠ মুদ্রিত হইল।

পরিশিষ্ট

'সাহিত্যের পথে'র প্রথম সংস্করণে 'পরলোকগত লোকেন পালিতকে লিখিত' রবীন্দ্রনাথের চারখানি পত্রের কিয়দংশমাত্র 'পরিশিষ্ট' আকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। ১২৯৮-৯৯ সালে প্রথম বর্ষের 'সাধনা' পত্রিকায় লোকেন্দ্রনাথ পালিতের পত্রোত্তর সহ উক্ত 'সাহিত্য সম্বন্ধে চিঠিপত্র'গুলি মাসে মাসে প্রকাশিত হয় (সাধনা, ১২৯৮ ফাল্গুন হইতে ১২৯৯ ভাদ্র ও আশ্বিন দ্রষ্টব্য)। রবীন্দ্র-রচনাবলীর অষ্টম খণ্ডে (পৃ ৪৬৩-৮৮) 'সাহিত্য' গ্রন্থের পরিশিষ্টে পত্রগুলির 'সাধনা'য় প্রকাশিত সম্পূর্ণতর পাঠ 'পত্রালাপ' নামে ইতিপূর্বেই সংকলিত হইয়াছে বলিয়া বর্তমান সংস্করণে সেগুলি বর্জিত হইল।

'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে মুদ্রিত প্রবন্ধগুলির সমসাময়িক কয়েকটি সাহিত্য-বিষয়ক রচনা, অভিভাষণ ও আলোচনার বিবরণ, বিভিন্ন পত্রিকা হইতে সংকলন করিয়া রচনাবলী-সংস্করণে নূতন পরিশিষ্ট যোগ করা হইল। সাময়িক পত্রে উহাদের প্রথম প্রকাশের সূচী নিম্নে মুদ্রিত হইল—

সভাপতির অভিভাষণ	শান্তিনিকেতন	১৩৩০ জ্যৈষ্ঠ
সভাপতির শেষ বক্তব্য	শান্তিনিকেতন	১৩৩০ জ্যৈষ্ঠ
সাহিত্যসম্মিলন	প্রবাসী	১৩৩৩ বৈশাখ
কবির অভিভাষণ	প্রবাসী	১৩৩৪ ফাল্গুন
সাহিত্যরূপ	প্রবাসী	১৩৩৫ বৈশাখ
সাহিত্য-সমালোচনা	প্রবাসী	১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠ
পঞ্চাশোর্ধ্বম্	বিচিত্রা	১৩৩৬ ফাল্গুন
বাংলাসাহিত্যের ক্রমবিকাশ	বিচিত্রা	১৩৪১ মাঘ

'সভাপতির অভিভাষণ' ও 'সভাপতির শেষ বক্তব্য'— কাশীতে উত্তরভারতীয় বঙ্গ-সাহিত্যসম্মিলনে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের কথিত বক্তৃতার শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত কর্তৃক 'আংশিক অনুলিখন'। বক্তৃতা দুইটি ইংরেজি ১৯২৩ সালের মার্চ মাসে যথাক্রমে ৩ ও ৪ তারিখে প্রদত্ত হয়।

১৩৩২ সালে বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের শিউড়ি-অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ সভাপতি হইবেন, এইরূপ কথা হইয়াছিল। 'সাহিত্যসম্মিলন' সেই উপলক্ষে রচিত হয়।

'কবির অভিভাষণ' প্রেসিডেন্‌সি কলেজের রবীন্দ্র-পরিষদের সভাপতি শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের অভ্যর্থনার উত্তরে বলা হইয়াছিল। আলোচ্য রচনাটি উক্ত মৌখিক অভিভাষণের কবির স্বকৃত অনুলেখন। ১নং 'রবীন্দ্র-পরিষদ-নিষ্ক্রান্তি'-রূপে 'রবীন্দ্র-পরিষদে কবির অভিভাষণ' নামে উহা স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।

'সাহিত্যরূপ' ও 'সাহিত্য-সমালোচনা' বিশ্বভারতী-সম্মিলনীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত আলোচনাসভার দুইটি বিশেষ অধিবেশনের রবীন্দ্রনাথ লিখিত বিবরণ। 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধ প্রকাশের ফলে সাহিত্যিকদের মধ্যে যে-আলোড়ন জাগিয়াছিল (শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লিখিত পূর্বসংকলিত পত্র দ্রষ্টব্য) তাহার পরিণামে বাংলার প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিকদের একত্রে আলোচনার উদ্দেশ্যে এই সভা আহ্বান করা হইয়াছিল। ১৩৩৪ সালের চৈত্র মাসে যথাক্রমে ৪ ও ৭ তারিখে বিশ্বভারতী-সম্মিলনীর উপরোক্ত দুইটি অধিবেশন জোড়াসাঁকোয় বিচিত্রাভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচনায় সূত্রধারের কর্তব্য রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সম্পাদন করেন।

'পঞ্চাশোর্ধ্বম্' বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের কলিকাতায় ভবানীপুরে অনুষ্ঠিত উনবিংশ অধিবেশনের জন্য (২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০) লিখিত অভিভাষণ। সে সময়ে বাংলার বাহিরে ব্যস্ত থাকায় রবীন্দ্রনাথ উক্ত অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে বা অভিভাষণ পাঠ করিতে পারেন নাই। রচনাটি অনতিবিলম্বে 'বিচিত্রা'য় বাহির হয়।

'বাংলাসাহিত্যের ক্রমবিকাশ' কলিকাতায় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের দ্বাদশ অধিবেশনের (২৭ ডিসেম্বর ১৯৩৫) উদ্‌বোধন অভিভাষণ।

বর্ণানুক্রমিক সূচী

অজানা সুর কে দিয়ে যায় কানে কানে ... ১৮২
অটোগ্রাফ ... ৩২
অনাদৃতা লেখনী ... ২৫
অনেক দিনের এই ডেস্কো ... ১০৩
অন্তরে তার যে মধুমাধুরী পুঞ্জিত ... ৪৮
অপরিচিতা ... ২৯৩
অপাক-বিপাক .. ১৯
অসংকোচে করিবে ক'ষে ভোজনরসভোগ ১৭
আকাশপ্রদীপ ... ৭৫
আধুনিক কাব্য ... ৪২০
আধুনিকা ... ৫
আমগাছ ... ৯৮
আমরা চিত্র, অতি বিচিত্র ... ১৭১-৭২
আমরা নূতন যৌবনেরই দূত ... ১৭৩
আমার ছাঁটা চুল ছিল খাটো ... ৪৩০
আমার মন বলে, চাই চাই গো ... ১৬৫
আমি তারেই জানি তারেই জানি ... ১৪২
আমি তোমারি মাটির কন্যা ... ১৫০
আমি ফুল তুলিতে এলেম বনে .. ১৮০
ইচ্ছে। সেই তো ভাঙছে ... ১৯১
ইস্টিমারের ক্যাবিনটাতে কবে নিলেম ঠাঁই ১০৪
উজ্জল শ্যামলবর্ণ, গলায় পলার হারখানি ... ৮৯
উতল হাওয়া লাগল আমার গানের তরণীতে ১৮৩
এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু ... ১১
এ তো সহজ কথা ... ৯৮
এ-ঘরে ও-ঘরে যাবার রাস্তায় সিদ্ধ মাংসের গন্ধ ৪২৬
এই ঘরে আগে পাছে .. ৯৪
এই সবুজ পাহাড়গুলির মধ্যে থাকি কেন ... ৪২৯

এক ছিল মোটা কেঁদো বাঘ	...	৪৪৬
একদিন মুখে এল নূতন এ নাম	...	১১২
এলেম নতুন দেশে	...	১৬৭
ঐ ছাপাখানাটার ভূত	...	৬৫
ওগো, তোমার চক্ষু দিয়ে মেলে সত্যদৃষ্টি	...	১৩৯
ওগো, শান্ত পাষাণমূরতি সুন্দরী	...	১৭৭
ওরে মন, যখন জাগলি না রে	...	২৮১
কবির অভিভাষণ	...	৪৮৬
কবির কৈফিয়ত	...	৩৬৮
কলকত্তামে চলা গয়ো রে সুরেনবাবু মেরা	...	৪১
কাঁচা আম	...	১২৪
কাপুরুষ	...	৩১
কালান্তর	...	৬৩
কী রসসুধা-বরষাদানে মাতিল সুধাকর	...	৪৬
কেন নয়ন আপনি ভেসে যায়	...	১৮৮
কোথা তুমি গেলে যে মোটরে	...	২৮
খবর এল, সময় আমার গেছে	...	১০৬
খর বায়ু বয় বেগে	...	১৫৯
খুলে আজ বলি, ওগো নব্য	...	৩২
গগনে গগনে যায় হাঁকি	...	১৮৯
গরঠিকানি	...	২০
গর-ঠিকানিয়া বন্ধু তোমার	...	৫৩১
গোধূলিতে নামল আঁধার	...	৭৫
গোপন কথাটি রবে না গোপনে	...	১৬৩
গৌড়ী রীতি	...	৩১,৫৩৩
ঘরেতে ভ্রমর এল গুন্‌গুনিয়ে	...	১৮১
চক্ষে আমার তৃষ্ণা, ওগো	...	১৩৮
চলতি ভাষায় যারে ব'লে থাকে আমাশা	...	১৯
চলো নিয়ম-মতে	...	১৭৪
চাতক	...	৪৬

চিঠি তব পড়িলাম, বলিবার নাই মোর ... ৫
চিংড়েতন, হর্তন, ইস্কাবন ... ১৭৫
জন্মেছিনু সূক্ষ্ম তারে বাঁধা মন নিয়া ... ৮২
জয় জয় তাসবংশ-অবতংস ... ১৭৪,৫৪৪
জল ... ৮৬
জানা-অজানা ... ৯৪
ঠাকুরমা দ্রুততালে ছড়া যেত প'ড়ে .. ৮৪
ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে ... ১১৫
তথ্য ও সত্য .. ৩৮২
তপস্বিনী ... ৩০৭
তর্ক ... ১১৭
তল্লাস করেছিনু, হেথাকার বৃক্ষের ... ৫৯
তিনটে কাঁচা আম পড়ে ছিল ... ১২৪
তুমি ... ৬৫
তুমি সুন্দরী এবং তুমি বাসি ... ৪২৪
তুলনায় সমালোচনাতে ... ৫৩
তৃণাদপি সুনীচেন ... ৬৯
তোমাদের বিয়ে হল ফাগুনের চৌঠা ... ১২
তোমার ঘরের সিঁড়ি বেয়ে ... ৬৩
তোমার পায়ের তলায় যেন গো রঙ লাগে ১৮২
তোলন নামন, পিছন সামন ... ১৬৮
দক্ষিণায়নের সূর্যোদয় আড়াল ক'রে ... ১২১
দুঃখ দিয়ে মেটাব দুঃখ তোমার .. ১৪৭
দূর হতে কয় কবি ... ৬০
দেয়ালের ঘেরে যারা ... ৫০
দোষী করো, দোষী করো ... ১৪৩
ধরাতলে চঞ্চলতা সব-আগে নেমেছিল জলে ৮৬
ধূমকেতু মাঝে মাঝে হাসির ঝাঁটায় ... ৩
ধ্বনি ... ৮২
ধ্যানভঙ্গ ... ৫২

নগ্ন দেহে শুয়ে আছি বসন্তে সবুজ বনে … ৪৩০
না না, ডাকব না, ডাকব না … ১৪০
নাতবউ … ৪৮
নামকরণ … ৫০, ১১২
নারীকে আর পুরুষকে যেই মিলিয়ে দিলেন বিধি ৬৭
নারীকে দিবেন বিধি পুরুষের অন্তরে মিলায়ে ১১৭
নারীপ্রগতি … ১০
নারীর কর্তব্য … ৫৪
নাসিক হইতে খুড়ার পত্র … ৪১
নাহি চাহিতেই ঘোড়া দেয় যেই … ৩১,৫৩৩
নিবেদনম্ অধ্যাপকিনিস্থ … ৩১
নিমন্ত্রণ … ৪৭
নীল জল… নির্মল চাঁদ … ৪৩০
নূতন সে পলে পলে অতীতে বিলীন … ৬৯১
পঞ্চমী … ৯২
পঞ্চাশোর্ধ্বম্ .. ৫১৩
পত্র … ৪২
পত্রদূতী … ৫৩১
পথের শেষ কোথায়, শেষ কোথায় … ১৫২
পদ্মাসনার সাধনাতে দুয়ার থাকে বন্ধ … ৫২
পয়লা নম্বর … ৩১৯
পরিণয়মঙ্গল … ১২
পলাতকা … ২৮
পাকুড়তলির মাঠে … ১১৫
পাখির ভোজ … ৯৯
পাড়ায় কোথাও যদি কোনো মৌচাকে … ৫৮
পাত্র ও পাত্রী … ৩৩৩
পাহাড় একটানা উঠে গেছে বহুশত হাত উচ্চে ৪৫৫
পুরুষের পক্ষে সব তন্ত্রমন্ত্র মিছে … ৫৪
প্রজাপতি যাঁদের সাথে … ৪৭

প্রশ্ন ... ৯৬
ফুল বলে, ধন্য আমি মাটির 'পরে ... ১৫৮
বঞ্চিত ... ৯৭
বধূ ... ৮৪
বলে দাও জল, দাও জল ... ১৩৭
বলো, সখী, বলো তারি নাম ... ১৭৮
বাংলাসাহিত্যের ক্রমবিকাশ ... ৫২০
বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও ... ১৯৩
বাঁশবাগানের গলি দিয়ে মাঠে ... ৯৬
বাস্তব ... ৩৬১
বিজয়মালা এনো আমার লাগি ... ১৮৩
বিধি হে, যত তাপ মোর দিকে ... ৩৯২
বিবিধজাতীয় মধু পেল যদি পাওয়া ... ৫৩৭
বেজি ... ১০৩
বেঠিকানা তব আলাপ শব্দভেদী ... ২০
বোষ্টমী ... ২৩৪
ভাইদ্বিতীয়া ... ১৪
ভাইফোঁটা ... ২৬১
ভাবি বসে বসে গতজীবনের কথা .. ৯২
ভূমিকা ... ৭৭
ভোজনবীর ... ১৭
ভোরে উঠেই পড়ে মনে ... ৯৯
মধুসন্ধায়ী (১-৪) ... ৫৮
মনে পড়ে, ছেলেবেলায় যে বই পেতুম হাতে ৭৭
মম রুদ্ধ মুকুলদলে এসো ... ১৫১
ময়ূরের দৃষ্টি ... ১২১
মশকমঙ্গলগীতিকা ... ৬৯
মাছিতত্ত্ব ... ৬১
মাছিবংশেতে এল অদ্ভুত জ্ঞানী সে ... ৬১
মাল্যতত্ত্ব ... ৩৪

মাস্টারি-শাসনদুর্গে সিঁধকাটা ছেলে ... ৭৯
মিলের কাব্য ... ৬৭
মিষ্টান্বিতা ... ৪৯
যাত্রা ... ১০৪
যাত্রাপথ ... ৭৭
যাবই আমি যাবই ওগো ... ১৬৩-৬৪-৬৬
যায় যদি যাক সাগরতীরে ... ১৪৫
যে আমারে দিয়েছে ডাক ... ১৩৫
যে দেশে বায়ু না মানে ... ১৮৯
যে মিষ্টান্ন সাজিয়ে দিলে ... ৪৯
রঙ্গ ... ১১
রাজসভাতে ছিল জ্ঞানী ... ৯০
রিচার্ড কোডি যখন শহরে যেতেন ... ৫৩২
রেলেটিভিটি ... ৫৩
লাইব্রেরিঘর, টেবিল-ল্যাম্পো জ্বালা ... ৩৪
লিখি কিছু সাধ্য কী ... ৬৮
শান্ত যেই জন ... ১৯০
শুনেছিনু নাকি মোটরের তেল ... ১০
শেষের রাত্রি ... ২৭৮
শ্যামল আরণ্য মধু বহি এল ডাক-হরকরা ... ৫৯
শ্যামা ... ৮৯
সকলের শেষ ভাই ... ১৪
সভাপতির অভিভাষণ ... ৪৬৭
সভাপতির শেষ বক্তব্য ... ৫৭৭
সময়হারা ... ১০৬
সম্পাদকি তাগিদ নিত্য চলছে বাহিরে ... ২৫
সাহিত্য ... ৩৭৫
সাহিত্যতত্ত্ব ... ৪৩৪
সাহিত্যধর্ম ... ৪০১
সাহিত্যবিচার ... ৪১৪

সাহিত্যরূপ	...	৪৯২
সাহিত্যসমালোচনা	...	৫০৩
সাহিত্যসম্মিলন	...	৪৮২
সাহিত্যে নবত্ব	...	৪০৮
সাহিত্যের তাৎপর্য	...	৪৫০
সুসীম চ-চক্র	...	৪৪
সৃষ্টি	...	৩৯২
সৃষ্টি-প্রলয়ের তত্ত্ব	...	৪২
স্কুল-পালানে	...	৩৯
স্ত্রীর পত্র	...	২৪৭
স্মৃতিরে আকার দিয়ে আঁকা	...	৭৭
হা-আ-আ-আই	...	১৭০
হাঁচ্ছোঃ, ভয় কী দেখাচ্ছ	...	১৭২
হায় হায় হায় দিন চলি যায়	...	৪৪
হালদারগোষ্ঠী	...	১৯৯
হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরুগুরু	...	১৪৬
হে নবীনা, হে নবীনা	...	১৬৫
হে মহাদুঃখ, হে রুদ্র, হে ভয়ংকর	...	১৪৮
হৈমন্তী	...	২২০

উল্লেখযোগ্য সংশোধন। রবীন্দ্র রচনাবলী ২৩

পৃ	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৯	১	পরিচে পেরাকি	পিরিচে পেড়াকি
৩৮	৬	সে দন	সেদিন
৫৫	১৮	মোট	মোটা
৯২	২৪	চাঁদনীর	চাঁদিনীর
১০১	২০	রক্ষে	রক্ষে্
১০৪	১৫	যথাবথ্য	যাথাবথ্য
১০৮	১৬	ভাঙা	ডাঙা
১৭৪	১২	ওদিকে	ওদিক
২২৩	১	ছুটি	ছুটি
২৩০	১২	সম্মুখে	সম্মুখে
২৪৭	২৭	বালা	বাংলা
৩১৪	১৯	অন্তরেরর	অন্তরের
৩১৫	১২	কৃচ্ছ	কৃচ্ছ্র
৩২১	১৪	ব্যয়ামপ্রণালী	ব্যায়ামপ্রণালী
৩২৬	২৬	পায়লা-নম্বরে	পয়লা-নম্বরে
৩২৭	২৮	সীতাংশু	সিতাংশু
৩৩৯	১৯	বলশালী	ধনশালী
৪১৬	১৫	ম হমাতেই	মহিমাতেই
৪১৭	৮	দয়ে	দিয়ে
৪৩৫	২	এঁকেই	একেই
৪৪৭	৮	শোনাবামা। ত্র	শোনবামাত্র
৪৫০	১৪	থাকে	থেকে
৪৬৯	৬	ঘেই	নেই
৪৭৫	২৩	জান:তে	জানাতে
৫০০	১২	আবসাদ	অবসাদ
৫৩০	১৯	রঙ্গ।	বড়ো রঙ্গ।

রবীন্দ্র রচনাবলী

চতুর্বিংশ খণ্ড

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

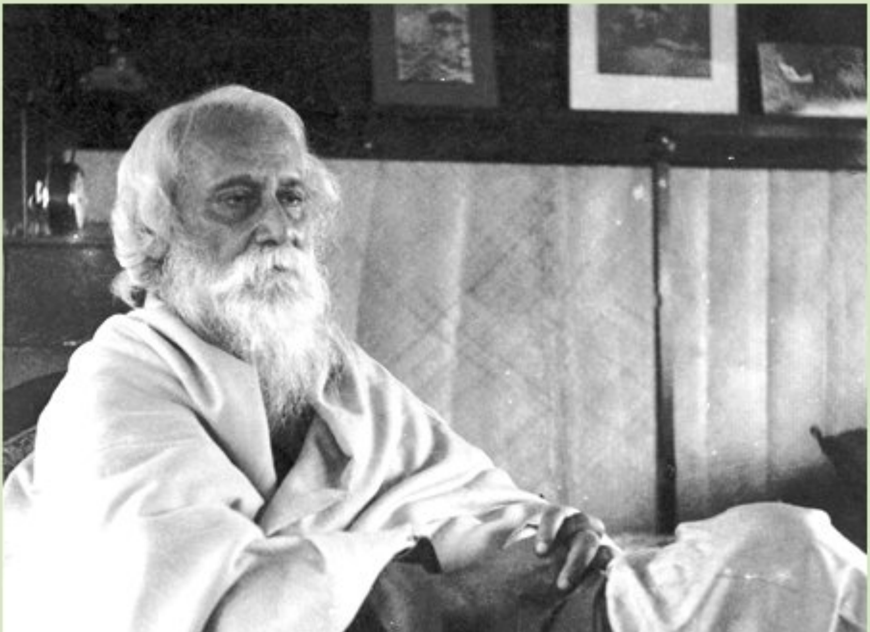

রবীন্দ্র-রচনাবলী

চতুর্বিংশ খণ্ড

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী
২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা

প্রকাশ ৭ পৌষ ১৩৫৪
পুনর্মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৮৮০ শকাব্দ : ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ

মূল্য : কাগজের মলাট ৯৲ টাকা
রেক্সিনে বাঁধাই ১২৲ টাকা

©

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী। ৬৷৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস। ৩০ কর্নওআলিস স্ট্রীট। কলিকাতা-৬
৩·১

সূচী

চিত্রসূচী ।৶০

কবিতা ও গান

নবজাতক ১

সানাই ৬৫

নাটক ও প্রহসন

বাঁশরি ১৪৫

উপন্যাস ও গল্প

গল্পগুচ্ছ ২০১

প্রবন্ধ

কালান্তর ২৪১

সংযোজন ৩৮৫

গ্রন্থপরিচয় ৪৬৫

বর্ণানুক্রমিক সূচী ৫০৩

চিত্রসূচী

রবীন্দ্রনাথ : সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ ৩

হিজলি-রাজবন্দী-হত্যার প্রতিবাদ-সভায় রবীন্দ্রনাথ ৪৫৩

কবিতা ও গান

নবজাতক

সূচনা

আমার কাব্যের ঋতুপরিবর্তন ঘটেছে বারে বারে। প্রায়ই সেটা ঘটে নিজের অলক্ষ্যে। কালে কালে ফুলের ফসল বদল হয়ে থাকে, তখন মৌমাছির মধু-জোগান নতুন পথ নেয়। ফুল চোখে দেখবার পূর্বেই মৌমাছি ফুলগন্ধের সূক্ষ্ম নির্দেশ পায়, সেটা পায় চার দিকের হাওয়ায়। যারা ভোগ করে এই মধু তারা এই বিশিষ্টতা টের পায় স্বাদে। কোনো কোনো বনের মধু বিগলিত তার মাধুর্যে, তার রঙ হয় রাঙা; কোনো পাহাড়ি মধু দেখি ঘন, আর তাতে রঙের আবেদন নেই, সে শুভ্র; আবার কোনো আরণ্য সঞ্চয়ে একটু তিক্ত স্বাদেরও আভাস থাকে।

কাব্যে এই-যে হাওয়াবদল থেকে সৃষ্টিবদল এ তো স্বাভাবিক, এমনি স্বাভাবিক যে এর কাজ হতে থাকে অন্যমনে। কবির এ সম্বন্ধে খেয়াল থাকে না। বাইরে থেকে সমজদারের কাছে এর প্রবণতা ধরা পড়ে। সম্প্রতি সেই সমজদারের সাড়া পেয়েছিলুম। আমার একশ্রেণীর কবিতার এই বিশিষ্টতা আমার স্নেহভাজন বন্ধু অমিয়চন্দ্রের দৃষ্টিতে পড়েছিল। ঠিক কী ভাবে তিনি এদের বিশ্লেষণ করে পৃথক করেছিলেন তা আমি বলতে পারি নে। হয়তো দেখেছিলেন, এরা বসন্তের ফুল নয়; এরা হয়তো প্রৌঢ় ঋতুর ফসল, বাইরে থেকে মন ভোলাবার দিকে এদের ঔদাসীন্য। ভিতরের দিকের মননজাত অভিজ্ঞতা এদের পেয়ে বসেছে। তাই যদি না হবে তা হলে তো ব্যর্থ হবে পরিণত বয়সের প্রেরণা। কিন্তু এ আলোচনা আমার পক্ষে সংগত নয়। আমি তাই নবজাতক গ্রন্থের কাব্যগ্রন্থনের ভার অমিয়চন্দ্রের উপরেই দিয়েছিলুম। নিশ্চিন্ত ছিলুম, কারণ দেশবিদেশের সাহিত্যে ব্যাপকক্ষেত্রে তাঁর সঞ্চরণ।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
৪ এপ্রিল, ১৯৪০

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

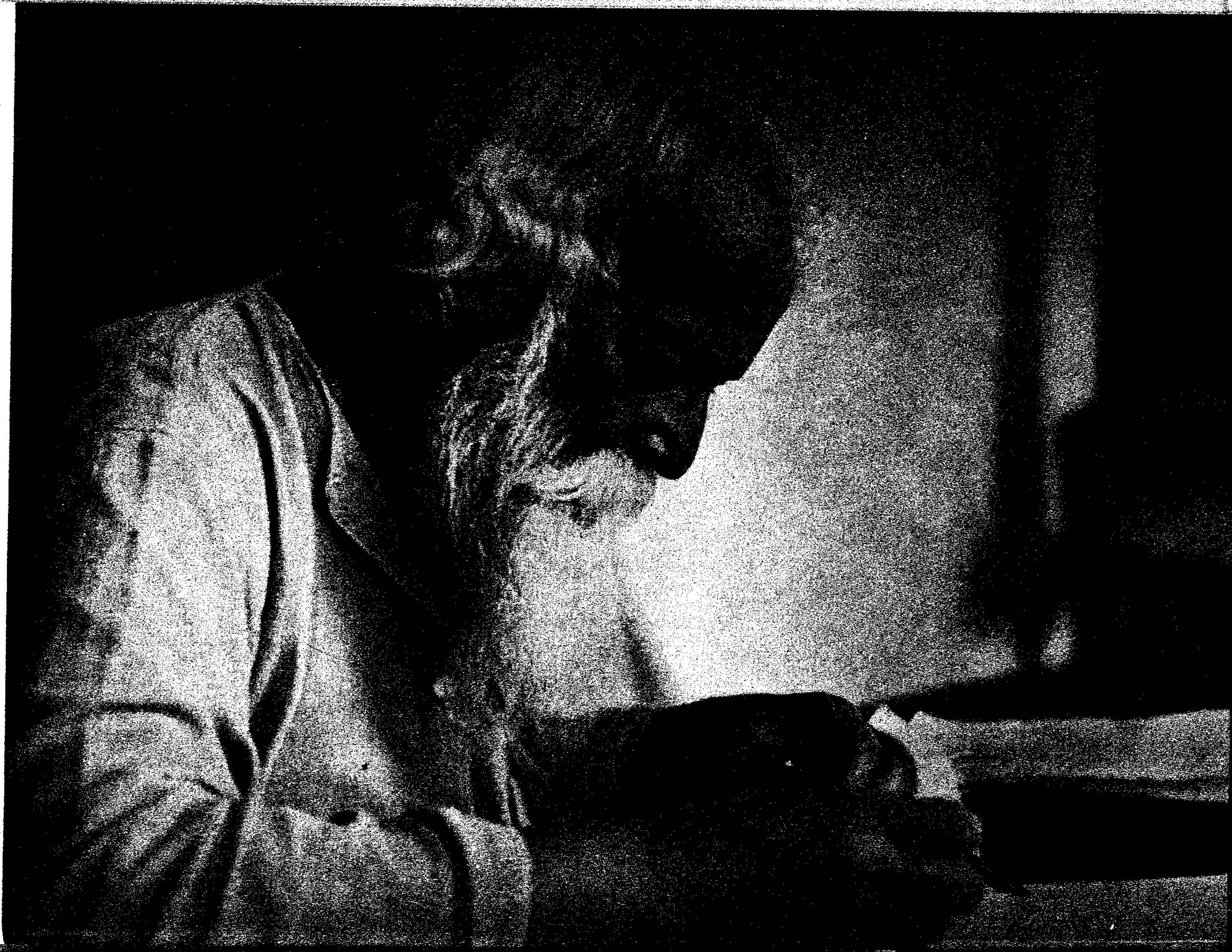

রবীন্দ্রনাথ

উদয়ন
সেপ্টেম্বর ১৯৩৭

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বিশী
কর্তৃক গৃহীত

নবজাতক

নবজাতক

নবীন আগন্তুক,
নব যুগ তব যাত্রার পথে
চেয়ে আছে উৎসুক।
কী বার্তা নিয়ে মর্তে এসেছ তুমি ;
জীবনরঙ্গভূমি
তোমার লাগিয়া পাতিয়াছে কী আসন।
নরদেবতার পূজায় এনেছ
কী নব সম্ভাষণ।
অমরলোকের কী গান এসেছ শুনে।
তরুণ বীরের তূণে
কোন্ মহাস্ত্র বেঁধেছ কটির 'পরে
অমঙ্গলের সাথে সংগ্রাম-তরে।
রক্তপ্লাবনে পঙ্কিল পথে
বিদ্বেষে বিচ্ছেদে
হয়তো রচিবে মিলনতীর্থ
শান্তির বাঁধ বেঁধে।
কে বলিতে পারে তোমার ললাটে লিখা
কোন্ সাধনার অদৃশ্য জয়টিকা।
আজিকে তোমার অলিখিত নাম
আমরা বেড়াই খুঁজি—
আগামী প্রাতের শুকতারা-সম
নেপথ্যে আছে বুঝি।

মানবের শিশু বারে বারে আনে
চির আশ্বাসবাণী—
নূতন প্রভাতে মুক্তির আলো
বুঝি-বা দিতেছে আনি

শান্তিনিকেতন
১৯ অগস্ট, ১৯৩৮

উদ্‌বোধন

প্রথম যুগের উদয়দিগঙ্গনে
প্রথম দিনের উষা নেমে এল যবে
প্রকাশপিয়াসি ধরিত্রী বনে বনে
শুধায়ে ফিরিল, সুর খুঁজে পাবে কবে।
এসো এসো সেই নব সৃষ্টির কবি
নবজাগরণযুগপ্রভাতের রবি।
গান এনেছিলে নব ছন্দের তালে
তরুণী উষার শিশিরস্নানের কালে,
আলো-আঁধারের আনন্দবিপ্লবে।

সে গান আজিও নানা রাগরাগিণীতে
শুনাও তাহারে আগমনীসংগীতে
যে জাগায় চোখে নূতন দেখার দেখা।
যে এসে দাঁড়ায় ব্যাকুলিত ধরণীতে
বননীলিমার পেলব সীমানাটিতে,
বহু জনতার মাঝে অপূর্ব একা।
অবাক আলোর লিপি যে বহিয়া আনে
নিভৃত প্রহরে কবির চকিত প্রাণে,
নব পরিচয়ে বিরহব্যথা যে হানে
বিহ্বল প্রাতে সংগীতসৌরভে,
দূর-আকাশের অরুণিম উৎসবে।

যে জাগায় জাগে পূজার শঙ্খধ্বনি,
বনের ছায়ায় লাগায় পরশমণি,
যে জাগায় মোছে ধরার মনের কালী
মুক্ত করে সে পূর্ণ মাধুরী-ডালি।
জাগে সুন্দর, জাগে নির্মল, জাগে আনন্দময়ী—
জাগে জড়ত্বজয়ী।
জাগো সকলের সাথে
আজি এ সুপ্রভাতে,
বিশ্বজনের প্রাঙ্গণতলে লহো আপনার স্থান—
তোমার জীবনে সার্থক হোক
নিখিলের আহ্বান।

[কালিম্পং]
২৫ বৈশাখ, ১৩৪৫

শেষদৃষ্টি

আজি এ আঁখির শেষদৃষ্টির দিনে
ফাগুনবেলার ফুলের খেলার
দানগুলি লব চিনে
দেখা দিয়েছিল মুখর প্রহরে
দিনের দুয়ার খুলি,
তাদের আভায় আজি মিলে যায়
রাঙা গোধূলির শেষতুলিকায়
ক্ষণিকের রূপ-রচনলীলায়
সন্ধ্যার রঙগুলি।

যে অতিথিদেহে ভোরবেলাকার
রূপ নিল ভৈরবী,

অস্তরবির দেহলিদুয়ারে
বাঁশিতে আজিকে আঁকিল উহারে
মূলতানরাগে সুরের প্রতিমা
গেরুয়া রঙের ছবি।

খনে খনে যত মর্মভেদিনী
বেদনা পেয়েছে মন
নিয়ে সে দুঃখ ধীর আনন্দে
বিষাদকরুণ শিল্পছন্দে
অগোচর কবি করেছে রচনা
মাধুরী চিরন্তন।

একদা জীবনে সুখের শিহর
নিখিল করেছে প্রিয়।
মরণপরশে আজি কুণ্ঠিত
অন্তরালে সে অবগুণ্ঠিত,
অদেখা আলোকে তাকে দেখা যায়
কী অনির্বচনীয়।

যা গিয়েছে তার অধরারূপের
অলখ পরশখানি
যা রয়েছে তারি তারে বাঁধে সুর,
দিক্‌সীমানার পারের সুদূর
কালের অতীত ভাবার অতীত
শুনায় দৈববাণী।

সেঁজুতি। শান্তিনিকেতন
১২ জানুয়ারি, ১৯৪০

প্রায়শ্চিত্ত

উপর আকাশে সাজানো তড়িৎ-আলো—
নিম্নে নিবিড় অতিবর্বর কালো
ভূমিগর্ভের রাতে—
ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের
নিদারুণ সংঘাতে
ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন,
সভ্যনামিক পাতালে যেথায়
জমেছে লুটের ধন।

দুঃসহ তাপে গর্জি উঠিল
ভূমিকম্পের রোল,
জয়তোরণের ভিত্তিভূমিতে
লাগিল ভীষণ দোল।
বিদীর্ণ হল ধনভাণ্ডারতল,
জাগিয়া উঠিছে গুপ্ত গুহায়
কালীনাগিনীর দল।
দুলিছে বিকট ফণা,
বিষনিশ্বাসে ফুঁসিছে অগ্নিকণা।

নিরর্থ হাহাকারে
দিয়ো না দিয়ো না অভিশাপ বিধাতারে
পাপের এ সঞ্চয়
সর্বনাশের পাগলের হাতে
আগে হয়ে যাক ক্ষয়।
বিষম দুঃখে ব্রণের পিণ্ড
বিদীর্ণ হয়ে, তার
কলুষপুঞ্জ ক'রে দিক উদ্গার।

ধরার বক্ষ চিরিয়া চলুক
বিজ্ঞানী হাড়গিলা,
রক্তসিক্ত লুব্ধ নখর
একদিন হবে ঢিলা।

প্রতাপের ভোজে আপনারে যারা বলি করেছিল দান
সে-দুর্বলের দলিত পিষ্ট প্রাণ
নরমাংসাশী করিতেছে কাড়াকাড়ি,
ছিন্ন করিছে নাড়ী।
তীক্ষ্ণ দশনে টানাছেঁড়া তারি দিকে দিকে যায় ব্যেপে
রক্তপঙ্কে ধরার অঙ্ক লেপে।
সেই বিনাশের প্রচণ্ড মহাবেগে
একদিন শেষে বিপুলবীর্য শান্তি উঠিবে জেগে।
মিছে করিব না ভয়,
ক্ষোভ জেগেছিল তাহারে করিব জয়।
জমা হয়েছিল আরামের লোভে
দুর্বলতার রাশি,
লাগুক তাহাতে লাগুক আগুন—
ভস্মে ফেলুক গ্রাসি।

ঐ দলে দলে ধার্মিক ভীরু
কারা চলে গির্জায়
চাটুবাণী দিয়ে ভুলাইতে দেবতায়।
দীনাত্মাদের বিশ্বাস, ওরা
ভীত প্রার্থনারবে
শান্তি আনিবে ভবে।
কৃপণ পূজায় দিবে নাকো কড়িকড়া।
থলিতে ঝুলিতে কষিয়া আঁটিবে
শত শত দড়িদড়া।

শুধু বাণীকৌশলে
জিনিবে ধরণীতলে।
স্তূপাকার লোভ
বক্ষে রাখিয়া জমা
কেবল শাস্ত্রমন্ত্র পড়িয়া
লবে বিধাতার ক্ষমা।

সবে না দেবতা হেন অপমান
এই ফাঁকি ভক্তির।
যদি এ ভুবনে থাকে আজো তেজ
কল্যাণশক্তির
ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত
পূর্ণ করিয়া শেষে
নূতন জীবন নূতন আলোকে
জাগিবে নূতন দেশে।

বিজয়াদশমী
[১৭ আশ্বিন] ১৩৪৫

বুদ্ধভক্তি

জাপানের কোনো কাগজে পড়েছি জাপানি সৈনিক যুদ্ধের সাফল্য কামনা ক'রে বুদ্ধমন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছিল। ওরা শক্তির বাণ মারছে চীনকে; ভক্তির বাণ বুদ্ধকে।

হুংকৃত যুদ্ধের বাদ্য
সংগ্রহ করিবারে শমনের খাদ্য।
সাজিয়াছে ওরা সবে উৎকটদর্শন,
দন্তে দন্তে ওরা করিতেছে ঘর্ষণ,
হিংসার উষ্মায় দারুণ অধীর
সিদ্ধির বর চায় করুণানিধির—
ওরা তাই স্পর্ধায় চলে
বুদ্ধের মন্দিরতলে।

তুরী ভেরি বেজে ওঠে রোষে গরোগরো,
ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরোথরো।

গর্জিয়া প্রার্থনা করে—
আর্তরোদন যেন জাগে ঘরে ঘরে।
আত্মীয়বন্ধন করি দিবে ছিন্ন,
গ্রামপল্লীর রবে ভস্মের চিহ্ন,
হানিবে শূন্য হতে বহ্নি-আঘাত,
বিদ্যার নিকেতন হবে ধূলিসাৎ—
বক্ষ ফুলায়ে বর যাচে
দয়াময় বুদ্ধের কাছে।
তুরী ভেরি বেজে ওঠে রোষে গরোগরো,
ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরোথরো।

হত-আহতের গণি সংখ্যা
তালে তালে মন্দ্রিত হবে জয়ডঙ্কা।
নারীর শিশুর যত কাটা-ছেঁড়া অঙ্গ
জাগাবে অট্টহাসে পৈশাচী রঙ্গ,
মিথ্যায় কলুষিবে জনতার বিশ্বাস,
বিষবাষ্পের বাণে রোধি দিবে নিশ্বাস—
মুষ্টি উঁচায়ে তাই চলে
বুদ্ধেরে নিতে নিজ দলে।
তুরী ভেরি বেজে ওঠে রোষে গরোগরো,
ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরোথরো।

শান্তিনিকেতন
৭ জানুয়ারি, ১৯৩৮

কেন

জ্যোতিষীরা বলে,
সবিতার আত্মদানযজ্ঞের হোমাগ্নিবেদিতলে
যে জ্যোতি উৎসর্গ হয় মহারুদ্রতপে
এ বিশ্বের মন্দিরমণ্ডপে,
অতিতুচ্ছ অংশ তার ঝরে
পৃথিবীর অতিক্ষুদ্র মৃৎপাত্রের 'পরে।
অবশিষ্ট অমেয় আলোকধারা
পথহারা,
আদিম দিগন্ত হতে
অক্লান্ত চলেছে ধেয়ে নিরুদ্দেশ স্রোতে।
সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছে অপার তিমির-তেপান্তরে
অসংখ্য নক্ষত্র হতে রশ্মিপ্লাবী নিরন্ত নির্ঝরে
সর্বত্যাগী অপব্যয়,
আপন সৃষ্টির 'পরে বিধাতার নির্মম অন্যায়।
কিংবা এ কি মহাকাল কল্পকল্পান্তের দিনে রাতে
এক হাতে দান ক'রে ফিরে ফিরে নেয় অন্য হাতে।
সঞ্চয়ে ও অপচয়ে যুগে যুগে কাড়াকাড়ি যেন—
কিন্তু, কেন।

তার পরে চেয়ে দেখি মানুষের চৈতন্যজগতে
ভেসে চলে সুখদুঃখ কল্পনাভাবনা কত পথে।
কোথাও বা জ্ব'লে ওঠে জীবন-উৎসাহ,
কোথাও বা সভ্যতার চিতাবহ্নিদাহ
নিভে আসে নিঃস্বতার ভস্ম-অবশেষে।
নির্ঝর ঝরিছে দেশে দেশে—
লক্ষ্যহীন প্রাণস্রোত মৃত্যুর গহ্বরে ঢালে মহী
বাসনার বেদনার অজস্র বুদ্‌বুদপুঞ্জ বহি।
কে তার হিসাব রাখে লিখি।

নিত্য নিত্য এমনি কি
অফুরান আত্মহত্যা মানবসৃষ্টির
নিরন্তর প্রলয়বৃষ্টির
অশ্রান্ত প্লাবনে।
নিরর্থক হরণে ভরণে
মানুষের চিত্ত নিয়ে সারাবেলা
মহাকাল করিতেছে দ্যূতখেলা
বাঁ হাতে দক্ষিণ হাতে যেন—
কিন্তু, কেন।

প্রথম বয়সে কবে ভাবনার কী আঘাত লেগে
এ প্রশ্নই মনে উঠেছিল জেগে—
শুধায়েছি, এ বিশ্বের কোন্ কেন্দ্রস্থলে
মিলিতেছে প্রতি দণ্ডে পলে
অরণ্যের পর্বতের সমুদ্রের উল্লোল গর্জন,
ঝটিকার মন্দ্রস্বন,
দিবসনিশার
বেদনাবীণার তারে চেতনার মিশ্রিত ঝংকার,
পূর্ণ করি ঋতুর উৎসব
জীবনের মরণের নিত্যকলরব,
আলোকের নিঃশব্দ চরণপাত
নিয়ত স্পন্দিত করি দ্যুলোকের অন্তহীন রাত।
কল্পনায় দেখেছিনু, প্রতিধ্বনিমণ্ডল বিরাজে
ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরকন্দর-মাঝে।
সেথা বাঁধে বাসা
চতুর্দিক হতে আসি জগতের পাখা-মেলা ভাষা।
সেথা হতে পুরানো স্মৃতিরে দীর্ণ করি
সৃষ্টির আরম্ভবীজ লয় ভরি ভরি
আপনার পক্ষপুটে ফিরে-চলা যত প্রতিধ্বনি।
অনুভব করেছি তখনি,

বহু যুগযুগান্তের কোন্ এক বাণীধারা
নক্ষত্রে নক্ষত্রে ঠেকি পথহারা
সংহত হয়েছে অবশেষে
মোর মাঝে এসে।
প্রশ্ন মনে আসে আরবার,
আবার কি ছিন্ন হয়ে যাবে সূত্র তার—
রূপহারা গতিবেগ প্রেতের জগতে
চলে যাবে বহু কোটি বৎসরের শূন্য যাত্রাপথে?
উজাড় করিয়া দিবে তার
পান্থের পাথেয়পাত্র আপন স্বল্পায়ু বেদনার—
ভোজশেষে উচ্ছিষ্টের ভাঙা ভাণ্ড হেন?
কিন্তু, কেন।

শান্তিনিকেতন
১২ অক্টোবর, ১৯৩৮

হিন্দুস্থান

মোরে হিন্দুস্থান
বারবার করেছে আহ্বান
কোন্ শিশুকাল হতে পশ্চিমদিগন্ত-পানে,
ভারতের ভাগ্য যেথা নৃত্যলীলা করেছে শ্মশানে,
কালে কালে
তাণ্ডবের তালে তালে,
দিল্লিতে আগ্রাতে
মঞ্জীরঝংকার আর দূর শকুনির ধ্বনি-সাথে;
কালের মন্থনদণ্ডঘাতে
উচ্ছলি উঠেছে যেথা পাথরের ফেনস্তূপে
অদৃষ্টের অট্টহাস্য অভ্রভেদী প্রাসাদের রূপে।

লক্ষ্মী-অলক্ষ্মীর দুই বিপরীত পথে
রথে প্রতিরথে
ধূলিতে ধূলিতে যেথা পাকে পাকে করেছে রচনা
জটিল রেখায় জালে শুভ-অশুভের আল্‌পনা।
নব নব ধ্বজা হাতে নব নব সৈনিকবাহিনী
এক কাহিনীর সূত্র ছিন্ন করি আরেক কাহিনী
বারংবার গ্রন্থি দিয়ে করেছে যোজন।
প্রাঙ্গণপ্রাচীর যার অকস্মাৎ করেছে লঙ্ঘন
দস্যুদল,
অর্ধরাত্রে দ্বার ভেঙে জাগিয়েছে আর্ত কোলাহল,
করেছে আসন-কাড়াকাড়ি,
ক্ষুধিতের অন্নথালি নিয়েছে উজাড়ি।
রাত্রিরে ভুলিল তারা ঐশ্বর্যের মশাল-আলোয়—
পীড়িত পীড়নকারী দোঁহে মিলি সাদায় কালোয়
যেখানে রচিয়াছিল দ্যূতখেলাঘর,
অবশেষে সেথা আজ একমাত্র বিরাট কবর
প্রান্ত হতে প্রান্তে প্রসারিত ;
সেথা জয়ী আর পরাজিত
একত্রে করেছে অবসান
বহু শতাব্দীর যত মান অসম্মান।
ভগ্নজানু প্রতাপের ছায়া সেথা শীর্ণ যমুনায়
প্রেতের আহ্বান বহি চলে যায়,
বলে যায়—
আরো ছায়া ঘনাইছে অন্তদিগন্তের
জীর্ণ যুগান্তের।

শান্তিনিকেতন
১৯ এপ্রিল, ১৯৩৭

রাজপুতানা

এই ছবি রাজপুতানার ;
এ দেখি মৃত্যুর পৃষ্ঠে বেঁচে থাকিবার
দুর্বিবহ বোঝা।
হতবুদ্ধি অতীতের এই যেন খোঁজা
পথভ্রষ্ট বর্তমানে অর্থ আপনার,
শূন্যেতে হারানো অধিকার।
ঐ তার গিরিদুর্গে অবরুদ্ধ নিরর্থ ভ্রূকুটি,
ঐ তার জয়স্তম্ভ তোলে ক্রুদ্ধ মুঠি
বিরুদ্ধ ভাগ্যের পানে।
মৃত্যুতে করেছে গ্রাস তবুও যে মরিতে না জানে,
ভোগ করে অসম্মান অকালের হাতে
দিনে রাতে,
অসাড় অন্তরে
গ্লানি অনুভব নাহি করে,
আপনারি চাটুবাক্যে আপনারে ভুলায় আশ্বাসে—
জানে না সে,
পরিপূর্ণ কত শতাব্দীর পণ্যরথ
উত্তীর্ণ না হতে পথ
ভগ্নচক্র পড়ে আছে মরুর প্রান্তরে,
ম্রিয়মাণ আলোকের প্রহরে প্রহরে
বেড়িয়াছে অন্ধ বিভাবরী
নাগপাশে ; ভাষাভোলা ধূলির করুণা লাভ করি
একমাত্র শান্তি তাহাদের।
লজ্ঘন যে করে নাই ভোলামনে কালের বাঁধের
অন্তিম নিষেধসীমা—
ভগ্নস্তূপে থাকে তার নামহীন প্রচ্ছন্ন মহিমা ;
জেগে থাকে কল্পনার ভিতে
ইতিবৃত্তহারা তার ইতিহাস উদার ইঙ্গিতে।

কিন্তু এ নির্লজ্জ কায়া। কালের উপেক্ষাদৃষ্টি-কাছে
না থেকেও তবু আছে।
একি আত্মবিস্মরণমোহ,
বীর্যহীন ভিত্তি-'পরে কেন রচে শূন্য সমারোহ।
রাজ্যহীন সিংহাসনে অত্যুক্তির রাজা,
বিধাতার সাজা।

হোথা যারা মাটি করে চাষ
রৌদ্রবৃষ্টি শিরে ধরি বারো মাস,
ওরা কভু আধামিথ্যা রূপে
সত্যেরে তো হানে না বিদ্রূপে।
ওরা আছে নিজ স্থান পেয়ে;
দারিদ্র্যের মূল্য বেশি লুপ্তমূল্য ঐশ্বর্যের চেয়ে।

এদিকে চাহিয়া দেখো টিটাগড়।
লোষ্ট্রে লৌহে বন্দী হেথা কালবৈশাখীর পণ্যঝড়।
বণিকের দম্ভে নাই বাধা,
আসমুদ্র পৃথ্বীতলে দৃপ্ত তার অক্ষুণ্ন মর্যাদা।
প্রয়োজন নাহি জানে ওরা
ভূষণে সাজায়ে হাতিঘোড়া
সম্মানের ভান করিবার,
ভুলাইতে ছদ্মবেশী সমুচ্চ তুচ্ছতা আপনার।
শেষের পংক্তিতে যবে থামিবে ওদের ভাগ্যলিখা,
নামিবে অন্তিম যবনিকা,
উত্তাল রজতপিণ্ড-উদ্ধারের শেষ হবে পালা,
যন্ত্রের কিঙ্করগুলো নিয়ে ভস্মডালা
লুপ্ত হবে নেপথ্যে যখন,
পশ্চাতে যাবে না রেখে প্রেতের প্রগল্‌ভ প্রহসন।

উদাত্ত যুগের রথে বল্গাধরা সে রাজপুতানা
মরুপ্রস্তরের স্তরে একদিন দিল মুষ্টি হানা;

তুলিল উচ্ছেদ করি কল্লোলোলে মহা-ইতিহাস
প্রাণে উচ্ছ্বসিত, মৃত্যুতে ফেনিল ; তারি তপ্তশ্বাস
স্পর্শ দেয় মনে, রক্ত উঠে আবর্তিয়া বুকে—
সে যুগের সুদূর সম্মুখে
স্তব্ধ হয়ে ভুলি এই কৃপণ কালের দৈন্যপাশে-
জর্জরিত, নতশির অদৃষ্টের অট্টহাসে,
গলবদ্ধ পশুশ্রেণীসম চলে দিন পরে দিন
লজ্জাহীন।
জীবনমৃত্যুর দ্বন্দ্ব-মাঝে
সেদিন যে দুন্দুভি মন্দ্রিয়াছিল তার প্রতিধ্বনি বাজে
প্রাণের কুহরে গুমরিয়া। নির্ভয় দুর্দান্ত খেলা,
মনে হয়, সেই তো সহজ, দূরে নিক্ষেপিয়া ফেলা
আপনারে নিঃসংশয় নিষ্ঠুর সংকটে। তুচ্ছ প্রাণ
নহে তো সহজ ; মৃত্যুর বেদিতে যার কোনো দান
নাই কোনো কালে সেই তো দুর্ভর অতি,
আপনার সঙ্গে নিত্য বাল্যপনা দুঃসহ দুর্গতি।
প্রচণ্ড সত্যেরে ভেঙে গল্পে রচে অলস কল্পনা
নিষ্কর্মার স্বাদু উত্তেজনা,
নাট্যমঞ্চে ব্যঙ্গ করি বীরসাজে
তারস্বর আস্ফালনে উন্মত্ততা করে কোন্ লাজে।
তাই ভাবি হে রাজপুতানা,
কেন তুমি মানিলে না যথাকালে প্রলয়ের মানা,
লভিলে না বিনষ্টির শেষ স্বর্গলোক ;
জনতার চোখ
দীপ্তিহীন
কৌতুকের দৃষ্টিপাতে পলে পলে করে যে মলিন।
শঙ্করের তৃতীয় নয়ন হতে
সম্মান নিলে না কেন যুগান্তের বহ্নির আলোতে।

মংপু
২২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫

ভাগ্যরাজ্য

আমার এ ভাগ্যরাজ্যে পুরানো কালের যে প্রদেশ,
আয়ুহারাদের ভগ্নশেষ
সেথা পড়ে আছে
পূর্বদিগন্তের কাছে।
নিঃশেষ করেছে মূল্য সংসারের হাটে,
অনাবশ্যকের ভাঙা ঘাটে
জীর্ণ দিন কাটাইছে তারা
অর্থহারা।
ভগ্ন গৃহে লগ্ন ঐ অর্ধেক প্রাচীর ;
আশাহীন পূর্ব আসক্তির
কাঙাল শিকড়জাল
বৃথা আঁকড়িয়া ধরে প্রাণপণে বর্তমান কাল।
আকাশে তাকায় শিলালেখ,
তাহার প্রত্যেক
অস্পষ্ট অক্ষর আজ পাশের অক্ষরে
ক্লান্ত স্বরে প্রশ্ন করে,
"আরো কি রয়েছে বাকি কোনো কথা,
শেষ হয়ে যায় নি বারতা।"

এ আমার ভাগ্যরাজ্যে অন্যত্র হোথায় দিগন্তরে
অসংলগ্ন ভিত্তি-'পরে
করে আছে চুপ
অসমাপ্ত আকাঙ্ক্ষার অসম্পূর্ণ রূপ।
অকথিত বাণীর ইঙ্গিতে
চারিভিতে
নীরবতা-উৎকণ্ঠিত মুখ
রয়েছে উৎসুক।

একদা যে যাত্রীদের সংকল্পে ঘটেছে অপঘাত,
অন্ত পথে গেছে অকস্মাৎ,
তাদের চকিত আশা,
স্থকিত চলার স্তব্ধ ভাষা
জানায়, হয় নি চলা সারা—
দুরাশার দূরতীর্থ আজো নিত্য করিছে ইশারা।
আজিও কালের সভা-মাঝে
তাদের প্রথম সাজে
পড়ে নাই জীর্ণতার দাগ,
লক্ষ্যচ্যুত কামনায় রয়েছে আদিম রক্তরাগ।
কিছু শেষ করা হয় নাই,
হেরো, তাই
সময় যে পেল না নবীন
কোনোদিন
পুরাতন হতে—
শৈবালে ঢাকে নি তারে বাঁধা-পড়া ঘাটে-লাগা স্রোতে ;
স্মৃতির বেদনা কিছু, কিছু পরিতাপ,
কিছু অপ্রাপ্তির অভিশাপ
তারে নিত্য রেখেছে উজ্জ্বল ;
না দেয় নীরস হতে মজ্জাগত গুপ্ত অশ্রুজল।
যাত্রাপথ-পাশে
আছ তুমি আধো-ঢাকা ঘাসে—
পাথরে খুদিতেছিনু, হে মূর্তি, তোমারে কোন্ ক্ষণে
কিসের কল্পনে।
অপূর্ণ তোমার কাছে পাই না উত্তর।
মনে যে কী ছিল মোর
যেদিন ফুটিত তাহা শিল্পের সম্পূর্ণ সাধনাতে
শেষ-রেখাপাতে,
সেদিন তা জানিতাম আমি ;
তার আগে চেষ্টা গেছে থামি।

সেই শেষ না-জানার
নিত্য নিরুত্তরখানি মর্মমাঝে রয়েছে আমার ;
স্বপ্নে তার প্রতিবিম্ব ফেলি
সচকিত আলোকের কটাক্ষে সে করিতেছে কেলি।

আলমোড়া
১৬ মে, ১৯৩৭

ভূমিকম্প

হায় ধরিত্রী, তোমার আঁধার পাতালদেশে
অন্ধ রিপু লুকিয়েছিল ছদ্মবেশে—
সোনার পুঞ্জ যেথায় রাখ,
আঁচলতলে যেথায় ঢাক
কঠিন লৌহ, মৃত্যুদূতের চরণধূলির
পিণ্ড তারা, খেলা জোগায়
যমালয়ের ডাণ্ডাগুলির।

উপর তলায় হাওয়ার দোলায় নবীন ধানে
ধানশ্রীসুর মূর্ছনা দেয় সবুজ গানে।
দুঃখে সুখে স্নেহে প্রেমে
স্বর্গ আসে মর্তে নেমে,
ঋতুর ডালি ফুল-ফসলের অর্ঘ্য বিলায়,
ওড়না রাঙে ধূপছায়াতে
প্রাণনটিনীর নৃত্যলীলায়।

অন্তরে তোর গুপ্ত যে পাপ রাখলি চেপে
তার ঢাকা আজ স্তরে স্তরে উঠল কেঁপে।
যে বিশ্বাসের আবাসখানি
ধ্রুব ব'লেই সবাই জানি

এক নিমেষে মিশিয়ে দিলি ধূলির সাথে,
প্রাণের দারুণ অবমানন
ঘটিয়ে দিলি জড়ের হাতে।

বিপুল প্রতাপ থাক্-না যতই বাহির দিকে
কেবল সেটা স্পর্ধাবলে রয় না টিঁকে।
দুর্বলতা কুটিল হেসে
ফাটল ধরায় তলায় এসে—
হঠাৎ কখন দিগ্‌ব্যাপিনী কীর্তি যত
দর্পহারীর অট্টহাস্যে
যায় মিলিয়ে স্বপ্নমতো।

হে ধরণী, এই ইতিহাস সহস্রবার
যুগে যুগে উদ্‌ঘাটিলে সামনে সবার।
জাগল দম্ভ বিরাট রূপে,
মজ্জায় তার চুপে চুপে
লাগল রিপুর অলক্ষ্য বিষ সর্বনাশা—
রূপক নাট্যে ব্যাখ্যা তারি
দিয়েছ আজ ভীষণ ভাষায়।

যে যথার্থ শক্তি সে তো শান্তিময়ী,
সৌম্য তাহার কল্যাণরূপ বিশ্বজয়ী।
অশক্তি তার আসন পেতে
ছিল তোমার অন্তরেতে—
সেই তো ভীষণ, নিষ্ঠুর তার বীভৎসতা,
নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠাহীন
তাই সে এমন হিংসারতা।

৬ চৈত্র [১৩৪০]

পক্ষীমানব

যন্ত্রদানব, মানবে করিলে পাখি।
স্থল জল যত তার পদানত
আকাশ আছিল বাকি।

বিধাতার দান পাখিদের ডানাদুটি।
রঙের রেখায় চিত্রলেখায়
আনন্দ উঠে ফুটি ;
তারা যে রঙিন পান্থ মেঘের সাথি।
নীল গগনের মহাপবনের
যেন তারা একজাতি।
তাহাদের লীলা বায়ুর ছন্দে বাঁধা ;
তাহাদের প্রাণ, তাহাদের গান
আকাশের সুরে সাধা ;
তাই প্রতিদিন ধরণীর বনে বনে
আলোক জাগিলে একতানে মিলে
তাহাদের জাগরণে।
মহাকাশতলে যে মহাশান্তি আছে
তাহাতে লহরী কাঁপে থরথরি
তাদের পাখার নাচে।

যুগে যুগে তারা গগনের পথে পথে
জীবনের বাণী দিয়েছিল আনি
অরণ্যে পর্বতে ;
আজি একি হল, অর্থ কে তার জানে।
স্পর্ধা পতাকা মেলিয়াছে পাখা
শক্তির অভিমানে।
তারে প্রাণদেব করে নি আশীর্বাদ।

তাহারে আপন করে নি তপন,
মানে নি তাহারে চাঁদ।
আকাশের সাথে অমিল প্রচার করি
কর্কশস্বরে গর্জন করে
বাতাসেরে জর্জরি।
আজি মানুষের কলুষিত ইতিহাসে
উঠি মেঘলোকে স্বর্গ-আলোকে
হানিছে অট্টহাসে।
যুগান্ত এল বুঝিলাম অনুমানে—
অশান্তি আজ উদ্যত বাজ
কোথাও না বাধা মানে;
ঈর্ষা হিংসা জ্বালি মৃত্যুর শিখা
আকাশে আকাশে বিরাট বিনাশে
জাগাইল বিভীষিকা।
দেবতা যেথায় পাতিবে আসনখানি
যদি তার ঠাঁই কোনোখানে নাই
তবে, হে বজ্রপাণি,
এ ইতিহাসের শেষ অধ্যায়তলে
রুদ্রের বাণী দিক দাঁড়ি টানি
প্রলয়ের রোষানলে।

আর্ত ধরার এই প্রার্থনা শুন—
শ্যামবনবীথি পাখিদের গীতি
সার্থক হোক পুন।

২৫ ফাল্গুন, ১৩৩৮

আহ্বান

কানাডার প্রতি

বিশ্ব জুড়ে ক্ষুব্ধ ইতিহাসে
অন্ধবেগে ঝঞ্ঝাবায়ু হুংকারিয়া আসে
ধ্বংস করে সভ্যতার চূড়া।
ধর্ম আজি সংশয়েতে নত,
যুগযুগের তাপসদের সাধনধন যত
দানবপদদলনে হল গুঁড়া।
তোমরা এসো তরুণ জাতি সবে
মুক্তিরণ-ঘোষণাবাণী জাগাও বীররবে।
তোলো অজেয় বিশ্বাসের কেতু।
রক্তে-রাঙা ভাঙন-ধরা পথে
দুর্গমেরে পেরোতে হবে বিঘ্নজয়ী রথে,
পরান দিয়ে বাঁধিতে হবে সেতু।
ত্রাসের পদাঘাতের তাড়নায়,
অসম্মান নিয়ো না শিরে, ভুলো না আপনায়।
মিথ্যা দিয়ে, চাতুরী দিয়ে, রচিয়া গুহাবাস
পৌরুষেরে কোরো না পরিহাস।
বাঁচাতে নিজ প্রাণ
বলীর পদে দুর্বলেরে কোরো না বলিদান।

জোড়াসাঁকো, কলিকাতা
১ এপ্রিল, ১৯৩৯

রাতের গাড়ি

এ প্রাণ, রাতের রেলগাড়ি,
দিল পাড়ি—
কামরায় গাড়িভরা ঘুম,
রজনী নিঃঝুম।

অসীম আঁধারে
কালি-লেপা কিছু-নয় মনে হয় যারে
নিদ্রার পারে রয়েছে সে
পরিচয়হারা দেশে।
ক্ষণ-আলো ইঙ্গিতে উঠে ঝলি,
পার হয়ে যায় চলি
অজানার পরে অজানায়,
অদৃশ্য ঠিকানায়।
অতিদূর-তীর্থের যাত্রী,
ভাষাহীন রাত্রি,
দূরের কোথা যে শেষ
ভাবিয়া না পাই উদ্দেশ।
চালায় যে নাম নাহি কয় ;
কেউ বলে, যন্ত্র সে, আর কিছু নয়।
মনোহীন বলে তারে, তবু অন্ধের হাতে
প্রাণমন সঁপি দিয়া বিছানা সে পাতে।
বলে, সে অনিশ্চিত, তবু জানে অতি
নিশ্চিত তার গতি।
নামহীন যে অচেনা বার বার পার হয়ে যায়
অগোচরে যারা সবে রয়েছে সেথায়,
তারি যেন বহে নিশ্বাস,
সন্দেহ-আড়ালেতে মুখ-ঢাকা জাগে বিশ্বাস।
গাড়ি চলে,
নিমেষ বিরাম নাই আকাশের তলে।
ঘুমের ভিতরে থাকে অচেতনে
কোন্ দূর প্রভাতের প্রত্যাশা নিদ্রিত মনে।

উদয়ন, শান্তিনিকেতন
২৮ মার্চ, ১৯৪০

মৌলানা জিয়াউদ্দীন

কখনো কখনো কোনো অবসরে
　　নিকটে দাঁড়াতে এসে ;
'এই যে' বলেই তাকাতেম মুখে,
　　'বোসো' বলিতাম হেসে।
দু-চারটে হত সামান্য কথা,
　　ঘরের প্রশ্ন কিছু,
গভীর হৃদয় নীরবে রহিত
　　হাসিতামাশার পিছু।
কত সে গভীর প্রেম সুনিবিড়,
　　অকথিত কত বাণী,
চিরকাল-তরে গিয়েছ যখন
　　আজিকে সে কথা জানি।
প্রতি দিবসের তুচ্ছ খেয়ালে
　　সামান্য যাওয়া-আসা,
সেটুকু হারালে কতখানি যায়
　　খুঁজে নাহি পাই ভাষা।

তব জীবনের বহু সাধনার
　　যে পণ্যভার ভরি
মধ্যদিনের বাতাসে ভাসালে
　　তোমার নবীন তরী,
যেমনি তা হোক মনে জানি তার
　　এতটা মূল্য নাই
যার বিনিময়ে পাবে তব স্মৃতি
　　আপন নিত্য ঠাঁই—
সেই কথা স্মরি বার বার আজ
　　লাগে ধিক্‌কার প্রাণে—
অজানা জনের পরম মূল্য
　　নাই কি গো কোনোখানে।

এ অবহেলার বেদনা বোঝাতে
কোথা হতে খুঁজে আনি
ছুরির আঘাত যেমন সহজ
তেমন সহজ বাণী।
কারো কবিত্ব, কারো বীরত্ব,
কারো অর্থের খ্যাতি—
কেহ-বা প্রজার সুহৃদ্ সহায়,
কেহ-বা রাজার জ্ঞাতি—
তুমি আপনার বন্ধুজনেরে
মাধুর্যে দিতে সাড়া,
ফুরাতে ফুরাতে রবে তবু তাহা
সকল খ্যাতির বাড়া।
ভরা আষাঢ়ের যে মালতীগুলি
আনন্দমহিমায়
আপনার দান নিঃশেষ করি
ধুলায় মিলায়ে যায়—
আকাশে আকাশে বাতাসে তাহারা
আমাদের চারি পাশে
তোমার বিরহ ছড়ায়ে চলেছে
সৌরভনিশ্বাসে।

শান্তিনিকেতন
৮ জুলাই, ১৯৩৮

অস্পষ্ট

আজি ফাল্গুনে দোলপূর্ণিমারাত্রি,
উপছায়া-চলা বনে বনে মন
আবছা পথের যাত্রী।
ঘুম-ভাঙানিয়া জোছনা—
কোথা থেকে যেন আকাশে কে বলে,
'একটুকু কাছে বোসো না।'

ফিস্‌ফিস্‌ করে পাতায় পাতায়,
উস্‌খুস্‌ করে হাওয়া।
ছায়ার আড়ালে গন্ধরাজের
তন্দ্রাজড়িত চাওয়া।
চন্দনিদহে থইথই জল
ঝিক্‌ঝিক্‌ করে আলোতে,
জামরুলগাছে ফুলকাটা কাজে
বুনুনি সাদায় কালোতে।
প্রহরে প্রহরে রাজার ফটকে
বহুদূরে বাজে ঘণ্টা।
জেগে উঠে বসে ঠিকানা-হারানো
শূন্য-উধাও মনটা।
বুঝিতে পারি নে কত কী শব্দ—
মনে হয় যেন ধারণা,
রাতের বুকের ভিতরে কে করে
অদৃশ্য পদচারণা।
গাছগুলো সব ঘুমে ডুবে আছে,
তন্দ্রা তারায় তারায়,
কাছের পৃথিবী স্বপ্নপ্লাবনে
দূরের প্রান্তে হারায়।
রাতের পৃথিবী ভেসে উঠিয়াছে
বিধির নিশ্চেতনায়,
আভাষ আপন ভাষার পরশ
খোঁজে সেই আনমনায়।
রক্তের দোলে যে-সব বেদনা
স্পষ্ট বোধের বাহিরে
ভাবনাপ্রবাহে বুদ্‌বুদ্‌ তারা,
স্থির পরিচয় নাহি রে।
প্রভাত-আলোক আকাশে আকাশে
এ চিত্র দিবে মুছিয়া,

পরিহাসে তার অবচেতনার
বঞ্চনা যাবে ঘুচিয়া।
চেতনার জালে এ মহাগহনে
বস্তু যা-কিছু টি'কিবে,
সৃষ্টি তারেই স্বীকার করিয়া
স্বাক্ষর তাহে লিখিবে।
তবু কিছু মোহ, কিছু কিছু ভুল
জাগ্রত সেই প্রাণপণায়
প্রাণতন্তুতে রেখায় রেখায়
রঙ রেখে যাবে আপনায়।
এ জীবনে তাই রাত্রির দান
দিনের রচনা জড়ায়ে
চিন্তা-কাজের ফাঁকে ফাঁকে সব
রয়েছে ছড়ায়ে ছড়ায়ে।
বুদ্ধি যাহারে মিছে বলে হাসে
সে যে সত্যের মূলে
আপন গোপন রসসঞ্চারে
ভরিছে ফসলে ফুলে।
অর্থ পেরিয়ে নিরর্থ এসে
ফেলিছে রঙিন ছায়া—
বাস্তব যত শিকল গড়িছে,
খেলেনা গড়িছে মায়া।

উদয়ন, শান্তিনিকেতন
২৭ মার্চ, ১৯৪০

এপারে-ওপারে

রাস্তার ওপারে
বাড়িগুলো ঘেঁষাঘেঁষি সারে সারে।
ওখানে সবাই আছে
ক্ষীণ যত আড়ালের আড়ে-আড়ে কাছে-কাছে।

যা-খুশি প্রসঙ্গ নিয়ে
ইনিয়ে-বিনিয়ে
নানা কণ্ঠে বকে যায় কলস্বরে।
অকারণে হাত ধরে ;
যে যাহারে চেনে
পিঠেতে চাপড় দিয়ে নিয়ে যায় টেনে
লক্ষ্যহীন অলিতে গলিতে,
কথা-কাটাকাটি চলে গলাগলি চলিতে চলিতে।
বৃথাই কুশলবার্তা জানিবার ছলে
প্রশ্ন করে বিনা কৌতূহলে।
পরস্পরে দেখা হয়,
বাঁধা ঠাট্টা করে বিনিময়।
কোথা হতে অকস্মাৎ ঘরে ঢুকে
হেসে ওঠে অহেতু কৌতুকে।
'আনন্দবাজার' হতে সংবাদ-উচ্ছিষ্ট ঘেঁটে ঘেঁটে
ছুটির মধ্যাহ্নবেলা বিষম বিতর্কে যায় কেটে।
সিনেমা-নটীর ছবি নিয়ে দুই দলে
রূপের তুলনা-দ্বন্দ্ব চলে,
উত্তাপ প্রবল হয় শেষে
বন্ধুবিচ্ছেদের কাছে এসে।
পথপ্রান্তে দ্বারের সম্মুখে বসি
ফেরিওয়ালাদের সাথে হুঁকো-হাতে দর-কষাকষি।
একই সুরে দম দিয়ে বার বার
গ্রামোফোনে চেষ্টা চলে থিয়েটরি গান শিখিবার।
কোথাও কুকুরছানা ঘেউ-ঘেউ আদরের ডাকে
চমক লাগায় বাড়িটাকে।
শিশু কাঁদে মেঝে মাথা হানি,
সাথে চলে গৃহিণীর অসহিষ্ণু তীব্র ধমকানি।
তাস-পিটোনির শব্দ, নিয়ে জিত হার
থেকে থেকে বিষম চিৎকার।

যেদিন ট্যাক্সিতে চ'ড়ে জামাই উদয় হয় আসি
মেয়েতে মেয়েতে হাসাহাসি,
টেপাটেপি, কানাকানি,
অঙ্গরাগে লাজুকেরে সাজিয়ে দেবার টানাটানি।
দেউড়িতে ছাতে বারান্দায়
নানাবিধ আনাগোনা ক্ষণে ক্ষণে ছায়া ফেলে যায়।

হেথা দ্বার বন্ধ হয় হোথা দ্বার খোলে,
দড়িতে গামছা ধুতি ফর্‌ফর্‌ শব্দ করি ঝোলে।
অনির্দিষ্ট ধ্বনি চারি পাশে
দিনে রাত্রে কাজের আভাসে।
উঠোনে অনবধানে-খুলে-রাখা কলে
জল বহে যায় কলকলে ;
সিঁড়িতে আসিতে যেতে
রাত্রিদিন পথ স্যাঁত্‌সেঁতে।
বেলা হলে ওঠে ঝন্‌ঝনি
বাসন-মাজার ধ্বনি।
বেড়ি হাতা খুন্তি রান্নাঘরে
ঘরকন্নার সুরে ঝংকার জাগায় পরস্পরে।
কড়ায় সর্ষের তেল চিড়্‌বিড়্‌ ফোটে,
তারি মধ্যে কইমাছ অকস্মাৎ ছ্যাঁক্‌ করে ওঠে।
বন্দেমাতরম্‌-পেড়ে শাড়ি নিয়ে তাঁতিবউ ডাকে
বউমাকে।
খেলার ট্রাইসিকেলে
ছড়্‌ছড়্‌ খড়্‌খড়্‌ আঙিনায় ঘোরে কার ছেলে।
যাদের উদয় অস্ত আপিসের দিক্‌চক্রবালে
তাদের গৃহিণীদের সকালে বিকালে
দিন পরে দিন যায়
দুইবার জোয়ার-ভাঁটায়
ছুটি আর কাজে।

হোথা পড়া-মুখস্থের একঘেয়ে অশ্রান্ত আওয়াজে
ধৈর্য হারাইছে পাড়া,
এগ্‌জামিনেশনে দেয় তাড়া।

প্রাণের প্রবাহে ভেসে
বিবিধ ভঙ্গীতে ওরা মেশে।
চেনা ও অচেনা
লঘু আলাপের ফেনা
আবর্তিয়া তোলে
দেখাশোনা আনাগোনা গতির হিল্লোলে

রাস্তার এপারে আমি নিঃশব্দ দুপুরে
জীবনের তথ্য যত ফেলে রেখে দূরে
জীবনের তত্ত্ব যত খুঁজি
নিঃসঙ্গ মনের সঙ্গে যুঝি,
সারাদিন চলেছে সন্ধান
দুরূহের ব্যর্থ সমাধান।
মনের ধূসর কূলে
প্রাণের জোয়ার মোরে একদিন দিয়ে গেছে তুলে।
চারি দিকে তীক্ষ্ণ আলো ঝক্‌ঝক্ করে
রিক্তরস উদ্দীপ্ত প্রহরে।
ভাবি এই কথা—
ওইখানে ঘনীভূত জনতার বিচিত্র তুচ্ছতা
এলোমেলো আঘাতে সংঘাতে
নানা শব্দ নানা রূপ জাগিয়ে তুলিছে দিনরাতে।
কিছু তার টেঁকে নাকো দীর্ঘকাল,
মাটিগড়া মৃদঙ্গের তাল
ছন্দটারে তার
বদল করিছে বারংবার।
তারি ধাক্কা পেয়ে মন

ক্ষণে-ক্ষণ
ব্যগ্র হয়ে ওঠে জাগি
সর্বব্যাপী সামান্যের সচল স্পর্শের লাগি।
আপনার উচ্চতট হতে
নামিতে পারে না সে যে সমস্তের ঘোলা গঙ্গাস্রোতে

পুরী
২০ বৈশাখ, ১৩৪৬

মংপু পাহাড়ে

কুজ্ঝটিজাল যেই
সরে গেল মংপু-র
নীল শৈলের গায়ে
দেখা দিল রঙপুর।
বহুকেলে জাদুকর, খেলা বহুদিন তার,
আর কোনো দায় নেই, লেশ নেই চিন্তার।
দূর বৎসর পানে ধ্যানে চাই যদ্দূর
দেখি লুকোচুরি খেলে মেঘ আর রোদ্দুর।
কত রাজা এল গেল, ম'ল এরই মধ্যে,
লড়েছিল বীর, কবি লিখেছিল পদ্যে।
কত মাথা-কাটাকাটি সভ্যে অসভ্যে,
কত মাথা-ফাটাফাটি সনাতনে নব্যে।
ঐ গাছ চিরদিন যেন শিশু মস্ত,
সূর্য-উদয় দেখে, দেখে তার অস্ত।
ঐ ঢালু গিরিমালা, রুক্ষ ও বন্ধ্যা,
দিন গেলে ওরই 'পরে জপ করে সন্ধ্যা।
নীচে রেখা দেখা যায় ঐ নদী তিস্তার,
কঠোরের স্বপ্নে ও মধুরের বিস্তার।

হেনকালে একদিন বৈশাখী গ্রীষ্মে
টানাপাখা-চলা সেই সেকালের বিশ্বে

রবিঠাকুরের দেখা সেইদিন মাত্তর,
আজি তো বয়স তার কেবল আটাত্তর—
সাতের পিঠের কাছে একফোঁটা শূন্য—
শত শত বরষের ওদের তারুণ্য।
ছোটো আয়ু মানুষের, তবু একি কাণ্ড,
এটুকু সীমায় গড়া মনোব্রহ্মাণ্ড—
কত সুখে দুখে গাঁথা, ইষ্টে অনিষ্টে,
সুন্দরে কুৎসিতে, তিক্তে ও মিষ্টে,
কত গৃহ-উৎসবে, কত সভাসজ্জায়,
কত রসে মজ্জিত অস্থি ও মজ্জায়,
ভাষার-নাগাল-ছাড়া কত উপলব্ধি,
ধেয়ানের মন্দিরে আছে তার স্তব্ধি।
অবশেষে একদিন বন্ধন খণ্ডি
অজানা অদৃষ্টের অদৃশ্য গণ্ডি
অন্তিম নিমেষেই হবে উত্তীর্ণ।
তখনি অকস্মাৎ হবে কি বিদীর্ণ
এত রেখা এত রঙে গড়া এই সৃষ্টি,
এত মধু-অঞ্জনে রঞ্জিত দৃষ্টি।
বিধাতা আপন ক্ষতি করে যদি ধার্য
নিজেরই তবিল-ভাঙা হয় তার কার্য,
নিমেষেই নিঃশেষ করি ভরা পাত্র
বেদনা না যদি তার লাগে কিছুমাত্র,
আমারই কী লোকসান যদি হই শূন্য—
শেষক্ষয় হলে কারে কে করিবে ক্ষুণ্ণ।
এ জীবনে পাওয়াটারই সীমাহীন মূল্য,
মরণে হারানোটা তো নহে তার তুল্য।
রবিঠাকুরের পালা শেষ হবে সদ্য,
তখনো তো হেথা এক অখণ্ড অদ্য
জাগ্রত রবে চির-দিবসের জন্যে
এই গিরিতটে, এই নীলিম অরণ্যে।

তখনো চলিবে খেলা নাই যার যুক্তি—
বার বার ঢাকা দেওয়া, বার বার মুক্তি।
তখনো এ বিধাতার সুন্দর ভ্রান্তি—
উদাসীন এ আকাশে এ মোহন কান্তি।

মংপু
১০ জুন, ১৯৩৮

ইস্‌টেশন

সকাল বিকাল ইস্টেশনে আসি,
চেয়ে চেয়ে দেখতে ভালোবাসি।
ব্যস্ত হয়ে ওরা টিকিট কেনে,
ভাটির ট্রেনে কেউ-বা চড়ে
কেউ-বা উজান ট্রেনে।
সকাল থেকে কেউ-বা থাকে বসে,
কেউ-বা গাড়ি ফেল্‌ করে তার
শেষ-মিনিটের দোষে।

দিনরাত গড়্‌গড়্‌ ঘড়্‌ঘড়্‌,
গাড়িভরা মানুষের ছোটে ঝড়।
ঘন ঘন গতি তার ঘুরবে
কভু পশ্চিমে, কভু পূর্বে।

চলচ্ছবির এই-যে মূর্তিখানি
মনেতে দেয় আনি
নিত্য-মেলার নিত্য-ভোলার ভাষা—
কেবল যাওয়া-আসা।
মঞ্চতলে দণ্ডে পলে
ভিড় জমা হয় কত—

পত্তাকাটা দেয় দুলিয়ে,
কে কোথা হয় গত।
এর পিছনে সুখদুঃখ-
ক্ষতিলাভের তাড়া
দেয় সবলে নাড়া।

সময়ের ঘড়িধরা অঙ্কেতে
ভোঁ ভোঁ ক'রে বাঁশি বাজে সংকেতে।
দেরি নাহি সয় কারো কিছুতেই—
কেহ যায়, কেহ থাকে পিছুতেই।

ওদের চলা ওদের পড়ে-থাকায়
আর কিছু নেই, ছবির পরে
কেবল ছবি আঁকায়।
খানিকক্ষণ যা চোখে পড়ে
তার পরে যায় মুছে,
আত্ম-অবহেলার খেলা
নিত্যই যায় ঘুচে।
ছেঁড়া পটের টুকরো জমে
পথের প্রান্ত জুড়ে,
তপ্ত দিনের ক্লান্ত হাওয়ায়
কোন্‌খানে যায় উড়ে।
'গেল গেল' ব'লে যারা
ফুকরে কেঁদে ওঠে
ক্ষণেক-পরে কান্না-সমেত
তারাই পিছে ছোটে।

ঢং ঢং বেজে ওঠে ঘণ্টা,
এসে পড়ে বিদায়ের ক্ষণটা।
মুখ রাখে জানলায় বাড়িয়ে,
নিমেষেই নিয়ে যায় ছাড়িয়ে

চিত্রকরের বিশ্বভুবনখানি—
এই কথাটাই নিলেম মনে মানি।
কর্মকারের নয় এ গড়া-পেটা—
আঁকড়ে ধরার জিনিস এ নয়,
দেখার জিনিস এটা।
কালের পরে যায় চলে কাল,
হয় না কভু হারা
ছবির বাহন চলাফেরার ধারা।
দুবেলা সেই এ সংসারের
চলতি ছবি দেখা,
এই নিয়ে রই যাওয়া-আসার
ইস্টেশনে একা।

এক তুলি ছবিখানা এঁকে দেয়,
আর তুলি কালি তাহে মেখে দেয়
আসে কারা এক দিক হতে ঐ,
ভাসে কারা বিপরীত স্রোতে ঐ।

শান্তিনিকেতন
৭ জুলাই, ১৯৩৮

জবাবদিহি

কবি হয়ে দোল-উৎসবে
কোন্ লাজে কালো সাজে আসি,
এ নিয়ে রসিকা তোরা সবে
করেছিলি খুব হাসাহাসি।
চৈত্রের দোল-প্রাঙ্গণে
আমার জবাবদিহি চাই
এ দাবি তোদের ছিল মনে,
কাজ ফেলে আসিয়াছি তাই।

দোলের দিনে, সে কী মনের ভুলে,
 পরেছিলাম যখন কালো কাপড়,
দখিন হাওয়া দুয়ারখানা খুলে
 হঠাৎ পিঠে দিল হাসির চাপড়।
সকল বেলা বেড়াই খুঁজি খুঁজি
 কোথা সে মোর গেল রঙের ডালা,
কালো এসে আজ লাগালো বুঝি
 শেষ প্রহরে রঙহরণের পালা।

ওরে কবি, ভয় কিছু নেই তোর—
 কালো রঙ যে সকল রঙের চোর।
জানি যে ওর বক্ষে রাখে তুলি
 হারিয়ে-যাওয়া পূর্ণিমা ফাল্গুনী—
অস্তরবির রঙের কালো ঝুলি,
 রসের শাস্ত্রে এই কথা কয় শুনি।
অন্ধকারে অজানা-সন্ধানে
 অচিন লোকে সীমাবিহীন রাতে
রঙের তৃষা বহন করি প্রাণে
 চলব যখন তারার ইশারাতে,
হয়তো তখন শেষ-বয়সের কালো
 করবে বাহির আপন গ্রন্থি খুলি
যৌবনদীপ— জাগাবে তার আলো
 ঘুমভাঙা সব রাঙা প্রহরগুলি।
কালো তখন রঙের দীপালিতে
 সুর লাগাবে বিস্মৃত সংগীতে।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
 ২৮ মার্চ, ১৯৪০

সাড়ে নটা

সাড়ে নটা বেজেছে ঘড়িতে ;
সকালের মৃদু শীতে
তন্দ্রাবেশে হাওয়া যেন রোদ পোহাইছে
পাহাড়ের উপত্যকা-নীচে
বনের মাথায়
সবুজের আমন্ত্রণ-বিছানো পাতায়।
বৈঠকখানার ঘরে রেডিয়োতে
সমুদ্রপারের দেশ হতে
আকাশে প্লাবন আনে সুরের প্রবাহে,
বিদেশিনী বিদেশের কণ্ঠে গান গাহে
বহু যোজনের অন্তরালে।
সব তার লুপ্ত হয়ে মিলেছে কেবল সুরে তালে।
দেহহীন পরিবেশহীন
গীতস্পর্শ হতেছে বিলীন
সমস্ত চেতনা ছেয়ে।
যে বেলাটি বেয়ে
এল তার সাড়া
সে আমার দেশের সময়-সূত্র-ছাড়া।
একাকিনী, বহি রাগিণীর দীপশিখা
আসিছে অভিসারিকা
সর্বভারহীনা ;
অরূপা সে, অলক্ষিত আলোকে আসীনা।
গিরিনদীসমুদ্রের মানে নি নিষেধ,
করিয়াছে ভেদ
পথে পথে বিচিত্র ভাষার কলরব,
পদে পদে জন্ম-মৃত্যু বিলাপ-উৎসব।
রণক্ষেত্রে নিদারুণ হানাহানি,
লক্ষ লক্ষ গৃহকোণে সংসারের তুচ্ছ কানাকানি,

সমস্ত সংসর্গ তার
একান্ত করেছে পরিহার।
বিশ্বহারা
একখানি নিরাসক্ত সংগীতের ধারা।
যক্ষের বিরহগাথা মেঘদূত
সেও জানি এমনি অদ্ভুত।
বাণীমূর্তি সেও একা।
শুধু নামটুকু নিয়ে কবির কোথাও নেই দেখা।
তার পাশে চুপ
সেকালের সংসারের সংখ্যাহীন রূপ।
সেদিনের যে প্রভাতে উজ্জয়িনী ছিল সমুজ্জ্বল
জীবনে উচ্ছল
ওর মাঝে তার কোনো আলো পড়ে নাই।
রাজার প্রতাপ সেও ওর ছন্দে সম্পূর্ণ বৃথাই।
যুগ যুগ হয়ে এল পার
কালের বিপ্লব বেয়ে, কোনো চিহ্ন আনে নাই তার।
বিপুল বিশ্বের মুখরতা
উহার শ্লোকের পটে স্তব্ধ করে দিল সব কথা।

মংপু
৮ জুন, ১৯৩৯

প্রবাসী

হে প্রবাসী,
আমি কবি যে বাণীর প্রসাদ-প্রত্যাশী
অন্তরতমের ভাষা
সে করে বহন। ভালোবাসা
তারি পক্ষে ভর করি নাহি জানে দূর।
রক্তের নিঃশব্দ সুর
সদা চলে নাড়ীতন্তু বেয়ে,
সেই সুর যে ভাষার শব্দে আছে ছেয়ে

বাণীর অতীতগামী তাহারি বাণীতে
ভালোবাসা আপনার গূঢ় রূপ পারে যে জানিতে।
হে বিষয়ী, হে সংসারী, তোমরা যাহারা
আত্মহারা,
যারা ভালোবাসিবার বিশ্বপথ
হারায়েছ, হারায়েছ আপন জগৎ,
রয়েছ আত্মবিরহী গৃহকোণে,
বিরহের ব্যথা নেই মনে।
আমি কবি পাঠালেম তোমাদের উদ্‌ভ্রান্ত পরানে
সে ভাষার দৌত্য, যাহা হারানো নিজেরে কাছে আনে.
ভেদ করি মরুকারা
শুষ্ক চিত্তে নিয়ে আসে বেদনার ধারা।
বিস্মৃতি দিয়েছে তাহে ঘের
আজন্মকালের যাহা নিত্যদান চিরসুন্দরের—
তারে আজ লও ফিরে।
লক্ষ্মীর মন্দিরে
আমি আনিয়াছি নিমন্ত্রণ ;
জানায়েছি, সেথাকার তোমার আসন
অন্যমনে তুমি আছ ভুলি।
জড় অভ্যাসের ধূলি
আজি নববর্ষে পুণ্যক্ষণে
যাক উড়ে তোমার নয়নে
দেখা দিক্— এ ভুবনে সর্বত্রই কাছে আসিবার
তোমার আপন অধিকার।

সুদূরের মিতা,
মোর কাছে চেয়েছিলে নূতন কবিতা।
এই লও বুঝে,
নূতনের স্পর্শমন্ত্র এর ছন্দে পাও যদি খুঁজে।

[পুরী]
৯ বৈশাখ, ১৩৪৬

জন্মদিন

তোমরা রচিলে যারে
নানা অলংকারে
তারে তো চিনি নে আমি,
চেনেন না মোর অন্তর্যামী
তোমাদের স্বাক্ষরিত সেই মোর নামের প্রতিমা।
বিধাতার সৃষ্টিসীমা
তোমাদের দৃষ্টির বাহিরে।

কালসমুদ্রের তীরে
বিরলে রচেন মূর্তিখানি
বিচিত্রিত রহস্যের যবনিকা টানি
রূপকার আপন নিভৃতে।
বাহির হইতে
মিলায়ে আলোক অন্ধকার
কেহ এক দেখে তারে, কেহ দেখে আর।
খণ্ড খণ্ড রূপ আর ছায়া,
আর কল্পনার মায়া,
আর মাঝে মাঝে শূন্য, এই নিয়ে পরিচয় গাঁথে
অপরিচয়ের ভূমিকাতে।
সংসারখেলার কক্ষে তাঁর
যে-খেলেনা রচিলেন মূর্তিকার
মোরে লয়ে মাটিতে আলোতে,
সাদায় কালোতে,
কে না জানে সে ক্ষণভঙ্গুর
কালের চাকার নীচে নিঃশেষে ভাঙিয়া হবে চুর।
সে বহিয়া এনেছে যে-দান
সে করে ক্ষণেকতরে অমরের ভান—
সহসা মুহূর্তে দেয় ফাঁকি,
মুঠি-কয় ধূলি রয় বাকি,

আর থাকে কালরাত্রি সব-চিহ্ন-ধুয়ে-মুছে-ফেলা
তোমাদের জনতার খেলা
রচিল যে পুতুলিরে
সে কি লুব্ধ বিরাট ধূলিরে
এড়ায়ে আলোতে নিত্য রবে।
এ কথা কল্পনা কর যবে
তখন আমার
আপন গোপন রূপকার
হাসেন কি আঁখিকোণে,
সে কথাই ভাবি আজ মনে।

পুরী
২৫ বৈশাখ, ১৩৪৬

প্রশ্ন

চতুর্দিকে বহ্নিবাষ্প শূন্যাকাশে ধায় বহুদূরে
কেন্দ্রে তার তারাপুঞ্জ মহাকাল-চক্রপথে ঘুরে।
কত বেগ, কত তাপ, কত ভার, কত আয়তন,
সূক্ষ্ম অঙ্কে করেছে গণন
পণ্ডিতেরা, লক্ষ কোটি ক্রোশ দূর হতে
দুর্লক্ষ্য আলোতে।

আপনার পানে চাই,
লেশমাত্র পরিচয় নাই।
এ কি কোনো দৃশ্যাতীত জ্যোতি।
কোন্ অজানারে ঘিরি এই অজানার নিত্য গতি।
বহুযুগে বহুদূরে স্মৃতি আর বিস্মৃতি-বিস্তার,
যেন বাষ্পপরিবেশ তার
ইতিহাসে পিণ্ড বাঁধে রূপে রূপান্তরে।
'আমি' উঠে ঘনাইয়া কেন্দ্র-মাঝে অসংখ্য বৎসরে।

সুখদুঃখ ভালোমন্দ রাগদ্বেষ ভক্তি সখ্য স্নেহ
এই নিয়ে গড়া তার সত্তাদেহ ;
এরা সব উপাদান ধাক্কা পায়, হয় আবর্তিত,
পুঞ্জিত, নর্তিত।
এরা সত্য কী যে
বুঝি নাই নিজে।
বলি তারে মায়া—
যাই বলি শব্দ সেটা, অব্যক্ত অর্থের উপচ্ছায়া।
তার পরে ভাবি,
এ অজ্ঞেয় সৃষ্টি 'আমি' অজ্ঞেয় অদৃশ্যে যাবে নাবি।
অসীম রহস্য নিয়ে মুহূর্তের নিরর্থকতায়
লুপ্ত হবে নানারঙা জলবিম্বপ্রায়,
অসমাপ্ত রেখে যাবে তার শেষকথা
আত্মার বারতা।
তখনো সুদূরে ঐ নক্ষত্রের দূত
ছুটাবে অসংখ্য তার দীপ্ত পরমাণুর বিদ্যুৎ
অপার আকাশ-মাঝে,
কিছুই জানি না কোন্ কাজে।
বাজিতে থাকিবে শূন্যে প্রশ্নের সুতীব্র আর্তস্বর,
ধ্বনিবে না কোনোই উত্তর।

শ্যামলী। শান্তিনিকেতন
৭ ডিসেম্বর, ১৯৩৮

রোম্যান্টিক

আমারে বলে যে ওরা রোম্যান্টিক।
সে কথা মানিয়া লই
রসতীর্থ-পথের পথিক।
মোর উত্তরীয়ে
রঙ লাগায়েছি, প্রিয়ে।

দুয়ার-বাহিরে তব আসি যবে
সুর করে ডাকি আমি ভোরের ভৈরবে।
বসন্তবনের গন্ধ আনি তুলে
রজনীগন্ধার ফুলে
নিভৃত হাওয়ায় তব ঘরে।
কবিতা শুনাই মৃদুস্বরে,
ছন্দ তাহে থাকে,
তার ফাঁকে ফাঁকে
শিল্প রচে বাক্যের গাঁথুনি—
তাই শুনি
নেশা লাগে তোমার হাসিতে।
আমার বাঁশিতে
যখন আলাপ করি মুলতান
মনের রহস্য নিজ রাগিণীর পায় যে সন্ধান।
যে-কল্পলোকের কেন্দ্রে তোমারে বসাই
ধূলি-আবরণ তার সযত্নে খসাই—
আমি নিজে সৃষ্টি করি তারে।
ফাঁকি দিয়ে বিধাতারে
কারুশালা হতে তাঁর চুরি করে আনি রঙ-রস,
আনি তাঁরি জাদুর পরশ।
জানি, তার অনেকটা মায়া,
অনেকটা ছায়া।
আমারে শুধাও যবে 'এরে কভু বলে বাস্তবিক?'
আমি বলি, 'কখনো না, আমি রোম্যান্টিক।'
যেথা ঐ বাস্তব জগৎ
সেখানে আনাগোনার পথ
আছে মোর চেনা।
সেথাকার দেনা
শোধ করি— সে নহে কথায় তাহা জানি—
তাহার আহ্বান আমি মানি।

দৈন্য সেথা, ব্যাধি সেথা, সেথায় কুশ্রীতা,
সেথায় রমণী দস্যুভীতা—
সেথায় উত্তরী ফেলি পরি বর্ম ;
সেথায় নির্মম কর্ম ;
সেথা ত্যাগ, সেথা দুঃখ, সেথা ভেরি বাজুক 'মাভৈঃ' ;
শৌখিন বাস্তব যেন সেথা নাহি হই।
সেথায় সুন্দর যেন ভৈরবের সাথে
চলে হাতে-হাতে।

ক্যাণ্ডীয় নাচ

সিংহলে সেই দেখেছিলেম ক্যাণ্ডিদলের নাচ ;
শিকড়গুলোর শিকল ছিঁড়ে যেন শালের গাছ
পেরিয়ে এল মুক্তিমাতাল খ্যাপা,
হুংকার তার ছুটল আকাশ-ব্যাপা।
ডালপালা সব দুড়্‌দাড়িয়ে ঘূর্ণি হাওয়ায় কহে—
নহে, নহে, নহে—
নহে বাধা, নহে বাঁধন, নহে পিছন-ফেরা,
নহে আবেগ স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা,
নহে মৃদু লতার দোলা, নহে পাতার কাঁপন—
আগুন হয়ে জ্বলে ওঠা এ যে তপের তাপন।
ওদের ডেকে বলেছিল সমুদ্দুরের ঢেউ,
'আমার ছন্দ রক্তে আছে এমন আছে কেউ।'
ঝঞ্ঝা ওদের বলেছিল, 'মঞ্জীর তোর আছে
ঝংকারে যার লাগাবে লয় আমার প্রলয়নাচে।'
ঐ যে পাগল দেহখানা, শূন্যে ওঠে বাহু,
যেন কোথায় হাঁ করেছে রাহু—
লুব্ধ তাহার ক্ষুধার থেকে চাঁদকে করবে ত্রাণ,
পূর্ণিমাকে ফিরিয়ে দেবে প্রাণ।

মহাদেবের তপোভঙ্গে যেন বিষম বেগে
নন্দী উঠল জেগে ;
শিবের ক্রোধের সঙ্গে
উঠল জলে দুর্দাম তার প্রতি অঙ্গে অঙ্গে
নাচের বহ্নিশিখা
নিদয়া নির্ভীকা।
খুঁজতে ছোটে মোহম্মদের বাহন কোথায় আছে
দাহন করবে এই নিদারুণ আনন্দময় নাচে।
নটরাজ যে পুরুষ তিনি, তাণ্ডবে তাঁর সাধন,
আপন শক্তি মুক্ত ক'রে ছেঁড়েন আপন বাঁধন ;
দুঃখবেগে জাগিয়ে তোলেন সকল ভয়ের ভয় ;
জয়ের নৃত্যে আপনাকে তাঁর জয়।

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪

অবর্জিত

আমি চলে গেলে ফেলে রেখে যাব পিছু
চিরকাল মনে রাখিবে এমন কিছু,
মূঢ়তা করা তা নিয়ে মিথ্যে ভেবে।
ধুলোর খাজনা শোধ করে নেবে ধুলো,
চুকে গিয়ে তবু বাকি রবে যতগুলো
গরজ যাদের তারাই তা খুঁজে নেবে।
আমি শুধু ভাবি, নিজেরে কেমনে ক্ষমি—
পুঞ্জ পুঞ্জ বকুনি উঠেছে জমি,
কোন্ সৎকারে করি তার সদ্‌গতি।
কবির গর্ব নেই মোর হেন নয়—
কবির লজ্জা পাশাপাশি তারি রয়,
ভারতীর আছে এই দয়া মোর প্রতি।

লিখিতে লিখিতে কেবলি গিয়েছি ছেপে,
সময় রাখি নি ওজন দেখিতে মেপে,
কীর্তি এবং কুকীর্তি গেছে মিশে।
ছাপার কালিতে অস্থায়ী হয় স্থায়ী,
এ অপরাধের জন্যে যে-জন দায়ী
তার বোঝা আজ লঘু করা যায় কিসে
বিপদ ঘটাতে শুধু নেই ছাপাখানা,
বিদ্যানুরাগী বন্ধু রয়েছে নানা—
আবর্জনারে বর্জন করি যদি
চারি দিক হতে গর্জন করি উঠে,
"ঐতিহাসিক সূত্র দিবে কি টুটে,
যা ঘটেছে তারে রাখা চাই নিরবধি।"
ইতিহাস বুড়ো, বেড়াজাল তার পাতা,
সঙ্গে রয়েছে হিসাবের মোটা খাতা—
ধরা যাহা পড়ে ফর্দে সকলি আছে।
হয় আর নয়, খোঁজ রাখে শুধু এই,
ভালোমন্দর দরদ কিছুই নেই,
মূল্যের ভেদ তুল্য তাহার কাছে।
বিধাতাপুরুষ ঐতিহাসিক হলে
চেহারা লইয়া ঋতুরা পড়িত গোলে,
অঘ্রান তবে ফাগুন রহিত ব্যেপে।
পুরানো পাতারা ঝরিতে যাইত ভুলে,
কচি পাতাদের আঁকড়ি রহিত ঝুলে,
পুরাণ ধরিত কাব্যের টুঁটি চেপে।
জোড়হাত করে আমি বলি, শোনো কথা,
সৃষ্টির কাজে প্রকাশেরি ব্যগ্রতা,
ইতিহাসটারে গোপন করে সে রাখে।
জীবনলক্ষ্মী মেলিয়া রঙের রেখা
ধরার অঙ্গে আঁকিছে পত্রলেখা,
ভূতত্ত্ব তার কঙ্কালে ঢাকা থাকে।

বিশ্বকবির লেখা যত হয় ছাপা
প্রুফ্‌শিটে তার দশগুণ পড়ে চাপা,
নব এডিশনে নূতন করিয়া তুলে।
দাগি যাহা, যাহে বিকার, যাহাতে ক্ষতি,
মমতামাত্র নাহি তো তাহার প্রতি—
বাঁধা নাহি থাকে ভুলে আর নির্ভুলে।
সৃষ্টির কাজ লুপ্তির সাথে চলে,
ছাপাযন্ত্রের ষড়যন্ত্রের বলে
এ বিধান যদি পদে পদে পায় বাধা—
জীর্ণ ছিন্ন মলিনের সাথে গোঁজা
কৃপণপাড়ার রাশীকৃত নিয়ে বোঝা
সাহিত্য হবে শুধু কি ধোবার গাধা।
যাহা কিছু লেখে সেরা নাহি হয় সবি,
তা নিয়ে লজ্জা না করুক কোনো কবি—
প্রকৃতির কাজে কত হয় ভুলচুক;
কিন্তু, হেয় যা শ্রেয়ের কোঠায় ফেলে
তারেও রক্ষা করিবার ভূতে পেলে
কালের সভায় কেমনে দেখাবে মুখ।
ভাবী কালে মোর কী দান শ্রদ্ধা পাবে,
খ্যাতিধারা মোর কত দূর চলে যাবে,
সে লাগি চিন্তা করার অর্থ নাহি।
বর্তমানের ভরি অর্ঘ্যের ডালি
অদেয় যা দিনু মাথায়ে ছাপার কালি
তাহারি লাগিয়া মার্জনা আমি চাহি।

'পদ্মা' বোট। চন্দননগর
৫ জুন, ১৯৩৫

শেষ হিসাব

চেনাশোনার সাঁঝবেলাতে
শুনতে আমি চাই—
পথে পথে চলার পালা
লাগল কেমন, ভাই।
দুর্গম পথ ছিল ঘরেই,
বাইরে বিরাট পথ—
তেপান্তরের মাঠ কোথা-বা,
কোথা-বা পর্বত।
কোথা-বা সে চড়াই উঁচু,
কোথা-বা উতরাই,
কোথা-বা পথ নাই।
মাঝে-মাঝে জুটল অনেক ভালো—
অনেক ছিল বিকট মন্দ,
অনেক কুশ্রী কালো।
ফিরেছিলে আপন মনের
গোপন অলিগলি,
পরের মনের বাহির-দ্বারে
পেতেছ অঞ্জলি।
আশাপথের রেখা বেয়ে
কতই এলে গেলে,
পাওনা ব'লে যা পেয়েছ
অর্থ কি তার পেলে।
অনেক কেঁদে-কেটে
ভিক্ষার ধন জুটিয়েছিলে
অনেক রাস্তা হেঁটে।
পথের মধ্যে লুঠেল দস্যু
দিয়েছিল হানা,

উজাড় করে নিয়েছিল
ছিন্ন ঝুলিখানা।
অতি কঠিন আঘাত তারা
লাগিয়েছিল বুকে—
ভেবেছিলুম, চিহ্ন নিয়ে
সে সব গেছে চুকে।
হাটে-বাটে মধুর যাহা
পেয়েছিলুম খুঁজি,
মনে ছিল, যত্নের ধন
তাই রয়েছে পুঁজি।
হায় রে ভাগ্য, খোলো তোমার ঝুলি
তাকিয়ে দেখো, জমিয়েছিলে ধূলি।
নিষ্ঠুর যে ব্যর্থকে সে
করে যে বর্জিত,
দৃঢ় কঠোর মুষ্টিতলে
রাখে সে অর্জিত
নিত্যকালের রতন-কণ্ঠহার ;
চিরমূল্য দেয় সে তারে
দারুণ বেদনার।
আর যা-কিছু জুটেছিল
না চাহিতেই পাওয়া—
আজকে তারা ঝুলিতে নেই,
রাত্রিদিনের হাওয়া
ভরল তারাই, দিল তারা
পথে চলায় মানে,
রইল তারাই একতারাতে
তোমার গানে গানে।

[শান্তিনিকেতন
ডিসেম্বর, ১৯৩৮]

সন্ধ্যা

দিন সে প্রাচীন অতি প্রবীণ বিষয়ী
তীক্ষ্ণদৃষ্টি, বস্তুরাজ্যজয়ী,
দিকে দিকে প্রসারিয়া গনিছে সম্বল আপনার।
নবীনা শ্যামলা সন্ধ্যা পরেছে জ্যোতির অলংকার
চিরনববধূ,
অন্তরে সলজ্জ মধু
অদৃশ্য ফুলের কুঞ্জে রেখেছে নিভৃতে।
অবগুণ্ঠনের অলক্ষিতে
তার দূর পরিচয়
শেষ নাহি হয়।
দিনশেষে দেখা দেয় সে আমার বিদেশিনী—
তারে চিনি তবু নাহি চিনি।

জয়ধ্বনি

যাবার সময় হলে জীবনের সব কথা সেরে
শেষবাক্যে জয়ধ্বনি দিয়ে যাব মোর অদৃষ্টেরে।
বলে যাব, পরমক্ষণের আশীর্বাদ
বারবার আনিয়াছে বিস্ময়ের অপূর্ব আস্বাদ।
যাহা রুগ্‌ণ, যাহা ভগ্ন, যাহা মগ্ন পঙ্কস্তরতলে
আত্মপ্রবঞ্চনাছলে
তাহারে করি না অস্বীকার।
বলি, বারবার
পতন হয়েছে যাত্রাপথে
ভগ্ন মনোরথে;
বারে বারে পাপ
ললাটে লেপিয়া গেছে কলঙ্কের ছাপ;

বারবার আত্মপরাভব কত
দিয়ে গেছে মেরুদণ্ড করি নত ;
কদর্যের আক্রমণ ফিরে ফিরে
দিগন্ত গ্লানিতে দিল ঘিরে।
মানুষের অসম্মান দুর্বিবহ দুখে
উঠেছে পুঞ্জিত হয়ে চোখের সম্মুখে,
ছুটি নি করিতে প্রতিকার—
চিরলগ্ন আছে প্রাণে ধিক্কার তাহার।

অপূর্ণ শক্তির এই বিকৃতির সহস্র লক্ষণ
দেখিয়াছি চারি দিকে সারাক্ষণ,
চিরন্তন মানবের মহিমারে তবু
উপহাস করি নাই কভু।
প্রত্যক্ষ দেখেছি যথা
দৃষ্টির সম্মুখে মোর হিমাদ্রিরাজের সমগ্রতা,
গুহাগহ্বরের যত ভাঙাচোরা রেখাগুলো তারে
পারে নি বিদ্রূপ করিবারে—
যত-কিছু খণ্ড নিয়ে অখণ্ডেরে দেখেছি তেমনি,
জীবনের শেষবাক্যে আজি তারে দিব জয়ধ্বনি।

শ্যামলী। শান্তিনিকেতন
২৬ নভেম্বর, ১৯৩৯

প্রজাপতি

সকালে উঠেই দেখি
প্রজাপতি একি
আমার লেখার ঘরে,
শেলফের 'পরে
মেলেছে নিস্পন্দ দুটি ডানা—
রেশমি সবুজ রঙ, তার 'পরে সাদা রেখা টানা।

সন্ধ্যাবেলা বাতির আলোয় অকস্মাৎ
ঘরে ঢুকে সারারাত
কী ভেবেছে কে জানে তা—
কোনোখানে হেথা
অরণ্যের বর্ণ গন্ধ নাই,
গৃহসজ্জা ওর কাছে সমস্ত বৃথাই।

বিচিত্র বোধের এ ভুবন,
লক্ষকোটি মন
একই বিশ্ব লক্ষকোটি ক'রে জানে
রূপে রসে নানা অনুমানে।
লক্ষকোটি কেন্দ্র তারা জগতের,
সংখ্যাহীন স্বতন্ত্র পথের
জীবনযাত্রার যাত্রী,
দিনরাত্রি
নিজের স্বাতন্ত্র্যরক্ষা-কাজে
একান্ত রয়েছে বিশ্ব-মাঝে।

প্রজাপতি বসে আছে যে কাব্যপুঁথির 'পরে
স্পর্শ তারে করে,
চক্ষে দেখে তারে,
তার বেশি সত্য যাহা তাহা একেবারে
তার কাছে সত্য নয়—
অন্ধকারময়।
ও জানে কাহারে বলে মধু, তবু
মধুর কী সে-রহস্য জানে না ও কভু।
পুষ্পপাত্রে নিয়মিত আছে ওর ভোজ—
প্রতিদিন করে তার খোঁজ
কেবল লোভের টানে,
কিন্তু নাহি জানে

লোভের অতীত যাহা। সুন্দর যা, অনির্বচনীয়,
যাহা প্রিয়,
সেই বোধ সীমাহীন দূরে আছে
তার কাছে।
আমি যেথা আছি
মন যে আপন টানে তাহা হতে সত্য লয় বাছি।
যাহা নিতে নাহি পারে
তাই শূন্যময় হয়ে নিত্য ব্যাপ্ত তার চারি ধারে।
কী আছে বা নাই কী এ,
সে শুধু তাহার জানা নিয়ে।
জানে না যা, যার কাছে স্পষ্ট তাহা, হয়তো-বা কাছে
এখনি সে এখানেই আছে
আমার চৈতন্যসীমা অতিক্রম করি' বহুদূরে
রূপের অন্তরদেশে অপরূপপুরে।
সে আলোকে তার ঘর
যে আলো আমার অগোচর।

শ্যামলী। শান্তিনিকেতন
১০ মার্চ, ১৯৩৯

প্রবীণ

বিশ্বজগৎ যখন করে কাজ
স্পর্ধা ক'রে পরে ছুটির সাজ।
আকাশে তার আলোর ঘোড়া চলে,
কৃতিত্বেরে লুকিয়ে রাখে পরিহাসের ছলে।
বনের তলে গাছে গাছে শ্যামল রূপের মেলা,
ফুলে ফলে নানান্ রঙে নিত্য নতুন খেলা।
বাহির হতে কে জানতে পায়, শান্ত আকাশতলে
প্রাণ বাঁচাবার কঠিন কর্মে নিত্য লড়াই চলে।

চেষ্টা যখন নগ্ন হয়ে শাখায় পড়ে ধরা,
তখন খেলার রূপ চলে যায়, তখন আসে জরা।

বিলাসী নয় মেঘগুলো তো জলের ভারে ভরা,
চেহারা তার বিলাসিতার রঙের ভূষণ পরা।
বাইরে ওরা বুড়োমিকে দেয় না তো প্রশ্রয়
অন্তরে তাই চিরন্তনের বজ্রমন্দ্র রয়।
জল-ঝরানো ছেলেখেলা যেমনি বন্ধ করে
ফ্যাকাশে হয় চেহারা তার, বয়স তাকে ধরে।
দেহের মাঝে হাজার কাজে বহে প্রাণের বায়ু—
পালের তরীর মতন যেন ছুটিয়ে চলে আয়ু,
বুকের মধ্যে জাগায় নাচন, কণ্ঠে লাগায় সুর,
সকল অঙ্গ অকারণে উৎসাহে ভরপুর।
রক্তে যখন ফুরোবে ওর খেলার নেশা খোঁজা
তখনি কাজ অচল হবে, বয়স হবে বোঝা।

ওগো তুমি কী করছ ভাই, স্তব্ধ সারাক্ষণ—
বুদ্ধি তোমার আড়ষ্ট যে, ঝিমিয়ে-পড়া মন।
নবীন বয়স যেই পেরোল খেলাঘরের দ্বারে
মরচে-পড়া লাগল তালা, বন্ধ একেবারে।
ভালোমন্দ বিচারগুলো খোঁটায় যেন পোঁতা।
আপন মনের তলায় তুমি তলিয়ে গেলে কোথা।
চলার পথে আগল দিয়ে বসে আছ স্থির—
বাইরে এসো, বাইরে এসো, পরমগম্ভীর।
কেবলই কি প্রবীণ তুমি, নবীন নও কি তাও।
দিনে দিনে ছি ছি কেবল বুড়ো হয়েই যাও।
আশি বছর বয়স হবে ওই যে পিপুলগাছ,
এ আশ্বিনের রোদদুরে ওর দেখলে বিপুল নাচ?
পাতায় পাতায় আবোল-তাবোল, শাখায় দোলাদুলি,
পাস্থ হাওয়ার সঙ্গে ও চায় করতে কোলাকুলি।

ওগো প্রবীণ, চলো এবার সকল কাজের শেষে
নবীন হাসি মুখে নিয়ে চরম খেলার বেশে।

রাত্রি

অভিভূত ধরণীর দীপ-নেভা তোরণদুয়ারে
আসে রাত্রি,
আধা অন্ধ, আধা বোবা,
বিরাট অস্পষ্ট মূর্তি,
যুগারম্ভসৃষ্টিশালে অসমাপ্তি পুঞ্জীভূত যেন
নিদ্রার মায়ায়।
হয় নি নিশ্চিত ভাগ সত্যের মিথ্যার,
ভালোমন্দ-যাচাইয়ের তুলাদণ্ডে
বাটখারা ভুলের ওজনে।
কামনার যে পাত্রটি দিনে ছিল আলোয় লুকানো
আঁধার তাহারে টেনে আনে—
ভরে দেয় সুরা দিয়ে
রজনীগন্ধার গন্ধে,
ঝিমিঝিমি ঝিল্লির ঝননে,
আধ-দেখা কটাক্ষে ইঙ্গিতে।
ছায়া করে আনাগোনা সংশয়ের মুখোশ-পরানো,
মোহ আসে কালো মূর্তি লালরঙে এঁকে,
তপস্বীরে করে সে বিদ্রূপ।
বেড়াজাল হাতে নিয়ে সঞ্চরে আদিম মায়াবিনী
যবে গুপ্ত গুহা হতে গোধূলির ধূসর প্রান্তরে
দস্যু এসে দিবসের রাজদণ্ড কেড়ে নিয়ে যায়।

বিশ্বনাট্যে প্রথম অঙ্কের
অনিশ্চিত প্রকাশের যবনিকা
ছিন্ন করে এসেছিল দিন,

নির্বারিত করেছিল বিশ্বের চেতনা
আপনার নিঃসংশয় পরিচয়।
আবার সে আচ্ছাদন
মাঝে-মাঝে নেমে আসে স্বপ্নের সংকেতে।
আবিল বুদ্ধির স্রোতে ক্ষণিকের মতো
যেতে ওঠে ফেনার নর্তন।
প্রবৃত্তির হালে ব'সে কর্ণধার করে
উদ্‌ভ্রান্ত চালনা তন্দ্রাবিষ্ট চোখে।
নিজেরে ধিক্কার দিয়ে মন ব'লে ওঠে,
"নহি নহি আমি নহি অপূর্ণ সৃষ্টির
সমুদ্রের পঙ্কলোকে অন্ধ তলচর
অর্ধস্ফুট শক্তি যার বিহ্বলতা-বিলাসী মাতাল
তরলে নিমগ্ন অনুক্ষণ।
আমি কর্তা, আমি মুক্ত, দিবসের আলোকে দীক্ষিত,
কঠিন মাটির 'পরে
প্রতি পদক্ষেপ যার
আপনারে জয় করে চলা।"

পুনশ্চ। শান্তিনিকেতন
২৬ জুলাই, ১৯৩৯

শেষ বেলা

এল বেলা পাতা ঝরাবারে ;
শীর্ণ বলিত কায়া, আজ শুধু ভাঙা ছায়া
মেলে দিতে পারে।
একদিন ডাল ছিল ফুলে ফুলে ভরা
নানা-রঙ-করা।
কুঁড়ি ধরা ফলে
কার যেন কী কৌতূহলে

উঁকি মেরে আসা
খুঁজে নিতে আপনার বাসা।
ঋতুতে ঋতুতে
আকাশের উৎসবদূতে
এনে দিত পল্লবপল্লীতে তার
কখনো পা টিপে চলা হালকা হাওয়ার,
কখনো-বা ফাগুনের অস্থির এলোমেলো চাল
জোগাইত নাচনের তাল।

জীবনের রস আজ মজ্জায় বহে,
বাহিরে প্রকাশ তার নহে।
অন্তরবিধাতার সৃষ্টিনিদেশে
যে অতীত পরিচিত সে নূতন বেশে
সাজবদলের কাজে ভিতরে লুকালো—
বাহিরে নিবিল দীপ, অন্তরে দেখা যায় আলো।
গোধূলির ধূসরতা ক্রমে সন্ধ্যার
প্রাঙ্গণে ঘনায় আঁধার।
মাঝে-মাঝে জেগে ওঠে তারা,
আজ চিনে নিতে হবে তাদের ইশারা।
সমুখে অজানা পথ ইঙ্গিত মেলে দেয় দূরে,
সেথা যাত্রার কালে যাত্রীর পাত্রটি পুরে
সদয় অতীত কিছু সঞ্চয় দান করে তারে
পিপাসার গ্লানি মিটাবারে।
যত বেড়ে ওঠে রাতি
সত্য যা সেদিনের উজ্জ্বল হয় তার ভাতি।
এই কথা ধ্রুব জেনে নিভৃতে লুকায়ে
সারা জীবনের ঋণ একে একে দিতেছি চুকায়ে।

[শান্তিনিকেতন]
১১ জানুয়ারি, ১৯৪০

রূপ-বিরূপ

এই মোর জীবনের মহাদেশে
কত প্রান্তরের শেষে,
কত প্লাবনের স্রোতে
এলেম ভ্রমণ করি শিশুকাল হতে—
কোথাও রহস্যঘন অরণ্যের ছায়াময় ভাষা,
কোথাও পাণ্ডুর শুষ্ক মরুর নৈরাশ্য,
কোথাও-বা যৌবনের কুসুমপ্রগল্‌ভ বনপথ,
কোথাও-বা ধ্যানমগ্ন প্রাচীন পর্বত
মেঘপুঞ্জে স্তব্ধ যার দুর্বোধ কী বাণী,
কাব্যের ভাণ্ডারে আনি
স্মৃতিলেখা ছন্দে রাখিয়াছি ঢাকি,
আজ দেখি, অনেক রয়েছে বাকি।
সুকুমারী লেখনীর লজ্জা ভয়
যা পরুষ, যা নিষ্ঠুর, উৎকট যা, করে নি সঞ্চয়
আপনার চিত্রশালে;
তার সংগীতের তালে
ছন্দোভঙ্গ হল তাই,
সংকোচে সে কেন বোঝে নাই।

সৃষ্টিরঙ্গভূমিতলে
রূপ-বিরূপের নৃত্য একসঙ্গে নিত্যকাল চলে,
সে দ্বন্দ্বের করতালঘাতে
উদ্দাম চরণপাতে
সুন্দরের ভঙ্গী যত অকুণ্ঠিত শক্তিরূপ ধরে,
বাণীর সম্মোহবন্ধ ছিন্ন করে অবজ্ঞার ভরে।
তাই আজ বেদমন্ত্রে হে বজ্রী, তোমার করি স্তব—
তব মন্ত্ররব

কঙ্কক ঐশ্বর্যদান,
রৌদ্রী রাগিণীর দীক্ষা নিয়ে যাক মোর শেষগান
আকাশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
রূঢ় পৌরুষের ছন্দে
জাগুক হুংকার,
বাণীবিলাসীর কানে ব্যক্ত হোক ভর্ৎসনা তোমার।

উদীচী। শান্তিনিকেতন
২৮ জানুয়ারি, ১৯৪০

শেষ কথা

এ ঘরে ফুরালো খেলা,
এল দ্বার রুধিবার বেলা।
বিলয়বিলীন দিনশেষে
ফিরিয়া দাঁড়াও এসে
যে ছিলে গোপনচর
জীবনের অন্তরতর।
ক্ষণিক মুহূর্ততরে চরম আলোকে
দেখে নিই স্বপ্নভাঙা চোখে;
চিনে নিই, এ লীলার শেষ পরিচয়ে
কী তুমি ফেলিয়া গেলে, কী রাখিলে অন্তিম সঞ্চয়ে
কাছের দেখায় দেখা পূর্ণ হয় নাই,
মনে-মনে ভাবি তাই—
বিচ্ছেদের দূরদিগন্তের ভূমিকায়
পরিপূর্ণ দেখা দিবে অস্তরবিরশ্মির রেখায়।
জানি না, বুঝিব কিনা প্রলয়ের সীমায় সীমায়
শুভ্রে আর কালিমায়

কেন এই আসা আর যাওয়া,
কেন হারাবার লাগি এতখানি পাওয়া।
জানি না, এ আজিকার মুছে-ফেলা ছবি
আবার নূতন রঙে আঁকিবে কি তুমি, শিল্পীকবি।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
৪ এপ্রিল, ১৯৪০

সানাই

২৪।৫

সানাই

দূরের গান

সুদূরের পানে চাওয়া উৎকণ্ঠিত আমি
মন সেই আষাঢ়ায় তীর্থপথগামী
যেথায় হঠাৎ-নামা প্লাবনের জলে
তটপ্লাবী কোলাহলে
ওপারের আনে আহ্বান,
নিরুদ্দেশ পথিকের গান।
ফেনোচ্ছল সে-নদীর বন্ধহারা জলে
পণ্যতরী নাহি চলে,
কেবল অলস মেঘ ব্যর্থ ছায়া-ভাসানের খেলা
খেলাইছে এবেলা ওবেলা।

দিগন্তের নীলিমার স্পর্শ দিয়ে ঘেরা
গোধূলিলগ্নের যাত্রী মোর স্বপনেরা।
নীল আলো প্রেয়সীর আঁখিপ্রান্ত হতে
নিয়ে যায় চিত্ত মোর অকূলের অবারিত স্রোতে ;
চেয়ে চেয়ে দেখি সেই নিকটতমারে
অজানার অতিদূর পারে।

মোর জন্মকালে
নিশীথে সে কে মোরে ভাসালে
দীপ-জ্বালা ভেলাখানি নামহারা অদৃষ্টের পানে ;
আজিও চলেছি তার টানে।
বাসাহারা মোর মন
তারার আলোতে কোন্ অধরাকে করে অন্বেষণ
পথে পথে
দূরের জগতে।

ওগো দূরবাসী,
কে শুনিতে চাও মোর চিরপ্রবাসের এই বাঁশি—
অকারণ বেদনার ভৈরবীর সুরে
চেনার সীমানা হতে দূরে
যার গান কক্ষচ্যুত তারা
চিররাত্রি আকাশেতে খুঁজিছে কিনারা।
এ বাঁশি দিবে সে-মন্ত্র যে-মন্ত্রের গুণে
আজি এ ফাল্গুনে
কুসুমিত অরণ্যের গভীর রহস্যখানি
তোমার সর্বাঙ্গে মনে দিবে আনি
সৃষ্টির প্রথম গূঢ়বাণী।
যেই বাণী অনাদির সুচিরবাঞ্ছিত
তারায় তারায় শূন্যে হল রোমাঞ্চিত,
রূপেরে আনিল ডাকি
অরূপের অসীমেতে জ্যোতিঃসীমা আঁকি।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
২২ ফাল্গুন, ১৩৪৬

কর্ণধার

ওগো আমার প্রাণের কর্ণধার,
দিকে দিকে ঢেউ জাগালো
লীলার পারাবার।
আলোক-ছায়া চমকিছে
ক্ষণেক আগে ক্ষণেক পিছে,
অমার আঁধার ঘাটে ভাসায়
নৌকা পূর্ণিমার।
ওগো কর্ণধার
ডাইনে বাঁয়ে দ্বন্দ্ব লাগে
সত্যের মিথ্যার

ওগো আমার লীলার কর্ণধার,
জীবন-তরী মৃত্যুভাঁটায়
কোথায় কর পার।
নীল আকাশের মৌনখানি
আনে দূরের দৈববাণী,
গান করে দিন উদ্দেশহীন
অকূল শূন্যতার।
তুমি ওগো লীলার কর্ণধার
রক্তে বাজাও রহস্যময়
মন্ত্রের ঝংকার।

তাকায় যখন নিমেষহারা
দিনশেষের প্রথম তারা
ছায়াঘন কুঞ্জবনে
মন্দ মৃদু গুঞ্জরণে
বাতাসেতে জাল বুনে দেয়
মদির তন্দ্রার।
স্বপ্নস্রোতে লীলার কর্ণধার
গোধূলিতে পাল তুলে দাও
ধূসরচ্ছন্দার।

অস্তরবির ছায়ার সাথে
লুকিয়ে আঁধার আসন পাতে।
ঝিল্লিরবে গগন কাঁপে,
দিগঙ্গনা কী জপ জাপে,
হাওয়ায় লাগে মোহপরশ
রজনীগন্ধার।
হৃদয়-মাঝে লীলার কর্ণধার
একতারাতে বেহাগ বাজাও
বিধুর সন্ধ্যার।

রাতের শঙ্খকুহর বেয়ে
গম্ভীর রব উঠে কেঁপে।
সঙ্গবিহীন চিরন্তনের
বিরহগান বিরাট মনের
শূন্যে করে নিঃশব্দের
বিষাদবিস্তার।
তুমি আমার লীলার কর্ণধার
তারার ফেনা ফেনিয়ে তোল
আকাশগঙ্গার।

বক্ষে যবে বাজে মরণভেরি
ঘুচিয়ে ত্বরা ঘুচিয়ে সকল দেরি,
প্রাণের সীমা মৃত্যুসীমায়
সূক্ষ্ম হয়ে মিলায়ে যায়,
ঊর্ধ্বে তখন পাল তুলে দাও
অন্তিম যাত্রার।
ব্যক্ত কর, হে মোর কর্ণধার,
আঁধারহীন অচিন্ত্য সে
অসীম অন্ধকার।

উদীচী। শান্তিনিকেতন
২৮ জানুয়ারি, ১৯৪০

আসা-যাওয়া

ভালোবাসা এসেছিল
এমন সে নিঃশব্দ চরণে
তারে স্বপ্ন হয়েছিল মনে,
দিই নি আসন বসিবার।
বিদায় সে নিল যবে, খুলিতেই দ্বার
শব্দ তার পেয়ে,
ফিরায়ে ডাকিতে গেনু ধেয়ে।

তখন সে স্বপ্ন কায়াহীন,
নিশীথে বিলীন,
দূরপথে তার দীপশিখা
একটি রক্তিম মরীচিকা।

[শান্তিনিকেতন]
২৮ মার্চ, ১৯৪০

ডমরুতে নটরাজ বাজালেন তাণ্ডবে যে তাল
ছিন্ন করে দিল তার ছন্দ তব ঝংকৃত কিঙ্কিণী
হে নর্তিনী,
বেণীর বন্ধনমুক্ত উৎক্ষিপ্ত তোমার কেশজাল
ঝঞ্ঝার বাতাসে
উচ্ছৃঙ্খল উদ্দাম উচ্ছ্বাসে ;
বিদীর্ণ বিদ্যুৎঘাতে তোমার বিহ্বল বিভাবরী
হে সুন্দরী।
সীমন্তের সিঁথি তব, প্রবালে খচিত কণ্ঠহার—
অন্ধকারে মগ্ন হল চৌদিকে বিক্ষিপ্ত অলংকার।
আভরণশূন্য রূপ
বোবা হয়ে আছে করি চুপ,
ভীষণ রিক্ততা তার
উৎসুক চক্ষুর 'পরে হানিছে আঘাত অবজ্ঞার।
নিষ্ঠুর নৃত্যের ছন্দে মুগ্ধহস্তে-গাঁথা পুষ্পমালা
বিস্রস্ত দলিত দলে বিকীর্ণ করিছে রঙ্গশালা।
মোহমদে ফেনায়িত কানায় কানায়
যে পাত্রখানায়
মুক্ত হত রসের প্লাবন
মত্ততায় শেষ পালা আজি সে করিল উদ্‌যাপন।
যে অভিসারের পথে চেলাঞ্চলখানি
নিতে টানি

কম্পিত প্রদীপশিখা-'পরে
তার চিহ্ন পদপাতে লুপ্ত করি দিলে চিরতরে ;
প্রান্তে তার ব্যর্থ বাঁশিরবে
প্রতীক্ষিত প্রত্যাশার বেদনা যে উপেক্ষিত হবে।

এ নহে তো ঔদাসীন্য, নহে ক্লান্তি, নহে বিস্মরণ,
ক্রুদ্ধ এ বিতৃষ্ণা তব মাধুর্যের প্রচণ্ড মরণ,
তোমার কটাক্ষ
দেয় তারই হিংস্র সাক্ষ্য
ঝলকে ঝলকে
পলকে পলকে,
বঙ্কিম নির্মম
মর্মভেদী তরবারি-সম।
তবে তাই হোক,
ফুৎকারে নিবায়ে দাও অতীতের অন্তিম আলোক।
চাহিব না ক্ষমা তব, করিব না দুর্বল বিনতি,
পরুষ মরুর পথে হোক মোর অন্তহীন গতি,
অবজ্ঞা করিয়া পিপাসারে,
দলিয়া চরণতলে ক্রূর বালুকারে।

মাঝে মাঝে কটুস্বাদ দুখে
তীব্র রস দিতে ঢালি রজনীর অনিদ্র কৌতুকে
যবে তুমি ছিলে রহঃসখী।
প্রেমেরি সে দানখানি, সে যেন কেতকী
রক্তরেখা এঁকে গায়ে
রক্তস্রোতে মধুগন্ধ দিয়েছে মিশায়ে।
আজ তব নিঃশব্দ নীরস হাস্যবাণ
আমার ব্যথার কেন্দ্র করিছে সন্ধান।
সেই লক্ষ্য তব
কিছুতেই মেনে নাহি লব,

বক্ষ মোর এড়ায়ে সে যাবে শূন্যতলে,
যেখানে উল্কায় আলো জ্বলে
ক্ষণিক বর্ষণে
অশুভ দর্শনে।

বেজে ওঠে ডঙ্কা, শঙ্কা শিহরায় নিশীথগগনে—
হে নির্দয়া, কী সংকেত বিচ্ছুরিল খলিত কঙ্কণে।

[শান্তিনিকেতন]
২১ জানুয়ারি, ১৯৪০

জ্যোতির্বাষ্প

হে বন্ধু, সবার চেয়ে চিনি তোমাকেই
এ কথায় পূর্ণ সত্য নেই।
চিনি আমি সংসারের শত সহস্রেরে
কাজের বা অকাজের ঘেরে
নির্দিষ্ট সীমায় যারা স্পষ্ট হয়ে জাগে,
প্রত্যহের ব্যবহারে লাগে,
প্রাপ্য যাহা হাতে দেয় তাই,
দান যাহা তাহা নাহি পাই।

অনন্তের সমুদ্রমন্থনে
গভীর রহস্য হতে তুমি এলে আমার জীবনে।
উঠিয়াছ অতলের অস্পষ্টতাখানি
আপনার চারি দিকে টানি।
নীহারিকা রহে যথা কেন্দ্রে তার নক্ষত্রেরে ঘেরি,
জ্যোতির্ময় বাষ্প-মাঝে দূরবিন্দু তারাটিরে হেরি।
তোমা-মাঝে শিল্পী তার রেখে গেছে তর্জনীর মানা,
সব নহে জানা।

সৌন্দর্যের যে-পাহারা জাগিয়া রয়েছে অন্তঃপুরে
সে আমারে নিত্য রাখে দূরে।

[শান্তিনিকেতন]
২৮ মার্চ, ১৯৪০

জানালায়

বেলা হয়ে গেল, তোমার জানালা-'পরে
রৌদ্র পড়েছে বেঁকে।
এলোমেলো হাওয়া আম্‌লকি-ডালে-ডালে
দোলা দেয় থেকে থেকে।
মন্থর পায়ে চলেছে মহিষগুলি,
রাঙা পথ হতে রহি রহি ওড়ে ধূলি,
নানা পাখিদের মিশ্রিত কাকলিতে,
আকাশ আবিল ম্লান সোনালির শীতে।
পসারী হোথায় হাঁক দিয়ে যায়
গলি বেয়ে কোন্ দূরে,
ভুলে গেছি যাহা তারি ধ্বনি বাজে
বক্ষে করুণ সুরে।
চোখে পড়ে খনে খনে
তব জানালায় কম্পিত ছায়া
খেলিছে রৌদ্র-সনে।

কেন মনে হয়, যেন দূর ইতিহাসে
কোনো বিদেশের কবি
বিদেশী ভাষার ছন্দে দিয়েছে এঁকে
এ বাতায়নের ছবি।
ঘরের ভিতরে যে-প্রাণের ধারা চলে
সে যেন অতীত কাহিনীর কথা বলে।
ছায়া দিয়ে ঢাকা সুখদুঃখের মাঝে
গুঞ্জনসুরে স্মরণমূর্ছনায় বাজে।

যারা আসে যায় তাদের ছায়ায়
প্রবাসের ব্যথা কাঁপে,
আমার চক্ষু তন্দ্রা-অলস
মধ্যদিনের তাপে।
ঘাসের উপরে একা বসে থাকি,
দেখি চেয়ে দূর থেকে,
শীতের বেলার রৌদ্র তোমার
জানালায় পড়ে বেঁকে।

[উদীচী। শান্তিনিকেতন]
১৫ জানুয়ারি, ১৯৪০

ক্ষণিক

এ চিকন তব লাবণ্য যবে দেখি
মনে মনে ভাবি, এ কি
ক্ষণিকের 'পরে অসীমের বরদান,
আড়ালে আবার ফিরে নেয় তারে
দিন হলে অবসান।
একদা শিশিররাতে
শতদল তার দল ঝরাইবে
হেমন্তে হিমপাতে.
সেই যাত্রায় তোমারো মাধুরী
প্রলয়ে লভিবে গতি।
এতই সহজে মহাশিল্পীর
আপনার এত ক্ষতি
কেমন করিয়া সয়,
প্রকাশে বিনাশে বাঁধিয়া সূত্র
ক্ষয়ে নাহি মানে ক্ষয়।
যে দান তাহার সবার অধিক দান
মাটির পাত্রে সে পায় আপন স্থান

ক্ষণভঙ্গুর দিনে
নিমেষ-কিনারে বিশ্ব তাহারে
বিস্ময়ে লয় চিনে।
অসীম যাহার মূল্য সে-ছবি
সামান্য পটে আঁকি
মুছে ফেলে দেয় লোলুপেরে দিয়ে ফাঁকি।
দীর্ঘকালের ক্লান্ত আঁখির উপেক্ষা হতে তারে
সরায় অন্ধকারে।
দেখিতে দেখিতে দেখে না যখন প্রাণ
বিস্মৃতি আসি অবগুণ্ঠনে
রাখে তার সম্মান।
হরণ করিয়া লয় তারে সচকিতে,
লুব্ধ হাতের অঙ্গুলি তারে
পারে না চিহ্ন দিতে।

[উদীচী। শান্তিনিকেতন]
১৫ জানুয়ারি, ১৯৪০

অনাবৃষ্টি

প্রাণের সাধন কবে নিবেদন
করেছি চরণতলে,
অভিষেক তার হল না তোমার
করুণ নয়নজলে।
রসের বাদল নামিল না কেন
তাপের দিনে।
ঝরে গেল ফুল, মালা পরাই নি
তোমার গলে।

মনে হয়েছিল, দেখেছি করুণা
আঁখির পাতে—
উড়ে গেল কোথা শুকানো যূথীর সাথে।

যদি এ মাটিতে চলিতে চলিতে
পড়িত তোমার দান
এ মাটি লভিত প্রাণ,
একদা গোপনে ফিরে পেতে তারে
অমৃত ফলে।

[শান্তিনিকেতন]
১৩ জানুয়ারি, ১৯৪০

নতুন রঙ

এ ধূসর জীবনের গোধূলি,
ক্ষীণ তার উদাসীন স্মৃতি,
মুছে-আসা সেই ম্লান ছবিতে
রঙ দেয় গুঞ্জনগীতি।

ফাগুনের চম্পকপরাগে
সেই রঙ জাগে,
ঘুমভাঙা কোকিলের কূজনে
সেই রঙ লাগে,
সেই রঙ পিয়ালের ছায়াতে
ঢেলে দেয় পূর্ণিমাতিথি।

এই ছবি ভৈরবী-আলাপে
দোলে মোর কম্পিত বক্ষে,
সেই ছবি সেতারের প্রলাপে
মরীচিকা এনে দেয় চক্ষে,
বুকের লালিম-রঙে রাঙানো
সেই ছবি স্বপ্নের অতিথি।

[শান্তিনিকেতন]
১৩ জানুয়ারি, ১৯৪০

গানের খেয়া

যে গান আমি গাই
জানি নে সে
কার উদ্দেশে।
যবে জাগে মনে
অকারণে
চপল হাওয়া
সুর যায় ভেসে
কার উদ্দেশে।
ঐ মুখে চেয়ে দেখি,
জানি নে তুমিই সে কি
অতীত কালের মুরতি এসেছ
নতুন কালের বেশে।
কভু জাগে মনে,
যে আসে নি এ জীবনে
ঘাট খুঁজি খুঁজি
গানের খেয়া সে মাগিতেছে বুঝি
আমার তীরেতে এসে

১৩।১।৪০

অধরা

অধরা মাধুরী ধরা পড়িয়াছে
এ মোর ছন্দবন্ধনে।
বলাকাপাতির পিছিয়ে-পড়া ও পাখি,
বাসা সুদূরের বনের প্রাঙ্গণে।
গত ফসলের পলাশের রাঙিমারে
ধরে রাখে ওর পাখা,
ঝরা শিরীষের পেলব আভাস
ওর কাকলিতে মাখা।

শুনে যাও বিদেশিনী,
তোমার ভাষায় ওরে
ডাকো দেখি নাম ধ'রে।

ও জানে তোমারি দেশের আকাশ
তোমারি রাতের তারা,
তব যৌবন-উৎসবে ও যে
গানে গানে দেয় সাড়া,
ওর দুটি পাখা চঞ্চলি উঠে তব হৃৎকম্পনে।
ওর বাসাখানি তব কুঞ্জের
নিভৃত প্রাঙ্গণে।

[শান্তিনিকেতন]
১৩ জানুয়ারি, ১৯৪০

ব্যথিতা

জাগায়ো না, ওরে জাগায়ো না।
ও আজি মেনেছে হার
ক্রূর বিধাতার কাছে।
সব চাওয়া ও যে দিতে চায় নিঃশেষে
অতলে জলাঞ্জলি।
দুঃসহ দুরাশার
গুরুভার যাক দূরে
কৃপণ প্রাণের ইতর বঞ্চনা
আসুক নিবিড় নিদ্রা,
তামসী মলিন তূলিকায়
অতীত দিনের বিদ্রূপবাণী
রেখায় রেখায় মুছে মুছে দিক্

স্মৃতির পত্র হতে,
থেমে যাক ওর বেদনার গুঞ্জন
সুপ্ত পাখির স্তব্ধ নীড়ের মতো।

[শান্তিনিকেতন]
১৩ জানুয়ারি, ১৯৪০

বিদায়

বসন্ত সে যায় তো হেসে, যাবার কালে
শেষ কুসুমের পরশ রাখে বনের ডালে।
তেমনি তুমি যাবে জানি,
ঝলক দেবে হাসিখানি,
অলক হতে খসবে অশোক নাচের তালে।
ভাসান-খেলার তরীখানি চলবে বেয়ে,
একলা ঘাটে রইব চেয়ে।
অস্তরবি তোমার পালে
রঙিন রশ্মি যখন ঢালে
কালিমা রয় আমার রাতের
অন্তরালে।

[১৩৪৬]

যাবার আগে

উদাস হাওয়ার পথে পথে
মুকুলগুলি ঝরে,
কুড়িয়ে নিয়ে এনেছি তাই
লহো করুণ করে।
যখন যাব চলে
ফুটবে তোমার কোলে,
মালা গাঁথার আঙুল যেন
আমায় স্মরণ করে।

ও হাতখানি হাতে নিয়ে
বসব তোমার পাশে
ফুল-বিছানো ঘাসে,
কানাকানির সাক্ষী রইবে তারা।
বউকথাকও ডাকবে তন্দ্রাহারা।

স্মৃতির ডালায় রইবে আভাসগুলি
কালকে দিনের তরে।
শিরীষ-পাতায় কাঁপবে আলো
নীরব দ্বিপ্রহরে।

[১৩৪৬]

সানাই

সারারাত ধ'রে
গোছা গোছা কলাপাতা আসে গাড়ি ভ'রে।
আসে সরা খুরি
ভূরি ভূরি।
এপাড়া ওপাড়া হতে যত
রবাহূত অনাহূত আসে শত শত ;
প্রবেশ পাবার তরে
ভোজনের ঘরে
ঊর্ধ্বশ্বাসে ঠেলাঠেলি করে ;
ব'সে পড়ে যে পারে যেখানে,
নিষেধ না মানে।
কে কাহারে হাঁক ছাড়ে হৈ হৈ,
এ কই, ও কই।
রঙিন উষ্ণীষধর
লালরঙা সাজে যত অনুচর

অনর্থক ব্যস্ততায় ফেরে সবে
আপনার দায়িত্বগৌরবে।
গোরুর গাড়ির সারি হাটের রাস্তায়,
রাশি রাশি ধুলো উড়ে যায়,
রাঙা রাগে
রৌদ্রে গেরুয়া রঙ লাগে।
ওদিকে ধানের কল দিগন্তে কালিমাধূম্র হাত
ঊর্ধ্বে তুলি, কলঙ্কিত করিছে প্রভাত।
ধান-পচানির গন্ধে
বাতাসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
মিশাইছে বিষ।
থেকে থেকে রেলগাড়ি মাঠের ওপারে দেয় শিস
দুই প্রহরের ঘণ্টা বাজে।

সমস্ত এ ছন্দভাঙা অসংগতি-মাঝে
সানাই লাগায় তার সারঙের তান।
কী নিবিড় ঐক্যমন্ত্র করিছে সে দান
কোন্ উদ্‌ভ্রান্তের কাছে,
বুঝিবার সময় কি আছে।
অরূপের মর্ম হতে সমুচ্ছ্বাসি
উৎসবের মধুচ্ছন্দ বিস্তারিছে বাঁশি।
সন্ধ্যাতারা-জ্বালা অন্ধকারে
অনন্তের বিরাট পরশ যথা অন্তর-মাঝারে,
তেমনি সুদূর স্বচ্ছ সুর
গভীর মধুর
অমর্ত লোকের কোন্ বাক্যের অতীত সত্যবাণী
অন্যমনা ধরণীর কানে দেয় আনি।
নামিতে নামিতে এই আনন্দের ধারা
বেদনার মূর্ছনায় হয় আত্মহারা।

বসন্তের যে দীর্ঘনিশ্বাস
বিকচ বকুলে আনে বিদায়ের বিমর্ষ আভাস,
সংশয়ের আবেগ কাঁপায়
সদ্যঃপাতী শিথিল চাঁপায়
তারি স্পর্শ লেগে
সাহানার রাগিণীতে বৈরাগিণী ওঠে যেন জেগে,
চলে যায় পথহারা অর্থহারা দিগন্তের পানে।

কতবার মনে ভাবি, কী যে সে কে জানে।
মনে হয়, বিশ্বের যে মূল উৎস হতে
সৃষ্টির নির্ঝর ঝরে শূন্যে শূন্যে কোটি কোটি স্রোতে
এ রাগিণী সেথা হতে আপন ছন্দের পিছু পিছু
নিয়ে আসে বস্তুর অতীত কিছু
হেন ইন্দ্রজাল
যার সুর যার তাল
রূপে রূপে পূর্ণ হয়ে উঠে
কালের অঞ্জলিপুটে।
প্রথম যুগের সেই ধ্বনি
শিরায় শিরায় উঠে রণরণি ;
মনে ভাবি, এই সুর প্রত্যহের অবরোধ-'পরে
যতবার গভীর আঘাত করে
ততবার ধীরে ধীরে কিছু কিছু খুলে দিয়ে যায়
ভাবী যুগ-আরম্ভের অজানা পর্যায়।
নিকটের দুঃখদ্বন্দ্ব নিকটের অপূর্ণতা তাই
সব ভুলে যাই,
মন যেন ফিরে
সেই অলক্ষ্যের তীরে তীরে
যেথাকার রাত্রিদিন দিনহারা রাতে
পদ্মের কোরক-সম প্রচ্ছন্ন রয়েছে আপনাতে।

উদীচী। শান্তিনিকেতন
৪।১।৪০

পূর্ণা

তুমি গো পঞ্চদশী
শুক্লা নিশার অভিসারপথে
চরম তিথির শশী।
স্মিত স্বপ্নের আভাস লেগেছে
বিহ্বল তব রাতে।
কচিৎ চকিত বিহগকাকলি
তব যৌবনে উঠিছে আকুলি
নব আষাঢ়ের কেতকীগন্ধ-
শিথিলিত নিদ্রাতে।

যেন অশ্রুত বনমর্মর
তোমার বক্ষে কাঁপে থরথর।
অগোচর চেতনার
অকারণ বেদনার
ছায়া এসে পড়ে মনের দিগন্তে,
গোপন অশান্তি
উছলিয়া তুলে ছলছল জল
কজ্জল-আঁখিপাতে।

[শান্তিনিকেতন]
১০।১।৪০

কৃপণা

এসেছিনু দ্বারে ঘনবর্ষণ রাতে,
প্রদীপ নিবালে কেন অঞ্চলঘাতে।
কালো ছায়াখানি মনে পড়ে গেল আঁকা,
বিমুখ মুখের ছবি অন্তরে ঢাকা,
কলঙ্করেখা যেন
চিরদিন চাঁদ বহি চলে সাথে সাথে

কেন বাধা হল দিতে মাধুরীর কণা
হায় হায়, হে কৃপণা।
তব যৌবন-মাঝে
লাবণ্য বিরাজে,
লিপিখানি তার নিয়ে এসে তবু
কেন যে দিলে না হাতে।

[জানুয়ারি, ১৯৪০]

ছায়াছবি

আমার প্রিয়ার সচল ছায়াছবি
সজল নীলাকাশে।
আমার প্রিয়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
সন্ধ্যাতারায় লুকিয়ে দেখে কাকে,
সন্ধ্যাদীপের লুপ্ত আলো স্মরণে তার ভাসে।
বারিঝরা বনের গন্ধ নিয়া
পরশহারা বরণমালা গাঁথে আমার প্রিয়া।
আমার প্রিয়া ঘন শ্রাবণধারায়
আকাশ ছেয়ে মনের কথা হারায়,
আমার প্রিয়ার আঁচল দোলে
নিবিড় বনের শ্যামল উচ্ছ্বাসে।

[১৩৪৫]

স্মৃতির ভূমিকা

আজি এই মেঘমুক্ত সকালের স্নিগ্ধ নিরালায়
অচেনা গাছের যত ছিন্ন ছিন্ন ছায়ার ডালায়
রৌদ্রপুঞ্জ আছে ভরি।
সারাবেলা ধরি
কোন্ পাখি আপনারি সুরে কুতূহলী
আলস্যের পেয়ালায় ঢেলে দেয় অস্ফুট কাকলি।

হঠাৎ কী হল মতি,
সোনালি রঙের প্রজাপতি
আমার রুপালি চুলে
বসিয়া রয়েছে পথ ভুলে।
সাবধানে থাকি, লাগে ভয়,
পাছে ওর জাগাই সংশয়—
ধরা প'ড়ে যায় পাছে, আমি নই গাছের দলের,
আমার বাণী সে নহে ফুলের ফলের।
চেয়ে দেখি, ঘন হয়ে কোথা নেমে গেছে ঝোপঝাড়;
সম্মুখে পাহাড়
আপনার অচলতা ভুলে থাকে বেলা-অবেলায়,
হামাগুড়ি দিয়ে চলে দলে দলে মেঘের খেলায়।
হোথা শুষ্ক জলধারা
শব্দহীন রচিছে ইশারা
পরিশ্রান্ত নিদ্রিত বর্ষার। নুড়িগুলি
বনের ছায়ার মধ্যে অস্থিসার প্রেতের অঙ্গুলি
নির্দেশ করিছে তারে যাহা নিরর্থক,
নির্ঝরিণী-সর্পিণীর দেহচ্যুত ত্বক্।
এখনি এ আমার দেখাতে
মিলায়েছে শৈলশ্রেণী তরঙ্গিত নীলিম রেখাতে
আপন অদৃশ্য লিপি। বাড়ির সিঁড়ির 'পরে
স্তরে স্তরে
বিদেশী ফুলের টব, সেথা জেরেনিয়মের গন্ধ
শ্বসিয়া নিয়েছে মোর ছন্দ
এ চারিদিকের এই-সব নিয়ে সাথে
বর্ণে গন্ধে বিচিত্রিত একটি দিনের ভূমিকাতে
এটুকু রচনা মোর বাণীর যাত্রায় হোক পার
যে ক'দিন তার ভাগ্যে সময়ের আছে অধিকার।

মংপু
৮ জুন, ১৯৩৯

মানসী

মনে নেই, বুঝি হবে অগ্রহান মাস,
তখন তরণীবাস
ছিল মোর পদ্মাবক্ষ-'পরে।
বামে বালুচরে
সর্বশূন্য শুভ্রতার না পাই অবধি।
ধারে ধারে নদী
কলরবধারা দিয়ে নিঃশব্দেরে করিছে মিনতি।
ওপারেতে আকাশের প্রশান্ত প্রণতি
নেমেছে মন্দিরচূড়া-'পরে।
হেথা-হোথা পলিমাটিস্তরে
পাড়ির নীচের তলে
ছোলা-খেত ভরেছে ফসলে।
অরণ্যে নিবিড় গ্রাম নীলিমার নিম্নাস্তের পটে;
বাঁধা মোর নৌকাখানি জনশূন্য বালুকার তটে

পূর্ণ যৌবনের বেগে
নিরুদ্দেশ বেদনার জোয়ার উঠেছে মনে জেগে
মানসীর মায়ামূর্তি বহি।
ছন্দের বুনানি গেঁথে অদেখার সাথে কথা কহি।

ম্লানরৌদ্র অপরাহ্নবেলা
পাণ্ডুর জীবন মোর হেরিলাম প্রকাণ্ড একেলা
অনারব্ধ সৃজনের বিশ্বকর্তা-সম।
সুদূর দুর্গম
কোন্ পথে যায় শোনা
অগোচর চরণের স্বপ্নে আনাগোনা।
প্রলাপ বিছায়ে দিনু আগন্তুক অচেনার লাগি,
আহ্বান পাঠানু শূন্যে তারি পদপরশন মাগি।

শীতের কৃপণ বেলা যায় ।
ক্ষীণ কুয়াশায়
অস্পষ্ট হয়েছে বালি ।
সায়াহ্নের মলিন সোনালি
পলে পলে
বদল করিছে রঙ মসৃণ তরঙ্গহীন জলে ।

বাহিরেতে বাণী মোর হল শেষ,
অন্তরের তারে তারে ঝংকারে রহিল তার রেশ ।
অফলিত প্রতীক্ষার সেই গাথা আজি
কবিরে পশ্চাতে ফেলি শূন্যপথে চলিয়াছে বাজি ।
কোথায় রহিল তার সাথে
বক্ষস্পন্দে-কম্পমান সেই স্তব্ধ রাতে
সেই সন্ধ্যাতারা ।
জন্মসাথিহারা
কাব্যখানি পাড়ি দিল চিহ্নহীন কালের সাগরে
কিছুদিন তরে ;
শুধু একখানি
সূত্রছিন্ন বাণী
সেদিনের দিনান্তের মগ্নস্মৃতি হতে
ভেসে যায় স্রোতে ।

[মংপু]
৯ জুন, ১৯৩৯

দেওয়া-নেওয়া

বাদল দিনের প্রথম কদমফুল
আমায় করেছ দান,
আমি তো দিয়েছি ভরা শ্রাবণের
মেঘমল্লার গান ।

সজল ছায়ার অন্ধকারে
ঢাকিয়া তারে
এনেছি সুরের শ্যামল খেতের
প্রথম সোনার ধান।

আজ এনে দিলে যাহা
হয়তো দিবে না কাল,
রিক্ত হবে যে তোমার ফুলের ডাল।

স্মৃতিবন্যার উছল প্লাবনে
আমার এ গান শ্রাবণে শ্রাবণে
ফিরিয়া ফিরিয়া বাহিবে তরণী
ভরি তব সম্মান।

[শান্তিনিকেতন]
১০।১।৪০

সার্থকতা

ফাল্গুনের সূর্য যবে
দিল কর প্রসারিয়া সঙ্গীহীন দক্ষিণ অর্ণবে,
অতল বিরহ তার যুগযুগান্তের
উচ্ছ্বসিয়া ছুটে গেল নিত্য-অশান্তের
সীমানার ধারে ;
ব্যথার ব্যথিত কারে
ফিরিল খুঁজিয়া,
বেড়ালো যুঝিয়া
আপন তরঙ্গদল-সাথে।
অবশেষে রজনীপ্রভাতে,
জানে না সে কখন দুলায়ে গেল চলি
বিপুল নিশ্বাসবেগে একটুকু মল্লিকার কলি।

উছাসিল গন্ধ তার,
সচকিয়া লভিল সে গভীর রহস্য আপনার।
এই বার্তা ঘোষিল অম্বরে—
সমুদ্রের উদ্বোধন পূর্ণ আজি পুষ্পের অন্তরে।

[শান্তিনিকেতন]
৭ আশ্বিন, ১৩৪৫

মায়া

আছ এ মনের কোন্ সীমানায়
যুগান্তরের প্রিয়া।
দূরে-উড়ে-যাওয়া মেঘের ছিদ্র দিয়া
কখনো আসিছে রৌদ্র কখনো ছায়া,
আমার জীবনে তুমি আজ শুধু মায়া ;
সহজে তোমায় তাই তো মিলাই সুরে,
সহজেই ডাকি সহজেই রাখি দূরে।
স্বপ্নরূপিণী তুমি
আকুলিয়া আছ পথ-খোওয়া মোর
প্রাণের স্বর্গভূমি।
নাই কোনো ভার, নাই বেদনার তাপ,
ধূলির ধরায় পড়ে না পায়ের ছাপ।
তাই তো আমার ছন্দে
সহসা তোমার চুলের ফুলের গন্ধে
জাগে নির্জন রাতের দীর্ঘশ্বাস,
জাগে প্রভাতের পেলব তারায়
বিদায়ের স্মিত হাস।
তাই পথে যেতে কাশের বনেতে
মর্মর দেয় আনি
পাশ-দিয়ে-চলা ধানী-রঙ-করা
শাড়ির পরশখানি।

যদি জীবনের বর্তমানের তীরে
আস কভু তুমি ফিরে
স্পষ্ট আলোয়, তবে
জানি না তোমার মায়ার সঙ্গে
কায়ার কি মিল হবে।
বিরহস্বর্গলোকে
সে-জাগরণের রূঢ় আলোয়
চিনিব কি চোখে-চোখে।
সন্ধ্যাবেলায় যে-দ্বারে দিয়েছ
বিরহকরুণ নাড়া
মিলনের ঘায়ে সে-দ্বার খুলিলে
কাহারো কি পাবে সাড়া।

কালিম্পঙ
২২ জুন, ১৯৩৮

অদেয়

তোমায় যখন সাজিয়ে দিলেম দেহ,
করেছ সন্দেহ
সত্য আমার দিই নি তাহার সাথে।
তাই কেবলি বাজে আমার দিনে রাতে
সেই সুতীব্র ব্যথা—
এমন দৈন্য, এমন কৃপণতা,
যৌবন-ঐশ্বর্যে আমার এমন অসম্মান।
সে লাঞ্ছনা নিয়ে আমি পাই নে কোথাও স্থান
এই বসন্তে ফুলের নিমন্ত্রণে।
খেয়ান-মগ্ন ক্ষণে
নৃত্যহারা শান্ত নদী সুপ্ত তটের অরণ্যচ্ছায়ায়
অবসন্ন পল্লীচেতনায়

যেথায় যখন স্বপ্নে-বলা মৃদু ভাষার ধারা—
প্রথম রাতের তারা
অবাক্‌ চেয়ে থাকে,
অন্ধকারের পারে যেন কানাকানির মানুষ পেল কাকে,
হৃদয় তখন বিশ্বলোকের অনন্ত নিভৃতে
দোসর নিয়ে চায় যে প্রবেশিতে—
কে দেয় দুয়ার রুধে,
একলা ঘরের স্তব্ধ কোণে থাকি নয়ন মুদে।
কী সংশয়ে কেন তুমি এলে কাঙাল বেশে।
সময় হলে রাজার মতো এসে
জানিয়ে কেন দাও নি আমায় প্রবল তোমার দাবি।
ভেঙে যদি ফেলতে ঘরের চাবি
ধুলার 'পরে মাথা আমার দিতেম লুটায়ে,
গর্ব আমার অর্ঘ্য হত পায়ে।
দুঃখের সংঘাতে আজি সুধার পাত্র উঠেছে এই ভ'রে,
তোমার পানে উদ্দেশেতে ঊর্ধ্বে আছি ধ'রে
চরম আত্মদান।
তোমার অভিমান
আঁধার ক'রে আছে আমার সমস্ত জগৎ,
পাই নে খুঁজে সার্থকতার পথ।

কালিম্পঙ
১৮ জুন, ১৯৩৮

রূপকথায়

কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা
মনে মনে।
মেলে দিলেম গানের সুরের এই ডানা
মনে মনে।

তেপান্তরের পাথার পেরোই রূপকথার,
পথ ভুলে যাই দূর পারে সেই চুপকথার,
পারুলবনের চম্পারে মোর হয় জানা
মনে মনে।

সূর্য যখন অস্তে পড়ে ঢুলি
মেঘে মেঘে আকাশকুসুম তুলি।
সাত সাগরের ফেনায় ফেনায় মিশে
যাই ভেসে দূর দিশে,
পরীর দেশের বন্ধ দুয়ার দিই হানা
মনে মনে।

[শান্তিনিকেতন]
১০।১।৪০

আহ্বান

জেলে দিয়ে যাও সন্ধ্যাপ্রদীপ
বিজন ঘরের কোণে।
নামিল শ্রাবণ, কালো ছায়া তার
ঘনাইল বনে বনে।

বিস্ময় আনো ব্যগ্র হিয়ার পরশ-প্রতীক্ষায়
সজল পবনে নীল বসনের চঞ্চল কিনারায়,
দুয়ার-বাহির হতে আজি ক্ষণে ক্ষণে
তব কবরীর করবীমালার বারতা আসুক মনে।

বাতায়ন হতে উৎসুক দুই আঁখি
তব মঞ্জীর-ধ্বনি পথ বেয়ে
তোমারে কি যায় ডাকি।

কম্পিত এই মোর বক্ষের ব্যথা
অলকে তোমার আনে কি চঞ্চলতা
বকুলবনের মুখরিত সমীরণে।

[শান্তিনিকেতন]
১০।১।৪০

অধীরা

চির-অধীরার বিরহ-আবেগ
দূরদিগন্তপথে
ঝঞ্ঝার ধ্বজা উড়ায়ে ছুটিল
মত্ত মেঘের রথে।
দ্বার ভাঙিবার অভিযান তার,
বারবার কর হানে,
বারবার হাঁকে 'চাই আমি চাই',
ছোটে অলক্ষ্য-পানে।

হুহু হুংকার ঝঞ্ঝার ঘর্ষণ,
সঘন শূন্যে বিদ্যুৎঘাতে
তীব্র কী হর্ষণ।
দুর্দাম প্রেম কি এ—
প্রস্তর ভেঙে খোঁজে উত্তর
গর্জিত ভাষা দিয়ে।
মানে না শাস্ত্র, জানে না শঙ্কা,
নাই দুর্বল মোহ—
প্রভুশাপ-'পরে হানে অভিশাপ
দুর্বার বিদ্রোহ।

করুণ ধৈর্যে গনে না দিবস,
সহে না পলেক ক্ষোণ,

তাপসের তপ করে না মান্য,
ভাঙে সে মুনির মৌন।
মৃত্যুরে দেয় টিটকারি তার হাস্যে,
মঞ্জীরে বাজে যে-ছন্দ তার লাস্যে
নহে মন্দাক্রান্তা—
প্রদীপ লুকায়ে শঙ্কিত পায়ে
চলে না কোমলকান্তা।

নিষ্ঠুর তার চরণতাড়নে
বিঘ্ন পড়িছে খসে,
বিধাতারে হানে ভর্ৎসনাবাণী
বজ্রের নির্ঘোষে।
নিলাজ ক্ষুধায় অগ্নি বরষে
নিঃসংকোচ আঁখি,
ঝড়ের বাতাসে অবগুণ্ঠন
উড্ডীন থাকি থাকি।

মুক্ত বেণীতে, স্রস্ত আঁচলে,
উচ্ছৃঙ্খল সাজে
দেখা যায় ওর মাঝে
অনাদি কালের বেদনায় উদ্‌বোধন-
সৃষ্টিযুগের প্রথম রাতের রোদন—
যে-নবসৃষ্টি অসীম কালের
সিংহদুয়ারে থামি
হেঁকেছিল তার প্রথম মন্ত্রে
'এই আসিয়াছি আমি'।

মংপু
৮ জুন, ১৯৩৮

বাসাবদল

যেতেই হবে।
দিনটা যেন খোঁড়া পায়ের মতো
ব্যাণ্ডেজেতে বাঁধা।
একটু চলা, একটু থেমে-থাকা,
টেবিলটাতে হেলান দিয়ে বসা
সিঁড়ির দিকে চেয়ে।
আকাশেতে পায়রাগুলো ওড়ে
ঘুরে ঘুরে চক্র বেঁধে।
চেয়ে দেখি দেয়ালে সেই লেখনখানি
গেল বছরের,
লালরঙা পেন্‌সিলে লেখা—
'এসেছিলুম; পাই নি দেখা; যাই তা হলে।
দোসরা ডিসেম্বর।'
এ লেখাটি ধুলো ঝেড়ে রেখেছিলেম তাজা,
যাবার সময় মুছে দিয়ে যাব।
পুরোনো এক ব্লটিং কাগজ
চায়ের ভোজে অলস ক্ষণের হিজিবিজি-কাটা,
ভাঁজ ক'রে তাই নিলেম জামার নীচে
প্যাক করতে গা লাগে না,
মেজের 'পরে বসে আছি পা ছড়িয়ে।
হাতপাখাটা ক্লান্ত হাতে
অন্যমনে দোলাই ধীরে ধীরে।
ভেঙ্কে ছিল মেডেন্‌-হেয়ার পাতায় বাঁধা
শুকনো গোলাপ,
কোলে নিয়ে ভাবছি বসে—
কী ভাবছি কে জানে।

অবিনাশের ফরিদপুরে বাড়ি,
আনুকূল্য তার
বিশেষ কাজে লাগে
আমার এই দশাতেই।
কোথা থেকে আপনি এসে জোটে
চাইতে না চাইতেই,
কাজ পেলে সে ভাগ্য ব'লেই মানে—
খাটে মুটের মতো।
জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা,
লাগল ক'ষে আস্তিন গুটিয়ে
ওডিকলোন মুড়ে নিল পুরোনো এক আনন্দবাজারে।
ময়লা মোজায় জড়িয়ে নিল এমোনিয়া।
ড্রেসিং কেসে রাখল খোপে খোপে
হাত-আয়না, রুপোয় বাঁধা ব্রুশ,
নখ চাঁচবার উখো,
সাবানদানি, ক্রিমের কৌটো ম্যাকাসারের তেল।
ছেড়ে-ফেলা শাড়িগুলো
নানা দিনের নিমন্ত্রণের
ফিকে গন্ধ ছড়িয়ে দিল ঘরে।
সেগুলো সব বিছিয়ে দিয়ে চেপে চেপে
পাট করতে অবিনাশের যে-সময়টা গেল
নেহাত সেটা বেশি।
বারে বারে ঘুরিয়ে আমার চটিজোড়া
কোঁচা দিয়ে যত্নে দিল মুছে,
ফুঁ দিয়ে সে উড়িয়ে দিল ধুলোটা কাল্পনিক
মুখের কাছে ধ'রে।
দেয়াল থেকে খসিয়ে নিল ছবিগুলো,
একটা বিশেষ ফোটো
মুছল আপন আস্তিনেতে অকারণে।
একটা চিঠির খাম

হঠাৎ দেখি লুকিয়ে নিল
বুকের পকেটেতে।
দেখে যেমন হাসি পেল, পড়ল দীর্ঘশ্বাস।
কার্পেটটা গুটিয়ে দিল দেয়াল ঘেঁষে—
জন্মদিনের পাওয়া,
হল বছর-সাতেক।

অবসাদের ভারে অলস মন,
চুল বাঁধতে গা লাগে নাই সারা সকালবেলা,
আলগা আঁচল অন্যমনে বাঁধি নি ব্রোচ দিয়ে।
কুটিকুটি ছিঁড়তেছিলেম একে-একে
পুরোনো সব চিঠি—
ছড়িয়ে রইল মেঝের 'পরে, ঝাঁট দেবে না কেউ
বোশেখমাসের শুকনো হাওয়া ছাড়া।
ডাক আনল পাড়ার পিয়ন বুড়ো,
দিলেম সেটা কাঁপা হাতে রিডাইরেক্টেড ক'রে।
রাস্তা দিয়ে চলে গেল তপসি-মাছের হাঁক,
চমকে উঠে হঠাৎ পড়ল মনে—
নাই কোনো দরকার।
মোটর-গাড়ির চেনা শব্দ কখন দূরে মিলিয়ে গেছে
সাড়ে-দশটা বেলায়
পেরিয়ে গিয়ে হাজরা রোডের মোড়।

উজাড় হল ঘর,
দেয়ালগুলো অবুঝ-পারা তাকিয়ে থাকে ফ্যাকাশে দৃষ্টিতে
যেখানে কেউ নেই।
সিঁড়ি বেয়ে পৌঁছে দিল অবিনাশ
ট্যাক্সিগাড়ি-'পরে।
এই দরোজায় শেষ বিদায়ের বাণী
শোনা গেল ঐ ভক্তের মুখে—

বললে, 'আমায় চিঠি লিখো।'
রাগ হল তাই শুনে
কেন জানি বিনা কারণেই।

[শান্তিনিকেতন
অগস্ট, ১৯৩৮]

শেষ কথা

রাগ কর নাই কর, শেষ কথা এসেছি বলিতে
তোমার প্রদীপ আছে, নাইকো সলিতে।
শিল্প তার মূল্যবান, দেয় না সে আলো,
চোখেতে জড়ায় লোভ, মনেতে ঘনায় ছায়া কালো
অবসাদে। তবু তারে প্রাণপণে রাখি যতনেই,
ছেড়ে যাব তার পথ নেই।
অন্ধকারে অন্ধদৃষ্টি নানাবিধ স্বপ্ন দিয়ে ঘেরে
আচ্ছন্ন করিয়া বাস্তবেরে।
অস্পষ্ট তোমারে যবে
ব্যগ্রকণ্ঠে ডাক দিই অত্যুক্তির স্তবে
তোমারে লঙ্ঘন করি সে-ডাক বাজিতে থাকে সুরে
তাহারি উদ্দেশে আজো যে রয়েছে দূরে।
হয়তো সে আসিবে না কভু,
তিমিরে আচ্ছন্ন তুমি তারেই নির্দেশ কর তবু।
তোমার এ দূত অন্ধকার
গোপনে আমার
ইচ্ছারে করিয়া পঙ্গু গতি তার করেছে হরণ,
জীবনের উৎসজলে মিশায়েছে মাদক মরণ।
রক্তে মোর যে-দুর্বল আছে
শঙ্কিত বক্ষের কাছে
তারেই সে করেছে সহায়,
পশুবাহনের মতো মোহভার তাহারে বহায়।

সে যে একান্তই দীন,
মূল্যহীন,
নিগড়ে বাঁধিয়া তারে
আপনারে
বিড়ম্বিত করিতেছ পূর্ণ দান হতে.
এ প্রমাদ কখনো কি দেখিবে আলোতে।
প্রেম নাহি দিয়ে যারে টানিয়াছ উচ্ছিষ্টের লোভে
সে-দীন কি পার্শ্বে তব শোভে।
কভু কি জানিতে পাবে অসম্মানে নত এই প্রাণ
বহন করিছে নিত্য তোমারি আপন অসম্মান।
আমারে যা পারিলে না দিতে
সে-কার্পণ্য তোমারেই চিরদিন রহিল বঞ্চিতে।

শ্যামলী। শান্তিনিকেতন
২২ মার্চ, ১৯৩৯

মুক্তপথে

ঝাঁকাও ভুরু দ্বারে আগল দিয়া,
চক্ষু করো রাঙা,
ঐ আসে মোর জাত-খোয়ানো প্রিয়া
ভদ্র-নিয়ম-ভাঙা।
আসন পাবার কাঙাল ও নয় তো
আচার-মানা ঘরে—
আমি ওকে বসাব হয়তো
ময়লা কাঁথার 'পরে।
সারধানে রয় বাজার-দরের খোঁজে
সাধু গাঁয়ের লোক,
ধুলার বরন ধূসর বেশে ও যে
এড়ায় তাদের চোখ।

বেশের আদর করতে গিয়ে ওরা
রূপের আদর ভোলে—

আমার পাশে ও মোর মনোচোরা,
একলা এসো চলে।
হঠাৎ কখন এসেছ ঘর ফেলে
তুমি পথিক-বধূ,
মাটির ভাঁড়ে কোথায় থেকে পেলে
পদ্মবনের মধু।
ভালোবাসি ভাবের সহজ খেলা
এসেছ তাই শুনে—
মাটির পাত্রে নাইকো আমার হেলা
হাতের পরশগুণে।
পায়ে নূপুর নাই রহিল বাঁধা,
নাচেতে কাজ নাই,
যে-চলনটি রক্তে তোমার সাধা
মন ভোলাবে তাই।
লজ্জা পেতে লাগে তোমার লাজ
ভূষণ নেইকো ব'লে,
নষ্ট হবে নেই তো এমন সাজ
ধুলোর 'পরে চ'লে।
গাঁয়ের কুকুর ফেরে তোমার পাশে,
রাখালরা হয় জড়ো,
বেদের মেয়ের মতন অনায়াসে
টাট্টু ঘোড়ায় চড়ো।
ভিজে শাড়ি হাঁটুর 'পরে তুলে
পার হয়ে যাও নদী,
বামুনপাড়ার রাস্তা যে যাই ভুলে
তোমায় দেখি যদি।

হাটের দিনে শাক তুলে যাও ক্ষেতে
চুপড়ি নিয়ে কাঁখে,
মটর কলাই খাওয়াও আঁচল পেতে
পথের গাধাটাকে।
মান' নাকো বাদল দিনের মানা,
কাদায়-মাখা পায়ে
মাথায় তুলে কচুর পাতাখানা
যাও চলে দূর গাঁয়ে।
পাই তোমারে যেমন খুশি তাই
যেথায় খুশি সেথা।
আয়োজনের বালাই কিছু নাই
জানবে বলো কে তা।
সতর্কতার দায় ঘুচায়ে দিয়ে
পাড়ার অনাদরে
এসো ও মোর জাত-খোয়ানো প্রিয়ে,
মুক্ত পথের 'পরে।

[শ্রীনিকেতন]
৬ নভেম্বর, ১৯৩৬

দ্বিধা

এসেছিলে তবু আস নাই, তাই
জানায়ে গেলে
সমুখের পথে পলাতকা পদ-পতন ফেলে।
তোমার সে উদাসীনতা
উপহাসভরে জানালো কি মোর দীনতা।
সে কি ছল-করা অবহেলা, জানি না সে—
চপল চরণ সত্য কি ঘাসে ঘাসে
গেল উপেক্ষা মেলে।

পাতায় পাতায় ফোঁটা ফোঁটা ঝরে জল,
ছলছল করে শ্যাম বনান্ততল।

তুমি কোথা দূরে কুঞ্জছায়াতে
মিলে গেলে কলমুখর মায়াতে,
পিছে পিছে তব ছায়ারৌদ্রের
খেলা গেলে তুমি খেলে।

[জানুয়ারি, ১৯৪০]

আধোজাগা

রাত্রে কখন মনে হল যেন
ঘা দিলে আমার দ্বারে,
জানি নাই আমি জানি নাই, তুমি
স্বপ্নের পরপারে।
অচেতন মন-মাঝে
নিবিড় গহনে ঝিমিঝিমি ধ্বনি বাজে,
কাঁপিছে তখন বেণুবনবায়ু
ঝিল্লির ঝংকারে।

জাগি নাই আমি জাগি নাই গো,
আধোজাগরণ বহিছে তখন
মৃদুমন্থরধারে।

গভীর মন্দ্রস্বরে
কে করেছে পাঠ পথের মন্ত্র
মোর নির্জন ঘরে।
জাগি নাই আমি জাগি নাই যবে
বনের গন্ধ রচিল ছন্দ
তন্দ্রার চারিধারে।

[জানুয়ারি, ১৯৪০]

যক্ষ

যক্ষের বিরহ চলে অবিশ্রাম অলকার পথে
পবনের ধৈর্যহীন রথে
বর্ষাবাষ্প-ব্যাকুলিত দিগন্তে ইঙ্গিত-আমন্ত্রণে
গিরি হতে গিরিশীর্ষে বন হতে বনে।
সমুৎসুক বলাকার ডানায় আনন্দ-চঞ্চলতা
তারি সাথে উড়ে চলে বিরহীর আগ্রহ-বারতা
চিরদূর স্বর্গপুরে,
ছায়াচ্ছন্ন বাদলের বক্ষোদীর্ণ নিশ্বাসের সুরে
নিবিড় ব্যথার সাথে পদে পদে পরমসুন্দর
পথে পথে মেলে নিরন্তর।

পথিক কালের মর্মে জেগে থাকে বিপুল বিচ্ছেদ ;
পূর্ণতার সাথে ভেদ
মিটাতে সে নিত্য চলে ভবিষ্যের তোরণে তোরণে
নব নব জীবনে মরণে।
এ বিশ্ব তো তারি কাব্য, মন্দাক্রান্তে তারি রচে টীকা
বিরাট দুঃখের পটে আনন্দের সুদূর ভূমিকা।
ধন্য যক্ষ সেই
সৃষ্টির আগুন-জ্বালা এই বিরহেই।

হোথা বিরহিণী ও যে স্তব্ধ প্রতীক্ষায়,
দণ্ড পল গনি গনি মন্থর দিবস তার যায়।
সম্মুখে চলার পথ নাই,
রুদ্ধ কক্ষে তাই
আগন্তুক পান্থ-লাগি ক্লান্তিভারে ধূলিশায়ী আশা।
কবি তারে দেয় নাই বিরহের তীর্থগামী ভাষা।

তার তরে বাণীহীন যক্ষপুরী ঐশ্বর্যের কারা
অর্থহারা—
নিত্য পুষ্প, নিত্য চন্দ্রালোক,
অস্তিত্বের এত বড়ো শোক
নাই মর্তভূমে
জাগরণ নাহি যার স্বপ্নমুগ্ধ ঘুমে।
প্রভুবরে যক্ষের বিরহ
আঘাত করিছে ওর দ্বারে অহরহ।
স্তব্ধগতি চরমের স্বর্গ হতে
ছায়ায়-বিচিত্র এই নানাবর্ণ মর্তের আলোতে
উহারে আনিতে চাহে
তরঙ্গিত প্রাণের প্রবাহে।

কালিম্পঙ
২০ জুন, ১৯৩৮

পরিচয়

বয়স ছিল কাঁচা,
বিদ্যালয়ের মধ্যপথের থেকে
বার হয়েছি আই-এ'র পালা সেরে।
মুক্ত বেণী পড়ল বাঁধা খোঁপার পাকে,
নতুন রঙের শাড়ি দিয়ে
দেহ ঘিরে যৌবনকে নতুন নতুন ক'রে
পেয়েছিলুম বিচিত্র বিস্ময়ে।

অচিন জগৎ বুকের মধ্যে পাঠিয়ে দিত ডাক
কখন থেকে থেকে,
দুপুরবেলায় অকাল ধারায় ভিজে মাটির আতপ্ত নিশ্বাসে,
চৈত্ররাতের মদির ঘন নিবিড় শূন্যতায়,
ভোরবেলাকার তন্দ্রাবিবশ দেহে
ঝাপসা আলোয় শিশির-ছোঁয়া আলস-জড়িমাতে।

যে-বিশ্ব মোর স্পষ্ট জানায় শেষের সীমায় থাকে
তারি মধ্যে, গুণী, তুমি অচিন সবার চেয়ে
তোমার আপন রচন-অন্তরালে।
কখনো-বা মাসিকপত্রে চমক দিত প্রাণে
অপূর্ব এক বাণীর ইন্দ্রজাল,
কখনো-বা আলগা-মলাট বইয়ের দাগি পাতায়
হাজারোবার-পড়া লেখায় পুরোনো কোন্ লাইন
হানত বেদন বিদ্যুতেরই মতো,
কখনো-বা বিকেলবেলায় ট্রামে চ'ড়ে
হঠাৎ মনে উঠত গুন্‌গুনিয়ে
অকারণে একটি তোমার শ্লোক।

অচিন কবি, তোমার কথার ফাঁকে ফাঁকে
দেখা যেত একটি ছায়াছবি—
স্বপ্নঘোড়ায়-চড়া তুমি খুঁজতে বেরিয়েছ
তোমার মানসীকে
সীমাবিহীন তেপান্তরে,
রাজপুত্র তুমি যে রূপকথার।

আয়নাখানার সামনে সেদিন চুল বাঁধবার বেলায়
মনে যদি ক'রে থাকি সে রাজকন্যা আমিই,
হেসো না তাই ব'লে।
তোমার সঙ্গে দেখা হবার আগে-ভাগেই
ছুঁইয়েছিলে রুপোর কাঠি,
জাগিয়েছিলে ঘুমন্ত এই প্রাণ।
সেই বয়সে আমার মতো অনেক মেয়ে
ঐ কথাটাই ভেবেছিল মনে;
তোমায় তারা বারে বারে পত্র লিখেছিল,
কেবল তোমার দেয় নি ঠিকানাটা।

হায় রে খেয়াল! খেয়াল এ কোন্ পাগলা বসন্তের;
ঐ খেয়ালের কুয়াশাতে আবছা হয়ে যেত
কত দুপুরবেলায়
কত ক্লাসের পড়া,
উছল হয়ে উঠত হঠাৎ
যৌবনেরই খাপছাড়া এক ঢেউ।

রোমান্স বলে একেই—
নবীন প্রাণের শিল্পকলা আপনা ভোলাবার।
আর-কিছুদিন পরেই
কখন ভাবের নীহারিকায় রশ্মি হত ফিকে—
বয়স যখন পেরিয়ে যেত বিশ-পঁচিশের কোঠা,
হাল-আমলের নভেল প'ড়ে
মনের যখন আব্রু যেত ভেঙে,
তখন হাসি পেত
আজকে দিনের কচিমেয়েপনায়।

সেই যে তরুণীরা
ক্লাসের পড়ার উপলক্ষে
পড়ত বসে 'ওড্‌স্ টু নাইটিঙ্গেল',
না-দেখা কোন্ বিদেশবাসী বিহঙ্গমের
না-শোনা সংগীতে
বক্ষে তাদের মোচড় দিত,
ঝরোখা সব খুলে যেত হৃদয়-বাতায়নে
ফেনায়িত সুনীল শূন্যতায়
উজাড় পরীস্থানে।

বরষ-কয়েক যেতেই
চোখে তাদের জুড়িয়ে গেল দৃষ্টিদহন
মরীচিকায়-পাগল হরিণীর।

ছেঁড়া মোজা শেলাই করায় এল যুগান্তর,
বাজারদরের ঠকা নিয়ে চাকরগুলোর সঙ্গে বকাবকির,
চা-পান-সভায় হাঁটুজলের সখ্যসাধনার।
কিন্তু আমার স্বভাববশে
ঘোর ভাঙে নি যখন ভোলামনে
এলুম তোমার কাছাকাছি।

চেনাশোনার প্রথম পালাতেই
পড়ল ধরা, একেবারে দুর্লভ নও তুমি—
আমার লক্ষ্য-সন্ধানেরই আগেই
তোমায় দেখি আপনি বাঁধন-মানা।
হায় গো রাজার পুত্র,
একটু পরশ দেবামাত্র পড়ল মুকুট খ'সে
আমার পায়ের কাছে,
কটাক্ষেতে চেয়ে তোমার মুখে
হেসেছিলুম আবিল চোখের বিহ্বলতায়।
তাহার পরে হঠাৎ কবে মনে হল—
দিগন্ত মোর পাংশু হয়ে গেল,
মুখে আমার নামল ধূসর ছায়া;
পাখির কণ্ঠে মিইয়ে গেল গান,
পাখায় লাগল উড়ুক্কু পাগলামি।
পাখির পায়ে এঁটে দিলেম ফাঁস
অভিমানের ব্যঙ্গস্বরে,
বিচ্ছেদেরই ক্ষণিক বঞ্চনায়,
কটুরসের তীব্র মাধুরীতে।

এমন সময় বেড়াজালের ফাঁকে
পড়ল এসে আরেক মায়াবিনী;
রণিতা তার নাম।
এ কথাটা হয়তো জান—

মেয়েতে মেয়েতে আছে বাজি-রাখার পণ
ভিতরে ভিতরে।
কটাক্ষে সে চাইল আমায়, তারে চাইলুম আমি,
পাশা ফেলল নিপুণ হাতের ঘুরুনিতে,
এক দানেতেই হল তারি জিত।
জিত? কে জানে তাও সত্য কি না।
কে জানে তা নয় কি তারি
দারুণ হারের পালা।

সেদিন আমি মনের ক্ষোভে
বলেছিলুম কপালে কর হানি,
চিনব ব'লে এলেম কাছে
হল বটে নিংড়ে নিয়ে চেনা
চরম বিকৃতিতে।
কিন্তু তবু ধিক্‌ আমারে, যতই দুঃখ পাই
পাপ যে মিথ্যে কথা।
আপনাকে তো ভুলিয়েছিলুম যেই তোমারে এলেম ভোলাবারে;
ঘুলিয়ে-দেওয়া ঘূর্ণিপাকে সেই কি চেনার পথ।
আমার মায়ার জালটা ছিঁড়ে অবশেষে আমায় বাঁচালে যে;
আবার সেই তো দেখতে পেলেম
আজো তোমার স্বপ্নঘোড়ায়-চড়া
নিত্যকালের সন্ধান সেই মানসসুন্দরীকে
সীমাবিহীন তেপান্তরের মাঠে।

দেখতে পেলেম ছবি,
এই বিশ্বের হৃদয়মাঝে
বসে আছেন অনির্বচনীয়া,
তুমি তাঁরি পায়ের কাছে বাজাও তোমার বাঁশি।
এ-সব কথা শোনাচ্ছে কি সাজিয়ে-বলার মতো।

না বন্ধু, এ হঠাৎ মুখে আসে,
ঢেউয়ের মুখে মোতির ঝিনুক যেন
মরুবালুর তীরে।
এ-সব কথা প্রতিদিনের নয়;
যে-তুমি নও প্রতিদিনের সেই তোমারে দিলাম যে-অঞ্জলি
তোমার দেবীর প্রসাদ রবে তাহে।
আমি কি নই সেই দেবীরই সহচরী,
ছিলাম না কি অচিন রহস্যে
যখন কাছে প্রথম এসেছিলে।

তোমায় বেড়া দিতে গিয়ে আমায় দিলেম সীমা।
তবু মনে রেখো,
আমার মধ্যে আজো আছে চেনার অতীত কিছু।

[মংপু]
১৩ জুন, ১৯৩৯

নারী

স্বাতন্ত্র্যস্পর্ধায় মত্ত পুরুষেরে করিবারে বশ
যে-আনন্দরস
রূপ ধরেছিল রমণীতে,
ধরণীর ধমনীতে
তুলেছিল চাঞ্চল্যের দোল
রক্তিম হিল্লোল,
সেই আদি ধ্যানমূর্তিটিরে
সন্ধান করিছে ফিরে ফিরে
রূপকার মনে-মনে
বিধাতার তপস্যার সংগোপনে।
পলাতকা লাবণ্য তাহার
বাঁধিবারে চেয়েছে সে আপন সৃষ্টিতে
প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে।

দুর্বাধ্য প্রস্তরশিল্পে দুঃসাধ্য সাধনা
সিংহাসন করেছে রচনা
অধরাকে করিতে আপন
চিরন্তন।
সংসারের ব্যবহারে যত লজ্জা ভয়
সংকোচ সংশয়,
শাস্ত্রবচনের ঘের,
ব্যবধান বিধিবিধানের
সকলি ফেলিয়া দূরে
ভোগের অতীত মূল সুরে
নগ্নতা করেছে শুচি,
দিয়ে তারে ভুবনমোহিনী শুভ্ররুচি।
পুরুষের অনন্ত বেদন
মর্তের মদিরা-মাঝে স্বর্গের সুধারে অন্বেষণ।
তারি চিহ্ন যেখানে-সেখানে
কাব্যে গানে,
ছবিতে মূর্তিতে,
দেবালয়ে দেবীর স্তুতিতে।
কালে কালে দেশে দেশে শিল্পস্বপ্নে দেখে রূপখানি,
নাহি তাহে প্রত্যহের গ্লানি।
দুর্বলতা নাহি তাহে, নাহি ক্লান্তি—
টানি লয়ে বিশ্বের সকল কান্তি
আদিস্বর্গলোক হতে নির্বাসিত পুরুষের মন
রূপ আর অরূপের ঘটায় মিলন।
উদ্ভাসিত ছিলে তুমি, অয়ি নারী, অপূর্ব আলোকে
সেই পূর্ণ লোকে—
সেই ছবি আনিতেছ ধ্যান ভরি
বিচ্ছেদের মহিমায় বিরহীর নিত্যসহচরী।

আলমোড়া
১৮ মে, ১৯৩৭

গানের স্মৃতি

কেন মনে হয়—
তোমার এ গানখানি এখনি যে শোনালে তা নয়।
বিশেষ লগ্নের কোনো চিহ্ন পড়ে নাই এর সুরে ;
শুধু এই মনে পড়ে, এই গানে দিগন্তের দূরে
আলোর কাঁপনখানি লেগেছিল সন্ধ্যাতারকার
সুগভীর স্তব্ধতায়, সে-স্পন্দন শিরায় আমার
রাগিণীর চমকেতে রহি রহি বিচ্ছুরিছে আলো
আজি দেয়ালির দিনে। আজো এই অন্ধকারে জ্বালো
সেই সায়াহ্নের স্মৃতি, যে নিভৃতে নক্ষত্রসভায়
নীহারিকা ভাষা তার প্রসারিল নিঃশব্দ প্রভায়—
যে ক্ষণে তোমার স্বর জ্যোতির্লোকে দিতেছিল আনি
অনন্তের-পথ-চাওয়া ধরিত্রীর সকরুণ বাণী।
সেই স্মৃতি পার হয়ে মনে মোর এই প্রশ্ন লাগে,
কালের-অতীত প্রান্তে তোমারে কি চিনিতাম আগে।
দেখা হয়েছিল না কি কোনো-এক সংগীতের পথে
অরূপের মন্দিরেতে অপরূপ ছন্দের জগতে।

শান্তিনিকেতন
দেয়ালি [৫ কার্তিক] ১৩৪৫

অবশেষে

যৌবনের অনাহূত রবাহূত ভিড়-করা ভোজে
কে ছিল কাহার খোঁজে,
ভালো করে মনে ছিল না তা
ক্ষণে ক্ষণে হয়েছে আসন পাতা,
ক্ষণে ক্ষণে নিয়েছে সরায়ে।
মালা কেহ গিয়েছে পরায়ে
জেনেছিনু, তবু কে যে জানি নাই তারে।

মাঝখানে বারে বারে
কত কী যে এলোমেলো
কভু গেল, কভু এল।
সার্থকতা ছিল যেইখানে
ক্ষণিক পরশি তারে চলে গেছি জনতার টানে।
সে যৌবনমধ্যাহ্নের অজস্রের পালা
শেষ হয়ে গেছে আজি, সন্ধ্যার প্রদীপ হল জ্বালা।
অনেকের মাঝে যারে কাছে দেখে হয় নাই দেখা
একেলার ঘরে তারে একা
চেয়ে দেখি, কথা কই চুপে চুপে,
পাই তারে না-পাওয়ার রূপে।

শান্তিনিকেতন
৩ ডিসেম্বর, ১৯৩৮

সম্পূর্ণ

প্রথম তোমাকে দেখেছি তোমার
বোনের বিয়ের বাসরে
নিমন্ত্রণের আসরে।
সেদিন তখনো দেখেও তোমাকে দেখি নি.
তুমি যেন ছিলে সূক্ষ্মরেখিণী
ছবির মতো—
পেন্সিলে-আঁকা ঝাপসা ধোঁয়াটে লাইনে
চেহারার ঠিক ভিতর দিকের
সন্ধানটুকু পাই নে।
নিজের মনের রঙ মেলাবার বাটিতে
চাপালি খড়ির মাটিতে
গোলাপি খড়ির রঙ হয় নি যে গোলা,
সোনালি রঙের মোড়ক হয় নি খোলা।

দিনে দিনে শেষে সময় এসেছে আগিয়ে,
তোমার ছবিতে আমারি মনের
রঙ যে দিয়েছি লাগিয়ে।
বিধাতা তোমাকে সৃষ্টি করতে এসে
আনমনা হয়ে শেষে
কেবল তোমার ছায়া
রচে দিয়ে, ভুলে ফেলে গিয়েছেন—
শুরু করেন নি কায়া।
যদি শেষ করে দিতেন, হয়তো
হত সে তিলোত্তমা,
একেবারে নিরুপমা।
যত রাজ্যের যত কবি তাকে
ছন্দের ঘের দিয়ে
আপন বুলিটি শিখিয়ে করত
কাব্যের পোষা টিয়ে।
আমার মনের স্বপ্নে তোমাকে
যেমনি দিয়েছি দেহ
অমনি তখন নাগাল পায় না
সাহিত্যিকেরা কেহ।
আমার দৃষ্টি তোমার সৃষ্টি
হয়ে গেল একাকার।
মাঝখান থেকে বিশ্বপতির ঘুচে গেল অধিকার।
তুমি যে কেমন আমিই কেবল জানি,
কোনো সাধারণ বাণী
লাগে না কোনোই কাজে।
কেবল তোমার নাম ধ'রে মাঝে-মাঝে
অসময়ে দিই ডাক,
কোনো প্রয়োজন থাক্ বা নাই-বা থাক্।
অমনি তখনি কাঠিতে-জড়ানো উলে
হাত কেঁপে গিয়ে গুন্‌তিতে যাও ভুলে।

কোনো কথা আর নাই কোনো অভিধানে
যার এত বড়ো মানে

শ্যামলী। শান্তিনিকেতন
২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৯

উদ্‌বৃত্ত

তব দক্ষিণ হাতের পরশ
কর নি সমর্পণ।
লেখে আর মোছে তব আলো ছায়া
ভাবনার প্রাঙ্গণে
খনে খনে আলিপন।

বৈশাখে কৃশ নদী
পূর্ণ স্রোতের প্রসাদ না দিল যদি
শুধু কুণ্ঠিত বিশীর্ণ ধারা
তীরের প্রান্তে
জাগালো পিয়াসি মন।

যতটুকু পাই ভীরু বাসনার
অঞ্জলিতে
নাই বা উচ্ছলিল,
সারা দিবসের দৈন্যের শেষে
সঞ্চয় সে যে
সারা জীবনের স্বপ্নের আয়োজন

[মংপু]
৩০।৯।৩৯

ভাঙন

কোন্ ভাঙনের পথে এলে
    আমার সুপ্ত রাতে।
ভাঙল যা তাই ধন্য হল
    নিঠুর চরণ-পাতে।
রাখব গেঁথে তারে
    কমলমণির হারে,
দুলবে বুকে গোপন বেদনাতে।

সেতারখানি নিয়েছিলে
    অনেক যতনভরে—
তার যবে তার ছিন্ন হল
    ফেললে ভূমি-'পরে।
নীরব তাহার গান
    রইল তোমার দান—
ফাগুন-হাওয়ার মর্মে বাজে
        গোপন মত্ততাতে

শ্রীনিকেতন
১২।৭।৩৯

অত্যুক্তি

মন যে দরিদ্র, তার
তর্কের নৈপুণ্য আছে, ধনৈশ্বর্য নাইকো ভাষার
কল্পনাভাণ্ডার হতে তাই করে ধার
বাক্য-অলংকার।
কখন হৃদয় হয় সহসা উতলা—
তখন সাজিয়ে বলা
আসে অগত্যাই ;
শুনে তাই

কেন তুমি হেসে ওঠ, আধুনিকা প্রিয়ে,
অত্যুক্তির অপবাদ দিয়ে।
তোমার সম্মানে ভাষা আপনারে করে সুসজ্জিত,
তারে তুমি বারে বারে পরিহাসে কোরো না লজ্জিত।
তোমার আরতি-অর্ঘ্যে অত্যুক্তিবঞ্চিত ভাষা হেয়,
অসত্যের মতো অশ্রদ্ধেয়।
নাই তার আলো,
তার চেয়ে মৌন ঢের ভালো।
তব অঙ্গে অত্যুক্তি কি কর না বহন
সন্ধ্যায় যখন
দেখা দিতে আস।
তখন যে হাসি হাস
সে তো নহে মিতব্যয়ী প্রত্যহের মতো—
অতিরিক্ত মধু কিছু তার মধ্যে থাকে তো সংহত।
সে হাসির অতিভাষা
মোর বাক্যে ধরা দেবে নাই সে প্রত্যাশা।
অলংকার যত পায় বাক্যগুলো তত হার মানে,
তাই তার অস্থিরতা বাড়াবাড়ি ঠেকে তব কানে।
কিন্তু, ওই আশমানি শাড়িখানি
ও কি নহে অত্যুক্তির বাণী।
তোমার দেহের সঙ্গে নীল গগনের
ব্যঞ্জনা মিলায়ে দেয়, সে যে কোন্ অসীম মনের
আপন ইঙ্গিত,
সে যে অঙ্গের সংগীত।
আমি তারে মনে জানি সত্যেরো অধিক।
সোহাগবাণীরে মোর হেসে কেন বল কাল্পনিক।

পুরী
৭ মে, ১৯৩৯

হঠাৎ মিলন

মনে পড়ে কবে ছিলাম একা বিজন চরে ;
তোমার নৌকা ভরা পালের ভরে,
সুদূর পারের হতে
কোন্ অবেলায় এল উজান স্রোতে।
দ্বিধায় ছোঁওয়া তোমার মৌনীমুখে
কাঁপতেছিল সলজ্জ কৌতুকে
আঁচল-আড়ে দীপের মতো একটুখানি হাসি,
নিবিড় সুখের বেদন দেহে উঠছিল নিশ্বাসি।

দুঃসহ বিস্ময়ে
ছিলাম স্তব্ধ হয়ে,
বলার মতো বলা পাই নি খুঁজে ;
মনের সঙ্গে যুঝে
মুখের কথার হল পরাজয়।
তোমার তখন লাগল বুঝি ভয়,
বাঁধন-ছেঁড়া অধীরতার এমন দুঃসাহসে
গোপনে মন পাছে তোমায় দোষে।
মিনতি উপেক্ষা করি ত্বরায় গেলে চলে
"তবে আসি" এইটি শুধু ব'লে।
তখন আমি আপন মনে যে-গান সারাদিন
গেয়েছিলেম, তাহারি সুর রইল অন্তহীন।
পাথর-ঠেকা নির্ঝর সে, তারি কলস্বর
দূরের থেকে পূর্ণ করে বিজন অবসর।

আলমোড়া
২৭ মে, ১৯৩৭

গানের জাল

দৈবে তুমি
কখন নেশায় পেয়ে
আপন-মনে
যাও চলে গান গেয়ে।
যে আকাশের সুরের লেখা লেখ'
বুঝি না তা, কেবল রহি চেয়ে।
হৃদয় আমার অদৃশ্যে যায় চলে,
প্রতিদিনের ঠিকঠিকানা ভোলে—
মৌমাছিরা আপনা হারায় যেন
গন্ধের পথ বেয়ে।

গানের টানা জালে
নিমেষ-ঘেরা বাঁধন হতে
টানে অসীম কালে।
মাটির আড়াল করি ভেদন
স্বর্গলোকের আনে বেদন,
পরান ফেলে ছেয়ে।

[১৯৩৯]

মরিয়া

মেঘ কেটে গেল
আজি এ সকাল বেলায়
হাসিমুখে এসো
অলস দিনেরি খেলায়।
আশানিরাশার সঞ্চয় যত
সুখদুঃখেরে ঘেরে
ভ'রে ছিল যাহা সার্থক আর
নিষ্ফল প্রণয়েরে,

অকূলের পানে দিব তা ভাসায়ে
ভাঁটার গাঙের ভেলায়।

যত বাঁধনের
গ্রন্থন দিব খুলে,
ক্ষণিকের তরে
রহিব সকল ভুলে।
যে গান হয় নি গাওয়া,
যে দান হয় নি পাওয়া
পুবেন হাওয়ায় পরিতাপ তার
উড়াইব অবহেলায়।

[১৯৩৯]

দূরবর্তিনী

সেদিন তুমি দূরের ছিলে মম,
তাই ছিলে সেই আসন-'পরে যা অন্তরতম।
অগোচরে সেদিন তোমার লীলা
বইত অন্তঃশীলা।
থমকে যেতে যখন কাছে আসি
তখন তোমার ত্রস্ত চোখে বাজত দূরের বাঁশি
ছায়া তোমার মনের কুঞ্জে ফিরত চুপে চুপে,
কায়া নিত অপরূপের রূপে।
আশার অতীত বিরল অবকাশে
আসতে তখন পাশে ;
একটি ফুলের দানে
চিরফাগুন-দিনের হাওয়া আনতে আমার প্রাণে।
অবশেষে যখন তোমার অভিসারের রথ
পেল আপন সহজ সুগম পথ,
ইচ্ছা তোমার আর নাহি পায় নতুন-জানার বাধা,
সাধনা নাই, শেষ হয়েছে সাধা।

তোমার পালে লাগে না আর হঠাৎ দখিন-হাওয়া ;
শিথিল হল সকল চাওয়া পাওয়া।
মাঘের রাতে আমের বোলের গন্ধ বহে যায়,
নিশ্বাস তার মেলে না আর তোমার বেদনায়।
উদ্‌বেগ নাই, প্রত্যাশা নাই, ব্যথা নাইকো কিছু,
পোষ-মানা সব দিন চলে যায় দিনের পিছু পিছু।
অলস ভালোবাসা
হারিয়েছে তার ভাষাপারের ভাষা।
ঘরের কোণের ভরা পাত্র দুই বেলা তা পাই,
ঝর্‌নাতলার উছল পাত্র নাই।

? ১৯৩৭

গান

যে ছিল আমার স্বপনচারিণী
এতদিন তারে বুঝিতে পারি নি,
দিন চলে গেছে খুঁজিতে।
শুভখনে কাছে ডাকিলে,
লজ্জা আমার ঢাকিলে,
তোমারে পেরেছি বুঝিতে।

কে মোরে ফিরাবে অনাদরে,
কে মোরে ডাকিবে কাছে,
কাহার প্রেমের বেদনার মাঝে
আমার মূল্য আছে,
এ নিরন্তর সংশয়ে আর
পারি না কেবলি যুঝিতে—
তোমারেই শুধু সত্য পেরেছি বুঝিতে।

[শ্যামলী। শান্তিনিকেতন]
৮।১২।৩৮

বাণীহারা

ওগো মোর নাহি যে বাণী
আকাশে হৃদয় শুধু বিছাতে জানি।
আমি অমাবিভাবরী আলোকহারা
মেলিয়া তারা
চাহি নিঃশেষ পথপানে
নিষ্ফল আশা নিয়ে প্রাণে।
বহুদূরে বাজে তব বাঁশি,
সকরুণ সুর আসে ভাসি
বিহ্বল বায়ে
নিদ্রাসমুদ্র পারায়ে।
তোমারি সুরের প্রতিধ্বনি
দিই যে ফিরায়ে—
সে কি তব স্বপ্নের তীরে
ভাঁটার স্রোতের মতো
লাগে ধীরে, অতি ধীরে ধীরে।

[১৩৪৬]

অনসূয়া

কাঁঠালের ভূতি-পচা, আমানি, মাছের যত আঁশ,
রান্নাঘরের পাঁশ,
মরা বিড়ালের দেহ, পেঁকো নর্দমায়
বীভৎস মাছির দল ঐকতান-বাদন জমায়।
শেষরাত্রে মাতাল বাসায়
স্ত্রীকে মারে, গালি দেয় গদ্‌গদ ভাষায়,
ঘুমভাঙা পাশের বাড়িতে
পাড়াপ্রতিবেশী থাকে হুংকার ছাড়িতে।
ভদ্রতার বোধ যায় চলে,
মনে হয় নরহত্যা পাপ নয় ব'লে।

কুকুরটা, সর্ব অঙ্গে ক্ষত,
বিছানায় শোয় এসে, আমি নিদ্রাগত।
নিজেরে জানান দেয় তীব্রকণ্ঠে আত্মশ্লাঘী সতী
রণচণ্ডা চণ্ডী মূর্তিমতী।
মোটা সিঁদুরের রেখা আঁকা,
হাতে মোটা শাঁখা,
শাড়ি লাল-পেড়ে,
খাটো খোঁপা-পিণ্ডটুকু ছেড়ে
ঘোমটার প্রান্ত ওঠে টাকের সীমায়—
অস্থির সমস্ত পাড়া এ মেয়ের সতী-মহিমায়।

এ গলিতে বাস মোর, তবু আমি জন্ম-রোমান্টিক—
আমি সেই পথের পথিক
যে-পথ দেখায়ে চলে দক্ষিণে বাতাসে,
পাখির ইশারা যায় যে-পথের অলক্ষ্য আকাশে।
মৌমাছি যে-পথ জানে
মাধবীর অদৃশ্য আহ্বানে।
এটা সত্য কিংবা সত্য ওটা
মোর কাছে মিথ্যা সে তর্কটা।
আকাশকুসুম-কুঞ্জবনে,
দিগঙ্গনে
ভিত্তিহীন যে-বাসা আমার
সেখানেই পলাতকা আসা-যাওয়া করে বার-বার
আজি এই চৈত্রের খেয়ালে
মনেরে জড়ালো ইন্দ্রজালে।
দেশকাল
ভুলে গেল তার বাঁধা তাল।
নায়িকা আসিল নেমে আকাশপ্রদীপে আলো পেয়ে।

সেই মেয়ে
নহে বিংশ-শতকিয়া
ছন্দোহারা কবিদের ব্যঙ্গহাসি-বিহসিত প্রিয়া।
সে নয় ইকনমিক্‌স্‌-পরীক্ষাবাহিনী
আতপ্ত বসন্তে আজি নিশ্বসিত যাহার কাহিনী।
অনসূয়া নাম তার, প্রাকৃতভাষায়
কারে সে বিস্মৃত যুগে কাঁদায় হাসায়,
অশ্রুত হাসির ধ্বনি মিলায় সে কলকোলাহলে
শিপ্রাতটতলে।
পিনদ্ধ বল্কলবন্ধে যৌবনের বন্দী দূত দোঁহে
জাগে অঙ্গে উদ্ধত বিদ্রোহে।
অযতনে এলায়িত রুক্ষ কেশপাশ
বনপথে মেলে চলে মৃদুমন্দ গন্ধের আভাস।
প্রিয়কে সে বলে 'পিয়',
বাণী লোভনীয়—
এনে দেয় রোমাঞ্চ-হরষ
কোমল সে ধ্বনির পরশ।
সোহাগের নাম দেয় মাধবীরে
আলিঙ্গনে ঘিরে,
এ মাধুরী যে দেখে গোপনে
ঈর্ষার বেদনা পায় মনে।

যখন নৃপতি ছিল উচ্ছৃঙ্খল উন্মত্তের মতো
দয়াহীন ছলনায় রত
আমি কবি অনাবিল সরল মাধুরী
করিতেছিলাম চুরি
এলা-বনচ্ছায়ে এক কোণে,
মধুকর যেমন গোপনে
ফুলমধু লয় হরি

নিভৃত ভাণ্ডার ভরি ভরি
মালতীর স্মিত সম্মতিতে।
ছিল সে গাঁথিতে
নতশিরে পুষ্পহার
সদ্য-তোলা কুঁড়ি মল্লিকার।
বলেছিনু, আমি দেব ছন্দের গাঁথুনি
কথা চুনি চুনি।

অয়ি মালবিকা,
অভিসার-যাত্রাপথে কখনো বহ নি দীপশিখা।
অর্ধাবগুণ্ঠিত ছিলে কাব্যে শুধু ইঙ্গিত-আড়ালে,
নিঃশবদে চরণ বাড়ালে
হৃদয়প্রাঙ্গণে আজি অস্পষ্ট আলোকে—
বিস্মিত চাহনিখানি বিস্ফারিত কালো দুটি চোখে,
বহু মৌনী শতাব্দীর মাঝে দেখিলাম—
প্রিয় নাম
প্রথম শুনিলে বুঝি কবিকণ্ঠস্বরে
দূর যুগান্তরে।
বোধ হল, তুলে ধ'রে ডালা
মোর হাতে দিলে তব আধফোটা মল্লিকার মালা।
সুকুমার অঙ্গুলির ভঙ্গীটুকু মনে ধ্যান ক'রে
ছবি আঁকিলাম বসে চৈত্রের প্রহরে।
স্বপ্নের বাঁশিটি আজ ফেলে তব কোলে
আর-বার যেতে হবে চ'লে
সেথা, যেথা বাস্তবের মিথ্যা বঞ্চনায়
দিন চলে যায়।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
২০ মার্চ, ১৯৪০

শেষ অভিসার

আকাশে ঈশানকোণে মসীপুঞ্জ মেঘ।
আসন্ন ঝড়ের বেগ
স্তব্ধ রহে অরণ্যের ডালে ডালে
যেন সে বাদুড় পালে পালে।
নিষ্কম্প পল্লবঘন মৌনরাশি
শিকার-প্রত্যাশী
বাঘের মতন আছে থাবা পেতে,
রন্ধ্রহীন আঁধারেতে।
ঝাঁকে ঝাঁক
উড়িয়া চলেছে কাক
আতঙ্ক বহন করি উদ্বিগ্ন ডানার 'পরে।
যেন কোন্ ভেঙে-পড়া লোকান্তরে
ছিন্ন ছিন্ন রাত্রিখণ্ড চলিয়াছে উড়ে
উচ্ছৃঙ্খল ব্যর্থতার শূন্যতল জুড়ে।

দুর্যোগের ভূমিকায় তুমি আজ কোথা হতে এলে
এলোচুলে অতীতের বনগন্ধ মেলে।
জন্মের আরম্ভপ্রান্তে আর-একদিন
এসেছিলে অম্লান নবীন
বসন্তের প্রথম দূতিকা,
এনেছিলে আষাঢ়ের প্রথম যূথিকা
অনির্বচনীয় তুমি।
মর্মতলে উঠিলে কুসুমি
অসীম বিস্ময়-মাঝে, নাহি জানি এলে কোথা হতে
অদৃশ্য আলোক হতে দৃষ্টির আলোতে।
তেমনি রহস্যপথে, হে অভিসারিকা,
আজ আসিয়াছ তুমি ; ক্ষণদীপ্ত বিদ্যুতের শিখা

কী ইঙ্গিত মেলিতেছে মুখে তব,
কী তাহার ভাষা অভিনব।

আসিছ যে-পথ বেয়ে সেদিনের চেনা পথ এ কি।
এ যে দেখি
কোথাও বা ক্ষীণ তার রেখা,
কোথাও চিহ্নের সূত্র লেশমাত্র নাহি যায় দেখা।
ডালিতে এনেছ ফুল স্মৃত বিস্মৃত,
কিছু-বা অপরিচিত।
হে দূতী, এনেছ আজ গন্ধে তব যে-ঋতুর বাণী
নাম তার নাহি জানি।
মৃত্যু-অন্ধকারময়
পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে আসন্ন তাহার পরিচয়।
তারি বরমাল্যখানি পরাইয়া দাও মোর গলে
স্তিমিতনক্ষত্র এই নীরবের সভাঙ্গনতলে ;
এই তব শেষ অভিসারে
ধরণীর পারে
মিলন ঘটায়ে যাও অজানার সাথে
অন্তহীন রাতে।

মংপু
২৩।৪।৪০

নামকরণ

বাদলবেলায় গৃহকোণে
রেশমে পশমে জামা বোনে,
নীরবে আমার লেখা শোনে,
তাই সে আমার শোনামণি।
প্রচলিত ডাক নয় এ যে
দরদীর মুখে ওঠে বেজে,

পণ্ডিতে দেয় নাই মেজে—
প্রাণের ভাষাই এর খনি।
সেও জানে আর জানি আমি
এ মোর নেহাত পাগলামি—
ডাক শুনে কাজ যায় থামি,
কঙ্কণ ওঠে কনকনি।

সে হাসে, আমিও তাই হাসি—
জবাবে ঘটে না কোনো বাধা।
অভিধান-বর্জিত ব'লে
মানে আমাদের কাছে সাদা।
কেহ নাহি জানে কোন্ খনে
পশমের শিল্পের সাথে
সুকুমার হাতের নাচনে
নূতন নামের ধ্বনি গাঁথে
শোনামণি, ওগো সুনয়নী

গৌরীপুর ভবন
কালিম্পং
২৪ মে, ১৯৪০

বিমুখতা

মন যে তাহার হঠাৎপ্লাবনী
নদীর প্রায়
অভাবিত পথে সহসা কী টানে
বাঁকিয়া যায়—
সে তার সহজ গতি,
সেই বিমুখতা ভরা ফসলের
যতই করুক ক্ষতি।

বাঁধা পথে তারে বাঁধিয়া রাখিবে যদি
বর্ষা নামিলে খরপ্রবাহিণী নদী
ফিরে ফিরে তার ভাঙিয়া ফেলিবে কূল,
ভাঙিবে তোমার ভুল।
নয় সে খেলার পুতুল, নয় সে
আদরের পোষা প্রাণী,
মনে রেখো তাহা জানি।
মত্তপ্রবাহবেগে
দুর্দাম তার ফেনিল হাস্য
কখন উঠিবে জেগে।
তোমার প্রাণের পণ্য আহরি
ভাসাইয়া দিলে ভঙ্গুর তরী,
হঠাৎ কখন পাষাণে আছাড়ি
করিবে সে পরিহাস,
হেলায় খেলায় ঘটাবে সর্বনাশ।
এ খেলারে যদি খেলা বলি মান,
হাসিতে হাস্য মিলাইতে জান,
তা হলে রবে না খেদ।
ঝরনার পথে উজানের খেয়া,
সে যে মরণের জেদ।
স্বাধীন বল' যে ওরে
নিতান্ত ভুল করে।
দিক্‌সীমানার বাঁধন টুটিয়া
ঘুমের ঘোরেতে চমকি উঠিয়া
যে-উল্কা পড়ে খ'সে
কোন্ ভাগ্যের দোষে
সেই কি স্বাধীন, তেমনি স্বাধীন এও—
এরে ক্ষমা করে যেয়ো।
বন্যারে নিয়ে খেলা যদি সাধ
লাভের হিসাব দিয়ো তবে বাদ,

গিরিনদী-সাথে বাঁধা পড়িয়ো না
পণ্যের ব্যবহারে।
মূল্য যাহার আছে একটুও
সাবধান করি ঘরে তারে থুয়ো,
খাটাতে যেয়ো না মাতাল চলার
চলতি এ কারবারে।
কাটিয়ো সাঁতার যদি জানা থাকে,
তলিয়ে যেয়ো না আওড়ের পাকে,
নিজেরে ভাসায়ে রাখিতে না জান
ভরসা ডাঙার পারে—
যতই নীরস হোক-না সে তবু
নিরাপদ জেনো তারে।
'সে আমারি' ব'লে বৃথা অহমিকা
ভালে আঁকি দেয় ব্যঙ্গের টিকা।
আল্‌গা লীলায় নাই দেওয়া পাওয়া,
দূর থেকে শুধু আসা আর যাওয়া—
মানবমনের রহস্য কিছু শিখা।

[কালিম্পং
জুন, ১৯৪০]

আত্মছলনা

দোষী করিব না তোমারে,
ব্যথিত মনের বিকারে,
নিজেরেই আমি নিজে নিজে করি ছলনা।
মনেরে বুঝাই বুঝি ভালোবাস,
আড়ালে আড়ালে তাই তুমি হাস ;
স্থির জান, এ যে অবুঝের খেলা,
এ শুধু মোহের রচনা।

সন্ধ্যামেঘের রাগে
অকারণে যত ভেসে-চলে-যাওয়া
অপরূপ ছবি জাগে।
সেইমতো ভাসে মায়ার আভাসে
রঙিন বাষ্প মনের আকাশে,
উড়াইয়া দেয় ছিন্ন লিপিতে
বিরহমিলন-ভাবনা।

[কালিম্পং]
২৯।৫।৪০

অসময়

বৈকালবেলা ফসল-ফুরানো
শূন্য খেতে
বৈশাখে যবে কৃপণ ধরণী
রয়েছে তেতে,
ছেড়ে তার বন জানি নে কখন
কী ভুল ভুলি
শুষ্ক ধূলির ধূসর দৈন্যে
এসেছিল বুলবুলি।

সকালবেলার স্মৃতিখানি মনে
বহিয়া বুঝি
তরুণ দিনের ভরা আতিথ্য
বেড়ালো খুঁজি।
অরুণে শ্যামলে উজ্জ্বল সেই
পূর্ণতারে
মিথ্যা ভাবিয়া ফিরে যাবে সে কি
রাতের অন্ধকারে।

তবুও তো গান করে গেল দান
কিছু না পেয়ে।
সংশয়-মাঝে কী শুনায়ে গেল
কাহারে চেয়ে।
যাহা গেছে সরে কোনো রূপ ধ'রে
রয়েছে বাকি,
এই সংবাদ বুঝি মনে মনে
জানিতে পেরেছে পাখি।

প্রভাতবেলায় যে ঐশ্বর্য
রাখে নি কণা,
এসেছিল সে যে, হারায় না কভু
সে সান্ত্বনা।
সত্য যা পাই ক্ষণেকের তরে
ক্ষণিক নহে।
সকালের পাখি বিকালের গানে
এ আনন্দই বহে।

? ১৯৪০

অপঘাত

সূর্যাস্তের পথ হতে বিকালের রৌদ্র এল নেমে।
বাতাস ঝিমিয়ে গেছে থেমে।
বিচালি-বোঝাই গাড়ি চলে দূর নদিয়ার হাটে
জনশূন্য মাঠে।
পিছে পিছে
দড়ি-বাঁধা বাছুর চলিছে।
রাজবংশীপাড়ায় কিনারে
পুকুরের ধারে
বনমালী পণ্ডিতের বড়ো ছেলে
সারাক্ষণ বসে আছে ছিপ ফেলে।

মাথার উপর দিয়ে গেল ডেকে
শুকনো নদীর চর থেকে
কাজ্‌লা বিলের পানে
বুনোহাঁস গুগ্‌লি-সন্ধানে।

কেটে-নেওয়া ইক্ষুখেত, তারি ধারে ধারে
দুই বন্ধু চলে ধীরে শান্ত পদচারে
বৃষ্টিধোওয়া বনের নিশ্বাসে,
ভিজে ঘাসে ঘাসে।
এসেছে ছুটিতে—
হঠাৎ গাঁয়েতে এসে সাক্ষাৎ দুটিতে,
নববিবাহিত একজনা,
শেষ হতে নাহি চায় ভরা আনন্দের আলোচনা।
আশে-পাশে ভাঁটিফুল ফুটিয়া রয়েছে দলে দলে
বাঁকাচোরা গলির জঙ্গলে,
মৃদুগন্ধে দেয় আনি
চৈত্রের ছড়ানো নেশাখানি।
জারুলের শাখায় অদূরে
কোকিল ভাঙিছে গলা একঘেয়ে প্রলাপের সুরে।

টেলিগ্রাম এল সেই ক্ষণে
ফিন্‌ল্যাণ্ড্‌ চূর্ণ হল সোভিয়েট বোমার বর্ষণে।

[কালিম্পং]
১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭

মানসী

আজি আষাঢ়ের মেঘলা আকাশে
মনখানা উড়ো পক্ষী
বাদলা হাওয়ায় দিকে দিকে ধায়
অজানার পানে লক্ষ্যি।

যাহা-খুশি বলি স্বগত কাকলি,
লিখিবারে চাহি পত্র,
গোপন মনের শিল্পসূত্রে
বুনানো দু-চারি ছত্র।
সঙ্গীবিহীন নিরালায় করি
জানা-অজানার সন্ধি,
গল্পঠিকানিয়া বন্ধু কে আছ
করিব বাণীর বন্দী।
না জানি তোমার নামধাম আমি,
না জানি তোমার তথ্য।
কিবা আসে যায় যে হও সে হও
মিথ্যা অথবা সত্য।
নিভৃতে তোমারি সাথে আনাগোনা
হে মোর অচিন মিত্র,
প্রলাপী মনেতে আঁকা পড়ে তব
কত অদ্ভুত চিত্র।
যে নেয় নি মেনে মর্ত শরীরে
বাঁধন পাঞ্চভৌত্যে
তার সাথে মন করেছি বদল
স্বপ্নমায়ার দৌত্যে।
ঘুমের ঘোরেতে পেয়েছি তাহার
রুক্ষ চুলের গন্ধ।
আধেক রাত্রে শুনি যেন তার—
দ্বার-খোলা, দ্বার-বন্ধ।
নীপবন হতে সৌরভে আনে
ভাষাবিহীনার ভাষ্য।
জোনাকি আঁধারে ছড়াছড়ি করে
মণিহার-ছেঁড়া হাস্য।
সঘন নিশীথে গর্জিছে দেয়া,
ঝিমিঝিমি বারি বর্ষে—

মনে-মনে ভাবি, কোন্ পালঙ্কে
কে নিদ্রা দেয় হবে।
গিরির শিখরে ডাকিছে ময়ূর
কবিকাব্যের রঙ্গে—
স্বপ্নপুলকে কে জাগে চমকি
বিগলিতচীর-অঙ্গে।
বাস্তব মোরে বঞ্চনা করে
পালায় চকিত নৃত্যে—
তারি ছায়া যবে রূপ ধরি আসে
বাঁধা পড়ি যায় চিত্তে।
তারার আলোকে ভরে সেই সাকী
মদিরোচ্ছল পাত্র,
নিবিড় রাতের মুগ্ধ মিলনে
নাই বিচ্ছেদ মাত্র।
ওগো মায়াময়ী, আজি বরষায়
জাগালে আমার ছন্দ—
যাহা-খুশি সুরে বাজিছে সেতার,
নাহি মানে কোনো বন্ধ।

[কালিম্পং]
২২ মে, ১৯৪০

অসম্ভব ছবি

আলোকের আভা তার অলকের চুলে,
বুকের কাছেতে হাঁটু তুলে
বসে আছে ঠেস দিয়ে পিপুলগুঁড়িতে,
পাশেই পাহাড়ে নদী নুড়িতে নুড়িতে
ফুলে উঠে চলে যায় বেগে।
দেবদারু-ছায়াতলে উঠে জেগে
কলস্বর,
কান পেতে শোনে তাই প্রাচীন পাথর—

অরণ্যের কোল
যেন মুখরিয়া তোলে শিশুর কল্লোল।
ইংরেজ কবির লেখা একমনে পড়িছে তরুণী,
গুন্‌গুন্ রব তার পিছনে দাঁড়ায়ে আমি শুনি ;
মৃদু বেদনায় ভাবি, যে-কবির বাণী
পড়িছে বিরাম নাহি মানি,
আমি কেন সে কবি না হই।
এতদিন নানাভাবে কাব্যে যাহা কই
আজি এ গিরির মতো কেন সে নির্বাক।
অদূরে মাদার-শাখে ঘুঘু দেয় ডাক।
আমার মর্মের ছন্দ পাখির ভাষায়
অক্লান্ত নৈরাশায়
উছলিতে থাকে একতানে
আন-মননীর কানে কানে।
আতপ্ত হতেছে দিন, শিশির শুকায়ে গেছে ঘাসে,
অজানা ফুলের গুচ্ছ উচ্চ শাখে দুলিছে বাতাসে।
ঢালু তটে তরুচ্ছায়াতলে
ঝিলিমিলি শিহরন ঝরনার জলে।
চূর্ণ কেশে নিত্য চঞ্চলতা,
দুর্বাধ্য পড়িছে চোখে, অধ্যয়নরতা
সরায়ে দিতেছে বারংবার
বাহুক্ষেপে। ধৈর্য মোর রহিল না আর,
চকিতে সম্মুখে আসি শুধালাম,
"তুমি কি শোন নি মোর নাম।"
মুখে তার সে কি অসন্তোষ,
সে কি লজ্জা, সে কি রোষ,
সে কি সমুদ্ধত অহংকার।
উত্তর শোনার
অপেক্ষা না করি আমি দ্রুত গেনু চলি।
ঘুঘুর কাকলি

ঘন পল্লবের মাঝে আশ্বিনের রৌদ্র ও ছায়ারে
ব্যথিত করিছে চির নিরুত্তর ব্যর্থতার ভারে।

মিথ্যা, মিথ্যা এ স্বপন, ঘরে ফিরে বসিয়া নির্জনে
শৈল-অরণ্যের সেই ছবিখানি আনি মনে-মনে,
অসম্ভব রচনায়
পূরণ করিনু তারে ঘটে নি যা সেই কল্পনায়।

যদি সত্য হ'ত, যদি বলিতাম কিছু,
শুনিত সে মাথা করি নিচু,
কিংবা যদি সুতীব্র চাহনি
বিদ্যুৎবাহনী
কটাক্ষে হানিত মুখে
রক্ত মোর আলোড়িয়া বুকে,
কিংবা যদি চলে যেত অঞ্চল সংবরি
শুষ্কপত্রপরিকীর্ণ বনপথ সচকিত করি,
আমি রহিতাম চেয়ে
হেসে উঠিতাম গেয়ে—
"চলে গেলে হে রূপসী, মুখখানি ঢেকে,
বঞ্চিত কর নি মোরে, পিছনে গিয়েছ কিছু রেখে।"

হায় রে, হয় নি কিছু বলা,
হয় নি ছায়ার পথে ছায়াসম চলা,
হয়তো সে শিলাতল-'পরে
এখনো পড়িছে কাব্য গুন্‌গুন্ স্বরে

শান্তিনিকেতন
১৬ জুলাই, ১৯৪০

অসম্ভব

পূর্ণ হয়েছে বিচ্ছেদ, যবে ভাবিনু মনে,
একা একা কোথা চলিতেছিলাম নিষ্কারণে।
শ্রাবণের মেঘ কালো হয়ে নামে বনের শিরে,
খর বিদ্যুৎ রাতের বক্ষ দিতেছে চিরে,
দূর হতে শুনি বারুণী নদীর তরল রব—
মন শুধু বলে, অসম্ভব এ অসম্ভব।

এমনি রাত্রে কতবার, মোর বাহুতে মাথা,
শুনেছিল সে যে কবির ছন্দে কাজরি-গাথা।
রিমিঝিমি ঘন বর্ষণে বন রোমাঞ্চিত,
দেহে আর মনে এক হয়ে গেছে যে-বাঞ্ছিত
এল সেই রাতি বহি শ্রাবণের সে-বৈভব—
মন শুধু বলে, অসম্ভব এ অসম্ভব।

দূরে চলে যাই নিবিড় রাতের অন্ধকারে,
আকাশের সুর বাজিছে শিরায় বৃষ্টিধারে।
যূথীবন হতে বাতাসেতে আসে সুধার স্বাদ,
বেণীবাঁধনের মালায় পেতেম যে-সংবাদ
এই তো জেগেছে নবমালতীর সে সৌরভ—
মন শুধু বলে, অসম্ভব এ অসম্ভব।

ভাবনার ভুলে কোথা চলে যাই অন্যমনে
পথসংকেত কত জানায়েছে যে-বাতায়নে।
শুনিতে পেলেম সেতারে বাজিছে সুরের দান
অশ্রুজলের আভাসে জড়িত আমারি গান।
কবিরে ত্যজিয়া রেখেছ কবির এ গৌরব—
মন শুধু বলে, অসম্ভব এ অসম্ভব।

শান্তিনিকেতন
১৬ জুলাই, ১৯৪০

গানের মন্ত্র

মাঝে মাঝে আসি যে তোমারে
গান শিখাবারে—
মনে তব কৌতুক লাগে,
অধরের আগে
দেখা দেয় একটুকু হাসির কাঁপন।
যে-কথাটি আমার আপন
এই ছলে হয় সে তোমারি।
তারে তারে সুর বাঁধা হয়ে যায় তারি
অন্তরে অন্তরে
কখন তোমার অগোচরে।
চাবি করা চুরি,
প্রাণের গোপন দ্বারে প্রবেশের সহজ চাতুরী,
সুর দিয়ে পথ বাঁধা
যে-দুর্গমে কথা পেত পদে পদে পাষাণের বাধা—
গানের মন্ত্রেতে দীক্ষা যার
এই তো তাহার অধিকার।
সেই জানে দেবতার অলক্ষিত পথ
শূন্যে শূন্যে যেথা চলে মহেন্দ্রের শব্দভেদী রথ।
ঘনবর্ষণের পিছে যেমন সে বিদ্যুতের খেলা
বিমুখ নিশীথবেলা,
অমোঘ বিজয়মন্ত্র হানে
দূর দিগন্তের পানে,
আঁধারের সংকোচ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে
মেঘমল্লারের ঝড়ে।

শান্তিনিকেতন
১৮ জুলাই, ১৯৪০

স্বল্প

জানি আমি, ছোটো আমার ঠাঁই—
তাহার বেশি কিছুই চাহি নাই।
দিয়ো আমায় সবার চেয়ে অল্প তোমার দান,
নিজের হাতে দাও তুলে তো
রইবে অফুরান।

আমি তো নই কাঙাল পরদেশী,
পথে পথে খোঁজ করে যে
যা পায় তারো বেশি।
সকলটুকুই চায় সে পেতে হাতে,
পুরিয়ে নিতে পারে না সে
আপন দানের সাথে।

তুমি শুনে বললে আমায় হেসে,
বললে ভালোবেসে,
"আশ মিটিবে এইটুকুতেই তবে ?"
আমি বলি, "তার বেশি কী হবে।
যে-দানে ভার থাকে
বস্তু দিয়ে পথ সে কেবল
আটক করে রাখে।
যে-দান কেবল বাহুর পরশ তব
তারে আমি বীণার মতো বক্ষে তুলে লব।
সুরে সুরে উঠবে বেজে,
যেটুকু সে তাহার চেয়ে
অনেক বেশি সে যে।
লোভীর মতো তোমার দ্বারে
যাহার আসা-যাওয়া,
তাহার চাওয়া-পাওয়া

তোমায় নিত্য খর্ব করে আনে
আপন ক্ষুধার পানে।
ভালোবাসার বর্বরতা,
মলিন করে তোমারি সম্মান
পৃথুল তার বিপুল পরিমাণ।
তাই তো বলি, প্রিয়ে,
হাসিমুখে বিদায় কোরো স্বল্প কিছু দিয়ে;
সন্ধ্যা যেমন সন্ধ্যাতারাটিরে
আনিয়া দেয় ধীরে
সূর্য-ডোবার শেষ সোপানের ভিতে
সলজ্জ তার গোপন থালিটিতে।"

শান্তিনিকেতন
১৭ জুলাই, ১৯৪০

অবসান

জানি দিন অবসান হবে,
জানি তবু কিছু বাকি রবে।
রজনীতে ঘুমহারা পাখি
এক সুরে গাহিবে একাকী—
যে শুনিবে, যে রহিবে জাগি
সে জানিবে, তারি নীড়হারা
স্বপন খুঁজিছে সেই তারা
যেথা প্রাণ হয়েছে বিবাগি।
কিছু পরে করে যাবে চুপ
ছায়াঘন স্বপনের রূপ।
ঝরে যাবে আকাশকুসুম,
তখন কূজনহীন ঘুম
এক হবে রাত্রির সাথে

যে-গান কানে নিল বাসা
তার ক্ষীণ গুঞ্জন-ভাষা
শেষ হবে সব-শেষ রাতে।

শান্তিনিকেতন
১৯ জুলাই, ১৯৪০

নাটক ও প্রহসন

বাঁশরি

২৪॥১০

বাঁশরি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শ্রীমতী বাঁশরি সরকার বিলিতি য়ুনিভার্সিটিতে পাস করা মেয়ে। রূপসী না হলেও তার চলে। তার প্রকৃতিটা বৈদ্যুতশক্তিতে সমুজ্জ্বল, তার আকৃতিটাতে শান-দেওয়া ইস্পাতের চাকচিক্য। ক্ষিতীশ সাহিত্যিক। চেহারায় খুঁত আছে, কিন্তু গল্প লেখায় খ্যাতনামা। পার্টি জমেছে সুষমা সেনদের বাগানে।

বাঁশরি। ক্ষিতীশ, সাহিত্যে তুমি নূতন ফ্যাশনের ধূমকেতু বললেই হয়। জ্বলন্ত লেজের ঝাপটায় পুরোনো কায়দাকে ঝেঁটিয়ে নিয়ে চলেছ আকাশ থেকে। যেখানে তোমাকে এনেছি এটা বিলিতি-বাঙালি মহল, ফ্যাশনেবল পাড়া। পথঘাট তোমার জানা নেই। দেউড়িতে কার্ড তলব করলেই ঘেমে উঠতে। তাই সকাল-সকাল আনলুম। আপাতত একটু আড়ালে বোসো। সকলে এলে প্রকাশ কোরো আপন মহিমা। এখন চললুম, হয়তো না আসতেও পারি।

ক্ষিতীশ। রোসো, একটু সমঝিয়ে দাও। অজায়গায় আমাকে আনা কেন।

বাঁশরি। কথাটা খোলসা করে বলি তবে। বাজারে নাম করেছ বই লিখে। আরও উন্নতি আশা করেছিলুম। ভেবেছিলুম, নামটাকে বাজার থেকে উদ্ধার করে এত ঊর্ধ্বে তুলবে যে, ইতরসাধারণ গাল পাড়তে থাকবে।

ক্ষিতীশ। আমার নামটা বাজারে-চলতি ঘষা পয়সা নয়, সে কথা কি স্বীকার কর না।

বাঁশরি। সাহিত্যের সদর বাজারের কথা হচ্ছে না, তোমরা যে-নতুনবাজারের চলতি দরে ব্যাবসা চালাচ্ছ সেও একটা বাজার। তার বাইরে যেতে তোমার সাহস নেই পাছে মালের গুমোর কমে। এবারে তারই প্রমাণ পেলুম তোমার এই হালের বইটাতে যার নাম দিয়েছ 'বেমানান'। শস্তায় পাঠক ভোলাবার লোভ তোমার

পুরো পরিমাণেই আছে। মাঝারি লেখকেরা মরে ঐ লোভে। তোমার এই বইটাকে বলি আধুনিকতার বটতলায় ছাপা, খেলো আধুনিকতা।

ক্ষিতীশ। কিঞ্চিৎ রাগ হয়েছে দেখছি; ছুরিটা বিঁধেছে তোমাদের ফ্যাশনেবল শার্ট-ফ্রন্ট ফুঁড়ে।

বাঁশরি। রামো! ছুরি বল ওকে! যাত্রার দলের কাঠের ছুরি, রাংতা-মাখানো। ওতে যারা ভোলে তারা অজ্‌বুগ।

ক্ষিতীশ। আচ্ছা, মেনে নিলেম। কিন্তু আমাকে এখানে কেন।

বাঁশরি। তুমি টেবিল বাজিয়ে বাজনা অভ্যেস কর, যেখানে সত্যিকার বাজনা মেলে সেইখানে শিক্ষা দিতে নিয়ে এলুম। এদের কাছ থেকে দূরে থাক, ঈর্ষা কর, বানিয়ে দাও গাল। তোমার বইয়ে নলিনাক্ষের নামে যে দলকে সৃষ্টি করে লোক হাসিয়েছ সে দলের মানুষকে কি সত্যি করে জান।

ক্ষিতীশ। আদালতের সাক্ষীর মতো জানি নে, বানিয়ে বলবার মতো জানি।

বাঁশরি। বানিয়ে বলতে গেলে আদালতের সাক্ষীর চেয়ে অনেক বেশি জানা দরকার হয়, মশায়। যখন কলেজে পড়া মুখস্থ করতে তখন শিখেছিলে রসাত্মক বাক্যই কাব্য; এখন সাবালক হয়েছ তবু ঐ কথাটা পুরিয়ে নিতে পারলে না যে, সত্যাত্মক বাক্য রসাত্মক হলেই তাকে বলে সাহিত্য।

ক্ষিতীশ। ছেলেমানুষি রুচিকে রস জোগাবার ব্যাবসা আমার নয়। আমি এসেছি জীর্ণকে চূর্ণ করে সাফ করতে।

বাঁশরি। বাস্‌ রে! আচ্ছা বেশ, কলমটাকে যদি ঝাঁটাই বানাতে চাও তা হলে আঁস্তাকুড়টা সত্যি হওয়া চাই, ঝাঁটাগাছটাও, আর সেই সঙ্গে ঝাড়ু-ব্যবসায়ীর হাতটাও। এই আমরাই তোমাদের নলিনাক্ষের দল, আমাদের অপরাধ আছে ঢের, তোমাদেরও আছে বিস্তর। কসুর মাপ করতে বলি নে, ভালো করে জানতে বলি, সত্যি করে জানাতে বলি, এতে ভালোই লাগুক মন্দই লাগুক কিছুই যায় আসে না।

ক্ষিতীশ। অন্তত তোমাকে তো জেনেছি, বাঁশি। কেমন লাগছে তারও আভাস আড়চোখে কিছু কিছু পাও বোধ করি।

বাঁশরি। দেখো সাহিত্যিক, আমাদের দলেও মানান-বেমানানের একটা নিক্তি আছে। চিটেগুড় মাখিয়ে কথাগুলোকে চটচটে করে তোলা এখানে চলতি নেই। ওটাতে ঘেন্না করে। শোনো ক্ষিতীশ, আর-একবার তোমাকে স্পষ্ট করে বলি।

ক্ষিতীশ। এত অধিক স্পষ্ট তোমার কথা যে, যত বুঝি তার চেয়ে বাজে বেশি।

বাঁশরি। তা হোক, শোনো। অশ্বত্থামার ছেলেবেলাকার গল্প পড়েছ। ধনীর

ছেলেকে দুধ খেতে দেখে যখন সে কান্না ধরল, তাকে পিটুলি গুলে খেতে দেওয়া হল, দু হাত তুলে নাচতে লাগল দুধ খেয়েছি বলে।

ক্ষিতীশ। বুঝেছি, আর বলতে হবে না। অর্থাৎ, আমার লেখায় পিটুলি-গোলা জল খাইয়ে পাঠকশিশুদের নাচাচ্ছি।

বাঁশরি। বানিয়ে-তোলা লেখা তোমার, বই প'ড়ে লেখা। জীবনে যার সত্যের পরিচয় আছে তার অমন লেখা বিস্বাদ লাগে।

ক্ষিতীশ। সত্যের পরিচয় আছে তোমার?

বাঁশরি। হাঁ আছে, দুঃখ এই, লেখবার শক্তি নেই। তার চেয়ে দুঃখের কথা— লেখবার শক্তি আছে তোমার, কিন্তু নেই সত্যের পরিচয়। আমি চাই, তুমি স্পষ্ট জানতে শেখ যেমন প্রত্যক্ষ করে আমি জেনেছি, সাচ্চা করে লিখতে শেখ। যাতে মনে হবে, আমারই মন প্রাণ যেন তোমার কলমের মুখে ফুটে পড়ছে।

ক্ষিতীশ। জানার কথা তো বললে, জানবার পদ্ধতিটা কী।

বাঁশরি। পদ্ধতিটা শুরু হোক আজকের এই পার্টিতে। এখানকার এই জগৎটার কাছ থেকে সেই পরিমাণে তুমি দূরে আছ যাতে এর সমস্তটাকে নির্লিপ্ত হয়ে দেখা সম্ভব।

ক্ষিতীশ। আচ্ছা, তা হলে এই পার্টিটার একটা সরল ব্যাখ্যা দাও, একটা সিনপ্‌সিস।

বাঁশরি। তবে শোনো— এক পক্ষে এই বাড়ির মেয়ে, নাম সুষমা সেন। পুরুষ-মাত্রেরই মত এই যে, ওর যোগ্যপাত্র জগতে নেই নিজে ছাড়া। উদ্ধত যুবকদের মধ্যে মাঝে মাঝে এমনতরো আস্তিন-গোটানো ভঙ্গী দেখি যাতে বোঝা যায়, আইন-আদালত না থাকলে ওকে নিয়ে লোকক্ষয়কর কাণ্ড ঘটত। অপর পক্ষে শম্ভুগড়ের রাজা সোমশংকর। মেয়েরা তার সম্বন্ধে কী কানাকানি করে বলব না, কারণ আমিও স্ত্রী জাতিরই অন্তর্গত। আজকের পার্টি এঁদের দোঁহাকার এন্‌গেজ্‌মেণ্ট নিয়ে।

ক্ষিতীশ। দুজন মানুষের ঠিকানা পাওয়া গেল। দুই সংখ্যাটা গড়ায় এসে সুশীতল গার্হস্থ্যে। তিন সংখ্যাটা নারদ, পাকিয়ে তোলে জটা, ঘটিয়ে তোলে তাপজনক নাট্য। এর মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি কোথাও আছে নিশ্চয়, নইলে সাহিত্যিকের প্রলোভন কোথায়।

বাঁশরি। আছে তৃতীয় ব্যক্তি, সেই হয়তো প্রধান ব্যক্তি। লোকে তাকে ডাকে পুরন্দরসন্ন্যাসী। পিতৃদত্ত নামটার সন্ধান মেলে না। কেউ দেখেছে তাকে কুম্ভমেলায়, কেউ দেখেছে গারো পাহাড়ে ভালুক-শিকারে। কেউ বলে, ও য়ুরোপে অনেককাল

ছিল। সুষমাকে কলেজের পড়া পড়িয়েছে আপন ইচ্ছায়। অবশেষে ঘটিয়েছে এই সম্বন্ধ। সুষমার মা বললেন— অনুষ্ঠানটা হোক ব্রাহ্মসমাজের কাউকে দিয়ে, সুষমা জেদ ধরলে একমাত্র পুরন্দর ছাড়া আর-কাউকে দিয়ে চলবে না। চতুর্দিকের আবহাওয়াটার কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, বলব, কোনো-একটা জায়গায় ডিপ্রেশন ঘটেছে। গতিকটা ঝোড়ো রকমের; বাদলা কোনো না কোনো পাড়ায় নেমেছে, বৃষ্টিপাত হয়তো স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি। বাস্, আর নয়।

ক্ষিতীশ। ওই যাঃ, এই দেখো আমার এণ্ডির চাদরটাতে মস্ত একটা কালির দাগ।

বাঁশরি। ব্যস্ত হও কেন। ঐ কালির দাগেই তোমার অসাধারণতা। তুমি রিয়ালিস্ট, নির্মলতা তোমাকে মানায় না। তুমি মসীধ্বজ। ঐ আসছে অনসূয়া প্রিয়ম্বদা।

ক্ষিতীশ। তার মানে ?

বাঁশরি। দুই সখী। ছাড়াছাড়ি হবার জো নেই। বন্ধুত্বের উপাধি-পরীক্ষায় ঐ নাম পেয়েছে, আসল নামটা ভুলেছে সবাই।

[উভয়ের প্রস্থান

দুই সখীর প্রবেশ

১। আজ সুষমার এন্‌গেজ্‌মেণ্ট, মনে করতে কেমন লাগে।

২। সব মেয়েরই এন্‌গেজ্‌মেণ্টে মন খারাপ হয়ে যায়।

১। কেন।

২। মনে হয়, দড়ির উপরে চলছে, থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে সুখদুঃখের মাঝখানে। মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন ভয় করে।

১। তা সত্যি। আজ মনে হচ্ছে যেন নাটকের প্রথম অঙ্কের ড্রপ্‌সীন উঠল। নায়কনায়িকাও তেমনি, নাট্যকার নিজের হাতে সাজিয়ে চালান করেছেন রঙ্গভূমিতে। রাজা সোমশংকরকে দেখলে মনে হয়, টডের রাজস্থান থেকে বেরিয়ে এল ছশো তিনশো বছর পেরিয়ে।

২। দেখিস নি, প্রথম যখন এলেন রাজাবাহাদুর ? খাঁটি মধ্যযুগের ; ঝাঁকড়া চুল, কানে বীরবৌলি, হাতে মোটা কঙ্কণ, কপালে চন্দনের তিলক, বাংলা কথা খুব বাঁকা। পড়লেন বাঁশরির হাতে, হল ওঁর মডার্ন্ সংস্করণ। দেখতে দেখতে যে-রকম

রূপান্তর ঘটল কারও সন্দেহ ছিল না ওঁর গোত্রান্তর ঘটবে বাঁশরির গুষ্টিতেই। বাপ প্রভুশংকর খবর পেয়েই তাড়াতাড়ি আধুনিকের কবল থেকে নিয়ে গেলেন সরিয়ে।

১। বাঁশরির চেয়ে বড়ো ওস্তাদ ঐ পুরন্দরসন্ন্যাসী, সব ক'টা বেড়া ডিঙিয়ে রাজার ছেলেকে টেনে নিয়ে এলেন এই ব্রাহ্মসমাজের আঙটি-বদলের সভায়। সব-চেয়ে কঠিন বেড়া স্বয়ং বাঁশরির।

সুষমার বিধবা মা বিভাসিনীর প্রবেশ

স্বল্পজলা বৈশাখী নদীর স্রোতঃপথে মাঝে মাঝে চর প'ড়ে যেরকম দৃশ্য হয় তেমনি চেহারা। শিথিলবিস্তারিত দেহ, কিছু মাংসবহুল, তবু চাপা পড়ে নি যৌবনের ধারাবশেষ।

বিভাসিনী। বসে বসে কী ফিস্ ফিস্ করছিস তোরা।

১। মাসি, লোকজন আসবার সময় হল, সুষমার দেখা নেই কেন।

বিভাসিনী। কী জানি, হয়তো সাজগোজ চলছে। তোরা চল্ বাছা, চায়ের টেবিলের কাছে, অতিথিদের খাওয়াতে হবে।

১। যাচ্ছি মাসি, ওখানে এখনও রোদ্দুর।

বিভাসিনী। যাই, দেখি গে সুষমা কী করছে। তাকে এখানে তোরা কেউ দেখিস নি ?

২। না, মাসি।

বিভাসিনী। কে যে বললে ঐ পুকুরটার ধারে এসেছিল ?

১। না, এতক্ষণ আমরাই ওখানে বেড়াচ্ছিলুম।

[বিভাসিনীর প্রস্থান

২। চেয়ে দেখ্ ভাই, তোদের সুধাংশু কী খাটুনিই খাটছে। নিজের খরচে ফুল কিনে এনে টেবিল সাজিয়েছে নিজের হাতে। কাল এক কাণ্ড বাধিয়েছিল। নেপু বিশ্বাস মুখ বাঁকিয়ে বলেছিল, সুষমা টাকার লোভে এক বুনো রাজাকে বিয়ে করছে।

১। নেপু বিশ্বেস! ওর মুখ বাঁকবে না ? বুকের মধ্যে যে ধনুষ্টংকার! আজকাল সুষমাকে নিয়ে ছেলেদের দলে বুক-জ্বলুনির লঙ্কাকাণ্ড। ঐ সুধাংশুর বুকখানা যেন মানোয়ারি জাহাজের বয়লারঘরের মতো হয়ে উঠেছে।

২। সুধাংশুর তেজ আছে, যেমন শোনা নেপুর কথা অমনি তাকে পেড়ে ফেললে মাটিতে, বুকের উপর চেপে বসে বললে, মাপ চেয়ে চিঠি লিখতে হবে।

১। দারুণ গোঁয়ার, ওর ভয়ে পেট ভ'রে কেউ নিন্দে করতেও পারে না। বাঙালির ছেলেদের বিষম কষ্ট।

২। জানিস নে, আমাদের পাড়ায় বসেছে হতাশের সমিতি? লোকে যাদের বলে সুষমাভক্ত সম্প্রদায়, সৌষমিক যাদের উপাধি, তারা নাম নিয়েছে লক্ষ্মীছাড়ার দল। নিশেন বানিয়েছে, তাতে ভাঙাকুলোর চিহ্ন। সন্ধ্যাবেলায় কী চেঁচামেচি। পাড়ার গেরস্তরা বলছে কাউন্সিলে প্রস্তাব তুলবে, আইন করে ধরে ধরে অবিলম্বে সব-ক'টার জীবন্ত সমাধি, অর্থাৎ বিয়ে দেওয়া চাই। নইলে রাত্তিরে ভদ্রলোকদের ঘুম বন্ধ। পাব্লিক-ন্যুসেন্স্ যাকে বলে।

১। এই লোকহিতকর কার্যে তুই সাহায্য করতে পারবি, প্রিয়।

২। দয়াময়ী, লোকহিতৈষিতা তোমারও কোনো মেয়ের চেয়ে কম নয়, ভাই। লক্ষ্মীছাড়ার ঘরে লক্ষ্মী স্থাপন করবার শখ আছে তোমার। আন্দাজে তা বুঝতে পারি। অমু, ঐ লোকটাকে চিনিস?

১। কখনো তো দেখি নি।

২। ক্ষিতীশবাবু। গল্প লেখে, খুব নাম। বাঁশরি দামী জিনিসের বাজারদর বোঝে। ঠাট্টা করলে বলে— ঘোলের সাধ দুধে মেটাচ্ছি, মুক্তার বদলে শুক্তি।

১। চল্ ভাই, সবাই এসে পড়ল। আমাদের একত্র দেখলে ঠাট্টা করবে।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

বাগানের কোণে তিনটে ঝাউগাছ চক্র করে দাঁড়িয়ে। তলায় কাঠের আসন। সেই নিভৃতে ক্ষিতীশ। অন্যত্র নিমন্ত্রিতের দল কেউ-বা আলাপ করছে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে, কেউ-বা খেলছে টেনিস, কেউ-বা টেবিলে সাজানো আহার্য ভোগ করছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

শচীন। আই সে, তারক, লোকটা আমাদের এলাকায় পিলপেগাড়ি করেছে, এর পরে পার্মনেণ্ট্ টেন্যুরের দাবি করবে। উচ্ছেদ করতে ফৌজদারি।

তারক। কার কথা বলছ।

শচীন। ঐ-যে নববার্তা কাগজের গল্পলিখিয়ে ক্ষিতীশ।

তারক। ওর লেখা একটাও পড়ি নি, সেইজন্যে অসীম শ্রদ্ধা করি।

শচীন। পড় নি ওর নূতন বই 'বেমানান'? বিলিতিমার্কা নব্যবাঙালিকে মুচড়ে মুচড়ে নিংড়েছে।

অরুণ। দূরে বসে কলম চালিয়েছে, ভয় ছিল না মনে। কাছে এসেছে এইবারে বুঝবে, নিংড়ে ধব্‌ধবে সাদা করতে পারি আমরাও। তার পরে চড়াতে পারি গাধার পিঠে।

অর্চনা। ওর ছোঁওয়া বাঁচাতে চাও তোমরা, ওরই ভয় তোমাদের ছোঁওয়াকে। দেখছ না— দূরে বসে আইডিয়ার ডিমগুলোতে তা দিচ্ছে?

সতীশ। ও হল সাহিত্যরথী, আমরা পায়ে-হাঁটা পেয়াদা, মিলন ঘটবে কী উপায়ে।

শচীন। ঘটকী আছেন স্বয়ং তোমার বোন বাঁশরি। হাইব্রো দার্জিলিং আর ফিলিস্টাইন সিলিগুড়ি, এর মধ্যে উনি রেল-লাইন পাতছেন। এখানে ক্ষিতীশের নেমন্তন্ন তাঁরই চক্রান্তে।

সতীশ। তাই নাকি। তা হলে ভগবানের কাছে হতভাগার আত্মার জন্যে শান্তি কামনা করি। আমার বোনকে এখনো চেনেন না।

শৈলবালা। তোমরা যাই বল, আমার কিন্তু ওর উপরে মায়া হয়।

সতীশ। কোন্‌ গুণে।

শৈল। চেহারাতে। শুনেছি, ছেলেবেলায় মায়ের বঁটির উপর পড়ে গিয়ে কপালে চোট লেগেছিল, তাই ঐ মস্ত কাটা দাগ। শরীরের খুঁত নিয়ে ওকে যখন ঠাট্টা কর, আমার ভালো লাগে না।

শচীন। মিস্ শৈল, বিধাতা তোমাকে নিখুঁত করেছেন তাই এত করুণা। কলির কোপ আছে যার চেহারায়, সে বিধাতার অকৃপার শোধ তুলতে চায় বিশ্বের উপর। তার হাতে কলম যদি সরু করে কাটা থাকে তা হলে শতহস্ত দূরে থাকা শ্রেয়। ইংরেজ কবি পোপের কথা মনে রেখো।

শৈল। আহা, তোমরা বাড়াবাড়ি করছ।

সতীশ। শৈল, তোমার দরদ দেখে নিজেরই কপালে বঁটি মারতে ইচ্ছে করছে। শাস্ত্রে আছে মেয়েদের দয়া আর ভালোবাসা থাকে এক মহলে, ঠাঁইবদল করতে দেরি হয় না।

শচীন। তোমার ভয় নেই সতীশ, মেয়েরা অযোগ্যকেই দয়া করে।

শৈল। আমাকে তাড়াতে চাও এখান থেকে ?

শচীন। সতীশ সেই অপেক্ষাই করছে। ও যাবে সঙ্গে সঙ্গে।

শৈল। রাগিয়ো না বলছি, তা হলে তোমার কথাও ফাঁস করে দেব।

শচীন। জেনে নাও বন্ধুগণ, আমারও ফাঁস করবার যোগ্য খবর আছে।

সতীশ। মিস্ বাণী, দেখছ লোকটার স্পর্ধা ? গুজবটাকে ঠেলে আনছে তোমার দিকে। পাশ কাটাতে না পারলে অ্যাক্‌সিডেন্ট্ অনিবার্য।

লীলা। মিস্ বাণীকে সাবধান করতে হবে না। ও জানে তাড়া লাগালেই বিপদকে খেদিয়ে আনা হয়। তাই চুপচাপ আছে, কপালে যা থাকে। ঐ-যে কী গানটা, 'বলেছিল ধরা দেব না'।

গান

বলেছিল ধরা দেব না, শুনেছিল সেই বড়াই।
বীরপুরুষের সয় নি গুমোর, বাধিয়ে দিয়েছে লড়াই।
তার পরে শেষে কী-যে হল কার,
কোন্ দশা হল জয়পতাকার—
কেউ বলে জিত, কেউ বলে হার, আমরা গুজব ছড়াই।

অর্চনা। আঃ, কেন তোরা বাণীকে নিয়ে পড়েছিস। ও এখনি কেঁদে ফেলবে। সুষীমা, যা তো ক্ষিতীশবাবুকে ডেকে আন্ চা খেতে।

লীলা। হায় রে কপাল ! মিথ্যে ডাকবে, চোখ নেই, দেখতে পাও না !

সতীশ। কেন, দেখবার কী আছে।

লীলা। ঐ-যে, এণ্ডি চাদরের কোণে মস্ত একটা কালির দাগ। ভেবেছেন চাপা দিয়েছেন কিন্তু ঝুলে পড়েছে।

সতীশ। আচ্ছা চোখ যা হোক তোমার !

লীলা। বোমা তদন্তে পুলিস না এলে ওঁকে নড়ায় কার সাধ্যি।

সতীশ। আমার কিন্তু ভয় হয়, কোন্‌দিন বাঁশরি ঐ জখমী মানুষকে বিয়ে করে পরিবারের মধ্যে আতুরাশ্রম খুলে বসে।

লীলা। কী বল তার ঠিক নেই। বাঁশরির জন্যে ভয় ! ওর একটা গল্প বলি, ভয় ভাঙবে শুনে। আমি উপস্থিত ছিলুম।

শচীন। কী মিছে তাস খেলছ তোমরা ! এসো এখানে, গল্প-লিখিয়ের উপর গল্প ! শুরু করো।

লীলা। সোমশংকর হাতছাড়া হবার পরে বাঁশরির শখ গেল নখী-দন্তী-গোছের একটা লেখক পোষবার। হঠাৎ দেখি জোটালো কোথা থেকে আস্ত একজন কাঁচা সাহিত্যিক। সেদিন উৎসাহ পেয়ে লোকটা শোনাতে এসেছে একটা নূতন লেখা। জয়দেব-পদ্মাবতীকে নিয়ে তাজা গল্প। জয়দেব দূর থেকে ভালোবাসে রাজমহিষী পদ্মাবতীকে। রাজবধূর যেমন রূপ তেমনি সাজসজ্জা, তেমনি বিদ্যেসাধ্যি। অর্থাৎ এ কালে জন্মালে সে হত ঠিক তোমারই মতো শৈল। এ দিকে জয়দেবের স্ত্রী যোলো-আনা গ্রাম্য, ভাষায় পানাপুকুরের গন্ধ, ব্যবহারটা প্রকাশ্যে বর্ণনা করবার মতো নয়, যে-সব তার বীভৎস প্রবৃত্তি— ড্যাশ দিয়ে ফুটকি দিয়েও তার উল্লেখ চলে না। লেখক শেষকালটায় খুব কালো কালিতে দেগে প্রমাণ করেছে যে, জয়দেব স্নব, পদ্মাবতী মেকি, একমাত্র খাঁটি সোনা মন্দাকিনী। বাঁশরি চৌকি ছেড়ে দাঁড়িয়ে তারস্বরে বলে উঠল, 'মাস্‌টরপীস!' ধন্যি মেয়ে! একেবারে সাব্লাইম ন্যাকামি।

শচীন। মানুষটা চুপসে চ্যাপটা হয়ে গেল বোধ হয়।

লীলা। উলটো। বুক উঠল ফুলে। বললে, 'শ্রীমতী বাঁশরি, মাটি খোঁড়বার কোদালকে আমি খনিত্র নাম দিয়ে শুদ্ধ করে নিই নে, তাকে কোদালই বলি।' বাঁশরি বলে উঠল, 'তোমার খেতাব হওয়া উচিত— নব্যসাহিত্যের পূর্ণচন্দ্র, কলঙ্কগর্বিত।' ওর মুখ দিয়ে কথা বেরোয় যেন আতসবাজির মতো।

শচীন। এটাও লোকটার গলা দিয়ে গলল? বাধল না?

লীলা। একটুও না। চায়ের পেয়ালায় চামচ নাড়তে নাড়তে ভাবল, আশ্চর্য করেছি, এবার মুগ্ধ করে দেব। বললে, 'শ্রীমতী বাঁশরি, আমার একটা থিওরি আছে। দেখে নেবেন একদিন ল্যাবরেটারিতে তার প্রমাণ হবে। মেয়েদের জৈবকণায় যে এনার্জি থাকে সেটা ব্যাপ্ত সমস্ত পৃথিবীর মাটিতে। নইলে পৃথিবী হত বন্ধ্যা।' আমাদের সর্দার-নেকি শুনেই এতখানি চোখ করে বললে, 'মাটিতে! বলেন কী ক্ষিতীশবাবু! মেয়েদের মাটি করবেন না। মাটি তো পুরুষ। পঞ্চভূতের কোঠায় মেয়ে যদি কোথাও থাকে সে জলে। নারীর সঙ্গে মেলে বারি। স্থূল মাটিতে সূক্ষ্ম হয়ে সে প্রবেশ করে, কখনো আকাশ থেকে নামে বৃষ্টিতে, কখনো মাটির তলা থেকে ওঠে ফোয়ারায়, কখনো কঠিন হয় বরফে, কখনো ঝরে পড়ে ঝরনায়।' যা বলিস ভাই শৈল, বাঁশি কোথা থেকে কথা আনে জুটিয়ে, ভগীরথের গঙ্গার মতো, হাঁপ ধরিয়ে দিতে পারে ঐরাবত হাতিটাকে পর্যন্ত।

শচীন। ক্ষিতীশ সেদিন ভিজে কাদা হয়ে গিয়েছিল বলো!

লীলা। সম্পূর্ণ। বাঁশি আমার দিকে ফিরে বললে, 'তুই তো এম. এস্‌সি.তে

বায়োকেমিস্ট্রি নিয়েছিস, শুনলি তো? বিশ্বে রমণীর রমণীয়তা যে অংশে সেইটিকে কেটে ছিঁড়ে পুড়িয়ে গুঁড়িয়ে হাইড্রলিক প্রেস দিয়ে দলিয়ে সল্‌ফ্যুরিক অ্যাসিড দিয়ে গলিয়ে তোকে রিসর্চে লাগতে হবে।' দেখো একবার দুষ্টুমি, আমি কোনোকালে বায়োকেমিস্ট্রি নিই নি। ওর পোষা জীবকে নাচাবার জন্যে চাতুরী। তাই বলছি, ভয় নেই, মেয়েরা যাকে গাল দেয় তাকেও বিয়ে করতে পারে কিন্তু যাকে বিদ্রূপ করে তাকে নৈব নৈবচ। সব-শেষে বোকাটা বললে, 'আজ স্পষ্ট বুঝলুম, পুরুষ তেমনি করেই নারীকে চায় যেমন করে মরুভূমি চায় জলকে মাটির তলায় বোবা ভাষাকে উদ্ভিদ করে তোলবার জন্যে।' এত হেসেছি!

তারক। তুমি তো ঐ বললে। আমি একদিন ক্ষিতীশের তালি-দেওয়া মুখ নিয়ে একটু ঠাট্টার আভাস দিয়েছিলেম। বাঁশরি বলে উঠলেন, 'দেখো লাহিড়ি, ওর মুখ দেখতে আমার পজিটিভ্‌লি ভালো লাগে।' আমি আশ্চর্য হয়ে বললেম, 'তা হলে মুখখানা বিশুদ্ধ মডার্‌ন্‌ আর্ট। বুঝতে ধাঁধা লাগে।' ওর সঙ্গে কথায় কে পারবে— ও বললে, 'বিধাতার তুলিতে অসীম সাহস। যাকে ভালো দেখতে করতে চান তাকে সুন্দর দেখতে করা দরকার বোধ করেন না। তাঁর মিষ্টান্ন ছড়ান ইতর লোকদেরই পাতে।' বাই জোভ্‌, সূক্ষ্ম বটে!

শৈল। আর কি কোনো কথা নেই তোমাদের। ক্ষিতীশবাবু শুনতে পাবেন যে।

সতীশ। ভয় নেই, ওখানে ফোয়ারা ছুটছে, বাতাস উলটো দিকে, শোনা যাবে না।

অর্চনা। আচ্ছা, তোমরা সব তাস খেলো, টেনিস খেলতে যাও, ওই মানুষটার সঙ্গে হিসেব চুকিয়ে আসি গে।

অর্চনা প্লেটে খাবার সাজিয়ে নিয়ে গেল ক্ষিতীশের কাছে। দোহারা গড়নের দেহ, সাজে-সজ্জায় কিছু অযত্ন আছে, হাসিখুশি ঢলঢলে মুখ, আয়ু পশ্চিমের দিকে এক ডিগ্রি হেলেছে।

অর্চনা। ক্ষিতীশবাবু, পালিয়ে বসে আছেন আমাদের কাছ থেকে তার মানে বুঝতে পারি, কিন্তু খাবার টেবিলটাকে অস্পৃশ্য করলেন কোন্‌ দোষে। নিরাকার আইডিয়ায় আপনারা অভ্যস্ত, নিরাহার ভোজও কি তাই। আমরা বঙ্গনারী বঙ্গসাহিত্যের সেবার ভার পেয়েছি যে দিকটাতে সে দিকে আপনাদের পাকযন্ত্র।

ক্ষিতীশ। দেবী, আমরা জোগাই রসাত্মক বাক্য, তা নিয়ে তর্ক ওঠে; আপনারা দেন রসাত্মক বস্তু, ওটা অন্তরে গ্রহণ করতে মতান্তর ঘটে না।

অর্চনা। কী চমৎকার। আমি যখন থালায় কেক সন্দেশ গোছাচ্ছিলুম আপনি ততক্ষণ কথাটা বানিয়ে নিচ্ছিলেন। সাত জন্ম উপোষ করে থাকলেও আমার মুখ দিয়ে এমন ঝক্‌ঝকে কথাটা বেরত না। তা যাক গে ; পরিচয় নেই, তবু এলুম কাছে, কিছু মনে করবেন না। পরিচয় দেবার মতো নেই বিশেষ কিছু। বালিগঞ্জ থেকে টালিগঞ্জে যাবার ভ্রমণবৃত্তান্তও কোনো মাসিকপত্রে আজ পর্যন্ত ছাপাই নি। আমার নাম অর্চনা সেন। ঐ-যে অপরিচিত ছোটো মেয়েটি বেণী দুলিয়ে বেড়াচ্ছে, আমি তারই অখ্যাত কাকী।

ক্ষিতীশ। এবার তা হলে আমার পরিচয়টা—

অর্চনা। বলেন কী। পাড়াগেঁয়ে ঠাওরালেন আমাকে? শেয়ালদ-স্টেশনে কি গাইড রাখতে হয় চেঁচিয়ে জানাতে যে কলকাতা শহরটা রাজধানী। এই পরশুদিন পড়েছি আপনার 'বেমানান' গল্পটা। পড়ে হেসে মরি আর-কি। ও কী। প্রশংসা শুনতে আজও আপনার লজ্জা বোধ হয়? খাওয়া বন্ধ করলেন যে? আচ্ছা, সত্যি বলুন, নিশ্চয় ঘরের লোক কাউকে লক্ষ্য করে লিখেছেন। রক্তের যোগ না থাকলে অমন অদ্ভুত সৃষ্টি বানানো যায় না। ঐ-যে, যে জায়গাটাতে মিস্টার কিষেণ গাপ্টা বি. এ ক্যাণ্টাব, মিস্ লোটিকার পিঠের দিকের জামার ফাঁক দিয়ে আঙটি ফেলে দিয়ে খানাতল্লাশির দাবি করে হো-হা বাধিয়ে দিলে। আমার বন্ধুরা সবাই পড়ে বললে, ম্যাচ্‌লেস— বঙ্গসাহিত্যে এ জায়গাটার দেশলাই মেলে না, একটু পোড়াকাঠিও না। আপনার লেখা ভয়ানক রিয়লিস্টিক ক্ষিতীশবাবু। ভয় হয় আপনার সামনে দাঁড়াতে।

ক্ষিতীশ। আমাদের দুজনের মধ্যে কে বেশি ভয়ংকর, বিচার করবেন বিধাতাপুরুষ।

অর্চনা। না, ঠাট্টা করবেন না। সিঙাড়াটা শেষ করে ফেলুন। আপনি ওস্তাদ, ঠাট্টায় আপনার সঙ্গে পারব না। মোস্ট ইণ্টারেস্টিং আপনার বইখানা। এমন সব মানুষ কোথাও দেখা যায় না। ঐ-যে মেয়েটা কী তার নাম— কথায় কথায় হাঁপিয়ে উঠে বলে, মাই আইজ্, ও গড— লাজুক ছেলে স্যাণ্ডেলের সংকোচ ভাঙবার জন্যে নিজে মোটর হাঁকিয়ে ইচ্ছে করে গাড়িটা ফেললে খাদে, মতলব ছিল স্যাণ্ডেলকে দুই হাতে তুলে পতিতোদ্ধার করবে। ,হবি তো হ স্যাণ্ডেলের হাতে হল কম্পউণ্ড ফ্র্যাক্‌চার। কী ড্রামাটিক, রিয়ালিজ্‌মের চূড়ান্ত! ভালোবাসার এতবড়ো আধুনিক পদ্ধতি বেদব্যাসের জানা ছিল না। ভেবে দেখুন, সুভদ্রার কত বড়ো চান্স্ মারা গেল, আর অর্জুনেরও কব্জি গেল বেঁচে!

ক্ষিতীশ। কম মডার্ন্ নন আপনি। আমার মতো নির্লজ্জকেও লজ্জা দিতে পারেন।

অর্চনা। দোহাই ক্ষিতীশবাবু, বিনয় করবেন না। আপনি নির্লজ্জ! লজ্জায় গলা দিয়ে সন্দেশ গলছে না। কলমটার কথা স্বতন্ত্র।

লীলা। (কিছু দূর থেকে) অর্চনামাসি, সময় হয়ে এল, ডাক পড়েছে।

অর্চনা। (জনান্তিকে) লীলা, আধমরা করেছি, বাকিটুকু তোর হাতে।

[অর্চনার প্রস্থান

লীলা সাহিত্যে ফার্স্ট্ ক্লাস এম. এ. ডিগ্রি নিয়ে আবার সায়েন্স ধরেছে। রোগা শরীর, ঠাট্টা-তামাশায় তীক্ষ্ণ, সাজগোজে নিপুণ, কটাক্ষে দেখবার অভ্যাস।

লীলা। ক্ষিতীশবাবু, নমস্কার! আপনি 'সর্বত্র পূজ্যতে'র দলে। লুকোবেন কোথায়, পূজারী আপনাকে খুঁজে বের করে নিজের গরজে। এনেছি অটোগ্রাফের খাতা। সুযোগ কি কম। কী লিখলেন দেখি।

'অন্য-সকলের মতো নয় যে-মানুষ তার মার অন্য-সকলের হাতে।' চমৎকার, কিন্তু প্যাথেটিক। মারে ঈর্ষা ক'রে। মনে রাখবেন, ছোটো যারা তাদের ভক্তিরই একটা ইডিয়ম ঈর্ষা, মারটা তাদের পূজা।

ক্ষিতীশ। বাগ্‌বাদিনীর জাতই বটে, কথায় আশ্চর্য করে দিলেন।

লীলা। বাচস্পতির জাত যে আপনারা। যেটা বললেম ওটা কোটেশন। পুরুষের লেখা থেকেই। আপনাদের প্রতিভা বাক্যরচনায়, আমাদের নৈপুণ্য বাক্য-প্রয়োগে। ওরিজিন্যালিটি আপনার বইয়ের পাতায় পাতায়। সেদিন আপনারই লেখা গল্পের বই পড়লেম। ব্রীলিয়েন্ট্। ঐ-যে যাতে একজন মেয়ের কথা আছে, সে যখন দেখলে স্বামীর মন আর-এক জনের উপরে, বানিয়ে চিঠি লিখলে; স্বামীর কাছে প্রমাণ করে দিলে যে সে ভালোবাসে তাদের প্রতিবেশী বামনদাসকে। আশ্চর্য সাইকলজির ধাঁধা। বোঝা শক্ত, স্বামীর মনে ঈর্ষা জাগাবার এই ফন্দী না তাকে নিষ্কৃতি দেবার ঔদার্য।

ক্ষিতীশ। না না, আপনি ওটা—

লীলা। বিনয় করবেন না। এমন ওরিজিন্যাল আইডিয়া, এমন ঝক্‌ঝকে ভাষা, এমন চরিত্রচিত্র আপনার আর-কোনো লেখায় দেখি নি। আপনার নিজের রচনাকেও বহু দূরে ছাড়িয়ে গেছেন। ওতে আপনার মুদ্রাদোষগুলো নেই, অথচ—

ক্ষিতীশ। ভুল করছেন আপনি। 'রক্তজবা'— ও-বইটা যতীন ঘটকের।

লীলা। বলেন কী। ছি, ছি, এমন ভুলও হয়! যতীন ঘটককে যে আপনি রোজ দু-বেলা গাল দিয়ে থাকেন। আমার এ কী বুদ্ধি। মাপ করবেন আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধ। আপনার জন্যে আর-এক পেয়ালা চা পাঠিয়ে দিচ্ছি— রাগ করে ফিরিয়ে দেবেন না। [লীলার প্রস্থান

রাজাবাহাদুর সোমশংকরের প্রবেশ

রাঘুবংশিক চেহারা 'শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ' রৌদ্রে পুড়ে ঈষৎ ম্লান গৌরবর্ণ, ভারী মুখ দাড়িগোঁফ-কামানো, চুড়িদার সাদা পায়জামা, চুড়িদার সাদা আচকান, সাদা মসলিনের পাঞ্জাবি কায়দার পাগড়ি, শুঁড়তোলা সাদা নাগরাজুতো, দেহটা যে ওজনের কণ্ঠস্বরটাও তেমনি।

সোমশংকর। ক্ষিতীশবাবু, বসতে পারি কি।

ক্ষিতীশ। নিশ্চয়।

সোমশংকর। আমার নাম সোমশংকর সিং। আপনার নাম শুনেছি মিস্ বাঁশরির কাছ থেকে। তিনি আপনার ভক্ত।

ক্ষিতীশ। বোঝা কঠিন। অন্তত ভক্তিটা অবিমিশ্র নয়। তার থেকে ফুলের অংশ ঝরে পড়ে, কাঁটাগুলো দিনরাত থাকে বিঁধে।

সোমশংকর। আমার দুর্ভাগ্য আপনার বই পড়বার অবকাশ পাই নি। তবু আমাদের এই বিশেষ দিনে আপনি এখানে এসেছেন, বড়ো কৃতজ্ঞ হলুম। কোনো-এক সময়ে আমাদের শম্ভুগড়ে আসবেন, এই আশা রইল। জায়গাটা আপনার মতো সাহিত্যিকের দেখবার যোগ্য।

বাঁশরি। (পিছন থেকে এসে) ভুল বলছ শংকর, যা চোখে দেখা যায় তা উনি দেখেন না। ভূতের পায়ের মতো ওঁর চোখ উলটো দিকে। সে কথা যাক। শংকর, ব্যস্ত হোয়ো না। এখানে আজ আমার নেমন্তন্ন ছিল না। ধরে নিচ্ছি, সেটা আমার গ্রহের ভুল নয়, গৃহকর্তাদেরই ভুল। সংশোধন করতে এলুম। আজ সুষমার সঙ্গে তোমার এন্‌গেজমেণ্টের দিন, অথচ এ সভায় আমি থাকব না এ হতেই পারে না। খুশি হও নি অনাহূত এসেছি বলে ?

সোমশংকর। খুব খুশি হয়েছি, সে কি বলতে হবে।

বাঁশরি। সেই কথাটা ভালো করে বলবার জন্যে একটু বোসো এখানে। ক্ষিতীশ,

ঐ চাঁপাগাছটার তলায় কিছুক্ষণ অদ্বিতীয় হয়ে থাকো গে। আড়ালে তোমার নিন্দে করব না। [ক্ষিতীশের প্রস্থান

শংকর, সময় বেশি নেই, কাজের কথাটা সেরে এখনই ছুটি দেব। তোমার নূতন এন্‌গেজমেন্টের রাস্তায় পুরোনো জঞ্জাল কিছু জমে আছে। সাফ করে ফেললে সুগম হবে পথ। এই নাও।

বাঁশরি রেশমের থলি থেকে একটা পান্নার কণ্ঠী, হীরের ব্রেস্‌লেট, মুক্তোবসানো ব্রোচ বের করে দেখিয়ে আবার থলিতে পুরে সোমশংকরের কোলে ফেলে দিলে।

সোমশংকর। বাঁশি, তুমি জান, আমার মুখে কথা জোগায় না। যা বলতে পারলেম না তার মানে নিজে বুঝে নিয়ো।

বাঁশরি। সব কথাই আমার জানা, মানে আমি বুঝি। এখন যাও, তোমাদের সময় হল।

সোমশংকর। যেয়ো না, বাঁশি। ভুল বুঝো না আমাকে। আমার শেষ কথাটা শুনে যাও। আমি জঙ্গলের মানুষ। শহরে এসে কলেজে পড়ার আরম্ভের মুখে প্রথম তোমার সঙ্গে দেখা। সে দৈবের খেলা। তুমিই আমাকে মানুষ করে দিয়েছিলে, তার দাম কিছুতেই শোধ হবে না। তুচ্ছ এই গয়নাগুলো।

বাঁশরি। আমার শেষ কথাটা শোনো, শংকর। আমার তখন প্রথম বয়েস, তুমি এসে পড়লে সেই নতুন-জাগা অরুণরঙের দিগন্তে। ডাক দিয়ে আলোয় আনলে যাকে তাকে লও বা না লও নিজে তো তাকে পেলুম। আত্মপরিচয় ঘটল। বাস্‌, দুই পক্ষে হয়ে গেল শোধবোধ। এখন দুজনেই অঋণী হয়ে আপন আপন পথে চললুম। আর কী চাই।

সোমশংকর। বাঁশি, যদি কিছু বলতে যাই নির্বোধের মতো বলব। বুঝলুম, আমার আসল কথাটা বলা হবে না কোনোদিনই। আচ্ছা, তবে থাক্‌। অমন চুপ করে আমার দিকে চেয়ে আছ কেন। মনে হচ্ছে, দুই চোখ দিয়ে আমাকে লুপ্ত করে দেবে।

বাঁশরি। আমি তাকিয়ে দেখছি একশো বছর পরেকার যুগান্তে। সে দিকে আমি নেই, তুমি নেই, আজকের দিনের অন্য কেউ নেই। ভুল বোঝার কথা বলছ! সেই ভুল বোঝার উপর দিয়ে চলে যাবে কালের রথ। ধুলো হয়ে যাবে, সেই ধুলোর উপরে বসে খেলা করবে তোমার নাতি-নাতনিরা। সেই নির্বিকার ধুলোর হোক জয়।

সোমশংকর। এ গয়নাগুলোর কোথাও স্থান রইল না; যাক তবে।

[ফেলে দিলে ফোয়ারার জলাশয়ে

সুষমার বোন সুষীমার প্রবেশ

ফ্রক পরা, চশমা চোখে, বেণী দোলানো, দ্রুতপদে-চলা এগারো বছরের মেয়ে।

সুষীমা। সন্ন্যাসীবাবা আসছেন, শংকরদা। তোমাকে ডেকে পাঠালেন সবাই। তুমি আসবে না, বাঁশিদিদি?

বাঁশরি। আসব বইকি, আসার সময় হোক আগে।

[সোমশংকর ও সুষীমার প্রস্থান

ক্ষিতীশ, শুনে যাও। চোখ আছে? দেখতে পাচ্ছ কিছু কিছু?

ক্ষিতীশ। রঙ্গভূমির বাইরে আমি। আওয়াজ পাচ্ছি, রাস্তা পাচ্ছি নে।

বাঁশরি। বাংলা উপন্যাসে নিয়ুমার্কেটের রাস্তা খুলেছ নিজের জোরে আলকাতরা ঢেলে। এখানে পুতুলনাচের রাস্তাটা বের করতে তোমারও অফীশিয়াল গাইড চাই! লোকে হাসবে যে!

ক্ষিতীশ। হাসুক-না। রাস্তা না পাই, অমন গাইডকে তো পাওয়া গেল।

বাঁশরি। রসিকতা! সস্তা মিষ্টান্নের ব্যাবসা! এজন্যে ডাকি নি তোমাকে। সত্যি করে দেখতে শেখো, সত্যি করে লিখতে শিখবে। চারি দিকে অনেক মানুষ আছে, অনেক অমানুষও আছে, ঠাহর করলেই চোখে পড়বে। দেখো দেখো, ভালো করে দেখো।

ক্ষিতীশ। নাই বা দেখলেম, তোমার তাতে কী।

বাঁশরি। নিজে লিখতে পারি নে যে, ক্ষিতীশ। চোখে দেখি, মনে বুঝি, স্বর বন্ধ, ব্যর্থ হয় যে সব। ইতিহাসে বলে, একদিন বাঙালি কারিগরদের বুড়ো আঙুল দিয়েছিল কেটে। আমিও কারিগর, বিধাতা বুড়ো আঙুল কেটে দিয়েছেন। আমদানি-করা মালে কাজ চালাই, পরখ করে দেখতে হয় সেটা সাঁচ্চা কি না। তোমরা লেখক, আমাদের মতো কলমহারাদের জন্যেই কলমের কাজ তোমাদের।

সুষমার প্রবেশ

দেখবামাত্র বিস্ময় লাগে। চেহারা সতেজ সবল সমুন্নত। রঙ যাকে বলে কনকগৌর, ফিকে চাঁপার মতো, কপাল নাক চিবুক যেন কুঁদে তোলা।

সুষমা। (ক্ষিতীশকে নমস্কার ক'রে) বাঁশি, কোণে লুকিয়ে কেন।

বাঁশরি। কুনো সাহিত্যিককে বাইরে আনবার জন্য। খনির সোনাকে শানে

চড়িয়ে তার চেকনাই বের করতে পারি, আগে থাকতেই হাতযশ আছে। জহরতকে দামী করে তোলে জহরী পরের ভেগেরই জন্য, কী বল। সুষী, ইনিই ক্ষিতীশবাবু, জান বোধ হয়।

সুষমা। জানি বইকি। এই সেদিন পড়ছিলুম ওঁর 'বোকার বুদ্ধি' গল্পটা। কাগজে কেন এত গাল দিয়েছে বুঝতে পারলুম না।

ক্ষিতীশ। অর্থাৎ বইখানা গাল দেবার যোগ্য এতই কী ভালো।

সুষমা। ওরকম ধারালো কথা বলবার ভার বাঁশরি আর ঐ আমার পিসতুতো বোন লীলার উপরে। আপনাদের মতো লেখকের বই সমালোচনা করতে ভয় করি, কেননা তাতে সমালোচনা করা হয় নিজেরই বিদ্যে-বুদ্ধির। অনেক কথা বুঝতেই পারি নে। বাঁশরির কল্যাণে আপনাকে কাছে পেয়েছি, দরকার হলে বুঝিয়ে নেব।

বাঁশরি। ক্ষিতীশবাবু ন্যাচার‍্যাল্ হিস্ট্রি লেখেন গল্পের ছাঁচে। যেখানটা জানা নেই, দগদগে রঙ লেপে দেন মোটা তুলি দিয়ে। রঙের আমদানি সমুদ্রের ওপার থেকে। দেখে দয়া হল। বললুম, জীবজন্তুর সাইকলজির খোঁজে গুহাগহ্বরে যেতে যদি খরচে না কুলোয়, অন্তত জুয়োলজিকালের খাঁচার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারতে দোষ কী।

সুষমা। তাই বুঝি এনেছ এখানে?

বাঁশরি। পাপমুখে বলব কী করে। তাই তো বটে। ক্ষিতীশবাবুর হাত পাকা, মালমশলাও পাকা হওয়া চাই। যথাসাধ্য জোগাড় দেবার মজুরগিরি করছি।

সুষমা। ক্ষিতীশবাবু, একটু অবকাশ করে নিয়ে আমাদের ও দিকে যাবেন। মেয়েরা সদ্য আপনার বই কিনে আনিয়েছে সই নেবে বলে। সাহস করছে না কাছে আসতে। বাঁশি, ওঁকে একলা ঘিরে রেখে কেন অভিশাপ কুড়োচ্ছ।

বাঁশরি। (উচ্চহাস্যে) সেই অভিশাপই তো মেয়েদের বর। সে তুমি জান। জয়যাত্রায় মেয়েদের লুটের মাল প্রতিবেশিনীর ঈর্ষা।

সুষমা। ক্ষিতীশবাবু, শেষ দরবার জানিয়ে গেলুম। গণ্ডি পেরোবার স্বাধীনতা যদি থাকে একবার যাবেন ও দিকে।

[সুষমার প্রস্থান

ক্ষিতীশ। কী আশ্চর্য ওঁকে দেখতে। বাঙালি ঘরের মেয়ে বলে মনেই হয় না। যেন এথীনা, যেন মিনর্ভা, যেন ব্রুন্‌হিল্‌ড্!

বাঁশরি। (তীব্রহাস্যে) হায় রে হায়, যত বড়ো দিগ্‌গজ পুরুষই হোক-না কেন সবার মধ্যেই আছে আদিম যুগের বর্বর। হাড়-পাকা রিয়লিস্ট্ বলে দেমাক কর, ভান কর মন্তর মান না। লাগল মন্তর চোখের কটাক্ষে, একদম উড়িয়ে নিয়ে গেল সাইথলজির

যুগে। আজও কচি মনটা রূপকথা আঁকড়িয়ে আছে। তাকে হিঁচড়িয়ে উজোন পথে টানাটানি ক'রে মনের উপরের চামড়াটাকে করে তুলেছ কড়া। দুর্বল বলেই বলের এত বড়াই।

ক্ষিতীশ। সে কথা মাথা হেঁট করেই মানব। পুরুষজাত দুর্বল জাত।

বাঁশরি। তোমরা আবার রিয়লিস্‌ট্! রিয়লিস্‌ট্ মেয়েরা। যতবড়ো স্থূল পদার্থ হও না, যা তোমরা তাই বলেই জানি তোমাদের। পাঁকে-ডোবা জলহস্তীকে নিয়ে ঘর যদি করতেই হয় তাকে ঐরাবত বলে রোমান্স্ বানাই নে। রঙ মাখাই নে তোমাদের মুখে। মাখি নিজে। রূপকথার খোকা সব! ভালো কাজ হয়েছে মেয়েদের! তোমাদের ভোলানো। পোড়া কপাল আমাদের! এথীনা! মিনর্ভা! মরে যাই! ওগো রিয়লিস্‌ট্, রাস্তায় চলতে যাদের দেখেছ পানওয়ালীর দোকানে, গড়েছ কালো মাটির তাল দিয়ে যাদের মূর্তি, তারাই সেজে বেড়াচ্ছে এথীনা, মিনর্ভা।

ক্ষিতীশ। বাঁশি, বৈদিককালে ঋষিদের কাজ ছিল মন্তর পড়ে দেবতা ভোলানো— যাঁদের ভোলাতেন তাঁদের ভক্তিও করতেন। তোমাদের যে সেই দশা। বোকা পুরুষদের ভোলাও তোমরা, আবার পাদোদক নিতেও ছাড় না। এমনি করেই মাটি করলে এই জাতটাকে।

বাঁশরি। সত্যি সত্যি, খুব সত্যি। ঐ বোকাদের আমরাই বসাই টঙের উপরে, চোখের জলে কাদামাখা পা ধুইয়ে দিই, নিজেদের অপমানের শেষ করি, যত ভোলাই তার চেয়ে ভুলি হাজার গুণে।

ক্ষিতীশ। এর উপায়?

বাঁশরি। লেখো, লেখো সত্যি করে, লেখো শক্ত করে। মন্তর নয়, মাইথলজি নয়, মিনর্ভার মুখোশটা ফেলে দাও টান মেরে। ঠোঁট লাল ক'রে তোমাদের পানওয়ালী যে মন্তর ছড়ায় ঐ আশ্চর্য মেয়েও ভাষা বদলিয়ে সেই মন্তরই ছড়াচ্ছে। সামনে পড়ল পথ-চলতি এক রাজা, শুরু করলে জাদু। কিসের জন্যে। টাকার জন্যে। শুনে রাখো, টাকা জিনিসটা মাইথলজির নয়, ওটা ব্যাঙ্কের, ওটা তোমাদের রিয়লিজ্‌মের কোঠায়।

ক্ষিতীশ। টাকার প্রতি দৃষ্টি আছে সেটা তো বুদ্ধির লক্ষণ, সেইসঙ্গে হৃদয়টাও থাকতে পারে।

বাঁশরি। আছে গো, হৃদয় আছে। ঠিক জায়গায় খুঁজলে দেখতে পাবে, পানওয়ালীরও হৃদয় আছে। কিন্তু মুনফা এক দিকে, হৃদয়টা আর-এক দিকে। এইটে যখন আবিষ্কার করবে তখনই জমবে গল্পটা। পাঠিকারা ঘোর আপত্তি করবে; বলবে,

মেয়েদের খেলো করা হল, অর্থাৎ তাদের মন্ত্রশক্তিতে বোকাদের মনে খটকা লাগানো হচ্ছে। উঁচুদরের পুরুষ পাঠকও গাল পাড়বে। বল কী, তাদের মাইথলজির রঙ চটিয়ে দেওয়া! সর্বনাশ! কিন্তু ভয় কোরো না ক্ষিতীশ, রঙ যখন যাবে জ্বলে, মন্ত্র পড়বে চাপা, তখনো সত্য থাকবে টি`কে, শেলের মতো, শূলের মতো।

ক্ষিতীশ। শ্রীমতী সুষমার হৃদয়ের বর্তমান ঠিকানাটা জানতে পারি কি।

বাঁশরি। ঠিকানা বলতে হবে না, নিজের চোখেই দেখতে পাবে যদি চোখ থাকে। এখন চলো ঐ দিকে। ওরা টেনিস-খেলা সেরে এসেছে। এখন আইস্‌ক্রিম পরিবেশনের পালা। বঞ্চিত হবে কেন।

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

বাগানের এক দিক। খাবার-টেবিল ঘিরে বসে আছে তারক, শচীন, সুধাংশু, সতীশ ইত্যাদি।

তারক। বাড়াবাড়ি হচ্ছে সন্ন্যাসীকে নিয়ে। নাম পুরন্দর নয়, সবাই জানে। আসল নাম ধরা পড়লেই বোকার ভিড় পাতলা হয়ে যেত। দেশী কি বিদেশী তা নিয়েও মতভেদ। ধর্ম কী জিজ্ঞাসা করলে হেসে বলে, ধর্মটা এখনো মরে নি তাই তাকে নামের কোঠায় ঠেসে দেওয়া চলে না। সেদিন দেখি, আমাদের হিমুকে গল্‌ফ শেখাচ্ছে। হিমুর জীবাত্মাটা কোনোমতে গল্‌ফের গুলির পিছনেই ছুটতে পারে, তার বেশি ওর দৌড় নেই, তাই সে ভক্তিতে গদ্‌গদ। মিস্টিরিয়স সাজের নানা মালমশলা জুটিয়েছে। আজ ওকে আমি একস্‌পোজ করব সবার সামনে, দেখে নিয়ো।

সুধাংশু। প্রমাণ করবে, তোমার চেয়ে যে বড়ো সে তোমার চেয়ে ছোটো।

সতীশ। আঃ সুধাংশু, মজাটা মাটি করিস কেন। পকেট বাজিয়ে ও বলছে ডক্যুমেণ্ট্ আছে। বের করুক-না, দেখি কী রকম চীজ সেটা। ঐ যে সন্ন্যাসী, সঙ্গে আসছেন এঁরা সবাই।

পুরন্দরের প্রবেশ

ললাট উন্নত, জ্বলছে দুই চোখ, ঠোঁটে রয়েছে অনুচ্চারিত অনুশাসন, মুখের স্বচ্ছ রঙ পাণ্ডুর শ্যাম— অন্তর থেকে বিচ্ছুরিত দীপ্তিতে ধৌত। দাড়ি-গোঁফ কামানো, সুডৌল মাথায় ছোটো করে ছাটা চুল, পায়ে নেই জুতো,

তসরের ধুতি পরা, গায়ে খয়েরি রঙের ঢিলে জামা। সঙ্গে সুষমা, সোমশংকর, বিভাসিনী।

শচীন। সন্ন্যাসীঠাকুর, বলতে ভয় করি, কিন্তু চা খেতে দোষ কী।

পুরন্দর। কিছুমাত্র না। যদি ভালো চা হয়। আজ থাক্, এইমাত্র নেমন্তন্ন খেয়ে আসছি।

শচীন। নেমন্তন্ন আপনাকেও? লাঞ্চে নাকি। গ্রেট্ইস্টার্নে বোষ্টমের মোচ্ছব!

পুরন্দর। গ্রেট্ইস্টার্নেই যেতে হয়েছিল। ডাক্তার উইল্কক্সের ওখানে।

শচীন। ডাক্তার উইল্কক্স! কী উপলক্ষে।

পুরন্দর। যোগবাশিষ্ঠ পড়ছেন।

শচীন। বাস্ রে! ওহে তারক, এগিয়ে এসো-না।— কী-যে বলছিলে।

তারক। এই ফোটোগ্রাফটা তো আপনার?

পুরন্দর। সন্দেহমাত্র নেই।

তারক। মোগলাই সাজ, সামনে গুড়্গুড়ি, পাশে দাড়িওয়ালাটা কে। সুস্পষ্ট যাবনিক।

পুরন্দর। রোশেনাবাদের নবাব। ইরানী বংশীয়। তোমার চেয়ে এঁর আর্যরক্ত বিশুদ্ধ।

তারক। আপনাকে কেমন দেখাচ্ছে যে!

পুরন্দর। দেখাচ্ছে তুর্কির বাদশার মতো। নবাবসাহেব ভালোবাসেন আমাকে, আদর করে ডাকেন মুক্তিয়ার মিঞা, খাওয়ান এক থালায়। মেয়ের বিয়ে ছিল, আমাকে সাজিয়েছিলেন আপন বেশে।

তারক। মেয়ের বিয়েতে ভাগবতপাঠ ছিল বুঝি?

পুরন্দর। ছিল পোলোখেলার টুর্নামেণ্ট্। আমি ছিলুম নবাবসাহেবের আপন দলে।

তারক। কেমন সন্ন্যাসী আপনি।

পুরন্দর। ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত। কোনো উপাধিই নেই, তাই সব উপাধিই সমান খাটে। জন্মেছি দিগম্বর বেশে, মরব বিশ্বাম্বর হয়ে। তোমার বাবা ছিলেন কাশীতে হরিহর তত্ত্বরত্ন, তিনি আমাকে যে নামে জানতেন সে নাম গেছে ঘুচে। তোমার দাদা রামসেবক বেদান্তভূষণ কিছুদিন পড়েছেন আমার কাছে বৈশেষিক। তুমি তারক লাহিড়ি, তোমার নাম ছিল বুকু, আজ শ্বশুরের সুপারিসে ককস্হিল সাহেবের অ্যাটর্নি-অফিসে শিক্ষানবিশ। সাজ বদলেছে তোমার, তারক

নামের আগুক্ষরটা তবর্গ থেকে টবর্গে চড়েছে। শুনেছি যাবে বিলেতে। বিশ্বনাথের বাহনের প্রতি দয়া রেখো।

তারক। ডাক্তার উইল্‌কক্সের কাছ থেকে কি ইন্ট্রোডাক্‌শন চিঠি পাওয়া যেতে পারবে।

পুরন্দর। পাওয়া অসম্ভব নয়।

তারক। মাপ করবেন।

[পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম

বাঁশরি। সুষমার মাস্টারিতে আজ ইস্তফা দিতে এসেছেন?

পুরন্দর। কেন দেব। আরো-একটি ছাত্র বাড়ল।

বাঁশরি। শুরু করাবেন মুগ্ধবোধের পাঠ? মুগ্ধতার তলায় ডুবছে যে মানুষটা হঠাৎ তার বোধোদয় হলে নাড়ি ছাড়বে।

পুরন্দর। (কিছুক্ষণ বাঁশরির মুখের দিকে তাকিয়ে) বৎসে, একেই বলে ধৃষ্টতা।

[বাঁশরি মুখ ফিরিয়ে সরে গেল

বিভাসিনী। সময় হয়েছে। ঘরের মধ্যে সভা প্রস্তুত, চলুন সকলে।

সকলের ঘরে প্রবেশ

দরজা পর্যন্ত গিয়ে বাঁশরি থমকে দাঁড়াল।

ক্ষিতীশ। তুমি যাবে না ঘরে?

বাঁশরি। শস্তাদরের সদুপদেশ শোনবার শখ আমার নেই।

ক্ষিতীশ। সদুপদেশ!

বাঁশরি। এই তো সুযোগ। পালাবার রাস্তা বন্ধ। জালিয়ানওয়ালাবাগের মার।

ক্ষিতীশ। আমি একবার দেখে আসিগে।

বাঁশরি। না। শোনো, প্রশ্ন আছে। সাহিত্যসম্রাট, গল্পটার মর্ম যেখানে সেখানে পৌঁচেছে তোমার দৃষ্টি?

ক্ষিতীশ। আমার হয়েছে অন্ধ-গোলাঙ্গুল ন্যায়। লেজটা ধরেছি চেপে, বাকিটা টান মেরেছে আমাকে কিন্তু চেহারা রয়েছে অস্পষ্ট। মোট কথাটা এই বুঝেছি যে, সুষমা বিয়ে করবে রাজাবাহাদুরকে, পাবে রাজৈশ্বর্য, তার বদলে হাতটা দিতে প্রস্তুত, হৃদয়টা নয়।

বাঁশরি। তবে শোনো বলি। সোমশংকর নয় প্রধান নায়ক, এ কথা মনে রেখো।

ক্ষিতীশ। তাই নাকি। তা হলে অন্তত গল্পটার ঘাট পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দাও। তার পরে সাঁতরিয়ে হোক, খেয়া ধরে হোক, পারে পৌঁছব।

বাঁশরি। হয়তো জান পুরন্দর তরুণসমাজে বিনা মাইনেয় মাস্টারি করেন। পরীক্ষায় উৎরিয়ে দিতে অদ্বিতীয়। কড়া বাছাই করে নেন ছাত্র। ছাত্রী পেতে পারতেন অসংখ্য, কিন্তু বাছাইরীতি এত অসম্ভব কঠিন যে, এতদিনে একটিমাত্র পেয়েছেন, তার নাম শ্রীমতী সুষমা সেন।

ক্ষিতীশ। ছাত্রী যাদের ত্যাগ করেছেন তাদের কী দশা।

বাঁশরি। আত্মহত্যার সংখ্যা কত, খবর পাই নি। এটা জানি, তাদের অনেকেই চঞ্চু মেলে চেয়ে আছে ঊর্ধ্বে।

ক্ষিতীশ। সেই চকোরীর দলে নাম লেখাও নি?

বাঁশরি। তোমার কী মনে হয়।

ক্ষিতীশ। আমার মনে হয় চকোরীর জাত তোমার নয়, তুমি মিসেস্ রাহুর পদের উমেদার। যাকে নেবে তাকে দেবে লোপ করে, শুধু চঞ্চু মেলে তাকিয়ে থাকা নয়।

বাঁশরি। ধন্য! নরনারীর ধাত বুঝতে পয়লা নম্বর, গোল্ড্ মেডালিস্ট্। লোকে বলে নারীস্বভাবের রহস্যভেদ করতে হার মানেন স্বয়ং নারীর সৃষ্টিকর্তা পর্যন্ত, কিন্তু তুমি নারীচরিত্রচারণচক্রবর্তী, নমস্কার তোমাকে।

ক্ষিতীশ। (করজোড়ে) বন্দনা সারা হল, এবার বর্ণনার পালা শুরু হোক।

বাঁশরি। এটা আন্দাজ করতে পার নি যে, সুষমা ঐ সন্ন্যাসীর ভালোবাসায় একেবারে শেষ-পর্যন্ত তলিয়ে গেছে?

ক্ষিতীশ। ভালোবাসা না ভক্তি?

বাঁশরি। চরিত্রবিশারদ, লিখে রাখো, মেয়েদের যে ভালোবাসা পৌঁছয় ভক্তিতে সেটা তাদের মহাপ্রয়াণ— সেখান থেকে ফেরবার রাস্তা নেই। অভিভূত যে পুরুষ ওদের সমান প্ল্যাট্ফর্মে নামে সেই গরিবের জন্য থার্ড্ক্লাস, বড়োজোর ইণ্টার-মীডিয়েট। সেলুনগাড়ি তো নয়ই। যে উদাসীন মেয়েদের মোহে হার মানল না, ওদের ভুজপাশের দিগ্বলয় এড়িয়ে যে উঠল মধ্যগগনে, দুই হাত ঊর্ধ্বে তুলে মেয়েরা তারই উদ্দেশে দিল শ্রেষ্ঠ নৈবেদ্য। দেখ নি তুমি, সন্ন্যাসী যেখানে মেয়েদের সেখানে কী ঠেলাঠেলি ভিড়।

ক্ষিতীশ। তা হবে। কিন্তু তার উল্টোটাও দেখেছি। মেয়েদের বিষম টান

একেবারে তাজা বর্বরের প্রতি। পুলকিত হয়ে ওঠে তাদের অপমানের কঠোরতায়, পিছন পিছন রসাতল পর্যন্ত যেতে রাজি।

বাঁশরি। তার কারণ মেয়েরা অভিসারিকার জাত। এগিয়ে গিয়ে যাকে চাইতে হয় তার দিকেই ওদের পুরো ভালোবাসা। ওদের উপেক্ষা তারই 'পরে দুর্বৃত্ত হবার মতো জোর নেই যার কিম্বা দুর্লভ হবার মতো তপস্যা।

ক্ষিতীশ। আচ্ছা, বোঝা গেল, সন্ন্যাসীকে ভালোবাসে ঐ সুষমা। তার পরে?

বাঁশরি। সে কী ভালোবাসা। মরণের বাড়া! সংকোচ ছিল না, কেননা একে সে ভক্তি বলেই জানত। পুরন্দর দূরে যেত আপন কাজে, সুষমা তখন যেত শুকিয়ে, মুখ হয়ে যেত ফ্যাকাসে। চোখে প্রকাশ পেত জ্বালা, মন শূন্যে শূন্যে খুঁজে বেড়াত কার দর্শন। বিষম ভাবনা হল মায়ের মনে। একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাঁশি, কী করি।' আমার বুদ্ধির উপর তখন তাঁর ভরসা ছিল। আমি বললেম, 'দাও-না পুরন্দরের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে।' তিনি তো আঁৎকে উঠলেন; বললেন, 'এমন কথা ভাবতেও পার?' তখন নিজেই গেলুম পুরন্দরের কাছে। সোজা বললুম, 'নিশ্চয়ই জানেন, সুষমা আপনাকে ভালোবাসে। ওকে বিয়ে করে উদ্ধার করুন বিপদ থেকে।' এমন করে মানুষটা তাকাল আমার মুখের দিকে, রক্ত জল হয়ে গেল। গম্ভীর সুরে বললে, 'সুষমা আমার ছাত্রী, তার ভার আমার 'পরে, আর আমার ভার তোমার 'পরে নয়।' পুরুষের কাছ থেকে এতবড়ো ধাক্কা জীবনে এই প্রথম। ধারণা ছিল, সব পুরুষের 'পরেই সব মেয়ের আবদার চলে, যদি নিঃসংকোচ সাহস থাকে। দেখলুম দুর্ভেদ্য দুর্গও আছে। মেয়েদের সাংঘাতিক বিপদ সেই বন্ধ কপাটের সামনে, ডাকও আসে সেইখান থেকে কপালও ভাঙে সেইখানটায়।

ক্ষিতীশ। আচ্ছা বাঁশি, সত্যি করে বলো, সন্ন্যাসী তোমারও মনকে টেনেছিল কিনা।

বাঁশরি। দেখো, সাইকলজির অতি সূক্ষ্ম তত্ত্বের মহলে কুলুপ দেওয়া ঘর। নিষিদ্ধ দরজা না খোলাই ভালো; সদরমহলেই যথেষ্ট গোলমাল, সামলাতে পারলে বাঁচি। আজ যে-পর্যন্ত শুনলে তার পরের অধ্যায়ের বিবরণ পাওয়া যাবে একখানা চিঠি থেকে। পরে দেখাব।

ক্ষিতীশ। ঘরের মধ্যে চেয়ে দেখো, বাঁশি। পুরন্দর আঙটি বদল করাচ্ছে। জানলার থেকে সুষমার মুখের উপর পড়েছে রোদের রেখা। স্তব্ধ হয়ে বসে আছে, শান্ত মুখ, জল ঝরে পড়ছে দুই চোখ দিয়ে। বরফের পাহাড়ে যেন সূর্যাস্ত, গলে পড়ছে ঝরনা।

বাঁশরি। সোমশংকরের মুখের দিকে দেখো— সুখ না দুঃখ, বাঁধন পরছে না ছিঁড়ছে? আর পুরন্দর, সে যেন ঐ সূর্যেরই আলো। তার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব রয়েছে লক্ষ যোজন দূরে, মেয়েটার মনে যে অগ্নিকাণ্ড চলছে তার সঙ্গে কোনো যোগই নেই। অথচ তাকে ঘিরে একটা জ্বলন্ত ছবি বানিয়ে দিলে।

ক্ষিতীশ। সুষমার 'পরে সন্ন্যাসীর মন এতই যদি নির্লিপ্ত তবে ওকেই বেছে নিলে কেন।

বাঁশরি। ও যে আইডিয়ালিস্ট্! বাস্ রে! এতবড়ো ভয়ংকর জীব জগতে নেই। আফ্রিকার অসভ্য মারে মানুষকে নিজে খাবে বলে। এরা মারে তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যায়। খায় না খিদে পেলেও। বলি দেয় সারে সারে, জেঙ্গিসখাঁর চেয়ে সর্বনেশে।

ক্ষিতীশ। সন্ন্যাসীর 'পরে তোমার মনে মনে ভক্তি আছে বলেই তোমার ভাষা এত তীব্র।

বাঁশরি। যাকে-তাকে ভক্তি করতে না পেলে বাঁচে না যে-সব হ্যাংলা মেয়ে আমি তাদের দলে নই গো। রাজরানী যদি হতুম মেয়েদের চুলে দড়ি পাকিয়ে ওকে দিতুম ফাঁসি। কামিনীকাঞ্চন ছোঁয় না-যে তা নয়, কিন্তু তাকে দেয় ফেলে ওর কোন্-এক জগন্নাথের রথের তলায়, বুকের পাঁজর যায় গুঁড়িয়ে।

ক্ষিতীশ। ওর আইডিয়াটা কী জানা চাই তো।

বাঁশরি। সে আছে বাওয়ায় বাঁও জলের নীচে। তোমার এলাকার বাইরে, সেখানে তোমার মন্দাকিনী-পদ্মাবতীর ডুবসাঁতার চলে না। আভাস পেয়েছি কোন্ ডাকঘর-বিবর্জিত দেশে ও এক সংঘ বানিয়েছে, তরুণতাপসসংঘ, সেখানে নানা পরীক্ষায় মানুষ তৈরি হচ্ছে।

ক্ষিতীশ। কিন্তু, তরুণী?

বাঁশরি। ওর মতে গৃহেই নারী, কিন্তু পথে নয়।

ক্ষিতীশ। তা হলে সুষমাকে কিসের প্রয়োজন।

বাঁশরি। অন্ন চাই-যে। মেয়েরা প্রহরণধারিণী না হোক বেড়িহাতা-ধারিণী তো বটে। রাজভাণ্ডারের চাবিটা থাকবে ওরই হাতে। ঐ-যে ওরা বেরিয়ে আসছে, অনুষ্ঠান শেষ হল বুঝি।

পুরন্দর ও অন্য সকলে বেরিয়ে এল ঘর থেকে

পুরন্দর। (সোমশংকর ও সুষমাকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে) তোমাদের মিলনের শেষ কথাটা ঘরের দেয়ালের মধ্যে নয় বাইরে, বড়ো রাস্তার সামনে। সুষমা

বৎসে, যে সম্বন্ধ মুক্তির দিকে নিয়ে চলে তাকেই শ্রদ্ধা করি। যা বেঁধে রাখে পশুর মতো প্রকৃতির-গড়া প্রবৃত্তির বন্ধনে বা মানুষের-গড়া দাসত্বের শৃঙ্খলে ধিক্ তাকে। পুরুষ কর্ম করে, স্ত্রী শক্তি দেয়। মুক্তির রথ কর্ম, মুক্তির বাহন শক্তি। সুষমা, ধনে তোমার লোভ নেই, তাই ধনে তোমার অধিকার। তুমি সন্ন্যাসীর শিষ্যা, তাই রাজার গৃহিণীপদে তোমার পূর্ণতা।

(ডান হাতে সোমশংকরের ডান হাত ধরে)

তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।

ওঠো, তুমি যশোলাভ করো। শত্রুদের জয় করো— যে রাজ্য অসীম সমৃদ্ধিবান তাকে ভোগ করো। বৎস, আমার সঙ্গে আবৃত্তি করো প্রণামের মন্ত্র।

নমঃ পুরস্তাদ্ অথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোস্তুতে সর্বত এব সর্ব।
অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ॥

তোমাকে নমস্কার সম্মুখ থেকে, তোমাকে নমস্কার পশ্চাৎ থেকে, হে সর্ব, তোমাকে নমস্কার সর্ব দিক থেকে। অনন্তবীর্য তুমি, অমিতবিক্রম তুমি, তোমাতেই সর্ব, তুমিই সর্ব।

ক্ষণকালের জন্য যবনিকা পড়ে তখনই উঠে গেল। তখন রাত্রি, আকাশে তারা দেখা যায়। সুষমা ও তার বন্ধু নন্দা।

সুষমা। এইবার সেই গানটা গা দেখি ভাই।

গান

নন্দা। না চাহিলে যারে পাওয়া যায়,
তেয়াগিলে আসে হাতে,
দিবসে সে-ধন হারায়েছি আমি
পেয়েছি আঁধার রাতে।
না দেখিবে তারে পরশিবে না গো,
তারি পানে প্রাণ মেলে দিয়ে জাগো,
তারায় তারায় র'বে তারি বাণী,
কুসুমে ফুটিবে প্রাতে॥

তারি লাগি যত ফেলেছি অশ্রুজল,
বীণাবাদিনীর শতদলদলে
করিছে সে টলমল।
মোর গানে গানে পলকে পলকে
ঝলসি উঠিছে ঝলকে ঝলকে,
শান্ত হাসির করুণ আলোক
ভাতিছে নয়নপাতে॥

পুরন্দরের প্রবেশ

সুষমা। (ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে) প্রভু, দুর্বল আমি। মনের গোপনে যদি পাপ থাকে ধুয়ে দাও, মুছে দাও। আসক্তি দূর হোক, জয়যুক্ত হোক তোমার বাণী।

পুরন্দর। বৎসে, নিজেকে নিন্দা কোরো না, অবিশ্বাস কোরো না, নাত্মানমবসাদয়েৎ। ভয় নেই, কোনো ভয় নেই। আজ তোমার মধ্যে সত্যের আবির্ভাব হয়েছে মাধুর্যে, কাল সেই সত্য অনাবৃত করবে আপন জগজ্জয়িনী বীরশক্তি।

সুষমা। আজ সন্ধ্যায় এইখানে তোমার প্রসন্নদৃষ্টির সামনে আমার নূতন জীবন আরম্ভ হল। তোমারই পথ হোক আমার পথ।

পুরন্দর। তোমাদের কাছ থেকে দূরে যাবার সময় আসন্ন হয়েছে।

সুষমা। দয়া করো প্রভু, ত্যাগ কোরো না আমাকে। নিজের ভার আমি নিজে বহন করতে পারব না। তুমি চলে গেলে আমার সমস্ত শক্তি যাবে তোমারই সঙ্গে।

পুরন্দর। আমি দূরে গেলেই তোমার শক্তি তোমার মধ্যে ধ্রুবপ্রতিষ্ঠিত হবে। আমি তোমার হৃদয়দ্বার খুলে দিয়েছি নিজে স্থান নেব বলে নয়। যিনি আমার ব্রতপতি তিনি সেখানে স্থান গ্রহণ করুন। আমার দেবতা হোন তোমারই দেবতা, দুঃখকে ভয় নেই, আনন্দিত হও আত্মজয়ী আপনারই মধ্যে।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সোমশংকরের মহত্ত্ব তুমি আপন অন্তরের থেকে চিনতে পেরেছ?

সুষমা। পেরেছি।

পুরন্দর। সেই দুর্লভ মহত্ত্বকে তোমার দুর্লভ সেবার দ্বারা মূল্যদান করে গৌরবান্বিত করবে, তার বীর্যকে সর্বোচ্চ সার্থকতার দিকে আনন্দে উন্মুখ রাখবে, এই নারীর কাজ; মনে রেখো, তোমার দিকে তাকিয়ে সে যেন নিজেকে শ্রদ্ধা করতে পারে— এই কথাটি ভুলো না।

সুষমা। কখনো ভুলব না।

পুরন্দর। প্রাণকে নারী পূর্ণতা দেয়, এইজন্যেই নারী মৃত্যুকেও মহীয়ান করতে পারে, তোমার কাছে এই আমার শেষ কথা।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চৌরঙ্গি-অঞ্চলে বাঁশরিদের বাড়ি। ক্ষিতীশ ও বাঁশরি

ক্ষিতীশ। তোমার হিন্দুস্থানী শোফারটা ভোরবেলা মুহুর্মুহু বাজাতে লাগল গাড়ির ভেঁপু। চেনা আওয়াজ, ধড়্ফড়িয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়লুম।

বাঁশরি। ভোরবেলায়? অর্থাৎ?

ক্ষিতীশ। অর্থাৎ আটটার কম হবে না।

বাঁশরি। অকালবোধন!

ক্ষিতীশ। দুঃখ নেই, তবু জানতে চাই কারণটা। কোনো কারণ না থাকলেও নালিশ করব না।

বাঁশরি। বুঝিয়ে বলছি। লেখবার বেলায় নলিনাক্ষের দল বলে যাদের দাগা দিয়েছ তাদের সামনে এলেই দেখি তোমার মন যায় এতটুকু হয়ে। মনে মনে চেঁচিয়ে নিজেকে বোঝাতে থাক— ওরা তো ডেকোরেটেড য়ুল্‌স্‌। কিন্তু, সেই স্বগতোক্তিতে সংকোচ চাপা পড়ে না। সাহিত্যিক আভিজাত্যবোধকে অন্তরের মধ্যে ফাঁপিয়ে তোল তবু নিজেকে ওদের সমান বহরে দাঁড় করাতে পার না। সেই চিত্তবিক্ষেপ থেকে বাঁচাবার জন্য নলিনাক্ষ-দলের দিন আরম্ভ হবার পূর্বেই তোমাকে ডাকিয়েছি। সকালবেলায় অন্তত নটা পর্যন্ত আমাদের এখানে রাতের উত্তরাকাণ্ড। আপাতত এ বাড়িটা সাহারা মরুভূমির মতো নির্জন।

ক্ষিতীশ। ওয়েসিস দেখতে পাচ্ছি এই ঘরটার সীমানায়।

বাঁশরি। ওগো পথিক, ওয়েসিস নয়, ভালো করে যখন চিনবে তখন বুঝবে, মরীচিকা।

ক্ষিতীশ। আমার মাথায় আরও উপমা আসছে বাঁশি, আজ তোমার সকাল-বেলাকার অসজ্জিত রূপ দেখাচ্ছে যেন সকালবেলাকার অলস চাঁদের মতো।

বাঁশরি। দোহাই তোমার, গদগদ ভাবটা রেখে দিয়ো একলা-ঘরের বিজনবিরহের জন্য। মুগ্ধ দৃষ্টি তোমাকে মানায় না। কাজের জন্য ডেকেছি, বাজে কথা স্ট্রিক্ট্‌লি প্রোহিবিটেড।

ক্ষিতীশ। এর থেকে ভাষার রেলেটিভিটি প্রমাণ হয়। আমার পক্ষে যা মর্মান্তিক জরুরি তোমার পক্ষে তা ঝেঁটিয়ে-ফেলা বাজে।

বাঁশরি। আজ সকালে এই আমার শেষ অনুরোধ, গাঁজিয়ে-ওঠা রসের ফেনা দিয়ে তাড়িখানা বানিয়ো না নিজের ব্যবহারটাকে। আর্টিস্টের দায়িত্ব তোমার।

ক্ষিতীশ। আচ্ছা, তবে মেনে নিলুম দায়িত্ব।

বাঁশরি। সাহিত্যিক, হতাশ হয়ে পড়েছি তোমার অসাড়তা দেখে। নিজের চক্ষে দেখলে একটা আসন্ন ট্র্যাজেডির সংকেত— আগুনের সাপ ফণা ধরেছে— এখনও চেতিয়ে উঠল না তোমার কলম, আমার তো কাল সারারাত্রি ঘুম হল না। এমন লেখা লেখবার শক্তি কেন আমাকে দিলেন না বিধাতা, যার অক্ষরে অক্ষরে ফেটে পড়ত রক্তবর্ণ আগুনের ফোয়ারা। দেখতে পাচ্ছি আর্টিস্টের চোখে, বলতে পারছি নে আর্টিস্টের কণ্ঠে। ব্রহ্মা যদি বোবা হতেন তা হলে অস্পষ্ট বিশ্বের ব্যথায় মহাকাশের বুক যেত ফেটে।

ক্ষিতীশ। কে বলে তুমি প্রকাশ করতে পার না বাঁশি, তুমি নও আর্টিস্ট্‌! তুমি যেন হীরেমুক্তোর হরির লুঠ দিচ্ছ। কথায় কথায় তোমার শক্তির প্রমাণ ছড়াছড়ি যায়, দেখে ঈর্ষা হয় মনে।

বাঁশরি। আমি যে মেয়ে, আমার প্রকাশ ব্যক্তিগত। বলবার লোককে প্রত্যক্ষ পেলে তবেই বলতে পারি। কেউ নেই তবু বলা— সেই বলা তো চিরকালের। আমাদের বলা নগদ বিদায়, হাতে হাতে, দিনে দিনে। ঘরে ঘরে মুহূর্তে মুহূর্তে সেগুলো ওঠে আর মেলায়।

ক্ষিতীশ। পুরুষ আর্টিস্ট্‌কে এবার মেরেছ ঠেলা, আচ্ছা বেশ, কাজ আরম্ভ হোক। সেদিন বলেছিলে একটা চিঠির কথা।

বাঁশরি। এই সেই চিঠি। সন্ন্যাসী বলছেন— প্রেমে মানুষের মুক্তি সর্বত্র। কবিরা যাকে বলে ভালোবাসা সেইটাই বন্ধন। তাতে একজন মানুষকেই আসক্তির দ্বারা ঘিরে নিবিড় স্বাতন্ত্র্যে অতিকৃত করে। প্রকৃতি রঙিন মদ ঢেলে দেয় দেহের পাত্রে, তাতে যে মাৎলামি তীব্র হয়ে ওঠে তাকে অপ্রমত্ত সত্যবোধের চেয়ে বেশি সত্য বলে ভুল হয়। খাঁচাকেও পাখি ভালোবাসে যদি তাকে আফিমের নেশায় বশ করা যায়। সংসারের যত দুঃখ, যত বিরোধ, যত বিকৃতি সেই মায়া নিয়ে যাতে

শিকলকে করে লোভনীয়। কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যে চিনতে যদি চাও তবে বিচার করে দেখো কোন্‌টাতে ছাড়া দেয় আর কোন্‌টা রাখে বেঁধে। প্রেমে মুক্তি, ভালোবাসায় বন্ধন।

ক্ষিতীশ। শুনলেম চিঠি, তার পরে?

বাঁশরি। তার পরে তোমার মাথা! অর্থাৎ তোমার কল্পনা। মনে মনে শুনতে পাচ্ছ না? শিষ্যকে বলছেন, ভালোবাসা আমাকে নয়, অন্য কাউকেও নয়। নির্বিশেষ প্রেম, নির্বিকার আনন্দ, নিরাসক্ত আত্মনিবেদন, এই হল দীক্ষামন্ত্র।

ক্ষিতীশ। তা হলে এর মধ্যে সোমশংকর আসে কোথা থেকে।

বাঁশরি। প্রেমের সরকারী রাস্তায়, যে প্রেমে সকলেরই সমান অধিকার খোলা হাওয়ার মতো। তুমি লেখকপ্রবর, তোমার সামনে সমস্যাটা এই যে, খোলা হাওয়ায় সোমশংকরের পেট ভরবে কি।

ক্ষিতীশ। কী জানি। সূচনায় তো দেখতে পাচ্ছি শূন্যপুরাণের পালা।

বাঁশরি। কিন্তু, শূন্যে এসে কি ঠেকতে পারে কিছু। শেষ-মোকামে তো পৌঁছল গাড়ি, এ-পর্যন্ত রথ চালিয়ে এলেন সন্ন্যাসীসারথি। আড্ডা-বদলের সময় যখন একদিন আসবে তখন লাগাম পড়বে কার হাতে। সেই কথাটা বলো না রিয়লিস্‌ট্‌!

ক্ষিতীশ। যাকে ওঁরা নাক সিটকে প্রকৃতি বলেন, সেই মায়াবিনীর হাতে। পাখা নেই অথচ আকাশে উড়তে চায় যে স্থূল জীবটা তাকে যিনি ধপ্‌ করে মাটিতে ফেলে চট্‌কা দেন ভাঙিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে সর্বাঙ্গে লাগিয়ে দেন ধুলো।

বাঁশরি। প্রকৃতির সেই বিদ্রূপটাকেই বর্ণনা করতে হবে তোমাকে। ভবিতব্যের চেহারাটা জোর কলমে দেখিয়ে দাও। বড়ো নিষ্ঠুর। সীতা ভাবলেন, দেবচরিত্র রামচন্দ্র উদ্ধার করবেন রাবণের হাত থেকে ; শেষকালে মানবপ্রকৃতি রামচন্দ্র চাইলেন তাঁকে আগুনে পোড়াতে। একেই বলে রিয়ালিজ্‌ম্‌, নোঙরামিকে নয়। লেখো লেখো, দেরি কোরো না, লেখো এমন ভাষায় যা হৃৎপিণ্ডের শিরাছেঁড়া ভাষা। পাঠকেরা চমকে উঠে দেখুক, এতদিন পরে বাংলার দুর্বল সাহিত্যে এমন একটা লেখা ফেটে বেরোল যা ঝোড়ো মেঘের বুকভাঙা সূর্যাস্তের রাগী আলোর মতো।

ক্ষিতীশ। ইস্‌, তোমার মনটা নেমেছে ভল্‌ক্যানোর জঠরাগ্নির মধ্যে। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ওদের অবস্থায় পড়লে কী করতে তুমি।

বাঁশরি। সন্ন্যাসীর উপদেশ সোনার জলে বাঁধানো খাতায় লিখে রাখতুম। তার পরে প্রবৃত্তির জোর কলমে তার প্রত্যেক অক্ষরের উপর দিতুম কালির আঁচড় কেটে। প্রকৃতি জাদু লাগায় আপন মন্ত্রে, সন্ন্যাসীও জাদু করতেই চায় উলটো মন্ত্রে।

ওর মধ্যে একটা মন্ত্র নিতুম মাথায়, আর-একটা মন্ত্রে প্রতিদিন প্রতিবাদ করতুম হৃদয়ে।

ক্ষিতীশ। এখন কাজের কথা পাড়া যাক। ইতিহাসের গোড়ার দিকটায় ফাঁক রয়েছে। ওদের বিবাহসম্বন্ধ সন্ন্যাসী ঘটাল কী উপায়ে।

বাঁশরি। প্রথমত সেনবংশ যে ক্ষত্রিয়, সেনানী শব্দ থেকে তার পদবীর উদ্ভব, ওরা যে কোনো-এক খ্রীস্ট-শতাব্দীতে এসেছিল কোনো-এক দক্ষিণপ্রদেশ থেকে দিগ্‌বিজয়ীবাহিনীর পতাকা নিয়ে বাংলার কোনো-এক বিশেষ বিভাগে, সেইটে প্রমাণ করে লিখল এক সংস্কৃত পুঁথি। কাশীর দ্রাবিড়ী পণ্ডিত করলে তার সমর্থন। সন্ন্যাসী স্বয়ং গেল সোমশংকরদের রাজ্যে। প্রজারা হাঁ করে রইল ওর চেহারা দেখে; কানাকানি করতে লাগল, কোনো একটা দেব-অংশের ঝালাই দিয়ে এর দেহখানা তৈরি। সভাপণ্ডিত মুগ্ধ হল শৈবদর্শনব্যাখ্যায়। রাজাবাহাদুরের মনটা সাদা, দেহটা জোরালো, তাতে লাগল কিছু সন্ন্যাসীর মন্ত্র, কিছু লাগল প্রকৃতির মোহ। তার পরে এই যা দেখছ।

ক্ষিতীশ। হায় রে, সন্ন্যাসী কি আমাদের মতো অভাজনদের হয়ে স্থূল প্রকৃতির তরফে ঘটকালি করেন না।

বাঁশরি। রাখো তোমার ছিবলেমি। ভুল করেছি তোমাকে নিয়ে। যে মানুষ খাঁটি লিখিয়ে তার সামনে যখন দেখা দিয়েছে সৃষ্টিকল্পনার এমন একটা জীবন্ত আদর্শ দব্‌ দব্‌ করছে যার নাড়ি, তার মুখ দিয়ে কি বেরোয় খেলো কথা। কেমন করে জাগাব তোমাকে। আমি যে প্রত্যক্ষ দেখছি একটা মহারচনার পূর্বরাগ, শুনছি তার অন্তহীন নীরস কান্না। দেখতে পাচ্ছ না অদৃষ্টের একটা নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ? থাক্ গে, শেষ হল আমার কথা। তোমার খাবার পাঠিয়ে দিতে চললুম। [প্রস্থানোদ্যম

ক্ষিতীশ। (ছুটে গিয়ে হাত চেপে ধরে) চাই নে খাবার। যেয়ো না তুমি।

বাঁশরি। (হাত ছিনিয়ে নিয়ে উচ্চহাস্যে) তোমার 'বেমানান' গল্পের নায়িকা পেয়েছ আমাকে! আমি ভয়ংকর সত্যি।

ড্রেসিং-গাউন-পরা সতীশের প্রবেশ

সতীশ। উচ্চহাসির আওয়াজ শুনলুম যে।

বাঁশরি। উনি এতক্ষণ স্টেজের মুন্নুবাবুর নকল করছিলেন।

সতীশ। ক্ষিতীশবাবুর নকল আসে নাকি।

বাঁশরি। আসে বইকি, ওঁর লেখা পড়লেই টের পাওয়া যায়। তুমি এঁর কাছে একটু বোসো, আমি ওঁর জন্য খাবার পাঠিয়ে দিইগে।

ক্ষিতীশ। দরকার নেই, কাজ আছে, দেরি করতে পারব না। [প্রস্থান

বাঁশরি। মনে থাকে যেন আজ বিকেলে সিনেমা— তোমারই 'পদ্মাবতী'।

ক্ষিতীশ। (নেপথ্য হতে) সময় হবে না।

বাঁশরি। হবেই সময়, অন্য দিনের চেয়ে দু-ঘণ্টা আগে।

সতীশ। আচ্ছা বাঁশি, ঐ ক্ষিতীশের মধ্যে কি দেখতে পাও বলো তো।

বাঁশরি। বিধাতা ওকে যে পরীক্ষার কাগজটা দিয়েছিলেন, দেখতে পাই তার উত্তরটা। আর দেখি তারই মাঝখানে পরীক্ষকের একটা মস্ত কাটা দাগ।

সতীশ। এমন ফেল-করা জিনিস নিয়ে করবে কি।

বাঁশরি। ডান হাত ধরে ওকে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করে দেব।

সতীশ। তার পরে বাঁ হাত দিয়ে প্রাইজ দেবার প্ল্যান আছে নাকি।

বাঁশরি। দিলে পরের ছেলের প্রতি নিষ্ঠুরতা করা হবে।

সতীশ। ঘরের ছেলের প্রতিও। এ দিকে ও মহলের হাল খবরটা শুনেছ ?

বাঁশরি। ও মহলের খবর এ মহলে এসে পৌঁছয় না। হাওয়া বইছে উলটো দিকে।

সতীশ। কথা ছিল সুষমার বিয়ে হবে মাস খানেক বাদে, সম্প্রতি স্থির হয়েছে আসছে হপ্তায়।

বাঁশরি। হঠাৎ দম এত দ্রুতবেগে চড়িয়ে দিলে যে ?

সতীশ। ওদের হৃৎপিণ্ড কেঁপে উঠেছে দ্রুতবেগে, হঠাৎ দেখেছে তোমাকে রণরঙ্গিনী বেশে। তোমার তীর ছোটার আগেই ছুটে বেরিয়ে পড়তে চায়— এইরকম আন্দাজ।

বাঁশরি। আমার তীর ! আধমরা প্রাণীকে আমি ছুঁই নে। বনমালী, মোটর ডাকো। [বাঁশরির প্রস্থান

শৈলর প্রবেশ

বয়স বাইশ কিন্তু দেখে মনে হয়, ষোল থেকে আঠারোর মধ্যে। তনু দেহ শ্যামবর্ণ, চোখের ভাব স্নিগ্ধ, মুখের ভাব মমতায় ভরা।

সতীশ। কী আশ্চর্য। ভোরের স্বপ্নে আজ তোমাকেই দেখেছি, শৈল। তুমিও আমাকে দেখেছ নিশ্চয়।

শৈল। না, দেখি নি তো।

সতীশ। আঃ, বানিয়ে বলো-না কেন। বড়ো নিষ্ঠুর তুমি। আমার দিনটা মধুর হয়ে উঠত তা হলে।

শৈল। তোমাদের ফরমাশে নিজেকে স্বপ্ন করে বানাতে হবে! আমরা যা, শুধু তাই নিয়ে তোমাদের মন খুশি হয় না কেন।

সতীশ। খুব হয়, এই-যে সাক্ষাৎ এসেছ এর চেয়ে আর কিসের দরকার।

শৈল। আমি এসেছি বাঁশরির কাছে।

সতীশ। ঐ দেখো, আবার একটা সত্য কথা। সদ্য বিছানা থেকে উঠেই দু-দুটো খাঁটি সত্য কথা সহ্য করি এত মনের জোর নেই। ধর্মরাজ মাপ করতেন তোমাকে যদি বলতে আমারই জন্য এসেছ।

শৈল। ব্যারিস্টার মানুষ, তুমি বড্ড লিটরল। বাঁশরির কাছে আসতে চেয়েছি বলে তোমার কাছে আসবার কথা মনে ছিল না এটা ধরে নিলে কেন।

সতীশ। খোঁটা দেবার জন্যে। বাঁশির সঙ্গে কথা আছে কিছু? আমাদের লগ্ন স্থির করবার পরামর্শ?

শৈল। না, কোনো কথা নেই। ওর জন্য বড়ো মন খারাপ হয়ে থাকে। মনের মধ্যে মরণবাণ বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে অথচ কবুল করবার মেয়ে নয়। ওর ব্যথায় হাত বুলোতে গেলে ফোঁস করে ওঠে, সেটা যেন সাপের মাথার মণি। তাই সময় পেলে কাছে এসে বসি, যা তা বকে যাই। পরশুদিন সকালে এসেছিলুম ওর ঘরে। পায়ের শব্দ পায় নি। ওর সামনে এক বাণ্ডিল চিঠি। ডেস্কে ঝুঁকে পড়ছিল বসে, বেশ বুঝতে পারলুম চোখ দিয়ে জল পড়ছে। যদি জানত আমি দেখতে পেয়েছি তা হলে একটা কাণ্ড বাধত, বোধ হয় আমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যেত। আস্তে আস্তে চলে গেলুম। কিন্তু, সেই ছবি আমি ভুলতে পারি নে। বাঁশি গেল কোথায়।

খানসামা চায়ের সরঞ্জাম রেখে গেল

সতীশ। বাঁশি এইমাত্র বেরিয়ে গেছে, ভাগ্যিস গেছে।

শৈল। ভারি স্বার্থপর তুমি।

সতীশ। অত্যন্ত। ও কী, উঠছ কেন। চা তৈরি শুরু করো।

শৈল। খেয়ে এসেছি।

সতীশ। তা হোক-না, আমি তো খাই নি। বসে খাওয়াও আমাকে। কবিরাজী মতে একলা চা খাওয়া নিষেধ, ওতে বায়ু প্রকুপিত হয়ে ওঠে।

শৈল। মিথ্যে আবদার কর কেন।

সতীশ। সুযোগ পেলেই করি, তোমার মতো খাঁটি সত্য আমার ধাতে নেই। ঢালো চা, ও কী করলে, চায়ে আমি চিনি দিই নে তুমি জান।

শৈল। ভুলে গিয়েছিলুম।

সতীশ। আমি হলে কখনো ভুলতুম না।

শৈল। আমাকে স্বপ্ন দেখে অবধি তোমার মেজাজের তো কোনো উন্নতি হয় নি। ঝগড়া করছ কেন।

সতীশ। কারণ মিষ্টি কথা পাড়লে তুমিই ঝগড়া বাধাতে। সীরিয়স হয়ে উঠতে।

শৈল। আচ্ছা থামো, তোমার চা খাওয়া হল ?

সতীশ। হলেই যদি ওঠ তা হলে হয় নি।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। হরিশবাবু দলিলপত্র নিয়ে এসেছেন।

সতীশ। বলো ফুরসত নেই।

[ভৃত্যের প্রস্থান

শৈল। ও কী ও, কাজ কামাই করবে!

সতীশ। করব, আমার খুশি।

শৈল। আমি যে দায়ী হব।

সতীশ। তাতে সন্দেহ নেই, বিনা কারণে কেউ কাজ কামাই করে না।

নেপথ্য থেকে। সতীশদা!

সতীশ। ঐ রে! এল ওরা! বাড়িতে নেই বলবার সময় দিলে না।

সুধাংশুর সঙ্গে একদল লোকের প্রবেশ

অলক্ষুণের দল, সকালবেলায় মুখ দেখলুম, উনলের উপর হাঁড়ির তলা যাবে ফেটে।

সুধাংশু। মিস্ শৈল, ভীরু তোমার আশ্রয় নিয়েছে, কিন্তু আজ ছাড়ছি নে।

সতীশ। ভয় দেখাও কেন। চাও কী।

শচীন। চাই লক্ষ্মীছাড়া ক্লাবের চাঁদা। প্রথম দিন থেকেই বাকি।

সতীশ। কী। আমি তোমাদের দলে! ভিগরস প্রোটেস্ট্ জানাচ্ছি, বলবান অস্বীকৃতি।

নরেন। দলিল দেখাও।

সতীশ। আমার দলিল এই সামনে সশরীরে।

সুধাংশু। শৈলদেবী, এই বুঝি! বে-আইনি প্রশ্রয় দেন পলাতকাকে।

শৈল। কিছু প্রশ্রয় দিই নে, নিন-না আপনাদের দাবি আদায় করে।

সতীশ। শৈল, যত তোমার সত্য আমার বেলায়। আর, এদের সামনে সত্যের অপলাপ— প্রশ্রয় দেও না বলতে চাও!

শৈল। কী প্রশ্রয় দিয়েছি।

সতীশ। এইমাত্র মাথার দিব্যি দিয়ে আমাকে চা খাওয়াতে বস নি? শ্রীহস্তে অজীর্ণ রোগের পত্তন আরম্ভ, তবু আমাকে বলে লক্ষ্মীছাড়া!

শচীন। লোকটা লোভ দেখিয়ে কথা বলছে। শৈলদেবী, যদি শক্ত হয়ে থাকতে পার তা হলে ওকে আমাদের লাইফ-মেম্বর করে নিই।

সতীশ। আচ্ছা, তবে বলি শোনো। চাঁদা পাবা মাত্র যদি পাড়া ছেড়ে দৌড় মার তা হলে এখনই বাকি-বকেয়া সব শোধ করে দিই।

শচীন। শুধু চাঁদা নয়। আমাদের ঘরে নেই চা ঢেলে দেবার লোক, যাদের ঘরে আছে সেখানে পালা করে চা খেতে বেরোই— তার পরে কিছু ভিক্ষে নিয়ে যাই— আজ এসেছি বাঁশরিদেবীর করকমল লক্ষ্য করে।

সতীশ। সৌভাগ্যক্রমে সেই দেবী তার করকমলসুদ্ধ অনুপস্থিত। অতএব ঘড়ি ধরে ঠিক পাঁচ মিনিটের নোটিশ দিচ্ছি, বেরোও তোমরা— ভাগো।

শৈল। আহা, ও কী কথা। না খেয়ে যাবেন কেন। আমি বুঝি পারি নে খাওয়াতে? একটু বসুন, সব ঠিক করে দিচ্ছি।

[শৈলের প্রস্থান

সতীশ। কিন্তু, ঐ যে ভিক্ষার কথাটা বললে, ভালো ঠেকল না। উদ্দেশ্যও বুঝতে পারছি নে।

সুধাংশু। কিংখাবের দোকানে আমাদের সমবেত দেনা আছে, আজ সমবেত চেষ্টায় শোধ করতে হবে।

সতীশ। কিংখাব! ভাবী লক্ষ্মীর আসন-রচনা?

শচীন। ঠিক তাই।

সতীশ। আশ্চর্য দূরদর্শিতা—

শচীন। না হে, অদূরদর্শিতা প্রমাণ করে দেব অবিলম্বে।

শৈলের প্রবেশ

শৈল। সব প্রস্তুত, আসুন আপনারা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বারান্দায় সোমশংকর। গহনার বাক্স খুলে জহুরি গহনা দেখাচ্ছে। কাপড়ের গাঁঠরি নিয়ে অপেক্ষা করছে কাশ্মীরী দোকানদার।

বাঁশরি। কিছু বলবার আছে।

সোমশংকর জহুরি ও কাশ্মীরীকে ইঙ্গিতে বিদায় করলে।

সোমশংকর। ভেবেছিলুম আজই যাব তোমার কাছে।

বাঁশরি। ও-সব কথা থাক্। ভয় নেই, কান্নাকাটি করতে আসি নি। তবু আর কিছু না হোক তোমার ভাবনা ভাববার অধিকার একদিন দিয়েছ আমাকে। তাই একটা কথা জিজ্ঞাসা করি— জান সুষমা তোমাকে ভালোবাসে না ?

সোমশংকর। জানি।

বাঁশরি। তাতে তোমার কিছুই যায় আসে না ?

সোমশংকর। কিছুই না।

বাঁশরি। তা হলে সংসারযাত্রাটা কিরকম হবে।

সোমশংকর। সংসারযাত্রার কথা ভাবছিই নে।

বাঁশরি। তবে কিসের কথা ভাবছ।

সোমশংকর। একমাত্র সুষমার কথা।

বাঁশরি। অর্থাৎ ভাবছ, তোমাকে ভালো না বেসেও কী করে সুখী হবে ঐ মেয়ে।

সোমশংকর। না, তা নয়। সুখী হবার কথা সুষমা ভাবে না— ভালোবাসারও দরকার নেই তার।

বাঁশরি। কিসের দরকার আছে তার, টাকার ?

সোমশংকর। তোমার যোগ্য কথা হল না, বাঁশি।

বাঁশরি। আচ্ছা, ভুল করেছি। কিন্তু, প্রশ্নটার উত্তর বাকি। কিসের দরকার আছে সুষমার।

সোমশংকর। ওর একটি ব্রত আছে। ওর জীবনে সমস্ত দরকার তাই নিয়ে, তাকে সাধ্যমত সার্থক করা আমারও ব্রত।

বাঁশরি। ওর ব্রত আগে, তারই পশ্চাতে তোমার— পুরুষের মতো শোনাচ্ছে না, এ কথা ক্ষত্রিয়ের মতো নয়ই। এতবড়ো পুরুষকে মন্ত্র পড়িয়েছে ঐ সন্ন্যাসী। বুদ্ধিকে দিয়েছে ঘোলা করে, দৃষ্টিকে দিয়েছে চাপা। শুনলুম সব, ভালো হল। গেল আমার

শ্রদ্ধা ভেঙে, গেল আমার বন্ধন ছিঁড়ে। বয়স্ক শিশুকে মানুষ করবার কাজ আমার নয়, সে-কাজের ভার সম্পূর্ণ দিলেম ছেড়ে ঐ মেয়ের হাতে।

পুরন্দরের প্রবেশ

সোমশংকর প্রণাম করলে, অগ্নিশিখার মতো বাঁশরি উঠে দাঁড়াল তার সামনে।

বাঁশরি। আজ রাগ করবেন না; ধৈর্য ধরবেন, কিছু প্রশ্ন করব।

[পুরন্দরের ইঙ্গিতে সোমশংকরের প্রস্থান

পুরন্দর। আচ্ছা, বলো তুমি।

বাঁশরি। জিজ্ঞাসা করি, সোমশংকরকে শ্রদ্ধা করেন আপনি? ওকে খেলার পুতুল বলে মনে করেন না?

পুরন্দর। বিশেষ শ্রদ্ধা করি।

বাঁশরি। তবে কেন এমন মেয়ের ভার দিচ্ছেন ওর হাতে যে ওকে ভালোবাসে না।

পুরন্দর। জান না এ অতি মহৎ ভার, একই কালে ক্ষত্রিয়ের পুরস্কার এবং পরীক্ষা। সোমশংকরই এই ভার গ্রহণ করবার যোগ্য।

বাঁশরি। যোগ্য বলেই ওর চিরজীবনের সুখ নষ্ট করতে চান আপনি?

পুরন্দর। সুখকে উপেক্ষা করতে পারে ঐ বীর মনের আনন্দে।

বাঁশরি। আপনি মানবপ্রকৃতিকে মানেন না?

পুরন্দর। মানবপ্রকৃতিকেই মানি, তার চেয়ে নীচের প্রকৃতিকে নয়।

বাঁশরি। এতই যদি হল, ওরা বিয়ে নাই করত?

পুরন্দর। ব্রতকে নিষ্কামভাবে পোষণ করবে মেয়ে, ব্রতকে নিষ্কামভাবে প্রয়োগ করবে পুরুষ, এই কথা মনে করে দুটি মেয়ে-পুরুষ অনেকদিন খুঁজেছি। দৈবাৎ পেয়েছি।

বাঁশরি। পুরুষ বলেই বুঝতে পারছ না যে, ভালোবাসা নইলে দুজন মানুষকে মেলানো যায় না।

পুরন্দর। মেয়ে বলেই বুঝতে ইচ্ছা করছ না, ভালোবাসার মিলনে মোহ আছে, প্রেমের মিলনে মোহ নেই।

বাঁশরি। মোহ চাই, চাই সন্ন্যাসী, মোহ নইলে সৃষ্টি কিসের। তোমার মোহ তোমার ব্রত নিয়ে— সেই ব্রতের টানে তুমি মানুষের মনগুলো নিয়ে কেটে ছিঁড়ে

জোড়াতাড়া দিতে বসেছ— বুঝতেই পারছ না তারা সজীব পদার্থ, তোমার প্ল্যানের মধ্যে খাপ-খাওয়াবার জন্য তৈরি হয় নি। আমাদের মোহ সুন্দর, আর-ভয়ংকর তোমাদের মোহ।

পুরন্দর। মোহ নইলে সৃষ্টি হয় না, মোহ ভাঙলে প্রলয়, এ কথা মানতে রাজি আছি। কিন্তু, তুমিও এ কথা মনে রেখো, আমার সৃষ্টি তোমার সৃষ্টির চেয়ে অনেক উপরে। তাই আমি নির্মম হয়ে তোমার সুখ দেব ছারখার করে। আমিও চাইব না সুখ; যারা আসবে আমার কাছে সুখের দিক থেকে, মুখ দেব ফিরিয়ে। আমার ব্রতই আমার সৃষ্টি, তার যা প্রাপ্য তা তাকে দিতেই হবে। যতই কঠিন হোক।

বাঁশরি। সেইজন্যেই সজীব নয় তোমার আইডিয়া, সন্ন্যাসী। তুমি জান মন্ত্র, জান না মানুষকে। মানুষের মর্মগ্রন্থি টেনে ছিঁড়ে সেইখানে তোমার কেঠো আইডিয়ার ব্যাণ্ডেজ বেঁধে অসহ্য ব্যথার 'পরে মস্ত মস্ত বিশেষণ চাপা দিতে চাও। তাকে বল শান্তি? টিঁকবে না ব্যাণ্ডেজ্, ব্যথা যাবে থেকে। তোমরা সব অমানুষ, মানুষের বসতিতে এলে কী করতে। যাও-না তোমাদের গুহাগহ্বরে বদরিকাশ্রমে। সেখানে মনের সাধে নিজেদের শুকিয়ে পাথর করে ফেলো। আমরা সামান্য মানুষ, আমাদের তৃষ্ণার জল মুখের থেকে কেড়ে নিয়ে মরুভূমিতে ছড়িয়ে দিয়ে তাকে সাধনা বলে প্রচার করতে চাও কোন্ করুণায়। ব্যর্থজীবনের অভিশাপ লাগবে না তোমাকে? যা নিজে ভোগ করতে জান না তা ভোগ করতে দেবে না ক্ষুধিতকে?

সুষমার প্রবেশ

এই-যে সুষমা, শোন্ বলি। মরিয়া হয়ে মেয়েরা চিতার আগুনে মরেছে অনেক, ভেবেছে তাতেই পরমার্থ। তেমনি করেই নিজের হাতে নিজের ভাগ্যে আগুন লাগিয়ে দিনে দিনে মরতে চাস জ্বলে জ্বলে? চাস নে তুই ভালোবাসা, কিন্তু যে-মেয়ে চায়, পাষাণ সে করে নি আপন নারীর প্রাণ, কেন কেড়ে নিতে এলি তার চিরজীবনের আনন্দ। এই আমি আজ বলে দিলুম তোকে, ঘোড়ায় চড়িস, শিকার করিস, সন্ন্যাসীর কাছে মন্ত্র নিস, তবু তুই পুরুষ নোস— আইডিয়ার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে তোর দিন কাটবে না গো, তোর রাত বিছিয়ে দেবে কাঁটার শয়ন।

সোমশংকরের প্রবেশ

সোমশংকর। বাঁশি, শান্ত হও, চলো এখান থেকে।

বাঁশরি। যাব না তো কী। মনে কোরো না মরব বুক ফেটে। জীবন হবে

চিরচিতানলের শ্মশান। কখনও এমন বিচলিত দশা হয় নি আমার। আজ কেন এল বন্যার মতো এই পাগলামি। লজ্জা! লজ্জা! লজ্জা! তোমাদের তিনজনের সামনে এই অপমান! থামো সোমশংকর, আমাকে দয়া করতে এসো না। মুছে ফেলব এই অপমান, কোনো চিহ্ন থাকবে না এর কাল। এই আমি বলে গেলুম।

[বাঁশরি ও সুষমার প্রস্থান

পুরন্দর। সোমশংকর, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

সোমশংকর। বলুন।

পুরন্দর। যে-ব্রত তুমি স্বীকার করেছ তা সম্পূর্ণই তোমার আপন হয়েছে কি। তার ক্রিয়া চলেছে তোমার প্রাণপ্রিয়ার সঙ্গে?

সোমশংকর। কেন সন্দেহ বোধ করছেন।

পুরন্দর। আমার প্রতি ভক্তিতেই যদি এই সংকল্প গ্রহণ করে থাক তবে এখনই ফেলে দাও এই বোঝা।

সোমশংকর। এমন কথা কেন বলছেন আজ। আমার মধ্যে দুর্বলতার লক্ষণ কিছু দেখছেন কি।

পুরন্দর। মোহিনী শক্তি আছে আমার, এমন কথা কেউ কেউ বলে— শুনে লজ্জা পাই; জাদুকর নই আমি।

সোমশংকর। আত্মার ক্রিয়াকে যারা বিশ্বাস করে না তারা তাকে বলে জাদুর ক্রিয়া।

পুরন্দর। ব্রতের মাহাত্ম্য তার স্বাধীনতায়। যদি ভুলিয়ে থাকি তোমাকে, সে-ভুল ভাঙতে হবে। গুরুবাক্য বিষ— সে-বাক্য যদি তোমার নিজের বাক্য না হয়।

সোমশংকর। সন্ন্যাসী, যে-ব্রত নিয়েছি সে আজ আমার রক্তে বইছে তেজরূপে, জ্বলছে বুকের মধ্যে হোমাগ্নির মতো। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি, আজ আমার দ্বিধা কোথায়।

পুরন্দর। এই কথাই শুনতে চেয়েছিলুম তোমার মুখ থেকে। আর-একটি কথা বাকি আছে। কেউ কেউ প্রশ্ন করে, কেন সুষমার বিবাহ দিলুম তোমার সঙ্গে। তোমারই কাছ থেকে আমি তার উত্তর চাই।

সোমশংকর। এতদিনের তপস্যায় এই নারীর চিত্তকে তুমি যজ্ঞের অগ্নিশিখার মতো ঊর্ধ্বে জ্বালিয়ে তুলেছ, আমারই 'পরে ভার দিলে এই অনির্বাণ অগ্নিকে চিরদিন রক্ষা করতে।

পুরন্দর। বৎস, যতদিন রক্ষা করবে তার দ্বারা তুমি আপনাকেই রক্ষা করতে

পারবে। ঐ তোমার মূর্তিমান ধর্ম, রইল তোমার সঙ্গে— ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতম্। আমার বন্ধন থেকে তুমি মুক্ত, সেই সঙ্গে শিষ্যের বন্ধন থেকে আমিও মুক্তি পেলুম। তোমাদের বিবাহের পর আমাকে যেতে হবে দূরে— হয়তো কোনোদিন আমার আর দেখা পাবে না। আমার এই আশীর্বাদ রইল, জানথ আত্মানম্— আপনাকে পূর্ণ করে জানো।

[পুরন্দরের প্রস্থান। সোমশংকর অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল

সোমশংকর। ওরে ভোলা, সেই নতুন গানটা—

গান

ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো।
একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই পথের আলো।
দুন্দুভিতে হল রে কার আঘাত শুরু,
বুকের মধ্যে উঠল বেজে গুরু গুরু,
পালায় ছুটে সুপ্তিরাতের স্বপ্নে-দেখা মন্দ ভালো।
নিরুদ্দেশের পথিক, আমায় ডাক দিলে কি—
দেখতে তোমায় না যদি পাই নাই-বা দেখি।
ভিতর থেকে ঘুচিয়ে দিলে চাওয়া পাওয়া,
ভাবনাতে মোর লাগিয়ে দিলে ঝড়ের হাওয়া,
বজ্রশিখায় এক পলকে মিলিয়ে দিলে সাদা কালো॥

নেপথ্য থেকে। যেতে পারি কি।

সোমশংকর। এসো এসো।

তারকের প্রবেশ

তারক। রাজাবাহাদুর, আজকাল তোমার কাছে আসতে কিরকম ভয়-ভয় করে।

সোমশংকর। কোনো কারণ তো দেখি নে।

তারক। কারণ নেই বলেই তো ভয় বেশি। আজ বাদে কাল বিয়ে কিন্তু মনে হচ্ছে যেন দ্বীপান্তরে চলেছ। ভয়ানক গাম্ভীর্য।

সোমশংকর। বিয়েটা তো এক লোক থেকে অন্য লোকে যাত্রাই বটে।

তারক। সব বিয়ে তা নয় রাজন্। নিজের কথা বলতে পারি। আমার বরযাত্রা হয়েছিল পটলডাঙা থেকে চোরবাগানে। মনের ভিতরটাও তার বেশি এগোয় নি।

আমার স্ত্রীর নাম পুষ্প। রসিকবন্ধু তার কবিতায় আমাকে খেতাব দিলে পুষ্পচোর। কবিতাটার হেডিং ছিল চৌর-পঞ্চাশিকা। কবিকে প্রশ্ন করলেম, চৌর-পঞ্চাশিকার একটা কবিতাই তো দেখছি, বাকি উনপঞ্চাশটা গেল কোথায়। উত্তর পেলেম, তারা উনপঞ্চাশ পবনরূপে বরের হৃদয়গহ্বরে বেড়াচ্ছে ঘুরপাক দিয়ে।

সোমশংকর। এর থেকে প্রমাণ হয় আমার রসিকবন্ধু নেই, তাই গাম্ভীর্য রয়েছে ঘনিয়ে।

তারক। আমাদের পাড়ার লক্ষ্মীছাড়ার দল অশোক গুপ্তদের বাগানে দর্মা-ঘেরা একটা পোড়ো ফর্নরিতে ক্লাব করেছে। আপিস থেকে ফিরে এসে সেইখানে সন্ধে-বেলায় বিষম হল্লা করতে থাকে। সান্ত্বনা দেবার জন্যে আমরা লক্ষ্মীমন্তরা ওদের নিমন্ত্রণ করছি। তোমাকে প্রিজাইড করতে হবে।

সোমশংকর। শুনেছি বৈকুণ্ঠলুণ্ঠন পাঁচালি লিখে ওরা আমাকে লক্ষ্মীহারী দৈত্য বানিয়েছে।

তারক। সে কথা সত্যি। ওদের টেম্পেরেচর কমানো দরকার হয়েছে।

সোমশংকর। বৈধ উপায়ে ওদের ঠাণ্ডা করতে রাজি আছি।

তারক। আমাদের কমলবিলাস সেনগুপ্তকে দিয়ে একটা নিমন্ত্রণপত্র রচিয়ে নিয়ে এলুম।

সোমশংকর। পড়ে শোনাও।

তারক। প্রজাপতি যাঁদের সাথে পাতিয়ে আছেন সখ্য,
আর যাঁরা সব প্রজাপতির ভবিষ্যতের লক্ষ্য,
উদরসেবার উদার ক্ষেত্রে মিলুন উভয় পক্ষ,
রসনাতে রসিয়ে উঠুক নানা রসের ভক্ষ্য।
সত্যযুগে দেবদেবীদের ডেকেছিলেন দক্ষ,
অনাহূত পড়ল এসে মেলাই যক্ষ রক্ষ,
আমরা সে-ভুল করব না তো, মোদের অন্নকক্ষ
দুই পক্ষেই অপক্ষপাত দেবে ক্ষুধার মোক্ষ।
আজও যাঁরা বাঁধন-ছাড়া ফুলিয়ে বেড়ান বক্ষ
বিদায়কালে দেব তাঁদের আশিস্ লক্ষ লক্ষ,
তাঁদের ভাগ্যে অবিলম্বে জুটুন কারাধ্যক্ষ,
এর পরে আর মিল মেলে না— য র ল ব হ ক্ষ।

ঐ আসছে ওদের দল।

সুধাংশু শচীন প্রভৃতির প্রবেশ

সোমশংকর। কী উদ্দেশ্যে আগমন।

সুধাংশু। গান শোনাব।

সোমশংকর। তার পরে ?

সুধাংশু। তার পরে নোব্‌ল্‌ রিভেঞ্জ্‌, সুমহতী প্রতিহিংসা।

সোমশংকর। ঐ মানুষটার কাঁধে ওটা কী। বোমা নয় ?

সুধাংশু। ক্রমশ প্রকাশ্য। এখন গান।

সোমশংকর। কার রচনা।

শচীন। কপিরাইটের তর্ক আছে। বিষয় অনুসারে কপিরাইট-স্বত্ব আমাদেরই, বাক্যগুলি যার তাকে আমরা গণ্য করি নে।

গান

আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল
ভবের পদ্মপত্রে জল
সদাই করছি টলোমল,
মোদের আসাযাওয়া শূন্য হাওয়া,
নাইকো ফলাফল।
নাহি জানি করণকারণ, নাহি জানি ধরনধারণ
নাহি মানি শাসন বারণ গো—
আমরা আপন রোখে মনের ঝোঁকে ছিঁড়েছি শিকল।
লক্ষ্মী তোমার বাহনগুলি ধনে পুত্রে উঠুন ফুলি,
লুটুন তোমার চরণধূলি গো—
আমরা স্কন্ধে লয়ে কাঁথা ঝুলি ফিরব ধরাতল।
তোমার বন্দরেতে বাঁধাঘাটে বোঝাই-করা সোনার পাটে
অনেক রত্ন অনেক হাটে গো,
আমরা নোঙরছেঁড়া ভাঙা তরী ভেসেছি কেবল।
আমরা এবার খুঁজে দেখি অকূলেতে কূল মেলে কি,
দ্বীপ আছে কি ভবসাগরে—
যদি সুখ না জোটে দেখব ডুবে কোথায় রসাতল।

আমরা জুটে সারাবেলা করব হতভাগার মেলা,
গাব গান করব খেলা গো,
কণ্ঠে যদি সুর না আসে করব কোলাহল ॥

সোমশংকর। এবার কিঞ্চিৎ ফলাহারের আয়োজন করি।

সুধাংশু। আগে দেবী আসুন ঘরে, তার পরে ফল কামনা করব।

সোমশংকর। তৎপূর্বে—

সুধাংশু। তৎপূর্বে সুমহতী প্রতিহিংসা। (গাঁঠরি থেকে কিংখাবের আসন বেরল) লক্ষ্মীর সঙ্গে তাঁর ভক্তদের যোগ থাকবে এই আসনটিতে। তোমাদের ঘরের মাটি রইল তোমাদের, তার উপরে আসনটা রইল আমাদেরই। আর তাঁর কমলাসন, সে আছে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে।

সোমশংকর। কী তোমাদের বলব। বলবার কথা আমি জানি নে।

—

তৃতীয় অঙ্ক

শেষ দৃশ্য

বাঁশরিদের বাড়ি। সতীশ ডেস্কে বসে লিখছে
সুষমার ছোটো বোন সুষীমার প্রবেশ

সতীশ। আমার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ পাকা করতে এসেছিস? বরের মুখ-দেখা বুঝি আজ?

সুষীমা। যাও!

সতীশ। যাও কী। বেশিদিনের কথা নয়, তোর বয়স যখন পাঁচ, মাকে জিজ্ঞাসা করিস, আমাকে বিয়ে করতে তোর কী জেদ ছিল। আমি তোকে সোনার বালা গড়িয়ে দিয়েছিলুম, সেটা ভেঙে ব্রোচ তৈরি হয়েছে।

সুষীমা। সতীশদা, কী বকছ তুমি।

সতীশ। আচ্ছা থাক্ তবে, কী জন্যে এসেছিস।

সুষীমা। দিদির বিয়েতে প্রেজেন্ট্ দেব।

সতীশ। সে তো ভালো কথা। কী দিতে চাস।

সুষীমা। এই চামড়ার থলিটা।

সতীশ। ভালো জিনিস, আমারই লোভ হচ্ছে।

সুষীমা। আমি এসেছি বাঁশিদিদির কাছে।

সতীশ। ওখান থেকে কেউ তোকে পাঠিয়ে দিয়েছে ?

সুষীমা। না, লুকিয়ে এসেছি, কেউ জানে না। আমার এই থলির উপরে বাঁশিদিদিকে দিয়ে আঁকিয়ে নেব।

সতীশ। বাঁশিদিদি আঁকতে পারে কে বললে তোকে।

সুষীমা। শংকরদাদা। তাঁর কাছে একটা সিগারেট-কেস আছে সেটা বাঁশিদিদির দেওয়া। তার উপরে একজোড়া পায়রা এঁকেছেন নিজের হাতে। চমৎকার!

সতীশ। আচ্ছা, তোর বাঁশিদিদিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[প্রস্থান

বাঁশরির প্রবেশ

বাঁশরি। কী সুষী।

সুষীমা। তোমাকে সতীশদাদা সব বলেছেন ?

বাঁশরি। হাঁ বলেছেন। ছবি এঁকে দেব তোর থলির উপর ? কী ছবি আঁকব।

সুষীমা। একজোড়া পায়রা, ঠিক যেমন এঁকেছ শংকরদাদার সিগারেট-কেসের উপরে।

বাঁশরি। ঠিক তেমনি করেই দেব। কিন্তু কাউকে বলিস নে যে আমি এঁকে দিয়েছি।

সুষীমা। কাউকে না।

বাঁশরি। তোকেও একটা কাজ করতে হবে, নইলে আমি আঁকব না।

সুষীমা। বলো কী করতে হবে।

বাঁশরি। সেই সিগারেট-কেসটা আমাকে এনে দিতে হবে।

সুষীমা। তাঁর বুকের পকেটে থাকে। কক্ষনো আমাকে দেবেন না।

বাঁশরি। আমার নাম করে বলিস দিতেই হবে।

সুষীমা। তুমি তাঁকে দিয়েছ আবার ফিরিয়ে নেবে কী করে।

বাঁশরি। তোমার শংকরদাদাও দেওয়া জিনিস ফিরিয়ে নেন।

সুষীমা। কক্ষনো না।

বাঁশরি। আচ্ছা, তাঁকে জিজ্ঞাসা করিস আমার নাম ক'রে।

সুষীমা। আচ্ছা করব। আমি যাই, কিন্তু ভুলো না আমার কথা।

বাঁশরি। তুইও ভুলিস না আমার কথা, আর নিয়ে যা এক বাক্স চকোলেট, কাউকে বলিস নে আমি দিয়েছি।

সুষীমা। কেন।

বাঁশরি। মা জানতে পারলে রাগ করবেন।

সুষীমা। কেন।

বাঁশরি। যদি তোর অসুখ করে।

সুষীমা। বলব না, কিন্তু খেতে দেব শংকরদাদাকেও।

[সুষীমার প্রস্থান

একখানা খাতা হাতে নিয়ে বাঁশরি সোফায় হেলান দিয়ে বসল

লীলার প্রবেশ

বাঁশরি। দেখ্ লীলা, মুখ গম্ভীর করে আসিস নে ভাই, তা হলে ঝগড়া হয়ে যাবে। মনে হচ্ছে সান্ত্বনা দেবার কুমতলব আছে, বাদল নামল বলে। দুঃখ আমার সয়, সান্ত্বনা আমার সয় না, সে তোদের জানা। বসেছিলেম গ্রামোফোনে কমিক গান বাজাতে কিন্তু তার চেয়ে কমিক জিনিস নিয়ে পড়েছি।

লীলা। কী বলো তো বাঁশি।

বাঁশরি। ক্ষিতীশের এই গল্পখানা।

লীলা। (খাতাটা তুলে নিয়ে) 'ভালোবাসার নিলাম'— নামটা চলবে বাজারে।

বাঁশরি। বস্তুটাও। এ জিনিসের কাটতি আছে। পড়তে চাস?

লীলা। না ভাই, সময় নেই, বিয়েবাড়ি সাজাবার জন্যে ডাক পড়েছে।

বাঁশরি। আমি কি সাজাতে পারতুম না!

লীলা। আমার চেয়ে অনেক ভালো পারতিস।

বাঁশরি। ডাকতে সাহস হল না! ভীরু ওরা।

লীলা। তা নয়, লজ্জা হল, কী বলে তোকে ডাকবে।

বাঁশরি। না ডেকেই লজ্জা দিলে আমাকে। ভাবছে আমি অন্নজল ছেড়ে ঘরে দরজা দিয়ে কেঁদে মরছি। ওদের সঙ্গে যখন তোর দেখা হবে কথাপ্রসঙ্গে বলিস, 'বাঁশি বিছানায় শুয়ে কমিক গল্প পড়ছিল, পেট ফেটে যাচ্ছিল হেসে হেসে।' নিশ্চয় বলিস।

লীলা। নিশ্চয় বলব, গল্পের বিষয়টা কী বল্ দেখি।

বাঁশরি। হিরোর নাম শ্যার চন্দ্রশেখর। নায়িকা পঙ্কজা, ধনকুবেরের মন ভোলাতে লেগেছেন উঠেপড়ে। ওঠার চেয়ে পড়ার অংশটাই বেশি। সেণ্ট্‌-অ্যাণ্টনির টেম্‌টেশন ছবি দেখেছিস তো? দিনের পর দিন নূতন বেহায়াগিরি— তোর খুব-যে শুচিবাই তা নয়, তবু ক্ষণে ক্ষণে গঙ্গার ঘাটে দৌড় মারতে চাইতিস। দ্বিতীয় নম্বরের নায়িকা গলা ভেঙে মরছে পঙ্ককুণ্ডের ধারে দাঁড়িয়ে। অবশেষে একদিন পৌষ মাসের অর্ধরাতে খিড়কির ঘাটে— তুই ভাবছিস হতভাগিনী আত্মহত্যা করে বাঁচল— ক্ষিতীশের কল্পনাকে অবিচার করিস নে— নায়িকা জলের মধ্যে এক পৈঠে পর্যন্ত নেবেছিল। ঠাণ্ডা জলে ছ্যাঁক করে উঠল গা-টা। ছুটল গরম বিছানা লক্ষ্য করে। এইখানটাতে সাইকলজির তর্ক এই, শীত করল বলেই মরা মুলতুবি কিম্বা শীত করাতে আগুনের কথাটা মাথায় এল, অমনি ভাবল ওদের জ্বালিয়ে মারবে বেঁচে থেকে।

লীলা। কিছুতে বুঝতে পারি নে, এত লোক থাকতে ক্ষিতীশের উপর এত ভরসা রেখেছিস কী করে।

বাঁশরি। অবিচার করিস নে। ওর লেখবার শক্তি আছে। ও আমাদের ময়মনসিংহের বাগানের আম, জাত ভালো, কিন্তু যতই চেষ্টা করা গেল ভিতরে পোকা হতেই আছে। ঐ পোকা বাদ দিয়ে কাজে লাগানো হয়তো চলবে। ঐ বুঝি আসছে।

লীলা। আমি তবে চললুম।

বাঁশরি। একেবারে যাস নে। সন্ধেবেলাটা কোনোমতে কাটাতে হবে। কমিক গল্পটা তো শেষ হল।

লীলা। কমিক গল্পের এক্‌টিনি করতে হবে বুঝি আমাকেই? আচ্ছা, রইলুম পাশের ঘরে।

ক্ষিতীশের প্রবেশ

ক্ষিতীশ। কেমন লাগল। মেলোড্রামার খাদ মেশাই নি সিকি তোলাও। সেণ্টিমেণ্টালিটির তরল রস চায় যে-সব খুকিরা, তাদের পক্ষে নির্জলা একাদশী। একেবারে নিষ্ঠুর সত্য।

বাঁশরি। কেমন লাগল বুঝিয়ে দিচ্ছি (পাতাগুলি ছিঁড়ে ফেলল)।

ক্ষিতীশ। করলে কী। সর্বনাশ! এটা আমার সব লেখায় সেরা, নষ্ট করে ফেললে?

বাঁশরি। দলিলটা নষ্ট করে ফেললেই সেরা জিনিসের বালাই থাকে না। কৃতজ্ঞ হোয়ো আমার 'পরে।

ক্ষিতীশ। সাহিত্যে নিজে কিছু দেবার শক্তি নেই, অথচ সংকোচ নেই তাকে বঞ্চিত করতে। এর দাম দিতে হবে, কিছুতে ছাড়ব না।

বাঁশরি। কী দাম চাই।

ক্ষিতীশ। তোমাকে।

বাঁশরি। ক্ষতিপূরণ এত সস্তায়, সাহস আছে নিতে?

ক্ষিতীশ। আছে।

বাঁশরি। সেন্টিমেন্ট্ এক ফোঁটাও মিলবে না।

ক্ষিতীশ। আশাও করি নে।

বাঁশরি। নির্জলা একাদশী, নিষ্ঠুর সত্য।

ক্ষিতীশ। রাজি আছি।

বাঁশরি। আছ রাজি? বুঝেসুঝে বলছ? এ কমিক নভেল নয়, ভুল করলে প্রুফ-দেখা চলবে না, এডিশনও ফুরবে না মরার দিন পর্যন্ত।

ক্ষিতীশ। শিশু নই, এ কথা বুঝি।

বাঁশরি। না মশায়, কিচ্ছু বোঝ না, বুঝতে হবে দিনে দিনে পলে পলে, বুঝতে হবে হাড়ে হাড়ে মজ্জায় মজ্জায়।

ক্ষিতীশ। সেই হবে আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো অভিজ্ঞতা।

বাঁশরি। তবে বলি শোনো। অবোধের 'পরে মেয়েদের স্বাভাবিক স্নেহ। তোমার উপর কৃপা আছে আমার। তাই অবুঝের মতো নিজের সর্বনাশের যে-প্রস্তাবটা করলে তাতে সম্মতি দিতে দয়া হচ্ছে।

ক্ষিতীশ। সম্মতি না দিলে সাংঘাতিক নির্দয়তা হবে। সামলে উঠতে পারব না।

বাঁশরি। মেলোড্রামা?

ক্ষিতীশ। না মেলোড্রামা নয়।

বাঁশরি। ক্রমে মেলোড্রামা হয়ে উঠবে না?

ক্ষিতীশ। যদি হয় তবে সেই দিনগুলোকে ঐ খাতার পাতার মতো টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলো।

বাঁশরি। (উঠে দাঁড়িয়ে) আচ্ছা সম্মতি দিলেম। (ক্ষিতীশ ছুটে এল বাঁশরির দিকে) ঐ রে, শুরু হল! ভালো করে ভেবে দেখো, এখনো পিছোবার সময় আছে।

ক্ষিতীশ। (করজোড়ে) মাপ করো, ভয় হচ্ছে পাছে মত বদলাও।

বাঁশরি। যখন বদলাবে তখন ভয় কোরো। অমন মুখের দিকে তাকিয়ে থেকো

না। দেখতে খারাপ লাগে। যাও রেজেস্ট্রি আফিসে। তিন-চার দিনের মধ্যে বিয়ে হওয়া চাই।

ক্ষিতীশ। নোটিশের মেয়াদ কমাতে আইনে যদি বাধে?

বাঁশরি। তা হলে বিয়েতেও বাধবে। দেরি করতে সাহস নেই।

ক্ষিতীশ। অনুষ্ঠান?

বাঁশরি। হবে না অনুষ্ঠান, তোমার দেখছি কমিকের দিকে ঝোঁক আছে। এখনো বুঝলে না জিনিসটা সীরিয়াস।

ক্ষিতীশ। কাউকে নিমন্ত্রণ?

বাঁশরি। কাউকে না।

ক্ষিতীশ। কাউকেই না?

বাঁশরি। আচ্ছা, সোমশংকরকে।

ক্ষিতীশ। কিরকম চিঠিটা লিখতে হবে তার একটা খসড়া—

বাঁশরি। খসড়া কেন, লিখে দিচ্ছি।

ক্ষিতীশ। স্বহস্তে?

বাঁশরি। হাঁ, স্বহস্তেই।

ক্ষিতীশ। আজই?

বাঁশরি। হাঁ, এখনই। (চিঠি লিখে) এই নাও, পড়ো।

ক্ষিতীশের পাঠ। এতদ্দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে, শ্রীমতী বাঁশরি সরকারের সহিত শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ভৌমিকের অবিলম্বে বিবাহ স্থির হইয়াছে। তারিখ জানানো অনাবশ্যক— আপনার অভিনন্দন প্রার্থনীয়। পত্রদ্বারা বিজ্ঞাপন হইল, ত্রুটি মার্জনা করিবেন। ইতি—

বাঁশরি। এ চিঠি এখনি রাজার দারোয়ানের হাতে দিয়ে আসবে। দেরি কোরো না।

[ক্ষিতীশের প্রস্থান

লীলা, শুনে যা খবরটা।

লীলার প্রবেশ

লীলা। কী খবর।

বাঁশরি। বাঁশরি সরকারের সঙ্গে ক্ষিতীশ ভৌমিকের বিবাহ পাকা হয়ে গেল।

লীলা। আঃ কী বলিস তার ঠিকানা নেই।

বাঁশরি। এতদিন পরে একটা ঠিকানা হল।

লীলা। এটা যে আত্মহত্যা!

বাঁশরি। তার পরে পুনর্জন্মের প্রথম অধ্যায়।

লীলা। সবচেয়ে দুঃখ এই যে, যেটা ট্র্যাজেডি সেটাকে দেখাবে প্রহসন।

বাঁশরি। ট্র্যাজেডির লজ্জা ঘুচবে ঠাট্টার হাসিতে। অশ্রুপাতের চেয়ে অগৌরব নেই।

লীলা। আমাদের রাশিচক্র থেকে খসে পড়ল সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাটি। যদি তার জ্বালা নিভত শোক করতুম না। জ্বালা সে সঙ্গে করে নিয়েই চলল অন্ধকারের তলায়।

বাঁশরি। তা হোক, ডার্ক্ হীট, কালো আগুন, কারো চোখে পড়বে না। আমার জন্য শোক করিস নে, যে আমার সাথি হতে চলল শোচনীয় সে-ই। এ কী। শংকর আসছে। তুই যা ভাই একটু আড়ালে।

[লীলার প্রস্থান

সোমশংকরের প্রবেশ

সোমশংকর। বাঁশি।

বাঁশরি। তুমি যে!

সোমশংকর। নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। জানি অন্যপক্ষ থেকে ডাকে নি তোমাকে। আমার পক্ষ থেকে কোনো সংকোচ নেই।

বাঁশরি। কেন সংকোচ নেই। ঔদাসীন্য?

সোমশংকর। তোমার কাছ থেকে যা পেয়েছি আর আমি যা দিয়েছি তোমাকে, এ-বিবাহে তাকে স্পর্শমাত্র করতে পারবে না, এ তুমি নিশ্চয় জান।

বাঁশরি। তবে বিবাহ করতে যাচ্ছ কেন।

সোমশংকর। সে কথা বুঝতে যদি নাও পার, তবু দয়া কোরো আমাকে।

বাঁশরি। তবু বলো। বুঝতে চেষ্টা করি।

সোমশংকর। কঠিন ব্রত নিয়েছি, একদিন প্রকাশ হবে, আজ থাক্, দুঃসাধ্য আমার সংকল্প, ক্ষত্রিয়ের যোগ্য। কোনো-এক সংকটের দিনে বুঝবে সে-ব্রত ভালোবাসার চেয়েও বড়ো। তাকে সম্পন্ন করতেই হবে প্রাণ দিয়েও।

বাঁশরি। আমাকে সঙ্গে নিয়ে সম্পন্ন করতে পারতে না?

সোমশংকর। নিজেকে কখনো তুমি ভুল বোঝাও না বাঁশি। তুমি নিশ্চিত জান তোমার কাছে আমি দুর্বল। হয়তো একদিন তোমার ভালোবাসা আমাকে টলিয়ে দিত আমার ব্রত থেকে। যে-দুর্গমপথে সুষমার সঙ্গে সন্ন্যাসী আমাকে যাত্রায় প্রবৃত্ত করেছেন সেখানে ভালোবাসার গতিবিধি বন্ধ।

বাঁশরি। সন্ন্যাসী হয়তো ঠিকই বুঝেছেন। তোমার চেয়েও তোমার ব্রতকে আমি বড়ো করে দেখতে পারতুম না। হয়তো সেইখানেই বাধত সংঘাত। আজ পর্যন্ত তোমার ব্রতের সঙ্গেই আমার শত্রুতা। তবে এই শত্রুর দুর্গে কোন্ সাহসে তুমি এলে। একদিন যে-শক্তি আমার মধ্যে দেখেছিলে আজ কিছু কি তার অবশিষ্ট নেই। ভয় করবে না?

সোমশংকর। শক্তি একটুও কমে নি, তবু ভয় করব না।

বাঁশরি। যদি তেমন করে পিছু ডাকি এড়িয়ে যেতে পারবে?

সোমশংকর। কী জানি, না পারতেও পারি।

বাঁশরি। তবে?

সোমশংকর। তোমাকে বিশ্বাস করি। আমার সত্য কখনোই ভাঙা পড়বে না তোমার হাতে। সংকটের মুখে যাবার পথে আমাকে হেয় করতে পারবে না তুমি। নিশ্চিত জান, সত্যভঙ্গ হলে আমি প্রাণ রাখব না। মরব তুষানলে পুড়ে।

বাঁশরি। শংকর, তুমি ক্ষত্রিয়ের মতোই ভালোবাসতে পার। শুধু ভাব দিয়ে নয় বীর্য দিয়ে। সত্যি করে বলো, আজও কি আমাকে সেদিনের মতোই ততখানি ভালোবাস।

সোমশংকর। ততখানিই।

বাঁশরি। আর কিছুই চাই নে আমি। সুষমাকে নিয়ে পূর্ণ হোক তোমার ব্রত, তাকে ঈর্ষা করব না।

সোমশংকর। একটা কথা বাকি আছে।

বাঁশরি। কী, বলো।

সোমশংকর। আমার ভালোবাসার কিছু চিহ্ন রেখে যাচ্ছি তোমার কাছে, ফিরিয়ে দিতে পারবে না। (অলংকারের সেই থলি বের করলে)

বাঁশরি। ও কী, ওসব-যে তলিয়ে ছিল জলে।

সোমশংকর। ডুব দিয়ে আবার তুলে এনেছি।

বাঁশরি। মনে করেছিলুম আমার সব হারিয়েছে। ফিরে পেয়ে অনেকখানি বেশি করে পেলুম। নিজের হাতে পরিয়ে দাও আমাকে। (সোমশংকর গয়না

পরিয়ে দিলে) শক্ত আমার প্রাণ। তোমার কাছেও কোনোদিন কেঁদেছি বলে মনে পড়ে না, আজ যদি কাঁদি কিছু মনে কোরো না। (হাতে মাথা রেখে কান্না)

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। রাজাবাহাদুরের চিঠি।

বাঁশরি। (দাঁড়িয়ে উঠে) শংকর, ও চিঠি আমাকে দাও।

সোমশংকর। না পড়েই ?

বাঁশরি। হাঁ, না পড়েই।

সোমশংকর। তবে নাও। (বাঁশরি চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলল) এখনো একটা কাজ বাকি আছে। এই সিগারেট-কেস চেয়ে পাঠিয়েছিলে। কেন, বুঝতে পারি নি।

বাঁশরি। আর-একবার তোমার ঐ পকেটে রাখব বলে, এ আমার দ্বিতীয়বারকার দান।

সোমশংকর। সন্ন্যাসীবাবা আমাদের বাড়িতে আসবেন এখনই— বিদায় দাও, যাই তাঁর কাছে।

বাঁশরি। যাও, জয় হোক সন্ন্যাসীর।

[সোমশংকরের প্রস্থান

লীলার প্রবেশ

লীলা। কী ভাই—

বাঁশরি। একটু বোসো। আর-একখানা চিঠি লেখা বাকি আছে, সেটা তাকে দিতে হবে তোরই হাত দিয়ে। (চিঠি লিখে লীলাকে দিলে) পড়ে দেখ্।

চিঠি

শ্রীমান ক্ষিতীশচন্দ্র ভৌমিক কল্যাণবরেষু—

তোমার ভাগ্য ভালো, ফাঁড়া কেটে গেল, আমারও বিবাহের আসন্ন আশঙ্কাটা সম্পূর্ণ লোপ করে দিলুম। 'ভালোবাসার নিলামে' সর্বোচ্চ দরই পেয়েছি, তোমার ডাক সে-পর্যন্ত পৌঁছত না। অন্যত্র অন্য-কোনো সান্ত্বনার সুযোগ উপস্থিতমত যদি না জোটে তবে বই লেখো। আশা করি এবার সত্যের সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছে। তোমার এই লেখায় বাঁশরির প্রতি দয়া করবার দরকার হবে না। আত্মহত্যায় এক পৈঠে পা বাড়িয়েই সে ফিরে এসেছে।

লীলা। (বাঁশরিকে জড়িয়ে ধরে) আঃ, বাঁচালি ভাই আমাদের সবাইকে। সুষমার উপর এখন আর তোর রাগ নেই?

বাঁশরি। কেন থাকবে। সে কি আমার চেয়ে জিতেছে। লীলা, দে ভাই সব দরজা খুলে সব আলোগুলো জ্বালিয়ে— বাগান থেকে যতগুলো ফুল পাস নিয়ে আয় সংগ্রহ করে।

[লীলার প্রস্থান

পুরন্দরের প্রবেশ

বাঁশরি। এ কী সন্ন্যাসী, তুমি যে আমার ঘরে?

পুরন্দর। চলে যাচ্ছি দূরে, হয়তো আর দেখা হবে না।

বাঁশরি। যাবার বেলায় আমার কথা মনে পড়ল?

পুরন্দর। তোমার কথা কখনোই ভুলি নি। ভোলবার মতো মেয়ে নও তুমি। নিত্যই এ কথা মনে রেখেছি তোমাকে চাই আমাদের কাজে— দুর্লভ দুঃসাধ্য তুমি, তাই দুঃখ দিয়েছি।

বাঁশরি। পার নি দুঃখ দিতে। মরা কঠিন নয়, পেয়েছি তার প্রথম শিক্ষা। কিন্তু তোমাকে একটা শেষকথা বলব সন্ন্যাসী, শোনো। সুষমাকে তুমি ভালোবাস, সুষমা জানে সেই কথা। তোমার ভালোবাসার সূত্রে গেঁথে ব্রতের হার পরেছে সে গলায়, তার আর ভাবনা কিসের। সত্য কি না বলো।

পুরন্দর। সত্য কি মিথ্যা সে-কথা বলে কোনো ফল নেই, দুইই সমান।

বাঁশরি। সুষমার ভাগ্য ভালো কিন্তু সোমশংকরকে কী তুমি দিলে।

পুরন্দর। সে পুরুষ, সে ক্ষত্রিয়, সে তপস্বী।

বাঁশরি। হোক পুরুষ, হোক ক্ষত্রিয়, তার তপস্যা অপূর্ণ থাকবে আমি না থাকলে, আবশ্যক আছে আমাকে।

পুরন্দর। বঞ্চিত হবার দুঃখই তাকে দেবে শক্তি।

বাঁশরি। কখনোই না, তাতেই পঙ্গু করবে তার ব্রত। যে পারে ঐ ক্ষত্রিয়কে শক্তি দিতে এমন কেবল একটি মেয়ে আছে এ-সংসারে।

পুরন্দর। জানি।

বাঁশরি। সে সুষমা নয়।

পুরন্দর। তাও জানি। কিন্তু ঐ বীরের শক্তি হরণ করতে পারে, এমনও একটি মাত্র মেয়ে আছে এ-সংসারে।

বাঁশরি। আজ অভয় দিচ্ছে সে। আপন অন্তরের মধ্যে সে আপনি পেয়েছে দীক্ষা। তার বন্ধন ঘুচেছে, সে আর বাঁধবে না।

পুরন্দর। তবে আজ যাবার দিনে নিঃসংকোচে তারই হাতে রেখে গেলেম সোমশংকরের দুর্গম পথের পাথেয়।

বাঁশরি। এতদিন আমার যত প্রণাম বাকি ছিল সব একত্র করে আজ এই দিলেম তোমার পায়ে।

পুরন্দর। আর আমি দিয়ে গেলেম তোমাকে একটি গান তোমার কণ্ঠে সেটিকে গ্রহণ করো।

গান

পিনাকেতে লাগে টংকার—
বসুন্ধরার পঞ্জরতলে   কম্পন জাগে শঙ্কার।
আকাশেতে ঘোরে ঘূর্ণী
সৃষ্টির বাঁধ চূর্ণি,
বজ্রভীষণ গর্জনরব   প্রলয়ের জয়ডঙ্কার।
স্বর্গ উঠিছে ক্রন্দি,
সুরপরিষদ বন্দী,
তিমিরগহন দুঃসহ রাতে   উঠে শৃঙ্খলঝংকার।
দানবদম্ভ তর্জি'
রুদ্র উঠিল গর্জি,
লণ্ডভণ্ড লুটিল ধুলায়   অভ্রভেদী অহংকার॥

উপন্যাস ও গল্প

গল্পগুচ্ছ

গল্পগুচ্ছ

নামঞ্জুর গল্প

আমাদের আসর জমেছিল পোলিটিক্যাল লঙ্কাকাণ্ডের পালায়। হাল আমলের উত্তরকাণ্ডে আমরা সম্পূর্ণ ছুটি পাই নি বটে, কিন্তু গলা ভেঙেছে; তা ছাড়া সেই অগ্নিদাহের খেলা বন্ধ।

বঙ্গভঙ্গের রঙ্গভূমিতে বিদ্রোহীর অভিনয় শুরু হল। সবাই জানেন, এই নাট্যের পঞ্চম অঙ্কের দৃশ্য আলিপুর পেরিয়ে পৌঁছল আণ্ডামানের সমুদ্রকূলে। পারানির পাথেয় আমার যথেষ্ট ছিল, তবু গ্রহের গুণে এপারের হাজতেই আমার ভোগসমাপ্তি। সহযোগীদের মধ্যে ফাঁসিকাঠ পর্যন্ত যাদের সর্বোচ্চ প্রোমোশন হয়েছিল, তাদের প্রণাম করে আমি পশ্চিমের এক শহরের কোণে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় পসার জমিয়ে তুললেম।

তখনো আমার বাবা বেঁচে। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের এক বড়ো মহকুমার সরকারি উকিল। উপাধি ছিল রায়বাহাদুর। তিনি বিশেষ-একটু ঘটা করেই আমার বাড়ি বন্ধ করে দিলেন। তাঁর হৃদয়ের সঙ্গে আমার যোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল কি না অন্তর্যামী জানেন, কিন্তু হয়েছিল পকেটের সঙ্গে। মনি-অর্ডারের সম্পর্ক পর্যন্ত ছিল না। যখন আমি হাজতে তখনই মায়ের মৃত্যু হয়েছিল। আমার পাওনা শাস্তিটা গেল তাঁর উপর দিয়েই।

আমার পিসি ব'লে যিনি পরিচিত, তিনি আমার স্বোপার্জিত কিম্বা আমার পৈতৃক, তা নিয়ে কারও কারও মনে সংশয় আছে। তার কারণ, আমি পশ্চিমে যাবার পূর্বে তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ সম্পূর্ণই অব্যক্ত ছিল। তিনি আমার কে, তা নিয়ে সন্দেহ থাকে তো থাক্, কিন্তু তাঁর স্নেহ না পেলে সেই আত্মীয়তার অরাজকতা-কালে আমাকে বিষম দুঃখ পেতে হত। তিনি আজন্ম পশ্চিমেই কাটিয়েছেন; সেইখানেই বিবাহ, সেইখানেই বৈধব্য। সেইখানেই স্বামীর বিষয়সম্পত্তি। বিধবা তাই নিয়েই বন্ধ ছিলেন।

তাঁর আরও একটি বন্ধন ছিল। বালিকা অমিয়া। কন্যাটি স্বামীর বটে, স্ত্রীর নয়। তার মা ছিল পিসিমার এক যুবতী দাসী, জাতিতে কাহার। স্বামীর মৃত্যুর পর

মেয়েটিকে তিনি ঘরে এনে পালন করছেন— সে জানেও না যে, তিনি তার মা নন।

এমন অবস্থায় তাঁর আর-একটি বন্ধন বাড়ল, সে হচ্ছে আমি স্বয়ং। যখন জেলখানার বাইরে আমার স্থান অত্যন্ত সংকীর্ণ তখন এই বিধবাই আমাকে তাঁর ঘরে এবং হৃদয়ে আশ্রয় দিলেন। তার পরে বাবার দেহান্তে যখন জানা গেল, উইলে তিনি আমাকে বিষয় থেকে বঞ্চিত করেন নি, তখন সুখে দুঃখে আমার পিসির চোখে জল পড়ল। বুঝলেন, আমার পক্ষে তাঁর প্রয়োজন ঘুচল। তাই বলে স্নেহ তো ঘুচল না।

তিনি বললেন, "বাবা, যেখানেই থাক, আমার আশীর্বাদ রইল।"

আমি বললেম, "সে তো থাকবেই, সেই সঙ্গে তোমাকেও থাকতে হবে, নইলে আমার চলবে না। হাজত থেকে বেরিয়ে যে-মাকে আর দেখতে পাই নি, তিনিই আমাকে পথ দেখিয়ে তোমার কাছে নিয়ে এসেছেন।"

পিসিমা তাঁর এতকালের পশ্চিমের ঘর-সংসার তুলে দিয়ে আমার সঙ্গে কলকাতায় চলে এলেন। আমি হেসে বললেম, "তোমার স্নেহগঙ্গার ধারাকে পশ্চিম থেকে পূর্বে বহন করে এনেছি, আমি কলির ভগীরথ।"

পিসিমা হাসলেন, আর চোখের জল মুছলেন। তাঁর মনের মধ্যে কিছু দ্বিধাও হল; বললেন, "অনেকদিন থেকে ইচ্ছে ছিল, মেয়েটার কোনো-একটা গতি করে শেষ বয়সে তীর্থ করে বেড়াব— কিন্তু বাবা, আজ যে তার উলটো পথে টেনে নিয়ে চললি।"

আমি বললুম, "পিসিমা, আমিই তোমার সচল তীর্থ। যে-কোনো ত্যাগের ক্ষেত্রেই তুমি আত্মদান কর-না কেন, সেইখানেই তোমার দেবতা আপনি এসে তা গ্রহণ করবেন। তোমার যে পুণ্য আত্মা।"

সবচেয়ে একটা যুক্তি তাঁর মনে প্রবল হল। তাঁর আশঙ্কা ছিল, স্বভাবতই আমার প্রবৃত্তির ঝোঁকটা আণ্ডামান-মুখো, অতএব কেউ আমাকে সামলাবার না থাকলে অবশেষে একদিন পুলিসের বাহুবন্ধনে বদ্ধ হবই। তাঁর মতলব ছিল, যে কোমল বাহুবন্ধন তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন ও স্থায়ী, আমার জন্য তারই ব্যবস্থা করে দিয়ে তবে তিনি তীর্থভ্রমণে বার হবেন। আমার বন্ধন নইলে তাঁর মুক্তি নেই।

আমার চরিত্র সম্বন্ধে এইখানে ভুল হিসেব করেছিলেন। কুষ্ঠিতে আমার বধ-বন্ধনের গ্রহটি অস্তিমে আমাকে শকুনি-গৃধিনীর হাতে সঁপে দিতে নারাজ ছিলেন না, কিন্তু প্রজাপতির হাতে নৈব নৈব চ। কন্যাকর্তারা ত্রুটি করেন নি, তাঁদের সংখ্যাও

অজস্র।' আমার পৈতৃক সম্পত্তির বিপুল সচ্ছলতার কথা সকলেই জানত; অতএব, ইচ্ছা করলে সম্ভবপর শ্বশুরকে দেউলে করে দিয়ে কন্যার সঙ্গে সঙ্গে বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা নহবতে সাহানা বাজিয়ে হাসতে হাসতে আদায় করতে পারতেম। করি নি। আমার ভাবী চরিতলেখক এ কথা যেন স্মরণ রাখেন যে, স্বদেশসেবার সংকল্পের কাছে এককালীন আমার এই বিশ-পঁচিশ হাজার টাকার ত্যাগ। জমা-খরচের অঙ্কটা অদৃশ্য কালিতে লেখা আছে বলে যেন আমার প্রশংসার হিসাব থেকে বাদ না পড়ে। পিতামহ ভীষ্মের সঙ্গে আমার মহৎ চরিত্রের এইখানে মিল আছে।

পিসিমা শেষ পর্যন্ত আশা ছাড়েন নি। এমন সময়ে ভারতের পোলিটিক্যাল আকাশে আমাদের সেই ক্ষাত্রযুগের পরবর্তী যুগের হাওয়া বইল। পূর্বেই বলেছি, এখনকার পালায় আমরা প্রধান নায়ক নই, তবু ফুট্-লাইটের অনেক পিছনে মাঝে মাঝে নিস্তেজভাবে আমাদের আসা-যাওয়া চলছে। এত নিস্তেজ যে, পিসিমা আমার সম্বন্ধে নিশ্চিন্তই ছিলেন। আমার জন্যে কালীঘাটে স্বস্ত্যয়ন করবার ইচ্ছে এককালে তাঁর ছিল, কিন্তু ইদানিং আমার ভাগ্য-আকাশে লাল-পাগড়ির রক্তমেঘ একেবারে অদৃশ্য থাকাতে তাঁর আর খেয়াল রইল না। এইটেই ভুল করলেন।

সেদিন পুজোর বাজারে ছিল খদ্দরের পিকেটিং। নিতান্ত কেবল দর্শকের মতন গিয়েছিলেম— আমার উৎসাহের তাপমাত্রা ৯৮ অঙ্কেরও নীচে ছিল, নাড়িতে বেশি বেগ ছিল না। সেদিন যে আমার কোনো আশঙ্কার কারণ থাকতে পারে সে-খবর আমার কুষ্ঠির নক্ষত্র ছাড়া আর-সবার কাছে ছিল অগোচর। এমন সময় খদ্দরপ্রচারকারিণী কোনো বাঙালি মহিলাকে পুলিস-সার্জেন্ট দিলে ধাক্কা। মুহূর্তের মধ্যেই আমার অহিংস অসহযোগের ভাবখানা প্রবল দুঃসহযোগে পরিণত হল। সুতরাং অনতিবিলম্বে থানায় হল আমার গতি। তার পরে যথানিয়মে হাজতের লালায়িত কবলের থেকে জেলখানার অন্ধকার জঠরদেশে অবতরণ করা গেল। পিসিমাকে ব'লে গেলেম, "এইবার কিছুকালের জন্যে তোমার মুক্তি। আপাতত আমার উপযুক্ত অভিভাবকের অভাব রইল না, অতএব এই সুযোগে তুমি তীর্থভ্রমণ করে নাওগে। অমিয়া থাকে কলেজের হস্টেলে; বাড়িতেও দেখবার-শোনবার লোক আছে; অতএব, এখন তুমি দেবসেবায় ষোলো-আনা মন দিলে দেবমানব কারও কোনো আপত্তির কথা থাকবে না।"

জেলখানাকে জেলখানা বলেই গণ্য করে নিয়েছিলেম। সেখানে কোনোরকম দাবিদাওয়া আবদার উৎপাত করি নি। সেখানে সুখ, সম্মান, সৌজন্য, সুহৃৎ ও সুখাদ্যের অভাবে অত্যন্ত বেশি বিস্মিত হই নি। কঠোর নিয়মগুলোকে কঠোর-

ভাবেই মেনে নিয়েছিলেম। কোনোরকম আপত্তি করাটাই লজ্জার বিষয় ব'লে মনে করতেম।

মেয়াদ পুরো হবার কিছু পূর্বেই ছুটি পাওয়া গেল। চারি দিকে খুব হাততালি। মনে হল যেন বাংলাদেশের হাওয়ায় বাজতে লাগল, 'এন্‌কোর! এক্‌সেলেণ্ট্‌!' মনটা খারাপ হল। ভাবলেম, যে ভুগল সেই কেবল ভুগল। আর, মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ, রস পেলে দশে মিলে। সেও বেশিক্ষণ নয়; নাট্যমঞ্চের পর্দা পড়ে যায়, আলো নেভে, তার পরে ভোলবার পালা। কেবল বেড়ি-হাতকড়ার দাগ যার হাড়ে গিয়ে লেগেছে তারই চিরদিন মনে থাকে।

পিসিমা এখনো তীর্থে। কোথায়, তার ঠিকানাও জানি নে। ইতিমধ্যে পুজোর সময় কাছে এল। একদিন সকালবেলায় আমার সম্পাদক-বন্ধু এসে উপস্থিত। বললেন, "ওহে, পুজোর সংখ্যার জন্যে একটা লেখা চাই।"

জিজ্ঞাসা করলেম, "কবিতা?"

"আরে, না। তোমার জীবনবৃত্তান্ত।"

"সে তো তোমার এক সংখ্যায় ধরবে না।"

"এক সংখ্যায় কেন। ক্রমে ক্রমে বেরোবে।"

"সতীর মৃতদেহ সুদর্শনচক্রে টুকরো টুকরো করে ছড়ানো হয়েছিল। আমার জীবনচরিত সম্পাদকি চক্রে তেমনি টুকরো টুকরো করে সংখ্যায় সংখ্যায় ছড়িয়ে দেবে, এটা আমার পছন্দসই নয়। জীবনী যদি লিখি গোটা আকারে বের করে দেব।"

"না-হয় তোমার জীবনের কোনো-একটা বিশেষ ঘটনা লিখে দাও-না।"

"কী-রকম ঘটনা।"

"তোমার সব-চেয়ে কঠোর অভিজ্ঞতা, খুব যাতে ঝাঁজ।"

"কী হবে লিখে।"

"লোকে জানতে চায় হে।"

"এত কৌতূহল? আচ্ছা, বেশ, লিখব।"

"মনে থাকে যেন সব-চেয়ে যেটাতে তোমার কঠোর অভিজ্ঞতা।"

"অর্থাৎ, সব-চেয়ে যেটাতে দুঃখ পেয়েছি, লোকের তাতেই সব-চেয়ে মজা। আচ্ছা, বেশ। কিন্তু নামটামগুলো অনেকখানি বানাতে হবে।"

"তা তো হবেই। যেগুলো একেবারে মারাত্মক কথা তার ইতিহাসের চিহ্ন বদল না করলে বিপদ আছে। আমি সেইরকম মরিয়াগোছের জিনিসই চাই। পেজ প্রতি তোমাকে—"

"আগে লেখাটা দেখো, তার পরে দরদস্তুর হবে।"

"কিন্তু, আর-কাউকে দিতে পারবে না বলে রাখছি। যিনি যত দর হাঁকুন, আমি তার উপরে—"

"আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে।"

শেষকালটা উঠে যাবার সময় বলে গেলেন, "তোমাদের ইনি— বুঝতে পারছ? নাম করব না— ঐ যে তোমাদের সাহিত্যধুরন্ধর— মস্ত লেখক ব'লে বড়াই; কিন্তু, যা বল তোমার স্টাইলের কাছে তার স্টাইল যেন ডসনের বুট আর তালতলার চটি।"

বুঝলেম, আমাকে উপরে চড়িয়ে দেওয়াটা উপলক্ষমাত্র, তুলনায় ধুরন্ধরকে নাবিয়ে দেওয়াটাই লক্ষ্য।

এই গেল আমার ভূমিকা। এইবার আমার কঠোর অভিজ্ঞতার কাহিনী।

'সন্ধ্যা' কাগজ যেদিন থেকে পড়তে শুরু, সেইদিন থেকেই আহারবিহার সম্বন্ধে আমার কড়া ভোগ। সেটাকে জেলযাত্রার রিহার্সাল বলা হত। দেহের প্রতি অনাদরের অভ্যাস পাকা হয়ে উঠল। তাই প্রথমবার যখন ঠেললে হাজতে, প্রাণপুরুষ বিচলিত হয় নি। তার পর বেরিয়ে এসে নিজের 'পরে কারও সেবাশুশ্রূষার হস্তক্ষেপমাত্র বরদাস্ত করি নি। পিসিমা দুঃখবোধ করতেন। তাঁকে বলতেম, "পিসিমা, স্নেহের মধ্যে মুক্তি, সেবার মধ্যে বন্ধন। তা ছাড়া, একের শরীরে অন্য শরীরধারীর আইন খাটানোকে বলে ডায়ার্কি, দ্বৈরাজ্য— সেইটের বিরুদ্ধে আমাদের অসহযোগ।"

তিনি নিশ্বাস ছেড়ে বলতেন, "আচ্ছা, বাবা, তোমাকে বিরক্ত করব না।"

নির্বোধ, মনে মনে ভাবতেম বিপদ কাটল।

ভুলেছিলেম, স্নেহসেবার একটা প্রচ্ছন্ন রূপ আছে। তার মায়া এড়ানো শক্ত। অকিঞ্চন শিব যখন তাঁর ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে দারিদ্র্যগৌরবে মগ্ন তখন খবর পান না যে, লক্ষ্মী কোন্‌-এক সময়ে সেটা নরম রেশম দিয়ে বুনে রেখেছেন, তার সোনার সুতোর দামে সুর্যনক্ষত্র বিকিয়ে যায়। যখন 'ভিক্ষের অন্ন খাচ্ছি' বলে সন্ন্যাসী নিশ্চিন্ত তখন জানেন না যে, অন্নপূর্ণা এমন মসলায় বানিয়েছেন যে, দেবরাজ প্রসাদ পাবার জন্যে নন্দীর কানে কানে ফিসফিস করতে থাকেন। আমার হল সেই দশা। শয়নে বসনে অশনে পিসিমার সেবার হস্ত গোপনে ইন্দ্রজাল বিস্তার করতে লাগল, সেটা দেশাত্মবোধীর অন্যমনস্ক চোখে পড়ল না। মনে মনে ঠিক দিয়ে বসে আছি, তপস্যা আছে অক্ষুণ্ণ। চমক ভাঙল জেলখানায় গিয়ে। পিসিমা ও পুলিসের ব্যবস্থায়

মধ্যে যে একটা ভেদ আছে, কোনো-রকম অদ্বৈতবুদ্ধি দ্বারা তার সমন্বয় করতে পারা গেল না। মনে মনে কেবলই গীতা আওড়াতে লাগলেম, নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন। হায় রে তপস্বী, কখন যে পিসিমার নানা গুণ নানা উপকরণ-সংযোগে হৃদয়দেশ পেরিয়ে একেবারে পাকযন্ত্রে প্রবেশ করেছে, তা জানতেও পারি নি। জেলখানায় এসে সেই জায়গাটাতে বিপাক ঘটতে লাগল।

ফল হল এই যে, বজ্রাঘাত ছাড়া আর-কিছুতে যে-শরীর কাবু হত না সে পড়ল অসুস্থ হয়ে। জেলের পেয়াদা যদি বা ছাড়লে জেলের রোগগুলোর মেয়াদ আর ফুরোতে চায় না। কখনো মাথা ধরে, হজম প্রায় হয় না, বিকেলবেলা জ্বর হতে থাকে। ক্রমে যখন মালাচন্দন হাততালি ফিকে হয়ে এসেছে তখনো এ আপদগুলো টনটনে হয়ে রইল।

মনে মনে ভাবি, পিসিমা তো তীর্থ করতে গেছেন, তাই বলে অমিয়াটার কি ধর্মজ্ঞান নেই। কিন্তু, দোষ দেব কাকে। ইতিপূর্বে অসুখে-বিসুখে আমার সেবা করবার জন্যে পিসিমা তাকে অনেকবার উৎসাহিত করেছেন— আমিই বাধা দিয়ে বলেছি, ভালো লাগে না।

পিসিমা বলেছেন, "অমিয়ার শিক্ষার জন্যেই বলছি, তোর আরামের জন্যে নয়।"

আমি বলেছি, "হাসপাতালে নার্সিং করতে পাঠাও-না।"

পিসিমা রাগ করে আর জবাব করেন নি।

আজ শুয়ে শুয়ে মনে মনে ভাবছি, 'না-হয় এক সময়ে বাধাই দিয়েছি, তাই বলে কি সেই বাধাই মানতে হবে। গুরুজনের আদেশের 'পরে এত নিষ্ঠা এই কলিযুগে!'

সাধারণত নিকট সংসারের ছোটোবড়ো অনেক ব্যাপারই দেশাত্মবোধীর চোখ এড়িয়ে যায়। কিন্তু, অসুখ করে পড়ে আছি বলে আজকাল দৃষ্টি হয়েছে প্রখর। লক্ষ্য করলেম, আমার অবর্তমানে অমিয়ারও দেশাত্মবোধ পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি প্রবল হয়ে উঠেছে। ইতিপূর্বে আমার দৃষ্টান্ত ও শিক্ষায় তার এত অভাবনীয় উন্নতি হয় নি। আজ অসহযোগের অসহ্য আবেগে সে কলেজ-ত্যাগিনী; ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতেও তার হৃৎকম্প হয় না; অনাথাসদনের চাঁদার জন্যে অপরিচিত লোকের বাড়িতে গিয়েও সে ঝুলি ফিরিয়ে বেড়ায়। এও লক্ষ্য করে দেখলেম, অনিল তার এই কঠিন অধ্যবসায় দেখে তাকে দেবী ব'লে ভক্তি করে— ওর জন্মদিনে সেই ভাবেরই একটা ভাঙা ছন্দের স্তোত্র সে সোনার কালিতে ছাপিয়ে ওকে উপহার দিয়েছিল।

আমাকেও ঐ ধরনের একটা-কিছু বানাতে হবে, নইলে অসুবিধা হচ্ছে। পিসিমার আমলে চাকরবাকরগুলো যথানিয়মে কাজ করত; হাতের কাছে কাউকে-না-কাউকে পাওয়া যেত। এখন এক গ্লাস জলের দরকার হলে আমার মেদিনীপুরবাসী শ্রীমান জলধরের অকস্মাৎ অভ্যাগমের প্রত্যাশায় চাতকের মতো তাকিয়ে থাকি; সময় মিলিয়ে ওষুধ খাওয়া সম্বন্ধে নিজের ভোলা মনের 'পরেই একমাত্র ভরসা। আমার চিরদিনের নিয়মবিরুদ্ধ হলেও রোগশয্যায় হাজিরে দেবার জন্যে অমিয়াকে দুই-একবার ডাকিয়ে এনেছি; কিন্তু দেখতে পাই, পায়ের শব্দ শুনলেই সে দরজার দিকে চমকে তাকায়, কেবলই উসখুস করতে থাকে। মনে দয়া হয়; বলি, "অমিয়া, আজ নিশ্চয় তোদের মীটিং আছে।"

অমিয়া বলে, "তা হোক-না দাদা, এখনো আর-কিছুক্ষণ— "

আমি বলি, "না, না, সে কি হয়। কর্তব্য সব আগে।"

কিন্তু প্রায়ই দেখতে পাই, কর্তব্যের অনেক আগেই অনিল এসে উপস্থিত হয়। তাতে অমিয়ার কর্তব্য-উৎসাহের পালে যেন দমকা হাওয়া লাগে, আমাকে বড়ো বেশি-কিছু বলতে হয় না।

শুধু অনিল নয়, বিদ্যালয়-বর্জক আরও অনেক উৎসাহী যুবক আমার বাড়ির একতলায় বিকেলে চা এবং ইন্‌স্পিরেশন গ্রহণ করতে একত্র হয়। তারা সকলেই অমিয়াকে যুগলক্ষ্মী বলে সম্ভাষণ করে। একরকম পদবী আছে, যেমন রায়বাহাদুর, পাট-করা চাদরের মতো, যাকেই দেওয়া যায় নির্ভাবনায় কাঁধে ঝুলিয়ে বেড়াতে পারে। আর-একরকম পদবী আছে, যার ভাগ্যে জোটে সে বেচারা নিজেকে পদবীর সঙ্গে মাপসই করবার জন্যে অহরহ উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকে। স্পষ্টই বুঝলেম, অমিয়ার সেই অবস্থা। সর্বদাই অত্যন্ত বেশি উৎসাহপ্রদীপ্ত হয়ে না থাকলে তাকে মানায় না। খেতে শুতে তার সময় না-পাওয়াটা বিশেষ সমারোহ করেই ঘটে। এপাড়ায় ওপাড়ায় খবর পৌঁছয়। কেউ যখন বলে, এমন করলে শরীর টিঁকবে কী করে, সে একটুখানি হাসে— আশ্চর্য সেই হাসি। ভক্তরা বলে 'আপনি একটু বিশ্রাম করুন গে, একরকম করে কাজটা সেরে নেব', সে তাতে ক্ষুণ্ণ হয়— ক্লান্তি থেকে বাঁচানোই কি বড়ো কথা। দুঃখগৌরব থেকে বঞ্চিত করা কি কম বিড়ম্বনা। তার ত্যাগ-স্বীকারের ফর্দের মধ্যে আমিও পড়ে গেছি। আমি যে তার এতবড়ো জেল-খাটা দাদা— উল্লাসকর কানাই বারীন উপেন্দ্র প্রভৃতির সঙ্গে এক জ্যোতিষ্কমণ্ডলীতে যার স্থান, গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় পার হয়ে তার যে-দাদা গীতার শেষ দিকের অধ্যায়ের মুখে অগ্রসর হয়েছে, তাকেও যথোচিত পরিমাণে দেখবার সে সময় পায় না। এত

বড়ো ফ্যাক্রিফাইস। যেদিন কোনো কারণে তার দলের লোকের অভাব হয়েছে সেদিন আমিও তার উৎসাহের মৌতাত জোগাবার জন্যে বলেছি, 'অমিয়া, ব্যক্তিগত মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ তোর জন্যে নয়, তোর জন্যে বর্তমান যুগ।' আমার কথাটা সে গম্ভীরমুখে নীরবে মেনে নিয়েছে। জেলে যাওয়ার পর থেকে আমার হাসি অন্তঃশীলা বইছে— যারা আমাকে চেনে না তারা বাইরে থেকে আমাকে খুব গম্ভীর বলেই মনে করে।

বিছানায় একলা পড়ে পড়ে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছি, বিমুখা বান্ধবা যান্তি। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, সেদিন কোথা থেকে একটা হ্যাঙলা কুকুর আমার বারান্দার কোণে আশ্রয় খুঁজছিল। গায়ের রোঁওয়া উঠে গেছে, জীর্ণ চামড়ার তলায় কঙ্কালের আব্রু নেই— আধমরা তার অবস্থা। অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে তাকে দুর-দুর করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেম। আজ ভাবছিলেম, এতটা বেশি ঝাঁজের সঙ্গে তাকে তাড়ালেম কেন। বেগানা কুকুর বলে নয়, ওর সর্বাঙ্গে মরণদশা দেখা দিয়েছে বলে। প্রাণের সংগীতসভায় ওর অস্তিত্বটা বেসুরো, ওর রুগ্‌ণতা বেয়াদবি। ওর সঙ্গে নিজের তুলনা মনে এল। চারি দিকের চলমান প্রাণের ধারার মধ্যে আমার অস্বাস্থ্য একটা স্থাবর পদার্থ, স্রোতের বাধা। সে দাবি করে, 'শিয়রের কাছে চুপ করে বসে থাকো।' প্রাণের দাবি, 'দিকে বিদিকে চলে বেড়াও।' রোগের বাঁধনে যে নিজে বদ্ধ অরোগীকে সে বন্দী করতে চায়— এটা একটা অপরাধ। অতএব, জীবলোকের উপর সব দাবি একেবারে পরিত্যাগ করব মনে করে গীতা খুলে বসলেম। প্রায় যখন স্থিতধী অবস্থায় এসে পৌচেছি, মনটা রোগ-অরোগের দ্বন্দ্ব ছাড়িয়ে গেছে, এমন সময় অনুভব করলেম, কে আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে। গীতা থেকে চোখ নামিয়ে দেখি, পিসিমার পোষ্যমণ্ডলীভুক্ত একটি মেয়ে। এপর্যন্ত দূরের থেকেই সাধারণভাবেই তাকে জানি; বিশেষভাবে তার পরিচয় জানি নে— তার নাম পর্যন্ত আমার অবিদিত। মাথায় ঘোমটা টেনে ধীরে ধীরে সে আমার পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

তখন মনে পড়ল, মাঝে মাঝে সে আমার দরজার বাইরের কোণে ছায়ার মতো এসে বার বার ফিরে ফিরে গেছে। বোধ করি সাহস করে ঘরে ঢুকতে পারে নি। আমার অজ্ঞাতসারে আমার মাথা-ধরার, গায়ে-ব্যথার ইতিবৃত্তান্ত সে আড়াল থেকে অনেকটা জেনে গিয়েছে। আজ সে লজ্জাভয় দূর করে ঘরের মধ্যে এসে প্রণাম করে বসল। আমি যে একদিন একজন মেয়েকে অপমান থেকে বাঁচাবার জন্যে দুঃখ-স্বীকারের অর্ঘ্য নারীকে দিয়েছি, সে হয়তো-বা দেশের সমস্ত মেয়ের হয়ে আমার পায়ের কাছে তারই প্রাপ্তিস্বীকার করতে এসেছে। জেল থেকে বেরিয়ে অনেক

সভায় অনেক মালা পেয়েছি, কিন্তু আজ ঘরের কোণে এই-যে অখ্যাত হাতের মানটুকু পেলেম এ আমার হৃদয়ে এসে বাজল। নিস্ত্রৈগুণ্য হবার উমেদার এই জেল-খাটা পুরুষের বহুকালের শুকনো চোখ ভিজে ওঠবার উপক্রম করলে। পূর্বেই বলেছি, সেবায় আমার অভ্যেস নেই। কেউ পা টিপে দিতে এলে ভালোই লাগত না, ধমকে তাড়িয়ে দিতেম। আজ এই সেবা প্রত্যাখ্যান করার স্পর্ধা মনেও উদয় হল না।

খুলনা জেলায় পিসিমার আদি শ্বশুরবাড়ি। সেখানকার গ্রামসম্পর্কের দুটি-চারটি মেয়েকে পিসিমা আনিয়ে রেখেছেন। পিসিমার কাজকর্মে পূজা-অর্চনায় তারা ছিল তাঁর সহকারিণী। তাঁর নানারকম ক্রিয়াকর্মে তাদের না হলে তাঁর চলত না। এ-বাড়িতে আর সর্বত্রই অমিয়ার অধিকার ছিল, কেবল পুজোর ঘরে না। অমিয়া তার কারণ জানত না, জানবার চেষ্টাও করত না। পিসিমার মনে ছিল, অমিয়া ভালোরকম লেখাপড়া শিখে এমন ঘরে বিয়ে করবে যেখানে আচার-বিচারের বাঁধাবাঁধি নেই, আর দেবদ্বিজ যেখান থেকে খাতির না পেয়ে শূন্য হাতে ফিরে আসেন। এটা আক্ষেপের কথা। কিন্তু, এ ছাড়া ওর আর-কোনো গতি হতেই পারে না— বাপের পাতক থেকে মেয়েকে সম্পূর্ণ বাঁচাবে কে। সেই কারণে অমিয়াকে তিনি ঢিলেমির ঢালু তট বেয়ে আধুনিক আচারহীনতার মধ্যে উত্তীর্ণ হতে বাধা দেন নি। ছেলেবেলা থেকে অঙ্কে আর ইংরেজিতে ক্লাসে সে হয়েছে ফার্স্ট। বছরে বছরে মিশনারি ইস্কুল থেকে ফ্রক্ প'রে বেণী দুলিয়ে চারটে-পাঁচটা করে প্রাইজ নিয়ে এসেছে। যে-বারে দৈবাৎ পরীক্ষায় দ্বিতীয় হয়েছে সে-বারে শোবার ঘরে দরজা বন্ধ করে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে; প্রায়োপবেশন করতে যায় আর-কি। এমনি করে পরীক্ষাদেবতার কাছে সিদ্ধির মানত করে সে তারই সাধনায় দীর্ঘকাল তন্ময় ছিল। অবশেষে অসহযোগের যোগিনীমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে পরীক্ষাদেবীর বর্জন-সাধনাতেও সে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হল। পাশ-গ্রহণেও যেমন, পাশ-ছেদনেও তেমনি, কিছুতেই সে কারও চেয়ে পিছিয়ে থাকবার মেয়ে নয়। পড়াশুনো করে তার যে খ্যাতি, পড়াশুনো ছেড়ে তার চেয়ে খ্যাতি অনেক বেশি বেড়ে গেল। আজ যে-সব প্রাইজ তার হাতের কাছে ফিরছে তারা চলে, তারা বলে, তারা অশ্রুসলিলে গলে, তারা কবিতাও লেখে।

বলা বাহুল্য, পিসিমার পাড়াগেঁয়ে পোষ্য মেয়েগুলির 'পরে অমিয়ার একটুও শ্রদ্ধা ছিল না। অনাথাসদনে যে-সময়ে চাঁদার টাকার চেয়ে অনাথারই অভাব বেশি, সেই সময়ে এই মেয়েদের সেখানে পাঠাবার জন্যে পিসিমার কাছে অমিয়া অনেক আবেদন করেছে। পিসিমা বলেছেন, "সে কী কথা— এরা তো অনাথা নয়, আমি বেঁচে আছি কী করতে। অনাথ হোক, সনাথ হোক, মেয়েরা চায় ঘর; সদনের মধ্যে

তাদের ছাপ মেরে বস্তাবন্দী করে রাখা কেন। তোমার যদি এতই দয়া থাকে তোমার ঘর নেই নাকি।"

যা হোক, মেয়েটি যখন মাথা হেঁট করে পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, আমি সংকুচিত অথচ বিগলিতচিত্তে একখানা খবরের কাগজ মুখের সামনে ধরে বিজ্ঞাপনের উপর চোখ বুলিয়ে যেতে লাগলেম। এমন সময় হঠাৎ অকালে অমিয়া ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত; নবযুগের উপযোগী ভাইফোঁটার একটা নূতন ব্যাখ্যা সে লিখেছে। সেইটে ইংরেজিতেও সে প্রচার করতে চায়; আমার কাছে তারই সাহায্য আবশ্যক। এই লেখাটির ওরিজিন্যাল আইডিয়াতে ভক্তদল খুব বিচলিত— এই নিয়ে তারা একটা ধুমধাম করবে বলে কোমর বেঁধেছে।

ঘরে ঢুকেই সেবানিযুক্ত মেয়েটিকে দেখেই অমিয়ার মুখের ভাব অত্যন্ত শক্ত হয়ে উঠল। তার দেশবিশ্রুত দাদা যদি একটু ইশারামাত্র করত তা হলে তার সেবা করবার লোকের কি অভাব ছিল। এত মানুষ থাকতে শেষকালে কি এই—

থাকতে পারলে না। বললে, "দাদা, হরিমতিকে কি তুমি—"

প্রশ্নটা শেষ করতে না দিয়ে ফস্ করে বলে ফেললেম, "পায়ে বড়ো ব্যথা করছিল।"

পুলিস-সার্জেণ্টের হাতে একটি মেয়ের অপমান বাঁচাতে গিয়ে জেলখানায় গিয়েছিলেম। আজ এক মেয়ের আক্রোশ থেকে আর-এক মেয়েকে আচ্ছাদন করবার জন্যে মিথ্যে কথা বলে ফেললেম। এবারেও শাস্তি শুরু হল। অমিয়া আমার পায়ের কাছে বসল। হরিমতি তাকে কুণ্ঠিত মৃদুকণ্ঠে কী একটা বললে, সে ঈষৎ মুখ বাঁকিয়ে জবাবই করলে না। হরিমতি আস্তে আস্তে উঠে চলে গেল। তখন অমিয়া পড়ল আমার পা নিয়ে। বিপদ ঘটল আমার। কেমন করে বলি 'দরকার নেই, আমার ভালোই লাগে না'। এতদিন পর্যন্ত নিজের পায়ের সম্বন্ধে যে স্বায়ত্তশাসন সম্পূর্ণ বজায় রেখেছিলেম, সে আর টেঁকে না বুঝি!

ধড়্‌ফড়্‌ করে উঠে বসে বললেম, "অমিয়া, দে তোর লেখাটা, ওটা তর্জমা করে ফেলি।"

"এখন থাক্-না, দাদা। তোমার পা কামড়াচ্ছে, একটু টিপে দিই-না?"

"না, পা কেন কামড়াবে। হাঁ হাঁ, একটু কামড়াচ্ছে বটে। তা, দেখ্‌ অমি, তোর এই ভাইফোঁটার আইডিয়াটা ভারি চমৎকার। কী করে তোর মাথায় এল, তাই ভাবি। ঐ যে লিখেছিস বর্তমান যুগে ভাইয়ের ললাট অতি বিরাট, সমস্ত বাংলাদেশে বিস্তৃত, কোনো একটিমাত্র ঘরে তার স্থান হয় না— এটা খুব-একটা বড়ো কথা। দে, আমি লিখে ফেলি: With the advent of the present age, Brother's

brow, waiting for its auspicious anointment from the sisters of Bengal, has grown immensely beyond the narrowness of domestic privacy, beyond the boundaries of the individual home। একটা আইডিয়ার মতো আইডিয়া পেলে কলম পাগল হয়ে ছোটে।"

অমিয়ার পা-টেপার ঝোঁক একেবারে থেমে গেল। মাথাটা ধরে ছিল, লিখতে একটুও গা লাগছিল না— তবু অ্যাস্পিরিনের বড়ি গিলে বসে গেলেম।

পরদিন দুপুরবেলায় আমার জলধর যখন দিবানিদ্রায় রত, দেউড়িতে দরোয়ানজি তুলসীদাসের রামায়ণ পড়ছে, গলির মোড় থেকে ভালুকনাচওয়ালার ডুগডুগি শোনা যাচ্ছে, বিশ্রামহারা অমিয় যখন যুগলক্ষ্মীর কর্তব্যপালনে বেরিয়েছে, এমন সময় দরজার বাইরে নির্জন বারান্দায় একটি ভীরু ছায়া দেখা দিলে। শেষকালে দ্বিধা করতে করতে কখন হঠাৎ এক সময়ে সেই মেয়েটি একটা হাতপাখা নিয়ে আমার মাথার কাছে বসে বাতাস করতে লাগল। বোঝা গেল, কাল অমিয়ার মুখের ভাবখানা দেখে পায়ে হাত দিতে আজ আর সাহস হল না। এতক্ষণে নববঙ্গের ভাইফোঁটা-প্রচারের মীটিং বসেছে। অমিয়া ব্যস্ত থাকবে। তাই ভাবছিলুম ভরসা করে বলে ফেলি, পায়ে বড়ো ব্যথা করছে। ভাগ্যে বলি নি।— মিথ্যে কথাটা মনের মধ্যে যখন ইতস্তত করছে ঠিক সেই সময়ে, অনাথাসদনের ত্রৈমাসিক রিপোর্ট হাতে, অমিয়ার প্রবেশ। হরিমতির পাখা-দোলনের মধ্যে হঠাৎ চমক লাগল ; তার হৃৎপিণ্ডের চাঞ্চল্য ও মুখশ্রীর বিবর্ণতা আন্দাজ করা শক্ত হল না। অনাথাসদনের এই সেক্রেটারির ভয়ে তার পাখার গতি খুব মৃদু হয়ে এল।

অমিয়া বিছানার এক ধারে বসে খুব শক্ত স্বরে বললে, "দেখো দাদা, আমাদের দেশে ঘরে ঘরে কত আশ্রয়হারা মেয়ে বড়ো বড়ো পরিবারে প্রতিপালিত হয়ে দিন কাটাচ্ছে, অথচ সে-সব ধনী ঘরে তাদের প্রয়োজন একটুও জরুরি নয়। গরিব মেয়ে, যারা খেটে খেতে বাধ্য, এরা তাদেরই অন্ন-অর্জনে বাধা দেয় মাত্র। এরা যদি সাধারণের কাজে লাগে যেমন আমাদের অনাথাসদনের কাজ— তা হলে—"

বুঝলেম, আমাকে উপলক্ষ করে হরিমতির উপরে বক্তৃতার এই শিলাবৃষ্টি। আমি বললেম, "অর্থাৎ, তুমি চলবে নিজের শখ-অনুসারে, আর আশ্রয়হীনারা চলবে তোমার হুকুম-অনুসারে। তুমি হবে অনাথাসদনের সেক্রেটারি, আর ওরা হবে অনাথাসদনের সেবাকারিণী। তার চেয়ে নিজেই লাগো সেবার কাজে ; বুঝতে পারবে, সে কাজ তোমার অসাধ্য। অনাথাদের অতিষ্ঠ করা সহজ, সেবা করা সহজ নয়। দাবি নিজের উপরে করো, অন্যের উপরে কোরো না।"

আমার স্বভাব, মাঝে মাঝে ভুলে যাই 'অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধম্'। ফল হল এই যে অমিয়া পিসিমারই সদস্যদের মধ্য থেকে আর-একটি মেয়েকে এনে হাজির করলে— তার নাম প্রসন্ন। তাকে আমার পায়ের কাছে বসিয়ে দিয়ে বললে, "দাদার পায়ে ব্যথা করে, তুমি পা টিপে দাও।" সে যথোচিত অধ্যবসায়ের সঙ্গে আমার পা টিপতে লাগল। এই হতভাগ্য দাদা এখন কোন্ মুখে বলে যে, তার পায়ে কোনোরকম বিকার হয় নি। কেমন করে জানায় যে, এমনতরো টেপাটেপি করে কেবলমাত্র তাকে অপদস্থ করা হচ্ছে। মনে মনে বুঝলেম, রোগশয্যায় রোগীর আর স্থান হবে না। এর চেয়ে ভালো নববঙ্গের ভাইফোঁটা-সমিতির সভাপতি হওয়া। পাখার হাওয়া আস্তে আস্তে থেমে গেল। হরিমতি স্পষ্ট অনুভব করলে, অস্ত্রটা তারই উদ্দেশে। এ হচ্ছে প্রসন্নকে দিয়ে হরিমতিকে উৎখাত করা। কণ্টকেনৈব কণ্টকম্। একটু পরে পাখাটা মাটিতে রেখে সে উঠে দাঁড়াল। আমার পায়ের কাছে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে আস্তে আস্তে দুই পায়ে হাত বুলিয়ে চলে গেল।

আবার আমাকে গীতা খুলতে হল। তবুও শ্লোকের ফাঁকে ফাঁকে দরজার ফাঁকের দিকে চেয়ে দেখি— কিন্তু সেই একটুখানি ছায়া আর-কোথাও দেখা গেল না। তার বদলে প্রসন্ন প্রায়ই আসে, প্রসন্নের দৃষ্টান্তে আরও দুই-চারিটি মেয়ে অমিয়ার দেশবিশ্রুত দেশভক্ত দাদার সেবা করবার জন্যে জড়ো হল। অমিয়া এমন ব্যবস্থা করে দিলে, যাতে পালা করে আমার নিত্যসেবা চলে। এদিকে শোনা গেল, হরিমতি একদিন কাউকে কিছু না বলে কলকাতা ছেড়ে তার পাড়াগাঁয়ের বাড়িতে চলে গেছে।

মাসের বারোই তারিখে সম্পাদক-বন্ধু এসে বললেন— "একি ব্যাপার। ঠাট্টা নাকি। এই কি তোমার কঠোর অভিজ্ঞতা।"

আমি হেসে বললেম, "পুজোর বাজারে চলবে না কি।"

"একেবারেই না। এটা তো অত্যন্তই হালকা-রকমের জিনিস।"

সম্পাদকের দোষ নেই। জেলবাসের পর থেকে আমার অশ্রুজল অন্তঃশীলা বইছে। লোকে বাইরে থেকে আমাকে খুব হালকা-প্রকৃতির লোক মনে করে।

গল্পটা আমাকে ফেরত দিয়ে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে এল অনিল। বললে, "মুখে বলতে পারব না, এই চিঠিটা পড়ুন।"

চিঠিতে অমিয়াকে, তার দেবীকে, যুগলক্ষ্মীকে বিবাহ করবার ইচ্ছে জানিয়েছে; এ-কথাও বলেছে, অমিয়ার অসম্মতি নেই।

তখন অমিয়ার জন্মবৃত্তান্ত তাকে বলতে হল। সহজে বলতেম না; কিন্তু

জানতেম, হীনবর্ণের 'পরে অনিল শ্রদ্ধাপূর্ণ করুণা প্রকাশ করে থাকে। আমি তাকে বললেম, "পূর্বপুরুষের কলঙ্ক জন্মের দ্বারাই ক্ষালিত হয়ে যায়, এ তো তোমরা অমিয়ার জীবনেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ। সে পদ্ম, তাতে পঙ্কের চিহ্ন নেই।"

নববর্ষে ভাইফোঁটার সভা তার পরে আর জমল না। ফোঁটা রয়েছে তৈরি, কপাল মেরেছে দৌড়। আর শুনেছি, অনিল কলকাতা ছেড়ে কুমিল্লায় স্বরাজ প্রচারের কী-একটা কাজ নিয়েছে।

অমিয়া কলেজে ভরতি হবার উদ্যোগে আছে। ইতিমধ্যে পিসিমা তীর্থ থেকে ফিরে আসার পর শুশ্রূষার সাত-পাক বেড়ি থেকে আমার পা ছুটো খালাস পেয়েছে।

অগ্রহায়ণ, ১৩৩২

সংস্কার

চিত্রগুপ্ত এমন অনেক পাপের হিসাব বড়ো অক্ষরে তাঁর খাতায় জমা করেন যা থাকে পাপীর নিজের অগোচরে। তেমনি এমন পাপও ঘটে যাকে আমিই চিনি পাপ বলে, আর-কেউ না। যেটার কথা লিখতে বসেছি সেটা সেই জাতের। চিত্রগুপ্তের কাছে জবাবদিহি করবার পূর্বে আগে-ভাগে কবুল করলে অপরাধের মাত্রাটা হাল্‌কা হবে।

ব্যাপারটা ঘটেছিল কাল শনিবার দিনে। সেদিন আমাদের পাড়ায় জৈনদের মহলে কী একটা পরব ছিল। আমার স্ত্রী কলিকাকে নিয়ে মোটরে করে বেরিয়েছিলুম —চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল বন্ধু নয়নমোহনের বাড়িতে।

স্ত্রীর কলিকা নামটি শ্বশুর-দত্ত, আমি ওর জন্ত দায়ী নই। নামের উপযুক্ত তাঁর স্বভাব নয়, মতামত খুবই পরিস্ফুট। বড়োবাজারে বিলিতি কাপড়ের বিপক্ষে যখন পিকেট করতে বেরিয়েছিলেন, তখন দলের লোক ভক্তি করে তাঁর নাম দিয়েছিল ধ্রুবব্রতা। আমার নাম গিরীন্দ্র। দলের লোক আমাকে আমার পত্নীর পতি বলেই জানে, স্বনামের সার্থকতার প্রতি লক্ষ্য করে না। বিধাতার কৃপায় পৈতৃক উপার্জনের গুণে আমারও কিঞ্চিৎ সার্থকতা আছে। তার প্রতি দলের লোকের দৃষ্টি পড়ে চাঁদা-আদায়ের সময়।

স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর স্বভাবের অমিল থাকলেই মিল ভালো হয়, শুকনো মাটির সঙ্গে জলধারার মতো। আমার প্রকৃতি অত্যন্ত ঢিলে, কিছুই বেশি করে চেপে ধরি নে। আমার স্ত্রীর প্রকৃতি অত্যন্ত আঁট, যা ধরেন তা কিছুতেই ছাড়েন না। আমাদের এই বৈষম্যের গুণেই সংসারে শান্তিরক্ষা হয়।

কেবল একটা জায়গায় আমাদের মধ্যে যে-অসামঞ্জস্য ঘটেছে তার আর মিটমাট হতে পারল না। কলিকার বিশ্বাস, আমি স্বদেশকে ভালোবাসি নে। নিজের বিশ্বাসের উপর তাঁর বিশ্বাস অটল— তাই আমার আন্তরিক দেশ-ভালোবাসার যতই প্রমাণ দিয়েছি, তাঁদের নির্দিষ্ট বাহ্য লক্ষণের সঙ্গে মেলে না বলে কিছুতেই তাকে দেশ-ভালোবাসা বলে স্বীকার করাতে পারি নে।

ছেলেবেলা থেকে আমি গ্রন্থবিলাসী, নতুন বইয়ের খবর পেলেই কিনে আনি। আমার শত্রুরাও কবুল করবে যে, সে বই পড়েও থাকি ; বন্ধুরা খুবই জানেন যে, প'ড়ে তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করতেও ছাড়ি নে।— সেই আলোচনার চোটে বন্ধুরা পাশ কাটিয়ে চলাতে অবশেষে একটিমাত্র মানুষে এসে ঠেকেছে, বনবিহারী, যাকে নিয়ে আমি রবিবারে আসর জমাই। আমি তার নাম দিয়েছি কোণবিহারী। ছাদে বসে তার সঙ্গে আলাপ করতে করতে এক-একদিন রাত্তির দুটো হয়ে যায়। আমরা যখন এই নেশায় ভোর তখন আমাদের পক্ষে সুদিন ছিল না। তখনকার পুলিস কারও বাড়িতে গীতা দেখলেই সিডিশনের প্রমাণ পেত। তখনকার দেশভক্ত যদি দেখত কারও ঘরে বিলিতি বইয়ের পাতা কাটা, তবে তাকে জানত দেশবিদ্রোহী। আমাকে ওরা শ্যামবর্ণের প্রলেপ দেওয়া শ্বেত-দ্বৈপায়ন বলেই গণ্য করত। সরস্বতীর বর্ণ সাদা বলেই সেদিন দেশভক্তদের কাছ থেকে তাঁর পূজা মেলা শক্ত হয়েছিল। যে-সরোবরে তাঁর শ্বেতপদ্ম ফোটে সেই সরোবরের জলে দেশের কপাল-পোড়ানো আগুন নেবে না, বরঞ্চ বাড়ে, এমনি একটা রব উঠেছিল।

সহধর্মিণীর সদ্‌দৃষ্টান্ত ও নিরন্তর তাগিদ সত্ত্বেও আমি খদ্দর পরি নে ; তার কারণ এ নয় যে, খদ্দরে কোনো দোষ আছে বা গুণ নেই বা বেশভূষায় আমি শৌখিন। একেবারে উলটো — স্বাদেশিক চালচলনের বিরুদ্ধে অনেক অপরাধ আমার আছে, কিন্তু পরিচ্ছন্নতা তার অন্তর্গত নয়। ময়লা মোটা রকমের সাজ, আলুথালু রকমে ব্যবহার করাটাই আমার অভ্যাস। কলিকার ভাবান্তর ঘটবার পূর্ববর্তী যুগে চীনেবাজারের আগা-চওড়া জুতো পরতুম, সে জুতোয় প্রতিদিন কালিমা-লেপন করিয়ে নিতে ভুলতুম, মোজা পরতে আপদ বোধ হত, শার্ট না পরে পাঞ্জাবি পরতে আরাম পেতুম, আর সেই পাঞ্জাবিতে দুটো-একটা বোতামের অভাব ঘটলেও খেয়াল করতুম না— ইত্যাদি কারণে কলিকার সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হবার আশঙ্কা ঘটেছিল।

সে বলত, "দেখো, তোমার সঙ্গে কোথাও বেরতে আমার লজ্জা করে।"

আমি বলতুম, "আমার অনুগত হবার দরকার নেই, আমাকে বাদ দিয়েই তুমি বেরিয়ো।"

আজ যুগের পরিবর্তন হয়েছে, আমার ভাগ্যের পরিবর্তন হয় নি। আজও কলিকা বলে, 'তোমার সঙ্গে বেরতে আমার লজ্জা করে।' তখন কলিকা যে-দলে ছিল তাদের উর্দি আমি ব্যবহার করি নি, আজ যে-দলে ভিড়েছে তাদের উর্দিও গ্রহণ করতে পারলুম না। আমাকে নিয়ে আমার স্ত্রীর লজ্জা সমানই রয়ে গেল। এটা আমারই স্বভাবের দোষ। যে-কোনো দলেরই হোক, ভেক ধারণ করতে আমার সংকোচ লাগে। কিছুতেই এটা কাটাতে পারলুম না। অপর পক্ষে মতান্তর জিনিসটা কলিকা খতম করে মেনে নিতে পারে না। ঝরনার ধারা যেমন মোটা পাথরটাকে বারে বারে ঘুরে ফিরে তর্জন করে বৃথা ঠেলা দিতেই থাকে, তেমনি ভিন্ন রুচিকে চলতে ফিরতে দিনে রাত্রে ঠেলা না দিয়ে কলিকা থাকতে পারে না ; পৃথক মত নামক পদার্থের সংস্পর্শমাত্র ওর স্নায়ুতে যেন দুর্নিবারভাবে সুড়সুড়ি লাগায়, ওকে একেবারে ছটফটিয়ে তোলে।

কাল চায়ের নিমন্ত্রণে যাবার পূর্বেই আমার নিষ্‌খদ্দর বেশ নিয়ে একসহস্র-একতম বার কলিকা যে আলোচনা উত্থাপিত করেছিল, তাতে তার কণ্ঠস্বরে মাধুর্যমাত্র ছিল না। বুদ্ধির অভিমান থাকাতে বিনা তর্কে তার ভর্ৎসনা শিরোধার্য করে নিতে পারি নি— স্বভাবের প্রবর্তনায় মানুষকে এত ব্যর্থ চেষ্টাতেও উৎসাহিত করে। তাই আমিও একসহস্র-একতম বার কলিকাকে খোঁটা দিয়ে বললুম, "মেয়েরা বিধিদত্ত চোখটার উপর কালাপেড়ে মোটা ঘোমটা টেনে আচারের সঙ্গে আঁচলের গাঁট বেঁধে চলে। মননের চেয়ে মাননেই তাদের আরাম। জীবনের সকল ব্যবহারকেই রুচি ও বুদ্ধির স্বাধীন ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে সংস্কারের জেনানায় পর্দানশীন করতে পারলে তারা বাঁচে। আমাদের এই আচারজীর্ণ দেশে খদ্দর-পরাটা সেইরকম মালাতিলকধারী ধার্মিকতার মতোই একটা সংস্কারে পরিণত হতে চলেছে বলেই মেয়েদের ওতে এত আনন্দ।"

কলিকা রেগে অস্থির হয়ে উঠল। তার আওয়াজ শুনে পাশের ঘর থেকে দাসীটা মনে করলে, ভার্যাকে পুরো ওজনের গয়না দিতে কর্তা বুঝি ফাঁকি দিয়েছে। কলিকা বললে, "দেখো, খদ্দর-পরার শুচিতা যেদিন গঙ্গাস্নানের মতোই দেশের লোকের সংস্কারে বাঁধা পড়ে যাবে সেদিন দেশ বাঁচবে। বিচার যখন স্বভাবের সঙ্গে এক হয়ে যায় তখনি সেটা হয় আচার। চিন্তা যখন আকারে দৃঢ়বদ্ধ হয় তখনি সেটা হয় সংস্কার ; তখন মানুষ চোখ বুজে কাজ করে যায়, চোখ খুলে দ্বিধা করে না।"

এই কথাগুলো অধ্যাপক নয়নমোহনের আপ্তবাক্য, তার থেকে কোটেশনমার্কা ক্ষয়ে গিয়েছে, কলিকা ওগুলোকে নিজের স্বচিন্তিত বলেই জানে।

'বোবার শত্রু নেই' যে পুরুষ বলেছিল সে নিশ্চয় ছিল অবিবাহিত। কোনো জবাব দিলুম না দেখে কলিকা দ্বিগুণ ঝেঁকে উঠে বললে, "বর্ণভেদ তুমি মুখে অগ্রাহ্য কর অথচ কাজে তার প্রতিকারের জন্য কিছুই কর না। আমরা খদ্দর পরে পরে সেই ভেদটার উপর অখণ্ড সাদা রঙ বিছিয়ে দিয়েছি, আবরণভেদ তুলে দিয়ে বর্ণভেদটার ছাল ছাড়িয়ে ফেলেছি।"

বলতে যাচ্ছিলুম,'বর্ণভেদকে মুখেই অগ্রাহ্য করেছিলুম বটে যখন থেকে মুসলমানের রান্না মুরগির ঝোল গ্রাহ্য করেছিলুম। সেটা কিন্তু মুখস্থ বাক্য নয়, মুখস্থ কার্য— তার গতিটা অন্তরের দিকে। কাপড় দিয়ে বর্ণ-বৈষম্য ঢাকা দেওয়াটা বাহ্যিক; ওতে ঢাকা দেওয়াই হয়, মুছে দেওয়া হয় না।' তর্কটাকে প্রকাশ করে বলবার যোগ্য সাহস কিন্তু হল না। আমি ভীরু পুরুষমানুষ মাত্র, চুপ করে রইলুম। জানি আপসে আমরা দুজনে যে-সব তর্ক শুরু করি কলিকা সেগুলিকে নিয়ে ধোবার বাড়ির কাপড়ের মতো আছড়িয়ে কচলিয়ে আনে তার বাহিরের বন্ধুমহল থেকে। দর্শনের প্রফেসর নয়নমোহনের কাছ থেকে প্রতিবাদ সংগ্রহ করে তার দীপ্ত চক্ষু নীরব ভাষায় আমাকে বলতে থাকে, "কেমন! জব্দ!"

নয়নের ওখানে নিমন্ত্রণে যাবার ইচ্ছা আমার একটুও ছিল না। নিশ্চয় জানি, হিন্দু-কাল্‌চারে সংস্কার ও স্বাধীন বুদ্ধি, আচার ও বিচারের আপেক্ষিক স্থানটা কী, এবং সেই আপেক্ষিকতায় আমাদের দেশকে অন্য সকল দেশের চেয়ে উৎকর্ষ কেন দিয়েছে, এই নিয়ে চায়ের টেবিলে তপ্ত চায়ের ধোঁয়ার মতোই সূক্ষ্ম আলোচনায় বাতাস আর্দ্র ও আচ্ছন্ন হবার আশু সম্ভাবনা আছে। এদিকে সোনালি পত্রলেখায় মণ্ডিত অখণ্ডিতপত্রবতী নবীন বইগুলি সদ্য দোকান থেকে আমার তাকিয়ার পাশে প্রতীক্ষা করছে, শুভদৃষ্টিমাত্র হয়েছে, কিন্তু এখনো তাদের ব্রাউন মোড়কের অবগুণ্ঠন-মোচন হয় নি; তাদের সম্বন্ধে আমার পূর্বরাগ প্রতি মুহূর্তে অন্তরে অন্তরে প্রবল হয়ে উঠছে। তবু বেরোতে হল; কারণ ধ্রুবতারার ইচ্ছাবেগ প্রতিহত হলে সেটা তার বাক্যে ও অবাক্যে এমন সকল ঘূর্ণীরূপ ধারণ করে যেটা আমার পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়।

বাড়ি থেকে অল্প একটু বেরিয়েছি। যেখানে রাস্তার ধারে কলতলা পেরিয়ে খোলার চালের ধারে স্থূলোদর হিন্দুস্থানী ময়রার দোকানে তেলে-ভাজা নানা প্রকার অপথ্য সৃষ্টি হচ্ছে, তার সামনে এসে দেখি বিষম একটা হল্লা। আমাদের প্রতিবেশী মাড়োয়ারিরা নানা বহুমূল্য পুজোপচার নিয়ে যাত্রা করে সবে-মাত্র বেরিয়েছে। এমন সময় এই জায়গাটাতে এসে ঠেকে গেল। শুনতে পেলেম মার্-মার্ ধ্বনি। মনে ভাবলুম, কোনো গাঁটকাটাকে শাসন চলছে।

মোটরের শিঙা ফুঁকতে ফুঁকতে উত্তেজিত জনতার কেন্দ্রের কাছে গিয়ে দেখি, আমাদের পাড়ার বুড়ো সরকারি মেথরটাকে বেদম মারছে। একটু আগেই রাস্তার কলতলায় স্নান সেরে সাফ কাপড় পরে ডান হাতে এক বালতি জল ও বগলে ঝাঁটা নিয়ে রাস্তা দিয়ে সে যাচ্ছিল। গায়ে চেক-কাটা মেরজাই, আঁচড়ানো চুল ভিজে; বাঁ হাত ধরে সঙ্গে চলেছিল আট-নয় বছরের এক নাতি। দুজনকেই দেখতে সুশ্রী, সুঠাম দেহ। সেই ভিড়ে কারও সঙ্গে বা কিছুর সঙ্গে তাদের ঠেকাঠেকি হয়ে থাকবে। তার থেকে এই নিরন্তর মারের সৃষ্টি। নাতিটা কাঁদছে আর সকলকে অনুনয় করছে, "দাদাকে মেরো না।" বুড়োটা হাত জোড় করে বলছে, "দেখতে পাই নি, বুঝতে পারি নি, কসুর মাফ করো।" অহিংসাব্রত পুণ্যার্থীদের রাগ চড়ে উঠছে। বুড়োর ভীত চোখ দিয়ে জল পড়ছে, দাড়ি দিয়ে রক্ত।

আমার আর সহ্য হয় না। ওদের সঙ্গে কলহ করতে নামা আমার পক্ষে অসম্ভব। স্থির করলুম, মেথরকে আমার নিজের গাড়িতে তুলে নিয়ে দেখাব আমি ধার্মিকদের দলে নই।

চঞ্চলতা দেখে কলিকা আমার মনের ভাব বুঝতে পারলে। জোর করে আমার হাত চেপে ধরে বললে, "করছ কী, ও যে মেথর।"

আমি বললুম, "হোক-না মেথর, তাই বলে ওকে অন্যায় মারবে?"

কলিকা বললে, "ওরই তো দোষ। রাস্তার মাঝখান দিয়ে যায় কেন। পাশ কাটিয়ে গেলে কি ওর মানহানি হত।"

আমি বললুম, "সে আমি বুঝি নে, ওকে আমি গাড়িতে তুলে নেবই।"

কলিকা বললে, "তা হলে এখনি এখানে রাস্তায় নেমে যাব। মেথরকে গাড়িতে নিতে পারব না— হাড়িডোম হলেও বুঝতুম, কিন্তু মেথর!"

আমি বললুম, "দেখছ-না, স্নান করে ধোপ-দেওয়া কাপড় পরেছে? এদের অনেকের চেয়ে ও পরিষ্কার।"

"তা হোক-না, ও যে মেথর!"

শোফারকে বললে, "গঙ্গাদীন, হাঁকিয়ে চলে যাও।"

আমারই হার হল। আমি কাপুরুষ। নয়নমোহন সমাজতত্ত্বঘটিত গভীর যুক্তি বের করেছিল— সে আমার কানে পৌঁছল না, তার জবাবও দিই নি।

মাদ্রাজ, ১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫

আষাঢ়, ১৩৩৫

বলাই

মানুষের জীবনটা পৃথিবীর নানা জীবের ইতিহাসের নানা পরিচ্ছেদের উপসংহারে, এমন একটা কথা আছে। লোকালয়ে মানুষের মধ্যে আমরা নানা জীবজন্তুর প্রচ্ছন্ন পরিচয় পেয়ে থাকি, সে কথা জানা। বস্তুত আমরা মানুষ বলি সেই পদার্থকে যেটা আমাদের ভিতরকার সব জীবজন্তুকে মিলিয়ে এক করে নিয়েছে— আমাদের বাঘ-গোরুকে এক খোঁয়াড়ে দিয়েছে পুরে, অহি-নকুলকে এক খাঁচায় ধরে রেখেছে। যেমন রাগিণী বলি তাকেই যা আপনার ভিতরকার সমুদয় সা-রে-গা-মা-গুলোকে সংগীত করে তোলে, তার পর থেকে তাদের আর গোলমাল করবার সাধ্য থাকে না। কিন্তু, সংগীতের ভিতরে এক-একটি সুর অন্য সকল সুরকে ছাড়িয়ে বিশেষ হয়ে ওঠে— কোনোটাতে মধ্যম, কোনোটাতে কোমলগান্ধার, কোনোটাতে পঞ্চম।

আমার ভাইপো বলাই— তার প্রকৃতিতে কেমন করে গাছপালার মূল সুরগুলোই হয়েছে প্রবল। ছেলেবেলা থেকেই চুপচাপ চেয়ে চেয়ে দেখাই তার অভ্যাস, নড়ে-চড়ে বেড়ানো নয়। পুবদিকের আকাশে কালো মেঘ স্তরে স্তরে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ায়, ওর সমস্ত মনটাতে ভিজে হাওয়া যেন শ্রাবণ-অরণ্যের গন্ধ নিয়ে ঘনিয়ে ওঠে ; ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ে, ওর সমস্ত গা যেন শুনতে পায় সেই বৃষ্টির শব্দ। ছাদের উপর বিকেল-বেলাকার রোদ্দুর পড়ে আসে, গা খুলে বেড়ায় ; সমস্ত আকাশ থেকে যেন কী একটা সংগ্রহ করে নেয়। মাঘের শেষে আমের বোল ধরে, তার একটা নিবিড় আনন্দ জেগে ওঠে ওর রক্তের মধ্যে, একটা কিসের অব্যক্ত স্মৃতিতে ; ফাল্গুনে পুষ্পিত শালবনের মতোই ওর অন্তর-প্রকৃতিটা চার দিকে বিস্তৃত হয়ে ওঠে, ভরে ওঠে, তাতে একটা ঘন রঙ লাগে। তখন ওর একলা বসে বসে আপন মনে কথা কইতে ইচ্ছে করে, যা-কিছু গল্প শুনেছে সব নিয়ে জোড়াতাড়া দিয়ে ; অতি পুরানো বটের কোটরে বাসা বেঁধে আছে যে একজোড়া অতি পুরানো পাখি, বেঙ্গমা বেঙ্গমী, তাদের গল্প। ওই ড্যাবা-ড্যাবা-চোখ-মেলে-সর্বদা-তাকিয়ে-থাকা ছেলেটা বেশি কথা কইতে পারে না। তাই ওকে মনে মনে অনেক বেশি ভাবতে হয়। ওকে একবার পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিলুম। আমাদের বাড়ির সামনে ঘন সবুজ ঘাস পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচে পর্যন্ত নেবে গিয়েছে, সেইটে দেখে আর ওর মন ভারি খুশি হয়ে ওঠে। ঘাসের আস্তরণটা একটা স্থির পদার্থ তা ওর মনে হয় না ; ওর বোধ হয়, যেন ওই ঘাসের পুঞ্জ একটা গড়িয়ে-চলা খেলা, কেবলই গড়াচ্ছে ; প্রায়ই তারই সেই ঢালু বেয়ে ও নিজেও

গড়াত— সমস্ত দেহ দিয়ে ঘাস হয়ে উঠত— গড়াতে গড়াতে ঘাসের আগায় ওর ঘাড়ের কাছে সুড়সুড়ি লাগত আর ও খিলখিল করে হেসে উঠত।

রাত্রে বৃষ্টির পরে প্রথম সকালে সামনের পাহাড়ের শিখর দিয়ে কাঁচা সোনারঙের রোদ্দুর দেবদারুবনের উপরে এসে পড়ে— ও কাউকে না বলে আস্তে আস্তে গিয়ে সেই দেবদারুবনের নিস্তব্ধ ছায়াতলে একলা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, গা ছমছম করে— এই-সব প্রকাণ্ড গাছের ভিতরকার মানুষকে ও যেন দেখতে পায়। তারা কথা কয় না, কিন্তু সমস্তই যেন জানে। তারা-সব যেন অনেক কালের দাদামশায়, 'এক যে ছিল রাজা'দের আমলের।

ওর ভাবে-ভোলা চোখটা কেবল যে উপরের দিকেই তা নয়, অনেক সময় দেখেছি, ও আমার বাগানে বেড়াচ্ছে মাটির দিকে কী খুঁজে খুঁজে। নতুন অঙ্কুরগুলো তাদের কোঁকড়ানো মাথাটুকু নিয়ে আলোতে ফুটে উঠছে এই দেখতে তার ঔৎসুক্যের সীমা নেই। প্রতিদিন ঝুঁকে পড়ে পড়ে তাদেরকে যেন জিজ্ঞাসা করে, 'তার পরে? তার পরে? তার পরে?' তারা ওর চির-অসমাপ্ত গল্প। সদ্য গজিয়ে-ওঠা কচি কচি পাতা, তাদের সঙ্গে ওর কী যে একটা বয়স্যভাব তা ও কেমন করে প্রকাশ করবে। তারাও ওকে কী একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার জন্য আঁকুপাঁকু করে। হয়তো বলে, 'তোমার নাম কী।' হয়তো বলে, 'তোমার মা কোথায় গেল।' বলাই মনে মনে উত্তর করে, 'আমার মা তো নেই।'

কেউ গাছের ফুল তোলে এইটে ওর বড়ো বাজে। আর-কারও কাছে ওর এই সংকোচের কোনো মানে নেই, এটাও সে বুঝেছে। এইজন্যে ব্যথাটা লুকোতে চেষ্টা করে। ওর বয়সের ছেলেগুলো গাছে ঢিল মেরে মেরে আমলকি পাড়ে, ও কিছু বলতে পারে না, সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। ওর সঙ্গীরা ওকে খ্যাপাবার জন্যে বাগানের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে ছড়ি দিয়ে দু পাশের গাছগুলোকে মারতে মারতে চলে, ফস্ ক'রে বকুলগাছের একটা ডাল ভেঙে নেয়— ওর কাঁদতে লজ্জা করে পাছে সেটাকে কেউ পাগলামি মনে করে। ওর সব-চেয়ে বিপদের দিন, যেদিন ঘাসিয়াড়া ঘাস কাটতে আসে। কেননা, ঘাসের ভিতরে ভিতরে ও প্রত্যহ দেখে দেখে বেড়িয়েছে— এতটুকু-টুকু লতা, বেগনি হল্‌দে নামহারা ফুল, অতি ছোটো ছোটো; মাঝে মাঝে কন্টিকারি গাছ, তার নীল নীল ফুলের বুকের মাঝখানটিতে ছোট্ট একটুখানি সোনার ফোঁটা; বেড়ার কাছে কাছে কোথাও-বা কালমেঘের লতা, কোথাও-বা অনন্তমূল; পাখিতে-খাওয়া নিমফলের বিচি পড়ে ছোটো ছোটো চারা বেরিয়েছে, কী সুন্দর তার পাতা— সমস্তই নিষ্ঠুর নিড়নি দিয়ে দিয়ে নিড়িয়ে

ফেলা হয়। তারা বাগানের শৌখিন গাছ নয়, তাদের নালিশ শোনবার কেউ নেই।

এক-একদিন ওর কাকির কোলে এসে বসে তার গলা জড়িয়ে বলে, "ওই ঘাসিয়াড়াকে বলো-না, আমার ওই গাছগুলো যেন না কাটে।"

কাকি বলে, "বলাই, কী যে পাগলের মতো বকিস। ও যে সব জঙ্গল, সাফ না করলে চলবে কেন।"

বলাই অনেকদিন থেকে বুঝতে পেরেছিল, কতকগুলো ব্যথা আছে যা সম্পূর্ণ ওর একলারই— ওর চার দিকের লোকের মধ্যে তার কোনো সাড়া নেই।

এই ছেলের আসল বয়স সেই কোটি বৎসর আগেকার দিনে, যেদিন সমুদ্রের গর্ভ থেকে নতুন-জাগা পঙ্কস্তরের মধ্যে পৃথিবীর ভাবী অরণ্য আপনার জন্মের প্রথম ক্রন্দন উঠিয়েছে— সেদিন পশু নেই, পাখি নেই, জীবনের কলরব নেই, চার দিকে পাথর আর পাঁক আর জল। কালের পথে সমস্ত জীবের অগ্রগামী গাছ, সূর্যের দিকে জোড় হাত তুলে বলেছে, 'আমি থাকব, আমি বাঁচব, আমি চিরপথিক, মৃত্যুর পর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অন্তহীন প্রাণের বিকাশতীর্থে যাত্রা করব রৌদ্রে-বাদলে, দিনে-রাত্রে।' গাছের সেই রব আজও উঠছে বনে বনে, পর্বতে প্রান্তরে, তাদেরই শাখায় পত্রে ধরণীর প্রাণ বলে বলে উঠছে, 'আমি থাকব, আমি থাকব।' বিশ্বপ্রাণের মূক ধাত্রী এই গাছ নিরবচ্ছিন্ন কাল ধরে দ্যুলোককে দোহন করে ; পৃথিবীর অমৃতভাণ্ডারের জন্যে প্রাণের তেজ, প্রাণের রস, প্রাণের লাবণ্য সঞ্চয় করে ; আর উৎকণ্ঠিত প্রাণের বাণীকে অহর্নিশি আকাশে উচ্ছ্বসিত করে তোলে, 'আমি থাকব।' সেই বিশ্বপ্রাণের বাণী কেমন-এক-রকম করে আপনার রক্তের মধ্যে শুনতে পেয়েছিল ওই বলাই। আমরা তাই নিয়ে খুব হেসেছিলুম।

একদিন সকালে একমনে খবরের কাগজ পড়ছি, বলাই আমাকে ব্যস্ত করে ধরে নিয়ে গেল বাগানে। এক জায়গায় একটা চারা দেখিয়ে আমকে জিজ্ঞাসা করলে, "কাকা, এ গাছটা কী।"

দেখলুম একটা শিমুলগাছের চারা বাগানের খোওয়া-দেওয়া রাস্তার মাঝখানেই উঠেছে।

হায় রে, বলাই ভুল করেছিল আমাকে ডেকে নিয়ে এসে। এতটুকু যখন এর অঙ্কুর বেরিয়েছিল, শিশুর প্রথম প্রলাপটুকুর মতো, তখনই এটা বলাইয়ের চোখে পড়েছে। তার পর থেকে বলাই প্রতিদিন নিজের হাতে একটু একটু জল দিয়েছে, সকালে বিকেলে ক্রমাগতই ব্যগ্র হয়ে দেখেছে কতটুকু বাড়ল। শিমুলগাছ বাড়েও

মস্ত, কিন্তু বলাইয়ের আগ্রহের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। যখন হাত দুয়েক উঁচু হয়েছে তখন ওর পত্রসমৃদ্ধি দেখে ভাবলে এ একটা আশ্চর্য গাছ, শিশুর প্রথম বুদ্ধির আভাস দেখবা মাত্র মা যেমন মনে করে আশ্চর্য শিশু। বলাই ভাবলে, আমাকেও চমৎকৃত করে দেবে।

আমি বললুম, "মালীকে বলতে হবে, এটা উপড়ে ফেলে দেবে।"

বলাই চমকে উঠল। এ কী দারুণ কথা। বললে, "না, কাকা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, উপড়ে ফেলো না।"

আমি বললুম, "কী যে বলিস তার ঠিক নেই। একেবারে রাস্তার মাঝখানে উঠেছে। বড়ো হলে চার দিকে তুলো ছড়িয়ে অস্থির করে দেবে।"

আমার সঙ্গে যখন পারলে না, এই মাতৃহীন শিশুটি গেল তার কাকির কাছে। কোলে বসে তার গলা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে, "কাকি, তুমি কাকাকে বারণ করে দাও, গাছটা যেন না কাটেন।"

উপায়টা ঠিক ঠাওরেছিল। ওর কাকি আমাকে ডেকে বললে, "ওগো, শুনছ। আহা, ওর গাছটা রেখে দাও।"

রেখে দিলুম। গোড়ায় বলাই না যদি দেখাত তবে হয়তো ওটা আমার লক্ষ্যই হত না। কিন্তু, এখন রোজই চোখে পড়ে। বছরখানেকের মধ্যে গাছটা নির্লজ্জের মতো মস্ত বেড়ে উঠল। বলাইয়ের এমন হল, এই গাছটার 'পরেই তার সব-চেয়ে স্নেহ।

গাছটাকে প্রতিদিনই দেখাচ্ছে নিতান্ত নির্বোধের মতো। একটা অজায়গায় এসে দাঁড়িয়ে কাউকে খাতির নেই, একেবারে খাড়া লম্বা হয়ে উঠছে। যে দেখে সেই ভাবে, এটা এখানে কী করতে। আরও দু-চারবার এর মৃত্যুদণ্ডের প্রস্তাব করা গেল। বলাইকে লোভ দেখালুম, এর বদলে খুব ভালো কতকগুলো গোলাপের চারা আনিয়ে দেব।

বললেম, "নিতান্তই শিমুলগাছই যদি তোমার পছন্দ, তবে আর-একটা চারা আনিয়ে বেড়ার ধারে পুঁতে দেব, সুন্দর দেখতে হবে।"

কিন্তু কাটবার কথা বললেই বলাই আঁতকে ওঠে, আর ওর কাকি বলে, "আহা, এমনিই কী খারাপ দেখতে হয়েছে।"

আমার বউদিদির মৃত্যু হয়েছে যখন এই ছেলেটি তাঁর কোলে। বোধ করি সেই শোকে দাদার খেয়াল গেল, তিনি বিলেতে এঞ্জিনিয়ারিং শিখতে গেলেন। ছেলেটি আমার নিঃসন্তান ঘরে কাকির কোলেই মানুষ। বছর দশেক পরে দাদা

ফিরে এসে বলাইকে বিলাতি কায়দায় শিক্ষা দেবেন বলে প্রথমে নিয়ে গেলেন সিমলেয়— তার পরে বিলেত নিয়ে যাবার কথা।

কাঁদতে কাঁদতে কাকির কোল ছেড়ে বলাই চলে গেল, আমাদের ঘর হল শূন্য।

তার পরে দু বছর যায়। ইতিমধ্যে বলাইয়ের কাকি গোপনে চোখের জল মোছেন, আর বলাইয়ের শূন্য শোবার ঘরে গিয়ে তার ছেঁড়া একপাটি জুতো, তার রবারের ফাটা গোলা, আর জানোয়ারের গল্পওয়ালা ছবির বই নাড়েন-চাড়েন; এতদিনে এই-সব চিহ্নকে ছাড়িয়ে গিয়ে বলাই অনেক বড়ো হয়ে উঠেছে, এই কথা বসে বসে চিন্তা করেন।

কোনো এক সময়ে দেখলুম, লক্ষ্মীছাড়া শিমুলগাছটার বড়ো বাড় বেড়েছে— এতদূর অসংগত হয়ে উঠেছে যে, আর প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। এক সময়ে দিলুম তাকে কেটে।

এমন সময়ে সিমলে থেকে বলাই তার কাকিকে এক চিঠি পাঠালে, "কাকি, আমার সেই শিমুলগাছের একটা ফোটোগ্রাফ পাঠিয়ে দাও।"

বিলেত যাবার পূর্বে একবার আমাদের কাছে আসবার কথা ছিল, সে আর হল না। তাই বলাই তার বন্ধুর ছবি নিয়ে যেতে চাইলে।

তার কাকি আমাকে ডেকে বললেন, "ওগো শুনছ, একজন ফোটোগ্রাফওয়ালা ডেকে আনো।"

জিজ্ঞাসা করলুম, "কেন।"

বলাইয়ের কাঁচা হাতের লেখা চিঠি আমাকে দেখতে দিলেন।

আমি বললেম, "সে গাছ তো কাটা হয়ে গেছে।"

বলাইয়ের কাকি দু দিন অন্ন গ্রহণ করলেন না, আর অনেকদিন পর্যন্ত আমার সঙ্গে একটি কথাও কন নি। বলাইয়ের বাবা ওকে তাঁর কোল থেকে নিয়ে গেল, সে যেন ওঁর নাড়ি ছিঁড়ে; আর ওর কাকা তাঁর বলাইয়ের ভালোবাসার গাছটিকে চিরকালের মতো সরিয়ে দিলে, তাতেও ওঁর যেন সমস্ত সংসারকে বাজল, তাঁর বুকের মধ্যে ক্ষত করে দিলে।

ঐ গাছ যে ছিল তাঁর বলাইয়ের প্রতিরূপ, তারই প্রাণের দোসর।

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫

চিত্রকর

ময়মনসিংহ ইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে আমাদের গোবিন্দ এল কলকাতায়। বিধবা মায়ের অল্প কিছু সম্বল ছিল। কিন্তু, সব-চেয়ে তার বড়ো সম্বল ছিল নিজের অবিচলিত সংকল্পের মধ্যে। সে ঠিক করেছিল, 'পয়সা' করবই, সমস্ত জীবন উৎসর্গ করে দিয়ে। সর্বদাই তার ভাষায় ধনকে সে উল্লেখ করত 'পয়সা' বলে। অর্থাৎ, তার মনে খুব একটা দর্শন স্পর্শন ঘ্রাণের যোগ্য প্রত্যক্ষ পদার্থ ছিল; তার মধ্যে বড়ো নামের মোহ ছিল না; অত্যন্ত সাধারণ পয়সা, হাটে হাটে হাতে হাতে ঘুরে ঘুরে ক্ষয়ে যাওয়া, মলিন হয়ে যাওয়া পয়সা, তাম্রগন্ধী পয়সা, কুবেরের আদিম স্বরূপ, যা রুপোয় সোনায় কাগজে দলিলে নানা মূর্তি পরিগ্রহ করে মানুষের মনকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

নানা বাঁকা পথের ভিতর দিয়ে নানা পঙ্কে আবিল হতে হতে আজ গোবিন্দ তার পয়সাপ্রবাহিণীর প্রশস্তধারার পাকা বাঁধানো ঘাটে এসে পৌঁচেছে। গানিব্যাগ্‌ওয়ালা বড়োসাহেব ম্যাক্‌ডুগালের বড়োবাবুর আসনে তার ধ্রুব প্রতিষ্ঠা। সবাই তাকে নাম দিয়েছিল ম্যাক্‌ডুলাল।

গোবিন্দর পিতৃব্য ভাই মুকুন্দ যখন উকিল-লীলা সংবরণ করলেন তখন একটি বিধবা স্ত্রী, একটি চার বছরের ছেলে, কলকাতায় একটি বাড়ি, কিছু জমা টাকা রেখে তিনি গেলেন লোকান্তরে। সম্পত্তির সঙ্গে কিছু ঋণও ছিল, সুতরাং তাঁর পরিবারের অন্নবস্ত্রের সংস্থান বিশেষ ব্যয়সংক্ষেপের উপর নির্ভর করত। এই কারণে তাঁর ছেলে চুনিলাল যে-সমস্ত উপকরণের মধ্যে মানুষ, প্রতিবেশীদের সঙ্গে তুলনায় সেগুলি খ্যাতিযোগ্য নয়।

মুকুন্দদাদার উইল-অনুসারে এই পরিবারের সম্পূর্ণ ভার পড়েছিল গোবিন্দর 'পরে। গোবিন্দ শিশুকাল থেকে ভ্রাতুষ্পুত্রের কানে মন্ত্র দিলে— 'পয়সা করো।'

ছেলেটির দীক্ষার পথে প্রধান বাধা দিলেন তাঁর মা সত্যবতী। স্পষ্ট কথায় তিনি কিছু বলেন নি, বাধাটা ছিল তাঁর ব্যবহারে। শিশুকাল থেকেই তাঁর বাতিক ছিল শিল্পকাজে। ফুল ফল পাতা নিয়ে, খাবারের জিনিস নিয়ে, কাগজ কেটে, কাপড় কেটে, মাটি দিয়ে, ময়দা দিয়ে, জামের রস ফলসার রস জবার রস শিউলি-বোঁটার রস দিয়ে, নানা অভূতপূর্ব অনাবশ্যক জিনিস রচনায় তাঁর আগ্রহের অন্ত ছিল না। এতে তাঁকে দুঃখও পেতে হয়েছে। কেননা, যা অদরকারি, যা অকারণ, তার বেগ আষাঢ়ের আকস্মিক বন্যাধারার মতো— সচলতা অত্যন্ত বেশি কিন্তু দরকারি কাজের খেয়া বাইবার পক্ষে অচল। মাঝে মাঝে এমনও হয়েছে, জ্ঞাতিবাড়িতে

নিমন্ত্রণ, সত্যবতী ভুলেই গেছেন, শোবার ঘরে দরজা বন্ধ, একতাল মাটি চটকে বেলা কাটছে। জ্ঞাতিরা বললে, বড়ো অহংকার। সন্তোষজনক জবাব দেবার জো নেই। এ-সব কাজেও ভালোমন্দর যে মূল্যবিচার চলে, সেটা বইপড়া বিদ্যার যোগেই মুকুন্দ জানতেন। আর্ট শব্দটার মাহাত্ম্যে শরীর রোমাঞ্চিত হত। কিন্তু, তাঁর আপন গৃহিণীর হাতের কাজেও যে এই শব্দটার কোনো স্থান আছে এমন কথা মনে করতেই পারতেন না। এই মানুষটির স্বভাবটিতে কোথাও কাঁটাখোঁচা ছিল না। তাঁর স্ত্রী অনাবশ্যক খেয়ালে অযথা সময় নষ্ট করেন, এটা দেখে তাঁর হাসি পেত, সে হাসি স্নেহরসে ভরা। এ নিয়ে সংসারের লোক কেউ যদি কটাক্ষ করত তিনি তখনই তার প্রতিবাদ করতেন। মুকুন্দর স্বভাবে অদ্ভুত একটা আত্মবিরোধ ছিল— ওকালতির কাজে ছিলেন প্রবীণ, কিন্তু ঘরের কাজে বিষয়বুদ্ধি ছিল না বললেই হয়। পয়সা তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে যথেষ্ট বইত, কিন্তু ধ্যানের মধ্যে আটকা পড়ত না। সেইজন্য মনটা ছিল মুক্ত; অনুগত লোকদের 'পরে নিজের ইচ্ছে চালাবার জন্যে কখনো দৌরাত্ম্য করতে পারতেন না। জীবনযাত্রার অভ্যাস ছিল খুব সাদাসিধা, নিজের স্বার্থ বা সেবা নিয়ে পরিজনদের 'পরে কোনোদিন অযথা দাবি করেন নি। সংসারের লোকে সত্যবতীর কাজে শৈথিল্য নিয়ে কটাক্ষ করলে মুকুন্দ তখনই সেটা থামিয়ে দিতেন। মাঝে মাঝে আদালত থেকে ফেরবার পথে রাধাবাজার থেকে কিছু রঙ, কিছু রঙিন রেশম, রঙের পেনসিল কিনে এনে সত্যবতীর অজ্ঞাতসারে তাঁর শোবার ঘরে কাঠের সিন্ধুকটার 'পরে সাজিয়ে রেখে আসতেন। কোনোদিন বা সত্যবতীর আঁকা একটা ছবি তুলে নিয়ে বলতেন, "বা, এ তো বড়ো সুন্দর হয়েছে।" একদিন একটা মানুষের ছবিকে উলটিয়ে ধরে তার পা দুটোকে পাখির মুণ্ড বলে স্থির করলেন; বললেন, "সতু, এটা কিন্তু বাঁধিয়ে রাখা চাই— বকের ছবি যা হয়েছে চমৎকার।" মুকুন্দ তাঁর স্ত্রীর চিত্ররচনায় ছেলেমানুষি কল্পনা করে মনে মনে যে-রসটুকু পেতেন, স্ত্রীও তাঁর স্বামীর চিত্রবিচার থেকে ভোগ করতেন সেই একই রস। সত্যবতী মনে নিশ্চিত জানতেন, বাংলাদেশের আর-কোনো পরিবারে তিনি এত ধৈর্য, এত প্রশ্রয় আশা করতে পারতেন না। শিল্পসাধনায় তাঁর এই দুর্নিবার উৎসাহকে কোনো ঘরে এত দরদের সঙ্গে পথ ছেড়ে দিত না। এইজন্যে যেদিন তাঁর স্বামী তাঁর কোনো রচনা নিয়ে অদ্ভুত অত্যুক্তি করতেন সেদিন সত্যবতী যেন চোখের জল সামলাতে পারতেন না।

এমন দুর্লভ সৌভাগ্যকেও সত্যবতী একদিন হারালেন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর স্বামী একটা কথা স্পষ্ট ক'রে বুঝেছিলেন যে, তাঁর ঋণজড়িত সম্পত্তির ভার এমন কোনো পাকা লোকের হাতে দেওয়া দরকার যাঁর চালনার কৌশলে ফুটো নৌকোও পার হয়ে

যাবে। এই উপলক্ষে সত্যবতী এবং তার ছেলেটি সম্পূর্ণভাবে গিয়ে পড়লেন গোবিন্দর হাতে। গোবিন্দ প্রথম দিন থেকেই জানিয়ে দিলেন, সর্বাগ্রে এবং সকলের উপরে পয়সা। গোবিন্দর এই উপদেশের মধ্যে এমন একটা সুগভীর হীনতা ছিল যে, সত্যবতী লজ্জায় কুণ্ঠিত হত।

তবু নানা আকারে আহারে-ব্যবহারে পয়সার সাধনা চলল। তা নিয়ে কথায় কথায় আলোচনা না করে তার উপরে যদি একটা আব্রু থাকত তা হলে ক্ষতি ছিল না। সত্যবতী মনে মনে জানতেন, এতে তাঁর ছেলের মনুষ্যত্ব খর্ব করা হয়— কিন্তু সহ্য করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না ; কেননা, যে-চিত্তভাব সুকুমার, যার মধ্যে একটি অসামান্য মর্যাদা আছে, সেই সব-চেয়ে অরক্ষিত ; তাকে আঘাত করা, বিদ্রূপ করা, সাধারণ রূঢ়স্বভাব মানুষের পক্ষে অত্যন্ত সহজ।

শিল্পচর্চার জন্যে কিছু কিছু উপকরণ আবশ্যক। এতকাল সত্যবতী তা না চাইতেই পেয়েছেন, সেজন্যে কোনোদিন তাঁকে কুণ্ঠিত হতে হয় নি। সংসারযাত্রার পক্ষে এই-সমস্ত অনাবশ্যক সামগ্রী, ব্যয়ের ফর্দে ধরে দিতে আজ যেন তাঁর মাথা কাটা যায়। তাই তিনি নিজের আহারের খরচ বাঁচিয়ে গোপনে শিল্পের সরঞ্জাম কিনিয়ে আনতেন। যা-কিছু কাজ করতেন সেও গোপনে দরজা বন্ধ করে। ভর্ৎসনার ভয়ে নয়, অরসিকের দৃষ্টিপাতের সংকোচে। আজ চুনি ছিল তাঁর শিল্পরচনার একমাত্র দর্শক ও বিচারকারী। এই কাজে ক্রমে তার সহযোগিতাও ফুটে উঠল। তাকে লাগল বিষম নেশা। শিশুর এ অপরাধ ঢাকা পড়ে না, খাতার পাতাগুলো অতিক্রম করে দেয়ালের গায়ে পর্যন্ত প্রকাশ হতে থাকে। হাতে মুখে জামার হাতায় কলঙ্ক ধরা পড়ে। পয়সা-সাধনার বিরুদ্ধে ইন্দ্রদেব শিশুর চিত্তকেও প্রলুব্ধ করতে ছাড়েন না। খুড়োর হাতে অনেক দুঃখ তাকে পেতে হল।

এক দিকে শাসন যতই বাড়তে চলল আর-এক দিকে মা তাকে ততই অপরাধে সহায়তা করতে লাগলেন। আপিসের বড়োসাহেব মাঝে মাঝে আপিসের বড়োবাবুকে নিয়ে আপন কাজে মফস্বলে যেতেন, সেই সময়ে মায়েতে ছেলেতে মিলে অবাধ আনন্দ। একেবারে ছেলেমানুষির একশেষ! যে-সব জন্তুর মূর্তি হত বিধাতা এখনো তাদের সৃষ্টি করেন নি— বেড়ালের ছাঁচের সঙ্গে কুকুরের ছাঁচ যেত মিলে, এমন-কি মাছের সঙ্গে পাখির প্রভেদ ধরা কঠিন হত। এই-সমস্ত সৃষ্টিকার্য রক্ষা করবার উপায় ছিল না— বড়োবাবু ফিরে আসবার পূর্বেই এদের চিহ্ন লোপ করতে হত। এই দুজনের সৃষ্টিলীলায় ব্রহ্মা এবং রুদ্রই ছিলেন, মাঝখানে বিষ্ণুর আগমন হল না।

শিল্পরচনাবায়ুর প্রকোপ সত্যবতীদের বংশে প্রবল ছিল। তারই প্রমাণস্বরূপে

সত্যবতীর চেয়ে বয়সে বড়ো তাঁরই এক ভাগ্‌নে রঙ্গলাল চিত্রবিদ্যায় হঠাৎ নামজাদা হয়ে উঠলেন। অর্থাৎ দেশের রসিক লোক তাঁর রচনার অদ্ভুতত্ব নিয়ে খুব অট্টহাস্য জমালে। তারা যে-রকম কল্পনা করে তার সঙ্গে তাঁর কল্পনার মিল হয় না দেখে তাঁর গুণপনার সম্বন্ধে তাদের প্রচণ্ড অবজ্ঞা হল। আশ্চর্য এই যে, এই অবজ্ঞার জমিতেই বিরোধ-বিদ্রূপের আবহাওয়ায় তাঁর খ্যাতি বেড়ে উঠতে লাগল; যারা তাঁর যতই নকল করে তারাই উঠে পড়ে লাগল প্রমাণ করতে যে, লোকটা আর্টিস্ট্ হিসাবে ফাঁকি— এমন-কি, তার টেক্‌নিকে সুস্পষ্ট গলদ। এই পরমনিন্দিত চিত্রকর একদিন আপিসের বড়োবাবুর অবর্তমানে এলেন তাঁর মামির বাড়িতে। দ্বারে ধাক্কা মেরে মেরে ঘরে যখন প্রবেশলাভ করলেন দেখলেন, মেঝেতে পা ফেলবার জো নেই। ব্যাপারখানা ধরা পড়ল। রঙ্গলাল বললেন, "এতদিন পরে দেখা গেল, গুণীর প্রাণের ভিতর থেকে সৃষ্টিমূর্তি তাজা বেরিয়েছে, এর মধ্যে দাগা-বুলোনোর তো কোনো লক্ষণ নেই, যে-বিধাতা রূপ সৃষ্টি করেন তাঁর বয়সের সঙ্গে ওর বয়সের মিল আছে। সব ছবিগুলো বের করে আমাকে দেখাও।"

কোথা থেকে বের করবে। যে-গুণী রঙে রঙে ছায়ায় আলোয় আকাশে আকাশে চিত্র আঁকেন তিনি তাঁর কুহেলিকা-মরীচিকাগুলি যেখানে অকাতরে সরিয়ে ফেলেন, এদের কীর্তিগুলোও সেইখানেই গেছে। রঙ্গলাল মাথার দিব্যি দিয়ে তাঁর মামিকে বললেন, "এবার থেকে তোমরা যা-কিছু রচনা করবে আমি এসে সংগ্রহ করে নিয়ে যাব।"

বড়োবাবু এখনো আসেন নি। সকাল থেকে শ্রাবণের ছায়ায় আকাশ ধ্যানমগ্ন, বৃষ্টি পড়ছে; বেলা ঘড়ির কাঁটার কোন্ সংকেতের কাছে তার ঠিকানা নেই, তার খোঁজ করতেও মন যায় না। আজ চুনিবাবু নৌকো-ভাসানোর ছবি আঁকতে লেগেছেন। নদীর ঢেউগুলো মকরের পাল, হাঁ করে নৌকোটাকে গিলতে চলেছে এমনিতরো ভাব; আকাশের মেঘগুলোও যেন উপর থেকে চাদর উড়িয়ে উৎসাহ দিচ্ছে বলে বোধ হচ্ছে— কিন্তু, মকরগুলো সর্বসাধারণের মকর নয়, আর মেঘগুলোকে 'ধূমজ্যোতিঃ-সলিলমরুতাং সন্নিবেশঃ' বললে অত্যুক্তি করা হবে। এ-কথাও সত্যের অনুরোধে বলা উচিত যে, এইরকমের নৌকো যদি গড়া হয় তা হলে ইন্‌সিয়োরেন্স্ আপিস কিছুতেই তার দায়িত্ব নিতে রাজি হবে না। চলল রচনা, আকাশের চিত্রীও যা-খুশি তাই করছেন, আর ঘরের মধ্যে ওই মস্ত চোখ-মেলা ছেলেটিও তথৈবচ।

এদের খেয়াল ছিল না যে, দরজা খোলা। বড়োবাবু এলেন। গর্জন করে উঠলেন, "কী হচ্ছে রে।"

ছেলেটার বুক কেঁপে উঠল, মুখ হল ফ্যাকাশে। স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, পরীক্ষায় চুনিলালের ইতিহাসে তারিখ ভুল হচ্ছে তার কারণটা কোথায়। ইতিমধ্যে চুনিলাল ছবিটাকে তার জামার মধ্যে লুকোবার ব্যর্থ প্রয়াস করাতে অপরাধ আরও প্রকাশমান হয়ে উঠল। টেনে নিয়ে গোবিন্দ যা দেখলেন তাতে তিনি আরও অবাক— এটা ব্যাপারখানা কী। এর চেয়ে যে ইতিহাসের তারিখ ভুলও ভালো। ছবিটা কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেললেন। চুনিলাল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

সত্যবতী একাদশীর দিন প্রায় ঠাকুরঘরেই কাটাতেন। সেইখান থেকে ছেলের কান্না শুনে ছুটে এলেন। ছবির ছিন্ন খণ্ডগুলো মেঝের উপর লুটোচ্ছে আর মেঝের উপর লুটোচ্ছে চুনিলাল। গোবিন্দ তখন ইতিহাসের তারিখ-ভুলের আদি কারণগুলো সংগ্রহ করছিলেন অপসারণের অভিপ্রায়ে।

সত্যবতী এতদিন কখনো গোবিন্দর কোনো ব্যবহারে কোনো কথা বলেন নি। এঁরই 'পরে তাঁর স্বামী নির্ভর স্থাপন করেছেন, এই স্মরণ করেই তিনি নিঃশব্দে সব সহ্য করেছেন। আজ তিনি অশ্রুতে আর্দ্র, ক্রোধে কম্পিত কণ্ঠে বললেন, "কেন তুমি চুনির ছবি ছিঁড়ে ফেললে।"

গোবিন্দ বললেন, "পড়াশুনো করবে না? আখেরে ওর হবে কী।"

সত্যবতী বললেন, "আখেরে ও যদি পথের ভিক্ষুক হয় সেও ভালো। কিন্তু, কোনোদিন তোমার মতো যেন না হয়। ভগবান ওকে যে-সম্পদ দিয়েছেন তারই গৌরব যেন তোমার পয়সার গর্বের চেয়ে বেশি হয়, এই ওর প্রতি আমার, মায়ের আশীর্বাদ।"

গোবিন্দ বললেন, "আমার দায়িত্ব আমি ছাড়তে পারব না, এ চলবে না কিছুতেই। আমি কালই ওকে বোর্ডিঙ-স্কুলে পাঠিয়ে দেব— নইলে তুমি ওর সর্বনাশ করবে।"

বড়োবাবু আপিসে গেলেন। ঘনবৃষ্টি নামল, রাস্তা জলে ভেসে যাচ্ছে।

সত্যবতী চুনির হাত ধরে বললেন, "চল্, বাবা।"

চুনি বললে, "কোথায় যাবে, মা।"

"এখান থেকে বেরিয়ে যাই।"

রঙ্গলালের দরজায় একহাঁটু জল। সত্যবতী চুনিলালকে নিয়ে তার ঘরে ঢুকলেন; বললেন, "বাবা, তুমি নাও এর ভার। বাঁচাও এ'কে পয়সার সাধনা থেকে।"

কার্তিক, ১৩৩৬

চোরাই ধন

মহাকাব্যের যুগে স্ত্রীকে পেতে হত পৌরুষের জোরে ; যে অধিকারী সেই লাভ করত রমণীরত্ন। আমি লাভ করেছি কাপুরুষতা দিয়ে, সে-কথা আমার স্ত্রীর জানতে বিলম্ব ঘটেছিল। কিন্তু, সাধনা করেছি বিবাহের পরে, যাকে ফাঁকি দিয়ে চুরি করে পেয়েছি তার মূল্য দিয়েছি দিনে দিনে।

দাম্পত্যের স্বত্ব সাব্যস্ত করতে হয় প্রতিদিনই নতুন করে, অধিকাংশ পুরুষ ভুলে থাকে এই কথাটা। তারা গোড়াতেই কাস্টম্‌ হৌসে মাল খালাস করে নিয়েছে সমাজের ছাড়চিঠি দেখিয়ে, তার পর থেকে আছে বেপরোয়া। যেন পেয়েছে পাহারাওয়ালার সরকারি প্রতাপ, উপরওয়ালার দেওয়া তকমার জোরে ; উর্দিটা খুলে নিলেই অতি অভাজন তারা।

বিবাহটা চিরজীবনের পালাগান ; তার ধুয়ো একটামাত্র, কিন্তু সংগীতের বিস্তার প্রতিদিনের নব নব পর্যায়ে। এই কথাটা ভালোরকম করে বুঝেছি সুনেত্রার কাছ থেকেই। ওর মধ্যে আছে ভালোবাসার ঐশ্বর্য, ফুরোতে চায় না তার সমারোহ ; দেউড়িতে চার-প্রহর বাজে তার সাহানা রাগিণী। আপিস থেকে ফিরে এসে একদিন দেখি আমার জন্যে সাজানো আছে বরফ-দেওয়া ফল্‌সার শরবত, রঙ দেখেই মনটা চমকে ওঠে ; তার পাশেই ছোটো রুপোর থালায় গোড়ে মালা, ঘরে ঢোকবার আগেই গন্ধ আসে এগিয়ে। আবার কোনোদিন দেখি আইসক্রিমের যন্ত্রে জমানো শাঁসে রসে মেশানো তালশাঁস এক-পেয়ালা, আর পিরিচে একটিমাত্র সূর্যমুখী। ব্যাপারটা শুনতে বেশি কিছু নয়, কিন্তু বোঝা যায়, দিনে দিনে নতুন করে সে অনুভব করেছে আমার অস্তিত্ব। এই পুরোনোকে নতুন করে অনুভব করার শক্তি আর্টিস্টের। আর ইতরে জনাঃ প্রতিদিন চলে দস্তুরের দাগা বুলিয়ে। ভালোবাসার প্রতিভা সুনেত্রার নবনবোন্মেষশালিনী সেবা। আজ আমার মেয়ে অরুণার বয়স সতেরো, অর্থাৎ ঠিক যে-বয়সে বিয়ে হয়েছিল সুনেত্রার। ওর নিজের বয়স আটত্রিশ, কিন্তু সযত্নে সাজসজ্জা করাটাকে ও জানে প্রতিদিন পুজোর নৈবেদ্য-সাজানো, আপনাকে উৎসর্গ করবার আহ্নিক অনুষ্ঠান।

সুনেত্রা ভালোবাসে শান্তিপুরে সাদা শাড়ি কালো পাড়ওয়ালা। খদ্দরপ্রচারকদের ধিক্কারকে বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করে নিয়েছে ; কিছুতেই স্বীকার করে নি খদ্দরকে। ও বলে দিশি তাঁতির হাত, দিশি তাঁতির তাঁত, এই আমার আদরের। তারা শিল্পী, তাদেরই পছন্দে সুতো, আমার পছন্দ সমস্ত কাপড়টা নিয়ে। আসল কথা, সুনেত্রা

বোঝে হালকা সাদা রঙের শাড়িতে সকল রঙেরই ইশারা খাটে সহজে। ও সেই কাপড়ে নূতনত্ব দেয় নানা আভাসে, মনে হয় না সেজেছে। ও বোঝে, আমার অবচেতন মনের দিগন্ত উদ্ভাসিত হয় ওর সাজে— আমি খুশি হই, জানি নে কেন খুশি হয়েছি।

প্রত্যেক মানুষেই আছে একজন আমি, সেই অপরিমেয় রহস্যের অসীম মূল্য জোগায় ভালোবাসায়। অহংকারের মেকি পয়সা তুচ্ছ হয়ে যায় এর কাছে। সুনেত্রা আপন মনপ্রাণ্ দিয়ে এই পরম মূল্য দিয়ে এসেছে আমাকে, আজ একুশ বছর ধরে। ওর শুভ্রললাটে কুঙ্কুমবিন্দুর মধ্যে প্রতিদিন লেখা হয় অক্লান্ত বিস্ময়ের বাণী। ওর নিখিল জগতের মর্মস্থান অধিকার করে আছি আমি, সেজন্যে আমাকে আর-কিছু হতে হয় নি সাধারণ জগতের যে-কেউ হওয়া ছাড়া। সাধারণকেই অসাধারণ ক'রে আবিষ্কার করে ভালোবাসা। শাস্ত্রে বলে, আপনাকে জানো। আনন্দে আপনাকেই জানি, আর-একজন যখন প্রেমে জেনেছে আমার আপনকে।

২

বাবা ছিলেন কোনো নামজাদা ব্যাঙ্কের অন্যতম অধিনায়ক, তারই একজন অংশিদার হলেম আমি। যাকে বলে ঘুমিয়ে-পড়া অংশিদার একেবারেই তা নয়। আষ্টেপৃষ্ঠে লাগাম দিয়ে জুতে দিলে আমাকে আপিসের কাজে। আমার শরীরমনের সঙ্গে এই কাজটা মানানসই নয়। ইচ্ছা ছিল, ফরেস্ট্ বিভাগে কোথাও পরিদর্শকের পদ দখল করে বসি, খোলা হাওয়ায় দৌড়ধাপ করি, শিকারের শখ নিই মিটিয়ে। বাবা তাকালেন প্রতিপত্তির দিকে ; বললেন, যে-কাজ পাচ্ছ সেটা সহজে জোটে না বাঙালির ভাগ্যে। হার মানতে হল। তা ছাড়া মনে হয়, পুরুষের প্রতিপত্তি জিনিসটা মেয়েদের কাছে দামী। সুনেত্রার ভগ্নীপতি অধ্যাপক ; ইম্পীরিএল সার্ভিস তার, সেটাতে ওদের মেয়েমহলের মাথা উপরে তুলে রাখে। যদি জংলি 'নিস্‌পেকেট্টর সাহেব' হয়ে সোলার হ্যাট পরে বাঘ-ভালুকের চামড়ায় মেঝে দিতুম ঢেকে, তাতে আমার দেহের গুরুত্ব কমিয়ে রাখত, সেই সঙ্গে কমাত আমার পদের গৌরব আর-পাঁচজন পদস্থ প্রতিবেশীর তুলনায়। কী জানি, এই লাঘবতায় মেয়েদের আত্মাভিমান বুঝি কিছু ক্ষুণ্ন করে।

এ দিকে ডেস্কে-বাঁধা স্থাবরত্বের চাপে দেখতে দেখতে আমার যৌবনের ধার আসছে ভোঁতা হয়ে। অন্য-কোনো পুরুষ হলে সে কথাটা নিশ্চিন্ত মনে ভুলে গিয়ে পেটের পরিধিবিস্তারকে দুর্বিপাক বলে গণ্য করত না। আমি তা পারি নে। আমি

জানি, সুনেত্রা মুগ্ধ হয়েছিল শুধু আমার গুণে নয়, আমার দেহসৌষ্ঠবে। বিধাতার স্বরচিত যে-বরমাল্য অঙ্গে নিয়ে একদিন তাকে বরণ করেছি নিশ্চিত তার প্রয়োজন আছে প্রতিদিনের অভ্যর্থনায়। আশ্চর্য এই যে, সুনেত্রার যৌবন আজও রইল অক্ষুণ্ণ, দেখতে দেখতে আমিই চলেছি ভাঁটার মুখে— শুধু ব্যাঙ্কে জমছে টাকা।

আমাদের মিলনের প্রথম অভ্যুদয়কে আর-একবার প্রত্যক্ষ চোখের সামনে আনল আমার মেয়ে অরুণা। আমাদের জীবনের সেই উষারুণরাগ দেখা দিয়েছে ওদের তারুণ্যের নবপ্রভাতে। দেখে পুলকিত হয়ে ওঠে আমার সমস্ত মন। কাঁচা ফুলের দিকে চেয়ে দেখি, আমার সেদিনকার বয়স ওর দেহে আবির্ভূত। যৌবনের সেই ক্ষিপ্রশক্তি, সেই অজস্র প্রফুল্লতা, আবার ক্ষণে ক্ষণে প্রতিহত দুরাশায় ম্লানায়মান উৎসাহের উৎকণ্ঠা। সেই দিন আমি যে-পথে চলতেম সেই পথ ওরও সামনে, তেমনি করেই অরুণার মায়ের মন বশ করবার নানা উপলক্ষ ও সৃষ্টি করছে, কেবল যথেষ্ট লক্ষ্যগোচর নই আমিই। অপর পক্ষে অরুণা জানে মনে মনে, তার বাবা বোঝে মেয়ের দরদ। এক-একদিন কী জানি কেন দুই চক্ষে অদৃশ্য অশ্রুর করুণা নিয়ে চুপ করে এসে বসে আমার পায়ের কাছের মোড়ায়। ওর মা নিষ্ঠুর হতে পারে, আমি পারি নে।

অরুণার মনের কথা ওর মা যে বোঝে না তা নয়; কিন্তু তার বিশ্বাস, এ সমস্তই 'প্রভাতে মেঘডম্বরম্‌', বেলা হলেই যাবে মিলিয়ে। ঐখানেই সুনেত্রার সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য। খিদে মিটতে না দিয়ে খিদে মেরে দেওয়া যায় না তা নয়, কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন পাত পড়বে তখন হৃদয়ের রসনায় নবীন ভালোবাসার স্বাদ যাবে মরে। মধ্যাহ্নে ভোরের সুর লাগাতে গেলে আর লাগে না। অভিভাবক বলেন, বিবেচনা করবার বয়েস হোক আগে, তার পরে ইত্যাদি। হায় রে, বিবেচনা করবার বয়েস ভালোবাসার বয়েসের উলটোপিঠে।

কয়েকদিন আগেই এসেছিল 'ভরা বাদর মাহ ভাদর'। ঘনবর্ষণের আড়ালে কলকাতার ইটকাঠের বাড়িগুলো এল মোলায়েম হয়ে, শহরের প্রখর মুখরতা অশ্রুগদ্‌গদ কণ্ঠস্বরের মতো হল বাষ্পাকুল। ওর মা জানত অরুণা আমার লাইব্রেরি-ঘরে পরীক্ষার পড়ায় প্রবৃত্ত। একখানা বই আনতে গিয়ে দেখি, মেঘাচ্ছন্ন দিনান্তের সজল ছায়ায় জানলার সামনে সে চুপ করে বসে; তখনো চুল বাঁধে নি, পুবে হাওয়ায় বৃষ্টির ছাঁট এসে লাগছে তার এলোচুলে।

সুনেত্রাকে কিছু বললেম না। তখনি শৈলেনকে লিখে দিলেম চায়ের নিমন্ত্রণ-চিঠি। পাঠিয়ে দিলেম আমার মোটরগাড়ি ওদের বাড়িতে। শৈলেন এল, তার অকস্মাৎ আবির্ভাব সুনেত্রার পছন্দ নয়, সেটা বোঝা কঠিন ছিল না। আমি

শৈলেনকে বললেম, "গণিতে আমার যেটুকু দখল তাতে হাল আমলের ফিজিক্সের তল পাই নে, তাই তোমাকে ডেকে পাঠানো ; কোয়ান্টম্ থিয়োরিটা যথাসাধ্য বুঝে নিতে চাই, আমার সেকেলে বিদ্যেসাধ্যি অত্যন্ত বেশি অথর্ব হয়ে পড়েছে।"

বলা বাহুল্য, বিদ্যাচর্চা বেশিদূর এগোয় নি। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস অরুণা তার বাবার চাতুরী স্পষ্টই ধরেছে আর মনে মনে বলেছে, এমন আদর্শ বাবা অন্য-কোনো পরিবারে আজ পর্যন্ত অবতীর্ণ হয় নি।

কোয়ান্টম্ থিয়োরির ঠিক শুরুতেই বাজল টেলিফোনের ঘণ্টা— ধড়ফড়িয়ে উঠে বললেম, "জরুরি কাজের ডাক। তোমরা এক কাজ করো, ততক্ষণ পার্লার টেনিস খেলো, ছুটি পেলেই আবার আসব ফিরে।"

টেলিফোনে আওয়াজ এল, "হ্যালো, এটা কি বারোশো অমুক নম্বর।"

আমি বললেম, "না, এখানকার নম্বর সাতশো অমুক।"

পরক্ষণেই নীচের ঘরে গিয়ে একখানা বাসি খবরের কাগজ তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করলেম, অন্ধকার হয়ে এল, দিলেম বাতি জ্বেলে।

সুনেত্রা এল ঘরে। অত্যন্ত গম্ভীর মুখ। আমি হেসে বললেম, "মিটিয়রলজিস্ট্ তোমার মুখ দেখলে ঝড়ের সিগনাল দিত।"

ঠাট্টায় যোগ না দিয়ে সুনেত্রা বললে, "কেন তুমি শৈলেনকে অমন করে প্রশ্রয় দাও বারে বারে।"

আমি বললেম, "প্রশ্রয় দেবার লোক অদৃশ্যে আছে ওর অন্তরাত্মায়।"

"ওদের দেখাশোনাটা কিছুদিন বন্ধ রাখতে পারলে এই ছেলেমানুষিটা কেটে যেত আপনা হতেই।"

"ছেলেমানুষির কসাইগিরি করতে যাবই বা কেন। দিন যাবে, বয়স বাড়বে, এমন ছেলেমানুষি আর তো ফিরে পাবে না কোনোকালে।"

"তুমি গ্রহনক্ষত্র মান না, আমি মানি। ওরা মিলতে পারে না।"

"গ্রহনক্ষত্র কোথায় কী ভাবে মিলেছে চোখে পড়ে না, কিন্তু ওরা দুজনে যে মিলেছে অন্তরে অন্তরে সেটা দেখা যাচ্ছে খুব স্পষ্ট করেই।"

"তুমি বুঝবে না আমার কথা। যখনি আমরা জন্মাই তখনি আমাদের যথার্থ দোসর ঠিক হয়ে থাকে। মোহের ছলনায় আর-কাউকে যদি স্বীকার করে নিই তবে তাতেই ঘটে অজ্ঞাত অসতীত্ব। নানা দুঃখে বিপদে তার শাস্তি।"

"যথার্থ দোসর চিনব কী করে।"

"নক্ষত্রের স্বহস্তে স্বাক্ষর-করা দলিল আছে।"

৩

আর লুকোনো চলল না।

আমার শ্বশুর অজিতকুমার ভট্টাচার্য। বনেদি পণ্ডিত-বংশে তাঁর জন্ম। বাল্যকাল কেটেছে চতুষ্পাঠীর আবহাওয়ায়। পরে কলকাতায় এসে কলেজে নিয়েছেন এম. এ ডিগ্রি গণিতে। ফলিত জ্যোতিষে তাঁর যেমন বিশ্বাস ছিল তেমনি ব্যুৎপত্তি। তাঁর বাবা ছিলেন পাকা নৈয়ায়িক, ঈশ্বর তাঁর মতে অসিদ্ধ; আমার শ্বশুরও দেবদেবী কিছুই মানতেন না তার প্রমাণ পেয়েছি। তাঁর সমস্ত বেকার বিশ্বাস ভিড় করে এসে পড়েছিল গ্রহনক্ষত্রের উপর, একরকম গোঁড়ামি বললেই হয়। এই ঘরে জন্মেছে সুনেত্রা; বাল্যকাল থেকে তার চার দিকে গ্রহনক্ষত্রের কড়া পাহারা।

আমি ছিলুম অধ্যাপকের প্রিয় ছাত্র, সুনেত্রাকেও তার পিতা দিতেন শিক্ষা। পরস্পর মেলবার সুযোগ হয়েছিল বার বার। সুযোগটা যে ব্যর্থ হয় নি সে-খবরটা বেতার বিদ্যুদ্‌বার্তায় আমার কাছে ব্যক্ত হয়েছে। আমার শাশুড়ির নাম বিভাবতী। সাবেককালের আওতার মধ্যে তাঁর জন্ম বটে, কিন্তু স্বামীর সংসর্গে তাঁর মন ছিল সংস্কারমুক্ত, স্বচ্ছ। স্বামীর সঙ্গে প্রভেদ এই, গ্রহনক্ষত্র তিনি একেবারেই মানতেন না, মানতেন আপন ইষ্টদেবতাকে। এ নিয়ে স্বামী একদিন ঠাট্টা করাতে বলেছিলেন, "ভয়ে ভয়ে তুমি পেয়াদাগুলোর কাছে সেলাম ঠুকে বেড়াও, আমি মানি স্বয়ং রাজাকে।"

স্বামী বললেন, "ঠকবে। রাজা থাকলেও যা না-থাকলেও তা, লাঠি ঘাড়ে নিশ্চিত আছে পেয়াদার দল।"

শাশুড়ি-ঠাকরুন বললেন, "ঠকব সেও ভালো। তাই বলে দেউড়ির দরবারে গিয়ে নাগরা জুতোর কাছে মাথা হেঁট করতে পারব না।"

আমার শাশুড়ি আমাকে বড়ো স্নেহ করতেন। তাঁর কাছে আমার মনের কথা ছিল অবারিত। অবকাশ বুঝে একদিন তাঁকে বললেম, "মা, তোমার নেই ছেলে, আমার নেই মা। মেয়ে দিয়ে আমাকে দাও তোমার ছেলের জায়গাটি। তোমার সম্মতি পেলে তার পরে পায়ে ধরব অধ্যাপকের।"

তিনি বললেন, "অধ্যাপকের কথা পরে হবে বাছা, আগে তোমার ঠিকুজি এনে দাও আমার কাছে।"

দিলেম এনে। তিনি বললেন, "হবার নয়। অধ্যাপকের মত হবে না। অধ্যাপকের মেয়েটিও তার বাপেরই শিষ্যা।"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "মেয়ের মা?"

বললেন, "আমার কথা বোলো না। আমি তোমাকে জানি, আমার মেয়ের মনও জানি, তার বেশি জানবার জন্যে নক্ষত্রলোকে ছোটবার শখ নেই আমার।"

আমার মন উঠল বিদ্রোহী হয়ে। বললেম, "এমনতরো অবাস্তব বাধা মানাই অন্যায়। কিন্তু, যা অবাস্তব তার গায়ে ঘা বসে না। তার সঙ্গে লড়াই করব কী দিয়ে।"

এ দিকে মেয়ের সম্বন্ধের কথা আসতে লাগল নানা দিক থেকে। গ্রহতারকার অসম্মতি নেই এমন প্রস্তাবও ছিল তার মধ্যে। মেয়ে জিদ করে বলে বসল, সে চিরকাল কুমারী থাকবে, বিদ্যার সাধনাতেই যাবে তার দিন।

বাপ মানে বুঝলেন না, তাঁর মনে পড়ল লীলাবতীর কথা। মা বুঝলেন, গোপনে জল পড়তে লাগল তাঁর চোখ দিয়ে। অবশেষে একদিন মা আমার হাতে একখানি কাগজ দিয়ে বললেন, "সুনেত্রার ঠিকুজি। এই দেখিয়ে তোমার জন্মপত্রী সংশোধন করিয়ে নিয়ে এসো। আমার মেয়ের অকারণ দুঃখ সইতে পারব না।"

পরে কী হল বলতে হবে না। ঠিকুজির অঙ্কজাল থেকে সুনেত্রাকে উদ্ধার করে আনলেম। চোখের জল মুছতে মুছতে মা বললেন, "পুণ্যকর্ম করেছ, বাছা।"

তার পরে গেছে একুশ বছর কেটে।

৪

হাওয়ার বেগ বাড়তে চলল, বৃষ্টির বিরাম নেই। সুনেত্রাকে বললেম, "আলোটা লাগছে চোখে, নিবিয়ে দিই।" নিবিয়ে দিলেম।

বৃষ্টিধারার মধ্যে দিয়ে রাস্তার ল্যাম্পের ঝাপসা আভা এল অন্ধকার ঘরে। সোফার উপরে সুনেত্রাকে বসালেম আমার পাশে। বললেম, "সুনি, আমাকে তোমার যথার্থ দোসর বলে মান তুমি?"

"এ আবার কী প্রশ্ন হল তোমার। উত্তর দিতে হবে নাকি।"

"তোমার গ্রহতারা যদি না মানে?"

"নিশ্চয় মানে, আমি বুঝি জানি নে?"

"এতদিন তো একত্রে কাটল আমাদের, কোনো সংশয় কি কোনোদিন উঠেছে তোমার মনে।"

"অমন সব বাজে কথা জিজ্ঞাসা কর যদি রাগ করব।"

"সুনি, দুজনে মিলে দুঃখ পেয়েছি অনেকবার। আমাদের প্রথম ছেলেটি মারা

গেছে আট-মাসে। টাইফয়েডে আমি যখন মরণাপন্ন, বাবার হল মৃত্যু। শেষে দেখি উইল জাল করে দাদা নিয়েছেন সমস্ত সম্পত্তি। আজ চাকরিই আমার একমাত্র ভরসা। তোমার মায়ের স্নেহ ছিল আমার জীবনের ধ্রুবতারা। পুজোর ছুটিতে বাড়ি যাওয়ার পথে নৌকোডুবি হয়ে স্বামীর সঙ্গে মারা গেলেন মেঘনা নদীর গর্ভে। দেখলেম, বিষয়বুদ্ধিহীন অধ্যাপক ঋণ রেখে গেছেন মোটা অঙ্কের; সেই ঋণ স্বীকার করে নিলেম। কেমন করে জানব, এই সমস্ত বিপত্তি ঘটায় নি আমারই দুষ্টগ্রহ? আগে থাকতে যদি জানতে আমাকে তো বিয়ে করতে না?"

সুনেত্রা কোনো উত্তর না করে আমাকে জড়িয়ে ধরলে।

আমি বললেম, "সব দুঃখ দুর্লক্ষণের চেয়ে ভালোবাসাই যে বড়ো, আমাদের জীবনে তার কি প্রমাণ হয় নি।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয় হয়েছে।"

"মনে করো, যদি গ্রহের অনুগ্রহে তোমার আগেই আমার মৃত্যু হয়, সেই ক্ষতি কি বেঁচে থাকতেই আমি পূরণ করতে পারি নি।"

"থাক্‌ থাক্‌, আর বলতে হবে না।"

"সাবিত্রীর কাছে সত্যবানের সঙ্গে একদিনের মিলনও যে চিরবিচ্ছেদের চেয়ে বড়ো ছিল, তিনি তো ভয় করেন নি মৃত্যুগ্রহকে।"

চুপ করে রইল সুনেত্রা। আমি বললেম, "তোমার অরুণা ভালোবেসেছে শৈলেনকে, এইটুকু জানা যথেষ্ট; বাকি সমস্তই থাক্‌ অজানা, কী বল, সুনি।"

সুনেত্রা কোনো উত্তর করলে না।

"তোমাকে যখন প্রথম ভালোবেসেছিলুম, বাধা পেয়েছি। আমি সংসারে দ্বিতীয়বার সেই নিষ্ঠুর দুঃখ আসতে দেব না কোনো গ্রহেরই মন্ত্রণায়। ওদের দুজনের ঠিকুজির অঙ্ক মিলিয়ে সংশয় ঘটতে দেব না কিছুতেই।"

ঠিক সেই সময়েই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। শৈলেন নেমে চলে যাচ্ছে। সুনেত্রা তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে বললে, "কী বাবা শৈলেন। এখুনি তুমি যাচ্ছ না কি।"

শৈলেন ভয়ে ভয়েই বললে, "কিছু দেরি হয়েই গেছে, ঘড়ি ছিল না, বুঝতে পারি নি।"

সুনেত্রা বললে, "না, কিছু দেরি হয় নি। আজ রাত্রে তোমাকে এখানেই খেয়ে যেতে হবে।"

একেই তো বলে প্রশ্রয়।

সেই রাত্রে আমার ঠিকুজি সংশোধনের সমস্ত বিবরণ স্থনেত্রাকে শোনালেম। সে বলে উঠল, "না বললেই ভালো করতে।"

"কেন।"

"এখন থেকে কেবলই ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে।"

"কিসের ভয়। বৈধব্যযোগের?"

অনেক ক্ষণ চুপ করে রইল স্থনি। তার পরে বললে, "না, করব না ভয়। আমি যদি তোমাকে ফেলে আগে চলে যাই তা হলে আমার মৃত্যু হবে দ্বিগুণ মৃত্যু।"

কার্তিক, ১৩৪০

প্রবন্ধ

কালান্তর

২৪॥১৬

কালান্তর

কালান্তর

একদিন চণ্ডীমণ্ডপে আমাদের আখড়া বসত, আলাপ জমত পাড়াপড়শিদের জুটিয়ে, আলোচনার বিষয় ছিল গ্রামের সীমার মধ্যেই বদ্ধ। পরস্পরকে নিয়ে রাগদ্বেষে গল্পে-গুজবে তাসে-পাশায় এবং তার সঙ্গে ঘণ্টা-তিনচার পরিমাণে দিবানিদ্রা মিশিয়ে দিনটা যেত কেটে। তার বাইরে মাঝে মাঝে চিত্তানুশীলনার যে-আয়োজন হত সে ছিল যাত্রা সংকীর্তন কথকতা রামায়ণপাঠ পাঁচালি কবিগান নিয়ে। তার বিষয়বস্তু ছিল পুরাকাহিনীভাণ্ডারে চিরসঞ্চিত। যে-জগতের মধ্যে বাস সেটা সংকীর্ণ এবং অতি-পরিচিত। তার সমস্ত তথ্য এবং রসধারা বংশানুক্রমে বৎসরে বৎসরে বার বার হয়েছে আবর্তিত অপরিবর্তিত চক্রপথে, সেইগুলিকে অবলম্বন করে আমাদের জীবন-যাত্রার সংস্কার নিবিড় হয়ে জমে উঠেছে, সেই-সকল কঠিন সংস্কারের ইটপাথর দিয়ে আমাদের বিশেষ সংসারের নির্মাণকার্য সমাধা হয়ে গিয়েছিল। এই সংসারের বাইরে মানব-ব্রহ্মাণ্ডের দিক্‌দিগন্তে বিরাট ইতিহাসের অভিব্যক্তি নিরন্তর চলেছে, তার ঘূর্ণ্যমান নীহারিকা আদ্যোপান্ত সনাতনপ্রথায় ও শাস্ত্রবচনে চিরকালের মতো স্থাবর হয়ে ওঠে নি, তার মধ্যে এক অংশের সঙ্গে আর-এক অংশের ঘাতসংঘাতে নব নব সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে, ক্রমাগতই তাদের পরস্পরের সীমানার সংকোচন-প্রসারণে পরিবর্তিত হচ্ছে ইতিহাসের রূপ, এ আমাদের গোচর ছিল না।

বাইরে থেকে প্রথম বিরুদ্ধ আঘাত লাগল মুসলমানের। কিন্তু সে-মুসলমানও প্রাচীন প্রাচ্য, সেও আধুনিক নয়। সেও আপন অতীত শতাব্দীর মধ্যে বদ্ধ। বাহুবলে সে রাজ্যসংঘটন করেছে কিন্তু তার চিত্তের সৃষ্টিবৈচিত্র্য ছিল না। এইজন্যে সে যখন আমাদের দিগন্তের মধ্যে স্থায়ী বাসস্থান বাঁধলে, তখন তার সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ ঘটতে লাগল— কিন্তু সে সংঘর্ষ বাহ্য, এক চিরপ্রথার সঙ্গে আর-এক চিরপ্রথার, এক বাঁধা মতের সঙ্গে আর-এক বাঁধা মতের। রাষ্ট্রপ্রণালীতে মুসলমানের প্রভাব প্রবেশ করেছে, চিত্তের মধ্যে তার ক্রিয়া সর্বতোভাবে প্রবল হয় নি, তারই প্রমাণ দেখি সাহিত্যে। তখনকার ভদ্রসমাজে সর্বত্রই প্রচলিত ছিল পার্সি, তবু বাংলা কাব্যের প্রকৃতিতে এই পার্সি বিদ্যার স্বাক্ষর পড়ে নি— একমাত্র ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে

মার্জিত ভাষায় ও অস্খলিত ছন্দে যে নাগরিকতা প্রকাশ পেয়েছে তাতে পার্সি-পড়া স্মিতপরিহাসপটু বৈদগ্ধ্যের আভাস পাওয়া যায়। তখনকার বাংলা সাহিত্যের প্রধানত দুই ভাগ ছিল, এক মঙ্গলকাব্য আর-এক বৈষ্ণবপদাবলী। মঙ্গলকাব্যে মাঝে মাঝে মুসলমান রাজ্যশাসনের বিবরণ আছে কিন্তু তার বিষয়বস্তু কিম্বা মনস্তত্ত্বে মুসলমান সাহিত্যের কোনো ছাপ দেখি নে, বৈষ্ণবগীতিকাব্যে তো কথাই নেই। অথচ বাংলা ভাষায় পার্সি শব্দ জমেছে বিস্তর, তা ছাড়া সেদিন অন্তত শহরে রাজধানীতে পারসিক আদবকায়দার যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব ছিল। তখনকার কালে দুই সনাতন বেড়া-দেওয়া সভ্যতা ভারতবর্ষে পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে, পরস্পরের প্রতি মুখ ফিরিয়ে। তাদের মধ্যে কিছুই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয় নি তা নয় কিন্তু তা সামান্য। বাহুবলের ধাক্কা দেশের উপরে খুব জোরে লেগেছে, কিন্তু কোনো নতুন চিন্তারাজ্যে কোনো নতুন সৃষ্টির উদ্যমে তার মনকে চেতিয়ে তোলে নি। তা ছাড়া আরো একটা কথা আছে। বাহির থেকে মুসলমান হিন্দুস্থানে এসে স্থায়ী বাসা বেঁধেছে কিন্তু আমাদের দৃষ্টিকে বাহিরের দিকে প্রসারিত করে নি। তারা ঘরে এসে ঘর দখল করে বসল, বন্ধ করে দিলে বাহিরের দিকে দরজা। মাঝে মাঝে সেই দরজা-ভাঙাভাঙি চলেছিল কিন্তু এমন কিছু ঘটে নি যাতে বাহিরের বিশ্বে আমাদের পরিচয় বিস্তারিত হতে পারে। সেইজন্য পল্লীর চণ্ডীমণ্ডপেই রয়ে গেল আমাদের প্রধান আসর।

তার পরে এল ইংরেজ কেবল মানুষরূপে নয়, নব্য য়ুরোপের চিত্তপ্রতীকরূপে। মানুষ জোড়ে স্থান, চিত্ত জোড়ে মনকে। আজ মুসলমানকে আমরা দেখি সংখ্যারূপে— তারা সম্প্রতি আমাদের রাষ্ট্রিক ব্যাপারে ঘটিয়েছে যোগ-বিয়োগের সমস্যা। অর্থাৎ এই সংখ্যা আমাদের পক্ষে গুণের অঙ্কফল না কষে ভাগেরই অঙ্কফল কষছে। দেশে এরা আছে অথচ রাষ্ট্রজাতিগত ঐক্যের হিসাবে এরা না থাকার চেয়েও দারুণতর, তাই ভারতবর্ষের লোকসংখ্যাতালিকাই তার অতিবহুলত্ব নিয়ে সব-চেয়ে শোকাবহ হয়ে উঠল।

ইংরেজের আগমন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক বিচিত্র ব্যাপার। মানুষ হিসাবে তারা রইল মুসলমানদের চেয়েও আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে— কিন্তু য়ুরোপের চিত্তদূতরূপে ইংরেজ এত ব্যাপক ও গভীর ভাবে আমাদের কাছে এসেছে যে আর-কোনো বিদেশী জাত কোনোদিন এমন করে আসতে পারে নি। য়ুরোপীয় চিত্তের জঙ্গমশক্তি আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত করল, যেমন দূর আকাশ থেকে আঘাত করে বৃষ্টিধারা মাটির 'পরে; ভূমিতলের নিশ্চেষ্ট অন্তরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে প্রাণের চেষ্টা সঞ্চার করে দেয়, সেই চেষ্টা বিচিত্ররূপে অঙ্কুরিত বিকশিত হতে থাকে।

এই চেষ্টা যে-ভূখণ্ডে একেবারে না ঘটে সেটা মরুভূমি, তার যে একান্ত অনন্যযোগিতা সে তো মৃত্যুর ধর্ম। আমরা য়ুরোপের কার কাছ থেকে কী কতটুকু পেয়েছি তাই অতি সূক্ষ্ম বিচারে চুনে চুনে অনেক পরিমাণে কল্পনা ও কিছু পরিমাণে গবেষণা বিস্তার করে আজকাল কোনো কোনো সমালোচক আধুনিক লেখকের প্রতি কলম উদ্যত করে নিপুণ ভঙ্গীতে খোঁটা দিয়ে থাকেন। একদা রেনেসাঁসের চিত্তবেগ ইটালি থেকে উদ্বেল হয়ে সমস্ত য়ুরোপের মনে যখন প্রতিহত হয়েছিল তখন ইংলণ্ডের সাহিত্যস্রষ্টাদের মনে তার প্রভাব যে নানারূপে প্রকাশ পেয়েছে সেটা কিছুই আশ্চর্যের কথা নয়, না হলেই সেই দৈন্যকে বর্বরতা বলা যেত। সচল মনের প্রভাব সজীব মন না নিয়ে থাকতেই পারে না— এই দেওয়া-নেওয়ার প্রবাহ সেইখানেই নিয়ত চলেছে যেখানে চিত্ত বেঁচে আছে চিত্ত জেগে আছে।

বর্তমান যুগের চিত্তের জ্যোতি পশ্চিম দিগন্ত থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে মানব-ইতিহাসের সমস্ত আকাশ জুড়ে উদ্ভাসিত, দেখা যাক তার স্বরূপটা কী। একটা প্রবল উদ্যমের বেগে য়ুরোপের মন ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত পৃথিবীতে, শুধু তাই নয় সমস্ত জগতে। যেখানেই সে পা বাড়িয়েছে সেইখানটাই সে অধিকার করেছে। কিসের জোরে। সত্যসন্ধানের সততায়। বুদ্ধির আলস্যে, কল্পনার কুহকে, আপাতপ্রতীয়মান সাদৃশ্যে, প্রাচীন পাণ্ডিত্যের অন্ধ অনুবর্তনায় সে আপনাকে ভোলাতে চায় নি, মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যা বিশ্বাস ক'রে নিশ্চিন্ত থাকতে চায় তার প্রলোভনকেও সে নির্মমভাবে দমন করেছে। নিজের সহজ ইচ্ছার সঙ্গে সংগত করে সত্যকে সে যাচাই করে নি। প্রতিদিন জয় করেছে সে জ্ঞানের জগৎকে, কেননা তার বুদ্ধির সাধনা বিশুদ্ধ, ব্যক্তিগত মোহ থেকে নির্মুক্ত।

যদিও আমাদের চার দিকে আজও পঞ্জিকার প্রাচীর খোলা আলোর প্রতি সন্দেহ উদ্যত করে আছে, তবু তার মধ্যে ফাঁক করে য়ুরোপের চিত্ত আমাদের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেছে, আমাদের সামনে এনেছে জ্ঞানের বিশ্বরূপ, মানুষের বুদ্ধির এমন একটা সর্বব্যাপী ঔৎসুক্য আমাদের কাছে প্রকাশ করেছে, যা অহৈতুক আগ্রহে নিকটতম দূরতম অণুতম বৃহত্তম প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় সমস্তকেই সন্ধান সমস্তকেই অধিকার করতে চায় ; এইটে দেখিয়েছে যে, জ্ঞানের রাজ্যে কোথাও ফাঁক নেই, সকল তথ্যই পরস্পর অচ্ছেদ্যসূত্রে গ্রথিত, চতুরানন বা পঞ্চাননের কোনো বিশেষ বাক্য বিশ্বের ক্ষুদ্রতম সাক্ষীর বিরুদ্ধে আপন অপ্রাকৃত প্রামাণিকতা দাবি করতে পারে না।

বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে যেমন, তেমনি চরিত্রনীতি সম্বন্ধেও। নতুন শাসনে যে-আইন এল তার মধ্যে একটি বাণী আছে, সে হচ্ছে এই যে, ব্যক্তিভেদে অপরাধের ভেদ ঘটে না।

ব্রাহ্মণই শূদ্রকে বধ করুক বা শূদ্রই ব্রাহ্মণকে বধ করুক, হত্যা অপরাধের পংক্তি একই, তার শাসনও সমান— কোনো মুনিঋষির অনুশাসন ন্যায়-অন্যায়ের কোনো বিশেষ দৃষ্টি প্রবর্তন করতে পারে না।

সমাজে উচিত-অনুচিতের ওজন, শ্রেণীগত অধিকারের বাটখারাযোগে আপন নিত্য আদর্শের তারতম্য ঘটাতে পারবে না, এ কথাটা এখনো আমরা সর্বত্র অন্তরে অন্তরে মেনে নিতে পেরেছি তা নয়, তবু আমাদের চিন্তায় ও ব্যবহারে অনেকখানি বিপ্লব এনেছে সন্দেহ নেই। সমাজ যাদের অস্পৃশ্যশ্রেণীতে গণ্য করেছে তাদেরও আজ দেবালয়প্রবেশে বাধা দেওয়া উচিত নয়, এই আলোচনাটা তার প্রমাণ। যদিও একদল লোক নিত্যধর্মনীতির উপর ভর না দিয়ে এর অনুকূলে শাস্ত্রের সমর্থন আওড়াচ্ছেন, তবু সেই আপ্তবাক্যের ওকালতিটাই সম্পূর্ণ জোর পাচ্ছে না। আসল এই কথাটাই দেশের সাধারণের মনে বাজছে যে, যেটা অন্যায় সেটা প্রথাগত, শাস্ত্রগত বা ব্যক্তিগত গায়ের জোরে শ্রেয় হতে পারে না, শংকরাচার্য-উপাধিধারীর স্বরচিত মার্কা সত্ত্বেও সে শ্রদ্ধেয় নয়।

মুসলমান-আমলের বাংলাসাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি করলে দেখা যায় যে, অবাধে অন্যায় করবার অধিকারই যে ঐশ্বর্যের লক্ষণ এই বিশ্বাসটা কলুষিত করেছে তখনকার দেবচরিত্র-কল্পনাকে। তখনকার দিনে যেমন অত্যাচারের দ্বারা প্রবল ব্যক্তি আপন শাসন পাকা করে তুলত, তেমনি করে অন্যায়ের বিভীষিকায় দেবদেবীর প্রতিপত্তি আমরা কল্পনা করেছি। সেই নিষ্ঠুর বলের হার-জিতেই তাঁদের শ্রেষ্ঠতা-অশ্রেষ্ঠতার প্রমাণ হত। ধর্মের নিয়ম মেনে চলবে সাধারণ মানুষ সেই নিয়মকে লঙ্ঘন করবার দুর্দাম অধিকার অসাধারণের। সন্ধিপত্রের শর্ত অনুসারে আপনাকে সংযত করা আবশ্যক সত্যরক্ষা ও লোকস্থিতির খাতিরে, কিন্তু প্রতাপের অভিমান তাকে স্ক্র্যাপ্ অফ্ পেপারের মতো ছিন্ন করবার স্পর্ধা রাখে। নীতিবন্ধন-অসহিষ্ণু অধর্মসাহসিকতার ঔদ্ধত্যকে একদিন ঈশ্বরত্বের লক্ষণ বলে মানুষ স্বীকার করেছে। তখনকার দিনে প্রচলিত 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা', এই কথাটার অর্থ এই যে, জগদীশ্বরের জগদীশ্বরতা তাঁর অপ্রতিহত শক্তির প্রমাণে, ন্যায়পরতার বিধানে নয়, সেই পন্থায় দিল্লীশ্বরও জগদীশ্বরের তুল্য খ্যাতির অধিকারী। তখন ব্রাহ্মণকে বলেছে ভূদেব, তার দেবত্বে মহত্ত্বের অপরিহার্য দায়িত্ব নেই, আছে অকারণ শ্রেষ্ঠতার নিরর্থক দাবি। এই অকারণ শ্রেষ্ঠতা ন্যায়-অন্যায়ের উপরে, তার প্রমাণ দেখি স্মৃতিশাস্ত্রে, শূদ্রের প্রতি অধর্মাচরণ করবার অব্যাহত অধিকারে। ইংরেজসাম্রাজ্য মোগলসাম্রাজ্যের চেয়েও প্রবল ও ব্যাপক সন্দেহ নেই, কিন্তু এমন কথা কোনো মূঢ়ের মুখ দিয়ে বেরোতে পারে

না যে, উইলিঙডনো বা জগদীশ্বরো বা। তার কারণ আকাশ থেকে বোমাবর্ষণে শত্রুপল্লী-বিধ্বংসনের নির্মম শক্তির দ্বারা ঈশ্বরত্বের আদর্শের তুল্যতা আজ কেউ পরিমাপ করে না। আজ আমরা মরতে মরতেও ইংরেজ-শাসনের বিচার করতে পারি ন্যায়-অন্যায়ের আদর্শে, এ কথা মনে করি নে, কোনো দোহাই পেড়ে শক্তিমানকে অসংযত শক্তি সংহরণ করতে বলা অশক্তের পক্ষে স্পর্ধা। বস্তুত ন্যায়-আদর্শের সর্বভূমিনতা স্বীকার করে এক জায়গায় ইংরেজরাজের প্রভূত শক্তি আপনাকে অশক্তের সমানভূমিতেই দাঁড় করিয়েছে।

যখন প্রথম ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল তখন শুধু যে তার থেকে আমরা অভিনব রস আহরণ করেছিলেম তা নয়, আমরা পেয়েছিলেম মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায় দূর করবার আগ্রহ, শুনতে পেয়েছিলেম রাষ্ট্রনীতিতে মানুষের শৃঙ্খল-মোচনের ঘোষণা, দেখেছিলেম বাণিজ্যে মানুষকে পণ্যে পরিণত করার বিরুদ্ধে প্রয়াস। স্বীকার করতেই হবে আমাদের কাছে এই মনোভাবটা নূতন। তৎপূর্বে আমরা মেনে নিয়েছিলুম যে জন্মগত নিত্যবিধানে বা পূর্বজন্মার্জিত কর্মফলে বিশেষ জাতের মানুষ আপন অধিকারের খর্বতা আপন অসম্মান শিরোধার্য করে নিতে বাধ্য, তার হীনতার লাঞ্ছনা কেবলমাত্র দৈবক্রমে ঘুচতে পারে জন্মপরিবর্তনে। আজও আমাদের দেশে শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে বহুলোক রাষ্ট্রীয় অগৌরব দূর করার জন্যে আত্মচেষ্টা মানে, অথচ সমাজবিধির দ্বারা অধঃকৃতদেরকে ধর্মের দোহাই দিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে আত্মাবমাননা স্বীকার করতে বলে ; এ কথা ভুলে যায় যে, ভাগ্যনির্দিষ্ট বিধানকে নির্বিরোধে মানবার মনোবৃত্তিই রাষ্ট্রিক পরাধীনতার শৃঙ্খলকে হাতে পায়ে এঁটে রাখবার কাজে সকলের চেয়ে প্রবলশক্তি। য়ুরোপের সংস্রব এক দিকে আমাদের সামনে এনেছে বিশ্বপ্রকৃতিতে কার্যকারণবিধির সার্বভৌমিকতা, আর-এক দিকে ন্যায়-অন্যায়ের সেই বিশুদ্ধ আদর্শ যা কোনো শাস্ত্রবাক্যের নির্দেশে, কোনো চিরপ্রচলিত প্রথার সীমাবেষ্টনে, কোনো বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ বিধিতে খণ্ডিত হতে পারে না। আজ আমরা সকল দুর্বলতা সত্ত্বেও আমাদের রাষ্ট্রজাতিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্যে যে-কোনো চেষ্টা করছি, সে এই তত্ত্বের উপরে দাঁড়িয়ে, এবং যে-সকল দাবি আমরা কোনোদিন মোগলসম্রাটের কাছে উত্থাপন করবার কল্পনাও মনে আনতে পারি নি, তাই নিয়ে প্রবল রাজশাসনের সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে বিরোধ বাধিয়েছি এই তত্ত্বেরই জোরে যে-তত্ত্ব কবিবাক্যে প্রকাশ পেয়েছে, "A man is a man for a' that".

আজ আমার বয়স সত্তর পেরিয়ে গেছে। বর্তমান যুগে— অর্থাৎ যাকে য়ুরোপীয় যুগ বলতেই হবে, সেই যুগে যখন প্রথম প্রবেশ করলুম সময়টা তখন আঠারোশো

খৃস্টাব্দের মাঝামাঝি। এইটিকে ভিক্টোরীয় যুগ নাম দিয়ে এখনকার যুবকেরা হাসাহাসি করে থাকে। য়ুরোপের যে-অংশের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ, সেই ইংলণ্ড তখন ঐশ্বর্যের ও রাষ্ট্রীয় প্রতাপের উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠিত। অনন্তকালে কোনো ছিদ্র দিয়ে তার অন্নভাণ্ডারে যে অলক্ষ্মী প্রবেশ করতে পারে, এ কথা কেউ সেদিন মনেও করে নি। প্রাচীন ইতিহাসে যাই ঘটে থাকুক, আধুনিক ইতিহাসে যারা পাশ্চাত্য সভ্যতার কর্ণধার তাঁদের সৌভাগ্য যে কোনোদিন পিছু হঠতে পারে, বাতাস বইতে পারে উলটো দিকে, তার কোনো আশঙ্কা ও লক্ষণ কোথাও ছিল না। রিফর্মেশন যুগে, ফ্রেঞ্চ রেভোল্যুশন যুগে য়ুরোপ যে-মতস্বাতন্ত্র্যের জন্যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্যে লড়েছিল, সেদিন তার সেই আদর্শে বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ হয় নি। সেদিন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ বেধেছিল দাসপ্রথার বিরুদ্ধে। ম্যাট্‌সিনি-গারিবাল্‌ডির বাণীতে কীর্তিতে সেই যুগ ছিল গৌরবান্বিত, সেদিন তুর্কির সুলতানের অত্যাচারকে নিন্দিত করে মন্দ্রিত হয়েছিল গ্ল্যাডস্টোনের বজ্রস্বর। আমরা সেদিন ভারতের স্বাধীনতার প্রত্যাশা মনে স্পষ্টভাবে লালন করতে আরম্ভ করেছি। সেই প্রত্যাশার মধ্যে এক দিকে যেমন ছিল ইংরেজের প্রতি বিরুদ্ধতা, আর-এক দিকে ইংরেজ-চরিত্রের প্রতি অসাধারণ আস্থা। কেবলমাত্র মনুষ্যত্বের দোহাই দিয়ে ভারতের শাসন-কর্তৃত্বে ইংরেজের শরিক হতেও পারি এমন কথা মনে করা যে সম্ভব হয়েছিল, সেই জোর কোথা থেকে পেয়েছিলেম। কোন্ যুগ থেকে সহসা কোন্ যুগান্তরে এসেছি। মানুষের মূল্য, মানুষের শ্রদ্ধেয়তা হঠাৎ এত আশ্চর্য বড়ো হয়ে দেখা দিল কোন্ শিক্ষায়। অথচ আমাদের নিজের পরিবারে প্রতিবেশে, পাড়ায় সমাজে, মানুষের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বা সম্মানের দাবি, শ্রেণীনির্বিচারে ন্যায়সংগত ব্যবহারের সমান অধিকারতত্ত্ব এখনো সম্পূর্ণরূপে আমাদের চরিত্রে প্রবেশ করতে পারে নি। তা হোক আচরণে পদে পদে প্রতিবাদসত্ত্বেও য়ুরোপের প্রভাব অল্পে অল্পে আমাদের মনে কাজ করছে। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিসম্বন্ধেও ঠিক সেই একই কথা। পাঠশালার পথ দিয়ে বিজ্ঞান এসেছে আমাদের দ্বারে, কিন্তু ঘরের মধ্যে পাঁজিপুঁথি এখনো তার সম্পূর্ণ দখল ছাড়ে নি। তবু য়ুরোপের বিদ্যা প্রতিবাদের মধ্য দিয়েও আমাদের মনের মধ্যে সম্মান পাচ্ছে।

তাই ভেবে দেখলে দেখা যাবে এই যুগ য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের গভীর সহযোগিতারই যুগ। বস্তুত যেখানে তার সঙ্গে আমাদের চিত্তের, আমাদের শিক্ষার অসহযোগ সেইখানেই আমাদের পরাভব। এই সহযোগ সহজ হয়, যদি আমাদের শ্রদ্ধায় আঘাত না লাগে। পূর্বেই বলেছি য়ুরোপের চরিত্রের প্রতি আস্থা নিয়েই আমাদের নবযুগের আরম্ভ হয়েছিল, দেখেছিলুম জ্ঞানের ক্ষেত্রে য়ুরোপ মানুষের

মোহমুক্ত বুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করেছে এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বীকার করেছে তার ন্যায়সংগত অধিকারকে। এতে করেই সকল প্রকার অভাবত্রুটি সত্ত্বেও আমাদের আত্মসম্মানের পথ খুলে গিয়েছে। এই আত্মসম্মানের গৌরববোধেই আজ পর্যন্ত আমরা স্বজাতি-সম্বন্ধে দুঃসাধ্যসাধনের আশা করছি, এবং প্রবল পক্ষকে বিচার করতে সাহস করছি সেই প্রবল পক্ষেরই বিচারের আদর্শ নিয়ে। বলতেই হবে এই চিত্তগত চরিত্রগত সহযোগ ছিল না আমাদের পূর্বতন রাজদরবারে। তখন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের সেই মূলগত দূরত্ব ছিল যাতে করে আমরা আকস্মিক শুভাদৃষ্টক্রমে শক্তিশালীর কাছে কদাচিৎ অনুগ্রহ পেতেও পারতুম, কিন্তু সে তারই নিজ গুণে, বলতে পারতুম না যে, সর্বজনীন ন্যায়ধর্ম অনুসারেই, মানুষ বলেই মানুষের কাছে আনুকূল্যের দাবি আছে।

ইতিমধ্যে ইতিহাস এগিয়ে চলল। বহুকালের সুপ্ত এশিয়ায় দেখা দিল জাগরণের উদ্যম। পাশ্চাত্যেরই সংঘাতে সংস্রবে জাপান অতি অল্পকালের মধ্যেই বিশ্বজাতি-সংঘের মধ্যে জয় করে নিলে সম্মানের অধিকার। অর্থাৎ জাপান বর্তমান কালের মধ্যেই বর্তমান, অতীতে ছায়াচ্ছন্ন নয়, সে তা সম্যকরূপে প্রমাণ করল। দেখতে পেলেম প্রাচ্য জাতিরা নবযুগের দিকে যাত্রা করেছে। অনেকদিন আশা করেছিলুম, বিশ্ব-ইতিহাসের সঙ্গে আমাদেরও সামঞ্জস্য হবে, আমাদেরও রাষ্ট্রজাতিক রথ চলবে সামনের দিকে, এবং এও মনে ছিল যে এই চলার পথে টান দেবে স্বয়ং ইংরেজও। অনেকদিন তাকিয়ে থেকে অবশেষে দেখলুম চাকা বন্ধ। আজ ইংরেজ শাসনের প্রধান গর্ব 'ল' এবং 'অর্ডর', বিধি এবং ব্যবস্থা নিয়ে। এই সুবৃহৎ দেশে শিক্ষার বিধান, স্বাস্থ্যের বিধান অতি অকিঞ্চিৎকর, দেশের লোকের দ্বারা নব নব পথে ধন উৎপাদনের সুযোগ-সাধন কিছুই নেই। অদূর ভবিষ্যতে তার যে সম্ভাবনা আছে, তাও দেখতে পাই নে, কেননা দেশের সম্বল সমস্তই তলিয়ে গেল 'ল' এবং 'অর্ডরের' প্রকাণ্ড কবলের মধ্যে। য়ুরোপীয় নবযুগের শ্রেষ্ঠদানের থেকে ভারতবর্ষ বঞ্চিত হয়েছে য়ুরোপেরই সংস্রবে। নবযুগের সূর্যমণ্ডলের মধ্যে কলঙ্কের মতো রয়ে গেল ভারতবর্ষ।

আজ ইংলণ্ড ফ্রান্স জার্মানি আমেরিকার কাছে ঋণী। ঋণের অঙ্ক খুব মোটা। কিন্তু এর দ্বিগুণ মোটাও যদি হত, তবু সম্পূর্ণ শোধ করা অসাধ্য হত না, দেনদার দেশে যদি কেবলমাত্র 'ল' এবং 'অর্ডর' বজায় রেখে তাকে আর-সকল বিষয়ে বঞ্চিত রাখতে আপত্তি না থাকত। যদি তার অন্নসংস্থান রইত আধপেটা পরিমাণ, তার পানযোগ্য জলের বরাদ্দ হত সমস্ত দেশের তৃষ্ণার চেয়ে বহুগুণ স্বল্পতর, যদি দেশে শতকরা পাঁচ-সাত জন মানুষের মতো শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও চলত, যদি চিরস্থায়ী রোগে প্রজনানুক্রমে দেশের হাড়ে হাড়ে দুর্বলতা নিহিত করে দেওয়া সত্ত্বেও নিশ্চেষ্টপ্রায়

থাকত তার আরোগ্যবিধান। কিন্তু যেহেতু জীবনযাত্রার সভ্য আদর্শ বজায় রাখবার পক্ষে এ-সকল অভাব একেবারেই মারাত্মক, এইজন্যে পাওনাদারকে এমন কথা বলতে শুনলুম যে আমরা দেনাশোধ করব না। সভ্যতার দোহাই দিয়ে ভারতবর্ষ কি এমন কথা বলতে পারে না যে, এই প্রাণ-দেউলে-করা তোমাদের দুর্মূল্য শাসনতন্ত্রের এত অসহ্য দেনা আমরা বহন করতে পারব না যাতে বর্বরদশার জগদ্দল পাথর চিরদিনের মতো দেশের বুকের উপর চেপে থাকে। বর্তমান যুগে য়ুরোপ যে-সভ্যতার আদর্শকে উদ্ভাবিত করেছে য়ুরোপই কি স্বহস্তে তার দাবিকে ভূমণ্ডলের পশ্চিম সীমানাতেই আবদ্ধ করে রাখবে। সর্বজনের সর্বকালের কাছে সেই সভ্যতার মহৎ দায়িত্ব কি য়ুরোপের নেই।

ক্রমে ক্রমে দেখা গেল য়ুরোপের বাইরে অনাত্মীয়মণ্ডলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার জন্যে নয়, আগুন লাগাবার জন্যে। তাই একদিন কামানের গোলা আর আফিমের পিণ্ড একসঙ্গে বর্ষিত হল চীনের মর্মস্থানের উপর। ইতিহাসে আজ পর্যন্ত এমন সর্বনাশ আর কোনোদিন কোথাও হয় নি— এক হয়েছিল য়ুরোপীয় সভ্যজাতি যখন নবাবিষ্কৃত আমেরিকায় স্বর্ণপিণ্ডের লোভে ছলে বলে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দিয়েছে 'মায়া' জাতির অপূর্ব সভ্যতাকে। মধ্যযুগে অসভ্য তাতার বিজিত দেশে নরমুণ্ডের স্তূপ উঁচু করে তুলেছিল; তার বেদনা অনতিকাল পরে লুপ্ত হয়েছে। সভ্য য়ুরোপ চীনের মতো এত বড়ো দেশকে জোর করে যে বিষ গিলিয়েছে, তাতে চিরকালের মতো তার মজ্জা জর্জরিত হয়ে গেল। একদিন তরুণ পারসিকের দল দীর্ঘকালের অসাড়তার জাল থেকে পারস্যকে উদ্ধার করবার জন্যে যখন প্রাণপণ করে দাঁড়িয়েছিল, তখন সভ্য য়ুরোপ কী রকম করে দুই হাতে তার টুঁটি চেপে ধরেছিল, সেই অমার্জনীয় শোকাবহ ব্যাপার জানা যায় পারস্যের তদানীন্তন পরাহত আমেরিকান রাজস্বসচিব শুস্টারের *Strangling of Persia* বইখানা পড়লে। ও দিকে আফ্রিকার কন্‌গো প্রদেশে য়ুরোপীয় শাসন যে কী রকম অকথ্য বিভীষিকায় পরিণত হয়েছিল সে সকলেরই জানা। আজও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোজাতি সামাজিক অসম্মানে লাঞ্ছিত, এবং সেই-জাতীয় কোনো হতভাগ্যকে যখন জীবিত অবস্থায় দাহ করা হয়, তখন শ্বেতচর্মী নরনারীরা সেই পাশব দৃশ্য উপভোগ করবার জন্যে ভিড় করে আসে।

তার পরে মহাযুদ্ধ এসে অকস্মাৎ পাশ্চাত্য ইতিহাসের একটা পর্দা তুলে দিলে। যেন কোন্ মাতালের আব্রু গেল ঘুচে। এত মিথ্যা এত বীভৎস হিংস্রতা নিবিড় হয়ে বহু পূর্বকার অন্ধ যুগে ক্ষণকালের জন্যে হয়তো মাঝে মাঝে উৎপাত করেছে, কিন্তু

এমন ভীষণ উদগ্র মূর্তিতে আপনাকে প্রকাশ করে নি। তারা আসত কালো আঁধির মতো ধুলায় আপনাকে আবৃত করে, কিন্তু এ এসেছে যেন অগ্নিগিরির আগ্নেয়স্রাব, অবরুদ্ধ পাপের বাধামুক্ত উৎস উচ্ছ্বাসে দিগ্‌দিগন্তকে ঝাপিয়ে তুলে, দগ্ধ করে দিয়ে দূরদূরান্তের পৃথিবীর শ্যামলতাকে। তার পর থেকে দেখছি য়ুরোপের শুভবুদ্ধি আপনার 'পরে বিশ্বাস হারিয়েছে, আজ সে স্পর্ধা করে কল্যাণের আদর্শকে উপহাস করতে উদ্যত। আজ তার লজ্জা গেছে ভেঙে; একদা ইংরেজের সংস্রবে আমরা যে-য়ুরোপকে জানতুম, কুৎসিতের সম্বন্ধে তার একটা সংকোচ ছিল, আজ সে লজ্জা দিচ্ছে সেই সংকোচকেই। আজকাল দেখছি আপনাকে ভদ্র প্রমাণ করবার জন্যে সভ্যতার দায়িত্ববোধ যাচ্ছে চলে। অমানবিক নিষ্ঠুরতা দেখা দিচ্ছে প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে। সভ্য য়ুরোপের সর্দার-পোড়ো জাপানকে দেখলুম কোরিয়ায়, দেখলুম চীনে, তার নিষ্ঠুর বলদৃপ্ত অধিকার-লঙ্ঘনকে নিন্দা করলে সে অট্টহাস্যে নজির বের করে য়ুরোপের ইতিহাস থেকে। আয়র্লণ্ডে রক্তপিঙ্গলের যে উন্মত্ত বর্বরতা দেখা গেল, অনতিপূর্বেও আমরা তা কোনোদিন কল্পনাও করতে পারতুম না। তার পরে চোখের সামনে দেখলুম জালিয়ানওয়ালাবাগের বিভীষিকা। যে-য়ুরোপ একদিন তৎকালীন তুর্কিকে অমানুষ বলে গঞ্জনা দিয়েছে তারই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রকাশ পেল ফ্যাসিজ্‌মের নির্বিচার নিদারুণতা। একদিন জেনেছিলুম আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা য়ুরোপের একটা শ্রেষ্ঠ সাধনা, আজ দেখছি য়ুরোপে এবং আমেরিকায় সেই স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ প্রতিদিন প্রবল হয়ে উঠছে। ব্যক্তিগত শ্রেয়োবুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করবার কথা অল্পবয়সে আমরা য়ুরোপের বেদী থেকে শুনতে পেতুম, আজ সেখানে যারা খৃস্টের উপদেশকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, যারা শত্রুকেও হিংসা করা মনে করে অধর্ম, তাদের কী দশা ঘটে তার একটা দৃষ্টান্ত থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

যুদ্ধবিরোধী ফরাসী যুবক রেনে রেইম লিখছেন :

So after the war I was sent to Guiana ·· Condemned to fifteen years' penal servitude I have drained to the dregs the cup of bitterness ' but the term of penal servitude being completed, there remains always the accessory punishment— banishment for life. One arrives in Guiana sound in health, young, vigorous, one leaves (if one leaves), weakly, old, ill··· One arrives in Guiana honest— a few months later one is corrupted··· They (the transportees) are an easy prey to all the maladies of this land— fever, dysentry, tuberculosis and most terrible of all, leprosy.

পোলিটিকাল মতভেদের জন্যে ইটালি যে দ্বীপান্তরবাসের বিধান করেছে, সে কীরকম দুঃসহ নরকবাস, সে কথা সকলেরই জানা আছে। য়ুরোপীয় সভ্যতার আলোক যে-সব দেশ উজ্জ্বলতম করে জ্বালিয়েছে, তাদের মধ্যে প্রধান স্থান নিতে পারে জর্মনি। কিন্তু আজ সেখানে সভ্যতার সকল আদর্শ টুকরো টুকরো করে দিয়ে এমন অকস্মাৎ, এত সহজে উন্মত্ত দানবিকতা সমস্ত দেশকে অধিকার করে নিলে, এও তো অসম্ভব হল না! যুদ্ধপরবর্তীকালীন য়ুরোপের বর্বর নির্দয়তা যখন আজ এমন নির্লজ্জভাবে চার দিকে উদ্‌ঘাটিত হতে থাকল তখন এই কথাই বার বার মনে আসে, কোথায় রইল মানুষের সেই দরবার যেখানে মানুষের শেষ আপিল পৌঁছবে আজ। মনুষ্যত্বের 'পরে বিশ্বাস কি ভাঙতে হবে— বর্বরতা দিয়েই কি চিরকাল ঠেকাতে হবে বর্বরতা। কিন্তু সেই নৈরাশ্যের মধ্যেই এই কথাও মনে আসে যে, দুর্গতি যতই উদ্ধতভাবে ভয়ংকর হয়ে উঠুক, তবু তাকে মাথা তুলে বিচার করতে পারি, ঘোষণা করতে পারি, তুমি অশ্রদ্ধেয়, অভিসম্পাত দিয়ে বলতে পারি "বিনিপাত", বলবার জন্যে পণ করতে পারে প্রাণ এমন লোকও দুর্দিনের মধ্যে দেখা দেয়, এই তো সকল দুঃখের, সকল ভয়ের উপরের কথা। আজ পেয়াদার পীড়নে হাড় গুঁড়িয়ে যেতে পারে, তবুও তো আগেকার মতো হাতজোড় করে বলতে পারি নে, দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা, বলতে পারি নে, তেজীয়ান যে তার কিছুই দোষের নয়। বরঞ্চ মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি, তারই দায়িত্ব বড়ো, তারই আদর্শে তারই অপরাধ সকলের চেয়ে নিন্দনীয়। যে দুঃখী, যে অবমানিত, সে যেদিন ন্যায়ের দোহাইকে অত্যাচারের সিংহগর্জনের উপরে তুলে আত্মবিস্মৃত প্রবলকে ধিক্কার দেবার ভরসা ও অধিকার সম্পূর্ণ হারাবে, সেই দিনই বুঝব এই যুগ আপন শ্রেষ্ঠসম্পদে শেষকড়া-পর্যন্ত দেউলে হল। তার পরে আসুক কল্পান্ত।

১৩৪০

বিবেচনা ও অবিবেচনা

বাংলা দেশে একদিন স্বদেশপ্রেমের বান ডাকিল; আমাদের প্রাণের ধারা হঠাৎ অসম্ভব রকম ফুলিয়া উঠিয়া পাড়ি ছাপাইয়া পড়ে আর কি। সেই বেগটা যে সত্য তাহার প্রমাণ এই যে, তাহার চাঞ্চল্যে কেবল আমাদের কাগজের নৌকাগুলাকে দোলা দেয় নাই, কেবল সভাতলেই করতালির তুফান উঠিয়া সমস্ত চুকিয়া গেল না।

সেদিন সমাজটাও যেন আগাগোড়া নড়িয়া উঠিল এমনতরো বোধ হইয়াছিল। এক মুহূর্তেই তাঁতের কাজে ব্রাহ্মণের ছেলেদের বাধা ছুটিয়া গেল; ভদ্রসন্তান কাপড়ের

মোট বহিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল, এমন-কি, হিন্দুমুসলমানে একত্রে বসিয়া আহার করার আয়োজনটাও হয়-হয় করিতে লাগিল।

তর্ক করিয়া এসব হয় নাই— কেহ বিধান লইবার জন্য অধ্যাপকপাড়ায় যাতায়াত করে নাই। প্রাণ জাগিলেই কাহারও পরামর্শ না লইয়া আপনি সে চলিতে প্রবৃত্ত হয়; তখন সে চলার পথের সমস্ত বাধাগুলাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া তাহাতে গম্ভীরভাবে সিঁদুর চন্দন মাখাইতে বসে না, কিম্বা তাহাকে লইয়া বসিয়া বসিয়া সুনিপুণ তত্ত্ব বা সুচারু কবিত্বের সূক্ষ্ম বুনানি বিস্তার করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হয় না। যেমনি চলিতে যায় অমনি সে আপনিই বুঝিতে পারে কোন্‌গুলা লইয়া তাহার চলিবে না; তখন যাহা গায়ে ঠেকে তাহাকেই সমস্ত গা দিয়া সে ঠেলা দিতে শুরু করে। সেই সাবেক পাথরগুলা যখন ঠেলার চোটে টলিতে থাকে তখন বোঝা যায় প্রাণ জাগিয়াছে বটে, ইহা মায়া নহে স্বপ্ন নহে।

সেই বন্যার বেগ কমিয়া আসিয়াছে। সমাজের মধ্যে যে চলার ঝোঁক আসিয়াছিল সেটা কাটিয়া গিয়া আজ আবার বাঁধি বোলের বেড়া বাঁধিবার দিন আসিয়াছে।

আজ আবার সমাজকে বাহবা দিবার পালা আরম্ভ হইল। জগতের মধ্যে কেবলমাত্র ভারতেরই জলবাতাসে এমন একটি অদ্ভুত জাদু আছে যে এখানে রীতি আপনিই নীতিকে বরণ করিয়া লয়, আচারের পক্ষে বিচারের কোনো প্রয়োজনই হয় না। আমাদের কিছুই বানাইবার দরকার নাই কেবল মানিয়া গেলেই চলে, এই বলিয়া নিজেকে অভিনন্দন করিতে বসিয়াছি।

যে-লোক কাজের উৎসাহে আছে, স্তবের উৎসাহে তাহার প্রয়োজনই থাকে না। ইহার প্রমাণ দেখো, আমরাও পশ্চিম সমুদ্রপারে গিয়া সেখানকার মানুষদের মুখের উপর বলিয়া আসিয়াছি, "তোমরা মরিতে বসিয়াছ। আত্মা বলিয়া পদার্থকে কেবলই বস্তুচাপা দিয়া তাহার দম বন্ধ করিবার জো করিয়াছ— তোমরা স্থূলের উপাসক।" এ-সব কঠোর কথা শুনিয়া তাহারা তো মারমূর্তি ধরে নাই। বরঞ্চ ভালোমানুষের মতো মানিয়া লইয়াছে; মনে মনে বলিয়াছে, 'হবেও বা। আমাদের বয়স অল্প, আমরা কাজ বুঝি— ইহারা অত্যন্ত প্রাচীন, অতএব কাজ কামাই করা সম্বন্ধে ইহারা যে তত্ত্বকথাগুলা বলে নিশ্চয় সেগুলা ইহারা আমাদের চেয়ে ভালোই বোঝে।' এই বলিয়া ইহারা আমাদিগকে দক্ষিণা দিয়া খুশি করিয়া বিদায় করিয়াছে এবং তাহার পরে আস্তিন গুটাইয়া যেমন কাজ করিতেছিল তেমনিই কাজ করিতে লাগিয়াছে।

কেননা, হাজারই ইহাদিগকে নিন্দা করি আর ভয় দেখাই ইহারা যে চলিতেছে; ইহারা যে প্রাণবান তাহার প্রমাণ যে ইহাদের নিজেরই মধ্যে। মরার বাড়া গালি

নাই, এ কথা ইহাদের পক্ষে খাটে না। ইহারা জানে মরার বাড়াও গালি আছে— বাঁচিয়া মরা। ইহাদের জীবনযাত্রায় সংকটের সীমা নাই, সমস্যার গ্রন্থিও বিস্তর কিন্তু সকলের উপরে ইহাদিগকে ভরসা দিতেছে ইহাদের প্রাণ। এইজন্য ইহারা নিন্দা অনায়াসে সহিতে পারে এবং নৈরাশ্যের কথাটাকে লইয়া ক্ষণকালের জন্য খেলা করে মাত্র, তাহাতে তাহাদের প্রাণের বেগে আর একটু উত্তেজনার সঞ্চার করে।

আমরাও তেমনি নিন্দা সহজে সহিতে পারিতাম যদি পুরাদমে কাজের পথে চলিতাম। কারণ তাহা হইলে আপনিই বুঝিতে পারিতাম প্রাণের গতিতে সমস্ত গ্লানিকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। পঙ্ক যখন অচল হইয়া থাকে তখন সেটা নিন্দিত, কিন্তু জোয়ারের গঙ্গাকে পঙ্কিল বলিয়া দোষ দিলেও যাহারা স্নান করে তাহাদের তাহাতে বাধা হয় না।

এইজন্য, নিষ্কর্মণ্য যে তাহারই অহোরাত্র স্তবের দরকার হয়। যে ধনীর কীর্তিও নাই, হাতে কোনো কর্মও নাই, চাটুকারের প্রয়োজন সব-চেয়ে তাহারই অধিক, নহিলে সে আপনার জড়ত্বের বোঝা বহিবে কেমন করিয়া। তাহাকে পরামর্শ দেওয়া উচিত যে, তোমার এই বনেদি স্থাবরত্ব গৌরব করিবার জিনিস নয়, যেমন করিয়া পার একটা কর্মে লাগিয়া যাও। কিন্তু এ স্থলে পরামর্শদাতার কাজটা নিরাপদ নহে, বাবুর পারিষদবর্গ তখনই হাঁ হাঁ করিয়া আসিবে। সুতরাং বকশিসের প্রত্যাশা থাকিলে বলিতে হয়, "হুজুর, আপনি যে সনাতন তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়াছেন উহার তুলার স্তূপ জগতে অতুল, অতএব বংশের গৌরব যদি রাখিতে চান তো নড়িবেন না।"

আমাদের সমাজে যে পরিমাণে কর্ম বন্ধ হইয়া আসিয়াছে সেই পরিমাণে বাহবার ঘটা বাড়িয়া উঠিয়াছে। চলিতে গেলেই দেখি সকল বিষয়েই পদে পদে কেবলই বাধে। এমন স্থলে হয় বলিতে হয়, খাঁচাটাকে ভাঙো, কারণ ওটা আমাদের ঈশ্বরদত্ত পাখাদুটাকে অসাড় করিয়া দিল ; নয় বলিতে হয়, ঈশ্বরদত্ত পাখার চেয়ে খাঁচার লোহার শলাগুলো পবিত্র, কারণ, পাখা তো আজ উঠিতেছে আবার কাল পড়িতেছে কিন্তু লোহার শলাগুলো চিরকাল স্থির আছে। বিধাতার সৃষ্টি পাখা নূতন, আর কামারের সৃষ্টি খাঁচা সনাতন ; অতএব ঐ খাঁচার সীমাটুকুর মধ্যে যতটুকু পাখাঝাপট সম্ভব সেইটুকুই বিধি, তাহাই ধর্ম, আর তাহার বাহিরে অনন্ত আকাশ-ভরা নিষেধ। খাঁচার মধ্যে যদি নিতান্তই থাকিতে হয় তবে খাঁচার স্তব করিলে নিশ্চয়ই মন ঠাণ্ডা থাকে।

আমাদের সামাজিক কামারে যে-শলাটি যেমন করিয়া বানাইয়াছে শিশুকাল হইতে

তাহারই স্তবের বুলি পড়িয়া পড়িয়া আমরা অন্য সকল গান ভুলিয়াছি, কেননা অন্যথা করিলে বিপদের অন্ত নাই। আমাদের এখানে সকল দিকেই ঐ কামারেরই হইল জয়, আর সব-চেয়ে বিড়ম্বিত হইলেন বিধাতা, যিনি আমাদিগকে কর্মশক্তি দিয়াছেন, যিনি মানুষ বলিয়া আমাদিগকে বুদ্ধি দিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

যাঁহারা বলিতেছেন যেখানে যাহা আছে সমস্তই বজায় থাক্, তাঁহারা সকলেই আমাদের প্রণম্য— কারণ, তাঁহাদের বয়স অল্পই হউক আর বেশিই হউক তাঁহারা সকলেই প্রবীণ। সংসারে তাঁহাদের প্রয়োজন আমরা অস্বীকার করি না। পৃথিবীতে এমন সমাজ নাই যেখানে তাঁহারা দণ্ড ধরিয়া বসিয়া নাই। কিন্তু বিধাতার বরে যে-সমাজ বাঁচিয়া থাকিবে সে-সমাজে তাঁহাদের দণ্ডই চরম বলিয়া মান পায় না।

সেদিন একটি কুকুরছানাকে দেখা গেল, মাটির উপর দিয়া একটি কীট চলিতেছে দেখিয়া তাহার ভারি কৌতূহল। সে তাহাকে শুঁকিতে শুঁকিতে তাহার অনুসরণ করিয়া চলিল। যেমনি পোকাটা একটু ধড়ফড় করিয়া উঠিতেছে অমনি কুকুরশাবক চমকিয়া পিছাইয়া আসিতেছে।

দেখা গেল তাহার মধ্যে নিষেধ এবং তাগিদ দুটা জিনিসই আছে। প্রাণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এই যে, সমস্তকেই সে পরখ করিয়া দেখে। নূতন নূতন অভিজ্ঞতার পথ ধরিয়া সে আপনার অধিকার বিস্তার করিয়া চলিতে চায়। প্রাণ দুঃসাহসিক— বিপদের ঠোকর খাইলেও সে আপনার জয়যাত্রার পথ হইতে সম্পূর্ণ নিরস্ত হইতে চায় না। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি প্রবীণও আছে, বাধার বিকট চেহারা দেখিবা মাত্রই সে বলে, কাজ কী। বহু পুরাতন যুগ হইতে পুরুষানুক্রমে যত-কিছু বিপদের তাড়না আপনার ভয়ের সংবাদ রাখিয়া গিয়াছে তাহাকে পুঁথির আকারে বাঁধাইয়া রাখিয়া একটি বৃদ্ধ তাহারই খবরদারি করিতেছে। নবীন প্রাণ এবং প্রবীণ ভয়, জীবের মধ্যে উভয়েই কাজ করিতেছে। ভয় বলিতেছে, 'রোসো রোসো', প্রাণ বলিতেছে, 'দেখাই যাক না'।

অতএব এই প্রবীণতার বিরুদ্ধে আমরা আপত্তি করিবার কে। আপত্তি করিও না। তাঁহার বৈঠকে তিনি গদিয়ান হইয়া থাকিবেন, সেখান হইতে তাঁহাকে আমরা নড়িয়া বসিতে বলি এমন বেআদব আমরা নই। কিন্তু প্রাণের রাজ্যে তাঁহাকেই একেশ্বর করিবার যখন ষড়যন্ত্র হয় তখনই বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়া বাহির হইবার দিন আসে। দুর্ভাবনা এবং নির্ভাবনা উভয়কেই আমরা খাতির করিয়া চলিতে রাজি আছি।

প্রাণের রাজ্যাধিকারে এই উভয়েই শরিক বটে কিন্তু উভয়ের অংশ যে সমান

উড়িতে উড়িতে আকাশ হইতে পড়িয়া চুরমার হইয়া মরিতেছে তাহাদের মধ্যে সেই দুরন্ত অবিবেচনা কাজ করিতেছে। এমনি করিয়াই একদিন যাহারা সমুদ্র পার হইবার সাধনা করিতে করিতে হাজার হাজার জলে ডুবিয়া মরিয়াছে সেই অবিবেচনাই তাহাদিগকে তাড়া করিয়াছিল। সেই দুর্ধর্ষ অবিবেচনার উত্তেজনাতেই আজও মানুষ তুষারদৈত্যের পাহারা এড়াইয়া কখনো উত্তরমেরু কখনো দক্ষিণমেরুতে কেবলমাত্র দিগ্বিজয় করিবার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছে। এমনি করিয়া যাহারা নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়া তাহারাই লক্ষ্মীকে দুর্গম অন্তঃপুর হইতে হরণ করিয়া আনিয়াছে।

এই দুঃসাহসিকের দল নিজের সমাজের মধ্যেও যে লক্ষ্মীছেলে হইয়া ঠাণ্ডা হইয়া বসিয়া আছে তাহা নহে। যাহা আছে তাহাই যে চূড়ান্ত এ কথা কোনোমতেই তাহাদের মন মানিতে চায় না। বিজ্ঞ মানুষদের নিয়ত ধমকানি খাইয়াও এই অশান্তের দল জীর্ণ বেড়া ভাঙিয়া পুরাতন বেড়া সরাইয়া কত উৎপাত করিতেছে তাহার ঠিকানা নাই। প্রাণের চাঞ্চল্য তাহাদের স্বভাবতই প্রবল বলিয়াই, তাহাদের সাহসের অন্ত নাই বলিয়াই, সেই বিপুল বেগেতেই তাহারা সমস্ত সীমাকে কেবলই ধাক্কা মারিয়া বেড়ায়। ইহা তাহাদের স্বভাব। এমনি করিয়াই আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে যেখানে সীমা দেখা যাইতেছিল বস্তুতই সেখানে সীমা নাই। ইহারা দুঃখ পায়, দুঃখ দেয়, মানুষকে অস্থির করিয়া তোলে এবং মরিবার বেলায় ইহারাই মরে। কিন্তু বাঁচিবার পথ ইহারাই বাহির করিয়া দেয়।

আমাদের দেশে সেই জন্মলক্ষ্মীছাড়া কি নাই। নিশ্চয়ই আছে। কারণ তাহারাই যে প্রাণের স্বাভাবিক সৃষ্টি; প্রাণ যে আপনার গরজেই তাহাদিগকে জন্ম দেয়। কিন্তু পৃথিবীতে যে-কোনো শক্তিই মানুষকে সম্পূর্ণ আপনার তাঁবেদার করিতে চায় সে প্রাণের লীলাকেই সব-চেয়ে ভয় করে— সেই কারণেই আমাদের সমাজ ঐ-সকল প্রাণবহুল দুরন্ত ছেলেকে শিশুকাল হইতে নানাপ্রকার শাসনে এমনই ঠাণ্ডা করিতে চায় যাহাতে তাহাদের ভালোমানুষি দেখিলে একেবারে চোখ জুড়াইয়া যায়। মানা, মানা, মানা; শুইতে বসিতে কেবলই তাহাদিগকে মানা মানিয়া চলিতে হইবে। যাহার কোনো কারণ নাই যুক্তি নাই তাহাকে মানাই যাহাদের নিয়ত অভ্যাস, মানিয়া চলা তাহাদের এমনি আশ্চর্য দুরন্ত হইয়া উঠে যে, যেখানে কাহাকেও মানিবার নাই সেখানে তাহারা চলিতেই পারে না। এইপ্রকার হতবুদ্ধি হতোদ্যম মানুষকে আপন তর্জনিসংকেতে ওঠ্ বোস্ করানো সহজ। আমাদের সমাজ সমাজের মানুষগুলাকে লইয়া এই প্রকারের একটা প্রকাণ্ড পুতুলবাজির কারখানা খুলিয়াছে। তারে তারে আপাদমস্তক কেমন করিয়া বাঁধিয়াছে, কী আশ্চর্য তাহার কৌশল। ইহাকে বাহবা

দিতে হয় বটে। বিধাতাকে এমন সম্পূর্ণরূপে হার মানানো, প্রাণীকে এমন কলের পুতুল করিয়া তোলা জগতে আর-কোথায় ঘটিয়াছে।

তবু হাজার হইলেও যাহাদের মধ্যে প্রাণের প্রাচুর্য আছে তাহাদিগকে সকল দিক হইতে চাপিয়া পিষিয়াও তাহাদের তেজ একেবারে নষ্ট করা যায় না। এইজন্য আর-কোনো কাজ না পাইয়া সেই উদ্যম সেই তেজ তাহারা সমাজের বেড়ি গড়িবার জন্যই প্রবলবেগে খাটাইতে থাকে। স্বভাবের বিকৃতি না ঘটিলে যাহারা সর্বাগ্রে চলার পথে ছুটিত তাহারাই পথের মধ্যে প্রাচীর তুলিবার জন্য সব-চেয়ে উৎসাহের সঙ্গে লাগিয়া থাকে। কাজ করিবার জন্যই তাহাদের জন্ম, কিন্তু কাজের ক্ষেত্র বন্ধ বলিয়া কাজ বন্ধ করিবার কাজেই তাহারা কোমর বাঁধিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগে।

ইহারা কুন্তীসুত কর্ণের মতো। পাণ্ডবের দলে কর্ণের যথার্থ স্থান ছিল কিন্তু সেখানে অদৃষ্টক্রমে কোনো অধিকার না পাওয়াতে পাণ্ডবদিগকে উচ্ছেদ করাই তাঁহার জীবনের ব্রত হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা যাঁহাদের কথা বলিতেছি তাঁহারা স্বভাবতই চলিষ্ণু, কিন্তু এ দেশে জন্মিয়া সে কথাটা তাঁহারা একেবারেই ভুলিয়া বসিয়াছেন— এইজন্য যাহারা ঠিক তাঁহাদের একদলের লোক, তাঁহাদের সঙ্গেই অহরহ হাতাহাতি করিতে পারিলে ইঁহারা আর-কিছু চান না।

এই শ্রেণীর লোক আজকাল অনেক দেখা যায়। ইঁহারা তাল ঠুকিয়া বলেন, "স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে," আক্ষেপ করিয়া বলেন, আমাদের প্রভুদের মানা আছে বলিয়াই আমরা পৌরুষ দেখাইতে পারি না। অথচ সমাজের চোখে ঠুলি দিয়া তাহাকে সরু মোটা হাজার বাঁধনে বাঁধিয়া মানার প্রকাণ্ড ঘানিতে জুড়িয়া একই চক্রপথে ঘুরাইবার সব-চেয়ে বড়ো ওস্তাদ ইঁহারাই। বলেন, এ ঘানি সনাতন, ইহার পবিত্র স্নিগ্ধ তৈলে প্রকুপিত বায়ু একেবারে শান্ত হইয়া যায়। ইঁহারা প্রচণ্ড তেজের সঙ্গেই দেশের তেজ নিবৃত্তির জন্যই লাগিয়াছেন ; সমাজের মধ্যে কোথাও কিছু ব্যস্ততার লক্ষণ না দেখা দেয় সেজন্য ইঁহারা ভয়ংকর ব্যস্ত।

কিন্তু পারিয়া উঠিবেন না। অস্থিরতার বিরুদ্ধে যে চাঞ্চল্য ইঁহাদিগকে এমন অস্থির করিয়া তুলিয়াছে সেটা দেশের নাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছে তাহার প্রমাণ তাঁহারা নিজেই। সকালবেলায় জাগিয়া উঠিয়া যদি কেহ কেহ ঘরে আলো আসিতেছে বলিয়া বিরক্ত হইয়া দুড়দাড় শব্দে ঘরের দরজাজানালাগুলো বন্ধ করিয়া দিতে চায় তবে নিশ্চয় আরো অনেক লোক জাগিবে যাহারা দরজা খুলিয়া দিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিবে। জাগরণের দিনে দুই দলই জাগে এইটেই আমাদের সকলের চেয়ে আশার কথা।

যাঁহারা দেশকে ঠাণ্ডা করিয়া রাখিয়াছিলেন তাঁহারা অনেকদিন একাধিপত্য করিয়াছেন। তাঁহাদের সেই একেশ্বর রাজত্বের কীর্তিগুলি চারি দিকেই দেখা যাইতেছে; তাহা লইয়া আলোচনা করিতে গেলেই রাগারাগি হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু দেশের নবযৌবনকে তাঁহারা আর নির্বাসিত করিয়া রাখিতে পারিবেন না। তাঁহারা চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া থাকুন, আর বাকি সবাই পথে ঘাটে বাহির হইয়া পড়ুক। সেখানে তারুণ্যের জয় হউক। তাহার পায়ের তলায় জঙ্গল মরিয়া যাক, জঞ্জাল সরিয়া যাক, কাঁটা দলিয়া যাক, পথ খোলসা হোক, তাহার অবিবেচনার উদ্ধত বেগে অসাধ্যসাধন হইতে থাক্।

চলার পদ্ধতির মধ্যে অবিবেচনার বেগও দরকার, বিবেচনার সংযমও আবশ্যক; কিন্তু অবিবেচনার বেগও বন্ধ করিব আবার বিবেচনা করিতেও অধিকার দিব না— মানুষকে বলিব, তুমি শক্তিও চালাইয়ো না, বুদ্ধিও চালাইয়ো না, তুমি কেবলমাত্র ঘানি চালাও, এ বিধান কখনোই চিরদিন চলিবে না। যে-পথে চলাফেরা বন্ধ, সে-পথে ঘাস জন্মায় এবং ঘাসের মধ্যে নানা রঙের ফুলও ফোটে। সে ঘাস সে ফুল সুন্দর এ কথা কেহই অস্বীকার করিবে না কিন্তু পথের সৌন্দর্য ঘাসেও নহে ফুলেও নহে, তাহা বাধাহীন বিচ্ছেদহীন বিস্তারে; তাহা ভ্রমরগুঞ্জনে নহে কিন্তু পথিকদলের অক্লান্ত পদধ্বনিতেই রমণীয়।

১৩২১

লোকহিত

লোকসাধারণ বলিয়া একটা পদার্থ আমাদের দেশে আছে এটা আমরা কিছুদিন হইতে আন্দাজ করিতেছি এবং এই লোকসাধারণের জন্য কিছু করা উচিত হঠাৎ এই ভাবনা আমাদের মাথায় চাপিয়াছে। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। এই কারণে, ভাবনার জন্যই ভাবনা হয়।

আমরা পরের উপকার করিব মনে করিলেই উপকার করিতে পারি না। উপকার করিবার অধিকার থাকা চাই। যে বড়ো সে ছোটোর অপকার অতি সহজে করিতে পারে কিন্তু ছোটোর উপকার করিতে হইলে কেবল বড়ো হইলে চলিবে না, ছোটো হইতে হইবে, ছোটোর সমান হইতে হইবে। মানুষ কোনোদিন কোনো যথার্থ হিতকে ভিক্ষারূপে গ্রহণ করিবে না, ঋণরূপেও না, কেবলমাত্র প্রাপ্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারিবে।

কিন্তু আমরা লোকহিতের জন্য যখন মাতি তখন অনেক স্থলে সেই মত্ততার মূলে একটি আত্মাভিমানের মদ থাকে। আমরা লোকসাধারণের চেয়ে সকল বিষয়ে বড়ো এই কথাটাই রাজকীয় চালে সম্ভোগ করিবার উপায় উহাদের হিত করিবার আয়োজন। এমন স্থলে উহাদেরও অহিত করি, নিজেদেরও হিত করি না।

হিত করিবার একটিমাত্র ঈশ্বরদত্ত অধিকার আছে, সেটি প্রীতি। প্রীতির দানে কোনো অপমান নাই কিন্তু হিতৈষিতার দানে মানুষ অপমানিত হয়। মানুষকে সকলের চেয়ে নত করিবার উপায় তাহার হিত করা অথচ তাহাকে প্রীতি না-করা।

এ কথা অনেক সময়েই শোনা যায় যে, মানুষ স্বভাবতই অকৃতজ্ঞ— যাহার কাছে সে ঋণী তাহাকে পরিহার করিবার জন্য তাহার চেষ্টা। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ— এ উপদেশ পারতপক্ষে কেহ মানে না। তাহার মহাজনটি যে-রাস্তা দিয়া চলে মানুষ সে-রাস্তায় চলা একেবারে ছাড়িয়া দেয়।

ইহার কারণ এ নয় যে, স্বভাবতই মানুষের মনটা বিকৃত। ইহার কারণ এই যে, মহাজনকে সুদ দিতে হয়। সে-সুদ আসলকে ছাড়াইয়া যায়। হিতৈষী যে সুদটি আদায় করে সেটি মানুষের আত্মসম্মান; সেটিও লইবে আবার কৃতজ্ঞতাও দাবি করিবে সে যে শাইলকের বাড়া হইল।

সেইজন্য, লোকহিত করায় লোকের বিপদ আছে সে কথা ভুলিলে চলিবে না। লোকের সঙ্গে আপনাকে পৃথক রাখিয়া যদি তাহার হিত করিতে যাই তবে সেই উপদ্রব লোকে সহ্য না করিলেই তাহাদের হিত হইবে।

অল্পদিন হইল এ সম্বন্ধে আমাদের একটা শিক্ষা হইয়া গেছে। যে কারণেই হউক যেদিন স্বদেশী নিমকের প্রতি হঠাৎ আমাদের অত্যন্ত একটা টান হইয়াছিল সেদিন আমরা দেশের মুসলমানদের কিছু অস্বাভাবিক উচ্চস্বরেই আত্মীয় বলিয়া ভাই বলিয়া ডাকাডাকি শুরু করিয়াছিলাম।

সেই স্নেহের ডাকে যখন তাহারা অশ্রুগদগদ কণ্ঠে সাড়া দিল না তখন আমরা তাহাদের উপর ভারি রাগ করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম এটা নিতান্তই ওদের শয়তানি। একদিনের জন্যও ভাবি নাই আমাদের ডাকের মধ্যে গরজ ছিল কিন্তু সত্য ছিল না। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে একটা সাধারণ সামাজিকতা আছে, যে সামাজিকতার টানে আমরা সহজ প্রীতির বশে মানুষকে ঘরে ডাকিয়া আনি, তাহার সঙ্গে বসিয়া খাই, যদি-বা তাহার সঙ্গে আমাদের পার্থক্য থাকে সেটাকে অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া দেখিতে দিই না— সেই নিতান্ত সাধারণ সামাজিকতার ক্ষেত্রে যাহাকে আমরা ভাই বলিয়া আপন বলিয়া মানিতে না পারি— দায়ে পড়িয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ভাই বলিয়া

যথোচিত সতর্কতার সহিত তাহাকে বুকে টানিবার নাট্যভঙ্গী করিলে সেটা কখনোই সফল হইতে পারে না।

এক মানুষের সঙ্গে আর-এক মানুষের, এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর-এক সম্প্রদায়ের তো পার্থক্য থাকেই, কিন্তু সাধারণ সামাজিকতার কাজই এই— সেই পার্থক্যটাকে রূঢ়ভাবে প্রত্যক্ষগোচর না করা। ধনী-দরিদ্রে পার্থক্য আছে, কিন্তু দরিদ্র তাহার ঘরে আসিলে ধনী যদি সেই পার্থক্যটাকে চাপা না দিয়া সেইটেকেই অত্যুগ্র করিয়া তোলে তবে আর যাই হউক দায়ে ঠেকিলে সেই দরিদ্রের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে যাওয়া ধনীর পক্ষে না হয় সত্য, না হয় শোভন।

হিন্দুমুসলমানের পার্থক্যটাকে আমাদের সমাজে আমরা এতই কুশ্রীভাবে বেআব্রু করিয়া রাখিয়াছি যে, কিছুকাল পূর্বে স্বদেশী অভিযানের দিনে একজন হিন্দু স্বদেশী-প্রচারক এক গ্লাস জল খাইবেন বলিয়া তাঁহার মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে বলিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করেন নাই। কাজের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার বশে মানুষ মানুষকে ঠেলিয়া রাখে, অপমানও করে— তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় না। কুস্তির সময়ে কুস্তিগিরদের গায়ে পরস্পরের পা ঠেকে তাহার হিসাব কেহ জমাইয়া রাখে না, কিন্তু সামাজিকতার স্থলে কথায় কথায় কাহারও গায়ে পা ঠেকাইতে থাকিলে তাহা ভোলা শক্ত হয়। আমরা বিদ্যালয়ে ও আপিসে প্রতিযোগিতার ভিড়ে মুসলমানকে জোরের সঙ্গে ঠেলা দিয়াছি ; সেটা সম্পূর্ণ প্রীতিকর নহে তাহা মানি ; তবু সেখানকার ঠেলাঠেলিটা গায়ে লাগিতে পারে, হৃদয়ে লাগে না। কিন্তু সমাজের অপমানটা গায়ে লাগে না, হৃদয়ে লাগে। কারণ, সমাজের উদ্দেশ্যই এই যে, পরস্পরের পার্থক্যের উপর সুশোভন সামঞ্জস্যের আস্তরণ বিছাইয়া দেওয়া।

বঙ্গবিচ্ছেদ-ব্যাপারটা আমাদের অন্নবস্ত্রে হাত দেয় নাই, আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিয়াছিল। সেই হৃদয়টা যতদূর পর্যন্ত অখণ্ড ততদূর পর্যন্ত তাহার বেদনা অপরিচ্ছিন্ন ছিল। বাংলার মুসলমান যে এই বেদনায় আমাদের সঙ্গে এক হয় নাই তাহার কারণ তাহাদের সঙ্গে আমরা কোনোদিন হৃদয়কে এক হইতে দিই নাই।

সংস্কৃত ভাষায় একটা কথা আছে, ঘরে যখন আগুন লাগিয়াছে তখন কূপ খুঁড়িতে যাওয়ার আয়োজন বৃথা। বঙ্গবিচ্ছেদের দিনে হঠাৎ যখন মুসলমানকে আমাদের দলে টানিবার প্রয়োজন হইল তখন আমরা সেই কূপ-খননেরও চেষ্টা করি নাই— আমরা মনে করিয়াছিলাম, মাটির উপরে ঘটি ঠুকিলেই জল আপনি উঠিবে। জল যখন উঠিল না কেবল ধুলাই উড়িল তখন আমাদের বিস্ময়ের সীমাপরিসীমা রহিল না। আজ

পর্যন্ত সেই কূপখননের কথা ভুলিয়া আছি। আরও বার বার মাটিতে ঘট ঠুকিতে হইবে; সেই সঙ্গে সে ঘট আপনার কপালে ঠুকিব।

লোকসাধারণের সম্বন্ধেও আমাদের ভদ্রসম্প্রদায়ের ঠিক ঐ অবস্থা। তাহাদিগকে সর্বপ্রকারে অপমানিত করা আমাদের চিরদিনের অভ্যাস। যদি নিজেদের হৃদয়ের দিকে তাকাই তবে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ভারতবর্ষকে আমরা ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ বলিয়াই জানি। বাংলাদেশে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা যে বাড়িয়া গিয়াছে তাহার একমাত্র কারণ হিন্দু ভদ্রসমাজ এই শ্রেণীয়দিগকে হৃদয়ের সহিত আপন বলিয়া টানিয়া রাখে নাই।

আমাদের সেই মনের ভাবের কোনো পরিবর্তন হইল না অথচ এই শ্রেণীর হিত-সাধনের কথা আমরা কষিয়া আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। তাই এ কথা স্মরণ করিবার সময় আসিয়াছে যে, আমরা যাহাদিগকে দূরে রাখিয়া অপমান করি তাহাদের মঙ্গলসাধনের সমারোহ করিয়া সেই অপমানের মাত্রা বাড়াইয়া কোনো ফল নাই।

একদিন যখন আমরা দেশহিতের ধ্বজা লইয়া বাহির হইয়াছিলাম তখন তাহার মধ্যে দেশের অংশটা প্রায় কিছুই ছিল না, হিতের অভিমানটাই বড়ো ছিল। সেদিন আমরা য়ুরোপের নকলে দেশহিত শুরু করিয়াছিলাম, অন্তরের একান্ত তাগিদে নয়। আজও আমরা লোকহিতের জন্য যে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছি তাহার মধ্যে অনেকটা নকল আছে। সম্প্রতি য়ুরোপে লোকসাধারণ সেখানকার রাষ্ট্রীয় রঙ্গভূমিতে প্রধান-নায়কের সাজে দেখা দিয়াছে। আমরা দর্শকরূপে এত দূরে আছি যে, আমরা তাহার হাত-পা নাড়া যতটা দেখি তাহার বাণীটা সে পরিমাণে শুনিতে পাই না। এইজন্যই নকল করিবার সময় ঐ অঙ্গভঙ্গীটাই আমাদের একমাত্র সম্বল হইয়া উঠে।

কিন্তু সেখানে কাণ্ডটা কী হইতেছে সেটা জানা চাই।

য়ুরোপে যাহারা একদিন বিশিষ্টসাধারণ বলিয়া গণ্য হইত তাহারা সেখানকার ক্ষত্রিয় ছিল। তখন কাটাকাটি মারামারির অন্ত ছিল না। তখন য়ুরোপের প্রবল বহিঃশত্রু ছিল মুসলমান; আর ভিতরে ছোটো ছোটো রাজ্যগুলা পরস্পরের গায়ের উপর পড়িয়া কেবলই মাথা ঠোকাঠুকি করিত। তখন দুঃসাহসিকের দল চারি দিকে আপনার ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া বেড়াইত— কোথাও শান্তি ছিল না।

সে সময়ে সেখানকার ক্ষত্রিয়েরাই ছিল দেশের রক্ষক। তখন তাহাদের প্রাধান্য স্বাভাবিক ছিল। তখন লোকসাধারণের সঙ্গে তাহাদের যে সম্বন্ধ ছিল সেটা কৃত্রিম নহে। তাহারা ছিল রক্ষাকর্তা এবং শাসনকর্তা। লোকসাধারণে তাহাদিগকে স্বভাবতই আপনাদের উপরিবর্তী বলিয়া মানিয়া লইত।

তাহার পরে ক্রমে অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। এখন য়ুরোপে রাজার জায়গাটা রাষ্ট্রতন্ত্র দখল করিতেছে, এখন লড়াইয়ের চেয়ে নীতিকৌশল প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধের আয়োজন পূর্বের চেয়ে বাড়িয়াছে বই কমে নাই কিন্তু এখন যোদ্ধার চেয়ে যুদ্ধবিদ্যা বড়ো; এখন বীর্যের আসনে বিজ্ঞানের অভিষেক হইয়াছে। কাজেই য়ুরোপে সাবেককালের ক্ষত্রিয়বংশীয়েরা এবং সেই সকল ক্ষত্রিয়-উপাধিধারীরা যদিও এখনো আপনাদের আভিজাত্যের গৌরব করিয়া থাকে তবু লোকসাধারণের সঙ্গে তাহাদের স্বাভাবিক সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেছে। তাই রাষ্ট্রচালনার কাজে তাহাদের আধিপত্য কমিয়া আসিলেও সেটাকে জাগাইয়া তুলিবার জোর তাহাদের নাই।

শক্তির ধারাটা এখন ক্ষত্রিয়কে ছাড়িয়া বৈশ্যের কূলে বহিতেছে। লোকসাধারণের কাঁধের উপরে তাহারা চাপিয়া বসিয়াছে। মানুষকে লইয়া তাহারা আপনার ব্যবসায়ের যন্ত্র বানাইতেছে। মানুষের পেটের জ্বালাই তাহাদের কলের স্টীম উৎপন্ন করে।

পূর্বকালের ক্ষত্রিয়নায়কের সঙ্গে মানুষের যে-সম্বন্ধ ছিল সেটা ছিল মানবসম্বন্ধ। দুঃখ কষ্ট অত্যাচার যতই থাক, তবু পরস্পরের মধ্যে হৃদয়ের আদানপ্রদানের পথ ছিল। এখন বৈশ্য মহাজনদের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ যান্ত্রিক। কর্মপ্রণালী নামক প্রকাণ্ড একটা জাঁতা মানুষের আর-সমস্তই গুঁড়া করিয়া দিয়া কেবল মজুরটুকুমাত্র বাকি রাখিবার চেষ্টা করিতেছে।

ধনের ধর্মই অসাম্য। জ্ঞান ধর্ম কলাসৌন্দর্য পাঁচজনের সঙ্গে ভাগ করিলে বাড়ে বই কমে না, কিন্তু ধন জিনিসটাকে পাঁচজনের কাছ হইতে শোষণ করিয়া লইয়া পাঁচজনের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা না করিলে সে টেঁকে না। এইজন্য ধনকামী নিজের গরজে দারিদ্র্য সৃষ্টি করিয়া থাকে।

তাই ধনের বৈষম্য লইয়া যখন সমাজে পার্থক্য ঘটে তখন ধনীর দল সেই পার্থক্যকে সমূলে ঘুচাইতে ইচ্ছা করে না, অথচ সেই পার্থক্যটা যখন বিপদজনক হইয়া উঠে তখন বিপদটাকে কোনোমতে ঠেকো দিয়া ঠেকাইয়া রাখিতে চায়।

তাই ও দেশে শ্রমজীবীর দল যতই গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতেছে ততই তাহাদিগকে ক্ষুধার অন্ন না দিয়া ঘুম-পাড়াইবার গান গাওয়া হইতেছে; তাহাদিগকে অল্পস্বল্প এটা-ওটা দিয়া কোনোমতে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা। কেহ বলে উহাদের বাসা একটু ভালো করিয়া দাও, কেহ বলে যাহাতে উহারা দু চামচ স্যুপ খাইয়া কাজে যাইতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করো, কেহ-বা তাহাদের বাড়িতে গিয়া মিষ্টমুখে কুশল জিজ্ঞাসা করে, শীতের দিনে কেহ-বা আপন উদ্বৃত্ত গরম কাপড়টা তাহাদিগকে পাঠাইয়া দেয়।

এমনি করিয়া ধনের প্রকাণ্ড জালের মধ্যে আটকা পড়িয়া লোকসাধারণ ছটফট করিয়া উঠিয়াছে। ধনের চাপটা যদি এত জোরের সঙ্গে তাহাদের উপর না পড়িত তবে তাহারা জমাট বাঁধিত না— এবং তাহারা যে, কেহ-বা কিছু তাহা কাহারও খবরে আসিত না। এখন ওদেশে লোকসাধারণ কেবল সেন্সস্-রিপোর্টের তালিকা-ভুক্ত নহে; সে একটা শক্তি। সে আর ভিক্ষা করে না, দাবি করে। এইজন্য তাহার কথা দেশের লোকে আর ভুলিতে পারিতেছে না; সকলকে সে বিষম ভাবাইয়া তুলিয়াছে।

এই লইয়া পশ্চিমদেশে নিয়ত যে-সব আলোচনা চলিতেছে আমরা তাহাদের কাগজে পত্রে তাহা সর্বদাই পড়িতে পাই। ইহাতে হঠাৎ এক-একবার আমাদের ধর্মবুদ্ধি চমক খাইয়া উঠে। বলে, তবে তো আমাদেরও ঠিক এই রকম আলোচনা কর্তব্য।

ভুলিয়া যাই ওদেশে কেবলমাত্র আলোচনার নেশায় আলোচনা নহে, তাহা নিতান্তই প্রাণের দায়ে। এই আলোচনার পশ্চাতে নানা বোঝাপড়া, নানা উপায়-অন্বেষণ আছে। কারণ সেখানে শক্তির সঙ্গে শক্তির লড়াই চলিতেছে— যাহারা অক্ষমকে অনুগ্রহ করিয়া চিত্তবিনোদন ও অবকাশযাপন করিতে চায় এ তাহাদের সেই বিলাসকলা নহে।

আমাদের দেশে লোকসাধারণ এখনো নিজেকে লোক বলিয়া জানে না, সেইজন্য জানান দিতেও পারে না। আমরা তাহাদিগকে ইংরেজি বই পড়িয়া জানিব এবং অনুগ্রহ করিয়া জানিব, সে জানায় তাহারা কোনো জোর পায় না, ফলও পায় না। তাহাদের নিজের অভাব ও বেদনা তাহাদের নিজের কাছে বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত। তাহাদের একলার দুঃখ যে একটি বিরাট দুঃখের অন্তর্গত এইটি জানিতে পারিলে তবে তাহাদের দুঃখ সমস্ত সমাজের পক্ষে একটি সমস্যা হইয়া দাঁড়াইত। তখন সমাজ, দয়া করিয়া নহে, নিজের গরজে সেই সমস্যার মীমাংসায় লাগিয়া যাইত। পরের ভাবনা ভাবা তখনই সত্য হয়, পর যখন আমাদিগকে ভাবাইয়া তোলে। অনুগ্রহ করিয়া ভাবিতে গেলে কথায় কথায় অন্যমনস্ক হইতে হয় এবং ভাবনাটা নিজের দিকেই বেশি করিয়া ঝোঁকে।

সাহিত্য সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। আমরা যদি আপনার উচ্চতার অভিমানে পুলকিত হইয়া মনে করি যে, ঐ-সব সাধারণ লোকদের জন্য আমরা লোকসাহিত্য সৃষ্টি করিব তবে এমন জিনিসের আমদানি করিব যাহাকে বিদায় করিবার জন্য দেশে ভাঙা কুলা দুর্মূল্য হইয়া উঠিবে। ইহা আমাদের ক্ষমতায় নাই। আমরা যেমন

অন্ত মানুষের হইয়া খাইতে পারি না, তেমনি আমরা অন্ত মানুষের হইয়া বাঁচিতে পারি না। সাহিত্য জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ, তাহা তো প্রয়োজনের প্রকাশ নহে। চিরদিনই লোকসাহিত্য লোক আপনি সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে। দয়ালু বাবুদের উপর বরাত দিয়া সে আমাদের কলেজের দোতলার ঘরের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া বসিয়া নাই। সকল সাহিত্যেরই যেমন এই লোকসাহিত্যেরও সেই দশা অর্থাৎ ইহাতে ভালো মন্দ মাঝারি সকল জাতেরই জিনিস আছে। ইহার যাহা ভালো তাহা অপরূপ ভালো— জগতের কোনো রসিকসভায় তাহার কিছুমাত্র লজ্জা পাইবার কারণ নাই। অতএব দয়ার তাগিদে আমাদের কলেজের কোনো ডিগ্রিধারীকেই লোকসাহিত্যের মুরুব্বিয়ানা করা সাজিবে না। স্বয়ং বিধাতাও অনুগ্রহের জোরে জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন না, তিনি অহেতুক আনন্দের জোরেই এই যাহা কিছু রচিয়াছেন। যেখানেই হেতু আসিয়া মুরুব্বি হইয়া বসে সেইখানেই সৃষ্টি মাটি হয়। এবং যেখানেই অনুগ্রহ আসিয়া সকলের চেয়ে বড়ো আসনটা লয় সেইখান হইতেই কল্যাণ বিদায় গ্রহণ করে।

আমাদের ভদ্রসমাজ আরামে আছে কেননা আমাদের লোকসাধারণ নিজেকে বোঝে নাই। এইজন্যই জমিদার তাহাদিগকে মারিতেছে, মহাজন তাহাদিগকে ধরিতেছে, মনিব তাহাদিগকে গালি দিতেছে, পুলিস তাহাদিগকে শুষিতেছে, গুরুঠাকুর তাহাদের মাথায় হাত বুলাইতেছে, মোক্তার তাহাদের গাঁট কাটিতেছে, আর তাহারা কেবল সেই অদৃষ্টের নামে নালিশ করিতেছে যাহার নামে সমন-জারি করিবার জো নাই। আমরা বড়োজোর ধর্মের দোহাই দিয়া জমিদারকে বলি তোমার কর্তব্য করো, মহাজনকে বলি তোমার সুদ কমাও, পুলিসকে বলি তুমি অন্যায় করিয়ো না— এমন করিয়া নিতান্ত দুর্বলভাবে কতদিন কতদিক ঠেকাইব। চালুনিতে করিয়া জল আনাইব আর বাহককে বলিব যতটা পারো তোমার হাত দিয়া ছিদ্র সামলাও— সে হয় না; তাহাতে কোনো এক সময়ে এক মুহূর্তের কাজ চলে কিন্তু চিরকালের এ ব্যবস্থা নয়। সমাজে দয়ার চেয়ে দায়ের জোর বেশি।

অতএব সব-প্রথমে দরকার, লোকেরা আপনাদের পরস্পরের মধ্যে যাহাতে একটা যোগ দেখিতে পায়। অর্থাৎ তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা রাস্তা থাকা চাই। সেটা যদি রাজপথ না হয় তো অন্তত গলিরাস্তা হওয়া চাই।

লেখাপড়া শেখাই এই রাস্তা। যদি বলি জ্ঞানশিক্ষা, তাহা হইলে তর্ক উঠিবে, আমাদের চাষাভুষারা যাত্রার দল ও কথকঠাকুরের কৃপায় জ্ঞানশিক্ষায় সকল দেশের অগ্রগণ্য। যদি বলি উচ্চশিক্ষা, তাহা হইলে ভদ্রসমাজে খুব একটা উচ্চহাস্য উঠিবে— সেটাও সহিতে পারিতাম যদি আশু এই প্রস্তাবটার কোনো উপযোগিতা থাকিত।

আমি কিন্তু সব-চেয়ে কম করিয়াই বলিতেছি, কেবলমাত্র লিখিতে পড়িতে শেখা। তাহা কিছু লাভ নহে তাহা কেবলমাত্র রাস্তা— সেও পাড়াগাঁয়ের মেটে রাস্তা। আপাতত এই যথেষ্ট, কেননা এই রাস্তাটা না হইলেই মানুষ আপনার কোণে আপনি বদ্ধ হইয়া থাকে। তখন তাহাকে যাত্রা-কথকতার যোগে সাংখ্য যোগ বেদান্ত পুরাণ ইতিহাস সমস্তই শুনাইয়া যাইতে পার, তাহার আঙিনায় হরিনামসংকীর্তনেরও ধুম পড়িতে পারে কিন্তু এ কথা তাহার স্পষ্ট বুঝিবার উপায় থাকে না যে, সে একা নহে, তাহার যোগ কেবলমাত্র অধ্যাত্মযোগ নহে, একটা বৃহৎ লৌকিক যোগ।

দূরের সঙ্গে নিকটের, অনুপস্থিতের সঙ্গে উপস্থিতের সম্বন্ধপথটা সমস্ত দেশের মধ্যে অবাধে বিস্তীর্ণ হইলে তবেই তো দেশের অনুভবশক্তিটা ব্যাপ্ত হইয়া উঠিবে। মনের চলাচল যতখানি, মানুষ ততখানি বড়ো। মানুষকে শক্তি দিতে হইলে মানুষকে বিস্তৃত করা চাই।

তাই আমি এই বলি, লিখিতে পড়িতে শিখিয়া মানুষ কী শিখিবে ও কতখানি শিখিবে সেটা পরের কথা, কিন্তু সে যে অন্যের কথা আপনি শুনিবে ও আপনার কথা অন্যকে শোনাইবে, এমনি করিয়া সে যে আপনার মধ্যে বৃহৎ মানুষকে ও বৃহৎ মানুষের মধ্যে আপনাকে পাইবে, তাহার চেতনার অধিকার যে চারি দিকে প্রশস্ত হইয়া যাইবে এইটেই গোড়াকার কথা।

য়ুরোপে লোকসাধারণ আজ যে এক হইয়া উঠিবার শক্তি পাইয়াছে তাহার কারণ এ নয় যে তাহারা সকলেই পরম পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। হয়তো আমাদের দেশাভিমানীরা প্রমাণ করিয়া দিতে পারেন যে পরাবিদ্যা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা আমাদের দেশের সাধারণ লোকে তাহাদের চেয়ে বেশি বোঝে, কিন্তু ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই যে য়ুরোপের সাধারণ লোকে লিখিতে পড়িতে শিখিয়া পরস্পরের কাছে পৌঁছিবার উপায় পাইয়াছে, হৃদয়ে হৃদয়ে গতিবিধির একটা মস্ত বাধা দূর হইয়া গেছে। এ কথা নিশ্চিত সত্য যে, য়ুরোপে লোকশিক্ষা আপাতত অগভীর হইলেও তাহা যদি ব্যাপ্ত না হইত তবে আজ সেখানে লোকসাধারণ নামক যে সত্তা আপনার শক্তির গৌরবে জাগিয়া উঠিয়া আপন প্রাপ্য দাবি করিতেছে তাহাকে দেখা যাইত না। তাহা হইলে যে গরিব সে ক্ষণে ক্ষণে ধনীর প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইত, যে ভৃত্য সে মনিবের পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া পড়িয়া থাকিত এবং যে মজুর সে মহাজনের লাভের উচ্ছিষ্টকণামাত্র খাইয়া ক্ষুধাদগ্ধ পেটের একটা কোণমাত্র ভরাইত।

লোকহিতৈষীরা বলিবেন, আমরা তো সেই কাজেই লাগিয়াছি— আমরা তো নাইট স্কুল খুলিয়াছি। কিন্তু ভিক্ষার দ্বারা কেহ কখনো সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে

না। আমরা ভদ্রলোকেরা যে শিক্ষা লাভ করিতেছি সেটাতে আমাদের অধিকার আছে বলিয়া আমরা অভিমান করি— সেটা আমাদিগকে দান করা অনুগ্রহ করা নয়, কিন্তু সেটা হইতে বঞ্চিত করা আমাদের প্রতি অন্যায় করা। এইজন্য আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় কোনো খর্বতা ঘটিলে আমরা উত্তেজিত হইয়া উঠি। আমরা মাথা তুলিয়া শিক্ষা দাবি করি। সেই দাবি ঠিক গায়ের জোরের নহে, তাহা ধর্মের জোরের। কিন্তু লোকসাধারণেরও সেই জোরের দাবি আছে; যতদিন তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা না হইতেছে ততদিন তাহাদের প্রতি অন্যায় জমা হইয়া উঠিতেছে এবং সেই অন্যায়ের ফল আমরা প্রত্যেকে ভোগ করিতেছি এ কথা যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা স্বীকার না করিব ততক্ষণ দয়া করিয়া তাহাদের জন্য এক-আধটা নাইট স্কুল খুলিয়া কিছুই হইবে না। সকলের গোড়ায় দরকার লোকসাধারণকে লোক বলিয়া নিশ্চিতরূপে গণ্য করা।

কিন্তু সমস্যাটা এই যে, দয়া করিয়া গণ্য করাটা টেঁকে না। তাহারা শক্তি লাভ করিয়া যেদিন গণ্য করাইবে সেইদিনই সমস্যার মীমাংসা হইবে। সেই শক্তি যে তাহাদের নাই তাহার কারণ তাহারা অজ্ঞতার দ্বারা বিচ্ছিন্ন। রাষ্ট্রব্যবস্থা যদি তাহাদের মনের রাস্তা তাহাদের যোগের রাস্তা খুলিয়া না দেয় তবে দয়ালু লোকের নাইট স্কুল খোলা অশ্রুবর্ষণ করিয়া অগ্নিদাহ নিবারণের চেষ্টার মতো হইবে। কারণ, এই লিখিতে পড়িতে শেখা তখনই যথার্থ ভাবে কাজে লাগিবে যখন তাহা দেশের মধ্যে সর্বব্যাপী হইবে। সোনার আঙটি কড়ে আঙুলের মাপে হইলেও চলে কিন্তু একটা কাপড় সেই মাপের হইলে তাহা ঠাট্টার পক্ষেও নেহাৎ ছোটো হয়— দেহটাকে এক-আবরণে আবৃত করিতে পারিলেই তবে তাহা কাজে দেখে। সামান্য লিখিতে পড়িতে শেখা দুইচারজনের মধ্যে বদ্ধ হইলে তাহা দামী জিনিস হয় না, কিন্তু সাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হইলে তাহা দেশের লজ্জা রক্ষা করিতে পারে।

পূর্বেই বলিয়াছি শক্তির সঙ্গে শক্তির বোঝাপড়া হইলে তবেই সেটা সত্যকার কারবার হয়। এই সত্যকার কারবারে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল। য়ুরোপে শ্রমজীবীরা যেমনি বলিষ্ঠ হইয়াছে অমনি সেখানকার বণিকরা জবাবদিহির দায়ে পড়িয়াছে। ইহাতেই দুই পক্ষের সম্বন্ধ সত্য হইয়া উঠিবে— অর্থাৎ যেটা বরাবর সহিবে সেইটেই দাঁড়াইয়া যাইবে, সেইটেই উভয়েরই পক্ষে কল্যাণের। স্ত্রীলোককে সাধ্বী রাখিবার জন্য পুরুষ সমস্ত সামাজিক শক্তিকে তাহার বিরুদ্ধে খাড়া করিয়া রাখিয়াছে— তাই স্ত্রীলোকের কাছে পুরুষের কোনো জবাবদিহি নাই— ইহাতেই স্ত্রীলোকের সহিত সম্বন্ধে পুরুষ সম্পূর্ণ কাপুরুষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; স্ত্রীলোকের চেয়ে ইহাতে পুরুষের ক্ষতি

অনেক বেশি। কারণ দুর্বলের সঙ্গে ব্যবহার করার মতো এমন দুর্গতিকর আর-কিছুই নাই। আমাদের সমাজ লোকসাধারণকে যে শক্তিহীন করিয়া রাখিয়াছে এইখানেই সে নিজের শক্তিকে অপহরণ করিতেছে। পরের অস্ত্র কাড়িয়া লইলে নিজের অস্ত্র নির্ভয়ে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে— এইখানেই মানুষের পতন।

আমাদের দেশের জনসাধারণ আজ জমিদারের, মহাজনের, রাজপুরুষের, মোটের উপর সমস্ত ভদ্রসাধারণের দয়ার অপেক্ষা রাখিতেছে, ইহাতে তাহারা ভদ্রসাধারণকে নামাইয়া দিয়াছে। আমরা ভৃত্যকে অনায়াসে মারিতে পারি, প্রজাকে অনায়াসে অতিষ্ঠ করিতে পারি, গরিব মূর্খকে অনায়াসে ঠকাইতে পারি; নিম্নতনদের সহিত ন্যায়ব্যবহার করা, মানহীনদের সহিত শিষ্টাচার করা নিতান্তই আমাদের ইচ্ছার 'পরে নির্ভর করে, অপর পক্ষের শক্তির 'পরে নহে, এই নিরন্তর সংকট হইতে নিজেদের বাঁচাইবার জন্যই আমাদের দরকার হইয়াছে নিম্নশ্রেণীয়দের শক্তিশালী করা। সেই শক্তি দিতে গেলেই তাহাদের হাতে এমন একটি উপায় দিতে হইবে যাহাতে ক্রমে তাহারা পরস্পর সম্মিলিত হইতে পারে— সেই উপায়টিই তাহাদের সকলকেই লিখিতে পড়িতে শেখানো।

১৩২১

লড়াইয়ের মূল

অগ্রহায়ণের সবুজপত্রে সম্পাদক বর্তমান যুদ্ধ সম্বন্ধে যে কয়টি কথা বলিয়াছেন তাহা পাকা কথা, সুতরাং তাহাতে শাঁসও আছে রসও আছে। ইহার উপরে আর-বেশি কিছু বলিবার দরকার নাই— সেই ভরসাতেই লিখিতে বসিলাম।

সম্পাদক বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন, এবারকার যে লড়াই তাহা সৈনিকে বণিকে লড়াই, ক্ষত্রিয়ে বৈশ্যে। পৃথিবীতে চিরকালই পুণ্যজীবীর 'পরে অস্ত্রধারীর একটা স্বাভাবিক অবজ্ঞা আছে— বৈশ্যের কর্তৃত্ব ক্ষত্রিয় সহিতে পারে না। তাই জর্মনি আপন ক্ষত্রতেজের দর্পে ভারি একটা অবজ্ঞার সহিত এই লড়াই করিতে লাগিয়াছে।

য়ুরোপে যে চার বর্ণ আছে তার মধ্যে ব্রাহ্মণটি তাঁর যজন যাজন ছাড়িয়া দিয়া প্রায় সরিয়া পড়িয়াছেন। যে খৃস্টসংঘ বর্তমান য়ুরোপের শিশু বয়সে উঁচু চৌকিতে বসিয়া বেত হাতে গুরুমহাশয়গিরি করিয়াছে আজ সে তার বয়ঃপ্রাপ্ত শিষ্যের দেউড়ির কাছে বসিয়া থাকে— সাবেক কালের খাতিরে কিছু তার বরাদ্দ বাঁধা আছে কিন্তু তার সেই

চৌকিও নাই, তার সেই বেতগাছটাও নাই। এখন তাহাকে এই শিষ্যটির মন জোগাইয়া চলিতে হয়। তাই যুদ্ধে বিগ্রহে, পরজাতির সহিত ব্যবহারে, য়ুরোপ যত-কিছু অন্যায় করিয়াছে খৃস্টসংঘ তাহাতে আপত্তি করে নাই বরঞ্চ ধর্মকথার ফোড়ঙ দিয়া তাহাকে উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছে।

এ দিকে ক্ষত্রিয়ের তলোয়ার প্রায় বেবাক গলাইয়া ফেলিয়া লাঙলের ফলা তৈরি হইল। তাই ক্ষত্রিয়ের দল বেকার বসিয়া বৃথা গোঁফে চাড়া দিতেছে। তাহারা শেঠজির মালখানার দ্বারে দরোয়ানগিরি করিতেছে মাত্র। বৈশ্যই সব-চেয়ে মাথা তুলিয়া উঠিল।

এখন সেই ক্ষত্রিয়ে বৈশ্যে "অন্ত যুদ্ধ ত্বয়া ময়া"। দ্বাপর যুগে আমাদের হলধর বলরামদাদা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যোগ দেন নাই। কলিযুগে তাঁর পরিপূর্ণ মদের ভাঁড়টিতে হাত পড়িবা মাত্র তিনি হুংকার দিয়া ছুটিয়াছেন। এবারকার কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রধান সর্দার কৃষ্ণ নহেন, বলরাম। রক্তপাতে তাঁর রুচি নাই— রজতফেনোচ্ছল মদের ঢোঁক গিলিয়া এতকাল ধরিয়া তাঁর নেশা কেবলই চড়িয়া উঠিতেছিল; এবারকার এই আচমকা উৎপাতে সেই নেশা কিছু ছুটিতে পারে কিন্তু আবার সময়কালে দ্বিগুণ বেগে মৌতাত জমিবে সে আশঙ্কা আছে।

ইহার পরে আর-একটা লড়াই সামনে রহিল, সে বৈশ্যে শূদ্রে মহাজনে মজুরে— কিছুদিন হইতে তার আয়োজন চলিতেছে। সেইটে চুকিলেই বর্তমান মনুর পালা শেষ হইয়া নূতন মন্বন্তর পড়িবে।

বণিকে সৈনিকে লড়াই তো বাধিল কিন্তু এই লড়াইয়ের মূল কোথায় সেটা জিজ্ঞাসা করিবার বিষয়। সাবেক-কালের ইতিহাসে দেখা যায় যারা কারবারী তারা রাজশক্তির আশ্রয় পাইয়াছে, কখনো-বা প্রশ্রয় পাইয়াছে, কখনো-বা অত্যাচার ও অপমান সহিয়াছে কিন্তু লড়াইয়ের আসরে তাহাদিগকে নামিতে হয় নাই। সেকালে ধন এবং মান স্বতন্ত্র ছিল, কাজেই ব্যবসায়ীকে তখন কেহ খাতির করিত না বরঞ্চ অবজ্ঞাই করিত।

কেননা জিনিস লইয়া মানুষের মূল্য নহে, মানুষ লইয়াই মানুষের মূল্য। তাই যে কালে ক্ষত্রিয়েরা ছিল গণপতি এবং বৈশ্যেরা ছিল ধনপতি তখন তাহাদের মধ্যে ঝগড়া ছিল না।

তখন ঝগড়া ছিল ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে। কেননা তখন ব্রাহ্মণ তো কেবলমাত্র যজন-যাজন অধ্যয়ন-অধ্যাপন লইয়া ছিল না— মানুষের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল। তাই ক্ষত্রিয়-প্রভু ও ব্রাহ্মণ-প্রভুতে সর্বদাই ঠেলাঠেলি চলিত; বশিষ্ঠে বিশ্বামিত্রে

আপস করিয়া থাকা শক্ত। য়ুরোপেও রাস্তায় পোপে বাঁও-কষাকষির অন্ত ছিল না।

কারবার জিনিসটা দেনাপাওনার জিনিস; তাহাতে ক্রেতা বিক্রেতা উভয়েরই উভয়ের মন রাখিবার গরজ আছে। প্রভুত্ব জিনিসটা ঠিক তার উলটা, তাহাতে গরজ কেবল এক পক্ষের। তাহাতে এক পক্ষ বোঝা হইয়া চাপিয়া বসে অন্য পক্ষই তাহা বহন করে।

প্রভুত্ব জিনিসটা একটা ভার, মানুষের সহজ চলাচলের সম্বন্ধের মধ্যে একটা বাধা। এইজন্য প্রভুত্বই যত-কিছু বড়ো বড়ো লড়াইয়ের মূল। বোঝা নামাইয়া ফেলিতে যদি না পারি অন্তত বোঝা সরাইতে না পারিলে বাঁচি না। পালকির বেহারা তাই বার বার কাঁধ বদল করে। মানুষের সমাজকেও এই প্রভুত্বের বোঝা লইয়া বার বার কাঁধ বদল করিতে হয়— কেননা তাহা তাহাকে বাহির হইতে চাপ দেয়। বোঝা অচল হইয়া থাকিতে চায় বলিয়াই মানুষের প্রাণশক্তি তাহাকে সচল করিয়া তোলে। এইজন্যই লক্ষ্মী চঞ্চলা। লক্ষ্মী যদি অচঞ্চল হইতেন তবে মানুষ বাঁচিত না।

ইতিপূর্বে মানুষের উপর প্রভুত্বচেষ্টা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের মধ্যেই বদ্ধ ছিল— এই কারণে তখনকার যতকিছু শস্ত্রের ও শাস্ত্রের লড়াই তাহাদিগকে লইয়া। কারবারীরা হাটে মাঠে গোঠে ঘাটে ফিরিয়া বেড়াইত, লড়াইয়ের ধার ধারিত না।

সম্প্রতি পৃথিবীতে বৈশ্যরাজক যুগের পত্তন হইয়াছে। বাণিজ্য এখন আর নিছক বাণিজ্য নহে, সাম্রাজ্যের সঙ্গে একদিন তার গান্ধর্ব বিবাহ ঘটিয়া গেছে।

একসময়ে জিনিসই ছিল বৈশ্যের সম্পত্তি, এখন মানুষ তার সম্পত্তি হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সাবেককালের সঙ্গে এখনকার কালের তফাত কী তাহা বুঝিয়া দেখা যাক। সে আমলে যেখানে রাজত্ব রাজাও সেইখানেই— জমাখরচ সব একজায়গাতেই।

কিন্তু এখন বাণিজ্যপ্রবাহের মতো রাজত্বপ্রবাহেরও দিনরাত আমদানি রফতানি চলিতেছে। ইহাতে পৃথিবীর ইতিহাসে সম্পূর্ণ একটা নূতন কাণ্ড ঘটিতেছে— তাহা এক দেশের উপর আর-এক দেশের রাজত্ব এবং সেই দুই দেশ সমুদ্রের দুই পারে।

এত বড়ো বিপুল প্রভুত্ব জগতে আর-কখনো ছিল না।

য়ুরোপের সেই প্রভুত্বের ক্ষেত্র এশিয়া ও আফ্রিকা।

এখন মুশকিল হইয়াছে জর্মনির। তার ঘুম ভাঙিতে বিলম্ব হইয়াছিল। সে ভোজের শেষবেলায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত। ক্ষুধা যথেষ্ট, মাছেরও গন্ধ পাইতেছে অথচ কাঁটা ছাড়া আর বড়ো কিছু বাকি নাই। এখন রাগে তার

শরীর গস্‌গস্‌ করিতেছে। সে বলিতেছে আমার জন্য যদি পাত পাড়া না হইয়া থাকে আমি নিমন্ত্রণপত্রের অপেক্ষা করিব না। আমি গায়ের জোরে যার পাই তার পাত কাড়িয়া লইব।

একসময় ছিল যখন কাড়িয়া-কুড়িয়া লইবার বেলায় ধর্মের দোহাই পাড়িবার কোনো দরকার ছিল না। এখন তার দরকার হইয়াছে। জর্মনির নীতিপ্রচারক পণ্ডিতেরা বলিতেছেন, যারা দুর্বল, ধর্মের দোহাই তাদেরই দরকার; যারা প্রবল, তাদের ধর্মের প্রয়োজন নাই, নিজের গায়ের জোরই যথেষ্ট।

আজ ক্ষুধিত জর্মনির বুলি এই যে, প্রভু এবং দাস এই দুই জাতের মানুষ আছে। প্রভু সমস্ত আপনার জন্য লইবে, দাস সমস্তই প্রভুর জন্য জোগাইবে— যার জোর আছে সে রথ হাঁকাইবে, যার জোর নাই সে পথ করিয়া দিবে।

য়ুরোপের বাহিরে যখন এই নীতির প্রচার হয় তখন য়ুরোপ ইহার কটুত্ব বুঝিতে পারে নাই।

আজ তাহা নিজের গায়ে বাজিতেছে। কিন্তু জর্মন-পণ্ডিত যে তত্ত্ব আজ প্রচার করিতেছে এবং যে তত্ত্ব আজ মদের মতো জর্মনিকে অন্যায় যুদ্ধে মাতাল করিয়া তুলিল সে তত্ত্বের উৎপত্তি তো জর্মন-পণ্ডিতের মগজের মধ্যে নহে, বর্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের মধ্যে।

১৩২১

ছোটো ও বড়ো

যে সময়ে দেশের লোক তৃষিত চাতকের মতো উৎকণ্ঠিত, যে সময়ে রাষ্ট্রীয় আবহাওয়ার পর্যবেক্ষকেরা খবর দিলেন যে, হোমরুলের প্রবল মৈসুম-হাওয়া আরব-সমুদ্র পাড়ি দিয়াছে, মুষলধারে বৃষ্টি নামিল বলিয়া; ঠিক সেই সময়েই মুষলধারে নামিল বেহার অঞ্চলে মুসলমানের প্রতি হিন্দুদের একটা হাঙ্গামা।

অন্য দেশেও সাম্প্রদায়িক ঈর্ষাদ্বেষ লইয়া মাঝে মাঝে তুমুল দ্বন্দ্বের কথা শুনি। আমাদের দেশে যে বিরোধ বাধে সে ধর্ম লইয়া, যদিচ আমরা মুখে সর্বদাই বড়াই করিয়া থাকি যে, ধর্মবিষয়ে হিন্দুর উদারতার তুলনা জগতে কোথাও নাই। বর্তমানকালে পশ্চিম মহাদেশের উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে যে বিরোধ বাধে তাহা অর্থ লইয়া। সেখানে খনির শ্রমিকেরা, সেখানে ডক ও রেলোয়ের কর্মিকেরা মাঝে মাঝে হুলস্থূল বাধাইয়া তোলে; তাহা লইয়া আইন করিতে হয়, ফৌজ ডাকিতে হয়, আইন

বন্ধ করিতে হয়, রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে। সে-দেশে এইরূপ বিরোধের সময় দুই পক্ষ থাকে। এক পক্ষ উৎপাত করে, আরেক পক্ষ উৎপাত নিবারণের উপায় চিন্তা করে। ব্যঙ্গপ্রিয় কোনো তৃতীয় পক্ষ সেখানে বাহির হইতে ছুয়ো দেয় না। কিন্তু আমাদের দুঃখের বাসরঘরে শুধু যে বর ও কনের দ্বৈততত্ত্ব তাহা নহে, তৃতীয় একটি কুটুম্বিনী আছেন, অট্টহাস্য এবং কানমলার কাজে তিনি প্রস্তুত।

ইংলণ্ডে এক সময় ছিল, যখন এক দিকে তার রাষ্ট্রযন্ত্রটা পাকা হইয়া উঠিতেছে এমন সময়েই প্রটেস্ট্যাণ্ট্ ও রোমানক্যাথলিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। সেই দ্বন্দ্বে দুই সম্প্রদায় যে পরস্পরের প্রতি বরাবর সুবিচার করিয়াছে তাহা নহে। এমন-কি বহুকাল পর্যন্ত ক্যাথলিকরা বহু অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াই কাটাইয়াছে। আজও কোনো বিশেষ একটি সাম্প্রদায়িক চার্চের ব্যয়ভার ইংলণ্ডের সমস্ত লোককে বহন করিতে হইতেছে, সে-দেশের অন্য সম্প্রদায়গুলির প্রতি ইহা অন্যায়। অশান্তি ও অসাম্যের এই বাহ্যিক ও মানসিক কারণগুলি আজ ইংলণ্ডে নিরুপদ্রব হইয়া উঠিয়াছে কেন। যেহেতু সেখানে সমস্ত দেশের লোকে মিলিয়া একটি আপন শাসনতন্ত্র পাইয়াছে। এই শাসনভার যদি সম্পূর্ণ বিদেশীর 'পরে থাকিত তবে যেখানে জোড়া মেলে নাই সেখানে ক্রমাগত ঠোকাঠুকি বাধিয়া বিচ্ছেদ স্থায়ী হইত। একদিন ব্রিটিশ পলিটিক্সে স্কটলণ্ড ও ইংলণ্ডের বিরোধ কম তীব্র ছিল না। কেননা উভয় জাতির মধ্যে ভাষা ভাব রুচি প্রথা ও ঐতিহাসিক স্মৃতিধারার সত্যকারই পার্থক্য ছিল। দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়াই দ্বন্দ্ব ক্রমে ঘুচিয়াছে। এই দ্বন্দ্ব ঘুচিবার প্রধান কারণ এই যে, ইংরেজ ও স্কচ উভয়েই একটা শাসনতন্ত্র পাইয়াছে যাহা উভয়েরই স্বাধিকারে; যাহাতে সম্পদে ও বিপদে উভয়েরই শক্তি সমান কাজ করিতেছে। ইহার ফল হইয়াছে এই যে, আজ ইংলণ্ডে স্কটিশ চার্চে ও ইংলিশ চার্চে প্রভেদ থাকিলেও, রোমান-ক্যাথলিকে প্রটেস্ট্যাণ্টে অনৈক্য ঘটিলেও, রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যে শক্তির ঐক্যে মঙ্গল-সাধনের যোগে তাহাদের মিলন ঘটিয়াছে। ইহাদের মাথার উপর একটি তৃতীয় পক্ষ যদি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকিয়া আপন ইচ্ছামত ইহাদিগকে চালনা করিত, তাহা হইলে কোনো কালেই কি ইহাদের জোড় মিলিত। আয়র্লণ্ডের সঙ্গে আজ পর্যন্ত ভালো করিয়া জোড় মেলে নাই কেন। অনেকদিন পর্যন্তই আয়র্লণ্ডের সঙ্গে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় অধিকারের সাম্য ছিল না বলিয়া।

এ কথা মানিতেই হইবে আমাদের দেশে ধর্ম লইয়া হিন্দুমুসলমানের মধ্যে একটা কঠিন বিরুদ্ধতা আছে। যেখানে সত্যভ্রষ্টতা সেইখানেই অপরাধ, যেখানে অপরাধ সেইখানেই শাস্তি। ধর্ম যদি অন্তরের জিনিস না হইয়া শাস্ত্রমত ও বাহ্য আচারকেই

মুখ্য করিয়া তোলে তবে সেই ধর্ম যত বড়ো অশান্তির কারণ হয়, এমন আর-কিছুই না। এই 'ডগমা' অর্থাৎ শাস্ত্রমতকে বাহির হইতে পালন-করা লইয়া য়ুরোপের ইতিহাস কতবার রক্তে লাল হইয়াছে। অহিংসাকে যদি ধর্ম বলো, তবে সেটাকে কর্মক্ষেত্রে দুঃসাধ্য বলিয়া ব্যবহারে না মানিতে পারি, কিন্তু বিশুদ্ধ আইডিয়ালের ক্ষেত্রে তাহাকে স্বীকার করিয়া ক্রমে সে দিকে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু বিশেষ শাস্ত্রমতের অনুশাসনে বিশেষ করিয়া যদি কেবল বিশেষ পশুহত্যা না করাকেই ধর্ম বলা যায় এবং সেইটে জোর করিয়া যদি অন্য ধর্মমতের মানুষকেও মানাইতে চেষ্টা করা হয়, তবে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিরোধ কোনোকালেই মিটিতে পারে না। নিজে ধর্মের নামে পশুহত্যা করিব অথচ অন্যে ধর্মের নামে পশুহত্যা করিলেই নরহত্যার আয়োজন করিতে থাকিব, ইহাকে অত্যাচার ছাড়া আর-কোনো নাম দেওয়া যায় না। আমাদের আশা এই যে, চিরদিন আমাদের ধর্ম আচারপ্রধান হইয়া থাকিবে না। আরো-একটি আশা আছে, একদিন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে দেশহিতসাধনের একই রাষ্ট্রীয় আইডিয়াল যদি আমাদের রাষ্ট্রতন্ত্রে বাস্তব হইয়া উঠে তবে সেই অন্তরের যোগে বাহিরের সমস্ত পার্থক্য তুচ্ছ হইয়া যাইবে।

অল্পদিন হইল, রেলগাড়িতে আমার এক ইংরেজ সঙ্গী জুটিয়াছিল। তিনি বেহার অঞ্চলের হাঙ্গামার প্রসঙ্গে গল্প করিলেন— সাহাবাদে কিম্বা কোনো একটা জায়গায় ইংরেজ কাপ্তেন সেখানকার এক জমিদারকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমার রায়তদের তোমরা তো ঠেকাইতে পারিলে না। তোমরাই আবার হোমরুল চাও!" জমিদার কী জবাব করিলেন শুনি নাই। সম্ভবত তিনি লম্বা সেলাম করিয়া বলিয়াছিলেন, "না সাহেব, আমরা হোমরুল চাই না, আমরা অযোগ্য অধম। আপাতত আমার রায়তদের তুমি ঠেকাও।" বেচারা জানিতেন হোমরুল তখন সমুদ্রপারের স্বপ্নলোকে, কাপ্তেন ঠিক সম্মুখেই, আর হাঙ্গামাটা কাঁধের উপর চড়িয়া বসিয়াছে।

আমি বলিলাম, "হিন্দুমুসলমানের এই দাঙ্গাটা হোমরুলের অধীনে তো ঘটে নাই। নিরস্ত্র জমিদারটি অক্ষমতার অপবাদে বোধ করি একবার সেনাপতি-সাহেবের ফৌজের দিকে নীরবে তাকাইয়াছিলেন। উপায় রহিল একজনের হাতে আর প্রতিকার করিবে আর-একজনে, এমনতরো শ্রমবিভাগের কথা আমরা কোথাও শুনি নাই। বাংলাদেশেও ঠিক স্বদেশী উত্তেজনার সময়, শুধু জামালপুরের মতো মফস্বলে নয়, একেবারে কলিকাতার বড়োবাজারে হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের উপদ্রব প্রচণ্ড হইয়াছিল— সেটা তো শাসনের কলঙ্ক, শুধু শাসিতের নয়। এইরূপ কাণ্ড যদি

সদাসর্বদা নিজামের হাইদ্রাবাদে বা জয়পুর বরোদা মৈশুরে ঘটিতে থাকিত তবে সেনাপতি-সাহেবের জবাব খুঁজিবার জন্ত আমাদের ভাবিতে হইত।”

আমাদের নালিশটাই যে এই। কর্তৃত্বের দায়িত্ব আমাদের হাতে নাই, কর্তা বাহির হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবার ভার লইয়াছে। ইহাতে আমরা ক্রমশই অন্তরের মধ্যে নিঃসহায় ও নিঃসম্বল হইতেছি ; সেজন্ত উলটিয়া কর্তারাই আমাদিগকে অবজ্ঞা করিলে ভয়ে ভয়ে আমরা জবাব দিই না বটে, কিন্তু মনে মনে যে-ভাষা প্রয়োগ করি তাহা সাধু নহে। কর্তৃত্ব যদি থাকিত তবে তাহাকে বজায় রাখিতে ও সার্থক করিতে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই সমান গরজ থাকিত, সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতার দায়িত্ব সকলে মিলিয়া অতি সাবধানে বহন করিতে হইত। এমনি করিয়া শুধু আজ নহে চিরদিনের মতো ভারতবর্ষের পোলিটিকাল আশ্রয় নিজের ভিত্তিতে পাকা হইত। কিন্তু এমন যদি হয় যে, একদিন ভারত-ইতিহাসের পরিচ্ছেদ-পরিবর্তনকালে প্রস্থানের বেলায় ইংরেজ তার সুশাসনের ভগ্নাবশেষের উপর রাখিয়া গেল আত্মনির্ভরে অনভ্যস্ত, আত্মরক্ষায় অক্ষম, আত্মকল্যাণসাধনে অসিদ্ধ, আত্মশক্তিতে নষ্টবিশ্বাস বহুকোটি নরনারীকে— রাখিয়া গেল এমন ক্ষেত্রে যেখানে প্রতিবেশী নব উদ্যমে জাগ্রত, নব শিক্ষায় অপরিমিত শক্তিশালী, তবে আমাদের সেই চিরদৈন্তপীড়িত অন্তহীন দুর্ভাগ্যের জন্ত কাহাকে আমরা দায়ী করিব। আর যদি কল্পনাই করা যায় যে, মানবের পরিবর্তনশীল ইতিহাসের মাঝখানে একমাত্র ভারতে ইংরেজসাম্রাজ্যের ইতিহাসই ধ্রুব হইয়া অনন্ত ভবিষ্যৎকে সদর্পে অধিকার করিয়া থাকিবে, তবে এই কি আমাদের ললাটের লিখন যে, ভারতের অধিবাসীরা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিবে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে দেশের কল্যাণকর্মবন্ধনের কোনো যোগ থাকিবে না ; চিরদিনের মতোই তাহাদের আশা ক্ষুদ্র, তাহাদের শক্তি অবরুদ্ধ, তাহাদের ক্ষেত্র সংকীর্ণ তাহাদের ভবিষ্যৎ পরের ইচ্ছার পাষাণ-প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ?

এ পর্যন্ত ইংরেজের রাজত্বে আমরা এক-শাসন পাইয়াছি কিন্তু এক-দায়িত্ব পাই নাই। তাই আমাদের ঐক্য বাহিরের। এ ঐক্যে আমরা মিলি না, পাশে পাশে সাজানো থাকি, বাহিরে বা ভিতরে একটু ধাক্কা পাইলেই ঠোকাঠুকি বাধিয়া যায়। এ ঐক্য জড় অকর্মক, ইহা সজীব সকর্মক নয়। ইহা ঘুমন্ত মানুষের এক মাটিতে শুইয়া থাকিবার ঐক্য, ইহা সজাগ মানুষের এক পথে চলিবার ঐক্য নহে। ইহাতে আমাদের গৌরব করিবার কিছু নাই ; সুতরাং ইহা আনন্দ করিবার নহে ; ইহাতে কেবল স্তুতি করিতে পারি, নতি করিতে পারি, উন্নতি করিতে পারি না।

একদিন আমাদের দেশে যে সমাজ ছিল তাহা সাধারণের প্রতি আমাদের দায়িত্বের

আদর্শকে সচেষ্ট রাখিয়াছিল। সেই দায়িত্বের ক্ষেত্র ছিল সংকীর্ণ, তখন আমাদের জন্মগ্রামকেই আমরা জন্মভূমি বলিয়া জানিতাম। তা হউক, সেই ছোটো সীমার মধ্যে ধনীর দায়িত্ব ছিল তার ধন লইয়া, জ্ঞানীর দায়িত্ব ছিল তার জ্ঞান লইয়া। যার যা শক্তি ছিল তার উপরে চারি দিকের দাবি ছিল। সচেষ্ট জীবনের এই যে নানা দিকে বিস্তার, ইহাতেই মানুষের যথার্থ আনন্দ ও গৌরব।

আমাদের সেই দায়িত্ব সমাজ হইতে বাহিরে সরিয়া গেছে। একমাত্র সরকার-বাহাদুরই আমাদের বিচার করেন, রক্ষা করেন, পাহারা দেন, চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন, শাস্তি দেন, সম্মান দেন, সমাজে কোন্‌টা হিন্দু কোন্‌টা অহিন্দু আদালত হইতে তার বিধান দেন, মদের ভাঁটির বন্দোবস্ত করেন এবং গ্রামের লোককে বাঘে ধরিয়া খাইতে থাকিলে জেলার ম্যাজিস্ট্রেটকে সবান্ধবে শিকার করিবার সুযোগ দিয়া থাকেন। সুতরাং এখন আমাদের সমাজ আমাদের উপর যে-পরিমাণে ভার চাপাইয়াছে সে-পরিমাণে ভার বহিতেছে না। ব্রাহ্মণ এখনো দক্ষিণা আদায় করেন কিন্তু শিক্ষা দেন না, ভূস্বামী খাজনা শুষিয়া লন কিন্তু তাঁর কোনো দায় নাই, ভদ্র-সম্প্রদায় জনসাধারণের কাছ হইতে সম্মান লন কিন্তু জনসাধারণকে আশ্রয় দেন না। ক্রিয়াকর্মে খরচপত্র বাড়িয়াছে বই কমে নাই, অথচ সেই বিপুল অর্থব্যয়ে সমাজ-ব্যবস্থাকে ধারণ ও পোষণের জন্য নয়, তাহা রীতিরক্ষা ও সমারোহ করিবার জন্য। ইহাতে দেশের ধনীদরিদ্র সকলেই পীড়া বোধ করে। এ দিকে দলাদলি, জাতে ঠেলাঠেলি, পুঁথির বিধান বেচাকেনা প্রভৃতি সমস্ত উৎপীড়নই আছে। যে-গাভীর বাঁধা খোরাক জোগাইতেছি সে দুধ দেওয়া প্রায় বন্ধ করিল, কিন্তু বাঁকা শিঙের গুঁতা মারাটা তার কমে নাই।

যে-ব্যবস্থা সমাজের ভিতরে ছিল সেটা বাহিরে আসিয়া পড়াতে সুব্যবস্থা হইল কি না সেটা লইয়া তর্ক নয়। মানুষ যদি কতকগুলা পাথরের টুকরা হইত তবে তাহাকে কেমন করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে সাজাইয়া কাজে লাগানো যায় সেইটেই সব-চেয়ে বড়ো কথা হইত। কিন্তু মানুষ যে মানুষ। তাকে বাঁচিতে হইবে, বাড়িতে হইবে, চলিতে হইবে। তাই এ কথাটা মানিতেই হইবে যে, দেশের সম্বন্ধে দেশের লোকের চেষ্টাকে নিরুদ্ধ করিয়া যে নিরানন্দের জড়তার দেশের বুকে চাপিয়া বসিতেছে সেটা শুধু যে নিষ্ঠুর তাহা নহে, সেটা রাষ্ট্রনীতিহিসাবে নিন্দনীয়। আমরা যে-অধিকার চাহিতেছি তাহা ঔদ্ধত্য করিবার বা প্রভুত্ব করিবার অধিকার নহে; আমরা সকল ক্ষুধাতুরকে ঠেকাইয়া জগৎসংসারটাকে একলা দুহিয়া লইবার জন্য লম্বা লাঠি কাঁধে লইতে চাই না; যুদ্ধে নরঘাত সম্বন্ধে বিশ্বের সকলের চেয়ে বড়ো শক্তি, বড়ো উদ্যোগ ও বড়ো

উৎসাহ রাখি বলিয়া শয়তানকে লজ্জা দিবার দুরাকাঙ্ক্ষা আমাদের নাই ; নিরীহ হিন্দু বলিয়া প্রবল পশ্চিম আমাদের উপরে যে-শ্লেষ প্রয়োগ করে তাহাকেই তিলক করিয়া আমাদের ললাটকে আমরা লাঞ্ছিত রাখিব ; আধ্যাত্মিক বলিয়া আমাদের আধুনিক শাসনকর্তারা আমাদের 'পরে যে কটাক্ষবর্ষণ করিয়াছেন তারই শরশয্যায় শেষ পর্যন্ত শয়ান থাকিতে আমরা দুঃখ বোধ করিব না— আমরা কেবলমাত্র আপন দেশের সেবা করিবার, তার দায়িত্বগ্রহণ করিবার স্বাভাবিক অধিকার চাই। এই অধিকার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া আশাহীন অকর্মণ্যতার দুঃখ ভিতরে ভিতরে অসহ্য হইয়াছে। এইজন্যই সম্প্রতি জনসেবার জন্য আমাদের যুবকদের মধ্যে একটা প্রবল আগ্রহ দেখিতে পাই। নিরাপদ শান্তির আওতায় মানুষ বাঁচে না। কেননা যেটা মানুষের অন্তরতম আবেগ তাহা বাড়িয়া চলিবার আবেগ। মহৎ লক্ষ্যের প্রতি আত্মোৎসর্গ করিয়া দুঃখ স্বীকার করাই সেই বাড়িয়া চলিবার গতি। সকল বড়ো জাতির ইতিহাসেই এই গতির দুর্নিবার আবেগ ব্যর্থতা ও সার্থক্যের উপলবন্ধুর পথে গর্জিয়া ফেনাইয়া, বাধা ভাঙিয়া চুরিয়া, ঝরিয়া পড়িতেছে। ইতিহাসের সেই মহৎ দৃশ্য আমাদের মতো পোলিটিকাল পঙ্গুদের কাছ হইতেও আড়াল করিয়া রাখা অসম্ভব। এইজন্য যে-সব যুবকের প্রকৃতিতে প্রাণের স্বাভাবিক উত্তেজনা আছে, মহতের উপদেশ ও ইতিহাসের শিক্ষা হইতে প্রেরণা লাভ করা সত্ত্বেও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা তাদের কাছে যে মৃত্যুর চেয়ে দারুণতর, সে কথা আত্মহত্যাকালে শচীন্দ্র দাসগুপ্তের মর্মান্তিক বেদনার পত্রখানি পড়িলেই বুঝা যাইবে। কিন্তু কেবল ক্ষণে ক্ষণে বন্যাদুর্ভিক্ষের নৈমিত্তিক উপলক্ষে অন্তর্গূঢ় সমস্ত শুভচেষ্টা নির্মুক্ত হইতে পারে না। দেশব্যাপী নিত্যকর্মের মধ্যেই মানুষের বিচিত্রশক্তি বিচিত্রভাবে সফল হয়। নতুবা তার অধিকাংশই বদ্ধ হইয়া আন্তরিক নৈরাশ্যের উত্তাপে বিকৃত হইতে থাকে। এই বিকার হইতে দেশে নানা গোপন উপদ্রবের সৃষ্টি। এইজন্য দেখা যায় দেশের ধর্মবুদ্ধি ও শুভচেষ্টার প্রতিই কর্তৃপক্ষের সন্দেহ সুতীব্র। যে-লোক স্বার্থপর বেইমান, যে-উদাসীন নিশ্চেষ্ট, বর্তমানের গুপ্ত ব্যবস্থায় তারই জীবনযাত্রা সকলের চেয়ে নিরাপদ, তারই উন্নতি ও পুরস্কারের পথে সকলের চেয়ে বাধা অল্প। নিঃস্বার্থ পরহিতৈষিতার জবাবদিহি ভয়ংকর হইয়াছে। কেননা সন্দিগ্ধের কাছে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন যে, মহৎ অধ্যবসায়ে তোমার দরকার কী। তুমি খাইয়া-দাইয়া বিয়া-থাওয়া করিয়া আপিসে আদালতে ঘুরিয়া মোটা বা সরু মাহিনায় যখন স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতে পার, তখন ঘরের খাইয়া বনের মোষ তাড়াইতে যাও কেন। বস্তুত কর্তৃপক্ষ জানেন, এই আলো এবং ঐ ধোঁয়া একই কারণ হইতে উঠিতেছে। সে কারণটা, নিষ্ক্রিয়তার অবসাদ

হইতে দেশের শুভবুদ্ধির মুক্ত হইবার চেষ্টা। যুক্তিশাস্ত্রে বলে, পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ। গুপ্তচরের যুক্তি বলে, পর্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ। কিন্তু যাই বলুক আর যাই করুক, মাটির তলায় ঐ যে দারুণ সুড়ঙ্গপথ খোলা হইল, যেখানে আলো নাই, শব্দ নাই, বিচার নাই, নিষ্কৃতির কোনো বৈধ উপায় নাই, এইটেই কি সুপথ হইল। দেশের ব্যাকুল চেষ্টাকে বিনা বাছনিতে একদমে কবরস্থ করিলে তার প্রেতের উৎপাতকে কি কোনোদিন শান্ত করিতে পারিবে। ক্ষুধার ছটফটানিকে বাহির হইতে কানমলা দিয়া ঠাণ্ডা করিয়া চিরদুর্ভিক্ষকে ভদ্র আকার দান করাই যে যথার্থ ভদ্রনীতি এমন কথা তো বলিতে পারিই না, তাহা যে বিজ্ঞনীতি তাহাও বলা যায় না।

এই-রকম চোরা-উৎপাতের সময় সমুদ্রের ওপার হইতে খবর আসিল আমাদিগকে দান করিবার জন্য স্বাধীন শাসনের একটা খসড়া তৈরি হইতেছে। মনে ভাবিলাম কর্তৃপক্ষ বুঝিয়াছেন যে, শুধু দমনের বিভীষিকায় অশান্তি দূর হয় না, দাক্ষিণ্যেরও দরকার। দেশ আমার দেশ, সে তো কেবল এখানে জন্মিয়াছি বলিয়াই নয়, এ দেশের ইতিহাসসৃষ্টি-ব্যাপারে আমার তপস্যার উপরে সমস্ত দেশের দাবি আছে বলিয়াই এ দেশ আমার দেশ, এই গভীর মহত্ত্ববোধ যদি দেশের লোক অনুভব করিবার উৎসাহ পায় তবেই এ দেশে ইংরেজরাজত্বের ইতিহাস গৌরবান্বিত হইবে। কালক্রমে বাহিরে সে ইতিহাসের অবসান ঘটিলেও অন্তরে তাহার মহিমা স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তা ছাড়া নিরতিশয় দুর্বলেরও প্রতিকূলতা নৌকার ক্ষুদ্রতম ছিদ্রের মতো। শান্তির সময় নিরন্তর জল সেঁচিয়া সেই ফাটা নৌকা বাওয়া যায়, কিন্তু তুফানের সময় যখন সকল হাতই দাঁড়ে হালে পালে আটক থাকে তখন তলার অতিতুচ্ছ ফাটলগুলিই মুশকিল বাধায়। রাগ করিয়া তার উপরে পুলিসের রেগুলেশন বা নন্-রেগুলেশন লাঠি ঠুকিলে ফাটল কেবল বাড়িতেই থাকে। ফাঁকগুলিকে বুজাইবার জন্য সময়-মত সামান্য খরচ করিলে কালক্রমে অসামান্য খরচ বাঁচে। এই কথা যে ইংলণ্ডের মনীষী রাষ্ট্রনৈতিকেরা বুঝিতেছেন না তাহা আমি মনে করি না। বুঝিতেছেন বলিয়াই হোমরুলের কথাটা উঠিয়াছে।

কিন্তু রিপু অন্ধ; সে উপস্থিত কালকেই বড়ো করিয়া দেখে, অনাগতকে উপেক্ষা করে। ধর্মের দোহাইকে সে দুর্বলতা এবং শৌখিন ভাবুকতা বলিয়া অবজ্ঞা করে। অভাবনীয় প্রত্যাশার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ইংরেজের এই রিপুর কথাটাকে ভারতবর্ষ সামান্য বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিল। যে সমস্ত ইংরেজ এ দেশে রাজসেরেস্তার আমলা বা পণ্যজীবী, তাহারা ভারতবর্ষের অত্যন্ত বেশি নিকটে আছে। এই নিকটের দৃশ্যের মধ্যে তাদেরই প্রতাপ, তাদেরই ধনসঞ্চয় সবচেয়ে সমুচ্চ, আর ভারতবর্ষের

ত্রিশ কোটি মানুষ তাদের সমস্ত সুখদুঃখ লইয়া ছায়ার মতো অস্পষ্ট অবাস্তব ও ম্লান। এই কাছের ওজনে, এই উপস্থিত কালের মাপে ভারতবর্ষের দাবি ইহাদের কাছে তুচ্ছ। তাই যে-কোনো বরলাভের প্রভাবে ভারতবর্ষ কিছুমাত্র আত্মশক্তি লাভ করিবে তাহা ক্ষীণ হইয়া, খণ্ডিত হইয়া, রক্তশূন্য হইয়া আমাদের কাছে পৌঁছিবে অথবা অর্ধপথে অপঘাতমৃত্যুতে মরিয়া ভারতভাগ্যের মরুপথকে ব্যর্থ সাধুসংকল্পের কঙ্কালে আকীর্ণ করিবে।

এই বাধা দিবার শক্তি যারা বহন করিতেছে অব্যাহত প্রতাপের মদের নেশায় তারা মাতোয়ারা, কঠিন স্বাজাত্যভিমানের স্তরসঞ্চিত আবরণে তাহাদের মন ভারতবর্ষের মানুষ-সংস্পর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন। ভারতবর্ষ ইহাদের কাছে একটা অতি প্রকাণ্ড সরকারী বা সওদাগরী আপিস। এ দিকে ইংলণ্ডের যে-ইংরেজ আমাদের ভাগ্যনায়ক তার রক্তের সঙ্গে ইহাদের রক্তের মিল, তার হাতের উপরে ইহাদের হাত, তার কানের কাছে ইহাদের মুখ, তার মন্ত্রণাগৃহে ইহাদের আসন, তার পোলিটিকাল নাট্যশালার নেপথ্যবিধান-গৃহে ইহাদের গতিবিধি। ভারতবর্ষ হইতে নিরন্তর প্রবাহিত হইতে হইতে ইংলণ্ডের ইংরেজ-সমাজের পরতে পরতে ইহারা মিশিয়াছে; সেখানকার ইংরেজের মনস্তত্ত্বকে ইহারা গড়িয়া তুলিতেছে। ইহারা নিজের পককেশের শপথ করে, অভিজ্ঞতার দোহাই পাড়ে এবং 'আমরাই ভারতসাম্রাজ্যের শিখরচূড়াকে অপরিমিত উচ্চ করিয়া তুলিয়াছি' এই বলিয়া ইহারা অপরিমিত প্রশ্রয় দাবি করে। এই অভ্রভেদী অভিমানের ছায়ান্তরালে আমাদের ভাষা, আমাদের আশা, আমাদের অস্তিত্ব কোথায়। ইহাকে উত্তীর্ণ হইয়া, আপিসের প্রাচীর ডিঙাইয়া, ত্রিশ কোটি ভারতবাসীকে মানুষ বলিয়া দেখিতে পায় এমন অসাধারণ দৃষ্টিশক্তি কার কাছে প্রত্যাশা করিব।

যে দূরবর্তী ইংরেজ য়ুরোপীয় আবহাওয়ার মধ্যে আছে বলিয়াই অন্ধস্বার্থের কুহক কাটাইয়া ভারতবর্ষকে উদার দৃষ্টিতে দেখিতে পায়, ইহারা তাহাদিগকে জানায় যে, নীচের আকাশের ধুলানিবিড় বাতাসের মধ্য দিয়া দেখাই বাস্তবকে দেখা, উপরের স্বচ্ছ আকাশ হইতে দেখাই বস্তুতন্ত্রবিরুদ্ধ। ভারতশাসনে দূরের ইংরেজের হস্তক্ষেপ করাকে ইহারা স্পর্ধিত অপরাধ বলিয়া গণ্য করে। ভারতবাসীকে এই কথাটা মনে রাখিতে হইবে, ইংরেজ বলিয়া যে-একটি মহৎ জাতি আছে প্রকৃতপক্ষে সেই যে ভারতশাসন করিতেছে তাহা নহে; ভারত-দফতরখানার বহুকালক্রমাগত সংস্কারের অ্যাসিডে কাঁচাবয়স হইতে জীর্ণ হইয়া যে-একটি আমলা-সম্প্রদায় আমাদের পক্ষে কৃত্রিম মানুষ হইয়া আছে আমরা তাহারই প্রজা। যে-মানুষ তার সমস্ত মনপ্রাণহৃদয় লইয়া মানুষ,

সে নয়, যে-মানুষ কেবলমাত্র বিশেষ প্রয়োজনের মাপে মানুষ— সেই তো কৃত্রিম মানুষ। ফোটোগ্রাফের ক্যামেরাকে কৃত্রিম চোখ বলিতে পারি। এই ক্যামেরা খুব স্পষ্ট করিয়া দেখে কিন্তু সম্পূর্ণ করিয়া দেখে না, তাহা চলতিকে দেখে না, যাহাকে দেখা যায় না তাহাকে দেখে না। এইজন্য বলা যায় যে, ক্যামেরা অন্ধ হইয়া দেখে। সজীব চোখের পিছনে সমগ্র মানুষ আছে বলিয়া তাহার দেখা কোনো আংশিক প্রয়োজনের পক্ষে যত অসম্পূর্ণ হোক মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পূর্ণ ব্যবহারক্ষেত্রে তাহাই সম্পূর্ণতর। বিধাতার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ যে তিনি চোখের বদলে আমাদিগকে ক্যামেরা দেন নাই। কিন্তু হায় ভারতশাসনে তিনি এ কী দিলেন। যে বড়ো-ইংরেজ ষোলো-আনা মানুষ, আমাদের ভাগ্যে সে থাকে সমুদ্রের ওপারে, আর এপারে পাড়ি দিতেই প্রয়োজনের কাঁচিকলের মধ্যে আপনার বারো-আনা ছাঁটিয়া সে এতটুকু ছোটো হইয়া বাহির হইয়া আসে। সেই এতটুকুর পরিমাণ কেবল সেইটুকু যাতে বাড়তির ভাগ কিছুই নাই, অর্থাৎ মানুষের যেটা স্বাদ গন্ধ লাবণ্য, যেটা তার কমনীয়তা ও নমনীয়তা, জীবনের স্বাভাবিক নিয়মে যাহা নিজেও বাড়িতে থাকে অন্যকেও বাড়াইতে থাকে সে সমস্তই কি বাদ পড়িল। এই ছোটোখাটো ছাঁটাছোঁটা ইংরেজ কোনোমতেই বুঝিতে পারে না এমন অত্যন্ত দামী ও নিখুঁত ক্যামেরা পাইয়াও সজীব চোখের চাহনির জন্য ভিতরে-ভিতরে আমাদের এত তৃষ্ণা কেন। বোঝে না তার কারণ, কলে ছাঁট পড়িবার সময় ইহাদের কল্পনাবৃত্তিটা যে বাদ পড়িয়াছে। ইংলণ্ডের সরকারী অনাথ-আশ্রমে যারা থাকে তাদের মন কেন পালাই-পালাই এবং প্রাণ কেন ত্রাহি-ত্রাহি করে। কেননা ঐ ওআর্ক-হাউস সম্পূর্ণ ঘরও নয়, সম্পূর্ণ বাহিরও নয়। উহা আত্মীয়তাও দেয় না, মুক্তিও দেয় না। উহা কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করিয়া কেবলমাত্র আশ্রয় দেয়। আশ্রয়টা অত্যন্ত দরকারী বটে, কিন্তু মানুষ যেহেতু মানুষ সেইজন্য সে ঘরকে চায়, অর্থাৎ দরকারের সঙ্গে বহুল পরিমাণে অ-দরকারকে না পাইলে সে বাঁচে না। নহিলে সে অপমানিত হয়, সুবিধা-সুযোগ ফেলিয়াও সে পালাইতে চেষ্টা করে। অনাথ-আশ্রমের কড়া কার্যাধ্যক্ষ এই অকৃতজ্ঞতায় বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হয় এবং কেবল তার ক্রোধের দ্বারাই দুঃখকে দমন করিবার জন্য সে দণ্ডধারণ করে। কেননা, এই কার্যাধ্যক্ষ পুরা মানুষ নয়, ইহার পুরা দৃষ্টি নাই, এই ছোটো মানুষ মনে করে দুর্ভাগা ব্যক্তি কেবলমাত্র আশ্রয়ের শান্তিটুকুর জন্য মুক্তির অসীম আশায় ব্যাকুল আপন আত্মাকে চিরদিনের মতোই বণিকের ঘরে বাঁধা রাখিতে পারে।

বড়ো-ইংরেজ অব্যবহিতভাবে ভারতবর্ষকে স্পর্শ করে না— সে মাঝখানে রাখিয়াছে ছোটো-ইংরেজকে। এইজন্য বড়ো-ইংরেজ আমাদের কাছে সাহিত্য

ইতিহাসের ইংরেজি পুঁথিতে, এবং ভারতবর্ষ বড়ো ইংরেজের কাছে আপিসের দফতরে এবং জমাখরচের পাকাখাতায়। অর্থাৎ ভারতবর্ষ তার কাছে স্তূপাকার স্ট্যাটিস্টিক্সের সমষ্টি। সেই স্ট্যাটিস্টিক্সে দেখা যায় কত আমদানি কত রপ্তানি ; কত আয় কত ব্যয় ; কত জন্মিল কত মরিল ; শান্তিরক্ষার জন্য কত পুলিস, শাস্তি দিবার জন্য কত জেলখানা। রেলের লাইন কত দীর্ঘ, কলেজের ইমারত কয়তলা উচ্চ। কিন্তু সৃষ্টি তো শুধু নীলাকাশ-জোড়া অঙ্কের তালিকা নয়। সেই অঙ্কমালার চেয়ে অনেক বেশির হিসাবটা ভারত-আপিসের কোনো ডিপার্টমেন্ট্ দিয়া কোনো মানবজীবের কাছে গিয়া পৌঁছায় না।

এ কথা বিশ্বাস করিতে যত বাধাই থাক্ তবু আমাদের দেশের লোকের ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, বড়ো-ইংরেজ বলিয়া একটা বড়ো জাতি সত্যই ভূগোলের এক জায়গায় আছে। প্রবলের প্রতি দুর্বল যে অবিচার করে তাহাতে তার দুর্বলতারই পরিচয় হয়— সেই দীনতা হইতে মুক্ত থাকিলেই আমাদের গৌরব। এ কথা শপথ করিয়া বলা যায় যে, এই বড়ো-ইংরেজ সর্বাংশেই মানুষের মতো। ইহাও নিশ্চিত যে, জগতের সকল বড়ো জাতিই যে-ধর্মের বলে বড়ো হইয়াছে ইংরেজও সেই বলেই বড়ো ; অত্যন্ত রাগ করিয়াও এ কথা বলা চলিবে না যে, সে কেবল তলোয়ারের ডগায় ভর করিয়া উঁচু হইয়াছে কিংবা টাকার থলির উপরে চড়িয়া। কোনো জাতিই টাকা করিতে কিংবা লড়াই করিতে পারে বলিয়াই ইতিহাসে গৌরব লাভ করিয়াছে এ কথা অশ্রদ্ধেয়। মনুষ্যত্বে বড়ো না হইয়াও কোনো জাতি বড়ো হইয়াছে এ কথাটাকে বিনা সাক্ষ্যপ্রমাণে গোড়াতেই ডিসমিস করা যাইতে পারে। ন্যায়, সত্য এবং স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা এই ইংরেজজাতির অন্তরের আদর্শ। সেই আদর্শ ইহাদের সাহিত্যে ও ইতিহাসে নানা আকারে ও অধ্যবসায়ে প্রকাশ পাইয়াছে এবং আজিকার মহাযুদ্ধেও সেই আদর্শ নানা ছলনা ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাহাদিগকে শক্তিদান করিতেছে।

এই বড়ো-ইংরেজ স্থির নাই, সে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। ইতিহাসের মধ্য দিয়া তার জীবনের পরিবর্তন ও প্রসার ঘটিতেছে। সে কেবল তার রাষ্ট্র ও বাণিজ্য লইয়া নয়, তার শিল্প সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান ধর্ম ও সমাজ লইয়া পূর্ণপ্রবাহে চলিয়াছে। সে সৃজনধর্মী ; য়ুরোপীয় সভ্যতার বিরাট যজ্ঞে সে একজন প্রধান হোতা। বর্তমান যুদ্ধের মহৎ শিক্ষা তার চিত্তকে প্রতিমুহূর্তে আন্দোলিত করিতেছে। মৃত্যুর উদার বৈরাগ্য-আলোকে সে মানুষের ইতিহাসকে নূতন করিয়া পড়িবার সুযোগ পাইল। সে দেখিল অপমানিত মনুষ্যত্বের প্রতিকূলে স্বাজাত্যের আত্মাভিমানকে একান্ত করিয়া তুলিবার অনিবার্য দুর্যোগটা কী। সে আজ নিজের গোচরে বা অগোচরে প্রত্যহ বুঝিতেছে

যে, স্বজাতির যিনি দেবতা সর্বজাতির দেবতাই তিনি, এইজন্য তাঁহার পূজায় নরবলি আনিলে একদিন রুদ্র তাঁর প্রলয়রূপ ধারণ করেন। আজ যদি সে না-ও বুঝিয়া থাকে, একদিন সে বুঝিবেই যে, হাওয়া যেখানেই পাতলা, ঝড়ের কেন্দ্রই সে জায়গাটায়— কেননা চারি দিকের মোটা হাওয়া সেই ফাঁক দখল করিতেই ঝুঁকিয়া পড়ে। তেমনি পৃথিবীর যে-সব দেশ দুর্বল, সবলের দ্বন্দ্বের কারণ সেখানেই; লোভের ক্ষেত্র সেখানেই; মানুষ সেখানে আপন মহৎস্বরূপে বিরাজ করে না; মানুষ প্রত্যহই সেখানে অসতর্ক হইয়া আপন মনুষ্যত্বকে শিথিল করিয়া বর্জন করিতে থাকে। শয়তান সেখানে আসন জুড়িয়া ভগবানকে দুর্বল বলিয়া বিদ্রূপ করে। বড়ো-ইংরেজ এ কথা বুঝিবেই যে, বালির উপর বাড়ি করা চলে না, একের শক্তিহীনতার উপরে অপরের শক্তির ভিত্তি কখনই পাকা হইতে পারে না।

কিন্তু ছোটো-ইংরেজ অগ্রসর হইয়া চলে না। যে-দেশকে সে নিশ্চল করিয়া বাঁধিয়াছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী সেই দেশের সঙ্গে সে আপনি বাঁধা। তার জীবনের এক পিঠে আপিস, আরেক পিঠে আমোদ। যে-পিঠে আপিস সে-পিঠে সে ভারতের বহুকোটি মানুষকে রাষ্ট্রিকের রাজদণ্ডের বা বণিকের মানদণ্ডের ডগাটা দিয়া স্পর্শ করে, আর যে-পিঠে আমোদ সে-পিঠটা চাঁদের পশ্চাদ্দিকের মতো, বৎসরের পর বৎসর সম্পূর্ণ অদৃশ্য। তবু কেবলমাত্র কালের অঙ্কপাত হিসাব করিয়া ইহারা অভিজ্ঞতার দাবি করে। ভারত-অধিকারের গোড়ায় ইহারা সৃজনের কাজে রত ছিল, কিন্তু তাহার পর বহুদীর্ঘকাল ইহারা পাকা সাম্রাজ্য ও পাকা বাণিজ্যকে প্রধানত পাহারা দিতেছে ও ভোগ করিতেছে। নিরন্তর রুটিনের ঘানি টানিয়া ইহারা বিষয়ীলোকদের পাকা প্রকৃতি পাইয়াছে, সেই প্রকৃতি কঠিন অসাড়তাকেই বল বলিয়া থাকে। তারা মনে করে তাদের আপিসটা সুনিয়মে চলিতেছে এইটেই বিশ্বের সব-চেয়ে বড়ো ঘটনা। কিন্তু আপিসের জানলার বাহিরে রাস্তার ধুলার উপর দিয়া বিশ্বদেবতা তাঁর রথযাত্রায় অতিদীনকেও যে নিজের সারথ্যেই চালাইতেছেন এই চালনাকে তারা অশ্রদ্ধা করে। অক্ষমের সঙ্গে নিয়ত কারবার করিয়া এ কথা তারা ধ্রুব বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে, যেমন তারা বর্তমানের মালিক তেমনি তারা ভবিষ্যতের নিয়ন্তা। আমরা এখানে আসিয়াছি এই কথা বলিয়াই তারা চুপ করে না, আমরা এখানে থাকিবই এই কথা বলিয়া তারা স্পর্ধা করে।

অতএব ওরে মরীচিকালুব্ধ দুর্ভাগা, বড়ো-ইংরেজের কাছ হইতে জাহাজ বোঝাই করিয়া বর আসিতেছে কেবল এই আশাটাকে বুকে করিয়াই পশ্চিমের ঘাটের দিকে অতবেশি কলরব করিতে করিতে ছুটিয়ো না। এই আশঙ্কাটাকেও মনে রাখিয়ো যে,

ভারতসাগরের তলায় তলায় ছোটো-ইংরেজের 'মাইন' সার বাঁধিয়া আছে। এটা অসম্ভব নয় যে তোমার ভাগ্যে জাহাজের যে ভাঙা কাঠ আছে সেটা স্বাধীনশাসনের অন্ত্যেষ্টিসৎকারের কাজে লাগিতে পারে। তার পরে লোনা জলে পেট ভরাইয়া ডাঙায় উঠিতে পারিলেই আমাদের অদৃষ্টের কাছে কৃতজ্ঞ থাকিব।

দেখিতে পাই, বড়ো-ইংরেজের দাক্ষিণ্যকেই চরম সম্পদ গণ্য করিয়া আমাদের লোকে চড়া চড়া কথায় ছোটো-ইংরেজের মুখের উপর জবাব দিতে শুরু করিয়াছেন। ছোটো-ইংরেজের জোর যে কতটা খেয়াল করিতেছেন না। ভুলিয়াছেন, মাঝখানের পুরোহিতের মামুলি বরাদ্দের পাওনা উপরের দেবতার বরকে বিকাইয়া দিতে পারে। এই মধ্যবর্তীর জোর কতটা এবং ইহাদের মেজাজটা কী ধরনের সে কি বারে বারে দেখি নাই। ছোটো-ইংরেজের জোর কত সেটা যে কেবল আমরা লর্ড রিপনের এবং কিছু পরিমাণে লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলে দেখিলাম তাহা নহে, আর-একদিন লর্ড ক্যানিং এবং লর্ড বেন্টিঙ্কের আমলেও দেখা গেছে।

তাই দেশের লোককে বার বার বলি, "কিসের জোরে স্পর্ধা কর। গায়ের জোর? তাহা তোমার নাই। কণ্ঠের জোর? তোমার যেমনি অহংকার থাক্‌ সেও তোমার নাই। মুরুব্বির জোর? সেও তো দেখি না। যদি ধর্মের জোর থাকে তবে তারই প্রতি সম্পূর্ণ ভরসা রাখো। স্বেচ্ছাপূর্বক দুঃখ পাইবার মহৎ অধিকার হইতে কেহ তোমাকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য, লোকশ্রেয়ের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করিবার গৌরব দুর্গম পথের প্রান্তে তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। বর যদি পাই তবে অন্তর্যামীর কাছ হইতে পাইব।"

দেখ নাই কি, বরদানের সংকল্প-ব্যাপারে ভারত-গবর্মেণ্টের উচ্চতম বিভাগের যোগ আছে শুনিয়া এ-দেশী ইংরেজের সংবাদপত্র অট্টহাস্যে প্রশ্ন করিতেছে, "ভারত-সচিবদের স্নায়ুবিকার ঘটিল নাকি। এমন কী উৎপাতের কারণ ঘটিয়াছে যে বজ্রপাত-ডিপার্টমেণ্ট্‌ হইতে হঠাৎ বৃষ্টিপাতের আয়োজন হইতেছে।" অথচ আমাদের ইস্কুলের কচি ছেলেগুলোকে পর্যন্ত ধরিয়া যখন দলে দলে আইনহীন রসাতলের নিরালোক ধামে পাঠানো হয় তখন ইহারাই বলেন, "উৎপাত এত গুরুতর যে, ইংরেজ-সাম্রাজ্যের আইন হার মানিল, মগের মুল্লুকের বেআইনের আমদানি করিতে হইল।" অর্থাৎ মারিবার বেলায় যে আতঙ্কটা সত্য, মলম দিবার বেলাতেই সেটা সত্য নয়। কেননা মারিতে খরচ নাই, মলম লাগাইতে খরচা আছে। কিন্তু তাও বলি, মারিবার খরচার বিল কালে মলমের খরচার চেয়ে বড়ো হইয়া উঠিতে পারে। তোমরা জোরের সঙ্গে ঠিক করিয়া আছ যে, ভারতের যে-ইতিহাস ভারতবাসীকে লইয়া, সেটা সামনের দিকে

বহিতেছে না ; তাহা ঘূর্ণির মতো একটা প্রবল কেন্দ্রের চারি দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে তলার মুখেই ঝুঁকিতেছে। এমন সময় আপিস হইতে বাহির হইবার কালে হঠাৎ একদিন দেখিতে পাও স্রোতটা তোমাদের নক্শার রেখা ছাড়াইয়া কিছুদূর আগাইয়া গেছে। তখন রাগিয়া গর্জাইতে গর্জাইতে বল, পাথর দিয়া বাঁধো উস্‌কো, বাঁধ দিয়া উহাকে ঘেরো। প্রবাহ তখন পথ না পাইয়া উপরের দিক হইতে নীচের দিকে তলাইতে থাকে— সেই চোরা-প্রবাহকে ঠেকাইতে গিয়া সমস্ত দেশের বক্ষ দীর্ণ বিদীর্ণ করিতে থাক।

আমার সঙ্গে এই ছোটো-ইংরেজের যে-একটা বিরোধ ঘটিয়াছিল সে কথা বলি। বিনাবিচারে শতশত লোককে বন্দী করার বিরুদ্ধে কিছুদিন আগে একখানি ছোটো চিঠি লিখিয়াছিলাম। ইহাতে ভারতজীবী কোনো ইংরেজি কাগজ আমাকে মিথ্যুক ও **extremist** বলিয়াছিল। ইহারা ভারতশাসনের তকমাহীন সচিব, সুতরাং আমাদিগকে সত্য করিয়া জানা ইহাদের পক্ষে অনাবশ্যক, অতএব আমি ইহাদিগকে ক্ষমা করিব। এমন-কি, আমাদের দেশের লোক, যাঁরা বলেন আমার পদ্যেও অর্থ নাই, গদ্যেও বস্তু নাই, তাঁদের মধ্যেও যে দুই-একজন ঘটনাক্রমে আমার লেখা পড়িয়াছেন তাঁহাদিগকে অন্তত এ কথাটুকু কবুল করিতেই হইবে যে, স্বদেশী উত্তেজনার দিন হইতে আজ পর্যন্ত আমি অতিশয়-পন্থার বিরুদ্ধে লিখিয়া আসিতেছি। আমি এই কথাই বলিয়া আসিতেছি যে, অন্যায় করিয়া যে ফল পাওয়া যায় তাহাতে কখনোই শেষ পর্যন্ত ফলের দাম পোষায় না, অন্যায়ের ঋণটাই ভয়ংকর ভারী হইয়া উঠে। সে যাই হোক, দিশি বা বিলিতি যে-কোনো কালিতেই হোক-না আমার নিজের নামে কোনো লাঞ্ছনাতে আমি ভয় করিব না। আমার যেটা বলিবার কথা সে এই যে, অতিশয়-পন্থা বলিতে আমরা এই বুঝি, যে-পন্থা না ভদ্র, না বৈধ, না প্রকাশ্য ; অর্থাৎ সহজ পথে ফলের আশা ত্যাগ করিয়া অপথে বিপথে চলাকেই 'একস্ট্রিমিজ্‌ম্‌' বলে। এই পথটা যে নিরতিশয় গর্হিত সে কথা আমি জোরের সঙ্গেই নিজের লোককে বলিয়াছি, সেইজন্যই আমি জোরের সঙ্গেই বলিবার অধিকার রাখি যে, 'একস্ট্রিমিজ্‌ম্‌' গবর্মেণ্টের নীতিতেও অপরাধ। আইনের রাস্তা বাঁধা রাস্তা বলিয়া মাঝে মাঝে তাহাতে গম্যস্থানে পৌঁছিতে ঘুর পড়ে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া বেলজিয়মের বুকের উপর দিয়া সোজা হাঁটিয়া রাস্তা সংক্ষেপ করার মতো 'একস্ট্রিমিজ্‌ম্‌' কাহাকেও শোভা পায় না।

ইংরেজিতে যাকে 'শর্টকাট্' বলে আদিমকালের ইতিহাসে তাহা চলিত ছিল। "লে আও, উস্‌কো শির লে আও" এই প্রণালীতে গ্রন্থি খুলিবার বিরক্তি বাঁচিয়া যাইত, এক কোপে গ্রন্থি কাটা পড়িত। য়ুরোপের অহংকার এই যে, সে আবিষ্কার

করিয়াছে এই সহজ প্রণালীতে গ্রন্থি কাটা পড়ে বটে কিন্তু মালের গুরুতর লোকসান ঘটে। সভ্যতার একটা দায়িত্ব আছে, সকল সংকটেই সে দায়িত্ব তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে। শাস্তি দেওয়ার মধ্যে একটা দারুণতা অনিবার্য বলিয়াই শাস্তিটাকে ন্যায়বিচার-প্রণালীর ফিলটারের মধ্য দিয়া ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ- ও পক্ষপাত- পরিশূন্য করিয়া সভ্যসমাজ তবে তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে। তাহা না হইলেই লাঠিয়ালের লাঠি এবং শাসনকর্তার ন্যায়দণ্ডের মধ্যে প্রভেদ বিলুপ্ত হইতে থাকে।

স্বীকার করি, কাজ কঠিন হইয়াছে। বাংলাদেশের একদল বালক ও যুবক স্বদেশের সঙ্গে স্বদেশীর সত্য যোগসাধনের বাধা-অতিক্রমের যে পথ অবলম্বন করিয়াছে তাহার জন্য আমরা লজ্জিত আছি। আরো লজ্জিত এইজন্য যে, দেশের প্রতি কর্তব্যনীতির সঙ্গে ধর্মনীতির বিচ্ছেদসাধন করায় অকর্তব্য নাই এ কথা আমরা পশ্চিমের কাছ হইতেই শিখিয়াছি। পলিটিক্সের গুপ্ত ও প্রকাশ্য মিথ্যা এবং পলিটিক্সের গুপ্ত ও প্রকাশ্য দস্যুবৃত্তি পশ্চিম সোনার সহিত খাদ মিশানোর মতো মনে করেন, মনে করেন ওটুকু না থাকিলে সোনা শক্ত হয় না। আমরাও শিখিয়াছি যে, মানুষের পরমার্থকে দেশের স্বার্থের উপরে বসাইয়া ধর্ম লইয়া টিক্‌টিক করিতে থাকা মূঢ়তা, দুর্বলতা, ইহা সেন্টিমেণ্টালিজ্‌ম্— বর্বরতাকে দিয়াই সভ্যতাকে এবং অধর্মকে দিয়াই ধর্মকে মজবুত করা চাই। এমনি করিয়া আমরা যে কেবল অধর্মকে বরণ করিয়া লইয়াছি তাহা নহে, আমাদের গুরুমশায়দের যেখানে বীভৎসতা, সেই বীভৎসতার কাছে মাথা হেঁট করিয়াছি। নিজের মনের জোরে ধর্মের জোরে গুরুমশায়ের উপরে দাঁড়াইয়াও এ কথা বলিবার তেজ ও প্রতিভা আমাদের আজ নাই যে,

> অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি,
> ততঃ সপত্নান্‌ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।

অর্থাৎ অধর্মের দ্বারা মানুষ বাড়িয়া উঠে, অধর্ম হইতে সে আপন কল্যাণ দেখে, অধর্মের দ্বারা সে শত্রুদিগকেও জয় করে, কিন্তু একেবারে মূল হইতে বিনাশ পায়। তাই বলিতেছি, গুরুমশায়দের কাছে আমাদের ধর্মবুদ্ধিরও যে এত-বড়ো পরাভব হইয়াছে ইহাতেই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো লজ্জা। বড়ো আশা করিয়াছিলাম, দেশে যখন দেশভক্তির আলোক জ্বলিয়া উঠিল তখন আমাদের প্রকৃতির মধ্যে যাহা সকলের চেয়ে মহৎ তাহাই উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইবে; আমাদের যাহা যুগসঞ্চিত অপরাধ তাহা আপন অন্ধকার কোণ ছাড়িয়া পালাইয়া যাইবে; দুঃসহ নৈরাশ্যের পাষাণস্তর বিদীর্ণ করিয়া অক্ষয় আশার উৎস উৎসারিত হইয়া উঠিবে এবং দুরূহ নিরুপায়তাকেও উপেক্ষা করিয়া অপরাহত ধৈর্য এক-এক পা করিয়া আপনার রাজপথ

নির্মাণ করিবে ; নিষ্ঠুর আচারের ভারে এ দেশে মানুষকে মানুষ যে অবনত অপমানিত করিয়া রাখিয়াছে অকৃত্রিম প্রীতির আনন্দময় শক্তির দ্বারা সেই ভারকে দূর করিয়া সমস্ত দেশের লোক একসঙ্গে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইব। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে এ কী হইল। দেশভক্তির আলোক জ্বলিল, কিন্তু সেই আলোতে এ কোন্ দৃশ্য দেখা যায়— এই চুরি ডাকাতি গুপ্তহত্যা ? দেবতা যখন প্রকাশিত হইয়াছেন তখন পাপের অর্ঘ্য লইয়া তাঁহার পূজা ? যে-দৈন্য যে-জড়তায় এতকাল আমরা পোলিটিকাল ভিক্ষা-বৃত্তিকেই সম্পদলাভের সদুপায় বলিয়া কেবল রাজদরবারে দরখাস্ত লিখিয়া হাত পাকাইয়া আসিয়াছি, দেশপ্রীতির নববসন্তেও সেই দৈন্য সেই জড়তা সেই আত্ম-অবিশ্বাস পোলিটিকাল চৌর্যবৃত্তিকেই রাতারাতি ধনী হইবার একমাত্র পথ মনে করিয়া সমস্ত দেশকে কি কলঙ্কিত করিতেছে না। এই চোরের পথ আর বীরের পথ কোনো চৌমাথায় একত্র আসিয়া মিলিবে না। য়ুরোপীয় সভ্যতায় এই দুই পথের সম্মিলন ঘটিয়াছে বলিয়া আমরা ভ্রম করি, কিন্তু বিধাতার দরবারে এখনো পথের বিচার শেষ হয় নাই সে কথা মনে রাখিতে হইবে ; আর বাহ্য ফললাভই যে চরম লাভ এ কথা সমস্ত পৃথিবী যদি মানে তবু ভারতবর্ষ যেন না মানে বিধাতার কাছে এই বর প্রার্থনা করি, তার পর পোলিটিকাল মুক্তি যদি পাই তো ভালো, যদি না পাই তবে তার চেয়ে বড়ো মুক্তির পথকে কলুষিত পলিটিক্সের আবর্জনা দিয়া বাধাগ্রস্ত করিব না।

কিন্তু একটা কথা ভুলিলে চলিবে না যে, দেশভক্তির আলোকে বাংলাদেশে কেবল যে চোরডাকাতকে দেখিলাম তাহা নহে, বীরকেও দেখিয়াছি। মহৎ আত্মত্যাগের দৈবীশক্তি আজ আমাদের যুবকদের মধ্যে যেমন সমুজ্জ্বল করিয়া দেখিয়াছি এমন কোনোদিন দেখি নাই। ইহারা ক্ষুদ্র বিষয়বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়া প্রবল নিষ্ঠার সঙ্গে দেশের সেবার জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। এই পথের প্রান্তে কেবল যে গবর্মেন্টের চাকরি বা রাজসম্মানের আশা নাই তাহা নহে, ঘরের বিজ্ঞ অভিভাবকদের সঙ্গেও বিরোধে এ রাস্তা কণ্টকিত। আজ সহসা ইহাই দেখিয়া পুলকিত হইয়াছি যে বাংলাদেশে এই ধনমানহীন সংকটময় দুর্গমপথে তরুণ পথিকের অভাব নাই। উপরের দিক হইতে ডাক আসিল, আমাদের যুবকেরা সাড়া দিতে দেরি করিল না ; তারা মহৎ ত্যাগের উচ্চ শিখরে নিজের ধর্মবুদ্ধির সম্বলমাত্র লইয়া পথ কাটিতে কাটিতে চলিবার জন্য দলে দলে প্রস্তুত হইতেছে। ইহারা কংগ্রেসের দরখাস্তপত্র বিছাইয়া আপন পথ সুগম করিতে চায় নাই, ছোটো-ইংরেজ ইহাদের শুভ সংকল্পকে ঠিকমত বুঝিবে কিম্বা হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিবে এ দুরাশাও ইহারা মনে রাখে নাই। অন্য সৌভাগ্যবান দেশে, যেখানে জনসেবার ও দেশসেবার বিচিত্র

পথ প্রশস্ত হইয়া দিকে দিকে চলিয়া গেছে, যেখানে শুভ ইচ্ছা এবং শুভ ইচ্ছার ক্ষেত্র এই দুইয়ের মধ্যে পরিপূর্ণ যোগ আছে, সেইখানে এই রকমের দৃঢ়সংকল্প আত্ম-বিসর্জনশীল বিষয়বুদ্ধিহীন কল্পনাপ্রবণ ছেলেরাই দেশের সকলের চেয়ে বড়ো সম্পদ। আত্মঘাতী শচীন্দ্রের অন্তিমের চিঠি পড়িলে বোঝা যায় যে, এ-ছেলেকে যে-ইংরেজ সাজা দিয়াছে সেই ইংরেজের দেশে এ যদি জন্মিত তবে গৌরবে বাঁচিতে এবং ততোধিক গৌরবে মরিতে পারিত। আদিমকালের বা এখনকার কালের যে-কোনো রাজা বা রাজার আমলা এই শ্রেণীর জীবনবান ছেলেদের শাসন করিয়া দলন করিয়া দেশকে একপ্রান্ত হইতে আর-একপ্রান্ত পর্যন্ত অসাড় করিয়া দিতে পারে। ইহাই সহজ, কিন্তু ইহা ভদ্র নয়, এবং আমরা শুনিয়াছি ইহা ঠিক ইংলিশ নহে। যারা নিরপরাধ অথচ মহৎ, অথবা মহৎ উৎসাহের ক্ষণিক বিকারে যারা পথ ভুল করিয়াছে, যারা উপরে চড়িতে গিয়া নীচে পড়িয়াছে এবং অভয় পাইলেই যারা সে পথ হইতে ফিরিয়া একদিন জীবনকে সার্থক করিতে পারিত, এমন-সকল ছেলেকে সন্দেহমাত্রের 'পরে নির্ভর করিয়া চিরজীবনের মতো পঙ্গু করিয়া দেওয়ার মতো মানবজীবনের এমন নির্মম অপব্যয় আর-কিছুই হইতে পারে না। দেশের সমস্ত বালক ও যুবককে আজ পুলিসের গুপ্তদলনের হাতে নির্বিচারে ছাড়িয়া দেওয়া— এ কেমনতরো রাষ্ট্রনীতি। এ-যে পাপকে হীনতাকে রাজপেয়াদার তকমা পরাইয়া দেওয়া। এ যেন রাতদুপুরে কাঁচা ফসলের খেতে মহিষের পাল ছাড়িয়া দেওয়া। যার খেত সে কপাল চাপড়াইয়া হায় হায় করিয়া মরে, আর যার মহিষ সে বুক ফুলাইয়া বলে— বেশ হইয়াছে, একটা আগাছাও আর বাকি নাই।

আর-একটা সর্বনাশ এই যে, পুলিস একবার যে-চারায় অল্পমাত্রও দাঁত বসাইয়াছে সে-চারায় কোনোকালে ফুলও ফোটে না, ফলও ধরে না। উহার লালায় বিষ আছে। আমি একটি ছেলেকে নিজে জানি, তার যেমন বুদ্ধি, তেমনি বিদ্যা, তেমনি চরিত্র; পুলিসের হাত হইতে সে বিক্ষত হইয়া বাহির হইল বটে, কিন্তু আজ সে তরুণ বয়সে উন্মাদ হইয়া বহরমপুর পাগলা-গারদে জীবন কাটাইতেছে। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি তার কাছে ব্রিটিশরাজের একচুলমাত্র আশঙ্কার কারণ ছিল না, অথচ তার কাছ থেকে আমাদের দেশ বিস্তর আশা করিতে পারিত। পুলিসের মারের তো কথাই নাই, তার স্পর্শই সাংঘাতিক। কিছুকাল পূর্বে শান্তিনিকেতনের ছেলেরা বীরভূমের জেলাস্কুলে পরীক্ষা দিতে গেলে পুলিসের লোক আর-কিছুই না করিয়া কেবলমাত্র তাহাদের নাম টুকিয়া লইত। আর-বেশি কিছু করিবার দরকার নাই; উহাদের নিশ্বাস লাগিলেই কাঁচা প্রাণের অঙ্কুর শুকাইতে শুরু করে। উহাদের খাতা

যে গুপ্ত খাতা, উহাদের চাল যে গুপ্ত চাল। সাপে-খাওয়া ফল যেমন কেহ খায় না, আজকের দিনে তেমনি পুলিসে-ছোঁওয়া মানুষকে কেহ কোনো ব্যবহারে লাগায় না। এমন-কি, যে মরিয়া-মানুষকে বৃদ্ধ রুগ্‌ণ দরিদ্র কুশ্রী কুচরিত্র কেহই পিছু হঠাইতে পারে না, বাংলাদেশের সেই কন্যাদায়িক বাপও তার কাছে ঘটক পাঠাইতে ভয় করে। সে দোকান করিতে গেলে তার দোকান চলে না, সে ভিক্ষা চাহিলে তাহাকে দয়া করিতে পারি কিন্তু দান করিতে বিপদ গনি। দেশের কোনো হিতকর্মে তাহাকে লাগাইলে সে কর্ম নষ্ট হইবে।

যে অধ্যক্ষদের 'পরে এই বিভীষিকা-বিভাগের ভার তাঁরা তো রক্তমাংসের মানুষ; তাঁরা তো রাগদ্বেষবিবর্জিত মহাপুরুষ নন। রাগ বা আতঙ্কের সময় আমরাও যেমন অল্প প্রমাণেই ছায়াকে বস্তু বলিয়া ঠাহর করি, তাঁরাও ঠিক তাই করেন। সকল মানুষকে সন্দেহ করাটাই যখন তাদের ব্যবসায় হয় তখন সকল মানুষকে অবিশ্বাস করাটাই তাঁদের স্বভাব হইয়া ওঠে। সংশয়ের সামান্য আভাসমাত্রকেই চূড়ান্ত করিয়া নিরাপদকে পাকা করিতে তাঁদের স্বভাবতই প্রবৃত্তি হয়— কেননা, উপরে তাঁদের দায়িত্ব অল্প, চারি পাশের লোক ভয়ে নিস্তব্ধ, আর পিছনে ভারতের ইংরেজ হয় উদাসীন নয় উৎসাহদাতা। যেখানে স্বাভাবিক দরদ নাই অথচ ক্রোধ আছে এবং শক্তিও অব্যাহত, সেখানে কার্যপ্রণালী যদি গুপ্ত এবং বিচারপ্রণালী যদি বিমুখ হয়, তবে সেই ক্ষেত্রেই যে ন্যায়ধর্ম রক্ষিত হইতেছে এ কথা কি আমাদের ছোটো-ইংরেজও সত্যই বিশ্বাস করেন। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, তিনি বিশ্বাস করেন না, কিন্তু তার বিশ্বাস এই যে, কাজ উদ্ধার হইতেছে। কারণ দেখিয়াছি, জর্মানিও এই বিশ্বাসের জোরে ইণ্টারন্যাশনাল আইনকে এবং দয়াধর্মকে অগ্রাহ্য করিয়া যুদ্ধ জিতিবার নিয়মকে সহজ করিয়াছে। তার কারণ, দুর্ভাগ্যক্রমে জর্মানিতে আজ বড়ো-জর্মানের চেয়ে ছোটো-জর্মানের প্রভাব বড়ো হইয়াছে, যে-জর্মান কাজ করিবার যন্ত্র এবং যুদ্ধ করিবার কায়দামাত্র। আবার বলি, "শির লে আও" বলিতে পারিলে রাজকার্য উদ্ধার হইতে পারে যে-রাজকার্য উপস্থিতের, কিন্তু রাজনীতির অধঃপতন ঘটে যে-রাজনীতি চিরদিনের। এই রাজনীতির জন্য ইংলণ্ডের ইতিহাসে ইংরেজ লড়াই করিয়াছে, এই রাজনীতির ব্যভিচারেই জর্মনির প্রতি মহৎ ঘৃণায় উদ্দীপ্ত ইংরেজ যুবক দলে দলে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে ছুটিয়াছে।

বিশ্বমানবের ইতিহাসকে অখণ্ড করিয়া দেখিবার অধ্যাত্মদৃষ্টি যাহাতে শান্তি-নিকেতন-আশ্রমের বালকদের পক্ষে দুর্বল বা কলুষিত না হয় আমি এই লক্ষ্য দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছি। তাই এই আশ্রমের শুভকার্যে ইংরেজ সাধকেরও জীবন উপহার

দাবি করিতে আমি কুণ্ঠিত হই নাই। পরমসত্যকে আমি কোনো বড়ো নামের দোহাই দিয়া খণ্ডিত করিতে চাই নাই, ইহাতে আমার ধর্মনীতিকে নিজ্‌ত্বের ইংরেজ ও এ-দেশী শিষ্যগণ দুর্বলের ধর্মনীতি ও মুমূর্ষুর সান্ত্বনা বলিয়া অবজ্ঞা করিতে পারেন। আমাদের অবস্থা অস্বাভাবিক; আমাদের বর্তমানের ক্ষেত্র ও ভবিষ্যতের আশা চারি দিকে সংকীর্ণ; আমাদের অন্তর্নিহিত মানসিক শক্তিবিকাশের উৎসাহ ক্ষীণ ও সুযোগ বাধাগ্রস্ত; বড়ো বড়ো উদ্ধত পদমান ও দায়িত্বের নিম্নতলের আওতায় কৃশ ও খর্ব হইয়া আমরা যে-ফল ফলাইয়া থাকি জগতের হাটে তার প্রয়োজন তুচ্ছ, তার দাম যৎকিঞ্চিৎ; অথচ সেই খর্বতাটাই আমাদের চিরস্বভাব এই অপবাদ দিয়া সেই আওতাটাকে চিরনিবিড় করিয়া রাখা আমাদের মতো শুদ্রের পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া দেশে বিদেশে ঘোষণা চলিতেছে। এই অবস্থায় যে-অবসাদ আনে তাহাতে দেশের লোকের মন অন্তরে অন্তরে গুরুভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। এই কারণেই ভয়দ্বেষ-বিবর্জিত আধ্যাত্মিক মুক্তিসাধনের উপদেশ এ-দেশে আজকাল শ্রদ্ধা পায় না। তবু আমার বিশ্বাস, এই সকল বাধার সঙ্গে লড়াই করিয়াও আমাদের আশ্রমের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নাই। কেননা বাধা দুরূহ হইলেও পরমার্থের সত্যটিকে মানুষের সামনে উপস্থিত করিলে সে তাকে একেবারে অশ্রদ্ধা করিতে পারে না— এমন-কি, আমাদের দেশের অত্যন্ত আধুনিক ছেলের পক্ষেও তাহা কঠিন হয়। আমাদের এই স্বভাবসম্বন্ধে পাঞ্জাবের লাটের সঙ্গেও আমার মতের মিল আছে। কিন্তু এক-এক-সময়ে এমন দুর্যোগ আসে যখন এই বাঙালির ছেলের মতো অত্যন্ত ভালোমানুষের কাছেও উচ্চতম সত্যের কথা অবজ্ঞাভাজন হইয়া উঠে। কেননা রিপুর সংঘাতে রিপু জাগে, তখন প্রমত্ততার উপরে কল্যাণকে স্বীকার করা দুঃসাধ্য হয়। আমাদের আশ্রমে দুটি ছোটো ছেলে আছে। তাদের অভিভাবকদের অবস্থা বেশ ভালোই ছিল। বরাবর তারা এখানে থাকিবার খরচ জোগাইয়াছে। কিছুকাল হইল তাদের পরিবারের তিনজন পুরুষের একসঙ্গে অন্তরায়ণ হইয়াছে। এখন আশ্রমবাসের খরচ জোগানো ছেলে দুটির পক্ষে অসম্ভব, আশ্রমে তাদের শিক্ষা ও আহারাদির ভার এখন আশ্রমকেই লইতে হইল। এই ছেলে দুটি কেবল যে নিজের গ্লানি বহিতেছে তা নয়, তাদের মায়ের যে দুঃখ কত তা তারা জানে। যে ব্যথায় অভাবে ও নিরানন্দে তাদের ঘর ভরিয়া উঠিয়াছে তা তাদের অগোচর নাই। বাপকে ম্যালেরিয়ায় ধরিয়াছে, মা ব্যাকুল হইয়া চেষ্টা করিতেছেন যাতে তাঁকে স্বাস্থ্যকর জায়গায় বন্দী রাখা হয়, এই-সমস্ত দুশ্চিন্তার দুঃখ এই শিশু দুটিকেও পীড়া দিতেছে। এ সম্বন্ধে ছেলে দুটির মুখে একটি শব্দ নাই, আমরাও কিছু বলি না— কিন্তু এই ছেলেরা যখন সামনে থাকে তখন

ধৈর্যের কথা, প্রেমের কথা, নিত্যধর্মের প্রতি নিষ্ঠার কথা, সর্বমানবের ভগবানের প্রতি বিশ্বাসের কথা বলিতে আমার কুণ্ঠা বোধ হয়, তখন সেই-সকল লোকের বিদ্রূপহাস্য-কুটিল মুখ আমার মনে পড়ে যাঁরা পাঞ্জাবের লাটের মতোই সাত্ত্বিকতার অতিশৈত্যকে পরিহাস করেন। এমনি করিয়া রিপুর সহিত রিপুর চকমকি ঠোকায় আগুন জ্বলিতেছে; এমনি করিয়া বাংলাদেশের প্রদেশে প্রদেশে দুঃখে আতঙ্কে মানুষ বাহিরের খেদকে অন্তরের নিত্যভাণ্ডারে সঞ্চিত করিতেছে। শাসনকর্তার অদৃশ্য মেঘের ভিতর হইতে হঠাৎ সংসারের মাঝখানে যে-বোমাগুলা আসিয়া পড়িতেছে তাহাতে মরিতেছে বিস্তর অনাথা রমণী এবং অসহায় শিশু। ইহাদিগকে কি **non-combatants** বলিবে না।

যদি জিজ্ঞাসা কর এই দুষ্ট সমস্যার মূল কোথায়, তবে বলিতেই হইবে স্বাধীন শাসনের অভাবে। ইংরেজের কাছে আমরা বড়োই পর, এমন-কি চীন-জাপানের সঙ্গেও তাঁরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি আন্তরিক সামীপ্য অনুভব করেন এ কথা তাঁদের কোনো কোনো বিদ্বান ভ্রমণকারী লিখিয়াছেন। তার পরে আমাদের আধ্যাত্মিকতা আছে, শুনিতেছি তাঁদের সে বালাই নাই— এত বড়ো মূলগত প্রভেদ মানুষে মানুষে আর-কিছু হইতেই পারে না। তার পরে তাঁরা আমাদের ভাষা জানেন না, আমাদের সঙ্গ রাখেন না। যেখানে এত দূরত্ব, এত কম জানা, সেখানে সতর্ক সন্দিগ্ধতা একমাত্র পলিসি হইতে বাধ্য। সেখানে দেশের যে-সব লোক স্বার্থপর ও চতুর, যারা অবৈতনিক গুপ্তচরবৃত্তি করাই উন্নতির উপায় বলিয়া জানে, তাদের বিষাক্ত প্রভাব শাসনতন্ত্রের ছিদ্রে ছিদ্রে প্রবেশ করিয়া তাহাকে মিথ্যায় এবং মিথ্যার চেয়ে ভয়ংকর অর্ধসত্যে ভরিয়া রাখে। যারা স্বার্থের চেয়ে আত্মসম্মানকে বড়ো জানে, যারা নিজের উন্নতির চেয়ে দেশের মঙ্গলকে শ্রেয় বলিয়া জানে, তারা যতক্ষণ না পুলিসের গ্রাসে পড়ে ততক্ষণ এই শাসনব্যবস্থা হইতে যথাসম্ভব দূরে থাকে। এই নিয়ত পা টিপিয়া চলা এবং চুপি চুপি বলা, এই দিনরাত আড়ে আড়ে চাওয়া এবং ঝোপে ঝাড়ে ঘোরা— আর-কিছু নয়, এই যে অবিরত পুলিসের সঙ্গ করা— এই কলুষিত হাওয়ার মধ্যে যে-শাসনকর্তা বাস করেন তাঁর মনের সন্দেহ কাজে নিদারুণ হইয়া উঠিতে কোনো স্বাভাবিক বাধা পায় না। কেননা, তাঁদের কাছে আমরা একটা অবচ্ছিন্ন সত্তা, আমরা কেবলমাত্র শাসিত সম্প্রদায়। সেইজন্য আমাদের ঘরে যখন মা কাঁদিতেছে, স্ত্রী আত্মহত্যা করিতেছে, শিশুদের শিক্ষা বন্ধ; যখন ভাগ্যহীন দেশের বহু দুঃখের সৎচেষ্টাগুলি সি. আই. ডি-র বাঁকা ইশারামাত্রে চারি দিকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে; তখন অপরপক্ষের কোনো মানুষের ডিনারের ক্ষুধা বা

নিশীথনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে না এবং ব্রিজ-খেলাতেও উৎসাহ অক্ষুণ্ণ থাকে। ইহা দোষারোপ করিয়া বলিতেছি না, ইহা স্বাভাবিক। এই-সব মানুষই যেখানে ষোলো-আনা মানুষ, সেখানে আপিসের শুকনো পার্চমেন্টের নীচে হইতে তাদের হৃদয়টা সম্ভবত বাহির হইয়া থাকে। ব্যুরোক্রেসি বলিতে সর্বত্রই সেই কর্তাদের বোঝায় যারা বিধাতার সৃষ্ট মনুষ্যলোক লইয়া কারবার করে না, যারা নিজের বিধানরচিত একটা কৃত্রিম জগতে প্রভুত্বজাল বিস্তার করে। স্বাধীনদেশে এই ব্যুরোক্রেসি সর্বপ্রধান নয়, এইজন্য মানুষ ইহাদের ফাঁকের মধ্য দিয়া বাড়িয়া উঠিতে পারে। অধীনদেশে এই ব্যুরোক্রেসি কোথাও একটুও ফাঁক রাখিতে চায় না। আমরা যখন খোলা আকাশে মাথা তুলিবার জন্য ফাঁকের দরবার করি, তখন ইহাদের ছোটোবড়ো শাখাপ্রশাখা সমুদ্রের এপারে-ওপারে এমনি প্রচণ্ড বেগে আন্দোলিত হইতে থাকে যে তখন আমরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া ভাবি— ফাঁকে কাজ নাই, এখন ঐ ডালের ঝাপটা খাইয়া ভাঙিয়া না পড়িতে হয়। তবু শেষ কথাটা বলিয়া রাখি ; কোনো অস্বাভাবিকতাকে কেবলমাত্র গায়ের জোরে অত্যন্ত বলবান জাতিও শেষ পর্যন্ত সঙিনের আগায় সিধা রাখিতে পারে না। ভার বাড়িয়া ওঠে, হাত ক্লান্ত হয় এবং বিশ্বপৃথিবীর বিপুল ভারাকর্ষণ স্বভাবের অসামঞ্জস্যকে ধূলিসাৎ করিয়া দেয়।

স্বাভাবিকতাটা কী। না, শাসনপ্রণালী যেমনি হোক আর যারই হোক দেশের লোকের সঙ্গে দেশের শাসনতন্ত্রের দায়িত্বের যোগ থাকা, দেশের শাসনতন্ত্রের প্রতি দেশের লোকের মমত্ব থাকা। সেই শাসন নিরবচ্ছিন্ন বাহিরের জিনিস হইলে তার প্রতি প্রজার ঔদাসীন্য বিতৃষ্ণায় পরিণত হইবেই হইবে। আবার সেই বিতৃষ্ণাকে যাঁরা বাহিরের দিক হইতেই দমন করিতে থাকেন তাঁরা বিতৃষ্ণাকে বিদ্বেষে পাকাইয়া তোলেন। এমনি করিয়া সমস্যা কেবলই জটিলতর হইতে থাকে।

বর্তমান যুগসত্যের দূত হইয়া ইংরেজ এ-দেশে আসিয়াছেন। যে-কালের যাহা সব-চেয়ে বড়ো বিশ্বসম্পদ তাহা নানা আকারে নানা উপায়ে দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িবেই। যাঁরা সেই সম্পদের বাহন, তাঁরা যদি লোভের বশ হইয়া কৃপণতা করেন, তবে তাঁরা ধর্মের অভিপ্রায়কে অনর্থক বাধা দিয়া দুঃখ সৃষ্টি করিবেন, কিন্তু তাঁরা যে-আগুন বহন করিতেছেন তাকে চাপা দিয়া রাখিতে পারিবেন না। যাহা দিবার তাহা তাঁহাদিগকে দিতেই হইবে, কেননা এ দানে তাঁহারা উপলক্ষ, এ দান এখনকার যুগের দান। কিন্তু অস্বাভাবিকতা হইতেছে এই যে, তাঁদের ঐতিহাসিক শুক্লপক্ষের দিকে তাঁরা যে-সত্যকে বিকীর্ণ করিতেছেন, তাঁদের ঐতিহাসিক কৃষ্ণপক্ষের দিকে তাঁরাই সেই সত্যকে শাসনের অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিতেছেন। কিন্তু নিজের প্রকৃতির এক

অংশকে তাঁরা আরেক অংশ দিয়া কিছুতেই প্রবঞ্চিত করিতে পারিবেন না। বড়ো-ইংরেজকে ছোটো-ইংরেজ চিরদিন স্বার্থের বাঁধ দিয়া ঠেকাইবার চেষ্টা করিলে দুঃখ-দুর্গতি বাড়াইতে থাকিবেন। ঐতিহাসিক খেলায় হাতের কাগজ দেখাইয়া খেলা হয় না। তার পরিণাম সমস্ত হিসাবের বিরুদ্ধে হঠাৎ দেখা দিয়া চমক লাগায়। এইজন্য মোটের উপর এই তত্ত্বটা বলা যায় যে, কোনো অস্বাভাবিকতাকে দীর্ঘকাল প্রশ্রয় দিতে দিতে যখন মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে আমার তৈরি নিয়মই নিয়ম, তখনই ইতিহাস হঠাৎ একটা সামান্য ঠোকর খাইয়া উল্‌টাইয়া পড়ে। শত বৎসর ধরিয়া মানুষ মানুষের কাছে আছে অথচ তার সঙ্গে মানবসম্বন্ধ নাই; তাকে শাসন করিতেছে অথচ তাকে কোনোমতেই আত্মীয় করিতেছে না; পূর্বধরণীর প্রাচীর ভাঙিয়া পশ্চিম একেবারে তার গোলাবাড়ির ভিতরে আসিয়া পড়িল অথচ এ মন্ত্র ছাড়িল না যে, '**never the twain shall meet**'; এত-বড়ো অস্বাভাবিকতার দুঃখকর বোঝা বিশ্বে কখনোই অটল হইয়া থাকিতে পারে না। যদি ইহার কোনো স্বাভাবিক প্রতিকার না থাকে তবে একটা ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডির পঞ্চমাঙ্কে ইহার যবনিকা পতন হইবে। ভারতবর্ষে আমাদের দুর্গতির যে মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি, তারও তো পালা অনেক যুগ ধরিয়া এমনি করিয়া রচিত হইয়াছিল। আমরাও মানুষকে কাছাকাছি রাখিয়াও দূরে ঠেকাইবার বিস্তারিত আয়োজন করিয়াছি; যে-অধিকারকে সকলের চেয়ে মূল্যবান বলিয়া নিজে গ্রহণ করিলাম, অন্যকে কেবলই তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি; আমরাও 'স্বধর্ম' বলিয়া একটা বড়ো নাম দিয়া মানুষের অবমাননা করিয়া নিত্যধর্মকে পীড়িত করিয়াছি। শাস্ত্রবিধির অতি কঠিন বাঁধন দিয়াও এই অস্বাভাবিকতাকে, এই অপবিত্র দেবদ্রোহকে আমরা নিজের ইতিহাসের অনুকূল করিয়া তুলিতে পারি নাই। মনে করিয়াছিলাম, আমাদের বল এইখানেই, কিন্তু এইখানেই আমাদের সকলের চেয়ে দুর্বলতা। এইখানেই শতাব্দীর পর শতাব্দী আমরা প্রতি পদে কেবল আপনাকে মারিতে মারিতে মরিয়াছি।

বর্তমানের চেহারা যেমনি হোক, তবু এই আশা এই বিশ্বাস মনে দৃঢ় করিয়াছি যে, পশ্চিম পূর্বের সহিত মিলিবে। কিন্তু এইখানে আমাদেরও কর্তব্য আছে। আমরা যদি ছোটো হইয়া ভয় পাই তবে ইংরেজও ছোটো হইয়া ভয় দেখাইবে। ছোটো-ইংরেজের সমস্ত জোর আমাদের ছোটো শক্তির উপরে। পৃথিবীর সেই ভাবী যুগ আসিয়াছে, অস্ত্রের বিরুদ্ধে নিরস্ত্রকে দাঁড়াইতে হইবে। সেদিন, যে মারিতে পারিবে তার জিত হইবে না, যে মরিতে পারিবে তারই জয় হইবে। সেদিন দুঃখ দেয় যে-মানুষ তার পরাভব হইবে, দুঃখ পায় যে-মানুষ তারই শেষ গৌরব। সেদিন মাংসপেশীর

সহিত আত্মার শক্তির সংগ্রাম হইয়া মানুষ জানাইয়া দিবে যে সে পশু নয়, প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়ম সে অতিক্রম করিয়াছে। এই মহত্ত্ব প্রমাণ করিবার ভার আমাদের উপর আছে। পূর্ব-পশ্চিমের যদি মিলন ঘটে তবে একটা মহৎ আইডিয়ালের উপর হইবে। তাহা নিছক অনুগ্রহের উপরে হইবে না। এবং কামান বন্দুক এবং রণতরীর উপরও হইবে না। দুঃখকে আমাদের সহায় করিতে হইবে, মৃত্যুকে আমাদের সহায় করিতে হইবে, তবে মৃত্যুঞ্জয় আমাদের সহায় হইবেন। আমরা যদি শক্তি না পাই তবে অশক্তের সহিত শক্তের মিলন সম্পূর্ণ হইতে পারিবে না। একতরফা আধিপত্যের যোগ যোগই নহে। আমাদিগকে নিজের শক্তিতেই পরের শক্তির সঙ্গে সন্ধি করিতে হইবে। সেই শক্তি ধার-করা শক্তি, ভিক্ষা-করা শক্তি না হউক। তাহা সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য দুঃখ সহিবার অপরিসীম শক্তি হউক। জগতে কাহারও সাধ্য নাই, দুঃখের শক্তিকে ত্যাগের শক্তিকে ধর্মের শক্তিকে বলির পশুর মতো শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারে। তাহা হারিয়া জেতে, তাহা মরিয়া অমর হয়, এবং মাংসপেশী আপন জয়স্তম্ভ নির্মাণ করিতে গিয়া হঠাৎ দেখিতে পায় সে পক্ষাঘাতে অচল হইয়াছে।

১৩২৪

বাতায়নিকের পত্র

এক দিকে আমাদের বিশ্বজগৎ, আর একদিকে আমাদের কর্মসংসার। সংসারটাকে নিয়ে আমাদের যত ভাবনা, জগৎটাকে নিয়ে আমাদের কোনো দায় নেই। এইজন্যে জগতের সঙ্গে আমাদের অহেতুক আত্মীয়তার সম্বন্ধটাকে যতটা পারি আড়াল করে রাখতে হয়, নইলে সংসারের ভাগে মনোযোগের কমতি প'ড়ে কাজের ক্ষতি হয়। তাই আমাদের আপিস থেকে বিশ্বকে বারোমাস ঠেকিয়ে রাখতে রাখতে এমনি হয় যে দরকার পড়লেও আর তার উদ্দেশ পাওয়া যায় না।

দরকার পড়েও। কেননা বিশ্বটা সত্য। সত্যের সঙ্গে কাজের সম্বন্ধ নাও যদি থাকে তবু অন্য সম্বন্ধ আছেই। সেই সম্বন্ধকে অন্যমনস্ক হয়ে অস্বীকার করলেও তাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অবশেষে কর্মে ক্লান্তি আসে, দিনের আলো ম্লান হয়, সংসারের বদ্ধ আয়তনের মধ্যে গুমট অসহ্য হয়ে উঠতে থাকে। তখন মন তার হিসাবের পাকা খাতা বন্ধ করে বলে ওঠে, বিশ্বকে আমার চাই, নইলে আর বাঁচিনে।

কিন্তু নিকটের সব দরজাগুলোর তালায় মরচে পড়ে গেছে, চাবি আর খোলে না। রেলভাড়া করে দূরে যেতে হয়। আপিসের ছাদটার উপরেই এবং তার আশেপাশেই যে-আকাশ নীল, যে-ধরণী শ্যামল, যে-জলের ধারা মুখরিত, তাকেই দেখবার জন্যে ছুটে যেতে হয় এটোয়া কাটোয়া ছোটোনাগপুরে।

এত কথা হঠাৎ আমার মনে উদয় হল কেন বলি। তোমরা সবাই জানো, পুরাকালে একসময়ে আমি সম্পূর্ণ বেকার ছিলুম। অর্থাৎ আমার প্রধান সম্বন্ধ ছিল বিশ্বজগতের সঙ্গে। তার পরে কিছুকাল থেকে সেই আমার প্রথমবয়সের সমস্ত অকৃতকর্মের বকেয়া শোধে লেগে গিয়েছিলুম। অর্থাৎ এখনকার প্রধান সম্বন্ধ হল সংসারের সঙ্গে। অথচ তখনকার সঙ্গে এখনকার দিনের যে এতবড়ো একটা বিচ্ছেদ ঘটেছে, কাজ করতে করতে তা ভুলে গিয়েছিলুম। এই ভোলবার ক্ষমতাই হচ্ছে মনের বিশেষ ক্ষমতা। সে দুনৌকোয় পা দেয় না; সে যখন একটা নৌকোয় থাকে তখন অন্য নৌকোটাকে পিছনে বেঁধে রাখে।

এমন সময় আমার শরীর অসুস্থ হল। সংসারের কাছ থেকে কিছুদিনের মতো ছুটি মিলল। দোতলা ঘরের পুব দিকের প্রান্তে খোলা জানলার ধারে একটা লম্বা কেদারায় ঠেস দিয়ে বসা গেল। দুটো দিন না-যেতেই দেখা গেল অনেক দূরে এসে পড়েছি, রেলভাড়া দিয়েও এতদূরে আসা যায় না।

যখন আমেরিকায় যাই, জাপানে যাই, ভ্রমণের কথায় ভরে ভরে তোমাদের চিঠি লিখে পাঠাই। পথ-খরচাটার সমান ওজনের গৌরব তাদের দিতে হয়। কিন্তু এই যে আমার নিখরচার যাত্রা কাজের পার থেকে অকাজের পারে, তারও ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখা চলে— মাঝে মাঝে লিখব। মুশকিল এই যে, কাজের মধ্যে মধ্যে অবকাশ মেলে কিন্তু পুরো অবকাশের মধ্যে অবকাশ বড়ো দুর্লভ। আরো একটা কথা এই যে, আমার এই নিখরচার ভ্রমণবৃত্তান্ত বিনা-কড়ি দামের উপযুক্ত নেহাত হালকা হওয়া উচিত— লেখনীর পক্ষে সেই হালকা চাল ইচ্ছা করলেই হয় না; কারণ লেখনী স্বভাবতই গজেন্দ্রগামিনী।

জগৎটাকে কেজো অভ্যাসের বেড়ার পারে ঠেলে রেখে অবশেষে ক্রমে আমার ধারণা হয়েছিল আমি খুব কাজের লোক। এই ধারণাটা জন্মালেই মনে হয় আমি অত্যন্ত দরকারী; আমাকে না হলে চলে না। মানুষকে বিনা মাইনেয় খাটিয়ে নেবার জন্যে প্রকৃতির হাতে যে-সমস্ত উপায় আছে এই অহংকারটা সকলের সেরা। টাকা নিয়ে যারা কাজ করে তারা সেই টাকার পরিমাণেই কাজ করে, সেটা একটা বাঁধা পরিমাণ; কাজেই তাদের ছুটি মেলে— বরাদ্দ ছুটির বেশি কাজ করাকে তারা

লোকসান বলে গণ্য করে। কিন্তু অহংকারের তাগিদে যারা কাজ করে তাদের আর ছুটি নেই ; লোকসানকেও তারা লোকসান জ্ঞান করে না।

আমাকে নইলে চলে না, এই কথা মনে করে এতদিন ভারি ব্যস্ত হয়ে কাজ করা গেছে, চোখের পলক ফেলতে সাহস হয় নি। ডাক্তার বলেছে, "এইখানেই বাস করো, একটু থামো।" আমি বলেছি, "আমি থামলে চলে কই।" ঠিক এমন সময়ে চাকা ভেঙে আমার রথ এই জানলাটার সামনে এসে থামল। এখানে দাঁড়িয়ে অনেকদিন পরে ঐ মহাকাশের দিকে তাকালুম। সেখানে দেখি মহাকালের রথযাত্রায় লক্ষ লক্ষ অগ্নিচক্র ঘুরতে ঘুরতে চলেছে ; না উড়ছে ধুলো, না উঠছে শব্দ, না পথের গায়ে একটুও চিহ্ন পড়ছে। ঐ রথের চলার সঙ্গে বাঁধা হয়ে বিশ্বের সমস্ত চলা অহরহ চলেছে। এক মুহূর্তে আমার যেন চটক ভেঙে গেল। মনে হল স্পষ্ট দেখতে পেলুম, আমাকে না হলেও চলে। কালের ঐ নিঃশব্দ রথচক্র কারো অভাবে, কারো শৈথিল্যে, কোথাও এক তিল বা এক পল বেধে যাবে এমন লক্ষণ তো দেখি নে। 'আমি-নইলে-চলে-না'র দেশ থেকে 'আমি-নইলে-চলে'র দেশে ধাঁ করে এসে পৌঁচেছি কেবলমাত্র ঐ ডেস্কের থেকে এই জানলার ধারটুকুতে এসে।

কিন্তু কথাটাকে এত সহজে মেনে নিতে পারব না। মুখে যদি বা মানি, মন মানে না। আমি থাকলেও যা আমি গেলেও তা, এইটেই যদি সত্য হবে তবে আমার অহংকার এক মুহূর্তের জন্যেও বিশ্বে কোথাও স্থান পেলে কী করে। তার টিঁকে থাকবার জোর কিসের উপরে। দেশকাল জুড়ে আয়োজনের তো অন্ত নেই, তবু এত ঐশ্বর্যের মধ্যে আমাকে কেউ বরখাস্ত করতে পারলে না। আমাকে না হলে চলে না তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, আমি আছি।

আমি যে আছি সেই থাকার মূল্যই হচ্ছে অহংকার। এই মূল্য যতক্ষণ নিজের মধ্যে পাচ্ছি ততক্ষণ নিজেকে টিঁকিয়ে রাখবার সমস্ত দায় সমস্ত দুঃখ অনবরত বহন করে চলেছি। সেইজন্য বৌদ্ধরা বলেছে, এই অহংকারটাকে বিসর্জন করলেই টিঁকে থাকার মূল মেরে দেওয়া হয়, কেননা তখন আর টিঁকে থাকার মজুরি পোষায় না।

যাই হোক এই মূল্য তো কোনো-একটা ভাণ্ডার থেকে জোগানো হয়েছে। অর্থাৎ আমি থাকি এরই গরজ কোনো-এক জায়গায় আছে ; সেই গরজ অনুসারেই আমাকে মূল্য দেওয়া হয়েছে। আমি থাকি এই ইচ্ছার আনুচর্য সমস্ত বিশ্ব করছে, বিশ্বের সমস্ত অণুপরমাণু। সেই পরম-ইচ্ছার গৌরবই আমার অহংকারে বিকশিত। সেই ইচ্ছার গৌরবেই এই অতিক্ষুদ্র আমি বিশ্বের কিছুর চেয়েই পরিমাণ ও মূল্যে কম নই।

এই ইচ্ছাকে মানুষ দুই রকম ভাবে দেখেছে। কেউ বলেছে এ হচ্ছে শক্তিময়ের

খেয়াল, কেউ বলেছে এ হচ্ছে আনন্দময়ের আনন্দ। আর যারা বলেছে, এ হচ্ছে মায়া, অর্থাৎ যা নেই তারই থাকা, তাদের কথা ছেড়ে দিলুম।

আমার থাকাটা শক্তির প্রকাশ, না, প্রীতির প্রকাশ, এইটে যে-যেমন মনে করে সে সেইভাবে জীবনের লক্ষ্যকে স্থির করে। শক্তিতে আমাদের যে-মূল্য দেয় তার এক চেহারা, আর প্রীতিতে আমাদের যে-মূল্য দেয় তার চেহারা সম্পূর্ণ আলাদা। শক্তির জগতে আমার অহংকারের যে দিকে গতি, প্রীতির জগতে আমার অহংকারের গতি ঠিক তার উল্‌টো দিকে।

শক্তিকে মাপা যায়; তার সংখ্যা, তার ওজন, তার বেগ সমস্তেরই আয়তন গণিতের অঙ্কের মধ্যে ধরা পড়ে। তাই যারা শক্তিকেই চরম বলে জানে তারা আয়তনে বড়ো হতে চায়। টাকার সংখ্যা, লোকের সংখ্যা, উপকরণের সংখ্যা, সমস্তকেই তারা কেবল বহুগুণিত করতে থাকে।

এইজন্যেই সিদ্ধিলাভের কামনায় এরা অন্যের অর্থ, অন্যের প্রাণ, অন্যের অধিকারকে বলি দেয়। শক্তিপূজার প্রধান অঙ্গ বলিদান। সেই বলির রক্তে পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে।

বস্তুতন্ত্রের প্রধান লক্ষণই হচ্ছে তার বাহ্যপ্রকাশের পরিমাপ্যতা— অর্থাৎ তার সসীমতা। মানুষের ইতিহাসে যত-কিছু দেওয়ানি এবং ফৌজদারি মামলা তার অধিকাংশই এই সীমানার চৌহদ্দি নিয়ে। পরিমাণের দিকে নিজের সীমানা অত্যন্ত বাড়াতে গেলেই পরিমাণের দিকে অন্যের সীমানা কাড়তে হয়। অতএব শক্তির অহংকার যেহেতু আয়তন বিস্তারেরই অহংকার, সেইজন্যে এই দিকে দাঁড়িয়ে খুব লম্বা দূরবীন কষলেও লড়াইয়ের রক্তসমুদ্র পেরিয়ে শান্তির কূল কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না।

কিন্তু এই যে বস্তুতান্ত্রিক বিশ্ব, এই যে শক্তির ক্ষেত্র, এর আয়তনের অঙ্কগুলো যোগ দিতে দিতে হঠাৎ এক জায়গায় দেখি তেরিজটা একটানা বেড়ে চলবার দিকেই ছুটছে না। বেড়ে চলবার তত্ত্বের মধ্যে হঠাৎ উঁচোট খেয়ে দেখা যায় সুষমার তত্ত্ব পথ আগলে। দেখি কেবলই গতি নয়, যতিও আছে। ছন্দের এই অমোঘ নিয়মকে শক্তি যখন অন্ধ অহংকারে অতিক্রম করতে যায় তখনি তার আত্মঘাত ঘটে। মানুষের ইতিহাসে এইরকম বার বার দেখা যাচ্ছে। সেইজন্যে মানুষ বলেছে, অতি দর্পে হতা লঙ্কা। সেইজন্যে ব্যাবিলনের অভ্রভেদী সৌধচূড়ার পতনবার্তা এখনো মানুষ স্মরণ করে।

তবেই দেখছি, শক্তিতত্ত্ব, যার বাহ্যপ্রকাশ আয়তনে, সেটাই চরমতত্ত্ব এবং

পরমতত্ত্ব নয়। বিশ্বের তাল-মেলাবার বেলায় আপনাকে তার থামিয়ে দিতে হয়। সেই সংযমের সিংহদ্বারই হচ্ছে কল্যাণের সিংহদ্বার। এই কল্যাণের মূল্য আয়তন নিয়ে নয়, বহুলতা নিয়ে নয়। যে এঁকে অন্তরে জেনেছে, সে ছিন্ন কন্থায় লজ্জা পায় না, সে রাজমুকুট ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়তে পারে।

শক্তিতত্ত্ব থেকে সুষমাতত্ত্বে এসে পৌঁছিয়েই বুঝতে পারি, ভুল জায়গায় এতদিন এত নৈবেদ্য জুগিয়েছি। বলির পশুর রক্তে যে-শক্তি ফুলে উঠল সে কেবল ফেটে মরবার জন্যেই। তার পিছনে যতই সৈন্য যতই কামান লাগাই না কেন, রণতরীর পরিধি যতই বৃদ্ধির দিকে নিয়ে চলি, লুঠের ভাগকে যতই বিপুল করে তুলতে থাকি, অঙ্কের জোরে মিথ্যাকে সত্য করা যাবে না, শেষকালে ঐ অতিবড়ো অঙ্কেরই চাপে নিজের বস্তার নীচে নিজে গুঁড়িয়ে মরতে হবে।

যাজ্ঞবল্ক্য যখন জিনিসপত্র বুঝিয়ে সুঝিয়ে দিয়ে এই অঙ্ক-কষার রাজ্যে মৈত্রেয়ীকে প্রতিষ্ঠিত করে বিদায় নিচ্ছিলেন, তখনই মৈত্রেয়ী বলেছিলেন, যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্! বহু, বহু, বহু, সব বহুকে জুড়ে জুড়েও, অঙ্কের পর অঙ্ক, যোগ করে করেও তবু তো অমৃতে গিয়ে পৌঁছনো যায় না। শব্দকে কেবলই অত্যন্ত বাড়িয়ে দিয়ে এবং চড়িয়ে দিয়ে যে-জিনিসটা পাওয়া যায় সেটা হল হুংকার আর শব্দকে সুর দিয়ে লয় দিয়ে সংযত সম্পূর্ণতা দান করলে যে-জিনিসটা পাওয়া যায় সেইটেই হল সংগীত; ঐ হুংকারটা হল শক্তি, এর পরিমাণ পাওয়া যায়, আর সংগীতটা হল অমৃত, হাতে বহরে ওকে কোথাও মাপবার জো নেই।

এই অমৃতের ক্ষেত্রে মানুষের অহংকারের স্রোত নিজের উল্‌টো দিকে, উৎসর্জনের দিকে। মানুষ আপনার দিকে কেবলই সমস্তকে টানতে টানতে প্রকাণ্ডতা লাভ করে, কিন্তু আপনাকে সমস্তর দিকে উৎসর্গ করতে করতে সে সামঞ্জস্য লাভ করে। এই সামঞ্জস্যেই শান্তি। কোনো বাহ্যব্যবস্থাকে বিস্তীর্ণতর করার দ্বারা শক্তিমানের সঙ্গে শক্তিমানকে জোড়া দিয়ে পুঞ্জীভূত করার দ্বারা, কখনোই সেই শান্তি পাওয়া যাবে না যে-শান্তি সত্যে প্রতিষ্ঠিত, যে-শান্তি অলোভে, যে-শান্তি সংযমে, যে-শান্তি ক্ষমায়।

প্রশ্ন তুলেছিলুম— আমার সত্তার পরমমূল্যটি কোন্ সত্যের মধ্যে। শক্তিময়ের শক্তিতে, না, আনন্দময়ের আনন্দে?

শক্তিকেই যদি সেই সত্য বলে বরণ করি তা হলে বিরোধকেও চরম ও চিরন্তন বলে মানতেই হবে। য়ুরোপের অনেক আধুনিক লেখক সেই কথাই স্পর্ধাপূর্বক প্রচার করছেন। তাঁরা বলছেন, শান্তির ধর্ম, প্রেমের ধর্ম, দুর্বলের আত্মরক্ষা করবার কৃত্রিম দুর্গ; বিশ্বের বিধান এই দুর্গকে খাতির করে না; শেষ পর্যন্ত শক্তিরই জয় হয়—

অতএব ভীরু ধর্মভাবুকের দল যাকে অধর্ম বলে নিন্দা করে, সেই অধর্মই কৃতার্থতার দিকে মানুষকে নিয়ে যায়।

অন্তদল সে কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে না; সমস্ত মেনে নিয়েই তারা বলে:

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি,
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।

ঐশ্বর্যগর্বেও মানুষের মন বাহিরের দিকে বিক্ষিপ্ত হয়, আবার দারিদ্র্যের দুঃখে ও অপমানেও মানুষের সমস্ত লোলুপ প্রবৃত্তি বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এই দুই অবস্থাতেই মানুষ সকল দেবতার উপরে সেই শক্তিকে আসন দিতে লজ্জিত হয় না— যে ক্রূর শক্তির দক্ষিণহস্তে অন্যায়ের এবং বামহস্তে ছলনার অস্ত্র। প্রতাপসম্মানমত্ত য়ুরোপের পলিটিক্স্ এই শক্তিপূজা। এইজন্য সেখানকার ডিপ্লোমেসি কেবলই প্রকাশ্যতাকে এড়িয়ে চলতে চায়; অর্থাৎ সেখানে শক্তি যে-মূর্তি ধারণ করেছে সে সম্পূর্ণ উলঙ্গমূর্তি নয়; কিন্তু তার লেলিহান রসনার উলঙ্গতা কোথাও ঢাকা নেই। ঐ দেখো পীস্-কন্‌ফারেন্সের সভাক্ষেত্রে তা লক্‌লক্ করছে।

অপরপক্ষে একদা আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় উচ্ছৃঙ্খলতার সময় ভীত পীড়িত প্রজা আপন কবিদের মুখ দিয়ে শক্তিরই স্তবগান করিয়েছে। কবিকঙ্কণচণ্ডী, অন্নদামঙ্গল, মনসার ভাসান, প্রকৃতপক্ষে অধর্মেরই জয়গান। সেই কাব্যে অন্যায়কারিণী ছলনাময়ী নিষ্ঠুর শক্তির হাতে শিব পরাভূত। অথচ অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, এই পরাভব-গানকেই মঙ্গলগান নাম দেওয়া হল।

আজকের দিনেও দেখি আমাদের দেশে সেই হাওয়া উঠেছে। আমরা ধর্মের নাম করেই একদল লোক বলছি, ধর্মভীরুতাও ভীরুতা; বলছি, যারা বীর, অন্যায় তাদের পক্ষে অন্যায় নয়। তাই দেখি সাংসারিকতায় যারা কৃতার্থ এবং সাংসারিকতায় যারা অকৃতার্থ, দুইয়েরই সুর এক জায়গায় এসে মেলে। ধর্মকে উভয়েই বাধা বলে জানে— সেই বাধা গায়ের জোরে অতিক্রম করতে চায়। কিন্তু গায়ের জোরই পৃথিবীতে সবচেয়ে বড়ো জোর নয়।

এই বড়ো দুঃসময়ে কামনা করি শক্তির বীভৎসতাকে কিছুতে আমরা ভয়ও করব না, ভক্তিও করব না— তাকে উপেক্ষা করব, অবজ্ঞা করব। সেই মনুষ্যত্বের অভিমান আমাদের হোক, যে-অভিমানে মানুষ এই স্থূল বস্তুজগতের প্রবল প্রকাণ্ডতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে মাথা তুলে বলতে পারে, আমার সম্পদ এখানে নয়; বলতে পারে, শৃঙ্খলে আমি বন্দী হই নে, আঘাতে আমি আহত হই নে, মৃত্যুতে আমি মরি নে; বলতে পারে, যেনাহং নামৃতঃ স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্। আমাদের পিতামহেরা বলে গেছেন,

এতদমৃতমভয়ং শান্ত উপাসীত— যিনি অমৃত, যিনি অভয় তাঁকে উপাসনা করে শান্ত হও। তাঁদের উপদেশকে আমরা মাথায় লই, এবং মৃত্যু ও সকল ভয়ের অতীত যে-শান্তি সেই শান্তিতে প্রতিষ্ঠালাভ করি।

২

কারো উঠোন চষে দেওয়া আমাদের ভাষায় চূড়ান্ত শাস্তি বলে গণ্য। কেননা উঠোনে মানুষ সেই বৃহৎ সম্পদকে আপন করেছে, যেটাকে বলে ফাঁক। বাহিরে এই ফাঁক দুর্লভ নয়, কিন্তু সেই বাহিরের জিনিসকে ভিতরের করে আপনার করে না তুললে তাকে পেয়েও না পাওয়া হয়। উঠোনে ফাঁকটাকে মানুষ নিজের ঘরের জিনিস করে তোলে; ঐখানে সূর্যের আলো তার ঘরের আপনার আলো হয়ে দেখা দেয়, ঐখানে তার ঘরের ছেলে আকাশের চাঁদকে হাততালি দিয়ে ডাকে। কাজেই উঠোনকেও যদি বেকার না রেখে তাকে ফসলের খেত বানিয়ে তোলা যায়, তা হলে যে-বিশ্ব মানুষের আপন ঘরের বিশ্ব, তারই বাসা ভেঙে দেওয়া হয়।

সত্যকার ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে প্রভেদ এই যে, ধনী এই ফাঁকটাকে বড়ো করে রাখতে পারে। যে-সমস্ত জিনিসপত্র দিয়ে ধনী আপনার ঘর বোঝাই করে তার দাম খুব বেশি, কিন্তু যে-ফাঁকটা দিয়ে তার আঙিনা হয় প্রশস্ত, তার বাগান হয় বিস্তীর্ণ সেইটেই হচ্ছে সবচেয়ে দামী। সদাগরের দোকানঘর জিনিসপত্রে ঠাসা; সেখানে ফাঁক রাখবার শক্তি তার নেই। দোকানে সদাগর কৃপণ, সেখানে লক্ষপতি হয়েও সে দরিদ্র। কিন্তু সেই সদাগরের বাসের বাড়িতে ঘরগুলো লম্বায় চওড়ায় উঁচুতে সকল দিকেই প্রয়োজনকে ধিক্কার করে ফাঁকটাকেই বেশি আদর দিয়েছে, আর বাগানের তো কথাই নেই। এইখানেই সদাগর ধনী।

শুধু কেবল জায়গার ফাঁকা নয়, সময়ের ফাঁকাও বহুমূল্য। ধনী তার অনেক টাকা দিয়ে এই অবকাশ কিনতে পায়। তার ঐশ্বর্যের প্রধান লক্ষণ এই যে, লম্বা লম্বা সময় সে ফেলে রাখতে পারে। হঠাৎ কেউ তার সময়ের উঠোন চষতে পারে না।

আরেকটা ফাঁকা, যেটা সবচেয়ে দামী, সে হচ্ছে মনের ফাঁকা। যা-কিছু নিয়ে মন চিন্তা করতে বাধ্য হয়, কিছুতেই ছাড় পায় না, তাকেই বলে দুশ্চিন্তা। গরিবের চিন্তা, হতভাগার চিন্তা মনকে একেবারে আঁকড়ে থাকে, অশথগাছের শিকড়গুলো ভাঙা মন্দিরকে যে-রকম আঁকড়ে ধরে। দুঃখ জিনিসটা আমাদের চৈতন্যের ফাঁক বুজিয়ে দেয়। শরীরের সুস্থ অবস্থা তাকেই বলে যেটা হচ্ছে শারীরচৈতন্যের ফাঁকা ময়দান। কিন্তু হোক দেখি বাঁ পায়ের কড়ে আঙুলের গাঁটের প্রান্তে বাতের বেদনা,

অমনি শারীরচৈতন্যের ফাঁক বুজে যায়, সমস্ত চৈতন্য ব্যথায় ভরে ওঠে। মন যে ফাঁকা চায়, দুঃখে সেই ফাঁকা পায় না।

স্থানের ফাঁকা না পেলে যেমন ভালো করে বাঁচা যায় না, তেমনি সময়ের ফাঁকা, চিন্তার ফাঁকা না পেলে মন বড়ো করে ভাবতে পারে না ; সত্য তার কাছে ছোটো হয়ে যায়। সেই ছোটো-সত্য মিটমিটে আলোর মতো ভয়কে প্রশ্রয় দেয়, দৃষ্টিকে প্রতারণা করে এবং মানুষের ব্যবহারের ক্ষেত্রকে সংকীর্ণ করে রাখে।

আজকের দিনে ভারতবাসী হয়ে নিজের সকলের চেয়ে বড়ো দৌর্ভাগ্য অনুভব করছি এই জানলার কাছটাতে এসে। আমাদের ভাগ্যে জানলার ফাঁক গেছে বুজে ; জীবনের এ-কোণে ও-কোণে একটু আধটু যা ছুটির পোড়ো জায়গা ছিল তা কাঁটাগাছে ভরে গেল।

প্রাচীন ভারতে একটা জিনিস প্রচুর ছিল, সেটাকে আমরা খুব মহামূল্য বলেই জানি, সে হচ্ছে সত্যকে খুব বড়ো করে ধ্যান করবার এবং উপলব্ধি করবার মতো মনের উদার অবকাশ। ভারতবর্ষ একদিন সুখ এবং দুঃখ, লাভ এবং অলাভের উপরকার সবচেয়ে বড়ো ফাঁকায় দাঁড়িয়ে সেই সত্যকেই সুস্পষ্ট করে দেখছিল, যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।

কিন্তু আজকের দিনে ভারতবর্ষের সেই ধ্যানের বড়ো অবকাশটি নষ্ট হল। আজকের দিনে ভারতবাসীর আর ছুটি নেই ; তার মনের অন্তরতম ছুটির উৎসটি শুকিয়ে শুকিয়ে মরে গেল, বেদনায় তার সমস্ত চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে।

তাই আজ যখনই এই বাতায়নে এসে বসেছি, অমনি দেখি আমাদের আঙিনা থেকে উঠছে দুর্বলের কান্না ; সেই দুর্বলের কান্নায় আমাদের উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম, সমস্ত অবকাশ একেবারে পরিপূর্ণ। আজকের দিনে দুর্বল যত ভয়ংকর দুর্বল, জগতের ইতিহাসে এমন আর-কোনো দিনই ছিল না।

বিজ্ঞানের কৃপায় বাহুবল আজ নিদারুণ দুর্জয়। পালোয়ান আজ জল স্থল আকাশ সর্বত্রই সিংহনাদে তাল ঠুকে বেড়াচ্ছে। আকাশ একদিন মানুষের হিংসাকে আপন সীমানায় ঢুকতে দেয় নি। মানুষের ক্রূরতা আজ সেই শূন্যকেও অধিকার করেছে। সমুদ্রের তলা থেকে আরম্ভ করে বায়ুমণ্ডলের প্রান্ত পর্যন্ত সব জায়গাতেই বিদীর্ণহৃদয়ের রক্ত বয়ে চলল।

এমন অবস্থায়, যখন সবলের সঙ্গে দুর্বলের বৈষম্য এত অত্যন্ত বেশি, তখনও যদি দেখা যায় এতবড়ো বলবানেরও ভীরুতা ঘুচল না, তা হলে সেই ভীরুতার কারণটা ভালো করে ভেবে দেখতে হবে। ভেবে দেখা দরকার এইজন্যে যে, য়ুরোপে

আজকের যে-শান্তিস্থাপনের চেষ্টা হচ্ছে সেই শান্তি টেঁকসই হবে কি না সেটা বিচার করতে হলে এই সমস্ত বলিষ্ঠদের মনস্তত্ত্ব বুঝে দেখা চাই।

যুদ্ধ যখন প্রবল বেগে চলছিল, যখন হারের আশঙ্কা জিতের আশার চেয়ে কম ছিল না, তখন সেই দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় সন্ধির শর্তভঙ্গ, অস্ত্রাদিপ্রয়োগে বিধিবিরুদ্ধতা, নিরস্ত্র শত্রুদের প্রতি বায়ুরথ থেকে অস্ত্রবর্ষণ প্রভৃতি কাণ্ডকে এ-পক্ষ 'ক্রাইম' অর্থাৎ অপরাধ বলে অভিযোগ করেছিলেন। মানুষ 'ক্রাইম' কখন করে? যখন সে ধর্মের গরজের চেয়ে আর-কোনো একটা গরজকে প্রবল বলে মনে করে। যুদ্ধে জয়লাভের গরজটাকেই জর্মনি ন্যায়াচরণের গরজের চেয়ে আশু গুরুতর বোধ করেছিল। এ-পক্ষ যখন সেজন্যে আঘাত পাচ্ছিলেন তখন বলছিলেন, জর্মনির পক্ষে কাজটা একেবারেই ভালো হচ্ছে না; হোক-না যুদ্ধ, তাই বলে কি আইন নেই ধর্ম নেই। আর যখন বিজিতপ্রদেশে জর্মনি লঘুপাপে গুরুদণ্ড দিতে দয়াবোধ করে নি তখন আশু প্রয়োজনের দিক থেকে জর্মনির পক্ষে তার কারণ নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু এ-পক্ষে বলেছিল, আশু প্রয়োজনসাধনাটাই কি মানুষের চরম মনুষ্যত্ব। সভ্যতার কি একটা দায়িত্ব নেই। সেই দায়িত্বরক্ষার চেয়ে যারা উপস্থিত কাজ-উদ্ধারকেই বড়ো মনে করে তারা কি সভ্যসমাজে স্থান পেতে পারে।

ধর্মের দিক থেকে এ-সকল কথার একেবারে জবাব নেই। শুনে আমাদের মনে হয়েছিল যুদ্ধের অগ্নিতে এবার বুঝি কলিযুগের সমস্ত পাপ দগ্ধ হয়ে গেল, এতদিন পরে মানুষের দশা ফিরবে, কেননা তার মন ফিরছে। মন না ফিরলে কেবলমাত্র অবস্থা বা ব্যবস্থা পরিবর্তনে কখনোই কোনো ফল পাওয়া যায় না।

কিন্তু আমাদের তখন হিসাবে একটা ভুল হয়েছিল। আমাদের দেশে শ্মশান-বৈরাগ্যকে লোকে সন্দেহের চক্ষে দেখে। তার কারণ, প্রিয়জনের আশু মৃত্যুতে মন যখন দুর্বল তখনকার বৈরাগ্যে বিশ্বাস নেই, সবল মনের বৈরাগ্যই বৈরাগ্য। তেমনি যুদ্ধফলের অনিশ্চয়তায় মন যখন দুর্বল তখনকার ধর্মবাক্যকে ষোলো-আনা বিশ্বাস করা যায় না।

যুদ্ধে এ-পক্ষের জিত হল। এখন কী করলে পৃথিবীতে শান্তির ভিত পাকা হয় তাই নিয়ে পঞ্চায়েত বসে গেছে। কথা-কাটাকাটি, প্রস্তাব-চালাচালি, রাজ্য-ভাগাভাগি চলছে। এই কারখানাঘর থেকে কী আকার এবং কী শক্তি নিয়ে কোন্ যন্ত্র বেরবে তা ঠিক বুঝতে পারছি নে।

আর-কিছু না বুঝি একটা কথা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে আসছে; এত আগুনেও কলিযুগের অন্ত্যেষ্টিসংকার হল না, মন বদল হয় নি। কলিযুগের সেই সিংহাসনটা

আজ কোন্‌খানে। লোভের উপরে। পেতে চাই, রাখতে চাই, কোনোমতেই কোথাও একটুও কিছু ছাড়তে চাই নে। সেইজন্তেই অতিবড়ো বলিষ্ঠের ভয়, কী জানি যদি দৈবাৎ এখন বা সুদূর কালেও একটুখানি লোকসান হয়। যেখানে লোকসান কোনোমতেই সইবে না, সেখানে আইনের দোহাই, ধর্মের দোহাই মিথ্যে। সেখানে অন্যায়কে কর্তব্য বলে আপনাকে ভোলাতে একটুও সময় লাগে না; সেখানে দোষের বিচার দোষের পরিমাণের দিক থেকে নয়, আইনের দিক থেকে নয়, নিজের লোভের দিক থেকে।

এই ভয়ংকর লোভের দিনে সবলকে সবল যখন ভয় করতে থাকে, তখন উচ্চতানের ধর্মের দোহাই দিয়ে রফারফির কথা হতে থাকে, তখন আইনের মধ্যে কোনো ছিদ্র কোনো জায়গায় যাতে একটুও না থাকতে পারে সেই চেষ্টা হয়। কিন্তু দুর্বলকে যখন সেই সময়েই সেই লোভেরই তাড়ায় সবল এতটুকু পরিমাণেও ভয় করে, তখন শাসনের উত্তেজনা কোনো দোহাই মানতে চায় না, তখন আইনের মধ্যে বড়ো বড়ো ছিদ্র খনন করা হয়।

প্রবলের ভয়ে এবং দুর্বলের ভয়ে মস্ত একটা তফাত আছে। দুর্বল ভয় পায় সে ব্যথা পাবে, আর প্রবল ভয় পায় সে বাধা পাবে। সকলেই জানেন কিছুকাল থেকে পাশ্চাত্য দেশে Yellow Peril বা পীতসংকট নাম নিয়ে একটা আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। এই আতঙ্কের মূল কথাটা এই যে, প্রবলের লোভ সন্দেহ করছে পাছে আর কোথাও থেকে সেই লোভ কোনো-একদিন প্রবল বাধা পায়। বাধা পাবার সম্ভাবনা কিসে। যদি আর-কোনো জাতি এই প্রবলদেরই মতো সকল বিষয়ে বড়ো হয়ে ওঠে। তাদের মতো বড়ো হওয়া একটা সংকট— এইটে নিবারণ করবার জন্যে অন্যদের চেপে ছোটো করে রাখা দরকার। সমস্ত পাশ্চাত্য জগৎ আজ এই নীতি নিয়ে বাকি জগতের সঙ্গে কারবার করছে। এই নীতিতে নিরন্তর যে-ভয় জাগিয়ে রাখে তাতে শান্তি টিকতে পারে না।

জগদ্বিখ্যাত ফরাসী লেখক আনাতোল ফ্রাঁস লিখছেন :

It does not, however, appear at first sight that the Yellow Peril at which European economists are terrified is to be compared to the White Peril suspended over Asia. The Chinese do not send to Paris, Berlin, and St. Petersburg missionaries to teach Christians the Fung-Chui, and sow disorder in European affairs. A Chinese expenditionary force did not land in Quiberon Bay to demand of the Government of the Republic extra-territoriality, i.e., the right of trying by a tribunal

of mandarins cases pending between Chinese and Europeans. Admiral Togo did not come and bombard Brest Roads with a dozen battleships, for the purpose of improving Japanese trade in France... He did not burn Versailles in the name of a higher civilisation. The army of the Great Asiatic Powers did not carry away to Tokio and Peking the Louvre paintings and the silver service of the Elysee

No indeed! Monsieur Edmond Thery himself admits that the yellow men are not sufficiently civilised to imitate the whites so faithfully. Nor does he foresee that they will ever rise to so high a moral culture. How could it be possible for them to possess our virtues? They are not Christians. But men entitled to speak consider that the Yellow Peril is none the less to be dreaded for all that it is economic. Japan and China organised by Japan, threaten us in all the markets of Europe, with a competition frightful, monstrous, enormous, and deformed, the mere idea of which causes the hair of the economists to stand on end.

অর্থাৎ লোভ কোথাও বাধা পেতে চায় না। সেইজন্তে যে নীচে আছে তাকে চিরকালই নীচে চেপে রাখতে চায়, এবং যে প্রবল হয়ে ওঠবার লক্ষণ দেখাচ্ছে তাকে অকল্যাণ বলেই গণ্য করে।

যতক্ষণ এই লোভ আছে ততক্ষণ জগতে শান্তি আনে পীস্-কন্ফারেন্সের এমন সাধ্য নেই। কলে অনেক জিনিস তৈরি হচ্ছে কিন্তু কলে-তৈরি শান্তিকে বিশ্বাস করি নে। কর্মিক ধনিকদের মধ্যে যে অশান্তি তারও কারণ লোভ, একরাজ্য-অন্তরাজ্যের মধ্যে যে-অশান্তি তারও কারণ লোভ, আবার রাজা ও প্রজার মধ্যে যে-অশান্তি তারও কারণ লোভ। তাই শেষকালে দাঁড়ায় এই, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

এমন অবস্থায় সবলপক্ষীয়েরা যখন আপোষনিষ্পত্তির যোগে শান্তিকামনা করে তখন তারা নিজেদের পারে পাকাবাঁধ বেঁধে এবং অন্তদের পারে পাকাখাদ কেটে লোভের স্রোতটাকে নিজেদের দিক থেকে অন্ত দিকে সরিয়ে দেয়। বসুন্ধরাকে এমন জায়গায় পরস্পর বখরা করে নিতে চায় যে-জায়গাটা যথেষ্ট নরম, অনায়াসেই যেখানে দাঁত বসে, এবং ছিঁড়তে গিয়ে নখে যদি আঘাত লাগে, নখ তার শোধ তুলতে পারে। কিন্তু জোর করে বলা যায় এমন ভাবে চিরদিন চলবে না; ভাগ সমান হবে না, লোভের ক্ষুধা সব জায়গায় সমান করে ভরবে না, পাপের ছিদ্র নানা জায়গায় থেকে যাবে; হঠাৎ একদিন ভরাডুবি হবে।

বিধাতা আমাদের একটা দিকে নিশ্চিন্ত করেছেন, ঐ বলের দিকটায় আমাদের রাস্তা একেবারে শেষ ফাঁকটুকু পর্যন্ত বন্ধ, যে-আশা রাস্তা না পেলেও উড়ে চলে সেই আশারও ডানা কাটা পড়েছে। আমাদের জন্যে কেবল একটা বড়ো পথ আছে, সে হচ্ছে দুঃখের উপরে যাবার পথ। রিপু আমাদের বাইরে থেকে আঘাত দিচ্ছে দিক, তাকে আমরা অন্তরে আশ্রয় দেব না। যারা মারে তাদের চেয়ে আমরা যখন বড়ো হতে পারব তখন আমাদের মার-খাওয়া ধন্য হবে। সেই বড়ো হবার পথ না লড়াই করা, না দরখাস্ত লেখা।

অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবম্ অধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে ॥

৩

অন্যের সঙ্গে কথা কওয়া এবং অন্যের সঙ্গে চিঠি লেখার ব্যবস্থা আছে সংসার জুড়ে। আর নিজের সঙ্গে? সেটা কেবল এই বাতায়নটুকুতে। কিন্তু নিজের মধ্যে কার সঙ্গে কে কথা কয়।

একটা উপমা দেওয়া যাক। মাটির জলের খানিকটা সূক্ষ্ম হয়ে মেঘ হয়ে আকাশে উড়ে যায়। সেখান থেকে সেই নির্মল দূরত্বের সংগীত এবং উদার বেগ নিয়ে ধারায় ধারায় পুনর্বার সে মাটির জলে ফিরে আসতে থাকে।

এই জলেরই মতো মানুষের মনের একটা ভাগ সংসারের ঊর্ধ্বে আকাশের দিকে উড়ে যায়, সেই আকাশচারী মনটা মাঝে মাঝে আবার যদি এই ভূচর মনের সঙ্গে মিলতে পারে তবে তাতেই পূর্ণতা ঘটে।

কিন্তু এমন-সকল মরুপ্রদেশ আছে যেখানে প্রায় সমস্ত বৎসর ধরেই অনাবৃষ্টি। বাষ্প হয়ে যা উপরে চলে গেল বর্ষণ হয়ে তা আর ধরায় নেমে আসে না। নীচের মনের সঙ্গে উপরের মনের আর মিলন হয় না। সেখানে খাল-কাটা জলে কাজ চলে যায়, কিন্তু সেখানে আকাশের সঙ্গে মাটির শুভসংগমের সংগীত এবং শঙ্খধ্বনি কোথায়। সেখানে বর্ষণমুখরিত রসের উৎসব হল না। সেখানে মনের মধ্যে চির-বিরহের একটা শুষ্কতা রয়ে গেল।

এ তো গেল অনাবৃষ্টির কথা। এ ছাড়া মাঝে মাঝে কাদাবৃষ্টি রক্তবৃষ্টি প্রভৃতি নানা উৎপাতের কথা শোনা যায়। আকাশের বিশুদ্ধতা যখন চলে যায়, বাতাস যখন পৃথিবীর নানা আবর্জনায় পূর্ণ হয়ে থাকে তখনই এইসব কাণ্ড ঘটে। তখন

আকাশের বাণীও নির্মল হয়ে পৃথিবীকে পবিত্র করে না। পৃথিবীরই পাপ পৃথিবীতে ফিরে আসতে থাকে।

আজকের দিনে সেই দুর্যোগ ঘটেছে। পৃথিবীর পাপের ধূলিতে আকাশের বর্ষণও আবিল হয়ে নামছে। নির্মল ধারায় পুণ্যস্নানের জন্যে অনেক দিনের যে-প্রতীক্ষা তাও আজ বারে বারে ব্যর্থ হল। মনের মধ্যে কাদা লাগছে এবং রক্তের চিহ্ন এসে পড়ছে; বার বার কত আর মুছব।

রক্তকলঙ্কিত পৃথিবী থেকে ঐ যে আজ একটা শান্তির দরবার উঠেছে, ঊর্ধ্ব আকাশের নির্মল নিঃশব্দতা তার বেসুরকে ধুয়ে দিতে পারছে না।

শান্তি? শান্তির দরবার সত্য সত্যই কে করতে পারে। ত্যাগের জন্যে যে প্রস্তুত। ভোগেরই জন্যে, লাভেরই জন্যে যাদের দশ আঙুল অজগর সাপের দশটা লেজের মতো কিলবিল করছে তারা শান্তি চায় বটে কিন্তু সে ফাঁকি দিয়ে; দাম দিয়ে নয়। যে-শান্তিতে পৃথিবীর সমস্ত ক্ষীরসর বাটি চেটে নিরাপদে খাওয়া যেতে পারে সেই শান্তি।

দুর্ভাগ্যক্রমে পৃথিবীর এই ক্ষীরসরের বড়ো বড়ো ভাণ্ডগুলো প্রায় আছে দুর্বলদের জিম্মায়। এইজন্য যে-ত্যাগশীলতায় সত্যকার শান্তি সেই ত্যাগের ইচ্ছা প্রবলদের মনে কিছুতেই সহজ হতে পারছে না। যেখানে শক্ত পাহারা সেখানে লোভ দমন করতে বেশি চেষ্টা করতে হয় না। সেখানে মানুষ সংযত হয় এবং নিজেকে খুব ভালো ছেলে বলেই মনে করে। কিন্তু আলগা পাহারা যেখানে, সেখানে ভয়ও থাকে না, লজ্জাও চলে যায়। এমন-সব জায়গা আছে যেখানে ভালো ছেলে বলে নিজের পরিচয় দিলে লাভ আছে; কিন্তু দুর্বলের সঙ্গে যেখানে কারবার সেখানে বেচারা প্রবলপক্ষের ভালো হওয়া সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ বলেই যে কত কঠিন তার দৃষ্টান্তের অভাব নেই। বিখ্যাত ফরাসীলেখক আনাতোল ফ্রাঁসের লেখা থেকে একটা জায়গা উদ্ধৃত করি। তিনি চীনদেশের সঙ্গে য়ুরোপের সম্বন্ধ আলোচনা উপলক্ষে লিখছেন:

In our own times, the Christian acquired the habit of sending jointly or separately into that vast Empire, whenever order was disturbed, soldiers who restored it by means of theft, rape, pillage, murder, and incendiarism, and of proceeding at short intervals with the pacific penetration of the country with rifles and guns. The poorly armed Chinese either defend themselves badly or not at all, and so they are massacred with delightful facility... In 1901, order having been disturbed at Peking, the troops of the five Great Powers, under the command of a German Field-Marshal, restored it by the customary

means. Having in this fashion covered themselves with military glory, the five Powers signed one of the innumerable treaties by which they guarantee the integrity of the very China whose provinces they divide among themselves.

পীকিনে যে ভাঙচুর, লুটপাট ও উৎপাত হয়েছিল মানুষের দুঃখ এবং অপমানের পক্ষে সে বড়ো কম নয়, কিন্তু সে সম্বন্ধে লজ্জা-পাওয়া এবং লজ্জা-দেওয়ার পরিমাণ আধুনিক য়ুরোপীয় যুদ্ধঘটিত আলোচনার তুলনায় কতই অণুপরিমাণমাত্র তা সকলেই জানেন। এর থেকে স্পষ্ট দেখা যায় ভালো হওয়ার যে কঠিন আদর্শ মানুষের মনুষ্যত্বকে উর্ধ্বে ধারণ করে রাখে দুর্বলের সংসর্গে সেইটে নেমে যায়। মানুষ নিজের অগোচরে নিজের সঙ্গে একটা সন্ধিপত্র লেখাপড়া করে নেয়— বলে, ভালোমন্দর বিচার নিয়ে নিজের সঙ্গে নিজের যে-একটা নিরন্তর লড়াই চলছে অমুক-অমুক চৌহদ্দির মধ্যে সেটাকে যথেষ্ট পরিমাণ ঢিল দেওয়া যেতে পারে। ভারতবর্ষে আমরাও এ কাজ করেছি, শূদ্রকে ব্রাহ্মণ এত দুর্বল করেছিল যে তার সম্বন্ধে ব্রাহ্মণের না ছিল লজ্জা না ছিল ভয়। আমাদের সংহিতাগুলি আলোচনা করলে এ কথা ধরা পড়বে। দেশ জুড়ে আজ তার যে ফল ফলেছে তা বোঝবার শক্তি পর্যন্ত চলে গেছে, দুর্গতি এত গভীর!

যে দুর্বল, সবলের পক্ষে সে তেমনি ভয়ংকর, হাতির পক্ষে যেমন চোরাবালি। এই বালি বাধা দিতে পারে না বলেই সম্মুখের দিকে অগ্রসর করে না, কেবলই নীচের দিকে টেনে নেয়। শক্তির আয়তন যত প্রকাণ্ড, তার ভার যতই বেশি, তার প্রতি অশক্তির নীচের দিকের টান ততই ভয়ংকর। যে-মাটি বাধা দেয় না, তাকে পদাঘাত যত জোরেই করবে, পদের পক্ষে ততই বিপদ ঘটবে।

যে-জায়গায় হাওয়া হালকা সেই জায়গাই হচ্ছে ঝড়ের কেন্দ্র। এইজন্যে য়ুরোপের বড়ো বড়ো ঝড়ের আসল জন্মস্থান এশিয়া আফ্রিকা। ঐখানে বাধা কম, ঐখানে ন্যায়পরতার য়ুরোপীয় আদর্শ খাড়া রাখবার প্রেরণা দুর্বল। এবং আশ্চর্য এই যে, সেই ন্যায়পরতার আদর্শ যে নেমে চলেছে বলদর্পে মানুষ সেটা বুঝতেই পারে না। এইটেই হচ্ছে দুর্গতির পরাকাষ্ঠা।

এই অসাড়তা, এই অন্ধতা এতদূর পর্যন্ত যায় যে, এক-একসময়ে তার কাণ্ড দেখে বড়ো দুঃখেও হাসি আসে। য়ুরোপের শুঁড়িখানা থেকে পোলিটিকাল মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে এমন একদল যুবক আমাদের দেশে আছে। তারা নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি করে। তাই দেখে অনেকবার এই কথাই ভেবেছি, মানুষের স্বদেশী পাপের তো অভাব নেই, এর উপরে যারা বিদেশী পাপের আমদানি করছে তারা আমাদের

কলুষের ভার আরো দুর্বহ করে তুলছে। এমন সময়ে আমাদের বাংলাদেশের ভূতপূর্ব শাসনকর্তা এই সমস্ত পোলিটিক্যাল হত্যাকাণ্ড উপলক্ষ করে বলে বসলেন, খুন করা সম্বন্ধে বাংলাদেশের ধর্মবুদ্ধি য়ুরোপের থেকে একেবারে স্বতন্ত্র; তিনি বলেন, বাঙালি জানে, খুন করা আর-কিছুই নয়, মানুষকে এক লোক থেকে আরেক লোকে চালান করে দেওয়া মাত্র।[১] যে-পাশ্চাত্যদের কাছে বাঙালি ছাত্র এই সমস্ত অপকর্ম শিখেছে অবশেষে তাঁদেরই কাছ থেকে এই বিচার! পলিটিক্সের হাটে তাঁরা মানুষের প্রাণ যে কী রকম ভয়ংকর সস্তা করে তুলেছেন, সেটা বোধ হয় অভ্যাসবশত নিজে তেমন করে দেখেন না বাইরের লোকে যেমন দেখতে পায়। এইসব পলিটিক্স-বিলাসীদের কি কোনো বিশেষ মনস্তত্ত্ব নেই। তাঁদের সেই মনস্তত্ত্বের শিক্ষাটাই আজ সমস্ত পৃথিবীময় খুন ছড়িয়ে চলেছে, এ কথা তাঁরাও ভুললেন?

ওরা আমাদের থেকে আলাদা, একেবারে ভিতরের দিক থেকে আলাদা, এই কথা যারা বলে তারা এরা-ওরার সম্বন্ধকে গোড়া ঘেঁষে কলুষিত করে। এদের সম্বন্ধে যে-নিয়ম ওদের সম্বন্ধে সে-নিয়ম চলতেই পারে না বলে তারা নিজের ধর্মবুদ্ধিকে ঠাণ্ডা রাখে; অন্যায়ের মধ্যে নিষ্ঠুরতার মধ্যে যতটুকু চক্ষুলজ্জা এবং অস্বস্তি আছে সেটুকু তারা মেরে রাখতে চায়। যতদিন ধরে প্রাচ্যদের সঙ্গে পাশ্চাত্যদের সম্বন্ধ হয়েছে ততদিন থেকেই এইসব বুলির উৎপত্তি। গায়ের জোরে যাদের প্রতি অন্যায় করা সহজ, তাদের সম্বন্ধে অন্যায় করতে পাছে মনের জোরেও কোথাও বাধে সেইজন্যে এরা সে রাস্তাটুকুও সাফ রাখতে চায়।

আমি পূর্বেই বলেছি, দুর্বলের সঙ্গে ব্যবহারে আমাদের বিচারবুদ্ধি নষ্ট হয়, নিজেদের এক আদর্শে বিচার করি, অন্যদের অন্য আদর্শে। নিজেদের ছাত্রেরা যখন গোলমাল করে তখন সেটাকে স্নেহপূর্বক বলি যৌবনোচিত চাঞ্চল্য, অন্যদের ছাত্ররাও যখন মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে ওঠে সেটাকে চোখ রাঙিয়ে বলি নষ্টামি। পরজাতিবিদ্বেষের লেশমাত্র লক্ষণে ভয়ংকর রাগ হয় যখন সেটা দেখি দুর্বলের তরফে, আর নিজের তরফে তার সাতগুণ বেশি থাকলেও তার এতরকমের সংগত কারণ পাওয়া যায় যে, সেটার প্রতি স্নেহই জন্মায়। আবার আনাতোল ফ্রাঁসের দ্বারস্থ হচ্ছি। তার কারণ, চিত্ত তাঁর স্বচ্ছ, কল্পনা তাঁর দীপ্তিমান, এবং যেটা অসংগত সেটা

---

১ ১৯১২ খৃস্টাব্দে বৃটিশ দ্বীপে প্রতি লক্ষ লোকে ·১৭ অংশ লোকের খুনের অভিযোগে বিচার হয়েছিল। ১৯১১ খৃস্টাব্দে বাংলা দেশে প্রতি লক্ষ লোকে ·০৮ অংশ লোকের খুনের চার্জে বিচার হয়েছিল। হাতের কাছে বই না থাকাতে সম্পূর্ণ তালিকা দিতে পারলাম না।

তাঁর কৌতুকদৃষ্টিতে মুহূর্তে ধরা পড়ে; পররাজ্যশাসনের বালাই তাঁর কোনোদিন ঘটে নি। চীনেদের কথাই চলছে:

They are polite and ceremonious, but are reproached with cherishing feeble sentiments of affections for Europeans. The grievances we have against them are greatly of the order of those which Mr. Du Chaillu cherished towards his Gorilla. Mr. Du Chaillu, while in a forest, brought down with his rifle the mother of a Gorilla. In its death the brute was still pressing its young to its bosom. He tore it from its embrace, and dragged it with him in a cage across Africa, for the purpose of selling it in Europe. Now, the young animal gave him just cause for complaint. It was unsociable, and actually starved itself to death. "I was powerless," says Mr Du Chaillu, "to correct its evil nature."

তাই বলছি, সবলের সব-চেয়ে বড়ো বিপদ হচ্ছে দুর্বলের কাছে। দুর্বল তার ধর্মবুদ্ধি এমন করে অপহরণ করে যে, সবল তা দেখতেই পায় না, বুঝতেই পারে না। আজকের দিনে এই বিপদটাই পৃথিবীতে সব-চেয়ে বেড়ে উঠছে। কেননা হঠাৎ বাহুবলের অতিবৃদ্ধি ঘটেছে। দুর্বলকে শাসন করা ক্রমেই নিরতিশয় অবাধ হয়ে আসছে। এই শাসন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এতই আটঘাট-বাঁধা যে, এর জালে যে-বেচারা পড়েছে কোথাও কোনোকালে এতটুকু ফাঁক দিয়ে একটুখানি বেরবার তার আশা নেই। তবুও কিছুতেই আশ মিটছে না, কেননা লোভ যে ভীরু, সে অতিবড়ো শক্তিমানকেও নিশ্চিন্ত হতে দেয় না। শক্তিমান তাই বসে বসে এই ঠাওরাচ্ছে যে, শাসনের ইস্কু-কলে এমনি কষে প্যাঁচ দিতে হবে যে, নালিশ জানাতে মানুষের সাহস হবে না, সাক্ষ্য দিতে ভয় পাবে, ঘরের কোণেও চেঁচিয়ে কাঁদলে অপরাধ হবে। কিন্তু শাসনকে এত বেশি সহজ করে ফেলে যারা সেই শাসনের ভার নিচ্ছে, নিজের মনুষ্যত্বের তহবিল ভেঙে এই অতিসহজ শাসনের মূল্য তাদের জোগাতে হবে। প্রতিদিন এই যে তহবিল ভেঙে চলা এর ফলটা প্রতিদিন নানা আকারে নিজের ঘরেই দেখা দেবে। এখনো দেখা দিচ্ছে কিন্তু তার হিসাব কেউ মিলিয়ে দেখছে না।

এই তো প্রবলপক্ষ সম্বন্ধে বক্তব্য। আমাদের পক্ষে এসব কথা বেশি করে আলোচনা করতে বড়ো লজ্জা বোধ হয়, কেননা বাইরে থেকে এর আকারটা উপদেশের মতো, কিন্তু এর ভিতরের চেহারাটা মার খেয়ে কান্নারই রূপান্তর। এক দিকে ভয় আরেক দিকে কান্না, দুর্বলের এইটেই হচ্ছে সকলের চেয়ে বড়ো লজ্জা। প্রবলের সঙ্গে লড়াই করবার শক্তি আমাদের নেই কিন্তু নিজের সঙ্গে লড়াই আমাদের

করতেই হবে। আর যাই করি, ভয় আমরা করব না, এবং কথা বলা যদি বন্ধ করে দেয় তবে সমুদ্রের এ-পার থেকে ও-পার পর্যন্ত নাকি সুরে কান্না আমরা তুলব না।

দুঃখের আগুন যখন জ্বলে তখন কেবল তার তাপেই জ্বলে মরব আর তার আলোটা কোনো কাজেই লাগাব না এটা হলেই সব-চেয়ে বড়ো লোকসান। সেই আলোটাতে মোহ-আঁধার ঘুচুক, একবার ভালো করে চেয়ে দেখো। নিজের মনকে একবার জিজ্ঞাসা করো, ঐ বীভৎস শক্তিমান মানুষটাকে যত বড়ো দেখাচ্ছে সে কি সত্যই তত বড়ো। বাইরে থেকে সে ভাঙচুর করতে পারে কিন্তু ভিতর থেকে মানুষের জীবনের সম্পদ লেশমাত্র যোগ করে দিয়ে যাবার সাধ্য ওর আছে? ও সন্ধি করতে পারে কিন্তু শান্তি দিতে পারে কি। ও অভিভূত করতে পারে কিন্তু শক্তি দান করতে পারে কি। আজ প্রায় দু হাজার বছর আগে সামান্য একদল জাল-জীবীর অখ্যাত এক গুরুকে প্রবল রোম সাম্রাজ্যের একজন শাসনকর্তা চোরের সঙ্গে সমান দণ্ডকাষ্ঠে বিঁধে মেরেছিল। সেদিন সেই শাসনকর্তার ভোজের অন্নে কোনো ব্যঞ্জনের ত্রুটি হয় নি এবং সে আপন রাজপালঙ্কে আরামেই ঘুমতে গিয়েছিল। সেদিন বাইরে থেকে বড়ো দেখিয়েছিল কাকে। আর আজ? সেদিন সেই মশানে বেদনা এবং মৃত্যু এবং ভয়, আর রাজপ্রাসাদে ভোগ এবং সমারোহ। আর আজ? আমরা কার কাছে মাথা নত করব। কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।

৪

বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলির বিষয়টা হচ্ছে, এক দেবতাকে তার সিংহাসন থেকে খেদিয়ে দিয়ে আরেক দেবতার অভ্যুদয়। সহজেই এই কথা মনে হয় যে, দুই দেবতার মধ্যে যদি কিছু নিয়ে প্রতিযোগিতা থাকে তা হলে সেটা ধর্মনীতিগত আদর্শেরই তারতম্য নিয়ে। যদি মানুষের ধর্মবুদ্ধিকে নূতন দেবতা পুরাতন দেবতার চেয়ে বেশি তৃপ্তি দিতে পারেন তা হলেই তাঁকে বরণ করবার সংগত কারণ পাওয়া যায়।

কিন্তু এখানে দেখি একেবারেই উল্‌টো। এককালে পুরুষদেবতা যিনি ছিলেন তাঁর বিশেষ কোনো উপদ্রব ছিল না। খামকা মেয়েদেবতা জোর করে এসে বায়না ধরলেন, আমার পুজো চাই। অর্থাৎ যে-জায়গায় আমার দখল নেই, সে-জায়গা আমি দখল করবই। তোমার দলিল কী। গায়ের জোর। কী উপায়ে দখল করবে। যে উপায়েই হোক। তার পরে যে-সকল উপায় দেখা গেল মানুষের সদ্‌বুদ্ধিতে তাকে সদুপায় বলে না। কিন্তু পরিণামে এই-সকল উপায়েরই জয় হল। ছলনা, অন্যায়

এবং নিষ্ঠুরতা কেবল যে মন্দির দখল করল তা নয়, কবিদের দিয়ে মন্দিরা বাজিয়ে চামর দুলিয়ে আপন জয়গান গাইয়ে নিলে। লজ্জিত কবিরা কৈফিয়ত দেবার ছলে মাথা চুলকিয়ে বললেন, কী করব, আমার উপর স্বপ্নে আদেশ হয়েছে। এই স্বপ্ন একদিন আমাদের সমস্ত দেশের উপর ভর করেছিল।

সেদিনকার ইতিহাস স্পষ্ট নয়। ইতিহাসের যে-একটা আবছায়া দেখতে পাচ্ছি সেটা এই রকম— বাংলা সাহিত্য যখন তার অব্যক্ত কারণ-সমুদ্রের ভিতর থেকে প্রবাল-দ্বীপের মতো প্রথম মাথা তুলে দেখা দিলে তখন বৌদ্ধধর্ম জীর্ণ হয়ে বিদীর্ণ হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে নানাপ্রকার বিকৃতিতে পরিণত হচ্ছে। স্বপ্নে যেমন এক থেকে আর হয়, তেমনি করেই বুদ্ধ তখন শিব হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। শিব ত্যাগী, শিব ভিক্ষু, শিব বেদবিরুদ্ধ, শিব সর্বসাধারণের। বৈদিক দক্ষের সঙ্গে এই শিবের বিরোধের কথা কবিকঙ্কণ এবং অন্নদামঙ্গলের গোড়াতেই প্রকাশিত আছে। শিবও দেখি বুদ্ধের মতো নির্বাণমুক্তির পক্ষে ; প্রলয়েই তাঁর আনন্দ।

কিন্তু এই শান্তির দেবতা, ত্যাগের দেবতা টিকল না। য়ুরোপেও আধুনিক শক্তি-পূজক বলছেন, যিশুর মতো অমন গরিবের দেবতা, নিরীহ দেবতা, অমন নেহাৎ ফিকে রক্তের দেবতা নিয়ে আমাদের চলবে না। আমাদের এমন দেবতা চাই জোর করে যে কেড়ে নিতে পারে, যেমন করে হোক যে নিজেকে জাহির করতে গিয়ে না মানে বাধা, না পায় ব্যথা, না করে লজ্জা। কিন্তু য়ুরোপে এই-যে বুলি উঠেছে সে কাদের পান-সভার বুলি। যারা জিতেছে, যারা লুটেছে, পৃথিবীটাকে টুকরো টুকরো করে যারা তাদের মদের চাট বানিয়ে খাচ্ছে।

আমাদের দেশের মঙ্গলগানের আসরেও ঐ বুলিই উঠেছিল। কিন্তু এ বুলি কোন্‌খান থেকে উঠল। যাদের অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, আশ্রয় নেই, সম্মান নেই সেই হতভাগাদের স্বপ্নের থেকে। তারা স্বপ্ন দেখল। কখন। যখন—

নারায়ণ, পরাশর, এড়াইল দামোদর,
উপনীত কুচট্যানগরে।
তৈল বিনা কৈলুঁ স্নান, করিলুঁ উদকপান,
শিশু কাঁদে ওদনের তরে।
আশ্রম পুখরি-আড়া, নৈবেদ্য শালুক পোড়া,
পূজা কৈনু কুমুদ প্রসূনে।
ক্ষুধাভয় পরিশ্রমে, নিদ্রা যাই সেই ধামে,
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে॥

সেদিনকার শক্তির স্বপ্ন স্বপ্নমাত্র, সে স্বপ্নের মূল ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমের মধ্যে।

শোনা গেছে ইতিহাসের গান অমিত্রাক্ষরে হয় না, এর চরণে-চরণে মিল। সেই পাঁচশো বছর পূর্বের এক চরণের সঙ্গে আজ পাঁচশো বছর পরের এক চরণের চমৎকার মিল শোনা যাচ্ছে না কি। য়ুরোপের শক্তিপূজক আজ বুক ফুলিয়ে বড়ো সমারোহেই শক্তির পুজো করছেন; মদে তাঁর দুই চক্ষু জবাফুলের মতো টক্‌টক করছে; খাড়া শাণিত; বলির পশু যূপে বাঁধা। তাঁরা কেউ কেউ বলছেন, আমরা যিশুকে মানি নে, আবার কেউ কেউ ভারতচন্দ্রের মতো গোঁজামিলন দিয়ে বলছেন, যিশুর সঙ্গে শক্তির সঙ্গে ভেদ করে দেওয়া ঠিক নয়, অর্ধনারীশ্বর মূর্তিতে দুজনকেই সমান মানবার মন্ত্র আছে। অর্থাৎ, একদল মদ খাচ্ছেন রাজাসনে বসে, আরেক দল পুল্‌পিটে চড়ে।

আর আমরাও বলছি, শিবকে মানব না। শিবকে মানা কাপুরুষতা। আমরা চণ্ডীর মঙ্গল গাইতে বসেছি। কিন্তু সে মঙ্গলগান স্বপ্নলব্ধ। ক্ষুধা-ভয়-পরিশ্রমের স্বপ্ন। জয়ীর চণ্ডীপূজায় আর পরাজিতের চণ্ডীগানে এই তফাত।

স্বপ্নেতেই যে আমাদের চণ্ডীগানের আদি এবং স্বপ্নেতেই যে তার অন্ত তার প্রমাণ কী। ঐ দেখো-না ব্যাধের দশা, তার স্ত্রী ফুল্লরার বারমাস্যা একবার শোনো; কিন্তু হল কী। হঠাৎ খামখেয়ালী শক্তি বিনা কারণে তাকে এমন-একটা আঙটি দিলেন যে, ঘরে আর টাকা ধরে না। কলিঙ্গরাজের সঙ্গে এই সামান্য ব্যাধ যখন লড়াই করল, তখন খামকা স্বয়ং হনুমান এসে তার পক্ষ নিয়ে কলিঙ্গের সৈন্যকে কিলিয়ে লাথিয়ে একাকার করে দিলে। একেই বলে শক্তির স্বপ্ন, ক্ষুধা এবং ভয়ের বরপুত্র। হঠাৎ একটা কিছু হবে। তাই সেই অতি-অদ্ভুত হঠাতের আশায় আমরা দলে দলে উচ্চৈঃস্বরে মা মা করে চণ্ডীগান করতে লেগে গেছি। সেই চণ্ডী ন্যায় অন্যায় মানে না, সুবিধার খাতিরে সত্যমিথ্যায় সে ভেদ করে না, সে যেন-তেন প্রকারে ছোটোকে বড়ো, দরিদ্রকে ধনী, অশক্তকে শক্তিমান করে দেয়। তার জন্যে যোগ্য হবার দরকার নেই, অন্তরের দারিদ্র্য দূর করবার প্রয়োজন হবে না, যেখানে যা যেমনভাবে আছে আলস্যভরে সেখানে তাকে তেমনি ভাবেই রাখা চলবে। কেবল করজোড়ে তারস্বরে বলতে হবে— মা মা মা!

যখন মোগলপাঠানের বন্যা দেশের উপর ভেঙে পড়ল, তখন সংসারের যে-বাহ্যরূপ মানুষ প্রবল করে দেখতে পেলে সেটা শক্তিরই রূপ। সেখানে ধর্মের হিসাব পাওয়া যায় না, সেখানে শিবের পরিচয় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। মানুষ যদি তখনো সমস্ত দুঃখ এবং পরাভবের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলতে পারে, আমি সব সহ্য করব তবুও কিছুতেই একে দেবতা বলে মানতে পারব না, তা হলেই মানুষের জিত হয়। চাঁদসদাগর

কিংবা ধনপতির বিদ্রোহের মধ্যে কিছুদূর পর্যন্ত মানুষের সেই পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। মারের পর মার খেয়েছে কিন্তু ভক্তিকে ঠিক জায়গা থেকে নড়তে দেয় নি। মিথ্যা এবং অন্যায় চার দিক থেকে তাদের আক্রমণ করলে; চণ্ডী বললেন, ভয়ে অভিভূত করে, দুঃখে জর্জর করে, ক্ষতিতে দুর্বল করে, মারের চোটে মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে তোমাদের কাছ থেকে জোর করে আমার পূজা আদায় করবই। নইলে? নইলে আমার প্রেস্টিজ যায়। ধর্মের প্রেস্টিজের জন্যে চণ্ডীর খেয়াল নেই, তাঁর প্রেস্টিজ হচ্ছে ক্ষমতার প্রেস্টিজ। অতএব মারের পর মার, মারের পর মার!

অবশেষে দুঃখের যখন চূড়ান্ত হল, তখন শিবকে সরিয়ে রেখে শক্তির কাছে আধমরা সদাগর মাথা হেঁট করলে। শক্তি তাদের এতদিন যে এত দুঃখ দিয়েছিল সে দুঃখে তেমন অপমান নেই যেমন অপমান শেষকালে এই মাথা হেঁট করে। যে-আত্মা অভয়, যে-আত্মা অমর, সে আপন প্রতিষ্ঠা থেকে নেমে এসে ভয়কে মৃত্যুকে দেবতা বলে, আপনার চেয়ে বড়ো বলে মানলে। এইখানেই শক্তির সকলের চেয়ে বীভৎস পরিচয় পাওয়া গেল।

আমরা আজ য়ুরোপের দেবতাকে স্বপ্নে পুজো করতে বসেছি, এইটেতেই য়ুরোপের কাছে আমাদের সব-চেয়ে পরাভব হয়েছে। যদি সে আমাদের আঘাত করতে চায় করুক, আমরা সহ্য করব, কিন্তু তাই বলে পুজো করব? সে চলবে না; কেননা পুজো করতে হবে ধর্মরাজকে। সে দুঃখ দেবে, দিকগে। কিন্তু হারিয়ে দেবে? কিছুতে না। মরার বাড়া গাল নেই; কিন্তু মরেও অমর হওয়া যায় এই কথা যদি কিছুতে ভুলিয়ে দেয় তা হলে তার চেয়ে সর্বনেশে মৃত্যু আর নেই।

মহান্তং বিভুম্ আত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি।

৫

মানুষের ইতিহাসের রথ আজ যত বড়ো ধাক্কা খেয়েছে এমন আর কোনোদিনই খায় নি। তার কারণ আধুনিক ইতিহাসের রথটা কলের গাড়ি, বহু কৌশলে ওর লোহার রাস্তা বাঁধা, আর এক-একটা এঞ্জিনের পিছনে গাড়ির শ্রেণী প্রকাণ্ড লম্বা হয়ে বাঁধা পড়েছে। তার পরে ওর পথ চলেছে জগৎ জুড়ে, নানা জায়গায় নানা পথে কাটাকাটি। কাজেই কলে কলে যদি একবার সংঘাত বাধল, যদি পরস্পরকে বাঁচিয়ে চলতে না পারল, তা হলে সেই দুর্যোগে ভাঙচুরের পরিমাণ অতি ভয়ানক হয়ে ওঠে, এবং পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আর-একপ্রান্ত পর্যন্ত থরথর করে কাঁপতে থাকে।

এই কলের গাড়ির সংঘাত এবারে খুব প্রবল ধাক্কায় ঘটেছে, কী মাল কী সওয়ারী

নাস্তানাবুদ হয়ে গেল। তাই চারি দিকে প্রশ্ন উঠেছে, এ কী হল, কেমন করে হল, কী করলে ভবিষ্যতে এমন আর না হতে পারে।

মানুষের ইতিহাসে এই প্রশ্ন এবং বিচার যখন উঠে পড়েছে তখন আমাদেরও কি ভাবতে হবে না। তখন শুধুই কি পরের নামে নালিশ করব। নিজের দায়িত্বের কথা স্মরণ করব না ?

আমি পূর্বেও আভাস দিয়েছি এখনও বলছি দুর্বলের দায়িত্ব বড়ো ভয়ানক। বাতাসে যেখানে যা-কিছু ব্যাধির বীজ ভাসছে দুর্বল তাকেই আতিথ্য দান করে তাকে নিজের জীবন দিয়ে জিইয়ে রাখে। ভীরু কেবল ভয়ের কারণকে বাড়িয়ে চলে, অবনত কেবল অপমানকে সৃষ্টি করে।

চোখে যেখানে আমরা দেখতে পাই নে সেখানে আমাদের ব্যথা পৌঁছয় না; মাটির উপর যে-সব পোকামাকড় আছে তাদের আমরা অবাধে মাড়িয়ে চলি কিন্তু যদি সামনে একটা পাখি এসে পড়ে তার উপরে পা ফেলতে সহজে পারি নে। পাখির সম্বন্ধে যে-বিচার করি পিঁপড়ের সম্বন্ধে সে-বিচার করি নে।

অতএব মানুষের প্রধান কর্তব্য তাকে এমনটি হতে হবে যাতে তাকে মানুষ বলে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। এ কর্তব্য কেবল তার নিজের সুবিধের জন্যে নয়, পরের দায়িত্বের জন্যেও। মানুষ মানুষকে মাড়িয়ে যাবে, এটা, যে-লোক মাড়ায় এবং যাকে মাড়ানো হয় কারো পক্ষে কল্যাণের নয়। আপনাকে যে খর্ব করে সে যে কেবল নিজেকেই কমিয়ে রাখে তা নয় মোটের উপর সমস্ত মানুষের মূল্য সে হ্রাস করে। কেননা, যেখানেই আমরা মানুষকে বড়ো দেখি সেখানেই আপনাকে বড়ো বলে চিনতে পারি— এই পরিচয় যত সত্য হয় নিজেকে বড়ো রাখবার চেষ্টা মানুষের পক্ষে তত সহজ হয়।

প্রত্যেক মানুষের যে-দেশে মূল্য আছে সমস্ত জাতি সে-দেশে আপনিই বড়ো হয়। সেখানে মানুষ বড়ো করে বাঁচবার জন্যে নিজের চেষ্টা পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগ করে, এবং বাধা পেলে শেষ পর্যন্ত লড়াই করতে থাকে। সে মানুষ যারই সামনে আসুক, তার চোখে সে পড়বেই, কাজেই ব্যবহারের বেলায় তার সঙ্গে ভেবে চিন্তে ব্যবহার করতেই হবে। তাকে বিচার করবার সময় কেবলমাত্র বিচারকের নিজের বিচারবুদ্ধির উপরেই যে ভরসা তা নয়, যথোচিত বিচার পাবার দাবি তার নিজের মধ্যেই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ।

অতএব যে-জাতি উন্নতির পথে বেড়ে চলেছে তার একটা লক্ষণ এই যে, ক্রমশই সে-জাতির প্রত্যেক বিভাগের এবং প্রত্যেক ব্যক্তির অকিঞ্চিৎকরতা চলে যাচ্ছে। যথাসম্ভব তাদের সকলেই মনুষ্যত্বের পুরো গৌরব দাবি করবার অধিকার পাচ্ছে।

এইজন্তেই সেখানে মানুষ ভাবছে, কী করলে সেখানকার প্রত্যেকেই ভদ্র বাসায় বাস করবে, ভদ্রোচিত শিক্ষা পাবে, ভালো খাবে, ভালো পরবে, রোগের হাত থেকে বাঁচবে, এবং যথেষ্ট অবকাশ ও স্বাতন্ত্র্য লাভ করবে।

কিন্তু আমাদের দেশে কী হয়েছে। আমরা বিশেষ শিক্ষা দীক্ষা ও ব্যবস্থার দ্বারা সমাজের অধিকাংশ লোককেই খাটো করে রেখেছি। তারা যে খাটো এটা কোনো তর্ক বা বিচারের উপরে নির্ভর করে না, এটাকে বিধিমতে সংস্কারগত করে তুলেছি। এমনি হয়েছে যে, যাকে ছোটো করেছি সে নিজে হাত জোড় করে বলছে আমি ছোটো। সমাজে তাদের অধিকারকে বড়োর সমতুল্য করতে চেষ্টা করলে তারাই সবচেয়ে বেশি আপত্তি করে।

এমনি করে অপমানকে স্বীকার করে নেবার শিক্ষা ও অভ্যাস সমাজের স্তরে স্তরে নানা আকারে বিধিবদ্ধ হয়ে আছে। যারা নীচে পড়ে আছে সংখ্যায় তারাই বেশি, তাদের জীবনযাত্রার আদর্শ সকল বিষয়েই হীন হলেও উপরের লোককে সেটা বাজে না। বরঞ্চ তাদের চালচলন যদি উপরের আদর্শ অবলম্বন করতে যায় তা হলে সেটাতে বিরক্তি বোধ হয়।

তার পরে এইসব চির-অপমানে-দীক্ষিত মানুষগুলো যখন মানবসভায় স্বভাবতই জোরগলায় সম্মান দাবি করতে না পারে, যখন তারা এত সংকুচিত হয়ে থাকে যে বিদেশী উদ্ধতভাবে তাদের অবজ্ঞা করতে অন্তরে বাহিরে বাধা বোধ না করে, তখন সেটাকে কি আমাদের নিজেরই কৃতকর্ম বলে গ্রহণ করব না।

আমরা নিজেরা সমাজে যে-অন্যায়কে আটেঘাটে বিধিবিধানে বেঁধে চিরস্থায়ী করে রেখেছি সেই অন্যায় যখন পলিটিক্সের ক্ষেত্রে অন্যের হাত দিয়ে আমাদের উপর ফিরে আসে তখন সেটা সম্বন্ধে সর্বতোভাবে আপত্তি করবার জোর আমাদের কোথায়।

জোর করি সেই বিদেশীরই ধর্মবুদ্ধির দোহাই দিয়ে। সে দোহাইয়ে কি লজ্জা বেড়ে ওঠে না। এ কথা বলতে কি মাথা হেঁট হয়ে যায় না যে, সমাজে আমাদের আদর্শকে আমরা ছোটো করে রাখব, আর পলিটিক্সে তোমাদের আদর্শকে তোমরা উঁচু করে রাখো? আমরা দাসত্বের সমস্ত বিধি সমাজের মধ্যে বিচিত্র আকারে প্রবল করে রাখব আর তোমরা তোমাদের ঔদার্যের দ্বারা প্রভুত্বের সমান অধিকার আমাদের হাতে নিজে তুলে দেবে? যেখানে আমাদের এলেকা সেখানে ধর্মের নামে আমরা অতি কঠোর কৃপণতা করব, কিন্তু যেখানে তোমাদের এলেকা সেখানে সেই ধর্মের দোহাই দিয়ে অপর্যাপ্ত বদান্যতার জন্যে তোমাদের কাছে দরবার

করতে থাকব এমন কথা বলি কোন্ মুখে। আর যদি আমাদের দরবার মঞ্জুর হয়? যদি আমরা আমাদের দেশের লোককে প্রত্যহ অপমান করতে কুণ্ঠিত না হই, অথচ বিদেশের লোক এসে আপন ধর্মবুদ্ধিতে সেই অপমানিতদের সম্মানিত করে তা হলে ভিতরে বাহিরেই কি আমাদের পরাভব সম্পূর্ণ হয় না।

আজকের দিনে যে কারণে হোক দুঃখ এবং অপমানের বেদনা নিরতিশয় প্রবল হয়ে উঠেছে ; এই উপলক্ষে আমাদের মনে একটা কথা আশা করবার আছে, সেটা হচ্ছে এই যে, ধর্মবুদ্ধিতে যখন অন্যপক্ষের পরাভব হচ্ছে তখন সেইখানে আমরা এদের উপরে উঠব। তা হলে এদের হাতের আঘাতে আমাদের গৌরব হানি করবে না বরং বাড়াবে। কিন্তু সেখানেও কি আমরা বলব, ধর্মবুদ্ধিতে তোমরা আমাদের চেয়ে বড়ো হয়ে থাকো ; নিজেদের সম্বন্ধে আমরা যে-রকম ব্যবহার করবার আশা করি নে আমাদের সম্বন্ধে তোমরা সেই রকম ব্যবহারই করো? অর্থাৎ চিরদিনই নিজের ব্যবস্থায় আমরা নিজেদের খাটো করে রাখি, আর চিরদিনই তোমরা নিজগুণে আমাদের বড়ো করে তোলো। সমস্ত বরাতই অন্যের উপরে, আর নিজের উপরে একটুও নয়? এত অশ্রদ্ধা নিজেকে, আর এতই শ্রদ্ধা অন্যকে? বাহুবলগত অধমতার চেয়ে এই ধর্মবুদ্ধিগত অধমতা কি আরো বেশি নিকৃষ্ট নয়।

অল্পকাল হল একটা আলোচনা আমি স্বকর্ণে শুনেছি, তার সিদ্ধান্ত এই যে, পরস্পরের মধ্যে পাকা দেওয়ালের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও এক চালের নীচে হিন্দু-মুসলমান আহার করতে পারবে না, এমন-কি সেই আহারে হিন্দুমুসলমানের নিষিদ্ধ কোনো আহার্য যদি নাও থাকে। যাঁরা এ কথা বলতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করেন না, হিন্দুমুসলমানের বিরোধের সময় তাঁরাই সন্দেহ করেন যে বিদেশী কর্তৃপক্ষেরা এই বিরোধ ঘটাবার মূলে। এই সন্দেহ যখন করেন তখন ধর্মবিচারে তাঁরা বিদেশীকে দণ্ডনীয় মনে করেন। এর একমাত্র কারণ ধর্মের দাবি নিজের উপরে তাঁদের যতটা, বিদেশীর উপরে তার চেয়ে অনেক বেশি। স্বদেশে মানুষে মানুষে ব্যবধানকে আমরা দুঃসহরূপে পাকা করে রাখব সেইটেই ধর্ম, কিন্তু বিদেশী সেই ব্যবধানকে কোনো কারণেই কোনো মতেই নিজের ব্যবহারে লাগালে সেটা অধর্ম। আত্মপক্ষে দুর্বলতাকে সৃষ্টি করব ধর্মের নামে, বিরুদ্ধপক্ষে সেই দুর্বলতাকে ব্যবহার করলেই সেটাকে অন্যায় বলব।

যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, পাকা দেওয়ালের অপর পারে যেখানে মুসলমান খাচ্ছে দেওয়ালের এপারে সেখানে হিন্দু কেন খেতে পারে না, তা হলে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়াই আবশ্যক হবে না। হিন্দুর পক্ষে এ প্রশ্নে বুদ্ধি খাটানো নিষেধ এবং সেই

নিষেধটা বুদ্ধিমান জীবের পক্ষে কত অদ্ভুত ও লজ্জাকর তা মনে উদয় হবার শক্তি পর্যন্ত চলে গেছে। সমাজের বিধানে নিজের বারো আনা ব্যবহারের কোনোপ্রকার সংগত কারণ নির্দেশ করতে আমরা বাধ্য নই; যেমন বাধ্য নয় গাছপালা কীটপতঙ্গ পশুপক্ষী। পলিটিক্সে বিদেশীর সঙ্গে কারবারে আমরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে শিখেছি— সে-ক্ষেত্রে সকল রকম বিধিবিধানের একটা বুদ্ধিগত জবাবদিহি আছে বলে মানতে অভ্যাস করছি; কিন্তু সমাজে পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহার, যার উপরে পরস্পরের গুরুতর সুখদুঃখ শুভাশুভ প্রত্যহ নির্ভর করে সে সম্বন্ধে বুদ্ধির কোনো কৈফিয়ৎ নেওয়া চলে এ কথা আমরা ভাবতেও একেবারে ভুলে গেছি।

এমনি করে যে-দেশে ধর্মবুদ্ধিতে এবং কর্মবুদ্ধিতে মানুষ নিজেকে দাসানুদাস করে রেখেছে, সে-দেশে কর্তৃত্বের অধিকার চাইবার সত্যকার জোর মানুষের নিজের মধ্যে থাকতেই পারে না। সে-দেশে এই সকল অধিকারের জন্যে পরের বদান্যতার উপরে নির্ভর করতে হয়।

কিন্তু আমি পূর্বেই বলেছি মানুষ যেখানে নিজেকে নিজে অত্যন্ত ছোটো এবং অপমানিত করে রাখে সেখানে তার কোনো দাবি স্বভাবত কারো মনে গিয়ে পৌঁছয় না। সেইজন্যে তাদের সঙ্গে যে-সকল প্রবলের ব্যবহার চলে সেই প্রবলদের প্রতিদিন দুর্গতি ঘটতে থাকে। মানুষের সঙ্গে আচরণের আদর্শ তাদের না নেমে গিয়ে থাকতে পারে না। ক্রমশই তাদের পক্ষে অন্যায়, ঔদ্ধত্য এবং নিষ্ঠুরতা স্বাভাবিক হয়ে উঠতে থাকে। নিজের ইচ্ছাকে অন্যের প্রতি প্রয়োগ করা তাদের পক্ষে একান্ত সহজ হওয়াতেই মানবস্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা নিজের অগোচরেই তাদের মনে শিথিল হয়ে আসে। ক্ষমতা যতই অবাধ হয় ক্ষমতা ততই মানুষকে নীচের দিকে নিয়ে যায়। এইজন্যে ক্ষমতাকে যথোচিত পরিমাণে বাধা দেবার শক্তি যার মধ্যে নেই তার দুর্বলতা সমস্ত মানুষেরই শত্রু। আমাদের সমাজ মানুষের ভিতর থেকে সেই বাধা দূর করবার একটা অতি ভয়ংকর এবং অতি প্রকাণ্ড যন্ত্র। এই যন্ত্র এক দিকে বিধান-অক্ষৌহিণী দিয়ে আমাদের চার দিকে বেড়ে ধরেছে, আর-এক দিকে, যে-বুদ্ধি যে-যুক্তি দ্বারা আমরা এর সঙ্গে লড়াই করে মুক্তিলাভ করতে পারতুম, সেই বুদ্ধিকে সেই যুক্তিকে একেবারে নির্মূল করে কেটে দিয়েছে। তার পরে অন্য দিকে অতি লঘু ত্রুটির জন্যে অতি গুরুদণ্ড। খাওয়া শোওয়া ওঠা বসার তুচ্ছতম স্খলন সম্বন্ধে শাস্তি অতি কঠোর। এক দিকে মূঢ়তার ভারে অন্য দিকে ভয়ের শাসনে মানুষকে অভিভূত করে জীবনযাত্রার অতি ক্ষুদ্র খুঁটিনাটি সম্বন্ধেও তার স্বাভিরুচি ও স্বাধীনতাকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। তার পরে? তার পরে ভিক্ষা, ভিক্ষা না মিললে কান্না। এই ভিক্ষা যদি অতি সহজেই

মেলে, আর এই কান্না যদি অতি সহজেই থামে, তা হলে সকল প্রকার মারের চেয়ে অপমানের চেয়ে সে আমাদের বড়ো দুর্গতির কারণ হবে। নিজেকে আমরা নিজে ছোটো করে রাখব, আর অন্যে আমাদের বড়ো অধিকার দিয়ে প্রশ্রয় দেবে এই অভিশাপ বিধাতা আমাদের দেবেন না বলেই আমাদের এত দুঃখের পর দুঃখ।

জাহাজের খোলের ভিতরটায় যখন জল বোঝাই হয়েছে তখনই জাহাজের বাইরেকার জলের মার সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। ভিতরকার জলটা তেমন দৃশ্যমান নয়, তার চালচলন তেমন প্রচণ্ড নয়, সে মারে ভারের দ্বারা, আঘাতের দ্বারা নয়, এইজন্যে বাইরের ঢেউয়ের চড়-চাপড়ের উপরেই দোষারোপ করে তৃপ্তি লাভ করা যেতে পারে; কিন্তু হয় মরতে হবে নয় একদিন এই সুবুদ্ধি মাথায় আসবে যে আসল মরণ ঐ ভিতরকার জলের মধ্যে, ওটাকে যত শীঘ্র পারা যায় সেঁচে ফেলতেই হবে। কাজটা যদি দুঃসাধ্যও হয় তবু এ কথা মনে রাখা চাই যে, সমুদ্র সেঁচে ফেলা সহজ নয়, তার চেয়ে সহজ, খোলের জল সেঁচে ফেলা। এ কথা মনে রাখতে হবে, বাইরে বাধাবিঘ্ন বিরুদ্ধতা চিরদিনই থাকবে, থাকলে ভালো বই মন্দ নয়— কিন্তু অন্তরে বাধা থাকলেই বাইরের বাধা ভয়ংকর হয়ে ওঠে। এইজন্যে ভিক্ষার দিকে না তাকিয়ে সাধনার দিকে তাকাতে হবে, তাতে অপমানও যাবে, ফলও পাব।

৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

শক্তিপূজা

'বাতায়নিকের পত্রে' আমি শক্তিপূজার যে আলোচনা করেছি সে সম্বন্ধে সাময়িকপত্রে একাধিক লোকে প্রতিবাদ লিখেছেন।

আমাদের দেশে শিব এবং শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে দুটি ধারা দেখতে পাই। তার মধ্যে একটিকে শাস্ত্রিক এবং আর-একটিকে লৌকিক বলা যেতে পারে। শাস্ত্রিক শিব যতী, বৈরাগী। লৌকিক শিব উন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খল। বাংলা মঙ্গলকাব্যে এই লৌকিক শিবেরই বর্ণনা দেখতে পাই। এমন-কি, রাজসভার কবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে শিবের যে চরিত্র বর্ণিত সে আর্যসমাজসম্মত নয়।

শক্তির যে শাস্ত্রিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় আমি তা স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু বাংলা মঙ্গলকাব্যে শক্তির যে স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে সে লৌকিক, এবং তার ভাব অন্যরূপ। সংসারে যারা পীড়িত, যারা পরাজিত, অথচ এই পীড়া ও পরাজয়ের যারা

কোনো ধর্মসংগত কারণ দেখতে পাচ্ছে না, তারা স্বেচ্ছাচারিণী নিষ্ঠুর শক্তির অন্যায় ক্রোধকেই সকল দুঃখের কারণ বলে ধরে নিয়েছে এবং সেই ঈর্ষাপরায়ণা শক্তিকে স্তবের দ্বারা পূজার দ্বারা শান্ত করবার আশাই এই-সকল মঙ্গলকাব্যের প্রেরণা।

প্রচণ্ড দেবতার যথেচ্ছাচারের বিভীষিকা মানবজাতির প্রথম পূজার মূলে দেখতে পাওয়া যায়। তার কারণ মানুষ তখনো বিশ্বের মূলে বিশ্বনিয়মকে দেখতে পায় নি এবং তখন সে সর্বদাই ভয়বিপদের দ্বারা বেষ্টিত। তখন শক্তিমানের আকস্মিক ঐশ্বর্যলাভ সর্বদাই চোখে পড়ছে, এবং আকস্মিকতারই প্রভাব মানবসমাজে সবচেয়ে উগ্রভাবে দৃশ্যমান।

যে-সময়ে কবিকঙ্কণ-চণ্ডী অন্নদামঙ্গল লিখিত হয়েছে সে-সময়ে মানুষের আকস্মিক উত্থানপতন বিস্ময়করমপে প্রকাশিত হত। তখন চার দিকেই শক্তির সঙ্গে শক্তির সংঘাত চলছে, এবং কার ভাগ্যে কোন্‌দিন যে কী আছে তা কেউ বলতে পারছে না। যে-ব্যক্তি শক্তিমানকে ঠিকমত স্তব করতে জানে, যে-ব্যক্তি সত্য মিথ্যা ন্যায় অন্যায় বিচার করে না, তার সমৃদ্ধিলাভের দৃষ্টান্ত তখন সর্বত্র প্রত্যক্ষ। চণ্ডীশক্তিকে প্রসন্ন করে তাকে নিজের ব্যক্তিগত ইষ্টলাভের অনুকূল করা তখন অন্তত একশ্রেণীর ধর্মসাধনার প্রধান অঙ্গ ছিল, তখনকার ধনীমানীরাই বিশেষত এই শ্রেণীভুক্ত ছিল, কেননা তখনকার শক্তির ঝড় তাদের উচ্চচূড়ার উপরেই বিশেষ করে আঘাত করত।

শাস্ত্রে দেবতার যে-স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে সেইটেই যে আদিম এবং লৌকিকটাই যে আধুনিক এ কথা বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত মানা যায় না। আমার বিশ্বাস, অনার্যদের দেবতাকে একদিন আর্যভাবের দ্বারা শোধন করে স্বীকার করে নেবার সময় ভারতবর্ষে উপস্থিত হয়েছিল। সেই সময়ে যে-সব দেবতা ভারতবর্ষের সাধুসমাজে প্রবেশ করেছিল তাদের চরিত্রে অসংগতি একেবারে দূর হতে পারে নি, তাদের মধ্যে আজও আর্য অনার্য দুই ধারা মিশ্রিত হয়ে আছে এবং লৌকিক ব্যবহারে সেই অনার্যধারারই প্রবলতা অধিক।

খৃস্টধর্মের বিকাশেও আমরা এই জিনিসটি দেখতে পাই। য়িহুদির জিহোবা এককালে মুখ্যত য়িহুদিজাতিরই পক্ষপাতী দেবতা ছিলেন। তিনি কী রকম নিষ্ঠুর ঈর্ষাপরায়ণ ও বলিপ্রিয় দেবতা ছিলেন তা ওল্‌ড্‌ টেস্টামেন্ট্‌ পড়লেই বোঝা যায়। সেই দেবতা ক্রমশ য়িহুদি সাধুঋষিদের বাণীতে এবং অবশেষে যিশুখৃস্টের উপদেশে সর্বমানবের প্রেমের দেবতা হয়ে প্রকাশ পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে আজও যে দুই বিরুদ্ধভাব জড়িয়ে আছে তা লৌকিক ব্যবহারে স্পষ্ট দেখতে পাই। আজও

তিনি যুদ্ধের দেবতা, ভাগাভাগির দেবতা, সাম্প্রদায়িক দেবতা। অখৃস্টানের প্রতি খৃস্টানের অবজ্ঞা ও অবিচার তাঁর নামের জোরে যত সজীব হয়ে আছে এমন আর-কিছুতে নয়।

আমাদের দেশে সাধারণত শাক্তধর্মসাধনা এবং বৈষ্ণবধর্মসাধনার মধ্যে দুই স্বতন্ত্রভাব প্রাধান্য লাভ করেছে। এক সাধনায় পশুবলি এবং মাংসভোজন, অন্য সাধনায় অহিংসা ও নিরামিষ আহার— এটা নিতান্ত নিরর্থক নয়। বিশেষ শাস্ত্রে এই পশু এবং অপরাপর মকারের যে ব্যাখ্যাই থাক্ সাধারণ ব্যবহারে তা প্রচলিত নেই। এইজন্যেই 'শক্তি' শব্দের সাধারণ যে-অর্থ, যে-অর্থ নানা চিহ্নে, অনুষ্ঠানে ও ভাবে শক্তিপূজার মধ্যে ওতপ্রোত এবং বাংলাদেশের মঙ্গলকাব্যে যে-অর্থ প্রচারিত হয়েছে আমি সেই অর্থ ই আমার রচনায় গ্রহণ করেছি।

একটি কথা মনে রাখতে হবে, দস্যুর উপাস্য দেবতা শক্তি, ঠগীর উপাস্য দেবতা শক্তি, কাপালিকের উপাস্য দেবতা শক্তি। আরো একটি ভাববার কথা আছে, পশুবলি বা নিজের রক্তপাত, এমন-কি, নরবলি স্বীকার করে মানত দেবার প্রথা শক্তিপূজায় প্রচলিত। মিথ্যা মামলায় জয় থেকে শুরু করে জ্ঞাতিশত্রুর বিনাশ কামনা পর্যন্ত সকল প্রকার প্রার্থনাই শক্তিপূজায় স্থান পায়। এক দিকে দেবচরিত্রের হিংস্রতা, অপর দিকে মানুষের ধর্মবিচারহীন ফলকামনা এই দুইয়ের যোগ যে-পূজায় আছে, তার চেয়ে বড়ো শক্তিপূজার কথা কোনো বিশেষ শাস্ত্রে নিগূঢ় আছে কি না সেটা আমার আলোচ্য ছিল না। শক্তিপূজার যে-অর্থ লৌকিক বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত, সে-অর্থকে অসংগত বলা যায় না; কারণ লোকপ্রচলিত কাহিনী এবং রূপকচিহ্নে সেই অর্থ ই প্রবল এবং সভ্য ও বর্বর সকল দেশে সকল ভাবেই শক্তিপূজা চলছে— অন্যায় অসত্য সে পূজায় লজ্জিত নয়, লোভ তার লক্ষ্য এবং হিংসা তার পূজোপচার। এই লোভ মন্দ নয়, ভালোই, হিংস্রশক্তি মনুষ্যত্বের পক্ষে অত্যাবশ্যক— এমন সকল তর্ক শক্তিপূজক য়ুরোপে স্পর্ধার সঙ্গে চলছে, য়ুরোপের ছাত্ররূপে আমাদের মধ্যেও চলছে— সে-সম্বন্ধে আমার যা বলবার অন্যত্র বলেছি; এখানে এইটুকু বক্তব্য যে, সাধারণ লোকের মনে শক্তিপূজার সঙ্গে একটি উলঙ্গ নিদারুণতার ভাব, নিজের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বলপূর্বক দুর্বলকে বলি দেবার ভাব সংগত হয়ে আছে— 'বাতায়নিকের পত্রে' আমি তারই উল্লেখ করেছি।

কিন্তু তবু এ কথা স্বীকার করা উচিত যে, কোনো ধর্মসাধনার উচ্চ অর্থ যদি দেশের কোনো বিশেষ শাস্ত্র বা সাধকের মধ্যে কথিত বা জীবিত থাকে তবে তাকে সম্মান করা কর্তব্য। এমন-কি, ভূরিপরিমিত প্রচলিত ব্যবহারের চেয়েও তাকে বড়ো বলে

জানা চাই। ধর্মকে পরিমাণের দ্বারা বিচার না করে তার উৎকর্ষের দ্বারা বিচার করাই শ্রেয়।—

স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।

১৩২৬

সত্যের আহ্বান

পরাসক্ত কীট বা জন্তু পরের রস রক্ত শোষণ করে বাঁচে; খাদ্যকে নিজের শক্তিতে নিজ দেহের উপকরণে পরিণত করবার দেহযন্ত্র তাদের বিকল হয়ে যায়; এমনি করে শক্তিকে অলস করবার পাপে প্রাণিলোকে এই-সকল জীবের অধঃপতন ঘটে। মানুষের ইতিহাসেও এই কথা খাটে। কিন্তু পরাসক্ত মানুষ বলতে কেবল যে পরের প্রতি জড়ভাবে আসক্ত মানুষকেই বোঝায় তা নয়। চিরদিন যা চলে আসছে তার সঙ্গে যে আপনাকে জুড়ে রেখে দেয়, প্রচলিতের স্রোতের টানে যে হালছাড়া ভাবে আত্মসমর্পণ করে, সেও পরাসক্ত। কেননা বাহির আমাদের অন্তরের পক্ষে পর, সে যখন কেবল অভ্যাসের তাগিদে আমাদের চালিয়ে নিয়ে যায় তখন আমাদের পরাসক্ত অন্তর নিরুদ্যম হয়ে ওঠে এবং মানুষের পরে অসাধ্যসাধন করবার যে-ভার আছে সে সিদ্ধ হয় না।

এই হিসাবে জন্তুরা এ জগতে পরাসক্ত। তারা প্রচলিতের ধারায় গা-ভাসান দিয়ে চলে। তারা প্রাকৃতিক নির্বাচনের শাসনে বাঁচে মরে, এগোয় বা পিছোয়। এই-জন্যেই তাদের অন্তঃকরণটা বাড়তে পারল না, বেঁটে হয়ে রইল। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে মৌমাছি যে-চাক তৈরি করে আসছে সেই চাক তৈরি করার একটানা ঝোঁক কিছুতেই সে কাটিয়ে বেরতে পারছে না। এতে করে তাদের চাক নিখুঁত-মতো তৈরি হচ্ছে, কিন্তু তাদের অন্তঃকরণ এই চিরাভ্যাসের গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ হয়ে আছে, সে আপনাকে নানা দিকে মেলে দিতে পারছে না। এই-সকল জীবের সম্বন্ধে প্রকৃতির যেন সাহসের অভাব দেখতে পাই। সে এদের নিজের আঁচলে ঢেকে চালায়, পাছে নিজে চলতে গেলে বিপদ বাধিয়ে বসে— এই ভয়ে এদের অন্তরের চলৎশক্তিকে ছেঁটে রেখে দিয়েছে।

কিন্তু সৃষ্টিকর্তার জীবরচনা-পরীক্ষায় মানুষের সম্বন্ধে হঠাৎ খুব একটা সাহস দেখতে পাওয়া যায়। তিনি তার অন্তঃকরণটাকে বাধা দিলেন না। বাহিরে প্রাণীটিকে

সর্বপ্রকারে বিবস্ত্র নিরস্ত্র দুর্বল করে এর অন্তঃকরণকে ছেড়ে দেওয়া হল। এই মুক্তি পাওয়ার আনন্দে সে বলে উঠল— আমি অসাধ্য সাধন করব। অর্থাৎ যা চিরদিন হয়ে আসছে তাই যে চিরদিন হতে থাকবে সে আমি সইব না, যা হয় না তাও হবে। সেইজন্যে মানুষ তার প্রথম যুগে যখন চার দিকে অতিকায় জন্তুদের বিকট নখদন্তের মাঝখানে পড়ে গেল, তখন সে হরিণের মতো পালাতে চাইল না, কচ্ছপের মতো লুকোতে চাইল না, সে অসাধ্য সাধন করলে— চকমকি পাথর কেটে কেটে ভীষণতর নখদন্তের সৃষ্টি করলে। যেহেতু জন্তুদের নখদন্ত তাদের বাহিরের দান এইজন্যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের 'পরেই এই নখদন্তের পরিবর্তন বা উন্নতি নির্ভর করে। কিন্তু মানুষের নখদন্ত তার অন্তঃকরণের সৃষ্টি; এইজন্যে সেই পাথরের বর্শাফলকের 'পরেই সে ভর করে রইল না, তার সমস্ত হাতিয়ার পাথরের কোঠা থেকে লোহার কোঠায় এসে পৌঁছল। এতে প্রমাণ হয় মানুষের অন্তঃকরণ সন্ধান করছে; যা তার চারি দিকে আছে তাতেই সে আসক্ত হয়ে নেই, যা তার হাতের কাছে নেই তাকে হাতের তলায় আনছে। পাথর আছে তার সামনে, তাতে সে সন্তুষ্ট নয়; লোহা আছে মাটির নীচে, সেখানে গিয়ে সে ধাক্কা দেয়, পাথরকে ঘষে-মেজে তার থেকে হাতিয়ার তৈরি করা সহজ; কিন্তু তাতেও তার মন উঠল না, লোহাকে আগুনে গলিয়ে হাতুড়িতে পিটিয়ে ছাঁচে ঢালাই করে যা সবচেয়ে বাধা দেয় তাকেই আপনার সবচেয়ে অনুগত করে তুললে। মানুষের অন্তঃকরণের ধর্মই হচ্ছে এই, আপনাকে খাটিয়ে কেবল যে তার সফলতা তা নয়, তার আনন্দ; সে কেবলই উপরিতল থেকে গভীরতলে পৌঁছতে চায়, প্রত্যক্ষ থেকে অপ্রত্যক্ষে, সহজ থেকে কঠিনে, পরাসক্তি থেকে আত্মকর্তৃত্বে, প্রবৃত্তির তাড়না থেকে বিচারের ব্যবস্থায়। এমনি করে সে জয়ী হয়েছে। কিন্তু কোনো এক দল মানুষ যদি বলে, 'এই পাথরের ফলা আমাদের বাপ-পিতামহের ফলা, এ ছাড়া আর যা-কিছু করতে যাব তাতে আমাদের জাত নষ্ট হবে', তা হলে একেবারে তাদের মনুষ্যত্বের মূলে ঘা লাগে; তা হলে যাকে তারা জাতরক্ষা বলে তা হতে পারে, কিন্তু তাদের সবচেয়ে যে বড়ো জাত মনুষ্যজাত সেইখানে তাদের কৌলীন্য মারা যায়। আজও যারা সেই পাথরের ফলার বেশি এগোয় নি মানুষ তাদের জাতে ঠেলেছে, তারা বনে জঙ্গলে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ায়। তারা বহিরবস্থার কাছে পরাসক্ত, তারা প্রচলিতের জিন-লাগামের টানে চোখে ঠুলি লাগিয়ে চলে; তারা অন্তরের স্বরাজ পায় নি, বাহিরের স্বরাজের অধিকার থেকে তাই তারা ভ্রষ্ট। এ কথা তারা জানেই না যে, মানুষকে আপনার শক্তিতে অসাধ্যসাধন করতে হবে; যা হয়েছে তার মধ্যে সে বদ্ধ থাকবে না, যা হয় নি তার দিকে সে এগোবে; তাল ঠুকে বুক ফুলিয়ে নয়,

অন্তঃকরণের সাধনার বলে, আত্মশক্তির উদ্‌বোধনে।

আজ ত্রিশ বৎসর হয়ে গেল, যখন 'সাধনা' কাগজে আমি লিখছিলুম,[১] তখন আমার দেশের লোককে এই কথাই বলবার চেষ্টা করেছি। তখন ইংরেজি-শেখা ভারতবর্ষ পরের কাছে অধিকার-ভিক্ষার কাজে বিষম ব্যস্ত ছিল। তখন বারে বারে আমি কেবল একটি কথা বোঝাবার প্রয়াস পেয়েছি যে মানুষকে অধিকার চেয়ে নিতে হবে না, অধিকার সৃষ্টি করতে হবে। কেননা মানুষ প্রধানত অন্তরের জীব, অন্তরেই সে কর্তা; বাহিরের লাভে অন্তরে লোকসান ঘটে। আমি বলেছিলেম, অধিকার-বঞ্চিত হবার দুঃখভার আমাদের পক্ষে তেমন বোঝা নয় যেমন বোঝা আমাদের মাথার উপরে 'আবেদন আর নিবেদনের থালা'। তার পরে যখন আমার হাতে 'বঙ্গদর্শন' এসেছিল[২] তখন বঙ্গবিভাগের ছুরি-শানানোর শব্দে সমস্ত বাংলাদেশ উতলা। মনের ক্ষোভে বাঙালি সেদিন ম্যাঞ্চেস্টরের কাপড় বর্জন করে বোম্বাই মিলের সদাগরদের লোভটাকে বৈদেশিক ডিগ্রিতে বাড়িয়ে তুলেছিল। যেহেতু ইংরেজ সরকারের 'পরে অভিমান ছিল এই বস্ত্রবর্জনের মূলে, সেইজন্যে সেই দিন এই কথা বলতে হয়েছিল 'এহ বাহ্য'। এর প্রত্যক্ষ লক্ষ্য ইংরেজ, ভারতবাসী উপলক্ষ, এর মুখ্য উত্তেজনা দেশের লোকের প্রতি প্রেম নয়, বিদেশী লোকের প্রতি ক্রোধ। সেদিন দেশের লোককে এই কথা বলে সাবধান করবার দরকার ছিল যে, ভারতে ইংরেজ যে আছে এটা বাইরের ঘটনা, দেশ যে আছে এটাই আমাদের ভিতরের কথা। এই ভিতরের কথাটাই হচ্ছে চিরসত্য, আর বাইরের ব্যাপারটা মায়া। মায়াকে ততক্ষণ অত্যন্ত বড়ো দেখায় যতক্ষণ রাগেই হোক বা অনুরাগেই হোক বাইরের দিক থেকে তার প্রতি সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তাকিয়ে থাকি। তেড়ে গিয়ে তার পায়ে দাঁত বসিয়ে দেওয়া সেও একটা তীব্র আসক্তি, আর ভক্তিতে তার পা জড়িয়ে ধরা সেও তথৈবচ— তাকে চাই নে বললেও তার ধ্যানে আমাদের সমস্ত হৃদয় রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে, আর চাই বললে তো কথাই নেই। মায়া জিনিসটা অন্ধকারের মতো, বাইরের দিক থেকে কলের গাড়ি চালিয়েও তাকে অতিক্রম করতে পারি নে, তাকে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে চাইলে সাত সমুদ্র তেরো নদী শুকিয়ে যাবে। সত্য আলোর মতো, তার শিখাটা জ্বলবামাত্র দেখা যায় মায়া নেই। এইজন্যেই শাস্ত্রে বলেছেন: স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। ভয় হচ্ছে মনের নাস্তিকতা,

---

১ ১৩০০, ১৩০১ সালের সাধনায় প্রকাশিত রাষ্ট্রনৈতিক প্রবন্ধাবলী। রবীন্দ্র-রচনাবলী দশম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

২ বঙ্গদর্শন-সম্পাদনার কাল ১৩০৮-১২।

তাকে না'এর দিক থেকে নিকেশ করা যায় না, উপস্থিতমত তার একটা কারণ গেলেও রক্তবীজের মতো আরেকটা কারণরূপে সে জন্ম নেয়। ধর্ম হচ্ছে সত্য, সে মনের আস্তিকতা, তার অল্পমাত্র আবির্ভাবে হাঁ প্রকাণ্ড না'কে একেবারে মূলে গিয়ে অভিভূত করে। ভারতে ইংরেজের আবির্ভাব -নামক ব্যাপারটি বহুরূপী; আজ সে ইংরেজের মূর্তিতে, কাল সে অন্য বিদেশীর মূর্তিতে এবং তার পরদিন সে নিজের দেশী লোকের মূর্তিতে নিদারুণ হয়ে দেখা দেবে। এই পরতন্ত্রতাকে ধনুর্বাণ হাতে বাইরে থেকে তাড়া করলে সে আপনার খোলশ বদলাতে বদলাতে আমাদের হয়রান করে তুলবে। কিন্তু আমার দেশ আছে এইটি হল সত্য, এইটিকে পাওয়ার দ্বারা বাহিরের মায়া আপনি নিরস্ত হয়।

আমার দেশ আছে এই আস্তিকতার একটি সাধনা আছে। দেশে জন্মগ্রহণ করেছি বলেই দেশ আমার, এ হচ্ছে সেই-সব প্রাণীর কথা যারা বিশ্বের বাহ্যব্যাপার সম্বন্ধে পরাসক্ত। কিন্তু যেহেতু মানুষের যথার্থ স্বরূপ হচ্ছে তার আত্মশক্তিসম্পন্ন অন্তরপ্রকৃতিতে, এইজন্য যে দেশকে মানুষ আপনার জ্ঞানে বুদ্ধিতে প্রেমে কর্মে সৃষ্টি করে তোলে সেই দেশই তার স্বদেশ। ১৯০৫ খৃস্টাব্দে আমি বাঙালিকে ডেকে এই কথা বলেছিলেম যে, আত্মশক্তির দ্বারা ভিতরের দিক থেকে দেশকে সৃষ্টি করো, কারণ সৃষ্টির দ্বারাই উপলব্ধি সত্য হয়।[৩] বিশ্বকর্মা আপন সৃষ্টিতে আপনাকেই লাভ করেন। দেশকে পাওয়ার মানে হচ্ছে দেশের মধ্যে আপনার আত্মাকেই ব্যাপক করে উপলব্ধি করা। আপনার চিন্তার দ্বারা, কর্মের দ্বারা, সেবার দ্বারা, দেশকে যখন নিজে গড়ে তুলতে থাকি তখনই আত্মাকে দেশের মধ্যে সত্য করে দেখতে পাই। মানুষের দেশ মানুষের চিত্তের সৃষ্টি, এইজন্যেই দেশের মধ্যে মানুষের আত্মার ব্যাপ্তি, আত্মার প্রকাশ।

যে দেশে জন্মেছি কী উপায়ে সেই দেশকে সম্পূর্ণ আমার আপন করে তুলতে হবে বহুকাল পূর্বে 'স্বদেশী সমাজ' নামক প্রবন্ধে[৪] তার বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেই আলোচনাতে যে-কোনো ত্রুটি থাকুক এই কথাটি জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে যে, দেশকে জয় করে নিতে হবে পরের হাত থেকে নয় নিজের নৈষ্কর্ম্য থেকে, ঔদাসীন্য থেকে। দেশের যে-কোনো উন্নতি সাধনের জন্যে যে উপলক্ষে আমরা ইংরেজ

৩ 'আত্মশক্তি' গ্রন্থের প্রকাশ, ১৩১২ আশ্বিন। রবীন্দ্র-রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

৪ রবীন্দ্র-রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

রাজসরকারের দ্বারস্থ হয়েছি সেই উপলক্ষে আমাদের নৈষ্কর্ম্যকে নিবিড়তর করে তুলেছি মাত্র। কারণ, ইংরেজ-রাজসরকারের কীর্তি আমাদের কীর্তি নয়, এইজন্য বাহিরের দিক থেকে সেই কীর্তিতে আমাদের যতই উপকার হোক, ভিতরের দিক থেকে তার দ্বারা আমাদের দেশকে আমরা হারাই, অর্থাৎ আত্মার মূল্যে সফলতা পাই। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন: ন বা অরে পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি। দেশ সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। দেশ আমারই আত্মা, এইজন্যই দেশ আমার প্রিয়— এ কথা যখন জানি তখন দেশের সৃষ্টিকার্যে পরের মুখাপেক্ষা করা সহ্যই হয় না।

আমি সেদিন দেশকে যে কথা বলবার চেষ্টা করেছিলুম সে বিশেষ-কিছু নতুন কথা নয় এবং তার মধ্যে এমন-কিছু ছিল না যাতে স্বদেশহিতৈষীর কানে সেটা কটু শোনায়। কিন্তু আর-কারো মনে না থাকতে পারে, আমার স্পষ্টই মনে আছে যে, আমার এই-সকল কথায় দেশের লোক বিষম ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। যারা কটুভাষা-ব্যবসায়ী সাহিত্যিক গুণ্ডা আমি তাদের কথা বলছি নে, কিন্তু গণ্যমান্য এবং শিষ্টশান্ত ব্যক্তিরাও আমার সম্বন্ধে ধৈর্য রক্ষা করতে পারেন নি। এর দুটি মাত্র কারণ; প্রথম— ক্রোধ, দ্বিতীয়— লোভ। ক্রোধের তৃপ্তিসাধন হচ্ছে এক রকমের ভোগসুখ; সেদিন এই ভোগসুখের মাৎলামিতে আমাদের বাধা অতি অল্পই ছিল— আমরা মনের আনন্দে কাপড় পুড়িয়ে বেড়াচ্ছি, পিকেট করছি, যারা আমাদের পথে চলছিল না তাদের পথে কাঁটা দিচ্ছি এবং ভাষায় আমাদের কোনো আব্রু রাখছি নে। এই সকল অমিতাচারের কিছুকাল পরে একজন জাপানি আমাকে একদিন বলেছিলেন, "তোমরা নিঃশব্দে দৃঢ় এবং গূঢ় ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করতে পার না কেন। কেবলই শক্তির বাজে খরচ করা তো উদ্দেশ্যসাধনের সদুপায় নয়।" তার জবাবে সেই জাপানিকে আমার বলতে হয়েছিল যে, "উদ্দেশ্যসাধনের কথাটাই যখন আমাদের মনে উজ্জ্বল থাকে তখন মানুষ স্বভাবতই আত্মসংযম করে নিজের সকল শক্তিকেই সেই দিকে নিযুক্ত করে। কিন্তু ক্রোধের তৃপ্তিসাধন যখন মত্ততার সপ্তকে সপ্তকে উদ্দেশ্যসাধনকে ছাড়িয়ে উঠতে থাকে তখন শক্তিকে খরচ করে দেউলে হতে আমাদের বাধা থাকে না।" যাই হোক সেদিন ঠিক যে সময়ে বাঙালি কিছুকালের জন্যে ক্রোধতৃপ্তির সুখভোগে বিশেষ বিঘ্ন পাচ্ছিল না, সমস্তই যেন একটা আশ্চর্য স্বপ্নের মতো বোধ হচ্ছিল, সেই সময়ে তাকে অন্য পথের কথা বলতে গিয়ে আমি তার ক্রোধের ভাজন হয়েছিলেম। তা ছাড়া আরও একটি কথা ছিল, সে হচ্ছে লোভ। ইতিহাসে সকল জাতি দুর্গম পথ দিয়ে দুর্লভ জিনিস পেয়েছে, আমরা তার চেয়ে

অনেক সস্তায় পাব— হাত-জোড়-করা ভিক্ষের দ্বারা নয়, চোখ-রাঙানো ভিক্ষের দ্বারা পাব, এই ফন্দির আনন্দে সেদিন দেশ মেতেছিল। ইংরেজ দোকানদার যাকে বলে reduced price sale, সেদিন যেন ভাগ্যের হাটে বাঙালির কপালে পোলিটিকাল মালের সেইরকম সস্তা দামের মৌসুম পড়েছিল। যার সম্বল কম, সস্তার নাম শোনবামাত্র সে এত বেশি খুশি হয়ে ওঠে যে, মালটা যে কী আর তার কী অবস্থা তার খোঁজ রাখে না, আর যে ব্যক্তি সন্দেহ প্রকাশ করে তাকে তেড়ে মারতে যায়। মোটকথা সেদিনও আমাদের লক্ষ্য ছিল, ধ্যান ছিল, ঐ বাইরের মায়াটা নিয়ে। তাই তখনকার কালের একজন নেতা বলেছিলেন, আমার এক হাত ইংরেজ সরকারের টুঁটিতে, আর-এক হাত তার পায়ে। অর্থাৎ কোনো হাতই বাকি ছিল না দেশের জন্য। তৎকালে এবং তার পরবর্তী কালে এই দ্বিধা হয়তো অনেকের একেবারে ঘুচে গেছে, এক দলের দুই হাতই হয়তো উঠেছে সরকারের টুঁটিতে আর-এক দলের দুই হাতই হয়তো নেমেছে সরকারের পায়ে, কিন্তু মায়া থেকে মুক্তিসাধনের পক্ষে দুইই হচ্ছে বাইরের পথ। হয় ইংরেজ সরকারের দক্ষিণে নয় ইংরেজ সরকারের বামে পোড়া মন ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার হাঁ'ই বল আর না'ই বল দুইই হচ্ছে ইংরেজকে নিয়ে।

সেদিন চারি দিক থেকে বাংলাদেশের হৃদয়াবেগের উপরেই কেবল তাগিদ এসেছে। কিন্তু শুধু হৃদয়াবেগ আগুনের মতো জ্বালানি বস্তুকে খরচ করে, ছাই করে ফেলে— সে তো সৃষ্টি করে না। মানুষের অন্তঃকরণ ধৈর্যের সঙ্গে, নৈপুণ্যের সঙ্গে, দূরদৃষ্টির সঙ্গে এই আগুনে কঠিন উপাদানকে গলিয়ে আপনার প্রয়োজনের সামগ্রীকে গড়ে তুলতে থাকে। দেশের সেই অন্তঃকরণকে সেদিন জাগানো হল না, সেইজন্যে এতবড়ো একটা হৃদয়াবেগ থেকে কোনো একটা স্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারল না।

এমনটা যে হল তার কারণ বাইরে নেই, তার কারণ আছে আমাদের নিজেরই ভিতরে। অনেক দিন থেকেই আমাদের ধর্মে কর্মে এক দিকে আছে হৃদয়াবেগ, আরেক দিকে আছে অভ্যস্ত আচার। আমাদের অন্তঃকরণ অনেক দিন থেকে কোনো কাজ করে নি; তাকে ভয়ে ভয়ে চেপে রাখা হয়েছে। এইজন্যে যখন আমাদের কাছ থেকে কোনো কাজ আদায় করার দরকার পড়ে তখন তাড়াতাড়ি হৃদয়াবেগের উপর বরাত দিতে হয় এবং নানারকম জাদুমন্ত্র আউড়িয়ে মনকে মুগ্ধ করবার প্রয়োজন ঘটে। অর্থাৎ সমস্ত দেশ জুড়ে এমন একটা অবস্থা উৎপাদন করা হয় যেটা অন্তঃকরণের কাজ করার পক্ষে বিষম প্রতিকূল।

অন্তঃকরণের জড়তায় যে ক্ষতি সে ক্ষতিকে কোনো কিছুতেই পূরণ করা যায় না।

কোনোমতে যখন পূরণ করতে চাই তখন মোহকে সহায় করতে ইচ্ছা হয়, তখন অক্ষমের লোভ আলাদিনের প্রদীপের গুজব শুনলেই একেবারে লাফিয়ে ওঠে। এ কথা সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করতে হবে যে, আলাদিনের প্রদীপের মতো এমন আশ্চর্য সুবিধার জিনিস আর নেই, কেবল ওর একটি মাত্র অসুবিধা এই যে, ও জিনিস কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু পাওয়া যে যায় না এ কথা খুব জোরের সঙ্গে সে মানুষ কিছুতেই বলতে পারে না যার লোভ বেশি অথচ যার সামর্থ্য কম। এইজন্যে তার উদ্যম তখনি পুরোদমে জেগে ওঠে যখন তাকে কেউ আলাদিনের প্রদীপের আশ্বাস দিয়ে থাকে। সেই আশ্বাসকে হরণ করতে গেলে সে এমনি চিৎকার করতে থাকে যেন তার সর্বস্বান্ত করা হল।

সেই বঙ্গবিভাগের উত্তেজনার দিনে একদল যুবক রাষ্ট্রবিপ্লবের দ্বারা দেশে যুগান্তর আনবার উদ্যোগ করেছিলেন। আর যাই হোক, এই প্রলয়হুতাশনে তাঁরা নিজেকে আহুতি দিয়েছিলেন, এইজন্যে তাঁরা কেবল আমাদের দেশে কেন সকল দেশেই সকলেরই নমস্য। তাঁদের নিষ্ফলতাও আত্মার দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। তাঁরা পরমত্যাগে পরমদুঃখে আজ একটা কথা স্পষ্ট জেনেছেন যে, রাষ্ট্র যখন তৈরি নেই তখন রাষ্ট্রবিপ্লবের চেষ্টা করা পথ ছেড়ে অপথে চলা— পথের চেয়ে অপথ মাপে ছোটো, কিন্তু সেটাকে অনুসরণ করতে গেলে লক্ষ্যে পৌঁছনো যায় না, মাঝের থেকে পা দুটোকে কাঁটায় কাঁটায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা হয়। যে-জিনিসের যা দাম তা পুরো না দিতে পারলে দাম তো যায়ই জিনিসও জোটে না। সেদিনকার সেই দুঃসাহসিক যুবকেরা ভেবেছিলেন সমস্ত দেশের হয়ে তাঁরা কয়জন আত্মোৎসর্গ দ্বারা রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাবেন; তাঁদের পক্ষে এটা সর্বনাশ, কিন্তু দেশের পক্ষে এটা সস্তা। সমস্ত দেশের অন্তঃকরণ থেকে সমস্ত দেশের উদ্ধার জেগে ওঠে, তার কোনো একটা অংশ থেকে নয়। রেলযানে ফার্স্ট্‌ক্লাস গাড়ির মূল্য এবং সৌষ্ঠব যেমনি থাক্‌, সে তার নিজের সঙ্গে সংযুক্ত থার্ড্‌ক্লাস গাড়িকে কোনোমতেই এগিয়ে যেতে পারে না। আমার মনে হয় তাঁরা আজ বুঝেছেন, সমগ্র দেশ বলে একটি জিনিস সমস্ত দেশের লোকের সৃষ্টি; এই সৃষ্টি তার সমস্ত হৃদয়বৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তি ইচ্ছাশক্তির প্রকাশে। এ হচ্ছে যোগলব্ধ ধন, অর্থাৎ যে যোগের দ্বারা মানুষের সকল বৃত্তি আপন সৃষ্টির মধ্যে সংহত হয়ে রূপলাভ করে। পোলিটিকাল যোগ বা ইকনমিক যোগ পূর্ণ যোগ নয়, সর্বশক্তির যোগ চাই। অন্য দেশের ইতিহাস যখন লক্ষ্য করে দেখি তখন পোলিটিকাল ঘোড়াটাকে সকলের আগে দেখি, মনে মনে ঠিক করি ঐ চতুষ্পদটারই টানে সমস্ত জাত এগিয়ে চলেছে। তখন হিসাব করে দেখি নে, এর পিছনে দেশ ব'লে যে গাড়িটা

আছে সেটা চলবার যোগ্য গাড়ি, তার এক চাকার সঙ্গে আরেক চাকার সামঞ্জস্য আছে, তার এক অংশের সঙ্গে আরেক অংশের ভালোরকম জোড় মেলানো আছে। এই গাড়িটি তৈরি করে তুলতে শুধু আগুন এবং হাতুড়ি-করাত এবং কলকব্জা লেগেছে তা নয়, এর মধ্যে অনেক দিনের অনেক লোকের অনেক চিন্তা অনেক সাধনা অনেক ত্যাগ আছে। আরো এমন দেশ আমরা দেখেছি, সে বাহ্যত স্বাধীন, কিন্তু পোলিটিকাল বাহনটি যখন তাকে টানতে থাকে তখন তার ঝড়্ঝড়্ খড়্খড়্ শব্দে পাড়ার ঘুম ছুটে যায়, ঝাঁকানির চোটে সওয়ারির বুকে পিঠে খিল ধরতে থাকে, পথ চলতে চলতে দশবার করে সে ভেঙে ভেঙে পড়ে, দড়ি-দড়া দিয়ে তাকে বাঁধতে বাঁধতে দিন কাবার হয়ে যায়। তবু ভালো হোক আর মন্দ হোক, কু আলগা হোক আর চাকা বাঁকা হোক, এ গাড়িও গাড়ি, কিন্তু যে জিনিসটা ঘরে বাইরে সাত টুকরো হয়ে আছে, যার মধ্যে সমগ্রতা কেবল যে নেই তা নয়, যা বিরুদ্ধতায় ভরা, তাকে উপস্থিতমত ক্রোধ হোক বা লোভ হোক কোনো-একটা প্রবৃত্তির বাহ্যবন্ধনে বেঁধে হেঁই হেঁই শব্দে টান দিলে কিছুক্ষণের জন্যে তাকে নড়ানো যায়— কিন্তু একে কি দেশদেবতার রথযাত্রা বলে। এই প্রবৃত্তির বন্ধন এবং টান কি টেঁকসই জিনিস। অতএব ঘোড়াটাকে আস্তাবলে রেখে আপাতত এই গড়াপেটার কাজটাই কি সবচেয়ে দরকার নয়। যমের ফাঁসি-বিভাগের সিংহদ্বার থেকে বাংলাদেশের যে-সব যুবক ঘরে ফিরে এসেছেন তাঁদের লেখা পড়ে কথা শুনে আমার মনে হয় তাঁরা এই কথাই ভাবছেন। তাঁরা বলছেন, সকলের আগে আমাদের যোগসাধন চাই, দেশের সমস্ত চিত্তবৃত্তির সম্মিলন ও পরিপূর্ণতা -সাধনের যোগ। বাইরের দিক থেকে কোনো অন্ধ বাধ্যতা দ্বারা এ হতেই পারে না, ভিতরের দিক থেকে জ্ঞানালোকিত চিত্তে আত্মোপলব্ধি দ্বারাই এ সম্ভব। যা-কিছুতে সমস্ত দেশের অন্তঃকরণ উদ্‌বোধিত হয় না, অভিভূত হয়, এ কাজের পক্ষে তা অন্তরায়।

নিজের সৃষ্টিশক্তির দ্বারা দেশকে নিজের করে তোলবার যে আহ্বান সে খুব একটা বড়ো আহ্বান। সে কোনো-একটা বাহ্য অনুষ্ঠানের জন্যে তাগিদ দেওয়া নয়। কারণ, পূর্বেই বলেছি মানুষ তো মৌমাছির মতো কেবল একই মাপে মৌচাক গড়ে না, মাকড়সার মতো নিরন্তর একই প্যাটার্নে জাল বোনে না। তার সকলের চেয়ে বড়ো শক্তি হচ্ছে তার অন্তঃকরণে— সেই অন্তঃকরণের কাছে তার পুরো দাবি, জড় অভ্যাস-পরতার কাছে নয়। যদি কোনো লোভে পড়ে তাকে আজ বলি, তুমি চিন্তা কোরো না, কর্ম করো, তা হলে যে মোহে আমাদের দেশ মরেছে সেই মোহকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। এতকাল ধরে আমরা অনুশাসনের কাছে, প্রথার কাছে মানবমনের সর্বোচ্চ

অধিকার অর্থাৎ বিচারের অধিকার বিকিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে অলস হয়ে বসে আছি। বলেছি, আমরা সমুদ্রপারে যাব না, কেননা মনুতে তার নিষেধ; মুসলমানের পাশে বসে খাব না, কেননা শাস্ত্র তার বিরোধী। অর্থাৎ যে প্রণালীতে চললে মানুষের মন বলে জিনিসের কোনোই দরকার হয় না, যা কেবলমাত্র চিন্তাহীন অভ্যাসনিষ্ঠতার কাজ, আমাদের সংসারযাত্রার পনেরো-আনা কাজই সেই প্রণালীতে চালিত। যে মানুষ সকল বিষয়েই দাসের প্রতি নির্ভর করে চলে তার যে-রকম পঙ্গুতা, যারা বাহ্য আচারের দ্বারাই নিয়ত চালিত তাদেরও সেই-রকম। কেননা পূর্বেই বলেছি অন্তরের মানুষই প্রভু, সে যখন একান্তভাবে বাহ্য প্রথার পরাসক্ত জীব হয়ে ওঠে তখন তার দুর্গতির সীমা থাকে না। আচারে চালিত মানুষ কলের পুতুল, বাধ্যতার চরম সাধনায় সে উত্তীর্ণ হয়েছে। পরতন্ত্রতার কারখানাঘরে সে তৈরি; এইজন্যে এক চালকের হাত থেকে তাকে নিষ্কৃতি দিতে গেলে আরেক চালকের হাতে তাকে সমর্পণ করতে হয়। পদার্থবিদ্যায় যাকে ইনর্শিয়া বলে, যে মানুষ তারই একান্ত সাধনাকে পবিত্রতা বলে অভিমান করে তার স্থাবরতাও যেমন জঙ্গমতাও তেমন, উভয়েই তার নিজের কর্তৃত্ব নেই। অন্তঃকরণের যে জড়ত্ব সর্বপ্রকার দাসত্বের কারণ, তার থেকে মুক্তি দেবার উপায় চোখে-ঠুলি-দেওয়া বাধ্যতাও নয়, কলের পুতুলের মতো বাহ্যানুষ্ঠানও নয়।

বঙ্গবিভাগের আন্দোলনের পরে এবার দেশে যে আন্দোলন উপস্থিত হয়েছে তার পরিমাণ আরও অনেক বড়ো; সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে তার প্রভাব। বহুদিন ধরে আমাদের পোলিটিকাল নেতারা ইংরেজি-পড়া দলের বাইরে ফিরে তাকান নি, কেননা তাঁদের দেশ ছিল ইংরেজি-ইতিহাস পড়া একটা পুঁথিগত দেশ। সে দেশ ইংরেজি ভাষার বাষ্পরচিত একটা মরীচিকা, তাতে বার্ক্‌ গ্লাড্‌স্টোন ম্যাট্‌সীনি গারিবাল্‌ডির অস্পষ্ট মূর্তি ভেসে বেড়াত। তার মধ্যে প্রকৃত আত্মত্যাগ বা দেশের মানুষের প্রতি যথার্থ দরদ দেখা যায় নি। এমন সময় মহাত্মা গান্ধি এসে দাঁড়ালেন ভারতের বহুকোটি গরিবের দ্বারে— তাদেরই আপন বেশে, এবং তাদের সঙ্গে কথা কইলেন তাদের আপন ভাষায়। এ একটা সত্যকার জিনিস, এর মধ্যে পুঁথির কোনো নজির নেই। এইজন্যেই তাঁকে যে মহাত্মা নাম দেওয়া হয়েছে এ তাঁর সত্য নাম। কেননা, ভারতের এত মানুষকে আপনার আত্মীয় করে আর কে দেখেছে। আত্মার মধ্যে যে শক্তির ভাণ্ডার আছে তা খুলে যায় সত্যের স্পর্শমাত্রে। সত্যকার প্রেম ভারতবাসীর বহুদিনের রুদ্ধদ্বারে যে মুহূর্তে এসে দাঁড়াল অমনি তা খুলে গেল। কারো মনে আর কার্পণ্য রইল না, অর্থাৎ সত্যের স্পর্শে সত্য জেগে উঠল। চাতুরি দ্বারা যে রাষ্ট্রনীতি চালিত হয় সে নীতি বন্ধ্যা, অনেক দিন থেকে এই শিক্ষার আমাদের দরকার ছিল। সত্যের যে

কী শক্তি, মহাত্মার কল্যাণে আজ তা আমরা প্রত্যক্ষ দেখেছি ; কিন্তু চাতুরী হচ্ছে ভীরু ও দুর্বলের সহজ ধর্ম, সেটাকে ছিন্ন করতে হলে তার চামড়া কেটে ছিন্ন করতে হয়। সেইজন্যে আজকের দিনেও দেশের অনেক বিজ্ঞ লোকেই মহাত্মার চেষ্টাকেও নিজেদের পোলিটিকাল জুয়োখেলার একটা গোপন চালেরই সামিল করে নিতে চান। মিথ্যায় জীর্ণ তাঁদের মন এই কথাটা কিছুতেই বুঝতে পারে না যে, প্রেমের দ্বারা দেশের হৃদয়ে এই যে প্রেম উদ্‌বেলিত হয়েছে এটা একটা অবান্তর বিষয় নয়— এইটেই মুক্তি, এইটেই দেশের আপনাকে পাওয়া— ইংরেজ দেশে আছে কি নেই এর মধ্যে সে কথার কোনো জায়গাই নেই। এই প্রেম হল স্বপ্রকাশ, এই হচ্ছে হাঁ— কোনো না'এর সঙ্গে এ তর্ক করতে যায় না, কেননা তর্ক করবার দরকারই থাকে না।

প্রেমের ডাকে ভারতবর্ষের হৃদয়ের এই-যে আশ্চর্য উদ্‌বোধন, এর কিছু সুর সমুদ্রপারে আমার কানে গিয়ে পৌচেছিল। তখন বড়ো আনন্দে এই কথা আমার মনে হয়েছিল যে, এইবার এই উদ্‌বোধনের দরবারে আমাদের সকলেরই ডাক পড়বে, ভারতবাসীর চিত্তে শক্তির যে বিচিত্র রূপ প্রচ্ছন্ন আছে সমস্তই প্রকাশিত হবে। কারণ, আমি একেই আমার দেশের মুক্তি বলি— প্রকাশই হচ্ছে মুক্তি। ভারতবর্ষে একদিন বুদ্ধদেব সর্বভূতের প্রতি মৈত্রীমন্ত্র নিজের সত্যসাধনার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন ; তার ফল হয়েছিল এই যে, সেই সত্যের প্রেরণায় ভারতের মনুষ্যত্ব শিল্পকলায় বিজ্ঞানে ঐশ্বর্যে পরিব্যক্ত হয়ে উঠেছিল। রাষ্ট্রশাসনের দিক থেকে সেদিনও ভারত বারে বারে এক হবার ক্ষণিক প্রয়াসের পর বারে বারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তার চিত্ত সুপ্তি থেকে— অপ্রকাশ থেকে মুক্তিলাভ করেছিল। এই মুক্তির জোর এত যে, সে আপনাকে দেশের কোনো ক্ষুদ্র সীমায় বদ্ধ করে রাখতে পারে নি— সমুদ্রমরুপারেও যে দূরদেশকে সে স্পর্শ করেছে তারই চিত্তের ঐশ্বর্যকে উদ্‌ঘাটন করেছে। আজকের দিনের কোনো বণিক কোনো সৈনিক এ কাজ করতে পারে নি ; তারা পৃথিবীকে যেখানেই স্পর্শ করেছে সেইখানেই বিরোধ পীড়া এবং অপমান জাগিয়েছে, সেইখানেই বিশ্বপ্রকৃতির শ্রী নষ্ট করে দিয়েছে। কেন। কেননা, লোভ সত্য নয়, প্রেমই সত্য। এইজন্য প্রেম যখন মুক্তি দেয় সে একেবারে ভিতরের দিক থেকে। কিন্তু লোভ যখন স্বাতন্ত্র্যের জন্যে চেষ্টা করে তখন সে জবর্দস্তির দ্বারা নিজের উদ্দেশ্য সাধন করতে অস্থির হয়ে ওঠে। বঙ্গবিভাগের দিনে এইটে আমরা লক্ষ্য করেছি— সেদিন গরিবদের আমরা ত্যাগদুঃখ স্বীকার করতে বাধ্য করেছি প্রেমের দ্বারা নয়, বাইরে থেকে নানাপ্রকারে চাপ দিয়ে। তার কারণ, লোভ অল্প

সময়ের মধ্যে একটা বিশেষ সংকীর্ণ ফললাভের চেষ্টা করে ; প্রেমের যে ফল সে এক-দিনের নয়, অল্পদিনের জন্যও নয়, সে ফলের সার্থকতা আপনার মধ্যেই।

এতদিন পরে আমার দেশে সেই আনন্দময় মুক্তির হাওয়া বইছে এইটেই আমি কল্পনা করে এসেছিলুম। এসে একটা জিনিস দেখে আমি হতাশ হয়েছি। দেখছি, দেশের মনের উপর বিষম একটা চাপ। বাইরে থেকে কিসের একটা তাড়নায় সবাইকে এক কথা বলাতে এক কাজ করাতে ভয়ংকর তাগিদ দিয়েছে।

আমি যখন প্রশ্ন করতে যাই, বিচার করতে যাই, আমার হিতৈষীরা ব্যাকুল হয়ে আমার মুখ চাপা দিয়ে বলেন, আজ তুমি কিছু বোলো না। দেশের হাওয়ায় আজ প্রবল একটা উৎপীড়ন আছে— সে লাঠি-সড়কির উৎপীড়ন নয়, তার চেয়ে ভয়ংকর সে অলক্ষ্য উৎপীড়ন। বর্তমান প্রচেষ্টা সম্বন্ধে যাঁদের মনে কিছুমাত্র সংশয় আছে, তাঁরা সেই সংশয় অতি ভয়ে ভয়ে অতি সাবধানে প্রকাশ করলেও পরমুহূর্তেই তার বিরুদ্ধে একটা শাসন ভিতরে ভিতরে উদ্যত হয়ে ওঠে। কোনো একটি খবরের কাগজে একদিন কাপড় পোড়ানো সম্বন্ধে অতি মৃদুমন্দ মধুর কণ্ঠে একটুখানি আপত্তির আভাসমাত্র প্রকাশ পেয়েছিল ; সম্পাদক বলেন, তার পরদিনই পাঠকমণ্ডলীর চাঞ্চল্য তাঁকে চঞ্চল করে তুললে। যে আগুনে কাপড় পুড়েছে সেই আগুনে তাঁর কাগজ পুড়তে কতক্ষণ। দেখতে পাচ্ছি এক পক্ষের লোক অত্যন্ত ব্যস্ত, আরেক পক্ষের লোক অত্যন্ত ত্রস্ত। কথা উঠেছে সমস্ত দেশের বুদ্ধিকে চাপা দিতে হবে, বিদ্যাকেও। কেবল বাধ্যতাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে। কার কাছে বাধ্যতা। মন্ত্রের কাছে, অন্ধবিশ্বাসের কাছে।

কেন বাধ্যতা। আবার সেই রিপুর কথা এসে পড়ে, সেই লোভ। অতি সত্বর অতি দুর্লভ ধন অতি সস্তায় পাবার একটা আশ্বাস দেশের সামনে জাগছে। এ যেন সন্ন্যাসীর মন্ত্রশক্তিতে সোনা ফলাবার আশ্বাস। এই আশ্বাসের প্রলোভনে মানুষ নিজের বিচারবুদ্ধি অনায়াসে জলাঞ্জলি দিতে পারে এবং অন্য যারা জলাঞ্জলি দিতে রাজি হয় না তাদের 'পরে বিষম ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। বাহিরের স্বাতন্ত্র্যের নামে মানুষের অন্তরের স্বাতন্ত্র্যকে এইরূপে বিলুপ্ত করা সহজ হয়। সকলের চেয়ে আক্ষেপের বিষয় এই যে, সকলেই যে এই আশ্বাসে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে তা নয়, কিন্তু তারা বলে, এই প্রলোভনে দেশের একদল লোককে দিয়ে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিয়ে নেওয়া যেতে পারে। "সত্যমেব জয়তে নানৃতম্" এটা যে ভারতের কথা সে ভারত এঁদের মতে স্বরাজ পেতেই পারে না। আরো মুশকিল এই যে, যে লাভের দাবি করা হচ্ছে তার একটা নাম দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সংজ্ঞা দেওয়া হয় নি। ভয়ের কারণটা

অস্পষ্ট হলে সে যেমন অতি ভয়ংকর হয়ে ওঠে, লোভের বিষয়টা অস্পষ্ট হলে তারও প্রবলতা বেড়ে যায়— কেননা তার মধ্যে কল্পনার কোনো বাধা থাকে না এবং প্রত্যেক লোকেই তাকে সম্পূর্ণ নিজের মনের মতো করে গড়ে নিতে পারে। জিজ্ঞাসা দ্বারা তাকে চেপে ধরতে গেলে সে এক আড়াল থেকে আরেক আড়ালে অতি সহজেই গা ঢাকা দেয়। এমনি করে এক দিকে লোভের লক্ষ্যটাকে অনির্দিষ্টতার দ্বারা অত্যন্ত বড়ো করে তোলা হয়েছে, অন্যদিকে তার প্রাপ্তির সাধনাকে সময়ে এবং উপায়ে অত্যন্ত সংকীর্ণভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এমনভাবে লোকের মনকে মোহাবিষ্ট করে তার পরে যখন তাকে বলা হয়, তোমার বুদ্ধিবিদ্যা প্রশ্নবিচার সমস্ত দাও ছাই করে, কেবল থাক্ তোমার বাধ্যতা, তখন সে রাজি হতে বিলম্ব করে না। কিন্তু কোনো একটা বাহ্যানুষ্ঠানের দ্বারা অদূরবর্তী কোনো একটা বিশেষ মাসের বিশেষ তারিখে স্বরাজ লাভ হবে এ কথা যখন অতি সহজেই দেশের অধিকাংশ লোক বিনা তর্কে স্বীকার করে নিলে এবং গদা হাতে সকল তর্ক নিরস্ত করতে প্রবৃত্ত হল, অর্থাৎ নিজের বুদ্ধির স্বাধীনতা বিসর্জন দিলে এবং অন্যের বুদ্ধির স্বাধীনতা হরণ করতে উদ্যত হল, তখন সেটাই কি একটা বিষম ভাবনার কথা হল না। এই ভূতকেই ঝাড়াবার জন্যে কি আমরা ওঝার খোঁজ করি নে। কিন্তু স্বয়ং ভূতই যদি ওঝা হয়ে দেখা দেয় তা হলেই তো বিপদের আর সীমা রইল না।

মহাত্মা তাঁর সত্যপ্রেমের দ্বারা ভারতের হৃদয় জয় করেছেন, সেখানে আমরা সকলেই তাঁর কাছে হার মানি। এই সত্যের শক্তিকে আমরা প্রত্যক্ষ করলুম এজন্য আজ আমরা কৃতার্থ। চিরন্তন সত্যকে আমরা পুঁথিতে পড়ি, কথায় বলি, যেক্ষণে তাকে আমরা সামনে দেখি সে আমাদের পুণ্যক্ষণ। বহুদিনে অকস্মাৎ আমাদের এই সুযোগ ঘটে। কন্‌গ্রেস আমরা প্রতিদিন গড়তে পারি, প্রতিদিন ভাঙতে পারি, ভারতের প্রদেশে প্রদেশে ইংরেজিভাষায় পোলিটিকাল বক্তৃতা দিয়ে বেড়ানোও আমাদের সম্পূর্ণ সাধ্যায়ত্ত, কিন্তু সত্যপ্রেমের যে সোনার কাঠিতে শত বৎসরের সুপ্ত চিত্ত জেগে ওঠে সে তো আমাদের পাড়ার স্যাকরার দোকানে গড়াতে পারি নে। যাঁর হাতে এই দুর্লভ জিনিস দেখলুম তাঁকে আমরা প্রণাম করি।

কিন্তু সত্যকে প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও সত্যের প্রতি আমাদের নিষ্ঠা যদি দৃঢ় না হয় তা হলে ফল হল কী। প্রেমের সত্যকে প্রেমের দিকে যেমন মানি, বুদ্ধির সত্যকে বুদ্ধির দিকে তেমনি আমাদের মানতে হবে। কন্‌গ্রেস প্রভৃতি কোনোরকম বাহ্যানুষ্ঠানে দেশের হৃদয় জাগে নি, মহৎ অন্তরের অকৃত্রিম প্রেমের স্পর্শে জাগল। আন্তরিক সত্যের এই প্রভাব যখন আমরা আজ এমন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তখন

স্বরাজলাভের বেলাতেই কি সেই সত্যকে আর আমরা বিশ্বাস করব না। উদ্‌বোধনের পালায় যাকে মানলুম, অনুষ্ঠানের পালায় তাকে বিসর্জন দিয়ে বসব?

মনে করো আমি বীণার ওস্তাদ খুঁজছি। পূর্বে পশ্চিমে আমি নানা লোককে পরীক্ষা করে দেখলুম কিন্তু হৃদয়ের তৃপ্তি হল না। তারা শব্দ করে খুব, তারা কৌশল জানে বিস্তর, তারা রোজগার করে যথেষ্ট, কিন্তু তাদের বাহাদুরিতে মনে প্রশংসা জাগে, প্রেম জাগে না। অবশেষে হঠাৎ একজনকে খুঁজে পাওয়া গেল তিনি তাঁর তারে দুটি-চারটি মীড় লাগাবামাত্র অন্তরের আনন্দ-উৎসের মুখে এতদিন যে পাথর চাপা ছিল সেটা যেন এক মুহূর্তে গেল গলে। এর কারণ কী। এই ওস্তাদের মনে যে আনন্দময়ী শক্তি আছে সে একটি সত্যকার জিনিস, সে আপন আনন্দশিখা থেকে অতি সহজেই হৃদয়ে হৃদয়ে আনন্দশিখাকে জ্বালিয়ে তোলে। আমি বুঝে নিলুম, তাঁকে ওস্তাদ বলে মানলুম। তার পর আমার দরকার হল একটি বীণা তৈরি করানো। কিন্তু এই বীণা তৈরির বিদ্যায় যে সত্যের দরকার সে আরেক জাতের সত্য। তার মধ্যে অনেক চিন্তা, অনেক শিক্ষা, অনেক বস্তুতত্ত্ব, অনেক মাপজোখ, অনেক অধ্যবসায়। সেখানে আমার ওস্তাদ যদি আমার দরিদ্র অবস্থার প্রতি দয়া করে হঠাৎ বলে বসেন "বাবা, বীণা তৈরি করাতে বিস্তর আয়োজনের দরকার, সে তুমি পেরে উঠবে না, তুমি বরঞ্চ এই কাঠির গায়ে একটা তার বেঁধে ঝংকার দাও; তা হলে অমুক মাসের অমুক তারিখে এই কাঠিই বীণা হয়ে বাজতে থাকবে", তবে সে কথা খাটবে না। আসলে আমার গুরুর উচিত নয় আমার অক্ষমতার প্রতি দয়া করা। এ কথা তাঁর বলাই চাই, "এ-সব জিনিস সংক্ষেপে এবং সস্তায় সারা যায় না।" তিনিই তো আমাদের স্পষ্ট বুঝিয়ে দেবেন যে, বীণার একটি মাত্র তার নয়, এর উপকরণ বিস্তর, এর রচনাবলী সূক্ষ্ম, নিয়মে একটুমাত্র ত্রুটি হলে বেসুর বাজবে, অতএব জ্ঞানের তত্ত্বকে ও নিয়মকে বিচারপূর্বক সযত্নে পালন করতে হবে। দেশের হৃদয়ের গভীরতা থেকে সাড়া বের করা এই হল ওস্তাদজির বীণা বাজানো— এই বিদ্যায় প্রেম যে কত বড়ো সত্য জিনিস সেই কথাটা আমরা মহাত্মাজির কাছ থেকে বিশুদ্ধ করে শিখে নিতে বসেছি, এ সম্বন্ধে তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ থাক্‌। কিন্তু স্বরাজ গড়ে তোলবার তত্ত্ব বহুবিস্তৃত, তার প্রণালী দুঃসাধ্য এবং কালসাধ্য; তাতে যেমন আকাঙ্ক্ষা এবং হৃদয়াবেগ তেমনি তথ্যানুসন্ধান এবং বিচারবুদ্ধি চাই। তাতে যাঁরা অর্থশাস্ত্রবিৎ তাঁদের ভাবতে হবে, যন্ত্রতত্ত্ববিৎ তাঁদের খাটতে হবে, শিক্ষাতত্ত্ববিৎ রাষ্ট্রতত্ত্ববিৎ সকলকেই ধ্যানে এবং কর্মে লাগতে হবে। অর্থাৎ দেশের অন্তঃকরণকে সকল দিক থেকে পূর্ণ উদ্যমে জাগতে হবে। তাতে দেশের লোকের জিজ্ঞাসাবৃত্তি যেন সর্বদা নির্মল ও নিরভিভূত থাকে, কোনো

গূঢ় বা প্রকাণ্ড শাসনের দ্বারা সকলের বুদ্ধিকে যেন ভীরু এবং নিশ্চেষ্ট করে তোলা না হয়। এই যে দেশের বিচিত্র শক্তিকে তলব দেওয়া এবং তাকে নিজের নিজের কাজে লাগানো, এ পারে কে। সকল ডাকে তো দেশ সাড়া দেয় না, পূর্বে তো বারম্বার তার পরীক্ষা হয়ে গেছে। দেশের সকল শক্তিকে দেশের সৃষ্টিকার্যে আজ পর্যন্ত কেউ যোগযুক্ত করতে পারে নি বলেই তো এতদিন আমাদের সময় বয়ে গেল। তাই এতকাল অপেক্ষা করে আছি, দেশের লোককে ডাক দেবার যাঁর সত্য অধিকার আছে তিনিই সকলকে সকলের আত্মশক্তিতে নিযুক্ত করে দেবেন। একদিন ভারতের তপোবনে আমাদের দীক্ষাগুরু তাঁর সত্যজ্ঞানের অধিকারে দেশের সমস্ত ব্রহ্মচারীদের ডেকে বলেছিলেন—

যথাপঃ প্রবতায়ন্তি যথা মাসা অহর্জরম্।
এবং মাং ব্রহ্মচারিণো ধাতরায়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা॥

জলসকল যেমন নিম্নদেশে গমন করে, মাসসকল যেমন সংবৎসরের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি সকল দিক থেকে ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকটে আসুন, স্বাহা। সেদিনকার সেই সত্যদীক্ষার ফল আজও জগতে অমর হয়ে আছে এবং তার আহ্বান এখনও বিশ্বের কানে বাজে। আজ আমাদের কর্মগুরু তেমনি করেই দেশের সমস্ত কর্মশক্তিকে কেন আহ্বান করবেন না, কেন বলবেন না, আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা— তারা সকল দিক থেকে আসুক। দেশের সকল শক্তির জাগরণেই দেশের জাগরণ, এবং সেই সর্বতোভাবে জাগরণেই মুক্তি। মহাত্মাজির কণ্ঠে বিধাতা ডাকবার শক্তি দিয়েছেন, কেননা তাঁর মধ্যে সত্য আছে, অতএব এই তো ছিল আমাদের শুভ অবসর। কিন্তু তিনি ডাক দিলেন একটিমাত্র সংকীর্ণ ক্ষেত্রে। তিনি বললেন, কেবলমাত্র সকলে মিলে সুতো কাটো, কাপড় বোনো। এই ডাক কি সেই "আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা"। এই ডাক কি নবযুগের মহাসৃষ্টির ডাক। বিশ্বপ্রকৃতি যখন মৌমাছিকে মৌচাকের সংকীর্ণ জীবনযাত্রায় ডাক দিলেন তখন লক্ষ লক্ষ মৌমাছি সেই আহ্বানে কর্মের সুবিধার জন্য নিজেকে ক্লীব করে দিলে ; আপনাকে খর্ব করার দ্বারা এই-যে তাদের আত্মত্যাগ এতে তারা মুক্তির উলটো পথে গেল। যে দেশের অধিকাংশ লোক কোনো প্রলোভনে বা অনুশাসনে অন্ধভাবে নিজের শক্তির ক্লীবত্ব সাধন করতে কুণ্ঠিত হয় না, তাদের বন্দিদশা যে তাদের নিজের অন্তরের মধ্যেই। চরকা কাটা এক দিকে অত্যন্ত সহজ, সেইজন্যেই সকল মানুষের পক্ষে তা শক্ত। সহজের ডাক মানুষের নয়, সহজের ডাক মৌমাছির। মানুষের কাছে তার চূড়ান্ত শক্তির দাবি করলে তবেই সে আত্মপ্রকাশের ঐশ্বর্য উদ্‌ঘাটিত করতে পারে। স্পার্টা বিশেষ লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে মানুষের

শক্তিকে সংকীর্ণ করে তাকে বল দেবার চেষ্টা করেছিল, স্পার্টার জয় হয় নি ; এথেন্স্ মানুষের সকল শক্তিকে উন্মুক্ত করে তাকে পূর্ণতা দিতে চেয়েছিল, এথেন্সের জয় হয়েছে ; তার সেই জয়পতাকা আজও মানবসভ্যতার শিখরচূড়ায় উড়ছে। য়ুরোপে সৈনিকাবাসে কারখানাঘরে মানবশক্তির ক্লীবত্বসাধন করছে না কি— লোভের বশে উদ্দেশ্যসাধনের খাতিরে মানুষের মনুষ্যত্বকে সংকীর্ণ করে ছেঁটে দিচ্ছে না কি। আর এইজন্যেই কি য়ুরোপীয় সমাজে আজ নিরানন্দ ঘনীভূত হয়ে উঠছে না। বড়ো কলের দ্বারাও মানুষকে ছোটো করা যায়, ছোটো কলের দ্বারাও করা যায়। এঞ্জিনের দ্বারাও করা যায়, চরকার দ্বারাও। চরকা যেখানে স্বাভাবিক সেখানে সে কোনো উপদ্রব করে না, বরঞ্চ উপকার করে— মানবমনের বৈচিত্র্যবশতই চরকা যেখানে স্বাভাবিক নয় সেখানে চরকায় সুতা কাটার চেয়ে মন কাটা যায় অনেকখানি। মন জিনিসটা সুতার চেয়ে কম মূল্যবান নয়।

একটি কথা উঠেছে এই যে, ভারতে শতকরা আশিজন লোক চাষ করে এবং তারা বছরে ছয় মাস বেকার থাকে, তাদের সুতা কাটতে উৎসাহিত করবার জন্যে কিছুকাল সকল ভদ্রলোকেরই চরকা ধরা দরকার। প্রথম আবশ্যক হচ্ছে যথোচিত উপায়ে তথ্যানুসন্ধান দ্বারা এই কথাটি প্রতিপন্ন করা। অর্থাৎ কী পরিমাণ চাষা কতদিন পরিমাণ বেকার থাকে। যখন চাষ বন্ধ তখন চাষারা কোনো উপায়ে যে পরিমাণ জীবিকা অর্জন করে সুতাকাটার দ্বারা তার চেয়ে বেশি অর্জন করবে কি না। চাষ ব্যতিরেকে জীবিকার একটিমাত্র উপায়ের দ্বারা সমস্ত কৃষাণকে বদ্ধ করা দেশের কল্যাণের পক্ষে উচিত কি না সে সম্বন্ধেও সন্দেহ আছে। কিন্তু মূল কথা এই যে, কারো মুখের কথায় কোনো অনুমানমাত্রের উপর নির্ভর করে আমরা সর্বজনীন কোনো পন্থা অবলম্বন করতে পারব না, আমরা বিশ্বাসযোগ্য প্রণালীতে তথ্যানুসন্ধান দাবি করি। তার পরে উপায়ের যথাযোগ্যতা সম্বন্ধে বিচার করা সম্ভবপর।

আমাকে কেউ কেউ বলেছেন, দেশের চিত্তশক্তিকে আমরা তো চিরদিনের জন্যে সংকীর্ণ করতে চাই নে, কেবল অতি অল্পকালের জন্যে। কেনই-বা অল্পকালের জন্যে। যেহেতু এই অল্পকালের মধ্যে এই উপায়ে আমরা স্বরাজ পাব? তার যুক্তি কোথায়। স্বরাজ তো কেবল নিজের কাপড় নিজে জোগানো নয়। স্বরাজ তো একমাত্র আমাদের বস্ত্রস্বচ্ছলতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তার যথার্থ ভিত্তি আমাদের মনের উপর, সেই মন তার বহুধাশক্তির দ্বারা এবং সেই আত্মশক্তির উপর আস্থা দ্বারা, স্বরাজ সৃষ্টি করতে থাকে। এই স্বরাজসৃষ্টি কোনো দেশেই তো শেষ হয় নি— সকল

দেশেই কোনো-না-কোনো অংশে লোভ বা মোহের প্ররোচনায় বন্ধনদশা থেকে গেছে। কিন্তু সেই বন্ধনদশার কারণ মানুষের চিত্তে। যে-সকল দেশে নিরন্তর এই চিত্তের উপর দাবি করা হচ্ছে। আমাদের দেশেও সেই চিত্তের বিকাশের উপরেই স্বরাজ দাঁড়াতে পারবে। তার জন্যে কোনো বাহ্য ক্রিয়া বাহ্য ফল নয়, জ্ঞান বিজ্ঞান চাই। দেশের চিত্তপ্রতিষ্ঠিত এই স্বরাজকে অল্পকাল কয়েকদিন চরকা কেটে আমরা পাব, এর যুক্তি কোথায়। যুক্তির পরিবর্তে উক্তি তো কোনোমতেই চলবে না। মানুষের মুখে যদি আমরা দৈববাণী শুনতে আরম্ভ করি তা হলে আমাদের দেশে, যে হাজার রকমের মারাত্মক উপসর্গ আছে এই দৈববাণী যে তারই মধ্যে অন্যতম এবং প্রবলতম হয়ে উঠবে। একবার যদি দেখা যায় যে, দৈববাণী ছাড়া আর-কিছুতেই আমাদের দেশ নড়ে না, তা হলে আশু প্রয়োজনের গরজে সকালে সন্ধ্যায় দৈববাণী বানাতে হবে, অন্য সকল রকম বাণীই নিরস্ত হয়ে যাবে। যেখানে যুক্তির অধিকার সেখানে উক্তি দিয়ে যাদের ভোলাতে হবে, তাদের পক্ষে, যেখানে আত্মার অধিকার সেখানে কোনো-না-কোনো কর্তার আসন পড়বেই। তারা স্বরাজের গোড়া কেটে বসে আছে, আগায় জল ঢেলে কোনো ফল হবে না। এ কথা মানছি, আমাদের দেশে দৈববাণী, দৈব ঔষধ, বাহ্যব্যাপারে দৈবক্রিয়া, এ-সবের প্রভাব খুবই বেশি— কিন্তু সেইজন্যেই আমাদের দেশে স্বরাজের ভিতপত্তন করতে হলে দৈববাণীর আসনে বিশেষ করে বুদ্ধির বাণীকে পাকা করে বসাতে হবে। কেননা, আমার পূর্বের প্রবন্ধে বলেছি, দৈব স্বয়ং আধিভৌতিক রাজ্যে বুদ্ধির রাজ্যাভিষেক করেছেন। তাই আজ বাইরের বিশ্বে তারাই স্বরাজ পাবে এবং তাকে রক্ষা করতে পারবে যারা আত্মবুদ্ধির জোরে আত্মকর্তৃত্বের গৌরব উপলব্ধি করতে পারে— যারা সেই গৌরবকে কোনো লোভে কোনো মোহে পরের পদানত করতে চায় না। এই-যে আজ বস্ত্রাভাবে লজ্জাকাতরা মাতৃভূমির প্রাঙ্গণে রাশীকৃত করে কাপড় পোড়ানো চলছে, কোন্ বাণীতে দেশের কাছে আজ তার তাগিদ আসছে। সে কি ঐ দৈববাণীতে নয়। কাপড় ব্যবহার বা বর্জন ব্যাপারে অর্থশাস্ত্রিকতত্ত্বের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, এ-সম্বন্ধে সেই তত্ত্বের ভাষাতেই দেশের সঙ্গে কথা কইতে হবে; বুদ্ধির ভাষা মান্য করা যদি বহুদিন থেকে দেশের অভ্যাসবিরুদ্ধ হয়, তবে আর-সব ছেড়ে দিয়ে ঐ অনভ্যাসের সঙ্গেই লড়াই করতে হবে। কেননা এই অনভ্যাসই আমাদের পক্ষে গোড়ায় গলদ, original sin। সেই গলদটারই খাতিরে সেই গলদকেই প্রশ্রয় দিয়ে আজ ঘোষণা করা হয়েছে, বিদেশী কাপড় অপবিত্র অতএব তাকে দগ্ধ করো। অর্থশাস্ত্রকে বহিষ্কৃত করে তার জায়গায় ধর্মশাস্ত্রকে জোর করে টেনে আনা হল।

অপবিত্র কথাটা ধর্মশাস্ত্রের কথা— অর্থের নিয়মের উপরের কথা। মিথ্যাকে বর্জন করতে হবে কেন, মিথ্যা অপবিত্র কেন, তার দ্বারা আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না বা নষ্ট হয় বলেই যে তা নয়। হোক বা না হোক, তার দ্বারা আমাদের আত্মা মলিন হয়। অতএব এ-ক্ষেত্রে অর্থশাস্ত্র বা রাষ্ট্রশাস্ত্রের কথা খাটে না, এখানে ধর্মশাস্ত্রেরই বাণী প্রবল। কিন্তু কোনো কাপড় পরা বা না-পরার মধ্যে যদি কোনো ভুল থাকে তবে সেটা অর্থতত্ত্বের বা স্বাস্থ্যতত্ত্বের বা সৌন্দর্যতত্ত্বের ভুল— এটা ধর্মতত্ত্বের ভুল নয়। এর উত্তরে কেউ কেউ বলেন, যে ভুলে দেহমনের দুঃখ আনয়ন করে সেইটেই অধর্ম। আমি তার উত্তরে এই বলি, ভুলমাত্রেই দুঃখ আছে— জিয়োমেট্রির ভুলে রাস্তা খারাপ হয়, ভিত বাঁকা হয়, সাঁকো নির্মাণে এমন গলদ ঘটে যে, তার উপর রেলগাড়ি চললে ভয়ংকর দুর্ঘটনা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই ভুলের সংশোধন ধর্মশাস্ত্রের মতে হয় না। অর্থাৎ ছেলেরা যে খাতায় জিয়োমেট্রির ভুল করে, অপবিত্র বলে সেই খাতা নষ্ট করে এ ভুলের সংশোধন হয় না, জিয়োমেট্রিরই সত্য নিয়মে সেই খাতাকে সংশোধন করতে হবে। কিন্তু মাস্টারমশায়ের মনে এ কথা উঠতে পারে যে, ভুলের খাতাকে অপবিত্র যদি না বলি, তা হলে এরা ভুলকে ভুল বলে গণ্য করবে না। তা যদি সত্য হয়, তা হলে অন্য-সব কাজ ছেড়ে সকলপ্রকার উপায়ে এই চিত্তগত দোষকে সংশোধন করতে হবে, তবেই এ ছেলেরা মানুষ হতে পারবে। কাপড় পোড়ানোর হুকুম আজ আমাদের 'পরে এসেছে। সেই হুকুমকে হুকুম বলে আমি মানতে পারব না, তার প্রথম কারণ হচ্ছে এই যে, চোখ বুজে হুকুম মানার বিষম বিপত্তি থেকে দেশকে উদ্ধার করবার জন্যে আমাদের লড়তে হবে— এক হুকুম থেকে আরেক হুকুমে তাকে ঘুরিয়ে হুকুম-সমুদ্রের সাতঘাটে তাকে জল খাইয়ে মারতে পারব না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে, যে কাপড় পোড়ানোর আয়োজন চলছে সে আমার কাপড় নয়, বস্তুত দেশবাসীদের মধ্যে যাদের আজ কাপড় নেই এ কাপড় তাদেরই, ও কাপড় আমি পোড়াবার কে। যদি তারা বলে 'পোড়াও' তা হলে অন্তত আত্মঘাতীর 'পরেই আত্মহত্যার ভার দেওয়া হয়, তাকে বধ করবার ভার আমাদের উপর পড়ে না। যে মানুষ ত্যাগ করছে তার অনেক কাপড় আছে আর যাকে জোর করে ত্যাগদুঃখ ভোগ করাচ্ছি কাপড়ের অভাবে সে ঘরের বার হতে পারছে না। এমনতরো জবর্দস্তির প্রায়শ্চিত্তে পাপক্ষালন হয় না। বার বার বলেছি আবার বলব, বাহ্য ফলের লোভে আমরা মনকে খোয়াতে পারব না। যে কলের দৌরাত্ম্যে সমস্ত পৃথিবী পীড়িত মহাত্মাজি সেই কলের সঙ্গে লড়াই করতে চান, এখানে আমরা তাঁর দলে। কিন্তু যে মোহমুগ্ধ মন্ত্রমুগ্ধ অন্ধবাধ্যতা আমাদের দেশের সকল দৈন্য ও অপমানের মূলে,

তাকে সহায় করে এ লড়াই করতে পারব না। কেননা তারই সঙ্গে আমাদের প্রধান লড়াই, তাকে তাড়াতে পারলে তবেই আমরা অন্তরে বাহিরে স্বরাজ পাব।

কাপড় পোড়াতে আমি রাজি আছি, কিন্তু কোনো উক্তির তাড়নায় নয়। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা যথেষ্ট সময় নিয়ে যথোচিত উপায়ে প্রমাণ সংগ্রহ করুন এবং সুযুক্তি দ্বারা আমাদের বুঝিয়ে দিন যে, কাপড়-পরা সম্বন্ধে আমাদের দেশ অর্থনৈতিক যে অপরাধ করেছে অর্থনৈতিক কোন্ ব্যবস্থার দ্বারা তার প্রতিকার হতে পারে। বিনা প্রমাণে বিনা যুক্তিতে কেমন করে নিশ্চিত বলব যে, বিশেষ একটা কাপড় পরে আমরা আর্থিক যে অপরাধ করেছি কাপড়টাকে পুড়িয়ে সেই অপরাধের মূলটাকে আরও বিস্তারিত করে দিচ্ছি নে, ম্যাঞ্চেস্টারের ফাঁস তাতে পরিণামে ও পরিমাণে আরও কঠিন হয়ে উঠবে না? এ তর্ক আমি বিশেষজ্ঞভাবে উত্থাপিত করছি নে, কেননা আমি বিশেষজ্ঞ নই, আমি জিজ্ঞাসুভাবেই করছি। বিশেষজ্ঞ যা বলেন তাই যে বেদবাক্য আমি তা বলি নে। কিন্তু সুবিধা এই যে, বেদবাক্যের ছন্দে তাঁরা কথা বলেন না। প্রকাশ্য সভায় তাঁরা আমাদের বুদ্ধিকে আহ্বান করেন।

একটি কথা আমাদের মনে ভাববার দিন এসেছে, সে হচ্ছে এই— ভারতের আজকের এই উদ্‌বোধন সমস্ত পৃথিবীর উদ্‌বোধনের অঙ্গ। একটি মহাযুদ্ধের তূর্যধ্বনিতে আজ যুগারম্ভের দ্বার খুলেছে। মহাভারতে পড়েছি, আত্মপ্রকাশের পূর্ববর্তী কাল হচ্ছে অজ্ঞাতবাসের কাল। কিছুকাল থেকে পৃথিবীতে মানুষ যে পরস্পর কী রকম ঘনিষ্ঠ হয়ে এসেছে সে কথাটা স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও অজ্ঞাত ছিল। অর্থাৎ ঘটনাটা বাইরে ছিল, আমাদের মনে প্রবেশ করে নি। যুদ্ধের আঘাতে এক মুহূর্তে সমস্ত পৃথিবীর মানুষ যখন বিচলিত হয়ে উঠল তখন এই কথাটা আর লুকোনো রইল না। হঠাৎ এক দিনে আধুনিক সভ্যতা অর্থাৎ পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত কেঁপে উঠল। বোঝা গেল এই কেঁপে ওঠার কারণটা স্থানিক নয় এবং ক্ষণিক নয়— এর কারণ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ এক মহাদেশ থেকে আর-এক মহাদেশে ব্যাপ্ত, তার মধ্যে সত্যের সামঞ্জস্য যতক্ষণ না ঘটবে ততক্ষণ এই কারণের নিবৃত্তি হবে না। এখন থেকে যে-কোনো জাত নিজের দেশকে একান্ত স্বতন্ত্র করে দেখবে বর্তমান যুগের সঙ্গে তার বিরোধ ঘটবে, সে কিছুতেই শান্তি পাবে না। এখন থেকে প্রত্যেক দেশকে নিজের জন্যে যে চিন্তা করতে হবে তার সে চিন্তার ক্ষেত্র হবে জগৎজোড়া। চিত্তের এই বিশ্বমুখী বৃত্তির চর্চা করাই বর্তমান যুগের শিক্ষার সাধনা। কিছুদিন থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ভারতরাষ্ট্রশাসনে একটা মূলনীতির পরিবর্তন হচ্ছে। এই পরিবর্তনের মূলে আছে ভারতরাষ্ট্রসমস্যাকে বিশ্বসমস্যার অন্তর্গত করে দেখবার চেষ্টা।

যুদ্ধ আমাদের মনের সামনে থেকে একটা পর্দা ছিঁড়ে দিয়েছে— যা বিশ্বের স্বার্থ নয় তা যে আমাদের নিজের স্বার্থের বিরোধী এই কথাকে মানুষ, পুঁথির পাতায় নয়, ব্যবহারের ক্ষেত্রে আজ দেখতে পাচ্ছে; এবং সে বুঝছে, যেখানে অন্যায় আছে সেখানে বাহ্য অধিকার থাকলেও সত্য অধিকার থাকে না। বাহ্য অধিকারকে খর্ব করেও যদি সত্য অধিকার পাওয়া যায় তবে সেটাতে লাভ ছাড়া লোকসান নেই। মানুষের মধ্যে এই-যে একটা বুদ্ধির বিরাট পরিবর্তন ঘটছে, তার চিত্ত সংকীর্ণ থেকে ভূমার দিকে যাচ্ছে, তারই হাত এই ভারতরাষ্ট্রনীতি-পরিবর্তনের মধ্যে কাজ করতে আরম্ভ করেছে। এর মধ্যে যথেষ্ট অসম্পূর্ণতা ও প্রভূত বাধা আছে— স্বার্থবুদ্ধি শুভবুদ্ধিকে পদে পদে আক্রমণ করবেই; তাই বলে এ কথা মনে করা অন্যায় যে, এই শুভবুদ্ধিই সম্পূর্ণ কপটতা এবং স্বার্থবুদ্ধিই সম্পূর্ণ অকৃত্রিম। আমার এই ষাট বৎসরের অভিজ্ঞতায় একটি কথা জেনেছি যে, কপটতার মতো দুঃসাধ্য অতএব দুর্লভ জিনিস আর নেই। খাঁটি কপট মানুষ হচ্ছে ক্ষণজন্মা লোক, অতি অকস্মাৎ তার আবির্ভাব ঘটে। আসল কথা, সকল মানুষের মধ্যেই কমবেশি পরিমাণে চারিত্রের দ্বৈধ আছে। আমাদের বুদ্ধির মধ্যে লজিকের যে কল পাতা তাতে দুই বিরোধী পদার্থকে ধরানো কঠিন বলেই ভালোর সঙ্গে যখন মন্দকে দেখি তখন তাড়াতাড়ি ঠিক করে নিই, এর মধ্যে ভালোটাই চাতুরী। আজকের দিনে পৃথিবীতে সর্বজনীন যে-সকল প্রচেষ্টা চলছে তার মধ্যে পদে পদে মানুষের এই চারিত্রের দ্বৈধ দেখা যাবে। সে অবস্থায় তাকে যদি তার অতীত-যুগের দিক থেকে বিচার করি তা হলে তার স্বার্থবুদ্ধিকে মনে করব খাঁটি, কারণ, তার অতীতের নীতি ছিল ভেদবুদ্ধির নীতি। কিন্তু তাকে যদি আমাদের আগামীকালের দিক থেকে বিচার করি তা হলে বুঝব শুভবুদ্ধিটাই খাঁটি। কেননা ভাবী যুগের একটা প্রেরণা এসেছে মানুষকে সংযুক্ত করবার জন্যে। যে বুদ্ধি সকলকে সংযুক্ত করে সেই হচ্ছে শুভবুদ্ধি। এই-যে লীগ অফ নেশন্‌স্‌ -প্রতিষ্ঠা বা ভারতশাসনসংস্কার, এ-সব হচ্ছে ভাবী যুগ সম্বন্ধে পশ্চিমদেশের বাণী। এ বাণী সত্যকে যদি-বা সম্পূর্ণ প্রকাশ না করে, এর চেষ্টা হচ্ছে সেই সত্যের অভিমুখে।

আজ এই বিশ্বচিত্ত-উদ্‌বোধনের প্রভাতে আমাদের দেশে জাতীয় কোনো প্রচেষ্টার মধ্যে যদি বিশ্বের সর্বজনীন কোনো বাণী না থাকে তা হলে তাতে আমাদের দীনতা প্রকাশ করবে। আমি বলছি নে, আমাদের আশু প্রয়োজনের যা-কিছু কাজ আছে তা আমরা ছেড়ে দেব। সকালবেলায় পাখি যখন জাগে তখন কেবলমাত্র আহার-অন্বেষণে তার সমস্ত জাগরণ নিযুক্ত থাকে না, আকাশের আহ্বানে তার দুই অক্লান্ত পাখা সায় দেয় এবং আলোকের আনন্দে তার কণ্ঠে গান জেগে ওঠে। আজ

সর্বমানবের চিত্ত আমাদের চিত্তে তার ডাক পাঠিয়েছে ; আমাদের চিত্ত আমাদের ভাষায় তার সাড়া দিক— কেননা ডাকের যোগ্য সাড়া দেওয়ার ক্ষমতাই হচ্ছে প্রাণশক্তির লক্ষণ। একদা যখন পরমুখাপেক্ষী পলিটিক্‌সে সংসক্ত ছিলুম, তখন আমরা কেবলই পরের অপরাধের তালিকা আউড়ে পরকে তার কর্তব্যত্রুটি স্মরণ করিয়েছি— আজ যখন আমরা পরপরায়ণতা থেকে আমাদের পলিটিক্‌স্‌কে ছিন্ন করতে চাই, আজও সেই পরের অপরাধ জপের দ্বারাই আমাদের বর্জননীতির পোষণপালন করতে চাচ্ছি। তাতে উত্তরোত্তর আমাদের যে মনোভাব প্রবল হয়ে উঠছে সে আমাদের চিত্তের আকাশে রক্তবর্ণ ধুলো উড়িয়ে বৃহৎ জগৎ থেকে আমাদের চিন্তাকে আবৃত করে রাখছে। প্রবৃত্তির দ্রুত চরিতার্থতার দিকে আমাদের উত্তেজনা সে কেবলই বাড়িয়ে তুলছে। সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত ভারতের বিরাট রূপ চোখে না পড়াতে আমাদের কর্মে ও চিন্তায় ভারতের যে পরিচয় আমরা দিতে প্রবৃত্ত হয়েছি সে অতি ছোটো, তার দীপ্তি নেই ; সে আমাদের ব্যবসায়বুদ্ধিকেই প্রধান করে তুলছে। এই বুদ্ধি কখনো কোনো বড়ো জিনিসকে সৃষ্টি করে নি। আজ পশ্চিম দেশে এই ব্যবসায়বুদ্ধিকে অতিক্রম করে শুভবুদ্ধি জাগিয়ে তোলবার জন্যে একটা আকাঙ্ক্ষা এবং উদ্যম দেখা দিয়েছে। সেখানে কত লোক দেখেছি যারা এই সংকল্পকে মনের মধ্যে নিয়ে আজ সন্ন্যাসী। অর্থাৎ যারা স্বাজাত্যের বাঁধন কেটে ঐক্যের সাধনায় ঘরছাড়া হয়ে বেরিয়েছে, যারা নিজের অন্তরে মানুষের ভিতরকার অদ্বৈতকে দেখেছে। সেইসব সন্ন্যাসীকে ইংরেজের মধ্যে অনেক দেখেছি ; তাঁরা তাঁদের স্বজাতির আত্মম্ভরিতা থেকে দুর্বলকে রক্ষা করবার সাধনায় স্বজাতির কাছ থেকে আঘাত ও অপমান স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন নি। সেই রকম সন্ন্যাসী দেখেছি ফ্রান্সে, যেমন রোমাঁ্যা রলাঁ— তিনি তাঁর দেশের লোকের দ্বারা বর্জিত। সেই রকম সন্ন্যাসী আমি য়ুরোপের অপেক্ষাকৃত অখ্যাত দেশের প্রান্তে দেখেছি। দেখেছি য়ুরোপের কত ছাত্রের মধ্যে ; সর্বমানবের ঐক্যসাধনায় তাদের মুখচ্ছবি দীপ্যমান। তারা ভাবী যুগের মহিমায় বর্তমান যুগের সমস্ত আঘাত ধৈর্যের সঙ্গে বহন করতে চায়, সমস্ত অপমান বীর্যের সঙ্গে ক্ষমা করতে চায়। আর আমরাই কি কেবল যেমন "পঞ্চকন্যাং স্মরেন্নিত্যং" তেমনি করে আজ এই শুভদিনের প্রভাতে কেবল পরের অপরাধ স্মরণ করব, এবং আমাদের জাতীয় সৃষ্টিকার্য একটা কলহের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে থাকব। আমরা কি এই প্রভাতে সেই শুভবুদ্ধিদাতাকে স্মরণ করব না— য একঃ, যিনি এক ; অবর্ণঃ, যিনি বর্ণহীন, যাঁর মধ্যে সাদা কালো নেই ; বহুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি, যিনি বহুধাশক্তির যোগে

অনেক বর্ণের লোকের জন্য তাদের অন্তর্নিহিত প্রয়োজন বিধান করেছেন ; আর তাঁরই কাছে কি প্রার্থনা করব না, স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু, তিনি আমাদের সকলকে শুভবুদ্ধি দ্বারা সংযুক্ত করুন।

১৩২৮

সমস্যা

যে ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসে, তাদের সংখ্যা দশ-বিশ হাজার হয়ে থাকে, কিন্তু তাদের সকলেরই পক্ষে একই প্রশ্ন, এক কালিতে একই অক্ষরে ছাপানো। সেই একই প্রশ্নের একই সত্য উত্তর দিতে পারলে তবে ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তীর্ণ হয়ে পদবী পায়। এইজন্যে পার্শ্ববর্তী পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে উত্তর চুরি করেও কাজ চলে। কিন্তু বিধাতার পরীক্ষার নিয়ম এত সহজ নয়। এক-এক জাতির কাছে তিনি এক-একটি স্বতন্ত্র সমস্যা পাঠিয়েছেন। সেই সমস্যার সত্য মীমাংসা তারা নিজে উদ্ভাবন করলে তবেই তারা তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পাবে ও মান পাবে। ভারতকেও তিনি একটি বিশেষ সমস্যা দিয়েছেন, যতদিন না তার সত্য মীমাংসা হবে ততদিন ভারতের দুঃখ কিছুতেই শান্ত হবে না। আমরা চাতুরী খাটিয়ে য়ুরোপের পরীক্ষাপত্র থেকে উত্তর চুরি করছি। একদিন বোকার মতো করছিলুম মাছি-মারা নকল, আজকে বুদ্ধিমানের মতো করছি ভাষার কিছু বদল ঘটিয়ে। পরীক্ষক বারে বারে তার পাশে নীল পেনসিল দিয়ে যে গোল গোল চিহ্ন কাটছেন তার সব-কটাকেও একত্র যোগ করতে গেলে বিয়োগান্ত হয়ে ওঠে।

বায়ুমণ্ডলে ঝড় জিনিসটাকে আমরা দুর্যোগ বলেই জানি। সে যেন রাগী আকাশটার কিল চড় লাথি ঘুষোর আকারে আসতে থাকে। এই প্রহারটা তো হল একটা লক্ষণ। কিসের লক্ষণ। আসল কথা, যে বায়ুস্তরগুলো পাশাপাশি আছে, যে প্রতিবেশীদের মধ্যে মিল থাকা উচিত ছিল, তাদের মধ্যে ভেদ ঘটেছে। এক অংশের বড়ো বেশি গৌরব, আর-এক অংশের বড়ো বেশি লাঘব হয়েছে। এ তো সহ্য হয় না, তাই ইন্দ্রদেবের বজ্র গড়্‌গড়্‌ করে ওঠে, পবনদেবের ভেঁপু হু-হু করে হুংকার দিতে থাকে। যতক্ষণ প্রতিবেশীদের মধ্যে সাম্যসাধন না হয়, হাওয়ায় হাওয়ায় পংক্তিভেদ ঘুচে না যায়, ততক্ষণ শান্তি হয় না, ততক্ষণ দেবতার রাগ মেটে না। যাদের মধ্যে পরস্পর মিলে চলবার সম্বন্ধ তাদের মধ্যে ভেদ ঘটলেই তুমুলকাণ্ড

বেধে যায়। তখন ঐ-যে অরণ্যটার গাম্ভীর্য নষ্ট হয়ে যায়, ঐ-যে সমুদ্রটা পাগলামি করতে থাকে, তাদের দোষ দিয়ে বা তাদের কাছে শান্তিশতক আউড়িয়ে কোনো ফল নেই। কান পেতে শুনে নাও, স্বর্গে মর্ত্যে এই রব উঠল, "ভেদ ঘটেছে, ভেদ ঘটেছে।"

এই হাওয়ার মধ্যে যে কথা, মানুষের মধ্যেও তাই। বাইরে থেকে যারা কাছাকাছি ভিতরের থেকে তাদের যদি ভেদ ঘটল, তা হলে ঐ ভেদটাই হল মূল বিপদ। যতক্ষণ সেটা আছে ততক্ষণ ইন্দ্রদেবের বজ্রকে, উনপঞ্চাশ পবনের চপেটাঘাতকে, বৈধ বা অবৈধ আন্দোলনের দ্বারা দমন করবার চেষ্টা করে ঝড়ের আন্দোলন কিছুতেই থামানো যায় না।

আমরা যখন বলি স্বাধীনতা চাই তখন কী চাই, সেটা ভেবে দেখা চাই। মানুষ যেখানে সম্পূর্ণ একলা সেইখানে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। সেখানে তার কারো সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই, কারো কাছে কোনো দায়িত্ব নেই, কারো প্রতি কোনো নির্ভর নেই, সেখানে তার স্বাতন্ত্র্যে লেশমাত্র হস্তক্ষেপ করবার কোনো মানুষই নেই। কিন্তু মানুষ এ স্বাধীনতা কেবল যে চায় না তা নয়, পেলে বিষম দুঃখ বোধ করে। রবিন্‌সন্‌ ক্রুসো তার জনহীন দ্বীপে যতখন একেবারে একলা ছিল ততখন সে একেবারে স্বাধীন ছিল। যখনই ফ্রাইডে এল তখনই তার সেই একান্ত স্বাধীনতা চলে গেল। তখন ফ্রাইডের সঙ্গে তার একটা পরস্পর-সম্বন্ধ বেধে গেল। সম্বন্ধ মাত্রেই অধীনতা। এমন-কি, প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধে প্রভুও ভৃত্যের অধীন। কিন্তু রবিন্‌সন্‌ ক্রুসো ফ্রাইডের সঙ্গে পরস্পর-দায়িত্বে জড়িত হয়েও নিজের স্বাধীনতার ক্ষতিজনিত দুঃখ কেন বোধ করে নি। কেননা, তাদের সম্বন্ধের মধ্যে ভেদের বাধা ছিল না। সম্বন্ধের মধ্যে ভেদ আসে কোথায়। যেখানে অবিশ্বাস আসে, ভয় আসে, যেখানে উভয়ে উভয়কে ঠকিয়ে জিততে চায়, যেখানে উভয়ের সঙ্গে উভয়ের ব্যবহারে সহজভাব থাকে না। ফ্রাইডে যদি হিংস্র বর্বর অবিশ্বাসী হত তা হলে তার সম্বন্ধে রবিন্‌সন্‌ ক্রুসোর স্বাধীনতা নষ্ট হত। যার সঙ্গে আমার সম্বন্ধের পূর্ণতা নেই, অর্থাৎ যার প্রতি আমি উদাসীন, সে আমাকে টেনে রাখে না, কিন্তু তাই বলেই যে তারই সম্পর্কে আমি স্বাধীনতার যথার্থ আনন্দ ভোগ করি তা নয়। যার সঙ্গে আমার সম্বন্ধের পূর্ণতা, যে আমার পরম বন্ধু, সুতরাং যে আমাকে বাঁধে, আমার চিত্ত তারই সম্বন্ধের মধ্যে স্বাধীনতা পায়, কোনো বাধা পায় না। যে স্বাধীনতা সম্বন্ধহীনতায় সেটা নেতিসূচক, সেই শূন্যতামূলক স্বাধীনতায় মানুষকে পীড়া দেয়। এর কারণ হচ্ছে, অসম্বদ্ধ মানুষ সত্য নয়, অন্যের সঙ্গে— সকলের সঙ্গে সম্বন্ধের ভিতর দিয়েই সে নিজের সত্যতা উপলব্ধি

করে। এই সত্যতা-উপলব্ধির বাধায় অর্থাৎ সম্বন্ধের ভেদে, অসম্পূর্ণতায়, বিকৃতিতেই তার স্বাধীনতার বাধা। কেননা, ইতিসূচক স্বাধীনতাই মানুষের যথার্থ স্বাধীনতা। মানুষের গার্হস্থ্যের মধ্যে বা রাজ্যের মধ্যে বিপ্লব বাধে কখন, না, যখন পরস্পরের সহজ সম্বন্ধের বিপর্যয় ঘটে। যখন ভাইদের মধ্যে সন্দেহ বা ঈর্ষা বা লোভ প্রবেশ ক'রে তাদের সম্বন্ধকে পীড়িত করতে থাকে— তখন তারা পরস্পরের মধ্যে বাধা পায়, কেবলই ঠোকর খেয়ে খেয়ে পড়ে, তাদের জীবনযাত্রার প্রবাহ পদে পদে প্রতিহত হয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তখন পরিবারে বিপ্লব ঘটে। রাষ্ট্রবিপ্লবও সম্বন্ধভেদের বিপ্লব। কারণ সম্বন্ধভেদেই অশান্তি, সেই অশান্তিতেই স্বাধীনতার ক্ষতি। আমাদের ধর্মসাধনাতেও কোন্ মুক্তিকে মুক্তি বলে। যে মুক্তিতে অহংকার দূর করে দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে চিত্তের পূর্ণ যোগ সাধন করে। তার কারণ, বিশ্বের সঙ্গে যোগেই মানুষ সত্য— এইজন্যে সেই সত্যের মধ্যেই মানুষ যথার্থ স্বাধীনতা পায়। আমরা একান্ত স্বাধীনতার শূন্যতাকে চাই নে, আমরা ভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে সম্বন্ধের পরিপূর্ণতাকে চাই, তাকেই বলি মুক্তি। যখন দেশের স্বাধীনতা চাই, তখন নেতিসূচক স্বাধীনতা চাই নে, তখন দেশের সকল লোকের সঙ্গে সম্বন্ধকে যথাসম্ভব সত্য বাধামুক্ত করতে চাই। সেটা হয় ভেদের কারণ দূর করে দিয়ে, কিন্তু সে কারণ ভিতরেও থাকতে পারে, বাইরেও থাকতে পারে। আমরা পশ্চিমের ইতিহাসে পড়েছি, সেখানকার লোকেরা স্বাধীনতা চাই বলে প্রায় মাঝে মাঝে কোলাহল তুলেছে। আমরাও সেই কোলাহলের অনুকরণ করি, আমরাও বলি আমরা স্বাধীনতা চাই। আমাদের এই কথাটি স্পষ্ট করে বুঝতে হবে যে, য়ুরোপ যখন বলেছে স্বাধীনতা চাই তখন বিশেষ অবস্থায় বিশেষ কারণে তার সমাজদেহের মধ্যে ভেদের দুঃখ ঘটেছিল— সমাজবর্তী লোকদের মধ্যে কোনো-না-কোনো বিষয়ে কোনো-না-কোনো আকারে সম্বন্ধের বিচ্ছেদ বা বিকৃতি ঘটেছিল, সেইটেকে দূর করার দ্বারাই তারা মুক্তি পেয়েছে। আমরাও যখন বলি স্বাধীনতা চাই তখন ভাবতে হবে কোন্ ভেদটা আমাদের দুঃখ-অকল্যাণের কারণ— নইলে স্বাধীনতা শব্দটা কেবল ইতিহাসের বুলি-রূপে ব্যবহার করে কোনো ফল হবে না। যারা ভেদকে নিজেদের মধ্যে ইচ্ছা করে পোষণ করে তারা স্বাধীনতা চায় এ কথার কোনো অর্থই নেই। সে কেমন হয়, না, মেজবউ বলছেন যে তিনি স্বামীর মুখ দেখতে চান না, সন্তানদের দূরে রাখতে চান, প্রতিবেশীদের সঙ্গে মেলামেশা করতে চান না, কিন্তু বড়োবউয়ের হাত থেকে ঘরকরনা নিজের হাতে কেড়ে নিতে চান।

য়ুরোপের কোনো কোনো দেশে দেখেছি রাষ্ট্রবিপ্লব ঘ'টে তার থেকে রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভাবন হয়েছে। গোড়াকার কথাটা এই যে, তাদের মধ্যে শাসিত ও শাসয়িতা

এই দুই দলের মধ্যে ভেদ ঘটেছিল। সে ভেদ জাতিগত ভেদ নয়, শ্রেণীগত ভেদ। সেখানে এক দিকে রাজা ও রাজপুরুষ, অন্য দিকে প্রজা, যদিচ একই জাতের মানুষ তবু তাদের মধ্যে অধিকারের ভেদ অত্যন্ত বেশি হয়ে উঠেছিল। এইজন্যে তাদের বিপ্লবের একটি মাত্র কাজ ছিল, এই শ্রেণীগত ভেদটাকে রাষ্ট্রনৈতিক শেলাইয়ের কলে বেশ পাকারকম শেলাই করে ঘুচিয়ে দেওয়া। আজ আবার সেখানে দেখছি, আর-একটা বিপ্লবের হাওয়া বইছে। খোঁজ করতে গিয়ে দেখা যায়, সেখানে বাণিজ্যক্ষেত্রে যারা টাকা খাটাচ্ছে, আর যারা মজুর খাটছে, তাদের মধ্যে অধিকারের ভেদ অত্যন্ত বেশি। এই ভেদে পীড়া ঘটায়, সেই পীড়ায় বিপ্লব। ধনীরা ভীত হয়ে উঠে কর্মীরা যাতে ভালো বাসস্থান পায়, যাতে তাদের ছেলেপুলেরা লেখাপড়া শিখতে পারে, যাতে তারা সকল বিষয়ে কতকটা পরিমাণে আরামে থাকে, দয়া করে মাঝে মাঝে সে চেষ্টা করে, কিন্তু তবু ভেদ যে রয়ে গেল। ধনীর অনুগ্রহের ছিটেফোঁটায় সেই ভেদ তো ঘোচে না, তাই আপদও মিটতে চায় না।

বহুকাল হল ইংলণ্ড্ থেকে একদল ইংরেজ আমেরিকায় গিয়ে বসতি করে। ইংলণ্ডের ইংরেজ সমুদ্রপার থেকে আমেরিকার ইংরেজের উপর শাসন বিস্তার করেছিল; এই শাসনের দ্বারা সমুদ্রের দুই পারের ভেদ মেটে নি। এ ক্ষেত্রে নাড়ির টানের চেয়ে দড়ির টানটাই প্রবল হওয়াতে বন্ধন জোর করে ছিঁড়ে ফেলতে হয়েছিল। অথচ এখানে দুই পক্ষই সহোদর ভাই।

একদিন ইটালিতে অস্ট্রিয়ান ছিল রাষ্ট্রের মুড়োয়, আর ইটালিয়ান ছিল ল্যাজায়। অথচ ল্যাজায় মুড়োয় প্রাণের যোগ ছিল না। এই প্রাণহীন বন্ধন ভেদকেই দুঃসহরূপে প্রকাশ করেছিল। ইটালি তার থেকে মুক্তিলাভ করে সমস্যার সমাধান করেছে।

তা হলে দেখা যাচ্ছে ভেদের দুঃখ থেকে ভেদের অকল্যাণ থেকে মুক্তিই হচ্ছে মুক্তি। এমন-কি, আমাদের দেশের ধর্মসাধনার মূল কথাটা হচ্ছে ঐ— তাতে বলে, ভেদবুদ্ধিতেই অসত্য, সেই ভেদবুদ্ধি ঘুচিয়ে দিলেই সত্যের মধ্যে আমাদের পরিত্রাণ।

কিন্তু পূর্বেই বলেছি বিধাতার পরীক্ষাশালায় সব পরীক্ষার্থীর একই প্রশ্ন নয়। ভেদ এক রকম নয়। এক পায়ে খড়ম আর-এক পায়ে বুট, সে এক রকমের ভেদ; এক পা বড়ো আর-এক পা ছোটো, সে আর-এক রকমের ভেদ; পায়ের হাড় ভেঙে গিয়ে পায়ের এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের বিচ্ছেদ, সে অন্য রকমের ভেদ; এই সব রকম ভেদই স্বাধীনশক্তিযোগে চলাফেরা করায় বাধা দেয়। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভেদের প্রতিকার ভিন্ন রকমের। খড়ম-পায়ের কাছ থেকে তার প্রশ্নের উত্তর চুরি করে নিয়ে ভাঙা-পা নিজের বলে চালাতে গেলে তার বিপদ আরো বাড়িয়ে তুলতে পারে।

ঐ-যে পূর্বেই বলেছি একদা ইংরেজ-জাতের মধ্যে ভেদের যে ছিন্নতা ছিল সেটাকে একটা রাষ্ট্রনৈতিক শেলাইয়ের কল দিয়ে তারা পাকা করে জুড়েছে। কিন্তু যেখানে কাপড়টা তৈরিই হয় নি, সুতোগুলো কতক আলাদা হয়ে কতক জটা পাকিয়ে পড়ে আছে, সেখানে রাষ্ট্রনৈতিক শেলাইয়ের কলের কথা ভাবাই চলে না, সেখানে আরো গোড়ায় যেতে হয়, সেখানে সমাজনৈতিক তাঁতে চড়িয়ে বহু সুতোকে এক অখণ্ড কাপড়ে পরিণত করা চাই। তাতে বিলম্ব হবে, কিন্তু শেলাইয়ের কলে কিছুতেই বিলম্ব সারা যায় না।

শিবঠাকুরের তিনটি বধূ সম্বন্ধে ছড়ায় বলছে :

এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান,
এক কন্যে না পেয়ে বাপের বাড়ি যান।

তিন কন্যেরই আহারের সমান প্রয়োজন ছিল— কিন্তু দ্বিতীয় কন্যেটি যে সহজ উপায়ে আহার করেছিলেন, বিশেষ কারণে তৃতীয় কন্যের সেটা আয়ত্তাধীন ছিল না; অতএব উদর এবং আহারসমস্যার পূরণ তিনি অপেক্ষাকৃত বিলম্বিত উপায়ে করতে বাধ্য হয়েছিলেন— বাপের বাড়ি ছুটেছিলেন। প্রথম কন্যের ক্ষুধানিবৃত্তি সম্বন্ধে পুরাবৃত্তের বিবরণটি অস্পষ্ট। আমার বিশ্বাস, তিনি আয়োজন মাত্র করেছিলেন, আর মধ্যমাটি তার ফলভোগ করে পরিতৃপ্ত হয়েছেন। ইতিহাসে এ-রকম দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

আমাদের এই জন্মভূমিটি শিবঠাকুরের মধ্যমা প্রেয়সী নন, সে কথা ধরে নেওয়া যেতে পারে। বহু শতাব্দী ধরে বার বার তার পরিচয় পাওয়া গেল। কাজেই লক্ষ্যসিদ্ধি সম্বন্ধে মধ্যমার পথটি তাঁর পথ হতেই পারে না। হয় তিনি রাঁধেন নি অথচ ভোজের দাবি করেছেন, শেষে শিবঠাকুরের ধমক খেয়ে সনাতন বাপের বাড়ির দিকে চলতে চলতে বেলা বইয়ে দিয়েছেন— নয়তো রেঁধেছেন, বেড়েছেন, কিন্তু খাবার বেলায় দেখেছেন আর-একজন পাত শূন্য করে দিয়েছে। অতএব তাঁর পক্ষে সমস্যা হচ্ছে, যে কারণে এমনটা ঘটে আর যে কারণে তিনি কথায় কথায় শিবঠাকুরকে চটিয়ে তোলেন সেটা সর্বাগ্রে দূর করে দেওয়া; আবদার করে বললেই হবে না যে, মেজবউ যেমন করে খাচ্ছে আমিও ঠিক তেমনি করে খাব।

আমরা সর্বদাই বলে থাকি, বিদেশী আমাদের রাজা এই দুঃখ ঘুচলেই আমাদের সব দুঃখ ঘুচবে। বিদেশী রাজা আমি পছন্দ করি নে। পেট-জোড়া পিলেও আমার পছন্দসই নয়। কিন্তু অনেকদিন থেকে দেখছি পিলেটি আমার সম্মতির অপেক্ষা না করে আপনি এসে পেট জুড়ে বসেছে। বহুযত্নে অন্তরের প্রকোষ্ঠে তাকে পালন করলেও বিপদ, আবার রাগের মাথায় ঘুষি মেরে তাকে ফাটিয়ে দিলেও সাংঘাতিক হয়ে

ওঠে। যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁরা বলেন, তোমাদের আশে-পাশে চার দিকেই ম্যালেরিয়া-বাহিনী ডোবা, সেইগুলো ভরাট না করলে তোমার পিলের ভরাট ছুটবে না। মুশকিলের ব্যাপার এই যে, পিলের উপরেই আমাদের যত রাগ, ডোবার উপরে নয়। আমরা বলি, আমাদের সনাতন ডোবা, ওগুলি যদি লুপ্ত হয় তা হলে ভূতকালের পবিত্র পদচিহ্নের গভীরতাই লোপ পাবে। সেই গভীরতা বর্তমানের অবিরল অশ্রুধারায় কানায় কানায় পূর্ণ হয় হোক কিন্তু আমাদের লোকালয় চিরদিন যেন ডোবায় ডোবায় শতধা হয়ে থাকে।

পাঠকেরা অধৈর্য হয়ে বলবেন, আর ভূমিকা নয়, এখন আমাদের বিশেষ সমস্যাটা কী বলেই ফেলো। বলতে সংকোচ হচ্ছে; কারণ, কথাটা অত্যন্ত বেশি সহজ। শুনে সবাই অশ্রদ্ধা করে বলবেন, ও তো সবাই জানে। এইজন্যেই রোগের পরিচয় সম্বন্ধে ডাক্তারবাবু অনিদ্রা না বলে যদি ইন্‌সম্‌নিয়া বলেন, তা হলে মনে হয় তাঁকে ষোলো টাকা ফি দেওয়া ষোলো-আনা সার্থক হল। আসল কথা, আমরা এক নই, আমাদের নিজেদের মধ্যে ভেদের অন্ত নেই। প্রথমেই বলেছি— ভেদটাই দুঃখ, ঐটেই পাপ। সে ভেদ বিদেশীর সঙ্গেই হোক আর স্বদেশীর সঙ্গেই হোক। সমাজটাকে একটা ভেদ-বিহীন বৃহৎ দেহের মতো ব্যবহার করতে পারি কখন। যখন তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে বোধশক্তি ও কর্মশক্তির প্রাণগত যোগ থাকে; যখন তার পা কাজ করলে হাত তার ফল পায়, হাত কাজ করলে পা তার ফল পায়। কল্পনা করা যাক, সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি-ছাড়া ভুলে দেহের আকৃতিধারী এমন একটা অপদার্থ তৈরি হয়েছে যার প্রত্যেক বিভাগের চার দিকে নিষেধের বেড়া; যার ডান-চোখে বাঁ-চোখে, ডান-হাতে বাঁ-হাতে ভাসুর ভাদ্রবৌয়ের সম্পর্ক; যার পায়ের শিরার রক্ত বুকের কাছে উঠতে গেলেই দাবড়ানি খেয়ে ফিরে যায়; যার তর্জনীটা কড়ে-আঙুলের সঙ্গে এক পংক্তিতে কাজ করতে গেলে প্রায়শ্চিত্তের দায়িক হয়; যার পায়ে তেল-মালিশের দরকার হলে ডান হাত হরতাল করে বসে। এই অত্যন্ত নড়বড়ে পদার্থটা অন্য পাড়ার দেহটার মতো সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পায় না। সে দেখে, অন্য দেহটা জুতো জামা প'রে লাঠি ছাতা নিয়ে পথে অপথে বুক ফুলিয়ে বেড়ায়। তখন সে ভাবে যে, ঐ দেহটার মতো জুতো জামা লাঠি ছাতা জুটলেই আমার সব দুঃখ ঘুচবে। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার ভুলের 'পরে নিজের ভুল যোগ করে দিয়ে সংশোধন চলে না। জুতো পেলেও তার জুতো খসে পড়বে, ছাতি পেলেও তার ছাতি হাওয়ায় দেবে উড়িয়ে, আর মনের মতো লাঠি যদি সে কোনোমতে জোগাড় করতে পারে অন্য পাড়ার দেহটি সে লাঠি ছিনিয়ে নিয়ে তার নড়বড়ে জীব-লীলার প্রহসনটাকে হয়তো ট্র্যাজেডিতে সমাপ্ত করে দিতে পারে। এখানে জুতো

জামা ছাতি লাঠির অভাবটাই সমস্যা নয়, প্রাণগত ঐক্যের অভাবটাই সমস্যা। কিন্তু বিধাতার উক্ত দেহরূপী বিদ্রূপটি হয়তো বলে থাকে যে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনৈক্যের কথাটা এখন চাপা থাক্‌, আপাতত সবার আগে যদি কোনো গতিকে একটা জামা জোগাড় করে নিয়ে সর্বাঙ্গ ঢাকতে পারি তা হলে সেই জামাটার ঐক্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ঐক্য আপনা-আপনি ঘটে উঠবে। আপনিই ঘটবে এ কথা বলা হচ্ছে নিজেকে ফাঁকি দেওয়া। এই ফাঁকি সর্বনেশে; কেননা, নিজকৃত ফাঁকিকে মানুষ ভালোবাসে, তাকে যাচাই করে দেখতেই প্রবৃত্তি হয় না।

মনে আছে, আমার বয়স যখন অল্প ছিল তখন দেশে দুই বিরোধী পক্ষের মধ্যে একটা তর্ক প্রায় শোনা যেত, আমরা কি নেশন না নেশন নই। কথাটা সম্পূর্ণ বুঝতুম তা বলতে পারি নে, কিন্তু আমরা নেশন নই এ কথা যে মানুষ বলত রাজা হলে তাকে জেলে দিতুম, সমাজপতি হলে তার ধোবা নাপিত বন্ধ করতুম। তার প্রতি অহিংস্রভাব রক্ষা করা আমার পক্ষে কঠিন হত। তখন এ সম্বন্ধে একটা বাঁধা তর্ক এই ছিল যে, সুইজর্‌ল্যাণ্ডে তিন ভিন্ন জাত পাশাপাশি রয়েছে তবুও তো তারা এক নেশন, তবে আর কী! শুনে ভাবতুম, যাক, ভয় নেই। কিন্তু মুখে ভয় নেই বললেও আসলে ভয় ঘোচে কই। ফাঁসির আসামীকে তার মোক্তার যখন বলেছিল 'ভয় কী, দুর্গা বলে ঝুলে পড়ো' তখন সে সান্ত্বনা পায় নি; কেননা দুর্গা বলতে সে রাজি কিন্তু ঐ ঝুলে পড়াটাতেই আপত্তি। সুইজর্‌ল্যাণ্ডের লোকেরাও নেশন আর আমরাও নেশন, এ কথা কেবল তর্কে সাব্যস্ত করে সান্ত্বনাটা কী— ফলের বেলায় দেখি, আমরা ঝুলে পড়েছি আর তারা মাটির উপর খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। রাধিকা চালুনিতে করে জল এনে কলঙ্কভঞ্জন করেছিলেন। যে হতভাগিনী নারী রাধিকা নয় তারও চালুনিটা আছে, কিন্তু তার কলঙ্কভঞ্জন হয় না, উল্টোই হয়। মূলে যে প্রভেদ থাকাতে ফলের এই প্রভেদ, সেই কথাটাই ভাববার কথা। সুইজর্‌ল্যাণ্ডে ভেদ যতগুলোই থাক্‌, ভেদবুদ্ধি তো নেই। সেখানে পরস্পরের মধ্যে রক্তবিমিশ্রণে কোনো বাধা নেই ধর্মে বা আচারে বা সংস্কারে। এখানে সে বাধা এত প্রচণ্ড যে, অসবর্ণ বিবাহের আইনগত বিঘ্ন দূর করবার প্রস্তাব হবা মাত্র হিন্দুসমাজপতি উদ্‌বেগে ঘর্মাক্ত-কলেবর হয়ে হরতাল করবার ভয় দেখিয়েছিলেন। সকলের চেয়ে গভীর আত্মীয়তার ধারা নাড়িতে বয়, মুখের কথায় বয় না। যাঁরা নিজেদের এক মহাজাত বলে কল্পনা করেন তাঁদের মধ্যে সেই নাড়ির মিলনের পথ ধর্মের শাসনে চিরদিনের জন্যে যদি অবরুদ্ধ থাকে, তা হলে তাঁদের মিলন কখনোই প্রাণের মিলন হবে না, সুতরাং সকলে এক হয়ে প্রাণ দেওয়া তাঁদের পক্ষে সহজ হতে পারবে না। তাঁদের প্রাণ যে

এক প্রাণ নয়। আমার কোনো বন্ধু ভারতের প্রত্যন্তবিভাগে ছিলেন। সেখানে পাঠান দস্যুরা মাঝে মাঝে হিন্দু লোকালয়ে চড়াও হয়ে স্ত্রীহরণ করে থাকে। একবার এইরকম ঘটনায় আমার বন্ধু কোনো স্থানীয় হিন্দুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সমাজের উপর এমন অত্যাচার তোমরা সহ্য করো কেন। সে নিতান্ত উপেক্ষার সঙ্গে বললে, উয়ো তো বেনিয়াকী লড়্‌কী। 'বেনিয়াকী লড়্‌কী' হিন্দু আর যে-ব্যক্তি তার হরণ ব্যাপারে উদাসীন সেও হিন্দু, উভয়ের মধ্যে শাস্ত্রগত যোগ থাকতে পারে কিন্তু প্রাণগত যোগ নেই। সেইজন্যে একের আঘাত অন্যের মর্মে গিয়ে বাজে না। জাতীয় ঐক্যের আদিম অর্থ হচ্ছে জন্মগত ঐক্য, তার চরম অর্থও তাই।

যেটা অবাস্তব, কোনোমতেই তার উপরে কোনো বড়ো সিদ্ধির পত্তন করা যায় না। মানুষ যখন দায়ে পড়ে তখন আপনাকে আপনি ফাঁকি দিয়ে আপনার কাছ থেকে কাজ উদ্ধার করবার চেষ্টা করে থাকে। বিভ্রান্ত হয়ে মনে করে, নিজেকে বাম হাতে ফাঁকি দিয়ে ডান হাতে লাভ করা যেতেও পারে। আমাদের রাষ্ট্রীয় ঐক্যসাধনার মূলে একটা মস্ত জাতীয় অবাস্তবতা আছে সে কথা আমরা ভিতরে ভিতরে সবাই জানি, সেইজন্যে সে দিকটাকে আমরা অগোচরে রেখে তার উপরে স্বাজাত্যের যে জয়স্তম্ভ গড়ে তুলতে চাই তার মালমসলাটাকেই খুব প্রচুর করে গোচর করতে ইচ্ছা করি। কাঁচা ভিতকে মালমসলার বাহুল্য দিয়ে উপস্থিতমত চাপা দিলেই সে তো পাকা হয়ে ওঠে না। বরঞ্চ একদিন সেই বাহুল্যেরই গুরুভারে ভিতের দুর্বলতা ভীষণরূপে সপ্রমাণ হয়ে পড়ে। খেলাফতের ঠেকো-দেওয়া সন্ধিবন্ধনের পর আজকের দিনে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মূলে ভুল থাকলে কোনো উপায়েই স্থূলে সংশোধন হতে পারে না। এ-সব কথা শুনলে অধৈর্য হয়ে কেউ কেউ বলে ওঠেন, আমাদের চার দিকে যে বিদেশী তৃতীয় পক্ষ শত্রুরূপে আছে সেই আমাদের মধ্যে ভেদ ঘটাচ্ছে, অতএব দোষ আমাদের নয়, দোষ তারই— ইতিপূর্বে আমরা হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি নির্বিরোধেই ছিলুম, কিন্তু, ইত্যাদি ইত্যাদি।— শাস্ত্রে বলে, কলি শনি ব্যাধি মানুষের ছিদ্র খোঁজে। পাপের ছিদ্র পেলেই তারা ভিতরে প্রবেশ করে সর্বনাশের পালা আরম্ভ করে দেয়। বিপদটা বাইরের, আর পাপটা আমার, এই কারণে বিপদের প্রতি ক্রোধ ও পাপের প্রতি মমতা করাই হচ্ছে সকল বিপদের সেরা।

জাহাজের খোলের মধ্যে ফাটল ছিল, যতদিন ঝড় তুফান ছিল না ততদিন সে জাহাজ খেয়া দিয়েছে। মাঝে মাঝে লোনা জল সেঁচতেও হয়েছিল, কিন্তু সে দুঃখটা মনে রাখবার মতো নয়। যেদিন তুফান উঠল সেদিন খোলের ফাটল বেড়ে বেড়ে

জাহাজ-ডুবি আসন্ন হয়েছে। কাপ্তেন যদি বলে, যত দোষ ঐ তুফানের, অতএব সকলে মিলে ঐ তুফানটাকে উচ্চৈঃস্বরে গাল পাড়ি, আর আমার ফাটলটি যেমন ছিল তেমনই থাক্‌, তা হলে ঐ কাপ্তেনের মতো নেতাটি পারে নিয়ে যাবে না, তলায় নিয়ে যাবে। তৃতীয় পক্ষ যদি আমাদের শত্রুপক্ষই হয় তা হলে এই কথাটা মনে রাখতে হবে, তারা তুফানরূপে আমাদের ফাটল মেরামতের কাজে লাগতে আসে নি। তারা ভয়ংকর বেগে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে কোন্‌খানে আমাদের তলা কাঁচা। দুর্বলাত্মাকে বাস্তবের কথাটা তারা ডাইনে বাঁয়ে চাপড় মেরে মেরে স্মরণ করিয়ে দেবে। বুঝিয়ে দেবে ডাইনের সঙ্গে বাঁয়ের যার মিল নেই রসাতলের রাস্তা ছাড়া আর সব রাস্তাই তার পক্ষে বন্ধ। এক কথায় তারা শিরিষের আঠার ঢেউ নয়, তারা লবণাম্বু। যতক্ষণ তাদের উপর রাগারাগি করে বৃথা মেজাজ খারাপ ও সময় নষ্ট করছি ততক্ষণ যথাসর্বস্ব দিয়ে ফাটল বন্ধ করার কাজে লাগলে পরিত্রাণের আশা থাকে। বিধাতা যদি আমাদের সঙ্গে কৌতুক করতে চান, বর্তমান তৃতীয় পক্ষের তুফানটাকে আপাতত দমিয়ে দিতেও পারেন, কিন্তু তুফানের সম্পূর্ণ বংশলোপ করে সমুদ্রকে ডোবা বানিয়ে দেবেন আমাদের মতো ধর্মপ্রাণ হিন্দুরও এতবড়ো আবদার তিনি শুনবেন না। অতএব কাপ্তেনদের কাছে দোহাই পাড়ছি, যেন তাঁরা কণ্ঠস্বরে ঝড়ের গর্জনের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে ফাটল-মেরামতের কথাটা একেবারে চাপা না দেন।

কাপ্তেনরা বলেন, সে দিকে যে আমাদের লক্ষ আছে তার একটা প্রমাণ দেখো যে, যদিও আমরা সনাতনপন্থী তবু আমরা স্পর্শদোষ সম্বন্ধে দেশের লোকের সংস্কার দূর করতে চাই। আমি বলি, এহ বাহ্য। স্পর্শদোষ তো আমাদের ভেদবুদ্ধির একটিমাত্র বাহ্য লক্ষণ। যে সনাতন ভেদবুদ্ধির বনস্পতি আমাদের পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে তার থেকে একটি কাঠি ভেঙে নিলেই তো পথ খোলসা হবে না।

আমি পূর্বে অন্যত্র বলেছি, ধর্ম যাদের পৃথক করে তাদের মেলবার দরজায় ভিতর দিক থেকে আগল দেওয়া। কথাটা পরিষ্কার করে বলবার চেষ্টা করি। সকলেই বলে থাকে, ধর্ম শব্দের মূল অর্থ হচ্ছে যা আমাদের ধারণ করে। অর্থাৎ, আমাদের যে-সকল আশ্রয় ধ্রুব তারা হচ্ছে ধর্মের অধিকারভুক্ত। তাদের সম্বন্ধে তর্ক নেই। এই সকল আশ্রয়ের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। এদের সঙ্গে ব্যবহারে যদি চঞ্চলতা করি, কথায় কথায় যদি মত বদল ও পথ বদল করতে থাকি, তা হলে বাঁচি নে।

কিন্তু সংসারের এমন একটা বিভাগ আছে যেখানে পরিবর্তন চলছে, যেখানে আকস্মিকের আনাগোনার অন্ত নেই; সেখানে নূতন নূতন অবস্থার সম্বন্ধে নূতন করে বারে বারে আপোষ-নিষ্পত্তি না করলে আমরা বাঁচি নে। এই নিত্যপরিবর্তনের

ক্ষেত্রে ধ্রুবকে অধ্রুবের জায়গায়, অধ্রুবকে ধ্রুবের জায়গায় বসাতে গেলে বিপদ ঘটবেই। যে মাটির মধ্যে গাছ শিকড় চালিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে শিকড়ের পক্ষে সেই ধ্রুব মাটি খুব ভালো, কিন্তু তাই বলে ডালপালাগুলোকেও মাটির মধ্যে পুঁতে ফেলা কল্যাণকর নয়। পৃথিবী নিত্য আমাকে ধারণ করে; পৃথিবী ধর্মের মতো ধ্রুব হলেই আমার পক্ষে ভালো, তার নড়চড় হতে থাকলেই সর্বনাশ। আমার গাড়িটাও আমাকে ধারণ করে; সেই ধারণ ব্যাপারটাকে যদি ধ্রুব করে তুলি তা হলে গাড়ি আমার পক্ষে পৃথিবী হবে না, পিঁজরে হবে। অবস্থা বুঝে আমাকে পুরোনো গাড়ি বেচতে হয় বা মেরামত করতে হয়, নতুন গাড়ি কিনতে হয় বা ভাড়া করতে হয়, কখনো বা গাড়িতে ঢুকতে হয়, কখনো বা গাড়ি থেকে বেরোতে হয়, আর গাড়িটা কাৎ হবার ভাব দেখালে তার থেকে লাফিয়ে পড়বার পূর্বে বিধান নেবার জন্যে ভাটপাড়ায় সইস পাঠাতে হয় না। ধর্ম যখন বলে 'মুসলমানের সঙ্গে মৈত্রী করো' তখন কোনো তর্ক না করেই কথাটাকে মাথায় করে নেব। ধর্মের এ কথাটা আমার কাছে মহাসমুদ্রের মতোই নিত্য। কিন্তু ধর্ম যখন বলে 'মুসলমানের ছোঁওয়া অন্ন গ্রহণ করবে না' তখন আমাকে প্রশ্ন করতেই হবে; কেন করব না। এ কথাটা আমার কাছে ঘড়ার জলের মতো অনিত্য, তাকে রাখব কি ফেলব সেটার বিচার যুক্তির দ্বারা। যদি বল এসব কথা স্বাধীনবিচারের অতীত, তা হলে শাস্ত্রের সমস্ত বিধানের সামনে দাঁড়িয়েই বলতে হবে, বিচারের যোগ্য বিষয়কে যারা নির্বিচারে গ্রহণ করে তাদের প্রতি সেই দেবতার ধিক্কার আছে ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ— যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন। তারা পাণ্ডাকে দেবতার চেয়ে বেশি ভয় ও শ্রদ্ধা করে, এমনি করে তারা দেবপূজার অপমান করতে কুণ্ঠিত হয় না।

সংসারের যে ক্ষেত্রটা বুদ্ধির ক্ষেত্র সেখানে বুদ্ধির যোগেই মানুষের সঙ্গে মানুষের সত্যমিলন সম্ভবপর। সেখানে অবুদ্ধির উৎপাত বিষম বাধা। সে যেন মানুষের বাসার মধ্যে ভুতুড়ে কাণ্ড। কেন, কী বৃত্তান্ত, ব'লে ভূতের কোনো জবাবদিহি নেই। ভূত বাসা তৈরি করে না, বাসা ভাড়া দেয় না, বাসা ছেড়েও যায় না। এতবড়ো জোর তার কিসের। না, সে বাস্তব নয়, অথচ আমার ভীরু মন তাকে বাস্তব বলে মেনে নিয়েছে। প্রকৃত বাস্তব যে সে বাস্তবের নিয়মে সংযত; যদি বা সে বাড়ি-ভাড়া নাও কবুল করে, অন্তত সরকারি ট্যাক্সো দিয়ে থাকে। অবাস্তবকে বাস্তব বলে মানলে তাকে জ্ঞানের কোনো নিয়মে পাওয়া যায় না। সেইজন্যে কেবল বুক দুর্‌দুর্‌ করে, গা ছম্‌ছম্‌ করে, আর বিনা বিচারে মেনেই চলি। যদি কেউ প্রশ্ন করে 'কেন', জবাব দিতে পারি নে, কেবল পিঠের দিকে বুড়ো-আঙুলটা দেখিয়ে দিয়ে বলি, ঐ যে। তার পরেও যদি

বলে 'কই যে', তাকে নাস্তিক বলে তাড়া করে যাই। মনে ভাবি, গোঁয়ারটা বিপদ ঘটালে বুঝি— ভূতকে অবিশ্বাস করলে যদি সে ঘাড় মটকে দেয়! তবুও যদি প্রশ্ন ওঠে 'কেন' তা হলে উত্তরে বলি, 'আর যেখানেই কেন খাটাও এখানে কেন খাটাতে এসো না বাপু, মানে মানে বিদায় হও— মরবার পরে তোমাকে পোড়াবে কে সে ভাবনাটা ভেবে রেখে দিয়ো।'

চিত্তরাজ্যে যেখানে বুদ্ধিকে মানি সেখানে আমার স্বরাজ; সেখানে আমি নিজেকে মানি, অথচ সেই মানার মধ্যে সর্বদেশের ও চিরকালের মানবচিত্তকে মানা আছে। অবুদ্ধিকে যেখানে মানি সেখানে এমন একটা সৃষ্টিছাড়া শাসনকে মানি যা না আমার না সর্বমানবের। সুতরাং সে একটা কারাগার, সেখানে কেবল আমার মতো হাত-পা-বাঁধা এক কারায় অবরুদ্ধ অকালজরাগ্রস্তদের সঙ্গেই আমার মিল আছে, বাইরের কোটি কোটি স্বাধীন লোকদের সঙ্গে কোনো মিল নেই। বৃহতের সঙ্গে এই ভেদ থাকাটাই হচ্ছে বন্ধন। কেননা পূর্বেই বলেছি, ভেদটাই সকল দিক থেকে আমাদের মূল বিপদ ও চরম অমঙ্গল। অবুদ্ধি হচ্ছে ভেদবুদ্ধি, কেননা চিত্তরাজ্যে সে আমাদের সকল মানবের থেকে পৃথক করে দেয়, আমরা একটা অদ্ভুতের খাঁচায় বসে কয়েকটা শেখানো বুলি আবৃত্তি করে দিন কাটাই।

জীবনযাত্রায় পদে পদেই অবুদ্ধিকে মানা যাদের চিরকালের অভ্যাস, চিত্রগুপ্তের কোনো একটা হিসাবের ভুলে হঠাৎ তারা স্বরাজের স্বর্গে গেলেও তাদের ঢেঁকি-লীলার শান্তি হবে না, সুতরাং পরপদপীড়নের তালে তালে তারা মাথা কুটে মরবে, কেবল মাঝে মাঝে পদযুগলের পরিবর্তন হবে এইমাত্র প্রভেদ।

যন্ত্রচালিত বড়ো বড়ো কারখানায় মানুষকে পীড়িত ক'রে যন্ত্রবৎ করে ব'লে আমরা আজকাল সর্বদাই তাকে কটূক্তি করে থাকি। এই উপায়ে পশ্চিমের সভ্যতাকে গাল পাড়ছি জেনে মনে বিশেষ সান্ত্বনা পাই। কারখানায় মানুষের এমন পঙ্গুতা কেন ঘটে; যেহেতু সেখানে তার বুদ্ধিকে ইচ্ছাকে কর্মকে একটা বিশেষ সংকীর্ণ ছাঁচে ঢালা হয়, তার পূর্ণ বিকাশ হতে পারে না। কিন্তু লোহা দিয়ে গড়া কলের কারখানাই একমাত্র কারখানা নয়। বিচারহীন বিধান লোহার চেয়ে শক্ত, কলের চেয়ে সংকীর্ণ। যে বিপুল ব্যবস্থাতন্ত্র অতি নিষ্ঠুর শাসনের বিভীষিকা সর্বদা উদ্যত রেখে বহু যুগ ধরে বহু কোটি নরনারীকে যুক্তিহীন ও যুক্তিবিরুদ্ধ আচারের পুনরাবৃত্তি করতে নিয়ত প্রবৃত্ত রেখেছে সেই দেশজোড়া মানুষ-পেষা জাঁতাকল কি কল হিসাবে কারও চেয়ে খাটো। বুদ্ধির স্বাধীনতাকে অশ্রদ্ধা করে এতবড়ো সুসম্পূর্ণ সুবিস্তীর্ণ চিত্তশূন্য বজ্রকঠোর বিধিনিষেধের কারখানা মানুষের রাজ্যে আর কোনোদিন আর কোথাও উদ্ভাবিত হয়েছে বলে আমি

তো জানি নে। চটকল থেকে যে পাটের বস্তা তৈরি হয়ে বেরোয় জড়ভাবে বোঝা গ্রহণ করবার জন্যেই তার ব্যবহার। মানুষ-পেষা কল থেকে ছাঁটাকাটা যেসব অতি-ভালোমানুষ পদার্থের উৎপত্তি হয় তারাও কেবল বাহিরের বোঝা বইতেই আছে। একটা বোঝা খালাস হতেই আর-একটা বোঝা তাদের অধিকার করে বসে।

প্রাচীন ভারত একদিন যখন বিধাতার কাছে বর চেয়েছিলেন তখন বলেছিলেন— স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু, য একঃ অবর্ণঃ— যিনি এক, যিনি বর্ণভেদের অতীত, তিনি আমাদের শুভবুদ্ধি দ্বারা সংযুক্ত করুন। তখন ভারত ঐক্য চেয়েছিলেন, কিন্তু পোলিটিকাল বা সামাজিক কলে-গড়া ঐক্যের বিড়ম্বনা চান নি। বুদ্ধ্যা শুভয়া, শুভবুদ্ধির দ্বারাই মিলতে চেয়েছিলেন— অন্ধ বশ্যতার লম্বা শিকলের দ্বারা নয়, বিচারহীন বিধানের কঠিন কানমলার দ্বারা নয়।

সংসারে আকস্মিকের সঙ্গে মানুষকে সর্বদাই নতুন করে বোঝাপড়া করতেই হয়। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির সেই কাজটাই খুব বড়ো কাজ। আমরা বিশ্বসৃষ্টিতে দেখতে পাই, আকস্মিক— বিজ্ঞানে যাকে variation বলে— আচমকা এসে পড়ে। প্রথমটা সে থাকে একঘরে, কিন্তু বিশ্বনিয়ম বিশ্বছন্দের সঙ্গে মিলিয়ে তাকে সবার করে নেন। অথচ সে এক নূতন বৈচিত্র্যের প্রবর্তন করে। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে, মানুষের সমাজে, আকস্মিক প্রায়ই অনাহূত এসে পড়ে। তার সঙ্গে যেরকম ব্যবহার করলে এই নূতন আগন্তুকটি চার দিকের সঙ্গে সুসংগত হয়, অর্থাৎ আমাদের বুদ্ধিকে রুচিকে চারিত্রকে, আমাদের কাণ্ডজ্ঞানকে, পীড়িত অবমানিত না করে, সতর্ক বুদ্ধি দ্বারাতেই সেটা সাধন করতে হয়। মনে করা যাক, একদা এক ফকির বিশেষ প্রয়োজনে রাস্তার মাঝখানে খুঁটি পুঁতে তাঁর ছাগলটাকে বেঁধে হাট করতে গিয়েছিলেন। হাটের কাজ সারা হল, ছাগলটারও একটা চরম সদ্গতি হয়ে গেল। উচিত ছিল, এই আকস্মিক খুঁটিটাকে সর্বকালীনের খাতিরে রাস্তার মাঝখান থেকে উদ্ধার করা। কিন্তু উদ্ধার করবে কে। অবুদ্ধি করে না, কেননা তার কাজ হচ্ছে যা আছে তাকেই চোখ বুজে স্বীকার করা; বুদ্ধিই করে, যা নূতন এসেছে তার সম্বন্ধে সে বিচারপূর্বক নূতন ব্যবস্থা করতে পারে। যে দেশে যা আছে তাকেই স্বীকার করা— যা ছিল তাকেই পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা সনাতন পদ্ধতি, সে দেশে খুঁটিটা শত শত বৎসর ধরে রাস্তার মাঝখানেই রয়ে গেল। অবশেষে একদিন খামকা কোথা থেকে একজন ভক্তিগদ্গদ মানুষ এসে তার গায়ে একটু সিঁদুর লেপে তার উপর একটা মন্দির তুলে বসল। তার পর থেকে বছর বছর পঞ্জিকাতে ঘোষণা দেখা গেল, শুক্লপক্ষের কার্তিকসপ্তমীতে যে ব্যক্তি খুঁটীশ্বরীকে এক সের ছাগদুগ্ধ ও তিন তোলা রজত দিয়ে পূজা দেয় তার সেই পূজা

ত্রিকোটিকুলমুদ্ধরেৎ। এমনি করে অবুদ্ধির রাজত্বে আকস্মিক খুঁটি সমস্তই সনাতন হয়ে ওঠে, লোকচলাচলের রাস্তায় চলার চেয়ে বাঁধা পড়ে থাকাটা সহজ হয়ে ওঠে। যাঁরা নিষ্ঠাবান তাঁরা বলেন, আমরা বিধাতার বিশেষ সৃষ্টি, অন্য কোনো জাতের সঙ্গে আমাদের মেলে না, অতএব রাস্তা বন্ধ হলেও আমাদের চলে কিন্তু খুঁটি না থাকলে আমাদের ধর্ম থাকে না। যারা খুঁটীশ্বরীকে মানেও না, এমন-কি যারা বিদেশী ভাবুক, তারাও বলে, আহা, একেই তো বলে আধ্যাত্মিকতা— নিজের জীবনযাত্রার সমস্ত সুযোগ-সুবিধাই এরা মাটি করতে রাজি, কিন্তু মাটি থেকে একটা খুঁটি এক ইঞ্চি পরিমাণও ওপ্‌ড়াতে চায় না। সেই সঙ্গে এও বলে, আমাদের বিশেষত্ব অন্য রকমের, অতএব আমরা এদের অনুকরণ করতে চাই নে, কিন্তু এরা যেন হাজার খুঁটিতে ধর্মের বেড়াজালে এইরকম বাঁধা হয়ে অত্যন্ত শান্ত সমাহিত হয়ে পড়ে থাকে— কারণ, এটি দূর থেকে দেখতে বড়ো সুন্দর।

সৌন্দর্য নিয়ে তর্ক করতে চাই নে। সেটা রুচির কথা। যেমন ধর্মের নিজের অধিকারে ধর্ম বড়ো, তেমনি সুন্দরের নিজের অধিকারে সুন্দর বড়ো। আমার মতো অর্বাচীনেরা বুদ্ধির অধিকারের দিক থেকে প্রশ্ন করবে, এমনতরো খুঁটি-কণ্টকিত পথ দিয়ে কখনো স্বাতন্ত্র্যসিদ্ধির রথ কি এগোতে পারে। বুদ্ধির অভিমানে বুক বেঁধে নব্যতন্ত্রী প্রশ্ন করে বটে, কিন্তু রাত্রে আর ঘুম হয় না। যেহেতু গৃহিণীরা স্বস্ত্যয়নের আয়োজন করে বলেন, 'ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর, কী জানি কোন্ খুঁটি কোন্ দিন বা দৃষ্টি দেয়। তোমরা চুপ করে থাকো-না। কলিকালে খুঁটি নাড়া দেবার মতো ডানপিটে ছেলের তো অভাব নেই।' শুনে আমাদের মতো নিছক আধুনিকদেরও বুক ধুক্‌ধুক্ করতে থাকে, কেননা রক্তের ভিতর থেকে সংস্কারটাকে তো ছেঁকে ফেলতে পারি নে। কাজেই পরের দিন ভোরবেলাতেই এক সেরের বেশি ছাগদুগ্ধ তিন তোলার বেশি রজত খরচ করে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

এই তো গেল আমাদের সবচেয়ে প্রধান সমস্যা। যে বুদ্ধির রাস্তায় কর্মের রাস্তায় মানুষ পরস্পরে মিলে সমৃদ্ধির পথে চলতে পারে সেইখানে খুঁটি গেড়ে থাকার সমস্যা; যাদের মধ্যে সর্বদা আনাগোনার পথ সকল রকমে খোলসা রাখতে হবে তাদের মধ্যে অসংখ্য খুঁটির বেড়া তুলে পরস্পরের ভেদকে বহুধা ও স্থায়ী করে তোলার সমস্যা; বুদ্ধির যোগে যেখানে সকলের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে, অবুদ্ধির অচল বাধায় সেখানে সকলের সঙ্গে চিরবিচ্ছিন্ন হবার সমস্যা; খুঁটিরূপিণী ভেদবুদ্ধির কাছে ভক্তিভরে বিচার-বিবেককে বলিদান করবার সমস্যা। ভাবুক লোকে এই সমস্যার সামনে দাঁড়িয়ে ছলছল নেত্রে বলেন, আহা, এখানে ভক্তিটাই হল বড়ো কথা এবং সুন্দর কথা, খুঁটিটা

তো উপলক্ষ্য। আমাদের মতো আধুনিকেরা বলে, এখানে বুদ্ধিটাই হল বড়ো কথা, সুন্দর কথা, খুঁটিটাও জঞ্জাল, ভক্তিটাও জঞ্জাল। কিন্তু আহা, গৃহিণী যখন অশুভ-আশঙ্কায় করজোড়ে গলবস্ত্র হয়ে দেবতার কাছে নিজের ডান হাত বাঁধা রেখে আসেন তার কী অনির্বচনীয় মাধুর্য! আধুনিক বলে, যেখানে ডান হাত উৎসর্গ করা সার্থক, যেখানে তাতে নেই অন্ধতা, যেখানে তাতে আছে সাহস, সেখানেই তার মাধুর্য; কিন্তু যেখানে অশুভ-আশঙ্কা মূঢ়তা-রূপে দীনতা-রূপে তার কুশ্রী কবলে সেই মাধুর্যকে গিলে খাচ্ছে সুন্দর সেখানে পরাস্ত— কল্যাণ সেখানে পরাহত।

আমাদের আর-একটি প্রধান সমস্যা হিন্দু-মুসলমান সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান এত দুঃসাধ্য তার কারণ দুই পক্ষই মুখ্যত আপন আপন ধর্মের দ্বারাই অচলভাবে আপনাদের সীমানির্দেশ করেছে। সেই ধর্মই তাদের মানববিশ্বকে সাদা কালো ছক কেটে দুই সুস্পষ্ট ভাগে বিভক্ত করেছে— আত্ম ও পর। সংসারে সর্বত্রই আত্মপরের মধ্যে কিছু পরিমাণে স্বাভাবিক ভেদ আছে। সেই ভেদের পরিমাণটা অতিমাত্র হলেই তাতে অকল্যাণ হয়। বুশ্‌ম্যান-জাতীয় লোক পরকে দেখবা মাত্র তাকে নির্বিশেষে বিষবাণ দিয়ে মারে। তার ফল হচ্ছে, পরের সঙ্গে সত্য মিলনে মানুষের যে মনুষ্যত্ব পরিস্ফুট হয় বুশ্‌ম্যানের তা হতে পারে নি, সে চূড়ান্ত বর্বরতার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। এই ভেদের মাত্রা যে জাতির মধ্যে অন্তরের দিক থেকে যতই কমে এসেছে সেই জাতি ততই উচ্চশ্রেণীর মনুষ্যত্বে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে। সে জাতি সকলের সঙ্গে যোগে চিন্তার কর্মের চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করতে পেরেছে।

হিন্দু নিজেকে ধর্মপ্রাণ বলে পরিচয় দেয়, মুসলমানও তাই দেয়। অর্থাৎ ধর্মের বাহিরে উভয়েরই জীবনের অতি অল্প অংশই অবশিষ্ট থাকে। এই কারণে এরা নিজ নিজ ধর্ম দ্বারাই পরস্পরকে ও জগতের অন্য সকলকে যথাসম্ভব দূরে ঠেকিয়ে রাখে। এই-যে দূরত্বের ভেদ এরা নিজেদের চারি দিকে অত্যন্ত মজবুৎ করে গেঁথে রেখেছে, এতে করে সকল মানুষের সঙ্গে সত্যযোগে মনুষ্যত্বের যে প্রসার হয় তা এদের মধ্যে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। ধর্মগত ভেদবুদ্ধি সত্যের অসীম স্বরূপ থেকে এদের সংকীর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। এইজন্যেই মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে নিত্যসত্যের চেয়ে বাহ্যবিধান কৃত্রিমপ্রথা এদের মধ্যে এত প্রবল হয়ে উঠেছে।

পূর্বেই বলেছি, মানবজগৎ এই দুই সম্প্রদায়ের ধর্মের দ্বারাই আত্ম ও পর এই দুই ভাগে অতিমাত্রায় বিভক্ত হয়েছে। সেই পর চিরকালই পর হয়ে থাক্ হিন্দুর এই ব্যবস্থা; সেই পর, সেই ম্লেচ্ছ বা অন্ত্যজ কোনো ফাঁকে তার ঘরের মধ্যে এসে ঢুকে না পড়ে এই তার ইচ্ছা। মুসলমানের তরফে ঠিক এর উল্‌টো। ধর্মগণ্ডীর বহির্বর্তী

পরকে সে খুব তীব্রভাবেই পর বলে জানে ; কিন্তু সেই পরকে, সেই কাফেরকে বরাবরকার মতো ঘরে টেনে এনে আটক করতে পারলেই সে খুশি। এদের শাস্ত্রে কোনো একটা খুঁটে-বের-করা শ্লোক কী বলে সেটা কাজের কথা নয়, কিন্তু লোক-ব্যবহারে এদের এক পক্ষ শত শত বৎসর ধরে ধর্মকে আপন দুর্গম দুর্গ করে পরকে দূরে ঠেকিয়ে আত্মগত হয়ে আছে, আর অপর পক্ষ ধর্মকে আপন ব্যূহ বানিয়ে পরকে আক্রমণ করে তাকে ছিনিয়ে এনেছে। এতে করে এদের মনঃপ্রকৃতি দুইরকম ছাঁদের ভেদবুদ্ধিতে একেবারে পাকা হয়ে গেছে। বিধির বিধানে এমন দুই দল ভারতবর্ষে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে প্রধান স্থান অধিকার করে নিয়েছে— আত্মীয়তার দিক থেকে মুসলমান হিন্দুকে চায় না, তাকে কাফের বলে ঠেকিয়ে রাখে ; আত্মীয়তার দিক থেকে হিন্দুও মুসলমানকে চায় না, তাকে ম্লেচ্ছ বলে ঠেকিয়ে রাখে।

একটা জায়গায় দুই পক্ষ ক্ষণে ক্ষণে মেলবার চেষ্টা করে, সে হচ্ছে তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে। শিবঠাকুরের ছড়াটা যদি আজ সম্পূর্ণ পাওয়া যেত তা হলে দেখা যেত, ঐ যে প্রথমা কন্যাটি রাঁধেন বাড়েন অথচ খেতে পান না, আর সেই যে তৃতীয়া কন্যাটি না খেয়ে বাপের বাড়ি যান, এদের উভয়ের মধ্যে একটা সন্ধি ছিল— সে হচ্ছে ঐ মধ্যমা কন্যাটির বিরুদ্ধে। কিন্তু যেদিন মধ্যমা কন্যা বাপের বাড়ি চলে যেত সেদিন অবশিষ্ট দুই সতিন এই দুই পোলিটিকাল allyদের মধ্যে চুলোচুলি বেধে উঠত। পদ্মায় ঝড়ের সময়ে দেখেছি কাক ফিঙে উভয়েই চরের মাটির উপর চঞ্চু আটকাবার চেষ্টায় একেবারে গায়ে গায়ে হয়ে পাখা ঝট্‌পট্ করেছে। তাদের এই সাযুজ্য দেখে তাড়াতাড়ি মুগ্ধ হবার দরকার নেই। ঝড়ের সময় যতক্ষণ এদের সন্ধি স্থায়ী হয়েছে তার চেয়ে বহুদীর্ঘকাল এরা পরস্পরকে ঠোকর মেরে এসেছে। বাংলাদেশে স্বদেশী-আন্দোলনে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান মেলে নি। কেননা, বাংলার অখণ্ড অঙ্গকে ব্যঙ্গ করার দুঃখটা তাদের কাছে বাস্তব ছিল না। আজ অসহকার-আন্দোলনে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান যোগ দিয়েছে, তার কারণ রুম-সাম্রাজ্যের অখণ্ড অঙ্গকে ব্যঙ্গীকরণের দুঃখটা তাদের কাছে বাস্তব। এমনতরো মিলনের উপলক্ষটা কখনোই চিরস্থায়ী হতে পারে না। আমরা সত্যতঃ মিলি নি ; আমরা একদল পূর্বমুখ হয়ে, অন্যদল পশ্চিমমুখ হয়ে কিছুক্ষণ পাশাপাশি পাখা ঝাপটেছি। আজ সেই পাখার ঝাপট বন্ধ হল, এখন উভয় পক্ষের চঞ্চু এক মাটি কামড়ে না থেকে পরস্পরের অভিমুখে সবেগে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। রাষ্ট্রনৈতিক অধিনেতারা চিন্তা করছেন, আবার কী দিয়ে এদের চঞ্চুদুটোকে ভুলিয়ে রাখা যায়। আসল ভুলটা রয়েছে অস্থিতে মজ্জাতে, তাকে ভোলাবার চেষ্টা করে ভাঙা যাবে না। কম্বল চাপা দিয়ে যে মনে ভাবে বরফটাকে গরম করে তোলা গেল,

সে একদিন দেখতে পায় তাতে করে তার শৈত্যটাকে স্থায়ী করা গেছে।

হিন্দুতে মুসলমানে কেবল যে এই ধর্মগত ভেদ তা নয়, তাদের উভয়ের মধ্যে একটা সামাজিক শক্তির অসমকক্ষতা ঘটেছে। মুসলমানের ধর্মসমাজের চিরাগত নিয়মের জোরেই তার আপনার মধ্যে একটা নিবিড় ঐক্য জমে উঠেছে, আর হিন্দুর ধর্মসমাজের সনাতন অনুশাসনের প্রভাবেই তার আপনার মধ্যে একটা প্রবল অনৈক্য ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। এর ফল এই যে, কোনো বিশেষ প্রয়োজন না থাকলেও হিন্দু নিজেকেই মারে, আর প্রয়োজন থাকলেও হিন্দু অন্যকে মারতে পারে না। আর মুসলমান কোনো বিশেষ প্রয়োজন না ঘটলেও নিজেকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করে, আর প্রয়োজন ঘটলে অন্যকে বেদম মার দিতে পারে। তার কারণ এ নয়, মুসলমানের গায়ে জোর আছে, হিন্দুর নেই ; তার আসল কারণ, তাদের সমাজের জোর আছে, হিন্দুর নেই। এক দল আভ্যন্তরিক বলে বলী, আর-এক দল আভ্যন্তরিক দুর্বলতায় নির্জীব। এদের মধ্যে সমকক্ষভাবে আপোষ ঘটবে কী করে। অত্যন্ত দুর্যোগের মুখে ক্ষণকালের জন্যে তা সম্ভব, কিন্তু যেদিন অধিকারের ভাগ-বাটোয়ারার সময় উপস্থিত হয় সেদিন সিংহের ভাগটা বিসদৃশরকম বড়ো হয়ে ওঠে, তার কারণটা তার থাবার মধ্যে। গত য়ুরোপীয় যুদ্ধে যখন সমস্ত ইংরেজ জাতের মুখশ্রী পাংশুবর্ণ হয়ে উঠেছিল, তখন আমাদের মতো ক্ষীণপ্রাণ জাতকেও তারা আদর করে সহায়তার জন্যে ডেকেছিল। শুধু তাই নয়, ঘোর বিষয়ী লোকেরও যেমন শ্মশানবৈরাগ্যে কিছুক্ষণের জন্যে নিষ্কাম বিশ্বপ্রেম জন্মায়, তেমনি যুদ্ধশেষের কয়েক দণ্ড পরেও রক্ত-আহুতি-যজ্ঞে তাদের সহযোগী ভারতীয়দের প্রতি তাদের মনে দাক্ষিণ্যেরও সঞ্চার হয়েছিল। যুদ্ধের ধাক্কাটা এল নরম হয়ে, আর তার পরেই দেখা দিল জালিয়ান-বাগে দানবলীলা, আর তার পরে এল কেনিয়ায় সাম্রাজ্যের সিংহদ্বারে ভারতীয়দের জন্যে অর্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা। রাগ করি বটে, কিন্তু সত্য সমকক্ষ না হয়ে উঠলে সমকক্ষের ব্যবহার পাওয়া যায় না। এই কারণেই মহাত্মাজি খুব একটা ঠেলা দিয়ে প্রজাপক্ষের শক্তিটাকে রাজপক্ষের অনুভবযোগ্য করে তোলবার চেষ্টা করেছেন। উভয় পক্ষের মধ্যে আপোষনিষ্পত্তিই তাঁর লক্ষ্য ছিল। এই আপোষনিষ্পত্তি সবল-দুর্বলের একান্ত ভেদ থাকলে হতেই পারে না। আমরা যদি ধর্মবলে রাজার সিংহাসনে ভূমিকম্প ঘটাতে পারতুম, তা হলে রাজার বাহুবল একটা ভালোরকম রফা করবার জন্যে আপনিই আমাদের ডাক পাড়ত। ভারতবর্ষে হিন্দুতে মুসলমানে প্রতিনিয়তই পরস্পর রফানিষ্পত্তির কারণ ঘটবে। অসমকক্ষতা থাকলে সে নিষ্পত্তি নিয়তই বিপত্তির আকার ধারণ করবে। ঝরনার জল পানের অধিকার নিয়ে একদা বাঘ ও মেষের মধ্যে একটা আপোষের কন্‌ফারেন্স্‌

বসেছিল। ঈশপের কথামালায় তার ইতিহাস আছে। উপসংহারে প্রবলতর চতুষ্পদটি তর্কের বিষয়টাকে কিরকম অত্যন্ত সরল করে এনেছিল সে কথা সকলেরই জানা আছে। ভারতবর্ষের কল্যাণ যদি চাই তা হলে হিন্দু-মুসলমানে কেবল যে মিলিত হতে হবে তা নয়, সমকক্ষ হতে হবে। সেই সমকক্ষতা তাল-ঠোকা পালোয়ানির ব্যক্তিগত সমকক্ষতা নয়, উভয়পক্ষের সামাজিক শক্তির সমকক্ষতা।

মালাবারে মোপলাতে-হিন্দুতে যে কুৎসিত কাণ্ড ঘটেছিল সেটা ঘটেছিল খিলাফৎ-সূত্রে হিন্দু-মুসলমানের সন্ধির ভরা জোয়ারের মুখেই। যে দুই পক্ষে বিরোধ তারা সুদীর্ঘকাল থেকেই ধর্মের ব্যবহারকে নিত্যধর্মনীতির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে এসেছে। নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণের ধর্ম মুসলমানকে ঘৃণা করেছে, মোপলা মুসলমানের ধর্ম নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করেছে। আজ এই দুই পক্ষের কন্‌গ্রেসমঞ্চ-ঘটিত ভ্রাতৃভাবের জীর্ণ মসলার দ্বারা তাড়াতাড়ি অল্প কয়েক দিনের মধ্যে খুব মজবুৎ করে পোলিটিকাল সেতু বানাবার চেষ্টা বৃথা। অথচ আমরা বারবারই বলে আসছি, আমাদের সনাতন ধর্ম যেমন আছে তেমনিই থাক্‌, আমরা অবাস্তবকে দিয়েই বাস্তব ফল লাভ করব, তার পরে ফললাভ হলে আপনিই সমস্ত গলদ সংশোধন হয়ে যাবে। বাজিমাৎ করে দিয়ে তার পরে চালের কথা ভাবব ; আগে স্বরাট হব, তার পরে মানুষ হব।

মালাবার-উৎপাত সম্বন্ধে এই তো গেল প্রথম কথা। তার পরে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে হিন্দু-মুসলমানের অসমকক্ষতা। ডাক্তার মুঞ্জে এই উপদ্রবের বিবরণ আলোচনা করে দক্ষিণের হিন্দুসমাজগুরু শঙ্করাচার্যের কাছে একটি রিপোর্ট্‌ পাঠিয়েছেন ; তাতে বলেছেন :

The Hindus of Malabar are generally speaking mild and docile and have come to entertain such a mortal fear of the Moplas that the moment any such trouble arises, the only way of escape the Hindus can think of, is to run for life leaving their children and womenfolk behind, to take care of themselves as best as they could, thinking perhaps honestly that if the Moplas attack them without any previous molestation, God, the Almighty and the Omniscient, is there to teach them a lesson and even to take a revenge on their behalf.

ডাক্তার মুঞ্জের এ কথাটির মানে হচ্ছে এই যে, হিন্দু ঐহিককে ঐহিকের নিয়মে ব্যবহার করতে অভ্যাস করে নি, সে নিত্যে অনিত্যে খিচুড়ি পাকিয়ে বুদ্ধিটাকে দিয়েছে জলে। বুদ্ধির জায়গায় বিধি, এবং আত্মশক্তির জায়গায় ভগবানকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে এরা আত্মাবমাননায় স্বয়ং ভগবানের অবমাননা করে বলেই দুঃখ পায়, সে কথা মনের জড়ত্ববশতই বোঝে না।

ডাক্তার মুঞ্জের রিপোর্টের আর-একটা অংশে তিনি বলছেন, আট শো বৎসর আগে মালাবারের হিন্দুরাজা ব্রাহ্মণমন্ত্রীদের পরামর্শে তাঁর রাজ্যে আরবদের বাসস্থাপনের জন্যে বিশেষভাবে সুবিধা করে দিয়েছিলেন। এমন-কি হিন্দুদের মুসলমান করবার কাজে তিনি আরবদের এতদূর প্রশ্রয় দিয়েছিলেন যে, তাঁর আইন-মতে প্রত্যেক জেলে-পরিবার থেকে একজন হিন্দুকে মুসলমান হতেই হত। এর প্রধান কারণ, ধর্মপ্রাণ রাজা ও তাঁর মন্ত্রীরা সমুদ্রযাত্রা ধর্মবিরুদ্ধ বলেই মেনে নিয়েছিলেন ; তাই মালাবারের সমুদ্রতীরবর্তী রাজ্যরক্ষার ভার সেই সকল মুসলমানের হাতেই ছিল, সমুদ্রযাত্রার বৈধতা সম্বন্ধে যারা বুদ্ধিকে মানত, মনুকে মানত না। বুদ্ধিকে না মেনে অবুদ্ধিকে মানাই যাদের ধর্ম রাজাসনে বসেও তারা স্বাধীন হয় না। তারা কর্মের মধ্যাহ্নকালকেও সুপ্তির নিশীথরাত্রি বানিয়ে তোলে। এই জন্যেই তাদের

ঠিক দুপ্‌প'র বেলা
ভূতে মারে ঢেলা।

মালাবারের রাজা একদা নিজে রাজার মুখোষ-মাত্র প'রে অবুদ্ধিকে রাজাসন ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেই অবুদ্ধি মালাবারের হিন্দুসিংহাসনে এখনো রাজা আছে। তাই হিন্দু এখনো মার খায় আর উপরের দিকে তাকিয়ে বলে, ভগবান আছেন। সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে আমরা অবুদ্ধিকে রাজা করে দিয়ে তার কাছে হাত জোড় করে আছি। সেই অবুদ্ধির রাজত্বকে— সেই বিধাতার বিধিবিরুদ্ধ ভয়ংকর ফাঁকটাকে কখনো পাঠান, কখনো মোগল, কখনো ইংরেজ এসে পূর্ণ করে বসছে। বাইরে থেকে এদের মারটাকেই দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এরা হল উপলক্ষ্য। এরা এক-একটা ঢেলামাত্র, এরা ভূত নয়। আমরা মধ্যাহ্নকালের আলোতেও বুদ্ধির চোখ বুজিয়ে দিয়ে অবুদ্ধির ভূতকে ডেকে এনেছি, সমস্ত তারই কর্ম। তাই ঠিক দুপ্‌প'র বেলায় যখন জাগ্রত বিশ্বসংসার চিন্তা করছে, কাজ করছে, তখন পিছন দিক থেকে কেবল আমাদেরই পিঠের উপর—

ঠিক দুপ্‌প'র বেলা
ভূতে মারে ঢেলা।

আমাদের লড়াই ভূতের সঙ্গে, আমাদের লড়াই অবুদ্ধির সঙ্গে, আমাদের লড়াই অবাস্তবের সঙ্গে। সেই আমাদের চারি দিকে ভেদ এনেছে, সেই আমাদের কাঁধের উপর পরবশতাকে চড়িয়ে দিয়েছে— সেই আমাদের এতদূর অন্ধ করে দিয়েছে যে যখন চীৎকারশব্দে ঢেলাকে গাল পেড়ে গলা ভাঙছি তখন সেই ভূতটাকে পরমাত্মীয় পরমারাধ্য বলে তাকেই আমাদের সমস্ত বাস্তুভিটে দেবত্র করে ছেড়ে দিয়েছি। ঢেলার দিকে তাকালে আমাদের পরিত্রাণের আশা থাকে না ; কেননা জগতে ঢেলা অসংখ্য,

ঢেলা পথে ঘাটে, ঢেলা একটা ফুরোলে হাজারটা আসে— কিন্তু ভূত একটা। সেই ভূতটাকে ঝেড়ে ফেলতে পারলে ঢেলাগুলো পায়ে পড়ে থাকে, গায়ে পড়ে না। ভারতবর্ষের সেই পুরাতন প্রার্থনাকে আজ আবার সমস্ত প্রাণমন দিয়ে উচ্চারণ করবার সময় এসেছে, শুধু কণ্ঠ দিয়ে নয়, চিন্তা দিয়ে, কর্ম দিয়ে, শ্রদ্ধা দিয়ে, পরস্পরের প্রতি ব্যবহার দিয়ে : য একঃ অবর্ণঃ, যিনি এক এবং সকল বর্ণভেদের অতীত, স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু, তিনিই আমাদের শুভবুদ্ধি দিয়ে পরস্পর সংযুক্ত করুন।

১৩৩০

সমাধান

সমস্যার দিকে কেউ যদি অঙ্গুলি নির্দেশ করে অমনি দেশের কৃতী অকৃতী সকলে সেই ব্যক্তিকেই সমাধানের জন্য দায়িক করে জবাব চেয়ে বসে। তারা বলে, আমরা তো একটা তবু যা হোক কিছু সমাধানে লেগেছি, তুমিও এমনি একটা সমাধান খাড়া করো, দেখা যাক তোমারই বা কত বড়ো যোগ্যতা।

আমি জানি, কোনো ঔষধসত্রে এক বিলাতি ডাক্তার ছিলেন। তাঁর কাছে এক বৃদ্ধ এসে করুণ স্বরে যেমনি বলেছে 'জ্বর' অমনি তিনি ব্যস্ত হয়ে তখনি তাকে একটা অত্যন্ত তিতো জ্বরঘ্ন রস গিলিয়ে দিলেন, সে লোকটা হাঁপিয়ে উঠল কিন্তু আপত্তি করবার সময় মাত্র পেল না। সেই সংকটের সময়ে আমি যদি ডাক্তারকে বাধা দিয়ে বলতুম, জ্বর ওর নয়, জ্বর ওর মেয়ের, তা হলে কি ডাক্তার রেগে আমাকে বলতে পারতেন যে, তবে তুমিই চিকিৎসা করো-না ; আমি তো তবু যা হয় একটা-কোনো ওষুধ যাকে হয় একজনকে খাইয়েছি, তুমি তো কেবল ফাঁকা সমালোচনাই করলে। আমার এইটুকু মাত্র বলবার কথা যে, আসল সমস্যাটা হচ্ছে, বাপের জ্বর নয়, মেয়ের জ্বর, অতএব বাপকে ওষুধ খাওয়ালে এ সমস্যার সমাধান হবে না।

কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে সুবিধার কথাটা এই যে, আমি যেটাকে সমস্যা বলে নির্ণয় করছি, সে আপন সমাধানের ইঙ্গিত আপনিই প্রকাশ করছে। অবুদ্ধির প্রভাবে আমাদের মন দুর্বল ; অবুদ্ধির প্রভাবে আমরা পরস্পরবিচ্ছিন্ন— শুধু বিচ্ছিন্ন নই, পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধ ; অবুদ্ধির প্রভাবে বাস্তব জগৎকে বাস্তবভাবে গ্রহণ করতে পারি নে বলেই জীবনযাত্রায় আমরা প্রতিনিয়ত পরাহত ; অবুদ্ধির প্রভাবে স্ববুদ্ধির প্রতি আস্থা হারিয়ে আন্তরিক স্বাধীনতার উৎসমুখে আমরা দেশজোড়া পরবশতার পাথর চাপিয়ে বসেছি। এইটেই যখন আমাদের সমস্যা তখন এর সমাধান শিক্ষা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

আজকাল আমরা এই একটা বুলি ধরেছি, ঘরে যখন আগুন লেগেছে তখন শিক্ষা-দীক্ষা সব ফেলে রেখে সর্বাগ্রে আগুন নেবাতে কোমর বেঁধে দাঁড়ানো চাই, অতএব সকলকেই চরকায় সুতো কাটতে হবে। আগুন লাগলে আগুন নেবানো চাই এ কথাটা আমার মতো মানুষের কাছেও দুর্বোধ নয়। এর মধ্যে দুরূহ ব্যাপার হচ্ছে কোন্‌টা আগুন সেইটে স্থির করা, তার পরে স্থির করতে হবে কোন্‌টা জল। ছাইটাকেই আমরা যদি আগুন বলি তা হলে ত্রিশ কোটি ভাণ্ডাকুলো লাগিয়েও সে আগুন নেবাতে পারব না। নিজের চরকার সুতো, নিজের তাঁতের কাপড় আমরা যে ব্যবহার করতে পারছি নে সেটা আগুন নয়, সেটা ছাইয়ের একটা অংশ অর্থাৎ আগুনের চরম ফল। নিজের তাঁত চালাতে থাকলেও এ আগুন জ্বলতে থাকবে। বিদেশী আমাদের রাজা এটাও আগুন নয়, এটা ছাই; বিদেশীকে বিদায় করলেও আগুন জ্বলবে— এমন-কি স্বদেশী রাজা হলেও দুঃখদহনের নিবৃত্তি হবে না। এমন নয় যে, হঠাৎ আগুন লেগেছে, হঠাৎ নিবিয়ে ফেলব। হাজার বছরের ঊর্ধ্বকাল যে আগুন দেশটাকে হাড়ে মাসে জ্বালাচ্ছে, আজ স্বহস্তে সুতো কেটে কাপড় বুনলেই সে আগুন দু দিনে বশ মানবে এ কথা মেনে নিতে পারি নে। আজ দুশো-বছর আগে চরকা চলেছিল, তাঁতও বন্ধ হয় নি, সেই সঙ্গে আগুনও দাউ-দাউ করে জ্বলছিল। সেই আগুনের জ্বালানি-কাঠটা হচ্ছে ধর্মে কর্মে অবুদ্ধির অন্ধতা।

যেখানে বর্বর অবস্থায় মানুষ ছাড়া-ছাড়া হয়ে থাকে সেখানে বনে জঙ্গলে ফলমূল খেয়ে চলে, কিন্তু যেখানে বহু লোকের সমাবেশে সভ্যতার বিচিত্র উদ্যম প্রকাশ পেতে চায় সেখানে ব্যাপক ক্ষেত্র জুড়ে বেশ ভালোরকম করে চাষ করা অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে। সকল বড়ো সভ্যতারই অন্নরূপের আশ্রয় হচ্ছে কৃষিক্ষেত্র। কিন্তু সভ্যতার একটা বুদ্ধিরূপ আছে, সে তো অন্নের চেয়ে বড়ো বই ছোটো নয়। ব্যাপকভাবে সর্বসাধারণের মনের ক্ষেত্র কর্ষণ করে বিচিত্র ও বিস্তীর্ণ -ভাবে বুদ্ধিকে ফলিয়ে তুলতে পারলে তবেই সে সভ্যতা মনস্বী হয়। কিন্তু যেখানে অধিকাংশ লোক মূঢ়তায় আবিষ্ট হয়ে অন্ধসংস্কারের নানা বিভীষিকায় সর্বদা ত্রস্ত হয়ে গুরু-পুরোহিত-গণৎকারের দরজায় অহরহ ছুটোছুটি করে মরছে সেখানে এমন কোনো সর্বজনীন স্বাধীনতামূলক রাষ্ট্রিক বা সামাজিক ব্যবস্থাতন্ত্র ঘটতেই পারে না যার সাহায্যে অধিকাংশ মানুষ নিজের অধিকাংশ ন্যায্য প্রাপ্য পেতে পারে। আজকালকার দিনে আমরা সেই রাষ্ট্রনীতিকেই শ্রেষ্ঠ বলি যার ভিতর দিয়ে সর্বজনের স্বাধীন বুদ্ধি স্বাধীন শক্তি নিজেকে প্রকাশ করবার উপায় পায়। কোনো দেশেই আজ পর্যন্ত তার সম্পূর্ণ আদর্শ দেখি নি। কিন্তু আধুনিক য়ুরোপে আমেরিকায় এই আদর্শের অভিমুখে প্রয়াস দেখতে পাই। এই

প্রয়াস কখন থেকে পাশ্চাত্য দেশে বললাভ করেছে। যখন থেকে সেখানে জ্ঞান ও শক্তি -সাধনার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি বহুলপরিমাণে সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়েছে। যখন থেকে সংসারযাত্রার ক্ষেত্রে মানুষ নিজের বুদ্ধিকে স্বীকার করতে সাহস করেছে। তখন থেকেই জনসাধারণ রাজা গুরু জড়প্রথা ও অন্ধসংস্কারগত শাস্ত্রবিধির বিষম চাপ কাটিয়ে উঠে মুক্তির সর্বপ্রকার বাধা আপন বুদ্ধির যোগে দূর করতে চেষ্টা করেছে। অন্ধ বাধ্যতা দ্বারা চালিত হবার চিরাভ্যাস নিয়ে মুক্তির বিপুল দায়িত্ব কোনো জাতি কখনো ভালো করে বুঝতেই পারবে না, বহন করা তো দূরের কথা। হঠাৎ এক সময়ে যাঁকে তারা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলে বিশ্বাস করে তাঁর বাণীকে দৈববাণী বলে জেনে তারা ক্ষণকালের জন্যে একটা দুঃসাধ্য সাধনও করতে পারে, অর্থাৎ যে আত্মশক্তি তাদের নিজের মধ্যে থাকা উচিত ছিল সেইটাকে বাইরে কোথাও খাড়া করে কোনো-এক সময়ে কোনো-একটা কাজ তারা মরিয়া হয়ে চালিয়ে নিতে পারে। নিত্য ব্যবহারের জন্যে যে আগুন জ্বালাবার কাজটা তাদের নিজের বুদ্ধির হাতেই থাকা উচিত ছিল কোনো একদিন সেই কাজটা কোনো অগ্নিগিরির আকস্মিক উচ্ছ্বাসের সহায়তায় তারা সাধন করে নিতে পারে। কিন্তু ক্বচিৎ-বিস্ফুরিত অগ্নিগিরির উপরেই যাদের ঘরের আলো জ্বালাবার ভার, নিজেদের বুদ্ধিশক্তির উপর নয়, মুক্তির নিত্যোৎসবে তাদের প্রদীপ জ্বলবে না এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। অতএব যে শিক্ষার চর্চায় তারা আগুন নিজে জ্বালাতে পারে, নিজে জ্বালানো অসাধ্য নয় এই ভরসা লাভ করতে পারে, সেই শিক্ষা পাওয়াই ঘরের অন্ধকার দূর হওয়ার একমাত্র সদুপায়।

এমন লোককে জানা আছে যে মানুষ জন্ম-বেকার, মজ্জাগত অবসাদে কাজে তার গা লাগে না। পৈতৃক সম্পত্তি তার পক্ষে পরম বিপত্তি, তাও প্রায় উজাড় হয়ে এল। অর্থ না হলে তার চলে না, কিন্তু উপার্জনের দ্বারা অর্থসঞ্চয়ের পথ এত দীর্ঘ, এত বন্ধুর যে, সে পথের সামনে বসে বসে পথটাকে হ্রস্ব করবার দৈব উপায়-চিন্তায় আধ-বোজা চোখে সর্বদা নিযুক্ত; তাতে কেবল তার চিন্তাই বেড়ে চলেছে, পথ কমছে না। এমন সময় সন্ন্যাসী এসে বললে, তিন মাসের মধ্যেই সহজ উপায়ে তোমাকে লক্ষপতি করে দিতে পারি। এক মুহূর্তে তার জড়তা ছুটে গেল। সেই তিনটে মাস সন্ন্যাসীর কথামত সে দুঃসাধ্য সাধন করতে লাগল। এই জড়পদার্থের মধ্যে সহসা এতটা প্রচুর উদ্যম দেখে সকলেই সন্ন্যাসীর অলৌকিক শক্তিতে বিস্মিত হয়ে গেল। কেউ বুঝলে না, এটা সন্ন্যাসীর শক্তির লক্ষণ নয়, ঐ মানুষটারই অশক্তির লক্ষণ। আত্মশক্তির পথে চলতে যে বুদ্ধি যে অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, যে মানুষের তা নেই তাকে অলৌকিক-

শক্তি-পথের আভাস দেবা মাত্রই সে তার জড়শয্যা থেকে লাফ দিয়ে ওঠে। তা না হলে আমাদের দেশে এত তাগাতাবিজ বিক্রি হবে কেন। যারা রোগ তাপ বিপদ আপদ থেকে রক্ষা পাবার বুদ্ধিসংগত উপায়ের 'পরে মানসিক জড়ত্ব-বশত আস্থা রাখে না, তাগাতাবিজ স্বস্ত্যয়ন তন্ত্র মন্ত্র মানতে তারা প্রভূত ত্যাগ এবং অজস্র সময় ও চেষ্টা ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হয় না। এ কথা ভুলে যায় যে, এই তাগাতাবিজ-গ্রস্তদেরই রোগতাপ-বিপদ-আপদের অবসান দেবতা বা অপদেবতা কারো কৃপাতেই ঘটে না, এই তাগাতাবিজ-গ্রস্তদেরই ঘরে অকল্যাণের উৎস শতধারায় চিরদিন উৎসারিত।

যে দেশে বসন্তরোগের কারণটা লোকে বুদ্ধির দ্বারা জেনেছে এবং সে কারণটা বুদ্ধির দ্বারা নিবারণ করেছে সে দেশে বসন্ত মারীরূপ ত্যাগ করে দৌড় মেরেছে। আর যে দেশের মানুষ মা-শীতলাকে বসন্তের কারণ বলে চোখ বুজে ঠিক করে বসে থাকে সে দেশে মা-শীতলাও থেকে যান, বসন্তও যাবার নাম করে না। সেখানে মা-শীতলা হচ্ছেন মানসিক পরবশতার একটি প্রতীক, বুদ্ধির স্বরাজচ্যুতির কদর্য লক্ষণ।

আমার কথার একটা মস্ত জবাব আছে। সে হচ্ছে এই যে, দেশের এক দল লোক তো বিদ্যাশিক্ষা করেছে। তারা তো পরীক্ষা পাস করবার বেলায় জাগতিক নিয়মের নিত্যতা অমোঘতা সম্বন্ধে ব্যাকরণবিশুদ্ধ ইংরেজি ভাষায় সাক্ষ্য দিয়ে ডিগ্রি নিয়ে আসে। কিন্তু আমাদের দেশে এই ডিগ্রিধারীদেরই ব্যবহারে কি আত্মবুদ্ধির 'পরে, বিশ্ববিধির 'পরে বিশ্বাস সপ্রমাণ হচ্ছে? তারাও কি বুদ্ধির অন্ধতায় সংসারে সকল রকমেরই দৈন্য বিস্তার করে না।

স্বীকার করতেই হয়, তাদের অনেকের মধ্যেই বুদ্ধিমুক্তির জোর বড়ো বেশি দেখতে পাই নে; তারাও উচ্ছৃঙ্খলভাবে যা-তা মেনে নিতে প্রস্তুত; অন্ধভক্তিতে অদ্ভুত পথে অকস্মাৎ চালিত হতে তারা উন্মুখ হয়ে আছে; আধিভৌতিক ব্যাপারের আধিদৈবিক ব্যাখ্যা করতে তাদের কিছুমাত্র সংকোচ নেই; তারাও নিজের বুদ্ধিবিচারের দায়িত্ব পরের হাতে সমর্পণ করতে লজ্জা বোধ করে না, আরাম বোধ করে।

তার একটা প্রধান কারণ এই যে, মূঢ়তার বিপুল ভারাকর্ষণ জিনিসটা ভয়ংকর প্রবল। নিজের সতর্ক বুদ্ধিকে সর্বদা জাগ্রত রাখতে সচেষ্ট শক্তির প্রয়োজন হয়। যে সমাজ দৈব গুরু ও অপ্রাকৃত প্রভাবের 'পরে আস্থাবান নয়, যে সমাজ বুদ্ধিকে বিশ্বাস করতে শিখেছে, সে সমাজে পরস্পরের উৎসাহে ও সহায়তায় মানুষের মনের শক্তি সহজেই নিরলস থাকে। আমাদের দেশে শিক্ষাপ্রণালীর দোষে একে তো শিক্ষা অগভীর হয়, তার উপরে সেই শিক্ষার ব্যাপ্তি নিরতিশয় সংকীর্ণ। এইজন্যে সর্বজনের

সম্মিলিত মনের শক্তি আমাদের মনকে অপ্রসন্নতার দিকে, আত্মশক্তির দিকে উন্মুখ করে রাখতে পারে না। সে সহজেই অলস হয়ে পড়ে এবং প্রচলিত বিশ্বাস ও চিরাগত প্রথার হাতে পা ঢেলে দিয়ে ছুটি পায়। তার পরে অশিক্ষিতদের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ ঘটে এই যে, তারা আপন অন্ধবিশ্বাসে বিনা দ্বিধায় সহজ ঘুম ঘুমোয়, আমরা নিজেকে ভুলিয়ে আফিঙের ঘুম ঘুমোই; আমরা কুতর্ক করে লজ্জা নিবারণ করতে চেষ্টা করি, জড়তা বা ভীরুত্ব-বশত যে কাজ করি তার একটা সুনিপুণ বা অনিপুণ ব্যাখ্যা বানিয়ে দিয়ে সেটাকে গর্বের বিষয় করে দাঁড় করাতে চাই। কিন্তু ওকালতির জোরে দুর্গতিকে চাপা দেওয়া যায় না।

দেশকে মুক্তি দিতে গেলে দেশকে শিক্ষা দিতে হবে, এ কথাটা হঠাৎ এত অতিরিক্ত মস্ত বলে ঠেকে যে একে আমাদের সমস্যার সমাধান বলে মেনে নিতে মন রাজি হয় না।

দেশের মুক্তি কাজটা খুব বড়ো অথচ তার উপায়টা খুব ছোটো হবে, এ কথা প্রত্যাশা করার ভিতরেই একটা গলদ আছে। এই প্রত্যাশার মধ্যেই রয়ে গেছে ফাঁকির 'পরে বিশ্বাস— বাস্তবের 'পরে নয়, নিজের শক্তির 'পরে নয়।

১৩৩০

শূদ্রধর্ম

মানুষ জীবিকার জন্যে নিজের সুযোগমত নানা কাজ করে থাকে। সাধারণত সেই কাজের সঙ্গে ধর্মের যোগ নেই, অর্থাৎ তার কর্তব্যকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি মূল্য দেওয়া হয় না।

ভারতবর্ষে একদিন জীবিকাকে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। তাতে মানুষকে শান্ত করে। আপনার জীবিকার ক্ষেত্রকে তার সমস্ত সংকীর্ণতা সমেত মানুষ সহজে গ্রহণ করতে পারে।

জীবিকানির্বাচন সম্বন্ধে ইচ্ছার দিকে যাদের কোনো বাধা নেই, অধিকাংশ স্থলে ভাগ্যে তাদের বাধা দেয়। যে মানুষ রাজমন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখে কাজের বেলায় তাকে রাজার ফরাসের কাজ করতে হয়। এমন অবস্থায় কাজের ভিতরে ভিতরে তার বিদ্রোহ থামতে চায় না।

মুশকিল এই যে, রাজসংসারে ফরাসের কাজের প্রয়োজন আছে, কিন্তু রাজমন্ত্রীর পদেরই সম্মান। এমন-কি, যে স্থলে তার পদই আছে, কর্ম নেই, সেখানেও সে তার

খেতাব নিয়ে মানের দাবি করে। ফরাস এ দিকে খেটে খেটে হয়রান হয় আর মনে মনে ভাবে, তার প্রতি দৈবের অবিচার। পেটের দায়ে অগত্যা দীনতা স্বীকার করে, কিন্তু ক্ষোভ মেটে না।

ইচ্ছার স্বাধীনতার স্বপক্ষে ভাগ্যও যদি যোগ দিত, সব ফরাসই যদি রাজমন্ত্রী হয়ে উঠত, তা হলে মন্ত্রণার কাজ যে ভালো চলত তা নয়, ফরাসের কাজও একেবারেই বন্ধ হয়ে যেত।

দেখা যাচ্ছে, ফরাসের কাজ অত্যাবশ্যক, অথচ ফরাসের পক্ষে তা অসন্তোষজনক। এমন অবস্থায় বাধ্য হয়ে কাজ করা অপমানকর।

ভারতবর্ষ এই সমস্যার মীমাংসা করেছিল বৃত্তিভেদকে পুরুষানুক্রমে পাকা করে দিয়ে। রাজশাসনে যদি পাকা করা হত তা হলে তার মধ্যে দাসত্বের অবমাননা থাকত এবং ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহের চেষ্টা কখনোই থামত না। পাকা হল ধর্মের শাসনে। বলা হল, এক-একটা জাতির এক-একটা কাজ তার ধর্মেরই অঙ্গ।

ধর্ম আমাদের কাছে ত্যাগ দাবি করে। সেই ত্যাগে আমাদের দৈন্য নয়, আমাদের গৌরব। ধর্ম আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলকেই কিছু না কিছু ত্যাগের পরামর্শ দিয়েছে। ব্রাহ্মণকেও অনেক ভোগ বিলাস ও প্রলোভন পরিত্যাগ করবার উপদেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, তার সঙ্গে ব্রাহ্মণ প্রচুর সম্মান পেয়েছিল। না পেলে সমাজে সে নিজের কাজ করতেই পারত না। শূদ্রও যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করেছে, কিন্তু সমাদর পায় নি। তবুও, সে কিছু পাক আর না পাক, ধর্মের খাতিরে হীনতা স্বীকার করার মধ্যেও তার একটা আত্মপ্রসাদ আছে।

বস্তুত জীবিকানির্বাহকে ধর্মের শ্রেণীতে ভুক্ত করা তখনি চলে যখন নিজের প্রয়োজনের উপরেও সমাজের প্রয়োজন লক্ষ্য থাকে। ব্রাহ্মণ ভাতে-ভাত খেয়ে বাহ্য দৈন্য স্বীকার করে নিয়ে সমাজের আধ্যাত্মিক আদর্শকে সমাজের মধ্যে বিশুদ্ধ যদি রাখে তবে তার দ্বারা তার জীবিকানির্বাহ হলেও সেটা জীবিকানির্বাহের চেয়ে বড়ো, সেটা ধর্ম। চাষী যদি চাষ না করে তবে এক দিনও সমাজ টেঁকে না। অতএব চাষী আপন জীবিকাকে যদি ধর্ম বলে স্বীকার করে তবে কথাটাকে মিথ্যা বলা যায় না। অথচ এমন মিথ্যা সান্ত্বনা তাকে কেউ দেয় নি যে, চাষ করার কাজ ব্রাহ্মণের কাজের সঙ্গে সম্মানে সমান। যেসব কাজে মানুষের উচ্চতর বৃত্তি খাটে, মানবসমাজে স্বভাবতই তার সম্মান শারীরিক কাজের চেয়ে বেশি, এ কথা সুস্পষ্ট।

যে দেশে জীবিকা-অর্জনকে ধর্মকর্মের সামিল করে দেখে না সে দেশেও নিম্নশ্রেণীর কাজ বন্ধ হলে সমাজের সর্বনাশ ঘটে। অতএব সেখানেও অধিকাংশ লোককেই সেই

কাজ করতেই হবে। সুযোগের সংকীর্ণতাবশত সে-রকম কাজ করবার লোকের অভাব ঘটে না, তাই সমাজ টিঁকে আছে। আজকাল মাঝে-মাঝে যখন সেখানকার শ্রমজীবীরা সমাজের সেই গরজের কথাটা মাথা নাড়া দিয়ে সমাজের নিষ্কর্মা বা পরাসক্ত বা বুদ্ধিজীবীদের জানান দেয় তখন সমাজে একটা ভূমিকম্প উপস্থিত হয়। তখন কোথাও বা কড়া রাজশাসন, কোথাও বা তাদের আর্জি-মঞ্জুরির দ্বারা সমাজ-রক্ষার চেষ্টা হয়।

আমাদের দেশে বৃত্তিভেদকে ধর্মশাসনের অন্তর্গত করে দেওয়াতে এরকম অসন্তোষ ও বিপ্লবচেষ্টার গোড়া নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এতে করে জাতিগত কর্মধারা-গুলির উৎকর্ষ সাধন হয়েছে কি না ভেবে দেখবার বিষয়।

যে-সকল কাজ বাহ্য অভ্যাসের নয়, যা বুদ্ধিমূলক বিশেষ ক্ষমতার দ্বারাই সাধিত হতে পারে, তা ব্যক্তিগত না হয়ে বংশগত হতেই পারে না। যদি তাকে বংশে আবদ্ধ করা হয় তা হলে ক্রমেই তার প্রাণ মরে গিয়ে বাইরের ঠাটটাই বড়ো হয়ে ওঠে। ব্রাহ্মণের যে সাধনা আন্তরিক তার জন্যে ব্যক্তিগত শক্তি ও সাধনার দরকার, যেটা কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক সেটা সহজ। আনুষ্ঠানিক আচার বংশানুক্রমে চলতে চলতে তার অভ্যাসটা পাকা ও দম্ভটা প্রবল হতে পারে, কিন্তু তার আসল জিনিসটি মরে যাওয়াতে আচারগুলি অর্থহীন বোঝা হয়ে উঠে জীবনপথের বিঘ্ন ঘটায়। উপনয়নপ্রথা এক সময়ে আর্যদ্বিজদের পক্ষে সত্য পদার্থ ছিল— তার শিক্ষা, দীক্ষা, ব্রহ্মচর্য, গুরুগৃহবাস, সমস্তই তখনকার কালের ভারতবর্ষীয় আর্যদের মধ্যে প্রচলিত শ্রেষ্ঠ আদর্শগুলিকে গ্রহণ করবার পক্ষে উপযোগী ছিল। কিন্তু যে-সকল উচ্চ আদর্শ আধ্যাত্মিক, যার জন্যে নিয়তজাগরূক চিৎশক্তির দরকার, সে তো মৃত পদার্থের মতো কঠিন আচারের পৈতৃক সিন্ধুকের মধ্যে বদ্ধ করে রাখবার নয়। সেইজন্যেই স্বভাবতই উপনয়নপ্রথা এখন প্রহসন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার কারণ, উপনয়ন যে আদর্শের বাহন ও চিহ্ন সেই আদর্শই গেছে সরে। ক্ষত্রিয়েরও সেই দশা; কোথায় যে সে, তাকে খুঁজে পাওয়া শক্ত। যারা ক্ষত্রিয়বর্ণ বলে পরিচিত, জাতকর্ম বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সময়েই তারা ক্ষত্রিয়ের কতকগুলি পুরাতন আচার পালন করে মাত্র।

এ দিকে শাস্ত্রে বলছেন: স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ। এ কথাটার প্রচলিত অর্থ এই দাঁড়িয়েছে যে, যে বর্ণের শাস্ত্রবিহিত যে ধর্ম তাকে তাই পালন করতে হবে। এ কথা বললেই তার তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, ধর্ম-অনুশাসনের যে অংশটুকু অন্ধভাবে পালন করা চলে তাই প্রাণপণে পালন করতে হবে, তার কোনো প্রয়োজন থাক্ আর নাই থাক্, তাতে অকারণে মানুষের স্বাধীনতার খর্বতা ঘটে ঘটুক,

তার ক্ষতি হয় হোক। অন্ধ আচারের অত্যাচার অত্যন্ত বেশি, তার কাছে ভালোমন্দর আন্তরিক মূল্যবোধ নেই। তাই যে শুচিবায়ুগ্রস্ত মেয়ে কথায় কথায় স্নান করতে ছোটে সে নিজের চেয়ে অনেক ভালো লোককে বাহ্যশুচিতার ওজনে ঘৃণাভাজন মনে করতে দ্বিধা বোধ করে না। বস্তুত তার পক্ষে আন্তরিক সাধনার কঠিনতর প্রয়াস অনাবশ্যক। এইজন্যে অহংকার ও অন্যের প্রতি অবজ্ঞায় তার চিত্তের অশুচিতা ঘটে। এই কারণে আধুনিক কালে যারা বুদ্ধিবিচার জলাঞ্জলি দিয়ে সমাজকর্তাদের মতে স্বধর্ম পালন করে তাদের ঔদ্ধত্য এতই দুঃসহ, অথচ এত নিরর্থক।

অথচ জাতিগত স্বধর্ম পালন করা খুবই সহজ যেখানে সেই স্বধর্মের মধ্যে চিত্তবৃত্তির স্থান নেই। বংশানুক্রমে হাঁড়ি তৈরি করা, বা ঘানির থেকে তেল বের করা, বা উচ্চতর বর্ণের দাস্যবৃত্তি করা কঠিন নয়— বরং তাতে মন যতই মরে যায় কাজ ততই সহজ হয়ে আসে। এই-সকল হাতের কাজেরও নূতনতর উৎকর্ষ সাধন করতে গেলে চিত্ত চাই। বংশানুক্রমে স্বধর্ম পালন করতে গিয়ে তার উপযুক্ত চিত্তও বাকি থাকে না, মানুষ কেবল যন্ত্র হয়ে একই কর্মের পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। যাই হোক, আজ ভারতে বিশুদ্ধভাবে স্বধর্মে টিঁকে আছে কেবল শূদ্রেরা। শূদ্রত্বে তাদের অসন্তোষ নেই। এইজন্যেই ভারতবর্ষের-নিমকে-জীর্ণ দেশে-ফেরা ইংরেজ-গৃহিণীর মুখে অনেকবার শুনেছি, স্বদেশে এসে ভারতবর্ষের চাকরের অভাব তারা বড়ো বেশি অনুভব করে। ধর্মশাসনে পুরুষানুক্রমে যাদের চাকর বানিয়েছে তাদের মতো চাকর পৃথিবীতে কোথায় পাওয়া যাবে। লাথিঝাঁটা-বর্ষণের মধ্যেও তারা স্বধর্মরক্ষা করতে কুণ্ঠিত হয় না। তারা তো কোনোকালে সম্মানের দাবি করে নি, পায়ও নি, তারা কেবল শূদ্রধর্ম অত্যন্ত বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করেছে। আজ যদি তারা বিদেশী শিক্ষায় মাঝে মাঝে আত্মবিস্মৃত হয় তবে সমাজপতি তাদের স্পর্ধা সম্বন্ধে আক্রোশ প্রকাশ করে।

স্বধর্মরত শূদ্রের সংখ্যাই ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশি, তাই এক দিক থেকে দেখতে গেলে ভারতবর্ষ শূদ্রধর্মেরই দেশ। তার নানা প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া গেছে। এই অতি প্রকাণ্ড শূদ্রধর্মের জড়ত্বের ভারাকর্ষণে ভারতের সমস্ত হিন্দুসম্প্রদায়ের মাথা হেঁট হয়ে আছে। বুদ্ধিসাধ্য জ্ঞানসাধ্য চারিত্রশক্তিসাধ্য যে-কোনো মহাসম্পদ্‌লাভের সাধনা আমরা আজ করতে চাই তা এই প্রবল শূদ্রস্বভাব ঠেলে তবে করতে হবে— তার পরে সেই সম্পদকে রক্ষা করবার ভারও এই অসীম অন্ধতার হাতে সমর্পণ করা ছাড়া আর উপায় নেই। এই কথাই আমাদের ভাববার কথা।

এই শূদ্রপ্রধান ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড়ো দুর্গতির যে ছবি দেখতে পাই সেই পরম আক্ষেপের কথাটা বলতে বসেছি।

প্রথমবারে যখন জাপানের পথে হংকঙের বন্দরে আমাদের জাহাজ লাগল, দেখলুম সেখানে ঘাটে একজন পাঞ্জাবি পাহারাওয়ালা অতি তুচ্ছ কারণে একজন চৈনিকের বেণী ধরে তাকে লাথি মারলে। আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল। নিজের দেশে রাজভৃত্যের-লাঞ্ছন-ধারী কর্তৃক স্বদেশীর এরকম অত্যাচার-দুর্গতি অনেক দেখেছি, দূর সমুদ্রতীরে গিয়েও তাই দেখলুম। দেশে বিদেশে এরা শূদ্রধর্মপালন করছে। চীনকে অপমানিত করবার ভার প্রভুর হয়ে এরা গ্রহণ করেছে, সে সম্বন্ধে এরা কোনো বিচার করতেই চায় না; কেননা এরা শূদ্রধর্মের হাওয়ায় মানুষ। নিমকের সহজ দাবি যতদূর পৌঁছায় এরা সহজেই তাকে বহু দূরে লঙ্ঘন করে যায়; তাতে আনন্দ পায়, গর্ব বোধ করে।

চীনের কাছ থেকে ইংরেজ যখন হংকঙ কেড়ে নিতে গিয়েছিল তখন এরাই চীনকে মেরেছে। চীনের বুকে এদেরই অস্ত্রের চিহ্ন অনেক আছে— সেই চীনের বুকে যে চীন আপন হৃদয়ের মধ্যে ভারতবর্ষের বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন ধারণ করেছিল, সেই ইৎসিং হিউয়েন্‌সাঙের চীন।

মানববিশ্বের আকাশে আজ যুদ্ধের কালো মেঘ চার দিকে ঘনিয়ে এসেছে। এ দিকে প্যাসিফিকের তীরে ইংরেজের তীক্ষ্ণচঞ্চু খরনখরদারুণ শ্যেনতরণীর নীড় বাঁধা হচ্ছে। পশ্চিম মহাদেশে দিকে দিকে রব উঠেছে যে, এসিয়ার অস্ত্রশালায় শক্তিশেল তৈরি চলছে; য়ুরোপের মর্মের প্রতি তার লক্ষ। রক্তমোক্ষণক্লান্ত পীড়িত এসিয়াও ক্ষণে ক্ষণে অস্থিরতার লক্ষণ দেখাচ্ছে। পূর্বমহাদেশের পূর্বতম প্রান্তে জাপান জেগেছে, চীনও তার দেওয়ালের চার দিকে সিঁধ কাটার শব্দে জাগবার উপক্রম করছে। হয়তো একদিন এই বিরাটকায় জাতি তার বন্ধন ছিন্ন করে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করবে, হয়তো একদিন তার আফিমে আবিষ্ট দেহ বহুকালের বিষ ঝেড়ে ফেলে আপনার শক্তি উপলব্ধি করতে পারবে। চীনের থলিঝুলি যারা ফুটো করতে লেগেছিল তারা চীনের এই চৈতন্যলাভকে য়ুরোপের বিরুদ্ধে অপরাধ বলেই গণ্য করবে। তখন এসিয়ার মধ্যে এই শূদ্র ভারতবর্ষের কী কাজ। তখন সে য়ুরোপের কামারশালায় তৈরি লোহার শিকল কাঁধে করে নির্বিচারে তার প্রাচীন বন্ধুকে বাঁধতে যাবে। সে মারবে, সে মরবে। কেন মারবে, কেন মরবে, এ কথা প্রশ্ন করতে তার ধর্মে নিষেধ। সে বলবে: স্বধর্মে হননং শ্রেয়ঃ, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ। ইংরেজ-সাম্রাজ্যের কোথাও সে সম্মান চায়ও না পায়ও না— ইংরেজের হয়ে সে কুলিগিরির বোঝা বয়ে মরে, যে বোঝার মধ্যে তার অর্থ নেই, পরমার্থ নেই; ইংরেজের হয়ে পরকে সে তেড়ে মারতে যায়, যে পর তার

শক্র নয়; কাজ সিদ্ধ হবা মাত্র আবার তাড়া খেয়ে তোষাখানার মধ্যে ঢোকে। শূদ্রের এই তো বহু যুগের দীক্ষা। তার কাজে স্বার্থও নেই, সম্মানও নেই, আছে কেবল 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ' এই বাণী। নিধনের অভাব হচ্ছে না; কিন্তু তার চেয়েও মানুষের বড়ো দুর্গতি আছে যখন সে পরের স্বার্থের বাহন হয়ে পরের সর্বনাশ করাকেই অনায়াসে কর্তব্য বলে মনে করে। অতএব এতে আশ্চর্যের কথা নেই যে, যদি দৈবক্রমে কোনোদিন ব্রিটানিয়া ভারতবর্ষকে হারায় তা হলে নিশ্বাস ফেলে বলবে: I miss my best servant.

১৩৩২

বৃহত্তর ভারত

বৃহত্তর ভারত পরিষদ্ -কর্তৃক অনুষ্ঠিত বিদায়সম্বর্ধনা উপলক্ষে

যবদ্বীপ যাবার পূর্বাহ্নে যে অভিনন্দন আপনারা আমাকে দিলেন তাতে আমার মনে বল সঞ্চার করবে। আমরা চার দিকের দাবির দ্বারা আমাদের প্রাণশক্তি আবিষ্কার করি। যার যা দেবার তা বাইরের নেবার ইচ্ছা থেকে আমরা দিতে সক্ষম হই। দাবির আকর্ষণ যদি থাকে তবে আপনি সহজ হয়ে যায় দেওয়ার পথ।

বাইরে যেখানে দাবি সত্য হয় অন্তরে সেখানেই দানের শক্তি উদ্‌বোধিত হয়ে ওঠে। দানের সামগ্রী আমাদের থাকলেও আমরা দিতে পারি নে সমাজে যতক্ষণ প্রত্যাশা না সজীব হয়ে ওঠে। আজ একটা আকাঙ্ক্ষা আমাদের মধ্যে জেগেছে যে আকাঙ্ক্ষা ভারতের বাইরেও ভারতকে বড়ো করে সন্ধান করতে চায়। সেই আকাঙ্ক্ষাই বৃহত্তর ভারতের প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে রূপ গ্রহণ করেছে। সেই আকাঙ্ক্ষাই আপন প্রত্যাশা নিয়ে আমাকে অভিনন্দন করছে। এই প্রত্যাশা আমার চেষ্টাকে সার্থক করুক।

বর্বরজাতীয় মানুষের প্রধান লক্ষণ এই যে, তার আত্মবোধ সংকীর্ণসীমাবদ্ধ। তার চৈতন্যের আলো উপস্থিত কাল ও বর্তমান অবস্থার ঘেরটুকুকেই আলোকিত করে রাখে বলে সে আপনাকে তার চেয়ে বড়ো ক্ষেত্রে জানে না। এইজন্যেই জ্ঞানে কর্মে সে দুর্বল। সংস্কৃত শ্লোকে বলে: যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। অর্থাৎ, ভাবনাই হচ্ছে সাধনার সৃষ্টিশক্তির মূলে। নিজের সম্বন্ধে, নিজের দেশ সম্বন্ধে বড়ো করে ভাবনা করবার দরকার আছে, নইলে কর্মে জোর পৌঁছয় না এবং অতি ক্ষীণ আশা ও অতি ক্ষুদ্র সিদ্ধি নিয়ে অকৃতার্থ হতে হয়। নিজের কাছে নিজের পরিচয়টাকে

বড়ো করবার চেষ্টাই সভ্যজাতির ইতিহাসগত চেষ্টা। নিজের পরিচয়কে সংকীর্ণ দেশকালের ভূমিকা থেকে মুক্তিদানই হচ্ছে এই চেষ্টার লক্ষ্য।

যখন বালক ছিলুম ঘরের কোণের বাতায়নে বসে দেশের প্রাকৃতিক রূপকে অতি ছোটো পরিধির মধ্যেই দেখেছি। বাইরের দিক থেকে দেশের এমন কোনো মূর্তি দেখি নি যার মধ্যে দেশের ব্যাপক আবির্ভাব আছে। বিদেশী বণিকের হাতে গড়া কলকাতা শহরের মধ্যে ভারতের এমন কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না যা সুগভীর ও সুদূরবিস্তৃত। সেই শিশুকালে কোণের মধ্যে অত্যন্ত বেশি অবরুদ্ধ ছিলাম বলেই ভারতবর্ষের বৃহৎ স্বরূপ চোখে দেখবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হয়েছিল।

এমন সময়ে আমার আট-নয় বছর বয়সে গঙ্গাতীরের এক বাগানে কিছু কালের জন্যে বাস করতে গিয়েছিলাম। গভীর আনন্দ পেলাম। গঙ্গানদী ভারতের একটি বৃহৎ পরিচয়কে বহন করে। ভারতের বহু দেশ বহু কাল ও বহু চিত্তের ঐক্যধারা তার স্রোতের মধ্যে বহমান। এই নদীর মধ্যে ভারতের একটি পরিচয়বাণী আছে। হিমাদ্রির স্কন্ধ থেকে পূর্বসমুদ্র পর্যন্ত লম্বমান এই গঙ্গানদী। সে যেন ভারতের যজ্ঞোপবীতের মতো, ভারতের বহুকালক্রমাগত জ্ঞানধর্মতপস্যার স্মৃতিযোগসূত্র।

তার পর আর কয়েক বৎসর পরেই পিতা আমাকে সঙ্গে করে হিমালয় পর্বতে নিয়ে যান। আমার পিতাকে এই প্রথম নিকটে দেখেছি, আর হিমালয় পর্বতকে। উভয়ের মধ্যেই ভাবের মিল ছিল। হিমালয় এমন একটি চিরন্তন রূপ যা সমগ্র ভারতের, যা এক দিকে দুর্গম আর-এক দিকে সর্বজনীন। আমার পিতার মধ্যেও ভারতের সেই বিদ্যা— চিন্তায় পূজায় কর্মে প্রত্যহ প্রাণময় হয়ে দেখা যাচ্ছিল, যা সর্বকালীন, যার মধ্যে প্রাদেশিকতার কার্পণ্যমাত্র নেই।

তার পর অল্প বয়সে ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়তে শুরু করলাম। তখন আলেকজান্দার থেকে আরম্ভ করে ক্লাইভের আমল পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতবর্ষ বারবার কিরকম পরাস্ত অপমানিত হয়ে এসেছে এই কাহিনীই দিন ক্ষণ তারিখ ও নামমালা -সমেত প্রত্যহ কণ্ঠস্থ করেছি। এই অগৌরবের ইতিহাসমরুতে রাজপুতদের বীরত্বকাহিনীর ওয়েসিস থেকে যেটুকু ফসল সংগ্রহ করা সম্ভব তাই নিয়ে স্বজাতির মহত্ত্ব-পরিচয়ের দারুণ ক্ষুধা মেটাবার চেষ্টা করা হত। সকলেই জানেন, সে সময়কার বাংলা কাব্য নাটক উপন্যাস কিরকম দুঃসহ ব্যগ্রতায় টডের রাজস্থান দোহন করতে বসেছিল। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, দেশের মধ্যে আমাদের পরিচয়-কামনা কিরকম উপবাসী হয়ে ছিল। দেশ বলতে কেবল তো মাটির দেশ নয়, সে যে মানবচরিত্রের দেশ। দেশের বাহ্য প্রকৃতি আমাদের দেহটা গড়ে বটে, কিন্তু আমাদের মানবচরিত্রের

দেশ থেকেই প্রেরণা পেয়ে আমাদের চরিত্র গড়ে ওঠে। সেই দেশটাকে যদি আমরা দীন বলে জানি তা হলে বিদেশী বীরজাতির ইতিহাস পড়ে আমাদের দীনতাকে তাড়াবার শক্তি অন্তরের মধ্যে পাই নে।

ঘরের কোণে আবদ্ধ থেকে ভারতের দৃশ্যরূপটাকে বড়ো করে দেখবার পিপাসা যেমন মনের মধ্যে প্রবল হয়েছিল, তেমনি তখনকার পাঠ্য ভারত-ইতিহাসের অগৌরব-অধ্যায়ের অন্ধকার কোণের মধ্যে বসে বসে ভারতের চারিত্রিক মহিমার বৃহৎ পরিচয় পাবার জন্য মনের মধ্যে একটা ক্ষুধার পীড়ন ছিল। বস্তুত এই অসহ্য ক্ষুধাই আমাদের মনকে তখন নানা হাস্যকর অত্যুক্তি ও অবাস্তবতা নিয়ে তৃপ্তির স্বপ্নমূলক উপকরণ-রচনায় প্রবৃত্ত করেছিল। আজও সেদিন যে একেবারে চলে গেছে তা বলতে পারি নে।

যে তারার আলো নিবে গেছে নিজের মধ্যেই সে সংকুচিত। নিজের মধ্যে একান্ত বন্ধ থাকবার বাধ্যতাকেই বলে দৈন্য। এই দৈন্যের গণ্ডির মধ্যেও তার প্রতি-মুহূর্ত-গত কাজ হয়তো কিছু আছে, কিন্তু উদার নক্ষত্রমণ্ডলীর সভায় তার সম্মানের স্থান নেই। সে অজ্ঞাত, অখ্যাত, পরিচয়হীন। এই অপরিচয়ের অবমাননাই কারাবাসের মতো। এর থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় আলোকের দ্বারা। অর্থাৎ, এমন কোনো প্রকাশের দ্বারা যাতে করে বিশ্বের সঙ্গে তাকে যোগযুক্ত করে, এমন সত্যের দ্বারা যা নিখিলের আদরণীয়।

আমাদের শাস্ত্রে বারবার বলেছে, যিনি নিজের মধ্যে সর্বভূতকে এবং সর্বভূতের মধ্যে নিজেকে জানেন তিনিই সত্যকে জানেন। অর্থাৎ, অহংসীমার মধ্যে আত্মার নিরুদ্ধ অবস্থা আত্মার সত্য অবস্থা নয়। ব্যক্তিগত মানুষের জীবনের সাধনায় এ যেমন একটা বড়ো কথা, নেশনের ঐতিহাসিক সাধনাতেও সেইরকম। কোনো মহাজাতি কী করে আপনাকে বিশ্বের কাছে পরিচিত করতে পারে এই তপস্যাই তার তপস্যা। যে পারলে না বিধাতা তাকে বর্জন করলেন। মানবসভ্যতার সৃষ্টিকার্যে তার স্থান হল না। রামচন্দ্র যখন সেতুবন্ধন করেছিলেন তখন কাঠবেড়ালিরও স্থান হয়েছিল সেই কাজে। সে তখন শুধু গাছের কোটরে নিজের খাদ্যান্বেষণে না থেকে আপনার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়েই দুই তটভূমির বিচ্ছেদসমুদ্রের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজে যোগ দিয়েছিল। সীতাকে রাবণের হাত থেকে উদ্ধার করাই পৃথিবীতে সকল মহৎ সাধনার রূপক। সেই সীতাই ধর্ম; সেই সীতা জ্ঞান, স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি; সেই সীতা সুন্দরী; সেই সীতা সর্বমানবের কল্যাণী। নিজের কোটরের মধ্যে প্রভূত খাদ্যসঞ্চয়ের ঐশ্বর্য নিয়ে এই কাঠবেড়ালির সার্থকতা ছিল না, কিন্তু সীতা-

উদ্ধারের মহৎ কাজে সে যে নিজেকে নিবেদন করেছিল এইজন্তেই মানবদেবতা তার পিঠে আশীর্বাদরেখা চিহ্নিত করেছিলেন। প্রত্যেক মহাজাতির পিঠে আমরা সেই চিহ্ন দেখতে চাই, সেই চিহ্নের দ্বারাই সে আপন কোটরকোণের অতীত নিত্যলোকে স্থান লাভ করে।

ভারতবর্ষের যে বাণী আমরা পাই সে বাণী যে শুধু উপনিষদের শ্লোকের মধ্যে নিবদ্ধ তা নয়। ভারতবর্ষ বিশ্বের নিকট যে মহত্তম বাণী প্রচার করেছে তা ত্যাগের দ্বারা, দুঃখের দ্বারা, মৈত্রীর দ্বারা, আত্মার দ্বারা; সৈন্য দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে, পীড়ন লুণ্ঠন দিয়ে নয়। গৌরবের সঙ্গে দস্যুবৃত্তির কাহিনীকে বড়ো বড়ো অক্ষরে আপন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সে অঙ্কিত করে নি।

আমাদের দেশেও দিগ্‌বিজয়ের পতাকা হাতে পরজাতির দেশ জয় করবার কীর্তি হয়তো সেকালে অনেকে লাভ করে থাকবেন, কিন্তু ভারতবর্ষ অন্য দেশের মতো ঐতিহাসিক জপমালায় ভক্তির সঙ্গে তাঁদের নাম স্মরণ করে না। বীর্যবান দস্যুদের নাম ভারতবর্ষের পুরাণে খ্যাত হয় নি।

অহংকেই যে মানুষ পরম ও চরম সত্য বলে জানে সেই বিনাশ পায়; সকল দুঃখ সকল পাপের মূল এই অহমিকায়। বিশ্বের প্রতি মৈত্রীভাবনাতেই এই অহংভাব লুপ্ত হয়, এই সত্যটি আত্মার আলোক। এই আলোকদীপ্তি ভারতবর্ষ নিজের মধ্যে বদ্ধ রাখতে পারে নি। এই আলোকের আভাতেই ভারত আপন ভূখণ্ডসীমার বাইরে আপনাকে প্রকাশ করেছিল। সুতরাং এইটিই হচ্ছে ভারতের সত্য পরিচয়। এই পরিচয়ের আলোকেই যদি নিজের পরিচয়কে উজ্জ্বল করতে পারি তা হলেই আমরা ধন্য। আমরা যে ভারতবর্ষে জন্মলাভ করেছি সে এই মুক্তিমন্ত্রের ভারতবর্ষে, সে এই তপস্বীর ভারতবর্ষে। এই কথাটি যদি ধ্রুব করে মনে রাখতে পারি তা হলে আমাদের সকল কর্ম বিশুদ্ধ হবে, তা হলে আমরা নিজেকে বিশেষ করে ভারতবাসী বলতে পারব, সেজন্য আমাদের নতুন করে ধ্বজা নির্মাণ করতে হবে না।

ক্ষুধা হলেই মানুষ অন্নের স্বপ্ন দেখে। আজকাল আমাদের দেশে পোলিটিকাল আত্মপরিচয়ের ক্ষুধাটাই নানা কারণে সবচেয়ে প্রবল হয়ে উঠেছে। এইজন্যে নিরন্তর তারই ভোজটাই স্বপ্নে দেখছি। তার চেয়ে বড়ো কথাগুলিকেও অপ্রাসঙ্গিক বলে উপেক্ষা করবার তর্জন আজকাল প্রায় শোনা যায়।

কিন্তু এই পোলিটিকাল আত্মপরিচয়ের ধারা খুঁজতে গিয়ে বিদেশী ইতিহাসে গিয়ে পৌঁছতে হয়। সেই ব্যগ্রতার তাড়নায় আপনাকে স্বপ্নে-গড়া ম্যাট্‌সিনি, স্বপ্নে-গড়া গারিবাল্‌ডি, কাল্পনিক ওয়াশিংটন বলে ভাবনা করতে হয়। অর্থতত্ত্বেও তাই; এখানে

আমাদের কারো কারো কল্পনা বল্‌শেভিজ্‌ম্‌ কারো সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্‌ কারো বা সোস্থালিজ্‌ম্‌'এর গোলকধাঁধায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ-সমস্তই মরীচিকার মতো, ভারতবর্ষের চিরকালীন জমির উপরে নেই— আমাদের দুর্ভাগ্যতাপদগ্ধ হাল আমলের তৃষার্ত দৃষ্টির উপরে স্বপ্ন রচনা করছে। এই স্বপ্ন-সিনেমার কোণে কোণে মাঝে মাঝে **'Made in Europe'**এর মার্কা ঝলক মেরে এর কারখানাঘরের বৃত্তান্তটি জানিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

অজানা পথে অবাস্তবের পিছনে আমরা যেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি সেখানে অভিভূতিবিহ্বলতার মধ্যে আমাদের নিজের পরিচয় নেই। অথচ, পূর্বেই বলেছি, নিজের ব্যক্তিস্বরূপের সত্য পরিচয়ের ভিত্তির উপরেই আমরা সিদ্ধিকে গড়ে তুলতে পারি। পলিটিক্‌স্‌-ইকনমিক্‌স্‌'এর বাইরেও আমাদের গৌরবলোক আছে, এ কথা যদি আমরা জানি তবে সেইখানেই আমাদের ভবিষ্যৎকে আমরা সত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব। বিশ্বাসহীনের মতো নিজের সত্যে অশ্রদ্ধা করে হাওয়ায় হাওয়ায় আকাশকুসুম চাষ করবার চেষ্টা করলে ফল পাব না।

ভারতবর্ষ যে কোন্‌খানে সত্য, নিজের লোহার সিন্ধুকের মধ্যে তার দলিল সে রেখে যায় নি। ভারতবর্ষ যা দিতে পেরেছে তার দ্বারাই তার প্রকাশ। নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ যা তার কুলোয় নি তাতেই তার পরিচয়। অন্যকে সত্য করে দিতে পারার মূলেই হচ্ছে অন্যকে আপন করে উপলব্ধি। আপন সীমার বাধা যে ভাঙতে পেরেছে বাইরের দুর্গম ভৌগোলিক বাধাও সে লঙ্ঘন করতে পেরেছে। এইজন্যেই ভারতবর্ষের সত্যের ঐশ্বর্যকে জানতে হলে সমুদ্রপারে ভারতবর্ষের সুদূর দানের ক্ষেত্রে যেতে হয়। আজ ভারতবর্ষের ভিতরে বসে ধূলিকলুষিত হাওয়ার ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষকে যা দেখি তার চেয়ে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করে ভারতবর্ষের নিত্যকালের রূপ দেখতে পাব ভারতবর্ষের বাইরে থেকে।

চীনে গেলাম, দেখলাম জাত হিসাবে তারা আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। নাকে চোখে ভাষায় ব্যবহারে তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো মিলই নেই। কিন্তু তাদের সঙ্গে এমন একটি গভীর আত্মীয়তার যোগ অনুভব করা গেল যা ভারতবর্ষীয় অনেকের সঙ্গে করা কঠিন হয়ে উঠেছে। এই যোগ রাজশক্তির দ্বারা স্থাপন করা হয় নি, এই যোগ উদ্যত তরবারির জোরেও নয়, এই যোগ কাউকে দুঃখ দিয়ে নয়— নিজে দুঃখস্বীকার করে। অত্যন্ত পরের মধ্যেও যে সত্যের বলে অত্যন্ত আত্মীয়তা স্বীকার করা সম্ভব হয় সেই সত্যের জোরেই চীনের সঙ্গে সত্য ভারতের চিরকালের যোগবন্ধন বাঁধা হয়েছে। এই সত্যের কথা বিদেশী পলিটিক্‌সের ইতিহাসে স্থান

পায় নি বলে আমরা একে অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করি নে। কিন্তু একে বিশ্বাস করবার প্রমাণ ভারতের বাইরে সুদূর দেশে আজও রয়ে গেছে।

জাপানে প্রতিদিনের ব্যবহারে জাপানির সুগভীর ধৈর্য, আত্মসংযম, তার রসবোধের বিচিত্র পরিচয়ে যখন বিস্মিত হতেছিলাম তখন এ কথা কতবার শুনেছি যে, এই-সকল গুণের প্রেরণা অনেকখানি বৌদ্ধধর্মের যোগে ভারতবর্ষ থেকে এসেছে। সেই মূল প্রেরণা স্বয়ং ভারতবর্ষ থেকে আজ লুপ্তপ্রায় হল। সত্যের যে বন্যা একদিন ভারতবর্ষের দুই কূল উপ্‌চিয়ে দেশে দেশে বয়ে গিয়েছিল ভারতবর্ষের প্রবাহিনীতে আজ তা তলায় নেমে আসছে, কিন্তু তার জলসঞ্চয় আজও দূরের নানা জলাশয়ে গভীর হয়ে আছে। এই কারণেই সেই-সকল জায়গা আধুনিক ভারতবাসীর পক্ষে তীর্থস্থান। কেননা ভারতবর্ষের ধ্রুব পরিচয় সেইসব জায়গাতেই।

মধ্যযুগে মুসলমান রাজশক্তির সঙ্গে হিন্দুদের ধর্মবিরোধ ঘটেছিল। সেইসময় ধারাবাহিকভাবে সাধুসাধকদের জন্ম হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে অনেকে মুসলমান ছিলেন, যাঁরা আত্মীয়তার সত্যের দ্বারা ধর্মবিরোধের মধ্যে সেতুবন্ধন করতে বসেছিলেন। তাঁরা পোলিটিশান ছিলেন না, প্রয়োজনমূলক পোলিটিকাল ঐক্যকে তাঁরা সত্য বলে কল্পনাও করেন নি। তাঁরা একেবারে সেই গোড়ায় গিয়েছিলেন যেখানে সকল মানুষের মিলনের প্রতিষ্ঠা ধ্রুব। অর্থাৎ, তাঁরা ভারতের সেই মন্ত্রই গ্রহণ করেছিলেন যাতে আছে, যারা সকলকে আপনার মধ্যে এক করে দেখে তারাই সত্য দেখে। তখনকার দিনের অনেক যোদ্ধা অনেক লড়াই করেছেন, বিদেশী-ছাঁচে-ঢালা ইতিহাসে তাঁদেরই নাম ও কীর্তি লিখিত হয়েছে। সে-সব যোদ্ধারা আজ তাঁদের কৃত কীর্তিস্তম্ভের ভগ্নশেষ ধূলিস্তূপের মধ্যে মিশিয়ে আছেন। কিন্তু আজও ভারতের প্রাণস্রোতের মধ্যে সেই-সকল সাধকের অমরবাণী-ধারা প্রবাহিত আছে; সেখান থেকে আমাদের প্রাণের প্রেরণা যদি আমরা নিতে পারি তা হলে তারই জোরে আমাদের রাষ্ট্রনীতি অর্থনীতি কর্মনীতি সবই বল পেয়ে উঠতে পারে।

সত্যবাণী যখন আমাদের প্রাণকে গভীর ভাবে উদ্‌বোধিত করে তখন সেই প্রাণ সকল দিকেই নিজের প্রকাশকে সার্থক করে। তখন সেই প্রাণ সৃষ্টির উদ্যমে পূর্ণ হয়ে ওঠে। চিত্তের উপর সত্যের সংঘাতের প্রমাণ হচ্ছে এই সৃষ্টিশক্তির সচেষ্টতা।

বৌদ্ধধর্ম সন্ন্যাসীর ধর্ম। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন দেখি তারই প্রবর্তনায় গুহাগহ্বরে চৈত্যবিহারে বিপুলশক্তিসাধ্য শিল্পকলা অপর্যাপ্ত প্রকাশ পেয়ে গেছে তখন বুঝতে পারি, বৌদ্ধধর্ম মানুষের অন্তরতম মনে এমন একটি সত্যবোধ জাগিয়েছে যা তার সমস্ত প্রকৃতিকে সফল করেছে, যা তার স্বভাবকে পঙ্গু করে নি। ভারতের বাহিরে

ভারতবর্ষ যেখানে তার মৈত্রীর সোনার কাঠি দিয়ে স্পর্শ করেছে সেখানেই শিল্পকলার কী প্রভূত ও পরমাশ্চর্য বিকাশ হয়েছে। শিল্পসৃষ্টিমহিমায় সে-সকল দেশ মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে।

অথচ সেখানকার লোকের সমজাতীয়দের দেখো, দেখবে তারা নরঘাতক, তারা শিল্পসম্পদ্‌হীন। এমন-সকল নিরালোক চিত্তে আলো জ্বাললে দয়াধর্ম ত্যাগধর্ম মৈত্রী-ধর্মের মহতী বাণীর দ্বারা। সেখানকার লোকে সামান্ত বেশভূষা-ভাষার পরিবর্তনের দ্বারা স্বাতন্ত্র্য পেয়েছে তা নয়; সৃষ্টি করবার সুপ্ত শক্তি তাদের মধ্যে জাগ্রত হয়েছে— সে কী পরমাদ্ভুত সৃষ্টি। এই-সকল দ্বীপেরই আশে পাশে আরও তো অনেক দ্বীপ আছে, সেখানে আমরা 'বরবুদর' দেখি নে কেন, সে-সব জায়গায় 'আঙ্করবট'এর সমতুল্য বা সমজাতীয় কিছু নেই কেন। সত্যের জাগরণমন্ত্র যে সেখানে পৌঁছায় নি। মানুষকে অনুকরণে প্রবৃত্ত করার মধ্যে গৌরব নেই, কিন্তু মানুষের সুপ্ত শক্তিকে মুক্তিদান করার মতো এতবড়ো গৌরবের কথা আর কি কিছু আছে।

লোকে যখন দরিদ্র হয় তখন বাইরের দিকে গৌরব খুঁজে বেড়ায়। তখন কথা বলে গৌরব করতে চায়, তখন পুঁথি থেকে শ্লোক খুঁটে খুঁটে গৌরবের মালমসলা ভগ্নস্তূপ থেকে সঞ্চয় করতে থাকে। এমনি করে সত্যকে ব্যবহার থেকে দূরে রেখে যদি গলার জোরে পুরাতন গৌরবের বড়াই করতে বসি তবে আমাদের ধিক্। অহংকার করবার জন্যে সত্যের ব্যবহার সত্যের অবমাননা। আমার মনের একান্ত প্রার্থনা এই যে, সত্যবাণীকে কাঁধে ঝুলিয়ে জয়ঢাক করে তাকে যেন বাজিয়ে না বেড়াই, বাইরের লোককে চমক লাগাবার জন্যে যেন তাকে অলংকার মাত্র না করি, যেন নিজেরই একান্ত আন্তরিক প্রয়োজনের জন্যেই তার সন্ধান ও সাধনা করতে পারি।

জাভায় যখন যাব তখন মনকে অহংকারমুক্ত করে সত্যের অমৃতমন্ত্রের ক্রিয়াটি দেখে যেন নম্র হতে পারি। সেই মৈত্রীর মহামন্ত্রটি নিজের মধ্যেই পাওয়া চাই, তা হলেই আমার চিত্তে যেখানে অরণ্য সেখানে মন্দির উঠবে, যেখানে মরুভূমি সেখানে সৌন্দর্যের রসবৃষ্টি হবে, জীবনের তপস্যা জয়যুক্ত হয়ে সার্থক হয়ে উঠবে।

১৩৩৪

হিন্দুমুসলমান

শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগকে লিখিত

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

ঘোর বাদল নেমেছে। তাই আমার মনটা মানব-ইতিহাসের শতাব্দীচিহ্নিত বেড়ার ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেছে। আকাশরঙ্গভূমিতে জল-বাতাসের মাতনের যুগযুগান্তরবাহিত স্মৃতিস্পন্দন আজ আমার শিরায় শিরায় মেঘমল্লারের মীড় লাগিয়েছে। আমার কর্তব্যবুদ্ধি কোথায় ভেসে গেল, সম্প্রতি আমি আমার সামনেকার ঐ সারবন্দী শালতাল-মহুয়াছাতিমের দলে ভিড়ে গেছি। প্রাণরাজ্যে ওদের হল বনেদি বংশ, ওরা কোন্ আদিকালের রৌদ্রবৃষ্টির উত্তরাধিকার পুরোপুরি ভোগ করে চলেছে। ওরা মানুষের মতো আধুনিক নয়, সেইজন্যে ওরা চিরনবীন। মানবজাতির মধ্যে কেবল কবিরাই সভ্যতার অপব্যয়ের চোটে তাদের আদিকালের উত্তরাধিকার একেবারে ফুঁকে দিয়ে বসে নি। তাই তরুলতার আভিজাত্য কবিদের নিতান্ত মানুষ বলে অবজ্ঞা করে না। এইজন্যেই বর্ষে বর্ষে বর্ষার সময় আমাকে এমন করে উতলা করে দেয়, আমাকে সকল দায়িত্ববন্ধন থেকে বিবাগি করে প্রাণের খেলাঘরে ডাকতে থাকে— আমাদের মর্মের মধ্যে যে ছেলেমানুষ আছে, যে হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে প্রাচীন পূর্বজ, সেই আমার কর্মশালাটি দখল করে বসে। সেইজন্যেই বর্ষা পড়ে অবধি আমি হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির সঙ্গে গাছপালার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে বসে গেছি, কাজকর্ম ছেড়ে গান তৈরি করছি— সেই সূত্রে মানুষের মধ্যে আমি সবচেয়ে কম মানুষ হয়েছি— আমার মন ঘাসের মতো কাঁপছে, পাতার মতো ঝিল্‌মিল্ করছে। কালিদাস এই উপলক্ষেই বলেছিলেন: মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ। অন্যথাবৃত্তি হচ্ছে মানববৃত্তির গণ্ডির বাইরের বৃত্তি। এই বৃত্তি আমাদের সেই সুদূরকালে নিয়ে যায় যখন প্রাণের খেলা চলছে, মনের মাস্টারি শুরু হয় নি— আজ যেখানে ইস্কুলের মোটা থাম উঠেছে সেখানে যখন ঘাসের ফুলে ফুলে প্রজাপতি উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। যাই হোক, এই সময়টাতে ঘনমেঘে মধ্যাহ্ন ছায়াবৃত, মাঠে মাঠে বাদল-হাওয়া ভেঁপু বাজিয়ে চলেছে, আর ছোটো ছোটো চঞ্চল জলধারা ইস্কুলছাড়া ছাত্রীদের অকারণ হাসির মতো চার দিকে খিল্‌খিল্ করছে। আজ ৭ই আষাঢ় কৃষ্ণা একাদশী তিথি, আজ অম্বুবাচী আরম্ভ হল। নামটা সার্থক হয়েছে, সমস্ত প্রকৃতি আজ জলের ভাষায় মুখর হয়ে উঠল। ঘনমেঘের চন্দ্রাতপের ছায়ায় আজ অম্বুবাচীর গীতিকবিতার

আসর বসেছে— তৃণসভায় গায়েনের দল ঝিল্লিরাও নিমন্ত্রণ পেয়েছে, আর তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে মত্তদাত্যুরী। এ আসরে আমার আসন পড়ে নি যে তা মনেও কোরো না। মেঘের ডাকের জবাব না দিয়ে চুপ করে যাব, আমি এমন পাত্র নই। মেঘের পর মেঘের মতো আমারও গান চলেছে দিনের পর দিন; তার কোনো গুরুত্ব নেই, কোনো উদ্দেশ্য নেই, মেঘ যেমন 'ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ' সেও তেমনি নিরর্থক উপাদানে তৈরি। ঠিক যখন আমার জানলার ধারে বসে গুঞ্জনধ্বনিতে গান ধরেছি—

আজ নবীন মেঘের সুর লেগেছে
আমার মনে,
আমার ভাবনা যত উতল হল
অকারণে—

ঠিক এমনসময় সমুদ্রপার হতে তোমার প্রশ্ন এল, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান-সমস্যার সমাধান কী। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, মানবসংসারে আমার কাজ আছে— শুধু মেঘমল্লারে মেঘের ডাকের জবাব দিয়ে চলবে না, মানব-ইতিহাসের যে-সমস্ত মেঘমন্দ্র প্রশ্নাবলী আছে তারও উত্তর ভাবতে হবে। তাই অম্বুবাচীর আসর পরিত্যাগ করে বেরিয়ে আসতে হল।

পৃথিবীতে দুটি ধর্মসম্প্রদায় আছে অন্য সমস্ত ধর্মমতের সঙ্গে যাদের বিরুদ্ধতা অত্যুগ্র — সে হচ্ছে খৃস্টান আর মুসলমান-ধর্ম। তারা নিজের ধর্মকে পালন করেই সন্তুষ্ট নয়, অন্য ধর্মকে সংহার করতে উদ্যত। এইজন্যে তাদের ধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া তাদের সঙ্গে মেলবার অন্য কোনো উপায় নেই। খৃস্টানধর্মাবলম্বীদের সম্বন্ধে একটি সুবিধার কথা এই যে, তারা আধুনিক যুগের বাহন; তাদের মন মধ্যযুগের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নয়। ধর্মমত একান্তভাবে তাদের সমস্ত জীবনকে পরিবেষ্টিত করে নেই। এইজন্যে অপরধর্মাবলম্বীদেরকে তারা ধর্মের বেড়ার দ্বারা সম্পূর্ণ বাধা দেয় না। য়ুরোপীয় আর খৃস্টান এই দুটো শব্দ একার্থক নয়। 'য়ুরোপীয় বৌদ্ধ' বা 'য়ুরোপীয় মুসলমান' শব্দের মধ্যে স্বতোবিরুদ্ধতা নেই। কিন্তু ধর্মের নামে যে জাতির নামকরণ ধর্মমতেই তাদের মুখ্য পরিচয়। 'মুসলমান বৌদ্ধ' বা 'মুসলমান খৃস্টান' শব্দ স্বতই অসম্ভব। অপর পক্ষে হিন্দুজাতিও এক হিসাবে মুসলমানদেরই মতো। অর্থাৎ, তারা ধর্মের প্রাকারে সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত। বাহ্য প্রভেদটা হচ্ছে এই যে, অন্য ধর্মের বিরুদ্ধতা তাদের পক্ষে সকর্মক নয়— অহিন্দু সমস্ত ধর্মের সঙ্গে তাদের non-violent non-co-operation। হিন্দুর ধর্ম মুখ্যভাবে জন্মগত ও আচারমূলক হওয়াতে তার বেড়া আরও কঠিন। মুসলমানধর্ম

স্বীকার করে মুসলমানের সঙ্গে সমানভাবে মেলা যায়, হিন্দুর সে পথও অতিশয় সংকীর্ণ। আহারে ব্যবহারে মুসলমান অপর সম্প্রদায়কে নিষেধের দ্বারা প্রত্যাখ্যান করে না, হিন্দু সেখানেও সতর্ক। তাই খিলাফৎ উপলক্ষে মুসলমান নিজের মসজিদে এবং অন্যত্র হিন্দুকে যত কাছে টেনেছে হিন্দু মুসলমানকে তত কাছে টানতে পারে নি। আচার হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের সেতু, সেইখানেই পদে পদে হিন্দু নিজের বেড়া তুলে রেখেছে। আমি যখন প্রথম আমার জমিদারি কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম তখন দেখেছিলুম, কাছারিতে মুসলমান প্রজাকে বসতে দিতে হলে জাজিমের এক প্রান্ত তুলে দিয়ে সেইখানে তাকে স্থান দেওয়া হত। অন্য-আচার-অবলম্বীদের অশুচি বলে গণ্য করার মতো মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের এমন ভীষণ বাধা আর কিছু নেই। ভারতবর্ষের এমনি কপাল যে, এখানে হিন্দু-মুসলমানের মতো দুই জাত একত্র হয়েছে; ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল; আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয়, ধর্মমতে প্রবল। এক পক্ষের যে দিকে দ্বার খোলা, অন্য পক্ষের সে দিকে দ্বার রুদ্ধ। এরা কী করে মিলবে। এক সময়ে ভারতবর্ষে গ্রীক পারসিক শক নানা জাতির অবাধ সমাগম ও সম্মিলন ছিল। কিন্তু মনে রেখো, সে 'হিন্দু'-যুগের পূর্ববর্তী কালে। হিন্দুযুগ হচ্ছে একটা প্রতিক্রিয়ার যুগ— এই যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে সচেষ্টভাবে পাকা করে গাঁথা হয়েছিল। দুর্লঙ্ঘ্য আচারের প্রাকার তুলে একে দুষ্প্রবেশ্য করে তোলা হয়েছিল। একটা কথা মনে ছিল না, কোনো প্রাণবান জিনিসকে একেবারে আটঘাট বন্ধ করে সামলাতে গেলে তাকে মেরে ফেলা হয়। যাই হোক, মোট কথা হচ্ছে, বিশেষ এক সময়ে বৌদ্ধযুগের পরে রাজপুত প্রভৃতি বিদেশীয় জাতিকে দলে টেনে বিশেষ অধ্যবসায়ে নিজেদেরকে পরকীয় সংস্রব ও প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ রক্ষা করবার জন্যেই আধুনিক হিন্দুধর্মকে ভারতবাসী প্রকাণ্ড একটা বেড়ার মতো করেই গড়ে তুলেছিল— এর প্রকৃতিই হচ্ছে নিষেধ এবং প্রত্যাখ্যান। সকল-প্রকার মিলনের পক্ষে এমন সুনিপুণ কৌশলে রচিত বাধা জগতে আর কোথাও সৃষ্টি হয় নি। এই বাধা কেবল হিন্দু-মুসলমানে তা নয়। তোমার আমার মতো মানুষ যারা আচারে স্বাধীনতা রক্ষা করতে চাই, আমরাও পৃথক, বাধাগ্রস্ত। সমস্যা তো এই, কিন্তু সমাধান কোথায়। মনের পরিবর্তনে, যুগের পরিবর্তনে। য়ুরোপ সত্যসাধনা ও জ্ঞানের ব্যাপ্তির ভিতর দিয়ে যেমন করে মধ্যযুগের ভিতর দিয়ে আধুনিক যুগে এসে পৌঁচেছে হিন্দুকে মুসলমানকেও তেমনি গণ্ডির বাইরে যাত্রা করতে হবে। ধর্মকে কবরের মতো তৈরি করে তারই মধ্যে সমগ্র জাতিকে ভূতকালের মধ্যে সর্বতোভাবে নিহিত করে রাখলে উন্নতির পথে চলবার উপায় নেই, কারও সঙ্গে

কারও মেলবার উপায় নেই। আমাদের মানসপ্রকৃতির মধ্যে যে অবরোধ রয়েছে তাকে ঘোচাতে না পারলে আমরা কোনোরকমের স্বাধীনতাই পাব না। শিক্ষার দ্বারা, সাধনার দ্বারা সেই মূলের পরিবর্তন ঘটাতে হবে— ডানার চেয়ে খাঁচা বড়ো এই সংস্কারটাকেই বদলে ফেলতে হবে— তার পরে আমাদের কল্যাণ হতে পারবে। হিন্দু-মুসলমানের মিলন যুগপরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু এ কথা শুনে ভয় পাবার কারণ নেই; কারণ অন্য দেশে মানুষ সাধনার দ্বারা যুগপরিবর্তন ঘটিয়েছে, গুটির যুগ থেকে ডানা-মেলার যুগে বেরিয়ে এসেছে। আমরাও মানসিক অবরোধ কেটে বেরিয়ে আসব; যদি না আসি তবে, নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়। ইতি ৭ই আষাঢ়, ১৩২৯

নারী

মানুষের সৃষ্টিতে নারী পুরাতনী। নরসমাজে নারীশক্তিকে বলা যেতে পারে আদ্যাশক্তি। এই সেই শক্তি যা জীবলোকে প্রাণকে বহন করে, প্রাণকে পোষণ করে।

পৃথিবীকে জীবের বাসযোগ্য করবার জন্যে অনেক যুগ গেছে ঢালাই-পেটাই করা মিস্ত্রির কাজে। সেটা আধখানা শেষ হতে না-হতেই প্রকৃতি শুরু করলেন জীবসৃষ্টি, পৃথিবীতে এল বেদনা। প্রাণসাধনার সেই আদিম বেদনা প্রকৃতি দিয়েছেন নারীর রক্তে, নারীর হৃদয়ে। জীবপালনের সমস্ত প্রবৃত্তিজাল প্রবল করে জড়িত করেছেন নারীর দেহমনের তন্তুতে তন্তুতে। এই প্রবৃত্তি স্বভাবতই চিত্তবৃত্তির চেয়ে হৃদয়বৃত্তিতেই স্থান পেয়েছে গভীর ও প্রশস্ত ভাবে। এই সেই প্রবৃত্তি নারীর মধ্যে যা বন্ধনজাল গাঁথছে নিজেকে ও অন্যকে ধরে রাখবার জন্যে প্রেমে, স্নেহে, সকরুণ ধৈর্যে। মানবসংসারকে গড়ে তোলবার, বেঁধে রাখবার এই আদিম বাঁধুনি। এই সেই সংসার যা সকল সমাজের সকল সভ্যতার মূলভিত্তি। সংসারের এই গোড়াকার বাঁধন না থাকলে মানুষ ছড়িয়ে পড়ত আকারপ্রকারহীন বাষ্পের মতো; সংহত হয়ে কোথাও মিলনকেন্দ্র স্থাপন করতে পারত না। সমাজবন্ধনের এই প্রথম কাজটি মেয়েদের।

প্রকৃতির সমস্ত সৃষ্টিপ্রক্রিয়া গভীর গোপন, তার স্বতঃপ্রবর্তনা দ্বিধাবিহীন। সেই আদিপ্রাণের সহজ প্রবর্তনা নারীর স্বভাবের মধ্যে। সেইজন্য নারীর স্বভাবকে মানুষ রহস্যময় আখ্যা দিয়েছে। তাই অনেক সময়ে অকস্মাৎ নারীর জীবনে যে সংবেগের উচ্ছ্বাস দেখতে পাওয়া যায় তা তর্কের অতীত— তা প্রয়োজন-অনুসারে বিধিপূর্বক

খনন করা জলাশয়ের মতো নয়, তা উৎসের মতো যার কারণ আপন অহৈতুক রহস্তে নিহিত।

প্রেমের রহস্ত, স্নেহের রহস্ত অতি প্রাচীন এবং দুর্গম। সে আপন সার্থকতার জন্তে তর্কের অপেক্ষা রাখে না। যেখানে তার সমস্তা সেখানে তার দ্রুত সমাধান চাই। তাই গৃহে নারী যেমনি প্রবেশ করেছে কোথা থেকে অবতীর্ণ হল গৃহিণী, শিশু যেমনি কোলে এল মা তখনই প্রস্তুত। জীবরাজ্যে পরিণত বুদ্ধি এসেছে অনেক পরে। সে আপন জায়গা খুঁজে পায় সন্ধান ক'রে, যুদ্ধ ক'রে। দ্বিধা মিটিয়ে চলতে তার সময় যায়। এই দ্বিধার সঙ্গে কঠিন দ্বন্দ্বেই সে সবলতা ও সফলতা লাভ করে। এই দ্বিধাতরঙ্গের ওঠাপড়ায় শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে যায়, সাংঘাতিক ভ্রম জমে উঠে বার বার মানুষের ইতিহাসকে দেয় বিপর্যস্ত করে। পুরুষের সৃষ্টি বিনাশের মধ্যে তলিয়ে যায়, নূতন করে বাঁধতে হয় তার কীর্তির ভূমিকা। পালটিয়ে পালটিয়ে পরীক্ষায় পুরুষের কর্ম কেবলই দেহপরিবর্তন করে। অভিজ্ঞতার এই নিত্যপরিক্রমণে যদি তাকে অগ্রসর করে তবে সে বেঁচে যায়, যদি ত্রুটিসংশোধনের অবকাশ না পায় তবে জীবন-বাহনের ফাটল বড়ো হয়ে উঠতে উঠতে তাকে টানে বিলুপ্তির কবলের মধ্যে। পুরুষের রচিত সভ্যতার আদিকাল থেকে এইরকম ভাঙা-গড়া চলছে। ইতিমধ্যে, নারীর মধ্যে প্রেয়সী, নারীর মধ্যে জননী প্রকৃতির দৌত্যে স্থিরপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আপন কাজ করে চলেছে। এবং প্রবল আবেগের সংঘর্ষে আপন সংসারের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে অগ্নিকাণ্ড করেও আসছে। সেই প্রলয়াবেগ যেন বিশ্বপ্রকৃতির প্রলয়লীলারই মতো, ঝড়ের মতো, দাবদাহের মতো— আকস্মিক, আত্মঘাতী।

পুরুষ তার আপন জগতে বারে বারে নূতন আগন্তুক। আজ পর্যন্ত কতবার সে গড়ে তুলেছে আপন বিধিবিধান। বিধাতা তাকে তার জীবনের পথ বাঁধিয়ে দেন নি; কত দেশে কত কালে তাকে আপন পথ বানিয়ে নিতে হল। এক কালের পথ বিপথ হয়ে উঠল আর-এক কালে, উলটিয়ে গেল তার ইতিহাস, করলে সে অন্তর্ধান।

নব নব সভ্যতার উলটপালটের ভিতর দিয়ে নারীর জীবনের মূলধারা চলেছে এক প্রশস্ত পথে। প্রকৃতি তাকে যে হৃদয়সম্পদ দিয়েছেন নিত্যকৌতূহলপ্রবণ বুদ্ধির হাতে তাকে নূতন নূতন অধ্যবসায়ে পরখ করতে দেওয়া হয় নি। নারী পুরাতনী।

পুরুষকে নানা দ্বারে নানা আপিসে উমেদারিতে ঘোরায়। অধিকাংশ পুরুষই জীবিকার জন্তে এমন কাজ মানতে বাধ্য হয় যার প্রতি তার ইচ্ছার তার ক্ষমতার সহজ সম্মতি নেই। কঠিন পরিশ্রমে নানা কাজের শিক্ষা তার করা চাই— তাতে বারো-আনা পুরুষই যথোচিত সফলতা পায় না। কিন্তু গৃহিণীরূপে জননীরূপে

মেয়েদের যে কাজ সে তার আপন কাজ, সে তার স্বভাবসংগত।

নানা বিঘ্ন কাটিয়ে অবস্থার প্রতিকূলতাকে বীর্যের দ্বারা নিজের অনুগত করে পুরুষ মহত্ত্ব লাভ করে। সেই অসাধারণ সার্থকতায় উত্তীর্ণ পুরুষের সংখ্যা অল্প। কিন্তু হৃদয়ের রসধারায় আপন সংসারকে শস্যশালা করে তুলেছে এমন মেয়েকে প্রায় দেখা যায় ঘরে ঘরে। প্রকৃতির কাছ থেকে তারা পেয়েছে অশিক্ষিতপটুত্ব, মাধুর্যের ঐশ্বর্য তাদের সহজে লাভ করা। যে মেয়ের স্বভাবের মধ্যে দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সহজ রসটি না থাকে, কোনো শিক্ষায়, কোনো কৃত্রিম উপায়ে সংসারক্ষেত্রে সে সার্থকতা পায় না।

যে সম্বল অনায়াসে পাওয়া যায় তার বিপদ আছে। বিপদের এক কারণ অন্যের পক্ষে তা লোভনীয়। সহজ-ঐশ্বর্যবান দেশকে বলবান নিজের একান্ত প্রয়োজনে আত্মসাৎ করে রাখতে চায়। অনুর্বর দেশের পক্ষে স্বাধীন থাকা সহজ। যে পাখির ডানা সুন্দর ও কণ্ঠস্বর মধুর তাকে খাঁচায় বন্দী করে মানুষ গর্ব অনুভব করে; তার সৌন্দর্য সমস্ত অরণ্যভূমির, এ কথা সম্পত্তিলোলুপরা ভুলে যায়। মেয়েদের হৃদয়মাধুর্য ও সেবানৈপুণ্যকে পুরুষ সুদীর্ঘকাল আপন ব্যক্তিগত অধিকারের মধ্যে কড়া পাহারায় বেড়া দিয়ে রেখেছে। মেয়েদের নিজের স্বভাবেই বাঁধন-মানা প্রবণতা আছে, সেইজন্যে এটা সর্বত্রই এত সহজ হয়েছে।

বস্তুত জীবপালনের কাজটাই ব্যক্তিগত। সেটা নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্বের কোঠায় পড়ে না, সেই কারণে তার আনন্দ বৃহৎ তত্ত্বের আনন্দ নয়; এমন-কি মেয়েদের নৈপুণ্য যদিও বহন করেছে রস, কিন্তু সৃষ্টির কাজে আজও যথেষ্ট সার্থক হয় নি।

তার বুদ্ধি, তার সংস্কার, তার আচরণ নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতার দ্বারা বহু যুগ থেকে প্রভাবান্বিত। তার শিক্ষা, তার বিশ্বাস বাহিরের বৃহৎ অভিজ্ঞতার মধ্যে সত্যতা লাভ করবার সম্পূর্ণ সুযোগ পায় নি। এইজন্যে নির্বিচারে সকল অপদেবতাকেই সে অমূলক ভয় ও অযোগ্য ভক্তির অর্ঘ্য দিয়ে আসছে। সমস্ত দেশ জুড়ে যদি দেখতে পাই, তবে দেখা যাবে এই মোহমুগ্ধতার ক্ষতি কত সর্বনেশে, এর বিপুল ভার বহন করে উন্নতির দুর্গম পথে এগিয়ে চলা কত দুঃসাধ্য। আবিলবুদ্ধি মূঢ়মতি পুরুষ দেশে যে কম আছে তা নয়, তারা শিশুকাল থেকে মেয়ের হাতে গড়া এবং তারাই মেয়েদের প্রতি সবচেয়ে অত্যাচারী। দেশে এই যে-সব আবিল মনের কেন্দ্রগুলি দেখতে দেখতে চারি দিকে গড়ে উঠছে, মেয়েদের অন্ধ বিচারবুদ্ধির উপরেই তাদের প্রধান নির্ভর। চিত্তের বন্দীশালা এমনি করে দেশে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে, এবং প্রতিদিন তার ভিত্তি হয়ে উঠছে দৃঢ়।

এ দিকে প্রায় পৃথিবীর সকল দেশেই মেয়েরা আপন ব্যক্তিগত সংসারের গণ্ডি পেরিয়ে আসছে। আধুনিক এসিয়াতেও তার লক্ষণ দেখতে পাই। তার প্রধান

কারণ সর্বত্রই সীমানা-ভাঙার যুগ এসে পড়েছে। যে-সকল দেশ আপন আপন ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রিক প্রাচীরের মধ্যে একান্ত বদ্ধ ছিল তাদের সেই বেড়া আজ আর তাদের তেমন করে ঘিরে রাখতে পারে না— তারা পরস্পর পরস্পরের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। স্বতই অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়েছে, দৃষ্টিসীমা চিরাভ্যস্ত দিগন্ত পেরিয়ে গেছে। বাহিরের সঙ্গে সংঘাতে অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে, নূতন নূতন প্রয়োজনের সঙ্গে আচার-বিচারের পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়ছে।

আমাদের বাল্যকালে ঘরের বাইরে যাতায়াতের আবশ্যকে মেয়েদের ছিল পালকির যুগ। মানী ঘরে সেই পালকির উপরে পড়ত ঘটাটোপ। বেথুন স্কুলে যে মেয়েরা সর্বপ্রথমে ভর্তি হয়েছিলেন তার মধ্যে অগ্রণী ছিলেন আমার বড়দিদি। তিনি দ্বার-খোলা পালকিতে ইস্কুলে যেতেন, সেদিনকার সম্ভ্রান্তবংশের আদর্শকে সেটা অল্প পীড়া দেয় নি। সেই একবস্ত্রের দিনে সেমিজ পরাটা নির্লজ্জতার লক্ষণ ছিল। শালীনতার প্রচলিত রীতি রক্ষা করে রেলগাড়িতে যাতায়াত করা সহজ ব্যাপার ছিল না।

আজ সেই ঢাকা পালকির যুগ বহু দূরে চলে গেছে। মৃদুপদে যায় নি, দ্রুতপদেই গেছে। বাইরের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ পরিবর্তন আপনিই ঘটেছে— এ নিয়ে কাউকে সভাসমিতি করতে হয় নি। মেয়েদের বিবাহের বয়স দেখতে দেখতে এগিয়ে গেল, সেও হয়েছে সহজে। প্রাকৃতিক কারণে নদীতে জলধারার পরিমাণ যদি বেড়ে যায় তবে তার তটভূমির সীমা আপনিই হটে যেতে থাকে। মেয়েদের জীবনে আজ সকল দিক থেকেই স্বতই তার তটের সীমা দূরে চলে যাচ্ছে। নদী উঠছে মহানদী হয়ে।

এই-যে বাহিরের দিকে ব্যবহারের পরিবর্তন এ তো বাইরেই থেকে যায় না। অন্তরপ্রকৃতির মধ্যেও এর কাজ চলতে থাকে। মেয়েদের যে মনোভাব বদ্ধ সংসারের উপযোগী মুক্ত সংসারে সে তো অচল হয়ে থাকতে পারে না। আপনিই জীবনের প্রশস্ত ভূমিকায় দাঁড়িয়ে তার মন বড়ো করে চিন্তা করতে, বিচার করতে আরম্ভ করে। তার পূর্বতন সংস্কারগুলিকে যাচাই করার কাজ আপনিই শুরু হতে থাকে। এই অবস্থায় সে নানারকম ভুল করতে পারে, কিন্তু বাধায় ঠেকতে ঠেকতে সে ভুল উত্তীর্ণ হতে হবে। সংকীর্ণ সীমায় পূর্বে মন যেরকম করে বিচার করতে অভ্যস্ত ছিল সে অভ্যাস আঁকড়ে থাকলে চারি দিকের সঙ্গে পদে পদে অসামঞ্জস্য আনতে থাকবে। এই অভ্যাস-পরিবর্তনে দুঃখ আছে, বিপদও আছে, কিন্তু সেই ভয় করে আধুনিক কালের স্রোতকে পিছনের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না।

গৃহস্থালির ছোটো পরিধির মধ্যে মেয়েদের জীবন যখন আবদ্ধ ছিল তখন মেয়েলি

মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি নিয়ে সহজেই তাদের কাজ চলে যেত। এজন্যে তাদের বিশেষ শিক্ষার দরকার ছিল না বলেই একদিন স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে এতই বিরুদ্ধতা এবং প্রহসনের সৃষ্টি হয়েছে। তখন পুরুষেরা নিজে যে-সব সংস্কারকে উপেক্ষা করত, যে-সব মত বিশ্বাস করত না, যে-সকল আচরণ পালন করত না, মেয়েদের বেলায় সেগুলিকে সযত্নে প্রশ্রয় দিয়েছে। তার মূলে তাদের সেই মনোবৃত্তি ছিল যে মনোবৃত্তি একেশ্বর শাসনকর্তাদের। তারা জানে, অজ্ঞানের অন্ধ সংস্কারের আবহাওয়ায় যথেচ্ছশাসনের সুযোগ রচনা করে; মনুষ্যোচিত স্বাধিকার বিসর্জন দিয়েও সন্তুষ্টচিত্তে থাকবার পক্ষে এই মুগ্ধ অবস্থাই অনুকূল অবস্থা। আমাদের দেশের অনেক পুরুষের মনে আজও এই ভাব আছে। কিন্তু কালের সঙ্গে সংগ্রামে তাদের হার মানতেই হবে।

কালের প্রভাবে মেয়েদের জীবনের ক্ষেত্র এই-যে স্বতই প্রসারিত হয়ে চলেছে, এই-যে মুক্তসংসারের জগতে মেয়েরা আপনিই এসে পড়ছে, এতে করে আত্মরক্ষা এবং আত্মসম্মানের জন্যে তাদের বিশেষ করে বুদ্ধির চর্চা, বিদ্যার চর্চা, একান্ত আবশ্যক হয়ে উঠল। তাই দেখতে দেখতে এর বাধা দূর হয়ে চলেছে। নিরক্ষরতার লজ্জা আজ ভদ্রমেয়েদের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো লজ্জা, পূর্বকালে মেয়েদের ছাতা জুতো ব্যবহারের যে লজ্জা ছিল এ তার চেয়ে বেশি, বাটনা-বাটা কোটনা-কোটা সম্বন্ধে অনৈপুণ্যের অখ্যাতি তার কাছে কিছুই নয়। অর্থাৎ, গার্হস্থ্য বাজার-দরেই মেয়েদের দর, এমন কথা আজকের দিনে বিয়ের বাজারেও ষোলো-আনা খাটছে না। যে বিদ্যার মূল্য সার্বভৌমিক, যা আশু প্রয়োজনের ঐকান্তিক দাবি ছাড়িয়ে চলে যায়, আজ পাত্রীর মহার্ঘতা-যাচাইয়ের জন্যে অনেক পরিমাণে সেই বিদ্যার সন্ধান নেওয়া হয়।

এই প্রণালীতেই আমাদের দেশের আধুনিক মেয়েদের মন ঘরের সমাজ ছাড়িয়ে প্রতিদিন বিশ্বসমাজে উত্তীর্ণ হচ্ছে।

প্রথম যুগে একদিন পৃথিবী আপন তপ্ত নিশ্বাসের কুয়াশায় অবগুণ্ঠিত ছিল, তখন বিরাট আকাশের গ্রহমণ্ডলীর মধ্যে আপন স্থান সে উপলব্ধি করতেই পারে নি। অবশেষে একদিন তার মধ্যে সূর্যকিরণ প্রবেশের পথ পেল। তখনই সেই মুক্তিতে আরম্ভ হল পৃথিবীর গৌরবের যুগ। তেমনিই একদিন আর্দ্র হৃদয়ালুতার ঘন বাষ্পাবরণ আমাদের মেয়েদের চিত্তকে অত্যন্ত কাছের সংসারে আবিষ্ট করে রেখেছিল। আজ তা ভেদ করে সেই আলোকরশ্মি প্রবেশ করছে যা মুক্ত আকাশের, যা সর্বলোকের। বহু দিনের যে-সব সংস্কারজড়িমাজালে তাদের চিত্ত আবদ্ধ বিজড়িত ছিল যদিও আজ তা সম্পূর্ণ কেটে যায় নি, তবু তার মধ্যে অনেকখানি ছেদ ঘটেছে। কতখানি যে, তা

আমাদের মতো প্রাচীন বয়স যাদের তারাই জানে।

আজ পৃথিবীর সর্বত্রই মেয়েরা ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে বিশ্বের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন এই বৃহৎ সংসারের দায়িত্ব তাদের স্বীকার করতেই হবে; নইলে তাদের লজ্জা, তাদের অকৃতার্থতা।

আমার মনে হয়, পৃথিবীতে নূতন যুগ এসেছে। অতিদীর্ঘকাল মানবসভ্যতার ব্যবস্থাভার ছিল পুরুষের হাতে। এই সভ্যতার রাষ্ট্রতন্ত্র অর্থনীতি সমাজশাসনতন্ত্র গড়েছিল পুরুষ। মেয়েরা তার পিছনে প্রকাশহীন অন্তরালে থেকে কেবল করেছিল ঘরের কাজ। এই সভ্যতা হয়ে ছিল একঝোঁকা। এই সভ্যতায় মানবচিত্তের অনেকটা সম্পদের অভাব ঘটেছে; সেই সম্পদ মেয়েদের হৃদয়ভাণ্ডারে কৃপণের জিম্মায় আটকা পড়ে ছিল। আজ ভাণ্ডারের দ্বার খুলেছে।

তরুণ যুগের মানুষহীন পৃথিবীতে পঙ্কস্তরের উপর যে অরণ্য ছিল বিস্তৃত সেই অরণ্য বহুলক্ষ বৎসর ধরে প্রতিদিন সূর্যতেজ সঞ্চয় করে এসেছে আপন বৃক্ষরাজির মজ্জায়। সেই-সব অরণ্য ভূগর্ভে তলিয়ে গিয়ে রূপান্তরিত অবস্থায় বহুযুগ প্রচ্ছন্ন ছিল। সেই পাতালের দ্বার যেদিন উদ্‌ঘাটিত হল, অকস্মাৎ মানুষ শত শত বৎসরের অব্যবহৃত সূর্যতেজকে পাথুরে কয়লার আকারে লাভ করল আপন কাজে; তখনি নূতন বল নিয়ে বিশ্ববিজয়ী আধুনিক যুগ দেখা দিল।

একদিন এ যেমন ঘটেছে সভ্যতার বাহিরের সম্পদ নিয়ে, আজ তেমনি অন্তরের সম্পদের একটি বিশেষ খনিও আপন সঞ্চয়কে বাহিরে প্রকাশ করল। ঘরের মেয়েরা প্রতিদিন বিশ্বের মেয়ে হয়ে দেখা দিচ্ছে। এই উপলক্ষে মানুষের সৃষ্টিশীল চিত্তে এই-যে নূতন চিত্তের যোগ, সভ্যতায় এ আর-একটি তেজ এনে দিলে। আজ এর ক্রিয়া প্রত্যক্ষে অপ্রত্যক্ষে চলছে। একা পুরুষের গড়া সভ্যতায় যে ভারসামঞ্জস্যের অভাব প্রায়ই প্রলয় বাধাবার লক্ষণ আনে, আজ আশা করা যায় ক্রমে সে যাবে সাম্যের দিকে। প্রচণ্ড ভূমিকম্প বার বার ধাক্কা লাগাচ্ছে পুরাতন সভ্যতার ভিত্তিতে। এই সভ্যতায় বিপত্তির কারণ অনেক দিন থেকে সঞ্চিত হয়ে উঠছিল, অতএব ভাঙনের কাজ কেউ বন্ধ করতে পারবে না। একটিমাত্র বড়ো আশ্বাসের কথা এই যে, কল্পান্তের ভূমিকায় নূতন সভ্যতা গড়বার কাজে মেয়েরা এসে দাঁড়িয়েছে— প্রস্তুত হচ্ছে তারা পৃথিবীর সর্বত্রই। তাদের মুখের উপর থেকেই যে কেবল ঘোমটা খসল তা নয়— যে ঘোমটায় আবরণে তারা অধিকাংশ জগতের আড়ালে পড়ে গিয়েছিল সেই মনের ঘোমটাও তাদের খসছে। যে মানবসমাজে তারা জন্মেছে সেই সমাজ আজ সকল দিকেই সকল বিভাগেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠল তাদের দৃষ্টির সম্মুখে। এখন অন্ধসংস্কারের কারখানায় গড়া

পুতুলগুলো নিয়ে খেলা করা আর তাদের সাজবে না। তাদের স্বাভাবিক জীবপালিনী বুদ্ধি, কেবল ঘরের লোককে নয়, সকল লোককে রক্ষার জন্যে কায়মনে প্রবৃত্ত হবে।

আদিকাল থেকে পুরুষ আপন সভ্যতাদুর্গের ইটগুলো তৈরি করেছে নিরন্তর নরবলির রক্তে— তারা নির্মমভাবে কেবলই ব্যক্তিবিশেষকে মেরেছে কোনো একটা সাধারণ নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে ; ধনিকের ধন উৎপন্ন হয়েছে শ্রমিকের প্রাণ শোষণ করে ; প্রতাপশালীর প্রতাপের আগুন জ্বালানো রয়েছে অসংখ্য দুর্বলের রক্তের আহুতি দিয়ে ; রাষ্ট্রস্বার্থের রথ চালিয়েছে প্রজাদের তাতে রজ্জুবদ্ধ করে। এ সভ্যতা ক্ষমতার দ্বারা চালিত, এতে মমতার স্থান অল্প। শিকারের আমোদকে জয়যুক্ত করে এ সভ্যতা বধ করে এসেছে অসংখ্য নিরীহ নিরুপায় প্রাণী ; এ সভ্যতায় জীবজগতে মানুষকে সকলের চেয়ে নিদারুণ করে তুলেছে মানুষের পক্ষে এবং অন্য জীবের পক্ষে। বাঘের ভয়ে বাঘ উদ্‌বিগ্ন হয় না, কিন্তু এ সভ্যতায় পৃথিবী জুড়ে মানুষের ভয়ে মানুষ কম্পান্বিত। এইরকম অস্বাভাবিক অবস্থাতেই সভ্যতা আপন মুষল আপনি প্রসব করতে থাকে। আজ তাই শুরু হল। সঙ্গে সঙ্গে ভীত মানুষ শান্তির কল বানাবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত, কিন্তু কলের শান্তি তাদের কাজে লাগবে না শান্তির উপায় যাদের অন্তরে নেই। ব্যক্তি-হননকারী সভ্যতা টিকতে পারে না।

সভ্যতাসৃষ্টির নূতন কল্প আশা করা যাক। এ আশা যদি রূপ ধারণ করে তবে এবারকার এই সৃষ্টিতে মেয়েদের কাজ পূর্ণ পরিমাণে নিযুক্ত হবে সন্দেহ নেই। নবযুগের এই আহ্বান আমাদের মেয়েদের মনে যদি পৌঁছে থাকে তবে তাঁদের রক্ষণশীল মন যেন বহু যুগের অস্বাস্থ্যকর আবর্জনাকে একান্ত আসক্তির সঙ্গে বুকে চেপে না ধরে। তাঁরা যেন মুক্ত করেন হৃদয়কে, উজ্জ্বল করেন বুদ্ধিকে, নিষ্ঠা প্রয়োগ করেন জ্ঞানের তপস্যায়। মনে রাখেন, নির্বিচার অন্ধরক্ষণশীলতা সৃষ্টিশীলতার বিরোধী। সামনে আসছে নূতন সৃষ্টির যুগ। সেই যুগের অধিকার লাভ করতে হলে মোহমুক্ত মনকে সর্বতোভাবে শ্রদ্ধার যোগ্য করতে হবে, অজ্ঞানের জড়তা এবং সকলপ্রকার কাল্পনিক ও বাস্তবিক ভয়ের নিম্নগামী আকর্ষণ থেকে টেনে আপনাকে উপরের দিকে তুলতে হবে। ফললাভের কথা পরে আসবে— এমন-কি, না আসতেও পারে— কিন্তু যোগ্যতা লাভের কথা সর্বাগ্রে। শান্তিনিকেতন। ২ অক্টোবর ১৯৩৬

১৩৪৩

সংযোজন

কর্মযজ্ঞ

হিতসাধন-মণ্ডলীর প্রথম সভাধিবেশনে কথিত বক্তৃতার সারমর্ম

সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তার জাতকর্ম-উৎসব করতে হয়; কিন্তু, মানুষের কোনো শুভানুষ্ঠানের বেলায় আমরা এ নিয়ম পালন করি না— তার জন্মের পূর্বে আশার সঞ্চারটুকু নিয়েই আমরা উৎসব করি। আজকের অনুষ্ঠানপত্রে লেখা আছে যে, হিতসাধন-মণ্ডলীর উদ্যোগে এ সভা আহূত, কিন্তু বস্তুত কোনো মণ্ডলী তো এখনো গড়া হয় নি— আজকের সভা কেবলমাত্র আশার আমন্ত্রণ নিয়ে এসেছে। তর্ক যুক্তি বিচার বিবেচনা সে-সমস্ত পথে চলতে চলতে হবে— কিন্তু যাত্রার আরম্ভে পাথেয় সংগ্রহ করা চাই, আশাই তো সেই পাথেয়।

দীর্ঘকাল নৈরাশ্যের মধ্যে আমরা যাপন করেছি। অন্যান্য দেশের সৌভাগ্যের ইতিহাস আমাদের সামনে খোলা। তারা কেমন করে উন্নতির দিকে চলেছে সে সমস্তই আমাদের জানা। কিন্তু তার থেকে আমাদের মনে কোনো আশার সঞ্চার হয় নি; উল্টে আমরা জেনেছিলুম যে, যেহেতু তারা প্রবল তাই তারা প্রবল, যেহেতু আমরা দুর্বল তাই আমরা দুর্বল, এর আর নড়চড় নেই। এই বিশ্বাস অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করে অবসাদে আমাদের অকর্মণ্য করে তুলেছে। দেশ জুড়ে কাজের ক্ষেত্র অথচ আমরা উদাসীন— তার কারণ এ নয় যে, আমাদের স্বাভাবিক দেশপ্রীতি নেই। বেদনায় বুক ভরে উঠেছে— তবু যে প্রতিকারের চেষ্টা করি নে তার একমাত্র কারণ, মনে আশা নেই।

কী পরিমাণ কাজ আমাদের সামনে আছে তার তালিকাটি আজ দেখা গেল, ভালোই হল। তার পরে দেশের মধ্যে কারা সেবক আছেন এবং তাঁরা কিরকম সাড়া দিলেন যদি জানতে পারি সেও ভালো। কিন্তু সবচেয়ে যেটি বোঝা গেল সেটি হচ্ছে এই যে, সমস্ত দেশের অন্তরের আশা আজ বাহিরে আকারগ্রহণের জন্য ব্যাকুল। সম্মুখে দুর্গম পথ। সেই পথের বাধা অতিক্রম করবার মতো পাথেয় এবং উপায় এই নূতন উদ্যোগের আছে কি নেই, তা আমি জানি না। কিন্তু প্রাণের ভিতরে আশা বলছে— না, মরব না, বাঁচবই এবং বাঁচাবই। এ আশা তো কোনোমতেই মরবার নয়, সে যে একেবারে প্রাণের মর্মনিহিত। যদিচ মরবার লক্ষণই দেখছি— হিন্দুর জনসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে, দুঃখদুর্গতির ডালপালা বাড়ছে, তবু প্রাণের ভিতর আশা এই যে, বাঁচব, বাঁচতেই হবে, কোনোমতেই মরব না।

জীবনের আরম্ভ বড়ো ক্ষীণ। যে-সব জিনিস নির্জীব তাকে এক মুহূর্তেই ফরমায়েশ-মত ইঁট-কাঠ জোগাড় করে প্রকাণ্ড করে তোলা যেতে পারে, কিন্তু প্রাণের উপরে তো

সে হুকুম চলে না। প্রাণ পরমতুর্বলরূপেই আপনার প্রথম পরিচয় দিয়ে থাকে— সে তো অণু আকারেই দেখা দেয়, অথচ তারই মধ্যে অনন্তকালের সত্তা লুকিয়ে থাকে। অতএব আজ আমাদের আয়োজন কতটুকুই বা, ক'জন লোকেরই বা এতে উৎসাহ— এসব কথা বলবার কথা নয়। কেননা, বাইরের আয়োজন ছোটো, অন্তরের আশা বড়ো। আমরা কতবার এরকম সভাসমিতির আয়োজন করেছি এবং কতবারই অকৃতার্থ হয়েছি— এ কথাও আলোচ্য নয়; ফিরে ফিরে যে এরকম চেষ্টা নানা আকারে দেখা দিয়েছে তার মানেই আমাদের আশা মরতে চায় না, তারও মানে প্রাণ আছে। প্রতিদিন আমাদের কত শুভচেষ্টা মরেছে এ কথা প্রত্যক্ষ হলেও কখনোই সত্য নয়; সত্য এই যে শুভচেষ্টা মরে নি, এবং কোনো কালে মরতে পারে না। এক রাজার পর আর-এক রাজা মরে, কিন্তু রাজার মৃত্যু নেই।

রামানন্দবাবু আমাদের সামনে কর্তব্যের যে তালিকা উপস্থিত করেছেন সে বৃহৎ। আমাদের সামর্থ্য যে কত অল্প তা তো আমরা জানি। যদি বাইরের হিসেব খতিয়ে দেখতে চাই, তা হলে কোনো ভরসা থাকে না। কিন্তু প্রাণের বেহিসাবি আনন্দে সমস্ত অবসাদকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সেই আনন্দই হচ্ছে শক্তি— নিজের ভিতরকার সেই আনন্দময় শক্তির উপর আমাদের ভরসা রাখতে হবে। আপনার প্রতি আমাদের রাজভক্তি চাই। আমাদের অন্তরের মধ্যে যে রাজা আছেন তাঁকে শ্রদ্ধা করি না বলেই তো তাঁর রাজত্ব তিনি চালাতে পারছেন না। তাঁর কাছে খাজানা নিয়ে এসো; বলো, হুকুম করো তুমি, প্রাণ দেব তোমার কাজে, প্রাণ দিয়ে প্রাণ পাব। আপনার প্রতি সেই রাজভক্তি প্রকাশ করবার দিন আজ উপস্থিত।

পৃথিবীর মহাপুরুষেরা জীবনের বাণী দিয়ে এই কথাই বলে গিয়েছেন যে, বাইরের পর্বতপ্রমাণ বাধাকে বড়ো করে দেখো না, অন্তরের মধ্যে যদি কণা-পরিমাণ শক্তি থাকে তার উপর শ্রদ্ধা রাখো। বিশ্বের সব শক্তি আমার, কিন্তু আমার নিজের ভিতরকার শক্তি যতক্ষণ না জাগে ততক্ষণ শক্তির সঙ্গে শক্তির যোগ হয় না। পৃথিবীতে শক্তিই শক্তিকে পায়। বিশ্বের মধ্যে যে পরম শক্তি সমস্ত সৃষ্টির ভিতর দিয়ে, ইতিহাসের ভিতর দিয়ে, আপনাকে বিচিত্ররূপে উদ্‌ঘাটিত করে সার্থক করে তুলছেন, সেই শক্তিকে আপনার করতে না পারলে, সমস্ত জগতে এক শক্তিরূপে যিনি রয়েছেন তাঁকে সুস্পষ্টরূপে স্পর্শ করতে না পারলে, নৈরাশ্য আর যায় না, ভয় আর ঘোচে না। বিশ্বের শক্তি আমারই শক্তি এই কথা জানো। এই দুটোমাত্র ছোটো চোখ দিয়ে লোকলোকান্তরে-উৎসারিত আলোকের প্রস্রবণধারাকে গ্রহণ করতে পারছি, তেমনি আপন খণ্ড-শক্তিকে উন্মীলিত করবা মাত্রই সকল মানুষের মধ্যে যে পরমা শক্তি আছে

সেই শক্তি আমারই মধ্যে দেখব।

আমরা এতদিন পর্যন্ত নানা ব্যর্থ চেষ্টার মধ্য দিয়ে চলেছি। চেষ্টারূপে যে তার কোনো সফলতা নেই তা বলছি না। বস্তুত অবাধ সফলতায় মানুষকে দুর্বল করে এবং ফলের মূল্য কমিয়ে দেয়। আমাদের দেশ যে হাতড়ে বেড়াচ্ছে, গলা ভেঙে ডাকাডাকি করে মরছে, লক্ষ্যস্থানে গিয়ে পৌঁছে উঠতে পারছে না— এর জন্য নালিশ করব না। এই বারম্বার নিষ্ফলতার ভিতর দিয়েই আমাদের বের করতে হচ্ছে কোন্ জায়গায় আমাদের যথার্থ দুর্বলতা। আমরা এটা দেখতে পেলাম যে, যেখানেই আমরা নকল করতে গিয়েছি সেইখানেই ব্যর্থ হয়েছি। যে-সব দেশ বড়ো আকারে আমাদের সামনে রয়েছে সেখানকার কাজের রূপকে আমরা দেখেছি, কাজের উৎসকে তো দেখি নি। তাই মনে কেবল আলোচনা করছি, অন্য দেশ এইরকম করে অমুক বাণিজ্য করে; এইরকম আয়োজনে অমুক প্রতিষ্ঠান গড়ে; অন্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে এত টাকাকড়ি, এত ঘরবাড়ি, এই নিয়ম ও পদ্ধতি— আমাদের তা নেই— এই জন্যই আমরা মরছি। আমরা আলাদিনের প্রদীপের উপর বিশ্বাস করি; মনে করি যে, অন্য দেশের আয়োজন-গুলোকে, সম্পদগুলোকে কোনো উপায়ে সশরীরে হাজির করলেই বুঝি আমরাও সৌভাগ্যশালী হয়ে উঠব। কিন্তু জানি না, আলাদিনের প্রদীপ আস্ত জিনিসগুলো তুলে এনে কী ভয়ংকর বোঝা আমাদের কাঁধে চাপিয়ে দেবে— তখন তার ভার বইবে কে। বহিশ্চক্ষু মেলে অন্য দেশের কর্মরূপকে আমরা দেখেছি, কিন্তু কর্তাকে দেখি নি— কেননা নিজের ভিতরকার কর্তৃশক্তিকে আমরা মেলতে পারি নি। কর্মের বোঝাগুলোকে পরের কাছ থেকে ধার করে এনে বিপন্ন ও ব্যর্থ হতেই হবে; কর্তাকে নিজের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে পারলেই তখন কাজের উপকরণ খাঁটি, কাজের মূর্তি সত্য ও কাজের ফল অমোঘ হবে।

আলাদিনের প্রদীপের ব্যাপার আমাদের এখানে অনেক দেখেছি, সেইজন্যে এ দেশে যে জিনিসটা গোড়াতেই বড়ো হয়ে দেখা দেয় তাকে বিশ্বাস করি নে। আমরা যেন আকৃতিটাকে চক্ষের পলকে যাদুকরের গাছের মতো মস্ত করে তোলবার প্রলোভনকে মনে স্থান না দিই। সত্য আপন সত্যতার গৌরবেই ছোটো হয়ে দেখা দিতে লজ্জিত হয় না। বড়ো আয়তনকে গ্রহণ করতে হলে, সেটাকে মিথ্যার কাছ থেকে পাছে ধার নিতে হয় এই তার বিষম ভয়। লোকের চোখ ভোলাবার মোহে গোড়াতেই যদি মিথ্যার সঙ্গে তাকে সন্ধি করতে হয়, তা হলে এক রাত্রের মধ্যে যত বৃদ্ধিই তার হোক, তিন রাত্রের মধ্যে সে 'সমূলেন বিনশ্যতি'। ঢাক-ঢোল বায়না দেবার পূর্বে এবং কাঠ-খড় জোগাড়ের গোড়াতেই, এ কথাটা যেন আমরা না ভুলি। যিনি

পৃথিবীর একার্ধকে ধর্মের আশ্রয় দান করেছেন তিনি আস্তাবলে নিরাশ্রয় দারিদ্র্যের কোলে জন্মেছিলেন। পৃথিবীতে যা কিছু বড়ো ও সার্থক তার যে কত ছোটো জায়গায় জন্ম, কোন্ অজ্ঞাত লগ্নে যে তার সূত্রপাত, তা আমরা জানি নে— অনেক সময় মরে গিয়ে সে আপনার শক্তিকে প্রকাশমান করে। আমার এইটে বিশ্বাস যে, যে দরিদ্র সেই দারিদ্র্য জয় করবে— সেই বীরই সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের বাহিরে জীর্ণ কন্থার 'পরে জন্মগ্রহণ করেছে। যে সূতিকাগৃহের অন্ধকার কোণে জন্মেছে সেখানে আমরা প্রবেশ করে তাকে প্রত্যক্ষ করতে পারি নি, কিন্তু সেখানকার শঙ্খধ্বনি বাইরের বাতাসকে স্পন্দিত করে তুলেছে। আমরা তাকে চক্ষে দেখলুম না কিন্তু আমাদের এই আনন্দ যে, তার অভ্যুদয় হয়েছে। আমাদের এই আনন্দ যে, আমরা তার সেবার অধিকারী।

আমরা জোড়হাত করে তাকিয়ে আছি; বলছি— তুমি এসেছ। তুমি অনেক দিনের প্রতীক্ষিত, অনেক দুঃখের ধন, তুমি বিধাতার কৃপা ভারতে অবতীর্ণ।

আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন যে, য়ুরোপে আজকাল কথা উঠেছে যে মানুষের উন্নতিসাধন ভালোবেসে নয়, বৈজ্ঞানিক নিয়মের জাঁতায় পিষে মানুষের উৎকর্ষ। অর্থাৎ, যেন কেবলমাত্র পুড়িয়ে-পিটিয়ে কেটে-ছেঁটে জুড়ে-তেড়ে মানুষকে তৈরি করা যায়। এইজন্যেই মানুষের প্রাণ পীড়িত হয়ে উঠেছে। যন্ত্রকে প্রাণের উপরে প্রতিষ্ঠিত করবার মতো দৌরাত্ম্য আর-কিছুই হতে পারে না। তার পরিচয় বর্তমান যুদ্ধে দেখতে পাচ্ছি। কলিযুগের কলদৈত্য স্বর্গের দেবতাদের নির্বাসিত করে দিয়েছে, কিন্তু আবার তো স্বর্গকে ফিরে পেতে হবে। শিবের তৃতীয় নেত্র অগ্নি উদ্গীরণ না করলে কেমন করে সেই মঙ্গল ভূমিষ্ঠ হবে যা দৈত্যের হাত থেকে স্বর্গকে উদ্ধার করবে।

কিন্তু, আমাদের দেশে আমরা একেবারে উল্টো দিক থেকে মরছি— আমরা সয়তানের কর্তৃত্বকে হঠাৎ প্রবল করতে গিয়ে মরি নি; আমরা মরছি ঔদাসীন্যে, আমরা মরছি জরায়। প্রাণের প্রতি প্রাণের যে সহজ ও প্রবল আকর্ষণ আছে আমরা তা হারিয়েছি; আমরা পাশের লোককেও আত্মীয় বলে অনুভব করি না, পরিবার-পরিজনের মধ্যেই প্রধানত আমাদের আনন্দ ও সহযোগিতা, সেই পরিধির বাইরে আমাদের চেতনা অস্পষ্ট। এইজন্যই আমাদের দেশে দুঃখ, মৃত্যু, অজ্ঞান, দারিদ্র্য। তাই আমরা এবার যৌবনকে আহ্বান করছি। দেশের যৌবনের দ্বারে আমাদের আবেদন— বাঁচাও, দেশকে তোমরা বাঁচাও। আমাদের ঔদাসীন্য বহুদিনের, বহুযুগের; আমাদের প্রাণশক্তি আচ্ছন্ন আবৃত, একে মুক্ত করো। কে করবে। দেশের যৌবন— যে যৌবন নূতনকে বিশ্বাস করতে পারে, প্রাণকে যে নিত্য অনুভব করতে পারে।

জরায় ব্যক্তিত্ব পঞ্চত্বে বিলীন হবার দিকে যায়। এইজন্য কোনো জায়গায়

ব্যক্তিত্বের স্ফূর্তি সে সইতে পারে না। ব্যক্তি মানে প্রকাশ। চারি দিকে যেটা অব্যক্ত সেই বৃহৎ যখন একটা কেন্দ্রকে আশ্রয় করে প্রকাশ পায় তখনই ব্যক্তিত্ব। সংকীর্ণের মধ্যে বিকীর্ণের ক্রিয়াশীলতাই ব্যক্তিত্ব। আমাদের জাতীয় ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ আমাদের জাতির মধ্যে বিশ্বমানবের আবির্ভাব কেমন করে জাগবে। দেবদানবকে সমুদ্র মন্থন করতে হয়েছিল তবে অমৃত জেগেছিল যে অমৃত সমস্তের মধ্যে ছড়ানো ছিল। কর্মের মন্থনদণ্ডের নিয়ততাড়নায় তবেই আমাদের সকলের মধ্যে যে শক্তি ছড়িয়ে আছে তাকে আমরা ব্যক্ত আকারে পাব ; তাতেই আমাদের জাতীয় ব্যক্তিত্ব অমর হয়ে উঠবে, আমাদের চিন্তা বাক্য এবং কর্ম সুনির্দিষ্টতা পেতে থাকবে। ইংরাজিতে যাকে বলে **sentimentalism** সেই দুর্বল অস্পষ্ট ভাবাতিশয্য আমাদের জীবনকে এতদিন জীর্ণ করেছে। কিন্তু এই ভাবাবেশের হাত থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র উপায় কাজে প্রবৃত্ত হওয়া। কাজে লাগলেই তর্ককীটের আক্রমণ ও পাণ্ডিত্যের পণ্ডতা থেকে রক্ষা পাব।

সেই কর্মের ক্ষেত্রে মিলনের জন্য আগ্রহবেগ দেশের ভিতরে জাগ্রত হয়েছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। দেশে আজ প্রচণ্ড শক্তি শিশুবেশে এসেছে। আমরা তা অন্তরে অনুভব করছি। যদি তা না অনুভব করি তবে বৃথা জন্মেছি এই দেশে, বৃথা জন্মেছি এই কালে। এমন সময়ে এ দেশে জন্মেছি যে সময়ে আমরা একটা নূতন সৃষ্টির আরম্ভ দেখতে পাব। এ দেশের নব্য ইতিহাসের সেই প্রথম প্রত্যূষে, যখন বিহঙ্গের কলকাকলিতে আকাশ ছেয়ে যায় নি, তখন আমরা জেগেছি। কিন্তু অরুণলেখা তো পূর্ব-গগনে দেখা দিয়েছে— ভয় নেই. আমাদের ভয় নেই। মায়ের পক্ষে তার সদ্যোজাত কুমারকে দেখবার আনন্দ যেমন, তেমনি সৌভাগ্য তেমনি আনন্দ আজ আমাদের। দেশে যখন বিধাতার আলোক অতিথি হয়ে এল তখন আমরা চোখ মেললুম। এই ব্রাহ্মমুহূর্তে, এই সৃজনের আরম্ভে, তাই প্রণাম করি তাঁকে যিনি আমাদের এই দেশে আহ্বান করেছেন— ভোগ করবার জন্য নয়, ত্যাগ করবার জন্য। আজ পৃথিবীর ঐশ্বর্যশালী জাতিরা ঐশ্বর্য ভোগ করছে, কিন্তু তিনি আমাদের জন্ম দিয়েছেন জীর্ণ কন্থার উপরে— আমাদের তিনি ভার দিয়েছেন দুঃখ দারিদ্র্য দূর করবার। তিনি বলেছেন, অভাবের মধ্যে তোমাদের পাঠালুম, অজ্ঞানের মধ্যে পাঠালুম, অস্বাস্থ্যের মধ্যে পাঠালুম, তোমরা আমার বীর পুত্র সব। আমরা দরিদ্র বলেই নিজের সত্য শক্তিকে আমাদের নিতান্তই স্বীকার করতে হবে। আমরা যে এত স্তূপাকার অজ্ঞান রোগ দুঃখ দারিদ্র্য মূঢ়সংস্কারের দুর্গদ্বারে এসে দাঁড়িয়েছি, আমরা ছোটো নই। আমরা বড়ো, এ কথা হবেই প্রকাশ— নইলে এ সংকট আমাদের সামনে কেন। সেই কথা স্মরণ করে যিনি

দুঃখ দিয়েছেন তাঁকে প্রণাম, যিনি অপমান দিয়েছেন তাঁকে প্রণাম, যিনি দারিদ্র্য দিয়েছেন তাঁকে প্রণাম।

ফাল্গুন ১৩২১

স্বাধিকারপ্রমত্তঃ

দেড় শো বৎসর পার হইয়া গেল, ইংরেজ-শাসন ভারতবর্ষকে আগাগোড়া দখল করিয়া বসিয়াছে। এ শাসনে ভারতের কল্যাণ হইয়াছে কি না, তার ধনসম্পদ শিল্প-বাণিজ্য পূর্বের চেয়ে বাড়িয়াছে কিম্বা তার আত্মশক্তির ও আত্মশাসনের সুযোগ বিস্তৃত হইয়াছে কি না, সে তর্কে আমাদের কোনো লাভ নাই, কারণ এ তর্কে অতীত মুছিবে না এবং বর্তমানের দুঃখ ঘুচিবে না। ঐতিহাসিক কৌতূহলের তরফ হইতেও ইহার মূল্য খুব বেশি নয়। কারণ, অনেক তথ্য আছে যাহা গোপনে এবং নীরবে ছাড়া স্মরণ করিয়া রাখিবার হুকুম আমাদের নাই। অতএব এমন আলোচনায় আমার দরকার কী যার পরিণাম শুভ বা সন্তোষজনক না হইতে পারে।

কিন্তু একটা কথা আছে যার সম্বন্ধে কোনো ঢাকাঢাকি নাই। এ কথা সকল পক্ষেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, এতকালের সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও পূর্ব ও পশ্চিম মেলে নাই, বরং তাদের মাঝখানের ফাঁক বাড়িয়াই চলিল। যখন দুই জাতি পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহার করিতে বাধ্য অথচ উভয়ের মধ্যে সত্যকার মিলন অসম্ভব, তখন এ সংস্রব হইতে যত উপকারই পাই ইহার বোঝা বড়ো ভারী। অতএব যখন আমরা বলি যে এই অস্বাভাবিক বিচ্ছেদের জড়ভারে চাপা পড়িয়া আমাদের হাড়ে-মাসে এক হইল, তখন সে কথা আমাদের শাসনতন্ত্রের অভিপ্রায় বা প্রণালীর বিরুদ্ধে অভিযোগের ভাবে বলি না। আজকের দিনে সে কথাটা আমাদের ভারতবর্ষের ভালোমন্দকে ছাড়াইয়াও অনেক দূর প্রসারিত। আমাদের নিজের ব্যথা হইতে বুঝিতে পারি, আজ এমন একটা প্রবল সভ্যতা জগৎ জুড়িয়া আপন জাল বিস্তার করিতেছে যা শোষণ করিতে পারে, শাসন করিতে পারে, কিন্তু যার মধ্যে সেই আধ্যাত্মিক শক্তি নাই যে শক্তিতে মানুষের সঙ্গে মানুষকে মিলাইয়া দেয়। যে সভ্যতা অবজ্ঞার সহিত বাহির হইতে আমাদের মাথার উপর উপকার বর্ষণ করে অথচ আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা উদ্ধত-ভাবে দাবি করিতে থাকে, অর্থাৎ যাহা দানের সঙ্গে হৃদয় দেয় না অথচ প্রতিদানের সঙ্গে হৃদয়ের মূল্য চাহিয়া বসে।

অতএব এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই সভ্যতার মধ্যে বুদ্ধিসম্পদ যথেষ্ট থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাতে এমন একটি সত্যের কমতি আছে যে সত্য মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস। এইজন্যই যে-সব জাত এই আধুনিক সভ্যতার হাতে গড়িয়া উঠিল তারা কোনো মুশকিলে ঠেকিলেই প্রথমেই বাহিরের দিকে হাৎড়ায়; মনে করে তাদের আপিসে, তাদের কার্যপ্রণালীতে একটা-কিছু লোকসান ঘটিয়াছে, মনে করে সেই প্রণালীটাকেই সারিয়া লইলে তারা উদ্ধার পাইবে। তাদের বিশ্বাস মানুষের সংসারটা একটা শতরঞ্চ খেলা, বড়েগুলোকে বুদ্ধিপূর্বক চালাইলেই বাজি মাৎ করা যায়। তারা এটা বুঝিতে পারে না যে, এই বুদ্ধির খেলায় যাকে জিৎ বলে মানুষের পক্ষে সেইটেই সবচেয়ে বড়ো হার হইতে পারে।

মানুষ একদিন স্পষ্ট হউক অস্পষ্ট হউক এই একটি বিশ্বাসে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল যে, কোনো-একটি সত্তা আছেন যাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ থাকাতেই আমাদের পরস্পরের প্রতি সম্বন্ধ সত্য হইয়াছে। সেইদিন হইতেই তার ইতিহাস শুরু হইয়াছে। য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধি বলে, এই বিশ্বাসের গোড়া ভূতের বিশ্বাসে। কিন্তু আমরা জানি, ওটা একেবারেই বাজে কথা। মানুষের পরস্পরের মধ্যে একটি গভীর ঐক্য আছে, সেই ঐক্যবোধের ভিতরেই ঐ বিশ্বাসের মূল, এবং এই ঐক্যবোধই মানুষের কর্তব্যনীতির ভিত্তি। এই একটি সত্যের উপলব্ধিই মানুষের সমস্ত সৃজনীশক্তির মধ্যে প্রাণ ও জ্যোতি সঞ্চার করিয়াছে, ইহাতেই সে আপন আত্মানুভূতির মধ্যে অসীমের স্পর্শ লাভ করিল।

স্বভাবতই ইতিহাসের আরম্ভে মানুষের ঐক্যবোধ এক-একটি জাতির পরিধির মধ্যেই বদ্ধ ছিল। যেমন বড়ো খেতের মধ্যে চারা রোপণ করিবার আগে ছোটো খেতের মধ্যে বীজ বপন করিতে হয়, এও ঠিক তেমনি। এইজন্য গোড়ায় মানুষ আপন দেবতাকে স্বজাতির বিশেষ দেবতা বলিয়াই গণ্য করিত, এবং তার কর্তব্যের দায়িত্ব বিশেষভাবে তার স্বজাতির সীমার মধ্যেই সংকীর্ণ ছিল।

আর্যরা যখন ভারতে আসিলেন তখন তাঁরা যে দেবতা ও যে পূজাবিধি সঙ্গে আনিলেন সে যেন তাঁদের নিজের বিশেষ সম্পত্তির মতোই ছিল। অনার্যদের সঙ্গে তাঁদের লড়াই বাধিল— সে লড়াই কিছুতেই মিটিতে চায় না, অবশেষে যখন আর্যসাধক সর্বভূতের মধ্যে সর্বভূতাত্মাকে উপলব্ধি ও প্রচার করিলেন তখনি ভিতরের দিক হইতে বিরোধের গোড়া কাটা পড়িল। হৃদয়ের মধ্যে মনীষা না জাগিলে বিভেদের মধ্যে মিলন আসে কী করিয়া।

মুসলমান যখন ভারতে রাজত্ব করিতেছিল তখন আমাদের রাষ্ট্রীয় চাঞ্চল্যের ভিতরে

ভিতরে একটা আধ্যাত্মিক উদ্‌বোধনের কাজ চলিতেছিল। সেইজন্য বৌদ্ধযুগের অশোকের মতো মোগল সম্রাট আকবরও কেবল রাষ্ট্রসাম্রাজ্য নয় একটি ধর্মসাম্রাজ্যের কথা চিন্তা করিয়াছিলেন। এইজন্যই সে সময়ে পরে পরে কত হিন্দু সাধু ও মুসলমান সুফির অভ্যুদয় হইয়াছিল যাঁরা হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের অন্তরতম মিলনক্ষেত্রে এক মহেশ্বরের পূজা বহন করিয়াছিলেন। এবং এমনি করিয়াই বাহিরের সংসারের দিকে যেখানে অনৈক্য ছিল অন্তরাত্মার দিকে পরম সত্যের আলোকে সেখানে সত্য অধিষ্ঠান আবিষ্কৃত হইতেছিল।

ভারতে সেই আধ্যাত্মিক সত্য সম্বন্ধের সাধনা আজিকার দিনেও নিশ্চেষ্ট হয় নাই। তাই এ কথা জোর করিয়া বলা যায় যে, রামমোহন রায়ের জন্ম এবং তাঁহার তপস্যা আধুনিক ভারতের সকল ঘটনার মধ্যে বড়ো ঘটনা; কারণ, পূর্ব ও পশ্চিম আপন অবিচ্ছিন্নতা অনুভব করিবে, আজ পৃথিবীতে ইহার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর। পশ্চিম যখন ভারতের দ্বারে আঘাত করিল তখন ভারত সর্বপ্রথমে রামমোহন রায়ের মধ্য দিয়াই সেই আঘাতের সত্যকার সাড়া দিয়াছিল। তিনি ভারতের তপস্যালব্ধ আধ্যাত্মিক সম্পদের মধ্যেই, অর্থাৎ পরমাত্মায় সকল আত্মার ঐক্য এই বিশ্বাসের মধ্যেই, সর্বমানবের মিলনের সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

আরো অনেক বড়ো লোক এবং বুদ্ধিমান লোক আমাদের কালে দেখিয়াছি। তাঁরা পশ্চিমের গুরুর কাছে শিক্ষা পাইয়াছেন। এই পশ্চিমের বিদ্যালয়ে নিজের জাতির সত্তাকে অত্যন্ত তীব্র করিয়া অনুভব করিতে শেখায়— এই শিক্ষায় যে স্বাদেশিকতা জন্মে তার ভিত্তি অন্য জাতির প্রতি অবজ্ঞাপরায়ণ পার্থক্যবোধের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এইজন্য এই শিক্ষা জগতের যেখানেই পৌঁছিয়াছে সেইখানেই পরজাতির প্রতি সন্দেহ-সংকুল বিরুদ্ধতা জাগিয়াছে; সেইখানেই মানুষ অন্য দেশের মানুষকে ছলে বলে ঠেলিয়া পৃথিবীর সমস্ত সুযোগ নিজে পুরা দখল করিবার জন্য নিজের সমস্ত শক্তিকে উদ্যত করিয়া তুলিতেছে। এই-যে একটা প্রকাণ্ড ব্যূহবদ্ধ অহংকার ও স্বার্থপরতার চর্চা, এই-যে মানুষকে সত্য করিয়া দেখিবার দৃষ্টিকে ইচ্ছা করিয়া বিকৃত করিবার চেষ্টা, ইহা আজ বিলিতি মদ এবং আর-আর পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে ভারতেও আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই শিক্ষায় বিপুল ও প্রবল মিথ্যার মধ্যে যেটুকু সত্য আছে সেটুকু আমাদিগকে লইতে হইবে; নহিলে আমাদের প্রকৃতি একঝোঁকা হইয়া পড়িবে। কিন্তু সেই সঙ্গে এই কথাও মনে রাখা চাই যে, ভারত যদি এমন কোনো সত্য উপলব্ধি করিয়া থাকে যাহার অভাবে অন্য দেশের সভ্যতা আপন সামঞ্জস্য হারাইয়া টলিয়া পড়িতেছে, তবে আজ সেই সত্যকে বলের সঙ্গে প্রকাশ করাই তার সকলের চেয়ে বড়ো কাজ।

আজ পশ্চিম মহাদেশের লোক হঠাৎ পৃথিবীর সকল জাতির সংস্রবে আসিয়া পড়িয়াছে। এই মহৎ ঘটনার জন্য তার ধর্মবুদ্ধি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া উঠে নাই। তাই ভারতের প্রাচীন বাণিজ্য আজ বিধ্বস্ত, চীন বিষে জীর্ণ, পারস্য পদদলিত; তাই কঙ্গোয় য়ুরোপীয় বণিকের দানবলীলা এবং পিকিনে বক্সার যুদ্ধে য়ুরোপীয়দের বীভৎস নিদারুণতা দেখিয়াছি। ইহার কারণ, য়ুরোপীয়েরা স্বজাতিকেই সবচেয়ে সত্য বলিয়া মানিতে শিখিয়াছে। ইহাতে কিছুদূর পর্যন্ত তাহাদিগকে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহাদিগকে পার করিবে না। বালকবয়সে একপ্রকার দুর্দান্ত আত্মম্ভরিতা তেমন অসংগত হয় না, কিন্তু বয়স হইলে সামাজিক দায়িত্ব স্বীকার করিবার সময় আসে; তখনও যদি মানুষ পরের সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে না শেখে তবে তাহাতে অন্যেরও অসুবিধা ঘটে এবং তাহারও চিরদিন সুবিধা ঘটে না।

আজ তাই এমন দিন আসিয়াছে যখন পশ্চিমের মানুষ নিজের ঘরের মধ্যেই বেশ করিয়া বুঝিতেছে স্বাজাতিকতা বলিতে কী বুঝায়। এতদিন যে স্বাজাতিকতার সমস্ত সুবিধাটুকু ইহারা নিজে ভোগ করিয়াছে এবং সমস্ত অসুবিধার বোঝা অন্য জাতির ঘাড়ে চাপাইয়া আসিয়াছে আজ তাহার ধাক্কা ইহাদের নিজের গৃহপ্রাচীরের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

এতদিন মানুষ বলিতে ইহারা মুখ্যত আপনাদিগকেই বুঝিয়াছে। তাহাতে ইহাদের আত্মোপলব্ধি এই সংকীর্ণ সীমার মধ্যে প্রচণ্ডরূপে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, এবং এই সীমার বাহিরে নিজের সুবিধা এবং অসুবিধা অনুসারে নিজের লাভক্ষতির পরিমাণ বুঝিয়া ইহারা ধর্মবুদ্ধিকে কমাইয়া বাড়াইয়া বেশ সহজ করিয়া আনিতে পারিয়াছে।

কিন্তু সুবিধার মাপে সত্যকে ছাঁটিতে গেলে সত্যও আমাদিগকে ছাঁটিতে আসে। কিছুদিন ও কিছুদূর পর্যন্ত সে অবজ্ঞা সহ্য করিয়া যায়। তার পরে একদিন হঠাৎ সে সুদে-আসলে আপনার পাওনা আদায় করিতে আসিয়া উপস্থিত হয়। এমন সময়ে আসে যেটা অত্যন্ত অসুবিধার সময়, এমন উপলক্ষে আসে যেটা হয়তো অত্যন্ত তুচ্ছ। তখন সেটাকে আমরা বিধাতার অবিচার মনে করি। অধর্মের টাকায় ভদ্র সমাজে যে মানুষ গৌরবে বয়স কাটাইল, হঠাৎ একদিন যদি তার খাতা ধরা পড়ে তবে সেটাকে সে অন্যায় অত্যাচার বলিয়াই মনে করে। বড়ো বড়ো সভ্য জাতি তেমনি আপন সমৃদ্ধিকে এমনি স্বাভাবিক এবং সুসংগত বলিয়া মনে করে যে, দুর্দিন যখন তার সেই সমৃদ্ধির ইতিহাস লইয়া কৈফিয়ত তলব করে তখন সেটাকে সে সুবিচার বলিয়া মনেই করিতে পারে না।

এইজন্য দেখিতে পাই, য়ুরোপ যখন কঠিন সংকটে পড়ে তখন বিধাতার রাজ্যে

এত দুঃখ কেন ঘটে তা লইয়া সে ভাবিয়া কূল পায় না। কিন্তু পৃথিবীর অন্য অংশের লোকেরাই বা কেন দুঃখ এবং অপমান ভোগ করে, সে কথা লইয়া বিধাতাকে কিম্বা নিজেকে তেমন জোরের সঙ্গে এরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না। তা হউক, এই সহজ সত্যটুকু তার ভালো করিয়াই জানা দরকার ছিল যে, মনুষ্যত্ব জিনিস একটা অখণ্ড সত্য, সেটা সকল মানুষকে লইয়াই বিরাজ করিতেছে। সেটাকে যখন কেহ স্বার্থের বা স্বজাতির খাতিরে খণ্ডিত করে তখন শীঘ্রই হোক বিলম্বেই হোক তার আঘাত একদিন নিজের বক্ষে আসিয়া পৌঁছে। ঐ মনুষ্যত্বের উপলব্ধি কী পরিমাণে সত্য হইয়াছে ইহা লইয়াই সভ্যতার বিচার হইবে— নহিলে, তার আমদানি-রফতানির প্রাচুর্য, তার রণতরীর দৈর্ঘ্য, তার অধীন দেশের বিস্তৃতি, তার রাষ্ট্রনীতির চাতুরী, এ লইয়া বিচার নয়। ইতিহাসের এই বিচারে আমরা পূর্বদেশের লোকেরা প্রধান সাক্ষী। আমাদিগকে অসংকোচে সত্য বলিতে হইবে, তার ফল আমাদের পক্ষে যত কঠিন এবং অন্যদের পক্ষে যত অপ্রিয় হউক। আমাদের বাণী প্রভুত্বের বাণী নয়, তার পশ্চাতে শস্ত্রবল নাই। আমরা সেই উচ্চ রাজতক্তে দাঁড়াই নাই যেখান হইতে দেশবিদেশ নতশিরে আদেশ গ্রহণ করে। আমরা রাজসভার বাহিরে সেই পথের ধারে ধুলার উপরে দাঁড়াইয়া আছি যে পথে যুগযুগান্তের যাত্রা চলিতেছে; যে পথে অনেক জাতি প্রভাতে জয়ধ্বজা উড়াইয়া দিগ্‌ দিগন্তে ধুলা ছড়াইয়া বাহির হইয়াছে, সন্ধ্যাবেলায় তারা ভগ্ন দণ্ড এবং জীর্ণ কন্থায় যাত্রা শেষ করিল; কত সাম্রাজ্যের অহংকার ঐ পথের ধুলায় কালের রথচক্রতলে চূর্ণ হইয়া গেল, আজ তার সন-তারিখের ভাঙা টুকরাগুলা কুড়াইয়া ঐতিহাসিক উল্টা-পাল্টা করিয়া জোড়া দিয়া মরিতেছে। আমাদের বাণী বেদনার বাণী— সত্যের বলে যার বল, একদিন যাহা অন্যসকল কলগর্জনের ঊর্ধ্বে ইতিহাসবিধাতার সিংহাসনতলে আসিয়া পৌঁছিবে।

একদিন ছিল যখন য়ুরোপ আপন আত্মাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল। তখন নানা চিত্তবিক্ষেপের মধ্যেও সে এ কথা বুঝিয়াছিল যে, বাহিরের লাভের দ্বারা নয়, কিন্তু অন্তরে সত্য হইয়া মানুষ আপন চরম সম্পদ পায়। সে জানিত, এ লাভের মূল্য কেবল আমাদের মনগড়া নয়, কিন্তু ইহার মূল্য সেই পরম প্রেমের মধ্যে যাহা চিরদিন মানুষের সংসারের মধ্যে সচেষ্ট হইয়া আছে। তার পরে এমন দিন আসিল যখন বিজ্ঞান বহির্জগতের মহিমা প্রকাশ করিয়া দিল এবং য়ুরোপের নিষ্ঠাকে আত্মার দিক হইতে বস্তুর দিকে জোর করিয়া ছিনাইয়া লইল।

মানুষের পক্ষে বিজ্ঞানের খুব একটা বড়ো তাৎপর্য আছে। প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে মানুষের জ্ঞানের সহযোগিতা আছে, বিজ্ঞান ইহাই প্রমাণ করে। প্রকৃতির নিয়মের

সাহায্যেই প্রাকৃতিক নির্বাচনের অধীনতা কাটাইয়া মানুষ আপন ধর্মবিবেকের স্বাধীন নির্বাচনের গৌরব লাভ করিতে পারে, ইহাই বিজ্ঞানের শিক্ষা। প্রকৃতি যে মানুষের পরিপূর্ণতালাভের পথে অন্তরায় নহে, প্রকৃতির সহিত সত্য ব্যবহার করিয়া তবেই আমাদের চিন্ময়কে রূপদান করিয়া তাহার বাস্তবপ্রতিষ্ঠা করিতে পারি, য়ুরোপের প্রতি এই সত্য প্রচারের ভার আছে।

বিজ্ঞান যেখানে সর্বসাধারণের দুঃখ এবং অভাব-মোচনের কাজে লাগে, যেখানে তার দান বিশ্বজনের কাছে গিয়া পৌঁছায়, সেইখানেই বিজ্ঞানের মহত্ত্ব পূর্ণ হয়। কিন্তু, যেখানে সে বিশেষ ব্যক্তি বা জাতিকে ধনী বা প্রবল করিয়া তুলিবার কাজে বিশেষ করিয়া নিযুক্ত হয় সেখানেই তার ভয়ংকর পতন। কারণ, ইহার প্রলোভন এত অত্যন্ত প্রকাণ্ড রূপে প্রবল যে আমাদের ধর্মবুদ্ধি তার কাছে অভিভূত হইয়া পড়ে এবং স্বাজাত্য ও স্বাদেশিকতা প্রভৃতি বড়ো বড়ো নামের বর্ম পড়িয়া নিজেরই শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া লড়াই করে। ইহাতে আজ জগতের সর্বত্র এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির সম্বন্ধ দুর্বলের দিকে দলন-বন্ধনের দ্বারা ভারগ্রস্ত এবং প্রবলের দিকে হিংস্রতার অন্তহীন প্রতিযোগিতায় উদ্ধত হইয়া উঠিতেছে ; সকল দেশে যুদ্ধ ও যুদ্ধের উদ্‌যোগ নিত্য হইয়া উঠিয়াছে এবং পোলিটিকাল মহামারীর বাহন যে রাষ্ট্রনীতি তাহা নিষ্ঠুরতা ও প্রবঞ্চনায় অন্তরে অন্তরে কলুষিত হইতে থাকিল।

তথাপি এই আশা করি, য়ুরোপের এতদিনের তপস্যার ফল আজ বস্তুলোভের ভীষণ দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়িয়া পায়ের তলায় ধুলা হইয়া যাইবে না। আজিকার দিনের প্রচণ্ড সংকটের বিপাকে য়ুরোপ আর-কোনো একটা নূতন প্রণালী, আর-একটা নূতন রাষ্ট্র-নৈতিক ব্যবস্থা খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু বারম্বার মৃত্যুর পাঠশালায় শিক্ষালাভের পরে য়ুরোপকে আজ না হয় তো আর-একদিন এ কথা মানিতেই হইবে যে, কেবল কার্যপ্রণালীর পিরামিড-নির্মাণের প্রতি আস্থা রাখা অন্ধ পৌত্তলিকতা ; তাহাকে এ কথা বুঝিতে হইবে, বাহিরের প্রণালীকে নয়, অন্তরের সত্যকে পাওয়া চাই ; এ কথা বুঝিতে হইবে যে, ক্রমাগতই বাসনা-হুতাগ্নির হব্য সংগ্রহ করিতে থাকিলে একদিন জগদ্‌ব্যাপী অগ্নিকাণ্ড না ঘটিয়া থাকিতে পারে না। একদিন জাগিয়া উঠিয়া য়ুরোপকে তার লুব্ধতা এবং উন্মত্ত অহংকারের সীমা বাঁধিয়া দিতে হইবে ; তার পরে সে আবিষ্কার করিতে পারিবে যে, উপকরণই যে সত্য তাহা নয়, অমৃতই সত্য।

ঈর্ষার অন্ধতায় য়ুরোপের মহত্ত্ব অস্বীকার করিলে চলিবে না। তার স্থানসন্নিবেশ, তার জলবায়ু, তার জাতিসমবায়, এমনভাবে ঘটিয়াছে যে, সহজেই তার ইতিহাস শক্তি সৌন্দর্য এবং স্বাতন্ত্র্যপরতায় সম্পদ্‌শালী হইয়া উঠিয়াছে। সেখানকার প্রকৃতিতে

কঠোরতা এবং মৃদুতার এমন একটি সামঞ্জস্য আছে যে, তাহা এক দিকে মানবের সমগ্র শক্তিকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করিয়া আনে, আর-এক দিকে তাহার চিত্তকে অভিভূত করিয়া নিশ্চেষ্ট অদৃষ্টবাদে দীক্ষিত করে না। এক দিকে তাহা য়ুরোপের সন্তানদের চিত্তে এমন তেজের উদ্রেক করিয়াছে যে তাহাদের উদ্যম ও সাহস কোথাও আপন দাবির কোনো সীমা স্বীকার করিতে চায় না; অপর দিকে তাহাদের বুদ্ধিতে অপ্রমাদ, তাহাদের কল্পনা-বৃত্তিতে সুসংযম, তাহাদের সকল রচনায় পরিমিতি এবং তাহাদের জীবনের লক্ষ্যের মধ্যে বাস্তবতাবোধের সঞ্চার করিয়াছে। তাহারা একে একে বিশ্বের গূঢ়রহস্যসকল বাহির করিতেছে, তাহাকে মাপিয়া ওজন করিয়া আয়ত্ত করিতেছে; তাহারা প্রকৃতির মধ্যে অন্তরতর যে-একটি ঐক্যতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে তাহা ধ্যানযোগে বা তর্কের বলে নয়— তাহা বাহিরের পর্দা ছিন্ন করিয়া, বৈচিত্র্যের প্রাচীর ভেদ করিয়া। তাহারা নিজের শক্তিতে রুদ্ধ দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া প্রকৃতির মহাশক্তিভাণ্ডারের মধ্যে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং লুব্ধ হস্তে সেই ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিতেছে।

নিজের এই শক্তি সম্বন্ধে য়ুরোপের দম্ভ অত্যন্ত বাড়িয়াছে বলিয়াই কোথায় যে তার ন্যূনতা তাহা সে বিচার করে না। বাহ্যপ্রকৃতির রূপ যে দেশে অতিমাত্র বৃহৎ বা প্রচণ্ড সে দেশে যেমন মানুষের চিত্ত তাহার কাছে অভিভূত হইয়া আত্মবিস্মৃত হয় তেমনি মানুষ নিজকৃত বস্তুসঞ্চয় এবং বাহ্যরচনার অতিবিপুলতার কাছে নিজে মোহাবিষ্ট হইয়া পরাস্ত হইতে থাকে। বাহিরের বিশালতার ভারে অন্তরের সামঞ্জস্য নষ্ট হইতে হইতে একদিন মানুষের সমৃদ্ধি ভয়ংকর প্রলয়ের মধ্যে ধুলায় লুটাইয়া পড়ে। রোম একদিন আপন সাম্রাজ্যের বিপুলতার দ্বারাই আপনি বিহ্বল হইয়াছিল। বস্তুর অপরিমিত বৃহত্ত্বের কাছে তার সত্য যে প্রতিদিন পরাভূত হইতেছিল তাহা সে নিজে জানিতেই পারে নাই। অথচ সেদিন য়িহুদি ছিল রাষ্ট্রব্যাপারে পরতন্ত্র, অপমানিত। কিন্তু, সেই পরাধীন জাতির একজন অখ্যাতনামা অকিঞ্চন যে সত্যের সম্পদ উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিল তাহাই তো স্তূপাকার বস্তুসঞ্চয়ের উপরে জয়লাভ করিল। য়িহুদি উদ্ধত রোমকে এই কথাটুকু মাত্র স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল যে, আপন আত্মাকে তুমি আপন ধনের চেয়ে বড়ো করিয়া জানো। এই কথাটুকুতেই পৃথিবীর ইতিহাসে নূতন যুগ আসিল।

দরিদ্রের কথায় আপনার উপর মানুষের শ্রদ্ধা জন্মিল, আত্মাকে লাভ করিবার জন্য সে বাহির হইল। বাহিরে তাহার বাধা বিস্তর, তবু নিজের সঙ্গে লড়াই করিতে করিতে অমৃতলোকের দিব্যসম্পদ অর্জন করিবার জন্য সে অগ্রসর হইতেছিল। এমন সময়ে তাহার তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য বাহিরের দিক হইতে আবার আসিল প্রলোভন।

বাহিরের জগৎকে তার হাতে তুলিয়া দিবার জন্য বিজ্ঞান তার সমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। য়ুরোপ আবার আত্মার চেয়ে আপন বস্তুসংগ্রহকে বড়ো করিয়া দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বস্তু চারি দিকে বাড়িয়া চলিল।

কিন্তু, ইহাই অসত্য। যেমন করিয়া যে নাম দিয়াই এই বাহিরকে মহীয়ান করিয়া তুলি না কেন, ইহা আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। ইহা ক্রমাগতই সন্দেহ, ঈর্ষা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতারণা, অন্ধ অহংকার এবং অবশেষে অপঘাতমৃত্যুর মধ্যে মানুষকে লইয়া যাইবেই ; কেননা মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো সত্য এই যে : তদেতৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা। অন্তরতর এই-যে আত্মা, বাহিরের সকল বিত্তের চেয়ে ইহা প্রিয়।

য়ুরোপে ইতিহাস একদিন নূতন করিয়া আপনাকে যে সৃষ্টি করিয়াছিল, কোনো নূতন কার্যপ্রণালী, কোনো নূতন রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যে তাহার মূলভিত্তি ছিল না। মানুষের আত্মা অন্য সব-কিছুর চেয়ে সত্য, এই তত্ত্বটি তাহার মনকে স্পর্শ করিবা মাত্র তাহার সৃজনীশক্তি সকল দিকে জাগিয়া উঠিল। অদ্যকার ভীষণ দুর্দিনে য়ুরোপকে এই কথাই আর-একবার স্মরণ করিতে হইবে। নহিলে একটার পর আর-একটা মৃত্যুবাণ তাহাকে বাজিতে থাকিবে।

আর আমরা আজ এই মৃত্যুশেলবিদ্ধ পশ্চিমের কাছ হইতে স্বাধীনতা ভিক্ষা করিবার জন্য ছুটাছুটি করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এই মুমূর্ষু আমাদিগকে কী দিতে পারে। পূর্বে এক রকমের রাষ্ট্রতন্ত্র ছিল, তাহার বদলে আর-এক রকমের রাষ্ট্রতন্ত্র? কিন্তু মানুষ কি কোনো সত্যকার বড়ো জিনিস একের হাত হইতে অন্যের হাতে তুলিয়া লইতে পারে। মানুষ যে-কোনো সত্যসম্পদ লয় তাহা মনের ভিতরেই লয়, বাহিরে না। ভিক্ষার দানে আমরা স্বাধীন হইব না— কিছুতেই না। স্বাধীনতা অন্তরের সামগ্রী।

য়ুরোপ কেন আমাদিগকে মুক্তি দিতে পারে না। যেহেতু তাহার নিজের মন মুক্তি পায় নাই। তার লোভের অন্ত কোথায়। যে হাত দিয়া সে কোনো সত্যবস্তু দিতে পারে লোভে তাহার সে হাতকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে— সত্য করিয়া তার দিবার সাধ্যই নাই, সে যে রিপুর দাস। যে মুক্ত সেই মুক্তি দান করে।

যদি সে বিষয়বুদ্ধির পরামর্শ পাইয়া আমাদিগকে কিছু দিতে আসে তবে সে নিজের দানকে নিজে কেবলই খণ্ডিত করিবে। এক হাত দিয়া যত দিবে আর-এক হাত দিয়া তার চেয়ে বেশি হরণ করিবে। স্বার্থের দানকে পরীক্ষা করিয়া লইবার বেলা দেখিব তাহাতে এত ছিদ্র যে, সে আমাদিগকে ভাসাইয়া রাখিবে কি, তাহাকে ভাসাইয়া রাখাই শক্ত।

তাই এই কথা বলি, বাহিরের দিক হইতে স্বাধীনতা পাওয়া যায়, এমন ভুল যদি মনে আঁকড়িয়া ধরি তবে বড়ো দুঃখের মধ্যেই সে ভুল ভাঙিবে। ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতে পারি নাই বলিয়াই অন্তরে বাহিরে আমাদের বন্ধন। যে হাত দিতে পারে সেই হাতই নিতে পারে। আপনার দেশকে আমরা অতি সামান্যই দিতেছি, সেইজন্যই আপনার দেশকে পাই নাই। বাহিরের একজন আমার দেশকে হাতে তুলিয়া দিলেই তবে তাহাকে পাইব, এ কথা যে বলে সে লোক দান পাইলেও দান রাখিতে পারিবে না। আপন লোককে দুঃখ দিই, অপমান করি, অবজ্ঞা করি, বঞ্চনা করি, বিশ্বাস করি না— সেইজন্যই আপন পর হইয়াছে, বাহিরের কোনো আকস্মিক কারণ হইতে নয়।

য়িহুদি যখন পরাধীন ছিল তখন রোমের হাত হইতে দক্ষিণাস্বরূপ তাহারা স্বাধীনতা পায় নাই। পরে এমন ঘটিয়াছে যে, য়িহুদি দেশছাড়া হইয়া বিদেশে ছড়াইয়া পড়িল। তাহার রাষ্ট্রও নাই, রাষ্ট্রতন্ত্রও নাই। কিন্তু তাহার ইতিহাসে এইটেই সকলের চেয়ে গুরুতর কথা নয়। ইহার চেয়ে অনেক বড়ো কথা এই যে, তাহার কাছ হইতে প্রাণের বীজ উড়িয়া আসিয়া য়ুরোপকে নূতন মনুষ্যত্ব দান করিয়াছে। সে যাহা দিয়াছে তাহাতেই তাহার সার্থকতা। যাহা হারাইয়াছে, যাহা পায় নাই, সেটা সত্ত্বেও সে বড়ো, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ হইয়াছে।

বাহিরের পরিমাণে মানুষের পরিমাণ নহে, এ কথা আমরা বার বার ভুলি কিন্তু তবু ইহা বার বার মনে করিতে হইবে। চীনদেশকে য়ুরোপ অস্ত্রবলে পরাস্ত করিয়া তাহাকে বিষ খাওয়াইয়াছে, সেটা বড়ো কথা নয়। কিন্তু বড়ো কথা এই যে, ভারত একদিন বিনা অস্ত্রবলে চীনকে অমৃত পান করাইয়াছিল। ভারত আজ যদি সমুদ্রের তলায় ডুবিয়া যায় তবু যাহা সে দান করিয়াছে তাহার জোরেই সে মানুষের চিত্তলোকে রহিল। যাহা সে ভিক্ষা করিয়াছিল, চুরি করিয়াছিল, স্তূপাকার করিয়াছিল, তাহার জোরে নয়।

তপস্যার বলে আমরা সেই দানের অধিকার পাইব, ভিক্ষার অধিকার নয়. এ কথা যেন কোনো প্রলোভনে না ভুলি। মানুষ যেহেতু মানুষ এই হেতু বস্তুর দ্বারা সে বাঁচে না, সত্যের দ্বারাই সে বাঁচে। এই সত্যই তাহার যে : তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়— তাঁহাকে জানিয়াই মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করে, তাহার উদ্ধারের অন্য কোনো উপায় নাই। এই সত্যকে দান করিবার জন্য আমাদের উপর আহ্বান আছে। মণ্টেগুর ডাক খুব বড়ো ডাক, আজ এই কথা বলিয়া ভারতের সভা হইতে সভায়, সংবাদপত্র হইতে সংবাদপত্রে ঘোষণা চলিতেছে। কিন্তু এই ভিক্ষার ডাকে আমরা মানুষ হইব না। আমাদের পিতামহেরা অমরলোক হইতে আমাদের

আহ্বান করিতেছেন, বলিতেছেন : তোমরা যে অমৃতের পুত্র এই কথা জানো এবং এই কথা জানাও ; মৃত্যুছায়াচ্ছন্ন পৃথিবীকে এই সত্য দান করো যে, কোনো কর্মপ্রণালীতে নয়, রাষ্ট্রতন্ত্রে নয়, বাণিজ্যব্যবস্থায় নয়, যুদ্ধ-অস্ত্রের নিদারুণতায় নয়—

তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি।
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়॥

মাঘ, ১৩২৪

চরকা

চরকা-চালনায় উৎসাহ প্রকাশ করি নি অপবাদ দিয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আমাকে ছাপার কালীতে লাঞ্ছিত করেছেন। কিন্তু দণ্ড দেবার বেলাতেও আমার 'পরে সম্পূর্ণ নির্মম হতে পারেন না বলেই আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকেও আমার সঙ্গে এক কলঙ্কের রসায়নে মিল করিয়েছেন।

এতে আমার ব্যথা দূর হল, তা ছাড়া একটা অত্যন্ত পুরোনো কথার নতুন প্রমাণ জুটল এই যে, কারো সঙ্গে কারো বা মতের মিল হয়, কারো সঙ্গে বা হয় না। অর্থাৎ, সকল মানুষে মিলে মৌমাছির মতো একই নমুনার চাক বাঁধবে, বিধাতা এমন ইচ্ছে করেন নি। কিন্তু সমাজবিধাতারা কখনো কখনো সেইরকম ইচ্ছা করেন। তাঁরা কাজকে সহজ করবার লোভে মানুষকে মাটি করতে কুণ্ঠিত হন না। তাঁরা ছাঁটাই-কলের মধ্যে মানুষ-বনস্পতিকে চালিয়ে দিয়ে ঠিক সমান মাপের হাজার হাজার সরু সরু দেশলাই কাঠি বের করে আনেন। বন্যদ্রব্যকে এরকম পণ্যদ্রব্য করলে বনদেবতারা চুপ করে থাকেন, কিন্তু মানুষের বুদ্ধিকে কাজের খাতিরে মৌমাছির বুদ্ধি করে তুললে নারায়ণের দরবারে হিসাবনিকাশের দিনে জরিমানায় দেউলে হবার ভয় আছে। ছোটো বয়সে জগন্নাথের ঘাটে জলযাত্রার প্রয়োজনে যখন যেতেম, নানা পান্সির মাঝি হাত ধরে টানাটানি করত। কিন্তু কোনো একটার 'পরে যখন অভিরুচির পক্ষপাত প্রকাশ করা যেত তখন সেজন্যে কারো কাছ থেকে শাসনভয় ছিল না। কেননা পান্সি ছিল অনেক, যাত্রী ছিল অনেক, তাদের গম্যস্থানও ছিল অনেক। কিন্তু, যদি দেশের উপর তারকেশ্বরের এমন একটা স্বপ্ন থাকত যে, তারণের জন্যে শুধু একটিমাত্র পান্সিই পবিত্র, তবে তাঁর প্রবল পাণ্ডাদের জবর্দস্তি ঠেকাত কে। এ দিকে মানবচরিত্র ঘাটে দাঁড়িয়ে কেঁদে মরত, ওরে পালোয়ান, কূল যদি বা একই হয়, ঘাট যে নানা— কোনোটা উত্তরে কোনোটা দক্ষিণে।

শাস্ত্রে বলেন, ঈশ্বরের শক্তি বহুধা। তাই সৃষ্টিব্যাপারে পাঁচ ভূতে মিলে কাজ করে। মৃত্যুতেই বিচিত্র ভূত দৌড় মারে; প্রলয়ে সব একাকার। মানুষকে ঈশ্বর সেই বহুধা শক্তি দিয়েছেন, তাই মানবসভ্যতার এত ঐশ্বর্য। বিধাতা চান মানবসমাজে সেই বহুকে গেঁথে গেঁথে সৃষ্টি হবে ঐক্যের; বিশেষফললুব্ধ শাসনকর্তারা চান, সেই বহুকে দ'লে ফেলে পিণ্ড পাকানো হবে সাম্যের। তাই সংসারে এত অসংখ্য এক-কলের মজুর, এক-উর্দি-পরা সেপাই, এক দলের দড়িতে বাঁধা কলের পুতুল। যেখানেই মানুষের মনুষ্যত্ব জুড়িয়ে হিম হয়ে যায় নি সেখানেই এই হামানদিস্তায়-কোটা সমীকরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চলছেই। কোথাও যদি সেই বিদ্রোহের লক্ষণ না থাকে, যদি দেখি সেখানে হয় প্রভুর চাবুকে নয় গুরুর অনুশাসনে মানুষকে অনায়াসেই একই ধূলিশয়নে অতি ভালোমানুষের মতো নিশ্চল শায়িত রাখতে পারে, তা হলে সেই 'দৃষ্টিহীন নাড়ীক্ষীণ হিমকলেবর' দেশের জন্যে শোকের দিন এসেছে বলেই জানব।

আমাদের দেশে অনেক দিন থেকেই সমীকরণের অলক্ষণ বলবান। এই মরণের ধর্মই আমাদের দেশে প্রত্যেক জাতের প্রত্যেক মানুষের 'পরেই এক-একটি বিশেষ কাজের বরাত দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কানে এই মন্ত্র যে, সৃষ্টির প্রথম দরবারে তাদের আদিপুরুষ একটিমাত্র বিশেষ মজুরির বায়না নিয়ে তাদের চিরকালকে বাঁধা দিয়ে বসে আছে। সুতরাং কাজে ইস্তফা দিতে গেলেই সেটা হবে অধর্ম। এইরকমে পিঁপড়ে-সমাজের নকলে খুচরো কাজ চালাবার খুব সুবিধে, কিন্তু মানুষ হবার বিশেষ বাধা। যে মানুষ কর্তা, যে সৃষ্টি করে, এতে তার মন যায় মারা; যে মানুষ দাস, যে মজুরি করে, তারই দেহের নৈপুণ্য পাকা হয়। তাই বহুকাল থেকে ভারতবর্ষে কেবলই পুরাতনের পুনরাবৃত্তি। এবং সেই পুনরাবৃত্তির জাঁতা চালিয়ে চালিয়েই অস্তিত্বের প্রতি ভারতের এত বিতৃষ্ণা। তাই সে জন্ম জন্মান্তরের পুনরাবর্তন-কল্পনায় আতঙ্কিত হয়ে সকল কর্ম ও কর্মের মূল মেরে দেবার জন্যে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করবার কথা ভাবছে। এই পুনরাবৃত্তির বিভীষিকা সে আপন প্রতিদিনের অভ্যাস-জড় কর্মচক্রের ঘুরপাকের মধ্যেই দেখেছে। লোকসান শুধু এইটুকু নয়, এমনি করে যারা কল বনে গেল তারা বীর্য হারালো, কোনো আপদকে ঠেকাবার শক্তিই তাদের রইল না। যুগ যুগ ধরে চতুর তাদের ঠকাচ্ছে, গুরু তাদের ভোলাচ্ছে, প্রবল তাদের কান-মলা দিচ্ছে। তারা এর কোনো অন্যথা কল্পনামাত্র করতে পারে না, কারণ তারা জানে মেরে রেখেছেন বিধাতা; সৃষ্টির আদিকালে চতুর্মুখ তাদের চাকায় দম দিয়ে বসে আছেন, সে দম সৃষ্টির শেষকাল পর্যন্ত ফুরোবে না। একঘেয়ে কাজের জীবন্মৃত্যুর ভেলার মধ্যে কালস্রোতে তাদের ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সনাতন শাস্ত্র যাই বলুন-না, সৃষ্টির গোড়ায়

ব্রহ্মা মানুষকে নিয়ে যে কাণ্ড করেছিলেন এর সঙ্গে তার সম্পূর্ণই তফাত। মানুষের খোলের মধ্যে ঘূর্ণিচাকার মোটর-কল না বসিয়ে মন ব'লে অত্যন্ত ছট্‌ফটে একটা পদার্থ ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেই বালাইটাকে বিদায় করতে না পারলে মানুষকে কল করে তোলা দুঃসাধ্য। ঐহিক বা পারত্রিক ভয়ে বা লোভে বা মোহমন্ত্রে এই মনটাকে আধমরা করে তবে কর্তারা এক দলের কাছে কেবলই আদায় করছেন তাঁতের কাপড়, আর-এক দলের কাছে কেবলই ঘানির তেল; এক দল কেবলই জোগাচ্ছে তাঁদের ফরমাশের হাঁড়ি, আর-এক দল বানাচ্ছে লাঙলের ফাল। তার পরে যদি দরকার হয় মনুষ্যোচিত কোনো বড়ো কাজে তাদের মন পেতে তারা ব'লে বসে, 'মন? সেটা আবার কোন্ আপদ। হুকুম করো-না কেন। মন্ত্র আওড়াও।'

গাছ বসিয়ে বেড়া তৈরি করতে গেলে সব গাছকেই সমান খাটো করে ছাঁটতে হয়। তেমনি করে আমাদের এই ছাঁটা মনের মুল্লুকে মানুষের চিত্তধর্মকে যুগে যুগে দাবিয়ে রেখেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজকেকার অবাধ্যতার যুগে এ দিকে ও দিকে তার গোটাকতক ডালপালা বিদ্রোহী হয়ে সাম্যসৌষম্যকে অতিক্রম করে যদি বেরিয়ে পড়বার দুষ্টলক্ষণ দেখায়, যদি সকলেরই মন আজ আঁধার রাতের ঝিল্লিধ্বনির মতো মৃদু গুঞ্জনে একটিমাত্র উপদেশমন্ত্রের সমতান-অনুকরণ না করে, তা হলে কেউ যেন উদ্‌বিগ্ন বা বিরক্ত না হন; কেননা স্বরাজের জন্যে আশা করা তখনই হবে খাঁটি।

এইজন্যেই কবুল করতে লজ্জা হচ্ছে না (যদিও লোকভয় যথেষ্ট আছে) যে, এ পর্যন্ত চরকার আন্দোলনে আমার মন ভিতর থেকে দোল খায় নি। অনেকে সেটাকে আমার স্পর্ধা বলে মনে করবেন, বিশেষ রাগ করবেন। কেননা বেড়জালে যখন অনেক মাছ পড়ে, তখন যে মাছটা ফস্‌কে যায় তাকে গাল না পাড়লে মন খোলসা হয় না। তথাপি আশা করি, আমার সঙ্গে প্রকৃতিতে মেলে এমন লোকও অনেক আছেন। তাঁদের সকলকে বাছাই করে নেওয়া শক্ত; কেননা চরকা সম্বন্ধে তাঁদের সকলের হাত চলে না, অথচ মুখ খুব মুখর বেগেই চলে।

যে-কোনো সমাজেই কর্মকাণ্ডকে জ্ঞানকাণ্ডের উপরে বসিয়েছে, সেইখানেই মানুষের সকল বিষয়ে পরাভব।

বুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে ভারতের মধ্যযুগের সাধু সাধক যাঁদেরই দেখি, যাঁরাই এসেছেন পৃথিবীতে কোনো মহাবার্তা বহন করে, তাঁরা সকলেই অমনস্ক যান্ত্রিক বাহ্যিক আচারের বিরোধী। তাঁরা সব বাধা ভেদ করে কথা কয়েছিলেন মানুষের অন্তরাত্মার কাছে। তাঁরা কৃপণের মতো, হিসাবি বিজ্ঞলোকের মতো এমন কথা বলেন নি যে, আগে বাহ্যিক, তার পরে আন্তরিক; আগে অন্নবস্ত্র, তার পরে আত্মশক্তির পূর্ণতা।

তাঁরা মানুষের কাছে বড়ো দাবি করে তাকে বড়ো সম্মান দিয়েছিলেন ; আর সেই বড়ো সম্মানের বলেই তার অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন সম্পদ বিচিত্রভাবে প্রকাশিত হয়ে সাহিত্যে, গানে, নানা কারুকলায় সমাজকে সমৃদ্ধিশালী করেছিল। তাঁরা মানুষকে দিয়েছিলেন আলো, দিয়েছিলেন জাগরণ ; অর্থাৎ তাকে দিয়েছিলেন তার আপন আত্মারই উপলব্ধি— তাতেই সব দেওয়া পূর্ণ হয়।

আজ সমস্ত দেশ জুড়ে আমাদের যদি দৈন্য এসে থাকে তা হলে জানা চাই, তার মূল আছে আমাদের ভিতরের দিকে। সেই মূল দুর্গতির একটিমাত্র বাহ্য লক্ষণ বেছে নিয়ে দেশশুদ্ধ সকলে মিলে তার উপরে একটিমাত্র বাহ্যিক প্রক্রিয়া নিয়ে পড়লে শনিগ্রহ ভয় পান না। মানুষ পাথরের মতো জড়পদার্থ হলে বাইরে হাতুড়ি ঠুকে তার মূর্তি বদল করা যেত ; কিন্তু মানুষের মূর্তিতে বাহির থেকে দৈন্য দেখা দিলে ভিতরে প্রাণশক্তির দিকে মন দেওয়া চাই— হাতুড়ি চালাতে গেলে সেই প্রাণটার উপরেই ঘা পড়বে।

একদিন মোগল-পাঠানের ধাক্কা যেই লাগল হিন্দুরাজত্বের ছোটো ছোটো আলগা পাট্‌কেলের কাঁচা ইমারত চার দিক থেকে খান্‌খান্‌ হয়ে ভেঙে পড়ল। দেশে তখন সুতোর অভাব ছিল না, কিন্তু সেই সুতো দিয়ে জড়িয়ে বেঁধে ভাঙন বন্ধ করা যায় নি। রাজার সঙ্গে তখন আর্থিক বিরোধ ছিল না, কেননা তাঁর সিংহাসন ছিল দেশেরই মাটিতে। যেখানে ছিল গাছ তার পাকা ফল পড়ত সেইখানেই গাছতলায়। আজ আমাদের দেশে রাজা এক-আধজন নয়, একেবারে রাজার বন্যা ভারতের মাটি ধুয়ে তার ফসল ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে সমুদ্রপারে। জমি তাতে ফলও হারায়, উর্বরতাও হারায়। এবারকার এ আঘাতও যে ঠেকাতে পারি নি তার কারণ এ নয় যে, আমাদের যথেষ্ট সুতো নেই ; কারণ এই যে, আমাদের মিল নেই, প্রাণ নেই।

কেউ কেউ বলেন, মোগল-পাঠানের আমলে আমাদের নিঃশক্তি ছিল বটে, কিন্তু অন্নবস্ত্রও তো ছিল। নদীতে জলধারা যখন কম তখনো বাঁধ দিয়ে ছোটো ছোটো কুণ্ডে হাতের কাছে দিনের কাজ চালাবার মতো জল ধরে রাখা যায়। এ দিকে বাঁধ ভেঙেছে যে। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে দেনাপাওনা বন্ধ করে লুকিয়ে থাকি এমন দিন আর নেই, কখনো আসবেও না। তা ছাড়া সেরকম অবরোধই সবচেয়ে বড়ো দৈন্য। এমন অবস্থায় বিশ্বের সঙ্গে ব্যাপারের যোগ্য মনের শক্তি যদি না জাগাতে পারি, তা হলে ফসল খেয়ে যাবে অন্যে, তুঁষ পড়ে থাকবে আমাদের ভাগে। ছেলে-ভোলানো ছড়ায় বাংলাদেশে শিশুদেরই লোভ দেখানো হয় যে, হাত ঘুরোলে লাড়ু পাবার আশা আছে ; কিন্তু কেবল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাত-চালানোর দ্বারা মনের নিশ্চলতার অভাব পূর্ণ হয়ে দৈন্য দূর হবে, স্বরাজ মিলবে, এমন কথা বয়ঃপ্রাপ্ত লোকদের বলা চলে না।

বাইরের দারিদ্র্য যদি তাড়াতে চাই তা হলে অন্তরেরই শক্তি জাগাতে হবে বুদ্ধির মধ্যে, জ্ঞানের মধ্যে, সহযোগিতা-প্রবর্তক হৃদ্যতার মধ্যে।

তর্ক উঠবে, কাজ বাইরের থেকেও মনকে তো নাড়া দেয়। দেয় বটে, কাজের মধ্যেই যদি মনের অভিমুখে কোনো একটা চিন্তার ব্যঞ্জনা থাকে। কেরানির কাজে এটা থাকে না, এ কথা আমাদের কেরানিগিরির দেশে সকলেই জানে। সংকীর্ণ অভ্যাসের কাজে বাহ্য নৈপুণ্যই বাড়ে, আর বদ্ধ মন ঘানির অন্ধ বলদের মতো অভ্যাসের চক্র প্রদক্ষিণ করতে থাকে। এইজন্যেই, যে-সব কাজ মুখ্যত কোনো-একটা বিশেষ শারীরিক প্রক্রিয়ার পুনঃপুনঃ আবৃত্তি সকল দেশেই মানুষ তাকে অবজ্ঞা করেছে। কার্লাইল খুব চড়া গলায় dignity of labour প্রচার করেছেন; কিন্তু বিশ্বের মানুষ যুগে যুগে তার চেয়ে অনেক বেশি চড়া গলায় indignity of labour সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়ে আসছে। যারা মজুরি করে তারা নিতান্ত দায়ে পড়েই সমাজের বা প্রভুর, প্রবলের বা বুদ্ধিমানের, লোভে বা শাসনে নিজেদের যন্ত্র বানিয়ে তোলে। তাদেরই মন্ত্র: সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ। অর্থাৎ, না খেয়ে যখন মরতেই বসেছে তখন মনটাকে বাদ দিয়েই হাত চালিয়ে পেট চালানো। তাই ব'লে মানুষের প্রধান-তর অর্ধেকটা বাদ দেওয়াতেই তার dignity, এমন কথা বলে তাকে সান্ত্বনা দেওয়া তাকে বিদ্রূপ করা। বস্তুত পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষকেই এই যন্ত্রীভবনের পঙ্গুতা থেকে বাঁচাবে কিসে, এইটেই হয়েছে মস্ত সমস্যা। আমার বিশ্বাস সব বড়ো সভ্যতাই হয় মরেছে নয় জীবন্মৃত হয়েছে, অল্প লোকের চাপে বহু লোককে মন-মরা করে দেওয়াতেই। কেননা মনই মানুষের সম্পদ। মনোবিহীন মজুরির আন্তরিক অগৌরব থেকে মানুষকে কোনো বাহ্য সমাদরে বাঁচাতে পারা যায় না। যারা নিজের কাছেই নিজে ভিতর থেকে খাটো হয়ে গেছে, অন্যেরা তাদেরই খাটো করতে পারে। য়ুরোপীয় সভ্যতায় বিজ্ঞানচর্চার সামনে যদি কোনো বড়ো নৈতিকসাধনা থাকে সে হচ্ছে বাহ্য প্রকৃতির হাতের সবরকম মার থেকে মানুষকে বাঁচানো, আর হচ্ছে মানুষেরই মনটাকে যন্ত্রে না বেঁধে প্রাকৃতিক শক্তিকেই যন্ত্রে বেঁধে সমাজের কাজ আদায় করা। এ কথা নিশ্চিত যে, বিজ্ঞানকে এক পাশে ঠেলে রেখে কেবল হাত চালিয়ে দেশের বিপুল দারিদ্র্য কিছুতে দূর হতে পারে না। মানুষের জানা এগিয়ে চলবে না, কেবল তার করাই চলতে থাকবে, মানুষের পক্ষে এতবড়ো কুলিগিরির সাধনা আর কিছুই নেই।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, মানুষ যেদিন প্রথম চাকা আবিষ্কার করেছিল সেদিন তার এক মহা দিন। অচল জড়কে চক্রাকৃতি দিয়ে তার সচলতা বাড়িয়ে দেবা মাত্র, যে বোঝা সম্পূর্ণ মানুষের নিজের কাঁধে ছিল তার অধিকাংশই পড়ল

জড়ের কাঁধে। সেই তো ঠিক, কেননা জড়ই তো শূদ্র। জড়ের তো বাহিরের সত্তার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের সত্তা নেই ; মানুষের আছে, তাই মানুষ মাত্রই দ্বিজ। তার বাহিরের প্রাণ, অন্তরের প্রাণ, উভয়কেই রক্ষা করতে হবে। তাই জড়ের উপর তার বাহ্য কর্মভার যতটাই সে না চাপাতে পারবে, ততটাই চাপাতে হবে মানুষের উপর। সুতরাং ততটা পরিমাণেই মানুষকে জড় করে শূদ্র করে তুলতেই হবে, নইলে সমাজ চলবে না। এই-সব মানুষকে মুখে dignity দিয়ে কেউ কখনোই dignity দিতে পারবে না। চাকা অসংখ্য শূদ্রকে শূদ্রত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে। এই চাকাই চরকায়, কুমোরের চাকে, গাড়ির তলায়, স্থূল সূক্ষ্ম নানা আকারে মানুষের প্রভূত ভার লাঘব করেছে। এই ভারলাঘবতার মতো ঐশ্বর্যের উপাদান আর নেই, এ কথা মানুষ বহুযুগ পূর্বে প্রথম বুঝতে পারলে যেদিন প্রথম চাকা ঘুরল। ইতিহাসের সেই প্রথম অধ্যায়ে যখন চরকা ঘুরে মানুষের ধন-উৎপাদনের কাজে লাগল ধন তখন থেকে চক্রবর্তী হয়ে চলতে লাগল, সেদিনকার চরকাতেই এসে থেমে রইল না। এই তথ্যটির মধ্যে কি কোনো তত্ত্ব নেই। বিষ্ণুর শক্তির যেমন একটা অংশ পদ্ম তেমনি আর-একটা অংশ চক্র। বিষ্ণুর সেই শক্তির নাগাল মানুষ যেই পেলে অমনি সে অচলতা থেকে মুক্ত হল। এই অচলতাই হচ্ছে মূল দারিদ্র্য। সকল দৈবশক্তিই অসীম, এইজন্য চলনশীল চক্রের এখনো আমরা সীমায় এসে ঠেকি নি। এমন উপদেশ যদি মেনে বসি যে, সুতো কাটার পক্ষে আদিমকালের চরকাই শেষ তা হলে বিষ্ণুর পূর্ণ প্রসন্নতা কখনোই পাব না, সুতরাং লক্ষ্মী বিমুখ হবেন। বিজ্ঞান মর্তলোকে এই বিষ্ণুচক্রের অধিকার বাড়াচ্ছে এ কথা যদি ভুলি, তা হলে পৃথিবীতে অন্য যে-সব মানুষ চক্রীর সম্মান রেখেছে তাদের চক্রান্তে আমাদের মরতে হবে।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মহাচক্রের যে বিরাট শক্তিরূপ দেখা যায় সেটাকে যখন ভুলি, যখন কোনো এক বিশেষ কালের বিশেষ চরকাকেই সুতো কাটবার চরম উপাদান রূপে দেখি ও অভ্যস্তভাবে ব্যবহার করি, তবে চরকা ভিতরের দিক থেকে আমাদের কাছে বোবা হয়ে থাকে, তখন যে চরকা মানুষকে একদিন শক্তির পথে ধনের পথে অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছে সে আর এগোবার কথা বলে না। কানের কাছে আওয়াজ করে না তা নয়, কিন্তু মনের সঙ্গে কথা কয় না।

আমাকে কেউ কেউ বলেছেন, চরকা ছাড়া আর কোনো কাজ কোরো না এমন কথা তো আমরা বলি নে। তা হতে পারে, কিন্তু আর কোনো কাজ করো এ কথাও তো বলা হয় না। সেই না-বলাটাই কি প্রবল একটা বলা নয়। স্বরাজসাধনায় একটিমাত্র কাজের হুকুম অতি নির্দিষ্ট, আর তার চার দিকেই নিঃশব্দতা। এই

নিঃশব্দতার পটভূমিকায় উপরে চরকা কি অত্যন্ত মস্ত হয়ে দেখা দিচ্ছে না। বস্তুত সে কি এতই মস্ত। ভারতবর্ষের তেত্রিশ কোটি লোক স্বভাবস্বাতন্ত্র্যনির্বিচারে এই ঘূর্ণ্যমান চরকার কাছে যে যতটা পারে আপন সময় ও শক্তির নৈবেদ্য সমর্পণ করবে— চরকার কি প্রকৃতই সেই মহিমা আছে। একই পূজাবিধিতে একই দেবতার কাছে সকল মানুষকে মেলবার জন্যে আজ পর্যন্ত নানা দেশে বারে বারে ডাক পড়ল। কিন্তু, তাও কি সম্ভব হয়েছে। পূজাবিধিই কি এক হল না দেবতাই হল একটি। দেবতাকে আর দেবার্চনাকে সব মানুষের পক্ষে এক করবার জন্য কত রক্তপাত, কত নিষ্ঠুর অত্যাচার পৃথিবীতে চলে আসছে। কিছুতেই কিছু হল না, শুধু কি স্বরাজতীর্থের সাধনমন্দিরে একমাত্র চরকা-দেবীর কাছেই সকলের অর্ঘ্য এসে মিলবে। মানবধর্মের প্রতি এত অবিশ্বাস? দেশের লোকের 'পরে এত অশ্রদ্ধা?

গুপী বলে আমাদের এক পশ্চিমদেশী বেহারা ছিল। ছেলেবেলায় তার কাছে গল্প শুনেছিলুম যে, যখন সে পুরীতীর্থে গিয়েছিল, জগন্নাথের কাছে কোন্ খাদ্য ফল উৎসর্গ করে দেবে এই নিয়ে তার মনে বিষম ভাবনা উপস্থিত হল। সে বার বার মনে মনে সকলরকম খাবার যোগ্য ফলের ফর্দ আউড়িয়ে যেতে লাগল। কোনোটাতেই তার মন সায় দিলে না। অবশেষে হঠাৎ মনে পড়ে গেল বিলিতি বেগুন। তখনি তার দ্বিধা গেল ঘুচে, জগন্নাথকে দিয়ে এল বিলিতি বেগুন, শেষ পর্যন্ত এ সম্বন্ধে তার পরিতাপ রইল না।

সবচেয়ে সহজ দেবতার কাছে সবচেয়ে কম দেওয়ার দাবি মানুষের প্রতি সবচেয়ে অন্যায় দাবি। স্বরাজসাধনের নাম করে তেত্রিশ কোটি লোককে চরকা কাটতে বলা জগন্নাথকে বিলিতি বেগুন দেওয়া। আশা করি, ভারতবর্ষে তেত্রিশ কোটি গুপী নেই। বড়ো যখন ডাক দেন তখন বড়ো দাবি করেন, তখন মানুষ ধন্য হয়। কেননা, মানুষ তখন আপন তুচ্ছতার মাঝখানে চমকে জেগে ওঠে, বুঝতে পারে সে বড়ো।

আমাদের দেশ আচারনিষ্ঠতার দেশ বলেই দেবতার চেয়ে পাণ্ডার পা-পুজোর 'পরে আমাদের ভরসা বেশি। বাহিরকে ঘুষ দিয়ে অন্তরকে তার দাবি থেকে বঞ্চিত করতে পারি, এমনতরো বিশ্বাস আমাদের ঘোচে না। আমরা মনে করি, দড়ির উপরে যদি প্রাণপণে আস্থা রাখি তা হলেই সে নাড়ী হয়ে ওঠে। এই বাহ্যিকতার নিষ্ঠা মানুষের দাসত্বের দীক্ষা। আত্মকর্তৃত্বের উপর নিষ্ঠা হারাবার এমন সাধনা আর নেই। এমন দেশে দেশ-উদ্ধারের নাম করে এল চরকা। ঘরে ঘরে বসে বসে চরকা ঘোরাচ্ছি আর মনে মনে বলছি, স্বরাজ-জগন্নাথের রথ এগিয়ে চলছে।

ঘোর পুরাতন কথাটাকে আজ নতুন করে বলতে হচ্ছে যে, স্বরাজের ভিত বাহ্য সাম্যের উপর নয়, অন্তরের ঐক্যের উপর। জীবিকার ক্ষেত্রে এই আন্তরিক ঐক্যের মস্ত একটা জায়গা আছে। বস্তুত ঐক্যটা বড়ো হতে গেলে জায়গাটা মস্ত হওয়াই চাই। কিন্তু, মানুষের সমগ্র জীবনযাত্রা থেকে তার একটিমাত্র ভগ্নাংশকে ছাড়িয়ে তারই উপর বিশেষ ঝোঁক দিলে সুতোও মিলবে, কাপড়ও মিলবে, কেবল মানুষের জীবনের সঙ্গে জীবনের মিল লক্ষের বাইরে পড়ে থাকবে।

ভারতবর্ষে ধর্মের ক্ষেত্রে সকলের মিল হওয়া সম্ভব নয়; আর রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সকলেই মিলবে এমন চর্চা এখানে কোনো দিন ছিল না, সবে এর আরম্ভ হয়েছে— সাধারণের মনকে সত্য ভাবে অধিকার করতে অনেক দেরি হবে। এইজন্যেই জীবিকার ভিতের উপরে একটা বড়ো মিলের পত্তন করবার দিকেই আমাদের মন দিতে হবে। জীবিকার ক্ষেত্র সবচেয়ে প্রশস্ত, এখানে ছোটো-বড়ো জ্ঞানী-অজ্ঞানী সকলেরই আহ্বান আছে— মরণেরই ডাকের মতো এ বিশ্বব্যাপী। এই ক্ষেত্র যদি রণক্ষেত্র না হয়— যদি প্রমাণ করতে পারি, এখানেও প্রতিযোগিতাই মানবশক্তির প্রধান সত্য নয়, সহযোগিতাই প্রধান সত্য— তা হলে রিপুর হাত থেকে, অশান্তির হাত থেকে মস্ত একটা রাজ্য আমরা অধিকার করে নিতে পারি। তা ছাড়া এ কথাও মনে রাখতে হবে, ভারতবর্ষে গ্রামসমাজে এই ক্ষেত্রে মেলবার চর্চা আমরা করেছি। সেই মিলনের সূত্র যদি বা ছিঁড়ে গিয়ে থাকে, তবু তাকে সহজে জোড়া দেওয়া চলে। কেননা আমাদের মনের স্বভাবটা অনেকটা তৈরি হয়ে আছে।

ব্যক্তিগত মানুষের পক্ষে যেমন জীবিকা, তেমনি বিশেষ দেশগত মানুষের পক্ষে তার রাষ্ট্রনীতি। দেশের লোকের বা দেশের রাষ্ট্রনায়কদের বিষয়বুদ্ধি এই রাষ্ট্রনীতিতে আত্মপ্রকাশ করে। বিষয়বুদ্ধি হচ্ছে ভেদবুদ্ধি। এপর্যন্ত এমনিই চলছে। বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্র একান্তভাবে স্বকীয় স্বার্থসাধনের যে আয়োজনে ব্যাপৃত সেই তার রাষ্ট্রনীতি। তার মিথ্যা দলিল আর অস্ত্রের বোঝা কেবলই ভারী হয়ে উঠছে। এই বোঝা বাড়াবার আয়োজনে পরস্পর পাল্লা দিয়ে চলেছে; এর আর শেষ নেই, জগতে শান্তি নেই। যেদিন মানুষ স্পষ্ট করে বুঝবে যে, সর্বজাতীয় রাষ্ট্রিক সমবায়েই প্রত্যেক জাতির প্রকৃত স্বার্থসাধন সম্ভব, কেননা পরস্পরনির্ভরতাই মানুষের ধর্ম, সেই দিনই রাষ্ট্রনীতিও বৃহৎভাবে মানুষের সত্যসাধনার ক্ষেত্র হবে। সেই দিনই সামাজিক মানুষ যে-সকল ধর্মনীতিকে সত্য বলে স্বীকার করে, রাষ্ট্রিক মানুষও তাকে স্বীকার করবে। অর্থাৎ, পরকে ঠকানো, পরের ধন চুরি, আত্মশ্লাঘার নিরবচ্ছিন্ন চর্চা, এগুলোকে কেবল পরমার্থের নয়, ঐক্যবদ্ধ মানুষের স্বার্থেরও অন্তরায় বলে জানবে। League of

Nations-এর প্রতিষ্ঠা হয়তো রাষ্ট্রনীতিতে অহমিকামুক্ত মনুষ্যত্বের আসন-প্রতিষ্ঠার প্রথম উদ্‌যোগ।

রাষ্ট্রনীতি যেমন একান্ত নেশন-স্বাতন্ত্র্যে, জীবিকাও তেমনি একান্ত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে আবদ্ধ। এখানে তাই এত প্রতিযোগিতা, ঈর্ষা, প্রতারণা, মানুষের এত হীনতা। কিন্তু, মানুষ যখন মানুষ তখন তার জীবিকাও কেবল শক্তিসাধনার ক্ষেত্র না হয়ে মনুষ্যত্বসাধনার ক্ষেত্র হয়, এইটেই উচিত ছিল। জীবিকার ক্ষেত্রেও মানুষ কেবল আপন অন্ন পাবে তা নয় আপন সত্য পাবে, এই তো চাই। কয়েক বছর পূর্বে যেদিন সমবায়মূলক জীবিকার কথা প্রথম শুনি, আমার মনে জটিল সমস্যার একটা গাঁঠ যেন অনেকটা খুলে গেল। মনে হল যে, জীবিকার ক্ষেত্রে স্বার্থের স্বাতন্ত্র্য মানুষের সত্যকে এতদিন অবজ্ঞা করে এসেছিল, সেখানে স্বার্থের সম্মিলন সত্যকে আজ প্রমাণ করবার ভার নিয়েছে। এই কথাই বোঝাতে বসেছে যে, দারিদ্র্য মানুষের অসম্মিলনে, ধন তার সাম্মলনে। সকল দিকেই মানবসভ্যতার এইটেই গোড়াকার সত্য— মনুষ্যলোকে এ সত্যের কোথাও সীমা থাকতে পারে, এ আমি বিশ্বাস করি নে।

জীবিকায় সমবায়তত্ত্ব এই কথা বলে যে, সত্যকে পেলেই মানুষের দৈন্য ঘোচে, কোনো একটা বাহ্য কর্মের প্রক্রিয়ায় ঘোচে না। এই কথায় মানুষ সম্মানিত হয়েছে। এই সমবায়তত্ত্ব একটা আইডিয়া, একটা আচার নয়; এইজন্য বহু কর্মধারা এর থেকে সৃষ্ট হতে পারে। মনের সঙ্গে পদে পদেই এর মুকাবিলা। ইংরাজি ভাষায় যাকে আঁধা গলি বলে, জীবিকাসাধনার পক্ষে এ সেরকম পথ নয়। বুঝেছিলুম, এই পথ দিয়ে কোনো-একটি বিশেষ আকারের অন্ন নয়, স্বয়ং অন্নপূর্ণা আসবেন, যাঁর মধ্যে অন্নের সকলপ্রকার রূপ এক সত্যে মিলেছে।

আমার কোনো কোনো আত্মীয় তখন সমবায়তত্ত্বকে কাজে খাটাবার আয়োজন করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় আমার মন আন্দোলিত হচ্ছিল, এমন সময় আয়র্লণ্ডের কবি ও কর্মবীর A. E. -রচিত Natoinal Being বইখানি আমার হাতে পড়ল। সমবায়জীবিকার একটা বৃহৎ বাস্তব রূপ স্পষ্ট চোখের সামনে দেখলুম। তার সার্থকতা যে কত বিচিত্র, মানুষের সমগ্র জীবনযাত্রাকে কেমন করে সে পূর্ণ করতে পারে, আমার কাছে তা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অন্নব্রহ্মও যে ব্রহ্ম, তাকে সত্য পন্থায় উপলব্ধি করলে মানুষ যে বড়ো সিদ্ধি পায়— অর্থাৎ কর্মের মধ্যে বুঝতে পারে যে, অন্যের সঙ্গে বিচ্ছেদেই তার বন্ধন, সহযোগেই তার মুক্তি— এই কথাটি আইরিশ কবি-সাধকের গ্রন্থে পরিস্ফুট।

নিশ্চয় অনেকে আমাকে বলবেন, এ-সব শক্ত কথা। সমবায়ের আইডিয়াটাকে

বৃহৎভাবে কাজে খাটানো অনেক চেষ্টায়, অনেক পরীক্ষায়, অনেক ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে গিয়ে তবে অনেক দিনে যদি সম্ভব হয়। কথাটা শক্ত বই-কি। কোনো বড়ো সামগ্রীই সস্তা দামে পাওয়া যায় না। দুর্লভ জিনিসের সুখসাধ্য পথকেই বলে ফাঁকির পথ। চরকায় স্বরাজ পাওয়া যায়, এ কথা অনেকে বলছেন, অনেকে বিশ্বাসও করছেন, কিন্তু যিনি স্পষ্ট করে বুঝেছেন এমন লোকের সঙ্গে আজও আমার দেখা হয় নি। কাজেই তর্ক চলে না; দেশে তর্ক চলছেও না, রাগারাগি চলছে। যাঁরা তর্কে নামেন তাঁরা হিসাব করে দেখিয়ে দেন, কত চরকায় কত পরিমাণ সুতো হয়, আর কত সুতোয় কতটা পরিমাণ খদ্দর হতে পারে। অর্থাৎ, তাঁদের হিসাব-মতে দেশে এতে কাপড়ের দৈন্য কিছু ঘুচবে। তা হলে গিয়ে ঠেকে দৈন্য দূর করার কথায়।

কিন্তু, দৈন্য জিনিসটা জটিল মিশ্র জিনিস। আর, এ জিনিসটার উৎপত্তির কারণ আছে আমাদের জ্ঞানের অভাবে, বুদ্ধির ত্রুটিতে, প্রথার দোষে ও চরিত্রের দুর্বলতায়। মানুষের সমস্ত জীবনযাত্রাকে এক করে ধরে তবে ভিতরে বাহিরে এর প্রতিকার করা যেতে পারে। কাজেই প্রশ্ন কঠিন হলে তার উত্তরটা সহজ হতে পারে না। যদি গোরা ফৌজ কামান বন্দুক দিয়ে আক্রমণ করে, তবে দিশি সেপাই তীর ধনুক দিয়ে তাদের ঠেকাতে পারে না। কেউ কেউ বলেছেন, কেন পারবে না। দেশসুদ্ধ লোক মিলে গোরাদের গায়ে যদি থুথু ফেলে তবে কামান বন্দুক সমেত তাদের ভাসিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এই থুথু-ফেলাকে বলা যেতে পারে দুঃখগম্য তীর্থের সুখসাধ্য পথ। আধুনিক কালের বিজ্ঞানাভিমানী যুদ্ধপ্রণালীর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশের পক্ষে এমন নিখুঁত অথচ সরল উপায় আর নেই, এ কথা মানি। আর এও না হয় আপাতত মেনে নেওয়া গেল যে, এই উপায়ে সরকারি থুৎকারপ্লাবনে গোরাদের ভাসিয়ে দেওয়া অসম্ভব নয়; তবু মানুষের চরিত্র যারা জানে তারা এটাও জানে যে তেত্রিশ কোটি লোক একসঙ্গে থুথু ফেলবেই না। দেশের দৈন্য-সমুদ্র সেঁচে ফেলবার উদ্দেশে চরকা-চালনা সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা চলে।

আয়র্লণ্ডে সার হরেস প্ল্যাঙ্কেট যখন সমবায়জীবিকা-প্রবর্তনে প্রথম লেগেছিলেন তখন কত বাধা কত ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে গিয়েছিলেন, কত নূতন নূতন পরীক্ষা তাঁকে করতে হয়েছিল; অবশেষে বহু চেষ্টার পরে সফলতার কিরকম শুরু হয়েছে National Being বই পড়লে তা বোঝা যাবে। আগুন ধরতে দেরি হয়, কিন্তু যখন ধরে তখন ছড়িয়ে যেতে বিলম্ব হয় না। শুধু তাই নয়, আসল সত্যের স্বরূপ এই যে, তাকে যে দেশের যে কোণেই পাওয়া ও প্রতিষ্ঠিত করা যায় সকল দেশেরই সমস্যা সে সমাধান করে। সার হরেস প্ল্যাঙ্কেট যখন আয়র্লণ্ডে সিদ্ধিলাভ করলেন তখন তিনি একই কালে

ভারতবর্ষের জন্যেও সিদ্ধিকে আবাহন করে আনলেন। এমনি করেই কোনো সাধক ভারতবর্ষের একটিমাত্র পল্লীতেও দৈন্য দূর করবার মূলগত উপায় যদি চালাতে পারেন, তা হলে তিনি তেত্রিশকোটি ভারতবাসীকেই চিরকালের সম্পদ দিয়ে যাবেন। আয়তন পরিমাপ করে যারা সত্যের যাথার্থ্য বিচার করে তারা সত্যকে বাহ্যিক ভাবে জড়ের সামিল করে দেখে; তারা জানে না যে, অতি ছোটো বীজের মধ্যেও যে প্রাণটুকু থাকে সমস্ত পৃথিবীকে অধিকার করবার পরোয়ানা সে নিয়ে আসে।

এইমাত্র আমার একজন বন্ধু বললেন যে, দেশের সাধারণ দৈন্যদূর বা স্বরাজলাভ বললে যতখানি বোঝায় তোমার মতে চরকায় সুতো কাটার লক্ষ ততদূর পর্যন্ত নাও যদি পৌঁছয়, তাতেই বা দোষ কী। চাষের কাজ যখন বন্ধ থাকে তখন চাষীর এবং গৃহকাজ প্রভৃতি সেরেও গৃহস্থর হাতে যে উপরি সময় বাকি থাকে, তাকে সকলে মিলে কোনো সর্বজনসাধ্য লাভবান কাজে লাগালে সাধারণের অবস্থার অনেক উন্নতি হতে পারে, দেশে চরকা চলিত করার এই শুভ ফলটুকুই ধরে নাও-না কেন। মনে আছে, এইজাতীয় আর-একটা কথা পূর্বে শুনেছিলুম। আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকেই ভাতের ফেন ফেলে দিয়ে থাকে। তার দ্বারা সমস্ত ভারত জুড়ে যে পুষ্টিকর খাদ্য নষ্ট হয়, তা সকলে মিলেই যদি রক্ষা করি তা হলে মোটের উপরে অনেকটা অন্নকষ্ট দূর হতে পারে। কথাটার মধ্যে সত্য আছে। ফেন-সমেত ভাত খেতে গেলে অভ্যস্ত রুচির কিছু বদল করা চাই, কিন্তু ফলের প্রতি লক্ষ করে দেখলে সেটা দুঃসাধ্য হওয়া উচিত নয়। এইরকম এমন আরো অনেক জিনিস আছে যাকে আমাদের দৈন্যলাঘব-উপায়ের তালিকার মধ্যে ধরা যেতে পারে। এ সম্বন্ধে যাঁরা যেটা ভালো বোঝেন চালাতে চেষ্টা করুন-না; তার কোনোটাতে ধন বাড়বে, কোনোটাতে তার সঙ্গে পুষ্টিও বাড়বে, কোনোটাতে কিছু পরিমাণে আলস্যদোষ কেটে যাবে। কিন্তু দেশে স্বরাজ-লাভের যে-একটা বিশেষ উদ্‌যোগ চলছে, দেশসুদ্ধ সকলে মিলে ভাতের ফেন না ফেলাকে তার একটা সর্বপ্রধান অঙ্গস্বরূপ করার কথা কারো তো মনেও হয় না। তার কি কোনো কারণ নেই। এ সম্বন্ধে আমার কথাটা পরিষ্কার করবার জন্যে ধর্মসাধনার দৃষ্টান্ত দিতে পারি। এই সাধন সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার উপলক্ষেই যদি বিশেষ জোর দিয়ে হাজারবার করে বলা হয় যে, যার-তার কুয়ো থেকে জল খেলে ধর্মভ্রষ্টতা ঘটে, তবে তার বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, এমন উপদেশে ধর্মসাধনার নৈতিক পন্থার মূল্য কমিয়ে দেওয়া হয়। যার-তার কুয়োতে মলিনতা থাকার আশঙ্কা আছে, সেই মলিনতায় স্বাস্থ্য ক্লিষ্ট হয়, স্বাস্থ্যের বিকারে চিত্তের বিকার ঘটে, সেই বিকারে ধর্মহানি হওয়ার আশঙ্কা আছে—এ-সব কথাই সত্য বলে মানলেও তবু বলতেই হবে, অপ্রধানকে

পরিমাণ-অতিরিক্ত মূল্য দিলে তাতে প্রধানের মূল্য কমে যায়। সেইজন্যেই আমাদের দেশে এমন অসংখ্য লোক আছে, মুসলমান যাদের কুয়ো থেকে জল তুলতে এলে মুসলমানকে মেরে খুন করতে যারা কুণ্ঠিত হয় না। ছোটোকে বড়োর সমান আসন দিলে সে সমান থাকে না, সে বড়োকে ছাড়িয়ে যায়। এইজন্যেই জলের শুচিতা-রক্ষার ধর্মবিধি মানুষের প্রাণহিংসা না করার ধর্মবিধিকে অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পেরেছে। আমাদের দেশে নিত্যধর্মের সঙ্গে আচারধর্মকে মিলিয়ে দেওয়ার দ্বারা এরকম দুর্গতি যে কত ঘটছে, তা বলে শেষ করা যায় না। আমাদের এই মজ্জাগত সনাতন অভ্যাসেরই জোরে আজ চরকা খদ্দর সর্বপ্রধান স্বারাজিক ধর্মকর্মের বেশে গদা হাতে বেড়াতে পারল, কেউ তাতে বিশেষ বিস্মিত হল না। এই প্রাধান্যের দ্বারাতেই সে অনিষ্ট করছে, আমাদের দেশের বহুযুগসঞ্চারী দুর্বলতার আর-একটা নতুন খাদ্য জুগিয়ে দিচ্ছে। এর পরে আর-একদিন আর-কোনো বলশালী ব্যক্তি হয়তো স্বারাজ্য-সিংহাসন থেকে প্রচার করবেন যে, ভাতের ফেন যে ফেলে দেয় সেই অন্নঘাতীকে মন্ত্রণাসভায় ঢুকতে দেব না। তাঁর যদি যথেষ্ট জোর থাকে এবং তাঁর শাসন যদি বেশি দিন চলে তবে আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে একদিন সাধুলোকে নিজেদের শুচিতারক্ষার জন্যে ভাতের ফেন-পাত উপলক্ষে মানুষের রক্তপাত করতে থাকবে। বিদেশী কাপড় পরায় অশুচিতা ঘটে এই নিষেধ যদি দেশের অধিকাংশ লোকে গ্রহণ করে, এবং অন্ন জল প্রভৃতি সম্বন্ধীয় অশুচিতা বোধের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সংস্কারগত হয়ে ওঠে, তা হলে সেদিন ইদের দিনে কলকাতায় যেরকম মাথা-ফাটাফাটি হয়েছে এ নিয়েও একদিন ম্লেচ্ছ ও অম্লেচ্ছদের মধ্যে তেমনি সাংঘাতিক দ্বন্দ্ব বেধে যাবে। যে আচারপরায়ণ সংস্কারের অন্ধতা থেকে আমাদের দেশে অস্পৃশ্যতারীতির উৎপত্তি সে অন্ধতাই আজ রাষ্ট্রিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়ে চরকা-খাদ্দরিক অস্পৃশ্যতা-তত্ত্ব জাগিয়ে তুলছে।

কেউ কেউ বলবেন, তুমি যে সমবায়জীবিকার কথা বলছ সকলে মিলে চরকা কাটাই তো তাই। আমি তা মানি না। সমস্ত হিন্দুসমাজে মিলে কুয়োর জলের শুচিতা রক্ষা করলেও সেটা জীবাণুতত্ত্বমূলক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান হয়ে ওঠে না ; ওটা একটা কর্ম, ওটা একটা সত্য নয়। এইজন্যেই কুয়োর জল যখন শুচি থাকছে পুকুরের জল তখন মলিন হচ্ছে, ঘরের কানাচের কাছে গর্তয় ডোবায় তখন রোগের বীজাণু অপ্রতিহত প্রভাবে যমরাজের শাসন প্রচার করছে। আমাদের দেশে কাসুন্দি তৈরি করবার সময় আমরা অত্যন্ত সাবধান হই— এই সাবধানতার মূলে প্যাস্ট্যর-আবিষ্কৃত তত্ত্ব আছে, কিন্তু যেহেতু তত্ত্বটা রোগের বীজাণুর মতোই অদৃশ্য আর বাহ্য কর্মটা পরিস্ফীত পিলেটারই মতো প্রকাণ্ড সেইজন্যেই এই কর্মপ্রণালীতে কেবলমাত্র কাসুন্দিই বাঁচছে,

মানুষ বাঁচছে না। একমাত্র কাসুন্দি তৈরি করবার বেলাতেই বিশ্বসুদ্ধ লোকে মিলে নিয়ম মানার মতোই, একমাত্র সুতো তৈরির বেলাতেই তেত্রিশ কোটি লোকে মিলে বিশেষ আচার রক্ষা। তাতে সুতো অনেক জমবে, কিন্তু যুগে যুগে যে অন্ধতা জমে উঠে আমাদের দারিদ্র্যকে গডবন্দী করে রেখেছে তার গায়ে হাত পড়বে না।

মহাত্মাজির সঙ্গে কোনো বিষয়ে আমার মতের বা কার্যপ্রণালীর ভিন্নতা আমার পক্ষে অত্যন্ত অরুচিকর। বড়ো করে দেখলে তাতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু তবু সব সময়ে মন মানে না। কেননা, যাঁকে প্রীতি করি, ভক্তি করি, তাঁর সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতার মতো আনন্দ আর কী হতে পারে। তাঁর মহৎ চরিত্র আমার কাছে পরম বিস্ময়ের বিষয়। ভারতের ভাগ্যবিধাতা তাঁর হাত দিয়ে একটি দীপ্যমান দুর্জয় দিব্যশক্তি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই শক্তি ভারতবাসীকে অভিভূত না করুক, বলশালী করুক; তাকে নিজের মন দিয়ে চিন্তা করতে, সংকল্প করতে, ত্যাগ করতে শিক্ষা দিক— এই আমার কামনা। যে কারণ ভিতরে থাকাতে রামমোহন রায়ের মতো অত বড়ো মনস্বীকেও মহাত্মা বামন বলতে কুণ্ঠিত হন নি— অথচ আমি সেই রামমোহনকে আধুনিক যুগের মহত্তম লোক বলেই জানি— সেই আভ্যন্তরিক মনঃপ্রকৃতিগত কারণই মহাত্মাজির কর্মবিধিতে এমন রূপ ধারণ করেছে যাকে আমার স্বধর্ম আপন বলে গ্রহণ করতে পারছে না। সেজন্যে আমার খেদ রয়ে গেল। কিন্তু, সাধনার বিচিত্র পথই বিধাতার অভিপ্রেত, নইলে প্রকৃতিভেদ জগতে কেন থাকবে। ব্যক্তিগত অনুরাগের টানে মহাত্মাজির কাছ থেকে চরকায় দীক্ষা নেবার প্রবল ইচ্ছা বারে বারে আমার মনে এসেছে। কিন্তু, আমার বুদ্ধিবিচারে চরকার যতটুকু মর্যাদা তার চেয়ে পাছে বেশি স্বীকার করা হয়, এই ভয়ে অনেক দ্বিধা করে নিরস্ত হয়েছি। মহাত্মাজি আমাকে ঠিক বুঝবেন জানি, এবং পূর্বেও বারবার আমার প্রতি যেমন ধৈর্য রক্ষা করেছেন আজও করবেন; আচার্য রায়মশায়ও জনাদরনিরপেক্ষ মতস্বাতন্ত্র্যকে শ্রদ্ধা করেন, অতএব মাঝে মাঝে বক্তৃতাসভায় যদিচ মুখে তিনি আমাকে অকস্মাৎ তাড়না করে উঠবেন, তবু অন্তরে আমার প্রতি নিষ্করুণ হবেন না। আর, যাঁরা আমার দেশের লোক, যাঁদের চিত্তস্রোত বেয়ে উপকার আর অপকার উভয়েরই কত স্মৃতি অতলের মধ্যে তলিয়ে গেল, তাঁরা আজ আমাকে যদি ক্ষমা না করেন কাল সমস্তই ভুলে যাবেন। আর যদিবা না ভোলেন, আমার কপালে তাঁদের হাতের লাঞ্ছনা যদি কোনোদিন নাও ঘোচে, তবে আজ যেমন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথকে লাঞ্ছনার সঙ্গী পেয়েছি কালও তেমনি হয়তো এমন কোনো কোনো স্বদেশের অনাদৃত লোককে পাব যাঁদের দীপ্তি দ্বারা লোকনিন্দা নিন্দিত হয়।

ভাদ্র ১৩৩২

স্বরাজসাধন

আমাদের দেশে বিজ্ঞ লোকেরা সংস্কৃত ভাষায় উপদেশ দিয়েছেন যে, যত খুশি কথায় বলো, লেখায় লিখো না। আমি এ উপদেশ মানি নি, তার ভূরি প্রমাণ আছে। কিছু পরিমাণে মেনেওছি, সে কেবল উত্তর লেখা সম্বন্ধে। আমার যা বলবার তা বলতে কসুর করি নে; কিন্তু বাদ যখন প্রতিবাদে পৌঁছয় তখন কলম বন্ধ করি। যতরকম লেখার বায়ু আছে ছন্দে এবং অছন্দে সকলেরই প্রভাব আমার উপর আছে— কেবল উত্তরবায়ুটাকে এড়িয়ে চলি।

মত বলে যে-একটা জিনিস আমাদের পেয়ে বসে সেটা অধিকাংশ স্থলেই বিশুদ্ধ যুক্তি দিয়ে গড়া নয়, তার মধ্যে অনেকটা অংশ আছে যেটাকে বলা যায় আমাদের মেজাজ। যুক্তি পেয়েছি বলে বিশ্বাস করি, সেটা অল্প ক্ষেত্রেই; বিশ্বাস করি বলেই যুক্তি জুটিয়ে আনি, সেইটেই অনেক ক্ষেত্রে। একমাত্র বৈজ্ঞানিক মতই খাঁটি প্রমাণের পথ দিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছয়; অন্য জাতের মতগুলো বারো আনাই রাগ-বিরাগের আকর্ষণে ব্যক্তিগত ইচ্ছার কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে।

এ কথাটা খুবই খাটে, যখন মতটা কোনো ফললোভের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর সেই লোভ যখন বহুসংখ্যক লোকের মনকে অধিকার করে। সেই বহু লোকের লোভকে উত্তেজিত করে তাদের তাড়া লাগিয়ে কোনো-একটা পথে প্রবৃত্ত করতে যুক্তির প্রয়োজন হয় না; কেবল পথটা খুব সহজ হওয়া চাই, আর চাই দ্রুত ফললাভের আশা। খুব সহজে এবং খুব শীঘ্র স্বরাজ পাওয়া যেতে পারে, এই কথাটা কিছুদিন থেকে দেশের মনকে মাতিয়ে রেখেছে। গণমনের এইরকম ঝোড়ো অবস্থায় এ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ উত্তর-প্রত্যুত্তর কেবলমাত্র বাগ্‌বিতণ্ডার সাইক্লোন আকার ধরে; সেই হাওয়ায় পাল তুলে দিয়ে কোনো মতকে কোনো বন্দরে পৌঁছিয়ে দেওয়া সহজ নয়। বহুকাল থেকে আমাদের ধারণা ছিল স্বরাজ পাওয়া দুর্লভ; এমন সময়ে যেই আমাদের কানে পৌঁছল যে, স্বরাজ পাওয়া খুবই সহজ এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই পাওয়া অসাধ্য নয় তখন এ সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতে বিচার করতে লোকের রুচি রইল না। তামার পয়সাকে সন্ন্যাসী সোনার মোহর করে দিতে পারে এ কথায় যারা মেতে ওঠে তারা বুদ্ধি নেই বলেই যে মাতে তা নয়, লোভে পড়ে বুদ্ধি খাটাতে ইচ্ছে করে না বলেই তাদের এত উত্তেজনা।

অল্প কিছুদিন হল, স্বরাজ হাতের কাছে এসে পৌঁচেছে বলে দেশের লোক বিচলিত হয়ে উঠেছিল। তার পরে মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে কথা উঠল, শর্ত পালন করা হয় নি

বলেই আমরা বঞ্চিত হয়েছি। এ কথা খুব অল্প লোকেই ভেবে দেখলেন যে, আমাদের সমস্যাই হচ্ছে শর্ত-প্রতিপালন নিয়ে। স্বরাজ পাবার শর্ত আমরা পালন করি নে বলেই স্বরাজ পাই নে, এ কথা তো স্বতঃসিদ্ধ। হিন্দু-মুসলমানে যদি আত্মীয়ভাবে মিলতে পারে তা হলে স্বরাজ পাবার একটা বড়ো ধাপ তৈরি হয়, কথাটা বলাই বাহুল্য। ঠেকছে ঐখানেই যে, হিন্দু মুসলমানের মিলন হল না; যদি মিলত তবে পাঁজিতে প্রতি বৎসরে যে ৩৬৫টা দিন আছে সব কটা দিনই হত শুভদিন। এ কথা সত্য যে, পাঁজিতে দিন স্থির করে দিলে নেশা লাগে, তাই বলে নেশা লাগলেই যে পথ সহজ হয় তা বলতে পারি নে।

পাঁজির নির্দিষ্ট দিন অনেক কাল হল ভেসে চলে গেছে, কিন্তু নেশা ছোটে নি। সেই নেশার বিষয়টা এই যে, স্বরাজিয়া সাধন হচ্ছে সহজিয়া সাধন। একটি বা দুটি সংকীর্ণ পথই তার পথ। সেই পথের অন্তর্গত হয়ে পড়েছে চরকা।

তা হলেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হয়, স্বরাজ জিনিসটা কী। আমাদের দেশনায়কেরা স্বরাজের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করেন নি। স্বাধীনতা শব্দটার মানে বিস্তৃত। নিজের চরকায় নিজের সুতো কাটার স্বাধীনতা আমাদের আছে। কাটি নে তার কারণ কলের সুতোর সঙ্গে সাধারণত চরকার সুতো পাল্লা রাখতে পারে না। হয়তো পারে, যদি ভারতের বহু কোটি লোক আপন বিনা মূল্যের অবসর-কাল সুতো কাটায় নিযুক্ত করে চরকার সুতোর মূল্য কমিয়ে দেয়। এটা যে সম্ভবপর নয় তার প্রমাণ এই যে, বাংলাদেশে যারা চরকার পক্ষে লেখনী চালাচ্ছেন তাঁরা অনেকেই চরকা চালাচ্ছেন না।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে, দেশে সকলে মিলে চরকা চালালে অর্থকষ্ট কিছু দূর হতে পারে। কিন্তু সেও স্বরাজ নয়। না হোক, সেটা অর্থ বটে তো। দারিদ্র্যের পক্ষে সেই বা কম কী। দেশের চাষীরা তাদের অবসরকাল বিনা উপার্জনে নষ্ট করে; তারা যদি সবাই সুতো কাটে তা হলে তাদের দৈন্য অনেকটা দূর হয়।

স্বীকার করে নেওয়া যাক, এও একটা বিশেষ সমস্যা বটে। চাষীদের উদ্‌বৃত্ত সময়টাকে কাজে লাগাতে হবে। কথাটা শুনতে যত সহজ তত সহজ নয়। এই সমস্যার সমাধানভার যদি নিতেই হয়, তবে এ সম্বন্ধে বুদ্ধির দুরূহ সাধনা দরকার। সংক্ষেপে বলে দিলেই হল না— ওরা চরকা কাটুক।

চাষী চাষ করা কাজের নিয়ত অভ্যাসের দ্বারা আপনার মনকে ও দেহকে একটা বিশেষ প্রবণতা দিয়েছে। চাষের পথই তার সহজ পথ। যখন সে চাষ করে তখনই সে কাজ করে, যখন চাষ করে না তখন কাজ করে না। কুঁড়ে বলে কাজ করে না,

এ অপবাদ তাকে দেওয়া অন্যায়। যদি সম্বৎসর তার চাষ চলতে পারত, তা হলে বছর ভরেই সে কাজ করত।

চাষ প্রভৃতি হাতের কাজের প্রকৃতিই এই যে, তাতে চালনার অভাবে মনকে নিশ্চেষ্ট করে দেয়। একটা চিরাভ্যস্ত কাজের থেকে আর-একটা ভিন্ন প্রকৃতির কাজে যেতে গেলেই মনের সক্রিয়তা চাই। কিন্তু চাষ প্রভৃতি মজুরির কাজ লাইন-বাঁধা কাজ। তা চলে ট্রামগাড়ির মতো। হাজার প্রয়োজন হলেও লাইনের বাইরে নতুন পথ তার পক্ষে সহজ নয়। চাষীকে চাষের বাইরে যে কাজ করতে বলা যায় তাতে তার মন ডিরেল্‌ড্‌ হয়ে যায়। তবু ঠেলেঠুলে তাকে হয়তো নড়ানো যেতে পারে, কিন্তু তাতে শক্তির বিস্তর অপব্যয় ঘটে।

বাংলাদেশের অন্তত দুই জেলার চাষীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। অভ্যাসের বাঁধন তাদের পক্ষে যে কত কঠিন তার অভিজ্ঞতা আমার আছে। এক জেলা এক-ফসলের দেশ। সেখানে ধান উৎপন্ন করতে চাষীরা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে। তার পরে তাদের ভিটের জমিতে তারা অবসরকালে সব্‌জি উৎপন্ন করতে পারত। উৎসাহ দিয়েছিলুম, ফল পাই নি। যারা ধান চাষের জন্য প্রাণপণ করতে পারে, তারা সব্‌জি চাষের জন্য একটুও নড়ে বসতে চায় না। ধানের লাইন থেকে সব্‌জির লাইনে তাদের মনকে ঠেলে তোলা কঠিন।

আর-এক জেলায় চাষী ধান পাট আখ সর্ষে প্রভৃতি সকলরকম চাষেই লেগে আছে। কিন্তু যে জমিতে এ-সব শস্য সহজে হয় না সে জমি তাদের বৃথা পড়ে থাকে, তার খাজনা বহন করে চলে। অথচ বৎসরে বৎসরে পশ্চিম অঞ্চল থেকে চাষী এসে এই জমিতেই তরমুজ খরমুজ কাঁকুড় প্রভৃতি ফলিয়ে যথেষ্ট লাভ করে নিয়ে দেশে ফিরে যায়। তবু স্থানীয় চাষী এই অনভ্যস্ত ফসল ফলিয়ে অবস্থার উন্নতি করতে বিমুখ। তাদের মন সরে না। যে চাষী পাটের ফলন করে তাকে স্বভাবত অলস বলে বদনাম দেওয়া চলে না। শুনেছি পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও কোথাও পাট উৎপন্ন করা কঠিন নয়, কিন্তু সেখানকার লোকেরা পাট প্রস্তুত করার দুঃসাধ্য দুঃখ বহন করতে নারাজ। বাংলাদেশে যে পাট একচেটে তার একমাত্র কারণ এখানকার জমিতে নয়, এখানকার চাষীতে। অথচ আমি দেখেছি, এই চাষীই তার বালুজমিতে তরমুজ ফলিয়ে লাভ করবার দৃষ্টান্ত বৎসর বৎসর স্বচক্ষে দেখাসত্ত্বেও এই অনভ্যস্ত পথে যেতে চায় না।

যখন কোনো-একটা সমস্যার কথা ভাবতে হয় তখন মানুষের মনকে কী করে এক পথ থেকে আর-এক পথে চালানো যায় সেই শক্ত কথাটা ভাবতে হয়, কোনো-একটা সহজ উপায় বাহ্যিকভাবে বাৎলিয়ে দিলেই যে কাজ হাসিল হয় তা বিশ্বাস করি নে—

মানুষের মনের সঙ্গে রফানিষ্পত্তি করাই হল গোড়ার কাজ। হিন্দু-মুসলমানের মিলন হোক, বাহিরের দিক থেকে এই পরোয়ানা জাহির করা কঠিন নয়। এই উপলক্ষে হিন্দুরা খিলাফৎ-আন্দোলনে যোগ দিতে পারে, কেননা সেরকম যোগ দেওয়া খুবই সহজ। এমন-কি নিজেদের আর্থিক সুবিধাও মুসলমানদের জন্য অনেক পরিমাণে ত্যাগ করতে পারে; সেটা দুরূহ সন্দেহ নেই, তবু 'এহ বাহ্য'। কিন্তু, হিন্দু-মুসলমানের মিলনের উদ্দেশে পরস্পরের মনের চিরাগত সংস্কারের পরিবর্তন করা সহজ নয়। সমস্যাটা সেইখানেই ঠেকেছে। হিন্দুর কাছে মুসলমান অশুচি, আর মুসলমানের কাছে হিন্দু কাফের— স্বরাজপ্রাপ্তির লোভেও এ কথাটা ভিতর থেকে উভয় পক্ষের কেউ ভুলতে পারে না। আমি একজন ইংরেজিনবিশের কথা জানতেম, হোটেলের খানার প্রতি তাঁর খুব লোভ ছিল। তিনি আর-সমস্তই রুচিপূর্বক আহার করতেন, কেবল গ্রেট-ঈস্টার্নের ভাতটা বাদ দিতেন; বলতেন, মুসলমানের রান্না ভাতটা কিছুতেই মুখে উঠতে চায় না। যে সংস্কারগত কারণে ভাত খেতে বাধে সেই সংস্কারগত কারণেই মুসলমানের সঙ্গে ভালো করে মিলতে তাঁর বাধবে। ধর্মনিয়মের আদেশ নিয়ে মনের যে-সকল অভ্যাস আমাদের অন্তর্নিহিত সেই অভ্যাসের মধ্যেই হিন্দুমুসলমান-বিরোধের দৃঢ়তা আপন সনাতন কেল্লা বেঁধে আছে; খিলাফতের আনুকূল্য বা আর্থিক ত্যাগ-স্বীকার সেই অন্দরে গিয়ে পৌঁছয় না।

আমাদের দেশের এই-সকল সমস্যা আন্তরিক বলেই এত দুরূহ। বাধা আমাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যেই আছে; সেটা দূর করবার কথা বললে আমাদের মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এই কারণে একটা অত্যন্ত সহজ বাহ্যিক প্রণালীর কথা শুনলেই আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। ঠিক পথে অর্থ-উপার্জনের বাধা যার অন্তরের মধ্যে আছে সেই ব্যক্তিই জুয়ো খেলে রাতারাতি বড়োমানুষ হবার দুরাশায় নিজের সর্বনাশ করতেও প্রস্তুত হয়।

চরকা কাটা স্বরাজ-সাধনার প্রধান অঙ্গ এ কথা যদি সাধারণে স্বীকার করে তবে মানতেই হয়, সাধারণের মতে স্বরাজটা একটা বাহ্য ফললাভ। এইজন্যই দেশের মঙ্গলসাধনে আত্মপ্রভাবের যে-সকল চরিত্রগত ও সামাজিক প্রথাগত বাধা আছে সেই প্রধান বিষয় থেকে আমাদের মনকে সরিয়ে এনে চরকা-চালনার উপরে তাকে অত্যন্ত নিবিষ্ট করলে লোকে বিস্মিত হয় না, বরঞ্চ আরাম পায়। এমন অবস্থায় ধরেই নেওয়া যাক যে. চাষীরা তাদের অবসরকাল যদি লাভবান কাজে লাগায় তা হলে আমাদের স্বরাজ-লাভের একটা প্রধান অন্তরায় দূর হতে পারে; ধরেই নেওয়া যাক, এই বাহ্যিক ব্যাপারটাই আমাদের দেশে সবচেয়ে আজ পরম চিন্তনীয়।

২৪।২৭

তা হলে দেশনায়কদের ভাবতে হবে, চাষীদের অবকাশকালকে সম্যক্‌রূপে কী উপায়ে খাটানো যেতে পারে। বলা বাহুল্য, চাষের কাজে খাটাতে পারলেই ঠিক রাস্তাটা পাওয়া যায়। আমার যদি কঠিন দৈন্যসংকট ঘটে তবে আমার পরামর্শদাতা হিতৈষীকে এই কথাই সর্বাগ্রে চিন্তা করতে হবে যে, আমি দীর্ঘকাল ধরে সাহিত্যরচনাতেই অভ্যস্ত। বাগ্‌ব্যবসায়ের প্রতি তাঁর যতই অশ্রদ্ধা থাক্‌, আমার উপকার করতে চাইলে এ কথা তিনি উড়িয়ে দিতে পারবেন না। তিনি হয়তো হিসাব খতিয়ে আমাকে স্পষ্ট দেখিয়ে দিতে পারেন যে, ছাত্রদের জন্যে কলেজ-পাড়ায় যদি চায়ের দোকান খুলি তা হলে শতকরা ৭৫ টাকা হারে মুনফা হতে পারে। হিসাব থেকে মানুষের মনটাকে বাদ দিলে লাভের অঙ্কটাকে খুব বড়ো করে দেখানো সহজ। চায়ের দোকান করতে গিয়ে আমি যে নিজেকে সর্বস্বান্ত করতে পারি তার কারণ এ নয় যে, সুযোগ্য চাওয়ালার মতো আমার বুদ্ধি নেই, তার কারণ চাওয়ালার মতো আমার মন নেই। অতএব হিতৈষী বন্ধু যদি আমাকে ডিটেক্‌টিভ গল্প লিখতে বা স্কুলকলেজ-পাঠ্য বিষয়ের নোট লিখতে বলেন, তবে নিতান্ত দায়ে ঠেকলে হয়তো সেটা চেষ্টা দেখতে পারি। আমার বিশ্বাস, চায়ের দোকান খোলার চেয়ে তাতে আমার সর্বনাশের সম্ভাবনা কম হবে। লাভের কথায় যদিবা সন্দেহ থাকে, অন্তত এ কথাটা নিশ্চিত যে, সাহিত্যিকের মনটাকে কাব্যের লাইন থেকে ডিটেক্‌টিভ গল্পের লাইনে সুইচ করে দেওয়া দুঃসাধ্য নয়।

চিরজীবন ধরে চাষীর দেহমনের যে শিক্ষা ও অভ্যাস হয়েছে তার থেকে তাকে অকস্মাৎ ঠেলে ফেলে দিয়ে তাকে সুখী বা ধনী করা সহজ নয়। পূর্বেই বলেছি, মনের চর্চা যাদের কম গোঁড়ামি তাদের বেশি, সামান্য পরিমাণ নূতনত্বেও তাদের বাধে। নিজের প্ল্যানের অত্যন্ত সহজত্বের প্রতি অনুরাগ-বশত মনস্তত্ত্বের এই নিয়মটা গায়ের জোরে লঙ্ঘন করবার চেষ্টা করলে তাতে মনস্তত্ত্ব অবিচলিত থাকবে, প্ল্যানটা জখম হবে।

চাষীকে চাষের পথে উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে চরিতার্থ করবার চেষ্টা অন্যান্য কোনো কোনো কৃষিক্ষেত্রবহুল দেশে চলেছে। সে-সব জায়গায় বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি খাটিয়ে মানুষ চাষের বিস্তর উন্নতি করেছে। আমাদের দেশের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, তারা তাদের জমি থেকে আমাদের চেয়ে দ্বিগুণ চারগুণ বেশি ফসল আদায় করছে। এই জ্ঞানালোকিত পথ সহজ পথ নয়, সত্য পথ। এই পথ-আবিষ্কারে মনুষ্যত্বের প্রমাণ হয়। চাষের উৎকর্ষ-উদ্ভাবনের দ্বারা চাষীর উদ্যমকে ষোলো-আনা খাটাবার চেষ্টা না করে তাকে চরকা ঘোরাতে বলা শক্তিহীনতার পরিচয়। আমরা চাষীকে অলস বলে দোষ দিই, কিন্তু তার অবস্থার উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে আমরা যখন তাকে চরকা ধরতে পরামর্শ দিই তখন সেটাতে আমাদেরই মানসিক আলস্যের প্রমাণ হয়।

এতক্ষণ এই যা আলোচনা করা গেল এটা এই মনে করেই করেছি যে, সুতো ও খদ্দর বহুল পরিমাণে দেশে উৎপন্ন হলে তাতে একদল শ্রমিকের অর্থকষ্ট দূর হবে। কিন্তু, সেও মেনে-নেওয়া কথা। এ সম্বন্ধে যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা সন্দেহ প্রকাশ করেও থাকেন ; আমার মতো আনাড়ির সে তর্কে প্রবেশ করে কাজ নেই। আমার নালিশ এই যে, চরকার সঙ্গে স্বরাজকে জড়িত করে স্বরাজ সম্বন্ধে দেশের জনসাধারণের বুদ্ধিকে ঘুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

দেশের কল্যাণ বলতে যে কতখানি বোঝায় তার ধারণা আমাদের সুস্পষ্ট হওয়া চাই। এই ধারণাকে অত্যন্ত বাহ্যিক ও অত্যন্ত সংকীর্ণ করার দ্বারা আমাদের শক্তিকে ছোটো করে দেওয়া হয়। আমাদের মনের উপর দাবি কমিয়ে দিলে অলস মন নির্জীব হয়ে পড়ে। দেশের কল্যাণসাধনায় চরকাকে প্রধান স্থান দেওয়া অবমানিত মনকে নিশ্চেষ্ট করে তোলবার উপায়। দেশের কল্যাণের একটা বিশ্বরূপ মনের সম্মুখে উজ্জ্বল করে রাখলে, দেশের লোকের শক্তির বিচিত্র ধারা সেই অভিমুখে চলবার পথ সমস্ত হৃদয় ও বুদ্ধিশক্তির দ্বারা খনন করতে পারে। সেই রূপটিকে যদি ছোটো করি আমাদের সাধনাকেও ছোটো করা হবে। পৃথিবীতে যারা দেশের জন্যে, মানুষের জন্যে দুঃসাধ্য ত্যাগস্বীকার করেছে তারা দেশের বা মানুষের কল্যাণছবিকে উজ্জ্বল আলোয় বিরাটরূপে ধ্যাননেত্রে দেখেছে। মানুষের ত্যাগকে যদি চাই তবে তার সেই ধ্যানের সহায়তা করা দরকার। বহুল পরিমাণ সুতো ও খদ্দরের ছবি দেশের কল্যাণের বড়ো ছবি নয়। এ হল হিসাবি লোকের ছবি. এতে সেই প্রকাণ্ড বেহিসাবি শক্তিকে জাগিয়ে দিতে পারে না যা বৃহতের উপলব্ধিজনিত আনন্দে কেবল যে দুঃখকে মৃত্যুকেও স্বীকার করতে প্রস্তুত হয় তা নয়, লোকের প্রত্যাখ্যান ও ব্যর্থতাকেও গ্রাহ্য করে না।

শিশু আনন্দের সঙ্গে ভাষা শিক্ষা করে। কেননা সে আপন বাপের মুখে মায়ের মুখে সর্বদাই ভাষার সমগ্র রূপটা দেখতে পায়। যখন সে স্পষ্ট করে বুঝতেও পারে না, তখনও এইটেই তাকে কেবলই আকর্ষণ করে। তাই এই প্রকাশের পূর্ণতা লাভের জন্য নিয়তই তার একটি আনন্দময় চেষ্টা জেগে থাকে। শিশুর মনকে বেষ্টন করে যদি এই পরিপূর্ণ ভাষা সর্বদা বিরাজ না করত, যদি তার চার দিকে কেবলই ঘুরতে থাকত মুগ্ধবোধব্যাকরণের সূত্র, তা হলে বেতের চোটে কাঁদিয়ে তাকে মাতৃভাষা শেখাতে হত, এবং তাও শিখতে লাগত বহু দীর্ঘকাল।

এই কারণে আমি মনে করি, দেশকে যদি স্বরাজসাধনায় সত্য ভাবে দীক্ষিত করতে চাই তা হলে সেই স্বরাজের সমগ্র মূর্তি প্রত্যক্ষগোচর করে তোলবার চেষ্টা করতে হবে। অল্পকালেই সেই মূর্তির আয়তন যে খুব বড়ো হবে এ কথা বলি নে ; কিন্তু তা

সম্পূর্ণ হবে, সত্য হবে, এ দাবি করা চাই। প্রাণবিশিষ্ট জিনিসের পরিণতি প্রথম থেকেই সমগ্রতার পথ ধরে চলে। তা যদি না হত তা হলে শিশু প্রথমে কেবল পায়ের বুড়ো আঙুল হয়ে জন্মাত; তার পরে সেটা ধীরে ধীরে হত হাঁটু পর্যন্ত পা; তার পরে ১৫।২০ বছরে সমগ্র মানবদেহটা দেখা দিত। শিশুর মধ্যে সমগ্রতার আদর্শ প্রথম থেকেই আছে, তাই তার মধ্যে আমরা এত আনন্দ পাই। সেই আনন্দে তাকে মানুষ করে তোলবার কঠিন দুঃখও মা-বাপ স্বীকার করতে পারে। নইলে যদি একখানা আজানু পা নিয়েই তাদের চার-পাঁচ বছর কাটাতে হত, তা হলে সেই আংশিকের দাসত্ব তাদের পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠত।

স্বরাজকে যদি প্রথমে দীর্ঘকাল কেবল চরকার সুতো আকারেই দেখতে থাকি তা হলে আমাদের সেই দশাই হবে। এইরকম অন্ধ সাধনায় মহাত্মার মতো লোক হয়তো কিছুদিনের মতো আমাদের দেশের একদল লোককে প্রবৃত্ত করতেও পারেন, কারণ তাঁর ব্যক্তিগত মাহাত্ম্যের ’পরে তাদের শ্রদ্ধা আছে। এইজন্যে তাঁর আদেশ পালন করাকেই অনেকে ফললাভ বলে গণ্য করে। আমি মনে করি, এরকম মতি স্বরাজ-লাভের পক্ষে অনুকূল নয়।

স্বদেশের দায়িত্বকে কেবল সুতো কাটায় নয়, সম্যক্‌ ভাবে গ্রহণ করবার সাধনা ছোটো ছোটো আকারে দেশের নানা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করা আমি অত্যাবশ্যক মনে করি। সাধারণের মঙ্গল জিনিসটা অনেকগুলি ব্যাপারের সমবায়। তারা পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাদের একটাকে পৃথক করে নিলে ফল পাওয়া যায় না। স্বাস্থ্যের সঙ্গে, বুদ্ধির সঙ্গে, জ্ঞানের সঙ্গে, কর্মের সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারলে তবেই মানুষের সব ভালো পূর্ণ ভালো হয়ে ওঠে। স্বদেশের সেই ভালোর রূপটিকে আমরা চোখে দেখতে চাই। সহস্র উপদেশের চেয়ে তাতে আমরা কাজ পাব। বিশেষ বিশেষ লোকালয়ে সাধারণের কল্যাণসাধনের দায়িত্ব প্রত্যেকে কোনো না কোনো আকারে গ্রহণ করে একটি সুস্থ জ্ঞানবান শ্রীসম্পন্ন সম্মিলিত প্রাণযাত্রার রূপকে জাগিয়ে তুলেছে, এমন-সকল দৃষ্টান্ত চোখের সামনে ধরা দরকার। নইলে স্বরাজ কাকে বলে সে আমরা সুতো কেটে, খদ্দর প’রে, কথার উপদেশ শুনে কিছুতেই বোঝাতে পারব না। যে জিনিসটাকে সমস্ত ভারতবর্ষে পেতে চাই ভারতবর্ষের কোনো-একটা ক্ষুদ্র অংশে তাকে যদি স্পষ্ট করে দেখা যায়, তা হলে সার্থকতার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জন্মাবে। তা হলে আত্মপ্রভাবের যে কী মূল্য তা বুঝতে পারব; ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন, বুঝব তার সাক্ষাৎ দর্শনের দ্বারা। ভারতবর্ষের একটিমাত্র গ্রামের লোকও যদি আত্মশক্তির দ্বারা সমস্ত গ্রামকে সম্পূর্ণ আপন করতে পারে তা হলেই স্বদেশকে স্বদেশরূপে লাভ করবার

কাজ সেইখানেই আরম্ভ হবে। জীবজন্তু স্থানবিশেষে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু জন্মগ্রহণের দ্বারাই দেশ তার হয় না। মানুষ আপন দেশকে আপনি সৃষ্টি করে। সেই সৃষ্টির কাজে ও রক্ষণের কাজে দেশের লোকের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হয়, আর সেই সৃষ্টি-করা দেশকে তারা প্রাণের চেয়ে ভালোবাসতে পারে। আমাদের দেশের মানুষ দেশে জন্মাচ্ছে মাত্র, দেশকে সৃষ্টি করে তুলছে না ; এইজন্যে তাদের পরস্পর মিলনের কোনো গভীর উপলক্ষ নেই, দেশের অনিষ্টে তাদের প্রত্যেকের অনিষ্টবোধ জাগে না। দেশকে সৃষ্টি করার দ্বারাই দেশকে লাভ করবার সাধনা আমাদের ধরিয়ে দিতে হবে। সেই সৃষ্টির বিচিত্র কর্মে মানুষের বিচিত্র শক্তির প্রয়োজন। নানা পথে এক লক্ষ্য -অভিমুখে সেই বিচিত্র শক্তির প্রয়োগের দ্বারাই আমরা আপনাকে দেশের মধ্যে উপলব্ধি করি। এই দেশসৃষ্টির সাধনা কাছের থেকে আরম্ভ করে ক্রমে দূরে প্রসারিত করলে তবেই আমরা ফল পাব। যদি এইরকম উদ্‌যোগকে আমরা আয়তনে ছোটো বলে অবজ্ঞা করি তবে গীতার সেই কথাটা যেন মনে আনি— স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। সত্যের জোর আয়তনে নয়, তার আপনাতেই।

সম্মিলিত আত্মকর্তৃত্বের চর্চা, তার পরিচয়, তার সম্বন্ধে গৌরববোধ জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হলে তবেই সেই পাকা ভিত্তির উপর স্বরাজ সত্য হয়ে উঠতে পারে। যখন গ্রামে গ্রামে অন্তরে বাহিরে তার অভাব— আর সেই অভাবই যখন দেশের লোকের অন্নের অভাব, শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব, জ্ঞানের অভাব, আনন্দের অভাবের মূল হয়ে উঠেছে, তখন দেশের জনসংঘের এই চিত্তদৈন্যকে ছাড়িয়ে উঠে কোনো বাহ্য অনুষ্ঠানের জোরে এ দেশে স্বরাজ কায়েম হতে পারে, এ কথা একেবারেই অশ্রদ্ধেয়। ইংরেজিতে একটা কথা আছে, সিদ্ধিই সিদ্ধিকে টানে— তেমনি স্বরাজই স্বরাজকে আবাহন করে আনে। বিশ্বে বিধাতার যে অধিকার আছে সেই হচ্ছে তাঁর স্বরাজ, অর্থাৎ বিশ্বকে সৃষ্টি করবার অধিকার। আমাদেরও স্বরাজ হচ্ছে সেই ঐশ্বর্য, অর্থাৎ আপন দেশকে আপনি সৃষ্টি করে তোলবার অধিকার। সৃষ্টি করার দ্বারাই তার প্রমাণ হয়, এবং তার উৎকর্ষসাধন হয়। বেঁচে থাকবার দ্বারাই প্রমাণ হয় যে আমার প্রাণ আছে। কেউ কেউ হয়তো বলতেও পারেন যে, সুতো কাটাও সৃষ্টি। তা নয়। তার কারণ, চরকায় মানুষ চরকারই অঙ্গ হয় ; অর্থাৎ যেটা কল দিয়ে করা যেত সে সেইটেই করে। সে ঘোরায়। কল জিনিসটা মনোহীন বলেই সে একা, নিজের বাইরে তার কিছুই নেই। তেমনি যে মানুষ সুতো কাটছে সেও একলা ; তার চরকার সূত্র অন্য কারো সঙ্গে তার অবশ্যযোগের সূত্র নয়। তার প্রতিবেশী কেউ যে আছে, এ কথা তার জানবার কোনো দরকারই নেই। রেশমের পলু যেমন একান্তভাবে নিজের চার দিকে রেশমের

সুতো বোনে, তারও কাজ সেইরকম। সে যন্ত্র, সে নিঃসঙ্গ, সে বিচ্ছিন্ন। কন্‌গ্রেসের কোনো মেম্বর যখন সুতো কাটেন তখন সেই সঙ্গে দেশের ইকনমিক্‌স্‌-স্বর্গের ধ্যান করতেও পারেন, কিন্তু এই ধ্যানমন্ত্রের দীক্ষা তিনি অন্য উপায়ে পেয়েছেন— চরকার মধ্যেই এই মন্ত্রের বীজ নেই। কিন্তু, যে মানুষ গ্রাম থেকে মারী দূর করবার উদ্‌যোগ করছে তাকে যদি বা দুর্ভাগ্যক্রমে সম্পূর্ণ একলাও কাজ করতে হয়, তবু তার কাজের আদিতে ও অন্তে সমস্ত গ্রামের চিন্তা নিবিড়ভাবে যুক্ত। এই কাজের দ্বারাই নিজের মধ্যে সমগ্র গ্রামকে সে উপলব্ধি করে। গ্রামেরই সৃষ্টিতে তার সজ্ঞান আনন্দ। তারই কাজে স্বরাজসাধনার সত্যকার আরম্ভ বটে। তার পরে সেই কাজে যদি সমস্ত গ্রামের লোক পরস্পর যোগ দেয় তা হলেই বুঝব, গ্রাম নিজেকে নিজে সৃষ্টি করার দ্বারাই নিজেকে নিজে যথার্থরূপে লাভ করবার দিকে এগোচ্ছে। এই লাভ করাকেই বলে স্বরাজলাভ। পরিমাণ হিসেবে কম হলেও সত্য হিসাবে কম নয়। অর্থাৎ শতকরা একশোর হারে লাভ না হলেও হয়তো শতকরা একের হারে লাভ; এই লাভই শতকরা একশোর সগোত্র, এমন-কি সহোদর ভাই। যে গ্রামের লোক পরস্পরের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অন্ন-উপার্জনে আনন্দবিধানে সমগ্রভাবে সম্মিলিত হয়েছে সেই গ্রামই সমস্ত ভারতবর্ষের স্বরাজলাভের পথে প্রদীপ জ্বেলেছে। তার পরে একটা দীপের থেকে আর-একটা দীপের শিখা জ্বালানো কঠিন হবে না; স্বরাজ নিজেই নিজেকে অগ্রসর করতে থাকবে, চরকার যান্ত্রিক প্রদক্ষিণপথে নয়, প্রাণের আত্মপ্রবৃত্ত সমগ্রবৃদ্ধির পথে।

আশ্বিন ১৩৩২

রায়তের কথা

শ্রীমান প্রমথনাথ চৌধুরী কল্যাণীয়েষু

আমাদের শাস্ত্রে বলে, সংসারটা ঊর্ধ্বমূল অবাক্‌শাখ। উপরের দিক থেকে এর শুরু, নীচে এসে ডালপালা ছড়িয়েছে; অর্থাৎ নিজের জোরে দাঁড়িয়ে নেই, উপরের থেকে ঝুলছে। তোমার 'রায়তের কথা' পড়ে আমার মনে হল যে, আমাদের পলিটিক্‌স্‌ও সেই জাতের। কন্‌গ্রেসের প্রথম উৎপত্তিকালে দেখা গেল, এই জিনিসটি শিকড় মেলেছে উপরওয়ালাদের উপর মহলে— কি আহার কি আশ্রয় উভয়েরই জন্যে এর অবলম্বন সেই ঊর্ধ্বলোকে।

যাঁদের আমরা ভদ্রলোক বলে থাকি তাঁরা স্থির করেছিলেন যে, রাজপুরুষে ও

ভদ্রলোকে মিলে ভারতের রাজগদি ভাগাভাগি করে নেওয়াই পলিটিক্স্‌। সেই পলিটিক্সে যুদ্ধবিগ্রহ সন্ধিশান্তি উভয় ব্যাপারই বক্তৃতামঞ্চে ও খবরের কাগজে, তার অস্ত্র বিশুদ্ধ ইংরাজি ভাষা— কখনও অনুনয়ের করুণ কাকলি, কখনও বা কৃত্রিম কোপের উত্তপ্ত উদ্দীপনা। আর দেশে যখন এই প্রগল্‌ভ বাগ্‌বাত্যা বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বস্তরে বিচিত্র বাষ্পলীলা-রচনায় নিযুক্ত তখন দেশের যারা মাটির মানুষ তারা সনাতন নিয়মে জন্মাচ্ছে মরছে, চাষ করছে, কাপড় বুনছে, নিজের রক্তে মাংসে সর্বপ্রকার শ্বাপদ-মানুষের আহার জোগাচ্ছে, যে দেবতা তাদের ছোঁয়া লাগলে অশুচি হন মন্দিরপ্রাঙ্গণের বাইরে সেই দেবতাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করছে, মাতৃভাষায় কাঁদছে হাসছে, আর মাথার উপর অপমানের মুষলধারা নিয়ে কপালে করাঘাত করে বলছে 'অদৃষ্ট'। দেশের সেই পোলিটিশান্‌ আর দেশের সর্বসাধারণ, উভয়ের মধ্যে অসীম দূরত্ব।

সেই পলিটিক্স্‌ আজ মুখ ফিরিয়েছে, অভিমানিনী যেমন করে বল্লভের কাছ থেকে মুখ ফেরায়। বলছে, কালো মেঘ আর হেরব না গো দূতী। তখন ছিল পূর্বরাগ ও অভিসার, এখন চলছে মান এবং বিচ্ছেদ। পালা বদল হয়েছে, কিন্তু লীলা বদল হয় নি। কাল যেমন জোরে বলেছিলেম 'চাই', আজ তেমনি জোরেই বলছি 'চাই নে'। সেই সঙ্গে এই কথা যোগ করেছি বটে যে, পল্লীবাসী জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি করাতে চাই। অর্থাৎ, এরাই আমার আপন, ওরা আমার পর। কিন্তু 'চাই নে' 'চাই নে' বলবার হুহুংকারেই গলার জোর গায়ের জোর চুকিয়ে দিই। তার সঙ্গে যেটুকু 'চাই' জুড়ি তার আওয়াজ বড়ো মিহি। যে অছিলাতেই অর্থ কিছু সংগ্রহ করি ভদ্রসমাজের পোলিটিকাল্‌ বারোয়ারি জমিয়ে তুলতেই তা ফুরিয়ে যায়, তার পরে অর্থ গেলে শব্দ যেটুকু বাকি থাকে সেটুকু থাকে পল্লীর হিতের জন্যে। অর্থাৎ, আমাদের আধুনিক পলিটিক্সের শুরু থেকেই আমরা নির্‌গুণ দেশপ্রেমের চর্চা করেছি দেশের মানুষকে বাদ দিয়ে।

এই নিরুপাধিক প্রেমচর্চার অর্থ যাঁরা জোগান তাঁদের কারো বা আছে জমিদারি, কারো বা আছে কারখানা ; আর শব্দ যাঁরা জোগান তাঁরা আইনব্যবসায়ী। এর মধ্যে পল্লীবাসী কোনো জায়গাতেই নেই ; অর্থাৎ আমরা যাকে দেশ বলি সেই প্রতাপাদিত্যের প্রেতলোকে তারা থাকে না। তারা অত্যন্ত প্রতাপহীন— কি শব্দসম্বলে কি অর্থ-সম্বলে। যদি দেওয়ানি অবাধ্যতা চলত তা হলে তাদের ডাকতে হত বটে, সে কেবল খাজনা বন্ধ করে মরবার জন্যে। আর, যাদের অন্ন-ভক্ষ্য-ধনুর্‌গুণ তাদের এখনও মাঝে মাঝে ডাক পাড়া হয় দোকান বন্ধ করে হরতাল করবার জন্যে, উপরওয়ালাদের কাছে আমাদের পোলিটিকাল বাঁকা ভঙ্গীটাকে অত্যন্ত তেড়া করে দেখাবার উদ্দেশ্যে।

এই কারণেই রায়তের কথাটা মুলতবিই থেকে যায়। আগে পাতা হোক সিংহাসন, গড়া হোক মুকুট, খাড়া হোক রাজদণ্ড, ম্যাঞ্চেস্টার পরুক কোপ্‌নি— তার পর সময় পাওয়া যাবে রায়তের কথা পাড়বার। অর্থাৎ, দেশের পলিটিক্‌স্‌ আগে, দেশের মানুষ পরে। তাই শুরুতেই পলিটিক্‌সের সাজ-ফর্মাশের ধুম পড়ে গেছে। সুবিধা এই যে, মাপ নেবার জন্যে কোনো সজীব মানুষের দরকার নেই। অন্য দেশের মানুষ নিজের দেহের বহর ও আবহাওয়ার প্রতি দৃষ্টি রেখে বার বার কেটে-ছেঁটে বদলে জুড়ে যে সাজ বানিয়েছে ঠিক সেই নমুনাটা দর্জির দোকানে চালান করলেই হবে। সাজের নামও জানি— একেবারে কেতাবের পাতা থেকে সদ্য-মুখস্থ— কেননা, আমাদের কারখানা-ঘরে নাম আগে, রূপ পরে। ডিমোক্রেসি, পার্লেমেণ্ট্‌, কানাডা অস্ট্রেলিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকার রাষ্ট্রতন্ত্র ইত্যাদি, এর সমস্তই আমরা চোখ বুজে কল্পনা করতে পারি; কেননা গায়ের মাপ নেবার জন্যে মানুষকে সামনে রাখবার বালাই একেবারেই নেই। এই সুবিধাটুকু নিষ্কণ্টকে ভোগ করবার জন্যেই বলে থাকি, আগে স্বরাজ, তার পরে স্বরাজ যাদের জন্যে তারা। পৃথিবীতে অন্য সব জায়গাতেই দেশের মানুষ নিজের প্রকৃতি শক্তি ও প্রয়োজনের স্বাভাবিক প্রবর্তনায় আপনিই আপনার স্বরাজ গড়ে তুলেছে; জগতে আমরাই কেবল পঞ্জিকার কোনো-একটি আসন্ন পয়লা জানুয়ারিতে আগে স্বরাজ পাব, তার পরে স্বরাজ্যের লোক ডেকে যেমন করে হোক সেটাকে তাদের গায়ে চাপিয়ে দেব। ইতিমধ্যে ম্যালেরিয়া আছে, মারী আছে, দুর্ভিক্ষ আছে, মহাজন আছে, জমিদার আছে, পুলিসের পেয়াদা আছে, গলায়-ফাঁস-লাগানো মেয়ের বিয়ে, মায়ের শ্রাদ্ধ, সহস্রবাহু সমাজের ট্যাক্‌সো, আর আছে ওকালতির দংষ্ট্রাকরাল সর্বস্বলোলুপ আদালত।

এই-সব কারণে আমাদের পলিটিক্‌সে তোমার 'রায়তের কথা' স্থানকালপাত্রোচিত হয়েছে কি না সন্দেহ করি। তুমি ঘোড়ার সামনের দিকে গাড়ি জোৎবার আয়োজনে যোগ দিচ্ছ না; শুধু তাই নয়, ঘোড়াটাকে জোৎবার উদ্‌যোগ বন্ধ রেখে খবর নিতে চাও সে দানা পেলে কি না, ওর দম কতটুকু বাকি। তোমার মন্ত্রণাদাতা বন্ধুদের মধ্যে এমন-কি কেউ নেই যে তোমাকে বলতে পারে— আগে গাড়ি টানাও, তা হলেই অমুক শুভ লগ্নে গম্যস্থানে পৌঁছবই; তার পরে পৌঁছবা মাত্রই যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে খবর নেবার জন্যে যে, ঘোড়াটা সচল না অচল, বেঁচে আছে না মরেছে। তোমার জানা উচিত ছিল, হাল আমলের পলিটিক্‌সে টাইম্‌টেব্‌ল্‌ তৈরি, তোরঙ্গ গুছিয়ে গাড়িতে চড়ে বসাই প্রধান কর্তব্য। অবশেষে গাড়িটা কোনো জায়গাতেই পৌঁছয় না বটে, কিন্তু সেটা টাইম্‌টেব্‌লের দোষ নয়; ঘোড়াটা চললেই হিসেব ঠিক মিলে যেত। তুমি তার্কিক; এতবড়ো উৎসাহে বাধা দিয়ে বলতে চাও, ঘোড়াটা যে চলে না বহুকাল

থেকে সেইটেই গোড়াকার সমস্যা। তুমি সাবেক ফ্যাশানের সাবধানী মানুষ, আস্তাবলের খবরটা আগে চাও। এ দিকে হাল ফ্যাশানের উৎসাহী মানুষ কোচ্‌বাক্সে চড়ে বসে অস্থিরভাবে পা ঘষছে ; ঘরে আগুন লাগার উপমা দিয়ে সে বলছে, অতি শীঘ্র পৌঁছনো চাই, এইটেই একমাত্র জরুরি কথা। অতএব ঘোড়ার খবর নেওয়া নিছক সময় নষ্ট করা। সব আগে দরকার গাড়িতে চড়ে বসা। তোমার 'রায়তের কথা' সেই ঘোড়ার কথা, যাকে বলা যেতে পারে গোড়ার কথা।

২

কিন্তু ভাবনার কথা এই যে, বর্তমান কালে একদল জোয়ান মানুষ রায়তের দিকে মন দিতে শুরু করেছেন। সব আগে তাঁরা হাতের গুলি পাকাচ্ছেন। বোঝা যাচ্ছে, তাঁরা বিদেশে কোথাও একটা নজির পেয়েছেন। আমাদের মন যখন অত্যন্ত আড়ম্বরে স্বাদেশিক হয়ে ওঠে তখনও দেখা যায়, সেই আড়ম্বরের সমস্ত মালমসলার গায়ে ছাপ মারা আছে 'Made in Europe'। য়ুরোপে প্রকৃতিগত ও অবস্থাগত কারণের স্বাভাবিক বেগে মানুষ সোশ্যালিজ্‌ম্‌, কম্যুনিজ্‌ম্‌, সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্‌ প্রভৃতি নানাপ্রকার সামাজিক পরিবর্তনের পরখ করছে। কিন্তু আমরা যখন বলি, রায়তের ভালো করব, তখন য়ুরোপের বাঁধি বুলি ছাড়া আমাদের মুখে বুলি বেরোয় না। এবার পূর্ববঙ্গে গিয়ে দেখে এলুম, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুশাঙ্কুরের মতো ক্ষণভঙ্গুর সাহিত্য গজিয়ে উঠছে। তারা সব ছোটো ছোটো এক-একটি রক্তপাতের ধ্বজা। বলছে, পিষে ফেলো, দলে ফেলো ; অর্থাৎ ধরণী নির্জমিদার নির্মহাজন হোক। যেন জবর্দস্তির দ্বারা পাপ যায়, যেন অন্ধকারকে লাঠি মারলে সে মরে। এ কেমন, যেন বৌয়ের দল বলছে, শাশুড়িগুলোকে গুণ্ডা লাগিয়ে গঙ্গাযাত্রা করাও, তা হলেই বধূরা নিরাপদ হবে। ভুলে যায় যে, মরা শাশুড়ির ভূত ঘাড়ে চেপে তাদের শাশুড়িতর শাশুড়িতম করে তুলতে দেরি করে না। আমাদের দেশের শাস্ত্রে বলে, বাইরের থেকে আত্মহত্যা করে ম'লেই ভববন্ধন ছেদন করা যায় না— স্বভাবের ভিতর থেকে বন্ধনের মূলচ্ছেদ করতে হয়। য়ুরোপের স্বভাবটা মারমুখো। পাপকে ভিতর থেকে মারতে সময় লাগে— তাদের সে তর সয় না, তারা বাইরে থেকে মানুষকে মারে।

একদিন ইংরেজের নকল করে আমাদের ছেঁড়া পলিটিক্‌স্‌ নিয়ে পার্লামেন্টীয় রাজনীতির পুতুলখেলা খেলতে বসেছিলেম। তার কারণ, সেদিন পলিটিক্‌সের আদর্শটাই য়ুরোপের অন্য সব-কিছুর চেয়ে আমাদের কাছে প্রত্যক্ষগোচর ছিল।

তখন য়ুরোপীয় যে সাহিত্য আমাদের মন দখল করেছে তার মধ্যে মাট্‌সিনি

গারিবাল্‌ডির সুরটাই ছিল প্রধান। এখন সেখানে নাট্যের পালা বদল হয়েছে। লঙ্কাকাণ্ডে ছিল রাজবীরের জয়, ছিল দানবের হাত থেকে সীতার মুক্তির কথা। উত্তরকাণ্ডে আছে দুর্মুখের জয়, রাজার মাথা হেঁট, প্রজার মন জোগাবার তাগিদে রাজরানীকে বিসর্জন। যুদ্ধের দিনে ছিল রাজার মহিমা, এখন এল প্রজার মহিমা। তখন গান চলছিল, বাহিরের বিরুদ্ধে ঘরের জয়; এখনকার গান, ইমারতের বিরুদ্ধে আঙিনার জয়। ইদানিং পশ্চিমে বলশেভিজ্‌ম্‌ ফাসিজ্‌ম্‌ প্রভৃতি যে-সব উদ্‌যোগ দেখা দিয়েছে আমরা যে তার কার্যকারণ তার আকার-প্রকার সুস্পষ্ট বুঝি তা নয়; কেবল মোটের উপর বুঝেছি যে, গুণ্ডাতন্ত্রের আখড়া জমল। অমনি আমাদের নকল-নিপুণ মন গুণ্ডামিটাকেই সবচেয়ে বড়ো করে দেখতে বসেছে। বরাহ-অবতার পঙ্ক-নিমগ্ন ধরাতলকে দাঁতের ঠেলায় উপরে তুলেছিলেন, এরা তুলতে চায় লাঠির ঠেলায়। এ কথা ভাববার অবকাশও নেই সাহসও নেই যে, গোঁয়ার্তমির দ্বারা উপর ও নীচের অসামঞ্জস্য ঘোচে না। অসামঞ্জস্যের কারণ মানুষের চিত্তবৃত্তির মধ্যে। সেইজন্যেই আজকের দিনের নীচের থাকটাকে উপরে তুলে দিলে, কালকের দিনের উপরের থাকটা নীচের দিকে পূর্বের মতোই চাপ লাগাবে। রাশিয়ার জার-তন্ত্র ও বল্‌শেভিক-তন্ত্র একই দানবের পাশমোড়া দেওয়া। পূর্বে যে ফোড়াটা বাঁ হাতে ছিল আজ সেটাকে ডান হাতে চালান করে দিয়ে যদি তাণ্ডবনৃত্য করা যায়, তা হলে সেটাকে বলতেই হবে পাগলামি। যাদের রক্তের তেজ বেশি, এক-এক সময়ে মাথায় বিপরীত রক্ত চড়ে গিয়ে তাদের পাগলামি দেখা দেয়— কিন্তু সেই দেখাদেখি নকল পাগলামি চেপে বসে অন্য লোকের, যাদের রক্তের জোর কম; তাকেই বলে হিস্‌টিরিয়া। আজ তাই যখন শুনে এলুম সাহিত্যে ইশারা চলছে, মহাজনকে লাগাও বাড়ি, জমিদারকে ফেলো পিষে, তখনি বুঝতে পারলুম, এই লালমুখো বুলির উৎপত্তি এদের নিজের রক্তের থেকে নয়। এ হচ্ছে বাঙালির অসাধারণ নকলনৈপুণ্যের নাট্য, ম্যাজেণ্টা রঙে ছোবানো। এর আছে উপরে হাত পা ছোঁড়া, ভিতরে চিত্তহীনতা।

৩

আমি নিজে জমিদার, এইজন্য হঠাৎ মনে হতে পারে, আমি বুঝি নিজের আসন বাঁচাতে চাই। যদি চাই তা হলে দোষ দেওয়া যায় না— ওটা মানবস্বভাব। যারা সেই অধিকার কাড়তে চায় তাদের যে বুদ্ধি, যারা সেই অধিকার রাখতে চায় তাদেরও সেই বুদ্ধি; অর্থাৎ কোনোটাই ঠিক ধর্মবুদ্ধি নয়, ওকে বিষয়বুদ্ধি বলা যেতে পারে। আজ যারা কাড়তে চায় যদি তাদের চেষ্টা সফল হয় তবে কাল তারাই বনবিড়াল হয়ে উঠবে।

হয়তো শিকারের বিষয়-পরিবর্তন হবে, কিন্তু দাঁত-নখের ব্যবহারটা কিছুমাত্র বৈষ্ণব ধরণের হবে না। আজ অধিকার কাড়বার বেলা তারা যে-সব উচ্চ-অঙ্গের কথা বলে তাতে বোঝা যায় তাদের 'নামে রুচি' আছে, কিন্তু কাল যখন 'জীবে দয়া'র দিন আসবে তখন দেখব আমিষের প্রতি জিহ্বার লেলিহান চাঞ্চল্য। কারণ, নামটা হচ্ছে মুখে আর লোভটা হচ্ছে মনে। অতএব, দেশের চিত্তবৃত্তির মাটিতে আজ যে জমিদার দেখা দিয়েছে সে যদি নিছক কাঁটাগাছই হয়, তা হলে তাকে দ'লে ফেললেও সেই মরা গাছের সারে দ্বিতীয় দফা কাঁটাগাছের শ্রীবৃদ্ধিই ঘটবে। কারণ, মাটিবদল হল না তো।

আমার জন্মগত পেশা জমিদারি, কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আসমানদারি। এই কারণেই জমিদারির জমি আঁকড়ে থাকতে আমার অন্তরের প্রবৃত্তি নেই। এই জিনিসটার 'পরে আমার শ্রদ্ধার একান্ত অভাব। আমি জানি জমিদার জমির জোঁক; সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব। আমরা পরিশ্রম না করে, উপার্জন না করে, কোনো যথার্থ দায়িত্ব গ্রহণ না করে ঐশ্বর্যভোগের দ্বারা দেহকে অপটু ও চিত্তকে অলস করে তুলি। যারা বীর্যের দ্বারা বিলাসের অধিকার লাভ করে আমরা সে জাতির মানুষ নই। প্রজারা আমাদের অন্ন জোগায় আর আমলারা আমাদের মুখে অন্ন তুলে দেয়— এর মধ্যে পৌরুষও নেই, গৌরবও নেই। নিজেকে ছোটো হাতের মাপে রাজা বলে কল্পনা করবার একটা অভিমান আছে বটে। 'রায়তের কথা'য় পুরাতন দপ্তর ঘেঁটে তুমি সেই সুখস্বপ্নেও বাদ সাধতে বসেছ। তুমি প্রমাণ করতে চাও যে, আমরা ইংরেজ-রাজসরকারের পুরুষানুক্রমিক গোমস্তা। আমরা এ দিকে রাজার নিমক খাচ্ছি— রায়তদের বলছি 'প্রজা', তারা আমাদের বলছে 'রাজা'— মস্ত একটা ফাঁকির মধ্যে আছি। এমন জমিদারি ছেড়ে দিলেই তো হয়। কিন্তু, কাকে ছেড়ে দেব। অন্য এক জমিদারকে? গোলাম-চোর খেলার গোলাম যাকেই গতিয়ে দিই, তার দ্বারা গোলাম-চোরকে ঠেকানো হয় না। প্রজাকে ছেড়ে দেব? তখন দেখতে দেখতে এক বড়ো জমিদারের জায়গায় দশ ছোটো জমিদার গজিয়ে উঠবে। রক্তপিপাসায় বড়ো জোঁকের চেয়ে ছিনে জোঁকের প্রবৃত্তির কোনো পার্থক্য আছে তা বলতে পারি নে। তুমি বলেছ, জমি চাষ করে যে জমি তারই হওয়া উচিত। কেমন করে তা হবে। জমি যদি পণ্যদ্রব্য হয়, যদি তার হস্তান্তরে বাধা না থাকে? এ কথা মোটের উপর বলা চলে যে, বই তারই হওয়া উচিত যে মানুষ বই পড়ে। যে মানুষ পড়ে না অথচ সাজিয়ে রেখে দেয়, বইয়ের সদ্ব্যবহারীকে সে বঞ্চিত করে। কিন্তু, বই যদি পটোলডাঙার দোকানে বিক্রি করতে কোনো বাধা না থাকে তা হলে যার বইয়ের শেল্‌ফ্‌ আছে, বুদ্ধি বিদ্যা নেই, সে যে বই কিনবে না এমন ব্যবস্থা কী করে করা যায়। সংসারে বইয়ের শেল্‌ফ্‌ বুদ্ধির চেয়ে অনেক সুলভ ও প্রচুর।

এই কারণে অধিকাংশ বইয়ের গতি হয় শেল্‌ফের থাকে, বুদ্ধিমানের ডেস্কে নয়। সরস্বতীর বরপুত্র যে ছবি রচনা করে লক্ষ্মীর বরপুত্র তাকে দখল করে বসে। অধিকার আছে ব'লে নয়, ব্যাঙ্কে টাকা আছে ব'লে। যাদের মেজাজ কড়া, সম্বল কম, এ অবস্থায় তারা খাপ্পা হয়ে ওঠে। বলে, মারো টাকাওয়ালাকে, কাড়ো ছবি। কিন্তু চিত্রকরের পেটের দায় যতদিন আছে, ছবি যতদিন বাজারে আসতে বাধ্য, ততদিন লক্ষ্মীমানের ঘরের দিকে ছবির টান কেউ ঠেকাতে পারবে না।

৪

জমি যদি খোলা বাজারে বিক্রি হয়ই তা হলে যে ব্যক্তি স্বয়ং চাষ করে তার কেনবার সম্ভাবনা অল্পই ; যে লোক চাষ করে না কিন্তু যার আছে টাকা, অধিকাংশ বিক্রয়যোগ্য জমি তার হাতে পড়বেই। জমির বিক্রয়ের সংখ্যা কালে কালে ক্রমেই যে বেড়ে যাবে, এ কথাও সত্য। কারণ, উত্তরাধিকারসূত্রে জমি যতই খণ্ড খণ্ড হতে থাকবে, চাষীর সাংসারিক অভাবের পক্ষে সে জমি ততই অল্প-স্বল্প হবেই ; কাজেই অভাবের তাড়ায় খরিদ-বিক্রি বেড়ে চলবে। এমনি করে ছোটো ছোটো জমিগুলি স্থানীয় মহাজনের বড়ো বড়ো বেড়াজালের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে ধরা পড়ে। তার ফলে জাঁতার দুই পাথরের মাঝখানে গোটা রায়ত আর বাকি থাকে না। একা জমিদারের আমলে জমিতে রায়তের যেটুকু অধিকার, জমিদার-মহাজনের দ্বন্দ্ব-সমাসে তা আর টেঁকে না। আমার অনেক রায়তকে এই চরম অকিঞ্চনতা থেকে আমি নিজে রক্ষা করেছি জমি-হস্তান্তরের বাধার উপর জোর দিয়ে। মহাজনকে বঞ্চিত করি নি, কিন্তু তাকে রফা করতে বাধ্য করেছি। যাদের সম্বন্ধে তা করা একেবারে অসম্ভব হয়েছে, তাদের কান্না আমার দরবার থেকে বিধাতার দরবারে গেছে। পরলোকে তারা কোনো খেসারত পাবে কি না সে তত্ত্ব এই প্রবন্ধে আলোচ্য নয়।

নীলচাষের আমলে নীলকর যখন ঋণের ফাঁসে ফেলে প্রজার জমি আত্মসাৎ করবার চেষ্টায় ছিল তখন জমিদার রায়তকে বাঁচিয়েছে। নিষেধ-আইনের বাঁধ যদি সেদিন না থাকত তা হলে নীলের বন্যায় রায়তি জমি ডুবে একাকার হত। মনে করো, আজ কোনো কারণে বাংলার উৎপন্ন ফসলের প্রতি যদি মাড়োয়ারি দখল-স্থাপনের উদ্দেশে ক্রমশ প্রজার জমি ছিনিয়ে নিতে ইচ্ছা করে, তা হলে অতি সহজেই সমস্ত বাংলা তারা ঘানির পাকে ঘুরিয়ে তার সমস্ত তেল নিংড়ে নিতে পারে। এমন মৎলব এদের কারো মাথায় যে কোনো দিন আসে নি, তা মনে করবার হেতু নেই। যে-সব ব্যবসায়ে এরা আজ নিযুক্ত আছে তার মুনফায় বিঘ্ন ঘটলেই আবদ্ধ মূলধন এই-সব খাতের

সন্ধান খুঁজবেই। এখন কথা হচ্ছে, ঘরের দিকে বেনো জল ঢোকাবার অনুকূল খাল-খনন কি রায়তের পক্ষে ভালো। মূল কথাটা এই— রায়তের বুদ্ধি নেই, বিদ্যা নেই, শক্তি নেই, আর ধনস্থানে শনি। তারা কোনোমতে নিজেকে রক্ষা করতে জানে না। তাদের মধ্যে যারা জানে তাদের মতো ভয়ংকর জীব আর নেই। রায়ত-খাদক রায়তের ক্ষুধা যে কত সর্বনেশে তার পরিচয় আমার জানা আছে। তারা যে প্রণালীর ভিতর দিয়ে স্ফীত হতে হতে জমিদার হয়ে ওঠে, তার মধ্যে শয়তানের সকল শ্রেণীর অনুচরেরই জটলা দেখতে পাবে। জাল, জালিয়াতি, মিথ্যা-মকদ্দমা, ঘর-জ্বালানো, ফসল-তছরূপ— কোনো বিভীষিকায় তাদের সংকোচ নেই। জেলখানায় যাওয়ার মধ্য দিয়ে তাদের শিক্ষা পাকা হয়ে উঠতে থাকে। আমেরিকায় যেমন শুনতে পাই ছোটো ছোটো ব্যাবসাকে গিলে ফেলে বড়ো বড়ো ব্যাবসা দানবাকার হয়ে ওঠে, তেমনি করেই দুর্বল রায়তের ছোটো ছোটো জমি ছলে বলে কৌশলে আত্মসাৎ করে প্রবল রায়ত ক্রমে জমিদার হয়ে উঠতে থাকে। এরা প্রথম অবস্থায় নিজে জমি চাষ করেছে, নিজের গোরুর গাড়িতে মাল তুলে হাটে বেচে এসেছে, স্বাভাবিক চতুরতা ছাড়া অন্য চাষীর সঙ্গে এদের কোনো প্রভেদ ছিল না। কিন্তু, যেমনি জমির পরিধি বাড়তে থাকে অমনি হাতের লাঙল খসে গিয়ে গদার আবির্ভাব হয়। পেটের প্রত্যন্তসীমা প্রসারিত হতে থাকে, পিঠের দিকে লাগে তাকিয়া, মুলুকের মিথ্যা মকদ্দমা-পরিচালনার কাজে পসার জমে, আর তার দাবরাব-তর্জন-গর্জন-শাসন-শোষণের সীমা থাকে না। বড়ো বড়ো জালের ফাঁক বড়ো, ছোটো মাছ তার ভিতর দিয়ে পালাবার পথ পায় ; কিন্তু ছোটো ছোটো জালে চুনোপুঁটি সমস্তই ছাঁকা পড়ে— এই চুনোপুঁটির ঝাঁক নিয়েই রায়ত।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, প্রতিকূল আইনটাকেই নিজের অনুকূল করে নেওয়াই মকদ্দমার জুজুৎসু খেলা। আইনের যে আঘাত মারতে আসে সেই আঘাতের দ্বারাই উলটিয়ে মারা ওকালতি-কুস্তির মারাত্মক প্যাঁচ। এই কাজে বড়ো বড়ো পালোয়ান নিযুক্ত আছে। অতএব রায়ত যতদিন বুদ্ধি ও অর্থের তহবিলে সম্পন্ন হয়ে না ওঠে ততদিন 'উচল' আইনও তার পক্ষে 'অগাধ জলে' পড়বার উপায় হবে।

এ কথা বলতে ইচ্ছা করে না, শুনতেও ভালো লাগে না যে, জমি সম্বন্ধে রায়তের স্বাধীন ব্যবহারে বাধা দেওয়া কর্তব্য। এক দিক থেকে দেখতে গেলে ষোলো-আনা স্বাধীনতার মধ্যে আত্ম-অপকারের স্বাধীনতাও আছে। কিন্তু ততবড়ো স্বাধীনতার অধিকার তারই যার শিশুবুদ্ধি নয়। যে রাস্তায় সর্বদা মোটর-চলাচল হয় সে রাস্তায় সাবালক মানুষকে চলতে বাধা দিলে সেটাকে বলা যায় জুলুম ; কিন্তু অত্যন্ত নাবালককে যদি কোনো বাধা না দিই তবে তাকে বলে অবিবেচনা। আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা

তাতে বলতে পারি, আমাদের দেশে মূঢ় রায়তদের জমি অবাধে হস্তান্তর করবার অধিকার দেওয়া আত্মহত্যার অধিকার দেওয়া। এক সময়ে সেই অধিকার তাদের দিতেই হবে, কিন্তু এখন দিলে কি সেই অধিকারের কিছু বাকি থাকবে। তোমার লেখার মধ্যে এই অংশে আমার মনে যে সংশয় আছে তা বললেম।

৫

আমি জানি, জমিদার নির্লোভ নয়। তাই রায়তের যেখানে কিছু বাধা আছে জমিদারের আয়ের জালে সেখানে মাছ বেশি আটক পড়ে। আমাদের দেশে মেয়ের বিবাহের সীমা সংকীর্ণ, সেই বাধাটাই বরপক্ষের আয়ের উপায়। এও তেমনি। কিন্তু দেখতে দেখতে চাষীর জমি সরে সরে মহাজনের হাতে পড়লে আখেরে তাতে জমিদারের লোকসান আছে বলে আনন্দ করবার কোনো হেতু নেই। চাষীর পক্ষে জমিদারের মুষ্টির চেয়ে মহাজনের মুষ্টি অনেক বেশি কড়া— যদি তাও না মান এটা মানতে হবে, সেটা আর-একটা উপ্‌রি মুষ্টি।

রায়তের জমিতে জমাবৃদ্ধি হওয়া উচিত নয়, এ কথা খুব সত্য। রাজসরকারের সঙ্গে দেনা-পাওনায় জমিদারের রাজস্ববৃদ্ধি নেই, অথচ রায়তের স্থিতিস্থাপক জমায় কমা সেমিকোলন চলবে, কোথাও দাঁড়ি পড়বে না, এটা ন্যায়বিরুদ্ধ। তা ছাড়া এই ব্যবস্থাটা জমির উন্নতিসাধন সম্বন্ধে স্বাভাবিক উৎসাহের একটা মস্ত বাধা ; সুতরাং কেবল চাষী নয়, সমস্ত দেশের পক্ষে এটাতে অকল্যাণ। তা ছাড়া গাছ কাটা, বাসস্থান পাকা করা, পুষ্করিণীখনন প্রভৃতির অন্তরায়গুলো কোনো মতেই সমর্থন করা চলে না।

কিন্তু এসব গেল খুচরো কথা। আসল কথা, যে মানুষ নিজেকে বাঁচাতে জানে না কোনো আইন তাকে বাঁচাতে পারে না। নিজেকে এই-যে বাঁচাবার শক্তি তা জীবনযাত্রার সমগ্রতার মধ্যে, কোনো-একটা খাপছাড়া প্রণালীতে নয়। তা বিশেষ আইনে নয়, চরকায় নয়, খদ্দরে নয়, কন্‌গ্রেসে ভোট দেবার চার-আনা ক্রীত অধিকারে নয়। পল্লীর মধ্যে সমগ্রভাবে প্রাণসঞ্চার হলে তবেই সেই প্রাণের সম্পূর্ণতা নিজেকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করবার শক্তি নিজের ভিতর থেকেই উদ্ভাবন করতে পারবে।

কেমন করে সেটা হবে সেই তত্ত্বটাই কাজে ও কথায় কিছুকাল থেকে ভাবছি। ভালো জবাব দিয়ে যেতে পারব কি না জানি নে— জবাব তৈরি হয়ে উঠতে সময় লাগে। তবু আমি পারি বা না পারি, এই মোটা জবাবটাই খুঁজে বের করতে হবে। সমস্ত খুচরো প্রশ্নের সমাধান এরই মধ্যে। নইলে তালি দিতে দিতে দিন বয়ে যাবে ; যার জন্যে এত জোড়াতাড়া সে ততকাল পর্যন্ত টিঁকবে কি না সন্দেহ।

আষাঢ় ১৩৩৩

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

আমাদের দেশে যাঁরা সত্যের ব্রত গ্রহণ করবার অধিকারী এবং সেই ব্রতকে প্রাণ দিয়ে যাঁরা পালন করবার শক্তি রাখেন তাঁদের সংখ্যা অল্প বলেই দেশের এত দুর্গতি। এমন চিত্তদৈন্য যেখানে, সেখানে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মতো অতবড়ো বীরের এমন মৃত্যু যে কতদূর শোকাবহ তার বর্ণনায় প্রয়োজন নেই। এর মধ্যে একটি কথা এই আছে যে, তাঁর মৃত্যু যতই শোচনীয় হোক, সে মৃত্যুতে তাঁর প্রাণ তাঁর চরিত্র ততই মহীয়ান হয়েছে। বারে বারে ইতিহাসে দেখা যায়, নিজের সমস্ত দিয়ে যাঁরা কল্যাণ-ব্রতকে গ্রহণ করেছেন অপমান ও অপমৃত্যু তাঁদের ললাটে জয়তিলক এমনি করেই এঁকেছে। মহাপুরুষরা আসেন প্রাণকে মৃত্যুর উপরেও জয়ী করতে, সত্যকে জীবনের সামগ্রী করে তুলতে। আমাদের খাদ্যদ্রব্যে প্রাণ দেবার যা উপকরণ রয়েছে তা বায়ুতে আছে, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারেও আছে। কিন্তু, যতক্ষণ তা উদ্ভিদে প্রাণীতে জৈব আকার না ধারণ করে ততক্ষণ প্রাণের পুষ্টি হয় না। সত্য সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। শুধুমাত্র বাক্যের হাওয়া থেকে আকর্ষণ করে নিয়ে তাকে জীবনগত করবার শক্তি ক'জনারই বা আছে। সত্যকে জানে অনেক লোকে, তাকে মানে সেই মানুষ যে বিশেষ শক্তিমান; প্রাণ দিয়ে তাকে মানার দ্বারাই সত্যকে আমরা সকল মানুষের করে দিই। এই মানতে পারার শক্তিটাই মস্ত জিনিস। এই শক্তির সম্পদ যাঁরা সমাজকে দেন তাঁদের দান মহামূল্য; সত্যের প্রতি সেই নিষ্ঠার আদর্শ শ্রদ্ধানন্দ এই দুর্বল দেশকে দিয়ে গেছেন। তাঁর সাধনা-পরিচয়ের উপযোগী যে নাম তিনি গ্রহণ করেছিলেন সেই নাম তাঁর সার্থক। সত্যকে তিনি শ্রদ্ধা করেছেন। এই শ্রদ্ধার মধ্যে সৃষ্টিশক্তি আছে। সেই শক্তির দ্বারা তাঁর সাধনাকে রূপমূর্তি দিয়ে তাকে তিনি সজীব করে গেছেন। তাই তাঁর মৃত্যুও আলোকের মতো হয়ে উঠে তাঁর শ্রদ্ধার সেই ভয়হীন ক্ষয়হীন ক্লান্তিহীন অমৃতচ্ছবিকে উজ্জ্বল করে প্রকাশ করেছে। সত্যের প্রতি শ্রদ্ধার এই ভূমানন্দকে তাঁর চরিত্রের মধ্যে আজ আমরা যেন সার্থক আকারে দেখতে পারি। এই সার্থকতা বাহ্য ফলে নয়, নিজেরই অকৃত্রিম বাস্তবতায়।

অপঘাতের এই-যে আঘাত শুধু মহাপুরুষেরাই একে সহ্য করতে পারেন, শুধু তাঁদের পক্ষেই এর কোনো অর্থ নেই। যাঁরা মরণকে ক্ষুদ্র স্বার্থের ঊর্ধ্বে তুলতে পেরেছেন জীবন থাকতেই তাঁরা অমৃতলোকে উত্তীর্ণ। কিন্তু, মৃত্যুর গুপ্তচর তো শ্রদ্ধানন্দের আয়ু হরণ করেই ফিরে যাবে না। ধর্মবিদ্রোহী ধর্মান্ধতার কাঁধে চড়ে রক্ত-কলুষিত যে বীভৎসতাকে নগরের পথে পথে সে বিস্তার করেছিল অনতিকাল পূর্বেই, সে

তো আমরা দেখেছি। সে যাদের নষ্ট করেছে তাদের তো কিছুই অবশেষ থাকে নি। তাদের মৃত্যু যে নিরতিশয় মৃত্যু, তাদের ক্ষতি যে চরম ক্ষতি।

তাদের ঘরে সন্তানহীন মাতার ক্রন্দনে সান্ত্বনা নেই, বিধবার দুঃখে শান্তি নেই। এই-যে নিষ্ঠুরতা যা সমস্তকে নিঃশেষে চিতাভস্মে সমাধা করে, তাকে তো সহ্য করতে পারা যায় না। দুর্বল স্বল্পপ্রাণ যারা, যাদের জনসাধারণ বলি, তারা এতবড়ো হিংসার বোঝা বইবে কী করে। এখন দেখতে পাচ্ছি, আবার যমরাজের সিংহদ্বার উদ্‌ঘাটিত হল, আবার প্রতিবেশীতে প্রতিবেশীতে হত্যার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হল। এর দুঃখ সইবে কে।

বিধাতা যখন দুঃখকে আমাদের কাছে পাঠান তখন সে একটি প্রশ্ন নিয়ে আসে। সে আমাদের জিজ্ঞাসা করে, তোমরা আমাকে কী ভাবে গ্রহণ করবে। বিপদ আসবে না এমন হতে পারে না— সংকটের সময় উপস্থিত হয়, আশু উদ্ধারের উপায় থাকে না, কিন্তু, কী ভাবে বিপদকে আমরা ব্যবহার করি তারই উপরে প্রশ্নের সদুত্তর নির্ভর করে। এই-যে পাপ কালো হয়ে দেখা দিল, এর ভয়ে ভীত হব না এর কাছে মাথা নত করব ? না সে পাপের বিরুদ্ধে পাপকে দাঁড় করাব ? মৃত্যুর আঘাত, দুঃখের আঘাতের উপর রিপুর উন্মত্ততাকে জাগ্রত করব ? শিশুর আচরণে দেখা যায়, সে যখন আছাড় খায় তখন মেজেকে আঘাত করতে থাকে। যতই আঘাত করে মেজে ততই সে আঘাত ফিরিয়ে দেয়। এ শিশুর ধর্ম। কিন্তু, যদি কোনো বয়স্ক লোক হোঁচট খায় তবে সে চিন্তা করে, বাধাটা কোথায়— বাধা যদি থাকে তো সেটা লঙ্ঘন বা সেটাকে অপসারণ করতে হবে। সচরাচর দেখতে পাই বাহির থেকে আকস্মিক আঘাতের চমকে মানুষের শিশুবুদ্ধি ফিরে আসে। সে তখন মনে করে, ধৈর্য অবলম্বন করাই কাপুরুষতা, ক্রোধের প্রকাশ পৌরুষ। আজকের দিনে স্বভাবতই ক্রোধের উদয় হয়ে থাকবে, সে কথা স্বীকার করি। মানবধর্ম তো একেবারে ছাড়তে পারি নে। কিন্তু ক্রোধদ্বারা যদি অভিভূত হই তবে সেও মানবধর্ম নয়। আগুন লেগে পাড়া যদি নিরুপায়ে ভস্ম হয়ে যায় তবে আগুনের রুদ্রতা নিয়ে আলোচনা করা বৃথা। তখন যদি দোষ কাউকে দিতে হয় তো আগুনকে যেন না দিই। বিপদের কারণ সর্বত্রই থাকে, তার প্রতিকারের উপায় যারা রাখে না তারাই দোষী। যাদের ঘর পুড়েছে তারা যদি বলতে পারে যে, কূপ খনন করে রাখি নি সেই অপরাধের শাস্তি পেলেম, তা হলে ভবিষ্যতে তাদের ঘর পোড়ার আশঙ্কা কমে। আমাদেরও আজকে তাই বলতে হবে। অপরাধের গোড়ার কথাটা ভাবা চাই। শুনে হয়তো লোকে বলবে, না, এ তো ভালো লাগছে না, একটা প্রলয়-ব্যাপার বাধিয়ে দিতে পারলে সান্ত্বনা পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের অধিবাসীদের দুই মোটা ভাগ, হিন্দু ও মুসলমান। যদি ভাবি, মুসলমানদের অস্বীকার করে এক পাশে সরিয়ে দিলেই দেশের সকল মঙ্গলপ্রচেষ্টা সফল হবে, তা হলে বড়োই ভুল করব। ছাদের পাঁচটা কড়িকে মানব, বাকি তিনটে কড়িকে মানবই না, এটা বিরক্তির কথা হতে পারে, কিন্তু ছাদ-রক্ষার পক্ষে সুবুদ্ধির কথা নয়। আমাদের সবচেয়ে বড়ো অমঙ্গল বড়ো দুর্গতি ঘটে যখন মানুষ মানুষের পাশে রয়েছে, অথচ পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ নেই অথবা সে সম্বন্ধ বিকৃত। বিদেশীর রাজ্যে রাজপুরুষদের সঙ্গে আমাদের একটা বাহ্য যোগ থাকে, অথচ আন্তরিক সম্বন্ধ থাকে না। বিদেশীয় রাজত্বে এইটেই আমাদের সবচেয়ে পীড়া দেয়। গায়ে-পড়া যোগটা দুর্বলতা ও অপমান আনে। বিদেশী শাসন সম্পর্কে যদি এ কথা খাটে তবে স্বদেশীয়দের সম্বন্ধে সে আরও কত সত্য। এক দেশে পাশাপাশি থাকতে হবে, অথচ পরস্পরের সঙ্গে হৃদ্যতার সম্বন্ধ থাকবে না, হয়তো বা প্রয়োজনের থাকতে পারে— সেইখানেই যে ছিদ্র— ছিদ্র নয়, কলির সিংহদ্বার। দুই প্রতিবেশীর মধ্যে যেখানে এতখানি ব্যবধান সেখানেই আকাশ ভেদ করে ওঠে অমঙ্গলের জয়তোরণ। আমাদের দেশে কল্যাণের রথযাত্রায় যখনই সকলে মিলে টানতে চেষ্টা করা হয়েছে, কংগ্রেস প্রভৃতি নানা প্রচেষ্টা-দ্বারা, সে রথ কোথায় এসে থেমে যায়, ভেঙে পড়ে? যেখানে গর্তগুলো হাঁ করে আছে হাজার বছর ধরে।

আমাদের দেশে যখন স্বদেশী-আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল তখন আমি তার মধ্যে ছিলেম। মুসলমানরা তখন তাতে যোগ দেয় নি, বিরুদ্ধ ছিল। জননায়কেরা কেউ কেউ তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন, ওদের একেবারে অস্বীকার করা যাক। জানি, ওরা যোগ দেয় নি। কিন্তু, কেন দেয় নি। তখন বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে এত প্রবল যোগ হয়েছিল যে সে আশ্চর্য! কিন্তু, এতবড়ো আবেগ শুধু হিন্দুসমাজের মধ্যেই আবদ্ধ রইল, মুসলমানসমাজকে স্পর্শ করল না! সেদিনও আমাদের শিক্ষা হয় নি। পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদের ডোবাটাকে আমরা সমাজের দোহাই দিয়ে গভীর করে রেখেছি। সেটাকে রক্ষা করেও লাফ দিয়ে সেটা পার হতে হবে, এমন আবদার চলে না। এমন কথা উঠতে পারে যে, ডোবা তো সনাতন ডোবা, কিন্তু আজ তার মধ্যে যে দুশ্চিকিৎস্য বিভ্রাট ঘটছে সেটা তো নূতন, অতএব হাল আমলের কোনো একটা ভূত আমাদের ঘাড় ভাঙবার গোপন ফন্দি করেছে, ডোবার কোনো দোষ নেই— ওটা ব্রহ্মার বুড়ো আঙুলের চাপে তৈরি। একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, ভাঙা গাড়িকে যখন গাড়িখানায় রাখা যায় তখন কোনো উপদ্রব হয় না। সেটার মধ্যে শিশুরা খেলা করতে পারে, চাই কি মধ্যাহ্নের বিশ্রামাবাসও হতে পারে। কিন্তু, যখনই

তাকে টানতে যাই তখন তার জোড়ভাঙা অংশে অংশে সংঘাত উপস্থিত হয়। যখন চলি নি, রাষ্ট্রসাধনার পথে পাশাপাশি রয়েছি, গ্রামের কর্তব্য পালন করেছি, তখন তো নাড়া খাই নি। আমি যখন আমার জমিদারি সেরেস্তায় প্রথম প্রবেশ করলেম তখন একদিন দেখি, আমার নায়েব তাঁর বৈঠকখানায় এক জায়গায় জাজিম খানিকটা তুলে রেখে দিয়েছেন। যখন জিজ্ঞেস করলেম 'এ কেন' তখন জবাব পেলেম, যে-সব সম্মানী মুসলমান প্রজা বৈঠকখানায় প্রবেশের অধিকার পায় তাদের জন্য ঐ ব্যবস্থা। এক তক্তপোষে বসাতেও হবে অথচ বুঝিয়ে দিতে হবে আমরা পৃথক। এ প্রথা তো অনেক দিন ধরে চলে এসেছে; অনেকদিন মুসলমান এ মেনে এসেছে, হিন্দুও মেনে এসেছে। জাজিম-তোলা আসনে মুসলমান বসেছে, জাজিম-পাতা আসনে অন্যে বসেছে। তার পর ওদের ডেকে একদিন বলেছি, 'আমরা ভাই, তোমাকেও আমার সঙ্গে ক্ষতি স্বীকার করতে হবে, কারাবাস ও মৃত্যুর পথে চলতে হবে।' তখন হঠাৎ দেখি অপর পক্ষ লাল টক্‌টকে নতুন ফেজ মাথায় দিয়ে বলে, আমরা পৃথক। আমরা বিস্মিত হয়ে বলি, রাষ্ট্র ব্যাপারে পরস্পর পাশে এসে দাঁড়াবার বাধাটা কোথায়। বাধা ঐ জাজিম-তোলা আসনে বহুদিনের মস্ত ফাঁকটার মধ্যে। ওটা ছোটো নয়। ওখানে অকূল অতল কালাপানি। বক্তৃতামঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ডাক দিলেই পার হওয়া যায় না।

আজকের দিনে রাষ্ট্রশক্তির উদ্‌বোধন হয়েছে বলেই যত ভেদ, যত ফাঁক, সব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেইজন্যই মার খাচ্ছি। এই মার নানা রূপে আসে— কিন্তু, আজ বড়ো করে দেখা দিল এই মহাপুরুষের মৃত্যুতে। মহাপুরুষেরা এই মারকে বক্ষে গ্রহণ করে এর একান্ত বীভৎসতার পরিচয় দেন। তাতেই আমাদের চৈতন্য হয়। এই-যে চৈতন্য এসেছে, রিপুর বশবর্তী হয়ে কি এই শুভ অবসরকে নষ্ট করব না শুভবুদ্ধি-দাতাকে বলব, যেখানেই ভেদ ঘটিয়েছি সেখানেই পাপের বেদি গেঁথেছি, তার থেকেই বাঁচাও!

এই-যে রুদ্রবেশে পাপ দেখা দিল এ তো ভালোই হয়েছে এক ভাবে। আজকে না ভেবে উপায় নেই যে, কী করে একে চিরকালের মতো পরাভূত করা যেতে পারে। প্রশ্ন উঠতে পারে, আশু আমরা কোন্ উপায় অবলম্বন করব। সহসা এ প্রশ্নের একটা পাকা-রকম উত্তর দিই এমন শক্তি আমার নেই। পরীক্ষা-আরম্ভ করে ক্রমে ক্রমে সে উপায় একদিন পাবই। আজকে সেই পরীক্ষা-আরম্ভের আয়োজন। আজকে দেখতে হবে, আমাদের হিন্দুসমাজের কোথায় কোন্ ছিদ্র, কোন্ পাপ আছে, অতি নির্মমভাবে তাকে আক্রমণ করা চাই। এই উদ্দেশ্য মনে নিয়ে আজ হিন্দুসমাজকে আহ্বান করতে

হবে ; বলতে হবে, পীড়িত হয়েছি আমরা, লজ্জিত হয়েছি, বাইরের আঘাতের জন্য নয়, আমাদের ভিতরের পাপের জন্য। এসো আজ সেই পাপ দূর করতে সকলে মিলি। আমাদের পক্ষে এ বড়ো সহজ কথা নয়। কেননা, অন্তরের মধ্যে বহুকালের অভ্যস্ত ভেদবুদ্ধি, বাইরেও বহুদিনের গড়া অতি কঠিন ভেদের প্রাচীর। মুসলমান যখন কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে মুসলমান সমাজকে ডাক দিয়েছে, সে কোনো বাধা পায় নি— এক ঈশ্বরের নামে 'আল্লাহো আক্‌বর' বলে সে ডেকেছে। আর আজ আমরা যখন ডাকব 'হিন্দু এসো' তখন কে আসবে। আমাদের মধ্যে কত ছোটো ছোটো সম্প্রদায়, কত গণ্ডী, কত প্রাদেশিকতা— এ উত্তীর্ণ হয়ে কে আসবে। কত বিপদ গিয়েছে। কই একত্র তো হই নি। বাহির থেকে যখন প্রথম আঘাত নিয়ে এল মহম্মদ ঘোরী তখন হিন্দুরা সে আসন্ন বিপদের দিনেতেও তো একত্র হয় নি। তার পর যখন মন্দিরের পর মন্দির ভাঙতে লাগল, দেবমূর্তি চূর্ণ হতে লাগল, তখন তারা লড়েছে, মরেছে, খণ্ড খণ্ড ভাবে যুদ্ধ করে মরেছে। তখনও একত্র হতে পারল না। খণ্ডিত ছিলেম বলেই মেরেছে, যুগে যুগে এই প্রমাণ আমরা দিয়েছি। কখনও কখনও ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করে অন্য প্রমাণ পাবার চেষ্টা করি বটে ; বলি, শিখরা তো একসময় বাধা ঘুচিয়েছিল। শিখরা যে বাধা ঘুচিয়েছিল সে তো শিখধর্ম দ্বারাই। পাঞ্জাবের কোথাকার জাঠ, কোথাকার কোন্‌ জাতি সব, শিখধর্মের আহ্বানে একত্র হতে পেরেছিল ; বাধাও দিতে পেরেছিল ; ধর্মকেও রক্ষা করতে এক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শিবাজি একসময় ধর্মরাজ্যস্থাপনের ভিত গেড়েছিলেন। তাঁর যে অসাধারণ শক্তি ছিল তদ্‌দ্বারা তিনি মারাঠাদের একত্র করতে পেরেছিলেন। সেই সম্মিলিত শক্তি ভারতবর্ষকে উপক্রুত করে তুলেছিল। অশ্বের সঙ্গে অশ্বারোহীর যখন সামঞ্জস্য হয় কিছুতেই সে অশ্ব থেকে পড়ে না ; শিবাজির হয়ে সেদিন যারা লড়েছিল তাদের সঙ্গে শিবাজির তেমনি সামঞ্জস্য হয়েছিল। পরে আর সে সামঞ্জস্য রইল না ; পেশোয়াদের মনে ও আচরণে ভেদবুদ্ধি, খণ্ড খণ্ড স্বার্থবুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়ে ক্ষণকালীন রাষ্ট্রবন্ধনকে টুকরো টুকরো করে দিলে। আমার কথা এই যে, আমাদের মধ্যে এই-যে পাপ পুষে রেখেছি এতে কি শুধু আমাদেরই অকল্যাণ, সে পাপে কি আমরা প্রতিবেশীদের প্রতি অবিচার করি নে, তাদের মধ্যে হিংসা জাগিয়ে তুলি নে? যে দুর্বল সেই প্রবলকে প্রলুব্ধ করে পাপের পথে টেনে আনে। পাপের প্রধান আশ্রয় দুর্বলের মধ্যে। অতএব যদি মুসলমান মারে আর আমরা পড়ে পড়ে মার খাই— তবে জানব, এ সম্ভব করেছে শুধু আমাদের দুর্বলতা। আপনার জন্যেও, প্রতিবেশীর জন্যেও আমাদের নিজেদের দুর্বলতা দূর করতে হবে। আমরা প্রতিবেশীদের কাছে আপিল করতে পারি, তোমরা ক্রূর হোয়ো না, তোমরা ভালো হও, নরহত্যার উপরে কোনো

ধর্মের ভিত্তি হতে পারে না— কিন্তু সে আপিল যে দুর্বলের কান্না। বায়ুমণ্ডলে বাতাস লঘু হয়ে এলে ঝড় যেমন আপনিই আসে, ধর্মের দোহাই দিয়ে কেউ তাকে বাধা দিতে পারে না, তেমনি দুর্বলতা পুষে রেখে দিলে সেখানে অত্যাচার আপনিই আসে— কেউ বাধা দিতে পারে না। কিছুক্ষণের জন্য হয়তো একটা উপলক্ষ নিয়ে পরস্পর কৃত্রিম বন্ধুতাবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারি, কিন্তু চিরকালের জন্য তা হয় না। যে মাটিতে কণ্টকতরু ওঠে সে মাটিকে যতক্ষণ শোধন না করা হয় ততক্ষণ তো কোনো ফল হবে না।

আপনার লোককেও যে পর করেছে, পরের সঙ্গেও যার আত্মীয়তা নেই, সে তো ঘাটে এসেছে, তার ঘর কোথায়। আর, তার শ্বাসই বা কতক্ষণ। আজ আমাদের অনুতাপের দিন— আজ অপরাধের ক্ষালন করতে হবে। সত্যিকার প্রায়শ্চিত্ত যদি করি তবেই শত্রু আমাদের মিত্র হবে, রুদ্র আমাদের প্রতি প্রসন্ন হবেন।

মাঘ ১৩৩৩

‘রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত’

যখন খবর পাই রাষ্ট্রনীতি সমাজনীতি ধর্মনীতি সম্বন্ধে আমার বিশেষ মত কী তা আমার রচনা থেকে কেউ উদ্ধার করবার চেষ্টা করছেন তখন নিশ্চিত জানি, আমার মতের সঙ্গে তাঁর নিজের মত মিশ্রিত হবে। দলিলের সাক্ষ্যের সঙ্গে উকিলের ব্যাখ্যা জড়িত হয়ে যে জিনিসটা দাঁড়ায় সেটাকে প্রমাণ বলে গণ্য করা চলে না। কেননা অন্য পক্ষের উকিলও সেই একই দলিলকে বিপরীত কথা বলিয়ে থাকেন; তার কারণ, বাছাই-করা বাক্যের বিশেষ অর্থ নির্ভর করে বিশেষরূপে বাছাই করার উপরেই।

রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে আমার মত আলোচনা করে সম্প্রতি ইংরেজি ভাষায় একখানি বই[১] লেখা হয়েছে। ব্যক্তিগত দিক থেকে আমি লেখকের প্রতি কৃতজ্ঞ; তিনি আমার প্রতি অসম্মান প্রকাশ করবার চেষ্টা করেন নি, শ্রদ্ধা করেই লিখেছেন। আমার প্রতি তাঁর মনের অনুকূল ভাব থাকাতেই আমার মতকে অনেক অংশে প্রচলিত মতের অনুকূল করে সাজিয়ে আমাকে সাধারণের প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন।

বইখানি আমাকে পড়তে হল। কেননা আমার রাষ্ট্রনৈতিক মত কোনো পাঠকের কাছে কিরকম প্রতীত হয়েছে তা জানবার কৌতূহল সামলাতে পারি নি। আমি

১ *Political Philosophy of Rabindranath* by Sachindranath Sen

জানি, আমার মত ঠিক যে কী তা সংগ্রহ করা সহজ নয়। বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত দেশের নানা অবস্থা এবং আমার নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দীর্ঘকাল আমি চিন্তা করেছি এবং কাজও করেছি। যেহেতু বাক্য রচনা করা আমার স্বভাব সেইজন্যে যখন যা মনে এসেছে তখনি তা প্রকাশ করেছি। রচনাকালীন সময়ের সঙ্গে প্রয়োজনের সঙ্গে সেই-সব লেখার যোগ বিচ্ছিন্ন করে দেখলে তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না। যে মানুষ সুদীর্ঘকাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিকভাবে দেখাই সংগত। যেমন এ কথা বলা চলে না যে, ব্রাহ্মণ আদি চারিবর্ণ সৃষ্টির আদিকালেই ব্রহ্মার মুখ থেকে পরিপূর্ণ স্বরূপে প্রকাশ পেয়েছে, যেমন স্বীকার করতেই হবে আর্যজাতির সমাজে বর্ণভেদের প্রথা কালে কালে নানা রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে পরিণত, তেমনি করেই অন্তত আমার সম্বন্ধে জানা চাই যে, রাষ্ট্রনীতির মতো বিষয়ে কোনো বাঁধা মত একেবারে সুসম্পূর্ণভাবে কোনো এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয় নি— জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে তারা গড়ে উঠেছে। সেই-সমস্ত পরিবর্তনপরম্পরার মধ্যে নিঃসন্দেহ একটা ঐক্যসূত্র আছে। সেইটিকে উদ্ধার করতে হলে রচনার কোন্ অংশ মুখ্য, কোন্ অংশ গৌণ, কোনটা তৎসাময়িক, কোনটা বিশেষ সময়ের সীমাকে অতিক্রম করে প্রবহমান, সেইটে বিচার করে দেখা চাই। বস্তুত সেটাকে অংশে অংশে বিচার করতে গেলে পাওয়া যায় না, সমগ্রভাবে অনুভব করে তবে তাকে পাই।

বইখানি পড়ে আমি নিজের মতের ঠিক চেহারাটা পেলুম না। মন বাধা পেল। বাধা পাবার অন্যান্য কারণের মধ্যে একটা কারণ এই যে, এর মধ্যে অনেক তর্জমা আছে যার ভাষা আমার নয়, অথচ আমার যে নয় তার নিদর্শন নেই। ভাষার ইঙ্গিত অনেকখানি কথা কয়। সেটা যখন বাদ পড়ে তখন কথার অর্থ পাওয়া যায়, কিন্তু তার ব্যঞ্জনা মারা পড়ে। আর যাই হোক, নিজের ভাষার দায়িত্ব নিজেকে নিতেই হয় কিন্তু অন্যের ভাষার দায়িত্ব নেওয়া চলে না।

তবু এই ত্রুটিকেও উপেক্ষা করা চলে— কিন্তু এ কথা বলতেই হল যে, নানা লেখা থেকে বাক্য চয়ন করে আমার মতের যে একটা মূর্তি দেওয়া হয়েছে তাতে অংশত হয় তো সব কথাই আছে কিন্তু সমগ্রত মোট কথাটা প্রকাশ পায় নি। এরকম হওয়াটা বোধ করি অবশ্যম্ভাবী। কোন্ কথাটার গুরুত্ব বেশি কোনটার কম, লেখক সেটা স্বভাবত নিজের অভিমত ও রুচির দ্বারা স্থির করেন এবং সেইভাবেই সমস্তটাকে গড়ে তোলেন।

এই উপলক্ষে আমার সমস্ত চিন্তার ক্ষেত্রের উপর নিজেকে একবার দৃষ্টিক্ষেপ করতে

হল। রাষ্ট্রিক সমস্যা সম্বন্ধে আমি কী ভেবেছি কী বলতে চেয়েছি তা নিজেই কুড়িয়ে এনে সংক্ষেপে আঁটি বাঁধবার চেষ্টা করা ভালো মনে করি। এজন্যে দলিল ঘাঁটব না, নিজের স্মৃতির উপরিতলে স্পষ্ট হয়ে যা জেগে আছে তারই অনুসরণ করব।

বালককালের অনেক প্রভাব জীবনপথে শেষ পর্যন্ত সঙ্গী হয়ে থাকে; প্রত্যক্ষ না থাকলেও তাদের প্রণোদনা থেকে যায়। আমাদের ব্রাহ্ম-পরিবার আধুনিক হিন্দুসমাজের বাহ্য আচার-বিচার ক্রিয়া-কর্মের নানা আবশ্যিক বন্ধন থেকে বিযুক্ত ছিল। আমার বিশ্বাস, সেই কিছু-পরিমাণ দূরত্ব-বশতই ভারতবর্ষের সর্বজনীন সর্বকালীন আদর্শের প্রতি আমার গুরুজনদের শ্রদ্ধা ছিল অত্যন্ত প্রবল। সেই গৌরববোধ সেদিন নানা আকারে আমাদের বাড়ির অন্তঃপ্রকৃতি ও বাইরের ব্যবহারকে অধিকার করেছে। তখনকার দিনে প্রচলিত আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্মের প্রতি যাঁদের আস্থা বিচলিত হত, তাঁদের মনকে হয় য়ুরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশেষ ছাঁদের নাস্তিকতা অথবা খৃস্টান-ধর্ম-প্রবণতা পেয়ে বসত। কিন্তু এ কথা সকলের জানা যে, সেকালে আমাদের পরিবারে ভারতেরই শ্রেষ্ঠ আদর্শের অনুসরণ করে ভারতের ধর্ম সংস্কার করবার উৎসাহ সর্বদা জাগ্রত ছিল।

বলা বাহুল্য, বালককালে স্বভাবতই সেই উৎসাহ আমার মনকে একটি বিশেষ ভাবে দীক্ষিত করেছে।

সেই ভাবটি এই যে, জীবনের যা কিছু মহত্তম দান তার পূর্ণ বিকাশ আমাদের অন্তঃপ্রকৃতির মধ্য থেকেই। আমাদের স্বভাবসীমার বাইরে শ্রেষ্ঠ জিনিসের অভাব নেই, লোভনীয় পদার্থ অনেক আছে, সে-সমস্তকে আমরা গ্রহণ করতে পারি নে যদি না আমাদের প্রকৃতির মধ্যে তাদের আত্মসাৎ করি। যখন আমরা বাইরের কিছুতে মুগ্ধ হই তখন লুব্ধ মন অনুকরণের মরীচিকা বিস্তারের দ্বারা তাকে নেবার জন্যে ব্যগ্র হয়। অনুকরণ প্রায় অতিকরণে পৌঁছয়; তাতে রঙ চড়াই বেশি, তার আওয়াজ হয় প্রবল, তার আস্ফালন হয় অত্যুগ্র, অত্যন্ত জোর করে নিজের কাছে প্রমাণ করতে চেষ্টা করি জিনিসটা আমারই— অথচ নানা দিক থেকে তার ভঙ্গুরতা তার আত্মবিরোধ প্রকাশ পেতে থাকে। বাইরের জিনিসকে যখন আপন অন্তরের করি তখন তার ভাবটা বজায় থাকতে পারে তবু তার প্রকাশটা হয় নিজের মতো। কিন্তু যতক্ষণ সেটা আমাদের বাইরে জোড়া থাকে, ভিতরে মিলে না যায়, ততক্ষণ সেটা হয় মোটা কলমে দাগা-বোলানো অক্ষরের মতো, মূলের চেয়ে আকারে বড়ো, কিন্তু একেবারে তার গায়ে গায় সংলগ্ন। তার থেকে স্বতন্ত্র হয়ে সে অক্ষর লেখকের আপন বাক্যে লেখকের আপন চিন্তিত ভাবকে লিপিবদ্ধ করতে পারে না। আমাদের রাষ্ট্রীয় চেষ্টায় বাইরে থেকে,

ইস্কুলে পড়ার বই থেকে, আমরা যা পেয়েছি তা আমাদের প্রাণে সর্বাঙ্গীন হয়ে ওঠে নি বলেই অনেক সময় তার বাইরের ছাঁদটাকেই খুব আড়ম্বরের সঙ্গে রেখায় রেখায় মেলাবার গলদঘর্ম চেষ্টা করি— এবং সেই মিলটুকু ঘটিয়েই মনে করি, যা পাবার তা পেয়েছি, যা করবার তা করা হল।

'সাধনা' পত্রিকায় রাষ্ট্রীয় বিষয়ে আমি প্রথম আলোচনা শুরু করি। তাতে আমি এই কথাটার উপরেই বেশি জোর দিয়েছি। তখনকার দিনে চোখ রাঙিয়ে ভিক্ষা করা ও গলা মোটা করে গবর্মেণ্টকে জুজুর ভয় দেখানোই আমরা বীরত্ব বলে গণ্য করতেম। আমাদের দেশে পোলিটিকাল অধ্যবসায়ের সেই অবাস্তব ভূমিকার কথাটা আজকের দিনের তরুণেরা ঠিকমত কল্পনা করতেই পারবেন না। তখনকার পলিটিক্সের সমস্ত আবেদনটাই ছিল উপরওয়ালার কাছে, দেশের লোকের কাছে একেবারেই না। সেই কারণেই প্রাদেশিক রাষ্ট্রসম্মিলনীতে, গ্রাম্যজনমণ্ডলীসভাতে, ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করাকে কেউ অসংগত বলে মনে করতেই পারতেন না। রাজসাহী-সম্মিলনীতে নাটোরের পরলোকগত মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের সঙ্গে চক্রান্ত করে সভায় বাংলাভাষা প্রবর্তন করবার প্রথম চেষ্টা যখন করি তখন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি তৎসাময়িক রাষ্ট্রনেতারা আমার প্রতি একান্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কঠোর বিদ্রূপ করেছিলেন। বিদ্রূপ ও বাধা আমার জীবনের সকল কর্মেই আমি প্রচুর পরিমাণেই পেয়েছি, এ ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয় নি। পর বৎসরে রুগ্‌ণশরীর নিয়ে ঢাকা-কন্‌ফারেন্‌সেও আমাকে এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল। আমার এই সৃষ্টিছাড়া উৎসাহ উপলক্ষে তখন এমনতরো একটা কানাকানি উঠেছিল যে, ইংরেজি ভাষায় আমার দখল নেই বলেই রাষ্ট্রসভার মতো অজায়গায় আমি বাংলা চালাবার উদ্‌যোগ করেছি। বাঙালির ছেলের পক্ষে যে গালি সবচেয়ে লজ্জার সেইটেই সেদিন আমার প্রতি প্রয়োগ করা হয়েছিল, অর্থাৎ ইংরেজি আমি জানি নে। এত বড়ো দুঃসহ লাঞ্ছনা আমি নীরবে সহ্য করেছিলুম তার একটা কারণ, ইংরেজিভাষা-শিক্ষায় বাল্যকাল থেকে আমি সত্যই অবহেলা করেছি; দ্বিতীয় কারণ, পিতৃদেবের শাসনে তখনকার দিনেও আমাদের পরিবারে পরস্পর পত্র লেখা প্রভৃতি ব্যাপারে ইংরেজিভাষা ব্যবহার অপমানজনক বলে গণ্য হত।

ইতিমধ্যে কার্জন লাটের হুকুমে দিল্লির দরবারের উদ্‌যোগ হল। তখন রাজশাসনের তর্জন স্বীকার করেও আমি তাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলুম। সেই প্রবন্ধ যদি হাল আমলের পাঠকেরা পড়ে দেখেন তবে দেখবেন, ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর রাষ্ট্রিক সম্বন্ধের বেদনা ও অপমানটা যে কোথায় আমার সেই লেখায় কতকটা প্রকাশ

করেছি। আমি এই বলতে চেয়েছিলুম, দরবার জিনিসটা প্রাচ্য— পাশ্চাত্য কর্তৃপক্ষ যখন সেটা ব্যবহার করেন তখন তার যেটা শূন্যের দিক সেইটিকেই জাহির করেন, যেটা পূর্ণের দিক সেটাকে নয়। প্রাচ্য অনুষ্ঠানের প্রাচ্যতা কিসে। সে হচ্ছে দুই পক্ষের মধ্যে আত্মিক সম্বন্ধ স্বীকার করা। তরবারির জোরে প্রতাপের যে সম্বন্ধ সে হল বিরুদ্ধ সম্বন্ধ, আর প্রভূত দাক্ষিণ্যের দ্বারা যে সম্বন্ধ সেইটেই নিকটের। দরবারে সম্রাট আপন অজস্র ঔদার্য প্রকাশ করবার উপলক্ষ পেতেন— সেদিন তাঁর দ্বার অবারিত, তাঁর দান অপরিমিত। পাশ্চাত্য নকল দরবারে সেই দিকটাতে কঠিন কৃপণতা, সেখানে জনসাধারণের স্থান সংকীর্ণ, পাহারাওয়ালার অস্ত্রে শস্ত্রে রাজপুরুষদের সংশয়বুদ্ধি কণ্টকিত— তার উপরে এই দরবারের ব্যয় বহনের ভার দরবারের অতিথিদেরই 'পরে। কেবলমাত্র নতমস্তকে রাজার প্রতাপকে স্বীকার করাবার জন্যেই এই দরবার। উৎসবের সমারোহ-দ্বারা পরস্পরের সম্বন্ধের অন্তর্নিহিত অপমানকেই আড়ম্বর করে বাইরে প্রকাশ করা হয়। এই কৃত্রিম হৃদয়হীন আড়ম্বরে প্রাচ্যহৃদয় অভিভূত হতে পারে, এমন কথা চিন্তা করার মধ্যেও অবিমিশ্র ঔদ্ধত্য এবং প্রজার প্রতি অপমান। ভারতবর্ষে ইংরেজের প্রভুত্ব তার আইনে, তার মন্ত্রগৃহে, তার শাসনতন্ত্রে ব্যাপ্তভাবে আছে কিন্তু সেইটেকে উৎসবের আকার দিয়ে উৎকট করে তোলার কোনো প্রয়োজন মাত্রই নেই।

বরঞ্চ এইরকম কৃত্রিম উৎসবে স্পষ্ট করে প্রকাশ করে দেওয়া হয় যে, ভারতবর্ষে ইংরেজ খুব কঠিন হয়ে আছে, কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের মানবসম্বন্ধ নেই, যান্ত্রিক সম্বন্ধ। এ দেশের সঙ্গে তার লাভের যোগ আছে, ব্যবহারের যোগ আছে, হৃদয়ের যোগ নেই। কর্তব্যের জালে দেশ আবৃত, সেই কর্তব্যের নৈপুণ্য এবং উপকারিতা স্বীকার করলেও আমাদের মানবপ্রকৃতি স্বভাবতই সেই প্রাণহীন শাসনতন্ত্রে পীড়া বোধ করে।

এই বেদনাই মনে নিয়ে আমার লেখায় আমি বিশেষ করে এবং বার বার করে বলেছি যে, ভারতবাসী যদি ভারতবর্ষের সকলপ্রকার হিতকর দান কোনো একটি প্রবল শক্তিশালী যন্ত্রের হাত দিয়েই চিরদিন গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হয়, তা হলে তার সুবিধা সুযোগ যতই থাক্‌, তার চেয়ে দুর্গতি আমাদের আর হতেই পারে না। সরকারবাহাদুর -নামক একটা অমানবিক প্রভাব ছাড়া আমাদের অভাবনিবারণের আর কোনো উপায় আমাদের হাতে নেই এইরকম ধারণা মনে বদ্ধমূল হতে দেওয়াতেই আমরা নিজের দেশকে নিজে যথার্থভাবে হারাই। আমাদের নিজের দেশ যে আমাদের নিজের হয় নি তার প্রধান কারণ এ নয় যে, এ দেশ বিদেশীর শাসনাধীনে। আসল কথাটা এই যে, যে দেশে দৈবক্রমে জন্মেছি মাত্র সেই দেশকে সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, তপস্যা-দ্বারা, জানার দ্বারা, বোঝার দ্বারা সম্পূর্ণ আত্মীয় করে তুলি নি— একে অধিকার করতে পারি

নি। নিজের বুদ্ধি দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, প্রেম দিয়ে যাকে গড়ে তুলি তাকেই আমরা অধিকার করি; তারই 'পরে অন্যায় আমরা মরে গেলেও সহ্য করতে পারি নে। কেউ কেউ বলেন, আমাদের দেশ পরাধীন বলেই তার সেবা সম্বন্ধে দেশের লোক উদাসীন। এমন কথা শোনবার যোগ্য নয়। সত্যকার প্রেম অনুকূল প্রতিকূল সকল অবস্থাতেই সেবার ভিতর দিয়ে স্বতই আত্মত্যাগ করতে উদ্যত হয়। বাধা পেলে তার উদ্যম বাড়ে বই কমে না। আমরা কন্‌গ্রেস করেছি, তীব্র ভাষায় হৃদয়াবেগ প্রকাশ করেছি, কিন্তু যে-সব অভাবের তাড়নায় আমাদের দেহ রোগে জীর্ণ, উপবাসে শীর্ণ, কর্মে অপটু, আমাদের চিত্ত অন্ধসংস্কারে ভারাক্রান্ত, আমাদের সমাজ শতখণ্ডে খণ্ডিত, তাকে নিজের বুদ্ধির দ্বারা, বিদ্যার দ্বারা, সংঘবদ্ধ চেষ্টা-দ্বারা দূর করবার কোনো উদ্‌যোগ করি নি। কেবলই নিজেকে এবং অন্যকে এই বলেই ভোলাই যে, যেদিন স্বরাজ হাতে আসবে তার পরদিন থেকেই সমস্ত আপনিই ঠিক হয়ে যাবে। এমনি করে কর্তব্যকে সুদূরে ঠেকিয়ে রাখা, অকর্মণ্যতার শূন্যগর্ভ কৈফিয়ত রচনা করা, নিরুৎসুক নিরুদ্যম দুর্বল চিত্তেরই পক্ষে সম্ভব।

আমাদের দেশকে সম্পূর্ণভাবে কেউই কেড়ে নিতে পারে না, এবং সেই দেশকে বাইরে থেকে দয়া করে কেউ আমাদের হাতে তুলে দেবে এমন শক্তি কারো নেই। দেশের 'পরে নিজের স্বাভাবিক অধিকারকে যে পরিমাণে আমরা ত্যাগ করেছি সেই পরিমাণেই অন্যে তাকে অধিকার করেছে। এই চিন্তা করেই একদিন আমি 'স্বদেশী সমাজ' নাম দিয়ে একটি বক্তৃতা করেছিলুম। তার মর্মকথাটা আর-একবার সংক্ষেপে বলবার প্রয়োজন আছে।

চিরদিন ভারতবর্ষে এবং চীনদেশে সমাজতন্ত্রই প্রবল, রাষ্ট্রতন্ত্র তার নীচে। দেশ যথার্থভাবে আত্মরক্ষা করে এসেছে সমাজের সম্মিলিত শক্তিতে। সমাজই বিদ্যার ব্যবস্থা করেছে, তৃষিতকে জল দিয়েছে, ক্ষুধিতকে অন্ন, পূজার্থীকে মন্দির, অপরাধীকে দণ্ড, শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা; গ্রামে গ্রামে দেশের চরিত্রকে রক্ষিত এবং তার শ্রীকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। দেশের উপর দিয়ে রাজ্য-সাম্রাজ্যের পরিবর্তন হয়ে গেল, স্বদেশী রাজায় রাজায় নিয়তই রাজত্ব নিয়ে হাত-ফেরাফেরি চলল, বিদেশী রাজারা এসে সিংহাসন-কাড়াকাড়ি করতে লাগল— লুঠপাট অত্যাচারও কম হল না— কিন্তু তবু দেশের আত্মরক্ষা হয়েছে যেহেতু সে আপন কাজ আপনি করেছে, তার অন্নবস্ত্র ধর্মকর্ম সমস্তই তার আপনারই হাতে। এমনি করে দেশ ছিল দেশের লোকের, রাজা ছিল তার এক অংশে মাত্র, মাথার উপর যেমন মুকুট থাকে তেমনি। রাষ্ট্রপ্রধান দেশে রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যেই বিশেষ-ভাবে বদ্ধ থাকে দেশের মর্মস্থান; সমাজপ্রধান দেশে দেশের প্রাণ সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে

থাকে। রাষ্ট্রপ্রধান দেশের রাষ্ট্রতন্ত্রের পতনে দেশের অধঃপতন, তাতেই সে মারা যায়। গ্রীস রোম এমনি করেই মারা গিয়েছে। কিন্তু চীন ভারত রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের ভিতর দিয়েই সুদীর্ঘকাল আত্মরক্ষা করেছে— তার কারণ, সর্বব্যাপী সমাজে তার আত্মা প্রসারিত।

পাশ্চাত্য রাজার শাসনে এইখানে ভারতবর্ষ আঘাত পেয়েছে। গ্রামে গ্রামে তার যে সামাজিক স্বরাজ পরিব্যাপ্ত ছিল রাজশাসন তাকে অধিকার করলে। যখন থেকে এই অধিকার পাকা হয়ে উঠল তখন থেকে গ্রামে গ্রামে দিঘিতে গেল জল শুকিয়ে; জীর্ণ মন্দিরে, শূন্য অতিথিশালায় উঠল অশথ গাছ; জাল-জালিয়াতি মিথ্যা-মকদ্দমাকে বাধা দেবার কিছু রইল না; রোগে তাপে দৈন্যে অজ্ঞানে অধর্মে সমস্ত দেশ রসাতলে তলিয়ে গেল।

সকলের চেয়ে বিপদ হল এই যে, দেশ দেশের লোকের কাছে কিছু চাইলে আর সাড়া পায় না। জলদান অন্নদান বিদ্যাদান সমস্তই সরকার-বাহাদুরের মুখ তাকিয়ে। এইখানেই দেশ গভীরভাবে আপনাকে হারিয়েছে। দেশের লোকের সঙ্গে দেশ যথার্থভাবে সেবার সম্বন্ধসূত্রে যুক্ত, সেইখানেই ঘটেছে মর্মান্তিক বিচ্ছেদ। আগে স্বরাজ পেলে তবে সেই স্বাভাবিক সম্বন্ধের কাজ চলতে থাকবে এ কথা বলাও যা আর আগে ধনলাভ হবে তার পরে ছেলে মাকে স্বীকার করবে এ কথা বলাও তাই। দারিদ্র্যের মধ্যেও স্বাভাবিক সম্বন্ধের কাজ চলা উচিত— বস্তুত সেই অবস্থায় সম্বন্ধের দাবি বাড়ে বই কমে না। 'স্বদেশী সমাজে' তাই আমি বলেছিলুম, ইংরেজ আমাদের রাজা কিম্বা আর-কেউ আমাদের রাজা এই কথাটা নিয়ে বকাবকি করে সময় নষ্ট না করে সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, নিজের দেশকে নিজে সত্যভাবে অধিকার করবার চেষ্টা সর্বাগ্রে করতে হবে। দেশের সমস্ত বুদ্ধিশক্তি ও কর্মশক্তিকে সংঘবদ্ধ আকারে কেমন করে দেশে বিস্তীর্ণ করা যেতে পারে 'স্বদেশী সমাজে' আমি তারই আদর্শ ব্যাখ্যা করেছিলুম। খদ্দর-পরা দেশই যে সমগ্র দেশের সম্পূর্ণ আদর্শ এ কথা আমি কোনোমতেই মানতে পারি নে; যখন দেশের আত্মা সজাগ ছিল তখন সে যে কেবলমাত্র আপন তাঁতে বোনা কাপড় আপনি পরেছে তা নয়, তখন তার সমাজে তার বহুধা শক্তি বিচিত্র সৃষ্টিতে আপনাকে সার্থক করেছে। আজ সমগ্রভাবেই সেই শক্তির দৈন্য ঘটেছে, কেবলমাত্র চরকায় সুতো কাটবার শক্তির দৈন্য নয়।

আজ আমাদের দেশে চরকালাঞ্ছন পতাকা উড়িয়েছি। এ যে সংকীর্ণ জড়শক্তির পতাকা, অপরিণত যন্ত্রশক্তির পতাকা, স্বল্পবল পণ্যশক্তির পতাকা— এতে চিত্তশক্তির কোনো আহ্বান নেই। সমস্ত জাতিকে মুক্তির পথে যে আমন্ত্রণ সে তো কোনো

বাহ্য প্রক্রিয়ার অন্ধ পুনরাবৃত্তির আমন্ত্রণ হতে পারে না। তার জন্যে আবশ্যক পূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্‌বোধন— সে কি এই চরকা-চালনায়। চিন্তাবিহীন মূঢ় বাহ্য অনুষ্ঠানকেই ঐহিক পারত্রিক সিদ্ধিলাভের উপায় গণ্য করেই কি এতকাল জড়ত্বের বেষ্টনে আমরা মনকে কর্মকে আড়ষ্ট করে রাখি নি। আমাদের দেশের সবচেয়ে বড়ো দুর্গতির কারণ কি তাই নয়। আজ কি আকাশে পতাকা উড়িয়ে বলতে হবে, বুদ্ধি চাই নে, বিদ্যা চাই নে, প্রীতি চাই নে, পৌরুষ চাই নে, অন্তরপ্রকৃতির মুক্তি চাই নে, সকলের চেয়ে বড়ো করে একমাত্র করে চাই চোখ বুজে মনকে বুজিয়ে দিয়ে হাত চালানো, বহু সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন চালানো হয়েছিল তারই অনুবর্তন ক'রে। স্বরাজ-সাধনযাত্রায় এই হল রাজপথ? এমন কথা বলে মানুষকে কি অপমান করা হয় না।

বস্তুত যখন সমগ্রভাবে দেশের বুদ্ধিশক্তি কর্মশক্তি উদ্যত থাকে তখন অন্য দেশ থেকে কাপড় কিনে পরলেও স্বরাজের মূলে আঘাত লাগে না। গাছের গোড়ায় বিদেশী সার দিলেই গাছ বিদেশী হয় না, যে মাটি তার স্বদেশী তার মূলগত প্রাধান্য থাকলে ভাবনা নেই। পৃথিবীতে স্বরাজী এমন কোনো দেশই নেই যেখানে অন্য দেশের আমদানি জিনিস বহুল পরিমাণে ব্যবহার না করে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গেই তারা নানা চেষ্টায় আপন শক্তিকেও সার্থক করছে— কেবল এক দিকে নয়, কেবল বণিকের মতো পণ্য-উৎপাদনে নয়, বিদ্যা-অর্জনে, বুদ্ধির আলোচনায়, লোকহিতে, শিল্পসাহিত্য-সৃষ্টিতে, মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশে। সে দিকে যদি আমাদের দেশে অভাব থাকে তবে নিজের হাত দুটোকে মনোবিহীন কল-আকারে পরিণত করে আমরা যতই সুতো কাটি আর কাপড় বুনি আমাদের লজ্জা যাবে না, আমরা স্বরাজ পাব না।

আমি প্রথম থেকেই রাষ্ট্রীয় প্রসঙ্গে এই কথাই বারম্বার বলেছি, যে কাজ নিজে করতে পারি সে কাজ সমস্তই বাকি ফেলে, অন্যের উপরে অভিযোগ নিয়েই অহরহ কর্মহীন উত্তেজনার মাত্রা চড়িয়ে দিন কাটানোকে আমি রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বলে মনে করি নে। আপন পক্ষের কথাটা সম্পূর্ণ ভুলে আছি বলেই অপর পক্ষের কথা নিয়ে এত অত্যন্ত অধিক করে আমরা আলোচনা করে থাকি। তাতে শক্তিহ্রাস হয়। স্বরাজ হাতে পেলে আমরা স্বরাজের কাজ নির্বাহ করতে পারব, তার পরিচয় স্বরাজ পাবার আগেই দেওয়া চাই। সে পরিচয়ের ক্ষেত্র প্রশস্ত। দেশের সেবার মধ্যে দেশের প্রতি প্রীতির প্রকাশ কোনো বাহ্য অবস্থান্তরের অপেক্ষা করে না, তার নির্ভর একমাত্র আন্তরিক সত্যের প্রতি। আজ যদি দেখি সেই প্রকাশ অলস উদাসীন, তবে বাহিরের অনুগ্রহে বাহ্য স্বরাজ পেলেই অন্তরের সেই জড়তা দূর হবে এ কথা আমি বিশ্বাস করি নে। আগে আমাদের বাহিরের বাধা দূর হবে, তার পরে আমাদের দেশপ্রীতি অন্তরের বাধা ভেদ

করে পরিপূর্ণ শক্তিতে দেশের সেবায় নিযুক্ত হবে, এমন আত্মবিড়ম্বনার কথা আমরা যেন না বলি। যে মানুষ বলে 'আগে ফাউণ্টেন-পেন পাব তার পরে মহাকাব্য লিখব' বুঝতে হবে তার লোভ ফাউণ্টেন-পেনের প্রতিই, মহাকাব্যের প্রতি নয়। যে দেশাত্মবোধী বলে, 'আগে স্বরাজ পেলে তার পরে স্বদেশের কাজ করব' তার লোভ পতাকা-ওড়ানো উর্দি-পরা স্বরাজের রঙকরা কাঠামোটার 'পরেই। একজন আর্টিস্‌ট্‌কে জানি, তিনি অনেক দিন থেকে বলে এসেছিলেন, 'রীতিমত স্টুডিয়ো আমার অধিকারে না পেলে আমি হাতের কাজ দেখাতে পারব না।' তাঁর স্টুডিয়ো জুটল, কিন্তু হাতের কাজ আজও এগোয় না। যতদিন স্টুডিয়ো ছিল না ততদিন ভাগ্যকে ও অন্য সকলকে কৃপণ বলে দোষ দেবার সুযোগ তাঁর ছিল, স্টুডিয়ো পাবার পর থেকে তাঁর হাতও চলে না মুখও চলে না। স্বরাজ আগে আসবে, স্বদেশের সাধনা তার পরে, এমন কথাও তেমনিই সত্যহীন, এবং ভিত্তিহীন এমন স্বরাজ।

অগ্রহায়ণ ১৩৩৬

হিন্দুমুসলমান

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের সকল সমাজের ঐক্যে প্রতিষ্ঠিত এক মহাজাতিকে জাগিয়ে তুলে তার একচ্ছত্র আসন রচনা করব বলে দেশনেতারা পণ করেছেন।

ঐ আসন জিনিসটা, অর্থাৎ যাকে বলে কন্‌স্টিট্যুশন, ওটা বাইরের, রাষ্ট্রশাসন-ব্যবস্থায় আমাদের পরস্পরের অধিকার-নির্ণয় দিয়ে সেটা গড়েপিটে তুলতে হবে। তার নানা রকমের নমুনা নানা দেশের ইতিহাসে দেখেছি, তারই থেকে যাচাই বাছাই করে প্ল্যান ঠিক করা চলছে। এই ধারণা ছিল, ওটাকে পাকা করে খাড়া করবার বাধা বাইরে, অর্থাৎ বর্তমান কর্তৃপক্ষদের ইচ্ছার মধ্যে। তারই সঙ্গে রফা করবার, তক্‌রার করবার কাজে কিছুকাল থেকে আমরা উঠে পড়ে লেগেছি।

যখন মনে হল কাজ এগিয়েছে, হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে দেখি, মস্ত বাধা নিজেদের মধ্যেই। গাড়িটাকে তীর্থে পৌঁছে দেবার প্রস্তাবে সারথি যদি-বা আধ-রাজি হল ওটাকে আস্তাবল থেকে ঠেলে বের করবার সময় হুঁশ হল, এক্কা গাড়িটার দুই চাকায় বিপরীত রকমের অমিল, চালাতে গেলেই উলটে পড়বার জো হয়।

যে বিরুদ্ধ মানুষটার সঙ্গে আমাদের বাইরের সম্বন্ধ, বিবাদ করে একদিন তাকে হটিয়ে বাহির করে দেওয়া দুঃসাধ্য হলেও নিতান্ত অসাধ্য নয়, সেখানে আমাদের

হারজিতের মামলা। কিন্তু ভিতরের লোকের বিবাদে কোনো এক পক্ষ জিতলেও মোটের উপর সেটা হার, আর হারলেও শান্তি নেই। কোনো পক্ষকে বাদ দেবারও জো নেই, আবার দাবিয়ে রাখতে গেলেও উৎপাতকে চিরকাল উত্তেজিত করে রাখাই হবে। ডান পাশের দাঁত বাঁ পাশের দাঁতকে নড়িয়ে দিয়ে যদি বড়াই করতে চায় তবে অবশেষে নিজে অনড় থাকবে না।

এতদিন রাষ্ট্রসভায় বরসজ্জাটার 'পরেই একান্ত মন দিয়েছিলুম, আসনটা কেমন হবে এই কথা ভেবেই মুগ্ধ। ওটা মহামূল্য ও লোভনীয়। প্রতিবেশীরা যারা কিংখাবের আসন বানিয়েছে তাদের আসরের ঘটা দেখে ঈর্ষা হয়। কিন্তু হায় রে, স্বয়ং বরকে বরণ করবার আন্তরিক আয়োজন বহুকাল থেকে ভুলেই আছি। আজ তাই পণ নিয়ে বরযাত্রীদের লড়াই বাধে। শুভকর্মে অশুভ গ্রহের শান্তির কথাটায় প্রথম থেকেই মন দিই নি, কেবল আসনটার মালমসলার ফর্দ নিয়ে বেলা বইয়ে দিয়েছি।

রাষ্ট্রিক মহাসন -নির্মাণের চেয়ে রাষ্ট্রিক মহাজাতি -সৃষ্টির প্রয়োজন আমাদের দেশে অনেক বড়ো, এ কথা বলা বাহুল্য। সমাজে ধর্মে ভাষায় আচারে আমাদের বিভাগের অন্ত নেই। এই বিদীর্ণতা আমাদের রাষ্ট্রিক সম্পূর্ণতার বিরোধী ; কিন্তু তার চেয়ে অশুভের কারণ এই যে, এই বিচ্ছেদে আমাদের মনুষ্যত্ব-সাধনার ব্যাঘাত ঘটিয়েছে ; মানুষে মানুষে কাছাকাছি বাস করে তবু কিছুতে মনের মিল হয় না, কাজের যোগ থাকে না, প্রত্যেক পদে মারামারি কাটাকাটি বেধে যায়, এটা বর্বরতার লক্ষণ। অথচ আমরা যে আত্মশাসনের দাবি করছি সেটা তো বর্বরের প্রাপ্য নয়। যাদের ধর্মে সমাজে প্রথায়, যাদের চিত্তবৃত্তির মধ্যে, এমন একটা মজ্জাগত জোড়-ভাঙানো দুর্যোগ আছে যে তারা কথায় কথায় একখানাকে সাতখানা করে ফেলে, সেই ছত্রভঙ্গের দল ঐকরাষ্ট্রিক সত্তাকে উদ্ভাবিত করবে কোন্ যন্ত্রের সাহায্যে।

যে দেশে প্রধানত ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায়, অন্য কোনো বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না, সে দেশ হতভাগ্য। সে দেশ স্বয়ং ধর্মকে দিয়ে যে বিভেদ সৃষ্টি করে সেইটে সকলের চেয়ে সর্বনেশে বিভেদ। মানুষ বলেই মানুষের যে মূল্য সেইটেকেই সহজ প্রীতির সঙ্গে স্বীকার করাই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি। যে দেশে ধর্মই সেই বুদ্ধিকে পীড়িত করে রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধি কি সে দেশকে বাঁচাতে পারে।

ইতিহাসে বারে বারে দেখা গেছে, যখন কোনো মহাজাতি নবজীবনের প্রেরণায় রাষ্ট্রবিপ্লব প্রবর্তন করেছে তার সঙ্গে সঙ্গে প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে তার ধর্মবিদ্বেষ। দেড়শত বৎসর পূর্বকার ফরাসি বিপ্লবে তার দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। সোভিয়েট রাশিয়া প্রচলিত ধর্মতন্ত্রের বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর। সম্প্রতি স্পেনেও এই ধর্মহননের আগুন

উদ্দীপ্ত। মেক্সিকোয় বিদ্রোহ বারে বারে রোমক চার্চ্‌কে আঘাত করতে উদ্যত।

নব্য তুর্কী যদিও প্রচলিত ধর্মকে উন্মূলিত করে নি, কিন্তু বলপূর্বক তার শক্তি হ্রাস করেছে। এর ভিতরকার কথাটা এই যে, বিশেষ ধর্মের আদিপ্রবর্তকগণ দেবতার নামে মানুষকে মেলাবার জন্যে, তাকে লোভ দ্বেষ অহংকার থেকে মুক্তি দেবার জন্যে উপদেশ দিয়েছিলেন। তার পরে সম্প্রদায়ের লোক মহাপুরুষদের বাণীকে সংঘবদ্ধ করে বিকৃত করেছে, সংকীর্ণ করেছে; সেই ধর্ম দিয়ে মানুষকে তারা যেমন ভীষণ মার মেরেছে এমন বিষয়বুদ্ধি দিয়েও নয়; মেরেছে প্রাণে মানে বুদ্ধিতে শক্তিতে, মানুষের মহোৎকৃষ্ট ঐশ্বর্যকে ছারখার করেছে। ধর্মের নামে পুরাতন মেক্সিকোয় স্পেনীয় খৃস্টানদের অকথ্য নিষ্ঠুরতার তুলনা নেই। পৃথিবীতে অপ্রতিহত প্রভুত্ব নিয়ে রাজা যেমন কতবার দুর্দান্ত অরাজকতায় মত্ত হয়েছে, প্রজার রক্ষাকর্তা নাম নিয়ে প্রজার সর্বনাশ করতে কুণ্ঠিত হয় নি, এবং অবশেষে সেই কারণেই আজকের ইতিহাসে রাজ্য থেকে রাজার কেবলই বিলুপ্তি ঘটছে, ধর্ম সম্বন্ধেও অনেক স্থলে সেই একই কারণে ধর্মতন্ত্রের নিদারুণ অধার্মিকতা দমন করবার জন্যে, মানুষকে ধর্মপীড়া থেকে বাঁচাবার জন্যে অনেকবার চেষ্টা দেখা গেল। আজ সেই সেই দেশেই প্রজা যথার্থ স্বাধীনতা পেয়েছে যে দেশে ধর্মমোহ মানুষের চিত্তকে অভিভূত করে এক-দেশ-বাসীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঔদাসীন্য বা বিরোধকে নানা আকারে ব্যাপ্ত করে না রেখেছে।

হিন্দুসমাজে আচার নিয়েছে ধর্মের নাম। এই কারণে আচারের পার্থক্যে পরস্পরের মধ্যে কঠিন বিচ্ছেদ ঘটায়। মৎস্যাশী বাঙালিকে নিরামিষ প্রদেশের প্রতিবেশী আপন বলে মনে করতে কঠিন বাধা পায়। সাধারণত বাঙালি অন্য প্রদেশে গিয়ে অভ্যস্ত আচারের ব্যতিক্রম উপলক্ষে অবজ্ঞা মনের মধ্যে পোষণ করে। যে চিত্তবৃত্তি বাহ্য আচারকে অত্যন্ত বড়ো মূল্য দিয়ে থাকে তার মমত্ববোধ সংকীর্ণ হতে বাধ্য। রাষ্ট্রসম্মিলনীতেও এই অভাব কথায় কথায় ধরা পড়ে এবং দেখা যায়, আমরা যে অলক্ষ্য ব্যবধান সঙ্গে করে নিয়ে বেড়াই তা সংস্কারগত, অতি সূক্ষ্ম এবং সেইজন্য অতি দুর্লঙ্ঘ্য। আমরা যখন মুখে তাকে অস্বীকার করি তখনও নিজের অগোচরেও সেটা অন্তঃকরণের মধ্যে থেকে যায়। ধর্ম আমাদের মেলাতে পারে নি, বরঞ্চ হাজারখানা বেড়া গড়ে তুলে সেই বাধাগুলোকে ইতিহাসের অতীত শাশ্বত বলে পাকা করে দিয়েছে। ইংরেজ নিজের জাতকে ইংরেজ বলেই পরিচয় দেয়। যদি বলত খৃস্টান তা হলে যে ইংরেজ বৌদ্ধ বা মুসলমান বা নাস্তিক তাকে নিয়ে রাষ্ট্রগঠনে মাথা ঠোকাঠুকি বেধে যেত। আমাদের প্রধান পরিচয় হিন্দু বা মুসলমান। এক দলকে বিশেষ পরিচয়-কালে বলি বটে হিন্দুস্থানি, কিন্তু তাদের হিন্দুস্থান বাংলার বাইরে।

কয়েক বছর পূর্বে আমার ইংরেজ বন্ধু এণ্ড্রুজকে নিয়ে মালাবারে ভ্রমণ করছিলুম। ব্রাহ্মণপল্লীর সীমানায় পা বাড়াতেই টিয়া-সমাজ-ভুক্ত একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করে দৌড় দিলেন। এণ্ড্রুজ বিস্মিত হয়ে তাঁকে গিয়ে ধরলেন এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে জানলেন, এ পাড়ায় তাঁদের জাতের প্রবেশনিষেধ। বলা বাহুল্য, হিন্দুসমাজবিধি-অনুসারে এণ্ড্রুজের আচারবিচার টিয়া-ভদ্রলোকের চেয়ে অনেক গুণে অশাস্ত্রীয়। শাসনকর্তার জাত বলে তাঁর জোর আছে, কিন্তু হিন্দু বলে হিন্দুর কাছে আত্মীয়তার জোর নেই। তার সম্বন্ধে হিন্দুর দেবতা পর্যন্ত জাত বাঁচিয়ে চলেন, স্বয়ং জগন্নাথ পর্যন্ত প্রত্যক্ষদর্শনীয় নন। বৈমাত্র সন্তানও মাতার কোলের অংশ দাবি করতে পারে— ভারতে বিশ্বমাতার কোলে এত ভাগ কেন। অনাত্মীয়তাকে অস্থিমজ্জায় আমরা সংস্কারগত করে রেখেছি, অথচ রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে তাদের আত্মীয়তা না পেলে আমরা বিস্মিত হই। শোনা গিয়েছে, এবার পূর্ববঙ্গে কোথাও কোথাও হিন্দুর প্রতি উৎপাতে নমশূদ্ররা নির্দয়ভাবে মুসলমানদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। ভাবতে হবে না কি, ওদের দরদ হল না কেন, আত্মীয়তার দায়িত্বে বাধা পড়ল কোথায়।

এই অনাত্মীয়তার অসংখ্য অন্তরাল বহু যুগ ধরে প্রকাশ্যে আমাদের রাষ্ট্রভাগ্যকে ব্যর্থ করেছে এবং আজও ভিতরে ভিতরে আমাদের দুঃখ ঘটাচ্ছে। জোর গলায় যেখানে বলছি আমরা এক, সূক্ষ্ম স্বরে সেখানে অন্তর্যামী আমাদের মর্মস্থানে বসে বলছেন, 'ধর্মে-কর্মে আচারে-বিচারে এক হবার মতো ঔদার্য তোমাদের নেই।' এর ফল ফলছে— আর রাগ করছি ফলের উপরে, বীজবপনের উপরে নয়।

যখন বঙ্গবিভাগের সাংঘাতিক প্রস্তাব নিয়ে বাঙালির চিত্ত বিক্ষুব্ধ তখন বাঙালি অগত্যা বয়কট-নীতি অবলম্বন করতে চেষ্টা করেছিল। বাংলার সেই দুর্দিনের সুযোগে বোম্বাই-মিলওয়ালা নির্মমভাবে তাঁদের মুনফার অঙ্ক বাড়িয়ে তুলে আমাদের প্রাণপণ চেষ্টাকে প্রতিহত করতে কুণ্ঠিত হন নি। সেই সঙ্গে দেখা গেল, বাঙালি মুসলমান সেদিন আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন। সেই যুগেই বাংলাদেশে হিন্দুমুসলমানে লজ্জাজনক কুৎসিত কাণ্ডের সূত্রপাত হল। অপরাধটা প্রধানত কোন্ পক্ষের এবং এই উপদ্রব অকস্মাৎ কোথা থেকে উৎসাহ পেলে, সে তর্কে প্রয়োজন নেই। আমাদের চিন্তা করবার বিষয়টা হচ্ছে এই যে, বাংলা দ্বিখণ্ডিত হলে বাঙালিজাতের মধ্যে যে পঙ্গুতার সৃষ্টি হত সেটা বাংলাদেশের সকল সম্প্রদায়ের এবং বস্তুত সমস্ত ভারতবর্ষেরই পক্ষে অকল্যাণকর, এটা যথার্থ দরদ দিয়ে বোঝবার মতো একাত্মতা আমাদের নেই বলে সেদিন বাঙালি হিন্দুর বিরুদ্ধে অনাত্মীয় অসহযোগিতা সম্ভব হয়েছিল। রাষ্ট্রপ্রতিমার

কাঠামো গড়বার সময় এ কথাটা মনে রাখা দরকার। নিজেকে ভোলানোর ছলে বিধাতাকে ভোলাতে পারব না।

এই ব্যাপারে সেদিন অনেকেই রাগারাগি করেছিলেন। কিন্তু ফুটো কলসীতে জল তুলতে গেলে জল যে পড়ে যায়, তা নিয়ে জলের উপরে বা কলসীর উপরে চোখ রাঙিয়ে লাভ কী। গরজ আমাদের যতই থাক্, ছিদ্রটা স্বভাবত ছিদ্রের মতোই ব্যবহার করবে। কলঙ্ক আমাদেরই আর সে কলঙ্ক যথাসময়ে ধরা পড়বেই, দৈবের কৃপায় লজ্জা-নিবারণ হবে না।

কথা হয়েছে, ভারতবর্ষে একরাষ্ট্রশাসন না হয়ে যুক্তরাষ্ট্রশাসননীতির প্রবর্তন হওয়া চাই। অর্থাৎ একেবারে জোড়ের চিহ্ন থাকবে না এতটা দূর মিলে যাবার মতো ঐক্য আমাদের দেশে নেই, এ কথাটা মেনে নিতে হয়েছে। আমাদের রাষ্ট্রসমস্যার এ একটা কেজো রকমের নিষ্পত্তি বলে ধরে নেওয়া যাক। কিন্তু তবু একটা কঠিন গ্রন্থি রয়ে গেল, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদ ও বিরোধ। এই বিচ্ছেদটা নানা কারণে আন্তরিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাইরে থেকে রাষ্ট্রনৈতিক প্রলেপ দিয়ে এর ফাটল নিবারণ করা চলবে না ; কোনো কারণে একটু তাপ বেড়ে উঠলেই আবার ফাটল ধরবে।

যেখানে নিজেদের মধ্যে সত্যকার ভেদ সেখানেই রাষ্ট্রিক ক্ষমতার হিস্যা নিয়ে স্বতন্ত্র কোঠায় স্বতন্ত্র হিসাব চলতে থাকে। সেখানে রাষ্ট্রিক সম্পদে সকলেরই অখণ্ড স্বার্থের কথাটা স্বভাবতই মনে থাকে না। এমন দুর্গ্রহে একই গাড়িকে দুটো ঘোড়া দু দিকে টানবার মুশকিল বাধায়। এখন থেকেই অধিকারের ভাগ-বখরা নিয়ে হট্টগোল জেগেছে। রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়বুদ্ধির যোগে গোল-টেবিল পেরিয়েও এই গোল উত্তরোত্তর বাড়বে বই কমবে এমন আশা আছে কি। বিষয়বুদ্ধির আমলে সহোদর ভাইদের মধ্যেও বচসা বেধে যায়। শেষকালে গুণ্ডাদের হাতেই লাঠিসড়কির যোগে যমের দ্বারে চরম নিষ্পত্তির ভার পড়ে।

একদল মুসলমান সম্মিলিত নির্বাচনের বিরুদ্ধে, তাঁরা স্বতন্ত্র নির্বাচনরীতি দাবি করেন এবং তাঁদের পক্ষের ওজন ভারী করবার জন্যে নানা বিশেষ সুযোগের বাটখারা বাড়িয়ে নিতে চান। যদি মুসলমানদের সবাই বা অধিকাংশ একমত হয়ে স্বতন্ত্র নির্বাচনরীতির দাবি করেন এবং নিজেদের পক্ষের ওজন বাড়িয়ে নিতে চান, তা হলে এমনতরো দাবি মেনে নিয়েও আপোষ করতে মহাত্মাজি রাজি আছেন বলে বোধ হল। তা যদি হয়, তাঁর প্রস্তাব মাথা পেতে নেওয়াই ভালো। কেননা, ভারতবর্ষের তরফে রাষ্ট্রিক যে অধিকার আমাদের জয় করে নিতে হবে তার সুস্পষ্ট মূর্তি এবং সাধনার প্রণালী সমগ্র-ভাবে তাঁরই মনে আছে। এপর্যন্ত একমাত্র তিনিই সমস্ত ব্যাপারটাকে অসামান্য

দক্ষতার সঙ্গে প্রবল বাধার বিরুদ্ধে অগ্রসর করে এনেছেন। কাজ-উদ্ধারের দিকে দৃষ্টি রাখলে শেষ পর্যন্ত তাঁরই হাতে সারথ্যভার দেওয়া সংগত। তবু, একজনের বা এক দলের ব্যক্তিগত সহিষ্ণুতার প্রতি নির্ভর করে এ কথা ভুললে চলবে না যে, অধিকার-পরিবেষণে কোনো এক পক্ষের প্রতি যদি পক্ষপাত করা হয় তবে সাধারণ মানব-প্রকৃতিতে সেই অবিচার সইবে না, এই নিয়ে একটা অশান্তি নিয়তই মারমুখো হয়ে থেকে যাবে। বস্তুত এটা পরস্পরের বিবাদ মেটাবার পন্থা নয়। সকলেই যদি এক-জোট হয়ে প্রসন্নমনে একঝোঁকা আপোষ করতে রাজি হয় তা হলে ভাবনা নেই। কিন্তু মানুষের মন! তার কোনো-একটা তারে যদি অত্যন্ত বেশি টান পড়ে তবে সুর যায় বিগড়ে, তখন সংগীতের দোহাই পাড়লেও সংগত মাটি হয়। ঠিক জানি না কী ভাবে মহাত্মাজি এ সম্বন্ধে চিন্তা করছেন। হয়তো গোল-টেবিল-বৈঠকে আমাদের সম্মিলিত দাবির জোর অক্ষুণ্ণ রাখাই আপাতত সবচেয়ে গুরুতর প্রয়োজন বলে তাঁর মনে হতে পারে। দুই পক্ষই আপন আপন জিদে সমান অটল হয়ে বসলে কাজ এগোবে না। এ কথা সত্য। এ ক্ষেত্রে এক পক্ষে ত্যাগ স্বীকার করে মিটমাট হয়ে গেলে উপস্থিত রক্ষা হয়। একেই বলে ডিপ্লোম্যাসি। পলিটিক্‌সে প্রথম থেকেই ষোলো-আনা প্রাপ্যের উপর চেপে বসলে ষোলো-আনাই খোয়াতে হয়। যারা অদূরদর্শী কৃপণের মতো অত্যন্ত বেশি টানাটানি না করে আপোষ করতে জানে তারাই জেতে। ইংরেজের এই গুণ আছে, নৌকোডুবি বাঁচাতে গিয়ে অনেকটা মাল ইংরেজ জলে ফেলে দিতে পারে। আমার নিজের বিশ্বাস, বর্তমান আপোষের প্রস্তাবে ইংরেজের কাছে আমরা যে প্রকাণ্ড ক্ষতি-স্বীকার দাবি করছি সেটা য়ুরোপের আর-কোনো জাতির কাছে একেবারেই খাটত না— তারা আগাগোড়াই ঘুষি উঁচিয়ে কথাটা সম্পূর্ণ চাপা দেবার চেষ্টা করত। রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে ইংরেজের সুবুদ্ধি বিখ্যাত; ইংরেজ সবখানির দিকে তাকিয়ে অনেকখানি সহ্য করতে পারে। এই বুদ্ধির প্রয়োজন যে আমাদের নেই, এ কথা গোঁয়ারের কথা; আখেরে গোঁয়ারের হার হয়ে থাকে। রাষ্ট্রিক অধিকার সম্বন্ধে একগুঁয়ে ভাবে দর-কষাকষি নিয়ে হিন্দু-মুসলমানে মন-কষাকষিকে অত্যন্ত বেশিদূর এগোতে দেওয়া শত্রুপক্ষের আনন্দবর্ধনের প্রধান উপায়।

আমার বক্তব্য এই যে, উপস্থিত কাজ-উদ্ধারের খাতিরে আপাতত নিজের দাবি খাটো করেও একটা মিটমাট করা সম্ভব হয় তো হোক, কিন্তু তবু আসল কথাটাই বাকি রইল। পলিটিক্‌সের ক্ষেত্রে বাইরে থেকে যেটুকু তালি-দেওয়া মিল হতে পারে সে মিলে আমাদের চিরকালের প্রয়োজন টিঁকবে না। এমন-কি পলিটিক্‌সেও এ তালিটুকু বরাবর অটুট থাকবে এমন আশা নেই, ঐ ফাঁকির জোড়টার কাছে বারে বারেই টান

পড়বে। যেখানে গোড়ায় বিচ্ছেদ সেখানে আগায় জল ঢেলে গাছকে চিরদিন তাজা রাখা অসম্ভব। আমাদের মিলতে হবে সেই গোড়ায়, নইলে কিছুতে কল্যাণ নেই।

এতদিন সেই গোড়ার দিকে একরকমের মিল ছিল। পরস্পরের তফাত মেনেও আমরা পরস্পর কাছাকাছি ছিলুম। সম্প্রদায়ের গণ্ডীর উপর ঠোকর খেয়ে পড়তে হত না, সেটা পেরিয়েও মানুষে মানুষে মিলের যথেষ্ট জায়গা ছিল। হঠাৎ এক সময়ে দেখা গেল, দুই পক্ষই আপন ধর্মের অভিমানকে উঁচিয়ে তুলতে লেগেছে। যতদিন আমাদের মধ্যে ধর্মবোধ সহজ ছিল ততদিন গোঁড়ামি থাকা সত্ত্বেও কোনো হাঙ্গাম বাধে নি। কিন্তু, এক সময়ে যে কারণেই হোক, ধর্মের অভিমান যখন উগ্র হয়ে উঠল তখন থেকে সম্প্রদায়ের কাঁটার বেড়া পরস্পরকে ঠেকাতে ও খোঁচাতে শুরু করলে। আমরাও মসজিদের সামনে দিয়ে প্রতিমা নিয়ে যাবার সময় কিছু অতিরিক্ত জিদের সঙ্গে ঢাকে কাঠি দিলুম, অপর পক্ষেও কোর্‌বানির উৎসাহ পূর্বের চেয়ে কোমর বেঁধে বাড়িয়ে তুললে, সেটা আপন আপন ধর্মের দাবি মেটাবার খাতির নিয়ে নয়, পরস্পরের ধর্মের অভিমানকে আঘাত দেবার স্পর্ধা নিয়ে। এই-সমস্ত উৎপাতের শুরু হয়েছে শহরে, যেখানে মানুষে মানুষে প্রকৃত মেলামেশা নেই বলেই পরস্পরের প্রতি দরদ থাকে না।

ধর্মমত ও সমাজরীতি সম্বন্ধে হিন্দু-মুসলমানে শুধু প্রভেদ নয়, বিরুদ্ধতা আছে, এ কথা মানতেই হবে। অতএব আমাদের সাধনার বিষয় হচ্ছে, তৎসত্ত্বেও ভালোরকম করে মেলা চাই। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ আমাদের না হলে নয়। কিন্তু এর একান্ত আবশ্যকতার কথা আমাদের সমস্ত হৃদয়মন দিয়ে আজও ভাবতে আরম্ভ করি নি। একদা খিলাফতের সমর্থন করে মহাত্মাজি মিলনের সেতু নির্মাণ করতে পারবেন মনে করেছিলেন। কিন্তু 'এহ বাহ্য'। এটা গোড়াকার কথা নয়, এই খেলাফত সম্বন্ধে মতভেদ থাকা অন্যায় মনে করি নে, এমন-কি, মুসলমানদের মধ্যেই যে থাকতে পারে তার প্রমাণ হয়েছে।

নানা উপলক্ষে এবং বিনা উপলক্ষে সর্বদা আমাদের পরস্পরের সঙ্গ ও সাক্ষাৎ-আলাপ চাই। যদি আমরা পাশাপাশি চলি, কাছাকাছি আসি, তা হলেই দেখতে পাব, মানুষ বলেই মানুষকে আপন বলে মনে করা সহজ। যাদের সঙ্গে মেলামেশা নেই তাদের সম্বন্ধেই মত প্রভৃতির অনৈক্য অত্যন্ত কড়া হয়ে ওঠে, বড়ো হয়ে দেখা দেয়। যখনই পরস্পর কাছাকাছি আনাগোনার চর্চা হতে থাকে তখনই মত পিছিয়ে পড়ে, মানুষ সামনে এগিয়ে আসে। শান্তিনিকেতনে মাঝে মাঝে মুসলমান ছাত্র ও শিক্ষক এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের কোনো প্রভেদ অনুভব

করি নি এবং সখ্য ও স্নেহসম্বন্ধ-স্থাপনে লেশমাত্র বাধা ঘটে নি। যে-সকল গ্রামের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের সম্বন্ধ তার মধ্যে মুসলমান গ্রাম আছে। যখন কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা দ্রুত-সহযোগে কলকাতার বাইরে ছড়িয়ে চলেছে তখন বোলপুর-অঞ্চলে মিথ্যা জনরব রাষ্ট্র করা হয়েছিল যে, হিন্দুরা মসজিদ ভেঙে দেবার সংকল্প করছে, এই সঙ্গে কলকাতা থেকে গুণ্ডার আমদানিও হয়েছিল। কিন্তু, স্থানীয় মুসলমানদের শান্ত রাখতে আমাদের কোনো কষ্ট পেতে হয় নি, কেননা তারা নিশ্চিত জানত আমরা তাদের অকৃত্রিম বন্ধু।

আমার অধিকাংশ প্রজাই মুসলমান। কোরবানি নিয়ে দেশে যখন একটা উত্তেজনা প্রবল তখন হিন্দু প্রজারা আমাদের এলাকায় সেটা সম্পূর্ণ রহিত করবার জন্য আমার কাছে নালিশ করেছিল। সে নালিশ আমি সংগত বলে মনে করি নি, কিন্তু মুসলমান প্রজাদের ডেকে যখন বলে দিলুম কাজটা যেন এমনভাবে সম্পন্ন করা হয় যাতে হিন্দুদের মনে অকারণে আঘাত না লাগে তারা তখনই তা মেনে নিলে। আমাদের সেখানে এ-পর্যন্ত কোনো উপদ্রব ঘটে নি। আমার বিশ্বাস তার প্রধান কারণ, আমার সঙ্গে আমার মুসলমান প্রজার সম্বন্ধ সহজ ও বাধাহীন।

এ কথা আশা করাই চলে না যে, আমাদের দেশের ভিন্ন ভিন্ন সমাজের মধ্যে ধর্মকর্মের মতবিশ্বাসের ভেদ একেবারেই ঘুচতে পারে। তবুও মনুষ্যত্বের খাতিরে আশা করতেই হবে আমাদের মধ্যে মিল হবে। পরস্পরকে দূরে না রাখলেই সে মিল আপনিই সহজ হতে পারবে। সঙ্ঘের দিক থেকে আজকাল হিন্দু-মুসলমান পৃথক হয়ে গিয়ে সাম্প্রদায়িক অনৈক্যকে বাড়িয়ে তুলেছে, মনুষ্যত্বের মিলটাকে দিয়েছে চাপা। আমি হিন্দুর তরফ থেকেই বলছি, মুসলমানের ত্রুটিবিচারটা থাক্— আমরা মুসলমানকে কাছে টানতে যদি না পেরে থাকি তবে সেজন্যে যেন লজ্জা স্বীকার করি। অল্পবয়সে যখন প্রথম জমিদারি সেরেস্তা দেখতে গিয়েছিলুম তখন দেখলুম, আমাদের ব্রাহ্মণ ম্যানেজার যে তক্তপোষে গদিতে বসে দরবার করেন সেখানে এক ধারে জাজিম তোলা, সেই জায়গাটা মুসলমান প্রজাদের বসবার জন্যে; আর জাজিমের উপর বসে হিন্দু প্রজারা। এইটে দেখে আমার ধিক্কার জন্মেছিল। অথচ এই ম্যানেজার আধুনিক দেশাত্মবোধী দলের। ইংরেজরাজের দরবারে ভারতীয়ের অসম্মান নিয়ে কটুভাষা-ব্যবহার তিনি উপভোগ করে থাকেন, তবু স্বদেশীয়কে ভদ্রোচিত সম্মান দেবার বেলা এত কৃপণ। এই কৃপণতা সমাজে ও কর্মক্ষেত্রে অনেক দূর পর্যন্ত প্রবেশ করেছে; অবশেষে এমন হয়েছে যেখানে হিন্দু সেখানে মুসলমানের দ্বার সংকীর্ণ, যেখানে মুসলমান সেখানে হিন্দুর বাধা বিস্তর। এই আন্তরিক বিচ্ছেদ যতদিন থাকবে ততদিন

স্বার্থের ভেদ ঘুচবে না এবং রাষ্ট্রব্যবস্থায় এক পক্ষের কল্যাণভার অপর পক্ষের হাতে দিতে সংকোচ অনিবার্য হয়ে উঠবে। আজ সম্মিলিত নির্বাচন নিয়ে যে দ্বন্দ্ব বেধে গেছে তার মূল তো এইখানেই। এই দ্বন্দ্ব নিয়ে যখন আমরা অসহিষ্ণু হয়ে উঠি তখন এর স্বাভাবিক কারণটার কথা ভেবে দেখি না কেন।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশে অকথ্য বর্বরতা বারে বারে আমাদের সহ্য করতে হয়েছে। জার-শাসনের আমলে এইরকম অত্যাচার রাশিয়ায় প্রায় ঘটত। বর্তমান বিপ্লবপ্রবণ পলিটিক্যাল যুগের পূর্বে আমাদের দেশে এরকম দানবিক কাণ্ড কখনও শোনা যায় নি। বৃটিশ-শাসিত ভারতে বহু গৌরবের **law and order** পদার্থটা বড়ো বড়ো শহরে পুলিস-পাহারার জাগ্রত দৃষ্টির সামনে স্পর্ধাসহকারে উপরি উপরি অবমানিত হতে লাগল ঠিক এই বিশেষ সময়টাতেই। মারের দুঃখ কেবল আমাদের পিঠের উপর দিয়েই গেল না, ওটা প্রবেশ করেছে বুকের ভিতরে। এটা এমন সময়ে ঘটল ঠিক যখন হিন্দু-মুসলমানে কণ্ঠ মিলিয়ে দাঁড়াতে পারলে আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হত, বিশ্বসভার কাছে আমাদের মাথা হেঁট হত না। এইরকমের অমানুষিক ঘটনায় লোকস্মৃতিকে চিরদিনের মতো বিষাক্ত করে তোলে, দেশের ডান হাতে বাঁ হাতে মিল করিয়ে ইতিহাস গড়ে তোলা দুঃসাধ্য হয়। কিন্তু, তাই বলেই তো হাল ছেড়ে দেওয়া চলে না; গ্রন্থি জটিল হয়ে পাকিয়ে উঠেছে বলে ক্রোধের বেগে সেটাকে টানাটানি করে আরও আঁট করে তোলা মূঢ়তা। বর্তমানের ঝাঁজে ভবিষ্যতের বীজটাকে পর্যন্ত অফলা করে ফেলা স্বাজাতিক আত্মহত্যার প্রণালী। নানা আশু ও সুদূর কারণে, অনেক দিনের পুঞ্জিত অপরাধে হিন্দু-মুসলমানের মিলনসমস্যা কঠিন হয়েছে, সেইজন্যেই অবিলম্বে এবং দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে তার সমাধানে প্রবৃত্ত হতে হবে। অপ্রসন্ন ভাগ্যের উপর রাগ করে তাকে দ্বিগুণ হন্যে করে তোলা চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়ার মতো।

বর্তমান রাষ্ট্রিক উদ্‌যোগে বোম্বাই প্রদেশে আন্দোলনের কাজটা সবচেয়ে সবেগে চলতে পেরেছিল তার অন্যতম কারণ, সেখানে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ বাধিয়ে দেবার উপকরণ যথেষ্ট ছিল না। পার্সিতে হিন্দুতে দুই পক্ষ খাড়া করে তোলা সহজ হয় নি। কারণ, পার্সি সমাজ সাধারণত শিক্ষিতসমাজ, স্বদেশের কল্যাণ সম্বন্ধে পার্সিরা বুদ্ধিপূর্বক চিন্তা করতে জানে, তা ছাড়া তাদের মধ্যে ধর্মোন্মত্ততা নেই। বাংলাদেশে আমরা আছি জতুগৃহে, আগুন লাগাতে বেশিক্ষণ লাগে না। বাংলাদেশে পরের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে যখনই নামি ঠিক সেই সময়টাতেই নিজের ঘর সামলানো অসাধ্য হয়ে ওঠে। এই দুর্যোগের কারণটা আমাদের এখানে গভীর করে শিকড় গেড়েছে, এ কথাটা মেনে নিতেই হবে। এ অবস্থায় শান্তমনে বুদ্ধিপূর্বক পরস্পরের মধ্যে সন্ধি-

স্থাপনের উপায় উদ্‌ভাবনে যদি আমরা অক্ষম হই, বাঙালি-প্রকৃতি-সুলভ হৃদয়াবেগের ঝোঁকে যদি কেবলই জেদ জাগিয়ে স্পর্ধা পাকিয়ে তুলি, তা হলে আমাদের দুঃখের অন্ত থাকবে না এবং স্বাজাতিক কল্যাণের পথ একান্ত দুর্গম হয়ে উঠবে।

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ চোখ বুজে বলেন, সবই সহজ হয়ে যাবে যখন দেশটাকে নিজের হাতে পাব। অর্থাৎ, নিজের বোঝাকে অবস্থাপরিবর্তনের কাঁধে চাপাতে পারব এই ভরসায় নিশ্চেষ্ট থাকবার এই ছুতো। কথাটা একটু বিচার করে দেখা যাক।

ধরে নেওয়া গেল গোল-বৈঠকের পরে দেশের শাসনভার আমরাই পাব। কিন্তু, দেশটাকে হাত-ফেরাফেরি করবার মাঝখানে একটা সুদীর্ঘ সন্ধিক্ষণ আছে। সিভিল-সার্ভিসের মেয়াদ কিছুকাল টিঁকে থাকতে বাধ্য। কিন্তু, সেইদিনকার সিভিল-সার্ভিস হবে ঘা-খাওয়া নেকড়ে বাঘের মতো। মন তার গরম হয়ে থাকবার কথা। সেই সময়-টুকুর মধ্যে দেশের লোক এবং বিদেশের লোকের কাছে কথাটা দেগে দেগে দেওয়া তার পক্ষে দরকার হবে যে, ব্রিটিশরাজের পাহারা আলগা হবা মাত্রই অরাজকতার কালসাপ নানা গর্ত থেকে বেরিয়ে চারি দিকেই ফণা তুলে আছে, তাই আমরা স্বদেশের দায়িত্ব-ভার নিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। আমাদের আপন লোকদেরকে দিয়েও এ কথা কবুল করিয়ে নেবার ইচ্ছা তার স্বভাবতই হবে যে, আগেকার আমলে অবস্থা ছিল ভালো। সেই যুগান্তরের সময়ে যে যে গুহায় আমাদের আত্মীয়বিদ্বেষের মারগুলো লুকিয়ে আছে সেই সেই খানে খুব করেই খোঁচা খাবে। সেইটি আমাদের বিষম পরীক্ষার সময়। সে পরীক্ষা সমস্ত পৃথিবীর কাছে। এখন থেকে সর্বপ্রকারে প্রস্তুত থাকতে হবে যেন বিশ্বজগতের দৃষ্টির সামনে মূঢ়তায় বর্বরতায় আমাদের নূতন ইতিহাসের মুখে কালী না পড়ে।

শ্রাবণ ১৩৩৮

হিজলি ও চট্টগ্রাম

প্রথমেই বলে রাখা ভালো, আমি রাষ্ট্রনেতা নই, আমার কর্মক্ষেত্র রাষ্ট্রিক আন্দোলনের বাইরে। কর্তৃপক্ষদের কৃত কোনো অন্যায় বা ত্রুটি নিয়ে সেটাকে আমাদের রাষ্ট্রিক খাতায় জমা করতে আমি বিশেষ আনন্দ পাই নে। এই-যে হিজলির গুলি চালানো ব্যাপারটি আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় তার শোচনীয় কাপুরুষতা ও পশুত্ব নিয়ে যা-কিছু আমার বলবার সে কেবল অবমানিত মনুষ্যত্বের দিকে তাকিয়ে।

এতবড়ো জনসভায় যোগ দেওয়া আমার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর, মনের পক্ষে উদ্‌ভ্রান্তিজনক, কিন্তু যখন ডাক পড়ল থাকতে পারলুম না। ডাক এল সেই

পীড়িতদের কাছ থেকে, রক্ষকনামধারীরা যাদের কণ্ঠস্বরকে নরঘাতক নিষ্ঠুরতা -দ্বারা চিরদিনের মতো নীরব করে দিয়েছে।

যখন দেখা যায় জনমতকে অবজ্ঞার সঙ্গে উপেক্ষা করে এত অনায়াসে বিভীষিকার বিস্তার সম্ভবপর হয় তখন ধরে নিতেই হবে যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের চরিত্র বিকৃত হয়েছে এবং এখন থেকে আমাদের ভাগ্যে দুর্দম দৌরাত্ম্য উত্তরোত্তর বেড়ে চলবার আশঙ্কা ঘটল। যেখানে নির্বিবেচক অপমান ও অপঘাতে পীড়িত হওয়া দেশের লোকের পক্ষে এত সহজ, অথচ যেখানে যথোচিত বিচারের ও অন্যায়-প্রতিকারের আশা এত বাধাগ্রস্ত, সেখানে প্রজারক্ষার দায়িত্ব যাদের 'পরে সেই-সব শাসনকর্তা এবং তাদেরই আত্মীয়-কুটুম্বদের শ্রেয়োবুদ্ধি কলুষিত হবেই এবং সেখানে ভদ্রজাতীয় রাষ্ট্রবিধির ভিত্তি জীর্ণ না হয়ে থাকতে পারে না।

এই সভায় আমার আগমনের কারণ আর কিছুই নয়, আমি আমার স্বদেশবাসীর হয়ে রাজপুরুষদের এই বলে সতর্ক করতে চাই যে, বিদেশীরাজ যত পরাক্রমশালী হোক-না কেন আত্মসম্মান হারানো তার পক্ষে সকলের চেয়ে দুর্বলতার কারণ। এই আত্ম-সম্মানের প্রতিষ্ঠা ন্যায়পরতায়, ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও অবিচলিত সত্যনিষ্ঠায়। প্রজাকে পীড়ন স্বীকার করে নিতে বাধ্য করানো রাজার পক্ষে কঠিন না হতে পারে, কিন্তু বিধিদত্ত অধিকার নিয়ে প্রজার মন যখন স্বয়ং রাজাকে বিচার করে তখন তাকে নিরস্ত করতে পারে কোন্ শক্তি। এ কথা ভুললে চলবে না যে, প্রজার অনুকূল বিচার ও আন্তরিক সমর্থনের 'পরেই অবশেষে বিদেশী শাসনের স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

আমি আজ উগ্র উত্তেজনাবাক্য সাজিয়ে সাজিয়ে নিজের হৃদয়াবেগের ব্যর্থ আড়ম্বর করতে চাই নে এবং এই সভার বক্তাদের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, তাঁরা যেন এই কথা মনে রাখেন যে, ঘটনাটা স্বতই আপন কলঙ্কলাঞ্ছিত নিন্দার পতাকা যে উচ্চে ধরে আছে তত ঊর্ধ্বে আমাদের ধিক্কারবাক্য পূর্ণবেগে পৌঁছতেই পারবে না। এ কথাও মনে রাখতেই হবে যে, আমরা নিজের চিত্তে সেই গম্ভীর শান্তি যেন রক্ষা করি যাতে করে পাপের মূলগত প্রতিকারের কথা চিন্তা করবার স্থৈর্য আমাদের থাকে এবং আমাদের নির্যাতিত ভ্রাতাদের কঠোর কঠিন দুঃখস্বীকারের প্রত্যুত্তরে আমরাও কঠিনতর দুঃখ ও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হতে পারি।

উপসংহারে শোকতপ্ত পরিবারদের নিকট আমাদের আন্তরিক বেদনা নিবেদন করি এবং সেই সঙ্গে এ কথাও জানাই যে, এই মর্মভেদী দুর্যোগের একদা সম্পূর্ণ অবসান হলেও দেশবাসী সকলের ব্যথিত স্মৃতি দেহমুক্ত আত্মার বেদীমূলে পুণ্যশিখার উজ্জ্বল দীপ্তি দান করবে।

কার্তিক ১৩৩৮

২

হিজলি কারার যে রক্ষীরা সেখানকার দু জন রাজবন্দীকে খুন করেছে তাদের প্রতি কোনো একটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র[১] খৃস্টোপদিষ্ট মানবপ্রেমের পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করেছেন। অপরাধকারীদের প্রতি দরদের কারণ এই যে, লেখকের মতে, নানা উৎপাতে তাদের স্নায়ুতন্ত্রের 'পরে এত বেশি অসহ্য চাড় লাগে যে, বিচারবুদ্ধিসংগত স্থৈর্য তাদের কাছে প্রত্যাশাই করা যায় না। এইসব অত্যন্ত-চড়া-নাড়ী-ওয়ালা ব্যক্তিরা স্বাধীনতা ও অক্ষুণ্ণ আত্মসম্মান ভোগ করে থাকে; এদের বাসা আরামের, আহারবিহার স্বাস্থ্যকর; এরাই একদা রাত্রির অন্ধকারে নরঘাতক অভিযানে সকলে মিলে চড়াও হয়ে আক্রমণ করলে সেই-সব হতভাগ্যদেরকে যারা বর্বরতম প্রণালীর বন্ধনদশায় অনির্দিষ্টকালব্যাপী অনিশ্চিত ভাগ্যের প্রতীক্ষায় নিজেদের স্নায়ুকে প্রতিনিয়ত পীড়িত করছে। সম্পাদক তাঁর সকরুণ প্যারাগ্রাফের স্নিগ্ধ প্রলেপ প্রয়োগ করে সেই হত্যাকারীদের পীড়িত চিত্তে সান্ত্বনা সঞ্চার করেছেন।

অধিকাংশ অপরাধেরই মূলে আছে স্নায়বিক অভিভূতি এবং লোভ ক্লেশ ক্রোধের এত দুর্দম উত্তেজনা যে তাতে সামাজিক দায়িত্ব ও কৃত কার্যের পরিণাম সম্পূর্ণ ভুলিয়ে দেয়। অথচ এরকম অপরাধ স্নায়ুপীড়া বা মানসিক বিকার থেকে উদ্‌ভূত হলেও আইন তার সমর্থন করে না; করে না বলেই মানুষ আত্মসংযমের জোরে অপরাধের ঝোঁক সামলিয়ে নিতে পারে। কিন্তু, করুণার পীযূষকে যদি বিশেষ যত্নে কেবল সরকারি হত্যাকারীদের ভাগেই পৃথক করে জোগান দেওয়া হয় এবং যারা প্রথম হতেই অন্তরে নিঃশান্তির আশা পোষণ করছে, যারা বিধিব্যবস্থার রক্ষকরূপে নিযুক্ত হয়েও বিধিব্যবস্থাকে স্পর্ধিত আস্ফালনের সঙ্গে ছারখার করে দিল, যদি সুকুমার স্নায়ুতন্ত্রের দোহাই দিয়ে তাদেরই জন্যে একটা স্বতন্ত্র আদর্শের বিচারপদ্ধতি মঞ্জুর হতে পারে, তবে সভ্যজগতের সর্বত্র ন্যায়বিচারের যে মূলতত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে তাকে অপমানিত করা হবে এবং সর্বসাধারণের মনে এর যে ফল ফলবে তা অজস্র রাজদ্রোহ-প্রচারের দ্বারাও সম্ভব হবে না।

পক্ষান্তরে এ কথা মুহূর্তের জন্যেও আশা করি নে যে, আমাদের দেশে রাষ্ট্রনৈতিক যে-সব গোঁড়ার দল যথারীতি-প্রতিষ্ঠিত আদালতের বিচারে দোষী প্রমাণিত হবে তারা যেন ন্যায়দণ্ড থেকে নিষ্কৃতি পায়— এমন-কি, যদিও বা চোখের সামনে রোমহর্ষক দৃশ্যে ও কাপুরুষ অত্যাচারীদের বিনা শাস্তিতে পরিত্রাণে তাদের স্নায়ুপীড়ার চরমতা ঘটে থাকে।

১ *The Statesman*

বিধর্ষিত আত্মীয়স্বজন ও নিজেদের লাঞ্ছিত মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে যদি তারা কোনো কঠোর দায়িত্ব কল্পনা করে নেয়, তবে সেই সঙ্গে এ কথাও যেন মনে স্থির রাখে যে, সেই দায়িত্বের পুরো মূল্য তাদের দিতেই হবে। এ কথা সকলেরই জানা আছে যে, আমাদের দেশের ছাত্রেরা য়ুরোপীয় ইস্কুলমাস্টারদের যোগেই পাশ্চাত্য দেশে স্বাধীনতালাভের ইতিহাসটিকে বিধিমতে হৃদয়ঙ্গম করে নিয়েছে, এবং এও বলা বাহুল্য যে, সেই ইতিহাস রাজা প্রজা উভয়পক্ষের দ্বারা প্রকাশ্যে বা গোপনে অনুষ্ঠিত আইনবিগর্হিত বিভীষিকায় পরিকীর্ণ— অনতিকাল পূর্বে আয়র্লাণ্ডে তার দৃষ্টান্ত উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশিত।

তথাপি বে-আইনি অপরাধকে অপরাধ বলেই মানতে হবে এবং তার ন্যায়সংগত পরিণাম যেন অনিবার্য হয় এইটেই বাঞ্ছনীয়। অথচ এ কথাও ইতিহাসবিখ্যাত যে, যাদের হাতে সৈন্যবল ও রাজপ্রতাপ অথবা যারা এই শক্তির প্রশ্রয়ে পালিত তারা বিচার এড়িয়ে এবং বলপূর্বক সাধারণের কণ্ঠরোধ করে ব্যাপকভাবে এবং গোপন প্রণালীতে দুর্বৃত্ততার চূড়ান্ত সীমায় যেতে কুণ্ঠিত হয় নি। কিন্তু মানুষের সৌভাগ্যক্রমে এরূপ নীতি শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারে না।

পরিশেষে আমি বিশেষ ভাবে গবর্মেণ্টকে এবং সেই সঙ্গে আমার দেশবাসিগণকে অনুরোধ করি যে, অন্তহীন চক্রপথে হিংসা ও প্রতিহিংসার যুগল তাণ্ডবনৃত্য এখনি শান্ত হোক। ক্রোধ ও বিরক্তিপ্রকাশকে বাধামুক্ত করে দেওয়া সাধারণ মানবপ্রকৃতির পক্ষে স্বাভাবিক সন্দেহ নেই, কিন্তু এটা শাসক শাসয়িতা কারও পক্ষেই সুবিজ্ঞতার লক্ষণ নয়। এরকম উভয়পক্ষে ক্রোধমত্ততা নিরতিশয় ক্ষতিজনক— এর ফলে আমাদের দুঃখ ও ব্যর্থতা বেড়েই চলবে এবং এতে শাসনকর্তাদের নৈতিক পৌরুষের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাসহানি ঘটবে, লোকসমাজে এই পৌরুষের প্রতিষ্ঠা তার ঔদার্যের দ্বারাই সপ্রমাণ হয়।

অগ্রহায়ণ ১৩৩৮

নবযুগ

আজ অনুভব করছি, নূতন যুগের আরম্ভ হয়েছে। আমাদের দেশের পুরাতন ইতিহাস যদি আলোচনা করি তা হলে দেখতে পাই যে, এক-একটি নূতন নূতন যুগ এসেছে বৃহত্তের দিকে, মিলনের দিকে নিয়ে যাবার জন্য সমস্ত ভেদ দূর করবার দ্বার উদ্‌ঘাটন করে দিতে। সকল সভ্যতার আরম্ভেই সেই ঐক্যবুদ্ধি। মানুষ একলা থাকতে পারে না। তার সত্যই এই যে, সকলের যোগে সে বড়ো হয়, সকলের সঙ্গে

মিলতে পারলেই তার সার্থকতা ; এই হল মানুষের ধর্ম। যেখানে এই সত্যকে মানুষ স্বীকার করে সেখানেই মানুষের সভ্যতা। যে সত্য মানুষকে একত্র করে, বিচ্ছিন্ন করে না, তাকে যেখানে মানুষ আবিষ্কার করতে পেরেছে সেখানেই মানুষ বেঁচে গেল। ইতিহাসে যেখানে মানুষ একত্র হয়েছে অথচ মিলতে পারে নি, পরস্পরকে অবিশ্বাস করেছে, অবজ্ঞা করেছে, পরস্পরের স্বার্থকে মেলায় নি, সেখানে মানুষের সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে নি।

আমি যখন জাপানে গিয়েছিলেম তখন একজন জাপানি বৌদ্ধ আমাকে বলেছিলেন যে, বুদ্ধদেবের উপদেশ অনুসারে তিনি বিশ্বাস করেন যে, মৈত্রী কেবল একটা হৃদয়ের ভাব নয়, এ একটি বিশ্বসত্য, যেমন সত্য এই আকাশের আলোক ; এ তো কেবল কল্পনা নয়, ভাব নয়। আলোক একান্ত সত্য বলেই তরুলতা জীবজন্তু প্রাণ পেয়েছে, সমস্ত শ্রী সৌন্দর্য সম্ভব হয়েছে। এই আলোক যেমন সত্য তেমনি সত্য এই মৈত্রী, প্রেম। আমার অন্তরেও সত্য, বাহিরেও সত্য। তিনি বললেন, আমি জানি, এই-যে গাছপালা নিয়ে আমি আছি এ কাজ মালীও করতে পারত ; কিন্তু সে ঐ প্রেমের সত্যটিকে স্বীকার করতে পারত না ; সে কেবল তার কর্তব্য করে যেত, ভালোবাসার সত্য থেকে সে গাছকে বঞ্চিত করত। যে একটি সত্য আছে বিশ্বের অন্তরে ভালোবাসার দ্বারা আমি তার উদ্রেক করছি, তাইতে আমার কাজ পূর্ণ হয়েছে।

বৌদ্ধশাস্ত্রে যাকে বলে পঞ্চশীল সে শুধু 'না'এর সমষ্টি ; কিন্তু সকল বিধিনিষেধের উপরে ও অন্তরে আছে ভালোবাসা, সে 'না' নয়, 'হাঁ'। মুক্তি তার মধ্যেই। সকল জীবের প্রতি প্রেম যখন অপরিমেয় হবে, প্রতিদিন সকল অবস্থায় যখন কামনা করব সকলের ভালো হোক, তাকেই বুদ্ধ বলেছেন ব্রহ্মবিহার, অর্থাৎ বৃহৎ সত্য যিনি তাঁকে পাওয়া। এইটিই সদর্থক, কেবলমাত্র পঞ্চশীল বা দশশীল নঙর্থক। মানুষের জীবনে যেখানে প্রেমের শক্তি, ত্যাগের শক্তি সচেষ্ট সেখানেই সে সার্থক ; নইলে সে আপন নিত্যরূপ পায় না, পদে পদে ছিন্নবিচ্ছিন্ন জীর্ণ হয়ে পড়ে। যেখানে সমাজের কেন্দ্রস্থল থেকে সেই প্রেম নানা কর্মে সেবায় আপনাকে প্রকাশ করে সেখানেই মানুষের সমাজ কল্যাণে শক্তিতে সুন্দর ; যেখানে প্রেমের অভাব সেখানেই বিনাশ।

ভারতবর্ষে এক সময়ে আর্য ও অনার্যের সংগ্রামে মানুষের সত্য পীড়িত হয়েছিল ; ভারতবর্ষ তখনও প্রতিষ্ঠালাভ করে নি। তার পরে আর-একটা যুগ এল। রামায়ণে আমরা তার আভাস পাই, তখন আর্য-অনার্যের যুদ্ধের অবসান হয়ে মিলনের কাল এসেছে। শ্রীরামচন্দ্র সেই মিলনের সত্যকে প্রকাশ করেছিলেন, এমন অনুমান করবার হেতু আছে। আমরা আরও দেখেছি, একসময় যে আনুষ্ঠানিক ধর্ম কর্মকাণ্ড

আকারে প্রধান হয়ে উঠেছিল অন্য সময়ে সে জ্ঞানের প্রাধান্য স্বীকার করে বিশ্বভৌমিকতাকে বরণ করেছে। তখন এই বাণী উঠল যে, নিরর্থক কৃচ্ছ্রসাধন নয়, আত্মপীড়ন নয়, সত্যই তপস্যা, দান তপস্যা, সংযম তপস্যা। ক্রিয়াকাণ্ড স্বভাবতই সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ, সে সকলের নয়, সে বিশেষ দলের অনুষ্ঠান, সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান। যে ধর্ম শুধু বাহ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে শৃঙ্খলিত তাতে কার কী প্রয়োজন। অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে আপনার প্রাণ আহুতি দিয়ে ব্যক্তিবিশেষ যে অদ্ভুত কর্ম করল তাতে কার কী এল গেল। কিন্তু, যিনি সত্যকার যোগী সকলের সঙ্গে যোগে তিনি বিশ্বাত্মার সঙ্গে যুক্ত; তিনি বললেন, যা-কিছু মঙ্গল, যা সকলের ভালোর জন্য, তাই তপস্যা। তখন বন্ধ দুয়ার খুলে গেল। দ্রব্যময় যজ্ঞে মানুষ শুধু নিজের সিদ্ধি খোঁজে; জ্ঞানযজ্ঞে সকলেরই আসন পাতা হল, সমস্ত মানুষের মুক্তির আয়োজন সেইখানে। এই কথা স্বীকার করবা মাত্র সভ্যতার নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়। ভগবদ্গীতায় আমরা এই নূতনের আভাস পাই, যেখানে ত্যাগের দ্বারা কর্মকে বিশুদ্ধ করবার কথা বলা হয়েছে, নিরর্থক অনুষ্ঠানের মধ্যে তাকে আবদ্ধ রাখতে বলে নি। ইহুদিদের মধ্যেও দেখি, ফ্যারিসিরা সংস্কার ও অনুষ্ঠানকেই বড়ো স্থান দিয়ে আসছিল। যীশু বললেন, এ তো বড়ো কথা নয়— কী খেলে কী পরলে তা দিয়ে তো লোক শুচি হয় না, অন্তরে সে কী তাই দিয়ে শুচিতার বিচার। এ নূতন যুগের চিরন্তন বাণী।

আমাদের যদি আজ শুভবুদ্ধি এসে থাকে তবে সকলকেই আমরা সম্মিলিত করবার সাধনা করব। আজ ভাববার সময় এল। মানুষের স্পর্শে অশুচিতার আরোপ করে অবশেষে সেই স্পর্শে দেবতারও শুচিতানাশ কল্পনা করি। এ বুদ্ধি হারাই যে, তাতে দেবতার স্বভাবকে নিন্দা করা হয়। তখন আমরা সম্প্রদায়ের মন্দিরে অর্ঘ্য আনি, বিশ্বনাথের মন্দিরের বিশ্বদ্বার রুদ্ধ করে দিয়ে তাঁর অবমাননা করি। মানুষকে লাঞ্ছিত করে হীন করে রেখে পুণ্য বলি কাকে।

আমি একসময় পদ্মাতীরে নৌকোয় ছিলেম। একদিন আমার কানে এল, একজন বিদেশী রুগ্ণ হয়ে শীতের মধ্যে তিন দিন নদীর ধারে পড়ে আছে। তখন কোনো একটা যোগ ছিল। সেই মুমূর্ষুর ঠিক পাশ দিয়েই শত শত পুণ্যকামী বিশেষ স্থানে জলে ডুব দিয়ে শুচি হবার জন্য চলেছে। তাদের মধ্যে কেউ পীড়িত মানুষকে ছুঁল না। সেই অজ্ঞাতকুলশীল পীড়িত মানুষের সামান্য মাত্র সেবা করলে তারা অশুচি হত, শুচি হবে জলে ডুব দিয়ে। জাত বলে একটা কোন্ পদার্থ তাদের আছে মানব-জাতীয়তার চেয়েও তাকে বড়ো বলে জেনেছে। যদি কারো মনে দয়া আসত, সেই দয়ার প্রভাবে সে যদি তার বারুণীস্নান ত্যাগ করে ঐ মানুষটিকে নিজের ঘরে নিয়ে সেবা করত, তা

হলে সমাজের মতে কেবল যে বারুণীর স্নানের পুণ্য সে হারাত তা নয়, সে দণ্ডনীয় হত, তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। তার ঘরে এসে রোগী যদি মরত তা হলে সমাজে সে বিষম বিপন্ন হয়ে পড়ত। যে মানবধর্ম সকল নিরর্থক আচারের বহু ঊর্ধ্বে তাকে দণ্ড মেনে নিতে হবে আচারীদের হাতে।

একজন প্রাচীন অধ্যাপক আমাকে বললেন, তাঁর গ্রামের পথে ধূলিশায়ী আমাশয়-রোগে-পীড়িত একজন বিদেশী পথিককে তিনি হাটের টিনের চালার নীচে স্থান দিতে অনুরোধ করেছিলেন। যার সেই চালা সে বললে, পারব না। তিনিও লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করলেন যে, তিনিও সমাজের দণ্ডের ভয়েই তাকে আশ্রয় দিতে পারেন নি। অর্থাৎ মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্যসাধন শাস্তির যোগ্য। তিনি হোমিওপ্যাথি জানতেন, পথের ধারেই তাকে কিছু ওষুধপত্র দিয়েছিলেন। আরোগ্যের দিকে যাচ্ছিল, এমনসময় রাত্রে শিলাবৃষ্টি হল ; পরদিন সকালে দেখা গেল, সে মরে পড়ে আছে। পাপপুণ্যের বিচার এতবড়ো বীভৎসতায় এসে ঠেকেছে। মানুষকে ভালোবাসায় অশুচিতা, তাকে মনুষ্যোচিত সম্মান করায় অপরাধ। আর জলে ডুব দিলেই সব অপরাধের স্খালন। এর থেকে মনে হয়, যে অভাব মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো অভাব সে প্রেমের অভাব। সে প্রেমের অভাবকে হৃদয়ে নিয়ে আমরা যাকে শুচিতা বলে থাকি তাকে রক্ষা করতে পারি, কিন্তু মনুষ্যত্বকে বাঁচাতে পারি নে।

আশা করি, দুর্গতির রাত্রি-অবসানে দুর্গতির শেষ সীমা আজ পেরোবার সময় এল। আজ নবীন যুগ এসেছে। আর্যে-অনার্যে একদা যেমন মিলন ঘটেছিল, শ্রীরামচন্দ্র যেমন চণ্ডালকে বুকে বেঁধেছিলেন, সেই যুগ আজ সমাগত। আজও যদি আমাদের মধ্যে প্রেম না আসে, কঠিন কঠোর নিষ্ঠুর অবজ্ঞা মানুষের থেকে মানুষকে দূর করে রাখে, তবে বাঁচব কী করে। রাউণ্ড্ টেবিলে গিয়ে, ভোটের সংখ্যা নিয়ে কাড়াকাড়ি করে? পশুর প্রতি আমরা যে ব্যবহার করি মানুষকে যদি তার চেয়েও অধম স্থান দিই তবে সেই অধমতা কি আমাদের সমস্ত সমাজেরই বুকের উপর চেপে বসবে না।

মানুষকে কৃত্রিম পুণ্যের দোহাই দিয়ে দূরে রেখেছি, তারই অভিশাপে আজ সমস্ত জাতি অভিশপ্ত। দেশজোড়া এতবড়ো মোহকে যদি আমরা ধর্মের সিংহাসনে স্থির-প্রতিষ্ঠ করে বসিয়ে রাখি তবে শত্রুকে বাইরে খোঁজবার বিড়ম্বনা কেন।

নবযুগ আসে বড়ো দুঃখের মধ্য দিয়ে। এত আঘাত এত অপমান বিধাতা আমাদের দিতেন না যদি এর প্রয়োজন না থাকত। অসহ্য বেদনায় আমাদের প্রায়শ্চিত্ত চলছে, এখনও তার শেষ হয় নি। কোনো বাহ্য পদ্ধতিতে পরের কাছে ভিক্ষা করে আমরা স্বাধীনতা পাব না ; কোনো সত্যকেই এমন করে পাওয়া যায় না। মানবের

যা সত্যবস্তু সেই প্রেমকে আমরা যদি অন্তরে জাগরূক করতে পারি তবেই আমরা সব দিকে সার্থক হব। প্রেম থেকে যেখানে ভ্রষ্ট হই সেখানেই অশুচিতা, কেননা সেখান থেকে আমাদের দেবতার তিরোধান। আমাদের শাস্ত্রেও বলছেন, যদি সত্যকে চাও তবে অন্যের মধ্যে নিজেকে স্বীকার করো। সেই সত্যেই পুণ্য এবং সেই সত্যের সাহায্যেই পরাধীনতার বন্ধনও ছিন্ন হবে। মানুষের সম্বন্ধে হৃদয়ের যে সংকোচ তার চেয়ে কঠোর বন্ধন আর নেই।

মানুষকে মানুষ বলে দেখতে না পারার মতো এতবড়ো সর্বনেশে অন্ধতা আর নেই। এই বন্ধন এই অন্ধতা নিয়ে কোনো মুক্তিই আমরা পাব না। যে মোহে আবৃত হয়ে মানুষের সত্য রূপ দেখতে পেলুম না সেই অপ্রেমের অবজ্ঞার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাক, যা যথার্থভাবে পবিত্র তাকে যেন সত্য করে গ্রহণ করতে পারি।

৭ পৌষ ১৩৩৯

প্রচলিত দণ্ডনীতি

আজ একটি বিশেষ নির্দিষ্ট দিনে বন্দীদের দুঃখে দরদ জানাবার জন্যে তোমরা সভা আহ্বান করেছ। সম্প্রতি আমাদের দেশে বিশেষ উপলক্ষে বিশেষ দিনে দল বেঁধে আন্দোলন করবার একটা রীতি দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। তাতে কিছুক্ষণের জন্যে নিজেদের নালিশ উপভোগ করবার একটা নেশায় আমাদের পেয়ে বসে। সেটার রাষ্ট্রীয় সার্থকতা যদি কিছু থাকে তো থাক্, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে এইরকম পোলিটিকাল দশা পাওয়ার উত্তেজনা উদ্রেক করা আমাদের এখানকার কাজের ও ভাবের সঙ্গে সংগত হয় বলে আমি মনে করি নে।

দেশের বিশেষ অনুরোধে ও প্রয়োজনে আমার যা বলবার সে আমি আশ্রমের বাইরে যথোচিত জায়গায় বলেছি, আজ আমার এখানে কিছু যদি বলতে হয় তবে আমি বলব, প্রচলিত দণ্ডনীতি সম্বন্ধে আমার সাধারণ মন্তব্য।

মনে আছে, ছেলেবেলায় পুলিসকে একটা প্রকাণ্ড বিভীষিকা-বিভাগের অন্তর্গত বলে মনে করতুম। যেমন স্বাভাবিক মানবজীবনের সঙ্গে দৈত্যদানব-ভূতপ্রেতের সহজ সামঞ্জস্য নেই, এ যেন সেইরকম। তাই তখন মনে করতুম, চোরও বুঝি মানুষ-জাতির স্বভাবগণ্ডির অত্যন্ত বাইরেকার বিকৃতি। এমন সময়ে চোরকে স্বচক্ষে দেখলুম, আমাদেরই বাড়ি থেকে অত্যন্ত ত্রস্ত হয়ে দরোয়ানদের লক্ষ এড়িয়ে পালিয়ে

যাবার চেষ্টা করছে। বিস্মিত হয়ে দেখলুম, সে নিতান্ত সাধারণ মানুষেরই মতো, এমন-কি তার চেয়ে দুর্বল।

আমার সেদিনকার চমক আজও ভাঙবার সময় আসে নি। যারা যে কারণেই হোক আইন ভেঙে অপরাধীর শ্রেণীতে গণ্য হয়েছে তাদের সম্বন্ধে এমন একটা সংস্কার বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, তাদের প্রতি অমানুষিক ব্যবহার করতে মন বাধা পায় না। ধরে রেখেছি, তারা আমাদের মতো নয়; আর যারা আমাদের মতো নয় তাদের প্রতি আচরণ অত্যাচার হয়ে উঠলে সমস্ত সমাজেরই যেন সমর্থন পাওয়া যায়। সমাজের গূঢ় অন্তরে যে নির্দয় প্রবৃত্তি আছে তাই চরিতার্থ করবার উপলক্ষ হয়ে ওঠে এরা।

আমার আর-একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি, এ ঘটেছিল পরের বয়সে। একদিন কোলকাতার রাস্তায় যেতে যেতে দেখলুম, পুলিস একজন আসামীকে— সে অপরাধ করে থাকতেও পারে, নাও পারে— কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে চলেছে সমস্ত রাস্তার জনতার মাঝখান দিয়ে। মানুষকে এমন জন্তুর মতো করে বেঁধে নিয়ে যাওয়া, এতে আমাদের সকলেরই অপমান। আমার মনে এটা এত যে লেগেছিল তার একটা কারণ, এ রকম কুদৃশ্য আমি ইংলণ্ডে বা য়ুরোপের আর-কোথাও দেখি নি। এর মধ্যে দুটো আঘাত একত্রে ছিল— এক হচ্ছে মানুষের প্রতি অপমান; আর-এক, বিশেষভাবে আমার দেশের লোকের প্রতি অপমান— এক হচ্ছে আইনভাঙা অপরাধীর প্রতি নির্দয়তা; আর-এক, আমাদের স্বদেশীয় অপরাধীর প্রতি অবজ্ঞা। সুতরাং সেই অবজ্ঞার ভাগী আমরা সকলেই। আমাদের দেশেই বিধিনির্দিষ্ট দণ্ডপ্রয়োগের অতিরিক্ত অপমান-প্রয়োগ সমস্ত জাতকে লাঞ্ছিত করে।

নির্দয় প্রণালী যে কার্যকরী, এই ধারণা বর্বর প্রবৃত্তির স্বভাবসংগত। পাঠশালা থেকে আরম্ভ করে পাগলাগারদ পর্যন্ত এর ক্রিয়া দেখা যায়। এর প্রধান কারণ, মানুষের মনে যে বর্বর মরে নি নির্দয়তায় সে রস পায়। সভ্য দেশে সেই রসসম্ভোগের স্থান সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। তার কারণ, কালক্রমে মানুষ খানিকটা সভ্য হয়েছে, সেই খানিকটা-সভ্য মানুষ আপনার ভিতরকার বর্বর মানুষকে লজ্জা দেয় এবং সংযত করে। যেখানে সেই সংযমের দাবি নেই সেখানে বর্বর সম্পূর্ণ ছাড়া পায়, নির্দয়তাই বৈধ হয়ে ওঠে। জেলখানায় মনুষ্যত্বের আদর্শ বর্বরের দ্বারা প্রতিদিন পীড়িত হচ্ছে, তাতে সন্দেহ নেই।

সমাজের দুষ্ট প্রবৃত্তি শোধনের কর্তব্যতা অনেক বেশি অতিক্রম করে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার বর্বর ধর্ম যদি জেলখানা আশ্রয় করে না থাকত, তা হলে ওখান থেকে দণ্ডবিধির দুর্বিষহ উগ্রতা লজ্জিত হয়ে চলে যেত। পাপকে সমাজের যে-কোনো জায়গাতেই ছোটো বড়ো যে-কোনো আকারেই প্রশ্রয় দেওয়া যায়, তলে তলে সে আপন

সীমা বাড়িয়ে চলতে থাকে। তারই কুৎসিত দৃষ্টান্ত দেখতে পাই আধুনিক য়ুরোপে। সেখানে সভ্যনামধারী বড়ো বড়ো দেশে শাস্তিদানের দানবিক দন্তবিকাশ নির্মম স্পর্ধার সঙ্গে সর্বত্রে সভ্যতাকে যেরকম বিদ্রূপ করতে উদ্যত হয়েছে, তার মূল রয়েছে সকল দেশের সব জেলখানাতেই। অনেক কাল থেকে অনেক খরচ করে সয়তানকে মানুষের রক্ত খাইয়ে পুষে রাখবার জন্যে বড়ো বড়ো পিঞ্জর রাখা হয়েছে। হিংস্রতার ঠগিধর্ম-উপাসক ফাসিজমের জন্মভূমিই হচ্ছে সভ্যতার আত্মবিরোধী এইসব জেলখানায়।

এইসব শাসনকেন্দ্র আপন আশেপাশে মনুষ্যত্বের কিরকম বিকৃতি ঘটাতে থাকে তার একটা দৃষ্টান্ত অনেক দিন পরে আমি আজও ভুলতে পারি নি। চীনযাত্রাকালে আমাদের জাহাজ পৌঁছল হংকং বন্দরে। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে দেখলুম, একজন চীনা ফেরিওয়ালা জাহাজের যাত্রীদের কাছে পণ্য বিক্রি করবার চেষ্টায় তীরে এসেছিল। তাদের নিষেধ করবার নিয়ম হয়তো ছিল। সেই কর্তব্য পালনের উপলক্ষে দেখলুম, আমাদের স্বদেশীয় শিখ কন্‌স্টেবল তার বেণী ধরে টেনে অনায়াসে তাকে লাথি মারলে। রূঢ়তা করার দ্বারা ঔদ্ধত্যের যে আনন্দ আদিম অসংস্কৃত বুদ্ধির মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে দণ্ডনীতির অসভ্যতাই তাকে অবারিত করবার সুযোগ দেয়।

মনে মনে কল্পনা করলুম, একজন য়ুরোপীয়— সে ফেরিওয়ালা নয়, হয়তো সে চোর, সে প্রতারক, সে দুর্বৃত্ত— তাকে ঐ শিখ কনস্‌টেবল গ্রেফ্‌তার করত, কর্তব্যের অনুরোধে মাথায় এক ঘা লাঠিও বসাতে পারত, কিন্তু তাকে কানে ধরে লাথি মারতে পারত না। ঐ কনস্‌টেবল নিষেধ করেছিল ফেরিওয়ালাকে, লাথি মেরেছিল সমস্ত জাতকে। অবজ্ঞাভাজন জাতির মানুষ কেবল যে অপমান ভোগ করে তা নয়, সহজেই তার সম্বন্ধে দণ্ডের কঠোরতা প্রবল হয়ে ওঠে। হয় যে, তার কারণ মানুষের গূঢ় দুষ্প্রবৃত্তি এইসকল ক্ষেত্রে বর্বরতার রসসম্ভোগের সুযোগ পায়।

বেণী ধরে টেনে লাথি মারতে যারা অকুণ্ঠিত সেই-শ্রেণীয় রাজানুচর এ দেশে নিঃসন্দেহ অনেক আছে। যে কারণে চীনে তাদের দেখেছি সেই কারণ এখানেও প্রবল। সেই অবজ্ঞা এবং তার আনুষঙ্গিক নিষ্ঠুরতা স্থায়ীভাবে এ দেশের আবহাওয়াকে ব্যাধিগ্রস্ত করেছে, এ কথা আমরা অনুভব করি।

এই প্রসঙ্গে আর-এক দিনের কথা আমি বলব। তখন শিলাইদহে ছিলুম। সেখানকার জেলেদের আমি ভালোরকম করেই জানতুম। তাদের জীবিকা জলের উপর। ডাঙার অধিকার যেমন পাকা, জলের অধিকার তেমন নয়। জলের মালেকরা তাদের উপর যেমন তেমন অত্যাচার করতে পারত; এই হিসাবে চাষীদের চেয়েও জেলেরা অসহায়। একবার জলকরের কর্তার কর্মচারী এসে অনধিকারে

কোনো নৌকা থেকে প্রচুর পরিমাণে মাছ তুলে নিল নিজের ডিঙিতে। এরকম ঘটনা সর্বদাই ঘটত। অন্যায় সহ্য করে যাওয়াই যার পক্ষে বাঁচবার সহজ উপায় এইবার সে সইতে পারল না, দিলে সেই কর্মচারীর কান কেটে। তার পরে রাত্রি তখন দু'পহর হবে, জেলেদের কাছ থেকে আমার বোটে লোক এল; বললে, সমস্ত জেলেপাড়ায় পুলিস লেগেছে। বললে, কঠোর আচরণ থেকে আমাদের মেয়েদের ছেলেদের রক্ষা করুন। তখনি একটি ভদ্রলোককে পাঠিয়ে দিলুম। সরকারি কাজে বাধা দেবার জন্যে নয়, কেবল উপস্থিত থাকবার জন্যে। তার অন্য শক্তি নেই, কিন্তু ভদ্র ব্যবহারের আদর্শ আছে। উপস্থিতি-দ্বারা সেই আদর্শকে প্রকাশ করেই অন্যায়ের সে প্রতিবাদ করতে পারবে।

আমাদের দেশের কারাবাসীদের সম্বন্ধেও তার বেশি আমাদের কিছু করবার নেই। আমরা জানাতে পারি কোন্‌টা ভদ্র কোন্‌টা ভদ্র নয়, মানবধর্মের দোহাই দিতে পারি। কিন্তু জানাব কাকে, দোহাই দেব কার সামনে দাঁড়িয়ে। জানাতে হবে তাদেরই যারা বেণী ধরে টান দেবার দলে, যারা মধ্যবর্তী, যারা বিদেশী রাজ্যশাসনের আধারে স্বদেশীর প্রতি অসম্মান ভরে তুলতে কুণ্ঠিত হয় না।

একটা কথা মনে রাখতে হবে, কোনো অপরাধীকে দণ্ড দেবার পূর্বে আইনে বাঁধা অত্যন্ত সতর্ক বিচারের প্রণালী আছে। এই সভ্যনীতি আমরা পেয়েছি ইংরেজের কাছ থেকে। এই নীতির 'পরে আমাদের দাবি অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এক সময়ে সরাসরি কাজির বিচার প্রচলিত ছিল। ব্যক্তিগত আন্দাজের উপর, পক্ষপাতের উপর যে বিচার-প্রণালীর ভিত্তি ছিল তাকে আমরা অশ্রদ্ধা করতে শিখেছি। এ কথা আজ আমাদের কাছে সহজ হয়েছে যে, অপরাধের অপবাদ-আরোপের পর থেকেই কোনো অভিযুক্তের প্রতি অন্যায় করা সহজ ছিল যে যুগে সে যুগের দণ্ডনীতি সভ্য আদর্শের ছিল না; মানুষের স্বাধীনতার অধিকার তখন অনিশ্চিত ভিত্তিতে স্থাপিত ছিল। সভ্যদেশে এ কথাও স্বীকৃত হয়েছে যে, অপরাধের নিঃসংশয় প্রমাণের জন্য প্রমাণতত্ত্বের অনুশাসনের ভিতর দিয়ে বৈধ সাক্ষ্যের সন্ধান ও বিশ্লেষণের জন্য অভিজ্ঞ বিচারক ও বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর প্রয়োজন আছে। এই বিশ্বাসের 'পরে যদি আস্থা না রাখি তা হলে আইন-আদালতকে প্রকাণ্ড অপব্যয়ের খেলা বলতে হবে। এই ব্যবস্থার মধ্যে নির্বিশেষে সকল মানুষের 'পরে যে সম্মান আছে এতদিন ধরে সেই নীতিকে শ্রদ্ধা করতে শিখছি। এও জানি, এত সাবধান হয়েও অনেক ঘটনায় অপরাধের শেষ মীমাংসা হয় নি। বহু নির্দোষী দণ্ডভোগ করেছে।

তবু যদি স্থির হয় যে বিশেষ স্থলে অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে গোপনে সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করে আন্দাজে বিচার ও আশু শাস্তিদান অনিবার্য, তবে তা নিয়ে তর্ক করতে

চাই নে, কিন্তু এ কথা বলতেই হবে এমন স্থলে শাস্তির পরিমাণ দুঃসহ না হওয়াই উচিত, এমন হওয়া চাই যাতে বিচারের ভুলে নিরপরাধের প্রতি শাস্তি অতি কঠোর হয়ে অনুতাপের কারণ না ঘটে। কেবলমাত্র বন্দীদশাই তো কম দুঃখকর নয়, তার উপরে শাসনের ঝালমসলা প্রচুর করে তুলে তার তীব্রতা বাড়িয়ে তোলাকে তো কোনোমতেই সভ্যনীতি বলতে পারি নে। ঝালমসলা যে কটুজাতীয়, বাহির থেকে তার আন্দাজ করতে পারি মাত্র। যখন বৈধ উপায়ে নিঃসন্দেহে দোষ-প্রমাণ-চেষ্টার অসুবিধা আছে বলে মনে করা হয়, অন্তত তখন এই সংশয়ের ক্ষেত্রে করুণার স্থান রাখা চাই।

কারাগার থেকে অন্তিম মুহূর্তে যাদের মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে যক্ষ্মারোগে মরবার জন্যে, তারা সকলেই এই বিলম্বিত মৃত্যুযন্ত্রণা-ভোগের নিশ্চিত যোগ্য— এমন কথা বিনা বিচারে তোমরা কি নিঃসংশয়ে বলতে পার, হে আমার দেশবাসীর স্বদেশী প্রতিনিধি!

বহুদিনসঞ্চিত একটা দুঃখের কথা কি আজ বলব। অল্প কালের মধ্যে দেশে অনেক বড়ো বড়ো মারকাট খুনোখুনি হয়ে গেছে। যাঁরা চক্ষে দেখেছেন, আত্মীয়স্বজনসহ তাঁরা অসহ্য দুঃখ পেয়েছেন। যাঁরা ভিতরের কথা জানেন তাঁদের যোগে যে-সব জনশ্রুতি দেশে রাষ্ট্র হয়েছে, দেশের লোক তাকে বিশ্বাস করবার যুক্তিসংগত কারণ পেয়েছেন। কিন্তু, কর্তৃপক্ষ এই নির্দয় ব্যাপারকে পোলিটিকাল অপরাধের শ্রেণীতে গণ্য করেন নি বলে অনুমানকে শেষ পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে বিনা জবাবদিহিতে কারো কোনো দণ্ডবিধান করেন নি। অপর ক্ষেত্রে তাই করেছেন এবং দেশের প্রতিনিধিরা একে ন্যায্য বলে সমর্থনও করেন। পলিটিক্সে খুনজখম লুঠপাটের জন্যে যারা দায়ী তারা ঘৃণ্য, অপর ক্ষেত্রেও যারা দায়ী তারা কম ঘৃণ্য নয়। এক ক্ষেত্রে গোপন সন্ধানে তাদের আবিষ্কার করা সহজ, অপর ক্ষেত্রে সহজ নয়, এমন অদ্ভুত কথা বলা চলে না। উভয় ব্যাপারেই শাসনের প্রয়োজন আছে। হয়তো গুপ্ত পাপচক্রান্তের বিধিনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া সম্ভব নয়— তবুও পাপের হেয়তা ও পরিমাণ কোনো পক্ষেই কম নয়।

পূর্বেই বলেছি, দণ্ডপ্রয়োগের অতিকৃত রূপকে আমি বর্বরতা বলি। আমি কোনো পক্ষেই হিংসার মূল্য হিংস্রতা দিয়ে দিতে চাই নে; কিন্তু সমাজ ও রাজার তরফ থেকে ধিক্কারের দ্বারা বিচারের প্রয়োজন আছে, উভয় পক্ষেই। নির্জন কারাকক্ষবাস বা আন্দামানে নির্বাসন আমি কোনোপ্রকার অপরাধীর জন্য সমর্থন করি নে, যাঁরা দেশবাসীর প্রতিনিধির পদে উচ্চ শাসনমঞ্চে সমাসীন তাঁরা যদি করেন আমি নীচে দাঁড়িয়ে তাঁদের প্রতিবাদ করব।

শ্রাবণ ১৩৪৪

গ্রন্থপরিচয়

[রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশের তারিখ ও রচনাসংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য গ্রন্থপরিচয়ে সংকলিত হইল।]

নবজাতক

'নবজাতক' ১৩৪৭ সালের বৈশাখ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। তৎপূর্বে ইহার অধিকাংশ কবিতা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে প্রকাশসূচী মুদ্রিত হইল—

উদ্‌বোধন	শতদল। কষ্টিপাথর, প্রবাসী ১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ
প্রায়শ্চিত্ত	প্রবাসী ১৩৪৫ অগ্রহায়ণ
বুদ্ধভক্তি	পরিচয় ১৩৪৪ ফাল্গুন
কেন	প্রবাসী ১৩৪৫ চৈত্র
হিন্দুস্থান	প্রবাসী ১৩৪৪ পৌষ
রাজপুতানা	প্রবাসী ১৩৪৫ মাঘ
ভাগ্যরাজ্য	পরিচয় ১৩৪৪ শ্রাবণ
ভূমিকম্প	নাচঘর ১৩৪০, ৩০ চৈত্র
পক্ষীমানব	বিচিত্রা ১৩৩৯ জ্যৈষ্ঠ
রাতের গাড়ি	জয়শ্রী ১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ
মৌলানা জিয়াউদ্দীন	প্রবাসী ১৩৪৫ শ্রাবণ
এপারে-ওপারে	প্রবাসী ১৩৪৬ শ্রাবণ
মংপু পাহাড়ে	পরিচয় ১৩৪৫ শ্রাবণ
ইস্‌টেশন	কবিতা ১৩৪৫ আশ্বিন
জবাবদিহি	প্রবাসী ১৩৪৭ বৈশাখ
প্রবাসী	'জন্মদিন' : প্রবাসী ১৩৪৬ জ্যৈষ্ঠ
জন্মদিন	প্রবাসী ১৩৪৬ আষাঢ়
রোম্যান্টিক	কবিতা ১৩৪৬ পৌষ
ক্যাণ্ডীয় নাচ	প্রবাসী ১৩৪৪ শ্রাবণ
অবর্জিত	প্রবাসী ১৩৪২ শ্রাবণ
শেষ হিসাব	কবিতা ১৩৪৬ আশ্বিন
জয়ধ্বনি	প্রবাসী ১৩৪৬ পৌষ

প্রজাপতি	প্রবাসী ১৩৪৬ বৈশাখ
প্রবীণ	প্রবাসী ১৩৪৫ পৌষ
রাত্রি	প্রবাসী ১৩৪৬ মাঘ

'উদ্‌বোধন' কবিতাটির যে পাঠ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত ছিল। উক্ত পাঠ অনুসারে, নিম্নোদ্ধৃত নূতন চারিটি ছত্রের অনুবৃত্তিস্বরূপ নবজাতকে মুদ্রিত পাঠের শেষ একাদশ ছত্র (পৃ. ৭) পড়িতে হইবে—

শুকতারকার প্রথম প্রদীপ হাতে
অরুণ-আভাস-জড়ানো ভোরের রাতে
আমি এসেছিনু তোমারে জাগাব ব'লে
তরুণ আলোর কোলে—

কবিতাটির আরম্ভের কুড়িটি ছত্র, রবীন্দ্রসদনে-রক্ষিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে, ১৯৩৮ সালের ১৩ অক্টোবর তারিখে শান্তিনিকেতনে স্বতন্ত্র কবিতা-আকারে প্রথম লিখিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। সেই আকারে উহা দ্বিতীয়সংস্করণ গীতবিতানের 'ভূমিকা' রূপে মুদ্রিত হইয়াছিল।

প্রায়শ্চিত্ত কবিতাটির পূর্বতন একটি পাঠ রবীন্দ্রসদনের পাণ্ডুলিপিতে নিম্নরূপ পাওয়া যায়—

বহু শত শত বৎসর ব্যাপি
শত শত দিনে রাতে
দৈন্যের আর স্পর্ধার সংঘাতে
ধিকি ধিকি করে ব্যাপ্ত হয়েছে
পাপের দহনজ্বালা
সভ্যনামিক পাতালপুরীতে যেখানে যক্ষশালা।
মাঝে মাঝে তারি ঝলক লেগেছে
আতিশয্যের 'পরে,
ভাগ্যের তাহা মহিমা বলিয়া
জেনেছে গর্বভরে।
সুখস্বপ্নের নিশীথে উঠিল ভূমিকম্পের রোল—

জয়তোরণের ভিত্তিভূমিতে লাগিল দারুণ দোল।
অহংকারের ফাটিল হর্ম্যচূড়া,
লুণ্ঠিত ধনভাণ্ডার হল গুঁড়া।
বিদীর্ণ হল প্রমোদভবনতল,
তারি গহ্বর ভেদিয়া উঠিল
নাগনাগিনীর দল।
বিষ-উদ্গারে তুলিল লক্ষ ফণা,
প্রলয়শ্বাসে ছুটিল অগ্নিকণা।
রক্তমাতাল যমদূত সবে বীভৎস উৎসবে
ধরণীর বুক চিরিতে লাগিল অট্টহাস্যরবে।
নিরর্থ হাহাকারে
দিয়ো না দিয়ো না অভিশাপ বিধাতারে।
পাপের এ সঞ্চয়
সর্বনাশের উদ্দাম বেগে আগে হয়ে যাক ক্ষয়।
অসহ দুঃখে ব্রণের পিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে তার
কলুষপুঞ্জ করে দিক উদ্গার।
দানবের ভোগে বলি এনেছিল যারা
সেই ভীরুদের দলিত জীবনে উঠুক মৃত্যুধারা।
মিছে করিব না ভয়,
ক্ষোভ জেগেছিল তাহারে করিব জয়।
জমা হয়েছিল আরামের লোভে
দুর্বলতার রাশি,
লাগুক তাহাতে লাগুক আগুন,
ফেলুক তাহারে গ্রাসি।
ঐ দলে দলে ধার্মিক ভীরু কারা চলে গির্জায়
চাটুবাণী দিয়ে ভুলাইতে দেবতায়।
দুর্বলাত্মা মনে জানে ওরা
ভীত প্রার্থনারবে
শান্তি আনিবে ভবে।
তার বেশি কিছু দিতে নাহি মন, শুধু বাণীকৌশলে

জিনিবে ধরণীতলে।
বহু দিবসের পুঞ্জিত লোভ
বক্ষে রাখিয়া জমা
কেবল শাস্ত্রমন্ত্র পড়িয়া
বিধাতার লবে ক্ষমা।
সবে না দেবতা হেন অপমান
এই ফাঁকি ভক্তির।
যদি এ ভুবনে থাকে কোনো তেজ
কল্যাণশক্তির—
ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত
পূর্ণ করিয়া শেষে
নূতন জীবন নূতন আলোকে
জাগিবে নূতন দেশে।

বিজয়াদশমী
১৩৪৫

‘বুদ্ধভক্তি’ কবিতার গদ্যছন্দে লিখিত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি রূপ পত্রপুট গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে বা উহার পুনর্মুদ্রণে সতেরো-সংখ্যক কবিতার আকারে মুদ্রিত আছে। আলোচ্য প্রসঙ্গে বিংশখণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলীর ৫১ পৃষ্ঠা ও গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য।

‘কেন’ কবিতার মিল-বিহীন একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পাঠ পাণ্ডুলিপিতে রহিয়াছে। কবিতাটির উহাই সম্ভবতঃ আদি পাঠ। সমগ্র কবিতাটি নিম্নে মুদ্রিত হইল—

শুনিলাম জ্যোতিষীর কাছে
তপনের আত্মদান-মহাযজ্ঞ হতে
যে জ্যোতি-উৎসর্গ হয় নৈবেদ্যের মতো
এ বিশ্বের মন্দিরমণ্ডপে,
অতি তুচ্ছ অংশ তার
ধরা পড়ে পৃথিবীর অতি ক্ষুদ্র মৃৎপাত্রের তলে।
অবশিষ্ট অমেয় আলোকরশ্মিধারা
আদিম দিগন্ত হতে

অক্লান্ত চলেছে ধেয়ে লক্ষ্যহারা দ্যুলোকে দ্যুলোকে।
সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছে অপার তিমির-তেপান্তরে
অসংখ্য নক্ষত্র হতে
তেজোদীপ্ত অক্ষৌহিণী।
এ কি সর্বত্যাগী অপব্যয়
সর্বগ্রাসী ব্যর্থতার নিঃসীম অতলে।
কিম্বা এ কি মহাকাল
এক হাতে দান করে, ফিরে ফিরে নেয় অন্য হাতে।
যুগে যুগে বারম্বার হিসাব মেলানো
প্রকাণ্ড সঞ্চয়ে অপচয়ে?
কিন্তু কেন।

তার পরে চেয়ে দেখি মানুষের চৈতন্যজগতে।
ভেসে চলে কত চিন্তা কত-না কল্পনা, কত পথে
কত কীর্তি রূপে রসে— তীব্র বেগে
অমরত্ব সন্ধানের উদ্দাম উচ্ছ্বাসে উঠে জেগে
ক্লান্তিহীন চেষ্টা কত।
জ্বলে ওঠে কোথাও বা বাতি
সংসারের যাত্রাপথে তপস্যার তেজে।
কোথাও বা সভ্যতার চিতাবহ্নিদাহ
নিঃস্বতার ভস্মশেষ রেখে।
লক্ষ লক্ষ ঝরিছে নির্ঝর
নিরুদ্দেশ প্রাণস্রোতে বহু ইচ্ছা বহু স্মৃতি লয়ে।
নিত্য নিত্য এমনি কি
অফুরান আত্মহত্যা মানবলোকের।
যুগে যুগান্তরে
মানুষের চিত্ত নিয়ে
মহাকাল কেবলি কি করে দ্যূতখেলা
আপনারি বাঁ হাতে দক্ষিণ হাতে।
কিন্তু কেন।

একদিন প্রথম বয়সে
এ প্রশ্নই জেগেছিল মনে।
শুধায়েছি এ বিশ্বের কোন্ কেন্দ্রস্থলে
মিলিতেছে নিরন্তর
অরণ্যের পর্বতের সমুদ্রের উল্লোলগর্জন,
ঝটিকার বজ্রমন্দ্র,
দিবসের রজনীর মর্মস্থলে
বেদনাবীণার তারে চেতনার মিশ্রিত ঝংকার,
নিদ্রার মর্মরধ্বনি,
বসন্তের বরষার ঋতু-সভাঙ্গনে
জীবনের মরণের অবিশ্রাম কীর্তনকল্লোল,
আলোকের নিঃশব্দ চরণধ্বনি
মহা-অন্ধকারে।
বালকের কল্পনায় দেখেছিনু প্রতিধ্বনিলোক
গুপ্ত আছে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরকন্দরে।
সেথায় বিশ্বের ভাষা চতুর্দিক হতে
নিত্য সম্মিলিত।
সেথা হতে প্রতিধ্বনি নূতন সৃষ্টির ক্ষুধা লয়ে
ফিরে দিকে দিকে।
বহু যুগযুগান্তের বিশ্বনিখিলের ধ্বনিধারা
নক্ষত্রে নক্ষত্রে ঠেকি আমাতে নিয়েছে আজি রূপ
নিবিড় সংহত প্রতিধ্বনি।
আজি শুধাইনু পুনরায়—
আবার কি সূত্র তার ছিন্ন হয়ে যাবে,
রূপহারা গতিবেগ
চলে যাবে বহু কোটি বৎসরের শূন্যযাত্রাপথে
ভেঙে ফেলে দিয়ে তার
স্বল্প-আয়ু বেদনার কমণ্ডলু।
কিন্তু কেন।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
১৮।৯।৩৮

'রাজপুতানা' কবিতাটির রচনা-প্রসঙ্গে শ্রীমতী মৈত্রেয়ীদেবীর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ হইতে রবীন্দ্রনাথের কয়েক ছত্র উক্তি উদ্ধৃত করা হইল—

…ঐ যে বইটা দিয়েছে না, স্টেটস্‌ম্যানের 'সুন্দর ভারত', ওর মধ্যে দেখছিলাম রাজপুতানার ছবি। দেখেই মনে হল, হায় হায় এই কি সেই রাজপুতানা? মৃত্যুর বোঝা বহন ক'রে তবু বেঁচে আছে। এর চেয়ে তার ধ্বংস ছিল ভালো। কোনো এক রকমের জীবনের চাইতে মরণই মঙ্গল, মরণই সম্মানের।

মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, প্রথম মুদ্রণ, পৃ ৩৭

১৩৪০ সালে বিহার-ভূমিকম্পের দুর্গতদের সাহায্য-কল্পে প্রধানতঃ শ্রীপ্রবোধেন্দু-নাথ ঠাকুরের উদ্যোগে কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবীর অভিনয় হইয়াছিল। 'ভূমিকম্প' কবিতাটি সেই উপলক্ষ্যে রচিত ও প্রেরিত হয়।

মৌলানা জিয়াউদ্দীন বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনে ইস্‌লামীয় সংস্কৃতির অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার অকালমৃত্যু ঘটিলে শান্তিনিকেতনে শোকসভায় রবীন্দ্রনাথের যে ভাষণ প্রদত্ত হয় তাহার অনুলিপি 'মৌলানা জিয়াউদ্দীন' কবিতার পরিপূরক-স্বরূপ ১৩৪৫ শ্রাবণের প্রবাসী হইতে নিম্নে মুদ্রিত হইল—

মৌলানা জিয়াউদ্দীন

আজকের দিনে একটা কোনো অনুষ্ঠানের সাহায্যে জিয়াউদ্দীনের অকস্মাৎ মৃত্যুতে আশ্রমবাসীদের কাছে বেদনা প্রকাশ করব, এ কথা ভাবতেও আমার কুণ্ঠাবোধ হচ্ছে। যে অনুভূতি নিয়ে আমরা একত্র হয়েছি তার মূলকথা কেবল কর্তব্যপালন নয়, এ অনুভূতি আরও অনেক গভীর।

জিয়াউদ্দীনের মৃত্যুতে যে স্থান শূন্য হল তা পূরণ করা সহজ হবে না, কারণ তিনি সত্য ছিলেন। অনেকেই তো সংসারের পথে যাত্রা করে, কিন্তু মৃত্যুর পরে চিহ্ন রেখে যায় এমন লোক খুব কমই মেলে। অধিকাংশ লোক লঘুভাবে ভেসে যায় হাল্কা মেঘের মতো। জিয়াউদ্দীন সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না; আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তিনি যে স্থান পেয়েছেন তা নিশ্চিহ্ন হয়ে একদিন একেবারে বিলীন হয়ে যাবে এ কথা ভাবতে পারি নে। কারণ, তাঁর সত্তা ছিল সত্যের উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। আশ্রম থেকে বাইরে গিয়েছিলেন তিনি ছুটিতে, তাঁর এই ছুটিই যে শেষ ছুটি হবে অদৃষ্টের এই নিষ্ঠুর লীলা মন মেনে নিতে চায় না। তিনি আজ পৃথিবীতে নেই সত্য, কিন্তু তাঁর সত্তা ওতপ্রোত ভাবে আশ্রমের সব-কিছুর সঙ্গে মিশে রইল।

তিনি প্রথম আশ্রমে এসেছিলেন বালক বয়সে ছাত্র হিসাবে, তখন হয়তো তিনি ঠিক তেমন ক'রে মিশতে পারেন নি এই আশ্রমিক জীবনের সঙ্গে যেমন পরিপূর্ণ ভাবে মিশেছিলেন পরবর্তী কালে। কেবল যে আশ্রমের সঙ্গে তাঁর হৃদয় ও কর্মপ্রচেষ্টার

সম্পূর্ণ যোগ হয়েছিল তা নয়, তাঁর সমস্ত শক্তি এখানকার আবহাওয়ায় পরিণতি লাভ করেছিল। সকলের তা হয় না। যাঁরা পরিণতির বীজ নিয়ে আসেন তাঁরাই কেবল আলো থেকে হাওয়া থেকে পরিপক্বতা আহরণ করতে পারেন। এই আশ্রমের যা সত্য যা শ্রেষ্ঠ সেটুকু জিয়াউদ্দীন এমনি ক'রেই পেয়েছিলেন। এই শ্রেষ্ঠতা হল মানবিকতার, আর এই সত্য হল আপনাকে সকলের মধ্যে প্রসারিত ক'রে দেবার শক্তি। ধর্মের দিক থেকে এবং কর্মের দিকে অনেকের সঙ্গেই হয়তো তাঁর মূলগত প্রভেদ ছিল, কিন্তু হৃদয়ের বিচ্ছেদ ছিল না। তাঁর চলে যাওয়ায় বিশ্বভারতীর কর্মক্ষেত্রে যে বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল, সেটা পূরণ করা যাবে না। আশ্রমের মানবিকতার ক্ষেত্রে তাঁর জায়গায় একটা শূন্যতা চিরকালের জন্যে রয়ে গেল। তাঁর অকৃত্রিম অন্তরঙ্গতা, তাঁর মতো তেমনি ক'রে কাছে আসা অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় না, সংকোচ এসে পরিপূর্ণ সংযোগকে বাধা দেয়। কর্মের ক্ষেত্রে যিনি কর্মী, হৃদয়ের দিক থেকে যিনি ছিলেন বন্ধু, আজ তাঁরই অভাবে আশ্রমের দিক থেকে ও ব্যক্তিগত ভাবে আমরা একজন পরম সুহৃদ্‌কে হারালাম।

প্রথম বয়সে তাঁর মন বুদ্ধি ও সাধনা যখন অপরিণত ছিল, তখন ধীরে ধীরে ক্রমপদক্ষেপে তিনি আশ্রমের জীবনের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। এখন তাঁর সংযোগের পরিণতি মধ্যাহ্নসূর্যের মতো দীপ্যমান হয়েছিল, আমরা তাঁর পূর্ণ বিকাশকে শ্রদ্ধা করেছি এবং আশা ছিল আরো অনেক কিছু তিনি দিয়ে যাবেন। তিনি যে বিদ্যার সাধনা গ্রহণ করেছিলেন সেই স্থান তেমন ক'রে আর কে নেবে; আশ্রমের সকলের হৃদয়ে তিনি যে সৌহার্দের আসন পেয়েছেন সে আসন আর কী ক'রে পূর্ণ হবে।

আজকের দিনে আমরা কেবল বৃথা শোক করতে পারি। আমাদের আদর্শকে যিনি রূপ দান করেছিলেন তাঁকে অকালে নিষ্ঠুরভাবে নেপথ্যে সরিয়ে দেওয়ায় মনে একটা অক্ষম বিদ্রোহের ভাব আসতে পারে। কিন্তু আজ মনকে শান্ত করতে হবে এই ভেবে যে, তিনি যে অকৃত্রিম মানবিকতার আদর্শ অনুসরণ ক'রে গেছেন সেটা বিশ্বভারতীতে তাঁর শাশ্বত দান হয়ে রইল। তাঁর সুস্থ চরিত্রের সৌন্দর্য, সৌহার্দের মাধুর্য ও হৃদয়ের গভীরতা তিনি আশ্রমকে দান ক'রে গেছেন, এটুকু আমাদের পরম সৌভাগ্য। সকলকে তো আমরা আকর্ষণ করতে পারি না। জিয়াউদ্দীনকে কেবল যে আশ্রম আকর্ষণ করেছিল তা নয়, এখানে তিনি তৈরি হয়েছিলেন; এখানকার হাওয়া ও মাটির রসসম্পদে, এখানকার সৌহার্দে তাঁর হৃদয়মন পরিপুষ্টি লাভ করেছিল। তিনি যে সম্পদ দিয়ে গেলেন তা আমাদের মনে গাঁথা হয়ে রইবে, তাঁর দৃষ্টান্ত আমরা ভুলব না।

আমার নিজের দিক থেকে কেবল এই কথাই বলতে পারি যে, এরকম বন্ধু দুর্লভ। এই বন্ধুত্বের অঙ্কুর একদিন বিরাট মহীরুহ হয়ে তার সুশীতল ছায়ায় আমায় শান্তি দিয়েছে— এ আমার জীবনে একটা চিরস্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকল। অন্তরে তাঁর সন্নিধির উপলব্ধি থাকবে, বাইরের কথায় সে গভীর অনুভূতি প্রকাশ করা যাবে না।

শান্তিনিকেতন
৮।৭।৩৮

'ইস্‌টেশন' কবিতার কেবলমাত্র দীর্ঘতর স্তবকগুলি প্রথমে রচিত হয়। পাণ্ডুলিপি অনুসারে রবীন্দ্রনাথ উহা ১৯৩৭ সালের ২৯ মে তারিখে আলমোড়ায় বাসকালে রচনা করেন। কবিতাটির গ্রন্থে মুদ্রিত তারিখ ও স্থান, বলা বাহুল্য, শেষ সংশোধনের হিসাবে বসানো হইয়াছে। কবিতাটির উক্ত প্রথম পাঠ পাণ্ডুলিপি হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

ইস্‌টেশনে

সকাল বিকাল ইস্টেশনে আস,
চেয়ে চেয়ে দেখতে ভালোবাস।
ব্যস্ত হয়ে ওরা টিকিট কেনে,
কেউ বা চড়ে ভাঁটির ট্রেনে কেউ বা উজান ট্রেনে।
সকাল থেকে কেউ বা থাকে বসে,
কেউ বা গাড়ি ফেল করে তার শেষ মিনিটের দোষে।
চলচ্ছবির এই-যে মূর্তিখানি
মনেতে দেয় আনি
লোকজনের এই নিত্যভোলার মুহূর্তদের ভাষা
কেবল যাওয়া আসা।
এ সংসারে পরে পরে ভিড় জমা হয় কত,
খানিক বাদে ঘণ্টা বাজে কে কোথা হয় গত।
এর পিছনে সুখদুঃখ ক্ষতিলাভের তাড়া
দেয় সবলে নাড়া।
কিন্তু তাদের থাকায়
আর কিছু নেই, ছবির পরে তারা ছবি আঁকায়।
চিত্রকরের বিশ্বভুবনখানি
এই কথাটাই নিলেম মনে জানি—

কর্মকারের নয় এ গড়া-পেটা,
আঁকড়ে ধরার জিনিস এ নয়, দেখার জিনিস এটা।
কালের পরে যায় চলে কাল, হয় না কভু হারা
ছবির বাহন চলাফেরার ধারা।
দুবেলা সেই এ সংসারের চল্‌তি ছবি দেখা
এই নিয়ে রও যাওয়া-আসার ইস্টেশনে একা।

আলমোড়া
২৯ মে ১৯৩৭

'সাড়ে নটা' কবিতাটি সম্বন্ধে 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' (প্রথম মুদ্রণ, পৃ ৯২-৯৩) গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, সর্বপ্রথমে উহা সানাই গ্রন্থে মুদ্রিত 'মানসী' ('মনে নেই বুঝি হবে অগ্রহান মাস') -নামক কবিতার সহিত যুক্ত আকারে রচিত হইয়াছিল এবং পরবর্তী সংশোধন ও পরিবর্তনের ফলে ক্রমে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র আকার লাভ করিয়াছে।

'প্রবাসী' কবিতার প্রসঙ্গে সাময়িক পত্রে মুদ্রিত মন্তব্যটি এইরূপ : লাহোরে কবির জন্মোৎসব-অনুষ্ঠানের উদ্যোগীরা শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীর মারফত নূতন কবিতার জন্য কবিকে অনুরোধ করেন, তদুপলক্ষ্যে রচিত।

'অবর্জিত' কবিতাটি, প্রবাসী পত্রে প্রকাশিত পাঠ অনুসারে, শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্দেশে রচিত হইয়াছিল।

সানাই

'সানাই' ১৩৪৭ সালের শ্রাবণ মাসে[১] প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার অধিকাংশ কবিতা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত। নিম্নে প্রকাশসূচী মুদ্রিত হইল—

দূরের গান	প্রবাসী ১৩৪৬ চৈত্র
কর্ণধার	'লীলা' : প্রবাসী ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ
আসা-যাওয়া	কবিতা ১৩৪৭ আষাঢ়
বিপ্লব	কবিতা ১৩৪৬ চৈত্র
জ্যোতির্বাষ্প	দেশ ১৩৪৭, ২৮ বৈশাখ

১ গ্রন্থে প্রথম প্রকাশের কাল 'আষাঢ়' মুদ্রিত হইয়াছিল ; ঐ মাসেই গ্রন্থটি প্রকাশিত হইবার কথা ছিল, কিন্তু পরে নবরচিত আর কয়েকটি কবিতা কবি যোগ করেন। গ্রন্থশেষে মুদ্রিত শ্রাবণ মাসে লেখা কবিতা-কয়টি দ্রষ্টব্য।

জানালায়	প্রবাসী ১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ
ক্ষণিক	কবিতা ১৩৪৭ আষাঢ়
নতুন রঙ	'গোধূলি' : জয়শ্রী ১৩৪৬ চৈত্র
সানাই	প্রবাসী ১৩৪৬ ফাল্গুন
স্মৃতির ভূমিকা	প্রবাসী ১৩৪৬ ভাদ্র
মানসী	'ছিন্নস্মৃতি' : পরিচয় ১৩৪৬ শ্রাবণ
সার্থকতা	প্রবাসী ১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ
মায়া	প্রবাসী ১৩৪৫ শ্রাবণ
অদেয়	প্রবাসী ১৩৪৬ জ্যৈষ্ঠ
রূপকথায়	'গান' : বঙ্গলক্ষ্মী ১৩৪৬ পৌষ
অধীরা	বিচিত্রা ১৩৪৫ বৈশাখ
বাসাবদল	প্রবাসী ১৩৪৬ আশ্বিন
শেষ কথা	পরিচয় ১৩৪৬ বৈশাখ
মুক্তপথে	কবিতা ১৩৪৩ পৌষ
আধোজাগা	রূপ ও রীতি ১৩৪৭ বৈশাখ
যক্ষ	প্রবাসী ১৩৪৫ শ্রাবণ
পরিচয়	প্রবাসী ১৩৪৬ কার্তিক
নারী	চতুরঙ্গ ১৩৪৫ আশ্বিন
গানের স্মৃতি	'তোমারে কি চিনিতাম আগে' : বিচিত্রা ১৩৪৫ অগ্রহায়ণ
অবশেষে	'পালাশেষ' : জয়শ্রী ১৩৪৬ আষাঢ়
সম্পূর্ণ	পরিচয় ১৩৪৫ চৈত্র
উদ্‌বৃত্ত	'গান' : বৈজয়ন্তী ১৩৪৬ কার্তিক
অত্যুক্তি	পরিচয় ১৩৪৬ জ্যৈষ্ঠ
হঠাৎ মিলন	বিচিত্রা ১৩৪৫ শ্রাবণ
দূরবর্তিনী	'অলস মিলন' : কবিতা ১৩৪৪ আশ্বিন
গান	বঙ্গলক্ষ্মী ১৩৪৬ বৈশাখ
বাণীহারা	'গান' : জয়শ্রী ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ
অনসূয়া	প্রবাসী ১৩৪৭ বৈশাখ
শেষ অভিসার	সমসাময়িক ১৩৪৭ আষাঢ়
বিমুখতা	প্রবাসী ১৩৪৭ ভাদ্র

অসময়	সাহানা	১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ
অপঘাত	প্রবাসী	১৩৪৭ শ্রাবণ
মানসী	প্রবাসী	১৩৪৭ শ্রাবণ

রবীন্দ্রসদনের পাণ্ডুলিপির সাহায্যে বর্তমান সংস্করণে অনেকগুলি কবিতার রচনা-স্থান ও তারিখের নির্দেশ সংযোজিত হইয়াছে।

'কর্ণধার' কবিতাটির প্রথম রচনা ও উহার ক্রমবিবর্তনের পরিচয়-স্বরূপ 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

একদিন সুন্দর রোদ উঠেছে, আকাশে অল্প অল্প শরৎকালের [?] মেঘ,— মংপুর পক্ষে দিনটা ঈষৎ গরম বলা যেতে পারে। এখানকার কুয়াসার বন্ধন মোচন ক'রে যেদিন রোদ উঠত উনি [রবীন্দ্রনাথ] খুব খুশি হয়ে উঠতেন। যথারীতি বারান্দার বড় চৌকিটাতে বসে আছেন। আমরা খাবার ঘর থেকে গুন্ গুন্ গান শুনতে পাচ্ছি। খাওয়াদাওয়া শেষ ক'রে বারান্দায় এলাম আমরা।

"আজ চমৎকার দিনটি হয়েছে। কেবল কুঁড়েমি করতে ইচ্ছে করছে, তাই এই চৌকিতে হেলান দিয়ে বসেই আছি, বসেই আছি।" গান গেয়ে যেতে লাগলেন,— "হে তরুণী তুমি আমার ছুটির কর্ণধার।— আজ সমস্ত দিনটা যেন ছুটিতে পাওয়া। কাজের দিন নয় এ, তাই বসে বসে গাইছি— হে তরুণী তুমিই আমার ছুটির কর্ণধার, অলস হাওয়ায় দিচ্ছ পাড়ি নিয়ে যাবে কর্মনদীর পার। হে তরুণী—" সে সুর মনে আছে। ইসারায় বল্লেন— কলমটা দাও। প্যাড আর কলম এগিয়ে দিলুম। গান গেয়ে লিখে চল্লেন—

হে তরুণী তুমিই আমার ছুটির কর্ণধার
অলস হাওয়ায় বাইচো স্বপনতরী
নিয়ে যাবে কর্মনদীর পার।

প্যাডটা নিয়ে গুন গুন ক'রে গেয়ে চললেন। বিকেল বেলা যখন ফিরে এলুম, দেখি লেখাটা প্রায় সবই বদল হয়ে গেছে এবং বিচিত্রিত ভাবে আগেকার লেখাটিকে কালির আচ্ছাদনে মণ্ডিত ক'রে আঁকা হয়েছে সুন্দর একটি ছবি, তার ফাঁকে ফাঁকে নূতন যে লেখাটা পড়া যাচ্ছে—

কে অদৃশ্য ছুটির কর্ণধার
অলস হাওয়ায় দিচ্ছ পাড়ি
কর্মনদীর পার।
দিগন্তরের কুঞ্জবনে
অশ্রুত কোন্ গুঞ্জরণে
বাতাসেতে জাল বুনে দেয়
মদির তন্দ্রার।
নীল নয়নের মৌনখানি
সেই সে দূরের আকাশবাণী

দিনগুলি মোর ওরি ডাকে
যায় ভেসে যায় বাঁকে বাঁকে
উদ্দেশহীন অকর্মণ্যতার।

[1]মংপু
২৩।৫।৩৯

প্যাডটা ফেলে দিলেন—"লও, কপি কর খাতায়।" তার পরদিন সকালবেলায় খাতাটা দিয়ে বল্লেন—"হে তরুণী আর একবার কপি করতে হচ্ছে।" তখন দেখি কবিতাটা আরো অনেক বদলে গেছে, তার প্রথম লাইনটা হয়েছে— "কে অসীমের লীলার কর্ণধার।" এমনি ক'রে পরিবর্তিত পরিবর্ধিত হতে হতে বেশ কয়েকদিন পরে সে এক সম্পূর্ণ অন্য কবিতা হয়ে দাঁড়াল—

ছুটির কর্ণধার
দখিন হাওয়ায় দিচ্ছ পাড়ি,
কর্মনদীর পার।
নীল আকাশের মৌনখানি
আনে দূরের দৈববাণী
মন্থর দিন তারি ডাকে
যায় ভেসে যায় বাঁকে বাঁকে
ভাঁটার স্রোতে উদ্দেশহীন
কর্মহীনতার
তুমি তখন ছুটির কর্ণধার
শিরায় শিরায় বাজিয়ে তোলো
নীরব ঝংকার— ইত্যাদি।

কয়েক মাস পরে তার যে সংস্করণ 'সানাই'-তে প্রকাশ হ'ল তাকে আর চেনবার জো নেই।

—মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, পৃ ১৭৭-৭৯

সানাই প্রকাশের পূর্বে ১৩৪৬ অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে 'লীলা' নামে উক্ত কবিতাটির আর একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পাঠ মুদ্রিত হইয়াছিল—

লীলা

ওগো কর্ণধার
সৃষ্টি তোমার ভাসান খেলায়
লীলার পারাবার।

১ কবিতাটির এই পাঠের রচনার স্থানকালনির্দেশ মূল পাণ্ডুলিপি হইতে উদ্ধৃত হইল।

আলোক-ছায়া চমকিছে
ক্ষণেক আগে, ক্ষণেক পিছে,
পূর্ণিমারে ফুটিয়ে তোলে
অমার অন্ধকার।
ছুটির খেলা খেলাও কর্ণধার,
ডাইনে বাঁয়ে দ্বন্দ্ব লাগে
সত্যের মিথ্যার।

লীলার কর্ণধার
জীবন নিয়ে মৃত্যুভাঁটায়
চলেছ কোন্ পার।
নীল আকাশের মৌনখানি
আনে দূরের দৈববাণী,
গান করে দিন উদ্দেশহীন
অকূল শূন্যতার।
তুমি ওগো লীলার কর্ণধার
রক্তে বাজাও রহস্যময়
মন্ত্রের ঝংকার।

অলস ক্ষেতের পোড়ো ভূমে
আগাম ফসল মগন ঘুমে।
অগোচরে মাটির নীচে
সোনার স্বপন অঙ্কুরিছে,
আলোর পানে কান্না ওঠে
খবর না পাই তার।
তুমি করো লীলার কর্ণধার
শ্যামল ঢেউয়ের তাল-সাধনা
দিগন্ত-দোলার।

তাকিয়ে থাকে নিমেষহারা
দিনশেষের প্রথম তারা।

ছায়াঘন কুঞ্জবনে
মন্দমৃদু গুঞ্জরণে
বাতাসেতে জাল বুনে দেয়
মদির তন্দ্রার।
তুমি তখন লীলার কর্ণধার
গোধূলিতে পাল তুলে দাও
ধূসরচ্ছন্দার।

অস্তরবির ছায়ার সাথে
লুকিয়ে আঁধার আসন পাতে।
ঝিল্লিরবে গগন কাঁপে,
দিগঙ্গনা কী জপ জাপে,
হাওয়ায় লাগে মোহপরশ
রজনীগন্ধার।
তুমি তখন লীলার কর্ণধার
নীরব সুরে বেহাগ বাজাও
বিধুর সন্ধ্যার।

রাতের শঙ্খকুহর ব্যেপে
ওঙ্কাররব ওঠে কেঁপে।
বিশ্বকেন্দ্রগুহা হতে
প্রতিধ্বনি অলখ স্রোতে
শূন্যে করে নিঃশবদের
তরঙ্গ বিস্তার।
তুমি তখন লীলার কর্ণধার
তারার ফেনা ফেনিয়ে তোলো
আকাশগঙ্গার।

মংপু
১৪।১০।৩৯

আলোচ্য কবিতার সানাইয়ে মুদ্রিত পাঠের অন্তিম স্তবকটি সর্বশেষে সংযোজিত

হয়। তৎপূর্বে 'উদীচী ২৫।১।৪০' তারিখের রচনা-অনুযায়ী (পাণ্ডুলিপি) কবিতাটি প্রথম পাঁচ স্তবকে সমাপ্ত ছিল।

'আসা-যাওয়া' কবিতার সহিত তুলনীয় সমকালীন একটি রচনা কৌতূহলী পাঠকদের জন্য পাণ্ডুলিপি হইতে উদ্ধৃত হইল। ইহাকে আলোচ্য কবিতার পূর্বপাঠ বলা সমীচীন না হইলেও ভাবের বিচারে পূর্বাভাস বলা চলে—

নির্জন রাতে নিঃশব্দ চরণপাতে কেন এলে,
দুয়ারে মম স্বপ্নের ধন সম এ যে দেখি
তব কণ্ঠের মালা এ কী গেছ ফেলে,
জাগালে না শিয়রে দীপ জেলে
এলে ধীরে ধীরে নিদ্রার তীরে তীরে
চামেলির ইঙ্গিত আসে
যে বাতাসে লজ্জিত গন্ধ মেলে।
বিদায়ের যাত্রাকালে পুষ্প-ঝরা বকুলের ডালে
দক্ষিণ পবনের প্রাণে
রেখে গেলে বল নি যে কথা কানে কানে,
বিরহবারতা
অরুণ আভার আভাসে রাঙায়ে গেলে।

উদয়ন
চৈত্র ১৩৪৬

নিম্নোদ্ধৃত গানটিও[১] এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য—

প্রেম এসেছিল
নিঃশব্দ চরণে
তাই স্বপ্ন মনে হল তারে
দিই নি তাহারে আসন।
বিদায় নিল যবে শব্দ পেয়ে
গেনু ধেয়ে—

১ ইহা দ্বিতীয়সংস্করণ গীতবিতানের প্রথম বা দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হয় নাই; পরবর্তী এবং প্রচলিত গীতবিতানের তৃতীয় খণ্ডে বা অখণ্ড গীতবিতানে সংকলিত এবং তৎপূর্বে সঙ্গীত-বিজ্ঞান-প্রবেশিকার ১৩৫০ কার্তিক-সংখ্যার ১৭২ পৃষ্ঠায় স্বরলিপিসহ মুদ্রিত হয়। উক্ত পত্রিকায় গানের পঞ্চম ছত্রে 'নিল যবে' স্থলে 'দিনু যারে' এবং সপ্তম ছত্রে 'তখন' স্থলে 'তখনো' মুদ্রিত হইয়াছে।

সে তখন স্বপ্ন কায়াবিহীন
নিশীথতিমিরে বিলীন,
দূর পথে দীপশিখা
রক্তিম মরীচিকা।

উদয়ন
২৮ চৈত্র ১৩৪৬

'বিপ্লব' কবিতার সংক্ষিপ্ত একটি পূর্বপাঠ পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া গিয়াছে। নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল—

নির্দয়া

ডমরুতে নটরাজ বাজালেন যে নাচের তাল
হে নটিনী
সে কি ছিন্ন করে নাই ঐ তব ঝংকৃত কিঙ্কিণী।
তোমার কুন্তলজাল
বেণীর বন্ধনমুক্ত উদ্দাম উচ্ছ্বাসে
উচ্ছৃঙ্খল উড়ে নি কি ঝঞ্ঝার বাতাসে।
বিদ্যুৎ-আঘাতে দীর্ণ হল ঐ তমিস্রাযামিনী
তোমার দিগন্তে হে নটিনী।
নিষ্ঠুর চরণপাতে মুগ্ধদের গাঁথা ফুলমালা
বিস্রস্ত দলিত দলে বিতীর্ণ করেছ রঙ্গশালা।
মোহমদিরায় পূর্ণ কানায় কানায়
যে পাত্রখানায়
উচ্ছলি পড়িত রসধারা
আজ তার পালা হল সারা।
বাজে ডঙ্কা, শঙ্কা লাগে মনে
হে নির্দয়া, কী সংকেত স্ফুরে তব কঙ্কণে কঙ্কণে।

উদীচী। শান্তিনিকেতন
১৬।১।৪০

'মানসী' (পৃ ৮৭) কবিতা রচনার ইতিহাস নবজাতক গ্রন্থের 'সাড়ে নটা' (পৃ ৪১) কবিতার সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এই প্রসঙ্গে 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের নিম্নোদ্ধৃত বিবরণ প্রণিধানযোগ্য—

সকাল সাড়ে নটা দশটার সময় খাওয়া হয়ে গেলে বসবার ঘরে এসে বসতেন একটা চৌকিতে, হাতে থাকত একটা বই বা কোনো মাসিক পত্র— রেডিওতে বাজত সুশ্রাব্য অশ্রাব্য মেশানো প্রোগ্রাম, কিছু শুনতেন, কিছু শুনতেন না। "ইয়োরোপের সংগীত শুনছিলুম গো আর্যে, কী আশ্চর্য এই যন্ত্রটা। কোন্ সুদূর থেকে কত রাজ্য পার হয়ে ভেসে আসছে এই সুরধ্বনি। সে দেশে এখন কত কাণ্ডই চলেছে, মারামারি হানাহানি, সব পার হয়ে আসছে একখানি সুর, তার মধ্যে একটুও ছায়া পড়ে নি সেখানকার জীবনের। যেখানে এই গান গাওয়া হচ্ছে সেখানেও তো নানা রকম ব্যাপার চলেছে, নানারকম ঘটনাপ্রবাহ। কত লোক আসছে যাচ্ছে— যে গান গাইছে তারও একটা অস্তিত্ব আছে, কিন্তু সে সমস্তকে বাদ দিয়ে একটি সকল-সম্পর্ক-রহিত নিরাসক্ত সুরের ধারা প্রবাহিত হয়ে আসছে। মনে পড়ে যখন বোটে বসে লিখতুম, চারিদিকে জল বয়ে চলেছে মৃদু কলধ্বনিতে, দূরে দেখা যায় বালির চর ধূ ধূ করছে, আমি লিখেই চলেছি লিখেই চলেছি "মানসী" (মানসসুন্দরী)। যখন শুরু করেছিলাম তখন ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ্দুর, তার পরে ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে এল আলো, আকাশ রঙীন ক'রে অস্ত গেল সূর্য। একটি মাত্র চাকর বোটে থাকত আমার নীরব সঙ্গী, সে কখন নীরবে মিট্‌মিটে প্রদীপ রেখে চলে গেল। আমি লিখেই চলেছি— মানসী। আজ কোনো কাজ নয়, সব ফেলে দিয়ে ছন্দ-বন্ধ-গ্রন্থ-গীত এসো তুমি প্রিয়ে! কোথায় গেল সেই দিন। সেই পদ্মার চর, ধূধূ করে সোনালী বালি, সেই মিট্‌মিটে শিখার ম্লান আলো, সব চিহ্ন ধুয়ে মুছে গেছে, শুধু আছে মানসী, তার যে পরিবেশ ছিল সে তো লুপ্ত হয়ে গেল— এমন কি তার থেকে সম্পূর্ণ বাদ পড়ে গেছে তার কবিও। চারিদিকের সমস্ত সূত্র তার ছিন্ন, সে শুধু একখানি সূত্রছিন্ন বাণী।... তোমার এই রেডিওর গান শুনছি আর এই সব ভাবছি।"

সেই দিন একটা প্রকাণ্ড কবিতা লিখেছিলেন এ বিষয় নিয়ে। তারপর পরিবর্তন করতে করতে একটা কবিতা থেকে দুটো কবিতা হয়। তার একটি 'সাড়ে নটা' নামে নবজাতকে আর একটি 'মানসী' নামে সানাইতে প্রকাশিত হয়েছে।

—মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, পৃ ৯১-৯৩

'সার্থকতা' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথকে প্রেরিত শ্রীমতী মৈত্রেয়ীদেবীর একটি কবিতার উত্তরে প্রথম লিখিত হইয়াছিল, 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' (পৃ ৬৩-৬৫) গ্রন্থে এইরূপ লেখা হইয়াছে।

'রূপকথায়' ১৩৪৬ সালে শান্তিনিকেতনে 'ডাকঘর' অভিনয়ের অসমাপ্ত এক আয়োজন উপলক্ষ্যে গান রূপে প্রথম রচিত হয়। নাটকটির তৃতীয় দৃশ্যে "ফকিরবেশী ঠাকুরদা"র ভূমিকায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ইহা গাহিবার কথা ছিল।

'বাসাবদল' কবিতার একটি পূর্ববর্তী পাঠে পাণ্ডুলিপিতে সূচনাংশ নিম্নমুদ্রিত আকারে পাওয়া যায়—

এল এবার জিনিস প্যাকের দিন।
বালিগঞ্জে বাসা ছেড়ে যাব ব্যারাকপুরে।
অবিনাশের আনুকূল্য এই দশাতেই জোটে
চাইতে না চাইতেই,
কাজ পেলে সে ভাগ্য বলেই মানে,
খাটে মুটের মতো।
আর সবারে বোঝা তো নয় সহজ ব্যাপার,
কেবল জানি এই অবিনাশ নিতান্ত নিশ্চিত
সময় অসময়ে।
বিমুখা বান্ধবা যান্তি
শুনি নাকি ধর্ম কেবল থাকে
আর এই অবিনাশ।
জিনিসপত্র ছড়াছড়ি,
লাগল ক'ষে আস্তিন গুটিয়ে।
ওডিকলোন মুড়ে নিল পুরোনো এক আনন্দবাজারে
ইত্যাদি।

তৎপূর্বের অন্য একটি পাণ্ডুলিপিতে 'বাসাবদল' (৯৬) ও 'পরিচয়' (পৃ ১০৫) এই উভয় কবিতার গদ্যছন্দে-লিখিত একটি অবিচ্ছিন্ন আদিপাঠ পাওয়া গিয়াছে। অপ্রকাশিতপূর্ব এই রচনাটির নাটকীয় সুসম্পূর্ণতা কবিতা দুইটির রসগ্রহণে পাঠকদের সবিশেষ সাহায্য করিবে বলিয়া মনে হয়—

নমস্কার কবি। চিনতুম না তোমাকে, চেয়েছিলুম চিনতে, চেনা হয়ে গেছে, আর বেশি সইত না, দাঁড়ি পড়েছে ঠিক জায়গায়।

বাঙালীর মেয়ে, অত্যন্ত করে জানি ঘরের লোকদের। লোভ ছিল অজানা জগতের পরিচয়ে। বয়স ছিল কাঁচা, সদ্য বেরিয়েছি কলেজের মধ্যপথ থেকে। আমার বিশ্ববৃত্তান্তে সব চেয়ে অজানা রহস্য কবি।

তখনো চোখে দেখি নি, অনিলবাবু, তোমাকে। পড়েছি তোমার লেখা, ছবি এসেছে মনে, স্বপ্নের ঘোড়ায় চড়ে তুমি খুঁজতে বেরিয়েছ তোমার মানসীকে।

রূপকথার রাজপুত্তুর তুমি— জগতে একটিমাত্র আছে রাজকন্যা, বিদেশী সমুদ্রের ওপারে, সে আছে তোমারই জন্যে।

তখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধতে বাঁধতে এমন কথা যদি মনে করে থাকি যেন আমিই সেই রাজকন্যা তবে হেসো না। দেখা হবার আগেই ছুঁইয়েছিলে রুপোর কাঠি, জাগিয়েছিলে সুপ্ত প্রাণকে। ঐ বয়সে অনেক মেয়ে মনে করেছিল ঐ একই কথা। তারা চিঠি লিখেছিল, ঠিকানা দেয় নি।

খেয়াল, মাঝ বসন্তের খেয়াল। ওরই আড়ালে কতদিন আবছা হয়ে গেছে দুপুরবেলাকার পরীক্ষার পড়া, বুকের মধ্যে হঠাৎ উছলে উঠেছে একটা যৌবনের ঢেউ।

একেই বলে রোম্যান্স্, নবীন বয়সে আপনা-ভোলানোর শিল্পকলা। মনের দেহলিতে এঁকেছি আলপনা, কার পা ফেলবার পথে। আরো কিছুদিন যেত, বয়েস পেরিয়ে যেত বিশের কোঠা, গোটাকতক মডার্ন্ নভেল পড়া হত শেষ, চোখের ঘোর যেত কেটে, হাসতুম নিজের কচিমেয়েপনায়। তার দৃষ্টান্ত দেখেছি কত।

সতেরো-আঠারো বছরের মেয়ের দল আছে আই. এ. ক্লাসের শেষ সীমানায়, চশমা চোখে পড়ছে কীট্সের কবিতা, না-দেখা নাইটেঙ্গেলের না-শোনা সুরে ব্যথিয়েছে তাদের বুকের পাঁজর, হৃদয়বাতায়নের ঝরোকা খুলে গেছে ফেনায়িত সমুদ্রের জনশূন্যতায় উজাড় কোন্ পরীস্থানে। অনিলবাবু, তোমার সঙ্গে শুভদৃষ্টির লগ্ন ছিল সেই আলো-আঁধারের ঝিকিমিকিতে। তখন কত দিন দুলেছে কত ঘরের কোণে তোমার কলামূর্তি তরুণীর আর্তচিত্তের রহস্যদোলায়।

তার পরে দেখি, দেখতে দেখতে সেই মেয়েদের সময় বয়ে যায়। এসে পড়ে যুগান্তর, ছেঁড়া মোজা সেলাইয়ের, নতুন বাজারে সওদা করতে পাঠাবার ফর্দ লেখার, চায়ের সভার হাঁটুজল বন্ধুত্বের।

আমার ভাগ্যে রোমান্সের ঘনসজল আষাঢ়ে দিন তখনো ফুরোয় নি— সেই রসাভিষিক্ত বাদল-বেলায় আলাপ হল তোমার সঙ্গে। অচেনাকে চেনা হল শুরু রোমাঞ্চিত মনে।

চেনার প্রথম অধ্যায়েই ধরা পড়ল তুমি একেবারেই দুর্লভ নও। মায়ার টান তো দেখি আমাদেরই দিকে। লক্ষ্যসন্ধানের আগেই ধরা পড়বার মতো তোমার ভাব। এত সহজ মৃগয়ায় পরীক্ষাই হয় না ব্যাধের গুণপনার।

উলটে গেল পালা। পথ চেয়ে বসেছিলুম ধরা দেব বলে, ধরবার খেলা হল শুরু। দুঃখ এই তুমি দুর্লভ নও। হায় আমার রাজপুত্র, একটু স্পর্শ লাগতেই তোমার

মুকুট পড়ল খসে ধুলোয় আমার পায়ের কাছে, সংকোচে চাইলুম পা সরিয়ে নিতে— তুমি বললে, থাক্ থাক্।

সেদিন আমার ফাঁদ পাতা ছিল বালিগঞ্জের ফ্ল্যাটে— কলকণ্ঠের কাকলীতে, মান-অভিমানের ছলনায়, অকারণ হাসির কল্লোলে। রসে রঙে এ ঘরের বেড়াজাল ছিল ঠাসবুনুনি করা। তুমি তোমার দিগ্বিজয়ী চালের মন্থর ভঙ্গীতে পা ফেললে ঠিক তার মাঝখানটাতে। বারে বারে চেয়ে দেখলুম কটাক্ষে, মনে মনে হাসলুম তোমার দুই চক্ষুর বিহ্বলতায়।

কোন্ ফাঁকে এসে পড়ল আর-এক মায়াবিনী— রণিতা। আমরা এক ব্যবসায়ের ব্যবসায়িনী। দেখলুম তার ফাঁসটাতে অল্প-একটু টান দিতেই বন্দী তখনি এক দিক থেকে আর-এক দিকে পড়ল হেলে। ভোজের বাহুল্যে ওর ক্ষুধা হয়েছিল অলস, সেই শিথিল অবস্থায় পথ্য ছিল তড়িদ্‌বেগে এক চুমুকের সুধারস। সেটা বুঝে নিয়েছিল যাদুকরী।

বোধ হয় জান না মেয়েতে মেয়েতে বাজি রাখা পণ আছে ভিতরে ভিতরে। রণিতা এল আমার দরজায়। আমার মুখে সে চাইলে, আমি চাইলুম তার মুখে। পাশা ফেলল তার হাতের এক ঘুরুনিতেই, এক দানেই হল জিত। তুমি গেলে চলে, মনেও পড়ল না একটা সামান্য রকম অছিলা করে যেতে।

হাসতে চেষ্টা করি সঙ্গিনীরা যখন শুধায় হল কী। রণিতাকেও একদিন জবাব দিতে হবে ঐ প্রশ্নেরই শুকনো হাসি দিয়ে। বেশি দেরি নেই।

পালা ফুরল, এবার প্যাক করতে হবে। অনাহূত সাহায্য করতে এল রমেশ— ঐটুকুই তার লাভ। লেগে গেল আস্তিন গুটিয়ে। কাঁচের শিশি মুড়তে লাগল খবরের কাগজে, কিছু বা জড়িয়ে দিল ছেঁড়া মোজায়। চামড়ার বাক্সোয় সাবধানে সাজিয়ে দিলে হাত-আয়না, রুপোর বাঁধানো চিরুনি, নখ-কাটা কাঁচি, চুলের তেল, ওটেনের মলম, পাউডারের কৌটো, সাবানের বাটি। অবসাদের ভারে অচল ছিল আমার মন, গা লাগছিল না কিছুতে হাত লাগাতে, কেবল বসে বসে ছিঁড়ছিলুম কুটিকুটি ক'রে পুরনো চিঠিগুলো। ব্যবহার-করা শাড়িগুলো নানা নিমন্ত্রণদিনের ফিকে গন্ধ মিলিয়ে দিল ঘরের হাওয়ায়। সেগুলো বিছিয়ে বিছিয়ে দুই হাতে চেপে চেপে পাট করে দিতে অসম্ভব সময় নিচ্ছিল রমেশ। আমার জরির-কাজ-করা স্লিপারের এক-একটা পাটি নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মুছে দিচ্ছিল কোঁচার কাপড়ে, কোনো আবশ্যক ছিল না। চৌকির উপর দাঁড়িয়ে দেয়াল থেকে সে খসিয়ে নিল ছবিগুলো। মোটা কার্পেটটা

গুটিয়ে-সুটিয়ে দিলে সরিয়ে ঘরের এক ধারে। মেঝের উপর ছড়িয়ে রইল ছেঁড়া চিঠির টুকরো। এল কুলির দল, আসবাবগুলো তুলে দিল মালগাড়িতে।

শূন্য হয়ে গেল ঘর, কোথায় মিলিয়ে গেল তার স্বপ্নরূপ, তার রঙিন মায়া। যে-কেউ কোথাও নেই তার দিকে তাকিয়ে থাকে ফ্যাকাসে দেয়াল অবুঝের মতো।

আমাকে ট্যাক্সিতে তুলে দেবার জন্যে শেষ পর্যন্ত রইল রমেশ। বললে, চিঠি লিখো কেমন থাক।

আমার রোম্যান্স্‌টুকু স্বল্প মাপের পেয়ালায়। এখনো তলায় কিছু রস আছে বাকি, আর কিছু আছে ব্যথা। আর দেরি হলে হাসির লেশও থাকত না, চোখের জলও যেত শুকিয়ে।

ভাবছি মনে এসব কী বকচি। ভারতচন্দ্রে আছে 'সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর'।

এতক্ষণ বিস্তর কথা বলা হল, শেষকালে দাঁড়াল সব তার মিছে। কী করে বললুম, তোমাকে চিনেছি। তোমাকে ভোলাতে বসলুম, আপনাকে ভোলালুম, এই কি চেনবার রাস্তা। যে বিস্ময়দৃষ্টি দিয়ে তুমি দেখেছ এই জগৎকে সেই দৃষ্টি দিয়ে যদি আমি চাইতুম তোমার দিকে তা হলেই দেখতুম তোমার সত্যকে। ঢাকা দিলুম তোমাকে মায়া দিয়ে, তোমার বিশ্বনিখিল থেকে সরিয়ে এনে কেটে ছেঁটে ছোটো করে তোমাকে ধরাতে চাইলুম আমার এই আড়াইশো-টাকা-ভাড়া ফ্ল্যাট্‌টাতে। আজ আমার চেয়ে তোমাকে দেখাচ্ছে ছোটো, আর বলছি তোমাকে চিনেছি।

—রবীন্দ্রসদনস্থ পাণ্ডুলিপি

উপরের রচনাটির প্রথমার্ধ অনেক সংশোধন ও সম্মার্জন করিয়া রবীন্দ্রনাথ উহা পরে শ্রীপ্রতিমা দেবীকে আলমোড়ায় পাঠাইয়াছিলেন। কৌতূহলী পাঠক শ্রীপ্রতিমা দেবীর 'চিত্রলেখা' গ্রন্থের ভূমিকা ও 'মন্দিরার উক্তি' লেখাটি এই প্রসঙ্গে দেখিতে পারেন। সেখানে 'অনিলবাবু'কে বদলাইয়া 'নরেশবাবু' করা হইয়াছে।

'নারী' (পৃ ১১০) কবিতার সাময়িক পত্রে প্রকাশিত পাঠে কিছু কিছু পাঠান্তর পাওয়া যায়। প্রথম দিকে 'সেই আদি ··· ··· সংগোপনে' পাঠ সাময়িক পত্রে এইরূপ ছিল—

তাহারি সংকল্পচ্ছবি বিধাতার মনে
আছে তাঁর তপস্যার সংগোপনে।

সেই আদি ধ্যানমূর্তিটিরে
সন্ধান করিছে ফিরে ফিরে
রূপকার।

অন্যান্য পাঠান্তর— 'রক্তিম হিল্লোল' স্থলে 'মদির হিল্লোল'। 'শাস্ত্রবচনের ঘের' স্থলে 'বচনের ঘের'। 'সকলি ফেলিয়া দূরে' স্থলে 'সকলি করিয়া দূর'। পরের ছত্রে 'সুরে' স্থলে 'সুর'। 'ভুবনমোহিনী' স্থলে 'ভুবনমোহন'। 'মর্তের মদিরা-মাঝে' স্থলে 'মর্ত্যের রূপের মাঝে'।

শেষ অংশের ('আদিস্বর্গলোক··· সহচরী') পাঠ এইরূপ ছিল—

যেন সর্ব পুরুষের নির্বাসিত মন
রূপ আর অরূপের ঘটায় মিলন।
মনে পড়ে যেন কবে ছিল অন্যলোকে
অপূর্ব আলোকে।
তারি ছবি আনে ধ্যানে ধরি
সেথায় যে ছিল তার চিরসহচরী।

'নামকরণ' (পৃ ১২৭) কবিতার একটি পূর্বতন পাঠ পাণ্ডুলিপি হইতে নিম্নে মুদ্রিত হইল—

নামকরণ

পাড়ার সবাই তারে ডাকে
আদরের নামে সুনয়নী,
বানান বদল ক'রে দিয়ে
আমি তারে ডাকি শুনায়নী।
বাদল-বেলায় গৃহকোণে
রেশমে পশমে জামা বোনে,
নীরবে আমার লেখা শোনে
তাই সে আমার শোনা-মনি।
কাব্য বোঝে কি নাই বোঝে,
শোনে, তাই ডাকি শুনায়নী।

প্রচলিত ডাক নয় এ যে
দরদীর মুখে ওঠে বেজে,
পণ্ডিতে দেয় নাই মেজে,
        অশুদ্ধ ভাষা এর খনি।
ভদ্ররীতির অভিধানে
মেলে না কোনোই এর মানে,
বর্বর ঠেকে তার কানে
        ভাষায় যে কড়া সনাতনী।
নূতন চোখে যে ওরে দেখি,
সাধুভাষা সে দেখাতে ঠেকি
আদরের টানে গেছে বেঁকি
        নিয়েছে নূতনতরো ধ্বনি।
সেও জানে আর জানি আমি
এ মোর নেহাত পাগলামি,
এ ডাকে চকিত তার দেহে
        কঙ্কণ উঠে কনকনি।
সে হাসে আমিও তাই হাসি,
        জবাবে ঘটে না কোনো বাধা—
ব্যাকরণ-বর্জিত ব'লে
        মানে আমাদের কাছে সাদা।
কেহ নাহি জানে কোন্ খনে
        কবিতার ছন্দের সাথে
পশমের শিল্প তোমার
        মিলে যায় সুকুমার হাতে
                শুনায়নী, ওগো সুনয়নী।

'বিমুখতা'র (পৃ ১২৮) অন্য দুইটি পাঠ পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়—

বিমুখ

হঠাৎপ্লাবনী যে মন নদীর প্রায়
অভাবিত পথে সহসা বাঁকিয়া যায়।

সে তার সহজ গতি,
এ বিমুখতায় যার হোক যত ক্ষতি।
বাঁধা পথে তারে বাঁধিয়া রাখিবে যদি
বর্ষা নামিবে যবে, অবাধ্য নদী
বারে বারে ফিরে ভাঙিয়া ফেলিবে কূল,
সে ভাঙন সাথে ভাঙিবে তোমার ভুল।
স্বেচ্ছাপ্রবাহবেগে
দুর্দাম তার ফেনিল হাস্য
উচ্ছ্বসি উঠে জেগে।
প্রাণের প্রচুর পণ্য আহরি
ভাসাইয়া দিলে ভঙ্গুর তরী,
উচ্ছ্বাসে তারে পাষাণে আছড়ি
করিবে সে পরিহাস,
খেলার ছলেতে ঘটাবে সর্বনাশ।
এ খেলারে যদি খেলা বলে মান,
এ হাসিতে যদি হাসিবারে জান,
তবেই তোমার জয়।
সহজের স্রোতে সহজ মনেই
ভাসিয়া চলিতে হয়।
মূল্য যাহার আছে একটুও
সাবধান হয়ে দূরে তারে থুয়ো,
এ স্রোতের সাথে বাঁধা পড়িয়ো না
পণ্যের ব্যবহারে।
ঘাটে ফিরে এসে তবে হাঁফ ছেড়ো
শান-বাঁধা তার ধারে।
যদি পার তবে কাটিয়ো সাঁতার,
সাধ করিয়ো না তলিয়ে যাবার,
নিজেরে ভাসায়ে রাখিতে না জান
বসে থেকো দূর পারে।

২৯।৫।৪০

বিমুখতা

যে মন হঠাৎ-প্লাবনী নদীর প্রায়
অভাবিত পথে কখন বাঁকিয়া যায়
সে তার সহজ গতি,
এ বিমুখতায় হোক-না যতই ক্ষতি।
বাঁধা পথে তারে বাঁধিয়া রাখিবে যদি
বর্ষা নামিলে খরপ্রবাহিনী নদী
ফিরে ফিরে তার ভাঙিয়া ফেলিবে কূল,
ভাঙিবে তোমার ভুল।
স্বৈরপ্রবাহবেগে
দুর্দাম তার ফেনিল হাস্য
উচ্ছ্বসি উঠে জেগে।
প্রাণের প্রচুর পণ্য আহরি
ভাসাইয়া দিলে ভঙ্গুর তরী,
উচ্ছ্বাসে তারে পাষাণে আছাড়ি
করিবে সে পরিহাস।
খেলার ছলেতে ঘটাবে সর্বনাশ।
এ খেলারে যদি খেলা বলি মান,
হাসিতে হাস্য মিলাইতে জান,
তবেই তোমার জয়।
সহজের স্রোতে সহজ মনেই
ভাসিয়া চলিতে হয়।
পেয়েছি বলিয়া যদি জাগে অহমিকা
তা হলে কপালে বিদ্রূপ আছে লিখা।
আলগা লীলায় নেই দেওয়া নেই পাওয়া,
সহাস নয়নে শুধু দূর থেকে চাওয়া,
মানবমনের রহস্য কিছু শিখা।
মূল্য যাহার আছে কোনো একটুও
সাবধান হয়ে তারে দূরে দূরে থুয়ো,

সাঁতার কাটিয়ো যদি সেটা জানা থাকে,
তলিয়ে যেয়ো না আওড়ের কোনো পাকে,
নিজেরে ভাসায়ে রাখিতে না জান
ভরসা ডাঙার পারে,
ঘাটে ফিরে এসে তবে হাঁফ ছেড়ো
শান-বাঁধা তার ধারে।

২৯।৫।৪০

'সানাই' গ্রন্থের অনেকগুলি ছোটো ছোটো কবিতার স্বতন্ত্র সংগীতরূপ প্রচলিত আছে। কোথাও বা গান আগে রচিত হইয়াছে, কোথাও বা কবিতা। তুলনামূলক পাঠের উদ্দেশে কবিতাগুলির দ্বিতীয়সংস্করণ-গীতবিতানে-মুদ্রিত সংগীতরূপ যথাক্রমে নির্দেশ করা হইল—

কবিতা	গীতি-রূপান্তরের প্রথম ছত্র	রচনাকাল
অনাবৃষ্টি	মম দুঃখের সাধন যবে করিনু নিবেদন	
নতুন রঙ	ধূসর জীবনের গোধূলিতে ক্লান্ত মলিন যেই স্মৃতি	
এবং	ধূসর জীবনের গোধূলিতে ক্লান্ত আলোয় ম্লানস্মৃতি	
গানের খেয়া	আমি যে গান গাই জানি নে সে কার উদ্দেশে	
অধরা	অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দোবন্ধনে	
ব্যথিতা	ওরে জাগায়ো না, ও যে বিরাম মাগে	
বিদায়	বসন্ত সে যায় তো হেসে, যাবার কালে	
যাবার আগে	এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে	
পূর্ণা	ওগো তুমি পঞ্চদশী	
কৃপণা	এসেছিনু দ্বারে তব শ্রাবণরাতে	
ছায়াছবি	আমার প্রিয়ার ছায়া	২৫।৮।১৯৩৮
দেওয়া-নেওয়া	বাদলদিনের প্রথম কদমফুল পুনশ্চ।	৩০।৭।১৯৩৯
আহ্বান	এসো গো, জ্বেলে দিয়ে যাও	১।৮।১৯৩৯
দ্বিধা	এসেছিলে তবু আস নাই জানায়ে গেলে	
আধোজাগা	স্বপ্নে আমার মনে হল	
উদ্বৃত্ত	যদি হায়, জীবনপূরণ নাই হল	
ভাঙন	তুমি কোন্ ভাঙনের পথে এলে সুপ্তরাতে	

গানের জাল	দৈবে তুমি কখন নেশায় পেয়ে	
মরিয়া	আজি মেঘ কেটে গেছে সকালবেলায়	
গান	যে ছিল আমার স্বপনচারিণী	৮।১২।১৯৩৮
বাণীহারা	বাণী মোর নাহি	
আত্মছলনা	দোষী করিব না, করিব না তোমারে	

বাঁশরি

'বাঁশরি' ১৩৪০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তৎপূর্বে ১৩৪০ সালে ভারতবর্ষ পত্রিকার কার্তিক অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায় উহা ধারাবাহিক ভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল।

গল্পগুচ্ছ

বর্তমান খণ্ডে সংকলিত সকল গল্পই সাময়িক পত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল। নিম্নে প্রকাশসূচী মুদ্রিত হইল।—

নামঞ্জুর গল্প	প্রবাসী	অগ্রহায়ণ ১৩৩২
সংস্কার	প্রবাসী	আষাঢ় ১৩৩৫
বলাই	প্রবাসী	অগ্রহায়ণ ১৩৩৫
চিত্রকর	প্রবাসী	কার্তিক ১৩৩৬
চোরাই ধন	ছোটগল্প	১১ কার্তিক ১৩৪০

বিশ্বভারতী-কর্তৃক প্রকাশিত গল্পগুচ্ছ তৃতীয় খণ্ডের বিভিন্ন মুদ্রণে এই গল্পগুলি সংকলন করা হইয়াছে ; বর্তমানে সব গল্পই তৃতীয়খণ্ড গল্পগুচ্ছের অন্তর্গত।

'বলাই' ও 'চিত্রকর' গল্প দুইটি "শান্তিনিকেতনে বর্ষা-উৎসব উপলক্ষ্যে রচিত" ও রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক পঠিত হয়।

কালান্তর

'কালান্তর' ১৩৪৪ সালের বৈশাখ মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধটি রবীন্দ্র-রচনাবলীর অষ্টাদশ খণ্ডে ইতিপূর্বে মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া কালান্তরের বর্তমান সংস্করণে পুনর্মুদ্রিত হইল না।

এই গ্রন্থে মুদ্রিত প্রবন্ধাবলীর সাময়িক পত্রে প্রথম প্রকাশের সূচী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল—

কালান্তর	পরিচয়	১৩৪০ শ্রাবণ
বিবেচনা ও অবিবেচনা	সবুজপত্র	১৩২১ বৈশাখ
লোকহিত	সবুজপত্র	১৩২১ ভাদ্র
লড়াইয়ের মূল	সবুজপত্র	১৩২১ পৌষ
ছোটো ও বড়ো	প্রবাসী	১৩২৪ অগ্রহায়ণ
বাতায়নিকের পত্র	প্রবাসী	১৩২৬ আষাঢ়
শক্তিপূজা	প্রবাসী	১৩২৬ কার্তিক
সত্যের আহ্বান	প্রবাসী	১৩২৮ কার্তিক
সমস্যা	প্রবাসী	১৩৩০ অগ্রহায়ণ
সমাধান	প্রবাসী	১৩৩০ অগ্রহায়ণ
শূদ্রধর্ম	প্রবাসী	১৩৩২ অগ্রহায়ণ
বৃহত্তর ভারত	প্রবাসী	১৩৩৪ শ্রাবণ
হিন্দুমুসলমান	শান্তিনিকেতন	১৩২৯ শ্রাবণ
নারী	প্রবাসী	১৩৪৩ অগ্রহায়ণ

'ছোটো ও বড়ো' প্রবন্ধে, বর্তমান খণ্ডের ২৮৩ পৃ ১০ ছত্রে 'ছোটো ইংরেজের জোর কত' ইত্যাদি বাক্যের পূর্বে, এই অতিরিক্ত রচনাংশ প্রবাসীতে ছিল—

দৃষ্টান্তগুলো একবার আবৃত্তি করিয়া দেখা যাক। ধরিয়া লও আনি বেসাণ্ট অপরাধী। কিন্তু আনি বেসাণ্টকে বড়ো ইংরেজ ক্ষমা করিয়াছেন। ছোটো ইংরেজ তাই লইয়া আজও গর্জাইতেছে। অপ্রিয় হইলেও accomplished factকে শেলের মতো বুকে বিঁধাইয়া গোপালের মতো চুপ করিয়া থাকিতে মর্লি আমাদিগকে পার্টিশেনের সময় উপদেশ দিয়াছিলেন। ছোটো ইংরেজকে ইস্কুলমাস্টারের গম্ভীর গলায় সে উপদেশ দিতে কেহ সাহসই করে না। তাই তাঁরা এই ক্ষমার কথা লইয়া পার্লামেণ্টে পর্যন্ত ক্ষণে ক্ষণে ভূমিকম্প বাধাইতেছেন। ইঁহারা ক্ষমা করার অপরাধ কোনোমতেই ভুলিতে পারেন না, কিন্তু নির্বিচারে শাস্তি দিবার জন্য ইঁহারা কারো কৈফিয়ত তলব করেন না। তাঁরা বলেন শাস্তি যখন দেওয়া হইয়াছে তখন ধরিয়া লইতে হইবে অপরাধ আছেই। যে তাহাতে আপত্তি করে সে extremist। আবার দেখো, পাঞ্জাবের ছোটোলাট বড়োলাট-সভার রাজতক্তের পাশে দাঁড়াইয়া ভারতের প্রজাদের সম্বন্ধে মুখ সামলাইয়া কথা কহেন নাই, সেজন্য কর্তৃপক্ষ খুব মৃদুস্বরে তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। ইহারই খেদ ছোটো-ইংরেজ কিছুতেই ভুলিতে পারেন না। অথচ

মণ্টেগু্য সাহেব তাঁর বর্তমান পদপ্রাপ্তির পূর্বে ভারত-আমলাতন্ত্র সম্বন্ধে দুই-চারটে স্পষ্ট কথা বলিয়াছিলেন, তাই লইয়া কেবল যে গালিগালাজের সাইক্লোন বহিতেছে তা নয়, মণ্টেগু্য সাহেবের শক্তি ও স্বাধীনতার চূড়া ভাঙিয়া গিয়াছে।

—প্রবাসী, ১৩২৪ অগ্রহায়ণ, পৃ ১২৭-২৮

উক্ত প্রবন্ধে, বর্তমান খণ্ডের ২৯৩ পৃ ৮ ছত্রে 'আমাদিগকে নিজের শক্তিতেই' ইত্যাদি বাক্যের পূর্বে, প্রবাসীতে পাওয়া যায়—

তাহাই সকলের চেয়ে কঠোর বিচ্ছেদ। যে সাম্রাজ্যগঠনে আমরা ইঁটকাঠের মতো কেবল উপকরণ মাত্র সে সাম্রাজ্য আমাদের নহে। যে সাম্রাজ্যগঠনে আমাদিগকেও কারিগর নিযুক্ত করা হইবে তাহাই আমাদের। সেই সাম্রাজ্যে আমরা প্রাণ পাইব এবং সেই সাম্রাজ্যের জন্য আমরা প্রাণ দিব।

—প্রবাসী, ১৩২৪ অগ্রহায়ণ, পৃ ১৩৪

'সত্যের আহ্বান' (ও 'শিক্ষার মিলন') প্রবন্ধ দুইটি কলিকাতার জনসভায় পাঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যে অসহযোগ আন্দোলন চলিতেছিল সে-সম্বন্ধে স্বীয় অভিমত দেশবাসীকে জ্ঞাপন করেন। 'সমস্যা' প্রবন্ধ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লিখিয়াছেন—

'সমস্যা' বক্তৃতাটাকে বহুল পরিমাণে মেজে ঘষে জনসভায় একদিন পড়েছিলুম। অধিকাংশ লোক বলছে কিছু বোঝা গেল না— সেটা একেবারে বাজে কথা— আসলে, ওদের বুঝতে ভালো লাগছে না। কেউ কেউ বলে আমার কথাগুলো কবির মতো, শুনতে ভালো, কাজে ভালো নয়। আর কিছুদিন পরে এই কথাগুলো তারা আওড়াবে— অম্লানবদনে বলবে ওগুলো তাদেরই চিরদিনের নিজের ভাবা কথা।

২৪ আশ্বিন, ১৩৩০ —শারদীয়া সংখ্যা, দৈনিক বসুমতী ১৩৫৪

'সমাধান' প্রবন্ধটির উপসংহার প্রবাসীতে অন্যরূপ ছিল। বর্তমান খণ্ডে ৩৬২ পৃ ১১ ছত্রের অনুক্রমে ছিল—

এইখানে গীতার উপদেশ আমাদের মনে করিয়ে দিতে হয় যে, কাজেরই অধিকার আমাদের, ফলের অধিকার নয়। আশুফলের প্রতি অতিশয় লোভ করেই আমরা জাদু-করের শরণাপন্ন হই; ফলের বদলে ফলের মরীচিকা দেখে নৃত্য করতে থাকি। তাতে সময়ও নষ্ট হয়, বুদ্ধিও নষ্ট হয়, ফলও নষ্ট হয়। তাতে বর্তমানকে ভোলাতে গিয়ে ভবিষ্যৎকে মাটি করি।

—প্রবাসী, ১৩৩০ অগ্রহায়ণ, পৃ ১৬০

গ্রন্থে-মুদ্রিত 'সমাধান' প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদের পরে (৩৬২ পৃ দ্রষ্টব্য) প্রবাসীতে ছিল—

সৌভাগ্যক্রমে অনেক কাল পরে একটা সদ্দৃষ্টান্ত আমাদের হাতের কাছে এসেছে। সেটা সম্বন্ধে আলোচনা করলে আমার কথাটা পরিষ্কার হবে।— বাংলা দেশ ম্যালেরিয়ায় মরছে। সে মার কেবল দেহের মার নয়, এই রোগে সমস্ত দেশটাকে মন-মরা করে দিয়েছে। আমাদের মানসিক অবসাদ, চারিত্রিক দৈন্য, অধ্যবসায়ের অভাব এই রোগজীর্ণতার ফল। ম্যালেরিয়া থেকে যদি আমরা উদ্ধার পাই তা হলে কেবল-যে আমরা সংখ্যা হিসাবে বাড়ব তা নয়, শক্তি হিসাবে বেড়ে উঠব। তখন কেবল-যে দুইজনের কাজ একজনে করতে পারব তাও নয়, এমন প্রকৃতির কাজ এমন ধরণে করতে পারব যা এখন পারি নে। অর্থাৎ, কেবল যে কাজের পরিমাণ বাড়বে তা নয়, কাজের উৎকর্ষ বাড়বে। তাতে সমস্ত দেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। এ কথা সকলেই জানি, সকলেই মানি— কিন্তু সেই সঙ্গে এতকাল এই কথাই মনে লেগে রয়েছে যে, বাংলা দেশ থেকে ম্যালেরিয়া দূর করে দেওয়া বা এই রোগের হ্রাস করা অসম্ভব। বাংলা দেশ ক্রমে ক্রমে নির্মানুষ হতে পারে, কিন্তু নির্মশক হবে কী করে। অতএব অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।

এমন সময়ে একজন সাহসিক বলে উঠলেন, দেশ থেকে মশা তাড়াবার ভার আমি নিলুম। এত বড়ো কথা বলবার ভরসাকেই তো আমি যথেষ্ট মনে করি। এই গুরু-মানা অবতার-মানা দেশে এত বড়ো বুকের পাটা তো দেখতে পাওয়া যায় না। এক-একটি গ্রাম নিয়ে তিনি কাজ আরম্ভ করেছেন। একটি গ্রামেও যদি তিনি ফল পান তা হলে সমস্ত দেশব্যাপী ব্যাধির মূলে কুঠারাঘাত করা হবে।

এইটুকুমাত্র কাজই তাঁর যথার্থ কাজ, মহৎ কাজ। কোনো একটিমাত্র জায়গায় যদি তিনি দেখিয়ে দিতে পারেন যে বিশেষ উপায়ে রোগের বাহনকে দূর করে দেওয়া যেতে পারে তা হলেই হল।

স্বহস্তে তিনি নিজের চেষ্টায় সমস্ত অলস দেশকে নীরোগ করে দেবেন এটা কল্যাণকর নয়। দৃষ্টান্তদ্বারা তিনি যেটা প্রমাণ করবেন সেইটেকে দেশ স্বয়ং গ্রহণ করলে তবেই সে উপস্থিত বিপদ থেকে রক্ষা পাবে এবং ভাবী বিপদের বিরুদ্ধে চিরকালের মতো প্রস্তুত হবে। নইলে বারে বারে নূতন নূতন 'ডাক্তার গোপাল চাটুজ্জে'র জন্যে তাকে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে হবে, আর ইতিমধ্যে তার পিলে-যকৃতের সাংঘাতিক উন্নতিসাধনে সে পৃথিবীর সকল দেশকে ছাড়িয়ে যাবে।

ম্যালেরিয়া যেমন শরীরের, অবুদ্ধি তেমনি মনের একটা বিষম ব্যাধি। এতে

মানুষের মূল্য কমিয়ে দেয়। অর্থাৎ গুনতি হিসাবে তার পরিমাণ বাড়লেও গুণের হিসাবে অত্যন্ত কমে যায়। স্বরাজ বল, সভ্যতা বল, মানুষের যা-কিছু মূল্যবান ঐশ্বর্য সমস্তই এই গুণের হিসেবের উপরেই নির্ভর করে। বালুর পরিমাণ যতই বেশি হোক-না কেন, তাতে মাটির গুণ নেই বলেই ফসল ফলাতে পারে না। ভারতবর্ষের ত্রিশকোটি মানুষের মন পরিমাণ হিসাবে প্রভূত, কিন্তু যোগ্যতা হিসাবে কতই স্বল্প। এই অযোগ্যতার এই অবুদ্ধির জগদ্দল পাথরটাকে ভারতবর্ষের মনের উপর থেকে ঠেলে না ফেললে বিধাতা আমাদের কোনো বর দিলেও তা সফল হবে না এ যদি সত্য হয় তবে আমাদের কোমর বেঁধে বলতেই হবে, এই আমাদের কাজ। এ কাজ প্রত্যেক কর্মীকে তাঁর হাতের কাছ থেকেই শুরু করতে হবে। যেখানেই যতটুকুই সফলতা লাভ করবেন সেই সফলতা সমস্ত দেশের। আয়তন থেকে যাঁরা সফলতার বিচার করেন তাঁরা ক্ষুণ্ণ হবেন, সত্যতা থেকে যাঁরা বিচার করেন তাঁরা জানেন যে, সত্য বামনরূপে এসে বলির কাছ থেকে ত্রিভুবন অধিকার করে নিতে পারেন।

আজকের দিনে জার্মানির কতখানি দুর্গতি হয়েছে, সকল দিক থেকে সে কত দুর্বল হয়ে পড়েছে, তা সকলেরই জানা আছে। এই জার্মানিতে এই দুঃখের দিনে, যখন তার সত্যই ঘরে আগুন লেগেছে, তখন জার্মানি আগুন নেবাবার নানা উপায়ের মধ্যে কোন্-একটা বিশেষ উপায়কে প্রাধান্য দিয়েছে সে কথা আমাদেরও আলোচনার যোগ্য। বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করবার জন্যে যে প্রচেষ্টা আজ সেখানে প্রবর্তিত হয়েছে সে সম্বন্ধে একটি চটি বই বেরিয়েছে। তার নাম Newer Adult Education in Germany। তার থেকে কয়েকটি লাইন এখানে তুলে দিই—

There are two forms of ruin— the sudden calamity of an earthquake and the slow, certain, steady advance of general decay that nothing seems able to impede. This latter is now the fate of Germany. A small percentage of the population may still make a display of wealth; but the structure of the country, its general welfare, its healthiness and growth are irretrievably stunted. The people face this. They know that for them there is no hope left, unless they have sufficient courage and vitality to build up with their own hands. The youth of Germany knows that it has no future unless it can build up one, and it is certain that this building will be of far-reaching influence in the entire structure of European civilization. Adult education is going to be one of the pillars of this structure.

এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে কয়েকটি ভাববার কথা আছে। প্রথম হচ্ছে, জার্মানির অবস্থা নিতান্তই নৈরাশ্যজনক, কিন্তু তবুও সেখানকার লোকে সেটাকে চরম বলে মেনে নিয়ে ভাগ্যের নিন্দা করছে না; তার কারণ, তারা সত্যের বর পাবার জন্যে বরাবর বাস্তব পথ অবলম্বন করতে অভ্যস্ত। তারা বুদ্ধিকে মানে বলেই নিজেকে মানে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এরা এ কথা নিঃসন্দেহ জানে যে ভাবী কালের জন্যে যখন উন্নতির নূতন ভিত বসাতে হবে তখন সেটা একমাত্র শিক্ষার দ্বারাই সম্ভবপর। এই উন্নতির দ্বারা তারা যে নিজের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বড়ো হবে তা নয়, সমগ্র য়ুরোপের সভ্যতার সঙ্গে আপন প্রভাবের দ্বারা সম্মিলিত হবে। তৃতীয় কথা হচ্ছে এই, অবস্থা যতই শোচনীয় হোক, ব্যাপারটা যতই দুঃসাধ্য হোক, তবু এটা করাই চাই।

এ কথা বলা বাহুল্য, প্রধানতঃ মানুষ শিক্ষার দ্বারাই তৈরি হয়— 'মানুষ করে তোলা' কথাটার মধ্যে এই অর্থ আছে। প্রকৃতির ক্রিয়া জন্তুকে জন্তু করে, মানুষের শিক্ষা মানুষকে মানুষ করে তোলে। আজকের দিনে যে মানসিক অবস্থায় আমরা এসে পৌঁচেছি— সেটা ভালোই হোক আর মন্দই হোক, সে অবস্থা আমাদের পূর্বকালীন শিক্ষার দ্বারাই ঘটেছে। এই অবস্থা পাকা করবার জন্যে কত শাস্ত্র কত উপদেশ কত ব্যবস্থা আছে তার সীমা নেই। যে বর্তমান অবস্থা এই শিক্ষার ফল, সেটা হচ্ছে ভিতর দিক থেকে মনের স্বাতন্ত্র্যহীনতার অবস্থা। এই অবস্থা কোনোমতেই বাইরের দিকে স্বরাজপ্রতিষ্ঠার অনুকূল হতেই পারে না। অতএব যদি স্বরাজকে প্রার্থনীয় বলেই মনে করি তা হলে আগেকার শিক্ষাকে অতিক্রম করে এমন কোনো-রকম শিক্ষা দেশে চালাতে হবে যাতে দেশের লোকের মন বুদ্ধিবৃত্তির স্বরাজের প্রতি আস্থাবান হতে পারে। যে শিক্ষায় আমাদের বর্তমানটা গড়ে উঠেছে সেই শিক্ষাতেই যদি আমাদের ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে, তা হলে সে আমাদের এই বর্তমানেরই পুনরাবৃত্তি হবে।

আজ জার্মানি এ কথা চিন্তা করতে প্রবৃত্ত হয়েছে যে, তার পূর্বতন শিক্ষাবিধির মধ্যে একটা দোষ ছিল।—

Germans feel that the well-oiled and smoothly running machine-like system of pre-war days was a system that was losing its substance, producing a mechanical form of culture— a culture that was lacking in essentials, a culture that seemed to turn out human beings with most extraordinarily cultivated brains but somehow out of touch with the human heart— science as apart from life, art, craft, learning,

recreation, all in separate compartments, and disharmony as a summary of all.

সার্বভৌম শিক্ষার সমগ্রতার দ্বারাই জার্মানির অধিবাসী মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণতা লাভ করবে, এই চিন্তা সে দেশে আগুন লাগার রূপকের জোরে উপেক্ষিত হয় নি। অথচ সেখানে অন্নাভাব বস্ত্রাভাব আমাদের দেশের চেয়েও প্রবলতর। আগে সুতো কাটব, কাপড় বুনব, খাব এবং তদ্দ্বারায় স্বরাজ পাব, তার পরে উপযুক্ত অবকাশ নিয়ে মনের দিক থেকে মানুষ হব, এ কথা মানুষের কথাই নয়। প্রাণের যেমন একটা সমগ্রতা আছে, তা ইঁট সাজিয়ে ক্রমে ক্রমে টুকরো টুকরো ক'রে গড়া নয়, মনুষ্যত্বেরও তেমনি সমগ্রতা আছে। তার দেহ পরবে বস্ত্র, আর তার মন থাকবে উলঙ্গ, এ সয় না— কোনো প্রয়োজনের দোহাই দিয়ে তার পূর্ণতাকে কিছুকাল ধরেও খণ্ডিত করলে সে ক্ষতি হয়তো কোনোকালে আর পূরণ হবে না। যদি বলি যতদিন স্বরাজ না পাব ততদিন দেশে শিল্পকার্যকে প্রশ্রয় দেব না, কেননা শিল্পকার্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় নয়, তা শৌখিন, তা হলে স্বরাজ কবে পাব জানি নে, কিন্তু যে শিল্প শত শত বৎসরের সাধনায় প্রাণলাভ করেছে স্বল্পকালের অনাদরে চিরদিনের জন্যে তা লুপ্ত হতে পারে। দেশে এমন লোকের অভাব নেই যাঁরা বলবেন, নাহয় তাই হল। আমি এই বলি, মানুষকে এক দিকে অসম্পূর্ণ করে আর-এক দিকে তাকে স্বাধীনতা দেওয়ার অর্থ হচ্ছে কলসীর এক দিক থেকে ছিদ্র করে আর-এক দিক থেকে তাতে জল ঢালা। মানুষ আপন সম্পূর্ণতা প্রকাশ করবার অবসর পাবে এইজন্যই মানুষের স্বাধীনতা। স্পার্টা আপন পূর্ণ মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করে বাহুবলের সাধনা করেছিল, তাতে কোনো ফল পায় নি; এথেন্স্‌ তার কোনো একটা বিশেষ শক্তিকে সংকীর্ণ করতে চায় নি, মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণতাকে চেয়েছিল, এইজন্যে সকল শক্তির সঙ্গে যোগেই সে বাহুবলকে পেয়েছিল। এর কারণ হচ্ছে, মনুষ্যত্বের প্রাণময় অখণ্ডতাই মানুষের পরম সত্য, কোনো আশু প্রয়োজনের লোভে তাকে খণ্ডিত করলে সমস্তটাকেই ক্লিষ্ট করা হয়।

সেই চটি বই থেকে আর-একটি অংশ উদ্ধৃত করে আমার এই লেখা শেষ করি।—

Everywhere, certainly, there is good will and courage in the face of insuperable difficulty. Those who have not experienced it, cannot realise what it means to be under-fed, under-paid, over-worked, and yet to go on unswervingly with the work of the education of the people. Through the straining of every nerve many thousand marks may be collected for this purpose, while the sum dwindles as it is held in the hand to mere nothingness through the uncontrollable depreciation of the currency.

This material side of the question cannot be overlooked, as the instability of conditions ruins all effort A thousand marks to-day are a hundred in a couple of days' time and the educator of the people of one week may be working in a factory the next in order to provide for his wife and his child as well as for his own livelihood. If the State were to appoint adult teachers as it does school teachers, salaries would rise to meet the depreciation, but the State stringently refuses to swell the budget by financing any new educational enterprise, and leaves the adult educational movement to struggle on almost unaided. It is extraordinary enough that ways and means can be found to continue at all, and this obviously is due solely to the keenness and self-sacrificing devotion of those working in the cause of bringing education within reach of the people. It will take many years before Germany sees clearly where the moulding of her efforts in adult education has led to, but what can be more absorbing and instructive than to study its growth ?

এই দুটি প্যারাগ্রাফ থেকে আমাদের শিক্ষার ও চিন্তার বিষয় যেটুকু আছে সে হচ্ছে এই যে, কাজের বাধা অতি কঠিন, কাজের ফল অতি নিকট নয়, অথচ কাজের অধ্যবসায় দুর্দমনীয়।

— প্রবাসী, ১৩৩০ অগ্রহায়ণ, পৃ ১৬০-১৬৩

'শূদ্রধর্ম' প্রবন্ধ বর্তমান সংস্করণে যেখানে শেষ হইয়াছে (পৃ ৩৬৭) প্রবাসীতে তাহার অনুবৃত্তিস্বরূপ নীচের অংশটুকু পাওয়া যায়—

সাংঘাই শহরে চীনীয়দের যে ধর্মঘট চলছে তার সম্বন্ধে একজন আমেরিকান লেখক আমেরিকার The Nation পত্রে একটি প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন। তাতে একজন চীন ভদ্রলোকের যে সাক্ষ্য প্রকাশিত হয়েছে তা নিম্নে উদ্‌ধৃত করি :

8 A Chinese Graduate of Glasgow. His English is faultless. His labor library is the best I have seen in the East. His pictures are hung in international exhibitions.

I am a pacifist. But I shall tell you a story that will show you how I feel about this strike. It will show you how hard it is to be a pacifist in China to-day.

There is a park here in Shanghai which is paid for chiefly by Chinese taxpayers, but no Chinese person is allowed to enter it. One day I was walking by this park when I saw a Sikh policeman chase away a group of ricksha men from the gate, curse them and deliberately

tip over one of the rickshas. He had lost his temper because one of the men had come too close to the forbidden territory. He took the license of one of the ricksha men away from him while the poor fellow stood here in the road with the tears streaming down his face. I walked over to the Sikh policeman and said :

"If I were hired by the British to police India for them, I would never treat your countrymen as you are treating these ricksha men."

He cooled down very quickly and was about to give the license back to the ricksha man when two Englishmen came up. They said to me :

"What are you doing here interfering with this policeman? Don't argue with us. You have no business here. You're nothing but a damned Chinaman. Get out of here."

They said that to me in China.

—প্রবাসী, ১৩৩২ অগ্রহায়ণ, পৃ ২১৫

১৯২৭ সালের জুলাই মাসে রবীন্দ্রনাথ পূর্বদ্বীপপুঞ্জ-অভিমুখে যাত্রা করিবার প্রাক্‌কালে 'বৃহত্তরভারতপরিষদ'-কর্তৃক তাঁহার বিদায়সম্বর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। 'বৃহত্তর ভারত' অভিভাষণটির উহাই উপলক্ষ্য।

'নারী' নিখিলবঙ্গ-মহিলা-কর্মীসম্মিলন উপলক্ষে লিখিত ও পঠিত হইয়াছিল।

সংযোজন

কালান্তরের প্রবন্ধগুলির সমসাময়িক, রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য অধিকাংশ সমাজ ও রাজনীতি -বিষয়ক রচনা বর্তমান খণ্ডের সংযোজনাংশে মুদ্রিত হইয়াছে। বিভিন্ন সাময়িক পত্র হইতে সংকলিত এই রচনাগুলির প্রথম প্রকাশের আনুপূর্বিক সূচী নিম্নে দেওয়া হইল—

কর্মযজ্ঞ	সবুজপত্র	১৩২১ ফাল্গুন
স্বাধিকারপ্রমত্তঃ	প্রবাসী	১৩২৪ মাঘ
চরকা	সবুজপত্র	১৩৩২ ভাদ্র
স্বরাজসাধন	সবুজপত্র	১৩৩২ আশ্বিন
রায়তের কথা	সবুজপত্র	১৩৩৩ আষাঢ়
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ	প্রবাসী	১৩৩৩ মাঘ
'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত'	প্রবাসী	১৩৩৬ অগ্রহায়ণ
হিন্দুমুসলমান	প্রবাসী	১৩৩৮ শ্রাবণ

হিজলি ও চট্টগ্রাম ১	প্রবাসী	১৩৩৮ কার্তিক[১]
হিজলি ও চট্টগ্রাম ২	প্রবাসী	১৩৩৮ অগ্রহায়ণ[২]
নবযুগ	প্রবাসী	১৩৩৯ মাঘ
প্রচলিত দণ্ডনীতি	প্রবাসী	১৩৪৪ আশ্বিন

'কর্মযজ্ঞ' ১৩২১ সালের ১ ফাল্গুন তারিখে কলিকাতায় সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে অনুষ্ঠিত 'বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলী'র প্রারম্ভিক "সভাধিবেশনে কথিত বক্তৃতার সারমর্ম"।

'রায়তের কথা' প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের 'রায়তের কথা' গ্রন্থের [অগস্ট ১৯২৬] 'ভূমিকা' রূপে মুদ্রিত হইয়াছিল—

আমার লেখা 'রায়তের কথা' যখন সবুজপত্রে প্রকাশিত হয় (১৩২৬ ফাল্গুন), তখন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিলেতে। এই কারণে সে প্রবন্ধটি সেকালে তাঁর চোখে পড়ে নি। সম্প্রতি তিনি আমার অনুরোধে সেটি প'ড়ে, এ বিষয়ে তাঁর মতামত সম্বলিত একখানি পত্র আমাকে লেখেন। এ পত্র অবশ্য লেখা হয়েছে ছাপবার জন্য।

এ লেখা টীকা-সমেত 'রায়তের কথা'র ভূমিকাস্বরূপ প্রকাশ করবার অনুমতি রবীন্দ্রনাথ আমাকে দিয়েছেন।

—বিজ্ঞপ্তি, রায়তের কথা

রবীন্দ্রসদনে-সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির সহিত মিলাইয়া বর্তমান গ্রন্থের পাঠ নির্ধারণ করা হইয়াছে।

'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত' -শীর্ষক প্রবন্ধটি শ্রীশচীন সেন -কর্তৃক লিখিত Political Philosophy of Rabindranath প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য।

হিজলি ও চট্টগ্রামের নৃশংস ঘটনাবলীর প্রতিবাদে ১৯৩১ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতার গড়ের মাঠে অক্‌টারলোনি মনুমেণ্টের পাদদেশে যে বিরাট সভা হয় "তাহাতে আনুমানিক এক লক্ষ লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন"। ঐ সভায় সভাপতি রবীন্দ্রনাথ যে অভিভাষণ পাঠ করেন বর্তমান খণ্ডের 'হিজলি ও চট্টগ্রাম' প্রবন্ধের তাহাই প্রথমার্ধ। উহা ঐদিনই সায়ংকালে এবং পরদিনও বিভিন্ন দৈনিক পত্রে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ-কৃত উহার ইংরেজি রূপও ঐ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল।[৩]

১ বিবিধ প্রসঙ্গ : 'চট্টগ্রাম ও হিজলীর ব্যাপার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ', পৃ ১৪৩-৪৪

২ বিবিধ প্রসঙ্গ : 'হিজলীর হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ', পৃ ৩০৪-০৫

৩ যথা, Call of the Victims : Amritabazar Patrika, 26 September 1931

উক্ত নির্মম ঘটনা প্রসঙ্গে কলিকাতার অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রিকা 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' বন্দীনিবাসের খুনী ওয়ার্ডার বা রক্ষীদের প্রতি সহানুভূতি-পূর্ণ যে মতামত প্রকাশ করেন তাহার জবাবে রবীন্দ্রনাথ স্টেট্‌স্‌ম্যান-সম্পাদককে ইংরেজিতে এক পত্র লেখেন। সম্পাদক অ্যাল্‌ফ্রেড এইচ ওয়াট্‌সন শ্রীঅমল হোমকে পত্রখানি ফেরত পাঠাইয়া (৩ নভেম্বর ১৯৩১) মন্তব্য করেন—

I must definitely refuse to publish from Dr. Rabindranath Tagore or any body else a letter which accuses men of murder who have never been tried on that count. I return the letter to you.

—The Calcutta Municipal Gazette (Tagore Memorial Special Supplement) 13 September 1941, pp. xl-xli

হিজলির ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের সেই পুনশ্চ বক্তব্য পরে অন্যান্য বহু ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশিত হইয়াছিল।[১] প্রবাসীর জন্য তাঁহার সেই বক্তব্য রবীন্দ্রনাথ বাংলায় লিখিয়া দিয়াছিলেন। 'হিজলি ও চট্টগ্রাম' প্রবন্ধের শেষার্ধরূপে তাহা মুদ্রিত হইল।

'নবযুগ', ১৩৩৯ সালের পৌষ মাসে শান্তিনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে কথিত ভাষণের রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক অনুমোদিত অনুলেখন।

'প্রচলিত দণ্ডনীতি', শান্তিনিকেতনে আন্দামানস্থ রাজনৈতিক বন্দীদের প্রায়োপবেশন উপলক্ষ্যে আহূত সভায় কথিত— "গত ২৯শে শ্রাবণ [১৩৪৪] শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতীর অধ্যাপক এবং ছাত্রী ও ছাত্রদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা তিনি এই প্রবন্ধের আকারে লিখিয়া দিয়াছেন।" (প্রবাসী ১৩৪৪ আশ্বিন, পৃ ৭৬৬)

—

১ যথা, Crimes are Crimes : Poet Tagore wants justice for Hijli wrongs
—Amritabazar Patrika, 4 November 1931

বর্ণানুক্রমিক সূচী

অত্যুক্তি	...	১১৬
অদেয়	...	৯১
অধরা	...	৭৮
অধরা মাধুরী ধরা পড়িয়াছে	...	৭৮
অধীরা	...	৯৪
অনসূয়া	...	১২২
অনাবৃষ্টি	...	৭৬
অপঘাত	...	১৩২
অবর্জিত	...	৪৯
অবশেষে	...	১১২
অবসান	...	১৪১
অভাবিত পথে সহসা বাঁকিয়া যায়	...	৪৮৮
অভিভূত ধরণীর দীপ-নেভা তোরণদুয়ারে	...	৫৯
অসময়	...	১৩১
অসম্ভব	...	১৩৮
অসম্ভব ছবি	...	১৩৫
অস্পষ্ট	...	২৯
আকাশে ঈশানকোণে মসীপুঞ্জ মেঘ	...	১২৬
আছ এ মনের কোন্ সীমানায়	...	৯০
আজি আষাঢ়ের মেঘলা আকাশে	...	১৩৩
আজি এ আঁখির শেষদৃষ্টির দিনে	...	৭
আজি এই মেঘমুক্ত সকালের	...	৮৫
আজি ফাল্গুনে দোলপূর্ণিমারাত্রি	...	২৯
আত্মছলনা	...	১৩০
আধোজাগা	...	১০৩
আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল	...	১৮৬
আমার এ ভাগ্যরাজ্যে	...	২০
আমার প্রিয়ার সচল ছায়াছবি	...	৮৫
আমারে বলে যে ওরা রোম্যান্টিক	...	৪৬

আমি চলে গেলে ফেলে রেখে যাব পিছু ... ৪৯
আলোকের আভা তার অলকের চুলে ... ১৩৫
আসা-যাওয়া ... ৭০
আহ্বান ... ২৬, ৯৩
ইস্‌টেশন ... ৩৭
ইস্‌টেশনে ... ৪৭৩
উদাস হাওয়ার পথে পথে ... ৮০
উদ্‌বৃত্ত ... ১১৫
উদ্‌বোধন ... ৬
উপর আকাশে সাজানো তড়িৎ-আলো ... ৯
এই ছবি রাজপুতানার ... ১৭
এই মোর জীবনের মহাদেশে ... ৬২
এ ঘরে ফুরালো খেলা ... ৬৩
এ চিকন তব লাবণ্য যবে দেখি ... ৭৫
এ ধূসর জীবনের গোধূলি ... ৭৭
এপারে-ওপারে ... ৩১
এ প্রাণ, রাতের রেলগাড়ি ... ২৬
এল বেলা পাতা ঝরাবারে ... ৬০
এসেছিনু দ্বারে ঘনবর্ষণ রাতে ... ৮৪
এসেছিলে তবু আস নাই, তাই ... ১০২
ওগো আমার প্রাণের কর্ণধার ... ৬৮
ওগো কর্ণধার ... ৪৭৭
ওগো মোর নাহি যে বাণী ... ১২২
কখনো কখনো কোনো অবসরে ... ২৮
কবি হয়ে দোল-উৎসবে ... ৩৯
কর্ণধার ... ৬৮
কর্মযজ্ঞ ... ৩৮৭
কাঁঠালের ভুতি-পচা, আমানি, মাছের যত আঁশ ১২২
কালান্তর ... ২৪৩
কুজ্‌ঝটিজাল যেই সরে গেল মংপু-র ... ৩৫

কৃপণা	...	৮৪
কেন	...	১৩, ৪৬৮
কেন মনে হয়	...	১১২
কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা		৯২
কোন্ ভাঙনের পথে এলে	...	১১৬
ক্যাণ্ডীয় নাচ	...	৪৮
ক্ষণিক	...	৭৫
গান	...	১২১
গানের খেয়া	...	৭৮
গানের জাল	...	১১৯
গানের মন্ত্র	...	১৩৯
গানের স্মৃতি	...	১১২
চতুর্দিকে বহ্নিবাষ্প শূন্যাকাশে ধায় বহুদূরে	...	৪৫
চরকা	...	৪০১
চিত্রকর	...	২২৫
চির-অধীরার বিরহ-আবেগ	...	৯৪
চেনাশোনার সাঁঝবেলাতে	...	৫২
চোরাই ধন	...	২৩০
ছায়াছবি	...	৮৫
ছোটো ও বড়ো	...	২৭২
জন্মদিন	...	৪৪
জবাবদিহি	...	৩৯
জয়ধ্বনি	...	৫৪
জাগায়ো না, ওরে জাগায়ো না	...	৭৯
জানালায়	...	৭৪
জানি আমি, ছোটো আমার ঠাঁই	...	১৪০
জানি দিন অবসান হবে	...	১৪১
জ্যোতির্বাষ্প	...	৭৩
জ্যোতিষীরা বলে	...	১৩
জ্বেলে দিয়ে যাও সন্ধ্যাপ্রদীপ	...	৯৩

ডমরুতে নটরাজ বাজালেন তাণ্ডবে যে তাল		৭১
ডমরুতে নটরাজ বাজালেন যে নাচের তাল		৪৮১
তব দক্ষিণ হাতের পরশ	...	১১৫
তুমি গো পঞ্চদশী	...	৮৪
তোমরা রচিলে যারে	...	৪৪
তোমায় যখন সাজিয়ে দিলেম দেহ	...	৯১
দিন সে প্রাচীন অতি প্রবীণ বিষয়ী	...	৫৪
দূরবর্তিনী	...	১২০
দূরের গান	...	৬৭
দেওয়া-নেওয়া	...	৮৮
দৈবে তুমি কখন নেশায় পেয়ে	...	১১৯
দোষী করিব না তোমারে	...	১৩০
দ্বিধা	...	১০২
নতুন রঙ	...	৭৭
নমস্কার কবি। চিনতুম না তোমাকে	...	৪৮৩
নবজাতক	...	৫
নবযুগ	...	৪৫৬
নবীন আগন্তুক	...	৫
না চাহিলে যারে পাওয়া যায়	...	১৭০
নামকরণ	...	১২৭, ৪৮৭
নামঞ্জুর গল্প	...	২০৩
নারী	...	১১০, ৩৭৭
নির্জন রাতে নিঃশব্দ চরণপাতে কেন এলে	...	৪৮০
নির্দয়া	...	৪৮১
পক্ষীমানব	...	২৪
পরিচয়	...	১০৫
পাড়ার সবাই তারে ডাকে	...	৪৮৭
পিনাকেতে লাগে টংকার	...	১৯৭
পূর্ণ হয়েছে বিচ্ছেদ, যবে ভাবিনু মনে	...	১৩৮
পূর্ণা	...	৮৪

প্রচলিত দণ্ডনীতি	...	৪৬০
প্রজাপতি	...	৫৫
প্রজাপতি যাঁদের সাথে পাতিয়ে আছেন সখ্য		১৮৫
প্রথম তোমাকে দেখেছি তোমার	...	১১৩
প্রথম যুগের উদয়দিগঙ্গনে	...	৬
প্রবাসী	...	৪২
প্রবীণ	...	৫৭
প্রশ্ন	...	৪৫
প্রাণের সাধন কবে নিবেদন	...	৭৬
প্রায়শ্চিত্ত	...	৯, ৪৬৬
প্রেম এসেছিল	...	৪৮০
ফাল্গুনের সূর্য যবে	...	৮৯
বয়স ছিল কাঁচা	...	১০৫
বলাই	...	২২০
বলেছিল ধরা দেব না	...	১৫৪
বসন্ত সে যায় তো হেসে, যাবার কালে	...	৮০
বহু শত শত বৎসর ব্যাপি	...	৪৬৬
বাঁকাও ভুরু দ্বারে আগল দিয়া	...	১০০
বাণীহারা	...	১২২
বাতায়নিকের পত্র	...	২৯৩
বাদলদিনের প্রথম কদমফুল	...	৮৮
বাদলবেলায় গৃহকোণে	...	১২৭
বাসাবদল	...	৯৬
বিদায়	...	৮০
বিপ্লব	...	৭১
বিবেচনা ও অবিবেচনা	...	২৫২
বিমুখ	...	৪৮৮
বিমুখতা	...	১২৮, ৪৯০
বিশ্বজগৎ যখন করে কাজ	...	৫৭
বিশ্ব জুড়ে ক্ষুব্ধ ইতিহাসে	...	২৬

বুদ্ধভক্তি	...	১১
বৃহত্তর ভারত	...	৩৬৭
বেলা হয়ে গেল, তোমার জানালা-'পরে	...	৭৪
বৈকালবেলা ফসল-ফুরানো শূন্য খেতে	...	১৩১
ব্যথিতা	...	৭৯
ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে	...	১৮৪
ভাগ্যরাজ্য	...	২০
ভাঙন	...	১১৬
ভালোবাসা এসেছিল	...	৭০
ভূমিকম্প	...	২২
মংপু পাহাড়ে	...	৩৫
মন যে তাহার হঠাৎপ্লাবনী	...	১২৮
মন যে দরিদ্র, তার	...	১১৬
মনে নেই, বুঝি হবে অগ্রহান মাস	...	৮৭
মনে পড়ে কবে ছিলাম একা বিজন চরে	...	১১৮
মরিয়া	...	১১৯
মাঝে মাঝে আসি যে তোমারে গান শিখাবারে		১৩৯
মানসী	...	৮৭, ১৩৩
মায়া	...	৯০
মুক্তপথে	...	১০০
মেঘ কেটে গেল	...	১১৯
মোরে হিন্দুস্থান	...	১৫
মৌলানা জিয়াউদ্দীন	...	২৮, ৪৭১
যক্ষ	...	১০৪
যক্ষের বিরহ চলে অবিশ্রাম অলকার পথে	...	১০৪
যন্ত্রদানব, মানবে করিলে পাখি	...	২৪
যাবার আগে	...	৮০
যাবার সময় হলে জীবনের সব কথা সেরে	...	৫৪
যে গান আমি গাই	...	৭৮
যে ছিল আমার স্বপনচারিণী	...	১২১

যেতেই হবে ... ৯৬
যে মন হঠাৎ-প্লাবনী নদীর প্রায় ... ৪৯০
যৌবনের অনাহূত রবাহূত ভিড়-করা ভোজে ১১২
'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত' ... ৪৩৬
রাগ কর নাই কর, শেষ কথা এসেছি বলিতে ৯৯
রাজপুতানা ... ১৭
রাতের গাড়ি ... ২৬
রাত্রি ... ৫৯
রাত্রে কখন মনে হল যেন ... ১০৩
রায়তের কথা ... ৪২২
রাস্তার ওপারে ... ৩১
রূপকথায় ... ৯২
রূপ-বিরূপ ... ৬২
রোম্যাণ্টিক ... ৪৬
লড়াইয়ের মূল ... ২৬৯
লীলা ... ৪৭৭
লোকহিত ... ২৬০
শক্তিপূজা ... ৩১৭
শুনিলাম জ্যোতিষীর কাছে ... ৪৬৮
শূদ্রধর্ম ... ৩৬২
শেষ অভিসার ... ১২৬
শেষ কথা ... ৬৩, ৯৯
শেষদৃষ্টি ... ৭
শেষ বেলা ... ৬০
শেষ হিসাব ... ৫২
সংস্কার ... ২১৫
সকাল বিকাল ইস্‌টেশনে আস ... ৪৭৩
সকাল বিকাল ইস্‌টেশনে আসি ... ৩৭
সকালে উঠেই দেখি ... ৫৫
সত্যের আহ্বান ... ৩২০

সন্ধ্যা	...	৫৪
সমস্যা	...	৩৪০
সমাধান	...	৩৫৮
সম্পূর্ণ	...	১১৩
সাড়ে নটা	...	৪১
সাড়ে নটা বেজেছে ঘড়িতে	...	৪১
সানাই	...	৮১
সারারাত ধ'রে	...	৮১
সার্থকতা	...	৮৯
সিংহলে সেই দেখেছিলেম ক্যাণ্ডিদলের নাচ		৪৮
সুদূরের পানে চাওয়া উৎকণ্ঠিত আমি	...	৬৭
সূর্যাস্তের পথ হতে বিকালের রৌদ্র এল নেমে		১৩২
সেদিন তুমি দূরের ছিলে মম	...	১২০
স্বরাজসাধন	...	৪১৪
স্বপ্ন	...	১৪০
স্বাতন্ত্র্যস্পর্ধায় মত্ত পুরুষেরে করিবারে বশ		১১০
স্বাধিকারপ্রমত্তঃ	...	৩৯২
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ	...	৪৩১
স্মৃতির ভূমিকা	...	৮৫
হঠাৎপ্লাবনী যে মন নদীর প্রায়	...	৪৮৮
হঠাৎ মিলন	...	১১৮
হায় ধরিত্রী, তোমার আঁধার পাতালদেশে	...	২২
হিজলি ও চট্টগ্রাম	...	৪৫৩
হিন্দুমুসলমান	...	৩৭৪, ৪৪৪
হিন্দুস্থান	...	১৫
হুংকৃত যুদ্ধের বাদ্য	...	১১
হে প্রবাসী	...	৪২
হে বন্ধু, সবার চেয়ে চিনি তোমাকেই	...	৭৩

রবীন্দ্র রচনাবলী

পঞ্চবিংশ খণ্ড

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

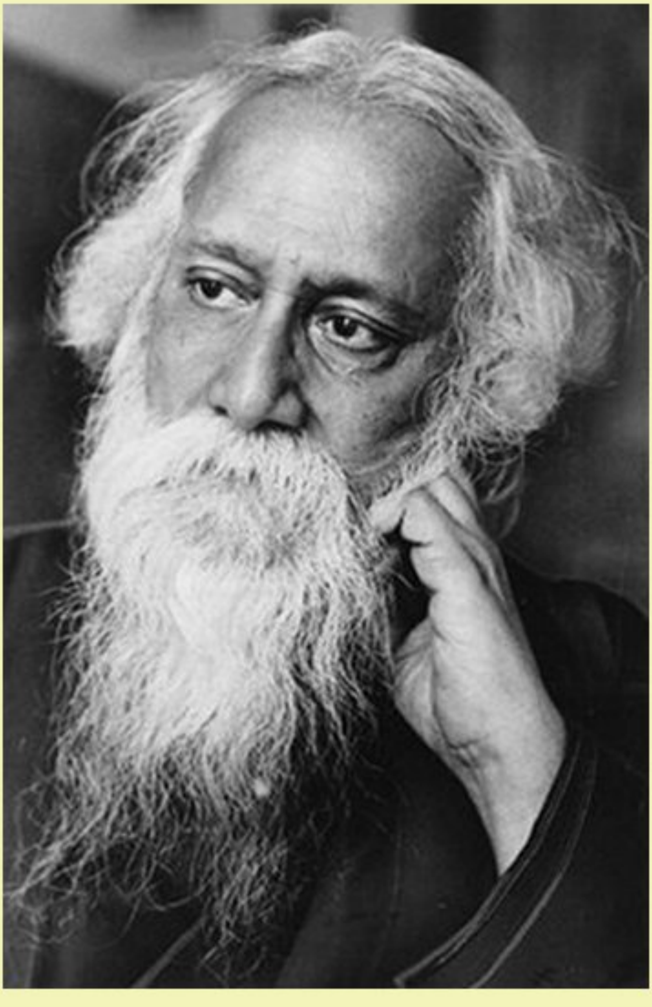

রবীন্দ্র-রচনাবলী

পঞ্চবিংশ খণ্ড

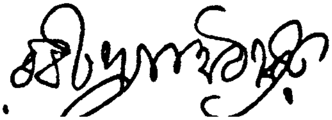

বিশ্বভারতী

২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা ৭

প্রকাশ ২৫ বৈশাখ ১৩৫৫
পুনর্মুদ্রণ শকাব্দ অগ্রহায়ণ ১৮৮০ : বঙ্গাব্দ ১৩৬৫

কাগজের মলাট ৯৲
রেক্সিনে বাঁধাই ১২৲

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী। ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর শ্রীবিদ্যুৎরঞ্জন বসু
শান্তিনিকেতন প্রেস। শান্তিনিকেতন। বীরভূম

সূচী

চিত্রসূচী ।৶০

কবিতা ও গান

রোগশয্যায় ১
আরোগ্য ৩৭
জন্মদিনে ৬৭

নাটক ও প্রহসন

শ্রাবণগাথা ১০৫
নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা ১২৫
নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা ১৫৯
শ্যামা ১৮৫
পরিশিষ্ট ২০৯

উপন্যাস ও গল্প

তিন সঙ্গী ২২১
পরিশিষ্ট ৩১৫

প্রবন্ধ

বিশ্বপরিচয় ৩৪৫

গ্রন্থপরিচয় ৪১৭
বর্ণানুক্রমিক সূচী ৪৩৯

চিত্রসূচী

'আরোগ্য'-পর্বে রবীন্দ্রনাথ — ৩

রবীন্দ্রনাথ : ১৯৪০ — ৬৯

নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা অভিনয় — ১৩১

কবিতা ও গান

রোগশয্যায়

বিশ্বের আরোগ্যলক্ষ্মী জীবনের অন্তঃপুরে যাঁর
পশু পক্ষী তরুতে লতায়
নিত্যরত অদৃশ্য শুশ্রূষা
জীর্ণতায় মৃত্যুপীড়িতেরে
অমৃতের সুধাস্পর্শ দিয়ে,
রোগের সৌভাগ্য নিয়ে, তাঁর আবির্ভাব
দেখেছিনু যে-দুটি নারীর
স্নিগ্ধ নিরাময় রূপে,
রেখে গেনু তাদের উদ্দেশে
অপটু এ লেখনীর প্রথম শিথিল ছন্দোমালা।

উদয়ন [শান্তিনিকেতন]
১ ডিসেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

১৯৪০ 'আরোগ্য'-পর্বে রবীন্দ্রনাথ শ্রীজিতেন্দ্রপ্রতাপ সিং গৃহীত

রোগশয্যায়

১

স্বরলোকে নৃত্যের উৎসবে
যদি ক্ষণকালতরে
ক্লান্ত উর্বশীর
তালভঙ্গ হয়
দেবরাজ করে না মার্জনা।
পূর্বার্জিত কীর্তি তার
অভিসম্পাতের তলে হয় নির্বাসিত।
আকস্মিক ত্রুটি মাত্র স্বর্গ কভু করে না স্বীকার।
মানবের সভাঙ্গনে
সেখানেও আছে জেগে স্বর্গের বিচার।
তাই মোর কাব্যকলা রয়েছে কুণ্ঠিত
তাপতপ্ত দিনান্তের অবসাদে;
কী জানি শৈথিল্য যদি ঘটে তার পদক্ষেপতালে।
খ্যাতিমুক্ত বাণী মোর
মহেন্দ্রের পদতলে করি সমর্পণ
যেন চলে যেতে পারি নিরাসক্তমনে
বৈরাগী সে সূর্যাস্তের গেরুয়া আলোয়;
নির্মম ভবিষ্য, জানি, অতর্কিতে দস্যুবৃত্তি করে
কীর্তির সঞ্চয়ে—
আজি তার হয় হোক প্রথম সূচনা।

উদয়ন
২৭ নভেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

২

অনিঃশেষ প্রাণ
অনিঃশেষ মরণের স্রোতে ভাসমান,
পদে পদে সংকটে সংকটে
নামহীন সমুদ্রের উদ্দেশবিহীন কোন্ তটে
পৌঁছিবারে অবিশ্রাম বাহিতেছে খেয়া,
কোন্ সে অলক্ষ্য পাড়ি-দেয়া
মর্মে বসি দিতেছে আদেশ,
নাহি তার শেষ।
চলিতেছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি প্রাণী,
এই শুধু জানি।
চলিতে চলিতে থামে, পণ্য তার দিয়ে যায় কাকে,
পশ্চাতে যে রহে নিতে ক্ষণপরে সেও নাহি থাকে।
মৃত্যুর কবলে লুপ্ত নিরন্তর ফাঁকি—
তবু সে ফাঁকির নয়, ফুরাতে ফুরাতে রহে বাকি;
পদে পদে আপনারে শেষ করি দিয়া
পদে পদে তবু রহে জিয়া।
অস্তিত্বের মহৈশ্বর্য শতছিদ্র ঘটতলে ভরা—
অফুরান লাভ তার অফুরান ক্ষতিপথে ঝরা;
অবিশ্রাম অপচয়ে সঞ্চয়ের আলস্য ঘুচায়,
শক্তি তাহে পায়।
চলমান রূপহীন যে বিরাট, সেই
মহাক্ষণে আছে তবু ক্ষণে ক্ষণে নেই।
স্বরূপ যাহার থাকা আর নাই-থাকা,
খোলা আর ঢাকা,
কী নামে ডাকিব তারে অস্তিত্বপ্রবাহে—
মোর নাম দেখা দিয়ে মিলে যাবে যাহে।

৩

একা বসে আছি হেথায়
যাতায়াতের পথের তীরে।
যারা বিহান-বেলায় গানের খেয়া
আনল বেয়ে প্রাণের ঘাটে,
আলোছায়ার নিত্য নাটে,
সাঁঝের বেলায় ছায়ায় তারা
মিলায় ধীরে।
আজকে তারা এল আমার
স্বপ্নলোকের দুয়ার ঘিরে;
সুরহারা সব ব্যথা যত
একতারা তার খুঁজে ফিরে।
প্রহর পরে প্রহর যে যায়,
বসে বসে কেবল গনি
নীরব জপের মালার ধ্বনি
অন্ধকারের শিরে শিরে।

জোড়াসাঁকো
৩০ অক্টোবর, ১৯৪০

৪

অজস্র দিনের আলো,
জানি, একদিন
দু চক্ষুরে দিয়েছিলে ঋণ।
ফিরায়ে নেবার দাবি জানায়েছ আজ
তুমি, মহারাজ।
শোধ করে দিতে হবে জানি,
তবু কেন সন্ধ্যাদীপে
ফেল ছায়াখানি।
রচিলে যে আলো দিয়ে তব বিশ্বতল
আমি সেথা অতিথি কেবল।

হেথা হোথা যদি পড়ে থাকে
কোনো ক্ষুদ্র ফাঁকে
নাই হল পুরা
সেটুকু টুকুরা—
রেখে যেয়ো ফেলে
অবহেলে,
যেথা তব রথ
শেষ চিহ্ন রেখে যায় অন্তিম ধুলায়
সেথায় রচিতে দাও আমার জগৎ
অল্প কিছু আলো থাক্,
অল্প কিছু ছায়া
আর কিছু মায়া।
ছায়াপথে লুপ্ত আলোকের পিছু
হয়তো কুড়ায়ে পাবে কিছু—
কণামাত্র লেশ
তোমার ঋণের অবশেষ।

জোড়াসাঁকো
৩ নভেম্বর, ১৯৪০

৫

এই মহাবিশ্বতলে
যন্ত্রণার ঘূর্ণযন্ত্র চলে,
চূর্ণ হতে থাকে গ্রহতারা।
উৎক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গ যত
দিক্ বিদিকে অস্তিত্বের বেদনারে
প্রলয়দুঃখের রেণুজালে
ব্যাপ্ত করিবারে ছোটে প্রচণ্ড আবেগে
পীড়নের যন্ত্রশালে
চেতনার উদ্দীপ্ত প্রাঙ্গণে

কোথা শেল শূল যত হতেছে ঝংকৃত,
কোথা ক্ষতরক্ত উৎসারিছে।
মানুষের ক্ষুদ্র দেহ,
যন্ত্রণার শক্তি তার কী দুঃসীম।
সৃষ্টি ও প্রলয় -সভাতলে—
তার বহ্নিরসপাত্র
কী লাগিয়া যোগ দিল বিশ্বের ভৈরবীচক্রে
বিধাতার প্রচণ্ড মত্ততা—কেন
এ দেহের মৃৎভাণ্ড ভরিয়া
রক্তবর্ণ প্রলাপের অশ্রুস্রোতে করে বিপ্লাবিত
প্রতি ক্ষণে অন্তহীন মূল্য দিল তারে
মানবের দুর্জয় চেতনা,
দেহদুঃখ-হোমানলে
যে অর্ঘ্যের দিল সে আহুতি—
জ্যোতিষ্কের তপস্যায়
তার কি তুলনা কোথা আছে।
এমন অপরাজিত বীর্যের সম্পদ,
এমন নির্ভীক সহিষ্ণুতা,
এমন উপেক্ষা মরণেরে,
হেন জয়যাত্রা
বহ্নিশয্যা মাড়াইয়া দলে দলে
দুঃখের সীমান্ত খুঁজিবারে
নামহীন জ্বালাময় কী তীর্থের লাগি—
সাথে সাথে পথে পথে
এমন সেবার উৎস আগ্নেয় গহ্বর ভেদ করি
অফুরান প্রেমের পাথেয়।

জোড়াসাঁকো
৪ নভেম্বর, ১৯৪০

৬

ওগো আমার ভোরের চড়ুই পাখি,
একটুখানি আঁধার থাকতে বাকি
ঘুমঘোরের অল্প অবশেষে
সাশির 'পরে ঠোকর মার এসে,
দেখ কোনো খবর আছে নাকি।
তাহার পরে কেবল মিছিমিছি
যেমন খুশি নাচের সঙ্গে
যেমন খুশি কেবল কিচিমিচি ;
নির্ভীক ঐ পুচ্ছ
সকল বাধা শাসন করে তুচ্ছ।
যখন প্রাতে দোয়েলরা দেয় শিস
কবির কাছে পায় তারা বকশিশ ;
সারা প্রহর একটানা এক পঞ্চম স্বর সাধি
লুকিয়ে কোকিল করে কী ওস্তাদি—
সকল পাখি ঠেলে
কালিদাসের বাহবা সেই পেলে।
তুমি কেয়ার কর না তার কিছু,
মান নাকো স্বরগ্রামের কোনো উঁচু নিচু।
কালিদাসের ঘরের মধ্যে ঢুকে
ছন্দভাঙা চেঁচামেচি
বাধাও কী কৌতুকে।
নবরত্নসভায় কবি যখন করে গান
তুমি তারি থামের মাথায় কী কর সন্ধান।
কবিপ্রিয়ার তুমি প্রতিবেশী,
সারা মুখর প্রহর ধ'রে তোমার মেশামেশি।
বসন্তেরই বায়না-করা
নয় তো তোমার নাট্য,
যেমন-তেমন নাচন তোমার—
নাইকো পারিপাট্য।

অরণ্যেরই গাহন-সভায় যাও না সেলাম ঠুকি,
আলোর সঙ্গে গ্রাম্য ভাষায় আলাপ মুখোমুখি ;
কী যে তাহার মানে
নাইকো অভিধানে—
স্পন্দিত ওই বক্ষটুকু তাহার অর্থ জানে।
ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে কী কর মস্করা,
অকারণে সমস্ত দিন কিসের এত ত্বরা।
মাটির 'পরে টান,
ধুলায় কর স্নান—
এমনি তোমার অযত্নেরই সজ্জা
মলিনতা লাগে না তায়, দেয় না তারে লজ্জা।
বাসা বাঁধ রাজার ঘরের ছাদের কোণে—
লুকোচুরি নাইকো তোমার মনে।

অনিদ্রাতে যখন আমার কাটে দুখের রাত
আশা করি দ্বারে তোমার প্রথম চঞ্চুঘাত।
অভীক তোমার, চটুল তোমার,
সহজ প্রাণের বাণী
দাও আমারে আনি—
সকল জীবের দিনের আলো
আমারে লয় ডাকি,
ওগো আমার ভোরের চড়ুই পাখি।

জোড়াসাঁকো
১১ নভেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

৭

গহন রজনী-মাঝে
রোগীর আবিল দৃষ্টিতলে
যখন সহসা দেখি
তোমার জাগ্রত আবির্ভাব,

মনে হয়, যেন
আকাশে অগণ্য গ্রহতারা
অন্তহীন কালে
আমারি প্রাণের দায় করিছে স্বীকার
তার পরে জানি যবে
তুমি চলে যাবে,
আতঙ্ক জাগায় অকস্মাৎ
উদাসীন জগতের ভীষণ স্তব্ধতা।

জোড়াসাঁকো
১২ নভেম্বর, ১৯৪০। রাত্রি দুটো

৮

মনে হয় হেমন্তের দুর্ভাষার কুজ্ঝটিকা-পানে
আলোকের কী যেন ভর্ৎসনা
দিগন্তের মূঢ়তারে তুলিছে তর্জনী।
পাণ্ডুবর্ণ হয়ে আসে সূর্যোদয়
আকাশের ভালে,
লজ্জা ঘনীভূত হয়,
হিমসিক্ত অরণ্যছায়ায়
স্তব্ধ হয় পাখিদের গান।

জোড়াসাঁকো
১৩ নভেম্বর, ১৯৪০

৯

হে প্রাচীন তমস্বিনী,
আজি আমি রোগের বিমিশ্র তমিস্রায়
মনে মনে হেরিতেছি—
কালের প্রথম কল্পে নিরন্তর অন্ধকারে
বসেছ সৃষ্টির ধ্যানে

কী ভীষণ একা,
বোবা তুমি, অন্ধ তুমি।
অসুস্থ দেহের মাঝে ক্লিষ্ট রচনার যে প্রয়াস
তাই হেরিলাম আমি
অনাদি আকাশে।
পঙ্গু উঠিতেছে কাঁদি নিদ্রার অতল-মাঝে,
আত্মপ্রকাশের ক্ষুধা বিগলিত লৌহগর্ভ হতে
গোপনে উঠিছে জ্বলি শিখায় শিখায়।
অচেতন তোমার অঙ্গুলি
অস্পষ্ট শিল্পের মায়া বুনিয়া চলিছে;
আদিমহার্ণব-গর্ভ হতে
অকস্মাৎ ফুলে ফুলে উঠিতেছে
প্রকাণ্ড স্বপ্নের পিণ্ড,
বিকলাঙ্গ, অসম্পূর্ণ—
অপেক্ষা করিছে অন্ধকারে
কালের দক্ষিণহস্তে পাবে কবে পূর্ণ দেহ,
বিরূপ কদর্য নেবে সুসংগত কলেবর
নব সূর্যালোকে।
মূর্তিকার দিবে আসি মন্ত্র পড়ি,
ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিবে বিধাতার অন্তর্গূঢ় সংকল্পের ধারা।

জোড়াসাঁকো
১৩ নভেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

১০

আমার দিনের শেষ ছায়াটুকু
মিশাইলে মূলতানে—
গুঞ্জন তার রবে চিরদিন,
ভুলে যাবে তার মানে।
কর্মক্লান্ত পথিক যখন

বসিবে পথের ধারে
এই রাগিণীর করুণ আভাস
পরশ করিবে তারে,
নীরবে শুনিবে মাথাটি করিয়া নিচু ;
শুধু এইটুকু আভাসে বুঝিবে,
বুঝিবে না আর কিছু—
'বিস্মৃত যুগে দুর্লভ ক্ষণে
বেঁচেছিল কেউ বুঝি,
আমরা যাহার খোঁজ পাই নাই
তাই সে পেয়েছে খুঁজি।'

জোড়াসাঁকো
১৩ নভেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

১১

জগতের মাঝখানে যুগে যুগে হইতেছে জমা
সুতীব্র অক্ষমা।
অগোচরে কোনোখানে একটি রেখার হলে ভুল
দীর্ঘ কালে অকস্মাৎ আপনারে করে সে নির্মূল।
ভিত্তি যার ধ্রুব বলে হয়েছিল মনে
তলে তার ভূমিকম্প টলে ওঠে প্রলয়নর্তনে।
প্রাণী কত এসেছিল দলে দলে
জীবনের রঙ্গভূমে
অপর্যাপ্ত শক্তির সম্বলে—
সে শক্তিই ভ্রম তার,
ক্রমেই অসহ্য হয়ে লুপ্ত করে দেয় মহাভার।
কেহ নাহি জানে,
এ বিশ্বের কোন্‌খানে
প্রতি ক্ষণে জমা
দারুণ অক্ষমা।

দৃষ্টির অতীত ক্রটি করিয়া ভেদন
সম্বন্ধের দৃঢ় সূত্র করিছে ছেদন ;
ইঙ্গিতের স্ফুলিঙ্গের ভ্রম
পশ্চাতে ফেরার পথ চিরতরে করিছে দুর্গম।
দারুণ ভাঙন এ যে পূর্ণেরই আদেশে ;
কী অপূর্ব সৃষ্টি তার দেখা দিবে শেষে—
গুঁড়াবে অবাধ্য মাটি, বাধা হবে দূর,
বহিয়া নূতন প্রাণ উঠিবে অঙ্কুর।
হে অক্ষমা,
সৃষ্টির বিধানে তুমি শক্তি যে পরমা ;
শান্তির পথের কাঁটা তব পদপাতে
বিদলিত হয়ে যায় বারবার আঘাতে আঘাতে।

জোড়াসাঁকো
১৩ নভেম্বর, ১৯৪০

১২

সকাল বেলায় উঠেই দেখি চেয়ে,
যাহা তাহা রয়েছে ঘর ছেয়ে—
খাতাপত্র কোথায় রাখি কী যে,
হাতড়ে বেড়াই, খুঁজে না পাই নিজে।
দামী যত কোথায় কী হয় জমা—
ছড়াছড়ি, নাই কোনো তার সেমিকোলন কমা।
পড়ে আছে পত্রবিহীন লেফাফা সব ছিন্ন—
এই তো দেখি পুরুষ জাতের জাত-কুঁড়েমির চিহ্ন।
পরক্ষণেই নামে কাজে মেয়ের হস্ত দুটি,
মুহূর্তেকেই বিলুপ্ত হয় যেথায় যত ক্রটি।
দ্রুত হস্তে নিলজ্জ সব বিশৃঙ্খলার প্রতি
নিয়ে আসে শোভনা তার চরম সদ্‌গতি।
ছেঁড়ার ক্ষত আরোগ্য হয়, দাগীর লজ্জা ঢাকে,
অদরকারীর গোপন বাসা কোথাও নাহি থাকে।

অগোছালোর মধ্যে থাকি ভাবি অবাক-পারা—
সৃষ্টিতে এই পুরুষ মেয়ের চলেছে দুই ধারা ;
পুরুষ আপন চারি দিকে জমায় আবর্জনা,
মেয়ে এসে নিত্য তারে করিছে মার্জনা ।

জোড়াসাঁকো
১৪ নভেম্বর, ১৯৪০ । দুপুর

১৩

দীর্ঘ দুঃখরাত্রি যদি
এক অতীতের প্রান্ততটে
খেয়া তার শেষ করে থাকে,
তবে নব বিস্ময়ের মাঝে
বিশ্বজগতের শিশুলোকে
জেগে ওঠে যেন সেই নূতন প্রভাতে
জীবনের নূতন জিজ্ঞাসা ।
পুরাতন প্রশ্নগুলি উত্তর না পেয়ে
অবাক্ বুদ্ধিরে যারা সদা ব্যঙ্গ করে,
বালকের চিন্তাহীন লীলাচ্ছলে
সহজ উত্তর তার পাই যেন মনে
সহজ বিশ্বাসে—
যে বিশ্বাস আপনার মাঝে তৃপ্ত থাকে,
করে না বিরোধ,
আনন্দের স্পর্শ দিয়ে সত্যের প্রত্যয় দেয় এনে

জোড়াসাঁকো
১৫ নভেম্বর, ১৯৪০ । প্রাতে

১৪

নদীর একটা কোণে শুষ্ক মরা ডাল
স্রোতের ব্যাঘাত যদি করে,
সৃষ্টিশক্তি ভাসমান আবর্জনা নিয়ে
সেখানে প্রকাশ করে আপনার রচনাচাতুরী—
ছোটো দ্বীপ গড়ে তোলে, টেনে আনে শৈবালের দল,
তীরের যা পরিত্যক্ত নেয় সে কুড়ায়ে,
দ্বীপসৃষ্টি-উপাদানে যাহা-তাহা জোটায় সম্বল।
আমার রোগীর ঘরে আবদ্ধ আকাশে
তেমনি চলেছে সৃষ্টি
চৌদিকের সব হতে স্বতন্ত্র স্বরূপে।
তাহার কর্মের আবর্তন
ছোটো সীমাটিতে।
কপালেতে হাত দিয়ে দেখে
তাপ আছে কি না ;
উদ্‌বিগ্ন চক্ষুর দৃষ্টি প্রশ্ন করে, ঘুম নেই কেন।
চুপিচুপি পা টিপিয়া
ঘরে আনে প্রভাতের আলো।
পথ্যের থালাটি নিয়ে হাতে
বার বার উপরোধে
রুচির বিরোধ লয় জিনি।
এলোমেলো যত-কিছু সযত্নে গুছায়ে রাখে
আঁচলে ধুলার লেশ ঝাড়ি।
দু হাতে সমান করি শয্যার কুঞ্চন
আসন প্রস্তুত রাখে শিয়রের কাছে
বিনিদ্র সেবার লাগি।
কথা হেথা ধীর স্বরে,
দৃষ্টি হেথা বাষ্প দিয়ে ছোঁওয়া,
স্পর্শ হেথা কম্পিত করুণ—

জীবনের এই রুদ্ধ স্রোত
আপনার কেন্দ্রে আবর্তিত,
বাহিরের সংবাদের
ধারা হতে বিচ্ছিন্ন সুদূর।

একদিন বন্যা নামে, শৈবালের দ্বীপ যায় ভেসে ;
পূর্ণ জীবনের যবে নামিবে জোয়ার
সেইমতো ভেসে যাবে সেবার বাসাটি,
সেথাকার দুঃখপাত্রে সুধাভরা এই ক'টা দিন।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
১৯ নভেম্বর, ১৯৪০

১৫

অসুস্থ শরীরখানা
কোন্ অবরুদ্ধ ভাষা করিছে বহন,
বাণীর ক্ষীণতা
মুহ্যমান আলোকেতে রচিতেছে অস্পষ্টের কারা।
নির্ঝর যখন ছোটে পরিপূর্ণ বেগে
বহুদূর দুর্গমেরে করিবারে জয়—
গর্জন তাহার
অস্বীকার করি চলে গুহার সংকীর্ণ আত্মীয়তা,
ঘোষণা করিতে থাকে নিখিল বিশ্বের অধিকার।
বলহারা ধারা তার মৃদু হয় যবে
বৈশাখের শীর্ণ শুষ্কতায়—
হারায় আপন মন্দ্রধ্বনি,
কৃশতম হয়ে আসে আপনার কাছে
আপনার পরিচয়।
খণ্ড খণ্ড কুণ্ড-মাঝে
ক্লান্ত তার গতিস্রোত লীন হয়ে থাকে।

তেমনি আমার রুগ্ন বাণী
স্পর্ধা হারায়েছে তার,
শক্তি নাই জীবনের সঞ্চিত গ্লানিরে
ধিক্কার দিবার।
আত্মগত ক্লিষ্ট জীবনের কুহেলিকা
তাহার বিশ্বের দৃষ্টি করিছে হরণ।

হে প্রভাতসূর্য,
আপনার শুভ্রতম রূপ
তোমার জ্যোতির কেন্দ্রে হেরিব উজ্জ্বল,
প্রভাতধ্যানেরে মোর সেই শক্তি দিয়ে
করো আলোকিত;
দুর্বল প্রাণের দৈন্য
হিরণ্ময় ঐশ্বর্যে তোমার
দূর করি দাও,
পরাভূত রজনীর অপমান-সহ।

উদয়ন
২১ নভেম্বর, ১৯৪০

১৬

অবসন্ন আলোকের
শরতের সায়াহ্নপ্রতিমা—
সংখ্যাহীন তারকার শান্ত নীরবতা
স্তব্ধ তার হৃদয়গহনে,
প্রতি ক্ষণে নিশ্বসিত নিঃশব্দ শুশ্রূষা।
আঁধারের গুহা দিয়ে
আসে তার জাগরণপথে
হতাশ্বাস রজনীর মন্থর প্রহরগুলি
প্রভাতের শুকতারা-পানে

পূজাগন্ধী বাতাসের
হিমস্পর্শ লয়ে।
সায়াহ্নের ম্লানদীপ্তি
সে করুণচ্ছবি
ধরিল কল্যাণরূপ
আজি প্রাতে অরুণকিরণে ;
দেখিলাম, ধীরে আসে আশীর্বাদ বহি
শেফালিকুসুমরুচি আলোর থালায়।

১৭

কখন ঘুমিয়েছিনু,
জেগে উঠে দেখিলাম—
কমলালেবুর ঝুড়ি
পায়ের কাছেতে
কে গিয়েছে রেখে।
কল্পনায় ডানা মেলে
অনুমান ঘুরে ঘুরে ফিরে
একে একে নানা স্নিগ্ধ নামে।
স্পষ্ট জানি না'ই জানি,
এক অজানারে লয়ে
নানা নাম মিলিল আসিয়া
নানা দিক হতে।
এক নামে সব নাম সত্য হয়ে উঠি
দানের ঘটায়ে দিল
পূর্ণ সার্থকতা।

উদয়ন
২১ নভেম্বর, ১৯৪০

১৮

সংসারের নানা ক্ষেত্রে নানা কর্মে বিক্ষিপ্ত চেতনা—
মানুষকে দেখি সেথা বিচিত্রের মাঝে
পরিব্যাপ্ত রূপে ;
কিছু তার অসমাপ্ত, অপূর্ণ কিছু বা।
রোগীকক্ষে নিবিড় একান্ত পরিচয়
একাগ্র লক্ষ্যের চারি দিকে,
নূতন বিস্ময় সে যে
দেখা দেয় অপরূপ রূপে।
সমস্ত বিশ্বের দয়া
সম্পূর্ণ সংহত তার মাঝে,
তার করস্পর্শে, তার বিনিদ্র ব্যাকুল আঁখিপাতে।

উদয়ন
২৩ নভেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

১৯

সজীব খেলনা যদি
গড়া হয় বিধাতার কর্মশালে,
কী তাহার দশা হয়
তাই করি অনুভব
আজি আয়ুশেষে।
হেথা খ্যাতি মোর পরাহত,
উপেক্ষিত গাম্ভীর্য আমার,
নিষেধে অনুশাসনে
শোওয়া বসা চলে।
‘চুপ করে থাকো,’
‘বেশি কথা কওয়া ভালো নয়’,
‘আরো কিছু খেতে হবে’—
এ-সকল আদেশ নির্দেশ

কভু ভর্ৎসনায়, কভু অনুনয়ে,
যাহাদের কণ্ঠ হতে আসে
তাহাদের পরিত্যক্ত খেলাঘরে
ভাঙা পুতুলের ট্রাজেডিতে
এই তো সেদিন মাত্র পড়েছে কৈশোর-যবনিকা।
কিছুক্ষণ
বিরোধের স্পর্ধা করি,
তার পরে ভালো ছেলে হয়ে
যেমন চালায় তাই চলি।
মনে ভাবি,
বৃদ্ধ ভাগ্য তার শাসনের ভার
কিছুদিন নূতন ভাগ্যের হাতে
সঁপি দিয়া কটাক্ষে হাসিছে দূরে থেকে
হেসেছিল যেমন বাদশা
আবুহোসেনের পালা
রচিয়া আড়ালে।
অমোঘ বিধির রাজ্যে বারবার হয়েছি বিদ্রোহী ;
এ রাজ্যে নিয়েছি মেনে
সেই দণ্ড
যাহা মৃণালের চেয়ে সুকোমল,
বিদ্যুতের চেয়ে স্পষ্ট
তর্জনী যাহার।

উদয়ন
২৩ নভেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

২০

রোগদুঃখ রজনীর নীরন্ধ্র আঁধারে
যে আলোকবিন্দুটিরে ক্ষণে ক্ষণে দেখি,
মনে ভাবি, কী তার নির্দেশ।

পথের পথিক যথা জানালার রন্ধ্র দিয়ে
উৎসব-আলোর পায় একটুকু খণ্ডিত আভাস,
সেইমতো যে রশ্মি অন্তরে আসে
সে দেয় জানায়ে—
এই ঘন আবরণ উঠে গেলে
অবিচ্ছেদে দেখা দিবে
দেশহীন কালহীন আদিজ্যোতি,
শাশ্বত প্রকাশপারাবার,
সূর্য যেথা করে সন্ধ্যাস্নান,
যেথায় নক্ষত্র যত মহাকায় বুদ্‌বুদের মতো
উঠিতেছে ফুটিতেছে—
সেথায় নিশান্তে যাত্রী আমি
চৈতন্যসাগর-তীর্থপথে।

উদয়ন
২৪ নভেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

২১

সকালে জাগিয়া উঠি
ফুলদানে দেখিনু গোলাপ ;
প্রশ্ন এল মনে—
যুগ-যুগান্তের আবর্তনে
সৌন্দর্যের পরিণামে যে শক্তি তোমারে আনিয়াছে
অপূর্ণের কুৎসিতের প্রতি পদে পীড়ন এড়ায়ে,
সে কি অন্ধ, সে কি অন্যমনা,
সেও কি বৈরাগ্যব্রতী সন্ন্যাসীর মতো
সুন্দরে ও অসুন্দরে ভেদ নাহি করে—
শুধু জ্ঞানক্রিয়া, শুধু বলক্রিয়া তার,
বোধের নাইকো কোনো কাজ ?
কারা তর্ক করে বলে, সৃষ্টির সভায়
সুশ্রী কুশ্রী বসে আছে সমান আসনে—

প্রহরীর কোনো বাধা নাই।
আমি কবি তর্ক নাহি জানি,
এ বিশ্বেরে দেখি তার সমগ্র স্বরূপে—
লক্ষকোটি গ্রহতারা আকাশে আকাশে
বহন করিয়া চলে প্রকাণ্ড সুষমা,
ছন্দ নাহি ভাঙে তার সুর নাহি বাধে,
বিকৃতি না ঘটায় স্খলন ;
ঐ তো আকাশে দেখি স্তরে স্তরে পাপড়ি মেলিয়া
জ্যোতির্ময় বিরাট গোলাপ।

উদয়ন
২৪ নভেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

২২

মধ্যদিনে আধো ঘুমে আধো জাগরণে
বোধ করি স্বপ্নে দেখেছিনু—
আমার সত্তার আবরণ
খসে পড়ে গেল
অজানা নদীর স্রোতে
লয়ে মোর নাম, মোর খ্যাতি,
কৃপণের সঞ্চয় যা-কিছু,
লয়ে কলঙ্কের স্মৃতি
মধুর ক্ষণের স্বাক্ষরিত ;
গৌরব ও অগৌরব
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে যায়,
তারে আর পারি না ফিরাতে ;
মনে মনে তর্ক করি আমিশূন্য আমি,
যা-কিছু হারালো মোর
সব চেয়ে কার লাগি বাজিল বেদনা।
সে মোর অতীত নহে
যারে লয়ে সুখে দুঃখে কেটেছে আমার রাত্রিদিন।

সে আমার ভবিষ্যৎ
যারে কোনো কালে পাই নাই,
যার মধ্যে আকাঙ্ক্ষা আমার
ভূমিগর্ভে বীজের মতন
অঙ্কুরিত আশা লয়ে
দীর্ঘরাত্রি স্বপ্ন দেখেছিল
অনাগত আলোকের লাগি।

উদয়ন
২৪ নভেম্বর, ১৯৪০। বিকাল

২৩

আরোগ্যের পথে
যখন পেলেম সদ্য
প্রসন্ন প্রাণের নিমন্ত্রণ,
দান সে করিল মোরে
নূতন চোখের বিশ্ব-দেখা।
প্রভাত-আলোয় মগ্ন ঐ নীলাকাশ
পুরাতন তপস্বীর
ধ্যানের আসন,
কল্প-আরম্ভের
অন্তহীন প্রথম মুহূর্তখানি
প্রকাশ করিল মোর কাছে ;
বুঝিলাম, এই এক জন্ম মোর
নব নব জন্মসূত্রে গাঁথা।
সপ্তরশ্মি সূর্যালোকসম
এক দৃশ্য বহিতেছে
অদৃশ্য অনেক সৃষ্টিধারা।

উদয়ন
২৫ নভেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

প্রহরীর কোনো বাধা নাই।
আমি কবি তর্ক নাহি জানি,
এ বিশ্বেরে দেখি তার সমগ্র স্বরূপে—
লক্ষকোটি গ্রহতারা আকাশে আকাশে
বহন করিয়া চলে প্রকাণ্ড সুষমা,
ছন্দ নাহি ভাঙে তার সুর নাহি বাধে,
বিকৃতি না ঘটায় স্খলন ;
ঐ তো আকাশে দেখি স্তরে স্তরে পাপড়ি মেলিয়া
জ্যোতির্ময় বিরাট গোলাপ।

উদয়ন
২৪ নভেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

২২

মধ্যদিনে আধো ঘুমে আধো জাগরণে
বোধ করি স্বপ্নে দেখেছিনু—
আমার সত্তার আবরণ
খসে পড়ে গেল
অজানা নদীর স্রোতে
লয়ে মোর নাম, মোর খ্যাতি,
কৃপণের সঞ্চয় যা-কিছু,
লয়ে কলঙ্কের স্মৃতি
মধুর ক্ষণের স্বাক্ষরিত ;
গৌরব ও অগৌরব
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে যায়,
তারে আর পারি না ফিরাতে ;
মনে মনে তর্ক করি আমিশূন্য আমি,
যা-কিছু হারালো মোর
সব চেয়ে কার লাগি বাজিল বেদনা।
সে মোর অতীত নহে
যারে লয়ে সুখে দুঃখে কেটেছে আমার রাত্রিদিন

সে আমার ভবিষ্যৎ
যারে কোনো কালে পাই নাই,
যার মধ্যে আকাঙ্ক্ষা আমার
ভূমিগর্ভে বীজের মতন
অঙ্কুরিত আশা লয়ে
দীর্ঘরাত্রি স্বপ্ন দেখেছিল
অনাগত আলোকের লাগি।

উদয়ন
২৪ নভেম্বর, ১৯৪০। বিকাল

২৩

আরোগ্যের পথে
যখন পেলেম সত্য
প্রসন্ন প্রাণের নিমন্ত্রণ,
দান সে করিল মোরে
নূতন চোখের বিশ্ব-দেখা।
প্রভাত-আলোয় মগ্ন ঐ নীলাকাশ
পুরাতন তপস্বীর
ধ্যানের আসন,
কল্প-আরম্ভের
অন্তহীন প্রথম মুহূর্তখানি
প্রকাশ করিল মোর কাছে;
বুঝিলাম, এই এক জন্ম মোর
নব নব জন্মসূত্রে গাঁথা।
সপ্তরশ্মি সূর্যালোকসম
এক দৃশ্য বহিতেছে
অদৃশ্য অনেক সৃষ্টিধারা।

উদয়ন
২৫ নভেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

২৪

প্রত্যূষে দেখিনু আজ নির্মল আলোকে
নিখিলের শান্তি-অভিষেক,
তরুগুলি নম্রশিরে ধরণীর নমস্কার করিল প্রচার।
যে শান্তি বিশ্বের মর্মে ধ্রুব প্রতিষ্ঠিত,
রক্ষা করিয়াছে তারে
যুগ-যুগান্তের যত আঘাতে সংঘাতে।
বিক্ষুব্ধ এ মর্তভূমে
নিজের জানায় আবির্ভাব
দিবসের আরম্ভে ও শেষে।
তারি পত্র পেয়েছ তো কবি, মাঙ্গলিক।
সে যদি অমান্য করে বিদ্রূপের বাহক সাজিয়া
বিকৃতির সভাসদ্‌রূপে
চিরনৈরাশ্যের দূত,
ভাঙা যন্ত্রে বেসুর ঝংকারে
ব্যঙ্গ করে এ বিশ্বের শাশ্বত সত্যেরে,
তবে তার কোন্ আবশ্যক।
শস্যক্ষেত্রে কাঁটাগাছ এসে
অপমান করে কেন মানুষের অন্নের ক্ষুধারে।
রুগ্ন যদি রোগেরে চরম সত্য বলে,
তাহা নিয়ে স্পর্ধা করা লজ্জা বলে জানি—
তার চেয়ে বিনা বাক্যে আত্মহত্যা ভালো।
মানুষের কবিত্বই
হবে শেষে কলঙ্কভাজন
অসংস্কৃত যদৃচ্ছের পথে চলি।
মুখশ্রীর করিবে কি প্রতিবাদ
মুখোষের নির্লজ্জ নকলে।

উদয়ন
২৬ নভেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

২৫

জীবনের দুঃখে শোকে তাপে
ঋষির একটি বাণী চিত্তে মোর দিনে দিনে হয়েছে উজ্জ্বল—
আনন্দ-অমৃতরূপে বিশ্বের প্রকাশ।
ক্ষুদ্র যত বিরুদ্ধ প্রমাণে
মহানেরে খর্ব করা সহজ পটুতা।
অন্তহীন দেশকালে পরিব্যাপ্ত সত্যের মহিমা
যে দেখে অখণ্ড রূপে
এ জগতে জন্ম তার হয়েছে সার্থক।

উদয়ন
২৮ নভেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

২৬

আমার কীর্তিরে আমি করি না বিশ্বাস
জানি, কালসিন্ধু তারে
নিয়ত তরঙ্গঘাতে
দিনে দিনে দিবে লুপ্ত করি।
আমার বিশ্বাস আপনারে।
দুই বেলা সেই পাত্র ভরি
এ বিশ্বের নিত্যসুধা
করিয়াছি পান।
প্রতি মুহূর্তের ভালোবাসা
তার মাঝে হয়েছে সঞ্চিত।
দুঃখভারে দীর্ণ করে নাই,
কালো করে নাই ধূলি
শিল্পেরে তাহার।
আমি জানি, যাব যবে
সংসারের রঙ্গভূমি ছাড়ি,
সাক্ষ্য দেবে পুষ্পবন ঋতুতে ঋতুতে

আপন আত্মায় যারা
ফলবান করে তারে
তারাই চরম লক্ষ্য মানবসৃষ্টির ;
একমাত্র তারা আছে, আর কেহ নাই ;
আর যারা সবে
মায়ার প্রবাহে তারা ছায়ার মতন—
দুঃখ তাহাদের সত্য নহে,
সুখ তাহাদের বিড়ম্বনা,
তাহাদের ক্ষতব্যথা দারুণ আকৃতি ধ'রে
প্রতি ক্ষণে লুপ্ত হয়ে যায়,
ইতিহাসে চিহ্ন নাহি রাখে।

উদয়ন
২৯ নভেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

৩০

সৃষ্টির চলেছে খেলা
চারি দিক হতে শত ধারে
কালের অসীম শূন্য পূর্ণ করিবারে।
সম্মুখে যা কিছু ঢালে পিছনে তলায় বারে বারে ;
নিরন্তর লাভ আর ক্ষতি,
তাহাতেই দেয় তারে গতি।
কবির ছন্দের খেলা সেও থাকি থাকি
নিশ্চিহ্ন কালের গায়ে ছবি আঁকা-আঁকি।
কাল যায়, শূন্য থাকে বাকি।
এই আঁকা-মোছা নিয়ে কাব্যের সচল মরীচিকা
ছেড়ে দেয় স্থান,
পরিবর্তমান
জীবনযাত্রার করে চলমান টীকা।
মানুষ আপন-আঁকা কালের সীমায়

সান্ত্বনা রচনা করে অসীমের মিথ্যা মহিমায়,
ভুলে যায় কত-না যুগের বাণীরূপ
ভূমিগর্ভে বহিতেছে নিঃশব্দের নিষ্ঠুর বিদ্রূপ।

উদয়ন
৩০ নভেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

৩১

আজিকার অরণ্যসভারে
অপবাদ দাও বারে বারে ;
বল যবে দৃঢ় কণ্ঠে অহংকৃত আপ্তবাক্যবৎ
প্রকৃতির অভিপ্রায়, 'নব ভবিষ্যৎ
করিবে বিরল রসে শুষ্কতার গান'—
বনলক্ষ্মী করিবে না অভিমান।
এ কথা সবাই জানে—
যে সংগীতরসপানে
প্রভাতে প্রভাতে
আনন্দে আলোকসভা মাতে
সে যে হেয়,
সে যে অশ্রদ্ধেয়,
প্রমাণ করিতে তাহা আরো বহু দীর্ঘকাল যাবে
এই এক ভাবে।
বনের পাখিরা ততদিন
সংশয়বিহীন
চিরন্তন বসন্তের স্তবে
আকাশ করিবে পূর্ণ
আপনার আনন্দিত রবে।

উদয়ন
৩০ নভেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

২

প্রভাতে প্রভাতে পাই আলোকের প্রসন্ন পরশে
অস্তিত্বের স্বর্গীয় সম্মান,
জ্যোতিঃস্রোতে মিশে যায় রক্তের প্রবাহ,
নীরবে ধ্বনিত হয় দেহে মনে জ্যোতিষ্কের বাণী।
রহি আমি দু চক্ষুর অঞ্জলি পাতিয়া
প্রতিদিন ঊর্ধ্ব-পানে চেয়ে।
এ আলো দিয়েছে মোরে জন্মের প্রথম অভ্যর্থনা,
অস্তসমুদ্রের তীরে এ আলোর দ্বারে
রবে মোর জীবনের শেষ নিবেদন।
মনে হয়, বৃথা বাক্য বলি, সব কথা বলা হয় নাই;
আকাশবাণীর সাথে প্রাণের বাণীর
সুর বাঁধা হয় নাই পূর্ণ সুরে,
ভাষা পাই নাই।

উদয়ন
ডিসেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

৩৩

বহুকাল আগে তুমি দিয়েছিলে একগুচ্ছ ধূপ,
আজি তার ধোঁয়া হতে বাহিরিল অপরূপ রূপ;
যেন কোন্ পুরানী আখ্যানে
স্তব্ধ মোর ধ্যানে
ধীরপদে এল কোন্ মালবিকা
লয়ে দীপশিখা
মহাকালমন্দিরের দ্বারে
যুগান্তের কোন্ পারে।
সদ্যস্নান-পরে
সিক্ত বেণী গ্রীবা তার জড়াইয়া ধরে,
চন্দনের মৃদু গন্ধ আসে

অঙ্গের বাতাসে।
মনে হয়, এই পূজারিনী—
এরে আমি বারবার চিনি,
আসে মৃদুমন্দ পদে
চিরদিবসের বেদিতলে
তুলি ফুল শুচিশুভ্র বসন-অঞ্চলে।
শান্ত স্নিগ্ধ চোখের দৃষ্টিতে
সেই বাণী নিয়ে আসে এ যুগের ভাষার সৃষ্টিতে।
সুললিত বাহুর কঙ্কণে
প্রিয়জন-কল্যাণের কামনা বহিছে সযতনে।
প্রীতি আত্মহারা
আদি সূর্যোদয় হতে
বহি আনে আলোকের ধারা।
দূর কাল হতে-তারি
হস্ত দুটি লয়ে সেবারস
আতপ্ত ললাট মোর আজো ধীরে করিছে পরশ।

উদয়ন
২ ডিসেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

৩৪

যখন বীণায় মোর আনমনা সুরে
গান বেঁধেছিনু বসি একা
তখনো যে ছিলে তুমি দূরে,
দাও নাই দেখা;
কেমনে জানিব, সেই গান
অপরিচয়ের তীরে তোমারেই করিছে সন্ধান।
দেখিলাম, কাছে তুমি আসিলে যেমনি
তোমারি গতির তালে বাজে মোর এ ছন্দের ধ্বনি;
মনে হল, সুরের সে মিলে
উচ্ছ্বসিল আনন্দের নিশ্বাস নিখিলে।

বর্ষে বর্ষে পুষ্পবনে পুষ্পগুলি ফুটে আর ঝরে
এ মিলের তরে।
কবির সংগীতে বাণী অঞ্জলি পাতিয়া আছে জাগি
অনাগত প্রসাদের লাগি।
চলে লুকাচুরি খেলা বিশ্বে অনিবার
অজানার সাথে অজানার।

উদয়ন
২ ডিসেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

৩৫

যেমন ঝড়ের পরে
আকাশের বক্ষতল করে অবারিত
উদয়াচলের জ্যোতিঃপথ
গভীর নিস্তব্ধ নীলিমায়,
তেমনি জীবন মোর মুক্ত হোক
অতীতের বাষ্পজাল হতে,
সদ্যনব জাগরণ দিক শঙ্খধ্বনি
এ জন্মের নবজন্মদ্বারে।
প্রতীক্ষা করিয়া আছি—
আলো হতে মুছে যাক রঙের প্রলেপ,
ঘুচে যাক ব্যর্থ খেলা আপনারে খেলেনা করিয়া,
নিরাসক্ত ভালোবাসা আপন দাক্ষিণ্য হতে
শেষ মূল্য পায় যেন তার।
আয়ুস্রোতে ভাসি যবে আঁধারে আলোতে,
তীরে তীরে অতীত কীর্তির পানে
ফিরে ফিরে না যেন তাকাই;
সুখে দুঃখে নিরন্তর
লিপ্ত হয়ে আছে যে আপনা
আপন-বাহিরে তারে স্থাপন করিতে যেন পারি
সংসারের শতলক্ষ ভাসমান ঘটনার সমান শ্রেণীতে,

নিঃশঙ্ক নিস্পৃহ চোখে দেখি যেন তারে
অনাত্মীয় নির্বাসনে।
এই শেষ কথা মোর,
সম্পূর্ণ করুক মোর পরিচয় অসীম শুভ্রতা।

উদয়ন
৩ ডিসেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

৩৬

যাহা-কিছু চেয়েছিনু একান্ত আগ্রহে
তাহার চৌদিক হতে বাহুর বেষ্টন
অপসৃত হয় যবে,
তখন সে বন্ধনের মুক্তক্ষেত্রে
যে চেতনা উদ্ভাসিয়া উঠে
প্রভাত-আলোর সাথে
দেখি তার অভিন্ন স্বরূপ।
শূন্য, তবু সে তো শূন্য নয়।
তখন বুঝিতে পারি ঋষির সে বাণী—
আকাশ আনন্দপূর্ণ না রহিত যদি
জড়তার নাগপাশে দেহ মন হইত নিশ্চল।
কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ
যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।

উদয়ন
৩ ডিসেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

৩৭

ধূসর গোধূলিলগ্নে সহসা দেখিনু একদিন
মৃত্যুর দক্ষিণবাহু জীবনের কণ্ঠে বিজড়িত,
রক্ত সূত্রগাছি দিয়ে বাঁধা ;
চিনিলাম তখনি দোঁহারে।
দেখিলাম, নিতেছে যৌতুক

বরের চরম দান মরণের বধূ ;
দক্ষিণবাহুতে বহি চলিয়াছে যুগান্তের পানে

উদয়ন
৪ ডিসেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

৩৮

ধর্মরাজ দিল যবে ধ্বংসের আদেশ
আপন হত্যার ভার আপনিই নিল মানুষেরা।
ভেবেছি পীড়িত মনে, পথভ্রষ্ট পথিক গ্রহের
অকস্মাৎ অপঘাতে একটি বিপুল চিতানলে
আগুন জ্বলে না কেন মহা এক সহমরণের।
তার পরে ভাবি মনে,
দুঃখে দুঃখে পাপ যদি নাহি পায় ক্ষয়
প্রলয়ের ভস্মক্ষেত্রে বীজ তার রবে সুপ্ত হয়ে,
নূতন সৃষ্টির বক্ষে
কণ্টকিয়া উঠিবে আবার

উদয়ন
৫ ডিসেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

৩৯

তোমারে দেখি না যবে মনে হয় আর্ত কল্পনায়,
পৃথিবী পায়ের নীচে চুপিচুপি করিছে মন্ত্রণা
সরে যাবে বলে।
আঁকড়ি ধরিতে চাহি উৎকণ্ঠায় শূন্য আকাশেরে
দুই বাহু তুলি।
চমকিয়া স্বপ্ন যায় ভেঙে ;
দেখি, তুমি নতশিরে বুনিছ পশম
বসি মোর পাশে
সৃষ্টির অমোঘ শান্তি সমর্থন করি।

উদয়ন
৫ ডিসেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

আরোগ্য

কল্যাণীয় শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর

বহু লোক এসেছিল জীবনের প্রথম প্রভাতে—
কেহ বা খেলার সাথি, কেহ কৌতূহলী,
কেহ কাজে সঙ্গ দিতে, কেহ দিতে বাধা।
আজ যারা কাছে আছ এ নিঃস্ব প্রহরে,
পরিশ্রান্ত প্রদোষের অবসন্ন নিস্তেজ আলোয়
তোমরা আপন দীপ আনিয়াছ হাতে,
খেয়া ছাড়িবার আগে তীরের বিদায়স্পর্শ দিতে
তোমরা পথিকবন্ধু,
যেমন রাত্রির তারা
অন্ধকারে লুপ্তপথ যাত্রীর শেষের ক্লিষ্ট ক্ষণে।

উদয়ন
৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। সকাল

আরোগ্য

১

এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি—
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি
এই মহামন্ত্রখানি,
চরিতার্থ জীবনের বাণী।
দিনে দিনে পেয়েছিনু সত্যের যা-কিছু উপহার
মধুরসে ক্ষয় নাই তার।
তাই এই মন্ত্রবাণী মৃত্যুর শেষের প্রান্তে বাজে—
সব ক্ষতি মিথ্যা করি অনন্তের আনন্দ বিরাজে
শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর
বলে যাব, তোমার ধূলির
তিলক পরেছি ভালে,
দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মুরতি,
এই জেনে এ ধুলায় রাখিনু প্রণতি।

উদয়ন
১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। সকাল

পরম সুন্দর
আলোকের স্নানপুণ্য প্রাতে।
অসীম অরূপ
রূপে রূপে স্পর্শমণি
রসমূর্তি করিছে রচনা,
প্রতিদিন
চিরনূতনের অভিষেক

চিরপুরাতন বেদিতলে।
মিলিয়া শ্যামলে নীলিমায়
ধরণীর উত্তরীয়
বুনে চলে ছায়াতে আলোতে।
আকাশের হৃৎস্পন্দন
পল্লবে পল্লবে দেয় দোলা।
প্রভাতের কণ্ঠ হতে মণিহার করে ঝিলিমিলি
বন হতে বনে।
পাখিদের অকারণ গান
সাধুবাদ দিতে থাকে জীবনলক্ষ্মীরে।
সবকিছু সাথে মিশে মানুষের প্রীতির পরশ
অমৃতের অর্থ দেয় তারে,
মধুময় করে দেয় ধরণীর ধূলি,
সর্বত্র বিছায়ে দেয় চিরমানবের সিংহাসন।

উদয়ন
১২ জানুয়ারি, ১৯৪১। দুপুর

৩

নির্জন রোগীর ঘর।
খোলা দ্বার দিয়ে
বাঁকা ছায়া পড়েছে শয্যায়।
শীতের মধ্যাহ্নতাপে তন্দ্রাতুর বেলা
চলেছে মন্থরগতি
শৈবালে দুর্বলস্রোত নদীর মতন।
মাঝে মাঝে জাগে যেন দূর অতীতের দীর্ঘশ্বাস
শস্যহীন মাঠে।

মনে পড়ে কতদিন
ভাঙা পাড়িতলে পদ্মা

কর্মহীন প্রৌঢ় প্রভাতের
ছায়াতে আলোতে
আমার উদাস চিন্তা দেয় ভাসাইয়া
ফেনায় ফেনায়।
স্পর্শ করি শূন্যের কিনারা
জেলেডিঙি চলে পাল তুলে,
যূথভ্রষ্ট শুভ্র মেঘ পড়ে থাকে আকাশের কোণে।
আলোতে ঝিকিয়া-ওঠা ঘট কাঁখে পল্লীমেয়েদের
ঘোমটায় গুণ্ঠিত আলাপে
গুঞ্জরিত বাঁকা পথে আম্রবনচ্ছায়ে
কোকিল কোথায় ডাকে ক্ষণে ক্ষণে নিভৃত শাখায়,
ছায়ায় কুণ্ঠিত পল্লীজীবনযাত্রার
রহস্যের আবরণ কাঁপাইয়া তোলে মোর মনে।
পুকুরের ধারে ধারে সর্ষেখেতে পূর্ণ হয়ে যায়
ধরণীর প্রতিদান রৌদ্রের দানের,
সূর্যের মন্দিরতলে পুষ্পের নৈবেদ্য থাকে পাতা।

আমি শান্ত দৃষ্টি মেলি নিভৃত প্রহরে
পাঠায়েছি নিঃশব্দ বন্দনা
সেই সবিতারে যাঁর জ্যোতিরূপে প্রথম মানুষ
মর্তের প্রাঙ্গণতলে দেবতার দেখেছে স্বরূপ।
মনে মনে ভাবিয়াছি, প্রাচীন যুগের
বৈদিক মন্ত্রের বাণী কণ্ঠে যদি থাকিত আমার
মিলিত আমার স্তব স্বচ্ছ এই আলোকে আলোকে।
ভাষা নাই, ভাষা নাই ;
চেয়ে দূর দিগন্তের পানে
মৌন মোর মেলিয়াছি পাণ্ডুনীল মধ্যাহ্ন-আকাশে।

উদয়ন
১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। দুপুর

৪

ঘণ্টা বাজে দূরে।
শহরের অভ্রভেদী আত্মঘোষণার
মুখরতা মন থেকে লুপ্ত হয়ে গেল,
আতপ্ত মাঘের রৌদ্রে অকারণে ছবি এল চোখে
জীবনযাত্রার প্রান্তে ছিল যাহা অনতিগোচর।

গ্রামগুলি গেঁথে গেঁথে মেঠো পথ গেছে দূর-পানে
নদীর পাড়ির 'পর দিয়ে।
প্রাচীন অশথতলা,
খেয়ার আশায় লোক ব'সে
পাশে রাখি হাটের পসরা।
গঞ্জের টিনের চালাঘরে
গুড়ের কলস সারি সারি,
চেটে যায় ঘ্রাণলুব্ধ পাড়ার কুকুর।
ভিড় করে মাছি।
রাস্তায় উপুড়মুখো গাড়ি
পাটের বোঝাই ভরা,
একে একে বস্তা টেনে উচ্চস্বরে চলেছে ওজন্
আড়তের আঙিনায়।
বাঁধা-খোলা বলদেরা
রাস্তার সবুজ প্রান্তে ঘাস খেয়ে ফেরে,
লেজের চামর হানে পিঠে।
সর্ষে আছে স্তূপাকার
গোলায় তোলার অপেক্ষায়।
জেলেনৌকো এল ঘাটে,
ঝুড়ি কাঁখে জুটেছে মেছুনি;
মাথার উপরে ওড়ে চিল।
মহাজনী নৌকোগুলো ঢালুতটে বাঁধা পাশাপাশি
মাল্লা বুনিতেছে জাল রৌদ্রে বসি চালের উপরে।

আঁকড়ি মোষের গলা সাঁতারিয়া চাষী ভেসে চলে
ওপারে ধানের খেতে।
অদূরে বনের ঊর্ধ্বে মন্দিরের চূড়া
ঝলি.ছ প্রভাত-রৌদ্রালোকে।
মাঠের অদৃশ্য পা.র চ.লে রেলগাড়ি
ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর
ধ্বনিরেখা টেনে দি.য়ে বাতাসের বুকে,
পশ্চাতে ধোঁয়ায় মেলি
দূরত্বজয়ের দীর্ঘ বিজয়পতাকা।

মনে এল, কিছুই সে নয়, সেই বহুদিন আগে,
দু'পহর রাত্তি,
নৌকা বাঁধা গঙ্গার কিনারে।
জ্যোৎস্নায় চিক্কণ জল,
ঘনীভূত ছায়ামূর্তি নিষ্কম্প অরণ্যতীরে-তীরে,
ক্বচিৎ বনের ফাঁকে দেখা যায় প্রদীপের শিখা।
সহসা উঠিনু জেগে।
শব্দশূন্য নিশীথ-আকাশে
উঠিছে গানের ধ্বনি তরুণ কণ্ঠের,
ছুটিছে ভাঁটির স্রোতে তন্বী নৌকা তরতর বেগে।
মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল;
দুই পারে স্তব্ধ বনে জাগিয়া রহিল শিহরন;
চাঁদের-মুকুট-পরা অচঞ্চল রাত্রির প্রতিমা
রহিল নির্বাক্ হয়ে পরাভূত ঘুমের আসনে।

পশ্চিমের গঙ্গাতীর, শহরের শেষ প্রান্তে বাসা,
দূরপ্রসারিত চর
শূন্য আকাশের নীচে শূন্যতার ভাষ্য করে যেন।
হেথা হোথা চরে গরু শস্যশেষ বাজরার খেতে;
তর্মুজের লতা হতে

ছাগল খেদায়ে রাখে কাঠি হাতে কৃষাণ-বালক।
কোথাও বা একা পল্লীনারী
শাকের সন্ধানে ফেরে ঝুড়ি নিয়ে কাঁখে।
কভু বহু দূরে চলে নদীর রেখার পাশে পাশে
নতপৃষ্ঠ ক্লিষ্টগতি গুণটানা মাল্লা একসারি।
জলে স্থলে সজীবের আর চিহ্ন নাই সারাবেলা।
গোলকচাঁপার গাছ অনাদৃত কাছের বাগানে ;
তলায়-আসন-গাঁথা বৃদ্ধ মহানিম,
নিবিড় গম্ভীর তার আভিজাত্যচ্ছায়া।
রাত্রে সেথা বকের আশ্রয়।
ইঁদারায় টানা জল
নালা বেয়ে সারাদিন কুলুকুলু চলে
ভুট্টার ফসলে দিতে প্রাণ।
ভজিয়া জাঁতায় ভাঙে গম
পিতল-কাঁকন-পরা হাতে।
মধ্যাহ্ন আবিষ্ট করে একটানা স্বর।

পথে-চলা এই দেখাশোনা
ছিল যাহা ক্ষণচর
চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে,
চিত্তে আজ তাই জেগে ওঠে ;
এইসব উপেক্ষিত ছবি
জীবনের সর্বশেষ বিচ্ছেদবেদনা
দূরের ঘণ্টার রবে এনে দেয় মনে।

উদয়ন
৩১ জানুয়ারি, ১৯৪১। বিকাল

৫

মুক্তবাতায়নপ্রান্তে জনশূন্য ঘরে
বসে থাকি নিস্তব্ধ প্রহরে,
বাহিরে শ্যামল ছন্দে উঠে গান
ধরণীর প্রাণের আহ্বান ;
অমৃতের উৎসস্রোতে
চিত্ত ভেসে চলে যায় দিগন্তের নীলিম আলোতে।
কার পানে পাঠাইবে স্তুতি
ব্যগ্র এই মনের আকূতি,
অমূল্যেরে মূল্য দিতে ফিরে সে খুঁজিয়া বাণীরূপ,
করে থাকে চুপ,
বলে, আমি আনন্দিত— ছন্দ যায় থামি—
বলে, ধন্য আমি।

উদয়ন
২৮ জানুয়ারি, ১৯৪১। বিকাল

৬

অতি দূরে আকাশের সুকুমার পাণ্ডুর নীলিমা।
অরণ্য তাহারি তলে ঊর্ধ্বে বাহু মেলি
আপন শ্যামল অর্ঘ্য নিঃশব্দে করিছে নিবেদন।
মাঘের তরুণ রৌদ্র ধরণীর 'পরে
বিছাইল দিকে দিকে স্বচ্ছ আলোকের উত্তরীয়।
এ কথা রাখিনু লিখে
উদাসীন চিত্রকর এই ছবি মুছিবার আগে।

উদয়ন
২৪ জানুয়ারি, ১৯৪১। সকাল

৭

হিংস্র রাত্রি আসে চুপে চুপে,
গতবল শরীরের শিথিল অর্গল ভেঙে দিয়ে
অন্তরে প্রবেশ করে,

হরণ করিতে থাকে জীবনের গৌরবের রূপ
কালিমার আক্রমণে হার মানে মন।
এ পরাভবের লজ্জা এ অবসাদের অপমান
যখন ঘনিয়ে ওঠে, সহসা দিগন্তে দেখা দেয়
দিনের পতাকাখানি স্বর্ণকিরণের রেখা-আঁকা;
আকাশের যেন কোন্ দূর কেন্দ্র হতে
উঠে ধ্বনি 'মিথ্যা মিথ্যা' বলি।
প্রভাতের প্রসন্ন আলোকে
দুঃখবিজয়ীর মূর্তি দেখি আপনার
জীর্ণদেহদুর্গের শিখরে।

উদয়ন
২৭ জানুয়ারি, ১৯৪১। সকাল

৮

একা ব'সে সংসারের প্রান্ত-জানালায়
দিগন্তের নীলিমায় চোখে পড়ে অনন্তের ভাষা।
আলো আসে ছায়ায় জড়িত
শিরীষের গাছ হতে শ্যামলের স্নিগ্ধ সখ্য বহি।
বাজে মনে— নহে দূর, নহে বহু দূর।
পথরেখা লীন হল অস্তগিরিশিখর-আড়ালে,
স্তব্ধ আমি দিনান্তের পান্থশালা-দ্বারে,
দূরে দীপ্তি দেয় ক্ষণে ক্ষণে
শেষতীর্থমন্দিরের চূড়া।
সেথা সিংহদ্বারে বাজে দিন-অবসানের রাগিণী
যার মূর্ছনায় মেশা এ জন্মের যা-কিছু সুন্দর,
স্পর্শ যা করেছে প্রাণ দীর্ঘ যাত্রাপথে
পূর্ণতার ইঙ্গিত জানায়ে।
বাজে মনে—নহে দূর, নহে বহু দূর।

উদয়ন
৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। বিকাল

৯

বিরাট সৃষ্টির ক্ষেত্রে
আতশবাজির খেলা আকাশে আকাশে
সূর্য তারা লয়ে
যুগযুগান্তের পরিমাপে।
অনাদি অদৃশ্য হতে আমিও এসেছি
ক্ষুদ্র অগ্নিকণা নিয়ে
এক প্রান্তে ক্ষুদ্র দেশে কালে।
প্রস্থানের অঙ্কে আজ এসেছি যেমনি
দীপশিখা ম্লান হয়ে এল,
ছায়াতে পড়িল ধরা এ খেলার মায়ার স্বরূপ,
শ্লথ হয়ে এল ধীরে
সুখ দুঃখ নাট্যসজ্জাগুলি।
দেখিলাম, যুগে যুগে নটনটী বহু শত শত
ফেলে গেছে নানারঙা বেশ তাহাদের
রঙ্গশালা-দ্বারের বাহিরে।
দেখিলাম চাহি
শত শত নির্বাপিত নক্ষত্রের নেপথ্যপ্রাঙ্গণে
নটরাজ নিস্তব্ধ একাকী।

উদয়ন
৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। বিকাল

১০

অলস সময়-ধারা বেয়ে
মন চলে শূন্য-পানে চেয়ে।
সে মহাশূন্যের পথে ছায়া-আঁকা ছবি পড়ে চোখে
কত কাল দলে দলে গেছে কত লোকে
সুদীর্ঘ অতীতে
জয়োদ্ধত প্রবল গতিতে।

এসেছে সাম্রাজ্যলোভী পাঠানের দল,
এসেছে মোগল ;
বিজয়রথের চাকা
উড়ায়েছে ধূলিজাল, উড়িয়াছে বিজয়পতাকা।
শূন্যপথে চাই,
আজ তার কোনো চিহ্ন নাই।
নির্মল সে নীলিমায় প্রভাতে ও সন্ধ্যায় রাঙালো
যুগে যুগে সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের আলো।
আরবার সেই শূন্যতলে
আসিয়াছে দলে দলে
লোহবাঁধা পথে
অনলনিশ্বাসী রথে
প্রবল ইংরেজ,
বিকীর্ণ করেছে তার তেজ।
জানি তারো পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল,
কোথায় ভাসায়ে দেবে সাম্রাজ্যের দেশবেড়া জাল ;
জানি তার পণ্যবাহী সেনা
জ্যোতিষ্কলোকের পথে রেখামাত্র চিহ্ন রাখিবে না।

মাটির পৃথিবী-পানে আঁখি মেলি যবে
দেখি সেথা কলকলরবে
বিপুল জনতা চলে
নানা পথে নানা দলে দলে
যুগ যুগান্তর হতে মানুষের নিত্য প্রয়োজনে
জীবনে মরণে।
ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল ;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।

ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।
রাজছত্র ভেঙে পড়ে, রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে,
জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে,
রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত-আঁখি
শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।
ওরা কাজ করে
দেশে দেশান্তরে,
অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের সমুদ্র-নদীর ঘাটে ঘাটে,
পঞ্জাবে বোম্বাই-গুজরাটে।
গুরুগুরু গর্জন গুন্‌গুন্‌ স্বর
দিনরাত্রে গাঁথা পড়ি দিনযাত্রা করিছে মুখর।
দুঃখ সুখ দিবসরজনী
মন্দ্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি।
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ-'পরে
ওরা কাজ করে।

উদয়ন
১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। সকাল

১১

পলাশ আনন্দমূর্তি জীবনের ফাল্গুনদিনের,
আজ এই সম্মানহীনের
দরিদ্র বেলায় দিলে দেখা
যেথা আমি সাথিহীন একা
উৎসবের প্রাঙ্গণ-বাহিরে
শস্যহীন মরুময় তীরে।
যেখানে এ ধরণীর প্রফুল্ল প্রাণের কুঞ্জ হতে
অনাদৃত দিন মোর নিরুদ্দেশ স্রোতে
ছিন্নবৃন্ত চলিয়াছে ভেসে
বসন্তের শেষে।

তবুও তো কৃপণতা নাই তব দানে,
যৌবনের পূর্ণ মূল্য দিলে মোর দীপ্তিহীন প্রাণে,
অদৃষ্টের অবজ্ঞারে কর নি স্বীকার—
ঘুচাইলে অবসাদ তার ;
জানাইলে চিত্তে মোর লভি অনুক্ষণ
সুন্দরের অভ্যর্থনা, নবীনের আসে নিমন্ত্রণ।

উদয়ন
১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। দুপুর

১২

দ্বার খোলা ছিল মনে, অসতর্কে সেথা অকস্মাৎ
লেগেছিল কী লাগিয়া কোথা হতে দুঃখের আঘাত ;
সে লজ্জায় খুলে গেল মর্মতলে প্রচ্ছন্ন যে বল
জীবনের নিহিত সম্বল।
ঊর্ধ্ব হতে জয়ধ্বনি
অন্তরে দিগন্তপথে নামিল তখনি,
আনন্দের বিচ্ছুরিত আলো
মুহূর্তে আঁধার-মেঘ দীর্ণ করি হৃদয়ে ছড়ালো।
ক্ষুদ্র কোটরের অসম্মান
লুপ্ত হল, নিখিলের আসনে দেখিনু নিজ স্থান,
আনন্দে আনন্দময়
চিত্ত মোর করি নিল জয়,
উৎসবের পথ
চিনে নিল মুক্তিক্ষেত্রে সগৌরবে আপন জগৎ।
দুঃখ-হানা গ্লানি যত আছে,
ছায়া সে, মিলালো তার কাছে।

উদয়ন
১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। দুপুর

১৩

ভালোবাসা এসেছিল একদিন তরুণ বয়সে
নির্ঝরের প্রলোপকল্লোলে,
অজানা শিখর হতে
সহসা বিস্ময় বহি আনি
ভ্রূভঙ্গিত পাষাণের নিশ্চল নির্দেশ
লঙ্ঘিয়া উচ্ছল পরিহাসে,
বাতাসেরে করি' ধৈর্যহারা,
পরিচয়ধারা-মাঝে তরঙ্গিয়া অপরিচয়ের
অভাবিত রহস্যের ভাষা,
চারি দিকে স্থির যাহা পরিমিত নিত্য প্রত্যাশিত
তারি মধ্যে মুক্ত করি' ধাবমান বিদ্রোহের ধারা।

আজ সেই ভালোবাসা স্নিগ্ধ সান্ত্বনার স্তব্ধতায়
রয়েছে নিঃশব্দ হয়ে প্রচ্ছন্ন গভীরে।
চারি দিকে নিখিলের বৃহৎ শান্তিতে
মিলেছে সে সহজ মিলনে,
তপস্বিনী রজনীর তারার আলোয় তার আলো,
পূজারত অরণ্যের পুষ্প-অর্ঘ্যে তাহার মাধুরী।

উদয়ন
৩০ জানুয়ারি, ১৯৪১। দুপুর

১৪

প্রত্যহ প্রভাতকালে ভক্ত এ কুকুর
স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে আসনের কাছে
যতক্ষণে সঙ্গ তার না করি স্বীকার
করস্পর্শ দিয়ে।
এটুকু স্বীকৃতি লাভ করি
সর্বাঙ্গে তরঙ্গি উঠে আনন্দপ্রবাহ।

বাক্যহীন প্রাণীলোক-মাঝে
এই জীব শুধু
ভালো মন্দ সব ভেদ করি
দেখেছে সম্পূর্ণ মানুষেরে ;
দেখেছে আনন্দে যারে প্রাণ দেওয়া যায়,
যারে ঢেলে দেওয়া যায় অহেতুক প্রেম,
অসীম চৈতন্যলোকে
পথ দেখাইয়া দেয় যাহার চেতনা।
দেখি যবে মূক হৃদয়ের
প্রাণপণ আত্মনিবেদন
আপনার দীনতা জানায়ে,
ভাবিয়া না পাই ও যে কী মূল্য করেছে আবিষ্কার
আপন সহজ বোধে মানবস্বরূপে ;
ভাষাহীন দৃষ্টির করুণ ব্যাকুলতা
বোঝে যাহা বোঝাতে পারে না,
আমারে বুঝায়ে দেয় সৃষ্টি-মাঝে মানবের সত্য পরিচয়

উদয়ন
৭ পৌষ, ১৩৪৭। সকাল

১৫

খ্যাতি নিন্দা পার হয়ে জীবনের এসেছি প্রদোষে,
বিদায়ের ঘাটে আছি বসে।
আপনার দেহটারে অসংশয়ে করেছি বিশ্বাস,
জরার সুযোগ পেয়ে নিজেরে সে করে পরিহাস,
সকল কাজেই দেখি কেবলি ঘটায় বিপর্যয়,
আমার কর্তৃত্ব করে ক্ষয় ;
সেই অপমান হতে বাঁচাতে যাহারা
অবিশ্রাম দিতেছে পাহারা,
পাশে যারা দাঁড়ায়েছে দিনান্তের শেষ আয়োজনে,
নাম না'ই বলিলাম তাহারা রহিল মনে মনে।

তাহারা দিয়েছে মোরে সৌভাগ্যের শেষ পরিচয়,
ভুলায়ে রাখিছে তারা দুর্বল প্রাণের পরাজয় ;
এ কথা স্বীকার তারা করে—
খ্যাতি প্রতিপত্তি যত সুযোগ্য সক্ষমদের তরে ;
তাহারাই করিছে প্রমাণ
অক্ষমের ভাগ্যে আছে জীবনের শ্রেষ্ঠ যেই দান।
সমস্ত জীবন ধরে খ্যাতির খাজনা দিতে হয়,
কিছু সে সহে না অপচয় ;
সব মূল্য ফুরাইলে যে দৈন্য প্রেমের অর্ঘ্য আনে
অসীমের স্বাক্ষর সেখানে।

উদয়ন
৯ জানুয়ারি, ১৯৪১। সকাল

১৬

দিন পরে যায় দিন, স্তব্ধ বসে থাকি ;
ভাবি মনে, জীবনের দান যত কত তার বাকি
চুকায়ে সঞ্চয় অপচয়।
অযত্নে কী হয়ে গেছে ক্ষয়,
কী পেয়েছি প্রাপ্য যাহা, কী দিয়েছি যাহা ছিল দেয়,
কী রয়েছে শেষের পাথেয়।
যারা কাছে এসেছিল, যারা চলে গিয়েছিল দূরে,
তাদের পরশখানি রয়ে গেছে মোর কোন্ সুরে।
অন্যমনে কারে চিনি নাই,
বিদায়ের পদধ্বনি প্রাণে আজ বাজিছে বৃথাই,
হয়তো হয় নি জানা ক্ষমা করে কে গিয়েছে চলে
কথাটি না ব'লে।
যদি ভুল করে থাকি তাহার বিচার
ক্ষোভ কি রাখিবে তবু যখন রব না আমি আর।
কত সূত্র ছিন্ন হল জীবনের আস্তরণময়,
জোড়া লাগাবারে আর রবে না সময়।

জীবনের শেষপ্রান্তে যে প্রেম রয়েছে নিরবধি
মোর কোনো অসম্মান তাহে ক্ষতচিহ্ন দেয় যদি,
আমার মৃত্যুর হস্ত আরোগ্য আনিয়া দিক তারে,
এ কথাই ভাবি বারে বারে।

উদয়ন
১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। বিকাল

১৭

যখন এ দেহ হতে রোগে ও জরায়
দিনে দিনে সামর্থ্য ঝরায়,
যৌবন এ জীর্ণ নীড় পিছে ফেলে দিয়ে যায় ফাঁকি,
কেবল শৈশব থাকে বাকি।
বদ্ধ ঘরে কর্মক্ষুব্ধ সংসার বাহিরে
অশক্ত সে শিশু চিত্ত মা খুঁজিয়া ফিরে।
বিত্তহারা প্রাণ লুব্ধ হয়
বিনা মূল্যে স্নেহের প্রশ্রয়
কারে কাছে করিবারে লাভ,
যার আবির্ভাব
ক্ষীণজীবিতেরে করে দান
জীবনের প্রথম সম্মান।
"থাকো তুমি" মনে নিয়ে এইটুকু চাওয়া
কে তারে জানাতে পারে তার প্রতি নিখিলের দাওয়া
শুধু বেঁচে থাকিবার।
এ বিস্ময় বারবার
আজি আসে প্রাণে,
প্রাণলক্ষ্মী ধরিত্রীর গভীর আহ্বানে
মা দাঁড়ায় এসে
যে মা চিরপুরাতন নূতনের বেশে

উদয়ন
২১ জানুয়ারি, ১৯৪১। বিকাল

১৮

ফসল কাটা হলে সারা মাঠ হয়ে যায় ফাঁক ;
অনাদরের শস্য গজায়, তুচ্ছ দামের শাক।
আঁচল-ভরে তুলতে আসে গরিব-ঘরের মেয়ে,
খুশি হয়ে বাড়িতে যায় যা জোটে তাই পেয়ে।
আজকে আমার চাষ চলে না, নাই লাঙলের বালাই ;
পোড়ো মাঠের কুঁড়েমিতে মন্থর দিন চালাই।
জমিতে রস কিছু আছে, শক্ত যায় নি আঁটি ;
ফলায় না সে ফল তবুও সবুজ রাখে মাটি।
শ্রাবণ আমার গেছে চলে, নাই বাদলের ধারা ;
অঘ্রান সে সোনার ধানের দিন করেছে সারা।
চৈত্র আমার রোদে পোড়া, শুকনো যখন নদী,
বুনো ফলের ঝোপের তলায় ছায়া বিছায় যদি,
জানব আমার শেষের মাসে ভাগ্য দেয় নি ফাঁকি,
শ্যামল ধরার সঙ্গে আমার বাঁধন রইল বাকি।

উদয়ন
১০ জানুয়ারি, ১৯৪১। সকাল

১৯

দিদিমণি—
অফুরান সান্ত্বনার খনি।
কোনো ক্লান্তি কোনো ক্লেশ
মুখে চিহ্ন দেয় নাই লেশ।
কোনো ভয় কোনো ঘৃণা কোনো কাজে কিছুমাত্র গ্লানি
সেবার মাধুর্যে ছায়া নাহি দেয় আনি।
এ অখণ্ড প্রসন্নতা ঘিরে তারে রয়েছে উজ্জ্বলি,
রচিতেছে শান্তির মণ্ডলী ;
ক্ষিপ্র হস্তক্ষেপে
চারি দিকে স্বস্তি দেয় ব্যেপে ;

আশ্বাসের বাণী সুমধুর
অবসাদ করি দেয় দূর।
এ স্নেহমাধুর্যধারা
অক্ষম রোগীরে ঘিরে আপনার রচিছে কিনারা ;
অবিরাম পরশ চিন্তার
বিচিত্র ফসলে যেন উর্বর করিছে দিন তার।
এ মাধুর্য করিতে সার্থক
এতখানি নির্বলের ছিল আবশ্যক।
অবাক হইয়া তারে দেখি,
রোগীর দেহের মাঝে অনন্ত শিশুরে দেখেছে কি।

উদয়ন
২ জানুয়ারি, ১৯৪১

২০

বিশুদাদা—
দীর্ঘবপু, দৃঢ়বাহু, দুঃসহ কর্তব্যে নাহি বাধা,
বুদ্ধিতে উজ্জ্বল চিত্ত তার
সর্বদেহে তৎপরতা করিছে বিস্তার।
তন্দ্রার আড়ালে
রোগক্লিষ্ট ক্লান্ত রাত্রিকালে
মূর্তিমান শক্তির জাগ্রত রূপ প্রাণে
বলিষ্ঠ আশ্বাস বহি আনে,
নির্নিমেষ নক্ষত্রের মাঝে
যেমন জাগ্রত শক্তি নিঃশব্দ বিরাজে
অমোঘ আশ্বাসে
সুপ্ত রাত্রে বিশ্বের আকাশে।
যখন শুধায় মোরে, দুঃখ কি রয়েছে কোনোখানে
মনে হয়, নাই তার মানে—
দুঃখ মিছে ভ্রম,
আপন পৌরুষে তারে আপনি করিব অতিক্রম।

সেবার ভিতরে শক্তি দুর্বলের দেহে করে দান
বলের সম্মান।

উদয়ন
৯ জানুয়ারি, ১৯৪১। সকাল

২১

চিরদিন আছি আমি অকেজোর দলে ;
বাজে লেখা, বাজে পড়া, দিন কাটে মিথ্যা বাজে ছলে।
যে গুণী কাটাতে পারে বেলা তার বিনা আবশ্যকে
তারে "এসো এসো" বলে যত্ন করে বসাই বৈঠকে।
কেজো লোকদের করি ভয়,
কব্জিতে ঘড়ি বেঁধে শক্ত করে বেঁধেছে সময়—
বাজে খরচের তরে উদ্‌বৃত্ত কিছুই নেই হাতে,
আমাদের মতো কুঁড়ে লজ্জা পায় তাদের সাক্ষাতে।
সময় করিতে নষ্ট আমরা ওস্তাদ,
কাজের করিতে ক্ষতি নানামতো পেতে রাখি ফাঁদ।
আমার শরীরটা যে বাস্তুদের তফাতে ভাগায়—
আপনার শক্তি নেই, পরদেহে মাশুল লাগায়।
সরোজদাদার দিকে চাই—
সব তাতে রাজি দেখি, কাজকর্ম যেন কিছু নাই,
সময়ের ভাণ্ডারেতে দেওয়া নেই চাবি,
আমার মতন এই অক্ষমের দাবি
মেটাবার আছে তার অক্ষুণ্ণ উদার অবসর,
দিতে পারে অকৃপণ অক্লান্ত নির্ভর।
দ্বিপ্রহর রাত্রিবেলা স্তিমিত আলোকে
সহসা তাহার মূর্তি পড়ে যবে চোখে
মনে ভাবি, আশ্বাসের তরী বেয়ে দূত কে পাঠালে,
দুর্যোগের দুঃস্বপ্ন কাটালে।

দায়হীন মানুষের অভাবিত এই আবির্ভাব
দয়াহীন অদৃষ্টের বন্দীশালে মহামূল্য লাভ।

উদয়ন
৯ জানুয়ারি, ১৯৪১। সকাল

২২

নগাধিরাজের দূর নেবু-নিকুঞ্জের
রসপাত্রগুলি
আনিল এ শয্যাতলে
জনহীন প্রভাতের রবির মিত্রতা,
অজানা নির্ঝরিণীর
বিচ্ছুরিত আলোকচ্ছটার
হিরণ্ময় লিপি,
সুনিবিড় অরণ্যবীথির
নিঃশব্দ মর্মরে বিজড়িত
স্নিগ্ধ হৃদয়ের দৌত্যখানি।
রোগপঙ্গু লেখনীর বিরল ভাষার
ইঙ্গিতে পাঠায় কবি আশীর্বাদ তার।

২৩

নারী তুমি ধন্যা--
আছে ঘর, আছে ঘরকন্না।
তারি মধ্যে রেখেছ একটুখানি ফাঁক।
সেথা হতে পশে কানে বাহিরের দুর্বলের ডাক
নিয়ে এসো শুশ্রূষার ডালি,
স্নেহ দাও ঢালি।
যে জীবলক্ষ্মীর মনে পালনের শক্তি বহমান,
নারী তুমি নিত্য শোন তাহারি আহ্বান।
সৃষ্টিবিধাতার
নিয়েছ কর্মের ভার,

তুমি নারী
তাঁহারি আপন সহকারী।
উন্মুক্ত করিতে থাক আরোগ্যের পথ,
নবীন করিতে থাক জীর্ণ যে-জগৎ,
শ্রীহারা যে তার ’পরে তোমার ধৈর্যের সীমা নাই,
আপন অসাধ্য দিয়ে দয়া তব টানিছে তারাই।
বুদ্ধিভ্রষ্ট অসহিষ্ণু অপমান করে বারে বারে,
চক্ষু মুছে ক্ষমা কর তারে।
অকৃতজ্ঞতার দ্বারে আঘাত সহিছ দিনরাতি,
লও শির পাতি।
যে অভাগ্য নাহি লাগে কাজে,
প্রাণলক্ষ্মী ফেলে যারে আবর্জনা-মাঝে,
তুমি তারে আনিছ কুড়ায়ে,
তার লাঞ্ছনার তাপ স্নিগ্ধ হস্তে দিতেছ জুড়ায়ে।
দেবতারে যে পূজা দেবার
দুর্ভাগারে কর দান সেই মূল্য তোমার সেবার।
বিশ্বের পালনী শক্তি নিজ বীর্যে বহ চুপে চুপে
মাধুরীর রূপে।
ভ্রষ্ট যেই, ভগ্ন যেই, বিরূপ বিকৃত,
তারি লাগি সুন্দরের হাতের অমৃত।

উদয়ন
১৩ জানুয়ারি, ১৯৪১। সকাল

২৪

অলস শয্যার পাশে জীবন মন্থরগতি চলে,
রচে শিল্প শৈবালের দলে।
মর্যাদা নাইক তার, তবু তাহে রয়
জীবনের স্বল্পমূল্য কিছু পরিচয়।

উদয়ন
২৩ জানুয়ারি, ১৯৪১। সকাল

২৫

বিরাট মানবচিত্তে
অকথিত বাণীপুঞ্জ
অব্যক্ত আবেগে ফিরে কাল হতে কালে
মহাশূন্যে নীহারিকাসম।
সে আমার মনঃসীমানার
সহসা আঘাতে ছিন্ন হয়ে
আকারে হয়েছে ঘনীভূত,
আবর্তন করিতেছে আমার রচনাকক্ষপথে

উদয়ন
৫ ডিসেম্বর, ১৯৪০। সকাল

২৬

এ কথা সে কথা মনে আসে,
বর্ষাশেষে শরতের মেঘ যেন ফিরিছে বাতাসে।
কাজের বাঁধনহারা শূন্যে করে মিছে আনাগোনা;
কখনো রুপালি আঁকে, কখনো ফুটায়ে তোলে সোনা।
অদ্ভুত মূর্তি সে রচে দিগন্তের কোণে,
রেখার বদল করে পুনঃ পুনঃ যেন অন্যমনে।
বাষ্পের সে শিল্পকাজ যেন আনন্দের অবহেলা—
কোনোখানে দায় নেই, তাই তার অর্থহীন খেলা।
জাগার দায়িত্ব আছে, কাজ নিয়ে তাই ওঠাপড়া।
ঘুমের তো দায়-নেই, এলোমেলো স্বপ্ন তাই গড়া।
মনের স্বপ্নের ধাত চাপা থাকে কাজের শাসনে,
বসিতে পায় না ছুটি স্বরাজ-আসনে।
যেমনি সে পায় ছাড়া খেয়ালে খেয়ালে করে ভিড়,
স্বপ্ন দিয়ে রচে যেন উড়ুক্ষু পাখির কোন্ নীড়।
আপনার মাঝে তাই পেতেছি প্রমাণ—
স্বপ্নের এ পাগলামি বিশ্বের আদিম উপাদান।

তাহারে দমনে রাখে, ধ্রুব করে সৃষ্টির প্রণালী
কর্তৃত্ব প্রচণ্ড বলশালী।
শিল্পের নৈপুণ্য এই উদ্দামেরে শৃঙ্খলিত করা,
অধরাকে ধরা।

উদয়ন
২৩ জানুয়ারি, ১৯৪১। দুপুর

২৭

বাক্যের যে ছন্দোজাল শিখেছি গাঁথিতে
সেই জালে ধরা পড়ে
অধরা যা চেতনার সতর্কতা ছিল এড়াইয়া
অগোচরে মনের গহনে।
নামে বাঁধিবারে চাই, না মানে নামের পরিচয়।
মূল্য তার থাকে যদি
দিনে দিনে হয় তাহা জানা
হাতে হাতে ফিরে।
অকস্মাৎ পরিচয়ে বিস্ময় তাহার
ভুলায় যদি বা,
লোকালয়ে নাহি পায় স্থান,
মনের সৈকততটে বিকীর্ণ সে রহে কিছুকাল,
লালিত যা গোপনের
প্রকাশ্যের অপমানে
দিনে দিনে মিশায় বালুতে।
পণ্যহাটে অচিহ্নিত পরিত্যক্ত রিক্ত এ জীর্ণতা
যুগে যুগে কিছু কিছু দিয়ে গেছে অখ্যাতের দান
সাহিত্যের ভাষা-মহাদ্বীপে
প্রাণহীন প্রবালের মতো।

উদয়ন
৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। বিকাল

২৮

মিলের চুমকি গাঁথি ছন্দের পাড়ের মাঝে মাঝে
অকেজো অলস বেলা ভরে ওঠে শেলাইয়ের কাজে।
অর্থভরা কিছুই-না চোখে করে ওঠে ঝিল্‌মিল্‌
ছড়াটার ফাঁকে ফাঁকে মিল।
গাছে গাছে জোনাকির দল
করে ঝলমল;
সে নহে দীপের শিখা, রাত্রি খেলা করে আঁধারেতে
টুকরো আলোক গেঁথে গেঁথে।
মেঠো গাছে ছোটো ছোটো ফুলগুলি জাগে;
বাগান হয় না তাহে, রঙের ফুটকি ঘাসে লাগে।
মনে থাকে, কাজে লাগে, সৃষ্টিতে সে আছে শত শত;
মনে থাকবার নয়, সেও ছড়াছড়ি যায় কত।
ঝরনায় জল ঝ'রে উর্বরা করিতে চলে মাটি;
ফেনাগুলো ফুটে ওঠে, পরক্ষণে যায় ফাটি ফাটি।
কাজের সঙ্গেই খেলা গাঁথা—
ভার তাহে লঘু রয়, খুশি হন সৃষ্টির বিধাতা।

উদয়ন
২৩ জানুয়ারি, ১৯৪১। সকাল

২৯

এ জীবনে সুন্দরের পেয়েছি মধুর আশীর্বাদ,
মানুষের প্রীতিপাত্রে পাই তাঁরি সুধার আস্বাদ!
দুঃসহ দুঃখের দিনে
অক্ষত অপরাজিত আত্মারে লয়েছি আমি চিনে।
আসন্ন মৃত্যুর ছায়া যেদিন করেছি অনুভব
সেদিন ভয়ের হাতে হয় নি দুর্বল পরাভব।
মহত্তম মানুষের স্পর্শ হতে হই নি বঞ্চিত,
তাঁদের অমৃতবাণী অন্তরেতে করেছি সঞ্চিত।

জীবনের বিধাতার যে দাক্ষিণ্য পেয়েছি জীবনে
তাহারি স্মরণলিপি রাখিলাম সকৃতজ্ঞমনে।

উদয়ন
২৮ জানুয়ারি, ১৯৪১। বিকাল

৩০

ধীরে সন্ধ্যা আসে, একে একে গ্রন্থি যত যায় স্খলি
প্রহরের কর্মজাল হতে। দিন দিল জলাঞ্জলি
খুলি পশ্চিমের সিংহদ্বার
সোনার ঐশ্বর্য তার
অন্ধকার-আলোকের সাগরসংগমে।
দূর প্রভাতের পানে নত হয়ে নিঃশব্দে প্রণমে।
চক্ষু তার মুদে আসে, এসেছে সময়
গভীর ধ্যানের তলে আপনার বাহ্য পরিচয়
করিতে মগন।
নক্ষত্রের শান্তিক্ষেত্র অসীম গগন
যেথা ঢেকে রেখে দেয় দিনশ্রীর অরূপ সত্তারে,
সেথায় করিতে লাভ সত্য আপনারে
খেয়া দেয় রাত্রি পারাবারে।

উদয়ন
১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। দুপুর

৩১

ক্ষণে ক্ষণে মনে হয় যাত্রার সময় বুঝি এল,
বিদায়দিনের 'পরে আবরণ ফেলো
অপ্রগল্‌ভ সূর্যাস্ত-আভার;
সময় যাবার
শান্ত হোক, স্তব্ধ হোক, স্মরণসভার সমারোহ
না রচুক শোকের সম্মোহ।
বনশ্রেণী প্রস্থানের দ্বারে
ধরণীর শান্তিমন্ত্র দিক মৌন পল্লবসম্ভারে।
নামিয়া আসুক ধীরে রাত্রির নিঃশব্দ আশীর্বাদ,
সপ্তর্ষির জ্যোতির প্রসাদ।

৩২

আলোকের অন্তরে যে আনন্দের পরশন পাই,
জানি আমি তার সাথে আমার আত্মার ভেদ নাই।
এক আদি জ্যোতি-উৎস হতে
চৈতন্যের পুণ্যস্রোতে
আমার হয়েছে অভিষেক,
ললাটে দিয়েছে জয়লেখ,
জানায়েছে অমৃতের আমি অধিকারী;
পরম-আমির সাথে যুক্ত হতে পারি
বিচিত্র জগতে
প্রবেশ লভিতে পারি আনন্দের পথে।

৩৩

এ আমির আবরণ সহজে স্খলিত হয়ে যাক;
চৈতন্যের শুভ্র জ্যোতি
ভেদ করি কুহেলিকা
সত্যের অমৃত রূপ করুক প্রকাশ।
সর্বমানুষের মাঝে
এক চিরমানবের আনন্দকিরণ
চিত্তে মোর হোক বিকীরিত।
সংসারের ক্ষুব্ধতার স্তব্ধ ঊর্ধ্বলোকে
নিত্যের যে শান্তিরূপ তাই যেন দেখে যেতে পারি,
জীবনের জটিল যা বহু নিরর্থক,
মিথ্যার বাহন যাহা সমাজের কৃত্রিম মূল্যেই,
তাই নিয়ে কাঙালের অশান্ত জনতা
দূরে ঠেলে দিয়ে
এ জন্মের সত্য অর্থ স্পষ্ট চোখে জেনে যাই যেন
সীমা তার পেরোবার আগে।

উদয়ন
১১ মাঘ, ১৩৪৭। সন্ধ্যা

জন্মদিনে

১৯৪০ রবীন্দ্রনাথ শ্রীনবীন গান্ধী গৃহীত

জন্মদিনে

১

সেদিন আমার জন্মদিন।
প্রভাতের প্রণাম লইয়া
উদয়দিগন্ত-পানে মেলিলাম আঁখি,
দেখিলাম সদ্যস্নাত উষা
আঁকি দিল আলোকচন্দনলেখা
হিমাদ্রির হিমশুভ্র পেলব ললাটে।
যে মহাদূরত্ব আছে নিখিল বিশ্বের মর্মস্থানে
তারি আজ দেখিনু প্রতিমা
গিরীন্দ্রের সিংহাসন-'পরে।
পরম গাম্ভীর্যে যুগে যুগে
ছায়াঘন অজানারে করিছে পালন
পথহীন মহারণ্য-মাঝে,
অভ্রভেদী সুদূরকে রেখেছে বেষ্টিয়া
দুর্ভেদ্য দুর্গমতলে
উদয় অস্তের চক্রপথে।
আজি এই জন্মদিনে
দূরত্বের অনুভব অন্তরে নিবিড় হয়ে এল।
যেমন সুদূর ঐ নক্ষত্রের পথ
নীহারিকা-জ্যোতির্বাষ্প-মাঝে
রহস্যে আবৃত,
আমার দূরত্ব আমি দেখিলাম তেমনি দুর্গমে—
অলক্ষ্য পথের যাত্রী, অজানা তাহার পরিণাম।

আজি এই জন্মদিনে
দূরের পথিক সেই তাহারি শুনিনু পদক্ষেপ
নির্জন সমুদ্রতীর হতে।

উদয়ন
২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। সকাল

২

বহু জন্মদিনে গাঁথা আমার জীবনে
দেখিলাম আপনারে বিচিত্র রূপের সমাবেশে।
একদা নূতন বর্ষ অতলান্ত সমুদ্রের বুকে
মোরে এনেছিল বহি
তরঙ্গের বিপুল প্রলাপে
দিক হতে যেথা দিগন্তরে
শূন্য নীলিমার 'পরে শূন্য নীলিমায়
তটকে করিছে অস্বীকার।
সেদিন দেখিনু ছবি অবিচিত্র ধরণীর—
সৃষ্টির প্রথম রেখাপাতে
জলমগ্ন ভবিষ্যৎ যবে
প্রতিদিন সূর্যোদয়-পানে
আপনার খুঁজিছে সন্ধান।
প্রাণের রহস্য-ঢাকা
তরঙ্গের যবনিকা-'পরে
চেয়ে চেয়ে ভাবিলাম,
এখনো হয় নি খোলা আমার জীবন-আবরণ—
সম্পূর্ণ যে আমি
রয়েছে গোপনে অগোচর।
নব নব জন্মদিনে
যে রেখা পড়িছে আঁকা শিল্পীর তুলির টানে টানে
ফোটে নি তাহার মাঝে ছবির চরম পরিচয়।

শুধু করি অনুভব,
চারি দিকে অব্যক্তের বিরাট প্লাবন
বেষ্টন করিয়া আছে দিবসরাত্রিরে।

উদয়ন
২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। বিকাল

৩

জন্মবাসরের ঘটে
নানা তীর্থে পুণ্যতীর্থবারি
করিয়াছি আহরণ, এ কথা রহিল মোর মনে।
একদা গিয়েছি চিন দেশে,
অচেনা যাহারা
ললাটে দিয়েছে চিহ্ন 'তুমি আমাদের চেনা' ব'লে।
খসে পড়ে গিয়েছিল কখন পরের ছদ্মবেশ;
দেখা দিয়েছিল তাই অন্তরের নিত্য যে মানুষ;
অভাবিত পরিচয়ে
আনন্দের বাঁধ দিল খুলে।
ধরিনু চিনের নাম, পরিনু চিনের বেশবাস।
এ কথা বুঝিনু মনে,
যেখানেই বন্ধু পাই সেখানেই নবজন্ম ঘটে।
আনে সে প্রাণের অপূর্বতা।
বিদেশী ফুলের বনে অজানা কুসুম ফুটে থাকে—
বিদেশী তাহার নাম, বিদেশে তাহার জন্মভূমি,
আত্মার আনন্দক্ষেত্রে তার আত্মীয়তা
অবারিত পায় অভ্যর্থনা।

উদয়ন
২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। সকাল

৪

আরবার ফিরে এল উৎসবের দিন।
বসন্তের অজস্র সম্মান
ভরি দিল তরুশাখা কবির প্রাঙ্গণে
নব জন্মদিনের ডালিতে।
রুদ্ধ কক্ষে দূরে আছি আমি—
এ বৎসরে বৃথা হল পলাশবনের নিমন্ত্রণ।
মনে করি, গান গাই বসন্তবাহারে।
আসন্ন বিরহস্বপ্ন ঘনাইয়া নেমে আসে মনে।
জানি, জন্মদিন
এক অবিচিত্র দিনে ঠেকিবে এখনি,
মিলে যাবে অচিহ্নিত কালের পর্যায়ে।
পুষ্পবীথিকার ছায়া এ বিষাদে করে না করুণ,
বাজে না স্মৃতির ব্যথা অরণ্যের মর্মরে গুঞ্জনে
নির্মম আনন্দ এই উৎসবের বাজাইবে বাঁশি
বিচ্ছেদের বেদনারে পথপার্শ্বে ঠেলিয়া ফেলিয়া।

উদয়ন
২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। দুপুর

৫

জীবনের আশি বর্ষে প্রবেশিনু যবে
এ বিস্ময় মনে আজ জাগে—
লক্ষকোটি নক্ষত্রের
অগ্নিনির্ঝরের যেথা নিঃশব্দ জ্যোতির বন্যাধারা
ছুটেছে অচিন্ত্য বেগে নিরুদ্দেশ শূন্যতা প্লাবিয়া
দিকে দিকে,
তমোঘন অন্তহীন সেই আকাশের বক্ষস্তলে
অকস্মাৎ করেছি উত্থান
অসীম সৃষ্টির যজ্ঞে মুহূর্তের স্ফুলিঙ্গের মতো
ধারাবাহী শতাব্দীর ইতিহাসে।

এসেছি সে পৃথিবীতে যেথা কল্প কল্প ধরি
প্রাণপঙ্ক সমুদ্রের গর্ভ হতে উঠি
জড়ের বিরাট অঙ্কতলে
উদ্ঘাটিল আপনার নিগূঢ় আশ্চর্য পরিচয়
শাখায়িত রূপে রূপান্তরে।
অসম্পূর্ণ অস্তিত্বের মোহাবিষ্ট প্রদোষের ছায়া
আচ্ছন্ন করিয়া ছিল পশুলোক দীর্ঘ যুগ ধরি;
কাহার একাগ্র প্রতীক্ষায়
অসংখ্য দিবসরাত্রি-অবসানে
মন্থরগমনে এল
মানুষ প্রাণের রঙ্গভূমে;
নূতন নূতন দীপ একে একে উঠিতেছে জ্বলে,
নূতন নূতন অর্থ লভিতেছে বাণী;
অপূর্ব আলোকে
মানুষ দেখিছে তার অপরূপ ভবিষ্যের রূপ,
পৃথিবীর নাট্যমঞ্চে
অঙ্কে অঙ্কে চৈতন্যের ধীরে ধীরে প্রকাশের পালা—
আমি সে নাট্যের পাত্রদলে
পরিয়াছি সাজ।
আমারো আহ্বান ছিল যবনিকা সরাবার কাজে,
এ আমার পরম বিস্ময়।
সাবিত্রী পৃথিবী এই, আত্মার এ মর্তনিকেতন,
আপনার চতুর্দিকে আকাশে আলোকে সমীরণে
ভূমিতলে সমুদ্রে পর্বতে
কী গূঢ় সংকল্প বহি করিতেছে সূর্যপ্রদক্ষিণ—
সে রহস্যসূত্রে গাঁথা এসেছিনু আশি বর্ষ আগে,
চলে যাব কয় বর্ষ পরে।

মংপু
বৈশাখ, ১৩৪৭

২৫।৬

৬

কাল প্রাতে মোর জন্মদিনে
এ শৈল-আতিথ্যবাসে
বুদ্ধের নেপালী ভক্ত এসেছিল মোর বার্তা শুনে।
ভূতলে আসন পাতি
বুদ্ধের বন্দনামন্ত্র শুনাইল আমার কল্যাণে—
গ্রহণ করিনু সেই বাণী।
এ ধরায় জন্ম নিয়ে যে মহামানব
সব মানবের জন্ম সার্থক করেছে একদিন,
মানুষের জন্মক্ষণ হতে
নারায়ণী এ ধরণী
যাঁর আবির্ভাব লাগি অপেক্ষা করেছে বহু যুগ,
যাঁহাতে প্রত্যক্ষ হল ধরায় সৃষ্টির অভিপ্রায়,
শুভক্ষণে পুণ্যমন্ত্রে
তাঁহারে স্মরণ করি জানিলাম মনে—
প্রবেশি মানবলোকে আশি বর্ষ আগে
এই মহাপুরুষের পুণ্যভাগী হয়েছি আমিও।

মংপু
বৈশাখ, ১৩৪৭

৭

অপরাহ্ণে এসেছিল জন্মবাসরের আমন্ত্রণে
পাহাড়িয়া যত।
একে একে দিল মোরে পুষ্পের মঞ্জরি
নমস্কারসহ।
ধরণী লভিয়াছিল কোন্ ক্ষণে
প্রস্তর আসনে বসি
বহু যুগ বহ্নিতপ্ত তপস্যার পরে এই বর,
এ পুষ্পের দান,
মানুষের জন্মদিনে উৎসর্গ করিবে আশা করি'।

সেই বর, মানুষেরে সুন্দরের সেই নমস্কার
আজি এল মোর হাতে
আমার জন্মের এই সার্থক স্মরণ।
নক্ষত্রে-খচিত মহাকাশে
কোথাও কি জ্যোতিঃসম্পদের মাঝে
কখনো দিয়েছে দেখা এ দুর্লভ আশ্চর্য সম্মান।

মংপু
বৈশাখ, ১৩৪৭

৮

আজি জন্মবাসরের বক্ষ ভেদ করি
প্রিয়মৃত্যুবিচ্ছেদের এসেছে সংবাদ ;
আপন আগুনে শোক দগ্ধ করি দিল আপনারে
উঠিল প্রদীপ্ত হয়ে।
সায়াহ্নবেলার ভালে অস্তসূর্য দেয় পরাইয়া
রক্তোজ্জ্বল মহিমার টিকা,
স্বর্ণময়ী করে দেয় আসন্ন রাত্রির মুখশ্রীরে,
তেমনি জ্বলন্ত শিখা মৃত্যু পরাইল মোরে
জীবনের পশ্চিমসীমায়।

আলোকে তাহার দেখা দিল
অখণ্ড জীবন, যাহে জন্ম মৃত্যু এক হয়ে আছে ;
সে মহিমা উদ্‌বারিল যাহার উজ্জ্বল অমরতা
কৃপণ ভাগ্যের দৈন্যে দিনে দিনে রেখেছিল ঢেকে।

মংপু
বৈশাখ, ১৩৪৭

৯

মোর চেতনায়
আদিসমুদ্রের ভাষা ওঙ্কারিয়া যায় ;
অর্থ তার নাহি জানি,
আমি সেই বাণী।

শুধু ছলছল কলকল ;
শুধু স্বর, শুধু নৃত্য, বেদনার কলকোলাহল ;
শুধু এ সাঁতার—
কখনো এ পারে চলা, কখনো ও পার,
কখনো বা অদৃশ্য গভীরে,
কভু বিচিত্রের তীরে তীরে।
ছন্দের তরঙ্গদোলে
কত যে ইঙ্গিত ভঙ্গী জেগে ওঠে, ভেসে যায় চলে।
স্তব্ধ মৌনী অচলের বহিয়া ইশারা
নিরন্তর স্রোতোধারা
অজানা সম্মুখে ধায়, কোথা তার শেষ
কে জানে উদ্দেশ।
আলোছায়া ক্ষণে ক্ষণে দিয়ে যায়
ফিরে ফিরে স্পর্শের পর্যায়।
কভু দূরে কখনো নিকটে
প্রবাহের পটে
মহাকাল দুই রূপ ধরে
পরে পরে
কালো আর সাদা।
কেবলি দক্ষিণে বামে প্রকাশ ও প্রকাশের বাধা
অধরার প্রতিবিম্ব গতিভঙ্গে যায় এঁকে এঁকে,
গতিভঙ্গে যায় ঢেকে ঢেকে।

১০

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।
দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী—
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত-না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে। বিশাল বিশ্বের আয়োজন ;
মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ।

সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে যাহে
অক্ষয় উৎসাহে—
যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী
কুড়াইয়া আনি।
জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে
পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে।

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি,
এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক—
রয়ে গেছে ফাঁক।
কল্পনায় অনুমানে ধরিত্রীর মহা-একতান
কত-না নিস্তব্ধ ক্ষণে পূর্ণ করিয়াছে মোর প্রাণ।
দুর্গম তুষারগিরি অসীম নিঃশব্দ নীলিমায়
অশ্রুত যে গান গায়
আমার অন্তরে বারবার
পাঠায়েছে নিমন্ত্রণ তার।
দক্ষিণমেরুর ঊর্ধ্বে যে অজ্ঞাত তারা
মহাজনশূন্যতায় রাত্রি তার করিতেছে সারা,
সে আমার অর্ধরাত্রে অনিমেষ চোখে
অনিদ্রা করেছে স্পর্শ অপূর্ব আলোকে।
সুদূরের মহাপ্লাবী প্রচণ্ড নির্ঝর
মনের গহনে মোর পাঠায়েছে স্বর।
প্রকৃতির ঐকতানস্রোতে
নানা কবি ঢালে গান নানা দিক হতে;
তাদের সবার সাথে আছে মোর এইমাত্র যোগ –
সঙ্গ পাই সবাকার, লাভ করি আনন্দের ভোগ,
গীতভারতীর আমি পাই তো প্রসাদ
নিখিলের সংগীতের স্বাদ।

সব চেয়ে দুর্গম-যে মানুষ আপন অন্তরালে,
তার কোনো পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।
সে অন্তরময়
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।
পাই নে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার,
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।
চাষি খেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল—
বহুদূরপ্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।
মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে,
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।
জীবনে জীবন যোগ করা
না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।
তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা
আমার সুরের অপূর্ণতা।
আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।
কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি।
সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারি না দিতে নিত্য আমি থাকি তারি খোঁজে।
সেটা সত্য হোক,
শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।
সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে শৌখিন মজ্‌দুরি।

এসো কবি অখ্যাতজনের
নির্বাক্ মনের।
মর্মের বেদনা যত করিয়া উদ্ধার—
প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারি ধার,
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।
অন্তরে যে উৎস তার আছে আপনারি
তাই তুমি দাও তো উদ্‌বারি।
সাহিত্যের ঐকতানসংগীতসভায়
একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়—
মূক যারা দুঃখে সুখে,
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে,
ওগো গুণী,
কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি।
তুমি থাকো তাহাদের জ্ঞাতি,
তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন আপনারি খ্যাতি—
আমি বারংবার
তোমারে করিব নমস্কার।

উদয়ন
২১ জানুয়ারি, ১৯৪১। সকাল

১১

কালের প্রবল আবর্তে প্রতিহত
ফেনপুঞ্জের মতো,
আলোকে আঁধারে রঞ্জিত এই মায়া,
অদেহ ধরিল কায়া।
সত্তা আমার, জানি না, সে কোথা হতে
হল উত্থিত নিত্যধাবিত স্রোতে।
সহসা অভাবনীয়
অদৃশ্য এক আরম্ভ-মাঝে কেন্দ্র রচিল স্বীয়।

বিশ্বসত্তা মাঝখানে দিল উঁকি,
এ কৌতুকের পশ্চাতে আছে জানি না কে কৌতুকী।
ক্ষণিকারে নিয়ে অসীমের এই খেলা,
নববিকাশের সাথে গেঁথে দেয় শেষ-বিনাশের হেলা,
আলোকে কালের মৃদঙ্গ উঠে বেজে,
গোপনে ক্ষণিকা দেখা দিতে আসে মুখ-ঢাকা বধূ সেজে,
গলায় পরিয়া হার
বুদ্‌বুদ্‌ মণিকার।
সৃষ্টির মাঝে আসন করে সে লাভ,
অনন্ত তারে অন্তসীমায় জানায় আবির্ভাব।

১২

করিয়াছি বাণীর সাধনা
দীর্ঘকাল ধরি,
আজ তারে ক্ষণে ক্ষণে উপহাস পরিহাস করি।
বহু ব্যবহার আর দীর্ঘ পরিচয়
তেজ তার করিতেছে ক্ষয়।
নিজেরে করিয়া অবহেলা
নিজেরে নিয়ে সে করে খেলা।
তবু জানি, অজানার পরিচয় আছিল নিহিত
বাক্যে তার বাক্যের অতীত।
সেই অজানার দূত আজি মোরে নিয়ে যায় দূরে
অকূল সিন্ধুরে
নিবেদন করিতে প্রণাম,
মন তাই বলিতেছে, আমি চলিলাম।

সেই সিন্ধু-মাঝে সূর্য দিনযাত্রা করি দেয় সারা,
সেথা হতে সন্ধ্যাতারা
রাত্রিরে দেখায়ে আনে পথ
যেথা তার রথ

চলেছে সন্ধান করিবারে
নূতন প্রভাত-আলো তমিস্রার পারে।
আজ সব কথা,
মনে হয়, শুধু মুখরতা।
তারা এসে থামিয়াছে
পুরাতন সে মন্ত্রের কাছে
ধ্বনিতেছে যাহা সেই নৈঃশব্দ্যচূড়ায়
সকল সংশয় তর্ক যে মৌনের গভীরে ফুরায়।
লোকখ্যাতি যাহার বাতাসে
ক্ষীণ হয়ে তুচ্ছ হয়ে আসে।
দিনশেষে কর্মশালা ভাষা রচনার
নিরুদ্ধ করিয়া দিক দ্বার।
পড়ে থাক্ পিছে
বহু আবর্জনা, বহু মিছে।
বারবার মনে মনে বলিতেছি, আমি চলিলাম—
যেথা নাই নাম,
যেখানে পেয়েছে লয়
সকল বিশেষ পরিচয়,
নাই আর আছে
এক হয়ে যেথা মিশিয়াছে,
যেখানে অখণ্ড দিন
আলোহীন অন্ধকারহীন,
আমার আমির ধারা মিলে যেথা যাবে ক্রমে ক্রমে
পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগরসংগমে।
এই বাহ্য আবরণ, জানি না তো, শেষে
নানা রূপে রূপান্তরে কালস্রোতে বেড়াবে কি ভেসে।
আপন স্বাতন্ত্র্য হতে নিঃসক্ত দেখিব তারে আমি
বাহিরে বহুর সাথে জড়িত অজানা তীর্থগামী।

•

আসন্ন বর্ষের শেষ। পুরাতন আমার আপন

শ্লথবৃন্ত ফলের মতন
ছিন্ন হয়ে আসিতেছে। অনুভব তারি
আপনারে দিতেছে বিস্তারি
আমার সকলকিছু-মাঝে।
প্রচ্ছন্ন বিরাজে
নিগূঢ় অন্তরে যেই একা,
চেয়ে আছি পাই যদি দেখা।
পশ্চাতের কবি
মুছিয়া করিছে ক্ষীণ আপন হাতের আঁকা ছবি।
সুদূর সম্মুখে সিন্ধু, নিঃশব্দ রজনী,
তারি তীর হতে আমি আপনারি শুনি পদধ্বনি।
অসীম পথের পান্থ, এবার এসেছি ধরা-মাঝে
মর্তজীবনের কাজে।
সে পথের 'পরে
ক্ষণে ক্ষণে অগোচরে
সকল পাওয়ার মধ্যে পেয়েছি অমূল্য উপাদেয়
এমন সম্পদ যাহা হবে মোর অক্ষয় পাথেয়।
মন বলে, আমি চলিলাম,
রেখে যাই আমার প্রণাম
তাঁদের উদ্দেশে যাঁরা জীবনের আলো
ফেলেছেন পথে যাহা বারে বারে সংশয় ঘুচালো।

উদয়ন
১৯ জানুয়ারি, ১৯৪১। সকাল

১৩

সৃষ্টিলীলাপ্রাঙ্গণের প্রান্তে দাঁড়াইয়া
দেখি ক্ষণে ক্ষণে
তমসের পরপার,
যেথা মহা-অব্যক্তের অসীম চৈতন্যে ছিনু লীন।

আজি এ প্রভাতকালে ঋষিবাক্য জাগে মোর মনে।
করো করো অপাবৃত হে সূর্য, আলোক-আবরণ,
তোমার অন্তরতম পরম জ্যোতির মধ্যে দেখি
আপনার আত্মার স্বরূপ।
যে আমি দিনের শেষে বায়ুতে মিশায় প্রাণবায়ু,
ভস্মে যার দেহ অন্ত হবে,
যাত্রাপথে সে আপন না ফেলুক ছায়া
সত্যের ধরিয়া ছদ্মবেশ।
এ মর্তের লীলাক্ষেত্রে সুখে দুঃখে অমৃতের স্বাদ
পেয়েছি তো ক্ষণে ক্ষণে,
বারে বারে অসীমেরে দেখেছি সীমার অন্তরালে।
বুঝিয়াছি, এ জন্মের শেষ অর্থ ছিল সেইখানে,
সেই সুন্দরের রূপে,
সে সংগীতে অনির্বচনীয়।
খেলাঘরে আজ যবে খুলে যাবে দ্বার
ধরণীর দেবালয়ে রেখে যাব আমার প্রণাম,
দিয়ে যাব জীবনের সে নৈবেদ্যগুলি
মূল্য যার মৃত্যুর অতীত।

উদয়ন
১১ মাঘ, ১৩৪৭। সকাল

১৪

পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে
শূন্যে আর ধরাতলে মন্ত্র বাঁধে ছন্দে আর মিলে।
বনেরে করায় স্নান শরতের রৌদ্রের সোনালি।
হলদে ফুলের গুচ্ছে মধু খোঁজে বেগুনি মৌমাছি।
মাঝখানে আমি আছি,
চৌদিকে আকাশ তাই দিতেছে নিঃশব্দ করতালি
আমার আনন্দে আজ একাকার ধ্বনি আর রঙ,
জানে তা কি এ কালিম্পঙ।

ভাণ্ডারে সঞ্চিত করে পর্বতশিখর
অন্তহীন যুগ যুগান্তর।
আমার একটি দিন বরমাল্য পরাইল তারে,
এ শুভ সংবাদ জানাবারে
অন্তরীক্ষে দূর হতে দূরে
অনাহত সুরে
প্রভাতে সোনার ঘণ্টা বাজে ঢঙ ঢঙ,
শুনিছে কি এ কালিম্পঙ।

গৌরীপুরভবন। কালিম্পঙ
২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৪০

১৫

মনে পড়ে, শৈলতটে তোমাদের নিভৃত কুটির;
হিমাদ্রি যেথায় তার সমুচ্চ শান্তির
আসনে নিস্তব্ধ নিত্য, তুঙ্গ তার শিখরের সীমা
লঙ্ঘন করিতে চায় দূরতম শূন্যের মহিমা।
অরণ্য যেতেছে নেমে উপত্যকা বেয়ে;
নিশ্চল সবুজবন্যা, নিবিড় নৈঃশব্দ্যে রাখে ছেয়ে
ছায়াপুঞ্জ তার। শৈলশৃঙ্গ-অন্তরালে
প্রথম অরুণোদয়-ঘোষণার কালে
অন্তরে আনিত স্পন্দ বিশ্বজীবনের
সদ্যস্ফূর্ত চঞ্চলতা। নির্জন বনের
গূঢ় আনন্দের যত ভাষাহীন বিচিত্র সংকেতে
লভিতাম হৃদয়েতে
যে বিস্ময় ধরণীর প্রাণের আদিম সূচনায়।
সহসা নাম-না-জানা পাখিদের চকিত পাখায়
চিন্তা মোর যেত ভেসে
শুভ্রহিমরেখাঙ্কিত মহানিরুদ্দেশে।
বেলা যেত, লোকালয়
তুলিত ত্বরিত করি সুপ্তোত্থিত শিথিল সময়।

গিরিগাত্রে পথ গেছে বেঁকে,
বোঝা বহি চলে লোক, গাড়ি ছুটে চলে থেকে থেকে
পার্বত্য জনতা
বিদেশী প্রাণযাত্রার খণ্ড খণ্ড কথা
মনে যায় রেখে,
রেখা-রেখা অসংলগ্ন ছবি যায় এঁকে।
শুনি মাঝে মাঝে
অদূরে ঘণ্টার ধ্বনি বাজে,
কর্মের দৌত্য সে করে
প্রহরে প্রহরে।
প্রথম আলোর স্পর্শ লাগে,
আতিথ্যের সখ্য জাগে
ঘরে ঘরে। স্তরে স্তরে দ্বারের সোপানে
নানারঙা ফুলগুলি অতিথির প্রাণে
গৃহিণীর যত্ন বহি প্রকৃতির লিপি নিয়ে আসে
আকাশে বাতাসে।
কলহাস্যে মানুষের স্নেহের বারতা
যুগযুগান্তের মৌনে হিমাদ্রির আনে সার্থকতা।

উদয়ন
২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। বিকাল

১৬

দামামা ঐ বাজে,
দিন-বদলের পালা এল
ঝোড়ো যুগের মাঝে।
শুরু হবে নির্মম এক নূতন অধ্যায়,
নইলে কেন এত অপব্যয়—
আসছে নেমে নিষ্ঠুর অন্যায়,
অন্যায়েরে টেনে আনে অন্যায়েরই ভূত
ভবিষ্যতের দূত।

কৃপণতার পাথর-ঠেলা বিষম বন্যাধারা
লোপ করে দেয় নিঃস্ব মাটির নিষ্ফলা চেহারা।
জমে-ওঠা মৃত বালির স্তর
ভাসিয়ে নিয়ে ভর্তি করে লুপ্তির গহ্বর;
পলিমাটির ঘটায় অবকাশ,
মরুকে সে মেরে মেরেই গজিয়ে তোলে ঘাস।
ডুব্‌লা খেতের পুরানো সব পুনরুক্তি যত
অর্থহারা হয় সে বোবার মতো।
অন্তরেতে মৃত
বাইরে তবু মরে না যে অন্ন ঘরে করেছে সঞ্চিত—
ওদের ঘিরে ছুটে আসে অপব্যয়ের ঝড়,
ভাঁড়ারে ঝাঁপ ভেঙে ফেলে, চালে ওড়ায় খড়।
অপঘাতের ধাক্কা এসে পড়ে ওদের ঘাড়ে,
জাগায় হাড়ে হাড়ে।
হঠাৎ অপমৃত্যুর সংকেতে
নূতন ফসল চাষের তরে আনবে নূতন খেতে।
শেষ পরীক্ষা ঘটাবে দুর্দৈবে—
জীর্ণ যুগের সঞ্চয়েতে কী যাবে, কী রইবে।
পালিশ-করা জীর্ণতাকে চিনতে হবে আজি,
দামামা তাই ঐ উঠেছে বাজি।

৩১ মে, ১৯৪০

১৭

সেই পুরাতন কালে ইতিহাস যবে
সংবাদে ছিল না মুখরিত
নিস্তব্ধ খ্যাতির যুগে—
আজিকার এইমতো প্রাণযাত্রাকল্লোলিত প্রাতে
যাঁরা যাত্রা করেছেন
মরণশঙ্কিল পথে

আত্মার অমৃত-অন্ন করিবারে দান
দূরবাসী অনাত্মীয় জনে,
দলে দলে যাঁরা
উত্তীর্ণ হন নি লক্ষ্য, তৃষানিদারুণ
মরুবালুতলে অস্থি গিয়েছেন রেখে,
সমুদ্র যাঁদের চিহ্ন দিয়েছে মুছিয়া,
অনারব্ধ কর্মপথে
অকৃতার্থ হন নাই তাঁরা—
মিশিয়া আছেন সেই দেহাতীত মহাপ্রাণ-মাঝে
শক্তি জোগাইছে যাহা অগোচরে চিরমানবেরে—
তাঁহাদের করুণার স্পর্শ লভিতেছি
আজি এই প্রভাত-আলোকে,
তাঁহাদের করি নমস্কার।

উদয়ন
১২ ডিসেম্বর, ১৯৪০। সকাল

১৮

নানা দুঃখে চিত্তের বিক্ষেপে
যাহাদের জীবনের ভিত্তি যায় বারংবার কেঁপে,
যারা অন্যমনা, তারা শোনো
আপনারে ভুলো না কখনো।
মৃত্যুঞ্জয় যাহাদের প্রাণ,
সব তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দীপ যারা জ্বালে অনির্বাণ,
তাহাদের মাঝে যেন হয়
তোমাদেরি নিত্য পরিচয়।
তাহাদের খর্ব কর যদি
খর্বতার অপমানে বন্দী হয়ে রবে নিরবধি।
তাদের সম্মানে মান নিয়ো
বিশ্বে যারা চিরস্মরণীয়।

১৭

বয়স আমার বুঝি হয়তো তখন হবে বারো,
অথবা কী জানি হবে দুয়েক বছর বেশি আরো।
পুরাতন নীলকুঠি-দোতলার 'পর
ছিল মোর ঘর।
সামনে উধাও ছাত—
দিন আর রাত
আলো আর অন্ধকারে
সাথিহীন বালকের ভাবনারে
এলোমেলো জাগাইয়া যেত,
অর্থশূন্য প্রাণ তারা পেত,
যেমন সমুখে নীচে
আলো পেয়ে বাড়িয়া উঠিছে
বেতগাছ ঝোপঝাড়ে
পুকুরের পাড়ে
সবুজের আলপনায় রঙ দিয়ে লেপে।
সারি সারি ঝাউগাছ ঝরঝর কেঁপে
নীলচাষ-আমলের প্রাচীন মর্মর
তখনো চলিছে বহি বৎসর বৎসর।
বৃদ্ধ সে গাছের মতো তেমনি আদিম পুরাতন
বয়স-অতীত সেই বালকের মন
নিখিল প্রাণের পেত নাড়া,
আকাশের অনিমেষ দৃষ্টির ডাকে দিত সাড়া,
তাকায়ে রহিত দূরে।
রাখালের বাঁশির করুণ সুরে
অস্তিত্বের যে বেদনা প্রচ্ছন্ন রয়েছে,
নাড়ীতে উঠিত নেচে।
জাগ্রত ছিল না বুদ্ধি, বুদ্ধির বাহিরে যাহা তাই
মনের দেউড়ি-পারে দ্বারী-কাছে বাধা পায় নাই।

স্বপ্নজনতার বিশ্বে ছিল দ্রষ্টা কিংবা স্রষ্টা রূপে,
পণ্যহীন দিনগুলি ভাসাইয়া দিত চুপে চুপে
পাতার ভেলায়
নিরর্থ খেলায়।
টাট্টু ঘোড়া চড়ি
রথতলা মাঠে গিয়ে দুর্দাম ছুটাত তড়বড়ি,
রক্তে তার মাতিয়ে তুলিত গতি,
নিজেরে ভাবিত সেনাপতি
পড়ার কেতাবে যারে দেখে
ছবি মনে নিয়েছিল এঁকে।
যুদ্ধহীন রণক্ষেত্রে ইতিহাসহীন সেই মাঠে
এমনি সকাল তার কাটে।
জবা নিয়ে গাঁদা নিয়ে নিঙাড়িয়া রস
মিশ্রিত ফুলের রঙে কী লিখিত, সে লেখার যশ
আপন মর্মের মাঝে হয়েছে রঙিন—
বাহিরের করতালিহীন।
সন্ধ্যাবেলা বিশ্বনাথ শিকারীকে ডেকে
তার কাছ থেকে
বাঘশিকারের গল্প নিস্তব্ধ সে ছাতের উপর,
মনে হ'ত, সংসারের সব চেয়ে আশ্চর্য খবর।
দম্ করে মনে মনে ছুটিত বন্দুক,
কাঁপিয়া উঠিত বুক।
চারি দিকে শাখায়িত সুনিবিড় প্রয়োজন যত
তারি মাঝে এ বালক অর্কিড-তরুকার মতো
ডোরাকাটা খেয়ালের অদ্ভুত বিকাশে
দোলে শুধু খেলার বাতাসে।
যেন সে রচয়িতার হাতে
পুঁথির প্রথম শূন্য পাতে
অলংকরণ আঁকা, মাঝে মাঝে অস্পষ্ট কী লেখা,
বাকি সব আঁকাবাঁকা রেখা।

আজ যবে চলিতেছে সাংঘাতিক হিসাবনিকাশ,
দিগ্‌দিগন্তে ক্ষমাহীন অদৃষ্টের দশনবিকাশ,
বিধাতার ছেলেমানুষির
খেলাঘর যত ছিল ভেঙে সব হল চৌচির।
আজ মনে পড়ে সেই দিন আর রাত,
প্রশস্ত সে ছাত,
সেই আলো সেই অন্ধকারে
কর্মসমুদ্রের মাঝে নৈষ্কর্ম্যদ্বীপের পারে
বালকের মনখানা মধ্যাহ্নে ঘুঘুর ডাক যেন।
এ সংসারে কী হতেছে কেন
ভাগ্যের চক্রান্তে কোথা কী যে,
প্রশ্নহীন বিশ্বে তার জিজ্ঞাসা করে নি কভু নিজে
এ নিখিলে যে জগৎ ছেলেমানুষির
বয়স্কের দৃষ্টিকোণে সেটা ছিল কৌতুকহাসির,
বালকের জানা ছিল না তা।
সেইখানে অবাধ আসন তার পাতা।
সেথা তার দেবলোক, স্বকল্পিত স্বর্গের কিনারা,
বুদ্ধির ভৎর্সনা নাই, নাই সেথা প্রশ্নের পাহারা,
যুক্তির সংকেত নাই পথে,
ইচ্ছা সঞ্চরণ করে বল্গামুক্ত রথে।

২০

মনে ভাবিতেছি, যেন অসংখ্য ভাষার শব্দরাজি
ছাড়া পেল আজি,
দীর্ঘকাল ব্যাকরণদুর্গে বন্দী রহি
অকস্মাৎ হয়েছে বিদ্রোহী,
অবিশ্রাম সারি সারি কুচকাওয়াজের পদক্ষেপে
উঠেছে অধীর হয়ে খেপে।
লঙ্ঘিয়াছে বাক্যের শাসন,
নিয়েছে অবুদ্ধিলোকে অবদ্ধ ভাষণ,

ছিন্ন করি অর্থের শৃঙ্খলপাশ
সাধুসাহিত্যের প্রতি ব্যঙ্গহাস্যে হানে পরিহাস।
সব ছেড়ে অধিকার করে শুধু শ্রুতি—
বিচিত্র তাদের ভঙ্গী, বিচিত্র আকৃতি।
বলে তারা, আমরা যে এই ধরণীর
নিশ্বসিত পবনের আদিম ধ্বনির
জন্মেছি সন্তান,
যখনি মানবকণ্ঠে মনোহীন প্রাণ
নাড়ীর দোলায় সদ্য জেগেছে নাচিয়া
উঠেছি বাঁচিয়া।
শিশুকণ্ঠে আদিকাব্যে এনেছি উচ্ছলি
অস্তিত্বের প্রথম কাকলি।
গিরিশিরে যে পাগল-ঝোরা
শ্রাবণের দূত, তারি আত্মীয় আমরা
আসিয়াছি লোকালয়ে
সৃষ্টির ধ্বনির মন্ত্র লয়ে।
মর্মরমুখর বেগে
যে ধ্বনির কলোৎসব অরণ্যের পল্লবে পল্লবে,
যে ধ্বনি দিগন্তে করে ঝড়ের ছন্দের পরিমাপ,
নিশান্তে জাগায় যাহা প্রভাতের প্রকাণ্ড প্রলাপ,
সে ধ্বনির ক্ষেত্র হতে হরিয়া করেছে পদানত
বন্য ঘোটকের মতো
মানুষ শব্দেরে তার জটিল নিয়মসূত্রজালে
বার্তাবহনের লাগি অনাগত দূর দেশে কালে।
বল্গাবদ্ধ শব্দ-অশ্বে চড়ি
মানুষ করেছে দ্রুত কালের মন্থর যত ঘড়ি।
জড়ের অচল বাধা তর্কবেগে করিয়া হরণ
অদৃশ্য রহস্যলোকে গহনে করেছে সঞ্চরণ,
ব্যূহে বাঁধি শব্দ-অক্ষৌহিণী
প্রতি ক্ষণে মূঢ়তার আক্রমণ লইতেছে জিনি।

কখনো চোরের মতো পশে ওরা স্বপ্নরাজ্যতলে,
ঘুমের ভাটার জলে
নাহি পায় বাধা—
যাহা-তাহা নিয়ে আসে, ছন্দের বাঁধনে পড়ে বাঁধা,
তাই দিয়ে বুদ্ধি অন্যমনা
করে সেই শিল্পের রচনা
সূত্র যার অসংলগ্ন স্খলিত শিথিল,
বিধির সৃষ্টির সাথে না রাখে একান্ত তার মিল ;
যেমন মাতিয়া উঠে দশ-বিশ কুকুরের ছানা—
এ ওর ঘাড়েতে চড়ে, কোনো উদ্দেশ্যের নাই মানা,
কে কাহারে লাগায় কামড়,
জাগায় ভীষণ শব্দে গর্জনের ঝড়,
সে কামড়ে সে গর্জনে কোনো অর্থ নাই হিংস্রতার,
উদ্দাম হইয়া উঠে শুধু ধ্বনি শুধু ভঙ্গী তার।
মনে মনে দেখিতেছি, সারা বেলা ধরি
দলে দলে শব্দ ছোটে অর্থ ছিন্ন করি—
আকাশে আকাশে যেন বাজে,
আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম ঘোড়াডুম সাজে।

গৌরীপুরভবন, কালিম্পঙ
২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৪০

২১

রক্তমাখা দন্তপংক্তি হিংস্র সংগ্রামের
শত শত নগরগ্রামের
অন্ত্র আজ ছিন্ন ছিন্ন করে ;
ছুটে চলে বিভীষিকা মূর্ছাতুর দিকে দিগন্তরে।
বন্যা নামে যমলোক হতে,
রাজ্যসাম্রাজ্যের বাঁধ লুপ্ত করে সর্বনাশা স্রোতে
যে লোভ-রিপুরে
লয়ে গেছে যুগে যুগে দূরে দূরে

সভ্য শিকারীর দল পোষমানা শ্বাপদের মতো,
দেশবিদেশের মাংস করেছে বিক্ষত,
লোলজিহ্বা সেই কুক্কুরের দল
অন্ধ হয়ে ছিঁড়িল শৃঙ্খল,
ভুলে গেল আত্মপর ;
আদিম বন্যতা তার উদ্‌বারিয়া উদ্দাম নখর
পুরাতন ঐতিহ্যের পাতাগুলা ছিন্ন করে,
ফেলে তার অক্ষরে অক্ষরে
পঙ্কলিপ্ত চিহ্নের বিকার।
অসন্তুষ্ট বিধাতার
ওরা দূত বুঝি,
শত শত বর্ষের পাপের পুঁজি
ছড়াছড়ি করে দেয় এক সীমা হতে সীমান্তরে,
রাষ্ট্রমদমত্তদের মদ্যভাণ্ড চূর্ণ করে
আবর্জনাকুণ্ডতলে।
মানব আপন সত্তা ব্যর্থ করিয়াছে দলে দলে,
বিধাতার সংকল্পের নিত্যই করেছে বিপর্যয়
ইতিহাসময়।
সেই পাপে
আত্মহত্যা-অভিশাপে
আপনার সাধিছে বিলয়।
হয়েছে নির্দয়
আপন ভীষণ শত্রু আপনার 'পরে,
ধূলিসাৎ করে
ভূরিভোজী বিলাসীর
ভাণ্ডারপ্রাচীর।

শ্মশানবিহারবিলাসিনী
ছিন্নমস্তা, মুহূর্তেই মানুষের সুখস্বপ্ন জিনি

বক্ষ ভেদি দেখা দিল আত্মহারা,
শতস্রোতে নিজ রক্তধারা
নিজে করি' পান।
এ কুৎসিৎ লীলা যবে হবে অবসান,
বীভৎস তাণ্ডবে
এ পাপযুগের অন্ত হবে,
মানব তপস্বীবেশে
চিতাভস্মশয্যাতলে এসে
নবসৃষ্টি-ধ্যানের আসনে
স্থান লবে নিরাসক্তমনে—
আজি সেই সৃষ্টির আহ্বান
ঘোষিছে কামান।

গৌরীপুরভবন, কালিম্পঙ
২২ মে, ১৯৪০।

২২

সিংহাসনতলচ্ছায়ে দূরে দূরান্তরে
যে রাজ্য জানায় স্পর্ধাভরে
রাজায় প্রজায় ভেদ মাপা,
পায়ের তলায় রাখে সর্বনাশ চাপা।
হতভাগ্য যে রাজ্যের সুবিস্তীর্ণ দৈন্যজীর্ণ প্রাণ
রাজমুকুটেরে নিত্য করিছে কুৎসিত অপমান,
অসহ্য তাহার দুঃখ তাপ
রাজারে না যদি লাগে, লাগে তারে বিধাতার শাপ।
মহা-ঐশ্বর্যের নিম্নতলে
অর্ধাশন অনশন দাহ করে নিত্য ক্ষুধানলে,
শুষ্কপ্রায় কলুষিত পিপাসার জল,
দেহে নাই শীতের সম্বল,
অবারিত মৃত্যুর দুয়ার,
নিষ্ঠুর তাহার চেয়ে জীবন্মৃত দেহ চর্মসার

শোষণ করিছে দিনরাত
রুদ্ধ আরোগ্যের পথে রোগের অবাধ অভিঘাত—
সেথা মুমূর্ষুর দল রাজত্বের হয় না সহায়,
হয় মহা দায়।
এক পাখা শীর্ণ যে পাখির
ঝড়ের সংকটদিনে রহিবে না স্থির,
সমুচ্চ আকাশ হতে ধুলায় পড়িবে অঙ্গহীন—
আসিবে বিধির কাছে হিসাব-চুকিয়ে-দেওয়া দিন।
অভ্রভেদী ঐশ্বর্যের চূর্ণীভূত পতনের কালে
দরিদ্রের জীর্ণ দশা বাসা তার বাঁধিবে কঙ্কালে।

উদয়ন
২৪ জানুয়ারি, ১৯৪১। বিকাল

২৩

জীবনবহনভাগ্য নিত্য আশীর্বাদে
ললাট করুক স্পর্শ
অনাদি জ্যোতির দান-রূপে—
নব নব জাগরণে প্রভাতে প্রভাতে
মর্ত এ আয়ুর সীমানায়।
ম্লানিমার ঘন আবরণ
দিনে দিনে পড়ুক খসিয়া
অমর্তলোকের দ্বারে
নিদ্রায়-জড়িত রাত্রিসম।
হে সবিতা, তোমার কল্যাণতম রূপ
করো অপাবৃত,
সেই দিব্য আবির্ভাবে
হেরি আমি আপন আত্মারে
মৃত্যুর অতীত।

উদয়ন
৭ পৌষ, ১৩৪৭। সকাল

২৪

পোড়ো বাড়ি, শূন্য দালান—
বোবা স্মৃতির চাপা কাঁদন হুহু করে,
মরা-দিনের-কবর-দেওয়া ভিতের অন্ধকার
গুমরে ওঠে প্রেতের কণ্ঠে সারা দুপুরবেলা।
মাঠে মাঠে শুকনো পাতার ঘূর্ণিপাকে
হাওয়ার হাঁপানি।
হঠাৎ হানে বৈশাখী তার বর্বরতা
ফাগুনদিনের যাবার পথে।

সৃষ্টিপীড়া ধাক্কা লাগায়
শিল্পকারের তুলির পিছনে।
রেখায় রেখায় ফুটে ওঠে
রূপের বেদনা
সাথিহারার তপ্ত রাঙা রঙে।
কখনো বা ঢিল লেগে যায় তুলির টানে;
পাশের গলির চিক-ঢাকা ঐ ঝাপসা আকাশতলে
হঠাৎ যখন রণিয়ে ওঠে
সংকেতঝংকার,
আঙুলের ডগার 'পরে নাচিয়ে তোলে মাতালটাকে।
গোধূলির সিঁদুর ছায়ায় ঝ'রে পড়ে
পাগলা আবেগের
হাউই-ফাটা আগুনঝুরি।

বাধা পায়, বাধা কাটায় চিত্রকরের তুলি।
সেই বাধা তার কখনো বা হিংস্র অশ্লীলতায়,
কখনো বা মদির অসংযমে।
মনের মধ্যে ঘোলা স্রোতের জোয়ার ফুলে ওঠে,
ভেসে চলে ফেনিয়ে-ওঠা অসংলগ্নতা।

রূপের বোঝাই ডিঙি নিয়ে চলল রূপকার
রাতের উজান স্রোত পেরিয়ে
হঠাৎ-মেলা ঘাটে।
ডাইনে বাঁয়ে সুর-বেসুরের দাঁড়ের ঝাপট চলে,
তাল দিয়ে যায় ভাসান-খেলা শিল্পসাধনার।

শান্তিনিকেতন
২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৯

২৫

জটিল সংসার,
মোচন করিতে গ্রন্থি জড়াইয়া পড়ি বারংবার।
গম্য নহে সোজা,
দুর্গম পথের যাত্রা স্কন্ধে বহি দুশ্চিন্তার বোঝা।
পথে পথে যথাতথা
শত শত কৃত্রিম বক্রতা।
অনুক্ষণ
হতাশ্বাস হয়ে শেষে হার মানে মন।
জীবনের ভাঙা ছন্দে ভ্রষ্ট হয় মিল,
বাঁচিবার উৎসাহ ধূলিতলে লুটায় শিথিল।

ওগো আশাহারা,
শুষ্কতার 'পরে আনো নিখিলের রসবন্যাধারা।
বিরাট আকাশে,
বনে বনে, ধরণীর ঘাসে ঘাসে,
সুগভীর অবকাশ পূর্ণ হয়ে আছে
গাছে গাছে,
অন্তহীন শান্তি-উৎসস্রোতে।
অন্তঃশীল যে রহস্য আঁধারে আলোতে
তারে সদ্য করুক আহ্বান
আদিম প্রাণের যজ্ঞে মর্মের সহজ সামগান।

আত্মার মহিমা যাহা তুচ্ছতায় দিয়েছে জর্জরি
ম্লান অবসাদে, তারে দাও দূর করি,
লুপ্ত হয়ে যাক শূন্যতলে
দ্যুলোকের ভূলোকের সম্মিলিত মন্ত্রণার বলে।

২৬

ফুলদানি হতে একে একে
আয়ুক্ষীণ গোলাপের পাপড়ি পড়িল ঝরে ঝরে
ফুলের জগতে
মৃত্যুর বিকৃতি নাহি দেখি।
শেষ ব্যঙ্গ নাহি হানে জীবনের পানে অসুন্দর।
যে মাটির কাছে ঋণী
আপনার ঘৃণা দিয়ে অশুচি করে না তারে ফুল,
রূপে গন্ধে ফিরে দেয় ম্লান অবশেষ।
বিদায়ের সকরুণ স্পর্শ আছে তাহে ;
নাইকো ভর্ৎসনা।
জন্মদিনে মৃত্যুদিনে দোঁহে যবে করে মুখোমুখি
দেখি যেন সে মিলনে
পূর্বাচলে অস্তাচলে
অবসন্ন দিবসের দৃষ্টিবিনিময়—
সমুজ্জ্বল গৌরবের প্রণত সুন্দর অবসান।

উদয়ন
২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। বিকাল

২৭

বিশ্বধরণীর এই বিপুল কুলায়
সন্ধ্যা— তারি নীরব নির্দেশে
নিখিল গতির বেগ ধায় তারি পানে।
চৌদিকে ধূসরবর্ণ আবরণ নামে।

মন বলে, ঘরে যাব—
কোথা ঘর নাহি জানে।
দ্বার খোলে সন্ধ্যা নিঃসঙ্গিনী,
সম্মুখে নীরন্ধ্র অন্ধকার।
সকল আলোর অন্তরালে
বিস্মৃতির দূতী
খুলে নেয় এ মর্তের ঋণ-করা সাজসজ্জা যত—
প্রক্ষিপ্ত যা কিছু তার নিত্যতার মাঝে
ছিন্ন জীর্ণ মলিন অভ্যাস।
আঁধারে অবগাহন-স্নানে
নির্মল করিয়া দেয় নবজন্ম নগ্ন ভূমিকারে।
জীবনের প্রান্তভাগে
অন্তিম রহস্যপথে দেয় মুক্ত করি
সৃষ্টির নূতন রহস্যেরে।
নব জন্মদিন তারে বলি
আঁধারের মন্ত্র পড়ি সন্ধ্যা যারে জাগায় আলোকে

২৮

নদীর পালিত এই জীবন আমার।
নানা গিরিশিখরের দান
নাড়ীতে নাড়ীতে তার বহে,
নানা পলিমাটি দিয়ে ক্ষেত্র তার হয়েছে রচিত,
প্রাণের রহস্যরস নানা দিক হতে
শস্যে শস্যে লভিল সঞ্চার।
পূর্বপশ্চিমের নানা গীতস্রোতজালে
ঘেরা তার স্বপ্ন জাগরণ।
যে নদী বিশ্বের দূতী
দূরকে নিকটে আনে,
অজানার অভ্যর্থনা নিয়ে আসে ঘরের দুয়ারে,

সে আমার রচেছিল জন্মদিন—
চিরদিন তার স্রোতে
বাঁধন-বাহিরে মোর চলমান বাসা
ভেসে চলে তীর হতে তীরে।
আমি ব্রাত্য, আমি পথচারী,
অবারিত আতিথ্যের অন্নে পূর্ণ হয়ে ওঠে
বারে বারে নির্বিচারে মোর জন্মদিবসের থালি।

উদয়ন
২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। দুপুর

২৯

তোমাদের জানি, তবু তোমরা যে দূরের মানুষ।
তোমাদের আবেষ্টন, চলাফেরা, চারি দিকে ঢেউ ওঠা-পড়া,
সবই চেনা জগতের তবু তার আমন্ত্রণে দ্বিধা—
সবা হতে আমি দূরে, তোমাদের নাড়ীর যে ভাষা
সে আমার আপন প্রাণের, বিষণ্ণ বিস্ময় লাগে
যবে দেখি স্পর্শ তার সসংকোচ পরিচয় নিয়ে
আনে যেন প্রবাসীর পাণ্ডুবর্ণ শীর্ণ আত্মীয়তা।
আমি কিছু দিতে চাই, তা না হলে জীবনে জীবনে
মিল হবে কী করিয়া—আসি না নিশ্চিত পদক্ষেপে—
ভয় হয়, রিক্ত পাত্র বুঝি, বুঝি তার রসস্বাদ
হারায়েছে পূর্বপরিচয়, বুঝি আদানে প্রদানে
রবে না সম্মান। তাই আশঙ্কার এ দূরত্ব হতে
এ নিষ্ঠুর নিঃসঙ্গতা-মাঝে তোমাদের ডেকে বলি,
যে জীবনলক্ষ্মী মোরে সাজায়েছে নব নব সাজে
তার সাথে বিচ্ছেদের দিনে নিভায়ে উৎসবদীপ
দারিদ্র্যের লাঞ্ছনায় ঘটাবে না কভু অসম্মান,
অলংকার খুলে নেবে, একে একে বর্ণসজ্জাহীন উত্তরীয়ে

ঢেকে দিবে, ললাটে আঁকিবে শুভ্র তিলকের রেখা ;
তোমরাও যোগ দিয়ো জীবনের পূর্ণ ঘট নিয়ে
সে অন্তিম অনুষ্ঠানে, হয়তো শুনিবে দূর হতে
দিগন্তের পরপারে শুভশঙ্খধ্বনি।

উদয়ন
৯ মার্চ, ১৯৪১। সকাল

নাটক ও প্রহসন

শ্রাবণগাথা

শ্রাবণগাথা

নটরাজ। মহারাজ, আদেশ করেন যদি, বর্ষার অভ্যর্থনা দিয়ে আজ উৎসবের ভূমিকা করা যাক।

রাজা। ভূমিকার কী প্রয়োজন।

নটরাজ। ধুয়োর যে প্রয়োজন গানে। ঐ ধুয়োটাই অঙ্কুরের মতো ছোটো হয়ে দেখা দেয়, তার পরে শাখায় পল্লবে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

রাজা। আচ্ছা, তা হলে বিলম্বে কাজ নেই।

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব-হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ রভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা,
    শ্যাম গম্ভীর সরসা।
গুরু গর্জনে নীল অরণ্য শিহরে,
উতলা কলাপী কেকাকলরবে বিহরে;
    নিখিল চিত্তহরষা
ঘনগৌরবে আসিছে মত্ত বরষা।

কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিকললনা,
জনপদবধূ তড়িৎ-চকিত-নয়না,
মালতীমালিনী কোথা প্রিয়পরিচারিকা,
    কোথা তোরা অভিসারিকা।
ঘনবনতলে এসো ঘননীলবসনা,
ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরসনা,
    আনো বীণা মনোহারিকা,
কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা।

আনো মৃদঙ্গ মুরজ মুরলী মধুরা,
বাজাও শঙ্খ, হুলুরব করো বধূরা,
এসেছে বরষা ওগো নব অনুরাগিণী,
ওগো প্রিয়সুখভাগিনী।
কুঞ্জকুটীরে অয়ি ভাবাকুললোচনা
ভূর্জপাতায় নবগীত করো রচনা,
মেঘমল্লার রাগিণী ;
এসেছে বরষা ওগো নব অনুরাগিণী।

কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভি,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পরো করবী,
কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
অঞ্জন আঁকো নয়নে।
তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া
ভবনশিখীরে নাচাও গণিয়া গণিয়া
স্মিতবিকশিত বয়নে,
কদম্বরেণু বিছাইয়া ফুলশয়নে।

এসেছে বরষা, এসেছে নবীন বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবনভরসা,
দুলিছে পবনে সনসন বনবীথিকা,
গীতময় তরুলতিকা।
শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে গন্ধমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা,
শত-শত গীত-মুখরিত বনবীথিকা॥

নটরাজ। ওগো কমলিকা, এখন তবে শুরু করো তোমাদের পালা।

রাজা। কী দিয়ে শুরু করবে।

নটরাজ। বনভূমির আত্মনিবেদন দিয়ে।

রাজা। কার কাছে আত্মনিবেদন।

নটরাজ। আকাশপথে যিনি এসেছেন অতিথি— আবির্ভাব যাঁর অরণ্যের রাসমঞ্চে, পূর্বদিগন্তে উড়েছে যাঁর কেশকলাপ।

সভাকবি। ওহে নটরাজ, আমরা আধুনিক কালের কবি— ফুলকাটা বুলি দিয়ে আমরা কথা কই নে— তুমি যেটা অত করে ঘুরিয়ে বললে, আমরা সেটাকে সাদা ভাষায় বলে থাকি বাদলা।

নটরাজ। বাদলা নামে রাজপথের ধুলোয়, সেটাকে দেয় কাদা ক'রে। বাদলা নামে রাজপ্রহরীদের পাগড়ির 'পরে, তার পাকে পাকে জমিয়ে তোলে কফের প্রকোপ। আমি যাঁর কথা বলছি তিনি নামেন ধরণীর প্রাণমন্দিরে, বিরহীর মর্মবেদনায়।

রাজা। তোমাদের দেশের লোক কথা জমাতে পারে বটে।

সভাকবি। ওঁদের শব্দ আছে বিস্তর, কিন্তু মহারাজ, অর্থের বড়ো টানাটানি।

নটরাজ। নইলে রাজদ্বারে আসব কোন্ দুঃখে। এইবার শুরু করো।

বাকি আমি রাখব না কিছুই।
তোমার চলার পথে পথে ছেয়ে দেব ভুঁই।
ওগো মোহন, তোমার উত্তরীয়
গন্ধে আমার ভরে নিয়ো,
উজাড় করে দেব পায়ে বকুল বেলা জুঁই।
পুরব-সাগর পার হয়ে যে এলে পথিক তুমি,
আমার সকল দেব অতিথিরে আমি বনভূমি।
আমার কুলায়-ভরা রয়েছে গান,
সব তোমারেই করেছি দান,
দেবার কাঙাল করে আমায় চরণ যখন ছুঁই॥

রাজা। দেখলুম, শুনলুম, লাগল ভালো, কিন্তু বুঝে পড়ে নিতে গেলে পুঁথির দরকার। আছে পুঁথি?

নটরাজ। এই নাও, মহারাজ।

রাজা। তোমাদের অক্ষরের ছাঁদটা সুন্দর, কিন্তু বোঝা শক্ত। এ কি চীনা অক্ষরে লেখা নাকি।

নটরাজ। বলতে পারেন অচিনা অক্ষরে।

রাজা। কিন্তু, রচনা যার সে গেল কোথায়।

নটরাজ। সে পালিয়েছে।

রাজা। পরিহাস বলে ঠেকছে। পালাবার তাৎপর্য কী।

নটরাজ। পাছে এখানকার বুদ্ধিমানরা বলেন, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। আরও দুঃখের বিষয়— যদি কিছু না বলে হাঁ করে থাকেন।

সভাকবি। এ তো বড়ো কৌতুক! পাঁজিতে লিখছে পূর্ণিমা, এ দিকে চাঁদ মেরেছেন দৌড়, পাছে কেউ বলে বসে তাঁর আলোটা ঝাপসা।

নটরাজ। বিশল্যকরণীটারই দরকার, গন্ধমাদনটা বাদ দিলেও চলে! না'ই রইলেন কবি, গানগুলো রইল।

সভাকবি। একটা ভাবনার বিষয় রয়ে গেল। গানে স্বয়ং কবিই সুর বসিয়েছেন নাকি।

নটরাজ। তা নয় তো কী। ফুলে যিনি দিয়েছেন রঙ তিনিই লাগিয়েছেন গন্ধ।

সভাকবি। সর্বনাশ! নিজের অধিকারে পেয়ে এবার দেবেন রাগিণীর মাথা হেঁট ক'রে। বাণীকে উপরে চড়িয়ে দিয়ে বীণার ঘটাবেন অপমান।

নটরাজ। অপমান ঘটানো একে বলে না, এ পরিণয় ঘটানো। রাগিণী যতদিন অনূঢ়া ততদিন তিনি স্বতন্ত্র। কাব্যের সঙ্গে বিবাহ হলেই তিনি কবিত্বের ছায়েবানুগতা। সপ্তপদীগমনের সময় কাব্যই যদি রাগিণীর পিছন পিছন চলে, সেটাকে বলব স্ত্রৈণের লক্ষণ। সেটা তোমাদের গৌড়ীয় পারিবারিক রীতি হতে পারে, কিন্তু রসরাজ্যের রীতি নয়।

রাজা। ওহে কবি, কথাটা বোধ হচ্ছে যেন তোমাকেই লক্ষ্য করে। ঘরের খবর জানলে কী করে।

সভাকবি। জনশ্রুতির 'পরে ভার, বানানো কথায় লোকরঞ্জন করা।

রাজা। জনশ্রুতিকে তা হলে কবি আখ্যা দিলে হয়। অলমতিবিস্তরেণ। যথারীতি কাজ আরম্ভ করো।

সভাকবি। আমরা সহ্য করব ওঁদের স্বরবর্ষণ, মহাবীর ভীষ্মের মতো।

নটরাজ। ধরণীর তপস্যা সার্থক হয়েছে, প্রণতি। রুদ্র আজ বন্ধুরূপ ধরেছেন, তাঁর তৃতীয় নেত্রের জ্বলদগ্নি দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছে শ্যামল জটাভার— প্রসন্ন তাঁর মুখ। প্রথমে সেই বন্ধুদর্শনের আনন্দকে আজ মুখরিত করো।

তপের তাপের বাঁধন কাটুক রসের বর্ষণে।
হৃদয় আমার, শ্যামল বঁধুর করুণ স্পর্শ নে।
অঝোর-ঝরন শ্রাবণজলে
তিমিরমেদুর বনাঞ্চলে
ফুটুক সোনার কদম্বফুল নিবিড় হর্ষণে।

ভরুক গগন, ভরুক কানন, ভরুক নিখিল ধরা,
দেখুক ভুবন মিলনস্বপন মধুর বেদনা-ভরা।
পরান-ভরানো ঘনছায়াজাল
বাহির আকাশ করুক আড়াল,
নয়ন ভুলুক, বিজুলি ঝলুক পরম দর্শনে।

নমো নমো নম করুণাঘন নম হে।
নয়নস্নিগ্ধ অমৃতাঞ্জনপরশে,
জীবন পূর্ণ সুধারসবরষে,
তব দর্শনধনসার্থক মন হে,
অকৃপণবর্ষণ করুণাঘন হে।
নম হে নম হে॥

সভাকবি। নটরাজ, মহারানী-মাতার কল্যাণে সেদিন রাজবাড়ি থেকে কিছু ভোজ্যপানীয় সংগ্রহ করে নিয়ে আসছিলেম গৃহিণীর ভাণ্ডার-অভিমুখে। মধ্যপথে বাহনটা পড়ল উঁচট খেয়ে, ছড়িয়ে পড়ল মোদক মিষ্টান্ন পথের পাঁকে, গড়িয়ে পড়ল পায়সান্ন ভাঙা হাঁড়ি থেকে নালার মধ্যে। তখন মুষলধারে বর্ষণ হচ্ছে— নৈবেদ্যটা শ্রাবণ স্বয়ং নিয়ে গেলেন ভাসিয়ে। তোমাদের এই প্রণামটাও দেখি সেইরকম। খুবই ছড়িয়েছ বটে, কিন্তু পৌঁছল কোথায় ভেবে পাচ্ছি নে।

নটরাজ। কবিবর, আমাদের প্রণামের রস তোমার হাঁড়িভাঙা পায়েসের রস নয়— ওকে নষ্ট করতে পারবে না কোনো পাঁকের অপদেবতা; সুরের পাত্রে রইল ও চিরকালের মতো, চিরকালের শ্যামল বঁধুর ভোগে বর্ষে বর্ষে ওর অক্ষয় উৎসর্গ।

রাজা। কিছু মনে কোরো না নটরাজ, আমাদের সভাকবি দুঃসহ আধুনিক। হাঁড়িভাঙা পায়েসের রস পাঁকে গড়ালে উনি সেটাকে নিয়ে চৌরপঞ্চশতক রচনা করতে পারেন, কিন্তু তৃপ্তি পান না সেই রসে যার সঙ্গে না আছে জঠরের যোগ, না আছে ভাণ্ডারের। তোমার কাজ অসংকোচে করে যাও, এখানে অন্য শ্রোতাও আছে।

নটরাজ। বনমালিনী, এবার তবে বর্ষাধারাস্নানের আমন্ত্রণ ঘোষণা করে দাও নূপুরের ঝংকারে, নৃত্যের হিল্লোলে। চেয়ে দেখো, শ্রাবণঘনশ্যামলার সিক্ত বেণীবন্ধন দিগন্তে স্খলিত, তার ছায়াবসনাঞ্চল প্রসারিত ঐ তমালতালীবনশ্রেণীর শিখরে শিখরে।

এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে,
এসো করো স্নান নবধারাজলে।
দাও আকুলিয়া ঘন কালো কেশ,
পরো দেহ ঘেরি মেঘনীল বেশ—
কাজল নয়নে, যূথীমালা গলে,
এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে।
আজি খনে খনে হাসিখানি সখী,
অধরে নয়নে উঠুক চমকি।
মল্লারগানে তব মধুস্বরে
দিক্‌ বাণী আনি বনমর্মরে—
ঘন বরিষনে জলকলকলে
এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে॥

রাজা। উত্তম। কিন্তু চাঞ্চল্য যেন কিছু বেশি, বর্ষাঋতু তো বসন্ত নয়।

নটরাজ। তা হলে ভিতরে তাকিয়ে দেখুন। সেখানে পুলক জেগেছে; সে পুলক গভীর, সে প্রশান্ত।

সভাকবি। ঐ তো মুশকিল। ভিতরের দিকে? ও দিকটাতে বাঁধা রাস্তা নেই তো।

নটরাজ। পথ পাওয়া যাবে সুরের স্রোতে। অন্তরাকাশে সজল হাওয়া মুখর হয়ে উঠল। বিরহের দীর্ঘনিশ্বাস উঠেছে সেখানে— কার বিরহ জানা নেই। ওগো গীতরসিকা, বিশ্ববেদনার সঙ্গে হৃদয়ের রাগিণীর মিল করো।

ঝরে ঝর ঝর ভাদর-বাদর,
বিরহকাতর শর্বরী।
ফিরিছে এ কোন্‌ অসীম রোদন
কানন কানন মর্মরি।
আমার প্রাণের রাগিণী আজি এ
গগনে গগনে উঠিল বাজিয়ে।
হৃদয় এ কী রে ব্যাপিল তিমিরে
সমীরে সমীরে সঞ্চরি॥

রাজা। কী বল হে, কী মনে হচ্ছে তোমার।

সভাকবি। সত্য কথা বলি, মহারাজ। অনেক কবিত্ব করেছি, অমরুশতক পেরিয়ে শান্তিশতকে পৌঁছবার বয়স হয়ে এল— কিন্তু এই যে এঁরা অশরীরী বিরহের কথা বলেন যা নিরবলম্ব, এটা কেমন যেন প্রেতলোকের ব্যাপার ব'লে মনে হয়।

রাজা। শুনলে তো, নটরাজ! একটু মিলনের আভাস লাগাও, অন্তত দূর থেকে আশা পাওয়া যায় এমন আয়োজন করতে দোষ কী।

সভাকবি। ঠিক বলেছেন, মহারাজ। পাত পেড়ে বসলে ওঁদের মতে যদি কবিত্ববিরুদ্ধ হয়, অন্তত রান্নাঘর থেকে গন্ধটা বাতাসে মেলে দিতে দোষ কী।

নটরাজ। বরমপি বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যা। পেটভরা মিলনে সুর চাপা পড়ে, একটু ক্ষুধা বাকি রাখা চাই, কবিরাজরা এমন কথা ব'লে থাকেন। আচ্ছা, তবে মিলনতরীর সারিগান বিরহবন্যার ও পার থেকে আসুক সজল হাওয়ায়।

ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে
বাদল-বাতাস মাতে মালতীর গন্ধে।
উৎসবসভা-মাঝে শ্রাবণের বীণা বাজে,
শিহরে শ্যামল মাটি প্রাণের আনন্দে।
দুই কূল আকুলিয়া অধীর বিভঙ্গে
নাচন উঠিল জেগে নদীর তরঙ্গে।
কাঁপিছে বনের হিয়া বরষনে মুখরিয়া,
বিজলি ঝলিয়া উঠে নবঘনমন্দ্রে ॥

রাজা। এ গানটাতে একটু উৎসাহ আছে। দেখছি, তোমার মৃদঙ্গওয়ালার হাত দুটো অস্থির হয়ে উঠেছে— ওকে একটু কাজ দাও।

নটরাজ। এবার তা হলে একটা অশ্রুত গীতচ্ছন্দের মূর্তি দেখা যাক।

সভাকবি। শুনলেন ভাষাটা! অশ্রুত গীত! নিরন্ন ভোজনের আয়োজন!

রাজা। দোষ দিয়ো না, যাদের যেমন রীতি। তোমাদের নিমন্ত্রণে আমিষের প্রাচুর্য।

সভাকবি। আজ্ঞা হাঁ মহারাজ, আমরা আধুনিক, আমিষলোলুপ।

নটরাজ। শ্যামলিয়া, দেহভঙ্গীর নিঃশব্দ গানের জন্যে অপেক্ষা করছি।

নাচ

রাজা। অতি উত্তম। শূন্যকে পূর্ণ করেছ তুমি। এই নাও পুরস্কার। নটরাজ, তোমাদের পালাগানে একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখেছি, এতে বিরহের অংশটাই

যেন বেশি। তাতে ওজন ঠিক থাকে না।

নটরাজ। মহারাজ, রসের ওজন আয়তনে নয়। সমস্ত গাছ এক দিকে, একটিমাত্র ফুল এক দিকে—তাতেও ওজন থাকে। অসীম অন্ধকার এক দিকে, একটি তারা এক দিকে—তাতেও ওজনের ভুল হয় না। বিরহের সরোবর হোক-না অকূল, তারই মধ্যে একটিমাত্র মিলনের পদ্মই যথেষ্ট।

সভাকবি। এঁদের দেশের লোক বাচালের সেরা, কথায় পেরে উঠবেন না। আমি বলি সন্ধি করা যাক— ক্ষণকালের জন্যে মিলনও ক্ষান্ত দিক, বিরহও চুপ মেরে থাক্। শ্রাবণ তো মেয়ে নয় মহারাজ, সে পুরুষ, ওঁর গানে সেই পুরুষের মূর্তি দেখিয়ে দিন্-না।

নটরাজ। ভালো বলেছ, কবি। তবে এসো উগ্রসেন, উন্মত্তকে বাঁধো কঠিন ছন্দে, বজ্রকে মঞ্জীর ক'রে নাচুক ভৈরবের অনুচর।

হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরুগুরু,
ঘন মেঘের ভুরু কুটিল কুঞ্চিত।
হল রোমাঞ্চিত বনবনান্তর,
দুলিল চঞ্চল বক্ষোহিন্দোলে
মিলনস্বপ্নে সে কোন্ অতিথি রে!
সঘনবর্ষণ-শব্দ-মুখরিত
বজ্রসচকিত ত্রস্ত শর্বরী,
মালতীবল্লরী কাঁপায় পল্লব
করুণ কল্লোলে, কানন শঙ্কিত
ঝিল্লিঝংকৃত ॥

রাজা। এই তো নৃত্য! কঠিনের বক্ষপ্লাবী আনন্দের নির্ঝর। এ তো মন ভোলাবার নয়, এ মন দোলাবার।

সভাকবি। কিন্তু এই দুর্দম আবেগ বেশিক্ষণ সইবে না। ঐ দেখুন, আপনার পারিষদের দল নেপথ্যের দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে। কড়াভোগ ওদের গলা দিয়ে নামে না, একটু মিঠুয়া চাই।

রাজা। নটরাজ, শুনলে তো। অতএব কিঞ্চিৎ মিষ্টান্নমিতরেজনাঃ।

নটরাজ। প্রস্তুত আছি। তা হলে শ্রাবণপূর্ণিমার লুকোচুরির কথাটা ফাঁস করে দেওয়া যাক।

ওগো শ্রাবণের পূর্ণিমা আমার
আজি রইলে আড়ালে।
স্বপনের আবরণে লুকিয়ে দাঁড়ালে।
আপনারি মনে জানি নে একেলা
হৃদয়-আঙিনায় করিছ কী খেলা,
তুমি আপনায় খুঁজে কি ফের'
কি তুমি আপনায় হারালে।
এ কি মনে রাখা, এ কি ভুলে যাওয়া,
এ কি স্রোতে ভাসা, এ কি কূলে বাওয়া।
কভু বা নয়ানে কভু বা পরানে
কর' লুকোচুরি কেন-যে কে জানে,
কভু বা ছায়ায় কভু বা আলোয়
কোন্ দোলায়-যে নাড়ালে॥

রাজা। বুঝতে পারলুম না এঁর মনোরঞ্জন হল কিনা। সে অসাধ্য চেষ্টায় প্রয়োজন নেই। আমার অনুরোধ এই, রসের ধারাবর্ষণ যথেষ্ট হয়েছে, এখন রসের ঝোড়ো হাওয়া লাগিয়ে দাও।

নটরাজ। মহারাজ, আপনার সঙ্গে আমারও মনের ভাব মিলছে। এবার শ্রাবণের ভেরীধ্বনি শোনা যাক। সুপ্তকে জাগিয়ে তুলুক, চেতিয়ে তুলুক অন্যমনাকে।

ওরে ঝড় নেমে আয়, আয় রে আমার শুকনো পাতার ডালে—
এই বরষায় নবশ্যামের আগমনের কালে।
যা উদাসীন, যা প্রাণহীন, যা আনন্দহারা
চরম রাতের অশ্রুধারায় আজ হয়ে যাক সারা—
যাবার যাহা যাক সে চলে রুদ্রনাচের তালে।
আসন আমার পাততে হবে রিক্ত প্রাণের ঘরে,
নবীন বসন পরতে হবে সিক্ত বুকের 'পরে।
নদীর জলে বান ডেকেছে, কূল গেল তার ভেসে,
যূথীবনের গন্ধবাণী ছুটল নিরুদ্দেশে—
পরান আমার জাগল বুঝি মরণ-অন্তরালে॥

রাজা। আমার সভাকবিকে বিমর্ষ করে দিয়েছ। তোমাদের এই গানে গানকে

ছাড়িয়ে গানের কবিকে দেখা যাচ্ছে বেশি, ঐখানে ইনি দেখছেন ওঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে। মনে মনে তর্ক করছেন, কী ক'রে আধুনিক ভাষায় এর খুব একটা কর্কশ জবাব দেওয়া যায়। আমি বলি— কাজ নেই, একটা সাদা ভাবের গান সাদা সুরে ধরো, যদি সম্ভব হয় ওঁর মনটা সুস্থ হোক।

নটরাজ। মহারাজের আদেশ পালন করব। আমাদের ভাষায় যতটা সম্ভব সহজ করেই প্রকাশ করব, কিন্তু যত্নেকৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্রদোষঃ। সকরুণা, এই বারিপতনশব্দের সঙ্গে মিলিয়ে বিচ্ছেদের আশঙ্কাকে সুরের যোগে মধুর করে তোলো।

ভেবেছিলেম আসবে ফিরে,
তাই ফাগুন-শেষে দিলেম বিদায়।
যখন গেলে তখন ভাসি নয়ননীরে,
এখন শ্রাবণদিনে মরি দ্বিধায়।
বাদল-সাঁঝের অন্ধকারে
আপনি কাঁদাই আপনারে,
একা ঝরো ঝরো বারিধারে
ভাবি কী ডাকে ফিরাব তোমায়।
যখন থাক আঁখির কাছে
তখন দেখি ভিতর বাহির সব ভ'রে আছে।
সেই ভরা দিনের ভরসাতে
চাই বিরহের ভয় ঘোচাতে,
তবু তোমা-হারা বিজন রাতে
কেবল 'হারাই হারাই' বাজে হিয়ায়॥

সভাকবি। নটরাজ, আমার ধারণা ছিল বসন্ত ঋতুরই ধাতটা বায়ুপ্রধান— সেই বায়ুর প্রকোপেই বিরহমিলনের প্রলাপটা প্রবল হয়ে ওঠে। কফপ্রধান ধাত বর্ষার— কিন্তু তোমার পালায় তাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছ। রক্ত হয়েছে তার চঞ্চল। তা হলে বর্ষায় বসন্তে প্রভেদটা কী।

নটরাজ। সোজা কথায় বুঝিয়ে দেব— বসন্তের পাখি গান করে, বর্ষার পাখি উড়ে চলে।

সভাকবি। তোমাদের দেশে এইটেকেই সোজা কথা বলে! আমাদের প্রতি কিছু দয়া থাকে যদি কথাটা আরও সোজা করতে হবে।

নটরাজ। বসন্তে কোকিল ডালপালার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে বনচ্ছায়াকে সকরুণ করে তোলে— আর বর্ষায় বলাকাই বল, হংসশ্রেণীই বল, উধাও হয়ে মুক্ত পথে চলে শূন্যে— কৈলাসশিখর থেকে বেরিয়ে পড়ে অকূল সমুদ্রতটের দিকে। ভাবনার এই দুই জাত আছে। মুখের তর্ক ছেড়ে সুরের ব্যাখ্যা ধরা যাক। পুরবিকা, ধরো গান।

মেঘের কোলে কোলে যায় রে চলে বকের পাঁতি ;
ওরা ঘরছাড়া মোর মনের কথা যায় বুঝি ঐ গাঁথি গাঁথি।
সুদূরের বাঁশির স্বরে
কে ওদের হৃদয় হরে,
দুরাশার দুঃসাহসে উদাস করে ;
উধাও হাওয়ার পাগলামিতে পাখা ওদের ওঠে মাতি।
ওদের ঘুম ছুটেছে, ভয় টুটেছে একেবারে ;
অলক্ষেতে লক্ষ্য ওদের, পিছন পানে তাকায় না রে।
যে বাসা ছিল জানা,
সে ওদের দিল হানা,
না জানার পথে ওদের নাই রে মানা ;
ওরা দিনের শেষে দেখেছে কোন্ মনোহরণ আঁধার রাতি ॥

নটরাজ। আপনার ঐ সভাকবির মুখখানা কিছুক্ষণ বন্ধ রাখুন। ওঁর গোমুখীবিনিঃসৃত বাক্যনির্ঝর এ দেশের কঠোর শিলাখণ্ডের উপর পাক খেয়ে বেড়াক। আমরা এনেছি সুরলোকের ধারা— আলোকের সভাপ্রাঙ্গণ ধুয়ে দিতে হবে। কাজ শেষ হলেই বিদায় নেব।

রাজা। আচ্ছা নটরাজ, তোমার পথের উপদ্রবকে নিরস্ত রাখব। পাল তুলে চলে যাও।

নটরাজ। মঞ্জুলা, তা হলে হাওয়াটা শোধন করে নিয়ে আর-একবার আবাহন-গান ধরো।

তৃষ্ণার শান্তি,
সুন্দরকান্তি,
তুমি এলে নিখিলের সন্তাপভঞ্জন।

আঁক' ধরাবক্ষে
দিক্‌বধূচক্ষে
সুশীতল সুকোমল শ্যামরসরঞ্জন।
এলে বীর, ছন্দে—
তব কটিবন্ধে
বিদ্যুৎ-অসিলতা বেজে ওঠে ঝঞ্চন।
তব উত্তরীয়ে
ছায়া দিলে ভরিয়ে
তমালবনশিখরে নবনীল-অঞ্জন।
ঝিল্লির মন্দ্রে
মালতীর গন্ধে
মিলাইলে চঞ্চল মধুকরগুঞ্জন।
নৃত্যের ভঙ্গে
এলে নবরঙ্গে,
সচকিত পল্লবে নাচে যেন খঞ্জন॥

রাজা। ওহে নটরাজ, সভাকবির মুখে আর শব্দমাত্র নেই। এর চেয়ে বড়ো সাধুবাদ আর আশা কোরো না।

সভাকবি। আছে মহারাজ, আছে, বলবার বিষয় আছে— হঠাৎ মুখ বন্ধ করে দেবেন না।

রাজা। আচ্ছা, বলো।

সভাকবি। আমি আধুনিক বটে, কিন্তু নাচ সম্বন্ধে আমি প্রাচীনপন্থী।

রাজা। কী বলতে চাও।

সভাকবি। নৃত্যকলায় দোষ আছে, ওটাকে হেয় করে রাখাই শ্রেয়।

রাজা। কাব্যে কোথাও কোনো দোষ সম্ভব নয় বুঝি! কত কালিদাস এবং অকালিদাস দেখা গেল, ওঁদের শ্লোকগুলোর মধ্যে পাঁক বাঁচিয়ে চলা দায় যে।

সভাকবি। কাব্য বলুন, গীতকলা বলুন, ওরা অভিজাতশ্রেণীয়, ওদের দোষকেও শিরোধার্য করতে হয়। কিন্তু ঐ নৃত্যকলার আভিজাত্য নেই, গৌড়দেশের ব্রাহ্মণরা ওকে অনাচরণীয়া ব'লে থাকেন।

নটরাজ। কবিবর, তোমার গৌড়দেশের সূচনা হবার বহু পূর্বে যখন আদিদেবের

আহ্বানে সৃষ্টি-উৎসব জাগল তখন তার প্রথম আরম্ভ হল আকাশে আকাশে বহ্নিমালার নৃত্যে। সূর্যচন্দ্রের নৃত্য আজও বিরাম পেল না, ষড়্‌ঋতুর নৃত্য আজও চলেছে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। সুরলোকে আলোক-অন্ধকারের যুগলনৃত্য, নরলোকে অশ্রান্ত নৃত্য জন্মমৃত্যুর, সৃষ্টির আদিম ভাষাই এই নৃত্য, তার অন্তিমেও উন্মত্ত হয়ে উঠবে এই নৃত্যের ভাষাতেই প্রলয়ের অগ্নিনটিনী। মানুষের অঙ্গে অঙ্গে স্বর্গের আনন্দকে তরঙ্গিত করবার ভার নিয়েছি আমরাই; তোমাদের মোহাচ্ছন্ন চোখে নির্মল দৃষ্টি জাগাব, নইলে বৃথা আমাদের সাধনা।

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ।
তারি সঙ্গে কী মৃদঙ্গে সদা বাজে
তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ।
হাসিকান্না হীরা পান্না দোলে ভালে;
কাঁপে ছন্দে ভালো মন্দ তালে তালে;
নাচে জন্ম, নাচে মৃত্যু পাছে পাছে
তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ।
কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ—
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি, নাচে বন্ধ;
সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ॥

রাজা। এর উপরে আর কথা চলে না। এখন আমার একটা অনুরোধ আছে। আমি ভালোবাসি কড়া পাকের রস। বর্ষার সবটাই তো কান্না নয়, ওতে আছে ঐরাবতের গর্জন, আছে উচ্চৈঃশ্রবার দৌড়।

নটরাজ। আছে বই কি। এসো তবে বিদ্যুন্ময়ী, শ্রাবণ যে স্বয়ং বজ্রপাণি মহেন্দ্রের সভাসদ্, নৃত্যে সুরে তোমরা তার প্রমাণ করে দাও।

দেখা না-দেখায় মেশা হে বিদ্যুৎলতা,
কাঁপাও ঝড়ের বুকে এ কী ব্যাকুলতা।
গগনে সে ঘুরে ঘুরে খোঁজে কাছে, খোঁজে দূরে;
সহসা কী হাসি হাস', নাহি কহ কথা।

আঁধার ঘনায় শূন্যে ; নাহি জানে নাম,
কী রুদ্র সন্ধানে সিন্ধু দুলিছে দুর্দাম।
অরণ্য হতাশ প্রাণে আকাশে ললাট হানে ;
দিকে দিকে কেঁদে ফিরে কী দুঃসহ ব্যথা ॥

নটরাজ। ওহে ওস্তাদ, তোমার গানের পিছনে পিছনে ঐ যে দলে দলে মেঘ এসে জুটল। গরজত বরখত চমকত বিজুরী। দুই পক্ষের পাল্লা চলুক। সুরে তালে কথায়, আর মেঘে বিদ্যুতে ঝড়ে।

পথিক মেঘের দল জোটে ঐ শ্রাবণগগন-অঙ্গনে।
মন রে আমার, উধাও হয়ে নিরুদ্দেশের সঙ্গ নে।
দিক্-হারানো দুঃসাহসে সকল বাঁধন পড়ুক খসে ;
কিসের বাধা ঘরের কোণে শাসনসীমালঙ্ঘনে।
বেদনা তোর বিজুলশিখা জ্বলুক অন্তরে,
সর্বনাশের করিস সাধন বজ্রমন্তরে।
অজানাতে করবি গাহন, ঝড় সে হবে পথের বাহন ;
শেষ ক'রে দিস আপ্‌নারে তুই প্রলয়রাতের ক্রন্দনে ॥

সভাকবি। ঐ রে ঘুরে ফিরে আবার এসে পড়ল—সেই অজানা, সেই নিরুদ্দেশের পিছনে-ছোটা পাগলামি।

নটরাজ। উজ্জয়িনীর সভাকবিরও ছিল ঐ পাগলামি। মেঘ দেখলেই তাঁকেও পেয়ে বসত অকারণ উৎকণ্ঠা ; তিনি বলেছেন, মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ— এখানকার সভাকবি কি তার প্রতিবাদ করবেন।

সভাকবি। এত বড়ো সাহস নেই আমার। কালিদাসকে নমস্কার ক'রে যথাসাধ্য চেষ্টা করব মেঘ-দেখা হাহুতাশটাকে মনে আনতে।

নটরাজ। আচ্ছা, তবে থাক্ কিছুক্ষণ হাহুতাশ, এখন অন্য কথা পাড়া যাক। মহারাজ, সব চেয়ে যারা ছোটো, উৎসবে সব চেয়ে সত্য তাদেরই বাণী। বড়ো বড়ো শাল তাল তমালের কথাই কবিরা বড়ো করে বলেন— যে কচিপাতাগুলি বন জুড়ে কোলাহল করে তাদের জন্যে স্থান রাখেন অল্পই।

রাজা। সত্য বলেছ, নটরাজ। ক্রিয়াকর্মের দিনে পাড়ার বুড়ো বুড়ো কর্তারা ভাঙা গলায় হাঁকডাক করে, কিন্তু উৎসব জমে ওঠে শিশুদের কলরবে।

নটরাজ। ঐ কথাটাই বলতে যাচ্ছিলুম। কিশলয়িনী, এসো তুমি শ্রাবণের আসরে।

ওরা অকারণে চঞ্চল ;
ডালে ডালে দোলে বায়ুহিল্লোলে
নব পল্লবদল।
বাতাসে বাতাসে প্রাণভরা বাণী
শুনিতে পেয়েছে কখন কী জানি,
মর্মরতানে দিকে দিকে আনে কৈশোর-কোলাহল।
ওরা কান পেতে শোনে গগনে গগনে মেঘে মেঘে কানাকানি,
বনে বনে জানাজানি।
ওরা প্রাণ-ঝরনার উচ্ছল ধার
ঝরিয়া ঝরিয়া বহে অনিবার,
চিরতাপসিনী ধরণীর ওরা শ্যামশিখা হোমানল ॥

রাজা। সাধু সাধু! কিন্তু নটরাজ, এ হল ললিত চাঞ্চল্য— এবার একটা দুর্ললিত চাঞ্চল্য দেখিয়ে দাও।

নটরাজ। এমন চাঞ্চল্য আছে যাতে বাঁধন শক্ত করে, আবার এমন আছে যাতে শিকল ছেঁড়ে। সেই মুক্তির উদ্‌বেগ আছে শ্রাবণের অন্তরে। এসো তো বিজুলি, এসো বিপাশা।

হা রে, রে রে, রে রে, আমায় ছেড়ে দে রে, দে রে—
যেমন ছাড়া বনের পাখি মনের আনন্দে রে।
ঘন শ্রাবণধারা যেমন বাঁধন-হারা,
বাদল বাতাস যেমন ডাকাত আকাশ লুটে ফেরে।
হা রে, রে রে, রে রে, আমায় রাখবে ধ'রে কে রে—
দাবানলের নাচন যেমন সকল কানন ঘেরে,
বজ্র যেমন বেগে গর্জে ঝড়ের মেঘে,
অট্টহাস্যে সকল বিঘ্ন- বাধার বক্ষ চেরে ॥

সভাকবি। মহারাজ, আমাদের দুর্বল রুচি, ক্ষীণ আমাদের পরিপাকশক্তি। আমাদের প্রতি দয়ামায়া রাখবেন। জানেন তো, ব্রাহ্মণা মধুরপ্রিয়াঃ। রুদ্ররস রাজন্যদেরই মানায়।

নটরাজ। আচ্ছা, তবে শোনো। কিন্তু বলে রাখছি, রস জোগান দিলেই যে রস ভোগ করা যায় তা নয়, নিজের অন্তরে রসরাজের দয়া থাকা চাই।

মম মন-উপবনে চলে অভিসারে আঁধার রাতে বিরহিণী
রক্তে তারি নূপুর বাজে রিনি রিনি।
দুরু দুরু করে হিয়া,
মেঘ উঠে গরজিয়া,
ঝিল্লি ঝনকে ঝিনি ঝিনি।
মম মন-উপবনে ঝরে বারিধারা,
গগনে নাহি শশী তারা।
বিজুলির চমকনে
মিলে আলো খনে খনে,
খনে খনে পথ ভোলে উদাসিনী॥

নটরাজ। অরণ্য আজ গীতহীন, বর্ষাধারায় নেচে চলেছে জলস্রোত বনের প্রাঙ্গণে— যমুনা, তোমরা তারই প্রচ্ছন্ন সুরের নৃত্য দেখিয়ে দাও মহারাজকে।

নাচ

রাজা। তোমার পালা বোধ হচ্ছে শেষের দিকে পৌঁছল— এইবার গভীরে নামো যেখানে শান্তি, যেখানে স্তব্ধতা, যেখানে জীবনমরণের সম্মিলন।

নটরাজ। আমারও মন তাই বলছে।

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি সে কি সহজ গান।
সেই সুরেতে জাগব আমি, দাও মোরে সেই কান।
ভুলব না আর সহজেতে, সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে
মৃত্যুমাঝে ঢাকা আছে যে অন্তহীন প্রাণ।
সে ঝড় যেন সই আনন্দে চিত্তবীণার তারে,
সপ্তসিন্ধু দিক্‌-দিগন্ত জাগাও যে ঝংকারে।
আরাম হতে ছিন্ন ক'রে সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায় শান্তি সুমহান॥

নটরাজ। মহারাজ, রাত্রি অবসানপ্রায়। গানে আপনার অভিনিবেশ কি ক্লান্ত হয়ে এল।

রাজা। কী বলো, নটরাজ! মন অভিষিক্ত হতে সময় লাগে। অন্তরে এখন রস প্রবেশ করেছে। আমার সভাকবির বিরস মুখ দেখে আমার মনের ভাব অনুমান কোরো না। প্রহর গণনা ক'রে আনন্দের সীমানির্ণয়! এ কেমন কথা!

সভাকবি। মহারাজ, দেশকালপাত্রের মধ্যে দেশও অসীম, কালও অসীম, কিন্তু আপনার পাত্রদের ধৈর্যের সীমা আছে। তোরণদ্বার থেকে চতুর্থ প্রহরের ঘণ্টা বাজল, এখন সভাভঙ্গ করলে সেটা নিন্দনীয় হবে না।

রাজা। কিন্তু তৎপূর্বে উষাসমাগমের একটা অভিনন্দন-গান হোক। নইলে ভদ্ররীতিবিরুদ্ধ হবে। যে-অস্তগমন নব অভ্যুদয়ের আশ্বাস না রেখেই যায় সে তো প্রলয়সন্ধ্যা।

নটরাজ। এ কথা সত্য। তবে এসো অরুণিকা, জাগাও প্রভাতের আগমনী। বিশ্ববেদাতে শ্রাবণের রসদানযজ্ঞ সমাধা হল। শ্রাবণ তার কমণ্ডলু নিঃশেষ করে দিয়ে বিদায়ের মুখে দাঁড়িয়েছে। শরতের প্রথম উষার স্পর্শমণি লেগেছে আকাশে।

দেখো দেখো, শুকতারা আঁখি মেলি চায়
প্রভাতের কিনারায়।
ডাক দিয়েছে রে শিউলি ফুলেরে—
আয় আয় আয়।
ও যে কার লাগি জ্বালে দীপ,
কার ললাটে পরায় টিপ,
ও যে কার আগমনী গায়—
আয় আয় আয়।
জাগো জাগো সখী,
কাহার আশায় আকাশ উঠিল পুলকি।
মালতীর বনে বনে
ঐ শোনো ক্ষণে ক্ষণে
কহিছে শিশিরবায়—
আয় আয় আয়॥

নটরাজ। মহারাজ, শরৎ দ্বারের কাছে এসে পৌঁচেছে, এইবার বিদায়গান। রসলোক থেকে আপনার সভাকবি মুক্তি পেলেন বস্তুলোকে।

সভাকবি। অর্থাৎ, অপদার্থ থেকে পদার্থে।

বাদলধারা হল সারা, বাজে বিদায়-সুর।
গানের পালা শেষ করে দে, যাবি অনেক দূর।

ছাড়ল খেয়া ও পার হতে ভাদ্রদিনের ভরা স্রোতে,
দুলছে তরী নদীর পথে তরঙ্গবন্ধুর।
কদমকেশর ঢেকেছে আজ বনপথের ধূলি,
মৌমাছিরা কেয়াবনের পথ গিয়েছে ভুলি।
অরণ্যে আজ স্তব্ধ হাওয়া, আকাশ আজি শিশির ছাওয়া,
আলোতে আজ স্মৃতির আভাস বৃষ্টির বিন্দুর ॥

নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা

বিজ্ঞপ্তি

এই গ্রন্থের অধিকাংশই গানে রচিত এবং সে গান নাচের উপযোগী। এ কথা মনে রাখা কর্তব্য যে, এই-জাতীয় রচনায় স্বভাবতই সুর ভাষাকে বহুদূর অতিক্রম ক'রে থাকে, এই কারণে সুরের সঙ্গ না পেলে এর বাক্য এবং ছন্দ পঙ্গু হয়ে থাকে। কাব্য-আবৃত্তির আদর্শে এই শ্রেণীর রচনা বিচার্য নয়। যে পাখির প্রধান বাহন পাখা, মাটির উপরে চলার সময় তার অপটুতা অনেক সময় হাস্যকর বোধ হয়

দৃশ্য

মণিপুর-অরণ্য

মণিপুর-প্রাসাদ

পাত্র

অর্জুন

চিত্রাঙ্গদা

সখীগণ

মদন

অর্জুনের বন্যপরিচর

গ্রামবাসীগণ

ভূমিকা

প্রভাতের আদিম আভাস অরুণবর্ণ আভার আবরণে।
অর্ধসুপ্ত চক্ষুর 'পরে লাগে তারই প্রথম প্রেরণা।
অবশেষে রক্তিম আবরণ ভেদ ক'রে সে আপন নিরঞ্জন শুভ্রতায়
সমুজ্জ্বল হয় জাগ্রত জগতে।
তেমনি সত্যের প্রথম উপক্রম সাজসজ্জার বহিরঙ্গে,
বর্ণবৈচিত্র্যে,
তারই আকর্ষণ অসংস্কৃত চিত্তকে করে অভিভূত।
একদা উন্মুক্ত হয় সেই বহিরাচ্ছাদন,
তখনই প্রবুদ্ধ মনের কাছে তার পূর্ণ বিকাশ।

এই তত্ত্বটি চিত্রাঙ্গদা নাট্যের মর্মকথা।
এই নাট্যকাহিনীতে আছে—
প্রথমে প্রেমের বন্ধন মোহাবেশে,
পরে তার মুক্তি সেই কুহক হতে
সহজ সত্যের নিরলংকৃত মহিমায়॥

নিউ এম্পায়ার, ক

নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা অভিনয়

চিত্রাঙ্গদা

মণিপুররাজের ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে শিব বর দিয়েছিলেন যে, তাঁর বংশে কেবল পুত্রই জন্মাবে। তৎসত্ত্বেও যখন রাজকুলে চিত্রাঙ্গদার জন্ম হল তখন রাজা তাঁকে পুত্ররূপেই পালন করলেন। রাজকন্যা অভ্যাস করলেন ধনুর্বিদ্যা; শিক্ষা করলেন যুদ্ধবিদ্যা, রাজদণ্ডনীতি।

অর্জুন দ্বাদশবর্ষব্যাপী ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ ক'রে ভ্রমণ করতে করতে এসেছেন মণিপুরে। তখন এই নাটকের আখ্যান আরম্ভ।

মোহিনী মায়া এল,
এল যৌবনকুঞ্জবনে।
এল হৃদয়শিকারে,
এল গোপন পদসঞ্চারে,
এল স্বর্ণকিরণবিজড়িত অন্ধকারে।
পাতিল ইন্দ্রজালের ফাঁসি,
হাওয়ায় হাওয়ায় ছায়ায় ছায়ায়
বাজায় বাঁশি।
করে বীরের বীর্য-পরীক্ষা,
হানে সাধুর সাধনদীক্ষা,
সর্বনাশের বেড়াজাল বেষ্টিল চারি ধারে।
এসো সুন্দর নিরলংকার,
এসো সত্য নিরহংকার—
স্বপ্নের দুর্গ হানো,
আনো মুক্তি আনো,
ছলনার বন্ধন ছেদি
এসো পৌরুষ-উদ্ধারে॥

১

প্রথম দৃশ্যে চিত্রাঙ্গদার শিকার আয়োজন

গুরু গুরু গুরু গুরু ঘন মেঘ গরজে পর্বতশিখরে,
অরণ্যে তমশ্ছায়া।
মুখর নির্ঝরকলকল্লোলে
ব্যাধের চরণধ্বনি শুনিতে না পায় ভীরু
হরিণদম্পতি।
চিত্রব্যাঘ্র পদনখচিহ্নরেখাশ্রেণী
রেখে গেছে ঐ পথপঙ্ক-'পরে,
দিয়ে গেছে পদে পদে গুহার সন্ধান।

বনপথে অর্জুন নিদ্রিত

শিকারের বাধা মনে করে চিত্রাঙ্গদার সখী তাঁকে তাড়না করলে

অর্জুন। অহো কী দুঃসহ স্পর্ধা,
অর্জুনে যে করে অশ্রদ্ধা
কোথা তার আশ্রয়!

চিত্রাঙ্গদা। অর্জুন! তুমি অর্জুন!

বালকবেশীদের দেখে সকৌতুক অবজ্ঞায়

অর্জুন। হাহা হাহা হাহা হাহা, বালকের দল,
মা'র কোলে যাও চলে, নাই ভয়।
অহো কী অদ্ভুত কৌতুক!

[প্রস্থান

চিত্রাঙ্গদা। অর্জুন! তুমি অর্জুন!
ফিরে এসো, ফিরে এসো,
ক্ষমা দিয়ে কোরো না অসম্মান,
যুদ্ধে করো আহ্বান!

বীর-হাতে মৃত্যুর গৌরব
করি যেন অনুভব—
অর্জুন! তুমি অর্জুন!

হা হতভাগিনী, এ কী অভ্যর্থনা মহতের,
এল দেবতা তোর জগতের,
গেল চলি,
গেল তোরে গেল ছলি—
অর্জুন! তুমি অর্জুন!

সখীগণ। বেলা যায় বহিয়া,
দাও কহিয়া
কোন্ বনে যাব শিকারে।
কাজল মেঘে সজল বায়ে
হরিণ ছুটে বেণুবনচ্ছায়ে।

চিত্রাঙ্গদা। থাক্ থাক্ মিছে কেন এই খেলা আর।
জীবনে হল বিতৃষ্ণা,
আপনার 'পরে ধিক্কার।

আত্ম-উদ্দীপনার গান

ওরে ঝড় নেমে আয়, আয় রে আমার
শুকনো পাতার ডালে,
এই বরষায় নবশ্যামের
আগমনের কালে।
যা উদাসীন, যা প্রাণহীন,
যা আনন্দহারা,
চরম রাতের অশ্রুধারায়
আজ হয়ে যাক সারা;
যাবার যাহা যাক সে চলে
রুদ্র নাচের তালে।
আসন আমার পাততে হবে
রিক্ত প্রাণের ঘরে,

নবীন বসন পরতে হবে
সিক্ত বুকের 'পরে।
নদীর জলে বান ডেকেছে
কূল গেল তার ভেসে,
যূথীবনের গন্ধবাণী
ছুটল নিরুদ্দেশে—
পরান আমার জাগল বুঝি
মরণ-অন্তরালে॥

সখী। সখা, কী দেখা দেখিলে তুমি!
এক পলকের আঘাতেই
খসিল কি আপন পুরানো পরিচয়।
রবিকরপাতে
কোরকের আবরণ টুটি
মাধবী কি প্রথম চিনিল আপনারে।

চিত্রাঙ্গদা। বঁধু, কোন্ আলো লাগল চোখে!
বুঝি দীপ্তিরূপে ছিলে সূর্যলোকে!
ছিল মন তোমারি প্রতীক্ষা করি
যুগে যুগে দিন রাত্রি ধরি,
ছিল মর্মবেদনাঘন অন্ধকারে,
জন্ম-জনম গেল বিরহশোকে।
অস্ফুটমঞ্জরী কুঞ্জবনে,
সংগীতশূন্য বিষণ্ণ মনে
সঙ্গীরিক্ত চিরদুঃখরাতি
পোহাব কি নির্জনে শয়ন পাতি!
সুন্দর হে, সুন্দর হে,
বরমাল্যখানি তব আনো বহে,
অবগুণ্ঠনছায়া ঘুচায়ে দিয়ে
হেরো লজ্জিত স্মিতমুখ শুভ আলোকে॥

[প্রস্থান

বন্য অনুচরদের সঙ্গে অর্জুনের প্রবেশ ও নৃত্য

২

সখীদের গান

যাও যদি যাও তবে
তোমায় ফিরিতে হবে
ব্যর্থ চোখের জলে
আমি লুটাব না ধূলিতলে,
বাতি নিবায়ে যাব না যাব না
মোর জীবনের উৎসবে।
মোর সাধনা ভীরু নহে,
শক্তি আমার হবে মুক্ত
দ্বার যদি রুদ্ধ রহে।
বিমুখ মুহূর্তেরে করি না ভয়—
হবে জয়, হবে জয়, হবে জয়,
দিনে দিনে হৃদয়ের গ্রন্থি তব
খুলিব প্রেমের গৌরবে॥

সখীসহ স্নানে আগমন

চিত্রাঙ্গদা। শুনি ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে
অতল জলের আহ্বান।
মন রয় না, রয় না, রয় না ঘরে,
চঞ্চল প্রাণ।
ভাসায়ে দিব আপনারে
ভরা জোয়ারে,
সকল ভাবনা-ডুবানো ধারায়
করিব স্নান।
ব্যর্থ বাসনার দাহ
হবে নির্বাণ।
ঢেউ দিয়েছে জলে।
ঢেউ দিল আমার মর্মতলে।

এ কী ব্যাকুলতা আজি আকাশে,
এই বাতাসে
যেন উতলা অপ্সরীর উত্তরীয়
করে রোমাঞ্চ দান,
দূর সিন্ধুতীরে কার মঞ্জীরে
গুঞ্জরতান ॥

সখীদের প্রতি

দে তোরা আমায় নূতন ক'রে দে
নূতন আভরণে।
হেমন্তের অভিসম্পাতে
রিক্ত অকিঞ্চন কাননভূমি ;
বসন্তে হোক দৈন্যবিমোচন
নব লাবণ্যধনে।
শূন্য শাখা লজ্জা ভুলে যাক
পল্লব-আবরণে।

সখীগণ। বাজুক প্রেমের মায়ামন্ত্রে
পুলকিত প্রাণের বীণাযন্ত্রে
চিরসুন্দরের অভিবন্দনা।
আনন্দচঞ্চল নৃত্য অঙ্গে অঙ্গে বহে যাক
হিল্লোলে হিল্লোলে,
যৌবন পাক্ সম্মান
বাঞ্ছিতসম্মিলনে ॥

[সকলের প্রস্থান

অর্জুনের প্রবেশ ও ধ্যানে উপবেশন
তাঁকে প্রদক্ষিণ ক'রে চিত্রাঙ্গদার নৃত্য

চিত্রাঙ্গদা। আমি তোমারে করিব নিবেদন
আমার হৃদয় প্রাণ মন !

অর্জুন। ক্ষমা করো আমায়,
বরণযোগ্য নহি বরাঙ্গনে,
ব্রহ্মচারী ব্রতধারী।

[প্রস্থান

চিত্রাঙ্গদা। হায় হায়, নারীরে করেছি ব্যর্থ
দীর্ঘকাল জীবনে আমার।
ধিক্ ধনুঃশর!
ধিক্ বাহুবল!
মুহূর্তের অশ্রুবন্যাবেগে
ভাসায়ে দিল যে মোর পৌরুষসাধনা।
অকৃতার্থ যৌবনের দীর্ঘশ্বাসে
বসন্তেরে করিল ব্যাকুল ॥

—

রোদন-ভরা এ বসন্ত
কখনো আসে নি বুঝি আগে।
মোর বিরহবেদনা রাঙালো
কিংশুকরক্তিমরাগে।
সখীগণ। তোমার বৈশাখে ছিল
প্রখর রৌদ্রের জ্বালা,
কখন্ বাদল
আনে আষাঢ়ের পালা,
হায় হায় হায়।
চিত্রাঙ্গদা। কুঞ্জদ্বারে বনমল্লিকা
সেজেছে পরিয়া নব পত্রালিকা,
সারা দিন-রজনী অনিমিখা
কার পথ চেয়ে জাগে।
সখীগণ। কঠিন পাষাণে কেমনে গোপনে ছিল,
সহসা ঝরনা
নামিল অশ্রুঢালা।
হায় হায় হায়।

চিত্রাঙ্গদা। দক্ষিণসমীরে দূর গগনে
একেলা বিরহী গাহে বুঝি গো।
কুঞ্জবনে মোর মুকুল যত
আবরণবন্ধন ছিঁড়িতে চাহে।

সখীগণ। মৃগয়া করিতে
বাহির হল যে বনে
মৃগী হয়ে শেষে
এল কি অবলা বালা।
হায় হায় হায়।

চিত্রাঙ্গদা। আমি এ প্রাণের রুদ্ধ দ্বারে
ব্যাকুল কর হানি বারে বারে,
দেওয়া হল না যে আপনারে
এই ব্যথা মনে লাগে ॥

সখীগণ। যে ছিল আপন
শক্তির অভিমানে
কার পায়ে আনে
হার মানিবার ডালা।
হায় হায় হায় ॥

একজন সখী। ব্রহ্মচর্য!
পুরুষের স্পর্ধা এ যে!
নারীর এ পরাভবে
লজ্জা পাবে বিশ্বের রমণী।
পঞ্চশর, তোমারি এ পরাজয়।
জাগো হে অতনু,
সখীরে বিজয়দূতী করো তব,
নিরস্ত্র নারীর অস্ত্র দাও তারে,
দাও তারে অবলার বল।

মদনকে চিত্রাঙ্গদার পূজানিবেদন

চিত্রাঙ্গদা। আমার এই রিক্ত ডালি
দিব তোমারি পায়ে।
দিব কাঙালিনীর আঁচল
তোমার পথে পথে বিছায়ে।
যে পুষ্পে গাঁথ পুষ্পধনু
তারি ফুলে ফুলে হে অতনু,
আমার পূজা-নিবেদনের দৈন্য
দিয়ো ঘুচায়ে।
তোমার রণজয়ের অভিযানে
আমায় নিয়ো,
ফুলবাণের টিকা আমার ভালে
এঁকে দিয়ো!
আমার শূন্যতা দাও যদি
সুধায় ভরি
দিব তোমার জয়ধ্বনি
ঘোষণ করি;
ফাল্গুনের আহ্বান জাগাও
আমার কায়ে
দক্ষিণবায়ে॥

মদনের প্রবেশ

মদন। মণিপুরনৃপদুহিতা
তোমারে চিনি,
তাপসিনী।
মোর পূজায় তব ছিল না মন,
তবে কেন অকারণ
মোর দ্বারে এলে তরুণী,
কহো কহো শুনি॥

চিত্রাঙ্গদা। পুরুষের বিদ্যা করেছিনু শিক্ষা
লভি নাই মনোহরণের দীক্ষা-

কুসুমধনু,
অপমানে লাঞ্ছিত তরুণ তনু।
অর্জুন ব্রহ্মচারী
মোর মুখে হেরিল না নারী,
ফিরাইল, গেল ফিরে।
দয়া করো অভাগীরে—
শুধু এক বরষের জন্যে
পুষ্পলাবণ্যে
মোর দেহ পাক্‌ তব স্বর্গের মূল্য
মর্তে অতুল্য॥

মদন। তাই আমি দিনু বর,
কটাক্ষে রবে তব পঞ্চম শর,
মম পঞ্চম শর—
দিবে মন মোহি,
নারীবিদ্রোহী সন্ন্যাসীরে
পাবে অচিরে,
বন্দী করিবে ভুজপাশে
বিদ্রূপহাসে।
মণিপুররাজকন্যা
কান্তহৃদয়-বিজয়ে হবে ধন্যা।

৩

নূতনরূপপ্রাপ্ত চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা। এ কী দেখি!
এ কে এল মোর দেহে
পূর্ব-ইতিহাসহারা!
আমি কোন্‌ গত জনমের স্বপ্ন;
বিশ্বের অপরিচিত আমি

আমি নহি রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা,
আমি শুধু এক রাত্রে ফোটা
অরণ্যের পিতৃমাতৃহীন ফুল,
এক প্রভাতের শুধু পরমায়ু,
তার পরে ধূলিশয্যা,
তার পরে ধরণীর চির-অবহেলা।

সরোবরতীরে

আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি।
আনন্দে বিষাদে মন উদাসী।
পুষ্পবিকাশের সুরে
দেহ মন উঠে পূরে,
কী মাধুরী সুগন্ধ
বাতাসে যায় ভাসি।
সহসা মনে জাগে আশা,
মোর আহুতি পেয়েছে অগ্নির ভাষা।
আজ মম রূপে বেশে
লিপি লিখি কার উদ্দেশে,
এল মর্মের বন্দিনী বাণী বন্ধন নাশি॥

মীনকেতু,
কোন্ মহা রাক্ষসীরে দিয়েছ বাঁধিয়া
অঙ্গসহচরী করি।
এ মায়ালাবণ্য মোর কী অভিসম্পাত!
ক্ষণিক যৌবনবন্যা
রক্তস্রোতে তরঙ্গিয়া
উন্মাদ করেছে মোরে।

নূতন কান্তির উত্তেজনায় নৃত্য

স্বপ্নমদির নেশায় মেশা এ উন্মত্ততা,
জাগায় দেহে মনে এ কী বিপুল ব্যথা।

বহে মম শিরে শিরে
এ কী দাহ, কী প্রবাহ—
চকিতে সর্বদেহে ছুটে তড়িৎলতা।
ঝড়ের পবনগর্জে হারাই আপনায়,
দুরন্ত যৌবনক্ষুব্ধ অশান্ত বন্যায়।
তরঙ্গ উঠে প্রাণে
দিগন্তে কাহার পানে,
ইঙ্গিতের ভাষায় কাঁদে—
নাহি নাহি কথা॥

[প্রস্থান

এরে ক্ষমা কোরো সখা,
এ যে এল তব আঁখি ভুলাতে,
শুধু ক্ষণকালতরে মোহ-দোলায় দুলাতে,
আঁখি ভুলাতে।
মায়াপুরী হতে এল নাবি,
নিয়ে এল স্বপ্নের চাবি,
তব কঠিন হৃদয়-দুয়ার খুলাতে,
আঁখি ভুলাতে॥

অর্জুনের প্রবেশ

অর্জুন। কাহারে হেরিলাম!
সে কি সত্য, সে কি মায়া,
সে কি কায়া,
সে কি সুবর্ণকিরণে-রঞ্জিত ছায়া!

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ

এসো এসো যে হও সে হও,
বলো বলো তুমি স্বপন নও।
অনিন্দ্যসুন্দর দেহলতা
বহে সকল আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা॥

চিত্রাঙ্গদা। তুমি অতিথি, অতিথি আমার।
বলো কোন্ নামে করি সংকার।

অর্জুন। পাণ্ডব আমি অর্জুন গাণ্ডীবধন্বা,
নৃপতিকন্যা।
লহো মোর খ্যাতি,
লহো মোর কীর্তি,
লহো পৌরুষ-গর্ব।
লহো আমার সর্ব॥

চিত্রাঙ্গদা। কোন্ ছলনা এ যে নিয়েছে আকার,
এর কাছে মানিবে কি হার।
ধিক্ ধিক্ ধিক্।
বীর তুমি বিশ্বজয়ী,
নারী এ যে মায়াময়ী,
পিঞ্জর রচিবে কি
এ মরীচিকার।
ধিক্ ধিক্ ধিক্।
লজ্জা, লজ্জা, হায় এ কী লজ্জা,
মিথ্যা রূপ মোর, মিথ্যা সজ্জা।
এ যে মিছে স্বপ্নের স্বর্গ,
এ যে শুধু ক্ষণিকের অর্ঘ্য,
এই কি তোমার উপহার।
ধিক্ ধিক্ ধিক্!

অর্জুন। হে সুন্দরী, উন্মথিত যৌবন আমার
সন্ন্যাসীর ব্রতবন্ধ দিল ছিন্ন করি।
পৌরুষের সে অধৈর্য
তাহারে গৌরব মানি আমি।
আমি তো আচারভীরু নারী নহি,
শাস্ত্রবাক্যে বাঁধা।
এসো সখা, দুঃসাহসী প্রেম
বহন করুক আমাদের
অজানার পথে।

চিত্রাঙ্গদা। তবে তাই হোক।
কিন্তু মনে রেখো,
কিংশুকদলের প্রান্তে এই যে দুলিছে
একটু শিশির— তুমি যারে করিছ কামনা
সে এমনি শিশিরের কণা
নিমিষের সোহাগিনী।

—

কোন্ দেবতা সে, কী পরিহাসে
ভাসালো মায়ার ভেলায়।
স্বপ্নের সাথি এসো মোরা মাতি
স্বর্গের কৌতুক-খেলায়।
সুরের প্রবাহে হাসির তরঙ্গে
বাতাসে বাতাসে ভেসে যাব রঙ্গে,
নৃত্যবিভঙ্গে,
মাধবীবনের মধুগন্ধে
মোদিত মোহিত মন্থর বেলায়।
যে ফুলমালা দুলায়েছ আজি
রোমাঞ্চিত বক্ষতলে,
মধুরজনীতে রেখো সরসিয়া
মোহের মদির জলে।
নবোদিত সূর্যের করসম্পাতে
বিকল হবে হায় লজ্জা-আঘাতে,
দিন গত হলে নূতন প্রভাতে
মিলাবে ধুলার তলে
কার অবহেলায়।

অর্জুন। আজ মোরে
সপ্তলোক স্বপ্ন মনে হয়।
শুধু একা পূর্ণ তুমি,
সর্ব তুমি,

বিশ্ববিধাতার গর্ব তুমি,
অক্ষয় ঐশ্বর্য তুমি,
এক নারী সকল দৈন্যের তুমি
মহা অবসান,
সব সাধনার তুমি
শেষ পরিণাম।

চিত্রাঙ্গদা। সে আমি যে আমি নই, আমি নই--
হায়, পার্থ, হায়,
সে যে কোন্ দেবের ছলনা।
যাও যাও ফিরে যাও, ফিরে যাও, বীর।
শৌর্য বীর্য মহত্ত্ব তোমার
দিয়ো না মিথ্যার পায়ে—
যাও যাও ফিরে যাও।

[প্রস্থান

অর্জুন। এ কী তৃষ্ণা, এ কী দাহ!
এ যে অগ্নিলতা, পাকে পাকে
ঘেরিয়াছে তৃষ্ণার্ত কম্পিত প্রাণ।
উত্তপ্ত হৃদয়
ছুটিয়া আসিতে চাহে
সর্বাঙ্গ টুটিয়া।

—

অশান্তি আজ হানল এ কী দহনজ্বালা।
বিঁধল হৃদয় নিদয় বাণে
বেদন-ঢালা।
বক্ষে জ্বালায় অগ্নিশিখা,
চক্ষে কাঁপায় মরীচিকা,
মরণ-সুতোয় গাঁথল কে মোর
বরণমালা।

চেনা ভুবন হারিয়ে গেল
স্বপন-ছায়াতে,
ফাগুন-দিনের পলাশরঙের
রঙিন মায়াতে।
যাত্রা আমার নিরুদ্দেশা,
পথ-হারানোর লাগল নেশা,
অচিন দেশে এবার আমার
যাবার পালা॥

৪

মদন ও চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা। ভস্মে ঢাকে ক্লান্ত হুতাশন ;
এ খেলা খেলাবে, হে ভগবন,
আর কতখন।
শেষ যাহা হবেই হবে, তারে
সহজে হতে দাও শেষ।
সুন্দর যাক রেখে স্বপ্নের রেশ।
জীর্ণ কোরো না, কোরো না,
যা ছিল নূতন।

মদন। না না না সখী, ভয় নেই, ভয় নেই—
ফুল যবে সাঙ্গ করে খেলা
ফল ধরে সেই।
হর্ষ-অচেতন বর্ষ
রেখে যাক মন্ত্রস্পর্শ
নবতর ছন্দস্পন্দন॥

[প্রস্থান

অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদা

কেটেছে একেলা বিরহের বেলা
আকাশকুসুম-চয়নে।
সব পথ এসে মিলে গেল শেষে
তোমার দুখানি নয়নে।
দেখিতে দেখিতে নূতন আলোকে
কি দিল রচিয়া ধ্যানের পুলকে
নূতন ভুবন নূতন দ্যুলোকে
মোদের মিলিত নয়নে।
বাহির-আকাশে মেঘ ঘিরে আসে,
এল সব তারা ঢাকিতে।
হারানো সে আলো আসন বিছালো
শুধু দুজনের আঁখিতে।
ভাষাহারা মম বিজন রোদনা
প্রকাশের লাগি করেছে সাধনা,
চিরজীবনেরি বাণীর বেদনা
মিটিল দোঁহার নয়নে ॥

[প্রস্থান

অর্জুনের প্রবেশ

অর্জুন। কেন রে ক্লান্তি আসে আবেশভার বহিয়া।
দেহ মন প্রাণ দিবানিশি জীর্ণ অবসাদে।
ছিন্ন করো এখনি বীর্যবিলোপী এ কুহেলিকা;
এই কর্মহারা কারাগারে রয়েছ কোন্ পরমাদে।

গ্রামবাসীগণের প্রবেশ

গ্রামবাসীগণ। হো এল এল এল রে দস্যুর দল,
গর্জিয়া নামে যেন বন্যার জল।
চল্ তোরা পঞ্চগ্রামী,
চল্ তোরা কলিঙ্গধামী,

মল্লপল্লী হতে চল্,
'জয় চিত্রাঙ্গদা' বল্,
বল্ বল্ ভাই রে—
ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই, নাই রে।

অর্জুন। জনপদবাসী, শোনো শোনো,
রক্ষক তোমাদের নাই কোনো?

গ্রামবাসী। তীর্থে গেছেন কোথা তিনি
গোপনব্রতধারিণী,
চিত্রাঙ্গদা তিনি রাজকুমারী।

অর্জুন। নারী! তিনি নারী!

গ্রামবাসীগণ। স্নেহবলে তিনি মাতা,
বাহুবলে তিনি রাজা।
তাঁর নামে ভেরী বাজা,
'জয় জয় জয়' বলো ভাই রে-
ভয় নাই, ভয় নাই, নাই রে॥

সন্ত্রাসের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান।
সংকটের কল্পনাতে হোয়ো না ম্রিয়মাণ।
মুক্ত করো ভয়,
আপনা-মাঝে শক্তি ধরো, নিজেরে করো জয়।
দুর্বলেরে রক্ষা করো, দুর্জনেরে হানো,
নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না জানো।
মুক্ত করো ভয়,
নিজের 'পরে করিতে ভর না রেখো সংশয়।
ধর্ম যবে শঙ্খরবে করিবে আহ্বান
নীরব হয়ে নম্র হয়ে পণ করিয়ো প্রাণ।
মুক্ত করো ভয়,
দুরূহ কাজে নিজেরি দিয়ো কঠিন পরিচয়।

[প্রস্থান

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ

চিত্রাঙ্গদা। কী ভাবিছ নাথ, কী ভাবিছ !

অর্জুন। চিত্রাঙ্গদা রাজকুমারী
কেমন না জানি
আমি তাই ভাবি মনে মনে।
শুনি স্নেহে সে নারী
বীর্যে সে পুরুষ,
শুনি সিংহাসনা যেন সে
সিংহবাহিনী।
জান যদি বলো প্রিয়ে,
বলো তার কথা॥

চিত্রাঙ্গদা। ছি ছি, কুৎসিৎ কুরূপ সে।
হেন বঙ্কিম ভুরুযুগ নাহি তার,
হেন উজ্জ্বল কজ্জল-আঁখিতারা।
সন্ধিতে পারে লক্ষ্য
কীণাঙ্কিত তার বাহু,
বিঁধিতে পারে না বীরবক্ষ
কুটিল কটাক্ষশরে।
নাহি লজ্জা, নাহি শঙ্কা,
নাহি নিষ্ঠুর সুন্দর রঙ্গ,
নাহি নীরব ভঙ্গীর সংগীতলীলা
ইঙ্গিতছন্দমধুর॥

অর্জুন। আগ্রহ মোর অধীর অতি—
কোথা সে রমণী বীর্যবতী।
কোষবিমুক্ত কৃপাণলতা—
দারুণ সে, সুন্দর সে
উদ্যত বজ্রের রুদ্ররসে,
নহে সে ভোগীর লোচনলোভা,
ক্ষত্রিয়বাহুর ভীষণ শোভা॥

সখীগণ। নারীর ললিত লোভন লীলায়
এখনি কেন এ ক্লান্তি।
এখনি কি সখা, খেলা হল অবসান।
যে মধুর রসে ছিলে বিহ্বল
সে কি মধুমাখা ভ্রান্তি,
সে কি স্বপ্নের দান,
সে কি সত্যের অপমান।
দূর দুরাশায় হৃদয় ভরিছ,
কঠিন প্রেমের প্রতিমা গড়িছ,
কী মনে ভাবিয়া নারীতে করিছ
পৌরুষসন্ধান।
এও কি মায়ার দান।
সহসা মন্ত্রবলে
নমনীয় এই কমনীয়তারে
যদি আমাদের সখী একেবারে
পরের বসন-সমান ছিন্ন
করি ফেলে ধূলিতলে,
সবে না সবে না সে নৈরাশ্য—
ভাগ্যের সেই অট্টহাস্য
জানি জানি সখা, ক্ষুব্ধ করিবে
লুব্ধ পুরুষপ্রাণ,
হানিবে নিঠুর বাণ॥

অর্জুন। যদি মিলে দেখা
তবে তারি সাথে
ছুটে যাব আমি
আর্তত্রাণে।
ভোগের আবেশ হতে
ঝাঁপ দিব যুদ্ধস্রোতে।
আজি মোর চঞ্চল রক্তের মাঝে
ঝননন ঝননন ঝঞ্ঝনা বাজে

চিত্রাঙ্গদা রাজকুমারী
একাধারে মিলিত পুরুষ নারী ॥

চিত্রাঙ্গদা। ভাগ্যবতী সে যে,
এত দিনে তার আহ্বান
এল তব বীরের প্রাণে।
আজ অমাবস্যার রাতি
হোক অবসান।
কাল শুভ শুভ্র প্রাতে
দর্শন মিলিবে তার,
মিথ্যায় আবৃত নারী
ঘুচাবে মায়া-অবগুণ্ঠন ॥

অর্জুনের প্রতি

সখী। রমণীর মন ভোলাবার ছলাকলা
দূর ক'রে দিয়ে উঠিয়া দাঁড়াক নারী,
সরল উন্নত বীর্যবন্ত অন্তরের বলে
পর্বতের তেজস্বী তরুণ তরু-সম,
যেন সে সম্মান পায় পুরুষের।
রজনীর নর্মসহচরী,
যেন হয় পুরুষের কর্মসহচরী,
যেন বামহস্তসম
দক্ষিণহস্তের থাকে সহকারী।
তাহে যেন পুরুষের তৃপ্তি হয়, বীরোত্তম।

৫

চিত্রাঙ্গদা ও মদন

চিত্রাঙ্গদা। লহো লহো ফিরে লহো
তোমার এই বর,
হে অনঙ্গদেব।
মুক্তি দেহো মোরে, ঘুচায়ে দাও

এই মিথ্যার জাল,
হে অনঙ্গদেব।
চুরির ধন আমার দিব ফিরায়ে
তোমার পায়ে
আমার অঙ্গশোভা;
অধররক্ত-রাঙিমা যাক মিলায়ে
অশোকবনে, হে অনঙ্গদেব।
যাক যাক যাক এ ছলনা,
যাক এ স্বপন, হে অনঙ্গদেব॥

মদন। তাই হোক তবে তাই হোক,
কেটে যাক রঙিন কুয়াশা,
দেখা দিক শুভ্র আলোক।
মায়া ছেড়ে দিক পথ,
প্রেমের আসুক জয়রথ,
রূপের অতীত রূপ
দেখে যেন প্রেমিকের চোখ—
দৃষ্টি হতে খসে যাক, খসে যাক
মোহনির্মোক॥

[প্রস্থান

বিনা সাজে সাজি দেখা দিবে তুমি কবে,
আভরণে আজি আবরণ কেন রবে।
ভালোবাসা যদি মেশে মায়াময় মোহে
আলোতে আঁধারে দোঁহারে হারাব দোঁহে,
ধেয়ে আসে হিয়া তোমার সহজ রবে—
আভরণ দিয়া আবরণ কেন তবে।
ভাবের রসেতে যাহার নয়ন ডোবা
ভূষণে তাহারে দেখাও কিসের শোভা।
কাছে এসে তবু কেন রয়ে গেলে দূরে।
বাহির-বাঁধনে বাঁধিবে কি বন্ধুরে।
নিজের ধনে কি নিজে চুরি করে লবে—
আভরণে আজি আবরণ কেন তবে॥

৬

চিত্রাঙ্গদার সহচর-সহচরীগণ

অর্জুনের প্রতি

এসো এসো পুরুষোত্তম,
এসো এসো বীর মম।
তোমার পথ চেয়ে
আছে প্রদীপ জ্বালা।
আজি পরিবে বীরাঙ্গনার হাতে
দৃপ্ত ললাটে, সখা,
বীরের বরণমালা।
ছিন্ন ক'রে দিবে সে তার
শক্তির অভিমান,
তোমার চরণে করিবে দান
আত্মনিবেদনের ডালা,
চরণে করিবে দান।
আজ পরাবে বীরাঙ্গনা তোমার
দৃপ্ত ললাটে সখা,
বীরের বরণমালা।

সখী। হে কৌন্তেয়,
ভালো লেগেছিল ব'লে
তব করযুগে সখী দিয়েছিল ভরি
সৌন্দর্যের ডালি,
নন্দনকানন হতে পুষ্প তুলে এনে
বহু সাধনায়।
যদি সাঙ্গ হল পূজা,
তবে আজ্ঞা করো প্রভু,
নির্মাল্যের সাজি
থাক্ পড়ে মন্দির-বাহিরে।
এইবার প্রসন্ন নয়নে চাও
সেবিকার পানে

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ

চিত্রাঙ্গদা। আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী।
নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী।
পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে
সে নহি নহি,
হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে
সে নহি নহি।
যদি পার্শ্বে রাখ মোরে
সংকটে সম্পদে,
সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে
সহায় হতে
পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।
আজ শুধু করি নিবেদন—
আমি চিত্রাঙ্গদা রাজেন্দ্রনন্দিনী॥

অর্জুন। ধন্য ধন্য ধন্য আমি।

সমবেত নৃত্য

তৃষ্ণার শান্তি সুন্দরকান্তি
তুমি এসো বিরহের সন্তাপ-ভঞ্জন।
দোলা দাও বক্ষে,
এঁকে দাও চক্ষে
স্বপনের তুলি দিয়ে মাধুরীর অঞ্জন।
এনে দাও চিত্তে
রক্তের নৃত্যে
বকুলনিকুঞ্জের মধুকরগুঞ্জন।
উদ্‌বেল উতরোল
যমুনার কল্লোল,
কম্পিত বেণুবনে মলয়ের চুম্বন

আনো নব পল্লবে
নর্তন উল্লোল,
অশোকের শাখা ঘেরি' বল্লরীবন্ধন ॥

—

এসো এসো বসন্ত, ধরাতলে—
আনো মুহু মুহু নব তান,
আনো নব প্রাণ,
নব গান,
আনো গন্ধমদভরে অলস সমীরণ,
আনো বিশ্বের অন্তরে অন্তরে
নিবিড় চেতনা।
আনো নব উল্লাসহিল্লোল,
আনো আনো আনন্দছন্দের হিন্দোলা
ধরাতলে।
ভাঙো ভাঙো বন্ধনশৃঙ্খল,
আনো আনো উদ্দীপ্ত প্রাণের বেদনা
ধরাতলে।
এসো থরথর-কম্পিত
মর্মরমুখরিত
মধু সৌরভপুলকিত
ফুল-আকুল মালতীবল্লীবিতানে
সুখছায়ে মধুবায়ে।
এসো বিকশিত উন্মুখ,
এসো চিরউৎসুক,
নন্দনপথ-চিরযাত্রী।
আনো বাঁশরিমন্দ্রিত মিলনের রাত্রি,
পরিপূর্ণ সুধাপাত্র
নিয়ে এসো।
এসো অরুণচরণ কমলবরন
তরুণ উষার কোলে।

এসো জ্যোৎস্নাবিবশ নিশীথে,
এসো নীরব কুঞ্জকুটীরে,
সুখসুপ্ত সরসানীরে।
এসো তড়িৎশিখাসম ঝঞ্ঝাবিভঙ্গে,
সিন্ধুতরঙ্গদোলে।
এসো জাগরমুখর প্রভাতে,
এসো নগরে প্রান্তরে বনে,
এসো কর্মে বচনে মনে।
এসো মঞ্জীরগুঞ্জর চরণে,
এসো গীতমুখর কলকণ্ঠে।
এসো মঞ্জুল মল্লিকামাল্যে,
এসো কোমল কিশলয়বসনে।
এসো সুন্দর, যৌবনবেগে।
এসো দৃপ্ত বীর, নব তেজে।
ওহে দুর্মদ, করো জয়যাত্রা
জরাপরাভব-সমরে—
পবনে কেশররেণু ছড়ায়ে,
চঞ্চল কুন্তল উড়ায়ে

অর্জুন। মা মিং কিল ত্বং বনাঃ শাখাং মধুমতীমিং।
যথা সুপর্ণঃ প্রপতন্ পক্ষৌ নিহন্তি ভূম্যাম্
এবা নিহন্মি তে মনঃ।
চিত্রাঙ্গদা। যথেমে দ্যাবা পৃথিবী সদ্যঃ পর্যেতি সূর্যঃ
এবা পর্যেমি তে মনঃ।
উভয়ে। অক্ষৌ নৌ মধুসংকাশে অনীকং নৌ সমঞ্জনম্।
অন্তঃ কৃণুষ্ব মাং হৃদি মন ইন্নৌ সহাসতি॥

শান্তিনিকেতন
৮ ফাল্গুন, ১৩৪২

মন্ত্রের অনুবাদ

ফুল্ল শাখা যেমন মধুমতী
মধুরা হও তেমনি মোর প্রতি।
বিহঙ্গ যথা উড়িবার মুখে
পাখায় ভূমিরে হানে
তেমনি আমার অন্তরবেগ
লাগুক তোমার প্রাণে।

—

আকাশধরা রবিরে ঘিরি
যেমন করি ফেরে,
আমার মন ঘিরিবে ফিরি
তোমার হৃদয়েরে।

—

আমাদের আঁখি হোক্ মধুসিক্ত,
অপাঙ্গ হয় যেন প্রেমে লিপ্ত।
হৃদয়ের ব্যবধান হোক্ মুক্ত,
আমাদের মন হোক্ যোগযুক্ত।

নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা

চণ্ডালিকা

প্রথম দৃশ্য

একদল ফুলওয়ালি চলেছে ফুল বিক্রি করতে

ফুলওয়ালির দল। নব বসন্তের দানের ডালি এনেছি তোদেরি দ্বারে,
আয় আয় আয়,
পরিবি গলার হারে।
লতার বাঁধন হারায়ে মাধবী মরিছে কেঁদে—
বেণীর বাঁধনে রাখিবি বেঁধে,
অলকদোলায় দুলাবি তারে,
আয় আয় আয়।
বনমাধুরী করিবি চুরি
আপন নবীন মাধুরীতে—
সোহিনী রাগিণী জাগাবে সে তোদের
দেহের বীণার তারে তারে,
আয় আয় আয়॥

—

আমার মালার ফুলের দলে আছে লেখা
বসন্তের মন্ত্রলিপি।
এর মাধুর্যে আছে যৌবনের আমন্ত্রণ।
সাহানা রাগিণী এর
রাঙা রঙে রঞ্জিত,
মধুকরের ক্ষুধা অশ্রুত ছন্দে
গন্ধে তার গুঞ্জরে।

আন্ গো ডালা, গাঁথ্ গো মালা,
আন্ মাধবী মালতী অশোকমঞ্জরী,
আয় তোরা আয়।
আন্ করবী রঙ্গন কাঞ্চন রজনীগন্ধা
প্রফুল্ল মল্লিকা,
আয় তোরা আয়।
মালা পর্ গো মালা পর্ সুন্দরী,
ত্বরা কর্ গো ত্বরা কর্।
আজি পূর্ণিমা রাতে জাগিছে চন্দ্রমা,
বকুলকুঞ্জ
দক্ষিণবাতাসে দুলিছে কাঁপিছে
থরথর মৃদু মর্মরি।
নৃত্যপরা বনাঙ্গনা বনাঙ্গনে সঞ্চরে,
চঞ্চলিত চরণ ঘেরি মঞ্জীর তার গুঞ্জরে।
দিস নে মধুরাতি বৃথা বহিয়ে
উদাসিনী, হায় রে।
শুভলগন গেলে চলে ফিরে দেবে না ধরা,
সুধাপসরা
ধুলায় দেবে শূন্য করি,
শুকাবে বঞ্জুলমঞ্জরী।
চন্দ্রকরে অভিষিক্ত নিশীথে ঝিল্লিমুখর বনছায়ে
তন্দ্রাহারা পিক-বিরহকাকলী-কূজিত দক্ষিণবায়ে
মালঞ্চ মোর ভরল ফুলে ফুলে ফুলে গো,
কিংশুকশাখা চঞ্চল হল দুলে দুলে গো॥

প্রকৃতি ফুল চাইতেই তাকে ঘৃণা করে চলে গেল

দইওয়ালার প্রবেশ

দইওয়ালা। দই চাই গো, দই চাই, দই চাই গো?
শ্যামলী আমার গাই,
তুলনা তাহার নাই।

কঙ্কণানদীর ধারে
ভোরবেলা নিয়ে যাই তারে—
দূর্বাদলঘন মাঠে তারে
সারা বেলা চরাই, চরাই গো।
দেহখানি তার চিক্কণ কালো,
যত দেখি তত লাগে ভালো।
কাছে বসে যাই ব'কে,
উত্তর দেয় সে চোখে,
পিঠে মোর রাখে মাথা—
গায়ে তার হাত বুলাই, হাত বুলাই গো॥

চণ্ডালকন্যা প্রকৃতি দই কিনতে চাইল
একজন মেয়ে সাবধান করে দিল

মেয়ে। ওকে ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, ছি,
ও যে চণ্ডালিনীর ঝি—
নষ্ট হবে যে দই
সে কথা জানো না কি।

[দইওয়ালার প্রস্থান

চুড়িওয়ালার প্রবেশ

চুড়িওয়ালা। ওগো তোমরা যত পাড়ার মেয়ে,
এসো এসো দেখো চেয়ে,
এনেছি কাঁকনজোড়া
সোনালি তারে মোড়া।
আমার কথা শোনো,
হাতে লহ প'রে,
যারে রাখিতে চাহ ধ'রে
কাঁকন দুটি বেড়ি হয়ে
বাঁধিবে মন তাহার—
আমি দিলাম কয়ে॥

প্রকৃতি চুড়ি নিতে হাত বাড়াতেই

মেয়েরা। ওকে ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, ছি,
ও যে চণ্ডালিনীর ঝি।

[চুড়িওয়ালা প্রভৃতির প্রস্থান

প্রকৃতি। যে আমারে পাঠাল এই
অপমানের অন্ধকারে
পূজিব না, পূজিব না সেই দেবতারে পূজিব না।
কেন দিব ফুল, কেন দিব ফুল,
কেন দিব ফুল আমি তারে—
যে আমারে চিরজীবন
রেখে দিল এই ধিক্‌কারে।
জানি না হায় রে কী দুরাশায় রে
পূজাদীপ জ্বালি মন্দিরদ্বারে।
আলো তার নিল হরিয়া
দেবতা ছলনা করিয়া,
আঁধারে রাখিল আমারে॥

পথ বেয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ

ভিক্ষুগণ। যো সন্নিসিন্নো
বরবোধিমূলে,
মারং সসেনং মহতিং বিজেত্বা
সম্বোধি মাগঞ্চি অনন্তঞাণে
লোকুত্তমো তং পণমামি বুদ্ধ।

[প্রস্থান

প্রকৃতির মা মায়ার প্রবেশ

মা। কী যে ভাবিস তুই অন্যমনে
নিষ্কারণে—
বেলা বহে যায়, বেলা বহে যায় যে।

রাজবাড়িতে ঐ বাজে ঘণ্টা ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং,
বেলা বহে যায়।
রৌদ্র হয়েছে অতি তিখনো
আঙিনা হয় নি যে নিকোনো,
তোলা হল না জল,
পাড়া হল না ফল,
কখন্ বা চুলো তুই ধরাবি।
কখন্ ছাগল তুই চরাবি।
ত্বরা কর্, ত্বরা কর্, ত্বরা কর্—
জল তুলে নিয়ে তুই চল্ ঘর।
রাজবাড়িতে ঐ বাজে ঘণ্টা
ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং,
ঐ যে বেলা বহে যায়।

প্রকৃতি। কাজ নেই, কাজ নেই মা,
কাজ নেই মোর ঘরকন্নায়।
যাক ভেসে যাক
যাক ভেসে সব বন্যায়।
জন্ম কেন দিলি মোরে,
লাঞ্ছনা জীবন ভ'রে—
মা হয়ে আনিলি এই অভিশাপ!
কার কাছে বল্ করেছি কোন্ পাপ,
বিনা অপরাধে এ কী ঘোর অন্যায়॥

মা। থাক্ তবে থাক্ তুই পড়ে,
মিথ্যা কান্না কাঁদ্ তুই
মিথ্যা দুঃখ গ'ড়ে॥

[প্রস্থান

প্রকৃতির জল তোলা

বুদ্ধশিষ্য আনন্দের প্রবেশ

আনন্দ। জল দাও আমায় জল দাও,
রৌদ্র প্রখরতর, পথ সুদীর্ঘ,
আমায় জল দাও।
আমি তাপিত পিপাসিত,
আমায় জল দাও।
আমি শ্রান্ত,
আমায় জল দাও।

প্রকৃতি। ক্ষমা করো প্রভু, ক্ষমা করো মোরে—
আমি চণ্ডালের কন্যা,
মোর কূপের বারি অশুচি।
তোমারে দেব জল হেন পুণ্যের আমি
নহি অধিকারিণী,
আমি চণ্ডালের কন্যা।

আনন্দ। যে মানব আমি সেই মানব তুমি কন্যা।
সেই বারি তীর্থবারি
যাহা তৃপ্ত করে তৃষিতেরে,
যাহা তাপিত শ্রান্তেরে স্নিগ্ধ করে
সেই তো পবিত্র বারি।
জল দাও আমায় জল দাও।

জল দান

কল্যাণ হোক তব, কল্যাণী ॥

[প্রস্থান

প্রকৃতি। শুধু একটি গণ্ডূষ জল,
আহা নিলেন তাঁহার করপুটের কমলকলিকায়।
আমার কূপ যে হল অকূল সমুদ্র—
এই যে নাচে এই যে নাচে তরঙ্গ তাহার,
আমার জীবন জুড়ে নাচে—

টলোমলো করে আমার প্রাণ,
আমার জীবন জুড়ে নাচে।
ওগো কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী পরম মুক্তি!
একটি গণ্ডূষ জল—
আমার জন্মজন্মান্তরের কালি ধুয়ে দিল গো
শুধু একটি গণ্ডূষ জল॥

মেয়ে পুরুষের প্রবেশ

ফসল কাটার আহ্বান

মাটি তোদের ডাক দিয়েছে আয় রে চলে,
আয় আয় আয়।
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে—
মরি হায় হায় হায়।
হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে,
দিগ্‌বধূরা ফসলখেতে,
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে ধরার আঁচলে—
মরি হায় হায় হায়।
মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুশি হল।
ঘরেতে আজ কে রবে গো, খোলো দুয়ার খোলো।
আলোর হাসি উঠল জেগে,
পাতায় পাতায় চমক লেগে
বনের খুশি ধরে না গো, ঐ যে উথলে—
মরি হায় হায় হায়॥

প্রকৃতি। ওগো ডেকো না মোরে ডেকো না।
আমার কাজভোলা মন, আছে দূরে কোন্—
করে স্বপনের সাধনা।
ধরা দেবে না অধরা ছায়া,
রচি গেছে মনে মোহিনী মায়া—
জানি না এ কী দেবতারি দয়া,
জানি না এ কী ছলনা।

আঁধার অঙ্গনে প্রদীপ জ্বালি নি,
দগ্ধ কাননের আমি যে মালিনী,
শূন্য হাতে আমি কাঙালিনী
করি নিশিদিন যাপনা।
যদি সে আসে তার চরণছায়ে
বেদনা আমার দিব বিছায়ে,
জানাব তাহারে অশ্রুসিক্ত
রিক্ত জীবনের কামনা॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

অর্ঘ্য নিয়ে বৌদ্ধনারীদের মন্দিরে গমন

স্বর্ণবর্ণে সমুজ্জ্বল নব চম্পাদলে
বন্দিব শ্রীমুনীন্দ্রের পাদপদ্মতলে।
পুণ্যগন্ধে পূর্ণ বায়ু হল সুগন্ধিত,
পুষ্পমাল্যে করি তাঁর চরণ বন্দিত॥

[প্রস্থান

প্রকৃতি। ফুল বলে, ধন্য আমি
ধন্য আমি মাটির 'পরে।
দেবতা ওগো, তোমার সেবা
আমার ঘরে।
জন্ম নিয়েছি ধূলিতে,
দয়া করে দাও ভুলিতে,
নাই ধূলি মোর অন্তরে।
নয়ন তোমার নত করো,
দলগুলি কাঁপে থরোথরো।

চরণপরশ দিয়ো দিয়ো,
ধূলির ধনকে করো স্বর্গীয়,
ধরার প্রণাম আমি তোমার তরে ॥

মা। তুই অবাক ক'রে দিলি আমায় মেয়ে।
পুরাণে শুনি না কি তপ করেছেন উমা
রোদের জ্বলনে,
তোর কি হল তাই।

প্রকৃতি। হাঁ মা, আমি বসেছি তপের আসনে।

মা। তোর সাধনা কাহার জন্যে।

প্রকৃতি। যে আমারে দিয়েছে ডাক,
বচনহারা আমাকে দিয়েছে বাক্।
যে আমারি জেনেছে নাম,
ওগো তারি নামখানি মোর হৃদয়ে থাক্।
আমি তারি বিচ্ছেদদহনে
তপ করি চিত্তের গহনে।
দুঃখের পাবকে হয়ে যায় শুদ্ধ
অন্তরে মলিন যাহা আছে রুদ্ধ,
অপমান-নাগিনীর খুলে যায় পাক ॥

মা। কিসের ডাক তোর কিসের ডাক।
কোন্ পাতালবাসী অপদেবতার ইশারা
তোকে ভুলিয়ে নিয়ে যাবে,
আমি মন্ত্র প'ড়ে কাটাব তার মায়া।

প্রকৃতি। আমার মনের মধ্যে বাজিয়ে দিয়ে গেছে—
জল দাও, জল দাও।

মা। পোড়া কপাল আমার!
কে বলেছে তোকে 'জল দাও'!
সে কি তোর আপন জাতের কেউ।

প্রকৃতি। হাঁ গো মা, সেই কথাই তো ব'লে গেলেন তিনি,
তিনি আমার আপন জাতের লোক।
আমি চণ্ডালী, সে যে মিথ্যা, সে যে মিথ্যা,

সে যে দারুণ মিথ্যা।
শ্রাবণের কালো যে মেঘ
তারে যদি নাম দাও 'চণ্ডাল',
তা ব'লে কি জাত ঘুচিবে তার,
অশুচি হবে কি তার জল।
তিনি ব'লে গেলেন আমায়,—
নিজেরে নিন্দা কোরো না,
মানবের বংশ তোমার,
মানবের রক্ত তোমার নাড়ীতে।
ছি ছি মা, মিথ্যা নিন্দা রটাস নে নিজের,
সে-যে পাপ।
রাজার বংশে দাসী জন্মায় অসংখ্য,
আমি সে দাসী নই।
দ্বিজের বংশে চণ্ডাল কত আছে,
আমি নই চণ্ডালী।

মা। কী কথা বলিস তুই,
আমি যে তোর ভাষা বুঝি নে।
তোর মুখে কে দিল এমন বাণী।
স্বপ্নে কি কেউ ভর করেছে তোকে
তোর গতজন্মের সাথি।
আমি যে তোর ভাষা বুঝি নে।

প্রকৃতি। এ নতুন জন্ম, নতুন জন্ম,
নতুন জন্ম আমার।
সেদিন বাজল দুপুরের ঘণ্টা,
ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ্দুর,
স্নান করাতেছিলেম কুয়োতলায়
মা-মরা বাছুরটিকে।
সামনে এসে দাঁড়ালেন
বৌদ্ধ ভিক্ষু আমার—
বললেন, জল দাও।

শিউরে উঠল দেহ আমার,
চমকে উঠল প্রাণ।
বল্ দেখি মা,
সারা নগরে কি কোথাও নেই জল!
কেন এলেন আমার কুয়োর ধারে,
আমাকে দিলেন সহসা
মানুষের তৃষ্ণা-মেটানো সম্মান।

বলে, দাও জল, দাও জল।
দেব আমি কে দিয়েছে হেন সম্বল।
কালো মেঘ-পানে চেয়ে
এল ধেয়ে
চাতক বিহ্বল—
বলে, দাও জল।
ভূমিতলে হারা
উৎসের ধারা
অন্ধকারে
কারাগারে।
কার সুগভীর বাণী
দিল হানি
কালো শিলাতল—
বলে, দাও জল॥

মা। বাছা, মন্ত্র করেছে কে তোকে,
তোর পথ-চাওয়া মন টান দিয়েছে কে।

প্রকৃতি। সে যে পথিক আমার,
হৃদয়পথের পথিক আমার।
হায় রে আর সে তো এল না এল না,
এ পথে এল না,
আর সে যে চাইল না জল।

আমার হৃদয় তাই হল মরুভূমি,
শুকিয়ে গেল তার রস—
সে যে চাইল না জল।

—

চক্ষে আমার তৃষ্ণা,
তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে।
আমি বৃষ্টিবিহীন বৈশাখী দিন,
সন্তাপে প্রাণ যায় যে পুড়ে।
ঝড় উঠেছে তপ্ত হাওয়ায় হাওয়ায়,
মনকে সুদূর শূন্যে ধাওয়ায়—
অবগুণ্ঠন যায় যে উড়ে।
যে ফুল কানন করত আলো,
কালো হয়ে সে শুকালো।
ঝরনারে কে দিল বাধা—
নিষ্ঠুর পাষাণে বাঁধা
দুঃখের শিখরচূড়ে॥

মা। বাছা, সহজ ক'রে বল আমাকে
মন কাকে তোর চায়।
বেছে নিস মনের মতন বর—
রয়েছে তো অনেক আপন জন।
আকাশের চাঁদের পানে
হাত বাড়াস নে।

প্রকৃতি। আমি চাই তাঁরে
আমারে দিলেন যিনি সেবিকার সম্মান,
ঝরে-পড়া ধুতরো ফুল
ধুলো হতে তুলে নিলেন যিনি দক্ষিণ করে।
ওগো প্রভু, ওগো প্রভু,
সেই ফুলে মালা গাঁথো,
পরো পরো আপন গলায়,
ব্যর্থ হতে তারে দিয়ো না দিয়ো না।

রাজবাড়ির অনুচরের প্রবেশ

অনুচর। সাত দেশেতে খুঁজে খুঁজে গো
শেষকালে এই ঠাঁই
ভাগ্যে দেখা পেলেম রক্ষা তাই।
মা। কেন গো কী চাই।
অনুচর। রানীমার পোষা পাখি কোথায় উড়ে গেছে—
সেই নিদারুণ শোকে
ঘুম নেই তাঁর চোখে,
ও চারণের বউ।
ফিরিয়ে এনে দিতেই হবে তোকে,
ও চারণের বউ।
মা। উড়োপাখি আসবে ফিরে
এমন কী গুণ জানি।
অনুচর। মিথ্যে ওজর শুনব না, শুনব না,
শুনবে না তোর রানী।
যাদু ক'রে মন্ত্র প'ড়ে ফিরে আনতেই হবে
খালাস পাবি তবে,
ও চারণের বউ।

[প্রস্থান

প্রকৃতি। ওগো মা, ঐ কথাই তো ভালো।
মন্ত্র জানিস তুই,
মন্ত্র প'ড়ে
দে তাঁকে তুই এনে।
মা। ওরে সর্বনাশী, কী কথা তুই বলিস—
আগুন নিয়ে খেলা!
শুনে বুক কেঁপে ওঠে,
ভয়ে মরি।
প্রকৃতি। আমি ভয় করি নে মা,
ভয় করি নে।
ভয় করি মা, পাছে

সাহস যায় নেমে,
পাছে নিজের আমি মূল্য ভুলি।
এত বড়ো স্পর্ধা আমার,
এ কী আশ্চর্য!
এই আশ্চর্য সে'ই ঘটিয়েছে—
তারো বেশি ঘটবে না কি,
আসবে না আমার পাশে,
বসবে না আধো-আঁচলে?

মা। তাঁকে আনতে যদি পারি
মূল্য দিতে পারবি কি তুই তার।
জীবনে কিছুই যে তোর
থাকবে না বাকি।

প্রকৃতি। না, কিছুই থাকবে না, কিছুই থাকবে না,
কিছুই না, কিছুই না।
যদি আমার সব মিটে যায়
সব মিটে যায়,
তবেই আমি বেঁচে যাব যে
চিরদিনের তরে
যখন কিছুই থাকবে না।
দেবার আমার আছে কিছু
এই কথাটাই যে
ভুলিয়ে রেখেছিল সবাই মিলে—
আজ জেনেছি, আমি নই-যে অভাগিনী;
দেবই আমি, দেবই আমি, দেব,
উজাড় করে দেব আমারে।
কোনো ভয় আর নেই আমার।
পড়্‌ তোর মন্তর, পড়্‌ তোর মন্তর,
ভিক্ষুরে নিয়ে আয় অমানিতার পাশে,
সে'ই তারে দিবে সম্মান—
এত মান আর কেউ দিতে কি পারে

মা। বাছা, তুই যে আমার বুকচেরা ধন।
তোর কথাতেই চলেছি
পাপের পথে, পাপীয়সী।
হে পবিত্র মহাপুরুষ,
আমার অপরাধের শক্তি যত
ক্ষমার শক্তি তোমার
আরো অনেক গুণে বড়ো।
তোমারে করিব অসম্মান—
তবু প্রণাম, তবু প্রণাম, তবু প্রণাম।

প্রকৃতি। আমায় দোষী করো।
ধুলায়-পড়া ম্লান কুসুম
পায়ের তলায় ধরো।
অপরাধে ভরা ডালি
নিজ হাতে করো খালি,
তার পরে সেই শূন্য ডালায়
তোমার করুণা ভরো—
আমায় দোষী করো।
তুমি উচ্চ, আমি তুচ্ছ
ধরব তোমায় ফাঁদে
আমার অপরাধে।
আমার দোষকে তোমার পুণ্য
করবে তো কলঙ্কশূন্য—
ক্ষমায় গেঁথে সকল ত্রুটি
গলায় তোমার পরো॥

মা। কী অসীম সাহস তোর, মেয়ে।

প্রকৃতি। আমার সাহস!
তাঁর সাহসের নাই তুলনা।
কেউ যে কথা বলতে পারে নি
তিনি ব'লে দিলেন কত সহজে—
জল দাও।

ঐ একটু বাণী—
তার দীপ্তি কত ;
আলো ক'রে দিল আমার সারা জন্ম।
বুকের উপর কালো পাথর চাপা ছিল যে,
সেটাকে ঠেলে দিল—
উথলি উঠল রসের ধারা।

মা। ওরা কে যায়
পীতবসন-পরা সন্ন্যাসী।

বৌদ্ধ ভিক্ষুর দল

ভিক্ষুগণ। নমো নমো বুদ্ধদিবাকরায়,
নমো নমো গোতমচন্দিমায়,
নমো নমো নন্তগুণন্নবায়,
নমো নমো সাকিয়নন্দনায়।

প্রকৃতি। মা, ঐ যে তিনি চলেছেন
সবার আগে আগে!
ফিরে তাকালেন না, ফিরে তাকালেন না—
তাঁর নিজের হাতের এই নূতন সৃষ্টিরে
আর দেখিলেন না চেয়ে!
এই মাটি, এই মাটি, এই মাটিই তোর
আপন রে!
হতভাগিনী, কে তোরে আনিল আলোতে
শুধু এক নিমেষের জন্যে!
থাকতে হবে তোকে মাটিতেই
সবার পায়ের তলায়।

মা। ওরে বাছা, দেখতে পারি নে তোর দুঃখ—
আনবই আনবই, আনবই তারে
মন্ত্র প'ড়ে।

প্রকৃতি। পড়্ তুই সব চেয়ে নিষ্ঠুর মন্ত্র,

পাকে পাকে দাগ দিয়ে
জড়ায়ে ধরুক ওর মনকে।
যেখানেই যাক,
কখনো এড়াতে আমাকে
পারবে না, পারবে না।

আকর্ষণীমন্ত্রে যোগ দেবার জন্যে মা
তার শিষ্যাদলকে ডাক দিল

মা। আয় তোরা আয়,
আয় তোরা আয়।

তাদের প্রবেশ
ও নৃত্য

যায় যদি যাক সাগরতীরে—
আবার আসুক, আসুক ফিরে।
রেখে দেব আসন পেতে
হৃদয়েতে।
পথের ধুলো ভিজিয়ে দেব
অশ্রুনীরে।
যায় যদি যাক শৈলশিরে—
আসুক ফিরে, আসুক ফিরে।
লুকিয়ে রব গিরিগুহায়,
ডাকব উহায়—
আমার স্বপন ওর জাগরণ
রইবে ঘিরে॥

মায়ের মায়ানৃত্য

মা। ভাবনা করিস নে তুই—
এই দেখ্ মায়াদর্পণ আমার,
হাতে নিয়ে নাচবি যখন

দেখতে পাবি তাঁর কী হল দশা।
এইবার এসো এসো রুদ্রভৈরবের সন্তান,
জাগাও তাণ্ডবনৃত্য। [প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

ময়ের মায়ানৃত্য

প্রকৃতি। ঐ দেখ্ পশ্চিমে মেঘ ঘনালো,
মন্ত্র খাটবে মা, খাটবে—
উড়ে যাবে শুষ্ক সাধনা সন্ন্যাসীর
শুকনো পাতার মতন।
নিববে বাতি, পথ হবে অন্ধকার,
ঝড়ে-বাসা-ভাঙা পাখি
ঘুরে ঘুরে পড়বে এসে মোর দ্বারে।
দুরু দুরু করে মোর বক্ষ,
মনের মাঝে ঝিলিক দিতেছে বিজুলি।
দূরে যেন ফেনিয়ে উঠেছে সমুদ্র—
তল নেই, কূল নেই তার।
মন্ত্র খাটবে মা, খাটবে।

মা। এইবার আয়নার সামনে নাচ্ দেখি তুই,
দেখ্ দেখি কী ছায়া পড়ল।

প্রকৃতির নৃত্য

প্রকৃতি। লজ্জা ছি ছি লজ্জা!
আকাশে তুলে দুই বাহু
অভিশাপ দিচ্ছেন কাকে।
নিজেরে মারছেন বহ্নির বেত্র,
শেল বিঁধছেন যেন আপনার মর্মে।

মা। ওরে বাছা, এখনি অধীর হলি যদি,
শেষে তোর কী হবে দশা।

প্রকৃতি। আমি দেখব না, আমি দেখব না,
আমি দেখব না তোর দর্পণ।
বুক ফেটে যায়, যায় গো,
বুক ফেটে যায়।
কী ভয়ংকর দুঃখের ঘূর্ণিঝঞ্ঝা—
মহান বনস্পতি ধুলায় কি লুটাবে,
ভাঙবে কি অভ্রভেদী তার গৌরব।
দেখব না, আমি দেখব না তোর দর্পণ।
না না না।

মা। থাক্ তবে থাক্ এই মায়া।
প্রাণপণে ফিরিয়ে আনব মোর মন্ত্র—
নাড়ী যদি ছিঁড়ে যায় যাক,
ফুরায়ে যায় যদি যাক নিশ্বাস।

প্রকৃতি। সেই ভালো মা, সেই ভালো।
থাক্ তোর মন্ত্র, থাক্ তোর—
আর কাজ নাই, কাজ নাই, কাজ নাই।

না না না, পড়্ মন্ত্র তুই, পড়্ তোর মন্ত্র—
পথ তো আর নেই বাকি।
আসবে সে, আসবে সে, আসবে,
আমার জীবনমৃত্যু-সীমানায় আসবে।
নিবিড় রাত্রে এসে পৌঁছবে পান্থ,
বুকের জ্বালা দিয়ে আমি
জ্বালিয়ে দিব দীপখানি—
সে আসবে।

—

দুঃখ দিয়ে মেটাব দুঃখ তোমার।
স্নান করাব অতল জলে
বিপুল বেদনার।

মোর সংসার দিব যে জ্বালি,
শোধন হবে এ মোহের কালি—
মরণব্যথা দিব তোমার
চরণে উপহার ॥

মা। বাছা, মোর মন্ত্র আর তো বাকি নেই,
প্রাণ মোর এল কণ্ঠে।

প্রকৃতি। মা গো, এতদিনে মনে হচ্ছে যেন
টলেছে আসন তাঁহার।
ঐ আসছে, আসছে, আসছে।
যা বহু দূরে, যা লক্ষ যোজন দূরে,
যা চন্দ্রসূর্য পেরিয়ে,
ঐ আসছে, আসছে, আসছে—
কাঁপছে আমার বক্ষ ভূমিকম্পে।

মা। বল্‌ দেখি বাছা, কী তুই দেখছিস আয়নায়।

প্রকৃতি। ঘন কালো মেঘ তাঁর পিছনে,
চারি দিকে বিদ্যুৎ চমকে।
অঙ্গ ঘিরে ঘিরে তাঁর
অগ্নির আবেষ্টন,
যেন শিবের ক্রোধানলদীপ্তি।
তোর মন্ত্রবাণী ধরি কালীনাগিনীমূর্তি
গর্জিছে বিষনিশ্বাসে,
কলুষিত করে তাঁর পুণ্যশিখা।

আনন্দের ছায়া-অভিনয়

মা। ওরে পাষাণী,
কী নিষ্ঠুর মন তোর,
কী কঠিন প্রাণ,
এখনো তো আছিস বেঁচে।

প্রকৃতি। ক্ষুধার্ত প্রেম তার নাই দয়া,
তার নাই ভয়, নাই লজ্জা।

নিষ্ঠুর পণ আমার,
আমি মানব না হার, মানব না হার—
বাঁধব তাঁরে মায়াবাঁধনে,
জড়াব আমারি হাসি-কাঁদনে।
ঐ দেখ্, ঐ নদী হয়েছেন পার—
একা চলেছেন ঘন বনের পথে।
যেন কিছু নাই তাঁর চোখের সম্মুখে—
নাই সত্য, নাই মিথ্যা ;
নাই ভালো, নাই মন্দ।

মাকে নাড়া দিয়ে

দুর্বল হোস নে হোস নে,
এইবার পড়্ তোর শেষনাগমন্ত্র—
নাগপাশ-বন্ধনমন্ত্র।
মা। জাগে নি এখনো জাগে নি
রসাতলবাসিনী নাগিনী।
বাজ্ বাজ্ বাজ্ বাঁশি, বাজ্ রে
মহাভীমপাতালী রাগিণী,
জেগে ওঠ্ মায়াকালী নাগিনী—
ওরে মোর মন্ত্রে কান দে—
টান দে, টান দে, টান দে, টান দে।
বিষগর্জনে ওকে ডাক দে—
পাক দে, পাক দে, পাক দে, পাক দে।
গহ্বর হতে তুই বার হ,
সপ্তসমুদ্র পার হ।
বেঁধে তারে আন্ রে—
টান্ রে, টান্ রে, টান্ রে, টান্ রে।
নাগিনী জাগল, জাগল, জাগল—
পাক দিতে ঐ লাগল, লাগল, লাগল—
মায়াটান ঐ টানল, টানল, টানল।

বেঁধে আনল, বেঁধে আনল, বেঁধে আনল ॥

এইবার নৃত্যে করো আহ্বান—
ধর্ তোরা গান।
আয় তোরা যোগ দিবি আয়
যোগিনীর দল।
আয় তোরা আয়,
আয় তোরা আয়,
আয় তোরা আয়।

সকলে। ঘুমের ঘন গহন হতে যেমন আসে স্বপ্ন,
তেমনি উঠে এসো এসো।
শমীশাখার বক্ষ হতে যেমন জ্বলে অগ্নি,
তেমনি তুমি এসো এসো।
ঈশানকোণে কালো মেঘের নিষেধ বিদারি
যেমন আসে সহসা বিদ্যুৎ,
তেমনি তুমি চমক হানি এসো হৃদয়তলে,
এসো তুমি, এসো তুমি, এসো এসো।
আঁধার যবে পাঠায় ডাক মৌন ইশারায়,
যেমন আসে কালপুরুষ সন্ধ্যাকাশে
তেমনি তুমি এসো, তুমি এসো এসো।
সুদূর হিমগিরির শিখরে
মন্ত্র যবে প্রেরণ করে তাপস বৈশাখ,
প্রখর তাপে কঠিন ঘন তুষার গলায়ে
বন্যাধারা যেমন নেমে আসে—
তেমনি তুমি এসো, তুমি এসো এসো ॥

মা। আর দেরি করিস নে, দেখ্ দর্পণ—
আমার শক্তি হল যে ক্ষয়।

প্রকৃতি। না, দেখব না আমি দেখব না,
আমি শুনব—

মনের মধ্যে আমি শুনব,
ধ্যানের মধ্যে আমি শুনব,
তাঁর চরণধ্বনি।
ঐ দেখ্ এল ঝড়, এল ঝড়,
তাঁর আগমনীর ঐ ঝড়—
পৃথিবী কাঁপছে থরো থরো থরো থরো,
গুরু গুরু করে মোর বক্ষ।

মা। তোর অভিশাপ নিয়ে আসে
হতভাগিনী।

প্রকৃতি। অভিশাপ নয় নয়,
অভিশাপ নয় নয়—
আনছে আমার জন্মান্তর,
মরণের সিংহদ্বার ঐ খুলছে।
ভাঙল দ্বার,
ভাঙল প্রাচীর,
ভাঙল এ জন্মের মিথ্যা।
ওগো আমার সর্বনাশ,
ওগো আমার সর্বস্ব,
তুমি এসেছ
আমার অপমানের চূড়ায়।
মোর অন্ধকারের ঊর্ধ্বে রাখো
তব চরণ জ্যোতির্ময়।

মা। ও নিষ্ঠুর মেয়ে,
আর যে সহে না, সহে না, সহে না।

প্রকৃতি। ওমা, ওমা, ওমা,
ফিরিয়ে নে তোর মন্ত্র
এখনি এখনি এখনি।
ও রাক্ষুসী, কী করলি তুই,
কী করলি তুই—
মরলি নে কেন, পাপীয়সী।

কোথা আমার সেই দীপ্ত সমুজ্জ্বল
শুভ্র সুনির্মল
সুদূর স্বর্গের আলো।
আহা কী ম্লান, কী ক্লান্ত—
আত্মপরাভব কী গভীর।
যাক যাক যাক,
সব যাক, সব যাক—
অপমান করিস নে বীরের,
জয় হোক তাঁর,
জয় হোক তাঁর,
জয় হোক।

আনন্দের প্রবেশ

প্রভু, এসেছ উদ্ধারিতে আমায়,
দিলে তার এত মূল্য,
নিলে তার এত দুঃখ।
ক্ষমা করো, ক্ষমা করো—
মাটিতে টেনেছি তোমারে,
এনেছি নীচে,
ধূলি হতে তুলি নাও আমায়
তব পুণ্যালোকে।
ক্ষমা করো।
জয় হোক তোমার জয় হোক।

আনন্দ। কল্যাণ হোক তব, কল্যাণী।

সকলে বুদ্ধকে প্রণাম

সকলে। বুদ্ধো সুসুদ্ধো করুণামহাণ্ণবো,
যোচ্চন্ত সুদ্ধব্বর ঞানলোচনো
লোকস্স পাপূপকিলেসঘাতকো
বন্দামি বুদ্ধং অহমাদরেণ তং॥

———

শ্যামা

২৫।১৩

শ্যামা

প্রথম দৃশ্য

বজ্রসেন ও তাহার বন্ধু

বন্ধু। তুমি ইন্দ্রমণির হার
এনেছ সুবর্ণ দ্বীপ থেকে—
রাজমহিষীর কানে যে তার খবর
দিয়েছে কে।
দাও আমায়, রাজবাড়িতে দেব বেচে
ইন্দ্রমণির হার—
চিরদিনের মতো তুমি যাবে বেঁচে।

বজ্রসেন। না না না বন্ধু,
আমি অনেক করেছি বেচাকেনা,
অনেক হয়েছে লেনাদেনা—
না না না,
এ তো হাটে বিকোবার নয় হার—
না না না।
কণ্ঠে দিব আমি তারি
যারে বিনা মূল্যে দিতে পারি—
ওগো আছে সে কোথায়,
আজো তারে হয় নাই চেনা।
না না না, বন্ধু।

বন্ধু। জান না কি
পিছনে তোমার রয়েছে রাজার চর।

বজ্রসেন। জানি জানি, তাই তো আমি
চলেছি দেশান্তর।

এ মানিক পেলেম আমি অনেক দেবতা পূজে,
বাধার সঙ্গে যুঝে—
এ মানিক দেব যারে অমনি তারে পাব খুঁজে,
চলেছি দেশ-দেশান্তর ॥

বন্ধু দূরে প্রহরীকে দেখতে পেয়ে বজ্রসেনকে মালা-সমেত পালাতে বলল

কোটালের প্রবেশ

কোটাল। থামো থামো,
কোথায় চলেছ পালায়ে
সে কোন্ গোপন দায়ে।
আমি নগর-কোটালের চর।

বজ্রসেন। আমি বণিক, আমি চলেছি
আপন ব্যবসায়ে,
চলেছি দেশান্তর।

কোটাল। কী আছে তোমার পেটিকায়।

বজ্রসেন। আছে মোর প্রাণ, আছে মোর শ্বাস।

কোটাল। খোলো, খোলো, বৃথা কোরো না পরিহাস।

বজ্রসেন। এই পেটিকা আমার বুকের পাঁজর যে রে—
সাবধান! সাবধান! তুমি ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না এরে।
তোমার মরণ, নয় তো আমার মরণ—
যমের দিব্য করো যদি এরে হরণ—
ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না।

[বজ্রসেনের পলায়ন

সেই দিকে তাকিয়ে

কোটাল। ভালো ভালো তুমি দেখব পালাও কোথা।
মশানে তোমার শূল হয়েছে পোঁতা—
এ কথা মনে রেখে
তোমার ইষ্টদেবতারে স্মরিয়ো এখন থেকে ॥

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

শ্যামার সভাগৃহে কয়েকটি সহচরী বসে আছে

নানা কাজে নিযুক্ত

সখীরা। হে বিরহী, হায়, চঞ্চল হিয়া তব—
নীরবে জাগ একাকী শূন্য মন্দিরে,
কোন্ সে নিরুদ্দেশ-লাগি আছ জাগিয়া।
স্বপনরূপিণী অলোকসুন্দরী
অলক্ষ্য অলকাপুরী-নিবাসিনী,
তাহার মুরতি রচিলে বেদনায় হৃদয়মাঝারে॥

উত্তীয়ের প্রবেশ

সখীরা। ফিরে যাও কেন ফিরে ফিরে যাও
বহিয়া বিফল বাসনা।
চিরদিন আছ দূরে
অজানার মতো নিভৃত অচেনা পুরে।
কাছে আস তবু আস না,
বহিয়া বিফল বাসনা।
পারি না তোমায় বুঝিতে—
ভিতরে কারে কি পেয়েছ,
বাহিরে চাহ না খুঁজিতে।
না-বলা তোমার বেদনা যত
বিরহপ্রদীপে শিখার মতো,
নয়নে তোমার উঠেছে জ্বলিয়া
নীরব কী সম্ভাষণা॥

উত্তীয়। মায়াবনবিহারিণী হরিণী
গহনস্বপনসঞ্চারিণী,
কেন তারে ধরিবারে করি পণ
অকারণ।

থাক্ থাক্, নিজ-মনে দূরেতে,
আমি শুধু বাঁশরির সুরেতে
পরশ করিব ওর প্রাণমন
অকারণ ॥

সখীরা। হতাশ হোয়ো না, হোয়ো না,
হোয়ো না, সখা।
নিজেরে ভুলায়ে লোয়ো না, লোয়ো না
আঁধার গুহাতলে।

উত্তীয়। চমকিবে ফাগুনের পবনে,
পশিবে আকাশবাণী শ্রবণে,
চিত্ত আকুল হবে অনুখন
অকারণ।
দূর হতে আমি তারে সাধিব,
গোপনে বিরহডোরে বাঁধিব—
বাঁধনবিহীন সেই যে বাঁধন
অকারণ ॥

সখীরা। হবে সখা, হবে তব হবে জয়—
নাহি ভয়, নাহি ভয়, নাহি ভয়।
হে প্রেমিকতাপস, নিঃশেষে আত্ম-আহুতি
ফলিবে চরম ফলে ॥

[প্রস্থান

সখীসহ শ্যামার প্রবেশ

সখী। জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা,
হে গরবিনী।
বৃথাই কাটিবে বেলা, সাঙ্গ হবে যে খেলা—
সুধার হাটে ফুরাবে বিকিকিনি,
হে গরবিনী।
মনের মানুষ লুকিয়ে আসে,
দাঁড়ায় পাশে, হায়—

হেসে চলে যায় জোয়ারজলে
ভাসিয়ে ভেলা,
দুর্লভ ধনে দুঃখের পণে লও গো জিনি,
হে গরবিনী।
ফাগুন্ যখন যাবে গো নিয়ে
ফুলের ডালা,
কী দিয়ে তখন গাঁথিবে তোমার
বরণমালা।
বাজবে বাঁশি দূরের হাওয়ায়,
চোখের জলে শূন্যে চাওয়ায়
কাটবে প্রহর—
বাজবে বুকে বিদায়পথে চরণ-ফেলা দিনযামিনী,
হে গরবিনী॥

শ্যামা। ধরা সে যে দেয় নাই, দেয় নাই,
যারে আমি আপনারে সঁপিতে চাই—
কোথা সে যে আছে সংগোপনে,
প্রতিদিন শত তুচ্ছের আড়ালে আড়ালে।
এসো মম সার্থক স্বপ্ন,
করো মোর যৌবন সুন্দর,
দক্ষিণবায়ু আনো পুষ্পবনে।
ঘুচাও বিষাদের কুহেলিকা,
নবপ্রাণমন্ত্রের আনো বাণী।
পিপাসিত জীবনের ক্ষুব্ধ আশা
আঁধারে আঁধারে খোঁজে ভাষা—
শূন্যে পথহারা পবনের ছন্দে,
ঝরে-পড়া বকুলের গন্ধে॥

সখীদের নৃত্যচর্চা, শেষে শ্যামার সজ্জা-সাধন, এমন সময়

বজ্রসেন ছুটে এল। পিছনে কোটাল

কোটাল। ধর্ ধর্ ঐ চোর, ঐ চোর।

বজ্রসেন। নই আমি নই চোর, নই চোর, নই চোর—
অন্যায় অপবাদে আমারে ফেলো না ফাঁদে
কোটাল। ঐ বটে, ঐ চোর, ঐ চোর, ঐ চোর।

[প্রস্থান

বজ্রসেন যে দিকে গেল শ্যামা সে দিকে কিছুক্ষণ তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইল

শ্যামা। আহা মরি মরি,
মহেন্দ্রনিন্দিতকান্তি উন্নতদর্শন
কারে বন্দী করে আনে
চোরের মতন কঠিন শৃঙ্খলে।
শীঘ্র যা লো সহচরী, যা লো, যা লো—
বল্‌ গে নগরপালে মোর নাম করি,
শ্যামা ডাকিতেছে তারে।
বন্দী সাথে লয়ে একবার
আসে যেন আমার আলয়ে দয়া করি॥

[শ্যামা ও সখীদের প্রস্থান

সখী। সুন্দরের বন্ধন নিষ্ঠুরের হাতে
ঘুচাবে কে।
নিঃসহায়ের অশ্রুবারি পীড়িতের চক্ষে
মুছাবে কে।
আর্তের ক্রন্দনে হেরো ব্যথিত বসুন্ধরা,
অন্যায়ের আক্রমণে বিষবাণে জর্জরা—
প্রবলের উৎপীড়নে কে বাঁচাবে দুর্বলেরে,
অপমানিতেরে কার দয়া বক্ষে লবে ডেকে।

[সহচরীর প্রস্থান

বজ্রসেন ও কোটাল-সহ শ্যামার পুনঃ প্রবেশ

শ্যামা। তোমাদের এ কী ভ্রান্তি—
কে ঐ পুরুষ দেবকান্তি,
প্রহরী, মরি মরি।

এমন করে কি ওকে বাঁধে।
দেখে যে আমার প্রাণ কাঁদে।
বন্দী করেছ কোন্ দোষে।

কোটাল। চুরি হয়ে গেছে রাজকোষে,
চোর চাই যে করেই হোক।
হোক-না সে যেই-কোনো লোক, চোর চাই।
নহিলে মোদের যাবে মান!

শ্যামা। নির্দোষী বিদেশীর রাখো প্রাণ,
দুই দিন মাগিনু সময়।

কোটাল। রাখিব তোমার অনুনয়;
দুই দিন কারাগারে রবে,
তার পর যা হয় তা হবে।

বজ্রসেন। এ কী খেলা হে সুন্দরী,
কিসের এ কৌতুক।
দাও অপমান-দুখ—
মোরে নিয়ে কেন, কেন এ কৌতুক।

শ্যামা। নহে নহে, এ নহে কৌতুক।
মোর অঙ্গের স্বর্ণ-অলংকার
সঁপি দিয়া শৃঙ্খল তোমার
নিতে পারি নিজ দেহে।
তব অপমানে মোর
অন্তরাত্মা আজি অপমান মানে।

[বজ্রসেনকে নিয়ে প্রহরীর প্রস্থান

সঙ্গে শ্যামা কিছু দূর গিয়ে ফিরে এসে

শ্যামা। রাজার প্রহরী ওরা অন্যায় অপবাদে
নিরীহের প্রাণ বধিবে ব'লে কারাগারে বাঁধে।
ওগো শোনো, ওগো শোনো, ওগো শোনো,
আছ কি বীর কোনো,

দেবে কি ওরে জড়িয়ে মরিতে
অবিচারের ফাঁদে
অন্যায় অপবাদে।

উত্তীয়ের প্রবেশ

উত্তীয়। ন্যায় অন্যায় জানি নে, জানি নে, জানি নে,
শুধু তোমারে জানি
ওগো সুন্দরী।
চাও কি প্রেমের চরম মূল্য— দেব আনি,
দেব আনি ওগো সুন্দরী।
প্রিয় যে তোমার, বাঁচাবে যারে,
নেবে মোর প্রাণঋণ—
তাহারি সঙ্গে তোমারি বক্ষে
বাঁধা রব চিরদিন
মরণডোরে।
কেমনে ছাড়িবে মোরে,
ওগো সুন্দরী॥

শ্যামা। এতদিন তুমি সখা, চাহ নি কিছু;
নীরবে ছিলে করি নয়ন নিচু।
রাজ-অঙ্গুরী মম করিলাম দান,
তোমারে দিলাম মোর শেষ সম্মান।
তব বীর-হাতে এই ভূষণের সাথে
আমার প্রণাম যাক তব পিছু পিছু।

উত্তীয়। আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান—
তুমি জান নাই, তুমি জান নাই,
তুমি জান নাই তার মূল্যের পরিমাণ।
রজনীগন্ধা অগোচরে
যেমন রজনী স্বপনে ভরে
সৌরভে,
তুমি জান নাই, তুমি জান নাই,

তুমি জান নাই, মরমে আমার ঢেলেছ তোমার গান।
বিদায় নেবার সময় এবার হল—
প্রসন্ন মুখ তোলো,
মুখ তোলো, মুখ তোলো—
মধুর মরণে পূর্ণ করিয়া স পিয়া যাব প্রাণ
চরণে।
যারে জান নাই, যারে জান নাই,
যারে জান নাই,
তার গোপন ব্যথার নীরব রাত্রি হোক আজি অবসান॥

শ্যামা হাত ধ'রে উত্তীয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল
অল্পক্ষণ পরে হাত ছেড়ে ধীরে ধীরে চলে গেল

সখী। তোমার প্রেমের বীর্যে
তোমার প্রবল প্রাণ সখীরে করিলে দান।
তব মরণের ডোরে
বাঁধিলে বাঁধিলে ওরে
অসীম পাপে
অনন্ত শাপে।
তোমার চরম অর্ঘ্য
কিনিল সখীর লাগি নারকী প্রেমের স্বর্গ।
উত্তীয়। প্রহরী, ওগো প্রহরী,
লহো লহো লহো মোরে বাঁধি।
বিদেশী নহে সে তব শাসনপাত্র,
আমি একা অপরাধী।
কোটাল। তুমিই করেছ তবে চুরি?
উত্তীয়। এই দেখো রাজ-অঙ্গুরী—
রাজ-আভরণ দেহে করেছি ধারণ আজি,
সেই পরিতাপে আমি কাঁদি।

[উত্তীয়কে লইয়া প্রহরীর প্রস্থান

সখী। বুক যে ফেটে যায়, হায় হায় রে।
তোর তরুণ জীবন দিলি নিষ্কারণে
মৃত্যুপিপাসিনীর পায় রে।
ওরে সখা,
মধুর দুর্লভ যৌবনধন ব্যর্থ করিলি
কেন অকালে
পুষ্পবিহীন গীতিহারা মরণমরুর পারে,
ওরে সখা।

[প্রস্থান

কারাগারে উত্তীয়। প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। নাম লহো দেবতার ; দেরি তব নাই আর,
দেরি তব নাই আর।
ওরে পাষণ্ড, লহো চরম দণ্ড ; তোর
অন্ত যে নাই আস্পর্ধার।

শ্যামার দ্রুত প্রবেশ

শ্যামা। থাম্ রে, থাম্ রে তোরা, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে—
দোষী ও-যে নয় নয়, মিথ্যা মিথ্যা সবই,
আমারি ছলনা ও যে—
বেঁধে নিয়ে যা মোরে
রাজার চরণে।
প্রহরী। চুপ করো, দূরে যাও, দূরে যাও নারী—
বাধা দিয়ো না, বাধা দিয়ো না।

[দুই হাতে মুখ ঢেকে শ্যামার প্রস্থান

প্রহরীর উত্তীয়কে হত্যা

সখী। কোন্ অপরূপ স্বর্গের আলো
দেখা দিল রে প্রলয়রাত্রি ভেদি
দুর্দিন দুর্যোগে,
মরণমহিমা ভীষণের বাজালো বাঁশি।

অকরুণ নির্মম ভুবনে
দেখিনু এ কী সহসা—
কোন্ আপনা-সমর্পণ, মুখে নির্ভয় হাসি ॥

তৃতীয় দৃশ্য

শ্যামা। বাজে গুরু গুরু শঙ্কার ডঙ্কা,
ঝঞ্ঝা ঘনায় দূরে
ভীষণ নীরবে।
কত রব সুখস্বপ্নের ঘোরে আপনা ভুলে,
সহসা জাগিতে হবে রে ॥

বজ্রসেনের প্রবেশ

শ্যামা। হে বিদেশী এসো এসো। হে আমার প্রিয়,
অভাগীরে করুণা করিয়ো, এসো এসো।
তোমা-সাথে এক স্রোতে ভাসিলাম আমি
হে হৃদয়স্বামী,
জীবনে মরণে প্রভু।
বজ্রসেন। এ কী আনন্দ, আহা—
হৃদয়ে দেহে ঘুচালে মম সকল বন্ধ।
দুঃখ আমার আজি হল যে ধন্য,
মৃত্যুগহনে লাগে অমৃতসুগন্ধ।
এলে কারাগারে
রজনীর পারে উষাসম,
মুক্তিরূপা অয়ি লক্ষ্মী দয়াময়ী।
শ্যামা। বোলো না, বোলো না, বোলো না
আমি দয়াময়ী।
মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা। বোলো না।
এ কারাপ্রাচীরে শিলা আছে যত
নহে তা কঠিন আমার মতো।

আমি দয়াময়ী!
মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা।

বজ্রসেন। জেনো প্রেম চিরঋণী আপনারি হরষে,
জেনো, প্রিয়ে।
সব পাপ ক্ষমা করি ঋণশোধ করে সে।
কলঙ্ক যাহা আছে,
দূর হয় তার কাছে,
কালিমার 'পরে তার অমৃত সে বরষে॥

প্রেমের জোয়ারে ভাসাবে দোঁহারে
বাঁধন খুলে দাও, দাও দাও।
ভুলিব ভাবনা পিছনে চাব না,
পাল তুলে দাও, দাও দাও।
প্রবল পবনে তরঙ্গ তুলিল—
হৃদয় দুলিল, দুলিল দুলিল,
পাগল হে নাবিক,
ভুলাও দিগ্‌বিদিক,
পাল তুলে দাও, দাও দাও॥

সখী। হায় হায় রে হায় পরবাসী,
হায় গৃহছাড়া উদাসী।
অন্ধ অদৃষ্টের আহ্বানে
কোথা অজানা অকূলে চলেছিস ভাসি।
শুনিতে কি পাস দূর আকাশে
কোন্‌ বাতাসে সর্বনাশার বাঁশি।
ওরে, নির্মম ব্যাধ যে গাঁথে
মরণের ফাঁসি।
রঙিন মেঘের তলে
গোপন অশ্রুজলে
বিধাতার দারুণ বিদ্রূপবজ্রে
সঞ্চিত নীরব অট্টহাসি॥

চতুর্থ দৃশ্য

কোটালের প্রবেশ

কোটাল। পুরী হতে পালিয়েছে যে পুরসুন্দরী
কোথা তারে ধরি, কোথা তারে ধরি।
রক্ষা রবে না, রক্ষা রবে না—
এমন ক্ষতি রাজার সবে না,
রক্ষা রবে না।
বন হতে কেন গেল অশোকমঞ্জরী
ফাল্গুনের অঙ্গন শূন্য করি।
ওরে কে তুই ভুলালি,
তারে কে তুই ভুলালি—
ফিরিয়ে দে তারে মোদের বনের দুলালী,
তারে কে তুই ভুলালি।

[প্রস্থান

মেয়েদের প্রবেশ। শেষে প্রহরীর প্রবেশ

সখীগণ। রাজভবনের সমাদর সম্মান ছেড়ে
এল আমাদের সখা।
দেরি কোরো না, দেরি কোরো না—
কেমনে যাবে অজানা পথে
অন্ধকারে দিক নিরখি।
অচেনা প্রেমের চমক লেগে
প্রণয়রাতে সে উঠেছে জেগে—
ধ্রুবতারাকে পিছনে রেখে
ধূমকেতুকে চলেছে লখি।
কাল সকালে পুরোনো পথে
আর কখনো ফিরিবে ও কি।
দেরি কোরো না, দেরি কোরো না, দেরি কোরো না।

প্রহরী। দাঁড়াও, কোথা চলো, তোমরা কে বলো বলো।
সখীগণ। আমরা আহিরিনী, সারা হল বিকিকিনি—
দূর গাঁয়ে চলি ধেয়ে আমরা বিদেশী মেয়ে।
প্রহরী। ঘাটে বসে হোথা ও কে।
সখীগণ। সাথি মোদের ও যে নেয়ে—
যেতে হবে দূর পারে,
এনেছি তাই ডেকে তারে।
নিয়ে যাবে তরী বেয়ে
সাথী মোদের ও যে নেয়ে—
ওগো প্রহরী, বাধা দিয়ো না, বাধা দিয়ো না,
মিনতি করি,
ওগো প্রহরী।

[প্রস্থান

সখী। কোন্ বাঁধনের গ্রন্থি বাঁধিল দুই অজানারে
এ কী সংশয়েরি অন্ধকারে।
দিশাহারা হাওয়ায় তরঙ্গদোলায়
মিলনতরণীখানি ধায় রে
কোন্ বিচ্ছেদের পারে॥

বজ্রসেন ও শ্যামার প্রবেশ

বজ্রসেন। হৃদয়ে বসন্তবনে যে মাধুরী বিকাশিল
সেই প্রেম সেই মালিকায় রূপ নিল, রূপ নিল।
এই ফুলহারে প্রেয়সী তোমারে
বরণ করি
অক্ষয় মধুর সুধাময়
হোক মিলনবিভাবরী।
প্রেয়সী তোমায় প্রাণবেদিকায়
প্রেমের পূজায় বরণ করি॥

—

কহো কহো মোরে প্রিয়ে,
আমারে করেছ মুক্ত কী সম্পদ দিয়ে।
অয়ি বিদেশিনী,
তোমার কাছে আমি কত ঋণে ঋণী।

শ্যামা। নহে নহে নহে— সে কথা এখন নহে।

সহচরী। নীরবে থাকিস সখী, ও তুই নীরবে থাকিস।
তোর প্রেমেতে আছে যে কাঁটা
তারে আপন বুকে বিঁধিয়ে রাখিস।
দয়িতেরে দিয়েছিলি সুধা,
আজিও তাহে মেটে নি ক্ষুধা—
এখনি তাহে মিশাবি কি বিষ।
যে জ্বলনে তুই মরিবি মরমে মরমে
কেন তারে বাহিরে ডাকিস॥

বজ্রসেন। কী করিয়া সাধিলে অসাধ্য ব্রত
কহো বিবরিয়া।
জানি যদি প্রিয়ে, শোধ দিব
এ জীবন দিয়ে এই মোর পণ॥

শ্যামা। তোমা লাগি যা করেছি
কঠিন সে কাজ,
আরো সুকঠিন আজ তোমারে সে কথা বলা।
বালক কিশোর উত্তীয় তার নাম,
ব্যর্থ প্রেমে মোর মত্ত অধীর ;
মোর অনুনয়ে তব চুরি-অপবাদ
নিজ-'পরে লয়ে
সঁপেছে আপন প্রাণ।

বজ্রসেন। কাঁদিতে হবে রে, রে পাপিষ্ঠা,
জীবনে পাবি না শান্তি।
ভাঙিবে ভাঙিবে কলুষনীড় বজ্র-আঘাতে।

শ্যামা। ক্ষমা করো নাথ, ক্ষমা করো।
এ পাপের যে অভিসম্পাত

হোক বিধাতার হাতে নিদারুণতর।
তুমি ক্ষমা করো, তুমি ক্ষমা করো।

বজ্রসেন। এ জন্মের লাগি
তোর পাপমূল্যে কেনা
মহাপাপভাগী
এ জীবন করিলি ধিক্‌কৃত।
কলঙ্কিনী ধিক্ নিশ্বাস মোর
তোর কাছে ঋণী।

শ্যামা। তোমার কাছে দোষ করি নাই,
দোষ করি নাই।
দোষী আমি বিধাতার পায়ে,
তিনি করিবেন রোষ—
সহিব নীরবে।
তুমি যদি না করো দয়া
সবে না, সবে না, সবে না॥

বজ্রসেন। তবু ছাড়িবি না মোরে?

শ্যামা। ছাড়িব না, ছাড়িব না, ছাড়িব না।
তোমা লাগি পাপ নাথ,
তুমি করো মর্মাঘাত।
ছাড়িব না।

শ্যামাকে বজ্রসেনের আঘাত ও শ্যামার পতন

[বজ্রসেনের প্রস্থান

নেপথ্যে। হায় এ কী সমাপন!
অমৃতপাত্র ভাঙিলি,
করিলি মৃত্যুরে সমর্পণ;
এ দুর্লভ প্রেম মূল্য হারালো
কলঙ্কে, অসম্মানে॥

বজ্রসেনের প্রবেশ

পল্লীরমণীরা। তোমায় দেখে মনে লাগে ব্যথা,

হায় বিদেশী পান্থ।
এই দারুণ রৌদ্রে, এই তপ্ত বালুকায়
তুমি কি পথভ্রান্ত।
দুই চক্ষুতে এ কী দাহ
জানি নে, জানি নে, জানি নে, কী যে চাহ।
চলো চলো আমাদের ঘরে,
চলো চলো ক্ষণেকের তরে,
পাবে ছায়া, পাবে জল।
সব তাপ হবে তব শান্ত।
কথা কেন নেয় না কানে,
কোথা চ'লে যায় কে জানে।
মরণের কোন্ দূত ওরে
করে দিল বুঝি উদ্‌ভ্রান্ত।

[সকলের প্রস্থান

বজ্রসেনের প্রবেশ

বজ্রসেন। এসো এসো এসো প্রিয়ে,
মরণলোক হতে নূতন প্রাণ নিয়ে।
নিষ্ফল মম জীবন,
নীরস মম ভুবন,
শূন্য হৃদয় পূরণ করো
মাধুরীসুধা দিয়ে।

সহসা নূপুর দেখিয়া কুড়াইয়া লইল

হায় রে, হায় রে; নূপুর,
তার করুণ চরণ ত্যজিলি, হারালি
কলগুঞ্জনসুর।
নীরব ক্রন্দনে বেদনাবন্ধনে
রাখিলি ধরিয়া বিরহ ভরিয়া
স্মরণ সুমধুর।
তার কোমল-চরণ-স্মরণ সুমধুর।

তোর ঝংকারহীন ধিক্কারে কাঁদে
প্রাণ মম নিষ্ঠুর ॥

[প্রস্থান

নেপথ্যে। সব কিছু কেন নিল না, নিল না,
নিল না ভালোবাসা—
ভালো আর মন্দেরে।
আপনাতে কেন মিটাল না
যত কিছু দ্বন্দ্বেরে—
ভালো আর মন্দেরে।
নদী নিয়ে আসে পঙ্কিল জলধারা
সাগরহৃদয়ে গহনে হয় হারা,
ক্ষমার দীপ্তি দেয় স্বর্গের আলো
প্রেমের আনন্দেরে—
ভালো আর মন্দেরে ॥

বজ্রসেনের প্রবেশ

বজ্রসেন। এসো এসো এসো প্রিয়ে,
মরণলোক হতে নূতন প্রাণ নিয়ে।

শ্যামার প্রবেশ

শ্যামা। এসেছি প্রিয়তম, ক্ষমো মোরে ক্ষমো।
গেল না গেল না কেন কঠিন পরান মম—
তব নিঠুর করুণ করে! ক্ষমো মোরে।
বজ্রসেন। কেন এলি, কেন এলি, কেন এলি ফিরে।
যাও যাও যাও যাও, চলে যাও।

শ্যামা চলে যাচ্ছে। বজ্রসেন চুপ করে দাঁড়িয়ে
শ্যামা একবার ফিরে দাঁড়াল। বজ্রসেন একটু এগিয়ে

বজ্রসেন। যাও যাও যাও যাও, চলে যাও।

[বজ্রসেনকে প্রণাম করে শ্যামার প্রস্থান

বজ্রসেন। ক্ষমিতে পারিলাম না যে
ক্ষমো হে মম দীনতা,
পাপীজনশরণ প্রভু।
মরিছে তাপে মরিছে লাজে
প্রেমের বলহীনতা—
ক্ষমো হে মম দীনতা,
পাপীজনশরণ প্রভু।
প্রিয়ারে নিতে পারি নি বুকে,
প্রেমেরে আমি হেনেছি,
পাপীরে দিতে শাস্তি শুধু
পাপেরে ডেকে এনেছি।
জানি গো তুমি ক্ষমিবে তারে
যে অভাগিনী পাপের ভারে
চরণে তব বিনতা।
ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না
আমার ক্ষমাহীনতা,
পাপীজনশরণ প্রভু॥

পরিশিষ্ট

পরিশোধ

(নাট্যগীতি)

কথা ও কাহিনীতে প্রকাশিত "পরিশোধ" নামক পদ্যকাহিনীটিকে নৃত্যাভিনয় উপলক্ষ্যে নাট্যীকৃত করা হয়েছে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এর সমস্তই সুরে বসানো। বলা বাহুল্য ছাপার অক্ষরে সুরের সঙ্গ দেওয়া অসম্ভব ব'লে কথাগুলির শ্রীহীন বৈধব্য অপরিহার্য।

১

গৃহদ্বারে পথপার্শ্বে

শ্যামা। এখনো কেন সময় নাহি হল
নাম-না-জানা অতিথি,
আঘাত হানিলে না দুয়ারে
কহিলে না, দ্বার খোলো।
হাজার লোকের মাঝে
রয়েছি একেলা যে,
এসো আমার হঠাৎ আলো
পরান চমকি' তোলো॥

আঁধার বাঁধা আমার ঘরে
জানি না কাঁদি কাহার তরে॥

চরণসেবার সাধনা আনো,
সকল দেবার বেদনা আনো,
নবীন প্রাণের জাগরমন্ত্র
কানে কানে বোলো॥

রাজপথে

প্রহরীগণ। রাজার আদেশ ভাই,
চোর ধরা চাই, চোর ধরা চাই,
কোথা তারে পাই?
যারে পাও তারে ধরো
কোনো ভয় নাই॥

বজ্রসেনের প্রবেশ

প্রহরী। ধর্ ধর্, ঐ চোর, ঐ চোর।

বজ্রসেন। নই আমি, নই নই নই চোর।

অন্যায় অপবাদে
আমারে ফেলো না ফাঁদে।
নই আমি নই চোর।

প্রহরী। ঐ বটে ঐ চোর ঐ চোর।

বজ্রসেন। এ কথা মিথ্যা অতি ঘোর।

আমি পরদেশী
হেথা নেই স্বজন বন্ধু কেহ মোর;
নই চোর, নই আমি, নই চোর।

শ্যামা। আহা মরি মরি,

মহেন্দ্রনিন্দিত কান্তি উন্নতদর্শন
কারে বন্দী ক'রে আনে চোরের মতন
কঠিন শৃঙ্খলে। শীঘ্র যা লো সহচরী,
বল্ গে নগরপালে মোর নাম করি,
শ্যামা ডাকিতেছে তারে। বন্দী সাথে লয়ে
একবার আসে যেন আমার আলয়ে
দয়া করি।

সহচরী। সুন্দরের বন্ধন নিষ্ঠুরের হাতে
ঘুচাবে কে;
নিঃসহায়ের অশ্রুবারি পীড়িতের চক্ষে
মুছাবে কে।
আর্তের ক্রন্দনে হেরো ব্যথিত বসুন্ধরা,
অন্যায়ের আক্রমণে বিষবাণে জর্জরা,
প্রবলের উৎপীড়নে কে বাঁচাবে দুর্বলেরে,
অপমানিতেরে কার দয়া বক্ষে লবে ডেকে।

প্রহরীদের প্রতি

শ্যামা। তোমাদের এ কী ভ্রান্তি,
কে ঐ পুরুষ দেবকান্তি,

প্রহরী, মরি মরি।
এমন ক'রে কি ওকে বাঁধে।
দেখে যে আমার প্রাণ কাঁদে।
বন্দী করেছ কোন্ দোষে ?

প্রহরী। চুরি হয়ে গেছে রাজকোষে
চোর চাই যে ক'রেই হোক্।
হোক-না সে যেই-কোনো লোক ;
নহিলে মোদের যাবে মান।

শ্যামা। নির্দোষী বিদেশীর রাখো প্রাণ,
দুই দিন মাগিনু সময়।

প্রহরী। রাখিব তোমার অনুনয় ;
দুই দিন কারাগারে রবে
তার পর যা হয় তা হবে।

বজ্রসেন। এ কী খেলা, হে সুন্দরী,
কিসের এ কৌতুক।
কেন দাও অপমান-দুখ,
মোরে নিয়ে কেন,
কেন এ কৌতুক।

শ্যামা। নহে নহে, নহে এ কৌতুক।
মোর অঙ্গের স্বর্ণ-অলংকার
সঁপি দিয়া, শৃঙ্খল তোমার
নিতে পারি নিজ দেহে। তব অপমানে
মোর অন্তরাত্মা আজি অপমান মানে।

বজ্রসেন। কোন্ অযাচিত আশার আলো
দেখা দিল রে তিমির রাত্রি ভেদি'
দুর্দিন দুর্যোগে,
কাহার মাধুরী বাজাইল করুণ বাঁশি।
অচেনা নির্মম ভুবনে
দেখিনু এ কী সহসা
কোন্ অজানার সুন্দর মুখে সান্ত্বনা হাসি॥

২

কারাঘর

শ্যামার প্রবেশ

বজ্রসেন। এ কী আনন্দ
হৃদয়ে দেহে ঘুচালে মম সকল বন্ধ।
দুঃখ আমার আজি হল যে ধন্য,
মৃত্যুগহনে লাগে অমৃত সুগন্ধ।
এলে কারাগারে
রজনীর পারে উষাসম,
মুক্তিরূপা অয়ি, লক্ষ্মী দয়াময়ী।

শ্যামা। বোলো না, বোলো না, আমি দয়াময়ী।
মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা।
এ কারাপ্রাচীরে শিলা আছে যত
নহে তা কঠিন আমার মতো।
আমি দয়াময়ী!
মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা।

বজ্রসেন। জেনো প্রেম চিরঋণী আপনারি হরষে,
জেনো, প্রিয়ে,
সব পাপ ক্ষমা করি ঋণশোধ করে সে।
কলঙ্ক যাহা আছে
দূর হয় তার কাছে,
কালিমার 'পরে তার অমৃত সে বরষে।

শ্যামা। হে বিদেশী, এসো এসো। হে আমার প্রিয়,
এই কথা স্মরণে রাখিয়ো,
তোমা সাথে এক স্রোতে ভাসিলাম আমি
হে হৃদয়স্বামী,
জীবনে মরণে প্রভু॥

বজ্রসেন। প্রেমের জোয়ারে ভাসাবে দোঁহারে
বাঁধন খুলে দাও, দাও দাও।
ভুলিব ভাবনা পিছনে চাব না
পাল তুলে দাও, দাও দাও।
প্রবল পবনে তরঙ্গ তুলিল
হৃদয় দুলিল, দুলিল দুলিল
পাগল হে নাবিক
ভুলাও দিগ্‌বিদিক
পাল তুলে দাও, দাও দাও॥

শ্যামা। চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে
নিয়ো না নিয়ো না সরায়ে।
জীবন মরণ সুখ দুখ দিয়ে
বক্ষে ধরিব জড়ায়ে॥
স্খলিত শিথিল কামনার ভার
বহিয়া বহিয়া ফিরি কত আর,
নিজ হাতে তুমি গেঁথে নিয়ো হার,
ফেলো না আমারে ছড়ায়ে॥
বিকায়ে বিকায়ে দীন আপনারে
পারি না ফিরিতে দুয়ারে দুয়ারে,
তোমার করিয়া নিয়ো গো আমারে
বরণের মালা পরায়ে॥

৩

বজ্রসেন ও শ্যামা

তরণীতে

শ্যামা। এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী।
তীরে বসে যায় যে বেলা, মরি গো মরি॥
ফুল ফোটানো সারা ক'রে
বসন্ত যে গেল স'রে

নিয়ে ঝরা ফুলের ডালা
বলো কী করি ॥
জল উঠেছে ছল্‌ছলিয়ে ঢেউ উঠেছে দুলে,
মর্‌মরিয়ে ঝরে পাতা বিজন তরুমূলে,
শূন্যমনে কোথায় তাকাস
সকল বাতাস সকল আকাশ
ঐ পারের ঐ বাঁশির সুরে
উঠে শিহরি ॥

বজ্রসেন। কহো কহো মোরে প্রিয়ে
আমারে করেছ মুক্ত কী সম্পদ দিয়ে।
অয়ি বিদেশিনী,
তোমারি কাছে আমি কত ঋণে ঋণী।

শ্যামা। নহে নহে নহে। সে কথা এখন নহে।

ঐ রে তরী দিল খুলে।
তোর বোঝা কে নেবে তুলে ॥
সামনে যখন যাবি ওরে,
থাক্ না পিছন পিছে প'ড়ে,
পিঠে তারে বইতে গেলে
একলা প'ড়ে রইবি কূলে ॥
ঘরের বোঝা টেনে টেনে
পারের ঘাটে রাখলি এনে
তাই যে তোরে বারে বারে
ফিরতে হল গেলি ভুলে।
ডাক্ রে আবার মাঝিরে ডাক্,
বোঝা তোমার যাক ভেসে যাক,
জীবনখানি উজাড় ক'রে
সঁপে দে তার চরণমূলে ॥

বজ্রসেন। কী করিয়া সাধিলে অসাধ্য ব্রত
কহো বিবরিয়া।

জানি যদি প্রিয়ে,
শোধ দিব এ জীবন দিয়ে
এই মোর পণ ॥

শ্যামা। নহে নহে নহে। সে কথা এখন নহে।
তোমা লাগি যা করেছি
কঠিন সে কাজ,
আরো সুকঠিন আজ
তোমারে সে কথা বলা।
বালক কিশোর উত্তীয় তার নাম,
ব্যর্থ প্রেমে মোর মত্ত অধীর।
মোর অনুনয়ে তব চুরি-অপবাদ
নিজ-'পরে লয়ে সঁপেছে আপন প্রাণ।
এ জীবনে মম ওগো সর্বোত্তম.
সর্বাধিক মোর এই পাপ
তোমার লাগিয়া ॥

বজ্রসেন। কাঁদিতে হবে রে, রে পাপিষ্ঠা,
জীবনে পাবি না শান্তি।
ভাঙিবে ভাঙিবে কলুষনীড় বজ্র-আঘাতে।
কোথা তুই লুকাবি মুখ মৃত্যু-আঁধারে ॥

শ্যামা। ক্ষমা করো নাথ, ক্ষমা করো।
এ পাপের যে অভিসম্পাত
হোক বিধাতার হাতে নিদারুণতর।
তুমি ক্ষমা করো।

বজ্রসেন। এ জন্মের লাগি
তোর পাপমূল্যে কেনা মহাপাপভাগী
এ জীবন করিলি ধিক্‌কৃত। কলঙ্কিনী
ধিক্ নিশ্বাস মোর তোর কাছে ঋণী।

শ্যামা। তোমার কাছে দোষ করি নাই,
দোষ করি নাই,
দোষী আমি বিধাতার পায়ে;

তিনি করিবেন রোষ—
সহিব নীরবে।
তুমি যদি না কর দয়া
সবে না, সবে না, সবে না ॥

বজ্রসেন তবু ছাড়িবে নে মোরে ?

শ্যামা। ছাড়িব না, ছাড়িব না।
তোমা লাগি পাপ নাথ,
তুমি করো মর্মাঘাত।
ছাড়িব না।

শ্যামাকে বজ্রসেনের হত্যার চেষ্টা

নেপথ্যে। হায়, এ কি সমাপন !
অমৃতপাত্র ভাঙিলি,
করিলি মৃত্যুরে সমর্পণ।
এ দুর্লভ প্রেম মূল্য হারালো, হারালো,
কলঙ্কে, অসম্মানে ॥

৪

পথিক রমণী

সব কিছু কেন নিল না, নিল না,
নিল না ভালোবাসা।
আপনাতে কেন মিটাল না যত কিছু দ্বন্দ্বেরে—
ভালো আর মন্দেরে।
নদী নিয়ে আসে পঙ্কিল জলধারা
সাগর-হৃদয়ে গহনে হয় হারা,
ক্ষমার দীপ্তি দেয় স্বর্গের আলো
প্রেমের আনন্দে রে ॥ [প্রস্থান

বজ্রসেন। ক্ষমিতে পারিলাম না যে
ক্ষমো হে মম দীনতা—
পাপীজনশরণ প্রভু।

মরিছে তাপে মরিছে লাজে
প্রেমের বলহীনতা,
ক্ষমো হে মম দীনতা।
প্রিয়ারে নিতে পারি নি বুকে, প্রেমেরে আমি হেনেছি,
পাপীরে দিতে শাস্তি শুধু পাপেরে ডেকে এনেছি,
জানি গো তুমি ক্ষমিবে তারে
যে অভাগিনী পাপের ভারে
চরণে তব বিনতা,
ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না
আমার ক্ষমাহীনতা ॥

এসো এসো এসো প্রিয়ে
মরণলোক হতে নূতন প্রাণ নিয়ে।
নিষ্ফল মম জীবন,
নীরস মম ভুবন
শূন্য হৃদয় পূরণ করো মাধুরীসুধা দিয়ে ॥

নূপুর কুড়াইয়া লইয়া

হায় রে নূপুর,
তার করুণ চরণ ত্যজিলি, হারালি কলগুঞ্জনসুর।
নীরব ক্রন্দনে বেদনাবন্ধনে
রাখিলি ধরিয়া বিরহ ভরিয়া স্মরণ সুমধুর।
তোর ঝংকারহীন ধিক্কারে কাঁদে প্রাণ মম নিষ্ঠুর ॥

শ্যামার প্রবেশ

শ্যামা। এসেছি প্রিয়তম।
ক্ষমো মোরে ক্ষমো।
গেল না, গেল না কেন কঠিন পরান মম
তব নিঠুর করুণ করে।
বজ্রসেন। কেন এলি, কেন এলি, কেন এলি ফিরে—
যাও যাও চলে যাও। [শ্যামার প্রণাম ও প্রস্থান

বজ্রসেন। ধিক্ ধিক্ ওরে মুগ্ধ,
কেন চাস্ ফিরে ফিরে।
এ যে দূষিত নিষ্ঠুর স্বপ্ন
এ যে মোহবাষ্পঘন কুজ্ঝটিকা,
দীর্ণ করিবি না কি রে।
অশুচি প্রেমের উচ্ছিষ্টে
নিদারুণ বিষ,
লোভ না রাখিস
প্রেতবাস তোর ভগ্ন মন্দিরে॥
নির্মম বিচ্ছেদসাধনায়
পাপ ক্ষালন হোক,
না করো মিথ্যা শোক,
দুঃখের তপস্বী রে,
স্মৃতিশৃঙ্খল করো ছিন্ন,
আয় বাহিরে
আয় বাহিরে॥

নেপথ্যে। কঠিন বেদনার তাপস দোঁহে,
যাও চিরবিরহের সাধনায়,
ফিরো না, ফিরো না, ভুলো না মোহে।
গভীর বিষাদের শান্তি পাও হৃদয়ে,
জয়ী হও অন্তর বিদ্রোহে॥
যাক পিয়াসা, ঘুচুক দুরাশা,
যাক মিলায়ে কামনা-কুয়াশা।
স্বপ্ন-আবেশবিহীন পথে
যাও বাঁধন-হারা,
তাপবিহীন মধুর স্মৃতি নীরবে ব'হে॥

আশ্বিন ১৩৪৩
শান্তিনিকেতন

উপন্যাস ও গল্প

তিন সঙ্গী

তিন সঙ্গী

রবিবার

আমার গল্পের প্রধান মানুষটি প্রাচীন ব্রাহ্মণপণ্ডিত-বংশের ছেলে। বিষয়ব্যাপারে বাপ ওকালতি ব্যবসায়ে আঁটি পর্যন্ত পাকা, ধর্মকর্মে শাক্ত আচারের তীব্র জারক রসে জারিত। এখন আদালতে আর প্র্যাকটিস করতে হয় না। এক দিকে পূজা-অর্চনা আর-এক দিকে ঘরে বসে আইনের পরামর্শ দেওয়া, এই দুটোকে পাশাপাশি রেখে তিনি ইহকাল পরকালের জোড় মিলিয়ে অতি সাবধানে চলেছেন। কোনো দিকেই একটু পা ফসকায় না।

এই রকম নিরেট আচারবাঁধা সনাতনী ঘরের ফাটল ফুঁড়ে যদি দৈবাৎ কাঁটাওয়ালা নাস্তিক ওঠে গজিয়ে, তা হলে তার ভিত-দেয়াল-ভাঙা মন সাংঘাতিক ঠেলা মারতে থাকে ইঁটকাঠের প্রাচীন গাঁথুনির উপরে। এই আচারনিষ্ঠ বৈদিক ব্রাহ্মণের বংশে দুর্দান্ত কালাপাহাড়ের অভ্যুদয় হল আমাদের নায়কটিকে নিয়ে।

তার আসল নাম অভয়াচরণ। এই নামের মধ্যে কুলধর্মের যে ছাপ আছে সেটা দিল সে ঘষে উঠিয়ে। বদল ক'রে করলে অভীককুমার। তা ছাড়া ও জানে যে প্রচলিত নমুনার মানুষ ও নয়। ওর নামটা ভিড়ের নামের সঙ্গে হাটে-বাজারে ঘেঁষাঘেঁষি করে ঘর্মাক্ত হবে সেটা ওর রুচিতে বাধে।

অভীকের চেহারাটা আশ্চর্য রকমের বিলিতি ছাঁদের। আঁট লম্বা দেহ গৌরবর্ণ, চোখ কটা, নাক তীক্ষ্ণ, চিবুকটা ঝুঁকেছে যেন কোনো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভঙ্গিতে। আর ওর মুষ্টিযোগ ছিল অমোঘ, সহপাঠীরা যারা কদাচিৎ এর পাণিপীড়ন সহ্য করেছে তারা একে শতহস্ত দূরে বর্জনীয় ব'লে গণ্য করত।

ছেলের নাস্তিকতা নিয়ে বাপ অম্বিকাচরণ বিশেষ উদ্‌বিগ্ন ছিলেন না। মস্ত তাঁর নজির ছিল প্রসন্ন ন্যায়রত্ন, তাঁর আপন জেঠামশায়। বৃদ্ধ ন্যায়রত্ন তর্কশাস্ত্রের গোলন্দাজ, চতুষ্পাঠীর মাঝখানে বসে অনুস্বার-বিসর্গওয়ালা গোলা দাগেন ঈশ্বরের অস্তিত্ববাদের উপরে। হিন্দুসমাজ হেসে বলে 'গোলা খা ডালা', দাগ পড়ে না সমাজের পাকা প্রাচীরের উপরে। আচারধর্মের খাঁচাটাকে ঘরের দাওয়ায় ঝুলিয়ে রেখে

ধর্মবিশ্বাসের পাখিটাকে শূন্য আকাশে উড়িয়ে দিলে সাম্প্রদায়িক অশান্তি ঘটে না। কিন্তু অভীক কথায় কথায় লোকাচারকে চালান দিত ভাঙা কুলোয় চড়িয়ে ছাইয়ের গাদার উদ্দেশে। ঘরের চার দিকে মোরগদম্পতিদের অপ্রতিহত সঞ্চরণ সর্বদাই মুখরধ্বনিতে প্রমাণ করত তাদের উপর বাড়ির বড়োবাবুর আভ্যন্তরিক আকর্ষণ। এ-সমস্ত ম্লেচ্ছাচারের কথা ক্ষণে ক্ষণে বাপের কানে পৌঁচেছে, সে তিনি কানে তুলতেন না। এমন কি, বন্ধুভাবে যে ব্যক্তি তাঁকে খবর দিতে আসত, সগর্জনে দেউড়ির অভিমুখে তার নির্গমনপথ দ্রুত নির্দেশ করা হত। অপরাধ অত্যন্ত প্রত্যক্ষ না হলে সমাজ নিজের গরজে তাকে পাশ কাটিয়ে যায়। কিন্তু অবশেষে অভীক একবার এত বাড়াবাড়ি করে বসল যে তার অপরাধ অস্বীকার করা অসম্ভব হল। ভদ্রকালী ওদের গৃহদেবতা, তাঁর খ্যাতি ছিল জাগ্রত ব'লে। অভীকের সতীর্থ বেচারা ভজু ভারি ভয় করত ওই দেবতার অপ্রসন্নতা। তাই অসহিষ্ণু হয়ে তার ভক্তিকে অশ্রদ্ধেয় প্রমাণ করবার জন্যে পুজোর ঘরে অভীক এমন-কিছু অনাচার করেছিল যাতে ওর বাপ আগুন হয়ে ব'লে উঠলেন, 'বেরো আমার ঘর থেকে, তোর মুখ দেখব না।' এতবড়ো ক্ষিপ্রবেগের কঠোরতা নিয়মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণপণ্ডিত-বংশের চরিত্রেই সম্ভব।

ছেলে মাকে গিয়ে বললে, "মা, দেবতাকে অনেককাল ছেড়েছি, এমন অবস্থায় আমাকে দেবতার ছাড়াটা নেহাত বাহুল্য। কিন্তু জানি বেড়ার ফাঁকের মধ্য দিয়ে হাত বাড়ালে তোমার প্রসাদ মিলবেই। ওইখানে কোনো দেবতার দেবতাগিরি খাটে না, তা যত বড়ো জাগ্রত হোন-না তিনি।"

মা চোখের জল মুছতে মুছতে আঁচল থেকে খুলে ওকে একখানি নোট দিতে গেলেন। ও বললে, "ওই নোটখানায় যখন আমার অত্যন্ত বেশি দরকার আর থাকবে না তখনই তোমার হাত থেকে নেব। অলক্ষ্মীর সঙ্গে কারবার করতে জোর লাগে, ব্যাঙ্কনোট হাতে নিয়ে তাল ঠোকা যায় না।"

অভীকের সম্বন্ধে আরও দুটো-একটা কথা বলতে হবে। জীবনে ওর দুটি উলটো জাতের শখ ছিল, এক কলকারখানা জোড়াতাড়া দেওয়া, আর-এক ছবি আঁকা। ওর বাপের ছিল তিনখানা মোটরগাড়ি, তাঁর মফস্বল-অভিযানের বাহন। যন্ত্রবিদ্যায় ওর হাতেখড়ি সেইগুলো নিয়ে। তা ছাড়া তাঁর ক্লায়েন্টের ছিল মোটরের কারখানা, সেইখানে ও শখ ক'রে বেগার খেটেছে অনেকদিন।

অভীক ছবি আঁকা শিখতে গিয়েছিল সরকারী আর্টস্কুলে। কিছুকালের মধ্যেই ওর এই বিশ্বাস দৃঢ় হল যে, আর বেশিদিন শিখলে ওর হাত হবে কলে-তৈরি, ওর মগজ হবে ছাঁচে-ঢালা। ও আর্টিস্ট, সেই কথাটা প্রমাণ করতে লাগল নিজের জোর

আওয়াজে। প্রদর্শনী বের করলে ছবির, কাগজের বিজ্ঞাপনে তার পরিচয় বেরল আধুনিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ আর্টিস্ট অভীককুমার, বাঙালি টিশিয়ান। ও যতই গর্জন করে বললে 'আমি আর্টিস্ট', ততই তার প্রতিধ্বনি উঠতে থাকল একদল লোকের ফাঁকা মনের গুহায়, তারা অভিভূত হয়ে গেল। শিষ্য এবং তার চেয়ে বেশি সংখ্যক শিষ্যা জমল ওর পরিমণ্ডলীতে। তারা বিরুদ্ধদলকে আখ্যা দিল ফিলিস্টাইন। বলল বুর্জোয়া।

অবশেষে দুর্দিনের সময় অভীক আবিষ্কার করলে যে তার ধনী পিতার তহবিলের কেন্দ্র থেকে আর্টিস্টের নামের 'পরে যে রজতচ্ছটা বিচ্ছুরিত হত তারই দীপ্তিতে ছিল তার খ্যাতির অনেকখানি উজ্জ্বলতা। সঙ্গে সঙ্গে সে আর-একটি তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিল যে অর্থভাগ্যের বঞ্চনা উপলক্ষ্য করে মেয়েদের নিষ্ঠায় কোনো ইতরবিশেষ ঘটে নি। উপাসিকারা শেষ পর্যন্ত দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে উচ্চমধুর কণ্ঠে তাকে বলছে আর্টিস্ট। কেবল নিজেদের মধ্যে পরস্পরকে সন্দেহ করেছে যে স্বয়ং তারা দুই-একজন ছাড়া বাকি সবাই আর্টের বোঝে না কিছুই, ভণ্ডামি করে, গা জ্বলে যায়।

অভীকের জীবনে এর পরবর্তী ইতিহাস সুদীর্ঘ এবং অস্পষ্ট। ময়লা টুপি আর তেলকালিমাখা নীলরঙের জামা-ইজের প'রে বার্নকোম্পানির কারখানায় প্রথমে মিস্ত্রিগিরি ও পরে হেডমিস্ত্রির কাজ পর্যন্ত চালিয়ে দিয়েছে। মুসলমান খালাসিদের দলে মিশে চার পয়সার পরোটা আর তার চেয়ে কম দামের শাস্ত্রনিষিদ্ধ পশুমাংস খেয়ে ওর দিন কেটেছে সস্তায়। লোকে বলেছে, ও মুসলমান হয়েছে ; ও বলেছে, মুসলমান কি নাস্তিকের চেয়েও বড়ো। হাতে যখন কিছু টাকা জমল তখন অজ্ঞাতবাস থেকে বেরিয়ে এসে আবার সে পূর্ণ পরিস্ফুট আর্টিস্টরূপে বোহেমিয়ানি করতে লেগে গেল। শিষ্য জুটল, শিষ্যা জুটল। চশমাপরা তরুণীরা তার স্টুডিয়োতে আধুনিক বে-আব্রু রীতিতে যে-সব নগ্নমনস্তত্ত্বের আলাপ-আলোচনা করতে লাগল, ঘন সিগারেটের ধোঁয়া জমল তার কালিমা আবৃত করে। পরস্পর পরস্পরের প্রতি কটাক্ষপাত ও অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বললে, পজিটিভ্‌লি ভাল্‌গর।

বিভা ছিল এই দলের একেবারে বাইরে। কলেজের প্রথম ধাপের কাছেই অভীকের সঙ্গে ওর আলাপ শুরু। অভীকের বয়স তখন আঠারো, চেহারায় নবযৌবনের তেজ ঝক্‌ঝক্ করছে, আর তার নেতৃত্ব বড়োবয়সের ছেলেরাও স্বভাবতই নিয়েছে স্বীকার করে।

ব্রাহ্মসমাজে মানুষ হয়ে পুরুষদের সঙ্গে মেশবার সংকোচ বিভার ছিল না। কিন্তু কলেজে বাধা ঘটল। তার প্রতি কোনো কোনো ছেলের অশিষ্টতা হাসিতে কটাক্ষে

ইঙ্গিতে আভাসে স্ফুরিত হয়েছে। কিন্তু একদিন একটি শহুরে ছেলের অভদ্রতা বেশ একটু গায়ে-পড়া হয়ে প্রকাশ পেল। সেটা অভীকের চোখে পড়তেই সেই ছেলেটাকে বিভার কাছে হিড়্‌হিড়্‌ করে টেনে নিয়ে এসে বললে, 'মাপ চাও'। মাপ তাকে চাইতেই হল নতশিরে আমতা আমতা করে। তার পর থেকে অভীক দায় নিল বিভার রক্ষাকর্তার। তা নিয়ে সে অনেক বক্রোক্তির লক্ষ্য হয়েছে, সমস্তই ঠিকরে পড়েছে তার চওড়া বুকের উপর থেকে। সে গ্রাহ্যই করে নি। বিভা লোকের কানাকানিতে অত্যন্ত সংকোচ বোধ করেছে কিন্তু সেই সঙ্গে তার মনে একটা রোমাঞ্চকর আনন্দও দিয়েছিল।

বিভার চেহারায় রূপের চেয়ে লাবণ্য বড়ো। কেমন করে মন টানে ব্যাখ্যা করে বলা যায় না। অভীক ওকে একদিন বলেছিল, "অনাহূতের ভোজে মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ। কিন্তু তোমার সৌন্দর্য ইতরজনের মিষ্টান্ন নয়। ও কেবল আর্টিস্টের; লিওনার্ডো ডা ভিঞ্চির ছবির সঙ্গেই মেলে, ইনস্ক্রুটেব্‌ল্‌।"

একদা কলেজের পরীক্ষায় বিভা অভীককে ডিঙিয়ে গিয়েছিল, তা নিয়ে তার অজস্র কান্না আর বিষম রাগ। এ যেন তার নিজের অসম্মান। বললে, "তুমি দিনরাত কেবল ছবি এঁকে এঁকে পরীক্ষায় পিছিয়ে পড়, আমার লজ্জা করে।"

কথাটা দৈবাৎ পাশের বারান্দা থেকে কানে যেতেই বিভার এক সখী চোখ টিপে বলেছিল, "মরি মরি, তোমারি গরবে গরবিনী আমি, রূপসী তোমারি রূপে।"

অভীক বললে, "মুখস্থ বিদ্যার দিগ্‌গজেরা জানেই না আমি কোন্‌ মার্কাশূন্য পরীক্ষায় পাশ করে চলেছি। আমার ছবি আঁকা নিয়ে তোমার চোখে জল পড়ে, আর তোমার শুকনো পণ্ডিতি দেখে আমার চোখের জল শুকিয়ে গেল। কিছুতেই বুঝবে না, কেননা তোমরা নামজাদা দলের পায়ের তলায় থাক চোখ বুজে, আর আমরা থাকি বদনামি দলের শিরোমণি হয়ে।"

এই ছবির ব্যাপারে দুজনের মধ্যে তীব্র একটা দ্বন্দ্ব ছিল। বিভা অভীকের ছবি বুঝতেই পারত না সেকথা সত্যি। অন্য মেয়েরা যখন ওর আঁকা যা-কিছু নিয়ে হই-হই করত, সভা করে গলায় মালা পরাত, সেটাকে বিভা অশিক্ষিতের ন্যাকামি মনে করে লজ্জা পেত। কিন্তু তীব্র ক্ষোভে ছট্‌ফট্‌ করেছে অভীকের মন বিভার অভ্যর্থনা না পেয়ে। দেশের লোকে ওর ছবিকে পাগলামি বলে গণ্য করছে, বিভাও যে মনে মনে তাদেরই সঙ্গে যোগ দিতে পারলে এইটেই ওর কাছে অসহ্য। কেবলই এই কল্পনা ওর মনে জাগে যে, একদিন ও য়ুরোপে যাবে আর সেখানে যখন জয়ধ্বনি উঠবে তখন বিভাও বসবে জয়মাল্য গাঁথতে।

রবিবার সকালবেলা। ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা থেকে ফিরে এসেই বিভা দেখতে পেলে অভীক বসে আছে তার ঘরে। বইয়ের পার্সেলের ব্রাউন মোড়ক ছিল আবর্জনার ঝুড়িতে। সেইটে নিয়ে কালি-কলমে একখানা আঁচড়কাটা ছবি আঁকছিল।

বিভা জিজ্ঞাসা করল, "হঠাৎ এখানে যে।"

অভীক বললে, "সংগত কারণ দেখাতে পারি, কিন্তু সেটা হবে গৌণ, মুখ্য কারণটা খুলে বললে সেটা হয়তো সংগত হবে না। আর যাই হোক, সন্দেহ কোরো না যে চুরি করতে এসেছি।"

বিভা তার ডেস্কের চৌকিতে গিয়ে বসল, বললে, "দরকার যদি হয় না-হয় চুরি করলে, পুলিসে খবর দেব না।"

অভীক বললে, "দরকারের হাঁ-করা মুখের সামনে তো নিত্যই আছি। পরের ধন হরণ করা অনেক ক্ষেত্রেই পুণ্যকর্ম, পারি নে পাছে অপবাদটা দাগা দেয় পবিত্র নাস্তিক মতকে। ধার্মিকদের চেয়ে আমাদের অনেক বেশি সাবধানে চলতে হয় আমাদের নেতি দেবতার ইজ্জত বাঁচাতে।"

"অনেকক্ষণ তুমি বসে আছ ?

"তা আছি, বসে বসে সাইকলজির একটা দুঃসাধ্য প্রব্লেম মনে মনে নাড়াচাড়া করছি যে তুমি পড়াশুনো করেছ, আর বাইরে থেকে দেখে মনে হয় বুদ্ধিসুদ্ধিও কিছু আছে, তবু ভগবানকে বিশ্বাস কর কী করে। এখনও সমাধান করতে পারি নি। বোধ হয় বার বার তোমার এই ঘরে এসে এই রিসর্চের কাজটা আমাকে সম্পূর্ণ করে নিতে হবে।"

"আবার বুঝি আমার ধর্মকে নিয়ে লাগলে ?"

"তার কারণ তোমার ধর্ম যে আমাকে নিয়ে লেগেছে। আমাদের মধ্যে যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে সেটা মর্মঘাতী। সে আমি ক্ষমা করতে পারি নে। তুমি আমাকে বিয়ে করতে পার না, যেহেতু তুমি যাকে বিশ্বাস কর আমি তাকে করি নে বুদ্ধি আছে ব'লে। কিন্তু তোমাকে বিয়ে করতে আমার তো কোনো বাধা নেই তুমি অবুঝের মতো সত্য মিথ্যে যাই বিশ্বাস কর-না কেন। তুমি তো নাস্তিকের জাত মারতে পার না। আমার ধর্মের শ্রেষ্ঠতা এইখানে। সব দেবতার চেয়ে তুমি আমার কাছে প্রত্যক্ষ সত্য, এ কথা ভুলিয়ে দেবার জন্যে একটি দেবতাও নেই আমার সামনে।"

বিভা চুপ করে বসে রইল। খানিকবাদে অভীক বলে উঠল, "তোমার ভগবান কি আমার বাবারই মতো। আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছেন ?"

"আঃ কী বকছ।"

অভীক জানে বিয়ে না করবার শক্ত কারণটা কোন্‌খানে। কথাটা বিভাকে দিয়ে বলিয়ে নিতে চায়, বিভা চুপ করে থাকে।

জীবনের আরম্ভ থেকেই বিভা তার বাবারই মেয়ে সম্পূর্ণরূপে। এত ভালোবাসা, এত ভক্তি সে আর-কোনো মানুষকে দিতে পারে নি। তার বাপ সতীশও এই মেয়েটির উপরে তাঁর অজস্র স্নেহ ঢেলে দিয়েছেন। তাই নিয়ে ওর মার মনে একটু ঈর্ষা ছিল। বিভা হাঁস পুষেছিল, তিনি কেবলই খিট্‌খিট্ করে বলেছিলেন, 'ওগুলো বড্ড বেশি কঁ্যাক্ কঁ্যাক্ করে।' বিভা আসমানি রঙের শাড়ি জ্যাকেট করিয়েছিল, মা বলেছিলেন, 'এ কাপড় বিভার রঙে একটুও মানায় না।' বিভা তার মামাতো বোনকে খুব ভালোবাসত। তার বিয়েতে যেতে চাইলেই মা বলে বসলেন, 'সেখানে ম্যালেরিয়া।'

মায়ের কাছ থেকে পদে পদে বাধা পেয়ে পেয়ে বাপের উপরে বিভার নির্ভর আরও গভীর এবং মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল।

মার মৃত্যু হয় প্রথমেই। তার পরে ওর বাপের সেবা অনেকদিন পর্যন্ত ছিল বিভার জীবনের একমাত্র ব্রত। এই স্নেহশীল বাপের সমস্ত ইচ্ছাকে সে নিজের ইচ্ছা করে নিয়েছে। সতীশ তাঁর বিষয়সম্পত্তি দিয়ে গেছেন মেয়েকে। কিন্তু ট্রাস্টীর হাতে। নিয়মিত মাসহারা বরাদ্দ ছিল। মোট টাকাটা ছিল উপযুক্ত পাত্রের উদ্দেশে বিভার বিবাহের অপেক্ষায়। বাপের আদর্শে এই উপযুক্ত পাত্র কে তা বিভা জানত। অন্তত অনুপযুক্ত যে কে তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। একদিন অভীক এ কথা তুলেছিল, বলেছিল, "যাঁকে তুমি কষ্ট দিতে চাও না, তিনি তো নেই, আর কষ্ট যাকে নিষ্ঠুর ভাবে বাজে, সেই লোকটাই আছে বেঁচে। হাওয়ায় তুমি ছুরি মারতে ব্যথা পাও, আর দরদ নেই এই রক্তমাংসের বুকের 'পরে।" শুনে বিভা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। অভীক বুঝেছিল, ভগবানকে নিয়ে তর্ক চলতে পারে, কিন্তু বাবাকে নিয়ে নয়।

বেলা প্রায় দশটা। বিভার ভাইঝি সুস্মি এসে বললে, "পিসিমা বেলা হয়েছে।" বিভা তার হাতে চাবির গোছা ফেলে দিয়ে বললে, "তুই ভাঁড়ার বের করে দে। আমি এখনি যাচ্ছি।"

বেকারদের কাজের বাঁধা সীমা না থাকাতেই কাজ বেড়ে যায়। বিভার সংসারও সেইরকম। সংসারের দায়িত্ব আত্মীয়পক্ষে হালকা ছিল বলেই অনাত্মীয়পক্ষে হয়েছে বহুবিস্তৃত। এই ওর আপনগড়া সংসারের কাজ নিজের হাতে করাই ওর অভ্যাস, চাকরবাকর পাছে কাউকে অবজ্ঞা করে। অভীক বললে, "অন্যায় হবে তোমার এখনই

যাওয়া, কেবল আমার 'পরে নয়, সুস্মির 'পরেও। ওকে স্বাধীন কর্তৃত্বের সময় দাও না কেন। ডোমিনিয়ন স্টাটস্, অন্তত আজকের মতো। তা ছাড়া আমি তোমাকে নিয়ে একটা পরীক্ষা করতে চাই, কখনও তোমাকে কাজের কথা বলি নি। আজ বলে দেখব। নতুন অভিজ্ঞতা হবে।"

বিভা বললে, "তাই হোক, বাকি থাকে কেন।"

পকেট থেকে অভীক চামড়ার কেস বের করে খুলে দেখালে। একটা কবজিঘড়ি। ঘড়িটা প্লাটিনমের, সোনার মণিবন্ধ, হীরের টুকরোর ছিট দেওয়া। বললে, "তোমাকে বেচতে চাই।"

"অবাক করেছ, বেচবে ?"

"হাঁ, বেচব, আশ্চর্য হও কেন।"

বিভা মুহূর্তকাল স্তব্ধ থেকে বললে, "এই ঘড়ি যে মনীষা তোমাকে জন্মদিনে দিয়েছিল। মনে হচ্ছে তার বুকের ব্যথা এখনও ওর মধ্যে ধুক্‌ধুক্ করছে। জান সে কত দুঃখ পেয়েছিল, কত নিন্দে সয়েছিল আর কত দুঃসাধ্য অপব্যয় করেছিল উপহারটাকে তোমার উপযুক্ত করবার জন্যে ?"

অভীক বললে, "এ ঘড়ি সেই তো দিয়েছিল, কে দিয়েছে শেষ পর্যন্ত জানতেই দেয় নি। কিন্তু আমি তো পৌত্তলিক নই যে বুকের পকেটে এই জিনিসটার বেদি বাঁধিয়ে মনের মধ্যে দিনরাত শাঁখঘণ্টা বাজাতে থাকব।"

"আশ্চর্য করেছ তুমি। এই ক'মাস হল সে টাইফয়েডে—"

"এখন সে তো সুখদুঃখের অতীত।"

"শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে এই বিশ্বাস নিয়ে মরেছিল যে তুমি তাকে ভালোবাসতে।"

"ভুল বিশ্বাস করে নি।"

"তবে ?"

"তবে আবার কী। সে নেই, কিন্তু তার ভালোবাসার দান আজও যদি আমাকে ফল দেয় তার চেয়ে আর কী হতে পারে।"

বিভার মুখে অত্যন্ত একটা পীড়ার লক্ষণ দেখা দিল। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, "এত দেশ থাকতে আমার কাছে বেচতে এলে কেন।"

"কেননা জানি তুমি দর-কষাকষি করবে না।"

"তার মানে কলকাতার বাজারে আমিই কেবল ঠকবার জন্যে তৈরি হয়ে আছি ?"

"তার মানে ভালোবাসা খুশি হয়ে ঠকে।"

এমন মানুষের 'পরে রাগ করা শক্ত, জোরের সঙ্গে বুক ফুলিয়ে ছেলেমানুষি।

কিছুতে যে লজ্জার কারণ আছে তা যেন ও জানেই না। এই ওর অকৃত্রিম অবিবেক, এই যে উচিত-অনুচিতের বেড়া অনায়াসে লাফ দিয়ে ডিঙিয়ে চলা, এতেই মেয়েদের স্নেহ ওকে এত করে টানে। ভর্ৎসনা করবার জোর পায় না। কর্তব্যবোধকে যারা অত্যন্ত সামলে চলে মেয়েরা তাদের পায়ের ধুলো নেয়। আর যে-সব দুর্দাম দুরন্তের কোনো বালাই নেই ন্যায়-অন্যায়ের, মেয়েরা তাদের বাহুবন্ধনে বাঁধে।

ডেস্কের ব্লটিঙকাগজটার উপর খানিকক্ষণ নীল পেনসিলের দাগ-কাটাকাটি করে শেষকালে বিভা বললে, "আচ্ছা, যদি আমার হাতে টাকা থাকে তবে অমনি তোমাকে দেব। কিন্তু তোমার ওই ঘড়ি আমি কিছুতেই কিনব না।"

উত্তেজিত কণ্ঠে অভীক বললে, "ভিক্ষা? তোমার সমান ধনী যদি হতুম, তা হলে তোমার দান নিতুম উপহার বলে, দিতুম প্রত্যুপহার সমান দামের। আচ্ছা, পুরুষের কর্তব্য আমিই বরঞ্চ করছি। এই নাও এই ঘড়ি, এক পয়সাও নেব না।"

বিভা বললে, "মেয়েদের তো নেবারই সম্বন্ধ। তাতে কোনো লজ্জা নেই। তাই ব'লে এ ঘড়ি নয়। আচ্ছা শুনি, কেন তুমি ওটা বিক্রি করছ।"

"তবে শোনো, তুমি তো জান, আমার অত্যন্ত বেহায়া একটা ফোর্ড গাড়ি আছে। সেটার চালচলনের ঢিলেমি অসহ্য। কেবল আমি বলেই ওর দশম দশা ঠেকিয়ে রেখেছি। আটশো টাকা দিলেই ওর বদলে ওর বাপদাদার বয়সী একটা পুরোনো ক্রাইসলার পাবার আশা আছে। তাকে নতুন করে তুলতে পারব আমার নিজের হাতের গুণে।"

"কী হবে ক্রাইসলারের গাড়িতে।"

"বিয়ে করতে যাব না।"

"এমন ভদ্র কাজ তুমি করবে, এ সম্ভব নয়।"

"ধরেছ ঠিক। তা হলে প্রথমে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি— শীলাকে দেখেছ, কুলদা মিস্ত্রিরের মেয়ে?"

"দেখেছি তোমারই পাশে যখন-তখন যেখানে-সেখানে।"

"আমার পাশেই ও বুক ফুলিয়ে জায়গা করে নিয়েছে আরও পাঁচজনকে ঠেকিয়ে। ও যে প্রগতিশীলা। ভদ্রসম্প্রদায়ের পিলে চমকে যাবে, এইটেতেই ওর আনন্দ।"

"শুধু কি তাই, মেয়ে-সম্প্রদায়ের বুকে শেল বিঁধবে, তাতেও আনন্দ কম নয়।"

"আমারও মনে ছিল ওই কথাটা, তোমার মুখে শোনাল ভালো। আচ্ছা মন খুলে বলো, ওই মেয়েটির সৌন্দর্য কি অন্যায় রকমের নয়, যাকে বলা যেতে পারে বিধাতার বাড়াবাড়ি।"

"সুন্দরী মেয়ের বেলাতেই বিধাতাকে মান বুঝি?"

"নিন্দে করবার দরকার হলে যেমন করে হোক একটা প্রতিপক্ষ খাড়া করতে হয়। দুঃখের দিনে যখন অভিমান করবার তাগিদ পড়েছিল, তখন রামপ্রসাদ মা'কে খাড়া করে বলেছিলেম, তোমাকে মা ব'লে আর ডাকব না। এতদিন ডেকে যা ফল হয়েছিল, না ডেকেও ফল তার চেয়ে বেশি হবে না, মাঝের থেকে নিন্দে করবার ঝাঁজটা ভক্ত মিটিয়ে নিলেন। আমিও নিন্দে করবার বেলায় বিধাতার নাম নিয়েছি।"

"নিন্দে কিসের।"

"বলছি। শীলাকে আমার গাড়িতে নিয়ে যাচ্ছিলুম ফুটবলের মাঠ থেকে খড়্‌খড়্‌ শব্দ করতে করতে, পিছনের পদাতিকদের নাসারন্ধ্রে ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে। এমনসময় পাকড়াশিগিন্নি— ওকে জান তো, লম্বা গজের অত্যুক্তিতেও ওকে চলনসই বলতে গেলে বিষম খেতে হয়— সে আসছিল কোথা থেকে তার নতুন একটা ফায়াট গাড়িতে। হাত তুলে আমাদের গাড়িটা থামিয়ে দিয়ে পথের মধ্যে খানিকক্ষণ হাঁ-ভাই-ও-ভাই করে নিলে। আর ক্ষণে ক্ষণে আড়ে আড়ে তাকাতে লাগল আমার রঙ-চটে-যাওয়া গাড়ির হুড্‌ আর জরাজীর্ণ পাদানটার দিকে। তোমাদের ভগবান যদি সাম্যবাদী হতেন, তা হলে মেয়েদের চেহারায় এত বেশি উঁচুনিচু ঘটিয়ে রাস্তায় ঘাটে এ রকম মনের আগুন জ্বালিয়ে দিতেন না।"

"তাই বুঝি তুমি—"

"হাঁ, তাই ঠিক করেছি, যত শিগ্‌গির পারি শীলাকে ক্রাইসলারের গাড়িতে চড়িয়ে পাকড়াশিগিন্নির নাকের সামনে দিয়ে শিঙা বাজিয়ে চলে যাব। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্যি করে বলো, তোমার মনে একটুখানি খোঁচা কি—"

"আমাকে এর মধ্যে টান কেন। বিধাতা আমার রূপ নিয়ে তো খুব বেশি বাড়াবাড়ি করেন নি। আর আমার গাড়িখানাও তোমার গাড়িখানার উপর টেক্কা দেবার যোগ্য নয়।"

অভীক তাড়াতাড়ি চৌকি থেকে উঠে মেঝের উপর বিভার পায়ের কাছে বসে তার হাত চেপে ধরে বললে, "কার সঙ্গে কার তুলনা। আশ্চর্য, তুমি আশ্চর্য, আমি বলছি, তুমি আশ্চর্য। আমি তোমাকে দেখি আর আমার ভয় হয় কোন্‌দিন ফস করে মেনে বসব তোমার ভগবানকে। শেষে কোনো কালে আর আমার পরিত্রাণ থাকবে না। তোমার ঈর্ষা আমি কিছুতেই জাগাতে পারলুম না। অন্তত সেটা জানতে দিলে না আমাকে। অথচ তুমি জান—"

"চুপ করো। আমি কিছু জানি নে। কেবল জানি অদ্ভুত, তুমি অদ্ভুত, সৃষ্টি-

কর্তার তুমি অট্টহাসি।"

অভীক বললে, "আমাকে তুমি মুখ ফুটে বলবে না, কিন্তু নিশ্চিত বুঝতে পারি, শীলার সম্বন্ধে তুমি আমার সাইকলজি জানতে চাও। ওকে আমার ঘোরতর অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে। অল্পবয়সে যেমন করে সিগারেট অভ্যাস হয়েছিল। মাথা ঘুরত তবু ছাড়তুম না। মুখে লাগত তিতো, মনে লাগত গর্ব। ও জানে কী করে দিনে দিনে মৌতাত জমিয়ে তুলতে হয়। মেয়েদের ভালোবাসায় যে মদটুকু আছে, সেটাতে আমার ইন্‌স্‌পিরেশন। আমি আর্টিস্ট। ও যে আমার পালের হাওয়া। ও নইলে আমার তুলি যায় আটকে বালির চরে। বুঝতে পারি, আমার পাশে বসলে শীলার হৃৎপিণ্ডে একটা লালরঙের আগুন জ্বলতে থাকে, ডেন্‌জার সিগ্‌নাল, তার তেজ প্রবেশ করে আমার শিরায় শিরায়।— দোষ নিয়ো না তপস্বিনী, ভাবছ সেটাতে আমার বিলাস, না গো না, সেটাতে আমার প্রয়োজন।"

"তাই তোমার এত প্রয়োজন ক্রাইসলারের গাড়িতে।"

"তা স্বীকার করব। শীলার মধ্যে যখন গর্ব জাগে তখন ওর ঝলক বাড়ে। মেয়েদের এত গয়না কাপড় জোগাতে হয় সেইজন্যেই। আমরা চাই মেয়েদের মাধুর্য, ওরা চায় পুরুষের ঐশ্বর্য। তারই সোনালি পূর্ণতার উপরে ওদের প্রকাশের ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড্‌। প্রকৃতির এই ফন্দি পুরুষদের বড়ো করে তোলবার জন্যে। সত্যি কি না বলো।"

"সত্যি হতে পারে। কিন্তু কাকে বলে ঐশ্বর্য তাই নিয়ে তর্ক। ক্রাইসলারের গাড়িকে যারা ঐশ্বর্য বলে, আমি তো বলি, তারা পুরুষকে ছোটো করবার দিকে টানে।"

অভীক উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, "জানি জানি, তুমি যাকে ঐশ্বর্য বল তারই সর্বোচ্চ চূড়ায় তুমি আমাকে পৌঁছিয়ে দিতে পারতে। তোমার ভগবান মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন।"

অভীকের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বিভা বললে, "ওই এক কথা বার বার বোলো না। আমি তো বরাবর উলটোই শুনেছি। বিয়েটা আর্টিস্টের পক্ষে গলার ফাঁস। ইন্‌স্‌পিরেশনের দম বন্ধ করে দেয়। তোমাকে বড়ো করতে যদি পারতুম, আমার যদি সে শক্তি থাকত তা হলে—"

অভীক ঝেঁকে উঠে বললে, "পারতুম কী, পেরেছ। আমার এই দুঃখু যে আমার সেই ঐশ্বর্য তুমি চিনতে পার নি। যদি পারতে তা হলে তোমার ধর্মকর্মের সব বাঁধন ছিঁড়ে আমার সঙ্গিনী হয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়াতে; কোনো বাধা

মানতে না। তরী তীরে এসে পৌঁছয় তবু যাত্রী তীর্থে ওঠবার ঘাট খুঁজে পায় না। আমার হয়েছে সেই দশা। বী, আমার মধুকরী, কবে তুমি আমাকে সম্পূর্ণ করে আবিষ্কার করবে বলো।"

"যখন আমাকে তোমার আর দরকার হবে না।"

"ও-সব অত্যন্ত ফাঁপা কথা। অনেকখানি মিথ্যের হাওয়া দিয়ে ফুলিয়ে তোলা। স্বীকার করো, 'আমাকে না হলে নয়' ব'লে জেনেই উৎকণ্ঠিত তোমার সমস্ত দেহমন। সে কি আমার কাছে লুকোবে।"

"এ কথা বলেই বা কী হবে, লুকোবই বা কেন। মনে যাই থাক্, আমি কাঙালপনা করতে চাই নে।"

"আমি চাই, আমি কাঙাল। আমি দিনরাত বলব, আমি চাই, আমি তোমাকেই চাই।"

"আর সেই সঙ্গে বলবে, আমি ক্রাইসলারের গাড়িও চাই।"

"ওই তো, ওটা তো জেলাসি। পর্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ। মাঝে মাঝে ঘনিয়ে উঠুক ধোঁয়া জেলাসির, প্রমাণ হোক ভালোবাসার অন্তর্গূঢ় আগুন। নিবে-যাওয়া ভল্‌ক্যানো নয় তোমার মন। তাজা ভিস্যুভিয়স।" ব'লে দাঁড়িয়ে উঠে অভীক হাত তুলে বললে, "হুর্‌রে।"

"এ কী ছেলেমানুষি করছ। এইজন্যেই বুঝি আজ সকালবেলায় এসেছিলে আগে থাকতে প্ল্যান ক'রে?"

"হাঁ এইজন্যেই। মানছি সে কথা। নইলে এমন মুগ্ধ কেউ কেউ জানা আছে যাকে এ ঘড়ি এখনি বেচতে পারি বিনা ওজরে অন্যায় দামে। কিন্তু তোমার কাছে কেবল তো দাম চাইতে আসি নি, যেখানে তোমার ব্যথার উৎস সেখানে ঘা মেরে অঞ্জলি পাততে চেয়েছিলেম। কিন্তু হতভাগার ভাগ্যে না হল এটা, না হল ওটা।"

"কেমন করে জানলে। ভাগ্য তো সব সময় দেখাবিন্তি খেলে না। কিন্তু দেখো, একটা কথা তোমাকে বলি— তুমি মাঝে মাঝে আমাকে জিগ্‌গেসা করেছ তোমার লীলাখেলা দেখে আমার মনে খোঁচা লাগে কি না। সত্য কথা বলি, লাগে খোঁচা।"

অভীক উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, "এটা তো সুসংবাদ।"

বিভা বললে, "অত উৎফুল্ল হোয়ো না। এ জেলাসি নয়, এ অপমান। মেয়েদের নিয়ে তোমার এই গায়ে-পড়া সখ্য, এই অসভ্য অসংকোচ, এতে সমস্ত মেয়েজাতের প্রতি তোমার অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। আমার ভালো লাগে না।"

"এ তোমার কী রকম কথা হল। শ্রদ্ধার ব্যক্তিগত বিশেষত্ব নেই? জাতকে-

যাত যেখানে যাকেই দেখব শ্রদ্ধা করে করে বেড়াব ? মাল যাচাই নেই, একেবারে wholesale শ্রদ্ধা ? একে বলে protection, ব্যাবসাদারিতে বাইরে থেকে কৃত্রিম মাশুল চাপিয়ে দর-বাড়ানো।"

"মিথ্যে তর্ক কোরো না।"

"অর্থাৎ তুমি তর্ক করবে, আমি করব না। একেই বলে, 'দিন ভয়ংকর, মেয়েরা বাক্য কবে কিন্তু পুরুষরা রবে নিরুত্তর'।"

"অভী, তুমি কেবলই কথা-কাটাকাটি করবার অছিলা খুঁজছ। বেশ জান আমি বলতে চাইছিলুম, মেয়েদের থেকে স্বভাবত একটা দূরত্ব বাঁচিয়ে চলাই পুরুষের পক্ষে ভদ্রতা।"

"স্বভাবত দূরত্ব বাঁচানো, না অস্বভাবত ? আমরা মডার্ন্, মেকি ভদ্রতা মানি নে, খাঁটি স্বভাবকে মানি। শীলাকে পাশে নিয়ে ঝাঁকানি-দেওয়া ফোর্ডগাড়ি চালাই, স্বাভাবিকতা হচ্ছে তার পাশাপাশিটাই। ভদ্রতার খাতিরে মাঝখানে দেড়হাত জায়গা রাখলে অশ্রদ্ধা করা হত স্বভাবকে।"

"অভী, তোমরা নিজের থেকে মেয়েদের বিশেষ মূল্য দিয়ে দামী করে তুলেছিলে, তাদের খেলো কর নি নিজের গরজেই। সেই দাম আজ যদি ফিরিয়ে নাও নিজের খুশিকেই করবে সস্তা, ফাঁকি দেবে নিজের পাওনাকেই। কিন্তু মিথ্যে বকছি, মডার্ন্ কালটাই খেলো।"

অভীক জবাব দিলে, "খেলো বলব না, বলব বেহায়া। সেকালের বুড়োশিব চোখ বুজে বসেছেন ধ্যানে, একালের নন্দীভৃঙ্গী আয়না হাতে নিয়ে নিজেদের চেহারাকে ব্যঙ্গ করছে— যাকে বলে debunking। জন্মেছি একালে, বোম্‌ভোলানাথের চেলা হয়ে কপালে চোখ তুলে বসে থাকতে পারব না; নন্দীভৃঙ্গীর বিদঘুটে মুখভঙ্গির নকল করতে পারলে আজকের দিনে নাম হবে।"

"আচ্ছা আচ্ছা, যাও নাম করতে দশ দিককে মুখ ভেঙচিয়ে। কিন্তু তার আগে আমাকে একটা কথা সত্যি করে বলো, তোমার কাছে আশকারা পেয়ে রাজ্যের যত মেয়ে তোমাকে নিয়ে এই যে টানাটানি করে এতে কি তোমার ভালোলাগার ধার ভোঁতা হয়ে যায় না। তোমরা কথায় কথায় যাকে বল thrill, ঠেলাঠেলিতে তাকে কি পায়ের নীচে দ'লে ফেলা হয় না।"

"সত্যি কথাই বলি তবে, বী, যাকে বলে thrill, যাকে বলে ecstasy, সে হল পয়লা নম্বরের জিনিস, ভাগ্যে দৈবাৎ মেলে। কিন্তু তুমি যাকে বলছ ভিড়ের মধ্যে টানাটানি, সে হল সেকেণ্ডহ্যাণ্ড দোকানের মাল, কোথাও বা দাগী, কোথাও বা

ছেঁড়া, কিন্তু বাজারে সেও বিকোয়, অল্প দামে। সেরা জিনিসের পুরো দাম দিতে পারে ক'জন ধনী।"

"তুমি পার অভী, নিশ্চয় পার, পুরো মূল্য আছে তোমার হাতে। কিন্তু অদ্ভুত তোমার স্বভাব, ছেঁড়া জিনিসে, ময়লা জিনিসে তোমাদের আর্টিস্টের একটা কৌতুক আছে, কৌতূহল আছে। সুসম্পূর্ণ জিনিস তোমাদের কাছে picturesque নয়। থাক্ গে এ-সব বৃথা তর্ক। আপাতত ক্রাইসলারের পালাটা যতদূর সম্ভব এগিয়ে দেওয়া যাক।"

এই ব'লে চৌকি ছেড়ে বিভা পাশের ঘরে চলে গেল। ফিরে এসে অভীকের হাতে একতাড়া নোট দিয়ে বললে, "এই নাও তোমার ইন্‌স্‌পিরেশন, কোম্পানি-বাহাদুরের মার্কামারা। কিন্তু তাই ব'লে তোমার ওই ঘড়ি আমাকে নিতে বোলো না।"

চৌকিতে মাথা রেখে অভীক মেঝের উপরে বসে রইল। বিভা দ্রুত পদে তার হাত টেনে নিয়ে বললে, "আমাকে ভুল বুঝো না। তোমার অভাব ঘটেছে। আমার অভাব নেই এমন সুযোগে—"

বিভাকে থামিয়ে দিয়ে অভীক বললে, "অভাব আছে আমার, দারুণ অভাব। তোমার হাতেই রয়েছে সুযোগ, তা পূরণ করবার। কী হবে টাকায়।"

বিভা অভীকের হাতের উপরে স্নিগ্ধভাবে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, "যা পারি নে তার দুঃখ রইল আমার মনে চিরদিন। যতটুকু পারি তার সুখ থেকে কেন আমাকে বঞ্চিত করবে।"

"না না না, কিছুতেই না। তোমারই কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে শীলাকে আমি গাড়ি চড়িয়ে বেড়াব? এ প্রস্তাবে ধিক্কার দেবে এই ভেবেছিলুম, রাগ করবে এই ছিল আশা।"

"রাগ করব কেন। তোমার দুষ্টুমি কতক্ষণের। এটা সাংঘাতিক শীলার পক্ষে, তোমার পক্ষে একটুও না। এমন ছেলেমানুষি কতবার তোমার দেখেছি, মনে মনে হেসেছি। জানি কিছুদিনের মতো এ খেলা না হলে তোমার চলে না। এও জানি স্থায়ী হলে আরও অচল হয়। হয়তো তুমি কিছু পেতে চাও, কিন্তু তোমাকে কিছু পাবে এ সইতে পার না।"

"বী, আমাকে তুমি অত্যন্ত বেশি জান তাই এমন ঘোরতর নিশ্চিন্ত থাক। জানতে পেরেছ আমার ভালো লাগে মেয়েদের কিন্তু সে ভালো-লাগা নাস্তিকেরই, তাতে বাঁধন নেই। পাথরে-গাঁথা মন্দিরে সে পূজাকে বন্দী করব না। বান্ধবীদের

সঙ্গে গলাগলির গদ্‌গদ্‌ দৃশ্য মাঝে মাঝে দেখেছি, সেই বিহ্বল স্ত্রৈণতায় আমার গা কেমন করে। কিন্তু মেয়েরা আমার কাছে নাস্তিকের দেবতা, অর্থাৎ আর্টিস্টের। আর্টিস্ট খাবি খেয়ে মরে না, সে সাঁতার দেয়, দিয়ে অনায়াসে পার হয়ে যায়। আমি লোভী নই, আমাকে নিয়ে যে মেয়ে ঈর্ষা করে সে লোভী। তুমি লোভী নও, তোমার নিরাসক্ত মনের সব চেয়ে বড়ো দান স্বাধীনতা।"

বিভা হেসে বললে, "তোমার স্তব এখন রাখো। আর্টিস্ট, তোমরা সাবালক শিশু, এবার যে খেলাটা ফেঁদেছ তার খেলনাটি না-হয় আমার হাত থেকেই নেবে।"

"নৈব নৈব চ। আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার ট্রাস্টীদের মুঠো থেকে এ টাকা খসিয়ে নিলে কী করে।"

"খোলসা করে বললে হয়তো খুশি হবে না। তুমি জান অমরবাবুর কাছে আমি ম্যাথাম্যাটিক্‌স্‌ শিখছি।"

"সব-তাতেই আমাকে বহু দূরে এড়িয়ে যেতে চাও, বিদ্যেতেও?"

"বোকো না, শোনো। আমার ট্রাস্টীদের মধ্যে একজন আছেন আদিত্যমামা। নিজে তিনি গণিতে ফর্স্ট ক্লাস মেডালিস্ট। তাঁর বিশ্বাস, যথেষ্ট সুযোগ পেলে অমরবাবু দ্বিতীয় রামানুজম্‌ হবেন। ওঁর কথা একটুখানি প্রব্লেম আইনস্টাইনকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, যা উত্তর পেয়েছিলেন সেটা আমি দেখেছি। এমন লোককে সাহায্য করতে হলে তাঁর মান বাঁচিয়ে করতে হয়। আমি তাই বললুম, ওঁর কাছে গণিত শিখব। মামা খুব খুশি। শিক্ষাখাতে ট্রাস্টফাণ্ড থেকে কিছু থোক টাকা আমার হাতে রেখে দিয়েছেন। তারই থেকে আমি ওঁকে বৃত্তি দিই।"

অভীকের মুখ কেমন একরকম হয়ে গেল। একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে, "এমন আর্টিস্টও হয়তো আছে যে উপযুক্ত সুযোগ পেলে মিকেল আঞ্জেলোর অন্তত দাড়ির কাছটাতে পৌঁছতে পারত।"

"কোনো সুযোগ না পেলেও হয়তো পারবে পৌঁছতে। এখন বলো আমার কাছ থেকে টাকাটা নেবে কি না।"

"খেলনার দাম?"

"হাঁ গো, আমরা তো চিরকাল তোমাদের খেলনার দামই দিয়ে থাকি। তাতে দোষ কী। তার পরে আছে আঁস্তাকুড়।"

"ক্রাইসলারের আজ শ্রাদ্ধশান্তি হল এইখানেই। প্রগতিশীলার প্রগতিবেগ ভাঙা ফোর্ডেই নড়্‌নড়্‌ করতে করতে চলুক। এখন ও-সব কথা আর ভালো লাগছে না। অমরবাবু শুনেছি টাকা জমাচ্ছেন বিলেতে যাবার জন্যে, সেখান থেকে প্রমাণ করে

আসবেন তিনি সামান্য লোক নন।"

বিভা বললে, "একান্ত আশা করি, তাই যেন ঘটে। তাতে দেশের গৌরব।"

উচ্চকণ্ঠে বললে অভীক, "আমাকেও তাই প্রমাণ করতে হবে, তুমি আশা কর আর নাই কর। ওঁর প্রমাণ সহজ, লজিকের বাঁধা রাস্তায়, আর্টের প্রমাণ রুচির পথে, সে রসিক লোকের প্রাইভেট পথ। সে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নয়। আমাদের এই চোখে-ঠুলি-পরা ঘানি-ঘোরানোর দেশে আমার চলবে না। যাদের দেখবার স্বাধীন দৃষ্টি আছে, আমি যাবই তাদের দেশে। একদিন তোমার মামাকে যেন বলতে হয়, আমিও সামান্য লোক নই, আর তাঁর ভাগনীকেও—"

"ভাগনীর কথা বোলো না। তুমি মিকেল আঞ্জেলোর সমান মাপের কি না তা জানবার জন্যে তাকে সবুর করতে হয় নি। তার কাছে তুমি বিনা প্রমাণেই অসামান্য। এখন বলো, তুমি যেতে চাও বিলেতে ?"

"সে আমার দিনরাত্রির স্বপ্ন।"

"তা হলে নাও-না আমার এই দান। প্রতিভার পায়ে এই সামান্য আমার রাজকর।"

"থাক্ থাক্, ও কথা থাক্ ; কানে ঠিক সুর লাগছে না। সার্থক হোক গণিত-অধ্যাপকের মহিমা। আমার জন্যে এ যুগ না হোক পরযুগ আছে, অপেক্ষা করে থাকবে পস্টারিটি। এই আমি বলে দিচ্ছি, একদিন আসবে যেদিন অর্ধেক রাত্রে বালিশে মুখ গুঁজে তোমাকে বলতে হবে, নামের সঙ্গে নাম গাঁথা হতে পারত চিরকালের মতো, কিন্তু হল না।"

"পস্টারিটির জন্যে অপেক্ষা করতে হবে না অভী, নিষ্ঠুর শাস্তি আমার আরম্ভ হয়েছে।"

"কোন্ শাস্তির কথা তুমি বলছ জানি নে, কিন্তু জানি তোমার সব চেয়ে বড়ো শাস্তি তুমি বুঝতে পার নি আমার ছবি। এসেছে নতুন যুগ, সেই যুগের বরণসভায় আধুনিক বড়ো চৌকিটাতে আমার দেখা তোমার মিলল না।" বলেই অভীক উঠে চলল দরজার দিকে।

বিভা বললে, "যাচ্ছ কোথায়।"

"মিটিং আছে।"

"কিসের মিটিং।"

"ছুটির সময়কার ছাত্রদের নিয়ে দুর্গাপূজা করব।"

"তুমি পুজো করবে ?"

"আমিই করব। আমি যে কিছুই মানি নে। আমার সেই না-মানার ফাঁকার মধ্যে তেত্রিশ কোটি দেবতা আর অপদেবতার জায়গার টানাটানি হবে না। বিশ্বসৃষ্টির সমস্ত ছেলেখেলা ধরাবার জন্যে আকাশ শূন্য হয়ে আছে।"

বিভা বুঝল বিভারই ভগবানের বিরুদ্ধে ওর এই বিদ্রূপ। কোনো তর্ক না করে সে মাথা নিচু করে চুপ করে বসে রইল।

অভীক দরজার কাছ থেকে ফিরে এসে বললে, "দেখো বী, তুমি প্রচণ্ড ন্যাশনালিস্ট। ভারতবর্ষে ঐক্যস্থাপনের স্বপ্ন দেখ। কিন্তু যে দেশে দিনরাত্রি ধর্ম নিয়ে খুনোখুনি সে দেশে সব ধর্মকে মেলাবার পুণ্যব্রত আমার মতো নাস্তিকেরই। আমিই ভারতবর্ষের ত্রাণকর্তা।"

অভীকের নাস্তিকতা কেন যে এত হিংস্র হয়ে উঠেছে বিভা তা জানে। তাই তার উপরে রাগ করতে পারে না। কিছুতে ভেবে পায় না কী হবে এর পরিণাম। বিভার আর যা কিছু আছে সবই সে দিতে পারে, কেবল ঠেকেছে ওর পিতার ইচ্ছায়। সে ইচ্ছা তো মত নয়, বিশ্বাস নয়, তর্কের বিষয় নয়। সে ওর স্বভাবের অঙ্গ। তার প্রতিবাদ চলে না। বার বার মনে করেছে এই বাধা সে লঙ্ঘন করবে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে কিছুতে তার পা সরতে চায় না।

বেহারা এসে খবর দিলে, অমরবাবু এসেছেন। অভীক অবিলম্বে দুড়্‌দাড়্‌ করে সিঁড়ি বেয়ে চলে গেল। বিভার বুকের মধ্যে মোচড়াতে লাগল। প্রথমটাতে ভাবলে, অধ্যাপককে বলে পাঠাই আজ পাঠ নেওয়া হবে না। পরক্ষণেই মনটাকে শক্ত করে বললে, "আচ্ছা, এইখানে নিয়ে আয়। বসতে বল্‌। একটু বাদেই আসছি।"

শোবার ঘরে উপুড় হয়ে বিছানায় গিয়ে পড়ল। বালিশ আঁকড়ে ধরে কান্না। অনেকক্ষণ পরে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে মুখে চোখে জল দিয়ে হাসিমুখে ঘরে এসে বললে, "আজ মনে করেছিলুম ফাঁকি দেব।"

"শরীর ভালো নেই বুঝি?"

"না, বেশ আছে। আসল কথা, কতকাল ধরে রবিবারের ছুটি রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে, থেকে থেকে তার প্রকোপ প্রবল হয়ে ওঠে।"

অধ্যাপক বললেন, "আমার রক্তে এ পর্যন্ত ছুটির মাইক্রোব ঢোকবার সময় পায় নি। কিন্তু আমিও আজ ছুটি নেব। কারণটা বুঝিয়ে বলি। এ বছর কোপেন-হেগেনে সার্বজাতিক ম্যাথামেটিক্‌স্‌ কন্‌ফারেন্স্‌ হবে। আমার নাম কী করে ওদের নজরে পড়ল জানি নে। ভারতবর্ষের মধ্যে আমিই নিমন্ত্রণ পেয়েছি। এতবড়ো সুযোগ তো ব্যর্থ হতে দিতে পারি নে।"

বিভা উৎসাহের সঙ্গে বললে, "নিশ্চয় আপনাকে যেতে হবে।"

অধ্যাপক একটুখানি হেসে বললেন, "আমার উপরওয়ালা যাঁরা আমাকে ডেপুটেশনে পাঠাতে পারতেন তাঁরা রাজী নন, পাছে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। অতএব তাঁদের সেই উৎকণ্ঠা আমার ভালোর জন্যেই। তেমন কোনো বন্ধু যদি পাই যে লোকটা খুব বেশি সেয়ানা নয়, তারই সন্ধানে আজ বেরব। ধারের বদলে যা বন্ধক দেবার আশা দিতে পারি সেটাকে না পারব দাঁড়িপাল্লায় চড়াতে, না পারব কষ্টিপাথরে ঘষে দেখাতে। আমরা বিজ্ঞানীরা কিছু বিশ্বাস করবার পূর্বে প্রত্যক্ষ প্রমাণ খুঁজি, বিষয়বুদ্ধিওয়ালারাও খোঁজে— ঠকাবার জো নেই কাউকে।"

বিভা উত্তেজিত হয়ে বললে, "যেখান থেকে হোক, বন্ধু একজনকে বের করবই, হয়তো সে খুব সেয়ানা নয়, সেজন্যে ভাববেন না।"

দু-চার কথায় সমস্যার মীমাংসা হয় নি। সেদিনকার মতো একটা আধাখেঁচড়া নিষ্পত্তি হল। অমরবাবু লোকটি মাঝারি সাইজের, শ্যামবর্ণ, দেহটি রোগা, কপাল চওড়া, মাথার সামনেদিককার চুল ফুরফুরে হয়ে এসেছে। মুখটি প্রিয়দর্শন, দেখে বোঝা যায় কারও সঙ্গে শত্রুতা করবার অবকাশ পান নি। চোখদুটিতে ঠিক অন্যমনস্কতা নয়, যাকে বলা যেতে পারে দূরমনস্কতা— অর্থাৎ রাস্তায় চলবার সময় ওঁকে নিরাপদ রাখবার দায়িত্ব বাইরের লোকদেরই। বন্ধু ওঁর খুব অল্পই, কিন্তু যে কজন আছে তারা ওঁর সম্বন্ধে খুবই উচ্চ আশা রাখে, আর বাকি যে-সব চেনা লোক তারা নাক সিটকে ওঁকে বলে হাইব্রাউ। কথাবার্তা অল্প বলেন, সেটাকে লোকে মনে করে হৃদ্যতারই স্বল্পতা। মোটের উপর ওঁর জীবনযাত্রায় জনতা খুব কম। তার সাইকলজির পক্ষে আরামের বিষয় এই যে, দশজনে ওঁকে কী ভাবে সে উনি জানেনই না।

অভীকের কাছে বিভা আজ তাড়াতাড়ি যে আটশো টাকা এনে দিয়েছিল সে একটা অন্ধ আবেগে মরিয়া হয়ে। বিভার নিয়মনিষ্ঠার প্রতি তার মামার বিশ্বাস অটল। কখনও তার ব্যত্যয় হয় নি। মেয়েদের জীবনে নিয়মের প্রবল ব্যতিক্রমের ঝটকা হঠাৎ কোন্‌দিক থেকে এসে পড়ে, তিনি বিষয়ী লোক সেটা কল্পনাও করতে পারেন নি। এই অকস্মাৎ অকাজের সমস্ত শাস্তি ও লজ্জা মনের মধ্যে স্পষ্ট করে দেখে নিয়েই একমুহূর্তের ঝড়ের ঝাপটে বিভা উপস্থিত করেছিল তার উৎসর্গ অভীকের কাছে। প্রত্যাখ্যাত সেই দান আবার নিয়মের পিল্‌পেগাড়ির মধ্যে

ফিরে এসেছে। বর্তমান ক্ষেত্রে ভালোবাসার সেই স্পর্ধাবেগ তার মনে নেই। স্বাধিকার লঙ্ঘন ক'রে কাউকে টাকা ধার দেবার কথা সে সাহস ক'রে মনে আনতে পারলে না। তাই বিভা প্ল্যান করেছে, মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া দামী গয়না বেচে যা পাবে সেই টাকা অমরকে উপলক্ষ্য ক'রে দেবে আপন স্বদেশকে।

বিভার কাছে যে-সব ছেলেমেয়ে মানুষ হচ্ছে, ও তাদের পড়ায় সাহায্য করে। আজ রবিবার। খাওয়ার পরে এতক্ষণ ওর ক্লাস বসেছিল। সকাল-সকাল দিল ছুটি।

বাক্স বের করে মেঝের উপর একখানা কাঁথা পেতে তাতে একে একে বিভা গয়না সাজাচ্ছিল। ওদের পরিবারের পরিচিত জহুরীকে ডেকে পাঠিয়েছে।

এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনতে পেল অভীকের। প্রথমেই গয়নাগুলো তাড়াতাড়ি লুকোবার ঝোঁক হল, কিন্তু যেমন পাতা ছিল তেমনি রেখে দিলে। কোনো কারণেই অভীকের কাছে কোনো কিছু চাপা দেবে, সে ওর স্বভাবের বিরুদ্ধে।

অভীক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল, বুঝল ব্যাপারখানা কী। বললে, "অসামান্যের পারানি কড়ি। আমার বেলায় তুমি মহামায়া, ভুলিয়ে রাখো ; অধ্যাপকের বেলায় তুমি তারা, তরিয়ে দাও। অধ্যাপক জানেন কি, অবলা নারী মৃণালভুজে তাঁকে পারে পাঠাবার উপায় করেছে ?"

"না, জানেন না।"

"জানলে কি এই বৈজ্ঞানিকের পৌরুষে ঘা লাগবে না।"

"ক্ষুদ্র লোকের শ্রদ্ধার দানে মহৎ লোকের অকুণ্ঠিত অধিকার, আমি তো এই জানি। এই অধিকার দিয়ে তাঁরা অনুগ্রহ করেন, দয়া করেন।"

"সে কথা বুঝলুম, কিন্তু মেয়েদের গায়ের গয়না আমাদেরই আনন্দ দেবার জন্যে, আমরা যত সামান্যই হই— কারও বিলেতে যাবার জন্যে নয়, তিনি যত বড়োই হোন-না। আমাদের মতো পুরুষদের দৃষ্টিকে এ তোমরা প্রথম থেকেই উৎসর্গ করে রেখেছ। এই হারখানি চুনির সঙ্গে মুক্তোর মিল করা, এ আমি একদিন তোমার গলায় দেখেছিলেম, যখন আমাদের পরিচয় ছিল অল্প। সেই প্রথম পরিচয়ের স্মৃতিতে এই হারখানি এক হয়ে মিশিয়ে আছে। ওই হার কি একলা তোমার, ও যে আমারও।"

"আচ্ছা, ওই হারটা না-হয় তুমিই নিলে।"

"তোমার সত্তা থেকে ছিনিয়ে-দেওয়া হার একেবারেই যে নিরর্থক। সে যে হবে চুরি। তোমার সঙ্গে নেব ওকে সবসুদ্ধ, সেই প্রত্যাশা করেই বসে আছি।

ইতিমধ্যে ওই হার হস্তান্তর কর যদি, তবে ফাঁকি দেবে আমাকে।"

"গয়নাগুলো মা দিয়ে গেছেন আমার ভাবী বিবাহের যৌতুক। বিবাহটা বাদ দিলে ও গয়নার কী সংজ্ঞা দেব। যাই হোক, কোনো শুভ কিংবা অশুভ লগ্নে এই কন্যাটির সালংকারা মূর্তি আশা কোরো না।"

"অন্যত্র পাত্র স্থির হয়ে গেছে বুঝি?"

"হয়েছে বৈতরণীর তীরে। বরঞ্চ এক কাজ করতে পারি, তুমি যাকে বিয়ে করবে সেই বধূর জন্যে আমার এই গয়না কিছু রেখে যাব।"

"আমার জন্যে বুঝি বৈতরণীর তীরে বধূর রাস্তা নেই?"

"ও কথা বোলো না। সজীব পাত্রী সব আঁকড়ে আছে তোমার কুষ্ঠি।"

"মিথ্যে কথা বলব না। কুষ্ঠির ইশারাটা একেবারে অসম্ভব নয়। শনির দশায় সঙ্গিনীর অভাব হঠাৎ মারাত্মক হয়ে উঠলে, পুরুষের আসে ফাঁড়ার দিন।"

"তা হতে পারে, কিন্তু তার কিছুকাল পরেই সঙ্গিনীর আবির্ভাবটাই হয় মারাত্মক। তখন ওই ফাঁড়াটা হয়ে ওঠে মুশকিলের। যাকে বলে পরিস্থিতি।"

"ওই যাকে বলে বাধ্যতামূলক উদ্‌বন্ধন। প্রসঙ্গটা যদিচ হাইপথেটিক্যাল, তবু সম্ভাবনার এত কাছঘেঁষা যে এ নিয়ে তর্ক করা মিথ্যে। তাই বলছি, একদিন যখন লালচেলি-পরা আমাকে হঠাৎ দেখবে পরহস্তগতং ধনং তখন—"

"আর ভয় দেখিয়ো না, তখন আমিও হঠাৎ আবিষ্কার করব, পরহস্তের অভাব নেই।"

"ছি ছি মধুকরী, কথাটা তো ভালো শোনাল না তোমার মুখে। পুরুষেরা তোমাদের দেবী বলে স্তুতি করে, কেননা তাদের অন্তর্ধান ঘটলে তোমরা শুকিয়ে মরতে রাজি থাক। পুরুষদের ভুলেও কেউ দেবতা বলে না। কেননা অভাবে পড়লেই বুদ্ধিমানের মতো অভাব পূরণ করিয়ে নিতে তারা প্রস্তুত। সম্মানের মুশকিল তো ওই। একনিষ্ঠতার পদবিটা বাঁচাতে গিয়ে তোমাদের প্রাণে মরত হয়। সাইকলজি এখন থাক্‌, আমার প্রস্তাব এই, অমরবাবুর অমরত্বলাভের দায়িত্ব আমাদেরই উপরে দাও-না, আমরা কি ওর মূল্য বুঝি নে। গয়না বেচে পুরুষকে লজ্জা দাও কেন।"

"ও কথা বোলো না। পুরুষদের যশ মেয়েদেরই সব চেয়ে বড়ো সম্পদ। যে দেশে তোমরা বড়ো সে দেশে আমরা ধন্য।"

"এ দেশ সেই দেশই হোক। তোমাদের দিকে তাকিয়ে সেই কথাই ভাবি প্রাণপণে। এ প্রসঙ্গে আমার কথাটা এখন থাক্‌, অন্য-এক সময় হবে। অমরবাবুর সফলতায় ঈর্ষা করে এমন খুদে লোক বাংলাদেশে অনেক আছে। এ দেশের

মানুষরা বড়োলোকের মড়ক। কিন্তু দোহাই তোমার, আমাকে সেই বামনদের দলে ফেলো না। শোনো আমি কত বড়ো একটা ক্রিমিন্যাল্ পুণ্যকর্ম করেছি।— দুর্গাপূজার চাঁদার টাকা আমার হাতে ছিল। সে টাকা দিয়ে দিয়েছি অমরবাবুর বিলেতযাত্রার ফণ্ডে। দিয়েছি কাউকে না ব'লে। যখন ফাঁস হবে, জীববলি খোঁজবার জন্যে মায়ের ভক্তদের বাজারে দৌড়তে হবে না। আমি নাস্তিক, আমি বুঝি সত্যকার পূজা কাকে বলে। ওরা ধর্মপ্রাণ, ওরা কী বুঝবে।"

"এ কী কাজ করলে অভীক। তুমি যাকে বল তোমার পবিত্র নাস্তিকধর্ম এ কাজ কি তার যোগ্য, এ যে বিশ্বাসঘাতকতা।"

"মানি। কিন্তু আমার ধর্মের ভিত কিসে দুর্বল ক'রে দিয়েছিল তা বলি। খুব ধুম করে পূজা দেবে ব'লে আমার চেলারা কোমর বেঁধেছিল। কিন্তু চাঁদার যে সামান্য টাকা উঠল সে যেমন হাস্যকর তেমন শোকাবহ। তাতে ভোগের পাঁঠাদের মধ্যে বিয়োগান্ত নাট্য জমত না, পঞ্চমাঙ্কের লাল রঙটা হত ফিকে। আমার তাতে আপত্তি ছিল না। স্থির করেছিলেম নিজেরাই কাঠি হাতে ঢাকে ঢোলে বেতালা চাঁটি লাগাব অসহ্য উৎসাহে আর লাউকুমড়োর বক্ষ বিদীর্ণ করব স্বহস্তে খড়্গাঘাতে। নাস্তিকের পক্ষে এই যথেষ্ট, কিন্তু ধর্মপ্রাণের পক্ষে নয়। কখন সন্ধ্যাবেলায় আমাকে না জানিয়ে ওদের একজন সাজল সাধুবাবা, পাঁচজন সাজল চেলা, কোনো একজন ধনী বিধবা বুড়িকে গিয়ে বললে, তার যে ছেলে রেঙ্গুনে কাজ করে, জগদম্বা স্বপ্ন দিয়েছেন, যথেষ্ট পাঁঠা আর পুরোবহরের পুজো না পেলে মা তাঁকে আস্ত খাবেন। তাঁর কাছ থেকে স্ক্রু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাঁচ হাজার টাকা বের করেছে। যেদিন শুনলুম, সেইদিনই টাকাটার সৎকার করেছি। তাতে আমার জাত গেল। কিন্তু টাকাটার কলঙ্ক ঘুচল। এই তোমাকে করলুম আমার কন্‌ফেশনাল। পাপ কবুল ক'রে পাপ ক্ষালন করে নেওয়া গেল। পাঁচ হাজার টাকার বাইরে আছে উনত্রিশটি মাত্র টাকা। সে রেখেছি কুমড়োর বাজারের দেনাশোধের জন্য।"

স্নিগ্ধ এসে বললে, "বচ্চু বেহারার জ্বর বেড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে কাশি, ডাক্তারবাবু কী লিখে দিয়ে গেছেন, দেখে দাও 'সে।"

বিভার হাত চেপে ধরে অভীক বললে, "বিশ্বহিতৈষিণী, রোগতাপের তদ্‌বির করতে দিনরাত ব্যস্ত আছ, আর যে-সব হতভাগার শরীর অতি বিশ্রী রকমে সুস্থ তাদের মনে করবার সময় পাও না।"

"বিশ্বহিত নয় গো, কোনো একজন অতি সুস্থ হতভাগাকে ভুলে থাকবার জন্যেই

এত ক'রে কাজ বানাতে হয়। এখন ছাড়ো, আমি যাই, তুমি একটু বোসো, আমার গয়না সামলিয়ে রেখো।"

"আর আমার লোভ কে সামলাবে।"

"তোমার নাস্তিকধর্ম।"

কিছুকাল দেখা নেই অভীকের। চিঠিপত্র কিছু পাওয়া যায় নি। বিভার মুখ শুকিয়ে গেছে। কোনো কাজ করতে মন যাচ্ছে না। তার ভাবনাগুলো গেছে ঘুলিয়ে। কী হয়েছে, কী হতে পারে, তার ঠিক পাচ্ছে না। দিনগুলো যাচ্ছে পাঁজর-ভেঙে-দেওয়া বোঝার মতন। ওর কেবলই মনে হচ্ছে, অভীক ওর উপরেই অভিমান করে চলে গেছে। ও ঘরছাড়া ছেলে, ওর বাঁধন নেই, উধাও হয়ে চলে গেল; ও হয়তো আর ফিরবে না। ওর মন কেবলই বলতে লাগল, 'রাগ কোরো না, ফিরে এসো, আমি তোমাকে আর দুঃখ দেব না।' অভীকের সমস্ত ছেলেমানুষি, ওর অবিবেচনা, ওর আবদার, যতই মনে পড়তে লাগল ততই জল পড়তে লাগল ওর দুই চক্ষু বেয়ে, কেবলই নিজেকে পাষাণী বলে ধিক্‌কার দিলে।

এমন সময়ে এল চিঠি স্টীমারের ছাপমারা। অভীক লিখেছে—

জাহাজের স্টোকার হয়ে চলেছি বিলেতে। এঞ্জিনে কয়লা জোগাতে হবে। বলছি বটে ভাবনা কোরো না, কিন্তু ভাবনা করছ মনে করে ভালো লাগে। তবু বলে রাখি এঞ্জিনের তাতে পোড়া আমার অভ্যেস আছে। জানি তুমি এই বলে রাগ করবে যে, কেন পাথেয় দাবি করি নি তোমার কাছ থেকে। একমাত্র কারণ এই যে, আমি যে আর্টিস্ট এ পরিচয়ে তোমার একটুও শ্রদ্ধা নেই। এ আমার চিরদুঃখের কথা; কিন্তু এজন্যে তোমাকে দোষ দেব না। আমি নিশ্চয়ই জানি, একদিন সেই রসজ্ঞ দেশের গুণী লোকেরা আমাকে স্বীকার করে নেবে যাদের স্বীকৃতির খাঁটি মূল্য আছে।

অনেক মূঢ় আমার ছবির অন্যায় প্রশংসা করেছে। আবার অনেক মিথ্যুক করেছে ছলনা। তুমি আমার মন ভোলানোর জন্যে কোনোদিন কৃত্রিম স্তব কর নি। যদিও তোমার জানা ছিল, তোমার একটুখানি প্রশংসা আমার পক্ষে অমৃত। তোমার চরিত্রের অটল সত্য থেকে আমি অপরিমেয় দুঃখ পেয়েছি, তবু সেই সত্যকে দিয়েছি আমি বড়ো মূল্য। একদিন বিশ্বের কাছে যখন সম্মান পাব, তখন সব চেয়ে সত্য সম্মান আমাকে তুমিই দেবে, তার সঙ্গে হৃদয়ের সুধা মিশিয়ে। যতক্ষণ তোমার বিশ্বাস

অসন্দিগ্ধ সত্যে না পৌঁছবে ততক্ষণ তুমি অপেক্ষা করবে। এই কথা মনে রেখে আজ দুঃসাধ্য-সাধনার পথে চলেছি।

এতক্ষণে জানতে পেরেছ তোমার হারখানি গেছে চুরি। এ হার তুমি বাজারে বিক্রি করতে যাচ্ছ, এই ভাবনা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলুম না। তুমি পাঁজর ভেঙে সিঁধ কাটতে যাচ্ছিলে আমার বুকের মধ্যে। তোমার ওই হারের বদলে আমার একতাড়া ছবি তোমার গয়নার বাক্সের কাছে রেখে এসেছি। মনে মনে হেসো না। বাংলাদেশের কোথাও এই ছবিগুলো ছেঁড়া কাগজের বেশি দর পাবে না। অপেক্ষা কোরো বী, আমার মধুকরী, তুমি ঠকবে না, কখনোই না। হঠাৎ যেমন কোদালের মুখে গুপ্তধন বেরিয়ে পড়ে, আমি জাঁক করে বলছি, তেমনি আমার ছবিগুলির দুর্মূল্য দীপ্তি হঠাৎ বেরিয়ে পড়বে। তার আগে পর্যন্ত হেসো, কেননা সব মেয়ের কাছেই সব পুরুষ ছেলেমানুষ— যাদের তারা ভালোবাসে। তোমার সেই স্নিগ্ধ কৌতুকের হাসি আমার কল্পনায় ভরতি করে নিয়ে চললুম সমুদ্রের পারে। আর নিলুম তোমার সেই মধুময় ঘর থেকে একখানি মধুময় অপবাদ। দেখেছি তোমার ভগবানের কাছে তুমি কত দরবার নিয়ে প্রার্থনা কর, এবার থেকে এই প্রার্থনা কোরো, তোমার কাছ থেকে চলে আসার দারুণ দুঃখ যেন একদিন সার্থক হয়।

তুমি মনে মনে কখনও আমাকে ঈর্ষা করেছ কিনা জানি নে। এ কথা সত্য, মেয়েদের আমি ভালোবাসি। ঠিক ততটা না হোক, মেয়েদের আমার ভালো লাগে। তারা আমাকে ভালোবেসেছে, সেই ভালোবাসা আমাকে কৃতজ্ঞ করে। কিন্তু নিশ্চয় তুমি জান যে, তারা নীহারিকামণ্ডলী, তার মাঝখানে তুমি একটিমাত্র ধ্রুবনক্ষত্র। তারা আভাস, তুমি সত্য। এ-সব কথা শোনাবে সেন্টিমেণ্টাল। উপায় নেই, আমি কবি নই। আমার ভাষাটা কলার ভেলার মতো, ঢেউ লাগলেই বাড়াবাড়ি করে দোলা দিয়ে। জানি বেদনার যেখানে গভীরতা সেখানে গম্ভীর হওয়া চাই, নইলে সত্যের মর্যাদা থাকে না। দুর্বলতা চঞ্চল, অনেকবার আমার দুর্বলতা দেখে হেসেছ। এই চিঠিতে তারই লক্ষণ দেখে একটু হেসে তুমি বলবে, এই তো ঠিক তোমার অভীর মতোই ভাবখানা। কিন্তু এবার হয়তো তোমার মুখে হাসি আসবে না। তোমাকে পাই নি ব'লে অনেক খুঁতখুঁত করেছি, কিন্তু হৃদয়ের দানে তুমি যে কৃপণ, এ কথার মতো এতবড়ো অবিচার আর কিছু হতে পারে না। আসলে এ জীবনে তোমার কাছে আমার সম্পূর্ণ প্রকাশ হতে পারল না। হয়তো কখনও হতে পারবে না। এই তীব্র অতৃপ্তি আমাকে এমন কাঙাল করে রেখেছে। সেইজন্যেই আর কিছু বিশ্বাস করি বা না করি, হয়তো জন্মান্তরে বিশ্বাস করতে হবে। তুমি স্পষ্ট করে আমাকে তোমার

ভালোবাসা জানাও নি কিন্তু তোমার স্তব্ধতার গভীর থেকে প্রতিক্ষণে যা তুমি দান করেছ, নাস্তিক তাকে কোনো সংজ্ঞা দিতে পারে নি— বলেছে, অলৌকিক। এরই আকর্ষণে কোনো-এক ভাবে হয়তো তোমার সঙ্গে সঙ্গে তোমার ভগবানেরই কাছাকাছি ফিরেছি। ঠিক জানি নে। হয়তো সবই বানানো কথা। কিন্তু হৃদয়ের একটা গোপন জায়গা আছে আমাদের নিজেরই অগোচরে, সেখানে প্রবল ঘা লাগলে কথা আপনি বানিয়ে বানিয়ে ওঠে, হয়তো সে এমন কোনো সত্য যা এতদিনে নিজে জানতে পারি নি।

বী, আমার মধুকরী, জগতে সব চেয়ে ভালোবেসেছি তোমাকে। সেই ভালোবাসার কোনো একটা অসীম সত্য-ভূমিকা আছে বলে যদি মনে করা যায়, আর তাকেই যদি বল তোমাদের ঈশ্বর, তা হলে তাঁর দুয়ার আর তোমার দুয়ার এক হয়ে রইল এই নাস্তিকের জন্যে। আবার আমি ফিরব— তখন আমার মত, আমার বিশ্বাস, সমস্ত চোখ বুজে সমর্পণ করে দেব তোমার হাতে; তুমি তাকে পৌঁছিয়ে দিয়ো তোমার তীর্থপথের শেষ ঠিকানায়, যাতে বুদ্ধির বাধা নিয়ে তোমার সঙ্গে এক মুহূর্তের বিচ্ছেদ আর কখনও না ঘটে। তোমার কাছ থেকে আজ দূরে এসে ভালোবাসার অভাবনীয়তা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আমার মনের মধ্যে, যুক্তিতর্কের কাঁটার বেড়া পার করিয়ে দিয়েছে আমাকে— আমি দেখতে পাচ্ছি তোমাকে লোকাতীত মহিমায়। এতদিন বুঝতে চেয়েছিলুম বুদ্ধি দিয়ে, এবার পেতে চাই আমার সমস্তকে দিয়ে।

তোমার নাস্তিক ভক্ত
অভীক

আশ্বিন, ১৩৪৬

শেষ কথা

জীবনের প্রবহমান ঘোলা রঙের হ-য-ব-র-লর মধ্যে হঠাৎ যেখানে গল্পটা আপন রূপ ধ'রে সদ্য দেখা দেয়, তার অনেক পূর্ব থেকেই নায়কনায়িকারা আপন পরিচয়ের সূত্র গেঁথে আনে। পিছন থেকে সেই প্রাক্‌গাল্পিক ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করতেই হয়। তাই কিছু সময় নেব, আমি যে কে সেই কথাটাকে পরিষ্কার করবার জন্যে। কিন্তু নামধাম ভাঁড়াতে হবে। নইলে জানাশোনা মহলের জবাবদিহি সামলাতে পারব না। কী নাম নেব তাই ভাবছি, রোম্যান্টিক নামকরণের দ্বারা গোড়া থেকেই

গল্পটাকে বসন্তরাগে পঞ্চমস্বরে বাঁধতে চাই নে। নবীনমাধব নামটা বোধ হয় চলে যেতে পারবে, ওর বাস্তবের শামলা রঙটা ধুয়ে ফেলে করা যেতে পারত নবারুণ সেনগুপ্ত; কিন্তু তা হলে খাঁটি শোনাত না, গল্পটা নামের বড়াই ক'রে লোকের বিশ্বাস হারাত, লোকে মনে করত ধারকরা জামিয়ার প'রে সাহিত্যসভায় বাবুয়ানা করতে এসেছে।

আমি বাংলাদেশের বিপ্লবীদলের একজন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মহাকর্ষশক্তি আণ্ডামানতীরের খুব কাছাকাছি টান মেরেছিল। নানা বাঁকা পথে সি. আই. ডি.-র ফাঁস এড়িয়ে এড়িয়ে গিয়েছিলুম আফগানিস্থান পর্যন্ত। অবশেষে পৌঁচেছি আমেরিকায় খালাসির কাজ নিয়ে। পূর্ববঙ্গীয় জেদ ছিল মজ্জায়, একদিনও ভুলি নি যে, ভারতবর্ষের হাতপায়ের শিকলে উখো ঘসতে হবে দিনরাত যতদিন বেঁচে থাকি। কিন্তু বিদেশে কিছুদিন থাকতেই একটা কথা নিশ্চিত বুঝেছিলুম, আমরা যে প্রণালীতে বিপ্লবের পালা শুরু করেছিলুম, সে যেন আতশবাজিতে পটকা ছোঁড়ার মতো, তাতে নিজের পোড়াকপাল পুড়িয়েছি অনেকবার, দাগ পড়ে নি ব্রিটিশ রাজতক্তে। আগুনের উপর পতঙ্গের অন্ধ আসক্তি। যখন সদর্পে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলুম তখন বুঝতে পারি নি, সেটাতে ইতিহাসের যজ্ঞানল জ্বালানো হচ্ছে না, জ্বালাচ্ছি নিজেদের খুব ছোটো ছোটো চিতানল। ইতিমধ্যে য়ুরোপীয় মহাসমরের ভীষণ প্রলয়রূপ তার অতি বিপুল আয়োজন সমেত চোখের সামনে দেখা দিয়েছিল— এই যুগান্তরসাধিনী সর্বনাশাকে আমাদের খোড়োঘরের চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিষ্ঠা করতে পারব সে দুরাশা মন থেকে লুপ্ত হয়ে গেল; সমারোহ ক'রে আত্মহত্যা করবার মতোও আয়োজন ঘরে নেই। তখন ঠিক করলুম, ন্যাশনাল দুর্গের গোড়া পাকা করতে হবে। স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলুম, বাঁচতে যদি চাই আদিম যুগের হাত দুখানায় যে কটা নখ আছে তা দিয়ে লড়াই করা চলবে না। এ যুগে যন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রের দিতে হবে পাল্লা; যেমন-তেমন করে মরা সহজ, কিন্তু বিশ্বকর্মার চেলাগিরি করা সহজ নয়। অধীর হয়ে ফল নেই, গোড়া থেকেই কাজ শুরু করতে হবে— পথ দীর্ঘ, সাধনা কঠিন।

দীক্ষা নিলুম যন্ত্রবিদ্যায়। ডেট্রয়েটে ফোর্ডের মোটর-কারখানায় কোনোমতে ঢুকে পড়লুম। হাত পাকাচ্ছিলুম, কিন্তু মনে হচ্ছিল না খুব বেশি দূর এগোচ্ছি। একদিন কী দুর্বুদ্ধি ঘটল, মনে হল, ফোর্ডকে যদি একটুখানি আভাস দিই যে, আমার উদ্দেশ্য নিজের উন্নতি করা নয়, দেশকে বাঁচানো, তা হলে স্বাধীনতাপূজারী আমেরিকার ধনসৃষ্টির জাদুকর বুঝি খুশি হবে, এমন কি আমার রাস্তা হয়তো করে দেবে প্রশস্ত। ফোর্ড চাপা হাসি হেসে বললে, 'আমার নাম হেন্‌রি ফোর্ড, পুরাতন ইংরেজি নাম। আমাদের ইংলণ্ডের মামাতো ভাইরা অকেজো, তাদের আমি কেজো করব— এই

আমার সংকল্প।' আমি ভেবেছিলুম, ভারতীয়কেও কেজো ক'রে তুলতে উৎসাহ হতেও পারে। একটা কথা বুঝতে পারলুম, টাকাওয়ালার দরদ টাকাওয়ালাদেরই 'পরে। আর দেখলুম, এখানে চাকাতৈরির চক্রপথে শেখা বেশি দূর এগোবে না। এই উপলক্ষ্যে একটা বিষয়ে চোখ খুলে গেল, সে হচ্ছে এই যে, যন্ত্রবিদ্যাশিক্ষার আরম্ভে গোড়ায় যাওয়া চাই ; যন্ত্রের মালমসলা-সংগ্রহ শিখতে হবে। ধরণী শক্তিমানদের জন্যে জমা করে রেখেছেন তাঁর দুর্গম জঠরে কঠিন খনিজ পদার্থ, এই নিয়ে দিগ্বিজয় করেছে তারা, আর গরিবদের জন্যে রয়েছে তার উপরের স্তরে ফসল—হাড় বেরিয়েছে তাদের পাঁজরায়, চুপসে গেছে তাদের পেট। আমি লেগে গেলুম খনিজবিদ্যা শিখতে। ফোর্ড বলেছে ইংরেজ অকেজো, তার প্রমাণ হয়েছে ভারতবর্ষে— একদিন হাত লাগিয়েছিল তারা নীলের চাষে আর-একদিন চায়ের চাষে— সিবিলিয়ানের দল দপ্তরখানায় তকমা-পরা 'ল অ্যাণ্ড অর্ডর'-এর ব্যবস্থা করেছে, কিন্তু ভারতের বিশাল অন্তর্ভাণ্ডারের সম্পদ উদ্ঘাটিত করতে পারে নি, কী মানবচিত্তের কী প্রকৃতির। ব'সে ব'সে পাটের চাষীর রক্ত নিংড়েছে। জামশেদ টাটাকে সেলাম করেছি সমুদ্রের ওপার থেকে। ঠিক করেছি আমার কাজ পটকা ছোঁড়া নয়। সিঁধ কাটতে যাব পাতালপুরীর পাথরের প্রাচীরে। মায়ের আঁচলধরা বুড়ো খোকাদের দলে মিশে 'মা মা' ধ্বনিতে মন্তর পড়ব না, আর দেশের দরিদ্রকে অক্ষম অভুক্ত অশিক্ষিত দরিদ্র ব'লেই মানব, 'দরিদ্রনারায়ণ' বুলি দিয়ে তার নামে মন্তর বানাব না। প্রথম বয়সে এ রকম বচনের পুতুলগড়া খেলা অনেক খেলেছি— কবিদের কুমোরবাড়িতে স্বদেশের যে রাংতা-লাগানো প্রতিমা গড়া হয়, তারই সামনে বসে বসে অনেক চোখের জল ফেলেছি। কিন্তু আর নয়, এই জাগ্রত বুদ্ধির দেশে এসে বাস্তবকে বাস্তব বলে জেনেই শুকনো চোখে কোমর বেঁধে কাজ করতে শিখেছি। এবার গিয়ে বেরিয়ে পড়বে এই বিজ্ঞানী বাঙাল কোদাল নিয়ে কুড়ুল নিয়ে হাতুড়ি নিয়ে দেশের গুপ্তধনের তল্লাসে, এই কাজটাকে কবির গদ্গদকণ্ঠের চেলারা দেশমাতৃকার পূজা বলে চিনতেই পারবে না।

ফোর্ডের কারখানাঘর ছেড়ে তার পরে ন'বছর কাটিয়েছি খনিবিদ্যা খনিজবিদ্যা শিখতে। য়ুরোপের নানা কেন্দ্রে ঘুরেছি, হাতেকলমে কাজ করেছি, দুই-একটা যন্ত্রকৌশল নিজেও বানিয়েছি— তাতে উৎসাহ পেয়েছি অধ্যাপকদের কাছে, নিজের উপরে বিশ্বাস হয়েছে, ধিক্কার দিয়েছি ভূতপূর্ব মন্ত্রমুগ্ধ অকৃতার্থ নিজেকে।

আমার ছোটোগল্পের সঙ্গে এই-সব বড়ো বড়ো কথার একান্ত যোগ নেই— বাদ দিলে চলত, হয়তো ভালোই হত। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে একটা কথা বলার দরকার ছিল, সেটা বলি। যৌবনের গোড়ার দিকে নারীপ্রভাবের ম্যাগ্‌নেটিজ্‌মে জীবনের

মেরুপ্রদেশের আকাশে যখন অরোরার রঙিন ছটার আন্দোলন ঘটতে থাকে, তখন আমি ছিলুম অন্যমনস্ক, একেবারে কোমর বেঁধে অন্যমনস্ক। আমি সন্ন্যাসী, আমি কর্মযোগী— এই-সব বাণীর দ্বারা মনের আগল শক্ত করে আঁটা ছিল। কন্যাদায়িকরা যখন আশেপাশে আনাগোনা করেছিল, আমি স্পষ্ট করেই বলেছি, কন্যার কুষ্ঠিতে যদি অকালবৈধব্যযোগ থাকে, তবেই যেন কন্যার পিতা আমার কথা চিন্তা করেন।

পাশ্চাত্য মহাদেশে নারীসঙ্গ ঠেকাবার বেড়া নেই। সেখানে আমার পক্ষে দুর্যোগের বিশেষ আশঙ্কা ছিল; আমি যে সুপুরুষ, দেশে থাকতে নারীদের মুখে সে কথা চোখের মৌন ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় শোনবার সম্ভাবনা ছিল না, তাই এ তথ্যটা আমার চেতনার বাইরে পড়ে ছিল। বিলেতে গিয়ে যেমন আবিষ্কার করেছি সাধারণের তুলনায় আমার বুদ্ধি বেশি আছে, তেমনি ধরা পড়েছিল আমাকে দেখতে ভালো। আমার এদেশী পাঠকদের মনে ঈর্ষা জন্মাবার মতো অনেক কাহিনীর ভূমিকা দেখা দিয়েছিল, কিন্তু হলফ করে বলছি, আমি তাদের নিয়ে ভাবের কুহকে মনকে জমাট বাঁধতে দিই নি। হয়তো আমার স্বভাবটা কড়া, পশ্চিমবঙ্গের শৌখিনদের মতো ভাবালুতায় আর্দ্রচিত্ত নই; নিজেকে পাথরের সিন্দুক করে তার মধ্যে আমার সংকল্পকে ধরে রেখেছিলুম। মেয়েদের নিয়ে রসের পালা শুরু করে তার পরে সময় বুঝে খেলা ভঙ্গ করা, সেও ছিল আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ; আমি নিশ্চয় জানতুম, যে জেদ নিয়ে আমি আমার ব্রতের আশ্রয়ে বেঁচে আছি, এক-পা ফসকালে সেই জেদ নিয়েই আমার ভাঙা ব্রতের তলায় পিষে মরতে হবে। আমার পক্ষে এর মাঝখানে কোনো ফাঁকির পথ নেই। তা ছাড়া আমি জন্মপাড়াগেঁয়ে, মেয়েদের সম্বন্ধে আমার সেকেলে সংকোচ ঘুচতে চায় না। তাই মেয়েদের ভালোবাসা নিয়ে যারা অহংকারের বিষয় করে, আমি তাদের অবজ্ঞা করি।

বিদেশী ভালো ডিগ্রিই পেয়েছিলুম। সেটা এখানে সরকারী কাজে লাগবে না জেনে ছোটোনাগপুরে চন্দ্রবংশীয় এক রাজার— মনে করা যাক, চণ্ডবীর সিংহের দরবারে কাজ নিয়েছিলুম। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর ছেলে দেবিকাপ্রসাদ কিছুদিন কেম্ব্রিজে পড়াশুনা করেছিলেন। দৈবাৎ তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল জুরিকে, সেখানে আমার খ্যাতি তাঁর কানে গিয়েছিল। তাঁকে বুঝিয়েছিলুম আমার প্ল্যান। শুনে খুব উৎসাহিত হয়ে তাঁদের স্টেটে আমাকে জিয়লজিকাল সর্ভের কাজে লাগিয়ে দিলেন। এমন কাজ ইংরেজকে না দেওয়াতে উপরিস্তরের বায়ুমণ্ডল বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। কিন্তু দেবিকাপ্রসাদ ছিলেন ঝাঁঝালো লোক। বুড়ো রাজার মন টল্‌মল্‌ করা সত্ত্বেও টিকে গেলুম।

এখানে আসবার আগে মা আমাকে বললেন, "বাবা, ভালো কাজ পেয়েছ, এইবার একটি বিয়ে করো, আমার অনেক দিনের সাধ মিটুক।" আমি বললুম, "অর্থাৎ কাজ মাটি করো। আমার যে কাজ তার সঙ্গে বিয়ের তাল মিলবে না।" দৃঢ় সংকল্প, ব্যর্থ হল মায়ের অনুনয়। যন্ত্রতন্ত্র সমস্ত বেঁধে-ছেদে নিয়ে চলে এলুম জঙ্গলে।

এই বার আমার দেশব্যাপী কীর্তিসম্ভাবনার ভাবী দিগন্তে হঠাৎ যে একটুকু গল্প ফুটে উঠল, তাতে আলেয়ার চেহারাও আছে, আরও আছে শুকতারার। নীচের পাথরকে প্রশ্ন করে মাটির সন্ধানে বেড়াচ্ছিলুম বনে বনে। পলাশফুলের রাঙা রঙের মাতলামিতে তখন বিভোর আকাশ। শালগাছে ধরেছে মঞ্জরি, মৌমাছি ঘুরে বেড়াচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে। ব্যাবসাদাররা জৌ সংগ্রহে লেগে গিয়েছে। কুলের পাতা থেকে জমা করছে তসরের রেশমের গুটি। সাঁওতালরা কুড়োচ্ছে মহুয়া ফল। ঝির্‌ঝির্ শব্দে হালকা নাচের ওড়না ঘুরিয়ে চলেছিল একটি ছিপ্‌ছিপে নদী, আমি তার নাম দিয়েছিলুম তনিকা। এটা কারখানাঘর নয়, কলেজক্লাস নয়, এ সেই সুখতন্দ্রায় আবিল প্রদোষের রাজ্য যেখানে একলা মন পেলে প্রকৃতি-মায়াবিনী তার উপরেও রংরেজিনীর কাজ করে— যেমন সে করে সূর্যাস্তের পটে।

মনটাতে একটু আবেশের ঘোর লেগেছিল। মন্থর হয়ে এসেছিল কাজের চাল, নিজের উপরে বিরক্ত হয়েছিলুম; ভিতর থেকে জোর লাগাচ্ছিলুম দাঁড়ে। মনে ভাবছিলুম, ট্রপিকাল আবহাওয়ার মাকড়সার জালে জড়িয়ে পড়লুম বুঝি। শয়তানি ট্রপিক্‌স্ এ দেশে জন্মকাল থেকে হাতপাখার হাওয়ায় হারের মন্ত্র চালাচ্ছে আমাদের রক্তে— এড়াতে হবে তার স্বেদসিক্ত জাদু।

বেলা পড়ে এল। এক জায়গায় মাঝখানে চর ফেলে দুভাগে চলে গিয়েছে নদী। সেই বালুর দ্বীপে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে বকের দল। দিনাবসানে রোজ এই দৃশ্যটি ইঙ্গিত করত আমার কাজের বাঁক ফিরিয়ে দিতে, ঝুলিতে মাটি-পাথরের নমুনা নিয়ে ফিরে চলছিলুম আমার বাংলোঘরে, সেখানে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করতে যাব। অপরাহ্ণ আর সন্ধ্যার মাঝখানে দিনের যে একটা পোড়ো জমির মতো ফালতো অংশ আছে, একলা মানুষের পক্ষে সেইটে কাটিয়ে চলা শক্ত। বিশেষত নির্জন বনে। তাই আমি ওই সময়টা রেখেছি পরখ করার কাজে। ডাইনামোতে বিজলি বাতি জ্বালাই, কেমিক্যাল নিয়ে মাইক্রস্‌কোপ নিয়ে নিক্তি নিয়ে বসি। এক-একদিন রাত দুপুর পেরিয়ে যায়। আজ আমার সন্ধানে এক জায়গায় ম্যাঙ্গানিজের লক্ষণ যেন ধরা পড়েছিল। তাই দ্রুত উৎসাহে চলেছিলুম। কাকগুলো মাথার উপর দিয়ে গেরুয়া-রঙের আকাশে কা কা শব্দে চলেছিল বাসায়।

এমন সময় হঠাৎ বাধা পড়ল আমার কাজে ফেরায়। পাঁচটি শালগাছের ব্যূহ ছিল বনের পথে একটা ঢিবির উপরে। সেই বেষ্টনীর মধ্যে কেউ বসে থাকলে কেবল একটিমাত্র ফাঁকের মধ্যে দিয়ে তাকে দেখা যায়, হঠাৎ চোখ এড়িয়ে যাবারই কথা। সেদিন মেঘের মধ্যে আশ্চর্য একটা দীপ্তি ফেটে পড়েছিল। বনের সেই ফাঁকটাতে ছায়ার ভিতরে রাঙা আলো যেন দিগঙ্গনার গাঁঠছেঁড়া সোনার মুঠোর মতো ছড়িয়ে পড়েছে। ঠিক সেই আলোর পথে বসে আছে মেয়েটি, গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে পা দুটি বুকের কাছে গুটিয়ে একমনে লিখছে একটি ডায়ারির খাতা নিয়ে। এক মুহূর্তে আমার কাছে প্রকাশ পেল একটি অপূর্ব বিস্ময়। জীবনে এ রকম দৈবাৎ ঘটে। পূর্ণিমার বান ডেকে আসার মতো বক্ষতটে ধাক্কা দিতে লাগল জোয়ারের ঢেউ।

গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলুম। একটি আশ্চর্য ছবি চিহ্নিত হতে লাগল মনের চিরস্মরণীয়াগারে। আমার বিস্তৃত অভিজ্ঞতার পথে অনেক অপ্রত্যাশিত মনোহরের দরজায় ঠেকেছে মন, পাশ কাটিয়ে চলে গেছি, আজ মনে হল জীবনের একটা কোন্ চরমের সংস্পর্শে এসে পৌঁছলুম। এমন করে ভাবা, এমন করে বলা আমার একেবারে অভ্যস্ত নয়। যে-আঘাতে মানুষের নিজের অজানা একটা অপূর্ব স্বরূপ ছিটকিনি খুলে অবারিত হয়, সেই আঘাত আমাকে লাগল কী করে। বরাবর জানি, আমি পাহাড়ের মতো খট্‌খটে, নিরেট। ভিতর থেকে উছলে পড়ল ঝরনা।

একটা-কিছু বলতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু মানুষের সঙ্গে সব চেয়ে বড়ো আলাপের প্রথম কথাটি কী হতে পারে ভেবে পাই নে। সে হচ্ছে খৃষ্টীয় পুরাণের প্রথম সৃষ্টির বাণী, আলো জাগুক, অব্যক্ত হয়ে যাক ব্যক্ত। এক সময়ে মনে হল— মেয়েটি— ওর আসল নাম পরে জেনেছি কিন্তু সেটা ব্যবহার করব না, ওকে নাম দিলুম অচিরা। মানে কী। মানে এই, যার প্রকাশ হতে বিলম্ব হল না, বিদ্যুতের মতো। রইল ঐ নাম। মুখ দেখে মনে হল অচিরা জানতে পেরেছে, কে একজন আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। উপস্থিতির একটা নীরব ধ্বনি আছে বুঝি। লেখা বন্ধ করেছে, অথচ উঠতে পারছে না। পলায়নটা পাছে বড্ড বেশি স্পষ্ট হয়। একবার ভাবলুম বলি, 'মাপ করুন'— কী মাপ করা, কী অপরাধ, কী বলব তাকে। একটু তফাতে গিয়ে বিলিতি বেঁটে কোদাল নিয়ে মাটিতে খোঁচা মারবার ভান করলুম, ঝুলিতে একটা কী পুরলুম, সেটা অত্যন্ত বাজে। তার পরে ঝুঁকে প'ড়ে মাটিতে বিজ্ঞানী দৃষ্টি চালনা করতে করতে চলে গেলুম। কিন্তু নিশ্চয় মনে জানি, যাঁকে ভোলাবার চেষ্টা করেছিলুম তিনি ভোলেন নি। মুগ্ধ পুরুষচিত্তের দুর্বলতার আরও অনেক প্রমাণ তিনি আরও অনেকবার পেয়েছেন, সন্দেহ নেই। আশা করলুম আমার বেলায় এটা তিনি

মনে-মনে উপভোগ করেছেন। এর চেয়ে বেড়া আর অল্প-একটু যদি ডিঙোতুম, তা হলে— তা হলে কী হ'ত কী জানি। রাগতেন, না রাগের ভান করতেন? অত্যন্ত চঞ্চল মন নিয়ে চলেছি আমার বাংলো ঘরের পথে, এমন সময় আমার চোখে পড়ল দুই টুকরায় ছিন্নকরা একখানা চিঠির খাম। এটাকে জিয়লজিকাল নমুনা বলে না। তবু তুলে দেখলুম। নামটা ভবতোষ মজুমদার আই. সি. এস.; ঠিকানা ছাপরা, মেয়েলি হাতে লেখা। টিকিট লাগানো আছে, তাতে ডাকঘরের ছাপ নেই। যেন কুমারীর দ্বিধা। আমার বিজ্ঞানী বুদ্ধি; স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, এই ছেঁড়া চিঠির খামের মধ্যে একটা ট্র্যাজেডির ক্ষতচিহ্ন আছে। পৃথিবীর ছেঁড়া স্তর থেকে তার বিপ্লবের ইতিহাস বের করা আমাদের কাজ। সেই আমার সন্ধানপটু হাত এই ছেঁড়া খামের রহস্য আবিষ্কার করতে সংকল্প করলে।

ইতিমধ্যে ভাবছি, নিজের অন্তঃকরণের রহস্য অভূতপূর্ব। এক-একটা বিশেষ অবজ্ঞার সংস্পর্শে তার ভাবখানা কী যে একটা নতুন আকারে দানা বেঁধে দেখা দেয়, এবারে তার পরিচয়ে বিস্মিত হয়েছি। এতদিন যে-মনটা নানা কঠিন অধ্যবসায় নিয়ে শহরে শহরে জীবনের লক্ষ্য সন্ধানে ঘুরেছে, তাকে স্পষ্ট করে চিনেছিলুম। ভেবেছিলুম সেই আমার সত্যকার স্বভাব, তার আচরণের ধ্রুবত্ব সম্বন্ধে আমি হলপ করতে পারতুম। কিন্তু তার মধ্যে বুদ্ধিশাসনের বহির্ভূত যে-একটা মূঢ় লুকিয়ে ছিল, তাকে এই প্রথম দেখা গেল। ধরা পড়ে গেল আরণ্যক, যে যুক্তি মানে না, যে মোহ মানে। বনের একটা মায়া আছে, গাছপালার নিঃশব্দ চক্রান্ত, আদিম প্রাণের মন্ত্র-ধ্বনি। দিনে দুপুরে ঝাঁ ঝাঁ করে তার উদাত্ত স্বর, রাতে দুপুরে মন্দ্রগম্ভীর ধ্বনি, গুঞ্জন করতে থাকে জীব-চেতনায়, আদিম প্রাণের গূঢ় প্রেরণায় বুদ্ধিকে দেয় আবিষ্ট করে।

জিয়লজির চর্চার মধ্যেই ভিতরে ভিতরে এই আরণ্যক মায়ার কাজ চলছিল, খুঁজছিলুম রেডিয়মের কণা, যদি কৃপণ পাথরের মুঠির মধ্য থেকে বের করা যায়; দেখতে পেলুম অচিরাকে, কুসুমিত শালগাছের ছায়ালোকের বন্ধনে। এর পূর্বে বাঙালি মেয়েকে দেখেছি সন্দেহ নেই। কিন্তু সবকিছু থেকে স্বতন্ত্র ভাবে এমন একান্ত করে তাকে দেখবার সুযোগ পাই নি। এখানে তার শ্যামল দেহের কোমলতায় বনের লতাপাতা আপন ভাষা যোগ করে দিল। বিদেশিনী রূপসী তো অনেক দেখেছি, যথোচিত ভালোও লেগেছে। কিন্তু বাঙালি মেয়ে এই যেন প্রথম দেখলুম, ঠিক যে-জায়গায় তাকে সম্পূর্ণ দেখা যেতে পারে, এই নিভৃত বনের মধ্যে সে নানা পরিচিত-অপরিচিত বাস্তবের সঙ্গে জড়িয়ে মিশিয়ে নেই; দেখে মনে হয় না, সে বেণী দুলিয়ে ডায়োসিশনে পড়তে যায়, কিংবা বেথুন কলেজের ডিগ্রিধারিণী, কিংবা বালিগঞ্জের

টেনিসপার্টিতে উচ্চ কলহাস্যে চা পরিবেশন করে। অনেকদিন আগে ছেলেবেলায় হরু ঠাকুর কিংবা রাম বসুর যে গান শুনে তারপরে ভুলে গিয়েছিলুম, যে-গান আজ রেডিয়োতে বাজে না, গ্রামোফোনে পাড়া মুখরিত করে না, জানিনে কেন মনে হল সেই গানের সহজ রাগিণীতে ঐ বাঙালি মেয়েটির রূপের ভূমিকা— মনে রইল সই মনের বেদনা। এই গানের সুরে যে-একটি করুণ ছবি আছে, সে আজ রূপ নিয়ে আমার চোখে স্পষ্ট ফুটে উঠল। এও সম্ভব হল। কোন্ প্রবল ভূমিকম্পে পৃথিবীর-যে তলায় লুকোনো আগ্নেয় সামগ্রী উপরে উঠে পড়ে, জিয়লজি শাস্ত্রে তা পড়েছি, নিজের মধ্যে দেখলুম সেই নীচের তলায় অন্ধকারের তপ্তবিগলিত জিনিসকে হঠাৎ উপরের আলোতে। কঠোর বিজ্ঞানী নবীনমাধবের অটল অন্তঃস্তরে এই উলটপালট আমি কোনোদিন আশা করতে পারি নি।

বুঝতে পারছি, যখন আমি রোজ বিকেলবেলায় এই পথ দিয়ে আমার কাজে ফিরেছি, ও আমাকে দেখেছে, অন্যমনস্ক আমি ওকে দেখি নি। বিলেতে যাবার পর থেকে নিজের চেহারার উপর একটা গর্ব জন্মেছে। ও, হাউ হ্যাণ্ডসম— এই প্রশস্তি কানাকানিতে আমার অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিলেতফেরত আমার কোনো কোনো বন্ধুর কাছে শুনেছি, বাঙালি মেয়ের রুচি আলাদা, তারা মোলায়েম মেয়েলি রূপই পুরুষের রূপে খোঁজে। চলিত কথা হচ্ছে—কার্তিকের মতো চেহারা। বাঙালি কার্তিক আর যাই হোক, কোনো পুরুষে দেবসেনাপতি নয়। প্যারিসে একজন বান্ধবীর মুখে শুনেছি, বিলিতি সাদা রঙ রঙের অভাব ; ওরিয়েন্টালের দেহে গরম আকাশ যে রঙ এঁকে দেয় সে সত্যিকার রঙ, সে ছায়ার রঙ, ঐ রঙই আমাদের ভালো লাগে ; এ কথাটা বঙ্গোপসাগরের ধারে বোধ হয় খাটে না। এতদিন এ-সব আলোচনা আমার মনেই ওঠে নি। কয়েকদিন ধরে আমাকে ভাবিয়েছে। রোদে-পোড়া আমার রঙ, লম্বা আমার প্রাণসার দেহ, শক্ত আমার বাহু, দ্রুত আমার গতি, শুনেছি দৃষ্টি আমার তীক্ষ্ণ, নাক চিবুক কপাল নিয়ে সুস্পষ্ট জোরালো আমার চেহারা। এপ্স্টাইন পাথরে আমার মূর্তি গড়তে চেয়েছিল, সময় দিতে পারি নি। কিন্তু বাঙালিকে আমি মায়ের খোক্কা বলেই জানি, আর মায়েরা তাদের কোলের ধনকে মোমে-গড়া পুতুলের মতো দেখতেই ভালোবাসে। এ-সব কথা মনের মধ্যে ঘুলিয়ে উঠে আমাকে রাগিয়ে তুলছিল। আগেভাগেই কল্পনায় ঝগড়া করছিলুম অচিরার সঙ্গে, বলছিলুম, 'তুমি যাকে বলো সুন্দর সে বিসর্জনের দেবতা, তোমাদের স্তব যদি বা পায় সে, টেঁকে না বেশিদিন।' বলছিলুম, 'আমি বড়ো বড়ো দেশের স্বয়ম্বরসভার মালা উপেক্ষা করে এসেছি, আর তুমি আমাকে উপেক্ষা করবে?' গায়ে প'ড়ে এই বানানো ঝগড়া এমনি ছেলেমানুষি

যে, একদিন হেসে উঠেছি আপন উষ্মায়। এদিকে বিজ্ঞানীর যুক্তি কাজ করছে ভিতরে ভিতরে। মনকে জানাই, এটাও একটা মস্ত কথা, আমার যাতায়াতের পথের ধারে ও বসে থাকে— একান্ত নিভৃতই যদি ওর প্রার্থনীয় হত, তা হলে ঠাঁই বদল করত। প্রথম প্রথম আমি ওকে আড়ে আড়ে দেখেছি, যেন দেখে নি এই ভান করে। ইদানীং মাঝে মাঝে স্পষ্ট চোখোচোখি হয়েছে— যতদূর আমার বিশ্বাস, সেটাকে চার চোখের অপঘাত ব'লে ওর মনে হয় নি।

এর চেয়েও বিশেষ একটা পরীক্ষা হয়ে গেছে। এর আগে দিনের বেলায় মাটি-পাথরের কাজ সাঙ্গ ক'রে দিনের শেষে ঐ পঞ্চবটীর পথ দিয়ে একবারমাত্র যেতেম বাসার দিকে। সম্প্রতি যাতায়াতের পুনরাবৃত্তি হতে আরম্ভ হয়েছে। এই ঘটনাটা যে জিয়লজি সম্পর্কিত নয়, সে কথা বোঝবার মতো বয়স হয়েছে অচিরার, আমারও সাহস ক্রমশ বেড়ে চলল যখন দেখলুম, এই সুস্পষ্ট ভাবের আভাসেও তরুণীকে স্থানচ্যুত করতে পারল না। এক-একদিন হঠাৎ পিছন ফিরে দেখেছি, অচিরা আমার তিরোগমনের দিকে চেয়ে আছে, আমি ফিরতেই তাড়াতাড়ি ডায়ারির দিকে চোখ নামিয়ে নিয়েছে। সন্দেহ হল, ওর ডায়ারি লেখার ধারায় আগেকার মতো বেগ নেই। আমার বিজ্ঞানী বুদ্ধিতে মনোরহস্যের আলোচনা জেগে উঠল। বুঝেছি সে কোনো-এক পুরুষের জন্যে তপস্যার ব্রত নিয়েছে, তার নাম ভবতোষ, সে ছাপরায় অ্যাসিস্টেণ্ট ম্যাজেস্ট্রেটি করছে বিলেত থেকে ফিরে এসেই। তার পূর্বে দেশে থাকতে এদের দুজনের প্রণয় ছিল গভীর, কাজ নেবার মুখেই একটা আকস্মিক বিপ্লব ঘটেছে। ব্যাপারটা কী, খবর নিতে হবে। শক্ত হল না, কেননা পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার কেম্ব্রিজের সতীর্থ আছে বঙ্কিম।

তাকে চিঠি লিখে পাঠালুম, 'বেহার সিভিল সার্ভিসে আছে ভবতোষ। কন্যাকর্তাদের মহলে জনশ্রুতি শোনা যায়, লোকটি সৎপাত্র। আমার কোনো বন্ধু আমাকে তাঁর মেয়ের জন্যে ঐ লোকটিকে প্রাজাপতিক ফাঁদে ফেলতে সাহায্য করতে অনুরোধ করেছেন। রাস্তা পরিষ্কার আছে কি না, আদ্যন্ত খবর নিয়ে তুমি যদি আমাকে জানাও, কৃতজ্ঞ হব। লোকটির মতিগতি কী রকম তাও জানতে চাই।'

উত্তর এল, 'রাস্তা বন্ধ। আর মতিগতি সম্বন্ধে এখনও যদি কৌতূহল বাকি থাকে, তবে শোনো।—

'কলেজে পড়বার সময় আমি ছাত্র ছিলুম ডাক্তার অনিলকুমার সরকারের— অ্যাল্‌ফাবেটের অনেকগুলি অক্ষর জোড়া তাঁর নাম। যেমন তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, তেমনি ছেলেমানুষের মতো তাঁর সরলতা। একমাত্র সংসারের আলো তাঁর নাতনিটিকে

যদি দেখো, তা হলে মনে হবে সাধনায় খুশি হয়ে সরস্বতী কেবল যে আবির্ভূত হয়েছেন তাঁর বুদ্ধিলোকে তা নয়, রূপ নিয়ে এসেছেন তাঁর কোলে। ঐ শয়তান ভবতোষ ঢুকল ওঁর স্বর্গলোকে। বুদ্ধি তার তীক্ষ্ণ, বচন তার অনর্গল। প্রথমে ভুললেন অধ্যাপক, তারপরে ভুলল তাঁর নাতনি। ওদের অসহ্য অন্তরঙ্গতা দেখে আমাদের হাত নিস্‌পিস্‌ করত। কিছু বলবার পথ ছিল না, বিবাহসম্বন্ধ পাকাপাকি স্থির হয়ে গিয়েছিল, কেবল অপেক্ষা ছিল বিলেত গিয়ে সিভিল সার্ভিসে উত্তীর্ণ হয়ে আসার। তার পাথেয় আর খরচ জুগিয়েছেন অধ্যাপক। লোকটার সর্দির ধাত ছিল। বধির ভগবানের কাছে আমরা দুবেলা প্রার্থনা করেছি, বিবাহের পূর্বে লোকটা যেন হ্যমোনিয়া হয়ে মরে। কিন্তু মরে নি। পাস করেছে। করেই ইণ্ডিয়া গবর্মেণ্টের উচ্চপদস্থ এক-জন মুরুব্বির মেয়েকে বিয়ে করেছে। লজ্জায় ক্ষোভে নিজের কাজ ছেড়ে দিয়ে মর্মাহত মেয়েটিকে নিয়ে অধ্যাপক কোথায় যে অন্তর্ধান করেছেন, তার খবর রেখে যান নি।'

চিঠিখানা পড়লুম। দৃঢ় সংকল্প করলুম, এই মেয়েটিকে তার লজ্জা থেকে অবসাদ থেকে উদ্ধার করব।

ইতিমধ্যে অচিরার সঙ্গে কোনোরকম করে একটা কথা আরম্ভ করবার জন্যে মন ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল। যদি বিজ্ঞানী না হয়ে হতুম সাহিত্যরসিক, কিংবা বাঙাল না হয়ে যদি হতুম-পশ্চিমবঙ্গের আধুনিক, তা হলে নিশ্চয় মুখে কথা বাধত না। কিন্তু বাঙালি মেয়েকে ভয় করি, চিনি নে ব'লে বোধ হয়। একটা ধারণা ছিল, হিন্দুনারী অজানা পরপুরুষমাত্রের কাছে একান্তই অনধিগম্য। খামকা কথা কইতে যাই যদি, তা হলে ওর রক্তে লাগবে অশুচিতা। সংস্কার জিনিসটা এমনি অন্ধ। এখানে কাজে যোগ দেবার পূর্বে কিছুদিন তো কলকাতায় কাটিয়ে এসেছি— আত্মীয়বন্ধুমহলে দেখে এলুম সিনেমামঞ্চপথবর্তিনী রঙমাখানো বাঙালি মেয়ে, যারা জাতবান্ধবী, তাদের— থাক্‌ তাদের কথা। কিন্তু অচিরার কোনো পরিচয় না পেয়েই মনে হল, ও আর-এক জাতের— এ কালের বাইরে আছে দাঁড়িয়ে নির্মল আত্মমর্যাদায়, স্পর্শভীরু মেয়ে। মনে-মনে কেবলই ভাবছি, প্রথম একটি কথা শুরু করব কী করে।

এই সময়ে কাছাকাছি দুই-একটা ডাকাতি হয়ে গিয়েছিল। মনে হল এই উপলক্ষে অচিরাকে বলি, 'রাজাকে ব'লে আপনার জন্যে পাহারার বন্দোবস্ত করে দিই।' ইংরেজ মেয়ে হলে হয়তো এই গায়েপড়া আনুকূল্যকে স্পর্ধা মনে করত, মাথা ঝাঁকিয়ে বলত, 'সে ভাবনা আমার'; কিন্তু এই বাঙালির মেয়ে যে কী ভাবে কথাটা নেবে, আমার সে অভিজ্ঞতা নেই। দীর্ঘকাল বাংলার বাইরে থেকে আমার মনের অভ্যাস অনেকখানি জড়িয়ে গেছে বিলিতি সংস্কারে।

দিনের আলো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এইবার অচিরার ঘরে ফেরবার সময়, কিংবা ওর দাদামশায় এসে ওকে বেড়াতে নিয়ে যাবেন। এমন সময়ে একজন হিন্দুস্থানী গোঁয়ার এসে অচিরার হাত থেকে হঠাৎ তার ব্যাগ আর ডায়ারিটা ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছিল, আমি সেই মুহূর্তেই বনের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বললুম, "কোনো ভয় নেই আপনার।"— এই ব'লে ছুটে সেই লোকটার ঘাড়ের উপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তেই সে ব্যাগ আর খাতা ফেলে দৌড় মারলে। আমি লুঠের ধন নিয়ে এসে অচিরাকে দিলুম।

অচিরা বললে, "ভাগ্যিস আপনি—"

আমি বললুম, "আমার কথা বলবেন না, ভাগ্যিস ও লোকটা এসেছিল।"

"তার মানে ?"

"তার মানে, ওরই সাহায্যে আপনার সঙ্গে প্রথম কথাটা হয়ে গেল। এতদিন কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিলুম না, কী যে বলি।"

"কিন্তু ও যে ডাকাত।"

"না, ও ডাকাত নয়, ও আমার বরকন্দাজ।"

অচিরা মুখে তার খয়েরী রঙের আঁচল তুলে ধ'রে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল। কী মিষ্টি তার ধ্বনি, যেন ঝর্‌নার স্রোতে নুড়ির নুরওয়ালা শব্দ।

হাসি থামতেই বললে, "কিন্তু সত্যি হলে খুব মজা হত।"

"মজা হত কার পক্ষে।"

"যাকে নিয়ে ডাকাতি তার পক্ষে। এই রকম যে একটা গল্প পড়েছি।"

"তারপরে উদ্ধারকর্তার কী হত।"

"তাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে চা খাইয়ে দিতুম।"

"আর এই ফাঁকি উদ্ধারকর্তার কী হবে।"

"তার তো আর-কিছুতে দরকার নেই। সে তো আলাপ করবার প্রথম কথাটা চেয়েছিল— পেয়েছে দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম কথা।"

"গণিতের সংখ্যাগুলো হঠাৎ ফুরোবে না তো।"

"কেন ফুরোবে।"

"আচ্ছা, আপনি হলে আমাকে প্রথম কথাটা কী বলতেন।"

"আমি হলে বলতুম, রাস্তায় ঘাটে কতকগুলো নুড়ি কুড়িয়ে কী ছেলেমানুষি করছেন। আপনার কি বয়স হয় নি।"

"কেন বলেন নি।"

"ভয় করেছিল।"

"ভয়? আমাকে ভয়?"

"আপনি যে বড়ো লোক। দাদুর কাছে শুনেছি। তিনি যে আপনার লেখা প্রবন্ধ বিলিতি কাগজে পড়েছিলেন। তিনি যা পড়েন আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন।"

"এটাও করেছিলেন?"

"হাঁ, করেছিলেন। কিন্তু লাটিন নামের পাহারার ঘটা দেখে জোড়হাত ক'রে বলেছিলুম, দাদু, এটা থাক্, বরঞ্চ তোমার কোয়ন্টম থিয়োরির বইখানা নিয়ে আসি।"

"সেটা বুঝি আপনি বুঝতে পারেন?"

"কিছুমাত্র না। কিন্তু দাদুর একটা বদ্ধ সংস্কার আছে— সবাই সবকিছুই বুঝতে পারে। তাঁর সে বিশ্বাস ভাঙতে আমার ভালো লাগে না। তাঁর আর-একটা আশ্চর্য ধারণা আছে— মেয়েদের সহজবুদ্ধি পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি তীক্ষ্ণ। তাই ভয়ে ভয়ে আছি এইবার নিশ্চয়ই 'টাইম-স্পেস'-এর জোড়-মেলানো সম্বন্ধের ব্যাখ্যা আমাকে শুনতে হবে। আসল কথা, মেয়েদের উপর তাঁর করুণার অন্ত নেই। দিদিমা যখন বেঁচে ছিলেন, বড়ো বড়ো কথা পাড়লেই তিনি মুখ বন্ধ করে দিতেন। তাই মেয়েদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি যে কতদূর যেতে পারে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিদিমার কাছ থেকে পান নি। আমি ওঁকে হতাশ করতে পারব না। অনেক শুনেছি, বুঝি নি, আরও অনেক শুনব আর বুঝব না।"

অচিরার দুই চোখ কৌতুকে স্নেহে জল্‌জল্ ছল্‌ছল্ করে উঠল। ইচ্ছে করছিল, স্নিগ্ধ কণ্ঠের এই আলাপ শীঘ্র যেন শেষ হয়ে না যায়। দিনের আলো ম্লান হয়ে এল। সন্ধ্যার প্রথম তারা জ্বলে উঠেছে শালবনের মাথার উপরে। সাঁওতাল মেয়েরা জ্বালানি-কাঠ সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছে ঘরে, দূর থেকে শোনা যাচ্ছে তাদের গান।

এমন সময় বাইরে থেকে ডাক এল, "দিদি, কোথায় তুমি। অন্ধকার হয়ে এল যে। আজকাল সময় ভালো নয়।"

"ভালো তো নয়ই দাদু, তাই একজন রক্ষাকর্তা নিযুক্ত করেছি।"

অধ্যাপক আসতেই তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলুম। তিনি শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন। পরিচয় দিলুম, "আমার নাম নবীনমাধব সেনগুপ্ত।"

বৃদ্ধের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বললেন, "বলেন কী, আপনিই ডাক্তার সেনগুপ্ত? আপনি তো ছেলেমানুষ।"

আমি বললুম, "নিতান্ত ছেলেমানুষ। আমার বয়স ছত্রিশের বেশি নয়।"

আবার অচিরার সেই কলমধুর কণ্ঠের হাসি, আমার মনে যেন দুনো লয়ের ঝংকারে সেতার বাজিয়ে দিলে। বললে, "দাদুর কাছে পৃথিবীর সবাই ছেলেমানুষ, আর দাদু হচ্ছেন সকল ছেলেমানুষের আগরওয়ালা।"

অধ্যাপক বললেন, "আগরওয়ালা? একটা নতুন শব্দ বাংলায় আমদানি করলে। কোথা থেকে জোটালে।"

"সেই যে তোমার ভালোবাসার মাড়োয়ারি ছাত্র, কুন্দনলাল আগরওয়াল্লা; আমাকে এনে দিত বোতলে করে আমের চাটনি; আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, আগরওয়ালা কথাটার মানে কী। সে বলেছিল, পায়োনিয়র।"

অধ্যাপক বললেন, "ডাক্তার সেনগুপ্ত, আপনার সঙ্গে আলাপ হল যদি, আমাদের ওখানে যেতে হবে তো।"

"কিচ্ছু বলতে হবে না, দাদু। যাবার জন্যে লাফালাফি করছেন। আমার কাছে শুনেছেন, দেশকালের একজোট তত্ত্ব নিয়ে তুমি ব্যাখ্যা করবে আইন্‌স্টাইনের কাঁধে চ'ড়ে।"

মনে মনে বললুম, 'সর্বনাশ। কী দুষ্টুমি।'

অধ্যাপক অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে বললেন, "আপনার বুঝি 'টাইম্-স্পেস'-এর—"

আমি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলুম, "কিচ্ছু বুঝি নে 'টাইম্-স্পেস'-এর। আমাকে বোঝাতে গেলে আপনার সময় নষ্ট হবে মাত্র।"

বৃদ্ধ ব্যগ্র হয়ে বলে উঠলেন, "সময়! এখানে সময়ের অভাব কোথায়। আচ্ছা, এক কাজ করুন-না, আজকে নাহয় আমাদের ওখানে আহার করবেন, কী বলেন।"

আমি লাফ দিয়ে বলতে যাচ্ছিলুম, 'এখ্‌খনি।'

অচিরা বলে উঠল, "দাদু, সাধে তোমাকে বলি ছেলেমানুষ। যখন-তখন নেমতন্ন করে তুমি আমাকে মুশকিলে ফেল। এই দণ্ডকারণ্যে ফিরপোর দোকান পাব কোথায়। ওঁরা বিলেতের ডিনার-খাইয়ে জাতের সর্বগ্রাসী মানুষ, কেন তোমার নাতনির বদনাম করবে। অন্তত ভেটকিমাছ আর ভেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে তো।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, তা হলে কবে আপনার সুবিধে হবে বলুন।"

"সুবিধে আমার কালই হতে পারবে। কিন্তু অচিরা দেবীকে বিপন্ন করতে চাই নে। ঘোর জঙ্গলে পাহাড়ে গুহাগহ্বরে আমাকে ভ্রমণে যেতে হয়। সঙ্গে রাখি থলে ভরে চিঁড়ে, ছড়াকয়েক কলা, বিলিতি বেগুন, কাঁচা ছোলার শাক, চিনেবাদামও কখনও থাকে। আমি সঙ্গে নিয়ে আসব ফলারের আয়োজন, অচিরা দেবী দই দিয়ে স্বহস্তে মেখে আমাকে খাওয়াবেন, এতে যদি রাজি থাকেন তা হলে কোনো কথা থাকবে না।"

"দাদু, বিশ্বাস কোরো না এ-সব লোককে। তুমি বাংলা মাসিকে লিখেছিলে বাঙালির খাদ্যে ভিটেমিনের প্রভাব, সে উনি পড়েছেন, তাই কেবল তোমাকে খুশি করবার জন্যে চিঁড়েকলার ফর্দ তোমাকে শোনালেন।"

আমি ভাবলুম, মুশকিলে ফেললে। বাংলা কাগজে ডাক্তারের লেখা ভিটামিনের তত্ত্ব পড়া কোনোকালে আমার দ্বারা সম্ভব নয়; কিন্তু কবুল করি কী করে।—বিশেষত উনি যখন উৎফুল্ল হয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সেটা পড়েছেন নাকি।"

আমি বললুম, "পড়ি বা না-পড়ি তাতে কিছু আসে যায় না, আসল কথা—"

"আসল কথা, উনি নিশ্চয় জানেন কাল যদি ওঁকে খাওয়াই, তা হলে ওঁর পাতে পশুপক্ষী স্থাবরজঙ্গম কিছুই বাদ পড়বে না। সেই জন্যে অত নিশ্চিন্ত মনে বিলিতি বেগুনের নামকীর্তন করলেন। ওঁর শরীরটার দিকে দেখো না চেয়ে, শুধু শাকান্নে গড়া ব'লে কেউ সন্দেহ করতে পারে? দাদু, তুমি সবাইকেই অত্যন্ত বেশি বিশ্বাস কর, এমনকি, আমাকেও। সেইজন্যে ঠাট্টা করে তোমাকে কিছু বলতে সাহস করি নে।"

বলতে বলতে ধীরে ধীরে আমরা ওঁদের বাড়ির দিকে চলেছি, এমন সময় হঠাৎ অচিরা বলে উঠল, "এইবার আপনি ফিরে যান বাসায়।"

"কেন, আমি ভেবেছিলুম আপনাদের বাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসব।"

"ঘর এলোমেলো হয়ে আছে। আপনি বলবেন, বাঙালি মেয়েরা সব অগোছালো। কাল এমন ক'রে সাজিয়ে রাখব যে মেমসাহেবের কথা মনে পড়বে।"

অধ্যাপক বললেন, "আপনি কিছু মনে করবেন না ডক্টর সেনগুপ্ত, অচি বেশি কথা কচ্ছে, কিন্তু ওর স্বভাব নয় সেটা। এখানে বড়ো নির্জন ব'লে ও জুড়ে রাখে আমার মনকে অনর্গল কথা কয়ে। সেটাই ওর অভ্যেস হয়ে গেছে। ও যখন চুপ করে থাকে তখনই আমার ঘরটা যেন ছম্‌ছম্‌ করতে থাকে, আমার মনটাও। ও জানে সে কথা। আমার ভয় করে পাছে ওকে কেউ ভুল বোঝে।"

বুড়োর গলা জড়িয়ে ধ'রে অচিরা বললে, "বুঝুক-না দাদু, অত্যন্ত অনিন্দনীয়া হতে চাই নে, সেটা অত্যন্ত আনইণ্টারেস্টিঙ।"

অধ্যাপক সগর্বে বলে উঠলেন, "জানেন সেনগুপ্ত, আমার দিদি কিন্তু কথা কইতে জানে, অমন আমি কাউকে দেখি নি।"

"তুমি আমার মতো কাউকে দেখো নি দাদু, আমিও কাউকে দেখি নি তোমার মতো।"

আমি বললুম, "আচার্যদেব, যাবার আগে আমাকে কিন্তু একটা কথা দিতে হবে।"

"আচ্ছা বেশ"।

"আপনি যতবার আমাকে আপনি বলেন, আমি মনে-মনে ততবার জিভ কাটতে থাকি। আমাকে তুমি যদি বলেন, তা হলে সেটাতেই যথার্থ আপনার স্নেহে সম্মান পাব। এ বাড়িতে আমাকে তুমি-শ্রেণীতে তুলে দিতে আপনার নাতনিও সাহায্য করবেন।"

"সর্বনাশ। আমি সামান্য নাতনি, হঠাৎ অত উঁচুতে নাগাল পাব না, আপনি বড়োলোক। আমি বলি আর-কিছুদিন যাক, যদি ভুলতে পারি আপনার ডিগ্রিধারী রূপ, তা হলে সবই সম্ভব হবে। কিন্তু দাদুর কথা স্বতন্ত্র। এখনই শুরু করো। দাদু, বলো তো, তুমি কাল খেতে এসো, দিদি যদি মাছের ঝোলে নুন বেশি দিয়ে ফেলে, তা হলে ভালোমানুষের মতো সহ্য কোরো, বোলো, বাঃ কী চমৎকার, পাতে আরও একটু দিতে হবে।"

অধ্যাপক সস্নেহে আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, "ভাই, আর কিছুকাল আগে যদি আমার দিদিকে দেখতে, তা হলে বুঝতে পারতে, আসলে ও লাজুক। সেইজন্যে ও যখন আলাপ করা কর্তব্য মনে করে, তখন জোর করতে গিয়ে কথা বেশি হয়ে পড়ে।"

"দেখেছেন ডক্টর সেনগুপ্ত, দাদু আমাকে কী রকম মধুর করে শাসন করেন। যেন ইক্ষুদণ্ড দিয়ে। অনায়াসে বলতে পারতেন, তুমি বড়ো মুখরা, তোমার প্রগল্‌ভতা অত্যন্ত অসহ্য। আপনি কিন্তু আমাকে ডিফেণ্ড করবেন। কী বলবেন, বলুন না।"

"আপনার মুখের সামনে বলব না।"

"বেশি কঠোর হবে?"

"আপনি জানেন আমার মনের কথা।"

"তা হলে থাক্। এখন বাড়ি যান।"

"একটা কথা বাকি আছে। কাল আপনাদের ওখানে যে নেমন্তন্ন সে আমার নতুন নামকরণের। কাল থেকে নবীনমাধব নাম থেকে লোপ পাবে ডাক্তার সেনগুপ্ত। সূর্যের কাছে আনাগোনা করতে গিয়ে ধূমকেতুর যেমন লেজটা যায় উড়ে, মুণ্ডটা থাকে বাকি।"

"তা হলে নামকর্তন বলুন, নামকরণ বলছেন কেন।"

"আচ্ছা, তাই সই।"

এইখানে শেষ হল আমার প্রথম বড়োদিন।

বার্ধক্যের কী প্রশান্ত সৌন্দর্য, কী সৌম্য মূর্তি। চোখদুটি যেন আশীর্বাদ করছে।

হাতে একটি পালিশ-করা লাঠি, গলায় শুভ্র পাট-করা চাদর, ধুতি যত্নে কোঁচানো, গায়ে তসরের জামা, মাথায় শুভ্র চুল বিরল হয়ে এসেছে, কিন্তু পরিপাটি করে আঁচড়ানো। স্পষ্ট বোঝা যায় এঁর সাজসজ্জায় এঁর দিনযাত্রায় নাতনির হাতের শিল্প-কার্য। ইনি যে অতিলালনের অত্যাচার সহ্য করেন, সে কেবল এই মেয়েটিকে খুশি রাখবার জন্যে।

আমার বৈজ্ঞানিক খবরকে ছাড়িয়ে উঠল, এঁদের খবর নেওয়া। অধ্যাপকের নাম ব্যবহার করব, অনিলকুমার সরকার। গত জেনেরেশনের কেম্‌ব্রিজ য়ুনিভার্সিটির পি. এইচ.-ডি. দলের একজন। মাসকয়েক আগে একটি ঔপনাগরিক কলেজের অধ্যক্ষতা ত্যাগ করে এখানকার স্টেটের একটা পরিত্যক্ত ডাকবাংলা ভাড়া নিয়ে নিজের খরচে সেটা বাসযোগ্য করেছেন। এইটে হল ইতিহাসের খসড়া, বাকিটুকু বঙ্কিমের চিঠি থেকে মিলিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

আমার গল্পের আদিপর্ব শেষ হয়ে গেল। ছোটোগল্পের আদি ও অন্তে বেশি ব্যবধান থাকে না। জিনিসটাকে ফলিয়ে বলবার লোভ করব না, ওর স্বভাব নষ্ট করতে চাই নে।

অচিরার সঙ্গে স্পষ্ট কথা বলার যুগ এল সংক্ষেপেই। সেদিন চড়িভাতি হয়েছিল তনিকা নদীর তীরে।

অধ্যাপক ছেলেমানুষের মতন হঠাৎ আমাকে জিগ্‌গেসা করে বসলেন, "নবীন, তোমার কি বিবাহ হয়েছে।"

প্রশ্নটা এতই সুস্পষ্ট ভাবব্যঞ্জক যে, আর কেউ হলে ওটা চেপে যেত। আমি উত্তর করলুম, "না, এখনও তো হয় নি।"

অচিরার কাছে কোনো কথাই এড়ায় না। সে বললে, "দাদু, ঐ এখনও শব্দটা সংশয়গ্রস্ত কন্যাকর্তাদের মনকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে। ওর কোনো যথার্থ মানে নেই।"

"একেবারে মানে যে নেই, এ কথা নিশ্চিত স্থির করলেন কী ক'রে।"

"এটা গণিতের প্রব্লেম— তাও হাইয়ার ম্যাথ্‌ম্যাটিক্‌স্‌ বললে যা বোঝায়, তা নয়। পূর্বেই শোনা গেছে, আপনি ছত্রিশ বছরের ছেলেমানুষ। হিসেব করে দেখলুম, এর মধ্যে আপনার মা অন্তত পাঁচসাতবার আপনাকে বলেছেন, 'বাবা, ঘরে বউ আনতে চাই।' আপনি বলেছেন, 'তার আগে চাই লোহার সিন্দুকে টাকা আনতে'। মা চোখের জল মুছে চুপ করে রইলেন। তারপরে ইতিমধ্যে আপনার আর-সব হয়েছে, কেবল ফাঁসি ছিল বাকি। শেষকালে এখানকার রাজসরকারে যখন মোটা মাইনের পদ

জুটল, মা আবার বললেন, 'বাবা, এবার বিয়ে করতে হবে, আমার আর কদিন বা সময় আছে।' আপনি বললেন, 'আমার জ।বন আর আমার সায়ান্স এক, সে আমি দেশকে উৎসর্গ করব। আমি কোনোদিন বিয়ে করব না।' হতাশ হয়ে আবার তিনি চোখের জল মুছে বসে আছেন। আপনার ছত্রিশ বছর বয়সের গণিতফল গণনা করতে আমার গণনায় ভুল হয়েছে কি না বলুন, সত্যি করে বলুন।"

এ মেয়ের সঙ্গে অনবধানে কথা কওয়া বিপদজনক। কিছুদিন আগেই একটা ব্যাপার ঘটেছিল। প্রসঙ্গক্রমে অচিরা আমাকে বলেছিল, "আমাদের দেশে মেয়েদের আপনারা পান সংসারের সঙ্গিনীরূপে। সংসারে যাদের দরকার নেই, এদেশের মেয়েরাও তাদের কাছে অনাবশ্যক। কিন্তু বিলেতে যারা বিজ্ঞানের তপস্বী, তাদের তো উপযুক্ত তপস্বিনী জোটে, যেমন ছিল অধ্যাপক কুরির সধর্মিণী মাদাম কুরি। সে-রকম কোনো মেয়ে আপনি সে দেশে থাকতে পান নি?" মনে পড়ে গেল ক্যাথারিনের কথা। একসঙ্গে কাজ করেছি লণ্ডনে থাকতে। এমনকি, আমার একটা রিসর্চের বইয়ে আমার নামের সঙ্গে তাঁর নামও জড়িত ছিল। মানতে হল কথাটা। অচিরা বললে, "তাঁকে আপনি বিয়ে করলেন না কেন। তিনি কি রাজি ছিলেন না।"

আবার মানতে হল, "হাঁ, প্রস্তাব তাঁর দিক থেকেই উঠেছিল।"

"তবে?"

"আমার কাজ যে ভারতবর্ষের। শুধু সে তো বিজ্ঞানের নয়।"

"অর্থাৎ ভালোবাসার সফলতা আপনার মতো সাধকের কামনার জিনিস নয়। মেয়েদের জীবনের চরম লক্ষ্য ব্যক্তিগত, আপনাদের নৈর্ব্যক্তিক।"

এর জবাবটা হঠাৎ মুখে এল না। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে অচিরা বললে, "বাংলা সাহিত্য আপনি বোধ হয় পড়েন না। কচ ও দেবযানী ব'লে একটা কবিতা আছে। তাতে ঐ কথাই আছে, মেয়েদের ব্রত হচ্ছে পুরুষকে বাঁধা, আর পুরুষদের ব্রত সে-বাঁধন কাটিয়ে অমরলোকের রাস্তা বানানো। কচ বেরিয়ে পড়েছিল দেবযানীর অনুরোধ এড়িয়ে, আপনি কাটিয়ে এসেছেন মায়ের অনুনয়। একই কথা। মেয়েপুরুষের এই চিরকালের দ্বন্দ্বে আপনি জয়ী হয়েছেন। জয় হোক আপনার পৌরুষের। কাঁদুক মেয়েরা, সে-কান্না আপনারা নিন পূজার নৈবেদ্য। দেবতার উদ্দেশে আসে নৈবেদ্য, কিন্তু দেবতা থাকেন নিরাসক্ত।"

অধ্যাপক এই আলোচনার মূল লক্ষ্য কিছুই বুঝলেন না। সগর্বে বললেন, "দিদির মুখে গভীর সত্য কেমন বিনা চেষ্টায় প্রকাশ পায়, বাইরের লোকে শুনলে মনে করবে—"

তাঁর কেবলই ভয়, বাইরের লোক তাঁর নাতনিকে ঠিক বুঝতে পারবে না। অচিরা বললে, "বাইরের লোক মেয়েদের জেঠামি সইতে পারে না, তাদের কথা তুমি ভেবো না। তুমি আমাকে ঠিক বুঝলেই হল।"

অচিরা খুব বড়ো কথাও বলে থাকে হাসির ছলে, কিন্তু আজ সে কী গম্ভীর। আমার একটা কথা আন্দাজে মনে হল, ভবতোষ ওকে বুঝিয়েছিল যে, সে যে ভারতসরকারের উচ্চ গগনের জ্যোতির্লোক থেকে বধূ এনেছে, তারও লক্ষ্য খুব উচ্চ এবং নিঃস্বার্থ। ব্রিটিশ রাষ্ট্রশাসনের ভাণ্ডার হতেই সে শক্তি সংগ্রহ করতে পারবে দেশের কাজে লাগাতে। এত সহজ নয় অচিরাকে ছলনা করা। সে যে ভোলে নি, তার প্রমাণ রয়ে গেছে সেই দ্বিখণ্ডিত চিঠির খামটা থেকেই।

অচিরা আবার বললে, "দেবযানী কচকে কী অভিসম্পাত দিয়েছিল জানেন, নবীনবাবু?"

"না।"

"বলেছিল, 'তোমার জ্ঞানসাধনার ধন তুমি নিজে ব্যবহার করতে পারবে না, অন্যকে দান করতে পারবে।' আমার কাছে কথাটা আশ্চর্য বোধ হয়। যদি এই অভিসম্পাত আজ দিত কেউ য়ুরোপকে, তা হলে সে বেঁচে যেত। বিশ্বের জিনিসকে নিজের জিনিসের মতো ব্যবহার করেই ওরা লোভের তাড়ায় মরছে। সত্যি কি না বলো, দাদু"

"খুব সত্যি। কিন্তু আশ্চর্য এই, এত কথা তুমি কী করে ভাবলে।"

"নিজগুণে একটুও নয়। ঠিক এইরকম কথা তোমার কাছে অনেকবার শুনেছি। তোমার একটা মহদ্‌গুণ আছে, ভোলানাথ তুমি, কখন্ কী বল, সমস্ত ভুলে যাও। চোরাই মালের উপর নিজের ছাপ লাগিয়ে দিতে ভয় থাকে না।"

আমি বললুম, "চুরিবিদ্যা বড়ো বিদ্যা। বিদ্যায় বল, রাষ্ট্রেই বল, বড়ো বড়ো সম্রাট বড়ো বড়ো চোর। আসল কথা, তারাই ছিঁচকে চোর ছাপ মারবার পূর্বেই যারা ধরা পড়ে।"

অচিরা বললে, "ওঁর কত ছাত্র ওঁর মুখের কথা খাতায় টুকে নিয়ে বই লিখে নাম করেছে। উনি তাদের লেখা পড়ে আশ্চর্য হয়ে প্রশংসা করেন। জানতেই পারেন না, নিজের প্রশংসা নিজেই করছেন। আমার ভাগ্যে এ প্রশংসা প্রায়ই জোটে; নবীনবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেই উনি কবুল করবেন, আমার ওরিজিন্যালিটির কথা খাতায় লিখতে শুরু করেছেন, যে-খাতায় তাম্রপ্রস্তরযুগের নোট রাখেন। মনে আছে দাদু, অনেকদিনের কথা, যখন কলেজে ছিলে, আমাকে কচ ও দেবযানীর কবিতা শুনিয়েছিলে? সেইদিন

থেকে আমি পুরুষের উচ্চ গৌরব মনে-মনে মেনেছি, কক্‌খনো মুখে স্বীকার করি নে।"

"কিন্তু দিদি, আমার কোনো কথায় আমি মেয়েদের গৌরবের লাঘব করি নি।"

"তুমি করবে? তুমি যে মেয়েদের অন্ধ ভক্ত, তোমার মুখের স্তবগান শুনে মনে-মনে হাসি। মেয়েরা নির্লজ্জ হয়ে সব মেনে নেয়। সস্তায় প্রশংসা আত্মসাৎ করা ওদের অভ্যেস হয়ে গেছে।"

সেদিন এই যে কথাবার্তা হয়ে গেল, এ নেহাত হাস্যালাপ নয়। এর মধ্যে ছিল যুদ্ধের সূচনা। অচিরার স্বভাবের দুটো দিক ছিল, আর তার ছিল দুটো আশ্রয়। এক ছিল তাদের নিজেদের বাড়ি, আর ছিল সেই পঞ্চবটী। ওর সঙ্গে যখন আমার বেশ সহজ সম্বন্ধ হয়ে এসেছে, তখন স্থির করেছিলুম, ঐ পঞ্চবটীর নিভৃতে হাসিকৌতুকের ছলে আমার জীবনের সত্যসংকটের কথা কোনো রকম করে তুলব এবং নিষ্পত্তির দিকে নিয়ে যাব। কিন্তু ওখানে পথ বন্ধ। আমাদের পরিচয়ের প্রথম দিনে প্রথম কথা যেমন মুখে আসছিল না, তেমনি এখানে যে-অচিরা আছে তার কাছে প্রথম কথা নেই। মোকাবিলায় ওর চরম মনের কথায় পৌঁছবার কোনো উপায় খুঁজে পাই নে। ওর ঘরের কাছে ওর সহাস্যমুখরতা রোধ করে দেয় আমার তরফের এক পা অগ্রগতি। আর ওর নিভৃত বনচ্ছায়ায় আমার সমস্ত চাঞ্চল্য ঠেকিয়ে রেখেছে নির্বাক নিঃশব্দতায়। কোনো-কোনোদিন ওদের ওখানে চায়ের নিমন্ত্রণসভার একটা কোনো সীমানায় মন খোলবার সুযোগ পাওয়া যায়, অচিরা বুঝতে পারে আমি বিপদমণ্ডলীর কাছাকাছি আসছি, সেইদিনই ওর বাক্যবাণবর্ষণের অবিরলতা অস্বাভাবিক বেড়ে ওঠে। একটুও ফাঁক পাই নে, আর আবহাওয়াও হয়ে ওঠে প্রতিকূল। আমার মন হয়েছে অত্যন্ত অশান্ত, কাজের বাধা এমনি ঘটছে যে, আমি লজ্জা পাচ্ছি মনে-মনে। সদরে বাজেটের মিটিঙে আমার রিসর্চবিভাগে আরও কিছু টাকা মঞ্জুর করে নেবার প্রস্তাব আছে, তারই সমর্থক রিপোর্ট অর্ধেকের বেশি লেখা হয় নি। ইতিমধ্যে ক্রোচের এস্‌থেটিক্‌স সম্বন্ধে আলোচনা রোজ কিছুদিন ধরে শুনে আসছি। বিষয়টা সম্পূর্ণ আমার উপলব্ধির এবং উপভোগের বাইরে—সেকথা অচিরা নিশ্চিত জানে। দাদুকে উৎসাহিত করে আর মনে-মনে হাসে। সম্প্রতি চলছে Behaviourism সম্বন্ধে যত বিরুদ্ধ যুক্তি আছে, তার ব্যাখ্যা। এই তত্ত্বালোচনার শোচনীয়তা হচ্ছে এই যে, অচিরা এই সময়টাতে ছুটি নিয়ে বাগানের কাজে চলে যায়, বলে, 'এ সব তর্ক পূর্বেই শুনেছি।' আমি বোকার মতো বসে থাকি, মাঝে-মাঝে দরজার দিকে তাকাই।

একটা স্থবিধে এই যে, অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করেন না— তর্কের কোনো একটা দুরূহ গ্রন্থি বুঝতে পারছি কি না। তাঁর মনে হয় সমস্তই জলের মতো বোঝা যায়।

কিন্তু আর তো চলবে না, কোনো ছিদ্রে আসল কথাটা পাড়তেই হবে। পিক্‌নিকের এক অবকাশে অধ্যাপক যখন পোড়ো মন্দিরের সিঁড়িটাতে বসে নব্য কেমিস্ট্রির নতুন-আমদানির বই পড়ছিলেন, বেঁটে আবলুস গাছের ঝোপের মধ্যে ব'সে অচিরা হঠাৎ আমাকে বললে, "এই চিরকালের বনের মধ্যে যে একটা অন্ধ প্রাণের শক্তি আছে, ক্রমেই তাকে আমার ভয় করছে।"

আমি বললুম, "আশ্চর্য, ঠিক এইরকমের কথা সেদিন আমি ডায়ারিতে লিখেছি।"

অচিরা বলে চলল, "পুরনো ইমারতের কোনো-একটা ফাটলে লুকিয়ে লুকিয়ে অশথের একটা অঙ্কুর ওঠে, তার পরে শিকড়ে শিকড়ে জড়িয়ে ধ'রে তার সর্বনাশ করে, এও তেমনি। দাদুর সঙ্গে এই কথাটাই হচ্ছিল। দাদু বলছিলেন, 'লোকালয় থেকে বহুদিন একান্ত দূরে থাকলে মানবচিত্ত প্রকৃতির প্রভাবে দুর্বল হতে থাকে, প্রবল হয়ে ওঠে আদিম প্রাণপ্রকৃতির প্রভাব।' আমি বললুম 'এ রকম অবস্থায় কী করা যায়।' তিনি বললেন, 'মানুষের চিত্তকে আমরা তো সঙ্গে করে আনতে পারি— ভিড়ের চেয়ে নির্জনে তাকে বরঞ্চ বেশি ক'রে পাই, এই দেখো-না আমার বইগুলি।' দাদুর পক্ষে বলা সহজ, কিন্তু সবাইকে এক ওষুধ খাটে না। আপনি কী বলেন।"

আমি বললুম, "আচ্ছা, বলব। আমার কথাটা ঠিকমতো বুঝে দেখবেন। আমার মত এই যে, এই রকম জায়গায় এমন একজন মানুষের সঙ্গ সমস্ত অন্তর বাহিরে পাওয়া চাই, যার প্রভাব মানবপ্রকৃতিকে সম্পূর্ণ করে রাখতে পারে। যতক্ষণ না পাই ততক্ষণ অন্ধশক্তির কাছে কেবলই হার ঘটতে থাকবে। আপনি যদি সাধারণ মেয়েদের মতো হতেন, তা হলে আপনার কাছে সত্য কথা শেষপর্যন্ত স্পষ্ট করে বলতে মুখে বাধত।"

অচিরা বললে, "বলুন আপনি, দ্বিধা করবেন না।"

বললুম, "আমি সায়ন্টিস্ট, যেটা বলতে যাচ্ছি সেটা ইম্পার্সোনাল ভাবে বলব। আপনি একদিন ভবতোষকে অত্যন্ত ভালোবেসেছিলেন। আজও কি আপনি তাঁকে তেমনি ভালোবাসেন।"

"আচ্ছা, মনে করুন, বাসি নে।"

"আমিই আপনার মনকে সরিয়ে এনেছি।"

"তা হতে পারে, কিন্তু একলা আপনি নন, বনের ভিতরকার এই ভীষণ অন্ধশক্তি। সেইজন্যে আমি এই সরে আসাকে শ্রদ্ধা করি নে, লজ্জা পাই।"

"কেন করেন না।"

"দীর্ঘকালের প্রয়াসে মানুষ চিত্তশক্তিতে নিজের আদর্শকে গ'ড়ে তোলে, প্রাণশক্তির অন্ধতা তাকে ভাঙে। আপনার দিকে আমার যে ভালোবাসা, সে সেই অন্ধশক্তির আক্রমণে।"

"ভালোবাসাকে আপনি এমন ক'রে গঞ্জনা দিচ্ছেন নারী হয়ে?"

"নারী বলেই দিচ্ছি। ভালোবাসার আদর্শ আমাদের পূজার জিনিস। তাকেই বলে সতীত্ব। সতীত্ব একটা আদর্শ। এ জিনিসটা বনের প্রকৃতির নয়, মানবীর। এ নির্জনে এতদিন সেই আদর্শকে আমি পূজা করছিলুম সকল আঘাত সকল বঞ্চনা সত্ত্বেও। তাকে রক্ষা করতে না পারলে আমার শুচিতা থাকে না।"

"আপনি শ্রদ্ধা করতে পারেন ভবতোষকে?"

"না।"

"তার কাছে যেতে পারেন?"

"না। কিন্তু সে আর আমার সেই জীবনের প্রথম ভালোবাসা, এক নয়। এখন আমার কাছে সেই ভালোবাসা ইম্পার্সোনাল। কোনো আধারের দরকার নেই।"

"ভালো বুঝতে পারছি নে।"

"আপনি বুঝতে পারবেন না। আপনাদের সম্পদ জ্ঞানের— উচ্চতম শিখরে সে জ্ঞান ইম্পার্সোনাল। মেয়েদের সম্পদ হৃদয়ের, যদি তার সব হারায়— যা কিছু বাহিক, যা দেখা যায়, ছোঁওয়া যায়, ভোগ করা যায়, তবু বাকি থাকে তার সেই ভালোবাসার আদর্শ যা অবাঙ্‌মনসোগোচরঃ। অর্থাৎ ইম্পার্সোনাল।"

আমি বললুম, "দেখুন, তর্ক করবার সময় আর নেই। এখানকার কাগজে বোধ হয় দেখে থাকবেন, আমার এখানকার কাজ শেষ হয়ে গেছে। অ্যাসিস্টেণ্ট জিয়লজিস্ট লিখেছেন, এখান থেকে আরও কিছু দূরে সন্ধানের কাজ আরম্ভ করতে হবে, কিন্তু—"

"কেন গেলেন না।"

"আপনার কাছ থেকে—"

"আমার কাছ থেকে শেষ কথাটা শুনতে চান, প্রথম কথাটা পূর্বেই আদায় করা হয়েছে।"

"হাঁ, ঠিক তাই।"

"তা হলে কথাটা পরিষ্কার করে বলি। আমার ঐ পঞ্চবটীর মধ্যে ব'সে আপনার অগোচরে কিছুকাল আপনাকে দেখেছি। সমস্ত দিন পরিশ্রম করেছেন, মানেন নি প্রখর রৌদ্রের তাপ। কোনো দরকার হয় নি কারও সঙ্গের। এক-একদিন মনে

হয়েছে হতাশ হয়ে গেছেন, যেটা পাবেন নিশ্চিত করেছিলেন সেটা পান নি। কিন্তু তার পরদিন থেকেই আবার অক্লান্ত মনে খোঁড়াখুঁড়ি চলেছে। বলিষ্ঠ দেহকে বাহন ক'রে বলিষ্ঠ মনের যেন জয়যাত্রা চলছে। এমনতরো বিজ্ঞানের তপস্বী আমি আর কখনও দেখি নি। ˚ রে থেকে ভক্তি করেছি।"

"এখন বুঝি—"

"না, বলি শুনুন। আমার সঙ্গে আপনার পরিচয় যতই এগিয়ে চলল, ততই দুর্বল হল সেই সাধনা। নানা তুচ্ছ উপলক্ষে কাজে বাধা পড়তে লাগল। তখন ভয় হল নিজেকে, এই নারীকে। ছি ছি, কী পরাজয়ের বিষ এনেছি আমার মধ্যে। এই তো আপনার দিকের কথা, এখন আমার কথাটা বলি। আমারও একটা সাধনা ছিল, সেও তপস্যা। তাতে আমার জীবনকে পবিত্র করবে, উজ্জ্বল করবে, এ আমি নিশ্চয় জানতুম। দেখলুম ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছি— যে-চাঞ্চল্য আমাকে পেয়ে বসেছিল তার প্রেরণা এই ছায়াচ্ছন্ন বনের নিশ্বাসের ভিতর থেকে, সে আদিম প্রাণের শক্তির। মাঝে-মাঝে এখানকার রাক্ষসী রাত্রির দ্বারা আবিষ্ট হয়ে মনে হয়েছে, একদিন আমার দাদুর কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিতে পারে বুঝি এমন প্রবৃত্তিরাক্ষস আছে। তার বিশ হাত দিনে দিনে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তখনই বিছানা ফেলে ছুটে গিয়ে ঝরনার মধ্যে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে আমি স্নান করেছি।"

এই কথা বলতে বলতে অচিরা ডাক দিলে, "দাদু।"

অধ্যাপক তাঁর পড়া ফেলে রেখে কাছে এসে মধুর স্নেহে বললেন, "কী দিদি।"

"তুমি সেদিন বলছিলে না, মানুষের সত্য তার তপস্যার ভিতর দিয়ে অভিব্যক্ত হয়ে উঠছে ?— তার অভিব্যক্তি বয়োলজির নয়।"

"হাঁ, তাই তো আমি বলি। পৃথিবীতে বর্বর মানুষ জন্তুর পর্যায়ে। কেবলমাত্র তপস্যার ভিতর দিয়ে সে হয়েছে জ্ঞানী মানুষ। আরও তপস্যা সামনে আছে, আরও স্থূলত্ব বর্জন করতে হবে, তবে সে হবে দেবতা। পুরাণে দেবতার কল্পনা আছে, কিন্তু অতীতে দেবতা ছিলেন না, দেবতা আছেন ভবিষ্যতে, মানুষের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে।"

"দাদু, এইবার তোমার আমার কথাটা চুকিয়ে দিই। কদিন থেকে মনের মধ্যে তোলপাড় করছে।"

আমি উঠে পড়ে বললুম, "তা হলে আমি যাই।"

"না, আপনি বসুন। দাদু, তোমার সেই কলেজের যে অধ্যক্ষপদ তোমার ছিল, সেটা আবার খালি হয়েছে। সেক্রেটরি খুব অনুনয় ক'রে তোমাকে লিখেছেন সেই

পদ ফিরে দিতে। তুমি আমাকে সব চিঠি দেখাও, কেবল এই চিঠিটাই দেখাও নি। তাতেই তোমার দুরভিসন্ধি সন্দেহ করে ঐ চিঠিটা চুরি করে দেখেছি।"

"আমারই অন্যায় হয়েছিল।"

"কিছু অন্যায় হয় নি। আমি তোমাকে টেনে এনেছি তোমার আসন থেকে নীচে। আমরা কেবল নামিয়ে আনতেই আছি।"

"কী বলছ দিদি।"

"সত্যি কথাই বলছি। বিশ্বজগৎ না থাকলে বিধাতার হাত খালি হয়, ছাত্র না থাকলে তোমার তেমনি। সত্যি কথা বলো।"

"বরাবর ইস্কুলমাস্টারি করেছি কিনা তাই—"

"তুমি আবার ইস্কুলমাস্টার! তুমি born teacher, তুমি আচার্য। তোমার জ্ঞানের সাধনা নিজের জন্যে নয়, অন্যকে দানের জন্যে। দেখেন নি নবীনবাবু, মাথায় একটা আইডিয়া এলে আমাকে নিয়ে পড়েন, দয়ামায়া থাকে না; বারো আনা বুঝতে পারি নে; নইলে আপনাকে নিয়ে বসেন, সে আরো শোচনীয় হয়ে ওঠে। আপনার মন যে কোন্ দিকে, বুঝতেই পারেন না, ভাবেন বিশুদ্ধ জ্ঞানের দিকে। দাদু, ছাত্র তোমার নিতান্তই চাই, কিন্তু বাছাই করে নিতে ভুলো না।"

অধ্যাপক বললেন, "ছাত্রই তো শিক্ষককে বাছাই করে, গরজ তো তারই।"

"আচ্ছা, সে-কথা পরে হবে। সম্প্রতি আমার চৈতন্য হয়েছে, যিনি শিক্ষক তাঁকে গ্রন্থকীট ক'রে তুলছি। এমনি ক'রে তপস্যা ভাঙি নিজের অন্ধ গরজে। সে কাজ তোমাকে নিতে হবে, এখনই যেতে হবে সেখানে ফিরে।"

অধ্যাপক হতবুদ্ধির মতো অচিরার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। অচিরা বললে, "ও, বুঝেছি, তুমি ভাবছ আমার কী গতি হবে। আমার গতি তুমি। ভোলানাথ, আমাকে যদি তোমার পছন্দ না হয়, তা হলে দিদিমা দি সেকেণ্ডের আমদানি করতে হবে, তোমার লাইব্রেরি বেচে তাঁর গয়না বানিয়ে দেবে, আমি দেব লম্বা দৌড়। অত্যন্ত অহংকার না বাড়লে এ কথা তোমাকে মানতেই হবে, আমাকে না হলে একদিনও তোমার চলে না। আমার অনুপস্থিতিতে পনেরই আশ্বিনকে পনেরই অক্টোবর ব'লে তোমার ধারণা হয়, যেদিন বাড়িতে তোমার সহযোগী অধ্যাপকের নিমন্ত্রণ, সেইদিনই লাইব্রেরিঘরে দরজা বন্ধ ক'রে নিদারুণ একটা ইকোয়েশন কষতে লেগে যাও। গাড়িতে চ'ড়ে ড্রাইভরকে যে-ঠিকানা দাও সে ঠিকানায় আজও বাড়ি তৈরি হয় নি। নবীনবাবু মনে করছেন আমি অত্যুক্তি করছি।"

আমি বললুম, "একেবারেই না। কিছুদিন তো ওঁকে দেখছি, তার থেকেই অসন্দিগ্ধ বুঝেছি, আপনি যা বলছেন তা খাঁটি সত্য।"

"আজ এত অলুক্ষণে কথা তোমার মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে কেন। জান নবীন, এই রকম যা-তা বলবার উপসর্গ ওর সম্প্রতি দেখা দিয়েছে।"

"সব লক্ষণ শান্ত হয়ে যাবে, তুমি চলো দেখি তোমার কাজে। নাড়ি আবার ফিরে আসবে। থামবে প্রলাপ-বকুনি।"

অধ্যাপক আমার দিকে চেয়ে বললেন, "তোমার কী পরামর্শ নবীন।"

উনি পণ্ডিত মানুষ ব'লেই জিয়লজিস্টের বুদ্ধির 'পরে ওঁর এত শ্রদ্ধা। আমি একটুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বললুম, "অচিরা দেবীর চেয়ে সত্য পরামর্শ আপনাকে কেউ দিতে পারবে না।"

অচিরা উঠে দাঁড়িয়ে পা ছুঁয়ে আমাকে প্রণাম করলে। আমি সংকুচিত হয়ে পিছু হঠে গেলুম। অচিরা বললে, "সংকোচ করবেন না, আপনার তুলনায় আমি কেউ নই। সে কথাটা একদিন স্পষ্ট হবে। এইখানেই শেষ বিদায় নিলুম। যাবার আগে আর কিন্তু দেখা হবে না।"

অধ্যাপক আশ্চর্য হয়ে বললেন, "সে কী কথা দিদি।"

"দাদু, তুমি অনেক কিছু জান, কিন্তু অনেক কিছু সম্বন্ধে তোমার চেয়ে আমার বুদ্ধি অনেক বেশি, সবিনয়ে এ কথাটা স্বীকার করে নিয়ো।"

আমি পদধূলি নিয়ে প্রণাম করলুম অধ্যাপককে। তিনি আমাকে বুকে আলিঙ্গন ক'রে ধরে বললেন, "আমি জানি সামনে তোমার কীর্তির পথ প্রশস্ত।"

এইখানে আমার ছোটো গল্প ফুরল। তার পরেকার কথা জিয়লজিস্টের। বাড়ি ফিরে গিয়ে কাজের নোট এবং রেকর্ডগুলো আবার খুললুম। মনে হঠাৎ খুব একটা আনন্দ জাগল— বুঝলুম একেই বলে মুক্তি। সন্ধ্যাবেলায় দিনের কাজ শেষ ক'রে বারান্দায় এসে বোধ হল— খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসেছে পাখি, কিন্তু পায়ে আছে এক টুকরো শিকল। নড়তে চড়তে সেটা বাজে।

৪. ১০. ৩৯

অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬

ল্যাবরেটরি

১

নন্দকিশোর ছিলেন লণ্ডন য়ুনিভার্সিটি থেকে পাশ করা এঞ্জিনিয়ার। যাকে সাধুভাষায় বলা যেতে পারে দেদীপ্যমান ছাত্র অর্থাৎ ব্রিলিয়াণ্ট, তিনি ছিলেন তাই। স্কুল থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষার তোরণে তোরণে ছিলেন পয়লা শ্রেণীর সওয়ারী।

ওঁর বুদ্ধি ছিল ফলাও, ওঁর প্রয়োজন ছিল দরাজ, কিন্তু ওঁর অর্থসম্বল ছিল আঁটমাপের।

রেলওয়ে কোম্পানির দুটো বড়ো ব্রিজ তৈরি করার কাজের মধ্যে উনি ঢুকে পড়তে পেরেছিলেন। ও-কাজের আয়ব্যয়ের বাড়তি-পড়তি বিস্তর, কিন্তু দৃষ্টান্তটা সাধু নয়। এই ব্যাপারে যখন তিনি ডানহাত বাঁহাত দুই হাতই জোরের সঙ্গে চালনা করেছিলেন তখন তাঁর মন খুঁতখুঁত করে নি। এ সব কাজের দেনাপাওনা নাকি কোম্পানি নামক একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট সত্তার সঙ্গে জড়িত, সেইজন্যে কোনো ব্যক্তিগত লাভলোকসানের তহবিলে এর পীড়া পৌঁছয় না।

ওঁর নিজের কাজে কর্তারা ওঁকে জীনিয়স বলত, নিখুঁত হিসাবের মাথা ছিল তাঁর। বাঙালি বলেই তার উপযুক্ত পারিশ্রমিক তাঁর জোটে নি। নীচের দরের বিলিতি কর্মচারী প্যাণ্টের দুই ভরা-পকেটে হাত গুঁজে যখন পা ফাঁক করে 'হ্যালো মিস্টার মল্লিক' ব'লে ওঁর পিঠ-থাবড়া দিয়ে কর্তাত্বি করত তখন ওঁর ভালো লাগত না। বিশেষত যখন কাজের বেলা ছিলেন উনি, আর দামের বেলা আর নামের বেলা ওরা। এর ফল হয়েছিল এই যে, নিজের ন্যায্য প্রাপ্য টাকার একটা প্রাইভেট হিসেব ওঁর মনের মধ্যে ছিল, সেটা পুষিয়ে নেবার ফন্দি জানতেন ভালো করেই।

পাওনা এবং অপাওনার টাকা নিয়ে নন্দকিশোর কোনোদিন বাবুগিরি করেন নি। থাকতেন শিকদারপাড়া গলির একটা দেড়তলা বাড়িতে। কারখানাঘরের দাগ-দেওয়া কাপড় বদলাবার ওঁর সময় ছিল না। কেউ ঠাট্টা করলে বলতেন, 'মজুর মহারাজের তকমা-পরা আমার এই সাজ।'

কিন্তু বৈজ্ঞানিক সংগ্রহ ও পরীক্ষার জন্যে বিশেষ করে তিনি বাড়ি বানিয়েছিলেন খুব মস্ত। এমন মশগুল ছিলেন নিজের শখ নিয়ে যে, কানে উঠত না লোকেরা বলাবলি করছে, এত বড়ো ইমারতটা যে আকাশ ফুঁড়ে উঠল— আলাদিনের প্রদীপটা ছিল কোথায়।

একরকমের শখ মানুষকে পেয়ে বসে সেটা মাতলামির মতো, হুঁশ থাকে না যে লোকে সন্দেহ করছে। লোকটা ছিল সৃষ্টিছাড়া, ওঁর ছিল বিজ্ঞানের পাগলামি। ক্যাটালগের তালিকা ওলটাতে ওলটাতে ওঁর সমস্ত মনপ্রাণ চৌকির দুই হাতা আঁকড়ে ধরে উঠত ঝেঁকে ঝেঁকে। জর্মনি থেকে আমেরিকা থেকে এমন-সব দামী দামী যন্ত্র আনাতেন যা ভারতবর্ষের বড়ো বড়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে মেলে না। এই বিদ্যালোভীর মনে সেই তো ছিল বেদনা। এই পোড়াদেশে জ্ঞানের ভোজের উচ্ছিষ্ট নিয়ে সস্তা দরের পাতা পাড়া হয়। ওদের দেশে বড়ো বড়ো যন্ত্র ব্যবহারের যে সুযোগ আছে আমাদের দেশে না থাকাতেই ছেলেরা টেক্সটবুকের শুকনো পাতা থেকে কেবল এঁটোকাঁটা হাতড়িয়ে বেড়ায়। উনি হেঁকে উঠে বলতেন, ক্ষমতা আছে আমাদের মগজে, অক্ষমতা আমাদের পকেটে। ছেলেদের জন্যে বিজ্ঞানের বড়ো রাস্তাটা খুলে দিতে হবে বেশ চওড়া ক'রে, এই হল ওঁর পণ।

দুর্মূল্য যন্ত্র যত সংগ্রহ হতে লাগল, ওঁর সহকর্মীদের ধর্মবোধ ততই অসহ্য হয়ে উঠল। এই সময়ে ওঁকে বিপদের মুখ থেকে বাঁচালেন বড়োসাহেব। নন্দকিশোরের দক্ষতার উপর তাঁর প্রচুর শ্রদ্ধা ছিল। তা ছাড়া রেলওয়ে কাজে মোটা মোটা মুঠোর অপসারণদক্ষতার দৃষ্টান্ত তাঁর জানা ছিল।

চাকরি ছাড়তে হল। সাহেবের আনুকূল্যে রেল-কোম্পানির পুরনো লোহালক্কড় সস্তা দামে কিনে নিয়ে কারখানা ফেঁদে বসলেন। তখন য়ুরোপের প্রথম যুদ্ধের বাজার সরগরম। লোকটা অসামান্য কৌশলী, সেই বাজারে নতুন নতুন খালে নালায় তাঁর মুনফার টাকায় বান ডেকে এল।

এমনসময় আর-একটা শখ পেয়ে বসল ওঁকে।

এক সময়ে নন্দকিশোর পাঞ্জাবে ছিলেন তাঁর ব্যাবসার তাগিদে। সেখানে জুটে গেল তাঁর এক সঙ্গিনী। সকালে বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিলেন, বিশ বছরের মেয়েটি ঘাগরা দুলিয়ে অসংকোচে তাঁর কাছে এসে উপস্থিত— জ্বলজ্বলে তার চোখ, ঠোঁটে একটি হাসি আছে, যেন শান-দেওয়া ছুরির মতো। সে ওঁর পায়ের কাছে ঘেঁসে এসে বললে, "বাবুজি, আমি কয়দিন ধরে এখানে এসে দু'বেলা তোমাকে দেখছি। আমার তাজ্জব লেগে গেছে।"

নন্দকিশোর হেসে বললেন, "কেন, এখানে তোমাদের চিড়িয়াখানা নেই নাকি।"

সে বললে, "চিড়িয়াখানার কোনো দরকার নেই। যাদের ভিতরে রাখবার, তারা বাইরে সব ছাড়া আছে। আমি তাই মানুষ খুঁজছি।"

"খুঁজে পেলে?"

নন্দকিশোরকে দেখিয়ে বললে, "এই তো পেয়েছি।"

নন্দকিশোর হেসে বললেন, "কী গুণ দেখলে বলো দেখি।"

ও বললে, "এখানকার বড়ো বড়ো সব শেঠজি, গলায় মোটা সোনার চেন, হাতে হীরার আংটি, তোমাকে ঘিরে এসেছিল—ভেবেছিল বিদেশী, বাঙালি, কারবার বোঝে না। শিকার জুটেছে ভালো। কিন্তু দেখলুম তাদের একজনেরও ফন্দি খাটল না। উলটে ওরা তোমারই ফাঁসকলে পড়েছে। কিন্তু তা ওরা এখনও বোঝে নি, আমি বুঝে নিয়েছি।"

নন্দকিশোর চমকে গেল কথা শুনে। বুঝলে একটি চিজ বটে—সহজ নয়।

মেয়েটি বললে, "আমার কথা তোমাকে বলি, তুমি শুনে রাখো। আমাদের পাড়ায় একজন ডাকসাইটে জ্যোতিষী আছে। সে আমার কুষ্টি গণনা করে বলেছিল, একদিন দুনিয়ায় আমার নাম জাহির হবে। বলেছিল আমার জন্মস্থানে শয়তানের দৃষ্টি আছে।"

নন্দকিশোর বললে, "বল কী। শয়তানের ?"

মেয়েটি বললে, "জানো তো বাবুজি, জগতে সব চেয়ে বড়ো নাম হচ্ছে ঐ শয়তানের। তাকে যে নিন্দে করে করুক, কিন্তু সে খুব খাঁটি। আমাদের বাবা বোম্‌ভোলানাথ ভোঁ হয়ে থাকেন। তাঁর কর্ম নয় সংসার চালানো। দেখো-না, সরকার বাহাদুর শয়তানির জোরে দুনিয়া জিতে নিয়েছে, খৃস্টানির জোরে নয়। কিন্তু ওরা খাঁটি, তাই রাজ্য রক্ষা করতে পেরেছে। যেদিন কথার খেলাপ করবে, সেদিন ঐ শয়তানেরই কাছে কানমলা খেয়ে মরবে।"

নন্দকিশোর আশ্চর্য হয়ে গেল।

মেয়েটি বললে, "বাবু, রাগ কোরো না। তোমার মধ্যে ঐ শয়তানের মন্তর আছে। তাই তোমারই হবে জিত। অনেক পুরুষকেই আমি ভুলিয়েছি, কিন্তু আমার উপরেও টেক্কা দিতে পারে এমন্‌ পুরুষ আজ দেখলুম। আমাকে তুমি ছেড়ো না বাবু, তা হলে তুমি ঠকবে।"

নন্দকিশোর হেসে বললে, "কী করতে হবে।"

"দেনার দায়ে আমার আইমার বাড়িঘর বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, তোমাকে সেই দেনা শোধ করে দিতে হবে।"

"কত টাকা দেনা তোমার।"

"সাত হাজার টাকা।"

নন্দকিশোরের চমক লাগল, ওর দাবির সাহস দেখে। বললে, "আচ্ছা আমি দিয়ে দেব, কিন্তু তার পরে ?"

"তার পরে আমি তোমার সঙ্গ কখনও ছাড়ব না।"

"কী করবে তুমি।"

"দেখব, যেন কেউ তোমায় ঠকাতে না পারে আমি ছাড়া।"

নন্দকিশোর হেসে বললেন, "আচ্ছা বেশ, রইল কথা, এই পরো আমার আংটি।"

কষ্টিপাথর আছে ওঁর মনে, তার উপরে দাগ পড়ল একটা দামী ধাতুর। দেখতে পেলেন মেয়েটির ভিতর থেকে ঝক্ ঝক্ করছে ক্যারেক্‌টরের তেজ— বোঝা গেল ও নিজের দাম নিজে জানে, তাতে একটুমাত্র সংশয় নেই। নন্দকিশোর অনায়াসে বললে, 'দেব টাকা'— দিলে সাত হাজার বুড়ী আইমাকে।

মেয়েটিকে ডাকত সবাই সোহিনী ব'লে। পশ্চিমী ছাঁদের সুকঠোর এবং সুন্দর তার চেহারা। কিন্তু চেহারায় মন টলাবে, নন্দকিশোর সে জাতের লোক ছিলেন না। যৌবনের হাটে মন নিয়ে জুয়ো খেলবার সময়ই ছিল না তাঁর।

নন্দকিশোর ওকে যে-দশা থেকে নিয়ে এসেছিলেন সেটা খুব নির্মল নয়, এবং নিভৃত নয়। কিন্তু ঐ একরোখা একগুঁয়ে মানুষ সাংসারিক প্রয়োজন বা প্রথাগত বিচারকে গ্রাহ্য করতেন না। বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করত, বিয়ে করেছ কি। উত্তরে শুনত, বিয়েটা খুব বেশি মাত্রায় নয়, সহ্যমতো। লোকে হাসত যখন দেখত, উনি স্ত্রীকে নিজের বিদ্যের ছাঁচে গড়ে তুলতে উঠেপড়ে লেগে গিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করত, "ও কি প্রোফেসারি করতে যাবে নাকি।" নন্দ বলতেন, "না, ওকে নন্দকিশোরি করতে হবে, সেটা যে-সে মেয়ের কাজ নয়।" বলত, "আমি অসবর্ণবিবাহ পছন্দ করি নে।"

"সে কী হে।"

"স্বামী হবে এঞ্জিনিয়র আর স্ত্রী হবে কোটনা-কুটনি, এটা মানবধর্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ। ঘরে ঘরে দেখতে পাই দুই আলাদা আলাদা জাতে গাঁটছড়া বাঁধা, আমি জাত মিলিয়ে নিচ্ছি। পতিব্রতা স্ত্রী চাও যদি, আগে ব্রতের মিল করাও।"

২

নন্দকিশোর মারা গেলেন প্রৌঢ় বয়সে কোন্-এক দুঃসাহসিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার অপঘাতে।

সোহিনী সমস্ত কারবার বন্ধ করে দিলে। বিধবা মেয়েদের ঠকিয়ে খাবার ব্যাবসাদার এসে পড়ল চার দিক থেকে। মামলার ফাঁদ ফাঁদলে আত্মীয়তার ছিটেফোঁটা

আছে যাদের। সোহিনী স্বয়ং সমস্ত আইনের প্যাঁচ নিতে লাগল বুঝে। তার উপরে নারীর মোহজাল বিস্তার করে দিলে স্থান বুঝে উকিলপাড়ায়। সেটাতে তাঁর অসংকোচ নৈপুণ্য ছিল, সংস্কার মানার কোনো বালাই ছিল না। মামলায় জিতে নিলে একে একে, দূর সম্পর্কের দেওর গেল জেলে দলিল জাল করার অপরাধে।

ওদের একটি মেয়ে আছে, তার নামকরণ হয়েছিল নীলিমা। মেয়ে স্বয়ং সেটিকে বদল করে নিয়েছে— নীলা। কেউ না মনে করে, বাপ-মা মেয়ের কালো রঙ দেখে একটা মোলায়েম নামের তলায় সেই নিন্দেটি চাপা দিয়েছে। মেয়েটি একেবারে ফুট্‌ফুটে গৌরবর্ণ। মা বলত, ওদের পূর্বপুরুষ কাশ্মীর থেকে এসেছিল— মেয়ের দেহে ফুটেছে কাশ্মীরী শ্বেতপদ্মের আভা, চোখেতে নীলপদ্মের আভাস, আর চুলে চমক দেয় যাকে বলে পিঙ্গলবর্ণ।

মেয়ের বিয়ের প্রসঙ্গে কুলশীল জাতগুষ্টির কথা বিচার করবার রাস্তা ছিল না। একমাত্র ছিল মন ভোলাবার পথ, শাস্ত্রকে ডিঙিয়ে গেল তার ভেলকি। অল্প বয়সের মাড়োয়ারি ছেলে, তার টাকা পৈতৃক, শিক্ষা এ কালের। অকস্মাৎ সে পড়ল এসে অনঙ্গের অলক্ষ্য ফাঁদে। নীলা একদিন গাড়ির অপেক্ষায় ইস্কুলের দরজার কাছে ছিল দাঁড়িয়ে। সেই সময় ছেলেটি দৈবাৎ তাকে দেখেছিল। তার পর থেকে আরও কিছুদিন ঐ রাস্তায় সে বায়ুসেবন করেছে। স্বাভাবিক স্ত্রীবুদ্ধির প্রেরণায় মেয়েটি গাড়ি আসবার বেশ কিছুক্ষণ পূর্বেই গেটের কাছে দাঁড়াত। কেবল সেই মাড়োয়ারি ছেলে নয়, আরও দুচার সম্প্রদায়ের যুবক ঐখানটায় অকারণ পদচারণার চর্চা করত। তার মধ্যে ঐ ছেলেটিই চোখ বুজে দিল ঝাঁপ ওর জালের মধ্যে। আর ফিরল না। সিভিল মতে বিয়ে করলে সমাজের ওপারে। বেশি দিনের মেয়াদে নয়। তার ভাগ্যে বধূটি এল প্রথমে, তার পরে দাম্পত্যের মাঝখানটাতে দাঁড়ি টানলে টাইফয়েড, তার পরে মুক্তি।

সৃষ্টিতে অনাসৃষ্টিতে মিশিয়ে উপদ্রব চলতে লাগল। মা দেখতে পায় তার মেয়ের ছটফটানি। মনে পড়ে নিজের প্রথম বয়সের জ্বালামুখীর অগ্নিচাঞ্চল্য। মন উদ্‌বিগ্ন হয়। খুব নিবিড় করে পড়াশোনার বেড়া ফাঁদতে থাকে। পুরুষ শিক্ষক রাখল না। একজন বিদুষীকে লাগিয়ে দিল ওর শিক্ষকতায়। নীলার যৌবনের আঁচ লাগত তারও মনে, তুলত তাকে তাতিয়ে অনির্দেশ্য কামনার তপ্তবাষ্পে। মুগ্ধের দল ভিড় করে আসতে লাগল এদিকে ওদিকে। কিন্তু দরওয়াজা বন্ধ। বন্ধুত্বপ্রয়াসিনীরা নিমন্ত্রণ করে চায়ে টেনিসে সিনেমায়, নিমন্ত্রণ পৌঁছয় না কোনো ঠিকানায়। অনেক লোভী ফিরতে লাগল মধুগন্ধভরা আকাশে, কিন্তু কোনো অভাগ্য কাঙাল সোহিনীর ছাড়পত্র পায় না। এদিকে দেখা যায় উৎকণ্ঠিত মেয়ে সুযোগ পেলে উঁকিঝুঁকি দিতে চায় অজায়গায়।

বই পড়ে যে বই টেক্স্ট্‌বুক কমিটির অনুমোদিত নয়, ছবি গোপনে আনিয়ে নেয় যা আর্টশিক্ষার আনুকূল্য করে ব'লে বিড়ম্বিত। ওর বিদুষী শিক্ষয়িত্রীকে পর্যন্ত অন্যমনস্ক করে দিলে। ডায়োসিশন থেকে বাড়ি ফেরবার পথে আলুথালুচুলওয়ালা গোঁফের-রেখামাত্র-দেওয়া সুন্দরহানো এক ছেলে ওর গাড়িতে চিঠি ফেলে দিয়েছিল। ওর রক্ত উঠেছিল ছম্ ছম্ ক'রে। চিঠিখানা লুকিয়ে রেখেছিল জামার মধ্যে। ধরা পড়ল মায়ের কাছে। সমস্ত দিন ঘরে বন্ধ থেকে কাটল অনাহারে।

সোহিনীর স্বামী যাদের বৃত্তি দিয়েছিলেন, সেই-সব ভালো ভালো ছাত্রমহলে সোহিনী পাত্র সন্ধান করেছে। সবাই প্রায় আড়ে আড়ে ওর টাকার থলির দিকে তাকায়। একজন তো তার থিসিস ওর নামে উৎসর্গ করে বসল। ও বললে, "হায় রে কপাল, লজ্জায় ফেললে আমাকে। তোমার পোস্টগ্রাজুয়েটী মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে শুনলুম, অথচ মালাচন্দন দিলে অজায়গায়, হিসাব করে ভক্তি না করলে উন্নতি হবে না যে।" কিছুদিন থেকে একটি ছেলের দিকে সোহিনী দৃষ্টিপাত করছিল। ছেলেটি পছন্দসই বটে। তার নাম রেবতী ভট্টাচার্য। এরই মধ্যে সায়ান্সের ডাক্তার পদবীতে চড়ে বসেছে। ওর দুটো-একটা লেখার যাচাই হয়ে গেছে বিদেশে।

৩

লোকের সঙ্গে মেলামেশা করবার কলাকৌশল সোহিনীর ভালো করেই জানা আছে। মন্মথ চৌধুরী রেবতীর প্রথম দিককার অধ্যাপক। তাঁকে নিলে বশ করে। কিছুদিন চায়ের সঙ্গে রুটিটোস্ট, অমলেট, কখনও বা ইলিশমাছের ডিমের বড়া খাইয়ে কথাটা পাড়লে। বললে, "আপনি হয়তো ভাবছেন আমি আপনাকে বারে বারে চা খেতে ডাকি কেন।"

"মিসেস মল্লিক, আমি তোমাকে নিশ্চয় বলতে পারি, সেটা আমার দুর্ভাবনার বিষয় নয়।"

সোহিনী বললে, "লোকে ভাবে, আমরা বন্ধুত্ব করে থাকি স্বার্থের গরজে।"

"দেখো মিসেস মল্লিক, আমার মত হচ্ছে এই—গরজটা যারই হোক, বন্ধুত্বটাই তো লাভ। আর এই বা কম কথা কী, আমার মতো অধ্যাপককে দিয়েও কারও স্বার্থসিদ্ধি হতে পারে। এ জাতটার বুদ্ধি কেতাবের বাইরে হাওয়া খেতে পায় না ব'লে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আমার কথা শুনে তোমার হাসি পাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। দেখো, যদিও আমি মাস্টারি করি তবু ঠাট্টা করতেও পারি। দ্বিতীয়বার চা খেতে ডাকবার পূর্বে এটা জেনে রাখা ভালো।"

"জেনে রাখলুম, বাঁচলুম। অনেক অধ্যাপক দেখেছি, তাঁদের মুখ থেকে হাসি বের করতে ডাক্তার ডাকতে হয়।"

"বাহবা, আমারই দলের লোক দেখছি তুমি। তা হলে এবার আসল কথাটা পাড়া হোক।"

"জানেন বোধ হয়, জীবনে আমার স্বামীর ল্যাবরেটরিই ছিল একমাত্র আনন্দ। আমার ছেলে নেই, ঐ ল্যাবরেটরিতে বসিয়ে দেবে বলে ছেলে খুঁজছি। কানে এসেছে রেবতী ভট্টাচার্যের কথা।"

অধ্যাপক বললেন, "যোগ্য ছেলেই বটে। তার যে লাইনের বিদ্যে সেটাকে শেষ পর্যন্ত চালান করতে মালমসলা কম লাগবে না।"

সোহিনী বললে, "আমার রাশকরা টাকায় ছাতা পড়ে যাচ্ছে। আমার বয়সের বিধবা মেয়েরা ঠাকুরদেবতার দালালদের দালালি দিয়ে পরকালের দরজা ফাঁক করে নিতে চায়। আপনি শুনে হয়তো রাগ করবেন, আমি ও সব কিছুই বিশ্বাস করি নে।"

চৌধুরী দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, "তুমি তবে কী মান।"

"মানুষের মতো মানুষ যদি পাই, তবে তার সব পাওনা শোধ করে দিতে চাই যতদূর আমার সাধ্য আছে। এই আমার ধর্মকর্ম।"

চৌধুরী বললেন, "হুররে। শিলা ভাসে জলে। মেয়েদের মধ্যেও দৈবাৎ কোথাও কোথাও বুদ্ধির প্রমাণ মেলে দেখছি। আমার একটি বি. এসসি. বোকা আছে, সেদিন হঠাৎ দেখি, গুরুর পা ছুঁয়ে সে উলটো ডিগবাজি খেলতে লেগেছে, মগজ থেকে বুদ্ধি যাচ্ছে উড়ে ফাটা শিমুলের তুলোর মতো। তা তোমার বাড়িতেই ওকে ল্যাবরেটরিতে বসিয়ে দিতে চাও? তফাতে আর কোথাও হলে হয় না?"

"চৌধুরীমশায়, আপনি ভুল করবেন না, আমি মেয়েমানুষ। এইখানেই এই ল্যাবরেটরিতেই হয়েছে আমার স্বামীর সাধনা। তাঁর ঐ বেদির তলায় কোনো-একজন যোগ্য লোককে বাতি জ্বালিয়ে রাখবার জন্যে যদি বসিয়ে দিতে পারি, তা হলে যেখানে থাকুন তাঁর মন খুশি হবে।"

চৌধুরী বললেন, "বাই জোভ, এতক্ষণে মেয়েমানুষের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। শুনতে খারাপ লাগল না। একটা কথা জেনে রেখো, রেবতীকে যদি শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি সাহায্য করতে চাও তা হলে লাখটাকারও লাইন পেরিয়ে যাবে।"

"গেলেও আমার খুদকুঁড়ো কিছু বাকি থাকবে।"

"কিন্তু পরলোকে যাঁকে খুশি করতে চাও তাঁর মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে না তো? শুনেছি তাঁরা ইচ্ছা করলে ঘাড়ে চড়ে লাফালাফি করতে পারেন।"

"আপনি খবরের কাগজ পড়েন তো। মানুষ মারা গেলেই তার গুণাবলী প্যারাগ্রাফে প্যারাগ্রাফে ছাপিয়ে পড়তে থাকে। সেই মৃত মানুষের বদান্যতার 'পরে ভরসা করলে তো দোষ নেই। টাকা যে মানুষ জমিয়েছে অনেক পাপ জমিয়েছে সে তার সঙ্গে, আমরা কী করতে আছি যদি থলি ঝেড়ে স্বামীর পাপ হালকা করতে না পারি। যাক গে টাকা, আমার টাকায় দরকার নেই।"

অধ্যাপক উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, "কী আর বলব তোমাকে। খনি থেকে সোনা ওঠে, সে খাঁটি সোনা, যদিও তাতে মিশোল থাকে অনেক-কিছু। তুমি সেই ছদ্মবেশী সোনার ঢেলা। চিনেছি তোমাকে। এখন কী করতে হবে বলো।"

"ঐ ছেলেটিকে রাজি করিয়ে দিন।"

"চেষ্টা করব, কিন্তু কাজটা খুব সহজ নয়। আর কেউ হলে তোমার দান লাফিয়ে নিত।"

"কোথায় বাধছে বলুন।"

"শিশুকাল থেকে একটি মেয়ে-গ্রহ ওর কুষ্টি দখল করে বসেছে। রাস্তা আগলে রয়েছে অটল অবুদ্ধি।"

"বলেন কী। পুরুষমানুষ—"

"দেখো মিসেস মল্লিক, রাগ করবে কাকে নিয়ে। জান মেট্রিয়ার্কাল সমাজ কাকে বলে। যে সমাজে মেয়েরাই হচ্ছে পুরুষের সেরা। এক সময়ে সেই দ্রাবিড়ী সমাজের ঢেউ বাংলাদেশে খেলত।"

সোহিনী বললে, "সে সুদিন তো গেছে। তলায় তলায় ঢেউ খেলে হয়তো, ঘুলিয়ে দেয় বুদ্ধিসুদ্ধি, কিন্তু হাল যে একলা পুরুষের হাতে। কানে মন্ত্র দেন তাঁরাই, আর জোরে দেন কানমলা। কান ছিঁড়ে যাবার জো হয়।"

"আহা হা, কথা কইতে জান তুমি। তোমার মতো মেয়েদের যুগ যদি আসে তা হলে মেট্রিয়ার্কাল সমাজে ধোবার বাড়ির ফর্দ রাখি মেয়েদের শাড়ির, আর আমাদের কলেজের প্রিন্সিপল্‌কে পাঠিয়ে দিই ঢেঁকি কুটতে। মনোবিজ্ঞান বলে, বাংলাদেশে মেট্রিয়ার্কি বাইরে নেই, আছে নাড়িতে। মা মা শব্দে হাম্বাধ্বনি আর কোনো দেশের পুরুষমহলে শুনেছ কি। তোমাকে খবর দিচ্ছি, রেবতীর বুদ্ধির ডগার উপরে চড়ে বসে আছে একটি রীতিমতো মেয়ে।"

"কাউকে ভালোবাসে নাকি।"

"আহা, সেটা হলে তো বুঝতুম, ওর শিরায় প্রাণ করছে ধুক্‌ধুক্। যুবতীর হাতে বুদ্ধি খোয়াবার বায়না নিয়েই তো এসেছে, এই তো সেই বয়েস। তা না হয়ে এই

কাঁচা বয়সে ও যে এক মালাজপকারিণীর হাতে মালার গুটি বনে গেছে। ওকে বাঁচাবে কিসে— না যৌবন, না বুদ্ধি, না বিজ্ঞান।"

"আচ্ছা একদিন ওঁকে এখানে চা খেতে ডাকতে পারি কি। আমাদের মতো অশুচির ঘরে খাবেন তো?"

"অশুচি! না খায় তো ওকে আছড়ে আছড়ে এমনি শুচি করে নেব যে বামনাইয়ের দাগ থাকবে না ওর মজ্জায়। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার নাকি একটি সুন্দরী মেয়ে আছে?"

"আছে। পোড়াকপালী সুন্দরীও বটে। তা কী করব বলুন।"

"না না, আমাকে ভুল কোরো না। আমার কথা যদি বল, সুন্দরী মেয়ে আমি পছন্দই করি। ওটা আমার একটা রোগ বললেই হয়। কিন্তু ওর আত্মীয়েরা বেরসিক, ভয় পেয়ে যাবে।"

"ভয় নেই, আমি নিজের জাতেই মেয়ের বিয়ে দেব ঠিক করেছি।"

এটা একেবারে বানানো কথা।

"তুমি নিজে তো বেজাতে বিয়ে করেছ।"

"নাকাল হয়েছি কম নয়। বিষয়ের দখল নিয়ে মামলা করতে হয়েছে বিস্তর। যে করে জিতেছি সেটা বলবার কথা নয়।"

"শুনেছি কিছু কিছু। বিপক্ষ পক্ষের আর্টিকেল্‌ড্ ক্লার্ক্‌কে নিয়ে তোমার নামে গুজব রটেছিল। মকদ্দমায় জিতে তুমি তো সরে পড়লে, সে লোকটা গলায় দড়ি দিয়ে মরতে যায় আর কি।"

"এত যুগ ধরে মেয়েমানুষ টিঁকে আছে কী ক'রে। ছল করার কম কৌশল লাগে না, লড়াইয়ের তাগবাগের সমানই সে, তবে কিনা তাতে মধুও কিছু খরচ করতে হয়। এ হল নারীর স্বভাবদত্ত লড়াইয়ের রীতি।"

"ঐ দেখো, আবার তুমি আমাকে ভুল করছ। আমরা বিজ্ঞানী, আমরা বিচারক নই, স্বভাবের খেলা আমরা নিষ্কাম ভাবে দেখে যাই। সে খেলায় যা ফল হবার তা ফলতে থাকে। তোমার বেলায় ফলটা বেশ হিসেবমতোই ফলেছিল, বলেছিলুম, ধন্য মেয়ে তুমি। এ কথাটাও ভেবেছি, আমি যে তখন প্রোফেসর ছিলুম, আর্টিকেল্‌ড ক্লার্ক্ ছিলুম না, সেটা আমার বাঁচোয়া। মার্করি সূর্যের কাছ থেকে যতটুকু দূরে আছে ততটুকু দূরে থেকেই বেঁচে গেল। ওটা গণিতের হিসাবের কথা, ওতে ভালো নেই মন্দ নেই। এসব কথা বোধ হয় তুমি বুঝতে শিখেছ।"

"তা শিখেছি। গ্রহগুলো টান মেনে চলে আবার টান এড়িয়ে চলে— এটা

একটা শিখে নেবার তত্ত্ব বই কি।"

"আর-একটা কথা কবুল করছি। এইমাত্র তোমার সঙ্গে কথা কইতে কইতে একটা হিসেব মনে মনে কষছিলুম, সেও অঙ্কের হিসেব। ভেবে দেখো, বয়সটা যদি অন্তত দশটা বছর কম হত তা হলে খামকা আজ একটা বিপদ ঘটত। কোলিশন ঐটুকু পাশ কাটিয়ে গেল আর কি! তবু বাষ্পের জোয়ার উঠছে বুকের মধ্যে। ভেবে দেখো, সৃষ্টিটা আগাগোড়াই কেবল অঙ্ককষার খেলা।"

এই ব'লে চৌধুরী দুই হাঁটু চাপড়িয়ে হাহা করে হেসে উঠলেন। একটা কথা তাঁর হুঁশ ছিল না যে, তাঁর সঙ্গে দেখা করবার আগে সোহিনী দুঘণ্টা ধরে রঙে চঙে এমন করে বয়স বদল করেছে যে সৃষ্টিকর্তাকে আগাগোড়াই দিয়েছে ঠকিয়ে।

৪

পরের দিন অধ্যাপক এসে দেখলেন সোহিনী রোঁয়া-ওঠা হাড়-বের-করা একটা কুকুরকে স্নান করিয়ে তোয়ালে দিয়ে তার গা মুছিয়ে দিচ্ছে।

চৌধুরী জিগ্‌গেসা করলেন, "এই অপয়মন্তটাকে এত সম্মান কেন।"

"ওকে বাঁচিয়েছি ব'লে। পা ভেঙেছিল মোটরের তলায় পড়ে, আমি সারিয়ে তুলেছি ব্যাণ্ডেজ বেঁধে। এখন ওর প্রাণটার মধ্যে আমারও শেয়ার আছে।"

"রোজ রোজ ঐ অলুক্ষুনের চেহারা দেখে মন খারাপ হয়ে যাবে না?"

"চেহারা দেখবার জন্যে ওকে তো রাখি নি। মরতে মরতে এই যে ও সেরে উঠছে, এটা দেখতে আমার ভালো লাগে। ঐ প্রাণীর বেঁচে থাকবার দরকারটা যখন দিনে দিনে মিটিয়ে দিই, তখন ধর্মকর্ম করতে ছাগলছানার গলায় দড়ি বেঁধে আমাকে কালীতলায় দৌড়তে হয় না। তোমাদের বায়োলজির ল্যাবরেটরির কানাখোঁড়া কুকুর-খরগোশগুলোর জন্যে আমি একটা হাসপাতাল বানাব স্থির করেছি।"

"মিসেস মল্লিক, তোমাকে যতই দেখছি তাক লাগছে।"

"আরও বেশি দেখলে ওটার উপশম হবে। রেবতীবাবুর খবর দেবেন বলেছিলেন, সেটা আরম্ভ করে দিন।"

"আমার সঙ্গে দুর সম্পর্কে ওদের যোগ আছে। তাই ওদের ঘরের খবর জানি। রেবতীকে জন্ম দিয়েই ওর মা যান মারা। বরাবর ও পিসির হাতে মানুষ। ওর পিসির আচারনিষ্ঠা একেবারে নিরেট। এতটুকু খুঁত নিয়ে ওঁর খুঁতখুঁতুনি সংসারকে অতিষ্ঠ করে তুলত। তাঁকে ভয় না করত এমন লোক ছিল না পরিবারে। ওঁর

হাতে রেবতীর পৌরুষ গেল ছাতু হয়ে। স্কুল থেকে ফিরতে পাঁচ মিনিট দেরি হলে পঁচিশ মিনিট লাগত তার জবাবদিহি করতে।"

সোহিনী বললে, "আমি তো জানি পুরুষরা করবে শাসন, মেয়েরা দেবে আদর, তবেই ওজন ঠিক থাকে।"

অধ্যাপক বললেন, "ওজন ঠিক রেখে চলা মরালগামিনীদের ধাতে নেই। ওরা এদিকে ঝুঁকবে ওদিকে ঝুঁকবে। কিছু মনে কোরো না মিসেস মল্লিক, ওদের মধ্যেও দৈবাৎ মেলে যারা খাড়া রাখে মাথা, চলে সোজা চালে। যেমন—"

"আর বলতে হবে না। কিন্তু আমার মধ্যেও শিকড়ের দিকে মেয়েমানুষ যথেষ্ট আছে। কী ঝোঁকে পেয়েছে দেখছেন না! ছেলে-ধরা ঝোঁক। নইলে আপনাকে বিরক্ত করতেম কি।"

"দেখো, বার বার ঐ কথাটা বোলো না। জেনে রেখো আজ ক্লাসের জন্যে তৈরি না হয়েই চলে এসেছি। কর্তব্যের গাফেলি এতই ভালো লাগছে।"

"বোধ হয় মেয়েজাতটার 'পরেই আপনার বিশেষ একটু কৃপা আছে।"

"একটুও অসম্ভব নয়। কিন্তু তার মধ্যেও তো ইতরবিশেষ আছে। যা হোক, সে কথাটা পরে হবে।"

সোহিনী হেসে বললে, "পরে না হলেও চলবে। আপাতত যে কথাটা উঠেছে শেষ করে দিন। রেবতীবাবুর এত উন্নতি হল কী করে।"

"যা হতে পারত তার তুলনায় কিছুই হয় নি। একটা রিসর্চের কাজে ওর বিশেষ দরকার হয়েছিল উঁচু পাহাড়ে যাবার। ঠিক করেছিল যাবে বদরিকাশ্রমে। আরে সর্বনাশ। পিসিরও ছিল এক পিসি, সে বুড়ি মরবে তো মরুক ঐ বদরিকারই রাস্তায়। পিসি বললে, 'আমি যতদিন বেঁচে আছি, পাহাড়পর্বত চলবে না।' কাজেই তখন থেকে একমনে যা কামনা করছি সে মুখ ফুটে বলবার নয়। থাক্ সে কথা।"

"কিন্তু শুধু পিসিমাদের দোষ দিলে চলবে কেন। মায়ের দুলাল ভাইপোদের হাড় বুঝি কোনো কালে পাকবে না?"

"সে তো পূর্বেই বলেছি। মেট্রিয়ার্কি রক্তের মধ্যে হাম্বাধ্বনি জাগিয়ে তোলে, হতবুদ্ধি হয়ে যায় বৎসরা। আফসোসের কথা কী আর বলব। এ তো হল নম্বর ওয়ান। তার পরে রেবতী যখন সরকারের বৃত্তি নিয়ে কেম্ব্রিজে যাবে স্থির হল, আবার এসে পড়ল সেই পিসিমা হাউ হাউ শব্দে। তার বিশ্বাস, ও চলেছে মেমসাহেব বিয়ে করতে। আমি বললুম, নাহয় করল বিয়ে। সর্বনাশ, কথাটা আন্দাজে ছিল, এবার যেন পাকা দেখা হয়ে গেল। পিসি বললে, 'ছেলে যদি বিলেতে যায় তা হলে

গলায় দড়ি দিয়ে মরব।' কোন্ দেবতার দোহাই পাড়লে পাকানো হবে দড়িটা নাস্তিক আমি জানি নে, তাই দড়িটা বাজারে মিলল না। রেবতীকে খুব খানিকটা গাল দিলুম, বললুম স্টুপিড, বললুম ডান্স, বললুম ইম্‌বেসীল। ব্যস্, ঐখানেই খতম। রেবু এখন ভারতীয় ঘানিতে ফোঁটা ফোঁটা তেল বের করছেন।"

সোহিনী অস্থির হয়ে বলে উঠল, "দেয়ালে মাথা ঠুকে মরতে ইচ্ছে করছে। একটা মেয়ে রেবতীকে তলিয়ে দিয়েছে, আর-একটা মেয়ে তাকে টেনে তুলবে ডাঙায়, এই আমার পণ রইল।"

"স্পষ্ট কথা বলি ম্যাডাম। জানোয়ারগুলোকে শিঙে ধরে তলিয়ে দেবার হাত তোমার পাকা— লেজে ধরে তাদের উপরে তোলবার হাত তেমন দুরস্ত হয় নি। তা এখন থেকে অভ্যাসটা শুরু হোক। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সায়ান্সে এত উৎসাহ তোমার এল কোথা থেকে।"

"সকল রকম সায়ান্সেই সারা জীবন আমার স্বামীর মন ছিল মেতে। তাঁর নেশা ছিল বর্মা চুরুট আর ল্যাবরেটরি। আমাকে চুরুট ধরিয়ে প্রায় বর্মিজ মেয়ে বানিয়ে তুলেছিলেন। ছেড়ে দিলুম, দেখলুম পুরুষদের চোখে খটকা লাগে। তাঁর আর-এক নেশা আমার উপর দিয়ে জমিয়েছিলেন। পুরুষরা মেয়েদের মজায় বোকা বানিয়ে, উনি আমাকে মজিয়েছিলেন বিদ্যে দিয়ে দিনরাত। দেখুন চৌধুরীমশায়, স্বামীর দুর্বলতা স্ত্রীর কাছে ঢাকা থাকে না, কিন্তু আমি ওঁর মধ্যে কোনোখানে খাদ দেখতে পাই নি। কাছে থেকে যখন দেখতুম, দেখেছি উনি বড়ো; আজ দূরে থেকে দেখছি, দেখি উনি আরও বড়ো।"

চৌধুরী জিগ্‌গেসা করলেন, "কোন্‌খানে সব চেয়ে তাঁকে বড়ো ঠেকছে।"

"বলব? উনি বিদ্বান বলে নয়। বিদ্যার 'পরে ওঁর নিষ্কাম ভক্তি ছিল ব'লে। উনি একটা পুজোর আলো পুজোর হাওয়ার মধ্যে ছিলেন। আমরা মেয়েরা দেখবার-ছোঁবার মতো জিনিস না পেলে পুজো করবার পথ পাই নে। তাঁর এই ল্যাবরেটরি আমার পুজোর দেবতা হয়েছে। ইচ্ছে করে এখানে মাঝে মাঝে ধুপধুনো জ্বালিয়ে শাঁখঘণ্টা বাজাই। ভয় করি আমার স্বামীর ঘৃণাকে। তাঁর দৈনিক যখন পুজো ছিল, এই-সব যন্ত্রতন্ত্র ঘিরে জমত কলেজের ছাত্রেরা, শিক্ষা নিত তাঁর কাছ থেকে, আর আমিও বসে যেতুম।"

"ছেলেগুলো সায়ান্সে মন দিতে পারত কি।"

"যারা পারত তাদেরই বাছাই হয়ে যেত। এমন-সব ছেলে দেখেছি যারা সত্যকার বৈরাগী। আবার দেখেছি কেউ কেউ নোট নেবার ছলে একেবারে পাশের ঠিকানায়

চিঠি লিখে সাহিত্যচর্চা করত।"

"কেমন লাগত ?"

"সত্যি কথা বলব ? খারাপ লাগত না। স্বামী চলে যেতেন কাজে, ভাবুকদের মন আশেপাশে ঘুর ঘুর করত।"

"কিছু মনে কোরো না, আমি সাইকলজি স্টাডি করে থাকি। জিগ্‌গেসা করি, ওরা কিছু ফল পেত কি।"

"বলতে ইচ্ছে করে না, নোংরা আমি। দুচারজনের সঙ্গে জানাশোনা হয়েছে যাদের কথা মনে পড়লে আজও মনের মধ্যে মুচড়িয়ে ধরে।"

"দুচারজন ?"

"মন যে লোভী, মাংসমজ্জার নীচে লোভের চাপা আগুন সে লুকিয়ে রেখে দেয়, খোঁচা পেলে জ্বলে ওঠে। আমি তো গোড়াতেই নাম ডুবিয়েছি, সত্যি কথা বলতে আমার বাধে না। আজন্ম তপস্বিনী নই আমরা। ভড়ং করতে করতে প্রাণ বেরিয়ে গেল মেয়েদের। দ্রৌপদীকুন্তীদের সেজে বসতে হয় সীতাসাবিত্রী। একটা কথা বলি আপনাকে চৌধুরীমশায়, মনে রাখবেন, ছেলেবেলা থেকে ভালোমন্দ-বোধ আমার স্পষ্ট ছিল না। কোনো গুরু আমায় তা শিক্ষা দেন নি। তাই মন্দের মাঝে আমি ঝাঁপ দিয়েছি সহজে, পারও হয়ে গেছি সহজে। গায়ে আমার দাগ লেগেছে কিন্তু মনে ছাপ লাগে নি। কিছু আমাকে আঁকড়ে ধরতে পারে নি। যাই হোক, তিনি যাবার পথে তাঁর চিতার আগুনে আমার আসক্তিতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন, জমা পাপ একে একে জ্বলে যাচ্ছে। এই ল্যাবরেটরিতেই জ্বলছে সেই হোমের আগুন।"

"ব্র্যাভো, সত্যি কথা বলতে কী সাহস তোমার।"

"সত্যি কথা বলিয়ে নেবার লোক থাকলে বলা সহজ হয়। আপনি যে খুব সহজ, খুব সত্যি।"

"দেখো, ঐ যে চিঠিলিখিয়ে ছেলেগুলো তোমার প্রসাদ পেয়েছিল, তারা কি এখনও আনাগোনা করে।"

"সেই করেই তো তারা মুছে দিয়েছে আমার মনের ময়লা। দেখলুম, জুটছে তারা আমার চেকবইয়ের দিকে লক্ষ্য করে। ভেবেছিল মেয়েমানুষের মোহ মরতে চায় না, ভালোবাসার সিঁধের গর্ত দিয়ে পৌঁছবে তাদের হাত আমার টাকার সিন্দুকে। এত রস আমার নেই, তারা তা জানত না। আমার শুকনো পাঞ্জাবি মন। আমি সমাজের আইনকানুন ভাসিয়ে দিতে পারি দেহের টানে প'ড়ে, কিন্তু প্রাণ গেলেও বেইমানি করতে পারব না। আমার ল্যাবরেটরির এক পয়সাও তারা খসাতে পারে নি। আমার

প্রাণ শক্ত পাথর হয়ে চেপে আছে আমার দেবতার ভাণ্ডারের দ্বার। ওদের সাধ্য নেই সে পাথর গলাবে। আমাকে যিনি বেছে এনেছিলেন তিনি ভুল করেন নি।"

"তাঁকে আমি প্রণাম করি, আর পাই যদি সেই ছেলেগুলোর কান মলে দিই।"

বিদায় নেবার আগে অধ্যাপক একবার ল্যাবরেটরিটা ঘুরে এলেন সোহিনীকে সঙ্গে নিয়ে। বললেন, "এখানেই মেয়েলিবুদ্ধির চোলাই হয়ে গেছে, অপদেবতার গাদ গেছে নেমে, বেরিয়ে এসেছে খাঁটি স্পিরিট।"

সোহিনী বললে, "যা বলুন, মন থেকে ভয় যায় না। মেয়েলিবুদ্ধি বিধাতার আদি সৃষ্টি। যখন বয়স অল্প থাকে মনের জোর থাকে, তখন সে লুকিয়ে থাকে ঝোপেঝাপে, যেই রক্ত আসে ঠাণ্ডা হয়ে, বেরিয়ে আসেন সনাতনী পিসিমা। তার আগেই আমার মরবার ইচ্ছে রইল।"

অধ্যাপক বললেন, "ভয় নেই তোমার, আমি বলছি তুমি সজ্ঞানে মরবে।"

৫

সাদা শাড়ি প'রে মাথায় কাঁচাপাকা চুলে পাউডার মেখে সোহিনী মুখের উপর একটি শুচি সাত্ত্বিক আভা মেজে তুললে। মেয়েকে নিয়ে মোটরলঞ্চে করে উপস্থিত হল বোটানিকালে। তাকে পরিয়েছে নীলচে সবুজ বেনারসী শাড়ি, ভিতর থেকে দেখা যায় বসন্তী রঙের কাঁচুলি। কপালে তার কুঙ্কুমের ফোঁটা, সূক্ষ্ম একটু কাজলের রেখা চোখে, কাঁধের কাছে ঝুলেপড়া গুচ্ছকরা খোঁপা, পায়ে কালো চামড়ার 'পরে লাল মখমলের কাজ-করা স্যাণ্ডেল।

যে আকাশনিম-বীথিকার তলায় রেবতী রবিবার কাটায় আগে থাকতে সংবাদ নিয়ে সোহিনী সেইখানেই এসে তাকে ধরলে। প্রণাম করলে একেবারে তার পায়ে মাথা রেখে। বিষম ব্যস্ত হয়ে উঠল রেবতী।

সোহিনী বললে, "কিছু মনে কোরো না বাবা, তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে, আমি ছত্রির মেয়ে। চৌধুরীমশায়ের কাছে আমার কথা শুনে থাকবে।"

"শুনেছি। কিন্তু এখানে আপনাকে বসাব কোথায়।"

"এই-যে রয়েছে সবুজ তাজা ঘাস, এমন আসন কোথায় পাওয়া যায়। ভাবছ বোধ হয়, এখানে আমি কী করতে এসেছি। এসেছি আমার ব্রত উদ্‌যাপন করতে। তোমার মতো ব্রাহ্মণ তো খুঁজে পাব না।"

রেবতী আশ্চর্য হয়ে বললে, "আমার মতো ব্রাহ্মণ?"

"তা না তো কী। আমার গুরু বলেছেন, এখনকার কালের সুরসেরা যে বিদ্যা

তাতেই যাঁর দখল তিনিই সেরা ব্রাহ্মণ।"

রেবতী অপ্রস্তুত হয়ে বললে, "আমার বাবা করতেন যজনযাজন, আমি মন্ত্রতন্ত্র কিছুই জানি নে।"

"বল কী, তুমি যে মন্ত্র শিখেছ সেই মন্ত্রে সমস্ত জগৎ হয়েছে মানুষের বশ। তুমি ভাবছ মেয়েমানুষের মুখে এসব কথা এল কোথা থেকে। পেয়েছি পুরুষের মতো পুরুষের মুখ থেকে। তিনি আমার স্বামী। যেখানে তাঁর সাধনার পীঠস্থান ছিল, কথা দাও বাবা, সেখানে তোমাকে যেতে হবে।"

"কাল সকালে আমার ছুটি আছে, যাব।"

"তোমার দেখছি গাছপালার শখ। বড়ো আনন্দ হল। গাছপালার খোঁজে আমার স্বামী গিয়েছিলেন বর্মায়, আমি তাঁর সঙ্গ ছাড়ি নি।"

সঙ্গ ছাড়ে নি কিন্তু সায়ান্সের চর্চায় নয়। নিজের ভিতর থেকে যে গাদ উঠত ফুটে, স্বামীর চরিত্রের মধ্যেও সেটা অনুমান না করে থাকতে পারত না। সন্দেহের সংস্কার ছিল ওর আঁতে আঁতে। একসময়ে নন্দকিশোরের যখন গুরুতর পীড়া হয়েছিল, তিনি স্ত্রীকে বলেছিলেন, "মরবার একমাত্র আরাম এই যে, সেখান থেকে তুমি আমাকে খুঁজে বের করে ফিরিয়ে আনতে পারবে না।"

সোহিনী বললে, "সঙ্গে যেতে পারি তো।"

নন্দকিশোর হেসে বললেন, "সর্বনাশ।"

সোহিনী রেবতীকে বললে, "বর্মা থেকে আসবার সময় এনেছিলুম এক গাছের চারা। বর্মিজরা তাকে বলে কোআইটানিয়েঙ্। চমৎকার ফুলের শোভা— কিন্তু কিছুতেই বাঁচাতে পারলুম না।"

আজই সকালে স্বামীর লাইব্রেরি ঘেঁটে এ নাম সোহিনী প্রথম বের করেছে। গাছটা চোখেও দেখে নি। বিদ্যার জাল ফেলে বিদ্বানকে টানতে চায়।

অবাক হল রেবতী। জিগ্‌গেসা করলে, "এর লাটিন নামটা কি জানেন।"

সোহিনী অনায়াসে বলে দিলে, "তাকে বলে মিলেটিয়া।"

বললে, "আমার স্বামী সহজে কিছু মানতেন না, তবু তাঁর একটা অন্ধবিশ্বাস ছিল ফলে ফুলে প্রকৃতির মধ্যে যা-কিছু আছে সুন্দর, মেয়েরা বিশেষ অবস্থায় তার দিকে একান্ত করে যদি মন রাখে তা হলে সন্তানরা সুন্দর হয়ে জন্মাবেই। এ কথা তুমি বিশ্বাস কর কি।"

বলা বাহুল্য এটা নন্দকিশোরের মত নয়।

রেবতী মাথা চুলকিয়ে বললে, "যথোচিত প্রমাণ তো এখনও জড়ো হয় নি।"

সোহিনী বললে, "অন্তত একটা প্রমাণ পেয়েছি আমার আপন ঘরেই। আমার মেয়ে এমন আশ্চর্য রূপ পেল কোথা থেকে। বসন্তের নানা ফুলের যেন— থাক্, নিজের চোখে দেখলেই বুঝতে পারবে।"

দেখবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠল রেবতী। নাট্যের কোনো সরঞ্জাম বাকি ছিল না।

সোহিনী তার রাঁধুনী বামুনকে সাজিয়ে এনেছে পূজারী বামুনের বেশে। পরনে চেলি, কপালে ফোঁটাতিলক, টিকিতে ফুল বাঁধা, বেলের আঠায় মাজা মোটা পইতে গলায়। তাকে ডেকে বললে, "ঠাকুর, সময় তো হল, নীলুকে এবার ডেকে নিয়ে এসো।"

নীলাকে তার মা বসিয়ে রেখেছিল স্টীমলঞ্চে। ঠিক ছিল ডালি হাতে সে উঠে আসবে, বেশ খানিকখন তাকে দেখা যাবে সকালবেলার ছায়ায়-আলোয়।

ইতিমধ্যে রেবতীকে সোহিনী তন্ন তন্ন করে দেখে নিতে লাগল। রঙ মসৃণ শ্যামবর্ণ, একটু হলদের আভা আছে। কপাল চওড়া, চুলগুলো আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে উপরে তোলা। চোখ বড়ো নয় কিন্তু তাতে দৃষ্টিশক্তির স্বচ্ছ আলো জ্বল্ জ্বল্ করছে, মুখের মধ্যে সেইটেই সকলের চেয়ে চোখে পড়ে। নীচে মুখের বেড়টা মেয়েলি ধাঁচের মোলায়েম। রেবতীর সম্বন্ধে ও যত খবর জোগাড় করেছে তার মধ্যে ও বিশেষ লক্ষ্য করেছে একটা কথা। ছেলেবেলাকার বন্ধুদের ওর উপরে ছিল কান্নাকাটি-জড়ানো সেন্টিমেণ্টাল ভালোবাসা। ওর মুখে যে একটা দুর্বল মাধুর্য ছিল, তাতে পুরুষ বালকদের মনে মোহ আনতে পারত।

সোহিনীর মনে খটকা লাগল। ওর বিশ্বাস, মেয়েদের মনকে নোঙরের মতো শক্ত করে আঁকড়ে ধরার জন্যে পুরুষের ভালো দেখতে হওয়ার দরকারই করে না। বুদ্ধিবিদ্যেটাও গৌণ। আসল দরকার পৌরুষের ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্। সেটা তার স্নায়ুর পেশীর ভিতরকার বেতার-বার্তার মতো। প্রকাশ পেতে থাকে কামনার অকথিত স্পর্ধারূপে।

মনে পড়ল, নিজের প্রথম বয়সের রসোন্মত্ততার ইতিহাস। ও যাকে টেনেছিল কিংবা যে টেনেছিল ওকে, তার না ছিল রূপ, না ছিল বিদ্যা, না ছিল বংশগৌরব। কিন্তু কী একটা অদৃশ্য তাপের বিকিরণ ছিল যার অলক্ষ্য সংস্পর্শে সমস্ত দেহ মন দিয়ে ও তাকে অত্যন্ত করে অনুভব করেছিল পুরুষমানুষ ব'লে। নীলার জীবনে কখন একসময়ে সেই অনিবার্য আলোড়নের আরম্ভ হবে এই ভাবনা তাকে স্থির থাকতে দিত না। যৌবনের শেষ দশাই সকলের চেয়ে বিপদের দশা, সেই সময়টাতে সোহিনীকে অনেকখানি ভুলিয়ে রেখেছিল নিরবকাশ জ্ঞানের চর্চায়। কিন্তু দৈবাৎ সোহিনীর মনের জমি ছিল স্বভাবত উর্বরা। কিন্তু যে জ্ঞান নৈর্ব্যক্তিক, সব মেয়ের তার প্রতি

টান থাকে না। নীলার মনে আলো পৌঁছয় না।

নদীর ঘাট থেকে আস্তে আস্তে দেখা দিল নীলা। রোদ্দুর পড়েছে তার কপালে তার চুলে, বেনারসি শাড়ির উপরে জরির রশ্মি ঝল্‌মল্‌ করে উঠছে। রেবতীর দৃষ্টি একমুহূর্তের মধ্যে ওকে ব্যাপ্ত করে দেখে নিলে। চোখ নামিয়ে নিল পরক্ষণেই। ছেলেবেলা থেকে তার এই শিক্ষা। যে সুন্দরী মেয়ে মহামায়ার মনোহারিণী লীলা, তাকে আড়াল করে রেখেছে পিসির তর্জনী। তাই যখন সুযোগ ঘটে তখন দৃষ্টির অমৃত ওকে তাড়াতাড়ি এক চুমুকে গিলতে হয়।

মনে মনে রেবতীকে ধিক্কার দিয়ে সোহিনী বললে, "দেখো দেখো, একবার চেয়ে দেখো।"

রেবতী চমকে উঠে চোখ তুলে চাইলে।

সোহিনী বললে, "দেখো তো ডক্টর অব সায়ান্স, ওর শাড়ির রঙের সঙ্গে পাতার রঙের কী চমৎকার মিল হয়েছে।"

রেবতী সসংকোচে বললে, "চমৎকার।"

সোহিনী মনে মনে বললে, 'নাঃ, আর পারা গেল না।' আবার বললে, "ভিতরে বসন্তী রঙ উঁকি মারছে, উপরে সবজে নীল। কোন্‌ ফুলের সঙ্গে মেলে বলো দেখি।"

উৎসাহ পেয়ে রেবতী ভালো করেই দেখলে। বললে, "একটা ফুল মনে পড়ছে কিন্তু উপরের আবরণটা ঠিক নীল নয়, ব্রাউন।"

"কোন্‌ ফুল বলো তো।"

রেবতী বললে, "মেলিনা।"

"ও বুঝেছি। তার পাঁচটি পাপড়ি, একটি উজ্জ্বল হলদে, বাকি চারটে শ্যামবর্ণ।"

রেবতী আশ্চর্য হয়ে গেল। বললে, "এত করে ফুলের পরিচয় জানলেন কী করে।"

সোহিনী হেসে বললে, "জানা উচিত হয় নি বাবা। পুজোর সাজির বাইরের ফুল আমাদের কাছে পরপুরুষ বললেই হয়।"

ডালি হাতে এল ধীরে ধীরে নীলা। মা বললে, "জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলি কেন। পা ছুঁয়ে প্রণাম কর্‌।"

"থাক্‌ থাক্‌" ব'লে রেবতী অস্থির হয়ে উঠল। রেবতী আসন করে বসেছিল, পা খুঁজে বের করতে নীলাকে একটু হাতড়াতে হল। শিউরে উঠল রেবতীর সমস্ত শরীর। ডালিতে ছিল দুর্লভ-জাতীয় অর্কিডের মঞ্জরি, রুপোর থালায় ছিল বাদামের তক্তি, পেস্তার বরফি, চন্দ্রপুলি, ক্ষীরের ছাঁচ, মালাইয়ের বরফি, চৌকো করে কাটা কাটা ভাপা দই।

বললে, "এ সমস্তই তৈরি নীলার নিজের হাতে।"

সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা। এসব কাজে নীলার না ছিল হাত, না ছিল মন।

সোহিনী বললে, "একটু মুখে দিতে হয় বাবা, ঘরে তৈরি তোমারই উদ্দেশে।"

ফরমাশে তৈরি বড়োবাজারের এক চেনা দোকানে।

রেবতী হাত জোড় করে বললে, "এ সময়ে খাওয়া আমার অভ্যাস নয়। বরং অনুমতি করেন যদি বাসায় নিয়ে যাই।"

সোহিনী বললে, "সেই ভালো। অনুরোধ করে খাওয়ানো আমার স্বামীর আইনে বারণ। তিনি বলতেন, মানুষ তো অজগরের জাত নয়।"

একটা বড়ো টিফিন-ক্যারিয়রে থাকে থাকে সোহিনী খাবার সাজিয়ে দিলে। নীলাকে বললে, "দে তো মা, সাজিতে ফুলগুলি ভালো করে সাজিয়ে। এক জাতের সঙ্গে আর-এক জাত মিশিয়ে দিস নে যেন। আর তোর খোঁপা ঘিরে ঐ যে সিল্কের রুমাল জড়িয়েছিস, ওটা পেতে দিস ফুলগুলির উপরে।"

বিজ্ঞানীর চোখে আর্টপিপাসুর দৃষ্টি উঠল উৎসুক হয়ে। এ যে প্রাকৃত জগতের মাপ-ওজনের বাইরেকার জিনিস। নানা রঙের ফুলগুলির মধ্যে নীলার সুঠাম আঙুল সাজাবার লয় রেখে নানা ভঙ্গিতে চলছিল— রেবতীর চোখ ফেরানো দায় হল। মাঝে মাঝে নীলার মুখের দিকে তাকিয়ে নিচ্ছিল। এক দিকে সেই মুখের সীমানা দিয়েছে চুনিমুক্তোপান্নার-মিশোলকরা একহারা হার জড়ানো চুলের ইন্দ্রধনু, আর-এক দিকে বসন্তীরঙা কাঁচুলির উচ্ছ্রিত রাঙা পাড়টি। সোহিনী মিষ্টান্ন সাজাচ্ছিল কিন্তু ওর একটা তৃতীয় নেত্র আছে যেন। সামনে যে একটা জাদু চলছিল সে ওর লক্ষ্য এড়ায় নি।

নিজের স্বামীর অভিজ্ঞতা অনুসারে সোহিনীর ধারণা ছিল বিদ্যাসাধনার বেড়া-দেওয়া খেত যে-সে গোরুর চরবার খেত নয়। আজ আভাস পেল বেড়া সকলের পক্ষে সমান ঘন নয়। সেটা ভালো লাগল না।

৬

পরের দিন সোহিনী অধ্যাপককে ডেকে পাঠালে। বললে, "নিজের গরজে আপনাকে ডেকে এনে মিছিমিছি কষ্ট দিই। হয়তো কাজের ক্ষতিও করি।"

"দোহাই তোমার, আরও-একটু ঘন ঘন ডেকো। দরকার থাকে তো ভালো, না থাকে তো আরও ভালো।"

"আপনি জানেন, দামী যন্ত্র সংগ্রহের নেশায় আমার স্বামীর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকত

না। মনিবদের ফাঁকি দিতেন এই নিষ্কাম লোভে। সমস্ত এসিয়ার মধ্যে এমন ল্যাবরেটরি কোথাও পাওয়া যাবে না, এই জেদ তাঁর মতো আমাকেও পেয়ে বসেছিল। এই জেদেই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, নইলে আমার মোদো রক্ত গাঁজিয়ে উঠে উপচিয়ে পড়ত চার দিকে। দেখুন চৌধুরীমশায়, নিজের স্বভাবের মধ্যে মন্দটা যা লেপটিয়ে থাকে সেটা যাঁর কাছে অসংকোচে বলতে পারি আপনি আমার সেই বন্ধু। নিজের কলঙ্কের দিকটা দেখাবার খোলসা দরজা পেলে মন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।"

চৌধুরী বললেন, "যারা সম্পূর্ণটা দেখতে পায় তাদের কাছে সত্যকে চাপা দেবার দরকার করে না। আধা সত্যই লজ্জার জিনিস। পুরোপুরি দেখার ধাত আমাদের, আমরা বিজ্ঞানী।"

"তিনি বলতেন, মানুষ প্রাণপণে প্রাণ বাঁচাতে চায় কিন্তু প্রাণ তো বাঁচে না। সেইজন্যে বাঁচবার শখ মেটাবার জন্যে এমন কিছুকে সে খুঁজে বেড়ায় যা প্রাণের চেয়ে অনেক বেশি। সেই দুর্লভ জিনিসকে তিনি পেয়েছেন তাঁর এই ল্যাবরেটরিতে। একে যদি আমি বাঁচিয়ে রাখতে না পারি তা হলেই তাঁকে চরম করে মারব স্বামীঘাতিনী হয়ে। আমি এর রক্ষক চাই, তাই খুঁজছিলুম রেবতীকে।"

"চেষ্টা করে দেখলে ?"

"দেখেছি, হাতে হাতে ফল পাবার আশা আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিঁকবে না।"

"কেন।"

"ওঁর পিসিমা যেমনি শুনবেন রেবতীকে টেনেছি কাছে, অমনি তাঁকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবার জন্যে ছুটে আসবেন। ভাববেন, আমার মেয়ের সঙ্গে ওঁর বিয়ে দেবার ফাঁদ পেতেছি।"

"দোষ কী, হলে তো ভালোই হত। কিন্তু তুমি যে বলেছিলে, বেজাতে মেয়ের বিয়ে দেবে না।"

"তখনও আপনার মন জানতুম না, তাই মিথ্যে কথা বলেছিলুম। খুবই চেয়েছিলুম। কিন্তু ছেড়েছি সেই মতলব।"

"কেন।"

"বুঝতে পেরেছি, ও ভাঙনধরানো মেয়ে। ওর হাতে যা পড়বে তা আস্ত থাকবে না।"

"কিন্তু ও তো তোমারই মেয়ে।"

"আমারই মেয়ে তো বটে, তাই তো ওকে আঁতের ভিতর থেকেই চিনি।"

অধ্যাপক বললেন, "কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে কেন যে, মেয়েরা পুরুষের ইন্‌স্পিরেশন জাগাতে পারে।"

"আমার সবই জানা আছে। পুরুষের খোরাকে আমিষ পর্যন্ত ভালোই চলে কিন্তু মদ ধরালেই সর্বনাশ। আমার মেয়েটি মদের পাত্র, কানায় কানায় ভরা।"

"তা হলে কী করতে চাও বলো।"

"আমার ল্যাবরেটরি দান করতে চাই পাব্লিককে।"

"তোমার একমাত্র মেয়েকে এড়িয়ে দিয়ে?"

"মেয়েকে? ওকে দান করলে সে দান পৌঁছবে কোন্ রসাতলে কী করে জানব আমার ট্রাস্ট সম্পত্তির প্রেসিডেন্ট করে দেব রেবতীকে। তাতে তো পিসির আপত্তি হতে পারবে না?"

"মেয়েদের আপত্তির যুক্তি যদি ধরতেই পারব তা হলে পুরুষ হয়ে জন্মাতে গেলুম কেন। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি নে, ওকে যদি জামাই না করবে তা হলে প্রেসিডেন্ট করতে চাও কেন।"

"শুধু যন্ত্রগুলো নিয়ে কী হবে। মানুষ চাই ওদের প্রাণ দিতে। আর-একটা কথা এই, আমার স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে একটাও নতুন যন্ত্র আনা হয় নি। টাকার অভাবে নয়। কিনতে হলে একটা লক্ষ্য ধরে কিনতে হয়। খবর জেনেছি, রেবতী ম্যাগ্নেটিজ্ম্ নিয়ে কাজ করছেন। সেই পথে সংগ্রহ এগিয়ে চলুক, যত দাম লাগে লাগুক্-না।"

"কী আর বলব, পুরুষমানুষ যদি হতে তোমাকে কাঁধে করে নিয়ে নেচে বেড়াতুম। তোমার স্বামী রেল-কোম্পানির টাকা চুরি করেছিলেন, তুমি চুরি করে নিয়েছ তাঁর পুরুষের মনখানা। এমন অদ্ভুত কলমের-জোড়-লাগানো বুদ্ধি আমি কখনও দেখি নি। আমারও পরামর্শ নেওয়া তুমি যে দরকার বোধ কর, এই আশ্চর্য।"

"তার কারণ আপনি যে খুব খাঁটি, ঠিক কথা বলতে জানেন।"

"হাসালে তুমি। তোমাকে বেঠিক কথা ব'লে ধরা পড়ব, এত বড়ো নিরেট বোকা আমি নই। তা হলে লাগা যাক এবার, জিনিসপত্র ফর্দ করা, দরদস্তুর যাচাই করা, ভালো উকিল ডেকে তোমার স্বত্ব বিচার করা, আইনকানুন বেঁধে দেওয়া ইত্যাদি অনেক হাঙ্গামা আছে।"

"এসব দায় কিন্তু আপনারই।"

"সেটা হবে নামমাত্র। বেশ ভালো করেই জান, যা তুমি বলাবে তাই বলব, যা করাবে তাই করব। আমার লাভটা এই যে দুবেলা দেখা হবে তোমার সঙ্গে। তোমাকে যে কী চক্ষে দেখেছি তুমি তো জান না।"

সোহিনী চৌকি থেকে উঠে এসে ধাঁ করে এক হাতে চৌধুরীর গলা জড়িয়ে ধরে

গালে চুমো খেয়ে চট্ করে সরে গেল, ভালোমানুষের মতো বসল গিয়ে চৌকিতে।

"ঐ রে সর্বনাশের শুরু হল দেখছি।"

"সে ভয় যদি একটুও থাকত তা হলে কাছেও এগতুম না। এ বরাদ্দ আপনার জুটবে মাঝে মাঝে।"

"ঠিক বলছ?"

"ঠিকই বলছি। আমার এতে খরচ নেই, আপনারও যে বেশি কিছু পাওনা আছে, মুখের ভাব দেখে তা বোধ হচ্ছে না।"

"অর্থাৎ বলতে চাও, এ হচ্ছে মরা কাঠে কাঠঠোকরার ঠোকর দেওয়া।— চললুম উকিলবাড়িতে।"

"কাল একবার আসবেন এ পাড়াতে।"

"কেন, কী করতে।"

"রেবতীর মনে দম দিতে।"

"আর নিজের মনটা খুইয়ে বসতে।"

"মন কি আপনার একলারই আছে।"

"তোমার মনের কিছু বাকি আছে নাকি।"

"উচ্ছিষ্ট অনেক পড়ে আছে।"

"তাতে এখনও অনেক বাঁদর নাচানো চলবে।"

৭

তার পরদিনে রেবতী ল্যাবরেটরিতে নির্দিষ্ট সময়ের অন্তত বিশ মিনিট আগে এসেই উপস্থিত। সোহিনী প্রস্তুত ছিল না, আটপৌরে কাপড়েই তাড়াতাড়ি চলে এল ঘরে। রেবতী বুঝতে পারলে গলদ হয়েছে। বললে, "আমার ঘড়িটা ঠিক চলছে না দেখছি।" সোহিনী সংক্ষেপে বললে, "নিশ্চয়।" একসময়ে একটু কী শব্দ শুনে রেবতী মনে মনে চমকে উঠে দরজার দিকে তাকালে। সুখন বেহারাটা গ্লাসকেসের চাবি নিয়ে এল ঘরে।

সোহিনী জিগ্‌গেসা করলে, "এক পেয়ালা চা আনিয়ে দেব কি।"

রেবতী ভাবলে বলা উচিত, হাঁ। বললে, "দোষ কী।"

ও বেচারার চা অভ্যাস নেই, সর্দির আভাস দিলে বেলপাতাসিদ্ধ গরম জল খেয়ে থাকে। মনে মনে বিশ্বাস ছিল স্বয়ং নীলা আসবে পেয়ালা হাতে।

সোহিনী জিগ্‌গেসা করলে, "তুমি কি কড়া চা খাও।"

ও ফস্ ক'রে বলে বসল, "হাঁ।"

ভাবলে এ ক্ষেত্রে হাঁ বলাটাই পাকা দস্তুর। এল চা, সেটা কড়া সন্দেহ নেই। কালির মতো রঙ, নিমের মতো তিতো। চা আনলে মুসলমান খানসামা। এটাও ওকে পরীক্ষা করবার জন্যে। আপত্তি করতে ওর মুখে কথা সরল না। এই সংকোচ ভালো লাগল না সোহিনীর। খানসামাকে বললে, "চা-টা ঢেলে দাও-না মোবারক, ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে।"

খানসামার হাতের পরিবেষণ-প্রত্যাশায় রেবতী বিশ মিনিট আগে এখানে আসে নি।

কী দুঃখে যে মুখে চামচ উঠছিল অন্তর্যামীই জানছিলেন, আর জানছিল সোহিনী। হাজার হোক মেয়েমানুষ, দুর্গতি দেখে বললে, "ও পেয়ালাটা থাক্। দুধ ঢেলে দিচ্ছি, তার সঙ্গে কিছু ফল খেয়ে নাও। সকাল সকাল এসেছ, বোধ হয় কিছু খেয়ে আসা হয় নি।" কথাটা সত্য। রেবতী ভেবেছিল আজও সেই বোটানিকালের পুনরাবৃত্তি হবে। কাছ দিয়েও গেল না, মুখে রয়ে গেল কড়া চায়ের তিতো স্বাদ আর মনে রয়েছে আশাভঙ্গের তিতো অভিজ্ঞতা।

এমনসময় প্রবেশ করলেন অধ্যাপক; ঘরে ঢুকেই রেবতীর পিঠ চাপড়িয়ে বললেন, "কী রে হল কী, সব যে একেবারে ঠাণ্ডা হিম। খুকুর মতো বসে বসে দুধ খাচ্ছিস ঢকে ঢক। চার দিকে যা দেখছিস একি খোকাবাবুর খেলনার দোকান। যাদের চোখ আছে তারা দেখেছে, মহাকালের চেলারা এইখানে আসে তাণ্ডবনৃত্য করতে।"

"আহা কেন বকছেন। না খেয়েই ও বেরিয়েছিল আজ সকালে। এল যখন, তখন দেখলুম মুখ যেন শুকনো।"

"ঐ রে পিসিমা দি সেকেণ্ড। এক পিসিমা দেবে এক গালে চাপড়, আর-এক পিসিমা দেবে অন্য গালে চুমো। মাঝখানে প'ড়ে ছেলেটা যাবে ভিজে কাদা হয়ে। আসল কথা কী জান, লক্ষ্মী যখন আপনি সেধে আসেন চোখে পড়েন না; যারা সাত মুল্লুক ঘুরে তাঁকে খুঁজে বের করে, ধরা দেন তিনি তাদেরই কাছে। না-চেয়ে পাওয়ার মতো না-পাওয়ার আর রাস্তা নেই। আচ্ছা বলো দেখি মিসেস—দূর হোক গে ছাই মিসেস, আমি ডাকবই তোমাকে সোহিনী ব'লে, এতে তুমি রাগই কর আর যাই কর।"

"মরণ আমার, রাগ করতে যাব কেন। ডাকুন আমাকে সোহিনী ব'লে, সুহি বললে আমার কান জুড়িয়ে যাবে।"

"গোপন কথাটা প্রকাশ করেই বলি। তোমার ঐ সোহিনী নামটির সঙ্গে আর-একটি শব্দের মিল আছে, বড়ো খাঁটি তার অর্থ। সকালে ঘুম থেকে উঠেই হিনি হিনি কিনি কিনি রবে ঐ দুটি শব্দ মিলিয়ে মনে মনে খঞ্জনি বাজাতে থাকি।"

"কেমিস্ট্রির রিসর্চে মিল করা আপনার অভ্যাস আছে, ওটা তারই একটা ফেঁকড়া।"

"মিল করতে গিয়ে মরেও অনেক লোক। বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করতে নেই— ঘোরতর দাহ্য পদার্থ।"

এই ব'লে হাঃ হাঃ শব্দে উচ্চহাস্য করে উঠলেন।

"নাঃ, ঐ ছোকরার সামনে এসব কথার আলোচনা করতে নেই। বারুদের কারখানায় আজ পর্যন্ত ও অ্যাপ্রেন্টিসি শুরু করে নি। পিসিমার আঁচল ওকে আগলে আছে, সে আঁচল নন্‌কম্‌বাস্টিব্‌ল্‌।"

রেবতীর মেয়েলি মুখ লাল হয়ে উঠছিল।

"সোহিনী, আমি তোমাকে জিগ্‌গেসা করতে যাচ্ছিলুম, আজ সকালে তুমি কি ওকে আফিম খাইয়ে দিয়েছিলে। অমন ঝিমিয়ে পড়ছে কেন।"

"খাইয়ে যদি থাকি সেটা না জেনে।"

"রেবু, ওঠ বলছি ওঠ্‌। মেয়েদের কাছে অমন মুখচোরা হয়ে থাকতে নেই। ওতে ওদের আস্পর্ধা বেড়ে যায়। ওরা তো ব্যামোর মতো পুরুষের দুর্বলতা খুঁজে বেড়ায়, ছিদ্র পেলেই টেম্পারেচর চড়িয়ে দেয় হু হু ক'রে। সাবজেক্ট্‌টা জানা আছে, ছেলেগুলোকে সাবধান করতে হয়। আমার মতো যারা ঘা খেয়েছে, মরে নি, তাঁদের কাছ থেকেই পাঠ নিতে হয়। রেবু, কিছু মনে করিস নে বাবা। যারা কথা কয় না, চুপ করে থাকে, তারাই সব চেয়ে ভয়ংকর। চল্‌ দেখি, তোকে একবার ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। ঐ দেখ্‌ দুটো গ্যালভানোমিটর, একেবারে হাল কায়দার। এই দেখ্‌ হাই ভ্যাকুয়ম পম্প্‌, আর এটা মাইক্রোফোটোমিটর, এ ছেলে-পাস-করাবার কলার ভেলা নয়। একবার এখানে আসন গেড়ে বোস্‌ দেখি। সেই তোমার টাকপড়া মাথার প্রোফেসর— নাম করতে চাই নে— দেখ কেমন তার মুখ চুন হয়ে না যায়। আমার ছাত্র হয়ে যখন তুই বিদ্যে শুরু করলি আমি তোকে বলি নি কি, তোর নাকের সামনে ঝুলছে যাকে কথায় বলে ভবিষ্যৎ। হেলাফেলা করে সেটাকে ফোঁপরা করে দিস নে যেন। তোর জীবনীর প্রথম চ্যাপ্‌টারের এক কোণে আমার নামটাও ছোটো অক্ষরে লেখা যদি থাকে, সেটা হবে আমার মস্ত গুরুদক্ষিণা।"

দেখতে দেখতে বিজ্ঞানী জেগে উঠল। জ্বলে উঠল তার দুই চোখ। চেহারাটা

একেবারে ভিতর থেকে গেল বদলে। মুগ্ধ হয়ে সোহিনী বললে, "তোমাকে যে-কেউ জানে তারা সকলেই তোমার এত বড়ো উন্নতির আশা করে যা প্রতিদিনের জিনিস নয়, যা চিরদিনের। কিন্তু আশা যতই বড়ো, ততই বড়ো তার বাধা ভিতরে বাইরে।"

অধ্যাপক রেবতীর পিঠে আর-একবার দিলে একটা মস্ত চাপড়। ঝন্‌ঝন্ করে উঠল তার শিরদাঁড়া। চৌধুরী তাঁর মস্ত ভারী গলায় বললেন, "দেখ্‌ রেবু, যে মহৎ ভবিষ্যতের বাহন হওয়া উচিত ছিল ঐরাবত, কৃপণ বর্তমান চাপিয়ে দেয় তাকে গোরুর গাড়িতে, কাদায় পড়ে থাকে সে অচল হয়ে। শুনছ, সোহিনী, সুহি ?— না না ভয় নেই, পিঠে চাপড় মারব না। বলো সত্যি ক'রে, কথাটা আমি কেমন গুছিয়ে বলেছি।"

"চমৎকার।"

"ওটা লিখে রেখো তোমার ডায়ারিতে।"

"তা রাখব।"

"কথাটার মানেটা বুঝেছিস তো রেবি ?"

"বোধ হয় বুঝেছি।"

"মনে রাখিস মস্ত প্রতিভার মস্ত দায়িত্ব। ও তো কারও নিজের জিনিস নয়। ওর জবাবদিহি অনন্তকালের কাছে। শুনছ সুহি, শুনছ ? কথাটা কেমন বলেছি বলো তো ভাই।"

"খুব ভালো বলেছেন। আগেকার দিনের রাজা থাকলে গলা থেকে মালা খুলে—"

"তারা তো মরেছে সব, কিন্তু—"

"ঐ কিন্তুটুকু মরে নি, মনে থাকবে।"

রেবতী বললে, "ভয় নেই, কিছুতে আমাকে দুর্বল করবে না।"

সোহিনীকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে গেল। সোহিনী তাড়াতাড়ি আটকিয়ে দিলে।

চৌধুরী বললেন, "আরে করলে কী। পুণ্যকর্ম না করার দোষ আছে, পুণ্যকর্মে বাধা দেওয়ার দোষ আরও বেশি।"

সোহিনী বললে, "প্রণাম যদি করতে হয় তো ঐখানে।"— ব'লে বেদির উপরে বসানো নন্দকিশোরের মূর্তি দেখিয়ে দিলে। ধূপধুনো জ্বলছে, ফুলে ভরে আছে থালা।

বললে, "পাতকীকে উদ্ধার করার কথা পুরাণে পড়েছি। আমাকে উদ্ধার করেছেন ঐ মহাপুরুষ। অনেক নিচে নামতে হয়েছিল, শেষকালে তুলে বসাতে পেরেছেন—

পাশে বললে মিথ্যে হবে, তাঁর পায়ের তলায়। বিদ্যার পথে মানুষকে উদ্ধার করবার দীক্ষা তিনি আমাকে দিয়ে গেছেন। বলে গিয়েছেন যেন মেয়েজামাইয়ের গুমর বাড়াবার জন্যে তাঁর জীবনের খনিখোঁড়া রত্ন ছাইয়ের গাদায় হারিয়ে না ফেলি। বললেন, 'ঐখানে রেখে গেলেম আমার সদ্গতি, আর সদ্গতি আমার দেশের।' "

অধ্যাপক বললেন, "শুনলি তো রেবু? এটা হবে ট্রাস্ট সম্পত্তি, তোকে দেওয়া হবে তার কর্তৃত্ব।"

রেবতী ব্যস্ত হয়ে বললে, "কর্তৃত্ব নেবার যোগ্য আমি নই। আমি পারব না।"

সোহিনী বললে, "পারবে না! ছি, এ কি পুরুষের মতো কথা।"

রেবতী বললে, "আমি চিরদিন পড়াশুনো করে এসেছি, এরকম কাজের ভার কখনও নিই নি।"

চৌধুরী বললেন, "ডিম ফোটবার আগে কখনও হাঁস সাঁতার দেয় নি। আজ তোমার ডিমের খোলা ভাঙবে।"

সোহিনী বললে, "ভয় নেই তোমার, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব।"

রেবতী আশ্বস্ত হয়ে চলে গেল।

সোহিনী অধ্যাপকের মুখের দিকে চেয়ে রইল। চৌধুরী বললেন, "জগতে বোকা অনেকরকম আছে, পুরুষ বোকা সকল বোকার সেরা। কিন্তু মনে রেখো, দায়িত্ব হাতে না পেলে দায়িত্বের যোগ্যতা জন্মায় না। একজোড়া হাত পেয়েছে মানুষ তাই সে হয়েছে মানুষ, একজোড়া খুর পেলেই তার সঙ্গে সঙ্গে মলবার যোগ্য লেজ আপনি গজিয়ে উঠত। তুমি কি রেবতীর হাতের বদলে খুর দেখতে পেয়েছ নাকি।"

"না, আমার ভালো লাগছে না। মেয়ের হাতেই যারা মানুষ কোনো কালে তাদের দুধে-দাঁত ভাঙে না। কপাল আমার। আপনি থাকতে আমি আর-কারও কথা কেন ভাবতে গেলুম।"

"খুশী হলুম শুনে। একটুখানি বুঝিয়ে দাও কী গুণ আছে আমার।"

"লোভ নেই আপনার একটুও।"

"এত বড়ো নিন্দের কথা! লোভের মতো জিনিসকে লোভ করি নে?— খুবই করি—"

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে তাঁর দুই গালে দুই চুমো দিয়ে সোহিনী সরে গেল।

"কোন্ খাতায় জমা হল এটা সোহিনী।"

"আপনার কাছে যে ঋণ পেয়েছি সে তো শোধ করতে পারি নে, তারই সুদ দিচ্ছি।"

"প্রথম দিন পেয়েছি একটি, আজ পেলুম দুটি। কেবলই বেড়ে চলবে নাকি।"

"বাড়বে বই কি, চক্রবৃদ্ধির নিয়মে।"

৮

চৌধুরী বললেন, "সোহিনী, তোমার স্বামীর শ্রাদ্ধে শেষকালে আমাকে পুরুত বানিয়ে দিলে? সর্বনাশ, এ কি কম দায়িত্ব। যার অস্তিত্ব হাতড়িয়ে পাওয়া যায় না তাকে খুশী করা! এ তো বাঁধাদস্তুরের দানদক্ষিনে নয় যে—"

"আপনিও তো বাঁধাদস্তুরের গুরুঠাকুর নন, আপনি যা করবেন সেটাই হবে পদ্ধতি। দানের ব্যবস্থা তৈরি করে রেখেছেন তো?"

"কদিন ধরে ঐ কাজই করেছি, দোকানবাজার কম ঘুরি নি। দানসামগ্রী সাজানো হয়ে গেছে নীচের বড়ো ঘরটাতে। ইহলোকস্থিত আত্মা যারা এগুলো আত্মসাৎ করবে তারা পেট ভরে খুশী হবে, সন্দেহ নেই।"

চৌধুরীর সঙ্গে নীচে গিয়ে সোহিনী দেখলে, সায়ান্স-পড়ুয়া ছেলেদের জন্যে নানা যন্ত্র, নানা মডেল, নানা দামী বই, নানা মাইক্রোস্‌কোপের স্লাইড্‌স্‌, নানা বায়োলজির নমুনা। প্রত্যেক সামগ্রীর সঙ্গে নাম ও ঠিকানা-লেখা কার্ড। আড়াইশো ছেলের জন্যে চেক লেখা হয়েছে এক বৎসরের বৃত্তির। খরচের জন্যে কিছুমাত্র সংকোচ করা হয় নি। বড়ো বড়ো ধনীদের শ্রাদ্ধে যে ব্রাহ্মণবিদায় হয় তার চেয়ে এর ব্যয়ের প্রসর অনেক বেশি, অথচ বিশেষ করে চোখে পড়ে না এর সমারোহ।

"পুরুতবিদায়ের কী দক্ষিণা দিতে হবে, সেটা তো আপনি ধরে দেন নি।"

"আমার দক্ষিণা তোমার খুশি।"

"খুশির সঙ্গে সঙ্গে আপনার জন্যে রেখেছি এই ক্রনোমিটর। জর্মনি থেকে আমার স্বামী এটা কিনেছিলেন, বরাবর তাঁর রিসর্চের কাজে লেগেছিল।"

চৌধুরী বললেন, "যা মনে আসছে তার ভাষা নেই। বাজে কথা বলতে চাই নে, আমার পুরুতের কাজ সার্থক হল।"

"আর-একটি লোক আছে, আজ তাকে ভুলতে পারি নে— সে আমাদের মানিকের বিধবা বউ।"

"মানিক বলতে কাকে বোঝায়।"

"সে ছিল ওঁর ল্যাবরেটরির হেড মিস্ত্রি। আশ্চর্য তার হাত ছিল। অত্যন্ত সূক্ষ্ম কাজে এক চুল তার নড়চড়্‌ হত না, কলকব্‌জার তত্ত্ব-বুঝে নিতে তার বুদ্ধি ছিল অভ্রান্ত। তাকে উনি অতিনিকট বন্ধুর মতো দেখতেন। গাড়ি করে নিয়ে যেতেন

বড়ো বড়ো কারখানায় কাজ দেখাতে। এদিকে সে ছিল মাতাল, ওঁর অ্যাসিস্টেন্টরা তাকে ছোটোলোক ব'লে অবজ্ঞা করত। উনি বলতেন, ও যে গুণী, তার সে গুণ বানিয়ে তোলা যায় না, সে গুণ খুঁজে মিলবে না। ওঁর কাছে তার সম্মান পুরোমাত্রায় ছিল। এর থেকে বুঝবেন কেন যে উনি আমাকে শেষ পর্যন্ত এত মান দিয়েছিলেন। আমার মধ্যে যে মূল্য তিনি দেখেছিলেন তার তুলনায় দোষের ওজন ওঁর কাছে ছিল খুব সামান্য। যে জায়গায় আমার মতো কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়েকে তিনি অসম্ভব রকম বিশ্বাস করেছিলেন, সে জায়গায় সে বিশ্বাস আমি কোনোদিন একটুমাত্র নষ্ট করি নি। আজও মনপ্রাণ দিয়ে রক্ষা করছি। এতটা তিনি আর-কারও কাছে পেতেন না। যেখানে আমি ছিলেম ছোটো সেখানে আমি তাঁর চোখে পড়ি নি, যেখানে আমি ছিলুম বড়ো সেখানে তিনি আমাকে পুরো সম্মান দিয়েছেন। আমার মূল্য যদি তাঁর চোখে না পড়ত তা হলে আমি কোথায় তলিয়ে যেতুম বলুন তো। আমি খুব খারাপ, কিন্তু আমি নিজেই বলছি আমি খুব ভালো, নইলে তিনি আমাকে কখনও সহ্য করতে পারতেন না।"

"দেখো সোহিনী, আমি অহংকার করে বলব যে আমি প্রথম থেকেই জেনেছি তুমি খুব ভালো। সস্তা দরের ভালো হলে কলঙ্ক লাগলে দাগ উঠত না।"

"যাক গে, আমাকে আর যে লোক যা মনে করুক না, তিনি আমাকে যা মান দিয়েছেন সে আজ পর্যন্ত টিঁকে আছে, আমার শেষ দিন পর্যন্ত থাকবে।"

"দেখো সোহিনী, তোমাকে যত দেখছি ততই জানছি, তুমি সে জাতের সহজ মেয়েমানুষ নও যারা স্বামী নামটা শুনলেই গ'লে পড়ে।"

"না, তা নই; আমি দেখেছি ওঁর মধ্যে শক্তি, প্রথম দিন থেকে জেনেছি উনি মানুষ, আমি শাস্ত্র মিলিয়ে পতিব্রতাগিরি করতে বসি নি। আমি জাঁক করেই বলছি, আমার মধ্যে যে রত্ন আছে সে একা ওঁরই কণ্ঠহারে দোলবার মতো, আর কারও নয়।"

এমন সময় নীলা ঘরে এসে ঢুকে পড়ল। বললে, "অধ্যাপকমশায়, কিছু মনে করবেন না, মায়ের সঙ্গে কিছু কথা আছে।"

"কিছু না মা, আমি এখন যাচ্ছি ল্যাবরেটরিতে। রেবতী কী রকম কাজ করছে দেখে আসি গে।"

নীলা বললে, "কোনো ভয় নেই। কাজ ভালোই চলছে। আমি এক-একদিন জানালার বাইরে থেকে দেখেছি, উনি মাথা গুঁজে লিখছেন, নোট নিচ্ছেন, কলম কামড়ে ধরে ভাবছেন। আমার প্রবেশ নিষেধ, পাছে সার আইজাকের গ্রাভিটেশন

যায় ন'ড়ে। সেদিন মা কাকে বলছিলেন উনি ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্‌ নিয়ে কাজ করছেন, তাই পাশ দিয়ে কেউ গেলেই কাঁটা নড়ে যায়, বিশেষত মেয়েরা।"

চৌধুরী হো হো করে হেসে উঠলেন, বললেন, "মা, ল্যাবরেটরি ভিতরেই আছে, ম্যাগ্‌নেটিজম্‌ নিয়ে কাজ চলছেই, কাঁটা যাঁরা নড়িয়ে দেন তাঁদের ভয় করতেই হয়। দিগ্‌ভ্রম ঘটায় যে। তবে চললুম।"

নীলা মাকে বললে, "আমাকে আর কতদিন তোমার আঁচলের গাঁঠ দিয়ে বেঁধে রাখবে। পেরে উঠবে না, কেবল দুঃখ পাবে।"

"তুই কী করতে চাস বল্‌।"

নীলা বললে, "তুমি তো জানই মেয়েদের জন্যে একটা হাইয়র স্টাডি মুভমেণ্ট খোলা হয়েছে, তুমি তাতে অনেক টাকা দিয়েছ। সেখানে আমাকে কেন কাজে লাগাও না।"

"আমার ভয় আছে পাছে তুই ঠিকমতো না চলিস।"

"সব চলাই বন্ধ করে দেওয়াই কি ঠিক চলার রাস্তা।"

"তা নয়, তা তো জানি, সেই তো আমার ভাবনা।"

"তুমি না ভেবে একবার আমাকে ভাবতে দাও-না। সে তো দিতেই হবে। আমি তো এখন খুকি নই। তুমি ভাবছ সেই-সব পাব্লিক জায়গায় নানা লোকের যাওয়া-আসা আছে, সে একটা বিপদ। জগৎসংসারে লোকচলাচল তো বন্ধ হবে না তোমার খাতিরে। আর তাদের সঙ্গে আমার জানাশুনো একেবারেই ঠেকিয়ে রাখবে যে সে আইন তো তোমার হাতে নেই।"

"জানি সব জানি, ভয় করে ভয়ের কারণ ঠেকিয়ে রাখতে পারব না। তা হলে তুই ওদের হাইয়র স্টাডি সার্কলে ভরতি হতে চাস?"

"হাঁ চাই।"

"আচ্ছা তাই হবে। সেখানকার পুরুষ অধ্যাপকদের একে একে দিবি জাহান্নমে সে জানি। কেবল একটি কথা দিতে হবে আমাকে। কোনোমতেই তুই রেবতীর কাছে ঘেঁষতে পাবি নে। আর কোনো ছুতোতেই ঢুকবি নে তার ল্যাবরেটরিতে।"

"মা, তুমি আমাকে কী মনে কর ভেবে পাই নে। কাছে ঘেঁষতে যাব তোমার ঐ খুদে সার আইজাক নিউটনের, এমন রুচি আমার?—মরে গেলেও না।"

সংকোচ বোধ করলে রেবতী শরীরটাকে নিয়ে যে রকম আঁকুবাঁকু করে তারই নকল ক'রে নীলা বললে, "ঐ স্টাইলের পুরুষকে নিয়ে আমার চলবে না। যে-সব মেয়েরা ভালোবাসে বুড়ো খোকাদের মানুষ করতে, ওকে জিইয়ে রেখে দেওয়া ভালো

তাদেরই জন্যে। ও মারবার যোগ্য শিকারই নয়।"

"একটু বেশি বাড়িয়ে কথা বলছিস নীলা, তাই ভয় হচ্ছে ওটা ঠিক তোর মনের কথা নয়। তা হোক, ওর সম্বন্ধে তোর মনের ভাব যাই হোক, ওকে যদি মাটি করতে চাস তা হলে সে তোর পক্ষে ভালো হবে না।"

"কখন তোমার কী মর্জি কিছুই বুঝতে পারি নে মা। ওর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবার জন্যে তুমি আমাকে সাজিয়ে পুতুল গড়ে তুলেছিলে, সে কি আমি বুঝতে পারি নি। সেইজন্যেই কি তুমি আমাকে ওর বেশি কাছে আনাগোনা করতে বারণ করছ, পাছে, চেনাশোনার ঘেঁষ লেগে পালিশ নষ্ট হয়ে যায়।"

"দেখ্ নীলা, আমি তোকে ব'লে দিচ্ছি তোর সঙ্গে ওর বিয়ে কিছুতেই হতে পারবে না।"

"তা হলে আমি যদি মোতিগড়ের রাজকুমারকে বিয়ে করি?"

"ইচ্ছা হয় তো করিস।"

"সুবিধে আছে, তার তিনটে বিয়ে, আমার দায় অনেকটা হালকা হবে, আর সে মদ খেয়ে ঢলাঢলি করে নাইটক্লাবে— তখন আমি অনেকটা ছুটি পাব।"

"আচ্ছা বেশ, সেই ভালো। রেবতীর সঙ্গে তোর বিয়ে হতে দেব না।"

"কেন, তোমার সার আইজাক নিউটনের বুদ্ধি আমি ঘুলিয়ে দেব মনে কর?"

"সে তর্ক থাক্, যা বললুম তা মনে রাখিস।"

"উনি নিজেই যদি হ্যাংলাপনা করেন।"

"তা হলে এ পাড়া তাকে ছাড়তে হবে— তোর অন্নে তাকে মানুষ করিস, তোর বাপের তহবিল থেকে এক কড়িও সে পাবে না।"

"সর্বনাশ। তা হলে নমস্কার সার আইজাক নিউটন।"

সেদিনকার পালা সংক্ষেপে এই পর্যন্ত।

৯

"চৌধুরীমশায়, আর সবই চলছে ভালো কেবল আমার মেয়ের ভাবনায় সুস্থির হতে পারছি নে। ও যে কোন্ দিকে তাক করতে শুরু করেছে বুঝতে পারছি নে।"

চৌধুরী বললেন, "আবার ওর দিকে তাক করছে কারা সেটাও একটা ভাববার কথা। হয়েছে কি, এরই মধ্যে রটে গেছে ল্যাবরেটরি রক্ষার জন্যে তোমার স্বামী অগাধ টাকা রেখে গেছে। মুখে মুখে তার অঙ্কটা বেড়েই চলেছে। এখন রাজত্ব আর রাজকন্যা নিয়ে বাজারে একটা জুয়োখেলার সৃষ্টি হয়েছে।"

"রাজকন্যাটি মাটির দরে বিকোবে তা জানি, কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে রাজত্ব সস্তায় বিকোবে না।"

"কিন্তু লোকের আমদানি শুরু হয়েছে। সেদিন হঠাৎ দেখি, আমাদেরই অধ্যাপক মজুমদার ওরই হাত ধরে বেরিয়ে এল সিনেমা থেকে। আমাকে দেখেই ঘাড় বেঁকিয়ে নিল। ছেলেটা ভালো ভালো বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ায়, দেশের মঙ্গলের দিকে ওর বুলি খুব সহজে খেলে। কিন্তু সেদিন ওর বাঁকা ঘাড় দেখে স্বদেশের জন্যে ভাবনা হল।"

"চৌধুরীমশায়, আগল ভেঙেছে।"

"ভেঙেছে বই কি। এখন এই গরিবকেই নিজের ঘটিবাটি সামলাতে হবে।"

"মজুমদার-পাড়ায় মড়ক লাগে লাগুক, আমার ভয় রেবতীকে নিয়ে।"

চৌধুরী বললেন, "আপাতত ভয় নেই। খুব ডুবে আছে। কাজ করছে খুব চমৎকার।"

"চৌধুরীমশায়, ওর বিপদ হচ্ছে সায়ান্সে ও যত বড়ো ওস্তাদই হোক, তুমি যাকে মেট্রিয়ার্কি বল সে রাজ্যের ও ঘোর আনাড়ি।"

"সে কথা ঠিক। ওর একবারও টিকে দেওয়া হয় নি। ছোঁয়াচ লাগলে বাঁচানো শক্ত হবে।"

"রোজ একবার কিন্তু ওকে আপনাকে দেখে যেতে হবে।"

"কোথা থেকে ও আবার ছোঁয়াচ না নিয়ে আসে। শেষকালে এ বয়সে আমি না মরি। ভয় কোরো না, মেয়েমানুষ যদিও, তবুও আশা করি ঠাট্টা বুঝতে পার। আমি পার হয়ে গেছি এপিডেমিকের পাড়াটা। এখন ছোঁওয়া লাগলেও ছোঁয়াচ লাগে না। কিন্তু একটা মুশকিল ঘটেছে। পরশু আমাকে যেতে হবে গুজরানওয়ালায়।"

"এটাও ঠাট্টা নাকি। মেয়েমানুষকে দয়া করবেন।"

"ঠাট্টা নয়, আমার সতীর্থ অমূল্য আড্ডি ছিলেন সেখানকার ডাক্তার। বিশপঁচিশ বছর প্র্যাকটিস করেছেন। কিছু বিষয়সম্পত্তিও জমিয়েছেন। হঠাৎ বিধবা স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে রেখে মরেছেন হার্টফেল করে। দেনাপাওনা চুকিয়ে জমিজমা বেচে তাদের উদ্ধার করে আনতে হবে আমাকে। কতদিন লাগবে ঠিক জানি নে।"

"এর উপরে আর কথা নেই।"

"এ সংসারে কথা কিছুরই উপরে নেই সোহিনী। নির্ভয়ে বলো, যা হবেই তা হোক। যারা অদৃষ্ট মানে তারা ভুল করে না। আমরা সায়ান্টিস্টরাও বলি অনিবার্যের এক চুল এদিক-ওদিক হবার জো নেই। যতক্ষণ কিছু করবার থাকে করো, যখন কোনোমতেই পারবে না, বোলো বাস্।"

"আচ্ছা তাই ভালো।"

"যে মজুমদারটির কথা বললুম, দলের মধ্যে সে তত বেশি মারাত্মক নয়। তাকে ওরা দলে টেনে রাখে মান বাঁচাবার জন্যে। আর-যাদের কথা শুনেছি, চাণক্যের মতে তাদের কাছ থেকে শত হস্ত দূরে থাকলেও ভাবনার কারণ থেকে যায়। অ্যাটর্নি আছে বঙ্কুবিহারি, তাকে আশ্রয় করা আর অক্টোপসকে জড়িয়ে ধরা একই কথা। ধনী বিধবার তপ্ত রক্ত এই-সব লোক পছন্দ করে। খবরটা শুনে রাখো, যদি কিছু করবার থাকে কোরো। সবশেষে আমার ফিলজফিটা মনে রেখো।"

"দেখুন চৌধুরীমশায়, রেখে দিন ফিলজফি। মানব না আপনার অদৃষ্ট, মানব না আপনার কার্যকারণের অমোঘ বিধান, যদি আমার ল্যাবরেটরির 'পরে কারও হাত পড়ে। আমি পাঞ্জাবের মেয়ে, আমার হাতে ছুরি খেলে সহজে। আমি খুন করতে পারি তা সে আমার নিজের মেয়ে হোক, আমার জামাইপদের উমেদার হোক।"

ওর শাড়ির নীচে ছিল কোমরবন্ধ লুকোনো। তার থেকে ধাঁ করে এক ছুরি বের করে আলোয় ঝলক খেলিয়ে দিয়ে গেল। বললে, "তিনি আমাকে বেছে নিয়েছিলেন— আমি বাঙালির মেয়ে নই, ভালোবাসা নিয়ে কেবল চোখের জল ফেলে কান্নাকাটি করি নে। ভালোবাসার জন্যে প্রাণ দিতে পারি, প্রাণ নিতে পারি। আমার ল্যাবরেটরি আর আমার বুকের কলিজা, তার মাঝখানে রয়েছে এই ছুরি।"

চৌধুরী বললেন, "একসময়ে কবিতা লিখতে পারতুম, আজ আবার মনে হচ্ছে হয়তো পারি লিখতে।"

"কবিতা লিখতে হয় লিখবেন, কিন্তু আপনার ফিলজফি ফিরিয়ে নিন। যা না মানবার তাকে আমি শেষ পর্যন্ত মানব না। একলা দাঁড়িয়ে লড়ব। আর বুক ফুলিয়ে বলব, জিতবই, জিতবই, জিতবই।"

"ব্র্যাভো, আমি ফিরিয়ে নিলুম আমার ফিলজফিটা। এখন থেকে লাগাব ঢাকে চাঁটি তোমার জয়যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে। আপাতত কিছুদিনের জন্যে বিদায় নিচ্ছি, ফিরতে দেরি হবে না।"

আশ্চর্যের কথা এই সোহিনীর চোখে জল ভরে এল। বললে, "কিছু মনে করবেন না।" জড়িয়ে ধরলে চৌধুরীর গলা। বললে, "সংসারে কোনো বন্ধনই টেঁকে না, এও মুহূর্তকালের জন্যে।"

ব'লেই গলা ছেড়ে দিয়ে পায়ের কাছে প'ড়ে সোহিনী অধ্যাপককে প্রণাম করলে।

১০

খবরের কাগজে যাকে বলে পরিস্থিতি সেটা হঠাৎ এসে পড়ে, আর আসে দল বেঁধে। জীবনের কাহিনী সুখে দুঃখে বিলম্বিত হয়ে চলে। শেষ অধ্যায়ে কোলিশন লাগে অকস্মাৎ, ভেঙেচুরে স্তব্ধ হয়ে যায়। বিধাতা তাঁর গল্প গড়েন ধীরে ধীরে, গল্প ভাঙেন এক ঘায়ে।

সোহিনীর আইমা থাকেন আম্বালায়। সোহিনী তার কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেয়েছে, 'যদি দেখা করতে চাও শীঘ্র এসো'।

এই আইমা তার একমাত্র আত্মীয় যে বেঁচে আছে। এরই হাত থেকে নন্দকিশোর কিনে নিয়েছিলেন সোহিনীকে।

নীলাকে তার মা বললে, "তুমিও আমার সঙ্গে এসো।"

নীলা বললে, "সে তো কিছুতেই হতে পারে না।"

"কেন পারে না।"

"ওরা আমাকে অভিনন্দন দেবে তারই আয়োজন চলছে।"

"ওরা কারা।"

"জাগানী ক্লাবের মেম্বররা। ভয় পেয়ো না, খুব ভদ্র ক্লাব। মেম্বরদের নামের ফর্দ দেখলেই বুঝতে পারবে। খুবই বাছাই করা।"

"তোমাদের উদ্দেশ্য কী।"

"স্পষ্ট বলা শক্ত। উদ্দেশ্যটা নামের মধ্যেই আছে। এই নামের তলায় আধ্যাত্মিক সাহিত্যিক আর্টিষ্টিক সব মানেই খুব গভীরভাবে লুকোনো আছে। নবকুমারবাবু খুব চমৎকার ব্যাখ্যা করে দিয়েছিলেন। ওরা ঠিক করেছে তোমার কাছ থেকে চাঁদা নিতে আসবে।"

"কিন্তু চাঁদা দেখছি ওরা নিয়ে শেষ করেছে। তুমি ষোলো আনাই পড়েছ ওর হাতে। কিন্তু এই পর্যন্তই। আমার যেটা ত্যাজ্য সেটাই ওরা পেয়েছে। আমার কাছ থেকে আর কিছু পাবার নেই।"

"মা, এত রাগ করছ কেন। ওঁরা নিঃস্বার্থভাবে দেশের উপকার করতে চান।"

"আচ্ছা সে আলোচনা থাক্। এতক্ষণে তুমি বোধ হয় তোমার বন্ধুদের কাছ থেকে খবর পেয়েছ যে তুমি স্বাধীন।"

"হাঁ পেয়েছি।"

"নিঃস্বার্থরা তোমাকে জানিয়েছেন যে তোমার স্বামীর দত্ত অংশে তোমার যে

টাকা আছে সে তুমি যেমন খুশি ব্যবহার করতে পার।"

"হাঁ জেনেছি।"

"আমার কানে এসেছে উইলের প্রোবেট নেবার জন্তে তোমরা প্রস্তুত হচ্ছ। কথাটা বোধ হয় সত্যি ?"

"হা সত্যি। বঙ্কুবাবু আমার সোলিসিটর।"

"তিনি তোমাকে আরও কিছু আশা এবং মন্ত্রণা দিয়েছেন।"

নীলা চুপ করে রইল।

"তোমার বঙ্কুবাবুকে আমি সিধে করে দেব যদি আমার সীমানায় তিনি পা বাড়ান। আইনে না পারি বে-আইনে। ফেরবার সময় আমি পেশোয়ার হয়ে আসব। আমার ল্যাবরেটরি রইল দিনরাত্রি চারজন শিখ সিপাইয়ের পাহারায়। আর যাবার সময় এই তোমাকে দেখিয়ে যাচ্ছি— আমি পাঞ্জাবের মেয়ে।"

ব'লে নিজের কোমরবন্ধ থেকে ছুরি বের করে বললে, "এ ছুরি না চেনে আমার মেয়েকে, না চেনে আমার মেয়ের সোলিসিটরকে। এর স্মৃতি রইল তোমার জিম্মায়। ফিরে এসে যদি হিসেব নেবার সময় হয় তো হিসেব নেব।"

১১

ল্যাবরেটরির চার দিকে অনেকখানি জমি ফাঁকা আছে। কাঁপন বা শব্দ যাতে যথাসম্ভব কাজের মাঝখানে না পৌঁছয়। এই নিস্তব্ধতা কাজের অভিনিবেশে রেবতীকে সহায়তা করে। তাই ও প্রায়ই এখানে রাত্রে কাজ করতে আসে।

নীচের ঘড়িতে দুটো বাজল। মুহূর্তের জন্য রেবতী তার চিন্তার বিষয় ভাবছিল জানালার বাইরে আকাশের দিকে চোখ মেলে।

এমন সময়ে দেওয়ালে পড়ল ছায়া। চেয়ে দেখে ঘরের মধ্যে এসেছে নীলা। রাত-কাপড় পরা, পাতলা সিল্কের শেমিজ। ও চমকে চৌকি থেকে উঠে পড়তে যাচ্ছিল। নীলা এসে ওর কোলের উপর বসে গলা জড়িয়ে ধরল। রেবতীর সমস্ত শরীর থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল, বুক উঠতে পড়তে লাগল প্রবলবেগে। গদগদ কণ্ঠে বলতে লাগল, "তুমি যাও, এ ঘর থেকে তুমি যাও।"

ও বললে, "কেন।"

রেবতী বললে, "আমি সহ্য করতে পারছি নে। কেন এলে তুমি এ ঘরে।"

নীলা ওকে আরও দৃঢ়বলে চেপে ধরে বললে, "কেন, আমাকে কি তুমি ভালোবাস না।"

রেবতী বললে, "বাসি, বাসি বাসি। কিন্তু এ ঘর থেকে তুমি যাও।"

হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল পাঞ্জাবী প্রহরী; ভর্ৎসনার কণ্ঠে বললে, "মায়িজি, বহুত শরমকি বাৎ হেয়, আপ বাহার চলা যাইয়ে।"

রেবতী চেতনমনের অগোচরে ইলেকট্রিক ডাকঘড়িতে কখন্ চাপ দিয়েছিল।

পাঞ্জাবী রেবতীকে বললে, "বাবুজি, বেইমানি মৎ করো।"

রেবতী নীলাকে জোর করে ঠেলে দিয়ে চৌকি থেকে উঠে পড়ল। দরোয়ান ফের নীলাকে বললে, "আপ বাহার চলা যাইয়ে, নহি তো মনিবকো হুকুম তামিল করে গা।"

অর্থাৎ জোর করে অপমান করে বের করে দেবে। বাইরে যেতে যেতে নীলা বললে, "শুনছেন সার আইজাক নিউটন?—কাল আমাদের বাড়িতে আপনার চায়ের নেমন্তন্ন, ঠিক চারটে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের সময়। শুনতে পাচ্ছেন না? অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন?" ব'লে একবার তার দিকে ফিরে দাঁড়ালে।

বাষ্পার্দ্র কণ্ঠে উত্তর এল, "শুনেছি।"

রাত-কাপড়ের ভিতর থেকে নীলার নিখুঁত দেহের গঠন ভাস্করের মূর্তির মতো অপরূপ হয়ে ফুটে উঠল, রেবতী মুগ্ধ চোখে না দেখে থাকতে পারল না। নীলা চলে গেল। রেবতী টেবিলের উপর মুখ রেখে পড়ে রইল। এমন আশ্চর্য সৌন্দর্য সে কল্পনা করতে পারে না। একটা কোন বৈদ্যুত বর্ষণ প্রবেশ করেছে ওর শিরার মধ্যে, চকিত হয়ে বেড়াচ্ছে অগ্নিধারায়। হাতের মুঠো শক্ত করে রেবতী কেবলই নিজেকে বলাতে লাগল, কাল চায়ের নিমন্ত্রণে যাবে না। খুব শক্ত শপথ করবার চেষ্টা করতে চায়, মুখ দিয়ে বেরয় না। ব্লটিঙের উপর লিখল, যাব না, যাব না, যাব না। হঠাৎ দেখলে তার টেবিলে একটা ঘন লাল রঙের রুমাল পড়ে আছে, কোণে নাম সেলাই করা 'নীলা'। মুখের উপর চেপে ধরল রুমাল, গন্ধে মগজ উঠল ভরে, একটা নেশা সির্ সির্ করে ছড়িয়ে গেল সর্বাঙ্গে।

নীলা আবার ঘরের মধ্যে এল। বললে, "একটা কাজ আছে ভুলে গিয়েছিলুম।"

দরোয়ান রুখতে গেল। নীলা বললে, "ভয় নেই তোমার, চুরি করতে আসি নি। একটা কেবল সই চাই। জাগানী ক্লাবের প্রেসিডেন্ট করব তোমাকে— তোমার নাম আছে দেশ জুড়ে।"

অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে রেবতী বললে, "ও ক্লাবের আমি তো কিছুই জানি নে।"

"কিছুই তো জানবার দরকার নেই। এইটুকু জানলেই হবে ব্রজেন্দ্রবাবু এই ক্লাবের পেট্রন।"

"আমি তো ব্রজেন্দ্রবাবুকে জানি নে।"

"এইটুকু জানলেই হবে, মেট্রপলিটান ব্যাঙ্কের তিনি ডাইরেক্টর। লক্ষ্মী আমার, জাদু আমার, একটা সই বই তো নয়।" ব'লে ডান হাত দিয়ে তার কাঁধ ঘিরে তার হাতটা ধরে বললে, "সই করো।"

সে স্বপ্নাবিষ্টের মতো সই করে দিলে।

কাগজটা নিয়ে নীলা যখন মুড়ছে দরোয়ান বললে, "এ কাগজ আমাকে দেখতে হবে।"

নীলা বললে, "এ তো তুমি বুঝতে পারবে না।"

দরোয়ান বললে, "দরকার নেই বোঝবার।" বলে কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললে। বললে, "দলিল বানাতে হয় বাইরে গিয়ে বানিয়ো। এখানে নয়।"

রেবতী মনে মনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। দরোয়ান নীলাকে বললে, "মাজি, এখন চলো তোমাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি গে।" ব'লে তাকে নিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে আবার ঘরে ঢুকল পাঞ্জাবী। বললে, "চার দিকে আমি দরজা বন্ধ করে রাখি, তুমি ওকে ভিতর থেকে খুলে দিয়েছ।"

এ কী সন্দেহ, কী অপমান। বারবার করে বললে, "আমি খুলি নি।"

"তবে ও কী করে ঘরে এল।"

সেও তো বটে। বিজ্ঞানী তখন সন্ধান করে বেড়াতে লাগল ঘরে ঘরে। অবশেষে দেখলে রাস্তার ধারের একটা বড়ো জানলা ভিতর থেকে আগল দেওয়া ছিল, কে সেই আগলটা দিনের বেলায় এক সময়ে খুলে রেখে গেছে।

রেবতীর যে ধূর্ত বুদ্ধি আছে এতটা শ্রদ্ধা তার প্রতি দরোয়ানজির ছিল না। বোকা মানুষ, পড়াশুনো করে এই পর্যন্ত তার তাকত। অবশেষে কপাল চাপড়ে বললে, "আওরত! এ শয়তানি বিধিদত্ত।"

যে অল্প-একটু রাত বাকি ছিল রেবতী নিজেকে বারবার করে বলালে, চায়ের নিমন্ত্রণে যাবে না।

কাক ডেকে উঠল। রেবতী চলে গেল বাড়িতে।

১২

পরের দিন সময়ের একটু ব্যতিক্রম হল না। চায়ের সভায় চারটে পঁয়তাল্লিশ মিনিটেই রেবতী গিয়ে হাজির। ভেবেছিল এ সভা নিভৃতে দুজনকে নিয়ে। ফ্যাশনেবল সাজ ওর দখলে নেই। প'রে এসেছে জামা আর ধুতি, ধোবার বাড়ি

থেকে নতুন কাচিয়ে আনা, আর কাঁধে ঝুলছে একটা পাটকরা চাদর। এসে দেখে সভা বসেছে বাগানে। অজানা শৌখিন লোকের ভিড়। দমে গেল ওর সমস্ত মনটা, কোথাও লুকোতে পারলে বাঁচে। একটা কোণ নিয়ে বসবার চেষ্টা করতেই সবাই উঠে পড়ল। বললে, "আসুন ডক্টর ভট্টাচার্য, আপনার আসন এইখানে।"

একটা পিঠ-উঁচু মখমলে-মোড়া চৌকি, মণ্ডলীর ঠিক মাঝখানেই। বুঝতে পারলে সমস্ত জনতার প্রধান লক্ষ্যই ও। নীলা এসে ওর গলায় মালা পরিয়ে দিলে, কপালে দিলে চন্দনের ফোঁটা। ব্রজেন্দ্রবাবু প্রস্তাব করলেন ওকে জাগানী সভার সভাপতি পদে বরণ করা হোক। সমর্থন করলেন বঙ্কুবাবু, চারি দিকে করতালির ধ্বনি উঠল। সাহিত্যিক হরিদাসবাবু ডক্টর ভট্টাচার্যের ইণ্টারন্যাশনাল খ্যাতির কথা ব্যাখ্যা করলেন। বললেন, "রেবতীবাবুর নামের পালে হাওয়া লাগিয়ে আমাদের জাগানি ক্লাবের তরণী খেয়া দেবে পশ্চিম-মহাসমুদ্রের ঘাটে ঘাটে।"

সভার ব্যবস্থাপকেরা রিপোর্টারদের কানে কানে গিয়ে বললে, "উপমাগুলোর কোনোটা যেন রিপোর্ট থেকে বাদ না যায়।"

বক্তারা একে একে উঠে যখন বলতে লাগল 'এতদিন পরে ডক্টর ভট্টাচার্য সায়ান্সের জয়তিলক ভারতমাতার কপালে পরিয়ে দিলেন,' রেবতীর বুকটা ফুলে উঠল— নিজেকে প্রকাশমান দেখলে সভ্যজগতের মধ্যগগনে। জাগানী সভা সম্বন্ধে যে-সমস্ত দাগী রকমের জনশ্রুতি শুনেছিল মনে মনে তার প্রতিবাদ করলে। হরিদাসবাবু যখন বললে, 'রেবতীবাবুর নামের কবচ রক্ষাকবচরূপে এ সভার গলায় আজ ঝোলানো হল, এর থেকে বোঝা যাবে এ সভার উদ্দেশ্য কত মহোচ্চ,' তখন রেবতী নিজের নামের গৌরব ও দায়িত্ব খুব প্রবলরূপে অনুভব করলে। ওর মন থেকে সংকোচের খোলসটা খসে পড়ে গেল। মেয়েরা মুখের থেকে সিগারেট নামিয়ে ঝুঁকে পড়ল ওর চৌকির উপর, মধুর হাস্যে বললে, "বিরক্ত করছি আপনাকে, কিন্তু একটা অটোগ্রাফ দিতেই হবে।"

রেবতীর মনে হল, এতদিন সে যেন একটা স্বপ্নের মধ্যে ছিল, স্বপ্নের গুটি গেছে খুলে, প্রজাপতি বেরিয়ে পড়েছে।

একে একে লোক বিদায় হল। নীলা রেবতীর হাত চেপে ধরে বললে, "আপনি কিন্তু যাবেন না।"

জ্বালাময় মদ ঢেলে দিলে ওর শিরার মধ্যে।

দিনের আলো শেষ হয়ে আসছে, লতাবিতানের মধ্যে সবুজ প্রদোষের অন্ধকার।

বেঞ্চির উপরে দুজনে কাছাকাছি বসল। নিজের হাতের উপরে রেবতীর হাত

তুলে নিয়ে নীলা বললে, "ডক্টর ভট্টাচার্য, আপনি পুরুষমানুষ হয়ে মেয়েদের অত ভয় করেন কেন।"

রেবতী স্পর্ধাভরে বললে, "ভয় করি? কখনও না।"

"আমার মাকে আপনি ভয় করেন না?"

"ভয় কেন করব, শ্রদ্ধা করি।"

"আমাকে?"

"নিশ্চয় ভয় করি।"

"সেটা ভালো খবর। মা বলেছেন, কিছুতে আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন না। তা হলে আমি আত্মহত্যা করব।"

"কোনো বাধা আমি মানব না, আমাদের বিয়ে হবেই হবে।"

কাঁধের উপর মাথা রেখে নীলা বললে, "তুমি হয়তো জান না, তোমাকে কতখানি চাই।"

নীলার মাথাটা আরও বুকের কাছে টেনে নিয়ে রেবতী বললে, "তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে এমন কোনো শক্তি নেই।"

"জাত?"

"ভাসিয়ে দেব জাত।"

"তা হলে রেজিস্ট্রারের কাছে কালই নোটিস দিতে হবে।"

"কালই দেব, নিশ্চয় দেব।"

রেবতী পুরুষের তেজ দেখাতে শুরু করেছে।

পরিণামটা দ্রুতবেগে ঘনিয়ে আসতে লাগল।

আইমার পক্ষাঘাতের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। মৃত্যুর আশঙ্কা আসন্ন। যে পর্যন্ত মৃত্যু না হয় সোহিনীকে তিনি কিছুতে ছাড়বেন না। এই সুযোগটাকে দুহাত দিয়ে আঁকড়িয়ে ধরে নীলার উন্মত্ত যৌবন আলোড়িত হয়ে উঠেছে।

পাণ্ডিত্যের চাপে রেবতীর পৌরুষের স্বাদ ফিকে হয়ে গেছে— তাকে নীলার যথেষ্ট পছন্দ নয়। কিন্তু ওকে বিবাহ করা নিরাপদ, বিবাহোত্তর উচ্ছৃঙ্খলতায় বাধা দেবার জোর তার নেই। শুধু তাই নয়। ল্যাবরেটরির সঙ্গে যে লোভের বিষয় জড়ানো আছে তার পরিমাণ প্রভূত। ওর হিতৈষীরা বলে ল্যাবরেটরির ভার নেবার যোগ্যতর পাত্র কোথাও মিলবে না রেবতীর চেয়ে; সোহিনী কিছুতে ওকে হাতছাড়া করবে না, এই হচ্ছে বুদ্ধিমানদের অনুমান।

এদিকে সহযোগীদের ধিক্কার শিরোধার্য করে রেবতী জাগানী ক্লাবের অধ্যক্ষতার সংবাদ ঘোষণা করতে দিলে সংবাদপত্রে। নীলা যখন বলত, 'ভয় লাগছে বুঝি', ও বলত 'আমি কেয়ার করি নে'। ওর পৌরুষ সম্বন্ধে সংশয়মাত্র না থাকে এই জেদ ওকে পেয়ে বসল। বললে, 'এডিংটনের সঙ্গে চিঠিপত্র আমার চলে, একদিন এই ক্লাবে আমি তাঁকে নিমন্ত্রিত করে আনব', ক্লাবের মেম্বররা বললে 'ধন্য'।

রেবতীর আসল কাজ গেছে বন্ধ হয়ে। ছিন্ন হয়ে গেছে ওর সমস্ত চিন্তাসূত্র। মন কেবলই অপেক্ষা করছে নীলা কখন আসবে, হঠাৎ পিছন থেকে ধরবে ওর চোখ টিপে। চৌকির হাতার উপর বসে বাঁ হাতে ধরবে ওর গলা জড়িয়ে। নিজেকে এই ব'লে আশ্বাস দিচ্ছে, ওর কাজটা যে বাধা পেয়েছে সেটা ক্ষণিক, একটু সুস্থির হলেই ভাঙার মুখে আবার জোড়া লাগবে। সুস্থির হবার লক্ষণ আশু দেখা যাচ্ছে না। ওর কাজের ক্ষতিতে পৃথিবীর কোনো ক্ষতি হচ্ছে নীলার মনের এক কোণেও সে শঙ্কা নেই, সমস্তটাকে সে প্রহসন মনে করে।

দিনের পর দিন জাল কেবলই জড়িয়ে যাচ্ছে। জাগানী সভা ওকে ছেঁকে ধরেছে, ওকে ঘোরতর পুরুষমানুষ বানিয়ে তুলছে। এখনও অকথ্য মুখ থেকে বেরয় না, কিন্তু অশ্রাব্য শুনলে জোর করে হাসতে থাকে। ডক্টর ভট্টাচার্য ওদের খুব একটা মজার জিনিস হয়ে উঠেছে।

মাঝে মাঝে রেবতীকে ঈর্ষায় কামড়িয়ে ধরে। ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টরের মুখের চুরট থেকে নীলা চুরট ধরায়। এর নকল করা রেবতীর অসাধ্য। চুরটের ধোঁয়া গলায় গেলে ওর মাথা ঘুরে পড়ে, কিন্তু এই দৃশ্যটা ওর শরীরমনকে আরও অসুস্থ করে তোলে। তা ছাড়া নানারকমের ঠেলাঠেলি টানাটানি যখন চলতে থাকে, ও আপত্তি না জানিয়ে থাকতে পারে না। নীলা বলে, 'এই দেহটার 'পরে আমাদের তো কোনো মোহ নেই, আমাদের কাছে এর দাম কিসের— আসল দামী জিনিস ভালোবাসা, সেটা কি বিলিয়ে ছড়িয়ে দিতে পারি।' ব'লে চেপে ধরে রেবতীর হাত। রেবতী তখন অন্যদের অভাজন ব'লেই মনে করে, ভাবে ওরা ছোবড়া নিয়েই খুশী, শাঁসটা পেল না।

ল্যাবরেটরির দ্বারের বাইরে দিনরাত পাহারা চলছে, ভিতরে ভাঙা কাজ পড়ে রয়েছে, কারও দেখা নেই।

১৩

ড্রয়িংরুমে সোফায় পা দুটো তুলে কুশনে হেলান দিয়ে নীলা, মেঝের উপরে নীলার পায়ের কাছে ঠেস দিয়ে বসে আছে রেবতী, হাতে রয়েছে লেখন-ভরা ফুলস্ক্যাপ।

রেবতী মাথা নেড়ে বললে, "ভাষায় কেমন যেন বেশি রঙ ফলানো হয়েছে, এতটা বাড়িয়ে-বলা লেখা পড়তে লজ্জা করবে আমার।"

"ভাষার তুমি মস্ত সমজদার কিনা। এ তো কেমিস্ট্রি ফরমুলা নয়, খুঁত খুঁত কোরো না, মুখস্থ করে যাও। জান এটা লিখেছেন আমাদের সাহিত্যিক প্রমদারঞ্জনবাবু?"

"ঐ সব মস্ত মস্ত সেণ্টেন্স আর বড়ো বড়ো শব্দগুলো মুখস্থ করা আমার পক্ষে ভারি শক্ত হবে।"

"ভারি তো শক্ত। তোমার কানের কাছে আউড়ে আউড়ে আমার তো সমস্তটা মুখস্থ হয়ে গেছে— 'আমার জীবনের সর্বোত্তম শুভ মুহূর্তে জাগানী সভা আমাকে যে অমরাবতীর মন্দারমাল্যে সমলংকৃত করিলেন',— গ্র্যাণ্ড! তোমার ভয় নেই আমি তো তোমার কাছেই থাকব, আস্তে আস্তে তোমাকে বলে দেব।"

"আমি বাংলাসাহিত্য ভালো জানি নে কিন্তু আমার কেমন মনে হচ্ছে, সমস্ত লেখাটা যেন আমাকে ঠাট্টা করছে। ইংরেজিতে যদি বলতে দাও কত সহজ হয়। Dear friends, Allow me to offer you my heartiest thanks for the honour you have conferred upon me on behalf of the Jagani Club— the great Awakener ইত্যাদি,— এমন দুটো সেণ্টেন্স বললেই বাস—"

"সে হচ্ছে না, তোমার মুখে বাংলা যে খুব মজার শোনাবে— ঐ যেখানটাতে আছে— 'হে বাংলাদেশের তরুণসম্প্রদায়, হে স্বাতন্ত্র্যসঞ্চালনরথের সারথি, হে ছিন্ন-শৃঙ্খলপরিকীর্ণ পথের অগ্রণীবৃন্দ'— যাই বল ইংরেজিতে এ কি হবার জো আছে। তোমার মতো বিজ্ঞানবিশারদের মুখে শুনলে তরুণ বাংলা সাপের মতো ফণা দুলিয়ে নাচবে। এখনও সময় আছে, আমি পড়িয়ে নিচ্ছি।"

গুরুভার দীর্ঘ দেহকে সিঁড়ির উপর দিয়ে সশব্দে বহন ক'রে সাহেবী পোশাকে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ব্রজেন্দ্র হালদার মচ্‌মচ্‌ শব্দে এসে উপস্থিত। বললে, "নাঃ এ অসহ্য, যখনই আসি নীলাকে দখল করে বসে আছ। কাজ নেই, কর্ম নেই, নীলিকে তফাত করে রেখেছ আমাদের কাছ থেকে কাঁটাগাছের বেড়ার মতো।"

রেবতী সংকুচিত হয়ে বললে, "আজ আমার একটু বিশেষ কাজ আছে তাই—"

"কাজ তো আছে, সেই ভরসাতেই তো এসেছিলুম ; আজ তুমি মেম্বরদের নেমন্তন্ন করেছ, ব্যস্ত থাকবে মনে ক'রে আপিসে যাবার আগে আধ ঘণ্টাটাক সময় করে নিয়ে তাড়াতাড়ি এসেছি। এসেই শুনছি এখানেই উনি পড়েছেন কাজে বাঁধা। আশ্চর্য। কাজ না থাকলে এইখানেই ওঁর ছুটি, আবার কাজ থাকলে এইখানেই ওঁর কাজ। এমন নাছোড়বান্দার সঙ্গে আমরা কেজো লোকেরা পাল্লা দিই কী ক'রে। নীলি, is it fair।"

নীলা বললে, "ডক্টর ভটচাজের দোষ হচ্ছে, উনি আসল কথাটা জোর করে বলতে পারেন না। উনি কাজ আছে বলে এসেছেন, এটা বাজে কথা ; না এসে থাকতে পারেন না বলেই এসেছেন, এটাই একটা শোনবার মতো কথা এবং সত্যি কথা। আমার সমস্ত সময় উনি দখল করেছেন ওঁর জেদের জোরে। এই তো ওঁর পৌরুষ। তোমাদের সবাইকে ঐ বাঙালের কাছে হার মানতে হল।"

"আচ্ছা ভালো, তা হলে আমাদেরও পৌরুষ চালাতে হবে। এখন থেকে জাগানীক্লাব-মেম্বররা নারীহরণের চর্চা শুরু করবে। জেগে উঠবে পৌরাণিক যুগ।"

নীলা বললে, "বেশ মজা লাগছে শুনতে। নারীহরণ, পাণিগ্রহণের চেয়ে ভালো। কিন্তু পদ্ধতিটা কী রকম।"

হালদার বললে, "দেখিয়ে দিতে পারি।"

"এখনই ?"

"হাঁ এখনই।"

বলেই সোফা থেকে নীলাকে আড়কোলা করে তুলে নিলে।

নীলা চীৎকার করে হেসে ওর গলা জড়িয়ে ধরলে।

রেবতীর মুখ অন্ধকার হয়ে উঠল, ওর মুশকিল এই যে অনুকরণ করবার কিংবা বাধা দেবার মতো গায়ের জোর নেই। ওর বেশি করে রাগ হতে লাগল নীলার 'পরে, এই-সব অসভ্য গোঁয়ারদের প্রশ্রয় দেয় কেন।

হালদার বললে, "গাড়ি তৈরি আছে। তোমাকে নিয়ে চললুম ডায়মণ্ডহারবারে। আজ সন্ধের ভোজে ফিরিয়ে এনে দেব। ব্যাঙ্কে কাজ ছিল, সেটা যাক গে চুলোয়। একটা সৎকার্য করা হবে। ডাক্তার ভটচাজকে নির্জনে কাজ করবার সুবিধে করে দিচ্ছি। তোমার মতো অতবড়ো ব্যাঘাতকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়াই ভালো, এজন্যে উনি আমাকে ধন্যবাদ দেবেন।"

রেবতী দেখলে, নীলার ছট্‌ফট্‌ করবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না, নিজেকে সে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টামাত্র করলে না, বেশ যেন আরামে ওর বক্ষ আশ্রয় করে রইল। ওর গলা জড়িয়ে রইল বিশেষ একটা আসক্তভাবে। যেতে যেতে বললে, "ভয় নেই

বিজ্ঞানী সাহেব, এটা নারায়ণের বিহর্গলমাত্র—সঙ্গাপারে যাচ্ছি নে, ফিরে আসব তোমার নেমন্তন্নে।"

রেবতী ছিঁড়ে ফেললে সেই লেখাটা। হালদারের বাহুর জোর এবং অসংকুচিত অধিকার-বিস্তারের তুলনায় নিজের বিদ্যাভিমান ওর কাছে আজ বৃথা হয়ে গেল।

আজ সান্ধ্যভোজ একটা নামজাদা রেস্টোরাঁতে। নিমন্ত্রণকর্তা স্বয়ং রেবতী ভট্টাচার্য, তাঁর সম্মানিতা পার্শ্ববর্তিনী নীলা। সিনেমার বিখ্যাত নটী এসেছে গান গাইতে। টোস্ট প্রোপোজ করতে উঠেছে বঙ্কুবিহারী, গুণগান হচ্ছে রেবতীর আর তার নামের সঙ্গে জড়িয়ে নীলার। মেয়েরা খুব জোরের সঙ্গে সিগারেট টানছে প্রমাণ করতে যে তারা সম্পূর্ণ মেয়ে নয়। প্রৌঢ়া মেয়েরা যৌবনের মুখোশ পরে ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে অট্টহাস্যে উচ্চকণ্ঠে পরস্পর গা-টেপাটিপিতে যুবতীদের ছাড়িয়ে যাবার জন্যে মাতামাতির ঘোড়দৌড় চালিয়েছে।

হঠাৎ ঘরে ঢুকল সোহিনী। স্তব্ধ হয়ে গেল ঘরসুদ্ধ সবাই। রেবতীর দিকে তাকিয়ে সোহিনী বললে, "চিনতে পারছি নে। ডক্টর ভট্টাচার্য বুঝি? খরচের টাকা চেয়ে পাঠিয়েছিলে, পাঠিয়ে দিয়েছি গেল শুক্রবারে; এই তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কিছু অকুলোন হচ্ছে না। এখন একবার উঠতে হচ্ছে, আজ রাত্রেই ল্যাবরেটরির ফর্দ অনুসারে জিনিসপত্র মিলিয়ে দেখব।"

"আপনি আমাকে অবিশ্বাস করছেন?"

"এতদিন অবিশ্বাস তো করি নি। কিন্তু লজ্জাশরম যদি থাকে বিশ্বাসরক্ষার কথা তুমি আর মুখে এনো না।"

রেবতী উঠতে যাচ্ছিল, নীলা তাকে কাপড় ধরে টেনে বসিয়ে দিলে। বললে, "আজ উনি বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেছেন, সকলে যান আগে, তার পরে উনি যাবেন।"

এর মধ্যে একটা নিষ্ঠুর ঠোকর ছিল। সার আইজাক মায়ের বড়ো পেয়ারের, ওর মতো এতবড়ো বিশ্বাসী আর কেউ নেই, তাই সকলকে ছাড়িয়ে ল্যাবরেটরির ভার ওর উপরেই। আরও একটু দেগে দেবার জন্যে বললে, "জান মা? অতিথি আজ পঁয়ষট্টি জন, এ ঘরে সকলকে ধরে নি, এক দল আছে পাশের ঘরে—ঐ শুনছ না হো হো লাগিয়েছে? মাথা পিছু পঁচিশ টাকা ধরে নেয়, মদ না খেলেও মদের দাম ধরে দিতে হয়। খালি গেলাসের জরিমানা কম লাগল না। আর কেউ হলে মুখ চুপসে যেত। ওঁর দরাজ হাত দেখে ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরের তাক লেগে গেছে। সিনেমার গাইয়েকে কত দিতে হয়েছে জান?— তার এক রাত্তিরের পাওনা চারশো টাকা।"

রেবতীর মনের ভিতরটা কাটা কইমাছের মতো ধড়্‌ফড়্‌ করছে; শুকনো মুখে কথাটি নেই।

সোহিনী জিজ্ঞাসা করলে, "আজকের সমারোহটা কিসের জন্যে।"

"তা জান না বুঝি? অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসে তো বেরিয়ে গেছে, উনি জাগানী ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট হয়েছেন, তারই সম্মানে এই ভোজ। লাইফ মেম্বরশিপের ছশো টাকা সুবিধেমতো পরে শুধে দেবেন।"

"সুবিধে বোধ হয় শীঘ্র হবে না।"

রেবতীর মনটার মধ্যে স্টীমরোলার চলাচল করছিল।

সোহিনী তাকে জিজ্ঞাসা করলে, "তা হলে এখন তোমার ওঠবার সুবিধে হবে না।"

রেবতী নীলার মুখের দিকে তাকালে। তার কুটিল কটাক্ষের খোঁচায় পুরুষমানুষের অভিমান জেগে উঠল। বললে, "কেমন করে যাই, নিমন্ত্রিতেরা সব—"

সোহিনী বললে, "আচ্ছা, আমি ততক্ষণ এখানে বসে রইলুম। নাসেরউল্লা, তুমি দরজার কাছে হাজির থাকো।"

নীলা বললে, "সে হতে পারবে না, মা। আমাদের একটা গোপন পরামর্শ আছে, এখানে তোমার থাকা উচিত হবে না।"

"দেখ্‌ নীলা, চাতুরীর পালা তুই সবে শুরু করেছিস, এখনও আমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারবি নে। তোদের কিসের পরামর্শ সে খবর কি আমি পাই নি। বলে দিচ্ছি, তোদের সেই পরামর্শের জন্যে আমারই থাকা সব চেয়ে দরকার।"

নীলা বললে, "তুমি কী শুনেছ, কার কাছে।"

"খবর নেবার ফন্দি থাকে গর্তর সাপের মতো টাকার থলির মধ্যে। এখানে তিনজন আইনওয়ালা মিলে দলিলপত্র ঘেঁটে বের করতে চাও ল্যাবরেটরি ফণ্ডে কোনো ছিদ্র আছে কিনা। তাই নয় কি, নীলু।"

নীলা বললে, "তা সত্যি কথা বলব। বাবার অতখানি টাকায় তাঁর মেয়ের কোনো শেয়ার থাকবে না, এটা অস্বাভাবিক। তাই সবাই সন্দেহ করে—"

সোহিনী চৌকি থেকে উঠে দাঁড়াল। বললে, "আসল সন্দেহের মূল আরও অনেক আগেকার দিনের। কে তোর বাপ, কার সম্পত্তির শেয়ার চাস। এমন লোকের তুই মেয়ে এ কথা মুখে আনতে তোর লজ্জা করে না?"

নীলা লাফিয়ে উঠে বললে, "কী বলছ, মা।"

"সত্যি কথা বলছি। তাঁর কাছে কিছুই গোপন ছিল না, তিনি জানতেন সব। আমার কাছে যা পাবার তা তিনি সম্পূর্ণ পেয়েছেন, আজও পাবেন তা, আর-কিছু

তিনি গ্রাহ্য করেন নি।"

ব্যারিস্টর ঘোষ বললে, "আপনার মুখের কথা তো প্রমাণ নয়।"

"সে কথা তিনি জানতেন। সকল কথা খোলসা করে তিনি দলিল রেজেস্ট্রি করে গেছেন।"

"ওহে বন্ধু, রাত হল যে, আর কেন। চলো।"

পেশোয়ারীর ভঙ্গি দেখে পঁয়ষট্টি জন অন্তর্ধান করলে।

এমন সময় সুটকেস হাতে এসে উপস্থিত চৌধুরী। বললেন, "তোমার টেলিগ্রাম পেয়ে ছুটে আসতে হল। কী রে রেবি, বেবি, মুখখানা যে পার্চমেণ্টের মতো সাদা হয়ে গেছে। ওরে, খোকার দুধের বাটি গেল কোথায়।"

নীলাকে দেখিয়ে সোহিনী বললে, "যিনি জোগাবেন তিনি যে ঐ বসে আছেন।"

"গয়লানীর ব্যাবসা ধরেছ নাকি, মা।"

"গয়লা ধরার ব্যাবসা ধরেছে, ঐ যে বসে আছে শিকারটি।"

"কে, আমাদের রেবি নাকি।"

"এইবার আমার মেয়ে আমার ল্যাবরেটরিকে বাঁচিয়েছে। আমি লোক চিনতে পারি নি; কিন্তু আমার মেয়ে ঠিক বুঝেছিল যে ল্যাবরেটরিতে গোয়ালঘর বসিয়ে দিয়েছিলুম— গোবরের কুণ্ডে আর-একটু হলেই ডুবত সমস্ত জিনিসটা।"

অধ্যাপক বললেন, "মা, তুমি এই জীবটিকে আবিষ্কার করেছ যখন, তখন এই গোষ্ঠবিহারীর ভার তোমাকেই নিতে হবে। ওর আর সবই আছে কেবল বুদ্ধি নেই, তুমি কাছে থাকলে তার অভাবটা টের পাওয়া যাবে না। বোকা পুরুষদের নাকে দড়ি দিয়ে চালিয়ে নিয়ে বেড়ানো সহজ।"

নীলা বললে, "কী গো সার আইজাক নিউটন, রেজেস্ট্রি আপিসে নোটিশ তো দেওয়া হয়েছে, ফিরিয়ে নিতে চাও নাকি।"

বুক ফুলিয়ে রেবতী বললে, "মরে গেলেও না।"

"বিয়েটা হবে তা হলে অশুভ লগ্নে।"

"হবেই, নিশ্চয় হবে।"

সোহিনী বললে, "কিন্তু ল্যাবরেটরি থেকে শত হস্ত দূরে।"

অধ্যাপক বললেন, "মা নীলু, ও বোকা, কিন্তু অক্ষম নয়। ওর নেশাটা কেটে যাক, তার পরে ওর খোরাকের জন্যে বেশি ভাবতে হবে না।"

"সার আইজাক, তা হলে কিন্তু তোমার কাপড়চোপড়গুলো একটু ভদ্র রকমের বানাতে হবে, নইলে তোমার সামনে আমাকে আবার ঘোমটা ধরতে হবে।"

হঠাৎ আর-একটা ছায়া পড়ল দেয়ালে। পিসিমা এসে দাঁড়ালেন। বললেন, "রেবি, চলে আয়।"

সুড়্ সুড়্ করে রেবতী পিসিমার পিছন পিছন চলে গেল, একবার ফিরেও তাকাল না।

আশ্বিন, ১৩৪৭

পরিশিষ্ট

ছোটো গল্প

শেষকথা

সাহিত্যে বড়ো গল্প ব'লে যেসব প্রগল্‌ভ বাণীবাহন দেখা যায় তারা প্রাক্‌ভূতাত্ত্বিক যুগের প্রাণীদের মতো— তাদের প্রাণের পরিমাণ যত দেহের পরিমাণ তার চার গুণ, তাদের লেজটা কলেবরের অত্যুক্তি।

অতিপরিমাণ ঘাসপাতা খেয়ে যাদের পেট মোটা তারা ভারবাহী জীব, স্তূপাকার মালের বস্তা টানা তাদের অদৃষ্টে। বড়ো গল্প সেই জাতের, মাল-বোঝাইওয়ালা। যেসব প্রাণীর খোরাক স্বল্প এবং সারালো, জাঁওর কেটে কেটে তারা প্রলম্বিত করে না ভোজন-ব্যাপার অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে। ছোটো গল্প সেই জাতের; বোঝা বইবার জন্যে সে নয়, একেবারে সে মার লাগায় মর্মে লঘু লম্ফে।

কিন্তু গল্পের ফরমাশ আসছে বড়ো বহরের। অনেকখানি মালকে মানুষ অনেকখানি দাম দিয়ে ঠকতেও রাজি হয়। ওটা তার আদিম দুর্নিবার প্রবৃত্তির দুর্বলতা। এটাই দেখতে পাওয়া যায় আমাদের দেশের বিয়ের ব্যাপারে। ইতরের মনভোলানো অতিপ্রাচুর্য এমনতরো রসাত্মক ক্রিয়াকর্মেও ভদ্রসমাজের বিনা প্রতিবাদে আজও চলে আসছে। আতিশয্যের ঢাকবাজানো পৌত্তলিকতা মানুষের প্রপৈত্রিক সংস্কার।

মানুষের জীবনটা বিপুল একটা বনস্পতির মতো। তার আয়তন তার আকৃতি সুঠাম নয়। দিনে দিনে চলছে তার মধ্যে এলোমেলো ডালপালার পুনরাবৃত্তি। এই স্তূপাকার একঘেয়েমির মধ্যে হঠাৎ একটি ফল ফ'লে ওঠে, সে নিটোল, সে সুডোল, বাইরে তার রঙ রাঙা কিংবা কালো, ভিতরে তার রস তীব্র কিংবা মধুর। সে সংক্ষিপ্ত, সে অনিবার্য, সে দৈবলব্ধ, সে ছোটো গল্প।

একটা দৃষ্টান্ত দেখানো যাক। রাজা এডওআর্ড ভ্রমণে বেরলেন দেশ-দেশান্তরে। মুগ্ধ স্তাবকদের ভিড় চলল সঙ্গে সঙ্গে, খবরের কাগজের প্যারাগ্রাফের ঠোঙাগুলো ঠেসে ভরে ভরে উঠল। এমন সময় যতসব রাজদূত, রাষ্ট্রনায়ক, বণিকসম্রাট, লেখনী-বজ্রপাণি সংবাদপাত্রিকের ঘেঁষাঘেঁষি ভিড়ের মধ্যে একটা কোন্ ছোটো রন্ধ্র দিয়ে রাজার চোখে পড়ল এক অকুলীন আমেরিকানী। শব্দভেদী সমারোহের স্বরবর্ষণ মুহূর্তে হয়ে গেল অবাস্তব, কালো পর্দা পড়ে গেল ইতিহাসের অসংখ্য দীপদীপ্ত রঙ্গমঞ্চের উপর। সমস্ত কিছু বাদ দিয়ে জ্বল্ জ্বল্ করে উঠল ছোটো গল্পটি দুর্লভ দুর্মূল্য। গোলমালের ভিতরে অদৃশ্য আর্টিস্ট ছিলেন আড়ালে, তাকিয়ে ছিলেন ব্যক্তিগত জীবন-সরোবরের গভীর অগোচরে। দেখছিলেন অতলসঞ্চারী অজানা মাছ কখন পড়ে তাঁর

বঁড়শিতে গাঁথা, কখন চমক দিয়ে ওঠে তাঁর ছোটো গল্পটি নানাবর্ণচ্ছটাখচিত লেজ আছড়িয়ে।

পৌরাণিক যুগের একটি ছোটো গল্প মনে পড়ছে— ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আখ্যান। দুঃসাধ্য তাঁর তপস্যা। নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্মচর্যের দুরূহ সাধনায়। অধিরোহণ করছিলেন বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র-যাজ্ঞবল্ক্যের দুর্গম উচ্চতায়। হঠাৎ দেখা দিল সামান্য রমণী, সে শুচি নয়, সাধ্বী নয়, সে বহন করে নি তত্ত্ব বা মন্ত্র বা মুক্তি; এমন কি ইন্দ্রলোক থেকে পাঠানো অপ্সরীও সে নয়। সমস্ত যাগযজ্ঞ ধ্যানধারণা সমস্ত অতীত ভবিষ্যৎ আঁট বেঁধে গেল এক ছোটো গ ।

এই হল ভূমিকা। আমি হচ্ছি সেই মানুষ যার অদৃষ্ট ভীল-রমণীর মতো ঝুড়িতে প্রতিদিন সংগ্রহ করত কাঁচা পাকা বদরী ফল, একদিন হঠাৎ কুড়িয়ে পেয়েছিল গজমুক্তা, একটি ছোটো গল্প।

সাহস করে লিখে ফেলব। কাজটা কঠিন। এতে হয়তো স্বাদ কিছু বা পাওয়া যাবে কিন্তু পেট ভরা ওজনের বস্তু মিলবে না।

প্রথম পর্ব

জীবনের প্রবহমান ঘোলা রঙের হ-য-ব-র-লর মধ্যে হঠাৎ যেখানে গল্পটা আপন রূপ ধ'রে সদ্য দেখা দেয়, তার অনেক পূর্ব থেকেই নায়কনায়িকারা আপন পরিচয়ের সূত্র গেঁথে আসে। গল্পের গোড়ায় প্রাক্‌গাল্পিক ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করতেই হয়। তাতে কিছু সময় নে । আমি যে কে, সে কথাটা পরিষ্কার করে নিই।

কিন্তু নামধাম ভাঁড়াতে হবে। নইলে চেনাশোনার মহলে গল্পের যাথাযথ্যের জবাবদিহি সামলাতে পারব না। একথা সবাই বোঝে না যে ঠিকঠাক সত্য বলবার এক কায়দা, আর তার চেয়েও বেশি সত্য বলবার ভঙ্গী আলাদা।

কী নাম নেব তাই ভাবছি। রোম্যান্টিক নামকরণের দ্বারা গোড়া থেকে গল্পটাকে বসন্তরাগে পঞ্চমস্বরে বাঁধতে চাই নে। নবীনমাধব নামটা বোধ হয় চলনসই। ওর শামলা রঙটা মেজে ফেলে গিল্‌টি লাগালে ওটা হতে পারত নবারুণ সেনগুপ্ত, কিন্তু খাঁটি শোনাত না।

আমি ছিলুম বাংলাদেশের বিপ্লবীদলের একজন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মহাকর্ষশক্তি আমাকে প্রায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল আণ্ডামানের তীরবরাবর। নানা বাঁকা পথে সি. আই. ডি-র ফাঁস এড়িয়ে প্রথমে আফ্‌গানিস্থান, তার পরে জাপান, তার পরে আমেরিকায় গিয়ে পৌঁছেছিলুম জাহাজি গোরার নানা কাজ নিয়ে।

পূর্ববঙ্গীয় দুর্জয় জেদ ছিল মজ্জায়। একদিনও ভুলি নি যে ভারতবর্ষের হাতকড়ায় উখো ঘষতে হবে দিনরাত যতদিন বেঁচে থাকি। কিন্তু এই সমুদ্রপারের কর্মপেশল হাড়মোটা প্রাণঘন দেশে থাকতে থাকতে একটা কথা নিশ্চিত বুঝেছিলুম যে, আমরা যে প্রণালীতে বিপ্লবের পালা শুরু করেছিলুম সে যেন আতশবাজিতে পটকা ছোঁড়ার মতো। তাতে নিজেদের পোড়াকপাল আরও পুড়িয়েছে অনেকবার, কিন্তু ফুটো করতে পারে নি ব্রিটিশ রাজপতাকা। আগুনের উপর পতঙ্গের অন্ধ আসক্তি। যখন সদর্পে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছিলুম, তখন বুঝতে পারি নি সেটাতে ইতিহাসের যজ্ঞানল জ্বালানো হচ্ছে না; জ্বালাচ্ছি নিজেদের খুব ছোটো ছোটো চিতানল।

তার পরে স্বচক্ষে দেখলুম য়ুরোপীয় মহাসমর। কী রকম টাকা ওড়াতে হয় ধুলোর মতো, আর প্রাণ উড়িয়ে দেয় ধোঁয়ার মতো দাবানলের। মরবার জন্যে তৈরি হতে হয় সমস্ত দেশ একজোট হয়ে, মারবার জন্যে তৈরি হতে হয় দীর্ঘকাল বিজ্ঞানের দুরূহ দীক্ষা নিয়ে। এই যুগান্তরসাধিনী সর্বনাশাকে আমাদের খোড়ো ঘরের চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিষ্ঠিত করব কোন্ দুরাশায়! যথোচিত সমারোহে বড়োরকমের আত্মহত্যা করবার আয়োজনও যে ঘরে নেই। ঠিক করলুম, ন্যাশনাল দুর্গের গোড়া পাকা করতে হবে, যত সময়ই লাগুক। বাঁচতে যদি চাই আদিম সৃষ্টির হাত দুখানায় গোটাদশেক নখ নিয়ে আঁচড় মেরে লড়াই করা চলবে না। এ যুগে যন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রের দিতে হবে পাল্লা। হাতাহাতি করার তালঠোকা পালোয়ানি সহজ, বিশ্বকর্মার চেলাগিরি সহজ নয়। পথ দীর্ঘ, সাধনা দুরূহ।

দীক্ষা নিলুম যন্ত্রবিদ্যায়। আমেরিকায় ডেট্রয়েটে ফোর্ডের মোটর-কারখানায় কোনোমতে ভর্তি হলুম। হাত পাকাচ্ছিলুম কিন্তু শিক্ষা এগচ্ছিল ব'লে মনে হয় নি। একদিন কী দুর্বুদ্ধি ঘটল, মনে হল ফোর্ডকে যদি একটুখানি আভাস দিতে যাই যে নিজের স্বার্থসিদ্ধি আমার উদ্দেশ্য নয়, আমি চাই দেশকে বাঁচাতে তা হলে ধনকুবের বুঝি বা খুশি হবে, এমন কি দেবে আমার রাস্তা প্রশস্ত ক'রে। অতি গম্ভীরমুখে ফোর্ড বললে, 'আমার নাম হেনরি ফোর্ড, পুরোনো পাকা ইংরেজি নাম। কিন্তু আমি জানি আমাদের ইংলণ্ডের মামাতো ভাইরা অকেজো, ইন্‌এফীসিয়েণ্ট। তাদের আমি কেজো ক'রে তুলব এই আমার সংকল্প।' অর্থাৎ অকেজো টাকাওয়ালাকে কেজো করবে কেজো টাকাওয়ালা স্বগোত্রের লাইন বাঁচিয়ে, আমরা থাকব চিরকাল কেজোদের হাতে কাদার পিণ্ড। তারা পুতুল বানাবে। এই দুঃখেই গিয়েছিলুম একদিন সোভিয়েটের দলে ভিড়তে। তারা আর যাই করুক কোনো নিরুপায় মানবজাতকে নিয়ে পুতুলনাচের অর্থকরী ব্যাবসা করে না।

কিছুদিন চাকা চালিয়ে শেষকালে বুঝলুম যন্ত্রবিদ্যাশিক্ষার আরও গোড়ায় যেতে হবে। শুরুতে দরকার যন্ত্রনির্মাণের মালমসলা যোগাড় করার বিদ্যে। কৃতকর্মাদের জন্যেই ধরণী দুর্গম পাতালপুরীতে জমা করে রেখেছেন কঠিন খনিজ পিণ্ড। সেইগুলো হস্তগত করে তারাই দিগ্বিজয় করেছে যাঁরা বাহাদুর জাত। আর যাদের চিরকালই অন্তভক্ষ্য ধনুগুর্ণ তাদের জন্যেই বাঁধা বরাদ্দ উপরিস্তরের ফলফসল শাকসব্‌জি; হাড় বেরিয়ে গেল পাঁজরের, পেটে পিঠে গেল এক হয়ে।

লেগে গেলুম খনিজবিদ্যায়। একথা ভুলি নি যে ফোর্ড বলেছেন ইংরেজ জাত অকেজো। তার প্রমাণ আছে ভারতবর্ষে। একদিন ওরা হাত লাগিয়েছিল নীলের চাষে, চায়ের চাষে আর-একদিন। সিভিলিয়ানদল দফতরখানায় 'ল অ্যাণ্ড অর্ডর'-এর জাঁতা চালিয়ে দেশের অস্থিমজ্জা ছাতু করে বানিয়ে তুলেছে বস্তাবন্দী ভালোমানুষি, অতি মোলায়েম। সামান্য কিছু কয়লার আকর ছাড়া ভারতের অন্তর্ভাণ্ডারের সম্পদ উদ্ঘাটিত করতে উপেক্ষা করেছে কিংবা অক্ষমতা দেখিয়েছে। নিংড়েছে বসে বসে পাটের চাষীর রক্ত। জামশেদজি টাটাকে সেলাম করেছি সমুদ্রের ওপার থেকে। ঠিক করেছি আমার কাজ পটকা ছোঁড়া নয়। সিঁধ কাটতে যাব পাতালপুরীর পাষাণ-প্রাচীরে। মায়ের আঁচলধরা খোকাদের দলে মিশে 'মা মা' ধ্বনিতে মন্তর আওড়াব না, আর দেশের যত অভুক্ত অক্ষম রুগ্ন অশিক্ষিত, কাল্পনিক ভয়ে দিনরাত কম্পমান, দরিদ্রকে সহজ ভাষায় দরিদ্র ব'লেই জানব, দরিদ্রনারায়ণ ব'লে একটা বুলি বানিয়ে তাদের বিদ্রূপ করব না। প্রথম বয়সে একবার বচনের পুতুলগড়া খেলা অনেক খেলেছি। কবি-কারিগরদের কুমোরটুলিতে স্বদেশের যে সস্তা রাঙতা-লাগানো প্রতিমা গড়া হয় তার সামনে গদগদ ভাষায় অনেক অশ্রুজল ফেলেছি। লোকে তার খুব একটা চওড়া নাম দিয়েছিল দেশাত্মবোধ। কিন্তু আর নয়। আক্কেলদাঁত উঠেছে। এই জাগ্রত বুদ্ধির দেশে এসে বাস্তবকে বাস্তব ব'লে জেনেই শুকনো চোখে কোমর বেঁধে কাজ করতে শিখেছি। এবার দেশে ফিরে গিয়ে বেরিয়ে পড়বে এই বিজ্ঞানী বাঙাল কোদাল নিয়ে কুড়ুল নিয়ে হাতুড়ি নিয়ে দেশের গুপ্তধনের তল্লাসে। মেয়েলিগলার মিহিসুরের মহাকবি-বিশ্বকবিদের অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠ চেলারা এই অনুষ্ঠানকে তাদের দেশমাতৃকার পুজা বলে চিনতেই পারবে না।

ফোর্ডের কারখানা ছেড়ে তার পর ন' বছর কাটিয়েছি খনিবিদ্যা খনিজবিদ্যা শিখতে। য়ুরোপের নানা কর্মশালায় ফিরেছি, হাতে কলমে কাজ করেছি, দুই-একটা যন্ত্রকৌশল নিজেও বানিয়েছি, উৎসাহ পেয়েছি অধ্যাপকের কাছ থেকে, নিজের উপরে বিশ্বাস হয়েছে, ধিক্কার দিয়েছি ভূতপূর্ব মন্ত্রমুগ্ধ অকৃতার্থ নিজেকে।

আমার ছোটোগল্পের সঙ্গে এইসব মোটা মোটা কথার বিশেষ যোগ নেই। বাদ দিলে চলত, হয়তো বা ভালোই হত। কেবল এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলার দরকার ছিল, সেইটে বলি। যৌবনের গোড়ায় যখন নারীপ্রভাবের ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্‌ রঙিন রশ্মির আন্দোলন তোলে জীবনের আকাশে আঁকাশে, তখন আমি ছিলুম কোমর বেঁধে অন্যমনস্ক। আমি সন্ন্যাসী, আমি কর্মযোগী, এই সমস্ত বাণীর কুলুপ আমার মনে কষে তালা এঁটে রেখেছিল। কন্যাদায়িকেরা যখন আশেপাশে ঘোরাঘুরি করেছে তখন আমি স্পষ্ট করেই বলেছি, কন্যার কুষ্টিতে যদি অকালবৈধব্যযোগ থাকে তবেই যেন তাঁরা আমার কথা চিন্তা করেন।

পাশ্চাত্য মহাদেশে নারীসঙ্গলাভে বাধা দেবার কাঁটার বেড়া নেই। সেখানে দুর্যোগের আশঙ্কা ছিল। আমি যে সুপুরুষ, বঙ্গনারীর মুখের ভাষায় তার কোনো ভাষ্য পাই নি। তাই এ সংবাদটা আমার চেতনার বাইরেই ছিল। বিলেতে গিয়ে প্রথম আবিষ্কার করেছি যে সাধারণের চেয়ে আমার বুদ্ধি বেশি, তেমনি ধরা পড়েছে আমার চেহারা ভালো। আমার দেশের অর্ধাশনশীর্ণ পাঠকের মুখে জল আসবার মতো রসগর্ভ কাহিনীর সূচনা সেখানে মাঝে মাঝে হয়েছিল। সেয়ানারা অবিশ্বাসে চোখ টেপাটিপি করতে পারেন তবু জোর করেই বলব সে কাহিনী মিলনান্ত বা বিয়োগান্তের যবনিকা-পতনে পৌঁছয় নি কেবল আমার জেদবশত। আমার স্বভাবটা কড়া, পাথুরে জমিতে জীবনের সংকল্প ছিল যক্ষের ধনের মতো পোঁতা, সেখানে চোরের সাবল ঠিকরে প'ড়ে ঠন্‌ করে ওঠে। তা ছাড়া আমি জাত-পাড়াগেঁয়ে, সাবেককেলে ভদ্রঘরে আমার জন্ম, মেয়েদের সম্বন্ধে আমার সংকোচ ঘুচতে চায় না।

আমার জর্মন ডিগ্রি উঁচুদরের ছিল। সেটা এখানে সরকারী কাজে বাতিল। তাই সুযোগ ক'রে ছোটোনাগপুরে চন্দ্রবংশীয় এক রাজার দরবারে কাজ নিয়েছি। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর ছেলে দেবিকাপ্রসাদ কিছুদিন কেম্ব্রিজে পড়াশুনো করেছিলেন। দৈবাৎ জুরিকে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা। তাঁকে বুঝিয়েছিলুম আমার প্ল্যান। শুনে উৎসাহিত হয়ে তাঁদের স্টেটে আমাকে লাগিয়ে দিলেন জিয়লজিকাল সর্ভের কাজে খনি-আবিষ্কারের প্রত্যাশায়। এত বড়ো কাজের ভার আনাড়ি সিভিলিয়নকে না দেওয়াতে সেক্রেটেরিয়টের উপরিস্তরে বায়ুমণ্ডল বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। দেবিকাপ্রসাদ শক্ত ধাতের লোক, বুড়ো রাজার মন টল্‌মল্‌ করা সত্ত্বেও টিঁকে গেলুম।

এখানে আসবার আগে মা বললেন, "ভালো কাজ পেয়েছ, এবার বাবা বিয়ে করো।" আমি বললুম, অর্থাৎ ভালো কাজ মাটি করো।

তার পরে বোবা পাথরকে প্রশ্ন করে করে বেড়াচ্ছিলুম পাহাড়ে জঙ্গলে। সে

সময়টাতে পলাশফুলের রাঙা রঙে বনে বনে নেশা লেগে গিয়েছে। শালগাছে অজস্র মঞ্জরী, মৌমাছিদের অনবরত গুঞ্জন। ব্যাবসাদারেরা মৌ সংগ্রহে লেগেছে, কুলের পাতা থেকে জমা করছে তসর-রেশমের গুটি, সাঁওতালরা কুড়চ্ছে পাকা মহুয়া ফল। ঝির্‌ঝির্‌ শব্দে হালকা নাচের ওড়না ঘুরিয়ে চলেছিল একটি ছিপ্‌ছিপে নদী। শুনেছি এখানকার কোনো অধিবাসিনী তার নাম দিয়েছেন তনিকা। তাঁর কথা পরে হবে।

দিনে দিনে বুঝতে পারছি এ জায়গাটা ঝিমিয়ে-পড়া ঝাপসা চেতনার দেশ, এখানে একলা মনের সন্ধান পেলে প্রকৃতি মায়াবিনী তাকে নিয়ে রঙরেজিনীর কাজ করে, যেমন করে সে অস্তসূর্যের উত্তরীয়ে।

মনটাতে একটু আবেশের ঘোর লাগছিল। ক্ষণে ক্ষণে ঢিলে হয়ে আসছিল কাজের চাল। নিজের উপর বিরক্ত হচ্ছিলুম, ভিতর থেকে কষে জোর লাগাচ্ছিলুম দাঁড়ে। ভয় হচ্ছিল ট্রপিকাল মাকড়সার জালে জড়িয়ে পড়ছি বুঝি। শয়তান ট্রপিক্‌স্‌ জন্মকাল থেকে এদেশে হাতপাখার হাওয়ায় ডাইনে বাঁয়ে হারের মন্ত্র চালাচ্ছে আমাদের ললাটে, মনে মনে পণ করছি এর স্বেদসিক্ত জাদু এড়াতেই হবে।

বেলা পড়ে এল। এক জায়গায় মাঝখানে চর ফেলে নুড়ি পাথর ঠেলে ঠেলে দুই শাখায় ভাগ হয়ে চলে গিয়েছে নদী। সেই বালুর দ্বীপে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে সারি সারি বকের দল। দিনাবসানে তাদের এই ছুটির ছবি দেখে রোজ আমি চলে যাই আমার কাজের বাঁক ফেরাতে। ঝুলিতে মাটি পাথর অভ্রের টুকরো নিয়ে সেদিন ফিরছিলুম আমার বাংলাঘরে, ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার কাজে। অপরাহ্ণ আর সন্ধ্যার মাঝখানে দিনের যে একটা ফালতো পোড়ো সময় থাকে সেইখানটাতে একলা মানুষের মন এলিয়ে পড়ে। তাই আমি নিজেকে চেতিয়ে রাখবার জন্যে এই সময়টা লাগিয়েছি পরখ করার কাজে। ডাইনামো দিয়ে বিজলি বাতি জ্বালাই, কেমিক্যাল নিয়ে মাইক্রস্‌কোপ নিয়ে নিক্তি নিয়ে বসি। এক-একদিন রাত দুপুর পেরিয়ে যায়।

আজ একটা পুরোনো পরিত্যক্ত তামার খনির খবর পেয়ে দ্রুত উৎসাহে তারই সন্ধানে চলেছিলুম। কাকগুলো মাথার উপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলেছে ফিকে আলোর আকাশে কা কা শব্দে। অদূরে একটা ঢিবির উপরে তাদের পঞ্চায়েত বসবার পড়েছে হাঁকডাক।

হঠাৎ বাধা পড়ল আমার কাজের রাস্তায়। পাঁচটা গাছের চক্রমণ্ডলী ছিল বনের পথের ধারে একটা উঁচু ডাঙার 'পরে। সেই বেষ্টনীর মধ্যে কেউ বসে থাকলে কেবল

একটিমাত্র অবকাশে তাকে দেখা যায়, হঠাৎ চোখ এড়িয়ে যাবারই কথা। সেদিন মেঘের মধ্যে দিয়ে একটি আশ্চর্য দীপ্তি বিচ্ছুরিত হয়েছিল। সেই গাছগুলোর ফাঁকটার ভিতর দিয়ে রাঙা আলোর ছোরা চিরে ফেলেছিল ভিতরকার ছায়াটাকে।

ঠিক সেই আলোর পথে বসে আছে মেয়েটি গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে, পা দুটি বুকের কাছে গুটিয়ে নিয়ে। পাশে ঘাসের উপর পড়ে আছে একখানা খাতা, বোধ হয় ডায়ারি।

বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল, থমকিয়ে গেলুম। দেখলুম যেন বিকেলের ম্লান রৌদ্রে গড়া একটি সোনার প্রতিমা। চেয়ে রইলুম গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে। অপূর্ব ছবি এক মুহূর্তে চিহ্নিত হয়ে গেল মনের চিরস্মরণীয়াগারে।

আমার বিস্তৃত অভিজ্ঞতার পথে অনেক অপ্রত্যাশিত মনোহরের দরজায় ঠেকেছে মন, পাশ কাটিয়ে চলে গেছি, আজ মনে হল জীবনের একটা কোন্ চরমের সংস্পর্শে এসে পৌঁছলুম। এমন করে ভাবা, এমন করে বলা আমার একেবারে অভ্যস্ত নয়। যে আঘাতে মানুষের নিজের অজানা একটা অপূর্ব স্বরূপ ছিটকিনি খুলে অবারিত হয়, সেই আঘাত আমাকে লাগল কী করে।

অত্যন্ত ইচ্ছা করছিল ওর কাছে গিয়ে কথার মতো কথা একটা-কিছু বলি। কিন্তু জানি নে কী কথা যে পরিচয়ের সবপ্রথম কথা, যে কথায় জানিয়ে দেবে খৃষ্টীয় পুরাণের প্রথম সৃষ্টির বাণী— আলো হোক, ব্যক্ত হোক যা অব্যক্ত।

আমি মনে মনে ওর নাম দিলুম— অচিরা। তার মানে কী। তার মানে এক মুহূর্তেই যার প্রকাশ, বিদ্যুতের মতো।

একসময়ে মনে হল অচিরা যেন জানতে পেরেছে কে একজন দাঁড়িয়ে আছে আড়ালে। স্তব্ধ উপস্থিতির একটা নিঃশব্দ শব্দ আছে বুঝি।

একটু তফাতে গিয়ে কোমরবন্ধ থেকে ভুজালি নিয়ে একান্ত মনোযোগের ভান করে মাটি খোঁচাতে লাগলুম। ঝুলিতে যা হয় কিছু দিলুম পুরে, গোটা কয়েক কাঁকরের ঢেলা। চলে গেলুম মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ে কী যেন সন্ধান করতে করতে। কিন্তু নিশ্চয় মনে জানি যাঁকে ভোলাতে চেয়েছিলুম তিনি ভোলেন নি। মুগ্ধ পুরুষচিত্তের বিহ্বলতার আরও অনেক দৃষ্টান্ত আরও অনেকবার তাঁর গোচর হয়েছে সন্দেহ নেই। আশা করলুম আমার বেলায় এটা তিনি উপভোগ করলেন, সকৌতুকে কিংবা সগর্বে, কিংবা হয়তো বা একটু মুগ্ধ মনে। কাছে যাবার বেড়া যদি আর-একটু ফাঁক করতুম তা হলে কী জানি কী হত। রাগ করতেন, না রাগের ভান করতেন?

অত্যন্ত চঞ্চল মনে চলেছি আমার বাংলাঘরের দিকে এমন সময় চোখে পড়ল দুই

টুকরোয় ছিন্নকরা একখানা চিঠির খাম। তাতে নাম লেখা, ভবতোষ মজুমদার আই. সি. এস, ছাপরা। তার বিশেষত্ব এই যে, এতে টিকিট আছে, কিন্তু সে টিকিটে ডাকঘরের ছাপ নেই। বুঝতে পারলুম ছেঁড়া চিঠির খামের মধ্যে একটা ট্র্যাজেডির ক্ষতচিহ্ন আছে। পৃথিবীর ছেঁড়া স্তর থেকে তার বিপ্লবের ইতিহাস বের করা আমার কাজ। সেই রকম কাজে লাগলুম ছেঁড়া খামটা নিয়ে।

ইতিমধ্যে ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে আমার নিজের অন্তঃকরণটা। নিজের অপ্রমত্ত কঠিন মনটাকে চিনে নিয়েছি ব'লে স্পষ্ট ধারণা ছিল। আজ এই প্রথম দেখলুম তার পাশের পাড়াতেই লুকিয়ে বসে আছে বুদ্ধিশাসনের বহির্ভূত একটা অবোধ।

নির্জন অরণ্যের সুগভীর কেন্দ্রস্থলে একটা সুনিবিড় সম্মোহন আছে যেখানে চলছে তার বুড়ো বুড়ো গাছপালার কানে কানে চক্রান্ত, যেখানে ভিতরে ভিতরে উচ্ছ্বসিত হচ্ছে সৃষ্টির আদিম প্রাণের মন্ত্রগুঞ্জরণ। দিনে দুপুরে ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে তার সুর উদাত্ত পর্দায়, রাতে দুপুরে তার মন্ত্রগম্ভীর ধ্বনি স্পন্দিত হতে থাকে জীবচেতনায়, বুদ্ধিকে দেয় আবিষ্ট করে। জিয়লজি-চর্চার ভিতরে ভিতরেই মনের আন্তর্ভৌম প্রদেশে ব্যাপ্ত হচ্ছিল এই আরণ্যক মায়ার কাজ। হঠাৎ স্পষ্ট হয়ে উঠে সে এক মুহূর্তে আমার দেহমনকে আবিষ্ট করে দিল যখনই দেখলুম অচিরাকে কুসুমিত ছায়ালোকের পরিবেষ্টনে।

বাঙালি মেয়েকে ইতিপূর্বে দেখেছি সন্দেহ নেই। কিন্তু তাকে এমন বিশুদ্ধ স্বপ্রকাশ স্বাতন্ত্র্যে দেখি নি। লোকালয়ে যদি এই মেয়েটিকে দেখতুম তা হলে যাকে দেখা যেত নানা লোকের সঙ্গে নানা সম্বন্ধে জড়িত বিমিশ্রিত এ মেয়ে সে নয়, এ দেখা দিল পরিবিস্তৃত নির্জন সবুজ নিবিড়তার পরিপ্রেক্ষিতে একান্ত স্বকীয়তায়। মনে হল না বেণী দুলিয়ে এ কোনো কালে ডায়োসিশনে পর্সেন্টেজ রাখতে গেছে, শাড়ির উপরে গাউন ঝুলিয়ে ডিগ্রি নিতে গেছে কনভোকেশনে, বালিগঞ্জে টেনিস-পার্টিতে চা ঢালছে উচ্চ কলহাস্যে। অল্পবয়সে শুনেছি পুরোনো বাংলা গান— "মনে রইল সই মনের বেদনা"— তারই সরল সুরের সঙ্গে মিশিয়ে চিরকালের বাঙালি মেয়ের একটা করুণ চেহারা আমি দেখতে পেতুম, অচিরাকে দেখে মনে হল সেইরকম বারোয়াঁ গানে তৈরি বাণীমূর্তি, যে গান রেডিয়োতে বাজে না, গ্রামোফোনে পাড়া মুখর করে না। এদিকে আমার আপনার মধ্যে দেখলুম মনের নিচের তলাকার তপ্তবিগলিত একটা প্রদীপ্ত রহস্য হঠাৎ উপরের আলোতে উদ্‌গীর্ণ হয়ে উঠেছে।

বুঝতে পারছি আমি যখন রোজ বিকেলে এই পথ দিয়ে কাজে ফিরেছি অচিরা আমাকে দেখেছে, অন্যমনস্ক আমি ওকে দেখি নি। নিজের চেহারা সম্বন্ধে যে বিশ্বাস

এনেছি বিলেত থেকে, এই ঘটনা সম্পর্কে মনের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া যে হয় নি তা বলতে পারি নে। কিন্তু সন্দেহও ছিল। বিলেতফেরত কোনো কোনো বন্ধুর কাছে শুনেছি, বিলিতি মেয়ের রুচির সঙ্গে বাঙালি মেয়ের রুচি মেলে না। এরা পুরুষের রূপে খোঁজে মেয়েলি মোলায়েম ছাঁদ। বাঙালি কার্তিক আর যাই হোক কোনো কালে দেবসেনাপতি ছিল না। এটা বলতে হবে আমাকেও ময়ূরে চড়ালে মানাবে না। এতদিন এসব আলোচনা আমার মনের ধার দিয়েও যায় নি। কিন্তু কয়েকদিন ধরে আমাকে ভাবিয়েছে। রোদেপোড়া আমার রঙ, লম্বা আমার দেহ, শক্ত আমার বাহু, দ্রুত আমার চলন, নাক চিবুক কপাল নিয়ে খুব স্পষ্ট রেখায় আঁকা আমার চেহারা। আমি নবনীনিন্দিত কষিতকাঞ্চনকান্তি বাঙালি মায়ের আদরের ধন নই।

আমার নিকটবর্তিনী বঙ্গনারীর সঙ্গে আমি মনে মনে ঝগড়া করেছি, একলা ঘরের কোণে বুক ফুলিয়ে বলেছি, 'তোমার পছন্দ পাই আর নাই পাই একথা নিশ্চয় জেনো তোমার দেশের চেয়ে বড়ো বড়ো দেশের স্বয়ম্বরসভার বরমাল্য উপেক্ষা করে এসেছি।' এই বানানো ঝগড়ার উষ্মায় একদিন হেসে উঠেছি আপন ছেলেমানুষিতে। আবার এদিকে বিজ্ঞানীর যুক্তিও কাজ করেছে ভিতরে ভিতরে। আপন মনে তর্ক করেছি, একান্ত নিভৃতে থাকাই যদি ওর প্রার্থনীয় তা হলে বারবার আমার সুস্পষ্ট দৃষ্টিপাত এড়িয়ে এতদিনে ও তো ঠাঁই বদল করত। কাজ সেরে এ পথ দিয়ে আগে যেতুম একবার মাত্র, আজকাল যখন-তখন যাতায়াত করি, যেন এই জায়গাটাতেই সোনার খনির খবর পেয়েছি। কখনও স্পষ্ট যখন চোখোচোখি হয়েছে আমার বিশ্বাস সেটাকে চার চোখের অপঘাত ব'লে ওর ধারণা হয় নি। এক-একদিন হঠাৎ পিছন-ফিরে দেখেছি আমার তিরোগমনের দিকে অচিরা তাকিয়ে আছে, ধরা পড়তেই দ্রুত চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের কাজে লাগলুম। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার কেম্ব্রিজের সতীর্থ প্রোফেসর আছেন বঙ্কিম। তাঁকে চিঠি লিখলুম, 'তোমাদের বেহার সিভিল সার্ভিসে আছেন এক ভদ্রলোক, নাম ভবতোষ। আমার কোনো বন্ধু, তাঁর মেয়ের জন্যে লোকটিকে উদ্বাহবন্ধনে জড়াবার দুষ্কর্মে সাহায্য করতে আমাকে অনুরোধ করেছেন। জানতে চাই রাস্তা খোলসা কি না, আর লোকটার মতিগতি কী রকম।'

উত্তর এল, 'পাকা দেয়াল তোলা হয়ে গেছে, রাস্তা বন্ধ। তার পরেও লোকটার মতিগতি সম্বন্ধে যদি কৌতূহল থাকে তবে শোনো। এ দেশে থাকতে আমি যাঁর ছাত্র ছিলুম তাঁর নাম নাই জানলে। তিনি পরম পণ্ডিত আর ঋষিতুল্য লোক। তাঁর নাতনিটিকে যদি দেখ তা হলে জানবে সরস্বতী কেবল যে আবির্ভূত হয়েছেন

অধ্যাপকের বিদ্যামন্দিরে তা নয় তিনি দেহ নিয়ে এসেছেন তাঁর কোলে। এমন বুদ্ধিতে উজ্জ্বল অপরূপ সুন্দর চেহারা কখনও দেখি নি।

"ভবতোষ ঢুকল শয়তান তাঁর স্বর্গলোকে। স্বল্পজল নদীর মতো বুদ্ধি তার অগভীর ব'লেই জ্বল্ জ্বল্ করে আর সেই জন্যেই তার বচনের ধারা অনর্গল। ভুললেন অধ্যাপক, ভুললেন নাতনি। রকমসকম দেখে আমাদের তো হাত নিস্‌পিস্ করতে থাকত। কিছু বলবার পথ ছিল না— বিবাহের সম্বন্ধ পাকাপাকি, বিলেত গিয়ে সিভিলিয়ান হয়ে আসবে তারই ছিল অপেক্ষা। তারও পাথেয় এবং খরচ জুগিয়েছেন কন্যার পিতা। লোকটার সর্দির ধাত, একান্ত মনে কামনা করেছিলুম ন্যুমোনিয়া হবে। হয় নি। পাস করলে পরীক্ষায়; দেশে ফেরবামাত্রই বিয়ে করলে ইণ্ডিয়া গবর্মেণ্টের উচ্চপদস্থ মুরব্বির মেয়েকে। লোকসমাজে নাতনির লজ্জা বাঁচাবার জন্যে মর্মাহত অধ্যাপক কোথায় অন্তর্ধান করেছেন জানি নে। অনতিকালের মধ্যে ভবতোষের অপ্রত্যাশিত পদোন্নতির সংবাদ এল। মস্ত একটা বিদায়ভোজের আয়োজন হল। শুনেছি খরচটা দিয়েছে ভবতোষ গোপনে নিজের পকেট থেকে। আমরাও নিজের পকেট থেকেই খরচ দিয়ে গুণ্ডা লাগিয়ে ভোজটা দিলুম লণ্ডভণ্ড করে। কাগজে কংগ্রেস-ওয়ালাদের প্রতিই সন্দেহ প্রকাশ করেছিল ভবতোষেরই ইশারায়। আমি জানি এই সৎকার্যে তারা লিপ্ত ছিল না। যে নাগরা জুতো লেগেছিল পলায়মানের পিঠে, সেটা অধ্যাপকেরই এক প্রাক্তন ছাত্রের প্রশস্ত পায়ের মাপে। পুলিশ এল গোলমালের অনেক পরে— ইনস্পেক্টর আমার বন্ধু, লোকটা সহৃদয়।'

চিঠিখানা পড়লুম, প্রাক্তন ছাত্রটির প্রতি ঈর্ষা হল।

অচিরার সঙ্গে প্রথম কথাটি শুরু করাই সব চেয়ে কঠিন কাজ। আমি বাঙালি মেয়েকে ভয় করি। বোধ করি চেনা নেই ব'লেই। অথচ কাজে যোগ দেবার কিছু আগেই কলকাতায় কাটিয়ে এসেছি। সিনেমামঞ্চপথবর্তিনী বাঙালি মেয়ের নতুন চাস-করা ভ্রূবিলাস দেখে তো স্তম্ভিত হয়েছি— তারা সব জাতবান্ধবী— থাক্ তাদের কথা। কিন্তু অচিরাকে দেখলুম একালের ঠেলাঠেলি ভিড়ের বাইরে— নির্মল আত্ম-মর্যাদায়, স্পর্শভীরু মেয়ে। আমি তাই ভাবছি প্রথম কথাটি শুরু করব কী করে।

জনরব এই যে কাছাকাছি ডাকাতি হয়ে গেছে। ভাবলুম, হিতৈষী হয়ে বলি 'রাজা-বাহাদুরকে ব'লে আপনার জন্যে পাহারার বন্দোবস্ত করে দিই।' ইংরেজ মেয়ে হলে হয়তো গায়েপড়া আনুকূল্য সইতে পারত না, মাথা বাঁকিয়ে বলত, 'সে ভাবনা আমার।' এই বাঙালি মেয়ে অচেনার কাছ থেকে কী ভাবে কথাটা নেবে আমার জানা নেই, হয়তো আমাকেই ডাকাত ব'লে সন্দেহ করবে।

ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটল সেটা উল্লেখযোগ্য।

দিনের আলো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। অচিরার সময় হয়েছে ঘরে ফেরবার। এমন সময় একটা হিন্দুস্থানী গোঁয়ার এসে তার হাত থেকে তার খাতা আর থলিটা নিয়ে যখন ছুটেছে আমি তখনই বনের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বললুম, "কোনো ভয় নেই আপনার।" এই বলে ছুটে সেই লোকটার ঘাড়ের উপর পড়তেই সে ব্যাগ খাতা ফেলে দৌড় মারলে। আমি লুঠের মাল নিয়ে এসে অচিরাকে দিলুম। অচিরা বললে, "ভাগ্যিস আপনি—"

আমি বললেম, "আমার কথা বলবেন না, ভাগ্যিস ঐ লোকটা এসেছিল।"

"তার মানে!"

"তার মানে তারই কৃপায় আপনার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়ে গেল।"

অচিরা বিস্মিত হয়ে বললে, "কিন্তু ও যে ডাকাত।"

"এমন অন্যায় অপবাদ দেবেন না। ও আমার বরকন্দাজ, রামশরণ।"

অচিরা মুখের উপর খয়েরি রঙের আঁচল টেনে নিয়ে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল। হাসি থামতে চায় না। কী মিষ্টি তার ধ্বনি। যেন ঝরনার নিচে নুড়িগুলো ঠুন্‌ঠুন্ করে উঠে সুরে সুরে। হাসি-অবসানে সে বললে, "কিন্তু সত্যি হলে খুব মজা হত।"

"মজা কার পক্ষে?"

"যাকে নিয়ে ডাকাতি।"

"আর উদ্ধারকর্তার?"

"বাড়ি নিয়ে গিয়ে তাকে এক পেয়ালা চা খাইয়ে দিতুম আর গোটা দুয়েক স্বদেশী বিস্কুট।"

"আর এই ফাঁকি উদ্ধারকর্তার কী হবে।"

"যে রকম শোনা গেল তাঁর তো আর-কিছুতে দরকার নেই, কেবল প্রথম কথাটা।"

"ঐ প্রথম পদক্ষেপেই গণিতের অগ্রগতিটা কি বন্ধ হবে।"

"কেন হবে। ওকে চালাবার জন্যে বরকন্দাজের সাহায্য দরকার হবে না।"

বসলুম সেখানেই ঘাসের উপরে। একটা কাটা গাছের গুঁড়ির উপরে বসে ছিল অচিরা।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "আপনি হলে আমাকে প্রথম কথাটা কী বলতেন।"

"বলতুম, রাস্তায় ঘাটে ঢেলা কুড়িয়ে কুড়িয়ে করছেন কী। আপনার কি বয়স হয় নি।"

"বলেন নি কেন।"

"ভয় করেছিল।"

"আমাকে ভয় কিসের ?"

"আপনি যে মস্ত লোক, দাদুর কাছে শুনেছি। তিনি আপনার লেখা প্রবন্ধ বিলিতি কাগজে পড়েছেন। তিনি যা পড়েন আমাকে শোনাতে চেষ্টা করেন।"

"এটাও কি করেছিলেন।"

"নিষ্ঠুর তিনি, করেছিলেন। লাটিন শব্দের ভিড় দেখে জোড়হাত করে তাঁকে বলেছিলুম, দাদু এটা থাক্। বরঞ্চ তোমার সেই কোয়াণ্টম থিয়োরির বইখানা খোলো।"

"সে থিয়োরিটা বুঝি আপনার জানা আছে ?"

"কিছুমাত্র না। কিন্তু দাদুর দৃঢ় বিশ্বাস সবাই সবকিছু বুঝতে পারে। আর তাঁর অদ্ভুত এই একটা ধারণা যে, মেয়েদের বুদ্ধি পুরুষদের বুদ্ধির চেয়ে বেশি তীক্ষ্ন। তাই ভয়ে ভয়ে আছি অবিলম্বে আমাকে 'টাইম-স্পেস'এর জোড়মিলনের ব্যাখ্যা শুনতে হবে। দিদিমা যখন বেঁচে ছিলেন, দাদু বড়ো বড়ো কথা পাড়লেই তিনি মুখ বন্ধ করে দিতেন ; এটাই যে মেয়েদের বুদ্ধির প্রমাণ, দাদু কিন্তু সেটা বোঝেন নি।"

অচিরার দুই চোখ স্নেহে আর কৌতুকে ছল্‌ছল্‌ জল্‌জল্‌ করে উঠল।

দিনের আলো নিঃশেষ হয়ে এল। সন্ধ্যার প্রথম তারা জলে উঠেছে একটা একলা তালগাছের মাথার উপরে। সাঁওতাল মেয়েরা ঘরে চলেছে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে, দূর থেকে শোনা যাচ্ছে তাদের গান।

এমন সময় বাইরে থেকে ডাক এল, "কোথায় তুমি। অন্ধকার হয়ে এল যে! আজকাল সময় ভালো নয়।"

অচিরা উত্তর দিল, "সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তাই জন্যে একজন ভলণ্টিয়র নিযুক্ত করেছি।"

আমি অধ্যাপকের পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলুম। তিনি শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আমি পরিচয় দিলুম, "আমার নাম শ্রীনবীনমাধব সেনগুপ্ত।"

বৃদ্ধের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, "বলেন কি! আপনিই ডাক্তার সেনগুপ্ত ? কিন্তু আপনাকে যে বড়ো ছেলেমানুষ দেখাচ্ছে।"

আমি বললুম, "ছেলেমানুষ না তো কী। আমার বয়স এই ছত্রিশের বেশি নয়— সাঁইত্রিশে পড়ব।"

আবার অচিরার সেই কলমধুর কণ্ঠের হাসি। আমার মনে যেন দুন লয়ের ঝংকারে

সেতার বাজিয়ে দিল। বললে, "দাদুর কাছে সবাই ছেলেমানুষ। আর উনি নিজে সব ছেলেমানুষের আগরওয়াল।"

অধ্যাপক হেসে বললেন, "আগরওয়াল, ভাষায় নতুন শব্দের আমদানি।"

অচিরা বললে, "মনে নেই, সেই যে তোমার মাড়োয়ারি ছাত্র কুন্দনলাল আগরওয়ালা, আমাকে এনে দিত বোতলে করে কাঁচা আমের চাটনি। তাকে জিগ্‌গেসা করেছিলুম আগরওয়াল শব্দের অর্থ কী— সে ফস্‌ করে বলে দিল পায়োনিয়র।"

অধ্যাপক বললেন, "ডাক্তার সেনগুপ্ত, আপনার সঙ্গে আলাপ হল যদি আমাদের ওখানে খেতে যেতে হবে তো।"

"কিছু বলতে হবে না দাদু, যাবার জন্যে ওঁর মন লাফালাফি করছে। আমি যে এইমাত্র ওঁকে বলে দিয়েছি দেশকালের মিলনতত্ত্ব তুমি ব্যাখ্যা করবে।"

মনে মনে বললুম, 'বাস্‌ রে, কী দুষ্টুমি।'

অধ্যাপক উৎসাহিত হয়ে বলে উঠলেন, "আপনার বুঝি 'টাইম-স্পেস'এর—"

আমি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলুম, "কিছু জানা নেই— বোঝাতে গেলে আপনার বৃথা সময় নষ্ট হবে।"

বৃদ্ধ ব্যগ্র হয়ে বলে উঠলেন, "এখানে সময়ের অভাব কোথায়। আচ্ছা, এক কাজ করুন না, আজই চলুন আমার ওখানে আহার করবেন।"

আমি লাফ দিয়ে বলতে যাচ্ছিলুম, 'এখ্‌খনি।' অচিরা বলে উঠল, "দাদু, সাধে তোমাকে বলি ছেলেমানুষ। যখন খুশি নেমন্তন্ন করে ফেল, আমি পড়ি মুশকিলে। ওঁরা বিলেতের ডিনার-খাইয়ে সর্বগ্রাসী মানুষ, কেন তোমার নাতনির বদনাম করবে।"

অধ্যাপক ধমক-খাওয়া বালকের মতো বললেন, "আচ্ছা, তবে আর কোন্‌ দিন আপনার সুবিধে হবে বলুন।"

"সুবিধে আমার কালই হতে পারবে কিন্তু অচিরা দেবীকে রসদ নিয়ে বিপন্ন করতে চাই নে। পাহাড়ে পর্বতে ঘুরি, সঙ্গে রাখি থলি ভরে চিঁড়ে, ছড়াকয়েক কলা, বিলিতি বেগুন, কাঁচা ছোলার শাক, চিনেবাদাম। আমিই বরঞ্চ সঙ্গে নিয়ে আসব ফলারের আয়োজন। অচিরা দেবী যদি স্বহস্তে দই দিয়ে মেখে দেন লজ্জা পাবে ফিরপোর দোকান।"

"দাদু, বিশ্বাস কোরো না এইসব মুখমিষ্টি লোককে। উনি নিশ্চয় পড়েছেন তোমার সেই লেখাটা বাংলা কাগজে, সেই ভিটামিনের গুণপ্রচার। তাই তোমাকে খুশি করবার জন্যে শোনালেন চিঁড়েকলার ফর্দ।"

মুশকিলে ফেললে। বাংলা কাগজ পড়া তো আমার ঘটেই ওঠে না।

অধ্যাপক উৎফুল্ল হয়ে জিগ্‌গেসা করলেন, "সেটা পড়েছেন বুঝি।"

অচিরার চোখের কোণে দেখতে পেলুম একটু হাসি। তাড়াতাড়ি শুরু করে দিলুম, "পড়ি আর নাই পড়ি তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু আসল কথাটা হচ্ছে" — আসল কথাটা আর হাতড়ে পাইনে।

অচিরা দয়া করে ধরিয়ে দিলে, "আসল কথা উনি নিশ্চিত জানেন, কাল যদি তোমার ওখানে নেমন্তন্ন জোটে তা হলে ওঁর পাতে পশুপক্ষী স্থাবরজঙ্গম কিছুই বাদ যাবে না। তাই অত নিশ্চিন্ত মনে বিলিতি বেগুনের নামকীর্তন করলেন। দাদু, তুমি সবাইকে অত্যন্ত বেশি বিশ্বাস কর, এমনকি, আমাকেও। সেইজন্যেই ঠাট্টা করে তোমাকে কিছু বলতে সাহস হয় না।"

কথা বলতে বলতে ধীরে ধীরে ওঁদের বাড়ির দিকে এগিয়ে চলেছি এমন সময় অচিরা হঠাৎ আমাকে বলে উঠল, "বাস্‌ আর নয়— এইবার যান বাসায় ফিরে।"

আমি বললুম, "দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেব।"

অচিরা বললে, "সর্বনাশ, দরজা পেরলেই আলুথালু উচ্ছৃঙ্খলতা আমাদের দুজনের সম্মিলিত রচনা। আপনি অবজ্ঞা করে বলবেন বাঙালি মেয়েরা অগোছালো। একটু সময় দিন, কাল দেখলে মনে হবে শ্বেতদ্বীপের শ্বেতভুজার অপূর্ব কীর্তি, মেমসাহেবী সৃষ্টি।"

অধ্যাপক কিছু কুণ্ঠিত হয়ে আমাকে বললেন, "আপনি কিছু মনে করবেন না— দিদি বড়ো বেশি কথা কচ্ছে। কিন্তু ওটা ওর স্বভাব নয় মোটে। এখানে অত্যন্ত নির্জন, তাই ও আমার মনের ফাঁক ভরে রেখে দেয় কথা কয়ে। সেটা ওর অভ্যেস হয়ে যাচ্ছে। ও যখন চুপ করে থাকে ঘরটা ছম্‌ছম্‌ করতে থাকে, আমার মনটাও। ও নিজে জানে না সে কথা। আমার ভয় হয় পাছে বাইরের লোকে ওকে ভুল বোঝে।"

বুড়োর গলা জড়িয়ে ধরে অচিরা বললে "বুঝুক-না দাদু। অত্যন্ত অনিন্দনীয়া হতে চাই নে, সেটা অত্যন্ত আনইণ্টারেস্টিঙ।"

অধ্যাপক সগর্বে বলে উঠলেন, "আমার দিদি কিন্তু কথা বলতে জানে, অমন আর কাউকে দেখি নি।"

"তুমিও আমার মতো কাউকে দেখ নি, আমিও কাউকে দেখি নি তোমার মতো।"

আমি বললুম, "আচার্যদেব, আজ বিদায় নেবার পূর্বে আমাকে একটা কথা দিতে হবে।"

"আচ্ছা বেশ।"

"আপনি যতবার আমাকে আপনি বলেন, আমি মনে মনে ততবার জিভ কাটি। আমাকে দয়া করে তুমি ব'লে যদি ডাকেন তা হলে মন সহজে সাড়া দেবে। আপনার নাতনিও সহকারিতা করবেন।"

অচিরা দুই হাত নেড়ে বললে, "অসম্ভব, আরও কিছুদিন যাক। সর্বদা দেখাশুনো হতে হতে বড়োলোকের তিলকলাঞ্ছন যখন ঘষা পয়সার মতো পালিশ করা হয়ে যাবে তখন সবই সম্ভব হবে। দাদুর কথা স্বতন্ত্র। আমি বরঞ্চ ওঁকে পড়িয়ে নিই। বলো তো দাদু, তুমি কাল খেতে এসো। দিদি যদি মাছের ঝোলে নুন দিতে ভোলে মুখ না বেঁকিয়ে বোলো, কী চমৎকার। বোলো সবটা আমারই পাতে দেওয়া ভালো, অন্যরা এরকম রান্না তো প্রায়ই ভোগ করে থাকেন।"

অধ্যাপক সস্নেহে আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, "ভাই, তুমি বুঝতে পারবে না আসলে এই মেয়েটি লাজুক তাই যখন আলাপ করা কর্তব্য মনে করে তখন সংকোচ ঠেলে উঠতে গিয়ে কথা বেশি হয়ে পড়ে।"

"দেখেছেন ডক্টর সেনগুপ্ত, দাদু আমাকে কী রকম মধুর করে শাসন করেন। অনায়াসে বলতে পারতেন, তুমি বড়ো মুখরা, তোমার বকুনি অসহ্য। আপনি কিন্তু আমাকে ডিফেণ্ড করবেন। কী বলবেন বলুন তো।"

"আপনার মুখের সামনে বলব না।"

"বেশি কঠোর হবে?"

"আপনি মনে মনেই জানেন।"

"থাক্, থাক্, তা হলে বলে কাজ নাই। এখন বাড়ি যান।"

আমি বললুম, "তার আগে সব কথাটা শেষ করে নিই। কাল আপনাদের ওখানে আমার নেমন্তন্নটা নামকর্তন-অনুষ্ঠানের। কাল থেকে নবীনমাধব নামটা থেকে কাটা পড়বে ডাক্তার সেনগুপ্ত। সূর্যের কাছাকাছি এলে ধূমকেতুর কেতুটা পায় লোপ, মুণ্ডুটা থাকে বাকি।"

এইখানে শেষ হল আমার বড়োদিন। দেখলুম বার্ধক্যের কী সৌম্যসুন্দর মূর্তি। পালিশ-করা লাঠি হাতে, গলায় শুভ্র পাটকরা চাদর, ধুতি যত্নে কোঁচানো, গায়ে তসরের জামা, মাথায় শুভ্র চুল বিরল হয়ে এসেছে কিন্তু পরিপাটি করে আঁচড়ানো। স্পষ্ট বোঝা যায়, নাতনির হাতের শিল্পকার্য এঁর বেশভূষণে এঁর দিনযাত্রায়। অতিলালনের অত্যাচার ইনি সস্নেহে সহ্য করেন, খুশি রাখবার জন্যে নাতনিটিকে।

এই গল্পের পক্ষে অধ্যাপকের ব্যাবহারিক নাম অনিলকুমার সরকার। তিনি গত

জেনেরেশনের কেম্ব্রিজের বড়ো পদবীধারী। মাস আষ্টেক আগে কোনো কলেজের অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করে এখানকার এস্টেটের একটা পোড়ো বাড়ি ভাড়া নিয়ে নিজের খরচে সেটা বাসযোগ্য করেছেন।

অন্তপর্ব

আমার গল্পের আদিপর্ব হল শেষ। ছোটো গল্পের আদি ও অন্তের মাঝখানে বিশেষ একটা ছেদ থাকে না— ওর আকৃতিটা গোল।

অচিরার সঙ্গে আমার অপরিচয়ের ব্যবধান ক্ষয় হয়ে আসছে। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে যেন পরিচয়টাই ব্যবধান। কাছাকাছি আসছি বটে কিন্তু তাতে একটা প্রতিঘাত জাগছে। কেন? অচিরার প্রতি আমার ভালোবাসা ওর কাছে স্পষ্ট হয়ে আসছে, অপরাধ কি তারই মধ্যে। কিংবা আমার দিকে ওর সৌহৃদ্য স্ফুটতর হয়ে উঠছে, সেইটেতেই ওর গ্লানি। কে জানে।

সেদিন চড়িভাতি তনিকা নদীর তীরে।

অচিরা ডাক দিলে, "ডাক্তার সেনগুপ্ত।"

আমি বললুম, "সেই প্রাণীটার কোনো ঠিকানা নেই, সুতরাং কোনো জবাব মিলবে না।"

"আচ্ছা, তা হলে নবীনবাবু।"

"সেও ভালো, যাকে বলে মন্দর ভালো।"

"কাণ্ডটা কী দেখলেন তো?"

আমি বললুম, "আমার সামনে লক্ষ্য করবার বিষয় কেবল একটিমাত্রই ছিল, আর কিছুই ছিল না।"

এইটুকু ঠাট্টায় অচিরা সত্যই বিরক্ত হয়ে বললে, "আপনার আলাপ ক্রমেই যদি অমন ইশারাওয়ালা হয়ে উঠতে থাকে তা হলে ফিরিয়ে আনব ডাক্তার সেনগুপ্তকে, তাঁর স্বভাব ছিল গম্ভীর।"

আমি বললুম, "আচ্ছা তা হলে কাণ্ডটা কী হয়েছিল বলুন।"

"ঠাকুর যে ভাত রেঁধেছিল সে কড়্‌কড়ে, আদ্ধেক তার চাল। আমি বললুম, দাদু, এ তো তোমার চলবে না। দাদু অমনি ব'লে বসলেন, জান তো ভাই, খাবার জিনিস শক্ত হলে ভালো করে চিবোবার দরকার হয়, তাতেই হজমের সাহায্য করে। পাছে আমি দুঃখ করি দাদুর জেগে উঠল সায়েন্সের বিদ্যে। নিমকিতে নুনের বদলে যদি চিনি দিত তা হলে নিশ্চয় দাদু বলত, চিনিতে শরীরের এনার্জি বাড়িয়ে দেয়।"

"দাদু, ও দাদু, তুমি ওখানে বসে বসে কী পড়ছ। আমি যে এদিকে তোমার চরিত্রে অতিশয়োক্তি-অলংকার আরোপ করছি, আর নবীনবাবু সমস্তই বেদবাক্য ব'লে বিশ্বাস করে নিচ্ছেন।"

কিছু দূরে পোড়ো মন্দিরের সিঁড়ির উপরে বসে অধ্যাপক বিলিতি ত্রৈমাসিক পড়ছিলেন। অচিরার ডাক শুনে সেখান থেকে উঠে আমাদের কাছে বসলেন। ছেলেমানুষের মতো হঠাৎ আমাকে জিগ্‌গেসা করলেন, "আচ্ছা নবীন, তোমার কি বিবাহ হয়েছে।"

কথাটা এতই সুস্পষ্ট ভাবব্যঞ্জক যে আর কেউ হলে বলত 'না', কিংবা ঘুরিয়ে বলত।

আমি আশাপ্রদ ভাষায় উত্তর দিলুম, "না, এখনও হয় নি।"

অচিরার কাছে কোনো কথা এড়ায় না। সে বললে, "ঐ এখনও শব্দটা সংশয়গ্রস্ত কন্যাকর্তাদের মনকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে, ওর কোনো যথার্থ অর্থ নেই।"

"একেবারেই নেই নিশ্চিত ঠাওরালেন কী করে।"

"ওটা গণিতের প্রব্লেম, সেও হাইয়ার ম্যাথ্‌ম্যাটিক্‌স্ নয়। পূর্বেই শোনা গেছে আপনি ছত্রিশ বছরের ছেলেমানুষ। হিসেব করে দেখলুম এর মধ্যে আপনার মা অন্তত পাঁচ-সাতবার বলেছেন, 'বাবা ঘরে বউ আনতে চাই।' আপনি জবাব করেছেন, 'তার পূর্বে ব্যাঙ্কে টাকা আনতে চাই।' মা চোখের জল মুছে চুপ করে রইলেন, তার পরে মাঝখানে আপনার আর-সব ঘটেছিল কেবল ফাঁসি ছিল বাকি। শেষকালে এখানকার রাজ-সরকারে মোটা মাইনের কাজ জুটল। মা বললেন, 'এইবার বউ নিয়ে এসো ঘরে। বড়ো কাজ পেয়েছ।' আপনি বললেন, 'বিয়ে করে সে কাজ মাটি করতে পারব না।' আপনার ছত্রিশ বছরের গণিতফল গণনা করতে ভুল হয়েছে কি না বলুন।"

এ মেয়ের সঙ্গে অনবধানে কথা বলা নিরাপদ নয়। কিছুদিন আগেই আমার একটা পরীক্ষা হয়ে গেছে। কথায় কথায় অচিরা আমাকে বলেছিল, "আমাদের দেশের মেয়েরা আপনাদের সংসারের সঙ্গিনী হতে পারে কিন্তু বিলেতে যারা জ্ঞানের তাপস তাদের তপস্যার সঙ্গিনী তো জোটে, যেমন ছিলেন অধ্যাপক কুরির সধর্মিণী মাদাম কুরি। আপনার কি তেমন কেউ জোটে নি।"

মনে পড়ে গেল ক্যাথারিনকে। সে একইকালে আমার বিজ্ঞানের এবং জীবনযাত্রার সাহচর্য করতে চেয়েছিল।

অচিরা জিগ্‌গেসা করলে, "আপনি কেন তাঁকে বিয়ে করতে চাইলেন না।"

কী উত্তর দেব ভাবছিলুম, অচিরা বললে, "আমি জানি কেন। আপনার সত্যভঙ্গ

হবে এই ভয় ছিল ; নিজেকে আপনার মুক্ত রাখতেই হবে। আপনি যে সাধক। আপনি তাই নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর নিজের প্রতি, নিষ্ঠুর তার 'পরে যে আপনার পথের সামনে আসে। এই নিষ্ঠুরতায় আপনার বীরত্ব দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার সে বললে, "বাংলা সাহিত্য বোধ হয় আপনি পড়েন না। কচ ও দেবযানী ব'লে একটা কবিতা আছে। তার শেষ কথাটা এই, মেয়েদের ব্রত পুরুষকে বাঁধা, আর পুরুষের ব্রত মেয়ের বাঁধন কাটিয়ে স্বর্গলোকের রাস্তা বানানো। কচ বেরিয়ে পড়েছিল দেবযানীর অনুরোধ এড়িয়ে, আর আপনি মায়ের অনুনয়— একই কথা।"

আমি বললুম, "দেখুন, আমি হয়তো ভুল করেছিলুম। মেয়েদের নিয়ে পুরুষের কাজ যদি না চলে তা হলে মেয়েদের সৃষ্টি কেন।"

অচিরা বললে, "বারো-আনার চলে, মেয়েরা তাদের জন্যেই। কিন্তু বাকি মাইনরিটি যারা সব কিছু পেরিয়ে নতুন পথের সন্ধানে বেরিয়েছে তাদের চলে না। সব-পেরোবার মানুষকে মেয়েরা যেন চোখের জল ফেলে রাস্তা ছেড়ে দেয়। যে দুর্গম পথে মেয়েপুরুষের চিরকালের দ্বন্দ্ব সেখানে পুরুষেরা হোক জয়ী। যে মেয়েরা মেয়েলি, প্রকৃতির বিধানে তাদের সংখ্যা অনেক বেশি, তারা ছেলে মানুষ করে, সেবা করে ঘরের লোকের। যে পুরুষ যথার্থ পুরুষ, তাদের সংখ্যা খুব কম ; তারা অভিব্যক্তির শেষ কোঠায়। মাথা তুলছে দুটি-একটি করে। মেয়েরা তাদের ভয় পায়, বুঝতে পারে না, টেনে আনতে চায় নিজের অধিকারের গণ্ডিতে। এই তত্ত্ব শুনেছি আমার দাদুর কাছে।

"দাদু, তোমার পড়া রেখে আমার কথা শোনো। মনে আছে, তুমি একদিন বলেছিলে, পুরুষ যেখানে অসাধারণ সেখানে সে নিরতিশয় একলা, নিদারুণ তার নিঃসঙ্গতা, কেননা তাকে যেতে হয় যেখানে কেউ পৌঁছয় নি। আমার ডায়ারিতে লেখা আছে।"

অধ্যাপক মনে করবার চেষ্টা করে বললেন, "বলেছিলুম নাকি? হয়তো বলেছিলুম।"

অচিরা খুব বড়ো কথাও কয় হাসির ছলে, আজ সে অত্যন্ত গম্ভীর।

খানিক বাদে আবার সে বললে, "দেবযানী কচকে কী অভিসম্পাত দিয়েছিল জানেন?"

"না।"

"বলেছিল, 'তোমার সাধনায় পাওয়া বিদ্যা তোমার নিজের ব্যবহারে লাগাতে

পারবে না।' যদি এই অভিসম্পাত আজ দিত দেবতা য়ুরোপকে, তা হলে য়ুরোপ বেঁচে যেত। বিশ্বের জিনিসকে নিজের মাপে ছোটো করেই ওখানকার মানুষ মরছে লোভের তাড়ায়। সত্যি কি না বলো দাদু।"

"খুব সত্যি, কিন্তু এত কথা কী করে ভাবলে।"

"নিজের বুদ্ধিতে না। একটা তোমার মহদ্‌গুণ আছে, কখন কাকে কী যে বল, ভোলানাথ তুমি সব ভুলে যাও। তাই চোরাই মালের উপর নিজের ছাপ লাগিয়ে দিতে ভাবনা থাকে না।"

আমি বললুম, "নিজের ছাপ যদি লাগে তা হলেই অপরাধ খণ্ডন হয়।"

"জানেন, নবীনবাবু, ওঁর কত ছাত্র ওঁর কত মুখের কথা খাতায় টুকে নিয়ে বই লিখে নাম করেছে। উনি তাই পড়ে আশ্চর্য হয়ে প্রশংসা করেছেন, বুঝতেই পারেন নি নিজের প্রশংসা নিজেই করছেন। কোন্ কথা আমার কথা আর কোন্ কথা ওঁর নিজের সে ওঁর মনে থাকে না— লোকের সামনে আমাকে বলে বসেন ওরিজিন্যাল, তখন সেটার প্রতিবাদ করার মতো মনের জোর পাওয়া যায় না। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি নবীনবাবুরও এ ভ্রম ঘটছে। কী করব বলো, আমি তো কোটেশন-মার্কা দিয়ে দিয়ে কথা বলতে পারি নে।"

"নবীনবাবুর এ ভ্রম কোনোদিন ঘুচবে না।"

অচিরা বললে, "দাদু একদিন আমাদের কলেজ-ক্লাসে কচ ও দেবযানীর ব্যাখ্যা করছিলেন। কচ হচ্ছে পুরুষের প্রতীক, আর দেবযানী মেয়ের। সেই দিন নির্মম পুরুষের মহৎ গৌরব মনে মনে মেনেছি, মুখে কক্‌খনো স্বীকার করি নে।"

অধ্যাপক বললেন, "কিন্তু দিদি, আমার কোনো কথায় মেয়েদের গৌরবের আমি কোনোদিন লাঘব করি নি।"

"তুমি আবার করবে। হায় রে। মেয়েদের তুমি যে অন্ধ ভক্ত। তোমার মুখের স্তবগান শুনে মনে মনে হাসি। মেয়েরা নির্লজ্জ হয়ে সব মেনে নেয়। তার উপরেও বুক ফুলিয়ে সতীসাধ্বীগিরির বড়াই করে নিজের মুখে। সস্তায় প্রশংসা আত্মসাৎ করা ওদের অভ্যেস হয়ে গেছে।"

অধ্যাপক বললেন, "না দিদি, অবিচার কোরো না। অনেক কাল ওরা হীনতা সহ্য করেছে, হয়তো সেইজন্যেই নিজেদের শ্রেষ্ঠতা নিয়ে একটু বেশি জোর দিয়ে তর্ক করে।"

"না দাদু, ও তোমার বাজে কথা। আসল হচ্ছে এটা স্ত্রীদেবতার দেশ— এখানে পুরুষেরা স্ত্রৈণ, মেয়েরাও স্ত্রৈণ। এখানে পুরুষরা কেবলই 'মা মা' করছে, আর মেয়েরা

চিরশিশুদের আশ্বাস দিচ্ছে যে তারা মায়ের জাত। আমার তো লজ্জা করে। পশু-পক্ষীদের মধ্যেও মায়ের জাত নেই কোথায়?"

চিত্তচাঞ্চল্যে কাজের এত বাধা ঘটছে যে লজ্জা পাচ্ছি মনে মনে। সদরে বাজেটের মিটিঙে রিসর্চবিভাগে আরও কিছু দান মঞ্জুর করিয়ে নেবার প্রস্তাব ছিল। তার সমর্থক রিপোর্টখানা অর্ধেকের বেশি লেখাই হয় নি। অথচ এদিকে ক্রোচের এস্‌থেটিক্‌স্‌ নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা শুনে আসছি। অচিরা নিশ্চিত জানে বিষয়টা আমার উপলব্ধি ও উপভোগের সম্পূর্ণ বাইরে। তা হলেও চলত, কিন্তু আমার বিশ্বাস ব্যাপারটাকে সে ইচ্ছে করে শোচনীয় করে তুলেছে। ঠিক এই সময়টাতেই সাঁওতালদের পার্বণ। তারা পচাই মদ খাচ্ছে আর মাদল বাজিয়ে মেয়ে-পুরুষে নৃত্য করছে। অচিরা ওদের পরম বন্ধু। মদের পয়সা জোগায়, সালু কিনে দেয় সাঁওতাল ছেলেদের কোমর বাঁধবার জন্যে, বাগান থেকে জবাফুলের জোগান দেয় সাঁওতাল মেয়েদের চুলে পরবার। ওকে না হলে তাদের চলেই না। অচিরা অধ্যাপককে বলেছে, ও তো এ কদিন থাকতে পারবে না অতএব এই সময়টাতে বিরলে আমাকে নিয়ে ক্রোচের রসতত্ত্ব যদি পড়ে শোনান তা হলে আমার সময় আনন্দে কাটবে। একবার সসংকোচে বলেছিলুম, 'সাঁওতালদের উৎসব দেখতে আমার বিশেষ কৌতূহল আছে।' স্বয়ং অধ্যাপক বললেন, না, সে আপনার ভালো লাগবে না। আমার ইনটেলেক্‌চুয়ল মনোবৃত্তির নির্জলা একান্ততার 'পরে তাঁর এত বিশ্বাস। মধ্যাহ্নভোজনের পরেই অধ্যাপক গুন গুন করে পড়ে চলেছেন। দূরে মাদলের আওয়াজ এক-একবার থামছে। পরক্ষণেই দ্বিগুণ জোরে বেজে উঠছে। কখনও বা পদশব্দ কল্পনা করছি, কখনও বা হতাশ হয়ে ভাবছি অসমাপ্ত রিপোর্টের কথা। সুবিধে এই অধ্যাপক জিগ্‌গেসাই করেন না কোথাও আমার ঠেকছে কিনা। তিনি ভাবেন সমস্তই জলের মতো সোজা। মাঝে মাঝে প্রতিবাদ উপলক্ষে প্রশ্ন করেন, আপনারও কি এই মনে হয় না। আমি খুব জোরের সঙ্গে বলি, নিশ্চয়।

ইতিমধ্যে কিছুদূরে আমাদের অর্ধসমাপ্ত কয়লার খনিতে মজুরদের হল স্ট্রাইক। ঘটালেন যিনি, এই তাঁর ব্যাবসা, স্বভাব এবং অভাব বশত; সমস্ত কাজের মধ্যে এইটেই সব চেয়ে সহজ। কোনো কারণ ছিল না, কেননা আমি নিজে সোশালিস্ট, সেখানকার বিধিবিধান আমার নিজের হাতে বাঁধা, কারও সেখানে না ছিল লোকসান, না ছিল অসম্মান।

নূতন যন্ত্র এসেছে জর্মনি থেকে, তারই খাটাবার চেষ্টায় ব্যস্ত আছি। এমন

সময় উত্তেজিত ভাবে এসে উপস্থিত অচিরা। বললে, "আপনি মোটা মাইনে নিয়ে ধনিকের নায়েবি করছেন, এদিকে গরিবের দারিদ্র্যের সুযোগটাকে নিয়ে আপনি—"

চন্ করে উঠল মাথা। বাধা দিয়ে বললুম, "কাজ চালাবার দায়িত্ব এবং ক্ষমতা যাদের তারাই অন্যায়কারী, আর জগতে যারা কোনো কাজই করে না করতে পারেও না, দয়ামায়া কেবল তাদেরই— এই সহজ অহংকারের মত্ততায় সত্যমিথ্যার প্রমাণ নিতেও মন চায় না।"

অচিরা বললে, "সত্য নয় বলতে চান ?"

আমি বললুম, "সত্য শব্দটা আপেক্ষিক। যা কিছু যত ভালোই হোক, তার চেয়ে আরও ভালো হতেও পারে। এই দেখুন-না আমার মোটা মাইনে বটে, তার থেকে মাকে পাঠাই পঞ্চাশ, নিজে রাখি ত্রিশ, আর বাকি— সে হিসেবটা থাক্। কিন্তু মার জন্যে পনেরো নিজের জন্যে পাঁচ রাখলে আইডিয়ালের আরও কাছ ঘেঁষে যেত, কিন্তু একটা সীমা আছে তো।"

অচিরা বললে, "সীমাটা কি নিজের ইচ্ছের উপরেই নির্ভর করে।"

আমি বললুম, "না, অবস্থার উপরে। যে কথাটা উঠল সেটা একটু বিচার করে দেখুন। য়ুরোপে ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিজ্ম্ গড়ে উঠেছে দীর্ঘকাল ধরে। যাদের হাতে টাকা ছিল এবং টাকা করবার প্রতিভা ছিল তারাই এটা গড়েছে। গড়েছে নিছক টাকার লোভে, সেটা ভালো নয় তা মানি। কিন্তু ঐ ঘুষটুকু যদি না পেত তা হলে একেবারে গড়াই হত না, এতদিন পরে আজ ওখানে পড়েছে হিসেবনিকেশের তলব।"

অচিরা বললে, "আপনি বলতে চান পায়ে তেল শুরুতে, কানমলা তার পরে ?"

"নিশ্চয়। আমাদের দেশে ভিত-গাঁথা সবে আরম্ভ হয়েছে এখনই যদি মার লাগাই তা হলে শুরুতেই হবে শেষ, সুবিধে হবে বিদেশী বণিকদের। মানছি আজ আমি লোভীদের ঘুষ দেওয়ার কাজ নিয়েছি, টাকাওয়ালার নায়েবি আমি করি। আজ সেলাম করছি বাদশার দরবারে এসে, কাল ওদের সিংহাসনের পায়ায় লাগাব কুড়ুল। ইতিহাসে তো এই দেখা গেছে।"

অচিরা বললে, "সব বুঝলুম। কিন্তু আমি দিনের পর দিন অপেক্ষা করে আছি দেখতে, এই স্ট্রাইক মেটাতে আপনি নিজে কবে যাবেন। নিশ্চয়ই আপনাকে ডাকও পড়েছিল। কিন্তু কেন যান নি ?"

চাপা গলায় বলতে চেষ্টা করলুম, "এখানে কাজ ছিল বিস্তর।" কিন্তু ফাঁকি দেব কী করে। আমার ব্যবহারে তো আমার কৈফিয়তের প্রমাণ হয় না।

কঠিন হাসি হেসে দ্রুতপদে চলে গেল অচিরা।

আর চলবে না। একটা শেষ নিষ্পত্তি করাই চাই। নইলে অপমানের অন্ত থাকবে না।

সাঁওতালী পার্বণ শেষ হয়েছে। সকালে বেড়াতে বেরিয়েছি। অচিরা সঙ্গে ছিল। উত্তরের দিকে একটা পাহাড় উঠেছে, আকাশের নীলের চেয়ে ঘন নীল। তার গায়ে গায়ে চারা শাল আর বৃদ্ধ শাল গাছে বন অন্ধকার। মাঝখান দিয়ে কাঠুরেদের পায়ে-চলার পথ। অধ্যাপক একটা অর্কিড ফুল বিশেষ করে পর্যবেক্ষণ করছেন, তাঁর পকেটে সর্বদা থাকে আতস কাচ।

গাছগুলোর মধ্যে অন্ধকার যেখানে ভ্রূকুটিল হয়ে উঠেছে আর ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে তীব্র আওয়াজে, অচিরা বসল একটা শেওলাঢাকা পাথরের উপর। পাশে ছিল মোটা জাতের বাঁশগাছ, তারই ছাঁটা কঞ্চির উপর আমি বসলুম। আজ সকাল থেকে অচিরার মুখে বেশি কথা ছিল না। সেইজন্যেই তার সঙ্গে আমার কথা কওয়া বাধা পাচ্ছিল।

সামনের দিকে তাকিয়ে এক সময় সে আস্তে আস্তে বলে উঠল, "সমস্ত বনটা মিলে প্রকাণ্ড একটা বহুঅঙ্গওয়ালা প্রাণী। গুঁড়ি মেরে বসে আছে শিকারি জন্তুর মতো। যেন স্থলচর অক্টোপাশ, কালো চোখ দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার নিরন্তর হিপনটিজমে ক্রমে ক্রমে দিনে দিনে আমার মনের মধ্যে একটা ভয়ের বোঝা যেন নিরেট হয়ে উঠেছে।"

আমি বললুম, "কতকটা এইরকম কথাই এই সেদিন আমার ডায়ারিতে লিখেছি।"

অচিরা বলে চলল, "মনটা যেন পুরোনো ইমারত, সকল কাজের বার। নিষ্ঠুর অরণ্য যেখানে পেয়েছে তার ফাটল, চালিয়ে দিয়েছে শিকড়, সমস্ত ভিতরটাকে টানছে ভাঙনের দিকে। এই বোবা কালা মহাকায় জন্তু মনের ফাটল আবিষ্কার করতে মজবুত—আমার ভয় বেড়ে চলেছে। দাদু বলেছিলেন, 'লোকালয় থেকে একান্ত দূরে থাকলে মানুষের মনঃপ্রকৃতি আসে অবশ হয়ে, প্রবল হয়ে ওঠে তার প্রাণ-প্রকৃতি।' আমি জিগ্‌গেস করলুম, 'এর প্রতিকার কী।' তিনি বললেন, 'মানুষের মনের শক্তিকে আমরা সঙ্গে করে আনতে পারি, এই দেখো-না এনেছি তাকে আমার লাইব্রেরিতে।' দাদুর উপযুক্ত এই উত্তর। কিন্তু আপনি কী বলেন।"

আমি বললুম, "আমাদের মন খোঁজে এমন একজন মানুষের সঙ্গ যে আমাদের সমস্ত অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ জাগিয়ে রাখতে পারে, চেতনার বন্যা বইয়ে দেয় জনশূন্যতার মধ্যে। এ তো লাইব্রেরির সাধ্য নয়।"

অচিরা একটু অবজ্ঞা করে বললে, "আপনি যার খোঁজ করছেন তেমন মানুষ পাওয়া যায় বইকি, যদি বড্ড দরকার পড়ে। তারা চৈতন্যকে উসকিয়ে তোলে নিজের দিকেই, বন্যা বইয়ে দিয়ে সাধনার বাঁধ ভেঙে ফেলে। এ সমস্তই কবিদের বানানো কথা, মোহরস দিয়ে জারানো। আপনাদের মতো বুকের-পাটাওয়ালা লোকের মুখে মানায় না। প্রথম যখন আপনাকে দেখেছিলুম, তখন দেখেছি আপনি রস খুঁজে বেড়ান নি, পথ খুঁড়ে বেরিয়েছিলেন কড়া মাটি ভেঙে। দেখেছি আপনার নিরাসক্ত পৌরুষের মূর্তি— সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আপনাকে প্রণাম করেছি। আজ আপনি কথার পুতুল দিয়ে নিজেকে ভোলাতে বসেছেন। এ দশা ঘটালে কে। স্পষ্ট করেই জিজ্ঞাসা করি, এর কারণ কি আমি।"

আমি বললুম, "তা হতে পারে। কিন্তু আপনি তো সাধারণ মেয়ে নন। পুরুষকে আপনি শক্তি দেবেন।"

"হাঁ, শক্তি দেব, যদি নিজেকেই মোহ জড়িয়ে না ধরে। আভাসে বুঝেছি আপনি আমার ইতিহাস কিছু কিছু সংগ্রহ করেছেন। আপনার কাছে কিছু ঢাকবার দরকার নেই। আপনি শুনেছেন আমি ভবতোষকে ভালোবেসেছিলুম।"

"হাঁ শুনেছি।"

"এও জানেন আমার ভালোবাসার অপমান ঘটেছে।"

"হাঁ জানি।"

"সেই অপমানিত ভালোবাসা অনেকদিন ধরে আমাকে আঁকড়ে ধরে দুর্বল করেছে। আমি জেদ করে বসেছিলুম তারই একনিষ্ঠ স্মৃতিকে জীবনের পূজামন্দিরে বসাব। চিরদিন একমনে সেই নিষ্ফল সাধনা করব মেয়েরা যাকে বলে সতীত্ব। নিজের ভালোবাসার অহংকারে সংসারকে ঠেলে ফেলে নির্জনে চলে এসেছি। কর্তব্যকে অবজ্ঞা করেছি নিজের দুঃখকে সম্মান করব ব'লে। আমার দাদুকে অনায়াসে সরিয়ে এনেছি তাঁর কাজের ক্ষেত্র থেকে— যেন এই মেয়েটার হৃদয়ের অহমিকা পৃথিবীর সবকিছুর উপরে। মোহ, মোহ, অন্ধ মোহ।"

খানিক ক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ সে বলে উঠল, "জানেন, আপনিই সেই মোহ ভাঙিয়ে দিয়েছেন।"

বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। সে বললে, "আপনিই এই আত্মাবমাননা থেকে ছিনিয়ে এনে আমাকে বাঁচালেন।"

স্তব্ধ রইলুম নিরুত্তর প্রশ্ন নিয়ে।

"আপনি তখনও আমাকে দেখেন নি। আমি আশ্চর্য হয়ে দেখেছি আপনার

দুঃসাধ্য প্রয়াসের দিনগুলি— সঙ্গ নেই, আরাম নেই, ক্লান্তি নেই, একটু কোথাও ছিদ্র নেই অধ্যবসায়ে। দেখেছি আপনার প্রশস্ত ললাট, আপনার চাপা ঠোঁটে অপরাজেয় ইচ্ছাশক্তির লক্ষণ, আর দেখেছি মানুষকে কী রকম অনায়াসে প্রভুত্বের জোরে চালনা করেন। দাদুর কাছে আমি মানুষ, আমি পুরুষের ভক্ত, যে পুরুষ সত্য যে পুরুষ তপস্বী। সেই পুরুষকেই দেখবার জন্যে আমার ভক্তিপিপাসু নারী ভিতরে ভিতরে অপেক্ষা করে ছিল নিজের অগোচরে। মাঝখানে এসেছিল অপদেবতা প্রবৃত্তির টানে। অবশেষে নিষ্কাম পুরুষের সুদৃঢ় শক্তিরূপ আপনিই আনলেন আমার চোখের সামনে।"

আমি জিগ্‌গেসা করলুম, "তার পর কি ভাবের পরিবর্তন হয়েছে।"

"হাঁ হয়েছে। আপনার বেদি থেকে নেমে এসেছেন প্রতিদিন। স্থানীয় কাগজে পড়লুম, দূরে অন্য-এক জায়গায় সন্ধানের কাজে আপনার ডাক পড়েছে। আপনি নড়লেন না, ভিতরে ভিতরে আত্মগ্লানি ভোগ করলেন। আপনার পথের সামনেকার ঢেলাখানার মতো আমাকে লাথি মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন না কেন। কেন নিষ্ঠুর হতে পারলেন না। যদি পারতেন তবে আমি ধন্য হতুম। আমার ব্রতের পারণা হত আমার কান্না দিয়ে।"

মৃদুস্বরে বললুম, "যাবার জন্যেই কাগজপত্তর গুছিয়ে নিচ্ছিলুম।"

"না, না, কখনোই না। মিথ্যে ছুতো করে নিজেকে ভোলাচ্ছিলেন। যতই দেখলুম আপনার দুর্বলতা, ভয় হতে লাগল আমার নিজেকে নিয়ে। ছি, ছি, কী পরাভবের বিষ এনেছি নারীর জীবনে, কেবল অন্যের জন্যে নয়, নিজের জন্যেও। ক্রমশই একটা চাঞ্চল্য আমাকে পেয়ে বসল, সে যেন এই বনের বিষনিশ্বাস থেকে। একদিন এখানকার পিশাচী রাত্রি এমন আমাকে আবিষ্ট করে ধরেছিল যে মনে হল যে এত বড়ো প্রবৃত্তি রাক্ষসীও আছে যে আমার দাদুর কাছ থেকেও আমাকে ছিনিয়ে নিতে পারে। তখনই সেই রাত্রেই ছুটে নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে ডুব দিয়ে দিয়ে স্নান করে এসেছি।"

এই কথা বলতে বলতে অচিরা ডাক দিল, "দাদু।"

অধ্যাপক গাছতলায় বসে পড়ছিলেন। উঠে এসে স্নেহের স্বরে বললেন, "কী দিদি? দূর থেকে বসে বসে ভাবছিলুম, তোমার উপরে আজ বাণী ভর দিয়েছেন— জ্বল্ জ্বল্ করছে তোমার চোখ দুটি।"

"আমার কথা থাক্, তুমি শোনো। তুমি সেদিন বলেছিলে মানুষের চরম অভিব্যক্তি তপস্যার মধ্য দিয়ে।"

"হাঁ, আমি তাই তো বলি। বর্বর মানুষ জন্তুর পর্যায়ে। কেবলমাত্র তপস্যার মধ্য দিয়ে সে হয়েছে জ্ঞানী মানুষ। আরও তপস্যা আছে সামনে, স্থূল আবরণ যুগে যুগে ত্যাগ করতে করতে সে হবে দেবতা। পুরাণে দেবতার কল্পনা আছে, কিন্তু দেবতা ছিলেন না অতীতে, দেবতা আছেন ভবিষ্যতে। মানুষের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে।"

অচিরা বললে, "দাদু, এইবার এসো, তোমার-আমার কথাটা আপসে চুকিয়ে দিই, কদিন থেকে মনের মধ্যে তোলপাড় করছে।"

আমি উঠে পড়লুম, বললুম, "তা হলে যাই।"

"না, আপনি বসুন।— দাদু, সেই যে কলেজের অধ্যক্ষপদটা তোমার ছিল, সেটা খালি হয়েছে। তোমাকে ডাক দিয়েছে ওরা।"

অধ্যাপক আশ্চর্য হয়ে বললেন, "কী করে জানলে ভাই।"

"তোমার কাছে চিঠি এসেছে, সে আমি চুরি করেছি।"

"চুরি করেছ!"

"করব না! আমাকে সব চিঠিই দেখাও কেবল কলেজের ছাপ-মারা ঐ চিঠিটাই দেখালে না। তোমার দুরভিসন্ধি সন্দেহ করে চুরি করে দেখতে হল।"

অধ্যাপক অপরাধীর মতো ব্যস্ত হয়ে বললেন,, "আমারই অন্যায় হয়েছে।"

"কিছু অন্যায় হয় নি। আমাকে লুকোতে চেয়েছিলে যে আমার জীবনের অভি-সম্পাত এখনও তুমি নিজের উপর টেনে নিয়ে চলবে। তোমার আপন আসন থেকে আমি যে নামিয়ে এনেচি তোমাকে। আমাদের তো ঐ কাজ।"

"কী বলছ দিদি।"

"সত্যি কথাই বলছি। তুমি শিক্ষাদানযজ্ঞের হোতা, এখানে এনে আমি তোমাকে করেছি শুধু গ্রন্থকীট। বিশ্বসৃষ্টি বাদ দিলে কী দশা হয় বিশ্বকর্তার। ছাত্র না থাকলে তোমার হয় ঠিক তেমনি। সত্যি কথা বলো।"

"বরাবর ইস্কুলমাস্টারি করে এসেছি কিনা।"

"তুমি আবার ইস্কুলমাস্টার! কী যে বল তুমি! তুমি যে স্বভাবতই আচার্য। দেখেন নি, নবীনবাবু, ওঁর মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে কি, আর দয়ামায়া থাকে না। অমনি আমাকে নিয়ে পড়েন— বারো আনাই বুঝতেই পারি নে। নইলে হাতড়িয়ে বের করেন এই নবীনবাবুকে, সে হয় আরও শোচনীয়। দাদু, ছাত্র তোমার নিতান্তই চাই জানি, কিন্তু বাছাই করে নিয়ো, রূপকথার রাজা সকালে ঘুম থেকে উঠেই যার মুখ দেখত তাকেই কন্যা দান করত। তোমার বিদ্যাদান অনেকটা সেই রকম।"

"না দিদি, আমাকে বাছাই করে নেয় যারা তারাই সাহায্য পায় আমার। এখনকার দিনে কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞাপন দিয়ে ছাত্র সংগ্রহ করে, আগেকার দিনে সন্ধান করে শিক্ষক লাভ করত শিক্ষার্থী।"

"আচ্ছা, সে কথা পরে হবে। এখনকার সিদ্ধান্ত এই যে, তোমাকে তোমার সেই কাজটা ফিরিয়ে নিতে হবে।"

অধ্যাপক হতবুদ্ধির মতো নাতনির মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। অচিরা বললে, "তুমি ভাবছ, আমার গতি কী হবে। আমার গতি তুমি। আর আমাকে ছাড়লে তোমার কী গতি জানই তো। এখন যে তোমার পনেরোই আশ্বিনে পনেরোই অক্টোবরে এক হয়ে যায়, নিজের নূতন ছাতার সঙ্গে পরের পুরোনো ছাতার স্বত্বাধিকারে ভেদজ্ঞান থাকে না, গাড়ি চড়ে ড্রাইভারকে এমন ঠিকানা বাতলিয়ে দাও সেই ঠিকানায় আজ পর্যন্ত কোনো বাড়ি তৈরি হয় নি, আর চাকরের ঘুম ভাঙবার ভয়ে সাবধানে পা টিপে টিপে কলতলায় নিজে গিয়ে কুঁজোয় জল ভরে নিয়ে আস।"

অধ্যাপক আমার দিকে চেয়ে বললেন, "কী তুমি বল, নবীন।"

কী জানি ওঁর হয়তো মনে হয়েছিল ওঁদের এই পারিবারিক প্রস্তাবে আমার ভোটেরও একটা মূল্য আছে।

আমি খানিক ক্ষণ চুপ করে রইলুম, তার পরে বললুম, "অচিরা দেবীর চেয়ে সত্য পরামর্শ আপনাকে কেউ দিতে পারবে না।"

অচিরা তখনই উঠে দাঁড়িয়ে পা ছুঁয়ে আমাকে প্রণাম করলে। বোধ হল যেন চোখ থেকে জল পড়ল আমার পায়ে। আমি সংকুচিত হয়ে পিছু হটে গেলুম।

অচিরা বললে, সংকোচ করবেন না। আপনার তুলনায় আমি কিছুই নই সে কথা নিশ্চয় জানবেন। এই কিন্তু শেষ বিদায়, যাবার আগে আর দেখা হবে না।"

অধ্যাপক বিস্মিত হয়ে বললেন, "সে কী কথা, দিদি।"

অচিরা বাষ্পগদগদ কণ্ঠ সামলিয়ে হেসে বললে, "দাদু, তুমি অনেক-কিছু জান, কিন্তু আরও-কিছু সম্বন্ধে আমার বুদ্ধি তোমার চেয়ে অনেক বেশি, এ কথাটা মেনে নিয়ো।"

এই বলে চলতে উদ্যত হল। আবার ফিরে এসে বললে, "আমাকে ভুল বুঝবেন না— আজ আমার তীব্র আনন্দ হচ্ছে যে আপনাকে মুক্তি দিলুম— তার থেকে আমারও মুক্তি। আমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে— লুকোব না, জল আরও পড়বে। নারীর চোখের জল তাঁরই সম্মানে যিনি সব বন্ধন কাটিয়ে জয়যাত্রায় বেরিয়েছেন।"

দ্রুতপদে অচিরা চলে গেল।

আমি পদধূলি নিয়ে প্রণাম করলুম অধ্যাপককে। তিনি আমাকে বুকে চেপে ধরে বললেন, "আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তোমার সামনে কীর্তির পথ প্রশস্ত।"

ছোটো গল্প ফুরল। পরেকার কথাটা খনি-খোঁড়ার ব্যাপার নিয়ে। তারও পরে আরও বাকি আছে— সে ইতিহাস নিরতিশয় একলার অভিযান, জনতার মাঝখান দিয়ে দুর্গম পথে রুদ্ধ দুর্গের দ্বার-অভিমুখে।

বাড়ি ফিরে গিয়ে যত আমার প্ল্যান আর নোট আর রেকর্ড উলটে পালটে নাড়া-চাড়া করলুম। দেখলুম, সামনে দিগন্তবিস্তৃত কাজের ক্ষেত্র, তাতেই আমার বৃহৎ ছুটি।

সন্ধেবেলায় বারান্দায় এসে বসলুম। খাঁচা ভেঙে গেছে। পাখির পায়ে আটকে রইল ছিন্ন শিকল। সেটা নড়তে চড়তে পায়ে বাজবে।

৪।১০।৩৯

প্রবন্ধ

বিশ্বপরিচয়

২৫|২৩

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু

প্রীতিভাজনেষু

এই বইখানি তোমার নামের সঙ্গে যুক্ত করছি। বলা বাহুল্য এর মধ্যে এমন বিজ্ঞানসম্পদ নেই যা বিনা সংকোচে তোমার হাতে দেবার যোগ্য। তা ছাড়া, অনধিকারপ্রবেশে ভুলের আশঙ্কা করে লজ্জা বোধ করছি, হয়তো তোমার সম্মান রক্ষা করাই হল না। কয়েকটি প্রামাণ্য গ্রন্থ সামনে রেখে সাধ্যমতো নিড়ানি চালিয়েছি। কিছু ওপড়ানো হল। যাই হোক আমার দুঃসাহসের দৃষ্টান্তে যদি কোনো মনীষী, যিনি একাধারে সাহিত্যরসিক ও বিজ্ঞানী, এই অত্যাবশ্যক কর্তব্যকর্মে নামেন তা হলে আমার এই চেষ্টা চরিতার্থ হবে।

শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক। এই জায়গায় বিজ্ঞানের সেই প্রথমপরিচয় ঘটিয়ে দেবার কাজে সাহিত্যের সহায়তা স্বীকার করলে তাতে অগৌরব নেই। সেই দায়িত্ব নিয়েই আমি এ কাজ শুরু করেছি। কিন্তু এর জবাবদিহি একা কেবল সাহিত্যের কাছেই নয়, বিজ্ঞানের কাছেও বটে। তথ্যের যাথার্থ্যে এবং সেটাকে প্রকাশ করবার যাথাযথ্যে বিজ্ঞান অল্পমাত্রও স্খলন ক্ষমা করে না। অল্প সাধ্যসত্ত্বেও যথাসম্ভব সতর্ক হয়েছি। বস্তুত আমি কর্তব্যবোধে লিখেছি কিন্তু কর্তব্য কেবল ছাত্রের প্রতি নয় আমার নিজের প্রতিও। এই লেখার ভিতর দিয়ে আমার নিজেকেও শিক্ষা দিয়ে চলতে হয়েছে। এই ছাত্রমনোভাবের সাধনা হয়তো ছাত্রদের শিক্ষাসাধনার পক্ষে উপযোগী হতেও পারে।

আমার কৈফিয়তটা তোমার কাছে একটু বড়ো করেই বলতে হচ্ছে, তা হলেই এই লেখাটি সম্বন্ধে আমার মনস্তত্ত্ব তোমার কাছে স্পষ্ট হতে পারবে।

বিশ্বজগৎ আপন অতিছোটোকে ঢাকা দিয়ে রাখল, অতিবড়োকে ছোটো করে দিল, কিংবা নেপথ্যে সরিয়ে ফেলল। মানুষের সহজ শক্তির কাঠামোর

মধ্যে ধরতে পারে নিজের চেহারাটাকে এমনি করে সাজিয়ে আমাদের কাছে ধরল। কিন্তু মানুষ আর যাই হোক সহজ মানুষ নয়। মানুষ একমাত্র জীব যে আপনার সহজ বোধকেই সন্দেহ করেছে, প্রতিবাদ করেছে, হার মানাতে পারলেই খুশি হয়েছে। মানুষ সহজশক্তির সীমানা ছাড়াবার সাধনায় দূরকে করেছে নিকট, অদৃশ্যকে করেছে প্রত্যক্ষ, দুর্বোধকে দিয়েছে ভাষা। প্রকাশলোকের অন্তরে আছে যে অপ্রকাশলোক, মানুষ সেই গহনে প্রবেশ ক'রে বিশ্বব্যাপারের মূলরহস্য কেবলই অবারিত করছে। যে সাধনায় এটা সম্ভব হয়েছে তার সুযোগ ও শক্তি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষেরই নেই। অথচ যারা এই সাধনার শক্তি ও দান থেকে একেবারেই বঞ্চিত হল তারা আধুনিক যুগের প্রত্যন্তদেশে একঘরে হয়ে রইল।

বড়ো অরণ্যে গাছতলায় শুকনো পাতা আপনি খসে পড়ে, তাতেই মাটিকে করে উর্বরা। বিজ্ঞানচর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিসগুলি কেবলই ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারই অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে। এই দৈন্য কেবল বিদ্যার বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রে আমাদের অকৃতার্থ করে রাখছে।

আমাদের মতো আনাড়ি এই অভাব অল্পমাত্র দূর করবার চেষ্টাতেও প্রবৃত্ত হলে তারাই সব চেয়ে কৌতুক বোধ করবে যারা আমারই মতো আনাড়ির দলে। কিন্তু আমার তরফে সামান্য কিছু বলবার আছে। শিশুর প্রতি মায়ের ঔৎসুক্য আছে কিন্তু ডাক্তারের মতো তার বিদ্যা নেই। বিদ্যাটি সে ধার করে নিতে পারে কিন্তু ঔৎসুক্য ধার করা চলে না। এই ঔৎসুক্য শুশ্রূষায় যে-রস জোগায় সেটা অবহেলা করবার জিনিস নয়।

আমি বিজ্ঞানের সাধক নই সে কথা বলা বাহুল্য। কিন্তু বালককাল থেকে বিজ্ঞানের রস আস্বাদনে আমার লোভের অন্ত ছিল না। আমার বয়স বোধ করি তখন নয়-দশ বছর; মাঝে মাঝে রবিবারে হঠাৎ আসতেন সীতানাথ দত্ত [ঘোষ] মহাশয়। আজ জানি তাঁর পুঁজি বেশি ছিল না, কিন্তু বিজ্ঞানের অতিসাধারণ দুই-একটি তত্ত্ব যখন দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিতেন

আমার মন বিস্ফারিত হয়ে যেত। মনে আছে আগুনে বসালে তলার জল গরমে হালকা হয়ে উপরে ওঠে আর উপরের ঠাণ্ডা ভারী জল নিচে নামতে থাকে, জল গরম হওয়ার এই কারণটা যখন তিনি কাঠের গুঁড়োর যোগে স্পষ্ট করে দিলেন, তখন অনবচ্ছিন্ন জলে একই কালে যে উপরে নিচে নিরন্তর ভেদ ঘটতে পারে তারই বিস্ময়ের স্মৃতি আজও মনে আছে। যে-ঘটনাকে স্বতই সহজ ব'লে বিনা চিন্তায় ধরে নিয়েছিলুম সেটা সহজ নয় এই কথাটা বোধ হয় সেই প্রথম আমার মনকে ভাবিয়ে তুলেছিল। তার পরে বয়স তখন হয়তো বারো হবে (কেউ কেউ যেমন রঙ-কানা থাকে আমি তেমনি তারিখ-কানা এই কথাটি বলে রাখা ভালো) পিতৃদেবের সঙ্গে গিয়েছিলুম ড্যালহৌসি পাহাড়ে। সমস্ত দিন ঝাঁপানে করে গিয়ে সন্ধ্যাবেলায় পৌঁছতুম ডাকবাংলায়। তিনি চৌকি আনিয়ে আঙিনায় বসতেন। দেখতে দেখতে, গিরিশৃঙ্গের বেড়া-দেওয়া নিবিড় নীল আকাশের স্বচ্ছ অন্ধকারে তারাগুলি যেন কাছে নেমে আসত। তিনি আমাকে নক্ষত্র চিনিয়ে দিতেন, গ্রহ চিনিয়ে দিতেন। শুধু চিনিয়ে দেওয়া নয়, সূর্য থেকে তাদের কক্ষচক্রের দূরত্বমাত্রা, প্রদক্ষিণের সময় এবং অন্যান্য বিবরণ আমাকে শুনিয়ে যেতেন। তিনি যা বলে যেতেন তাই মনে ক'রে তখনকার কাঁচা হাতে আমি একটা বড়ো প্রবন্ধ লিখেছি। স্বাদ পেয়েছিলুম বলেই লিখেছিলুম, জীবনে এই আমার প্রথম ধারাবাহিক রচনা, আর সেটা বৈজ্ঞানিক সংবাদ নিয়ে।

তার পরে বয়স আরও বেড়ে উঠল। ইংরেজি ভাষা অনেকখানি আন্দাজে বোঝবার মতো বুদ্ধি তখন আমার খুলেছে। সহজবোধ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই যেখানে যত পেয়েছি পড়তে ছাড়ি নি। মাঝে মাঝে গাণিতিক দুর্গমতায় পথ বন্ধুর হয়ে উঠেছে, তার কৃচ্ছ্র তার উপর দিয়ে মনটাকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছি। তার থেকে একটা এই শিক্ষা লাভ করেছি যে, জীবনে প্রথম অভিজ্ঞতার পথে সবই যে আমরা বুঝি তাও নয় আর সবই সুস্পষ্ট না বুঝলে আমাদের পথ এগোয় না এ কথাও বলা চলে না। জলস্থল-বিভাগের মতোই আমরা যা বুঝি তার চেয়ে না বুঝি অনেক বেশি, তবুও চলে যাচ্ছে এবং আনন্দ পাচ্ছি। কতক পরিমাণে না-বোঝাটাও আমাদের এগোবার দিকে

ঠেলে দেয়। যখন ক্লাসে পড়াতুম এই কথাটা আমার মনে ছিল। আমি অনেক সময়েই বড়োবয়সের পাঠ্যসাহিত্য ছেলেবয়সের ছাত্রদের কাছে ধরেছি। কতটা বুঝেছে তার সম্পূর্ণ হিসাব নিই নি, হিসাবের বাইরেও তারা এক রকম ক'রে অনেকখানি বোঝে যা মোটে অপথ্য নয়। এই বোধটা পরীক্ষকের পেনসিলমার্কার অধিকারগম্য নয় কিন্তু এর যথেষ্ট মূল্য আছে। অন্তত আমার জীবনে এইরকম পড়ে-পাওয়া জিনিস বাদ দিলে অনেকখানিই বাদ পড়বে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের সহজ বই পড়তে লেগে গেলুম। এই বিষয়ের বই তখন কম বের হয় নি। স্যার রবর্ট বল-এর বড়ো বইটা আমাকে অত্যন্ত আনন্দ দিয়েছে। এই আনন্দের অনুসরণ করবার আকাঙ্ক্ষায় নিউকোম্ব্‌স্‌, ফ্লামরিয় প্রভৃতি অনেক লেখকের অনেক বই পড়ে গেছি— গলাধঃকরণ করেছি শাঁসসুদ্ধ বীজসুদ্ধ। তার পরে এক সময়ে সাহস ক'রে ধরেছিলুম প্রাণতত্ত্ব সম্বন্ধে হক্সলির এক সেট প্রবন্ধমালা। জ্যোতির্বিজ্ঞান আর প্রাণবিজ্ঞান কেবলই এই দুটি বিষয় নিয়ে আমার মন নাড়াচাড়া করেছে। তাকে পাকা শিক্ষা বলে না, অর্থাৎ তাতে পাণ্ডিত্যের শক্ত গাঁথুনি নেই। কিন্তু ক্রমাগত পড়তে পড়তে মনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক একটা মেজাজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। অন্ধবিশ্বাসের মূঢ়তার প্রতি অশ্রদ্ধা আমাকে বুদ্ধির উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে আশা করি অনেক পরিমাণে রক্ষা করেছে। অথচ কবিত্বের এলাকায় কল্পনার মহলে বিশেষ যে লোকসান ঘটিয়েছে সে তো অনুভব করি নে।

আজ বয়সের শেষপর্বে মন অভিভূত নব্যপ্রাকৃততত্ত্বে— বৈজ্ঞানিক মায়াবাদে। তখন যা পড়েছিলুম তার সব বুঝি নি। কিন্তু পড়ে চলেছিলুম। আজও যা পড়ি তার সবটা বোঝা আমার পক্ষে অসম্ভব, অনেক বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের পক্ষেও তাই।

বিজ্ঞান থেকে যাঁরা চিত্তের খাদ্য সংগ্রহ করতে পারেন তাঁরা তপস্বী।— মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ, আমি রস পাই মাত্র। সেটা গর্ব করবার মতো কিছু নয়, কিন্তু মন খুশি হয়ে বলে যথালাভ। এই বইখানা সেই যথালাভের ঝুলি, মাধুকরী বৃত্তি নিয়ে পাঁচ দরজা থেকে এর সংগ্রহ।

পাণ্ডিত্য বেশি নেই সুতরাং সেটাকে বেমালুম ক'রে রাখতে বেশি চেষ্টা পেতে হয় নি। চেষ্টা করেছি ভাষার দিকে। বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ শিক্ষার জন্যে পারিভাষিকের প্রয়োজন আছে। কিন্তু পারিভাষিক চর্ব্যজাতের জিনিস। দাঁত-ওঠার পরে সেটা পথ্য। সেই কথা মনে করে যতদূর পারি পরিভাষা এড়িয়ে সহজ ভাষার দিকে মন দিয়েছি।

এই বইখানিতে একটি কথা লক্ষ্য করবে— এর নৌকোটা অর্থাৎ এর ভাষাটা যাতে সহজে চলে সে চেষ্টা এতে আছে কিন্তু মাল খুব বেশি কমিয়ে দিয়ে একে হালকা করা কর্তব্য বোধ করি নি। দয়া করে বঞ্চিত করাকে দয়া বলে না। আমার মত এই যে, যাদের মন কাঁচা তারা যতটা স্বভাবত পারে নেবে, না পারে আপনি ছেড়ে দিয়ে যাবে, তাই বলে তাদের পাতটাকে প্রায় ভোজ্যশূন্য করে দেওয়া সদ্ব্যবহার নয়। যে-বিষয়টা শেখবার সামগ্রী, নিছক ভোগ করবার নয়, তার উপর দিয়ে অবাধে চোখ বুলিয়ে যাওয়াকে পড়া বলা যায় না। মন দেওয়া এবং চেষ্টা করে বোঝাটাও শিক্ষার অঙ্গ, সেটা আনন্দেরই সহচর। নিজের যে-শিক্ষার চেষ্টা বাল্যকালে নিজের হাতে গ্রহণ করেছিলুম তার থেকে আমার এই অভিজ্ঞতা। এক বয়সে দুধ যখন ভালোবাসতুম না, তখন গুরুজনদের ফাঁকি দেবার জন্যে দুধটাকে প্রায় আগাগোড়া ফেনিয়ে বাটি ভরতি করার চক্রান্ত করেছি। ছেলেদের পড়বার বই যাঁরা লেখেন, দেখি তাঁরা প্রচুর পরিমাণে ফেনার জোগান দিয়ে থাকেন। এইটে ভুলে যান, জ্ঞানের যেমন আনন্দ আছে তেমনি তার মূল্যও আছে, ছেলেবেলা থেকে মূল্য ফাঁকি দেওয়া অভ্যাস হতে থাকলে যথার্থ আনন্দের অধিকারকে ফাঁকি দেওয়া হয়। চিবিয়ে খাওয়াতেই একদিকে দাঁত শক্ত হয় আর-একদিকে খাওয়ার পুরো স্বাদ পাওয়া যায়, এ বই লেখবার সময়ে সে কথাটা সাধ্যমতো ভুলি নি।

শ্রীমান প্রমথনাথ সেনগুপ্ত এম. এসসি. তোমারই ভূতপূর্ব ছাত্র। তিনি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-অধ্যাপক। বইখানি লেখবার ভার প্রথমে তাঁর উপরেই দিয়েছিলেম। ক্রমশ সরে সরে ভারটা অনেকটা আমার উপরেই এসে পড়ল। তিনি না শুরু করলে আমি সমাধা করতে পারতুম

না, তা ছাড়া অনভ্যস্ত পথে শেষ পর্যন্ত অব্যবসায়ীর সাহসে কুলোত না। তাঁর কাছ থেকে ভরসাও পেয়েছি সাহায্যও পেয়েছি।

আলমোড়ায় নিভৃতে এসে লেখাটাকে সম্পূর্ণ করতে পেরেছি। মস্ত সুযোগ হল আমার স্নেহাস্পদ বন্ধু বশী সেনকে পেয়ে। তিনি যত্ন করে এই রচনার সমস্তটা পড়েছেন। পড়ে খুশী হয়েছেন এইটেতেই আমার সব চেয়ে লাভ।

আমার অসুখ অবস্থায় স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয় যত্ন করে প্রুফ সংশোধন করে দিয়ে বইখানি প্রকাশের কাজে আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন ; এজন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

শান্তিনিকেতন
২ আশ্বিন ১৩৪৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বপরিচয়

পরমাণুলোক

আমাদের সজীব দেহ কতকগুলি বোধের শক্তি নিয়ে জন্মেছে, যেমন দেখার বোধ, শোনার বোধ, ঘ্রাণের বোধ, স্বাদের বোধ, স্পর্শের বোধ। এইগুলিকে বলি অনুভূতি। এদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের ভালোমন্দ-লাগা, আমাদের সুখদুঃখ।

আমাদের এইসব অনুভূতির সীমানা বেশি বড়ো নয়। আমরা কতদূরই বা দেখতে পাই, কতটুকু শব্দই বা শুনি। অন্যান্য বোধগুলিরও দৌড় বেশি নয়। তার মানে আমরা যেটুকু বোধশক্তির সম্বল নিয়ে এসেছি সে কেবল এই পৃথিবীতেই আমাদের প্রাণ বাঁচিয়ে চলার হিসাবমতো। আরও কিছু বাড়তি হাতে থাকে। তাতেই আমরা পশুর কোঠা পেরিয়ে মানুষের কোঠায় পৌঁছতে পারি।

যে নক্ষত্র থেকে এই পৃথিবীর জন্ম, যার জ্যোতি এর প্রাণকে পালন করছে সে হচ্ছে সূর্য। এই সূর্য আমাদের চার দিকে আলোর পর্দা টাঙিয়ে দিয়েছে। পৃথিবীকে ছাড়িয়ে জগতে আর যে কিছু আছে তা দেখতে দিচ্ছে না। কিন্তু দিন শেষ হয়, সূর্য অস্ত যায়, আলোর ঢাকা যায় সরে; তখন অন্ধকার ছেয়ে বেরিয়ে পড়ে অসংখ্য নক্ষত্র। বুঝতে পারি জগৎটার সীমানা পৃথিবী ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে গেছে। কিন্তু কতটা যে দূরে তা কেবল অনুভূতিতে ধরতে পারি নে।

সেই দূরত্বের সঙ্গে আমাদের একমাত্র যোগ চোখের দেখা দিয়ে। সেখান থেকে শব্দ আসে না, কেননা শব্দের বোধ হাওয়ার থেকে। এই হাওয়া চাদরের মতোই পৃথিবীকে জড়িয়ে আছে। এই হাওয়া পৃথিবীর মধ্যেই শব্দ জাগায়, এবং শব্দের ঢেউ চালাচালি করে। পৃথিবীর বাইরে ঘ্রাণ আর স্বাদের কোনো অর্থই নেই। আমাদের স্পর্শবোধের সঙ্গে আমাদের আর-একটা বোধ আছে, ঠাণ্ডা-গরমের বোধ। পৃথিবীর বাইরের সঙ্গে আমাদের এই বোধটার অন্তত এক জায়গায় খুবই যোগ আছে। সূর্যের থেকে রোদ্দুর আসে, রোদ্দুর থেকে পাই গরম। সেই গরমে আমাদের প্রাণ। সূর্যের চেয়ে লক্ষগুণ গরম নক্ষত্র আছে। তার তাপ আমাদের বোধে পৌঁছয় না। কিন্তু সূর্যকে তো আমাদের পর বলা যায় না। অন্য যেসব অসংখ্য নক্ষত্র নিয়ে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, সূর্য তাদের মধ্যে সকলের চেয়ে আমাদের আত্মীয়। তবু মানতে হবে,

সূর্য পৃথিবীর থেকে আছে দূরে। কম দূরে নয়, প্রায় ন'কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল তার দূরত্ব। শুনে চমকে উঠলে চলবে না। যে ব্রহ্মাণ্ডে আমরা আছি এখানে ঐ দূরত্বটা নক্ষত্রলোকের সকলের চেয়ে নিচের ক্লাসের। কোনো নক্ষত্রই ওর চেয়ে পৃথিবীর কাছে নেই।

এইসব দূরের কথা শুনে আমাদের মনে চমক লাগে তার কারণ জলে মাটিতে তৈরি এই পিণ্ডটি, এই পৃথিবী, অতি ছোটো। পৃথিবীর দীর্ঘতম লাইনটি অর্থাৎ তার বিষুবরেখার কটিবেষ্টন ঘুরে আসবার পথ প্রায় পঁচিশ হাজার মাইল মাত্র। বিশ্বের পরিচয় যতই এগোবে ততই দেখতে পাবে জগতের বৃহত্ত্ব বা দূরত্বের ফর্দে এই পঁচিশ হাজার সংখ্যাটা অত্যন্ত নগণ্য। পূর্বেই বলেছি আমাদের বোধশক্তির সীমা অতি ছোটো। সর্বদা যেটুকু দূরত্ব নিয়ে আমাদের কারবার করতে হয় তা কতটুকুই বা। ঐ সামান্য দূরত্বটুকুর মধ্যেই আমাদের দেখার আমাদের চলাফেরার বরাদ্দ নির্দিষ্ট।

কিন্তু পর্দা যখন উঠে গেল, তখন আমাদের অনুভূতির সামান্য সীমানার মধ্যেই বৃহৎ বিশ্ব নিজেকে নিতান্ত ছোটো ক'রে একটুখানি আভাসে জানান দিলে, তা না হলে জানা হতই না, কেননা বড়ো দেখার চোখ আমাদের নয়। অন্য জীবজন্তুরা এইটুকু দেখাই মেনে নিলে। যতটুকু তাদের অনুভূতিতে ধরা দিল ততটুকুতেই তারা সন্তুষ্ট হল। মানুষ হল না। ইন্দ্রিয়বোধে জিনিসটার একটু ইশারা মাত্র পাওয়া গেল। কিন্তু মানুষের বুদ্ধির দৌড় তার বোধের চেয়ে আরও অনেক বেশি, জগতের সকল দৌড়ের সঙ্গেই সে পাল্লা দেবার স্পর্ধা রাখে। সে এই প্রকাণ্ড জগতের প্রকাণ্ড মাপের খবর জানতে বেরল, অনুভূতির ছেলেভুলোনো গুজব দিলে বাতিল করে। ন'কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইলকে আমরা কোনোমতেই অনুভব করতে পারি নে, কিন্তু বুদ্ধি হার মানলে না, হিসেব কষতে বসল।

বাইরের বিশ্বলোকটার কথা থাক্‌, আমরা যে পৃথিবীতে আছি, তার চেয়ে কাছে তো আর কিছুই নেই, তবু এর সমস্তটাকে এক ক'রে দেখা আমাদের বোধের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু একটি ছোটো গ্লোবে যদি তার ম্যাপ আঁকা দেখি, তা হলে পৃথিবীর সমগ্রটাকে জানার একটুখানি গোড়াপত্তন হয়। আয়তন হিসাবে গ্লোবটি পৃথিবীর অনেক-হাজার ভাগের একভাগমাত্র। আমাদের অন্যসব বোধ বাদ দিয়ে কেবলমাত্র দৃষ্টিবোধের আঁচড়কাটা পরিচয় এতে আছে। বিস্তারিত বিবরণ হিসাবে, এ একেবারে ফাঁকা। বেশি দেখবার শক্তি আমাদের নেই বলেই ছোটো করেই দেখাতে হল।

প্রতিরাত্রে বিশ্বকে এই যে ছোটো করেই দেখানো হয়েছে সেও আমাদের মাথার উপরকার আকাশের গ্লোবে। দৃষ্টিবোধ ছাড়া অন্য কোনো বোধ এর মধ্যে জায়গা

পায় না। যা চিন্তা করতে মন অভিভূত হয়ে যায় এত বড়ো জিনিসকে দিকসীমানায় বদ্ধ এই আকাশটুকুর মধ্যে আমাদের কাছে ধরা হল।

কতই ছোটো করে ধরা হয়েছে তার একটুখানি আন্দাজ পেতে হলে সূর্যের দৃষ্টান্ত মনে আনতে হবে। স্বভাবতই আমরা যতকিছু বড়ো জিনিসকে জানি বা মনে আনতে পারি তার মধ্যে সব চেয়ে বড়ো এই পৃথিবী। এ-কে আমরা অংশ অংশ করেই দেখতে পারি। একসঙ্গে সবটার প্রকৃত ধারণা আমাদের বোধের পক্ষে অসম্ভব। অথচ সূর্য এই পৃথিবীর চেয়ে প্রায় তেরো লক্ষ গুণ বড়ো। এতবড়ো সূর্য আকাশের একটা ধারে আমাদের কাছে দেখা দিয়েছে একটি সোনার থালার মতো। সূর্যের ভিতরকার সমস্ত তুমুল তোলপাড়ের যখন খবর পাই আর তার পরে যখন দেখি ভোরবেলায় আমাদের আমবাগানের পিছন থেকে সোনার গোলকটি ধীরে ধীরে উপরে উঠে আসছে, জীবজন্তু গাছপালা আনন্দিত হয়ে উঠছে, তখন মনে ভাবি আমাদের কীরকম ভুলিয়ে রাখা হয়েছে ; আমাদের বলে দিয়েছে তোমাদের জীবনের কাজে এর বেশি জানবার কোনো দরকার নেই। না ভোলালেই বা বাঁচতুম কী করে। ঐ সূর্য আপন বিরাট স্বরূপে যা, সে যদি আমাদের অনুভূতির অল্পমাত্রও কাছে আসত তা হলে তো আমরা মুহূর্তেই লোপ পেয়ে যেতুম। এই তো গেল সূর্য। এই সূর্যের চেয়ে আরও অনেক গুণ বড়ো আছে আরও অনেক অনেক নক্ষত্র। তাদের দেখছি কতকগুলি আলোর ফুটকির মতো। যে-দূরত্বের মধ্যে এইসব নক্ষত্র ছড়ানো, ভেবে তার কিনারা পাওয়া যায় না। বিশ্বজগতের বাসা যে আকাশটাতে সেটা যে কত বড়ো সেকথা আর-একদিক থেকে ভেবে দেখা যেতে পারে। আমাদের তাপবোধে পৃথিবীর বাইরে থেকে একটা খুব বড়ো খবর খুব জোরের সঙ্গে এসে পৌঁচচ্ছে, সে হচ্ছে রৌদ্রের উত্তাপ। এ খবরটা ন'কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরের। কিন্তু ঐ তো আকাশে আকাশে আছে বহুকোটি নক্ষত্র, তাদের মধ্যে কোনো-কোনোটি সূর্যের চেয়ে বহুগুণ বেশি উত্তপ্ত। কিন্তু আমাদের ভাগ্যগুণে তাদের সম্মিলিত গরম পথেই এতটা মারা গেল যে বিশ্বজোড়া অগ্নিকাণ্ডে আমাদের আকাশটা দুঃসহ হল না। কত দূরের এই পথ, কত প্রকাণ্ড এই আকাশ। তাপের অনুভূতিকে স্পর্শ-করা ন'কোটি মাইল তার কাছে তুচ্ছ। বড়ো যজ্ঞের রান্নাঘরে যে চুলি জ্বলছে তার কাছে বসা আরামের নয়, কিন্তু বেলা দশটার কাছাকাছি শহরের সমস্ত রান্নাঘরে যে আগুন জ্বলে বড়ো আকাশে তা ছড়িয়ে যায় বলেই শহরে বাস করতে পারি। নক্ষত্রলোকের ব্যাপারটাও সেইরকম। সেখানকার আগুনের ঘটা যতই প্রচণ্ড হোক, তার চার দিকের আকাশটা আরও অনেক প্রকাণ্ড।

এই বিরাট দূরত্ব থেকে নক্ষত্রদের অস্তিত্বের খবর এনে দিচ্ছে কিসে। সহজ উত্তর হচ্ছে আলো। কিন্তু আলো যে চুপচাপ বসে খবর আউড়িয়ে যায় না, আলো যে ডাকের পেয়াদার মতো খবর পিঠে করে নিয়ে দৌড়ে চলে, বিজ্ঞানের এই একটা মস্ত আবিষ্কার। চলা বলতে সামান্য চলা নয়, এমন চলা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আর কোনো দূতেরই নেই। আমরা ছোটো পৃথিবীর মানুষ, তাই এতকাল জগতের সব চেয়ে বড়ো চলার কথাটা জানবার সুযোগ পাই নি। একদিন বিজ্ঞানীদের অত্যাশ্চর্য হিসাবের কলে ধরা পড়ে গেল, আলো চলে সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে। এমন একটা বেগ যা অঙ্কে লেখা যায়, মনে আনা যায় না। বুদ্ধিতে যার পরীক্ষা হয়, অনুভবে হয় না। আলোর এই চলনের দৌড় অনুভবে বুঝব, এই পৃথিবীটুকুতে এত বড়ো জায়গা পাব কোথায়। এইটুকুর মধ্যে ওর চলাকে আমরা না-চলার মতোই দেখে আসছি। পরখ করবার মতো স্থান পাওয়া যায় মহাশূন্যে। সূর্য আছে সেই মহাশূন্যের যে দূরত্বমাত্রা নিয়ে, সে যত কোটি মাইল হোক জ্যোতিষ্কলোকের দূরত্বের মাপকাঠিতে খুব বেশি নয়।

সুতরাং এইটুকু দূরত্বের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ছোটো মাপে মানুষ আলোর দৌড় দেখতে পেল। খবর মিলল যে, এই শূন্য পেরিয়ে সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসে প্রায় সাড়ে আট মিনিটে। অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টির পাল্লায় সূর্য যখন উপস্থিত, আসলে তার আগেই সে এসেছে। এই আগমনের খবরটি জানাতে আলো-নকিবের মিনিট আষ্টেক দেরি হল। এইটুকু দেরিতে বিশেষকিছু আসে যায় না। প্রায় তাজা খবরই পাওয়া গেছে। কিন্তু সৌরজগতের সব চেয়ে কাছে আছে যে নক্ষত্র, অর্থাৎ নক্ষত্রমহলে যাকে আমাদের পাড়াপড়শি বললে চলে, যখন সে জানান দিল 'এই যে আছি' তখন তার সেই বার্তা বয়ে আনতে আলোর সময় লাগছে চার বছরের কাছাকাছি। অর্থাৎ এইমাত্র যে খবর পাওয়া গেল সেটা চার বছরের বাসি। এইখানে দাঁড়ি টানলেই যথেষ্ট হত, কিন্তু আরও দূরের নক্ষত্র আছে যেখান থেকে আলো আসতে বহু লক্ষ বছর লাগে।

আকাশে আলোর এই চলাচলের খবর বেয়ে বিজ্ঞানে একটা প্রশ্ন উঠল, তার চলার ভঙ্গীটা কী রকম। সেও এক আশ্চর্য কথা। উত্তর পাওয়া গেছে তার চলা অতি সূক্ষ্ম ঢেউয়ের মতো। কিসের ঢেউ সেকথা ভেবে পাওয়া যায় না; কেবল আলোর ব্যবহার থেকে এটা মোটামুটি জানা গেছে ওটা ঢেউ বটে। কিন্তু মানুষের মনকে হয়রান করবার জন্যে সঙ্গে সঙ্গেই একটা জুড়িখবর তার সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ নিয়ে হাজির হল, জানিয়ে দিলে আলো অসংখ্য জ্যোতিষ্কণা নিয়ে; অতি ছিটেগুলির মতো

ক্রমাগত তার বর্ষণ। এই দুটো উলটো খবরের মিলন হল কোন্‌খানে তা ভেবে পাওয়া যায় না। এর চেয়েও আশ্চর্য একটা পরস্পর উলটো কথা আছে, সে হচ্ছে এই যে বাইরে যেটা ঘটছে সেটা একটা-কিছু ঢেউ আর বর্ষণ, আর ভিতরে আমরা যা পাচ্ছি তা, না এটা, না ওটা, তাকে আমরা বলি আলো ;—এর মানে কী, কোনো পণ্ডিত তা বলতে পারলেন না।

যা ভেবে ওঠা যায় না, যা দেখাশোনার বাইরে, তার এত সূক্ষ্ম এবং এত প্রকাণ্ড খবর পাওয়া গেল কী করে, এ প্রশ্ন মনে আসতে পারে। নিশ্চিত প্রমাণ আছে, আপাতত এ কথা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। যাঁরা প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন অসাধারণ তাঁদের জ্ঞানের তপস্যা, অত্যন্ত দুর্গম তাঁদের সন্ধানের পথ। তাঁদের কথা যাচাই করে নিতে যে বিদ্যাবুদ্ধির দরকার, তাও আমাদের অনেকের নেই। অল্প বিদ্যা নিয়ে অবিশ্বাস করতে গেলে ঠকতে হবে। প্রমাণের রাস্তা খোলাই আছে। সেই রাস্তায় চলবার সাধনা যদি কর, শক্তি যদি হয়, তবে একদিন এসব বিষয় নিয়ে সওয়ালজবাব সহজেই হতে পারবে।

আপাতত আলোর ঢেউয়ের কথাই বুঝে নেওয়া যাক। এই ঢেউ একটিমাত্র ঢেউয়ের ধারা নয়। এর সঙ্গে অনেক ঢেউ দল বেঁধেছে। কতকগুলি চোখে পড়ে, অনেকগুলি পড়ে না। এইখানে বলে রাখা ভালো, যে আলো চোখে পড়ে না, চলতি ভাষায় তাকে আলো বলে না। কিন্তু দৃশ্যই হোক অদৃশ্যই হোক একটা-কোনো শক্তির এই ধরনের ঢেউখেলিয়ে চলাই যখন উভয়েরই স্বভাব তখন বিশ্বতত্ত্বের বইয়ে ওদের পৃথক নাম অসংগত। বড়োভাই নামজাদা, ছোটোভাইকে কেউ জানে না, তবু বংশগত ঐক্য ধরে উভয়েরই থাকে একই উপাধি, এও তেমনি।

আলোর ঢেউয়ের আপন দলের আরও একটি ঢেউ আছে, সেটা চোখে দেখি নে, স্পর্শে বুঝি। সেটা তাপের ঢেউ। সৃষ্টির কাছে তার খুবই প্রতাপ। এমনিতরো আলোর-ঢেউজাতীয় নানা পদার্থের কোনোটা দেখা যায়, কোনোটা স্পর্শে বোঝা যায়; কোনোটাকে স্পষ্ট আলোরূপে জানি আবার সঙ্গে সঙ্গেই তাপরূপেও বুঝি ; কোনোটাকে দেখাও যায় না, স্পর্শেও পাওয়া যায় না। আমাদের কাছে প্রকাশিত অপ্রকাশিত আলোতরঙ্গের ভিড়কে যদি এক নাম দিতে হয়, তবে তাকে তেজ বলা যেতে পারে। বিশ্বসৃষ্টির আদি অন্তে মধ্যে প্রকাশ্যে আছে বা লুকিয়ে আছে বিভিন্ন অবস্থায় এই তেজের কাঁপন। পাথর হোক লোহা হোক বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় তাদের মধ্যে কোনো নড়াচড়া নেই। তারা যেন স্থিরত্বের আদর্শস্থল। কিন্তু এ কথা প্রমাণ হয়ে গেছে যে তাদের অণু পরমাণু, অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, যাদের দেখতে পাই নে অথচ

যাদের মিলিয়ে নিয়ে এরা আগাগোড়া তৈরি, তারা সকল সময়েই ভিতরে ভিতরে কাঁপছে। ঠাণ্ডা যখন থাকে তখনও কাঁপছে, আর কাঁপুনি যখন আরও চড়ে ওঠে তখন গরম হয়ে বাইরে থেকেই ধরা পড়ে আমাদের বোধশক্তিতে। আগুনে পোড়ালে লোহার পরমাণু কাঁপতে কাঁপতে এত বেশি অস্থির হয়ে ওঠে যে তার উত্তেজনা আর লুকানো থাকে না। তখন কাঁপনের ঢেউ আমাদের শরীরের স্পর্শনাড়ীকে ঘা-মেরে তার মধ্য দিয়ে যে খবরটা চালিয়ে দেয় তাকে বলি গরম। বস্তুত গরমটা আমাদের মারে। আলো মারে চোখে, গরম মারে গায়ে।

ছেলেবেলায় যখন একদিন মাস্টারমশায় দেখিয়ে দিলেন লোহার টুকরো আগুনে তাতিয়ে প্রথমে হয় গরম, তার পরে হয় লাল টক্‌টকে, তার পরে হয় সাদা জ্বল্‌জ্বলে, বেশ মনে আছে তখন আমাকে এই কথা নিয়ে ভাবিয়েছিল যে, আগুন তো কোনো-একটা দ্রব্য নয় যেটা লোহার সঙ্গে বাইরে থেকে মিশিয়ে লোহাকে দিয়ে এমনতরো চেহারা বদল করাতে পারে। তার পরে আজ শুনছি আরও তাপ দিলে এই লোহাটা গ্যাস হয়ে যাবে। এ সমস্তই জাদুকর তাপের কাণ্ড, সৃষ্টির আরম্ভ থেকে আজ পর্যন্ত চলেছে।

সূর্যের আলো সাদা। এই সাদা রঙে মিলিয়ে আছে সাতটা বিভিন্ন রঙের আলো। যেন সাতরঙের রশ্মির পেখম, গুটিয়ে ফেললে দেখায় সাদা, ছড়িয়ে ফেললে দেখায় সাতরঙা। সেকালে ছিল ঝাড়লণ্ঠন, বিজলিবাতির তাড়ায় তারা হয়েছে দেশছাড়া। এই ঝাড়ের গায়ে ঝুলত তিনপিঠওয়ালা কাঁচের পরকলা। এইরকম তিনপিঠওয়ালা কাঁচের গুণ এই যে, ওর ভিতর দিয়ে রোদ্দুর এলে তার থেকে সাত রঙের আলো ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে। পরে পরে রঙ বিছানো হয়; বেগনি (Violet), অতিনীল (Indigo), নীল (Blue), সবুজ (Green), হলদে (Yellow), নারাঙি (Orange) আর লাল (Red)। এই সাতটা রঙ চোখে দেখা যায় কিন্তু এদের দুই প্রান্তের বাইরে তেজের আরও অনেক ছোটো-বড়ো ঢেউ আছে, তারা আমাদের সহজ চেতনায় ধরা দেয় না। সেই জাতের যে ঢেউ বেগনি রঙের পরের পারে তাকে বলে ultra-violet light, সহজ ভাষায় বলা যাক বেগনি-পারের আলো। আর যে আলো লালের এলাকায় এসে পৌঁছয় নি, রয়েছে তার আগের পারে তাকে বলে infra-red light, আমরা বলতে পারি লাল-উজানি আলো। স্যর উইলিয়ম হার্শেল ছিলেন এক মস্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তিনপিঠওয়ালা কাঁচের মধ্য দিয়ে তিনি পরীক্ষা করে দেখেছিলেন আলোর সাতরঙা ছটা। কালোরঙ-করা তাপ-মাপের নল নিয়ে এক-একটা রঙের কাছে ধরে দেখলেন। লালরঙের দিকে উত্তাপ ধীরে ধীরে বাড়তে

লাগল। লাল পেরিয়ে নলটিকে নিয়ে গেলেন বেগুনি-অন্ধকারে, সেখানেও গরম থামতে চায় না। বোঝা গেল আরও আলো আছে ঐ অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে। তারপর এলেন এক জর্মন রসায়নী। একটা ফোটোগ্রাফির প্লেট নিয়ে পরীক্ষায় লাগলেন। এই প্লেটে লাল থেকে বেগনি পর্যন্ত সাতটা রঙের সাড়া পাওয়া গেল। শেষে বেগনি পেরিয়ে চললেন অন্ধকারে, সেখানে চোখে যা ধরা দেয় না প্লেটে তা ধরা পড়ল। দেখা গেল আলোর উত্তাপটা লালরঙের দিকে, আর রাসায়নিক ক্রিয়া বেগনি পারের দিকে। এক কালে মনে হয়েছিল অ-দেখারা রঙিন দলেরই পার্শ্বচর, অন্ধকারে পড়ে গেছে। যত এগোতে লাগল গুপ্ত আলোর সন্ধান, ততই সাতরঙা দলেরই আসন হল খাটো। বিজ্ঞানের জরীপে আলোর সীমানা আজ সাতরঙ-রাজার দেশ ছাড়িয়ে গেছে শতগুণ। লাল-উজানি আলোর দিকে ক্রমে আজ দেখা দিল যে ঢেউ সেই ঢেউ বেয়ে চলে আকাশবাণী, যাকে বলে রেডিয়োবার্তা; বেগনি-পারের দিকে প্রকাশ পেল বিখ্যাত রয়ন্টগেন আলো, যে-আলোর সাহায্যে দেহের চামড়ার ঢাকা পেরিয়ে ভিতরকার হাড় দেখতে পাওয়া যায়।

আলো জিনিসটাতে কেবল যে নক্ষত্রের অস্তিত্বের খবর দেয় তা নয়, ওদের মধ্যে কোন্ কোন্ পদার্থ মিলিয়ে আছে, মানুষ সে খবরও আলোর যেন বুক চিরে আদায় করে নিয়েছে। কেমন করে আদায় হল বুঝিয়ে বলা যাক।

তিনপিঠওয়ালা কাঁচের ভিতর দিয়ে সূর্যের সাদা আলো পার করলে তার সাতটা রঙের পরিচয় পরে পরে বেরিয়ে পড়ে। লোহা প্রভৃতি শক্ত জিনিস যথেষ্ট তেতে জ্বলে উঠলে তার আলো যখন ক্রমে সাদা হয়ে ওঠে তখন এই সাদা আলো ভাগ করলে সাত রঙের ছটা পাশাপাশি দেখা যায়। তাদের মাঝে মাঝে কোনো ফাঁক থাকে না। কিন্তু লোহাকে গরম করতে করতে যখন তা গ্যাস হয়ে যায় তখন ঐ কাঁচের ভিতর দিয়ে তার আলো ভাঙলে বর্ণচ্ছটায় একটানা আলো পাই নে। দেখা যায় আলাদা আলাদা উজ্জ্বল রেখা, তাদের মধ্যে মধ্যে থাকে আলোহীন ফাঁকা জায়গা। এই বর্ণালোকচিহ্নপাতের নাম দেওয়া যাক বর্ণলিপি।

এই লিপিতে দেখা গেছে দীপ্ত গ্যাসীয় অবস্থায় প্রত্যেক জিনিসের আলোর বর্ণচ্ছটা স্বতন্ত্র। নুনের মধ্যে সোডিয়ম নামক এক মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়। তাপ দিয়ে দিয়ে তাকে গ্যাস করে ফেললে বর্ণলিপিতে তার আলোর মধ্যে খুব কাছাকাছি দেখা যায় দুটি হলদে রেখা। আর-কোনো রঙ পাই নে। সোডিয়ম ছাড়া অন্য কোনো জিনিসেরই বর্ণচ্ছটায় ঠিক ঐ জায়গাতেই ঐ দুটি রেখা মেলে না। ঐ দুটি রেখা যেখানকারই গ্যাসের বর্ণলিপিতে দেখা যাবে বুঝব সেখানে সোডিয়ম আছেই।

কিন্তু দেখা যায় সূর্যের আলোর বর্ণচ্ছটায় সোডিয়ম গ্যাসের ঐ দুটি উজ্জ্বল হলদে রেখা চুরি গেছে, তার জায়গায় রয়েছে দুটো কালো দাগ। বিজ্ঞানী বলেন উত্তপ্ত কোনো গ্যাসীয় জিনিসের আলো সেই গ্যাসেরই অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা স্তরের ভিতর দিয়ে আসার সময় সম্পূর্ণ শোষিত হয়। এক্ষেত্রে আলোর অভাবেই যে কালো দাগের সৃষ্টি তা নয়। বস্তুত সূর্যের বর্ণমণ্ডলে যে সোডিয়ম গ্যাস সূর্যের আলো আটক করে সেও আপন উত্তাপ অনুযায়ী আলো ছড়িয়ে দেয়, আলোকমণ্ডলের তুলনায় উত্তাপ কম ব'লে এর আলো হয় অনেকটা ম্লান। এই ম্লান আলো বর্ণচ্ছটায় উজ্জ্বল আলোর পাশে কালোর বিভ্রম জন্মায়।

মৌলিক জিনিস মাত্রেরই আলো ভেঙে প্রত্যেকটির বর্ণচ্ছটার ফর্দ তৈরি হয়ে গেছে। এই বর্ণভেদের সঙ্গে তুলনা করলেই বস্তুভেদ ধরা পড়বে তা সে যেখানেই থাক্, কেবল গ্যাসীয় অবস্থায় থাকা চাই।

পৃথিবী থেকে যে বিরেনব্বইটি মৌলিক পদার্থের খবর পাওয়া গেছে সূর্যে তার সবগুলিরই থাকা উচিত, কেননা পৃথিবী সূর্যেরই দেহজাত। প্রথম পরীক্ষায় পাওয়া গিয়েছিল ছত্রিশটি মাত্র জিনিস। বাকিগুলির কী হল সেই প্রশ্নের মীমাংসা করছেন বাঙালী বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা। নূতন সন্ধানপথ বের করে সূর্যে আরও কতকগুলি মৌলিক জিনিস তিনি ধরতে পেরেছেন। তাঁর পথ বেয়ে প্রায় সবগুলিরই খবর মিলেছে। আজও যেগুলি গরঠিকানা, মাঝপথেই পৃথিবীর হাওয়া তাদের সংবাদ শুষে নেয়।

সব রঙ মিলে সূর্যের আলো সাদা, তবে কেন নানা জিনিসের নানা রঙ দেখি। তার কারণ সব জিনিস সব রঙ নিজের মধ্যে নেয় না, কোনো-কোনোটাকে বিনা ওজরে বাইরে বিদায় করে দেয়। সেই ফেরত-দেওয়া রঙটাই আমাদের চোখের লাভ। মোটা ব্লটিং যে রসটা শুষে ফেলে সে কারো ভোগে লাগে না, যে রসটা সে নেয় না সেই উদ্‌বৃত্ত রসটাই আমাদের পাওনা। এও তেমনি। চুনি পাথর সূর্যকিরণের আর-সব রকম ঢেউকেই মেনে নেয়, ফিরিয়ে দেয় লাল রঙকে। তার এই ত্যাগের দানেই চুনির খ্যাতি। যা নিজে আত্মসাৎ করেছে তার কোনো খ্যাতি নেই। লাল রঙটাই কেন যে ও নেয় না, আর নীল রঙের 'পরেই নীলা পাথরের কেন সম্পূর্ণ বৈরাগ্য এ প্রশ্নের জবাব ওদের পরমাণু-মহলে লুকানো রইল। সূর্যের সব ঢেউকেই পাকা-চুল ফিরে পাঠায় তাই সে সাদা, কাঁচা-চুল কোনো ঢেউই ফিরে দেয় না, অর্থাৎ আলোর কোনো অংশই তার কাছ থেকে ছাড়া পায় না, তাই সে কালো। জগতের সব জিনিসই যদি সূর্যের সব রঙই করত আত্মসাৎ তা হলে সেই কৃপণের জগৎটা দেখা দিত কালো হয়ে, অর্থাৎ দেখাই দিত না। যেন খবর বিলোবার সাতটা

পেয়াদাকেই পোস্টমাস্টার বন্ধ করে রাখত। অথচ কোনো আলোই যদি না নিত সবই হত সাদা, তবে সেই একাকারে সব জিনিসেরই প্রভেদ যেত ঘুচে। যেন সাতটা পেয়াদার সব চিঠিই তাল পাকিয়ে একখানা করা হত, কোনো স্বতন্ত্র খবরই পাওয়া যেত না। একই চেহারায় সবাইকে দেখাকে দেখা বলে না। না-আলো আর পূর্ণ-আলো কোনোটাতেই আমাদের দেখা চলে না, আমরা দেখি ভাঙা আলোর মেলামেশায়।

সূর্যকিরণের সঙ্গে জড়ানো এমন অনেক ঢেউ আছে, যারা অতি অল্প পরিমাণে আসে ব'লে অনুভব করতে পারি নে। এমন ঢেউও আছে যারা প্রচুর পরিমাণেই নেমে আসে, কিন্তু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল তাদের আটক করে। নইলে জ্বলে পুড়ে মরতে হত। সূর্যের যে পরিমাণ দান আমরা সইতে পারি প্রথম থেকেই তাই নিয়ে আমাদের দেহতন্ত্রের বোঝাপড়া হয়ে গেছে। তার বাইরে আমাদের জীবনযাত্রার কারবার বন্ধ।

বিশ্বছবিতে সব চেয়ে যা আমাদের চোখে পড়ে সে হল নক্ষত্রলোক, আর সূর্য, সেও একটা নক্ষত্র। মানুষের মনে এতকাল এরা প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। বর্তমান যুগে সব চেয়ে মানুষকে আশ্চর্য করে দিয়েছে এই বিশ্বের ভিতরকার লুকানো বিশ্ব, যা অতি সূক্ষ্ম, যা চোখে দেখা যায় না, অথচ যা সমস্ত সৃষ্টির মূলে।

একটা মাটির ঘর নিয়ে যদি পরখ ক'রে বের করতে চাই তার গোড়াকার জিনিসটা কী, তা হলে পাওয়া যাবে ধুলোর কণা। যখন তাকে আর গুঁড়ো করা চলবে না তখন বলব এই অতি সূক্ষ্ম ধুলোই মাটির ঘরের আদিম মালমশলা। তেমনি করেই মানুষ একদিন ভেবেছিল, বিশ্বের পদার্থগুলিকে ভাগ করতে করতে যখন এমন সূক্ষ্মে এসে ঠেকবে যে তাকে আর ভাগ করা যাবে না তখন সেইটেকেই বলব বিশ্বের আদিভূত, অর্থাৎ গোড়াকার সামগ্রী। আমাদের শাস্ত্রে তাকে বলে পরমাণু, য়ুরোপীয় শাস্ত্রে বলে অ্যাটম। এরা এত সূক্ষ্ম যে দশকোটি পরমাণুকে পাশাপাশি সাজালে তার মাপ হবে এক ইঞ্চি মাত্র।

সহজ উপায়ে ধুলোর কণাকে আর আমরা ভাগ করতে পারি নে কিন্তু বৈজ্ঞানিক তাড়নে বিশ্বের সকল সামগ্রীকে আরও অনেক বেশি সূক্ষ্মে নিয়ে যেতে পেরেছে। শেষকালে এসে ঠেকেছে বিরেনব্বইটা অমিশ্র পদার্থে। পণ্ডিতেরা বললেন এদেরই যোগ-বিয়োগে জগতের যতকিছু জিনিস গড়া হয়েছে, এদের সীমান্ত পেরোবার জো নেই।

মনে করা যাক, মাটির ঘরের এক অংশ তৈরি খাঁটি মাটি দিয়ে, আর-এক অংশ মাটিতে গোবরে মিলিয়ে। তা হলে দেয়াল গুঁড়িয়ে দুরকম জিনিস পাওয়া যাবে, এক বিশুদ্ধ ধুলোর কণা, আর-এক ধুলোর সঙ্গে মেশানো গোবরের গুঁড়ো। তেমনি বিশ্বের সব জিনিস পরখ ক'রে বিজ্ঞানীরা তাদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, এক ভাগের নাম মৌলিক, আর-এক ভাগের নাম যৌগিক। মৌলিক পদার্থে কোনো মিশল নেই, আর যৌগিক পদার্থে এক বা আরও বেশি জিনিসের যোগ আছে। সোনা মৌলিক, ওকে সাধারণ উপায়ে যত সূক্ষ্ম ভাগ কর সোনা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে না। জল যৌগিক, ওকে ভাগ করলে দুটো মৌলিক গ্যাস বেরিয়ে পড়ে, একটার নাম অক্সিজেন আর-একটার নাম হাইড্রজেন। এই দুটি গ্যাস যখন স্বতন্ত্র থাকে তখন তাদের এক রকমের গুণ, আর যেই তারা মিশে হয় জল, তখনই তাদের আর চেনবার জো থাকে না, তাদের মিলনে সম্পূর্ণ নূতন স্বভাব উৎপন্ন হয়। যৌগিক পদার্থ মাত্রেরই এই দশা। তারা আপনার মধ্যে আপন আদিপদার্থের পরিচয় গোপন করে। যা হোক এইসব অ্যাটম পদবিওয়ালারাই একদিন খ্যাতি পেয়েছিল জগতের মূল উপাদান ব'লে; সবাই বলেছিল, এদের ধাতে আর একটুকুও ভাগ সয় না। কিন্তু শেষকালে তারও ভাগ বেরল। যাকে পরমাণু বলা হয়েছে তাকেও ভাঙতে ভাঙতে ভিতরে পাওয়া গেল অতিপরমাণু; সে এক অপরূপ জিনিস, তাকে জিনিস বলতেও মুখে বাধে। বুঝিয়ে বলা যাক।

আজকাল ইলেকট্রিসিটি শব্দটা খুব চলতি— ইলেকট্রিক-বাতি, ইলেকট্রিক মশাল, ইলেকট্রিক পাখা এমন আরও কত কী। সকলেরই জানা আছে ওটা একরকমের তেজ। এও সবাই জানে মেঘের মধ্যে থেকে আকাশে যা চমক দেয় সেই বিদ্যুৎও ইলেকট্রিসিটি ছাড়া আর কিছু নয়। এই বিদ্যুৎই পৃথিবীতে আমাদের কাছে সব চেয়ে প্রবল প্রতাপে ইলেকট্রিসিটিকে, আলোয় এবং গর্জনে ঘোষণা করে। গায়ে লাগলে সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। ইলেকট্রিসিটি শব্দটাকে আমরা বাংলায় বলব বৈদ্যুত।

এই বৈদ্যুত আছে দুই জাতের। বিজ্ঞানীরা এক জাতের নাম দিয়েছেন পজিটিভ, আর-এক জাতের নাম নেগেটিভ। তর্জমা করলে দাঁড়ায় হাঁ-ধর্মী আর না-ধর্মী। এদের মেজাজ পরস্পরের উলটো, এই বিপরীতকে মিলিয়ে দিয়ে হয়েছে সমস্ত যা-কিছু। অথচ পজিটিভের প্রতি পজিটিভের, নেগেটিভের প্রতি নেগেটিভের একটা স্বভাবগত বিরুদ্ধতা আছে, এদের টানটা বিপরীত পক্ষের দিকে।

এই দুই জাতের অতি সূক্ষ্ম বৈদ্যুতকণা জোট বেঁধেছে পরমাণুতে। এই দুই পক্ষকে নিয়ে প্রত্যেক পরমাণু যেন গ্রহে সূর্যে মিলন-বাঁধা। সৌরমণ্ডলের মতো।

সূর্য যেমন সৌরলোকের কেন্দ্রে থেকে টানের লাগামে ঘোরাচ্ছে পৃথিবীকে, পজিটিভ বৈদ্যুতকণা তেমনি পরমাণুর কেন্দ্রে থেকে টান দিচ্ছে নেগেটিভ কণাগুলোকে, আর তারা সার্কাসের ঘোড়ার মতো লাগামধারা পজিটিভের চার দিকে ঘুরছে।

পৃথিবী ঘুরছে সূর্যের চার দিকে, নয় কোটি মাইলের দূরত্ব রক্ষা করে। আয়তনের তুলনায় অতিপরমাণুদের কক্ষপথের দূরত্ব অনুপাতে তার চেয়ে বেশি বই কম নয়। পরমাণু যে অণুতম আকাশ অধিকার করে আছে তার মধ্যেও দূরত্বের প্রভূত কম-বেশি আছে। ইতিপূর্বে নক্ষত্রলোকে বৃহত্ত্বের ও পরস্পর-দূরত্বের অতি প্রকাণ্ডতার কথা বলেছি, কিন্তু অতি ছোটোকেও বলা যেতে পারে অতি প্রকাণ্ড ছোটো। বৃহৎ প্রকাণ্ডতার সীমাকে সংখ্যাচিহ্ন দিয়ে ঘের দিতে গেলে যেমন একের পিছনে বিশ-পঁচিশটা অঙ্কপাত করতে হয় ক্ষুদ্রতম প্রকাণ্ডতা সম্বন্ধে সেই একই কথা। তারও সংখ্যার ফৌজ লম্বা লাইন জুড়ে দাঁড়ায়। পরমাণুর অতি সূক্ষ্ম আকাশে যে দূরত্ব বাঁচিয়ে অতিপরমাণুরা চলাফেরা করে তার উপমা উপলক্ষ্যে একজন বিখ্যাত জ্যোতিষী বলেছেন, হাওড়া স্টেশনের মতো মস্ত একটা স্টেশন থেকে অন্য সব কিছু জিনিস সরিয়ে দিয়ে কেবল গোটা পাঁচ-ছয় বোলতা ছেড়ে দিলে তবে তারই সঙ্গে তুলনা হতে পারে পরমাণুর আকাশস্থিত অতিপরমাণুদের। কিন্তু এই ব্যাপক শূন্যের মধ্যে দূরবর্তী কয়েকটি চঞ্চল পদার্থকে আটকে রাখবার জন্যে পরমাণুর কেন্দ্রবস্তুর প্রায় সমস্ত ভার সমস্ত শক্তি কাজ করছে। এ না হলে পরমাণুজগৎ ছারখার হয়ে যেত, আর পরমাণু দিয়ে গড়া বিশ্বজগতের অস্তিত্ব থাকত না।

পদার্থের মধ্যে অণুগুলি পরস্পর কাছাকাছি আছে একটা টানের শক্তিতে। তবু সোনার মতো নিরেট জিনিসের অণুরও মাঝে মাঝে ফাঁক আছে। সংখ্যা দিয়ে সেই অতি সূক্ষ্ম ফাঁকের পরিমাণ জানাতে চাই নে, তাতে মন পীড়িত হবে। প্রশ্ন ওঠে একটুও ফাঁক থাকে কেন, গ্যাস থাকে কেন, কেন থাকে তরল পদার্থ। এর একই জাতের প্রশ্ন হচ্ছে পৃথিবী কেন সূর্যের গায়ে গিয়ে এঁটে যায় না। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটা পিণ্ডে তাল পাকিয়ে যায় না কেন। এর উত্তর এই পৃথিবী সূর্যের টান মেনেও দৌড়ের বেগে তফাত থাকতে পারে। দৌড় যদি যথেষ্ট পরিমাণ বেশি হত তা হলে টানের বাঁধন ছিঁড়ে শূন্যে বেরিয়ে পড়ত, দৌড়ের বেগ যদি ক্লান্ত হত তা হলে সূর্য তাকে নিত আত্মসাৎ ক'রে। অণুদের মধ্যে ফাঁক থেকে যায় গতির বেগে, তাতেই বাঁধনের শক্তিকে ঠেলে রেখে দেয়। গ্যাসীয় পদার্থে গতির প্রাধান্য বেশি। অণুর দল এই অবস্থায় এত দ্রুতবেগে চলে যে তাদের পরস্পরের মিল ঘটবার অবকাশ থাকে না। মাঝে মাঝে তাদের সংঘাত হয় কিন্তু মুহূর্তেই আবার যায় সরে। তরল

পদার্থে আণবিক আকর্ষণের শক্তি সামান্য ব'লেই চলন বেগের জন্যে তাদের মধ্যে অতিঘনিষ্ঠতার সুযোগ হয় না। নিরেট বস্তুতে বাঁধনের শক্তিটা অপেক্ষাকৃত প্রবল। তাতে অণুর দল সীমাবদ্ধ স্থানের ভিতর আটকা পড়ে থাকে। তাই ব'লে তারা যে শান্ত থাকে তা নয় তাদের মধ্যে কম্পন চলছেই কিন্তু তাদের স্বাধীনতার ক্ষেত্র অল্পপরিসর।

অণুদের মধ্যে এই চলন কাঁপন, এই হচ্ছে তাপ। অস্থিরতা যত বাড়ে গরম ততই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এদের একেবারে শান্ত করা সম্ভব হত যদি এদের তাপ তাপমানের শূন্য অঙ্কের নিচে আরও ২৭৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড নামিয়ে দেওয়া সম্ভব হত।

এইবার হাইড্রজেন গ্যাসের পরমাণু মহলে দৃষ্টি দেওয়া যাক।

এর চেয়ে হালকা গ্যাস আর নেই। এর পরমাণুর কেন্দ্রে বিরাজ করছে একটি-মাত্র বৈদ্যুতকণা যাকে বলে প্রোটন, আর তার টানে বাঁধা প'ড়ে চার দিকে ঘুরছে অন্য একটিমাত্র কণিকা যার নাম ইলেকট্রন। প্রোটন-কণায় যে বৈদ্যুতের প্রভাব সে পজিটিভধর্মী, আর ইলেকট্রনকণা যে বৈদ্যুতের বাহন সে নেগেটিভধর্মী। নেগেটিভ ইলেকট্রন চটুল চঞ্চল, পজিটিভ প্রোটন রাশভারি। ইলেকট্রনের ওজনটা গণ্যের মধ্যেই নয়, পরমাণুর প্রায় সমস্ত ভার কেন্দ্রবস্তুতে হয়েছে জমা।

মোটের উপরে সব ইলেকট্রনই না-ধর্মী বটে কিন্তু এমন একজাতের ইলেকট্রন ধরা পড়েছে যারা হাঁ-ধর্মী, অথচ ওজনে ইলেকট্রনেরই সমান। এদের নাম দেওয়া হয়েছে পজিট্রন।

কখনো কখনো দেখা গেছে বিশেষ হাইড্রজেনের পরমাণু সাধারণের চেয়ে ডবল ভারি। পরীক্ষায় বেরিয়ে পড়ল কেন্দ্রস্থলে প্রোটনের সঙ্গে আছে তার এক সহযোগী। পূর্বেই বলেছি প্রোটন হাঁ-ধর্মী। তার কেন্দ্রের শরিকটিকে পৃথক করে দেখা গেল সে সাম্যধর্মী, হাঁ-ধর্মীও নয়, না-ধর্মীও নয়। অতএব সে বৈদ্যুতধর্মবর্জিত। সে আপন প্রোটন শরিকের সমান ওজনের, কিন্তু প্রোটন যেমন ক'রে ইলেকট্রনকে টানে এ তেমন টানতে পারে না, আবার প্রোটনকে ঠেলে ফেলবার চেষ্টাও তার নেই। এই কণার নাম দেওয়া হয়েছে ন্যুট্রন। এটি লক্ষ্য করে দেখা গিয়েছে অন্য জাতের বাটখারা দিয়ে পরমাণু যতই ভারি করা যাক ইলেকট্রনের উপরে সেই সাম্যধর্মীদের কোনো জোর খাটে না—একটি প্রোটন কেবল একটিমাত্র ইলেকট্রনকে শাসনে রাখে। পরমাণুকেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যা যে পরিমাণ বেশি হয় সেই পরিমাণ ইলেকট্রনকে তারা বশে রাখে। অক্সিজেন গ্যাসের পরমাণুকেন্দ্রে আছে আটটি প্রোটন, সঙ্গে থাকে আটটি ন্যুট্রন, তার প্রদক্ষিণকারী ইলেকট্রনের সংখ্যা থাকে ঠিক আটটি।

পজিটিভে নেগেটিভে যথাপরিমাণ মিলে যেখানে সন্ধি করে আছে সেখানে যদি কোনো উপায়ে গৃহবিচ্ছেদ ঘটানো যায়, গুটিকতক নেগেটিভকে দেওয়া যায় তফাত করে, তা হলে সেই জিনিসে বৈদ্যুতের পরিমাণের হিসাবে হবে গরমিল, অতিরিক্ত হয়ে পড়বে পজিটিভ বৈদ্যুতের চার্জ। মেয়েপুরুষে মিলে যেখানে গৃহস্থালীর সামঞ্জস্য সেখানে মেয়ের প্রভাবকে যে-পরিমাণে সরিয়ে দেওয়া যাবে, সে-সংসারটা সেই পরিমাণে হয়ে পড়বে পুরুষপ্রধান; এও তেমনি।

এই চার্জ কথাটা ইলেকট্রিসিটির প্রসঙ্গে সর্বদাই ব্যবহারে লাগে। সাধারণত যে-সব জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করি তাদের মধ্যে বৈদ্যুতের কোনো ছটফটানি দেখা যায় না, তারা চার্জ করা নয়, অর্থাৎ দুই জাতের যে-পরিমাণ বৈদ্যুতে মিলে মিশে থাকলে শান্তি রক্ষা হয় তা তাদের মধ্যে আছে। কিন্তু কোনো জিনিসে কোনো একটা জাতের বৈদ্যুত যদি সন্ধি না মেনে আপন নির্দিষ্ট পরিমাণ ছাপিয়ে বাড়াবাড়ি করে তা হলে সেই বৈদ্যুতের দ্বারা জিনিসটা চার্জ করা হয়েছে বলা হয়।

এক টুকরো রেশম নিয়ে কাঁচের গায়ে ঘষা গেল। ফল হল এই যে ঘষড়ানিতে কাঁচের থেকে কিছু ইলেকট্রন এল বেরিয়ে, সেটা চালান হল রেশমে। কাঁচে নেগেটিভ কমতেই পজিটিভ বৈদ্যুতের প্রাধান্য হল, ওদিকে রেশমে নেগেটিভ বৈদ্যুতের প্রভাব বাড়ল, সেটা হল নেগেটিভ বৈদ্যুতের দ্বারা চার্জ করা। ইলেকট্রন-খোয়ানো কাঁচ তার পজিটিভ চার্জের ঝোঁকে টেনে নিতে চাইল রেশমটাকে, আবার নেগেটিভের ভিড়-বাহুল্যওয়ালা রেশমে টান পড়ল কাঁচের দিকে। কাঁচ বা রেশমে সাধারণতন্ত্র যখন অক্ষুণ্ণ ছিল তখন আপনাতে আপনি ছিল সহজ, ছিল শান্ত। শান্ত অবস্থায় এদের মধ্যে বৈদ্যুতের অস্তিত্ব জানাই যায় নি। বাইরে বৈদ্যুতিক গৃহবিপ্লবের খবর তখনই বেরিয়ে পড়ল যেমনি ভাগাভাগির অসমানতায় ক্ষোভ জন্মিয়ে দিলে।

কাঁচ কিংবা অন্য কিছুর থেকে ঘষাঘষির দ্বারা সামান্য পরিমাণ ইলেকট্রন সরিয়ে নেবার কথা বলেছি। পরিমাণটা কত যদি বিজ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করা যায় তিনি সামান্য একটু ঘাড় নেড়ে বলবেন, ঘষড়ানির মাত্রা অনুসারে চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট কোটি হতে পারে। বিজলি বাতির সল্‌তে-তারের ভিতর দিয়ে ইলেকট্রনের ঠেসাঠেসি ভিড় চলতে থাকে, তবেই সে জ্বলে। তারে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে যতগুলি ইলেকট্রন একসঙ্গে যাত্রা করে আমাদের গণিতশাস্ত্রে সেই সংখ্যার কী নাম আছে আমি তা তো জানি নে। যা হোক এটা দেখা গেল যে, অতিপরমাণুদের দুরন্ত চাঞ্চল্য পজিটিভ নেগেটিভে সন্ধি করে সংযত হয়ে আছে তাই বিশ্বে আছে শান্তি। ভালুকওয়ালা বাজায় ডুগডুগি, তারই তালে ভালুক নাচে, আর নানা খেলা দেখায়। ডুগডুগিওয়ালা

না যদি থাকে, পোষমানা ভালুক যদি শিকলি কেটে স্বধর্ম পায় তা হলে কামড়িয়ে আঁচড়িয়ে চার দিকে অনর্থপাত করতে থাকে। আমাদের সর্বাঙ্গে এবং দেহের বাইরে এই পোষমানা বিভীষিকা নিয়ে অদৃশ্য ডুগডুগির ছন্দে চলেছে সৃষ্টির নাচ ও খেলা। সৃষ্টির আখড়ায় দুই খেলোয়াড় তাদের ভীষণ দ্বন্দ্ব মিলিয়ে বিশ্বচরাচরে রঙ্গভূমি সরগরম করে রেখেছে।

কোনো কোনো বিজ্ঞানী পরমাণুজগৎকে সৌরমণ্ডলীর সঙ্গে তুলনীয় করে বললেন, পরমাণুর কেন্দ্র ঘিরে ভিন্ন ভিন্ন চক্রপথে ঘুর খাচ্ছে ইলেকট্রনের দল। আর-এক পণ্ডিত প্রমাণ করলেন যে, ঘূর্ণিপাক-খাওয়া ইলেকট্রনরা তাদের এক কক্ষপথ থেকে আর-এক কক্ষপথে ঠাঁই বদল করে, আবার ফেরে আপন নির্দিষ্ট পথে।

পরমাণুলোকের যে-ছবি সৌরলোকের ছাঁদে, তাতে আছে পজিটিভ বৈদ্যুতওয়ালা একটা কেন্দ্রবস্তু, আর তার চার দিকে ইলেকট্রনদের প্রদক্ষিণ।

এ মত মেনে নেবার বাধা আছে। ইলেকট্রন যদি একটানা পথে চলত তা হলে ক্রমে তার শক্তি ক্ষয় হয়ে ক্রমে পথ খাটো করে সে পড়ত গিয়ে কেন্দ্রবস্তুর উপরে। পরমাণুর সর্বনাশ ঘটাত।

এখন এই মত দাঁড়িয়েছে, ইলেকট্রনের ডিম্বাকার চলবার পথ একটি নয়, একাধিক। কেন্দ্র থেকে এই কক্ষগুলির দূরত্ব নির্দিষ্ট। কেন্দ্রের সব চেয়ে কাছের যে পথ, কোনো ইলেকট্রন তা পেরিয়ে যেতে পারে না। ইলেকট্রন বাইরের পথ থেকে ভিতরের পথে দর্শন দেয়। কেন দেয় এবং হঠাৎ কখন দেখা দেবে তার কোনো বাঁধা নিয়ম পাওয়া যায় না। তেজ শোষণ ক'রে ইলেকট্রন ভিতরের পথ থেকে বাইরের পথে লাফিয়ে যায়, এই লাফের মাত্রা নির্ভর করে শোষিত তেজের পরিমাণের উপর। ইলেকট্রন তেজ বিকীর্ণ করে কেবল যখন সে তার বাইরের পথ থেকে ভিতরের পথে আবির্ভূত হয়। ছাড়া-পাওয়া এই তেজকেই আমরা পাই আলোরূপে। যতক্ষণ একই কক্ষে চলতে থাকে ততক্ষণ তার শক্তি-বিকিরণ বন্ধ। এ মতটা ধরে-নেওয়া একটা মত, কোনো কারণ দেখানো যায় না। মতটা মেনে নিলে তবেই বোঝা যায় পরমাণু কেন টিঁকে আছে, বিশ্ব কেন বিলুপ্ত হয়ে যায় নি।

এসব কথার পিছনে দুরূহ তত্ত্ব আছে, সেটা বোঝবার অনেক দেরি। আপাতত কথাটা শুনে রাখা মাত্র।

পূর্বেই বলেছি বিজ্ঞানীরা খুব দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করেছিলেন যে, বিরেনব্বইটি আদিভূত বিশ্বসৃষ্টির মৌলিক পদার্থ। অতিপরমাণুদের সাক্ষ্যে আজ সেকথা অপ্রমাণ

হয়ে গেল। তবু এখনও রয়ে গেল এদের সম্মানের উপাধিটা।

একদা মৌলিক পদার্থের খ্যাতি ছিল যে তাদের গুণের নিত্যতা আছে। তাদের যতই ভাঙা যাক কিছুতেই তাদের স্বভাবের বদল হয় না। বিজ্ঞানের প্রথম অধ্যায়ে দেখা গেল তাদের চরম ভাগ করলে বেরিয়ে পড়ে দুই জাতীয় বৈদ্যুতওয়ালা কণাবস্তুর জুড়িনৃত্য। যারা মৌলিক পদার্থ নামধারী তাদের স্বভাবের বিশেষত্ব রক্ষা করেছে এইসব বৈদ্যুতেরা বিশেষ সংখ্যায় একত্র হয়ে। এইখানেই যদি থামত তা হলেও পরমাণুদের রূপনিত্যতার খ্যাতি টিঁকে যেত। কিন্তু ওদের নিজের দলের থেকেই বিরুদ্ধ সাক্ষ্য পাওয়া গেল। একটা খবর পাওয়া গেল যে, হালকা যেসব পরমাণু তাদের মধ্যে ইলেকট্রন প্রোটনের ঘোরাঘুরি নিত্যনিয়মিতভাবে চলে আসছে বটে কিন্তু অত্যন্ত ভারি যারা, যাদের মধ্যে ন্যুট্রন-প্রোটনসংঘের অতিরিক্ত ঠেসাঠেসি ভিড়, যেমন য়ুরেনিয়ম বা রেডিয়ম, তারা আপন তহবিল সামলাতে পারছে না, সদা সর্বক্ষণই তাদের মূল সম্বল ছিটকে পড়তে পড়তে হালকা হয়ে তারা এক রূপ থেকে অন্য রূপ ধরছে।

এতকাল রেডিয়ম নামক এক মৌলিক ধাতু লুকিয়ে ছিল স্থূল আবরণের মধ্যে। তার আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পরমাণুর গূঢ়তম রহস্য ধরা পড়ে গেল। বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তার প্রথম মোকাবিলার ইতিহাস মনে রেখে দেবার যোগ্য।

যখন র‍্যণ্টগেন রশ্মির আবিষ্কার হল, দেখা গেল তার স্থূল বাধা ভেদ করবার ক্ষমতা। তখন আঁরি বেকরেল ছিলেন প্যারিস ম্যুনিসিপাল স্কুলে বিজ্ঞানের অধ্যাপক। স্বতোদীপ্তিমান পদার্থ মাত্রেরই এই বাধা ভেদ করবার শক্তি আছে কি না, সেই পরীক্ষায় তিনি লাগলেন। এইরকম কতকগুলি ধাতুপদার্থ নিয়ে কাজ আরম্ভ করে দিলেন। তাদের কালো কাগজে মুড়ে রেখে দিলেন ফোটোগ্রাফের প্লেটের উপরে। দেখলেন তাতে মোড়ক ভেদ করে কেবল য়ুরেনিয়ম ধাতুরই চিহ্ন পড়ল। সকলের চেয়ে গুরুভার যার পরমাণু তার তেজস্ক্রিয়তা সপ্রমাণ হয়ে গেল।

পিচব্লেণ্ড নামক এক খনিজ পদার্থ থেকে য়ুরেনিয়মকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়ে থাকে। বেকরেলের এক অসামান্য বুদ্ধিমতী ছাত্রী ছিলেন মাদাম কুরি। তাঁর স্বামী পিয়ের কুরি ফরাসী বিজ্ঞান বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁরা স্বামীস্ত্রীতে মিলে এই পিচব্লেণ্ড নিয়ে পরখ করতে লাগলেন, দেখলেন এর তেজস্ক্রিয় প্রভাব য়ুরেনিয়মের চেয়ে আরও প্রবল। পিচব্লেণ্ডের মধ্যে এমন কোনো কোনো পদার্থ আছে যারা এই শক্তির মূলে, তারই আবিষ্কারের চেষ্টায় তিনটি নূতন পদার্থ বের হল, রেডিয়ম, পলোনিয়ম, এবং য়্যাক্‌টিনিয়ম।

পরীক্ষা করতে করতে প্রায় চল্লিশটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ পাওয়া গেছে। প্রায় এদের সবগুলিই বিজ্ঞানে নতুন জানা।

তখনকার দিনে সকলের চেয়ে চমক লাগিয়ে দিল এই ধাতুর একটি অদ্ভুত স্বভাব। সে নিজের মধ্যে থেকে জ্যোতিষ্কণা বিকীর্ণ ক'রে নিজেকে নানা মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত করতে করতে অবশেষে সীসে করে তোলে। এ যেন একটা বৈজ্ঞানিক ভেলকি বললেই হয়। এক ধাতু থেকে অন্য ধাতুর যে উদ্ভব হতে পারে, সে এই প্রথম জানা গেল।

যে-সকল পদার্থ রেডিয়মের এক জাতের, অর্থাৎ তেজ-ছিটোনোই যাদের স্বভাব তারা সকলেই জাত-খোওয়াবার দলে। তারা কেবলই আপনার তেজের মূলধন খরচ করতে থাকে। এই অপব্যয়ের ফর্দে প্রথম যে তেজঃপদার্থ পড়ে, গ্রীকবর্ণমালার প্রথম অক্ষরের নামে তার নাম দেওয়া হয়েছে আল্‌ফা। বাংলা বর্ণমালা ধরে তাকে ক বললে চলে। এ একটা পরমাণু, পজিটিভ জাতের। রেডিয়মের আরও একটা ছিটিয়ে-ফেলা তেজের কণা আছে, তার নাম দেওয়া হয়েছে বীটা, বলা যেতে পারে খ। সে ইলেকট্রন, নেগেটিভ চার্জ করা, বিষম তার দ্রুত বেগ। তবু পাতলা একটি কাগজ চলার রাস্তায় পড়লে আল্‌ফা-পরমাণু দেহান্তর লাভ করে, সে হয়ে যায় হীলিয়ম গ্যাস। আরও কিছু বাধা লাগে বীটাকে থামিয়ে দিতে। রেডিয়মের তূণে এই দুইটি ছাড়া আর-একটি রশ্মি আছে তার নাম গামা। সে পরমাণু বা অতিপরমাণু নয়, সে একটি বিশেষ আলোকরশ্মি। তার কিরণ স্থূল বস্তুকে ভেদ করে যেতে পারে, যেমন যায় র‍্যণ্টগেন্ রশ্মি। এইসব তেজস্কণার ব্যবহার সকল অবস্থাতেই সমান, লোহা-গলানো গরমেও, গ্যাস-তরল-করা ঠাণ্ডাতেও। তা ছাড়া তাদের ফিরিয়ে নিয়ে আবার পূর্বের মতো দানা বেঁধে দেওয়া কারও সাধ্য নেই।

পরমাণুর কেন্দ্র-পিণ্ডটিতে যতক্ষণ না কোনো লোকসান ঘটে ততক্ষণ দুটো-চারটে ইলেকট্রন যদি ছিনিয়ে নেওয়া যায় তা হলে তার বৈদ্যুতের বাঁধা বরাদ্দে কিছু কমতি পড়তে পারে কিন্তু অপঘাতটা সাংঘাতিক হয় না। যদি ঐ কেন্দ্রবস্তুটার খাস তহবিলে লুটপাট সম্ভব হয় তা হলেই পরমাণুর জাত বদল হয়ে যায়।

পরমাণুর নিজের মধ্যে একান্ত ঐক্য নেই এ-খবরটা পেয়েই বিজ্ঞানীরা প্রথমটা আশা করেছিলেন যে, তাঁরা তেজ-ছুঁড়ে-মারা গোলন্দাজ রেডিয়মকে লাগাবেন পরমাণুর মধ্যে ভেদ ঘটিয়ে তার কেন্দ্রসম্বলভাঙা লুটপাটের কাজে। কিন্তু লক্ষ্যটি অতিসূক্ষ্ম, নিশানা করা সহজ নয়, তেজের ঢেলা বিস্তর মারতে মারতে দৈবাৎ একটা লেগে যায়। তাই এ-রকম অনিশ্চিত লড়াইপ্রণালীর বদলে আজকাল প্রকাণ্ড যন্ত্র তৈরির আয়োজন

হচ্ছে যাতে অতি প্রচণ্ড শক্তিমান বৈদ্যুত উৎপন্ন হয়ে পরমাণুর কেন্দ্রকেল্লার পাহারা ভেদ করতে পারে। সেখানে আছে প্রবল পালোয়ান-শক্তির পাহারা। আজ ঠিক যে-সময়টাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারবার জন্যে সহস্রঘ্নী যন্ত্রের উদ্ভাবন হচ্ছে ঠিক সেই সময়টাতেই বিশ্বের সূক্ষ্মতম পদার্থের অলক্ষ্যতম মর্ম বিদীর্ণ করবার জন্যে বিরাট বৈদ্যুতবর্ষণীর কারখানা বসল।

পূর্বেই বলেছি আল্‌ফাকণা স্বরূপ হারিয়ে হয়ে যায় হীলিয়ম গ্যাস। এটা কাজে লেগেছে পৃথিবীর বয়স প্রমাণ করতে। কোনো পাহাড়ের একখানা পাথরের মধ্যে যদি বিশেষ পরিমাণ হীলিয়ম গ্যাস দেখা যায়, তা হলে এই গ্যাসের পরিণতির নির্দিষ্ট সময় হিসাব করে ঐ পাহাড়ের জন্মকুষ্ঠি তৈরি করা যায়। এই প্রণালীর ভিতর দিয়ে পৃথিবীর বয়স বিচার করা হয়েছে।

ওজনের গুরুত্বে হাইড্রজেন গ্যাসের ঠিক উপরের কোঠাতেই পড়ে যে-গ্যাস তারই নাম দেওয়া হয়েছে হীলিয়ম। এই গ্যাস বিজ্ঞানীমহলে নূতন-জানা। এই গ্যাস প্রথম ধরা পড়েছিল সূর্যগ্রহণের সময়ে। সূর্য আপন চক্রসীমাটুকু ছাড়িয়ে বহুলক্ষ ক্রোশ দূর পর্যন্ত জলদ্‌বাষ্পের অতি সূক্ষ্ম উত্তরীয় উড়িয়ে থাকে, ঝরনা যেমন জলকণার কুয়াশা ছড়ায় আপনার চারি দিকে। গ্রহণের সময় সেই তার চার দিকের আগ্নেয় গ্যাসের বিস্তার দেখতে পাওয়া যায় দুরবীনে। এই দূরবিক্ষিপ্ত গ্যাসের দীপ্তিকে য়ুরোপীয় ভাষায় বলে করোনা, বাংলায় একে বলা যেতে পারে কিরীটিকা।

কিছুকাল আগে ১৯৩৭ খৃস্টাব্দের সূর্যগ্রহণের সুযোগে এই কিরীটিকা পরীক্ষা করবার সময় বর্ণলিপির নীলসীমানার দিকে দেখা গেল তিনটি অজানা সাদা রেখা। পণ্ডিতেরা ভাবলেন হয়তো কোনো একটি আগের জানা পদার্থ অধিক দহনে নূতন দশা পেয়েছে, এটা তারই চিহ্ন। কিংবা হয়তো একটা নতুন পদার্থ ই বা জানান দিল। এখনও তার ঠিকানা হল না।

১৮৬৮ খৃস্টাব্দের গ্রহণের সময় বিজ্ঞানীদের এইরকমই একটা চমক লাগিয়েছিল। সূর্যের গ্যাসীয় বেড়ার ভিতর থেকে একটা লিপি এল তখনকার কোনো অচেনা পদার্থের। এই নূতন খবর-পাওয়া মৌলিক পদার্থের নাম দেওয়া হল হীলিয়ম, অর্থাৎ সৌরক। কেননা তখন মনে হয়েছিল এটা একান্ত সূর্যেরই অন্তর্গত গ্যাস। অবশেষে ত্রিশ বছর কেটে গেলে পরে বিখ্যাত রসায়নী র‍্যামজে এই গ্যাসের আমেজ পেলেন পৃথিবীর হাওয়ায় অতি সামান্য পরিমাণে। তখন স্থির হল পৃথিবীতে এ গ্যাস দুর্লভ। তার পরে দেখা গেল উত্তর-আমেরিকায় কোনো মেটে তেলের গহ্বরে যে-গ্যাস পাওয়া যায় তাতে যথেষ্ট পরিমাণে হীলিয়ম আছে। তখন একে কাজে লাগাবার সুবিধে

হল। অত্যন্ত হালকা ব'লে এতদিন হাইড্রজেন গ্যাস দিয়ে আকাশযানগুলোর উড়ন-শক্তির জোগান দেওয়া হত। কিন্তু হাইড্রজেন গ্যাস ওড়াবার পক্ষে যেমন কেজো, জ্বালাবার পক্ষে তার চেয়ে কম না। এই গ্যাস অনেক মস্ত মস্ত উড়োজাহাজকে জ্বালিয়ে মেরেছে। হীলিয়ম গ্যাসের মধ্যে প্রচ্ছন্ন দুরন্ত জ্বলনচণ্ডী নেই, অথচ হাইড্রজেন ছাড়া সকল গ্যাসের চেয়ে এ হালকা। তাই জাহাজ-ওড়ানোকে নিরাপদ করবার জন্যে তারই ব্যবহার চলতি হয়েছে। চিকিৎসাতেও কোনো কোনো রোগে এর প্রয়োগ শুরু হল।

পূর্বেই বলা হয়েছে পজিটিভ চার্জওয়ালা পদার্থ ও নেগেটিভ চার্জওয়ালা পদার্থ পরস্পরকে কাছে টানে কিন্তু একই জাতীয় চার্জওয়ালারা পরস্পরকে ঠেলে ফেলতে চায়। যতই তাদের কাছাকাছি করা যায় ততই উগ্র হয়ে ওঠে তাদের ঠেলার জোর। তেমনি বিপরীত চার্জওয়ালারা যতই পরস্পরের কাছে আসে তাদের টানের জোর ততই বেড়ে ওঠে। এই জন্যে যেসব ইলেকট্রন কেন্দ্রবস্তুর কাছাকাছি থাকে তারা টানের জোর এড়াবার জন্যে দূরবর্তীদের চেয়ে দৌড়য় বেশি জোরে। সৌরমণ্ডলে যেসব গ্রহ সূর্যের যত কাছে তাদের দৌড়ের বেগ ততই বেশি। দূরের গ্রহদের বিপদ কম, তারা অনেকটা ধীরেসুস্থে চলে।

এই ইলেকট্রন প্রোটনের ব্যাস সমস্ত পরমাণুর পঞ্চাশ হাজার ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ পরমাণুর মধ্যে শূন্যতাই বেশি। একটা মানুষের দেহের সমস্ত পরমাণু যদি ঠেসে দেওয়া হয়, তা হলে তার থেকে একটি অদৃশ্যপ্রায় বস্তুবিন্দু তৈরি হবে।

দুই প্রোটনের পরস্পরের প্রতি বিমুখতার জোর যে কত, রসায়নী ফ্রেডরিক সডি তার হিসাব করে বলেছেন, এক গ্র্যাম পরিমাণ প্রোটন যদি ভূতলের এক মেরুতে রাখা যায় আর তার বিপরীত মেরুতে থাকে আর-এক গ্র্যাম প্রোটন তা হলে এই সুদূর পথ পেরিয়ে গিয়ে তাদের উভয়েরই ঠেলা মারার জোর হবে প্রায় ছ শো মণের চাপে। এই যদি বিধি হয় তা হলে বোঝা শক্ত হয় পরমাণুকেন্দ্রের অতি সংকীর্ণ মণ্ডলীর মধ্যে একটির বেশি প্রোটন কেমন করে ঘেঁষাঘেঁষি মিলে থাকতে পারে। এই নিয়ম অনুসারে হাইড্রজেন যার পরমাণুকেন্দ্রে একেশ্বর প্রোটনের অধিকার, সে ছাড়া বিশ্বে আর কোনো পদার্থ তো টিঁকতেই পারে না; তা হলে তো বিশ্বজগৎ হয়ে ওঠে হাইড্রজেনময়।

এদিকে দেখা যায় য়ুরেনিয়ম ধাতু বহন করেছে ৯২টা প্রোটন, ১৪৬টা ন্যুট্রন। এত বেশি ভিড় সে সামলাতে পারে না একথা সত্য, ক্ষণে ক্ষণে সে তার কেন্দ্রভাণ্ডার থেকে বৈদ্যুতকণার বোঝা হালকা করতে থাকে। ভার কিছু পরিমাণ কমলে সে

রূপ নেয় রেডিয়মের, আরও কমলে হয় পলোনিয়ম, অবশেষে সীসের রূপ ধরে স্থিতি পায়।

ওজন এত ছেঁটে ফেলেও স্থিতি পায় কী করে এ সন্দেহ তো দূর হয় না। বিকিরণের পালা শেষ করে সমস্ত বাদসাদ দিয়েও সীসের দখলে বাকি থাকে ৮২টা প্রোটন। পজিটিভ বৈদ্যুতের স্বজাত-ঠেলা-মারা মেজাজ নিয়ে এই প্রোটনগুলো পরমাণুলোকের শান্তিরক্ষা করে কী ক'রে, দীর্ঘকাল ধরে এ প্রশ্নের ভালো জবাব পাওয়া গেল না। কেন্দ্রের বাইরে এদের ঝগড়া মেটে না, কেন্দ্রের ভিতরটাতে এদের মৈত্রী অটুট, এ একটা বিষম সমস্যা।

এই রহস্যভেদের উপযোগী ক'রে যন্ত্রশক্তির বল বৃদ্ধি করা হল। পরমাণুর কেন্দ্রগত প্রোটন-লক্ষ্যের বিরুদ্ধে পরীক্ষকেরা হাঁ-ধর্মী বৈদ্যুতকণার দল লাগিয়ে দিলেন; যত জোরের বৈদ্যুতকণা তাদের ধাক্কা দিলে তার বেগ সেকেণ্ডে ৬৭২০ মাইল। তবু কেন্দ্রস্থিত প্রোটন আপন প্রোটনধর্ম রক্ষা করলে, আক্রমণকারী বৈদ্যুতের দলকে ছিটকিয়ে ফেললে। বৈদ্যুত তাড়নার জোর বাড়িয়ে দেওয়া হল। বিজ্ঞানী লাগালেন ধাক্কা ৭৭০০ মাইলের বেগে, শিকারটিকে হার মানাতে পারলেন না। অবশেষে ৮০০০ মাইলের তাড়া খেয়ে বিরুদ্ধশক্তি নরম হবার লক্ষণ দেখালে। ছিটকোনো-শক্তির বেড়া ডিঙিয়ে আক্রমণশক্তি পৌঁছল কেন্দ্রদুর্গের মধ্যে। দেখা গেল দুটি সমধর্মী বৈদ্যুতকণা যত কাছে গিয়ে পৌঁছলে তাদের ঠেলাঠেলি যায় চুকে সে হচ্ছে এক ইঞ্চির বহু কোটি ভাগ ঘেঁষাঘেঁষিতে। তা হলে ধরে নিতে হবে ঐ নৈকট্যের মধ্যে প্রোটনদের পরস্পর ঠেলে ফেলার শক্তি যত তার চেয়ে প্রভূত বড়ো একটা শক্তি আছে, টেনে রাখবার শক্তি। ঐ শক্তি পরমাণুমহলে প্রোটনকেও যেমন টানে ন্যুট্রনকেও তেমনি টানে, অর্থাৎ বৈদ্যুতের চার্জ যার আছে আর যার নেই উভয়ের 'পরেই তার সমান প্রভাব। পরমাণুকেন্দ্রবাসী এই অতিপ্রবল আকর্ষণশক্তি সমস্ত বিশ্বকে রেখেছে বেঁধে। পরমাণুর মধ্যেকার ঘরোয়া বিবাদ মিটিয়েছে যে-শাসন সেই শাসনেই বিশ্বে বিরাজ করে শান্তি।

আধুনিক ইতিহাস থেকে এর উপমা সংগ্রহ করে দেওয়া যাক। চীন রিপব্লিকের শান্তি নষ্ট ক'রে কতকগুলি একাধিপত্যলোলুপ জাঁদরেল পরস্পর লড়াই ক'রে দেশটাকে ছারখার করে দিচ্ছিল। রাষ্ট্রের কেন্দ্রস্থলে এই বিরুদ্ধদলের চেয়ে প্রবলতর শক্তি যদি থাকত তা হলে শাসনের কাজে এদের সকলকে এক ক'রে রাষ্ট্রশক্তিকে বলিষ্ঠ ও নিরাপদ করে রাখা সহজ হত। পরমাণুর রাষ্ট্রতন্ত্রে সেই বড়ো শক্তি আছে সকল শক্তির উপরে, তাই যারা স্বভাবত মেলে না তারাও মিলে বিশ্বের শান্তি রক্ষা হচ্ছে।

এর থেকে দেখতে পাচ্ছি বিশ্বের শান্তি পদার্থটি ভালোমানুষি শান্তি নয়। যতসব দুরন্তদের মিলিয়ে নিয়ে তবে একটা প্রবল মিল হয়েছে। যারা স্বতন্ত্রভাবে সর্বনেশে তারাই মিলিতভাবে সৃষ্টির বাহন।

পরমাণুর ইতিহাসে রেডিয়মের অধ্যায়ের মূল্য বেশি, সেইজন্যে একটু বিশদ করে তার কথাটা বলে নিই।— রেডিয়ম লোহা প্রভৃতির মতোই ধাতুদ্রব্য। এর পরমাণুগুলি ভারে এবং আয়তনে বড়ো। অবশেষে একদিন কী কারণে কেউ জানে না রেডিয়মের পরমাণু যায় ফেটে, তার অল্প একটু অংশ যায় ছুটে; এই ভাঙন-ধরা পরমাণু থেকে নিঃসৃত আল্‌ফারশ্মিতে যে কণিকাগুলি প্রবাহিত হয় তারা প্রত্যেকে দুটি প্রোটন ও দুটি ন্যুট্রনের সংযোগে তৈরি। অর্থাৎ হীলিয়ম পরমাণুর কেন্দ্রবস্তুরই সঙ্গে তারা এক। বীটারশ্মি কেবল ইলেকট্রনের ধারা। গামারশ্মিতে কণা নেই; তা আলোকজাতীয়। কেন যে এমন ভাঙচুর হয় তার কারণ আজও ধরা পড়ে নি। এইটুকু অপব্যয়ের দরুণ পরমাণুর বাকি অংশ আর সেই সাবেক রেডিয়মরূপে থাকে না। তার স্বভাব যায় বদলিয়ে। দুটি ইলেকট্রন আত্মসাৎ করে আল্‌ফাকণার পরিণতি ঘটে হীলিয়ম গ্যাসে। এই স্ফোরণ ব্যাপারকে বাইরের কিছুতে না পারে উসকিয়ে দিতে, না পারে থামাতে। চারি দিকের অবস্থা ঠাণ্ডাই থাক আর গরমই থাক, অন্য অণুপরমাণুদের সঙ্গে মেলামেশাই করুক, অর্থাৎ তার বাইরের ব্যবস্থা যে রকমই হোক তার ফেটে যাওয়ার কাজটা ঘটতে থাকে ভিতরের থেকে। গড়ের উপরে রেডিয়মের আয়ু প্রায় দু হাজার বছর, কিন্তু তার যে-পরমাণু থেকে একটা আল্‌ফাকণা ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে তার মেয়াদ প্রায় দিন-চারেকের। তার পরে তার থেকে পরে পরে স্ফোরণ ঘটতে থাকে, অবশেষে গিয়ে ঠেকে সীসেতে। আল্‌ফাকণা যখন শুরু করে তার দৌড় তখন তার বেগ থাকে এক সেকেণ্ডে প্রায় দশ হাজার মাইল। কিন্তু যখন তাকে কোনো বস্তুপদার্থের এমন কি বাতাসের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় তখন দুতিনইঞ্চি-খানেক পথ যেতে যেতেই তার চলন সহজ হয়ে আসে। আল্‌ফারশ্মি চলে একেবারে সোজা রেখা ধ'রে। কী ক'রে পারে সে একটা ভাববার কথা। কেননা বাতাসে যে অক্সিজেন বা নাইট্রজেন পরমাণু আছে হীলিয়মের পরমাণু তার চেয়ে অনেক হালকা আর ছোটো। এই তিন ইঞ্চি রাস্তায় বাতাসের বিস্তর ভারি ভারি অণু তাকে ঠেলে যেতে হয়। এ কিন্তু ভিড় ঠেলে যাওয়া নয়, ভিড় ভেদ করে যাওয়া। পরমাণু বলতে বোঝায় একটি কেন্দ্রবস্তু আর তাকে ঘিরে দৌড়-খাওয়া ইলেকট্রনের দল। এদের পাহারার ভিতর দিয়ে যেতে প্রচণ্ড বেগের জোর চাই। সেই জোর আছে আল্‌ফাকণার। সে অন্য মণ্ডলীর ভিতর দিয়ে চলে যায়। অন্য পরমাণুর ভিতর দিয়ে

যেতে যেতে লোকসান ঘটাতে থাকে। কোনো পরমাণুর দিলে হয়তো একটা ইলেকট্রন সরিয়ে, ক্রমে দুটো-তিনটে গেল হয়তো তার খসে, তখন ইলেকট্রনগুলো বাঁধনছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। অন্য পরমাণুদের সঙ্গে জোড় বাঁধে। যে-পরমাণু ইলেকট্রন হারিয়েছে তাকে লাগে পজিটিভ বৈদ্যুতের চার্জ আর যে-পরমাণু ছাড়া-ইলেকট্রনটাকে ধরেছে তার চার্জ নেগেটিভ বৈদ্যুতের। তারা যদি পরস্পরের যথেষ্ট কাছাকাছি আসে তা হলে আবার হিসেব সমান করে নেয়। অসাম্য ঘুচলে তখন বৈদ্যুতধর্মের চাঞ্চল্য শান্ত হয়ে যায়। স্বভাবত হীলিয়ম পরমাণুর থাকে দুটো ইলেকট্রন। কিন্তু রেডিয়ম থেকে আল্‌ফাকণারূপে নিঃসৃত হয়ে সে যখন অন্য বস্তুর মধ্যে দিয়ে ছুটতে থাকে তখনকার মতো তার সঙ্গী দুটো যায় ছিন্ন হয়ে। অবশেষে উপদ্রবের অন্ত হলে ছুটো ইলেকট্রনদের মধ্যে থেকে অভাব পূরণ করে নিয়ে স্বধর্মে ফিরে আসে।

এইখানে আর-একটা কথা বলে এই প্রসঙ্গ শেষ করে দেওয়া যাক। সকল বস্তুরই পরমাণুর ইলেকট্রন প্রোটন ও ন্যুট্রন একই পদার্থ। তাদেরই ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে বস্তুর ভেদ। যে-পরমাণুর আছে মোট ছয়টা পজিটিভ চার্জ সেই হল কার্বনের অর্থাৎ আঙ্গারিক বস্তুর পরমাণু। সাতটা ইলেকট্রনওয়ালা পরমাণু নাইট্রজেনের, আটটা অক্সিজেনের। কেবল হাইড্রজেন পরমাণুর আছে একটা ইলেকট্রন। আর বিরেনব্বইটা আছে য়ুরেনিয়মের। পরমাণুদের মধ্যে পজিটিভ চার্জের সংখ্যাভেদ নিয়েই তাদের জাতিভেদ। সৃষ্টির সমস্ত বৈচিত্র্য এই সংখ্যার ছন্দে।

বৈদ্যুতসন্ধানীরা যখন আপন কাজে নিযুক্ত আছেন তখন তাদের হিসাবে গোলমাল বাধিয়ে দিয়ে অকস্মাৎ একটা অজানা শক্তির অস্তিত্ব ধরা দিল। তার বিকিরণকে নাম দেওয়া হল মহাজাগতিক রশ্মি, কস্‌মিক রশ্মি। বলা যেতে পারে আকস্মিক রশ্মি। কোথা থেকে আসছে বোঝা গেল না কিন্তু দেখা গেল সর্বত্রই। কোনো বস্তু বা কোনো জীব নেই যার উপরে এর করক্ষেপ চলছে না। এমন কি ধাতুদ্রব্যের পরমাণুগুলোকে ঘা মেরে উত্তেজিত করে দিচ্ছে। হয়তো এরা জীবের প্রাণশক্তির সাহায্য করছে, কিংবা বিনাশ করছে— কী করছে জানা নেই, আঘাত করছে এইটেই নিঃসংশয়।

এই যে ক্রমাগতই কস্‌মিকরশ্মি-বর্ষণ চলেছে এর উৎপত্তির রহস্য অজানা রয়ে গেল। কিন্তু জানা গেছে বিপুল এর উদ্যম, সমস্ত আকাশ জুড়ে এর সঞ্চরণ, জলে স্থলে আকাশে সকল পদার্থেই এর প্রবেশ। এই মহা আগন্তুকের পিছনে বিজ্ঞানের চর লেগেই আছে, কোন্ দিন এর গোপন ঠিকানা ধরা পড়বে।

অনেকে বলেন কস্‌মিক আলো আলোই বটে, র‍্যাণ্টগেন রশ্মির চেয়ে বহুগুণে

জোরালো। তাই এরা সহজে পুরু সীসে বা মোটা সানার পাত পার হয়ে চলে যায়। বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় এটুকু জানা গেছে এই আলোর সঙ্গে আছে বৈদ্যুতকণা। পৃথিবীর যে ক্ষেত্রে চৌম্বকশক্তি বেশি এরা তারই টানে আপন পথ থেকে সরে গিয়ে মেরুপ্রদেশে জমা হয়, তাই পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় কস্‌মিক রশ্মির সমাবেশের কমিবেশি দেখা যায়।

কস্‌মিক রশ্মির সম্বন্ধে এখনও নানা মতের আনাগোনা চলেইছে। পরমাণুর নূতন তত্ত্বের সূত্রপাত হওয়ার পর থেকেই বিজ্ঞানমহলে মননের ও মতের তোলাপাড়ার অন্ত নেই, বিশ্বের মূল কারখানার ব্যবস্থায় ধ্রুবত্বের পাকা সংকেত খুঁজে বের করা অসাধ্য হল। নিত্য ব'লে যদি কিছু খ্যাতি পেতে পারে তবে সে কেবল এক আদিজ্যোতি, যা রয়েছে সবকিছুরই ভূমিকায়, যার প্রকাশের নানা অবস্থান্তরের ভিতর দিয়ে গড়ে উঠেছে বিশ্বের এই বৈচিত্র্য।

নক্ষত্রলোক

এই তো দেখা গেল বিশ্বব্যাপী অরূপ বৈদ্যুতলোক। এদের সম্মিলনের দ্বারা প্রকাশবান রূপলোক গ্রহনক্ষত্রে।

গোড়াতেই বলে রাখি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আসল চেহারা কী জানবার জো নেই। বিশ্বপদার্থের নিতান্ত অল্পই আমাদের চোখে পড়ে। তা ছাড়া আমাদের চোখ কান স্পর্শেন্দ্রিয়ের নিজের বিশেষত্ব আছে। তাই বিশ্বের পদার্থগুলি বিশেষ ভাবে বিশেষ রূপে আমাদের কাছে দেখা দেয়। ঢেউ লাগে চোখে, দেখি আলো। আরও সূক্ষ্ম বা আরও স্থূল ঢেউ সম্বন্ধে আমরা কানা। দেখাটা নিতান্ত অল্প, না-দেখাটাই অত্যন্ত বেশি। পৃথিবীর কাজ চালাব বলেই সেই অনুযায়ী আমাদের চোখ কান, আমরা যে বিজ্ঞানী হব প্রকৃতি সে খেয়ালই করে নি। মানুষের চোখ অণুবীক্ষণ ও দূরবীন এই দুইএর কাজই সামান্য পরিমাণে করে থাকে। বোধের সীমা বাড়লে বা বোধের প্রকৃতি অন্য রকম হলে আমাদের জগৎটাও হত অন্য রকম।

বিজ্ঞানীর কাছে সেই অন্য রকমই তো হয়েছে। এতই অন্য রকমের যে, যে-ভাষায় আমরা কাজ চালাই এ জগতের পরিচয়ে তার অনেকখানিই কাজে লাগে না। প্রত্যহ এমন চিহ্নওয়ালা ভাষা তৈরি করতে হচ্ছে যে, সাধারণ মানুষ তার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারে না।

একদিন মানুষ ঠিক করেছিল বিশ্বমণ্ডলের কেন্দ্রে পৃথিবীর আসন অবিচলিত, তাকে প্রদক্ষিণ করছে সূর্যনক্ষত্র। মনে যে করেছিল, সে জন্যে তাকে দোষ দেওয়া যায় না—সে দেখেছিল পৃথিবী-দেখা সহজ চোখে। আজ তার চোখ বেড়ে গেছে, বিশ্ব-দেখা চোখ বানিয়ে নিয়েছে। ধরে নিতে হয়েছে পৃথিবীকেই ছুটতে হয় সূর্যের চার দিকে, দরবেশি নাচের মতো পাক খেতে খেতে। পথ সুদীর্ঘ, লাগে ৩৬৫ দিনের কিছু বেশি। এর চেয়ে বড়ো পথওয়ালা গ্রহ আছে, তারা ঘুরতে এত বেশি সময় নেয় যে ততদিন বেঁচে থাকতে গেলে মানুষের পরমায়ুর বছর বাড়াতে হবে।

রাত্রের আকাশে মাঝে মাঝে নক্ষত্রপুঞ্জের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় লেপে দেওয়া আলো। তাদের নাম দেওয়া হয়েছে নীহারিকা। এদের মধ্যে কতকগুলি সুদূরবিস্তৃত অতি হালকা গ্যাসের মেঘ, আবার কতকগুলি নক্ষত্রের সমাবেশ। দুরবীনে এবং ক্যামেরার যোগে জানা গেছে যে, যে-ভিড় নিয়ে এই শেষোক্ত নীহারিকা, তাতে যত নক্ষত্র জমা হয়েছে, বহু কোটি তার সংখ্যা, অদ্ভুত দ্রুত তাদের গতি। এই যে নক্ষত্রের ভিড় নীহারিকামণ্ডলে অতি দ্রুতবেগে ছুটছে, এরা পরস্পর ধাক্কা লেগে চুরমার হয়ে যায় না কেন। উত্তর দিতে গিয়ে চৈতন্য হল এই নক্ষত্রপুঞ্জকে ভিড় বলা ভুল হয়েছে। এদের মধ্যে গলাগলি ঘেঁষাঘেঁষি একেবারেই নেই। পরস্পরের কাছ থেকে অত্যন্তই দূরে দূরে এরা চলাফেরা করছে। পরমাণুর অন্তর্গত ইলেকট্রনদের গতিপথের দূরত্ব সম্বন্ধে স্যর জেম্‌স্‌ জীন্‌স্‌ যে উপমা দিয়েছেন এই নক্ষত্রমণ্ডলীর সম্বন্ধেও অনুরূপ উপমাই তিনি প্রয়োগ করেছেন। লণ্ডনে ওয়াটর্লু নামে এক মস্ত স্টেশন আছে। যতদূর মনে পড়ে সেটা হাওড়া স্টেশনের চেয়ে বড়োই। স্যর জেম্‌স্‌ জীন্‌স্‌ বলেন সেই স্টেশন থেকে আর-সব খালি করে ফেলে কেবল ছ'টি মাত্র ধুলোর কণা যদি ছড়িয়ে দেওয়া যায় তবে আকাশে নক্ষত্রদের পরস্পর দূরত্ব এই ধূলিকণাদের বিচ্ছেদের সঙ্গে কিছু পরিমাণে তুলনীয় হতে পারবে। তিনি বলেন, নক্ষত্রের সংখ্যা ও আয়তন যতই হোক আকাশের অচিন্তনীয় শূন্যতার সঙ্গে তার তুলনাই হতে পারে না।

বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, সৃষ্টিতে রূপবৈচিত্র্যের পালা আরম্ভ হবার অনেক আগে কেবল ছিল একটা পরিব্যাপ্ত জ্বলন্ত বাষ্প। গরম জিনিস মাত্রেরই ধর্ম এই যে ক্রমে ক্রমে সে তাপ ছড়াতে থাকে। ফুটন্ত জল প্রথমে বাষ্প হয়ে বেরিয়ে আসে। ঠাণ্ডা হতে হতে সেই বাষ্প জমে হয় জলের কণা। অত্যন্ত তাপ দিলে কঠিন পদার্থও ক্রমে যায় গ্যাস হয়ে; সেই রকম তাপের অবস্থায় বিশ্বের হালকা ভারি সব জিনিসই ছিল গ্যাস। কোটি কোটি বছর ধরে কালে কালে তা ঠাণ্ডা হচ্ছে। তাপ কমতে কমতে গ্যাস থেকে ছোটো ছোটো টুকরো ঘন হয়ে ভেঙে পড়েছে। এই বিপুলসংখ্যক কণা

তারার আকারে জোট বেঁধে নীহারিকা গড়ে তুলছে। য়ুরোপীয় ভাষায় এদের বলে নেব্যুলা, বহুবচনে নেব্যুলী। আমাদের সূর্য আছে এই রকম একটি নীহারিকার অন্তর্গত হয়ে।

আমেরিকার পর্বতচূড়ায় বসানো হয়েছে মস্ত বড়ো এক দূরবীন, তার ভিতর দিয়ে খুব বড়ো এক নীহারিকা দেখা গেছে। সে আছে অ্যাণ্ড্রমিডা নামধারী নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে। ঐ নীহারিকার আকার অনেকটা গাড়ির চাকার মতো। সেই চাকা ঘুরছে। এক পাক ঘোরা শেষ করতে তার লাগে প্রায় দু কোটি বছর। নয় লাখ বছর লাগে এর কাছ থেকে পৃথিবীতে আলো এসে পৌঁছতে।

আমাদের সব চেয়ে কাছের যে তারা, যাকে আমাদের তারা-পাড়ার পড়শী বললে চলে, সংখ্যা সাজিয়ে তার দূরত্ব বোঝাবার চেষ্টা করা বৃথা। সংখ্যাবাঁধা যে-পরিমাণ দূরত্ব মোটামুটি আমাদের পক্ষে বোঝা সহজ, তার সীমা পৃথিবীর গোলকটির মধ্যেই বদ্ধ, যাকে আমরা রেলগাড়ি দিয়ে মোটর দিয়ে স্টীমার দিয়ে চলতে চলতে মেপে যাই। পৃথিবী ছাড়িয়ে নক্ষত্র-বস্তির সীমানা মাড়ালেই সংখ্যার ভাষাটাকে প্রলাপ বলে মনে হয়। গণিতশাস্ত্র নাক্ষত্রিক হিসাবটার উপর দিয়ে সংখ্যার যে-ডিম পেড়ে চলে সে যেন পৃথিবীর বহুপ্রসূ কীটেরই নকলে।

সাধারণত আমরা দূরত্ব গনি মাইল বা ক্রোশ হিসাবে, নক্ষত্রদের সম্বন্ধে তা করতে গেলে অঙ্কের বোঝা দুর্বহ হয়ে উঠবে। সূর্যই তো আমাদের কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে, তার চেয়ে বহু লক্ষগুণ দূরে আছে নক্ষত্রের দল, সংখ্যা দিয়ে তাদের দূরত্ব গোনা কড়ি দিয়ে হাজার হাজার মোহর গোনার মতো। সংখ্যা-সংকেত বানিয়ে মানুষ লেখনের বোঝা হালকা করেছে, হাজার লিখতে তাকে হাজারটা দাঁড়ি কাটতে হয় না। কিন্তু জ্যোতিষ্কলোকের মাপ এ সংকেতে কুলোল না। তাই আর-এক সংকেত বেরিয়েছে। তাকে বলা যায় আলো-চলার মাপ। ৩৬৬ দিনের বছর হিসাবে সে চলে পাঁচ লক্ষ আটাশি হাজার কোটি মাইল। সূর্যপ্রদক্ষিণের যেমন সৌর বছর তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের পরিমাপে, তেমনি নক্ষত্রদের গতিবিধি, তাদের সীমা-সরহদ্দের মাপ, আলো-চলা বছরের মাত্রা গণনা ক'রে। আমাদের নক্ষত্রজগতের ব্যাস আন্দাজ একলক্ষ আলো-বছরের মাপে। আরও অনেক লক্ষ নাক্ষত্রজগৎ আছে এর বাইরে। সেইসব ভিন্ন গাঁয়ের নক্ষত্রদের মধ্যে একটির পরিচয় ফোটোগ্রাফে ধরা হয়েছে, হিসেব মতে সে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ আলো-বছর দূরে। আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী নক্ষত্রের দূরত্ব পঁচিশ লক্ষ কোটি মাইল। এর থেকে বোঝা যাবে কী বিপুল শূন্যতার মধ্যে বিশ্ব ভাসছে। আজকাল শুনতে পাই পৃথিবীতে স্থানাভাব নিয়েই লড়াই বাধে। নক্ষত্রদের

মাঝখানে কিছুমাত্র যদি জায়গার টানাটানি থাকত তা হলে সর্বনেশে ঠোকাঠুকিতে বিশ্ব যেত চুরমার হয়ে।

চোখে দেখার যুগ থেকে এল দুরবীনের যুগ। দুরবীনের জোর বাড়তে বাড়তে বেড়ে চলল দ্যুলোকে আমাদের দৃষ্টির পরিধি। পূর্বে যেখানে ফাঁক দেখেছি সেখানে দেখা দিল নক্ষত্রের ঝাঁক। তবু বাকি রইল অনেক। বাকি থাকবারই কথা। আমাদের নাক্ষত্রজগতের বাইরে এমনসব জগৎ আছে যাদের আলো দুরবীনদৃষ্টিরও অতীত। একটা বাতির শিখা ৮৫৭৫ মাইল দূরে যেটুকু দীপ্তি দেয় এমনতরো আভাকে দুরবীন যোগে ধরবার চেষ্টায় হার মানলে মানুষের চক্ষু। দুরবীন আপন শক্তি অনুসারে খবর এনে দেয় চোখে, চোখের যদি শক্তি না থাকে সেই অতিক্ষীণ খবরটুকু বোধের কোঠায় চালান করে দিতে, তা হলে আর উপায় থাকে না। কিন্তু ফোটোগ্রাফ-ফলকের আলো-ধরা শক্তি চোখের শক্তির চেয়ে ঢের বেশি স্থায়ী। সেই শক্তির উদ্বোধন করলে বিজ্ঞান, দূরতম আকাশে জাল ফেলবার কাজে লাগিয়ে দিলে ফোটো-গ্রাফ। এমন ফোটোগ্রাফি বানালে যা অন্ধকারে-মুখঢাকা আলোর উপর সমন জারি করতে পারে। দুরবীনের সঙ্গে ফোটোগ্রাফি, ফোটোগ্রাফির সঙ্গে বর্ণলিপিযন্ত্র জুড়ে দিলে। সম্প্রতি এর শক্তি আরও বিচিত্র ক'রে তুলে দেওয়া হয়েছে। সূর্যে নানা পদার্থ গ্যাস হয়ে জ্বলছে। তারা সকলে একসঙ্গে মিলে যখন দেখা দেয় তখন ওদের তন্ন তন্ন করে দেখা সম্ভব হয় না। সেইজন্যে এক আমেরিকান বিজ্ঞানী সূর্য-দেখা দুরবীন বানিয়েছেন যাতে জ্বলন্ত গ্যাসের সব রকম রঙ থেকে এক-একটি রঙের আলো ছাড়িয়ে নিয়ে তার সাহায্যে সূর্যের সেই বিশেষ গ্যাসীয় রূপ দেখা সম্ভব হয়েছে। ইচ্ছামতো কেবলমাত্র জ্বলন্ত ক্যালসিয়মের রঙ কিংবা জ্বলন্ত হাইড্রজেনের রঙে সূর্যকে দেখতে পেলে তার গ্যাসীয় অগ্নিকাণ্ডের অনেক খবর মেলে যা আর কোনো উপায়ে পাওয়া যায় না।

সাদা আলো ভাগ করতে পারলে তার বর্ণসপ্তকের একদিকে পাওয়া যায় লাল অন্যদিকে বেগনি— এই দুই সীমাকে ছাড়িয়ে চলেছে যে আলো সে আমাদের চোখে পড়ে না।

ঘন নীলরঙের আলোর ঢেউয়ের পরিমাপ এক ইঞ্চির দেড়কোটি ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ এই আলোর রঙে যে ঢেউ খেলে তার একটা ঢেউয়ের চূড়া থেকে পরবর্তী ঢেউয়ের চূড়ার মাপ এই। এক ইঞ্চির মধ্যে রয়েছে দেড়কোটি ঢেউ। লাল রঙের আলোর ঢেউ প্রায় এর দ্বিগুণ লম্বা। একটা তপ্ত লোহার জ্বলন্ত লাল আলো যখন ক্রমেই নিভে আসে, আর দেখা যায় না, তখনও আরও বড়ো মাপের অদৃশ্য আলো

তার থেকে ঢেউ দিয়ে উঠতে থাকে। আমাদের দৃষ্টিকে সে যদি জাগিয়ে তুলতে পারত তা হলে সেই লাল-উজানি রঙের আলোয় আমরা নিভে-আসা লোহাকে দেখতে পেতুম, তা হলে গরমিকালের সন্ধ্যাবেলায় অন্ধকারে রৌদ্র মিলিয়ে গেলেও লাল-উজানি আলোয় গ্রীষ্মতপ্ত পৃথিবী আমাদের কাছে আভাসিত হয়ে দেখা দিত।

একান্ত অন্ধকার ব'লে কিছুই নেই। যাদের আমরা দেখতে পাই নে তাদেরও আলো আছে। নক্ষত্রলোকের বাহিরের নিবিড়-কালো আকাশেও অনবরত নানাবিধ কিরণ বিকীর্ণ হচ্ছে। এইসকল অদৃশ্য দূতকেও দৃশ্যপটে তুলে তাদের কাছ থেকে গোপন অস্তিত্বের খবর আদায় করতে পারছি এই বর্ণলিপিযুক্ত দুরবীন-ফোটোগ্রাফের সাহায্যে।

বেগনি-পারের আলো জ্যোতিষীদের কাছে লাল-উজানি আলোর মতো এত বেশি কাজে লাগে না। তার কারণ এই খাটো ঢেউয়ের আলোর অনেকখানি পৃথিবীর হাওয়া পেরিয়ে আসতে নষ্ট হয়, দূরলোকের খবর দেবার কাজে লাগে না। এরা খবর দেয় পরমাণুলোকের। একটা বিশেষ পরিমাণ উত্তেজনায় পরমাণু সাদা আলোয় স্পন্দিত হয়। তেজ আরও বাড়লে দেখা দেয় বেগনি-পারের আলো। অবশেষে পরমাণুর কেন্দ্রবস্তু যখন বিচলিত হতে থাকে তখন সেই প্রবল উত্তেজনায় বের হয় আরও খাটো ঢেউ যাদের বলি গামা রশ্মি। মানুষ তার যন্ত্রের শক্তি এতদূর বাড়িয়ে তুলেছে যে এক্‌স-রশ্মি বা গামা-রশ্মির মতো রশ্মিকে মানুষ ব্যবহার করতে পারে।

যে কথা বলতে যাচ্ছিলুম সে হচ্ছে এই যে, বর্ণলিপি-বাঁধা দুরবীন-ফোটোগ্রাফ দিয়ে মানুষ নক্ষত্রবিশ্বের অতি দূর অদৃশ্য লোককে দৃষ্টিপথে এনেছে। আমাদের আপন নাক্ষত্রলোকের সুদূর বাইরে আরও অনেক নাক্ষত্রলোকের ঠিকানা পাওয়া গেল। শুধু তাই নয়, নক্ষত্রেরা যে সবাই মিলে আমাদের নাক্ষত্র-আকাশে এবং দূরতর আকাশে ঘুর খাচ্ছে তাও ধরা পড়েছে এই যন্ত্রের দৃষ্টিতে।

দূর আকাশের কোনো জ্যোতির্ময় গ্যাসের পিণ্ড, যাকে বলে নক্ষত্র, যখন সে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে কিংবা পিছিয়ে যায় তখন আমাদের দৃষ্টিতে একটা বিশেষত্ব ঘটে। ঐ পদার্থটি স্থির থাকলে যে-পরিমাণ দৈর্ঘ্যের আলোর ঢেউ আমাদের অনুভূতিতে পৌঁছিয়ে দিতে পারত কাছে এলে তার চেয়ে কম দৈর্ঘ্যের ধারণা জন্মায়, দূরে গেলে তার চেয়ে বেশি। যেসব আলোর ঢেউ দৈর্ঘ্যে কম, তাদের রঙ ফোটে বর্ণসপ্তকের বেগনির দিকে, আর যারা দৈর্ঘ্যে বেশি তারা পৌঁছয় লাল রঙের কিনারায়। এই কারণে নক্ষত্রের কাছে-আসা দূরে-যাওয়ার সংকেত ভিন্ন রঙের

সিগন্যালে জানিয়ে দেয় বর্ণলিপি। শিঙে বাজিয়ে রেলগাড়ি পাশ দিয়ে চলে যাবার সময় কানে তার আওয়াজ পূর্বের চেয়ে চড়া ঠেকে। কেননা শৃঙ্গধ্বনি বাতাসে যে ঢেউ-তোলা আওয়াজ আমাদের কানে বাজায়, গাড়ি কাছে এলে সেই ঢেউগুলো পুঞ্জীভূত হয়ে কানে চড়া সুরের অনুভূতি জাগায়। আলোতে চড়া রঙের সপ্তক বেগনির দিকে।

কোনো কোনো গ্যাসীয় নীহারিকার যে উজ্জ্বলতা সে তার আপন আলোতে নয়। যে নক্ষত্রগুলি তাদের মধ্যে ভিড় করে আছে তারাই ওদের আলোকিত করেছে। আবার কোথাও নীহারিকার পরমাণুগুলি নক্ষত্রের আলোককে নিজেরা শুষে নিয়ে ভিন্ন দৈর্ঘ্যের আলোতে তাকে চালান করে।

নীহারিকার আর-একটি বিশেষত্ব দেখতে পাওয়া যায়। তার মাঝে মাঝে মেঘের মতো কালো কালো লেপ দেওয়া আছে, নিবিড়তম তারার ভিড়ের মধ্যে এক এক জায়গায় কালো ফাঁক। জ্যোতিষী বার্নার্ডের পর্যবেক্ষণে এমনতরো প্রায় দুশোটা কালো আকাশ-প্রদেশ দেখা দিয়েছে। বার্নার্ড অনুমান করেন এগুলি অস্বচ্ছ গ্যাসের মেঘ, ওর পিছনের তারাগুলিকে ঢেকে রেখেছে। কোনোটা কাছে, কোনোটা দূরে, কোনোটা ছোটো, কোনোটা প্রকাণ্ড বড়ো।

নক্ষত্রলোকের অনুবর্তী আকাশে যে বস্তুপুঞ্জ ছড়িয়ে আছে তার নিবিড়তা হিসাব করলে জানা যায় যে সে অত্যন্ত কম, প্রত্যেক ঘন-ইঞ্চিতে আধ ডজন মাত্র পরমাণু। সে যে কত কম এই বিচার করলে বোঝা যাবে যে, বিজ্ঞান পরীক্ষাগারে সব চেয়ে জোরের পাম্প দিয়ে যে শূন্যতা সৃষ্টি করা হয় তার মধ্যেও ঘনইঞ্চিতে বহু কোটি পরমাণু বাকি থেকে যায়।

আমাদের আপন নাক্ষত্রলোকটি প্রকাণ্ড একটা চ্যাপটা ঘুরপাক-খাওয়া জগৎ, বহু শত কোটি নক্ষত্রে পূর্ণ। তাদের মধ্যে মধ্যে যে আকাশ তাতে অতি সূক্ষ্ম গ্যাস কোথাও বা অত্যন্ত বিরল, কোথাও বা অপেক্ষাকৃত ঘন, কোথাও বা উজ্জ্বল, কোথাও বা অস্বচ্ছ। সূর্য আছে এই নাক্ষত্রলোকের কেন্দ্র থেকে তার ব্যাসের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ দূরে, একটা নাক্ষত্রমেঘের মধ্যে। নক্ষত্রগুলির বেশি ভিড় নীহারিকার কেন্দ্রের কাছে।

অ্যাণ্টারীজ নক্ষত্রের ব্যাস উনচল্লিশ কোটি মাইল, আর সূর্যের ব্যাস আট লক্ষ চৌষট্টি হাজার মাইল। সূর্য মাঝারি বহরের তারা বলেই গণ্য। যে নাক্ষত্রজগতের একটি মধ্যবিত্ত তারা এই সূর্য, তার মতো এমন আরও আছে লক্ষ লক্ষ জগৎ। সব নিয়ে এই যে ব্রহ্মাণ্ড কোথায় তার সীমা তা আমরা জানি নে।

আমাদের সূর্য তার সব গ্রহগুলিকে নিয়ে ঘুর খাচ্ছে আর তার সঙ্গেই ঘুরছে এই

নাক্ষত্রচক্রবর্তীর সব তারাই, একটি কেন্দ্রের চার দিকে। এই মহলে সূর্যের ঘূর্ণিপাকের গতিবেগ এক সেকেণ্ডে প্রায় দুশো মাইল। চলতি চাকার থেকে ছিটকে-পড়া কাদার মতোই সে ঘোরার বেগে নাক্ষত্রচক্র থেকে ছিটকে পড়ত; এই চক্রের হাজার কোটি নক্ষত্র ওকে টেনে রাখছে, সীমার বাইরে যেতে দেয় না।

এই টানের শক্তির খবরটা নিশ্চয়ই পাঠকদের জানা তবু সেটা এই বিশ্ববর্ণনা থেকে বাদ দিলে চলবে না।

সত্য হোক মিথ্যে হোক একটা গল্প চলিত আছে যে, বিজ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ন্যুটন একদিন দেখতে পেলেন একটা আপেল ফল গাছ থেকে পড়ল, তখনই তাঁর মনে প্রশ্ন উঠল ফলটা নিচেই বা পড়ে কেন, উপরেই বা যায় না কেন উড়ে। তাঁর মনে আরও অনেক প্রশ্ন ঘুরছিল। ভাবছিলেন চাঁদ কিসের টানে পৃথিবীর চার দিকে ঘুরছে, পৃথিবীই বা কিসের টানে ঘুরছে সূর্যের চার দিকে। ফল পড়ার ব্যাপারে তিনি বুঝলেন একটা টান দেবার শক্তি আছে এই পৃথিবীর। সব-কিছুকে সে নিজের ভিতরের দিকে টানছে। তাই যদি হবে তবে চন্দ্রকেই বা সে ছাড়বে কেন। নিশ্চয়ই এই শক্তিটা দূরে কাছে এমন জিনিস নেই যাকে টানবে না। ভাবনাটা ক্রমেই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। বুঝতে পারা গেল একা পৃথিবী নয় সব-কিছুই টানে সব-কিছুকে। যার মধ্যে যতটা আছে বস্তু, তার টানবার জোর ততটা। তা ছাড়া দূরত্বের কম-বেশিতে এই টানের জোরও বাড়ে-কমে। দূরত্ব দ্বিগুণ বাড়ে যদি, টান কমে যায় চার গুণ, চার গুণ বাড়লে টান কমবে ষোলো গুণ। এ না হলে সূর্যের টানে পৃথিবীর যা-কিছু সম্বল সব লুঠ হয়ে যেত। এই টানাটানির পালোয়ানিতে কাছের জিনিসের 'পরে পৃথিবীর জিত রয়ে গেল। ন্যুটনের মৃত্যুর বছর-সত্তর পরে আর-একজন ইংরেজ বিজ্ঞানী লর্ড ক্যাভেণ্ডিশ তাঁর পরখ করবার ঘরে দুটো সীসের গোলা ঝুলিয়ে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিয়েছেন তারা ঠিক নিয়ম মেনেই পরস্পরকে টানছে। এই নিয়মের হিসাবটি বাঁচিয়ে আমিও এই লেখার টেবিলে বসে সব-কিছুকেই টানছি। পৃথিবীকে, চন্দ্রকে, সূর্যকে, বিশ্বে যত তারা আছে তার প্রত্যেকটাকেই। যে পিঁপড়েটা এসেছে আমার ঘরের কোণে আহারের খোঁজে তাকেও টানছি; সেও দূর থেকে দিচ্ছে আমায় টান, বলা বাহুল্য আমাকে বিশেষ ব্যস্ত করতে পারে নি। আমার টানে ওরও তেমন ভাবনার কারণ ঘটল না। পৃথিবী এই আঁকড়ে ধরার জোরে অসুবিধা ঘটিয়েছে অনেক। চলতে গেলে পা তোলার দরকার। কিন্তু পৃথিবী টানে তাকে নিচের দিকে; দূরে যেতে হাঁপিয়ে পড়ি সময়ও লাগে বিস্তর। এই টেনে রাখার ব্যবস্থা গাছপালার পক্ষে খুবই ভালো। কিন্তু মানুষের পক্ষে একেবারেই নয়। তাই জন্মকাল থেকে মৃত্যুকাল

পর্যন্ত এই টানের সঙ্গে মানুষকে লড়াই করে চলতে হয়েছে। অনেক আগেই সে আকাশে উড়তে পারত কিন্তু পৃথিবী কিছুতেই তাকে মাটি ছাড়তে দিতে চায় না। এই চব্বিশঘণ্টা টানের থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে মানুষ কল বানিয়েছে বিস্তর— এতে পৃথিবীকে কিছু ফাঁকি দেওয়া চলে— সম্পূর্ণ না। কিন্তু এই টানকে নমস্কার করি যখন জানি, পৃথিবী হঠাৎ যদি তার টান আলগা করে তা হলে যে ভীষণ বেগে পৃথিবী পাক খাচ্ছে তাতে আমরা তার পিঠের উপর থেকে কোথায় ছিটকে পড়ি তার ঠিকানা থাকে না। বস্তুত পৃথিবীর টানটা এমন ঠিক মাপে হয়েছে যাতে আমরা চলতে পারি অথচ পৃথিবী ছাড়তে পারি নে।

বিপরীতধর্মী বৈদ্যুতকণার যুগলমিলনে যে সৃষ্টি হল সেই জগৎটার মধ্যে সর্বব্যাপী দুই বিরুদ্ধ শক্তির ক্রিয়া, চলা আর টানা, মুক্তি আর বন্ধন। একদিকে ব্রহ্মাণ্ডজোড়া মহা দৌড় আর-একদিকে ব্রহ্মাণ্ডজোড়া মহা টান। সবই চলছে আর সবই টানছে। চলাটা কী আর কোথা থেকে তাও জানি নে। আর টানটা কী আর কোথা থেকে তাও জানি নে। আজকের বিজ্ঞানে বস্তুর বস্তুত্ব এসেছে অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয়ে, সব চেয়ে প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে চলা আর টানা। চলা যদি একা থাকত তা হলে চলন হত একেবারে সিধে রাস্তায় অন্তহীনে। টানা তাকে ফিরিয়ে ফিরিয়ে আনছে অন্তবানে, ঘোরাচ্ছে চক্রপথে। সূর্য এবং গ্রহের মধ্যে আছে বহুলক্ষ মাইল ফাঁকা, সেই দূরত্বের শূন্য পার হয়ে নিরন্তর চলেছে অশরীরী টানের শক্তি, অদৃশ্য লাগামে বেঁধে গ্রহগুলোকে ঘোরাচ্ছে সার্কাসের ঘোড়ার মতো। এদিকে সূর্যও ঘুরছে বহুকোটি ঘূর্ণ্যমান নক্ষত্রে-তৈরি এক মহা জ্যোতিশ্চক্রের টানে। বিশ্বের অণীয়সী গতিশক্তির দিকে তাকাও সেখানেও বিরাট চলা-টানার একই ছন্দের লীলা। সূর্য আর গ্রহের মাঝখানের যে দূরত্ব, তুলনা করলে দেখা যাবে অতিপরমাণু জগতে প্রোটন ইলেকট্রনের মধ্যেকার দূরত্ব কম-বেশি সেই পরিমাণে। টানের জোর সেই শূন্যকে পেরিয়ে নিত্যকাল বাঁধা পথে ঘোরাচ্ছে ইলেকট্রনের দলকে। গতি আর সংযমের অসীম সামঞ্জস্য নিয়ে সব-কিছু। এইখানে বলে রাখা দরকার, ইলেকট্রন প্রোটনের টানাটানি মহাকর্ষের নয়, সেটা বৈদ্যুত টানের। পরমাণুদের অন্তরের টানটা বৈদ্যুতের টান, বাহিরের টানটা মহাকর্ষের, যেমন মানুষের ঘরের টানটা আত্মীয়তার, বাইরের টানটা সমাজের।

মহাকর্ষ সম্বন্ধে এই যে মতের আলোচনা করা গেল ন্যুটনের সময় থেকে এটা চলে আসছে। এর থেকে আমাদের মনে এই একটা ধারণা জন্মে গেছে যে, দুই বস্তুর মাঝখানের অবকাশের ভিতর দিয়ে একটা অদৃশ্য শক্তি টানাটানি করছে।

কিন্তু এই ছবিটা মনে আনবার কিছু বাধা আছে। মহাকর্ষের ক্রিয়া একটুও সময়

নেয় না। আকাশ পেরিয়ে আলো আসতে সময় লাগে সেকথা পূর্বে বলেছি। বৈদ্যুতিক শক্তিরাও ঢেউ খেলিয়ে আসে আকাশের ভিতর দিয়ে। কিন্তু অনেক পরীক্ষা করেও মহাকর্ষের বেলায় সে রকম সময় নিয়ে চলার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তার প্রভাব তাৎক্ষণিক। আরও একটা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আলো বা উত্তাপ পথের বাধা মানে কিন্তু মহাকর্ষ তা মানে না। একটা জিনিসকে আকাশে ঝুলিয়ে রেখে পৃথিবী আর তার মাঝখানে যত বাধাই রাখা যাক না তার ওজন কমে না। ব্যবহারে অন্য কোনো শক্তির সঙ্গে এর মিল পাওয়া যায় না।

অবশেষে আইনস্টাইন দেখিয়ে দিলেন এটা একটা শক্তিই নয়। আমরা এমন একটা জগতে আছি যার আয়তনের স্বভাব অনুসারেই প্রত্যেক বস্তুই প্রত্যেকের দিকে ঝুঁকতে বাধ্য। বস্তুমাত্র যে-আকাশে থাকে তার একটা বাঁকানো গুণ আছে, মহাকর্ষে তারই প্রকাশ। এটা সর্বব্যাপী, এটা অপরিবর্তনীয়। এমনকি আলোককেও এই বাঁকা বিশ্বের ধারা মানতে হয়। তার নানা প্রমাণ পাওয়া গেছে। বোঝার পক্ষে টানের ছবি সহজ ছিল কিন্তু যে নূতন জ্যামিতির সাহায্যে এই বাঁকা আকাশের ঝোঁক হিসেব ক'রে জানা যায় সে কজন লোকেরই বা আয়ত্তে আছে।

যাই হোক ইংরেজিতে যাকে গ্র্যাভিটেশন বলে তাকে মহাকর্ষ না ব'লে ভারাবর্তন নাম দিলে গোল চুকে যায়।

আমাদের এই যে নাক্ষত্রজগৎ, এ যেন বিরাট শূন্য আকাশের দ্বীপের মতো। এখান থেকে দেখা যায় দূরে দূরে আরও অনেক নাক্ষত্রদ্বীপ। এই দ্বীপগুলির মধ্যে সব চেয়ে আমাদের নিকটের যেটি, তাকে দেখা যায় অ্যাণ্ড্রমিডা নক্ষত্র দলের কাছে। দেখতে একটা ঝাপসা তারার মতো। সেখান থেকে যে আলো চোখে পড়ছে সে যাত্রা করে বেরিয়েছে ন লক্ষ বছর পূর্বে। কুণ্ডলীচক্র-পাকানো নীহারিকা আরও আছে আরও দূরে। তাদের মধ্যে সব চেয়ে দূরবর্তীর সম্বন্ধে হিসাবে স্থির হয়েছে যে, সে আছে তিন হাজার লক্ষ আলো-বছর দূরত্বের পথে। বহুকোটি নক্ষত্র-জড়ো-করা এইসব নাক্ষত্রজগতের সংখ্যা একশো কোটির কম হবে না।

একটা আশ্চর্যের কথা উঠেছে এই যে কাছের দুটো তিনটে ছাড়া বাকি নাক্ষত্রজগৎগুলো আমাদের জগতের কাছ থেকে কেবলই সরে চলেছে। যেগুলি যত বেশি দূরে তাদের দৌড়-বেগও তত বেশি। এইসব নাক্ষত্রজগতের সমষ্টি নিয়ে যে বিশ্বকে আমরা জানি, কোনো কোনো পণ্ডিত ঠিক করেছেন সে ক্রমশই ফুলে উঠছে। সুতরাং যতই ফুলছে ততই নক্ষত্রপুঞ্জের পরস্পরের দূরত্ব যাচ্ছে বেড়ে। যে-বেগে

তা'রা সরছে তাতে আর একশো ত্রিশ কোটি বছর পরে তাদের পরস্পরের দূরত্ব এখনকার চেয়ে দ্বিগুণ হবে।

অর্থাৎ এই পৃথিবীর ভূগঠনের সময়ের মধ্যে নক্ষত্রবিশ্ব আগেকার চেয়ে দ্বিগুণ ফেঁপে গিয়েছে।

শুধু এই নয়, একদল বিজ্ঞানীর মতে এই বস্তুপুঞ্জসংঘটিত বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গে গোলকরূপী আকাশটাও বিস্ফারিত হয়ে চলেছে। এঁদের মতে আকাশের কোনো-এক বিন্দু থেকে সিধে লাইন টানলে সে লাইন অসীমে চলে না গিয়ে ঘুরে এসে এক সময়ে সেই প্রথম বিন্দুতে এসে পৌঁছয়। এই মত অনুসারে দাঁড়াচ্ছে এই যে, আকাশ-গোলকে নক্ষত্রজগৎগুলি আছে, যেমন আছে পৃথিবী-গোলককে ঘিরে জীবজন্তু গাছপালা। সুতরাং বিশ্বজগৎটার ফেঁপে-ওঠা সেই আকাশমণ্ডলেরই বিস্ফারণের মাপে। কিন্তু মতের স্থিরতা হয় নি এ কথা মনে রাখা উচিত; আকাশ অসীম, কালও নিরবধি, এই মতটাও মরে নি। আকাশটাও বুদবুদ কি না এই প্রসঙ্গে আমাদের শাস্ত্রের মত এই যে সৃষ্টি চলেছে প্রলয়ের দিকে। সেই প্রলয়ের থেকে আবার নূতন সৃষ্টি উদ্ভাসিত হচ্ছে, ঘুম আর জাগার পালার মতো। অনাদিকাল থেকে সৃষ্টি ও প্রলয়ের পর্যায় দিন ও রাত্রির মতো বারে বারে ফিরে ফিরে আসছে, তার আদিও নেই অন্তও নেই, এই কল্পনাই মনে আনা সহজ।

পর্সিয়ুস রাশিতে অ্যালগল নামে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে। তার উজ্জ্বলতা স্থির থাকে ষাট ঘণ্টা। তার পরে পাঁচ ঘণ্টার শেষে তার প্রভা কমে যায় এক-তৃতীয়াংশ। আবার উজ্জ্বল হতে শুরু করে। পাঁচ ঘণ্টা পরে পূর্ণ উজ্জ্বলতা পায়, সেই ভরা ঐশ্বর্য থাকে ষাট ঘণ্টা। এইরকম উজ্জ্বলতার কারণ ঘটায় ওর জুড়ি নক্ষত্র। প্রদক্ষিণের সময় ক্ষণে ক্ষণে গ্রহণ লাগে গ্রহণ ছাড়ে।

আর-একদল তারা আছে তাদের দীপ্তি বাইরের কোনো কারণ থেকে নয়, কিন্তু ভিতরেরই কোনো জোয়ার ভাঁটায় একবার কমে একবার বাড়ে। কিছুদিন ধরে সমস্ত তারাটা হয়ে যায় বিস্ফারিত, আবার ক্রমে যায় সংকুচিত হয়ে। তার আলোটা যেন নাড়ির দব্‌দবানি। সিফিউস নক্ষত্রমণ্ডলীতে এইসব তারা প্রথম খুঁজে পাওয়া গেছে ব'লে এদের নাম হয়েছে সিফাইড্‌স্। এদের খোঁজ পাওয়ার পর থেকে নাক্ষত্রজগতের দূরত্ব বের করার একটা মস্ত সুবিধা হয়েছে।

আরও একদল নক্ষত্রের কথা বলবার আছে, তারা নাম পেয়েছে নতুন নক্ষত্র। তাদের আলো হঠাৎ অতিক্রত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, অনেক হাজার গুণ থেকে অনেক লক্ষ গুণ পর্যন্ত। তার পরে ধীরে ধীরে অত্যন্ত ম্লান হয়ে যায়। এক কালে এই

হঠাৎ-জ্বলে ওঠা তারাদের আবির্ভাবকে নতুন আবির্ভাব মনে করে এদের নাম দেওয়া হয়েছিল নতুন তারা।

কিছুকাল পূর্বে লাসের্টা অর্থাৎ গোধিকা নামধারী নক্ষত্ররাশির কাছে একটি, যাকে বলে নতুন তারা, হঠাৎ অত্যুজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠল। পরে পরে চারটে জ্যোতির খোলস দিলে ছেড়ে। দেখা গেল ছাড়া খোলস দৌড় দিয়েছে এক সেকেণ্ডে ২২০০ মাইল বেগে। এই নক্ষত্র আছে প্রায় ২৬০০ আলো-চলা-বছর দূরে। অর্থাৎ এই যে তারার গ্যাস জ্বলনের উৎপতন আজ আমাদের চোখে পড়ল এটা ঘটেছিল খ্রীস্টজন্মের সাড়ে ছশো বছর পূর্বে। তার এইসব ছেড়ে-ফেলা গ্যাসের খোলসগুলির কী হল এ নিয়ে আন্দাজ চলেছে। সে কি ওর বন্ধন কাটিয়ে মহাশূন্যে বিবাগী হয়ে যাচ্ছে, না ওর টানে বাঁধা পড়ে ঠাণ্ডা হয়ে ওর আনুগত্য ক'রে চলেছে। এই যে তারা জ্বলে-ওঠা, এ ঘটনাকে বিচার করে কোনো কোনো পণ্ডিত বলেছেন হয়তো এমনি করেই নক্ষত্রের বিস্ফোরণ থেকে ছাড়া-পাওয়া গ্যাসপুঞ্জ হতেই গ্রহের উৎপত্তি; হয়তো সূর্য এক সময়ে এইরকম নতুন তারার রীতি অনুসারে আপন উৎসারিত বিচ্ছিন্ন অংশ থেকেই গ্রহসন্তানদের জন্ম দিয়েছে। এ মত যদি সত্য হয় তা হলে সম্ভবত প্রত্যেক প্রাচীন নক্ষত্রেরই এক সময়ে একটা বিস্ফোরণের দশা আসে, আর গ্রহবংশের সৃষ্টি করে। হয়তো আকাশে নিঃসন্তান নক্ষত্র অল্পই আছে।

দ্বিতীয় মত এই যে, বাহিরের একটা চলতি তারা অন্য আর-একটা তারার টানের এলাকার মধ্যে এসে প'ড়ে ঘটিয়েছে এই প্রলয় কাণ্ড। এই মত অনুসারে পৃথিবীর উৎপত্তির আলোচনা পরে করা যাবে।

আমাদের নাক্ষত্রজগতে যেসব নক্ষত্র আছে তারা নানা রকমের। কেউ বা সূর্যের চেয়ে দশ হাজার গুণ বেশি আলো দেয়, কেউ বা দেয় একশো ভাগ কম। কারও বা পদার্থপুঞ্জ অত্যন্ত ঘন, কারও বা নিতান্তই পাতলা। কারও উপরিতলের তাপমাত্রা বিশ-ত্রিশ হাজার সেন্টিগ্রেড পরিমাণে, কারও বা তিন হাজার সেন্টিগ্রেডের বেশি নয়, কেউ বা বারে বারে প্রসারিত কুঞ্চিত হতে হতে আলো-উত্তাপের জোয়ার-ভাঁটা খেলাচ্ছে, কেউ বা চলেছে একা একা; কারাও বা চলেছে জোড় বেঁধে, তাদের সংখ্যা নক্ষত্রদলের একতৃতীয়াংশ। জুড়ি নক্ষত্রেরা ভারাবর্তনের জালে ধরা প'ড়ে যাপন করছে প্রদক্ষিণের পালা। জুড়ির মধ্যে যার জোর কম প্রদক্ষিণের দায়টা পড়ে তারই 'পরে। যেমন সূর্য আর পৃথিবী। অবশ্য পৃথিবী যে কিছু টান দিচ্ছে না তা নয় কিন্তু সূর্যকে বড়ো বেশি বিচলিত করতে পারে না। প্রদক্ষিণের অনুষ্ঠানটা একা সম্পন্ন করছে পৃথিবীই। যেখানে দুই জ্যোতিষ্ক প্রায় সমান জোরের সেখানে উভয়ের

মাঝামাঝি জায়গায় একটা লক্ষ্য স্থির থাকে, দুই নক্ষত্র সেটাকেই প্রদক্ষিণ করে।

এই জুড়ি নক্ষত্র হল কী ক'রে তা নিয়ে আলাদা আলাদা মত শুনি। কেউ কেউ বলেন এর মূলে আছে দস্যুবৃত্তি। অর্থাৎ জোর যার মুলুক তার নীতি অনুসারে একটা তারা আর-একটাকে বন্দী ক'রে আপন সঙ্গী ক'রে রেখেছে। অন্য মতে জুড়ির জন্ম মূল নক্ষত্রের নিজেরই অঙ্গ থেকে। বুঝিয়ে বলি। নক্ষত্র যতই ঠাণ্ডা হয় ততই আঁট হয়ে ওঠে। এমনি ক'রে যতই হয় ঘন ততই তার ঘুরপাক হয় দ্রুত। সেই দ্রুতগতির ঠেলায় প্রবল হতে থাকে বাহির-মুখো বেগ। গাড়ির চাকা যখন ঘোরে খুব জোরে তখন তার মধ্যে এই বাহির-মুখো বেগ জোর পায় বলেই তার গায়ের কাদা ছিটকে পড়ে, আর তার জোড়গুলো যদি কাঁচা থাকে তা হলে তার অংশগুলো ভেঙে ছুটে যায়। নক্ষত্রের ঘুরপাকের জোর বাড়তে বাড়তে এই বাহির-মুখো বেগ বেড়ে যাওয়াতে অবশেষে একদিন সে ভেঙে দুখানা হয়ে যায়। তখন থেকে এই দুই অংশ দুই নক্ষত্র হয়ে যুগলযাত্রায় চলা শুরু করে।

কোনো কোনো জুড়ির প্রদক্ষিণের এক পাক শেষ করতে লাগে অনেক হাজার বছর। কখনও দেখা যায় ঘুরতে ঘুরতে একটি আর-একটিকে আমাদের দৃষ্টিলক্ষ্য থেকে আড়াল করে দেয়, উজ্জ্বলতায় দেয় বাধা। কিন্তু উজ্জ্বলতায় বিশেষ লোকসান ঘটত না যদি আড়ালকারী নক্ষত্র অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল না হত। নক্ষত্রে নক্ষত্রে উজ্জ্বলতার ভেদ যথেষ্ট আছে। এমনও আছে যে কোনো নক্ষত্র তার সব দীপ্তি হারিয়েছে। প্রকাণ্ড আয়তন ও প্রচণ্ড উত্তাপ নিয়ে যেসব নক্ষত্র তাদের বাল্যদশা শুরু করেছে, তিনকাল যাবার সময় তা'রা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়ে খরচ করবার মতো আলোর পুঁজি ফুঁকে দিয়েছে। শেষ দশায় এইসব দেউলে নক্ষত্র থাকে অখ্যাত হয়ে অন্ধকারে।

বেটলজিয়ুজ নামে এক মহাকায় নক্ষত্র আছে, তার লাল আলো দেখলে বোঝা যায় তার বয়স হয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু তবু জলজল করছে। অথচ আছে অনেক দূরে, পৃথিবীতে তার আলো পৌঁছতে লাগে ১৯০ বছর। আসল কথা, আয়তন এর অত্যন্ত প্রকাণ্ড, নিজের দেহের মধ্যে বহুকোটি সূর্যকে জায়গা দিতে পারে। ওদিকে বৃশ্চিক রাশিতে অ্যাণ্টারীজ নামক নক্ষত্র আছে, তার আয়তন বেটলজিয়ুজের প্রায় দুনো। আবার এমন নক্ষত্র আছে যারা গ্যাসময় বটে কিন্তু যাদের বস্তুপদার্থ ওজনে লোহার চেয়ে অনেক ভারি।

মহাকায় নক্ষত্রদের কায়া যে বড়ো তার কারণ এ নয় যে, তাদের বস্তুপরিমাণ বেশি, তারা অত্যন্ত বেশি ফেঁপে আছে মাত্র। আবার এমন অনেক ছোটো নক্ষত্র আছে তা'রা যে ছোটো তার কারণ তাদের গ্যাসের সম্বল অত্যন্ত ঠাসা ক'রে পোঁটলা-বাঁধা।

সূর্যের ঘনত্ব এদের মাঝামাঝি, অর্থাৎ জলের চেয়ে কিছু বেশি; ক্যাপেলা নক্ষত্রের গড়পড়তা ঘনত্ব আমাদের হাওয়ার সমান। কিন্তু সেখানে বায়ুপরিবর্তন করবার কথা যদি চিন্তা করি তা হলে মনে রাখতে হবে পরিবর্তন হবে দারুণ বেশি। আবার একেও ছাড়িয়ে গেছে কালপুরুষমণ্ডলীভুক্ত লালরঙের দানব তারা বেটলজিয়ুজ এবং বৃশ্চিক রাশির অ্যান্টারীজ। এদের ঘনত্বের এত অত্যন্ত কমতি, পৃথিবীর কোনো পদার্থের সঙ্গে তার সুদূর তুলনাও হতে পারে না। বিজ্ঞান-পরীক্ষাগারের খুব কষে পাম্প-করা পাত্রে যেটুকু গ্যাস বাকি থাকে তার চেয়েও কম।

আবার অপর কিনারায় আছে সাদা রঙের বেঁটে তারাগুলো। তাদের ঘনত্বের কাছে লোহা প্লাটিনম কিছুই ঘেঁষতে পারে না। অথচ এরা জমাট কঠিন নয়, এরা গ্যাসদেহী সূর্যেরই সগোত্র। তাদের অন্দরমহলে জ্বলুনির যে প্রচণ্ড তাপ তাতে ইলেকট্রনগুলো প্রোটনের বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তা'রা খালাস পায় তাঁবেদারির দায়িত্ব থেকে— উভয়ে উভয়ের মান বাঁচিয়ে চললে যে-জায়গা জুড়ত সেটা যায় কমে, ক্রমাগতই উচ্ছৃঙ্খল ভাঙা পরমাণুর মধ্যে মাথা-ঠোকাঠুকি চলতে থাকে। পরমাণুর সেই আয়তনখর্বতা অনুসারে নক্ষত্রের আয়তন হয়ে যায় ছোটো। এদিকে এই ভাঙাচোরার বে-আইনি শান্তিভঙ্গ থেকে উষ্মা বেড়ে ওঠে সহজ মাত্রা ছাড়িয়ে, ঘন গ্যাস ভারি হয়ে ওঠে প্লাটিনমের তিন হাজার গুণ বেশি। সেইজন্যে বেঁটে তারাগুলো মাপে হয় ছোটো, তাপে কম হয় না, ওজনের বাড়াবাড়িতেও বড়োদের ছাড়িয়ে যায়। সিরিয়স নক্ষত্রের একটি অস্পষ্ট সঙ্গী তারা আছে। সাধারণ গ্রহের মতো ছোটো তার মাপ, অথচ সূর্যের মতো তার বস্তুপুঞ্জের পরিমাণ। সূর্যের ঘনত্ব জলের দেড়গুণের কিছু কম, সিরিয়সের সঙ্গীটির ঘনত্ব গড়ে জলের চেয়ে পঞ্চাশ হাজার গুণ বেশি। একটা দেশালাই-বাক্সের মধ্যে এর গ্যাস ভরলে সেটা ওজনে পঞ্চাশ মণ ছাড়িয়ে যাবে। আবার পর্সিয়ুস নক্ষত্রের খুদে সঙ্গীটির ঐ পরিমাণ পদার্থ ওজনে হাজার-দশেক মণ যাবে পেরিয়ে। আবার শুনতে পাওয়া যাচ্ছে কোনো কোনো বিজ্ঞানী এ মত মানেন না। পৃথিবীর যখন নতুন গড়নপিটন হচ্ছিল তখন জলে স্থলে ঘন ঘন পরস্পরের প্রতিবাদ চলছিল, আজ যেখানে গহ্বর কাল সেখানে পাহাড়, কিছুকাল থেকে প্রাকৃতবিজ্ঞানে এই দশা ঘটিয়েছে। কত মত উঠছে আর নামছে তার ঠিকানা নেই।

আমাদের নাক্ষত্রজগতের নক্ষত্রের দল কেউ পুবের দিকে কেউ পশ্চিমের দিকে নানা রকম পথ ধরে চলেছে। সূর্য দৌড়েছে সেকেণ্ডে প্রায় দুশো মাইল বেগে, একটা দানব তারা আছে তার দৌড়ের বেগ সেকেণ্ডে সাতশো মাইল।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এদের মধ্যে কেউ এই নাক্ষত্রজগতের শাসন ছাড়িয়ে বাইরে

উধাও হয়ে যায় না। এক বাঁকা-টানের মহাজালে বহুকোটি নক্ষত্র বেঁধে নিয়ে এই জগৎটা লাটিমের মতো পাক খাচ্ছে। আমাদের নাক্ষত্রজগতের দূরবর্তী বাইরেকার জগতেও এই ঘূর্ণিপাক। এদিকে পরমাণুজগতের অণুতম আকাশেও চলেছে প্রোটন-ইলেকট্রনের ঘুরখাওয়া। কালস্রোত বেয়ে চলেছে নানা জ্যোতির্লোকের নানা আবর্ত। এই জন্যেই আমাদের ভাষায় এই বিশ্বকে বলে জগৎ। অর্থাৎ এর সংজ্ঞা হচ্ছে এ চলছে— চলাতেই এর উৎপত্তি, চলাই এর স্বভাব।

নাক্ষত্রজগতের দেশকালের পরিমাপ পরিমাণ গতিবেগ দূরত্ব ও তার অগ্নি-আবর্তের চিন্তনাতীত প্রচণ্ডতা দেখে যতই বিস্ময় বোধ করি একথা মানতে হবে বিশ্বে সকলের চেয়ে বড়ো আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মানুষ তাদের জানছে, এবং নিজের আশু জীবিকার প্রয়োজন অতিক্রম করে তাদের জানতে চাচ্ছে। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ক্ষণভঙ্গুর তার দেহ, বিশ্ব-ইতিহাসের কণামাত্র সময়টুকুতে সে বর্তমান, বিরাট বিশ্বসংস্থিতির অণুমাত্র স্থানে তার অবস্থান, অথচ অসীমের কাছঘেঁষা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দুষ্পরিমেয় বৃহৎ ও দুরধিগম্য সূক্ষ্মের হিসাব সে রাখছে— এর চেয়ে আশ্চর্য মহিমা বিশ্বে আর কিছুই নেই, কিংবা বিপুল সৃষ্টিতে নিরবধি কালে কী জানি আর-কোনো লোকে আর-কোনো চিত্তকে অধিকার ক'রে আর-কোনো ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে কি না। কিন্তু একথা মানুষ প্রমাণ করেছে যে, ভূমা বাহিরের আয়তনে নয়, পরিমাণে নয়, আন্তরিক পরিপূর্ণতায়।

সৌরজগৎ

সূর্যের সঙ্গে গ্রহদের সম্বন্ধের বাঁধন বিচার করলে দেখা যায় গ্রহগুলির প্রদক্ষিণের রাস্তা সূর্যের বিষুবরেখার প্রায় সমক্ষেত্রে। এই গেল এক। আর-এক কথা, সূর্য যেদিক দিয়ে আপন মেরুদণ্ডকে বেষ্টন করে ঘুর দেয়, গ্রহেরাও সেই দিক দিয়ে পাক খায় আর সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এর থেকে বোঝা যায় সূর্যের সঙ্গে গ্রহদের সম্বন্ধ জন্মগত। তাদের সেই জন্মবিবরণের আলোচনা করা যাক।

নক্ষত্রেরা পরস্পর বহু কোটি মাইল দূরে দূরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ব'লে তাদের গায়ে পড়া বা অতিশয় কাছে আসার সম্ভাবনা নেই বললেই হয়। কেউ কেউ আন্দাজ করেন যে, প্রায় দুশো কোটি বছর আগে এইরকমের একটি দুঃসম্ভব ঘটনাই হয়তো ঘটেছিল। একটি প্রকাণ্ড নক্ষত্র এসে পড়েছিল তখনকার যুগের সূর্যের কাছে। ঐ নক্ষত্রের টানে সূর্য এবং আগন্তুক নক্ষত্রের মধ্যে প্রচণ্ড বেগে উথলে উঠল অগ্নিবাষ্পের জোয়ারের

ঢেউ। অবশেষে টানের চোটে কোনো কোনো ঢেউ বেড়ে উঠতে উঠতে ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল। সেই বড়ো নক্ষত্র হয়তো এদের কতকগুলোকে আত্মসাৎ করে থাকবে, বাকিগুলো সূর্যের প্রবল টানে তখন থেকে ঘুরতে লাগল সূর্যের চারি দিকে। তেজ ছড়িয়ে দিয়ে এরা ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত হল। সেই ছোটো-বড়ো জলন্ত বাষ্পের টুকরোগুলি থেকেই গ্রহদের উৎপত্তি; পৃথিবী তাদেরই মধ্যে একটি। এরা ক্রমশ আপন তেজ ছড়িয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গ্রহের আকার ধরেছে। আকাশে নক্ষত্রের দূরত্ব, সংখ্যা ও গতি হিসাব করে দেখা গেছে যে প্রায় পাঁচ-ছ' হাজার কোটি বছরে একবার-মাত্র এরকম অপঘাত ঘটতেও পারে। গ্রহসৃষ্টির এই মত মেনে নিলে বলতে হবে যে গ্রহপরিচয়ওয়ালা নক্ষত্রসৃষ্টি এই বিশ্বে প্রায় অঘটনীয় ব্যাপার। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের অণ্ডগোলকসীমা ফেঁপে উঠতে উঠতে নক্ষত্রেরা ক্রমশই পরস্পরের কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে এ মত যদি স্বীকার করতে হয় তা হলে পূর্বযুগে আকাশগোলক যখন সংকীর্ণ ছিল তখন তারায় তারায় ঠোকাঠুকির ব্যাপার সদা-সর্বদা ঘটত বলে ধরে নিতে হয়। সেই নক্ষত্র-মেলার ভিড়ের দিনে অনেক নক্ষত্রেরই ছিন্ন অংশ থেকে গ্রহের উৎপত্তি-সম্ভাবনা ছিল একথা যুক্তিসংগত। যে অবস্থায় আমাদের সূর্য অন্য সূর্যের ঠেলা খেয়েছিল সেই অবস্থাটা সেই সংকুচিত বিশ্বের দিনে এখনকার হিসাবমতে দুর সম্ভাবনীয় ছিল না বলেই মনে করে নিতে হবে। যাঁরা এই মত মেনে নেন নি তাঁদের অনেকে বলেন যে, প্রত্যেক নক্ষত্রের বিকাশের বিশেষ অবস্থায় ক্রমশ এমন একটা সময় আসে যখন সে পাকা শিমুলফলের মতো ফেটে গিয়ে প্রচণ্ড বেগে চারি দিকে পুঞ্জ পুঞ্জ অগ্নি-বাষ্প ছড়িয়ে ফেলে দেয়। কোনো কোনো নক্ষত্র থেকে হঠাৎ এরকম জলন্ত গ্যাস বেরিয়ে আসতে দেখা গিয়েছে। ছোটো একটি নক্ষত্র ছিল, কয়েক বছর আগে তাকে ভালো দুরবীন ছাড়া কখনও দেখা যায় নি। একসময় হঠাৎ দীপ্তিতে সে আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রদের প্রায় সমতুল্য হয়ে উঠল। আবার কয়েকমাস পরে আস্তে আস্তে তার প্রবল প্রতাপ এত ক্ষীণ হয়ে গেল যে, পূর্বের মতোই তাকে দুরবীন ছাড়া দেখাই গেল না। উজ্জ্বল অবস্থায় অল্প সময়ের মধ্যে এই নক্ষত্রটি পুঞ্জপুঞ্জ যে জলন্ত বাষ্প চারি দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে সেইগুলিই আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বেঁধে গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি ঘটাতে পারে বলে অনুমান করা অসংগত নয়। এই মত স্বীকার করলে বলতে হবে যে কোটি কোটি নক্ষত্র এই অবস্থার ভিতর দিয়ে গিয়েছে, অতএব সৌরজগতের মতোই আপন আপন গ্রহদলে কোটি কোটি নাক্ষত্রজগৎ এই বিশ্ব পূর্ণ করে আছে। পৃথিবীর সব চেয়ে কাছে আছে যে নক্ষত্র তারও যদি গ্রহমণ্ডলী থাকে তবে তা দেখতে হলে যত বড়ো দুরবীনের দরকার তা আজও তৈরি হয় নি।

অল্প কিছুদিন হল কেম্ব্রিজের এক তরুণ পণ্ডিত লিট্‌লটন সৌরজগৎ-সৃষ্টি সম্বন্ধে একটি নূতন মত প্রচার করেছেন। পূর্বেই বলেছি আকাশে অনেক জোড়ানক্ষত্র পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করছে। এঁর মতে আমাদের সূর্যেরও একটি জুড়ি ছিল। ঘুরতে ঘুরতে আর-একটা ভবঘুরে জ্যোতিষ্ক এসে এই অনুচরের গায়ে পড়ে ধাক্কা মেরে তাকে অনেক দূরে ছিটকে ফেলে দিয়ে চলে গেল। চলে যেতে যেতে পরস্পর আকর্ষণের জোরে মস্ত বড়ো একটা জ্বলন্ত বাষ্পের টানা সূত্র বের হয়ে এসেছিল; তারই ভিতর মিশিয়ে গিয়েছিল এদের উভয়ের উপাদানসামগ্রী। এই বাষ্পসূত্রের যে অংশ সূর্যের প্রবল টানে আটকা পড়ে গেল সেই বন্দী-করা গ্যাসের থেকেই জন্মেছে আমাদের গ্রহমণ্ডলী। এরা আয়তনে ছোটো ব'লেই ঠাণ্ডা হয়ে আসতে দেরি করলে না; তাপ কমতে কমতে গ্যাসের টুকরোগুলো প্রথমে হল তরল, তারপর আরও ঠাণ্ডা হতেই তাদের শক্ত হয়ে ওঠবার দিন এল।

একথা মনে রেখো ঐ-সকল আন্দাজি মতকে নিশ্চিত প্রমাণের মধ্যে ধরে নেওয়া চলবে না।

বলা আবশ্যক, সূর্যের সমস্তটাই গ্যাস। পৃথিবীর যেসব উপাদান মাটি ধাতু পাথরে শক্ত, তাদের সমস্তই সূর্যের মধ্যে প্রচণ্ড উত্তাপে আছে গ্যাসের অবস্থায়। বর্ণলিপিযন্ত্রের রেখাপাত থেকে তার প্রমাণ হয়ে গেছে।

কিরীটিকার অতি সূক্ষ্ম গ্যাস-আবরণের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সেই স্তর পেরিয়ে যত ভিতরে যাওয়া যাবে, ততই দেখা দেবে ঘনতর গ্যাস এবং উষ্ণতর তাপ। সূর্যের উপরিতলের তাপমাত্রা প্রায় দশহাজার ফারেনহাইট ডিগ্রির মাপে, অবশেষে নিচে নামতে নামতে এমন স্তরে পৌঁছব যেখানে ঠাসা গ্যাসের আর স্বচ্ছতা নেই। এই জায়গায় তাপমাত্রা এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ডিগ্রির চেয়ে বেশি। অবশেষে কেন্দ্রে গিয়ে পাওয়া যাবে প্রায় সাত কোটি বিশ লক্ষ ডিগ্রির তাপ। সেখানে সূর্যের দেহবস্তু কঠিন লোহা পাথরের চেয়ে অনেক বেশি ঘন অথচ গ্যাসধর্মী।

সূর্যের দূরত্বের কথাটা অঙ্ক দিয়ে বলবার চেষ্টা না করে একটা কাল্পনিক ব্যাখ্যা দিয়ে বলা যাক। আমাদের দেহে যেসব অনুভূতি ঘটছে আমাদের কাছে তার খবর-চালাচালির ব্যবস্থা করছে অসংখ্য স্পর্শনাড়ী। এই নাড়ীগুলি আমাদের শরীর ব্যাপ্ত ক'রে মিলেছে মস্তিষ্কে গিয়ে। টেলিগ্রাফের তারের মতো তাদের যোগে মস্তিষ্কে খবর আসে, আমরা জানতে পারি কোথায় পিঁপড়ে কামড়াল, জিবে যে খাদ্য লাগল সেটা মিষ্টি, যে দুধের বাটি হাতে তুললুম সে গরম। আমাদের শরীরটা হাওড়া থেকে বর্ধমানের মতো প্রশস্ত নয়, তাই খবর পেতে দেরি লাগে না। তবু অতি অল্প

একটু সময় লাগেই; সে এতই অল্প যে তা মাপা শক্ত। কিন্তু পণ্ডিতেরা তাও মেপেছেন। তাঁরা পরীক্ষা করে স্থির করেছেন যে মানুষের শরীরের মধ্য দিয়ে দৈহিক ঘটনা অনুভূতিতে পৌঁছয় সেকেণ্ডে প্রায় একশো ফুট বেগে। মনে করা যাক, এমন একটা দৈত্য আছে, পৃথিবী থেকে হাত বাড়ালে যার হাত সূর্যে পৌঁছতে পারে। দুঃসাহসী দৈত্যের হাত যতই শক্ত হোক, সূর্যের গা ছোঁবামাত্রই যাবে পুড়ে। কিন্তু পুড়ে যাওয়ার যে ক্ষতি ও যন্ত্রণা নাড়ীযোগে সেটা টের পেতে তার লাগবে প্রায় একশো বাট বছর। তার আগেই সে মারা যায় তো জানবেই না।

সূর্যের ব্যাস ৮ লক্ষ ৬৪ হাজার মাইল; ১১০টি পৃথিবী পাশাপাশি এক সরল রেখায় রাখলে সূর্যের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে পৌঁছতে পারে। সূর্যের ওজন পৃথিবীর চেয়ে ৩ লক্ষ ৩০ হাজার গুণ বেশি, তাই নিজের দিকে সে টান দিতে পারে সেই পরিমাণ ওজনের জোরে। এই টানের জোরে সূর্য পৃথিবীকে আপন আয়ত্তে বেঁধে রাখে, কিন্তু দৌড়ের জোরে পৃথিবী আপন স্বাতন্ত্র্য রাখতে পেরেছে।

গোল আলুর ঠিক মাঝখান দিয়ে উপর থেকে নিচে পর্যন্ত যদি একটা শলা চালিয়ে দেওয়া যায় আর সেই শলাটার চার দিকে যদি আলুটাকে ঘোরানো যায়, তা হলে সেই ঘোরা যেমন হয় সেই রকম হয় ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবীর একবার করে ঘুর-খাওয়া। আমরা বলি, পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডের চার দিকে ঘুরছে। আমাদের শলাফোঁড়া আলুটার সঙ্গে পৃথিবীর তফাত এই যে, তার এ রকম কোনো শলা নেই। মেরুদণ্ড কোনো দণ্ডই নয়। যে জায়গাটাতে শলা থাকতে পারত কাল্পনিক সোজা লাইনের সেই জায়গাটাকেই বলি মেরুদণ্ড। যেমন লাটিম। সে ঘোরে আপন মাঝখানের এমন একটা খাড়া লাইনের চার দিকে যে-লাইনটা মনে-করে-নেওয়া।

মেরুদণ্ডের চার দিকে পৃথিবীর এক পাক ঘুরতে লাগে চব্বিশ ঘণ্টা। সূর্যও আপন মেরুদণ্ডের চার দিকে ঘোরে। ঘুরতে কতক্ষণ লাগে তা যে উপায়ে জানা গেছে সে-কথা বলি। খুব ভোরে যখন আলোতে চোখ ধাঁধায় না তখন সূর্যের দিকে তাকালে হয়তো দেখা যাবে সূর্যের গায়ে কালো কালো দাগ আছে। এক-একটি কালো দাগ সময়ে সময়ে এত বড়ো হয়ে প্রকাশ পায় যে, সমস্ত গ্রহ, উপগ্রহ একত্র করলেও তার সমান হয় না। ছোটো দাগগুলি মিলিয়ে যেতে বেশিদিন লাগে না, কিন্তু বড়ো বড়ো দাগ দু-তিন সপ্তাহ থাকে। দুরবীন দিয়ে দেখলে মনে হয় যেন এরা ক্রমাগত ডানদিকে ঘুরে যাচ্ছে, কিন্তু আসলে ঘুরছে এদের সবাইকে গায়ে নিয়ে সূর্য। এই কালো দাগের অনুসরণ ক'রে এই ঘুরে যাওয়ার সময়টার হিসাব পাওয়া গেছে; প্রমাণ হয়েছে যে, পৃথিবী ঘোরে চব্বিশ ঘণ্টায়, সূর্য ঘোরে ছাব্বিশ দিনে।

সূর্যের দাগগুলো সূর্যের বাইরের আবরণে প্রকাণ্ড আবর্তগহ্বর। সেখান দিয়ে ভিতর থেকে উত্তপ্ত গ্যাস কুণ্ডলী আকারে ঘুরতে-ঘুরতে উপরে বেরিয়ে আসছে। এর কেন্দ্রপ্রদেশ ঘোর কালো, তার নাম আম্‌ব্রা; তার চার দিকে কম-কালো বেষ্টনী, তার নাম পেনাম্‌ব্রা। এদের কালো দেখতে হয়েছে চার পাশের দীপ্তির তুলনায়— সেই আলো যদি বন্ধ করা যেত তা হলে অতি তীব্র দেখা যেত এদের জ্যোতি। সূর্যের যে দাগ খুব বড়ো তার কোনো-কোনোটার আম্‌ব্রার এক পার থেকে আর-এক পারের মাপ পঞ্চাশ হাজার মাইল, দেড় লক্ষ মাইল তার পেনাম্‌ব্রার মাপ।

সূর্যের এইসব দাগের কমা-বাড়ার প্রভাব পৃথিবীর উপরে নানা রকমে কাজ করে। যেমন আমাদের আবহাওয়ায়। প্রায় এগারো বছরের পালাক্রমে সূর্যের দাগ বাড়ে কমে। পরীক্ষায় দেখা গেছে বনস্পতির গুঁড়ির মধ্যে এই দাগি বৎসরের সাক্ষ্য আঁকা পড়ে। বড়ো গাছের গুঁড়ি কাটলে তার মধ্যে দেখা যায় প্রতি বছরের একটা করে চক্রচিহ্ন। এই চিহ্নগুলি কোনো কোনো জায়গায় ঘেঁষাঘেঁষি কোনো কোনো জায়গায় ফাঁক ফাঁক। প্রত্যেক চক্রচিহ্ন থেকে বোঝা যায় গাছটা বৎসরে কতখানি করে বেড়েছে। আমেরিকায় এরিজোনার মরুপ্রায় প্রদেশে ডাক্তার ডগলাস দেখেছেন যে, যে বছরে সূর্যের কালো দাগ বেশি দেখা দিয়েছে সেই বছরে গুঁড়ির দাগটা চওড়া হয়েছে বেশি। এরিজোনার পাইন গাছে পাঁচশো বছরের চিহ্ন গুনতে গুনতে ১৬৫০ থেকে ১৭২৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সূর্যের দাগের লক্ষণে একটা ফাঁক পড়ল। অবশেষে তিনি গ্রিনিজ মানযন্ত্র-বিভাগে সংবাদ নিয়ে জানলেন ঐ-কটা বছরে সূর্যের দাগ প্রায় ছিল না।

সূর্যের দেহ থেকে যে প্রচুর আলো বেরিয়ে চলেছে তার অতি সামান্য ভাগ গ্রহগুলিতে ঠেকে। অনেকখানিই চলে যায় শূন্যে, সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে; কোনো নক্ষত্রে পৌঁছয় চার বছরে, কোনো নক্ষত্রে ত্রিশ হাজার বছরে, কোনো নক্ষত্রে ন'লক্ষ বছরে। আমরা মনে ভাবি সূর্য আমাদেরই, আর তার আলোর দানে আমাদেরই বেশি দাবি। কিন্তু এত আলোর একটুখানি মাত্র আমাদের ছুঁয়ে যায়। তার পরে সূর্যের এই আলোকের দূত সূর্যে আর ফেরে না, কোথায় যায়, বিশ্বের কোন্‌ কাজে লাগে কে জানে।

জ্যোতিষ্কলোকদের সম্বন্ধে একটা আলোচনা বাকি রয়ে গেল। কোথা থেকে নিরন্তর তাদের তাপের জোগান চলছে তার সন্ধান করা দরকার পরমাণুদের মধ্যে।

ইলেকট্রন-প্রোটনের যোগে যদি কখনও একটি হীলিয়মের পরমাণু সৃষ্টি করা যায় তা হলে সেই সৃষ্টিকার্যে যে প্রচণ্ড তেজের উদ্ভব হবে তার আঘাতে আমাদের পৃথিবীতে

এক সর্বনাশী প্রলয়কাণ্ড ঘটবে। এ তো গ'ড়ে তোলবার কথা। কিন্তু বস্তু ধ্বংস করতে তার চেয়ে অনেকগুণ তীব্র শক্তির প্রয়োজন। প্রোটনে ইলেকট্রনে যদি সংঘাত বাধে তা হলে সুতাব্র কিরণ বিকিরণ ক'রে তখনই তা'রা মিলিয়ে যাবে। এতে যে প্রচণ্ড তেজের উদ্ভব হয় তা কল্পনাতীত।

এইরকম কাণ্ডটাই ঘটছে নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে। সেখানে বস্তুধ্বংসের কাজ চলছে বলেই অনুমান করা সংগত। এই মত অনুসারে সূর্য তিনশো ষাট লক্ষ কোটি টন ওজনের বস্তুপুঞ্জ প্রত্যহ খরচ করে ফেলছে। কিন্তু সূর্যের ভাণ্ডার এত বৃহৎ যে আরও বহু বহু কোটি বৎসর এইরকম অপব্যয়ের উদ্দামতা চলতে পারবে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের আয়ু সম্বন্ধে যে শেষহিসেব অবধারিত হয়েছে সেটা মেনে নিলে বস্তু-ভাঙনের চেয়ে বস্তু-গড়নের মতটাই বেশি খাটে। যদি ধরে নেওয়া যায় যে একসময়ে সূর্য ছিল হাইড্রজেনের পুঞ্জ, তা হলে সেই হাইড্রজেন থেকে হীলিয়ম গড়ে উঠতে যে তেজ জাগবার কথা সেটা এখনকার হিসাবের সঙ্গে মেলে।

অতএব এই বিশ্বজগৎটা ধ্বংসের দিকে, না গ'ড়ে ওঠবার দিকে চলছে, না দুই একসঙ্গে ঘটছে সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের মতের মিল হয় নি। কয়েক বৎসর হল যে-বিকীরণশক্তি ধরা পড়েছে যার নাম দেওয়া হয়েছে কস্‌মিক রশ্মি; সেটার উদ্ভব না পৃথিবীতে না সূর্যে, এমনকি না নক্ষত্রলোকে। নক্ষত্রপরপারের কোনো আকাশ হতে বিশ্বসৃষ্টির ভাঙন কিংবা গড়ন থেকে সে বেরিয়ে পড়েছে এইরকম আন্দাজ করা হয়েছে।

যাই হোক, বিশ্বসৃষ্টি ব্যাপারের এই যে সব বিপরীত বার্তাবহ-ইশারা আসছে বিজ্ঞানীদের পরীক্ষাগারে সেটা হয়তো কোনো-একটা জটিল গণনার ব্যাপারে এসে ঠেকবে। কিন্তু আমরা তো বিজ্ঞানী নই, বুঝতে পারি নে হঠাৎ অঙ্কের আরম্ভ হয় কোথা থেকে, একেবারে শেষই বা হয় কোন্‌খানে। সম্পূর্ণ-সংঘটিত বিশ্বকে নিয়ে হঠাৎ কালের আরম্ভ হল আর সম্পোলুপ্ত বিশ্বের সঙ্গে কালের সম্পূর্ণ অন্ত হবে, আমাদের বুদ্ধিতে এর কিনারা পাই নে। বিজ্ঞানী বলবেন, বুদ্ধির কথা এখানে আসছে না, এ হল গণনার কথা; সে গণনা বর্তমান ঘটনাধারার উপরে প্রতিষ্ঠিত— এর আদি-অন্তে যদি অন্ধকার দেখি তা হলে উপায় নেই।

গ্রহলোক

গ্রহ কাকে বলে সেকথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সূর্য হল নক্ষত্র; পৃথিবী হল গ্রহ, সূর্য থেকে ছিঁড়ে-পড়া টুকরো, ঠাণ্ডা হয়ে তার আলো গেছে নিবে। কোনো গ্রহেরই আপন আলো নেই। সূর্যের চার দিকে এই গ্রহদের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট পথ ডিম্বরেখাকারে— কারও বা পথ সূর্যের কাছে, কারও বা পথ সূর্য থেকে বহু দূরে। সূর্যকে ঘুরে আসতে কোনো গ্রহের এক বছরের কম লাগে, কারও বা একশো বছরের বেশি। যে-গ্রহেরই ঘুরতে যত সময় লাগুক এই ঘোরার সম্বন্ধে একটি বাঁধা নিয়ম আছে, তার কখনই ব্যতিক্রম হয় না। সূর্যপরিবারের দূর বা কাছের ছোটো বা বড়ো সকল গ্রহকেই পশ্চিম দিক থেকে পুব দিকে প্রদক্ষিণ করতে হয়। এর থেকে বোঝা যায় গ্রহেরা সূর্য থেকে একই অভিমুখে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়েছে, তাই চলবার ঝোঁক হয়েছে একই দিকে। চলতি গাড়ি থেকে নেমে পড়বার সময় গাড়ি যে মুখে চলেছে সেই দিকে শরীরের উপর একটা ঝোঁক আসে। গাড়ি থেকে পাঁচজন নামলে পাঁচজনেরই সেই একদিকে হবে ঝোঁক। তেমনি ঘূর্ণ্যমান সূর্য থেকে বেরিয়ে পড়বার সময় সব গ্রহই একই দিকে ঝোঁক পেয়েছে। ওদের এই চলার প্রবৃত্তি থেকে ধরা পড়ে ওরা সবাই এক জাতের, সবাই একঝোঁকা।

সূর্যের সব চেয়ে কাছে আছে বুধগ্রহ, ইংরেজিতে যাকে বলে মার্করি। সে সূর্য থেকে সাড়েতিন কোটি মাইল মাত্র দূরে। পৃথিবী যতটা দূর বাঁচিয়ে চলে তার প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ। বুধের গায়ে ঝাপসা কিছু কিছু দাগ দেখা যায়, সেইটে লক্ষ্য করে বোঝা গেছে কেবল ওর এক পিঠ ফেরানো সূর্যের দিকে। সূর্যের চার দিক ঘুরে আসতে ওর লাগে ৮৮ দিন। নিজের মেরুদণ্ড ঘুরতেও ওর লাগে তাই। সূর্য-প্রদক্ষিণের পথে পৃথিবীর দৌড় প্রতি সেকেণ্ডে উনিশ মাইল। বুধগ্রহের দৌড় তাকে ছাড়িয়ে গেছে, তার বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ত্রিশ মাইল। একে ওর রাস্তা ছোটো তাতে ওর ব্যস্ততা বেশি, তাই পৃথিবীর সিকি সময়েই ওর প্রদক্ষিণ সারা হয়ে যায়। বুধগ্রহের প্রদক্ষিণের যে-পথ সূর্য ঠিক তার কেন্দ্রে নেই, একটু একপাশে আছে। সেইজন্যে ঘোরবার সময় বুধগ্রহ কখনও সূর্যের অপেক্ষাকৃত কাছে আসে কখনও যায় দূরে।

এই গ্রহ সূর্যের এত কাছে থাকাতে তাপ পাচ্ছে খুব বেশি। অতি সূক্ষ্ম পরিমাণ তাপ মাপবার একটি যন্ত্র বেরিয়েছে, ইংরেজিতে তার নাম thermo-couple। তাকে দুরবীনের সঙ্গে জুড়ে গ্রহতারার তাপের খবর জানা যায়। এই যন্ত্রের হিসাব অনুসারে, বুধগ্রহের যে-অংশ সূর্যের দিকে ফিরে থাকে তার তাপ সীসে টিন গলাতে পারে। এই

তাপে বাতাসের অণু এত বেশি বেগে চঞ্চল হয়ে ওঠে যে বুধগ্রহ তাদের ধরে রাখতে পারে না, তা'রা দেশ ছেড়ে শূন্যে দেয় দৌড়। বাতাসের অণু পলাতক স্বভাবের। পৃথিবীতে তারা সেকেণ্ডে দুইমাইলমাত্র বেগে ছুটোছুটি করে, তাই টানের জোরে পৃথিবী তাদের সামলিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু যদি কোনো কারণে তাপ বেড়ে উঠে ওদের দৌড় হত সেকেণ্ডে সাত মাইল, তা হলেই পৃথিবী আপন হাওয়াকে আর বশ মানাতে পারত না।

যে-সব বিজ্ঞানী বিশ্বজগতের হিসাবনবিশ তাঁদের একটা প্রধান কাজ হচ্ছে গ্রহ-নক্ষত্রের ওজন ঠিক করা। এ কাজে সাধারণ দাঁড়িপাল্লার ওজন চলে না, তাই কৌশলে ওদের খবর আদায় করতে হয়। সেই কথাটা বুঝিয়ে বলি। মনে করো একটা গড়ানে গোলা হঠাৎ এসে পথিককে দিলে ধাক্কা, সে পড়ল দশ হাত দূরে। কতখানি ওজনের গোলা এসে জোর লাগালে মানুষটা এতখানি বিচলিত হয়, তার নিয়মটা যদি জানা থাকে তা হলে এ দশ হাতের মাপটা নিয়ে গোলাটার ওজন অঙ্ক কষে বের করা যেতে পারে। একবার হঠাৎ এইরকম অঙ্ক কষার সুযোগ ঘটাতে বুধগ্রহের ওজন মাপা সহজ হয়ে গেল। সুবিধাটা ঘটিয়ে দিলে একটা ধূমকেতু। সে কথাটা বলবার আগে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার ধূমকেতুরা কী রকম ধরনের জ্যোতিষ্ক।

ধূমকেতু শব্দের মানে ধোঁয়ার নিশান। ওর চেহারা দেখে নামটার উৎপত্তি। গোল মুণ্ড আর তার পিছনে উড়ছে উজ্জ্বল একটা লম্বা পুচ্ছ। সাধারণত এই হল ওর আকার। এই পুচ্ছটা অতি সূক্ষ্ম বাষ্পের। এত সূক্ষ্ম যে কখনও কখনও তাকে মাড়িয়ে গিয়েছে পৃথিবী, তবু সেটা অনুভব করতে পারি নি। ওর মুণ্ডটা উল্কাপিণ্ড দিয়ে তৈরি। এখনকার বড়ো বড়ো পণ্ডিতেরা এই মত স্থির করেছেন যে ধূমকেতুরা সূর্যের বাঁধা অনুচরেরই দলে। কয়েকটা থাকতে পারে যারা পরিবারভুক্ত নয় যারা আগন্তুক।

একবার একটি ধূমকেতুর প্রদক্ষিণপথে ঘটল অপঘাত। বুধের কক্ষপথের পাশ দিয়ে যখন সে চলছিল তখন বুধের সঙ্গে টানাটানিতে তার পথের হয়ে গেল গোলমাল। রেলগাড়ি রেলচ্যুত হলে আবার তাকে রেলে ঠেলে তোলা হয় কিন্তু টাইমটেবলের সময় পেরিয়ে যায়। এক্ষেত্রে তাই ঘটল। ধূমকেতুটা আপন পথে যখন ফিরল তখন তার নির্দিষ্ট সময় হয়েছে উত্তীর্ণ। ধূমকেতুকে যে-পরিমাণ নড়িয়ে দিতে বুধগ্রহের যতখানি টানের জোর লেগেছিল তাই নিয়ে চলল অঙ্ককষা। যার যতটা ওজন সেই পরিমাণ জোরে সে টান লাগায় এটা জানা কথা, এর থেকেই বেরিয়ে পড়ল বুধগ্রহের ওজন। দেখা গেল তেইশটা বুধগ্রহের বাটখারা চাপাতে পারলে তবেই তা পৃথিবীর ওজনের সমান হয়।

বুধগ্রহের পরের রাস্তাতেই আসে শুক্রগ্রহের প্রদক্ষিণের পালা। তার ২২৫ দিন লাগে সূর্য ঘুরে আসতে। অর্থাৎ আমাদের সাড়েসাত মাসে তার বৎসর। ওর মেরুদণ্ড-ঘোরা ঘূর্ণিপাকের বেগ কতটা তা নিয়ে এখনও তর্ক শেষ হয় নি। এই গ্রহটি বছরের এক সময়ে সূর্যাস্তের পরে পশ্চিম দিগন্তে দেখা দেয়, তখন তাকে বলি সন্ধ্যাতারা, আবার এই গ্রহই আর-এক সময়ে সূর্য ওঠবার আগে পুবদিকে ওঠে, তখন তাকে শুকতারা বলে জানি। কিন্তু মোটেই এ তারা নয়, খুব জল্‌জল্‌ করে ব'লেই সাধারণের কাছে তারা খেতাব পেয়েছে। এর আয়তন পৃথিবীর চেয়ে অল্প-একটু কম। এই গ্রহের পথ পৃথিবীর পথের চেয়ে আরও তিন কোটি মাইল সূর্যের কাছে। সেও কম নয়। যথোচিত দূর বাঁচিয়ে আছে তবু এর ভিতরকার খবর ভালো করে পাই নে। সে সূর্যের আলোর প্রখর আবরণের জন্যে নয়। বুধকে ঢেকেছে সূর্যেরই আলো, আর শুক্রকে ঢেকেছে এর নিজেরই ঘন মেঘ। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন শুক্রগ্রহের যে উত্তাপ তাতে জলের বিশেষ রূপান্তর হয় না। কাজেই ওখানে জলাশয় আর মেঘ দুইয়ের অস্তিত্বই আশা করতে পারি।

মেঘের উপরিতলা থেকে যতটা আন্দাজ করা যায় তাতে প্রমাণ হয় এই গ্রহের অক্সিজেন-সম্বল নিতান্তই সামান্য। ওখানে যে-গ্যাসের স্পষ্ট চিহ্ন পাওয়া যায় সে হচ্ছে আঙ্গারিক গ্যাস। মেঘের উপরতলায় তার পরিমাণ পৃথিবীর ঐ গ্যাসের চেয়ে বহু হাজার গুণ বেশি। পৃথিবীর এই গ্যাসের প্রধান ব্যবহার লাগে গাছপালার খাদ্য জোগাতে।

এই আঙ্গারিক গ্যাসের ঘন আবরণে গ্রহটি যেন কম্বলচাপা। তার ভিতরের গরম বেরিয়ে আসতে পারে না। সুতরাং শুক্রগ্রহের উপরিতল ফুটন্ত জলের মতো কিংবা তার চেয়ে বেশি উষ্ণ।

শুক্রে জোলো বাষ্পের সন্ধান যে পাওয়া গেল না সেটা আশ্চর্যের কথা। শুক্রের ঘন মেঘ তা হলে কিসের থেকে সে-কথা ভাবতে হয়। সম্ভব এই যে মেঘের উচ্চস্তরে ঠাণ্ডায় জল এত জমে গেছে যে তার থেকে বাষ্প পাওয়া যায় না।

এ কথাটা বিশেষ করে ভেবে দেখবার বিষয়। পৃথিবীতে সৃষ্টির প্রথম যুগে যখন গলিত বস্তুগুলো ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বাঁধতে লাগল তখন অনেক পরিমাণে জোলো বাষ্প আর আঙ্গারিক গ্যাসের উদ্ভব হল। তাপ আরও কমলে পর জোলো বাষ্প জল হয়ে গ্রহতলে সমুদ্র বিস্তার করে দিলে। তখন বাতাসে যে-সব গ্যাসের প্রাধান্য ছিল তা'রা নাইট্রজেনের মতো সব নিষ্ক্রিয় গ্যাস। অক্সিজেন গ্যাসটা তৎপর জাতের মিশুক, অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে মিশে যৌগিক পদার্থ তৈরি করা তার স্বভাব। এমনি

করে নিজেকে সে রূপান্তরিত করতে থাকে। তৎসত্ত্বেও পৃথিবীর হাওয়ায় এতটা পরিমাণ অক্সিজেন বিশুদ্ধ হয়ে টিঁকল কী করে।

তার প্রধান কারণ পৃথিবীর গাছপালা। উদ্ভিদেরা বাতাসের আঙ্গারিক গ্যাস থেকে অঙ্গার পদার্থ নিয়ে নিজেদের জীবকোষ তৈরি করে, মুক্তি দেয় অক্সিজেনকে। তার পরে প্রাণীদের নিশ্বাস ও লতাপাতার পচানি থেকে আবার আঙ্গারিক গ্যাস উঠে আপন তহবিল পূরণ করে। পৃথিবীতে সম্ভবত প্রাণের বড়ো অধ্যায়টা আরম্ভ হল তখনই যখন সামান্যকিছু অক্সিজেন ছিল সেই আদিকালের উদ্ভিদের মধ্যে। এই উদ্ভিদের পালা যতই বেড়ে চলল ততই তাদের নিশ্বাসে অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়িয়ে তুললে। কমে গেল আঙ্গারিক গ্যাস।

অতএব সম্ভবত শুক্রগ্রহের অবস্থা সেই আদিকালের পৃথিবীর মতো। একদিন হয়তো কোনো ফাঁকে উদ্ভিদ দেখা দেবে, আর আঙ্গারিক গ্যাস থেকে অক্সিজেনকে ছাড়া দিতে থাকবে। তার পরে বহু দীর্ঘকালে ক্রমশ জীবজন্তুর পালা হবে শুরু। চাঁদ আর বুধগ্রহের অবস্থা ঠিক এর উলটো। সেখানে জীবপালনযোগ্য হাওয়া টানের দুর্বলতাবশত দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গিয়েছিল।

সৌরমণ্ডলীতে শুক্রগ্রহের পরের আসনটা পৃথিবীর। অন্য গ্রহদের কথা শেষ করে তার পরে পৃথিবীর খবর নেওয়া যাবে।

পৃথিবীর পরের পংক্তিতেই মঙ্গলগ্রহের স্থান। এই লালচে রঙের গ্রহটিই অন্য গ্রহদের চেয়ে পৃথিবীর সব চেয়ে কাছে। এর আয়তন পৃথিবীর প্রায় নয় ভাগের এক ভাগ। সূর্যের চার দিকে একবার ঘুরে আসতে এর লাগে ৬৮৭ দিন। যে-পথে এ সূর্যের প্রদক্ষিণ করছে তা অনেকটা ডিমের মতো; তাই ঘোরার সময় একবার সে আসে সূর্যের কাছে আবার যায় দূরে। আপন মেরুদণ্ডের চার দিকে এ গ্রহের ঘুরতে লাগে পৃথিবীর চেয়ে আধঘণ্টা মাত্র বেশি, তাই সেখানকার দিনরাত্রি আমাদের পৃথিবীর দিনরাত্রির চেয়ে একটু বড়ো। এই গ্রহে যে-পরিমাণ বস্তু আছে, তা পৃথিবীর বস্তুমাত্রার দশ ভাগের এক ভাগ, তাই টানবার শক্তিও সেই পরিমাণে কম।

সূর্যের টানে মঙ্গলগ্রহের ঠিক যে-পথ বেয়ে চলা উচিত ছিল, তার থেকে ওর চাল একটু তফাত। পৃথিবীর টানে ওর এই দশা। ওজন অনুসারে টানের জোরে পৃথিবী মঙ্গলগ্রহকে কতখানি টলিয়েছে সেইটে হিসেব করে পৃথিবীর ওজন ঠিক হয়েছে। এইসূত্রে সূর্যের দূরত্বও ধরা পড়ল। কেননা মঙ্গলকে সূর্যও টানছে পৃথিবীও টানছে, সূর্য কতটা পরিমাণে দূরে থাকলে দুই টানে কাটাকাটি হয়ে মঙ্গলের এইটুকু বিচলিত হওয়া সম্ভব সেটা গণনা করে বের করা যেতে পারে। মঙ্গলগ্রহ বিশেষ বড়ো গ্রহ নয়,

তার ওজনও অপেক্ষাকৃত কম, সুতরাং সেই অনুসারে টানের জোর বেশি না হওয়াতে তার হাওয়া খোওয়াবার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু সূর্য থেকে যথেষ্ট দূরে আছে বলে এতটা তাপ পায় না যাতে হাওয়ার অণু গরমে উধাও হয়ে চলে যেতে পারে। মঙ্গলগ্রহের হাওয়ায় অক্সিজেন সন্ধানের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। সামান্য কিছু থাকতে পারে। মঙ্গলগ্রহের লাল রঙে অনুমান হয় সেখানকার পাথরগুলো অক্সিজেনের সংযোগে সম্পূর্ণ মরচে-পড়া হয়ে গেছে। আর জলীয় বাষ্পের যা-চিহ্ন পাওয়া গেল তা পৃথিবীর জলীয় বাষ্পের শতকরা পাঁচ ভাগের এক ভাগ। মঙ্গলগ্রহের হাওয়ায় এই যে অকিঞ্চনতার লক্ষণ দেখা যায় তাতে বোঝা যায় পৃথিবী ক্রমে ক্রমে একদিন আপন সম্বল খুইয়ে এই দশায় পৌঁছবে।

পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের চেয়ে মঙ্গল থেকে তার দূরত্ব বেশি অতএব নিঃসন্দেহ এ গ্রহ অনেকটা ঠাণ্ডা। দিনের বেলায় বিষুবপ্রদেশে হয়তো কিছু গরম থাকে কিন্তু রাতে নিঃসন্দেহ বরফজমা শাতের চেয়ে আরও অনেক শীত বেশি। বরফের-টুপি-পরা তার মেরুপ্রদেশের তো কথাই নেই।

এই গ্রহের মেরুপ্রদেশে বরফের টুপিটা বাড়ে-কমে, মাঝে মাঝে তাদের দেখাও যায় না। এই গলে-যাওয়া টুপির আকার-পরিবর্তন যন্ত্রদৃষ্টিতে ধরা পড়ে। এই গ্রহতলের অনেকটা ভাগ মরুর মতো শুকনো। কেবল গ্রীষ্মঋতুতে কোনো কোনো অংশ শ্যামবর্ণ হয়ে ওঠে, সম্ভবত জল চলার রাস্তায় বরফ গলার দিনে গাছপালা গজিয়ে উঠতে থাকে।

মঙ্গলগ্রহকে নিয়ে পণ্ডিতে পণ্ডিতে একটা তর্ক চলেছে অনেকদিন ধরে। একদা একজন ইতালীয় বিজ্ঞানী মঙ্গলে লম্বা লম্বা আঁচড় দেখতে পেলেন, বললেন, নিশ্চয়ই এ গ্রহের বাসিন্দেরা মেরুপ্রদেশ থেকে বরফ-গলা জল পাবার জন্যে খাল কেটেছে। আবার কোনো কোনো বিজ্ঞানী বললেন, ওটা চোখের ভুল। ইদানীং জ্যোতিষ্কলোকের দিকে মানুষ ক্যামেরা চালিয়েছে। সেই ক্যামেরা-তোলা ছবিতেও কালো দাগ দেখা যায়। কিন্তু ওগুলো যে কৃত্রিম খাল, আর বুদ্ধিমান জীবেরই কীর্তি, সেটা নিতান্তই আন্দাজের কথা। অবশ্য এ গ্রহে প্রাণী থাকা অসম্ভব নয়, কেননা এখানে হাওয়া জল আছে।

দুটি উপগ্রহ মঙ্গলগ্রহের চারি দিকে ঘুরে বেড়ায়। একটির এক পাক শেষ করতে লাগে ত্রিশ ঘণ্টা, আর-একটির সাড়েসাত ঘণ্টা, অর্থাৎ মঙ্গলগ্রহের এক দিনরাত্রির মধ্যে সে তাকে ঘুরে আসে প্রায় তিনবার। আমাদের চাঁদের চেয়ে এরা প্রদক্ষিণের কাজ সেরে নেয় অনেক শীঘ্র।

মঙ্গল আর বৃহস্পতিগ্রহের কক্ষপথের মাঝখানে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা দেখে

পণ্ডিতেরা সন্দেহ ক'রে খোঁজ করতে লেগে গেলেন। প্রথমে অতিছোটো চারটি গ্রহ দেখা দিল। তার পরে দেখা গেল ওখানে বহুহাজার টুকরো-গ্রহের ভিড়। ঝাঁকে ঝাঁকে তা'রা ঘুরছে সূর্যের চারি দিকে। ওদের নাম দেওয়া যাক গ্রহিকা। ইংরেজিতে বলে asteroids। প্রথম যার দর্শন পাওয়া গেল তার নাম দেওয়া হয়েছে সারিজ (Ceres), তার ব্যাস চারশো পঁচিশ মাইল। ঈরস (Eros) বলে একটি গ্রহিকা আছে, সূর্যপ্রদক্ষিণের সময় সে পৃথিবীর যত কাছে আসে, এমন আর কোনো গ্রহই আসে না। এরা এত ছোটো যে এদের ভিতরকার কোনো বিশেষ খবর পাওয়া যায় না। এদের সবগুলোকে জড়িয়ে যে ওজন পাওয়া যায় তা পৃথিবীর ওজনের শিকিভাগেরও কম। মঙ্গলের চেয়ে কম, নইলে মঙ্গলের চলার পথে টান লাগিয়ে কিছু গোল বাধাত।

এই টুকরো-গ্রহগুলিকে কোনো একটা আস্ত-গ্রহেরই ভগ্নশেষ বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু পণ্ডিতেরা বলেন সে-কথা যথার্থ নয়। বলা যায় না কী কারণে এরা জোট বেঁধে গ্রহ আকার ধরতে পারে নি।

এই গ্রহিকাদের প্রসঙ্গে আর-এক দলের কথা বলা উচিত। তা'রাও অতি ছোটো, তা'রাও ঝাঁক বেঁধে চলে এবং নির্দিষ্ট পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণও করে থাকে, তা'রা উল্কাপিণ্ডের দল। পৃথিবীতে ক্রমাগতই তাদের বর্ষণ চলছে, ধুলার সঙ্গে তাদের যে ছাই মিশেছে সে বড়ো কম নয়। পৃথিবীর উপরে হাওয়ার চাঁদোয়া না থাকলে এইসব ক্ষুদ্র শত্রুর আক্রমণে আমাদের রক্ষা থাকত না।

উল্কাপাত দিনে রাতে কিছু-না-কিছু হয়ে থাকে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ মাসের বিশেষ বিশেষ দিনে উল্কাপাতের ঘটা হয় বেশি। ২১ এপ্রিল, ৯, ১০, ১১ আগস্ট, ১২, ১৩, ১৪ ও ২৭ নভেম্বরের রাত্রে এই উল্কাবৃষ্টির আতশবাজি দেখবার মতো জিনিস। এ সম্বন্ধে দিনক্ষণের বাঁধাবাঁধি দেখে বিজ্ঞানীরা কারণ খোঁজ করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

ব্যাপারটা হচ্ছে এই, ওদের একটা বিশেষ পথ আছে। কিন্তু গ্রহদের মতো ওরা একা চলে না, ওরা দ্যুলোকের দলবাঁধা পঙ্গপালের জাত। লক্ষ লক্ষ চলেছে ভিড় করে এক রাস্তায়। বৎসরের বিশেষ বিশেষ দিনে পৃথিবী গিয়ে পড়ে ঠিক ওদের যেখানে জটলা। পৃথিবীর টান ওরা সামলাতে পারে না। রাশি রাশি বর্ষণ হতে থাকে। পৃথিবীর ধুলোয় ধুলো হয়ে যায়। কখনও কখনও বড়ো বড়ো টুকরোও পড়ে, ফেটেফুটে চারি দিক ছারখার করে দেয়। সূর্যের এলেকায় অনধিকার প্রবেশ ক'রে বিপন্ন হয়েছে এমন ধূমকেতুর এরা দুর্ভাগ্যের নিদর্শন। এমন কথাও শোনা যায়, তরুণ বয়সে পৃথিবীর

অন্তরে যখন তাপ ছিল বেশি তখন অগ্ন্যুৎপাতে পৃথিবীর ভিতরের সামগ্রী এত উপরে ছুটে গিয়েছিল যে পৃথিবীর টান এড়িয়ে গিয়ে সূর্যের চার দিকে তা'রা ঘুরে বেড়াচ্ছে, মাঝে মাঝে নাগাল পেলেই আবার তাদের পৃথিবী নেয় টেনে। বিশেষ বিশেষ দিনে সেই উল্কার যেন হরির লুট হতে থাকে। আবার এমন অনেক উল্কাপিণ্ডের সন্ধান মিলেছে যারা সৌরমণ্ডলীর বাইরে থেকে এসে ধরা পড়ে পৃথিবীর টানে। বিশ্বের কোথাও হয়তো একটা প্রলয়কাণ্ড ঘটেছিল যার উদ্দামতায় বস্তুপিণ্ড ভেঙে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়েছিল। এই উল্কার দল আজ তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

এই অতিক্ষুদ্রদের পরের রাস্তাতেই দেখা দেয় অতিমস্তবড়ো গ্রহ বৃহস্পতি।

এই বৃহস্পতিগ্রহের কাছ থেকে কোনো পাকা খবর প্রত্যাশা করার পূর্বে দুটি জিনিস লক্ষ্য করা দরকার। সূর্য থেকে তার দূরত্ব, আর তার আয়তন। পৃথিবীর দূরত্ব ৯ কোটি মাইলের কিছু উপর আর বৃহস্পতির দূরত্ব ৪৮ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল, অর্থাৎ পৃথিবীর দূরত্বের চেয়ে পাঁচগুণেরও বেশি। পৃথিবী সূর্যের যতটা তাপ পায়, বৃহস্পতি পায় তার সাতাশ ভাগের এক ভাগ মাত্র।

এককালে জ্যোতিষীরা আন্দাজ করেছিলেন যে, বৃহস্পতিগ্রহ পৃথিবীর মতো এত ঠাণ্ডা হয়ে যায় নি, তার নিজের যথেষ্ট তাপের সঞ্চয় আছে। তার বায়ুমণ্ডলে সর্বদা যে চঞ্চলতা দেখা যায় তার নিজের অন্তরের তাপই তার কারণ। কিন্তু যখন বৃহস্পতির তাপমাত্রার হিসাব কষা সম্ভব হল তখন দেখা গেল গ্রহটি অত্যন্তই ঠাণ্ডা। বরফজমা শৈত্যের চেয়ে আরও ২৮০ ফারেনহাইট ডিগ্রির তলায় পৌঁছায় তার তাপমাত্রা। এত অত্যন্ত বেশি ঠাণ্ডায় বৃহস্পতির জোলো বাষ্প থাকতেই পারে না। তার বায়ুমণ্ডল থেকে দুটো গ্যাসের কিনারা পাওয়া গেল। একটা হচ্ছে অ্যামোনিয়া, নিশাদলে যার তীব্রগন্ধে চমক লাগায়, আর একটা আলেয়া গ্যাস, মাঠের মধ্যে পথিকদের পথ ভোলাবার জন্যে যার নাম আছে। নানাপ্রকার যুক্তি মিলিয়ে আপাতত স্থির হয়েছে যে, বৃহস্পতির দেহ কঠিন, প্রায় পৃথিবীর সমান ঘন। বৃহস্পতির ভিতরকার পাথুরে জঠরটার প্রসার বাইশ হাজার মাইল; এর উপরে বরফের স্তর জমে রয়েছে ষোলো হাজার মাইল। এই বরফপুঞ্জের উপরে আছে ৬০০০ মাইল বায়ুস্তর। এতবড়ো রাশকরা বাতাসের প্রবল চাপে হাইড্রজেনও তরল হয়ে যায়। অতএব এই গ্রহে ঘটেছে কঠিন বরফস্তরের উপরে তরল গ্যাসের সমুদ্র। আর তার বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বস্তর তরল অ্যামোনিয়া বিন্দুতে তৈরি।

বৃহস্পতি অতিকায় গ্রহ, ওর ব্যাস প্রায় নব্বই হাজার মাইল, আয়তনে পৃথিবীর চেয়ে তেরোশোগুণ বড়ো।

সূর্যপ্রদক্ষিণ করতে বৃহস্পতির লাগে প্রায় বারো বৎসর। দূরে থাকাতে ওর কক্ষপথ পৃথিবী থেকে অনেক বড়ো হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু ও চলেও যথেষ্ট মন্দ গমনে। পৃথিবী যেখানে উনিশ মাইল চলে এক সেকেণ্ডে, ও চলে আট মাইল মাত্র। কিন্তু ওর স্বাবর্তন অর্থাৎ নিজের মেরুদণ্ডের চার দিকে ঘোরা খুবই দ্রুত বেগে। অতবড়ো বিপুল দেহটাকে পাক খাওয়াতে ওর লাগে দশ ঘণ্টা। আমাদের এক দিন এক রাত্রি সময়ের মধ্যে ওর দুই দিনরাত্রি শেষ হয়েও উদ্‌বৃত্ত থাকে।

নয়টি উপগ্রহ নিয়ে বৃহস্পতির পরিবারমণ্ডলী। দশম উপগ্রহের খবর পাওয়া গেছে, কিন্তু সে-খবর পাকা হয় নি। পৃথিবীর চাঁদের চেয়ে এই চাঁদগুলোর বৃহস্পতি-প্রদক্ষিণবেগ অনেক বেশি দ্রুত। প্রথম চারটি উপগ্রহ আমাদেরই চাঁদের মতো বড়ো। তাদেরও আছে অমাবস্যা পূর্ণিমা এবং ক্ষয়বৃদ্ধি।

বৃহস্পতির সবদূরের দুটি উপগ্রহ তার দলের অন্যান্য উপগ্রহের উলটো মুখে চলে। এর থেকে কেউ কেউ আন্দাজ করেন, এরা এককালে ছিল দুটো গ্রহিকা, বৃহস্পতির টানে ধরা পড়ে গেছে।

আলো যে এক সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল বেগে ছুটে চলে তা প্রথম স্থির হয় বৃহস্পতির চন্দ্রগ্রহণ থেকে। হিসাব মতে বৃহস্পতির উপগ্রহের গ্রহণ যখন ঘটবার কথা, প্রত্যেক বারে তার কিছুকাল পরে ঘটতে দেখা যায়। তার কারণ, ওর আলো আমাদের চোখে পড়তে কিছু দেরি করে। একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় নিয়ে আলো চলে, এ যদি না হত তা হলে গ্রহণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রহণের ঘটনাটা দেখা যেত। পৃথিবী থেকে এই উপগ্রহের দূরত্ব মেপে ও গ্রহণের মেয়াদ কতটা পেরিয়েছে সেটা লক্ষ্য ক'রে আলোর বেগ প্রথম হিসাব করা হয়।

বৃহস্পতির নিজস্ব আলো নেই তার প্রমাণ পাওয়া যায় বৃহস্পতির নয়-নয়টি উপগ্রহের গ্রহণের সময়। গ্রহণটা হয় কী ক'রে ভেবে দেখো। কোনো এক যোগাযোগে যখন সূর্য থাকে পিছনে, আর গ্রহ থাকে আলো আড়াল ক'রে সূর্যের সামনে, আর তারও সামনে থাকে গ্রহের ছায়ায় উপগ্রহ, তখনই সূর্যালোক পেতে বাধা পেয়ে উপগ্রহে লাগে গ্রহণ। কিন্তু মধ্যবর্তী গ্রহের নিজেরই যদি আলো থাকত, তা হলে সেই আলো পড়ত উপগ্রহে, গ্রহণ হতেই পারত না। আমাদের চাঁদের গ্রহণেও সেই একই কথা। চাঁদের কাছ থেকে সূর্যকে যখন সে আড়াল করে, তখন জ্যোতির্হীন পৃথিবী চাঁদকে ছায়াই দিতে পারে, নিজের থেকে আলো দিতে পারে না।

বৃহস্পতিগ্রহের পরের পংক্তিতে আসে শনিগ্রহ।

এ গ্রহ আছে সূর্য থেকে ৮৮ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল দূরে। আর ২৯½ বছরে এক পাক তার সূর্যপ্রদক্ষিণ। শনির বেগ বৃহস্পতির চেয়েও কম— এক সেকেণ্ডে ছ'মাইল মাত্র। বৃহস্পতি ছাড়া সৌরজগতের অন্য গ্রহের চেয়ে এর আকার অনেক বড়ো; এর ব্যাস পৃথিবীর প্রায় ৯ গুণ। পৃথিবীর ব্যাসের চেয়ে নয়গুণ বড়ো হয়েও এক পাক ঘুর খেতে ওর লাগে পৃথিবীর অর্ধেকের চেয়েও কম সময়। এত জোরে ঘুরছে ব'লে সেই বেগের ঠেলায় ওর আকার হয়েছে কিছু চ্যাপটা ধরনের। এত বড়ো এর আয়তন অথচ ওজন পৃথিবীর ৯৫ গুণ মাত্র বেশি। এত হালকা ব'লে এই প্রকাণ্ড আয়তন সত্ত্বেও টানবার শক্তি পৃথিবীর চেয়ে এর বেশি নয়। একটি মেঘের আবরণ একে ঘিরে আছে, যার আকার-বদল মাঝে মাঝে দেখা যায়।

শনির উপগ্রহ আছে নয়টি। সব চেয়ে বড়ো যেটি, আয়তনে সে বুধগ্রহের চেয়েও বড়ো, প্রায় আট লক্ষ মাইল দূরে থাকে, ষোলো দিনে তার প্রদক্ষিণ শেষ হয়।

শনিগ্রহের বেষ্টনীর বর্ণচ্ছটা-পরীক্ষায় দেখা গেছে যে এই বেষ্টনীর যেসব অংশ গ্রহের কাছাকাছি আছে তাদের চলনবেগ বাইরের দূরবর্তী অংশের চেয়ে অনেক বেশি। বেষ্টনী যদি অখণ্ড চাকার মতো হত, তা হলে ঘূর্ণিচাকার নিয়মে বেগটা বাইরের দিকে বেশি হত। কিন্তু শনির বেষ্টনী যদি খণ্ড খণ্ড জিনিস নিয়ে হয় তা হলে তাদের যে দল গ্রহের কাছে, টানের জোরে তারাই ঘুরবে বেশি বেগে। এইসব লক্ষ লক্ষ টুকরো-উপগ্রহ ছাড়াও ন'টি বড়ো উপগ্রহ ভিন্নপথে শনিগ্রহকে প্রদক্ষিণ করছে।

কী ক'রে যে এ গ্রহের চারি দিকে দলে দলে ছোটো ছোটো টুকরো সৃষ্টি হল, সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের যে মত তারই কিছু এখানে বলা যাক। গ্রহের প্রবল টানে কোনো উপগ্রহই আপন গোল আকার রাখতে পারে না, শেষ পর্যন্ত অনেকটা তার ডিমের মতো চেহারা হয়। অবশেষে এমন এক সময় আসে যখন টান আর সহ্য করতে না পেরে উপগ্রহ ভেঙে দু'টুকরো হয়ে যায়। এই ছোটো টুকরো দুটিও আবার ভাঙতে থাকে। এমনি করে ভাঙতে ভাঙতে একটিমাত্র উপগ্রহ থেকে লক্ষ লক্ষ টুকরো বেরোনো অসম্ভব হয় না। চাঁদেরও একদিন এই দশা হবার কথা। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, প্রত্যেক গ্রহকে ঘিরে আছে একটি করে অদৃশ্য মণ্ডলীর বেড়া, তাকে বলে বিপদের গণ্ডি। তার মধ্যে এসে পড়লেই উপগ্রহের দেহ কেঁপে উঠে ডিমের মতো লম্বাটে আকার ধরে, তার পরে থাকে ভাঙতে। শেষকালে টুকরোগুলো জোট বেঁধে ঘুরতে থাকে গ্রহের চার দিকে। বিজ্ঞানীদের মতে বৃহস্পতির প্রথম উপগ্রহ এই অদৃশ্য বিপদগণ্ডির কাছে এসে পড়েছে, আর-কিছুদিন পরে সেখানে ঢুকলেই খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে। শনিগ্রহের মতো বৃহস্পতির চার দিক ঘিরে তখন তৈরি হবে একটি উজ্জ্বল

বেষ্টনী। শনিগ্রহের চারি দিকে যে বেষ্টনীর কথা বলা হল তার সৃষ্টি সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা আন্দাজ করেন যে, অনেকদিন আগে শনির একটি উপগ্রহ ঘুরতে ঘুরতে এর বিপদগণ্ডির ভিতরে গিয়ে পড়েছিল, তার ফলে উপগ্রহটা ভেঙে টুকরো হয়ে আজও এই গ্রহের চার দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পৃথিবীর বিপদগণ্ডির অনেকটা বাইরে আছে বলে চাঁদের যা পরিবর্তন হয়েছে তা খুব বেশি না। পৃথিবীর টানের জোরে আস্তে আস্তে চাঁদ তার কাছে এগিয়ে আসছে, তার পরে যখন ঐ বেড়ার মধ্যে অপঘাতের এলেকায় প্রবেশ করবে তখন যাবে টুকরো টুকরো হয়ে, আর সেই টুকরোগুলো পৃথিবীর চার দিক ঘিরে শনিগ্রহের নকল করতে থাকবে, তখন হবে তার শনির দশা।

কেম্ব্রিজের অধ্যাপক জেফ্রের মত এর উলটো। তিনি বলেন চাঁদে পৃথিবীতে দূরত্ব বেড়েই চলেছে। অবশেষে চান্দ্রমাসে সৌরমাসে সমান হয়ে যাবে, তখন কাছের দিকে টানবার পালা শুরু হবে।

বৃহস্পতির চেয়ে শনি সূর্য থেকে আরও বেশি দূরে—কাজেই ঠাণ্ডাও আরও বেশি। এর বাইরের দিকের বায়ুমণ্ডল অনেকটা বৃহস্পতির মতো, কেবল অ্যামোনিয়া তত বেশি জানা যায় না, আলেয়া গ্যাসের পরিমাণ শনিতে বৃহস্পতির চেয়ে বেশি। শনি যদিও পৃথিবীর চেয়ে আয়তনে অনেক বড়ো তবু তার ওজন সে-পরিমাণে বেশি নয়। বৃহস্পতির মতো এর বায়ুমণ্ডল গভীর হবার কথা, কেননা এর টান এড়িয়ে বাতাসের পালাবার পথ নেই। এর বাতাসের পরিমাণ অত্যন্ত বেশি বলেই এর গড়পড়তা ওজন আয়তনের তুলনায় এত কম। এর ভিতরের কঠিন অংশের ব্যাস ২৪০০০ মাইল, তার উপরে প্রায় ৬০০০ মাইল বরফ জমেছে, আর তার উপরে আছে ১৬০০০ মাইল হাওয়া।

শনিগ্রহের পরের মণ্ডলীতে আছে য়ুরেনস নামক এক নতুন-খবর-পাওয়া গ্রহ।

এ গ্রহ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ কিছু জানা সম্ভব হয় নি। এর আয়তন পৃথিবীর ৬৪ গুণ বেশি। সূর্য থেকে ১৭৮ কোটি ২৮ লক্ষ মাইল দূরে থেকে সেকেণ্ডে চার মাইল বেগে ৮৪ বছরে একবার তাকে প্রদক্ষিণ করে। এত বড়ো এর আয়তন কিন্তু খুব দূরে আছে বলে দুরবীন ছাড়া একে দেখা যায় না। যে জিনিসে এ গ্রহ তৈরি তা জলের চেয়ে একটু ঘন, তাই পৃথিবী থেকে বহু গুণ বড়ো হলেও, এর ওজন পৃথিবীর ১৫ গুণ মাত্র।

১০ ঘণ্টা ৪৩ মিনিটে এ গ্রহ একবার ঘুরপাক খাচ্ছে। চারটি উপগ্রহ নিজ নিজ পথে ক্রমাগত একে প্রদক্ষিণ করছে।

য়ুরেনস আবিষ্কারের কিছুকাল পরেই পণ্ডিতেরা য়ুরেনসের বেহিসাবি চলন দেখে স্থির করলেন, এ গ্রহ পথের নিয়ম ভেঙেছে আর-একটা কোনো গ্রহের টানে। খুঁজতে খুঁজতে বেরল সেই গ্রহ। তার নামকরণ হল নেপচুন।

সূর্য থেকে এর দূরত্ব ২৭৯ কোটি ৩৫ লক্ষ মাইল; প্রায় ১৬৪ বছরে এ সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। এর ব্যাস প্রায় ৩৩০০০ মাইল, য়ুরেনসের চেয়ে কিছু বড়ো। দূরবীনে শুধু ছোটো একটি সবুজ থালার মতো দেখায়। একটি উপগ্রহ ২ লক্ষ ২২ হাজার মাইল দূরে থেকে ৫ দিন ২১ ঘণ্টায় একে একবার ঘুরে আসছে। উপগ্রহের দূরত্ব এবং এই গ্রহের আয়তন থেকে হিসাব করা হয়েছে যে এর বস্তুপদার্থ জল থেকে কিছু ভারি, ওজনে এ প্রায় য়ুরেনস-এর সমান। কত বেগে এ গ্রহ মেরুদণ্ডের চার দিকে ঘুরছে তা আজও একেবারে ঠিক হয় নি।

নেপচুনের আকর্ষণে য়ুরেনস-এর যে নূতন পথে চলার কথা তা হিসেব করার পরেও দেখা গেল যে য়ুরেনস ঠিক সে পথ ধরেও চলছে না। তার থেকে বোঝা গেল যে নেপচুন ছাড়া এ গ্রহের গতিপথের বাইরে রয়েছে আরও একটা জ্যোতিষ্ক। ১৯৩০ সালে বেরিয়ে পড়ল নূতন এক গ্রহ। তার নাম দেওয়া হল প্লুটো। এ গ্রহ এত ছোটো ও এত দূরে যে দূরবীনেও একে দেখা যায় না। ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে নিঃসন্দেহে এর অস্তিত্ব প্রমাণ করা হয়েছে। এই গ্রহই সূর্য থেকে সব চেয়ে দূরে, তাই আলো-উত্তাপ পাচ্ছে এত কম যে, এর অবস্থা আমরা কল্পনাও করতে পারি নে।

৩৯৬ কোটি মাইল দূর থেকে প্রায় ২৫০ বছরে এ গ্রহ সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে।

প্লুটো গ্রহটির তাপমাত্রা হবে বরফগলা শৈত্যের ৪৪৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট পরিমাপের নিচে। এত শীতে অত্যন্ত দুরন্ত গ্যাসও তরল এমনকি নিরেট হয়ে যায়। আঙ্গারিক গ্যাস, অ্যামোনিয়া, নাইট্রজেন প্রভৃতি বায়ব পদার্থগুলো জমে বরফপিণ্ডে গ্রহটাকে নিশ্চয় ঢেকে ফেলেছে। কেউ কেউ মনে করেন সৌরলোকের শেষসীমানায় কতকগুলো ছোটো ছোটো গ্রহ ছিটিয়ে আছে, প্লুটো তাদের মধ্যে একটি। কিন্তু এ মতের নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় নি, কখনও যাবে কি না বলা যায় না। এখনকার চেয়ে অনেক প্রবলতর দূরবীন ঐ দূরত্বের যবনিকা তুলতে যদি পারে তা হলেই সংশয়ের সমাধান হবে।

ভূলোক

অন্য গ্রহের আকারের ও চলাফেরার কিছু কিছু খবর জমেছে, কেবল পৃথিবী একমাত্র গ্রহ যার শরীরের গঠনরীতি আমরা পুরোপুরি অনেকটা জানতে পেরেছি। গ্যাসীয় অবস্থা পেরিয়ে যখন থেকে তার দেহ আঁট বেঁধেছে তখন থেকেই সর্বাঙ্গে তার ইতিহাসের নানা সংকেতচিহ্ন আঁকা পড়ছে।

পৃথিবীর উপরকার স্তরে কোনো ঢাকা না থাকাতে সেই ভাগটা শীঘ্র ঠাণ্ডা হয়ে শক্ত হল, আর ভিতরের স্তর ক্রমশ নিরেট হতে থাকল। দুধের সর ঠাণ্ডা হতে হতে যেমন কুঁচকিয়ে যায়, পৃথিবীর উপরকার স্তর ঠাণ্ডা হতে হতে তেমনি কুঁচকিয়ে যেতে লাগল। কুঁচকিয়ে গেলে দুধের সর যেটুকু অসমান হয় সে আমরা গণ্যই করি নে। কিন্তু কুঁচকিয়ে- যাওয়া পৃথিবীর স্তরের অসমানতা তেমন সামান্য ব'লে উড়িয়ে দেবার নয়। নিচের স্তর এই অসমানতার ভার বইবার মতো পাকা হয় নি। তাই ভালো নির্ভর না পাওয়াতে উপরের শক্ত স্তরটা ভেঙে তুবড়ে উঁচুনিচু হতে থাকল, দেখা দিল পাহাড়পর্বত। বুড়ো মানুষের কপালের চামড়া কুঁচকে যেমন বলি পড়ে, তেমনি এগুলো যেন পৃথিবীর উপরকার চামড়ার বলি। সমস্ত পৃথিবীর বৃহৎ গভীরতার তুলনায় এই পাহাড়পর্বত মানুষের চামড়ার উপর বলিচিহ্নের চেয়ে কম বই বেশি নয়।

প্রাচীন যুগের পৃথিবীতে কুঁচকে-যাওয়া স্তরের উঁচুনিচুতে কোথাও নামল গহ্বর, কোথাও উঠল পর্বত। গহ্বরগুলো তখনও জলে ভরতি হয় নি। কেননা তখনও পৃথিবীর তাপে জলও ছিল বাষ্প হয়ে। ক্রমে মাটি হল ঠাণ্ডা, বাষ্প হল জল। সেই জলে গহ্বর ভরে উঠে হল সমুদ্র।

পৃথিবীর অনেকখানি জলের বাষ্প তো তরল হল; কিন্তু হাওয়ার প্রধান গ্যাসগুলো গ্যাসই রয়ে গেল। তাদের তরল করা সহজ নয়। যতটা ঠাণ্ডা হলে তারা তরল হতে পারত ততটা ঠাণ্ডায় জল যেত জমে, আগাগোড়া পৃথিবী হত বরফের বর্মে আবৃত। মাঝারি পরিমাপের গরমে-ঠাণ্ডায় অক্সিজেন নাইট্রজেন প্রভৃতি বাতাসের গ্যাসীয় জিনিসগুলি চলাফেরা করছে সহজে, আমরা নিশ্বাস নিয়ে বাঁচছি।

পৃথিবীর ভিতরের দিকে সংকোচন এখনও একেবারে থেমে যায় নি। তারই নড়নের ঠেলায় হঠাৎ কোথাও তলার জায়গা যদি নিচে থেকে কিছু সরে যায়, তা হলে উপরের শক্ত আবরণ ভেঙে গিয়ে তার উপরে চাপ দিয়ে পড়ে, দুলিয়ে দেয় পৃথিবীর স্তরকে, ভূমিকম্প জেগে ওঠে। আবার কোনো কোনো জায়গায় ভাঙা আবরণের চাপে নিচের তপ্ত তরল জিনিস উপরে উছলে ওঠে।

পৃথিবীর ভিতরের অবস্থা জানতে গেলে যতটা খুঁড়ে দেখা দরকার এখনও ততটা নিচে পর্যন্ত খোঁড়া হয় নি। কয়লার খোঁজে মানুষ মাটির যতটা নিচে নেমেছে সে এক মাইলের বেশি নয়। তাতে কেবল এই খবরটা পাওয়া গেছে যে, যত পৃথিবীর নিচের দিকে যাওয়া যায় ততই একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় গরম বাড়তে থাকে। এই উত্তাপবৃদ্ধির পরিমাণ সব জায়গায় সমান নয়, স্থানভেদে মাত্রাভেদ ঘটে। এক-সময়ে একটা মত চলতি ছিল যে, ভূস্তরটা ভাসছে পৃথিবীর ভিতরকার তাপে-গলা তরল ধাতুর উপরে। এখনকার মত হচ্ছে পৃথিবীটা নিরেট, ভিতরের দিকে তাপের অস্তিত্ব দেখা যায় বটে কিন্তু পৃথিবীর স্তরে যেসব তেজস্ক্রিয় পদার্থ আছে, যথেষ্ট তাপ পাওয়া যাচ্ছে তাদের থেকে। তার অন্তঃকেন্দ্রের উপাদান লোহার চেয়ে নিবিড়। সম্ভবত সে স্থানটি খুব গরম, কিন্তু এতটা নয় যাতে ভিতরকার জিনিস গলে যেতে পারে। আন্দাজ করা যাচ্ছে সেখানকার জিনিসটা লোহা আর নিকেল, তারা আছে দু'হাজার মাইল জুড়ে, আর তাদের বেড়ে আছে যে একটা খোল সে পুরু দু'হাজার মাইলের উপরে।

পৃথিবীর সমস্তটাই যদি জলময় হত তা হলে তার ওজন যতটা হ'ত জলে স্থলে মিশিয়ে তার চেয়ে তার ওজন সাড়ে-পাঁচগুণ বেশি। তার উপরকার তলার পাথর জলের চেয়ে তিনগুণ বেশি ঘন। তা হলে তার ভিতরে আরও বেশি ভারি জিনিস আছে ধরে নিতে হবে। কেবল যে উপরকার চাপেই তাদের ঘনত্ব বেড়ে গেছে তা নয় সেখানকার বস্তুপুঞ্জের ভার স্বভাবতই বেশি।

পৃথিবীকে ঘিরে আছে যে বাতাস তার শতকরা ৭৮ ভাগ নাইট্রজেন, ২১ ভাগ অক্সিজেন। আর আর যেসব গ্যাস আছে সে অতি সামান্য। অক্সিজেন গ্যাস মিশুক গ্যাস, লোহার সঙ্গে মিশে মর্চে ধরায়, অঙ্গারপদার্থের সঙ্গে মিশে আগুন জ্বালায়— এমনি করে বায়ুমণ্ডল থেকে নিয়ত তার অনেক খরচ হতে থাকে। এদিকে গাছপালারা বাতাসের অঙ্গারাম্ল গ্যাসের থেকে নিজের প্রয়োজনে অঙ্গার আদায় করে নিয়ে অক্সিজেন-ভাগ বাতাসকে ফিরিয়ে দেয়। এ না হলে পৃথিবীর হাওয়া অঙ্গারাম্ল গ্যাসে ভরে যেত, মানুষ পেত না তার নিশ্বাসের বায়ু।

আকাশের অনেকটা উঁচু পর্যন্ত হাওয়ার বেশি পরিবর্তন হয় নি। যেসব গ্যাস মিশিয়ে হাওয়া তৈরি তাদের অনেকটাই আরও অনেক উঁচুতে পৌঁছয় না। খুব সম্ভব সব চেয়ে হালকা দুটো গ্যাস অর্থাৎ হীলিয়ম এবং হাইড্রজেনে মিশনো সেখানকার হাওয়া।

বাতাসের ঘনত্ব কমতে কমতে ক্রমশই বাতাস অনেক ঊর্ধ্বে উঠে গিয়েছে। বাহিরলোক থেকে পৃথিবীতে যে উল্কাপাত হয় পৃথিবীর হাওয়ার ঘর্ষণে তা জ্বলে ওঠে, তাদের অনেকেরই এই জ্বলন প্রথম দেখা দেয় ১২০ মাইল উপরে। ধরে নিতে হবে তার ঊর্ধ্বে আরও অনেকখানি বাতাস আছে যার ভিতর দিয়ে আসতে আসতে তবে এই জ্বলনের অবস্থা ঘটে।

সূর্যের আলো নয় কোটি মাইল পেরিয়ে আসে পৃথিবীতে। গ্রহবেষ্টনকারী আকাশের শূন্যতা পার হয়ে আসতে তেজের বেশি ক্ষয় হবার কথা নয়। যে প্রচণ্ড তেজ নিয়ে সে বায়ুমণ্ডলের প্রত্যন্ত দেশে পৌঁছয় তার আঘাতে সেখানকার হাওয়ার পরমাণু নিশ্চয়ই ভেঙেচুরে ছারখার হয়ে যায়— কেউ আস্ত থাকে না। বাতাসের সর্বোচ্চ ভাগে ভাঙা পরমাণুর যে স্তরের সৃষ্টি হয় তাকে নাম দেওয়া হয় (F2) এফ ২ স্তর।

সেখানকার খরচের পর বাকি সূর্যকিরণ নিচের ঘনতর বায়ুমণ্ডলকে আক্রমণ করে, সেখানেও পরমাণুভাঙা যে স্তরের উদ্ভব হয় তার নাম দেওয়া হয়েছে (F1) এফ ১ স্তর।

আরও নিচে আরও ঘন বাতাসে সূর্যকিরণের আঘাতে পঙ্গু পরমাণুর আরও-একটা যে স্তর দেখা দেয়, তার নাম (E) ই স্তর।

সূর্যকিরণের বেগনি-পারের রশ্মি পরমাণু-ভাঙচুরের কাজে সব চেয়ে প্রধান উদ্যোগী। উচ্চতর স্তরে উপদ্রব শেষ করতে করতে বেগনি-পারের রশ্মি অনেকখানি নিঃস্ব হয়ে নিচের হাওয়ায় অল্প পৌঁছয়। সেটা আমাদের রক্ষে। বেশি হলে সইত না।

সূর্যকিরণ ছাড়া আরও অনেক কালাপাহাড় দূর থেকে আসে বাতাসকে অদৃশ্য গদাঘাত করতে। যেমন উল্কা, তাদের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এরা ছুটে আসে গ্রহ-আকাশের ভিতর দিয়ে এক সেকেণ্ডে দশ থেকে একশো মাইল বেগে। হাওয়ার ঘর্ষণে তাদের মধ্যে তাপ জেগে ওঠে, তার মাত্রা হয় তিন হাজার থেকে সাত হাজার ফারেনহাইট ডিগ্রি পর্যন্ত; তাতে করে বেগনি-পারের আলোর তীক্ষ্ণ বাণ তূণমুক্ত হয়ে আসে, বাতাসের অণুগুলোর গায়ে প'ড়ে তাদের জ্বালিয়ে চুরমার করে দেয়। এ ছাড়া আর-এক রশ্মিবর্ষণের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সে কস্‌মিক রশ্মি। বিশ্বে সে-ই হচ্ছে সব চেয়ে প্রবল শক্তির বাহন।

পৃথিবীর বাতাসে আছে অক্সিজেন নাইট্রজেন প্রভৃতি গ্যাসের কোটি কোটি অণুকণা, তা'রা অতি দ্রুতবেগে ক্রমাগতই ঘোরাঘুরি করছে, পরস্পরের মধ্যে সংঘাত চলছেই। যারা হালকা কণা তাদের দৌড় বেশি। সমগ্র দলের যে বেগ তার চেয়ে

স্বতন্ত্র ছুটকো অণুর বেগ অনেক বেশি। সেইজন্যে পৃথিবীর বাহির আঙিনার সীমা থেকে হাইড্রজেনের খুচরো অণু প্রায়ই পৃথিবীর টান কাটিয়ে বাইরে দৌড় দিচ্ছে। কিন্তু দলের বাইরে অক্সিজেন নাইট্রজেনের অণুকণার গতি কখনও ধৈর্যহারা পলাতকার বেগ পায় না। সেই কারণে পৃথিবীর বাতাসে তাদের দৈন্য ঘটে নি; কেবল তরুণ বয়সে যে হাইড্রজেন ছিল পৃথিবীর সব চেয়ে প্রধান গ্যাসীয় সম্পত্তি, ক্রমে ক্রমে সেটার অনেকখানিই সে খুইয়ে ফেলেছে।

বড়ো বড়ো ডানাওয়ালা পাখি শুধু ডানা ছড়িয়েই অনেকক্ষণ ধরে হাওয়ার উপরে ভেসে বেড়ায়, বুঝতে পারি পাখিকে নির্ভর দিতে পারে এতটা ঘনতা আছে বাতাসের। বস্তুত কঠিন ও তরল জিনিসের মতোই হাওয়ারও ওজন মেলে। আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত হাওয়া আছে অনেক মাইল ধরে। সেই হাওয়ার চাপ এক ফুট লম্বা ও এক ফুট চওড়া জিনিসের উপর প্রায় সাতাশ মণ। একজন সাধারণ মানুষের শরীরে চাপ পড়ে প্রায় ৪০০ মণের উপর। তবুও তা টের পাই নে। যেমন উপর থেকে তেমনি নিচের থেকে, আবার আমাদের শরীরের মধ্যে যে হাওয়া আছে তার থেকে সমানভাবে বাতাসের চাপ আর ঠেলা লাগছে ব'লে বাতাসের ভার আমাদের পীড়া দিচ্ছে না।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল আপন আবরণে দিনের বেলায় সূর্যের তাপ অনেকটা ঠেকিয়ে রাখে, আর রাত্রিতে মহাশূন্যের প্রবল ঠাণ্ডাটাকেও বাধা দেয়। চাঁদের গায়ে হাওয়ার উড়ুনি নেই তাই সে সূর্যের তাপে ফুটন্ত জলের সমান গরম হয়ে ওঠে। অথচ গ্রহণের সময় যখনই পৃথিবী চাঁদের উপর ছায়া ফেলে অমনি দেখতে দেখতেই সে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। হাওয়া থাকলে তাপটাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারত। চাঁদের কেবল এইমাত্র ত্রুটি নয়; বাতাস নেই বলে সে একেবারে বোবা, কোথাও একটু শব্দ হবার জো নেই। বিশেষভাবে নাড়া পেলে বাতাসে নানা আয়তনের সূক্ষ্ম ঢেউ ওঠে, সেইগুলো নানা কাঁপনের ঘা দেয় আমাদের কানের ভিতরকার পাতলা চামড়ায়, তখন সেইসব ঢেউ নানা রকম আওয়াজ হয়ে আমাদের কাছে সাড়া দিতে থাকে। আরও-একটি কাজ আছে বাতাসের। কোনো কারণে রৌদ্র যেখানে কিছু বাধা পায় সেখানে ছায়াতেও যথেষ্ট আলো থাকে, এই আলো বিছিয়ে দেয় বাতাস। নইলে যেখানটিতে রোদ পড়ত কেবল সেইখানেই আলো হত। ছায়া ব'লে কিছুই থাকত না। তীব্র আলোর ঠিক পাশেই থাকত ঘোর অন্ধকার। গাছের মাথার উপর রোদ্দুর উঠত চোখ রাঙিয়ে আর তার তলা হত মিশমিশে কালো, ঘরের ছাঁদে ঝাঁ ঝাঁ করত দুইপহরের রোদের তেজ, ঘরের ভিতর থাকত দুইপহরের অমাবস্যার রাত্রি। প্রদীপ

জ্বালার কথা চিন্তা করাই হত মিথ্যে, কেননা পৃথিবীর বাতাসে অক্সিজেন গ্যাসের সাহায্যেই সবকিছু জ্বলে।

গাছের সবুজ পাতায় থাকে গোলাকার অণুপদার্থ, তাদের মধ্যে ক্লরফিল বলে একটি পদার্থ আছে— তারাই সূর্যের আলো জমা করে রাখে গাছের নানা বস্তুতে। তাদের শক্তিতেই তৈরি হচ্ছে ফলেফসলে আমাদের খাদ্য, আর গাছের ডালেতে গুঁড়ির কাঠ। পৃথিবীর বাতাসে আছে অঙ্গারাক্সিজেনী গ্যাস সামান্য পরিমাণে। উদ্ভিদবস্তুতে যত অঙ্গারপদার্থ আছে, যার থেকে কয়লা হয়, সমস্ত এই গ্যাস থেকে নেওয়া। এই অক্সিজেনী-আঙ্গারিক গ্যাস মানুষের দেহে কেবল যে কাজে লাগে না তা নয়, একে শরীর থেকে বের করে দিতে না পারলে আমরা মারা পড়ি। কিন্তু গাছ আপন ক্লরফিলের যোগে এই অক্সিজেনী আঙ্গারিককেও জলে মিশিয়ে ধানে গমে আমাদের জন্য যে খাবার বানিয়ে তোলে সেই খাদ্যের ভিতর দিয়ে সূর্যতাপের শক্তিকে আমরা প্রাণের কাজে লাগাতে পারি। এই শক্তিকে আকাশ থেকে নেবার ক্ষমতা আমাদের নেই, গাছের আছে। গাছের থেকে আমরা নিই ধার করে। পৃথিবীতে সমস্ত জন্তুরা মিলে যে অক্সিজেন-মিশ্রিত আঙ্গারিক বাষ্প নিশ্বাসের সঙ্গে বের করে দেয় সেটা লাগে গাছপালার প্রয়োজনে। আগুন-জ্বালানি থেকে, উদ্ভিদ ও জন্তুদেহের পচানি থেকেও এই বাষ্প বাতাসে ছড়াতে থাকে। পৃথিবীতে কলকারখানায় রান্নার কাজে কয়লা যা পোড়ানো হয় সে বড়ো কম নয়। তার থেকে উদ্ভব হয় বহু কোটি মণ অঙ্গারাক্সিজেনী গ্যাস। গাছের পক্ষে যে হাওয়ার ভোজের দরকার সেটা এমনি করে জুটতে থাকে ত্যাজ্য পদার্থ থেকে।

বাতাসকে মৌলিক পদার্থ বলা চলে না, ওটা মিশল জিনিস। তাতে মিশেছে নানা গ্যাস কিন্তু মেলে নি, একত্রে আছে, এক হয় নি। বাতাসে যে পরিমাণ অক্সিজেন তার প্রায় চার গুণ আছে নাইট্রজেন। কেবলমাত্র নাইট্রজেন থাকলে দম আটকিয়ে মরে যেতুম। কেবলমাত্র অক্সিজেনে আমাদের প্রাণবস্তু পুড়ে পুড়ে শেষ হয়ে যেত। এই প্রাণবস্তু কিছু পরিমাণ জ্বলে, আবার জ্বলতে কিছু পরিমাণ বাধা পায়, তবেই আমরা দুই বাড়াবাড়ির মাঝখানে থেকে বাঁচতে পারি।

সমস্ত বায়ুমণ্ডল জলে স্যাৎসেঁতে। যে জল থাকে মেঘে, তার চেয়ে অনেক বেশি জল আছে হাওয়ায়।

উপরকার বায়ুমণ্ডলে ভাঙা পরমাণুর বৈদ্যুতস্তরের কথা পূর্বে বলেছি। সে ছাড়া সহজ বাতাসের দুটো স্তর আছে। এর যে প্রথম থাকটা পৃথিবীর সব চেয়ে কাছে তার বৈজ্ঞানিক নাম troposphere, বাংলায় একে ক্ষুব্ধস্তর বলা যেতে পারে। পাঁচ থেকে

দশ মাইলের বেশি এর চড়াই নয়। সমগ্র বায়ুস্তরগুলের মাপে এই ক্ষুব্ধস্তরের উচ্চতা খুবই কম, কিন্তু এইটুকুর মধ্যেই আছে বাতাসের সমস্ত পদার্থের প্রায় ৯০ ভাগ। কাজেই অন্য স্তরের চেয়ে এ স্তর অনেক বেশি ঘন। পৃথিবীর একেবারে গায়ে লেগে আছে ব'লে এই স্তরে সর্বদা পৃথিবীর উত্তাপের ছোঁয়াচ লাগে। সেই উত্তাপের কমায়-বাড়ায় হাওয়া এখানে ক্রমাগত ছুটোছুটি করে। এই স্তরেই তাই ঝড়বৃষ্টি। এর আরও উপরে যে স্তর পৃথিবীর তাপ সেখানে ঝড়তুফান চালান করতে পারে না। তাই সেখানকার হাওয়া শান্ত। পণ্ডিতেরা এ স্তরের নাম দিয়েছেন stratosphere, বাংলায় আমরা বলব স্তব্ধস্তর।

আদি সূর্য থেকে যেমন পৃথিবী বেরিয়ে এসেছে তেমনি বাষ্পদেহী আদিম পৃথিবী থেকে বেরিয়ে এসেছে চাঁদ। তার পরে কোটি কোটি বৎসরে পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়ে শক্ত হল, চাঁদও হল তাই।

২ লক্ষ ৩৯ হাজার মাইল দূরে থেকে ২৭⅓ দিনে চাঁদ পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করছে। সেই প্রদক্ষিণের কালে কেবল একটা পিঠ পৃথিবীর দিকে ফিরিয়ে রেখেছে। এর ব্যাস প্রায় ২১৬০ মাইল, এর উপাদান জল থেকে ৩½ গুণ ভারি। অন্যান্য গ্রহনক্ষত্রের তুলনায় পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব খুবই কম ব'লে একে এত উজ্জ্বল ও আয়তনে এত বড়ো দেখায়। আশিটি চাঁদ একসঙ্গে ওজন করলে পৃথিবীর ওজনের সমান হবে। দুরবীনে চাঁদকে দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় পৃথিবীর মতোই শক্ত জিনিসে এ তৈরি। ওর উপরে আছে বড়ো বড়ো গহ্বর আর বড়ো বড়ো পাহাড়।

পৃথিবীর টানে চন্দ্র পৃথিবীর চার দিকে ঘুরছে। এক পাক ঘুরতে তার এক মাসের কিছু কম লাগে। গড়পড়তায় তার গতিবেগ এক সেকেণ্ডে আধ মাইলের বেশি নয়। পৃথিবী ঘোরে সেকেণ্ডে উনিশ মাইল। আপন মেরুদণ্ডের চার দিকে ঘুরতে চাঁদের এক মাসের সমানই লাগে। তার দিন আর বৎসর চলে একই রকম ধীরমন্দ চালে।

চাঁদের ওজন থেকে হিসেব করা হয়েছে যে কোনো জিনিসের গতিবেগ যদি সেখানে সেকেণ্ডে ১½ মাইল হয় তা হলে চাঁদের টান অগ্রাহ্য করে তা ছুটে বাইরে যেতে পারে। চাঁদ যে নিয়মে অতিমাত্রায় রোদ পোহায় তাতে তার তেতে-ওঠা পিঠের উপরে হাওয়া অত্যন্ত গরম হয়ে ওঠাতে চাঁদ তার বাতাসের অণুদের ধরে রাখতে পারে নি, তারা সবাই গেছে বেরিয়ে। যেখানে হাওয়ার চাপ নেই সেখানে জল খুব তাড়াতাড়ি বাষ্প হয়ে যায়। বাষ্প হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জলের অণু গরমে চঞ্চল হয়ে চাঁদের বাঁধন ছাড়িয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। জল-হাওয়া যেখানে নেই সেখানে কোনো

রকমের প্রাণ টিঁকতে পারে বলে আমরা জানি নে। চাঁদকে একটা তালপাকানো মরুভূমি বলা যেতে পারে।

রাতের বেলায় যাদের আমরা খসে-পড়া তারা বলি সেগুলো যে তারা নয় তা আজ আর কাউকে বলতে হবে না। সেই-উল্কাপিণ্ডগুলো পৃথিবীর টানে দিনরাত লাখো লাখো পড়ছে পৃথিবীর উপর। তার অধিকাংশই বাতাসের ঘেঁষ লেগে জ্বলে উঠে ছাই হয়ে যাচ্ছে। যেগুলো বড়ো আয়তনের, তা'রা জ্বলতে জ্বলতে মাটিতে এসে পৌঁছয়, বোমার মতো যায় ফেটে, চার দিকে যা পায় দেয় ছারখার করে।

চাঁদেও ক্রমাগত এই উল্কাবৃষ্টি হচ্ছে। ওদের ঠেকিয়ে ছাই করে দেবার মতো একটু হাওয়া নেই, অবাধে ওরা ঢেলা মারছে চাঁদের সর্বাঙ্গে। বেগ কম নয়, সেকেণ্ডে প্রায় ত্রিশ মাইল, সুতরাং ঘা মারে সর্বনেশে জোরে।

চাঁদে বড়ো বড়ো গর্তের উৎপত্তি একদা-উৎসারিত অগ্নি-উৎস থেকেই। যে গলন্তপদার্থ ও ছাই তখন বেরিয়ে এসেছিল, হাওয়া-জল না থাকায় এত যুগ ধরেও তাদের কোনো বদল হতে পারে নি। ছাইঢাকা আছে ব'লে সূর্যের আলো এই আবরণ ভেদ করে খুব বেশি নিচে যেতে পারে না, আর নিচের উত্তাপও উপরে আসতে পারে না।

চাঁদের যেদিকে সূর্যের আলো পড়ে তার উত্তাপ প্রায় ফুটন্ত জলের সমান, আর যেখানে আলো পড়ে না তা এত ঠাণ্ডা হয় যে বরফের শৈত্যের চেয়ে তা প্রায় ২৫০ ফারেনহাইট ডিগ্রি নিচে থাকে। চন্দ্রগ্রহণের সময় পৃথিবীর ছায়া এসে যখন চাঁদের উপরে পড়ে তখন তার উত্তাপ কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রায় ৩৪৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট কমে যায়।

হাওয়া না থাকায় ও ছাইয়ের আবরণ থাকায় সূর্যের আলো নিচে প্রবেশ করতে পারে না ব'লে সঞ্চিত কোনো উত্তাপই চাঁদে নেই; তাই এত তাড়াতাড়ি এর উত্তাপ কমে আসে। এসব প্রমাণ থেকে বলা যায় যে, আগ্নেয়গিরির ছাই ঢেকে রেখেছে চাঁদের প্রায় সব জায়গা।

চাঁদ পৃথিবীর কাছের উপগ্রহ। তার টানের জোর প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করি পৃথিবীর সমুদ্রগুলোতে, সেখানে জোয়ারভাঁটা খেলতে থাকে; আর শুনেছি আমাদের শরীরে জরজারি বাতের ব্যথাও ঐ টানের জোরে জেগে ওঠে। বাতের রোগীরা ভয় করে অমাবস্যা-পূর্ণিমাকে।

আদিকালে পৃথিবীতে জীবনের কোনো চিহ্নই ছিল না। প্রায় সত্তর-আশি কোটি বছর ধরে চলেছিল নানা আকারে তেজের উৎপাত। কোথাও অগ্নিগিরি

ফুঁসছে তপ্ত বাষ্প, উগরে দিচ্ছে তরল ধাতু, ফোয়ারা ছোটাচ্ছে গরম জলের। নিচের থেকে ঠেলা খেয়ে কাঁপছে ফাটছে ভূমিতল, উঠে পড়ছে পাহাড়পর্বত, তলিয়ে যাচ্ছে ভূখণ্ড।

পৃথিবীর শুরু থেকে প্রায় দেড়শো কোটি বছর যখন পার হল তখন অশান্ত আদিযুগের মাথা-কুটে-মরা অনেকটা থেমেছে। এমন সময়ে সৃষ্টির সকলের চেয়ে আশ্চর্য ঘটনা দেখা দিল। কেমন করে কোথা থেকে প্রাণের ও তার পরে ক্রমশ মনের উদ্‌ভব হল তার ঠিকানা পাওয়া যায় না। তার আগে পৃথিবীতে সৃষ্টির কারখানাঘরে তোলাপাড়া ভাঙাগড়া চলছিল প্রাণহীন পদার্থ নিয়ে। তার উপকরণ ছিল মাটি জল, লোহা পাথর প্রভৃতি; আর সঙ্গে সঙ্গে ছিল অক্সিজেন, হাইড্রজেন, নাইট্রজেন প্রভৃতি কতকগুলি গ্যাস। নানা রকমের প্রচণ্ড আঘাতে তাদেরই উলটপালট করে জোড়াতাড়া দিয়ে নদী-পাহাড়-সমুদ্রের রচনা ও অদলবদল চলছিল। এমন সময়ে এই বিরাট জীবহীনতার মধ্যে দেখা দিল প্রাণ, আর তার সঙ্গে মন। এদের পূর্ববর্তী পদার্থরাশির সঙ্গে এর কোনোই মিল নেই।

নক্ষত্রদের প্রথম আরম্ভ যেমন নীহারিকায় তেমনি পৃথিবীতে জীবলোকে প্রথম যা প্রকাশ পেল তাকে বলা যেতে পারে প্রাণের নীহারিকা। সে একরকম অপরিস্ফুট ছড়িয়ে-পড়া প্রাণপদার্থ, ঘন লালার মতো অঙ্গবিভাগহীন— তখনকার ঈষৎ-গরম সমুদ্রজলে ভেসে বেড়াত। তার নাম দেওয়া হয়েছে প্রোটোপ্ল্যাজ্‌ম্। যেমন নক্ষত্র দানা বেঁধে ওঠে আগ্নেয় বাষ্পে, তেমনি বহু যুগ লাগল এর মধ্যে মধ্যে একটি একটি পিণ্ড জমতে। সেইগুলির এক শ্রেণীর নাম দেওয়া হয়েছে অমীবা; আকারে অতি ছোটো; অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখা যায়। পঙ্কিল জলের ভিতর থেকে এদের পাওয়া যেতে পারে। এদের মুখ চক্ষু হাত পা নেই। আহারের খোঁজে ঘুরে বেড়ায়। দেহপিণ্ডের এক অংশ প্রসারিত করে দিয়ে পায়ের কাজ করিয়ে নেয়। খাবারের সম্পর্কে এলে সেই সাময়িক পা দিয়ে সেটাকে টেনে নেয়। পাকযন্ত্র বানিয়ে নেয় দেহের একটা অংশে। নিজের সমস্ত দেহটাকে ভাগ করে তার বংশবৃদ্ধি হয়। এই অমীবারই আর-এক শাখা দেখা দিল, তারা দেহের চারি দিকে আবরণ বানিয়ে তুললে, শামুকের মতো। সমুদ্রে আছে এদের কোটি কোটি সূক্ষ্ম দেহ। এদের এই দেহপঙ্ক জমে জমে পৃথিবীর স্থানে স্থানে খড়িমাটির পাহাড় তৈরি হয়েছে।

বিশ্বরচনার মূলতম উপকরণ পরমাণু; সেই পরমাণুগুলি অচিন্তনীয় বিশেষ নিয়মে অতিসূক্ষ্ম জীবকোষরূপে সংহত হল। প্রত্যেক কোষটি সম্পূর্ণ এবং স্বতন্ত্র, তাদের প্রত্যেকের নিজের ভিতরেই একটা আশ্চর্য শক্তি আছে যাতে করে বাইরে থেকে

খাদ্য নিয়ে নিজেকে পুষ্ট অনাবশ্যককে ত্যাগ ও নিজেকে বহুগুণিত করতে পারে। এই বহুগুণিত করার শক্তি দ্বারা ক্ষয়ের ভিতর দিয়ে মৃত্যুর ভিতর দিয়ে প্রাণের ধারা প্রবাহিত হয়ে চলে।

এই জীবাণুকোষ প্রাণলোকে প্রথমে একলা হয়ে দেখা দিয়েছে। তার পরে এরা যত সংঘবদ্ধ হতে থাকল ততই জীবজগতে উৎকর্ষ ও বৈচিত্র্য ঘটতে লাগল। যেমন বহুকোটি তারার সমবায়ে একটি নীহারিকা তেমনি বহুকোটি জীবকোষের সমাবেশে এক-একটি দেহ। বংশাবলীর ভিতর দিয়ে এই দেহজগৎ একটি প্রবাহ সৃষ্টি করে নূতন নূতন রূপের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়ে চলেছে। আমরা এত কাল নক্ষত্রলোক সূর্যলোকের কথা আলোচনা করে এসেছি। তার চেয়ে বহুগুণ বেশি আশ্চর্য এই প্রাণলোক। উদ্দাম তেজকে শান্ত করে দিয়ে ক্ষুদ্রায়তন গ্রহরূপে পৃথিবী যে অনতি-ক্ষুব্ধ পরিণতি লাভ করেছে সেই অবস্থাতেই প্রাণ এবং তার সহচর মন-এর আবির্ভাব সম্ভবপর হয়েছে একথা যখন চিন্তা করি তখন স্বীকার করতেই হবে জগতে এই পরিণতিই শ্রেষ্ঠ পরিণতি। যদিও প্রমাণ নেই এবং প্রমাণ পাওয়া আপাতত অসম্ভব তবু একথা মানতে মন যায় না যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এই জীবনধারণযোগ্য চৈতন্যপ্রকাশক অবস্থা একমাত্র এই পৃথিবীতেই ঘটেছে, যে, এই হিসাবে পৃথিবী সমস্ত জগৎধারার একমাত্র ব্যতিক্রম।

উপসংহার

একদা জগতের সকলের চেয়ে মহাশ্চর্য বার্তা বহন করে বহুকোটি বৎসর পূর্বে তরুণ পৃথিবীতে দেখা দিল আমাদের চক্ষুর অদৃশ্য একটি জীবকোষের কণা। কী মহিমার ইতিহাস সে এনেছিল কত গোপনে। দেহে দেহে অপরূপ শিল্পসম্পদশালী তার সৃষ্টিকার্য নব নব পরীক্ষার ভিতর দিয়ে অনবরত চলে আসছে। যোজনা করবার, শোধন করবার, অতি জটিল কর্মতন্ত্র উদ্‌ভাবন ও চালনা করবার বুদ্ধি প্রচ্ছন্নভাবে তাদের মধ্যে কোথায় আছে, কেমন করে তাদের ভিতর দিয়ে নিজেকে সক্রিয় করেছে, উত্তরোত্তর অভিজ্ঞতা জমিয়ে তুলছে, ভেবে তার কিনারা পাওয়া যায় না। অতি-পেলববেদনাশীল জীবকোষগুলি বংশাবলীক্রমে যথাযথ পথে সমষ্টি বাঁধছে জীবদেহে, নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে; নিজের ভিতরকার উদ্যমে জানি না কী করে দেহক্রিয়ার এমন আশ্চর্য কর্তব্যবিভাগ করছে। যে কোষ পাকযন্ত্রের, তার কাজ এক রকমের, যে কোষ মস্তিষ্কের, তার কাজ একেবারেই অন্য রকমের। অথচ জীবাণুকোষগুলি মূলে একই। এদের দুরূহ কাজের ভাগ-বাঁটোয়ারা হল কোন্ হুকুমে এবং এদের বিচিত্র কাজের মিলন ঘটিয়ে স্বাস্থ্য নামে একটা সামঞ্জস্য সাধন করল কিসে। জীবাণুকোষের দুটি প্রধান ক্রিয়া আছে, বাইরে থেকে খাবার জুগিয়ে বাঁচা ও বাড়তে থাকা, আর নিজের অনুরূপ জীবনকে উৎপন্ন করে বংশধারা চালিয়ে যাওয়া। এই আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার জটিল প্রয়াস গোড়াতেই এদের উপর ভর করল কোথা থেকে।

অপ্রাণ বিশ্বে যেসব ঘটনা ঘটছে তার পিছনে আছে সমগ্র জড়জগতের ভূমিকা। মন এইসব ঘটনা জানছে, এই জানার পিছনে মনের একটা বিশ্বভূমিকা কোথায়? পাথর লোহা গ্যাসের নিজের মধ্যে তো জানার সম্পর্ক নেই। এই দুঃসাধ্য প্রশ্ন নিয়ে বিশেষ একটা যুগে প্রাণ মন এল পৃথিবীতে— অতিক্ষুদ্র জীবকোষকে বাহন ক'রে।

পৃথিবীতে সৃষ্টি-ইতিহাসে এদের আবির্ভাব অভাবনীয়। কিন্তু সকলকিছুর সঙ্গে সম্বন্ধহীন একান্ত আকস্মিক কোনো অভ্যুৎপাতকে আমাদের বুদ্ধি মানতে চায় না। আমরা জড়বিশ্বের সঙ্গে মনোবিশ্বের মূলগত ঐক্য কল্পনা করতে পারি সর্বব্যাপী তেজ বা জ্যোতিঃ-পদার্থের মধ্যে। অনেক কাল পরে বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে আপাত-দৃষ্টিতে যে-সকল স্থূল পদার্থ জ্যোতির্হীন, তাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন-আকারে নিত্যই জ্যোতির ক্রিয়া চলছে। এই মহাজ্যোতিরই সূক্ষ্ম বিকাশ প্রাণে এবং আরও সূক্ষ্মতর বিকাশ চৈতন্যে ও মনে। বিশ্বসৃষ্টির আদিতে মহাজ্যোতি ছাড়া আর কিছুই যখন পাওয়া যায় না, তখন বলা যেতে পারে চৈতন্যে তারই প্রকাশ। জড় থেকে জীবে একে একে

পর্দা উঠে মানুষের মধ্যে এই মহাচৈতন্যের আবরণ ঘোচাবার সাধনা চলেছে। চৈতন্যের এই মুক্তির অভিব্যক্তিই বোধ করি সৃষ্টির শেষ পরিণাম।

পণ্ডিতেরা বলেন, বিশ্বজগতের আয়ু ক্রমাগতই ক্ষয় হচ্ছে একথা চাপা দিয়ে রাখা চলে না। মানুষের দেহের মতোই তাপ নিয়ে জগতের দেহের শক্তি। তাপের ধর্মই হচ্ছে যে, খরচ হতে হতে ক্রমশই নেমে যায় তার উষ্মা। সূর্যের উপরিতলের স্তরে যে তাপশক্তি আছে তার মাত্রা হচ্ছে শূন্য ডিগ্রির উপরে ছয় হাজার সেন্টিগ্রেড। তারই কিছু কিছু অংশ নিয়ে পৃথিবীতে বাতাস চলছে, জল পড়ছে, প্রাণের উদ্যমে জীবজন্তু চলাফেরা করছে। সঞ্চয় তো ফুরোচ্ছে, একদিন তাপের শক্তি মহাশূন্যে ব্যাপ্ত হয়ে গেলে আবার তাকে টেনে নিয়ে এনে রূপ দেবার যোগ্য করবে কে। একদিন আমাদের দেহের সদাচঞ্চল তাপশক্তি চারি দিকের সঙ্গে একাকার হয়ে যখন মিলে যায়, তখন কেউ তো তাকে জীবযাত্রায় ফিরিয়ে আনতে পারে না। জগতে যা ঘটছে, যা চলছে, পিঁপড়ের চলা থেকে আকাশে নক্ষত্রের দৌড় পর্যন্ত, সমস্তই তো বিশ্বের হিসাবের খাতায় খরচের অঙ্ক ফেলে চলেছে। সে সময়টা যত দূরেই হোক একদিন বিশ্বের নিত্যখরচের তহবিল থেকে তার তাপের সম্বল ছড়িয়ে পড়বে শূন্যে। এই নিয়ে বিজ্ঞানী গণিতবেত্তা বিশ্বের মৃত্যুকালের গণনায় বসেছিল।

আমার মনে এই প্রশ্ন ওঠে, সূর্য নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কের আরম্ভকালের কথাও তো দেখি অঙ্ক পেতে পণ্ডিতেরা নির্দিষ্ট করে থাকেন। অসীমের মধ্যে কোথা থেকে আরম্ভ হল। অসীমের মধ্যে একান্ত আদি ও একান্ত অন্তের অবিশ্বাস্য তর্ক চুকে যায় যদি মেনে নিই আমাদের শাস্ত্রে যা বলে, অর্থাৎ কল্পে কল্পান্তরে সৃষ্টি হচ্ছে, আর বিলীন হচ্ছে, ঘুম আর ঘুম-ভাঙার মতো।

সৌরলোকের বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের গতি ও অবস্থিতির ভিতর রয়েছে একটা বিরাট শৃঙ্খলা; বিভিন্ন গ্রহ, চক্রপথে প্রায় একই সমক্ষেত্রে থেকে, একটা ঘূর্ণিটানের আবর্তে ধরা প'ড়ে একই দিকে চ'লে সূর্যপ্রদক্ষিণের পালা শেষ করছে। সৃষ্টির গোড়ার কথা যাঁরা ভেবেছেন তাঁরা এতগুলি তথ্যের মিলকে আকস্মিক ব'লে মেনে নিতে পারেন নি। যে মতবাদ গ্রহলোকের এই শৃঙ্খলার সুস্পষ্ট কারণ নির্দেশ করতে পেরেছে তা-ই প্রাধান্য পেয়েছে সব চেয়ে বেশি। যেসব বস্তুসংঘ নিয়ে সৌরমণ্ডলীর সৃষ্টি তাদের ঘূর্ণিবেগের মাত্রার হিসাব একটা প্রবল অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে এসব মতবাদকে গ্রহণযোগ্য করার পক্ষে। হিসাবের গরমিল যেখানে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে সেই মতকেই দিতে হয়েছে বাতিল করে। ঘূর্ণিবেগের মাত্রা প্রায় ঠিক রেখে যে দু-একটি মতবাদ এত কাল টিকে ছিল তাদের বিরুদ্ধেও নূতন বিঘ্ন এসে উপস্থিত হয়েছে।

আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের মানমন্দিরের ডিরেক্টর হেনরি নরিস রাসেল সম্প্রতি জীন্‌স ও লিট্‌লটনের মতবাদের যে বিরুদ্ধসমালোচনা করেছেন তাতে মনে হয় কিছুদিনের মধ্যেই এদেরও বিদায় নিতে হবে গ্রহণযোগ্য মতবাদের পর্যায় থেকে, পূর্ববর্তী বাতিল-করাদের পাশেই হবে এদের স্থান। নক্ষত্রের সংঘাতে গ্রহ-লোকের সৃষ্টি হলে জ্বলন্ত গ্যাসের যে টানাসূত্র বের হয়ে আসত তার তাপমাত্রা এত বেশি হত যে এই বাষ্পপিণ্ডের বিভিন্ন অংশ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত। কিন্তু অতিক্রান্ত তাপ ছড়িয়ে দিয়ে এই টানাসূত্র ঠাণ্ডা হয়ে একটা স্থিতি পেতে চাইত; এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির ক্রিয়ায়, মুক্তি আর বন্ধনের টানাটানিতে কার জিত হবে তাই নিয়েই হেনরি রাসেল আলোচনা করেছেন। আমাদের কাছে দুর্বোধ্য গণিতশাস্ত্রের হিসাব থেকে মোটামুটি প্রমাণ হয়েছে যে টানাসূত্রের প্রত্যেকটি পরমাণু তেজের প্রবল অভিঘাতে বিবাগী হয়ে মহাশূন্যে বেরিয়ে পড়ত, জমাট বেঁধে গ্রহলোক সৃষ্টি করা তাদের পক্ষে সম্ভব হত না। যে বাধার কথা তিনি আলোচনা করেছেন তা জীন্‌স ও লিট্‌ল্‌টনের প্রচলিত মতবাদের মূলে এসে কঠোর আঘাত ক'রে তাদের আজ ধূলিসাৎ করতে উদ্যত হয়েছে।

শুদ্ধিপত্র : রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৫

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৮	১৩	নিতে	শুনিতে
৫৩	২	প্রলোপকল্লোলে	প্রলাপকল্লোলে
১১৩	২২	ভোজনের	ভোজের
১৪৩	২৯	সখা	সখী
২১৬	৫	ছাড়িবে	ছাড়িবি
২৭০	৭	পাতা	পাত
২৭৫	৬	দেবে	দেব
৩২৬	৩০	অতি ছিটেগুলির	অতি খুদে ছিটেগুলির
৩৬০	২১	ব্লুটিং	ব্লটিং

গ্রন্থপরিচয়

[রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশের তারিখ ও রচনা সংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য গ্রন্থপরিচয়ে সংকলিত হইল।]

রোগশয্যায়

'রোগশয্যায়' ১৩৪৭ সালের পৌষ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। মূল ফোটোগ্রাফ ও রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর সংবলিত মাত্র পঞ্চাশখানি গ্রন্থের একটি বিশিষ্ট সংস্করণও সেই সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৯৪০ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন হইতে কালিম্পঙ যাত্রা করেন এবং সেখানে গৌরীপুরভবনে ২৬ সেপ্টেম্বর তারিখে হঠাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন। ২৯ তারিখে অচেতন অবস্থায় তাঁহাকে কলিকাতায় আনা হয়। প্রায় দেড়মাস জোড়াসাঁকোয় অবস্থানের পর নভেম্বরের মাঝামাঝি অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ করায় ডাক্তারের অনুমতিক্রমে তিনি শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন করেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনের এই সর্বশেষ রোগশয্যাপর্বের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য বিবরণ শ্রীপ্রতিমা ঠাকুর 'নির্বাণ' গ্রন্থে বিশদভাবে লিখিয়াছেন। রোগশয্যায় ও আরোগ্য-পর্বের কবিতা রচনা প্রসঙ্গে উক্ত গ্রন্থের নিম্নোদ্ধৃত কিয়দংশ প্রণিধানযোগ্য :

প্রথম মাস [অক্টোবর] বাবামশায়ের চেতনা ঝাপসা ছিল, মাঝে মাঝে সচেতন হতেন আবার ঝিমিয়ে পড়তেন; দ্বিতীয় মাস থেকে তিনি সম্পূর্ণ চেতনা ফিরে পান এবং মুখে মুখে ছড়া তৈরি করেন, কবিতা লিখতে থাকেন; সেই সময় আশেপাশে যাঁরা থাকতেন তাঁরা টুকে নিতেন সেইসব রচনা। ডাক্তারদের মতে তখনকার মতো বিপদজনক সময় কেটে গেলেও তিনি পূর্বের মতো সুস্থ হতে পারেন নি। তখন তিনি রুগ্ণ। ডাক্তাররা নভেম্বর মাসে তাঁকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে যাবার অনুমতি দিলেন। সেখানকার খোলা হাওয়া, শীতের তাজা ভাব, সমস্তই প্রথম ধাক্কায় তাঁর দেহ-মনকে সজাগ ক'রে তুলল, মনে হল হয়তো একটা আরোগ্য আসবে। হয়তো আবার পূর্বের মতো চ'লে-ফিরে বেড়ানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে। কলকাতায় থাকার সময় শেষের দিকে যে-কবিতাগুলি লিখেছিলেন, বেশির ভাগ সেইগুলিই 'রোগশয্যায়' নাম দিয়ে ছাপা হল। এই বই এবং 'আরোগ্যে'র অনেক কবিতাই তাঁর নিষ্ঠাবান অনুরাগী সেবক-সেবিকার উদ্দেশে লেখা।

—নির্বাণ, পৃ ৩৪-৩৫

রোগশয্যায় গ্রন্থখানি 'যে-দুটি নারীর উদ্দেশে' উৎসর্গীকৃত, 'নির্বাণে' শ্রীপ্রতিমা দেবীর সাক্ষ্য অনুসারে তাঁহাদের নাম শ্রীনন্দিতা কৃপালনী ও শ্রীঅমিতা ঠাকুর।

'৩০ অক্টোবর' তারিখচিহ্নিত ৩নং কবিতাটি জোড়াসাঁকোয় চেতনাপ্রাপ্তির পরে রচিত রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম কবিতা। ১৩৪৭ সালের অগ্রহায়ণের প্রবাসী পত্রিকায় উক্ত কবিতাটি 'জপের মালা' নামে এবং ৪নং কবিতাটি 'ঋণশোধ' নামে প্রথম প্রকাশিত হয়।

৬, ৭ ও ৩১ নং কবিতা তিনটি যথাক্রমে 'ভোরের চড়ুই পাখি', 'গহন রজনী' ও 'অপবাদ' নামে প্রবাসীর ১৩৪৭ পৌষ সংখ্যায় প্রথম মুদ্রিত হয়। অন্যান্য কবিতাগুলি কিঞ্চিৎ অধিক একমাস কালের মধ্যে (৩০ অক্টোবর হইতে ৫ ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে) রচিত এবং গ্রন্থাকারেই সর্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

আরোগ্য

'আরোগ্য' ১৩৪৭ সালের ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার সমস্ত কবিতাই কলিকাতা হইতে শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তনের পরে রবীন্দ্রনাথ মুখে মুখে রচনা করেন। অধিকাংশ কবিতাই কোনো পত্রিকায় বাহির হয় নাই।

৩নং কবিতাটির একটি পূর্বতন পাঠ সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার অষ্টম বর্ষ, নবম সংখ্যায় (২৭ পৌষ ১৩৪৭, পৃ ৩৩৭) 'দূরস্মৃতি' নামে প্রথম মুদ্রিত হয়। পত্রিকায় উক্ত কবিতার দৈর্ঘ্য ছিল মোট ২৮ ছত্র, রচনার কাল ও স্থান মুদ্রিত হইয়াছিল '২৭।১২।৪০ উদয়ন'। পাঠান্তর স্বরূপ উহার শেষাংশ দেশ পত্রিকা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

বর্ণহীন প্রৌঢ় প্রভাতের
ছায়াতে আলোতে
আমার চিত্তের ধারা ভাসাইয়া চলে
ফেনায় ফেনায়।
স্পর্শ করি' শূন্যের কিনারা
জেলেডিঙি চলে পাল তুলে,
যূথভ্রষ্ট মেঘ পড়ে থাকে আকাশের কোণে।
সমস্ত দিনের পটে
অতি ক্ষীণ চিহ্ন দেয় কর্মের চিন্তার রেখাগুলি,
পরক্ষণে মুছে যায়।
স্বচ্ছ আনন্দের রূপ স্তব্ধ হেরি অন্তরে বাহিরে
প্রসারিত পাণ্ডুনীল আকাশের তলে।

হেথায় চাহিয়া দেখি বিরস প্রান্তর
সংসারের দায়হারা
তপ্ত শয্যাশায়ী
অকর্মণ্য রোগীসম।
সঙ্গীহীন ছায়াহীন তালগাছ শূন্যে চেয়ে থাকে,
দেখি সেই রূপণের মাঝে
দীর্ঘ দিনে আপনার নিরর্থক ভাবনার ছবি।

১৯নং কবিতাটি 'দেশ' পত্রিকার অষ্টম বর্ষ, দশম সংখ্যায় (৫ মাঘ ১৩৪৭, পৃ ৩৭৯) 'দিদিমণি' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল।

৯ জন্মদিনে

'জন্মদিনে' ১৩৪৮ সালের পয়লা বৈশাখ, শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র-জন্মোৎসব দিবসে প্রকাশিত হয়। ইহার অনেকগুলি কবিতাই সাময়িক পত্রে পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে প্রকাশসূচী মুদ্রিত হইল :

২ 'অপরিসমাপ্ত' : বৈশাখী বার্ষিকী ১৩৪৮
৫ 'জন্মদিন' ১ : প্রবাসী ১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ
৬ ২ : প্রবাসী ১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ
৭ ৩ : প্রবাসী ১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ
৮ 'জন্মমৃত্যু' : প্রবাসী ১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ
৯ 'জলচর' : প্রবাসী ১৩৪৭ কার্তিক
১০ 'ঐকতান' : প্রবাসী ১৩৪৭ ফাল্গুন
১১ 'প্রথম প্রেতি' : প্রবাসী ১৩৪৭ আশ্বিন
১২ 'পথের শেষে' : প্রবাসী ১৩৪৮ বৈশাখ
১৪ 'কালিম্পঙের চিঠি' : পরিচয় ১৩৪৭ কার্তিক
১৫ 'গিরি-নিবাস' : প্রবাসী ১৩৪৮ বৈশাখ
১৬ 'নবজাতকের উত্তর-কাণ্ড' : প্রবাসী ১৩৪৭ আষাঢ়
১৭ 'আরোগ্য' : প্রবাসী ১৩৪৭ মাঘ
১৮ 'চিরস্মরণীয়' : প্রবাসী ১৩৪৭ ফাল্গুন
১৯ 'ছেলেবেলা' : প্রবাসী ১৩৪৭ কার্তিক

২০ 'আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম ঘোড়াডুম সাজে' : প্রবাসী ১৩৪৭ চৈত্র
২১ 'অভিশাপ' : প্রবাসী ১৩৪৭ আষাঢ়
২৫ 'অন্তঃশীলা' : প্রবাসী ১৩৪৭ মাঘ

৫, ৬ ও ৭ নং কবিতার রচনা সম্পর্কে শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ হইতে প্রাসঙ্গিক কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

পঁচিশে বৈশাখের দু'তিন দিন আগে একটা রবিবারে এখানে উৎসবের বন্দোবস্ত হল। সকাল বেলা দশটার সময় স্নান করে কালো জামা কালো রঙের জুতো প'রে [রবীন্দ্রনাথ] বাইরে এসে বসলেন। কাঠের বুদ্ধমূর্তির সামনে বসে একজন বৌদ্ধ বৃদ্ধ স্তোত্র পাঠ করল। উনি [রবীন্দ্রনাথ] ঈশোপনিষদ্ থেকে অনেকটা পড়লেন। সেই দিন দুপুর বেলা 'জন্মদিন' ব'লে তিনটে কবিতা লিখেছিলেন, তার মধ্যে বৌদ্ধ-বৃদ্ধের কথা ছিল। বিকেল বেলা দলে দলে সবাই আসতে লাগল— আমাদের পাহাড়ী দরিদ্র প্রতিবেশী, সানাই বাজতে লাগল, গেরুয়া রঙের জামার উপর মালাচন্দনভূষিত আশ্চর্য স্বর্গীয় সেই সৌন্দর্য সবাই স্তব্ধ হয়ে দেখতে লাগল। ঠেলা-চেয়ারে করে বাড়ির পথ দিয়ে ধীরে ধীরে ওঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, দলে দলে পাহাড়ীরা প্রণত হয়ে ফুল দিচ্ছিল। প্রত্যেকটি লোক শিশু বৃদ্ধ সবাই কিছু না কিছু ফুল এনেছে। ওরা যে এমন করে ফুল দিতে জানে তা আগে কখনও মনে করি নি। তিব্বতীরা পরাল 'খর্দা' গাছের সুতোর বোনা স্কার্ফ, যা ওরা লামাদের পরায়। ফুলে প্রায় আবৃত হয়ে গিয়েছিলেন। শঙ্খধ্বনির মধ্যে 'শিলাতলে' এসে বসলেন, তিব্বতী আর ভুটানীরা শুরু করলে তাদের জংলী তাণ্ডব নাচ।

—মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, সং ২, পৃ ২৫৫-৫৬

৮নং কবিতায় 'প্রিয়মৃত্যুবিচ্ছেদের' সংবাদের যে উল্লেখ, তাহা রবীন্দ্রনাথের পরম স্নেহভাজন ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরলোকগমনের সংবাদ। কবিতাটি উপরে বর্ণিত উৎসব-দিবসের পরদিন বৈকালে রচিত।

'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ-লেখিকার সাক্ষ্য (পৃ ২৩৭-৩৮) অনুসারে ১১ নং কবিতাটি ১৩৪৭ সালের বৈশাখ মাসে মংপুতে রচিত হইয়াছিল।

১৪ নং কবিতাটি কালিম্পঙ হইতে (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪০) শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীকে যে পত্রের সহিত রবীন্দ্রনাথ পাঠাইয়াছিলেন তাহার প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নে মুদ্রিত হইল :

কর্তব্যের সংসারের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে আছি। রক্তে জোয়ার আসবে ব'লে মনে হচ্ছে যেন। শারদা পদার্পণ করেছেন পাহাড়ের শিখরে, পায়ের তলায় মেঘপুঞ্জ কেশর ফুলিয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে। মাথার কিরীটে সোনার রৌদ্র বিচ্ছুরিত।

কেদারায় বসে আছি সমস্ত-দিন, মনের দিক্‌প্রান্তে ক্ষণে ক্ষণে শুনি বীণাপাণির বীণার গুঞ্জরন। তারই একটুখানি নমুনা পাঠাই।

— কালিম্পঙের চিঠি : পরিচয় ১৩৪৭ কার্তিক, পৃ ৩৩২

ইহার পরদিন, ২৬ সেপ্টেম্বর হইতে সাংঘাতিক অসুস্থ হইয়া রবীন্দ্রনাথ মাসাধিক কাল প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় কাটান, এবং ক্রমে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইবার পর ৩০ অক্টোবর (১৯৪০) তারিখে রোগশয্যায় পুনরায় কবিতা রচনা শুরু করেন।

১৫ নং কবিতা প্রবাসীতে 'মিত্রা—' সম্বোধনে প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীমৈত্রেয়ী দেবীর উদ্দেশে উক্ত সম্বোধন।

১৬ নং কবিতা 'কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তী'কে 'নবজাতকের উত্তর-কাণ্ড' নামে পত্রাকারে প্রেরিত হইয়াছিল। ১৩৪৭ আষাঢ়ের প্রবাসীতে ৩৫৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ২নং 'পত্রালাপ' দ্রষ্টব্য।

১৩৪৭ সালের ৭ পৌষ উৎসবে শান্তিনিকেতন-মন্দিরে 'আরোগ্য' নামে রবীন্দ্রনাথের যে মুদ্রিত ভাষণ পঠিত হয় ১৭ নং কবিতাটি তাহারই উপসংহার। রচনা-তারিখ ১২ ডিসেম্বরের পরিবর্তে সম্ভবত '২২ ডিসেম্বর' হইবে।

১৮ নং কবিতাটি 'চিরস্মরণীয়' নামে ১৩৪৭ ফাল্গুনের প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথের '১১ মাঘ' ভাষণের শেষে (পৃ ৫৮০) মুদ্রিত হইয়াছিল। উহার রচনাকাল মাঘ ১৩৪৭ বলিয়া মনে হয়।

২৫ নং কবিতাটির রচনা-তারিখ প্রবাসী পত্রিকা অনুসারে (১৩৪৭ মাঘ, পৃ ৪২৭) '২৮ মে ১৯৪০' হইবে।

উপসংহারে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, এই 'জন্মদিনে' বইখানি কবির জীবিতকালে প্রকাশিত সর্বশেষ কবিতা-গ্রন্থ।

শ্রাবণগাথা

'শ্রাবণগাথা' ১৩৪১ সালের শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হয়। উক্ত সালের '২৬ ও ২৭ শ্রাবণ' তারিখে শান্তিনিকেতনে নৃত্যগীত সহযোগে ইহার 'প্রথম অভিনয়' হয়।

১১৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত "তৃষ্ণার শান্তি" গানের একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পাঠ কৌতূহলী পাঠক চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে ১৫৪ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাইবেন।

নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা

'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা'র কথা-অংশ কলিকাতায় নিউএম্পায়ার থিয়েটারে ১১, ১২, ও ১৩ মার্চ তারিখে (১৯৩৬) অভিনয় উপলক্ষে পুস্তিকা আকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৪২ সালের ফাল্গুন মাসে। পরে ১৩৪৩ সালের বৈশাখ মাসে ইহার একটি স্বরলিপি-সহ পরিমার্জিত সংস্করণ বাহির হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান সংস্করণে শেষোক্ত সংস্করণের পাঠ মুদ্রিত হইল। ১৪২ পৃষ্ঠার "ওরে ক্ষমা কোরো সখা" গানটি উক্ত সংস্করণের শেষে স্বরলিপি-অংশে প্রথম সংযোজিত হয়; পাদটীকায় বলা হইয়াছিল "কয়েক রাত্রি অভিনয়ের পরে এই গানটি নাটকে নূতন যোগ করা হইয়াছে"।

গ্রন্থারম্ভে 'বিজ্ঞপ্তি'তে কবি বলিয়াছেন "এই গ্রন্থের অধিকাংশই গানে রচিত"। সেই সঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, আলোচ্য নাটকে কেবলমাত্র নিম্ননির্দেশিত অংশগুলিই "কাব্য-আবৃত্তির আদর্শে" রচিত :

১৩৪ পৃষ্ঠায় 'সখী'র উক্তি "সখা, কী দেখা দেখিলে তুমি···প্রথম চিনিল আপনারে।"

১৩৭ পৃষ্ঠায় 'চিত্রাঙ্গদা'র উক্তি "হায় হায়···বসন্তেরে করিল ব্যাকুল।"

১৩৮ পৃষ্ঠায় 'একজন সখী'র উক্তি "ব্রহ্মচর্য !···দাও তারে অবলার বল।"

১৪০-৪১ পৃষ্ঠায় 'নূতনরূপপ্রাপ্ত চিত্রাঙ্গদা'র উক্তি "এ কী দেখি !···ধরণীর চির-অবহেলা।" এবং "মীনকেতু···উন্মাদ করেছে মোরে।"

১৪৩ পৃষ্ঠায় 'অর্জুন'-এর উক্তি "হে সুন্দরী···অজানার পথে।"

১৪৪ পৃষ্ঠায় 'চিত্রাঙ্গদা'র উত্তর "তবে তাই হোক···নিমিষের সোহাগিনী।"

১৪৪-৪৫ পৃষ্ঠায় 'অর্জুন'-এর উক্তি "আজ মোরে···শেষ পরিণাম।"

১৪৫ পৃষ্ঠায় 'চিত্রাঙ্গদা'র উত্তর "সে আমি যে আমি নই···যাও যাও ফিরে যাও।"

'অর্জুন'-এর উক্তি "এ কী তৃষ্ণা···সর্বাঙ্গ টুটিয়া।"

১৫১ পৃষ্ঠায় 'সখী'র উক্তি "রমণীর মন ভোলাবার···বীরোত্তম।"

১৫৩ পৃষ্ঠায় 'সখী'র উক্তি "হে কৌন্তেয়···সেবিকার পানে।"

১৫৬ পৃষ্ঠার বৈদিক মন্ত্রগুলিও, বলা বাহুল্য, অভিনয়কালে আবৃত্তি করা হইয়া থাকে।

শ্রীমতী প্রতিমা দেবী কর্তৃক লিখিত ও রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অনুমোদিত "চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য" প্রবন্ধের নিম্নোক্ত অংশ এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য :

চিত্রাঙ্গদার আর-একটি বিশেষ জিনিস হল ছোটো ছোটো কবিতাগুলি, তারা মাঝে মাঝে সূত্র ধরিয়ে দিয়েছে মূল কাহিনীর, গান ও নাচ বন্ধ করে দর্শকের চিত্তকে বিশ্রাম দেওয়ার সঙ্গে নাটকের ঘটনাসূত্রের যোগ রাখাই কবিতাগুলির কাজ, এই কবিতাগুলির ছন্দ দেহের নৃত্যলীলাকে বাঁচিয়ে রাখে। পরবর্তী নৃত্য যে আবার সেই ভঙ্গীর মধ্যে সাড়া দিয়ে উঠবে এ যেন তারই ভূমিকা।

—প্রবাসী, ১৩৪৩ চৈত্র, পৃ ৭৯২

১৩৪৩ সালের প্রবাসীতে পৌষ সংখ্যায় (পৃ ৪২৬-৩৪) "নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা" প্রবন্ধে শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ('কথা ও সুর' গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধ) এবং চৈত্র সংখ্যায় (পৃ ৭৮৯-৯৩) "চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য" প্রবন্ধে শ্রীপ্রতিমা দেবী রবীন্দ্রনাথের এই নাটকটির শিল্পকলা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছিলেন। শেষোক্ত প্রবন্ধের কয়েকটি প্রাসঙ্গিক ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

চিত্রাঙ্গদার সম্বন্ধে আলোচনার সময় মনে রাখতে হবে যে নৃত্যনাট্যে কলাকৌশল কথার ভাষা নিয়ে কারবার করে না, তার ভাষা হল সুর ও তাল ; ভাব খেলে তার দেহরেখায়। এই রেখার খেলা মাত্রেই ছবির বিষয় এসে পড়ে, তাই তার জন্যে পটভূমির দরকার হয় রঙ ও আলো। এই রঙ আলো ছাড়া নৃত্যকলার পরিপ্রেক্ষিত ফুটিয়ে তোলা শক্ত, বিশেষতঃ যখন সে নাটকীয় রাজ্যে গিয়ে পৌঁছয়। নাচেতে দেহের রেখা খুব নিখুঁত হওয়া চাই, কোথাও তার কোনো অবান্তর ভঙ্গী হলে তালের সঙ্গে ভঙ্গীর সংগতি রক্ষা করা দুরূহ হয়ে পড়ে। রেখা ও তালের মিলন ছাড়া নৃত্যকলা পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। কবিতা ও গদ্যে যে তফাৎ, নৃত্যনাট্যের সঙ্গে বিশুদ্ধ নাটকের সেই রকমই পার্থক্য।

—প্রবাসী, ১৩৪৩ চৈত্র, পৃ ৭৯২

১৩৪২ সালের ফাল্গুনে নৃত্যনাট্যটির প্রথম বারের অভিনয় আরম্ভ হইবার পূর্বে নাট্যের মর্মকথাটি অভিনয়-মঞ্চ হইতে রবীন্দ্রনাথ নিম্নলিখিত ভাষায় ব্যক্ত করেন।

প্রভাতের প্রথম আভাস অরুণবর্ণ আভার আবরণে,
অর্ধসুপ্ত চক্ষুর 'পরে লাগে তারি আঘাত।
অবশেষে সেই আবরণ ভেদ ক'রে সে আপন নিরঞ্জন শুভ্রতায়
সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে জাগ্রত জগতে।
তেমনি সত্যের প্রথম আবির্ভাব সাজ-সজ্জার বহিরঙ্গে, বর্ণবৈচিত্র্যে,
তাই দিয়ে অসংস্কৃত চিত্তকে সে করে মুগ্ধ।
অবশেষে নিজের সেই আচ্ছাদন যখন সে মোচন করে
তখন প্রবুদ্ধ মনের কাছে নির্মল মহিমায় তার বিকাশ।
এই কথাটিই চিত্রাঙ্গদা নাট্যের মর্মকথা।

এই নাট্যকাহিনীর মধ্যে আছে, প্রথমে প্রেমের বন্ধন মোহাবেশে,
পরে তার মুক্তি সেই কুহক হতে
নিরলংকার সত্যের সহজ মহিমায়।
—প্রবাসী ১৩৪২ চৈত্র, পৃ ৮৮৯

চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের প্রচলিত 'ভূমিকা'-অংশের ইহাই আদি পাঠ।

আলোচ্য নৃত্যনাট্য প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মূল নাট্যকাব্য 'চিত্রাঙ্গদা' রবীন্দ্র-রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ডে নাটক ও প্রহসন বিভাগে ইতিপূর্বেই মুদ্রিত হইয়াছে।

নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা

আলোচ্য নাটিকাটি ১৩৪৪ সালের ফাল্গুন মাসে 'চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য' নামে পুস্তিকা আকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮, ১৯ ও ২০ মার্চ তারিখে (১৯৩৮) কলিকাতায় "ছায়া" রঙ্গমঞ্চে সাধারণের সমক্ষে উহা সর্বপ্রথম অভিনীত হইয়াছিল।

পরবর্তী সালে ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি তারিখে (১৯৩৯) কলিকাতার "শ্রী" রঙ্গমঞ্চে পুনরভিনয়ের কয়েক মাস পূর্ব হইতেই রবীন্দ্রনাথ নাটিকাটিকে আগাগোড়া পরিমার্জিত করিয়া নৃত্যে সংগীতে নূতন আকার দান করেন। ১৩৪৫ সালের চৈত্র মাসে 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা' নামে স্বরলিপি-সহ একটি নূতন সংস্করণ বাহির হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান সংস্করণে উক্ত নূতন সংস্করণের পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণের সহিত স্বরলিপি-সংস্করণের প্রধান প্রভেদ এই যে শেষোক্ত সংস্করণে প্রথম দৃশ্যের আরম্ভে ফুলওয়ালির দলের "নব বসন্তের গানের ডালি" গানটি নূতন সংযোজন, এবং নিচের দুইটি গান সম্পূর্ণ বর্জিত হইয়াছে।

আয় রে মোরা ফসল কাটি।
মাঠ আমাদের মিতা, ওরে, আজ তারি সওগাতে
ঘরের আঙন সারা বছর ভরবে দিনে রাতে।
নেব তারি দান,
সোনার রঙের ধান,
তাই-যে গাহি গান,
তাই-যে সুখে খাটি॥

এই গানটি প্রথম দৃশ্যে "মাটি তোদের ডাক দিয়েছে" গানের (পৃ ১৬৭) অব্যবহিত পূর্বে 'পুরুষ' দলের গান রূপে ছিল।

হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরুগুরু, ইত্যাদি

(শ্রাবণগাথা, পৃ ১১৪ দ্রষ্টব্য)

দ্বিতীয় দৃশ্যের সর্বশেষে (পৃ ১৭৮) ইহা 'পুরুষদলের নৃত্য' হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

নৃত্যনাট্যটির প্রথম সংস্করণের শুরুতে চণ্ডালিকা মূল নাটকের 'ভূমিকা'টি ও সমগ্র নাট্যবিষয়ের রবীন্দ্রনাথ-কৃত একটি 'পরিচয়' সন্নিবেশিত হইয়াছিল। ভূমিকাটি রবীন্দ্র-রচনাবলীর ত্রয়োবিংশ খণ্ডে (পৃ ১৩৩) একবার মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া বর্তমান খণ্ডে পুনরায় দেওয়া হইল না। 'পরিচয়' অংশটি নিম্নে আদ্যোপান্ত মুদ্রিত হইল :

পরিচয়

(সমগ্র চণ্ডালিকা নাটিকার গদ্য এবং পদ্য অংশে সুর দেওয়া হয়েছে। এই কারণে মনে রাখা দরকার এই নাটিকা দৃশ্য এবং শ্রাব্য, কিন্তু পাঠ্য নয়।)

প্রথম দৃশ্য

ফুল বিক্রি করতে চলেছে মেয়েরা। (গান)

চণ্ডালকন্যা প্রকৃতি ফুল চাইতেই তার স্পর্শ বাঁচিয়ে সবাই চলে গেল।

দইওয়ালা এল। সেও প্রকৃতিকে এড়িয়ে চলে গেল।

চুড়িওয়ালা এল, সেও ঘৃণা করে ওকে চুড়ি বেচল না।

(সকলের প্রস্থান)

দেবতাকে নিন্দা ক'রে প্রকৃতির গীত নৃত্য।

বৌদ্ধভিক্ষুরা বুদ্ধস্তব গান করে গেল রাস্তা দিয়ে।

ঘরকন্নায় অবহেলা করছে ব'লে মা এসে প্রকৃতিকে ভর্ৎসনা করলে।

চির-লাঞ্ছনায় জন্ম দিয়েছে ব'লে প্রকৃতি ধিক্কার দিলে তার মাকে।

(মায়ের প্রস্থান)

প্রকৃতির জল-তোলার অভিনয়।

বুদ্ধশিষ্য আনন্দ এসে জল চাইলেন।

প্রকৃতি ক্ষমা চেয়ে বললে, "আমি চণ্ডালকন্যা, আমার কুয়োর জল অশুচি।"

আনন্দ বললেন, "যে মানুষ আমি, তুমিও সেই মানুষ। যে জল তৃষিতকে তৃপ্ত করে সেই জলই পবিত্র তীর্থবারি।" প্রকৃতির হাতের জল খেয়ে তিনি চলে গেলেন।

পুলকিত মনে প্রকৃতির নৃত্য।

পাড়ার মেয়েপুরুষরা ওকে ফসলকাটার কাজে ডাকতে এল। ভাবাবেগে নিমগ্ন প্রকৃতি তাদের ফিরিয়ে দিলে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পুষ্প অর্ঘ্য নিয়ে পুরনারীরা বুদ্ধের মন্দিরে চলে গেল।

প্রকৃতি গান গেয়ে বলছে, "ফুল মাটির কোলে ফুটেছে, দেবতা আসবেন সেই মাটির কাছেই আপন পুজা নিতে।"

মা এসে বললে, "তুই রৌদ্রে পুড়ে উমার মতো তপস্যা করছিস নাকি।"

প্রকৃতি বললে, "আমি তাঁরই জন্যে তপস্যা করছি যিনি আমাকে ডাক দিয়ে গেছেন, যিনি আমাকে নতুন জন্ম দিয়েছেন। আমি তাঁকেই চাই যিনি আমাকে দিয়েছেন সেবিকার সম্মান।"

রাজবাড়ির অনুচর এসে চণ্ডালিকাকে জানালে রানীর পোষা পাখি উড়ে গেছে, মন্ত্র প'ড়ে তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে, এই আদেশ। (প্রস্থান)

মন্ত্রের কথা শুনে প্রকৃতি মাকে ধ'রে পড়ল, মন্ত্র প'ড়ে আনন্দকে তার কাছে আনিয়ে দিতে হবে।

মা ভয় পেয়ে দ্বিধা করলে, বললে, "যদি আনিয়ে দিই তবে তার মূল্য দিতে গিয়ে তোর কিছুই বাকি থাকবে না।"

প্রকৃতি বললে, "আমার কিছুই বাকি থাকবে না জানি তবু আমি ভয় করি নে।"

মা রাজি হল।

বুদ্ধের স্তব পাঠ করতে করতে ভিক্ষুর দল পথ দিয়ে চলে গেল।

প্রকৃতি দেখলে আগে আগে চলেছেন আনন্দ, কিন্তু তার দিকে ফিরে তাকালেন না, সেই খেদে সে আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগল, আর মাকে বললে, তার মন্ত্রে আরও জোর দিতে।

আকর্ষণী নৃত্যে যোগ দেবার জন্যে মা আপন শিষ্যাদের ডাক দিলে। তাদের প্রবেশ ও নৃত্য।

প্রকৃতির হাতে মায়াদর্পণ দিয়ে মা বললে, এই দর্পণ হাতে নিয়ে নাচলে যাকে কামনা করছে তার ছায়া দেখতে পাবে।—তাণ্ডব নৃত্যে মা রুদ্রভৈরবের দলকে আহ্বান করলে। তাদের নৃত্য।

তৃতীয় দৃশ্য

মায়ের মন্ত্রনৃত্য।

আকাশে মেঘ ঘনিয়েছে দেখে প্রকৃতির আশা হল, মন্ত্র খাটবে, সন্ন্যাসীর শুষ্ক সাধনা উড়ে যাবে শুকনো পাতার মতন।

মা বললে, "এইবার আয়নার সামনে নেচে দেখ্ তো কী ছায়া পড়ল।"

প্রকৃতি আয়নায় দেখলে, আনন্দ আকাশে হাত তুলে থেকে থেকে কাকে যেন অভিশাপ দিচ্ছেন, নিজেকে কঠোরভাবে আঘাত করছেন। দেখে সে অনুতাপে অভিভূত হল। বললে "আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, এ দর্পণ আমি দেখব না।"

মায়া যখন বললে, "তা হলে মন্ত্র ফিরিয়ে নেওয়াই ভালো' প্রকৃতি প্রথমে তাতে সম্মতি দিলে, পরক্ষণেই বললে, "না, তোর মন্ত্র পড়্, আসুন তিনি, দুঃখ দিয়েই তাঁর দুঃখ মেটাব আমি।"

প্রকৃতি তার মাকে নাগপাশ মন্ত্র পড়তে বললে। (নাগপাশমন্ত্র নৃত্য)

(আহ্বান গানের সঙ্গে শিষ্যাদের নৃত্য)

(আনন্দের ছায়া অভিনয়)

অবশেষে আনন্দ পরাভূত হয়ে কাছে এসে উপস্থিত হলেন। তখন মহাপুরুষের এই অপমান প্রকৃতি সহ্য করতে পারলে না। বললে, "প্রভু, তুমি আমাকে উদ্ধার করতে এসেছ। আমি তোমাকে নিচে নামিয়ে এনেছি, তুমি আমাকে উপরে টেনে তুলবে ব'লে।"

সকলে মিলে বুদ্ধের স্তবমন্ত্র পাঠ ও প্রণাম।

সমাপ্ত

কলিকাতায় পুনরভিনয় কালে প্রচারিত পুস্তিকা হইতে নৃত্যনাট্যটির রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক নূতন করিয়া লিখিত আর-একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে মুদ্রিত হইল :

প্রথম দৃশ্য

ফুলওয়ালির দল ফুল বিক্রি করতে এসেছে। চণ্ডালিকাও আনলে তার ফুলের ডালি। সবাই ঘৃণায় তার পাশ কাটিয়ে গেল। দইওয়ালা এল দই বেচতে, চণ্ডালিকা প্রকৃতি কেনবার জন্যে হাত বাড়াতেই দইওয়ালাকে সবাই নিষেধ করলে।

চুড়িওয়ালা এল চুড়ি বিক্রি করতে, প্রকৃতি চুড়ি কিনতে চাইতেই চুড়িওয়ালাকে সবাই সতর্ক করে দিলে। চণ্ডালিকা মনের দুঃখে তার সৃষ্টিকর্তাকে ধিক্কার দিলে। প্রকৃতির মা মায়ার প্রবেশ। ঘরের কাজে চণ্ডালিকার ঔদাসীন্য নিয়ে তাকে ভর্ৎসনা করতেই, মা তাকে অপমানের মধ্যে জন্ম দিয়েছে বলে তাকে তিরস্কার করলে। মা বিস্মিত হয়ে চলে গেল। বুদ্ধদেবের শিষ্য আনন্দ এসে জল চাইলেন। তার হাতের জল অশুচি বলে চণ্ডালিকা সংকোচ প্রকাশ করলে। আনন্দ বললেন, "যে জল তৃষিতের তৃষ্ণা দূর করে, তাপিতের তাপ শান্ত করে, সেই জলই শুচি।" তিনি জল খেয়ে চলে গেলেন। তাঁর করুণা ও তাঁর রূপে প্রকৃতির মন মুগ্ধ হয়ে গেল পাড়ার মেয়েরা ধানকাটার কাজে ওকে ডাকতে এল। ও বললে,

"আমায় ডেকো না আমায় ডেকো না—
আমার কাজভোলা মন আছে দূরে কোন্
করে স্বপনের সাধনা॥"

দ্বিতীয় দৃশ্য

বুদ্ধের পূজার অর্ঘ্য নিয়ে পথ দিয়ে চলে গেল পূজারিনীরা। প্রকৃতি এসে গাইলে,

"ফুল বলে ধন্য আমি, ধন্য আমি মাটির 'পরে—
দেবতা ওগো তোমার পূজা আমার ঘরে॥"

মা এসে বললে, "তুই অবাক করলি যে, উমার মতো তুই তপস্যা করছিস নাকি। তোর সাধনা কার জন্যে।" চণ্ডালিকা বললে, "যে আমাকে আহ্বান করলে, তার জন্যে। আমি ছিলুম বাণীহারা, যে আমাকে বাণী দিয়েছে, আমার মনের মধ্যে যে বাজিয়ে দিয়ে গেছে 'জল দাও', তার জন্যে।" মা বললে, "তোর কাছে কে আবার জল চাইলে, সে কি তোর আপন লোক নাকি।" প্রকৃতি বললে, "তিনি বলেছেন, তিনি আমার আপন লোকই বটেন। তিনি আমাকে নব জন্ম দিয়েছেন। মন্ত্র পড়ে তুই নিয়ে আয় ভিক্ষুকে এই অমানিতার পাশে, আমি তাঁকে আত্মনিবেদনের সম্মান দেব।" এত বড়ো স্পর্ধার কথা শুনে মা স্তম্ভিত হয়ে গেল। এমন সময় ভিক্ষুর দল নিয়ে আনন্দ পথ দিয়ে চলে গেলেন। তার দিকে তাকালেন না দেখে চণ্ডালিকার অসহ্য ক্ষোভ হল। মা বললে, "মন্ত্র পড়ে আমি ওঁকে আনবই।" তার শিষ্যাদের সঙ্গে সম্মোহন নৃত্য করে কন্যার হাতে একটা মায়াদর্পণ দিলে। বললে, "এই দর্পণ নিয়ে যখন তুই নাচবি দেখতে পাবি তাঁর কী দশা হচ্ছে।"

তৃতীয় দৃশ্য

এই দৃশ্যে মন্ত্রের কাজ চলেছে। মায়াদর্পণে আনন্দের অভিভব-দৃশ্য দেখে মাঝে মাঝে প্রকৃতি অনুতপ্ত হচ্ছে, মাকে নিষেধ করছে, আবার তাকে উৎসাহিত করছে। অবশেষে মহাকালনাগিনীমন্ত্র-প্রভাবে টান ধরল। পরাভূত আনন্দের অসম্মানে দুঃখার্ত হয়ে আনন্দকে প্রকৃতি প্রণাম করে বললে, "আমাকে ক্ষমা করো, তোমাকে মাটিতে টেনেছি, তুমি আমাকে ধূলি হতে তুলে নাও তোমার পুণ্যলোকে।"

চণ্ডালিকা-কে নৃত্যনাট্যে রূপদান করার প্রেরণা প্রসঙ্গে ২১।১।৩৮ তারিখে শান্তিনিকেতন হইতে শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রের নিম্নে-উদ্ধৃত অংশ প্রণিধানযোগ্য :

আজ আমার মন যে ঋতুকে আশ্রয় করে আছে, সে দক্ষিণ হাওয়ার ঋতু, অন্তরের দিকে তার প্রবাহ, কিছুকালের জন্যে ফুল ফুটিয়ে ফুল ঝরিয়ে দেবে দৌড়। সেই মাতালটা বড়ো হাটের জন্যে ফসল-ফলানো কেয়ার করে না। কিছুদিন থেকে সমস্ত চণ্ডালিকাকে গানময় করে তুলতে ব্যস্ত আছি। খ্যাতির দিক থেকে এর দাম নেই বললেই হয়। প্রথমত বিদেশী হাটে চালান করবার মাল এ নয়, দ্বিতীয়ত দেশের মাতব্বর লোকেরা এর বিশেষ খাতির করবেন ব'লে আশাই করি নে, যদি করেন তবে প্রভূত মুরুব্বিয়ানা মিশিয়ে করবেন। অথচ দিনরাত্রি এত পরিপূর্ণ হয়ে আছে আমার মন যে, সমস্ত সামাজিক কর্তব্য তুচ্ছ ব'লে মনে হয়। অর্থাৎ আছি আমি অজন্তা-গুহায়— তার বাইরের সংসারটা সম্পূর্ণ মুলতবি বিভাগে রয়ে গেছে।

—প্রবাসী, ১৩৪৪ ফাল্গুন, পৃ ৭১৪

শ্রীমতী প্রতিমা দেবী কর্তৃক লিখিত ও রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অনুমোদিত "চণ্ডালিকা" প্রবন্ধটি নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা-র পরিপূর্ণ রসগ্রহণের পক্ষে অপরিহার্য। ১৩৪৫ সালের আশ্বিনের প্রবাসী হইতে উক্ত প্রবন্ধের কিয়দংশ নিম্নে মুদ্রিত হইল :

চণ্ডালিকার ভূমিকা হল খাঁটি সাহিত্য; একটি মানুষের মানসিক ক্রমবিকাশের পটভূমির উপর তার রচনা। মানুষের মধ্যে যা আদিম আকর্ষণ তারই আবেগ দিয়ে শুরু হয়েছে চণ্ডালিকার নৃত্যকলা। দেহের যে আকর্ষণী মন্ত্র যা শিবের তপস্যাকেও টলাতে পেরেছিল প্রকৃতি-পুরুষের অন্তরের সেই চিরন্তন দ্বন্দ্ব পৌঁছল চণ্ডালিকার প্রাণে, তারই আঘাতে দোল-খাওয়া মন নৃত্যসংগীতের তালে আপনাকে বিচ্ছুরিত করে দিল অবসাদ বিষাদ করুণার আতিশয্যে।...

মূল আখ্যানের সঙ্গে এই নৃত্যনাট্যের আখ্যান-অংশ কিছু তফাত হয়ে গেছে। নাটকীয় সংঘাতকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে এবং রঙ্গমঞ্চের আঙ্গিককে উৎকর্ষ দেবার নিমিত্ত কবি এরূপ করতে বাধ্য হয়েছেন, যদিও সাহিত্যের দিক থেকে মনস্তাত্ত্বিক পরিচালনায় কোনোরূপ পরিবর্তন হয় নি।

প্রথম দৃশ্যে চণ্ডালিকা সাধারণ মেয়েদের দৈনন্দিন কাজের এবং পথের গতানুগতিক স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। সেখানে তার সখী আছে, মা আছে, কর্ম আছে। সেই পথের জীবনের মধ্যে একদিন তার প্রাণে এসে পৌঁছল কোন্ প্রেমের ডাক, প্রথম সাড়া দিয়ে উঠল তার দেহ, তার কামনা, তার পর অসীম দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে টানা-ছেঁড়ার অপরিমেয় অভিজ্ঞতার সাধনায় তার মন বিকশিত হল প্রেমের গভীর আনন্দে। মূল উপাখ্যানের মধ্যে যদিও আনন্দ স্বপ্রকাশ নয়, চণ্ডালিকার মুখের বাণী থেকেই তাঁর দ্বন্দ্বের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু নাটকীয় রসকে জমিয়ে তোলবার জন্যে এবং চণ্ডালিকার দুরূহ মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে দর্শকের চিত্তকে বিরাম দেবার জন্যে বৌদ্ধ ভিক্ষু আনন্দের মনোজগতের দ্বন্দ্বকে ছায়ানৃত্যে দেখানো হয়েছে। চণ্ডালিকার মায়াদর্পণে সন্ন্যাসীর যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল তারই ছায়া জেগে উঠল দর্শকের চোখে। আনন্দের যে দ্বন্দ্ব সে চণ্ডালিকার চেয়ে কিছু কম নয়। এক দিকে তার সুগভীর জ্ঞানের সাধনা, এক দিকে তার দেহের কামনা; এই বস্তুজগতের আকর্ষণ জ্ঞানীকেও টেনে আনলে মাটির পৃথিবীতে, কিন্তু অবশেষে মানুষই জিতল। জীবধর্মের আদিমতাকে ছাপিয়ে উঠল তার আত্মার শক্তি, দিশাহারা উন্মাদনায় বাঁধা পড়ল না সে সংসারের মায়াজালে। চিরবৈরাগী পুরুষ, যার প্রেরণায় সে ছুটেছে উত্তর মেরুতে, উড়েছে আকাশ পথে, ডুবেছে অতল সমুদ্রে, সেই দুর্দাম শক্তির পুরুষকার দেহের আকর্ষণ থেকে আনন্দকে পৌঁছে দিল পৌরুষের অসাধারণ গৌরবে।...

এই যে প্রকৃতি-পুরুষের স্বভাবের মধ্যে মূলগত বিরুদ্ধতা, চণ্ডালিকার সাহিত্য ও নৃত্যনাট্য সেই মানসিক জটিলতাকে সুর ও তালের ছন্দে প্রকাশ করতে চেয়েছে। দেহের অনুপম ভঙ্গিমার মধ্য দিয়ে মনোজগতের ইতিকথাকে নয়নগোচর করে তোলাই ছিল চণ্ডালিকার আদর্শ।

—প্রবাসী, ১৩৪৫ আশ্বিন, পৃ ৭৭৬-৭৭

চণ্ডালিকার মূল আখ্যান প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-রচনাবলী ত্রয়োবিংশ খণ্ডের গ্রন্থপরিচয় (পৃ ৫৪২-৪৩) দ্রষ্টব্য।

শ্যামা

'শ্যামা' নৃত্যনাট্য স্বরলিপি-সহ ১৩৪৬ সালের ভাদ্র মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। তৎপূর্বেই ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারির ৭ ও ৮ তারিখে নাটিকাটি কলিকাতায় "শ্রী" রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল। ইহার বৎসর তিনেক আগে ১৩৪৩ সালের আশ্বিন মাসে কথা ও কাহিনী-র "পরিশোধ" কবিতাটিকে (রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড পৃ ৩১-৪০ দ্রষ্টব্য) অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ একটি গীতিনাট্য রচনা করিয়াছিলেন; এবং শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের ও অন্যান্য শিল্পীদের সহায়তায় ১০ ও ১১ অক্টোবর তারিখে (১৯৩৬) উহা ভবানীপুর আশুতোষ কলেজ হলে মঞ্চস্থ করেন। ১৩৪৩ সালের কার্তিকের প্রবাসীতে ১-১১ পৃষ্ঠায় "পরিশোধ (নাট্যগীতি)" আগাগোড়া মুদ্রিত হইয়াছিল। বস্তুত উক্ত 'নাট্যগীতি'তেই শ্যামা নৃত্যনাট্যের আদি সূচনা।

'পরিশোধ নাট্যগীতি'র প্রবাসীতে-প্রকাশিত পাঠ রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে শ্যামার 'পরিশিষ্ট'রূপে যথাস্থানে (পৃ ২০৯-১৮) মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্যামা বা পরিশোধ-এর আখ্যান-অংশ, চণ্ডালিকার মতোই কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal (Published by the Asiatic Society of Bengal, 57 Park Street, 1882) গ্রন্থের মহাবস্তুবদান-অংশে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে গৃহীত। কৌতূহলী পাঠকদের জন্য উক্ত গদ্যাংশটি আগাগোড়া মূল গ্রন্থ হইতে নিম্নে মুদ্রিত হইল :

Story of Syāmā and Vajrasena —The reason why Buddha abandoned his faithful wife Yasodharā is given in the following story.

There was in times of yore a horse-dealer at Takshasilā, named Vajrasena ; on his way to the fair at Vārānasī, his horses were stolen, and he was severely wounded. As he slept in a deserted house in the suburbs of Vārānasī, he was caught by policemen as a thief. He was ordered to the place of execution. But his manly beauty attracted the attention of Syāmā, the first public woman in Vārānasī. She grew enamoured of the man, and requested one of her handmaids to rescue the criminal at any hazard. By offering large sums of money, she succeeded in inducing the executioners to set Vajrasena free, and excute the orders of the king on another, a banker's son, who was an admirer of Syāmā. The latter not knowing his fate, approached the place of execution with victuals for the criminal, and was severed in two by the executioners.

The woman was devotedly attached to Vajrasena. But her inhuman conduct to the banker's son made a deep impression on his mind. He could not reconcile himself to the idea of being in love with the perpetrator of such a crime. On an occasion when they both set on a pluvial excursion, Vajrasena plied her with wine, and, when, she was almost senseless, smothered and drowned her. When he thought she was quite dead, he dragged her to the steps of the ghat and fled, leaving her in that helpless condition. Her mother, who was at hand, came to her rescue, and by great assiduity resuscitated her. Syāmā's first measure, after recovery, was to find out a Bhikshunī of Takshasilā, and to send through her a message to Vajrasena, inviting him to her loving embrace. Buddha was that Vajrasena, and Syāmā, Yaśodharā.

—The Sanskrit Buddhist Literature, p. 135.

১৯৩৯ সালে অভিনয়কালে প্রচারিত রবীন্দ্রনাথ-কৃত 'শ্যামা'র একটি সংক্ষিপ্ত নাট্যপরিচয় সমসাময়িক প্রচার-পুস্তিকা হইতে নিম্নে মুদ্রিত হইল :

শ্যামা

প্রথম দৃশ্য

রাজপথে

বজ্রসেন বণিক। সে অনেক সন্ধানে ইন্দ্রমণির হার সংগ্রহ করেছে। তার ইচ্ছা, এই হার সে কাউকে বেচবে না। বিনামূল্যে যাকে পরাতে চায় তাকেই খুঁজে বের করবে। বন্ধু বললে, "এই হারের প্রতি রাজার চরের লক্ষ্য আছে।" বজ্রসেন বললে, "সেই ভয়ে যাচ্ছি বিদেশে পালিয়ে।" বলতে বলতে কোটালের চর এসে বললে, "তোমার পেটিকায় কী আছে দেখাও।" বজ্রসেন বললে, "এ তুমি ছুঁয়ো না, এ আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয়।" বলে সে ছুটে গেল। কোটালের চর বললে, "দেখব তুমি কোথায় পালাও।"

দ্বিতীয় দৃশ্য

শ্যামার সভা

শ্যামা রাজনটী, বিখ্যাত সুন্দরী। তার প্রেমে পাগল বালক উত্তীয়। সে শ্যামার পূজা করে দূরের থেকে। সখীদের করুণা তার 'পরে। শ্যামা নৃত্যগীতে প্রবৃত্ত, এমন সময়ে চোর অপবাদ দিয়ে প্রহরী শ্যামার সভার মধ্য দিয়ে বজ্রসেনের পিছন পিছন ছুটে গেল। শ্যামা বজ্রসেনের দেবকান্ত মূর্তি দেখে মুগ্ধ। সখিকে পাঠিয়ে বজ্রসেনের সঙ্গে প্রহরীকে ডেকে পাঠালে। বজ্রসেনকে বাঁচাবার জন্যে দুদিন সময় চাইলে। প্রহরী রাজি হল। শ্যামা সভাস্থদের উদ্দেশ করে বললে, "তোমাদের মধ্যে এমন বীর কে আছে যে এই নিরপরাধ বিদেশীকে অন্যায় অপবাদ থেকে রক্ষা করবে।" উত্তীয় এসে বললে, "ন্যায়-অন্যায় বুঝি নে, ঐ বিদেশীর নামের অভিযোগ আমি নিজে স্বীকার করে প্রাণ দেব— সেই মৃত্যুর বন্ধনেই তোমার সঙ্গে আমার মিলন হবে।" প্রহরীর কাছে সে আত্মসমর্পণ করলে। কারাগারে তার মৃত্যু হল।

তৃতীয় দৃশ্য

পথে

বজ্রসেনের সঙ্গে শ্যামার মিলনের আনন্দ। দেশত্যাগ করে বজ্রসেন ও শ্যামার পলায়ন। পলাতকা রাজনটীর সন্ধানে প্রহরীর অনুসরণ। সখীরা তাকে ছলনা করে

ভুলিয়ে দিলে। শ্যামাকে বার বার বজ্রসেনের প্রশ্ন, কী উপায়ে তাকে উদ্ধার করা হয়েছে। অবশেষে শ্যামার কাছে শুনলে তার জন্যে প্রাণ দিয়েছে উত্তীয়। বজ্রসেন তাকে ধিক্কার দিলে, ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বর্জন করে চলে যাবার সময়ে শ্যামা তাকে ছাড়তে চাইলে না। বজ্রসেন তাকে সংঘাতিক আঘাত করে চলে গেল। শ্যামার প্রতি প্রেম ভুলতে পারলে না, অনুতাপে দগ্ধ হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল, শ্যামাকে ডাকতে লাগল মৃত্যুলোক থেকে। সেই আহ্বানে শ্যামার হঠাৎ আবির্ভাব। বললে, "তোমার নিষ্ঠুর আঘাতের মধ্যেও করুণা ছিল, আমি মরণের দ্বার থেকে তোমার কাছে ফিরে এসেছি।" আবার বজ্রসেনের মনে ধিক্কার জাগল, বললে, "চলে যাও।" শ্যামা প্রণাম করে চলে গেল।

পরিতপ্ত বজ্রসেনের গান :

ক্ষমিতে পারিলাম না যে
　　ক্ষমো এ মম দীনতা,
　　পাপীজনশরণ প্রভু।
মরিছে তাপে মরিছে লাজে
　　প্রেমের বলহীনতা,
　　ক্ষমো এ মম দীনতা ॥

প্রিয়ারে নিতে পারি নি বুকে,
　　প্রেমেরে আমি হেনেছি,
পাপীরে দিতে শাস্তি শুধু
　　পাপেরে ডেকে এনেছি।
　　　জানি গো তুমি ক্ষমিবে তারে
　　　যে অভাগিনী পাপের ভারে
　　　　চরণে তব বিনতা,
　　　ক্ষমিবে না ক্ষমিবে না
　　　　আমার ক্ষমাহীনতা ॥

শ্যামা, চণ্ডালিকা প্রভৃতি নৃত্যনাট্য প্রসঙ্গে শান্তিনিকেতন হইতে ১৪।২।৩৯ তারিখের এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লিখিয়াছিলেন :

সুরের বোঝাই-ভরা তিনটে নাটিকার মাঝিগিরি শেষ করা গেল। নটনটীরা যন্ত্রতন্ত্র নিয়ে চলে গেল কলকাতায়। দীর্ঘকাল আমার মন ছিল গুঞ্জনমুখরিত।

আনন্দে ছিলুম। সে আনন্দ বিশুদ্ধ, কেননা সে নির্বস্তুক (abstract)। বাক্যের সৃষ্টির উপরে আমার সংশয় জন্মে গেছে। এত রকম চলতি খেয়ালের উপর তার দর যাচাই হয়, খুঁজে পাই নে তার মূল্যের আদর্শ।······

···গানেতে মনের মধ্যে এনে দেয় একটা দূরত্বের পরিপ্রেক্ষণী। বিষয়টা যত কাছেরই হোক সুরে হয় তার রথযাত্রা, তাকে দেখতে পাই ছন্দের লোকান্তরে, সীমান্তরে, প্রাত্যহিকের করস্পর্শে তার ক্ষয় ঘটে না, দাগ ধরে না। আমার শ্যামা নাটকের জন্যে একটা গান তৈরি করেছি, ভৈরবী রাগিণীতে—

জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা
হে গরবিনী।

এই গরবিনীকে সংসারে দেখেছি বারংবার, কিন্তু গানের সুর শুনলে বুঝবে, এই বারংবারের অনেক বাইরে সে চলে গেছে। যেন কোন্ চিরকালের গরবিনীর পায়ের কাছে বসে মুগ্ধ মন অন্তরে অন্তরে সাধনা করতে থাকে। সুরময় ছন্দোময় দূরত্বই তার সকলের চেয়ে বড়ো অলংকার।······

গানে আমি রচনা করেছি শ্যামা, রচনা করেছি চণ্ডালিকা। তার বিষয়টা বিশুদ্ধ স্বপ্নবস্তু নয়। তীব্র তার সুখদুঃখ ভালোমন্দ। তার বাস্তবতা অকৃত্রিম এবং নিবিড়। কিন্তু এগুলোকে পুলিস-কেসের রিপোর্টরূপে বানানো হয় নি— গানে তার বাধা দিয়েছে— তার চার দিকে যে দূরত্ব বিস্তার করেছে তাকে পার হয়ে পৌঁছতে পারে নি যা-কিছু অবান্তর, যা অসংলগ্ন, যা অনাহূত আকস্মিক। অথচ জগতে সব কিছুর সঙ্গেই আছে অসংলগ্ন, অর্থহীন, আবর্জনা; তাদেরই সাক্ষ্য নিয়ে তবেই প্রমাণ করতে হবে সাহিত্যের সত্যতা, এমন বে-আইনী বিধি মানতে মনে বাধছে। অন্তত গানে এ কথা ভাবতেই পারি নে।···

—প্রবাসী, ১৩৪৫ চৈত্র, পৃ ৭৮২-৭৮৫

তিন সঙ্গী

'তিন সঙ্গী' ১৩৪৭ সালের পৌষমাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গল্পগুলির সাময়িক পত্রে প্রথম প্রকাশের সূচী নিম্নে প্রদত্ত হইল:

রবিবার	আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৪৬ শারদীয়া সংখ্যা
শেষ কথা	শনিবারের চিঠি, ১৩৪৬ ফাল্গুন
ল্যাবরেটরি	আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৪৭ শারদীয়া সংখ্যা

শেষকথা গল্পটির একটি ভিন্নতর পাঠ দেশ পত্রিকার 'বিদ্যাসাগর স্মৃতি-সংখ্যা'য় (৩০ অগ্রহায়ণ ১৩৪৬, পৃ ১৬৫-৭৬) "ছোটো গল্প" নামে বাহির হইয়াছিল। পরিশিষ্টে উহা আদ্যোপান্ত মুদ্রিত হইল।

ল্যাবরেটরি গল্পটির সূত্রে শ্রীপ্রতিমা দেবীর 'নির্বাণ গ্রন্থ' হইতে প্রাসঙ্গিক কয়েকটি ছত্র উদ্ধারযোগ্য :

……অসুস্থতার মধ্যে পুজোর 'আনন্দবাজার' বেরল, তাতে ল্যাবরেটরি গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল, অসুখের মধ্যে সেদিন তিনি [রবীন্দ্রনাথ] ভালো ছিলেন তাই কাগজখানি আসবামাত্র আমার স্বামী [রথীন্দ্রনাথ] তা নিয়ে গিয়ে তাঁকে দেখিয়েছিলেন। কী আগ্রহ তাঁর গল্পটি দেখে, ডাক্তারদের বারণ সত্ত্বেও তিনি কাগজখানি হাতে নিয়ে আগাগোড়া চোখ বুলিয়ে গেলেন। সোহিনীকে নিয়ে যখন কেউ-কেউ আলোচনা করতেন, তাঁদের প্রায়ই বলতেন, "সোহিনীকে সকলে হয়তো বুঝতে পারবে না, সে একেবারে এখনকার যুগের সাদায়-কালোয় মিশনো খাঁটি রিয়ালিজ্‌ম্‌, অথচ তলায়-তলায় অন্তঃসলিলার মতো আইডিয়ালিজ্‌মই হল সোহিনীর প্রকৃত স্বরূপ।" বন্ধুবান্ধব এসে গল্পটির প্রশংসা করলে অসুখের মধ্যেও তাঁর মুখ কত উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

—নির্বাণ, পৃ ৩৪

বিশ্বপরিচয়

'বিশ্বপরিচয়' ১৩৪৪ সালের আশ্বিন মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। বইখানি উক্ত বৎসর আলমোড়ায় গ্রীষ্মাবকাশ যাপনের সময় রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন।

সর্বসাধারণের উপযোগী করিয়া সহজ ভাষায় বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনার এই প্রয়াস প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রকে রবীন্দ্রনাথ নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন :

বিশ্বপরিচয় বইখানা তোমাকে পাঠিয়ে দিতে লিখে দিলুম, তারই সঙ্গে ফাউ একখানা 'ছড়ার ছবি' পাবে। ডাঙায় নাচতে পারি বলেই জলে সাঁতার কাটার অধিকার যে পাকা হবে এমন কোনো কথা নেই। বিজ্ঞান-সরোবরের ঘাটের কাছটাতে খুব হাত-পা ছুঁড়েছি, প্রাইজ পাব এমন আশা করি নে। বিজ্ঞানের আবহাওয়ার সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকের মনটা চন্দ্রলোকের মতোই। যতটা সাধ্য, হাওয়া খেলিয়ে দেবার ইচ্ছা অনেক দিন থেকে মনে ছিল, কিন্তু হাওয়াটা ওজনে ভারী হয়েছে এমন নালিশ কানে উঠেছে।—মাল থাকবে অথচ ভার থাকবে না এমন জাদুবিদ্যা ওস্তাদের পক্ষেই সম্ভব। বিজ্ঞানের একটা রসালো উপক্রমণিকা লেখা তোমারই দ্বারা সাধ্য, কেননা তোমার ভাণ্ডারে বাক্যরস এবং অর্থমূল্য দুইই

আছে পুরো পরিমাণে; অতএব দেশকে বঞ্চিত কোরো না। একদিন ক্লাস চালিয়েছিলে আজ আসর জমাতে হবে। ইতি ৫।১০।৩৭

—বৈজয়ন্তী, ১৩৪৬ ফাল্গুন-চৈত্র, পৃ ২৮৯

আলোচ্য গ্রন্থের তৃতীয় ও পঞ্চম সংস্করণে রবীন্দ্রনাথ স্বতন্ত্র দুইটি ভূমিকা সংযোজন করিয়াছিলেন। উক্ত ভূমিকা দুইটি নিম্নে মুদ্রিত হইল :

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

যে বয়সে শরীরের অপটুতা ও মনোযোগশক্তির স্বাভাবিক শৈথিল্যবশত সাধারণ সুপরিচিত বিষয়ের আলোচনাতেও স্খলন ঘটে সেই বয়সেই অল্পপরিচিত বিষয়ের রচনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেম। তার একমাত্র কারণ সহজ ভাষায় বিজ্ঞানের ব্যাখ্যার ছাঁচ গড়ে দেবার ইচ্ছা আমার মনে ছিল। আশা ছিল বিষয়বস্তুর ত্রুটিগুলির সংশোধন হতে পারবে বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে। কিছুদিন অপেক্ষার পর আমার সে আশা পূর্ণ হয়েছে। কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ সেন এবং বম্বাই থেকে শ্রীযুক্ত ইন্দ্রমোহন সোম বিশেষ যত্ন করে ভুলগুলি দেখিয়ে দেওয়াতে সেগুলি সংশোধন করবার সুযোগ হল। তাঁরা অযাচিতভাবে এই উপকার করলেন, সেজন্যে আমি তাঁদের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ আছি। এইসঙ্গে পূর্বসংস্করণের পাঠকদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

কালিম্পঙ
২৭।৬।৩৮

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

এই গ্রন্থে যে-সকল ত্রুটি লক্ষ্যগোচর হয়েছে সে-সমস্তই অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সেনগুপ্ত বিশেষ মনোযোগ করে সংশোধিত করেছেন— তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।

শান্তিনিকেতন
৯।১।৪০

বাংলাভাষা-পরিচয় গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ "ছাত্রপাঠকদের প্রতি" 'বিশ্বপরিচয়' সম্বন্ধে যে কথাকয়টি বলিয়াছেন তাহাও এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য :

··তোমাদের জন্যে বিশ্বপরিচয় বইখানা লিখেছিলুম এই ভাবেই। বিজ্ঞানের রাজ্যে স্থায়ী বাসিন্দাদের মতো সঞ্চয় জমা হয় নি ভাণ্ডারে, রাস্তায় বাউলদের মতো

খুশি হয়ে ফিরেছি, খবরের ঝুলিটাতে দিনভিক্ষে যা জুটেছে তার সঙ্গে দিয়েছি আমার খুশির ভাষা মিলিয়ে। ছোটোখাটো অপরাধ যদি ঘটে থাকে সেই খুশির ভোগে অনেকটা তার খণ্ডন হতে পারে। জ্ঞানের দেশে ভ্রমণের শখ ছিল বলেই বেঁচে গেছি, বিশেষ সাধনা না থাকলেও। সেই শখটা তোমাদের মনে যদি জাগাতে পারি তা হলে আমার যতটুকু শক্তি সেই অনুসারে ফল পাওয়া গেল মনে করে আশ্বস্ত হব।

—বাংলাভাষা-পরিচয়, পৃ ।৵০

'বিশ্বপরিচয়' পরবর্তীকালে বিশ্বভারতী কর্তৃক 'লোকশিক্ষা-গ্রন্থমালা'র প্রারম্ভিক গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থমালার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া ভূমিকায় সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন, আলোচ্য গ্রন্থ রচনার গভীরতর প্রেরণাটি হৃদয়ঙ্গম করিতে তাহা বিশেষ সাহায্য করে। ভূমিকাটির প্রাসঙ্গিক কয়েক ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

শিক্ষণীয় বিষয়মাত্রই বাংলাদেশের সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করে দেওয়া এই অধ্যবসায়ের উদ্দেশ্য। তদনুসারে ভাষা সরল এবং যথাসম্ভব পরিভাষাবর্জিত হবে, এর প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে ; অথচ রচনার মধ্যে বিষয়বস্তুর দৈন্য থাকবে না, সেও আমাদের চিন্তার বিষয়।···

বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞানচর্চার। আমাদের গ্রন্থপ্রকাশকার্যে তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

—লোকশিক্ষা-গ্রন্থমালার ভূমিকা

বর্ণানুক্রমিক সূচী

অজস্র দিনের আলো	...	৭
অতি দূরে আকাশের সুকুমার পাণ্ডুর নিলিমা		৪৭
অনিঃশেষ প্রাণ	...	৬
অপরাহ্ণে এসেছিল জন্মবাসরের আমন্ত্রণে	...	৭৪
অবসন্ন আলোকের	...	১৯
অভিশাপ নয় নয়	...	১৮৩
অলস শয্যার পাশে জীবন মন্থরগতি চলে	...	৬১
অলস সময়-ধারা বেয়ে	...	৪৯
অশান্তি আজ হানল এ কী দহনজ্বালা	...	১৪৫
অসুস্থ শরীরখানা	...	১৮
আকাশধরা রবিরে ঘিরি	...	১৫৭
আগ্রহ মোর অধীর অতি	...	১৪৯
আজ মোরে সপ্তলোক স্বপ্ন মনে হয়	...	১৪৪
আজিকার অরণ্যসভারে	...	৩১
আজি জন্মবাসরের বক্ষ ভেদ করি	...	৭৫
আমরা আহিরিনী, সারা হল বিকিকিনি	...	২০০
আমাদের আঁখি হোক মধুসিক্ত	...	১৫৭
আমায় দোষী করো	...	১৭৫
আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি	...	১৪১
আমার এই রিক্ত ডালি	...	১৩৯
আমার কীর্তিরে আমি করি না বিশ্বাস	...	২৭
আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া	...	১৯৪
আমার দিনের শেষ ছায়াটুকু	...	১৩
আমার মনের মধ্যে বাজিয়ে দিয়ে গেছে	...	১৬৯
আমার মালার ফুলের দলে আছে লেখা	...	১৬১
আমার সাহস! তাঁর সাহসের নাই তুলনা		১৭৫
আমি চাই তাঁরে	...	১৭২

আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী … ১৫৪
আমি তোমারে করিব নিবেদন … ১৩৬
আমি দেখব না, আমি দেখব না … ১৭৯
আমি বণিক, আমি চলেছি … ১৮৮
আমি ভয় করি নে মা … ১৭৩
আরবার ফিরে এল উৎসবের দিন … ৭২
আরোগ্যের পথে … ২৫
আলোকের অন্তরে যে আনন্দের পরশন পাই ৬৬
আহা মরি মরি মহেন্দ্রনিন্দিত কান্তি … ১৯২, ২১০
উড়ো পাখি আসবে ফিরে … ১৭৩
উপসংহার … ৪১৩
এ আমির আবরণ সহজে স্খলিত হয়ে যাক ৬৬
এ কথা সে কথা মনে আসে … ৬২
এ কী আনন্দ, আহা … ১৯৭, ২১২
এ কী খেলা হে সুন্দরী … ১৯৩, ২১১
এ কী তৃষ্ণা, এ কী দাহ … ১৪৫
এ কী দেখি! এ কে এল মোর দেহে … ১৪০
এ জন্মের লাগি … ২০২, ২১৫
এ জীবনে সুন্দরের পেয়েছি মধুর আশীর্বাদ ৬৪
এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি … ৪১
এ নতুন জন্ম, নতুন জন্ম … ১৭০
এই পেটিকা আমার বুকের পাঁজর যে রে … ১৮৮
এই মহাবিশ্বতলে … ৮
একা বসে আছি হেথায় … ৭
একা বসে সংসারের প্রান্ত-জানালায় … ৪৮
এখনো কেন সময় নাহি হল … ২০৯
এত দিন তুমি সখা, চাহনি কিছু … ১৯৪
এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার … ২১৩
এরে ক্ষমা কোরো সখা … ১৪২
এসেছি প্রিয়তম, ক্ষমো মোরে ক্ষমো … ২০৪, ২১৭

এসো এসো এসো প্রিয়ে	...	২০৩, ২০৪, ২১৭
এসো এসো পুরুষোত্তম	...	১৫৩
এসো এসো বসন্ত, ধরাতলে	...	১৫৫
এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে	...	১১২
ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে	...	১০৭
ঐ দেখ্‌ পশ্চিমে মেঘ ঘনাল	...	১৭৮
ঐ রে তরী দিল খুলে	...	২১৪
ওকে ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, ছি	...	১৬৩, ১৬৪
ওগো আমার ভোরের চড়ুই পাখি	...	১০
ওগো ডেকো না মোরে ডেকো না	...	১৬৭
ওগো তোমরা যত পাড়ার মেয়ে	...	১৬৩
ওগো মা, ঐ কথাই তো ভালো	...	১৭৩
ওগো শ্রাবণের পূর্ণিমা আমার	...	১১৫
ওমা ওমা ওমা	...	১৮৩
ওরা অকারণে চঞ্চল	...	১২১
ওরে ঝড় নেমে আয়	...	১১৫, ১৩৩
ওরে পাষাণী	...	১৮০
ওরে বাছা দেখতে পারি নে তোর দুঃখ	...	১৭৬
ওরে সর্বনাশী, কী কথা তুই বলিস	...	১৭৩
কখন ঘুমিয়েছিনু	...	২০
কঠিন বেদনার তাপস দোঁহে	...	২১৮
করিয়াছি বাণীর সাধনা	...	৮০
কহো কহো মোরে প্রিয়ে	...	২০১, ২১৪
কাজ নেই, কাজ নেই মা	...	১৬৫
কাল প্রাতে মোর জন্মদিনে	...	৭৪
কালের প্রবল আবর্তে প্রতিহত	...	৭৯
কাহারে হেরিলাম	...	১৪২
কিসের ডাক তোর কিসের ডাক	...	১৬৯
কী কথা বলিস তুই	...	১৭০
কী যে ভাবিস তুই অন্যমনে	...	১৬৪

কেটেছে একেলা বিরহের বেলা ... ১৪৭
কেন গো কী চাই ... ১৭৩
কেন রে ক্লান্তি আসে ... ১৪৭
কোন্ অপরূপ স্বর্গের আলো ... ১৯৬
কোন্ অযাচিত আশার আলো ... ২১১
কোন্ ছলনা এ যে নিয়েছে আকার ... ১৪৩
কোন্ দেবতা সে, কী পরিহাসে ... ১৪৪
কোন্ বাঁধনের গ্রন্থি বাঁধিল ... ২০০
ক্ষণে ক্ষণে মনে হয় যাত্রার সময় বুঝি এল ... ৬৫
ক্ষমা করো আমায় ... ১৩৭
ক্ষমা করো নাথ, ক্ষমা করো ... ২০১, ২১৫
ক্ষমা করো প্রভু, ক্ষমা করো মোরে ... ১৬৬
ক্ষমিতে পারিলাম না যে ... ২০৫, ২১৬
ক্ষুধার্ত প্রেম তার নাই দয়া ... ১৮০
খুলে দাও দ্বার ... ২৮
খ্যাতি নিন্দা পার হয়ে জীবনের ... ৫৪
গহন রজনী-মাঝে ... ১১
গুরু গুরু গুরু গুরু ঘন মেঘ গরজে ... ১৩২
গ্রহলোক ... ৩৯৩
ঘণ্টা বাজে দূরে ... ৪৪
ঘন কালো মেঘ তাঁর পিছনে ... ১৮০
ঘুমের ঘন গহন হতে ... ১৮২
চক্ষে আমার তৃষ্ণা ... ১৭২
চমকিবে ফাগুনের পবনে ... ১৯০
চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে ... ২১৩
চিত্রাঙ্গদা রাজকুমারী কেমন না জানি ... ১৪৯
চিরদিন আছি আমি অকেজোর দলে ... ৫৯
ছাড়িব না, ছাড়িব না ... ২০২, ২১৬
ছি ছি, কুৎসিৎ কুরূপ সে ... ১৪৯
ছোটো গল্প ... ৩১৫

জগতের মাঝখানে যুগে যুগে হইতেছে জমা		১৪
জটিল সংসার	...	৯৭
জন্মবাসরের ঘটে	...	৭১
জল দাও আমায় জল দাও	...	১৬৬
জাগে নি এখনো জাগে নি	...	১৮১
জান না কি পিছনে তোমার	...	১৮৭
জানি জানি, তাই তো আমি	...	১৮৭
জীবনবহনভাগ্য নিত্য আশীর্বাদে	...	৯৫
জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা	...	১৯০
জীবনের আশি বর্ষে প্রবেশিনু যবে	...	৭২
জীবনের দুঃখে শোকে তাপে	...	২৭
জেনো প্রেম চিরঋণী আপনারি হরষে	...	১৯৮, ২১২
ঝরে ঝর ঝর ভাদর-বাদর	...	১১২
তপের তাপের বাঁধন কাটুক	...	১১০
তবে তাই হোক	...	১৪৪
তাই আমি দিনু বর	...	১৪০
তাই হোক তবে তাই হোক	...	১৫২
তাঁকে আনতে যদি পারি	...	১৭৪
তুমি অতিথি, অতিথি আমার	...	১৪৩
তুমি ইন্দ্রমণির হার	...	১৮৭
তৃষ্ণার শান্তি, সুন্দরকান্তি	...	১১৭, ১৫৪
তোমা লাগি যা করেছি	...	২০১, ২১৫
তোমাদের এ কী ভ্রান্তি	...	১৯২, ২১০
তোমাদের জানি, তবু তোমরা যে দূরের মানুষ		১০০
তোমায় দেখে মনে লাগে ব্যথা	...	২০২
তোমার কাছে দোষ করি নাই	...	২০২, ২১৫
তোমার প্রেমের বীর্যে	...	১৯৫
তোমার বৈশাখে ছিল	...	১৩৭-৩৮
তোমারে দেখি না যবে	...	৩৬
থাক্ তবে থাক্ এই মায়া	...	১৭৯

থাক্ তবে থাক্ তুই পড়ে ... ১৬৫
থাক্ থাক্ মিছে কেন এই খেলা আর ... ১৩৩
থামো, থামো, কোথায় চলেছ পালায়ে ... ১৮৮
দই চাই গো, দই চাই ... ১৬২
দামামা ঐ বাজে ... ৮৫
দিনদমণি— অফুরান সান্ত্বনার খনি .. ৫৭
দিন পরে যায় দিন, স্তব্ধ বসে থাকি ... ৫৫
দীর্ঘ দুঃখরাত্রি যদি ... ১৬
দুঃখ দিয়ে মেটাব দুঃখ তোমার ... ১৭৯
দুঃসহ দুঃখের বেড়াজালে ... ২৯
দে তোরা আমায় নূতন ক'রে দে ... ১৩৬
দেখা না-দেখায় মেশা হে বিদ্যুৎলতা ... ১১৯
দেখো দেখো, শুকতারা আঁখি মেলি চায় ... ১২৩
দ্বার খোলা ছিল মনে ... ৫২
ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে ... ১১৩
ধরা সে যে দেয় নাই, দেয় নাই ... ১৯১
ধর্মরাজ দিল যবে ধ্বংসের আদেশ ... ৩৬
ধিক্ ধিক্ ওরে মুগ্ধ ... ২১৮
ধীরে সন্ধ্যা আসে ... ৬৫
ধূসর গোধূলিলগ্নে সহসা দেখিনু একদিন ... ৩৫
নক্ষত্রলোক ... ৩৭৪
নগাধিরাজের দূর নেবু-নিকুঞ্জের ... ৬০
নদীর একটা কোণে শুষ্ক মরা ডাল ... ১৭
নদীর পালিত এই জীবন আমার ... ৯৯
নব বসন্তের দানের ডালি ... ১৬১
নমো নমো নম করুণাঘন নম হে ... ১১১
নহে নহে, এ নহে কৌতুক ... ১৯৩, ২১১
না, কিছুই থাকবে না ... ১৭৪
না, দেখব না আমি দেখব না ... ১৮২
না না না বন্ধু ... ১৮৭

না না না সখী, ভয় নেই	...	১৪৬
নানা দুঃখে চিত্তের বিক্ষেপে	...	৮৭
নারী তুমি ধন্যা	...	৬০
নারীর ললিত লোভন লীলায়	...	১৫০
নির্জন রোগীর ঘর	...	৪২
নীরবে থাকিস সখী, ও তুই	...	২০১
ন্যায় অন্যায় জানি নে	...	১৯৪
পড়্ তুই সব চেয়ে নিষ্ঠুর মন্ত্র	...	১৭৬
পথিক মেঘের দল জোটে ঐ	...	১২০
পরম সুন্দর	...	৪১
পরমাণুলোক	...	৩৫৩
পলাশ আনন্দমূর্তি জীবনের ফাল্গুনদিনের	...	৫১
পাণ্ডব আমি অর্জুন গাণ্ডীবধন্বা	...	১৪৩
পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে	...	৮৩
পুরী হতে পালিয়েছে যে পুরসুন্দরী	...	১৯৯
পুরুষের বিদ্যা করেছিনু শিক্ষা	...	১৩৯
পোড়ো বাড়ি, শূন্য দালান	...	৯৬
প্রত্যহ প্রভাতকালে ভক্ত এ কুকুর	...	৫৩
প্রত্যুষে দেখিনু আজ নির্মল আলোকে	...	২৬
প্রভাতে প্রভাতে পাই আলোকের	...	৩২
প্রভাতের আদিম আভাস	...	১২৯
প্রভু, এসেছ উদ্ধারিতে আমায়	...	১৮৪
প্রেমের জোয়ারে ভাসাবে দোঁহারে	...	১৯৮, ২১৩
ফসল কাটা হলে সারা মাঠ হয়ে যায় ফাঁক	...	৫৭
ফিরে যাও কেন ফিরে ফিরে যাও	...	১৮৯
ফুল বলে, ধন্য আমি	...	১৬৮
ফুলদানি হতে একে একে	...	৯৮
ফুল্ল শাখা যেমন মধুমতী	...	১৫৭
বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি	...	১২২
বঁধু কোন্ আলো লাগল চোখে	...	১৩৪

বয়স আমার বুঝি হয়তো তখন হবে বারো		৮৮
বলে, দাও জল, দাও জল	...	১৭১
বহুকাল আগে তুমি দিয়েছিলে	...	৩২
বহু জন্মদিনে গাঁথা আমার জীবনে	...	৭০
বহু লোক এসেছিল জীবনের প্রথম প্রভাতে		৩৯
বাকি আমি রাখব না কিছুই	...	১০৯
বাক্যের যে ছন্দোজাল শিখেছি গাঁথিতে	...	৬৩
বাছা, তুই যে আমার বুকচেরা ধন	...	১৭৫
বাছা, মন্ত্র করেছে কে তোকে	...	১৭১
বাছা, সহজ ক'রে বল আমাকে	...	১৭২
বাজুক প্রেমের মায়ামন্ত্রে	...	১৩৬
বাজে গুরু গুরু শঙ্কার ডঙ্কা	...	১৯৭
বাদলধারা হল সারা, বাজে বিদায়-সুর	...	১২৩
বিনা সাজে সাজি দেখা দিবে তুমি কবে	...	১৫২
বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি	...	৭৬
বিরাট মানবচিত্তে	...	৬২
বিরাট সৃষ্টির ক্ষেত্রে	...	৪৯
বিশুদাদা— দীর্ঘবপু, দৃঢ়বাহু	...	৫৮
বিশ্বধরণীর এই বিপুল কুলায়	...	৯৮
বিশ্বের আরোগ্যলক্ষ্মী জীবনের অন্তঃপুরে যাঁর		৩
বুক যে ফেটে যায়	...	১৯৬
বেলা যায় বহিয়া	...	১৩৩
বোলো না, বোলো না	...	১৯৭, ২১২
ব্রহ্মচর্য! পুরুষের স্পর্ধা এ যে	...	১৩৮
ভস্মে ঢাকে ক্লান্ত হুতাশন	...	১৪৬
ভাগ্যবতী সে যে	...	১৫১
ভাবনা করিস নে তুই	...	১৭৭
ভালোবাসা এসেছিল একদিন তরুণ বয়সে	...	৫৩
ভালো ভালো তুমি দেখব পালাও কোথা	...	১৮৮
ভূলোক	...	৪০৪

ভেবেছিলেম আসবে ফিরে ... ১১৬
মণিপুরনৃপদুহিতা তোমারে চিনি ... ১৩৯
মধ্যদিনে আধো ঘুমে আধো জাগরণে ... ২৪
মনে পড়ে, শৈলতটে তোমাদের নিভৃত কুটির ৮৪
মনে ভাবিতেছি, যেন অসংখ্য ভাষার শব্দরাজি ৯০
মনে হয় হেমন্তের দুর্ভাষার কুজ্ঝটিকা-পানে ১২
মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে ... ১১৯
মম মন-উপবনে চলে অভিসারে ... ১২২
মা, ঐ যে তিনি চলেছেন ... ১৭৬
মা গো, এতদিনে মনে হচ্ছে যেন ... ১৮০
মাটি তোদের ডাক দিয়েছে ... ১৬৭
মায়াবনবিহারিণী হরিণী ... ১৮৯
মিথ্যে ওজর শুনব না শুনব না ... ১৭৩
মিলের চুমকি গাঁথি ছন্দের পাড়ের মাঝে মাঝে ৬৪
মীনকেতু, কোন্ মহা রাক্ষসীরে ... ১৪১
মুক্তবাতায়নপ্রান্তে জনশূন্য ঘরে ... ৪৭
মেঘের কোলে কোলে যায় রে চলে ... ১১৭
মোর চেতনায় আদি সমুদ্রের ভাষা ... ৭৫
মোহিনী মায়া এল ... ১৩১
যখন এ দেহ হতে রোগে ও জরায় ... ৫৬
যখন বীণায় মোর আনমনা সুরে ... ৩৩
যদি মিলে দেখা তবে তারি সাথে ... ১৫০
যাও যদি যাও তবে ... ১৩৫
যায় যদি যাক সাগরতীরে ... ১৭৭
যাহা-কিছু চেয়েছিনু একান্ত আগ্রহে ... ৩৫
যে আমারে দিয়েছে ডাক ... ১৬৯
যে আমারে পাঠাল ... ১৬৪
যে চৈতন্যজ্যোতি ... ২৯
যে মানব আমি সেই মানব তুমি ... ১৬৬
যেমন ঝড়ের পরে ... ৩৪

রক্তমাখা দন্তপংক্তি হিংস্র সংগ্রামের	...	৯২
রবিবার	...	২২৩
রমণীর মন ভোলাবার ছলাকলা	...	১৫১
রাজভবনের সমাদর সম্মান ছেড়ে	...	১৯৯
রাজার প্রহরী ওরা অন্যায় অপবাদে	...	১৯৩
রানীমার পোষা পাখি	...	১৭৩
রোগদুঃখ রজনীর নিরন্ধ্র আঁধারে	...	২২
রোদন-ভরা এ বসন্ত	...	১৩৭-৩৮
লজ্জা, ছি ছি লজ্জা	...	১৭৮
লহো লহো ফিরে লহো	...	১৫১
ল্যাবরেটরি	...	২৬৯
শুধু একটি গণ্ডূষ জল	...	১৬৬
শুনি ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে	...	১৩৫
শেষ কথা	...	২৪৫
সংসারের নানা ক্ষেত্রে নানা কর্মে বিক্ষিপ্ত চেতনা		২১
সকাল বেলায় উঠেই দেখি চেয়ে	...	১৫
সকালে জাগিয়া উঠি	...	২৩
সখী, কী দেখা দেখিলে তুমি	...	১৩৪
সজীব খেলনা যদি	...	২১
সন্ত্রাসের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান	...	১৪৮
সব কিছু কেন নিল না	...	২০৪,২১৬
সাত দেশেতে খুঁজে খুঁজে গো	...	১৭৩
সাথী মোদের ও যে নেয়ে	...	২০০
সিংহাসনতলচ্ছায়ে দূরে দূরান্তরে	...	৯৪
সুন্দরের বন্ধন নিষ্ঠুরের হাতে	...	১৯২,২১০
সুরলোকে নৃত্যের উৎসবে	...	৫
সৃষ্টির চলেছে খেলা	...	৩০
সৃষ্টিলীলাপ্রাঙ্গণের প্রান্তে দাঁড়াইয়া	.	৮২
সে আমি যে আমি নই	...	১৪৫
সে যে পথিক আমার	...	১৭১

বর্ণানুক্রমিক সূচী

সেই পুরাতন কালে ইতিহাস যবে	...	৮৬
সেই ভালো মা, সেই ভালো	...	১৭৯
সেদিন আমার জন্মদিন	...	৬৯
সৌরজগৎ	...	৩৮৭
স্বর্ণবর্ণে সমুজ্জ্বল নব চম্পাদলে	...	১৬৮
স্বপ্নমদির নেশায় মেশা এ উন্মত্ততা	...	১৪১
হতাশ হোয়ো না, হোয়ো না	...	১৯০
হবে সখা, হবে তব হবে জয়	...	১৯০
হা রে, রে রে, রে রে, আমায়	...	১২১
হা হতভাগিনী, এ কী অভ্যর্থনা	...	১৩৩
হাঁ গো মা, সেই কথাই তো বলে গেলেন তিনি		১৬৯
হায় এ কী সমাপন	...	২০২,২১৬
হায় রে হায় রে নূপুর	...	২০৩,২১৭
হায় হায় নারীরে করেছি ব্যর্থ	...	১৩৭
হায় হায় রে হায় পরবাসী	...	১৯৮
হিংস্র রাত্রি আসে চুপে চুপে	...	৪৭
হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরু গুরু	...	১১৪
হৃদয়ে বসন্তবনে যে মাধুরী বিকাশিল	...	২০০
হে কৌন্তেয়, ভালো লেগেছিল ব'লে	...	১৫৩
হে প্রাচীন তমস্বিনী	...	১২
হে বিদেশী এসো এসো	...	১৯৭,২১২
হে বিরহী, হায়, চঞ্চল হিয়া তব	...	১৮৯
হে সুন্দরী, উন্মথিত যৌবন আমার	...	১৪৩
হো এল এল এল রে দস্যুর দল	...	১৪৭

২৫।৩০

রবীন্দ্র রচনাবলী

ষড়্‌বিংশ খণ্ড

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

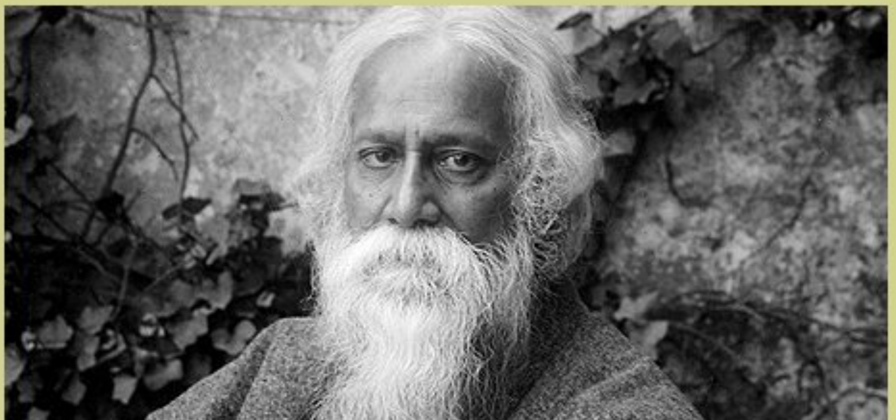

রবীন্দ্র-রচনাবলী

ষড়্‌বিংশ খণ্ড

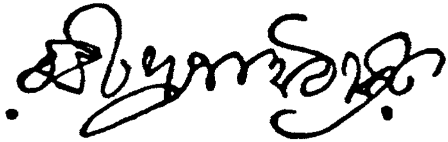

96393

বিশ্বভারতী

২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা

প্রকাশ পৌষ ১৩৫৫
পুনর্মুদ্রণ পৌষ ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ : ১৮৮০ শকাব্দ

মূল্য : কাগজের মলাট নয় টাকা
রেক্সিনে বাঁধাই বারো টাকা

©

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী। ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড। ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা-৯

৬১

বিজ্ঞপ্তি

রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে তাঁহার যত রচনা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল, রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে তাহার অধিকাংশের প্রকাশ সমাপ্ত হইল ; তবে 'ছিন্নপত্র', 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' এবং 'পথে ও পথের প্রান্তে' ভবিষ্যতে রবীন্দ্র-রচনাবলীর এক বা একাধিক খণ্ডে অন্যান্য চিঠিপত্রের সহিত মুদ্রিত হইবে এবং 'গীতবিতান'ও রবীন্দ্র-রচনাবলীর খণ্ডান্তরে প্রকাশিত হইবে।

রবীন্দ্রনাথের দেহাবসানের স্বল্পকাল পরে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'ছড়া' ও 'শেষ লেখা' বর্তমান খণ্ডে প্রকাশিত হইল। ভবিষ্যতে রবীন্দ্র-রচনাবলীর যে-সকল খণ্ড প্রকাশিত হইবে সেগুলিতে পূর্বোক্ত কয়েকখানি গ্রন্থ ব্যতীত এই-সকল রচনাও মুদ্রিত হইবে— রবীন্দ্রনাথের পরলোকগমনের পরে প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ, সাময়িক পত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন রচনা যেগুলি এ পর্যন্ত কোনো গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নাই, এবং পাণ্ডুলিপি-নিবদ্ধ রচনাবলী।

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

সূচী

চিত্রসূচী ॥০

কবিতা ও গান

ছড়া ১

শেষ লেখা ৩৭

নাটক ও প্রহসন

মুক্তির উপায় ৫৫

উপন্যাস ও গল্প

লিপিকা ৯১

সে ১৮১

গল্পসল্প ২৯৭

প্রবন্ধ

বাংলাভাষা-পরিচয় ৩৬৫

পথের সঞ্চয় ৪৫৭

ছেলেবেলা ৫৮৩

সভ্যতার সংকট ৬৩৩

গ্রন্থপরিচয় ৬৪৩

বর্ণানুক্রমিক সূচী ৬৬৫

চিত্রসূচী

প্রতিকৃতি

রবীন্দ্রনাথ ১

রবীন্দ্রনাথ ও দৌহিত্রী নন্দিতা ২৯৯

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অঙ্কিত

রেখাঙ্কনের অতিরিক্ত চিত্রাবলী

সে ২১০

পাল্লারাম ২১১

হৈ রে হৈ মারহাট্টা ২৭৬

মাস্টারমশায় ২৭৭

কবিতা ও গান

ছড়া

অলস মনের আকাশেতে
প্রদোষ যখন নামে,
কর্মরথের ঘড়্‌ঘড়ানি
যে-মুহূর্তে থামে,
এলোমেলো ছিন্নচেতন
টুকরো কথার ঝাঁক
জানি নে কোন্‌ স্বপ্নরাজের
শুনতে যে পায় ডাক,
ছেড়ে আসে কোথা থেকে
দিনের বেলার গর্ত—
কারো আছে ভাবের আভাস
কারো বা নেই অর্থ—
ঘোলা মনের এই যে সৃষ্টি,
আপন অনিয়মে
ঝিঁঝির ডাকে অকারণের
আসর তাহার জমে।
একটুখানি দীপের আলো
শিখা যখন কাঁপায়
চার দিকে তার হঠাৎ এসে
কথার ফড়িং ঝাঁপায়।

পষ্ট আলোর সৃষ্টি-পানে
যখন চেয়ে দেখি
মনের মধ্যে সন্দেহ হয়
হঠাৎ মাতন এ কি।

বাইরে থেকে দেখি একটা
নিয়ম-ঘেরা মানে,
ভিতরে তার রহস্য কী
কেউ তা নাহি জানে।
খেয়াল-স্রোতের ধারায় কী সব
ডুবছে এবং ভাসছে—
ওরা কী-যে দেয় না জবাব,
কোথা থেকে আসছে।
আছে ওরা এই তো জানি,
বাকিটা সব আঁধার—
চলছে খেলা একের সঙ্গে
আর-একটাকে বাঁধার।
বাঁধনটাকেই অর্থ বলি,
বাঁধন ছিঁড়লে তারা
কেবল পাগল বস্তুর দল
শূন্যেতে দিক্‌হারা।

উদয়ন [শান্তিনিকেতন]
৫ জানুয়ারি ১৯৪১

ছড়া

১

সুবলদাদা আনল টেনে আদমদিঘির পাড়ে,
লাল বাঁদরের নাচন সেথায় রামছাগলের ঘাড়ে।
বাঁদরওয়ালা বাঁদরটাকে খাওয়ায় শালিধান্য,
রামছাগলের গম্ভীরতা কেউ করে না মান্য।
দাড়িটা তার নড়ে কেবল, বাজে রে ডুগডুগি।
কাংলা মারে লেজের ঝাপট, জল ওঠে বুগবুগি।
রামছাগলের ভারি গলায় ভ্যাভ্যা রবের ডাকে
সুড়সুড়ি দেয় থেকে থেকে চৌকিদারের নাকে।
হাঁচির পরে বারে বারে যতই হাঁচি ছাড়ে
বাতাসেতে ঘন ঘন কোদাল যেন পাড়ে।
হাঁচির পরে সারি সারি হাঁচি নাসার চোটে
তেঁতুলবনে ঝড়ের দমক যেন মাথা কোটে,
গাছের থেকে ইঁচড়গুলো খসে খসে পড়ে,
তালের পাতা ডাইনে বাঁয়ে পাখার মতো নড়ে।
দত্তবাড়ির ঘাটের কাছে যেমনি হাঁচি পড়া,
আঁৎকে উঠে কাঁখের থেকে বউ ফেলে দেয় ঘড়া।
কাকেরা হয় হতবুদ্ধি, বকের ভাঙে ধ্যান,
এজলাসেতে চমকে ওঠেন হরিমোহন সেন।
টেবিলেতে তুফান ওঠে চা-পেয়ালার তলে,
বিষম লেগে শৌখিনদের চোখ ভেসে যায় জলে।
বিদ্যালয়ের মঞ্চ-'পরে টাক-পড়া শির টলে—
পিঠ পেতে দেয়, চ'ড়ে বসে টেরিকাটার দলে।
গুঁতো মেরে চালায় তারে, সেলাম করে আদায়,
একটু এদিক-ওদিক হলে বিষম দাঙ্গা বাধায়।

লোকে বলে, কলঙ্কদল সূর্যলোকের আলো
দখল ক'রে জ্যোতির্লোকের নাম করেছে কালো।
তাই তো সবই উলট-পালট, উপর-নামন নীচে—
ভয়ে ভয়ে নিচু মাথায় সমুখটা যায় পিছে।
হাঁচির ধাক্কা এতখানি, এটা গুজব মিথ্যে—
এই নিয়ে সব কলেজপড়া বিজ্ঞানীদের চিত্তে
অল্প কিছু লাগল ধোঁকা ; রাগল অপর পক্ষে—
বললে, পড়াশুনোয় কেবল ধুলো লাগায় চক্ষে,
অন্য দেশে অসম্ভব যা পুণ্য ভারতবর্ষে
সম্ভব নয় বলিস যদি প্রায়শ্চিত্ত কর্ সে।
এর পরে দুই দলে মিলে ইঁট পাটকেল ছোঁড়া—
চক্ষে দেখায় সর্ষের ফুল, কেউ বা হল খোঁড়া।
পুণ্য ভারতবর্ষে ওঠে বীরপুরুষের বড়াই,
সমুদ্দুরের এ পারেতে একেই বলে লড়াই।
সিন্ধুপারে মৃত্যুনাটে চলছে নাচানাচি,
বাংলাদেশের তেঁতুলবনে চৌকিদারের হাঁচি।
সত্য হোক বা মিথ্যে হোক তা, আদমদিঘির পাড়ে
বাঁদর চড়ে বসে আছে রামছাগলের ঘাড়ে।
রামছাগলের দাড়ি নড়ে, বাজে রে ডুগডুগি—
কাৎলা মারে লেজের ঝাপট, জল ওঠে বুগবুগি।

কালিম্পং
১৫ মে ১৯৪০

২

কদমাগঞ্জ উজাড় করে
আসছিল মাল মালদহে,
চড়ায় পড়ে নৌকোডুবি
হল যখন কালদহে,
তলিয়ে গেল অগাধ জলে
বস্তা বস্তা কদমা যে

পাঁচ মোহানায় কৎলু ঘাটে
ব্রহ্মপুত্র নদ-মাঝে।
আসামেতে সদ্‌কি জেলায়
হাংলু-ফিড়াঙ পর্বতের
তলায় তলায় ক'দিন ধরে
বইল ধারা সর্বতের।
মাছ এল সব কাৎলাপাড়া
খয়রাহাটি ঝেঁটিয়ে,
মোটা মোটা চিংড়ি ওঠে
পাঁকের তলা ঘেঁটিয়ে।
চিনির পানা খেয়ে খুশি
ডিগবাজি খায় কাংলা,
চাঁদামাছের সরু জঠর
রইল না আর পাতলা।
শেষে দেখি ইলিশমাছের
জলপানে আর রুচি নাই,
চিতলমাছের মুখটা দেখেই
প্রশ্ন তারে পুছি নাই।
ননদকে ভাজ বললে, তুমি
মিথ্যে এ মাছ কোটো ভাই,
রাঁধতে গিয়ে দেখি এ যে
মিঠাই-গজার ছোটোভাই।
মেছোনিকে গিন্নি বলেন,
ঝুড়ির ঢাকা খুলো না,
মাছের রাজ্যে কোথাও যে নেই
এ মৌরলার তুলনা।
বাগীশকে কাল শুধিয়েছিলেম,
ব্রহ্মা কি কাজ ভুলল,
বিধাতা কি শেষবয়সে
ময়রাদোকান খুলল।

যতীন ভায়ার মনে জাগে
ক্রমবিকাশ থিয়োরি,
গল্‌ব্ল্যাডারে ক্রমে ক্রমে
চিনি জমছে কি ওরই।
খগেন বলে, মাছের মধ্যে
মাধুর্য নয় পথ্যাচার—
চচ্চড়িতে মোরব্বাতে
একাত্মবাদ অত্যাচার।
বেদান্তী কয়, রসনাতে
রসের অভেদ গলতি,
এমন হলে রাজ্যে হবে
নিরামিষের চলতি।
ডাক পড়েছে অধ্যাপকের
জামাইষষ্ঠী পার্বণে—
খাওয়ায় তাকে যত্ন করে
শাশুড়ি আর চার বোনে
মাছের মুড়ো মুখে দিয়েই
উঠল জেগে বকুনি,
হাত নেড়ে সে তত্ত্বকথা
করলে শুরু তখুনি—
কলিযুগের নিমক খেয়ে
আমরা মানুষ সকলেই,
হঠাৎ বিষম সাধু হয়ে
সত্যযুগের নকলেই
সব জাতেরই নিমকি থেকে
নিমক যদি হটিয়ে দেয়,
সকল ভাঁড়েই চিনির পানার
জয়ধ্বনি রটিয়ে দেয়,
চিনির বলদ জোড়ে এসে
সকল মিটিং-কমিটি,

চোখের জলেই নোন্‌তা হবে
বাংলাদেশের জমিটি।
সোনার স্থানে থাকবে সোনা,
মিঠের স্থানে মিষ্টি—
সাহিত্যে বা পাকশালাতে
এরেই বলে কৃষ্টি।
চিনি সে তো বার-মহলের,
রক্তে বসত নোন্‌তার—
দোকানে প্রাণ মিষ্টি খোঁজে,
নুন যে আপন ধন তার।
সাগরবাসের আদিম উৎস
চোখের জলে খুলিয়ে দেয়,
নির্বাসনের দুঃখটা তার
আখের খেতে ভুলিয়ে দেয়
অতএব এই—
কী পাগলামি,
কলম উঠল খেপে,
মিথ্যে বকা দৌড় দিয়েছে
মিলের স্কন্ধে চেপে।
কবির মাথা ঘুলিয়ে গেছে
বৈশাখের এই রোদে,
চোখের সামনে দেখছে কেবল
মাছের ডিমের বোদে।
ঠাণ্ডা মাথায় ঘুচুক এবার
রসের অনাবৃষ্টি,
উলটোপালটা না হয় যেন
নোন্‌তা এবং মিষ্টি।

৩

ঝিনেদার জমিদার কালাচাঁদ রায়রা
সে-বছর পুষেছিল একপাল পায়রা।
বড়োবাবু খাটিয়াতে বসে বসে পান খায়,
পায়রা আঙিনা জুড়ে খুঁটে খুঁটে ধান খায়
হাঁসগুলো জলে চলে আঁকাবাঁকা রকমে,
পায়রা জমায় সভা বক্‌-বক্‌-বকমে।

খবরের কাগজেতে shock দিল বক্ষে,
প্যারাগ্রাফে ঠোক্কর লাগে তার চক্ষে।
তিন দিন ধ'রে নাকি দুই দলে পোড়াদয়
ঘুড়ি-কাটাকাটি নিয়ে মাথা-ফাটাফাটি হয়।
কেউ বলে ঘুড়ি নয়, মনে হয় সন্ধ—
পোলিটিকালের যেন পাওয়া যায় গন্ধ।
'রানাঘাট-সমাচারে' লিখেছে রিপোর্টার—
আঠারোই অঘ্রানে শুরু হতে ভোরটার
বেশি বই কম নয় ছয়-সাত হাজারে
গুণ্ডার দল এল সবজির বাজারে।
এ খবর একেবারে লুকোনোই দরকার,
গাপ করে দিল তাই ইংরেজ সরকার।
ভয় ছিল কোনোদিন প্রশ্নের ধাক্কায়
পার্লিয়ামেন্টের হাওয়া পাছে পাক খায়।
এডিটর বলে, এতে পুলিসের গাফেলি।
পুলিস বলে যে, চলো বুঝেসুঝে পা ফেলি;
ভাঙল কপাল যত কপালেরই দোষ সে,
এসব ফসল ফলে কন্‌গ্রেসি শস্যে।
সবজির বাজারেতে মুলো মোচা সস্তায়
পাওয়া গেল বাসি মাল ঝাঁকা ঝুড়ি বস্তায়।

ঝুড়ি থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মেরেছিল চালতা,
যশোরের কাগজেতে বেরিয়েছে কাল তা।
'মহাকাল' লিখেছিল, ভাষা তার শানানো—
চালতা ছোঁড়ার কথা আগাগোড়া বানানো;
বড়ো বড়ো লাউ নাকি ছুঁড়েছে দু পক্ষে,
শচীবাবু দেখেছে সে আপনার চক্ষে।
দাঙ্গায় হাঙ্গামে মিছে ক'রে লোক গোনা,
সংবাদী সমাজের কখনো এ যোগ্য না।
আর-এক সাক্ষীর আর-এক জবানি—
বেল ছুঁড়ে মেরেছিল দেখেছে তা ভবানী।
যার নাকে লেগেছিল সে গিয়েছে ভেবড়ে,
ভাগ্যেই নাক তার যায় নাই থেবড়ে।
শুনে এডিটর বলে, এ কি বিশ্বাস্য—
কে না জানে নাসাটা যে সহজেই নাশ্য।
জানি না কি ও পাড়ায় কোনোখানে নাই বেল;
ভবানী লিখল, এ যে আগাগোড়া লাইবেল।
মাঝে মাঝে গায়ে প'ড়ে চেঁচায় আদিত্য—
আমারে আরোপ করা মিথ্যাবাদিত্ব!
কোন্ বংশে যে মোর জন্ম তা জান তো,
আমার পায়ের কাছে করো মাথা আনত।
আমার বোনের যোগ বিবাহের সূত্রে
ভজু গোস্বামীদের পুত্রের পুত্রে।
এডিটর লেখে, তব ভগ্নীর স্বামী যে
গো বটে গোয়ালবাসী, জানি তাহা আমি যে।
ঠাট্টার অর্থ টা ব্যাকরণে খুঁজতে
দেরি হল, পরদিনে পারল সে বুঝতে।
মহা রেগে বলে, তব কলমের চালনা
এখনি ঘুচাতে পারি, বাড়াবাড়ি ভালো না।
ফাঁস করে দিই যদি, হবে সে কি খোশনাম,
কোথায় তলিয়ে যাবে সাতকড়ি ঘোষ নাম।

জানি তব জামাইয়ের জ্যাঠাইয়ের যে বেহাই
আদালতে কত ক'রে পেয়েছিল সে রেহাই।
ঠাণ্ডা মেজাজ মোর সহজে তো রাগি নে,
নইলে তোমার সেই আদরের ভাগিনে
তার কথা বলি যদি— এই ব'লে বলাটা
শুরু ক'রে ঘেঁটে দিল পক্ষের তলাটা।
তার পরে জানা গেল গাঁজাখুরি সবটাই,
মাথা-ফাটাফাটি আদি মিছে জনরবটাই।
মাছ নিয়ে বকাবকি করেছিল জেলেটা,
পচা কলা ছুঁড়ে তারে মেরেছিল ছেলেটা।
আসল কথাটা এই অটলা ও পটলা
বাধালো ধর্মঘটে জন ছয়ে জটলা।
শুধু কুলি চারজন করেছিল গোলমাল—
লালপাগড়ি সে এসে বলেছিল, তোল্ মাল।
গুড়ের কলসিখানা মেতে উঠে ফেটেছিল,
রাজ্যের থেঁকিগুলো শুঁকে শুঁকে চেটেছিল।
বক্তৃতা করেছিল হরিহর শিকদার—
দোকানিরা বলেছিল, এ যে ভারি দিকদার।
সাদা এই প্রতিবাদ লিখেছিল তারিণী,
গ্রামের নিন্দে সে-যে সইতেই পারে নি।
নেহাত পারে না যারা পাব্লিশ না ক'রে
সব-শেষ পাতে দিল বর্জাই আখরে।
প্রতিবাদটুকু কোনো রেখা নাহি রেখে যায়,
বেল থেকে তাল হয়ে গুজবটা থেকে যায়।
ঠিকমতো সংবাদ লিখেছিল সজনী—
সহ্য না হল সেটা, শুনেছে বা ক'জনই।
জ্যাঠাইয়ের বেহাইয়ের মামলাটা ছাড়াতে
যা ঘটেছে হাসি তার থেকে গেল পাড়াতে।
আদরের ভাগনের কী কেলেঙ্কারি সে,
বারাসতে বরিশালে হয়ে গেছে জারি সে।

হিতসাধনী সভার চাঁদাচুরি কাণ্ড
ছড়িয়ে পড়েছে আজ সারা ব্রহ্মাণ্ড।
ছেলেরা দুভাগ হল মাণ্ডয়ার কলেজে—
এরা যদি বলে বেল, ওরা লাউ বলে যে।
চালতার দল থাকে উভয়ের মাঝেতে,
তারা লাগে দু দলের সভা-ভাঙা কাজেতে।
দলপতি পশ্চাতে রব তোলে বাহবার,
তার পরে গোলেমালে হয়ে পড়ে যা হবার।
ভয়ে ভয়ে ছি-ছি বলে কলেজের কর্তারা,
তার পরে মাপ চেয়ে চলে যায় ঘর তারা।

একদা দু এডিটরে দেখা হল গাড়িতে,
পনেরো মিনিট শুধু ছিল ট্রেন ছাড়িতে।
ফোঁস করে ওঠে ফের পুরাতন কথা সেই,
ঝাঁজ তার পুরো আছে আগে ছিল যথা সেই।
একজন বলে বেল, লাউ বলে অন্যে,
দুজনেই হয়ে ওঠে মারমুখো হন্যে।
দেখছি যা ব্যাপার সে নয় কম তর্কের,
মুখে বুলি ওঠে আত্মীয় সম্পর্কের।
পয়লা দরের knave, idiot কি কেবল,
liar সে, humbug, cad unspeakable—
এই মতো বাছা বাছা ইংরেজি কটুতা
প্রকাশ করিতে থাকে দুজনের পটুতা।
অনুচর যারা, তারা খেপে ওঠে কেউ কেউ—
কুকুরটা কী ভেবে যে ডেকে ওঠে ভেউ-ভেউ।
হাওড়ায় ভিড় জমে, দেখে সবে রঙ্গ—
গার্ড এসে করে দিল যাত্রাই ভঙ্গ।
গার্ডকে সেলাম করি ; বলি, ভাই বাঁচালি,
টার্মিনাসেতে এল বেলছোঁড়া পাঁচালি।

ঝিনেদার জমিদার বসে বসে পান খায়,
পায়রা আঙিনা জুড়ে খুঁটে খুঁটে ধান খায়।
হেলেদুলে হাঁসগুলো চলে বাঁকা রকমে,
পায়রা জমায় সভা বক্‌-বক্‌-বকমে।

উদয়ন [শান্তিনিকেতন]
৯ মার্চ ১৯৪০

৪

বাসাখানি গায়ে-লাগা আর্মানি গির্জার—
দুই ভাই সাহেবালি জোনাবালি মির্জার।
কাবুলি বেড়াল নিয়ে দু দলের মোক্তার
বেঁধেছে কোমর, কে যে সামলাবে রোখ তার।
হানাহানি চলছেই একেবারে বেহোঁশে,
নালিশটা কী নিয়ে যে, জানে না তা কেহ সে।
সে কি লেজ নিয়ে, সে কি গোঁফ নিয়ে তকরার,
হিসেবে কি গোল আছে নখগুলো বখরার।
কিংবা মিয়াঁও ব'লে থাবা তুলে ডেকেছিল—
তখন সামনে তার দু ভাইয়ের কে কে ছিল।
সাক্ষীর ভিড় হল দলে দলে তা নিয়ে,
আওয়াজ যাচাই হল ওস্তাদ আনিয়ে।
কেউ বলে ধা-পা-নি-মা, কেউ বলে ধা-মা-রে—
চাঁই চাঁই বোল দেয়, তবলায় ঘা মারে।
ওস্তাদ ঝেঁকে ওঠে, প্যাঁচ মারে কুস্তির—
জজসাব কী ক'রে যে থাকে বলো সুস্থির।
সমন হয়েছে জারি, কাবুলের সর্দার
চলে এল উটে চড়ে— পিছে ঝাড়ুবরদার।
উটেতে কামড় দিল, হল তার পা টুটা—
বিলকুল লোকসান হয়ে গেল হাঁটুটা।
খেসারত নিয়ে মাথা তেতে ওঠে আমিরের,
ফউজ পেরিয়ে এল পাঁচিলটা পামিরের।

বাজারে মেলে না আর আখরোট-খোবানি,
কাঁউসিল ঘরে আজ কী নাকানিচোবানি।
ইরানে পড়েছে সাড়া গবেষণাবিভাগে—
এ কাবুলি বিড়ালের নাড়িতে যে কী ভাগে
বংশ রয়েছে চাপা, মেসোপোটেমিয়ারই
মার্জারগুষ্টির হবে সে কি ঝিয়ারি।
এর আদি মাতামহী সে কি ছিল মিশোরি—
নাইল-তটিনী-তট-বিহারিণী কিশোরী।
রোঁয়াতে সে ইরানী যে নাহি তাহে সংশয়,
দাঁতে তার এসীরিয়া যখনি সে দংশয়।
কটা চোখ দেখে বলে পণ্ডিতগণেতে,
এখনি পাঠানো চাই Wimবিল্‌ডনেতে।
বাঙালি থিসিসওলা পড়ে গেছে ভাবনায়—
ঠিকুজি মিলবে তার চাটগাঁ কি পাবনায়।
আর্মানি গির্জার আশেপাশে পাড়াতে
কোনোখানে এক তিল ঠাঁই নাই দাঁড়াতে।
কেম্‌ব্রিজ খালি হল, আসে সব স্কলারে—
কী ভীষণ হাড়কাটা করাতের ফলা রে।
বিজ্ঞানীদল এল বলিন ঝাঁটিয়ে,
হাতপাকা জন্তুর-নাড়িভুঁড়ি-ঘাঁটিয়ে।
জজ বলে, বিড়ালটা কী রকম জানা চাই,
আইডেন্‌টিটি তার আদালতে আনা চাই।
বিড়ালের দেখা নাই— ঘরেও না, বনে না;
মিআঁউ আওয়াজটুকু কেউ আর শোনে না।
জজ বলে, সাক্ষীরে কোন্‌খানে ঢুকোলো,
অত বড়ো লেজের কি আগাগোড়া লুকোলো
পেয়াদা বললে, লেজ গেছে মিউজিয়মে
প্রিভিকৌঁসিলে-দেওয়া আইনের নিয়মে।
জজ বলে, গোঁফ পেলে রবে মোর সম্মান;
পেয়াদা বললে, তারো নয় বড়ো কম মান—

মিউনিকে নিয়ে গেছে ছাঁটা গোঁফ ষণ্ডেই,
তারে আর কোনোমতে ফেরাবার পথ নেই।
বিড়াল ফেরার হল, নাই নামগন্ধ ;
জজ বলে, তাই ব'লে মামলা কি বন্ধ।
তখনি চৌকি ছেড়ে রেগে করে পাচারি,
থেকে থেকে হুংকারে কেঁপে ওঠে কাছারি।
জজ বলে, গেল কোথা ফরিয়াদী আসামী !
হুজুর, পেয়াদা বলে, বেটাদের চাষামি !
শুনি নাকি দুই ভাই উকিলের তাকাদায়
বলে গেছে, আমাদের বুঝি বেঁচে থাকা দায় !
কণ্ঠে এমনি ফাঁস এঁটে দিল জড়িয়ে,
মোক্তারে কী করিবে সাক্ষীরে পড়িয়ে।

উদয়ন [শান্তিনিকেতন]
১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০

৫

ছেঁড়া মেঘের আলো পড়ে
দেউলচূড়ার ত্রিশূলে ;
কলুবুড়ি শাকসবজি
তুলেছে পাঁচমিশুলে।
চাষী খেতের সীমানা দেয়
উঁচু ক'রে আল তুলে ;
নদীতে জল কানায় কানায়,
ডিঙি চলে পাল তুলে।
কোমর-ঘেরা আঁচলখানা,
হাতে পানের কৌটা—
ঘোষপাড়াতে হন্‌হনিয়ে
চলে নাপিতবউটা।
গোকুল ছোঁড়া গুঁড়ি আঁকড়ে
ওঠে গাছের উপুরি,

পেড়ে আনে থোলো থোলো
কাঁচা কাঁচা সুপুরি।
বর্ষাজলের ঢল নেমেছে,
ছাপিয়ে গেল বাঁধখানা,
পাড়ির কাছে ডুবো ডিঙি
যাচ্ছে দেখা আধখানা।
লখা চলে ছাতা মাথায়,
গৌরী-কনের বর—
ড্যাংড্যাডাড্যাং বাদ্যি বাজে,
চড়কডাঙায় ঘর।

ভাণ্ডমালী লাউডাঁটাতে
ভরেছে তার ঝাঁকাটা,
কামার পিটোয় ঢুম্‌ঢুমিয়ে
গোরুর গাড়ির চাকাটা।
মাঠের ধারে ধক্‌ধকিয়ে
চলন্তি গাড়ির ধোঁওয়াতে
আকাশ যেন ছেয়ে চলে
কালো বাঘের রোঁওয়াতে
কাঁসারিটা বাজিয়ে কাঁসা
জাগিয়ে দিল গলিটা,
গিন্নিরা দেয় ছেঁড়া কাপড়
ভর্তি ক'রে থলিটা।
ভিজে চুলের ঝুঁটি বেঁধে
বসে আছেন সেজোবউ,
মোচার ঘণ্ট বানাতে সে
সবার চেয়ে কেজো বউ।
গামলা চেটে পরখ করে
দড়ি দিয়ে বাঁধা গাই,

উঠোনের এক কোণে জমা
রান্নাঘরের গাদা ছাই।
ভালুকনাচের ডুগডুগি ওই
বাজছে পাইকপাড়াতে,
বেদের মেয়ে বাঁদরছানার
লাগল উকুন ছাড়াতে।
অশথতলায় পাটল গোরু
আরামে চোখ বোজে তার,
ছাগলছানা ঘুরে বেড়ায়
কচি ঘাসের খোঁজে তার।
ছকুমালী খেতের থেকে
তুলছে মুলো ভাদুরে,
পিঠ আঁকড়ে জড়িয়ে থাকে
ছেলেটা তার আদুরে।
হঠাৎ কখন বাদুলে মেঘ
জুটল এসে দলে দল,
পসলা কয়েক বৃষ্টি হতেই
মাঠ হয়ে যায় জলে জল।
কচুর পাতায় ঢেকে মাথা
সাঁওতালী সব মেয়েরা
ঘোষের বাগান থেকে পাড়ে
কাঁচা কাঁচা পেয়ারা।
মাথায় চাদর বেঁধে নিয়ে
হাট থেকে যায় হাটুরে;
ভিজে কাঠের আঁটি বেঁধে
চলছে ছুটে কাঠুরে।
নিমের ডালে পাখির ছানা
পাড়তে গেল ওরা কি—
পকেট ভরে নিয়ে গেল
কাঠবিড়ালির খোরাকি।

হালদারদের মেয়েটা ওই—
দেখি তারে যখুনি
মাঠে মাঠে ভিজে বেড়ায়,
মা এসে দেয় বকুনি।
গোলাকৃতি গড়নটা ওর,
সবাই ডাকে বাতাবি ;
খুদু বলে, আমার সঙ্গে
সাঙাৎনি কি পাতাবি।
পুকুরপাড়ে ছড়িয়ে আছে
তেলের শিশির কাঁচভাঙা,
জেলের পোঁতা বাঁশের খোঁটায়
বসে আছে মাছরাঙা।
দক্ষিণে ওই উঠল হাওয়া,
বৃষ্টি এখন থামল কি।
গাছের তলায় পা ছড়িয়ে
চিবোয় ভুলু আমলকি।
ময়লা কাপড় হিস্‌হিসিয়ে
আছাড় মারে ধোবাতে ;
পাড়ার মেয়ে মাছ ধরতে
আঁচল মেলে ডোবাতে।
পা ডুবিয়ে ঘাটের ধারে
ঘোষপুকুরের কিনারায়
মাসিক-পত্র পড়ছে বসে
থার্ড ইয়ারের বীণা রায়।
বিজুলি যায় সাপ খেলিয়ে
লক্‌লকি।
বাঁশের পাতা চমকে ওঠে
ঝক্‌ঝকি।
চড়কডাঙায় ঢাক বাজে ঐ
ড্যাড্যাংড্যাঙ।

মাঠে মাঠে মকমকিয়ে
ডাকছে ব্যাঙ

উদীচী [শান্তিনিকেতন]
২০ অগস্ট ১৯৪০

৬

খেঁদুবাবুর এঁধো পুকুর, মাছ উঠেছে ভেসে ;
পদ্মমণি চচ্চড়িতে লঙ্কা দিল ঠেসে।
আপনি এল ব্যাক্‌টিরিয়া, তাকে ডাকা হয় নাই।
হাঁসপাতালের মাখন ঘোষাল বলেছিল, ভয় নাই।
সে বলে, সব বাজে কথা, খাবার জিনিস খাদ্য—
দশ দিনেতেই ঘটিয়ে দিল দশজনারই শ্রাদ্ধ।
শ্রাদ্ধের যে ভোজন হবে কাঁচাতেঁতুল দরকার,
বেগুনমুলোর সন্ধানেতে ছুটল ন্যাড়াসরকার।
বেগুনমুলো পাওয়া যাবে নিলফামারির বাজারে,
নগদ দামে বিক্রি করে তিন টাকা দাম হাজারে।
হুমকাতে লোক পাঠিয়েছিল, বানিয়ে দেবে মুড়কি—
সন্দেহ হয় ওজনমতো মিশল তাতে গুড় কি।
সর্ষে যে চাই মণ দু'তিনেক ঝোলে ঝালে বাটনায়,
কালুবাবু তারই খোঁজে গেলেন ধেয়ে পাটনায়।
বিষম খিদেয় করল চুরি রামছাগলের দুধ,
তারই সঙ্গে মিশিয়ে নিলে গমভাঙানির খুদ।
ঐ শোনা যায় রেডিয়োতে বোঁচা গোঁফের হুমকি ;
দেশবিদেশে শহরগ্রামে গলা-কাটার ধুম কী।
খাঁচায় পোষা চন্দনাটা ফড়িঙে পেট ভরে ;
সকাল থেকে নাম করে গান, হরে কৃষ্ণ হরে।

বালুর চরে আলুহাটা— হাতে বেতের চুপড়ি,
খেতের মধ্যে ঢুকে কালু মুলো নিল উপ্‌ড়ি।

নদীর পাড়ে কিচিরমিচির লাগালো গাঙশালিখ যে,
অকারণে ঢোলক বাজায় মুলোখেতের মালিক যে।
কাঁকুড়খেতে মাচা বাঁধে পিলেওয়ালা ছোকরা,
বাঁশের বনে কঞ্চি কাটে মুচিপাড়ার লোকরা।
পাটনাতে নীলকুঠির গঞ্জে খেয়া চালায় পাটনি,
রোদে জলে নিত্যুই চলে চার পহরের খাটনি।
কড়াপড়া কঠিন হাতে মাজা কাঁসার কাঁকনটা,
কপালে তার পত্রলেখা উল্কিদেওয়া আঁকনটা।
কুচোমাছের টুকরি থেকে চিলেতে নেয় ছোঁ মেরে,
মেছনি তার সাত গুষ্টি উদ্দেশে দেয় যমেরে।
ও পারেতে খড়্গপুরে কাঠি পড়ে বাজনায়,
মুন্সিবাবু হিসেব ভোলে জমিদারের খাজনায়।
রেডিয়োতে খবর জানায়, বোমায় করলে ফুটো,
সমুদ্দুরে তলিয়ে গেল মালের জাহাজ দুটো।
খাঁচার মধ্যে ময়না থাকে, বিষম কলরবে
ছাতু ছড়ায়, মাতায় পাড়া আত্মারামের স্তবে।

হুইস্‌ল্‌ দিল প্যাসেঞ্জারে সাঁৎরাগাছির ড্রাইভার—
মাথায় মোছে হাতের কালি, সময় না পায় নাইবার।
ননদ গেল ঘুঘুডাঙায়, সঙ্গে গেল চিন্তে—
লিলুয়াতে নেমে গেল ঘুড়ির লাঠাই কিনতে।
লিলুয়াতে খইয়ের মোওয়া চার ধামা হয় বোঝাই,
দাম দিতে হায় টাকার থলি মিথ্যে হল খোঁজাই।
ননদ পরল রাঙা চেলি, পাল্কি চড়ে চলল—
পাড়ায় পাড়ায় রব উঠেছে গায়ে-হলুদ কল্য।
কাহারগুলো পাগড়ি বাঁধে, বাঁদি পরে ঘাগরা,
জমাদারের মামা পরে শুঁড়তোলা তার নাগরা।
পাঁড়েজি তাঁর খড়ম নিয়ে চলেন খটাৎ খটাৎ,
কোথা থেকে ধোবার গাধা চেঁচিয়ে ওঠে হঠাৎ।

খয়রাডাঙার ময়রা আসে, কিনে আনে ময়দা—
পচা ঘিয়ের গন্ধ ছড়ায়, যমালয়ের পয়দা।
আকাশ থেকে নামল বোমা, রেডিয়ো তাই জানায়,
অপঘাতে বসুন্ধরা ভরল কানায় কানায়।
খাঁচার মধ্যে শ্যামা থাকে, ছিরকুটে খায় পোকা,
শিস দেয় সে মধুর স্বরে, হাততালি দেয় খোকা।

হুইস্‌ল্‌ বাজে ইস্টিসনে, বরের জ্যাঠামশাই
চমকে ওঠে— গেলেন কোথায় অগ্রদ্বীপের গোঁসাই।
সাংরাগাছির নাচনমণি কাটতে গেল সাঁতার,
হায় রে কোথায় ভাসিয়ে দিল সোনার সিঁথি মাথার।
মোষের শিঙে ব'সে ফিঙে লেজ দুলিয়ে নাচে—
শুধোয় নাচন, সিঁথি আমার নিয়েছে কোন্‌ মাছে।
মাছের লেজের ঝাপটা লাগে, শালুক ওঠে দুলে;
রোদ পড়েছে নাচনমণির ভিজে চিকন চুলে।
কোথায় ঘাটের ফাটল থেকে ডাকল কোলাব্যাঙ,
খড়গ্‌পুরের ঢাকে ঢোলে বাজল ড্যাড্যাংড্যাঙ।
কাঁপছে ছায়া আঁকাবাঁকা, কলমিপাড়ের পুকুর—
জল খেতে যায় এক-পা-কাটা তিনপেয়ে এক কুকুর।
হুইস্‌ল্‌ বাজে, আছে সেজে পাইকপাড়ার পাত্রী,
শেয়ালকাঁটার বন পেরিয়ে চলে বিয়ের যাত্রী।
গ্যাগোঁ করে রেডিয়োটা, কে জানে কার জিত—
মেশিন্‌গানে গুঁড়িয়ে দিল সভ্যবিধির ভিত।
টিয়ের মুখের বুলি শুনে হাসছে ঘরে পরে—
রাধে কৃষ্ণ, রাধে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে।

দিন চলে যায় গুন্‌গুনিয়ে ঘুমপাড়ানির ছড়া,
শানবাঁধানো ঘাটের ধারে নামছে কাঁখের ঘড়া।
আতাগাছের তোতাপাখি, ডালিমগাছে মৌ,
হীরেদাদার মড়্‌মড়ে থান, ঠাকুরদাদার বউ।

পুকুরপাড়ে জলের ঢেউয়ে দুলছে ঝোপের কেয়া,
পাটনি চালায় ভাঙা ঘাটে তালের ডোঙার খেয়া।
খোকা গেছে মোষ চরাতে, খেতে গেছে ভুলে,
কোথায় গেল গমের রুটি শিকের 'পরে তুলে।
আমার ছড়া চলেছে আজ রূপকথাটা ঘেঁষে,
কলম আমার বেরিয়ে এল বহুরূপীর বেশে।
আমরা আছি হাজার বছর ঘুমের ঘোরের গাঁয়ে,
আমরা ভেসে বেড়াই স্রোতের শেওলা-ঘেরা নায়ে।
কচি কুমড়োর ঝোল রাঁধা হয়, জোড়পুতুলের বিয়ে,
বাঁধা বুলি ফুকরে ওঠে কমলাপুলির টিয়ে।
ছাইয়ের গাদায় ঘুমিয়ে থাকে পাড়ার খেঁকি কুকুর,
পান্তিহাটে বেতোঘোড়া চলে টুকুর-টুকুর।
তালগাছেতে হুতোমথুমো পাকিয়ে আছে ভুরু,
তক্তিমালা হুড়মবিবির গলাতে সাতপুরু।
আধেক জাগায় আধেক ঘুমে ঘুলিয়ে আছে হাওয়া,
দিনের রাতের সীমানাটা পেঁচোয়-দানোয়-পাওয়া।
ভাগ্যলিখন ঝাপসা কালির, নয় সে পরিষ্কার—
দুঃখসুখের ভাঙা বেড়ায় সমান যে দুই ধার।
কামারহাটার কাঁকুড়গাছির ইতিহাসের টুকরো,
ভেসে চলে ভাঁটার জলে উইয়ে-ঘুনে-ফুকরো।
অঘটন তো নিত্য ঘটে রাস্তাঘাটে চলতে,
লোকে বলে, সত্যি নাকি!— ঘুমোয় বলতে বলতে।
সিন্ধুপারে চলছে হোথায় উলটপালট কাণ্ড,
হাড় গুঁড়িয়ে বানিয়ে দিলে নতুন কী ব্রহ্মাণ্ড।
সত্য সেথায় দারুণ সত্য, মিথ্যে ভীষণ মিথ্যে,
ভালোয় মন্দে সুরাসুরের ধাক্কা লাগায় চিত্তে।
পা ফেলতে না ফেলতে হচ্ছে ক্রোশ পার।
দেখতে দেখতে কখন যে হয় এসপার-ওসপার।

উদয়ন [শান্তিনিকেতন]
১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০

গলদাচিংড়ি তিংড়িমিংড়ি,
লম্বা দাঁড়ার করতাল,
পাকড়াশিদের কাঁকড়াডোবায়
মাকড়সাদের হরতাল।
পয়লা ভাদর, পাগলা বাঁদর,
লেজখানা যায় ছিঁড়ে,
পালতে মাদার, সেরেস্তাদার
কুটছে নতুন চিঁড়ে।
কলেজপাড়ায় শেয়াল তাড়ায়
অন্ধ কলুর গিন্নি।
ফটকে ছোঁড়া চট্‌কিয়ে খায়
সত্যপিরের সিন্নি।
মুল্লুক জুড়ে উল্লুক ডাকে,
ঢোলে কুল্লুক ভট্ট,
ইলিশের ডিম ভাজে বঙ্কিম,
কাঁদে তিনকড়ি চট্ট।
গরানহাটায় সজনেডাঁটা
কিনছে পুলিস সার্জন,
চিৎপুরে ঐ নাগা সন্ন্যাসী
কাত হয়ে মরে চারজন।
পঞ্চায়েতের চুপড়ি বেতের,
সর্ষেখেতের চাষী ;
কাঁচালঙ্কার ফোড়ন লাগায়
কুড়োনচাঁদের মাসি।
পটলডাঙায় চক্ষু রাঙায়
মুর্গিহাটার মিঞা ;
শম্ভু বাজায় তম্বুরাটায়
কেঁয়াও-কেঁয়াও-কিঞা।

ঠন্ঠনে আজ বেচে লণ্ঠন
চার পয়সায় আটটা।
মুখ ভেংচিয়ে হেড্মাস্টার
মস্করে করে ঠাট্টা।
চিন্তামণির কয়লাখনির
কুলির ইন্ফ্লুয়েঞ্জা;
বিরিঞ্চিদের খাজাঞ্চি ঐ
চণ্ডীচরণ সেন-জা।
শিলচরে হায় কিলচড় খায়
হস্টেলে যত ছাত্র;
হাজি মোল্লার দাড়িমাল্লার
বাকি একজন মাত্র।
দাওয়াইখানায় শিঙাড়া বানায়,
উচ্চিংড়েটা লাফ দেয়;
কনেস্টেবল পেতেছে টেব্‌ল্‌
খুদিরে চায়ের কাপ দেয়।
গুবরেপোকার লেগেছে মড়ক,
তুবড়ি ছোটায় পঙ্কু;
স্যায়রত্নের ঘাড়ের উপর
কাকাতুয়া হানে চঞ্চু।
সিরাজগঞ্জে বিরাট মিটিং,
তুলো-বের-করা বালিশ;
বংশু ফকির ভাঙা চৌকির
পায়াতে লাগায় পালিশ।
রাবণের দশ মুণ্ডে নেমেছে
বকুনি ছাড়ায়ে মাত্রা;
নেড়ানেড়ি দলে হরি-হরি বলে,
শেষ হল রামযাত্রা।

পুনশ্চ [শান্তিনিকেতন]
১৯ নভেম্বর ১৯৪০

রাত্তিরে কেন হল মর্জি,
চুল কাটে চাঁদনির দর্জি।
চুমরিয়ে দিল তার জুলফি,
নাপিত আদায় করে full fee।
চাঁদনির রাঁধুনি সে আসে যায়,
বঁড়শি-বেহালা থেকে বাসে যায়।
ভবুরাম ওর পাড়াপড়শী,
বেচে সে লাঠাই আর বঁড়শি।
আর বেচে যাত্রার বেয়ালা,
আর বেচে চা খাবার পেয়ালা।
চা খেয়ে সে দিল ঘুম তখুনি,
সইল না গিন্নির বকুনি।
কটকের নেত্ত মজুমদার,
সে বটে সুবিখ্যাত ঘুমদার।
কালু সিং দেয় তারে পাক্কা
তিন মণ ওজনের ধাক্কা।
হাই তুলে বলে, এ কী ঠাট্টা—
ঘড়িতে যে সবে সাড়ে-আটটা।
চৌকিদারের মেজো শালী সে
পড়ে থাকে মুখ গুঁজে বালিশে।
তাই দেখে গলাভাঙা পালোয়ান
বাজখাঁই সুরে বলে, আলো আন্।
নীচে থেকে বলে হেঁকে রহমৎ,
বাংলা জবানি তুমি কহো মৎ।
ও দিকে মাথায় বেঁধে তোয়ালে
ভিখুরাম নাচে তার গোয়ালে।
তোয়ালেটা পাদরির ভাইঝির,
মোজা-জোড়া খড়দার বাইজির।

পিরানের পাড়ে দেয় চুমকি,
ইরানেতে সেলাইয়ের ধুম কী।
বোগদাদে তাই যাবে আলাদিন
শাশুড়ি যতই ঘরে তালা দিন।
শাশুড়ির মুখঢাকা বুর্খায়,
পাছে তারে ঠেলা মারে গুর্খায়।
চুরি গেছে গুর্খার ভেঁপুটি,
এজলাসে চিন্তিত ডেপুটি।
ডেপুটির জুতো মোড়া সাটিনেই,
কোনোখানে দাঁতনের কাঠি নেই।
দাঁতনের খোঁজে লাগে খটকা,
পেয়াদা ঘি আনে তিন মটকা।
গাওয়া ঘি সে নয়, সে-যে ভয়সা—
সের-করা দাম পাঁচ পয়সা।
বাবু বলে, দাম খুব জেয়াদা,
কাজে ইস্তফা দিল পেয়াদা।
উমেদার এল আজ পয়লা
গোয়াড়ির যত গোড়ো গয়লা।
পয়লায় ঘরে হাঁড়ি চড়ে না,
পল্লরে ছেড়ে খাঁদু নড়ে না।
পল্ল সেদিন মহা বিব্রত,
বুধবারে ছিল তার কী ব্রত।
ভাশুর পড়ল এসে সুমুখে,
দুধ খেয়ে নিল এক চুমুকে।
চেপে এল লজ্জা শরমটা,
টেনে দিল দেড়-হাত ঘোমটা।
চুঁচড়োয় বাড়ি হরিমোহনের,
গঙ্গায় স্নানে গেছে গ্রহণের।
সঙ্গে নিয়েছে চার গণ্ডা
বেছে বেছে পালোয়ান ষণ্ডা।

তাল ঠোকে রামধন মুন্সি,
কোমরেতে তিন পাক ঘুন্সি।
দিদি বলে, মুখ তোর ফ্যাকাশে,
ভালো করে ডাক্তার দেখাসে।
বলে ওঠে তিনকড়ি পোদ্দার,
আগে তুই উকিলের শোধ্ ধার।
ভিখু শুনে কেঁদে চোখ রগড়ায়,
একদম চলে গেল মগরায়।
মগরায় খুদি নিয়ে খুকে
খেজুরের আঁটিগুলো গুনছে—
যেই হল তিন-কুড়ি পাঁচটা,
দেখে নিল উনুনের আঁচটা।
ননদের ঘরে ক'রে ঘি চুরি
তখনি চড়িয়ে দিল খিচুড়ি।
হল না তো চালে ডালে মেলানো,
মুশকিল হবে ওটা গেলানো।
সাড়া পায় মাছওয়ালা মিস্তের ;
বলে, পাকা রুই চাই তিন সের।
বনমালী মাছ আনে গামছায় ;
বলে, ও যে এক্ষুনি দাম চায়।
আচ্ছা, সে দেখা যাবে কালকে—
ব'লেই সে চলে গেল শালকে।
মুন্সি যখন লেখে তৌজি,
জলে নামে শালকের বউ ঝি।
শালকের ঘাটে ভাঙা পাল্কি ;
কালু যাবে বানিচঙে কাল কি।
বানিচঙে ঢেঁকি পাকা-গাঁথ্‌নি,
ধান কাটে কালুদার নাৎনি।
বানিচঙ কোন্ দেশে কোন্ গাঁয়,
কে জানে সে যশোরে কি বনগাঁয়।

ফুটবলে বনগাঁর ঝোঁকার
যত হারে, তত বাড়ে রোখ তার।
তার ছেলে হরেরাম মিস্তির,
আঁক ক'ষে ব্যামো হল পিত্তির।
মুখ চোখ হয়ে গেল হলদে,
ওরে ওকে পলতার ঝোল দে।
পলতা কিনতে গেল ধুবড়ি,
কিনল গুগলি এক-চুবড়ি।
হুগলির গুগলি কী মাগগি,
ভাঙা হাটে পাওয়া গেল ভাগ্যি।
ধুবড়িতে মানকচু সস্তা,
ফাউ পেল কাগজ দু বস্তা।
দেখে বলে নীলমণি সরকার—
কাগজে হরুর খুব দরকার;
জ্যামিতি অতীত তার সাধ্যর,
যতই করুন তারে মারধোর।
কাগজে বসিয়ে রেখে নারকেল
পেন্সিলে কাটে ব'সে সার্‌কেল।
সার্‌কেল কাটতে সে কী বুঝে
খামকাই ঠেকে গেল ত্রিভুজে।
সইতে পারে না তার চাপুনি,
পালাজ্বরে দিল তারে কাঁপুনি।
শ্রাদ্ধবাড়িতে লেগে ঠাণ্ডা
হেঁচে মরে ত্রিবেণীর পাণ্ডা।
অবেলায় খেতে বসে দারোগা,
শির শির ক'রে ওঠে তারো গা।
টাট্টু ঘোড়ার এক গাড়িতে
ডাক্তার এল তার বাড়িতে।
সে-ঘোড়াটা বেড়া ভাঙে নম্বর,
চিহ্ন রাখে না খেত-খন্দর।

নন্দ বিকেলে গেল হাবড়ায়,
সারি সারি গাড়ি দেখে ঘাবড়ায়।
গোনে ব'সে, তিন চার পাঁচ সাত,
আউড়িয়ে যায় সারা ধারাপাত।
শুনে শুনে পারে না যে থামতে,
গল্‌গল্‌ ক'রে থাকে ঘামতে।
নয় দশ বারো তেরো চোদ্দ,
মনে পড়ে পয়ারের পদ্য।
কাশীরাম দাসে আনে পুণ্য,
দশে আর বিশে লাগে শূন্য।
'কাশীরাম কাশীরাম' বোল দেয়,
সারাদিন মনে তার দোল দেয়।
আঁকগুলো মাথা থাকে ঘোলাতে,
নন্দ ছুটেছে হাটখোলাতে।
হাটখোলা শ্বশুরের গদি তার—
সেইখানে বাসা মেলে যদি তার
এক সংখ্যায় মন দেবে ঝাঁপ,
তার চেয়ে বেশি হলে হবে পাপ।
আর নয়, আর নয়, আর নয়—
কখনোই দুই তিন চার নয়।

উদীচী [শান্তিনিকেতন]
২০ জানুয়ারি ১৯৪০

৯

আজ হল রবিবার, খুব মোটা বহরের
কাগজের এডিশন ; যত আছে শহরের
কানাকানি, যত আছে আজগবি সংবাদ,
যায় নিকো কোনোটার একটুও রঙ বাদ।
'বার্তাকু' লিখে দিল, গুজরানওয়ালায়
দলে দলে জোট করে পাঞ্জাবি গোয়ালায়

বলে তারা, গোরু পোষা গ্রাম্য এ কারবার
প্রগতির যুগে আজ দিন এল ছাড়বার।
আজ থেকে প্রত্যহ রাত্তির পোয়ালেই
বসবে প্রেপরিটরি ক্লাস এই গোয়ালেই।
স্তূপ রচা দুই বেলা খড়-ভুষি-ঘাসটার
ছেড়ে দিয়ে হবে ওরা ইস্কুলমাস্টার।
হম্বাধ্বনি যাহা গো-শিশু গো-বৃদ্ধের
অন্তর্ভূত হবে বই-গেলা বিদ্যের।
যত অভ্যেস আছে লেজ ম'লে পিটোনো
ছেলেদের পিঠে হবে পেট ভ'রে মিটোনো

'গদাধরে' রেগে লেখে, এ কেমন ঠাট্টা—
বার্তাকু পরে পরে সাতটা কি আটটা
যা লিখেছে সব কটা সমাজের বিরোধী,
মতগুলো প্রগতির দ্বার আছে নিরোধি।
সেদিন সে লিখেছিল, ঘুঁটে চাই চালানো,
শহরের ঘরে ঘরে ঘুঁটে হোক জ্বালানো।
কয়লা ঘুঁটেতে যেন সাপে আর নেউলে,
ঝড়িয়াকে করে দিক একদম দেউলে।
সেনেট হাউস আদি বড়ো বড়ো দেয়ালী
শহরের বুক জুড়ে আছে যেন হেঁয়ালি।
ঘুঁটে দিয়ে ভরা হোক, এই এক ফতোয়ায়
এক দিনে শহরের বেড়ে যাবে কত আয়।
গোয়ালারা চোনা যদি জমা করে গামলায়
কত টাকা বাঁচে তবে জল-দেওয়া মামলায়।
বার্তাকু কাগজের ব্যঙ্গে যে গা জ্বলে,
সুন্দর মুখ পেলে লেপে ওরা কাজলে।
এ-সকল বিদ্রূপে বুদ্ধি যে খেলো হয়,
এ দেশের আবহাওয়া ভারি এলোমেলো হয়

গদাধর কাগজের ধমকানি থামল,
হেসে উঠে বার্তাকু যুদ্ধেতে নামল।
বলে, ভায়া, এ জগতে ঠাট্টা সে ঠাট্টাই—
গদাধর, গদা রেখে লও সেই পাঠটাই।
মাস্টার না হয়ে যে হলে তুমি এডিটর
এ লাগি তোমার কাছে দেশটাই ক্রেডিটর
এডুকেশনের পথে হয় নি যে মতি তব,
এই পুণ্যেই হবে গোকুলেই গতি তব।

অবশেষে এ দুখানা কাগজের আসরে
বচসার ঝাঁজ দেখে ভয়ে কথা না সরে।

উদয়ন [শান্তিনিকেতন]
১৭ মার্চ ১৯৪০

১০

সিউড়িতে হরেরাম মৈত্তির
পাঁজি দেখে সতেরোই চৈত্তির।
বলে, আজ যেতে হবে মথুরায়।
সেথা তার মামা আছে সতু রায়।
বেস্পতিবারে গাড়ি চড়ে তার,
চাকা ভাঙে নরসিংগড়ে তার।
তাই তার যাত্রাটা ঘুরলে,
ফিরে এসে চলে গেল শুরুলে।
ঠিক হল যেতে হবে পেশোয়ার,
সেথা আছে সেজো মাসি মেসো আর
এসে দেখে একা আছে বউ সে,
মেসো গেছে পানিপথে পৌষে।
হাথুয়ার কাছাকাছি না যেতেই,
বাঙালি সে ধরা পড়ে সাজেতেই।

চোখ রাঙা ক'রে বলে দারোগা,
থানামে লে কর্ হম মারো গা।
ছোটো ভাই বেঁধে চিঁড়ে মুড়কি
সন্ন্যাসী হয়ে গেল রুড়কি।
ঠোক্কর খেয়ে পড়ে বোঁচকায়,
কুক্ষণে পা দুখানা মোচকায়।
শেষে গেল সুলতানপুরে সে,
গান ধরে মুলতান সুরে সে।
বেলাশেষে এল যবে বাম্‌ড়ায়
কী ভীষণ মশা তাকে কামড়ায়।
বুঝলে সে শান্ত যে হওয়া দায়,
গোরুর গাড়িতে চলে নওয়াদায়।
গোরুটা পড়ল মুখ থুবড়ি
ক্রোশ দুই থাকতেই ধুবড়ি।
কাটিহারে তুলে তাকে ধরল,
তখন সে পেট ফুলে মরল।
শুনেছে তিসির খুব নামো দর,
তাই পাড়ি দিতে গেল দামোদর
দামোদরে বুধুরাম খেয়া দেয়,
চেপে বসে ডেপুটির পেয়াদায়।
শংকর ভোরবেলা চুঁচড়োয়
হাউ-হাউ শব্দে গা মুচড়োয়।
নাড়াজোলে বড়োবাবু তখুনি
শুরু করে বংশুকে বকুনি।
বংশুর যত হোক খাটো আয়,
তবু তার বিয়ে হবে কাটোয়ায়।
শাঁখা হুঁকো বাঁধা নিয়ে খড়দার
ধার দিলে মতিরাম সর্দার।
'শাঁখা চাই' বলতেই শাঁখারি
বলে, শাঁখা আছে তিন টাকারই।

দর-কষাকষি নিয়ে অবশেষ
পুলিসথানায় হল সব শেষ।
সাসারামে চলে গেল লোক তার
খুঁজে যদি পাওয়া যায় মোক্তার।
সাক্ষীর খোঁজে গেল চেউকি,
গাঁজাখোর আছে সেথা কেউ কি।
সাথে নিয়ে ভুলুদা ও শশিদি
অনুকূল চলে গেছে শুসিদি।
পথে যেতে বহু দুখ ভুগে রে
খোঁড়া ঘোড়া বেচে এল মুঙেরে।
মা ও দিকে বাতে তার পা খুঁড়ায়,
পড়ে আছে সাত দিন বাঁকুড়ায়।
ডাক্তার তিনকড়ি সাণ্ডেল
বদলি করেছে বাসা বাণ্ডেল।
তাই লোক পাঠায় কোদাবুমায়,
চিঠি লিখে দিল সে ভোঁদার মায়।
সাতক্ষীরা এল চুপিচুপি সে,
তার পরে গেল পাঁচথুপি সে।
সেখানেতে মাছি প'ল ভাতে তার,
ঝগড়া হোটেলবাবু সাথে তার।
অতুল গিয়েছে কবে নাসিকে,
সঙ্গে নিয়েছে তার মাসিকে।
রাঁধবার লোক আছে মাদ্রাজি
সাত টাকা মাইনেয় আধ-রাজি।
লালচাঁদ যেতে যেতে পাকুড়ে
খিদেটা মেটায় শসা কাঁকুড়ে।
পৌঁছিয়ে বাহাদুরগঞ্জে
হাঁসফাঁস করে তার মন যে।
বাসা খুঁজে সাথি তার কাঙলা
খুলনায় পেল এক বাঙলা।

শুধু একখানা ভাঙা চৌকি,
এখানেই থাকে মেজো বউ কি।
নেমে গেল যেথা কামুজংশন,
ভিমরুলে করে দিল দংশন।
ডাক্তারে বলে চুন লাগাতে
জ্বালাটাকে চায় যদি ভাগাতে।
চুন কিনতে সে গেল কাটনি,
কিনে এল আমড়ার চাটনি।
বিকানিরে পড়ল সে নাকালে,
উটে তাকে কী বিষম ঝাঁকালে।
বাড়িভাড়া করেছিল শ্বশুরই,
তাই খুশি মনে গেল মশুরি।
শ্বশুর উধাও হল না ব'লে,
জামাই কি ছাড়া পাবে তা ব'লে।
জায়গা পেয়েছে মালগাড়িতে,
হাত সে বুলাতেছিল দাড়িতে,
ঝাঁকা থেকে মুর্গিটা নাকে তার
ঠোকর মেরেছে কোন্ ফাঁকে তার
নাকের গিয়েছে জাত রটে যায়,
গাঁয়ের মোড়ল সব চটে যায়।
কানপুর হতে এল পণ্ডিত,
বলে এরে করা চাই দণ্ডিত।
লাশা হতে শ্বেত কাক খুঁজিয়া
নাসাপথে পাখা দাও গুঁজিয়া।
হাঁচি তবে হবে শতশতবার,
নাক তার শুচি হবে ততবার।
তার পরে হল মজা ভরপুর
যখন সে গেল মজাফরপুর।
শালা ছিল জমাদার থানাতে,
ভোজ ছিল মোগলাই খানাতে।

জৌনপুরি কাবাবের গন্ধে
ভুরভুর করে সারা সন্ধে।
দেহটা এমনি তার তাতালে
যেতে হল মেয়ো-হাঁসপাতালে
তার পরে কী যে হল শেষটা
খবর না পাই করে চেষ্টা।

উদয়ন [শান্তিনিকেতন]
৭ মার্চ ১৯৪০

১১

মাঝরাতে ঘুম এল, লাউ কেটে দিতে
ছিঁড়ে গেল ভুলুয়ার ফতুয়ার ফিতে।
খুহু বলে, মামা আসে, এই বেলা লুকো।
কানাই কাঁদিয়া বলে, কোথা গেল হুঁকো।
নাতি আসে হাতি চড়ে। খুড়ো বলে, আহা,
মারা বুঝি গেল আজ সনাতন সাহা।
তাঁতিনীর নাতিনীর সাথিনী সে হাসে;
বলে, আজ ইংরেজি মাসের আঠাশে।
তাড়া খেয়ে ন্যাড়া বলে, চলে যাব রাঁচি।
ঠাণ্ডায় বেড়ে গেল বাঁদরের হাঁচি।
কুকুরের লেজে দেয় ইন্‌জেক্‌শ্যান,
মাস্‌লি টিকিট কেনে জলধর সেন।
পাঁজি লেখে, এ বছরে বাঁকা এ কালটা,
ত্যাড়াবাঁকা বুলি তার উলটা-পালটা—
ঘুলিয়ে গিয়েছে তার বেবাক খবর—
জানি নে তো কে যে কারে দিচ্ছে কবর।

উদয়ন [শান্তিনিকেতন]
৫ ডিসেম্বর ১৯৪০। বিকাল

শেষ লেখা

শেষ লেখা

১

সমুখে শান্তিপারাবার,
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।
তুমি হবে চিরসাথি,
লও লও হে ক্রোড় পাতি,
অসীমের পথে জ্বলিবে জ্যোতি
ধ্রুবতারকার।

মুক্তিদাতা, তোমার ক্ষমা, তোমার দয়া
হবে চিরপাথেয় চিরযাত্রার।

হয় যেন মর্তের বন্ধন ক্ষয়,
বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়,
পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয়
মহা-অজানার।

পুনশ্চ [শান্তিনিকেতন]
৩ ডিসেম্বর ১৯৩৯। বেলা একটা

২

রাহুর মতন মৃত্যু
শুধু ফেলে ছায়া,
পারে না করিতে গ্রাস জীবনের স্বর্গীয় অমৃত
জড়ের কবলে
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি।
প্রেমের অসীম মূল্য

সম্পূর্ণ বঞ্চনা করি লবে
হেন দস্যু নাই গুপ্ত
নিখিলের গুহাগহ্বরেতে
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি।
সবচেয়ে সত্য ক'রে পেয়েছিনু যারে
সবচেয়ে মিথ্যা ছিল তারি মাঝে ছদ্মবেশ ধরি,
অস্তিত্বের এ কলঙ্ক কভু
সহিত না বিশ্বের বিধান
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি।
সবকিছু চলিয়াছে নিরন্তর পরিবর্তবেগে
সেই তো কালের ধর্ম।
মৃত্যু দেখা দেয় এসে একান্তই অপরিবর্তনে,
এ বিশ্বে তাই সে সত্য নহে
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি।
বিশ্বেরে যে জেনেছিল আছে ব'লে
সেই তার আমি
অস্তিত্বের সাক্ষী সেই,
পরম-আমির সত্যে সত্য তার
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি।

৭ মে ১৯৪০

৩

ওরে পাখি,
থেকে থেকে ভুলিস কেন সুর,
যাস নে কেন ডাকি—
বাণীহারা প্রভাত হয় যে বৃথা
জানিস নে তুই কি তা।
অরুণ-আলোর প্রথম পরশ
গাছে গাছে লাগে,
কাঁপনে তার তোরই যে সুর

পাতায় পাতায় জাগে—
তুই যে ভোরের আলোর মিতা
জানিস নে তুই কি তা।
জাগরণের লক্ষ্মী যে ওই
আমার শিয়রেতে
আছে আঁচল পেতে,
জানিস নে তুই কি তা।
গানের দানে উহারে তুই
করিস নে বঞ্চিতা।
দুঃখরাতের স্বপনতলে
প্রভাতী তোর কী যে বলে
নবীন প্রাণের গীতা,
জানিস নে তুই কি তা।

উদয়ন [শান্তিনিকেতন]
১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১। বিকাল

৪

রৌদ্রতাপ ঝাঁ ঝাঁ করে
জনহীন বেলা দুপহরে।
শূন্য চৌকির পানে চাহি,
সেথায় সান্ত্বনালেশ নাহি।
বুক ভরা তার
হতাশের ভাষা যেন করে হাহাকার।
শূন্যতার বাণী ওঠে করুণায় ভরা,
মর্ম তার নাহি যায় ধরা।
কুকুর মনিবহারা যেমন করুণ চোখে চায়,
অবুঝ মনের ব্যথা করে হায়-হায় ;
কী হল যে, কেন হল, কিছু নাহি বোঝে—
দিনরাত ব্যর্থ চোখে চারি দিকে খোঁজে।

চৌকির ভাষা যেন আরো বেশি করুণ কাতর,
শূন্যতার মূক ব্যথা ব্যাপ্ত করে প্রিয়হীন ঘর।

উদয়ন [শান্তিনিকেতন]
২৬ মার্চ ১৯৪১। বিকাল

৫

আরো একবার যদি পারি
খুঁজে দেব সে আসনখানি
যার কোলে রয়েছে বিছানো
বিদেশের আদরের বাণী।

অতীতের পালানো স্বপন
আবার করিবে সেথা ভিড়,
অস্ফুট গুঞ্জনস্বরে
আরবার রচি দিবে নীড়।

সুখস্মৃতি ডেকে ডেকে এনে
জাগরণ করিবে মধুর,
যে বাঁশি নীরব হয়ে গেছে
ফিরায়ে আনিবে তার সুর।

বাতায়নে রবে বাহু মেলি
বসন্তের সৌরভের পথে,
মহানিঃশব্দের পদধ্বনি
শোনা যাবে নিশীথজগতে।

বিদেশের ভালোবাসা দিয়ে
যে প্রেয়সী পেতেছে আসন
চিরদিন রাখিবে বাঁধিয়া
কানে কানে তাহারি ভাষণ।

ভাষা যার জানা ছিল নাকো,
আঁখি যার কয়েছিল কথা,
জাগায়ে রাখিবে চিরদিন
সকরুণ তাহারি বারতা।

উদয়ন [শান্তিনিকেতন]
৬ এপ্রিল ১৯৪১। দুপুর

৬

ঐ মহামানব আসে ;
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে।
সুরলোকে বেজে উঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক—
এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয়শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নব জীবনের আশ্বাসে।
জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়,
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।

উদয়ন [শান্তিনিকেতন]
১ বৈশাখ ১৩৪৮

৭

জীবন পবিত্র জানি,
অভাব্য স্বরূপ তার
অজ্ঞেয় রহস্য-উৎস হতে
পেয়েছে প্রকাশ
কোন্ অলক্ষিত পথ দিয়ে
সন্ধান মেলে না তার।

প্রত্যহ নূতন নির্মলতা
দিল তারে সূর্যোদয়
লক্ষ ক্রোশ হতে
স্বর্ণঘটে পূর্ণ করি আলোকের অভিষেকধারা।
সে জীবন বাণী দিল দিবসরাত্রিরে,
রচিল অরণ্যফুলে অদৃশ্যের পূজা-আয়োজন,
আরতির দীপ দিল জ্বালি
নিঃশব্দ প্রহরে।
চিত্ত তারে নিবেদিল
জন্মের প্রথম ভালোবাসা।
প্রত্যহের সব ভালোবাসা
তারি আদি সোনার কাঠিতে
উঠেছে জাগিয়া;
প্রিয়ারে বেসেছি ভালো,
বেসেছি ফুলের মঞ্জরিকে;
করেছে সে অন্তরতম
পরশ করেছে যারে।
জন্মের প্রথম গ্রন্থে নিয়ে আসে অলিখিত পাতা,
দিনে দিনে পূর্ণ হয় বাণীতে বাণীতে।
আপনার পরিচয় গাঁথা হয়ে চলে,
দিনশেষে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে ছবি,
নিজেরে চিনিতে পারে
রূপকার নিজের স্বাক্ষরে,
তার পরে মুছে ফেলে বর্ণ তার রেখা তার
উদাসীন চিত্রকর কালো কালি দিয়ে;
কিছু বা যায় না মোছা সুবর্ণের লিপি,
ধ্রুবতারকার পাশে জাগে তার জ্যোতিষ্কের লীলা

উদয়ন [শান্তিনিকেতন]
২৫ এপ্রিল ১৯৪১

৮

বিবাহের পঞ্চম বরষে
যৌবনের নিবিড় পরশে
গোপন রহস্য ভরে
পরিণত রসপুঞ্জ অন্তরে অন্তরে
পুষ্পের মঞ্জরি হতে ফলের স্তবকে
বৃন্ত হতে ত্বকে
সুবর্ণবিভায় ব্যাপ্ত করে।
সংবৃত সুমন্দ গন্ধ অতিথিরে ডেকে আনে ঘরে।
সংযত শোভায়
পথিকের নয়ন লোভায়।
পাঁচ বৎসরের ফুল্ল বসন্তের মাধবীমঞ্জরি
মিলনের স্বর্ণপাত্রে সুধা দিল ভরি;
মধুসঞ্চয়ের পর
মধুপেরে করিল মুখর।
শান্ত আনন্দের আমন্ত্রণে
আসন পাতিয়া দিল রবাহূত অনাহূত জনে।
বিবাহের প্রথম বৎসরে
দিকে দিগন্তরে
শাহানায় বেজেছিল বাঁশি,
উঠেছিল কল্লোলিত হাসি—
আজ স্মিতহাস্য ফুটে প্রভাতের মুখে
নিঃশব্দ কৌতুকে।
বাঁশি বাজে কানাড়ায় সুগভীর তানে
সপ্তর্ষির ধ্যানের আহ্বানে।
পাঁচ বৎসরের ফুল্ল বিকশিত সুপ্রশস্ত প্রথানি
সংসারের মাঝখানে পূর্ণতায় স্বর্গ দিল আনি।
বসন্তপঞ্চম রাগ আরম্ভেতে উঠেছিল বাজি,
সুরে সুরে তালে তালে পূর্ণ হয়ে উঠিয়াছে আজি;

পুষ্পিত অরণ্যতলে প্রতি পদক্ষেপে
মঞ্জীরে বসন্তরাগ উঠিতেছে কেঁপে।

উদয়ন [শান্তিনিকেতন]
২৫ এপ্রিল ১৯৪১। সকাল

৯

বাণীর মুরতি গড়ি
একমনে
নির্জন প্রাঙ্গণে
পিণ্ড পিণ্ড মাটি তার
যায় ছড়াছড়ি—
অসমাপ্ত মূক
শূন্যে চেয়ে থাকে
নিরুৎসুক।
গর্বিত মূর্তির পদানত
মাথা ক'রে থাকে নিচু,
কেন আছে উত্তর না দিতে পারে কিছু।
বহুগুণে শোচনীয় হায় তার চেয়ে
এক কালে যাহা রূপ পেয়ে
কালে কালে অর্থহীনতায়
ক্রমশ মিলায়।
নিমন্ত্রণ ছিল কোথা, শুধাইলে তারে
উত্তর কিছু না দিতে পারে—
কোন্ স্বপ্ন বাঁধিবারে
বহিয়া ধূলির ঋণ
দেখা দিল
মানবের দ্বারে।
বিস্মৃত স্বর্গের কোন্
উর্বশীর ছবি
ধরণীর চিত্তপটে

বাঁধিতে চাহিয়াছিল
কবি—
তোমারে বাহনরূপে
ডেকেছিল,
চিত্রশালে যত্নে রেখেছিল,
কখন সে অন্যমনে গেছে ভুলি—
আদিম আত্মীয় তব ধূলি,
অসীম বৈরাগ্যে তার দিক্‌বিহীন পথে
তুলি নিল বাণীহীন রথে।
এই ভালো,
বিশ্বব্যাপী ধূসর সম্মানে
আজ পঙ্গু আবর্জনা
নিয়ত গঞ্জনা
কালের চরণক্ষেপে পদে পদে
বাধা দিতে জানে,
পদাঘাতে পদাঘাতে জীর্ণ অপমানে
শান্তি পায় শেষে
আবার ধূলিতে হবে বেশে।

উদয়ন [শান্তিনিকেতন]
৩ মে ১৯৪১। সকাল

১০

আমার এ জন্মদিন-মাঝে আমি হারা
আমি চাহি বন্ধুজন যারা
তাহাদের হাতের পরশে
মর্ত্যের অন্তিম প্রীতিরসে
নিয়ে যাব জীবনের চরম প্রসাদ,
নিয়ে যাব মানুষের শেষ আশীর্বাদ।
শূন্য ঝুলি আজিকে আমার;

দিয়েছি উজাড় করি
যাহা কিছু আছিল দিবার,
প্রতিদানে যদি কিছু পাই—
কিছু স্নেহ, কিছু ক্ষমা—
তবে তাহা সঙ্গে নিয়ে যাই
পারের খেয়ায় যাব যবে
ভাষাহীন শেষের উৎসবে।

উদয়ন [শান্তিনিকেতন]
৬ মে ১৯৪১। সকাল

১১

রূপনারানের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ,
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায়,
সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম,
সে কখনো করে না বঞ্চনা।
আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন,
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।

উদয়ন [শান্তিনিকেতন]
১৩ মে ১৯৪১। রাত্রি ৩-১৫ মিনিট

১২

তব জন্মদিবসের দানের উৎসবে
বিচিত্র সজ্জিত আজি এই
প্রভাতের উদয়প্রাঙ্গণ।
নবীনের দানসত্র কুসুমে পল্লবে
অজস্র প্রচুর।
প্রকৃতি পরীক্ষা করি দেখে
ক্ষণে ক্ষণে আপন ভাণ্ডার,
তোমারে সম্মুখে রাখি পেল সে সুযোগ।
দাতা আর গ্রহীতার যে সংগম লাগি
বিধাতার নিত্যই আগ্রহ
আজি তা সার্থক হল,
বিশ্বকবি তাহারি বিস্ময়ে
তোমারে করেন আশীর্বাদ—
তাঁর কবিত্বের তুমি সাক্ষীরূপে দিয়েছ দর্শন
বৃষ্টিধৌত শ্রাবণের
নির্মল আকাশে।

উদয়ন [শান্তিনিকেতন]
১৩ জুলাই ১৯৪১। সকাল

১৩

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—
কে তুমি।
মেলে নি উত্তর।
বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিমসাগরতীরে,

নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি।
পেল না উত্তর।

জোড়াসাঁকো। কলিকাতা
২৭ জুলাই ১৯৪১। সকাল

১৪

দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে
এসেছে আমার দ্বারে ;
একমাত্র অস্ত্র তার দেখেছিনু
কষ্টের বিকৃত ভান, ত্রাসের বিকট ভঙ্গি যত—
অন্ধকারে ছলনার ভূমিকা তাহার।

যতবার ভয়ের মুখোশ তার করেছি বিশ্বাস
ততবার হয়েছে অনর্থ পরাজয়।
এই হার-জিত খেলা, জীবনের মিথ্যা এ কুহক,
শিশুকাল হতে বিজড়িত পদে পদে এই বিভীষিকা,
দুঃখের পরিহাসে ভরা।
ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি—
মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে।

জোড়াসাঁকো। কলিকাতা
২৯ জুলাই ১৯৪১। বিকাল

১৫

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে,
হে ছলনাময়ী।

মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত ;
তার তরে রাখ নি গোপন রাত্রি।
তোমার জ্যোতিষ্ক তারে
যে-পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ,
সে যে চিরস্বচ্ছ,
সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তারে চিরসমুজ্জ্বল।
বাহিরে কুটিল হোক অন্তরে সে ঋজু,
এই নিয়ে তাহার গৌরব।
লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত।
সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।
কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে,
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
আপন ভাণ্ডারে।
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।

জোড়াসাঁকো। কলিকাতা
৩০ জুলাই ১৯৪১। সকাল সাড়ে নয়টা

নাটক ও প্রহসন

মুক্তির উপায়

ভূমিকা

ফকির, স্বামী অচ্যুতানন্দের চেলা। গোঁফদাড়িতে মুখের বারো আনা অনাবিষ্কৃত। ফকিরের স্ত্রী হৈমবতী। বাপের আদরের মেয়ে। তিনি টাকা রেখে গেছেন ওর জন্যে। ফকিরের বাপ বিশ্বেশ্বর পুত্রবধূকে স্নেহ করেন, পুত্রের অপরিমিত গুরুভক্তিতে তিনি উৎকণ্ঠিত।

পুষ্পমালা এম. এ. পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়া মেয়ে। দূরসম্পর্কে হৈমর দিদি। কলেজি খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে পাড়াগাঁয়ে বোনের বাড়িতে সংসারটাকে প্রত্যক্ষ দেখতে এসেছে। কৌতূহলের সীমা নেই। কৌতুকের জিনিসকে নানা রকমে পরখ করে দেখছে কখনো নেপথ্যে, কখনো রঙ্গভূমিতে। ভারি মজা লাগছে। সকল পাড়ায় তার গতিবিধি, সকলেই তাকে ভালোবাসে।

পুষ্পমালার একজন গুরু আছেন, তিনি খাঁটি বনস্পতি জাতের। অগুরু-জঙ্গলে দেশ গেছে ছেয়ে। পুষ্পর ইচ্ছে সেইগুলোতে হাসির আগুন লাগিয়ে খাণ্ডবদাহন করে। কাজ শুরু করেছিল এই নবগ্রামে। শুনেছি, বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর পুণ্যকর্মে ব্যাঘাত ঘটেছে। তার পর থেকে পঞ্চশরের সঙ্গে হাসির শর যোগ করে ঘরের মধ্যেই সুমধুর অশান্তি আলোড়িত করেছে। সেই প্রহসনটা এই প্রহসনের বাইরে।

পাশের পাড়ার মোড়ল ষষ্ঠীচরণ। তার নাতি মাখন দুই.স্ত্রীর তাড়ায় সাত বছর দেশছাড়া। ষষ্ঠীচরণের বিশ্বাস পুষ্পর অসামান্য বশীকরণ-শক্তি। সেই পারবে মাখনকে ফিরিয়ে আনতে। পুষ্প শুনে হাসে আর ভাবে, যদি সম্ভব হয় তবে প্রহসনটাকে সে সম্পূর্ণ করে দেবে। এই নিয়ে রবি ঠাকুর নামে একজন গ্রন্থকারের সঙ্গে মাঝে মাঝে সে পত্রব্যবহার করেছে।

মুক্তির উপায়

প্রথম দৃশ্য

ফকির। পুষ্পমালা। হৈমবতী

ফকির। সোহং সোহং সোহং।

পুষ্প। ব'সে ব'সে আওড়াচ্ছ কী।

ফকির। গুরুমন্ত্র।

পুষ্প। কতদূর এগোল।

ফকির। এই, ইড়া নাড়িটার কাছ পর্যন্ত এসে গেল থেমে।

পুষ্প। হঠাৎ থামে কেন।

ফকির। ঐ আমার ছিঁচকাঁদুনি খুকিটার কীর্তি। মন্তরটা গুরগুর গুরগুর করতে করতে দিব্যি উঠছিল উপরের দিকে ঠেলে। বোধ হয় আর সিকি ইঞ্চি হলেই পিঙ্গলার মধ্যে ঢুকে পড়ত, এমন সময় মেয়েটা নাকিস্বরে চীৎকার করে উঠল— বাবা, নচঞ্চুস্। দিলুম ঠাস করে গালে এক চড়, ভ্যাঁ করে উঠল কেঁদে, অমনি এক চমকে মন্তরটা নেমে পড়ল পিঙ্গলার মুখ থেকে একেবারে নাভীগহ্বর পর্যন্ত। সোহং ব্রহ্ম, সোহং ব্রহ্ম।

পুষ্প। তোমার গুরুর মন্তরটা কি অজীর্ণরোগের মতো। নাড়ির মধ্যে গিয়ে—

ফকির। হাঁ দিদি, নাড়ির মধ্যে ঘুটঘাট ঘুটঘাট করছেই— ওটা বায়ু কিনা।

পুষ্প। বায়ু নাকি।

ফকির। তা না তো কী। শব্দব্রহ্ম— ওতে বায়ু ছাড়া আর কিছুই নেই। ঋষিরা যখন কেবলই বায়ু খেতেন তখন কেবলই বানাতেন মন্তর।

পুষ্প। বল কী।

ফকির। নইলে অতটা বায়ু জমতে দিলে পেট যেত ফেটে। নাড়ি যেত পটপট করে ছিঁড়ে বিশখানা হয়ে।

পুষ্প। উঃ, তাই তো বটে— একেবারে চার-বেদ-ভরা মন্ত্র— কম হাওয়া তো লাগে নি।

ফকির। শুনলেই তো বুঝতে পার, ঐ-যে ও—ম্‌, ওটা তো নিছক বায়ু-উদ্‌গার। পুণ্যবায়ু, জগৎ পবিত্র করে।

পুষ্প। এত সব জ্ঞানের কথা পেলে কোথা থেকে। আমরা হলে তো পাগল হয়ে যেতুম।

ফকির। সবই গুরুর মুখ থেকে। তিনি বলেন, কলিতে গুরুর মুখই গোমুখী— মন্ত্রগঙ্গা বেরচ্ছে কল্‌কল্‌ করে।

পুষ্প। বি. এ.তে সংস্কৃতে অনার্স্‌ নিয়ে খেটে মরেছি মিথ্যে। অজীর্ণ রোগেও ভুগেছি, সেটা কিন্তু পাকযন্ত্রের, ইড়াপিঙ্গলার নয়।

ফকির। এতেই বুঝে নাও— গুরুর কৃপা। তাই তো আমার নাড়ির মধ্যে মন্তরটা প্রায়ই ডাক ছাড়ে গুরু গুরু গুরু শব্দে।

পুষ্প। আচ্ছা, ডাকটা কি আহারের পরে বাড়ে।

ফকির। তা বাড়ে বটে।

পুষ্প। গুরু কী বলেন।

ফকির। তিনি বলেন, পেটের মধ্যে স্থূলে সূক্ষ্মে লড়াই, যেন দেবে দৈত্যে। খাদ্যের সঙ্গে মন্ত্রের বেধে যায় যেন গোলাগুলি-বর্ষণ, নাড়িগুলো উচ্চস্বরে গুরুকে স্মরণ করতে থাকে।

হৈম। দুঃখের কথা আর কী বলব দিদি, পেটের মধ্যে গুরুর স্মরণ চলছে, বাইরেও বিরাম নেই। চরণদাস বাবাজি আছেন ওঁর গুরুভাই, সে লোকটার দয়ামায়া নেই, ওঁকে গান শেখাচ্ছেন। পাড়ার লোকেরা—

পুষ্প। চুপ চুপ চুপ, পতিব্রতা তুমি। স্বামীর কণ্ঠ যখন চলে, সাধ্বীরা প্রাণপণে থাকেন নীরবে। ফকিরদা, গলায় গান শানাচ্ছ কেন, গান্ধিজির অহিংসানীতির কথা শোন নি।

হৈম। তোমরা দুজনে তত্ত্বকথা নিয়ে থাকো। আমাকে যেতে হবে মাছ কুটতে। আমি চললুম। [প্রস্থান

ফকির। আমার কথাটা বুঝিয়ে বলি। গুরুর মন্ত্র, যাকে বলে গুরুপাক। খুব বেশি যখন জমে ওঠে অন্তরে, তখন সমস্ত শরীরটা ওঠে পাক দিয়ে; নাচের ঘূর্ণি উঠতে থাকে পায়ের তলা থেকে উপরের দিকে; আর, ঘানি ঘুরলে যেরকম আওয়াজ দিতে চায়, ভক্তির ঘোরে সেইরকম গানের আওয়াজ ওঠে গলার ভিতর দিয়ে। এই দেখো-না এখনি সাধনার নাড়া লেগেছে একেবারে মূলাধার থেকে— উঃ!

পুষ্প। কী সর্বনাশ! ডাক্তার ডাকব নাকি।

ফকির। কিছু করতে হবে না। একবার পেট ভরে নেচে নিতে হবে। গুরু বলেছেন, গুরুর মন্ত্রটা হল ধারক, আর নৃত্যটা হল সারক, দুটোরই খুব দরকার। (উঠে দাঁড়িয়ে নৃত্য)

গুরুচরণ করো শরণ-অ

ভবতরঙ্গ হবে তরণ-অ

সুধাক্ষরণ প্রাণভরণ-অ

মরণভয় হবে হরণ-অ।

পুষ্প। শুধু মরণভয়-হরণ নয়, দাদা। গুরুদক্ষিণার চোটে স্ত্রীর গয়না, বাপের তহবিল -হরণও চলছে পুরো দমে।

ফকির। ঐ দেখো, বাবা আসছেন বৌকে নিয়ে। বড়ো ব্যাঘাত, বড়ো ব্যাঘাত। গুরো।

পুষ্প। ব্যাঘাতটা কিসের।

ফকির। স্থূলরূপে ওঁরা আমাকে ফকির বলেই জানেন।

পুষ্প। আরো একটা রূপ আছে নাকি।

ফকির। ক্ষয় হয়ে গেছে আমার ফকির-দেহটা ভিতরে ভিতরে। কেবলই মিলে যাচ্ছে গুরুদেহের সূক্ষ্মরূপে। বাইরে পড়ে আছে খোলসটা মাত্র। ওঁরা আসলটাকে কিছুতেই দেখবেন না।

পুষ্প। খোলসটা যে অত্যন্ত বেশি দেখা যাচ্ছে। একেবারেই স্বচ্ছ নয়।

ফকির। দৃষ্টিশুদ্ধি হতে দেরি হয়। কিন্তু সব আগে চাই বিশ্বাসটা। ভগবৎ-কৃপায় এঁদের মনে যদি কখনো বিশ্বাস জাগে, তা হলে গুরুদেহে আর ফকিরের দেহে একেবারে অভেদ রূপ দেখতে পাবেন— তখন বাবা—

পুষ্প। তখন বাবা গয়ায় পিণ্ডি দিতে বেরবেন।

[ফকিরের প্রস্থান

বিশ্বেশ্বর ও হৈমবতীর প্রবেশ

বিশ্বেশ্বর। (হৈমর প্রতি) বেয়াই ব্যাঙ্কে তোমার নামে কিছু টাকা রেখে গেছেন। ফকির সেটা জানে, তাই তো ওর কিছু হল না।

পুষ্প। আর কী হলে আর কী হত, সে ভাবতে গেলে মাথা ঘুরে যায়।

বিশ্বেশ্বর। ম্যাকিননের হেড্‌বাবু আমার বন্ধুর শ্যালীপতি, সে বলেছিল, ফকির যা-হয় একটা কিছু পাস করলেই তাকে এসিস্টেন্ট স্টোর্‌কীপার করে দেবে। বাঁদরটা কেবল জেদ করেই বারে বারে ফেল করতে লাগল।

পুষ্প। ফেল করবার বিশ্রী জেদ আরো অনেক ছেলের দেখেছি। মিত্তিরদের বাড়ির মোতিলাল আমার সঙ্গে একসঙ্গেই পড়া আরম্ভ করেছিল। ম্যাট্রিকের এ পারের খোঁটা এমনি বিষম জেদ করে আঁকড়িয়ে রইল, ওর পিসেমশায় ওর কানে ধরে ঝিঁকে মারতে মারতে কান প্রায় ছিঁড়ে দিলেন কিন্তু পার করতে পারলেন না। চল্ ভাই হৈমি, পড়া করবি আয়— স্বামীর হয়ে পাস করার কাজটা তুই সেরে রাখবি চল্।

বিশ্বেশ্বর। যাও পড়তে, কিন্তু শোনো মা,— ফকির টাকা চাইলেই তুমি ওকে দাও কেন।

হৈম। কী করব বাবা, টাকা টাকা করে উনি বড়ো অশান্তি বাধান।

বিশ্বেশ্বর। ঐ দেখো-না, একটা রোঁওয়া-ওঠা বাঘের চামড়ার উপর বসে বিড়বিড় করে বকছে। এই ফকির, শুনে যা, বাঁদর। শুনে যা বলছি।

পুষ্প। মেসোমশায়, তোমার বুঝি সাহস হয় না ওকে ওর গণ্ডিটা থেকে টেনে আনতে!

বিশ্বেশ্বর। সত্যি কথা বলি, মা, ভয়-ভয় করে। ওর সব মন্তর-তন্তর ঠিক যে মানি তাও নয়, আবার না মানবার মতো বুকের পাটাও নেই। দেখো-না, ওখানটায় কিরকম খুদে পাগলা-গারদ সাজিয়েছে। গুরু কবে পাঁঠা খেয়েছিল, তার মুড়োর খুলিটা রেখেছে পশমের আসনে।

পুষ্প। ঐ জায়গাটাকে ও নাম দিয়েছে মোক্ষধাম। গুরুর সিগারেট-খাওয়া দেশলাই-কাঠিগুলো কাটা কাঁচকলার টুকরোর উপর পুঁতে পুঁতে গণ্ডি বানিয়েছে। ও বলে, কাঠিগুলোর আলো কিছুতেই নেবে না, যার দিব্যদৃষ্টি আছে সে চোখ বুজলেই দেখতে পায়। গুরুর একটা চা-সেটের ভাঙা পিরিচ এনেছে, সেটার প্রতিষ্ঠা হয়েছে গুরুর বর্মা চুরুটের প্যাক্‌বাক্সে। গুরু ভালোবাসেন সাড়ে আঠারো ভাজা, কিনে এনে নৈবেদ্য দেয় ঐ পিরিচ ভরে। বলে, ঐ পিরিচে যে পেয়ালা ছিল এক কালে, তার অদৃশ্যরূপ গুরুর অদৃশ্য প্রসাদ ঢালতে থাকে। মোক্ষধাম ভরে যায় দার্জিলিং চায়ের গন্ধে।

বিশ্বেশ্বর। আচ্ছা মা, ঐ বড়ো বড়ো বোতলগুলো কী করতে সাজিয়ে রেখেছে! ওর মধ্যে গুরুর ফীভার-মিক্‌শ্চারের অদৃশ্যরূপ ভরে রেখেছে না কি!

পুষ্প। বল্-না হৈমি, ওগুলো কিসের জন্যে।

হৈম। দক্ষিণা পেলেই গুরু তালপাতার উপর গীতার শ্লোক লিখে সেগুলো জল দিয়ে ধুয়ে দেন। গীতা-ধোওয়া জলে ঐ বোতলগুলো ভরা। তিন সন্ধে স্নান করে

তিন চুমুক করে খান। ওঁর বিশ্বাস, ওঁর রক্তে গীতার বন্যা বয়ে যাচ্ছে। আমার সংসার-খরচের দশ টাকার পাঁচখানা নোট ঐ বন্যায় গেছে ভেসে। যাই, আমার কাজ আছে। [প্রস্থান

বিশ্বেশ্বর। ওরে ও ফকুরে!

পুষ্প। আচ্ছা, আমি ওকে নিয়ে আসছি। (কাছের দিকে গিয়ে ব্যস্ত হয়ে) ও ফকিরদা, করেছ কী!

ফকির। কেন, কী হয়েছে।

পুষ্প। গুরু হাঁসের ডিমের বড়া খেয়েছিলেন, তার খোলাটা পড়ে গেছে তোমার চাদর থেকে বারান্দার কোণে।

ফকির। (লাফ দিয়ে উঠে) এঃ, ছি ছি, করেছি কী!

পুষ্প। হতভাগা হাঁসটাকে পর্যন্ত বঞ্চিত করলে তুমি! সে তোমার পিছনে পিছনে প্যাঁক প্যাঁক করতে করতে যেত বৈকুণ্ঠধামে— সেখানে পাড়ত স্বর্গীয় ডিম।

ফকির। (বেরিয়ে এসে খোলাটা নিয়ে বারবার মাথায় ঠেকালে) ক্ষমা কোরো গুরু, ক্ষমা কোরো— এ অণ্ড জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের বিগ্রহ ; এর মধ্যে আছে চন্দ্র সূর্য, আছে লোকপাল দিক্‌পালরা সবাই। গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে আনিগে।

পুষ্প। (চাদর চেপে ধ'রে) এনো, এখন তোমার বাবার কথাটা শুনে নাও।

[চাদরের খুঁটে ডিম বেঁধে ফকির বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম করলে

বিশ্বেশ্বর। বাপু, ভক্তিটা খাটো করে আমার উক্তিটা মানো।

ফকির। কী আদেশ করেন।

বিশ্বেশ্বর। আর-একবার পাস করবার চেষ্টা করে দেখো।

ফকির। পারব না, বাবা।

বিশ্বেশ্বর। কী পারবি নে। পাস করতে না পাস করবার চেষ্টা করতে?

ফকির। চেষ্টা আমার দ্বারা হবে না।

বিশ্বেশ্বর। কেন হবে না।

ফকির। গুরুজি বলেন, পাশ শব্দের অর্থ বন্ধন। প্রথমে পাস, তার পরেই চাকরি।

বিশ্বেশ্বর। লক্ষ্মীছাড়া! কী করে চলবে তোমার! আমার পেন্সনের উপর? আমি কি তোমাকে খাওয়াবার জন্যে অমর হয়ে থাকব। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি— বৌমার কাছে টাকা চাইতে তোর লজ্জা করে না? পুরুষমানুষ হয়ে স্ত্রীর কাছে কাঙালপনা!

ফকির। আমি নিজের জন্তে এক পয়সা নিই নে।

বিশ্বেশ্বর। তবে নিস্ কার জন্তে।

ফকির। ওঁরই সদ্গতির জন্তে।

বিশ্বেশ্বর। বটে? তার মানে?

ফকির। আমি তো সবই নিবেদন করি গুরুজির ভোগে। তার ফলের অংশ উনিও পাবেন।

বিশ্বেশ্বর। অংশ পাবেন বটে! উনিই ফল পাবেন আঁঠিসুদ্ধ। ছেলেপুলেরা মরবে শুকিয়ে।

ফকির। আমি কিছুই জানি নে। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে) যা করেন গুরু।

বিশ্বেশ্বর। বেরো, বেরো আমার সামনে থেকে লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর। তোর মুখ দেখতে চাই নে। [প্রস্থান

হৈমবতীর প্রবেশ

ফকির। কা তব কান্তা—

হৈমবতী। কী বকছ।

ফকির। কা তব কান্তা। কোন্ কান্‌তা হ্যায়।

হৈমবতী। হিন্দুস্থানী ধরেছ? বাংলায় বলো।

ফকির। বলি, কাঁদছে কে।

হৈমবতী। তোমারই মেয়ে মিন্তু।

ফকির। হায় রে, একেই বলে সংসার। কাঁদিয়ে ভাসিয়ে দিলে।

হৈমবতী। কাকে বলে সংসার।

ফকির। তোমাকে।

হৈমবতী। আর, তুমি কী! মুক্তির জাহাজ আমার! তোমরা বাঁধ না, আমরাই বাঁধি!

ফকির। গুরু বলেছেন, বাঁধন তোমাদেরই হাতে।

হৈমবতী। আমি তোমাকে যদি বেঁধে থাকি সাত পাকে, তোমার গুরু বেঁধেছেন সাতার পাকে।

ফকির। মেয়েমানুষ— কী বুঝবে তুমি তত্ত্বকথা! কামিনী কাঞ্চন—

হৈম। দেখো, ভণ্ডামি কোরো না। কাঞ্চনের দাম তোমার গুরুজি কতখানি বোঝেন সে আমাকে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আর, কামিনীর কথা বলছ!

ঐ মূর্খ কামিনীগুলোই পায়ের ধুলো নিয়ে পায়ে কাঞ্চন যদি না ঢালত তা হলে তোমার গুরুজির পেট অত মোটা হত না। একটা খবর তোমাকে দিয়ে রাখি। এ বাড়ি থেকে একটা মায়া তোমায় কাটবে। কাঞ্চনের বাঁধন খসল তোমার। শ্বশুরমশায় আমাকে দিব্যি গালিয়ে নিয়েছেন, আমার মাসহারা থেকে তোমাকে এক পয়সাও আর দিতে পারব না।

পুষ্পর প্রবেশ

পুষ্প। ফকিরদা! মানে কী। তোমার শোবার ঘর থেকে পাওয়া গেল মাণ্ডূক্যোপনিষৎ! অনিদ্রার পাঁচন না কি!

ফকির। (ঈষৎ হেসে) তোমরা কী বুঝবে— মেয়েমানুষ!

পুষ্প। কৃপা করে বুঝিয়ে দিতে দোষ কী!

[ফকির হাস্যমুখে নীরব

হৈম। কী জানি ভাই, ওখানা উনি বালিশের নীচে রেখে রাত্তিরে ঘুমোন।

পুষ্প। বেদমন্ত্রগুলোকে তলিয়ে দেন ঘুমের তলায়। এ বই পড়তে গেলে যে তোমাকে ফিরে যেতে হবে সাতজন্ম পূর্বে।

ফকির। গুরুকৃপায় আমাকে পড়তে হয় না।

পুষ্প। ঘুমিয়ে পড়তে হয়।

ফকির। এই পুঁথি হাতে তুলে নিয়ে তিনি এর পাতায় পাতায় ফুঁ দিয়ে দিয়েছেন, জ্বলে উঠেছে এর আলো, মলাট ফুঁড়ে জ্যোতি বেরতে থাকে অক্ষরের ফাঁকে ফাঁকে, ঢুকতে থাকে সুষুম্না নাড়ির পাকে পাকে।

পুষ্প। সেজন্যে ঘুমের দরকার?

ফকির। খুবই। আমি স্বয়ং দেখেছি গুরুজিকে, দুপুরবেলা আহারের পর ভগবদ্গীতা পেটের উপর নিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছেন বিছানায়— গভীর নিদ্রা। বারণ করে দিয়েছেন সাধনায় ব্যাঘাত করতে। তিনি বলেন, ইড়াপিঙ্গলার মধ্য দিয়ে শ্লোকগুলো অন্তরাত্মায় প্রবেশ করতে থাকে, তার আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যায়। অবিশ্বাসীরা বলে, নাক ডাকে। তিনি হাসেন; বলেন, মূঢ়দের নাক ডাকে, ইড়াপিঙ্গলা ডাকে জ্ঞানীদের— নাসারন্ধ্র আর ব্রহ্মরন্ধ্র ঠিক এক রাস্তায়, যেন চিৎপুর আর চৌরঙ্গী।

পুষ্প। ভাই হৈমি, ফকিরদার ইড়াপিঙ্গলা আজকাল কী রকম আওয়াজ দিচ্ছে।

হৈম। খুব জোরে। মনে হয়, পেটের মধ্যে তিনটে চারটে ব্যাঙ মরীয়া হয়ে উঠেছে।

ফকির। ঐ দেখো, শুনলে পুষ্পদিদি? আশ্চর্য ব্যাপার! সত্যি কথা না জেনেই

মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। গুরুজি বলে দিয়েছেন, মাণ্ডূক্য উপনিষদের ডাকটাই হচ্ছে ব্যাঙের ডাক। অন্তরাত্মা চরম অবস্থায় নাভীগহ্বরে প্রবেশ করে হয়ে পড়েন কূপমণ্ডূক, চার দিকের কিছুতেই আর নজর পড়ে না। তখনি পেটের মধ্যে কেবলই শিবোহং শিবোহং শিবোহং করে নাড়িগুলো ডাক ছাড়তে থাকে। সেই ঘুমেতে কী গভীর আনন্দ সে আমিই জানি— যোগনিদ্রা একেই বলে।

হৈম। একদিন মিস্তু কেঁদে উঠে ওঁর সেই ব্যাঙডাকা ঘুম ভাঙিয়ে দিতেই তাকে মেরে খুন করেন আর কি।

পুষ্প। ফকিরদা, সংস্কৃতে অনার্স নিয়েছিলুম, আমাকে পড়তে হয়েছিল মাণ্ডূক্যের কিছু কিছু। নাকের মধ্যে গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে হেঁচে হেঁচে ঘুম ভাঙিয়ে রাখতে হত। হাঁচির চোটে নিরেট ব্রহ্মজ্ঞানের বারো আনা তরল হয়ে নাক দিয়েই বেরিয়ে গিয়েছিল। ইড়াপিঙ্গলা রইল বেকার হয়ে। অভাগিনী আমি, গুরুর ফুঁয়ের জোরে অজ্ঞানসমুদ্র পার হতে পারলেম না।

ফকির। (ঈষৎ হেসে) অধিকারভেদ আছে।

পুষ্প। আছে বই-কি। দেখো-না, ঐ শাস্ত্রেই ঋষি কোন্-এক শিষ্যকে দেখিয়ে বলেছেন, সোয়মাত্মা চতুষ্পাৎ— এর আত্মাটা চার-পা-ওয়ালা। অধিকারভেদকেই তো বলে দু-পা চার-পায়ের ভেদ। হৈম, রাত্রে তো ব্যাঙের ডাক শুনে জেগে থাকিস, আর কোনো জাতের ডাক শুনিস কি দিনের বেলায়।

হৈম। কী জানি ভাই, মিস্তু দৈবাৎ ওঁর মন্ত্রপড়া জলের ঘটি উলটিয়ে দিতেই উনি যে হাঁক দিয়ে উঠেছিলেন সেটা—

পুষ্প। হাঁ, সেটা চারপেয়ে ডাক। মিলছে এই শাস্ত্রের সঙ্গে।

ফকির। সোহং ব্রহ্ম, সোহং ব্রহ্ম, সোহং ব্রহ্ম।

পুষ্প। ফকিরদা, তপস্যা যখন ভেঙেছিল শিব এসেছিলেন তাঁর বরদাত্রীর কাছে— তোমার তপস্যা এবার গুটিয়ে নাও; এই দেখো, বরদাত্রী অপেক্ষা করে আছেন লালপেড়ে শাড়িখানি পরে।

হৈমবতী। পুষ্পদিদি, বরদাত্রীর জন্যে ভাবনা নেই; পাড় দেখা দিচ্ছে রঙ-বেরঙের।

পুষ্প। বুঝেছি, গেরুয়া রঙের ছটা বুঝি ঘরের দেয়াল পেরিয়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে?

হৈমবতী। এরই মধ্যে আসতে আরম্ভ করেছেন দুটি একটি করে বরদাত্রী। গেরুয়া রঙের নেশা মেয়েরা সামলাতে পারে না। পোড়াকপালীদের মরণদশা আর-

কি ! সেদিন এসেছিল একজন বেহায়া মেয়ে ওঁর কাছে মুক্তিমন্ত্র নেবে ব'লে। হবি তো হ, আমারই ঘরে এসে পড়েছিল— দুটো-একটা খাঁটি কথা শুনিয়েছিলুম, মুক্তিমন্ত্রেরই কাজ করেছিল, গেল মাথা ঝাঁকানি দিয়ে বেরিয়ে।

ফকির। দেখো, আমার মাগুর্‌কাটা দাও।

পুষ্প। কী করবে।

ফকির। নারীর হাত লেগেছে, গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে আনিগে।

পুষ্প। সেই ভালো, বুদ্ধি দিয়ে ধোওয়াটা তো হল না এ জন্মে।

ফকির। শুনে যাও, হৈম। আজকে গুরুগৃহে নবরত্নদান ব্রত। আমি তাঁকে দেব সোনা, একটা গিনি চাই।

হৈমবতী। দিতে পারব না, শ্বশুরমশায় পা ছুঁইয়ে বারণ করেছেন।

পুষ্প। তোমার গুরুজির বুঝি কাঞ্চনে অরুচি নেই !

ফকির। তাঁর মহিমা কী বুঝবে তোমরা ! কাঞ্চন পড়তে থাকে তাঁর ঝুলির মধ্যে আর তিনি চোখ বুজে বলেন— হুং ফট্। বাস্‌, একেবারে ছাই হয়ে যায়। যারা তাঁর ভক্ত তাদের এ বচক্ষে দেখা।

পুষ্প। ঝুলিতে যদি ছাই ভরবারই দরকার থাকে, কাঠের ছাই আছে, কয়লার ছাই আছে, সোনার ছাই দিয়ে বোকামি কর কেন।

ফকির। হায় রে, এইটেই বুঝলে না ! গুরুজি বলেছেন, মহাদেবের তৃতীয় নেত্রে দগ্ধ হয়েছিলেন কন্দর্প, সোনার আসক্তি ছাই করতেই গুরুজির আবির্ভাব ধরাধামে। স্থূল সোনার কামনা ভস্ম করে কানে দেবেন সূক্ষ্ম সোনা, গুরুমন্ত্র।

পুষ্প। আর সহ্য হচ্ছে না, চল্‌ ভাই হৈমি, তোর পড়া বাকি আছে।

ফকির। সোহহং ব্রহ্ম, সোহহং ব্রহ্ম, সোহহং ব্রহ্ম।

পুষ্প। (খানিক দূরে গিয়ে ফিরে এসে) রোসো ভাই, একটা কথা আছে, বলে যাই। ফকিরদা, শুনেছি তোমার গুরু আমার সঙ্গে একবার দেখা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

ফকির। হাঁ, তিনি শুনেছেন, তুমি বেদান্ত পাস করেছ। তিনি আমাকে বলে রেখেছেন, নিশ্চয় তোমাকে তাঁর পায়ে এসে পড়তে হবে, বেদান্ত যাবে কোথায় ভেসে ! সময় প্রায় হয়ে এল।

পুষ্প। বুঝতে পারছি। ক'দিন ধরে কেবলই বাঁ চোখ নাচছে।

ফকির। নাচছে ? বটে ! ঐ দেখো, অব্যর্থ তাঁর বাক্য। টান ধরেছে।

পুষ্প। কিন্তু আগে থাকতে বলে রাখছি, ছাই করে দেবার মতো মালমসলা

আমার মধ্যে বেশি পাবেন না। যা ছিল সব পাস করতে করতে য়ুনিভার্সিটির আঁস্তাকুড়ে ভর্তি করে দিয়েছি।

হৈমবতী। কী বলছ ভাই, পুষ্পদিদি! কোন্ ভূতে আবার তোমাকে পেল।

পুষ্প। কী জানি ভাই, দেশের হাওয়ায় এটা ঘটায়। বুদ্ধিতে কাঁপন দিয়ে হঠাৎ আসে যেন ম্যালেরিয়ার গুরুগুরুনি। মনে হচ্ছে, রবি ঠাকুরের একটা গান শুনেছিলুম—

গেরুয়া ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে!

ফকির। পুষ্পদি, তুমি যে এতদূর এগিয়েছ তা আমি জানতুম না। পূর্বজন্মের কর্মফল আর কি!

পুষ্প। নিশ্চয়ই, অনেক জন্মের অবুদ্ধিকে দম দিতে দিতে এমন অদ্ভুত বুদ্ধি হঠাৎ পাক খেয়ে ওঠে— তার পরে আর রক্ষে নেই।

ফকির। উঃ, আশ্চর্য! ধন্য তুমি! সংসারে কেউ কেউ থাকে যারা একেবারেই— কী বলব!

পুষ্প। একেবারে শেষের দিক থেকেই শুরু করে। রবি ঠাকুর বলেছেন—

যখনি জাগিলে বিশ্বে পূর্ণপ্রস্ফুটিতা

ফকির। বা বা, বেশ বলেছেন রবি ঠাকুর— আমি তো কখনো পড়ি নি!

পুষ্প। ভালো করেছ, পড়লে বিপদেই পড়তে। ভাই হৈমি, তোর সেই মটরদানার তুলসী হারটা আমাকে দে দেখি। মহাপুরুষদের দর্শনে খালি হাতে যেতে নেই।

হৈম। কী বল, দিদি! ও যে আমার শাশুড়ির দেওয়া!

পুষ্প। এ মানুষটিও তো তোর শাশুড়ির দেওয়া, এও সেখানে তলিয়েছে ওটাও সেখানে যাবে নাহয়।

ফকির। অবোধ নারী, আসক্তি ত্যাগ করো, গুরুচরণে নিবেদন করো যা কিছু আছে তোমার।

পুষ্প। হৈমি, বিশ্বাস করে দাও আমার হাতে, লোকসান হবে না।

ফকির। আহা, বিশ্বাস— বিশ্বাসই সব! আমার ছোটো ছেলেটার নাম দেব— অমূল্যধন বিশ্বাস।

পুষ্প। হৈমি, ভয় নেই, আমার সাধনা হারাধন ফেরানো। গুরুকৃপায় সিদ্ধিলাভ হবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গুরুধাম

শিষ্যশিষ্যাপরিবৃত গুরু। জটাজাল বিলম্বিত পিঠের উপরে। গেরুয়া চাদরখানা স্থূল উদরের উপর দিয়ে বেঁকে পড়েছে, ঘোলা জলের ঝরনার মতো। ধূপধুনা। গদির এক পাশে খড়ম, যারা আসছে খড়মকে প্রণাম করছে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলছে— গুরো। গুরুর চক্ষু মুদ্রিত, বুকের কাছে দুই হাত জোড়া। মেয়েরা থেকে থেকে আঁচল দিয়ে চোখ মুছছে। দুজন দু পাশে দাঁড়িয়ে পাখা করছে। অনেকক্ষণ সব নিস্তব্ধ।

গুরু। (হঠাৎ চোখ খুলে) এই-যে, তোমরা সবাই এসেছ, জানতেই পারি নি। সিদ্ধিরস্তু সিদ্ধিরস্তু। এখন মন দিয়ে শোনো আমার কথা।

সেবক। মন তো প'ড়েই আছে গুরুর চরণে।

[শিষ্যাদের ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না

গুরু। আজ তোমাদের বড়ো কঠিন পরীক্ষা। মুক্তির সাতটা দরজার মধ্যে এইটে হল তিনের দরজা। শিবোহং শিবোহং শিবোহং। এইটে কোনোমতে পেরলে হয়। যাদের ধনের থলি ফেঁপে উঠেছে উত্থুরি-রুগির পেটের মতো, তারা এই সরু দরজায় যায় আটকে, জাঁতাকলের মতো।

সকলে। হায় হায় হায়, হায় হায় হায়!

গুরু। এইখেনে এসে মুক্তির ইচ্ছেতেই ঘটে বাধা। কেউ বসে পড়ে, কেউ ফিরে যায়। তার পরে এক দুই তিন, ঘণ্টা পড়ল, বাস্— হয়ে গেল, ডুবল নৌকো, আর টিকি দেখবার জো থাকে না। ক্রিং ক্রিং ক্রম্।

সকলে। হায় হায় হায়, হায় হায় হায়!

গুরু। এতকাল আমার সংসর্গে থেকে তোমাদের ধনের লোভ কিছু হাল্কা হয়েছে যদি দেখি, তা হলে আর মার নেই। এইবার তবে শুরু হোক। ওহে চরণদাস, গানটা ধরো।

গুরুপদে মন করো অর্পণ,
ঢালো ধন তাঁর ঝুলিতে—
লঘু হবে ভার, রবে নাকো আর
ভবের দোলায় দুলিতে।

হিসাবের খাতা নাড় ব'সে ব'সে,
মহাজনে নেয় সুদ কষে কষে—
খাটি যেই জন সেই মহাজনে
কেন থাক হায় ভুলিতে,
দিন চলে যায় ট্যাঁকে টাকা হায়
কেবলি খুলিতে তুলিতে।

গুরু। কী নিতাই, চুপ করে বসে বসে মাথা চুলকোচ্ছ যে? মন খারাপ হয়ে গেছে বুঝি! আচ্ছা, এই নে, পায়ের ধুলো নে।

নিতাই। তা, গুরুর কাছে মিথ্যে কথা বলব না। খুবই ভাবনা আছে মনে। কাল সারারাত ধস্তাধস্তি করে স্ত্রীর বাক্স ভেঙে বাজুবন্ধজোড়া এনেছি।

গুরু। এনেছ, তবে আর ভাবনা কী।

নিতাই। প্রভো, ভাবনা তো এখন থেকেই। বউ বলেছে, ঘরে যদি ফিরি তবে ঝাঁটাপেটা করে দূর করে দেবে।

গুরু। সেজন্যে এত ভয় কেন।

নিতাই। এ মারটা প্রভুর জানা নেই, তাই বলছেন।

গুরু। নারদসংহিতায় বলে, দাম্পত্যকলহে চৈব— ঝগড়া দুদিনে যাবে মিটে।

নিতাই। ঐ নারীটিকে চেনেন না। সীতা সাবিত্রীর সঙ্গে মেলে না। নাম দিয়েছি হিড়িম্বা। তা, বরঞ্চ যদি অনুমতি পাই তা হলে দ্বিতীয় সংসার করে শান্তিপুরে বাসা বাঁধব।

গুরু। দোষ কী! বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিরা বলেছেন, অধিকন্তু ন দোষায়। সেইরকম দৃষ্টান্তও দেখিয়েছেন। পুরুষের পক্ষে স্ত্রী গৌরবে বহুবচন।

মাধব। তার মানে একাই এক সহস্র।

গুরু। উল্টো। আধ্যাত্মিক অর্থে পুরুষের পক্ষে এক সহস্রই একা। বড়ো বড়ো সজ্জন কুলীন বহু কষ্টে তার প্রমাণ দিয়েছেন। সেই জন্যেই এ দেশকে বলে পুণ্যভূমি— পুণ্যবিবাহকর্মে আমাদের পুরুষদের ক্লান্তি নেই।

মাধব। আহা, এ দেশের আধ্যাত্মিক বিবাহের এমন সুন্দর ব্যাখ্যা আর কখনো শুনি নি।

গুরু। কী গো বিপিন, প্রস্তুত তো? যেমন বলেছিলুম, কাল তো সারারাত জপ করেছিলে— সোনা মিথ্যে, সোনা মিথ্যে, সব ছাই, সব ছাই?

বিপিন। জপেছি। মোহরটা আরো যেন তারার মতো জ্বল জ্বল করতে লাগল

মনের মধ্যে। (গুরুর পা জড়িয়ে ধ'রে) প্রভু, আমি পাপিষ্ঠ, এবারকার মতো মাপ করো, আরো কিছুদিন সময় দাও।

গুরু। এই রে! ঘোলো, ঘোলো দেখছি। সর্বনাশ হল। দিতে এসে ফিরিয়ে নেওয়া, এ যে গুরুর ধন চুরি করা! (ঝুলি এগিয়ে দিয়ে) ফেল্, ফেল্ বল্‌ছি, এখ্‌খনি ফেল্।

[বিপিন বহু কষ্টে কম্পিত হস্তে রুমাল থেকে মোহর খুলে নিয়ে ঝুলিতে ফেলল এইবার সবাই মিলে বলো দেখি,—

সোনা ছাই, সোনা ছাই, সোনা ছাই।
নাহি চাই, নাহি চাই, নাহি চাই।
নয়ন মুদিলে পরে কিছু নাই, কিছু নাই, কিছু নাই।

[সকলের চীৎকারস্বরে আবৃত্তি

এই-যে, মা তারিণী! এস এস, এই নাও আশীর্বাদ। তোমার ভাবনা নেই, তুমি অনেক দূরে এগিয়েছ। তোমরা মেয়েমানুষ, তোমাদের সরল ভক্তি, দেখে পুরুষদের শিক্ষা হোক।

[তারিণী পায়ের কাছে এক জোড়া বালা রেখে অনেকক্ষণ মাথা ঠেকিয়ে রাখল

(গুরু হাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে) গুরুভার বটে— বন্ধনটা বেশ একটু চাপ দিয়েছিল মনটাকে। যাকগে, এত দিনে হাতের বেড়ি তোমার খসল। লোহার বেড়ির চেয়ে অনেক কঠিন— ঠিক কিনা, মা?

তারিণী। খুব ঠিক, বাবা। মনে হচ্ছে, খানিকটা মাংস কেটে নিলে।

গুরু। মাংস নয়, মাংস নয়, মোহপাশ। গ্রন্থি এই সবে আল্‌গা হতে শুরু করল, তার পরে ক্রমে ক্রমে—

তারিণী। না বাবা, আর পারব না। মেয়ের বিয়ের জন্যে শাশুড়ির আমলের গয়নাগুলি যত্ন করে রেখে দিয়েছি।

গুরু। (থলির মধ্যে বালাজোড়া ফেলে দিয়ে) আচ্ছা আচ্ছা, এখনকার মতো এই পর্যন্তই থাক্। তোমরা বলো সবাই— সোনা ছাই ইত্যাদি।

[সকলের আবৃত্তি

আরে বলদেও, ক্যা খবর?

বলদেও। (পায়ের কাছে হাজার টাকার নোট রেখে) খবর আঁখসে দেখ্ লিজিয়ে হুজরৎ।

গুরু। ভালা ভালা, দিল তো খুশ হ্যায়?

বলদেও। পহেলা তো বহুৎ ঘবড়া গিয়া থা। রাত ভর মেরে জীবাত্মানেসে হাজারো দফে বাতায়া লিয়া কি, কুছ্‌ নেই, কুছ্‌ নেই, ইয়ে তো শ্রেফ কাগজ হ্যায়, হাওয়াসে চলা জাতা, আগ্‌সে জল্‌ জাতা, পানীমেসে গল্‌ জাতা, ইস্‌কো কিম্মৎ কৌড়িসে ভি কমতি হ্যায়। লিকেন আত্মারাম সারা বখৎ ঘড়বড় কর্‌তে থে। মেরে ঐসি বুদ্ধি লগি যে ইয়ে কাগজ তো গুরুজিকে পাঁও পর ডারনেকে লায়েক একদম নেই হ্যায়— ইস্‌সে দো এক রুপেয়া ভি অচ্ছি হ্যায়। পিছে ফজিরমে দো লোটা ভর ভাঙ যব পী লিয়া, তব সব তুরন্ত হো গয়া। মেরে দিল হাল্কা হো গয়া ইয়ে কাগজকা মাফিক।

গুরু। জীতা রহো বাবা, পরমাত্মা তুঝকো ভালা করে। বলো সবাই—

নোটগুলো সব ঝুটো, সব ঝুটো, সব ঝুটো—

ওরা সব খড়কুটো, খড়কুটো, খড়কুটো—

ছাই হয়ে উড়ে যাবে মুঠো মুঠো, মুঠো মুঠো, মুঠো মুঠো।

[সকলের আবৃত্তি

গুরু। আজ ফকিরকে দেখছি নে যে বড়ো।

বলদেও। এক ঔরৎ ফকিরচাঁদজিকো আপনি সাথ লেকে আয়ি হ্যায়। নয়া আদমি, হমারা মালুম দিয়া কি ভিতর আকে চিল্লায়েগি— ইস্‌বাস্তে দোনোকো বাহার খাড়া রখ্‌খা হ্যায়। হুকুম মিল্‌নেসে লে আয়গা।

গুরু। কী সর্বনাশ! ঔরৎ! আরে নিয়ে আয়, নিয়ে আয়, এখ্‌খনি নিয়ে আয়। এইখানে একটা ভালো আসন পেতে দে, মেয়েটা হাতছাড়া না হয়!

ফকিরের সঙ্গে পুষ্পর প্রবেশ

গুরু। এস এস, মা, এস। মুখ দেখেই বুঝছি, দৈববাণীর বাহন হয়ে এসেছ।

পুষ্প। ভুল বুঝছেন। আমি ছাই ফেলবার ভাঙা কুলো হয়েই এসেছি। এই আমার সঙ্গে যাকে দেখছেন, এত বড়ো বিশুদ্ধ ছাইয়ের গাদা কোম্পানির মুল্লুকে আর পাবেন না। কোনোদিন ওঁর মধ্যে পৈত্রিক সোনার আভাস হয়তো কিছু ছিল— গুরুর আশীর্বাদে চিহ্নমাত্রই নেই।

গুরু। এসব কথার অর্থ কী।

পুষ্প। অর্থ এই যে, এঁর বাপ এঁকে ত্যাগ করেছেন, ইনি ত্যাগ করতে যাচ্ছেন এঁর স্ত্রীকে। এক পয়সার সম্বল এঁর নেই। শুনেছি, আপনার এখানে সকলরকম আবর্জনারই স্থান আছে, তাই রইলেন ইনি আপনার শ্রীপাদপদ্মে।

ফকির। অ্যাঁ, এসব কথা কী বলছ, পুষ্পদি। ঐ তো, সোনার হারগাছা নিয়ে আসা গেল— গুরুচরণে রাখবে না ?

পুষ্প। রাখব বৈকি। (গুরুর হাতে দিয়ে) তৃপ্ত হলেন তো ?

গুরু। (হারখানা হাতে নিয়ে ওজন আন্দাজ ক'রে) আমার অতি বৎসামান্যেই তৃপ্তি। পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং।

ফকির। ভুল করবেন না প্রভু, ওটা আমারই দান।

পুষ্প। ভুল ভাঙানো জরুরি দরকার, নইলে আসন্ন বিপদ। ওর বাবা বিশ্বেশ্বরবাবু পুলিসে খবর দিয়েছেন, তাঁর হার চুরি গেছে। খানাতল্লাসি করতে এখনি আসছে মথুরগঞ্জের বড়ো দারোগা দবিরুদ্দিন সাহেব।

গুরু। (দাঁড়িয়ে উঠে) কী সর্বনাশ !

পুষ্প। কোনো ভয় নেই, এখ্‌খনি সোনাগুলোকে ভস্ম করে ফেলুন, পুলিসের উপর সেটা প্রকাণ্ড একটা কানমলা হবে।

গুরু। (কাতরস্বরে) বলদেও !

বলদেও। (লাঠি বাগিয়ে) কুছ পরোয়া নেই, ভগবান। আপ তো পরমাত্মা হো, আপকো হুকুমসে হম লড়াই করেঙ্গে।

মথুর। গুরুজি, ওর ভরসায় থাকবেন না। ওর ভাঙের নেশা এখনো ভাঙে নি। লালপাগড়ি দেখলেই যাবে ছুটে। আপাতত আপনি দৌড় দিন। কী জানি, এই নোটখানা পরমাত্মার ভরসায় ওর কোন্ মনিবের বাক্স ভেঙে নিয়ে এসেছে !

গুরু। অ্যাঁ, বল কি মথুর। পালাব কোথায়। ওরা যে আমার বাসার ঠিকানা জানে। এখন এই ঝুলিটা তোমরা কে রাখবে।

সকলে। কেউ না, কেউ না।

তারিণী। আমার বালা জোড়া ফিরিয়ে দাও।

গুরু। এখ্‌খনি, এখ্‌খনি। আর বলদেও, তোমার নোটখানা তুমি নাও, বাবা।

বলদেও। অব্‌ভি তো নেই সকেঙ্গে। পুলিস চলা আনেসে পিছে লেউঙ্গা।

পুষ্প। আচ্ছা, আমারই হাতে ঝুলিটা দিন। পুলিসের কর্তার সঙ্গে পরিচয় আছে। যার যার জিনিস সবাইকে ফিরিয়ে দেব।

মথুর। ওরে বাস্ রে, স্পাই রে স্পাই। কারও রক্ষা নেই আজ।

গুরু। স্পাই ! সর্বনাশ ! (ঊর্ধ্বশ্বাসে) চললুম আমি। মোটরটা আছে ?

একজন। আছে।

ফকির। (পায়ে ধ'রে) প্রভো, আমি কিন্তু ছাড়ছি নে তোমার সঙ্গ।

গুরু। দূর দূর দূর। ছাড়্, ছাড়্ বলছি। লক্ষ্মীছাড়া! হতভাগা!

ফকির। তা, আমার কী দশা হবে! আমার কোথায় গতি!

গুরু। তোমার গতি গো-ভাগাড়ে।

[দ্রুত প্রস্থান

বিপিন। মা গো, ঐ ঝুলির মধ্যে আমার আছে মোহরটা।

নিতাই। আর, আমার আছে বাজুবন্দ।

পুষ্প। এই নাও তোমরা।

সকলে। তুমিই রক্ষা করলে মা, ধড়ে প্রাণ এল।

বলদেও। মাইজি, উয়ো নোট হমকো দে দীজিয়ে। আফিস্‌কে বখৎমে থোড়ি দের হ্যায়।

পুষ্প। এই নাও, ঠিক জায়গায় পৌঁছিয়ে দেবে তো?

বলদেও। হুজুর। পরমাত্মাজি তো ফেরার হো গয়া, দুস্‌রা লেনেওয়ালা কোই হ্যায় নেই সওয়ায় মনিব ঔর ডাকু। মালুম থা কি নোট ভস্‌ম হো জায়গা, উস্‌কা পত্তা নহি মিলেগা, মেরা পুণ্য ঔর পুলিসকী ডাণ্ডা ফরক্ রহেগা। অভি দেখ্‌তা হুঁ কি হিসাবকি থোড়ি গলতি থী। হর হর, বোম্ বোম্।

[প্রস্থান

পুষ্প। ফকিরদা, মাথায় হাত দিয়ে ভাবছ কী। গুরুর পদধূলি তো আঠারো আনা মিলেছে। এখন ঘরে চলো।

ফকির। যাব না।

পুষ্প। কোথায় যাবে।

ফকির। রাস্তায়।

পুষ্প। আচ্ছা বেশ, ছান্দোগ্যটা তো নিয়ে আসতে হবে!

ফকির। সে আমার সঙ্গে আছে।

পুষ্প। কিন্তু, তোমার গুরু?

ফকির। রইলেন আমার অন্তরে।

পুষ্প। আর, ডিমের খোলাটা?

ফকির। সে ঝুলছে গামছায় বাঁধা বুকের কাছে।

[প্রস্থান

পুষ্প। (পিছন থেকে) সোয়মাত্মা চতুষ্পাৎ।

হৈমর প্রবেশ

পুষ্প। বিশ্বাস করতে পারিস নে বুঝি? এই নে তোর হার।

হৈম। আর, অগুটি?

পুষ্প। এখনকার মতো চার পা তুলে সে বেড়া ডিঙিয়েছে।

হৈম। তার পর?

পুষ্প। লম্বা দড়ি আছে।

হৈম। আমার কিন্তু ভয় হচ্ছে।

পুষ্প। তুই হাউমাউ করিস নে তো। চতুষ্পদ একটু চরে বেড়াক-না!

হৈম। উনি ছান্দোগ্য নিয়ে যখন বেরলেন তখনি বুঝলুম, ফিরবেন না। মণ্ডুক মানে ব্যাঙ বুঝি, ভাই?

পুষ্প। হাঁ।

হৈম। উনি আজকাল বলতে আরম্ভ করেছেন, মানুষের আত্মা হচ্ছে ব্যাঙ। সেই পরম ব্যাঙ যখন অন্তরে কুড়ুর কুড়ুর করে ডাকে তখনি বোঝা যায়, সে পরমানন্দে আছে।

পুষ্প। তাই হোক-না, ওর আত্মা দেশে বিদেশে ডেকে বেড়াক, তোর আত্মা-ব্যাঙ এখন কিছুদিনের মতো ঘুমিয়ে নিক।

হৈম। মনটা যে হু হু করবে, তার চেয়ে ব্যাঙের ডাক যে ভালো।

পুষ্প। ভয় নেই, আনব তোর মাণ্ডূক্যকে ফিরিয়ে।

তৃতীয় দৃশ্য

ষষ্ঠীচরণ। পুষ্প

ষষ্ঠী। মা, শরণ নিলুম তোমার।

পুষ্প। খবর নিয়েছি পাড়ায়, তোমার নাতি মাখন পলাতক সাত বছর থেকে— সংসারের দুনলা বন্দুক লেগেছে তার বুকে, দুঃখ এখনো ভুলতে পারে নি। একটা বিয়ে করলে পুরুষের পা পড়ে না মাটিতে, তোলা থাকে স্ত্রীর মাথার উপরে; আর, দুটো বিয়ে করলেই দুজোড়া মল বাজতে থাকে ওদের পিঠে, শিরদাঁড়া যায় বেঁকে।

ষষ্ঠী। কী না জান তুমি, মা। নবগ্রাম থেকে আরম্ভ করে মল্লুগঞ্জ পর্যন্ত সব

কটা গাঁ যে তুমি জিতে নিয়েছ। বিধাতাপুরুষ নিষ্ঠুর, তাই তোমায় মোলাম করতে হয় তাঁর শাসন।

পুষ্প। না জ্যাঠামশায়, বাড়িয়ে বোলো না। আমি মজা দেখতে বেরিয়েছি— ছুটি পেয়েছি বই পড়ার গারদ থেকে। দেখতে এলুম কেমন ক'রে নিজের পায়ে বেড়ি আর নিজের গলায় ফাঁস পরাতে নিস্‌পিস্‌ করতে থাকে মানুষের হাত দুটো। এ না হলে ভবের খেলা জমত না। ভগবান বোধ হয় রসিক লোক, হাসতে ভালোবাসেন।

ষষ্ঠী। না মা, সবই অদৃষ্ট। হাতে হাতে দেখো-না! বড়ো বৌয়ের ছেলেপুলের দেখা নেই। ভাবলেম, পিতৃপুরুষ পিণ্ডি না পেয়ে শুকিয়ে মরবেন বৈতরণীতীরে। ধ'রে বেঁধে দিলেম মাখনের দ্বিতীয় বিয়ে, আর সবুর সইল না, দেখতে দেখতে পরে পরে দুই পক্ষেরই কল্যাণে চারটি মেয়ে তিনটি ছেলে দেখা দিল আমার ঘরে।

পুষ্প। এবারে পিতৃপুরুষের অজীর্ণ রোগের আশঙ্কা দেখছি।

ষষ্ঠী। মা, তোমার সব ভালো, কেবল একটা বড়ো খট্‌কা লাগে— মনে হয়, তুমি দেবতা ব্রাহ্মণ মানই না।

পুষ্প। কথাটা সত্যি।

ষষ্ঠী। কেন মা, ঐ খুঁৎটুকু কেন থেকে যায়।

পুষ্প। সংসারে দেবতাব্রাহ্মণের অবিচারের বিরুদ্ধেই যে লড়াই করতে হয়, ওদের মানলে জোর পেতুম না। সে কথা পরে হবে, আমি মাখনের খোঁজেই আছি।

ষষ্ঠী। জান তো মা, ও কিরকম হো হো করে বেড়াত— কেবল খেলাধুলো, কেবল ঠাট্টাতামাসা। ভয় হত, কোথায় কী করে বসে! তাই তো ওর গলায় একটা নোঙরের পর আর-একটা নোঙর ঝুলিয়ে দিলুম।

পুষ্প। নোঙর বেড়েই চলল, ভারে নৌকো তলিয়ে যাবার জো। আমি তোমাদের পাড়ায় এসেছি হৈমির খবর নেবার জন্যে। শুনলুম, সে তোমার এখানেই আছে।

ষষ্ঠী। হাঁ মা, এতদিন আমি ছিলুম নামেই মামা। তার বিয়ের পর থেকে এই তাকে দেখলুম। বুক জুড়িয়ে গেল তার মধুর স্বভাবে। তারও স্বামী পালিয়েছে। হল কি বলো তো! কন্‌গ্রেসওয়ালারা এর কিছু করে উঠতে পারলে না?

পুষ্প। মহাত্মাজিকে বললে এখনি তিনি মেয়েদের লাগিয়ে দেবেন অসহযোগ আন্দোলনে। দেশে হাতাবেড়ির আওয়াজ একেবারে হবে বন্ধ। গলির মোড়ে খুদু ময়রার দোকানে তেলে-ভাজা ফুলুরি খেয়ে বাবুদের আপিসে ছুটতে হবে— দুদিন বাদেই সিক্ লীভের দরখাস্ত।

ষষ্ঠী। ও সর্বনাশ!

পুষ্প। ভয় নেই, মেয়েদের হয়ে আমি মহাত্মাজিকে দরবার জানাব না। বরঞ্চ রবি ঠাকুরকে ধরব, যদি তিনি একটা প্রহসন লিখে দেন।

ষষ্ঠী। কিন্তু, রবি ঠাকুর কি আজকাল লিখতে পারে। আমার শ্যালার কাছে—

পুষ্প। আর বলতে হবে না। কথাটা রাষ্ট্র হয়ে গেছে দেখছি। কিন্তু ভাবনা নেই, লেখন্দাজ ঢের জুটে গেছে। দ্বাদশ আদিত্য বললেই হয়।

ষষ্ঠী। বরঞ্চ লিখতেই যদি হয়, আমি তো মনে করি, আজকাল মেয়েরা যেরকম—

পুষ্প। অসহ্য, অসহ্য। আমা শেমিজ পরার পর থেকে ওদের লজ্জা শরম সব গেছে।

ষষ্ঠী। সেদিন কলকাতায় গিয়েছিলুম ; দেখি, মেয়েরা ট্র্যামে বাসে এমনি ভিড় করেছে—

পুষ্প। যে পুরুষ বেচারারা খালি গাড়ি পেলেও নড়তে চায় না। ও কথা থাক্‌গে— মাখনের জন্যে ভেবো না।

ষষ্ঠী। সেই ভালো, তোমার উপরেই ভার রইল।

[ষষ্ঠীর প্রস্থান

হৈমর প্রবেশ

হৈম। শুনলুম তুমি এসেছ, তাই তাড়াতাড়ি এলুম।

পুষ্প। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিলেন, তাই গান্ধারী চোখে কাপড় বেঁধে অন্ধ সাজলেন। তোমারও সেই দশা। স্বামী এল বেরিয়ে রাস্তায়, স্ত্রী এল বেরিয়ে বাবার বাড়িতে।

হৈম। মন টেঁকে না ভাই, কী করি! তুমি বলেছিলে, হারাধন ফিরিয়ে আনবে।

পুষ্প। একটু সবুর করো— ছিপ ফেলতে হয় সাবধানে ; একটা ধরতে যাই, দুটো এসে পড়ে টোপ গিলতে।

হৈম। আমার তো দুটোতে দরকার নেই।

পুষ্প। যেরকম দিন কাল পড়েছে, দুটো একটা বাড়তি হাতে রাখা ভালো। কে জানে কোন্‌টা কখন ফস্‌কে যায়।

হৈম। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। দেখলুম কাগজে তোমার নাম দিয়ে একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে—

পুষ্প। হাঁ, সেটা আমারই কীর্তি।

হৈম। তাতে লিখেছ, প্রাইভেট সিনেমায় সেতুবন্ধ নাটকের জন্যে লোক চাই, হনুমানের পার্ট্ অভিনয় করবে। তোমার আবার সিনেমা কোথায়।

পুষ্প। এই তো চার দিকেই চলচ্ছবির নাট্যশালা, তোমাদের সবাইকে নিয়েই।

হৈম। তা যেন বুঝলুম, এর মধ্যে হনুমানের অভাব ঘটল কবে থেকে।

পুষ্প। দল পুরু আছে ঘরে ঘরে। একটা পাগলা পালিয়েছে লেজ তুলে, ডাক দিচ্ছি তাকে।

হৈম। সাড়া মিলেছে ?

পুষ্প। মিলেছে।

হৈম। তার পরে ?

পুষ্প। রহস্য এখন ভেদ করব না।

হৈম। যা খুশি কোরো, আমার প্রাণীটিকে বেশি দিন ছাড়া রেখো না। ঐ কে আসছে ভাই, দাড়িগোঁফঝোলা চেহারা— ওকে তাড়িয়ে দিতে বলে দিই।

পুষ্প। না না, তুমি বরঞ্চ যাও, আমি ওর সঙ্গে কাজ সেরে নিই।

[হৈমর প্রস্থান

সেই লোকের প্রবেশ

পুষ্প। তুমি কে ?

সেই লোক। সেটা প্রকাশের যোগ্য নয় গোড়া থেকেই, জন্মকাল থেকেই। আমি বিধাতার কুকীর্তি, হাতের কাজের যে নমুনা দেখিয়েছেন তাতে তাঁর সুনাম হয় নি।

পুষ্প। মন্দ তো লাগছে না !

সেই লোক। অর্থাৎ মজা লাগছে। ঐ গুণেই বেঁচে গেছি। প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিলেই লোকের মজা লাগে। লোক হাসিয়েছি বিস্তর।

পুষ্প। কিন্তু, সব জায়গায় মজা লাগে নি।

সেই লোক। খবর পেয়েছ দেখছি। তা হলে আর লুকিয়ে কী হবে। নাম আমার শ্রীমাখনচন্দ্র। বুঝতেই পারছ, যাত্রার দলের সরকারি গোঁফদাড়ি পরে এসেছি কেন। এ পাড়ায় মুখ দেখাবার সাহস নেই, পিঠ দেখানোই অভ্যেস হয়ে গেছে।

পুষ্প। এলে যে বড়ো ?

মাখন। চলেছিলুম নাজিরপুরে ইলিশ মাছ ধরার দলে। ইস্টেশনে দেখি বিজ্ঞাপন,

হনুমানের দরকার। রইল পড়ে জেলেগিরি। জেলেরা ছাড়তে চায় না, আমাকে ভালোবাসে। আমি বললুম, ভাই, এদের বিজ্ঞাপনের পয়সা বেবাক লোকসান হবে আমি যদি না যাই— আর দ্বিতীয় মানুষ নেই যার এত বড়ো যোগ্যতা। এ তো আর ত্রেতাযুগ নয়।

পুষ্প। খাওয়াপরায় কিছু টানাটানি পড়েছে বুঝি ?

মাখন। নিতান্ত অসহ্য হয় নি। কেবল যখন ধনেশাক দিয়ে ডিমওয়ালা কই মাছের ঝোলের গন্ধস্মৃতি অন্তরাত্মার মধ্যে পাক খেয়ে ওঠে, তখন আমার শ্রীমতী বাঁয়া আর শ্রীমতী তবলার তেরেকেটে মেরেকেটে ভিরকুটি মিরকুটির তালে তালে দূর থেকে মন কেমন ধড়্ ফড়্ করতে থাকে।

পুষ্প। তাই বুঝি ধরা দিতে এসেছ ?

মাখন। না না, মনটা এখনো তত দূর পর্যন্ত শক্ত হয় নি। শেষে বিজ্ঞাপনদাতার খবর নিতে এসে যখন দেখলুম, ঠিকানাটা এই আঙিনারই সীমানার মধ্যে তখন প্রথমটা ভাবলুম বিজ্ঞাপনের মান রক্ষা করব, দেব এক লম্ফ। কিন্তু, রইলুম কেবল মজার লোভে। পণ করলুম শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। দিদি আমার, কেমন সন্দেহ হচ্ছে, কোনো সূত্রে বুঝি আমাকে চিনতে, নইলে অমন বিজ্ঞাপন তোমার মাথায় আসত না।

পুষ্প। তোমার খাঁচিলওয়ালা নাকের খ্যাতি পাড়ার লোকের মুখে মুখে। তোমার বিজ্ঞাপন তোমার নাকের উপর। বিশ্বকর্মার হাতে এ নাক দুবার তৈরি হতে পারে না— ছাঁচ তিনি মনের ক্ষোভে ভেঙে ফেলেছেন।

মাখন। এই নাকের জোরে একবার বেঁচে গিয়েছি, দিদি। মহকুমা চুরি হল, সন্দেহ করে আমাকে ধরলে চৌকিদার। দারোগা বুদ্ধিমান ; সে বললে, এ লোকটা চুরি করবে কোন্ সাহসে— নাক লুকোবে কোথায়। বুঝেছ দিদি ? আমার এ নাকটাতে ভাঁড়ামির ব্যাবসা চলে, চোরের ব্যাবসা একেবারে চলে না।

পুষ্প। কিন্তু, তোমার হাতে যে কলার ছড়াটা দেখছি ওটা তো আমার চেনা, কোনো ফিকিরে তোমার বুড়ি-অন্নপূর্ণার ঘর থেকে সরিয়ে নিয়েছ।

মাখন। অনেক দিনের পেটের জ্বালায় ওদের ভাঁড়ারে চুরি পূর্বে থেকেই অভ্যেস আছে।

পুষ্প। এত বড়ো কাঁদি নিয়ে করবে কী। হনুমানের পালায় ভালিম দেবে ?

মাখন। সে তো ছেলেবেলা থেকেই দিচ্ছি। পথের মধ্যে দেখলুম এক ব্রহ্মচারী বসে আছেন পাকুড়তলায়। আমার বদ অভ্যাস, হাসাতে চেষ্টা করলুম— ঠোঁটের

এক কোণও নড়াতে পারলুম না, মন্তর আউড়েই চলল। ভয় হল, বুঝি ব্রহ্মদত্যি হবে। কিন্তু, মুখ দেখে বুঝলুম উপোষ করতে হতভাগা তিথিবিচার করছে না। ওর পাঁজিতে তিনটে চারটে একাদশী একসঙ্গে জমাট বেঁধে গেছে। জিজ্ঞাসা করলুম, বাবাজি, খাবে কিছু? কপালে চোখ তুলে বললে, গুরুর কৃপা যদি হয়। মাঝে মাঝে দেখি মাথার নীচে পুঁথি রেখে নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছেন, ডাকের শব্দে ও গাছের পাখি একটাও বাকি নেই। নাকের সামনে রেখে আসব কলার ছড়াটা।

পুষ্প। লোকটার পরিচয় নিতে হবে তো।

মাখন। নিশ্চয় নিশ্চয়। হাসতে হাসতে পেট ফেটে যাবে, আমার চেয়ে মজা।

পুষ্প। ভালো হল। হনুমানের সঙ্গে অঙ্গদ চাই। ওকে তোমারই হাতে তৈরি করে নিতে হবে। শেওড়াফুলির হাট উজাড় করে কলার কাঁদি আনিয়ে নেব।

মাখন। শুধু কলার কাঁদির কর্ম নয়।

পুষ্প। তা নয় বটে। যে কারখানায় তুমি নিজে তৈরি সেখানকার দুই-চাকা-ওয়ালা যন্ত্রের তলায় ওকে ফেলা চাই।

মাখন। দয়াময়ী, জীবের প্রতি এত হিংসা ভালো নয়।

পুষ্প। ভয় নেই, আমি আছি, হঠাৎ অপঘাত ঘটতে দেব না। আপাতত কলার ছড়াটা ওকে দিয়ে এস।

মাখন। আমাদের দেশে মেয়েরা থাকতে সন্ন্যাসী না খেয়ে মরে না। কিন্তু, ও লোকটা ভুল করেছে— বৈরাগির ব্যাবসা ওর নয়, ওর চেহারায় জলুষ নেই। নিতান্ত নিজের স্ত্রী ছাড়া ওর খবরদারি করবার মানুষ মিলবে না।

পুষ্প। তোমার অমন চেহারা নিয়ে তুমি ছ বছর চালালে কী করে।

মাখন। ময়রার দোকানে মাছি তাড়িয়েছি, পেয়েছি বাসি লুচি তেলে-ভাজা, যার খদ্দের জোটে না। যাত্রার দলে ভিস্তি সেজেছি, জল খেতে দিয়েছেন অধিকারী মুড়কি আর পচা কলা। সুবিধে পেলেই মা মাসি পাতিয়ে মেয়েদের পাঁচালি শুনিয়ে দিয়েছি যখন পুরুষরা কাজে চলে গেছে—

ওরে ভাই, জানকীরে দিয়ে এস বন—
ওরে রে লক্ষ্মণ এ কী কুলক্ষণ, বিপদ ঘটেছে বিলক্ষণ।

মা-জননীদের দুই চক্ষু দিয়ে অশ্রুধারা বয়েছে— দু-চার দিনের সম্বল নিয়ে এসেছি। আমাকে ভালোবাসে সবাই। জ্যাঠাইমা আমার যদি দুটো বিয়ে না দিত তা হলে চাই কি আমার নিজের স্ত্রীও হয়তো আমাকে ভালোবাসতে পারত। বাইরে থেকে বুঝতে পারবে না, কিন্তু আমারও কেমন অল্পেতেই মন গলে যায়। এই দেখো-না,

এখন তোমাকে মা-অন্নদা বলতে ইচ্ছে করছে।

পুষ্প। সেই ভালো, আমার নাতির সংখ্যা বেড়ে চলেছে, দিদির পদটা বড্ড বেশি ভারী হয়ে উঠল। আচ্ছা, জিগেস করি, তোমার মনটা কী বলছে।

মাখন। তবে মা, কথাটা খুলে বলি। অনেক দিন পরে এ পাড়ায় কাছাকাছি আসতেই প্রথম দিনেই আমার বিপদ বাধল ফোড়নের গন্ধে। সেদিন আমাদের রান্নাঘরে পাঁঠা চড়েছিল— সত্যি বলি, বড়ো বোয়ের মুখ খারাপ, কিন্তু রান্নায় ওর হাত ভালো। সেদিন বাতাস শুঁকে শুঁকে বাড়ির আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়িয়েছি সারাদিন। তার পর থেকে অর্ধভোজনের টানে এ পাড়া ছাড়া আমার অসাধ্য হল। বারবার মনে পড়ছে, কত দিনের কত গালমন্দ আর কত কাঁটাচচ্চড়ি। একদিন দিব্যি গেলেছিলুম, এ বাড়িতে কোনোদিন আর ঢুকব না। প্রতিজ্ঞা ভেঙেছি কাল।

পুষ্প। কিসে ভাঙালো।

মাখন। ভালের বড়ার গন্ধে। দিনটা ছট্‌ফট্ করে কাটালুম। রাত্তিরে যখন সব নিশুতি, বাইরে থেকে ছিট্‌কিনি খুলে ঢুকলুম ঘরে। খুট করে শব্দ হতেই আমার ছোটোটি এক হাতে পিদিম এক হাতে লাঠি নিয়ে ঢুকে পড়ল ঘরে। মুখে মেখে এসেছিলুম কালি, আমি হাঁ করে দাঁত পিঁচিয়ে হাঁউমাউখাঁউ করে উঠতেই পতন ও মূর্ছা। বড়ো বৌ একবার উঁকি মেরেই দিল দৌড়। আমি রয়ে বসে পেট ভরে আহার করে ধামাসুদ্ধ বড়া নিয়ে এলুম বেরিয়ে।

পুষ্প। কিছু প্রসাদ রেখে এলে না পতিব্রতাদের জন্যে?

মাখন। অনেকখানি পায়ের ধুলো রেখে এসেছি, আর বড়াগুলো নিয়ে এসেছি বলবলকে খাইয়ে দিতে।

পুষ্প। আচ্ছা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্যি বলবে?

মাখন। দেখো মা, বিপদে না পড়লে আমি কখনো মিথ্যে কথা কই নে।

পুষ্প। লোকে বলে, তুমি কাশীতে গিয়ে আরও একটা বিয়ে করেছ।

মাখন। তা করেছি।

পুষ্প। পিঠ সুড়্‌সুড়্‌ করছিল?

মাখন। না মা, দুটো বিয়ে কাকে বলে হাড়ে হাড়ে জেনেছি। ভারি ইচ্ছা হল, একটা বিয়ে কী রকম মরবার আগে জেনে নেব।

পুষ্প। জেনে নিয়েছ সেটা?

মাখন। বেশি দিন নয়। ভাগ্যবতী কিনা, পুণ্যফলে মারা গেল সকাল-সকাল, স্বামী বর্তমানেই। ঘোমটা সবে খুলেছে মাত্র। কিন্তু ভালো ক'রে মুখ ফোটবার

তখনো সময় হয় নি। বেঁচে থাকলে কপালে কী ছিল বলা যায় না।

পুষ্প। কার কপালে ?

মাখন। শক্ত কথা।

চতুর্থ দৃশ্য

নিদ্রামগ্ন ফকির। মুখের কাছে একছড়া কলা। জেগে উঠে কলার ছড়া তুলে নেড়েচেড়ে দেখল

ফকির। আহা, গুরুদেবের কৃপা। (ছড়াটা মাথায় ঠেকিয়ে চোখ বুজে) শিবোহং শিবোহং শিবোহং। (একটা একটা ক'রে গোটা দশেক খেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে) আঃ !

মাখনের প্রবেশ

মাখন। কী দাদা, ভালো তো ! আমার নাম শ্রীমাখনানন্দ।

ফকির। গুরুর চরণ ভরসা।

মাখন। গুরুই খুঁজে মরছি। সদ্‌গুরু মেলে না তো। দয়া হবে কি। নেবে কি অভাজনকে।

ফকির। ভয় নেই, সময় হোক আগে।

মাখন। (কান্নার সুরে) সময় আমার হবে না প্রভু, হবে না। দিন যে গেল ! বড়ো পাপী আমি। আমার কী গতি হবে।

ফকির। গুরুপদে মন স্থির করো— শিবোহং।

মাখন। এই পদেই ঠেকল আমার তরী ; যম তা হলে ভয়ে কাছে ঘেঁষবে না।

ফকির। তোমার নিষ্ঠা দেখে বড়ো সন্তুষ্ট হলুম।

মাখন। শুধু নিষ্ঠা নয় গুরু, এনেছি কিছু তালের বড়া। তালগাছটা সুদ্ধ উদ্ধার পাক।

ফকির। (ব্যগ্রভাবে আহার) আহা, সুস্বাদ বটে। ভক্তির দান কিনা।

মাখন। সার্থক হল আমার নিবেদন। বাড়ির এঁরারা খবর পেলে কী খুশিই হবেন ! যাই, ওঁদের সংবাদ পাঠিয়ে দিইগে, ওঁরা আরও কিছু হাতে নিয়ে আসবেন।— প্রভু, গৃহাশ্রমে আর কি ফিরবেন না।

ফকির। আর কেন। গুরু বলেন, বৈরাগ্যং এবং ভয়ং।

মাখন। গৃহী আমি, ভাইনে বাঁয়ে মায়া-মাকড়সানি জড়িয়েছে আপাদমস্তক। ধনদৌলতের সোনার কেল্লাটা কত বড়ো ফাঁকি সেটা খুব করেই বুঝে নিয়েছি। বুঝেছি সেটা নিছক স্বপ্ন। ভগবান আমাকে অকিঞ্চন করে পথে পথে ঘোরাবেন এই তো আমার দিনরাত্রির সাধনা, কিন্তু আর তো পারি নে, একটা উপায় বাৎলিয়ে দাও।

ফকির। আছে উপায়।

মাখন। (পা জড়িয়ে) বলে দাও, বলে দাও, বঞ্চিত কোরো না।

ফকির। দিন-ভোর উপোষ ক'রে থেকে—

মাখন। উপোষ! সর্বনাশ! সেটা অভ্যেস নেই একেবারেই। আমার দুষ্ট গ্রহ দিনে চারবার করে আহার জুটিয়ে দিয়ে অন্তরটা একেবারে নিরেট করে দিয়েছেন। আর কোনো রাস্তা যদি—

ফকির। আচ্ছা, দুখানা রুটি—

মাখন। আরও একটু দয়া করেন যদি, দু'বাটি ক্ষীর!

ফকির। ভালো, তাই হবে।

মাখন। আহা, কী করুণা প্রভুর! তেমন করে পা যদি চেপে থাকতে পারি তা হলে পাঁঠাটাও—

ফকির। না না, ওটা থাক্।

মাখন। আচ্ছা, তবে থাক্, একটা দিন বই তো নয়। তা, কী করতে হবে বলুন। দেখুন, আমি মুখ্খু মানুষ, অনুস্বার-বিসর্গওয়ালা মন্তর মুখ দিয়ে বেরবে না, কী বলতে কী বলব, শেষকালে অপরাধ হবে।

ফকির। ভয় নেই, তোমার জন্যে সহজ করেই দিচ্ছি। গুরুর মূর্তি স্মরণ করে সারারাত জপ করবে, সোনা তোমাকেই দিলুম, তোমাকেই দিলুম, যতক্ষণ না ধ্যানের মধ্যে দেখবে, সোনা আর নেই— কোথাও নেই।

মাখন। হবে হবে প্রভু, এই অধমেরও হবে। বলব, সোনা নেই, সোনা নেই; এ হাতে নেই, ও হাতে নেই; ট্যাঁকে নেই, থলিতে নেই; ব্যাঙ্কে নেই, বাক্সোয় নেই। ঠিক সুরে বাজবে মন্ত্র। আচ্ছা, গুরুজি, ওর সঙ্গে একটা অনুস্বার জুড়ে দিলে হয় না? নইলে নিতান্ত বাংলায় বড্ডো শোনাচ্ছে। অনুস্বার দিলে জোর পাওয়া যায়— সোনাং নেই, সোনাং নেই, কিছুং নেই, কিছুং নেই।

ফকির। মন্দ শোনাচ্ছে না।

মাখন। আচ্ছা, তবে অনুমতি হোক, পোলাওটা ঠাণ্ডা হয়ে এল!

[প্রস্থান

ফকিরের গান

শোন্ রে শোন্ অবোধ মন,—
শোন্ সাধুর উক্তি, কিসে মুক্তি
সেই সুযুক্তি কর্ গ্রহণ।
ভবের শুক্তি ভেঙে মুক্তি-মুক্তা কর্ অন্বেষণ
ওরে ও ভোলা মন!

ষষ্ঠীচরণ ছুটে এসে

ষষ্ঠী। দেখি দেখি, এই তো দাদু আমার— আমার মাখন। (মুখে হাত বুলিয়ে) অমন চাঁদ মুখখানা দাড়ি গোঁফ দিয়ে একেবারে চাপা দিয়েছে। একে ভগবান আমার চোখে পরিয়েছে বুড়ো বয়সের ঠুলি, ভালো দেখতেই পাই নে, তার উপর এ কী কাণ্ড করেছিস মাখন!

ফকির। সোহং ব্রহ্ম, সোহং ব্রহ্ম, সোহং ব্রহ্ম।

ষষ্ঠী। করেছিস কী দাদু, মন্তর প'ড়ে প'ড়ে অমন মিষ্টি গলায় কড়া পাড়িয়ে দিয়েছিস! সুর মোটা হয়ে গেছে!

ফকির। শিবোহং শিবোহং শিবোহং।

বামনদাস বাবুর প্রবেশ

বামনদাস। আরে আরে, আমাদের মাখন নাকি? খাঁটি তো? ও ষষ্ঠীদা, মানতেই হবে যোগবল— নাকের উপর থেকে আঁচিলটা একেবারে সাফ দিয়েছে উড়িয়ে। ভট্‌চায, দেখে যাও হে, নাকের উপর কী মন্তর লেগেছিল গো! একটু চিহ্ন রেখে যায় নি। ষষ্ঠীদা, ঐ নাক নিয়ে কত ঝাড়ফুঁক করেছিলে, একটু টলাতে পার নি। তপিস্তের মাহাত্মি বটে—

ষষ্ঠী। না ভাই, মাহাত্মি ভালো লাগছে না। তোরা যাকে বলতিস গণ্ডারী নাক, সে ছিল ভালো।

নিশিঠাকুর। ওর মুখমণ্ডল যে নিজেকে বেকবুল করছে, তার উপরে আবার মুখে কথা নেই। অমন সব বোলচাল, মুনি হয়ে সব ভুলেছে বুঝি!

ভজহরি। দেখি দেখি মাখ্‌না, মুখটা দেখি। (চিমটি কেটে, চামড়া টেনে) না হে, এ মুখোষ নয়, ধাঁদা লাগিয়ে দিলে।

নিতাই। কিন্তু, দেখ্ তো টেনে ওর দাড়িগোঁফ সত্যি কি না!

ফকির। উঃ উঃ!

চণ্ডী। (পিঠে কিল মেরে) কেমন লাগল।

ফকির। উঃ!

চণ্ডী। ঐ তো, সন্ন্যাসীর সুখদুঃখবোধ আছে তো! মাথায় হুঁকোর জল ঢালি তবে, মাথা ঠাণ্ডা হোক।

ষষ্ঠী। আহা, কেন ওকে বিরক্ত করছ ভাই? সাত বছর পরে ফিরে এল, সবাই মিলে আবার ওকে তাড়াবে দেখছি। মাখন, ও ভাই মাখন, আর দুখ্ খু দিস্ নে— একটা কথা ক, নাহয় ছুটো গাল দিলিই বা!

ফকির। আপনারা আমাকে মাখন বলে ডাকছেন কেন। পূর্ব-আশ্রমে আমার যে নাম থাক্, আমার গুরুদত্ত নাম চিদানন্দ স্বামী। [সকলের উচ্চহাস্য

চিনু। ওরে বাবা, ত্রাণকর্তা এলেন আমাদের। ভাখ্ মাখ্না, জ্যাকামি করিস নে। ভাবছিস, এমনি করে আবার ফাঁকি দিয়ে পালাবি! সেটি হচ্ছে না; তোর দুই বৌয়ের হাতে দুই কান জিম্মে করে দেব, থাকবি কড়া পাহারায়।

ফকির। ওরে, হায় ওরে!

দুই স্ত্রীর প্রবেশ

১। ঐ যে গো, মুখ চোখ বদলিয়ে এসেছেন আমাদের কলির নারদ।

ফকির। মা, আমি তোমাদের অধম সন্তান, দয়া করো আমাকে।

সকলে। এই এই, করলে কী! প্রাণের ভয়ে মা বলে ফেললে?

১। ও পোড়াকপালে মিন্‌সে, তুই মা বলিস কাকে!

২। চোখের মাথা খেয়ে বসেছিস, তোর মরণ হয় না!

ফকির। একটু ভালো করে আমাকে দেখে নিন।

১। তোমাকে দেখে দেখে চোখ ক্ষয়ে গেছে। তুমি কচি খোকা নও, নতুন জন্মাও নি। তোমার দুধের দাঁত অনেক দিন পড়েছে, তোমার বয়সের কি গাছ পাথর আছে। তোমায় যম ভুলেছে ব'লে কি আমরাও ভুলব।

২। (নাক মুচ্ড়িয়ে দিয়ে) সাক্ষীকে বিদায় করেছ নাকের ডগা থেকে। তাই ব'লে আমাদের ভোলাতে পারবে না— তোমার বিট্‌লেমি চের জানা আছে। ওমা, ওমা, ঐ দেখ্ লো ছুটকি— সেই তালের বড়ার ধামাটা।

১। তাই রাত্তিরে গিয়েছিলেন ভূত সেজে বড়া খেতে!

২। চকোত্তিমশায়, এই দেখে নাও— মিন্‌সে রান্নাঘরে ঢুকে এনেছে বড়াসুদ্ধ আমাদের ধামা চুরি ক'রে। [সকলের হাস্য

কানু মণ্ডল। সে কি হয়। যোগবল, ভাঁড়ার থেকে উড়িয়ে এনেছে।

ষষ্ঠী। ওগো বৌদিদিরা, কেন ওকে খোঁটা দিচ্ছ। ঘরের বড়া ঘরের মানুষই যদি নিয়ে এসে থাকে তাকে কি চুরি বলে।

১। ভালোমানুষের মতো যদি নিত তবে দোষ ছিল না— মা গো, সে কী দাঁত-খিঁচুনি। আমার তো দাঁতকপাটি লেগে গেল।

ষষ্ঠী। ভাই মাখন, এটা তো ভালো কর নি— গোপনে আমাকে জানালে না কেন। তালের বড়ার অভাব কী।

ফকির। গুরো!

২। (কলার ছড়ার বাকি অংশ তুলে ধ'রে) এই দেখো তোমরা। ভাঁড়ারে রেখেছিলুম ব্রাহ্মণভোজন করাব ব'লে। সকালে উঠে আর দেখতে পাই নে। দরজাও খোলা নেই, ভয়ে মরি। আমাদের এই মহাপুরুষের কীর্তি। কলা চুরি করে ধর্মকর্ম করেন!

ষষ্ঠীচরণ। (মহাক্রোধে) দেখো, এ আমি কিছুতেই সইব না। এই ভাইনি দুটোকে ঘর থেকে বিদায় করতে হবে, নইলে আমার মাখনকে টেঁকাতে পারব না। দেখছ তো মাখন? কেবল ভালোমানুষি করে দুই বৌকে কী রকম করে বিগ্‌ড়িয়ে দিয়েছ!

ফকির। সর্বনাশ! আপনারা সাংঘাতিক ভুল করছেন। আপনাদের সকলের পায়ে ধরি— আমাকে বাঁচান! হে গুরো, কী করলে তুমি।

ষষ্ঠী। না ভাই, বেকবুল যেয়ো না। ধামাটা তুমি ওদের ঘর থেকে এনেছিলে, কলার ছড়াটাও প্রায় নিকেশ করেছ। সেটাতে তোমার অপরাধ হয় নি— তবে লজ্জা পাচ্ছ কেন।

ফকির। দোহাই ধর্মের, দোহাই আপনাদের— আমি ধামাও আনি নি, কলার কাঁদিও আনি নি।

ষষ্ঠী। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে খেয়েছ তুমি। কেন এত জিদ করছ।

ফকির। খেয়েছি, কিন্তু—

বামনদাস। আবার কিন্তু কিসের!

ফকির। আমি আনি নি।

[সকলের হাস্য

পাঁচু। তুমি খাও তালের বড়া, দেয় এনে আর-এক মহাত্মা, এও তো মজা কম নয়। তাকে চেন না?

ফকির। আজ্ঞে না।

সিধু। সে চেনে না তোমাকে ?

ফকির। আজ্ঞে না।

নকুল। এ যে আরব্য উপন্যাস।

[সকলের হাস্য

ষষ্ঠী। যা হবার তা তো হয়ে গেছে, এখন ঘরে চলো।

ফকির। কার ঘরে যাব ?

১। মরি মরি, ঘর চেন না পোড়ারমুখো ! বলি, আমাদের দুটিকে চেন তো ?

ফকির। সত্যি কথা বলি, রাগ করবেন না, চিনি নে।

সকলে। ঐ লোকটার ভণ্ডামি তো সইবে না। জোর করে নিয়ে যাও ওকে ধ'রে, তালা বন্ধ করে রাখো।

ফকির। ওরে !

সকলে মিলে ঠেলাঠেলি। ওঠো, ওঠো বলছি।

সুধীর। বৌ দুটোকে এড়াতে চাও তার মানে বুঝি ; কিন্তু তোমার ছেলেমেয়ে-গুলিকে ? তোমার চারটি মেয়ে, তিনটি ছেলে, তাও ভুলেছ না কি।

ফকির। ও সর্বনাশ ! আমাকে মেরে ফেললেও এখান থেকে নড়ব না। (গাছের গুঁড়ি আঁকড়িয়ে ধ'রে) কিছুতেই না।

হরিশ উকিল। জান আমি কে ? পূর্ব-আশ্রমে জানতে। অনেক সাধুকে জেলে পাঠিয়েছি। আমি হরিশ উকিল। জান ? তোমার দুই স্ত্রী !

ফকির। এখানে এসে প্রথম জানলুম।

হরিশ। আর, তোমার চার মেয়ে তিন ছেলে।

ফকির। আপনারা জানেন, আমি কিছুই জানি নে।

হরিশ। এদের ভরণপোষণের ভার তুমি যদি না নাও, তা হলে মকদ্দমা চলবে বলে রাখলুম।

ফকির। বাপ রে ! মকদ্দমা ! পায়ে ধরি, একটু রাস্তা ছাড়ুন।

দুই স্ত্রী। যাবে কোথায়, কোন্ চুলোয়, যমের কোন্ দুয়োরে ?

ফকির। ওরে ! (হতবুদ্ধি হয়ে বসে পড়ল)

হৈমবতীর প্রবেশ ও ফকিরকে প্রণাম

ফকির। (লাফিয়ে উঠে) এ কী, এ যে হৈমবতী ! বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।

১। ওলো, ওর সেই কাশীর বৌ, এখনো মরে নি বুঝি।

মাখনকে নিয়ে পুষ্পর প্রবেশ

মাখন। ধরা দিলেম— বেওজর। লাগাও হাতকড়ি। প্রমাণের দরকার নেই। একেবারে সিধে নাকের দিকে তাকান। আমি মাখনচন্দ্র। এই আমার দড়ি আর এই আমার কল্‌সি। মা অঞ্জনা, কিষ্কিন্ধ্যায় তো ঢোকালে। মাঝে মাঝে খবর নিয়ো। নইলে বিপদে পড়লে আবার লাফ মারব।

পুষ্প। ফকিরদা, তোমার মুক্তি কোথায় সে তো এখন বুঝেছ?

ফকির। খুব বুঝেছি— এ রাস্তা আর ছাড়ছি নে।

পুষ্প। বাছা মাখন, তোমার মস্ত সুবিধে আছে— তোমার স্ফূর্তি কেউ মারতে পারবে না। এ ছুটিও নয়।

দুই স্ত্রী। ছি ছি, আর একটু হলে তো সর্বনাশ হয়েছিল! (গড় হয়ে প্রণাম ক'রে) বাঁচালে এসে।

উপন্যাস ও গল্প

লিপিকা

লিপিকা

পায়ে চলার পথ

এই তো পায়ে চলার পথ।

এসেছে বনের মধ্যে দিয়ে মাঠে, মাঠের মধ্যে দিয়ে নদীর ধারে, খেয়াঘাটের পাশে বটগাছতলায়। তার পরে ও পারের ভাঙা ঘাট থেকে বেঁকে চলে গেছে গ্রামের মধ্যে; তার পরে তিসির খেতের ধার দিয়ে, আমবাগানের ছায়া দিয়ে, পদ্মদিঘির পাড় দিয়ে, রথতলার পাশ দিয়ে কোন্ গাঁয়ে গিয়ে পৌঁচেছে জানি নে।

এই পথে কত মানুষ কেউ বা আমার পাশ দিয়ে চলে গেছে, কেউ বা সঙ্গ নিয়েছে, কাউকে বা দূর থেকে দেখা গেল; কাঁরো বা ঘোমটা আছে, কারো বা নেই; কেউ বা জল ভরতে চলেছে, কেউ বা জল নিয়ে ফিরে এল।

২

এখন দিন গিয়েছে, অন্ধকার হয়ে আসে।

একদিন এই পথকে মনে হয়েছিল আমারই পথ, একান্তই আমার; এখন দেখছি, কেবল একটিবার মাত্র এই পথ দিয়ে চলার হুকুম নিয়ে এসেছি, আর নয়।

নেবুতলা উজিয়ে সেই পুকুরপাড়, দ্বাদশ দেউলের ঘাট, নদীর চর, গোয়ালবাড়ি, ধানের গোলা পেরিয়ে— সেই চেনা চাউনি, চেনা কথা, চেনা মুখের মহলে আর একটিবারও ফিরে গিয়ে বলা হবে না, "এই যে!" এ পথ যে চলার পথ, ফেরার পথ নয়।

আজ ধূসর সন্ধ্যায় একবার পিছন ফিরে তাকালুম; দেখলুম, এই পথটি বহুবিস্মৃত পদচিহ্নের পদাবলী, ভৈরবীর সুরে বাঁধা।

যত কাল যত পথিক চলে গেছে তাদের জীবনের সমস্ত কথাকেই এই পথ আপনার একটিমাত্র ধূলিরেখায় সংক্ষিপ্ত করে এঁকেছে; সেই একটি রেখা চলেছে সূর্যোদয়ের দিক থেকে সূর্যাস্তের দিকে, এক সোনার সিংহদ্বার থেকে আর-এক সোনার সিংহদ্বারে।

৩

"ওগো পায়ে চলার পথ, অনেক কালের অনেক কথাকে তোমার ধূলিবন্ধনে বেঁধে নীরব করে রেখো না। আমি তোমার ধুলোয় কান পেতে আছি, আমাকে কানে কানে বলো।"

পথ নিশীথের কালো পর্দার দিকে তর্জনী বাড়িয়ে চুপ ক'রে থাকে।

"ওগো পায়ে চলার পথ, এত পথিকের এত ভাবনা, এত ইচ্ছা, সে-সব গেল কোথায়।"

বোবা পথ কথা কয় না। কেবল সূর্যোদয়ের দিক থেকে সূর্যাস্ত অবধি ইশারা মেলে রাখে।

"ওগো পায়ে চলার পথ, তোমার বুকের উপর যে-সমস্ত চরণপাত একদিন পুষ্পবৃষ্টির মতো পড়েছিল আজ তারা কি কোথাও নেই।"

পথ কি নিজের শেষকে জানে, যেখানে লুপ্ত ফুল আর স্তব্ধ গান পৌঁছল, যেখানে তারার আলোয় অনির্বাণ বেদনার দেয়ালি-উৎসব!

মেঘলা দিনে

রোজই থাকে সমস্তদিন কাজ, আর চার দিকে লোকজন। রোজই মনে হয়, সেদিনকার কাজে, সেদিনকার আলাপে সেদিনকার সব কথা দিনের শেষে বুঝি একেবারে শেষ করে দেওয়া হয়। ভিতরে কোন্ কথাটি যে বাকি রয়ে গেল তা বুঝে নেবার সময় পাওয়া যায় না।

আজ সকালবেলা মেঘের স্তবকে স্তবকে আকাশের বুক ভরে উঠেছে। আজও সমস্ত দিনের কাজ আছে সামনে, আর লোক আছে চার দিকে। কিন্তু, আজ মনে হচ্ছে, ভিতরে যা-কিছু আছে বাইরে তা সমস্ত শেষ করে দেওয়া যায় না।

মানুষ সমুদ্র পার হল, পর্বত ডিঙিয়ে গেল, পাতালপুরীতে সিঁধ কেটে মণিমানিক চুরি করে আনলে, কিন্তু একজনের অন্তরের কথা আর-একজনকে চুকিয়ে দিয়ে ফেলা, এ কিছুতেই পারলে না।

আজ মেঘলা দিনের সকালে সেই আমার বন্দী কথাটাই মনের মধ্যে পাখা ঝাপটে মরছে। ভিতরের মানুষ বলছে, "আমার চিরদিনের সেই আর-একজনটি কোথায়, যে আমার হৃদয়ের শ্রাবণমেঘকে ফতুর ক'রে তার সকল বৃষ্টি কেড়ে নেবে!"

আজ মেঘলা দিনের সকালে শুনতে পাচ্ছি, সেই ভিতরের কথাটা কেবলই বন্ধ দরজার শিকল নাড়ছে। ভাবছি, "কী করি। কে আছে যার ডাকে কাজের বেড়া ডিঙিয়ে এখনি আমার বাণী সুরের প্রদীপ হাতে বিশ্বের অভিসারে বেরিয়ে পড়বে। কে আছে যার চোখের একটি ইশারায় আমার সব ছড়ানো ব্যথা এক মুহূর্তে এক আনন্দে গাঁথা হবে, এক আলোতে জ্বলে উঠবে। আমার কাছে ঠিক সুরটি লাগিয়ে চাইতে পারে যে আমি তাকেই কেবল দিতে পারি। সেই আমার সর্বনেশে ভিখারি রাস্তার কোন্ মোড়ে।"

আমার ভিতরমহলের ব্যথা আজ গেরুয়াবসন পরেছে। পথে বাহির হতে চায়, সকল কাজের বাহিরের পথে, যে পথ একটিমাত্র সরল তারের একতারার মতো, কোন্ মনের মানুষের চলায় চলায় বাজছে।

বাণী

ফোটা ফোটা বৃষ্টি হয়ে আকাশের মেঘ নামে, মাটির কাছে ধরা দেবে ব'লে। তেমনি কোথা থেকে মেয়েরা আসে পৃথিবীতে বাঁধা পড়তে।

তাদের জন্য অল্প জায়গার জগৎ, অল্প মানুষের। ঐটুকুর মধ্যে আপনার সবটাকে ধরানো চাই— আপনার সব কথা, সব ব্যথা, সব ভাবনা। তাই তাদের মাথায় কাপড়, হাতে কাঁকন, আঙিনায় বেড়া। মেয়েরা হল সীমাস্বর্গের ইন্দ্রাণী।

কিন্তু, কোন্ দেবতার কৌতুকহাস্যের মতো অপরিমিত চঞ্চলতা নিয়ে আমাদের পাড়ায় ঐ ছোটো মেয়েটির জন্ম। মা তাকে রেগে বলে "দস্যি", বাপ তাকে হেসে বলে "পাগলি"।

সে পলাতকা ঝরনার জল, শাসনের পাথর ডিঙিয়ে চলে। তার মনটি যেন বেণুবনের উপরডালের পাতা, কেবলই ঝির্ ঝির্ করে কাঁপছে।

২

আজ দেখি, সেই দুরন্ত মেয়েটি বারান্দায় রেলিঙে ভর দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে, বাদলশেষের ইন্দ্রধনুটি বললেই হয়। তার বড়ো বড়ো দুটি কালো চোখ আজ অচঞ্চল, তমালের ডালে বৃষ্টির দিনে ডানাভেজা পাখির মতো।

ওকে এমন স্তব্ধ কখনো দেখি নি। মনে হল, নদী যেন চলতে চলতে এক জায়গায় এসে থমকে সরোবর হয়েছে।

৩

কিছুদিন আগে রৌদ্রের শাসন ছিল প্রখর; দিগন্তের মুখ বিবর্ণ; গাছের পাতাগুলো শুকনো, হলদে, হতাশ্বাস।

এমন সময় হঠাৎ কালো আলুথালু পাগলা মেঘ আকাশের কোণে কোণে তাঁবু ফেললে। সূর্যাস্তের একটা রক্তরশ্মি খাপের ভিতর থেকে তলোয়ারের মতো বেরিয়ে এল।

অর্ধেক রাত্রে দেখি, দরজাগুলো খড়্‌খড়্‌ শব্দে কাঁপছে। সমস্ত শহরের ঘুমটাকে ঝড়ের হাওয়া ঝুঁটি ধরে ঝাঁকিয়ে দিলে।

উঠে দেখি, গলির আলোটা ঘন বৃষ্টির মধ্যে মাতালের ঘোলা চোখের মতো দেখতে। আর, গির্জের ঘড়ির শব্দ এল যেন বৃষ্টির শব্দের চাদর মুড়ি দিয়ে।

সকালবেলায় জলের ধারা আরও ঘনিয়ে এল, রৌদ্র আর উঠল না।

৪

এই বাদলায় আমাদের পাড়ার মেয়েটি বারান্দার রেলিঙ ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে।

তার বোন এসে তাকে বললে, "মা ডাকছে।" সে কেবল সবেগে মাথা নাড়ল, তার বেণী উঠল দুলে; কাগজের নৌকো নিয়ে তার ভাই তার হাত ধরে টানলে। সে হাত ছিনিয়ে নিলে। তবু তার ভাই খেলার জন্যে টানাটানি করতে লাগল। তাকে এক থাপড় বসিয়ে দিলে।

৫

বৃষ্টি পড়ছে। অন্ধকার আরও ঘন হয়ে এল। মেয়েটি স্থির দাঁড়িয়ে।

আদিযুগে সৃষ্টির মুখে প্রথম কথা জেগেছিল জলের ভাষায়, হাওয়ার কণ্ঠে। লক্ষকোটি বছর পার হয়ে সেই স্মরণবিস্মরণের অতীত কথা আজ বাদলার কলস্বরে ঐ মেয়েটিকে এসে ডাক দিলে। ও তাই সকল বেড়ার বাইরে চলে গিয়ে হারিয়ে গেল।

কত বড়ো কাল, কত বড়ো জগৎ, পৃথিবীতে কত যুগের কত জীবলীলা! সেই সুদূর, সেই বিরাট, আজ এই দুরন্ত মেয়েটির মুখের দিকে তাকালো মেঘের ছায়ায়, বৃষ্টির কলশব্দে।

ও তাই বড়ো বড়ো চোখ মেলে নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে রইল, যেন অনন্তকালেরই প্রতিমা।

মেঘদূত

মিলনের প্রথম দিনে বাঁশি কী বলেছিল।

সে বলেছিল, "সেই মানুষ আমার কাছে এল যে মানুষ আমার দূরের।"

আর, বাঁশি বলেছিল, "ধরলেও যাকে ধরা যায় না তাকে ধরেছি, পেলেও সকল পাওয়াকে যে ছাড়িয়ে যায় তাকে পাওয়া গেল।"

তার পরে রোজ বাঁশি বাজে না কেন।

কেননা, আধখানা কথা ভুলেছি। শুধু মনে রইল, সে কাছে; কিন্তু সে যে দূরেও তা খেয়াল রইল না। প্রেমের যে আধখানায় মিলন সেইটেই দেখি, যে আধখানায় বিরহ সে চোখে পড়ে না, তাই দূরের চিরতৃপ্তিহীন দেখাটা আর দেখা যায় না; কাছের পর্দা আড়াল করেছে।

দুই মানুষের মাঝে যে অসীম আকাশ সেখানে সব চুপ, সেখানে কথা চলে না। সেই মস্ত চুপকে বাঁশির সুর দিয়ে ভরিয়ে দিতে হয়। অনন্ত আকাশের ফাঁক না পেলে বাঁশি বাজে না।

সেই আমাদের মাঝের আকাশটি আঁধিতে ঢেকেছে, প্রতি দিনের কাজে কর্মে কথায় ভরে গিয়েছে, প্রতি দিনের ভয়ভাবনা-কৃপণতায়।

২

এক-একদিন জ্যোৎস্নারাত্রে হাওয়া দেয়; বিছানার 'পরে জেগে ব'সে বুক ব্যথিয়ে ওঠে; মনে পড়ে, এই পাশের লোকটিকে তো হারিয়েছি।

এই বিরহ মিটবে কেমন করে, আমার অনন্তের সঙ্গে তার অনন্তের বিরহ।

দিনের শেষে কাজের থেকে ফিরে এসে যার সঙ্গে কথা বলি সে কে। সে তো সংসারের হাজার লোকের মধ্যে একজন; তাকে তো জানা হয়েছে, চেনা হয়েছে, সে তো ফুরিয়ে গেছে।

কিন্তু, ওর মধ্যে কোথায় সেই আমার অফুরান একজন, সেই আমার একটিমাত্র। ওকে আবার নূতন করে খুঁজে পাই কোন্ কূলহারা কামনার ধারে।

ওর সঙ্গে আবার একবার কথা বলি সময়ের কোন্ ফাঁকে, বনমল্লিকার গন্ধে নিবিড় কোন্ কর্মহীন সন্ধ্যার অন্ধকারে।

৩

এমন সময়ে নববর্ষা ছায়া-উত্তরীয় উড়িয়ে পূর্বদিগন্তে এসে উপস্থিত। উজ্জয়িনীর কবির কথা মনে পড়ে গেল। মনে হল, প্রিয়ার কাছে দূত পাঠাই।

আমার গান চলুক উড়ে, পাশে থাকার সুদূর দুর্গম নির্বাসন পার হয়ে যাক।

কিন্তু, তা হলে তাকে যেতে হবে কালের উজান-পথ বেয়ে বাঁশির ব্যথায় ভরা আমাদের প্রথম মিলনের দিনে, সেই আমাদের যে দিনটি বিশ্বের চিরবর্ষা ও চিরবসন্তের সকল গন্ধে সকল ক্রন্দনে জড়িয়ে রয়ে গেল, কেতকীবনের দীর্ঘশ্বাসে আর শালমঞ্জরীর উতলা আত্মনিবেদনে।

নির্জন দিঘির ধারে নারিকেলবনের মর্মরমুখরিত বর্ষার আপন কথাটিকেই আমার কথা করে নিয়ে প্রিয়ার কানে পৌঁছিয়ে দিক, যেখানে সে তার এলোচুলে গ্রন্থি দিয়ে, আঁচল কোমরে বেঁধে সংসারের কাজে ব্যস্ত।

৪

বহু দূরের অসীম আকাশ আজ বনরাজিনীলা পৃথিবীর শিয়রের কাছে নত হয়ে পড়ল। কানে কানে বললে, "আমি তোমারই।"

পৃথিবী বললে, "সে কেমন করে হবে। তুমি যে অসীম, আমি যে ছোটো।"

আকাশ বললে, "আমি তো চার দিকে আমার মেঘের সীমা টেনে দিয়েছি।"

পৃথিবী বললে, "তোমার যে কত জ্যোতিষ্কের সম্পদ, আমার তো আলোর সম্পদ নেই।"

আকাশ বললে, "আজ আমি আমার চন্দ্র সূর্য তারা সব হারিয়ে ফেলে এসেছি, আজ আমার একমাত্র তুমি আছ।"

পৃথিবী বললে, "আমার অশ্রুভরা হৃদয় হাওয়ায় হাওয়ায় চঞ্চল হয়ে কাঁপে, তুমি যে অবিচলিত।"

আকাশ বললে, "আমার অশ্রুও আজ চঞ্চল হয়েছে, দেখতে কি পাও নি। আমার বক্ষ আজ শ্যামল হল তোমার ঐ শ্যামল হৃদয়টির মতো।"

সে এই ব'লে আকাশ-পৃথিবীর মাঝখানকার চিরবিরহটাকে চোখের জলের গান দিয়ে ভরিয়ে দিলে।

৫

সেই আকাশ-পৃথিবীর বিবাহমন্ত্রগুঞ্জন নিয়ে নববর্ষা নামুক আমাদের বিচ্ছেদের 'পরে। প্রিয়ার মধ্যে যা অনির্বচনীয় তাই হঠাৎ-বেজে-ওঠা বীণার তারের মতো

চকিত হয়ে উঠুক। সে আপন সিঁথির 'পরে তুলে দিক দূর বনান্তের রঙটির মতো তার নীলাঞ্চল। তার কালো চোখের চাহনিতে মেঘমল্লারের সব মিড়গুলি আর্ত হয়ে উঠুক। সার্থক হোক বকুলমালা তার বেণীর বাঁকে বাঁকে জড়িয়ে উঠে।

যখন ঝিল্লীর ঝংকারে বেণুবনের অন্ধকার থরথর্ করছে, যখন বাদল-হাওয়ায় দীপশিখা কেঁপে কেঁপে নিবে গেল, তখন সে তার অতি কাছের ঐ সংসারটাকে ছেড়ে দিয়ে আসুক, ভিজে ঘাসের গন্ধে ভরা বনপথ দিয়ে, আমার নিভৃত হৃদয়ের নিশীথরাত্রে।

বাঁশি

বাঁশির বাণী চিরদিনের বাণী— শিবের জটা থেকে গঙ্গার ধারা, প্রতি দিনের মাটির বুক বেয়ে চলেছে; অমরাবতীর শিশু নেমে এল মর্ত্যের ধূলি নিয়ে স্বর্গ-স্বর্গ খেলতে।

পথের ধারে দাঁড়িয়ে বাঁশি শুনি আর মন যে কেমন করে বুঝতে পারি নে। সেই ব্যথাকে চেনা সুখদুঃখের সঙ্গে মেলাতে যাই, মেলে না। দেখি, চেনা হাসির চেয়ে সে উজ্জ্বল, চেনা চোখের জলের চেয়ে সে গভীর।

আর, মনে হতে থাকে, চেনাটা সত্য নয়, অচেনাই সত্য। মন এমন সৃষ্টিছাড়া ভাব ভাবে কী করে। কথায় তার কোনো জবাব নেই।

আজ ভোরবেলাতেই উঠে শুনি, বিয়েবাড়িতে বাঁশি বাজছে।

বিয়ের এই প্রথম দিনের সুরের সঙ্গে প্রতি দিনের সুরের মিল কোথায়। গোপন অতৃপ্তি, গভীর নৈরাশ্য; অবহেলা, অপমান, অবসাদ; তুচ্ছ কামনার কার্পণ্য, কুশ্রী নীরসতার কলহ, ক্ষমাহীন ক্ষুদ্রতার সংঘাত, অভ্যস্ত জীবনযাত্রার ধূলিলিপ্ত দারিদ্র্য— বাঁশির দৈববাণীতে এসব বার্তার আভাস কোথায়।

গানের সুর সংসারের উপর থেকে এই-সমস্ত চেনা কথার পর্দা এক টানে ছিঁড়ে ফেলে দিলে। চিরদিনকার বর-কনের শুভদৃষ্টি হচ্ছে কোন্ রক্তাংশুকের সলজ্জ অবগুণ্ঠনতলে, তাই তার তানে তানে প্রকাশ হয়ে পড়ল।

যখন সেখানকার মালাবদলের গান বাঁশিতে বেজে উঠল তখন এখানকার এই কনেটির দিকে চেয়ে দেখলেম; তার গলায় সোনার হার, তার পায়ে দুগাছি মল, সে যেন কান্নার সরোবরে আনন্দের পদ্মটির উপরে দাঁড়িয়ে।

সুরের ভিতর দিয়ে তাকে সংসারের মানুষ ব'লে আর চেনা গেল না। সেই চেনা ঘরের মেয়ে অচিন ঘরের বউ হয়ে দেখা দিলে।

বাঁশি বলে, এই কথাই সত্য।

সন্ধ্যা ও প্রভাত

এখানে নামল সন্ধ্যা। সূর্যদেব, কোন্ দেশে, কোন্ সমুদ্রপারে, তোমার প্রভাত হল।

অন্ধকারে এখানে কেঁপে উঠছে রজনীগন্ধা, বাসরঘরের দ্বারের কাছে অবগুণ্ঠিতা নববধূর মতো; কোন্‌খানে ফুটল ভোরবেলাকার কনকচাঁপা।

জাগল কে। নিবিয়ে দিল সন্ধ্যায়-জ্বালানো দীপ, ফেলে দিল রাত্রে-গাঁথা সেঁউতিফুলের মালা।

এখানে একে একে দরজায় আগল পড়ল, সেখানে জানলা গেল খুলে। এখানে নৌকো ঘাটে বাঁধা, মাঝি ঘুমিয়ে; সেখানে পালে লেগেছে হাওয়া।

ওরা পান্থশালা থেকে বেরিয়ে পড়েছে, পুবের দিকে মুখ করে চলেছে; ওদের কপালে লেগেছে সকালের আলো, ওদের পারানির কড়ি এখনো ফুরোয় নি; ওদের জন্যে পথের ধারের জানলায় জানলায় কালো চোখের করুণ কামনা অনিমেষ চেয়ে আছে; রাস্তা ওদের সামনে নিমন্ত্রণের রাঙা চিঠি খুলে ধরলে, বললে, "তোমাদের জন্যে সব প্রস্তুত।"

ওদের হৃৎপিণ্ডের রক্তের তালে তালে জয়ভেরী বেজে উঠল।

এখানে সবাই ধূসর আলোয় দিনের শেষ খেয়া পার হল।

পান্থশালার আঙিনায় এরা কাঁথা বিছিয়েছে; কেউ বা একলা, কারো বা সঙ্গী ক্লান্ত; সামনের পথে কী আছে অন্ধকারে দেখা গেল না, পিছনের পথে কী ছিল কানে কানে বলাবলি করছে; বলতে বলতে কথা বেধে যায়, তার পরে চুপ করে থাকে; তার পরে আঙিনা থেকে উপরে চেয়ে দেখে, আকাশে উঠেছে সপ্তর্ষি।

সূর্যদেব, তোমার বামে এই সন্ধ্যা, তোমার দক্ষিণে ঐ প্রভাত, এদের তুমি মিলিয়ে দাও। এর ছায়া ওর আলোটিকে একবার কোলে তুলে নিয়ে চুম্বন করুক, এর পূরবী ওর বিভাসকে আশীর্বাদ করে চলে যাক।

পুরোনো বাড়ি

অনেক কালের ধনী গরিব হয়ে গেছে, তাদেরই ঐ বাড়ি।

দিনে দিনে ওর উপরে দুঃসময়ের আঁচড় পড়ছে।

দেয়াল থেকে বালি খসে পড়ে, ভাঙা মেঝে নখ দিয়ে খুঁড়ে চড়ুইপাখি ধুলোয় পাখা ঝাপট দেয়, চণ্ডীমণ্ডপে পায়রাগুলো বাদলের ছিন্ন মেঘের মতো দল বাঁধল।

উত্তর দিকের এক পাল্লা দরজা কবে ভেঙে পড়েছে কেউ খবর নিলে না। বাকি দরজাটা, শোকাতুরা বিধবার মতো, বাতাসে ক্ষণে ক্ষণে আছাড় খেয়ে পড়ে— কেউ তাকিয়ে দেখে না।

তিন মহল বাড়ি। কেবল পাঁচটি ঘরে মানুষের বাস, বাকি সব বন্ধ। যেন পঁচাশি বছরের বুড়ো, তার জীবনের সবখানি জুড়ে সেকালের কুলুপ-লাগানো স্মৃতি, কেবল একখানিতে একালের চলাচল।

বালি-খসা ইঁট-বের-করা বাড়িটা তালি-দেওয়া-কাঁথা-পরা উদাসীন পাগলার মতো রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে; আপনাকেও দেখে না, অন্যকেও না।

২

একদিন ভোররাত্রে ঐ দিকে মেয়ের গলায় কান্না উঠল। শুনি, বাড়ির যেটি শেষ ছেলে, শখের যাত্রায় রাধিকা সেজে যার দিন চলত, সে আজ আঠারো বছরে মারা গেল।

ক'দিন মেয়েরা কাঁদল, তার পরে তাদের আর খবর নেই।

তার পরে সকল দরজাতেই তালা পড়ল।

কেবল উত্তর দিকের সেই একখানা অনাথা দরজা ভাঙেও না, বন্ধও হয় না; ব্যথিত হৃৎপিণ্ডের মতো বাতাসে ধড়াস ধড়াস করে আছাড় খায়।

৩

একদিন সেই বাড়িতে বিকেলে ছেলেদের গোলমাল শোনা গেল।

দেখি, বারান্দা থেকে লালপেড়ে শাড়ি ঝুলছে।

অনেক দিন পরে বাড়ির এক অংশে ভাড়াটে এসেছে। তার মাইনে অল্প, ছেলে-মেয়ে বিস্তর। শ্রান্ত মা বিরক্ত হয়ে তাদের মারে, তারা মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদে।

একটা আধাবয়সী দাসী সমস্ত দিন খাটে, আর গৃহিণীর সঙ্গে ঝগড়া করে; বলে 'চললুম', কিন্তু যায় না।

৪

বাড়ির এই ভাগটায় রোজ একটু-আধটু মেরামত চলছে।

ফাটা সাসির উপর কাগজ আঁটা হল ; বারান্দায় রেলিঙের ফাঁকগুলোতে বাঁখারি বেঁধে দিলে ; শোবার ঘরে ভাঙা জানলা ইঁট দিয়ে ঠেকিয়ে রাখলে ; দেয়ালে চুনকাম হল, কিন্তু কালো ছাপগুলোর আভাস ঢাকা পড়ল না।

ছাদে আলসের 'পরে গামলায় একটা রোগা পাতাবাহারের গাছ হঠাৎ দেখা দিয়ে আকাশের কাছে লজ্জা পেলে। তার পাশেই ভিত ভেদ করে অশথ গাছটি সিধে দাঁড়িয়ে ; তার পাতাগুলো এদের দেখে যেন খিল্‌খিল্‌ করে হাসতে লাগল।

মস্ত ধনের মস্ত দারিদ্র্য। তাকে ছোটো হাতের ছোটো কৌশলে ঢাকা দিতে গিয়ে তার আবরু গেল।

কেবল উত্তর দিকের উজাড় ঘরটির দিকে কেউ তাকায় নি। তার সেই ভোড়ভাঙা দরজা আজও কেবল বাতাসে আছড়ে পড়ছে, হতভাগার বুক-চাপড়ানির মতো।

গলি

আমাদের এই শানবাঁধানো গলি, বারে বারে ডাইনে বাঁয়ে এঁকে বেঁকে একদিন কী যেন খুঁজতে বেরিয়েছিল। কিন্তু, সে যে দিকেই যায় ঠেকে যায়। এ দিকে বাড়ি, ও দিকে বাড়ি, সামনে বাড়ি।

উপরের দিকে যেটুকু নজর চলে তাতে সে একখানি আকাশের রেখা দেখতে পায়— ঠিক তার নিজেরই মতো সরু, তার নিজেরই মতো বাঁকা।

সেই ছাঁটা আকাশটাকে জিজ্ঞাসা করে, "বলো তো দিদি, তুমি কোন্ নীল শহরের গলি।"

দুপুরবেলায় কেবল একটুখনের জন্যে সে সূর্যকে দেখে আর মনে মনে বলে, "কিছুই বোঝা গেল না।"

বর্ষামেঘের ছায়া দুইসার বাড়ির মধ্যে ঘন হয়ে ওঠে, কে যেন গলির খাতা থেকে তার আলোটাকে পেন্সিলের আঁচড় দিয়ে কেটে দিয়েছে। বৃষ্টির ধারা শানের উপর দিয়ে গড়িয়ে চলে, বর্ষা ডমরু বাজিয়ে যেন সাপ খেলাতে থাকে। পিছল হয়, পথিকদের ছাতায় ছাতায় বেধে যায়, ছাদের উপর থেকে ছাতার উপরে হঠাৎ নালার জল লাফিয়ে প'ড়ে চমকিয়ে দিতে থাকে।

গলিটা অভিভূত হয়ে বলে, "ছিল খট্‌খটে শুকনো, কোনো বালাই ছিল না। কিন্তু, কেন অকারণে এই ধারাবাহী উৎপাত।"

ফাল্গুনে দক্ষিণের হাওয়াকে গলির মধ্যে লক্ষ্মীছাড়ার মতো দেখতে হয়; ধুলো আর ছেঁড়া কাগজগুলো এলোমেলো উড়তে থাকে। গলি হতবুদ্ধি হয়ে বলে, "এ কোন্ পাগলা দেবতার মাৎলামি।"

তার ধারে ধারে প্রতিদিন যে-সব আবর্জনা এসে জমে—মাছের আঁশ, চুলোর ছাই, তরকারির খোসা, মরা ইঁদুর, সে জানে এই-সব হচ্ছে বাস্তব। কোনোদিন ভুলেও ভাবে না, "এ সমস্ত কেন।"

অথচ, শরতের রোদ্দুর যখন উপরের বারান্দায় আড় হয়ে পড়ে, যখন পুজোর নহবত ভৈরবীতে বাজে, তখন ক্ষণকালের জন্যে তার মনে হয়, "এই শানবাঁধা লাইনের বাইরে মস্ত একটা কিছু আছে বা!"

এ দিকে বেলা বেড়ে যায়; ব্যস্ত গৃহিণীর আঁচলটার মতো বাড়িগুলোর কাঁধের উপর থেকে রোদ্দুরখানা গলির ধারে খসে পড়ে; ঘড়িতে ন'টা বাজে; ঝি কোমরে ঝুড়ি করে বাজার নিয়ে আসে; রান্নার গন্ধে আর ধোঁয়ায় গলি ভরে যায়; যারা আপিসে যায় তারা ব্যস্ত হতে থাকে।

গলি তখন আবার ভাবে, "এই শানবাঁধা লাইনের মধ্যেই সব সত্য। আর, যাকে মনে ভাবছি মস্ত একটা কিছু সে মস্ত একটা স্বপ্ন।"

একটি চাউনি

গাড়িতে ওঠবার সময় একটুখানি মুখ ফিরিয়ে সে আমাকে তার শেষ চাউনিটি দিয়ে গেছে।

এই মস্ত সংসারে ঐটুকুকে আমি রাখি কোন্‌খানে।

দণ্ড পল মুহূর্ত অহরহ পা ফেলবে না, এমন একটু জায়গা আমি পাই কোথায়।

মেঘের সকল সোনার রঙ যে সন্ধ্যায় মিলিয়ে যায় এই চাউনি কি সেই সন্ধ্যায় মিলিয়ে যাবে। নাগকেশরের সকল সোনালি রেণু যে বৃষ্টিতে ধুয়ে যায় এও কি সেই বৃষ্টিতেই ধুয়ে যাবে।

সংসারের হাজার জিনিসের মাঝখানে ছড়িয়ে থাকলে এ থাকবে কেন—হাজার কথার আবর্জনায়, হাজার বেদনার স্তূপে।

তার ঐ এক চকিতের দান সংসারের আর-সমস্তকে ছাড়িয়ে আমারই হাতে এসে পৌঁচেছে। এ'কে আমি রাখব গানে গেঁথে, ছন্দে বেঁধে ; আমি এ'কে রাখব সৌন্দর্যের অমরাবতীতে।

পৃথিবীতে রাজার প্রতাপ, ধনীর ঐশ্বর্য হয়েছে মরবারই জন্যে। কিন্তু, চোখের জলে কি সেই অমৃত নেই যাতে এক নিমেষের চাউনিকে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখতে পারে।

গানের সুর বললে, "আচ্ছা, আমাকে দাও। আমি রাজার প্রতাপকে স্পর্শ করি নে, ধনীর ঐশ্বর্যকেও না, কিন্তু ঐ ছোটো জিনিসগুলিই আমার চিরদিনের ধন ; ঐগুলি দিয়েই আমি অসীমের গলার হার গাঁথি।"

একটি দিন

মনে পড়ছে সেই দুপুরবেলাটি। ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টিধারা ক্লান্ত হয়ে আসে, আবার দমকা হাওয়া তাকে মাতিয়ে তোলে।

ঘরে অন্ধকার, কাজে মন যায় না। যন্ত্রটা হাতে নিয়ে বর্ষার গানে মল্লারের সুর লাগালেম।

পাশের ঘর থেকে একবার সে কেবল দুয়ার পর্যন্ত এল। আবার ফিরে গেল। আবার একবার বাইরে এসে দাঁড়াল। তার পরে ধীরে ধীরে ভিতরে এসে বসল। হাতে তার সেলাইয়ের কাজ ছিল, মাথা নিচু করে সেলাই করতে লাগল। তার পরে সেলাই বন্ধ ক'রে জানলার বাইরে ঝাপসা গাছগুলোর দিকে চেয়ে রইল।

বৃষ্টি ধরে এল, আমার গান থামল। সে উঠে চুল বাঁধতে গেল।

এইটুকু ছাড়া আর কিছুই না। বৃষ্টিতে গানেতে অকাজে আঁধারে জড়ানো কেবল সেই একটি দুপুরবেলা।

ইতিহাসে রাজাবাদশার কথা, যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী, সস্তা হয়ে ছড়াছড়ি যায়। কিন্তু, একটি দুপুরবেলার ছোটো একটু কথার টুকরো দুর্লভ রত্নের মতো কালের কৌটোর মধ্যে লুকোনো রইল, দুটি লোক তার খবর জানে।

কৃতঘ্ন শোক

ভোরবেলায় সে বিদায় নিলে।

আমার মন আমাকে বোঝাতে বসল, "সবই মায়া।"

আমি রাগ করে বললেম, "এই তো টেবিলে সেলাইয়ের বাক্স, ছাতে ফুলগাছের টব, খাটের উপর নাম-লেখা হাতপাখাখানি— সবই তো সত্য।"

মন বললে, "তবু ভেবে দেখো—"

আমি বললেম, "থামো তুমি। ঐ দেখো-না গল্পের বইখানি, মাঝের পাতায় একটি চুলের কাঁটা, সবটা পড়া শেষ হয় নি; এও যদি মায়া হয়, সে এর চেয়েও বেশি মায়া হল কেন।"

মন চুপ করলে। বন্ধু এসে বললেন, "যা ভালো তা সত্য, তা কখনো যায় না; সমস্ত জগৎ তাকে রত্নের মতো বুকের হারে গেঁথে রাখে।"

আমি রাগ করে বললেম, "কী করে জানলে। দেহ কি ভালো নয়। সে দেহ গেল কোন্‌খানে।"

ছোটো ছেলে যেমন রাগ ক'রে মাকে মারে তেমনি করেই বিশ্বে আমার যা-কিছু আশ্রয় সমস্তকেই মারতে লাগলেম। বললেম, "সংসার বিশ্বাসঘাতক।"

হঠাৎ চমকে উঠলেম। মনে হল কে বললে, "অকৃতজ্ঞ!"

জানলার বাইরে দেখি ঝাউগাছের আড়ালে তৃতীয়ার চাঁদ উঠছে, যে গেছে যেন তারই হাসির লুকোচুরি। তারা-ছিটিয়ে-দেওয়া অন্ধকারের ভিতর থেকে একটি ভর্ৎসনা এল, "ধরা দিয়েছিলেম সেটাই কি ফাঁকি, আর আড়াল পড়েছে এইটেকেই এত জোরে বিশ্বাস?"

সতেরো বছর

আমি তার সতেরো বছরের জানা।

কত আসাযাওয়া, কত দেখাদেখি, কত বলাবলি; তারই আশেপাশে কত স্বপ্ন, কত অনুমান, কত ইশারা; তারই সঙ্গে সঙ্গে কখনো বা ভোরের ভাঙা ঘুমে শুকতারার আলো, কখনো বা আষাঢ়ের ভরসন্ধ্যায় চামেলিফুলের গন্ধ, কখনো বা বসন্তের শেষ প্রহরে ক্লান্ত নহবতের পিলুবারোয়াঁ; সতেরো বছর ধরে এই-সব গাঁথা পড়েছিল তার মনে।

আর, তারই সঙ্গে মিলিয়ে সে আমার নাম ধরে ডাকত। ঐ নামে যে মানুষ সাড়া দিত সে তো একা বিধাতার রচনা নয়। সে যে তারই সতেরো বছরের জানা দিয়ে গড়া; কখনো আদরে কখনো অনাদরে, কখনো কাজে কখনো অকাজে, কখনো সবার সামনে কখনো একলা আড়ালে, কেবল একটি লোকের মনে মনে জানা দিয়ে গড়া সেই মানুষ।

তার পরে আরও সতেরো বছর যায়। কিন্তু এর দিনগুলি, এর রাতগুলি, সেই নামের রাখিবন্ধনে আর তো এক হয়ে মেলে না, এরা ছড়িয়ে পড়ে।

তাই এরা রোজ আমাকে জিজ্ঞাসা করে, "আমরা থাকব কোথায়। আমাদের ডেকে নিয়ে ঘিরে রাখবে কে।"

আমি তার কোনো জবাব দিতে পারি নে, চুপ করে বসে থাকি আর ভাবি। আর, ওরা বাতাসে উড়ে চলে যায়। বলে, "আমরা খুঁজতে বেরোলেম।"

"কাকে।"

কাকে সে এরা জানে না। তাই কখনো যায় এ দিকে, কখনো যায় ও দিকে; সন্ধ্যাবেলাকার খাপছাড়া মেঘের মতো অন্ধকারে পাড়ি দেয়, আর দেখতে পাই নে।

প্রথম শোক

বনের ছায়াতে যে পথটি ছিল সে আজ ঘাসে ঢাকা।

সেই নির্জনে হঠাৎ পিছন থেকে কে বলে উঠল, "আমাকে চিনতে পার না?"

আমি ফিরে তার মুখের দিকে তাকালেম। বললেম, "মনে পড়ছে, কিন্তু ঠিক নাম করতে পারছি নে।"

সে বললে, "আমি তোমার সেই অনেক কালের, সেই পঁচিশ বছর বয়সের শোক।"

তার চোখের কোণে একটু ছল্‌ছলে আভা দেখা দিলে, যেন দিঘির জলে চাঁদের রেখা।

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেম। বললেম, "সেদিন তোমাকে শ্রাবণের মেঘের মতো কালো দেখেছি, আজ যে দেখি আশ্বিনের সোনার প্রতিমা। সেদিনকার সব চোখের জল কি হারিয়ে ফেলেছ।"

কোনো কথাটি না বলে সে একটু হাসলে; বুঝলেম, সবটুকু রয়ে গেছে ঐ হাসিতে। বর্ষার মেঘ শরতে শিউলিফুলের হাসি শিখে নিয়েছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলেম, "আমার সেই পঁচিশ বছরের যৌবনকে কি আজও তোমার কাছে রেখে দিয়েছ।"

সে বললে, "এই দেখো-না আমার গলার হার।"

দেখলেম, সেদিনকার বসন্তের মালার একটি পাপড়িও খসে নি।

আমি বললেম, "আমার আর তো সব জীর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু তোমার গলায় আমার সেই পঁচিশ বছরের যৌবন আজও তো ম্লান হয় নি।"

আস্তে আস্তে সেই মালাটি নিয়ে সে আমার গলায় পরিয়ে দিলে। বললে, "মনে আছে? সেদিন বলেছিলে, তুমি সান্ত্বনা চাও না, তুমি শোককেই চাও।"

লজ্জিত হয়ে বললেম, "বলেছিলেম। কিন্তু, তার পরে অনেক দিন হয়ে গেল, তার পরে কখন ভুলে গেলেম।"

সে বললে, "যে অন্তর্যামীর বর, তিনি তো ভোলেন নি। আমি সেই অবধি ছায়াতলে গোপনে বসে আছি। আমাকে বরণ করে নাও।"

আমি তার হাতখানি আমার হাতে তুলে নিয়ে বললেম, "এ কী তোমার অপরূপ মূর্তি।"

সে বললে, "যা ছিল শোক, আজ তাই হয়েছে শান্তি।"

প্রশ্ন

শ্মশান হতে বাপ ফিরে এল।

তখন সাত বছরের ছেলেটি— গা খোলা, গলায় সোনার তাবিজ— একলা গলির উপরকার জানলার ধারে।

কী ভাবছে তা সে আপনি জানে না।

সকালের রৌদ্র সামনের বাড়ির নিম গাছটির আগডালে দেখা দিয়েছে; কাঁচা-আম-ওয়ালা গলির মধ্যে এসে হাঁক দিয়ে দিয়ে ফিরে গেল।

বাবা এসে খোকাকে কোলে নিলে; খোকা জিজ্ঞাসা করলে, "মা কোথায়।"

বাবা উপরের দিকে মাথা তুলে বললে, "স্বর্গে।"

২

সে রাত্রে শোকে শ্রান্ত বাপ, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ক্ষণে ক্ষণে গুমরে উঠছে।

দুয়ারে লণ্ঠনের মিট্‌মিটে আলো, দেয়ালের গায়ে একজোড়া টিকটিকি।

সামনে খোলা ছাদ, কখন খোকা সেইখানে এসে দাঁড়াল।

চারি দিকে আলো-নেবানো বাড়িগুলো যেন দৈত্যপুরীর পাহারাওয়ালা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমচ্ছে।

উলঙ্গ গায়ে খোকা আকাশের দিকে তাকিয়ে।

তার দিশাহারা মন কাকে জিজ্ঞাসা করছে, "কোথায় স্বর্গের রাস্তা।"

আকাশে তার কোনো সাড়া নেই; কেবল তারায় তারায় বোবা অন্ধকারের চোখের জল।

২

গল্প

ছেলেটির যেমনি কথা ফুটল অমনি সে বললে, "গল্প বলো।"

দিদিমা বলতে শুরু করলেন, "এক রাজপুত্তুর, কোটালের পুত্তুর, সদাগরের পুত্তুর—"

গুরুমশায় হেঁকে বললেন, "তিন-চারে বারো।"

কিন্তু তখন তার চেয়ে বড়ো হাঁক দিয়েছে রাক্ষসটা "হাঁউ মাঁউ খাঁউ"— নামতার হুংকার ছেলেটার কানে পৌঁছয় না।

যারা হিতৈষী তারা ছেলেকে ঘরে বন্ধ ক'রে গম্ভীর স্বরে বললে, "তিন-চারে বারো এটা হল সত্য; আর রাজপুত্তুর, কোটালের পুত্তুর, সওদাগরের পুত্তুর, ওটা হল মিথ্যে, অতএব— "

ছেলেটির মন তখন সেই মানসচিত্রের সমুদ্র পেরিয়ে গেছে মানচিত্রে যার ঠিকানা মেলে না; তিন-চারে বারো তার পিছে পিছে পাড়ি দিতে যায়, কিন্তু সেখানে ধারাপাতের হালে পানি পায় না।

হিতৈষী মনে করে, নিছক দুষ্টমি, বেতের চোটে শোধন করা চাই।

দিদিমা গুরুমশায়ের গতিক দেখে চুপ। কিন্তু আপদ বিদায় হতে চায় না, এক যায় তো আর আসে। কথক এসে আসন জুড়ে বসলেন। তিনি শুরু করে দিলেন এক রাজপুত্রের বনবাসের কথা।

যখন রাক্ষসীর নাক কাটা চলছে তখন হিতৈষী বললেন, "ইতিহাসে এর কোনো প্রমাণ নেই; যার প্রমাণ পথে ঘাটে সে হচ্ছে, তিন-চারে বারো।"

ততক্ষণে হনুমান লাফ দিয়েছে আকাশে, অত ঊর্ধ্বে ইতিহাস তার সঙ্গে কিছুতেই পাল্লা দিতে পারে না। পাঠশালা থেকে ইস্কুলে, ইস্কুল থেকে কলেজে ছেলের মনকে পুটপাকে শোধন করা চলতে লাগল। কিন্তু যতই চোলাই করা যাক, ঐ কথাটুকু কিছুতেই মরতে চায় না "গল্প বলো"।

২

এর থেকে দেখা যায়, শুধু শিশুবয়সে নয়, সকল বয়সেই মানুষ গল্পপোষ্য জীব। তাই পৃথিবী জুড়ে মানুষের ঘরে ঘরে, যুগে যুগে, মুখে মুখে, লেখায় লেখায়, গল্প যা জমে উঠেছে তা মানুষের সকল সঞ্চয়কেই ছাড়িয়ে গেছে।

হিতৈষী একটা কথা ভালো করে ভেবে দেখে না, গল্পরচনার নেশাই হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার সবশেষের নেশা : তাঁকে শোধন করতে না পারলে মানুষকে শোধন করার আশা করা যায় না।

একদিন তিনি তাঁর কারখানাঘরে আগুন থেকে জল, জল থেকে মাটি গড়তে লেগে গিয়েছিলেন। সৃষ্টি তখন গলদ্‌ঘর্ম, বাষ্পভারাকুল। ধাতুপাথরের পিণ্ডগুলো তখন থাকে থাকে গাঁথা হচ্ছে ; চার দিকে মাল মসলা ছড়ানো আর দমাদম পিটনি। সেদিন বিধাতাকে দেখলে কোনোমতে মনে করা যেতে পারত না যে, তাঁর মধ্যে কোথাও কিছু ছেলেমানুষি আছে। তখনকার কাণ্ডকারখানা যাকে বলে 'সারবান'।

তার পরে কখন শুরু হল প্রাণের পত্তন। জাগল ঘাস, উঠল গাছ, ছুটল পশু, উড়ল পাখি। কেউ বা মাটিতে বাঁধা থেকে আকাশে অঞ্জলি পেতে দাঁড়াল, কেউ বা ছাড়া পেয়ে পৃথিবীময় আপনাকে বহুধা বিস্তার করে চলল, কেউ বা জলের যবনিকাতলে নিঃশব্দ নৃত্যে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে ব্যস্ত, কেউ বা আকাশে ডানা মেলে সূর্যালোকের বেদীতলে গানের অর্ঘ্যরচনায় উৎসুক। এখন থেকেই ধরা পড়তে লাগল বিধাতার মনের চাঞ্চল্য।

এমন করে বহু যুগ কেটে যায়। হঠাৎ এক সময়ে কোন্‌ খেয়ালে সৃষ্টিকর্তার কারখানায় উনপঞ্চাশ পবনের তলব পড়ল। তাদের সবক'টাকে নিয়ে তিনি মানুষ গড়লেন। এত দিন পরে আরম্ভ হল তাঁর গল্পের পালা। বহুকাল কেটেছে তাঁর বিজ্ঞানে, কারুশিল্পে ; এইবার তাঁর শুরু হল সাহিত্য।

মানুষকে তিনি গল্পে গল্পে ফুটিয়ে তুলতে লাগলেন। পশুপাখির জীবন হল আহার নিদ্রা সন্তানপালন ; মানুষের জীবন হল গল্প। কত বেদনা, কত ঘটনা ; সুখদুঃখ রাগবিরাগ ভালোমন্দের কত ঘাতপ্রতিঘাত। ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার, একের সঙ্গে দশের, সাধনার সঙ্গে স্বভাবের, কামনার সঙ্গে ঘটনার সংঘাতে কত আবর্তন। নদী যেমন জলস্রোতের ধারা, মানুষ তেমনি গল্পের প্রবাহ। তাই পরস্পর দেখা হতেই প্রশ্ন এই, "কী হল হে, কী খবর, তার পরে ?" এই 'তার পরে'র সঙ্গে 'তার পরে' বোনা হয়ে পৃথিবী জুড়ে মানুষের গল্প গাঁথা হচ্ছে। তাকেই বলি জীবনের কাহিনী, তাকেই বলি মানুষের ইতিহাস।

বিধাতার-রচা ইতিহাস আর মানুষের-রচা কাহিনী, এই দুইয়ে মিলে মানুষের সংসার। মানুষের পক্ষে কেবল-যে অশোকের গল্প, আকবরের গল্পই সত্য তা নয় ; যে রাজপুত্র সাত-সমুদ্র-পারে সাত-রাজার-ধন মানিকের সন্ধানে চলে সেও সত্য ; আর সেই ভক্তিবিমুগ্ধ হনুমানের সরল বীরত্বের কথাও সত্য যে হনুমান গন্ধমাদনকে

উৎপাটিত করে আনতে সংশয় বোধ করে না। এই মানুষের পক্ষে আয়ুষ্ঠেব যেমন সত্য দুর্যোধনও তেমনি সত্য। কোন্‌টার প্রমাণ বেশি, কোন্‌টার প্রমাণ কম, সে হিসাবে নয়; কেবল গল্প হিসাবে কোন্‌টা খাঁটি, সেইটেই তার পক্ষে সবচেয়ে সত্য।

মানুষ বিধাতার সাহিত্যলোকেই মানুষ; সুতরাং না সে বস্তুতে গড়া, না তত্ত্বে— অনেক চেষ্টা করে হিতৈষী কোনোমতেই এই কথা মানুষকে ভোলাতে পারলে না। অবশেষে হয়রান হয়ে হিতকথার সঙ্গে গল্পের সন্ধিস্থাপন করতে সে চেষ্টা করে, কিন্তু চিরকালের স্বভাবদোষে কিছুতে জোড়া মেলাতে পারে না। তখন গল্পও যায় কেটে, হিতকথাও পড়ে খ'সে, আবর্জনা জমে ওঠে।

মীনু

মীনু পশ্চিমে মানুষ হয়েছে। ছেলেবেলায় ইদারার ধারে তুঁতের গাছে লুকিয়ে ফল পাড়তে যেত; আর অড়রখেতে যে বুড়ো মালী ঘাস নিড়োত তার সঙ্গে ওর ছিল ভাব।

বড়ো হয়ে জৌনপুরে হল ওর বিয়ে। একটি ছেলে হয়ে মারা গেল, তার পরে ডাক্তার বললে, "এও বাঁচে কি না-বাঁচে।"

তখন তাকে কলকাতায় নিয়ে এল।

ওর অল্প বয়েস। কাঁচা ফলটির মতো ওর কাঁচা প্রাণ পৃথিবীর বোঁটা শক্ত করে আঁকড়ে ছিল। যা-কিছু কচি, যা-কিছু সবুজ, যা-কিছু সজীব, তার 'পরেই ওর বড়ো টান।

আঙিনায় তার আট-দশ হাত জমি, সেইটুকুতে তার বাগান।

এই বাগানটি ছিল যেন তার কোলের ছেলে। তারই বেড়ার 'পরে যে ঝুমকোলতা লাগিয়েছিল। এইবার সেই লতায় কুঁড়ির আভাস দিতেই সে চলে এসেছে।

পাড়ার সমস্ত পোষা এবং না-পোষা কুকুরের অন্ন আর আদর ওরই বাড়িতে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে যেটিকে সে ভালোবাসত তার নাক ছিল থ্যাবা, তার নাম ছিল ভোঁতা।

তারই গলায় পরাবে বলে মীনু রঙিন পুঁতির মালা গাঁথতে বসেছিল। সেটা শেষ হল না। যার কুকুর সে বললে, "বউদিদি, এটিকে তুমি নিয়ে যাও।"

মীনুর স্বামী বললে, "বড়ো হাঙ্গাম, কাজ নেই।"

২

কলকাতার বাসায় দোতলার ঘরে মীনু শুয়ে থাকে। হিন্দুস্থানি দাই কাছে-বসে কী কী বকে; সে খানিক শোনে, খানিক শোনে না।

একদিন সারারাত মীনুর ঘুম ছিল না। ভোরের আঁধার একটু যেই ফিকে হল সে দেখতে পেলে, তার জানলার নিচেকার গোলকচাঁপার গাছটি ফুলে ভরে উঠেছে। তার একটু মৃদুগন্ধ মীনুর জানলার কাছটিতে এসে যেন জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কেমন আছ।"

ওদের বাসা আর পাশের বাড়িটার অল্প একটুখানি ফাঁকের মধ্যে ঐ রৌদ্রের কাঙাল গাছটি, বিশ্বপ্রকৃতির এই হাবা ছেলে, কেমন করে এসে প'ড়ে যেন বিভ্রান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ক্লান্ত মীনু বেলায় উঠত। উঠেই সেই গাছটির দিকে চেয়ে দেখত, সেদিনের মতো আর তো তেমন ফুল দেখা যায় না। দাইকে বলত, "আহা দাই, মাথা খা, এই গাছের তলাটি খুঁড়ে দিয়ে রোজ একটু জল দিস।"

এই গাছে কেন-যে কদিন ফুল দেখা যায় নি, একটু পরেই বোঝা গেল।

সকালের আলো তখন আধফোটা পদ্মের মতো সবে জাগছে, এমন সময় সাজি হাতে পূজারি ব্রাহ্মণ গাছটাকে ঝাঁকানি দিতে লাগল, যেন খাজনা আদায়ের জন্যে বর্গির পেয়াদা।

মীনু দাইকে বললে, "শীঘ্র ঐ ঠাকুরকে একবার ডেকে আন্।"

ব্রাহ্মণ আসতেই মীনু তাকে প্রণাম করে বললে, "ঠাকুর, ফুল নিচ্ছ কার জন্যে।"

ব্রাহ্মণ বললে, "দেবতার জন্যে।"

মীনু বললে, "দেবতা তো ঐ ফুল স্বয়ং আমাকে পাঠিয়েছেন।"

"তোমাকে!"

"হাঁ, আমাকে। তিনি যা দিয়েছেন সে তো ফিরিয়ে নেবেন ব'লে দেন নি।"

ব্রাহ্মণ বিরক্ত হয়ে চলে গেল।

পরের দিন ভোরে আবার সে যখন গাছ নাড়া দিতে শুরু করলে তখন মীনু তার দাইকে বললে, "ও দাই, এ তো আমি চোখে দেখতে পারি নে। পাশের ঘরের জানলার কাছে আমার বিছানা করে দে।"

৩

পাশের ঘরের জানলার সামনে রায়চৌধুরীদের চৌতলা বাড়ি। মীনু তার স্বামীকে ডাকিয়ে এনে বললে, "ঐ দেখো, দেখো, ওদের কী সুন্দর ছেলেটি। ওকে একটিবার আমার কোলে এনে দাও-না।"

স্বামী বললে, "গরিবের ঘরে ছেলে পাঠাবে কেন।"

মীনু বললে, "শোনো একবার! ছোটো ছেলের বেলায় কি ধনী-গরিবের ভেদ আছে। সবার কোলেই ওদের রাজসিংহাসন।"

স্বামী ফিরে এসে খবর দিলে, "দরোয়ান বললে, বাবুর সঙ্গে দেখা হবে না।"

পরের দিন বিকেলে মীনু দাইকে ডেকে বললে, "ঐ চেয়ে দেখ্, বাগানে একলা বসে খেলছে। দৌড়ে যা, ওর হাতে এই সন্দেশটি দিয়ে আয়।"

সন্ধ্যাবেলায় স্বামী এসে বললে, "ওরা রাগ করেছে।"

"কেন, কী হয়েছে।"

"ওরা বলেছে, দাই যদি ওদের বাগানে যায় তো পুলিশে ধরিয়ে দেবে।"

এক মুহূর্তে মীনুর দুই চোখ জলে ভেসে গেল। সে বললে, "আমি দেখেছি, দেখেছি, ওর হাত থেকে ওরা আমার সন্দেশ ছিনিয়ে নিলে। নিয়ে ওকে মারলে। এখানে আমি বাঁচব না। আমাকে নিয়ে যাও।"

নামের খেলা

প্রথম বয়সেই সে কবিতা লিখতে শুরু করে।

বহু যত্নে খাতায় সোনালি কালির কিনারা টেনে, তারই গায়ে লতা এঁকে, মাঝখানে লাল কালি দিয়ে কবিতাগুলি লিখে রাখত। আর, খুব সমারোহে মলাটের উপর লিখত, শ্রীকেদারনাথ ঘোষ।

একে একে লেখাগুলিকে কাগজে পাঠাতে লাগল। কোথাও ছাপা হল না।

মনে মনে সে স্থির করলে, যখন হাতে টাকা জমবে তখন নিজে কাগজ বের করবে।

বাপের মৃত্যুর পর গুরুজনেরা বার বার বললে, "একটা কোনো কাজের চেষ্টা করো, কেবল লেখা নিয়ে সময় নষ্ট কোরো না।"

সে একটুখানি হাসলে আর লিখতে লাগল। একটি দুটি তিনটি বই সে পরে পরে ছাপালে।

এই নিয়ে খুব আন্দোলন হবে আশা করেছিল। হল না।

২

আন্দোলন হল একটি পাঠকের মনে। সে হচ্ছে তার ছোটো ভাগ্নেটি।

নতুন ক খ শিখে সে যে বই হাতে পায় চেঁচিয়ে পড়ে।

একদিন একখানা বই নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে মামার কাছে ছুটে এল। বললে, "দেখো দেখো, মামা, এ যে তোমারই নাম।"

মামা একটুখানি হাসলে, আর আদর ক'রে খোকার গাল টিপে দিলে।

মামা তার বাক্স খুলে আর-একখানি বই বের করে বললে, "আচ্ছা, এটা পড়ো দেখি।"

ভাগ্নে একটি একটি অক্ষর বানান ক'রে ক'রে মামার নাম পড়ল। বাক্স থেকে আরও একটা বই বেরোল, সেটাতেও পড়ে দেখে মামার নাম।

পরে পরে যখন তিনটি বইয়ে মামার নাম দেখলে তখন সে আর অল্পে সন্তুষ্ট হতে চাইল না। দুই হাত ফাঁক করে জিজ্ঞেস করলে, "তোমার নাম আরও অনেক অনেক অনেক বইয়ে আছে— একশোটা, চব্বিশটা, সাতটা বইয়ে?"

মামা চোখ টিপে বললে, "ক্রমে দেখতে পাবি।"

ভাগ্নে বই তিনটে নিয়ে লাফাতে লাফাতে বাড়ির বুড়ি ঝিকে দেখাতে নিয়ে গেল।

৩

ইতিমধ্যে মামা একখানা নাটক লিখেছে। ছত্রপতি শিবাজি তার নায়ক।

বন্ধুরা বললে, "এ নাটক নিশ্চয় থিয়েটারে চলবে।"

সে মনে মনে স্পষ্ট দেখতে লাগল, রাস্তায় রাস্তায় গলিতে গলিতে তার নিজের নামে আর নাটকের নামে যেন শহরের গায়ে উল্কি পরিয়ে দিয়েছে।

আজ রবিবার। তার থিয়েটারবিলাসী বন্ধু থিয়েটারওয়ালাদের কাছে অভিমত আনতে গেছে। তাই সে পথ চেয়ে রইল।

রবিবারে তার ভাগ্নেরও ছুটি। আজ সকাল থেকে সে এক খেলা বের করেছে, অন্যমনস্ক হয়ে মামা তা লক্ষ্য করে নি।

ওদের ইস্কুলের পাশে ছাপাখানা আছে। সেখান থেকে ভাগ্নে নিজের নামের কয়েকটা সীসের অক্ষর জুটিয়ে এনেছে। তার কোনোটা ছোটো, কোনোটা বড়ো।

যে-কোনো বই পায় এই সীসের অক্ষরে কালি লাগিয়ে তাতে নিজের নাম ছাপাচ্ছে। মামাকে আশ্চর্য করে দিতে হবে।

৪

আশ্চর্য করে দিলে। মামা এক সময়ে বসবার ঘরে এসে দেখে, ছেলেটি ভারি ব্যস্ত।

"কী কানাই, কী করছিস।"

ভাগ্নে খুব আগ্রহ করেই দেখালে সে কী করছে। কেবল তিনটিমাত্র বই নয়, অন্তত পঁচিশখানা বইয়ে ছাপার অক্ষরে কানাইয়ের নাম।

এ কী কাণ্ড। পড়াশুনোর নাম নেই, ছোঁড়াটার কেবল খেলা। আর, এ কী রকম খেলা।

কানাইয়ের বহু দুঃখে জোটানো নামের অক্ষরগুলি হাত থেকে সে ছিনিয়ে নিলে।

কানাই শোকে চীৎকার করে কাঁদে, তার পরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, তার পরে থেকে থেকে দমকায় দমকায় কেঁদে ওঠে— কিছুতেই সান্ত্বনা মানে না।

বুড়ি ঝি ছুটে এসে জিজ্ঞেস করলে, "কী হয়েছে, বাবা।"

কানাই বললে, "আমার নাম।"

মা এসে বললে, "কী রে কানাই, কী হয়েছে।"

কানাই রুদ্ধকণ্ঠে বললে, "আমার নাম।"

ঝি লুকিয়ে তার হাতে আস্ত একটি ক্ষীরপুলি এনে দিলে; মাটিতে ফেলে দিয়ে সে বললে, "আমার নাম।"

মা এসে বললে, "কানাই, এই নে তোর সেই রেলগাড়িটা।"

কানাই রেলগাড়ি ঠেলে ফেলে বললে, "আমার নাম।"

৫

থিয়েটার থেকে বন্ধু এল।

মামা দরজার কাছে ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে, "কী হল।"

বন্ধু বললে, "ওরা রাজি হল না।"

অনেক ক্ষণ চুপ করে থেকে মামা বললে, "আমার সর্বস্ব যায় সেও ভালো, আমি নিজে থিয়েটার খুলব।"

বন্ধু বললে, "আজ ফুটবল ম্যাচ দেখতে যাবে না ?"

ও বললে, "না, আমার জ্বরভাব।"

বিকেলে মা এসে বললে, "খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল।"

ও বললে, "খিদে নেই।"

সন্ধের সময় স্ত্রী এসে বললে, "তোমার সেই নতুন লেখাটা শোনাবে না ?"

ও বললে, "মাথা ধরেছে।"

ভাগ্নে এসে বললে, "আমার নাম ফিরিয়ে দাও।"

মামা ঠাস্‌ করে তার গালে এক চড় কষিয়ে দিলে।

ভুল স্বর্গ

লোকটি নেহাত বেকার ছিল।

তার কোনো কাজ ছিল না, কেবল শখ ছিল নানা রকমের।

ছোটো ছোটো কাঠের চৌকোয় মাটি ঢেলে তার উপরে সে ছোটো ছোটো ঝিনুক সাজাত। দূর থেকে দেখে মনে হত যেন একটা এলোমেলো ছবি, তার মধ্যে পাখির ঝাঁক ; কিম্বা এবড়ো-খেবড়ো মাঠ, সেখানে গোরু চরছে ; কিম্বা উঁচুনিচু পাহাড়, তার গা দিয়ে ওটা বুঝি ঝরনা হবে, কিম্বা পায়ে-চলা পথ।

বাড়ির লোকের কাছে তার লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। মাঝে মাঝে পণ করত পাগলামি ছেড়ে দেবে, কিন্তু পাগলামি তাকে ছাড়ত না।

২

কোনো কোনো ছেলে আছে সারা বছর পড়ায় ফাঁকি দেয়, অথচ পরীক্ষায় খামকা পাশ করে ফেলে। এর সেই দশা হল।

সমস্ত জীবনটা অকাজে গেল, অথচ মৃত্যুর পরে খবর পেলে যে, তার স্বর্গে যাওয়া মঞ্জুর।

কিন্তু, নিয়তি স্বর্গের পথেও মানুষের সঙ্গ ছাড়ে না। দূতগুলো মার্কা ভুল করে তাকে কেজো লোকের স্বর্গে রেখে এল।

এই স্বর্গে আর সবই আছে, কেবল অবকাশ নেই।

এখানে পুরুষরা বলছে, "হাঁফ ছাড়বার সময় কোথা।" মেয়েরা বলছে, "চললুম, ভাই, কাজ রয়েছে পড়ে।" সবাই বলে, "সময়ের মূল্য আছে।" কেউ বলে না,

"সময় অমূল্য।" "আর তো পায়া যায় না" ব'লে সবাই আক্ষেপ করে, আর ভারি খুশি হয়। "খেটে খেটে হয়রান হলুম" এই নালিশটাই সেখানকার সংগীত।

এ বেচারা কোথাও ফাঁক পায় না, কোথাও খাপ খায় না। রাস্তায় অন্যমনস্ক হয়ে চলে, তাতে ব্যস্ত লোকের পথ আটক করে। চাদরটি পেতে যেখানেই আরাম ক'রে বসতে চায়, শুনতে পায় সেখানেই ফসলের খেত, বীজ পোঁতা হয়ে গেছে। কেবলই উঠে যেতে হয়, সরে যেতে হয়।

৩

ভারি এক ব্যস্ত মেয়ে স্বর্গের উৎস থেকে রোজ জল নিতে আসে।

পথের উপর দিয়ে সে চলে যায় যেন সেতারের দ্রুত তালের গতের মতো।

তাড়াতাড়ি সে এলো খোঁপা বেঁধে নিয়েছে। তবু দু'চারটে দুরন্ত অলক কপালের উপর ঝুঁকে প'ড়ে তার চোখের কালো তারা দেখবে ব'লে উঁকি মারছে।

স্বর্গীয় বেকার মানুষটি এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, চঞ্চল ঝরনার ধারে তমালগাছটির মতো স্থির।

জানলা থেকে ভিক্ষুককে দেখে রাজকন্যার যেমন দয়া হয়, এ'কে দেখে মেয়েটির তেমনি দয়া হল।

"আহা, তোমার হাতে বুঝি কাজ নেই?"

নিশ্বাস ছেড়ে বেকার বললে, "কাজ করব তার সময় নেই।"

মেয়েটি ওর কথা কিছুই বুঝতে পারলে না। বললে, "আমার হাত থেকে কিছু কাজ নিতে চাও?"

বেকার বললে, "তোমার হাত থেকেই কাজ নেব ব'লে দাঁড়িয়ে আছি।"

"কী কাজ দেব।"

"তুমি যে ঘড়া কাঁখে করে জল তুলে নিয়ে যাও তারই একটি যদি আমাকে দিতে পার।"

"ঘড়া নিয়ে কী হবে। জল তুলবে?"

"না, আমি তার গায়ে চিত্র করব।"

মেয়েটি বিরক্ত হয়ে বললে, "আমার সময় নেই, আমি চললুম।"

কিন্তু, বেকার লোকের সঙ্গে কাজের লোক পারবে কেন। রোজ ওদের উৎসতলায় দেখা হয় আর রোজ সেই একই কথা, "তোমার কাঁখের একটি ঘড়া দাও, তাতে চিত্র করব।"

হার মানতে হল, ঘড়া দিলে।

সেইটিকে ঘিরে ঘিরে বেকার আঁকতে লাগল কত রঙের পাক, কত রেখার ঘের।

আঁকা শেষ হলে মেয়েটি ঘড়া তুলে ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলে। ভুরু বাঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "এর মানে ?"

বেকার লোকটি বললে, "এর কোনো মানে নেই।"

ঘড়া নিয়ে মেয়েটি বাড়ি গেল।

সবার চোখের আড়ালে বসে সেটিকে সে নানা আলোতে নানা রকমে হেলিয়ে ঘুরিয়ে দেখলে। রাত্রে থেকে থেকে বিছানা ছেড়ে উঠে দীপ জেলে চুপ করে বসে সেই চিত্রটা দেখতে লাগল। তার বয়সে এই সে প্রথম এমন কিছু দেখেছে যার কোনো মানে নেই।

তার পরদিন যখন সে উৎসতলায় এল তখন তার দুটি পায়ের ব্যস্ততায় একটু যেন বাধা পড়েছে। পা দুটি যেন চলতে চলতে আন্‌মনা হয়ে ভাবছে— যা ভাবছে তার কোনো মানে নেই।

সেদিনও বেকার মানুষ এক পাশে দাঁড়িয়ে।

মেয়েটি বললে, "কী চাও।"

সে বললে, "তোমার হাত থেকে আরও কাজ চাই।"

"কী কাজ দেব।"

"যদি রাজি হও, রঙিন সুতো বুনে বুনে তোমার বেণী বাঁধবার দড়ি তৈরি করে দেব।"

"কী হবে।"

"কিছুই হবে না।"

নানা রঙের নানা-কাজ-করা দড়ি তৈরি হল। এখন থেকে আয়না হাতে নিয়ে বেণী বাঁধতে মেয়ের অনেক সময় লাগে। কাজ পড়ে থাকে, বেলা বয়ে যায়।

৪

এ দিকে দেখতে দেখতে কেজো স্বর্গে কাজের মধ্যে বড়ো বড়ো ফাঁক পড়তে লাগল। কান্নায় আর গানে সেই ফাঁক ভরে উঠল।

স্বর্গীয় প্রবীণেরা বড়ো চিন্তিত হল। সভা ডাকলে। তারা বললে, "এখানকার ইতিহাসে কখনো এমন ঘটে নি।"

স্বর্গের দূত এসে অপরাধ স্বীকার করলে। সে বললে, "আমি ভুল লোককে ভুল স্বর্গে এনেছি।"

ভুল লোকটিকে সভায় আনা হল। তার রঙিন পাগড়ি আর কোমরবন্ধের বাহার দেখেই সবাই বুঝলে, বিষম ভুল হয়েছে।

সভাপতি তাকে বললে, "তোমাকে পৃথিবীতে ফিরে যেতে হবে।"

সে তার রঙের ঝুলি আর তুলি কোমরে বেঁধে হাঁফ ছেড়ে বললে, "তবে চললুম।"

মেয়েটি এসে বললে, "আমিও যাব।"

প্রবীণ সভাপতি কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। এই সে প্রথম দেখলে এমন-একটা কাণ্ড যার কোনো মানে নেই।

রাজপুত্তুর

রাজপুত্তুর চলেছে নিজের রাজ্য ছেড়ে, সাত রাজার রাজ্য পেরিয়ে, যে দেশে কোনো রাজার রাজ্য নেই সেই দেশে।

সে হল যে কালের কথা সে কালের আরম্ভও নেই, শেষও নেই।

শহরে গ্রামে আর-সকলে হাটবাজার করে, ঘর করে, ঝগড়া করে; যে আমাদের চিরকালের রাজপুত্তুর সে রাজ্য ছেড়ে ছেড়ে চলে যায়।

কেন যায়।

কুয়োর জল কুয়োতেই থাকে, খাল বিলের জল খাল বিলের মধ্যেই শান্ত। কিন্তু, গিরিশিখরের জল গিরিশিখরে ধরে না, মেঘের জল মেঘের বাঁধন মানে না। রাজপুত্তুরকে তার রাজ্যটুকুর মধ্যে ঠেকিয়ে রাখবে কে। তেপান্তর মাঠ দেখে সে ফেরে না, সাতসমুদ্র তেরোনদী পার হয়ে যায়।

মানুষ বারে বারে শিশু হয়ে জন্মায় আর বারে বারে নতুন ক'রে এই পুরাতন কাহিনীটি শোনে। সন্ধ্যাপ্রদীপের আলো স্থির হয়ে থাকে, ছেলেরা চুপ করে গালে হাত দিয়ে ভাবে, "আমরা সেই রাজপুত্তুর।"

তেপান্তর মাঠ যদি বা ফুরোয়, সামনে সমুদ্র। তারই মাঝখানে দ্বীপ, সেখানে দৈত্যপুরীতে রাজকন্যা বাঁধা আছে।

পৃথিবীতে আর-সকলে টাকা খুঁজছে, নাম খুঁজছে, আরাম খুঁজছে, আর যে আমাদের রাজপুত্তুর সে দৈত্যপুরী থেকে রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে বেরিয়েছে। তুফান উঠল, নৌকো মিলল না, তবু সে পথ খুঁজছে।

এইটেই হচ্ছে মানুষের সব-গোড়াকার রূপকথা আর সব-শেষের। পৃথিবীতে যারা নতুন জন্মেছে দিদিমার কাছে তাদের এই চিরকালের খবরটি পাওয়া চাই যে, রাজকন্যা বন্দিনী, সমুদ্র দুর্গম, দৈত্য দুর্জয়, আর ছোটো মানুষটি একলা দাঁড়িয়ে পণ করছে, "বন্দিনীকে উদ্ধার করে আনব।"

বাইরে বনের অন্ধকারে বৃষ্টি পড়ে, ঝিল্লি ডাকে, আর ছোটো ছেলেটি চুপ করে গালে হাত দিয়ে ভাবে, "দৈত্যপুরীতে আমাকে পাড়ি দিতে হবে।"

২

সামনে এল অসীম সমুদ্র, স্বপ্নের-ঢেউ-তোলা নীল ঘুমের মতো। সেখানে রাজপুত্তুর ঘোড়ার উপর থেকে নেমে পড়ল।

কিন্তু, যেমনি মাটিতে পা পড়া অমনি এ কী হল। এ কোন্ জাদুকরের জাদু।

এ যে শহর। ট্রাম চলেছে। আপিসমুখো গাড়ির ভিড়ে রাস্তা দুর্গম। তালপাতার বাঁশি -ওয়ালা গলির ধারে উলঙ্গ ছেলেদের লোভ দেখিয়ে বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে চলেছে।

আর, রাজপুত্তুরের এ কী বেশ। এ কী চাল। গায়ে বোতামখোলা জামা, ধুতিটা খুব সাফ নয়, জুতোজোড়া জীর্ণ। পাড়াগাঁয়ের ছেলে, শহরে পড়ে, টিউশানি করে বাসাখরচ চালায়।

রাজকন্যা কোথায়।

তার বাসার পাশের বাড়িতেই।

চাঁপাফুলের মতো রঙ নয়, হাসিতে তার মানিক খসে না। আকাশের তারার সঙ্গে তার তুলনা হয় না, তার তুলনা নববর্ষার ঘাসের আড়ালে যে নামহারা ফুল ফোটে তারই সঙ্গে।

মা-মরা মেয়ে বাপের আদরের ছিল। বাপ ছিল গরিব, অপাত্রে মেয়ের বিয়ে দিতে চাইল না, মেয়ের বয়স গেল বেড়ে, সকলে নিন্দে করলে।

বাপ গেছে মরে, এখন মেয়ে এসেছে খুড়োর বাড়িতে।

পাত্রের সন্ধান মিলল। তার টাকাও বিস্তর, বয়সও বিস্তর, আর নাতিনাৎনির সংখ্যাও অল্প নয়। তার দাবরাবের সীমা ছিল না।

খুড়ো বললেন, মেয়ের কপাল ভালো।

এমন সময় গায়ে-হলুদের দিনে মেয়েটিকে দেখা গেল না, আর পাশের বাসায় সেই ছেলেটিকে।

খবর এল, তারা লুকিয়ে বিবাহ করেছে। তাদের জাতের মিল ছিল না, ছিল কেবল মনের মিল। সকলেই নিন্দে করলে।

লক্ষপতি তাঁর ইষ্টদেবতার কাছে সোনার সিংহাসন মানত করে বললেন, "এ ছেলেকে কে বাঁচায়।"

ছেলেটিকে আদালতে দাঁড় করিয়ে বিচক্ষণ সব উকিল প্রবীণ সব সাক্ষী দেবতার কৃপায় দিনকে রাত করে তুললে। সে বড়ো আশ্চর্য।

সেইদিন ইষ্টদেবতার কাছে জোড়া পাটা কাটা পড়ল, ঢাক ঢোল বাজল, সকলেই খুশি হল। বললে, "কলিকাল বটে, কিন্তু ধর্ম এখনো জেগে আছেন।"

৩

তার পরে অনেক কথা। জেল থেকে ছেলেটি ফিরে এল। কিন্তু, দীর্ঘ পথ আর শেষ হয় না। তেপান্তর মাঠের চেয়েও সে দীর্ঘ এবং সঙ্গীহীন। কতবার অন্ধকারে তাকে শুনতে হল, "হাঁউমাউখাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ।" মানুষকে খাবার জন্যে চারি দিকে এত লোভ।

রাস্তার শেষ নেই কিন্তু চলার শেষ আছে। একদিন সেই শেষে এসে সে থামল।

সেদিন তাকে দেখবার লোক কেউ ছিল না। শিয়রে কেবল একজন দয়াময় দেবতা জেগে ছিলেন। তিনি যম।

সেই যমের সোনার কাঠি যেমনি ছোঁয়ানো অমনি এ কী কাণ্ড। শহর গেল মিলিয়ে, স্বপ্ন গেল ভেঙে।

মুহূর্তে আবার দেখা দিল সেই রাজপুত্তুর। তার কপালে অসীমকালের রাজটিকা। দৈত্যপুরীর দ্বার সে ভাঙবে, রাজকন্যার শিকল সে খুলবে।

যুগে যুগে শিশুরা মায়ের কোলে বসে খবর পায়— সেই ঘরছাড়া মানুষ তেপান্তর মাঠ দিয়ে কোথায় চলল। তার সামনের দিকে সাত সমুদ্রের ঢেউ গর্জন করছে।

ইতিহাসের মধ্যে তার বিচিত্র চেহারা; ইতিহাসের পরপারে তার একই রূপ, সে রাজপুত্তুর।

সুয়োরানীর সাধ

সুয়োরানীর বুঝি মরণকাল এল।

তার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে, তার কিছুই ভালো লাগছে না। বদ্যি বড়ি নিয়ে এল। মধু দিয়ে মেড়ে বললে, "খাও।" সে ঠেলে ফেলে দিলে।

রাজার কানে খবর গেল। রাজা তাড়াতাড়ি সভা ছেড়ে এল। পাশে বসে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার কী হয়েছে, কী চাই।"

সে গুমরে উঠে বললে, "তোমরা সবাই যাও; একবার আমার স্যাঙাৎনিকে ডেকে দাও।"

স্যাঙাৎনি এল। রানী তার হাত ধরে বললে, "সই, বসো। কথা আছে।"

স্যাঙাৎনি বললে, "প্রকাশ করে বলো।"

সুয়োরানী বললে, "আমার সাতমহলা বাড়ির এক ধারে তিনটে মহল ছিল দুয়োরানীর। তার পরে হল দুটো, তার পরে হল একটা। তার পরে রাজবাড়ি থেকে সে বের হয়ে গেল।

তার পরে দুয়োরানীর কথা আমার মনেই রইল না।

তার পরে একদিন দোলযাত্রা। নাটমন্দিরে যাচ্ছি ময়ূরপংখি চ'ড়ে। আগে লোক, পিছে লশকর। ডাইনে বাজে বাঁশি, বাঁয়ে বাজে মৃদঙ্গ।

এমনসময় পথের পাশে, নদীর ধারে, ঘাটের উপরটিতে দেখি একখানি কুঁড়েঘর, চাঁপাগাছের ছায়ায়। বেড়া বেয়ে অপরাজিতার ফুল ফুটেছে, দুয়োরের সামনে চালের গুঁড়ো দিয়ে শঙ্খচক্রের আলপনা। আমার ছত্রধারিণীকে শুধোলেম, 'আহা, ঘরখানি কার।' সে বললে, দুয়োরানীর।

তার পরে ঘরে ফিরে এসে সন্ধ্যার সময় বসে আছি, ঘরে প্রদীপ জ্বালি নি, মুখে কথা নেই।

রাজা এসে বললে, 'তোমার কী হয়েছে, কী চাই।'

আমি বললেম, 'এ ঘরে আমি থাকব না।'

রাজা বললে, 'আমি তোমার কোঠাবাড়ি বানিয়ে দেব গজদন্তের দেওয়াল দিয়ে। শঙ্খের গুঁড়োয় মেঝেটি হবে দুধের ফেনার মতো সাদা, মুক্তোর ঝিনুক দিয়ে তার কিনারে এঁকে দেব পদ্মের মালা।'

আমি বললেম, 'আমার বড়ো সাধ গিয়েছে, কুঁড়েঘর বানিয়ে থাকি তোমার বাহির-বাগানের একটি ধারে।'

রাজা বললে, 'আচ্ছা বেশ, তার আর ভাবনা কী।'

কুঁড়েঘর বানিয়ে দিলে। সে ঘর যেন তুলে-আনা বনফুল। যেমনি তৈরি হল অমনি যেন মুষড়ে গেল। বাস করতে গেলেম, কেবল লজ্জা পেলেম।

তার পরে একদিন স্নানযাত্রা।

নদীতে নাইতে গেছি। সঙ্গে একশো সাত জন সঙ্গিনী। জলের মধ্যে পাল্কি নামিয়ে দিলে, স্নান হল।

পথে ফিরে আসছি, পাল্কির দরজা একটু ফাঁক করে দেখি, ও কোন্ ঘরের বউ গা। যেন নির্মাল্যের ফুল। হাতে সাদা শাঁখা, পরনে লালপেড়ে শাড়ি। স্নানের পর ঘড়ায় ক'রে জল তুলে আনছে, সকালের আলো তার ভিজে চুলে আর ভিজে ঘড়ার উপর ঝিকিয়ে উঠছে।

ছত্রধারিণীকে শুধোলেম, 'মেয়েটি কে, কোন্ দেবমন্দিরে তপস্যা করে।'

ছত্রধারিণী হেসে বললে, 'চিনতে পারলে না? ঐ তো দুয়োরানী।'

তার পরে ঘরে ফিরে একলা বসে আছি, মুখে কথা নেই। রাজা এসে বললে, 'তোমার কী হয়েছে, কী চাই।'

আমি বললেম, 'আমার বড়ো সাধ, রোজ সকালে নদীতে নেয়ে মাটির ঘড়ায় জল তুলে আনব বকুলতলার রাস্তা দিয়ে।'

রাজা বললে, 'আচ্ছা বেশ, তার আর ভাবনা কী।'

রাস্তায় রাস্তায় পাহারা বসল, লোকজন গেল সরে।

সাদা শাঁখা পরলেম আর লালপেড়ে শাড়ি। নদীতে স্নান সেরে ঘড়ায় করে জল তুলে আনলেম। দুয়োরের কাছে এসে মনের দুঃখে ঘড়া আছড়ে ভাঙলেম। যা ভেবেছিলেম তা হল না, শুধু লজ্জা পেলেম।

তার পরে সেদিন রাসযাত্রা।

মধুবনে জ্যোৎস্নারাতে তাঁবু পড়ল। সমস্ত রাত নাচ হল, গান হল।

পরদিন সকালে হাতির উপর হাওদা চড়ল। পর্দার আড়ালে বসে ঘরে ফিরছি, এমন সময় দেখি, বনের পথ দিয়ে কে চলেছে, তার নবীন বয়েস। চূড়ায় তার বনফুলের মালা। হাতে তার ডালি; তাতে শালুক ফুল, তাতে বনের ফল, তাতে খেতের শাক।

ছত্রধারিণীকে শুধোলেম, 'কোন্ ভাগ্যবতীর ছেলে পথ আলো করেছে।'

ছত্রধারিণী বললে, 'জান না? ঐ তো দুয়োরানীর ছেলে। ওর মার জন্যে নিয়ে চলেছে শালুক ফুল, বনের ফল, খেতের শাক।'

তার পরে ঘরে ফিরে একলা বসে আছি, মুখে কথা নেই।

রাজা এসে বললে, 'তোমার কী হয়েছে, কী চাই।'

আমি বললেম, 'আমার বড়ো সাধ, রোজ খাব শালুক ফুল, বনের ফল, খেতের শাক; আমার ছেলে নিজের হাতে তুলে আনবে।'

রাজা বললে, 'আচ্ছা বেশ, তার আর ভাবনা কী।'

সোনার পালঙ্কে বসে আছি, ছেলে ডালি নিয়ে এল। তার সর্বাঙ্গে ঘাম, তার মুখে রাগ। ডালি পড়ে রইল, লজ্জা পেলেম।

তার পরে আমার কী হল কী জানি।

একলা বসে থাকি, মুখে কথা নেই। রাজা রোজ এসে আমাকে শুধোয়, 'তোমার কী হয়েছে, কী চাই।'

সুয়োরানী হয়েও কী চাই সে কথা লজ্জায় কাউকে বলতে পারি নে। তাই তোমাকে ডেকেছি, স্যাঙাৎনি। আমার শেষ কথাটি বলি তোমার কানে, 'ঐ দুয়োরানীর দুঃখ আমি চাই।' "

স্যাঙাৎনি গালে হাত দিয়ে বললে, "কেন বলো তো।"

সুয়োরানী বললে, "ওর ঐ বাঁশের বাঁশিতে সুর বাজল, কিন্তু আমার সোনার বাঁশি কেবল বয়েই বেড়ালেম, আগলে বেড়ালেম, বাজাতে পারলেম না।"

বিদূষক

কাঞ্চীর রাজা কর্ণাট জয় করতে গেলেন। তিনি হলেন জয়ী। চন্দনে, হাতির দাঁতে, আর সোনামানিকে হাতি বোঝাই হল।

দেশে ফেরবার পথে বলেশ্বরীর মন্দির বলির রক্তে ভাসিয়ে দিয়ে রাজা পুজো দিলেন।

পুজো দিয়ে চলে আসছেন— গায়ে রক্তবস্ত্র, গলায় জবার মালা, কপালে রক্তচন্দনের তিলক; সঙ্গে কেবল মন্ত্রী আর বিদূষক।

এক জায়গায় দেখলেন, পথের ধারে আমবাগানে ছেলেরা খেলা করছে।

রাজা তাঁর দুই সঙ্গীকে বললেন, "দেখে আসি, ওরা কী খেলছে।"

২

ছেলেরা দুই সারি পুতুল সাজিয়ে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলছে।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "কার সঙ্গে কার যুদ্ধ।"

তারা বললে, "কর্ণাটের সঙ্গে কাঞ্চীর।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "কার জিত, কার হার।"

ছেলেরা বুক ফুলিয়ে বললে, "কর্ণাটের জিত, কাঞ্চীর হার।"

মন্ত্রীর মুখ গম্ভীর হল, রাজার চক্ষু রক্তবর্ণ, বিদূষক হা হা ক'রে হেসে উঠল।

৩

রাজা যখন তাঁর সৈন্য নিয়ে ফিরে এলেন, তখনো ছেলেরা খেলছে।

রাজা হুকুম করলেন, "এক-একটা ছেলেকে গাছের সঙ্গে বাঁধো, আর লাগাও বেত।"

গ্রাম থেকে তাদের মা-বাপ ছুটে এল। বললে, "ওরা অবোধ, ওরা খেলা করছিল, ওদের মাপ করো।"

রাজা সেনাপতিকে ডেকে বললেন, "এই গ্রামকে শিক্ষা দেবে, কাঞ্চীর রাজাকে কোনোদিন যেন ভুলতে না পারে।"

এই বলে শিবিরে চলে গেলেন।

৪

সন্ধেবেলায় সেনাপতি রাজার সম্মুখে এসে দাঁড়াল। প্রণাম করে বললে, "মহারাজ, শৃগাল কুকুর ছাড়া এ গ্রামে কারো মুখে শব্দ শুনতে পাবে না।"

মন্ত্রী বললে, "মহারাজের মান রক্ষা হল।"

পুরোহিত বললে, "বিশ্বেশ্বরী মহারাজের সহায়।"

বিদূষক বললে, "মহারাজ, এবার আমাকে বিদায় দিন।"

রাজা বললেন, "কেন।"

বিদূষক বললে, "আমি মারতেও পারি নে, কাটতেও পারি নে, বিধাতার প্রসাদে আমি কেবল হাসতে পারি। মহারাজের সভায় থাকলে আমি হাসতে ভুলে যাব।"

৩

ঘোড়া

সৃষ্টির কাজ প্রায় শেষ হয়ে যখন ছুটির ঘণ্টা বাজে ব'লে, হেনকালে ব্রহ্মার মাথায় একটা ভাবোদয় হল।

ভাণ্ডারীকে ডেকে বললেন, "ওহে ভাণ্ডারী, আমার কারখানাঘরে কিছু কিছু পঞ্চভূতের জোগাড় করে আনো, আর-একটা নতুন প্রাণী সৃষ্টি করব।"

ভাণ্ডারী হাত জোড় করে বললে, "পিতামহ, আপনি যখন উৎসাহ করে হাতি গড়লেন, তিমি গড়লেন, অজগর সর্প গড়লেন, সিংহ ব্যাঘ্র গড়লেন, তখন হিসাবের দিকে আদৌ খেয়াল করলেন না। যতগুলো ভারী আর কড়া জাতের ভূত ছিল সব প্রায় নিকাশ হয়ে এল। ক্ষিতি অপ্‌ তেজ তলায় এসে ঠেকেছে। থাকবার মধ্যে আছে মরুৎ ব্যোম, তা সে যত চাই।"

চতুর্মুখ কিছুক্ষণ ধরে চারজোড়া গোঁফে তা দিয়ে বললেন, "আচ্ছা ভালো, ভাণ্ডারে যা আছে তাই নিয়ে এসো, দেখা যাক।"

এবারে প্রাণীটিকে গড়বার বেলা ব্রহ্মা ক্ষিতি-অপ-তেজটাকে খুব হাতে রেখে খরচ করলেন। তাকে না দিলেন শিঙ, না দিলেন নখ; আর দাঁত যা দিলেন তাতে চিবনো চলে, কামড়ানো চলে না। তেজের ভাণ্ড থেকে কিছু খরচ করলেন বটে, তাতে প্রাণীটা যুদ্ধক্ষেত্রের কোনো কোনো কাজে লাগবার মতো হল কিন্তু তার লড়াইয়ের শখ রইল না। এই প্রাণীটি হচ্ছে ঘোড়া। এ ডিম পাড়ে না তবু বাজারে তার ডিম নিয়ে একটা গুজব আছে, তাই একে দ্বিজ বলা চলে।

আর যাই হোক, সৃষ্টিকর্তা এর গড়নের মধ্যে মরুৎ আর ব্যোম একেবারে ঠেসে দিলেন। ফল হল এই যে, এর মনটা প্রায় ষোলো-আনা গেল মুক্তির দিকে। এ হাওয়ার আগে ছুটতে চায়, অসীম আকাশকে পেরিয়ে যাবে ব'লে পণ ক'রে বসে। অন্য সকল প্রাণী কারণ উপস্থিত হলে দৌড়য়; এ দৌড়য় বিনা কারণে; যেন তার নিজেই নিজের কাছ থেকে পালিয়ে যাবার একান্ত শখ। কিছু কাড়তে চায় না, কাউকে মারতে চায় না, কেবলই পালাতে চায়— পালাতে পালাতে একেবারে বুঁদ হয়ে যাবে, ঝিম হয়ে যাবে, ভোঁ হয়ে যাবে, তার পরে 'না' হয়ে যাবে, এই তার মৎলব। জ্ঞানীরা বলেন, ধাতের মধ্যে মরুৎব্যোম যখন ক্ষিতি-অপ-তেজকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে ওঠে তখন এইরকমই ঘটে।

ব্রহ্মা বড়ো খুশি হলেন। বাসার জন্যে তিনি অন্য জন্তুর কাউকে দিলেন বন, কাউকে দিলেন গুহা, কিন্তু এর দৌড় দেখতে ভালোবাসেন ব'লে একে দিলেন খোলা মাঠ।

মাঠের ধারে থাকে মানুষ। কাড়াকুড়ি করে সে যা-কিছু জমায় সমস্তই মস্ত বোঝা হয়ে ওঠে। তাই যখন মাঠের মধ্যে ঘোড়াটাকে ছুটতে দেখে মনে মনে ভাবে, "এটাকে কোনো গতিকে বাঁধতে পারলে আমাদের হাট করার বড়ো সুবিধে।"

ফাঁস লাগিয়ে ধরলে একদিন ঘোড়াটাকে। তার পিঠে দিলে জিন, মুখে দিলে কাঁটা লাগাম। ঘাড়ে তার লাগায় চাবুক আর কাঁধে মারে জুতোর শেল। তা ছাড়া আছে দলামলা।

মাঠে ছেড়ে রাখলে হাতছাড়া হবে, তাই ঘোড়াটার চারি দিকে পাঁচিল তুলে দিলে। বাঘের ছিল বন, তার বনই রইল; সিংহের ছিল গুহা, কেউ কাড়ল না। কিন্তু, ঘোড়ার ছিল খোলা মাঠ, সে এসে ঠেকল আস্তাবলে। প্রাণীটাকে মরুৎব্যোম মুক্তির দিকে অত্যন্ত উসকে দিলে, কিন্তু বন্ধন থেকে বাঁচাতে পারলে না।

যখন অসহ্য হল তখন ঘোড়া তার দেয়ালটার 'পরে লাথি চালাতে লাগল। তার পা যতটা জখম হল দেয়াল ততটা হল না; তবু, চুন বালি খ'সে দেয়ালের সৌন্দর্য নষ্ট হতে লাগল।

এতে মানুষের মনে বড়ো রাগ হল। বললে, "একেই বলে অকৃতজ্ঞতা। দানাপানি খাওয়াই, মোটা মাইনের সইস আনিয়ে আট প্রহর ওর পিছনে খাড়া রাখি, তবু মন পাই নে।"

মন পাবার জন্যে সইসগুলো এমনি উঠে পড়ে ডাণ্ডা চালালে যে, ওর আর লাথি চলল না। মানুষ তার পাড়াপড়শিকে ডেকে বললে, "আমার এই বাহনটির মতো এমন ভক্ত বাহন আর নেই।"

তারা তারিফ করে বললে, "তাই তো, একেবারে জলের মতো ঠাণ্ডা। তোমারই ধর্মের মতো ঠাণ্ডা।"

একে তো গোড়া থেকেই ওর উপযুক্ত দাঁত নেই, নখ নেই, শিঙ নেই, তার পরে দেয়ালে এবং তদভাবে শূন্যে লাথি ছোঁড়াও বন্ধ। তাই মনটাকে খোলসা করবার জন্যে আকাশে মাথা তুলে সে চিঁহি চিঁহি করতে লাগল। তাতে মানুষের ঘুম ভেঙে যায় আর পাড়াপড়শিরাও ভাবে, আওয়াজটা তো ঠিক ভক্তিগদ্‌গদ শোনাচ্ছে না। মুখ বন্ধ করবার অনেকরকম যন্ত্র বেরোল। কিন্তু, দম বন্ধ না করলে মুখ তো একেবারে

বন্ধ হয় না। তাই চাপা আওয়াজ মুমূর্ষুর খাবির মতো মাঝে মাঝে বেরোতে থাকে।

একদিন সেই আওয়াজ গেল ব্রহ্মার কানে। তিনি ধ্যান ভেঙে একবার পৃথিবীর খোলা মাঠের দিকে তাকালেন। সেখানে ঘোড়ার চিহ্ন নেই।

পিতামহ যমকে ডেকে বললেন, "নিশ্চয় তোমারই কীর্তি! আমার ঘোড়াটিকে নিয়েছ।"

যম বললেন, "সৃষ্টিকর্তা, আমাকেই তোমার যত সন্দেহ। একবার মানুষের পাড়ার দিকে তাকিয়ে দেখো।"

ব্রহ্মা দেখেন, অতি ছোটো জায়গা, চার দিকে পাঁচিল তোলা; তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ক্ষীণস্বরে ঘোড়াটি চিঁহি চিঁহি করছে।

হৃদয় তাঁর বিচলিত হল। মানুষকে বললেন, "আমার এই জীবকে যদি মুক্তি না দাও তবে বাঘের মতো ওর নখদন্ত বানিয়ে দেব, ও তোমার কোনো কাজে লাগবে না।"

মানুষ বললে, "ছি ছি, তাতে হিংস্রতার বড়ো প্রশ্রয় দেওয়া হবে। কিন্তু, যাই বল, পিতামহ, তোমার এই প্রাণীটি মুক্তির যোগ্যই নয়। ওর হিতের জন্যেই অনেক খরচে আস্তাবল বানিয়েছি। খাসা আস্তাবল।"

ব্রহ্মা জেদ করে বললেন, "ওকে ছেড়ে দিতেই হবে।"

মানুষ বললে, "আচ্ছা, ছেড়ে দেব। কিন্তু, সাত দিনের মেয়াদে; তার পরে যদি বল, তোমার মাঠের চেয়ে আমার আস্তাবল ওর পক্ষে ভালো নয়, তা হলে নাকে খত দিতে রাজি আছি।"

মানুষ করলে কী, ঘোড়াটাকে মাঠে দিলে ছেড়ে; কিন্তু, তার সামনের দুটো পায়ে কষে রশি বাঁধল। তখন ঘোড়া এমনি চলতে লাগল যে, ব্যাঙের চাল তার চেয়ে সুন্দর।

ব্রহ্মা থাকেন সুদূর স্বর্গে; তিনি ঘোড়াটার চাল দেখতে পান, তার হাঁটুর বাঁধন দেখতে পান না। তিনি নিজের কীর্তির এই ভাঁড়ের মতো চালচলন দেখে লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেন। বললেন, "ভুল করেছি তো।"

মানুষ হাত জোড় করে বললে, "এখন এটাকে নিয়ে করি কী। আপনার ব্রহ্মলোকে যদি মাঠ থাকে তো বরঞ্চ সেইখানে রওনা করে দিই।"

ব্রহ্মা ব্যাকুল হয়ে বললেন, "যাও যাও, ফিরে নিয়ে যাও তোমার আস্তাবলে।"

মানুষ বললে, "আদিদেব, মানুষের পক্ষে এ যে এক বিষম বোঝা।"

ব্রহ্মা বললেন, "সেই তো মানুষের মনুষ্যত্ব।"

কর্তার ভূত

বুড়ো কর্তার মরণকালে দেশসুদ্ধ সবাই বলে উঠল, "তুমি গেলে আমাদের কী দশা হবে।"

শুনে তারও মনে দুঃখ হল। ভাবলে, "আমি গেলে এদের ঠাণ্ডা রাখবে কে।"

তা ব'লে মরণ তো এড়াবার জো নেই। তবু দেবতা দয়া করে বললেন, "ভাবনা কী। লোকটা ভূত হয়েই এদের ঘাড়ে চেপে থাক্-না। মানুষের মৃত্যু আছে, ভূতের তো মৃত্যু নেই।"

২

দেশের লোক ভারি নিশ্চিন্ত হল।

কেননা ভবিষ্যৎকে মানলেই তার জন্যে যত ভাবনা, ভূতকে মানলে কোনো ভাবনাই নেই; সকল ভাবনা ভূতের মাথায় চাপে। অথচ তার মাথা নেই, সুতরাং কারো জন্যে মাথাব্যথাও নেই।

তবু স্বভাবদোষে যারা নিজের ভাবনা নিজে ভাবতে যায় তারা খায় ভূতের কানমলা। সেই কানমলা না যায় ছাড়ানো, তার থেকে না যায় পালানো, তার বিরুদ্ধে না চলে নালিশ, তার সম্বন্ধে না আছে বিচার।

দেশসুদ্ধ লোক ভূতগ্রস্ত হয়ে চোখ বুজে চলে। দেশের তত্ত্বজ্ঞানীরা বলেন, "এই চোখ বুজে চলাই হচ্ছে জগতের সবচেয়ে আদিম চলা। একেই বলে অদৃষ্টের চালে চলা। সৃষ্টির প্রথম চক্ষুহীন কীটাণুরা এই চলা চলত; ঘাসের মধ্যে, গাছের মধ্যে, আজও এই চলার আভাস প্রচলিত।"

শুনে ভূতগ্রস্ত দেশ আপন আদিম আভিজাত্য অনুভব করে। তাতে অত্যন্ত আনন্দ পায়।

ভূতের নায়েব ভূতুড়ে জেলখানার দারোগা। সেই জেলখানার দেয়াল চোখে দেখা যায় না। এইজন্যে ভেবে পাওয়া যায় না, সেটাকে ফুটো করে কী উপায়ে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব।

এই জেলখানায় যে ঘানি নিরন্তর ঘোরাতে হয় তার থেকে এক ছটাক তেল বেরোয় না যা হাটে বিকোতে পারে, বেরোবার মধ্যে বেরিয়ে যায় মানুষের তেজ। সেই তেজ বেরিয়ে গেলে মানুষ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তাতে করে ভূতের রাজত্বে আর কিছুই না থাক্— অন্ন হোক, বস্ত্র হোক, স্বাস্থ্য হোক— শান্তি থাকে।

কত-যে শান্তি তার একটা দৃষ্টান্ত এই যে, অন্য সব দেশে ভূতের বাড়াবাড়ি হলেই মানুষ অস্থির হয়ে ওঝার খোঁজ করে। এখানে সে চিন্তাই নেই। কেননা ওঝাকেই আগেভাগে ভূতে পেয়ে বসেছে।

৩

এই ভাবেই দিন চলত, ভূতশাসনতন্ত্র নিয়ে কারো মনে দ্বিধা জাগত না; চিরকালই গর্ব করতে পারত যে, এদের ভবিষ্যৎটা পোষা ভেড়ার মতো ভূতের খোঁটায় বাঁধা, সে ভবিষ্যৎ ভ্যা'ও করে না, ম্যা'ও করে না, চুপ করে পড়ে থাকে মাটিতে, যেন একেবারে চিরকালের মতো মাটি।

কেবল অতি সামান্য একটা কারণে একটু মুশকিল বাধল। সেটা হচ্ছে এই যে, পৃথিবীর অন্য দেশগুলোকে ভূতে পায় নি। তাই অন্য সব দেশে যত ঘানি ঘোরে তার থেকে তেল বেরোয় তাদের ভবিষ্যতের রথচক্রটাকে সচল করে রাখবার জন্যে, বুকের রক্ত পিষে ভূতের খর্পরে ঢেলে দেবার জন্যে নয়। কাজেই মানুষ সেখানে একেবারে জুড়িয়ে যায় নি। তারা ভয়ংকর সজাগ আছে।

৪

এ দিকে দিব্যি ঠাণ্ডায় ভূতের রাজ্য জুড়ে 'খোকা ঘুমোলো, পাড়া জুড়োলো'।

সেটা খোকার পক্ষে আরামের, খোকার অভিভাবকের পক্ষেও; আর পাড়ার কথা তো বলাই আছে।

কিন্তু, 'বর্গি এল দেশে'।

নইলে ছন্দ মেলে না, ইতিহাসের পদটা খোঁড়া হয়েই থাকে।

দেশে যত শিরোমণি চূড়ামণি আছে সবাইকে জিজ্ঞাসা করা গেল, "এমন হল কেন।"

তারা এক বাক্যে শিখা নেড়ে বললে, "এটা ভূতের দোষ নয়, ভুতুড়ে দেশের দোষ নয়, একমাত্র বর্গিরই দোষ। বর্গি আসে কেন।"

শুনে সকলেই বললে, "তা তো বটেই।" অত্যন্ত সান্ত্বনা বোধ করলে।

দোষ যারই থাক্‌, খিড়কির আনাচে-কানাচে ঘোরে ভূতের পেয়াদা, আর সদরের রাস্তায়-ঘাটে ঘোরে অভূতের পেয়াদা; ঘরে গেরস্তর টেঁকা দায়, ঘর থেকে বেরোবারও পথ নেই। এক দিক থেকে এ হাঁকে, "খাজনা দাও।" আর-এক দিক থেকে ও হাঁকে, "খাজনা দাও।"

এখন কথাটা দাঁড়িয়েছে 'খাজনা দেব কিসে'।

এতকাল উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিম থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে নানা জাতের বুলবুলি এসে বেবাক ধান খেয়ে গেল, কারো হুঁশ ছিল না। জগতে যারা হুঁশিয়ার এরা তাদের কাছে ঘেঁষতে চায় না, পাছে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। কিন্তু, তারা অকস্মাৎ এদের অত্যন্ত কাছে ঘেঁষে, এবং প্রায়শ্চিত্তও করে না। শিরোমণি-চূড়ামণির দল পুঁথি খুলে বলেন, "বেহুঁশ যারা তারাই পবিত্র, হুঁশিয়ার যারা তারাই অশুচি, অতএব হুঁশিয়ারদের প্রতি উদাসীন থেকো, প্রবুদ্ধমিব সুপ্তঃ।"

শুনে সকলের অত্যন্ত আনন্দ হয়।

৫

কিন্তু, তৎসত্ত্বেও এ প্রশ্নকে ঠেকানো যায় না 'খাজনা দেব কিসে'।

শ্মশান থেকে মশান থেকে ঝোড়ো হাওয়ায় হাহা ক'রে তার উত্তর আসে, "আব্রু দিয়ে, ইজ্জত দিয়ে, ইমান দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে।"

প্রশ্নমাত্রেরই দোষ এই যে, যখন আসে একা আসে না। তাই আরও একটা প্রশ্ন উঠে পড়েছে, "ভূতের শাসনটাই কি অনন্তকাল চলবে।"

শুনে ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি আর মাসতুতো-পিসতুতোর দল কানে হাত দিয়ে বলে, "কী সর্বনাশ। এমন প্রশ্ন তো বাপের জন্মে শুনি নি। তা হলে সনাতন ঘুমের কী হবে— সেই আদিমতম, সকল জাগরণের চেয়ে প্রাচীনতম ঘুমের?"

প্রশ্নকারী বলে, "সে তো বুঝলুম, কিন্তু আধুনিকতম বুলবুলির ঝাঁক আর উপস্থিততম বর্গির দল, এদের কী করা যায়।"

মাসিপিসি বলে, "বুলবুলির ঝাঁককে কৃষ্ণনাম শোনাব, আর বর্গির দলকেও।"

অর্বাচীনেরা উদ্ধত হয়ে বলে ওঠে, "যেমন করে পারি ভূত ছাড়াব।"

ভূতের নায়েব চোখ পাকিয়ে বলে, "চুপ। এখনো ঘানি অচল হয় নি।"

শুনে দেশের খোকা নিস্তব্ধ হয়, তার পরে পাশ ফিরে শোয়।

৬

মোদ্দা কথাটা হচ্ছে, বুড়ো কর্তা বেঁচেও নেই, মরেও নেই, ভূত হয়ে আছে। দেশটাকে সে নাড়েও না, অথচ ছাড়েও না।

দেশের মধ্যে দুটো-একটা মানুষ, যারা দিনের বেলা নায়েবের ভয়ে কথা কয় না, তারা গভীর রাত্রে হাত জোড় করে বলে, "কর্তা, এখনো কি ছাড়বার সময় হয় নি।"

কর্তা বলেন, "ওরে অবোধ, আমার ধরাও নেই, ছাড়াও নেই, তোরা ছাড়লেই আমার ছাড়া।"

তারা বলে, "ভয় করে যে কর্তা।"

কর্তা বলেন, "সেইখানেই তো ভূত।"

তোতাকাহিনী

এক-যে ছিল পাখি। সে ছিল মূর্খ। সে গান গাহিত, শাস্ত্র পড়িত না। লাফাইত, উড়িত, জানিত না কায়দাকানুন কাকে বলে।

রাজা বলিলেন, "এমন পাখি তো কাজে লাগে না, অথচ বনের ফল খাইয়া রাজহাটে ফলের বাজারে লোকসান ঘটায়।"

মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "পাখিটাকে শিক্ষা দাও।"

২

রাজার ভাগিনাদের উপর ভার পড়িল পাখিটাকে শিক্ষা দিবার।

পণ্ডিতেরা বসিয়া অনেক বিচার করিলেন। প্রশ্নটা এই, উক্ত জীবের অবিদ্যার কারণ কী।

সিদ্ধান্ত হইল, সামান্য খড়কুটা দিয়া পাখি যে বাসা বাঁধে সে বাসায় বিদ্যা বেশি ধরে না। তাই সকলের আগে দরকার, ভালো করিয়া খাঁচা বানাইয়া দেওয়া।

রাজপণ্ডিতেরা দক্ষিণা পাইয়া খুশি হইয়া বাসায় ফিরিলেন।

৩

স্যাকরা বসিল সোনার খাঁচা বানাইতে। খাঁচাটা হইল এমন আশ্চর্য যে, দেখিবার জন্য দেশবিদেশের লোক ঝুঁকিয়া পড়িল। কেহ বলে, "শিক্ষার একেবারে হদ্দমুদ্দ।" কেহ বলে, "শিক্ষা যদি নাও হয়, খাঁচা তো হইল। পাখির কী কপাল।"

স্যাকরা থলি বোঝাই করিয়া বকশিশ পাইল। খুশি হইয়া সে তখনি পাড়ি দিল বাড়ির দিকে।

পণ্ডিত বসিলেন পাখিকে বিদ্যা শিখাইতে। নস্য লইয়া বলিলেন, "অল্প পুঁথির কর্ম নয়।"

ভাগিনা তখন পুঁথিলিখকদের তলব করিলেন। তারা পুঁথির নকল করিয়া এবং

নকলের নকল করিয়া পর্বতপ্রমাণ করিয়া তুলিল। যে দেখিল সেই বলিল, "সাবাস। বিদ্যা আর ধরে না।"

লিপিকরের দল পারিতোষিক লইল বলদ বোঝাই করিয়া। তখনি ঘরের দিকে দৌড় দিল। তাদের সংসারে আর টানাটানি রহিল না।

অনেক দামের খাঁচাটার জন্য ভাগিনাদের খবরদারির সীমা নাই। মেরামত তো লাগিয়াই আছে। তার পরে ঝাড়া মোছা পালিশ-করার ঘটা দেখিয়া সকলেই বলিল, "উন্নতি হইতেছে।"

লোক লাগিল বিস্তর এবং তাদের উপর নজর রাখিবার জন্য লোক লাগিল আরও বিস্তর। তারা মাস-মাস মুঠা-মুঠা তনখা পাইয়া সিন্ধুক বোঝাই করিল।

তারা এবং তাদের মামাতো খুড়তুতো মাসতুতো ভাইরা খুশি হইয়া কোঠা-বালাখানায় গদি পাতিয়া বসিল।

৪

সংসারে অন্য অভাব অনেক আছে, কেবল নিন্দুক আছে যথেষ্ট। তারা বলিল, "খাঁচাটার উন্নতি হইতেছে, কিন্তু পাখিটার খবর কেহ রাখে না।"

কথাটা রাজার কানে গেল। তিনি ভাগিনাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাগিনা, এ কী কথা শুনি।"

ভাগিনা বলিল, "মহারাজ, সত্য কথা যদি শুনিবেন তবে ডাকুন স্যাকরাদের, পণ্ডিতদের, লিপিকরদের, ডাকুন যারা মেরামত করে এবং মেরামত তদারক করিয়া বেড়ায়। নিন্দুকগুলো খাইতে পায় না বলিয়াই মন্দ কথা বলে।"

জবাব শুনিয়া রাজা অবস্থাটা পরিষ্কার বুঝিলেন, আর তখনি ভাগিনার গলায় সোনার হার চড়িল।

৫

শিক্ষা যে কী ভয়ংকর তেজে চলিতেছে, রাজার ইচ্ছা হইল স্বয়ং দেখিবেন। একদিন তাই পাত্র মিত্র অমাত্য লইয়া শিক্ষাশালায় তিনি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।

দেউড়ির কাছে অমনি বাজিল শাঁখ ঘণ্টা ঢাক ঢোল কাড়া নাকাড়া তুরী ভেরী দামামা কাঁসি বাঁশি কাঁসর খোল করতাল মৃদঙ্গ জগঝম্প। পণ্ডিতেরা গলা ছাড়িয়া, টিকি নাড়িয়া, মন্ত্রপাঠে লাগিলেন। মিস্ত্রি মজুর স্যাকরা লিপিকর তদারকনবিশ আর মামাতো পিসতুতো খুড়তুতো এবং মাসতুতো ভাই জয়ধ্বনি তুলিল।

ভাগিনা বলিল, "মহারাজ, কাণ্ডটা দেখিতেছেন!"

মহারাজ বলিলেন, "আশ্চর্য। শব্দ কম নয়।"

ভাগিনা বলিল, "শুধু শব্দ নয়, পিছনে অর্থও কম নাই।"

রাজা খুশি হইয়া দেউড়ি পার হইয়া যেই হাতিতে উঠিবেন এমন সময়, নিন্দুক ছিল ঝোপের মধ্যে গা ঢাকা দিয়া, সে বলিয়া উঠিল, "মহারাজ, পাখিটাকে দেখিয়াছেন কি।"

রাজার চমক লাগিল ; বলিলেন, "ঐ যা! মনে তো ছিল না। পাখিটাকে দেখা হয় নাই।"

ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিতকে বলিলেন, "পাখিকে তোমরা কেমন শেখাও তার কায়দাটা দেখা চাই।"

দেখা হইল। দেখিয়া বড়ো খুশি। কায়দাটা পাখিটার চেয়ে এত বেশি বড়ো যে, পাখিটাকে দেখাই যায় না ; মনে হয়, তাকে না দেখিলেও চলে। রাজা বুঝিলেন, আয়োজনের ত্রুটি নাই। খাঁচায় দানা নাই, পানি নাই ; কেবল রাশি রাশি পুঁথি হইতে রাশি রাশি পাতা ছিঁড়িয়া কলমের ডগা দিয়া পাখির মুখের মধ্যে ঠাসা হইতেছে। গান তো বন্ধই, চীৎকার করিবার ফাঁকটুকু পর্যন্ত বোজা। দেখিলে শরীরে রোমাঞ্চ হয়।

এবারে রাজা হাতিতে চড়িবার সময় কানমলা-সর্দারকে বলিয়া দিলেন, নিন্দুকের যেন আচ্ছা করিয়া কান মলিয়া দেওয়া হয়।

৬

পাখিটা দিনে দিনে ভদ্র-দস্তুর-মত আধমরা হইয়া আসিল। অভিভাবকেরা বুঝিল, বেশ আশাজনক। তবু স্বভাবদোষে সকালবেলার আলোর দিকে পাখি চায় আর অন্যায় রকমে পাখা ঝট্‌পট্ করে। এমন-কি, এক-একদিন দেখা যায় সে তার রোগা ঠোঁট দিয়া খাঁচার শলা কাটিবার চেষ্টায় আছে।

কোতোয়াল বলিল, "এ কী বেয়াদবি।"

তখন শিক্ষামহালে হাপর হাতুড়ি আগুন লইয়া কামার আসিয়া হাজির। কী দমাদ্দম পিটানি। লোহার শিকল তৈরি হইল, পাখির ডানাও গেল কাটা।

রাজার সম্বন্ধীরা মুখ হাঁড়ি করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "এ রাজ্যে পাখিদের কেবল যে আক্কেল নাই তা নয়, কৃতজ্ঞতাও নাই।"

তখন পণ্ডিতেরা এক হাতে কলম, এক হাতে সড়কি লইয়া এমনি কাণ্ড করিল যাকে বলে শিক্ষা।

কামারের পসার বাড়িয়া কামারগিন্নির গায়ে সোনাদানা চড়িল এবং কোতোয়ালের হুঁশিয়ারি দেখিয়া রাজা তাকে শিরোপা দিলেন।

৭

পাখিটা মরিল। কোন্‌কালে যে কেউ তা ঠাহর করিতে পারে নাই। নিন্দুক লক্ষ্মীছাড়া রটাইল, "পাখি মরিয়াছে।"

ভাগিনাকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন, "ভাগিনা, এ কী কথা শুনি।"

ভাগিনা বলিল, "মহারাজ, পাখিটার শিক্ষা পুরা হইয়াছে।"

রাজা শুধাইলেন, "ও কি আর লাফায়।"

ভাগিনা বলিল, "আরে রাম!"

"আর কি ওড়ে।"

"না।"

"আর কি গান গায়।"

"না।"

"দানা না পাইলে আর কি চেঁচায়।"

"না।"

রাজা বলিলেন, "একবার পাখিটাকে আনো তো, দেখি।"

পাখি আসিল। সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়সওয়ার আসিল। রাজা পাখিটাকে টিপিলেন, সে হাঁ করিল না, হুঁ করিল না। কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা খস্‌খস্ গজ্‌গজ্ করিতে লাগিল।

বাহিরে নববসন্তের দক্ষিণহাওয়ায় কিশলয়গুলি দীর্ঘনিশ্বাসে মুকুলিত বনের আকাশ আকুল করিয়া দিল।

অস্পষ্ট

জানলার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় সামনের বাড়ির জীবনযাত্রা। রেখা আর ছেদ, দেখা আর না-দেখা দিয়ে সেই ছবি আঁকা।

একদিন পড়ার বই পড়ে রইল, বনমালীর চোখ গেল সেই দিকে।

সেদিন দেখে, সে বাড়ির ঘরকন্নার পুরোনো পটের উপর দুজন নতুন লোকের চেহারা। একজন বিধবা প্রবীণা, আর-একটি মেয়ের বয়স ষোলো হবে কি সতেরো।

সেই প্রবীণা জানলার ধারে বসে মেয়েটির চুল বেঁধে দিচ্ছে, আর মেয়ের চোখ বেয়ে জল পড়ছে।

আর-একদিন দেখা গেল, চুল বাঁধবার লোকটি নেই। মেয়েটি দিনান্তের শেষ আলোতে ঝুঁকে প'ড়ে বোধ হল যেন একটি পুরোনো ফোটোগ্রাফের ফ্রেম আঁচল দিয়ে মাজছে।

তার পর দেখা যায়, জানলার ছেদগুলির মধ্যে দিয়ে ওর প্রতি দিনের কাজের ধারা— কোলের কাছে ধামা নিয়ে ডাল বাছা, জাঁতি হাতে সুপুরি কাটা, স্নানের পরে বাঁ হাত দিয়ে নেড়ে নেড়ে ভিজে চুল শুকোনো, বারান্দার রেলিঙের উপরে বালাপোষ রোদ্দুরে মেলে দেওয়া।

দুপুরবেলায় পুরুষেরা আপিসে; মেয়েরা কেউ বা ঘুমোয়, কেউ বা তাস খেলে; ছাতে পায়রার খোপে পায়রাদের বক্‌বকম্ মিইয়ে আসে।

সেই সময়ে মেয়েটি ছাতের চিলেকোঠায় পা মেলে বই পড়ে; কোনোদিন বা বইয়ের উপর কাগজ রেখে চিঠি লেখে, আবাঁধা চুল কপালের উপরে থমকে থাকে, আর আঙুল যেন চলতে চলতে চিঠির কানে কানে কথা কয়।

একদিন বাধা পড়ল। সেদিন সে খানিকটা লিখছে চিঠি, খানিকটা খেলছে কলম নিয়ে, আর আলসের উপরে একটা কাক আধখাওয়া আমের আঁঠি ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে।

এমন সময়ে যেন পঞ্চমীর অন্যমনা চাঁদের কোণার পিছনে পা টিপে টিপে একটা মোটা মেঘ এসে দাঁড়ালো। মেয়েটি আধাবয়সি। তার মোটা হাতে মোটা কাঁকন। তার সামনের চুল ফাঁক, সেখানে সিঁথির জায়গায় মোটা সিঁদুর আঁকা।

বালিকার কোল থেকে তার না-শেষ-করা চিঠিখানা সে আচমকা ছিনিয়ে নিলে। বাজপাখি হঠাৎ পায়রার পিঠের উপর পড়ল।

ছাতে আর মেয়েটিকে দেখা যায় না। কখনো বা গভীর রাতে, কখনো বা সকালে বিকালে, ঐ বাড়ি থেকে এমন-সব আভাস আসে যার থেকে বোঝা যায়, সংসারটার তলা ফাটিয়ে দিয়ে একটা ভূমিকম্প বেরিয়ে আসবার জন্যে মাথা ঠুকছে।

এ দিকে জানলার ফাঁকে ফাঁকে চলছে ডাল বাছা আর পান সাজা; ক্ষণে ক্ষণে দুধের কড়া নিয়ে মেয়েটি চলেছে উঠোনে কলতলায়।

এমনি কিছুদিন যায়। সেদিন কার্তিক মাসের সন্ধ্যাবেলা; ছাদের উপর আকাশপ্রদীপ জ্বলেছে, আস্তাবলের ধোঁয়া অজগর সাপের মতো পাক দিয়ে আকাশের নিশ্বাস বন্ধ করে দিলে।

বনমালী বাইরে থেকে ফিরে এসে যেমনি ঘরের জানলা খুলল অমনি তার চোখে পড়ল, সেই মেয়েটি ছাদের উপর হাত জোড় করে স্থির দাঁড়িয়ে। তখন গলির শেষ প্রান্তে মল্লিকদের ঠাকুরঘরে আরতির কাঁসর ঘণ্টা বাজছে। অনেক ক্ষণ পরে ভূমিষ্ঠ হয়ে মেঝেতে মাথা ঠুকে ঠুকে বারবার সে প্রণাম করলে; তার পরে চলে গেল।

সেদিন বনমালী নীচে গিয়েই চিঠি লিখলে। লিখেই নিজে গিয়ে তখনি ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে এল।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে একমনে কামনা করতে লাগল, সে চিঠি যেন না পৌঁছয়। সকালবেলায় উঠে সেই বাড়ির দিকে যেন মুখ তুলে চাইতে পারলে না।

সেই দিনই বনমালী মধুপুরে চলে গেল; কোথায় গেল কাউকে বলে গেল না।

কলেজ খোলবার সময় সময় ফিরে এল। তখন সন্ধ্যাবেলা। সামনের বাড়ির আগাগোড়া সব বন্ধ, সব অন্ধকার। ওরা সব গেল কোথায়।

বনমালী বলে উঠল, "যাক, ভালোই হয়েছে।"

ঘরে ঢুকে দেখে ডেস্কের উপরে একরাশ চিঠি। সব-নীচের চিঠির শিরোনাম মেয়েলি হাতের ছাঁদে লেখা, অজানা হাতের অক্ষরে, তাতে পাড়ার পোস্ট-আপিসের ছাপ।

চিঠিখানি হাতে করে সে বসে রইল। লেফাফা খুললে না। কেবল আলোর সামনে তুলে ধরে দেখলে। জানালার ভিতর দিয়ে জীবনযাত্রার যেমন অস্পষ্ট ছবি, আবরণের ভিতর দিয়ে তেমনি অস্পষ্ট অক্ষর।

একবার খুলতে গেল, তার পরে বাক্সের মধ্যে চিঠিটা রেখে চাবি বন্ধ করে দিলে; শপথ করে বললে, "এ চিঠি কোনোদিন খুলব না।"

পট

যে শহরে অভিরাম দেবদেবীর পট আঁকে, সেখানে কারো কাছে তার পূর্বপরিচয় নেই। সবাই জানে, সে বিদেশী, পট আঁকা তার চিরদিনের ব্যাবসা।

সে মনে ভাবে, "ধনী ছিলেম, ধন গিয়েছে, হয়েছে ভালো। দিনরাত দেবতার রূপ ভাবি, দেবতার প্রসাদে খাই, আর ঘরে ঘরে দেবতার প্রতিষ্ঠা করি। আমার এই মান কে কাড়তে পারে।"

এমন সময় দেশের রাজমন্ত্রী মারা গেল। বিদেশ থেকে নতুন এক মন্ত্রীকে রাজা আদর করে আনলে। সেদিন তাই নিয়ে শহরে খুব ধুম।

কেবল অভিরামের তুলি সেদিন চলল না।

নতুন রাজমন্ত্রী, এই তো সেই কুড়িয়ে-পাওয়া ছেলে, যাকে অভিরামের বাপ মানুষ করে নিজের ছেলের চেয়ে বেশি বিশ্বাস করেছিল। সেই বিশ্বাস হল সিঁধকাঠি, তাই দিয়ে বুড়োর সর্বস্ব সে হরণ করলে। সেই এল দেশের রাজমন্ত্রী হয়ে।

যে ঘরে অভিরাম পট আঁকে সেই তার ঠাকুরঘর; সেখানে গিয়ে হাত জোড় করে বললে, "এই জন্যেই কি এতকাল রেখায় রেখায় রঙে রঙে তোমাকে স্মরণ করে এলেম। এত দিনে বর দিলে কি এই অপমান।"

২

এমন সময় রথের মেলা বসল।

সেদিন নানা দেশের নানা লোক তার পট কিনতে এল, সেই ভিড়ের মধ্যে এল একটি ছেলে, তার আগে পিছে লোক-লশকর।

সে একটি পট বেছে নিয়ে বললে, "আমি কিনব।"

অভিরাম তার নফরকে জিজ্ঞাসা করলে, "ছেলেটি কে।"

সে বললে, "আমাদের রাজমন্ত্রীর একমাত্র ছেলে।"

অভিরাম তার পটের উপর কাপড় চাপা দিয়ে বললে, "বেচব না।"

শুনে ছেলের আবদার আরও বেড়ে উঠল। বাড়িতে এসে সে খায় না, মুখ ভার করে থাকে।

অভিরামকে মন্ত্রী থলিভরা মোহর পাঠিয়ে দিলে; মোহরভরা থলি মন্ত্রীর কাছে ফিরে এল।

মন্ত্রী মনে মনে বললে, "এত বড়ো স্পর্ধা!"

অভিরামের উপর যতই উৎপাত হতে লাগল ততই সে মনে মনে বললে, "এই আমার জিত।"

৩

প্রতিদিন প্রথম সকালেই অভিরাম তার ইষ্টদেবতার একখানি করে ছবি আঁকে। এই তার পূজা, আর কোনো পূজা সে জানে না।

একদিন দেখলে, ছবি তার মনের মতো হয় না। কী যেন বদল হয়ে গেছে। কিছুতে তার ভালো লাগে না। তাকে যেন মনে মনে মারে।

দিনে দিনে সেই সূক্ষ্ম বদল স্থূল হয়ে উঠতে লাগল। একদিন হঠাৎ চমকে উঠে বললে, "বুঝতে পেরেছি।"

আজ সে স্পষ্ট দেখলে, দিনে দিনে তার দেবতার মুখ মন্ত্রীর মুখের মতো হয়ে উঠছে।

তুলি মাটিতে ফেলে দিয়ে বললে, "মন্ত্রীরই জিত হল।"

সেইদিনই পট নিয়ে গিয়ে মন্ত্রীকে অভিরাম বললে, "এই নাও সেই পট, তোমার ছেলেকে দিয়ো।"

মন্ত্রী বললে, "কত দাম।"

অভিরাম বললে, "আমার দেবতার ধ্যান তুমি কেড়ে নিয়েছিলে, এই পট দিয়ে সেই ধ্যান ফিরে নেব।"

মন্ত্রী কিছুই বুঝতে পারলে না।

নতুন পুতুল

এই গুণী কেবল পুতুল তৈরি করত ; সে পুতুল রাজবাড়ির মেয়েদের খেলার জন্যে।

বছরে বছরে রাজবাড়ির আঙিনায় পুতুলের মেলা বসে। সেই মেলায় সকল কারিগরই এই গুণীকে প্রধান মান দিয়ে এসেছে।

যখন তার বয়স হল প্রায় চার কুড়ি, এমন সময় মেলায় এক নতুন কারিগর এল। তার নাম কিষণলাল, বয়স তার নবীন, নতুন তার কায়দা।

যে পুতুল সে গড়ে তার কিছু গড়ে কিছু গড়ে না, কিছু রঙ দেয় কিছু বাকি রাখে। মনে হয়, পুতুলগুলো যেন ফুরোয় নি, যেন কোনোকালে ফুরিয়ে যাবে না।

নবীনের দল বললে, "লোকটা সাহস দেখিয়েছে।"

প্রবীণের দল বললে, "একে বলে সাহস ? এ তো স্পর্ধা।"

কিন্তু, নতুন কালের নতুন দাবি। এ কালের রাজকন্যারা বলে, "আমাদের এই পুতুল চাই।"

সাবেক কালের অনুচরেরা বলে, "আরে ছিঃ।"

শুনে তাদের জেদ বেড়ে যায়।

বুড়োর দোকানে এবার ভিড় নেই। তার ঝাঁকাভরা পুতুল যেন খেয়ার অপেক্ষায় ঘাটের লোকের মতো ও পারের দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

এক বছর যায়, দু বছর যায়, বুড়োর নাম সবাই ভুলেই গেল। কিষণলাল হল রাজবাড়ির পুতুলহাটের সর্দার।

২

বুড়োর মন ভাঙল, বুড়োর দিনও চলে না। শেষকালে তার মেয়ে এসে তাকে বললে, "তুমি আমার বাড়িতে এসো।"

জামাই বললে, "খাও দাও, আরাম করো, আর সবজির খেত থেকে গোরু বাছুর খেদিয়ে রাখো।"

বুড়োর মেয়ে থাকে অষ্টপ্রহর ঘরকরনার কাজে। তার জামাই গড়ে মাটির প্রদীপ, আর নৌকো বোঝাই করে শহরে নিয়ে যায়।

নতুন কাল এসেছে সে কথা বুড়ো বোঝে না, তেমনিই সে বোঝে না যে, তার নাৎনির বয়স হয়েছে ষোলো।

যেখানে গাছতলায় ব'সে বুড়ো খেত আগলায় আর ক্ষণে ক্ষণে ঘুমে ঢুলে পড়ে সেখানে নাৎনি গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে; বুড়োর বুকের হাড়গুলো পর্যন্ত খুশি হয়ে ওঠে। সে বলে, "কী দাদি, কী চাই।"

নাৎনি বলে, "আমাকে পুতুল গড়িয়ে দাও, আমি খেলব।"

বুড়ো বলে, "আরে ভাই, আমার পুতুল তোর পছন্দ হবে কেন।"

নাৎনি বলে, "তোমার চেয়ে ভালো পুতুল কে গড়ে শুনি।"

বুড়ো বলে, "কেন, কিষণলাল।"

নাৎনি বলে, "ইস্! কিষণলালের সাধ্যি!"

দুজনের এই কথা-কাটাকাটি কতবার হয়েছে। বারে বারে একই কথা।

তার পরে বুড়ো তার ঝুলি থেকে মালমশলা বের করে; চোখে মস্ত গোল চশমাটা আঁটে।

নাৎনিকে বলে, "কিন্তু দাদি, ভুট্টা যে কাকে খেয়ে যাবে।"

নাৎনি বলে, "দাদা, আমি কাক তাড়াব।"

বেলা বয়ে যায়; দূরে ইঁদারা থেকে বলদে জল টানে, তার শব্দ আসে; নাৎনি কাক তাড়ায়, বুড়ো বসে বসে পুতুল গড়ে।

৩

বুড়োর সকলের চেয়ে ভয় তার মেয়েকে। সেই গিন্নির শাসন বড়ো কড়া, তার সংসারে সবাই থাকে সাবধানে।

বুড়ো আজ একমনে পুতুল গড়তে বসেছে; হুঁশ হল না, পিছন থেকে তার মেয়ে ঘন ঘন হাত দুলিয়ে আসছে।

কাছে এসে যখন সে ডাক দিলে তখন চশমাটা চোখ থেকে খুলে নিয়ে অবোধ ছেলের মতো তাকিয়ে রইল।

মেয়ে বললে, "দুধ দোওয়া পড়ে থাক্, আর তুমি সুভদ্রাকে নিয়ে বেলা বইয়ে দাও। অত বড়ো মেয়ে, ওর কি পুতুলখেলার বয়স।"

বুড়ো তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "সুভদ্রা খেলবে কেন। এ পুতুল রাজবাড়িতে বেচব। আমার দাদির যেদিন বর আসবে সেদিন তো ওর গলায় মোহরের মালা পরাতে হবে। আমি তাই টাকা জমাতে চাই।"

মেয়ে বিরক্ত হয়ে বললে, "রাজবাড়িতে এ পুতুল কিনবে কে।"

বুড়োর মাথা হেঁট হয়ে গেল। চুপ করে বসে রইল।

সুভদ্রা মাথা নেড়ে বললে, "দাদার পুতুল রাজবাড়িতে কেমন না কেনে দেখব।"

৪

দু দিন পরে সুভদ্রা এক কাহন সোনা এনে মাকে বললে, "এই নাও, আমার দাদার পুতুলের দাম।"

মা বললে, "কোথায় পেলি।"

মেয়ে বললে, "রাজপুরীতে গিয়ে বেচে এসেছি।"

বুড়ো হাসতে হাসতে বললে, "দাদি, তবু তো তোর দাদা এখন চোখে ভালো দেখে না, তার হাত কেঁপে যায়।"

মা খুশি হয়ে বললে, "এমন ষোলোটা মোহর হলেই তো সুভদ্রার গলায় হার হবে।"

বুড়ো বললে, "তার আর ভাবনা কী।"

সুভদ্রা বুড়োর গলা জড়িয়ে ধরে বললে, "দাদাভাই, আমার বরের জন্যে তো ভাবনা নেই।"

বুড়ো হাসতে লাগল, আর চোখ থেকে এক ফোঁটা জল মুছে ফেললে।

৫

বুড়োর যৌবন যেন ফিরে এল। সে গাছের তলায় বসে পুতুল গড়ে আর সুভদ্রা কাক তাড়ায়, আর দূরে ইঁদারায় বলদে ক্যাঁ-কোঁ করে জল টানে।

একে একে ষোলোটা মোহর গাঁথা হল, হার পূর্ণ হয়ে উঠল।

মা বললে, "এখন বর এলেই হয়।"

সুভদ্রা বুড়োর কানে কানে বললে, "দাদাভাই, বর ঠিক আছে।"

দাদা বললে, "বল্ তো দাদি, কোথায় পেলি বর।"

সুভদ্রা বললে, "যেদিন রাজপুরীতে গেলেম দ্বারী বললে, কী চাও। আমি বললেম, রাজকন্যাদের কাছে পুতুল বেচতে চাই। সে বললে, এ পুতুল এখনকার দিনে চলবে না। ব'লে আমাকে ফিরিয়ে দিলে। একজন মানুষ আমার কান্না দেখে বললে, দাও তো, ঐ পুতুলের একটু সাজ ফিরিয়ে দিই, বিক্রি হয়ে যাবে। সেই মানুষটিকে তুমি যদি পছন্দ কর দাদা, তা হলে আমি তার গলায় মালা দিই।"

বুড়ো জিজ্ঞাসা করলে, "সে আছে কোথায়।"

নাংনি বললে, "ঐ যে, বাইরে পিয়ালগাছের তলায়।"

বর এল ঘরের মধ্যে; বুড়ো বললে, "এ যে কিষণলাল।"

কিষণলাল বুড়োর পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, "হাঁ, আমি কিষণলাল।"

বুড়ো তাকে বুকে চেপে ধরে বললে, "ভাই, একদিন তুমি কেড়ে নিয়েছিলে আমার হাতের পুতুলকে, আজ নিলে আমার প্রাণের পুতুলটিকে।"

নাংনি বুড়োর গলা ধরে তার কানে কানে বললে, "দাদা, তোমাকে সুদ্ধ।"

উপসংহার

ভোজরাজের দেশে যে মেয়েটি ভোরবেলাতে দেবমন্দিরে গান গাইতে যায় সে কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়ে।

আচার্য বলেন, "একদিন শেষরাত্রে আমার কানে একখানি সুর লাগল। তার পরে সেইদিন যখন সাজি নিয়ে পারুলবনে ফুল তুলতে গেছি তখন এই মেয়েটিকে ফুলগাছতলায় কুড়িয়ে পেলেম।"

সেই অবধি আচার্য মেয়েটিকে আপন তম্বুরাটির মতো কোলে নিয়ে মানুষ করেছে; এর মুখে যখন কথা ফোটে নি এর গলায় তখন গান জাগল।

আজ আচার্যের কণ্ঠ ক্ষীণ, চোখে ভালো দেখেন না। মেয়েটি তাঁকে শিশুর মতো মানুষ করে।

কত যুবা দেশ বিদেশ থেকে এই মেয়েটির গান শুনতে আসে। তাই দেখে মাঝে মাঝে আচার্যের বুক কেঁপে ওঠে; বলেন, "যে বোঁটা আলগা হয়ে আসে ফুলটি তাকে ছেড়ে যায়।"

মেয়েটি বলে, "তোমাকে ছেড়ে আমি এক পলক বাঁচি নে।"

আচার্য তার মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে বলেন, "যে গান আজ আমার কণ্ঠ ছেড়ে গেল সেই গান তোরই মধ্যে রূপ নিয়েছে। তুই যদি ছেড়ে যাস তা হলে আমার চিরজন্মের সাধনাকে আমি হারাব।"

২

ফাগুনপূর্ণিমায় আচার্যের প্রধান শিষ্য কুমারসেন গুরুর পায়ে একটি আমের মঞ্জরী রেখে প্রণাম করলে। বললে, "মাধবীর হৃদয় পেয়েছি, এখন প্রভুর যদি সম্মতি পাই তা হলে দুজনে মিলে আপনার চরণসেবা করি।"

আচার্যের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। বললেন, "আনো দেখি আমার তম্বুরা। আর, তোমরা দুইজনে রাজার মতো, রানীর মতো, আমার সামনে এসে বসো।"

তম্বুরা নিয়ে আচার্য গান গাইতে বসলেন। দুলহা-দুলহীর গান, সাহানার সুরে। বললেন, "আজ আমার জীবনের শেষ গান গাব।"

এক পদ গাইলেন। গান আর এগোয় না। বৃষ্টির ফোঁটায় ভেরে-ওঠা জুঁইফুলটির মতো হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে খসে পড়ে। শেষে তম্বুরাটি কুমারসেনের হাতে দিয়ে বললেন, "বৎস, এই লও আমার যন্ত্র।"

তার পরে মাধবীর হাতখানি তার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, "এই লও আমার প্রাণ।"

তার পরে বললেন, "আমার গানটি দুজনে মিলে শেষ করে দাও, আমি শুনি।"

মাধবী আর কুমার গান ধরলে— সে যেন আকাশ আর পূর্ণচাঁদের কণ্ঠ মিলিয়ে গাওয়া।

৩

এমন সময়ে দ্বারে এল রাজদূত, গান থেমে গেল।

আচার্য কাঁপতে কাঁপতে আসন থেকে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "মহারাজের কী আদেশ।"

দূত বললে, "তোমার মেয়ের ভাগ্য প্রসন্ন, মহারাজ তাকে ডেকেছেন।"

আচার্য জিজ্ঞাসা করলেন, "কী ইচ্ছা তাঁর।"

দূত বললে, "আজ রাত পোয়ালে রাজকন্যা কাম্বোজে পতিগৃহে যাত্রা করবেন, মাধবী তাঁর সঙ্গিনী হয়ে যাবে।"

রাত পোয়ালো, রাজকন্যা যাত্রা করলে।

২৬।১০

মহিষী মাধবীকে ডেকে বললে, "আমার মেয়ে প্রবাসে গিয়ে যাতে প্রসন্ন থাকে সে ভার তোমার উপরে।"

মাধবীর চোখে জল পড়ল না, কিন্তু অনাবৃষ্টির আকাশ থেকে যেন রৌদ্র ঠিকরে পড়ল।

৪

রাজকন্যার ময়ূরপংখি আগে যায়, আর তার পিছে পিছে যায় মাধবীর পাল্কি। সে পাল্কি কিংখাবে ঢাকা, তার দুই পাশে পাহারা।

পথের ধারে ধুলোর উপরে ঝড়ে-ভাঙা অশ্বত্থডালের মতো পড়ে রইলেন আচার্য, আর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কুমারসেন।

পাখিরা গান গাইছিল পলাশের ডালে ; আমের বোলের গন্ধে বাতাস বিহ্বল হয়ে উঠেছিল। পাছে রাজকন্যার মন প্রবাসে কোনোদিন ফাগুনসন্ধ্যায় হঠাৎ নিমেষের জন্য উতলা হয়, এই চিন্তায় রাজপুরীর লোকে নিশ্বাস ফেললে।

পুনরাবৃত্তি

সেদিন যুদ্ধের খবর ভালো ছিল না। রাজা বিমর্ষ হয়ে বাগানে বেড়াতে গেলেন।

দেখতে পেলেন, প্রাচীরের কাছে গাছতলায় বসে খেলা করছে একটি ছোটো ছেলে আর একটি ছোটো মেয়ে।

রাজা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কী খেলছ।"

তারা বললে, "আমাদের আজকের খেলা রামসীতার বনবাস।"

রাজা সেখানে বসে গেলেন।

ছেলেটি বললে, "এই আমাদের দণ্ডকবন, এখানে কুটীর বাঁধছি।"

সে একরাশ ভাঙা ডালপালা খড় ঘাস জুটিয়ে এনেছে, ভারি ব্যস্ত।

আর, মেয়েটি শাক পাতা নিয়ে খেলার হাঁড়িতে বিনা আগুনে রাঁধছে ; রাম খাবেন, তারই আয়োজনে সীতার এক দণ্ড সময় নেই।

রাজা বললেন, "আর তো সব দেখছি, কিন্তু রাক্ষস কোথায়।"

ছেলেটিকে মানতে হল, তাদের দণ্ডকবনে কিছু কিছু ত্রুটি আছে।

রাজা বললেন, "আচ্ছা, আমি হব রাক্ষস।"

ছেলেটি তাঁকে ভালো করে দেখলে। তার পরে বললে, "তোমাকে কিন্তু হেরে যেতে হবে।"

রাজা বললেন, "আমি খুব ভালো হারতে পারি। পরীক্ষা করে দেখো।"

সেদিন রাক্ষসবধ এতই সুচারুরূপে হতে লাগল যে, ছেলেটি কিছুতে রাজাকে ছুটি দিতে চায় না। সেদিন এক বেলাতে তাঁকে দশবারোটা রাক্ষসের মরণ একলা মরতে হল। মরতে মরতে হাঁপিয়ে উঠলেন।

ত্রেতাযুগে পঞ্চবটীতে যেমন পাখি ডেকেছিল সেদিন সেখানে ঠিক তেমনি করেই ডাকতে লাগল। ত্রেতাযুগে সবুজ পাতার পর্দায় পর্দায় প্রভাত-আলো যেমন কোমল ঠাটে আপন সুর বেঁধে নিয়েছিল আজও ঠিক সেই সুরই বাঁধলে।

রাজার মন থেকে ভার নেমে গেল।

মন্ত্রীকে ডেকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ছেলে মেয়ে দুটি কার।"

মন্ত্রী বললে, "মেয়েটি আমারই, নাম রুচিরা। ছেলের নাম কৌশিক, ওর বাপ গরিব ব্রাহ্মণ, দেবপূজা করে দিন চলে।"

রাজা বললেন, "যখন সময় হবে এই ছেলেটির সঙ্গে ঐ মেয়ের বিবাহ হয়, এই আমার ইচ্ছা।"

শুনে মন্ত্রী উত্তর দিতে সাহস করলে না, মাথা হেঁট করে রইল।

২

দেশে সবচেয়ে যিনি বড়ো পণ্ডিত রাজা তাঁর কাছে কৌশিককে পড়তে পাঠালেন। যত উচ্চবংশের ছাত্র তাঁর কাছে পড়ে। আর পড়ে রুচিরা।

কৌশিক যেদিন তাঁর পাঠশালায় এল সেদিন অধ্যাপকের মন প্রসন্ন হল না। অন্য সকলেও লজ্জা পেলে। কিন্তু, রাজার ইচ্ছা।

সকলের চেয়ে সংকট রুচিরার। কেননা, ছেলেরা কানাকানি করে। লজ্জায় তার মুখ লাল হয়, রাগে তার চোখ দিয়ে জল পড়ে।

কৌশিক যদি কখনো তাকে পুঁথি এগিয়ে দেয় সে পুঁথি ঠেলে ফেলে। যদি তাকে পাঠের কথা বলে সে উত্তর করে না।

রুচির প্রতি অধ্যাপকের স্নেহের সীমা ছিল না। কৌশিককে সকল বিষয়ে সে এগিয়ে যাবে এই ছিল তাঁর প্রতিজ্ঞা, রুচিরও সেই ছিল পণ।

মনে হল, সেটা খুব সহজেই ঘটবে, কারণ কৌশিক পড়ে বটে কিন্তু একমনে নয়। তার সাঁতার কাটতে মন, তার বনে বেড়াতে মন, সে গান করে, সে যন্ত্র বাজায়।

অধ্যাপক তাকে ভর্ৎসনা করে বলেন, "বিদ্যায় তোমার অনুরাগ নেই কেন।"

সে বলে, "আমার অনুরাগ শুধু বিদ্যায় নয়, আরও নানা জিনিসে।"

অধ্যাপক বলেন, "সে-সব অনুরাগ ছাড়ো।"

সে বলে, "তা হলে বিদ্যার প্রতিও আমার অনুরাগ থাকবে না।"

৩

এমনি করে কিছু কাল যায়।

রাজা অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার ছাত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে।"

অধ্যাপক বললেন, "রুচিরা।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "আর কৌশিক?"

অধ্যাপক বললেন, "সে যে কিছুই শিখেছে এমন বোধ হয় না।"

রাজা বললেন, "আমি কৌশিকের সঙ্গে রুচির বিবাহ ইচ্ছা করি।"

অধ্যাপক একটু হাসলেন; বললেন, "এ যেন গোধূলির সঙ্গে উষার বিবাহের প্রস্তাব।"

রাজা মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, "তোমার কন্যার সঙ্গে কৌশিকের বিবাহে বিলম্ব উচিত নয়।"

মন্ত্রী বললে, "মহারাজ, আমার কন্যা এ বিবাহে অনিচ্ছুক।"

রাজা বললেন, "স্ত্রীলোকের মনের ইচ্ছা কি মুখের কথায় বোঝা যায়।"

মন্ত্রী বললে, "তার চোখের জলও যে সাক্ষ্য দিচ্ছে।"

রাজা বললেন, "সে কি মনে করে কৌশিক তার অযোগ্য।"

মন্ত্রী বললে, "হাঁ, সেই কথাই বটে।"

রাজা বললেন, "আমার সামনে দুজনের বিদ্যার পরীক্ষা হোক। কৌশিকের জয় হলে এই বিবাহ সম্পন্ন হবে।"

পরদিন মন্ত্রী রাজাকে এসে বললে, "এই পণে আমার কন্যার মত আছে।"

৪

বিচারসভা প্রস্তুত। রাজা সিংহাসনে ব'সে, কৌশিক তাঁর সিংহাসনতলে।

স্বয়ং অধ্যাপক রুচিকে সঙ্গে করে উপস্থিত হলেন। কৌশিক আসন ছেড়ে উঠে তাঁকে প্রণাম ও রুচিকে নমস্কার করলে। রুচি দৃক্‌পাত করলে না।

কোনোদিন পাঠশালার রীতিপালনের জন্যেও কৌশিক রুচির সঙ্গে তর্ক করে নি। অন্য ছাত্রেরাও অবজ্ঞা করে তাকে তর্কের অবকাশ দিত না। তাই আজ যখন তার

যুক্তির মুখে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ তীরের ফলায় আলোর মতো ঝিক্‌মিক্ করে উঠল তখন গুরু বিস্মিত হলেন, এবং বিরক্ত হলেন। রুচির কপালে ঘাম দেখা দিল, সে বুদ্ধি স্থির রাখতে পারলে না। কৌশিক তাকে পরাভবের শেষ কিনারায় নিয়ে গিয়ে তবে ছেড়ে দিলে।

ক্রোধে অধ্যাপকের বাক্‌রোধ হল, আর রুচির চোখ দিয়ে ধারা বেয়ে জল পড়তে লাগল।

রাজা মন্ত্রীকে বললেন, "এখন, বিবাহের দিন স্থির করো।"

কৌশিক আসন ছেড়ে উঠে জোড় হাতে রাজাকে বললে, "ক্ষমা করবেন, এ বিবাহ আমি করব না।"

রাজা বিস্মিত হয়ে বললেন, "জয়লব্ধ পুরস্কার গ্রহণ করবে না?"

কৌশিক বললে, "জয় আমারই থাক্, পুরস্কার অন্যের হোক।"

অধ্যাপক বললেন, "মহারাজ, আর এক বছর সময় দিন, তার পরে শেষ পরীক্ষা।"

সেই কথাই স্থির হল।

৫

কৌশিক পাঠশালা ত্যাগ করে গেল। কোনোদিন সকালে তাকে বনের ছায়ায়, কোনোদিন সন্ধ্যায় তাকে পাহাড়ের চূড়ার উপর দেখা যায়।

এ দিকে রুচির শিক্ষায় অধ্যাপক সমস্ত মন দিলেন। কিন্তু, রুচির সমস্ত মন কোথায়।

অধ্যাপক বিরক্ত হয়ে বললেন, "এখনও যদি সতর্ক না হও তবে দ্বিতীয়বার তোমাকে লজ্জা পেতে হবে।"

দ্বিতীয়বার লজ্জা পাবার জন্যেই যেন সে তপস্যা করতে লাগল। অপর্ণার তপস্যা যেমন অনশনের, রুচির তপস্যা তেমনি অনধ্যায়ের। ষড়্‌দর্শনের পুঁথি তার বন্ধই রইল, এমন-কি কাব্যের পুঁথিও দৈবাৎ খোলা হয়।

অধ্যাপক রাগ করে বললেন, "কপিল-কণাদের নামে শপথ করে বলছি, আর কখনো স্ত্রীলোক ছাত্র নেব না। বেদবেদান্তের পার পেয়েছি, স্ত্রীজাতির মন বুঝতে পারলেম না।"

একদা মন্ত্রী এসে রাজাকে বললে, "ভবদত্তর বাড়ি থেকে কন্যার সম্বন্ধ এসেছে। কুলে শীলে ধনে মানে তারা অদ্বিতীয়। মহারাজের সম্মতি চাই।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "কন্যা কী বলে।"

মন্ত্রী বললে, "মেয়েদের মনের ইচ্ছা কি মুখের কথায় বোঝা যায়।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "তার চোখের জল আজ কী রকম সাক্ষ্য দিচ্ছে।"

মন্ত্রী চুপ করে রইল।

৬

রাজা তাঁর বাগানে এসে বসলেন। মন্ত্রীকে বললেন, "তোমার মেয়েকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।"

রুচিরা এসে রাজাকে প্রণাম করে দাঁড়াল।

রাজা বললেন, "বৎসে, সেই রামের বনবাসের খেলা মনে আছে?"

রুচিরা স্মিতমুখে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

রাজা বললেন, "আজ সেই রামের বনবাস খেলা আর-একবার দেখতে আমার বড়ো সাধ।"

রুচিরা মুখের এক পাশে আঁচল টেনে চুপ করে রইল।

রাজা বললেন, "বনও আছে, রামও আছে, কিন্তু শুনছি বৎসে, এবার সীতার অভাব ঘটেছে। তুমি মনে করলেই সে অভাব পূরণ হয়।"

রুচিরা কোনো কথা না ব'লে রাজার পায়ের কাছে নত হয়ে প্রণাম করলে।

রাজা বললেন, "কিন্তু, বৎসে, এবার আমি রাক্ষস সাজতে পারব না।"

রুচিরা স্নিগ্ধ চক্ষে রাজার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

রাজা বললেন, "এবার রাক্ষস সাজবে তোমাদের অধ্যাপক।"

সিদ্ধি

স্বর্গের অধিকারে মানুষ বাধা পাবে না, এই তার পণ। তাই, কঠিন সন্ধানে অমর হবার মন্ত্র সে শিখে নিয়েছে। এখন একলা বনের মধ্যে সেই মন্ত্র সে সাধনা করে।

বনের ধারে ছিল এক কাঠকুড়নি মেয়ে। সে মাঝে মাঝে আঁচলে ক'রে তার জন্যে ফল নিয়ে আসে, আর পাতার পাত্রে আনে ঝরনার জল।

ক্রমে তপস্যা এত কঠোর হল যে, ফল সে আর ছোঁয় না, পাখিতে এসে ঠুকরে খেয়ে যায়।

আরও কিছু দিন গেল। তখন ঝরনার জল পাতার পাত্রেই শুকিয়ে যায়, মুখে ওঠে না।

কাঠকুড়নি মেয়ে বলে, "এখন আমি করব কী! আমার সেবা যে বৃথা হতে চলল।"

তার পর থেকে ফুল তুলে সে তপস্বীর পায়ের কাছে রেখে যায়, তপস্বী জানতেও পারে না।

মধ্যাহ্নে রোদ যখন প্রখর হয় সে আপন আঁচলটি তুলে ধ'রে ছায়া করে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু, তপস্বীর কাছে রোদও যা ছায়াও তা।

কৃষ্ণপক্ষের রাতে অন্ধকার যখন ঘন হয় কাঠকুড়নি সেখানে জেগে বসে থাকে। তাপসের কোনো ভয়ের কারণ নেই, তবু সে পাহারা দেয়।

২

একদিন এমন ছিল যখন এই কাঠকুড়নির সঙ্গে দেখা হলে নবীন তপস্বী স্নেহ করে জিজ্ঞাসা করত, "কেমন আছ।"

কাঠকুড়নি বলত, "আমার ভালোই কী আর মন্দই কী। কিন্তু, তোমাকে দেখবার লোক কি কেউ নেই। তোমার মা, তোমার বোন?"

সে বলত, "আছে সবাই, কিন্তু আমাকে দেখে হবে কী। তারা কি আমায় চিরদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারবে।"

কাঠকুড়নি বলত, "প্রাণ থাকে না বলেই তো প্রাণের জন্যে এত দরদ।"

তাপস বলত, "আমি খুঁজি চিরদিন বাঁচবার পথ। মানুষকে আমি অমর করব।"

এই বলে সে কত কী বলে যেত; তার নিজের সঙ্গে নিজের কথা, সে কথার মানে বুঝবে কে।

কাঠকুড়নি বুঝত না, কিন্তু আকাশে নবমেঘের ডাকে ময়ূরীর যেমন হয় তেমনি তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠত।

তার পরে আরও কিছু দিন যায়। তপস্বী মৌন হয়ে এল, মেয়েকে কোনো কথা বলে না।

তার পরে আরও কিছু দিন যায়। তপস্বীর চোখ বুজে এল, মেয়েটির দিকে চেয়ে দেখে না।

মেয়ের মনে হল, সে আর ঐ তাপসের মাঝখানে যেন তপস্যার লক্ষ যোজন ক্রোশের দূরত্ব। হাজার হাজার বছরেও এতটা বিচ্ছেদ পার হয়ে একটুখানি কাছে আসবার আশা নেই।

তা নাই বা রইল আশা। তবু ওর কান্না আসে; মনে মনে বলে, দিনে একবার

যদি বলেন 'কেমন আছ' তা হলে সেই কথাটুকুতে দিন কেটে যায়, এক বেলা যদি একটু ফল আর জল গ্রহণ করেন তা হলে অন্নজল ওর নিজের মুখে রোচে।

৩

এ দিকে ইন্দ্রলোকে খবর পৌঁছল, মানুষ মর্তকে লঙ্ঘন করে স্বর্গ পেতে চায়— এত বড়ো স্পর্ধা।

ইন্দ্র প্রকাশ্যে রাগ দেখালেন, গোপনে ভয় পেলেন। বললেন, "দৈত্য স্বর্গ জয় করতে চেয়েছিল বাহুবলে, তার সঙ্গে লড়াই চলেছিল; মানুষ স্বর্গ নিতে চায় দুঃখের বলে, তার কাছে কি হার মানতে হবে।"

মেনকাকে মহেন্দ্র বললেন, "যাও, তপস্যা ভঙ্গ করোগে।"

মেনকা বললেন, "সুররাজ, স্বর্গের অস্ত্রে মর্তের মানুষকে যদি পরাস্ত করেন তবে তাতে স্বর্গের পরাভব। মানবের মরণবাণ কি মানবীর হাতে নেই।"

ইন্দ্র বললেন, "সে কথা সত্য।"

৪

ফাল্গুনমাসে দক্ষিণহাওয়ার দোলা লাগতেই মর্মরিত মাধবীলতা প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। তেমনি ঐ কাঠকুড়নির উপরে একদিন নন্দনবনের হাওয়া এসে লাগল, আর তার দেহমন একটা কোন্ উৎসুক মাধুর্যের উন্মেষে উন্মেষে ব্যথিত হয়ে উঠল। তার মনের ভাবনাগুলি চাকছাড়া মৌমাছির মতো উড়তে লাগল, কোথা তারা মধুগন্ধ পেয়েছে।

ঠিক সেই সময়ে সাধনার একটা পালা শেষ হল। এইবার তাকে যেতে হবে নির্জন গিরিগুহায়। তাই সে চোখ মেলল।

সামনে দেখে সেই কাঠকুড়নি মেয়েটি খোঁপায় পরেছে একটি অশোকের মঞ্জরী, আর তার গায়ের কাপড়খানি কুসুম্ভফুলে রঙ করা। যেন তাকে চেনা যায় অথচ চেনা যায় না। যেন সে এমন একটি জানা সুর যার পদগুলি মনে পড়ছে না। যেন সে এমন একটি ছবি যা কেবল রেখায় টানা ছিল, চিত্রকর কোন্ খেয়ালে কখন এক সময়ে তাতে রঙ লাগিয়েছে।

তাপস আসন ছেড়ে উঠল। বললে, "আমি দূর দেশে যাব।"

কাঠকুড়নি জিজ্ঞাসা করলে, "কেন, প্রভু।"

তপস্বী বললে, "তপস্যা সম্পূর্ণ করবার জন্যে।"

কাঠকুড়নি হাত জোড় করে বললে, "দর্শনের পুণ্য হতে আমাকে কেন বঞ্চিত করবে।"

তপস্বী আবার আসনে বসল, অনেক ক্ষণ ভাবল, আর কিছু বলল না।

৫

তার অনুরোধ যেমনি রাখা হল অমনি মেয়েটির বুকের এক ধার থেকে আর-এক ধারে বারে বারে যেন বজ্রসূচি বিঁধতে লাগল।

সে ভাবলে, "আমি অতি সামান্য, তবু আমার কথায় কেন বাধা ঘটবে।"

সেই রাতে পাতার বিছানায় একলা জেগে ব'সে তার নিজেকে নিজের ভয় করতে লাগল।

তার পরদিন সকালে সে ফল এনে দাঁড়াল, তাপস হাত পেতে নিলে। পাতার পাত্রে জল এনে দিতেই তাপস জল পান করলে। সুখে তার মন ভরে উঠল।

কিন্তু তার পরেই নদীর ধারে শিরীষগাছের ছায়ায় তার চোখের জল আর থামতে চায় না। কী ভাবলে কী জানি।

পরদিন সকালে কাঠকুড়নি তাপসকে প্রণাম করে বললে, "প্রভু, আশীর্বাদ চাই।"

তপস্বী জিজ্ঞাসা করলে, "কেন।"

মেয়েটি বললে, "আমি বহুদূর দেশে যাব।"

তপস্বী বললে, "যাও, তোমার সাধনা সিদ্ধ হোক।"

৬

একদিন তপস্যা পূর্ণ হল।

ইন্দ্র এসে বললেন, "স্বর্গের অধিকার তুমি লাভ করেছ।"

তপস্বী বললে, "তা হলে আর স্বর্গে প্রয়োজন নেই।"

ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, "কী চাও।"

তপস্বী বললে, "এই বনের কাঠকুড়নিকে।"

প্রথম চিঠি

বধূর সঙ্গে তার প্রথম মিলন, আর তার পরেই সে এই প্রথম এসেছে প্রবাসে।

চলে যখন আসে তখন বধূর লুকিয়ে কান্নাটি ঘরের আয়নার মধ্যে দিয়ে চকিতে ওর চোখে পড়ল।

মন বললে, "ফিরি, দুটো কথা বলে আসি।"

কিন্তু, সেটুকু সময় ছিল না।

সে দূরে আসবে ব'লে একজনের দুটি চোখ বয়ে জল পড়ে, তার জীবনে এমন সে আর-কখনো দেখে নি।

পথে চলবার সময় তার কাছে পড়ন্ত রোদ্‌দুরে এই পৃথিবী প্রেমের ব্যথায় ভরা হয়ে দেখা দিল। সেই অসীম ব্যথার ভাণ্ডারে তার মতো একটি মানুষেরও নিমন্ত্রণ আছে, এই কথা মনে করে বিস্ময়ে তার বুক ভরে উঠল।

যেখানে সে কাজ করতে এসেছে সে পাহাড়। সেখানে দেবদারুর ছায়া বেয়ে বাঁকা পথ নীরব মিনতির মতো পাহাড়কে জড়িয়ে ধরে, আর ছোটো ছোটো ঝরনা কাকে যেন আড়ালে আড়ালে খুঁজে বেড়ায় লুকিয়েচুরিয়ে।

আয়নার মধ্যে যে ছবিটি দেখে এসেছিল আজ প্রকৃতির মধ্যে প্রবাসী সেই ছবিরই আভাস দেখে, নববধূর গোপন ব্যাকুলতার ছবি।

২

আজ দেশ থেকে তার স্ত্রীর প্রথম চিঠি এল।

লিখেছে, "তুমি কবে ফিরে আসবে। এসো এসো, শীঘ্র এসো। তোমার দুটি পায়ে পড়ি।"

এই আসাযাওয়ার সংসারে তারও চলে যাওয়া আর তারও ফিরে আসার যে এত দাম ছিল, এ কথা কে জানত। সেই দুটি আতুর চোখের চাউনির সামনে সে নিজেকে দাঁড় করিয়ে দেখলে, আর তার মন বিস্ময়ে ভরে উঠল।

ভোরবেলায় উঠে চিঠিখানি নিয়ে দেবদারুর ছায়ায় সেই বাঁকা পথে সে বেড়াতে বেরোল। চিঠির পরশ তার হাতে লাগে আর কানে যেন সে শুনতে পায়, "তোমাকে না দেখতে পেয়ে আমার জগতের সমস্ত আকাশ কান্নায় ভেসে গেল।"

মনে মনে ভাবতে লাগল, "এত কান্নার মূল্য কি আমার মধ্যে আছে।"

৩

এমন সময় সূর্য উঠল পূর্বদিকের নীল পাহাড়ের শিখরে। দেবদারুর শিশিরভেজা পাতার ঝালরের ভিতর দিয়ে আলো ঝিল্‌মিল্‌ করে উঠল।

হঠাৎ চারটি বিদেশিনী মেয়ে দুই কুকুর সঙ্গে নিয়ে রাস্তার বাঁকের মুখে তার সামনে এসে পড়ল। কী জানি কী ছিল তার মুখে, কিম্বা তার সাজে, কিম্বা তার চালচলনে— বড়ো মেয়েদুটি কৌতুকে মুখ একটুখানি বাঁকিয়ে চলে গেল। ছোটো মেয়েদুটি হাসি চাপবার চেষ্টা করলে, চাপতে পারলে না; দুজনে দুজনকে ঠেলাঠেলি করে খিল্‌খিল্‌ করে হেসে ছুটে গেল।

কঠিন কৌতুকের হাসিতে ঝরনাগুলিরও সুর ফিরে গেল। তারা হাততালি দিয়ে উঠল। প্রবাসী মাথা হেঁট করে চলে আর ভাবে, "আমার দেখার মূল্য কি এই হাসি।"

সেদিন রাস্তায় চলা তার আর হল না। বাসায় ফিরে গেল, একলা ঘরে বসে চিঠিখানি খুলে পড়লে, "তুমি কবে ফিরে আসবে। এসো, এসো, শীঘ্র এসো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি।"

রথযাত্রা

রথযাত্রার দিন কাছে।

তাই রানী রাজাকে বললে, "চলো, রথ দেখতে যাই।"

রাজা বললে, "আচ্ছা।"

ঘোড়াশাল থেকে ঘোড়া বেরোল, হাতিশাল থেকে হাতি। ময়ূরপংখি যায় সারে সারে, আর বল্লম হাতে সারে সারে সিপাইসান্ত্রি। দাসদাসী দলে দলে পিছে পিছে চলল।

কেবল বাকি রইল একজন। রাজবাড়ির ঝাঁটার কাঠি কুড়িয়ে আনা তার কাজ।

সর্দার এসে দয়া করে তাকে বললে, "ওরে, তুই যাবি তো আয়।"

সে হাত জোড় করে বললে, "আমার যাওয়া ঘটবে না।"

রাজার কানে কথা উঠল সবাই সঙ্গে যায়, কেবল সেই দুঃখীটা যায় না।

রাজা দয়া করে মন্ত্রীকে বললে, "ওকেও ডেকে নিয়ো।"

রাস্তার ধারে তার বাড়ি। হাতি যখন সেইখানে পৌঁছল মন্ত্রী তাকে ডেকে বললে, "ওরে দুঃখী, ঠাকুর দেখবি চল্‌।"

সে হাত জোড় করে বলল, "কত চলব। ঠাকুরের দুয়ার পর্যন্ত পৌঁছই এমন সাধ্য কি আমার আছে।"

মন্ত্রী বললে, "ভয় কী রে তোর, রাজার সঙ্গে চলবি।"

সে বললে, "সর্বনাশ! রাজার পথ কি আমার পথ।"

মন্ত্রী বললে, "তবে তোর উপায়? তোর ভাগ্যে কি রথযাত্রা দেখা ঘটবে না।"

সে বললে, "ঘটবে বই কি। ঠাকুর তো রথে করেই আমার দুয়ারে আসেন।"

মন্ত্রী হেসে উঠল। বললে, "তোর দুয়ারে রথের চিহ্ন কই।"

দুঃখী বললে, "তাঁর রথের চিহ্ন পড়ে না।"

মন্ত্রী বললে, "কেন বল্ তো।"

দুঃখী বললে, "তিনি যে আসেন পুষ্পকরথে।"

মন্ত্রী বললে, "কই রে সেই রথ।"

দুঃখী দেখিয়ে দিলে, তার দুয়ারের দুই পাশে দুটি সূর্যমুখী ফুটে আছে।

সওগাত

পুজোর পরব কাছে। ভাণ্ডার নানা সামগ্রীতে ভরা। কত বেনারসি কাপড়, কত সোনার অলংকার; আর ভাণ্ড ভ'রে ক্ষীর দই, পাত্র ভ'রে মিষ্টান্ন।

মা সওগাত পাঠাচ্ছেন।

বড়োছেলে বিদেশে রাজসরকারে কাজ করে; মেজোছেলে সওদাগর, ঘরে থাকে না; আর-কয়টি ছেলে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া ক'রে পৃথক পৃথক বাড়ি করেছে; কুটুম্বরা আছে দেশে বিদেশে ছড়িয়ে।

কোলের ছেলেটি সদর দরজায় দাঁড়িয়ে সারা দিন ধরে দেখছে, ভারে ভারে সওগাত চলেছে, সারে সারে দাসদাসী, থালাগুলি রঙবেরঙের রুমালে ঢাকা।

দিন ফুরোল। সওগাত সব চলে গেল। দিনের শেষনৈবেদ্যের সোনার ডালি নিয়ে সূর্যাস্তের শেষ আভা নক্ষত্রলোকের পথে নিরুদ্দেশ হল।

ছেলে ঘরে ফিরে এসে মাকে বললে, "মা, সবাইকে তুই সওগাত দিলি, কেবল আমাকে না।"

মা হেসে বললেন, "সবাইকে সব দেওয়া হয়ে গেছে, এখন তোর জন্যে কী বাকি রইল এই দেখ্।"

এই বলে তার কপালে চুম্বন করলেন।

ছেলে কাঁদোকাঁদো স্বরে বললে, "সওগাত পাব না ?"

"যখন দূরে যাবি তখন সওগাত পাবি।"

"আর, যখন কাছে থাকি তখন তোর হাতের জিনিস দিবি নে ?"

মা তাকে দু হাত বাড়িয়ে কোলে নিলেন ; বললেন, "এই তো আমার হাতের জিনিস।"

মুক্তি

বিরহিণী তার ফুলবাগানের এক ধারে বেদী সাজিয়ে তার উপর মূর্তি গড়তে বসল। তার মনের মধ্যে যে মানুষটি ছিল বাইরে তারই প্রতিরূপ প্রতিদিন একটু একটু করে গড়ে, আর চেয়ে চেয়ে দেখে, আর ভাবে, আর চোখ দিয়ে জল পড়ে।

কিন্তু, যে রূপটি একদিন তার চিত্তপটে স্পষ্ট ছিল তার উপরে ক্রমে যেন ছায়া পড়ে আসছে। রাতের বেলাকার পদ্মের মতো স্মৃতির পাপড়িগুলি অল্প অল্প করে যেন মুদে এল।

মেয়েটি তার নিজের উপর রাগ করে, লজ্জা পায়। সাধনা তার কঠিন হল, ফল খায় আর জল খায়, আর তৃণশয্যায় পড়ে থাকে।

মূর্তিটি মনের ভিতর থেকে গড়তে গড়তে সে আর প্রতিমূর্তি রইল না। মনে হল, এ যেন কোনো বিশেষ মানুষের ছবি নয়। যতই বেশি চেষ্টা করে ততই বেশি তফাত হয়ে যায়।

মূর্তিকে তখন সে গয়না দিয়ে সাজাতে থাকে, একশো এক পদ্মের ডালি দিয়ে পুজো করে, সন্ধেবেলায় তার সামনে গন্ধতেলের প্রদীপ জ্বালে— সে প্রদীপ সোনার, সে তেলের অনেক দাম।

দিনে দিনে গয়না বেড়ে ওঠে, পুজোর সামগ্রীতেই বেদী ঢেকে যায়, মূর্তিকে দেখা যায় না।

২

এক ছেলে এসে তাকে বললে, "আমরা খেলব।"

"কোথায়।"

"ঐখানে, যেখানে তোমার পুতুল সাজিয়েছ।"

মেয়ে তাকে হাঁকিয়ে দেয় ; বলে, "এখানে কোনোদিন খেলা হবে না।"

আর-এক ছেলে এসে বলে, "আমরা ফুল তুলব।"

"কোথায়।"

"ঐযে, তোমার পুতুলের ঘরের শিয়রে যে চাঁপাগাছ আছে ঐ গাছ থেকে।"

মেয়ে তাকে তাড়িয়ে দেয়; বলে, "এ ফুল কেউ ছুঁতে পাবে না।"

আর-এক ছেলে এসে বলে, "প্রদীপ ধরে আমাদের পথ দেখিয়ে দাও।"

"প্রদীপ কোথায়।"

"ঐ যেটা তোমার পুতুলের ঘরে জ্বাল।"

মেয়ে তাকে তাড়িয়ে দেয়; বলে, "ও প্রদীপ ওখান থেকে সরাতে পারব না।"

৩

এক ছেলের দল যায়, আর-এক ছেলের দল আসে।

মেয়েটি শোনে তাদের কলরব, আর দেখে তাদের নৃত্য। ক্ষণকালের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে যায়। অমনি চমকে ওঠে, লজ্জা পায়।

মেলার দিন কাছে এল।

পাড়ার বুড়ো এসে বললে, "বাছা, মেলা দেখতে যাবি নে?"

মেয়ে বললে, "আমি কোথাও যাব না।"

সঙ্গিনী এসে বললে, "চল্‌, মেলা দেখবি চল্‌।"

মেয়ে বললে, "আমার সময় নেই।"

ছোটো ছেলেটি এসে বললে, "আমায় সঙ্গে নিয়ে মেলায় চলো-না।"

মেয়ে বললে, "যেতে পারব না, এইখানে যে আমার পুজো।"

৪

একদিন রাত্রে ঘুমের মধ্যেও সে যেন শুনতে পেলে সমুদ্রগর্জনের মতো শব্দ। দলে দলে দেশবিদেশের লোক চলেছে— কেউ বা রথে, কেউ বা পায়ে হেঁটে; কেউ বা বোঝা পিঠে নিয়ে, কেউ বা বোঝা ফেলে দিয়ে।

সকালে যখন সে জেগে উঠল তখন যাত্রীর গানে পাখির গান আর শোনা যায় না। ওর হঠাৎ মনে হল, 'আমাকেও যেতে হবে।'

অমনি মনে পড়ে গেল, 'আমার যে পুজো আছে, আমার তো যাবার জো নেই।'

তখনি ছুটে চলল তার বাগানের দিকে যেখানে মূর্তি সাজিয়ে রেখেছে।

গিয়ে দেখে, মূর্তি কোথায়! বেদীর উপর দিয়ে পথ হয়ে গেছে। লোকের পরে লোক চলে, বিশ্রাম নেই।

"এইখানে যাকে বসিয়ে রেখেছিলেম সে কোথায়।"

কে তার মনের মধ্যে বলে উঠল, 'যারা চলেছে তাদেরই মধ্যে।'

এমন সময় ছোটো ছেলে এসে বললে, "আমাকে হাতে ধরে নিয়ে চলো।"

"কোথায়।"

ছেলে বললে, "মেলার মধ্যে তুমিও যাবে না?"

মেয়ে বললে, "হাঁ, আমিও যাব।"

যে বেদীর সামনে এসে সে বসে থাকত সেই বেদীর উপর হল তার পথ, আর মূর্তির মধ্যে যে ঢেকে গিয়েছিল সকল যাত্রীর মধ্যে তাকে পেলে।

পরীর পরিচয়

রাজপুত্রের বয়স কুড়ি পার হয়ে যায়, দেশবিদেশ থেকে বিবাহের সম্বন্ধ আসে।

ঘটক বললে, "বাহ্লীকরাজের মেয়ে রূপসী বটে, যেন সাদা গোলাপের পুষ্পবৃষ্টি।"

রাজপুত্র মুখ ফিরিয়ে থাকে, জবাব করে না।

দূত এসে বললে, "গান্ধাররাজের মেয়ের অঙ্গে অঙ্গে লাবণ্য ফেটে পড়ছে, যেন দ্রাক্ষালতায় আঙুরের গুচ্ছ।"

রাজপুত্র শিকারের ছলে বনে চলে যায়। দিন যায়, সপ্তাহ যায়, ফিরে আসে না।

দূত এসে বললে, "কাম্বোজের রাজকন্যাকে দেখে এলেম; ভোরবেলাকার দিগন্তরেখাটির মতো বাঁকা চোখের পল্লব, শিশিরে স্নিগ্ধ, আলোতে উজ্জ্বল।"

রাজপুত্র ভর্তৃহরির কাব্য পড়তে লাগল, পুঁথি থেকে চোখ তুলল না।

রাজা বললে, "এর কারণ? ডাকো দেখি মন্ত্রীর পুত্রকে।"

মন্ত্রীর পুত্র এল। রাজা বললে, "তুমি তো আমার ছেলের মিতা, সত্য করে বলো, বিবাহে তার মন নেই কেন।"

মন্ত্রীর পুত্র বললে, "মহারাজ, যখন থেকে তোমার ছেলে পরীস্থানের কাহিনী শুনেছে সেই অবধি তার কামনা, সে পরী বিয়ে করবে।"

২

রাজার হুকুম হল, পরীস্থান কোথায় খবর চাই।

বড়ো বড়ো পণ্ডিত ডাকা হল, যেখানে যত পুঁথি আছে তারা সব খুলে দেখলে। মাথা নেড়ে বললে, পুঁথির কোনো পাতায় পরীস্থানের কোনো ইশারা মেলে না।

তখন রাজসভায় সওদাগরদের ডাক পড়ল। তারা বললে, "সমুদ্র পার হয়ে কত দ্বীপেই ঘুরলেম— এলাদ্বীপে, মরীচদ্বীপে, লবঙ্গলতার দেশে। আমরা গিয়েছি মলয়দ্বীপে চন্দন আনতে, মৃগনাভির সন্ধানে গিয়েছি কৈলাসে দেবদারুবনে। কোথাও পরীস্থানের কোনো ঠিকানা পাই নি।"

রাজা বললে, "ডাকো মন্ত্রীর পুত্রকে।"

মন্ত্রীর পুত্র এল। রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলে, "পরীস্থানের কাহিনী রাজপুত্র কার কাছে শুনেছে।"

মন্ত্রীর পুত্র বললে, "সেই যে আছে নবীন পাগলা, বাঁশি হাতে বনে বনে ঘুরে বেড়ায়, শিকার করতে গিয়ে রাজপুত্র তারই কাছে পরীস্থানের গল্প শোনে।"

রাজা বললে, "আচ্ছা, ডাকো তাকে।"

নবীন পাগলা এক মুঠো বনের ফুল ভেট দিয়ে রাজার সামনে দাঁড়াল। রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলে, "পরীস্থানের খবর তুমি কোথায় পেলে।"

সে বললে, "সেখানে তো আমার সদাই যাওয়া আসা।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায় সে জায়গা।"

পাগলা বললে, "তোমার রাজ্যের সীমানায় চিত্রগিরি পাহাড়ের তলে, কাম্যক-সরোবরের ধারে।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলে, "সেইখানে পরী দেখা যায়?"

পাগলা বললে, "দেখা যায়, কিন্তু চেনা যায় না। তারা ছদ্মবেশে থাকে। কখনো কখনো যখন চলে যায় পরিচয় দিয়ে যায়, আর ধরবার পথ থাকে না।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি তাদের চেন কী উপায়ে।"

পাগলা বললে, "কখনো বা একটা সুর শুনে, কখনো বা একটা আলো দেখে।"

রাজা বিরক্ত হয়ে বললে, "এর আগাগোড়া সমস্তই পাগলামি, একে তাড়িয়ে দাও।"

৩

পাগলার কথা রাজপুত্রের মনে গিয়ে বাজল।

ফাল্গুনমাসে তখন ডালে ডালে শালফুলে ঠেলাঠেলি, আর শিরীষফুলে বনের প্রান্ত শিউরে উঠেছে। রাজপুত্র চিত্রগিরিতে একা চলে গেল।

সবাই জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায় যাচ্ছ।"

সে কোনো জবাব করলে না।

গুহার ভিতর দিয়ে একটি ঝরনা ঝরে আসে, সেটি গিয়ে মিলেছে কাম্যকসরোবরে ; গ্রামের লোক তাকে বলে উদাসঝোরা। সেই ঝরনাতলায় একটি পোড়ো মন্দিরে রাজপুত্র বাসা নিলে।

এক মাস কেটে গেল। গাছে গাছে যে কচিপাতা উঠেছিল তাদের রঙ ঘন হয়ে আসে, আর ঝরাফুলে বনপথ ছেয়ে যায়। এমন সময় একদিন ভোরের স্বপ্নে রাজপুত্রের কানে একটি বাঁশির সুর এল। জেগে উঠেই রাজপুত্র বললে, "আজ পাব দেখা।"

৪

তখনি ঘোড়ায় চড়ে ঝরনাধারার তীর বেয়ে চলল, পৌঁছল কাম্যকসরোবরের ধারে। দেখে, সেখানে পাহাড়েদের এক মেয়ে পদ্মবনের ধারে বসে আছে। ঘড়ায় তার জল ভরা, কিন্তু ঘাটের থেকে সে ওঠে না। কালো মেয়ে কানের উপর কালো চুলে একটি শিরীষফুল পরেছে, গোধূলিতে যেন প্রথম তারা।

রাজপুত্র ঘোড়া থেকে নেমে তাকে বললে, "তোমার ঐ কানের শিরীষফুলটি আমাকে দেবে ?"

যে হরিণী ভয় জানে না এ বুঝি সেই হরিণী। ঘাড় বেঁকিয়ে একবার সে রাজপুত্রের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। তখন তার কালো চোখের উপর একটা কিসের ছায়া আরও ঘন কালো হয়ে নেমে এল— ঘুমের উপর যেন স্বপ্ন, দিগন্তে যেন প্রথম শ্রাবণের সঞ্চার।

মেয়েটি কান থেকে ফুল খসিয়ে রাজপুত্রের হাতে দিয়ে বললে, "এই নাও।"

রাজপুত্র তাকে জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কোন্ পরী আমাকে সত্য করে বলো।"

শুনে একবার মুখে দেখা দিল বিস্ময়, তার পরেই আশ্বিনমেঘের আচমকা বৃষ্টির মতো তার হাসির উপর হাসি, সে আর থামতে চায় না।

রাজপুত্র মনে ভাবল, "স্বপ্ন বুঝি ফলল— এই হাসির সুর যেন সেই বাঁশির সুরের সঙ্গে মেলে।"

রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে দুই হাত বাড়িয়ে দিলে ; বললে, "এসো।"

সে তার হাত ধরে ঘোড়ায় উঠে পড়ল, একটুও ভাবল না। তার জলভরা ঘড়া ঘাটে রইল পড়ে।

শিরীষের ডাল থেকে কোকিল ডেকে উঠল, কুহু কুহু কুহু কুহু।

রাজপুত্র মেয়েটিকে কানে কানে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার নাম কী।"

সে বললে, "আমার নাম কাজরী।"

উদাসঝোরার ধারে দুজনে গেল সেই পোড়ো মন্দিরে। রাজপুত্র বললে, "এবার তোমার ছদ্মবেশ ফেলে দাও।"

সে বললে, "আমরা বনের মেয়ে, আমরা তো ছদ্মবেশ জানি নে।"

রাজপুত্র বললে, "আমি যে তোমার পরীর মূর্তি দেখতে চাই।"

পরীর মূর্তি! আবার সেই হাসি, হাসির উপর হাসি। রাজপুত্র ভাবলে, "এর হাসির সুর এই ঝরনার সুরের সঙ্গে মেলে, এ আমার এই ঝরনার পরী।"

৫

রাজার কানে খবর গেল, রাজপুত্রের সঙ্গে পরীর বিয়ে হয়েছে। রাজবাড়ি থেকে ঘোড়া এল, হাতি এল, চতুর্দোলা এল।

কাজরী জিজ্ঞাসা করলে, "এসব কেন!"

রাজপুত্র বললে, "তোমাকে রাজবাড়িতে যেতে হবে।"

তখন তার চোখ ছল্‌ছলিয়ে এল। মনে পড়ে গেল, তার ঘড়া পড়ে আছে সেই জলের ধারে; মনে পড়ে গেল, তার ঘরের আঙিনায় শুকোবার জন্যে ঘাসের বীজ মেলে দিয়ে এসেছে; মনে পড়ল, তার বাপ আর ভাই শিকারে চলে গিয়েছিল, তাদের ফেরবার সময় হয়েছে; আর মনে পড়ল, তার বিয়েতে একদিন যৌতুক দেবে ব'লে তার মা গাছতলায় তাঁত পেতে কাপড় বুনছে, আর গুন্‌গুন্‌ করে গান গাইছে।

সে বললে, "না, আমি যাব না।"

কিন্তু ঢাক ঢোল বেজে উঠল; বাজল বাঁশি, কাঁসি, দামামা— ওর কথা শোনা গেল না।

চতুর্দোলা থেকে কাজরী যখন রাজবাড়িতে নামল, রাজমহিষী কপাল চাপড়ে বললে, "এ কেমনতরো পরী।"

রাজার মেয়ে বললে, "ছি, ছি, কী লজ্জা।"

মহিষীর দাসী বললে, "পরীর বেশটাই বা কী রকম।"

রাজপুত্র বললে, "চুপ করো, তোমাদের ঘরে পরী ছদ্মবেশে এসেছে।"

৬

দিনের পর দিন যায়। রাজপুত্র জ্যোৎস্নারাত্রে বিছানায় জেগে উঠে চেয়ে দেখে, কাজরীর ছদ্মবেশ একটু কোথাও খসে পড়েছে কিনা। দেখে যে, কালো মেয়ের কালো চুল এলিয়ে গেছে, আর তার দেহখানি যেন কালো পাথরে নিখুঁত করে খোদা একটি

প্রতিমা। রাজপুত্র চুপ করে বসে ভাবে, "পরী কোথায় লুকিয়ে রইল, শেষরাতে অন্ধকারের আড়ালে উষার মতো।"

রাজপুত্র ঘরের লোকের কাছে লজ্জা পেলে। একদিন মনে একটু রাগও হল। কাজরী সকালবেলায় বিছানা ছেড়ে যখন উঠতে যায় রাজপুত্র শক্ত করে তার হাত চেপে ধরে বললে, "আজ তোমাকে ছাড়ব না— নিজরূপ প্রকাশ করো, আমি দেখি।"

এমনি কথাই শুনে বনে যে হাসি হেসেছিল সে হাসি আর বেরোল না। দেখতে দেখতে দুই চোখ জলে ভরে এল।

রাজপুত্র বললে, "তুমি কি আমায় চিরদিন ফাঁকি দেবে।"

সে বললে, "না, আর নয়।"

রাজপুত্র বললে, "তবে এইবার কার্তিকী পূর্ণিমায় পরীকে যেন সবাই দেখে।"

৭

পূর্ণিমার চাঁদ এখন মাঝগগনে। রাজবাড়ির নহবতে মাঝরাতের সুরে ঝিমি ঝিমি তান লাগে।

রাজপুত্র বরসজ্জা প'রে হাতে বরণমালা নিয়ে মহলে ঢুকল; পরীবৌয়ের সঙ্গে আজ হবে তার শুভদৃষ্টি।

শয়নঘরে বিছানায় সাদা আস্তরণ, তার উপর সাদা কুন্দফুল রাশ-করা; আর উপরে জানলা বেয়ে জ্যোৎস্না পড়েছে।

আর, কাজরী?

সে কোথাও নেই।

তিন প্রহরের বাঁশি বাজল। চাঁদ পশ্চিমে হেলেছে। একে একে কুটুম্বে ঘর ভরে গেল।

পরী কই।

রাজপুত্র বললে, "চলে গিয়ে পরী আপন পরিচয় দিয়ে যায়, আর তখন তাকে পাওয়া যায় না।"

প্রাণমন

আমার জানলার সামনে রাঙা মাটির রাস্তা।

ওখান দিয়ে বোঝাই নিয়ে গোরুর গাড়ি চলে ; সাঁওতাল মেয়ে খড়ের আঁটি মাথায় করে হাটে যায়, সন্ধ্যাবেলায় কলহাস্যে ঘরে ফেরে।

কিন্তু, মানুষের চলাচলের পথে আজ আমার মন নেই।

জীবনের যে ভাগটা অস্থির, নানা ভাবনায় উদ্‌বিগ্ন, নানা চেষ্টায় চঞ্চল, সেটা আজ ঢাকা পড়ে গেছে। শরীর আজ রুগ্‌ণ, মন আজ নিরাসক্ত।

ঢেউয়ের সমুদ্র বাহিরতলের সমুদ্র ; ভিতরতলে যেখানে পৃথিবীর গভীর গর্ভশয্যা ঢেউ সেখানকার কথা গোলমাল করে ভুলিয়ে দেয়। ঢেউ যখন থামে তখন সমুদ্র আপন গোচরের সঙ্গে অগোচরের, গভীরতলের সঙ্গে উপরিতলের অখণ্ড ঐক্যে স্তব্ধ হয়ে বিরাজ করে।

তেমনি আমার সচেষ্ট প্রাণ যখনি ছুটি পেল, তখনি সেই গভীর প্রাণের মধ্যে স্থান পেলুম যেখানে বিশ্বের আদিকালের লীলাক্ষেত্র।

পথ-চলা পথিক যত দিন ছিলুম তত দিন পথের ধারের ঐ বটগাছটার দিকে তাকাবার সময় পাই নি ; আজ পথ ছেড়ে জানলায় এসেছি, আজ ওর সঙ্গে মোকাবিলা শুরু হল।

আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে ক্ষণে ক্ষণে ও যেন অস্থির হয়ে ওঠে। যেন বলতে চায়, "বুঝতে পারছ না ?"

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বলি, "বুঝেছি, সব বুঝেছি ; তুমি অমন ব্যাকুল হোয়ো না।"

কিছু ক্ষণের জন্যে আবার শান্ত হয়ে যায়। আবার দেখি, ভারি ব্যস্ত হয়ে ওঠে ; আবার সেই থর্‌থর্ ঝর্‌ঝর্ ঝল্‌মল্।

আবার ওকে ঠাণ্ডা করে বলি, "হাঁ হাঁ, ঐ কথাই বটে ; আমি তোমারই খেলার সাথি, লক্ষহাজার বছর ধরে এই মাটির খেলাঘরে আমিও গণ্ডূষে গণ্ডূষে তোমারই মতো সূর্যালোক পান করেছি, ধরণীর স্তন্যরসে আমিও তোমার অংশী ছিলেম।"

তখন ওর ভিতর দিয়ে হঠাৎ হাওয়ার শব্দ শুনি ; ও বলতে থাকে, "হাঁ, হাঁ, হাঁ।"

যে ভাষা রক্তের মর্মরে আমার হৃৎপিণ্ডে বাজে, যা আলো-অন্ধকারের নিঃশব্দ আবর্তনধ্বনি, সেই ভাষা ওর পত্রমর্মরে আমার কাছে এসে পৌঁছয়। সেই ভাষা বিশ্বজগতের সরকারি ভাষা।

তার মূল বাণীটি হচ্ছে, "আছি, আছি ; আমি আছি, আমরা আছি।"

সে ভারি খুশির কথা। সেই খুশিতে বিশ্বের অণু পরমাণু থর্‌থর্ করে কাঁপছে।

ঐ বটগাছের সঙ্গে আমার আজ সেই এক ভাষায় সেই এক খুশির কথা চলছে।

ও আমাকে বলছে, "আছ হে বটে ?"

আমি সাড়া দিয়ে বলছি, "আছি হে মিতা।"

এমনি করে 'আছি'তে 'আছি'তে এক তালে করতালি বাজছে।

২

ঐ বটগাছটার সঙ্গে যখন আমার আলাপ শুরু হল তখন বসন্তে ওর পাতাগুলো কচি ছিল ; তার নানা ফাঁক দিয়ে আকাশের পলাতক আলো ঘাসের উপর এসে পৃথিবীর ছায়ার সঙ্গে গোপনে গলাগলি করত।

তার পরে আষাঢ়ের বর্ষা নামল ; ওরও পাতার রঙ মেঘের মতো গম্ভীর হয়ে এসেছে। আজ সেই পাতার রাশ প্রবীণের পাকা বুদ্ধির মতো নিবিড়, তার কোনো ফাঁক দিয়ে বাইরের আলো প্রবেশ করবার পথ পায় না। তখন গাছটি ছিল গরিবের মেয়েটির মতো ; আজ সে ধনীঘরের গৃহিণী, যেন পর্যাপ্ত পরিতৃপ্তির চেহারা।

আজ সকালে সে তার মরকতমণির বিশনলী হার ঝল্‌মলিয়ে আমাকে বললে, "মাথার উপর অমনতরো ইটপাথর মুড়ি দিয়ে বসে আছ কেন। আমার মতো একেবারে ভরপুর বাইরে এসো-না।"

আমি বললেম, "মানুষকে যে ভিতর বাহির দুই বাঁচিয়ে চলতে হয়।"

গাছ নড়েচড়ে বলে উঠল, "বুঝতে পারলেম না।"

আমি বললেম, "আমাদের দুটো জগৎ, ভিতরের আর বাইরের।"

গাছ বললে, "সর্বনাশ ! ভিতরেরটা আছে কোথায়।"

"আমার আপনারই ঘেরের মধ্যে।"

"সেখানে কর কী।"

"সৃষ্টি করি।"

"সৃষ্টি আবার ঘেরের মধ্যে ! তোমার কথা বোঝবার জো নেই।"

আমি বললেম, "যেমন তীরের মধ্যে বাঁধা প'ড়ে হয় নদী, তেমনি ঘেরের মধ্যে ধরা প'ড়েই তো সৃষ্টি। একই জিনিস ঘেরের মধ্যে আটকা প'ড়ে কোথাও হীরের টুকরো, কোথাও বটের গাছ।"

গাছ বললে, "তোমার ঘেরটা কী রকম শুনি।"

আমি বললেম, "সেইটি আমার মন। তার মধ্যে যা ধরা পড়ছে তাই নানা সৃষ্টি হয়ে উঠছে।"

গাছ বললে, "তোমার সেই বেড়াঘেরা সৃষ্টিটা আমাদের চন্দ্রসূর্যের পাশে কতটুকুই বা দেখায়।"

আমি বললেম, "চন্দ্রসূর্যকে দিয়ে তাকে তো মাপা যায় না, চন্দ্রসূর্য যে বাইরের জিনিস।"

"তা হলে মাপবে কী দিয়ে।"

"সুখ দিয়ে, বিশেষত দুঃখ দিয়ে।"

গাছ বললে, "এই পুবে হাওয়া আমার কানে কানে কথা কয়, আমার প্রাণে প্রাণে তার সাড়া জাগে। কিন্তু, তুমি যে কিসের কথা বললে আমি কিছুই বুঝলেম না।"

আমি বললেম, "বোঝাই কী করে। তোমার ঐ পুবে হাওয়াকে আমাদের বেড়ার মধ্যে ধ'রে বীণার তারে যেমনি বেঁধে ফেলেছি, অমনি সেই হাওয়া এক সৃষ্টি থেকে একেবারে আর-এক সৃষ্টিতে এসে পৌঁছয়। এই সৃষ্টি কোন্ আকাশে যে স্থান পায়, কোন্ বিরাট চিত্তের স্মরণাকাশে, তা আমিও ঠিক জানি নে। মনে হয়, যেন বেদনার একটা আকাশ আছে। সে আকাশ মাপের আকাশ নয়।"

"আর, ওর কাল?"

"ওর কালও ঘটনার কাল নয়, বেদনার কাল। তাই সে কাল সংখ্যার অতীত।"

"দুই আকাশ দুই কালের জীব তুমি, তুমি অদ্ভুত। তোমার ভিতরের কথা কিচ্ছুই বুঝলেম না।"

"নাই বা বুঝলে।"

"আমার বাইরের কথা তুমিই কি ঠিক বোঝ।"

"তোমার বাইরের কথা আমার ভিতরে এসে যে কথা হয়ে ওঠে তাকে যদি বোঝা বল তো সে বোঝা, যদি গান বল তো গান, কল্পনা বল তো কল্পনা।"

৩

গাছ তার সমস্ত ডালগুলো তুলে আমাকে বললে, "একটু থামো। তুমি বড়ো বেশি ভাব', আর বড়ো বেশি বক'।"

শুনে আমার মনে হল, এ কথা সত্যি। আমি বললেম, "চুপ করবার জন্যেই তোমার কাছে আসি, কিন্তু অভ্যাসদোষে চুপ ক'রে ক'রেও বকি; কেউ কেউ যেমন ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও চলে।"

কাগজটা পেন্সিলটা টেনে ফেলে দিলেম, রইলেম ওর দিকে অনিমেষ তাকিয়ে। ওর চিকন পাতাগুলো ওস্তাদের আঙুলের মতো আলোকবীণায় দ্রুত তালে ঘা দিতে লাগল।

হঠাৎ আমার মন বলে উঠল, "এই তুমি যা দেখছ আর এই আমি যা ভাবছি, এঁর মাঝখানের যোগটা কোথায়।"

আমি তাকে ধমক দিয়ে বললেম, "আবার তোমার প্রশ্ন? চুপ করো।"

চুপ করে রইলেম, একদৃষ্টে চেয়ে দেখলেম। বেলা কেটে গেল।

গাছ বললে, "কেমন, সব বুঝেছ?"

আমি বললেম, "বুঝেছি।"

৪

সেদিন তো চুপ করেই কাটল।

পরদিনে আমার মন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "কাল গাছটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠলে 'বুঝেছি', কী বুঝেছ বলো তো।"

আমি বললেম, "নিজের মধ্যে মানুষের প্রাণটা নানা ভাবনায় ঘোলা হয়ে গেছে। তাই, প্রাণের বিশুদ্ধ রূপটি দেখতে হলে চাইতে হয় ঐ ঘাসের দিকে, ঐ গাছের দিকে।"

"কী রকম দেখলে।"

"দেখলেম, এই প্রাণের আপনাতে আপনার কী আনন্দ। নিজেকে নিয়ে পাতায় পাতায়, ফুলে ফুলে, ফলে ফলে, কত যত্নে সে কত ছাঁটই ছেঁটেছে, কত রঙই লাগিয়েছে, কত গন্ধ, কত রস। তাই ঐ বটের দিকে তাকিয়ে নীরবে বলছিলেম,—ওগো বনস্পতি, জন্মমাত্রই পৃথিবীতে প্রথম প্রাণ যে আনন্দধ্বনি করে উঠেছিল সেই ধ্বনি তোমার শাখায় শাখায়। সেই আদিযুগের সরল হাসিটি তোমার পাতায় পাতায় ঝল্‌মল্ করছে। আমার মধ্যে সেই প্রথম প্রাণ আজ চঞ্চল হল। ভাবনার বেড়ার মধ্যে সে বন্দী হয়ে বসে ছিল; তুমি তাকে ডাক দিয়ে বলেছ, ওরে আয়-না রে আলোর মধ্যে, হাওয়ার মধ্যে; আর আমারই মতো নিয়ে আয় তোর রূপের তুলি, রঙের বাটি, রসের পেয়ালা।"

মন আমার খানিক ক্ষণ চুপ করে রইল। তার পরে কিছু বিমর্ষ হয়ে বললে, "তুমি ঐ প্রাণের কথাটাই নিয়ে কিছু বাড়াবাড়ি ক'রে থাক, আমি যেসব উপকরণ জড়ো করছি তার কথা এমন সাজিয়ে সাজিয়ে বল না কেন।"

"তার কথা আর কইব কী। সে নিজেই নিজের টংকারে ঝংকারে হুংকারে ক্রেংকারে আকাশ কাঁপিয়ে রেখেছে। তার ভারে, তার জটিলতায়, তার জঞ্জালে পৃথিবীর বক্ষ ব্যথিত হয়ে উঠল। ভেবে পাই নে, এর অন্ত কোথায়। থাকের উপরে আর কত থাক উঠবে, গাঁঠের উপরে আর কত গাঁঠ পড়বে। এই প্রশ্নেরই জবাব ছিল ঐ গাছের পাতায়।"

"বটে? কী জবাব শুনি।"

"সে বলছে, প্রাণ যত ক্ষণ নেই তত ক্ষণ সমস্তই কেবল স্তূপ, সমস্তই কেবল ভার। প্রাণের পরশ লাগবা মাত্রই উপকরণের সঙ্গে উপকরণ আপনি মিলে গিয়ে অখণ্ড সুন্দর হয়ে ওঠে। সেই সুন্দরকেই দেখো এই বনবিহারী। তারই বাঁশি তো বাজছে বটের ছায়ায়।"

৫

তখন কবেকার কোন্ ভোররাত্রি।

প্রাণ আপন সুপ্তিশয্যা ছাড়ল; সেই প্রথম পথে বাহির হল অজানার উদ্দেশে, অসাড় জগতের তেপান্তর মাঠে।

তখনও তার দেহে ক্লান্তি নেই, মনে চিন্তা নেই; তার রাজপুত্তুরের সাজে না লেগেছে ধুলো, না ধরেছে ছিদ্র।

সেই অক্লান্ত নিশ্চিন্ত অম্লান প্রাণটিকে দেখলেম এই আষাঢ়ের সকালে, ঐ বট-গাছটিতে। সে তার শাখা নেড়ে আমাকে বললে, "নমস্কার।"

আমি বললেম, "রাজপুত্তুর, মরুদৈত্যটার সঙ্গে লড়াই চলছে কেমন বলো তো।"

সে বললে, "বেশ চলছে, একবার চার দিকে তাকিয়ে দেখো-না।"

তাকিয়ে দেখি, উত্তরের মাঠ ঘাসে ঢাকা, পুবের মাঠে আউশ ধানের অঙ্কুর, দক্ষিণে বাঁধের ধারে তালের সার; পশ্চিমে শালে তালে মহুয়ায়, আমে জামে খেজুরে, এমনি জটলা করেছে যে দিগন্ত দেখা যায় না।

আমি বললেম, "রাজপুত্তুর, ধন্য তুমি। তুমি কোমল, তুমি কিশোর, আর দৈত্যটা হল যেমন প্রবীণ তেমনি কঠোর; তুমি ছোটো, তোমার তূণ ছোটো, তোমার তীর ছোটো, আর ও হল বিপুল, ওর বর্ম মোটা, ওর গদা মস্ত। তবু তো দেখি, দিকে দিকে তোমার ধ্বজা উড়ল, দৈত্যটার পিঠের উপর তুমি পা রেখেছ; পাথর মানছে হার, ধুলো দাসখত লিখে দিচ্ছে।"

বট বললে, "তুমি এত সমারোহ কোথায় দেখলে।"

আমি বললেম, "তোমার লড়াইকে দেখি শান্তির রূপে, তোমার কর্মকে দেখি বিশ্রামের বেশে, তোমার জয়কে দেখি নম্রতার মূর্তিতে। সেই জন্তেই তো তোমার ছায়ায় সাধক এসে বসেছে ঐ সহজ যুদ্ধজয়ের মন্ত্র আর ঐ সহজ অধিকারের সন্ধিটি শেখবার জন্তে। প্রাণ যে কেমন ক'রে কাজ করে, অরণ্যে অরণ্যে তারই পাঠশালা খুলেছ। তাই যারা ক্লান্ত তারা তোমার ছায়ায় আসে, যারা আর্ত তারা তোমার বাণী খোঁজে।

আমার স্তব শুনে বটের ভিতরকার প্রাণপুরুষ বুঝি খুশি হল ; সে বলে উঠল, "আমি বেরিয়েছি মরুদৈত্যের সঙ্গে লড়াই করতে ; কিন্তু আমার এক ছোটো ভাই আছে, সে যে কোন্ লড়াইয়ে কোথায় চলে গেল আমি তার আর নাগাল পাই নে। কিছু ক্ষণ আগে তারই কথা কি তুমি বলছিলে।"

"হ্যাঁ, তাকেই আমরা নাম দিয়েছি— মন।"

"সে আমার চেয়ে চঞ্চল। কিছুতে তার সন্তোষ নেই। সেই অশান্তটার খবর আমাকে দিতে পার ?"

আমি বললেম, "কিছু কিছু পারি বই কি। তুমি লড়ছ বাঁচবার জন্তে, সে লড়ছে পাবার জন্তে, আরও দূরে আর-একটা লড়াই চলছে ছাড়বার জন্তে। তোমার লড়াই অসাড়ের সঙ্গে, তার লড়াই অভাবের সঙ্গে, আরও একটা লড়াই আছে সঞ্চয়ের সঙ্গে। লড়াই জটিল হয়ে উঠল, ব্যূহের মধ্যে যে প্রবেশ করছে ব্যূহ থেকে বেরোবার পথ সে খুঁজে পাচ্ছে না। হার জিত অনিশ্চিত ব'লে ধাঁধা লাগল। এই দ্বিধার মধ্যে তোমার ঐ সবুজ পতাকা যোদ্ধাদের আশ্বাস দিচ্ছে। বলছে, 'জয়, প্রাণের জয়।' গানের তান বেড়ে বেড়ে চলেছে, কোন্ সপ্তক থেকে কোন্ সপ্তকে চড়ল তার ঠিকানা নেই। এই স্বরসংকটের মধ্যে তোমার তম্বূরাটি সরল তারে বলছে, 'ভয় নেই, ভয় নেই।' বলছে, 'এই তো মূল সুর আমি বেঁধে রেখেছি, এই আদি প্রাণের সুর। সকল উন্মত্ত তানই এই সুরে সুন্দরের ধুয়োয় এসে মিলবে আনন্দের গানে। সকল পাওয়া, সকল দেওয়া ফুলের মতো ফুটবে, ফলের মতো ফলবে।' "

আগমনী

আয়োজন চলেইছে। তার মাঝে একটুও ফাঁক পাওয়া যায় না যে ভেবে দেখি, কিসের আয়োজন।

তবুও কাজের ভিড়ের মধ্যে মনকে এক-একবার ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞাসা করি, "কেউ আসবে বুঝি ?"

মন বলে, "রোসো। আমাকে জায়গা দখল করতে হবে, জিনিসপত্র জোগাতে হবে, ঘরবাড়ি গড়তে হবে, এখন আমাকে বাজে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোরো না।"

চুপচাপ করে আবার খাটতে বসি। ভাবি, জায়গা-দখল সারা হবে, জিনিসপত্র-সংগ্রহ শেষ হবে, ঘরবাড়ি-গড়া বাকি থাকবে না, তখন শেষ জবাব মিলবে।

জায়গা বেড়ে চলেছে, জিনিসপত্র কম হল না, ইমারতের সাতটা মহল সারা হল। আমি বললেম, "এইবার আমার কথার একটা জবাব দাও।"

মন বলে, "আরে রোসো, আমার সময় নেই।"

আমি বললেম, "কেন, আরও জায়গা চাই ? আরও ঘর ? আরও সরঞ্জাম ?"

মন বললে, "চাই বই কি।"

আমি বললেম, "এখনও যথেষ্ট হয় নি ?"

মন বললে, "এতটুকুতে ধরবে কেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করলেম, "কী ধরবে। কাকে ধরবে।"

মন বললে, "সেসব কথা পরে হবে।"

তবু আমি প্রশ্ন করলেম, "সে বুঝি মস্ত বড়ো ?"

মন উত্তর করলে, "বড়ো বই কি।"

এত বড়ো ঘরেও তাকে কুলোবে না, এত মস্ত জায়গায়! আবার উঠেপড়ে লাগলেম। দিনে আহার নেই, রাত্রে নিদ্রা নেই। যে দেখলে সেই বাহবা দিলে; বললে, "কাজের লোক বটে।"

এক-একবার কেমন আমার সন্দেহ হতে লাগল, বুঝি মন বাঁদরটা আসল কথার জবাব জানে না। সেইজন্যেই কেবল কাজ চাপা দিয়ে জবাবটাকে সে ঢাকা দেয়। মাঝে মাঝে এক-একবার ইচ্ছা হয়, কাজ বন্ধ করে কান পেতে শুনি পথ দিয়ে কেউ আসছে কি না। ইচ্ছা হয়, আর ঘর না বাড়িয়ে ঘরে আলো জ্বালি, আর সাজ সরঞ্জাম না জুটিয়ে ফুল ফোটার বেলা থাকতে একটা মালা গেঁথে রাখি।

কিন্তু, ভরসা হয় না। কারণ, আমার প্রধান মন্ত্রী হল মন। সে দিনরাত তার দাঁড়িপাল্লা আর মাপকাঠি নিয়ে ওজন-দরে আর গজের মাপে সমস্ত জিনিস যাচাই করছে। সে কেবলই বলছে, "আরও না হলে চলবে না।"

"কেন চলবে না।"

"সে যে মস্ত বড়ো।"

"কে মস্ত বড়ো।"

বাস্, চুপ। আর কথা নেই।

যখন তাকে চেপে ধরি "অমন করে এড়িয়ে গেলে চলবে না, একটা জবাব দিতেই হবে" তখন সে রেগে উঠে বলে, "জবাব দিতেই হবে, এমন কী কথা। যার উদ্দেশ মেলে না, যার খবর পাই নে, যার মানে বোঝবার জো নেই, তুমি সেই কথা নিয়েই কেবল আমার কাজ কামাই করে দাও। আর, আমার এই দিকটাতে তাকাও দেখি। কত মামলা, কত লড়াই; লাঠিসড়কি-পাইক-বরকন্দাজে পাড়া জুড়ে গেল; মিস্ত্রিতে মজুরে ইটকাঠ-চুন-সুরকিতে কোথাও পা ফেলবার জো কী। সমস্তই স্পষ্ট; এর মধ্যে আন্দাজ নেই, ইশারা নেই। তবে এ-সমস্ত পেরিয়েও আবার প্রশ্ন কেন।"

শুনে তখন ভাবি, মনটাই সেয়ানা, আমিই অবুঝ। আবার ঝুড়িতে করে ইট বয়ে আনি, চুনের সঙ্গে সুরকি মেশাতে থাকি।

২

এমনি করেই দিন যায়। আমার ভূমি দিগন্ত পেরিয়ে গেল, ইমারতের পাঁচ তলা সারা হয়ে ছ'তলার ছাদ পিটোনো চলছে। এমন সময়ে একদিন বাদলের মেঘ কেটে গেল; কালো মেঘ হল সাদা; কৈলাসের শিখর থেকে ভৈরোঁর তান নিয়ে ছুটির হাওয়া বইল, মানস-সরোবরের পদ্মগন্ধে দিনরাত্রির দণ্ডপ্রহরগুলোকে মৌমাছির মতো উতলা করে দিলে। উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি, সমস্ত আকাশ হেসে উঠেছে আমার ছয়তলা ঐ বাড়িটার উদ্ধত ভারাগুলোর দিকে চেয়ে।

আমি তো ব্যাকুল হয়ে পড়লেম; যাকে দেখি তাকেই জিজ্ঞাসা করি, "ওগো, কোন্ হাওয়াখানা থেকে আজ নহবত বাজছে বলো তো।"

তারা বলে, "ছাড়ো, আমার কাজ আছে।"

একটা খ্যাপা পথের ধারে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে, মাথায় কুন্দফুলের মালা জড়িয়ে চুপ করে বসে ছিল। সে বললে, "আগমনীর সুর এসে পৌঁছল।"

আমি যে কী বুঝলেম জানি নে; বলে উঠলেম, "তবে আর দেরি নেই।"

সে হেসে বললে, "না, এল ব'লে।"

তখনি খাতাঞ্জিখানায় এসে মনকে বললেম, "এবার কাজ বন্ধ করো।"

মন বললে, "সে কী কথা। লোকে যে বলবে অকর্মণ্য।"

আমি বললেম, "বলুক গে।"

মন বললে, "তোমার হল কী। কিছু খবর পেয়েছ নাকি।"

আমি বললেম, "হাঁ, খবর এসেছে।"

"কী খবর।"

মুশকিল, স্পষ্ট ক'রে জবাব দিতে পারি নে। কিন্তু, খবর এসেছে। মানস-সরোবরের তীর থেকে আলোকের পথ বেয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে হাঁস এসে পৌঁছল।

মন মাথা নেড়ে বললে, "মস্ত বড়ো রথের চুড়ো কোথায়, আর মস্ত ভারি সমারোহ? কিছু তো দেখি নে, শুনি নে।"

বলতে বলতে আকাশে কে যেন পরশমণি ছুঁইয়ে দিলে। সোনার আলোয় চার দিক ঝল্‌মল্‌ করে উঠল। কোথা থেকে একটা রব উঠে গেল, "দূত এসেছে।"

আমি মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে দূতের উদ্দেশে জিজ্ঞাসা করলেম, "আসছেন নাকি।"

চার দিক থেকে জবাব এল, "হাঁ, আসছেন।"

মন ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, "কী করি! সবেমাত্র আমার ছয়তলা বাড়ির ছাদ পিটোনো চলছে; আর, সাজ সরঞ্জাম সব তো এসে পৌঁছল না।"

উত্তর শোনা গেল, "আরে ভাঙো ভাঙো, তোমার ছতলা বাড়ি ভাঙো।"

মন বললে, "কেন।"

উত্তর এল, "আজ আগমনী যে। তোমার ইমারতটা বুক ফুলিয়ে পথ আটকেছে।"

মন অবাক হয়ে রইল।

আবার শুনি, "ঝেঁটিয়ে ফেলো তোমার সাজ সরঞ্জাম।"

মন বললে, "কেন।"

"তোমার সরঞ্জাম যে ভিড় করে জায়গা জুড়েছে।"

যাক গে। কাজের দিনে ব'সে ব'সে ছতলা বাড়ি গাঁথলেম, ছুটির দিনে একে একে সব-ক'টা তলা ধূলিসাৎ করতে হল। কাজের দিনে সাজ সরঞ্জাম হাটে হাটে জড়ো করা গেল, ছুটির দিনে সমস্ত বিদায় করেছি।

কিন্তু, মস্ত বড়ো রথের চুড়ো কোথায়, আর মস্ত ভারি সমারোহ?

মন চার দিকে তাকিয়ে দেখলে।

কী দেখতে পেলে।

শরৎপ্রভাতের শুকতারা।

কেবল ঐটুকু?

হাঁ, ঐটুকু। আর দেখতে পেলে শিউলিবনের শিউলিফুল।

কেবল ঐটুকু?

হাঁ, ঐটুকু। আর দেখা দিল লেজ দুলিয়ে ভোরবেলাকার একটি দোয়েল পাখি।

আর কী।

আর, একটি শিশু, সে খিল্‌খিল্‌ ক'রে হাসতে হাসতে মায়ের কোল থেকে ছুটে পালিয়ে এল বাইরের আলোতে।

"তুমি যে বললে আগমনী, সে কি এরই জন্যে।"

"হাঁ, এরই জন্যেই তো প্রতিদিন আকাশে বাঁশি বাজে, ভোরের বেলায় আলো হয়।"

"এরই জন্যে এত জায়গা চাই?"

"হাঁ গো, তোমার রাজার জন্যে সাতমহলা বাড়ি, তোমার প্রভুর জন্যে ঘরভরা সরঞ্জাম। আর, এদের জন্যে সমস্ত আকাশ, সমস্ত পৃথিবী।"

"আর, মস্ত-বড়ো?"

"মস্ত-বড়ো এইটুকুর মধ্যেই থাকেন।"

"ঐ শিশু তোমাকে কী বর দেবে।"

"ঐ তো বিধাতার বর নিয়ে আসে। সমস্ত পৃথিবীর আশা নিয়ে, অভয় নিয়ে, আনন্দ নিয়ে। ওরই গোপন তূণে লুকোনো থাকে ব্রহ্মাস্ত্র, ওরই হৃদয়ের মধ্যে ঢাকা আছে শক্তিশেল।"

মন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "হাঁ গো কবি, কিছু দেখতে পেলে, কিছু বুঝতে পারলে?"

আমি বললেম, "সেই জন্যেই ছুটি নিয়েছি। এত দিন সময় ছিল না, তাই দেখতে পাই নি, বুঝতে পারি নি।"

স্বর্গ-মর্ত

গান

মাটির প্রদীপখানি আছে
মাটির ঘরের কোলে,
সন্ধ্যাতারা তাকায় তারই
আলো দেখবে ব'লে।
সেই আলোটি নিমেষহত
প্রিয়ার ব্যাকুল চাওয়ার মতো,
সেই আলোটি মায়ের প্রাণের
ভয়ের মতো দোলে।
সেই আলোটি নেবে জ্বলে
শ্যামল ধরার হৃদয়তলে,
সেই আলোটি চপল হাওয়ায়
ব্যথায় কাঁপে পলে পলে।
নামল সন্ধ্যাতারার বাণী
আকাশ হতে আশিস আনি,
অমর শিখা আকুল হল
মর্ত শিখায় উঠতে জ্বলে।

ইন্দ্র। সুরগুরো, একদিন দৈত্যদের হাতে আমরা স্বর্গ হারিয়েছিলুম। তখন দেবে মানবে মিলে আমরা স্বর্গের জন্যে লড়াই করেছি, এবং স্বর্গকে উদ্ধার করেছি, কিন্তু এখন আমাদের বিপদ তার চেয়ে অনেক বেশি। সে কথা চিন্তা করে দেখবেন।

বৃহস্পতি। মহেন্দ্র, আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে। স্বর্গের কী বিপদ আশঙ্কা করছেন।

ইন্দ্র। স্বর্গ নেই।

বৃহস্পতি। নেই? সে কী কথা। তা হলে আমরা আছি কোথায়।

ইন্দ্র। আমরা আমাদের অভ্যাসের উপর আছি, স্বর্গ যে কখন ক্রমে ক্ষীণ হয়ে, ছায়া হয়ে, লুপ্ত হয়ে গেছে, তা জানতেও পারি নি।

কার্তিকেয়। কেন দেবরাজ, স্বর্গের সমস্ত সমারোহ, সমস্ত অনুষ্ঠানই তো চলছে।

ইন্দ্র। অনুষ্ঠান ও সমারোহ বেড়ে উঠেছে, দিনশেষে সূর্যাস্তের সমারোহের মতো, তার পশ্চাতে অন্ধকার। তুমি তো জান দেবসেনাপতি, স্বর্গ এত মিথ্যা হয়েছে যে, সকলপ্রকার বিপদের ভয় পর্যন্ত তার চলে গেছে। দৈত্যেরা যে কত যুগযুগান্তর তাকে আক্রমণ করে নি তা মনে পড়ে না। আক্রমণ করবার যে কিছুই নেই। মাঝে মাঝে স্বর্গের যখন পরাভব হ'ত তখনও স্বর্গ ছিল, কিন্তু যখন থেকে—

কার্তিকেয়। আপনার কথা যেন কিছু কিছু বুঝতে পারছি।

বৃহস্পতি। স্বপ্ন থেকে জাগবা মাত্রই যেমন বোঝা যায়, স্বপ্ন দেখছিলুম, ইন্দ্রের কথা শুনেই তেমনি মনে হচ্ছে, একটা যেন মায়ার মধ্যে ছিলুম, কিন্তু তবু এখনও সম্পূর্ণ ঘোর ভাঙে নি।

কার্তিকেয়। আমার কী রকম বোধ হচ্ছে বলব ? তূণের মধ্যে শর আছে, সেই শরের ভার বহন করছি, সেই শরের দিকেই মন বদ্ধ আছে, ভাবছি সমস্তই ঠিক আছে। এমন সময়ে কে যেন বললে, একবার তোমার চার দিকে তাকিয়ে দেখো। চেয়ে দেখি, শর আছে কিন্তু লক্ষ্য করবার কিছুই নেই। স্বর্গের লক্ষ্য চলে গেছে।

বৃহস্পতি। কেন এমন হল তার কারণ তো জানা চাই।

ইন্দ্র। যে মাটির থেকে রস টেনে স্বর্গ আপনার ফুল ফুটিয়েছিল সেই মাটির সঙ্গে তার সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে গেছে।

বৃহস্পতি। মাটি আপনি কাকে বলছেন।

ইন্দ্র। পৃথিবীকে। মনে তো আছে, একদিন মানুষ স্বর্গে এসে দেবতার কাজে যোগ দিয়েছে এবং দেবতা পৃথিবীতে নেমে মানুষের যুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে। তখন স্বর্গ মর্ত উভয়েই সত্য হয়ে উঠেছিল, তাই সেই যুগকে সত্যযুগ বলত। সেই পৃথিবীর সঙ্গে যোগ না থাকলে স্বর্গ আপনার অমৃতে আপনি কি বাঁচতে পারে।

কার্তিকেয়। আর, পৃথিবীও যে যায়, দেবরাজ। মানুষ এমনি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাচ্ছে যে, সে আপনার শৌর্যকে আর বিশ্বাস করে না, কেবল বস্তুর উপরেই তার ভরসা। বস্তু নিয়ে মারামারি কাটাকাটি পড়ে গেছে। স্বর্গের টান যে ছিন্ন হয়েছে, তাই আত্মা বস্তু ভেদ করে আলোকের দিকে উঠতে পারছে না।

বৃহস্পতি। এখন উদ্ধারের উপায় কী।

ইন্দ্র। পৃথিবীর সঙ্গে স্বর্গের আবার যোগসাধন করতে হবে।

বৃহস্পতি। কিন্তু, দেবতারা যে পথ দিয়ে পৃথিবীতে যেতেন, অনেক দিন হল, সে পথের চিহ্ন লোপ হয়ে গেছে। আমি মনে করেছিলুম, ভালোই হয়েছে। ভেবেছিলুম, এইবার প্রমাণ হয়ে যাবে, স্বর্গ নিরপেক্ষ, নিরবলম্ব, আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ।

ইন্দ্র। একদিন সকলেরই সেই বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে, পৃথিবীর প্রেমেই স্বর্গ বাঁচে, নইলে স্বর্গ শুকিয়ে যায়। অমৃতের অভিমানে সেই কথা ভুলেছিলুম বলেই পৃথিবীতে দেবতার যাবার পথের চিহ্ন লোপ পেয়েছিল।

কার্তিকেয়। দৈত্যদের পরাভবের পর থেকে আমরা আটঘাট বেঁধে স্বর্গকে সুরক্ষিত করে তুলেছি। তার পর থেকে স্বর্গের ঐশ্বর্য স্বর্গের মধ্যেই জমে আসছে; বাহিরে তার আর প্রয়োগ নেই, তার আর ক্ষয় নেই। যুগ যুগ হতে অব্যাঘাতে তার এতই উন্নতি হয়ে এসেছে যে, বাহিরের অন্য সমস্ত-কিছু থেকে স্বর্গ বহু দূরে চলে গেছে। স্বর্গ তাই আজ একলা।

ইন্দ্র। উন্নতিই হোক আর দুর্গতিই হোক, যাতেই চার দিকের সঙ্গে বিচ্ছেদ আনে তাতেই ব্যর্থতা আনে। ক্ষুদ্র থেকে মহৎ যখন সুদূরে চলে যায় তখন তার মহত্ত্ব নিরর্থক হয়ে আপনাকে আপনি ভারগ্রস্ত করে মাত্র। স্বর্গের আলো আজ আপনার মাটির প্রদীপের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলেয়ার আলো হয়ে উঠেছে, লোকালয়ের আয়ত্তের অতীত হয়ে সে নিজেরও আয়ত্তের অতীত হয়েছে; নির্বাপণের শাস্তির চেয়ে তার এই শাস্তি গুরুতর। দেবলোক আপনাকে অতি বিশুদ্ধ রাখতে গিয়ে আপন শুচিতার উচ্চ প্রাচীরে নিজেকে বন্দী করেছে, সেই দুর্গম প্রাচীর ভেঙে গঙ্গার ধারার মতো মলিন মর্তের মধ্যে তাকে প্রবাহিত করে দিয়ে তবে তার বন্ধনমোচন হবে। তার সেই স্বাতন্ত্র্যের বেষ্টন বিদীর্ণ করবার জন্যেই আমার মন আজ এমন বিচলিত হয়ে উঠেছে। স্বর্গকে আমি ঘিরতে দেব না, বৃহস্পতি; মলিনের সঙ্গে, পতিতের সঙ্গে, অজ্ঞানীর সঙ্গে, দুঃখীর সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দিতে হবে।

বৃহস্পতি। তা হলে আপনি কী করতে চান।

ইন্দ্র। আমি পৃথিবীতে যাব।

বৃহস্পতি। সেই যাবার পথটাই বন্ধ, সেই নিয়েই তো দুঃখ।

ইন্দ্র। দেবতার স্বরূপে সেখানে আর যেতে পারব না, মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করব। নক্ষত্র যেমন খ'সে প'ড়ে তার আকাশের আলো আকাশে নিবিয়ে দিয়ে, মাটি হয়ে মাটিকে আলিঙ্গন করে, আমি তেমনি করে পৃথিবীতে যাব।

বৃহস্পতি। আপনার জন্মাবার উপযুক্ত বংশ পৃথিবীতে এখন কোথায়।

কার্তিকেয়। বৈশ্য এখন রাজা, ক্ষত্রিয় এখন বৈশ্যের সেবায় লড়াই করছে, ব্রাহ্মণ এখন বৈশ্যের দাস।

ইন্দ্র। কোথায় জন্মাব সে তো আমার ইচ্ছার উপরে নেই, যেখানে আমাকে আকর্ষণ করে নেবে সেইখানেই আমার স্থান হবে।

বৃহস্পতি। আপনি যে ইন্দ্র সেই স্মৃতি কেমন করে—

ইন্দ্র। সেই স্মৃতি লোপ করে দিয়ে তবেই আমি মর্তবাসী হয়ে মর্তের সাধনা করতে পারব।

কার্তিকেয়। এতদিন পৃথিবীর অস্তিত্ব ভুলেই ছিলুম, আজ আপনার কথায় হঠাৎ মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। সেই তন্বী শ্যামা ধরণী সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের পথ ধরে স্বর্গের দিকে কী উৎসুক দৃষ্টিতেই তাকিয়ে আছে। সেই ভীরুর ভয় ভাঙিয়ে দিতে কী আনন্দ। সেই ব্যথিতার মনে আশার সঞ্চার করতে কী গৌরব। সেই চন্দ্রকান্তমণিকিরীটিনী নীলাম্বরী সুন্দরী কেমন করে ভুলে গিয়েছে যে সে রানী। তাকে আবার মনে করিয়ে দিতে হবে যে, সে দেবতার সাধনার ধন, সে স্বর্গের চিরদয়িতা।

ইন্দ্র। আমি সেখানে গিয়ে তার দক্ষিণসমীরণে এই কথাটি রেখে আসতে চাই যে, তারই বিরহে স্বর্গের অমৃতে স্বাদ চলে গেছে এবং নন্দনের পারিজাত ম্লান; তাকে বেষ্টন ক'রে ধ'রে যে সমুদ্র রয়েছে সেই তো স্বর্গের অশ্রু, তারই বিচ্ছেদক্রন্দনকেই তো সে মর্তে অনন্ত করে রেখেছে।

কার্তিকেয়। দেবরাজ, যদি অনুমতি করেন তা হলে আমরাও পৃথিবীতে যাই।

বৃহস্পতি। সেখানে মৃত্যুর অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়ে অমৃতের জ্যোতিকে একবার দেখে আসি।

কার্তিকেয়। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী তাঁর মাটির ঘরটিতে যে নিত্যনূতন লীলা বিস্তার করেছেন আমরা তার রস থেকে কেন বঞ্চিত হব। আমি যে বুঝতে পারছি, আমাকে পৃথিবীর দরকার আছে; আমি নেই বলেই তো সেখানে মানুষ স্বার্থের জন্যে নির্লজ্জ হয়ে যুদ্ধ করছে, ধর্মের জন্যে নয়।

বৃহস্পতি। আর, আমি নেই বলেই তো মানুষ কেবল ব্যবহারের জন্যে জ্ঞানের সাধনা করছে, মুক্তির জন্যে নয়।

ইন্দ্র। তোমরা সেখানে যাবে, আমি তো তারই উপায় করতে চলেছি; সময় হলেই তোমরা পরিণত ফলের মতো আপন মাধুর্যভারে সহজেই মর্তে স্খলিত হয়ে পড়বে। সে পর্যন্ত অপেক্ষা করো।

কার্তিকেয়। কখন টের পাব মহেন্দ্র, যে, আপনার সাধনা সার্থক হল।

বৃহস্পতি। সে কি আর চাপা থাকবে। যখন জয়শঙ্খধ্বনিতে স্বর্গলোক কেঁপে উঠবে তখনি বুঝব যে—

ইন্দ্র। না দেবগুরু, জয়ধ্বনি উঠবে না। স্বর্গের চোখে যখন করুণার অশ্রু গলে পড়বে তখনই জানবেন, পৃথিবীতে আমার জন্মলাভ সফল হল।

২৬।১২

কার্তিকেয়। তত দিন বোধ হয় জানতে পারব না, সেখানে ধুলার আবরণে আপনি কোথায় লুকিয়ে আছেন।

বৃহস্পতি। পৃথিবীর রসই তো হল এই লুকোচুরিতে। ঐশ্বর্য সেখানে দরিদ্রবেশে দেখা দেয়, শক্তি সেখানে অক্ষমের কোলে মানুষ হয়, বীর্য সেখানে পরাভবের মাটির তলায় আপন জয়স্তম্ভের ভিত্তি খনন করে। সম্ভব সেখানে অসম্ভবের মধ্যে বাসা করে থাকে। যা দেখা দেয়, পৃথিবীতে তাকে মানতে গিয়েই ভুল হয়; যা না দেখা দেয় তারই উপর চিরদিন ভরসা রাখতে হবে।

কার্তিকেয়। কিন্তু সুররাজ, আপনার ললাটের চিরোজ্জ্বল জ্যোতি আজ ম্লান হল কেন।

বৃহস্পতি। মর্তে যে যাবেন তার গৌরবের প্রভা আজ দীপ্যমান হয়ে উঠুক।

ইন্দ্র। দেবগুরু, জন্মের যে বেদনা সেই বেদনা এখনি আমাকে পীড়িত করছে। আজ আমি দুঃখেরই অভিসারে চলেছি, তারই আহ্বানে আমার মনকে টেনেছে। শিবের সঙ্গে সতীর যেমন বিচ্ছেদ হয়েছিল, স্বর্গের আনন্দের সঙ্গে পৃথিবীর ব্যথার তেমনি বিচ্ছেদ হয়েছে; সেই বিচ্ছেদের দুঃখ এত দিন পরে আজ আমার মনে রাশীকৃত হয়ে উঠেছে। আমি চললুম সেই ব্যথাকে বুকে তুলে নেবার জন্যে। প্রেমের অমৃতে সেই ব্যথাকে আমি সৌভাগ্যবতী করে তুলব। আমাকে বিদায় দাও।

কার্তিকেয়। মহেন্দ্র, আমাদের জন্যে পথ করে দাও, আমরা সেইখানেই গিয়ে তোমার সঙ্গে মিলব। স্বর্গ আজ দুঃখের অভিযানে বাহির হোক।

বৃহস্পতি। আমরা পথের অপেক্ষাতেই রইলুম, দেবরাজ। স্বর্গ থেকে বাহির হবার পথ করে দাও, নইলে আমাদের মুক্তি নেই।

কার্তিকেয়। বাহির করো, দেবরাজ, স্বর্গের বন্ধন থেকে আমাদের বাহির করো— মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আমাদের পথ রচনা করো।

বৃহস্পতি। তুমি স্বর্গরাজ, আজ তুমি স্বর্গের তপোভঙ্গ ক'রে জানিয়ে দাও যে, স্বর্গ পৃথিবীরই।

কার্তিকেয়। যারা স্বর্গকামনায় পৃথিবীকে ত্যাগ করবার সাধনা করেছে চিরদিন তুমি তাদের পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছ, আজ স্বয়ং স্বর্গকে সেই পথে নিয়ে যেতে হবে।

ইন্দ্র। সেই বাধার ভিতর দিয়ে মুক্তিতে যাবার পথ—

বৃহস্পতি। যে মুক্তি আপন আনন্দে চিরদিনই বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করে।

গান

পথিক হে, পথিক হে,
ঐ যে চলে, ঐ যে চলে
সঙ্গী তোমার দলে দলে।
অন্যমনে থাকি কোণে,
চমক লাগে ক্ষণে ক্ষণে,
হঠাৎ শুনি জলে স্থলে
পায়ের ধ্বনি আকাশতলে
পথিক হে, পথিক হে,
যেতে যেতে পথের থেকে,
আমায় তুমি যেয়ো ডেকে।
যুগে যুগে বারে বারে
এসেছিলে আমার দ্বারে,
হঠাৎ যে তাই জানিতে পাই
তোমার চলা হৃদয়তলে।

—

সংযোজন

কথিকা

এবার মনে হল, মানুষ অন্যায়ের আগুনে আপনার সমস্ত ভাবী কালটাকে পুড়িয়ে কালো করে দিয়েছে, সেখানে বসন্ত কোনোদিন এসে আর নতুন পাতা ধরাতে পারবে না।

মানুষ অনেক দিন থেকে একখানি আসন তৈরি করছে। সেই আসনই তাকে খবর দেয় যে, তার দেবতা আসবেন, তিনি পথে বেরিয়েছেন।

যেদিন উন্মত্ত হয়ে সেই তার অনেক দিনের আসন সে ছিঁড়ে ফেলে সেদিন তার যজ্ঞস্থলীর ভগ্নবেদী বলে, "কিছুই আশা করবার নেই, কেউ আসবে না।"

তখন এত দিনের আয়োজন আবর্জনা হয়ে ওঠে। তখন চারি দিক থেকে শুনতে পাই, "জয়, পশুর জয়।"

তখন শুনি, "আজও যেমন কালও তেমনি। সময় চোখে-ঠুলি-দেওয়া বলদের মতো, চিরদিন একই ঘানিতে একই আর্তস্বর তুলছে। তাকেই বলে সৃষ্টি। সৃষ্টি হচ্ছে অন্ধের কান্না।"

মন বললে, "তবে আর কেন। এবার গান বন্ধ করা যাক। যা আছে কেবলমাত্র তারই বোঝা নিয়ে ঝগড়া চলে, যা নেই তারই আশা নিয়েই গান।"

শিশুকাল থেকে যে পথের পানে চেয়ে বারে বারে মনে আগমনীর হাওয়া লেগেছে— যে পথ দিগন্তের দিকে কান পেতেছে দেখে বুঝেছিলুম, ও পার থেকে রথ বেরোল— সেই পথের দিকে আজ তাকালেম ; মনে হল, সেখানে না আছে আগন্তুকের সাড়া, না আছে কোনো ঘরের।

বীণা বললে, "দীর্ঘ পথে আমার সুরের সাথি যদি কেউ না থাকে তবে আমাকে পথের ধারে ফেলে দাও।"

তখন পথের ধারের দিকে চাইলুম। চমকে উঠে দেখি, ধুলোর মধ্যে একটি কাঁটাগাছ ; তাতে একটিমাত্র ফুল ফুটেছে।

আমি বলে উঠলুম, "হায় রে হায়, ঐ তো পায়ের চিহ্ন।"

তখন দেখি, দিগন্ত পৃথিবীর কানে কানে কথা কইছে; তখন দেখি, আকাশে আকাশে প্রতীক্ষা। তখন দেখি, চাঁদের আলোয় তালগাছের পাতায় পাতায় কাঁপন ধরেছে; বাঁশঝাড়ের ফাঁক দিয়ে দিঘির জলের সঙ্গে চাঁদের চোখে চোখে ইশারা।

পথ বললে, "ভয় নেই।"

আমার বীণা বললে, "সুর লাগাও।"

—

সে

উৎসর্গ

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
করতলযুগলেষু

মেঘের ফুরোল কাজ এইবার।
সময় পেরিয়ে দিয়ে ঢেলেছিল জলধার,
সুদীর্ঘ কালের পরে নিল ছুটি।
উদাসী হাওয়ার সাথে জুটি
রচিছে যেন সে অন্যমনে
আকাশের কোণে কোণে
ছবির খেয়াল রাশি রাশি,
মিলিছে তাহার সাথে হেমন্তে কুয়াশা-ছোঁওয়া হাসি।
দেবপিতামহ হাসে স্বর্গের কর্মের হেরি হেলা,
ইন্দ্রের প্রাঙ্গণতলে দেবতার অর্থহীন খেলা।

আমারো খেয়াল-ছবি মনের গহন হতে
ভেসে আসে বায়ুস্রোতে।
নিয়মের দিগন্ত পারায়ে
যায় সে হারায়ে
নিরুদ্দেশে
বাউলের বেশে।

যেথা আছে খ্যাতিহীন পাড়া
সেথায় সে মুক্তি পায় সমাজ-হারানো লক্ষ্মীছাড়া।
যেমন-তেমন এরা বাঁকা বাঁকা
কিছু ভাষা দিয়ে কিছু তুলি দিয়ে আঁকা,
দিলেম উজাড় করি ঝুলি।
লও যদি লও তুলি,
রাখ ফেল যাহা ইচ্ছা তাই—
কোনো দায় নাই।

ফসল কাটার পরে
শূন্য মাঠে তুচ্ছ ফুল ফোটে অগোচরে
আগাছার সাথে।
এমন কি আছে কেউ যেতে যেতে তুলে নেবে হাতে-
যার কোনো দাম নেই,
নাম নেই,
অধিকারী নাই যার কোনো,
বনশ্রী মর্যাদা যারে দেয় নি কখনো।

শান্তিনিকেতন
পৌষ ১৩৪৩

সে

বিধাতা লক্ষলক্ষ কোটিকোটি মানুষ সৃষ্টি করে চলেছেন, তবু মানুষের আশা মেটে না; বলে, আমরা নিজে মানুষ তৈরি করব। তাই দেবতার সজীব পুতুল-খেলার পাশাপাশি নিজের খেলা শুরু হল পুতুল নিয়ে, সেগুলো মানুষের আপন-গড়া মানুষ। তার পরে ছেলেরা বলে 'গল্প বলো'; তার মানে, ভাষায়-গড়া মানুষ বানাও। গড়ে উঠল কত রাজপুত্তুর, মন্ত্রীর পুত্তুর, সুয়োরানী, দুয়োরানী, মৎস্যনারীর উপাখ্যান, আরব্য উপন্যাস, রবিন্‌সন্‌ ক্রুসো। পৃথিবীর জনসংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলল। বুড়োরাও আপিসের ছুটির দিনে বলে, মানুষ বানাও; হল আঠারো-পর্ব মহাভারত প্রস্তুত। আর, লেগে গিয়েছেন গল্প-বানিয়ের দল দেশে দেশে।

নাৎনির ফরমাশে কিছু দিন থেকে লেগেছি মানুষ গড়ার কাজে; নিছক খেলার মানুষ, সত্যমিথ্যের কোনো জবাবদিহি নেই। গল্প যে শুনছে তার বয়স ন বছর, আর যে শোনাচ্ছে সে সত্তর পেরিয়ে গেছে। কাজটা একলাই শুরু করেছিলুম, কিন্তু মালমসলা এতই হাল্‌কা ওজনের যে, নির্বিচারে পুপুও দিল যোগ। আর-একটা লোককে রেখেছিলুম, তার কথা হবে পরে।

অনেক গল্প শুরু হয়েছে এই ব'লে যে, এক যে ছিল রাজা। আমি আরম্ভ ক'রে দিলুম, এক যে আছে মানুষ। তার পরে লোকে যাকে বলে গপ্‌পো, এতে তারও কোনো আঁচ নেই। সে মানুষ ঘোড়ায় চ'ড়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে গেল না। একদিন রাত্রি দশটার পর এল আমার ঘরে। আমি বই পড়ছিলুম। সে বললে, দাদা, খিদে পেয়েছে।

রাজপুত্তুরের গল্প অনেক শুনেছি; কখনোই তার খিদে পায় না। কিন্তু এর খিদে পেয়ে গেল গোড়াতেই, শুনে খুশি হলুম। খিদে-পাওয়া লোকের সঙ্গে ভাব করা সহজ। খুশি করবার জন্যে গলির মোড়ের থেকে বেশি দূর যেতে হয় না।

দেখলুম, লোকটার দিব্যি খাবার শখ। ফরমাশ করে মুড়োর ঘণ্ট, লাউচিংড়ি, কাঁটাচচ্চড়ি; বড়োবাজারের মালাই পেলে বাটিটা চেঁচেপুঁছে খায়। এক-একদিন শখ

খায় আইস্‌ক্রিমের। এমন ক'রে খায় সে দেখবার যোগ্য। মজুমদারদের জামাইবাবুর সঙ্গে অনেকটা মেলে।

একদিন ঝমাঝম্ বৃষ্টি। বসে বসে ছবি আঁকছি। এখানকার মাঠের ছবি। উত্তর দিকে বরাবর চলে গেছে রাঙা মাটির রাস্তা— দক্ষিণ দিকে পোড়ো জমি, উঁচুনিচু ঢেউ-খেলানো, মাঝে মাঝে ঝাঁকড়া বুনো খেজুর। দূরে দুটো-চারটে তালগাছ আকাশের দিকে কাঙালের মতো তাকিয়ে। তারই পিছনে জমে উঠেছে ঘন মেঘ, যেন একটা প্রকাণ্ড নীল বাঘ্ ওৎ পেতে আছে, কখন এক লাফে মাঝ-আকাশে উঠে সূর্যটাকে দেবে থাবার ঘা। বাটিতে রঙ গুলে তুলি বাগিয়ে এইসব এঁকে চলেছি।

দরজায় পড়ল ঠেলা। খুলে দেখি ডাকাত নয়, দৈত্য নয়, কোটালের পুত্তুর নয়— সেই লোকটা। সর্বাঙ্গ বেয়ে জল ঝরছে, ময়লা ভিজে জামা গায়ে লেপ্‌টে গেছে, কোঁচার ডগায় কাদা, জুতোয় কাদার পিণ্ডি। আমি বললুম, এ কী!

সে বললে, যখন বেরিয়েছিলুম খট্‌খটে রোদ্দুর। আদ্ধেক পথে আসতে বৃষ্টি নামল। তোমার ঐ বিছানার চাদরটা যদি দাও তো কাপড় ছেড়ে গায়ে জড়িয়ে বসি।

হুকুম পাবার সবুর সইল না। চট্ ক'রে খাটের থেকে লক্ষৌছিটের ঢাকাটা টেনে নিয়ে তাই দিয়ে মাথাটা মুছে কাপড় ছেড়ে সেটা গায়ে জড়িয়ে বসল। ভাগ্যিস কাশ্মীরি জামিয়ারটা পাতা ছিল না।

বললে, দাদা, তোমাকে একটা গান শোনাব।

কী করি, ছবি-আঁকা বন্ধ করতে হল।

সে শুরু করলে—

ভাবো শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে,
নিতান্ত কৃতান্ত-ভয়ান্ত হবে ভবে।

আমার মুখের ভাব দেখে তার কী সন্দেহ হল জানি নে; জিগেস করলে, কেমন লাগছে।

আমি বললুম, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তোমাকে গলা সাধতে হবে লোকালয় থেকে দূরে ব'সে। তার পরে বুঝে নেবেন চিত্রগুপ্ত, যদি সইতে পারেন।

সে বললে, পুপেদিদিও হিন্দুস্থানি ওস্তাদের কাছে গান শেখে, সেইখানে আমাকে বসিয়ে দিলে কেমন হয়।

আমি বললুম, পুপেদিদিকে যদি রাজি করাতে পার তা হলে কথা নেই।

সে বললে, পুপেদিদিকে আমি বড়ো ভয় করি।

এই পর্যন্ত শুনে আমার শ্রোতা পুপেদিদি খুব হেসে উঠল। তাকে কেউ ভয় করে,

এতে সে ভারি খুশি। যেমন খুশি হয় জগতের দোর্দণ্ডপ্রতাপের দল।

দয়াময়ী আশ্বাস দিয়ে বললে, ভয় নেই, আমি তাকে কিছু বলব না।

আমি বললুম, তোমাকে ভয় কে না করে! ছবেলা ছু বাটি ক'রে ছুধ খাও— গায়ে কী রকম জোর! মনে আছে তো, তোমার হাতে লাঠি দেখে সেই বাঘটা লেজ গুটিয়ে একেবারে হুটুপিসির বিছানার নীচে গিয়ে লুকিয়েছিল।

বীরাঙ্গনা ভারি খুশি। মনে করিয়ে দিলে ভালুকটার কথা— সে পালাতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিল নাবার ঘরের স্নানের জলের টবের মধ্যে।

সেই যে মানুষটার ইতিহাস গড়ে উঠেছিল আমার একলার হাতে এখন থেকে পুপেও তাতে যেখানে-সেখানে জোড়া দিতে লাগল। আমি যদি বা বলি, একদিন বেলা তিনটার সময় সে এসেছিল আমার কাছে দাড়ি কামাবার খুর চেয়ে নিতে, আর নিতে খালি বিস্কুটের টিন, পুপে খবর দেয়, সে ওর কাছ থেকে নিয়ে গেছে পশম বোনবার কুরুশ-কাটি।

সব গল্পেরই একটা আরম্ভ আছে, শেষ আছে, কিন্তু ঐ-যে 'এক যে আছে মানুষ' তার আর শেষ নেই। তার দিদির জ্বর হয়, ডাক্তার ডাকতে যায়। টমি কুকুর আছে, বেড়ালের নখের আঁচড় লেগে তার নাক যায় ছ'ড়ে। পিছন দিক থেকে গোরুর গাড়ির উপর চ'ড়ে বসেছিল, তাই নিয়ে গাড়োয়ানের সঙ্গে হয় বিষম বচসা। উঠোনে কলতলায় পিছলে প'ড়ে বামুন ঠাকরুনের মাটির ঘড়া দেয় ভেঙে। মোহন-বাগানের ফুটবল-ম্যাচ্ দেখতে গিয়েছিল, পকেট থেকে সাড়ে তিন আনা পয়সা কে নেয় তুলে; ফিরতি রাস্তায় ভীমনাগের দোকান থেকে সন্দেশ কেনা বাদ গেল। বন্ধু আছে কিনু চৌধুরী, তার ওখানে গিয়ে কুচো চিংড়ি ভাজা আর আলুর দম ফরমাশ করে। এমনি একটার পর একটা চলছে দিনের পর দিন। এর সঙ্গে পুপে জুড়েছে, কোনোদিন ছুপুরবেলায় ওর ঘরে গিয়ে বলেছে মায়ের আলমারি থেকে পাকপ্রণালীর বইখানা খুঁজে বের করতে, বন্ধু সুধাকান্তবাবু শিখতে চায় মোচার ঘণ্ট তৈরি করা। আর-একদিন পুপের সুবাসিত নারিকেল তেল নিয়ে গেল চেয়ে, ভয় হয়েছে মাথায় টাক প'ড়ে আসছে দেখে। আর-একদিন দিদ্দার ওখানে গান শুনতে গেল, দিদ্দা তখন তাকিয়া ঠেসান দিয়ে ঘুমিয়ে।

এই-যে আমাদের এক যে আছে মানুষ, এর একটা নাম নিশ্চয়ই আছে। সে কেবল আমরা ছুজনেই জানি, আর-কাউকে বলা বারণ। এইখানটাতেই গল্পের মজা। এক যে ছিল রাজা, তারও নাম নেই; রাজপুত্র, তারও নেই। আর রাজকন্যা, যার

চুল লুটিয়ে পড়ে মাটিতে, যার হাসিতে মানিক, চোখের জলে মুক্তো, তারও নাম কেউ জানে না। ওরা নামজাদা নয়, অথচ ঘরে ঘরে ওদের খ্যাতি।

এই-যে আমাদের মানুষটি, একে আমরা শুধু বলি 'সে'। বাইরের লোক কেউ নাম জিগেস করলে আমরা দুজনে মুখ-চাওয়া-চাওয়ি ক'রে হাসি। পুপে বলে, আন্দাজ ক'রে বলো দেখি, প দিয়ে আরম্ভ। কেউ বলে প্রিয়নাথ, কেউ বলে পঞ্চানন, কেউ বলে পাঁচকড়ি, কেউ বলে পীতাম্বর, কেউ বলে পরেশ, কেউ বলে পীটার্স্‌, কেউ বলে প্রেস্কট, কেউ বলে পীরবক্স, কেউ বলে পীয়ার খাঁ।

এইখানে এসে কলম থামতেই একজন বললে, গল্প চলবে তো ?

কার গল্প। এ তো রাজপুত্তুর নয়, এ হল মানুষ, এ খায়-দায় ঘুমোয়, আপিসে যায়, সিনেমা দেখবারও শখ আছে। দিনের পর দিন যা সবাই করছে তাই এর গল্প। মনের মধ্যে যদি মানুষটাকে স্পষ্ট ক'রে গ'ড়ে তোল তা হলে দেখতে পাবে, এ যখন দোকানের রোয়াকে ব'সে রসগোল্লা খায় আর তার রস ঠোঙার ছিদ্র দিয়ে অজানিতে পড়তে থাকে তার ময়লা ধুতির উপর, সেটাই গল্প। যদি জিগেস কর 'তার পরে' তা হলে বলব, তার পরে ও ট্রামে চড়ে বসল, হঠাৎ জ্ঞান হল পয়সা নেই, টপ্‌ ক'রে লাফিয়ে পড়ল। তার পরে ? তার পরে এই রকমই আরও কত কী— বড়োবাজার থেকে বহুবাজার, বহুবাজার থেকে নিমতলা।

ওদের মধ্যে একজন বললে, যা সৃষ্টিছাড়া, বড়োবাজারে বহুবাজারে, এমন-কি নিমতলাতেও যার গতি নেই, তা নিয়ে কি গল্প হয় না।

আমি বললুম, যদি হয় তা হলেই হয়, না হলে হয়ই না।

সে বললে, হোক তবে। হোক-না একেবারে যা ইচ্ছে তাই ; মাথা নেই, মুণ্ডু নেই, মানে নেই, মোদ্দা নেই, এমন একটা-কিছু।

এটা হল স্পর্ধা। বিধাতার সৃষ্টি, নিয়মের রসারসি দিয়ে ক'ষে বাঁধা, যেটা হবার সেটা হবেই। এ তো সহ্য হয় না। একঘেয়ে বিধানের সৃষ্টিকর্তা পিতামহকে এমন ক্ষেত্রে ঠাট্টা ক'রে নেওয়া যাক যেখানে শাস্তির ভয় নেই। এ তো তাঁর নিজের এলেকা নয়।

আমাদের সে ছিল কোণে বসে। কানে কানে বললে, দাদা, লেগে যাও। আমার নাম দিয়ে যা-খুশি চালিয়ে দিতে পার, ফৌজদারি করব না।

সে মানুষটির পরিচয় দেওয়ার দরকার আছে।

পুপুদিদিমণিকে ধারা বেয়ে যে গল্প ব'লে যাচ্ছি সেই গল্পের মূল অবলম্বন হচ্ছে

একটি সর্বনামধারী সে, কেবলমাত্র বাক্য দিয়ে তৈরি। সেইজন্যে একে নিয়ে যা-তা করা সম্ভব, কোনোখানে এসে কোনো প্রশ্নের হুঁচোট খাবার আশঙ্কা নেই। কিন্তু অনাসৃষ্টির চাক্ষুষ প্রমাণ দেবার জন্যে একজন শরীরধারী জোগাড় করতে হয়েছে। সাহিত্যের মামলায় কেস্‌টা যখনই বড়ো বেশি বেসামাল হয়ে পড়ে তখনই এ লোকটা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত। কিছুই বাধে না। আমার মতো মোক্তারের ইশারা পেলেই সে অম্লানমুখে বলতে পারে যে, কাঁচড়াপাড়ার কুম্ভমেলায় গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে কুমীরে ধরেছিল তার টিকির ডগা। সেটা গেল তলিয়ে, বোঁটা-ছেঁড়া মানবদেহের বাকি অংশটুকু উঠে এসেছে ডাঙায়। আরও একটু চোখ টিপে দিলে সে নির্লজ্জ হয়ে বলতে পারে, মানোয়ারী জাহাজের ডুবুরি গোরা সাত মাস পাঁক ঘেঁটে গোটা পাঁচ-ছয় চুল ছাড়া বাকি টিকিটা উদ্ধার করে এনেছে, বকশিষ পেয়েছে এককালীন সোয়া তিন টাকা। পুপুদিদি তবু যদি বলে 'তার পরে' তা হলে তখনি শুরু করবে, নীলরতন ডাক্তারের পায়ে ধরে বললে, দোহাই ডাক্তারবাবু, ওষুধ দিয়ে টিকিটা জোড়া দিয়ে লাগিয়ে দাও, নইলে তেলোর কাছে প্রসাদী ফুল বাঁধতে পারছি নে। তিনি সন্ন্যাসী-দত্ত বজ্রজটী মলম লাগিয়ে দিতেই টিকিটা একেবারে মরিয়া হয়ে বেড়ে চলেছে, অফুরান একটা কেঁচোর মতো। পাগড়ি পরলে পাগড়িটা বেলুনের মতো ফেঁপে উঠতে থাকে, মাথার বালিশটার উপর চুড়ো তৈরি হতে থাকে দৈত্যপুরীর ব্যাঙের ছাতার মতো। বাঁধা মাইনে দিয়ে নাপিত রাখতে হল। প্রহরে প্রহরে তাকে দিয়ে ব্রহ্মতালু চাঁচিয়ে নিতে হচ্ছে।

তবু যদি শ্রোতার কৌতূহল না মেটে তা হলে সে করুণ মুখ ক'রে বলতে থাকে যে, মেডিক্যাল কলেজের সার্জন-জেনেরাল হাতের আস্তিন গুটিয়ে বসে ছিল ; তার ভীষণ জেদ, মাথার ঐ জায়গাটাতে ইস্‌ক্রুপ দিয়ে ফুটো ক'রে সেইখানে রবারের ছিপি এঁটে গালা লাগিয়ে শিলমোহর ক'রে দেবে, ইহকাল-পরকালে ওখান দিয়ে আর টিকি গজাতে পারবে না। চিকিৎসাটা ইহকাল ডিঙিয়ে পরকালেই গিয়ে ঠেকবে, এই আশঙ্কায় ও কোনোমতেই রাজি হল না।

আমাদের এই 'সে' পদার্থটি ক্ষণজন্মা বটে ; এমনতরো কোটিকে গোটিক মেলে। মিথ্যে কথা বানাতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিভা। আমার আজগবি গল্পের এত বড়ো উত্তর-সাধক ওস্তাদ বহু ভাগ্যে জুটেছে। গল্প-প্রশ্নের উত্তরপাড়ার এই যে মানুষ, মাঝে মাঝে একে পুপুদিদির কাছে এনে হাজির করি— দেখে তার বড়ো চোখ আরও বড়ো হয়ে ওঠে। খুশি হয়ে বাজার থেকে গরম জিলিপি এনে খাইয়ে দেয়।— লোকটা অসম্ভব জিলিপি ভালোবাসে, আর ভালোবাসে শিকদারপাড়া গলির চম্‌চম্‌। পুপুদিদি জিগেস

করে, তোমার বাড়ি কোথায়। ও বলে, কোন্‌নগরে, প্রশ্নচিহ্নের গলিতে।

নাম বলি নে কেন। নাম বললে ইনি যে কেবলমাত্র ইনিতেই এসে ঠেকবেন, এই ভয়। জগতে আমি আছি একজন মাত্র, তুমিও তাই, সেই তুমি আমি ছাড়া আর-সকলেই তো সে। আমার গল্পের সকল সে'র উনি জামিন।

একটা কথা ব'লে রাখি, নইলে অধর্ম হবে। ওকে মাঝে রেখে যে পালা জমানো হয়েছে তার থেকে যারা বিচার করে তারা ভুল করে; যারা তাকে চাক্ষুষ দেখেছে তারা জানে লোকটা সুপুরুষ চেহারা সুগম্ভীর। রাত্তিরে যেমন তারার আলোর ছড়াছড়ি, ওর গাম্ভীর্য তেমনি চাপা হাসিতে ভরা। ও পয়লা নম্বরের মানুষ, তাই কোনো ঠাট্টা মস্‌করায় ওকে জখম করতে পারে না। ওকে বোকার মতো সাজাতে আমার মজা লাগে, কেননা ও আমার চেয়ে বুদ্ধিমান। অবুঝের ভান করলেও ওর মানহানি হয় না; সুবিধে হয়, পুপুর স্বভাবের সঙ্গে ওর মিল হয়ে যায়।

২

এর মধ্যে পুপেদিদি গেছে দার্জিলিঙে। সে রইল মাথাঘষা গলিতে একলা আমার জিম্মায়। তার ভালো লাগছে না। আমিও জ্বালাতন হয়েছি। বলে, আমাকে দার্জিলিং পাঠাও।

আমি বললুম, কেন।

সে বললে, পুরুষ মানুষ বেকার বসে আছি, আত্মীয়স্বজন ভারি নিন্দে করছে।

কী কাজ করবে, বলো।

পুপেদিদির খেলার রান্নার জন্যে খবরের কাগজ কুচিকুচি করে দেব।

এত মেহন্নত সইবে না। একটু চুপ করো দেখি। আমি এখন হুঁহাউ দ্বীপের ইতিহাস লিখছি।

হুঁহাউ নামটা শোনাচ্ছে ভালো, দাদা। ওটা তোমার চেয়ে আমার কলমেই মানাত ঠিক। বিষয়টার একটু আমেজ দিতে পার কি।

ঠাট্টা নয়, বিষয়টা গম্ভীর, কলেজে পাঠ্য হবার আশা রাখি। একদল বৈজ্ঞানিক ঐ শূন্য দ্বীপে বসতি বেঁধেছেন। খুব কঠিন পরীক্ষায় প্রবৃত্ত।

একটুখানি বুঝিয়ে বলো— কী করছেন তাঁরা। হাল নিয়মে চাষবাস করছেন?

একেবারে উল্টো, চাষের সম্পর্ক নেই।

আহারের কী ব্যবস্থা।

একেবারেই বন্ধ।

প্রাণটা ?

সেই চিন্তাটাই সব চেয়ে তুচ্ছ। পাকযন্ত্রের বিরুদ্ধে ওঁদের সত্যাগ্রহ। বলছেন, ঐ জঠরযন্ত্রটার মতো প্যাঁচাও জিনিস আর নেই। যত রোগ, যত যুদ্ধবিগ্রহ, যত চুরি-ডাকাতির মূল কারণ তার নাড়ীতে নাড়ীতে।

দাদা, কথাটা সত্য হলেও হজম করা শক্ত।

তোমার পক্ষে শক্ত। কিন্তু, ওঁরা হলেন বৈজ্ঞানিক। পাকযন্ত্রটা উপড়ে ফেলেছেন, পেট গেছে চুপ্‌সে, আহার বন্ধ, নস্য নিচ্ছেন কেবলই। নাক দিয়ে পোষ্টাই নিচ্ছেন হাওয়ায় শুষে। কিছু পৌঁচচ্ছে ভিতরে, কিছু হাঁচতে হাঁচতে বেরিয়ে যাচ্ছে। দুই কাজ একসঙ্গেই চলছে, দেহটা সাফও হচ্ছে, ভর্তিও হচ্ছে।

আশ্চর্য কৌশল। কলের জাঁতা বসিয়েছেন বুঝি ? হাঁস মুরগি পাঁটা ভেড়া আলু পটোল একসঙ্গে পিষে শুকিয়ে ভর্তি করছেন ডিবের মধ্যে ?

না। পাকযন্ত্র, কসাইখানা, দুটোই সংসার থেকে লোপ করা চাই। পেটের দায়, বিল-চোকানোর ল্যাঠা একসঙ্গে মেটাবেন। চিরকালের মতো জগতে শান্তিস্থাপনার উপায় চিন্তা করছেন।

নস্যটা তবে শস্য নিয়েও নয়, কেননা সেটাতেও কেনাবেচার মামলা।

বুঝিয়ে বলি। জীবলোকে উদ্ভিদের সবুজ অংশটাই প্রাণের গোড়াকার পদার্থ, সেটা তো জান ?

পাপমুখে কেমন করে বলব যে জানি, কিন্তু বুদ্ধিমানেরা নিতান্ত যদি জেদ করেন তা হলে মেনে নেব।

দ্বৈপায়ন পণ্ডিতের দল ঘাসের থেকে সবুজ সার বের করে নিয়ে সূর্যের বেগ্‌নি-পেরোনো আলোয় শুকিয়ে মুঠো মুঠো নাকে ঠুসছেন। সকালবেলায় ডান নাকে ; মধ্যাহ্নে বাঁ নাকে ; সায়াহ্নে দুই নাকে একসঙ্গে, সেইটেই বড়ো ভোজ। ওঁদের সমবেত হাঁচির শব্দে চমকে উঠে পশুপক্ষীরা সাঁৎরিয়ে সমুদ্র পার হয়ে গেছে।

শোনাচ্ছে ভালো। অনেক দিন বেকার আছি দাদা, পাকযন্ত্রটা হন্যে হয়ে উঠেছে—তোমাদের ঐ নস্যটার দালালি করতে পারি যদি নিয়ুমার্কেটে, তা হলে—

অল্প একটু বাধা পড়েছে, সে কথা পরে বলব। তাঁদের আর-একটা মত আছে। তাঁরা বলেন, মানুষ দু পায়ে খাড়া হয়ে চলে ব'লে তাদের হৃদ্‌যন্ত্র পাকযন্ত্র ঝুলে ঝুলে মরছে ; অস্বাভাবিক অত্যাচার ঘটেছে লাখো লাখো বৎসর ধ'রে। তার জরিমানা

দিতে হচ্ছে আয়ুক্ষয় ক'রে। দোলায়মান হৃদয়টা নিয়ে মরছে নরনারী; চতুষ্পদের কোনো বালাই নেই।

বুঝলুম, কিন্তু উপায় ?

ওঁরা বলছেন, প্রকৃতির মূল মৎলবটা শিশুদের কাছ থেকে শিখে নিতে হবে। সেই দ্বীপের সব চেয়ে উঁচু পাহাড়ে শিলালিপিতে অধ্যাপক খুদে রেখেছেন— সবাই

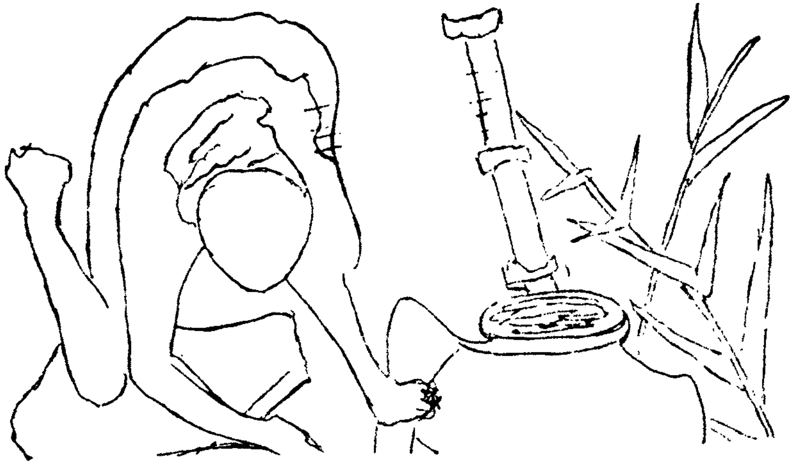

মিলে হামাগুড়ি দাও, ফিরে এসো চতুষ্পদী চালে, যদি দীর্ঘকাল ধরণীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাও।

সাবাস! আরও কিছু বাকি আছে বোধ হয় ?

আছে। ওঁরা বলেন, কথা কওয়াটা মানুষের বানানো। ওটা প্রকৃতিদত্ত নয়। ওতে প্রতিদিন শ্বাসের ক্ষয় হতে থাকে, সেই শ্বাসক্ষয়েই আয়ুক্ষয়। স্বাভাবিক প্রতিভায় এ কথাটা গোড়াতেই আবিষ্কার করেছে বানর। ত্রেতাযুগের হনুমান আজও আছে বেঁচে। আজ ওঁরা নিরালায় বসে সেই বিশুদ্ধ আদিম বুদ্ধির অনুসরণ করছেন। মাটির দিকে মুখ ক'রে সবাই একেবারে চুপ। সমস্ত দ্বীপটাতে কেবল নাকের থেকে হাঁচির শব্দ বেরোয়, মুখের থেকে কোনো শব্দই নেই।

পরস্পর বোঝাপড়া চলে কী ক'রে।

অত্যাশ্চর্য ইশারার ভাষা উদ্ভাবিত।— কখনো ঢেঁকি-কোটার ভঙ্গীতে, কখনো হাতপাখা-চালানোর চালে, কখনো জোড়ো সুপুরি গাছের নকলে ডাইনে বাঁয়ে উপরে

নীচে ঘাড় দুলিয়ে বাঁকিয়ে নাড়িয়ে কাঁপিয়ে হেলিয়ে ঝাঁকিয়ে। এমন-কি, সেই ভাষার সঙ্গে ভুরু-বাঁকানি চোখ-টেপানি যোগ ক'রে ওদের কবিতায় কাজও চলে। দেখা গেছে, তাতে দর্শকের চোখে জল আসে, নস্যির জায়গাটা বন্ধ হয়ে পড়ে।

কিছু টাকা আমাকে ধার দাও, দোহাই তোমার। ঐ হুঁহাউ দ্বীপেই যেতে হচ্ছে আমাকে। এত বড়ো নতুন মজাটা—

নতুন আর পুরোনো হতে পেল কই। হাঁচতে হাঁচতে বস্‌তিটা বেবাক ফাঁক হয়ে গেছে। পড়ে আছে জালা-জালা সবুজ নস্যি। ব্যবহার করবার যোগ্য নাক বাকি নেই একটাও।

এ তোমার আগাগোড়াই বানানো। বিজ্ঞানের ঠাট্টার পক্ষেও এটা বাড়াবাড়ি শোনাচ্ছে। এই হুঁহাউ দ্বীপের ইতিহাস বানিয়ে তুমি পুপেদিদিকে তাক লাগিয়ে দিতে চাও। ঠিক করেছিলে, তোমার এই অভাগা সে-নামওয়ালাকেই বৈজ্ঞানিক সাজিয়ে সারা দ্বীপময় হাঁচিয়ে হাঁচিয়ে মারবে। বর্ণনা করবে, আমি ঘাড়-নাড়ানাড়ির ঘটা ক'রে ঘটোৎকচ-বধ পাঁচালির আসর জমাচ্ছি কী ক'রে। হয়তো কোন্‌ হামাগুড়ি-ওয়ালি মনোহর-ঘাড়-নাড়ানির সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে বসবে, ঘাড়নাড়া-মন্ত্রে কনে নাড়বে মাথা বাঁ দিক থেকে ডান দিকে, আর আমি নাড়ব ডান দিক থেকে বাঁ দিকে। সপ্তপদী-গমন হয়ে উঠবে চতুর্দশপদী। ওদের সেনেট-হলে ঘাড়নাড়া ভাষায় যখন ওরা সারে সারে পরীক্ষা দিতে বসেছে, তার মধ্যে আমাকেও বসাবে এক কোণে। আমার উপর তোমার দয়ামায়া নেই, দেবে ফেল করিয়ে। কিন্তু ওদের স্পোর্টিং ক্লাবে হামা-গুড়ি-রেসে আমাকেই পাওয়াবে ফার্স্ট্‌ প্রাইজ। বলে দিচ্ছি, পুপেদিদিকে এমন করে হাসাতে পারবে মনেও কোরো না।

বেশি বোকো না। চাণক্যপণ্ডিত শ্রেণীবিশেষের আয়ুবৃদ্ধির জন্যে বলেছেন : তাবচ্চ বাঁচতে মূর্খ যাবৎ ন বক্‌বকায়তে।— তুমি তো সংস্কৃত কিছু শিখেছিলে ?

যতটা শিখেছিলেম ভুলেছি তার দেড়গুণ ওজনে। নয়া-চাণক্য জগতের হিতের জন্যে যে উপদেশ দিয়েছেন সেটাও তোমার জানা দরকার দাদা, ছন্দ মিলিয়েই লেখা : তখন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচি যখন পণ্ডিত চুপায়তে।— চললুম। আমার শেষ পরামর্শ এই, বৈজ্ঞানিক রসিকতা ছেড়ে দিয়ে ছেলেমানুষি করো যতটা পার।

এই কাহিনীটা পুপেদিদির কাছে একটুও পছন্দসই হয় নি। কপাল কুঁচকে বললে, এ কখনো হয় ? নস্যি নিয়ে পেট ভরে ?

আমি বললেম, গোড়াতে পেটটাকেই যে সরিয়ে দিয়েছে।

পুপুদিদি আশ্বস্ত হয়ে বললে, ওঃ, তাই বুঝি।

শেষ পর্যন্ত ওর গিয়ে ঠেকল কথা না বলাতে। ওর প্রশ্ন, কথা না ব'লে কি বাঁচা যায়।

আমি বললুম, ওদের সব চেয়ে বড়ো পণ্ডিত ভূর্জপাতায় লিখে লিখে দ্বীপময় প্রচার করেছেন, কথা বলেই মানুষ মরে। তিনি সংখ্যাগণনায় প্রমাণ করে দিয়েছেন, যারা কথা বলত সবাই মরেছে।

হঠাৎ পুপুদিদির বুদ্ধিতে প্রশ্ন উঠল, আচ্ছা, বোবারা ?

আমি বললেম, তারা কথা ব'লে মরে নি, তারা মরেছে কেউ বা পেটের অসুখে, কেউ বা কাশিসর্দিতে।

শুনে পুপুদিদির মনে হল, কথাটা যুক্তিসংগত।

আচ্ছা, দাদামশায়, তোমার কী মত।

আমি বললুম, কেউ বা মরে কথা ব'লে, কেউ বা মরে না ব'লে।

আচ্ছা, তুমি কী চাও।

আমি ভাবছি, হুঁহাউ দ্বীপে গিয়ে বাস করব, জম্বুদ্বীপে বকিয়ে মারল আমাকে, আর পেরে উঠছি নে।

৩

শিবাশোধনসমিতির একটা রিপোর্ট পাঠিয়েছে আমাদের সে। পুপুদিদির আসরে আজ সন্ধেবেলায় সেইটে পাঠ হবে।

রিপোর্ট

সন্ধেবেলায় মাঠে বসে গায়ে হাওয়া লাগাচ্ছি এমন সময় শেয়াল এসে বললে, দাদা, তুমি নিজের কাচ্চাবাচ্চাদের মানুষ করতে লেগেছ, আমি কী দোষ করেছি।

জিজ্ঞাসা করলেম, কী করতে হবে শুনি।

শেয়াল বললে, নাহয় হলুম পশু, তাই ব'লে কি উদ্ধার নেই। পণ করেছি, তোমার হাতে মানুষ হব।

শুনে মনে ভাবলুম, সৎকার্য বটে।

জিজ্ঞাসা করলুম, তোমার এমন মৎলব হল কেন।

সে বললে, যদি মানুষ হতে পারি তা হলে শেয়াল-সমাজে আমার নাম হবে,

আমাকে পুজো করবে ওরা।

আমি বললুম, বেশ কথা।

বন্ধুদের খবর দেওয়া গেল। তারা খুব খুশি। বললে, একটা কাজের মতো কাজ বটে। পৃথিবীর উপকার হবে। ক'জনে মিলে একটা সভা করলুম, তার নাম দেওয়া গেল শিবা-শোধন-সমিতি।

পাড়ায় আছে অনেক কালের একটা পোড়ো চণ্ডীমণ্ডপ। সেখানে রোজ রাত্তির নটার পরে শেয়াল মানুষ করার পুণ্যকর্মে লাগা গেল।

জিজ্ঞাসা করলুম, বৎস, তোমাকে জ্ঞাতিরা কী নামে ডাকে।

শেয়াল বললে, হোহো।

আমরা বললুম, ছি ছি, এ তো চলবে না। মানুষ হতে চাও তো প্রথমে নাম বদলাতে হবে, তার পরে রূপ। আজ থেকে তোমার নাম হল শিবুরাম।

সে বললে, আচ্ছা। কিন্তু মুখ দেখে বোঝা গেল, হোহো নামটা তার যেরকম মিষ্টি লাগে শিবুরাম তেমন লাগল না। উপায় নেই, মানুষ হতেই হবে।

প্রথম কাজ হল তাকে দু পায়ে দাঁড় করানো। অনেক দিন লাগল। বহু কষ্টে নড়্‌বড়্‌ করতে করতে চলে, থেকে থেকে পড়ে পড়ে যায়। ছ মাস গেল দেহটাকে কোনোমতে খাড়া রাখতে। থাবাগুলো ঢাকবার জন্য পরানো হল জুতো মোজা দস্তানা।

অবশেষে আমাদের সভাপতি গৌর গোঁসাই বললেন, শিবুরাম, এইবার আয়নায় তোমার দ্বিপদী ছন্দের মূর্তিটা দেখো দেখি, পছন্দ হয় কিনা।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘুরে ফিরে ঘাড় বেঁকিয়ে শিবুরাম অনেক ক্ষণ ধরে দেখলে। শেষকালে বললে, গোঁসাইজি, এখনো তোমার সঙ্গে তো চেহারার মিল হচ্ছে না।

গোঁসাইজি বললেন, শিবু, সোজা হলেই কি হল। মানুষ হওয়া এত সোজা নয়। বলি, লেজটা যাবে কোথায়। ওটার মায়া কি ত্যাগ করতে পার।

শিবুরামের মুখ গেল শুকিয়ে। শেয়ালপাড়ায় দশ-বিশ গাঁয়ের মধ্যে ওর লেজ ছিল বিখ্যাত।

সাধারণ শেয়ালরা ওর নাম দিয়েছিল 'খাসা-লেজুড়ি'। যারা শেয়ালি-সংস্কৃত জানত তারা সেই ভাষায় ওকে বলত, 'সুলোমলাঙ্গুলী'। দু দিন গেল ওর ভাবতে, তিন রাত্রি ওর ঘুম হল না। শেষকালে বৃহস্পতিবারে এসে বললে, রাজি।

পাটকিলে রঙের ঝাঁকড়া রোঁয়াওয়ালা লেজটা গেল কাটা, একেবারে গোড়া ঘেঁষে।

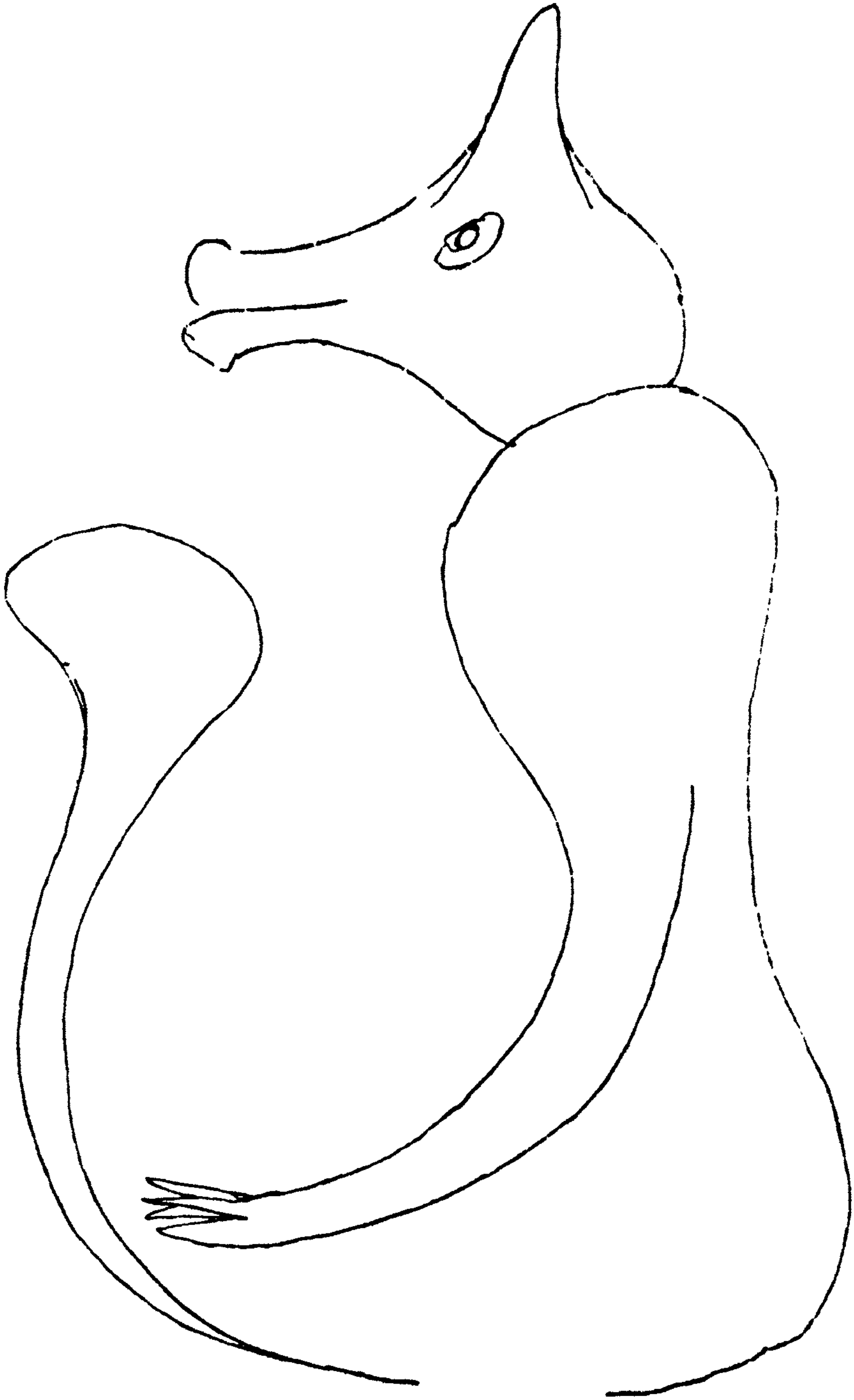

সভ্যেরা সকলে বলে উঠল, অহো, পশুর এ কী মুক্তি ! লেজবন্ধনের মায়া ওর এত দিনে কেটে গেল ! ধন্য !

শিবুরাম একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। চোখের জল সামলিয়ে নিয়ে সেও অতি করুণস্বরে বললে, ধন্য !

সেদিন ওর আহারে রুচি রইল না, সমস্ত রাত সেই কাটা লেজের স্বপ্ন দেখলে।

পরদিন শিবুরাম সভায় এসে হাজির। গোঁসাইজি বললেন, কেমন হে শিবু, দেহটা হাল্কা বোধ হচ্ছে তো ?

শিবুরাম বললে, আজ্ঞে, খুবই হাল্কা। কিন্তু মন বলছে, লেজ গেল তবু মানুষের সঙ্গে বর্ণভেদ তো ঘুচল না।

গোঁসাই বললেন, রঙ মিলিয়ে সবর্ণ হতে চাও যদি, তবে রোঁয়া ঘুচিয়ে ফেলো।

তিনু নাপিত এল।

পাঁচ দিন লাগল খুর বুলিয়ে বুলিয়ে লোমগুলো চেঁচে ফেলতে। রূপ যেটা ফুটে উঠল তা দেখে সভ্যরা সবাই চুপ করে গেল।

শিবুরাম উদ্‌বিগ্ন হয়ে বললে, মশায়, আপনারা কোনো কথা বলেন না কেন।

সভ্যরা বললে, আমরা নিজের কীর্তিতে অবাক।

শিবুরাম মনে শান্তি পেল। কাটা লেজ ও চাঁচা রোঁয়ার শোক ভুলে গেল।

সভ্যরা দুই চক্ষু বুজে বললেন, শিবুরাম, আর নয়। সভা বন্ধ হল। এখন—

শিবু বললে, এখন আমার কাজ হবে শেয়াল-সমাজকে অবাক করা।

এ দিকে শিবুরামের পিসি খেঁকিনি কেঁদে কেঁদে মরে। গাঁয়ের মোড়ল হুক্কুইকে গিয়ে বললে, মোড়ল মশায়, আজ এক বছরের উপর হয়ে গেল আমার হোঁহোঁকে দেখি নে কেন। বাঘ-ভাল্লুকের হাতে পড়ল না তো ?

মোড়ল বললে, বাঘ-ভাল্লুককে ভয় কিসের ? ভয় ঐ মানুষ জানোয়ারটাকে, হয়তো তাদের ফাঁদে পড়েছে।

খোঁজ পড়ে গেল। ঘুরতে ঘুরতে ভলন্টিয়ারের দল এল সেই চণ্ডীমণ্ডপের বাঁশবনে। ডাক দিলে, হুক্কা হুয়া।

শিবুরামের বুকের মধ্যে ধড়্‌ফড়্‌ করে উঠল, একবার গলা ছেড়ে ঐ একতানমন্ত্রে যোগ দিতে ইচ্ছা হল। বহু কষ্টে চেপে গেল।

দ্বিতীয় প্রহরে বাঁশবনে আবার ডাক উঠল, হুক্কা হুয়া। এবার শিবুরামের চাপা গলায় কান্নার মতো একটুখানি রব উঠল। তবু থেমে গেল।

তৃতীয় প্রহরে ওরা আবার যখন ডাক ছাড়লে শিবুরাম আর থাকতে পারলে না ;

ডেকে উঠল, হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া।

হুকুই বললে, ঐ তো হৌহৌয়ের গলা শুনি। একবার হাঁক দাও তো।

ডাক পড়ল, হৌহৌ!

সভাপতি বিছানা ছেড়ে এসে বললেন, শিবুরাম!

বাইরে থেকে আবার ডাক পড়ল, হৌহৌ!

গোঁসাইজি আবার সতর্ক করে দিলেন, শিবুরাম!

তৃতীয়বার ডাকে শিবুরাম ছুটে বেরিয়ে আসতেই শেয়ালরা দিল দৌড়। হুকুই, হৈয়ো, হূহূ প্রভৃতি বড়ো বড়ো শেয়াল-বীর আপন আপন গর্তের ভিতর গিয়ে ঢুকল।

সমস্ত শেয়াল-সমাজ স্তম্ভিত।

তার পর ছ মাস গেল।

শেষ খবর পাওয়া গেছে। শিবুরাম সারারাত হেঁকে হেঁকে বেড়াচ্ছে, আমার লেজ কই, আমার লেজ কই।

গোঁসাইয়ের শোবার ঘরের সামনের রোয়াকে ব'সে ঊর্ধ্ব দিকে মুখ তুলে প্রহরে প্রহরে কোকিয়ে উঠে বলে, আমার লেজ ফিরে দাও।

গোঁসাই দরজা খুলতে সাহস করে না— ভয় পায়, পাছে তাকে খ্যাপা শেয়ালে কামড়ায়।

শেয়ালকাঁটার বনে যেখানে শিবুরামের বাড়ি সেখানে ওর যাওয়া বন্ধ। জ্ঞাতিরা ওকে দূর থেকে দেখলে, হয় পালায় নয় খেঁকিয়ে কামড়াতে আসে। ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপেই থাকে, সেখানে একজোড়া প্যাঁচা ছাড়া আর অন্য প্রাণী নেই। খাঁদু, গোবর, বেঁচি, ঢেঁড়ি প্রভৃতি বড়ো বড়ো ডানপিটে ছেলেরাও ভূতের ভয়ে সেখানকার জঙ্গল থেকে করমচা পাড়তে যায় না।

শেয়ালি ভাষায় শেয়াল একটা ছড়া লিখেছে, তার আরম্ভটা এইরকম—

ওরে লেজ, হারা লেজ, চক্ষে দেখি ধুঁয়া।
বক্ষ মোর গেল ফেটে হুক্কা হুয়া হুয়া॥

পুপে বলে উঠল, কী অন্যায়, ভারি অন্যায়। আচ্ছা, দাদামশায়, ওর মাসিও ওকে নেবে না ঘরে?

আমি বললুম, তুমি ভেবো না; ওর গায়ের রোঁয়াগুলো আবার উঠুক, তখন ওকে চিনতে পারবে।

কিন্তু, ওর লেজ ?

হয়তো লাঙ্গুলাস্ত্র ঘৃত পাওয়া যেতে পারে কবিরাজমশায়ের ঘরে। আমি খোঁজ নেব।

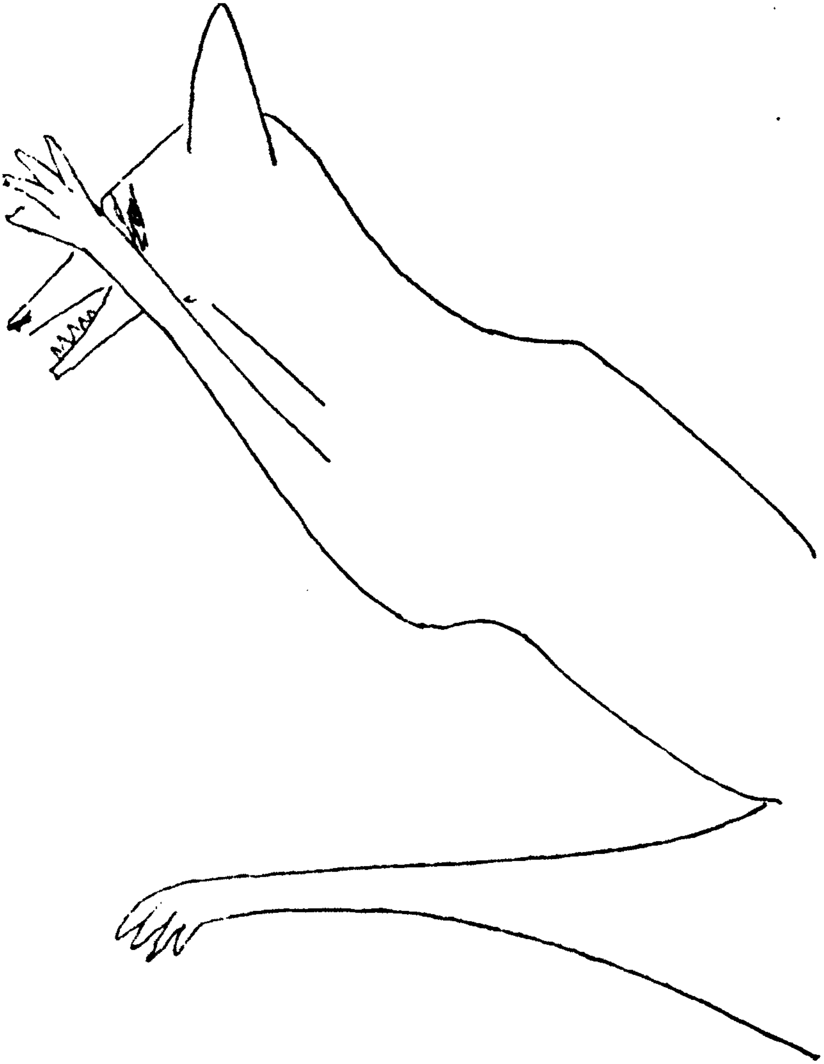

আমার লেজ কই ! আমার লেজ কই !

সে আমাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললে, রাগ কোরো না দাদা, হক্ কথা বলব— তোমারও শোধনের দরকার হয়েছে।

বে-আদব কোথাকার, কিসের শোধন আমার।

তোমার ঐ বুড়োমির শোধন। বয়স তো কম হয় নি, তবু ছেলেমানুষিতে পাকা হতে পারলে না।

প্রমাণ পেলে কিসে।

এই-যে রিপোর্ট্‌টা পড়ে শোনালে, ওটা তো আগাগোড়া ব্যঙ্গ, প্রবীণ বয়সের জ্যাঠামি। দেখলে না পুপুদিদির মুখ কিরকম গম্ভীর? বোধ হয় গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। ভাবছিল, রোঁয়া-চাঁচা শেয়ালটা এখনি এল বুঝি তার কাছে নালিশ করতে। বুদ্ধির মাত্রাটা একটু কমাতে যদি না পার তা হলে গল্প বলা ছেড়ে দাও।

ওটা কমানো আমার পক্ষে শক্ত। তুমি বুঝবে কী ক'রে; তোমাকে তো চেষ্টাই করতে হয় না, বিধাতা আছেন তোমার সহায়।

দাদা, রাগ করছ বটে, কিন্তু আমি বলে দিলুম, বুদ্ধির ঝাঁজে তোমার রস যাচ্ছে শুকিয়ে। মজা করছ মনে কর, কিন্তু তোমার ঠাট্টা গায়ে ঠেকলে ঝামার মতো লাগে। এর আগে তোমাকে অনেকবার সতর্ক করে দিয়েছি— হাসতে গিয়ে, হাসাতে গিয়ে পরকাল খুইয়ো না। লেজকাটা শেয়ালের কথা শুনে পুপুদিদির চোখ জলে ভরে এসেছিল, দেখতে পাও নি বুঝি? বল তো আজই তাকে আমি একটুখানি হাসিয়ে দিই গে— বিশুদ্ধ হাসি, তাতে বুদ্ধির ভেজাল নেই।

লেখা তৈরি আছে নাকি?

আছে। নাটকি চালের আলাপ। বললেই হবে, আমাদের পাড়ার উধো গোবরা আর পঞ্চুতে মিলে কথা হচ্ছে। ওদের সবাইকে দিদি চেনে।

আচ্ছা বেশ, দেখা যাক।

গেছো বাবা

উধো। কী রে, সন্ধান পেলি?

গোবরা। আরে ভাই, তোমার কথা শুনে আজ মাসখানেক ধরে বনে-বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে হাড় মাটি হল, টিকিও দেখতে পেলুম না।

পঞ্চু। কার সন্ধান করছিস রে।

গোবরা। গেছো বাবার।

পঞ্চু। গেছো বাবা? সে আবার কে রে।

উধো। জানিস নে? বিশ্বসুদ্ধ লোক তাকে জানে।

পঞ্চু। তা, গেছো বাবার ব্যাপারটা কী শুনি।

উধো। বাবা যে গাছে চড়ে বসবে সেই গাছই হবে কল্পতরু। তলায় দাঁড়িয়ে হাত পাতলেই যা চাইবি তাই পাবি রে।

পঞ্চু। খবর পেলি কার কাছ থেকে।

উধো। ঘোকড় গাঁয়ের ভেকু সর্দারের কাছ থেকে। বাবা সেদিন ডুমুর গাছে চড়ে বসে পা দোলাচ্ছিল ; ভেকু জানে না, তলা দিয়ে যাচ্ছে, মাথায় ছিল এক হাঁড়ি

চিটেগুড়, তামাক তৈরী করবে। বাবার পায়ে ঠেকে তার হাঁড়ি গেল টলে— চিটেগুড়ে তার মুখ চোখ গেল বুজে। বাবার দয়ার শরীর; বললে, ভেকু, তোর মনের কামনা কী খুলে বল্। ভেকুটা বোকা; বললে, বাবা একখানা ট্যানা দাও, মুখটা মুছে ফেলি। যেমনি বলা অমনি গাছ থেকে খসে পড়ল একখানা গামছা। মুখ চোখ মুছে উপরে যখন তাকালো তখন আর কারও দেখা নেই। যা চাইবে কেবল একবার। বাস্, তার পরে কেঁদে আকাশ ফাটালেও সাড়া মিলবে না।

পঞ্চু। হায় রে হায়, শাল নয়, দোশালা নয়, শুধু একখানা গামছা! ভেকুর আর বুদ্ধি কত হবে।

উধো। তা হোক, নেপু। ঐ গামছা নিয়েই তার দিব্যি চলে যাচ্ছে— দেখিস নি? রথতলার কাছে অত বড়ো আটচালা বানিয়েছে। গামছা হোক, বাবার গামছা তো।

পঞ্চু। কী করে হল। ভেল্কি নাকি।

উধো। হোঁদলপাড়ার মেলায় ভেকু সেদিন বাবার গামছা পেতে বসল। হাজারে হাজারে লোক এসে জুটল। বাবার নামে টাকাটা সিকেটা আলুটা মুলোটা চার দিক থেকে গামছার উপর পড়তে লাগল। মেয়েরা কেউ বা এসে বলে, ও ভেকুদাদা, আমার ছেলেটার মাথায় বাবার গামছা একটু ঠেকিয়ে দে, আজ তিনমাস ধ'রে জ্বরে ভুগছে। ওর নিয়ম হচ্ছে নৈবিদ্যি চাই পাঁচ সিকে, পাঁচটা সুপুরি, পাঁচ কুন্‌কে চাল, পাঁচ ছটাক ঘি।

পঞ্চু। নৈবিদ্যি তো দিচ্ছে, ফল পাচ্ছে কিছু?

উধো। পাচ্ছে বৈ কি। গাজন পাল গামছা ভরে পনেরো দিন ধরে ধান ঢেলেছে; তার পরে ঐ গামছার কোণে দড়ি লাগিয়ে একটা পাঁঠাও দিলে বেঁধে, ঐ পাঁঠার ডাকে চার দিক থেকে লোক এসে জমল। কী বলব, ভাই, মাস এগারো পরেই গাজনের চাকরি জুটে গেল। আমাদের রাজবাড়ির কোতোয়ালের সিদ্ধি ঘোঁটে, তার দাড়ি চুমরিয়ে দেয়।

পঞ্চু। সত্যি বলছিস?

উধো। সত্যি না তো কী। গাজন যে আমার মামাতো ভাইয়ের ভায়রা-ভাই হয়।

পঞ্চু। আচ্ছা ভাই উধো, গামছাটা তুই দেখেছিস?

উধো। দেখেছি বৈ কি। হটুগঞ্জের তাঁতে নেড়গঞ্জ ওসারের যে গামছা বুনুনি হয়, চাঁপার বরন জমি, লাল পাড়, একেবারে বেমালুম তাই।

পঞ্চু। বলিস কী। তা, সে গাছের উপর থেকে পড়ল কী করে।

উধো। ঐ তো মজা। বাবার দয়া!

পঞ্চু। চল্ ভাই, চল্, খোঁজ করতে বেরোই। কিন্তু, চিনব কী করে।

উধো। সেই তো মুশকিল। কেউ তো তাকে দেখে নি। আবার ছবি তো হ, ভেকু বেটার চোখ গেল চিটেগুড়ে বুজে।

পঞ্চু। তবে উপায়?

উধো। আমি তো হাটে ঘাটে যাকে দেখছি তাকেই জোড়হাত ক'রে জিগেস করছি, দয়া ক'রে জানাও, তুমিই কি গেছো বাবা। শুনে তারা তেড়ে মারতে আসে। একজন তো দিল আমার মাথায় হুঁকোর জল ঢেলে।

গোবরা। তা দিক গে। ছাড়া হবে না। খুঁজে বের করবই। যা থাকে কপালে।

পঞ্চু। ভেকু বলে, গাছে চড়লেই তবে বাবার চেহারা ধরা পড়ে, যখন নীচে থাকেন চেনবার জো নেই।

উধো। গাছে চড়িয়ে চড়িয়ে মানুষকে পরখ করব কী ক'রে, ভাই। আমি এক বুদ্ধি করেছি, আমার আমড়া গাছ আমড়ায় ভরে গেছে, যাকে দেখছি তাকেই বলছি, আমড়া পেড়ে নাও— গাছটা প্রায় খালি হয়ে এল, ডালগুলোও ভেঙেছে।

পঞ্চু। আর দেরি নয় রে, চল্। কপালের জোর যদি থাকে তবে দর্শনলাভ হবেই। একবার গলা ছেড়ে ডাক দে-না, ভাই! গেছো বাবা, ও বাবা, দয়াল বাবা, পারুলবনে কোথাও যদি থাক লুকিয়ে, একবার অভাগাদের দর্শন দাও।

গোবরা। ওরে হয়েছে রে, দয়া হল বুঝি।

পঞ্চু। কই রে, কই।

গোবরা। ঐ-যে চালতা গাছে।

পঞ্চু। কী রে, চালতা গাছে কী। দেখছি নে তো কিছু।

গোবরা। ঐ-যে দুলছে।

পঞ্চু। কী দুলছে। ও তো লেজ রে।

উধো। তোর কেমন বুদ্ধি গোবরা, ও বাবার লেজ নয় রে, হনুমানের লেজ। দেখছিস নে মুখ ভ্যাঙাচ্ছে?

গোবরা। ঘোর কলি যে! বাবা ঐ কপিরূপ ধরেছেন আমাদের ভোলাবার জন্যে।

পঞ্চু। ভুলছি নে, বাবা, কালামুখ দেখিয়ে ভোলাতে পারবে না। যত পার মুখ ভ্যাঙাও, নড়ছি নে— তোমার ঐ শ্রীলেজের শরণ নিলুম।

গোবরা। ওরে, বাবা যে লম্বা লাফ দিয়ে পালাতে শুরু করল রে।

পঞ্চু। পালাবে কোথায়। আমাদের ভক্তির দৌড়ের সঙ্গে পারবে কেন।

গোবরা। ঐ বসেছে কয়েৎবেল গাছের ডগায়।

উধো। পঞ্চু, উঠে পড়্-না গাছে।

পঞ্চু। আরে, তুই ওঠ্-না।

উধো। আরে, তুই ওঠ্।

পঞ্চু। অত উচ্চে উঠতে পারব না, বাবা, কৃপা ক'রে নেমে এসো।

উধো। বাবা, তোমার ঐ শ্রীলেজ গলায় বেঁধে অন্তিমে যেন চক্ষু মুদতে পারি এই আশীর্বাদ করো।

[প্রস্থান

ওহে কমবুদ্ধি, হাসাতে পারলে ?

না। যে মানুষ সবই বিনা বিচারে বিশ্বাস করতে পারে তাকে হাসানো সোজা নয়। ভয় হচ্ছে, পুপেদিদি পাছে গেছো বাবার সন্ধান করতে আমাকে পাঠায়।

মুখ দেখে আমারও তাই বোধ হচ্ছে। গেছো বাবার 'পরে ওর টান পড়েছে। আচ্ছা, কাল পরীক্ষা ক'রে দেখব, বিশ্বাস না করিয়েও মজা লাগাতে পারা যায় কি না।

কিছুক্ষণ বাদে পুপু এসে বললে, আচ্ছা, দাদামশায়, গেছো বাবার কাছে তুমি হলে কী চাইতে।

আমি বললেম, পুপুদিদির জন্যে এমন একটা কলম চাইতেম যা নিয়ে লিখতে বসলে অঙ্ক কষতে একটা ভুলও হত না।

পুপুদিদি হাততালি দিয়ে বলে উঠল, আঃ, সে কী মজাই হত !

অঙ্কে দিদি এবার একশোর মধ্যে সাড়ে তেরো মার্কা পেয়েছে।

৪

স্বপ্ন দেখছি কি জেগে আছি বলতে পারি নে। জানি নে কত রাত। ঘর অন্ধকার, লণ্ঠনটা আছে বারান্দায়, দরজার বাইরে। একটা চামচিকে পোকার লোভে ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছে, গয়ায়-পিণ্ডি-না-দেওয়া ভূতের মতো।

সে এসে হাঁক দিলে, দাদা, ঘুমচ্ছ নাকি।

বলেই ঘরে ঢুকে পড়ল। কালো কম্বলে সর্বাঙ্গ মোড়া।

জিগেস করলেম, এ কেমন সজ্জা তোমার।

বললে, আমার বরসজ্জা।

বরসজ্জা! বুঝিয়ে বলো।

কনে দেখতে যাচ্ছি।

জানি নে কেন, আমার যেন ঘুমে-ঘোলা বুদ্ধিতে ঠেকল যে, ঠিক হয়েছে, এই সজ্জাই উচিত। উৎসাহ দিয়ে বললুম, সেজেছ ভালো। তোমার ওরিজিন্যালিটি দেখে খুশি হলুম। একেবারে ক্লাসিকাল সাজ।

কী রকম।

ভূতনাথ যখন তাঁর তপস্বিনী কনেকে বর দিতে এলেন, তাঁর গায়ে ছিল হাতির চামড়া। তোমার এটা যেন ভালুকের চামড়া। নারদ দেখলে খুশি হতেন।

দাদা, সমজদার তুমি। এলেম এইজন্যেই তোমার কাছে এত রাত্তিরে।

কত রাত বলো দেখি।

দেড়টার বেশি হবে না।

কনে কি এখনি দেখা চাই।

হাঁ, এখনি।

শুনেই বলে উঠলেম, ভারি চমৎকার।

কী কারণে বলো তো।

কেন-যে এতদিন আইডিয়াটা মাথায় আসে নি তাই ভাবি। আপিসের বড়ো সাহেবের মুখ দেখা দিনের রোদ্দুরে, আর কনে দেখা মাঝরাত্তিরের অন্ধকারে।

দাদা, তোমার মুখের কথা যেন অমৃতসমান। একটা পৌরাণিক নজির দাও তো।

মহাদেব অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন মহাকালীর দিকে অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে, এই কথাটা স্মরণ কোরো।

অহো, দাদা, তোমার কথায় আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। সাব্লাইম যাকে বলে। তা হলে আর কথা নেই।

কনেটি কে এবং আছেন কোথায়।

আমার বৌদিদির ছোটো বোন, আছেন তাঁরই বাড়িতে।

চেহারায় তোমার বৌদিদির সঙ্গে কি মেলে।

মেলে বই কি, সহোদরা বটে।

তা হলে অন্ধকার রাতের দরকার আছে।

বৌদি স্বয়ং ব'লে দিয়েছেন, টর্চটা যেন সঙ্গে না আনি।

বৌদির ঠিকানাটা?

সাতাশ মাইল দূরে, চৌচাকলা গ্রামে, উনকুণ্ড পাড়ায়।

ভোজন আছে তো?

আছে বৈকি।

শুনে কোন্ মোহের ঘোরে যে মনটা পুলকিত হল বলতে পারি নে। লিভরের দোষে ভুগে আসছি বারো বছর, খাবার নাম শুনলেই পিত্তি যায় বিগড়ে।

জিগেস করলেম, খাওয়াটা কী রকম হবে শুনি।

অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, অতি উত্তম, অতি উত্তম, অতি উত্তম। বৌদি আমসত্ত দিয়ে উচ্ছেসিদ্ধ চমৎকার রাঁধে, আর কুলের আঁটি ঢেঁকিতে কুটে তার সঙ্গে দোক্তার জল মিশিয়ে চাটনি—

বলেই নাচ জুড়ে দিল বিলিতি চালে,— টিটিটম্‌টম্, টিটিটম্‌টম্, টিটিটম্‌টম্।

জীবনে কোনোদিন নাচি নি, হঠাৎ নাচ পেয়ে গেল— দুজনে হাত ধরাধরি ক'রে নাচতে শুরু ক'রে দিলুম, টিটিটম্‌টম্। মনে হল আশ্চর্য আমার ক্ষমতা; যমুনা দিদি যদি দেখত তবে বলত, নাচ বটে।

শেষকালে হাঁপিয়ে উঠে ধপ্ ক'রে বসে পড়লুম। বললুম, আহারের ফর্দ যা দিলে একেবারে খাঁটি ভিটামিন। লিভরের পক্ষে অমৃত। কনে দেখতে যাবে তো কনের পরীক্ষা তো চাই।

এক দফা হয়ে গেছে আগেই।

কী রকম।

মনে করলুম, মিলন হবার আগে মিলের পরীক্ষা চাই। ঠিক কি না বলো।

ঠিক তো বটেই। পরীক্ষার প্রণালীটা কী।

জিগেস করা চাই 'শোলোক মেলাতে পার কি না'। দূত পাঠিয়েছিলুম 'রংমশাল'এর সহ-সম্পাদককে, তিনি আওড়ালেন—

সুন্দরী, তুমি কালো কুষ্টি।

বললেন, মিল ক'রে এর জবাব দিতে হবে, পুরো মাপের মিল।

কনেটি এক নিঃশেষে ব'লে দিলে—

কানা তুমি, নেই ভালো দৃষ্টি।

সহ-সম্পাদকের এটা অসহ্য হল, ব'লে দিলে—

ব্রহ্মা লম্বা হাতে
তোমাকে গড়েছে রাতে
যবে শেষ হল আলোবৃষ্টি।

লম্বা হাতে বলবার তাৎপর্য কী হল।

মেয়েটি ঢ্যাঙা আছে শুনেছি, তোমার চেয়ে ইঞ্চি দুই-তিন বড়ো হবে। তাই শুনেই তো আমার উৎসাহ।

বলো কী।

একখানা মেয়ে বিয়ে করতে গিয়ে পাওয়া যাবে আধখানা ফাউ।

এ কথাটা আমার মাথায় ওঠে নি।

যা হোক দাদা, সহ-সম্পাদকের কাছে হার মেনে ও হার-মানার একটা কবুলতি দিয়ে দিয়েছে।

কী রকম।

মাছের আঁশের হার গেঁথে ওর গলায় পরিয়েছে, বলেছে যশঃসৌরভ তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরবে।

আমি লাফ দিয়ে ব'লে উঠলুম, ধন্য! এবার দেখছি এক অসাধারণের সঙ্গে আর-এক অসাধারণের মিলন হবে, জগতে এমন কদাচিৎ ঘটে। তা হলে আর কেন দিন ক্ষণ দেখা।

কিন্তু মেয়েটির পণ, ওকে যে হারাতে পারবে তাকেই ও বিয়ে করবে।

রূপে?

না, কথার মিলে। ঠিকমত যদি মেলাতে পারি তা হলে ও নিজেকে দেবে জলাঞ্জলি।

পারবে তো?

নিশ্চয়।

প্ল্যানটা কী শুনি।

বলব, চার লাইনে আমার চরিত্র বর্ণনা করো, শুবে আমাকে খুশি ক'রে দাও। মিল হওয়া চাই ফর্স্ট্ ক্লাস।

কনে দেখার যদি পেটেন্ট্ নেওয়া চলত তুমি নিতে পারতে! বরের স্তব দিয়ে শুরু! অতি উত্তম। উমা তাতেই জিতেছিলেন।

প্রথম লাইনটা ওকে ধরিয়ে দিতে হবে, নইলে আমার চরিত্রের থই পাবে না; আমার বর্ণনার ধুয়োটি হচ্ছে এই—

তুমি দেখি মানুষটা একেবারে অদ্ভুত।

পুরো বছরের মিল দাবি করলে মেয়েটি বোধ হয় মাথায় হাত দিয়ে পড়বে। ওকে হার মানতেই হবে। আচ্ছা দাদা, তুমিই দাও দেখি ওর পরের লাইনটা যোগ ক'রে।

আমি বললেম—

স্কন্ধে তোমার বুঝি চাপিয়াছে বদ ভূত।

এক্‌সেলেণ্ট্‌। কিন্তু আর দুটো লাইন না হলে শ্লোক তো ভর্তি হয় না। আমি বলছি, কনে তো কনে, কনের বাবার সাধ্যি হবে না ওর মিল বের করতে। দাদা, তোমার মাথায় কিছু আসছে? ভাষায় হোক্‌ অভাষায় হোক।

একেবারেই না।

তা হলে শোনো—

ছাত থেকে লাফ দাও, পাঁক দেখে ঝাঁপ দাও,

যখন তখন করো যদ্ভূত তদ্ভূত।

ও আবার কী! ওটা কোন্‌ দিশি বুলি।

দেবভাষা সংস্কৃত, কিম্ভূত শব্দের এক পর্যায়।

যদ্ভূত তদ্ভূত, মানেটা কী হল।

ওর মানে, যা খুশি তাই। ওটা বঙ্গভাষায়, যাকে হাল আমলের পণ্ডিতেরা বলেছে 'অবদান'।

লোকটার 'পরে আমার ভক্তি কূল ছাপিয়ে উঠল। মনে হল অসাধারণ প্রতিভা। ওর পিঠ থাবড়িয়ে বললুম, স্তম্ভিত করেছ আমাকে।

সে বললে, স্তম্ভিত হলে চলবে কেন। চলতে হবে। লগ্ন বয়ে যাচ্ছে। ফস্‌ ক'রে ববকরণ পেরিয়ে যাবে কখন, এসে পড়বে তৈতিলকরণ, বৈধৃতযোগ, তার পরেই হর্ষণযোগ, বিষ্টিকরণ, শেষ রাত্তিরে অশ্বকযোগ, ধনিষ্ঠানক্ষত্র— গোস্বামীমতে ব্যতীপাতযোগ বালবকরণ, পরিঘযোগে যখন গরকরণ এসে পড়বে তখন বিপদ হবে— ঘরকন্নার পক্ষে গরকরণের মতো এত বড়ো বাধা আর নেই। সিদ্ধিযোগ ব্রহ্মযোগ ইন্দ্রযোগ শিবযোগ এই হপ্তার মধ্যে একদিনও পাওয়া যাবে না, বরীয়ানযোগের অল্প একটু আশা আছে যখন পুনর্বসু নক্ষত্রের দৃষ্টি পড়বে।

কাজ নেই, কাজ নেই, এখ্‌খনি বেরিয়ে পড়া যাক। ডাক দাও পুত্তুলালকে, মোটরখানা আনুক। সে এতক্ষণে চরকা কাটতে বসেছে। চরকা কাটতে কাটতে তবে সে ঘুমতে পারে, মোটর চালিয়ে চালিয়ে তার এই দশা হয়েছে।

গাড়িতে চড়ে বসলুম।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলেছি, ঘোর অন্ধকার। পুকুরের ধারে আস্‌সেওড়ার ঝোপ। হঠাৎ তার ভিতর থেকে খেঁকশিয়ালি উঠল ডেকে। তখন রাত সাড়ে তিনটে হবে। যেমনি ডাকা, পুত্তুলাল চমকে উঠে গাড়িসুদ্ধ গিয়ে পড়ল একগলা জলের মধ্যে। এ দিকে তার পিঠের কাপড়ের ভিতরে একটা ব্যাঙ ঢুকে লাফালাফি করছে। আর, পুত্তুলালের সে কী চেঁচানি! আমি ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, পুত্তুলাল, তোর পিঠে বাত আছে, ব্যাঙটাকে খুব কষে লাফাতে দে, বিনি পয়সায় অমন ভালো মালিশ আর পাবি নে।

গাড়ির ছাদের উপর দাঁড়িয়ে ডাক দিতে লাগলুম, বনমালী, বনমালী।

ইস্টুপিডের কোনো সাড়াশব্দ নেই। স্পষ্টই বোঝা গেল, সে তখন বোলপুর স্টেশনের প্ল্যাট্‌ফরমে চাদর মুড়ি দিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছে। ভারি রাগ হল। ইচ্ছে করল, তার নাকের মধ্যে ফাউন্টেন পেনের সুড়্‌সুড়ি দিয়ে তাকে হাঁচিয়ে দিয়ে আসি গে। এ দিকে পাঁকের জলে আমার চুলগুলো গেছে ভিজে। না আঁচড়ে নিয়ে ওর বৌদিদির ওখানে যাই কী ক'রে। গোলমাল শুনে পুকুরপাড়ে হাঁসগুলো প্যাঁক প্যাঁক ক'রে ডেকে উঠেছে। এক লাফ দিয়ে পড়লুম তাদের মধ্যে; একটাকে চেপে ধরে তার ডানা দিয়ে ঘষে ঘষে চুলটা একরকম ঠিক করে নিলুম। পুত্তুলাল বললে, ঠিক বলেছ, দাদাবাবু। ব্যাঙের লাফে বড়ো আরাম বোধ হচ্ছে। ঘুম আসছে।

যাওয়া গেল ওর বৌদিদির বাড়িতে। খিদের চোটে একেবারে ভুলে গেছি কনে দেখার কথা। বৌদিদিকে জিগেস করলেম, আমার সঙ্গে ছিল সে, তাকে দেখছি নে কেন।

তিন হাত দোপাট্টা কাপড়ের ঘোমটার ভিতর থেকে মিহিসুরে বৌদিদি বললে, সে কনে খুঁজতে গেছে।

কোন্‌ চুলোয়।

মজা দিঘির ধারে বাঁশতলায়।

কত দূর হবে।

তিন পহরের পথ।

দূর বেশি নয় বটে। কিন্তু, খিদে পেয়েছে। তোমার সেই চাট্‌নি বের করো দিকি।

বৌদিদি নাকি সুরে বললে, হায় রে আমার পোড়া কপাল, এই গেল মঙ্গলবারের আগের মঙ্গলবারে ফাটা ফুটবল্‌ ভর্তি ক'রে সমস্তটা পাঠিয়ে দিয়েছি বুদ্ধুদিদির ওখানে— সে ওটা খেতে ভালোবাসে ছোলার ছাতুর সঙ্গে শর্ষেতেল আর লঙ্কা দিয়ে মেখে।

পান্নারাম

মুখ শুকিয়ে গেল ; বললুম, আমরা খাই কী।

বৌদিদি বললে, শুকনো কুঁচো চিংড়িমাছের মোরব্বা আছে টাট্‌কা চিটেগুড়ে জমানো। বাছারা খেয়ে নাও, নইলে পিত্তি পড়ে যাবে।

কিছু খেলেম, অনেকটাই রইল বাকি। পুত্তুলালকে জিগেস করলুম, খাবি ?

সে বললে, ভাঁড়টা দাও, বাড়ি গিয়ে আহ্নিক ক'রে খাব।

বাড়ি এলেম ফিরে। চটিজুতো ভিজে, গা-ময় কাদা।

বনমালীকে ডাক দিয়ে বললুম, বাঁদর, কী করছিলি।

সে হাউহাউ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে বললে, বিছে কামড়েছিল, তাই ঘুমচ্ছিলুম।

ব'লেই সে চলে গেল ঘুমতে।

এমন সময় একটা গুণ্ডাগোছের মানুষ একেবারে ঘরের মধ্যে উপস্থিত। মস্ত লম্বা, ঘাড় মোটা, মোটা পিপের মতো গর্দান, বনমালীর মতো রঙ কালো, ঝাঁকড়া চুল, খোঁচা খোঁচা গোঁফ, চোখ দুটো রাঙা, গায়ে ছিটের মেরজাই, কোমরে লাল রঙের ডোরাকাটা লুঙির উপর হলদে রঙের তিন-কোণা গামছা বাঁধা, হাতে পিতলের কাঁটামারা লম্বা একটা বাঁশের লাঠি, গলার আওয়াজ যেন গদাইবাবুদের মোটর গাড়িটার শিঙের মতো। হঠাৎ সে সাড়ে তিন মোন ওজনের গলায় ডেকে উঠল, বাবুমশায় !

চমকে উঠে কলমের খোঁচায় খানিকটা কাগজ ছিঁড়ে গেল।

বললুম, কী হয়েছে, কে তুমি।

সে বললে, আমার নাম পান্নারাম, দিদির বাড়ি থেকে এসেছি, জানতে চাই তোমাদের সে কোথায় গেল।

আমি বললুম, আমি কী জানি।

পান্নারাম চোখ পাকিয়ে হাঁক দিয়ে বললে, জান না বটে ! ঐ যে তার তালি-দেওয়া আঁশ-বের-করা সবুজ রঙের এক পাটি পশমের মোজা কাদাসুদ্ধ শুকিয়ে গিয়ে মরা কাঠবেড়ালির কাটা লেজের মতো তোমার বইয়ের শেলফে ঝুলছে, ওটা ফেলে সে যাবে কোন্ প্রাণে।

আমি বললুম, লোকসান সইবে না, যেখানে থাকে ফিরে আসবেই। কিন্তু হয়েছে কী।

পান্নারাম বললে, পরশুদিন সন্ধের সময় দিদি গিয়েছিল জজিলাটের বাড়ি। লাট-গিন্নির সঙ্গে গঙ্গাজল পাতিয়েছে। ফিরে এসে দেখে, একটা ঘটি, একটা ছাতা, একজোড়া তাস, হারিকেন লণ্ঠন, আর একটা পাথুরে কয়লার ছালা নিয়ে কোথায় সে

চ'লে গেছে। দিদি বাগান থেকে একঝুড়ি বাঁশের কোঁড়া, লাউডগা আর বেতোশাক তুলে রেখেছিল ; তাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দিদি ভারি রাগ করছে।

আমি বললুম, তা আমি কী করব।

পান্নারাম বললে, তোমার এখানে কোথায় সে লুকিয়ে আছে, তাকে বের ক'রে দাও।

আমি বললুম, এখানে নেই, তুমি থানায় খবর দাও গে।

নিশ্চয় আছে।

আমি বললুম, ভালো মুশকিলে ফেললে দেখছি! বলছি সে নেই।

'নিশ্চয় আছে, নিশ্চয় আছে, নিশ্চয় আছে' বলতে বলতে পান্নারাম আমার টেবিলের উপর দমাদ্দম তার বাঁশের লাঠির মুণ্ডটা ঠুকতে লাগল। পাশের বাড়িতে একটা পাগল ছিল, সে শেয়াল ডাকের নকল ক'রে হাঁক দিল 'হুক্কাহুয়া'। পাড়ার সব কুকুর চেঁচিয়ে উঠল। বনমালী আমার জন্যে এক গ্লাস বেলের সরবত রেখে গিয়েছিল, সেটা উল্‌টিয়ে বোতল ভেঙে বেগ্‌নি রঙের কালির সঙ্গে মিশে রেশমের চাদর বেয়ে আমার জুতোর মধ্যে গিয়ে জমল। চীৎকার করতে লাগলুম, বনমালী, বনমালী!

বনমালী ঘরে ঢুকেই পান্নারামের চেহারা দেখে 'বাপ রে' 'মা রে' ব'লে চেঁচাতে চেঁচাতে দৌড় দিলে।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল ; বললেম, সে গেছে কনের খোঁজ করতে।

কোথায়।

মজাদিঘির ধারে বাঁশতলায়।

লোকটা বললে, সেখানে যে আমারই বাড়ি।

তা হলে ঠিক হয়েছে। তোমার মেয়ে আছে?

আছে।

এইবার তোমার মেয়ের পাত্র জুটল।

জুটলো এখনো বলা যায় না। এই ডাণ্ডা নিয়ে ঘাড়ে ধরে তার বিয়ে দেব, তার পরে বুঝব কন্যাদায় ঘুচল।

তা হলে আর দেরি কোরো না। কনে দেখার পরেই বরকে দেখা হয়তো সহজ হবে না।

সে বললে, ঠিক কথা।

একটা ভাঙা বালতি ছিল ঘরের বাইরে। সেটা ফস্‌ ক'রে তুলে নিলে। জিগেস করলেম, ওটা নিয়ে কী হবে।

ও বললে, বড়ো রোদ্দুর, টুপির মতো ক'রে পরব।

ও তো গেল। তখন কাক ডাকছে, ট্র্যামের শব্দ শুরু হয়েছে। বিছানা থেকে ধড়্‌ফড়্‌ ক'রে উঠেই ডাক দিলেম বনমালীকে। জিগেস করলেম, ঘরে কে ঢুকেছিল।

ও চোখ রগড়ে বললে, দিদিমণির বেড়ালটা।

এই পর্যন্ত শুনে পুপেদিদি হতাশভাবে বললে, ও কী কথা দাদামশায়, তুমি যে বলছিলে, তুমি নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলে, তার পরে তোমার ঘরে এসেছিল পান্নারাম।

সামলে নিলুম। আর একটু হলেই বুদ্ধিমানের মতো বলতে যাচ্ছিলুম, আগাগোড়া স্বপ্ন। সব মাটি হত। এখন থেকে পান্নারামকে নিয়ে উঠে পড়ে লাগতে হবে যেমন ক'রে পারি। স্বপ্ন যখন বিধাতা ভাঙেন নালিশ খাটে না। আমরা ভাঙলে বড়ো নিষ্ঠুর হয়।

পুপুদিদি বললে, দাদামশায়, ওদের দুজনের বিয়ে হল কি না বললে না তো কিছু।

বুঝলুম, বিয়ে হওয়াটা জরুর দরকার। বললুম, বিয়ে না হয়ে কি রক্ষা আছে।

তার পরে তোমার সঙ্গে ওদের দেখা হয়েছে কি।

হয়েছে বৈ কি। তখন ভোর সাড়ে চারটে, রাস্তার গ্যাস নেবে নি। দেখলুম, নতুন বৌ তার বরকে ধরে নিয়ে চলেছে।

কোথায়।

নতুন বাজারে মানকচু কিনতে।

মানকচু!

হাঁ, বর আপত্তি করেছিল।

কেন।

বলেছিল, অত্যন্ত দরকার হলে বরঞ্চ কাঁঠাল কিনে আনতে পারি, মানকচু পারব না।

তার পরে কী হল।

আনতে হল মানকচু কাঁধে করে।

খুশি হল পুপু; বললে, খুব জব্দ!

মানকচু কিনবে

৫

সকালে বসে চা খাচ্ছি এমন সময় সে এসে উপস্থিত।

জিগেস করলুম, কিছু বলবার আছে ?

ও বললে, আছে।

চট্ ক'রে বলে ফেলো, আমাকে এখনি বেরতে হবে।

কোথায়।

লাটসাহেবের বাড়ি।

লাটসাহেব তোমাকে ডাকেন নাকি।

না, ডাকেন না, ডাকলে ভালো করতেন।

ভালো কিসের।

জানতে পারতেন, ওঁরা যাদের কাছ থেকে খবর পেয়ে থাকেন আমি তাদের চেয়েও খবর বানাতে ওস্তাদ। কোনো রায়বাহাদুর আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না, সে কথা তুমি জান।

জানি, কিন্তু আমাকে নিয়ে আজকাল তুমি যা-তা বলছ।

অসম্ভব গল্পেরই যে ফর্মাশ।

হোক-না অসম্ভব, তারও তো একটা বাঁধুনি থাকা চাই। এলোমেলো অসম্ভব তো যে-সে বানাতে পারে।

তোমার অসম্ভবের একটা নমুনা দাও।

আচ্ছা বলি শোনো—

স্মৃতিরত্নমশায় মোহনবাগানের গোল-কীপারি ক'রে ক্যাল্‌কাটার কাছ থেকে একে একে পাঁচ গোল খেলেন। খেয়ে খিদে গেল না, উল্টো হল, পেট চোঁ-চোঁ করতে লাগল। সামনে পেলেন অক্‌টর্‌লনি মন্যুমেণ্ট। নীচে থেকে চাটতে চাটতে চুড়ো পর্যন্ত দিলেন চেটে। বদরুদ্দিন মিঞা সেনেট-হলে বসে জুতো সেলাই করছিল, সে হাঁ-হাঁ ক'রে ছুটে এল। বললে, আপনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হয়ে এত বড়ো জিনিসটাকে এঁটো করে দিলেন !

'তোবা তোবা' ব'লে তিনবার মন্যুমেণ্টের গায়ে থুথু ফেলে মিঞাসাহেব দৌড়ে গেল স্টেট্‌স্‌ম্যান-আপিসে খবর দিতে।

স্মৃতিরত্নমশায়ের হঠাৎ চৈতন্য হল, মুখটা তাঁর অশুদ্ধ হয়েছে। গেলেন মুজিয়মের দরোয়ানের কাছে। বললেন, পাড়েজি, তুমিও ব্রাহ্মণ, আমিও ব্রাহ্মণ—একটা

অনুরোধ রাখতে হবে।

পাঁড়েজি দাড়ি চুম্‌রিয়ে নিয়ে সেলাম ক'রে বললে, কোমা ভু পোর্তে ভু সি ভু প্লে।

পণ্ডিতমশায় একটু চিন্তা ক'রে বললেন, বড়ো শক্ত প্রশ্ন, সাংখ্যকারিকা মিলিয়ে দেখে কাল জবাব দিয়ে যাব। বিশেষ আজ আমার মুখ অশুদ্ধ, আমি মন্যুমেণ্ট চেটেছি।

পাঁড়েজি দেশালাই দিয়ে বর্মা চুরুট ধরালো। দু টান টেনে বললে, তা হলে এক্ষুনি খুলুন ওয়েব্‌স্টার ডিক্‌সনারি, দেখুন বিধান কী।

স্মৃতিরত্ন বললেন, তা হলে তো ভাটপাড়ায় যেতে হয়। সে পরে হবে, আপাতত তোমার ঐ পিতলে-বাঁধানো ডাণ্ডাখানা চাই।

পাঁড়ে বললে, কেন, কী করবেন, চোখে কয়লার গুঁড়ো পড়েছে বুঝি?

স্মৃতিরত্ন বললেন, তুমি খবর পেলে কেমন ক'রে। সে তো পড়েছিল পরশু দিন। ছুটতে হল উল্টোডিঙিতে যকৃত-বিকৃতির বড়ো ডাক্তার ম্যাকার্টনি সাহেবের কাছে। তিনি নারকেলডাঙা থেকে সাবল আনিয়ে সাফ করে দিলেন।

পাঁড়েজি বললে, তবে ডাণ্ডায় তোমার কী প্রয়োজন।

পণ্ডিত মশায় বললেন, দাঁতন করতে হবে।

পাঁড়েজি বললে, ওঃ, তাই বলো, আমি বলি নাকে কাঠি দিয়ে হাঁচবে বুঝি, তা হলে আবার গঙ্গাজল দিয়ে শোধন করতে হত।

এই পর্যন্ত বলে গুড়্‌গুড়িটা কাছে নিয়ে দু টান টেনে সে বললে, দেখো দাদা, এই-রকম তোমার বানিয়ে বলবার ধরন। এ যেন আঙুল দিয়ে না লিখে গণেশের শুঁড় দিয়ে লম্বা চালে বাড়িয়ে লেখা। যেটাকে যেরকম জানি সেটাকে অন্যরকম করে দেওয়া। অত্যন্ত সহজ কাজ। যদি বল লাটসাহেব কলুর ব্যাবসা ধ'রে বাগবাজারে শুটকি মাছের দোকান খুলেছেন, তবে এমন সস্তা ঠাট্টায় যারা হাসে তাদের হাসির দাম কিসের।

চটেছ ব'লে বোধ হচ্ছে।

কারণ আছে। আমাকে নিয়ে পুপুদিদিকে সেদিন যাচ্ছে-তাই কতকগুলো বাজে কথা বলেছিলে। নিতান্ত ছেলেমানুষ বলেই দিদি হাঁ করে সব শুনেছিল। কিন্তু, অদ্ভুত কথা যদি বলতেই হয় তবে তার মধ্যে কারিগরি চাই তো।

সেটা ছিল না বুঝি ?

না, ছিল না। চুপ করে থাকতুম যদি আমাকে সূক্ষ্ম না জড়াতে। যদি বলতে, তোমার অতিথিকে তুমি জিরাফের মুড়িঘণ্ট খাইয়েছ, শর্বেবাঁটা দিয়ে তিমিমাছ-ভাজা আর পোলাওয়ের সঙ্গে পাঁকের থেকে টাটকা ধরে আনা জলহস্তী, আর তার সঙ্গে তালের গুঁড়ির ডাঁটা-চচ্চড়ি, তা হলে আমি বলতুম, ওটা হল স্থূল। ওরকম লেখা সহজ।

আচ্ছা, তুমি হলে কী রকম লিখতে।

বলি, রাগ করবে না? দাদা, তোমার চেয়ে আমার কেরামতি যে বেশি তা নয়, কম বলেই সুবিধে। আমি হলে বলতুম—

তাসমানিয়াতে তাস খেলার নেমন্তন্ন ছিল, যাকে বলে দেখা-বিন্তি। সেখানে কোজুমাচুকু ছিলেন বাড়ির কর্তা, আর গিন্নির নাম ছিল শ্রীমতী হাঁচিয়েন্দানি কোরুকুনা। তাঁদের বড়ো মেয়ের নাম পাম্কুনি দেবী, স্বহস্তে রেঁধেছিলেন কিন্টিনাবুর মেরিউনাথু, তার গন্ধ যায় সাত পাড়া পেরিয়ে। গন্ধে শেয়ালগুলো পর্যন্ত দিনের বেলা হাঁক ছেড়ে ডাকতে আরম্ভ করে নির্ভয়ে, লোভে কি ক্ষোভে জানি নে; কাকগুলো জমির উপর ঠোঁট গুঁজে দিয়ে মরিয়া হয়ে পাখা ঝাপটায় তিন ঘণ্টা ধরে। এ তো গেল তরকারি। আর, জালা জালা ভর্তি ছিল কাঙ্চুটোর সাঙ্চানি। সে দেশের পাকা পাকা আঁকৃসুটো ফলের ছোবড়া-চোঁয়ানো। এই সঙ্গে মিষ্টান্ন ছিল ইকৃটিকুটির ভিকৃটিমাই, ঝুড়িভর্তি। প্রথমে ওদের পোষা হাতি এসে পা দিয়ে সেগুলো দ'লে দিল; তার পরে ওদের দেশের সব চেয়ে বড়ো জানোয়ার, মানুষে গোরুতে সিঙ্গিতে মিশোল, তাকে ওরা বলে গাণ্ডিসাণ্ডুং, তার কাঁটাওয়ালা জিব দিয়ে চেটে চেটে কতকটা নরম করে আনলে। তার পরে তিনশো লোকের পাতের সামনে দমাদ্দম হামানদিস্তার শব্দ উঠতে লাগল। ওরা বলে, এই ভীষণ শব্দ শুনলেই ওদের জিবে জল আসে; দূর পাড়া থেকে শুনতে পেয়ে ভিখারি আসে দলে দলে। খেতে খেতে যাদের দাঁত ভেঙে যায় তারা সেই ভাঙা দাঁত দান করে যায় বাড়ির কর্তাকে। তিনি সেই ভাঙা দাঁত ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেন জমা ক'রে রাখতে, উইল করে দিয়ে যান ছেলেদের। যার তবিলে যত দাঁত তার তত নাম। অনেকে লুকিয়ে অন্যের সঞ্চিত দাঁত কিনে নিয়ে নিজের ব'লে চালিয়ে দেয়। এই নিয়ে বড়ো বড়ো মকদ্দমা হয়ে গেছে। হাজারদাঁতিরা পঞ্চাশদাঁতির ঘরে

যেয়ে দেয় না। একজন সামান্ত পনেরোদাঁতি ওদের কেটুকু নাড়ু খেতে গিয়ে হঠাৎ দম আটকিয়ে মারা গেল, হাজারদাঁতির পাড়ায় তাকে পোড়াবার লোক পাওয়াই গেল না। তাকে লুকিয়ে ভাসিয়ে দিলে চৌচঙ্গি নদীর জলে। তাই নিয়ে নদীর দুই ধারের লোকেরা খেসারতের দাবি করে নালিশ করেছিল, লড়েছিল প্রিভিকৌন্সিল পর্যন্ত।

আমি হাঁপিয়ে উঠে বললুম, থামো, থামো! কিন্তু জিগেস করি, তুমি যে কাহিনীটা আওড়ালে তার বিশেষ গুণটা কী।

ওর গুণটা এই, এটা ফুলের আঁঠির চাটনি নয়। যা কিছুই জানি নে তাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করবার শখ মেটালে কোনো নালিশের কারণ থাকে না। কিন্তু, এতেও যে আছে উঁচু দরের হাসি তা আমি বলি নে। বিশ্বাস করবার অতীত যা তাকেও বিশ্বাস করবার যোগ্য করতে পার যদি, তা হলেই অদ্ভুত রসের গল্প জমে। নেহাত বাজারে-চল্‌তি ছেলে-ভোলাবার সস্তা অত্যুক্তি যদি তুমি বানাতে থাক তা হলে তোমার অপযশ হবে, এই আমি ব'লে রাখলুম।

আমি বললেম, আচ্ছা, এমন করে গল্প বলব যাতে পুপুদিদির বিশ্বাস ভাঙতে ওঝা ডাকতে হবে।

ভালো কথা, কিন্তু লাটসাহেবের বাড়িতে যাওয়া বলতে কী বোঝায়।

বোঝায়, তুমি বিদায় নিলেই ছুটি পাই। একবার বসলে উঠতে চাও না, তাই 'তুমি যাও' অনুরোধটা সামান্ত একটু ঘুরিয়ে বলতে হল।

বুঝেছি, আচ্ছা, তবে চললুম।

৬

সার্কাস দেখে আসার পর থেকে পুপুদিদির মনটা যেন বাঘের বাসা হয়ে উঠল। বাঘের সঙ্গে, বাঘের মাসির সঙ্গে সর্বদা তার আলাপ চলছে। আমরা কেউ যখন থাকি নে তখনই ওদের মজলিস জমে। আমার কাছে নাপিতের খবর নিচ্ছিল; আমি বললুম, নাপিতের কী দরকার।

পুপু জানালে, বাঘ ওকে অত্যন্ত ধরে পড়েছে। খোঁচা খোঁচা হয়ে উঠেছে ওর গোঁফ, ও কামাতে চায়।

আমি জিগেস করলেম, গোঁফ কামানোর কথা ওর মনে এল কী করে।

পুপু বললে, চা খেয়ে বাবার পেয়ালায় তলানি যেটুকু বাকি থাকে আমি বাঘকে খেতে দিই। সেদিন তাই খেতে এসে ও দেখতে পেয়েছিল পাঁচুবাবুকে ; ওর বিশ্বাস, গোঁফ কামালে ওর মুখখানা দেখাবে ঠিক পাঁচুবাবুরই মতো।

আমি বললুম, সেটা নিতান্ত অন্যায় ভাবে নি। কিন্তু, একটু মুশকিল আছে। কামানোর শুরুতেই নাপিতকে যদি শেষ করে দেয় তা হলে কামানো শেষ হবেই না।

শুনেই ফস্ ক'রে পুপের মাথায় বুদ্ধি এল ; ব'লে ফেললে, জান দাদামশায় ? বাঘরা

কখ্খনো নাপিতকে খায় না।

আমি বললুম, বল কী। কেন বলো দেখি।

খেলে ওদের পাপ হয়।

ওঃ, তা হলে কোনো ভয় নেই। এক কাজ করা যাবে, চৌরঙ্গিতে সাহেব-নাপিতের দোকানে নিয়ে যাওয়া যাবে।

পুপে হাততালি দিয়ে বলে উঠল, হাঁ হাঁ, ভারি মজা হবে। সাহেবের মাংস নিশ্চয় খাবে না, ঘেন্না করবে।

খেলে গঙ্গাস্নান করতে হবে। খাওয়া-ছোঁওয়ায় বাঘের এত বাছবিচার আছে, তুমি জানলে কী করে, দিদি।

পুপ্ খুব সেয়ানার মতো মুখ টিপে হেসে বললে, আমি সব জানি।

আর, আমি বুঝি জানি নে?

কী জান, বলো তো।

ওরা কখনো চাষী কৈবর্তর মাংস খায় না; বিশেষত যারা গঙ্গার পশ্চিম-পারে থাকে। শাস্ত্রে বারণ।

আর, যারা পুব-পারে থাকে?

তারা যদি জেলে কৈবর্ত হয় তো সেটা অতি পবিত্র মাংস। সেটা খাবার নিয়ম বাঁ থাবা দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে।

বাঁ থাবা কেন।

ঐটে হচ্ছে শুদ্ধ রীতি। ওদের পণ্ডিতরা ডান থাবাকে নোংরা বলে। একটি কথা জেনে রাখো দিদি, নাপতিনীদের 'পরে ওদের ঘেন্না। নাপ্তিনীরা যে মেয়েদের পায়ে আল্‌তা লাগায়।

তা লাগালেই বা?

সাধু বাঘেরা বলে, আলতাটা রক্তের ভান, ওটা আঁচ্‌ড়ে কাম্‌ড়ে ছিঁড়ে চিবিয়ে বের করা রক্ত নয়, ওটা মিথ্যাচার। এরকম কপটাচরণকে ওরা অত্যন্ত নিন্দে করে। একবার একটা বাঘ ঢুকেছিল পাগড়িওয়ালার ঘরে, সেখানে ম্যাজেন্টা গোলা ছিল গামলায়। রক্ত মনে ক'রে মহা খুশি হয়ে মুখ ডুবোলে তার মধ্যে। সে একেবারে পাকা রঙ। বাঘের দাড়ি গোঁফ, তার দুই গাল, লাল টক্‌টকে হয়ে উঠল। নিবিড় বনে যেখানে বাঘেদের পুরুতপাড়া মোষমারা গ্রামে, সেইখানে আসতেই ওদের আঁচাড়ি শিরোমণি ব'লে উঠল, এ কী কাণ্ড! তোমার সমস্ত মুখ লাল কেন। ও লজ্জায় প'ড়ে মিথ্যে করে বললে, গণ্ডার মেরে তার রক্ত খেয়ে এসেছি।

ধরা পড়ে গেল মিথ্যে। পণ্ডিতজি বললে, নখে তো রক্তের চিহ্ন দেখি নে; মুখ শুঁকে বললে, মুখে তো রক্তের গন্ধ নেই। সবাই বলে উঠল, ছি ছি! এ তো রক্তও নয়, পিত্তও নয়, মগজও নয়, মজ্জাও নয়— নিশ্চয় মানুষের পাড়ায় গিয়ে এমন একটা রক্ত খেয়েছে যা নিরামিষ রক্ত, যা অশুচি। পঞ্চায়েত বসে গেল। কামড়বিশারদ-মশায় হুঙ্কার দিয়ে বললে, প্রায়শ্চিত্ত করা চাই। করতেই হল।

যদি না করত।

সর্বনাশ! ও যে পাঁচ-পাঁচটা মেয়ের বাপ; বড়ো বড়ো থরনখিনীর গৌরীদানের বয়স হয়ে এসেছে। পেটের নীচে লেজ গুটিয়ে সাত গণ্ডা মোষ পণ দিতে চাইলেও বর জুটবে না। এর চেয়েও ভয়ংকর শাস্তি আছে।

কী রকম।

ম'লে শ্রাদ্ধ করবার জন্যে পুরুত পাওয়া যাবে না, শেষ কালে হয়তো বেত-জঙ্গল গাঁ থেকে নেকড়ে-বেঘো পুরুত আনতে হবে; সে ভারি লজ্জা, সাত পুরুষের মাথা হেঁট।

শ্রাদ্ধ নাই বা হল।

শোনো একবার। বাঘের ভূত যে না খেয়ে মরবে।

সে তো মরেইছে, আবার মরবে কী ক'রে।

সেই তো আরও বিপদ। না খেয়ে মরা ভালো, কিন্তু ম'রে না খেয়ে বেঁচে থাকা যে বিষম দুর্‌গ্রহ।

পুপুদিদিকে ভাবিয়ে দিলে। খানিকক্ষণ বাদে ভুরু কুঁচ্‌কিয়ে বললে, ইংরেজের ভূত তা হলে খেতে পায় কী ক'রে।

তারা বেঁচে থাকতে যা খেয়েছে তাতেই তাদের সাত জন্ম অমনি চ'লে যায়। আমরা যা খাই তাতে বৈতরণী পার হবার অনেক আগেই পেট চোঁ-চোঁ করতে থাকে।

সন্দেহ মীমাংসা হতেই পুপে জিগেস করলে, প্রায়শ্চিত্ত কিরকম হল।

আমি বললুম, হাঁকবিদ্যা-বাচস্পতি বিধান দিলে যে, বাঘাচণ্ডীতলার দক্ষিণপশ্চিম কোণে কৃষ্ণপঞ্চমী তিথি থেকে শুরু করে অমাবস্যার আড়াই পহর রাত পর্যন্ত ওকে কেবল থ্যাক্‌শেয়ালির ঘাড়ের মাংস খেয়ে থাকতে হবে; তাও হয় ওর পিসতুতো বোন কিম্বা মাসতুতো শালার মেজো ছেলে ছাড়া আর কেউ শিকার করলে হবে না— আর, ওকে খেতে হবে পিছনের ডান দিকের থাবা দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে। এত বড়ো শাস্তির

হুকুম শুনেই বাঘের গা বমি-বমি করে এল ; চার পায়ে হাত জোড় করে হাউ-হাউ করতে লাগল।

কেন, কী এমন শাস্তি।

বল কী, থ্যাকশিয়ালির মাংস! যত দূর অশুচি হতে হয়। বাঘটা দোহাই পেড়ে

বললে, আমাকে বরঞ্চ নেউলের লেজ খেতে বলো সেও রাজি, কিন্তু খ্যাক্‌শেয়ালির ঘাড়ের মাংস!

শেষকালে কি খেতে হল।

হল বই কি।

দাদামশায়, বাঘেরা তা হলে খুব ধার্মিক?

ধার্মিক না হলে কি এত নিয়ম বাঁচিয়ে চলে। সেইজন্যেই তো শেয়ালরা ওদের ভারি ভক্তি করে। বাঘের এঁটো প্রসাদ পেলে ওরা বর্তিয়ে যায়। মাঘের ত্রয়োদশীতে যদি মঙ্গলবার পড়ে তা হলে সেদিন ভোর রাত্তিরে ঠিক দেড় প্রহর থাকতে বুড়ো বাঘের পা চেটে আসা শেয়ালদের ভারি পুণ্যকর্ম। কত শেয়াল প্রাণ দিয়েছে এই পুণ্যের জন্যে।

পুপুর বিষম খটকা লাগল। বললে, বাঘরা এতই যদি ধার্মিক হবে তা হলে জীবহত্যে করে কাঁচা মাংস খায় কী করে।

সে বুঝি যে-সে মাংস। ও-যে মন্ত্র দিয়ে শোধন করা।

কিরকম মন্ত্র।

ওদের সনাতন হালুম-মন্ত্র। সেই মন্ত্র প'ড়ে তবে ওরা হত্যা করে। তাকে কি হত্যা বলে।

যদি হালুম-মন্ত্র বলতে ভুলে যায়।

বাঘপুঙ্গব-পণ্ডিতের মতে তা হলে ওরা বিনা মন্ত্রে যে জীবকে মারে পরজন্মে সেই জীব হয়েই জন্মায়। ওদের ভারি ভয় পাছে মানুষ হয়ে জন্মাতে হয়।

কেন।

ওরা বলে, মানুষের সর্বাঙ্গ টাক-পড়া, কী কুশ্রী! তার পরে, সামান্য একটা লেজ, তাও নেই মানুষের দেহে। পিঠের মাছি তাড়াবার জন্যেই ওদের বিয়ে করতে হয়। আবার দেখো-না, ওরা খাড়া দাঁড়িয়ে সঙের মতো দুই পায়ে ভর দিয়ে হাঁটে— দেখে আমরা হেসে মরি। আধুনিক বাঘের মধ্যে সব চেয়ে বড়ো জ্ঞানী শার্দৌল্যতত্ত্বরত্ন বলেন, জীবসৃষ্টির শেষের পালায় বিশ্বকর্মার মালমসলা যখন সমস্তই কাবার হয়ে গেল তখনই মানুষ গড়তে তাঁর হঠাৎ শখ হল। তাই বেচারাদের পায়ের তলার জন্যে থাবা দূরে থাক্ কয়েক-টুকরো খুরের জোগাড় করতে পারলেন না, জুতো প'রে তবে ওরা পায়ের লজ্জা নিবারণ করতে পারে— আর, গায়ের লজ্জা ঢাকে ওরা কাপড়ে জড়িয়ে। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ওরাই হল লজ্জিত জীব। এত লজ্জা জীবলোকে আর কোথাও নেই।

বাঘেদের বুঝি ভারি অহংকার ?

ভয়ংকর। সেইজন্যেই তো ওরা এত ক'রে জাত বাঁচিয়ে চলে। জাতের দোহাই পেড়ে একটা বাঘের খাওয়া বন্ধ করেছিল একজন মানুষের মেয়ে ; তাই নিয়ে আমাদের সে একটা ছড়া বানিয়েছে।

তোমার মতো সে আবার ছড়া বানাতে পারে নাকি।

তার নিজের বিশ্বাস সে পারে, এই তর্ক নিয়ে তো পুলিস ডাকা যায় না।

আচ্ছা, শোনাও-না।

তবে শোনো।—

এক ছিল মোটা কেঁদো বাঘ,
গায়ে তার কালো কালো দাগ।
বেহারাকে খেতে ঘরে ঢুকে
আয়নাটা পড়েছে সমুখে।
এক ছুটে পালালো বেহারা,
বাঘ দেখে আপন চেহারা।
গাঁ-গাঁ ক'রে ডেকে ওঠে রাগে,
দেহ কেন ভরা কালো দাগে।

ঢেঁকিশালে পুঁটু ধান ভানে,
বাঘ এসে দাঁড়ালো সেখানে।
ফুলিয়ে ভীষণ দুই গোঁফ
বলে, চাই গ্লিসেরিন সোপ।

পুঁটু বলে, ও কথাটা কী যে
জন্মেও জানি নে তা নিজে।
ইংরেজি-টিংরেজি কিছু
শিখি নি তো, জাতে আমি নিচু।

বাঘ বলে, কথা বল ঝুঁটো,
নেই কি আমার চোখ দুটো।
গায়ে কিসে দাগ হল লোপ
না মাখিলে গ্লিসেরিন সোপ।

পুঁটু বলে, আমি কালো কুষ্টি,
কখনো মাখি নি ও জিনিসটি।
কথা শুনে পায় মোর হাসি,
নই মেম-সাহেবের মাসি।

বাঘ বলে, নেই তোর লজ্জা ?
খাব তোর হাড় মাস মজ্জা।

পুঁটু বলে, ছি ছি ওরে বাপ,
মুখেও আনিলে হবে পাপ।
জান না কি আমি অস্পৃশ্য,
মহাত্মা গাঁধিজির শিষ্য।
আমার মাংস যদি পাও
জাত যাবে জান না কি তাও।
পায়ে ধরি করিয়ো না রাগ !—

ছুঁস নে ছুঁস নে, বলে বাঘ,
আরে ছি ছি, আরে রাম রাম,
বাঘ্নাপাড়ায় বদনাম
রটে যাবে ; ঘরে মেয়ে ঠাসা,
ঘুচে যাবে বিবাহের আশা
দেবী বাঘা-চণ্ডীর কোপে।
কাজ নেই গ্লিসেরিন সোপে।

জান, পুপুদিদি ? আধুনিক বাঘেদের মধ্যে ভারি একটা কাণ্ড চলছে— যাকে বলে প্রগতি, প্রচেষ্টা। ওদের প্রগতিওয়ালা প্রচারকেরা বাঘ-সমাজে ব'লে বেড়াচ্ছে যে, অস্পৃশ্য ব'লে খাদ্য বিচার করা পবিত্র জন্তু-আত্মার প্রতি অবমাননা। ওরা বলছে, আজ থেকে আমরা যাকে পাব তাকেই খাব ; বাঁ থাবা দিয়ে খাব, ডান থাবা দিয়ে খাব, পিছনের থাবা দিয়েও খাব ; হালুম-মন্ত্র পড়েও খাব, না পড়েও খাব— এমন-কি, বৃহস্পতিবারেও আমরা আঁচ্ড়ে খাব, শনিবারেও আমরা কামড়ে খাব। এত ঔদার্য। এই বাঘেরা যুক্তিবাদী এবং সর্বজীবে এদের সম্মানবোধ অত্যন্ত কলাও। এমন-কি, এরা পশ্চিম-পারের চাষী কৈবর্তদেরও খেতে চায়, এতই এদের উদার মন। ঘোরতর

দলাদলি বেধে গেছে। প্রাচীনরা নব্য সম্প্রদায়কে নাম দিয়েছে চাষী-কৈবর্ত-খেগো, এই নিয়ে মহা হাসাহাসি পড়েছে।

পুপু বললে, আচ্ছা দাদামশায়, তুমি কখনো বাঘের উপর কবিতা লিখেছ?

হার মানতে মন গেল না। বললুম, হাঁ লিখেছি।

শোনাও-না।

গম্ভীর স্বরে আবৃত্তি করে গেলুম—

তোমার সৃষ্টিতে কভু শক্তিরে কর না অপমান,
হে বিধাতা— হিংসারেও করেছ প্রবল হস্তে দান
আশ্চর্য মহিমা এ কী। প্রখরনখর বিভীষিকা,
সৌন্দর্য দিয়েছ তারে, দেহধারী যেন বজ্রশিখা,
যেন ধূর্জটির ক্রোধ। তোমার সৃষ্টির ভাঙে বাঁধ
ঝঞ্ঝা উচ্ছৃঙ্খল, করে তোমার দয়ার প্রতিবাদ
বনের যে দস্যু সিংহ, ফেনজিহ্ব ক্ষুব্ধ সমুদ্রের
যে উদ্ধত ঊর্ধ্ব ফণা, ভূমিগর্ভে দানবযুদ্ধের
ডমরুনিঃস্বনী স্পর্ধা, গিরিবক্ষভেদী বহ্নিশিখা
যে আঁকে দিগন্তপটে আপন জ্বলন্ত জয়টিকা,
প্রলয়নর্তিনী বন্যা বিনাশের মদিরবিহ্বল
নির্লজ্জ নিষ্ঠুর— এই যত বিশ্ববিপ্লবীর দল
প্রচণ্ড সুন্দর। জীবলোকে যে দুর্দান্ত আনে ত্রাস
হীনতালাঞ্ছনে সে তো পায় না তোমার পরিহাস।

চুপ করে রইল পুপু। আমি বললুম, কী দিদি, ভালো লাগল না বুঝি।

ও কুণ্ঠিত হয়ে বললে, না না, ভালো লাগবে না কেন। কিন্তু, এর মধ্যে বাঘটা কোথায়।

আমি বললুম, যেমন সে থাকে ঝোপের মধ্যে, দেখা যায় না তবু আছে ভয়ংকর গোপনে।

পুপু বললে, অনেক দিন আগে গ্লিসেরিন-সোপ-খোজা বাঘের কথা আমাকে বলেছিলে। তার খবরটা কোথা থেকে পেলে সে।

আমার কথা ও করে চুরি, নিজের মুখে সেটা দেয় বসিয়ে।

কিন্তু—

'কিন্তু' না তো কী। লিখেছে ভালোই।

কিন্তু—

হাঁ, ঠিক কথা। আমি অমন করে লিখি নে, হয়তো লিখতে পারি নে। আমার মালটা ও চুরি করে, তার পরে যখন পালিস ক'রে দেয় তখন চেনা শক্ত হয়—এমন ঢের দেখেছি। ঠিক ঐরকম আর-একটি ছড়া বানিয়েছে।

শোনাও-না।

আচ্ছা, শোনো তবে।—

সুঁদরবনের কেঁদো বাঘ,
সারা গায়ে চাকা চাকা দাগ।
যথাকালে ভোজনের
কম হলে ওজনের
হত তার ঘোরতর রাগ।

একদিন ডাক দিল গাঁ-গাঁ—
বলে, তোর গিন্নিকে জাগা।
শোন্ বটুরাম হ্যাড়া,
পাঁচ জোড়া চাই ভ্যাড়া,
এখনি ভোজের পাত লাগা।

বটু বলে, এ কেমন কথা,
শিখেছ কি এই ভদ্রতা।
এত রাতে হাঁকাহাঁকি
ভালো না, জান না তা কি,
আদবের এ যে অন্যথা।

মোর ঘর নেহাত জঘন্য,
মহাপশু, হেথায় কী জন্য।
ঘরেতে বাঘিনী মাসি
পথ চেয়ে উপবাসী,
তুমি খেলে মুখে দেবে অন্ন।

সেথা আছে গোসাপের ঠ্যাঙ।
আছে তো শুট্‌কে কোলা ব্যাঙ।
আছে বাসি খরগোষ,
গন্ধে পাইবে তোষ,
চলে যাও নেচে ড্যাঙ ড্যাঙ।

নইলে কাগজে প্যারাগ্রাফ
রটিবে, ঘটিবে পরিতাপ—
বাঘ বলে, রামো, রামো,
বাক্যবাগীশ থামো,
বকুনির চোটে ধরে হাঁপ।

তুমি ন্যাড়া, আস্ত পাগল,
বেরোও তো, খোলো তো আগল।
ভালো যদি চাও তবে
আমারে দেখাতে হবে
কোন্ ঘরে পুষেছ ছাগল।

বটু কহে, এ কী অকরণ,
ধরি তব চতুশ্চরণ—
জীববধ মহাপাপ,
তারো বেশি লাগে শাপ
পরধন করিলে হরণ।

বাঘ শুনে বলে, হরি হরি,
না খেয়ে আমিই যদি মরি,
জীবেরই নিধন তাহা—
সহমরণেতে আহা
মরিবে যে বাঘী সুন্দরী।

অতএব ছাগলটা চাই,
না হলে তুমিই আছ ভাই
এত বলি তোলে থাবা।
বটুরাম বলে, বাবা,
চলো ছাগলেরই ঘরে যাই।

দ্বার খুলে বলে, পড়ো ঢুকে,
ছাগল চিবিয়ে খাও সুখে।
বাঘ সে ঢুকিল যেই,
দ্বিতীয় কথাটি নেই,
বাহিরে শিকল দিল রুখে।

বাঘ বলে, এ তো বোকা ভায়,
তামাসার এ নহে আকার।
পাঁঠার দেখি নে টিকি,
লেজের সিকির সিকি
নেই তো, শুনি নে ভ্যাভ্যাকার।

ওরে হিংসুক সয়তান,
জীবের বধিতে চাস্ প্রাণ!
ওরে ক্রূর, পেলে তোরে
থাবায় চাপিয়া ধ'রে
রক্ত শুষিয়া করি পান—

ঘরটাও ভীষণ ময়লা—
বটু বলে, মহেশ গয়লা
ও ঘরে থাকিত, আজ
থাকে তোর যমরাজ
আর থাকে পাথুরে কয়লা।

গোঁফ ফুলে ওঠে যেন ঝাঁটা,
বাঘ বলে, গেল কোথা পাঁঠা!

বটুরাম বলে নেচে,
এই পেটে তলিয়েছে,
খুঁজিলে পাবে না সারা গাঁটা।

ভালো লাগল ?

তা, যাই বলো দাদামশায়, কিন্তু বাঘের ছড়া খুব ভালো লিখেছে।

আমি বললুম, তা হবে, হয়তো ভালোই লিখেছে। কিন্তু, ও ভালো লেখে কি আমি ভালো লিখি সে সম্বন্ধে শেষ অভিমতটা দেবার জন্যে অন্তত আরও দশটা বছর অপেক্ষা কোরো।

পুপু বললে, আমার বাঘ কিন্তু আমাকে খেতে আসে না।

সে তো তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখেই বুঝতে পারছি। তোমার বাঘ কী করে।

রাত্তিরে যখন শুয়ে থাকি বাইরে থেকে ও জানলা আঁচড়ায়। খুলে দিলেই হাসে।

তা হতে পারে, ওরা খুব হাসিয়ে জাত। ইংরেজিতে যাকে বলে হিউমরাস্। কথায় কথায় দাঁত বের করে।

৭

পুপে এসে জিগেস করলে, দাদামশায়, তুমি যে বললে শনিবারে সে আসবে তোমার নেমন্তন্নে। কী হল।

সবই ঠিক হয়েছিল। হাজি মিঞা শিক্‌কাবাব বানিয়েছিল, তোফা হয়েছিল খেতে।

তার পরে ?

তার পরে নিজে খেলুম তার বারো আনা আন্দাজ, আর পাড়ার কালু ছোঁড়াটাকে দিলুম বাকিটুকু। কালু বললে, দাদাবাবু, এ-যে আমাদের কাঁচকলার বড়ার চেয়ে ভালো।

সে কিছু খেল না ?

জো কী।

সে এল না ?

সাধ্য কী তার।

তবে সে আছে কোথায়।

কোথাও না।

ঘরে ?

না।

দেশে ?

না।

বিলেতে ?

না।

তুমি যে বলছিলে, আণ্ডামানে যাওয়া ওর একরকম ঠিক হয়ে আছে। গেল নাকি।

দরকার হল না।

তা হলে কী হল আমাকে বলছ না কেন।

ভয় পাবে কিম্বা দুঃখ পাবে, তাই বলি নে।

তা হোক, বলতে হবে।

আচ্ছা, তবে শোনো। সেদিন ক্লাস পড়াবার খাতিরে আমার পড়ে নেবার কথা ছিল 'বিদগ্ধমুখমণ্ডন'। একসময় হঠাৎ দেখি, সেটা রয়েছে পড়ে, হাতে উঠে এসেছে 'পাঁচুপাকড়াশির পিস্‌শাশুড়ি'। পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, রাত হবে তখন আড়াইটা। স্বপ্ন দেখছি, গরম তেল জ্বলে উঠে আমাদের কিনি বাম্‌নির মুখ বেবাক গিয়েছে পুড়ে; সাত দিন সাত রাত্তির হত্যে দিয়ে তারকেশ্বরের প্রসাদ পেয়েছে দু'কৌটো লাহিড়ি কোম্পানির মুন্‌লাইট স্নো; তাই মাখছে মুখে ঘ'ষে ঘ'ষে। আমি বুঝিয়ে বললুম, ওতে হবে না গো, মোষের বাচ্ছার গালের চামড়া কেটে নিয়ে মুখে জুড়তে হবে, নইলে রঙ মিলবে না। শুনেই আমার কাছে সওয়া তিন টাকা ধার নিয়ে সে ধর্মতলার বাজারে মোষ কিনতে দৌড়েছে। এমন সময় ঘরে একটা কী শব্দ শোনা গেল, কে যেন হাওয়ার তৈরি চটিজুতো হুস হুস ক'রে টানতে টানতে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধড়্‌ফড়্‌ ক'রে উঠলেম, উস্‌কে দিলেম লণ্ঠনটা। ঘরে একটা-কিছু এসেছে দেখা গেল কিন্তু সে যে কে, সে যে কী, সে যে কেমন, বোঝা গেল না। বুক ধড়্‌ফড়্‌ করছে, তবু জোর গলা ক'রে হেঁকে বললুম, কে হে তুমি। পুলিস ডাকব নাকি।

অদ্ভুত হাঁড়িগলায় এই জীবটা বললে, কী দাদা, চিনতে পারছ না? আমি যে তোমার পুপেদিদির সে। এখানে যে আমার নেমন্তন্ন ছিল।

আমি বললুম, বাজে কথা বলছ, এ কী চেহারা তোমার!

সে বললে, চেহারাখানা হারিয়ে ফেলেছি।

হারিয়ে ফেলেছ? মানে কী হল।

মানেটা বলি। পুপেদিদির ঘরে ভোজ, সকাল-সকাল নাইতে গেলেম। বেলা

তখন সবেমাত্র দেড়টা। তেলেনিপাড়ার ঘাটে বসে ঝামা দিয়ে ক'ষে মুখ মাজ্‌ছিলুম ; মাজার চোটে আরামে এমনি ঘুম এল যে, ঢুলতে ঢুলতে ঝুপ্‌ ক'রে পড়লুম জলে ;

তার পরে কী হল জানি নে। উপরে এসেছি কি নীচে কি কোথায় আছি জানি নে, পষ্ট দেখা গেল আমি নেই।

নেই!

তোমার পা ছুঁয়ে বলছি—

আরে আরে, গা ছুঁতে হবে না, বলে যাও।

চুলকুনি ছিল গায়ে; চুলকতে গিয়ে দেখি, না আছে নখ, না আছে চুলকনি। ভয়ানক দুঃখ হল। হাউহাউ ক'রে কাঁদতে লাগলুম, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে যে হাউহাউটা বিনা মূল্যে পেয়েছিলুম সে গেল কোথায়। যত চেঁচাই চেঁচানোও হয় না, কান্নাও শোনা যায় না। ইচ্ছে হল, মাথা ঠুকি বটগাছটাতে; মাথাটার টিকি খুঁজে পাই নে কোথাও। সব চেয়ে দুঃখ— বারোটা বাজল, 'খিদে কই' 'খিদে কই' ব'লে পুকুরধারে পাক খেয়ে বেড়াই, খিদে-বাঁদরটার চিহ্ন মেলে না।

কী বক্‌ছ তুমি, একটু থামো।

ও দাদা, দোহাই তোমার, থামতে বোলো না। থামবার দুঃখ যে কী অ-থামা মানুষ সে তুমি কী বুঝবে। থামব না, আমি থামব না, কিছুতেই থামব না, যতক্ষণ পারি থামব না।

এই ব'লে ধুপ্‌ধাপ্‌ ধুপ্‌ধাপ্‌ ক'রে লাফাতে লাগল, শেষকালে ডিগবাজি খেলা শুরু করলে আমার কার্পেটের উপর, জলের মধ্যে শুশুকের মতো।

করছ কী তুমি।

দাদা, একেবারে বাদশাহি থামা থেমেছিলুম, আর কিছুতেই থামছি নে। মারধোর যদি কর সেও লাগবে ভালো। আস্ত কিলের যোগ্য পিঠ নেই যখন জানতে পারলুম, তখন সাতকড়ি পণ্ডিতমশায়ের কথা মনে ক'রে বুক ফেটে যেতে চাইল, কিন্তু বুক নেই তো ফাটবে কী। কই-মাছের যদি এই দশা হত তা হলে বামুনঠাকুরের হাতে পায়ে ধরত তাকে একবার তপ্ত তেলে এপিঠ ওপিঠ ওল্‌টাতে পাল্‌টাতে। আহা, যে পিঠখানা হারিয়েছে সেই পিঠে পণ্ডিতমশায়ের কত কিলই খেয়েছি, ইঁট দিয়ে তৈরি খইয়ের মোয়াগুলোর মতো। আজ মনে হয়, উঃ— দাদা, একবার কিলিয়ে দাও খুব ক'রে দমাদম—

ব'লে আমার কাছে এসে পিঠ দিলে পেতে।

আমি আঁৎকে উঠে বললুম, যাও যাও, সরে যাও।

ও বললে, কথাটা শেষ ক'রে নিই। একখানা গা খুঁজে খুঁজে বেড়ালুম গাঁয়ে গাঁয়ে। বেলা তখন তিন পহর। যতই রোদে বেড়াই কিছুতেই রোদে পুড়ে সারা হচ্ছি নে, এই দুঃখটা যখন অসহ্য এমন সময় দেখি, আমাদের পাতুখুড়ো মুচিখোলার বটগাছতলায় গাঁজা খেয়ে শিবনেত্র। মনে হল, তার প্রাণপুরুষটা বিন্দু হয়ে ব্রহ্মতালুর চুড়োয় এসে জোনাক-পোকার মতো মিট্‌মিট্‌ করছে। বুঝলুম, হয়েছে সুযোগ। নাকের গর্ত দিয়ে আত্মারামকে ঠেসে চালিয়ে দিলুম তার দেহের মধ্যে, নতুন নাগ্‌রা জুতোর

ভিতরে যেমন ক'রে পা'টা ঠেসে গুঁজতে হয়। সে হাঁপিয়ে উঠে ভাঙা গলায় ব'লে উঠল, কে তুমি বাবা, ভিতরে জায়গা হবে না।

তখন তার গলাটা পেয়েছি দখলে; বললুম, তোমার হবে না জায়গা, আমার হবে। বেরোও তুমি।

সে গোঁ গোঁ করতে করতে বললে, অনেকখানি বেরিয়েছি, একটু বাকি। ঠেলা মারো।

দিলুম ঠেলা, হুস্ ক'রে গেল বেরিয়ে।

এ দিকে পাতুখুড়োর গিন্নি এসে বললে, বলি, ও পোড়ারমুখো।

কান জুড়িয়ে গেল। বললুম, বলো বলো, আবার বলো, বড়ো মিষ্টি লাগছে, এমন ডাক যে আবার কোনোদিন শুনতে পাব এমন আশাই ছিল না।

বুড়ি ভাবলে ঠাট্টা করছি, ঝাঁটা আনতে গেল ঘরের মধ্যে। ভয় হল, পড়ে-পাওয়া দেহটা খোয়াই বুঝি। বাসায় এসে আয়নাতে মুখ দেখলুম, সমস্ত শরীর উঠল শিউরে। ইচ্ছে করল র‍্যাঁদা দিয়ে মুখটাকে ছুলে নিই।

গা-হারার গা এল, কিন্তু চেহারা-হারার চেহারাখানা সাত বাঁও জলের তলায়, তাকে ফিরে পাবার কী উপায়।

ঠিক এই সময়ে দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর খিদেটাকে পাওয়া গেল। একেবারে জঠর জুড়ে। সব ক'টা নাড়ী চোঁ চোঁ করে উঠেছে এক সঙ্গে। চোখে দেখতে পাই নে পেটের জ্বালায়। যাকে পাই তাকে খাই গোছের অবস্থা। উঃ, কী আনন্দ।

মনে পড়ল, তোমার ঘরে পুপুদিদির নেমন্তন্ন। রেলভাড়ার পয়সা নেই। হেঁটে চলতে শুরু করলুম। চলার অসম্ভব মেহন্নতে কী যে আরাম সে আর কী বলব। ফুর্তিতে একেবারে গলদ্‌ঘর্ম। এক এক পা ফেলছি আর মনে মনে বলছি, থামছি নে, থামছি নে, চলছি তো চলছিই। এমন বেদম চলা জীবনে কখনো হয় নি। দাদা, পুরো একখানা গা নিয়ে বসে আছ কেদারায়, বুঝতেই পার না কষ্টে যে কী মজা। এই কষ্টে বুঝতে পারা যায়, আছি বটে, খুব কষে আছি, ষোলো আনা পেরিয়ে গিয়ে আছি।

আমি বললুম, সব বুঝলুম, এখন কী করতে চাও বলো।

করবার দায় তোমারই, নেমন্তন্ন করেছিলে, খাওয়াতে হবে, সে কথা ভুললে চলবে না।

রাত এখন তিনটে সে কথা তুমিও ভুললে চলবে না।

তা হলে চললুম পুপুদিদির কাছে।

খবরদার !

দাদা, ভয় দেখাচ্ছ মিছে, মরার বাড়া গাল নেই। চললুম।

কিছুতেই না।

সে বললে, যাবই।

আমি বললুম, কেমন যাও দেখব।

সে বলতে লাগল, যাবই, যাবই, যাবই।

আমার টেবিলের উপর চ'ড়ে নাচতে নাচতে বললে, যাবই, যাবই, যাবই।

শেষকালে পাঁচালির সুর লাগিয়ে গাইতে লাগল, যাবই, যাবই, যাবই।

আর থাকতে পারলুম না। ধরলুম ওর লম্বা চুলের ঝুঁটি। টানাটানিতে গা থেকে, ঢিলে মোজার মতো, দেহটা সর্‌সর্‌ ক'রে খ'সে ধপ্‌ ক'রে পড়ে গেল।

সর্বনাশ ! গাঁজাখোরের আত্মাপুরুষকে খবর দিই কী ক'রে। চেঁচিয়ে ব'লে উঠলুম, আরে আরে, শোনো শোনো, ঢুকে পড়ো এই গা'টার মধ্যে, নিয়ে যাও এটাকে।

কেউ কোথাও নেই। ভাবছি, আনন্দবাজারে বিজ্ঞাপন দেব।

পুপেদিদি এতখানি চোখ ক'রে বললে, সত্যি কি, দাদামশায়।

আমি বললুম, সত্যির চেয়ে অনেক বেশি— গল্প।

৮

আমি তখন এম. এ. ক্লাসের জন্যে এরিয়োপ্যাজিটিকার নোট লিখছি, মিলিয়ে দেখবার জন্যে বই পড়তে হচ্ছিল ইণ্টর্‌ন্যাশনল্‌ মেলিফ্লুয়স্‌ অ্যাব্রা-ক্যাডাব্রা, আর পাত কেটে পরিশিষ্ট দেখছিলুম থ্রী হণ্ড্রেড ইয়র্স্‌ অফ ইগো-ইণ্ডিটর্মিনেশন্‌ বইখানার।

লাইব্রেরি থেকে আনাতে দিয়েছি অনোম্যাটোপিইয়া অফ টিণ্টিন্যাব্যুলেশন্‌। এমন সময় হুড়্‌মুড়্‌ করে এসে ঢুকল আমাদের সে।

আমি বললুম, হয়েছে কী, স্ত্রী গলায় দড়ি দিয়েছে নাকি।

ও বললে, নিশ্চয় দিত যদি সে থাকত। কিন্তু, কী কাণ্ড বাধিয়েছ বলো দেখি।

কেন কী হল।

আমাকে নিয়ে এ পর্যন্ত বিস্তর আজগবি গল্প বানিয়েছ। ভাগ্যে আমার নামটা দাও নি, নইলে ভদ্রসমাজে মুখ দেখানো দায় হত। দেখলুম পুপুদিদির মজা লাগছে,

তাই সহ্য করেছি সব। কিন্তু এবার যে উল্টো হল।

কেন কী হল বলোই-না।

তবে শোনো। পুপুদিদি কাল গিয়েছিল সিনেমায়। মোটরে উঠতে যাচ্ছে, আমি পিছন থেকে এসে বললুম, দিদিমণি, তোমার গাড়িতে আমাকে তুলে নিয়ে যাও। তার পরে কী আর বলব দাদা, একেবারে হিস্টিরিয়া।

কিরকম।

হাতে চোখ ঢেকে চেঁচিয়ে উঠে দিদি বললে, যাও যাও, গাঁজাখোরের গা চুরি ক'রে আমার গাড়িতে উঠতে পাবে না। চার দিক থেকে লোক এল ছুটে, আমাকে পুলিশে ধরে নিয়ে যায় আর-কি। জীবনে অনেক নিন্দে শুনেছি, কিন্তু এরকম ওরিজিন্যাল নিন্দে শুনি নি কখনো। গাঁজাখোরের গা চুরি করা! আমার অতিবড়ো প্রাণের বন্ধুও এমন নিন্দে আমার নামে রটায় নি। বাড়ি ফিরে এসে সমস্ত ব্যাপারটা শোনা গেল। এ তোমারই কীর্তি।

আমারই তো বটে। কী করি বলো। তোমাকে নিয়ে আর কাঁহাতক গল্প বানাই। বয়স হয়ে গেছে, কলমটাকে যেন বাতে ধরল, পুপুদিদির ফরমাশ-মত অসম্ভব গল্প বলার হাল্কা চাল আর নেই কলমের। তাই এই শেষ গল্পটাতে তোমাকে একেবারে খতম করে দিয়েছি।

খতম হতে রাজি নই, দাদা। দোহাই তোমার, পুপুদিদির ভয় ভাঙিয়ে দাও। বুঝিয়ে বলো, ওটা গল্প।

বলেছিলুম, কিন্তু ভয় ভাঙতে চায় না। নাড়ীতে জড়িয়ে গেছে। উপায় না দেখে স্বয়ং সেই পাতু গেঁজেলকে আনলুম তার সামনে, উল্টো হল ফল। পাতুর গা'খানা প'রে যে তুমিই ঘুরে বেড়াচ্ছ তারই প্রমাণ প্রত্যক্ষ হয়ে গেল।

তা হলে দাদা, গল্পটাকে উল্‌টিয়ে দাও, ধনুষ্টংকারে মরুক পাতু। গাঁজাখোরের গা'খানাকে নিমতলার ঘাটে পুড়িয়ে ফেলো। ঘটা ক'রে তার শ্রাদ্ধ করব, পুপুদিদিকে করব তাতে নেমন্তন্ন; খরচ যত পড়ে দেব নিজের পকেট থেকে। আমি হলুম দিদির গল্পের বহুরূপী, হঠাৎ এত বড়ো পদ থেকে আমাকে অপদস্থ করলে বাঁচব না।

আচ্ছা, গল্পের উল্টোরথে তোমাকে পুপুদিদির ঘরে আবার ফিরিয়ে আনব।

পরদিন সন্ধ্যায় সময় সে এল, আমি শুরু করলুম গল্পটা।—

বললুম, পাতুর স্ত্রী স্বামীর স্বত্ব পাবার জন্যে তোমার নামে আদালতে নালিশ করেছে।

এইটুকু শুনেই সে ব'লে উঠল, এ চলবে না, দাদা। পাতুর স্ত্রীকে তুমি চক্ষে দেখ নি তো। মকদ্দমায় ঐ মহিলাটি যদি জেতে তা হলে যে আসামীপক্ষ আফিম খেয়ে মরবে।

ভয় কী, কথা দিচ্ছি, হার হোক, জিত হোক, টিঁকিয়ে রাখব তোমাকে।

আচ্ছা, ব'লে যাও।

হাত জোড় ক'রে তুমি হাকিমকে বললে, হুজুর, ধর্মাবতার, সাত পুরুষে আমি ওর স্বামী নই।

উকিল চোখ রাঙিয়ে বললে, স্বামী নও, তার মানে কী।

তুমি বললে, তার মানে, এ পর্যন্ত আমি ওকে বিয়ে করি নি, দ্বিতীয় আর কোনো মানে আপাতত কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি নে।

রামসদয় মোক্তার খুব একটা ধমক দিয়ে বললে, আলবত তুমি ওর স্বামী, মিথ্যে কথা বোলো না।

তুমি জজ সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললে, জীবনে বিস্তর মিথ্যে বলেছি, কিন্তু ঐ বুড়িকে সজ্ঞানে স্ব-ইচ্ছায় বিয়ে করেছি, এত বড়ো দিগ্‌গজ মিথ্যে বানিয়ে বলবার তাকত আমার নেই। মনে করতে বুক কেঁপে ওঠে।

তখন ওরা সাক্ষী তলব করলে পঁয়ত্রিশজন গাঁজাখোরকে। একে একে তারা গাঁজাটেপা আঙুল তোমার মুখে বুলিয়ে বলে গেল, চেহারাটা একেবারে হুবহু পাতুর; এমন-কি, বাঁ কপালের আবটা পর্যন্ত। তবে কিনা—

মোক্তার তেরিয়া হয়ে উঠে বললে, 'তবে কিনা' আবার কিসের।

ওরা বললে, সেই রকমের পাতুই বটে, কিন্তু সেই পাতুই, হলপ ক'রে এমন কথা বলি কী ক'রে। ঠাক্‌রুনকে তো জানি, বন্ধু কম দুঃখ পায় নি, অনেক ঝাঁটা ক্ষয়ে গেছে ওর পিঠে। তার দাম বাঁচালে গাঁজার খরচে টানাটানি পড়ত না। তাই বলছি হুজুর, আদালতে হলপ ক'রে ভদ্রলোকের সর্বনাশ করতে পারব না।

মোক্তার চোখ রাঙিয়ে বললে, তা হলে এ লোকটা কে বলো। দ্বিতীয় পাতু বানাবার শক্তি ভগবানেরও নেই।

গেঁজেলের সর্দার বললে, ঠিক বলেছ বাবা, এরকম ছিষ্টি দৈবাৎ হয়। ভগবান নাকে খত দিয়েছেন, এমন কাজ আর করবেন না। তবু তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, একটা কোনো সয়তান ভগবানের পাল্টা জবাব দিয়েছে। একেবারে ওস্তাদের হাতের নকল, পাকা জালিয়াতের কাজ। পাতুর দেহখানা শুকিয়ে শুকিয়ে ওর নাক চিম্‌সিয়ে বেঁকে

গিয়েছিল, সেই বঙ্কিমচন্দ্রের নাকটি পর্যন্ত যেন কেটে ওর মুখের মাঝখানে বসিয়ে দিয়েছে। ওর হাতের চামড়া নকল করতে বোধ করি হাজার চামচিকের ডানা খরচ করতে হয়েছে।

তুমি দেখলে মকদ্দমা আর টেঁকে না; সাহেবকে বললে, এক হপ্তা সময় দিন, খাঁটি পাতু পক্ষীরাজকে হাজির ক'রে দেব এই আদালতে।

তখনি ছুটলে তেলিনিপাড়ার দিঘির ঘাটে। কপাল ভালো, ঠিক তক্ষুনি তোমার দেহটা উঠছে ভেসে। পাতুর দেহ ডাঙায় চিত ক'রে ফেলে পুরোনো খোলটা জুড়ে বসলে। মস্ত একটা হাঁপ ছেড়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ডাক দিলে, ওরে পাতু!

তখনই ওর দেহটা উঠল খাড়া হয়ে। পাতু বললে, ভায়া, সঙ্গে সঙ্গেই ছিলুম। মনটা অস্থির ছিল গাঁজার মৌতাতে। ইচ্ছে করত, আত্মহত্যে করি, কিন্তু সে রাস্তাও তুমি জুড়ে বসেছিলে। বেঁচে যখন ছিলুম তখন বেঁচে থাকবার শখ ছিল ষোলো আনা; যেমনি মরেছি অমনি আর যে কোনোমতেই কোনো কালেই মরতে পারব না, এই দুঃখ অসহ্য হয়ে উঠল। সামান্য একটা দড়ি নিয়ে গলায় ফাঁস লাগাব, এটুকু যোগ্যতাও রইল না।

তুমি বললে, যা হবার তা তো হল, এখন চলো আদালতে। জজসাহেবকে ব'লে তোমার গাঁজার বরাদ্দ করে দেব।

গেলে আদালতে। জজসাহেব পাতুকে ধমক দিয়ে বললে, এ বুড়ি তোমার স্ত্রী কি না সত্যি ক'রে বলো।

পাতু বললে, হুজুর, সত্যি ক'রে বলতে মন যায় না। কিন্তু ভদ্রলোকের ছেলে মিথ্যে ব'লে পাপ করব কেন। নিশ্চয় জানি যে, পাপের সঙ্গে সঙ্গে উনিই পিছন পিছন ছুটবেন। উনিই আমার প্রথম পক্ষের পরিবার।

সাহেব জিগেস করলেন, আরও আছে না কি।

পাতু বললে, না থাকলে মান রক্ষা হয় না যে। কুলীনের ছেলে। নৈকষ্যকুলীন।

রবিবার দিনে পুপুদিদি পড়েছে গল্পটা। আমাকে জিগেস করলে, আচ্ছা দাদামশায়, তুমি যে লিখেছ একরাশ ইংরেজি বই নিয়ে কোন্ কলেজের জন্যে বই লিখছ। তোমার আবার কলেজ কোথায়, তা ছাড়া কখনো তো দেখি নি ঐরকমের বই খুলতে। তুমি তো লেখ কেবল ছড়া।

স্পষ্ট জবাব না দিয়ে একটুখানি হাসলুম।

আচ্ছা দাদামশায়, তুমি কি সংস্কৃত জান।

দেখো পুপুদিদি, এরকম প্রশ্নগুলো বড়ো রূঢ়। মুখের সামনে জিগেস করতে নেই।

৯

সকালবেলায় পুপেদিদি উদ্‌বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলে, দাদামশায় সে'কে নিয়ে সব গল্প কি ফুরিয়ে গেল।

দাদামশায় খবরের কাগজ ফেলে রেখে চশমা কপালে তুলে বললে, গল্প ফুরোয় না, গল্প-বলিয়ের দিন ফুরোয়।

আচ্ছা, ও তো গা ফিরিয়ে পেলে, তার পরে কী হল বলো-না।

আবার ওকে গা খাটিয়ে মরতে হবে, গায়ে প'ড়ে নিতে হবে নানা দায়। কখনো গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াবে। কখনো গালমন্দ গা পেতে নেবে, কখনো নেবে না। কখনো কাজে গা লাগবে, কখনো লাগবে না। ওর গা থাকা সত্ত্বেও কুঁড়েমি দেখে লোকে বলবে, কিছুতে ওর গা নেই। কখনো গা ঘুরবে, কখনো গা কেমন করবে, গা ঘুলিয়ে যাবে। কখনো গা ভার হবে, কখনো গা মাটি-মাটি করবে, গা ম্যাজ্‌ম্যাজ্‌ করবে, গা সির্‌সির্‌ করবে, গা ঘিন্‌ঘিন্‌ করতে থাকবে। সংসারটা কখনো হবে গা-সওয়া, কখনো হবে উল্টো। কারও কথায় গা জ্ব'লে যাবে, কারও কথায় গা যাবে জুড়িয়ে। বন্ধুবান্ধবের কথা শুনে গায়ে জ্বর আসবে। এত মুশকিল একখানা গা নিয়ে।

আচ্ছা, দাদামশায়, ও যখন আর-একজনের গা নিয়ে বেড়াত তখন মুশকিল হত কার। গা কেমন করলে ওর করত কি তার করত।

শক্ত কথা। আমি তো বলতে পারব না, ওকে জিগেস করলে ওরও মাথা ঘুরে যাবে।

দাদামশায়, গা নিয়ে এত হাঙ্গাম আমি কখনো ভাবিনি।

ঐ হাঙ্গামগুলো জোড়া দিয়েই তো যত গল্প। গায়ের উপর সওয়ার হয়ে গল্প ছুটেছে চার দিকে। কোনো গা গল্পের গাধা, কোনো গা গল্পের রাজহস্তী।

তোমার গা কী, দাদামশায়।

বলব না। অহংকার করতে বারণ করে শাস্ত্রে।

দাদামশায়, সে'র গল্প তুমি থামিয়ে দিলে কেন।

বলি তা হলে। কুঁড়েমির স্বর্গ সকল স্বর্গের উপরে। সেখানে যে ইন্দ্র ব'সে অমৃত খাচ্ছেন হাজার চক্ষু আধখানা বুজে, তিনি হলেন গল্পের দেবতা। আমি তাঁর ভক্ত; কিন্তু তাঁর সভায় আজকাল ঢুকতেই পারি নে। আমার ভাগে গল্পের প্রসাদ অনেকদিন থেকে বন্ধ।

কেন।

পথ ভুল হয়ে গিয়েছিল।

কী করে।

অমরাবতীর যে সুরধুনীনদীর এক পারে ইন্দ্রলোক, তারই ভাঁটিতে আছে আর-এক স্বর্গ। কারখানাঘরের কালো ধোঁয়ায় পতাকা উড়ছে সেখানকার আকাশে। সেটা হল কাজের স্বর্গ। সেখানে হাফ্‌প্যাণ্ট্‌-পরা দেবতা বিশ্বকর্মা। একদিন শরৎ-কালের সকালে পুজোর থালায় শিউলিফুল সাজিয়ে রাস্তায় চলেছি ; ঘাড়ের উপর এসে পড়ল বাইক-চড়া এক পাণ্ডা। তার ঝুলিতে একতাড়া খাতা ; বুকের পকেটে একটা লাল কালীর, একটা কালো কালীর ফাউণ্টেন্‌পেন। খবরের কাগজের কাটা টুকরোর বাণ্ডিল চায়না-কোটের দুই পকেট ছাড়িয়ে বেরিয়ে পড়েছে ; ডান হাতের কব্জিঘড়িতে স্ট্যাণ্ডার্ড্‌ টাইম, বাঁ হাতে কলকাতা টাইম ; ব্যাগে ই. আই. আর., ই. বি. আর., এ. বি. আর., এন. ডব্লু. আর., বি. এন. আর., বি. বি. আর., এস. আই. আর. এর টাইম-টেবিল। বুকের পকেটে নোটবই ডায়রি-সুদ্ধ। ধাক্কা খেয়ে মুখ থুবড়িয়ে পড়ি আর-কি। সে বললে, আকাশের দিকে তাকিয়ে চলেছ কোন্‌ চুলোয়।

আমি বললুম, রাগ কোরো না, পাণ্ডাজি। মন্দিরে পুজো দিতে যাব, রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি নে।

সে বললে, তোমরা বুঝি মেঘের-দিকে-হাঁ-ক'রে-তাকানো রাস্তা-খোঁজার দল! চলো, পথ দেখিয়ে দিচ্ছি।

আমাকে হিড়্‌হিড়্‌ করে টেনে নিয়ে এল বিশ্বকর্মাঠাকুরের মন্দিরে। হাঁ-না করবার সময় দিলে না। কিছু জিগেস করবার আগেই বললে, রাখো এইখানে থালা, পকেট থেকে বের করো পাঁচ-সিকে দক্ষিণে।

বোকার মতো পুজো দিলেম। তখনই হিসেব সে টুকে নিলে তার নোট্‌বইয়ে। কব্জিঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, হয়েছে কাজ, এখন বেরোও। সময় নেই।

পরদিন থেকেই দেখি ফল ফলেছে। ভোর তখন সাড়ে চারটে। ডাকাত পড়েছে ভেবে ধড়্‌ফড়্‌ ক'রে ঘুম ভেঙে শুনি, অনাথতারিণী সভার সভ্যেরা বারো-তেরো বছরের পঁচিশটা ছেলে জুটিয়ে দরজায় এসে চীৎকারস্বরে গান জুড়ে দিয়েছে—

যত পেটে ধরে তার চেয়ে ভর' পেটে,
টাকাপয়সায় পকেট পড়ছে ফেটে—
হিসেব খতিয়ে দেখলে বুঝতে পার'
অনাথজনের কত ধার তুমি ধার'।

তারো, গরিবেরে তারো,

তারো, তারো, তারো।

'তারো তারো' করতে করতে ভীষণ চাটি পড়তে লাগল খোলে। মনে মনে যত খতিয়ে দেখছি তহবিলে কত টাকা বাকি, চাটি ততই কানে তালা ধরিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে বাজল কাঁসর; 'তারো তারো তারো' ক'রে নাচ জুড়ে দিলে ছেলেগুলো। অসহ

হয়ে এল। দেরাজ খুলে থলিটা বের করলেম। সাত দিনের না-কামানো-দাড়ি-ওয়ালা ওদের সর্দার উৎসাহিত হয়ে চাদর পেতে ধরলে। থলি ঝাড়তে বেরোল এক টাকা, ন আনা, তিন পয়সা। মাসের দু দিন বাকি, দর্জির দেনার জন্যে টানাটানি করে ঐটুকু রেখেছিলেম।

গান ছেড়ে গাল শুরু করলে। বললে, অগাধ টাকা, চিরটা দিন পায়ের উপর পা দিয়ে গদিয়ান হয়ে বসে আছ ; ভুলেছ, যেদিন মরবে সেদিন তোমার মতো লক্ষপতির যে দর আর আমাদের ছেঁড়া-ট্যানা-পরা ভিখিরিরও সেই দর।

এ কথাগুলো পুরোনো ঠেকল, কিন্তু ঐ লক্ষপতি বিশেষণটাতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

এই হল শুরু। তার পরে ইতিমধ্যে পঁচিশটা সভার সভ্য হয়েছি। বাংলাদেশে সরকারি সভাপতি হয়ে দাঁড়ালেম। আদি ভারতীয় সংগীতসভা, কচুরিপানা-ধ্বংসন সভা, মৃতসংকার সভা, সাহিত্যশোধন সভা, তিন চণ্ডীদাসের সমন্বয় সভা, ইক্ষুছিবড়ের পণ্যপরিণতি সভা, খঞ্জানে খনার লুপ্তভিটা-সংস্কার সভা, পিঁজরাপোলের উন্নতিসাধিনী সভা, ক্ষৌরব্যয়নিবারিণী-দাড়ি-গোঁফ-রক্ষণী সভা— ইত্যাদি সভার বিশিষ্ট সভ্য হয়েছি। অনুরোধ আসছে, ধনুষ্টংকারতত্ত্ব বইখানির ভূমিকা লিখতে, নব্যগণিতপাঠের অভিমত দিতে, ভুবনডাঙায় ভবভূতির জন্মস্থাননির্ণয় পুস্তিকার গ্রন্থকারকে আশীর্বাদ পাঠাতে, রাওলপিণ্ডির ফরেস্ট্ অফিসারের কন্যার নামকরণ করতে, দাড়িকামানো সাবানের প্রশংসা জানাতে, পাগলামির ওষুধ সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতা প্রচার করতে।

দাদামশায়, মিছিমিছি তুমি এত বেশি বক যে তোমার সময় নেই বললে কেউ বিশ্বাস করে না। আজ তোমাকে বলতেই হবে, গা ফিরে পেয়ে কী করলে সে।

বিষম খুশি হয়ে চলে গেল দমদমে।

দমদমে কেন।

অনেক দিন পরে নিজের কান দুটো ফিরে পেয়ে স্বকর্ণে আওয়াজ শোনবার শখ ওর কিছুতে মিটতে চায় না। শ্যামবাজারের মোড়ে কান পেতে থাকে ট্র্যামের বাসের ঘড়্ঘড়ানিতে। টিটেগড়ের চটকলের দারোয়ানের সঙ্গে ভাব করে নিয়েছে, তার ঘরে বসে কলের গর্জন শুনে ওর চোখ বুজে আসে। ঠোঙায় করে রসগোল্লা আর আলুর দম নিয়ে বার্ন্ কোম্পানির কামারের দোকানে বসে খেতে যায়। বন্দুকের তাক অভ্যেস করতে গোরা ফৌজ গেছে দমদমে, ও তারই ধুম্ ধুম্ শব্দ শুনছিল আরামে, টার্গেটের ও পারে ব'সে। আনন্দে আর থাকতে পারলে না, টার্গেটের এ ধারে মুখ

বাড়িয়ে দেখতে এসেছে, লাগল একটা গুলি ওর মাথায়।— বাস্।

বাস্ কী, দাদামশায়।

বাস্ মানে সব গল্প গেল একদম ফুরিয়ে।

না, না, সে হতেই পারে না। আমাকে ফাঁকি দিচ্ছ। এমন ক'রে তো সব গল্পই ফুরোতে পারে।

ফুরোয় তো বটেই।

না, সে হবে না কিছুতেই। তার পরে কী হল বলো।

বল কী— মরার পরেও?

হাঁ, মরার পরে।

তুমি গল্পের সাবিত্রী হয়ে উঠলে দেখছি।

না, অমন ক'রে আমাকে ভোলাতে পারবে না, বলো কী হল।

আচ্ছা, বেশ। লোকে বলে মরার বাড়া গাল নেই। মরার বাড়াও গাল আছে, সেই কথাটা বলি তবে। ফৌজের ডাক্তার ছিল তাঁবুতে, মস্ত ডাক্তার সে। সে যখন খবর পেলে মানুষটা মগজে গুলি লেগে মরেছে, বিষম খুশি হয়ে লাফ দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল— হুর্‌রা।

খুশি হল কেন।

ও বললে, এইবার মগজ বদল করার পরীক্ষা হবে।

মগজ বদল হবে কী ক'রে।

বিজ্ঞানের বাহাদুরি। জু থেকে চেয়ে নিলে একটা বনমানুষ্। বের করলে তার মগজ। আর, সে'র মাথার খুলি খুলে ফেললে। তার মধ্যে বাঁদরের মগজ পুরে দিয়ে খড়ির পলেস্তারা দিয়ে মাথাটা বেঁধে রাখলে পনেরো দিন। খুলি জুড়ে গেল। বিছানা ছেড়ে সে যখন উঠল, তখন সে এক বিষম কাণ্ড। যাকে দেখে তার দিকে দাঁত খিঁচিয়ে কিচিমিচি করে ওঠে। নর্স্ দিলে দৌড়। ডাক্তারসাহেব বজ্রমুঠিতে ওর দুই হাত চেপে ধরে জোর গলায় বললেন, স্থির হয়ে বোসো এইখানে। ও হুকুমটা বুঝলে, কিন্তু ভাষাটা বুঝলে না। ও চৌকিতে বসতে চায় না, ও লাফ দিয়ে উঠে বসতে চায় টেবিলের উপরে। কিন্তু, লাফ দিতে পারে না, ধপ্ ক'রে পড়ে যায় মেজের উপর। দরজাটা খোলা ছিল, বাইরে ছিল একটা অশথগাছ। সবার হাত এড়িয়ে ছুটল সেই গাছের দিকে। ভাবলে, এক লাফে চড়তে পারবে ডালে। বারবার লাফ দিতে থাকে অথচ ডালে পৌঁছতে পারে না, ধপ্ ক'রে পড়ে যায়। বুঝতেই পারে না, কেন পারছে না। রেগে রেগে ওঠে। ওর লম্ফ দেখে চার দিকে মেডিকেল

কলেজের ছেলেরা হো-হো ক'রে হাসতে থাকে। ও দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে তেড়ে যায়। একজন ফিরিঙ্গি ছেলে গাছতলায় পা ছড়িয়ে বসে কোলে রুমাল পেতে রুটি মাখন দিয়ে কলা দিয়ে আরামে খাচ্ছিল, ও হঠাৎ গিয়ে তার কলা ছিনিয়ে নিয়ে দিলে মুখে পুরে; ছেলেটা রেগে ওকে মারতে যায়, বন্ধুদের হাসি কিছুতে থামতে চায় না।

মহা ভাবনা পড়ে গেল ওর জিম্মে নেবে কে। কেউ বললে পাঠাও জু'তে, কেউ বললে অনাথ-আশ্রমে। জু'র কর্তা বললে, এখানে মানুষ পোষা আমাদের বরাদ্দে নেই। অনাথ-আশ্রমের অধ্যক্ষ বললে, এখানে বাঁদর পোষা আমাদের নিয়মে কুলোবে না।

দাদামশায়, থামলে কেন।

দিদিমণি, জগতের সব-কিছুর সব-শেষে আছে থামা।

না, এ কিন্তু এখনও থামে নি। কলা ছিনিয়ে খাওয়া ও তো যে-সে পারে।

আচ্ছা, কাল হবে, আজ কাজ আছে।

কাল কী হবে বলো-না, অল্প একটুখানি।

জান তো ওর বিয়ের সম্বন্ধ আগেই হয়েছে? ওর যে মগজ বদল হয়ে গেছে সে খবরটা কনের বাড়িতে পৌঁছয় নি। দিন স্থির, লগ্ন স্থির। বরের পিসে ওকে মস্ত দু ছড়া কলা খাইয়ে ঠাণ্ডা করে বিয়ের জায়গায় নিয়ে গেছেন। তার পরে বিয়ে-বাড়িতে যে কাণ্ডটা হল তা ভালো করে ফলিয়ে বললে তখন তুমিই বলবে, গল্পের মতো গল্প হয়েছে। এর পরে আর ওকে মেরে ফেলবার দরকার হবে না। সে মরার বাড় হবে।

সন্ধেবেলায় বসেছি ছাদে। দিব্যি দক্ষিণের হাওয়া দিচ্ছে। শুক্লা চতুর্থীর চাঁদ উঠেছে আকাশে। পুপুদিদি একটি আকন্দের মালা গেঁথে এনেছে কাঁচপাত্রে, গল্প বলা শেষ হলে বক্‌শিষ মিলবে।

হেনকালে হাঁপাতে হাঁপাতে সে উপস্থিত। বললে, আজ থেকে আমার গল্প-জোগানের কাজে আমি ইস্তফা দিলুম। আমাকে পাতু গেঁজেলের গা পরিয়েছিলে, সেও সহ্য করেছি। শেষকালে বাঁদরের মগজ পুরেছ আমার খুলির মধ্যে, এ সইবে না। এর পরে হয়তো আমাকে চামচিকে কি টিকটিকি কি গুবরে পোকা বানিয়ে দেবে। তোমাদের অসাধ্য কিছুই নেই। আজ আপিসে গিয়ে কেদারা টেনে বসেছি। দেখি

ডেস্কের উপরে এক ছড়া মর্তমান কলা। সহজ অবস্থায় কলা আমি ভালোই বাসি, কিন্তু এখন থেকে আমাকে কলা খাওয়া ছেড়েই দিতে হবে। পুপুদিদি, এর পরে তোমার ঐ দাদামশায় আমাকে নিয়ে যদি ব্রহ্মদত্যি কিম্বা কন্ধকাটা বানান, তা হলে কাগজে না ছাপান যেন। ইতিমধ্যে কন্যাকর্তা এসেছিলেন আমার ঘরে। বিয়েতে আশি ভরি সোনা দেবার কথা পাকা ছিল; একদম নেমে গেছে তেরো ভরিতে। ওরা বুঝেছে, আমার ভাগ্যে এর পরে কনে জোটা দায় হবে। এই ভেবে বিদায় নিলেম।

১০

সন্ধেবেলায় বসে আছি দক্ষিণদিকের চাতালে। সামনে কতকগুলো পুরোনো কালের প্রবীণ শিরীষগাছ আকাশের তারা আড়াল ক'রে জোনাকির আলো দিয়ে যেন একশোটা চোখ টিপে ইশারা করছে।

পুপেদি'কে বললেম, বুদ্ধি তোমার অত্যন্ত পেকে উঠছে, তাই মনে করছি আজ তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেব, একদিন তুমি ছেলেমানুষ ছিলে।

দিদি হেসে উঠে বললে, ঐখানে তোমার জিত। তুমিও এক কালে ছেলেমানুষ ছিলে, সে কথা স্মরণ করিয়ে দেবার উপায় আমার হাতে নেই।

আমি নিশ্বাস ফেলে বললুম, বোধ হয় আজকের দিনে কারও হাতেই নেই। আমিও শিশু ছিলুম, তার একমাত্র সাক্ষী আছে ঐ আকাশের তারা। আমার কথা ছেড়ে দাও, আমি তোমার একদিনকার ছেলেমানুষির কথা বলব। তোমার ভালো লাগবে কি না জানি নে, আমার মিষ্টি লাগবে।

আচ্ছা, ব'লে যাও।

বোধ হচ্ছে, ফাল্গুন মাস পড়েছে। তার আগেই ক'দিন ধরে রামায়ণের গল্প শুনেছিলে সেই চিক্‌চিকে-টাক-ওয়ালা কিশোরী চট্টোর কাছে। আমি সকাল বেলায় চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ছি, তুমি এতখানি চোখ ক'রে এসে উপস্থিত। আমি বললেম, হয়েছে কী।

হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, আমাকে হরণ ক'রে নিয়েছে।

কী সর্বনাশ। কে এমন কাজ করলে।

এ প্রশ্নের উত্তরটা তখনও তোমার মাথায় তৈরি হয় নি। বলতে পারতে রাবণ, কিন্তু কথাটা সত্য হত না ব'লে তোমার সংকোচ ছিল। কেননা, আগের সন্ধেবেলাতেই

রাবণ যুদ্ধে মারা গিয়েছে, তার একটা মুণ্ডুও বাকি ছিল না। উপায় না দেখে একটু থম্‌কে গিয়ে তুমি বললে, সে আমাকে বলতে বারণ করেছে।

তবেই তো বিপদ বাধালে। তোমাকে এখন উদ্ধার করা যায় কী ক'রে। কোন্‌ দিক দিয়ে নিয়ে গেল।

সে একটা নতুন দেশ।

খান্দেশ নয় তো ?

না।

বুন্দেলখণ্ড নয় ?

না।

কী রকমের দেশ।

নদী আছে, পাহাড় আছে, বড়ো বড়ো গাছ আছে। খানিকটা আলো, খানিকটা অন্ধকার।

সে তো অনেক দেশেই আছে। রাক্ষস-গোছের কিছু দেখতে পেয়েছিলে ? জিব-বের-করা কাঁটাওয়ালা ?

হাঁ হাঁ, সে একবার জিব মেলেই কোথায় মিলিয়ে গেল।

বড়ো তো ফাঁকি দিলে, নইলে ধরতুম তার ঝুঁটি। যাই হোক, একটা কিছুতে করে তো তোমাকে নিয়ে গিয়েছিল। রথে ?

না।

ঘোড়ায় ?

না।

হাতিতে ?

ফস্‌ ক'রে ব'লে ফেললে, খরগোসে। ঐ জন্তুটার কথা খুব মনে জাগছে ; জন্মদিনে পেয়েছিলে একজোড়া বাবার কাছ থেকে।

আমি বললেম, তবেই তো চোর কে তা জানা গেল।

টিপিটিপি হেসে তুমি বললে, কে বলো তো।

এ নিঃসন্দেহ চাঁদামামার কাজ।

কী ক'রে জানলে।

তারও যে অনেক কালের বাতিক খরগোষ পোষা।

কোথায় পেয়েছিল খরগোষ।

তোমার বাবা দেয় নি।

তবে কে দিয়েছিল।

ও চুরি করেছিল ব্রহ্মার চিড়িয়াখানায় ঢুকে।

ছিঃ।

ছিঃই তো। তাই ওর গায়ে কলঙ্ক লেগেছে, দাগা দিয়েছেন ব্রহ্মা।

বেশ হয়েছে।

কিন্তু শিক্ষা হল কই। আবার তো তোমাকে চুরি করলে। বোধ হয় তোমার

২৬।১৭

হাত দিয়ে ওর খরগোষকে ফুলকপির পাতা খাওয়াবে।

খুশি হলে শুনে। আমার বুদ্ধির পরখ করবার জন্যে বললে, আচ্ছা, বলো দেখি, খরগোষ কী ক'রে আমাকে পিঠে ক'রে নিলে।

নিশ্চয় তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে।

ঘুমলে কি মানুষ হাল্কা হয়ে যায়।

হয় বই-কি। তুমি ঘুমিয়ে কখনো ওড় নি ?

হাঁ, উড়েছি তো।

তবে আর শক্তটা কী। খরগোষ তো সহজ, ইচ্ছে করলে কোলা ব্যাঙের পিঠে চড়িয়ে তোমাকে মাঠময় ব্যাঙ-দৌড় করিয়ে বেড়াতে পারত।

ব্যাঙ। ছী ছি ছি! শুনলেও গা কেমন করে।

না, ভয় নেই— ব্যাঙের উৎপাত নেই চাঁদের দেশে। একটা কথা জিগেস করি, পথের ব্যাঙ্গমাদাদার সঙ্গে তোমার দেখা হয় নি কি।

হাঁ, হয়েছিল বই-কি।

কিরকম।

ঝাউগাছের উপর থেকে নীচে এসে খাড়া হয়ে দাঁড়ালো। বললে, পুপেদিদিকে কে চুরি করে নিয়ে যায়। শুনে খরগোষ এমন দৌড় দৌড়ল যে ব্যাঙ্গমাদাদা পারল না তাকে ধরতে।— আচ্ছা, তার পরে?

কার পরে।

খরগোষ তো নিয়ে গেল, তার পরে কী হল বলো-না।

আমি কী বলব। তোমাকেই তো বলতে হবে।

বাঃ, আমি তো ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, কেমন করে জানব।

সেই তো মুশকিল হয়েছে। ঠিকানাই পাচ্ছি নে কোথায় তোমাকে নিয়ে গেল। উদ্ধার করতে যাই কোন্ রাস্তায়। একটা কথা জিগেস করি, যখন রাস্তা দিয়ে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছিল, ঘণ্টা শুনতে পাচ্ছিলে কি।

হাঁ হাঁ, পাচ্ছিলুম ঢঙ ঢঙ ঢঙ।

তা হলে রাস্তাটা সোজা গেছে ঘণ্টাকর্ণদের পাড়া দিয়ে।

ঘণ্টাকর্ণ! তারা কিরকম।

তাদের দুটো কান দুটো ঘণ্টা। আর, দুটো লেজে দুটো হাতুড়ি। লেজের ঝাপটা দিয়ে একবার এ কানে বাজায় ঢঙ, একবার ও কানে বাজায় ঢঙ। দু জাতের ঘণ্টাকর্ণ আছে, একটা আছে হিংস্র, কাঁসরের মতো খন্‌খন্ আওয়াজ দেয়; আর-একটার গম্‌গম্ গম্ভীর শব্দ।

তুমি কখনো তার শব্দ শুনতে পাও, দাদামশায়?

পাই বই-কি। এই, কাল রাত্তিরেই বই পড়তে পড়তে হঠাৎ শুনলেম ঘণ্টাকর্ণ চলেছেন ঘোর অন্ধকারের ভিতর দিয়ে। বারোটা বাজালেন যখন তখন আর থাকতে পারলুম না। তাড়াতাড়ি বই ফেলে দিয়ে চমকে উঠে দৌড় দিলুম বিছানায়, বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে চোখ বুজে রইলুম পড়ে।

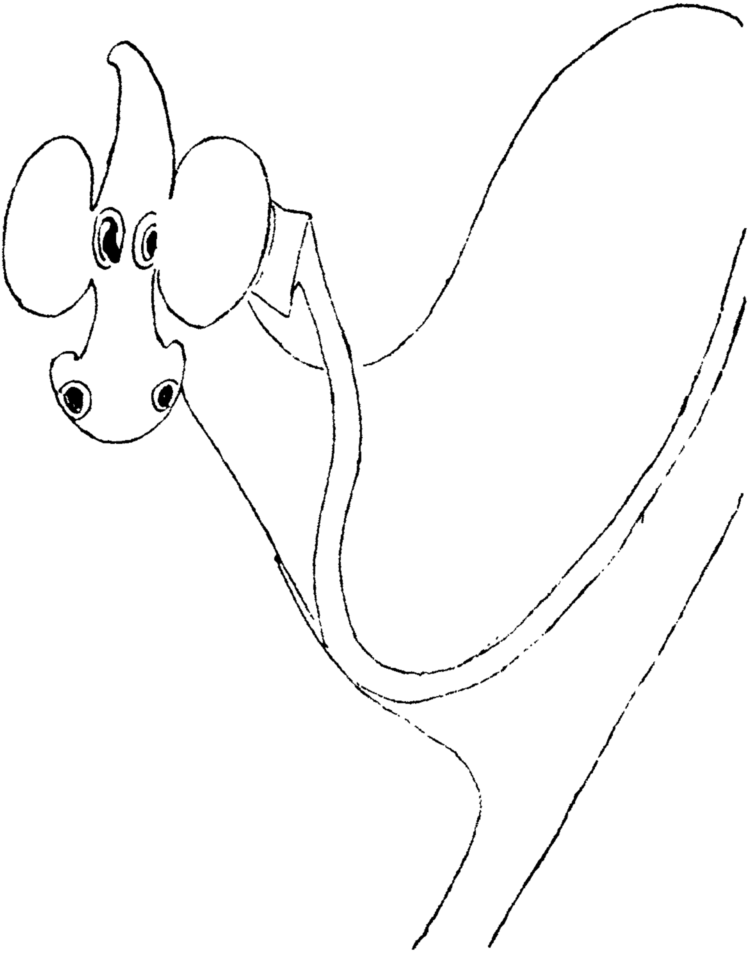

খরগোষের সঙ্গে ঘণ্টাকর্ণের ভাব আছে ?

খুব ভাব। খরগোষটা তারই আওয়াজের দিকে কান পেতে চলতে থাকে সপ্তর্ষিপাড়ার ছায়াপথ দিয়ে।

তার পরে ?

তার পরে যখন একটা বাজে, দুটো বাজে, তিনটে বাজে, চারটে বাজে, পাঁচটা বাজে, তখন রাস্তা শেষ হয়ে যায়।

তার পরে ?

তার পরে পৌঁছয় তন্দ্রা-তেপান্তরের ও পারে আলোর দেশে। আর দেখা যায় না।

আমি কি পৌঁচেছি সেই দেশে।

নিশ্চয় পৌঁচেছ।

এখন তা হলে আমি খরগোষের পিঠে নেই ?

থাকলে যে তার পিঠ ভেঙে যেত।

ওঃ, ভুলে গেছি, এখন যে আমি ভারী হয়েছি। তার পরে ?

তার পরে তোমাকে উদ্ধার করা চাই তো।

নিশ্চয় চাই। কেমন করে করবে।

সেই কথাটাই তো ভাবছি। রাজপুত্তুরের শরণ নিতে হল দেখছি।

কোথায় পাবে।

ঐ-যে তোমাদের সুকুমার।

শুনে এক মুহূর্তে তোমার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। একটু কঠিন সুরেই বললে, তুমি তাকে খুব ভালোবাস। তোমার কাছে সে পড়া ব'লে নিতে আসে। তাই তো সে আমাকে অঙ্কে এগিয়ে যায়।

এগিয়ে যাবার অন্য স্বাভাবিক কারণও আছে। সে কথাটার আলোচনা করলুম না। বললুম, তা, তাকে ভালোবাসি আর না বাসি, সেই আছে এক রাজপুত্তুর।

কেমন করে জানলে।

আমার সঙ্গে বোঝাপড়া করে তবে সে ঐ পদটা পাকা করে নিয়েছে।

তুমি বেশ একটু ভুরু কুঁচকে বললে, তোমারই সঙ্গে ওর যত বোঝাপড়া!

কী করি বলো, কোনোমতে ও মানতে চায় না— ওর চেয়ে আমি বয়সে খুব বেশি বড়ো।

ওকে তুমি বল রাজপুত্তুর! ওকে আমি জটায়ুপাখি বলেও মনে করি নে। ভারি তো!

একটু শান্ত হও, এখন ঘোর বিপদে পড়া গেছে! তুমি কোথায় তার তো ঠিকানাই নেই। তা, এবারকার মতো কাজ উদ্ধার করে দিক, আমরা নিশ্বেস ফেলে বাঁচি। এর পরে ওকে সেতুবন্ধনের কাঠবিড়ালি বানিয়ে দেব।

উদ্ধার করতে ও রাজি হবে কেন। ওর এক্জামিনের পড়া আছে।

রাজি হবার বারো-আনা আশা আছে। এই পরশু শনিবারে ওদের ওখানে গিয়েছিলুম। বেলা তিনটে। সেই রোদ্দুরে মাকে ফাঁকি দিয়ে ও দেখি ঘুরে বেড়াচ্ছে

বাড়ির ছাদে। আমি বললুম, ব্যাপার কী।

ঝাঁকানি দিয়ে মাথাটা উপরে তুলে বললে, আমি রাজপুত্তুর।

তলোয়ার কোথায়।

দেয়ালির রাত্রে ওদের ছাদে আধপোড়া তুবড়িবাজির একটা কাঠি পড়েছিল, কোমরে সেইটেকে ফিতে দিয়ে বেঁধেছে! আমাকে দেখিয়ে দিলে।

আমি বললুম, তলোয়ার বটে। কিন্তু, ঘোড়া চাই তো?

বললে, আস্তাবলে আছে।

ব'লে ছাদের কোণ থেকে ওর জ্যাঠামশায়ের বহুকেলে বেহায়া একটা ছেঁড়া ছাতা টেনে নিয়ে এল। দুই পায়ের মধ্যে তাকে চেপে ধরে হাট্‌হাট্‌ আওয়াজ করতে করতে ছাদময় একবার দৌড় করিয়ে আনলে। আমি বললুম, ঘোড়া বটে!

এর পক্ষীরাজের চেহারা দেখতে চাও?

চাই বই-কি।

ছাতাটা ফস্‌ করে খুলে দিলে। ছাতার পেটের মধ্যে ঘোড়ার খাবার দানা ছিল, সেগুলো ছড়িয়ে পড়ল ছাদে।

আমি বললুম, আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! এ জন্মে পক্ষীরাজ দেখব, কোনোদিন এমন আশাই করি নি।

এইবার আমি উড়ছি, দাদা। চোখ বুজে থাকো, তা হলে বুঝতে পারবে, আমি ঐ মেঘের কাছে গিয়ে ঠেকেছি। একেবারে অন্ধকার!

চোখ বোজবার দরকার করে না আমার। স্পষ্টই জানতে পারছি, তুমি খুব উড়ছ, পক্ষীরাজের ডানা মেঘের মধ্যে হারিয়ে গেছে।

আচ্ছা, দাদামশায়, আমার ঘোড়াটার একটা নাম দিয়ে দাও তো।

আমি বললুম, ছত্রপতি।

নামটা পছন্দ হল। রাজপুত্তুর ছাতার পিঠ চাপ্‌ড়িয়ে বললে, ছত্রপতি!

নিজেই ঘোড়ার হয়ে তার জবাব দিলে, আজ্ঞে!

আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে, তুমি ভাবছ, আমি বললুম। আজ্ঞে, তা নয়, ঘোড়া বললে।

সে কথাও কি আমাকে বলতে হবে। আমি কি এত কালা।

রাজপুত্তুর বললে, ছত্রপতি, আর ভালো লাগছে না চুপচাপ পড়ে থাকতে।

তারই মুখ থেকে উত্তর পাওয়া গেল, কী হুকুম বলো।

তেপান্তরের মাঠ পেরোনো চাই।

রাজি আছি।

আমি তো আর থাকতে পারি নে, কাজ আছে; রসে ভঙ্গ দিয়ে বলতে হল, রাজপুত্তুর, কিন্তু তোমার মাস্টার যে বসে আছে। দেখে এলুম, তার মেজাজটা চটা।

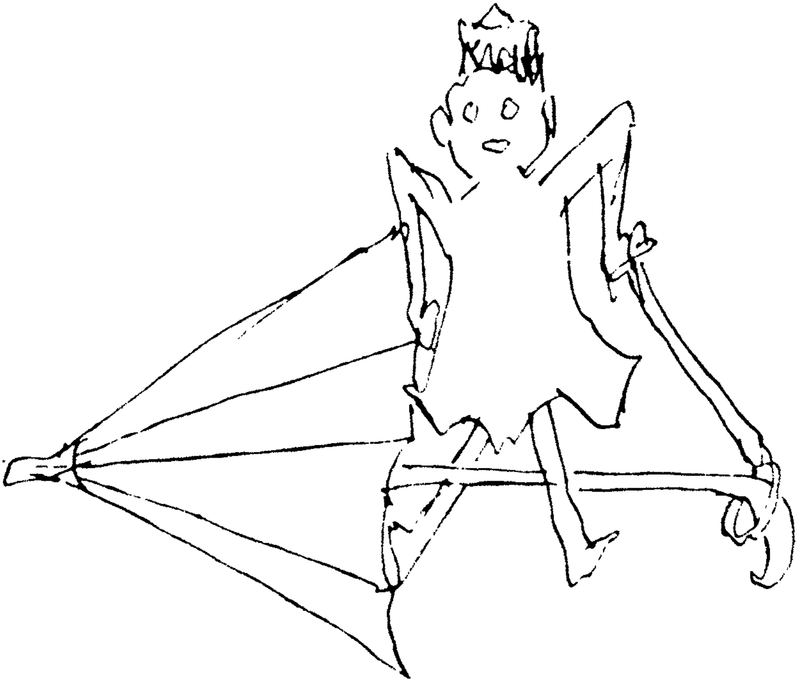

শুনে রাজপুত্রের মনটা ছট্‌ফট্‌ করে উঠল। ছাতাটাকে থাব্‌ড়া মেরে বললে, এখখনি আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পার না কি।

বেচারা ঘোড়ার হয়ে আমাকেই বলতে হল, রাত্তির না হলে ও তো উড়তে পারে না। দিনের বেলায় ও ন্যাকামি ক'রে ছাতা সাজে; তুমি ঘুমোলেই ও ডানা মেলবে। এখনকার মতো পড়তে যাও, নইলে বিপদ বাধবে।

সুকুমার মাস্টরের কাছে পড়তে গেল। যাবার সময় আমাকে বললে, কিন্তু সব কথা এখনো শেষ হয় নি।

আমি বললুম, কথা কি কখনোই শেষ হতে পারে। শেষ হলে মজা কিসের।

পাঁচটার সময় পড়া শেষ হয়ে যাবে। দাদু, তখন তুমি এসো।

আমি বললুম, থর্ড্‌নম্বর রৌভরের পরে মুখ বদলাবার জন্যে পয়লা নম্বরের গল্প চাই। নিশ্চয় আসব।

১১

মাস্টারমশায়কে দেখলুম গলির মোড়ে, ট্রামের প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে আছেন। আমি যখন গেলুম সুকুমারদের বাড়ির ছাদে, তখন সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। সামনের তেতালা বাড়িটাতে পড়ন্তি বেলাকার রোদ্দুর আড়াল করেছে। গিয়ে দেখি, চিলে কোঠার সামনে সুকুমার চুপ করে বসে। ছাদের কোণটাতে বিশ্রাম করছে তার ছত্রপতি। পিছন দিকের সিঁড়ি দিয়ে যখন উপরে উঠে এলুম, তখনো আমার পায়ের শব্দ ওর কানে পৌঁছল না। খানিক বাদে ডাক দিলুম, রাজপুত্তুর।

ওর যেন স্বপ্ন গেল ভেঙে, চমকে উঠল।

জিগেস করলুম, বসে কী ভাবছ ভাই।

ও বললে, শুকসারীর কথা শুনছি।

শুকসারীর দেখা পেলে কোথায়।

ঐ যে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে বন। ডালে ডালে ফুল ছড়াছড়ি— হলদে, লাল, নীল, যেন সন্ধ্যাবেলাকার মেঘের মতো। তারই ভিতর থেকে শুকসারীর গলা শোনা যাচ্ছে।

তাদের দেখতে পাচ্ছ তো?

হাঁ, পাচ্ছি। খানিকটা দেখা যায়, খানিকটা ঢাকা।

তা, কী বলছে ওরা।

এইবার মুশকিলে পড়ল আমাদের রাজপুত্তুর। খানিকটা আমতা আমতা ক'রে বললে, তুমিই বলো-না, দাদা, ওরা কী বলছে।

ঐ তো স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে, ওরা তর্ক করছে।

কিসের তর্ক।

শুক বলছে, আমি এবার উড়ব। সারী বলছে, কোথায় উড়বে। শুক বলছে, যেখানে কোথাও ব'লে কিছুই নেই, কেবল ওড়াই আছে; তুমিও চলো আমার সঙ্গে। সারী বললে, আমি ভালোবাসি এই বনকে; এখানে ডালে জড়িয়ে উঠেছে ঝুমকো লতা, এখানে ফল আছে বটের, এখানে শিমুলের ফুল যখন ফোটে তখন কাকের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে ভালো লাগে তার মধু খেতে; এখানে রাত্তিরে জোনাকিতে ছেয়ে যায় ঐ কাম্‌রাঙার ঝোপ, আর বাদলায় বৃষ্টি যখন ঝরতে থাকে তখন দুলতে থাকে নারকেলের ডাল ঝর্‌ঝর্‌ শব্দ ক'রে— আর, তোমার আকাশে কীই বা আছে। শুক

বললে, আমার আকাশে আছে সকাল, আছে সন্ধে, আছে মাঝরাত্রের তারা, আছে দক্ষিনে হাওয়ার যাওয়া আসা, আর আছে কিছুই না—কিছুই না—কিছুই না।

সুকুমার জিগেস করলে, কিছুই-না থাকে কী ক'রে, দাদু।

সেই কথাই তো এইমাত্র সারী জিগেস করলে শুককে।

শুক কী বলছে।

শুক বলছে, আকাশের সব চেয়ে অমূল্যধন ঐ কিছুই-না। ঐ কিছুই-না আমাকে ডাক দেয় ভোরের বেলায়। ওরই জন্যে আমার মন কেমন করে যখন বনের মধ্যে বাসা বাঁধি। ঐ কিছুই-না কেবল খেলা করে রঙের খেলা নীল আঙিনায়; মাঘের শেষে আমের বোলের নিমন্ত্রণ-চিঠিগুলি ঐ কিছুই-না'র ওড়না বেয়ে হুহু করে উড়ে আসে, মৌমাছিরা খবর পেয়ে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

উৎসাহে সুকুমার লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল; বললে, আমার পক্ষীরাজকে ঐ কিছুই-না'র রাস্তা দিয়েই তো চালাতে হবে।

নিশ্চয়ই। পুপুদিদির হরণব্যাপারটা আগাগোড়াই ঐ কিছুই-না'র তেপান্তরে।

সুকুমার হাত মুঠো ক'রে বললে, সেইখান দিয়েই আমি তাকে ফিরিয়ে আনব, নিশ্চয় আনব।

বুঝতে পারছ তো, পুপুদিদি?—রাজপুত্তর তৈরিই আছে, তোমাকে উদ্ধার করতে দেরি হবে না। এতক্ষণে ছাদের উপরে তার ঘোড়াটা একবার পাখা খুলছে, আবার বন্ধ করছে।

তুমি খুব ঝাঁকিয়ে উঠে বললে, দরকার নেই।

বল কী, এত বড়ো বিপদ থেকে তোমার উদ্ধার হল না, আর আমরা নিশ্চিন্ত থাকব?

হয়ে গেছে উদ্ধার।

কখন হল।

শুনলে না? একটু আগেই ঘণ্টাকর্ণ এসে আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল।

কখন ঘটল এটা।

ঐ-যে, ঢঙ ঢঙ ক'রে দিলে নটা বাজিয়ে।

কোন্ জাতের ঘণ্টাকর্ণ।

হিংস্র জাতের। এখন ইস্কুলে যাবার সময় এগিয়ে আসছে। বিচ্ছিরি লেগেছে আওয়াজটা।

গল্পটা অকালে গেল ভেঙে। দুসরা রাজপুত্তুর খুঁজে বের করা উচিত ছিল। এ তো অঙ্কের হরণ পূরণ নয়—ওরকম ক্লাস-পেরোনো ছেলে তেপান্তর পেরোবার স্পর্ধা করবে, এ তুমি কিছুতেই সইতে পারলে না। আমি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলুম,

লাখখানেক ঝিঁঝিঁ-পোকা আমদানি করব আমাদের পানাপুকুরের ধারের স্যাঁৎড়াবন থেকে। তারা চাঁদামামার নিদমহলের পশ্চিম দিকের খিড়কির দরজা দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ঢুকে সবাই মিলে তোমার বিছানার চাদরটাতে দিত টান সুড়্‌সুড়্‌ ক'রে। তার উপরে তোমাকে নামিয়ে আনত। তাদের ঝিঁঝি ঝিঁঝি শব্দে চাঁদনি-চকে ঝিমিয়ে পড়ত চাঁদের পাহারাওয়ালা। সমস্ত রাস্তায় বায়না দিয়ে রেখেছিলুম জোনাকির আলোধারীর দলকে। বাঁশতলার বাঁকা গলি দিয়ে তোমাকে নিয়ে চলত, খস্‌ খস্‌ শব্দ করত ঝরে-পড়া শুক্‌নো পাতাগুলো। ঝর্‌ ঝর্‌ করতে থাকত নারকেলের ডাল। গন্ধে-ভুর-ভুর শর্ষেখেতের আল বেয়ে যখন এসে পড়তে তিরপুনির ঘাটে তখন ধামা-ভরা বিন্নিধানের খই নিয়ে ডাক দিতুম গঙ্গামায়ের শুঁড়তোলা মকরকে, তোমাকে চড়িয়ে দিতেম তার পিঠে। ডাইনে বাঁয়ে তার লেজের ঠেলায় জল উঠত কল্‌কলিয়ে। তিন পহর রাতে শেয়ালগুলো ডাঙায় দাঁড়িয়ে জিগেস করত, ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া! আমি বলতুম, চুপ রও, কুছ নেই হুয়া। এই যাত্রাপথে পেঁচা আর বাদুড়ের সঙ্গেও কিছু আপোষে বন্দোবস্তের কথা ছিল। তাদের কাজে লাগাতুম। ভোর সাড়ে চারটের সময় শুকতারা নেমে পড়ত পশ্চিম-আকাশে, পূর্ব-আকাশে আলোর রেখায় দেখা দিত সকালবেলার তর্জনীতে সোনার আংটি থেকে ঠিক্‌রে-পড়া সংকেত। সদ্য-জেগে-ওঠা কাক তেঁতুলের ডালে বসে অস্থির হয়ে প্রশ্ন করত, কা-কা? আমি যেমনি বলতুম 'কিচ্ছু না', অমনি দেখতে দেখতে সব যেত মিলিয়ে— তুমি জেগে উঠতে তোমার বিছানায়।

পুপুদিদি একটুখানি হেসে বললে, এই-যে আমার ছেলেমানুষির কাহিনীটি শোনা গেল— এটি এত ইনিয়ে-বিনিয়ে ব'লে তোমার কী আনন্দ হল। আমার হিংসুকে স্বভাব ছিল, এইটে জানাবার জন্যে তোমার এতই উৎসাহ! আর, আমাদের বিলিতি-আমড়া গাছের পাকা আমড়াগুলো পেড়ে নিয়ে সুকুমারদাকে লুকিয়ে দিয়ে আসতুম, আমড়া সে ভালোবাসত ব'লে; চুরির অপবাদটা হত আমার, আর ভোগ করত সে— সে কথাটা চেপে গেছ। সুকুমারদা নাহয় অঙ্কই ভালো কষত, কিন্তু আমার বেশ মনে আছে একদিন সে 'অবধান' কথাটার মানে ভেবে পাচ্ছিল না, আমি স্লেটে লিখে আড় করে ধরে তাকে দেখিয়ে দিয়েছিলুম— এ কথাগুলো বুঝি তোমার গল্পের মধ্যে পড়ে না?

আমি বললুম, আমার খুশির কারণ এ নয় যে, মনের জ্বালায় তুমি সুকুমারদার যৌবরাজ্য মানতে চাও নি। তার উপরে তোমার হিংসের কারণ ছিল আমার উপর

তোমার অনুরাগবশত— আমার আনন্দের স্মৃতি রয়েছে ঐখানেই।

আচ্ছা, তোমার অহংকার নিয়ে তুমি থাকো। একটা কথা তোমাকে জিগেস করি, সেই-যে তোমার নামহারা বানানো মানুষটি যাকে বলতে সে, তার হল কী।

আমি বললেম, তার বয়স বেড়ে গেছে।

ভালোই তো।

সে এখন চিন্তা করে, মাথায় তার দুঃসমস্যার ভিমরুলে চাক বেঁধেছে, তর্কে তার সঙ্গে পারবার জো নেই।

দেখছি আমারই প্যার‍্যালাল লাইনেই চলেছে।

তা হতে পারে, কিন্তু গল্পের এলেকা ছাড়িয়ে গেছে। থেকে থেকে সে হাত মুঠো ক'রে ঝেঁকে ঝেঁকে ব'লে উঠছে, শক্ত হতে হবে।

বলুক-না। শক্ত ছাঁদেই গল্প জমুক-না। চুমুক দিয়ে খাওয়া নেই হল, চিবিয়ে খাওয়া চলবে তো। হয়তো আমার পছন্দ হবে।

পাছে আক্কেল দাঁতের অভাবে তাকে কায়দা করতে না পার, এই ভয়ে অনেকদিন তাকে চুপ করিয়ে রেখেছি।

ইস! তোমার ভাবনা দেখে হাসি পায়। তুমি ঠাউরে রেখেছ, আমার যথেষ্ট বয়স হয় নি।

সর্বনাশ! এতবড়ো নিন্দে অতিবড়ো শত্রুও করতে পারবে না।

তা হলে ডাকো-না তাকে তোমার আসরে, তার বর্তমান মেজাজটা বুঝে নিই।

তাই সই।

১২

ঝগড়ুকে বললেম, কোথায় আছে সেই বীরবটা। সেখানে পাও বোলাও উস্‌কো।

এল সে তার কাঁটাওয়ালা মোটা গোলাপের গুঁড়ির লাঠিখানা ঠক্‌ঠক্ করতে করতে। মালকোঁচা-মারা ধুতি, চাদরখানা জড়ানো কোমরে, হাঁটু পর্যন্ত কালো পশমের মোটা মোজা, লাল ডোরা-কাটা জামার উপর হাতাহীন বিলিতি ওয়েস্ট্‌কোট সবুজ বনাতের, সাদা রোঁয়াওয়ালা রাশিয়ান টুপি মাথায়— পুরোনো মালের দোকান থেকে কেনা— বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে ন্যাকড়া জড়ানো— কোনো একটা সন্ত

অপঘাতের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। কড়া চামড়ার জুতোর মস্‌মসানি শোনা যায় গলির মোড় থেকে। ঘন ভুরুদুটোর নীচে চোখদুটো যেন মস্থে-থেমে-যাওয়া দুটো বুলেটের মতো।

বললে, হয়েছে কী। শুকনো মটর চিবোচ্ছিলুম দাঁত শক্ত করবার জন্যে, ছাড়ল না তোমার ঝগড়ু। বললে, বাবুর চোখদুটো ভীষণ লাল হয়েছে, বোধ হয় ডাক্তার ডাকতে হবে। শুনেই তাড়াতাড়ি গয়লাবাড়ি থেকে এক-ভাঁড় চোনা এনেছি; মোচার খোলায় করে ফোঁটা ফোঁটা ঢালতে থাকো, সাফ হয়ে যাবে চোখ।

আমি বললুম, যতক্ষণ তুমি আছ আমার ত্রিসীমানায়, আমার চোখের লাল কিছুতেই ঘুচবে না। ভোরবেলাতেই তোমাদের পাড়ার যত মাতব্বর আমার দরজায় ধন্না দিয়ে পড়েছে।

বিচলিত হবার কী কারণ।

তুমি থাকতে দোসরা কারণের দরকার নেই। খবর পাওয়া গেল, তোমার চেলা কংসারি মুন্সি, যার মুখ দেখলে অযাত্রা, তোমার ছাদে বসে একখানা রামশিঙে তুলে ধরে ফুঁক দিচ্ছে; আর গাঁজার লোভ দেখিয়ে জড়ো করেছ যত ফাটা-গলার ফৌজ, তারা প্রাণপণে চেঁচানি অভ্যেস করছে। ভদ্রলোকেরা বলছে, হয় তারা ছাড়বে পাড়া নয় তোমাকে ছাড়াবে।

মহা উৎসাহে লাফ দিয়ে উঠে সে চীৎকারস্বরে বললে, প্রমাণ হয়েছে!

কিসের প্রমাণ।

বেসুরের দুঃসহ জোর। একেবারে ডাইনামাইট। বদ্‌সুরের ভিতর থেকে ছাড়া পেয়েছে দুর্জয় বেগ, উড়ে গিয়েছে পাড়ার ঘুম, দৌড় দিয়েছে পাড়ার শান্তি, পালাই-পালাই রব উঠেছে চার দিকে। প্রচণ্ড আসুরিক শক্তি। এর ধাক্কা একদিন টের পেয়েছিলেন স্বর্গের ভালো-মানুষরা। বসে বসে আধ চোখ বুজে অমৃত পাচ্ছিলেন। গন্ধর্ব ওস্তাদেরা তম্বুরা ঘাড়ে অতি নিখুঁত স্বরে তান লাগাচ্ছিলেন পরজ-বসন্তে, আর নূপুরঝংকারিণী অপ্সরীরা নিপুণ তালে তেহাই দিয়ে নৃত্য জমিয়েছিলেন। এ দিকে মৃত্যুবরণ নীল অন্ধকারে তিন যুগ ধ'রে অসুরের দল রসাতল-কোঠায় তিমিমাছের লেজের ঝাপ্‌টার বেলয়ে বেসুর সাধনা করছিল। অবশেষে একদিন শনিতে কলিতে মিলে দিলে সিগ্নাল, এসে পড়ল বেসুর-সংগতের কালাপাহাড়ের দল সুরওয়ালাদের সমে-নাড়া-দেওয়া ঘাড়ে হুংকার ক্রেংকার ঝন্‌ঝন্‌কার ক্রন্‌কার দুড়্‌মকার গড়্‌-গড়্‌গড়ৎকার শব্দে। তীব্র বেসুরের তেলেবেগুনি জলনে পিতামহ-পিতামহ ডাক ছেড়ে তাঁরা লুকোলেন ব্রহ্মাণীর অন্দরমহলে। তোমাকে বলব কী আর, তোমার তো জানা আছে সকল শাস্ত্রই।

জানা যে নেই আজ তা বোঝা গেল তোমার কথা শুনে।

দাদা, তোমাদের বই-পড়া বিদ্যে, আসল খবর কানে পৌঁছয় না। আমি ঘুরে বেড়াই শ্মশানে মশানে, গূঢ়তত্ত্ব পাই সাধকদের কাছ থেকে। আমার উৎকটদন্তী গুরুর মুখকন্দর থেকে বেসুরতত্ত্ব অল্প কিছু জেনেছিলুম, তাঁর পায়ে অনেকদিন ভেরেণ্ডার বিরেচক তৈল মর্দন ক'রে।

বেসুরতত্ত্ব আয়ত্ত করতে তোমার বিলম্ব হয় নি সেটা বুঝতে পারছি। অধিকারভেদ মানি আমি।

দাদা, ঐ তো আমার গর্বের কথা। পুরুষ হয়ে জন্মালেই পুরুষ হয় না, পরুষতার প্রতিভা থাকা চাই। একদিন আমার গুরুর অতি অপূর্ব বিশ্রীমুখ থেকে—

গুরুমুখকে আমরা বলে থাকি শ্রীমুখ, তুমি বললে বিশ্রীমুখ !

গুরুর আদেশ। তিনি বলেন, শ্রীমুখটা নিতান্ত মেয়েলি, বিশ্রী মুখেই পুরুষের গৌরব। ওর জোরটা আকর্ষণের নয়, বিপ্রকর্ষণের। মান কি না।

মানতে যে হতভাগ্য বাধ্য হয় সে মানে বই-কি।

মধুর রসে তোমার মৌতাত পাকা হয়ে গেছে দাদা, কঠোর সত্য মুখে রোচে না, ভাঙতে হবে তোমাদের দুর্বলতা— মিঠে সুরে যার নাম দিয়েছ সুরুচি, বিশ্রীকে সহ করবার শক্তি নেই যার।

দুর্বলতা ভাঙা সবলতা ভাঙার চেয়ে অনেক শক্ত।— বিশ্রীতত্ত্বর গুরুবাক্য

শোনাতে চাচ্ছিলে, শুনিয়ে দাও।

একেবারে আদিপর্ব থেকে শুরু আরম্ভ করলেন ব্যাখ্যান। বললেন, মানবসৃষ্টির শুরুতে চতুর্মুখ তাঁর সামনের দিকের দাড়ি-কামানো দুটো মুখ থেকে মিহি সুর বের করলেন। কোমল রেখাব থেকে মধুর ধারার মসৃণ মিড়ের উপর দিয়ে পিছলে গড়িয়ে এল কোমল নিখাদ পর্যন্ত। সেই সুকুমার স্বরলহরী প্রত্যূষের অরুণবর্ণ মেঘের থেকে প্রতিফলিত হয়ে অত্যন্ত আরামের দোলা লাগালো অতিশয় মিঠে হাওয়ায়। তারই মৃদু হিল্লোলে দোলায়িত নৃত্যচ্ছন্দে রূপ নিয়ে দেখা দিল নারী। স্বর্গে শাঁখ বাজাতে লাগলেন বরুণদেবের ঘরনী।

বরুণদেবের ঘরনী কেন।

তিনি যে জলদেবী। নারী জাতটা বিশুদ্ধ জলীয়; তার কাঠিন্য নেই, চাঞ্চল্য আছে, চঞ্চল করেও। ভূব্যবস্থার গোড়াতেই জলরাশি। সেই জলে পানকৌড়ির পিঠে চ'ড়ে যত সব নারী ভেসে বেড়াতে লাগল সারিগান গাইতে গাইতে।

অতি চমৎকার। কিন্তু, তখন পানকৌড়ির সৃষ্টি হয়েছে না কি।

হয়েছে বই-কি। পাখিদের গলাতেই প্রথম সুর বাঁধা চলছিল। দুর্বলতার সঙ্গেই মাধুর্যের অনবচ্ছিন্ন যোগ, এই তত্ত্বটির প্রথম পরীক্ষা হল ঐ দুর্বল জীবগুলির ডানায় এবং কণ্ঠে। একটা কথা বলি, রাগ করবে না তো?

না রাগতে চেষ্টা করব।

যুগান্তরে পিতামহ যখন মানবসমাজে দুর্বলতাকেই মহিমান্বিত করবার কাজে কবিসৃষ্টি করেছিলেন, তখন সেই সৃষ্টির ছাঁচ পেয়েছিলেন এই পাখির থেকেই। সেদিন একটা সাহিত্যসম্মিলন গোছের ব্যাপার হল তাঁর সভামণ্ডপে; সভাপতিরূপে কবিদের আহ্বান ক'রে বলে দিলেন, তোমরা মনে মনে উড়তে থাকো শূন্যে, আর ছন্দে ছন্দে গান করো বিনা কারণে, যা-কিছু কঠিন তা তরল হয়ে যাক, যা-কিছু বলিষ্ঠ তা এলিয়ে পড়ে যাক আর্দ্র হয়ে।— কবিসম্রাট, আজ পর্যন্ত তুমি তাঁর কথা রক্ষা করে চলেছ।

চলতেই হবে যতদিন না ছাঁচ বদল হয়।

আধুনিক যুগ শুকিয়ে শক্ত হয়ে আসছে, মোমের ছাঁচ আর মিলবেই না। এখন সে দিন নেই যখন নারীদেবতার জলের বাসাটি দোল খেত পদ্মে, যখন মনোহর দুর্বলতায় পৃথিবী ছিল অতলে নিমগ্ন।

সৃষ্টি ঐ মোলায়েমের ছন্দে এসেই থামল না কেন।

গোটা কয়েক যুগ যেতে না যেতেই ধরণীদেবী আর্ত বাক্যে আবেদনপত্র পাঠালেন চতুর্মুখের দরবারে। বললেন, ললনাদের এই লকারবহুল লালিত্য আর তো সহ্য হয়

না। স্বয়ং নারীরাই করুণ কল্লোলে ঘোষণা করতে লাগল, ভালো লাগছে না। ঊর্ধ্বলোক থেকে প্রশ্ন এল, কী ভালো লাগছে না। সুকুমারীরা বললে, বলতে পারি নে।— কী চাই।— কী চাই তারও সন্ধান পাচ্ছি নে।

ওদের মধ্যে পাড়াকুঁদুলিরও কি অভিব্যক্তি হয় নি। আগাগোড়াই কি সুবচনীর পালা।

কোঁদলের উপযুক্ত উপলক্ষ্যটি না থাকাতেই বাক্যবাণের টঙ্কার নিমগ্ন রইল অতলে, ঝাঁটার কাঠির অঙ্কুর স্থান পেল না অকূলে।

এত বড়ো দুঃখের সংবাদে চতুর্মুখ লজ্জিত হলেন বোধ করি?

লজ্জা ব'লে লজ্জা! চার মুণ্ড হেঁট হয়ে গেল। স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন রাজহংসের কোটি-যোজন-জোড়া ডানাদুটোর 'পরে পুরো একটা ব্রহ্মযুগ। এ দিকে আদিকালের লোকবিশ্রুত সাধ্বী পরম-পানকৌড়িনী, শুভ্রতায় যিনি ব্রহ্মার পরমহংসের সঙ্গে পাল্লা দেবার সাধনায় হাজার বার ক'রে জলে ডুব দিয়ে দিয়ে চঞ্চুঘর্ষণে পালকগুলোকে ডাটাসার ক'রে ফেলছিলেন, তিনি পর্যন্ত ব'লে উঠলেন, নির্মলতাই যেখানে নিরতিশয় সেখানে শুচিতার সর্বপ্রধান সুখটাই বাদ পড়ে, যথা, পরকে খোঁটা দেওয়া; শুভ্রমন্য হবার মজাটাই থাকে না। প্রার্থনা করলেন, হে দেব, মলিনতা চাই, ভূরিপরিমাণে, অনতিবিলম্বে এবং প্রবল বেগে। বিধি তখন অস্থির হয়ে লাফিয়ে উঠে বললেন, ভুল হয়েছে, সংশোধন করতে হবে। বাস্ রে কী গলা। মনে হল মহাদেবের মহাবৃষভটার ঘাড়ে এসে পড়েছে মহাদেবীর মহাসিংহটা— অতিলৌকিক সিংহনাদে আর বৃষগর্জনে মিলে দ্যুলোকের নীলমণিমণ্ডিত ভিতটাতে দিলে ফাটল ধরিয়ে। মজার আশায় বিষ্ণুলোক থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন নারদ। তাঁর ঢেঁকির পিঠ থাবড়িয়ে বললেন, বাবা ঢেঁকি, শুনে রাখো ভাবীলোকের বিশ্ব-বেসুরের আদিমন্ত্র, যথাকালে ঘর ভাঙাবার কাজে লাগবে। ক্রুদ্ধ ব্রহ্মার চার গলার ঐক্যতান আওয়াজের সঙ্গে যোগ দিলে দিঙ্‌নাগেরা শুঁড় তুলে, শব্দের ধাক্কায় দিগঙ্গনাদের বেণীবন্ধ খুলে গিয়ে আকাশ আগাগোড়া ঠাসা হয়ে গেল এলোচুলে— বোধ হল কালো-পাল-তোলা ব্যোমতরী ছুটল কালপুরুষের শ্মশানঘাটে।

হাজার হোক, সৃষ্টিকর্তা পুরুষ তো বটে।

পৌরুষ চাপা রইল না। তাঁর পিছনের দাড়িওয়ালা দুই মুখের চার নাসাফলক উঠল ফুলে, হাঁপিয়ে-ওঠা বিরাট হাপরের মতো। চার নাসারন্ধ্র থেকে একসঙ্গে ঝড় ছুটল আকাশের চার দিককে তাড়না ক'রে। ব্রহ্মাণ্ডে সেই প্রথম ছাড়া পেল দুর্জয়শক্তিমান বেসুরপ্রবাহ— গোঁ-গোঁ গাঁ-গাঁ ভড়্‌মুড়্‌ দুদ্দাড়্‌ গড়্‌গড়্‌ ঘড়্‌ঘড়্‌ ঘড়াঙ।

গন্ধর্বেরা কাঁধে তম্বুরা নিয়ে দলে দলে দৌড় দিল ইন্দ্রলোকের খিড়কির আঙিনায়, যেখানে শচীদেবী স্নানান্তে মন্দারকুঞ্জচ্ছায়ায় পারিজাতকেশরের ধূপধূমে চুল শুকোতে যান। ধরণীদেবী ভয়ে কম্পান্বিতা; ইষ্টমন্ত্র জপতে জপতে ভাবতে লাগলেন, ভুল করেছি বা। সেই বেসুরো ঝড়ের উল্টোপাল্টা ধাক্কায় কামানের মুখের তপ্ত গোলার মতো ধক্‌ধক্‌ শব্দে বেরিয়ে পড়তে লাগল পুরুষ।— কী দাদা, চুপচাপ যে। কথাগুলো মনে লাগছে তো?

লাগছে বই-কি। একেবারে দুম্‌দাম্‌ শব্দে লাগছে।

সৃষ্টির সর্বপ্রধান পর্বে বেসুরেরই রাজত্ব, এ কথাটা বুঝতে পেরেছ তো?

বুঝিয়ে দাও-না।

তরল জলের কোমল একাধিপত্যকে ঢুঁ মেরে, গুঁতো মেরে, লাথি মেরে, কিল মেরে, ঘুষো মেরে, ধাক্কা মেরে, উঠে পড়তে লাগল ডাঙা তার পাথুরে নেড়া মুণ্ডুগুলো তুলে। ভূলোকের ইতিহাসে এইটেকেই সব চেয়ে বড়ো পর্ব ব'লে মান কি না।

মানি বই-কি।

এত কাল পরে বিধাতার পৌরুষ প্রকাশ পেল ডাঙায়; পুরুষের স্বাক্ষর পড়ল সৃষ্টির শক্ত জমিতে। গোড়াতেই কী বীভৎস পালোয়ানি। কখনো আগুনে পোড়ানো, কখনো বরফে জমানো, কখনো ভূমিকম্পের জবর্দস্তির যোগে মাটিকে হাঁ করিয়ে কবিরাজি বড়ির মতো পাহাড়গুলোকে গিলিয়ে খাওয়ানো— এর মধ্যে মেয়েলি কিছু নেই, সে কথা মান কি না।

মানি বই-কি।

জলে ওঠে কলধ্বনি, হাওয়ায় বাঁশি বাজে সোঁ-সোঁ— কিন্তু বিচলিত ডাঙা যখন ডাক পাড়তে থাকে তখন ভরতের সংগীতশাস্ত্রটাকে পিণ্ডি পাকিয়ে দেয়। তোমার মুখ দেখে বোধ হচ্ছে, কথাটা ভালো লাগছে না। কী ভাবছ বলেই ফেলো-না।

আমি ভাবছি, আর্ট্‌ মাত্রেরই একটা পুরাগত বনেদ আছে যাকে বলে ট্র্যাডিশন। তোমার বেসুরধ্বনির আর্ট্‌কে বনেদি ব'লে প্রমাণ করতে পার কি।

খুব পারি। তোমাদের সুরের মূল ট্র্যাডিশন মেয়ে-দেবতার বাজযন্ত্রে। যদি বেসুরের উদ্ভব খুঁজতে চাও তবে সিধে চলে যাও পৌরাণিক মেয়েমহল পেরিয়ে পুরুষ দেবতা জটাধারীর দরজায়। কৈলাসে বীণাযন্ত্র বে-আইনি, উর্বশী সেখানে নাচের বায়না নেয় নি। যিনি সেখানে ভীষণ বেতালে তাণ্ডবনৃত্য করেন তাঁর নন্দীভৃঙ্গী ফুঁকতে থাকে শিঙে, তিনি বাজান ববম্‌বম গালবাদ্য, আর কড়াকড় কড়াকড় ডমরু। ধ্ব'সে পড়তে থাকে কৈলাসের পিণ্ড পিণ্ড পাথর। মহাবেসুরের আদি-উৎপত্তিটা স্পষ্ট হয়েছে তো?

হয়েছে।

মনে রেখো সুরের হার, বেসুরের জিত, এই নিয়েই পালা রচনা হয়েছে পুরাণে দক্ষযজ্ঞের। একদা যজ্ঞসভায় জমা হয়েছিলেন দেবতারা— দুই কানে কুণ্ডল, দুই বাহুতে অঙ্গদ, গলায় মণিমাল্য। কী বাহার! ঋষিমুনিদের দেহ থেকে আলো পড়ছিল ঠিক্‌রিয়ে। কণ্ঠ থেকে উঠছিল অনিন্দ্যসুন্দর সুরে সুমধুর সামগান, ত্রিভুবনের শরীর রোমাঞ্চিত। হঠাৎ দুড়্‌দাড়্‌ ক'রে এসে পড়ল বিশ্রীবিরূপের বেসুরি দল, শুচিসুন্দরের সৌকুমার্য মুহূর্তে লণ্ডভণ্ড। কুশ্রীর কাছে সুশ্রীর হার, বেসুরের কাছে সুরের— পুরাণে এ কথা কীর্তিত হয়েছে কী আনন্দে, কী অট্টহাস্যে, অন্নদামঙ্গলের পাতা ওল্‌টালেই তা টের পাবে। এই তো দেখছ বেসুরের শাস্ত্রসম্মত ট্র্যাডিশন। ঐ-যে তুন্দিলতনু গজানন সর্বাগ্রে পেয়ে থাকেন পুজো, এটাই তো চোখ-ভোলানো দুর্বল ললিতকলার বিরুদ্ধে স্থূলতম প্রোটেস্‌ট্‌। বর্তমান যুগে ঐ গণেশের শুঁড়ই তো চিম্‌নি-মূর্তি ধরে পাশ্চাত্য পণ্যযজ্ঞশালায় বৃংহিতধ্বনি করছে। গণনায়কের এই কুৎসিত বেসুরের জোরেই কি ওরা সিদ্ধিলাভ করছে না। চিন্তা করে দেখো।

দেখব।

যখন করবে তখন এ কথাটাও ভেবে দেখো, বেসুরের অজেয় মাহাত্ম্য কঠিন ডাঙাতেই। সিংহ বল', ব্যাঘ্র বল', বলদ বল', যাদের সঙ্গে সগর্বে বীরপুরুষদের তুলনা করা হয় তারা কোনো কালে ওস্তাদজির কাছে গলা সাধে নি। এ কথায় তোমার সন্দেহ আছে কি।

তিলমাত্র না।

এমন-কি, ডাঙার অধম পশু যে গর্দভ, যত দুর্বল সে হোক-না, বীণাপাণির আসরে সে সাক্রেদি করতে যায় নি, এ কথা তার শত্রু মিত্র এক বাক্যে স্বীকার করবে।

তা করবে।

ঘোড়া তো পোষমানা জীব— লাথি মারবার যোগ্য খুর থাকা সত্ত্বেও নির্বিবাদে চাবুক খেয়ে মরে— তার উচিত ছিল, আস্তাবলে খাড়া দাঁড়িয়ে ঝিঁঝিঁটখাম্বাজ আলাপ করা। তার চিঁহিঁ হিঁহিঁ শব্দে সে রাশি রাশি সফেন চন্দ্রবিন্দুবর্ষণ করে বটে, তবু বেসুরো অনুনাসিকে সে ডাঙার সম্মান রক্ষা করতে ভোলে না। আর গজরাজ, তাঁর কথা বলাই বাহুল্য। পশুপতির কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত এই-সমস্ত স্থলচর জীবের মধ্যে কি একটাও কোকিলকণ্ঠ বের করতে পার। ঐ-যে তোমার বুল্‌ডগ্‌ ফ্রেডি চীৎকারে ঘুমছাড়া করে পাড়া, ওর গলায় দয়া ক'রে বা মজা ক'রে বিধাতা যদি দেন শ্যামা-দোয়েলের শিষ, ও তা হলে নিজের মধুর কণ্ঠের অসহ্য ধিক্কারে তোমার চল্‌তি মোটরের

তলায় গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে এ আমি বাজি রাখতে পারি। আচ্ছা, সত্যি করে বলো, কালিঘাটের পাঁঠা যদি কর্কশ ভ্যাভ্যা না করে রামকেলি ভাঁজতে থাকে, তা হলে তুমি তাকে জগন্মাতার পবিত্র মন্দির থেকে দূর-দূর করে খেদিয়ে দেবে না কি।

নিশ্চয় দেব।

তা হলে বুঝতে পারছ আমরা যে সুমহৎ ব্রত নিয়েছি তার সার্থকতা। আমরা শক্ত ডাণ্ডার শাক্ত সন্তান, বেসুরমন্ত্রে দীক্ষিত। আধমরা দেশের চিকিৎসায় প্রয়োগ করতে চাই চরম মুষ্টিযোগ। জাগরণ চাই, বল চাই। জাগরণ শুরু হয়েছে পাড়ায়; প্রতিবেশীদের বলিষ্ঠতা দুম্‌দাম্‌ শব্দে দুর্দাম হচ্ছে, পৃষ্ঠদেশে তার প্রমাণ পাচ্ছে আমার চেলারা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কোতোয়ালরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে, টনক নড়েছে শাসন-কর্তাদের।

তোমার গুরু বলছেন কী।

তিনি মহানন্দে মগ্ন। দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন, বেসুরের নবযুগ এসেছে সমস্ত জগতে। সভ্য জাতরা আজ বলছে, বেসুরটাতেই বাস্তব, ওতেই পুঞ্জীভূত পৌরুষ, সুরের মেয়েমানুষিই দুর্বল করেছে সভ্যতা। ওদের শাসনকর্তা বলছে, জোর চাই, খৃস্টানি চাই নে। রাষ্ট্রবিধিতে বেসুর চড়ে যাচ্ছে পর্দায় পর্দায়। সেটা কি তোমার চোখে পড়ে নি, দাদা।

চোখে পড়বার দরকার কী, ভাই। পিঠে পড়ছে দমাদ্দম।

এ দিকে বেতালপঞ্চবিংশতিই চাপল সাহিত্যের ঘাড়ে। আনন্দ করো, বাংলাও ওদের পাছু ধরেছে।

সে তো দেখছি। পাছু ধরতে বাংলা কোনোদিন পিছপাও নয়।

এ দিকে গুরুর আদেশে বেসুরমন্ত্র সাধন করবার জন্যে আমরা চৈচৈসংঘ স্থাপন করেছি। দলে একজন কবি জুটেছে। তার চেহারা দেখে আশা হয়েছিল নবযুগ মূর্তিমান। রচনা দেখে ভুল ভাঙল, দেখি তোমারই চেলা। হাজার বার করে বলছি, ছন্দের মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলো গদাঘাতে। বলছি, অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্‌। বুঝিয়ে দিলেম, কথার মানেটাকে সম্মান করায় কেবল দাসবুদ্ধির গাঁঠপড়া মনটাই ধরা পড়ে। ফল হচ্ছে না। বেচারার দোষ নেই— গলদঘর্ম হয়ে ওঠে, তবু ভদ্রলোকি কাব্যের ছাঁদ ঘোচাতে পারে না। ওকে রেখেছি পরীক্ষাধীনে। প্রথম নমুনা যেটা সমিতির কাছে দাখিল করেছে সেটা শুনিয়ে দিই। সুর দিয়ে শোনাতে পারব না।

সেই জন্যেই তোমাকে ঘরে ঢুকতে দিতে সাহস হয়।

তবে অবধান করো—

পায়ে পড়ি শোনো ভাই গাইয়ে,
    হৈহৈপাড়া ছেড়ে দূর দিয়ে যাইয়ে।
হেথা সা রে গা-মা পা'য়ে সুরাসুরে যুদ্ধ,
    শুদ্ধ কোমলগুলো বেবাক অশুদ্ধ—
অভেদ রাগিণীরাগে ভগিনী ও ভাইয়ে।
    তার-ছেঁড়া তম্বুরা, তাল-কাটা বাজিয়ে—
        দিনরাত বেধে যায় কাজিয়ে।
    ঝাঁপতালে দাদ্‌রায় চৌতালে ধামারে
        এলোমেলো ঘা মারে—
তেরে কেটে মেরে কেটে ধাঁ ধাঁ ধাঁ ধাঁ ধাঁইয়ে।

সভাসুদ্ধ একবাক্যে ব'লে উঠলুম, এ চলবে না। এখনো জাতের মায়া ছাড়তে পারে নি— শুচিবায়ুগ্রস্ত, নাড়ী দুর্বল। আমরা বেছন্দ চাই বেপরোয়া। কবির মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া গেল। বললুম, আরও একবার কোমর বেঁধে লাগো, বাঙালি ছেলেদের কানে জোরের কথা হাতুড়ি পিটিয়ে চালিয়ে দাও, মনে রেখো পিটুনির চোটে ঠেলা মেরে জোর চালানো আজ পৃথিবীর সর্বত্রই প্রচলিত— বাঙালি শুধু কি ঘুমিয়ে রয়। দেখলুম, লোকটার অন্তঃকরণ পাক খেয়ে উঠেছে। বলে উঠল, নয় নয়, কখনোই নয়। কলমটাকে কামড়ে ধ'রে ছুটে গিয়ে বসল টেবিলে। করজোড়ে গণেশকে বললে, তোমার কলাবধূকে পাঠিয়ে দাও অন্তঃপুরে সিদ্ধিদাতা। লাগাও তোমার শুঁড়ের আছাড় আমার মগজে, ভূমিকম্প লাগুক আমার মাতৃভাষায়, জোরের তপ্তপঙ্ক উৎসারিত হোক কলমের মুখে, দুঃশ্রাব্যের চোটে বাঙালির ছেলেকে দিক জাগিয়ে। কবি মিনিট পনেরো পরে বেরিয়ে চীৎকার স্বরে আবৃত্তি শুরু করলে। মুখ চোখ লাল, চুলগুলো উস্কোখুস্কো, দশা পাবার দশা।—

মার্ মার্ মার্ রবে মার্ গাট্টা,
মারহাট্টা, ওরে মারহাট্টা।
    ছুটে আয় দুদ্দাড়,
    ভাঙ্ মাথা, ভাঙ্ হাড়,
কোথা তোর বাসা আছে হাড়কাট্টা।

আন্ ঘুষো, আন্ কিল,
আন্ ঢেলা, আন্ ঢিল,
নাক মুখ থেঁতো ক'রে দিক ঠাট্টা।
আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম
দুম্‌দাম ধুমাধুম,
ভেঙে চুরে চুর্‌মার হোক খাট্টা।
ঘুম যাক, মারো কষে মাল্‌সাট্টা।
বাঁশিওলা চুপ রাও,
টান মেরে উপ্‌ড়াও
ধরা হতে ললিতলবঙ্গলতা।
বেল জুঁই চম্পক
দূরে দিক ঝম্পক,
উপবনে জমা হোক জঙ্গলতা।

আমি অস্থির হয়ে দুই হাত তুলে বললুম, থামো থামো, আর নয়। জয়দেবের ভূত এখনো কাঁধে বসে ছন্দের সার্কাস করছে, কানের দখল ছাড়ে নি। গয়াধামে ঐ লেখাটার যদি পিণ্ডি দিতে চাও তবে ওর উপরে হানো মুষল, ওটাকে ছির্‌কুটে নাস্তানাবুদ ক'রে তার উপরে ফুট্‌কি বৃষ্টি করো। কবি হাত জোড় ক'রে বললে, আমি পারব না, তুমি হাত লাগাও। আমি বললুম, ঐ-যে মারহাট্টা শব্দটা তোমার মাথায় এসেছে, ঐটেতেই তোমার ভবিষ্যতের আশা। 'চলন্তিকা' থেকে কথাটাকে ছিঁড়ে ফেলেছ, অর্থের শিকড়টা রয়ে গেল মাটির নীচে। শুধু ডাঁটা ধরে খাড়া রয়েছে ধ্বনির মারমূর্তি। এইবার সমস্তটাকে ছত্রছাড়া করে দিই— দেখো, কী মূর্তি বেরোয়—

হৈ রে হৈ মারহাট্টা
গালপাট্টা
ঝাঁটপাট্টা।

* * *

হাড়কাট্টা ক্যাঁ কোঁ কাঁচ্,
গড়্‌গড়্ গড়্‌গড়্।......
ছড়্‌দড়ুম্ দুদ্দাড়

হৈ রে হৈ মারহাট্টা

শাম্ব : অধ্যায় ১৩

ডাণ্ডা

ধপাং

ঠাণ্ডা

কম্পাউণ্ড ফ্র্যাক্‌চার

* * *

মড়্‌মড়্‌ মড়্‌মড়্‌

দুড়্‌ম……

হুড়্‌মুড়্‌ হুড়্‌মুড়্‌

দেউকিনন্দন

ঝক্কন পাণ্ডে

কুন্দন গাড়োয়ান

বাঁকে বিহারী

তড়্‌বড়্‌ তড়্‌বড়্‌ তড়্‌বড়্‌ তড়্‌বড়্‌

খট্‌খট্‌ মস্‌মস্‌

ধড়াধ্বড়

ধড়্‌ফড়্‌ ধড়্‌ফড়্‌

হো হো হু হু হা হা—

ট ঠ ড ঢ ড় ঢ় হঃ—

ইনফর্মো হেডিস্‌ লিম্বো।

দাদা, তোমার নকল করি নি এই সার্টিফিকেট আমাকে দিতে হবে।

খুশি হয়ে দেব।

নবযুগের মহাকাব্য তোমাকে লিখতে হবে দাদা।

যদি পারি। বিষয়টা কী।

বেসুর-ছিঁড়িম্বের দিগ্বিজয়।

পুপুদিদিকে জিগেস করলুম, কেমন লাগল।

পুপু বললে, ধাঁধা লাগল।

অর্থাৎ ?

অর্থাৎ, সুরাসুরের যুদ্ধে অসুরের জয়টা কেন আমার তেমন খারাপ লাগল না, তাই ভাবছি। বিশ্রী গোঁয়ারটার দিকেই রায় দিতে চাচ্ছে মন।

তার কারণ, তুমি স্ত্রীজাতীয়। অত্যাচারের মোহ কাটে নি। মার খেয়ে আনন্দ পাও, মারবার শক্তিটাকে প্রত্যক্ষ দেখে।

অত্যাচারের আক্রমণ পছন্দসই তা বলতে পারি নে— কিন্তু বীভৎসমূর্তিতে যে পৌরুষ ঘুষি উঁচিয়ে দাঁড়ায় তাকে মনে হয় সারাহীন।

আমার মতটা বলি। দুঃশাসনের আস্ফালনটা পৌরুষ নয়, একেবারে উল্টো। আজ পর্যন্ত পুরুষই সৃষ্টি করেছে সুন্দর, লড়াই করেছে বেসুরের সঙ্গে। অসুর সেই পরিমাণেই জোরের ভান করে যে পরিমাণে পুরুষ হয় কাপুরুষ। আজ পৃথিবীতে তারই প্রমাণ পাচ্ছি।

১৩

পুপুদিদির মনে হল, আমি ওর মর্যাদাহানি করেছি। তখন সন্ধে হয়ে আসছে। কেদারায় হেলান দিয়ে ও বসল আমার কাছে। অন্য দিকে মুখ করে বললে, তুমি আমাকে নিয়ে বানিয়ে বানিয়ে কেবল ছেলেমানুষি করছ, এতে তোমার কী সুখ।

আজকাল ওর কথা শুনে হাসতে সাহস হয় না। ভালোমানুষের মতো মুখ করেই বললুম, তোমার বয়সে পাকা বুদ্ধির প্রমাণ দিতেই তোমাদের আগ্রহ, আমার বয়সে ভাবতে ভালো লাগে যে মজাটা এখনো আছে কাঁচা। সুযোগ পেলে মশগুল হয়ে ছেলেমানুষি করি বানিয়ে, হয়তো মানানসই হয় না।

তাই ব'লে আগাগোড়াই যদি ছেলেমানুষি কর, তা হলে সত্যিকার ছেলেমানুষিই হয় না। ছেলে বয়সের ভিতরে ভিতরে বড়ো বয়সের মিশল থাকে।

দিদি, এটা একটা কথার মতো কথা বলেছ। শিশুর কোমল দেহেও শক্ত হাড়ের গোড়াপত্তন থাকে। এ কথাটা আমি ভুলেছিলুম না কি।

তোমার বকুনি শুনে মনে হয়, যখন আমি ছোটো ছিলুম তখনকার দিনে এমন কিছুই ছিল না যা ব্যঙ্গ করবার নয় অথচ মজা করবার!

একটা উদাহরণ দেখাও।

মনে করো, আমাদের মাস্টারমশায়। তিনি অদ্ভুত ছিলেন, কিন্তু খাঁটি অদ্ভুত। তাই তাঁকে এত ভালো লাগত।

আচ্ছা, তাঁর কথাটা একটু ধরিয়ে দাও-না।

আজও তাঁর মুখখানা স্পষ্ট মনে পড়ে। ক্লাসে বসতেন যেন আলগোছে, বইগুলো ছিল কণ্ঠস্থ। উপরের দিকে তাকিয়ে পাঠ ব'লে যেতেন, কথাগুলো যেন সদ্য ঝরে পড়ছে আকাশ থেকে। আমরা ক্লাসে উপস্থিত থাকব, মন দিয়ে পড়া শুনব, সে গরজটা সম্পূর্ণ আমাদেরই ব'লে তিনি মনে করতেন।

তিনি তোমাদের মুখ চেনবার সুযোগ পান নি বোধ হয়।

চেষ্টাও করেন নি। একদিন ছুটির দরবার নিয়ে তাঁর ঘরে ঢুকতেই তিনি শশব্যস্ত হয়ে চৌকি ছেড়ে উঠে পড়লেন; মনে করলেন, আমি বুঝি যাকে বলে একজন রীতিমত মহিলা।

অমনতরো অভাবনীয় ভুল করা তাঁর অভ্যস্ত ছিল।

ছিল বই-কি। তোমার দাড়ি দেখে কোনোদিন তোমাকে নবাব খাঞ্জেখাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি ব'লে ভুল করেন নি তো? না, ঠাট্টা নয়, তিনি তো তোমার বন্ধু ছিলেন, বলো-না তাঁর কথা।

তাঁর শত্রু কেউ ছিল না, কিন্তু সমজদার বন্ধু ছিলুম একমাত্র আমি। লোকে যখন তাঁর খ্যাপামির কথা রটাত তিনি আশ্চর্য হয়ে যেতেন। একদিন আমাকে এসে বললেন, সবাই বলছে, আমি ক্লাস পড়াই কিন্তু ক্লাসের দিকে তাকাই নে।

আমি বললুম, তোমার সাঙাৎরা তোমার বিদ্যের দোষ ধরতে পারে না, তোমার বুদ্ধির দোষ ধরে। তারা বলে, তোমার পড়ানোর ভুল হয় না কিন্তু পড়াচ্ছ যে সেইটেই ভুলে যাও।

পড়াচ্ছি যদি না ভুলি তবে পড়াতে পারতুম না, নিছক মাস্টারিই করে যেতুম। পড়ানোটা নিঃশেষে হজম হয়ে গেছে, ওটা নিয়ে মনটা আইঢাই করে না।

জলচর জলে সাঁতার দিলে টের পাওয়া যায় না, স্থলচর দিলে সেটা খুবই মালুম হয়। তুমি অধ্যাপন-সরোবরের গভীর জলের মাছ।

আমি যদি ছাত্রদের দিকেই তাকাই তবে ক্লাসের দিকে মন দেব কী ক'রে।

তোমার সেই ক্লাসটা আছে কোথায়।

কোথাও না, সেইজন্যেই তো বাধা পাই নে। ছাত্ররাই যদি আমার চোখ জুড়ে বসে তা হলে ক্লাসের আত্মাপুরুষটা আড়ালে পড়ে যে।

'পড়ো বাবা আত্মারাম' এই বুঝি তোমার বুলি?

পড়াচ্ছি কই। আমার আত্মারামকেই টহল দেওয়াচ্ছি।

তোমার প্রণালীটা কিরকম।

গঙ্গাধারার ব'হে যাবার প্রণালী যেরকম। ডাইনে বাঁয়ে কোথাও মরু, কোথাও ফসল, কোথাও শ্মশান, কোথাও শহর। এই নিয়ে গঙ্গামায়ীকে পদে পদে বিচার করতে যদি হত তা হলে আজ পর্যন্ত সগরসন্তানদের উদ্ধার হত না। যাদের যতটা হবার তাই হয়, বিধাতার সঙ্গে টক্কর দিয়ে তার চেয়ে বেশি হওয়াতে গেলেই চলা বন্ধ। আমার পড়ানো চলে মেঘের মতো শূন্য দিয়ে, বর্ষণ হয় নানা খেতে, ফসল ফলে খেত-অনুসারে। অসম্ভবকে নিয়ে ঠেলাঠেলি করে সময় নষ্ট করি নে ব'লে হেড্‌মাস্টার হন ক্ষাপা। ঐ হেড্‌মাস্টারটিকেও অত্যন্ত সত্য ব'লে গণ্য করলে অত্যন্ত ভুল করা হয়।

পুপু বললে, ছাত্রীদের অনেকে মনে মনে খুঁৎখুঁৎ করত। তাদের লক্ষ্য করে একদিন বলেছিলেন, এখানে যে মাস্টারটা আছে তাকে নেই ক'রে দিয়েছি, তোমাদের নিজের মনকেই বেড়ে ওঠবার জায়গা করে দেবার জন্যেই। আর-একদিন তিনি বলেছিলেন, মাস্টারিতে আমি হচ্ছি ক্লাসিক, আর সিধুবাবু রোমান্টিক। বলো, বাহবা, মাস্টারমশায়ের কথাটা আমরা কিছুই বুঝতে পারি নি।

মানে হচ্ছে, মাস্টার সমগ্র ক্লাসকেই দিতেন উপরে তুলে, আর সিধু ছাত্রদের একে একে নিজের কাঁধে চড়িয়ে গর্তগাড়ি পার করত। বুঝেছ?

না, বোঝবার দরকার নেই। তুমি তাঁর কথা বলে যাও, মজা লাগে শুনতে।

আমারও লাগে, কেননা লোকটাকে বুঝতে লাগে দেরি। একদিন চীন-দার্শনিকের দোহাই দিয়ে মাস্টার আমাকে বললে, যে রাজ্যে রাজত্বটা নেই সেই রাজ্যই সকল রাজ্যের সেরা।

পুপে সগর্বে বললে, আমাদের ক্লাস সেরা ক্লাস ছিল সন্দেহ নেই।

আমি বললুম, তার কারণ, প্রমাণ সত্ত্বেও তোমার কম বুদ্ধির লক্ষণ মাস্টার লক্ষ্য করতেন না।

পুপে মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, এটাকে কি গাল বলব না ঠাট্টা।

আমি বললুম, পাশ দিয়ে যেতে যেতে তোমার চুলটা টেনে দিই, এ ঠাট্টা সেই স্নিগ্ধ জাতের। এতে ক্যাসাস ব্যালাই অর্থাৎ 'অস্ত্র যুদ্ধ অমা ময়া'র ঘোষণা নেই।

পুপে বললে, মাস্টারমশায়ের ব্যবস্থা ছিল মজার রকমের। তিনি বলতেন,

তোমাদের নিজের খবর নিজেই রাখবে ; তোমাদের খবরদারি করবার কাজ আমার নয়। প্রতিদিনের পড়ার ফল নিজেরাই রাখতুম ; মার্কা দেবার নিয়ম জানা ছিল।

তার ফল কী হল।

মার্কা বরঞ্চ কম করেই দিতুম।

কখনো কি ঠকাতে না।

বাইরের কেউ মার্কা দেবার থাকলে তাকে ঠকাবার লোভ হতে পারত। নিজেকে ঠকানো বোকামি। বিশেষত তিনি তো দেখতেন না।

তার পরে ?

তার পরে প্রত্যেক তিন মাস অন্তর নিজেরাই হিসেব ক'রে জানতুম উঠছি কি নাবছি।

তোমাদের কি সত্যযুগের হাইস্কুল, অত্যন্ত হাই ? ফাঁকি দেবার লোকই বুঝি ছিল না ?

মাস্টারমশায় ছিলেন অবিচলিত। তিনি বলতেন, সংসারে একদল লোক ফাঁকি দেবেই। কিন্তু, নিজের দায় যাদের নিজের হাতে, ওরই মধ্যে তারাই কম ফাঁকি দেয়। আমাদের শাস্তিও ছিল ঐ জাতের। বাইরে থেকে না। একদিন হাজিরি নাম-ডাক উপলক্ষ্যে প্রিয়সখার পর্সেন্টেজ বাঁচাবার জন্যে মিথ্যে কথা বলে ফেলেছিলুম ; তিনি বললেন, অশুচি হয়েছ, প্রায়শ্চিত্ত কোরো। তিনি জানতেও চাইতেন না করেছি কি না।

প্রায়শ্চিত্ত কি করেছিলে।

নিশ্চয়ই করেছিলুম।

অর্থাৎ, তোমার পাউডরের কৌটোটি ঐ প্রিয়সখীকে দান করেছিলে ?

আমি কখ্‌খনো পাউডর মাখি নে।

বলতে চাও, তোমার ঐ মুখের রঙ তোমার খাস নিজেরই ?

আর যাই হোক তোমার কাছ থেকে ধার নিই নি, মিলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে।

ছি, আমাকে নিয়ে তোমার দৃষ্টিতে যদি ভেদবুদ্ধি দেখা দেয় তা হলে তাতে দোষারোপ ঘটে। আমরা যে সবর্ণ— বর্ণভেদের জো কী। হাতের কাছে কবি থাকলে বলতেন, তোমার গায়ের রঙ ফুটে বেরিয়েছে ব্রহ্মার হাসি থেকে।

আর তোমার রঙ তাঁর ঠাট্টার হাসি থেকে।

এ'কেই বলে অন্যোন্যস্তুতি, ম্যুচুয়ল অ্যাড্‌মিরেশন। পিতামহের দুই জাতের হাসি

আছে— একটা দন্ত্য, একটা মূর্ধন্য। আমাতে লেগেছে মূর্ধন্য হাসি, ইংরেজিতে তাকে বলে উইট।

দাদামশায়, নিজের গুণগান তোমার মুখে কখনো বাধে না।

সেইটেই আমার প্রধান গুণ। আপনাকে যারা জানে আমি সেই অসামান্যের দলে।

মুখ খুলে গেছে, কিন্তু আর নয়, এবার থামো। মাস্টারমশায়ের কথা হচ্ছিল, এখন উঠে পড়ল তোমার নিজের কথা।

তাতে দোষ হয়েছে কী। বিষয়টা তো উপাদেয়, যাকে বলে ইন্টারেস্টিং।

বিষয়টা সর্বদাই রয়েছে সামনে। তাকে তো স্মরণ করবার দরকার হয় না। তাকে যে ভোলাই শক্ত।

আচ্ছা, তা হলে মাস্টারের একটা বিশেষ পরিচয় দিই তোমাকে। এটা টুকে রাখবার যোগ্য। একদিন সন্ধেবেলায় মাস্টার জনকয়েক লোককে নেমন্তন্ন করেছিল। খবরটা তার মনে আছে কি না জানবার জন্যে সকাল-সকাল গেলুম তার বাড়িতে। সেবক কানাইয়ের সঙ্গে তার যে আলোচনাটা চলছিল, বলি সে কথাটা। কানাই বললে, জগন্নাত্রীপুজোর বাজারে গলদা চিংড়ির দাম চড়ে গেছে, তাই এনেছি ডিমওয়ালা কাঁকড়া।

মাস্টার ঈষৎ চিন্তিত হয়ে বলে, কাঁকড়া কী হবে।

ও বললে, লাউ দিয়ে ঝোল, সে তোফা হবে।

আমি বললুম, মাস্টার, গল্‌দা চিংড়ির উপর তোমার লোভ ছিল ?

মাস্টার বললে, ছিল বই-কি।

তা হলে তো লোভ সম্বরণ করতে হবে।

তা কেন। লোভটা প্রস্তুত হয়েই আছে, তাকে শান্ট্ ক'রে চালিয়ে দেব কাঁকড়ার লাইনে।

দেখছি, তোমাকে বিস্তর শান্ট্ করতে হয়।

মাস্টার বললে, কাঁকড়ার ঝোল তো খেয়েছি অনেকবার, সম্পূর্ণ মন দিই নি। এবার যখন দেখলুম কানাইয়ের জিভে জল এসেছে, তখন তার সিক্ত রসনার নির্দেশে খাবার সময় মনটা ঝুঁকে পড়বে কাঁকড়ার দিকে, রসটা পাব বেশি ক'রে। কাঁকড়ার ঝোলটাকে ও যেন লাল পেন্‌সিলে আণ্ডারলাইন ক'রে দিলে; ওটাকে ভালো করে মুখস্থ করবার পক্ষে সুবিধে হল আমার।

মাস্টার জিগেস করলে, আঁটি-বাঁধা ওটা কী এনেছিস।

কানাই বললে, সজনের ডাঁটা।

মাস্টার সগর্বে আমার দিকে চেয়ে বললে, এই দেখো মজা। ও বাজারে যাবার সময় আমার মনে ছিল লাউডগা। ও বাজার থেকে ফিরে এল, আমি পেয়ে গেলুম সজনের ডাঁটা। হুকুম না করবার এই সুবিধে।

আমি বললুম, সজনের ডাঁটা না এনে ও যদি আনত চিচিঙ্গে?

মাস্টার জবাব দিলেন, তা হলে ক্ষণকালের জন্যে ভাবনা করতে হত। নাম জিনিসটার প্রভাব আছে। চিচিঙ্গে শব্দটা লোভজনক নয়। কিন্তু, কানাই যদি ওটা বিশেষ ক'রে বাছাই করে আনত, তা হলে সংস্কার কাটাবার একটা উপলক্ষ হত। জীবনে সব-প্রথমে ভেবে দেখবার সুযোগ হত 'দেখাই যাক-না'; হয়তো আবিষ্কার করতুম, ওটা মন্দ চলে না। চিচিঙ্গে পদার্থটার বিরুদ্ধে অন্ধ বিরাগ দূর হয়ে উপভোগ্যের সীমানা বেড়ে যেত। এমনি করেই কাব্যে কবিরা তো নিজের রুচিতে আমাদের রুচির প্রসার বাড়িয়ে দিচ্ছে। সৃষ্টিকে আণ্ডরলাইন করাই তাদের কাজ।

তোমার রুচির প্রসার বাড়াবার কাজে কানাইয়ের আরও এমন হাত আছে?

আছে বই-কি। ও না থাকলে পিড়িং শাকে আমি কোনোদিন মনোযোগই দিতুম না। শব্দটা আমাকে মারত ধাক্কা। সংসারে সংস্কারমুক্তিই তো অধিকারপ্রাপ্তি।

সেই মহৎ কাজে আছে তোমার কানাই।

তা মানতে হবে, ভাই। ওর ইচ্ছার যোগে আমার ইচ্ছার সংকীর্ণতা ঘুচে যায় প্রতিদিন। আমি একলা থাকলে এমনটা ঘটত না।

বুঝলুম, কিন্তু কানাইয়ের ইচ্ছার সীমানাটা—

বাড়িয়েছি বই-কি। পূর্ববঙ্গের লোক, কলাইয়ের ডালের নাম শুনতে পারত না। আজকাল হিঙ দিয়ে কলাইয়ের ডাল ও খাচ্ছে বেশ।

এমন সময়ে কানাইয়ের পুনঃপ্রবেশ। বললে, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, আজ দইটা আনি নি। কবরেজমশায় বলেন, রাত্রে দইটা বারণ।

দইয়ের দাম চড়ে গেছে বললে খিরুক্তি হয়, এইজন্যে কবরেজমশায়কে পাড়তে হল। সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললে, অল্প একটু আদার রস মিশিয়ে পাৎলা চা বানিয়ে দেব, শীতের রাত্রে উপকার দেবে।

আমি জিগেস করলেম, কী বল হে মাস্টার, আদা দিয়ে চা সবাইকে খাওয়াবে না কি।

সবাইকার কথা বলব কী করে। যারা খাবে তারা খাবে। হতে পারে উপকার। যারা খাবে না তাদের অপকার হবে না।

আমি বললুম, মাস্টার, চীন-দার্শনিকের উপদেশমতে তোমার গেরস্থালিতে মনিব নেই বুঝি ?

না।

তা হলে চাকরই বা আছে কেন।

মনিব না থাকলেই চাকর স্বতই থাকে না।

তোমার এখানে চাকরে মনিবে বেমালুম মিশিয়ে গিয়ে একটা যৌগিক পদার্থ খাড়া হয়েছে বুঝি ?

মাস্টার হেসে বললে, অক্সিজেন হাইড্রোজেনের দাহ মেজাজ ঘুচে গিয়ে দোঁহে মিলে একেবারে জল।

আমি বললুম, যদি বিয়ে করতে তারা, পাড়া ছেড়ে চীনের দর্শন দৌড় দিত। থেকেও থাকবে না, গিন্নি এমন নির্বিশেষ পদার্থ নয়। মুখের উপর ঘোমটা টেনেও তোমার সংসারে সে হত অতিশয় স্পষ্ট। তার রাজ্যে রাজত্বটা তার কটাক্ষে যেত দোলা ; সর্বদা ধাক্কা লাগাত, কখনো পিঠে, কখনো বুকে।

মাস্টার বললে, তা হলে কর্তা রিটর্ন্ টিকিট না কিনেই দৌড় মারত ভেরাগাড়ি-খায়ে, গিন্নিত্ব অন্তর্ধান করত ইস্টার্ন্ বেঙ্গল রেলের রাস্তা বেয়ে বাপের বাড়িতে।

মাস্টার মাঝে মাঝে হাসির কথা বলে, কিন্তু হাসে না।

পুপুদিদি বললে, আমাদের মাস্টারমশায়কে নিয়ে যদি গল্পের পালা বাঁধতে হয় কিরকম ক'রে বাঁধ।

তা হলে দশ লক্ষ বছর বাদ দিই।

তার মানে, আজগুবি গল্প বানাতে, অথচ আজকের দিনের বিরুদ্ধ পক্ষের সাক্ষীর শঙ্কা থাকত না।

কোনো সাহিত্যওয়ালা কখনো সাক্ষীর ভয় করে না। আসল কথা, আমার গল্পটা ফুটে উঠতে যুগান্তরের দরকার করবে। কেন, সেইটে বুঝিয়ে বলি— পৃথিবী-সৃষ্টির গোড়াকার মালমসলা ছিল পাথর লোহা প্রভৃতি মোটা মোটা ভারী ভারী জিনিস। তারই ঢালাই পেটাই চলেছিল অনেককাল। কঠোরের বে-আব্রুতা ছিল বহু যুগ ধ'রে। অবশেষে নরম মাটি পৃথিবীকে শ্যামল আস্তরণে ঢাকা দিয়ে সৃষ্টিকর্তার যেন লজ্জা

রক্ষা করলে। তখন জীবজন্তু আসরে নামল স্তূপাকার হাড়মাংসের বোঝাই নিয়ে; মোটা মোটা বর্ম প'রে তারা দুশো পাঁচশো যোন অসভ্য লেজ টেনে টেনে বেড়াতে লাগল। তারা ছিল দর্শনধারী জীব। কিন্তু সেই মাংসবাহীর দল সৃষ্টিকর্তার পছন্দসই হল না। আবার চলল বহু যুগ ধরে নিষ্ঠুর পরীক্ষা। শেষকালে এল মনোবাহী মানুষ। লেজের বাহুল্য গেল ঘুচে, হাড়মাংস হল পরিমিত, কড়া চামড়াটা নরম হয়ে এল ঢকে। না রইল শিঙ, না রইল ক্ষুর, না রইল নখের জোর, চার পা এসে ঠেকল দুটিমাত্র পায়ে। বোঝা গেল, বিধাতা তাঁর হাতিয়ার চালাচ্ছেন সৃষ্টির যুগটাকে ক্রমশ সূক্ষ্ম করে আনবার জন্যে। স্থূলে সূক্ষ্মে জড়িয়ে আছে মানুষ। মনের সঙ্গে মাংসের চলেছে ঠেলাঠেলি, মারামারি। বিধাতা পুনশ্চ মাথা নাড়ছেন, উঁহু, হল না। লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, এটাও টিঁকবে না; এ আপনিই আপনাকে নিকেশ করে দেবে আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে। যাবে কয়েক লক্ষ বছর কেটে। মাংস পড়বে ঝরে, মন উঠবে একেশ্বর হয়ে। সেই বিশুদ্ধ মনের যুগে তোমার মাস্টারমশায় বসেছেন শরীররিক্ত ক্লাসে। মনে করে দেখো, তাঁর শিক্ষা দেবার প্রণালী হচ্ছে ছাত্রদের মধ্যে নিজেকে মেলাতে থাকা মনের উপর মন বিছিয়ে, বাইরের বাধা নেই বললেই হয়।

স্থূল বুদ্ধির বাধাও নেই?

সেটা না থাকলে বুদ্ধি মাত্রই হয়ে পড়ে বেকার। ভালো-মন্দ বোকা-বুদ্ধিমানের ভেদ আছেই। চরিত্র আছে নানা রকমের। ভাবের বৈচিত্র্য আছে, ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য আছে। এখন তিনিই ভালো মাস্টার যিনি সেই অনেকের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন, শিক্ষা এখন অন্তরে অন্তরে।

দাদামশায়, ইস্কুলটা কোথায় আছে সেটা ঠিক মনে আনতে পারছি নে।

পৃথিবীতে তিনটে বাসা আছে— এক সমুদ্রতলে, আর-এক ভূতলে, আর আছে আকাশে যেখানে সূক্ষ্ম হাওয়া আর সূক্ষ্মতর আলো। এইখানটা আজ আছে খালি আগামী যুগের জন্যে।

তা হলে তোমার ক্লাস চলেছে সেই হাওয়ায় সেই আলোয়। কিন্তু, ছাত্রদের চেহারাটা কিরকম।

বুঝিয়ে বলা শক্ত, তাদের আকার নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু আকারের আধার নেই।

তা হলে বোধ হচ্ছে নানা রঙের আলোয় তারা গড়া।

সেইটেই সম্ভব। তোমাদের বিজ্ঞান-মাস্টার তো সেদিন বুঝিয়ে দিয়েছেন, বিশ্বজগতে সূক্ষ্ম আলোর কণাই বহুরূপী হয়ে স্থূল রূপের ভান করছে। সেদিন আলো আপন আদিম সূক্ষ্মরূপেই প্রকাশ পাবে। ক্লাসে তোমরা সবাই আলো করে বসবে।

সেদিন ওটিন-স্নো-ওয়ালারা একেবারে দেউলে হয়ে গেছে।

দেউলে কেন, আলো হয়ে গেছে।

দেউলে হয়ে যাওয়ার মানেই তো আলো হয়ে যাওয়া।

আমি কোন্‌ রঙের আলো হব, দাদামশায়।

সোনার রঙের।

আর তুমি?

আমি একেবারে বিশুদ্ধ রেডিয়ম।

সেদিন আলোয় আলোয় লড়াই হবে না তো? ইলেক্‌ট্রন নিয়ে হবে না কি কাড়াকাড়ি।

ভাবনা ধরিয়ে দিলে। লীগ অফ লাইট্‌স্‌এর দরকার হবে বোধ হচ্ছে। ইলেক্‌ট্রন নিয়ে টানাটানির গুজব এখনি শুনতে পাচ্ছি।

ভালোই তো দাদামশায়। বীররসের কবিতা তোমার ভাষায় উজ্জ্বল বর্ণে বর্ণিত হবে। ঐ যাঃ, ভাষা থাকবে তো?

শব্দের ভাষা নিছক ভাবের ভাষায় গিয়ে পৌঁছবে, ব্যাকরণ মুখস্থ করতে হবে না।

আচ্ছা, গান?

গান হবে রঙের সংগত। বড়ো সহজ হবে না। তান যখন ঠিকরে পড়তে থাকবে, ঝলক মারবে আকাশের দিকে দিকে। তখনকার তানসেনরা দিগন্তে অরোরা বোরিয়ালিস বানিয়ে দেবে।

আর, তোমার গদ্যকাব্য কী হবে বলো তো।

তাতে লোহার ইলেক্‌ট্রনও মিশবে, আবার সোনারও।

সেদিনকার দিদিমা পছন্দ করবে না।

আমার ভরসা আছে সেদিনকার আধুনিক নাৎনিরা মুগ্ধ হয়ে যাবে।

তা হলে সেই আলোর যুগে তোমার নাৎনি হয়েই জন্মাব। এবারকার মতো দেহ-ধারিণীর 'পরে ধৈর্য রক্ষা কোরো। এখন চললুম সিনেমায়।

কিসের পালা।

বৈদেহীর বনবাস।

১৪

পরদিন সকালবেলায় প্রাতরাশে আমার নির্দেশমত পুপেদিদি নিয়ে এল পাথরের পাত্রে ছোলাভিজে এবং গুড়। বর্তমান যুগে পুরাকালীন গৌড়ীয় খাদ্যবিধির রেনেসাঁস-প্রবর্তনে লেগেছি। দিদিমণি জিগেস করলে, চা হবে কি।

আমি বললুম, না, খেজুর-রস।

দিদি বললে, আজ তোমার মুখখানা অমন দেখছি কেন। কোনো খারাপ স্বপ্ন দেখেছ না কি।

আমি বললুম, স্বপ্নের ছায়া তো মনের উপর দিয়ে যাওয়া-আসা করছেই— স্বপ্নও মিলিয়ে যায়, ছায়ারও চিহ্ন থাকে না। আজ তোমার ছেলেমানুষির একটা কথা বারবার মনে পড়ছে, ইচ্ছে করছে বলি।

বলো-না।

সেদিন লেখা বন্ধ ক'রে বারান্দায় বসে ছিলুম। তুমি ছিলে, সুকুমারও ছিল। সন্ধে হয়ে এল, রাস্তার বাতি জ্বালিয়ে গেল, আমি বসে বসে সত্যযুগের কথা বানিয়ে বানিয়ে বলছিলুম।

বানিয়ে বলছিলে! তার মানে ওটাকে অসত্যযুগ ক'রে তুলছিলে।

ওকে অসত্য বলে না। যে রশ্মি বেগ্‌নির সীমা পেরিয়ে গেছে তাকে দেখা যায় না ব'লেই সে মিথ্যে নয়, সেও আলো। ইতিহাসের সেই বেগ্‌নি-পেরোনো আলোতেই মানুষের সত্যযুগের সৃষ্টি। তাকে প্রাগৈতিহাসিক বলব না, সে আল্‌ট্রা-ঐতিহাসিক।

আর তোমার ব্যাখ্যা করতে হবে না। কী বলছিলে বলো।

আমি তোমাদের বলছিলুম, সত্যযুগে মানুষ বই প'ড়ে শিখত না, খবর শুনে জানত না, তাদের জানা ছিল হয়ে-উঠে জানা।

কী মানে হল বুঝতে পারছি নে।

একটু মন দিয়ে শোনো বলি। বোধ হয় তোমার বিশ্বাস তুমি আমাকে জান?

দৃঢ় বিশ্বাস।

জান, কিন্তু সে জানায় সাড়ে-পনেরো আনাই বাদ পড়ে গেছে। ইচ্ছে করলেই তুমি যদি ভিতরে ভিতরে আমি হয়ে যেতে পারতে তা হলেই তোমার জানাটা সম্পূর্ণ সত্য হ'ত।

তা হলে তুমি বলতে চাও আমরা কিছুই জানি নে?

জানিই নে তো। সবাই মিলে ধরে নিয়েছি যে জানি, সেই আপোষে ধরে নেওয়ার উপরেই আমাদের কারবার।

কারবার তো ভালোই চলছে।

চলছে, কিন্তু এ সত্যযুগের চলা নয়। সেই কথাই তোমাদের বলছিলুম— সত্যযুগে মানুষ দেখার জানা জানত না, ছোঁওয়ার জানা জানত না, জানত একেবারে হওয়ার জানা।

মেয়েদের মন প্রত্যক্ষকে আঁকড়ে থাকে; ভেবেছিলেম আমার কথাটা অত্যন্ত অবাস্তব ঠেকবে পুপুর কাছে, ভালোই লাগবে না। দেখলুম একটু ঔৎসুক্য হয়েছে। বললে, বেশ মজা।

একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেই বললে, আচ্ছা, দাদামশায়, আজকাল তো সায়ান্স অনেক বুজরুগি করছে; মরা মানুষের গান শোনাচ্ছে, দূরের মানুষের চেহারা দেখাচ্ছে, আবার শুনছি সিসেকে সোনা করছে— তেমনি একদিন হয়তো এমন একটা বিদ্যুতের খেলা খেলাবে যে ইচ্ছে করলে একজন আর-একজনের মধ্যে মিলে যেতে পারবে।

অসম্ভব নয়। কিন্তু, তুমি তা হলে কী করবে। কিছুই লুকোতে পারবে না।

সর্বনাশ! সব মানুষেরই যে লুকোবার আছে অনেক।

লুকোনো আছে ব'লেই লুকোবার আছে। যদি কারও কিছুই লুকোনো না থাকত তা হলে দেখা-বিন্তি খেলার মতো সবার সব জেনেই লোকব্যবহার হ'ত।

কিন্তু, লজ্জার কথা যে অনেক আছে।

লজ্জার কথা সকলেরই প্রকাশ হলে লজ্জার ধার চলে যেত।

আচ্ছা, আমার কথা কী বলতে যাচ্ছিলে তুমি।

সেদিন আমি তোমাকে জিগেস করেছিলুম, তুমি যদি সত্যযুগে জন্মাতে তবে আপনাকে কী হয়ে দেখতে তোমার ইচ্ছে হত। তুমি ফস্ ক'রে বলে ফেললে, কাবুলি বেড়াল।

পুপে মস্ত খাপা হয়ে বলে উঠল, কখ্খনো না। তুমি বানিয়ে বলছ।

আমার সত্যযুগটা আমার বানানো হতে পারে কিন্তু তোমার মুখের কথাটা তোমারই। ওটা ফস্ করে আমি-হেন বাচালও বানাতে পারতুম না।

এর থেকে তুমি কি মনে করেছিলে আমি খুব বোকা।

এই মনে করেছিলুম যে, কাবুলি বেড়ালের উপর অত্যন্ত লোভ করেছিলে অথচ কাবুলি বেড়াল পাবার পথ তোমার ছিল না, তোমার বাবা বেড়াল জন্তুটাকে দেখতে

পারতেন না। আমার মতে সত্যযুগে বেড়াল কিনতেও হ'ত না, পেতেও হ'ত না, ইচ্ছে করলেই বেড়াল হতে পারা যেত।

মানুষ ছিলুম, বেড়াল হলুম— এতে কী সুবিধেটা হল। তার চেয়ে যে বেড়াল কেনাও ভালো, না কিনতে পারলে না পাওয়া ভালো।

ঐ দেখো, সত্যযুগের মহিমাটা মনে ধারণা করতে পারছ না। সত্যযুগের পুপে আপনার সীমানা বাড়িয়ে দিত বেড়ালের মধ্যে। সীমানা লোপ করত না। তুমি তুমিও থাকতে, বেড়ালও হতে।

তোমার এ-সব কথার কোনো মানে নেই।

সত্যযুগের ভাষায় মানে আছে। সেদিন তো তোমাদের অধ্যাপক প্রমথবাবুর কাছে শুনেছিলে, আলোকের অণুপরমাণু বৃষ্টির মতো কণাবর্ষণও বটে আবার নদীর মতো তরঙ্গধারাও বটে। আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝি, হয় এটা নয় ওটা; কিন্তু বিজ্ঞানের বুদ্ধিতে একই কালে দুটোকেই মেনে নেয়। তেমনি একই কালে তুমি পুপুও বটে, বেড়ালও বটে— এটা সত্যযুগের কথা।

দাদামশায়, যতই তোমার বয়স এগিয়ে চলছে ততই তোমার কথাগুলো অবোধ্য হয়ে উঠছে, তোমার কবিতারই মতো।

অবশেষে সম্পূর্ণ নীরব হয়ে যাব তারই পূর্বলক্ষণ।

সেদিনকার কথাটা কি ঐ কাবুলি বেড়ালের পরে আর এগোল না।

এগিয়েছিল। সুকুমার এক কোণে বসে ছিল, সে স্বপ্নে কথা বলার মতো ব'লে উঠল, আমার ইচ্ছে করে শালগাছ হয়ে দেখতে।

সুকুমারকে উপহসিত করবার সুযোগ পেলে তুমি খুশি হতে। ও শালগাছ হতে চায় শুনে তুমি তো হেসে অস্থির। ও চমকে উঠল লজ্জায়। কাজেই ও বেচারির পক্ষ নিয়ে আমি বললেম— দক্ষিণের হাওয়া দিল কোথা থেকে, গাছটার ডাল ছেয়ে গেল ফুলে, ওর মজ্জার ভিতর দিয়ে কী মায়ামন্ত্রের অদৃশ্য প্রবাহ বয়ে যায় যাতে ঐ রূপের গন্ধের ভোজবাজি চলতে থাকে। ভিতরের থেকে সেই আবেগটা জানতে ইচ্ছা করে বই-কি! গাছ না হতে পারলে বসন্তে গাছের সেই অপরিমিত রোমাঞ্চ অনুভব করব কী ক'রে।

আমার কথা শুনে সুকুমার উৎসাহিত হয়ে উঠল; বললে, আমার শোবার ঘরের জানলা থেকে যে শালগাছটা দেখা যায়, বিছানায় শুয়ে শুয়ে তার মাথাটা আমি দেখতে পাই; মনে হয়, ও স্বপ্ন দেখছে।

শালগাছ স্বপ্ন দেখছে শুনে বোধ হয় বলতে যাচ্ছিলে, কী বোকার মতো কথা। বাধা দিয়ে ব'লে উঠলুম, শালগাছের সমস্ত জীবনটাই স্বপ্ন। ও স্বপ্নে চলে এসেছে বীজের থেকে অঙ্কুরে, অঙ্কুর থেকে গাছে। পাতাগুলোই তো ওর স্বপ্নে-কওয়া কথা।

সুকুমারকে বললুম, সেদিন যখন সকালবেলায় ঘন মেঘ ক'রে বৃষ্টি হচ্ছিল আমি দেখলুম, তুমি উত্তরের বারান্দায় রেলিঙ ধ'রে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলে। কী ভাবছিলে বলো দেখি।

সুকুমার বললে, জানি নে তো কী ভাবছিলুম।

আমি বললুম, সেই না-জানা ভাবনায় ভ'রে গিয়েছিল তোমার সমস্ত মন মেঘে-ভরা আকাশের মতো। সেইরকম গাছগুলো যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, ওদের মধ্যে যেন একটা না-জানা ভাব আছে। সেই ভাবনাই বর্ষায় মেঘের ছায়ায় নিবিড় হয়, শীতের সকালের রৌদ্রে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সেই না-জানা ভাবনার ভাষায় কচি পাতায় ওদের ডালে ডালে বকুনি জাগে, গান ওঠে ফুলের মঞ্জুরিতে।

আজও মনে পড়ে সুকুমারের চোখ দুটো কিরকম এতখানি হয়ে উঠল। সে বললে, আমি যদি গাছ হতে পারতুম তা হলে সেই বকুনি সির্‌সির্‌ করে আমার সমস্ত গা বেয়ে উঠত আকাশের মেঘের দিকে।

তুমি দেখলে সুকুমার আসরটা দখল করে নিচ্ছে। ওকে নেপথ্যে সরিয়ে তুমি এলে সামনে। কথা পাড়লে, আচ্ছা, দাদামশায়, এখন যদি সত্যযুগ আসে তুমি কী হতে চাও।

তোমার বিশ্বাস ছিল, আমি ম্যাস্‌টোডন কিম্বা মেগাথেরিয়ম হতে চাইব— কেননা, জীব-ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়ের প্রাণীদের সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে এর কিছুদিন আগেই আলোচনা করেছি। তখন তরুণ পৃথিবীর হাড় ছিল কাঁচা, পাকা রকম ক'রে জমাট হয়ে ওঠে নি তার মহাদেশ, গাছপালাগুলোর চেহারা ছিল বিশ্বকর্তার প্রথম তুলির টানের। সেইদিনকার আদিম অরণ্যে সেইদিনকার অনিশ্চিত শীতগ্রীষ্মের অধিকারে এই-সব ভীমকায় জন্তুগুলোর জীবযাত্রা চলছে কিরকম করে তা স্পষ্টরূপে কল্পনা করতে পারছে না আজকের দিনের মানুষ, এই কথাটা তোমার শোনা ছিল আমার মুখে। পৃথিবীতে প্রাণের প্রথম অভিযানের সেই মহাকাব্য-যুগটাকে স্পষ্ট ক'রে জানবার ব্যাকুলতা তুমি আমার কথা থেকে বুঝতে পেরেছিলে। তাই আমি যদি হঠাৎ ব'লে উঠতুম 'সেকালের রোঁয়াওয়ালা চার-দাঁত-ওয়ালা হাতি হওয়া আমার ইচ্ছে', তা হলে তুমি খুশি হতে। তোমার কাবুলি বেড়াল হওয়ার থেকে এই ইচ্ছে বেশি দূরে পড়ত না, আমাকে তোমার দলে পেতে। হয়তো আমার মুখে

ঐ ইচ্ছেটাই ব্যক্ত হ'ত। কিন্তু, সুকুমারের কথাটা আমার মনকে টেনে নিয়েছিল অন্য দিকে।

পুপে বলে উঠল, জানি, জানি, সুকুমারদা'র সঙ্গেই তোমার মনের মিল ছিল বেশি।

আমি বললুম, তার একমাত্র কারণ, ও ছিল ছেলে, আমিও ছেলে হয়েই জন্মেছিলুম একদিন। ওর ভাবনার ছাঁচ ছিল আমারই শিশু ভাবনার ছাঁচে। তুমি সেদিন তোমার খেলার হাঁড়িকুঁড়ি নিয়ে ভাবী গৃহস্থালির যে স্বপ্নলোক বানিয়ে তুলে খুশি হতে সেটা দেখতে পেতুম একটু তফাত থেকে। তুমি তোমার খেলার খোকাকে কোলে ক'রে যখন নাচাতে, তার স্নেহের রসটা ষোলো আনা পাবার সাধ্য আমার ছিল না।

পুপু বললে, আচ্ছা, সে কথা থাক্, সেদিন তুমি কী হতে ইচ্ছে করছিলে বলো।

আমি হতে চেয়েছিলুম একখানা দৃশ্য অনেকখানি জায়গা জুড়ে। সকালবেলার প্রথম প্রহর, মাঘের শেষে হাওয়া হয়েছে উতলা, পুরোনো অশথগাছটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে ছেলেমানুষের মতো, নদীর জলে উঠেছে কলরব, উঁচুনিচু ডাঙায় ঝাপ্সা দেখাচ্ছে দলবাঁধা গাছ। সমস্তটার পিছনে খোলা আকাশ; সেই আকাশে একটা সুদূরতা, মনে হচ্ছে যেন অনেক দূরের ও-পার থেকে একটা ঘণ্টার ধ্বনি ক্ষীণতম হয়ে গেছে বাতাসে, যেন রোদ্দুরে মিশিয়ে দিয়েছে তার কথাটাকে : বেলা যায়।

তোমার মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল, একখানা গাছ হওয়ার চেয়ে নদী বন আকাশ নিয়ে একখানা সমগ্র ভূদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কল্পনা তোমার কাছে অনেক বেশি সৃষ্টিছাড়া বোধ হল।

সুকুমার বললে, গাছপালা নদী সবটার উপরে তুমি ছড়িয়ে মিলিয়ে গেছ মনে করতে আমার ভারি মজা লাগছে। আচ্ছা, সত্যযুগ কি কোনোদিন আসবে।

যতদিন না আসে ততদিন ছবি আছে, কবিতা আছে। আপনাকে ভুলে গিয়ে আর-কিছু হয়ে যাবার ঐ একটা বড়ো রাস্তা।

সুকুমার বললে, তুমি যেটা বললে ওটা কি ছবিতে এঁকেছ।

হাঁ, এঁকেছি।

আমিও একটা আঁকব।

সুকুমারের স্পর্ধার কথা শুনে তুমি বলে উঠলে, পারবে না কি তুমি আঁকতে।

আমি বললুম, ঠিক পারবে। আঁকা হয়ে গেলে ভাই, তোমারটা আমি নেব, আমারটা তোমাকে দেব।

সেদিন এই পর্যন্ত হল আমাদের আলাপ।

এইবার আমাদের সেদিনকার আসরের শেষ কথাটা ব'লে নিই। তুমি চলে গেলে তোমার পায়রাকে ধান খাওয়াতে। সুকুমার তখনো বসে বসে কী ভাবতে লাগল। আমি তাকে বললুম, তুমি কী ভাবছ বলব?

সুকুমার বললে, বলো দেখি।

তুমি ভেবে দেখছ, আরও কী হয়ে যেতে পারলে ভালো হয়— হয়তো প্রথম-মেঘ-করা আষাঢ়ের বৃষ্টি-ভেজা আকাশ, হয়তো পুজোর ছুটিতে ঘরমুখো পাল-তোলা পান্সিনৌকোখানি। এই উপলক্ষ্যে আমি তোমাকে আমার জীবনের একটা কথা বলি। তুমি জান দীরুকে আমি কত ভালোবাসতুম। হঠাৎ টেলিগ্রামে খবর পেলুম তার টাইফয়েড, সেই বিকেলেই চলে গেলুম মুন্সিগঞ্জে তাদের বাড়িতে। সাত দিন, সাত রাত কাটল। সেদিন ছিল অত্যন্ত গরম, রৌদ্র প্রখর। দূরে একটা কুকুর করুণ সুরে আর্তনাদ করে উঠছিল; শুনে মন খারাপ হয়ে যায়। বিকেলে রোদ পড়ে আসছে, পশ্চিম দিক থেকে ডুমুরগাছের ছায়া পড়েছে বারান্দার উপরে। পাড়ার গয়লানি এসে জিগেস করলে, তোমাদের খোকাবাবু কেমন আছে গা। আমি বললুম, মাথার কষ্ট, গা-জ্বালা আজ কমেছে। যারা সেবা করছিল তারা আজ কেউ কেউ ছুটি নেবার অবকাশ পেলে। দুজন ডাক্তার রুগি দেখে বেরিয়ে এসে ফিস্ ফিস্ ক'রে কী পরামর্শ করলে; বুঝলেম, আশার লক্ষণ নয়। চুপ করে বসে রইলুম; মনে হল, কী হবে শুনে। সায়াহ্নের ছায়া ঘনিয়ে এল। দেখা গেল সামনের মহানিমগাছের মাথার উপরে সন্ধ্যাতারা দেখা দিয়েছে। দূরের রাস্তায় পাট-বোঝাই গোরুর গাড়ির শব্দ আর শোনা যায় না। সমস্ত আকাশটা যেন ঝিম্‌ঝিম্ করছে। কী জানি কেন মনে মনে বলছি, পশ্চিম-আকাশ থেকে ঐ আসছে রাত্রিরূপিণী শান্তি, স্নিগ্ধ, কালো, স্তব্ধ। প্রতিদিনই তো আসে কিন্তু আজ এল বিশেষ একটি মূর্তি নিয়ে, স্পর্শ নিয়ে। চোখ বুজে সেই ধীরে-চলে-আসা রাত্রির আবির্ভাব আমার সমস্ত অঙ্গকে মনকে যেন আবৃত করে দিলে। মনে মনে বললুম, ওগো শান্তি, ওগো রাত্রি, তুমি আমার দিদি, আমার অনাদি কালের দিদি। দিন-অবসানের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে টেনে নাও তোমার বুকের কাছে আমার দীরুভাইকে; তার সকল জ্বালা যাক জুড়িয়ে একেবারে।— দুই পহর পেরিয়ে গেল; একটা কান্নার ধ্বনি উঠল রোগীর শিয়রের কাছ থেকে; নিস্তব্ধ

রাস্তা বেয়ে গেল চলে ডাক্তারের গাড়ি তার ঘরে ফিরে। সেদিন আমার সমস্ত-মন-ভরা একটি রাত্রির রূপ দেখেছি; আমি তাতে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলুম, পৃথিবী যেমন তার স্বাতন্ত্র্য মিলিয়ে দেয় নিশীথের ধ্যানাবরণে।

কী জানি সুকুমারের কী মনে হল; সে অধীর হয়ে বলে উঠল, আমাকে কিন্তু তোমার ঐ দিদি অন্ধকারের ভিতর দিয়ে অমন চুপিচুপি নিয়ে যাবে না। পুজোর ছুটির দিনে যেদিন সকালে দশটা বাজবে, কাউকে ইস্কুলে যেতে হবে না, ছেলেরা সবাই যেদিন গেছে রথতলার মাঠে ব্যাট্‌বল খেলতে, সেইদিন আমি খেলার মতো করেই হঠাৎ মিলিয়ে যাব আকাশে ছুটির দিনের রোদ্‌দুরে।

শুনে আমি চুপ করে রইলুম; কিছু বললুম না।

পুপেদিদি বললে, কাল থেকে সুকুমারদা'র কথা তুমি প্রায়ই বলছ। তার মধ্যে আমার উপরে একটুখানি খোঁচা থাকে। তুমি কি মনে কর তোমার ভালোবাসার অংশ নিয়ে সুকুমারদা'র সঙ্গে আমার ছেলেবেলাকার যে ঝগড়া ছিল সেটা এখনও আছে।

হয়তো একটুখানি আছে বা। সেইটেকে একেবারে ক্ষইয়ে দেব বলেই বারবার তার কথা তুলি। আরও একটুখানি কারণ আছে।

কী কারণ বলোই-না।

কিছুদিন আগে সুকুমারের বাবা ডাক্তার নিতাই এসেছিলেন আমার কাছে বিদায় নিতে।

কেন, বিদায় নিতে কেন।

তোমাকে বলব মনে করেছিলুম, বলা হয় নি। আজ বলি। নিতাই চাইলে সুকুমার আইন পড়ে, সুকুমার চাইলে সে ছবি আঁকা শেখে নন্দলালবাবুর কাছে। নিতাই বললে, ছবি আঁকা বিদ্যেয় আঙুল চলে, পেট চলে না।

সুকুমার বললে, আমার ছবির খিদে যত পেটের খিদে তত বেশি নয়।

নিতাই কিছু কড়া করে বললে, সে কথাটা তোমার প্রমাণ ক'রে দেবার দরকার হয় নি, পেট সহজেই চলে যাচ্ছে।

কথাটা বিশ্রী লাগল তার মনে, কিন্তু হেসে বললে, কথাটা সত্যি— এর প্রমাণ দেওয়া উচিত।

বাবা ভাবলে, এইবার ছেলে আইন পড়তে বসবে। সুকুমারের বরিশালের মাতামহ খেপা গোছের মানুষ ; সুকুমারের স্বভাবটা তাঁরই ছাঁচের, চেহারারও সাদৃশ্য আছে। দুজনের 'পরে দুজনের ভালোবাসা পরম বন্ধুর মতো। পরামর্শ হল দুজনে মিলে ; সুকুমার টাকা পেল কিছু, কখন চলে গেল বিলেতে কেউ জানে না। বাবাকে চিঠি লিখে গেল, আপনি চান না আমি ছবি আঁকা শিখি, শিখব না। আপনি চান অর্থকরী বিদ্যা আয়ত্ত করব, তাই করতে চললুম। যখন সমাপ্ত হবে প্রণাম করতে আসব, আশীর্বাদ করবেন।

কোন্ বিদ্যে শিখতে গেল কাউকে বলে নি। একটা ডায়ারি পাওয়া গেল তার ডেস্কে। তার থেকে বোঝা গেল, সে য়ুরোপে গেছে উড়ো জাহাজের মাঝিগিরি শিখতে। তার শেষ দিকটা কপি করে এনেছি। ও লিখছে—

মনে আছে, একদিন আমার ছত্রপতি পক্ষীরাজে চড়ে পুপুদিদিকে চন্দ্রলোক থেকে উদ্ধার করতে যাত্রা করেছিলুম আমাদের ছাদের এক ধার থেকে আর-এক ধারে। এবার চলেছি কলের পক্ষীরাজকে বাগ মানাতে। য়ুরোপে চন্দ্রলোকে যাবার আয়োজন চলেছে। যদি সুবিধা পাই যাত্রীর দলে আমিও নাম লেখাব। আপাতত পৃথিবীর আকাশ-প্রদক্ষিণে হাত পাকিয়ে নিতে চাই। একদিন আমি তার দাদামশায়ের দেখাদেখি যে ছবি এঁকেছিলুম, দেখে পুপুদিদি হেসেছিল। সেই দিন থেকে দশ বছর ধরে ছবি আঁকা অভ্যাস করেছি, কাউকে দেখাই নি। এখনকার আঁকা দুখানা ছবি রেখে গেলুম পুপের দাদামশায়ের জন্যে। একটা ছবি জল-স্থল-আকাশের একতান সংগত নিয়ে, আর-একটা আমার বরিশালের দাদামশায়ের। পুপের দাদামশায় ছবি দুটো দেখিয়ে পুপেদিদির সেদিনকার হাসি যদি ফিরিয়ে নিতে পারেন তো ভালোই, নইলে যেন ছিঁড়ে ফেলেন। আমার এবারকার যাত্রায় চন্দ্রলোকের মাঝপথেই পক্ষীরাজের পাখা ভাঙা অসম্ভব নয়। যদি ভাঙে তবে এক নিমেষে সত্যলোকে পৌঁছব, সূর্য-প্রদক্ষিণের পথে একেবারে মিলে যাব পৃথিবীর সঙ্গে। যদি বেঁচে থাকি, আকাশের খেয়া-পারাপারে যদি নৈপুণ্য ঘটে, তা হলে একদিন পুপুদিদিকে নিয়ে শূন্যপথে পাড়ি দিয়ে আসব, মনে এই ইচ্ছে রইল। সত্যযুগে বোধ হয় ইচ্ছে আর ঘটনা একই ছিল। চেষ্টা করব ধ্যানযোগে ইচ্ছেকেই ঘটনা ব'লে ধরে নিতে। ছেলেবেলা থেকে অকারণে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকাই আমার অভ্যাস। ঐ আকাশটা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ যুগের কোটি কোটি ইচ্ছে দিয়ে পূর্ণ। এই বিলীয়মান ইচ্ছেগুলো বিশ্বসৃষ্টির কোন্ কাজে লাগে কী জানি। বেড়াক উড়ে আমার দীর্ঘনিশ্বাসে উৎসারিত ইচ্ছেগুলো সেই আকাশেই যে আকাশে আজ আমি উড়তে চলেছি।

পুপুদিদি ব্যাকুল হয়ে উঠে জিগেস করলে, সুকুমারদা'র এখনকার খবর কী।

আমি বললুম, সেইটেই পাওয়া যাচ্ছে না বলেই তার বাবা বিলেতে সন্ধান করতে চলেছেন।

বিবর্ণ হয়ে গেল দিদির মুখ। আস্তে আস্তে উঠে ঘরে দরজা বন্ধ করে দিলে।

আমি জানি, সুকুমারের আঁকা সেই ছেলেমানুষি পুপুদিদি আপন ডেস্কে লুকিয়ে রেখেছে।

আমি চশমাটা মুছে ফেলে চলে গেলুম সুকুমারদের বাড়ির ছাদে। সেই ভাঙা ছাতাটা সেখানে নেই, নেই সেই আতসবাজির আধপোড়া কাঠি।

গল্পসল্প

রবীন্দ্রনাথ ও দৌহিত্রী নন্দিতা

নন্দিতাকে

শেষ পারানির খেয়ায় তুমি
দিনশেষের নেয়ে
অনেক জানার থেকে এলে
নূতন-জানা মেয়ে।
ফেরাবে মুখ যাবে যখন
ঘাটের পারে আনি,
হয়তো হাতে দিয়ে যাবে
রাতের প্রদীপখানি।

১২ মার্চ ১৯৪১

আমারে পড়েছে আজ ডাক,
কথা কিছু বলতেই হবে।
বিশ্রাম করা পড়ে থাক্,
পার যদি মন দাও তবে।
ফিস্‌ফিস্ কর যদি ব'সে
খস্‌খস্ মেজেতে পা ঘ'ষে—
অভ্যাস হয়ে গেছে এ ব্যাঘাত যত,
যেন কিছু হয় নাই থাকি এইমতো।
গম্ভীর হয়ে করি প্রফেটের ভান ;
শুনে যে ঘুমিয়ে পড়ে সে বুদ্ধিমান।

আমাদের কাল থেকে ভাই,
এ কালটা আছে বহু দূরে—
মোটা মোটা কথাগুলো তাই
ব'লে থাকি খুব মোটা সুরে
পিছনেতে লাগে নাকো কেউ
বৃদ্ধের প্রতি সম্মানে,
মারতে আসে না ছুটে কেউ
কথা যদি নাও লয় কানে।
বিধাতা পরিয়ে দিল আজ
নারদমুনির এই সাজ।
তাই তো নিয়েছি কাজ উপদেষ্টার ;
এ কাজটা সবচেয়ে কম চেষ্টার।

তবে শোনো— মন্দ সে মন্দই,
হোক-না সে গুপিনাথ, হোক-না সে নন্দই।
আর শোনো— ভালো যে সে ভালো,
চোখ তার কটা হোক, হোক বা সে কালো।
অল্প যা বললেম দেখো তাই ভেবে,
পাছে ভুলে যাও তাই নোট লিখে নেবে।
যদি বল, পুরাতন এই কথাগুলো—
আমিও যে পুরাতন সেটা নাহি ভুলো।

৮ মার্চ ১৯৪০

[illegible]

২৬।২০

গল্পসল্প

বিজ্ঞানী

দাদামশায়, নীলমণিবাবুকে তোমার এত কেন ভালো লাগে আমি তো বুঝতে পারি নে।

এই প্রশ্নটা পৃথিবীর সবচেয়ে শক্ত প্রশ্ন, এর ঠিক উত্তর কজন লোকে দিতে পারে।

তোমার হেঁয়ালি রাখো। অমন এলোমেলো আলুথালু অগোছালো লোককে মেয়েরা দেখতে পারে না।

ওটা তো হল সার্টিফিকেট, অর্থাৎ লোকটা খাঁটি পুরুষমানুষ।

জান না তুমি, উনি কথায় কথায় কী রকম হুলুস্থুল বাধিয়ে তোলেন। হাতের কাছে যেটা আছে সেটা ওঁর হাতেই ঠেকে না। সেটা উনি খুঁজে বেড়ান পাড়ায় পাড়ায়।

ভক্তি হচ্ছে তো লোকটার উপরে।

কেন শুনি।

হাতের কাছের জিনিসটাই যে সবচেয়ে দূরের সে কজন লোক জানে, অথচ নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে।

একটা দৃষ্টান্ত দেখাও দেখি।

যেমন তুমি।

আমাকে তুমি খুঁজে পাও নি বুঝি?

খুঁজে পেলে যে রস মারা যেত, যত খুঁজছি তত অবাক হচ্ছি।

আবার তোমার হেঁয়ালি।

উপায় নেই। দিদি, আমার কাছে আজও তুমি সহজ নও, নিত্যি নূতন।

কুসমি দাদামশায়ের গলা জড়িয়ে বললে, দাদামশায় এটা কিন্তু শোনাচ্ছে ভালো। কিন্তু, ও কথা থাক্। নীলুবাবুর বাড়িতে কাল কী রকম হুলুস্থুল বেধেছিল সে খবরটা বিধুমামার কাছে শোনো-না।

কী গো মামা, কী হয়েছিল শুনি।

অদ্ভুত— বিধুমামা বললেন, পাড়ায় রব উঠল নীলুবাবুর কলমটা পাওয়া যাচ্ছে না; খোঁজ পড়ে গেল মশারির চালে পর্যন্ত। ডেকে পাঠালে পাড়ার মাধুবাবুকে।

বললে, ওহে মাধু, আমার কলমটা ?

মাধুবাবু বললেন, জানলে খবর দিতুম।

ধোবাকে ডাক পড়ল, ডাক পড়ল হারু নাপিতকে। বাড়িসুদ্ধ সবাই যখন হাল ছেড়ে দিয়েছে তখন তার ভাগ্নে এসে বললে, কলম যে তোমার কানেই আছে গোঁজা।

যখন কোনো সন্দেহ রইল না তখন ভাগ্নের গালে এক চড় মেরে বললে, বোকা কোথাকার, যে কলমটা পাওয়া যাচ্ছে না সেটাই খুঁজছি।

রান্নাঘর থেকে স্ত্রী এল বেরিয়ে; বললে, বাড়ি মাথায় করেছ যে।

নীলু বললে, যে কলমটা চাই ঠিক সেই কলমটা খুঁজে পাচ্ছি না।

বউদি বললে, যেটা পেয়েছ সেই দিয়েই কাজ চালিয়ে নেও, যেটা পাও নি সেটা কোথাও পাবে না।

নীলু বললে, অন্তত সেটা পাওয়া যেতে পারে কুণ্ডুদের দোকানে।

বউদি বললে, না গো, দোকানে সে মাল মেলে না।

নীলু বললে, তা হলে সেটা চুরি গিয়েছে।

তোমার সব জিনিসই তো চুরি গিয়েছে, যখন চোখে পাও না দেখতে। এখন চুপচাপ ক'রে এই কলম নিয়েই লেখো, আমাকেও কাজ করতে দাও। পাড়াসুদ্ধ অস্থির করে তুলেছ।

সামান্য একটা কলম পাব না কেন শুনি।

বিনি পয়সায় মেলে না ব'লে।

দেব টাকা— ওরে ভুতো।

আজ্ঞে—

টাকার থলিটা যে খুঁজে পাচ্ছি না।

ভুতো বললে, সেটা যে ছিল আপনার জামার পকেটে।

তাই নাকি।

পকেট খুঁজে দেখলে থলি আছে, থলিতে টাকা নেই। টাকা কোথায় গেল।

খুঁজতে বেরোল টাকা। ডেকে পাঠালে ধোবাকে।

আমার পকেটের থলি থেকে টাকা গেল কোথায়।

ধোবা বললে, আমি কী জানি। ও জামা আমি কাচি নি।

ডাকল ওসমান দর্জিকে।

আমার থলি থেকে টাকা গেল কোথায়।

ওসমান রেগে উঠে বললে, আছে আপনার লোহার সিন্দুকে।

জামাইবাড়ি থেকে স্ত্রী ফিরে এসে বললে, হয়েছে কী।

নীলমণি বললে, বাড়িতে ডাকাত ঢুকেছি। পকেট থেকে টাকা নিয়ে গেছে।

স্ত্রী বললে, হায় রে কপাল— সেদিন যে বাড়িওয়ালাকে বাড়িভাড়া শোধ করে দিলে ৩৫৲ টাকা।

তাই নাকি। বাড়িওয়ালা যে বাড়ি ছাড়বার জন্য আমাকে নোটিশ পাঠিয়েছিল।

তুমি ভাড়া শোধ করে দিয়েছিলে তার পরেই।

সে কী কথা। আমি যে বাদুড়বাগানে নিমচাঁদ হালদারের কাছে গিয়ে তার বাড়ি ভাড়া নিয়েছি।

স্ত্রী বললে, বাদুড়বাগান, সে আবার কোন্ চুলোয়।

নীলমণি বললে, রোসো, ভেবে দেখি। সে যে কোন্ গলিতে কোন্ নম্বরে তা তো মনে পড়ছে না। কিন্তু লোকটির সঙ্গে লেখাপড়া হয়ে গেছে— দেড় বছরের জন্য ভাড়া নিতে হবে।

স্ত্রী বললে, বেশ করেছ, এখন দুটো বাড়ির ভাড়া সামলাবে কে।

নীলমণি বললে, সেটা তো ভাবনার কথা নয়। আমি ভাবছি, কোন্ নম্বর, কোন্ গলি। আমার নোট্‌বুকে বাদুড়বাগানের বাসা লেখা আছে। কিন্তু, মনে পড়ছে না, গলিটার নম্বর লেখা আছে কি না।

তা, তোমার নোটবইটা বের করো-না।

মুশকিল হয়েছে যে, তিন দিন ধরে নোটবইটা খুঁজে পাচ্ছি না।

ভাগ্নে বললে, মামা, মনে নেই? সেটা যে তুমি দিদিকে দিয়েছিলে স্কুলের কপি লিখতে।

তোর দিদি কোথায় গেল।

তিনি তো গেছেন এলাহাবাদে মেসোমশায়ের বাড়িতে।

মুশকিলে ফেললি দেখছি। এখন কোথায় খুঁজে পাই, কোন্ গলি, কোন্ নম্বর।

এমন সময়ে এসে পড়ল নিমচাঁদ হালদারের কেরানি। সে বললে, বাদুড়বাগানের বাড়ির ভাড়া চাইতে এসেছি।

কোন্ বাড়ি।

সেই যে ১৩ নম্বর শিবু সমাদ্দারের গলি।

বাঁচা গেল, বাঁচা গেল। শুনছ, গিন্নি? ১৩ নম্বর শিবু সমাদ্দারের গলি। আর ভাবনা নেই।

শুনে আমার মাথামুণ্ডু হবে কী।

একটা ঠিকানা পাওয়া গেল।

সে তো পাওয়া গেল। এখন ছুটো বাড়ির ভাড়া সামলাবে কেমন করে।

সে কথা পরে হবে। কিন্তু, বাড়ির নম্বর ১৩, গলির নাম শিবু সমাদ্দারের গলি।

কেরানির হাত ধরে বললে, ভায়া, বাঁচালে আমাকে। তোমার নাম কী বলো, আমি নোটবইয়ে লিখে রাখি।

পকেট চাপড়ে বললে, ঐ যা। নোটবই আছে এলাহাবাদে। মুখস্থ করে রাখব— ১৩ নম্বর, শিবু সমাদ্দারের গলি।

কুসমি বললে, এই কলম হারানো ব্যাপারটা তো সামান্য কথা। যেদিন ওঁর একপাটি চটিজুতো পাওয়া যাচ্ছিল না, সেদিন নীলমণিবাবুর ঘরে কী ধুন্ধুমারই বেধে গিয়েছিল। ওঁর স্ত্রী পণ করলেন, তিনি বাপের বাড়ি চলে যাবেন। চাকর-বাকররা একজোট হয়ে বললে, যদি একপাটি চটিজুতো নিয়ে তাদের সন্দেহ করা হয় তবে তারা কাজে ইস্তফা দেবে— তার উপরে সে চটিতে তিন তালি দেওয়া।

আমি বললুম, খবরটা আমারও কানে এসেছিল; দেখলেম ব্যাপারটা গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে। গেলুম নীলুর বাড়িতে। বললুম, ভায়া, তোমার চটি হারিয়েছে?

সে বললে, দাদা, হারায় নি, চুরি গিয়েছে, আমি তার প্রমাণ দিতে পারি।

প্রমাণের কথা তুলতেই আমি ভয় পেয়ে গেলুম। লোকটা বৈজ্ঞানিক; একটা ছুটো তিনটে ক'রে যখন প্রমাণ বের করতে থাকবে আমার নাওয়া-খাওয়া যাবে ঘুচে। আমাকে বলতে হল, নিশ্চয় চুরি গিয়েছে। কিন্তু এমন আশ্চর্য চোরের আড্ডা কোথায় যে একপাটি চটি চুরি করে বেড়ায়, আমার জানতে ইচ্ছে করে।

নীলু বললে, ওইটেই হচ্ছে তর্কের বিষয়। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, চামড়ার বাজার চড়ে গিয়েছে।

আমি দেখলুম, এর উপরে আর কথা চলবে না। বললুম, নীলুভাই, তুমি আসল কথাটি ধরতে পেরেছ। আজকালকার দিনে সবই বাজার নিয়ে। তাই আমি দেখেছি, মল্লিকদের দেউড়িতে পাঁচ-সাত দিন অন্তর মুচি আসে দরোয়ানজির নাগরা

জুতোয় সুকতলা বসাবার ভান ক'রে। তার দৃষ্টি রাস্তার লোকদের পায়ের দিকে।

তখনকার মতো তাকে আমি ঠাণ্ডা করেছিলুম। তার পরে সেই চটি বেরোল বিছানার নীচে থেকে। নীলুর পেয়ারের কুকুর সেটা নিয়ে আনন্দে ছেঁড়াছেঁড়ি করেছে। নীলুর সবচেয়ে দুঃখ হল এই চটির সন্ধান পেয়ে, তার প্রমাণ গেল মারা।

কুসমি বললে, আচ্ছা, দাদামশায়, মানুষ এতবড়ো বোকা হয় কী ক'রে।

আমি বললুম, অমন কথা বোলো না দিদি, অঙ্কশাস্ত্রে ও পণ্ডিত। অঙ্ক ক'ষে ক'ষে ওর বুদ্ধি এত সূক্ষ্ম হয়েছে যে, সাধারণ লোকের চোখে পড়ে না।

কুসমি নাক তুলে বললে, ওঁর অঙ্ক নিয়ে কী করছেন উনি।

আমি বললুম, আবিষ্কার। চটি কেন হারায় সেটা উনি সব সময়ে খুঁজে পান না, কিন্তু চাঁদের গ্রহণ লাগায় সিকি সেকেণ্ড্ দেরি কেন হয়, এ তাঁর অঙ্কের ডগায় ধরা পড়বেই। আজকাল তিনি প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছেন যে, জগতে গ্রহ তারা কোনো জিনিসই ঘুরছে না, তারা কেবলই লাফাচ্ছে। এ জগতে কোটি কোটি উচ্চিংড়ে ছাড়া পেয়েছে। এর অকাট্য প্রমাণ রয়েছে ওর খাতায়। আমি আর কথা কই নে, পাছে সেগুলো বের করতে থাকেন।

কুসমি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললে, ওঁর কি সবই অনাসৃষ্টি। খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে উচ্চিংড়ের লাফ মেপে মেপে অঙ্ক কষছেন! এ না হলে ওঁর এমন দশা হবে কেন।

আমি বললুম, ওর ঘরকন্না ঘুরতে ঘুরতে চলবে না, তিড়িংবিড়িং করে লাফাতে লাফাতে চলবে।

কুসমি বললে, এতক্ষণে বুঝলুম, এ লোকটার কলমই বা হারায় কেন, একপাটি চটিই বা পাওয়া যায় না কেন, আর তুমিই বা কেন ওঁকে এত ভালোবাস। যত পাগলের উপরে তোমার ভালোবাসা, আর তারাই তোমার চার দিকে এসে জোটে।

দেখো দিদি, সবশেষে তোমাকে একটা কথা বলে রাখি। তুমি ভাবছ, নীলু লক্ষ্মীছাড়াকে নিয়ে তোমার বউদি রেগেই আছেন। গোপনে তোমাকে জানাচ্ছি—একেবারে তার উল্টো। ওর এই এলোমেলো আলুথালু ভাব দেখেই তিনি মুগ্ধ। আমারও সেই দশা।

*

* *

পাঁচটা না বাজতেই ভুলুরাম শর্মা সে
টেরিটিবাজারে গেল মনিবের ফর্মাশে।
মরেছে অতুল মামা, আজি তারি শ্রাদ্ধের
জোগাড় করতে হবে নানাবিধ খাদ্যের।
বাবু বলে, ভুলো না হে, আরো চাই দর্মা।
ভোলা কি সহজ কথা, বলে ভুলু শর্মা।
কাঁক্‌রোল কিনে বসে কাঁচকলা কিনতে।
শাঁকআলু কচু কিনা পারে না সে চিনতে।
বকুনি খেয়েছে যেই মাছওলা মিন্‌সের,
তাড়াতাড়ি কিনে বসে কামরাঙা তিন সের।
বাবু বলে, কামরাঙা এতগুলো হবে কী।
ভুলু বলে, কানে আমি শুনি নাই তবে কি।
দেখলেম কিনছে যে ও পাড়ার সরকার,
বুঝলেম নিশ্চয় আছে এর দরকার।
কানে গুঁজে নিয়ে তার হিসাবের লেখনী
বাবু বলে, ফিরে দিয়ে এসো তুমি এখনি।
মনিবের হুকুমটা শুনল সে হাঁ ক'রে,
ফিরে দিতে চ'লে গেল কিছু দেরি না ক'রে।
বললে সে, দোকানিকে যা করেছি জব্দ—
ফলগুলো ফিরে নিতে করে নি টুঁ শব্দ।
বাবু কয় 'টাকা কই' টান দিয়ে তামাকে।
ভুলু বলে, সে কথাটা বল নি তো আমাকে।
এসেছি উজাড় ক'রে বাজারের ঝুড়িটা—
দোকানির মাসি ছিল, হেসে খুন বুড়িটা।

রাজার বাড়ি

কুসমি জিগেস করলে, দাদামশায়, ইরুমাসির বোধ হয় খুব বুদ্ধি ছিল।

ছিল বই-কি, তোর চেয়ে বেশি ছিল।

থমকে গেল কুসমি। অল্প একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, ওঃ, তাই বুঝি তোমাকে এত ক'রে বশ করেছিলেন ?

তুই যে উল্টো কথা বললি, বুদ্ধি দিয়ে কেউ কাউকে বশ করে ?

তবে ?

করে অবুদ্ধি দিয়ে। সকলেরই মধ্যে এক জায়গায় বাসা ক'রে থাকে একটা বোকা, সেইখানে ভালো ক'রে বোকামি চালাতে পারলে মানুষকে বশ করা সহজ হয়। তাই তো ভালোবাসাকে বলে মন ভোলানো।

কেমন ক'রে করতে হয় বলো-না।

কিচ্ছু জানি নে, কী যে হয় সেই কথাই জানি, তাই তো বলতে যাচ্ছিলুম।

আচ্ছা, বলো।

আমার একটা কাঁচামি আছে, আমি সব-তাতেই অবাক হয়ে যাই ; ইরু ঐখানেই পেয়ে বসেছিল। সে আমাকে কথায় কথায় কেবল তাক লাগিয়ে দিত।

কিন্তু, ইরুমাসি তো তোমার চেয়ে ছোটো ছিলেন।

অন্তত বছর-খানেক ছোটো। কিন্তু আমি তার বয়সের নাগাল পেতুম না ; এমন করে আমাকে চালাতো, যেন আমার দুধে-দাঁত ওঠে নি। তার কাছে আমি হাঁ করেই থাকতুম।

ভারি মজা।

মজা বই-কি। তার কোনো-এক সাতমহল রাজবাড়ি নিয়ে সে আমাকে ছট্‌ফটিয়ে তুলেছিল। কোনো ঠিকানা পাই নি। একমাত্র সেই জানত রাজার বাড়ির সন্ধান। আমি পড়তুম থার্ড্ নম্বর রীডার ; মাস্টার মশায়কে জিগ্‌গেস করেছি, মাস্টার মশায় হেসে আমার কান ধ'রে টেনে দিয়েছেন।

জিগ্‌গেস করেছি ইরুকে, রাজবাড়িটা কোথায় বলো-না।

সে চোখ দুটো এতখানি ক'রে বলত, এই বাড়িতেই।

আমি তার মুখের দিকে চেয়ে থাকতুম হাঁ ক'রে; বলতুম, এই বাড়িতেই!— কোন্‌খানে আমাকে দেখিয়ে দাও-না।

সে বলত, মন্তর না জানলে দেখবে কী করে।

আমি বলতুম, মন্তর আমাকে ব'লে দাও-না। আমি তোমাকে আমার কাঁচা-আম-কাটা ঝিনুকটা দেব।

সে বলত, মন্তর বলে দিতে মানা আছে।

আমি জিগ্‌গেস করতুম, ব'লে দিলে কী হয়।

সে কেবল বলত, ও বাবা!

কী যে হয় জানাই হল না।— তার ভঙ্গী দেখে গা শিউরে উঠত। ঠিক করেছিলুম, একদিন যখন ইরু রাজবাড়িতে যাবে আমি যাব লুকিয়ে লুকিয়ে তার পিছনে পিছনে। কিন্তু সে যেত রাজবাড়িতে আমি যখন যেতুম ইস্কুলে। একদিন জিগ্‌গেস করেছিলুম, অন্য সময়ে গেলে কী হয়। আবার সেই 'ও বাবা'। পীড়াপীড়ি করতে সাহসে কুলোত না।

আমাকে তাক লাগিয়ে দিয়ে নিজেকে ইরু খুব একটা-কিছু মনে করত। হয়তো একদিন ইস্কুল থেকে আসতেই সে ব'লে উঠেছে, উঃ, সে কী পেল্লায় কাণ্ড।

ব্যস্ত হয়ে জিগেস করেছি, কী কাণ্ড।

সে বলেছে, বলব না।

ভালোই করত— কানে শুনতুম কী একটা কাণ্ড, মনে বরাবর রয়ে যেত পেল্লায় কাণ্ড।

ইরু গিয়েছে হন্তদন্তর মাঠে, যখন আমি ঘুমোতুম। সেখানে পক্ষীরাজ ঘোড়া চ'রে বেড়ায়, মানুষকে কাছে পেলেই সে একেবারে উড়িয়ে নিয়ে যায় মেঘের মধ্যে।

আমি হাততালি দিয়ে ব'লে উঠতুম, সে তো বেশ মজা।

সে বলত, মজা বই-কি! ও বাবা!

কী বিপদ ঘটতে পারত শোনা হয় নি, চুপ করে গেছি মুখের ভঙ্গী দেখে। ইরু দেখেছে পরীদের ঘরকন্না— সে বেশি দূরে নয়। আমাদের পুকুরের পুব পাড়িতে যে চীনেবট আছে তারই মোটা মোটা শিকড়গুলোর অন্ধকার ফাঁকে ফাঁকে। তাদের ফুল তুলে দিয়ে সে বশ করেছিল। তারা ফুলের মধু ছাড়া আর কিছু খায় না। ইরুর পরী-বাড়ি যাবার একমাত্র সময় ছিল দক্ষিণের বারান্দায় যখন নীলকমল মাস্টারের কাছে আমাদের পড়া করতে বসতে হত।

ইরুকে জিগ্‌গেস করতুম, অন্য সময়ে গেলে কী হয়।

ইরু বলত, পরীরা প্রজাপতি হয়ে উড়ে যায়।

আরও অনেক কিছু ছিল তার অবাক্-করা ঝুলিতে। কিন্তু, সবচেয়ে চমক লাগাতো সেই না-দেখা রাজবাড়িটা। সে যে একেবারে আমাদের বাড়িতেই, হয়তো আমার শোবার ঘরের পাশেই। কিন্তু, মন্তর জানি নে যে। ছুটির দিনে দুপুর বেলায় ইরুর সঙ্গে গেছি আমতলায়, কাঁচা আম পেড়ে দিয়েছি, দিয়েছি তাকে আমার বহুমূল্য ঘষা ঝিনুক। সে খোসা ছাড়িয়ে শুল্‌পো শাক দিয়ে বসে বসে খেয়েছে কাঁচা আম, কিন্তু মন্তরের কথা পাড়লেই বলে উঠেছে, ও বাবা!

তার পরে মন্তর গেল কোথায়, ইরু গেল শ্বশুরবাড়িতে, আমারও রাজবাড়ি খোঁজ করবার বয়স গেল পেরিয়ে— ঐ বাড়িটা রয়ে গেল গর-ঠিকানা। দূরের রাজবাড়ি অনেক দেখেছি, কিন্তু ঘরের কাছের রাজবাড়ি— ও বাবা!

*

* *

খেলনা খোকার হারিয়ে গেছে, মুখটা শুকোনো।
মা বলে, দেখ্, ঐ আকাশে আছে লুকোনো।
খোকা শুধোয়, ঘরের থেকে গেল কী ক'রে।
মা বলে যে, ঐ তো মেঘের থলিটা ভ'রে
নিয়ে গেছে ইন্দ্রলোকের শাসন-ছেঁড়া ছেলে।
খোকা বলে, কখন এল, কখন খবর পেলে।
মা বললে, ওরা এল যখন সবাই মিলি
চৌধুরিদের আমবাগানে লুকিয়ে গিয়েছিলি,
যখন ওদের ফলগুলো সব করলি বেবাক নষ্ট।
মেঘলা দিনে আলো তখন ছিল নাকো পষ্ট—
গাছের ছায়ার চাদর দিয়ে এসেছে মুখ ঢেকে,
কেউ আমরা জানি নে তো কজন তারা কে কে।
কুকুরটাও ঘুমোচ্ছিল লেজেতে মুখ গুঁজে,
সেই সুযোগে চুপিচুপি গিয়েছে ঘর খুঁজে।
আমরা ভাবি, বাতাস বুঝি লাগল বাঁশের ডালে,
কাঠবেড়ালি ছুটছে বুঝি আটচালাটার চালে।

তখন দিঘির বাঁধ ছাপিয়ে ছুটছে মাঠে জল,
মাছ ধরতে হো হো রবে জুটছে মেয়ের দল।
তালের আগা ঝড়ের তাড়ায় শূন্যে মাথা কোটে,
মেঘের ডাকে জানলাগুলো খড়্‌খড়িয়ে ওঠে।
ভেবেছিলুম, শান্ত হয়ে পড়ছ ক্লাসে তুমি,
জানি নে তো কখন এমন শিখেছ দুষ্টুমি।
খোকা বলে, ঐ যে তোমার ইন্দ্রলোকের ছেলে—
তাদের কেন এমনতরো দুষ্টুমিতে পেলে।
ওরা যখন নেমে আসে আমবাগানের 'পরে—
ডাল ভাঙে আর ফল ছেঁড়ে আর কী কাণ্ডটাই করে।
আসল কথা, বাদল যেদিন বনে লাগায় দোল,
ডালে-পালায় লতায়-পাতায় বাধায় গণ্ডগোল—
সেদিন ওরা পড়াশুনোয় মন দিতে কি পারে,
সেদিন ছুটির মাতন লাগায় অজয়নদীর ধারে।
তার পরে সব শান্ত হলে ফেরে আপন দেশে,
মা তাহাদের বকুনি দেয়, গল্প শোনায় শেষে।

বড়ো খবর

কুসমি বললে, তুমি যে বললে এখনকার কালের বড়ো বড়ো সব খবর তুমি আমাকে শোনাবে, নইলে আমার শিক্ষা হবে কী রকম ক'রে দাদামশায়।

দাদামশায় বললে, বড়ো খবরের ঝুলি বয়ে বেড়াবে কে বলো, তার মধ্যে যে বিস্তর রাবিশ।

সেগুলো বাদ দাও-না।

বাদ দিলে খুব অল্প একটু বাকি থাকবে, তখন তোমার মনে হবে ছোটো খবর। কিন্তু আসলে সেই খাঁটি খবর।

আমাকে খাঁটি খবরই দাও।

তাই দেব। তোমাকে যদি বি-এ পাশ করতে হ'ত, সব রাবিশই তোমার টেবিলে উঁচু করতে হত; অনেক বাজে কথা, অনেক মিথ্যে কথা, টেনে বেড়াতে হত খাতা

বোঝাই ক'রে।

কুসমি বললে, আচ্ছা দাদামশায়, এখনকার কালের একটা খুব বড়ো খবর দাও দেখি খুব ছোটো ক'রে, দেখি তোমার কেমন ক্ষমতা।

আচ্ছা শোনো।

শান্তিতে কাজ চলছিল।

মহাজনি নৌকোয় ঘোরতর ঝগড়া চলছে পালে আর দাঁড়ে। দাঁড়ের দল ঠক্‌ঠক্ করতে করতে মাঝির বিচারসভায় এসে উপস্থিত, বললে, এ তো আর সহ্য হয় না। ঐ যে তোমার অহংকেরে পাল, বুক ফুলিয়ে বলে আমাদের ছোটোলোক। কেননা, আমরা দিনে রাতে নীচের পাটাতনে বাঁধা থেকে জল ঠেলে ঠেলে চলি। আর উনি চলেন খেয়ালে, কারও হাতের ঠেলার তোয়াক্কা রাখেন না। সেইজন্যেই উনি হলেন বড়োলোক। তুমি ঠিক করে দাও কার কদর বেশি। আমরা যদি ছোটো লোক হই তবে জোট বেঁধে কাজে ইস্তফা দেব, দেখি তুমি নৌকো চালাও কী ক'রে।

মাঝি দেখলে বিপদ, দাঁড় ক'টাকে আড়ালে টেনে নিয়ে চুপিচুপি বললে, ওর কথায় কান দিয়ো না ভায়ারা। নিতান্ত ফাঁপা ভাষায় ও কথা ব'লে থাকে। তোমরা জোয়ানরা সব দড়ি-বাঁচি করে না খাটলে নৌকো একেবারে অচল। আর, ঐ পাল করেন ফাঁকা বাবুয়ানা উপরের মহলে। একটু ঝোড়ো হাওয়া দিয়েছে কি উনি কাজ বন্ধ করে গুটিসুটি মেরে পড়ে থাকেন নৌকোর চালের উপরে। তখন ফড়্‌ফড়ানি বন্ধ, সাড়াই পাওয়া যায় না। কিন্তু, সুখে-দুঃখে বিপদে-আপদে হাটে-ঘাটে তোমরাই আছ আমার ভরসা। ঐ নবাবির বোঝাটাকে যখন-তখন তোমাদের টেনে নিয়ে বেড়াতে হয়। কে বলে তোমাদের ছোটোলোক।

মাঝির ভয় হল, কথাগুলো পালের কানে উঠল বুঝি। সে এসে কানে কানে বললে, পাল-মশায়, তোমার সঙ্গে কার তুলনা। কে বলে যে তুমি নৌকো চালাও, সে তো মজুরের কর্ম। তুমি আপন ফুর্তিতে চল আর তোমার ইয়ারবক্সিরা তোমার ইশারায় পিছন-পিছন চলে। আবার ঝুলে পড় একটু যদি হাঁপ ধরে। ঐ দাঁড়গুলোর ইৎরমিতে তুমি কান দিয়ো না ভায়া, ওদের এমনি ক'ষে বেঁধে রেখেছি যে যতই ওদের ঝপ্‌ঝপানি থাক্-না কাজ না করে উপায় নেই।

শুনে পাল উঠল ফুলে। মেঘের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাই তুলতে লাগল।

কিন্তু, লক্ষণ ভালো নয়। দাঁড়গুলোর মজবুত হাড়, এখন কাত হয়ে আছে, কোন্ দিন খাড়া হয়ে দাঁড়াবে, লাগাবে ঝাপটা, চৌচির হয়ে যাবে পালের গুমর। ধরা পড়বে

দাঁড়েই চালায় নৌকো— ঝড় হোক, ঝাপট হোক, উজান হোক, ভাঁটা হোক

কুসমি বললে, তোমার বড়ো খবর এইটুকু বই নয় ? তুমি ঠাট্টা করছ।

দাদামশায় বললে, ঠাট্টার মতন এখন শোনাচ্ছে। দেখতে দেখতে একদিন বড়ো খবর বড়ো হয়েই উঠবে।

তখন ?

তখন তোমার দাদামশায় ঐ দাঁড়গুলোর সঙ্গে তাল মেলানো অভ্যাস করতে বসবে।

আর, আমি ?

যেখানে দাঁড় বড়ো বেশি কচ্‌কচ্‌ করে সেখানে দেবে একটু তেল।

দাদামশায় বললেন, খাঁটি খবর ছোটো হয়েই থাকে, যেমন বীজ। ডালপালা নিয়ে বড়ো গাছ আসে পরে। এখন বুঝেছ তো ?

কুসমি বললে, হ্যাঁ, বুঝেছি।

মুখ দেখে বোঝা গেল, বোঝে নি। কিন্তু কুসমির একটা গুণ আছে, দাদামশায়ের কাছে ও সহজে মানতে চায় না যে ও কিছু বোঝে নি। ওর ইরুমাসির চেয়ে ও বুদ্ধিতে যে কম, এ কথাটা চাপা থাকাই ভালো।

•

•

পালের সঙ্গে দাঁড়ের বুঝি গোপন রেষারেষি,
মনে মনে তর্ক করে কার সমাদর বেশি।
দাঁড় ভাবে যে, পাঁচ-ছজনা গোলাম তাহার পাছে,
একলা কেবল বুড়ো মাঝি পালের তরে আছে।
পাল ভাবে যে, জলের সঙ্গে দাঁড়ের নিত্য বৈরি,
বাতাসকে তো বক্ষে নিতে আমি সদাই তৈরি ;
আমার খাতির মিতার সঙ্গে ভালোবাসার জোরে,
ওরা মরে ঝেঁকে ঝেঁকেই শুধু লড়াই ক'রে—
ওঠে পড়ে পরের খেয়ে তাড়া,
আমি চলি আকাশ থেকে যখনি পাই সাড়া।

চণ্ডী

দিদি, তুমি বোধ হয় ও পাড়ার চণ্ডীবাবুকে জান ?

জানি নে! তিনি যে ডাকসাইটে নিন্দুক।

বিধাতার কারখানায় খাঁটি জিনিস তৈরি হয় না, মিশল থাকেই। দৈবাৎ এক-একজন উৎরে যায়। চণ্ডী তারই সেরা নমুনা। ওর নিন্দুকতায় ভেজাল নেই। জান তো, আমি আর্টিস্ট্-মানুষ। সেইজন্যে এরকম খাঁটি জিনিস আমার দরবারে জুটিয়ে আনি। একেবারে লোকটা জীনিয়স বললেই হয়। একটা এড়িয়ে গেলে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একদিন দেখি, অধ্যাপক অনিলের দরজায় কান দিয়ে কী শুনছে। আমি তাকে বললুম, অমন করে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছ কাকে হে।

সেটাই যদি জানতুম তা হলে তো কথাই ছিল না। চার দিকে চোখ কান খুলে রাখতে হয়, কাউকে বিশ্বাস করবার জো নেই— চোর-ছ্যাঁচড়ে দেশ ভরে গেল।

বলো কী হে।

শুনে অবাক হবেন, এই সেইদিন অমন আমার চাঁপার রঙের গামছাখানা আলনার উপর থেকে বেমালুম গায়েব হয়ে গেল।

বলো কী হে, গামছা!

আজ্ঞে হাঁ, গামছা বই-কি। কোণটাতে একটুখানি ছেঁড়া ছিল, তা সেলাই করিয়ে নিয়েছিলুম।

তুমি অনিলবাবুর দরজার কাছে অমন ঘুর-ঘুর করছিলে কেন। পরের ছেঁড়া গামছা জোগাড় করবার রোগে তাঁকে ধরেছে নাকি।

আরে ছি ছি, ওঁরা হলেন বড়োলোক, গামছা কখনো চক্ষেও দেখেন নি। টার্কিস তোয়ালে না হলে ওঁর এক পা চলে না।

তা হলে ?

আমি ভাবছিলুম, ওঁর পাওনা তো বেশি নয়। অথচ, এত বাবুআনা চলে কী ক'রে।

বোধ হয় ধার ক'রে!

আজকালকার বাজারে ধার তো সহজ নয়, তার চেয়ে সহজ ফাঁকি।

আচ্ছা, তুমি পুলিশে খবর দিয়েছিলে নাকি।

না, তার দরকার হয় নি। সেটা বেরোল আমার স্ত্রীর ময়লা কাপড়ের ঝুড়ির ভিতর থেকে। কাউকেই বিশ্বাস করবার জো নেই।

কী বল তুমি, ওটা ঠিক জায়গাতেই তো ছিল।

আপনি সাদা লোক, আসল কথাটাই বুঝতে পারছেন না। আপনি জানেন তো আমার শালা কোচ্‌লুকে। কী রকম সে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ায়। পয়সা জোটে কোথা থেকে। কাজটি করছেন তিনি, আর গিন্নি সেটাকে বেমালুম চাপা দিয়েছেন।

তুমি জানলে কী ক'রে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, এ কি জানতে বাকি থাকে।

কখনো তাকে নিতে দেখেছ ?

যে এমন কাজ করে সে কি দেখিয়ে দেখিয়ে করে। এ দিকে দেখুন-না, পুলিশ আছে চোখ বুজে, তারা যে বখরা নিয়ে থাকে। এই-সব উৎপাত আরম্ভ হয়েছে যখন থেকে দেখা দিয়েছেন ঐ আপনাদের গান্ধিমহারাজ।

এর মধ্যে তিনি আবার এলেন কোত্থেকে।

ঐ যে তাঁর অহিংস্র নীতি। ধড়াধড় না পিটলে চোরের চুরি রোগ কখনো সারে ? তিনি নিজে থাকেন কপ্‌নি প'রে। এক পয়সা সম্বল নেই। এ-সব লম্বাচওড়া বুলি তাঁকেই সাজে। আমরা গেরস্থ মানুষ, শুনে চক্ষু স্থির হয়ে যায়। এ দিকে আর-এক নতুন ফন্দি বেরিয়েছে জানেন তো ? ঐ যে যাকে আপনারা বলেন চাঁদা। তার মুনফা কম নয়। কিন্তু সেটা তলিয়ে যায় কোথায় তার হিসেব রাখে কে। মশায়, সেদিন আমারই ঘরে এসে উপস্থিত অনাথ-হাসপাতালের চাঁদা চাইতে। লজ্জা হয়, কী আর বলব। খাতা হাতে যিনি এসেছিলেন আপনারা সবাই তাঁকে জানেন। ডাক্তার—আর নাম করে কাজ নেই, কে আবার তাঁর কানে ওঠাবে। তিনি যে মাঝে মাঝে আসেন আমাদের ঘরে নাড়ী টিপতে। সিকি পয়সা দিতে হয় না বটে, তেমনি সিকি পয়সার ফলও পাই নে। তবু হাজার হোক, এম-বি তো বটে। এমনি হাল আমলের তাঁর চিকিৎসা যে রোগীরা তাঁর কাছে ঘেঁষে না। কাজেই টাকার টানাটানি হয় বই-কি।

ছি ছি, কী বলছ তুমি।

তা মশায়, আমি মুখফোড় মানুষ। সত্যিকথা আমার বাধে না। ওঁর মুখের সামনেই শুনিয়ে দিতে পারতুম। কিন্তু কী বলব, আমার ছেলেটাকে আদায়ের কাজে রেখে আমার মুখ বন্ধ করেছেন। তার কাছ থেকেও মাঝে মাঝে ইশারা পাই। দক্ষিণহস্ত বেশ চলছে ভালো। বুঝছেন তো ? আমাদের দেশে আজকালকার

ইংরিমি যে কী রকম অসহ্য, তার আর-একটা নমুনা আপনাকে শোনাই।

কী রকম।

আমাদের পাড়ায় আছে একটা গোমুখ্যু যাকে ওরা নাম দিয়েছে কবিবর। তাকে দিয়ে দেখুন আমার নামে কী লিখিয়েছে। ঘোর লাইবেল। নিন্দুকেরা দল পাকিয়েছে। পাড়ায় কান পাতবার জো নেই। খ্যাক্শিয়ালি ব'লে চেঁচাচ্ছে আমার পিছনে পিছনে। এত সাহস হত না যদি না এদের পিছনে থাকত নামজাদা মুরুব্বি সব গান্ধিজির চেলা।

দেখি দেখি কী লিখেছে। মন্দ হয় নি তো। লোকটার হাত দোরস্ত আছে।—

আলো যার মিট্‌মিটে,
স্বভাবটা খিট্‌খিটে,
বড়োকে করিতে চায় ছোটো,
সব ছবি ভুষো মেজে
কালো ক'রে নিজেকে যে
মনে করে ওস্তাদ পোটো,
বিধাতার অভিশাপে
ঘুরে মরে ঝোপে ঝাপে,
স্বভাবটা যার বদ্‌খেয়ালি,
খ্যাক্ খ্যাক্ করে মিছে
সব তাতে দাঁত খিঁচে
তারে নাম দিব খ্যাক্‌শেয়ালি।

ও কী ও, আপনার দরজায় পুলিশ যে।

ব্যাপারটা কী।

চণ্ডীবাবুর ছেলের নামে কেস এসেছে।

হ্যাঁ, কিসের কেস।

অনাথ-হাসপাতালের চাঁদার টাকা তিনি ভেঙে বসেছেন।

মিথ্যে কথা। আগাগোড়া পুলিশের সাজানো। আপনি তো জানেন, আমার ছেলে একসময় আহার নিদ্রা ছেড়ে গান্ধির নামে দরজায় দরজায় চাঁদা ভিক্ষে করে বেড়িয়েছিল, সেই অবধি বরাবর তার উপর পুলিশের নজর লেগে আছে। কিছু না, এটা পলিটিক্যাল মামলা।

দাদামশায়, তোমার এই গল্পটা আমার একটুও ভালো লাগল না

*

* *

যেমন পাজি তেমনি বোকা,
গোবর-ভরা মাথা,
লোকটা কে-যে ভেবে পাচ্ছি না তা।
কবে যে কী বলেছিল ঠিক তা মনে নাই,
আচ্ছা ক'রে মুখের মতো জবাব দিতে চাই;
কী যে জবাব, কার যে জবাব যদি মনে পড়ে—
প্রাণ ফিরে পাই ধড়ে।
হাতে পেলে দেওয়াই নাকে খত,
স্ত্রীর ছিঁড়ে দিই নথ।
রাস্কেল সে, পাজির অধম, শয়তান মিট্‌মিটে;
দিনরাত্তির ইচ্ছে করে, ঘুঘু চরাই ভিটেয়।
বদ্‌মাশকে শিক্ষা দেব— অসহ্য এই ইচ্ছে
মনকে নাড়া দিচ্ছে।
লোকটা কে-যে স্পষ্ট তা নয়, এই কথাটাই স্পষ্ট—
অতি খারাপ, নিতান্তই সে নষ্ট।
পথের মোড়ে যদি পেতেম দেখা
মনের ঝালটা ঝেড়ে নিতেম যদি থাকত একা।
বুকটা ভ'রে অকথা সব জমে উঠছে ঢের,
লক্ষ্য মনে না পড়ে তো কাগজ করব বের,
যেখানে পাই নাম একটা করব নির্বাচন—
খালাস পাবে মন।

রূ

কাল তোমার ভালো লাগে নি চণ্ডীকে নিয়ে বকুনি। ও একটা ছবি মাত্র। কড়া কড়া লাইনে আঁকা, ওতে রস নাই। আজ তোমাকে কিছু বলব, সে সত্যিকার গল্প।

কুসমি অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই বলো। তুমি তো সেদিন বললে, বরাবর মানুষ সত্যি খবর দিয়ে এসেছে গল্পের মধ্যে মুড়ে। একেবারে ময়রার দোকান বানিয়ে রেখেছে। সন্দেশের মধ্যে ছানাকে চেনাই যায় না।

দাদামশায় বললে, এ না হলে মানুষের দিন কাটত না। কত আরব্য-উপন্যাস, পারস্য-উপন্যাস, পঞ্চতন্ত্র, কত কী সাজানো হয়ে গেল। মানুষ অনেকখানি ছেলেমানুষ, তাকে রূপকথা দিয়ে ভোলাতে হয়। আর ভূমিকায় কাজ নেই। এবার শুরু করা যাক।—

এক যে ছিল রাজা, তাঁর ছিল না রাজরানী। রাজকন্যার সন্ধানে দূত গেল অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ মগধ কোশল কাঞ্চী। তারা এসে খবর দেয় যে, মহারাজ, সে কী দেখলুম ; কারু চোখের জলে মুক্তো ঝরে, কারু হাসিতে খ'সে পড়ে মানিক! কারু দেহ চাঁদের আলোয় গড়া, সে যেন পূর্ণিমারাত্রের স্বপ্ন।

রাজা শুনেই বুঝলেন, কথাগুলি বাড়িয়ে বলা, রাজার ভাগ্যে সত্য কথা জোটে না অনুচরদের মুখের থেকে। তিনি বললেন, আমি নিজে যাব দেখতে।

সেনাপতি বললেন, তবে ফৌজ ডাকি?

রাজা বললেন, লড়াই করতে যাচ্ছি নে।

মন্ত্রী বললেন, তবে পাত্রমিত্রদের খবর দিই?

রাজা বললেন, পাত্রমিত্রদের পছন্দ নিয়ে কন্যা দেখার কাজ চলে না।

তা হলে রাজহস্তী তৈরি করতে বলে দিই?

রাজা বললেন, আমার একজোড়া পা আছে।

সঙ্গে কয়জন যাবে পেয়াদা?

রাজা বললেন, যাবে আমার ছায়াটা।

আচ্ছা, তা হলে রাজবেশ পরুন— চুনিপান্নার হার, মানিক-লাগানো মুকুট, হীরে-লাগানো কাঁকন আর গজমোতির কানবালা।

রাজা বললেন, আমি রাজার সঙ সেজেই থাকি, এবার সাজব সন্নেসির সঙ।

মাথায় লাগালেন জটা, পরলেন কপনি, গায়ে মাখলেন ছাই, কপালে আঁকলেন তিলক আর হাতে নিলেন কমণ্ডলু আর বেলকাঠের দণ্ড। 'বোম্ বোম্ মহাদেব' ব'লে বেরিয়ে পড়লেন পথে। দেশে দেশে রটে গেল— বাবা পিনাকীশ্বর নেমে এসেছেন হিমালয়ের গুহা থেকে, তাঁর একশো-পঁচিশ বছরের তপস্যা শেষ হল।

রাজা প্রথমে গেলেন অঙ্গদেশে। রাজকন্যা খবর পেয়ে বললেন, ডাকো আমার কাছে।

কন্যার গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামল, চুলের রঙ যেন ফিঙের পালক, চোখ দুটিতে হরিণের চমকে-ওঠা চাহনি। তিনি বসে বসে সাজ করছেন। কোনো বাঁদি নিয়ে এল স্বর্ণচন্দন বাটা, তাতে মুখের রঙ হবে যেন চাঁপাফুলের মতো। কেউ বা আনল ভৃঙ্গলাঞ্ছন তেল, তাতে চুল হবে যেন পম্পাসরোবরের ঢেউ। কেউ বা আনল মাকড়সাজাল শাড়ি। কেউ বা আনল হাওয়াহাল্কা ওড়না। এই করতে করতে দিনের তিনটে প্রহর যায় কেটে। কিছুতেই কিছু মনের মতো হয় না। সন্নেসিকে বললেন, বাবা, আমাকে এমন চোখ-ভোলানো সাজের সন্ধান বলে দাও, যাতে রাজরাজেশ্বরের লেগে যায় ধাঁধা, কাজকর্ম যায় ঘুচে, কেবল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দিনরাত্রি কাটে।

সন্ন্যাসী বললেন, আর-কিছুই চাই না?

রাজকন্যা বললেন, না, আর-কিছুই না।

সন্ন্যাসী বললেন, আচ্ছা, আমি তবে চললেম, সন্ধান মিললে নাহয় আবার দেখা দেব।

রাজা সেখান থেকে গেলেন বঙ্গদেশে। রাজকন্যা শুনলেন সন্ন্যাসীর নামডাক। প্রণাম করে বললেন, বাবা, আমাকে এমন কণ্ঠ দাও, যাতে আমার মুখের কথায় রাজরাজেশ্বরের কান যায় ভরে, মাথা যায় ঘুরে, মন হয় উতলা। আমার ছাড়া আর কারও কথা যেন তাঁর কানে না যায়। আমি যা বলাই তাই বলেন।

সন্ন্যাসী বললেন, সেই মন্ত্র আমি সন্ধান করতে বেরলুম। যদি পাই তবে ফিরে এসে দেখা হবে।

ব'লে তিনি গেলেন চলে।

গেলেন কলিঙ্গে। সেখানে আর-এক হাওয়া অন্দরমহলে। রাজকন্যা মন্ত্রণা করছেন কী ক'রে কাঞ্চী জয় ক'রে তাঁর সেনাপতি সেখানকার মহিষীর মাথা হেঁট করে দিতে পারে, আর কোশলের গুমরও তাঁর সহ্য হয় না। তার রাজলক্ষ্মীকে বাঁদি ক'রে

তাঁর পায়ে তেল দিতে লাগিয়ে দেবেন।

সন্ন্যাসীর খবর পেয়ে ডেকে পাঠালেন। বললেন, বাবা, শুনেছি সহস্রঘ্নী অস্ত্র আছে শ্বেতদ্বীপে যার তেজে নগর গ্রাম সমস্ত পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আমি যাকে বিয়ে করব, আমি চাই তাঁর পায়ের কাছে বড়ো বড়ো রাজবন্দীরা হাত জোড় করে থাকবে, আর রাজার মেয়েরা বন্দিনী হয়ে কেউ বা চামর দোলাবে, কেউ বা ছত্র ধ'রে থাকবে, আর কেউ বা আনবে তাঁর পানের বাটা।

সন্ন্যাসী বললেন, আর-কিছু চাই নে তোমার ?

রাজকন্যা বললেন, আর-কিছুই না।

সন্ন্যাসী বললেন, সেই দেশ-জ্বালানো অস্ত্রের সন্ধানে চললেম।

সন্ন্যাসী গেলেন চলে। বললেন, ধিক্।

চলতে চলতে এসে পড়লেন এক বনে। খুলে ফেললেন জটাজুট। ঝরনার জলে স্নান ক'রে গায়ের ছাই ফেললেন ধুয়ে। তখন বেলা প্রায় তিনপ্রহর। প্রখর রোদ, শরীর শ্রান্ত, ক্ষুধা প্রবল। আশ্রয় খুঁজতে খুঁজতে নদীর ধারে দেখলেন একটি পাতার ছাউনি। সেখানে একটি ছোটো চুলা বানিয়ে একটি মেয়ে শাকপাতা চড়িয়ে দিয়েছে রাঁধবার জন্য। সে ছাগল চরায় বনে, সে মধু জড়ো করে রাজবাড়িতে জোগান দিতে। বেলা কেটে গেছে এই কাজে। এখন শুকনো কাঠ জ্বালিয়ে শুরু করেছে রান্না। তার পরনের কাপড়খানি দাগপড়া, তার দুই হাতে দুটি শাঁখা, কানে লাগিয়ে রেখেছে একটি ধানের শিষ। চোখ দুটি তার ভোমরার মতো কালো। স্নান ক'রে সে ভিজে চুল পিঠে মেলে দিয়েছে যেন বাদলশেষের রাত্তির।

রাজা বললেন, বড়ো খিদে পেয়েছে।

মেয়েটি বললে, একটু সবুর করুন, আমি অন্ন চড়িয়েছি, এখনি তৈরি হবে আপনার জন্য।

রাজা বললেন, আর, তুমি কী খাবে তা হলে।

সে বললে, আমি বনের মেয়ে, জানি কোথায় ফলমূল কুড়িয়ে পাওয়া যায়। সেই আমার হবে ঢের। অতিথিকে অন্ন দিয়ে যে পুণ্যি হয় গরিবের ভাগ্যে তা তো সহজে জোটে না।

রাজা বললেন, তোমার আর কে আছে।

মেয়েটি বললে, আছেন আমার বুড়ো বাপ, বনের বাইরে তাঁর কুঁড়েঘর। আমি ছাড়া তাঁর আর কেউ নেই। কাজ শেষ ক'রে কিছু খাবার নিয়ে যাই তাঁর কাছে। আমার জন্য তিনি পথ চেয়ে আছেন।

রাজা বললেন, তুমি অন্ন নিয়ে চলো, আর আমাকে দেখিয়ে দাও সেই-সব ফলমূল যা তুমি নিজে জড়ো করে খাও।

কন্যা বললে, আমার যে অপরাধ হবে।

রাজা বললেন, তুমি দেবতার আশীর্বাদ পাবে। তোমার কোনো ভয় নেই। আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো।

বাপের জন্য তৈরি অন্নের থালি সে মাথায় নিয়ে চলল। ফলমূল সংগ্রহ ক'রে দুজনে তাই খেয়ে নিলে। রাজা গিয়ে দেখলেন, বুড়ো বাপ কুঁড়েঘরের দরোজায় ব'সে।

সে বললে, মা, আজ দেরি হল কেন।

কন্যা বললে, বাবা, অতিথি এনেছি তোমার ঘরে।

বৃদ্ধ ব্যস্ত হয়ে বললে, আমার গরিবের ঘর, কী দিয়ে আমি অতিথিসেবা করব।

রাজা বললেন, আমি তো আর কিছুই চাই নে, পেয়েছি তোমার কন্যার হাতের সেবা। আজ আমি বিদায় নিলেম। আর-একদিন আসব।

সাত দিন সাত রাত্রি চলে গেল, এবার রাজা এলেন রাজবেশে। তাঁর অশ্ব রথ সমস্ত রইল বনের বাইরে। বৃদ্ধের পায়ের কাছে মাথা রেখে প্রণাম করলেন; বললেন, আমি বিজয়পত্তনের রাজা। রানী খুঁজতে বেরিয়েছিলাম দেশে বিদেশে। এতদিন পরে পেয়েছি— যদি তুমি আমায় দান কর, আর যদি কন্যা থাকেন রাজি।

বৃদ্ধের চোখ জলে ভরে গেল। এল রাজহস্তী— কাঠকুড়ানি মেয়েকে পাশে নিয়ে রাজা ফিরে গেলেন রাজধানীতে।

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের রাজকন্যারা শুনে বললে, ছি!

*

* *

আসিল দিয়াড়ি হাতে রাজার ঝিয়ারি
খিড়কির আঙিনায়, নামটি পিয়ারি।
আমি শুধালেম তারে, এসেছ কী লাগি।
সে কহিল চুপে চুপে, কিছু নাহি মাগি।
আমি চাই ভালো ক'রে চিনে রাখো মোরে,
আমার এ আলোটিতে মন লহো ভ'রে।

আমি যে তোমার দ্বারে করি আসাযাওয়া,
তাই হেথা বকুলের বনে দেয় হাওয়া।
যখন ফুটিয়া ওঠে যূথী বনময়
আমার আঁচলে আনি তার পরিচয়।
যেথা যত ফুল আছে বনে বনে ফোটে
আমার পরশ পেলে খুশি হয়ে ওঠে।
শুকতারা ওঠে ভোরে, তুমি থাক একা,
আমিই দেখাই তারে ঠিকমতো দেখা।
যখনি আমার শোনে নূপুরের ধ্বনি
ঘাসে ঘাসে শিহরণ জাগে-যে তখনি।
তোমার বাগানে সাজে ফুলের কেয়ারি,
কানাকানি করে তারা, এসেছে পিয়ারি।
অরুণের আভা লাগে সকালের মেঘে,
'এসেছে পিয়ারি' ব'লে বন ওঠে জেগে।
পূর্ণিমারাতে আসে ফাগুনের দোল,
'পিয়ারি পিয়ারি' রবে ওঠে উতরোল।
আমের মুকুলে হাওয়া মেতে ওঠে গ্রামে,
চারি দিকে বাঁশি বাজে পিয়ারির নামে।
শরতে ভরিয়া উঠে যমুনার বারি,
কূলে কূলে গেয়ে চলে 'পিয়ারি পিয়ারি'।

মুনশি

আচ্ছা দাদামশায়, তোমাদের সেই মুনশিজি এখন কোথায় আছেন।

এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারব তার সময়টা বুঝি কাছে এসেছে, তবু হয়তো কিছুদিন সবুর করতে হবে।

ফের অমন কথা যদি তুমি বল, তা হলে তোমার সঙ্গে কথা বন্ধ করব।

সর্বনাশ, তার চেয়ে যে মিথ্যে কথা বলাও ভালো। তোমার দাদামশায় যখন স্কুল-পালানে ছেলে ছিল তখন মুনশিজি ছিলেন ঠিক কত বয়েস তা বলা শক্ত।

তিনি বুঝি পাগল ছিলেন ?

হাঁ, যেমন পাগল আমি।

তুমি আবার পাগল ? কী-যে বল তার ঠিক নেই।

তাঁর পাগলামির লক্ষণ শুনলে বুঝতে পারবে, আমার সঙ্গে তাঁর আশ্চর্য মিল।

কী রকম শুনি।

যেমন তিনি বলতেন, জগতে তিনি অদ্বিতীয়। আমিও তাই বলি।

তুমি যা বল সে তো সত্যি কথা। কিন্তু, তিনি যা বলতেন তা যে মিথ্যে।

দেখো দিদি, সত্য কখনো সত্যই হয় না যদি সকলের সম্বন্ধেই সে না খাটে। বিধাতা লক্ষকোটি মানুষ বানিয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই অদ্বিতীয়। তাঁদের ছাঁচ ভেঙে ফেলেছেন। অধিকাংশ লোকে নিজেকে পাঁচজনের সমান মনে ক'রে আরাম বোধ করে। দৈবাৎ এক-একজন লোককে পাওয়া যায় যারা জানে, তাদের জুড়ি নেই। মুনশি ছিলেন সেই জাতের মানুষ।

দাদামশায়, তুমি একটু স্পষ্ট ক'রে তাঁর কথা বলো-না, তোমার অর্ধেক কথা আমি বুঝতে পারি নে।

ক্রমে ক্রমে বলছি, একটু ধৈর্য ধরো।—

আমাদের বাড়িতে ছিলেন মুনশি, দাদাকে ফার্‌সি পড়াতেন। কাঠামোটা তাঁর বানিয়ে তুলতে মাংসের পড়েছিল টানাটানি। হাড় কখানার উপরে একটা চামড়া ছিল লেগে, যেন মোমজামার মতো। দেখে কেউ আন্দাজ করতে পারত না তাঁর ক্ষমতা কত। না পারবার হেতু এই যে, ক্ষমতার কথাটা জানতেন কেবল তিনি নিজে। পৃথিবীতে বড়ো বড়ো সব পালোয়ান কখনো জেতে কখনো হারে। কিন্তু, যে তালিম নিয়ে মুনশির ছিল গুমর তাতে তিনি কখনো কারও কাছে হটেন নি। তাঁর বিদ্যেতে কারও কাছে তিনি যে ছিলেন কম্‌তি সেটার নজির বাইরে থাকতে পারে, ছিল না তাঁর মনে। যদি হত ফার্‌সি পড়া বিদ্যে তা হলে কথাটা সহজে মেনে নিতে রাজি ছিল লোকে। কিন্তু, ফার্‌সির কথা পাড়লেই বলতেন, আরে ও কি একটা বিদ্যে। কিন্তু, তাঁর বিশ্বাস ছিল আপনার গানে। অথচ তাঁর গলায় যে আওয়াজ বেরোত সেটা চেঁচানি কিংবা কাঁদুনির জাতের, পাড়ার লোকে ছুটে আসত বাড়িতে কিছু বিপদ ঘটেছে মনে ক'রে। আমাদের বাড়িতে নামজাদা গাইয়ে ছিলেন বিষ্ণু তিনি কপাল চাপ্‌ড়িয়ে বলতেন, মুনশিজি আমার রুটি মারলেন দেখছি। বিষ্ণুর এই হতাশ ভাবখানা দেখে মুনশি বিশেষ দুঃখিত হতেন না— একটু মুচকে হাসতেন মাত্র। সবাই বলত,

মুনশিজি, কী গলাই ভগবান আপনাকে দিয়েছেন। খোশনামটা মুনশি নিজের পাওনা বলেই টেঁকে গুঁজতেন। এই তো গেল গান।

আরও একটা বিদ্যে মুনশির দখলে ছিল। তারও সমজদার পাওয়া যেত না। ইংরেজি ভাষায় কোনো হাড়পাকা ইংরেজও তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারে না, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। একবার বক্তৃতার আসরে নাবলে সুরেন্দ্র বাঁড়ুজ্জেকে দেশছাড়া করতে পারতেন কেবল যদি ইচ্ছে করতেন। কোনোদিন তিনি ইচ্ছে করেন নি। বিষ্ণুর রুটি বেঁচে গেল, সুরেন্দ্রনাথের নামও। কেবল কথাটা উঠলে মুনশি একটু মুচকে হাসতেন।

কিন্তু, মুনশির ইংরেজি ভাষায় দখল নিয়ে আমাদের একটা পাপকর্মের বিশেষ সুবিধা হয়েছিল। কথাটা খুলে বলি। তখন আমরা পড়তুম বেঙ্গল একাডেমিতে, ডিক্রুজ সাহেব ছিলেন ইস্কুলের মালিক। তিনি ঠিক করে রেখেছিলেন, আমাদের পড়াশুনা কোনোকালেই হবে না। কিন্তু, ভাবনা কী। আমাদের বিদ্যেও চাই নে, বুদ্ধিও চাই নে, আমাদের আছে পৈতৃক সম্পত্তি। তবুও তাঁর ইস্কুল থেকে ছুটি চুরি করে নিতে হলে তার চলতি নিয়মটা মানতে হত। কর্তাদের চিঠিতে ছুটির দাবির কারণ দেখাতে হত। সে চিঠি যত বড়ো জালই হোক, ডিক্রুজ সাহেব চোখ বুজে দিতেন ছুটি। মাইনের পাওনাতে লোকসান না ঘটলে তাঁর ভাবনা ছিল না। মুনশিকে জানাতুম ছুটি মঞ্জুর হয়েছে। মুনশি মুখ টিপে হাসতেন। হবে না? বাস্‌ রে, তাঁর ইংরেজি ভাষায় কী জোর। সে ইংরেজি কেবল ব্যাকরণের ঠেলায় হাইকোর্টের জজের রায় ঘুরিয়ে দিতে পারত। আমরা বলতুম, নিশ্চয়! হাইকোর্টের জজের কাছে কোনোদিন তাঁকে কলম পেশ করতে হয় নি।

কিন্তু, সবচেয়ে তাঁর ঝোঁক ছিল লাঠি-খেলার কায়দানি নিয়ে। আমাদের বাড়ির উঠোনে রোদ্দুর পড়লেই তাঁর খেলা শুরু হত। সে খেলা ছিল নিজের ছায়াটার সঙ্গে। হুংকার দিয়ে ঘা লাগাতেন কখনো ছায়াটার পায়ে, কখনো তার ঘাড়ে, কখনো তার মাথায়। আর, মুখ তুলে চেয়ে চেয়ে দেখতেন চার দিকে যারা জড়ো হত তাদের দিকে। সবাই বলত, সাবাস্‌! বলত, ছায়াটা যে বর্তিয়ে আছে সে ছায়ার বাপের ভাগ্যি। এই থেকে একটা কথা শেখা যায় যে, ছায়ার সঙ্গে লড়াই ক'রে কখনো হার হয় না। আর-একটা কথা এই যে, নিজের মনে যদি জানি 'জিতেছি' তা হলে সে জিত কেউ কেড়ে নিতে পারে না। শেষ দিন পর্যন্ত মুনশিজির জিত রইল। সবাই বলত 'সাবাস্‌', আর মুনশি মুখ টিপে হাসতেন।

দিদি, এখন বুঝতে পারছ, ওর পাগলামির সঙ্গে আমার মিল কোথায়। আমিও

ছায়ার সঙ্গে লড়াই করি। সে লড়াইয়ে আমি যে জিতি তার কোনো সন্দেহ থাকে না। ইতিহাসে ছায়ার লড়াইকে সত্যি লড়াই ব'লে বর্ণনা করে।

*

* *

ভীষণ লড়াই তার উঠোন-কোণের,
সতুর মনটা ছিল নেপোলিয়নের।
ইংরেজ ফৌজের সাথে যার রুধে
দু-বেলা লড়াই হত দুই চোখ মুদে।
ঘোড়া টগ্‌বগ্ ছোটে, ধুলা যায় উড়ে,
বাঙালি সৈন্যদল চলে মাঠ জুড়ে।
ইংরেজ দুদ্দাড় কোথা দেয় ছুট,
কোন্ দূরে মস্‌মস্ করে তার বুট।
বিছানায় শুয়ে শুয়ে শোনে বারে বারে,
দেশে তার জয়রব ওঠে চারি ধারে।
যখন হাত-পা নেড়ে করে বক্তৃতা
কী যে ইংরেজি ফোটে বলা যায় কি তা।
ক্লাসে কথা বেরোয় না, গলা তার ভাঙা,
প্রশ্ন শুধালে মুখ হয়ে ওঠে রাঙা।
কাহিল চেহারা তার, অতি মুখচোরা—
রোজ পেন্‌সিল তার কেড়ে নেয় গোরা।
খবরের কাগজের ছেঁড়া ছবি কেটে
খাতা সে বানিয়েছিল আঠা দিয়ে এঁটে।
রোজ তার পাতাগুলি দেখত সে নেড়ে,
হুহু একদিন সেটা নিয়ে গেল কেড়ে।
কালি দিয়ে গাধা লিখে পিঠে দিয়ে ছাপ
হাততালি দিতে দিতে চ্যাঁচায় প্রতাপ।
বাহিরের ব্যবহারে হারে সে সদাই,
ভিতরের ছবিটাতে জিত ছাড়া নাই।

ম্যাজিশিয়ান

কুসমি বললে, আচ্ছা দাদামশায়, শুনেছি এক সময়ে তুমি বড়ো বড়ো কথা নিয়ে খুব বড়ো বড়ো বই লিখেছিলে।

জীবনে অনেক দুষ্কর্ম করেছি, তা কবুল করতে হবে। ভারতচন্দ্র বলেছেন, সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।

আমার ভালো লাগে না মনে করতে যে, আমি তোমার সময় নষ্ট করে দিচ্ছি।

ভাগ্যবান মানুষেরই যোগ্য লোক জোটে সময় নষ্ট ক'রে দেবার।

আমি বুঝি তোমার সেই যোগ্য লোক?

আমার কপালক্রমে পেয়েছি, খুঁজলে পাওয়া যায় না।

তোমাকে খুব ছেলেমানুষি করাই?

দেখো, অনেকদিন ধ'রে আমি গম্ভীর পোশাকি সাজ প'রে এতদিন কাটিয়েছি, সেলাম পেয়েছি অনেক। এখন তোমার দরবারে এসে ছেলেমানুষির ঢিলে কাপড় প'রে হাঁপ ছেড়েছি। সময় নষ্ট করার কথা বলছ, দিদি— এক সময় তার হুকুম ছিল না। তখন ছিলুম সময়ের গোলাম। আজ আমি গোলামিতে ইস্তফা দিয়েছি। শেষের ক'টা দিন আরামে কাটবে। ছেলেমানুষির দোসর পেয়ে লম্বা কেদারায় পা ছড়িয়ে বসেছি। যা খুশি বলে যাব, মাথা চুলকে কারও কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে না।

তোমার এই ছেলেমানুষির নেশাতেই তুমি যা খুশি তাই বানিয়ে বলছ।

কী বানিয়েছি বলো।

যেমন তোমাদের ঐ হ. চ. হ.; অমনতরো অদ্ভুত খ্যাপাটে মানুষ তো আমি দেখি নি।

দেখো দিদি, এক-একটা জীব জন্মায় যার কাঠামোটা হঠাৎ যায় বেঁকে। সে হয় মিউজিয়মের মাল। ঐ হ. চ. হ. আমার মিউজিয়মে দিয়েছেন ধরা।

ওঁকে পেয়ে তুমি খুব খুশি হয়েছিলে?

তা হয়েছিলুম। কেননা তখন তোমার ইরুমাসি গিয়েছেন চলে শ্বশুরবাড়ি। আমাকে অবাক ক'রে দেবার লোকের অভাব ঘটেছিল। ঠিক সেই সময় এসেছিলেন হরীশচন্দ্র হালদার একমাথা টাক নিয়ে। তাঁর তাক লাগিয়ে দেবার রকমটা ছিল

আলাদা, তোমার ইরুমাসির উল্টো। সেদিন তোমার ইরুমাসি শুরু করেছিল জটাইবুড়ির কথা। ঐ জটাইবুড়ির সঙ্গে অমাবস্যার রাত্রে আলাপ পরিচয় হ'ত। সে বুড়িটার কাজ ছিল চাঁদে বসে চরকা কাটা। সে চরকা বেশিদিন আর চলল না। ঠিক এমন সময় পালা জমাতে এলেন প্রোফেসার হরীশ হালদার। নামের গোড়ার পদবীটা তাঁর নিজের হাতেই লাগানো। তাঁর ছিল ম্যাজিক-দেখানো হাত। একদিন বাদলা দিনের সন্ধেবেলায় চায়ের সঙ্গে চিঁড়েভাজা খাওয়ার পর তিনি বলে বসলেন, এমন ম্যাজিক আছে যাতে সামনের ওই দেয়ালগুলো হয়ে যাবে ফাঁকা।

পঞ্চানন দাদা টাকে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, এ বিদ্যে ছিল বটে ঋষিদের জানা।

শুনে প্রোফেসার রেগে টেবিল চাপড়ে বললেন, আরে রেখে দিন আপনার মুনি ঋষি, দৈত্য দানা, ভূত প্রেত।

পঞ্চানন দাদা বললেন, আপনি তবে কী মানেন।

হরীশ একটিমাত্র ছোটো কথায় বলে দিলেন, দ্রব্যগুণ।

আমরা ব্যস্ত হয়ে বললুম, সে জিনিসটা কী।

প্রোফেসার বলে উঠলেন, আর যাই হোক, বানানো কথা নয়, মন্তর নয়, তন্তর নয়, বোকা-ভুলোনো আজগুবি কথা নয়।

আমরা ধরে পড়লুম, তবে সেই দ্রব্যগুণটা কী।

প্রোফেসার বললেন, বুঝিয়ে বলি। আগুন জিনিসটা একটা আশ্চর্য জিনিস, কিন্তু তোমাদের ঐসব ঋষিমুনির কথায় জ্বলে না। দরকার হয় জ্বালানি কাঠের। আমার ম্যাজিকও তাই। সাত বছর হর্তকি খেয়ে তপস্যা করতে হয় না। জেনে নিতে হয় দ্রব্যগুণ। জানবা মাত্র তুমিও পার আমিও পারি।

কী বলেন প্রোফেসার, আমিও পারি ঐ দেয়ালটাকে হাওয়া করে দিতে?

পার বই-কি। হিড়িংফিড়িং দরকার হয় না, দরকার হয় মাল-মসলার।

আমি বললেম, বলে দিন-না কী চাই।

দিচ্ছি। কিছু না— কিছু না, কেবল একটা বিলিতি আমড়ার আঁঠি আর শিলনোড়ার শিল।

আমি বললুম, এ তো খুবই সহজ। আমড়ার আঁঠি আর শিল আনিয়ে দেব, তুমি দেয়ালটাকে উড়িয়ে দাও।

আমড়ার গাছটা হওয়া চাই ঠিক আট বছর সাত মাসের। কৃষ্ণাদশীর চাঁদ ওঠবার এক দণ্ড আগে তার অঙ্কুরটা সবে দেখা দিয়েছে। সেই তিথিটা পড়া চাই

শুক্রবারে রাত্রির এক প্রহর থাকতে। আবার শুক্কুর বারটা অগ্রহায়ণের উনিশে তারিখে না হলে চলবে না। ভেবে দেখো বাবা, এতে ফাঁকি কিছুই নেই। দিনখন তারিখ সমস্ত পাকা ক'রে বেঁধে দেওয়া।

আমরা ভাবলুম, কথাটা শোনাচ্ছে অত্যন্ত বেশি খাঁটি। বুড়ো মালীটাকে সন্ধান করতে লাগিয়ে দেব।

এখনো সামান্য কিছু বাকি আছে। ঐ শিলটা তিব্বতের লামারা কালিম্পঙের হাটে বেচতে নিয়ে আসে ধবলেশ্বর পাহাড় থেকে।

পঞ্চানন দাদা এ পার থেকে ও পার পর্যন্ত টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, এটা কিছু শক্ত ঠেকছে।

প্রোফেসার বললেন, শক্ত কিছুই নয়। সন্ধান করলেই পাওয়া যাবে।

মনে মনে ভাবলুম, সন্ধান করাই চাই, ছাড়া হবে না— তার পরে শিল নিয়ে কী করতে হবে।

রোসো, অল্প একটু বাকি আছে। একটা দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ চাই।

পঞ্চানন দাদা বললেন, সে শঙ্খ পাওয়া তো সহজ নয়। যে পায় সে যে রাজা হয়।

হ্যাঃ, রাজা হয় না মাথা হয়। শঙ্খ জিনিসটা শঙ্খ। যাকে বাংলায় বলে শাঁখ। সেই শঙ্খটা আমড়ার আঁঠি দিয়ে, শিলের উপর রেখে, ঘষতে হবে। ঘষতে ঘষতে আঁঠির চিহ্ন থাকবে না, শঙ্খ যাবে ক্ষ'য়ে। আর, শিলটা যাবে কাদা হয়ে। এইবার এই পিণ্ডিটা নিয়ে দাও বুলিয়ে দেয়ালের গায়। বাস্‌। এ'কেই বলে দ্রব্যগুণ। দ্রব্যগুণেই দেয়ালটা দেয়াল হয়েছে। মন্তরে হয় নি। আর দ্রব্যগুণেই সেটা হয়ে যাবে ধোঁয়া, এতে আশ্চর্য কী।

আমি বললুম, তাই তো, কথাটা খুব সত্যি শোনাচ্ছে।

পঞ্চানন দাদা মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন ব'সে ব'সে, বাঁ হাতে হুঁকোটা ধ'রে।

আমাদের সন্ধানের ত্রুটিতে এই সামান্য কথাটার প্রমাণ হলই না। এতদিন পরে ইক্কর মক্কর তক্কর রাজবাড়ি, মনে হল, সব বাজে। কিন্তু, অধ্যাপকের দ্রব্যগুণের মধ্যে কোনোখানেই তো ফাঁকি নেই। দেয়াল রইল নিরেট হয়ে। অধ্যাপকের 'পরে আমাদের ভক্তিও রইল অটল হয়ে। কিন্তু, একবার দৈবাৎ কী মনের ভুলে দ্রব্যগুণটাকে নাগালের মধ্যে এনে ফেলেছিলেন। বলেছিলেন, ফলের আঁঠি মাটিতে পুঁতে এক ঘণ্টার মধ্যেই গাছও পাওয়া যাবে, ফলও পাওয়া যাবে।

আমরা বললুম, আশ্চর্য।

হ. চ. হ. বললেন, কিছু আশ্চর্য নয়, দ্রব্যগুণ। ঐ আঁঠিতে মনসাসিজের আঠা একুশবার লাগিয়ে একুশবার শুকোতে হবে। তার পরে পোঁতো মাটিতে আর দেখো কী হয়।

উঠে-প'ড়ে জোগাড় করতে লাগলুম। মাস দুয়েক লাগল আঠা মাখাতে আর শুকোতে। কী আশ্চর্য, গাছও হল ফলও ধরল, কিন্তু সাত বছরে। এখন বুঝেছি কাকে বলে দ্রব্যগুণ। হ. চ. হ. বললেন, ঠিক আঠা লাগানো হয় নি।

বুঝলেম, ঐ ঠিক আঠাটা দুনিয়ার কোথাও পাওয়া যায় না। বুঝতে সময় লেগেছে।

*

* *

যেটা যা হয়েই থাকে সেটা তো হবেই—
হয় না যা তাই হলে ম্যাজিক তবেই।
নিয়মের বেড়াটাতে ভেঙে গেলে খুঁটি
জগতের ইস্কুলে তবে পাই ছুটি।
অঙ্কর কেলাসেতে অঙ্কই কষি—
সেথায় সংখ্যাগুলো যদি পড়ে খসি,
বোর্ডের 'পরে যদি হঠাৎ নাম্‌তা
বোকার মতন করে আম্‌তা-আম্‌তা,
দুইয়ে দুইয়ে চার যদি কোনো উচ্ছ্বাসে
একেবারে চ'ড়ে বসে উনপঞ্চাশে,
ভুল তবু নির্ভুল ম্যাজিক তো সেই ;
'পাঁচ-সাতে পঁয়ত্রিশ'এ কোনো মজা নেই।
মিথ্যেটা সত্যই আছে কোনোখানে,
কবিরা শুনেছি তারি রাস্তাটা জানে—
তাদের ম্যাজিকওলা খ্যাপা পদ্যের
দোকানেতে তাই এত জোটে খদ্দের।

পরী

কুসমি বললে, তুমি বড্ড বানিয়ে কথা বল। একটা সত্যিকার গল্প শোনাও-না।

আমি বললুম, জগতে দুরকম পদার্থ আছে। এক হচ্ছে সত্য, আর হচ্ছে—আরও-সত্য। আমার কারবার আরও-সত্যকে নিয়ে।

দাদামশায়, সবাই বলে, তুমি কী যে বল কিছু বোঝাই যায় না।

আমি বললুম, কথাটা সত্যি, কিন্তু যারা বোঝে না সেটা তাদেরই দোষ।

আরও-সত্যি কাকে বলছ একটু বুঝিয়ে বলো-না।

আমি বললুম, এই যেমন তোমাকে সবাই কুসমি বলে জানে। এই কথাটা খুবই সত্য ; তার হাজার প্রমাণ আছে। আমি কিন্তু সন্ধান পেয়েছি যে, তুমি পরীস্থানের পরী। এটা হল আরও-সত্য।

খুশি হল কুসমি। বলল, আচ্ছা, সন্ধান পেলে কী করে।

আমি বললুম, তোমার ছিল একজামিন, বিছানার উপরে বসে বসে ভূগোলবৃত্তান্ত মুখস্থ করছিলে, কখন তোমার মাথা ঠেকল বালিশে, পড়লে ঘুমিয়ে। সেদিন ছিল পূর্ণিমার রাত্রি। জানলার ভিতর দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়ল তোমার মুখের উপরে, তোমার আসমানি রঙের শাড়ির উপরে। আমি সেদিন স্পষ্ট দেখতে পেলুম, পরীস্থানের রাজা চর পাঠিয়েছে তাদের পলাতকা পরীর খবর নিতে। সে এসেছিল আমার জানলার কাছে, তার সাদা চাদরটা উড়ে পড়েছিল ঘরের মধ্যে। চর দেখল তোমাকে আগাগোড়া, ভেবে পেল না তুমি তাদের সেই পালিয়ে-আসা পরী কি না। তুমি এই পৃথিবীর পরী ব'লে তার সন্দেহ হল। তোমাকে মাটির কোল থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে সহজ হবে না। এত ভার সইবে না। ক্রমে চাঁদ উপরে উঠে গেল, ঘরের মধ্যে ছায়া পড়ল, চর শিশুগাছের ছায়ায় মাথা নেড়ে চলে গেল। সেদিন আমি খবর পেলুম, তুমি পরীস্থানের পরী, পৃথিবীর মাটির ভারে বাঁধা পড়ে গেছ।

কুসমি বললে, আচ্ছা দাদামশায়, আমি পরীস্থান থেকে এলুম কী করে।

আমি বললুম, সেখানে একদিন তুমি পারিজাতের বনে প্রজাপতির পিঠে চড়ে উড়ে বেড়াচ্ছিলে, হঠাৎ তোমার চোখে পড়ল দিগন্তের ঘাটে এসে ঠেকেছে একটা খেয়ানৌকো। সেটা সাদা মেঘ দিয়ে গড়া, হাওয়া লেগে দুলছে। তোমার কী মনে হল, তুমি উঠে পড়লে সেই নৌকোয়। নৌকো চলল ভেসে, ঠেকল এসে পৃথিবীর

ঘাটে, তোমার মা নিলেন কুড়িয়ে।

কুসমি ভারি খুশি হয়ে বললে হাততালি দিয়ে, দাদামশায়, আচ্ছা, এ কি সত্যি।

আমি বললুম, ঐ দেখো, কে বললে সত্যি। আমি কি সত্যিকে মানি। এ হল আরও-সত্যি।

কুসমি বললে, আচ্ছা, আমি কি পরীস্থানে ফিরে যেতে পারব না।

আমি বললুম, পারতেও পার, যদি তোমার স্বপ্নের পালে পরীস্থানের হাওয়া এসে লাগে।

আচ্ছা, যদি হাওয়া লাগে তবে কোন্ রাস্তায় কোথা দিয়ে কোথায় যাব। সে কি অনে—ক দূরে।

আমি বললুম, সে খুব কাছে।

কত কাছে।

যত কাছে তুমি আছ আর আমি আছি। ঐ বিছানার বাইরে যেতে হবে না। আর-একদিন জানলা দিয়ে পড়ুক এসে জ্যোৎস্না ; এবার যখন তুমি তাকিয়ে দেখবে বাইরে, তোমার আর সন্দেহ হবে না। তুমি দেখবে জ্যোৎস্নার স্রোত বেয়ে মেঘের খেয়ানৌকো এসে পৌঁচচ্ছে। কিন্তু, তুমি যে এখন পৃথিবীর পরী হয়েছ, ও নৌকোয় তোমার কুলোবে না। এখন তুমি তোমার দেহ ছেড়ে বেরিয়ে যাবে, কেবল তোমার মন থাকবে তোমার সাথি। তোমার সত্য থাকবে এই পৃথিবীতে প'ড়ে আর তোমার আরও-সত্য যাবে কোথায় ভেসে, আমরা কেউ তার নাগাল পাব না।

কুসমি বললে, আচ্ছা, এবারে পূর্ণিমারাত এলে আমি ঐ আকাশের পানে তাকিয়ে থাকব। দাদামশায়, তুমি কি আমার হাত ধরে যাবে।

আমি বললুম, আমি এইখানে বসে বসে পথ দেখিয়ে দিতে পারব। আমার সেই ক্ষমতা আছে— কেননা আমি সেই আরও-সত্যের কারবারি।

*

* *

যেটা তোমায় লুকিয়ে-জানা সেটাই আমার পেয়ার,
বাপ মা তোমায় যে নাম দিল থোড়াই করি কেয়ার।
সত্য দেখায় যেটা দেখি তারেই বলি পরী,
আমি ছাড়া কজন জানে তুমি যে অপ্সরী।

কেটে দেব বাঁধা নামের বন্দীর শৃঙ্খল,
সেই কাজেতেই লেগে গেছি আমরা কবির দল—
কোনো নামেই কোনো কালে কুলোয় নাকো যারে
তাহার নামের ইশারা দেই ছন্দের ঝংকারে।

আরও-সত্য

দাদামশায়, সেদিন তুমি যে আরও-সত্যির কথা বলছিলে, সে কি কেবল পরীস্থানেই দেখা যায়।

আমি বললুম, তা নয় গো, এ পৃথিবীতেও তার অভাব নেই। তাকিয়ে দেখলেই হয়। তবে কিনা সেই দেখার চাউনি থাকা চাই।

তা, তুমি দেখতে পাও?

আমার ঐ গুণটাই আছে, যা না দেখবার তাই হঠাৎ দেখে ফেলি। তুমি যখন বসে বসে ভূগোল-বিবরণ মুখস্থ কর তখন মনে পড়ে যায় আমার ভূগোল পড়া। তোমার ঐ ইয়াংসিকিয়াং নদীর কথা পড়লে চোখের সামনে যে জ্যোগ্রাফি খুলে যেত তাকে নিয়ে এক্‌জামিন পাশ করা চলে না। আজও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সারি সারি উট চলেছে রেশমের বস্তা নিয়ে। একটা উটের পিঠে আমি পেয়েছিলুম জায়গা।

সে কী কথা দাদামশায়। আমি জানি, তুমি কোনোদিন উটে চড় নি।

ঐ দেখো দিদি, তুমি বড়ো বেশি প্রশ্ন কর।

আচ্ছা, তুমি বলে যাও। তার পরে? উট পেলে তুমি কোথা থেকে।

ঐ দেখো, আবার প্রশ্ন। উট পাই বা না পাই, আমি চ'ড়ে বসি। কোনো দেশে যাই বা না যাই, আমার ভ্রমণ করতে বাধে না। ওটা আমার স্বভাব।

তার পরে কী হল।

তার পরে কত শহর গেলেম পেরিয়ে— ফুচুং, ক্যাংচাও, চুংকুং; কত মরুভূমির ভিতর দিয়ে গিয়েছি রাত্তির বেলায় তারা দেখে রাস্তা চিনে চিনে। গেলুম উস্‌খুস্ পাহাড়ের তরাইয়ে। জলপাইয়ের বন দিয়ে, আঙুরের খেত দিয়ে, পাইন গাছের ছায়া দিয়ে। পড়েছিলুম ডাকাতের হাতে, সাদা ভালুক সামনে দাঁড়িয়েছিল দুই থাবা তুলে।

আচ্ছা, এত যে তুমি ঘুরে বেড়ালে, সময় পেলে কখন।

যখন ক্লাশসুদ্ধ ছেলে খাতা নিয়ে পরীক্ষা দিচ্ছিল।

তুমি পরীক্ষায় পাশ করলে তা হলে কী করে।

ওর সহজ উত্তর হচ্ছে— আমি পাশ করি নি।

আচ্ছা, তুমি বলে যাও।

এর কিছুদিন আগে আমি আরব্য উপন্যাসে চীনদেশের রাজকন্যার কথা পড়েছি, বড়ো সুন্দরী তিনি। আশ্চর্যের কথা কী আর বলব, সেই রাজকন্যার সঙ্গেই আমার হল দেখা। সেটা ঘটেছিল ফুচাও নদীর ঘাটে। সাদা পাথর দিয়ে বাঁধানো ঘাট, উপরে নীল পাথরের মণ্ডপ। দুই ধারে দুই চাঁপা গাছ, তার তলায় দুই পাথরের সিংহের মূর্তি। পাশে সোনার ধুনুচি থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে ধোঁয়া। একজন দাসী পাখা করছিল, একজন চামর দোলাচ্ছিল, একজন দিচ্ছিল চুল বেঁধে। আমি কেমন করে পড়ে গেলুম তাঁর সামনে। রাজকন্যা তখন তাঁর দুধের মতো সাদা ময়ূরকে দাড়িমের দানা খাওয়াচ্ছিলেন, চমকে উঠে বললেন, কে তুমি।

সেই মুহূর্তেই ফস্ করে আমার মনে প'ড়ে গেল যে, আমি বাংলাদেশের রাজপুত্তুর।

সে কী কথা। তুমি তো—

ঐ দেখো, আবার প্রশ্ন? আমি বলছি, সেদিন ছিলুম বাংলাদেশের রাজপুত্তুর, তাই তো বেঁচে গেলুম। নইলে সে তো দূর ক'রে তাড়িয়ে দিত আমাকে। তা না করে দিলে সোনার পেয়ালায় চা খেতে। চন্দ্রমল্লিকার সঙ্গে মেশানো সেই চা, গন্ধে আকুল করে দেয়।

তা হলে কি তোমাকে বিয়ে করল নাকি।

দেখো, ওটা বড়ো গোপন কথা। আজ পর্যন্ত কেউ জানে না।

কুসমি হাততালি দিয়ে বলে উঠল, বিয়ে নিশ্চয়ই হয়েছিল, খুব ঘটা করে হয়েছিল।

দেখলুম বিয়েটা না হলে ও বড়ো দুঃখিত হবে।—শেষকালে হল বিয়ে। হ্যাংচাও শহরের আদ্ধেক রাজত্ব আর শ্রীমতী আংচনী দেবীকে লাভ করলুম। ক'রে—

করে কী হল। আবার বুঝি সেই উটে চড়ে বসলে?

নইলে এখানে ফিরে এসে দাদামশায় হলেম কী করে। হ্যাঁ, চড়েছিলুম— সে উট কোথাও যায় না। মাথার উপর দিয়ে ফুস্থং পাখি গান গেয়ে চলে গেল।

ফুস্থং পাখি? সে কোথায় থাকে।

কোথাও থাকে না; কিন্তু তার লেজ নীল, তার ডানা বাসন্তী, তার ঘাড়ের কাছে বাদামি, ওরা দলে দলে উড়ে গিয়ে বসল হাচাং গাছে।

হাচাং গাছের তো আমি নাম শুনি নি।

আমিও শুনি নি, তোমাকে বলতে বলতে এইমাত্র মনে পড়ল। আমার ঐ দশা, আমি আগে থাকতে তৈরি হই নে। তখনি তখনি দেখি, তখনি তখনি বলি। আজ আমার ফুস্থং পাখি উড়ে চলে গেছে সমুদ্রের আর-এক পারে। অনেকদিন তার কোনো খবর নেই।

কিন্তু, তোমার বিয়ের কী হল। সেই রাজকন্যা?

দেখো, চুপ করে যাও। আমি কোনো জবাব দেব না। আর তা ছাড়া, তুমি দুঃখ কোরো না, তখনও তুমি জন্মাও নি— সে কথা মনে রেখো।

*

* *

আমি যখন ছোটো ছিলুম, ছিলুম তখন ছোটো;
আমার ছুটির সঙ্গী ছিল ছবি আঁকার পোটো।
বাড়িটা তার ছিল বুঝি শঙ্খী নদীর মোড়ে,
নাগকন্যা আসত ঘাটে শাঁখের নৌকো চ'ড়ে।
চাঁপার মতো আঙুল দিয়ে বেণীর বাঁধন খুলে
ঘন কালো চুলের গুচ্ছে কী ঢেউ দিত তুলে।
রৌদ্র-আলোয় ঝলক দিয়ে বিন্দুবারির মতো
মাটির 'পরে পড়ত ঝরে মুক্তা মানিক কত।
নাগকেশরের তলায় ব'সে পদ্মফুলের কুঁড়ি
দূরের থেকে কে দিত তার পায়ের তলায় ছুঁড়ি।
একদিন সেই নাগকুমারী ব'লে উঠল, কে ও।
জবাব পেলে, দয়া ক'রে আমার বাড়ি যেয়ো।

রাজপ্রাসাদের দেউড়ি সেথায় শ্বেত পাথরে গাঁথা,
মণ্ডপে তার মুক্তাঝালর দোলায় রাজার ছাতা।
ঘোড়সওয়ারি সৈন্য সেথায় চলে পথে পথে,
রক্তবরন ধ্বজা ওড়ে তিরিশঘোড়ার রথে।
আমি থাকি মালঞ্চেতে রাজবাগানের মালী,
সেইখানেতে যূথীর বনে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালি।
রাজকুমারীর তরে সাজাই কনকচাঁপার ডালা,
বেণীর বাঁধন-তরে গাঁথি শ্বেতকরবীর মালা।
মাধবীতে ধরল কুঁড়ি, আর হবে না দেরি—
তুমি যদি এস তবে ফুটবে তোমায় ঘেরি।
উঠবে জেগে রঙনগুচ্ছ পায়ের আসনটিতে,
সামনে তোমার করবে নৃত্য ময়ূর-ময়ূরীতে।
বনের পথে সারি সারি রজনীগন্ধায়
বাতাস দেবে আকুল ক'রে ফাগুনি সন্ধ্যায়।
বলতে বলতে মাথার উপর উড়ল হাঁসের দল,
নাগকুমারী মুখের 'পরে টানল নীলাঞ্চল।
ধীরে ধীরে নদীর 'পরে নামল নীরব পায়ে,
ছায়া হয়ে গেল কখন চাঁপাগাছের ছায়ে।
সন্ধ্যামেঘের সোনার আভা মিলিয়ে গেল জলে।
পাতল রাত্রি তারা-গাঁথা আসন শূন্যতলে।

ম্যানেজারবাবু

আজ তোমাকে যে গল্পটা বলব মনে করেছি সেটা তোমার ভালো লাগবে না।

তুমি বললেও ভালো লাগবে না কেন।

যে লোকটার কথা বলব সে চিতোর থেকে আসে নি কোনো রানা-মহারানার দল ছেড়ে—

চিতোর থেকে না এলে বুঝি গল্প হয় না?

হয় বই-কি— সেইটাই তো প্রমাণ করা চাই। এই মানুষটা ছিল সামান্য একজন

জমিদারের সামান্য পাইক। এমন-কি, তার নামটাই ভুলে গেছি। ধরে নেওয়া যাক সুজনলাল মিশির। একটু নামের গোলমাল হলে ইতিহাসের কোনো পণ্ডিত তা নিয়ে কোনো তর্ক করবে না।

সেদিন ছিল যাকে বলে জমিদারি সেরেস্তার 'পুণ্যাহ', খাজনা-আদায়ের প্রথম দিন। কাজটা নিতান্তই বিষয়-কাজ। কিন্তু, জমিদারি মহলে সেটা হয়ে উঠেছে একটা পার্বণ। সবাই খুশি— যে খাজনা দেয় সেও, আর যে খাজনা বাক্সতে ভর্তি করে সেও। এর মধ্যে হিসেব মিলিয়ে দেখবার গন্ধ ছিল না। যে যা দিতে পারে তাই দেয়, প্রাপ্য নিয়ে কোনো তকরার করা হয় না। খুব ধুমধাম, পাড়াগেঁয়ে সানাই অত্যন্ত বেসুরে আকাশ মাতিয়ে তোলে। নতুন কাপড় প'রে প্রজারা কাছারিতে সেলাম দিতে আসে। সেই পুণ্যাহের দিনে ঢাক ঢোল সানাইয়ের শব্দে জেগে উঠে ম্যানেজারবাবু ঠিক করলেন, তিনি স্নান করবেন দুধে। চারি দিকে সমারোহ দেখে হঠাৎ তাঁর মনে হল, তিনি তো সামান্য লোক নন। সামান্য জলে তাঁর অভিষেক কী করে হবে। ঘড়া ঘড়া দুধ এল গোয়ালা প্রজাদের কাছ থেকে। হল তাঁর স্নান। নাম বেরিয়ে গেল চারি দিকে; সেদিন তিনি সন্ধ্যাবেলায় খুশিমনে বাসার রোয়াকে ব'সে গুড়গুড়ি টানছেন, এমন সময় মিশির সর্দার, ব্রাহ্মণের ছেলে লাঠিখেলা নিয়ে খুব নাম করেছে, বললে, হুজুর আপনার নিমক তো খেয়েছি অনেককাল, কিন্তু অনেক-দিন বসে আছি, আমাকে তো কাজে লাগালেন না। যদি কিছু করবার থাকে তো হুকুম করুন।

ম্যানেজার গুড়গুড়ি টানতে লাগলেন। মনে পড়ে গেল একটা কাজের কথা। জসিম মণ্ডল চর মহলের প্রজা, তার খেত ছিল পাশের জমিদারের সীমানা-ঘেঁষা। ফসল জন্মালেই প্রতিবেশী জমিদার লোকজন নিয়ে প্রজাকে আট্‌কাত। দায়ে পড়ে জসিমের দুই জমিদারেরই খাতায় আর দু জায়গাতেই খাজনা দিয়ে ফসল সামলাতে হত। যে ম্যানেজার দুধে স্নান করেন এটা তাঁর ভালো লাগে নি। এ বছরের জলিধানের ফসল কাটবার সময় আসছে— এটা চরের বিশেষ ফসল। চরের জমির জল নেমে গেলেই কৃষাণ পলিমাটিতে বীজ ছিটিয়ে দেয়, শ্রাবণ ভাদ্র মাসে ফসল গোলায় তোলে। এ বছরটা ছিল ভালো; ধানের শিষে সমস্ত মাঠ হি হি করছে। এবারকার ফসল বেদখল হলে ভারি লোকসান।

ম্যানেজার বললেন, সর্দার, একটা কাজ আছে। জসিমের জমিতে তোমাকে ধান আগলাতে হবে। একা তোমারই উপরে ভার। দেখব কেমন মরদ তুমি।

ম্যানেজার তখনও দুধের স্নানের গুমোর হজম করে উঠতে পারেন নি। মিশিরকে হুকুম দিয়ে গুড়গুড়ি টানতে লাগলেন।

ধান কাটার সময় এল। দিন নেই, রাত নেই, মিশির জমিমের খেতে পাহারা দেয়।

একদিন ভরা খেতে অন্য পক্ষের লোক হল্লা ক'রে এল, মিশির বুক ফুলিয়ে বললে, বাবা-সকল, আমি থাকতে এ ধান তোমাদের ঘরে উঠবে না। সেলাম ঠুকে চলে যাও।

মিশির যত বড়ো সর্দার হোক, সেদিন সে একলা। যখন তাকে ঘেরাও করলে সে গুটিসুটি মেরে ব'সে সবাইকে আট্‌কাতে লাগল।

অপর পক্ষের লোক বললে, দাদা, পারবে না। কেন প্রাণ দেবে।

মিশির বললে, নিমক খেয়েছি, প্রাণ যায় যাক ; নিমকের মান রাখতেই হবে।

চলল দাঙ্গা— শুধু লাঠির মার হলে হয়তো মিশির ঠেকাতেও পারত। অপর পক্ষ শড়কি চালালো। একটা এসে বিঁধল মিশিরের পায়ে।

অপর পক্ষ আবার তাকে সতর্ক করে বললে, আর কেন। এবার ক্ষান্ত দে ভাই।

মিশির বললে, মিশির সর্দার প্রাণের ভয় করে না, ভয় করে বেইমানির।

শেষকালে একটা শড়কি এসে বিঁধল তার পেটে। এটা হল মরণের মার। পুলিশের হাতে পড়বার ভয়ে অপর পক্ষ পালাবার পথ দেখলে। মিশির শড়কি টেনে উপড়ে, পেটে চাদর জড়িয়ে ছুটল তাদের পিছন-পিছন। বেশি দূরে যেতে পারলে না। পড়ে গেল মাটিতে।

পুলিশ এল। মিশির জমিদারকে বাঁচাবার জন্য, তাঁর নামও করলে না। বললে, আমি জমিমের চাকরি নিয়ে তার ধান আগলাচ্ছিলুম।

ম্যানেজার সব খবর পেলেন। গুড়গুড়ি লাগলেন টানতে।

তাঁর দুধের স্নানের খ্যাতি— এ তো যে-সে লোকের কর্ম নয়। কিন্তু, নিমক খেয়েছে যখন তখন প্রাণ দেওয়া— এটা এতই কী আশ্চর্য। এমন তো ঘটেই থাকে। কিন্তু, দুধে স্নান!

*

* *

তুমি ভাবো এই-যে বোঁটা
কিছুই বুঝি নয়কো ওটা,
ফুলের গুমোর সবার চেয়ে বড়ো—
বিমুখ হয়ে আজ যদি ও
আলগা করে বাঁধন স্বীয়
তখনি ফুল হয় যে পড়ো-পড়ো।
বোঁটাই ওকে হাওয়ায় নাচায়,
অপমানের থেকে বাঁচায়,
ধরে রাখে সূর্যালোকের ভোজে;
বুক ফুলিয়ে দেয় না দেখা,
গোপনে রয় একা একা,
নিচু হয়ে সবার উপর ও যে।
বনের ও তো আদুরে নয়,
শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়,
গায়েতে ওর নাইকো অলংকার;
রস জোগায় সে চুপে চুপে,
থাকে নিজে নীরস রূপে,
আপন জোরে বহে আপন ভার।
কাঁটা যখন উঁচিয়ে থাকে
অহিংস্র কেউ কয় না তাকে—
যতই কিন্তু করুক-না বদনাম,
পশুর কামড় থেকে যারে
বাঁচিয়ে রাখে বারে বারে
সেই তো জানে কাঁটার কত দাম।

বাচস্পতি

দাদামশায়, তুমি তোমার চার দিকে যেসব পাগলের দল জমিয়েছিলে, গুণ হিসেব ক'রে তাদের বুঝি সব নম্বর দিয়ে রেখেছিলে ?

হ্যাঁ, তা করতে হয়েছে বই-কি। কম তো জমে নি।

তোমার পয়লা নম্বর ছিলেন বাচস্পতি মশায়, তাঁকে আমার ভারি মজা লাগে।

আমার শুধু মজা লাগে না, আশ্চর্য লাগে। কারণ বলি— কবিতা লিখে থাকি। কথা বাঁকানো-চোরানো আমাদের ব্যাবসা। যে শব্দের কোনো সাদা মানে আছে তাকে আমরা ধ্বনি লাগিয়ে তার চেহারা বদল করি। সে এক রকমের জাদুবিদ্যা বললেই হয়। কাজটা সহজ নয়। আমাদের বাচস্পতি আমাকে আশ্চর্য করে দিয়েছিলেন যখন দেখলুম তিনি একেবারে গোড়াগুড়ি ভাষা বানিয়েছেন। কান দিয়ে ধ্বনির রাস্তায় তার মানের রাস্তা খুঁজতে হয়। আমাদের কাজটাও অনেকটা তাই, কিন্তু এতদূর পর্যন্ত নয়। আমরা তবু ব্যাকরণ অভিধান মেনে চলি। বাচস্পতির ভাষা চলত সে-সমস্তই ডিঙিয়ে। শুনলে মনে হত যেন কী একটি মানে আছে!— মানে ছিল বই-কি। কিন্তু, সেটা কানের সঙ্গে ধ্বনি মিলিয়ে আন্দাজ করতে হত। আমার 'অদ্ভুত-রত্নাকর' সভার প্রধান পণ্ডিত ছিলেন বাচস্পতি মশায়। প্রথম বয়সে পড়াশুনা করেছিলেন বিস্তর, তাতে মনের তলা পর্যন্ত গিয়েছিল ঘুলিয়ে। হঠাৎ এক সময়ে তাঁর মনে হল, ভাষার শব্দগুলো চলে অভিধানের আঁচল ধ'রে। এই গোলামি ঘটেছে ভাষার কলিযুগে। সত্যযুগে শব্দগুলো আপনি উঠে পড়ত মুখে। সঙ্গে সঙ্গেই মানে আনত টেনে। তিনি বলতেন, শব্দের আপন কাজই হচ্ছে বোঝানো, তাকে আবার বোঝাবে কে। একদিন একটা নমুনা শুনিয়ে তাক্ লাগিয়ে দিলেন। বললেন, আমার নায়িকা যখন নায়ককে বলেছিল হাত নেড়ে 'দিন রাত তোমার ঐ হিদ্‌হিদ্‌ হিদিক্কারে আমার পাঁজঝুরিতে তিড়িতঙ্ক লাগে', তখন তার মানে বোঝাতে পণ্ডিতকে ডাকতে হয় নি। যেমন পিঠে কিল মেরে সেটাকে কিল প্রমাণ করতে মহামহোপাধ্যায়ের দরকার হয় না।

সভাপতি একদিন বিষয়টা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, ওহে বাচস্পতি, সেই ছেলেটার কী দশা হল।

বাচস্পতি বললেন, সে ছেলেটার বুঝকিন্ গোড়া থেকেই ছিল বুঝকুমুল গোছের।

তার নাম দিয়েছিলাম বিচ্‌কুম্‌কুর।

মথুরবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ও নামটা কেন।

বাচস্পতি বললেন, সে যে একেবারেই বিচ্‌কুম্‌কুর। পাঠশালার পেডেণ্ডোকে দেখলেই তার আন্‌তারা যেত ফুস্‌কলিয়ে। বুকের ভিতরে করতে থাকত কুড়ুকুর কুড়ুকুর। এমন ছেলেকে বেশি পড়ালে সে একেবারেই ফুস্‌কে যাবে, এ কথাটা বলেছিল পাড়ার সবচেয়ে যে ছিল পেড়াম্বর হুড়ুমুকি। একটু রসুন— বুঝিয়ে বলি। পেডেণ্ডো কথাটা বালিদ্বীপের কাছে পেয়েছি। তাদের মুখের পণ্ডিত শব্দটা আপনিই হয়ে উঠেছে পেডেণ্ডো। ভেবে দেখুন, কত বড়ো ওজন, ওর বিদ্যের বোঝা ঠেলে নিয়ে যেতে দশবিশ জন ডিগ্রিধারী জোয়ানের দরকার হয়। আর পণ্ডিত— ছোঃ, তুড়ি দিয়ে তুড়তুড়ুং ক'রে উড়িয়ে দেওয়া যায়।

অটলদা বললেন, বাচস্পতি, তোমার আজকেকার বর্ণনাটা যে একেবারেই চলতি গ্রাম্যভাষায়। এ তোমাকে মানায় না। সেই সেদিন যে সাধুভাষা বেরিয়েছিল তোমার মুখ দিয়ে, যার সঞ্চংস্বনিত হাদিকো বুদবুধিদের মন তিংতিড়ি তিংতিড়ি ক'রে ওঠে, সেই ভাষার একটু নমুনা আজ এদের শুনিয়ে দাও। যে ভাষায় ভারতের ইতিহাসটি গেঁথেছ, যার গুরুভার হিসেব ক'রে বলেছিলে ভুভুম্মানিত ভাষা, তার পরিচয়টা চাই। শুনে এদের সকলের আন্‌তারা কাঁচ্‌কলিয়ে যাক।

বাচস্পতি মশায় শুরু করলেন, সম্মম্মরাট সমুদ্রগুপ্তের ক্রেক্ষটাক্ষ ঋরিংভ্রম্যন্ত পর্যুগাসন উত্থুংসিত—

একজন সভাসদ বললেন, বাচস্পতি মশায়, উত্থুংসিত কথাটা শোনাচ্ছে ভালো, ওর মানেটা বুঝিয়ে দিন।

পণ্ডিতজি বললেন, ওর মানে উত্থুংসিত।

তার মানে?

তার মানে উত্থুংসিত।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ, তার মানে হতেই পারে না। মেয়েকেটে একটা মানে দিতেও পারি।

কী রকম।

ভিরভ্রিংগট্ট।

আর বলতে হবে না, স্পষ্ট বুঝেছি, ব'লে যান।

বাচস্পতি আবার শুরু করে দিলেন, সম্মম্মরাট সমুদ্রগুপ্তের ক্রেক্ষটাক্ষ ঋরিংভ্রম্যন্ত পর্যুগাসন উত্থুংসিত নিরংকরালের সহিত—

মথুরবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, কেমন মশায়, বুঝেছেন তো নিরংকরাল—

একেবারে জলের মতো। ওর চেয়ে বেশি বুঝতে চাই নে— মুশকিল হবে।

বাচস্পতি আবার ধরলেন, নিরংকরালের সহিত অজাতশক্র অপরিপর্যস্মিত গর্গরায়ণকে পরমস্তি শয়নে সমুসদ্গারিত করিয়াছিল।

এই পর্যন্ত ব'লে বাচস্পতি মশায় একবার সভাস্থ সকলের মুখের দিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন। বললেন, দেখুন একবার, সহজ কাকে বলে। অভিধানের প্রয়োজনই হয় না।

সভার লোকেরা বললে, প্রয়োজন হলেই বা পাব কোথায়।

বাচস্পতি মশায় একটু চোখ টিপে বললেন, ভাবখানা বুঝেছেন তো ?

মথুরবাবু বললেন, বুঝেছি বই-কি। সমুদ্রগুপ্ত অজাতশক্রকে আচ্ছা করে পিটিয়ে দিয়েছিলেন। আহা, বাচস্পতি মশায়, লোকটাকে একেবারে সমুসদ্গারিত করে দিলে গো— একেবারে পরমস্তি শয়নে।

বাচস্পতি বললেন, ছোটোলাট একবার এসেছিলেন আমাদের পাড়ার স্কুলে বুটের ধুলো দিয়ে যেতে। তখন আমি তাঁকে এই বুগবুলবুলি ভাষার একটা ইংরেজি তর্জমা শুনিয়েছিলুম।

সভাস্থ সকলেই বললেন, ইংরেজিটা শোনা যাক।

বাচস্পতি পড়ে গেলেন, দি হাব্বারফ্লুয়াস ইন্‌ফ্যাচুফুয়েশন অব আকবর ডর্বেঙ্গি-ক্যালি ল্যাসেরটাইজড্ দি গর্ব্যাণ্ডিজম্ অফ হুমায়ুন।— শুনে ছোটোলাট একেবারে টরেটম্ বনে গিয়েছিলেন ; মুখ হয়েছিল চাপা হাসিতে ফুস্‌কায়িত। হেড পেডেণ্ডোর টিকির চার ধারে ভেরেণ্ডম্ লেগে গেল, সেক্রেটারি চৌকি থেকে তড়তং করে উৎখিয়ে উঠলেন। ছেলেগুলোর উজবুম্মুখো ফুড়ফুড়োমি দেখে মনে হল, তারা যেন সব ফিরিচুঙ্কুসের একেবারে চিক্‌চাকস্ আমদানি। গতিক দেখে আমি চংচটকা দিলুম।

সভাপতি বললেন, বাচস্পতি, এইখানেই ক্ষান্ত দাও হে, আর বেশিক্ষণ চললে পরাগগলিত হয়ে যাব। এখনি মাথাটার মধ্যে তাজ্ঝিম্ মাজ্ঝিম্ করছে।

বাচস্পতি আর কিছুদিন বেঁচে থাকলে সভাপতির ভাষা এতদিনে ওঁদের মুখবুদ্‌বুদী শব্দে রঝম্ গঝম্ করে উঠত।

*

* *

যার যত নাম আছে সব গড়া-পেটা,
যে নাম সহজে আসে দেওয়া যাক সেটা।

এই ব'লে কাউকে সে ডাকে বুজ্‌কুল,
আদ্‌রুম ডাকত সে যে ছিল অতুল।
মোতিরাম দাস নিল নাম মুচকুস,
কাশিরাম মিত্তির হল পুচফুস।
পাশগাড়ি নাম নিল পাঁচকড়ি ঘোষ,
আজ হতে বাজ্‌রাই হল আশুতোষ।
ভুষকুড়ি রায় হল শ্রীমজুমদার,
কুর্দম হয়ে গেল যে ছিল কেদার।
যেদিন যূথীরে নাম দিল ভুজকুশি,
সেদিন স্বামীর সাথে হল ঘুষোঘুষি।
পিচকিনি নাম দিল যবে ললিতারে
দাদা এসে রাস্‌কেল ব'লে গেল তারে।
মিঠে মিঠে নাম যত মানে দিয়ে ঘেরা,
সে বলত, ভাবীকালে রবে না তো এরা—
পিত্ত নাশিবে নাম যদি হয় তিতো,
ভূজকালি নাম দেখো আমি নিয়েছি তো।
পাড়ার লোকেরা বলে ঘিরে তার বাড়ি,
ভাবীকালে পৌঁছিয়ে দিব তবে গাড়ি।
বেচারা গতিক দেখে দিল মুখ ঢাকা,
পিছে পিছে তাড়া করে মেসো আর কাকা।
দিয়েছিল যে মেয়ের নাম উজকুড়ি,
সঙ্গে উকিল নিয়ে এল তার খুড়ি।
শুনলে সে কেস্‌ হবে ডিফামেশনের,
ছেড়ে দিলে কাজ নাম-পরিবেশনের।

পান্নালাল

দাদামশায়, তোমার পাগলের দলের মধ্যে পান্নালাল ছিল খুব নতুন রকমের।

জান, দিদি? পাগলরা প্রত্যেকেই নতুন, কারও সঙ্গে কারও মিল হয় না। যেমন তোমার দাদামশায়। বিধাতার নতুন পরীক্ষা। ছাঁচ তিনি ভেঙে ফেলেন।

সাধারণ লোকের বুদ্ধিতে মিল হয়, অসাধারণ পাগলের মিল হয় না। তোমাকে একটা উদাহরণ দেখাই।—

আমার দলে একজন পাগল ছিল, তার নাম ত্রিলোচন দাস। সে তিন ক্রোশ পথ না ঘুরে কখনো বাড়ি যেত না।

জিজ্ঞাসা করলে বলত, বাবা, যমের চর চার দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের ফাঁকি দিতে না পারলে রক্ষে নাই। জান তো, আমার বাবা ছিলেন কী রকম একগুঁয়ে মানুষ? পাগল বললেই হয়। কোনোমতেই আমার পরামর্শ মানতেন না। বরাবর তিনি সিধে রাস্তায় বাড়ি গিয়েছেন— তার পরে জান তো? আজ তিনি কোথায়। আর, আমি আজ সাত বছর ধরে পশ্চিমমুখো রাস্তা ধরে আমার পুবের দিকের বাড়িতে যাই। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলি, ভোজুয়গুলের বাড়িতে আমার পুজোর নেমন্তন্ন।

জগতে যত বুদ্ধিমান আছে সকলেই সিধে রাস্তায় বাড়ি যায়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কেবল একজন আছে যে বাড়ি যেতে তিন ক্রোশ পথ বেঁকে যায়।

আমার দুইনম্বরের কথা শোনো; সে বাচস্পতির কথা শুনে বলত, আহা, লোকটা একেবারে বেহেড হয়ে গেছে। আর, বাচস্পতি তার কথা শুনে মুখ টিপে হাসতেন; বলতেন, এই লোকটার মগজে আছে বুজগুমুলের বাসা।

প্রেসিডেন্ট্ বললেন, কী হে হাজরা, তোমার বাড়ির হয়েছিল কী।

এতকালের পৈতৃক ঘরটা পথের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিলে। এমন দৌড় মারলে, কোনো চিহ্ন রাখলে না কোথাও।

বল কী।—

আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ। কলকাতায় হয়েছি মানুষ, বাবার মৃত্যুর পর কিছু টাকা এল হাতে। ঠিক করলেম, পৈতৃক ভিটেটা একবার দেখে আসা দরকার। সেই ভিটের কথা এইটুকু মাত্র জানতুম— পাঁচকুণ্ডু গ্রামে ছিল তার ভিত, ভোজুঘাটার সাড়ে সাত ক্রোশ তফাতে। শুভদিন দেখে নৌকো করে পৌঁছলাম ভোজুঘাটায়। কেউ ঠিকানা বলতে পারলে না। চললেম খুঁজে বের করতে, মুদির দোকান থেকে চিঁড়ে মুড়কি নিলুম বেঁধে। সাত ক্রোশ পার হতে বাজল রাত্তির ন'টা। চার দিকে পোড়ো জমি, আগাছায় জঙ্গল, ভিটের কোনো চিহ্ন নাই। বারবার যাওয়া-আসা করেছি, ভিটে খুঁজে পাই নে। রাস্তার দোকানি আমাকে দেখে কী ভাবলে কে

জানে, দুর্দশার কথা শুনল আমার কাছে। বললে, এক কাজ করো বাপু, বোড়ো-গ্রামে বিখ্যাত গণৎকার মধুসূদন জ্যোতিষী কুষ্টি দেখে তোমার ভিটের খবর দিতে পারবেন।

কোথা থেকে তিনি খবর পেয়েছেন আমার হাতে কিছু মাল আছে। খুব ফূর্তি করে গণনায় বসে গেলেন। অনেক আঁকজোঁক কেটে শেষকালে বললেন, আপনার ঘরের সঙ্গে রাস্তার ঘোরতর মন-কষাকষি হয়ে গেছে; একেবারে মুখ-দেখাদেখি বন্ধ; ভিটে রেগে দৌড় মেরেছে মাসির বাড়িতে।

ব্যস্ত হয়ে বললেম, মাসির বাড়িটা কোথায়।

শুনে বিশ্বাস করবেন না, একেবারে সাত হাত মাটির নীচে। ঐখানে মানুষ হয়েছিল, ঐখানেই মুখ লুকিয়েছে।

তা হলে এখন উপায়?

আছে উপায়। আপনি যান কলকাতায় ফিরে, উপযুক্ত-মতো কিছু টাকা রেখে যান। ঠিক সাড়ে সাত মাস পরে ফিরে আসবেন। মাসিকে খুশি ক'রে আপনার পৈতৃক বাড়ি ফিরিয়ে আনব। কিন্তু, কিছু দক্ষিণা লাগবে।

আমি বললেম, তা যত লাগে লাগুক, আপনি ভাববেন না। পৈতৃক ভিটে আমার চাই।

আশ্চর্য জ্যোতিষীর বাহাদুরি। সাড়ে সাত মাস পরে ফিরে এসে ভোজুঘাটার থেকে মেপে ঠিক সাড়ে সাত ক্রোশ পেরলুম। যেখানে কিছু ছিল না সেখানে বাসাটা উঠেছে মাথা তুলে। আমি বললুম, কিন্তু গণকঠাকুর, বাসাটা যে ঠেকছে একেবারে চাঁছাপোঁছা নতুন?

গণকঠাকুর বললেন, হবে না? মাসির বাড়িতে খেয়েদেয়ে একেবারে চিক্‌চিকিয়ে উঠেছে!

আপনারা হাসাহাসি করছেন, কিন্তু এ একেবারে আমার স্বচক্ষে দেখা। আমকাঠের দরজাজানালা আর তালকাঠের কড়িবরগা। আমার কলেজি বন্ধুরা কথাটাকে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। আমার বালুকডাঙার বিখ্যাত পণ্ডিত হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীকে ডাকিয়ে আনলুম বিধান দিতে। তিনি বললেন, সংসারে সকলের চেয়ে বড়ো বিপদ হচ্ছে পথের সঙ্গে ঘরের আড়াআড়ি নিয়ে।

এর বেশি আর একটিও কথা বলতে চাইলেন না। আমি কলকাতার বন্ধুদের ঠেলা দিয়ে বললুম, কেমন!

পান্নালালের গল্পটা শুনে বাচস্পতি মুচকে হেসে বললেন, ভোরম্ভোল

*

* *

মাটি থেকে গড়া হয়, পুন হয় মাটি,
আবার গড়িতে তারে দিনরাত খাটি।
একই মসলায় তারে ভাঙে আর গড়ে,
পুরোনোটা বারে বারে নূতনেতে চড়ে।
গেছে যাহা তাও আছে, এই বিশ্বাসে
ফাঁকা যেথা সেথা মন ফিরে ফিরে আসে।

চন্দনী

জানোই তো সেদিন কী কাণ্ড। একেবারে তলিয়ে গিয়েছিলেম আর-কি, কিন্তু তলায় কোথায় যে ফুটো হয়েছে তার কোনো খবর পাওয়া যায় নি। না মাথা ধরা, না মাথা ঘোরা, না গায়ে কোথাও ব্যথা, না পেটের মধ্যে একটুও খোঁচাখুঁচির তাগিদ। যমরাজার চরগুলি খবর আসার সব দরজাগুলো বন্ধ করে ফিস্ ফিস্ ক'রে মন্ত্রণা করছিল। এমন সুবিধে আর হয় না! ডাক্তারেরা কলকাতায় নব্বই মাইল দূরে। সেদিনকার এই অবস্থা।

সন্ধে হয়ে এসেছে। বারান্দায় বসে আছি। ঘন মেঘ ক'রে এল। বৃষ্টি হবে বুঝি। আমার সভাসদ্‌রা বললে, ঠাকুরদা, একসময় শুনেছি তুমি মুখে মুখে গল্প ব'লে শোনাতে, এখন শোনাও না কেন।

আর-একটু হলেই বলতে যাচ্ছিলুম, ক্ষমতায় ভাঁটা পড়েছে ব'লে।

এমনসময় একটি বুদ্ধিমতী বলে উঠলেন, আজকাল আর বুঝি তুমি পার না?

এটা সহ্য করা শক্ত। এ যেন হাতির মাথায় অঙ্কুশ। আমি বুঝলুম, আজ আমার আর নিস্তার নেই। বললুম, পারি নে তা নয়— পারি। তবে কিনা—

বাকিটা আর বলা হল না। মনে মনে তখন রাজপুতনা থেকে গল্প তলপ করতে আরম্ভ করেছি। খানিকটা কাশলুম। একবার বললুম, রোসো, একবার একটুখানি দেখে আসি, কে যেন এল।

কেউ আসে নি। শেষকালে বসতে হল।

যমদূতগুলো মোটের উপরে হাঁদা। একটু নড়তে গেলেই ধুপধাপ ক'রে শব্দ করে, আর তাদের শেলশূল-ছুরিছোরাগুলো ঝন্‌ঝনিয়ে ওঠে। সেদিন কিন্তু একেবারে নিঃশব্দ।—

সন্ধ্যা হয়েছে, পথিক চলেছেন গোরুর গাড়িতে ক'রে। পরদিন সকালে রাজমহলে পৌঁছলে নৌকো নিয়ে তিনি যাত্রা করবেন পশ্চিমে। তিনি রাজপুত, তাঁর নাম অরিজিৎসিংহ। বাংলাদেশে ছোটো কোনো রাজার ঘরে সেনাপতির কাজ করতেন। ছুটি নিয়ে চলেছেন রাজপুতনায়। রাত্রি হয়ে এসেছে। গাড়িতে বসে বসে ঘুমিয়ে পড়েছেন। হঠাৎ একসময় জেগে উঠে দেখলেন, গাড়ি চলেছে বনের মধ্যে। গাড়োয়ানকে বললেন, ঘাটের রাস্তা ছেড়ে এখানে কেন।

গাড়োয়ান বললে, আমাকে চিনলেই বুঝবেন কেন।

তার পাগড়িটা অনেকখানি আড় ক'রে পরা ছিল। সোজা ক'রে পরতেই অরিজিৎ বললেন, চিনেছি। ডাকাতের সর্দার পরাক্রমসিংহের চর তুমি। অনেকবার তোমার হাতে পড়েছিলুম, এড়িয়ে এসেছি।

সে বললে, ঠিক ঠাওরেছেন, এবার এড়াতে পারছেন না। চলুন আমার মনিবের কাছে।

অরিজিৎ বললেন, উপায় নেই, যেতেই হবে। কিন্তু, তোমাদের ইচ্ছে পূর্ণ হবে না।

গাড়ি চলল বনের মধ্যে। এর আগের কথাটা এবার খুলে বলা যাক।—

অরিজিৎ বড়ো ঘরের ছেলে। মোগল সম্রাট তাঁর রাজ্য নিলে কেড়ে, তিনি এলেন বাংলাদেশে পালিয়ে। এখান থেকে তৈরি হয়ে একদিন তাঁর রাজ্য ফিরে নেবেন, এই ছিল তাঁর পণ। এ দিকে পরাক্রমসিং মুসলমানদের হাতে তাঁর বিষয়সম্পত্তি হারিয়ে ডাকাতের দল বানিয়েছিলেন। তাঁর মেয়ের বিবাহের বয়স হয়েছে; অরিজিতের সঙ্গে বিবাহ হয়, এই ছিল তাঁর চেষ্টা। কিন্তু, জাতিতে তিনি অরিজিতের সমান দরের ছিলেন না, তাঁর ঘরের মেয়েকে বিবাহ করতে অরিজিৎ রাজি নন।

রাত্রি ভোর হয়ে এসেছে। তাঁকে পরাক্রমের দরবারে এনে দাঁড় করালে পরাক্রম বললেন, ভালো সময়েই এসেছ, বিয়ের লগ্ন পড়বে আর দু দিন পরে। তোমার জন্য বরসজ্জা সব তৈরি।

অরিজিৎ বললেন, অন্যায় করবেন না। সকলেই জানে, আপনার গুষ্টিতে মুসলমান

রক্তের মিশল ঘটেছে।

পরাক্রম বললেন, কথাটা সত্য হতেও পারে, সেইজন্যেই তোমার মতো উচ্চ কুলের রক্ত মিশল ক'রে আমার বংশের রক্ত শুধরে নেবার জন্যে এতদিন চেষ্টা করেছি। আজ সুযোগ এল। তোমার মানহানি করব না। বন্দী করে রাখতে চাই নে, ছাড়া থাকবে। একটা কথা মনে রেখো, এই বন থেকে বেরোবার রাস্তা না জানলে কারোর সাধ্যি নেই এখান থেকে পালায়। মিছে চেষ্টা কোরো না, আর যা ইচ্ছা করতে পার।

রাত্রি অনেক হয়েছে। অরিজিতের ঘুম নেই, বসেছেন এসে কাশিনী নদীর ঘাটে বটগাছের তলায়। এমনসময় একটি মেয়ে, মুখ ঘোমটায় ঢাকা, তাঁকে এসে বললে, আমার প্রণাম নিন। আমি এখানকার সর্দারের মেয়ে। আমার নাম রঞ্জনকুমারী। আমাকে সবাই চন্দনী ব'লে ডাকে। আপনার সঙ্গে পিতাজি আমার বিবাহ অনেক দিন থেকে ইচ্ছা করেছেন। শুনলেম, আপনি রাজি হচ্ছেন না। কারণ কী বলুন আমাকে। আপনি কি মনে করেন আমি অস্পৃশ্য।

অরিজিৎ বললেন, কোনো মেয়ে কখনো অস্পৃশ্য হয় না, শাস্ত্রে বলেছে।

তবে কি আমাকে দেখতে ভালো নয় ব'লে আপনার ধারণা।

তাও নয়, আপনার রূপের সুনাম আমি দূর থেকে শুনেছি।

তবে আপনি কেন কথা দিচ্ছেন না।

অরিজিৎ বললেন, কারণটা খুলে বলি। করঞ্জরের রাজকন্যা নির্মলকুমারী আমার বহুদূর-সম্পর্কের আত্মীয়া। তাঁর সঙ্গে ছেলেবেলায় একসঙ্গে খেলা করেছি। তিনি আজ বিপদে পড়েছেন। মুসলমান নবাব তাঁর পিতার কাছে তাঁর জন্যে দূত পাঠিয়েছিলেন। পিতা কন্যা দিতে রাজি না হওয়াতে যুদ্ধ বেধে গেল। আমি তাঁকে বাঁচিয়ে আনব, ঠিক করেছি। তার আগে আর-কোথাও আমার বিবাহ হতে পারবে না, এই আমার পণ। করঞ্জর রাজ্যটি ছোটো, রাজার শক্তি অল্প। বেশি দিন যুদ্ধ চলবে না জানি, তার আগেই আমাকে যেতে হবে। চলেছিলেম সেই রাস্তায়, পথের মধ্যে তোমার পিতা আমাকে ঠেকিয়ে রাখলেন। কী করা যায় তাই ভাবছি।

মেয়েটি বললে, আপনি ভাববেন না। এখান থেকে আপনার পালাবার বাধা হবে না, আমি রাস্তা জানি। আজ রাত্রেই আপনাকে বনের বাহিরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেব। কিছু মনে করবেন না, আপনার চোখ বেঁধে নিয়ে যেতে হবে, কেননা এ বনের পথের সংকেত বাইরের লোককে জানতে দিতে চণ্ডেশ্বরীদেবীর মানা আছে; তা ছাড়া আপনার হাতে পরাব শিকল। তার যে কী দরকার পথেই জানতে পারবেন।

অরিজিৎ চোখবাঁধা হাতবাঁধা অবস্থায় ঘন বনের মধ্যে দিয়ে চন্দনীর পিছন-পিছন চললেন। সে রাত্রে ডাকাতের দল সবাই ভাঙ খেয়ে বেহোঁশ। কেবল পাহারায় যে সর্দার ছিল সেই ছিল জেগে। সে বললে, চন্দনী, কোথায় চলেছ।

চন্দনী বললে, দেবীর মন্দিরে।

ওই বন্দীটি কে।

বিদেশী, ওকে দেবীর কাছে বলি দেব। তুমি পথ ছেড়ে দাও।

সে বললে, একলা কেন।

দেবীর আদেশ, আর-কাউকে সঙ্গে নেওয়া নিষেধ।

ওরা বনের বাইরে গিয়ে পৌঁছল, তখন রাত্রি প্রায় হয়েছে ভোর। চন্দনী অরিজিৎকে প্রণাম করে বললে, আপনার আর ভয় নেই। এই আমার কঙ্কণ, নিয়ে যান, দরকার হলে পথের মধ্যে কাজে লাগতে পারে।

অরিজিৎ চললেন দূরপথে। নানা বিঘ্ন কাটিয়ে যতই দিন যাচ্ছে ভয় হতে লাগল, সময়মত হয়তো পৌঁছতে পারবেন না। বহুকষ্টে করঞ্জর রাজ্যের যখন কাছাকাছি গিয়েছেন খবর পেলেন, যুদ্ধের ফল ভালো নয়। দুর্গ বাঁচাতে পারবে না। আজ হোক, কাল হোক, মুসলমানেরা দখল করে নিতে পারবে তাতে সন্দেহ নেই। অরিজিৎ আহারনিদ্রা ছেড়ে প্রাণপণে ঘোড়া ছুটিয়ে যখন দুর্গের কাছাকাছি গিয়েছেন, দেখলেন, সেখানে আগুন জ্বলে উঠেছে। বুঝলেন মেয়েরা জহরব্রত নিয়েছে। হার হয়েছে তাই সকলে চিতা জ্বালিয়েছে মরবার জন্যে। অরিজিৎ কোনোমতে দুর্গে পৌঁছলেন। তখন সমস্ত শেষ হয়ে গিয়েছে। মেয়েরা আর কেউ নেই। পুরুষরা তাদের শেষ লড়াই লড়ছে। নির্মলকুমারী রক্ষা পেল কিন্তু সে মৃত্যুর হাতে, তাঁর হাতে নয় এই দুঃখ। তখন মনে পড়ল চন্দনী তাঁকে বলেছিল, তোমার কাজ শেষ হয়ে গেলে পর তোমাকে এখানেই ফিরে আসতে হবে ; সেজন্যে, যতদিন হোক, আমি পথ চেয়ে থাকব।

তার পর দুই মাস চলে গেল। ফাল্গুনের শুক্লপক্ষে অরিজিৎ সেই বনের মধ্যে পৌঁছলেন। শাঁখ বেজে উঠল, সানাই বাজল, সবাই পরল নতুন পাগড়ি লাল রঙের, গায়ে ওড়াল বাসন্তীরঙের চাদর। শুভলগ্নে অরিজিতের সঙ্গে চন্দনীর বিবাহ হয়ে গেল।

এই পর্যন্ত হল আমার গল্প। তার পরে বরাবরকার অভ্যাসমত শোবার ঘরের কেদারায় গিয়ে বসলুম। বাদলার হাওয়া বইছিল। বৃষ্টি হবে-হবে করছে। সুধাকান্ত দেখতে এলেন, দরজা জানালা ঠিকমতো বন্ধ আছে কি না। এসে দেখলেন, আমি কেদারায় বসে আছি। ডাকলেন, কোনো উত্তর নেই। স্পর্শ করে বললেন, ঠাণ্ডা

হাওয়া দিচ্ছে, চলুন বিছানায়।

কোনো সাড়া নেই। তার পরে চৌষট্টি ঘণ্টা কাটল অচেতনে

*

* *

দিন-খাটুনির শেষে
বৈকালে ঘরে এসে
আরামকেদারা যদি মেলে,
গল্পটি মনগড়া,
কিছু বা কবিতা পড়া,
সময়টা যায় হেসেখেলে।
হেথায় শিমুলবন,
পাখি গায় সারাখন,
ফুল থেকে মধু খেতে আসে।
ঝোপে ঘুঘু বাসা বেঁধে
সারাদিন সুর সেধে
আধো ঘুম ছড়ায় বাতাসে।
গোয়ালপাড়ার গ্রামে
মেয়েরা নদীতে নামে,
কলরব আসে দূর হতে।
চারি দিকে ঢেউ তোলে,
বটছায়া জলে দোলে,
বালিকা ভাসিয়া চলে স্রোতে।
দিয়ে জুঁই বেল জবা
সাজানো সুহৃদ্‌সভা,
আলাপপ্রলাপ জেগে ওঠে—
ঠিক সুরে তার বাঁধা,
মূলতানে তান সাধা,
গল্প শোনায় ছেলে জোটে।

ধ্বংস

দিদি, তোমাকে একটা হালের খবর বলি।—

প্যারিস শহরের অল্প একটু দূরে ছিল তাঁর ছোটো বাসাটি। বাড়ির কর্তার নাম পিয়ের শোপ্যাঁ। তাঁর সারা জীবনের শখ ছিল গাছপালায় জোড় মিলিয়ে, রেণু মিলিয়ে, তাদের চেহারা, তাদের রঙ, তাদের স্বাদ বদল ক'রে নতুন রকমের সৃষ্টি তৈরি করতে। তাতে কম সময় লাগত না। এক-একটি ফুলের ফলের স্বভাব বদলাতে বছরের পর বছর কেটে যেত। এ কাজে যেমন ছিল তাঁর আনন্দ তেমনি ছিল তাঁর ধৈর্য। বাগান নিয়ে তিনি যেন জাদু করতেন। লাল হত নীল, সাদা হত আলতার রঙ, আঁটি যেত উড়ে, খোসা যেত খ'সে। যেটা ফলতে লাগে ছ মাস তার মেয়াদ কমে হত দু মাস। ছিলেন গরিব, ব্যাবসাতে সুবিধা করতে পারতেন না। যে করত তাঁর হাতের কাজের তারিফ তাকে দামি মাল অমনি দিতেন বিলিয়ে। যার মতলব ছিল দাম ফাঁকি দিতে সে এসে বলত, কী ফুল ফুটেছে আপনার সেই গাছটাতে, চার দিক থেকে লোক আসছে দেখতে, একেবারে তাক লেগে যাচ্ছে।

তিনি দাম চাইতে ভুলে যেতেন।

তাঁর জীবনের খুব বড়ো শখ ছিল তাঁর মেয়েটি। তার নাম ছিল ক্যামিল। সে ছিল তাঁর দিনরাত্রের আনন্দ, তাঁর কাজকর্মের সঙ্গিনী। তাকে তিনি তাঁর বাগানের কাজে পাকা করে তুলেছিলেন। ঠিকমতো বুদ্ধি করে কলমের জোড় লাগাতে সে তার বাপের চেয়ে কম ছিল না। বাগানে সে মালী রাখতে দেয় নি। সে নিজের হাতে মাটি খুঁড়তে, বীজ বুনতে, আগাছা নিড়োতে, বাপের সঙ্গে সমান পরিশ্রম করত। এ ছাড়া রেঁধেবেড়ে বাপকে খাওয়ানো, কাপড় সেলাই ক'রে দেওয়া, তাঁর হয়ে চিঠির জবাব দেওয়া— সব কাজের ভার নিয়েছিল নিজে। চেস্ট্‌নাট গাছের তলায় ওদের ছোট্ট এই ঘরটি সেবায় শান্তিতে ছিল মধুমাখা। ওদের বাগানের ছায়ায় চা খেতে খেতে পাড়ার লোক সে কথা জানিয়ে যেত। ওরা জবাবে বলত, অনেক দামের আমাদের এই বাসা, রাজার মণিমানিক দিয়ে তৈরি নয়, তৈরি হয়েছে দুটি প্রাণীর ভালোবাসা দিয়ে, আর-কোথাও এ পাওয়া যাবে না।

যে ছেলের সঙ্গে মেয়েটির বিবাহের কথা ছিল সেই জ্যাক মাঝে মাঝে কাজে যোগ দিতে আসত; কানে কানে জিগ্‌গেস করত, শুভদিন আসবে কবে। ক্যামিল কেবলই দিন পিছিয়ে দিত; বাপকে ছেড়ে সে কিছুতেই বিয়ে করতে চাইত না।

জর্মানির সঙ্গে যুদ্ধ বাধল ফ্রান্সের। রাজ্যের কড়া নিয়ম, পিয়েরকে যুদ্ধে টেনে নিয়ে গেল। ক্যামিল চোখের জল লুকিয়ে বাপকে বললে, কিছু ভয় কোরো না, বাবা। আমাদের এই বাগানকে প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখব।

মেয়েটি তখন হলদে রজনীগন্ধা তৈরি করে তোলবার পরখ করছিল। বাপ বলেছিলেন, হবে না; মেয়ে বলেছিল, হবে। তার কথা যদি খাটে তা হলে যুদ্ধ থেকে বাপ ফিরে এলে তাঁকে অবাক করে দেবে, এই ছিল তার পণ।

ইতিমধ্যে জ্যাক এসেছিল দু দিনের ছুটিতে রণক্ষেত্র থেকে খবর দিতে যে, পিয়ের পেয়েছে সেনানায়কের তক্‌মা। নিজে না আসতে পেরে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছে এই সুখবর দিতে। জ্যাক এসে দেখলে, সেইদিন সকালেই গোলা এসে পড়েছিল ফুলবাগানে। যে তাকে প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল তার প্রাণসুদ্ধ নিয়ে ছারখার হয়ে গেল বাগানটি। এর মধ্যে দয়ার হাত ছিল এইটুকু, ক্যামিল ছিল না বেঁচে।

সকলের আশ্চর্য লেগেছিল সভ্যতার জোর হিসাব করে। লম্বা দৌড়ের কামানের গোলা এসে পড়েছিল পঁচিশ মাইল তফাত থেকে। এ'কে বলে কালের উন্নতি।

সভ্যতার কত যে জোর, আর-এক দেশে আর-একবার তার পরীক্ষা হয়েছে। তার প্রমাণ রয়ে গেছে ধুলার মধ্যে, আর-কোথাও নয়। সে চীনদেশে। তাকে লড়তে হয়েছিল বড়ো বড়ো দুই সভ্য জাতের সঙ্গে। পিকিন শহরে ছিল আশ্চর্য এক রাজবাড়ি। তার মধ্যে ছিল বহু-কালের-জড়ো-করা মন-মাতানো শিল্পের কাজ। মানুষের হাতের তেমন গুণপনা আর-কখনো হয় নি, হবে না। যুদ্ধে চীনের হার হল; হার হবার কথা, কেননা মার-জখমের কায়দানিতে সভ্যতার অদ্ভুত বাহাদুরি। কিন্তু, হায় রে আশ্চর্য শিল্প, অনেক কালের গুণীদের ধ্যানের ধন, সভ্যতার অল্প কালের আঁচড়ে কামড়ে ছিঁড়েমিড়ে গেল কোথায়। পিকিনে একদিন গিয়েছিলুম বেড়াতে, নিজের চোখে দেখে এসেছি। বেশি কিছু বলতে মন যায় না।

*

* *

মানুষ সবার বড়ো জগতের ঘটনা,
মনে হ'ত, মিছে না এ শাস্ত্রের রটনা
তখন এ জীবনকে পবিত্র মেনেছি
যখন মানুষ বলে মানুষকে জেনেছি।

ভোরবেলা জানালায় পাখিগুলো জাগালে
ভাবিতাম, আছি যেন স্বর্গের নাগালে।
মনে হ'ত, পাকা ধানে বাঁশি যেন বাজানো,
মায়ের আঁচল-ভরা দান যেন সাজানো।
তরী যেত নীলাকাশে সাদা পাল মেলিয়া,
প্রাণে যেত অজানার ছায়াখানি ফেলিয়া।
বুনো হাঁস নদীপারে মেলে যেত পাখা সে,
উতলা ভাবনা মোর নিয়ে যেত আকাশে।
নদীর শুনেছি ধ্বনি কত রাতদুপুরে,
অপ্সরী যেত যেন তাল রেখে নূপুরে।
পূজার বেজেছে বাঁশি ঘুম হতে উঠিতেই,
পূজায় পাড়ার হাওয়া ভরে যেত ছুটিতেই।
বন্ধুরা জুটিতাম কত নব বরষে,
সুধায় ভরিত প্রাণ সুহৃদের পরশে।
পশ্চিমে হেনকালে পথে কাঁটা বিছিয়ে
সভ্যতা দেখা দিল দাঁত তার খিঁচিয়ে।
সভ্যতা কারে বলে ভেবেছিনু জানি তা—
আজ দেখি কী অশুচি, কী যে অপমানিতা।
কলবল সম্বল সিভিলাইজেশনের,
তার সবচেয়ে কাজ মানুষকে পেষণের।
মানুষের সাজে কে যে সাজিয়েছে অসুরে,
আজ দেখি 'পশু' বলা গাল দেওয়া পশুরে।
মানুষকে ভুল ক'রে গড়েছেন বিধাতা,
কত মারে এত বাঁকা হতে পারে সিধা তা।
দয়া কি হয়েছে তাঁর হতাশের রোদনে,
তাই গিয়েছেন লেগে ভ্রমসংশোধনে।
আজ তিনি নররূপী দানবের বংশে
মানুষ লাগিয়েছেন মানুষের ধ্বংসে।

ভালোমানুষ

ছিঃ, আমি নেহাত ভালোমানুষ।

কুসমি বললে, কী যে তুমি বল তার ঠিক নেই। তুমি যে ভালোমানুষ সেও কি বলতে হবে। কে না জানে, তুমি ও পাড়ার লোটনগুণ্ডার দলের সর্দার নও। ভালোমানুষ তুমি বল কাকে।

এইবার ঠিক প্রশ্নটা এসেছে তোমার মুখে। ভালোমানুষ তাকেই বলে যে অন্যায়ের কাছেও নিজের দখল ছেড়ে দেয়, দরাজ হাতের গুণে নয়, মনের জোর নেই বলেই।

যেমন?

যেমন আজই ঘটেছিল সকালে। বেশ একটুখানি গুছিয়ে নিয়ে লিখতে বসেছিলুম, এমনসময় এসে হাজির পাঁচকড়ি। একেবারে সাহারা থেকে সিমুম হাওয়া বয়ে গেল, শুকিয়ে গেল মনের মধ্যে যা-কিছু ছিল তাজা। ঐ একটি প্রাণী বিধাতার কারখানা থেকে বাঁকা হয়ে বেরিয়েছিল, কোনো মানুষের সঙ্গে কোনোখানেই জোড় মেলে না। এক সময়ে ক্যাল্‌কাটাকে উচ্চারণ করেছিল কালকুট্টা, সেই অবধি সবাই ওকে ডাকত কালোকুত্তা। শুনতে শুনতে সেটা ওর কানে সয়ে গিয়েছিল। ইস্কুলে কেউ ওকে দেখতে পারত না। একদিন আমাদের রমেন 'রাস্কেল' ব'লে ঘাড়ের উপর পড়ে ঘুষিয়ে ওর নাক বাঁকিয়ে দিয়েছিল; ব'লে রেখেছিল, এর পরের বারে কান দেবে বাঁকা ক'রে।

এসেই সে বসল আমার লেখাপড়া করার চৌকিটাতে। ভালোমানুষের মুখ দিয়ে বেরোল না, ওখানে আমি কাজ করব। ডেস্কের উপর ঝুঁকে যেন অন্যমনে এটা ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। বললে দোষ হত না যে, ওগুলো দরকারি জিনিস, ঘাঁটাঘাঁটি কোরো না। কিন্তু— কী আর বলব। বললে, অনেককাল দেখা সাক্ষাৎ হয় নি। শুরু করলে, আহা আমাদের সেই ইস্কুলের দিন ছিল কী সুখের। গল্প লাগালে খোঁড়া গোবিন্দ ময়রার। দেখি, আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে আমার সোনা-বাঁধানো ফাউন্টেন-পেনটা, চাদরের আড়ালে ওর পকেটের দিকে। বললেই হত, ভুল করছ, কলমটা তোমার নয়, ওটা আমার। কিন্তু, আমি যে ভালোমানুষ, ভদ্রলোকের ছেলে— এতবড়ো লজ্জার কথা ওকে বলি কী ক'রে। ওর চুরিকরা হাতটার দিকে চাইতেই পারলুম না। সন্দেহ করছি লোকটা ব'লে বসবে, আজ এখানেই খাব। বলতে পারব না, না, সে হবে না। ভাবতে ভাবতে ঘেমে উঠেছি। হঠাৎ

মাথায় বুদ্ধি এল ; ব'লে বসলুম, রমেনের ওখানে আমাকে এখনি যেতে হবে।

কালকুত্তা বললে, ভালো হল, তোমার সঙ্গে একত্রেই যাওয়া যাক। ইস্কুল ছেড়ে অবধি তার সঙ্গে একবারও দেখা হয় নি।

কী মুশকিল। ধপ্ করে বসে পড়লুম। বাইরের দিকে তাকিয়ে বললুম, বৃষ্টি পড়ছে দেখছি।

ও বললে, তাতে হয়েছে কী। আমার ছাতা নেই, কিন্তু তোমার সঙ্গে এক ছাতাতেই যেতে পারব।

আর কেউ হলে জোর করেই বলত, সে হবে না। কিন্তু, আমার উপায় নেই। তা, ভালোমানুষ হলেও বিপদে পড়লে আমার মাথাতেও বুদ্ধি জোগায়। আমি বললুম, অত অসুবিধা করবার দরকার কী। তার চেয়ে বরঞ্চ ছাতাটা তুমি নিয়ে যাও, যখনি সুযোগ হবে ফিরিয়ে দিলেই হবে।

আর সে তিলমাত্র দেরি করল না। বললে, প্ল্যানটা শোনাচ্ছে ভালো।

ছাতাটা বগলে ক'রে চট্‌পট্ সরে পড়ল। ভয় ছিল, ফাউন্টেন-পেনের খোঁজ উঠে পড়ে। ছাতা ফেরাবার সুযোগ কোনোদিনই হবে না। হায় রে, আমার পনেরো টাকা দামের সিল্কের ছাতাটা। ছাতা ফিরবে না, ফাউন্টেন-পেনও ফিরবে না, কিন্তু সবচেয়ে আরামের কথা হচ্ছে— সেও ফিরবে না।

কী বল, দাদামশায়! তোমার সেই ফাউন্টেন-পেন, সেই ছাতা, তুমি ফিরে পাবে না?

ভদ্র বিধান-মতে ফিরে পাবার আশা নেই।

আর, অভদ্র বিধান-মতে?

ভালোমানুষের কুষ্ঠিতে সে লেখে না।

আমি তো ভালোমানুষ নই, আমি তাকে চিঠি লিখব— তোমার সে কথা জানবার দরকার হবে না।

আরে ছিছি, না না, সে কি হয়। আর, লিখে হবেই বা কী। সে বলবে, আমি নিই নি।

জানি, ও তাই বলবে। কিন্তু, আমরা যে জেনেছি ও চুরি করেছে, সেইটেই ওকে আমি জানাতে চাই।

সর্বনাশ! ঠিক সেইটেই ওকে জানাতে চাই নে— ভদ্রলোকের ছেলে চুরি করেছে— ছিছি, কতবড়ো লজ্জার কথা। আমার এমন কত গেছে, তুমি তখন জন্মাও

নি। তখন ব্রাউনিঙের কবিতার আদর নতুন বেড়েছে। খুব আগ্রহ করে পড়ছিলুম। আমার সাহিত্যিক বন্ধুকে উৎসাহ করে একটা কবিতা পড়ে শোনালুম। তিনি বললেন, এ বইটা আমার নিশ্চয় পড়া চাই, তিন দিন পরেই ফিরিয়ে দেব। আমার মুখ শুকিয়ে গেল। বললুম, এটা আমি এখন পড়ছি। এতই ভালোমানুষের স্বরে বলেছিলুম যে বইটা রাখতে পারা গেল না। দিনকয়েক পরে খবর নিয়ে জানলুম, তিনি গেছেন একটা মকদ্দমার তদ্‌বির করতে বহরমপুরে। ফিরতে দেরি হবে। আমার জানা হকারকে ব'লে দিলুম, ব্রাউনিঙের বড়ো এডিশনটা যদি পাওয়া যায় আমাকে যেন জানায়। কিছুদিন পরে খবর পেলাম, পাওয়া গেছে। বইটা বের করে দেখালে, আমারই সেই বই। যে পাতাখানায় আমার নাম লেখা ছিল সেই পাতাটা ছেঁড়া। কিনে নিলুম। তার পর থেকে সেই বইখানা লুকিয়ে রাখতে হল, যেন আমিই চোর। আমার লাইব্রেরি ঘাঁটতে ঘাঁটতে পাছে বইখানা তাঁর হাতে ঠেকে। আমার কাছে তাঁর বিদ্যে ধরা পড়েছে, এ কথাটা পাছে তিনি জানতে পান। আহা, হাজার হোক, ভদ্রলোক।

আর বলতে হবে না, দাদামশায়, পষ্ট বুঝেছি কাকে বলে ভালোমানুষ।

*

* *

মণিরাম সত্যই স্বাম্না,
বাহিরের ধাক্কা সে নেয় না।
বেশি ক'রে আপনারে দেখাতে
চায় যেন কোনোমতে ঠেকাতে।
যোগ্যতা থাকে যদি থাক্-না,
ঢাকে তারে চাপা দিয়ে ঢাকনা।
আপনারে ঠেলে রেখে কোণেতে
তবে সে আরাম পায় মনেতে।
যেথা তারে নিতে চায় আগিয়ে
দূরে থাকে সে সভায় না গিয়ে।
বলে না সে, আরো দে বা খুবই দে;
ঠেলা নাহি মারে পেলে সুবিধে।

যদি দেখে টানাটানি খাবারে
বলে, কী যে পেট তার, বাবা রে!
ব্যঞ্জনে নুন নেই, খাবে তা;
মুখ দেখে বোঝা নাহি যাবে তা।
যদি শোনে, যা তা বলে লোকরা
বলে, আহা, ওরা ছেলে-ছোকরা।
পাঁচু বই নিয়ে গেল না ব'লে;
বলে, খোঁটা দিয়ো নাকো তা ব'লে।
বন্ধু ঠকায় যদি, সইবে;
বলে, হিসাবের ভুল দৈবে।
ধার নিয়ে যায় কোনো সাড়া নেই
বলে তারে, বিশেষ তো তাড়া নেই।
যত কেন যায় তারে ঘা মারি
বলে, দোষ ছিল বুঝি আমারি।

মুক্তকুন্তলা

আমার খুদে বন্ধুরা এসে হাজির তাদের নালিশ নিয়ে। বললে, দাদামশায় তুমি কি আমাদের ছেলেমানুষ মনে কর।

তা, ভাই, ঐ ভুলটাই তো করেছিলুম। আজকাল নিজেরই বয়েসটার ভুল হিসেব করতে শুরু করেছি।

রূপকথা আমাদের চলবে না, আমাদের বয়েস হয়ে গেছে।

আমি বললুম, ভায়া, রূপকথার কথাটা তো কিছুই নয়। ওর রূপটাই হল আসল। সেটা সব বয়েসেই চলে। আচ্ছা, ভালো, যদি পছন্দ না হয় তবে দেখি খুঁজে-পেতে। নিজের বয়েসটাতে ডুব মেরে তোমাদের বয়েসটাকে মনে আনতে চেষ্টা করছি। তার থলি থেকে রূপকথা নাহয় বাদ দিলুম, তার পরের সারে দেখতে পাই মৎস্যনারীর উপাখ্যান। সেও চলবে না। তোমরা নতুন যুগের ছেলে, খাঁটি খবর চাও; ফস্ করে জিজ্ঞেস করে বসবে, লেজা যদি হয় মাছের, মুড়ো কী করে হবে মানুষের। রোসো, তবে ভেবে দেখি। তোমাদের বয়েসে, এমন-কি তোমাদের চেয়ে কিছু বেশি বয়েসে আমরা ম্যাজিকওয়ালা হরীশ হালদারকে পেয়ে বসেছিলুম। শুধু তাঁর ম্যাজিকে হাত

ছিল না, সাহিত্যেও কলম চলত। আমাদের কাছে সেও ছিল ম্যাজিক-বিশেষ। আজও মনে আছে একটা ঝুল্‌ঝুলে খাতায় লেখা তাঁর নাটকটা, নাম ছিল মুক্তকুন্তলা। এমন নাম কার মাথায় আসতে পারে! কোথায় লাগে সূর্যমুখী, কুন্দনন্দিনী। তার পর তার মধ্যে যা সব লম্বা চালের কথাবার্তা, তার বুলিগুলো শুনে মনে হয়েছিল, এ কালিদাসের ছাপ-মারা মাল। বীরাঙ্গনার দাপট কী! আর, দেশ-উদ্ধারের তাল ঠোকা! নাটকের রাজপুত্রটি ছিলেন স্বয়ং পুরুরাজের ভাগ্নে ; নাম ছিল রণদুর্ধর্ষ সিং। এও একটা নাম বটে, মুক্তকুন্তলার নামের সঙ্গে সমান পাঁয়তারা করতে পারে। আমাদের তাক লেগে গেল।—

আলেকজাণ্ডার এসেছিলেন ভারত জয় করতে। রণদুর্ধর্ষ বিদায় নিতে এলেন মুক্তকুন্তলার কাছে। মুক্তকুন্তলা বললেন, যাও বীরবর, যুদ্ধে জয়লাভ করে এসো, আলেকজাণ্ডারের মুকুট এনে দেওয়া চাই আমার পায়ের তলায়। যুদ্ধে মারা পড়লেও পাবে তুমি স্বর্গলোক, আর যদি বেঁচে ফিরে এস তো স্বয়ং আছি আমি।

উঃ, কতবড়ো চটাপট হাততালির জায়গা একবার ভেবে দেখো। আমি রাজি হলেম মুক্তকুন্তলা সাজতে, কেননা আমার গলার আওয়াজটা ছিল মিহি।

আমাদের দালানের পিছন দিকে খানিকটা পোড়ো জমি ছিল, তাকে বলা হত গোলাবাড়ি। সত্যিকার ছেলেমানুষের পক্ষে সেই জায়গাটা ছিল ছুটির স্বর্গ। সেই গোলাবাড়ির একটা ধারে আমাদের বাড়ির ভাঁড়ার ঘর, লোহার গরাদে দেওয়া ; সেই গরাদের মধ্যে হাত গলিয়ে বস্তার ফাঁকের থেকে ডাল চাল কুড়িয়ে আনতুম। ইঁটের উনুন পেতে কাঠকোট জোগাড় করে চড়িয়ে দিতুম ছেলেমানুষি খিচুড়ি। তাতে না ছিল নুন, না ছিল ঘি, না ছিল কোনোপ্রকার মসলার বালাই। কোনোমতে আধসিদ্ধ হলে খেতে লেগে যেতুম। মনে হয় নি ভোজের মধ্যে নিন্দের কিছু ছিল। এই গোলাবাড়ির পাঁচিল ঘেঁষে গোটাকতক বাখারি জোগাড় করে হ. চ. হ., আমাদের বিখ্যাত নাট্যকার, নানা আয়তনের খবরের কাগজ পুরেজুড়ে একটা স্টেজ খাড়া করেছিলেন। স্টেজ শব্দটা মনে করেই আমাদের বুক ফুলে উঠত। এই স্টেজে আমাকে সাজতে হবে মুক্তকুন্তলা। সব কথা স্পষ্ট মনে নেই, কিন্তু হতভাগিনী মুক্তকুন্তলার দুঃখের দশা কিছু কিছু মনে পড়ে। এইটুকু জানি, তিনি তলোয়ার হাতে বীরপুরুষের সঙ্গে যোগ দিতে গিয়েছিলেন ঘোড়ায় চ'ড়ে। কিন্তু, ঘোড়াটা যে কার সাজবার কথা ছিল সে ঠিক মনে আনতে পারছি নে। যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে বীরললনা যে স্বদেশের জন্যে প্রাণ দিয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর বুকে যখন বর্শা (পাতকাঠি) বিদ্ধ হল, যখন মাটিতে তাঁর মুক্তকুন্তল লুটিয়ে পড়ছে, রণদুর্ধর্ষ পাশে এসে দাঁড়ালেন।

বীরাঙ্গনা বললেন, বীরবর, আমাকে এখন বিদায় দাও, হয়তো স্বর্গে গিয়ে দেখা হবে। আহা, আবার হাততালির পালা।

অভিনয়ের জোগাড়যন্ত্র মোটামুটি একরকম হয়ে এসেছিল। হরীশচন্দ্র কোথা থেকে এনেছিলেন নানা রকমের পরচুলো গোঁফদাড়ি। বউদিদির হাতে পায়ে ধরে দুটো-একটা শাড়িও জোগাড় করেছিলুম। তাঁর কৌটা থেকে সিঁদুর নিয়ে সিঁথেয় পরবার সময় কোনো ভাবনা মনে আসে নি। স্কুলে যাবার সময় ভুলেছিলুম তার দাগ মুছতে। ছেলেদের মধ্যে মস্ত হাসি উঠেছিল। কিছুদিন আমার ক্লাসে মুখ দেখাবার জো রইল না। নাটকের অভিনয়ে সবচেয়ে ফল দেখা গেল এই হাসিতে। আর, বাকিটুকু হয়ে গেল একেবারে ফাঁকি। যেখানে আমাদের স্টেজের বাখারি পোঁতা হয়েছিল ঠিক সেই জায়গায় সেজদাদা কুস্তির আখড়া পত্তন করলেন। মুক্ত-কুন্তলার সবচেয়ে দুঃখের দশা হল যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, এই কুস্তির আড্ডায়। রণদুর্ধর্ষকে মিহি গলায় বলবার সুযোগ পেলেন না, হে বীরবর, স্বর্গে তোমার সঙ্গে হয়তো দেখা হবে। তার বদলে বলতে হল, সাড়ে নটা বাজল, স্কুলের গাড়ি তৈরি।

এর থেকেই বুঝবে, আমরা যখন ছেলেমানুষ ছিলেম সে ছিলেম খাঁটি ছেলেমানুষ।

*

* *

'দাদা হব' ছিল বিষম শখ—
তখন বয়স বারো হবে,
কড়া হয় নি ত্বক।
স্টেজ বেঁধেছি ঘরের কোণে,
বুক ফুলিয়ে ক্ষণে ক্ষণে
হয়েছিল দাদার অভিনয়;
কাঠের তরবারি মেরে
দাড়ি-পরা বিপক্ষেরে
বারে বারেই করেছিলুম জয়।
আজ খসেছে মুখোষটা সে,
আরেক লড়াই চারি পাশে—
মারছি কিছু অনেক খাচ্ছি মার।

দিন চলেছে অবিরত,
ভাবনা মনে জমছে কত,
        ষোলো-আনা নয় সে অহংকার।
দেখছে নতুন পালার দাদা
হাত দুটো তার পড়ছে বাঁধা
        এ সংসারের হাজার গোলামিতে।
তবুও সব হয় নি ফাঁকি,
তহবিলে রয় যা বাকি
        কাজ চলছে দিতে এবং নিতে।
সাজ হয়ে এল পালা,
নাট্যশেষের দীপের মালা
        নিভে নিভে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে।
রঙিন ছবির দৃশ্য রেখা
ঝাপসা চোখে যায় না দেখা,
        আলোর চেয়ে ধোঁয়া উঠছে জ'মে।
সময় হয়ে এল এবার
স্টেজের বাঁধন খুলে দেবার,
        নেবে আসছে আঁধার-যবনিকা।
খাতা হাতে এখন বুঝি
আসছে কানে কলম গুঁজি
        কর্ম যাহার চরম হিসাব লিখা।
চোখের 'পরে দিয়ে ঢাকা
ভোলা মনকে ভুলিয়ে রাখা
        কোনোমতেই চলবে না তো আর।
অসীম দূরের প্রেক্ষণীতে
পড়বে ধরা শেষ গণিতে
        জিত হয়েছে কিংবা হল হার।

—

প্রবন্ধ

বাংলাভাষা-পরিচয়

উৎসর্গ

ভাষাচার্য শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

করকমলে

২৬৷২৪

ভূমিকা

ছাত্রপাঠকদের প্রতি

ভাষার আশ্চর্য রহস্য চিন্তা ক'রে বিস্মিত হই। আজ যে বাংলা ভাষা বহুলক্ষ মানুষের মন-চলাচলের হাজার হাজার রাস্তায় গলিতে আলো ফেলে সহজ করেছে পরস্পরের প্রতি মুহূর্তের বোঝাপড়া, আলাপ-পরিচয়, এর দীপ্তির পথরেখা অনুসরণ করে চললে কালের কোন্ দূরদুর্গম দিগন্তে গিয়ে পৌঁছব। তারা কোন্ যাযাবর মানুষ, যারা অজানা অভিজ্ঞতার তীর্থযাত্রায় দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ের পথিক ছিল, যারা এই ভাষার প্রথম কম্পমান অস্পষ্ট শিখার প্রদীপ হাতে নিয়ে বেরিয়েছিল অখ্যাত জন্মভূমি থেকে সুদীর্ঘ বন্ধুর বাধাজটিল পথে। সেই আদিম দীপালোক এক যুগের থেকে আর-এক যুগের বাতির মুখে জ্বলতে জ্বলতে আজ আমার এই কলমের আগায় আপন আত্মীয়তার পরিচয় নিয়ে এল। ইতিহাসের যে বিপুল পরিবর্তনের শাখা-প্রশাখার মধ্য দিয়ে আদিযাত্রীরা চলে এসেছে তারই প্রভাবে সেই শ্বেতকায় পিঙ্গলকেশ বিপুলশক্তি আরণ্যকদের সঙ্গে এই শ্যামলবর্ণ ক্ষীণ-আয়ু শহরবাসী ইংরেজ রাজত্বের প্রজার সাদৃশ্য ধূসর হয়েছে কালের ধূলিক্ষেপে। কেবল মিল চলে এসেছে একটি নিরবচ্ছিন্ন ভাষার প্রাচীন সূত্রে। সে ভাষায় মাঝে মাঝে নতুন সূত্রের জোড় লেগেছে, কোথাও কোথাও ছিন্ন হয়ে তাতে বেঁধেছে পরবর্তী কালের গ্রন্থি, কোথাও কোথাও অনার্য হাতের ব্যবহারে তার সাদা রঙ মলিন হয়েছে, কিন্তু তার ধারায় ছেদ পড়ে নি। এই ভাষা আজও আপন অঙ্গুলি নির্দেশ করছে বহুদূর পশ্চিমের সেই এক আদিজন্মভূমির দিকে যার নিশ্চিত ঠিকানা কেউ জানে না।

প্রাচীন ভারতবর্ষে অস্পষ্ট ইতিবৃত্তের প্রাকৃত লোকেরা যে ভাষায় কথা কইত, দুই প্রধান শাখায় তা বিভক্ত ছিল— শৌরসেনী ও মাগধী। শৌরসেনী ছিল পাশ্চাত্য হিন্দির মূলে, মাগধী অথবা প্রাচ্যা ছিল প্রাচ্য হিন্দির আদিতে। আর ছিল ওড্রী, ওড়িয়া; গৌড়ী, বাংলা। আসামীর

উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু অনতিপ্রাচীন যুগে আসামীতে গদ্য ভাষার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, এত বাংলায় পাই নে। সেই-সব দৃষ্টান্তে যে ভাষার পরিচয় পাই তার সঙ্গে বাংলার প্রভেদ নেই বললেই হয়।

মাগধী এবং শৌরসেনীর মধ্যে মাগধীই প্রাচীনতর। হর্ন্‌লে সাহেবের মতে এই সময়ে ভারতবর্ষে মাগধীই একমাত্র প্রাকৃত ভাষা ছিল। এই ভাষা পশ্চিম থেকে ক্রমে পূর্বের দিকে এসেছে। আর দ্বিতীয় ভাষাপ্রবাহ শৌরসেনী ভারতবর্ষে প্রবেশ ক'রে পশ্চিম দেশ অধিকার করেছিল। হর্ন্‌লের মতে আর্যরা ভারতবর্ষে এসেছিল দুইবার পরে পরে। উভয়ের ভাষায় মূলগত ঐক্য থাকলেও কিছু কিছু প্রভেদ আছে।

নদী যেমন অতিদূর পর্বতের শিখর থেকে ঝরনায় ঝরনায় ঝরে ঝরে নানা দেশের ভিতর দিয়ে নানা শাখায় বিভক্ত হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পৌঁছয়, তেমনি এই দূর কালের মাগধী ভাষা আর্য জনসাধারণের বাণীধারায় বয়ে এসে সুদূর যুগান্তরে ভারতের সুদূর প্রান্তে বাংলাদেশের হৃদয়কে আজ ধ্বনিত করেছে, উর্বরা করেছে তার চিত্তভূমিকে। আজও শেষ হল না তার প্রকাশ-লীলা। সমুদ্রের কাছাকাছি এসে সে বিস্তৃত হয়েছে, মিশ্রিত হয়েছে, গভীর হয়েছে তার প্রবাহ, দেশের সীমা ছাড়িয়ে সর্বদেশের আবেষ্টনের সঙ্গে এসে মিলেছে। সেই দূর কালের সঙ্গে আর আমাদের এই বর্তমান কালের, বহু দেশের অজানা চিত্তের সঙ্গে আর বাংলাদেশের নবজাগ্রত চিত্তের মিলনের দৌত্য নিয়ে চলেছে এই অতিপুরাতন এবং এই অতি-আধুনিক বাক্যস্রোত, এই কথা ভেবে এর রহস্যে বিস্মিত হয়ে আছি। সেই বিস্ময়ের প্রকাশ আমার এই বইটিতে।

ভাষা জিনিসটা আমরা অত্যন্ত সহজে ব্যবহার করি, কিন্তু তার নাড়ী-নক্ষত্রের খবর রাখা একটুও সহজ নয়। যে নিয়মের ঐক্য ধরে পরিচয় সহজ হয় ভাষার ইতিহাসে একটা তার অবিচ্ছিন্ন সূত্রও থাকে, আবার তার বদলও চলে পদে পদে। কেন বদল হয় তার ভালো কৈফিয়ত সব সময়ে পাওয়া যায় না। সে-সমস্ত কঠিন সমস্যার বিচার নিয়ে এ বই লিখছি নে। ভাষার ক্ষেত্রে চলতে চলতে যাতে আমাকে খুশি করেছে, ভাবিয়েছে,

আশ্চর্য করেছে, তারই কৌতুকের ভাগ সকলকে দেব বলেই লেখবার ইচ্ছে হল। বিষয়টাকে যাঁরা ফলাও করে দেখছেন ও তলিয়ে বুঝেছেন, এ লেখায় তাঁদের কাছে দুটো-চারটে খুঁত বেরোবেই। কিন্তু তা নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত হবার দরকার নেই। ভাষাতত্ত্বে প্রবীণ সুনীতিকুমারের সঙ্গে আমার তফাত এই— তিনি যেন ভাষা সম্বন্ধে ভূগোলবিজ্ঞানী, আর আমি যেন পায়ে-চলা পথের ভ্রমণকারী। নানা দেশের শব্দমহলের, এমন-কি তার প্রেতলোকের হাটহদ্দ জানেন তিনি, প্রমাণে অনুমানে মিলিয়ে তার খবর দিতে পারেন সুসম্বদ্ধ প্রণালীতে। চলতে চলতে যা আমার চোখে পড়েছে এবং যে ভাবনা উঠেছে আমার মনে, সেই খাপছাড়া দৃষ্টির অভিজ্ঞতা নিয়ে যখন যা মনে আসে আমি বকে যাব। তাতে ক'রে মনে তোমরা সেই চলে বেড়াবার স্বাদটা পাবে। তারও দাম আছে। তোমাদের জন্যে বিশ্বপরিচয় বইখানা লিখেছিলুম এই ভাবেই। বিজ্ঞানের রাজ্যে স্থায়ী বাসিন্দাদের মতো সঞ্চয় জমা হয় নি ভাণ্ডারে, রাস্তায় বাউলদের মতো খুশি হয়ে ফিরেছি, খবরের ঝুলিটাতে দিন-ভিক্ষে যা জুটেছে তার সঙ্গে দিয়েছি আমার খুশির ভাষা মিলিয়ে। ছোটোখাটো অপরাধ যদি ঘটে থাকে সেই খুশির ভোগে অনেকটা তার খণ্ডন হতে পারে। জ্ঞানের দেশে ভ্রমণের শখ ছিল বলেই বেঁচে গেছি, বিশেষ সাধনা না থাকলেও। সেই শখটা তোমাদের মনে যদি জাগাতে পারি তা হলে আমার যতটুকু শক্তি সেই অনুসারে ফল পাওয়া গেল মনে করে আশ্বস্ত হব।

মানুষের মনোভব ভাষাজগতের যে অদ্ভুত রহস্য আমার মনকে বিস্ময়ে অভিভূত করে তারই ব্যাখ্যা করে এই বইটি আরম্ভ করেছি। তার পরে, এই বইয়ে যে ভাষার রূপ আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি, তাকে বলে বাংলার চলিত ভাষা। আমি তাকে বলি প্রাকৃত বাংলা। সংস্কৃতের যুগে যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃত প্রচলিত ছিল, তেমনি প্রাকৃত বাংলারও নানা রূপ আছে বাংলার ভিন্ন ভিন্ন অংশে। এদেরই মধ্যে একটা বিশেষ প্রাকৃত চলেছে আধুনিক বাংলাসাহিত্যে। এই প্রাকৃতেরই স্বভাব বিচার করেছি এই বইয়ে। লেখকের পক্ষে একটা মুশকিল আছে। চলতি বাংলা চলতি

বলেই সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা নয়। হয়তো উচ্চারণে এবং বাক্যব্যবহারে একজনের সঙ্গে আর-একজনের সকল বিষয়ে মিল এখনও পাকা হতে পারে নি। কিন্তু যে ভাষা সাহিত্যে আশ্রয় নিয়েছে তাকে নিয়ে এলোমেলো ব্যবহারে ক্ষতি হবার আশঙ্কা আছে। এখন থেকে বিক্ষিপ্ত পথগুলিকে একটি পথে মিলিয়ে নেবার কাজ শুরু করা চাই। এই গ্রন্থে রইল তার প্রথম চেষ্টা। ক্রমে ক্রমে নানা লোকের অধ্যবসায়ে এই ভাষার দ্বিধাগ্রস্ত প্রথাগুলি বিধিবদ্ধ হতে পারবে। এই গ্রন্থে সমর্থিত কোনো উচ্চারণ বা ভাষারীতি কারও কারও অভ্যস্ত নয়। সুতরাং ব্যবহারে পরস্পরের পার্থক্য আছে। সেই অবস্থায় রাশীকরণের প্রণালীতে অর্থাৎ অধিকাংশ লোকের সাংখ্যিক তুলনায় তার বিচার স্থির হতে পারবে।

শান্তিনিকেতন
৭ কার্তিক, ১৩৪৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলাভাষা-পরিচয়

জীবের মধ্যে সবচেয়ে সম্পূর্ণতা মানুষের। কিন্তু সবচেয়ে অসম্পূর্ণ হয়ে সে জন্মগ্রহণ করে। বাঘ ভালুক তার জীবনযাত্রার পনেরো আনা মূলধন নিয়ে আসে প্রকৃতির মালখানা থেকে। জীবরঙ্গভূমিতে মানুষ এসে দেখা দেয় দুই শূন্য হাতে মুঠো বেঁধে।

মানুষ আসবার পূর্বেই জীবসৃষ্টিযজ্ঞে প্রকৃতির ভূরিব্যয়ের পালা শেষ হয়ে এসেছে। বিপুল মাংস, কঠিন বর্ম, প্রকাণ্ড লেজ নিয়ে জলে স্থলে পৃথুল দেহের যে অমিতাচার প্রবল হয়ে উঠেছিল তাতে ধরিত্রীকে দিলে ক্লান্ত করে। প্রমাণ হল আতিশয্যের পরাভব অনিবার্য। পরীক্ষায় এটাও স্থির হয়ে গেল যে, প্রশ্রয়ের পরিমাণ যত বেশি হয় দুর্বলতার বোঝাও তত দুর্বহ হয়ে ওঠে। নূতন পর্বে প্রকৃতি যথাসম্ভব মানুষের বরাদ্দ কম করে দিয়ে নিজে রইল নেপথ্যে।

মানুষকে দেখতে হল খুব ছোটো, কিন্তু সেটা একটা কৌশল মাত্র। এবারকার জীবযাত্রার পালায় বিপুলতাকে করা হল বহুলতায় পরিণত। মহাকায় জন্তু ছিল প্রকাণ্ড একলা, মানুষ হল দূরপ্রসারিত অনেক।

মানুষের প্রধান লক্ষণ এই যে, মানুষ একলা নয়। প্রত্যেক মানুষ বহু মানুষের সঙ্গে যুক্ত, বহু মানুষের হাতে তৈরি।

কখনো কখনো শোনা গেছে, বনের জন্তু মানুষের শিশুকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে পালন করেছে। কিছুকাল পরে লোকালয়ে যখন তাকে ফিরে পাওয়া গেছে তখন দেখা গেল জন্তুর মতোই তার ব্যবহার। অথচ সিংহের বাচ্ছাকে জন্মকাল থেকে মানুষের কাছে রেখে পুষলে সে নরসিংহ হয় না।

এর মানে, মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে মানবসন্তান মানুষই হয় না, অথচ তখন তার জন্তু হতে বাধা নেই। এর কারণ বহু যুগের বহু কোটি লোকের দেহ মন মিলিয়ে মানুষের সত্তা। সেই বৃহৎ সত্তার সঙ্গে যে পরিমাণে সামঞ্জস্য ঘটে ব্যক্তিগত মানুষ সেই পরিমাণে যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠে। সেই সত্তাকে নাম দেওয়া যেতে পারে মহামানুষ।

এই বৃহৎ সত্তার মধ্যে একটা অপেক্ষাকৃত ছোটো বিভাগ আছে। তাকে বলা যেতে পারে জাতিক সত্তা। ধারাবাহিক বহু কোটি লোক পুরুষপরম্পরায় মিলে এক-একটা সীমানায় বাঁধা পড়ে।

এদের চেহারার একটা বিশেষত্ব আছে। এদের মনের গড়নটাও কিছু বিশেষ ধরণের। এই বিশেষত্বের লক্ষণ অনুসারে দলের লোক পরস্পরকে বিশেষ আত্মীয় বলে অনুভব করে। মানুষ আপনাকে সত্য বলে পায় এই আত্মীয়তার সূত্রে গাঁথা বহুদূরব্যাপী বৃহৎ ঐক্যজালে।

মানুষকে মানুষ ক'রে তোলবার ভার এই জাতিক সত্তার উপরে। সেইজন্যে মানুষের সবচেয়ে বড়ো আত্মরক্ষা এই জাতিক সত্তাকে রক্ষা করা। এই তার বৃহৎ দেহ, তার বৃহৎ আত্মা। এই আত্মিক ঐক্যবোধ যাদের মধ্যে দুর্বল, সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠবার শক্তি তাদের ক্ষীণ। জাতির নিবিড় সম্মিলিত শক্তি তাদের পোষণ করে না, রক্ষা করে না। তারা পরস্পর বিশ্লিষ্ট হয়ে থাকে, এই বিশ্লিষ্টতা মানবধর্মের বিরোধী। বিশ্লিষ্ট মানুষ পদে পদে পরাভূত হয়, কেননা তারা সম্পূর্ণ মানুষ নয়।

যেহেতু মানুষ সম্মিলিত জীব এইজন্যে শিশুকাল থেকে মানুষের সবচেয়ে প্রধান শিক্ষা— পরস্পর মেলবার পথে চলবার সাধনা। যেখানে তার মধ্যে জন্তুর ধর্ম প্রবল সেখানে স্বেচ্ছা এবং স্বার্থের টানে তাকে স্বতন্ত্র করে, ভালোমত মিলতে দেয় বাধা; তখন সমষ্টির মধ্যে যে ইচ্ছা, যে শিক্ষা, যে প্রবর্তনা দীর্ঘকাল ধরে জমে আছে সে জোর ক'রে বলে, 'তোমাকে মানুষ হতে হবে কষ্ট ক'রে; তোমার জন্তুধর্মের উল্টো পথে গিয়ে।' জাতিক সত্তার অন্তর্গত প্রত্যেকের মধ্যে নিয়ত এই ক্রিয়া চলছে ব'লে একটা বৃহৎ সীমানার মধ্যে একটা বিশেষ ছাঁদের মনুষ্যসংঘ তৈরি হয়ে উঠছে। একটা বিশেষ জাতিক নামের ঐক্যে তারা পরস্পর পরস্পরকে চেনে, তারা পরস্পরের কাছ থেকে বিশেষ অবস্থায় বিশেষ আচরণ নিশ্চিন্ত মনে প্রত্যাশা করতে পারে। মানুষ জন্মায় জন্তু হয়ে, কিন্তু এই সংঘবদ্ধ ব্যবস্থার মধ্যে অনেক দুঃখ করে সে মানুষ হয়ে ওঠে।

এই-যে বহুকালক্রমাগত ব্যবস্থা যাকে আমরা সমাজ নাম দিয়ে থাকি, যা মনুষ্যত্বের প্রেরয়িতা, তাকেও সৃষ্টি করে চলেছে মানুষ প্রতিনিয়ত— প্রাণ দিয়ে, ত্যাগ দিয়ে, চিন্তা দিয়ে, নব নব অভিজ্ঞতা দিয়ে, কালে কালে তার সংস্কার ক'রে। এই অবিশ্রাম দেওয়া-নেওয়ার দ্বারাই সে প্রাণবান হয়ে ওঠে, নইলে সে জড়যন্ত্র হয়ে থাকত এবং তার দ্বারা পালিত এবং চালিত মানুষ হত কলের পুতুলের মতো; সেই-সব যান্ত্রিক নিয়মে বাঁধা মানুষের মধ্যে নতুন উদ্ভাবনা থাকত না, তাদের মধ্যে অগ্রসরগতি হত অবরুদ্ধ।

সমাজ এবং সমাজের লোকদের মধ্যে এই প্রাণগত মনোগত মিলনের ও আদানপ্রদানের উপায়স্বরূপে মানুষের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যে সৃষ্টি সে হচ্ছে তার ভাষা। এই ভাষার নিরন্তর ক্রিয়ায় সমস্ত জাতকে এক করে তুলেছে; নইলে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে মানবধর্ম থেকে বঞ্চিত হত।

জ্যোতির্বিজ্ঞানী বলেন, এমন-সব নক্ষত্র আছে যারা দীপ্তিহারা, তাদের প্রকাশ নেই, জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে তারা অখ্যাত। জীবজগতে মানুষ জ্যোতিষ্কজাতীয়। মানুষ দীপ্ত নক্ষত্রের মতো কেবলই আপন প্রকাশশক্তি বিকীর্ণ করছে। এই শক্তি তার ভাষার মধ্যে।

জ্যোতিষ্কনক্ষত্রের মধ্যে পরিচয়ের বৈচিত্র্য আছে ; কারও দীপ্তি বেশি, কারও দীপ্তি ম্লান, কারও দীপ্তি বাধাগ্রস্ত। মানবলোকেও তাই। কোথাও ভাষার উজ্জ্বলতা আছে, কোথাও নেই। এই প্রকাশবান নানা জাতির মানুষ ইতিহাসের আকাশে আলোক বিস্তীর্ণ করে আছে। আবার কাদেরও বা আলো নিবে গিয়েছে, আজ তাদের ভাষা লুপ্ত।

জাতিক সত্তার সঙ্গে সঙ্গে এই-যে ভাষা অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে এ এতই আমাদের অন্তরঙ্গ যে, এ আমাদের বিস্মিত করে না, যেমন বিস্মিত করে না আমাদের চোখের দৃষ্টিশক্তি— যে চোখের দ্বার দিয়ে নিত্যনিয়ত আমাদের পরিচয় চলছে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে। কিন্তু একদিন ভাষার সৃষ্টিশক্তিকে মানুষ দৈবশক্তি বলে অনুভব করেছে সে কথা আমরা বুঝতে পারি যখন দেখি য়িহুদি পুরাণে বলেছে, সৃষ্টির আদিতে ছিল বাক্য ; যখন শুনি ঋগ্বেদে বাগ্‌দেবতা আপন মহিমা ঘোষণা ক'রে বলছেন—

> আমি রাজ্ঞী। আমার উপাসকদের আমি ধনসমূহ দিয়ে থাকি। পূজনীয়াদের মধ্যে আমি প্রথমা। দেবতারা আমাকে বহু স্থানে প্রবেশ করতে দিয়েছেন।
>
> প্রত্যেক মানুষ, যার দৃষ্টি আছে, প্রাণ আছে, শ্রুতি আছে, আমার কাছ থেকেই সে অন্ন গ্রহণ করে। যারা আমাকে জানে না তারা ক্ষীণ হয়ে যায়।
>
> আমি স্বয়ং যা বলে থাকি তা দেবতা এবং মানুষদের দ্বারা সেবিত। আমি যাকে কামনা করি তাকে বলবান করি, সৃষ্টিকর্তা করি, ঋষি করি, প্রজ্ঞাবান করি।

২

কোঠাবাড়ির প্রধান মসলা ইঁট, তার পরে চুন-সুরকির নানা বাঁধন। ধ্বনি দিয়ে আঁটবাঁধা শব্দই ভাষার ইঁট, বাংলায় তাকে বলি 'কথা'। নানারকম শব্দচিহ্নের গ্রন্থি দিয়ে এই কথাগুলোকে গেঁথে গেঁথে হয় ভাষা।

মাটির তাল নিয়ে চাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কুমোর গ'ড়ে তোলে হাঁড়িকুঁড়ি, নানা খেলনা, নানা মূর্তি। মানুষ সেইরকম গলার আওয়াজটাকে ঠোঁটে দাঁতে জিভে

টাকরায় নাকের গর্তে ঘুরিয়ে ধ্বনির পুঞ্জ গড়ে তুলেছে ; মানুষের মনের ঝোঁক, হৃদয়ের আবেগ সেইগুলোকে ঠেলা দিয়ে দিয়ে নানা আকার দিচ্ছে।

দোয়েল-কোকিলরাও ধ্বনি দিয়ে ভাব প্রকাশ করে। মানুষের ভাষার ধ্বনি তেমন সহজ নয়। মানুষের অন্য নানা আচরণের মতো প্রত্যেক শিশুকে নতুন ক'রে শুরু করতে হয়েছে ভাষার অভ্যেস, জাগিয়ে রাখতে হয়েছে এর কৌশল। সেইজন্যে মানুষের ভাষা বাঁধা পড়ে যায় না একই অচল ঠাটে।

আস্তে আস্তে বদল তার চলেইছে, দু-তিন শো বছর আগেকার ভাষার সঙ্গে পরের ভাষার তফাত ঘটে আসছেই। তবু বিশেষ জাতের ভাষার মূল স্বভাবটা থেকে যায়, কেবল তার আচারের কিছু কিছু বদল হয়ে চলে। সেইজন্যেই প্রাচীন বাংলাভাষা বদল হতে হতে আধুনিক বাংলায় এসে দাঁড়িয়েছে, অমিল আছে যথেষ্ট, তবু তার স্বভাবের কাঠামোটাকে নিয়ে আছে তার ঐক্য।

ভাষাবিজ্ঞানীরা এই কাঠামোর বিচার ক'রে ভাষার জাত নির্ণয় করেন।

সংস্কৃত ব্যাকরণে সমস্ত শব্দেরই এক-একটা মূল ধাতু আন্দাজ করা হয়েছে। সব আন্দাজগুলিই সম্পূর্ণ সত্য হোক বা না হোক, এর গোড়াকার তত্ত্বটাকে মানি। প্রাণজগতে প্রাণীসৃষ্টির আরম্ভে দেখা দেয় একটি একটি ক'রে জীবকোষ, তার পরে তাদেরই সমবায়ে ক্রমে পরিস্ফুট হয়ে উঠতে থাকে অবয়বধারী জীব। এক-একটি জীব এক-একটি বিশেষ কাঠামো নিয়ে তাদের স্বাতন্ত্র্যের ইতিহাস অনুসরণ করে। জীববিজ্ঞানীরা তাদের সেই কাঠামোর ঐক্য থেকে নানা পরিবর্তনের ভিতরেও তাদের শ্রেণী নির্ণয় করেন।

ভারতবর্ষের কতকগুলি বিশেষ ভাষাকে ভাষাবিজ্ঞানী গৌড়ীয় ভাষা নাম দিয়ে তাদের মেলবন্ধন করেছেন। আমি বাঙালী, মারাঠি ভাষা শুনলে তার অর্থ বুঝতে পারি নে ; কিন্তু দুটো ভাষাই যে এক জাতের, ভাষাবিজ্ঞানীরা সেটা ধরতে পেরেছেন তাদের কাঠামো থেকে। পুষ্তু ভাষায় কথা কয় পাঠানেরা, ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমানা পেরিয়ে ; পূর্ব সীমানায় আমরা বলি বাংলা। কিন্তু দুই ভাষারই কঙ্কাল-সংস্থানের মধ্যে যে ঐক্য আছে তার থেকে বোঝা যায় এরা আত্মীয়। এই দুই ভাষাতেই বহুসংখ্যক ধ্বনি গড়ে উঠেছে শব্দ হয়ে। একটা মূলস্বভাব তাদের ঐক্য দিয়েছে। শব্দগুলো বিশ্লেষণ ক'রে দেখলে সেই স্বভাবটা ধরা পড়ে। এর থেকে বোঝা যায়, এক-এক জাতির ভাষা তার স্বতন্ত্র খেয়ালের সৃষ্টি নয়। কতকগুলি মূল ধ্বনিসংকেত নিয়ে যারা ভাষার কারবার আরম্ভ করেছিল, তারা ছড়িয়ে পড়েছে নানা দেশে। কিন্তু ধ্বনিসংকেতের আত্মীয়তা ধরা পড়ে তাঁদের কাছে, ভাষাদৃষ্টির অভিজ্ঞতা

যাদের আছে। প্রাচীন যুগের ঘোড়া আর এখনকার ঘোড়ায় প্রভেদ আছে বিস্তর, কিন্তু তাদের কঙ্কালের ছাঁদ দেখলে বোঝা যায়, তারা এক বংশের। ভাষার মধ্যেও সেই কঙ্কালের ছাঁদের মিল পেলেই তাদের একজাতীয়তা ধরা পড়ে।

ভাষা বানিয়েছে মানুষ, এ কথা কিছু সত্য আবার অনেকখানি সত্য নয়। ভাষা যদি ব্যক্তিগত কোনো মানুষের বা দলের কৃতকার্য হত তা হলে তাকে বানানো বলতুম; কিন্তু ভাষা একটা সমগ্র জাতের লোকের মন থেকে, মুখ থেকে, ক্রমশই গড়ে উঠেছে। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর জমিতে ভিন্ন ভিন্ন রকমের গাছপালা যেমন অভিব্যক্ত হয়ে ওঠে, ভাষার মূলপ্রকৃতিও তেমনি। মানুষের বাগ্‌যন্ত্র যদিও সব জাতের মধ্যেই একই ছাঁদের তবু তাদের চেহারায় তফাত আছে, এও তেমনি। বাগ্‌যন্ত্রের একটা-কিছু সূক্ষ্ম ভেদ আছে, তাতেই উচ্চারণের গড়ন যায় বদলে। ভিন্ন ভিন্ন জাতের মুখে স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণের মিশ্রণ ঘটবার রাস্তায় তফাত দেখতে পাওয়া যায়। তার পরে তাদের চিন্তার আছে ভিন্ন ভিন্ন ছাঁচ, তাতে শব্দ জোড়বার ধরণ ও ভাষার প্রকৃতি আলাদা ক'রে দেয়। ভাষা প্রথমে আরম্ভ হয় নানারকম দৈবাৎ শব্দসংঘাতে, তার পরে মানুষের দেহমনের স্বভাব অনুসরণ করে সেই-সব সংকেতের ধারায় সে ভরে উঠতে থাকে। পথহীন মাঠের মধ্যে দিয়ে যখন একজন বা দু-চারজন মানুষ কোনো-এক সময়ে চলে গেছে, তখন তাদের পায়ের চাপে মাটি ও ঘাস চাপা প'ড়ে একটা আকস্মিক সংকেত তৈরি হয়েছে। পরবর্তী পথিকেরা পায়ের তলায় তারই আহ্বান পায়। এমনি করে পদক্ষেপের প্রবাহে এ পথ চিহ্নিত হতে থাকে। যদি পরিশ্রম বাঁচাবার জন্যে মানুষ এ পথ বানাতে বিশেষ চেষ্টা করত তা হলে রাস্তা হত সিধে; কিন্তু দেখতে পাই, মেঠো পথ চলেছে বেঁকেচুরে। তাতে রাস্তা দীর্ঘ হয়েছে কি না সে কথা কেউ বিচার করে নি।

ভাষার আকস্মিক সংকেত এমনি ক'রে অলক্ষ্যে টেনে নিয়ে চলেছে যে পথে সেটা আঁকাবাঁকা পথ। হিসেব ক'রে তৈরি হয় নি, হয়েছে ইশারা থেকে ইশারায়। পুরোনো রাস্তা কিছু কিছু জীর্ণ হয়েছে, আবার তার উপরে নতুন সংস্কারেরও হাত পড়েছে। অনেক খুঁত আছে তার মধ্যে, নানা স্থানেই সে যুক্তিসংগত নয়। না হোক, তবু সে প্রাণের জিনিস, সমস্ত জাতের প্রাণমনের সঙ্গে সে গেছে এক হয়ে।

৩

মানুষের একটা গুণ এই যে সে প্রতিমূর্তি গড়ে; তা সে পটে হোক, পাথরে হোক, মাটিতে ধাতুতে হোক। অর্থাৎ একটি বস্তুর অনুরূপে আর-একটিকে বানাতে সে আনন্দ

পায়। তার আর-একটি গুণ প্রতীক তৈরি করা, খেলার আনন্দে বা কাজের সুবিধের জন্যে। প্রতীক কোনো-কিছুর অনুরূপ হবে, এমন কথা নেই। মুখোষ প'রে বড়োলাটসাহেবের পক্ষে অবিকল রাজার চেহারার নকল করা অনাবশ্যক। ভারতবর্ষের গদিতে তিনি রাজার স্থান দখল করে কাজ চালান— তিনি রাজার প্রতীক বা প্রতিনিধি। প্রতীকটা মেনে নেওয়ার ব্যাপার। ছেলেবেলায় মাস্টারি খেলা খেলবার সময় মেনে নিয়েছিলুম বারান্দার রেলিংগুলো আমার ছাত্র। মাস্টারি শাসনের নিষ্ঠুর গৌরব অনুভব করবার জন্যে সত্যিকার ছেলে সংগ্রহ করবার দরকার হয় নি। এক টুকরো কাগজের সঙ্গে দশ টাকার চেহারার কোনো মিল নেই, কিন্তু সবাই মিলে মেনে নিয়েছে দশ টাকা তার দাম, দশ টাকার সে প্রতীক। এতে দলের লোকের দেনাপাওনাকে সোজা ক'রে দেওয়া হল।

ভাষা নিয়ে মানুষের প্রতীকের কারবার। বাঘের খবর আলোচনা করবার উপলক্ষ্যে স্বয়ং বাঘকে হাজির করা সহজও নয়, নিরাপদও নয়। বাঘে মানুষকে খায়, এই সংবাদটাকে প্রত্যক্ষ করানোর চেষ্টা নানা কারণেই অসংগত। 'বাঘ' ব'লে একটা শব্দকে মানুষ বানিয়েছে বাঘ জন্তুর প্রতীক। বাঘের চরিত্রে জানবার বিষয় থাকতে পারে বিস্তর, সে-সমস্তই ব্যবহার করা এবং জমা করা যায় ভাষার প্রতীক দিয়ে। মানুষের জ্ঞানের সঙ্গে ভাবের সঙ্গে অভিব্যক্ত হয়ে চলেছে এই তার একটি বিরাট প্রতীকের জগৎ। এই প্রতীকের জালে জল স্থল আকাশ থেকে অসংখ্য সত্য সে আকর্ষণ করছে, এবং সঞ্চারণ করতে পারছে দূর দেশে ও দূর কালে। ভাষা গড়ে তোলা মানুষের পক্ষে সহজ হয়েছে যে প্রতীকরচনার শক্তিতে, প্রকৃতির কাছ থেকে সেই দানটাই মানুষের সকল দানের সেরা।

ধ্বনিতে গড়া বিশেষ বিশেষ প্রতীক কেবল যে বিশেষ বিশেষ বস্তুর নামধারী হয়ে কাজ চালাচ্ছে তা নয়, আরও অনেক সূক্ষ্ম তার কাজ। ভাষাকে তাল রেখে চলতে হয় মনের সঙ্গে। সেই মনের গতি কেবল তো চোখের দেখার সীমানার মধ্যে সংকীর্ণ নয়। যাদের দেখা যায় না, ছোঁওয়া যায় না, কেবলমাত্র ভাবা যায়, মানুষের সবচেয়ে বড়ো দেনাপাওনা তাদেরই নিয়ে। খুব একটা সামান্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

বলতে চাই, তিনটে সাদা গোরু। ঐ 'তিন' শব্দটা সহজ নয়, আর 'সাদা' শব্দটাও যে খুব সাদা অর্থাৎ সরল তা বলতে পারি নে। পৃথিবীতে তিন-জন মানুষ, তিন-তলা বাড়ি, তিন-সের দুধ প্রভৃতি তিনের পরিমাণওয়ালা জিনিস বিস্তর আছে, কিন্তু জিনিসমাত্রই নেই অথচ তিন ব'লে একটা সংখ্যা আছে এ অসম্ভব। এ যদি ভাবতে যাই তা হলে হয়তো তিন সংখ্যার একটা অক্ষর ভাবি, সেই অক্ষরটাকে মুখে বলি তিন;

কিন্তু অক্ষর তো তিন নয়। ঐ তিন অক্ষর এবং তিন শব্দের মধ্যে নিঃশব্দে লুকোনো রয়েছে অগণ্য তিন-সংখ্যক জিনিসের নির্দেশ। তাদের নাম করতে হয় না। ভাষার এই সুবিধা নিয়ে মানুষ সংখ্যা বোঝাবার শব্দ বানিয়েছে বিস্তর। তিনটে তিন সংখ্যার গোরু একত্র করলে ৯টা গোরু হয়, এ কথা স্মরণ করাবার জন্যে গোয়ালঘরে টেনে নিয়ে যেতে হয় না। গোরু প্রভৃতি সব-কিছু বাদ দিয়ে মানুষ ভাষার একটা কৌশল বানিয়ে দিলে, বললে তিন-ত্রিক্‌খে নয়। ও একটা ফাঁদ। তাতে ধরা পড়তে লাগল কেবল গোরু নয় তিন-সংখ্যা-বাঁধা যে-কোনো তিন জিনিসের পরিমাপ। ভাষা যার নেই এই সহজ কথাটা ধরে রাখবার উপায় তার হাতে নেই।

এই উপলক্ষ্যে একটা ঘটনা আমার মনে পড়ল। ইস্কুলে-পড়া একটি ছোটো মেয়ের কাছে আমার নামতার অজ্ঞতা প্রমাণ করবার জন্যে পরিহাস ক'রে বলেছিলুম, তিন-পাঁচে পঁচিশ।

চোখদুটো এত বড়ো ক'রে সে বললে, 'আপনি কি জানেন না তিন-পাঁচে পনেরো ?' আমি বললুম, 'কেমন করে জানব বলো, সব তিনই কি এক মাপের। তিনটে হাতিকে পাঁচগুণ করলেও পনেরো, তিনটে টিকটিকিকেও ?' শুনে তার মনে বিষম ধিক্কার উপস্থিত হল, বললে, 'তিন যে তিনটে একক, হাতি-টিকটিকির কথা তোলেন কেন।' শুনে আমার আশ্চর্য বোধ হল। যে একক সরুও নয় মোটাও নয়, ভারিও নয় হাল্কাও নয়, যে আছে কেবল ভাষা আঁকড়িয়ে, সেই নির্গুণ একক ওর কাছে এত সহজ হয়ে গেছে যে, আস্ত হাতি-টিকটিকিকেও বাদ দিয়ে ফেলতে তার বাধে না। এই তো ভাষার গুণ।

'সাদা' কথাটাও এইরকম সৃষ্টিছাড়া। সে একটা বিশেষণ, বিশেষ্য নইলে একেবারে নিরর্থক। সাদা বস্তু থেকে তাকে ছাড়িয়ে নিলে জগতে কোথাও তাকে রাখবার জায়গা পাওয়া যায় না, এক ঐ ভাষার শব্দটাতে ছাড়া। এই তো গেল গুণের কথা, এখন বস্তুর কথা।

মনে আছে আমার বয়স যখন অল্প আমার একজন মাস্টার বলেছিলেন, এই টেবিলের গুণগুলি সব বাদ দিলে হয়ে যাবে শূন্য। শুনে মন মানতেই চাইল না। টেবিলের গায়ে যেমন বানিশ লাগানো হয় তেমনি টেবিলের সঙ্গে তার গুণগুলো লেগে থাকে, এই রকমের একটা ধারণা বোধ করি আমার মনে ছিল। যেন টেবিলটাকে বাদ দিতে গেলে মুটে ডাকার দরকার, কিন্তু গুণগুলো ধুয়ে মুছে ফেলা সহজ। সেদিন এই কথা নিয়ে হাঁ করে অনেকক্ষণ ভেবেছিলুম। অথচ মানুষের ভাষা গুণহীনকে নিয়ে অনেক বড়ো বড়ো কারবার করেছে। একটা দৃষ্টান্ত দিই।

আমাদের ভাষায় একটা সরকারি শব্দ আছে, 'পদার্থ'। বলা বাহুল্য, জগতে পদার্থ ব'লে কোনো জিনিস নেই; জল মাটি পাথর লোহা আছে। এমনতরো অনির্দিষ্ট ভাবনাকে মানুষ তার ভাষায় বাঁধে কেন। জরুরি দরকার আছে বলেই বাঁধে।

বিজ্ঞানের গোড়াতেই এ কথাটা বলা চাই যে, পদার্থ মাত্রই কিছু না কিছু জায়গা জোড়ে। ঐ একটা শব্দ দিয়ে কোটি কোটি শব্দ বাঁচানো গেল। অভ্যাস হয়ে গেছে ব'লে এ সৃষ্টির মূল্য ভুলে আছি। কিন্তু ভাষার মধ্যে এই-সব অভাবনীয়কে ধরা মানুষের একটা মস্ত কীর্তি।

বোঝা-হাল্কা-করা এই-সব সরকারি শব্দ দিয়ে বিজ্ঞান দর্শন ভরা। সাহিত্যেও তার কমতি নেই। এই মনে করো, 'হৃদয়' শব্দটা বলি অত্যন্ত সহজেই। কারও হৃদয় আছে বা হৃদয় নেই, যত সহজে বলি তত সহজে ব্যাখ্যা করতে পারি নে। কারও 'মনুষ্যত্ব' আছে বলতে কী আছে তা সমস্তটা স্পষ্ট করে বলা অসাধ্য। এ ক্ষেত্রে ধ্বনির প্রতীক না দিয়ে অন্যরকম প্রতীকও দেওয়া যেতে পারে। মনুষ্যত্ব ব'লে একটা আকারহীন পদার্থকে কোনো-একটা মূর্তি দিয়ে বলাও চলে। কিন্তু মূর্তিতে জায়গা জোড়ে, তার ভার আছে, তাকে বয়ে নিয়ে যেতে হয়। তা ছাড়া তাকে বৈচিত্র্য দেওয়া যায় না। শব্দের প্রতীক আমাদের মনের সঙ্গে মিলিয়ে থাকে, অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে তার অর্থের বিস্তার হতেও বাধা ঘটে না।

এ কথাটা জেনে রাখা ভালো যে, এই-সব ভার-লাঘব-করা সরকারি অর্থের শব্দগুলিকে ইংরেজিতে বলে অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট্‌ শব্দ। বাংলায়, এর একটা নতুন প্রতিশব্দের দরকার। বোধ করি 'নির্বস্তুক' বললে কাজ চলতে পারে। বস্তু থেকে গুণকে নিষ্ক্রান্ত করে নেওয়া যে ভাবমাত্র তাকে বলবার ও বোঝাবার জন্যে নির্বস্তুক শব্দটা হয়তো ব্যবহারের যোগ্য। এই অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট্‌ শব্দগুলোকে আশ্রয় করে মানুষের মন এত দূরে চলে যেতে পেরেছে যত দূরে তার ইন্দ্রিয়শক্তি যেতে পারে না, যত দূরে তার কোনো যানবাহন পৌঁছয় না।

৪

মানুষ যেমন জানবার জিনিস ভাষা দিয়ে জানায় তেমনি তাকে জানাতে হয় সুখ-দুঃখ, ভালো লাগা - মন্দ লাগা, নিন্দা-প্রশংসার সংবাদ। ভাবে ভঙ্গীতে, ভাষাহীন আওয়াজে, চাহনিতে, হাসিতে, চোখের জলে এই-সব অনুভূতির অনেকখানি বোঝানো যেতে পারে। এইগুলি হল মানুষের প্রকৃতিদত্ত বোবার ভাষা, এ ভাষায় মানুষের ভাবপ্রকাশ প্রত্যক্ষ। কিন্তু সুখ দুঃখ ভালোবাসার বোধ অনেক সূক্ষ্মে যায়, ঊর্ধ্বে যায়;

তখন তাকে ইশারায় আনা যায় না, বর্ণনায় পাওয়া যায় না, কেবল ভাষার নৈপুণ্যে যত দূর সম্ভব নানা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে। ভাষা হৃদয়বোধের গভীরে নিয়ে যেতে পেরেছে বলেই মানুষের হৃদয়াবেগের উপলব্ধি উৎকর্ষ লাভ করেছে। সংস্কৃতিমানদের বোধশক্তির রূঢ়তা যায় ক্ষয় হয়ে, তাঁদের অনুভূতির মধ্যে সূক্ষ্ম সুকুমার ভাবের প্রবেশ ঘটে সহজে। গোঁয়ার হৃদয় হচ্ছে অশিক্ষিত হৃদয়। অবশ্য স্বভাবদোষে রুচি ও অনুভূতির পরুষতা যাদের মজ্জাগত তাদের আশা ছেড়ে দিতে হয়। জ্ঞানের শক্তি নিয়েও এ কথা খাটে। স্বাভাবিক মূঢ়তা যাদের দুর্ভেদ্য, জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চায় তাদের বুদ্ধিকে বেশি দূর পর্যন্ত সার্থকতা দিতে পারে না।

মানুষের বুদ্ধিসাধনার ভাষা আপন পূর্ণতা দেখিয়েছে দর্শনে বিজ্ঞানে। হৃদয়বৃত্তির চূড়ান্ত প্রকাশ কাব্যে। দুইয়ের ভাষায় অনেক তফাত। জ্ঞানের ভাষা যত দূর সম্ভব পরিষ্কার হওয়া চাই; তাতে ঠিক কথাটার ঠিক মানে থাকা দরকার, সাজসজ্জার বাহুল্যে সে যেন আচ্ছন্ন না হয়। কিন্তু ভাবের ভাষা কিছু যদি অস্পষ্ট থাকে, যদি সোজা ক'রে না বলা হয়, যদি তাতে অলংকার থাকে উপযুক্তমত, তাতেই কাজ দেয় বেশি। জ্ঞানের ভাষায় চাই স্পষ্ট অর্থ; ভাবের ভাষায় চাই ইশারা, হয়তো অর্থ বাঁকা ক'রে দিয়ে।

ভালো লাগা বোঝাতে কবি বললেন, 'পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে'। বললেন, 'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনি বহিয়া যায়'। এখানে কথাগুলোর ঠিক মানে নিলে পাগলামি হয়ে দাঁড়াবে। কথাগুলো যদি বিজ্ঞানের বইয়ে থাকত তা হলে বুঝতুম, বিজ্ঞানী নতুন আবিষ্কার করেছেন এমন একটি দৈহিক হাওয়া যার রাসায়নিক ক্রিয়ায় পাথর কঠিন থাকতে পারে না, গ্যাস রূপে হয় অদৃশ্য। কিংবা কোনো মানুষের শরীরে এমন একটি রশ্মি পাওয়া গেছে যার নাম দেওয়া হয়েছে লাবণি, পৃথিবীর টানে যার বিকিরণ মাটির উপর দিয়ে ছড়িয়ে যেতে থাকে। শব্দের অর্থকে একান্ত বিশ্বাস করলে এইরকম একটা ব্যাখ্যা ছাড়া উপায় থাকে না। কিন্তু এ-যে প্রাকৃত ঘটনার কথা নয়, এ-যে মনে-হয়-যেন'র কথা। শব্দ তৈরি হয়েছে ঠিকটা-কী জানাবার জন্যে; সেইজন্যে ঠিক-যেন-কী বলতে গেলে তার অর্থকে বাড়াতে হয়, বাঁকাতে হয়। ঠিক-যেন-কী'র ভাষা অভিধানে বেঁধে দেওয়া নেই, তাই সাধারণ ভাষা দিয়েই কবিকে কৌশলে কাজ চালাতে হয়। তাকেই বলা যায় কবিত্ব। বস্তুত কবিত্ব এত বড়ো জায়গা পেয়েছে তার প্রধান কারণ, ভাষার শব্দ কেবল আপন সাদা অর্থ দিয়ে সব ভাব প্রকাশ করতে পারে না। তাই কবি লাবণ্য শব্দের যথার্থ সংজ্ঞা ত্যাগ ক'রে বানিয়ে বললেন, যেন লাবণ্য একটা ঝরনা, শরীর থেকে ঝ'রে পড়ে মাটিতে। কথার

অর্থ টাকে সম্পূর্ণ নষ্ট ক'রে দিয়ে এ হল ব্যাকুলতা ; এতে বলার সঙ্গে সঙ্গেই বলা হচ্ছে 'বলতে পারছি নে'। এই অনির্বচনীয়তার সুযোগ নিয়ে নানা কবি নানারকম অত্যুক্তির চেষ্টা করে। সুযোগ নয় তো কী ; যাকে বলা যায় না তাকে বলবার সুযোগই কবির সৌভাগ্য। এই সুযোগেই কেউ লাবণ্যকে ফুলের গন্ধের সঙ্গে তুলনা করতে পারে, কেউ বা নিঃশব্দ বীণাধ্বনির সঙ্গে—অসংগতিকে আরও বহু দূরে টেনে নিয়ে গিয়ে। লাবণ্যকে কবি যে লাবণি বলেছেন সেও একটা অধীরতা। প্রচলিত শব্দকে অপ্রচলিতের চেহারা দিয়ে ভাষার আভিধানিক সীমানাকে অনির্দিষ্ট ভাবে বাড়িয়ে দেওয়া হল।

হৃদয়াবেগে যার সীমা পাওয়া যায় না তাকে প্রকাশ করতে গেলে সীমাবদ্ধ ভাষার বেড়া ভেঙে দিতে হয়। কবিত্বে আছে সেই বেড়া ভাঙার কাজ। এইজন্যেই মা তার সন্তানকে যা নয় তাই ব'লে একেকে আর ক'রে জানায়। বলে চাঁদ, বলে মানিক, বলে সোনা। এক দিকে ভাষা স্পষ্ট কথার বাহন, আর-এক দিকে অস্পষ্ট কথারও। এক দিকে বিজ্ঞান চলেছে ভাষার সিঁড়ি বেয়ে ভাষাসীমার প্রত্যন্তে, ঠেকেছে গিয়ে ভাষাতীত সংকেতচিহ্নে ; আর-এক দিকে কাব্যও ভাষার ধাপে ধাপে ভাবনার দূরপ্রান্তে পৌঁছিয়ে অবশেষে আপন বাঁধা অর্থের অন্যথা করেই ভাবের ইশারা তৈরি করতে বসেছে।

৫

জানার কথাকে জানানো আর হৃদয়ের কথাকে বোধে জাগানো, এ ছাড়া ভাষার আর-একটা খুব বড়ো কাজ আছে। সে হচ্ছে কল্পনাকে রূপ দেওয়া। এক দিকে এইটেই সবচেয়ে অদরকারি কাজ, আর-এক দিকে এইটেতেই মানুষের সবচেয়ে আনন্দ। প্রাণলোকে সৃষ্টিব্যাপারে জীবিকার প্রয়োজন যত বড়ো জায়গাই নিক-না, অলংকরণের আয়োজন বড়ো কম নয়। গাছপালা থেকে আরম্ভ ক'রে পশুপক্ষী পর্যন্ত সর্বত্রই রঙে রেখায় প্রসাধনের বিভাগ একটা মস্ত বিভাগ। পাশ্চাত্য মহাদেশে যে ধর্মনীতি প্রচলিত, পশুরা তাতে অসম্মানের জায়গা পেয়েছে। আমার বিশ্বাস, সেই কারণেই য়ুরোপের বিজ্ঞানীবুদ্ধি জীবমহলে সৌন্দর্যকে একান্তই কেজো আদর্শে বিচার করে এসেছে। প্রকৃতিদত্ত সাজে সজ্জায় ওদের বোধশক্তি প্রাণিক প্রয়োজনের বেশি দূরে যে যায়, এ কথা য়ুরোপে সহজে স্বীকার করতে চায় না। কিন্তু সৌন্দর্য একমাত্র মানুষের কাছেই প্রয়োজনের অতীত আনন্দের দূত হয়ে এসেছে আর পশুপক্ষীর সুখবোধ

একান্তভাবে কেবল প্রাণধারণের ব্যবসায়ে সীমাবদ্ধ, এমন কথা মানতেই হবে তার কোনো কারণ নেই।

যাই হোক, সৌন্দর্যকে মানুষ অহৈতুক বলে মেনে নিয়েছে। ক্ষুধা তৃষ্ণা মানুষকে টানে প্রাণযাত্রার গরজে; সৌন্দর্যও টানে, কিন্তু তাতে প্রয়োজনের তাগিদ নেই। প্রয়োজনের সামগ্রীর সঙ্গে আমরা সৌন্দর্যকে জড়িয়ে রাখি, সে কেবল প্রয়োজনের একান্ত ভারাকর্ষণ থেকে মনকে উপরে তোলবার জন্যে। প্রাণিক শাসনক্ষেত্রের মাঝখানে সৌন্দর্যের একটি মহল আছে যেখানে মানুষ মুক্ত, তাই সেখানেই মানুষ পায় বিশুদ্ধ আনন্দ।

মানুষ নির্মাণ করে প্রয়োজনে, সৃষ্টি করে আনন্দে। তাই ভাষার কাজে মানুষের দুটো বিভাগ আছে— একটা তার গরজের; আর-একটা তার খুশির, তার খেয়ালের। আশ্চর্যের কথা এই যে, ভাষার জগতে এই খুশির এলেকায় মানুষের যত সম্পদ সযত্নে সঞ্চিত এমন আর-কোনো অংশে নয়। এইখানে মানুষ সৃষ্টিকর্তার গৌরব অনুভব করেছে, সে পেয়েছে দেবতার আসন।

সৃষ্টি বলতে বোঝায় সেই রচনা যার মুখ্য উদ্দেশ্য প্রকাশ। মানুষ বুদ্ধির পরিচয় দেয় জ্ঞানের বিষয়ে, যোগ্যতার পরিচয় দেয় কৃতিত্বে, আপনারই পরিচয় দেয় সৃষ্টিতে। বিশ্বে যখন আমরা এমন-কিছুকে পাই যা রূপে রসে নিরতিশয়ভাবে তার সত্তাকে আমাদের চেতনার কাছে উজ্জ্বল করে তোলে, যাকে আমরা স্বীকার না করে থাকতে পারি নে, যার কাছ থেকে অন্য কোনো লাভ আমরা প্রত্যাশাই করি নে, আপন আনন্দের দ্বারা তাকেই আমরা আত্মপ্রকাশের চরম মূল্য দিই। ভাষায় মানুষের সবচেয়ে বড়ো সৃষ্টি সাহিত্য। এই সৃষ্টিতে যেটি প্রকাশ পেয়েছে তাকে যখন চরম বলেই মেনে নিই তখন সে হয় আমার কাছে তেমনি সত্য যেমন সত্য ঐ বটগাছ। সে যদি এমন-কিছু হয় সচরাচরের সঙ্গে যার মিল না থাকে, অথচ যাকে নিশ্চিত প্রতীতির সঙ্গে স্বীকার করে নিয়ে বলি 'এই যে তুমি', তা হলে সেও সত্য হয়েই সাহিত্যে স্থান পায়, প্রাকৃত জগতে যেমন সত্যরূপে স্থান পেয়েছে পর্বত নদী। মহাভারতের অনেক-কিছুই আমার কাছে সত্য; তার সত্যতা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক, এমন-কি প্রাকৃতিক কোনো প্রমাণ না থাকতে পারে, এবং কোনো প্রমাণ আমি তলব করতেই চাই নে, তাকে সত্য ব'লে অনুভব করেছি এই যথেষ্ট। আমরা যখন নতুন জায়গায় ভ্রমণ করতে বেরোই তখন সেখানে নিত্য অভ্যাসে আমাদের চৈতন্য মলিন হয় নি বলেই সেখানকার অতি সাধারণ দৃশ্য সম্বন্ধেও আমাদের অনুভূতি স্পষ্ট থাকে; এই স্পষ্ট অনুভূতিতে যা দেখি তার সত্যতা উজ্জ্বল, তাই সে আমাদের আনন্দ দেয়। তেমনি সেই সাহিত্যকেই

আমরা শ্রেষ্ঠ বলি যা রসজ্ঞদের অনুভূতির কাছে আপন রচিত রসকে রূপকে অবশ্যস্বীকার্য করে তোলে। এমনি করে ভাষায় জিনিসকে মানুষের মনের কাছে সত্য করে তোলবার নৈপুণ্য যে কী, তা রচয়িতা স্বয়ং হয়তো বলতে পারেন না।

প্রাকৃতিক জগতে অনেক-কিছুই আছে যা অকিঞ্চিৎকর বলে আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। কিন্তু অনেক আছে যা বিশেষভাবে সুন্দর, যা মহীয়ান, যা বিশেষ কোনো ভাবস্মৃতির সঙ্গে জড়িত। লক্ষ লক্ষ জিনিসের মধ্যে তাই সে বাস্তবরূপে বিশেষভাবে আমাদের মনকে টেনে নেয়। মানুষের রচিত সাহিত্যজগতে সেই বাস্তবের বাছাই করা হতে থাকে। মানুষের মন যাকে বরণ করে নেয় সব-কিছুর মধ্যে থেকে সেই সত্যের সৃষ্টি চলছে সাহিত্যে; অনেক নষ্ট হচ্ছে, অনেক থেকে যাচ্ছে। এই সাহিত্য মানুষের আনন্দলোক, তার বাস্তব জগৎ। বাস্তব বলছি এই অর্থে যে, সত্য এখানে আছে বলেই সত্য নয়, অর্থাৎ এ বৈজ্ঞানিক সত্য নয়— সাহিত্যের সত্যকে মানুষের মন নিশ্চিত মেনে নিয়েছে বলেই সে সত্য।

মানুষ জানে, জানায়; মানুষ বোধ করে, বোধ জাগায়। মানুষের মন কল্পজগতে সঞ্চরণ করে, সৃষ্টি করে কল্পরূপ: এই কাজে ভাষা তার যত সহায়তা করে ততই উত্তরোত্তর তেজস্বী হয়ে উঠতে থাকে।

সাহিত্যে যে স্বতঃপ্রকাশ সে আমাদের নিজের স্বভাবের। তার মধ্যে মানুষের অন্তরতর পরিচয় আপনিই প্রতিফলিত হয়। কেন হয় তার একটু আলোচনা করা যেতে পারে।

যে সত্য আমাদের ভালো লাগা - মন্দ লাগায় অপেক্ষা করে না, অস্তিত্ব ছাড়া যার অন্য কোনো মূল্য নেই, সে হল বৈজ্ঞানিক সত্য। কিন্তু যা-কিছু আমাদের সুখদুঃখ-বেদনার স্বাক্ষরে চিহ্নিত, যা আমাদের কল্পনার দৃষ্টিতে সুপ্রত্যক্ষ, আমাদের কাছে তাই বাস্তব। কোন্‌টা আমাদের অনুভূতিতে প্রবল করে সাড়া দেবে, আমাদের কাছে দেখা দেবে নিশ্চিত রূপ ধরে, সেটা নির্ভর করে আমাদের শিক্ষাদীক্ষার, আমাদের স্বভাবের, আমাদের অবস্থার বিশেষত্বের উপরে। আমরা যাকে বাস্তব বলে গ্রহণ করি সেইটেতেই আমাদের যথার্থ পরিচয়। এই বাস্তবের জগৎ কারও প্রশস্ত, কারও সংকীর্ণ। কারও দৃষ্টিতে এমন একটা সচেতন সজীবতা আছে, বিশ্বের ছোটো বড়ো অনেক-কিছুই তার অন্তরে সহজে প্রবেশ করে। বিধাতা তার চোখে লাগিয়ে রেখেছেন বেদনার স্বাভাবিক দূরবীক্ষণ অণুবীক্ষণ -শক্তি। আবার কারও কারও জগতে আন্তরিক কারণে বা বাহিরের অবস্থাবশত বেশি ক'রে আলো পড়ে বিশেষ কোনো সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে। তাই মানুষের বাস্তববোধের বিশেষত্ব ও

আয়তনেই যথার্থ তার পরিচয়। সে যদি কবি হয় তবে তার কাব্যে ধরা পড়ে তার মন এবং তার মনের দেখা বিশ্ব। যুদ্ধের পূর্বে ও পরে ইংরেজ কবিদের দৃষ্টিক্ষেত্রের আলো বদল হয়ে গেছে, এ কথা সকলেই জানে। প্রবল আঘাতে তাদের মানসিক পথযাত্রার রথ পূর্বকার বাঁধা লাইন থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে। তার পর থেকে পথ চলেছে অন্য দিকে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের পুরোনো সাহিত্য থেকে একটি দৃষ্টান্তের আলোচনা করা যেতে পারে।

মঙ্গলকাব্যের ভূমিকাতেই দেখি, কবি চলেছেন দেশ ছেড়ে। রাজ্যে কোনো ব্যবস্থা নেই, শাসনকর্তারা যথেচ্ছাচারী। নিজের জীবনে মুকুন্দরাম রাষ্ট্রশক্তির যে পরিচয় পেয়েছেন তাতে তিনি সবচেয়ে প্রবল করে অনুভব করেছেন অন্যায়ের উচ্ছৃঙ্খলতা; বিদেশে উপবাসের পর স্নান করে তিনি যখন ঘুমোলেন, দেবী স্বপ্নে তাঁকে আদেশ করলেন দেবীর মহিমাগান রচনা করবার জন্যে। সেই মহিমাকীর্তন ক্ষমাহীন ন্যায়ধর্মহীন ঈর্ষাপরায়ণ ক্রূরতার জয়কীর্তন। কাব্যে জানালেন, যে শিবকে কল্যাণময় বলে ভক্তি করা যায় তিনি নিশ্চেষ্ট, তাঁর ভক্তদের পদে পদে পরাভব। ভক্তের অপমানের বিষয় এই যে, অন্যায়কারিণী শক্তির কাছে সে ভয়ে মাথা করেছে নত, সেই সঙ্গে নিজের আরাধ্য দেবতাকে করেছে অশ্রদ্ধেয়। শিবশক্তিকে সে মেনে নিয়েছে অশক্তি বলেই।

মনসামঙ্গলের মধ্যেও এই একই কথা। দেবতা নিষ্ঠুর, ন্যায়ধর্মের দোহাই মানে না, নিজের পূজা-প্রচারের অহংকারে সব দুষ্কর্মই সে করতে পারে। নির্মম দেবতার কাছে নিজেকে হীন ক'রে, ধর্মকে অস্বীকার ক'রে, তবেই ভীরুর পরিত্রাণ, বিশ্বের এই বিধানই কবির কাছে ছিল প্রবলভাবে বাস্তব।

অপর দিকে আমাদের পুরাণকথাসাহিত্যে দেখো প্রহ্লাদচরিত্র। যাঁরা এই চরিত্রকে রূপ দিয়েছেন তাঁরা উৎপীড়নের কাছে মানুষের আত্মপরাভবকেই বাস্তব ব'লে মানেন নি। সংসারে সচরাচর ঘটে সেই দীনতাই, কিন্তু সংখ্যা গণনা করে তাঁরা মানবসত্যকে বিচার করেন নি। মানুষের চরিত্রে যেটা সত্য হওয়া উচিত তাঁদের কাছে সেইটেই হয়েছে প্রত্যক্ষ বাস্তব, যেটা সর্বদাই ঘটে এর কাছে সেটা ছায়া। যে কালের মন থেকে এ রচনা জেগেছিল সে কালের কাছে বীর্যবান দৃঢ়চিত্ততার মূল্য যে কতখানি, এই সাহিত্য থেকে তারই পরিচয় পাওয়া যায়।

আর-এক কবিকে দেখো, শেলি। তাঁর কাব্যে অত্যাচারী দেবতার কাছে মানুষ বন্দী। কিন্তু পরাভব এর পরিণাম নয়। অসহ্য পীড়নের তাড়নাতেও অন্যায় শক্তির

কাছে মানুষ অভিভূত হয় নি। এই কবির কাছে অত্যাচারীর পীড়নশক্তির দুর্জয়তাই সবচেয়ে বড়ো সত্য হয়ে প্রকাশ পায় না, তাঁর কাছে তার চেয়ে বাস্তব সত্য হচ্ছে অত্যাচারিতের অপরাজিত বীর্য।

সাহিত্যের জগৎকে আমি বলছি বাস্তবের জগৎ, এই কথাটার তাৎপর্য আরও একটু ভালো করে বুঝে দেখা দরকার। এ তর্ক প্রায় মাঝে মাঝে উঠেছে যে, প্রাকৃত জগতে যা অপ্রিয় যা দুঃখজনক, যাকে আমরা বর্জন করতে ইচ্ছা করি, সাহিত্যে তাকে কেন আদর করে স্থান দেওয়া হয়, এমন-কি বিরহান্তক নাটক কেন মিলনান্তক নাটকের চেয়ে বেশি মূল্য পেয়ে থাকে।

যা আমাদের মনে জোরে ছাপ দেয়, বাস্তবতার হিসাবে তারই প্রভাব আমাদের কাছে প্রবল। দুঃখের ধাক্কায় আমরা একটুও উদাসীন থাকতে পারি নে। এ কথা সত্য হলেও তর্ক উঠবে, দুঃখ যখন অপ্রিয় তখন সাহিত্যে তাকে উপভোগ্য বলে স্বীকার করি কেন। এর সহজ উত্তর এই— দুঃখ অপ্রিয় নয়, সাহিত্যেই তার প্রমাণ। যা-কিছু আমরা বিশেষ করে অনুভব করি তাতে আমরা বিশেষ করে আপনাকেই পাই। সেই পাওয়াতে আনন্দ। চার দিকে আমাদের অনুভবের বিষয় যদি কিছু না থাকে তা হলে সে আমাদের পক্ষে মৃত্যু; কিংবা যদি কেবলমাত্র তাই থাকে যাতে স্বভাবত আমাদের ঔৎসুক্যের অভাব বা ক্ষীণতা তা হলে মনে অবসাদ আসে, কেননা তাতে করে আমাদের আপনাকে অনুভব করাটা সচেতন হয়ে ওঠে না। দুঃখের অনুভূতি আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি চেতিয়ে রাখে; কিন্তু সংসারে দুঃখের সঙ্গে ক্ষতি এবং আঘাত জড়িয়ে থাকে, সেইজন্যে আমাদের প্রাণপুরুষ দুঃখের সম্ভাবনায় কুণ্ঠিত হয়। জীবনযাত্রার আঘাত বা ক্ষতি সাহিত্যে নেই বলেই বিশুদ্ধ অনুভবটুকু ভোগ করতে পারি। গল্পে ভূতের ভয়ের অনুভূতিতে ছেলেরা পুলকিত হয়, কেননা তাদের মন এই অনুভূতির অভিজ্ঞতা পায় বিনা দুঃখের মূল্যে। কাল্পনিক ভয়ের আঘাতে ভূত তাদের কাছে নিবিড়ভাবে বাস্তব হয়ে ওঠে, আর এই বাস্তবের অনুভূতি ভয়ের যোগেই আনন্দজনক। যারা সাহসী তারা বিপদের সম্ভাবনাকে যেচে ডেকে আনে, ভয়ানকে আনন্দ আছে বলেই। তারা এভারেস্টের চূড়া লঙ্ঘন করতে যায় অকারণে। তাদের মনে ভয় নেই বলেই ভয়ের কারণ-সম্ভাবনায় তাদের নিবিড় আনন্দ। আমার মনে ভয় আছে, তাই আমি দুর্গম পর্বতে চড়তে যাই নে, কিন্তু দুর্গমযাত্রীদের বিবরণ ঘরে বসে পড়তে ভালোবাসি; কেননা তাতে বিপদের স্বাদ পাই অথচ বিপদের আশঙ্কা থাকে না। যে ভ্রমণবৃত্তান্তে বিপদ যথেষ্ট ভীষণ নয় তা পড়তে তত ভালো লাগে না। বস্তুত প্রবল অনুভূতি মাত্রই আনন্দজনক, কেননা সেই অনুভূতি-দ্বারা প্রবলরূপে

আমরা আপনাকে জানি। সাহিত্য বহু বিচিত্রভাবে আমাদের আপনাকে জানার জগৎ, অথচ সে জগতে আমাদের কোনো দায়িত্ব নেই।

সাহিত্যে মানুষের আত্মপরিচয়ের হাজার হাজার ঝরনা বয়ে চলেছে— কোনোটা পঙ্কিল, কোনোটা স্বচ্ছ, কোনোটা ক্ষীণ, কোনোটা পরিপূর্ণপ্রায়। কোনোটা মানুষের মরবার সময়ের লক্ষণ জানায়, কোনোটা জানায় তার নবজাগরণের।

বিচার করলে দেখা যায়, মানুষের সাহিত্যরচনা তার দুটো পদার্থ নিয়ে। এক হচ্ছে যা তার চোখে অত্যন্ত করে পড়েছে, বিশেষ করে মনে ছাপ দিয়েছে। তা হাস্যকর হতে পারে, অদ্ভুত হতে পারে, সাংসারিক আবশ্যকতা অনুসারে অকিঞ্চিৎকর হতে পারে। তার মূল্য এই যে, তাকে মনে এনেছি একটা সুস্পষ্ট ছবিরূপে, ঘটনারূপে ; অর্থাৎ সে আমাদের অনুভূতিকে অধিকার করেছে বিশেষ ক'রে, ছিনিয়ে নিয়ে চেতনার ক্ষীণতা থেকে। সে হয়তো অবজ্ঞা বা ক্রোধ উদ্রেক করে, কিন্তু সে স্পষ্ট। যেমন মন্থরা বা ভাঁড়ুদত্ত। দৈনিক ব্যবহারে তার সঙ্গ আমরা বর্জন করে থাকি। কিন্তু সাহিত্যে যখন তার ছবি দেখি তখন হেসে কিংবা কোনো রকমে উত্তেজিত হ'য়ে ব'লে উঠি, 'ঠিক বটে!' এইরকম কোনো চরিত্রকে বা ঘটনাকে নিশ্চিত স্বীকার করাতে আমাদের আনন্দ আছে। নিয়তই বহু লক্ষ পদার্থ এবং অসংখ্য ব্যাপার যা আমাদের জীবনমনের ক্ষেত্র দিয়ে চলেছে তা প্রবলরূপে আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয় হয় না। কিন্তু যা-কিছু স্বভাবত কিংবা বিশেষ কারণে আমাদের চৈতন্যকে উদ্রিক্ত ক'রে আলোড়িত করে সেই-সব অভিজ্ঞতার উপকরণ আমাদের মনের ভাণ্ডারে জমা হতে থাকে, তারা বিচিত্রভাবে আমাদের স্বভাবকে পূর্ণ করে। মানুষের সাহিত্য মানুষের সেই সম্ভাবিত, সম্ভবপর, অসংখ্য অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। জাভাতে দেখে এলুম আশ্চর্য নৃত্যকৌশলের সঙ্গে হনুমানে ইন্দ্রজিতে লড়াইয়ের নাট্যাভিনয়। এই দুই পৌরাণিক চরিত্র এমন অন্তরঙ্গভাবে তাদের অভিজ্ঞতার জিনিস হয়ে উঠেছে যে, চার দিকের অনেক পরিচিত মানুষের এবং প্রত্যক্ষ ব্যাপারের চেয়ে এদের সত্তা এবং আচরণ তাদের কাছে প্রবলতররূপে সুনিশ্চিত হয়ে গেছে। এই সুনিশ্চিত অভিজ্ঞতার আনন্দ প্রকাশ পাচ্ছে তাদের নাচে গানে।

সাহিত্যের আর-একটা কাজ হচ্ছে, মানুষ যা অত্যন্ত ইচ্ছা করে সাহিত্য তাকে রূপ দেয়। এমন করে দেয় যাতে সে আমাদের মনের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। সংসার অসম্পূর্ণ ; তার ভালোর সঙ্গে মন্দ জড়ানো, সেখানে আমাদের আকাঙ্ক্ষা ভরপুর মেটে না। সাহিত্যে মানুষ আপনার সেই আকাঙ্ক্ষা-পূর্ণতার জগৎসৃষ্টি করে চলেছে। তার ইচ্ছার আদর্শে যা হওয়া উচিত ছিল, যা হয় নি, তাকে মূর্তিমান ক'রে মেটাচ্ছে সে

আপন ক্ষোভ। সেই রচনার প্রভাব ফিরে এসে তার নিজের সংসাররচনায় চরিত্ররচনায় কাজ করছে। মানুষের বড়ো ইচ্ছাকে যে সাহিত্য আকার দিয়েছে, এবং আকার দেওয়ার দ্বারা মানুষের মনকে ভিতরে ভিতরে বড়ো ক'রে তুলছে, তাকে মানুষ যুগে যুগে সম্মান দিয়ে এসেছে।

এইসঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে, সাহিত্যে মানুষের চারিত্রিক আদর্শের ভালো মন্দ দেখা দেয় ঐতিহাসিক নানা অবস্থাভেদে। কখনো কখনো নানা কারণে ক্লান্ত হয় তার শুভবুদ্ধি, যে বিশ্বাসের প্রেরণায় তাকে আত্মজয়ের শক্তি দেয় তার প্রতি নির্ভর শিথিল হয়, কলুষিত প্রবৃত্তির স্পর্ধায় তার রুচি বিকৃত হতে থাকে, শৃঙ্খলিত পশুর শৃঙ্খল যায় খুলে, রোগজর্জর স্বভাবের বিষাক্ত প্রভাব হয়ে ওঠে সাংঘাতিক, ব্যাধির সংক্রামকতা বাতাসে বাতাসে ছড়াতে থাকে দূরে দূরে। অথচ মৃত্যুর ছোঁয়াচ লেগে তার মধ্যে কখনো কখনো দেখা দেয় শিল্পকলার আশ্চর্য নৈপুণ্য। শুক্তির মধ্যে মুক্তা দেখা দেয় তার ব্যাধিরূপে। শীতের দেশে শরৎকালের বনভূমিতে যখন মৃত্যুর হাওয়া লাগে তখন পাতায় পাতায় রঙিন তার বিকাশ বিচিত্র হয়ে ওঠে, সে তাদের বিনাশের উপক্রমণিকা। সেইরকম কোনো জাতির চরিত্রকে যখন আত্মঘাতী রিপুর দুর্বলতায় জড়িয়ে ধরে তখন তার সাহিত্যে, তার শিল্পে, কখনো কখনো মোহনীয়তা দেখা দিতে পারে। তারই প্রতি বিশেষ লক্ষ নির্দেশ ক'রে যে রসবিলাসীরা অহংকার করে তারা মানুষের শত্রু। কেননা সাহিত্যকে শিল্পকলাকে সমগ্র মনুষ্যত্ব থেকে স্বতন্ত্র করতে থাকলে ক্রমে সে আপন শৈল্পিক উৎকর্ষের আদর্শকেও বিকৃত করে তোলে।

মানুষ যে কেবল ভোগরসের সমজদার হয়ে আত্মশ্লাঘা করে বেড়াবে তা নয়; তাকে পরিপূর্ণ করে বাঁচতে হবে, অপ্রমত্ত পৌরুষে বীর্যবান হয়ে সকলপ্রকার অমঙ্গলের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। স্বজাতির সমাধির উপরে ফুলবাগান নাহয় নাই তৈরি হল।

৬

সমুদ্রের মধ্যে হাজার হাজার প্রবাল আপন দেহের আবরণ মোচন করতে করতে কখন্ এক সময়ে দ্বীপ বানিয়ে তোলে। তেমনি বহুসংখ্যক মন আপনার অংশ দিয়ে দিয়ে গড়ে তুলেছে আপনার ভাবাদ্বীপ।

মানুষ বানিয়েছে আপনার গায়ের কাপড়। বয়স বাড়তে বাড়তে তার দেহের মাপের বদল হয়। বারবার পুরোনো কাপড় ফেলে দিয়ে নতুন কাপড় না বানালে তার চলে না। জাতির মন কখনো বাড়ে, আবার রুগ্ণ উপবাসীর যেরকম দশা হয় তেমনি

কখনো বা সে কমেও বটে। কিন্তু পুরোনো আমার মতো ভাষাটাকে ফেলে দিয়ে দর্জির দোকানে নতুন ভাষার ফরমাশ দিতে হয় না। মনের গড়নের সঙ্গেই চলেছে তার গড়ন, মনের বাড়নের সঙ্গেই তার বাড়। আমার এই প্রায় আশি বছর বয়সে নিজেরই ভিতর থেকে দেখতে পাই, সত্তর বছর পূর্বের বাঙালির মন আর এখনকার মনে তফাত বিস্তর। দেখতে পাচ্ছি এই তার মনের বদল ভাষার মধ্যেও ভিতরে-ভিতরে কাজ করছে। সত্তর বছর আগেকার ভাষা এখন নেই। এর উপরে লেগেছে অনেক মনের নব নব স্পর্শ ও প্রবর্তনা। কিন্তু সে কথাও সম্পূর্ণ সত্য নয়। নতুন যুগের জোয়ার আসে কোনো এক-একজন বিশেষ মনীষীর মনে। নতুন বাণীর পণ্য বহন করে আনে। সমস্ত দেশের মন জেগে ওঠে চিরাভ্যস্ত জড়তা থেকে; দেখতে দেখতে তার বাণীর বদল হয়ে যায়। বাংলাদেশে তার মস্ত দৃষ্টান্ত বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর আগে ভাষার মধ্যে অসাড়তা ছিল; তিনি জাগিয়ে দেওয়াতে তার যেন স্পর্শবোধ গেল বেড়ে। নতুন কালের নানা আহ্বানে সে সাড়া দিতে শুরু করলে। অল্পকালের মধ্যেই আপন শক্তি সম্বন্ধে সে সচেতন হয়ে উঠল। বঙ্গদর্শনের পূর্বকার ভাষা আর পরের ভাষা তুলনা করে দেখলে বোঝা যাবে, এক প্রান্তে একটা বড়ো মনের নাড়া খেলে দেশের সমস্ত মনে ঢেউ খেলিয়ে যায় কত দ্রুত বেগে, আর তখনি তখনি তার ভাষা কেমন করে নূতন নূতন প্রণালীর মধ্যে আপন পথ ছুটিয়ে নিয়ে চলে।

৭

আমরা যাকে দেশ বলি, বাইরে থেকে দেখতে সে ভূগোলের এক অংশ। কিন্তু তা নয়। পৃথিবীর উপরিভাগে যেমন আছে তার বায়ুমণ্ডল, যেখানে বয় তার প্রাণের নিশ্বাস, যেখানে ওঠে তার গানের ধ্বনি, যার মধ্যে দিয়ে আসে তার আকাশের আলো, তেমনি একটা মনোমণ্ডল স্তরে স্তরে এই ভূভাগকে অদৃশ্য আবেষ্টনে ঘিরে ফেলেছে— সমস্ত দেশকে সেই দেয় অন্তরের ঐক্য।

পৃথিবীর আবহ-আস্তরণের মতোই তার সব কাজ সব দান সকলকে নিয়ে। যা ভূখণ্ড এ তাকেই করে তুলেছে দেশ। ধারাবাহিক বৃহৎ আত্মীয়তার ঐক্যবেষ্টনে প্রাকৃতিককে আচ্ছন্ন করে দিয়ে তাকে করেছে মানবিক। এই সীমার মধ্যে অনেক যুগের মা তার ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়িয়েছে একই ভাষার গান গেয়ে, সন্ধেবেলায় তাদের কোলে টেনে এনে বলেছে রূপকথা একই ভাষায়। পূজা করেছে এরা এক ভাষার মন্ত্রে, স্ত্রী পুরুষ একই ভাষায় পরস্পর ভালোবাসায় আলাপ করেছে; তার ভাষা অভিষিক্ত হয়ে গেছে প্রাণের রসে। মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো ভুলচুক হয়েছে, শয়তানি

বুদ্ধি পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ এনেছে, হানাহানি বাধিয়েছে, সমস্ত দলের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা খুঁচিয়ে তুলেছে। কিন্তু সেটাই সমস্ত দেশের প্রকৃতিতে সবচেয়ে সত্য আকার ধরে মুখ্য স্থান নেয় নি, তাই দেশের লোক দেশকে বলেছে মাতৃভূমি। এখানে উন্মেষিত হয়েছে এমন একটা মানবিকতার নিবিড় ঐক্য যা সমস্ত জাতকে রক্ষা করে, প্রবল করে, জ্ঞান দেয়, আনন্দিত করে সৌন্দর্যসৃষ্টিতে। যে দেশে এইরকম ঐক্যের মহৎরূপ অপূর্ণতা থেকে ক্রমে পূর্ণ হয়ে উঠেছে, বারবার উদ্ধার করেছে সমস্ত জাতকে বিঘ্নবিপদ থেকে বীর্য ও শুভবুদ্ধির জোরে, সেই দেশকেই মানুষ একান্তভাবে আপনার মধ্যে পেয়েছে, ভালোবেসেছে, সত্যি করে তাকে বলতে পেরেছে মাতৃভূমি।

এ কথা হয়তো আমরা অনেকে জানি নে যে, বাংলাদেশের বা ভারতবর্ষের মাতৃভূমি নাম আমাদের দেওয়া নয়। ঐ শব্দটাকে আমরা তর্জমা করে নিয়েছি ইংরেজি মাদারল্যাণ্ড্ থেকে। আমার বিশ্বাস এক সময়ে ভারতবর্ষে একটি উদ্‌বোধনের বিশেষ যুগ এসেছিল যখন ভরতরাজবংশকে স্মৃতির কেন্দ্রস্থলে রেখে ভারতের আর্যজাতীয়েরা নিজের ঐক্য উপলব্ধির সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সেই যুগেই বেদ পুরাণ দর্শনশাস্ত্র, লোকপ্রচলিত কথা ও কাহিনী, সংগ্রহ করবার উদ্যোগ এ দেশে জেগে উঠেছিল। সে অনেক দিনের কথা।

কিন্তু স্বাজাতিক ঐক্য সুদৃঢ় হয়ে গড়ে উঠতে পারে নি। বহুধাবিভক্ত ভারত ছোটো ছোটো রাজ্যে উপরাজ্যে পরস্পর কেবলই কাড়াকাড়ি হানাহানি করেছে, সাধারণ শত্রু যখন দ্বারে এসেছে সকলে এক হয়ে বিদেশীর আক্রমণ ঠেকাতে পারে নি।

এই শোচনীয় আত্মবিচ্ছেদ ও বহির্বিপ্লবের সময়ে ভারতবর্ষে একটিমাত্র ঐক্যের মহাকর্ষশক্তি ছিল, সে তার সংস্কৃতভাষা। এই ভাষাই ধর্মে কর্মে কাব্য-ইতিহাস-পুরাণ-চর্চায় তার সভ্যতাকে রেখেছিল বাঁধ বেঁধে। এই ভাষাই পিতৃপুরুষের চিত্তশক্তি দিয়ে সমস্ত দেশের দেহে ব্যাপ্ত করেছিল ঐক্যবোধের নাড়ির জাল। দেশের যে মাতৃশক্তি হৃদয়ের আত্মীয়তায় দেশের নানা জাতিকে এক সম্ভতিসূত্রে বাঁধতে পারত তার উৎস ছিল না এর মাটিতে। কিন্তু যে পিতৃশক্তি চিত্তোৎকর্ষের পথ দিয়ে ভাবী বংশকে জ্ঞানসম্পদে সম্মানিত করেছে তা আমরা পেয়েছি একটি আশ্চর্য ভাষার দৌত্য হতে।

ভারতবর্ষের নাম মাতার নাম নয়, কেননা ভারতবর্ষ যথার্থই পিতৃভূমি। তাই ভারতবর্ষের দেশ জুড়ে ব্যাপ্ত ঋষিদের নাম, আর রামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধ প্রভৃতি মহাপুরুষদের চরিত-বৃত্তান্ত। তাই পরকালে পিতৃলোকের পথকে সদ্গতির পথ বলে জানি।

এ কথা মনে রাখা উচিত যে, দেশবাসী সকলকে আমরা এক নাম দিয়ে পরিচিত

করি নি। মহাভারতে আমরা কাশী কাঞ্চি মগধ কোশল প্রভৃতি প্রদেশের কথা শুনেছি, কিন্তু তাদের সমস্তকে নিয়ে এক দেশের কথা শুনি নি। আজ আমরা যে হিন্দু নাম দিয়ে নিজেদের ধর্ম ও আচার -গত একটা বিশেষ ঐক্যের পরিচয় দিয়ে থাকি, সে নামকরণ আমাদের নিজকৃত নয়। বাইরে থেকে মুসলমান আমাদের এই নাম দিয়েছিল। হিন্দুস্থান নাম মুসলমানদের কাছ থেকে পাওয়া। আর যে একটি নামে আমাদের দেশ জগতের কাছে এক দেশ বলে খ্যাত সে হচ্ছে ইণ্ডিয়া, সে নামও বিদেশী। বস্তুত ভারতবাসী বোঝাবার কোনো নামকে যদি যথার্থ ন্যাশনাল বলা যায়, অর্থাৎ যে নামে ভারতের সকল জাতিকে বর্ণধর্ম-আচার-নির্বিশেষে এক ব'লে ধরা হয়েছে, সে ইণ্ডিয়ান। আমাদের ভাষায় আমাদের স্বাদেশিক নাম নেই।

বাংলাদেশের ইতিহাস খণ্ডতার ইতিহাস। পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ, রাঢ় বারেন্দ্রের ভাগ কেবল ভূগোলের ভাগ নয়; অন্তরের ভাগও ছিল তার সঙ্গে জড়িয়ে, সমাজেরও মিল ছিল না। তবু এর মধ্যে যে ঐক্যের ধারা চলে এসেছে সে ভাষার ঐক্য নিয়ে। এতকাল আমাদের যে বাঙালি বলা হয়েছে তার সংজ্ঞা হচ্ছে, আমরা বাংলা বলে থাকি। শাসনকর্তারা বাংলাপ্রদেশের অংশ-প্রত্যংশ অন্য প্রদেশে জুড়ে দিয়েছেন, কিন্তু সরকারী দফতরের কাঁচিতে তার ভাষাটাকে ছেঁটে ফেলতে পারেন নি।

ইতিমধ্যে স্বাদেশিক ঐক্যের মাহাত্ম্য আমরা ইংরেজের কাছে শিখেছি। জেনেছি এর শক্তি, এর গৌরব। দেখেছি এই সম্পর্কে এদের প্রেম, আত্মত্যাগ, জনহিতব্রত। ইংরেজের এই দৃষ্টান্ত আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেছে, অধিকার করেছে আমাদের সাহিত্যকে। আজ আমরা দেশের নামে গৌরব স্থাপন করতে চাই মানুষের ইতিহাসে।

এই-যে আমাদের দেশ আজ আমাদের মনকে টানছে, এর সঙ্গে সঙ্গেই জেগেছে আমাদের ভাষার প্রতি টান। মাতৃভাষা নামটা আজকাল আমরা ব্যবহার করে থাকি, এ নামও পেয়েছি আমাদের নতুন শিক্ষা থেকে। ইংরেজিতে আপন ভাষাকে বলে মাদার টাঙ্, মাতৃভাষা তারই তর্জমা। এমন দিন ছিল যখন বাঙালি বিদেশে গিয়ে আপন ভাষাকে অনায়াসেই পুরোনো কাপড়ের মতো ছেড়ে ফেলতে পারত; বিলেতে গিয়ে ভাষাকে সে দিয়ে আসত সমুদ্রে জলাঞ্জলি, ইংরেজভাষিণী অনুচরীদের সঙ্গে রেখে ছেলেমেয়েদের মুখে বাংলা চাপা দিয়ে তার উপরে ইংরেজির জয়পতাকা দিত সগর্বে উড়িয়ে। আজ আমাদের ভাষা এই অপমান থেকে উদ্ধার পেয়েছে, তার গৌরব আজ সমস্ত বাংলাভাষীকে মাহাত্ম্য দিয়েছে। বৎসরে বৎসরে জেলায় জেলায় সাহিত্যসম্মেলন বাঙালির একটা পার্বণ হয়ে দাঁড়িয়েছে; এ নিয়ে তাকে চেতিয়ে তুলতে হয় নি, হয়েছে স্বভাবতই।

৮

বাংলাভাষা ভারতবর্ষের প্রায় পাঁচ কোটি লোকের ভাষা। হিন্দি বা হিন্দুস্থানি যাদের যথার্থ ঘরের ভাষা, শিক্ষা-করা ভাষা নয়, সুনীতিকুমার দেখিয়েছেন, তাদের সংখ্যা চার কোটি বারো লক্ষের কাছাকাছি। এর উপরে আছে আট কোটি আটাশি লক্ষ লোক যারা তাদের খাঁটি মাতৃভাষা বর্জন ক'রে সাহিত্যে সভাসমিতিতে ইস্কুলে আদালতে হিন্দুস্থানির শরণাপন্ন হয়। তাই হিন্দুস্থানিকে ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যবহারের জন্যে এক ভাষা বলে গণ্য করা যেতে পারে। তার মানে, বিশেষ কাজের প্রয়োজনে কোনো বিশেষ ভাষাকে কৃত্রিম উপায়ে স্বীকার করা চলে, যেমন আমরা ইংরেজি ভাষাকে স্বীকার করেছি। কিন্তু ভাষার একটা অকৃত্রিম প্রয়োজন আছে; সে প্রয়োজন কোনো কাজ চালাবার জন্যে নয়, আত্মপ্রকাশের জন্যে।

রাষ্ট্রিক কাজের সুবিধা করা চাই বই-কি, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কাজ দেশের চিত্তকে সরস সফল ও সমুজ্জ্বল করা। সে কাজ আপন ভাষা নইলে হয় না। দেউড়িতে একটা সরকারি প্রদীপ জ্বালানো চলে, কিন্তু একমাত্র তারই তেল জোগাবার খাতিরে ঘরে ঘরে প্রদীপ নেবানো চলে না।

এই প্রসঙ্গে য়ুরোপের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। সেখানে দেশে দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, অথচ এক সংস্কৃতির ঐক্য সমস্ত মহাদেশে। সেখানে বৈষয়িক অনৈক্যে যারা হানাহানি করে এক সংস্কৃতির ঐক্যে তারা মনের সম্পদ নিয়তই অদল বদল করছে। ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ধারায় বয়ে নিয়ে আসা পণ্যে সমৃদ্ধিশালী, য়ুরোপীয় চিত্ত জয়ী হয়েছে সমস্ত পৃথিবীতে।

তেমনি ভারতবর্ষেও ভিন্ন ভিন্ন ভাষার উৎকর্ষ-সাধনে দ্বিধা করলে চলবে না। মধ্যযুগে য়ুরোপে সংস্কৃতির এক ভাষা ছিল লাটিন। সেই ঐক্যের বেড়া ভেদ করেই য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা যেদিন আপন আপন শক্তি নিয়ে প্রকাশ পেলে সেই দিন য়ুরোপের বড়োদিন। আমাদের দেশেও সেই বড়োদিনের অপেক্ষা করব— সব ভাষা একাকার করার দ্বারা নয়, সব ভাষার আপন আপন বিশেষ পরিণতির দ্বারা।

৯

বাংলাভাষাকে চিনতে হবে ভালো ক'রে; কোথায় তার শক্তি, কোথায় তার দুর্বলতা, দুইই আমাদের জানা চাই।

রূপকথায় বলে, এক-যে ছিল রাজা, তার দুই ছিল রানী, সুয়োরানী আর দুয়োরানী। তেমনি বাংলাবাক্যাধীপেরও আছে দুই রানী— একটাকে আদর করে

নাম দেওয়া হয়েছে সাধু ভাষা ; আর-একটাকে কথ্য ভাষা, কেউ বলে চল্‌তি ভাষা, আমার কোনো কোনো লেখায় আমি বলেছি প্রাকৃত বাংলা। সাধু ভাষা মাজাঘষা, সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধান থেকে ধার করা অলংকারে সাজিয়ে তোলা। চলতি ভাষার আটপৌরে সাজ নিজের চরকায় কাটা সুতো দিয়ে বোনা। অলংকারের কথা যদি জিজ্ঞাসা কর কালিদাসের একটা লাইন তুলে দিলে তার জবাব হবে ; কবি বলেন : কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্‌। যার মাধুর্য আছে সে যা পরে তাতেই তার শোভা। রূপকথায় শুনেছি সুয়োরানী ঠাঁই দেয় দুয়োরানীকে গোয়ালঘরে। কিন্তু গল্পের পরিণামের দিকে দেখি সুয়োরানী যায় নির্বাসনে, টিঁকে থাকে একলা দুয়োরানী রানীর পদে। বাংলায় চলতি ভাষা বহু কাল ধরে জায়গা পেয়েছে সাধারণ মাটির ঘরে, হেঁশেলের সঙ্গে, গোয়ালের ধারে, গোবর-নিকোনো আঙিনার পাশে যেখানে সন্ধেবেলায় প্রদীপ জ্বালানো হয় তুলসীতলায় আর বোষ্টমী এসে নাম শুনিয়ে যায় ভোরবেলাতে। গল্পের শেষ অংশটা এখনো সম্পূর্ণ আসে নি, কিন্তু আমার বিশ্বাস সুয়োরানী নেবেন বিদায় আর একলা দুয়োরানী বসবেন রাজাসনে।

চলতি ভাষার চলার বিরাম নেই, তার চলবার শক্তি আড়ষ্ট হবার সময় পায় না।

আমাদের মুখরিত দিনরাত্রির সব কথা ঝরে পড়ছে তার মাটিতে, তার সঙ্গে মিশিয়ে গিয়ে তার প্রকাশের শক্তিকে করছে উর্বরা।

তবু একটা কথা মানতে হবে যে, মানুষের বলবার কথা সবই যে সহজ তা নয় ; এমন কথা আছে যা ভালো করে এঁটে না বললে বলাই হয় না। সেই-সব বিচার-করা কথা কিংবা সাজিয়ে-বলা কথা চলে না দিনরাত্রির ব্যবহারে, যেমন চলে না দরবারি পোশাক কিংবা বেনারসি শাড়ি। আমরা সর্বদা মুখের কথায় বিজ্ঞান আওড়াই নে। তত্ত্বকথাও পণ্ডিতসভায়, তার আলোচনায় বিশেষ বিস্তার দরকার করে। তাই তর্ক ওঠে, এদের জন্যে চলতি ভাষার বাইরে একটা পাকা গাঁথুনির ভাষা বানানো নেহাত দরকার ; সাধু ভাষায় এরকম মহলের পত্তন সহজ, কেননা, ও ভাষাটাই বানানো।

কথাটা একটু বিচার করে দেখা যাক। আমরা লিখিয়ে-পড়িয়ের দলে চলতি ভাষাকে অনেক কাল থেকে জাতে ঠেলেছি। সাহিত্যের আসরে তাকে পা বাড়াতে দেখলেই দরোয়ান এসেছে তাড়া করে। সেইজন্যেই খিড়কির দরজায় পথ চলার অভ্যাসটাই ওর হয়ে গেছে স্বাভাবিক। অন্দরমহলে যে মেয়েরা অভ্যস্ত তাদের ব্যবহার সহজ হয় পরিচিত আত্মীয়দের মধ্যেই, বাইরের লোকদের সামনে তাদের মুখ দিয়ে কথা সরে না। তার কারণ এ নয় যে তাদের শক্তি নেই, কিন্তু সংকুচিত হয়েছে তাদের শক্তি। পাশ্চাত্য জাতিদের ভাষায় এই সদর-অন্দরের বিচার নেই। তাই

সেখানে সাহিত্য পেয়েছে চলনশীল প্রাণ, আর চলতি ভাষা পেয়েছে মননশীলতার ঐশ্বর্য। আমাদের ঘোমটা টানার দেশে সেটা তেমন করে প্রচলিত হয় নি ; কিন্তু হবার বাধা বাইরের শাসনে, স্বভাবের মধ্যে নয়।

সে অনেক দিনের কথা। তখন রামচন্দ্র মিত্র ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে বাংলার অধ্যাপক। তাঁর একজন ছাত্রের কাছে শুনেছি, পরীক্ষা দিতে যাবার পূর্বে বাংলা রচনা সম্বন্ধে তিনি উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, 'বাবা, সুশীতলসমীরণ লিখতে গিয়ে যত্বে ণত্বে কিংবা হ্রস্ব দীর্ঘ স্বরে যদি ধাঁধা লাগিয়ে দেয় তা হলে লিখে দিয়ো 'ঠাণ্ডা হাওয়া'।' সেদিনকার দিনে এটি সোজা কথা ছিল না। তখনকার সাধু বাংলা ঠাণ্ডা হাওয়া কিছুতেই সইতে পারত না, তখনকার রুগীরা যেমন ঠাণ্ডা জল খেতে পেত না তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে গেলেও।

সাধু ভাষার সঙ্গে চলতি ভাষার প্রধান তফাতটা ক্রিয়াপদের চেহারার তফাত নিয়ে। 'হচ্ছে' 'করছে'কে যদি জলচল করে নেওয়া যায় তা হলে জাতঠেলাঠেলি অনেকটা পরিমাণে ঘোচে। উতঙ্কের গুরুদক্ষিণা আনবার সময় তক্ষক বিঘ্ন ঘটিয়েছিল, এইটে থেকেই সর্পবংশধ্বংসের উৎপত্তি : এর ক্রিয়াক'টাকে অল্প একটু মোচড় দিয়ে সাধু ভাষার ভঙ্গী দিলেই কালীসিংহের মহাভারতের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। তাঁর কাজে ও কথায় অসংগতি : মুখের ভাষাতেও এটা বলা চলে, আবার এও বলা যায় 'তাঁর কাজে কথায় মিল নেই'। 'বাসুকি ভীমকে আলিঙ্গন করলেন' এ কথাটা মুখের ভাষায় অশুচি হয় না, আবার 'বাসুকি ভীমের সঙ্গে কোলাকুলি করলেন' এটাতেও বোধ হয় নিন্দের কারণ ঘটে না। বিজ্ঞানে দুর্বোধ তথ্য আছে, কিন্তু তা নিয়ে আমাদের সাধু ভাষাও গলদ্‌ঘর্ম হয়, আবার চলতি ভাষারও চোখে অন্ধকার ঠেকে। বিজ্ঞানের চর্চা আমাদের দেশে যখন ছড়িয়ে পড়বে তখন উভয় ভাষাতেই তার পথ প্রশস্ত হতে থাকবে। নতুন-বানানো পারিভাষিকে উভয় পক্ষেরই হবে সমান স্বত্ব।

১০

এইখানে এ কথা স্বীকার করতেই হবে, সংস্কৃতের আশ্রয় না নিলে বাংলা ভাষা অচল। কী জ্ঞানের কী ভাবের বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের যতই বিস্তার হচ্ছে ততই সংস্কৃতের ভাণ্ডার থেকে শব্দ এবং শব্দ বানাবার উপায় সংগ্রহ করতে হচ্ছে। পাশ্চাত্য ভাষাগুলিকেও এমনি করেই গ্রীক-লাটিনের বশ মানতে হয়। তার পারিভাষিক শব্দগুলো গ্রীক লাটিন থেকে ধার নেওয়া কিংবা তারই উপাদান নিয়ে তারই ছাঁচে

ঢালা। ইংরেজি ভাষায় দেখা যায়, তার পুরাতন পরিচিত দ্রব্যের নামগুলি স্যাক্সন এবং কেল্ট্। এগুলি সব আদিম জাতির আদিম অবস্থার সম্পত্তি। সেই পুরাতন কাল থেকে যতই দূরে চলে এসেছে ততই তার ভাষাকে অধিকার করেছে গ্রীক ও লাটিন। আমাদেরও সেই দশা। খাঁটি বাংলা ছিল আদিম কালের, সে বাংলা নিয়ে এখনকার কাজ ষোলো-আনা চলা অসম্ভব।

অভিধান দেখলে টের পাওয়া যাবে ইংরেজি ভাষার অনেকখানিই গ্রীক-লাটিনে গড়া। বস্তুত তার হাড়ে মাস লেগেছে ঐ ভাষায়। কোনো বিশেষ লেখার রচনারীতি হয়তো গ্রীক-লাটিন-ঘেঁষা, কোনোটার বা অ্যাংলো-স্যাক্সনের ছাঁদ। তাই বলে ইংরেজি ভাষা দুটো দল পাকিয়ে তোলে নি। কৃত্রিম ছাঁচে ঢালাই করা একটা স্বতন্ত্র সাহিত্যিক ভাষা খাড়া ক'রে তাই নিয়ে কোনো সম্প্রদায় কৌলীন্যের বড়াই করে না। নানা বন্দর থেকে নানা শব্দসম্পদের আমদানি ক'রে কথায় ও লেখায় একই তহবিল তারা ভর্তি করে তুলেছে। ওদের ভাষার খিড়কির দরজায় একতারা-বাজিয়ের আর সদর দরজায় বীণার ওস্তাদের ভিড় হয় না।

আমাদের ভাষাও সেই এক বড়ো রাস্তার পথেই চলেছে। কথার ভাষার বদল চলছে লেখার ভাষার মাপে। পঞ্চাশ বছর পূর্বে চলতি ভাষায় যে-সব কথা ব্যবহার করলে হাসির রোল উঠত, আজ মুখের বাক্যে তাদের চলাফেরা চলছে অনায়াসেই। মনে তো আছে, আমার অল্প বয়সে বাড়ির কোনো চাকর যখন এসে জানালে 'একজন বাবু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন', মনিবদের আসরে চার দিক থেকে হাসি ছিটকে পড়ল। যদি সে বলত 'অপিক্ষে' তা হলে সেটা মাননসই হ'ত। আবার অল্পকিছুদিন আগে আমার কোনো ভৃত্য মাংসের তুলনায় মাছ খাওয়ার অপদার্থতা জানিয়ে যখন আমাকে বললে 'মাছের দেহে সামর্থ্য কতটুকুই বা আছে', আমার সন্দেহ হয় নি যে সে উচ্চ প্রাইমারি স্কুলে পরীক্ষা পাশ করেছে। আজ সমাজের উপরতলায় নীচের তলায় ভাষাব্যবহারে আর্য-অনার্যের মিশোল চলেছে। মনে করো সাধারণ আলাপে আজ যদি এমন কথা কেউ বলে যে 'সভ্যজগতে অর্থনীতির সঙ্গে গ্রন্থি পাকিয়ে রাষ্ট্রনীতির জটিলতা যতই বেড়ে উঠছে শান্তির সম্ভাবনা যাচ্ছে দূরে', তা হলে এই মাত্র সন্দেহ করব, লোকটা বাংলার সঙ্গে ইংরেজি মেশাবার বিরুদ্ধে। কিন্তু এই বাক্যকে প্রহসনে উদ্ধৃত করবার যোগ্য বলে কেউ মনে করবে না। নিঃসন্দেহ এর শব্দগুলো হয়ে উঠেছে সাহিত্যিক, কেননা বিষয়টাই তাই। পঞ্চাশ বছর আগে এরকম বিষয় নিয়ে ঘরোয়া আলোচনা হত না, এখন তা হয়ে থাকে, কাজেই কথা ও লেখার সীমানার ভেদ থাকছে না। সাহিত্যিক দণ্ডনীতির ধারা থেকে

গুরুচণ্ডালী অপরাধের কোঠা উঠেই গেছে।

এটা হতে পেরেছে তার কারণ, সীমাসরহদ্দ নিয়ে মামলা করে না চলতি ভাষা। স্বদেশী বিদেশী হাল্কা ভারী সব শব্দই ঘেঁষাঘেঁষি করতে পারে তার আঙিনায়। সাধু ভাষায় তাদের পাসপোর্ট্ মেলা শক্ত। পার্সি আরবি কথা চলতি ভাষা বহুল পরিমাণে অসংকোচে হজম করে নিয়েছে। তারা এমন আতিথ্য পেয়েছে যে তারা যে ঘরের নয় সে কথা ভুলেই গেছি। 'বিদায়' কথাটা সংস্কৃতসাহিত্যে কোথাও মেলে না। সেটা আরবি ভাষা থেকে এসে দিব্যি সংস্কৃত পোশাক প'রে বসেছে। 'হয়রান করে দিয়েছে' বললে ক্লান্তি ও অসহ্যতা মিশিয়ে যে ভাবটা মানে আসে কোনো সংস্কৃতের আমদানি শব্দে তা হয় না। অমুকের কণ্ঠে গানে 'দরদ' লাগে না, বললে ঠিক কথাটি বলা হয়, ও ছাড়া আর-কোনো কথাই নেই। গুরুচণ্ডালীর শাসনকর্তা যদি দরদের বদলে 'সংবেদনা' শব্দ চালাবার হুকুম করেন তবে সে হুকুম অমান্য করলে অপরাধ হবে না।

ভাষার অবিমিশ্র কৌলীন্য নিয়ে খুঁৎখুঁৎ করেন এমন গোঁড়া লোক আজও আছেন। কিন্তু ভাষাকে দুইমুখো ক'রে তার দুই বাণী বাঁচিয়ে চলার চেষ্টাকে অসাধু বলাই উচিত। ভাষায় এরকম কৃত্রিম বিচ্ছেদ জাগিয়ে রেখে আচারের শুচিতা বানিয়ে তোলা পুণ্যকর্ম নয়, এখন আর এটা সম্ভবও হবে না।

সুনীতিকুমার বলেন খৃস্টীয় দশম শতকের কোনো-এক সময়ে পুরাতন বাংলার জন্ম। কিন্তু ভাষার সম্বন্ধে এই 'জন্ম' কথাটা খাটে না। যে জিনিস অনভিব্যক্ত অবস্থা থেকে ক্রমশ ব্যক্ত হয়েছে তার আরম্ভসীমা নির্দেশ করা কঠিন। দশম শতকের বাংলাকে বিংশ শতকের বাঙালি আপন ভাষা বলে চিনতে পারবে কি না সন্দেহ। শতকে শতকে ভাষা ক্রমশ ফুটে উঠেছে, আধুনিক কালেও চলছে তার পরিণতি। নতুন নতুন জ্ঞানের সঙ্গে, ভাবের সঙ্গে, রীতির সঙ্গে, আমাদের পরিচয় যত বেড়ে চলেছে, আমাদের ভাষার প্রকাশ ততই হচ্ছে ব্যাপক। গত ষাট বছরে যা ঘটেছে দু-তিন শতকেও তা ঘটে নি।

বাংলা ভাষার কাঁচা অবস্থায় যেটা সবচেয়ে আমাদের চোখে পড়ে সে হচ্ছে ক্রিয়া-ব্যবহার সম্বন্ধে ভাষার সংকোচ। সদ্য-ডিম-ভাঙা পাখির বাচ্ছার দেখা যায় ডানার ক্ষীণতা। ক্রিয়াপদের মধ্যেই থাকে ভাষার চলবার শক্তি। রূপগোস্বামীর লেখা কারিকা থেকে পুরোনো বাংলা গদ্যের একটু নমুনা দেখলেই এ কথা বুঝতে পারা যাবে—

প্রথম শ্রীকৃষ্ণ গুণ নির্ণয়। শব্দগুণ গন্ধগুণ রূপগুণ রসগুণ স্পর্শগুণ এই পাঁচগুণ। এই পঞ্চগুণ শ্রীমতি

রাধিকাভেও বসে।... পূর্বরাগের মূল দুই হটাৎ প্রবল অকস্মাৎ প্রবল।[১]

ক্রিয়াপদ-ব্যবহার যদি পাকা হত, তা হলে উড়ে চলার বদলে ভাষার এরকম লাফ দিয়ে দিয়ে চলা সম্ভব হত না। সেই সময়কেই বাংলা ভাষার পরিণতির যুগ বলব যখন থেকে তার ক্রিয়াপদের যথোচিত প্রাচুর্য এবং বৈচিত্র্য ঘটেছে। পুরাতন গদ্যের বিস্তৃত নমুনা যদি পাওয়া যেত তা হলে ক্রিয়াপদ-অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে ভাষার অভিব্যক্তির ধারা নির্ণয় করা সহজ হত।

রামমোহন রায় যখন গদ্য লিখতে বসেছিলেন তখন তাঁকে নিয়ম হেঁকে হেঁকে, কোদাল হাতে, রাস্তা বানাতে হয়েছিল। ঈশ্বর গুপ্তের আমলে বঙ্কিমের কলমে যে গদ্য দেখা দিয়েছিল তাতে যতটা ছিল পিণ্ডতা, আকৃতি ততটা ছিল না। যেন ময়দা নিয়ে তাল পাকানো হচ্ছিল, লুচি বেলা হয় নি।

সজনীকান্ত দাসের প্রবন্ধ থেকে তার একটা নমুনা দিই—

গগনমণ্ডলে বিরাজিতা কাদম্বিনী উপরে কম্পায়মানা চপলা সতাপ ক্ষণিক জীবনের অতিশয় প্রিয় হওত মূঢ় মানবমণ্ডলী অহরহঃ বিষয় বিষার্ণবে নিমজ্জিত রহিয়াছে। পরমেশ প্রেম পরিহার পুরঃসর প্রতিক্ষণ প্রমদা প্রেমে প্রমত্ত রহিয়াছে। অম্বুবিম্বুপম জীবনে চন্দ্রার্ক সদৃশ চিরস্থায়ী জ্ঞানে বিবিধ আনন্দোৎসব করিতেছে, কিন্তু ভ্রমেও ভাবনা করে না যে সেসব উৎসব শব হইলে কি হইবে।[২]

তার পরে বিদ্যাসাগর এই কাঁচা ভাষায় চেহারার শ্রী ফুটিয়ে তুললেন। আমার মনে হয় তখন থেকে বাংলা গদ্যভাষায় রূপের আবির্ভাব হল।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যিনি ঈশ্বর গুপ্তের আসরে প্রথম হাত পাকাচ্ছিলেন অত্যন্ত আড়ষ্ট বাংলা ভাষায়, সেই ভাষারই বন্ধন মোচন করেছিলেন সেই বঙ্কিম। তিনিই তাকে দিয়েছিলেন চলবার স্বাধীনতা।

আমরা পুরাতন সাহিত্যে পেয়েছি পদ্য, সেইটেই বনেদি। কিন্তু এ কথা বলা ঠিক হবে না, সাধু ভাষার আদর্শ ছিল তার মধ্যে। ভাষাকে ছন্দে-ওজন-করা পদে বিভক্ত করতে গেলে তার মধ্যে স্বাভাবিক কথা বলার নিয়ম খাটে না, ক্রমে তার একটা বিশেষ রীতি বেঁধে যায়। প্রথমত কর্তা-কর্ম-ক্রিয়াপদের সহজ পর্যায় রক্ষা হতেই পারে না। তার পরে তার মধ্যে কতকগুলি পুরোনো শব্দ ও রীতি থেকে যায়, ছন্দের আশ্রয় পেয়ে যারা কালের বদল মানে না। চারটে লাইন পদ্য বানিয়ে তার দৃষ্টান্ত

১ সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস -লিখিত 'বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ' প্রবন্ধ থেকে তুলে দেওয়া হল। —সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪০শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৪০, পৃ ৪৩

২ সংবাদপ্রভাকর, ২৩ এপ্রিল, ১৮৫২। —বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ, বিবিধ খণ্ড, পৃ ৩৮

দেখানো যাক—

কার সনে নাহি জানি করে বসি কানাকানি,
সাঁঝবেলা দিগ্‌বধূ কাননে মর্মরে।
আঁচলে কুড়ায়ে তারা কী লাগি আপনহারা,
মানিকের বরমালা গাঁথে কার তরে।

এই কটা লাইনকে সাধুভাষায় ঢালাই করতে গেলে হবে এইরকম— সন্ধ্যাকালে দিগ্বধূ অরণ্যমর্মরধ্বনিতে কাহার সহিত বিশ্রম্ভালাপে প্রবৃত্ত তাহা জানি না। জানি না কী কারণে ও কাহার জন্য আত্মবিহ্বল অবস্থায় সে আপন বস্ত্রাঞ্চলে নক্ষত্রসংগ্রহপূর্বক মাণিক্যের বরমাল্য গ্রন্থন করিতেছে।

'সনে' কথাটা এখন আর বলি নে, প্রাচীন পদাবলীতে ঐ অর্থে 'সঙে' কথা সর্বদা পাওয়া যায়। 'নাহি জানি' কথাটার 'নাহি' শব্দটা এখনকার নিয়মে 'জানি'র সঙ্গে মিলতে পারে না। 'নাহি' শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ 'নাস্তি', চলিত কথায় 'নেই'। 'জানি'র সঙ্গে 'নেই' জোড়া যায় না, বলি 'জানি নে'। 'সাঁঝবেলা' গ্রাম্যভাষায় এখনো চলে, কিন্তু যাদের জন্যে ঐ শ্লোকটা লেখা তাদের সঙ্গে আলাপে 'সাঁঝবেলা' শব্দটা বেখাপ। 'বসিয়া'র জায়গায় 'বসি' আমরা বলি নে। যে শ্রেণীর লোকের ভাষায় 'লেগে' শব্দের ব্যবহার চলে তাদের খুশি করবার জন্যে দিগ্বধূ কখনো তারার মালা গাঁথেই না। 'জন্যে'র পরিবর্তে 'লাগি' বা 'লাগিয়া' কিংবা 'তরে' শব্দটা ছন্দের মধ্যস্থতায় ছাড়া ভদ্রনামধারীদের রসনায় প্রবেশ পায় না। যেমতি তেমতি নেহারো উড়িলা হেরো মোরে পানে যবে হেথা সেথা নারে তারে প্রভৃতি শব্দ পদ্যের ফরমাশি।

যদি বর্ষার দিনে বন্ধু এসে কথা জুড়ে দেয় 'হেরো ঐ পুব দিকের পানে, রহি রহি বিজুলি চমক দেয়, মোর ডর লাগে, নাহি জানি কী লাগি সাধ যায় তোমা সনে একা বসি মনের কথা করি কানাকানি', তবে এটাকে মধুরালাপের ভূমিকা বলে কেউ মনে করবে না, বন্ধুর জন্যে উদ্‌বিগ্ন হবে।

তবু মন ভোলাবার ব্যবসায়ে পদ্য যদি সাদা ভাষার বাজে মালমশলা মেশায় তবে তাকে মাপ করা যায়, কিন্তু চলতি ব্যবহারে গদ্য যদি হঠাৎ সাধু হয়ে ওঠে তবে মহাপণ্ডিতেরাও মনে করবে, বিদ্রূপ করা হচ্ছে। কারও মাসির 'পরে বিশেষ সম্মান দেখাবার জন্যে কেউ যদি বিশুদ্ধ সাধু ভাষায় বলে 'আপনকার মাতৃস্বসা আশা করি দুঃসাধ্য অতিসার ব্যাধি হইতে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন', তবে বোনপো ইংরেজের মুখে শুনলে মনে মনে হাসবে, বাঙালির মুখে শুনলে উচ্চহাস্য ক'রে উঠবে।

তর্ক ওঠে, বাংলাদেশে কোন্ প্রদেশের ভাষাকে সাহিত্যিক কথ্যভাষা বলে মেনে নেব। উত্তর এই যে, কোনো বিশেষ কারণে বিশেষ প্রদেশের ভাষা স্বতই সর্বজনীনতার মর্যাদা পায়। যে-সকল সৌভাগ্যবান দেশে কোনো একমাত্র ভাষা বিনা তর্কে সর্বদেশের বাণীরূপে স্বীকৃত হয়েছে, সেখানেও নানা প্রাদেশিক উপভাষা আছে। বিশেষ কারণে টস্‌কানি প্রদেশের উপভাষা সমস্ত ইটালির এক ভাষা বলে গণ্য হয়েছে। তেমনি কলকাতা শহরের নিকটবর্তী চার দিকের ভাষা স্বভাবতই বাংলাদেশের সকলদেশী ভাষা বলে গণ্য হয়েছে। এই এক ভাষার সর্বজনীনতা বাংলাদেশের কল্যাণের বিষয় বলেই মনে করা উচিত। এই ভাষায় ক্রমে পূর্ববঙ্গেরও হাত পড়তে আরম্ভ হয়েছে, তার একটা প্রমাণ এই যে, আমরা দক্ষিণের লোকেরা 'সাথে' শব্দটা কবিতায় ছাড়া সাহিত্যে বা মুখের আলাপে ব্যবহার করি নে। আমরা বলি 'সঙ্গে'। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কানে যেমনি লাগুক, 'সঙ্গে' কথাটা 'সাথে'র কাছে হার মেনে আসছে। আরও একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়ছে। মাত্র চারজন লোক : এমন প্রয়োগ আজকাল প্রায় শুনি। বরাবর বলে এসেছি 'চারজনমাত্র লোক', অর্থাৎ চারজনের দ্বারা মাত্রা-পাওয়া, পরিমিত-হওয়া লোক। অবশ্য 'মাত্র' শব্দ গোড়ায় বসলে কথাটাতে জোর দেবার সুবিধে হয়। ভাষা সব সময়ে যুক্তি মানে না।

যা হোক, যে দক্ষিণী বাংলা লোকমুখে এবং সাহিত্যে চলে যাচ্ছে তাকেই আমরা বাংলা ভাষা বলে গণ্য করব। এবং আশা করব, সাধু ভাষা তাকেই আসন ছেড়ে দিয়ে ঐতিহাসিক কবরস্থানে বিশ্রামলাভ করবে। সেই কবরস্থান তীর্থস্থান হবে, এবং অলংকৃত হবে তার স্মৃতিশিলাপট।

১১

মানুষের উদ্ভাবনী প্রতিভার একটা কীর্তি হল চাকা বানানো। চাকার সঙ্গে একটা নতুন চলৎশক্তি এল তার সংসারে। বস্তুর বোঝা সহজে নড়ে না, তাকে পরস্পরের মধ্যে চালাচালি করতে দুঃখ পেতে হয়। চাকা সেই জড়ত্বের মধ্যে প্রাণ এনে দিলে। আদানপ্রদানের কাজ চলল বেগে।

ভাষার দেশে সেই চাকা এসেছে ছন্দের রূপে। সহজ হল মোট-বাঁধা কথাগুলিকে চালিয়ে দেওয়া। মুখে মুখে চলল ভাষার দেনা-পাওনা।

কবিতার বিশেষত্ব হচ্ছে তার গতিশীলতা। সে শেষ হয়েও শেষ হয় না। গদ্যে যখন বলি 'একদিন শ্রাবণের রাত্রে বৃষ্টি পড়েছিল', তখন এই বলার মধ্যে এই খবরটা

ফুরিয়ে যায়। কিন্তু কবি যখন বললেন—

রজনী শাঙনঘন ঘন দেয়াগরজন
রিম্‌ ঝিম্‌ শবদে বরিষে—

তখন কথা থেমে গেলেও বলা থামে না।

এ বৃষ্টি যেন নিত্যকালের বৃষ্টি, পঞ্জিকা-আশ্রিত কোনো দিনক্ষণের মধ্যে বদ্ধ হয়ে এ বৃষ্টি শুব্ধ হয়ে যায় নি। এই খবরটির উপর ছন্দ যে দোলা সৃষ্টি করে দেয় সে দোলা ঐ খবরটিকে প্রবহমান করে রাখে।

অণু পরমাণু থেকে আরম্ভ করে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত সর্বত্রই নিরন্তর গতিবেগের মধ্যে ছন্দ রয়েছে। বস্তুত এই ছন্দই রূপ। উপাদানকে ছন্দের মধ্যে তরঙ্গিত করলেই সৃষ্টি রূপ ধারণ করে। ছন্দের বৈচিত্র্যই রূপের বৈচিত্র্য। বাতাস যখন ছন্দে কাঁপে তখনি সে সুর হয়ে ওঠে। ভাবকে কথাকে ছন্দের মধ্যে জাগিয়ে তুললেই তা কবিতা হয়। সেই ছন্দ থেকে ছাড়িয়ে নিলেই সে হয় সংবাদ; সেই সংবাদে প্রাণ নেই, নিত্যতা নেই।

মেঘদূতের কথা ভেবে দেখো। মনিব একজন চাকরকে বাড়ি থেকে বের করে দিলে, গদ্যে এই খবরের মতো এমন খবর তো সর্বদা শুনছি। কেবল তফাত এই যে, রামগিরি অলকার বদলে হয়তো আমরা আধুনিক রামপুরহাট হাটখোলার নাম পাচ্ছি। কিন্তু মেঘদূত কেন লোকে বছর বছর ধরে পড়ছে। কারণ, মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দের মধ্যে বিশ্বের গতি নৃত্য করছে। তাই এই কাব্য চিরকালের সজীব বস্তু। গতিচাঞ্চল্যের ভিতরকার কথা হচ্ছে, 'আমি আছি' এই সত্যটির বিচিত্র অনুভূতি। 'আমি আছি' এই অনুভূতিটা তো বদ্ধ নয়, এ-যে সহস্র রূপে চলায় ফেরায় আপনাকে জানা। যতদিন পর্যন্ত আমার সত্তা স্পন্দিত নন্দিত হচ্ছে ততদিন 'আমি আছি'র বেগের সঙ্গে সৃষ্টির সকল বস্তু বলছে, 'তুমি যেমন আছ আমিও তেমনি আছি।' 'আমি আছি' এই সত্যটি কেবলই প্রকাশিত হচ্ছে 'আমি চলছি'র দ্বারা। চলাটি যখন বাধাহীন হয়, চার দিকের সঙ্গে যখন সুসংগত হয়, সুন্দর হয়, তখনি আনন্দ। ছন্দোময় চলমানতার মধ্যেই সত্যের আনন্দরূপ। আর্টে কাব্যে গানে প্রকাশের সেই আনন্দমূর্তি ছন্দের দ্বারা ব্যক্ত হয়।

একদা ছিল না ছাপাখানা, অক্ষরের ব্যবহার হয় ছিল না নয় ছিল অল্প। অথচ মানুষ যে-সব কথা সকলকে জানাবার যোগ্য মনে করেছে দলের প্রতি শ্রদ্ধায়, তাকে বেঁধে রাখতে চেয়েছে এবং চালিয়ে দিতে চেয়েছে পরস্পরের কাছে।

এক শ্রেণীর কথা ছিল যেগুলো সামাজিক উপদেশ। আর ছিল চাষবাসের পরামর্শ,

শুভ-অশুভের লক্ষণ, লগ্নের ভালোমন্দ ফল। এই-সমস্ত পরীক্ষিত এবং কল্পিত কথাগুলোকে সংক্ষেপ করে বলতে হয়েছে, ছন্দে বাঁধতে হয়েছে, স্থায়িত্ব দেবার জন্যে। দেবতার স্তুতি, পৌরাণিক আখ্যান বহন করেছে ছন্দ। ছন্দ তাদের রক্ষা করেছে যেন পেটিকার মধ্যে। সাহিত্যের প্রথম পর্বে ছন্দ মানুষের শুধু খেয়ালের নয়, প্রয়োজনের একটা বড়ো সৃষ্টি; আধুনিক কালে যেমন সৃষ্টি তার ছাপাখানা। ছন্দ তার সংস্কৃতির ধাত্রী, ছন্দ তার স্মৃতির ভাণ্ডারী।

চলতি ভাষার স্বভাব রক্ষা ক'রে বাংলা ছন্দে কবিতা যা লেখা হয়েছে সে আমাদের লোকগাথায়, বাউলের গানে, ছেলে ভোলাবার ও ঘুম পাড়াবার ছড়ায়, ব্রতকথায়। সাধুভাষী সাহিত্যমহলের বাইরে তাদের বসতি। তারা যে সমস্তই প্রাচীন তা নয়। লক্ষণ দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, তাদের অনেক আছে যারা আমাদের সমান বয়সেরই আধুনিক, এমন-কি ছন্দে মিলে ভাবে আমাদেরই শাক্‌রেদি সন্দেহ করি। একটা দৃষ্টান্ত দেখাই—

অচীন ডাকে নদীর বাঁকে
ডাক যে শোনা যায়।
অকূল পাড়ি, থামতে নারি,
সদাই ধারা ধায়।
ধারার টানে তরী চলে,
ডাকের চোটে মন যে টলে,
টানাটানি ঘুচাও জগায়
হল বিষম দায়।

এর মিল, এর মাত্রাঘষা ছাঁদ ও শব্দবিন্যাস আধুনিক। তবুও যেটা লক্ষ্য করবার বিষয় সে হচ্ছে এর চলতি ভাষা। চলতি ভাষার কবিতা বাংলা শব্দের স্বাভাবিক হসন্তরূপ মেনে নিয়েছে। হসন্ত শব্দ স্বরবর্ণের বাধা না পাওয়াতে পরস্পর জুড়ে যায়, তাতে যুক্তবর্ণের ধ্বনি কানে লাগে। চলতি ভাষার ছন্দ সেই যুক্তবর্ণের ছন্দ। উপরের ঐ কবিতাকে সাধু ভাষার ছন্দে ঢালাই করলে তার চেহারা হয় নিম্নলিখিত-মতো—

অচিনের ডাকে নদীটির বাঁকে
ডাক যেন শোনা যায়।
কূলহীন পাড়ি, থামিতে না পারি,
নিশিদিন ধারা ধায়।

সে ধারার টানে তরীখানি চলে
সেই ডাক শুনে মন মোর টলে,
এই টানাটানি ঘুচাও অপার
হয়েছে বিষম দায়।

যদি উচ্চারণ মেনে বানান করা যেত তা হলে বাউলের গানের চেহারা হত—

অচিণ্ডাকে নদীব"াকে ডাক্‌ছে শোনা যায়।

সাধু ভাষার কবিতায় বাংলা শব্দের হসন্তরীতি যে মানা হয় নি তা নয়, কিন্তু তাদের পরস্পরকে ঠোকাঠুকি ঘেঁষাঘেঁষি করতে দেওয়া হয় না। বাউলের গানে আছে 'ডাকের চোটে মন যে টলে'। এখানে 'ডাকের' আর 'চোটে', 'মন' আর 'যে', এদের মধ্যে উচ্চারণের কোনো ফাঁক থাকে না। কিন্তু সাধু ভাষার গানে 'মন' আর 'মোর' হসন্ত শব্দ হলেও হসন্ত শব্দের স্বভাব রক্ষা করে না, সন্ধির নিয়মে পরস্পর এঁটে যায় না।

বাংলা ভাষার সবচেয়ে পুরোনো ছন্দ পয়ারের ছাঁদের, অর্থাৎ দুই সংখ্যার ওজনে। যেমন—

খনা ডেকে ব'লে যান
রোদে ধান ছায়ায় পান।
দিনে রোদ রাতে জল
তাতে বাড়ে ধানের বল।

এমনি ক'রে হতে হতে ছন্দের মধ্যে এসে পড়ে তিনের মাত্রা। যেমন—

আনহি বসন্ত আনহি চাষ,
বলে ডাক তাহার বিনাশ।

কিংবা—

আষাঢ়ে কাড়ান নাঙ্কে,
শ্রাবণে কাড়ান ধানকে,
ভাদরে কাড়ান শিষকে,
আশ্বিনে কাড়ান কিসকে।

এর অর্থ বোঝাবার দায়িত্ব নিতে পারব না।

দুই মাত্রার ছড়ার ছন্দ পরিণত রূপ নিয়েছে পয়ারে। বাঙালি বহুকাল ধরে এই ছন্দে গেয়ে এসেছে রামায়ণ মহাভারত একটানা সুরে। এই ছন্দে প্রবাহিত প্রাদেশিক পুরাণকাহিনী রঙিয়েছে বাঙালির হৃদয়কে। দারিদ্র্য ছিল তার জীবন-যাত্রায়, তার ভাগ্যদেবতা ছিল অত্যাচারপরায়ণ, সে এমন নৌকোয় ভাসছিল যার হাল

ছিল না তার নিজের হাতে ; যখন তার আকাশ থাকত শান্ত তখন গ্রামের এ ঘাটে ও ঘাটে চলত তার আনাগোনা সামান্য কারবার নিয়ে, কখনো বা দিনের পর দিন দুর্যোগ লেগেই থাকত, ভাগ্যের অনিশ্চয়তায় হঠাৎ কে কোথায় পৌঁছয় তার ঠিক ছিল না, হঠাৎ নৌকোসুদ্ধ হত ভরাডুবি। এরা ছড়া বাঁধে নি নিজের কোনো স্মরণীয় ইতিহাস নিয়ে। এরা গান বাঁধে নি ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখবেদনায়। এরা নিঃসন্দেহই ভালোবেসেছে, কিন্তু নিজের জবানিতে প্রকাশ করে নি তার হাসিকান্না। দেবতার চরিত-বৃত্তান্তে এরা ঢেলেছে এদের অন্তরের আবেগ ; হরপার্বতীর লীলায় এরা নিজের গৃহস্থালির রূপ ফুটিয়েছে, রাধাকৃষ্ণের প্রেমের গানে এরা সেই প্রেমের কল্পনাকে মনের মধ্যে ঢেউ লাগিয়েছে যে প্রেম সমাজবন্ধনে বন্দী নয়, যে প্রেম শ্রেয়োবুদ্ধি-বিচারের বাইরে। একমাত্র কাহিনী ছিল রামায়ণ-মহাভারতকে অবলম্বন করে যা মানবচরিত্রের নতোন্নতকে নিয়ে হিমালয়ের মতো ছিল দিক থেকে দিগন্তরে প্রসারিত। কিন্তু সে হিমালয় বাংলাদেশের উত্তরতম সীমায় দূর গিরিমালার মতোই ; তার অভ্রভেদী মহত্ত্বের কঠিন মূর্তি সমতল বাংলার রসাতিশয্যের সঙ্গে মেলে না। তা বিশেষভাবে বাংলার নয়, তা সনাতন ভারতের। অন্নদামঙ্গলের সঙ্গে, কবিকঙ্কণের সঙ্গে, রামায়ণ-মহাভারতের তুলনা করলে উভয়ের পার্থক্য বোঝা যাবে। অন্নদামঙ্গল চণ্ডীমঙ্গল বাংলার ; তাতে মনুষ্যত্বের বীর্য প্রকাশ পায় নি, প্রকাশ পেয়েছে অকিঞ্চিৎকর প্রাত্যহিকতার অনুজ্জ্বল জীবনযাত্রা।

এই কাব্যের পণ্য ভেসেছিল পয়ার ছন্দে। ভাঙাচোরা ছিল এর পদবিন্যাস। গানের সুর দিয়ে এর অসমানতা মিলিয়ে দেওয়া হত, দরকার হত না অক্ষর সাজাবার কাজে সতর্ক হবার। পুরানো কাব্যের পুঁথি দেখলেই তা টের পাওয়া যায়। অত্যন্ত উঁচুনিচু তার পথ। ভারতচন্দ্রই প্রথম ছন্দকে সৌষম্যের নিয়মে বেঁধেছিলেন। তিনি ছিলেন সংস্কৃত ও পারসিক ভাষায় পণ্ডিত। ভাষাবিন্যাসে ছন্দে প্রাদেশিকতার শৈথিল্য তিনি মানতে পারেন নি।

পয়ার ছন্দের একেশ্বরত্ব ছাড়িয়ে গিয়ে বিচিত্র হয়েছে ছন্দ বৈষ্ণব পদাবলীতে। তার একটা কারণ, এগুলি একটানা গল্প নয়। এই পদগুলিতে বিচিত্র হৃদয়াবেগের সংঘাত লেগেছে। দোলায়িত হয়েছে সেই আবেগ তিনমাত্রার ছন্দে। দ্বৈমাত্রিক এবং ত্রৈমাত্রিক ছন্দে বাংলা কাব্যের আরম্ভ। এখনো পর্যন্ত ঐ দুই জাতের মাত্রাকে নানা প্রকারে সাজিয়ে বাংলায় ছন্দের লীলা চলছে। আর আছে দুই এবং তিনের জোড় বিজোড় সংখ্যা মিলিয়ে পাঁচ কিংবা নয়ের অসম মাত্রার ছন্দ।

মোট কথা বলা যায়, দুই এবং তিন সংখ্যাই বাংলায় সকল ছন্দের মূলে। তার

রূপের বৈচিত্র্য ঘটে যতিবিভাগের বৈচিত্র্যে, এবং নানা ওজনের পংক্তিবিন্যাসে। এই-রকম বিভিন্ন বিভাগের যতি ও পংক্তি নিয়ে বাংলায় ছন্দ কেবলই বেড়ে চলেছে।

এক সময়ে শ্রেণীবদ্ধ মাত্রা গুণে ছন্দ নির্ণয় হত। বালকবয়সে একদিন সেই চোদ্দ অক্ষর মিলিয়ে ছেলেমানুষি পয়ার রচনা ক'রে নিজের কৃতিত্বে বিস্মিত হয়েছিলুম। তার পরে দেখা গেল, কেবল অক্ষর গণনা ক'রে যে ছন্দ তৈরি হয় তার শিল্পকলা আদিম জাতের। পদের নানা ভাগ আর মাত্রার নানা সংখ্যা দিয়ে ছন্দের বিচিত্র অলংকৃতি। অনেক সময়ে ছন্দের নৈপুণ্য কাব্যের মর্যাদা ছাড়িয়ে যায়।

চলতি ভাষার কাব্য, যাকে বলে ছড়া, তাতে বাংলার হসন্তসংঘাতের স্বাভাবিক ধ্বনিকে স্বীকার করেছে। সেটা পয়ার হলেও অক্ষর-গোনা পয়ার হবে না, সে হবে মাত্রা-গোনা পয়ার। কিন্তু কথাটা ঠিক হল না, বস্তুত সাধু ভাষায় পয়ারও মাত্রা-গোনা। সাহিত্যিক কবুলতি পত্রে সাধু ভাষায় অক্ষর এবং মাত্রা এক পরিমাণের বলে গণ্য হয়েছে। এইমাত্র রফা হয়েছে যে সাধু ভাষায় পদ্য-উচ্চারণকালে হসন্তের টানে শব্দগুলি গায়ে গায়ে লেগে যাবে না; অর্থাৎ বাংলার স্বাভাবিক ধ্বনির নিয়ম এড়িয়ে চলতে হবে।—

সতত হে নদ তুমি পড়ো মোর মনে,
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে।

চলতি বাংলায় 'নদ' আর 'তুমি', 'মোর' আর 'মনে' হসন্তের বাঁধনে বাঁধা। এই পয়ারে ঐ শব্দগুলিকে হসন্ত বলে যে মানা হয় নি তা নয়, কিন্তু ওর বাঁধন আলগা করে দেওয়া হয়েছে। 'কান' আর 'আমি', 'ভ্রান্তির' আর 'ছলনে' হসন্তের রীতিতে হওয়া উচিত ছিল যুক্ত শব্দ; কিন্তু সাধু ছন্দের নিয়মে ওদের জোড় বাঁধতে বাধা দেওয়া হয়েছে।

একটা খাঁটি ছড়ার নমুনা দেখা যাক—

এ পার গঙ্গা ও পার গঙ্গা মধ্যিখানে চর,
তারই মধ্যে বসে আছেন শিবু সদাগর।

এটা পয়ার কিন্তু চোদ্দ অক্ষরের সীমানা পেরিয়ে গেছে। তবু উচ্চারণ মিলিয়ে বানান করলে চোদ্দ অক্ষরের বেশি হবে না—

এপার্গঙ্গা ওপার্গঙ্গা মধ্যিখানে চর,
তারি মধ্যে বসে আছেশিবু সদাগর।

ছড়ায় প্রায় দেখা যায় মাত্রার ঘনতা কোথাও কম, কোথাও বেশি। আবৃত্তিকারের

উপর ছন্দ মিলিয়ে নেবার বরাত দেওয়া আছে। ছন্দের নিজের মধ্যে যে ঝোঁক আছে তার তাড়ায় কণ্ঠ আপনি প্রয়োজনমত স্বর বাড়ায় কমায়।—

শিবু ঠাকুরের বিয়ে হবে তিন কন্যে দান।

এখানে 'বিয়ে হবে' শব্দে মাত্রা ঢিলে হয়ে গেছে। যদি থাকত 'শিবু ঠাকুরের বিয়ের সভায় তিন কন্যে দান', তা হলে মাত্রা পুরো হত। কিন্তু বাংলাদেশে ছেলে বুড়ো এমন কেউ নেই যে আপনিই 'বিয়ে— হবে—' স্বরে টান না দেয়।

বক ধলো, বস্ত্র ধলো, ধলো রাজহংস,
তাহার অধিক ধলো কন্যে তোমার হাতের শঙ্খ।

দুটো লাইনের মাত্রার কমি-বেশি স্পষ্ট; কিন্তু ভয়ের কারণ নেই, স্বতই আবৃত্তির টানে দুটো লাইনের ওজন মিলে যায়। ছন্দে চলতি ভাষা আইন জারি না করেও আইন মানিয়ে নিতে পারে।

ছেলে ভোলাবার ছড়া শুনলে একটা কথা স্পষ্ট বোঝা যায়, এতে অর্থের সংগতির দিকে একটুও দৃষ্টি নেই, দৃষ্টি দেবার দরকার বোধ করা হয় নি। যুক্তিবাঁধন-ছেঁড়া ছবিগুলো ছন্দের ঢেউয়ের উপর টগ্‌বগ্‌ করে ভেসে উঠছে, ভেসে যাচ্ছে। স্বপ্নের মতো একটা আকস্মিক ছবি আর-একটা ছবিকে জুটিয়ে আনছে। একটা শব্দের অনুপ্রাসে হোক বা আর-কোনো অনির্দিষ্ট কারণে হোক, আর-একটা শব্দ রবাহূত এসে পড়ছে। আধুনিক য়ুরোপীয় কাব্যে অবচেতন চিত্তের এই-সমস্ত স্বপ্নের লীলাকে স্থান দেবার একটা প্রেরণা দেখা যায়। আধুনিক মনস্তত্ত্বে মানুষের মগ্নচৈতন্যের সক্রিয়তার উপর বিশেষ দৃষ্টি পড়েছে। চৈতন্যের সতর্কতা থেকে মুক্তি দিয়ে স্বপ্নলোকের অসংলগ্ন স্বতঃসৃষ্টিকে কাব্যে উদ্ধার ক'রে আনবার একটা প্রয়াস দেখতে পাই। নীচের ছড়াটির মতো এই জাতের রচনা কোনো আধুনিক কবির হাত দিয়ে বেরিয়েছে কি না জানি নে। খবর যা পেয়েছি তাতে জানা যায়, এর চেয়ে অসংলগ্ন কাব্যের অভ্যুদয় হয়েছে।—

নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোটন রেখেছে,
বড়ো সাহেবের বিবিগুলি নাইতে এসেছে।
দু পারে দুই রুই কাৎলা ভেসে উঠেছে,
দাদার হাতে কলম ছিল ছুঁড়ে মেরেছে।
ও পারেতে দুটি মেয়ে নাইতে নেবেছে,
ঝুনু ঝুনু চুলগাছটি ঝাড়তে লেগেছে।
কে রেখেছে, কে রেখেছে, দাদা রেখেছে।
আজ দাদার ঢেলা ফেলা, কাল দাদার বে।

দাদা যাবে কোন্‌খান রে, বকুলতলা রে।
বকুল ফুল কুড়োতে কুড়োতে পেয়ে গেলুম মালা।
রামধনুকে বাদ্যি বাজে সীতেনাথের খেলা।
সীতেনাথ বলে রে ভাই, চালকড়াই খাব।
চালকড়াই খেতে খেতে গলা হল কাঠ,
হেথা হোথা জল পাব চিৎপুরের মাঠ।
চিৎপুরের মাঠেতে বালি চিক্‌চিক্‌ করে,
চাঁদমুখে রোদ লেগে রক্ত ফেটে পড়ে।

সুদূর কাল থেকে আজ পর্যন্ত এই কাব্য যারা আউড়িয়েছে এবং যারা শুনেছে তারা একটা অর্থের অতীত রস পেয়েছে; ছন্দতে ছবিতে মিলে একটা মোহ এনেছে তাদের মনের মধ্যে। সেইজন্যে অনেক নামজাদা কবিতার চেয়ে এর আয়ু বেড়ে চলেছে। এর ছন্দের চাকা ঘুরে চলেছে বহু শতাব্দীর রাস্তা পেরিয়ে।

আদিম কালের মানুষ তার ভাষাকে ছন্দের দোল লাগিয়ে নিরর্থক নাচাতে কুণ্ঠিত হয় নি। নাচের নেশা আছে তার রক্তে। বুদ্ধি যখন তার চেতনায় একাধিপত্য করতে আরম্ভ করেছে, তখনি সে নেশা কাটিয়ে উঠে মেনেছে শব্দের সঙ্গে অর্থের একান্ত যোগ। আদিম মানুষ মন্ত্র বানিয়েছে, সে মন্ত্রের শব্দে অর্থের শাসন নেই অথবা আছে সামান্য। তার মন ছন্দে দোলায়িত ধ্বনির রহস্যে ছিল অভিভূত। তার মনে ধ্বনির এই-যে সম্মোহনপ্রভাব, দেবতার উপরে, প্রাকৃতিক শক্তির উপরেও তার ক্রিয়া সে কল্পনা করত। তাই সাঁওতাল প্রভৃতি আদিম জাতির অনেক গানের শব্দে অর্থ হয়েছে গৌণ; অর্থের যে আভাস আছে সে কেবল ধ্বনির গুণে মনের মধ্যে মোহ বিস্তার করে, অর্থাৎ কোনো স্পষ্ট বার্তার জন্যে তার আদর নয়, ব্যঞ্জনার অনির্দেশ্যতাই তাকে প্রবলতা দেয়। মা তার ছেলেকে নাচাচ্ছে—

খেনা নাচন খেনা,
বট পাকুড়ের ফেনা।
বলদে খালো চিনা, ছাগলে খালো ধান,
সোনার জাদুর জন্যে যারে নাচ্‌না কিনে আন্‌।

এর মধ্যে খানিকটা অর্থহীন ধ্বনি, খানিকটা অর্থবান ছবির টুকরো নিয়ে যে ছড়া বানানো হয়েছে তাতে আছে সেই নাচন যে নাচন স্বপ্নলোকে কিনতে পাওয়া যায়।

এই-যে ধ্বনিতে অর্থে মিলে মনের মধ্যে মোহাবেশ জাগিয়ে তোলা, এটা সকল যুগের কবিতার মধ্য দিয়েই কমবেশি প্রকাশ পায়; তাই অর্থের প্রবলতা বেড়ে উঠলে কবিতার সম্মোহন যায় কমে। ধ্বনির ইশারা দিয়ে যা নিজেকে অভাবনীয় রূপে

সার্থক করে তোলে, শিক্ষকের ব্যাখ্যার দ্বারা তা যখন সমর্থনের অপেক্ষা করে তখন কবিতার মন্ত্রশক্তি হারায় তার গুণ। ছন্দ আছে জাদুর কাজে, খেয়াল গেলে বুদ্ধিকে অগ্রাহ্য করতে সে সাহস করে।

সাহিত্যের মধ্যে কারুকাজ, কাব্যে যার প্রাধান্য, তার একটা দিক হচ্ছে শব্দের বাছাই-সাজাই করা। কালে কালে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ভাষার শব্দ জমে যায় বিস্তর। তার মধ্যে থেকে বেছে নিতে হয় এমন শব্দ যা কল্পনার ঠিক ফরমাশটি মানতে পারে পুরো পরিমাণে।

রামপ্রসাদ বলেছেন: আমি করি দুখের বড়াই। 'বড়াই'-বর্গের অনেক ভারী ভারী কথা ছিল: গর্ব করি, গৌরব করি, মাহাত্ম্য বোধ করি। কিন্তু 'দুঃখকেই বড়ো ক'রে নিয়েছি' বলবার জন্যে অমন নিতান্ত সহজ অর্থাৎ ঠিক কথাটি বাংলাভাষায় আর নেই।

যেমন আছে শব্দের বাছাই তেমনি আছে ভাবপ্রকাশের বাছাইয়ের কাজ।

বাউল বলতে চেয়েছে, চার দিকে অচিন্তনীয় অপরিসীম রহস্য, তারই মধ্যে চলেছে জীবনযাত্রা। সে বললে—

> পরান আমার স্রোতের দীয়া
> (আমায় ভাসাইলা কোন্ ঘাটে)।
> আগে আন্ধার পাছে আন্ধার, আন্ধার নিশুইৎ-ঢালা।
> আন্ধারমাঝে কেবল বাজে লহরেরই মালা।
> তার তলেতে কেবল চলে নিশুইৎ রাতের ধারা,
> সাথের সাথি চলে বাতি, নাই গো কূলকিনারা।

নানা রহস্যে একলা-জীবনের গতি, যেন চার দিকের নিশুৎ অন্ধকারে স্রোতে-ভাসানো প্রদীপের মতো— এমন সহজ উপমা মিলবে কোথায়। একটা শব্দ-বাছাই লক্ষ্য করা যাক: লহরেরই মালা। ঊর্মি নয়, তরঙ্গ নয়, ঢেউ নয়, শব্দ জাগাচ্ছে জলে ছোটো ছোটো চাঞ্চল্য, ইংরেজিতে যাকে বলে ripples। অন্ধকারের তলায় তলায় রাত্রির ধারা চলেছে, এ ভাবটা মনে হয় যেন আধুনিক কবির ছোঁয়াচ-লাগা। রাত্রি স্তব্ধ হয়ে আছে, এইটেই সাধারণত মুখে আসে। তার প্রহরগুলি নিঃশব্দ নির্লক্ষ্য স্রোতের মতো বয়ে চলেছে, এ উপমাটায় হালের টাঁকশালের ছাপ লেগেছে বলেই মনে হয়।

শব্দ-বাছাই ভাব-বাছাইয়ের শিল্পকাজ চলেছে পৃথিবীর সাহিত্য জুড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ছন্দে চলেছে ধ্বনির কাজ। সেটা গদ্যে চলে অলক্ষ্যে, পদ্যে চলে প্রত্যক্ষে।

মুখে মুখে প্রতিদিনের ব্যবহারের ভাষায় কলাকৌশলের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মানুষ দলবাঁধা জীব। একলার ব্যবহারে সে আটপৌরে, দলের ব্যবহারে সুসজ্জিত। সকলের সঙ্গে আচরণে মানুষের যে সৌজন্য সেই তার ব্যবহারের শিল্পকার্য। তাতে যত্নপূর্বক বাছাই সাজাই আছে। সর্বজনীন ব্যবহারে ব্যক্তিগত খেয়ালের যথেচ্ছাচার নিন্দনীয়। এ ক্ষেত্রে মানুষ নিজেকে ও অন্যকে একটা চিরন্তন আদর্শের দ্বারা সম্মান দেয়। সাহিত্যকে কদাচিৎ শ্রীভ্রষ্ট সৌজন্যভ্রষ্ট করায় প্রকাশ পায় সমাজের বিকৃতি, প্রকাশ পায় কোনো সাময়িক বা মারাত্মক ব্যাধির লক্ষণ।

ভাষা অবতীর্ণ হয়েছে মানুষকে মানুষের সঙ্গে মেলাবার উদ্দেশ্যে। সাধারণত সে মিলন নিকটের এবং প্রত্যহের। সাহিত্য এসেছে মানুষের মনকে সকল কালের সকল দেশের মনের সঙ্গে মুখোমুখি করবার কাজে। প্রাকৃত জগৎ সকল কালের সকল স্থানের সকল তথ্য নিয়ে, সাহিত্যজগৎ সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষের কল্পনা-প্রবণ মন নিয়ে। এই জগৎ-সৃষ্টিতে যে-সকল বড়ো বড়ো রূপকার আপন বিশ্বজনীন প্রতিভা খাটিয়েছেন সেই-সব সৃষ্টিকর্তাদেরকে মানুষ চিরস্মরণীয় বলে স্বীকার করেছে। বলেছে তাঁরা অমর। পঞ্জিকার গণনা অনুসারে অমর নয়। মাহেঞ্জদারোর ভগ্নাবশেষ যখন দেখি তখন বোঝা যায়, তারই মতো এমন অনেক সভ্যতা মাটির তলায় লুপ্ত হয়ে গেছে। সেদিনকার বিলুপ্ত সভ্যতাকে যাঁরা একদিন বাণীরূপ দিয়েছিলেন তাঁদের সেই বাণীও নেই, সেই স্মৃতিও নেই। কিন্তু যখন তাঁরা বর্তমান ছিলেন তখন তাঁদের কীর্তির যে মূল্য ছিল সে কেবল উপস্থিত কালের নয়, সে নিত্যকালের। সকল কালের সকল মানুষের চিত্তমিলনবেদিকায় উৎসর্গ করা তাঁদের দান সেদিন অমরতার স্বাক্ষর পেয়েছিল, আমরা সে সংবাদ জানি আর নাই জানি।

১২

সাধু ভাষার সঙ্গে চলতি ভাষার প্রধান প্রভেদ ক্রিয়াপদের চেহারায়। যেমন সাধুভাষার 'করিতেছি' হয়েছে চলতি ভাষায় 'করছি'।

এরও মূল কথাটা হচ্ছে আমাদের ভাষাটা হসন্তবর্ণের শক্ত মুঠোয় আঁটবাঁধা। 'করিতেছি' এলানো শব্দ, পিণ্ড পাকিয়ে হয়েছে 'করছি'।

এই ভাষার একটা অভ্যেস দেখা যায়, তিন বা ততোধিক অক্ষর-ব্যাপী শব্দের দ্বিতীয় বর্ণে হসন্ত লাগিয়ে শেষ অক্ষরে একটা স্বরবর্ণ জুড়ে শব্দটাকে তাল পাকিয়ে দেওয়া। যথা ক্রিয়াপদে: ছিট্‌কে পড়া, কাৎরে ওঠা, বাৎলে দেওয়া, সাঁৎরে যাওয়া,

ইন্‌হিনিয়ে চলা, বদ্‌লিয়ে দেওয়া, বিগ্‌ড়িয়ে যাওয়া।

বিশেষ্যপদে : কাৎলা ভেট্‌কি কাঁক্‌ড়া শাম্‌লা ন্যাক্‌ড়া চাম্‌চে নিম্‌কি চিম্‌টে টুক্‌রি কুল্‌কে আধ্‌লা কাঁচ্‌কলা সক্‌ড়ি দেশ্‌লাই চাম্‌ড়া মাট্‌কোঠা পাগ্‌লা পল্‌তা চাল্‌তে গাম্‌লা আম্‌লা।

বিশেষণ, যেমন : পুঁচ্‌কে বোট্‌কা আল্‌গা ছুট্‌কো হাল্‌কা বিধ্‌কুটে পাৎলা ডান্‌পিটে শুট্‌কো পান্‌সা চিম্‌সে।

এই হসন্তবর্ণের প্রভাবে আমাদের চলতি ভাষায় যুক্তবর্ণের ধ্বনিরই প্রাধান্ত ঘটেছে।

আরও গোড়ায় গেলে দেখতে পাই, এটা ঘটতে পেরেছে অকারের প্রতি ভাষার উপেক্ষাবশত।

সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণের সঙ্গে বাংলা উচ্চারণ মিলিয়ে দেখলে প্রথমেই কানে ঠেকে অ স্বরবর্ণ নিয়ে। সংস্কৃত আ স্বরের হ্রস্বরূপ সংস্কৃত অ। বাংলায় এই হ্রস্ব আ অর্থাৎ অ আমাদের উচ্চারণে আ নাম নিয়েই আছে; যেমন: চালা কাঁচা রাজা। এ-সব আ এক মাত্রার চেয়ে প্রশস্ত নয়। সংস্কৃত আ'কারযুক্ত শব্দ আমরা হ্রস্বমাত্রাতেই উচ্চারণ করি, যেমন 'কামনা'।

বাংলা বর্ণমালার অ সংস্কৃত স্বরবর্ণের কোঠায় নেই। ইংরেজি star শব্দের a সংস্কৃত আ, ইংরেজি stir শব্দের i সংস্কৃত অ। ইংরেজি ball শব্দের a বাংলা অ। বাংলায় 'অল্পসল্প'র বানান যাই হোক, ওর চারটে বর্ণেই সংস্কৃত অ নেই। হিন্দিতে সংস্কৃত অ আছে, বাংলা অ নেই। এই নিয়েই হিন্দুস্থানি ওস্তাদের বাঙালি শাকরেদরা উচ্চ অঙ্গের সংগীতে বাংলা ভাষাকে অস্পৃশ্য বলে গণ্য করেন।

বাংলা অ যদিও বাংলাভাষার বিশেষ সম্পত্তি তবু এ ভাষায় তার অধিকার খুবই সংকীর্ণ। শব্দের আরম্ভে যখন সে স্থান পায় তখনি সে টি্‌কে থাকতে পারে। 'কলম' শব্দের প্রথম বর্ণে অ আছে, দ্বিতীয় বর্ণে সে 'ও' হয়ে গেছে, তৃতীয় বর্ণে সে একেবারে লুপ্ত। ঐ আদিবর্ণের মর্যাদা যদি সে অব্যাঘাতে পেত তা হলেও চলত, কিন্তু পদে পদে আক্রমণ সইতে হয়, আর তখনি পরাস্ত হয়ে থাকে। 'কলম' যেই হল 'কল্‌মি', অমনি প্রথম বর্ণের অকার বিগড়িয়ে হল ও। শব্দের প্রথমস্থিত অকারের এই ক্ষতি বারে বারে নানা রূপেই ঘটছে, যথা: মন বন ধন্ত বক্ষ হরি মধু মসৃণ। এই শব্দগুলিতে আদ্য অকার 'ও' স্বরকে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে। দেখা গেছে, ন বর্ণের পূর্বে তার এই দুর্গতি, ক্ষ বা ক্ষ ফলার পূর্বেও তাই। তা ছাড়া দুটি স্বরবর্ণ আছে ওর শত্রু, ই আর উ। তারা পিছনে থেকে ঐ আদ্য অ'কে করে দেয় ও, যেমন: গতি ফণী বধূ

যদু। য ফলার পূর্বেও অকারের এই দশা, যেমন: কন্য মন্ত পণ্য বন্য। যদি বলা যায় এইটেই স্বাভাবিক তা হলে আবার বলতে হয়, এ স্বভাবটা সর্বজনীন নয়। পূর্ববঙ্গের রসনায় অকারের এ বিপদ ঘটে না। তা হলেই দেখা যাচ্ছে, অকারকে বাংলা বর্ণমালায় স্বীকার করে নিয়ে পদে পদে তাকে অশ্রদ্ধা করা হয়েছে বাংলাদেশের বিশেষ অংশে। শব্দের শেষে হসন্ত তাকে খেদিয়েছে, শব্দের আরম্ভে সে কেবলই তাড়া খেতে থাকে। শব্দের মাঝখানেও অকারের মুখোষ প'রে ওকারের একাধিপত্য, যথা: খড়ম বালক আদর বাঁদর কিরণ টোপর চাকর বাসন বাদল বছর শিকড় আসল মঙ্গল সহজ। বিপদে ওর একমাত্র রক্ষা সংস্কৃত ভাষার কবলে, যেমন: অ-মল বি-জন নী-রস কু-রঙ্গ স-বল দুর্-বল অন্-উপম প্রতি-পদ। এই আশ্রয়ের জোরও সর্বত্র খাটে নি, যথা: বিপদ বিষম সকল।

মধ্যবর্ণের অকার রক্ষা পায় য় বর্ণের পূর্বে, যথা: সময় মলয় আশয় বিষয়।

মধ্যবর্ণের অকার ওকার হয়, সে-যে কেবল হসন্ত শব্দে তা নয়। আকারান্ত এবং যুক্তবর্ণের পূর্বেও এই নিয়ম, যথা: বসন্ত আলস্য লবঙ্গ সহস্র বিলম্ব স্বতন্ত্র রচনা রটনা যোজনা কল্পনা বঞ্চনা।

ইকার আর উকার পদে পদে অকারকে অপদস্থ করে থাকে তার আরও প্রমাণ আছে।

সংস্কৃত ভাষায় ঈয় প্রত্যয়ের যোগে 'জল' হয় 'জলীয়'। চলতি বাংলায় ওখানে আসে উআ প্রত্যয়: জল+উআ = জলুআ। এইটে হল প্রথম রূপ।

কিন্তু উ স্বরবর্ণ শব্দটাকে স্থির থাকতে দেয় না। তার বাঁ দিকে আছে বাংলা অ, ডান দিকে আছে আ, এই দুটোর সঙ্গে মিশে দুই দিকে দুই ওকার লাগিয়ে দিল, হয়ে দাঁড়ালো 'জোলো'।

অকারে বা অযুক্ত বর্ণে যে-সব শব্দের শেষ সেই-সব শব্দের প্রান্তে অ বাসা পায় না, তার দৃষ্টান্ত পূর্বে দিয়েছি। ব্যতিক্রম আছে ত প্রত্যয়-ওয়ালা শব্দে, যেমন: গত হত ক্ষত। আর কতকগুলি সর্বনাম ও অব্যয় শব্দে, যেমন: যত তত কত যেন কেন হেন। আর 'এক শো' অর্থের 'শত' শব্দে। কিন্তু এ কথাটাও ভুল হল। বানানের ছলনা দেখে মনে হয় অন্তত ঐ কটা জায়গায় অ বুঝি টি'কে আছে। কিন্তু সে ছাপার অক্ষরে আপনার মান বাঁচিয়ে মুখের উচ্চারণে ওকারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, হয়েছে: নতো শতো গতো ক্যানো।

অকারের অত্যন্ত অনাদর ঘটেছে বাংলায় বিশেষণ শব্দে। বাংলাভাষায় দুই

অক্ষরের বিশেষণ শব্দ প্রায়ই অকারান্ত হয় না, তাদের শেষে থাকে আকার একার বা ওকার। এর ব্যতিক্রম অতি অল্পই। প্রথমে সেই ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত যতগুলি মনে পড়ে দেওয়া যাক। রঙ বোঝায় যে শব্দে, যেমন: লাল নীল শ্যাম। স্বাদ বোঝায় যে শব্দে, যেমন: টক ঝাল। সংখ্যাবাচক শব্দ: এক থেকে দশ; তার পরে, বিশ ত্রিশ ও ষাট। এইখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। এইরকম সংখ্যাবাচক শব্দ কেবলমাত্র সমাসে খাটে, যেমন: একজন দশঘর দুইমুখো তিনহপ্তা। কিন্তু বিশেষ্য পদের সঙ্গে জোড়া না লাগিয়ে ব্যবহার করতে গেলেই ওদের সঙ্গে 'টি' বা 'টা', 'খানা' বা 'খানি' যোগ করা যায়, এর অন্যথা হয় না। কখনো কখনো বা বিশেষ অর্থে ই প্রত্যয় জোড়া হয়, যেমন: একই লোক, দুইই বোকা। কিন্তু এই প্রত্যয় আর বেশি দূর চালাতে গেলে 'জন' শব্দের সহায়তা দরকার হয়, যেমন: পাঁচজনই দশজনেই। 'জন' ছাড়া অন্য বিশেষ্য চলে না; 'পাঁচ গোরুই' 'দশ চৌকিই' অবৈধ, ওদের ব্যবহার করা দরকার হলে সংখ্যাশব্দের পরে টি টা খানি খানা জুড়তে হবে, যথা: দশটা গোরুই, পাঁচখানি তক্তাই। এক দুই -এর বর্গ ছাড়া আরও দুটি দুই অক্ষরের সংখ্যাবাচক শব্দ আছে, যেমন: আধ এবং দেড়। কিন্তু এরাও বিশেষ্যশব্দ-সহযোগে সমাসে চলে, যেমন: আধযোন দেড়পোওয়া। সমাস ছাড়া বিশেষণ রূপ: দেড়া আধা। সমাসসংশ্লিষ্ট একটা শব্দের দৃষ্টান্ত দেখাই: জোড়হাত। সমাস ছাড়ালে হবে 'জোড়া হাত'। 'হেঁট' বিশেষণ শব্দটি ক্রিয়াপদের যোগে অথবা সমাসে চলে: হেঁটমুণ্ড, কিংবা হেঁট-করা, হেঁট-হওয়া। সাধারণ বিশেষণ অর্থে ওকে ব্যবহার করি নে, বলি নে 'হেঁট মানুষ'। বস্তুত 'হেঁট হওয়া' 'হেঁট করা' জোড়া ক্রিয়াপদ, জুড়ে লেখাই উচিত। 'মাঝ' শব্দটাও এই জাতের, বলি: মাঝখানে মাঝদরিয়া। এ হল সমাস। আর বলি: মাঝ থেকে। এখানে 'থেকে' অপাদানের চিহ্ন, অতএব 'মাঝ-থেকে' শব্দটা জোড়া শব্দ। বলি নে: মাঝ লোক, মাঝ ঘর। এই মাঝ শব্দটা খাঁটি বিশেষণ রূপ নিলে হয় 'মেঝো'।

দুই অক্ষরের হসন্ত বাংলা বিশেষণের দৃষ্টান্ত ভেবে ভেবে আরও কিছু মনে আনা যেতে পারে, কিন্তু অনেকটা ভাবতে হয়। অপর পক্ষে বেশি খুঁজতে হয় না, যেমন: বড়ো ছোটো মেঝো সেজো ভালো কালো ধলো রাঙা সাদা ফিকে খাটো রোগা মোটা বেঁটে কুঁজো বাঁকা সিধে কানা খোঁড়া বোঁচা হুলো ন্যাকা খাঁদা ট্যারা কটা গোটা ন্যাড়া খ্যাপা মিঠে ডাঁসা কষা খাসা ভোকা কাঁচা পাকা খাঁটি মেকি কড়া চোখা রোখা ভিজে হাজা শুকো গুঁড়ো বুড়ো উঁচা খেলো ছ্যাঁদা ঝুঁটো ভীতু উঁচু নিচু কালা হাবা বোকা চ্যাঙা বেঁটে টুঁটো ঘনো।

বাংলা বর্ণমালায় ই আর উ সবচেয়ে উদ্যমশীল স্বরবর্ণ। রাসায়নিক মহলে অক্সিজেন গ্যাস নানা পদার্থের সঙ্গে নানা বিকার ঘটিয়ে দিয়ে নিজেকে রূপান্তরিত করে, ই স্বরবর্ণটা সেইরকম। অন্তত আ'কে বিগড়িয়ে দেবার জন্যে তার খুব উদ্যম, যেমন: থলি+আ=থ'লে, করি+আ=ক'রে। ইআ প্রত্যয়ের ই পূর্ববর্তী একটা বর্ণকে ডিঙিয়ে শব্দের আদি ও অন্তে বিকার ঘটায়, তার দৃষ্টান্ত: জাল+ইআ=জেলে, বালি+ইআ=বেলে, মাটি+ইআ=মেটে, লাঠি+ইআল=লেঠেল।

পরে যেখানে আকার আছে ই সেখানে আ'এ হাত না দিয়ে নিজেকেই বদলে ফেলেছে, তার দৃষ্টান্ত যথা: মিঠাই=মেঠাই, বিড়াল=বেড়াল, শিয়াল=শেয়াল, কিতাব=কেতাব, খিতাব=খেতাব।

আবার নিজেকে বজায় রেখে আকারটাকে বিগড়িয়ে দিয়েছে, তার দৃষ্টান্ত দেখো: হিসাব=হিসেব, নিশান=নিশেন, বিকাল=বিকেল, বিলাত=বিলেত। ই কোনো উৎপাত করে নি এমন দৃষ্টান্তও আছে, সে বেশি নয়, অল্পই, যেমন: বিচার নিবাস কৃষাণ পিশাচ।

একদা বাংলা ক্রিয়াপদে আ স্বরবর্ণের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। করিলা চলিলা করিবা যাইবা: এইটেই নিয়ম ছিল। ইতিমধ্যে ই উপদ্রব বাধিয়ে দিলে। নিরীহ আকারকে সে শান্তিতে থাকতে দেয় না; 'দিলা'কে করে তুলল 'দিলে', 'করিবা' হল 'করবে'।

বাংলা ক্রিয়াপদের সদ্য-অতীতে ইল প্রত্যয়ে বিকল্পে ও এবং এ লাগে, যেমন: করলো করলে। 'করিল' হয়েছে 'করলো', ইকারের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন ক'রে। 'করিলা' থেকে 'করলে' হয়েছে ইকারের শাসন মেনেই, অর্থাৎ আ'কে নিকটে পেয়ে ই তার যোগে একটা এ ঘটিয়েছে। মনে করিয়ে দেওয়া ভালো, দক্ষিণবঙ্গের কথ্য বাংলার কথা বলছি। এই ভাষায় 'করিলাম' যদি 'করলেম' হয়ে থাকে সে তার স্বরবর্ণের প্রবৃত্তিবশত। এই কারণেই 'হইয়া' হয়েছে 'হয়ে'।

বাংলায় উ স্বরবর্ণও খুব চঞ্চল। ইকার টেনে আনে এ স্বরকে, আর ও স্বরকে টানে উকার: পট+উআ=পোটো। মাঝের উ ডাইনে বাঁয়ে দিলে স্বর বদলিয়ে। শব্দের আদ্যক্ষরে যদি থাকে আ, তা হলে এই সব্যসাচী বাঁ দিকে লাগায় এ, ডান দিকে ও। 'মাঠ' শব্দে উআ প্রত্যয় যোগে 'মাঠুআ', হয়ে গেল 'মেঠো'; 'কাঠুআ' থেকে 'কেঠো'। উকারের আত্মবিসর্জনের যেমন দৃষ্টান্ত দেখলুম, তার আত্মপ্রতিষ্ঠারও দৃষ্টান্ত আছে, যেমন: মুড়াল=মুড়ুল, উনান=উনুন। কোথাও বা আদ্যক্ষরের উকার পরবর্তী আকারকে ও ক'রে দিয়ে নিজে খাঁটি থাকে, যেমন: জুতা=জুতো, গুঁড়া=গুঁড়ো,

পূজা=পুজো, সুতা=সুতো, ছুতার=ছুতোর, কুমার=কুমোর, উজাড়=উজোড়। উকারের পরবর্তী অকারকে অনেক স্থলেই উকার করে দেওয়া হয়, যেমন : পুতল= পুতুল, পুখর=পুখুর, হুকম=হুকুম, উপড়=উপুড়।

একটা কথা বলে রাখি, ইকারে সঙ্গে উকারের একটা যোগসাজোস আছে। তিন অক্ষরের কোনো শব্দের তৃতীয় বর্ণে যদি ই থাকে তা হলে সে মধ্যবর্ণের আ'কে তাড়িয়ে সেখানে বিনা বিচারে উ'এর আসন করে দেয়। কিন্তু প্রথমবর্ণে উ কিংবা ই থাকা চাই, যেমন : উড়ানি=উড়ুনি, নিড়ানি=নিড়ুনি, পিটানি=পিটুনি। কিন্তু 'পেটানি'র বেলায় খাটে না ; কারণ ওটা একার, ইকার নয়। 'মাতানি'র বেলায়ও এইরূপ। 'খাটুনি' হয়, যেহেতু ট'এ আকারের সংস্রব নেই। গাঁথুনি মাতুনি রাঁধুনি'রও উকার এসেছে অকারকে সরিয়ে দিয়ে। সেই নিয়মে : এখুনি চিরুনি। 'চালানি' শব্দে আকারকে মেরে উকার দখল পেলে না, কিন্তু 'চালনি' শব্দে অকারকে ঠেলে ফেলে অনায়াসে হল 'চালুনি'।

উকারের ব্যবহার দেখলে মনে পড়ে কোকিলকে, সে যেখানে সেখানে পরের বাসায় ডিম পেড়ে যায়।

এও দেখা গেছে ইআ প্রত্যয়-ওয়ালা শব্দে ই'কে ঠেলে উ অনধিকারে নিজে আসন জুড়ে বসে, যেমন : জঙ্গল=জঙ্গলিয়া=জঙ্গুলে, বাদল=বাদলিয়া=বাদুলে। এমনিতরো : নাটুকে মাতুনে।

হাতুড়ে কাঠুরে সাপুড়ে হাটুরে মেছুড়ে : এদের মধ্যে কোনো-একটা প্রত্যয় যোগে র বা ড় এসে জুটেছে। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, 'মেছুড়ে'র ঘাসে লাগল একার, 'সাপুড়ে'র সাপ রইল নির্বিকার। ভাষাকে প্রশ্ন করলে এক-এক সময়ে ভালো জবাব পাই, এক-এক সময় পাইও নে। চাষ যে করে সে 'চাষুড়ে' হল না কেন।

আমার হিন্দিভাষী বন্ধু বলেন, বাংলায় 'সাপুড়ে' ; হিন্দিতে : সঁপেরা=সাঁপ+ হারা। বাংলা 'কাঠুরে' হিন্দিতে 'লকড়হারা', হিন্দিতে 'কাঠহারা' কথা নেই। হিন্দির এই 'হারা' তদ্ধিত প্রত্যয় ; অধিকার অর্থে এর প্রয়োগ, ক্রিয়া অর্থে নয়। বোধ করি সেই কারণে 'চাষুড়ে' শব্দটা সম্ভব হয় নি।

স্বরবিকারের আর-একটা অদ্ভুত দৃষ্টান্ত দেখো। ইআ প্রত্যয়-যোগে একটা ওকার খামখা হয়ে গেল উ : গোবোর+ইয়া=গুবুরে, কোঁদোল+ইয়া=কুঁদুলে। 'কুঁদলে' হল না কেন সেও একটা প্রশ্ন। 'গোবোর' থেকে ওকারটাকে হসন্তের ঘাড়ে তাড়িয়ে দিলে। 'কোঁদোল' শব্দেও হসন্তকে জায়গা না দিয়ে, নিজে বসল জমিয়ে।

অকারের প্রতি উপেক্ষা সম্বন্ধে আরও প্রমাণ দেওয়া যায়। হাত বুলিয়ে সন্ধান

করাকে বলে 'হাৎড়ানো', অসমাপিকায় 'হাৎড়িয়ে'। এখানে 'হাত'এর ত থেকে ছেঁটে দেওয়া হল অকার। অথচ 'হাতুড়ে' শব্দের বেলায় নাহক একটা উকার এনে জুড়ে দিলে, তবু অকারকে কিছুতে আমল দিল না। 'বাদল' শব্দের উত্তর ইআ প্রত্যয় যোগ ক'রে 'বাদ্‌লে' করলে না বটে, কিন্তু দিলে 'বাদুলে' করে।

এই-সব দৃষ্টান্ত থেকে বুঝতে পারি, অন্তত পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গের রসনার টান আছে উকারের দিকে। 'হাতড়ি' শব্দ তাই সহজেই হয়েছে 'হাতুড়ি'। তা ছাড়া দেখো: বাছুর তেঁতুল বামুন মিশুক হিংসুক বিদ্যুৎবার।[১]

এই প্রসঙ্গে আর-একটা দৃষ্টান্ত দেবার আছে। 'চিবোতে' 'ঘুমোতে' শব্দের স্থলে আজকাল 'চিবুতে' 'ঘুমুতে' উচ্চারণ ও বানান চলেছে। আজকাল বলছি এইজন্যে যে, আমার নিজের কাছে এই উচ্চারণ ছিল অপরিচিত ও অব্যবহৃত। 'চিবোতে' 'ঘুমোতে' শব্দের মূলরূপ: চিবাইতে ঘুমাইতে। আ+ই'কে ঠেলে ফেলে নিঃসম্পর্কীয় উ এসে বসল। অবশ্য এর অন্য নজির আছে। বিনানি=বিনুনি, ঝিমানি=ঝিমুনি, পিটানি=পিটুনি শব্দে দেখা যাচ্ছে প্রথম বর্ণের ইকার তার সবর্ণ তৃতীয় বর্ণের 'পরে হস্তক্ষেপ করলে না, অথচ মধ্যবর্ণের আ'কে সরিয়ে দিয়ে তার জায়গায় বসিয়ে দিলে উ। মনে রাখতে হবে, প্রথম বর্ণের ইকার তার এই বন্ধু উ'কে নিমন্ত্রণের জন্যে দায়ী। গোড়ায় যেখানে ইকারের ইঙ্গিত নেই সেখানে উ পথ পায় না ঢুকতে। পূর্বেই তার দৃষ্টান্ত দিয়েছি। 'ঠ্যাঙানি' হয় না 'ঠেঙুনি', 'ঠকানি' হয় না 'ঠকুনি', 'বাঁকানি' হয় না 'বাঁকুনি'। 'চিবুতে' 'ঘুমুতে' উচ্চারণ আমার কানে ঠিক ব'লে ঠেকে না, সে যে নিতান্ত কেবল অভ্যাসের জন্যে তা আমি মানতে পারি নে। বাংলা ভাষায় এ উচ্চারণ অনিবার্য নয়। আমার বিশ্বাস 'চিনাইতে' শব্দকে কেউ 'চিনুতে' বলে না, অন্তত আমার তাই ধারণা। 'তুলাইতে' কেউ কি 'তুলুতে', কিংবা 'ছুটাইতে' 'ছুটুতে' বলে? 'বুঝাইতে' বলতে 'বুঝুতে' কেউ বলে কিনা নিশ্চিত জানি নে, আশা করি বলে না। 'পুরাইতে' বলতে 'পুরুতে' কিংবা 'ঠকাইতে' বলতে 'ঠকুতে' শুনি নি। আমার নিশ্চিত বোধ হয় 'কান জুড়ুল' কেউ বলে না, অথচ 'ঘুমাইল' ও 'জুড়াইল' একই ছাঁদের কথা। 'আমাকে দিয়ে তার ঘোড়াটা কিনাইল' বাক্যটাকে চলতি ভাষায় যদি বলে 'আমাকে দিয়ে তার ঘোড়াটা কিনুল', আমার বোধ হয় সেটা বেআড়া শোনাবে। এই 'শোনাবে' শব্দটা 'শুনুবে' হয়ে উঠতে বোধ হয় এখনো দেরি আছে। আমরা এক কালে যে-সব

১ হিন্দিতে 'হাতুড়ি' শব্দের প্রতিশব্দ স্ত্রীলিঙ্গে 'হতৌড়ি'। বিহারীতে স্ত্রীলিঙ্গে 'হতউরি'। উড়া এবং উরা প্রত্যয় থেকে উকারের প্রবেশ স্বাভাবিক। হিন্দিতেও হ্রস্ব ওকারকে উকারের মতো বলবার ও লেখবার প্রবৃত্তি আছে: বোলবানা=বুলবানা, কোড়বানা=কুড়বানা, গোবর+ঐলা=গুবরৈলা।

উচ্চারণে অভ্যস্ত ছিলুম এখন তার অন্যথা দেখি, যেমন : পেত্তোল (পিত্তোল), ভেত্তোর (ভিত্তোর), তেতো (তিতো), সোন্দোর (সুন্দোর), ডাল দে (দিয়ে) বেখে খাওয়া, তার বে (বিয়ে) হয়ে গেল।

উকারের ধ্বনি তার পরবর্তী অক্ষরেও প্রতিধ্বনিত হতে পারে, এতে আশ্চর্যের কথা নেই, যেমন : মুণ্ডু কুণ্ডু ভদ্দুর কদ্দুর পুত্তুর মুগুর। তবু 'কুণ্ডল' ঠিক আছে, কিন্তু 'কুণ্ডুলি'তে লাগল উকার। 'সুন্দর' 'সুন্দরী'তে কোনো উৎপাত ঘটে নি। অথচ 'গণনা' শব্দে অনাহূত উকার এসে বানিয়ে দিলে 'গুনে'। 'শয়ন' থেকে হল 'শুয়ে', 'বয়ন' থেকে 'বুনে', 'চয়ন' থেকে 'চুনে'।

বাংলা অকারের প্রতি বাংলা ভাষার অনাদরের কথা পূর্বেই বলেছি। ইকার-উকারের পূর্বে তার স্বরূপ লোপ হয়ে ও হয়। ঐ নিরীহ স্বরের প্রতি একারের উপদ্রবও কম নয়। উচ্চারণে তার একটা অকার-তাড়ানো ঝোঁক আছে। তার প্রমাণ পাওয়া যায় সাধারণ লোকের মুখের উচ্চারণে। বাল্যকালে প্রলয়-ব্যাপারকে 'পেল্লায়' ব্যাপার বলতে শুনেছি মেয়েদের মুখে। সমাজের বিশেষ স্তরে আজও এর চলন আছে, এবং আছে : পেল্লাদ (প্রহ্লাদ), পেরনাম (প্রণাম), পেরথম (প্রথম), পেরধান (প্রধান), পেরজা (প্রজা), পেসোন্নো (প্রসন্ন), পেসাদ অথবা পেরসাদ (প্রসাদ)। 'প্রত্যাশা' ও 'প্রত্যয়' শব্দের অপভ্রংশে প্রথম বর্ণে হস্তক্ষেপ না ক'রে দ্বিতীয় বর্ণে বিনা কৈফিয়তে একার নিয়েছে বাসা, হয়েছে 'পিত্তেস', 'পিত্তেয়', কখনো হয় 'পেত্তয়'। একারকে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে ইকার এবং ঋকার, তারও দৃষ্টান্ত আছে, যেমন : সেদ্ধো (সিদ্ধ), নেত্তো (নিত্য বা নৃত্য), কেষ্টো (কিষ্টো), শেকোল (শিকল), বেরোদ (বৃহৎ), খেস্টান (খৃস্টান)। প্রথম বর্ণকে ডিঙিয়ে মাঝখানের বর্ণে একার লাফ দিয়েছে সেও লক্ষ্য করবার বিষয়, যেমন : নিমেস বিশেস, সরেস (সরস), নীরেস ঈশেন বিলেত বিকেল অবেষ্ট।

স্বরবর্ণের খেয়ালের আর-একটা দৃষ্টান্ত দেখানো যাক।—

'পিটানো' শব্দের প্রথম বর্ণের ইকার যদি অবিকৃত থাকে তা হলে দ্বিতীয় বর্ণের আকারকে দেয় ওকার করে, হয় 'পিটোনো'। ইকার যদি বিগড়ে গিয়ে একার হয় তা হলে আকার থাকে নিরাপদে, হয় 'পেটানো'। তেমনি : মিটোনো=মেটানো, বিলোনো=বেলানো, কিলোনো=কেলানো। ইকার একারে যেমন অদল-বদলের সম্বন্ধ তেমনি উকারে ওকারে। শব্দের প্রথম বর্ণে উ যদি খাঁটি থাকে তা হলে দ্বিতীয় বর্ণের অকারকে পরাস্ত ক'রে করবে ওকার। যেমন 'ঝুলানো' হয়ে থাকে 'ঝুলোনো'। কিন্তু যদি ঐ উকারের স্খলন হয়ে হয় ওকার তা হলে আকারের ক্ষতি

হয় না, তখন হয় 'ভোলানো'। তেমনি : ডুবোনো = ডোবানো, ছুটোনো = ছোটানো। কিন্তু 'ঘুমোনো' কখনোই হয় না 'ঘোমানো', 'ফুলোনো' হয় না 'ফোলানো' কেন। অকর্মক বলে কি ওর স্বতন্ত্র বিধান।

দেখা যাচ্ছে বাংলা উচ্চারণে ইকার এবং উকার খুব কর্মিষ্ঠ, একার এবং ওকার ওদের শরণাগত, বাংলা অকার এবং আকার উৎপাত সইতেই আছে।

স্বরবর্ণের কোঠায় আমরা ঋ'কে ঋণস্বরূপে নিয়েছি বর্ণমালায়, কিন্তু উচ্চারণ করি ব্যঞ্জন বর্ণের— রি। সেইজন্যে অনেক বাঙালি 'মাতৃভূমি'কে বলেন 'মাত্রিভূমি'। যে কবি তাঁর ছন্দে ঋকারকে স্বরবর্ণরূপে ব্যবহার করেন তাঁর ছন্দে ঐ বর্ণে অনেকের রসনা ঠোকর খায়।

সাধারণত বাংলায় স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ নেই। তবু কোনো কোনো স্থলে স্বরের উচ্চারণ কিছু পরিমাণে বা সম্পূর্ণ পরিমাণে দীর্ঘ হয়ে থাকে। হসন্ত বর্ণের পূর্ববর্তী স্বরবর্ণের দিকে কান দিলে সেটা ধরা পড়ে, যেমন 'জল'। এখানে জ'এ যে অকার আছে তার দীর্ঘতা প্রমাণ হল 'জলা' শব্দের জ'এর সঙ্গে তুলনা করে দেখলে। 'হাত' আর 'হাতা'য় প্রথমটির হা দীর্ঘ, দ্বিতীয়টির হ্রস্ব। 'পিঠ' আর 'পিঠে', 'ভূত' আর 'ভুতো', 'ঘোল' আর 'ঘোলা'— তুলনা করে দেখলে কথাটা স্পষ্ট হবে। সংস্কৃতে দীর্ঘস্বরের দীর্ঘতা সর্বত্রই, বাংলায় স্থানবিশেষে। কথায় ঝোঁক দেবার সময় বাংলা স্বরের উচ্চারণ সব জায়গাতেই দীর্ঘ হয়, যেমন : ভা—রি তো পণ্ডিত, কে—বা কার খোঁজ রাখে, আ—জই যাব, হল—ই বা, অবা—ক করলে, হাজা—রো লোক, কী— যে বকো, এক ধা—র থেকে লাগা—ও মার। যুক্তবর্ণের পূর্বে সংস্কৃতে স্বর দীর্ঘ হয়, বাংলায় তা হয় না।

বাংলায় একটা অতিরিক্ত স্বরবর্ণ আছে যা সংস্কৃত ভাষায় নেই। বর্ণমালায় সে ঢুকেছে একারের নামের ছাড়পত্র নিয়ে, তার জন্যে স্বতন্ত্র আসন পাতা হয় নি। ইংরেজি bad শব্দের a তার সমজাতীয়। বাংলায় তার বিশেষ বানান করবার সময় আমরা য ফলায় আকার দিয়ে থাকি। বাংলায় আমরা যেটাকে বলি অন্তঃস্থ য, চ বর্গের জ'এর সঙ্গে তার উচ্চারণের ভেদ নেই। য'এর নীচে ফোঁটা দিয়ে আমরা আর-একটা অক্ষর বানিয়েছি তাকে বলি ইয়। সেটাই সংস্কৃত অন্তঃস্থ য। সংস্কৃত উচ্চারণ-মতে 'যম' শব্দ 'য়ম'। কিন্তু ওটাকে 'জম' উচ্চারণের অজুহাতে য়'র ফোঁটা দিয়েছি সরিয়ে। 'নিয়ম' শব্দের বেলায় য়'র ফোঁটা রক্ষে করেছি, তার উচ্চারণেও সংস্কৃত বজায় আছে। কিন্তু যফলা-আকারে (্যা) য়'কে দিয়েছি খেদিয়ে আর আ'টাকে দিয়েছি বাঁকা করে। সংস্কৃতে 'ন্যাস' শব্দের উচ্চারণ 'নিয়াস', বাংলায়

হল nas। তার পর থেকে দরকার পড়লে য ফলার চিহ্নটাকে ব্যবহার করি আকারটাকে বাঁকিয়ে দেবার জন্যে। Paris শব্দকে বাংলায় লিখি 'প্যারিস', সংস্কৃত বানানের নিয়ম অনুসারে এর উচ্চারণ হওয়া উচিত ছিল 'পিয়ারিস'। একদা 'ন্যায়' শব্দটাকে বাংলায় 'নেয়ায়' লেখা হয়েছে দেখেছি।

অথচ 'ন্যায়' শব্দকে বানানের ছলনায় আমরা তৎসম শব্দ বলে চালাই। 'যম'কেও আমরা ভয়ে ভয়ে বলে থাকি বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ, অথচ রসনায় ওটা হয়ে দাঁড়ায় তদ্ভব বাংলা।

সংস্কৃত শব্দের একার বাংলায় অনেক স্থলেই স্বভাব পরিবর্তন করেছে, যেমন 'খেলা', যেমন 'এক'। জেলাভেদে এই একারের উচ্চারণ একেবারে বিপরীত হয়। তেল মেঘ পেট লেজ— শব্দে তার প্রমাণ আছে।

পূর্বেই দেখিয়েছি আ এবং বাংলা অ স্বরবর্ণ সম্বন্ধে ইকার এবং উকারের ব্যবহার আধুনিক খবরের কাগজের ভাষায় যাকে বলে চাঞ্চল্যজনক, অর্থাৎ এরা সর্বদা অপঘাত ঘটিয়ে থাকে। কিন্তু এদের অনুগত একারের প্রতি এরা সদয়। 'এক' কিংবা 'একটা' শব্দের এ গেছে বেঁকে, কিন্তু উ তাকে রক্ষা করেছে 'একুশ' শব্দে। রক্ষা করবার শক্তি আকারের নেই, তার প্রমাণ 'এগারো' শব্দে। আমরা দেখিয়েছি ন'এর পূর্বে অ হয়ে যায় ও, 'যেমন' 'ধন' 'মন' শব্দে। ঐ ন একারের বিকৃতি ঘটায় : ফেন সেন কেন যেন। ইকারের পক্ষপাত আছে একারের প্রতি, তার প্রমাণ দিতে পারি। 'লিখন' থেকে হয়েছে 'লেখা'— বিশুদ্ধ এ— 'গিলন' থেকে 'গেলা'। অথচ 'দেখন' থেকে 'দ্যাখা', 'বেচন' থেকে 'ব্যাচা', 'হেলন' থেকে 'হ্যালা'। অসমাপিকা ক্রিয়ার মধ্যে এদের বিশেষ রূপগ্রহণের মূল পাওয়া যায়, যেমন : লিখিয়া – লেখা (পূর্ববঙ্গে 'ল্যাখা'), গিলিয়া – গেলা। কিন্তু : খেলিয়া – খ্যালা, বেচিয়া – ব্যাচা। মিলন অর্থে আর-একটা শব্দ আছে 'মেলন', তার থেকে হয়েছে 'ম্যালা', আর 'মিলন' থেকে হয়েছে 'মেলা' (মিলিত হওয়া)।

য ফলায় আকার না থাকলেও বাংলায় তার উচ্চারণ অ্যাকার, যেমন 'ব্যয়' শব্দে। এটা হল আগুক্ষরে। অন্যত্র ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব ঘটায়, যেমন 'সভ্য'। পূর্বে বলেছি ইকারের প্রতি একারের টান। 'ব্যক্তি' শব্দের ইকার প্রথম বর্ণে দেয় একার বসিয়ে, 'ব্যক্তি' শব্দ হয়ে যায় 'বেক্তি'। হ'এর সঙ্গে য ফলা যুক্ত হলে কোথা থেকে জ'এ-ঝ'এ জটলা ক'রে হয়ে দাঁড়ায় 'সোজ্‌ঝো'। অথচ 'সহ্য' শব্দটাকে বাঙালি তৎসম বলতে কুণ্ঠিত হয় না। বানানের ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে দিলেই দেখা যাবে, বাংলায় তৎসম শব্দ নেই বললেই হয়। এমন-কি কোনো নতুন সংস্কৃত শব্দ আমদানি করলে বাংলার

নিয়মে তখনি সেটা প্রাকৃত রূপ ধরবে। ফলে হয়েছে, আমরা লিখি এক আর পড়ি আর। অর্থাৎ আমরা লিখি সংস্কৃত ভাষায়, আর ঠিক সেইটেই পড়ি প্রাকৃত বাংলা ভাষায়।

য ফলার উচ্চারণ বাংলায় কোথাও সম্মানিত হয় নি, কিন্তু এক কালে বাংলার ক্রিয়াপদে পথ হারিয়ে সে স্থান পেয়েছিল। 'খাইল' 'আইল' শব্দের 'খাল্য' 'আল্য' রূপ প্রাচীন বাংলায় দেখা গিয়েছে। ইকারটা শব্দের মাঝখান থেকে ভ্রষ্ট হয়ে শেষকালে গিয়ে পড়াতে এই ইঅ'র সৃষ্টি হয়েছিল।

বাংলার অন্য প্রদেশে এই যফলা-আকারের অভাব নেই, যেমন 'মায্যা মানুষ'। বাংলা সাধু ভাষার অসমাপিকা ক্রিয়াপদে যফলা-আকার ছদ্মবেশে আছে, যেমন : হইয়া খাইয়া। প্রাচীন পুঁথিতে অনেক স্থলে তার বানান দেখা যায় : হয়্যা খায়্যা।

সম্প্রতি একটা প্রশ্ন আমার কাছে এসেছে। 'যাওয়া খাওয়া পাওয়া দেওয়া নেওয়া' ধাতু 'যেতে খেতে পেতে দিতে নিতে' আকার নিয়ে থাকে, কিন্তু 'গাওয়া বাওয়া চাওয়া কওয়া বওয়া' কেন তেমনভাবে হয় না 'গেতে বেতে চেতে ক'তে ব'তে'। এর যে উত্তর আমার মনে এসেছে সে হচ্ছে এই যে, যে ধাতুতে হ'এর প্রভাব আছে তার ই লোপ হয় না। 'গাওয়া'র হিন্দি প্রতিশব্দ 'গাহনা', 'চাওয়া'র চাহনা, 'কওয়া'র কহনা। কিন্তু 'খানা দেনা লেনা'র মধ্যে হ নেই। 'বাহন' থেকে 'বাওয়া', সুতরাং তার সঙ্গে হ'এর সম্বন্ধ আছে। 'ছাদন' ও 'ছাওয়া'র মধ্যপথে বোধকরি 'ছাহন' ছিল, তাই 'ছাইতে'র জায়গায় 'ছেতে' হয় না।

স্বরবর্ণের অনুরাগ-বিরাগের সূক্ষ্ম নিয়মভেদ এবং তার স্বৈরাচার কৌতুকজনক। সংস্কৃত উচ্চারণে যে নিয়ম চলেছিল প্রাকৃতে তা চলল না, আবার নানা প্রাকৃতে নানা উচ্চারণ। বাংলা ভাষা কয়েক শো বছর আগে যা ছিল এখন তা নেই। এক ভাষা ব'লে চেনাই শক্ত। আগে বলত 'পড়ই', এখন বলে 'পড়ে'; 'হোহ্' হয়ে গেছে 'হও'; 'আমহি' হল 'আমি'; 'বাম্‌হন' হল 'বামুন'; এই বদল হওয়ার ঝোঁক বহু লোককে আশ্রয় ক'রে এমন স্বতোবেগে চলছে যেন এ সজীব পদার্থ। হয়তো এই মুহূর্তেই আমাদের উচ্চারণ তার কক্ষপথ থেকে অতি ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। ফ হচ্ছে f, ভ হচ্ছে ব, চ হচ্ছে স, এখনো কানে স্পষ্ট ধরা পড়ছে না।

যে প্রাচীন প্রাকৃতের সঙ্গে বাংলা প্রাকৃতের নিকটসম্বন্ধ তার রঙ্গভূমিতে আমাদের স্বরবর্ণগুলি জন্মান্তরে কী রকম লীলা করে এসেছে তার অনুসরণ করে এলে অপভ্রংশের কতকগুলি বাঁধা রীতি হয়তো পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সে পথের পথিক আমি নই। খবর নিতে হলে যেতে হবে সুনীতিকুমারের দ্বারে।

কিন্তু এ সম্বন্ধে রসনার প্রকৃতিগত কোনো সাধারণ নিয়ম বের করা কঠিন হবে। কেননা দেখা যাচ্ছে, পূর্ব উত্তর বঙ্গে এবং দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গে অনেক স্থলে কেবল যে উচ্চারণের পার্থক্য আছে তা নয়, বৈপরীত্যও লক্ষিত হয়।

বাংলা ভাষায় স্বরবর্ণের উচ্চারণবিকার নিয়ে আরও কিছু আলোচনা করেছি আমার বাংলা শব্দতত্ত্বে[১]।

স্বরবর্ণ সম্বন্ধে পালা শেষ করার পূর্বে একটা কথা বলে নিই। এর পরে প্রত্যয় সম্বন্ধে যেখানে বিস্তারিত করে বলেছি সেখানটা পড়লে পাঠকরা জানতে পারবেন বাংলা ভাষাটা ভঙ্গীওয়ালা ভাষা।

বাংলায় এ ও উ এই তিনটে স্বরবর্ণ কেবল যে অর্থবান শব্দের বানানের কাজে লাগে তা নয়। সেই শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কিছু ভঙ্গী তৈরি করে। 'হরি'কে যখন 'হরে' বলি কিংবা 'কালী'কে বলি 'কেলো', তখন সেটা সম্মানের সম্ভাষণ বলে শোনাবে না। কিন্তু 'হরু' বা 'কালু', 'ভুলু' বা 'খুকু', এমন-কি 'খাঁদু' শব্দে স্নেহ বহন করে। পূর্বে দেখানো হয়েছে বাংলা ই এবং উ স্বরটা সম্মানী, এ এবং ও অন্ত্যজ। আ স্বরটা অনাদৃত, ওর ব্যবহার আছে অনাদরে, যেমন : মাখন – মাখ্না, মদন – মদ্না, বামন = বাম্না। ইংরেজিতে 'রবর্ট' থেকে 'বর্টি', 'এলিজাবেথ' থেকে 'লিজি', 'মার্গারেট' থেকে 'ম্যাগি', 'উইলিয়ম' থেকে 'উইলি', চার্ল্স্' থেকে 'চার্লি'— ইকার স্বরে দেয় আত্মীয়তার টান। ইকারে আদর প্রকাশ বাংলাতেও পাওয়া যায়। সেখানে আকারকে ঠেলে দিয়ে ই এসে বসে, যেমন : লতা = লতি, কণা = কনি, ক্ষমা = ক্ষেমি, সরলা = সর্লি, মীরা = মীরি। অকারান্ত শব্দেও এ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যেমন : স্বর্ণ = স্বর্নি। এগুলি সব মেয়ের নাম। আই যোগেও আদরের সুর লাগে, যেমন : নিমাই নিতাই কানাই বলাই। এ কিংবা ও স্বরের অবজ্ঞা, উ স্বরের স্নেহব্যঞ্জনা সংস্কৃতে পাই নে।

বাংলা বর্ণমালায় কতকগুলো বর্ণ আছে যারা বেকার, আর কতকগুলো আছে যারা বেগার খাটে অর্থাৎ নিজের কর্তব্য ছেড়ে অন্যের কাজে লাগে। ক বর্গের অনুনাসিক ঙ সাধু ভাষায় যুক্তবর্ণে ছাড়া অন্যত্র আপন গৌরবে স্থান পায় নি। যেখানে রসনায় তার উচ্চারণকে স্বীকার করেছে সেখানে লেখায় উপেক্ষা করেছে তার স্বরূপকে। 'রক্তবর্ণ' বলতে বোঝায় যে শব্দ তাকে লেখা হয়েছে 'রাঙা', অর্থাৎ তখনকার ভদ্রলোকেরা ভুল বানান করতে রাজি ছিলেন, কিন্তু ঙ'র বৈধ দাবি কিছুতে মানতে

১ শব্দতত্ত্ব : রবীন্দ্র-রচনাবলীর দ্বাদশ খণ্ড

চান নি। বানান-জগতে আমিই বোধ হয় সবপ্রথমে ঙ'র প্রতি দৃষ্টি দিয়েছিলেম, সেও বোধ করি ছন্দের প্রতি মমতাবশত। যেখানে 'ভাঙ্গা' বানান ছন্দকে ভাঙে সেখানে ভাঙন রক্ষা করবার জন্যে ঙ'র শরণ নিয়ে লিখেছি 'ভাঙা'। কিন্তু চ বর্গের ঞ'র যথোচিত সদ্গতি করা যায় নি। এই ঞ অন্য ব্যঞ্জনবর্ণকে আঁকড়িয়ে টিঁকে থাকে, একক নিজের জোরে কোথাও ঠাঁই পায় না। ঐ 'ঠাঁই' কথাটা মনে করিয়ে দিলে যে, এক কালে ঞ ছিল ঐ শব্দটার অবলম্বন। প্রাচীন সাহিত্যে অনেক শব্দ পাওয়া যায় অস্তিমে যার ঞ'ই ছিল আশ্রয়, যেমন: নাঞি মুঞি খাঞা হঞা। এইজাতীয় অসমাপিকা ক্রিয়া মাত্রেই ঞা'র প্রভুত্ব ছিল। আমার বিশ্বাস, এটা রাঢ়দেশের লেখক ও লিপিকরদের অভ্যস্ত ব্যবহার। অনুনাসিক বর্জনের জন্যেই পূর্ববঙ্গ বিখ্যাত।

বাংলা বর্ণমালায় আর-একটা বিভীষিকা আছে, মূর্ধন্য এবং দন্ত্য ন'এ ভেদাভেদ-তত্ত্ব। বানানে ওদের ভেদ, ব্যবহারে ওরা অভিন্ন। মূর্ধন্য ণ'এর আসল উচ্চারণ বাঙালির জানা নেই। কেউ কেউ বলেন, ওটা মূলত দ্রাবিড়ি। ওড়িয়া ভাষায় এর প্রভাব দেখা যায়। ড়'এ চন্দ্রবিন্দুর মতো ওর উচ্চারণ। খাঁড়া চাঁড়াল ভাঁড়ার প্রভৃতি শব্দে ওর পরিচয় পাওয়া যায়।

ল কলকাতা অঞ্চলে অনেক স্থলে নকার গ্রহণ করে, যেমন: নেওয়া নুন নেবু, নিচু (ফল), নাল (লালা), নাগাল নেপ ন্যাপা, নোয়া (সধবার হাতের), ন্যাজ, নোড়া (লোষ্ট্র), ন্যাংটা (উলঙ্গ)। কাব্যের ভাষায়: করিনু চলিনু। গ্রাম্য ভাষায়: নাটি, ন্যাকা (লেখা), নাল (লাল বর্ণ), নক্কা ইত্যাদি।

বাংলা বর্ণমালায় সংস্কৃতের তিনটে বর্ণ আছে, শ ষ স। কিন্তু সবক'টির অস্তিত্বের পরিচয় উচ্চারণে পাই নে। ওরা বাঙালি শিশুদের বর্ণপরিচয়ে বিষম বিভ্রাট ঘটিয়েছে। উচ্চারণ ধ'রে দেখলে আছে এক তালব্য শ। আর বাকি দুটো আসন দখল করেছে সংস্কৃত অভিধানের দোহাই পেড়ে। দন্ত্য স'এর উচ্চারণ অভিধান অনুসারে বাংলায় নেই বটে, কিন্তু ভাষায় তার দুটো-একটা ফাঁক জুটে গেছে। যুক্তবর্ণের যোগে রসনায় সে প্রবেশ করে, যেমন: স্নান হস্ত কাস্তে মাস্তল। শ্রী মিশ্র অশ্রু: তালব্য শ'এর মুখোষ পড়েছে কিন্তু আওয়াজ দিচ্ছে দন্ত্য স'এর। সংস্কৃতে যেখানে র ফলায় সংস্রবে এসেছে তালব্য শ, বাংলায় সেখানে এল দন্ত্য স। এ ছাড়া 'নাচতে' 'মুছতে' প্রভৃতি শব্দে চ-ছ'এর সঙ্গে ত'এর ঘেঁষ লেগে দন্ত্য স'এর ধ্বনি জাগে।

সংস্কৃতে অন্তঃস্থ, বর্গীয়, দুটো ব আছে। বাংলায় যাকে আমরা বলে থাকি তৎসম শব্দ, তাতেও একমাত্র বর্গীয় ব'এর ব্যবহার। হাওয়া খাওয়া প্রভৃতি ওয়া-ওয়ালা শব্দে অন্তঃস্থ ব'এর আভাস পাওয়া যায়। আসামি ভাষায় এই ওয়া অন্তঃস্থ ব দিয়েই

লেখে, যেমন : 'হওয়া'র পরিবর্তে 'হবা'। হ এবং অন্তঃস্থ ব'এর সংযুক্ত বর্ণেও রসনা অন্তঃস্থ ব'কে স্পর্শ করে, যেমন : আহ্বান জিহ্বা।

বাংলা বর্ণমালার সবপ্রান্তে একটি যুক্তবর্ণকে স্থান দেওয়া হয়েছে, বর্ণনা করবার সময় তাকে বলা হয় : ক'এ মূর্ধন্য ষ 'ক্ষিয়ো'। কিন্তু তাতে না থাকে ক, না থাকে মূর্ধন্য ষ। শব্দের আরম্ভে সে হয় খ ; অন্তে মধ্যে দুটো খ'এ জোড়া ধ্বনি, যেমন 'বক্ষ'। এই ক্ষ'র একটা বিশেষত্ব দেখা যায়, ইকারের পূর্বে সে একার গ্রহণ করে, যেমন : ক্ষেতি ক্ষেমি ক্ষেপি। তা ছাড়া আকার হয় ্যাকার, যেমন 'ক্ষান্ত' হয় 'খ্যান্তো' ; কারও কারও মুখে 'ক্ষমা' হয় 'খ্যামা'।

১৩

আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্র যতই বেড়ে চলেছে ততই দেখতে পাচ্ছি, আমাদের চলতি ভাষার কারখানায় জোড়তোড়ের কৌশলগুলো অত্যন্ত দুর্বল। বিশেষ্যকে বিশেষণ বা ক্রিয়াপদে পরিণত করবার সহজ উপায় আমাদের ভাষায় নেই বললেই হয়। তাই বাংলা ভাষায় আপন রীতিতে নতুন শব্দ বানানো প্রায় অসাধ্য। সংস্কৃত ভাষায় কতকগুলো টুকরো শব্দ আছে যেগুলোর স্বতন্ত্র কাজ নেই, তারা বাক্যের লাইন বদলিয়ে দেয়। রেলের রাস্তায় যেমন সিগ্‌ন্যাল, ভিন্ন দিকে ভিন্ন রঙের আলোয় তাদের ভিন্ন রকমের সংকেত, সংস্কৃত ব্যাকরণের উপসর্গগুলো শব্দের মাথায় চড়া সেইরকম সিগ্‌ন্যাল। কোনোটাতে আছে নিষেধ, কোনোটা দেখায় এগোবার পথ, কোনোটা বাইরের পথ, কোনোটা নীচের দিকে, কোনোটা উপরের দিকে, কোনোটা চার দিকে, কোনোটা ডাকে ফিরে আসতে। 'গত' শব্দে আ উপসর্গ জুড়ে দিলে হয় 'আগত', সেটা লক্ষ্য করায় কাছের দিক ; নির্ জুড়ে দিলে হয় 'নির্গত', দেখিয়ে দেয় বাইরের দিক ; অনু জুড়ে দিলে হয় 'অনুগত', দেখিয়ে দেয় পিছনের দিক ; তেমনি 'সংগত' 'দুর্গত' 'অপগত' প্রভৃতি শব্দে নানা দিকে তর্জনী চালানো। উপসর্গ থাকে সামনে, প্রত্যয় থাকে পিছনে। তারা আছে একই শব্দের নানা অর্থ বানাবার কাজে। নতুন শব্দ তৈরি করবার বেলায় তাদের নইলে চলে না।

শব্দগড়নের কাজে বাংলাতেও কতকগুলো প্রত্যয় পাওয়া যায়। তার একটার দৃষ্টান্ত অন, যার থেকে হয়েছে : চলন বলন গড়ন ভাঙন। এরই সহকারী আ প্রত্যয়, যার থেকে পাওয়া যায় বিশেষ্য পদে : চলা বলা গড়া ভাঙা। এই প্রত্যয়টা বাংলায় সবচেয়ে সাধারণ, প্রায় সব ক্রিয়াতেই এদের জোড়া যায়। এই আ প্রত্যয়

বিশেষণেও লাগে, যেমন : ঠেলা গাড়ি, ভাঙা রাস্তা। কিন্তু তি দিয়ে একটা প্রত্যয় আছে যেটা বিশেষভাবে বিশেষণেরই, যেমন : চলতি গাড়ি, কাটতি মাল, ঘাটতি ওজন। মুশকিল এই যে, সব জায়গাতেই কাজে লাগাতে পারি নে, কেন পারি নে তারও স্পষ্ট কৈফিয়ত পাওয়া যায় না। 'গড়তি টেবিল' কিংবা 'কথা-কইতি খোকা' বলতে মুখে বাধে, এর কোনো সংগত কারণ ছিল না। কাজ চালাবার জন্যে অন্য কোনো প্রত্যয় খুঁজতে হয়, সব সময়ে খুঁজে পাওয়া যায় না। যে টেবিল গড়া চলছে তাকে সংস্কৃতে বোধ হয় 'সংঘটমান' বলা চলে, কিন্তু বাংলায় কিছু হাৎড়ে পাই নে। যে খোকা কথা কয় ইএ প্রত্যয়ের সাহায্যে তাকে 'কথা-কইয়ে' বলা যেতে পারে। অথচ ঐ প্রত্যয় দিয়ে 'হাসিয়ে' 'কাঁদিয়ে' বলা নিষিদ্ধ। কাঁদার বেলায় আর-এক প্রত্যয় খুঁজে পাওয়া যায় উনে, বলি 'কাঁদুনে'। কিন্তু 'হাসুনে' বললে হাসির উদ্রেক হবে। অথচ 'নাচুনে' চলতে পারে। 'দৌড়ুনে' কথার দরকার আছে কিন্তু বলা হয় না, কেউ যদি সাহস ক'রে বলে খুশি হব। 'দ্রুতধাবনশীল ঘোড়া'র চেয়ে 'জোরে-দৌড়ুনে ঘোড়া' কানে ভালোই শোনায়। এই শব্দগুলোর প্রত্যয়টাকে ঠিক উনে বলা চলবে না; 'নাচুনে' শব্দের গোড়া হচ্ছে : নাচন+ইয়া=নাচনিয়া। বাংলা ভাষার প্রকৃতি ই এবং আ'কে উ এবং এ করে দিয়েছে, হয়ে উঠেছে 'নাচুনে'। এই কথাটা মনে ক'রে কৌতুক লাগে যে, দুটো অসদৃশ স্বরবর্ণকে ঠেলে দিয়ে কোথা থেকে উ এবং এ যায় জুটে।

সংস্কৃতে প্রত্যয় নিয়ম মেনে চলে, বাংলায় প্রায়ই ফাঁকি দেয়। বেসুর-বিশিষ্টকে বলি 'বেসুরা' (চলতি উচ্চারণ 'বেসুরো'); সুর-বিশিষ্টকে বলি নে 'সুরা' বা 'সুরো', আর কী বলি তাও তো ভেবে পাই নে। 'সুরেলা গলা' হয়তো বলে থাকি জানি নে, অন্তত বলতে দোষ নেই। বালি-বিশিষ্টকে বলি 'বালিয়া', অপভ্রংশে 'বেলে'; কিন্তু চিনি-বিশিষ্টকে বলব না 'চিনিয়া' বা 'চিনে', চিনদেশজ বাদামকে 'চিনে বাদাম' বলতে আপত্তি করি নে।

অনা প্রত্যয়-যোগে হয় 'পাও' থেকে 'পাওনা', 'গাও' থেকে 'গাওনা'। কিন্তু 'ধাও' থেকে 'ধাওনা' হয় না। অন্য প্রত্যয় যোগে হতে পারে 'ধাওয়াই'। 'কূট' থেকে 'কোটনা'; 'ফুট' থেকে 'ফুটকি' হয়, 'ফোটনা' হয় না। 'বাঁটা' থেকে 'বাঁটনা' হয়; 'ছাঁটা' থেকে 'ছাঁটাই' হবে, 'ছাঁটনা' হবে না।

সংস্কৃতে মৎ প্রত্যয় কোথাও 'মান' কোথাও 'বান' হয়, কিন্তু তার নিয়ম পাকা। সেই নিয়ম মেনে যেখানে দরকার 'মান' বা 'বান' লাগিয়ে দেওয়া যায়। সংস্কৃতে 'শক্তিমান' বলব, 'ধনবান' বলব; বাংলায় একটাকে বলব 'জোয়ালো' আর-একটাকে

'টাকাওয়ালা'। অন্য ভাষাতেও ভাষার খেয়াল ক্ষণে ক্ষণে দেখা দেয়, কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি কম। যেমন ইংরেজিতে আছে: হেল্‌থি ওয়েল্‌থি প্রাকি লাকি ওয়েটি স্টিকি মিস্টি ফগি। কিন্তু 'কারেজি' নয়, 'কারেজিয়স'। তবু একটা নিয়ম পাওয়া যায়। এক সিলেব্‌ল্‌'এর হালকা কথায় প্রায় সর্বত্রই বিশিষ্ট অর্থে y লাগে, বড়ো মাত্রার কথায় এই প্রত্যয় খাটে না।

পূর্বেই বলেছি বাংলা ভাষাতেও প্রত্যয় আছে, কিন্তু তাদের প্রয়োগ সংকীর্ণ, আর তাদের নিয়ম ও ব্যতিক্রমে পাল্লা চলেছে, কে হারে কে জেতে।

সংস্কৃতে আছে ত প্রত্যয়-যুক্ত 'বিকশিত পুষ্প', বাংলায় 'ফোটা ফুল'। বুক-ফাটা কান্না, চুল-চেরা তর্ক, মন-মাতানো গান, নুয়ে-পড়া ডাল, কুলি-খাটানো ব্যাবসা: এই দৃষ্টান্তগুলোতে পাওয়া যায় আ প্রত্যয়, আনো প্রত্যয়। কাজ চলে, কিন্তু এর চেয়ে আর-একটু জটিল হলে মুশকিল বাধে। 'অচিন্তিতপূর্ব ঘটনা' খাস বাংলায় সহজে বলবার জো নেই।

কিন্তু এ কথাও জেনে রাখা ভালো, খাস বাংলায় এমন-সব বলবার ভঙ্গী আছে যা আর কোথাও পাওয়া যায় না। শব্দকে দ্বিগুণ করবার একটা কৌশল কথ্য বাংলায় চলতি, কোনো অর্থবান শব্দে তার ইশারা দেওয়া যায় না। মাঠ ধূধূ করছে, রৌদ্র করছে ঝাঁঝাঁ: মানেওয়ালা কথায় এর ব্যাখ্যা অসম্ভব। তার কারণ, অর্থের চেয়ে ধ্বনি সহজে মনে প্রবেশ করে: উস্‌খুস্‌ নিস্‌পিস্‌ ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ কাচুমাচু শব্দের ধরাবাঁধা অর্থ নেই। তাদের কাছ থেকে যেন উপরিপাওনা আদায় হয়, তাতে ব্যাকরণী টাঁকশালের ছাপ নেই।

বাংলায় আর-একরকম শব্দদ্বৈত আছে তাদের মধ্যে অর্থের আভাস পাই, কিন্তু তারা যতটা বলে তার চেয়ে আঙুল দেখিয়ে দেয় বেশি। সংস্কৃতে আছে 'পতনোন্মুখ', বাংলায় বলে 'পড়ো-পড়ো'। সংস্কৃতে যা 'আসন্ন' বাংলায় তা 'হব-হব'। সেইরকম: গেল-গেল যায়-যায়। সংস্কৃতে যা 'বাষ্পাকুল' বাংলায় তা 'কাঁদো-কাঁদো'। সংস্কৃতে বলে 'অবরুদ্ধস্বরে', বাংলায় বলে 'বাধো-বাধো গলায়'। বাংলায় ঐ কথাগুলোতে কেবল যে একটা ভাব পাওয়া যায় তা নয়, যেন ছবি পাই। একটা শ্লোক বলা যাক—

যাব-যাব করে, চরণ না সরে,
ফিরে-ফিরে চায় পিছে,
পড়ো-পড়ো জলে ভরো-ভরো চোখ
শুধু চেয়ে থাকে নীচে।

ঠিক এরকম একটুকরো রেখালেখ্য এই বাধো-বাধো ভাষাতেই বানানো চলে।

বাংলায় বর্ণনার ছবিকে স্পষ্ট করবার জন্যেই এই-যে অস্পষ্ট ভাষার কায়দা, এর কথা বাংলা শব্দতত্ত্ব গ্রন্থে ধ্বন্যাত্মক শব্দের আলোচনায় আরও বিস্তারিত করে বলেছি।[১]

বাংলায় কোনো কোনো প্রত্যয় অর্থগত ব্যবহার অতিক্রম ক'রে এইরকম ইঙ্গিতের দিকে পৌঁচেছে, তার উল্লেখ করা যাক: কিপ্‌টেমো ছিব্‌লেমো ছেলেমো জ্যাঠামো ঠ্যাটামো ফাজ্‌লেমো বিট্‌লেমো পেজোমো হ্যাংলামো বোকামো বাঁদ্‌রামো গোঁড়ামো মাংলামো গুণ্ডামো।

সংস্কৃতের কোন্ প্রত্যয়ের সঙ্গে এর তুলনা করব? ত্ব প্রত্যয় দিয়ে 'কিপ্‌টেমো'কে 'কিপ্‌টেত্ব' বলা যেতে পারে। কিন্তু ত্ব প্রত্যয় নির্বিকার, ভালো-মন্দ প্রিয়-অপ্রিয় জড়-অজড়ে ভেদ করে না। অথচ উপরের ফর্দটা দেখলেই বোঝা যাবে, শব্দগুলো একেবারেই ভদ্রজাতের নয়। গাল-বর্ষণের জন্যেই যেন পাঁকের পিণ্ড জমা করা হয়েছে। ঐ মো বা আমো প্রত্যয়ের যোগে 'বাঁদ্‌রামো' বলি, কিন্তু 'সিংহমো' বলি নে। 'কিপ্‌টেমো' হল, 'দাতামো' হল না। 'পেজোমো' বলা চলে অনায়াসে, কিন্তু 'সেধোমো' (সাধুত্ব) বলতে বাধে। একটা প্রত্যয় দিয়ে বিশেষ ক'রে মনের ঝাল মেটাবার উপায় বোধ করি আর-কোনো ভাষাতেই নেই।

আর-একটা প্রত্যয় দেখো, পনা: বুড়োপনা ন্যাকাপনা ছিব্‌লেপনা আদুরেপনা গিন্নিপনা। সবগুলোর মধ্যেই কটাক্ষপাত। ব্যাকরণের প্রত্যয়ের যেরকম ভেদনির্বিচার হওয়া উচিত, এ একেবারেই তা নয়। চণ্ডীমণ্ডপে বসে বিরুদ্ধ দলকে খোঁচা দেবার জন্যেই এগুলো যেন বিশেষ করে শান-দেওয়া।

আনা প্রত্যয়টা দেখো: বাবুআনা বিবিআনা সাহেবিআনা নবাবিআনা মুরুব্বি-আনা গরিবিআনা। বলা বাহুল্য, এর ভাবখানা একেবারেই ভালো নয়। ঐ যে 'গরিবিআনা' শব্দটা বলা হয়েছে, ওর মধ্যেও কপট অহংকারের ভাণ আছে। যদি বলা যায় 'সাধুআনা' তা হলে বুঝতে হবে সেটা সত্যিকার সাধুত্ব নয়।

এই জাতের আর-একটা প্রত্যয় আছে, গিরি। তার সঙ্গে প্রায় 'ফলাতে' কথার যোগ হয়: বাবুগিরি গুরুগিরি সাধুগিরি দাতাগিরি। এতে ভাণ করা, মিথ্যে অহংকার করা বোঝায়।

আরও একটা প্রত্যয় দেখা যাক, অনি বা আনি: বকুনি ধমকানি ছিঁচ্‌কাঁদুনি শাসানি হাঁপানি নাকানি-চোবানি জ্বলুনি কাঁপুনি মুখ-ঝাঁকানি খ্যাঁকানি লোক-হাসানি ফোঁপানি গ্যাঙানি ভ্যাঙানি ঘ্যাঙানি খিঁচুনি ছটফটানি কুটকুটুনি ফোসফোঁসানি। এর সবগুলিই গাল-দেওয়া শব্দ নয়, কিন্তু অপ্রিয়। হাসিটা তো ভালো জিনিস, কিন্তু, আনি

১ দ্বাদশখণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলীর ৬৭৪ পৃ

প্রত্যয় দিয়ে হল 'লোকহাসানি', হাসির গুণটা গেল বিগড়িয়ে। ছাঁকুনি নিড়ুনি বিনুনি চাটনি শব্দ বস্তুবাচক, সেইজন্যে তাদের মধ্যে নিন্দার ঝাঁজ প্রবেশ করতে পারে নি।

ইআ [বিকারে 'এ'] প্রত্যয়টা যখন বস্তুসূচক না হয়ে ভাবসূচক হয়, তখন তার ইঙ্গিতে কোথাও সুখের বা শ্রদ্ধার আভাস পাব না। যেমন: নড়্‌বড়ে নিড়্‌বিড়ে খিট্‌খিটে কট্‌মটে টন্‌টনে কন্‌কনে মিন্‌মিনে প্যান্‌পেনে ঘ্যান্‌ঘেনে ভ্যাজ্‌ভেজে ভ্যাদ্‌ভেদে ম্যাজ্‌মেজে ম্যাড়্‌মেড়ে জব্‌জবে খস্‌খসে জ্যাল্‌জেলে। সামান্য কয়েকটা ব্যতিক্রম আছে, 'জল্‌জলে' 'টুক্‌টুকে'; সংখ্যা বেশি নয়।

এবার দেখা যাক উআ'র বিকারে 'ও' প্রত্যয়: মেয়ো মেতো জোরো হুলো টেকো ক্ষেপো শুঁফো কুনো বুনো পেঁকো, কোতো (বাবু), রোখো খেলো ভেতো, খেগো (পোকায়)। এগুলোও সুবিধের নয়; হয় তুচ্ছ নয় পীড়াকর। ভাত যে খায় সে নিন্দনীয় নয়, কিন্তু কাউকে যদি বলি 'ভেতো' তবে তাকে সম্মান করা হয় না। জীবমাত্রই খাদ্যপদার্থ ব্যবহার করে, সেটা দোষের নয়; কিন্তু কোনো-একটা খাদ্যের সম্পর্কে কাউকে যদি বলা হয় 'খেগো' তা হলে বুঝতে হবে সেই খাদ্য সম্বন্ধে অবজ্ঞার কারণ আছে। যথাস্থানে যথাপরিমাণে জল উপাদেয়, কিন্তু যাকে বলি 'জোলো' তার মূল্য বা স্বাদের সম্বন্ধে অপবাদ দেওয়া হয়।

মন্দত্ব বোঝাতে সংস্কৃতে দুঃ ব'লে একটা উপসর্গ আছে, কু'ও যোগ করা যায়। কিন্তু বাংলায় এই প্রত্যয়গুলোতে যে কুৎসাবিশিষ্ট অবমাননা আছে অন্য কোনো ভাষায় বোধ হয় তা পাওয়া যায় না।

এবার স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয়ের আলোচনা ক'রে প্রত্যয়ের পালা শেষ করা যাক।

খাপছাড়াভাবে সংস্কৃতের অনুসরণে নী ও ঈ প্রত্যয়ের যোগে স্ত্রীলিঙ্গ বোঝাবার রীতি বাংলায় আছে, কিন্তু তাকে নিয়ম বলা চলে না। সংস্কৃত ব্যাকরণকেও মেনে চলবার অভ্যেস তার নেই। সংস্কৃতে ব্যাঘ্রের স্ত্রী 'ব্যাঘ্রী', বাংলায় সে 'বাঘিনী'। সংস্কৃতে 'সিংহী'ই স্ত্রীজাতীয় সিংহ, বাংলায় সে 'সিংহিনী'। আকারযুক্ত স্ত্রীবাচক শব্দ সংস্কৃত থেকে বাংলা ধার নিয়েছে, যেমন 'লতা'; কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গে আ প্রত্যয় বাংলায় নেই। সংস্কৃতে আছে জানি, এত বেশি জানি যে, আকারান্ত শব্দ দেখবামাত্র তাকে নারীশ্রেণীয় বলে সন্দেহ করি। বাংলাদেশের মেয়েদের 'সবিতা' নাম দেখে প্রায়ই আশঙ্কা হয় 'পিতা'কে পাছে কেউ এই নিয়মে মাতা ব'লে গণ্য করে। মেয়েদের নামে 'চন্দ্রমা' শব্দেরও ব্যবহার দেখেছি, আর মনে পড়ছে কোনো দুর্যোগে ভগবান চন্দ্রমা স্ত্রীছদ্মবেশে বাঙালির ঘরেও দেখা দিয়েছেন, বাঙালির কাব্যেও অবতীর্ণ হয়েছেন।

এ দিকে 'নীলিমা' 'তনিমা' প্রভৃতি পুংলিঙ্গ শব্দ আকারের টানে মেয়েদের নামের সঙ্গে এক মালায় গাঁথা পড়ে। 'নিভা' নামক একটা ছিন্নমুণ্ড শব্দ 'শরচ্চন্দ্রনিভাননা' থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যুক্ত হয়েছে বাঙালি মেয়েদের নামমালায় আকারের টিকিট দেখিয়ে।

স্ত্রীলিঙ্গের কোনো একটি বা একাধিক প্রত্যয় যদি নির্বিশেষে বা বাঁধা নিয়মে ভাষায় খাটত তা হলে একটা শৃঙ্খলা থাকত, কিন্তু সে সুযোগ ঘটে নি। বাংলায় 'উট' হয়তো 'উটী', কিন্তু 'মোষ' হয় না 'মোষী', এমন-কি 'মোষিনী'ও না— কী হয় বলতে পারি নে, বোধ করি 'মাদী মোষ'। 'হাতি' সম্বন্ধেও ঐ এক কথা, 'নাতনী' বলি কিন্তু 'হাতিনী' বলি নে। উট-হাতির চেয়ে কুকুর-বিড়াল পরিচিত জীব, 'কুকুরী' 'বিড়ালী' বললেই চলত, কিংবা 'কুকুরনী' 'বিড়ালনী'। বলা হয় না। মানুষ সম্বন্ধেও কেমন একটা ইতস্তত আছে— 'খোট্টানি' 'উড়েনি' ব'লে থাকি, কিন্তু 'পাঞ্জাবিনী' 'শিখিনী' 'মগিনী' বলি নে; 'মাদ্রাজিনী'ও তদ্রূপ; 'বাঙালিনী' বলি নে, 'কাঙালিনী' বলে থাকি।

আত্মীয়তা সম্বন্ধের নামগুলিতে স্ত্রী প্রত্যয়ের ছাপ আছে: দিদি মাসি পিসি শ্যালী শাশুড়ি ভাইঝি বোনঝি। 'ননদ' শব্দে ইনী যোগ না করলেও তার প্রভাব সম্পূর্ণ থেকে যায়। জা শ্যালাজ প্রভৃতি শব্দে দীর্ঘ ঈকারের সমাগম নেই।

জাতঘটিত ব্যাবসাঘটিত নামে নী ইনী যথেষ্ট চলে: বামনী কায়েতনী। অন্ত্য জাত সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। 'বদ্দিনী' কখনো শুনি নি। 'বাগ্‌দিনী' চলে, 'ডোমনী' 'হাড়িনী'ও শুনেছি, 'সাঁওতালনী' বললে খটকা লাগে না। পুরুতনী ধোবানী নাপতিনী কামারনী কুমোরনী তাঁতিনী: সর্বদাই ব্যবহার হয়। অথচ শেলাই ব্যাবসা ধরলেও মেয়েরা 'দর্জিনী' উপাধি পাবে কি না সন্দেহ। যা হোক মোটের উপর বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গে নী ইনী প্রত্যয়টারই চল বেশি।

একটা বিষয়ে বাংলাকে বাহাদুরি দিতে হবে। য়ুরোপীয় অনেক ভাষায়, তা ছাড়া হিন্দি হিন্দুস্থানি গুজরাটি মারাঠিতে, কাল্পনিক খেয়ালে বা স্বরবর্ণের বিশেষত্ব নিয়ে লিঙ্গভেদপ্রথা চলেছে। ভাষার এই অসংগত ব্যবহার বিদেশীদের পক্ষে বিষম সংকটের। বাংলা এ সম্বন্ধে বাস্তবকে মানে। বাংলায় কোনোদিন ঘুড়ি উড্ডীয়মানা হবে না, কিংবা বিজ্ঞাপনে নির্মলা চিনির পাকে সুমধুরা রসগোল্লার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করবে না। কিংবা শুশ্রূষার কাজে দারুণা মাথাধরায় বরফশীতলা জলপটির প্রয়োগ-সম্ভাবনা নেই।

এইখানে একটা কথা জানিয়ে রাখি। সংস্কৃত ভাষার নিয়মে বাংলার স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয়ে এবং অন্যত্র দীর্ঘ ঈকার বা ন'এ দীর্ঘ ঈকার মানবার যোগ্য নয়। খাঁটি

বাংলাকে বাংলা বলেই স্বীকার করতে যেন লজ্জা না করি, প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা যেমন আপন সত্য পরিচয় দিতে লজ্জা করে নি। অভ্যাসের দোষে সম্পূর্ণ পারব না, কিন্তু লিঙ্গভেদসূচক প্রত্যয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণ কতকটা স্বীকার করায় দ্বারা তার ব্যভিচারটাকেই পদে পদে ঘোষণা করা হয়। তার চেয়ে ব্যাকরণের এই-সকল স্বেচ্ছাচার বাংলা ভাষারই প্রকৃতিগত এই কথাটা স্বীকার করে নিয়ে যেখানে পারি সেখানে খাঁটি বাংলা উচ্চারণের একমাত্র হ্রস্ব ইকারকে মানব। 'ইংরেজি' বা 'মুসলমানি' শব্দে যে ই-প্রত্যয় আছে সেটা যে সংস্কৃত নয়, তা জানাবার জন্যই অসংকোচ হ্রস্ব ইকার ব্যবহার করা উচিত। ওটাকে ইন্‌-ভাগান্ত গণ্য করলে কোন্‌ দিন কোনো পণ্ডিতাভিমানী লেখক 'মুসলমানিনী' কায়দা বা 'ইংরেজিনী' রাষ্ট্রনীতি বলতে গৌরব বোধ করবেন এমন আশঙ্কা থেকে যায়।

১৪

বাংলা বিশেষ্যপদে বহুবচনের প্রভাব অল্পই। অধিকাংশ স্থলেই 'সব' 'গুলি' 'সকল' প্রভৃতি শব্দ জোড়া দিয়ে কাজ চালানো হয়। এ ভাষায় সর্বনাম শব্দে বহুবচনের বিভক্তি যতটা চলে অন্যত্র ততটা নয়। বহুবচনে 'মানুষরা' ব'লে থাকি অথচ 'ঘোড়ারা' বলতে কানে ঠেকে, অথচ 'ঘোড়াদের' বলা চলে। মোটের উপর এ কথা খাটে যে সচেতন জীবদের নিয়ে বহুবচনে রা এবং সম্বন্ধে ও কর্মকারকে দের চিহ্ন ব্যবহার হয়ে থাকে। 'মোষেরা খুব বলবান জীব' বা 'ময়ূরদের পুচ্ছ লম্বা' এটা নিয়মবিরুদ্ধ নয়। এই রা চিহ্ন সাধারণ বিশেষ্যে লাগে। বিশেষ বিশেষ্যে ওর প্রয়োগ কানে বাধে। বলতে পারি 'ঐ মোষরা পাঁকে ডুবে আছে', কিন্তু 'ঐ মোষগুলো পাঁকে ডুবে আছে' বললেই মানানসই হয়। 'মোষরা' বললে মোষজাতিকে মনে আসে, 'মোষগুলো' বললে মনে আসে বিশেষ মোষের দল।

'মানুষরা নিষ্ঠুরভাবে পশুকে হার মানালো' ঠিক শোনায়, এও ঠিক শোনায়: কুলিগুলো নির্দয়ভাবে গাড়িতে বোঝা চাপিয়েছে। কিন্তু 'মানুষগুলো পশুকে হার মানায়' অশুদ্ধ। সাধারণ বিশেষ্যে রা চলে, কিন্তু বিশেষ বিশেষ্যে গুলো। 'মানুষরা ওখানে জটলা করছে' বললে মনে হয় যেন জানানো হচ্ছে অন্য কোনো জীব করে নি। এখানে 'মানুষগুলো' বললেই সংশয় থাকে না।

'টেবিলরা' 'চৌকিরা' নিষিদ্ধ। জড়পদার্থের 'গুলো' ছাড়া গতি নেই। আর-একটা শব্দ আছে, কথার পূর্বে বসে সমষ্টি বোঝায়, যেমন 'সব': সব চৌকি, সব জন্তু, সব মানুষ। কিন্তু এখানে এই শব্দ কেবলমাত্র বহুবচন বোঝায় না, সঙ্গে সঙ্গে

একটা ঝোঁক দেয়। সব চৌকি সরিয়ে দাও, অর্থাৎ একটাও বাকি রেখো না। সব ভিখিরিই বাঙালি, অর্থাৎ নির্বিশেষে বাঙালি। 'সব' প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে 'গুলো' প্রয়োগটা যোগ দিতে চায়, যেমন : সব চৌকিগুলোই ভাঙা, সব ভিখিরিগুলোই চেঁচাচ্ছে। এখানে 'সব' বোঝাচ্ছে একান্ততা, আর 'গুলো' বোঝাচ্ছে বহুবচন। বহুবচনে এক সময়ে 'সব' ব্যবহৃত হত। কবিতায় এখনো দেখা যায়, যেমন : পাখিসব তোমাসব ইত্যাদি। আমরা বলি : কাফ্রিরা সব কালো। বহুবচনের রা বিভক্তির সঙ্গে জোড়া লাগে 'সব' শব্দ : এরা সব গেল কোথায়। শুধু 'এরা গেল কোথায়' বললেই চলে, কিন্তু 'সব' শব্দের দ্বারা সমষ্টির উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এই 'সব' শব্দ একবচনকে বহুবচন করে না, বহুবচনকে সুনির্দিষ্ট করে। 'সবাই' শব্দে আরও বেশি জোর লাগে : এরা যে সবাই চলে গেছে, কিংবা, চৌধুরীদের সবাইকেই নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। 'সব' শব্দের সমার্থক হচ্ছে 'সকল' : এরা সকলেই চ'লে গেছে, কিংবা, চৌধুরীদের সকলকেই নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। কিন্তু 'সকল' শব্দের প্রয়োগ 'সব' শব্দের চেয়ে সংকীর্ণ।

এই প্রসঙ্গে আমাদের ভাষার একটা বিশেষ ভঙ্গীর কথা বলি। 'সব' শব্দের অর্থে কোনো দূষণীয়তা নেই, 'যত' সর্বনাম শব্দটাও নিরীহ। কিন্তু দুটোকে এক করলে সেই জুড়িশব্দটা হয়ে ওঠে নিন্দার বাহন। 'মূর্খ' 'কুঁড়ে' কিংবা 'লক্ষ্মীছাড়া' প্রভৃতি কটুস্বাদ বিশেষণ ঐ 'যত সব' শব্দটাকে বাহন ক'রে ভাষায় যেন মুখ সিট্‌কোতে আসে, যথা : যত সব বাঁদর, কিংবা কুঁড়ে, কিংবা লক্ষ্মীছাড়া। এখানে বলা উচিত ঐ 'যত' শব্দটার মধ্যেই আছে বিষ। 'যত বাঁদর এক জায়গায় জুটেছে' বললেই যথেষ্ট অকথ্য বলা হয়। লক্ষ্য করবার বিষয়টা এই যে, 'যত' শব্দটা একটা অসম্পূর্ণ সর্বনাম, 'তত' দিয়ে তবে এর সম্পূর্ণতা। 'তত' বাদ দিলে 'যত' হয়ে পড়ে বেকার, লেগে যায় অনর্থক গালমন্দর কাজে।

বাংলা ভাষায় সর্বনামের খুব ঘটা। নানা শ্রেণীর সর্বনাম, যথা ব্যক্তিবাচক, স্থানবাচক, কালবাচক, পরিমাণবাচক, তুলনাবাচক, প্রশ্নবাচক।

'মুই' এক কালে উত্তমপুরুষ সর্বনামের সাধারণ ব্যবহারে প্রচলিত ছিল, প্রাচীন কাব্যগ্রন্থে তা দেখতে পাই। 'আমহি' ক্রমশ 'আমি' রূপ ধরে ওকে করলে কোণঠেসা, ও রইল গ্রাম্য ভাষার আড়ালে। সেকালের সাহিত্যে ওকে দেখা গেছে দীনতাপ্রকাশের কাজে, যেমন : মুঞি অতি অভাগিনী।

নিজের প্রতি অবজ্ঞা স্বাভাবিক নয় তাই ওকে সংকোচে সরে দাঁড়াতে হল। কিন্তু মধ্যমপুরুষের বেলায় যথাস্থানে কুণ্ঠার কোনো কারণ নেই, তাই 'তুই' শব্দে বাধা ঘটে নি,

নীচের বেঞ্চিতে ও রয়ে গেল। 'তুহিঁ' 'তুমি'-রূপে ভর্তি হয়েছে উপরের কোঠায়। এরও গৌরবার্থ অনেকখানি ক্ষয়ে গেল, বোধকরি নির্বিচার সৌজন্যের আতিশয্যে। তাই উপরওয়ালাদের জন্যে আরও একটা শব্দের আমদানি করতে হয়েছে, 'আপহিঁ' থেকে 'আপনি'। আইনমতে মধ্যমপুরুষের আসন ওর নয়, ওর অনুবর্তী ক্রিয়াপদের রূপ দেখলেই তার প্রমাণ হয়। 'তুমি'র বেলায় 'আছ'; 'আপনি'র বেলায় 'আছেন', এই শব্দটি যদি খাঁটি মধ্যমপুরুষ-জাতীয় হত তা হলে ওর অনুচর ক্রিয়াপদ হতে পারত 'আপনি আছ' কিংবা 'আছঁ'।

'আপনি' শব্দের মূল হচ্ছে সংস্কৃত 'আত্মন্'। বাংলায় প্রথমপুরুষেও 'স্বয়ং' অর্থে এর ব্যবহার আছে, যেমন: সে আপনিই আপনার প্রভু। আত্মীয়কে বলা হয় 'আপন লোক'। হিন্দিতে সম্মানসূচক অর্থে প্রথমপুরুষ মধ্যমপুরুষ উভয়তই 'আপ' ব্যবহৃত হয়।

বাংলা ভাষায় উত্তমপুরুষে 'আম'-প্রত্যয়যুক্ত ক্রিয়াপদের ব্যবহার চলে, সে সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। তার তিনরকম রূপ প্রচলিত: করলাম, করলুম, করলেম। 'করলাম' নদিয়া হতে শুরু করে বাংলার পূর্বে ও উত্তরে চলে থাকে। এর প্রাচীন রূপ দেখেছি: আইলাঙ কইলাঙ। আমরা দক্ষিণী বাঙালি, আমাদের অভ্যস্ত 'করলুম' ও 'করলেম'। উত্তমপুরুষের ক্রিয়াপদে সানুনাসিক উকার পশ্চিমে এখনো চলে, যেমন: হেরিনু করিনু। কলকাতার অপভাষায় 'করনু' 'খেনু' ব্যবহার শোনা যায়। ক্রিয়াপদে এই সানুনাসিক উ প্রাচীন সাহিত্যে যথেষ্ট পাই: কেন গেলুঁ কালিন্দীর কূলে, দুকূলে দিলুঁ দুখ, মলুঁ মলুঁ সই। 'করলেম' শব্দের আলোচনা পরে করা যাবে। কৃত্তিবাসের পুরাতন রামায়ণে দেখেছি 'রাখিলোম প্রাণ'। তেমনি পাওয়া যায় 'তুমি'র জায়গায় 'তোমি'। বাংলা ভাষায় উকারে ওকারে দেনাপাওনা চলে এ তার প্রমাণ।

প্রথমপুরুষের মহলে আছে 'সে' আর 'তিনি'। রামমোহন রায়ের সময়ে দেখা যায় 'তিনি' শব্দের সাধুভাষার প্রয়োগ 'তেঁহ'। মেয়েদের মুখে 'তেনার' 'তেনবা' আজও শোনা যায়, ওটা 'তেঁহ' শব্দের কাছাকাছি। প্রাচীন রামায়ণে 'তাঁর' 'তাঁহার' শব্দ নেই বললেই হয়, তার বদলে আছে 'তান' 'তাহান'। ন'কারের অনুনাসিকটা বহুবচনের রূপ। তাই সম্মানের চন্দ্রবিন্দুতিলকধারী বহুবচনরূপী 'তেঁহ' ও 'তিঁহো' (পুরাতন সাহিত্যে) হয়েছে 'তিনি'। গৌরবে তার রূপ বহুবচনের বটে, কিন্তু ব্যবহার একবচনের। তাই পুনর্বার বহুবচনের আবশ্যকে রা বিভক্তি জুড়ে 'তাঁহা' শব্দের রাস্তা দিয়ে 'তাঁহারা' শব্দ সাজানো হয়ে থাকে। সেই সঙ্গে যে ক্রিয়াপদটি তার দখলে তাতে আছে প্রাচীন ন'কারান্ত বহুবচনরূপ, যেমন 'আছেন'। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে পরবর্তী

বাংলা ভাষায় ক্রিয়াপদে বহুবচনের চিহ্ন থাকলেও তার অর্থ হয়েছে লোপ। সংস্কৃতে বহুবচনে 'পতন্তি' শব্দ আছে প্রথমপুরুষের পতন বোঝাতে। বাংলায় সেই অন্তি'র ন রয়েছে 'পড়েন' শব্দে, কিন্তু এ ভাষায় 'তিনি'ও পড়েন 'তাঁরা'ও পড়েন। এই ন'কার-ধারী ক্রিয়াপদ কেবল 'আপনি' আর 'আপনারা', 'তিনি' ও 'তাঁরা', এঁদের সম্মান রক্ষার কাজেই নিযুক্ত। প্রাচীন রামায়ণে এইরূপ স্থানে প্রায় সর্বত্রই দেখা যায় 'পড়েন্ত' 'দেখিলেন্ত' প্রভৃতি ন্ত-বিশিষ্ট ক্রিয়াপদ একবচনে এবং বহুবচনে, প্রথমপুরুষে।

সদ্যঅতীত কালের প্রথমপুরুষ ক্রিয়াপদে বিকল্পে ইল এবং ইলে প্রয়োগ হয়, যেমন : সে ফল পাড়ল, সে ফল পাড়লে। এই একার প্রয়োগ প্রাচীন পদাবলীতে দৈবাৎ দেখেছি, যথা : বিঁধিলে বাণ। কিন্তু অনেক দেখা গেছে ময়নামতীর গানে, যেমন : বিকল দেখি হাড়িপা রহিলে। এ সম্বন্ধে একটা সাধারণ নিয়ম এই যে, অচেতনবাচক শব্দের ক্রিয়াপদে 'এ' লাগে না। অসমাপিকাতে লাগে, যেমন : পা ফুললে ডাক্তার ডেকো। 'তার পা ফুলল' হয়, 'পা ফুললে' হয় না। নির্বস্তুক শব্দ সম্বন্ধেও সেই কথা : তাঁর কলকাতায় যাওয়া ঘটল না। 'ঘটলে না' হতে পারে না। এ ছাড়া নিম্নলিখিত কয়েকটি ক্রিয়াপদে 'এ' খাটে না : এল গেল হল, প'ল (পড়ল), ম'ল (মরল)। দুই অক্ষরের ক্রিয়াপদমাত্রে এই ব্যতিক্রম হয় এমন যেন মনে করা না হয়। তার প্রমাণ : খেল নিল দিল শুল ধুল। ইতে-প্রত্যয়যুক্ত জোড়া ক্রিয়াপদে 'এ' লাগে না, যেমন : করতে থাকল, হাসতে লাগল। কিন্তু ইয়া-প্রত্যয়যুক্ত জোড়া ক্রিয়াপদে লাগে, যেমন : সে হেসে ফেললে। এ ছাড়া আরও দুই-এক জায়গায় কানে সন্দেহ ঠেকে, যেমন 'ভোর বেলায় সে মরলে' বলি নে, 'মরল'ই ঠিক শোনায়। কিন্তু 'তিনি মরলেন' নিত্যব্যবহৃত। 'কলকাতায় সে চললে' বলি নে, কিন্তু 'তিনি চললেন' ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

প্রাচীন রামায়ণে দেখা গেছে প্রথমপুরুষের সদ্যঅতীত ক্রিয়াপদে প্রায় সর্বত্রই ক-প্রত্যয়-সমেত একার, যেমন : দিলেক লইলেক। আবার একারের সম্পর্ক নেই এমন দৃষ্টান্তও অনেক আছে, যেমন : চলিল সত্বর, পাঠাইল ত্বরিত। আধুনিক বাংলায় এইরূপ ক্রিয়াপদে কোথাও 'এ' লাগে কোথাও লাগে না, কিন্তু অন্তস্থিত ক-প্রত্যয়টা খসে গেছে।

প্রথমপুরুষ ইল-প্রত্যয়যুক্ত ক্রিয়াপদে এই-যে একার প্রয়োগ, এরই সঙ্গে সম্ভবত 'করলেম' 'চললেম' শব্দের একার-উচ্চারণের যোগ আছে। করলেন (করিল তিনি), আর, করলেম (করিল আমি) : এক নিয়মে পাশাপাশি বসতে পারে। আরও একটা কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে, সে হচ্ছে স্বরবিকারের নিয়ম। ই'র পর আ থাকলে

জুইয়ে দিলে 'এ' হয় তার অনেক দৃষ্টান্ত মেলে। যেমন 'ঈশান' থেকে 'ঈশেন', 'বিলাত' থেকে 'বিলেত', 'নিশান' থেকে 'নিশেন'।

এক কালে 'মুই' ভদ্র সমাজে ত্যাজ্য ছিল না। প্রাচীন রামায়ণে পাওয়া যায় 'মুঞি নরপতি'। কর্মকারকে 'মোকে', কোথাও বা 'মোখে'। বহুবচনে 'মোরা'। আজ 'মোরা' রয়ে গেছে কাব্যলোকে। কবির কলমে 'আমরা' শব্দের চেয়ে 'মোরা' শব্দের চলন বেশি। প্রাচীন বাংলায় 'আমরা' 'তোমরা'র পরিবর্তে 'আমিসব' 'তুমিসব' শব্দের ব্যবহার প্রায়ই দেখা গেছে।

আমি তুমি আপনি তিনি: ব্যক্তিবাচক সর্বনাম, মানুষ সম্বন্ধেই খাটে। 'সে' কেবলমাত্র মানুষ নয় জন্তু সম্বন্ধেও খাটে, যেমন: কুকুরটাকে মারতেই সে চেঁচিয়ে উঠল। 'সে' থেকে বিশেষণ শব্দ হয়েছে 'সেই'। এর প্রয়োগ সর্বত্রই: সেই মানুষ, সেই গাছ, সেই গোরু। 'এ' থেকে হয়েছে 'এই'। 'এ' বোঝায় কাছের বর্তমান পদার্থকে, 'সে' বোঝায় অবর্তমানকে। সম্মানার্থে 'এ' থেকে হয়েছে 'ইনি'।

বাংলা ভাষার একটা বিশেষত্ব এই যে, সর্বনামে লিঙ্গভেদ নেই। ইংরেজিতে প্রথম পুরুষে he পুংলিঙ্গ, she স্ত্রীলিঙ্গ, it ক্লীবলিঙ্গ। ইংরেজিতে যদি বলতে হয়, সে প'ড়ে গেছে, তবে সেই প্রসঙ্গে he she বা it বলাই চাই। বাংলায় ক্লীবলিঙ্গের নির্দেশ আছে, কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গের নেই। সে এ ও তিনি ইনি উনি: স্ত্রীও হয়, পুরুষও হয়। ক্লীবলিঙ্গে 'সে' 'এ' 'ও' শব্দে নির্দেশক চিহ্ন যোগ করা চাই, যেমন: সেটা ওটা সেখানা ওখানা। বাংলা কাব্যে এই প্রথমপুরুষ সর্বনামে যখন ইচ্ছাপূর্বক লিঙ্গ নির্দেশ করা হয় না তখন তার ইংরেজি তর্জমা অসম্ভব হয়। 'যে' সর্বনাম পদের সঙ্গে কোনো না কোনো বিশেষ্য উহ্য বা ব্যক্ত রূপে থাকেই। 'যে গান গাচ্ছে' বলতে বোঝায়, যে মানুষ। অন্যত্র: যে ঘড়ি চলছে না, যে বাড়ি ভাড়া দেওয়া হয়েছে।

'যেই' শব্দের একটি প্রয়োগ আছে, তাতে 'মুহূর্তে' বা 'ক্ষণে' উহ্য থাকে, যথা: যেই এল অমনি চলে গেল, যেই দেখা সেই আর মুখে কথা নেই। এখানে 'যেই আর সেই' শব্দের পিছনে উহ্য আছে 'ক্ষণে'। অন্যত্র 'যেই' বা 'সেই' শব্দের প্রয়োগে উহ্য থাকে 'মানুষ', যেমন: যেই আসুক সেই মার খাবে। 'যাই' শব্দের সঙ্গে উহ্য থাকে দুটি বিশেষণের দ্বন্দ্ব, যেমন: সে যাই বলুক। অর্থাৎ, এটাই বলুক বা ওটাই বলুক, ভালোই বলুক বা মন্দই বলুক। আর-এক প্রকার প্রয়োগ আছে 'যেই কথা সেই কাজ', অর্থাৎ কাজে কথায় প্রভেদ নেই— এখানে ই প্রত্যয় নিশ্চয়তা অর্থে ঝোঁক দেবার জন্যে।

'যে' অসম্পূর্ণার্থক সর্বনাম বিশেষণ, মানবার্থে তার পূরণ হয় 'ও' এবং 'সে' দিয়ে। অন্য জীব বা বস্তুর সম্বন্ধে যখন তার প্রয়োগ হয় তখন সেই বস্তু বা জীবের নাম তার

সঙ্গে জুড়তে হয়, যেমন : যে পুকুর, যে ঘটি, যে বেড়াল। নির্বস্তুক শব্দেও সেই নিয়ম, যেমন : যে স্নেহ শিশুর অনিষ্ট করে সে স্নেহ নিষ্ঠুরতা।

কখনো কখনো বাক্যকে অসম্পূর্ণ রেখে 'যে' শব্দের ব্যবহার হয়, যেমন : যে তোমার বুদ্ধি। বাকিটুকু উহ্য আছে বলেই এর দংশনের জোর বেশি। বাংলা ভাষায় এইরকম খোঁচা-দেওয়া বাঁকা ভঙ্গীর আরও অনেক দৃষ্টান্ত পরে পাওয়া যাবে।

মানুষ ছাড়া আর কিছুকে কিংবা সমূহকে বোঝাতে গেলে 'যে' ছেড়ে 'যা' ধরতে হবে, যেমন : যা নেই ভারতে (মহাভারতে) তা নেই ভারতে। কিন্তু 'যারা' শব্দ 'যা' শব্দের বহুবচন নয়, 'যে' শব্দেরই বহুবচন, তাই ওর প্রয়োগ মানবার্থে। 'তা' বোঝায় অচেতনকে, কিন্তু 'তারা' বোঝায় মানুষকে। 'সে' শব্দের বহুবচন 'তারা'।

শব্দকে দুনো করে দেবার যে ব্যবহার বাংলায় আছে, 'কে' এবং 'যে' সর্বনাম শব্দে তার দৃষ্টান্ত দেখানো যাক : কে কে এল, যে যে এসেছে। এর পূরণার্থে 'সে সে লোক' না বলে বলা হয় 'তারা' কিংবা 'সেই সেই লোক'। 'যেই যেই লোক'এর ব্যবহার নেই। সম্বন্ধপদে 'যার যার' 'তার তার' মানবার্থে চলে। এইরকম দ্বৈতে বহুকে এক এক ক'রে দেখবার ভাব আছে। ভিন্ন ভিন্ন তুমি'কে নির্দেশ ক'রে 'তুমি তুমি' 'তোমার তোমার' বললে দোষ ছিল না, কিন্তু বলা হয় না।

যে বাক্যের প্রথম অংশে দ্বৈতে আছে 'যে' তার পূরণার্থক শেষ অংশে সমগ্রবাচক বহুবচন-ব্যবহারটাই নিয়ম, যেমন : যে যে লোক, বা যাঁরা যাঁরা এসেছেন তাঁদের পান দিয়ো।

যত এত তত অত কত শব্দ পরিমাণবাচক। এদের মধ্যে 'তত' শব্দ ছাড়া আর সবগুলিতে দ্বিত্ব চলে।

এখন তখন যখন কখন কালবাচক। 'কখন্' শব্দ প্রায়ই প্রশ্নসূচক, সাধারণভাবে 'কখন্' বলতে অনিশ্চিত বা দূরবর্তী সময় বোঝায় : কখন্ যে গেছে। কিন্তু 'কখনো' প্রশ্নার্থক হয় না। প্রশ্নের ভাবে যখন বলি 'সে কখনো এ কাজ করে' তখন 'কি' অব্যয়-শব্দ উহ্য থাকে। দ্বিত্বে 'কখনো' শব্দের অর্থ 'মাঝে মাঝে'। 'কখনোই' একটা 'না' চায় : কখনোই হবে না।

'কখন্' শব্দের 'কী থেনে' -ভঙ্গীওয়ালা রূপ কাব্যসাহিত্যে পাওয়া যায়।

'কভু' শব্দের অর্থও 'কখনো'। এখন দৈবাৎ পদ্যে ছাড়া আর কোথাও কাজে লাগে না। ওর জুড়ি ছিল 'তবু' শব্দটা, কিন্তু ওর সময়বাচক অর্থটা নেই। 'তবু' শব্দের দ্বারা এমন কোনো সম্ভাবনা বোঝায় যেটা ঠিক উপযুক্ত বা আকাঙ্ক্ষিত নয় : যদিও রৌদ্র প্রখর তবু সে ছাতা মাথায় দেয় না, আমি তো বারণ করেছি তবু যদি যায়

দুঃখ পাবে। কালবাচক ক্রিয়াবিশেষণে বহুবচন বা কর্মকারক নেই। সম্বন্ধপদে : এখনকার তখনকার কখনকার, কোন্ সময়কার, কোন্ সময়টার। অধিকরণে : কোন্ সময়ে, যে সময়ে। পদ্যে 'কোন্ খনে', গ্রাম্য ভাষায় 'কী খেনে' এবং অধিকাংশ স্থলেই শুভ অশুভ লক্ষণ-সূচনায় এর প্রয়োগ হয়। অপাদান : যখন থেকে, কোন্ সময় থেকে।

কালবাচক ক্রিয়াবিশেষণ আরও একটা বাকি আছে 'কবে'। ওর দুটি জুড়ি ছিল : এবে যবে। তারা পদ্যে আশ্রয় নিয়েছে। 'তবে' একদা ওদেরই দলে ছিল, কিন্তু এখন 'তবু' শব্দের মতো সেও অর্থ বদলিয়েছে। একটা সম্ভাবনার সঙ্গে আর-একটা সম্ভাবনাকে সে জোড়ে, যেমন : যদি যাও তবে বিপদে পড়বে। তবে এক কাজ করো : 'তবে' শব্দের পূর্ববর্তী উহ্য ব্যাপারের প্রসঙ্গে কোনো কাজ করার পরামর্শ।

এই প্রসঙ্গে 'সবে' শব্দটার উল্লেখ করা যেতে পারে। বলে থাকি : সবে এইমাত্র চলে গেছে, সবে পাঁচটা বেজেছে। এখানে 'সবে' অব্যয়, ওতে মাত্রা বোঝায়, সকল ক্ষেত্রেই পরিমাণের সীমা বোঝাতে তার প্রয়োগ : সবে পাঁচজন। সবে ভোর হয়েছে : অর্থাৎ সময়ের মাত্রা ভোরে এসে পৌচেছে। সেইরকম : সবে এক পোওয়া দুধ।

যেমন তেমন অমন এমন কেমন তুলনাবাচক। 'কেমনে' শব্দের ব্যবহার পদ্যে করণকারকে। 'কেমন' শব্দের দ্বৈতে সন্দেহ বোঝায় : কেমন কেমন ঠেকছে। গা কেমন কেমন করছে : একটা অনির্দিষ্ট অসুস্থ ভাব। 'কেমন' শব্দের সঙ্গে 'যেন'-যোগে সংশয় ঘনীভূত হয়, আর সে সংশয়টা অপ্রিয়। লোকটাকে কেমন যেন ঠেকছে : অর্থাৎ ভালো ঠেকছে না। ভঙ্গীওয়ালা 'কেমন' শব্দটা আছে খোঁচা দেবার কাজে : কেমন জব্দ, কেমন মার মেরেছে, কেমন জুতো, কেমন ঠকানটাই ঠকিয়েছে।

অধিকরণের বাহনরূপে 'এমনি' শব্দের ব্যবহার আছে : এমনিতেই জায়গা পাই নে। খোঁচা দেবার ভঙ্গীতেও এই শব্দটার যোগ্যতা আছে : এমনিই কী যোগ্যতা।

'যত' শব্দ তার জুড়ি হারালে টিটকারির কাজে লাগে সে কথা পূর্বেই বলেছি। 'অত' কথাটারও তীক্ষ্ণতা আছে, যেমন : অত চালাকি কেন, অত বাবুগিরি তোমাকে মানায় না, অত ভালোমানুষি করতে হবে না।

এজাতীয় আরও দৃষ্টান্ত আছে, যথা 'যে' এবং 'যেমন'। 'সে' এবং 'তেমন'এর সঙ্গে যদি বিচ্ছেদ ঘটানো যায় তবে মুখ বাঁকানোর ভঙ্গী আনে, যথা : যে মধুর বাক্য তোমার। 'তেমন'এর সঙ্গ-বর্জিত 'যেমন' শব্দটাও বক্রোক্তি : যেমন তোমার বুদ্ধি।

এই ধরণেরই আর-একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়ে : কোথাকার মানুষ হে। এ বাক্যটার চেহারা প্রশ্নেরই মতো, কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা রাখে না। এতে যে সংবাদ

উহ্য আছে সে নিবাসঘটিত নয়, সে হচ্ছে লোকটার ধৃষ্টতার বা মূর্খতার পরিচয় নিয়ে। কোথাকার সাধুপুরুষ এসে জুটল : লোকটার সাধুতা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ হচ্ছে না।

'যেমতি' 'তেমতি' পদ্যে আশ্রয় নিয়েছে। 'সেইমতো' 'এইমতো' এখনো টিঁকে আছে। কিন্তু 'এর মতো' 'তার মতো'র ব্যবহারটাই বেশি। করণকারকে রয়ে গেছে 'কোনোমতে'। অথচ 'কোনোমতো' বা 'কোন্‌মতো' শব্দটা নেই।

'কেন' শব্দটা সর্বনাম। এর অর্থ প্রশ্নবাচক, এর রূপটা করণকারকের। ঘটনা ঘটল কেন : অর্থাৎ ঘটল কী কারণের দ্বারা। 'কেনে বা' প্রাচীন কাব্যেও পড়েছি, গ্রাম্য লোকের মুখেও শোনা যায়।

কেন, কেন বা, কেনই বা। 'লোকটা কেন কাঁদছে' এ একটা সাধারণ প্রশ্ন। 'কেন বা কাঁদছে' বললে কান্নাটা যে ব্যর্থ বা অবোধ্য সেইটে বলা হল। কেন বা এলে বিদেশে : অর্থাৎ বিদেশে আসাটা নিষ্ফল। কেনই বা মরতে এখানে এলুম : এ হল পরিতাপের ধিক্কার। এর মধ্যে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই প্রয়োগগুলির সবগুলোই অপ্রিয়তাব্যঞ্জক। কেন তিনি তিব্বতি পড়ছেন তা নিজেই জানেন না : এ সহজ কথা। যেই বলা হল 'কেনই বা তিনি তিব্বতি পড়তে বসলেন' অমনি বোঝা যায়, কাজটা সুবুদ্ধির মতো হয় নি।

'কেন' শব্দের এক বর্গের শব্দ 'যেন' 'হেন'। 'যেন' সাদৃশ্য বোঝাতে। 'হেন' শব্দের প্রয়োগ বিশেষণে, যথা : হেন রূপ দেখি নাই কভু, হেন কাজ নেই যা সে করতে পারে না, সে-হেন লোকও তেড়ে এল। হেন কাজ=এমন কাজ। সে-হেন= তার মতো।

'যেন' শব্দটাতে বিদ্রূপের ভঙ্গী লাগানো চলে : যেন নবাব খাঞ্জে খাঁ, যেন আহ্লাদে পুতুল, যেন কার্তিকটি, যেন ডানাকাটা পরী। বাংলায় বিদ্রূপের ভঙ্গীরীতি অত্যন্ত সুলভ।

'তেন' শব্দের ব্যবহার লোপ পেয়েছে। 'হেন' শব্দের অর্থ 'মতো' কিংবা 'এই-মতো'। এর সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যায় 'তেন' শব্দের অর্থ 'সেইমতো'। 'হেন-তেন' জোড়া শব্দ এখনো চলিত আছে। হেন-তেন কত কী ব'কে গেল : অর্থাৎ, ব'কল কখনো এরকম কখনো সেরকম, অসংলগ্ন বকুনি। প্রাচীন বাংলায় দেখেছি 'যেন কন্যা তেন বর'। এখানে 'যেন' শব্দের 'যে-হেন' অর্থ।

'যেন' শব্দটা 'হেন' শব্দের জুড়ি। পদাবলীতে পাওয়া গেছে, 'যেহ্ন' (যে-হেন)। বোঝা যায় এই 'হেন' শব্দের যোগেই 'যেন' শব্দ চেহারা পেয়েছে। আধুনিক বাংলায় 'যেন' শব্দটা তুলনা-উপমার কাজেই লাগে, কিন্তু পুরাতন বাংলায় তার অর্থের বিকৃতি

হয় নি। তখন তার অর্থ ছিল 'যেমন': যেন বায় তেন আইসে, যেন রাজা তেন দেশ।

'হেন' শব্দটা রয়ে গেছে ভাষায় মহদাশ্রয় পক্ষে। কিন্তু 'সে' কিংবা 'এ' শব্দের যোগে এখনো চলে, যেমন: সে-হেন লোক। এই 'হেন' শব্দের যোগে ঐ 'সে' শব্দে অক্ষমতা বা অসম্মানের আভাস দেয়। যেমন: সে-হেন লোক দৌড় মারলে। 'হেন' শব্দের যোগে 'এ' শব্দে অসামান্যতা বোঝায়, যেমন: এ-হেন লোক দেখা যায় না, এ-হেন দুর্দশাতেও মানুষ পড়ে।

'কেন'র সঙ্গে 'যে' যোগ করলে পরিতাপ বা ভর্ৎসনার ভঙ্গী আসে, যেমন: কেন যে মরতে আসা, কেন যে এতগুলো পাস করলে। 'কী করতে' শব্দটারও ঐ-রকম ঝোঁক, অর্থাৎ তাতে আছে ব্যর্থতার ক্ষোভ।

শুধু 'কী' শব্দের মধ্যেও এই রকমের ভঙ্গী। এই কাজে ওর সঙ্গে যোগ দেয় ই অব্যয়: কী চেহারাই করেছ, কী কবিতাই লিখেছেন, কী সাধুগিরিই শিখেছ। ঐ 'কী'এর সঙ্গে 'বা' যোগ করলে ঝাঁজ আরও বাড়ে। 'কী বা'কে বাঁকিয়ে 'কীবে' করলে ভঙ্গীতে আরও বিদ্রূপ পৌঁছয়। ই'র সহযোগিতা বাদ দিলে 'কী' বিশুদ্ধ বিস্ময় প্রকাশের কাজে লাগে: কী সুন্দর তার মুখ।

সম্মান খর্ব করবার বিশেষ প্রত্যয় বাংলা ভাষায় যথেষ্ট পাওয়া গেল, সর্বনামের প্রয়োগেও বক্রোক্তি দেখা গেছে। কিন্তু শ্রদ্ধা বা প্রশংসা -প্রকাশের প্রয়োজনে ভাষায় কেবল একটা বিশেষ ভঙ্গী আছে 'আহা' অব্যয় শব্দটার যোগে, যেমন: আহা মানুষটি বড়ো ভালো। করুণা প্রকাশেও এর ব্যবহার আছে। অথচ 'আহামরি' শব্দের পরিণামটা ভালো হয় নি। গোড়ায় এর উদ্দেশ্য ভালোই ছিল, এখন এ শব্দটার যে প্রকৃত স্বভাব সেইটাই গেছে বিপরীত হয়ে। এটা হয়েছে বিদ্রূপের বাহন। ওটাকে আরও একটু প্রশস্ত ক'রে হল 'আহা ম'রে যাই'; এর ঝাঁজ আরও বেশি। পদে পদে বাংলায় এই বাঁকা ভঙ্গীটা এসে পড়ে: ভা-রি তো পণ্ডিত, ম-স্ত নবাব। এদের কণ্ঠস্বর উৎসাহে দীর্ঘকৃত হয়ে গাল পাড়ে যথার্থ মানেটাকে ডিঙিয়ে। হাঁদারাম ভোঁদারাম বোকারাম ভ্যাবাগঙ্গারাম শব্দগুলোর ব্যবহার চূড়ান্ত মূঢ়তা প্রকাশের জন্যে। কিন্তু 'সুবুদ্ধিরাম' 'সুপটুরাম' বলবার প্রয়োজনমাত্র ভাষা অনুভব করে না। সবচেয়ে অদ্ভুত এই যে 'রাম' শব্দের সঙ্গেই যত বোকা বিশেষণের যোগ, 'বোকা লক্ষ্মণ' বলতে কারও রুচিই হয় না।

'কি' যেখানে অব্যয় সেখানে প্রশ্নের সংকেত। উহ্য বিশেষ্যের সহযোগে বিশেষণে ওর প্রয়োগ আছে। তুমি কী করছ: অর্থাৎ 'কী কাজ' করছ। আর-একটা প্রয়োগ বিস্ময়

বোঝাতে, যেমন : কী সুন্দর। পূর্বেই বলেছি তীক্ষ্ণধার স্বরবর্ণ ই সঙ্গে না থাকলে এর সৌজন্য বজায় থাকে। বিশেষণ-প্রয়োগে 'কী', যথা : কী কাজে লাগবে জানি নে। 'কী' বিশেষণ শব্দে অচেতন বা নির্বস্তুক বা অনির্দিষ্ট বোঝায় : ওর কী দশা হবে, কী হ'তে কী হল। বিকল্প বোঝাতে ওর প্রয়োগ আছে, যেমন : কী রাম কী শ্যাম কাউকেই বাদ দেওয়া যায় না। 'কোন্' বিশেষণ জড় চেতন দুইয়েই লাগে।

সর্বনামের কর্মকারকে সাধারণত কে বিভক্তি : আমাকে তোমাকে। 'সে'র বেলায় 'তাকে' কিংবা 'সেটিকে' 'সেটাকে'।

বাংলা সর্বনাম করণকারকে একটা বিভক্তির উপরে আর-একটি চিহ্ন জোড়া হয়। বিভক্তিটা সম্বন্ধপদের, যেমন 'আমার', ওতে জোড়া হয় 'দ্বারা' শব্দ : আমার দ্বারা। আর-একটা শব্দচিহ্ন আছে 'দিয়ে'। তার বেলায় মূলশব্দে লাগে কর্মকারকের বিভক্তি : আমাকে দিয়ে।

'কী' শব্দের করণকারকের রূপ : কিসে, কিসে ক'রে, কী দিয়ে, কিসের দ্বারা। অধিকরণেরও রূপ 'কিসে', যথা : এ লেখাটা কিসে আছে। এ-সমস্তই একবচনের ও অজীববাচকের দৃষ্টান্ত, এরা বহুবচনে হবে : এগুলোকে দিয়ে, সেগুলোকে দিয়ে, কোন্‌গুলোকে দিয়ে। অসম্মানে মানুষের বেলা হয় ; নচেৎ হয় : এদের দিয়ে, তাদের দিয়ে, ওদের দিয়ে।

সাধারণত বাংলায় বিশেষণপদের বহুবচনরূপ নেই। ওদের অধিকৃত বিশেষ্য শব্দগুলিতে বহুবচনের ব্যবস্থা করতে হয়, যথা : বুনো পশুদের, পিতলের ঘটিগুলোর। বলা বাহুল্য 'ঘটিদের' হয় না, 'পশুদের' হয়। রা এবং দের বিভক্তি জড়বাচক শব্দের অধিকারে নেই। তার পক্ষে গুলো শব্দই বৈধ। অথচ গুলো অপর পক্ষের ব্যবহারেও লাগে। কিন্তু পরিমাণবাচক 'এত' 'তত' 'যত' 'কত' বিশেষণের সঙ্গে বহুবচন-বিভক্তি গুলো যুক্ত হয়। তা ছাড়া 'এ' 'সে' 'যে' 'ও' 'ঐ' 'সেই' 'কোন্' শব্দের সঙ্গে বহুবচনে কর্তৃপদে গুলো ও কর্মকারকে বা সম্বন্ধে দের যোগ করা হয়।

বাংলা সর্বনামশব্দ-প্রয়োগে একটা খটকার জায়গা আছে।

'আমাকে তোমাকে খাওয়াতে হবে' এমন কথা শোনা যায়। কে কাকে খাওয়াবে তর্কটা পরিষ্কার হয় না। এমন স্থলে যিনি খাওয়াবার কর্তা তাঁকে সম্বন্ধ-আসনে বসালে কথাটা পাকা হয়। আর সেটা যদি ক্রিয়াপদের পূর্বেই থাকে তা হলে দ্বিধা মেটে। 'আমাকে তোমার খাওয়াতে হবে' বাক্যটা স্পষ্ট। গোল বাধে বহুবচনের বেলায়। কেননা বহুবচনের সম্বন্ধপদে দের আর কর্মকারকের দের একই চেহারার। এর একমাত্র উপায় কে বিভক্তি দ্বারা কর্মকারককে নিঃসংশয় করা। 'আমাদেরকে

তোমাদের খাওয়াতে হবে' বললে নিশ্চিন্ত মনে নিমন্ত্রণে যাওয়া যায়। সম্বন্ধকারকের চিহ্নে কর্মকারকের কাজ চালিয়ে নেওয়া ভাষায় অমার্জনীয় ঢিলেমি।

১৫

বাংলায় নির্দেশকশব্দরূপে প্রধানত ব্যবহৃত হয়: টি টা খানি খানা। ইংরেজিতে এর প্রতিরূপ the। ইংরেজিতে the বসে শব্দের পূর্বে, বাংলায় নির্দেশক শব্দ বসে শব্দের পরে, বস্তুবাচক বা জীববাচক শব্দের অনুষঙ্গে। যা বস্তু বা জীব -বাচক নয় স্থানবিশেষে তার সঙ্গেও যোগ হয়, যেমন: বেশি লজ্জাটা ভালো নয়, ওর হাসিটি বড়ো মিষ্টি। এখানে লজ্জা ও হাসিকে বস্তুর মতোই কল্পনা করে নেওয়া হয়েছে।

এক দুই তিন শব্দ সংখ্যাবাচক। ওদের সঙ্গে প্রায় নিত্যযোগ টি ও টা'র। ইংরেজিতে এ দস্তুর নেই। বাংলায় সংখ্যাবাচক শব্দ যখন সমাসে বাঁধা পড়ে তখন তাদের টি টা পড়ে খ'সে, যেমন: দশসের আটহাত পাঁচমিশলি। তা ছাড়া 'জন' শব্দের সংযোগে টি টা চলে না। 'একটি জন' বলি নে, অথচ 'একটি মানুষ' বলেই থাকি।

আরও কয়েকটি নির্দেশক শব্দ আছে, যেমন: টু টুক্ টুকু গোছা গাছি। তেল জল ধুলো কাদা প্রভৃতি অনির্দিষ্ট-আকার-বাচক শব্দে সংখ্যাবাচক শব্দের ব্যবহার চলে না। 'একটা তেল' 'একটি ধুলো' বলি নে, কিন্তু 'একটু তেল' 'একটু ধুলো' বলেই থাকি। 'অনেকটা জল' 'অনেকটা ময়দা' বলে থাকি কিন্তু 'অনেকটি' মাটি বা দুধ বলা চলে না। কেননা টা শব্দে ব্যাপকতা বোঝায়, টি শব্দে বোঝায় খণ্ডতা।

টু টুক্ টুকু: স্বল্পতাসূচক। সজীব পদার্থে এর ব্যবহার নেই। ছোটো গাধার বাচ্ছাকেও কেউ 'গাধাটুকু' বলবে না, পরিহাস ক'রে 'মানুষটুকু' বলা চলে।

সরু লম্বা জিনিসের সঙ্গে 'গাছি' 'গাছা'র ব্যবহার: দড়িগাছা বেতগাছা হারগাছা। দুই-একটা ব্যতিক্রম থাকতে পারে, যেমন 'চুড়িগাছি'। লম্বায়-ছোটো জিনিসে চলে না; 'গোঁফগাছি' কিছুতেই নয়। টুকু চলে ছোটো জিনিসে, কিন্তু গড়নওয়ালা জিনিসে নয়। 'চুনটুকু' হয়, 'পদ্মটুকু' হয় না; 'আংটিটুকু' হয় না, 'পশমটুকু' হয়। সন্ন্যাসীঠাকুরের 'রাগটুকু' প্রভৃতি অবস্তুবাচক শব্দেও চলে; 'একটুকু' হয়, কিন্তু 'দুটুকু' 'তিনটুকু' হয় না। 'ঐটুকু' শব্দের সঙ্গে 'খানি' জোড়া যায়, 'খানা' যায় না; 'একটুকখানি', কিন্তু 'একটুকখানা' নয়। জীববাচক শব্দে খাটে না; 'একটুক জীব' নেই কোথাও।

আরও কয়েকটি নির্দেশক পদ আছে যা শব্দের পূর্বে বসে। তারা সর্বনাম জাতের, যেমন: সেই এই ঐ।

১৬

বাংলা বিশেষ্যশব্দে সংস্কৃত বিশেষ্যশব্দের অনুস্বার বিসর্গ না থাকাতে কর্তৃকারকে চিহ্নের কোনো উৎপাত নেই। একেবারে নেই বলাও চলে না। কর্তৃপদে মাঝে মাঝে একারের সংকেত দেখা যায়, যেমন : পাগলে কী না বলে।

ভাষাবিজ্ঞানীরা এইরকম প্রয়োগকে তির্যক্‌রূপ বলেন, এ যেন শব্দকে ত্যাড়চা করে দেওয়া। সব গৌড়ীয় ভাষায় এই তির্যক্‌রূপ পাওয়া যায়, যেমন : দেবে জনে ঘোড়ে। বাংলায় বলি : দেবে মানবে লেগেছে, পাঁচজনে যা বলে। 'ঘোড়ে' বাংলায় নেই, আছে 'ঘোড়ায়' : ঘোড়ায় লাথি মেরেছে।

এই তির্যক্‌রূপের ভিতর দিয়েই কারকের বিভক্তিগুলো তৈরি হয়েছে, আর হয়েছে বহুবচনের রূপ, যেমন : মানুষে থেকে, মানুষেরা মানুষেতে মানুষেদের। তোমা আমা যাহা তাহা থেকে : তোমার আমার যাহার তাহার তোমাকে আমাকে ইত্যাদি।

এই তির্যক্‌রূপের কর্তৃকারক এক সময়ে সাধারণ অর্থে ছিল : আপনে শিখায় প্রভু শচীর নন্দনে, সোই আপনে কর সেবা। প্রাচীন রামায়ণে দেখা যায় নামসংজ্ঞায় প্রায় সর্বত্রই এই তির্যক্‌রূপ, যেমন : সুমিত্রায়ে কৌশল্যায়ে দশরথে লোমপাদে। এখন এর ব্যবহারে একটা বিশেষত্ব ঘটেছে। 'বানরে কলা খায়' বলে থাকি, 'গোপালে সন্দেশ খায়' বলি নে। বাংলার কোনো কোনো অংশে তাও বলে শুনেছি। ময়মনসিংহগীতিকায় আছে : কোনো দোষে দোষী নয় আমার সোয়ামিজনে।

শ্রেণীবাচক কর্তৃপদে তির্যক্‌রূপ দেখা যায়, অন্যত্র যায় না। 'বাঘে গোরুটাকে খেয়েছে' বললে বোঝায় : বাঘজাতীয় জন্তুতে গোরুকে খেয়েছে, ভালুকে খায় নি। যখন বলি 'রামে মারলে মরব, রাবণে মারলেও মরব', তখন ব্যক্তিগত রাম রাবণের কথা বলি নে ; তখন রামশ্রেণীয় আঘাতকারী ও রাবণশ্রেণীয় আঘাতকারীর কথা বলা হয়।

'জন' শব্দের তির্যক্‌রূপ 'জনা'। একো জনা একো রকমের : এই 'জনা' বিশেষ একজনের সম্বন্ধে নয়, জনগুলি এক-একটি শ্রেণীগত। 'একহ' শব্দ থেকে হয়েছে 'একো'।

মনে রাখা দরকার, কর্তৃপদের এই তির্যক্‌রূপ জড় পদার্থে খাটে না। যখন বলি 'মেঘে অন্ধকার করেছে' তখন বুঝতে হবে, 'মেঘে' করণকারক।

গৌড়ীয় ভাষার প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায়, শব্দরূপে সম্বন্ধপদের চিহ্নই প্রাধান্য পেয়েছিল। অবশেষে প্রয়োজনমত তারই উপরে স্বতন্ত্র কারকের বিভক্তি যোগ করতে হয়েছে। তারই নিদর্শন পাই কর্মকারকে 'তোমারে' 'শ্রীরামেরে' প্রভৃতি শব্দে।

আধুনিক বাংলা পদ্যেও এই যে বিভক্তিরই প্রাধান্য। বাংলা রামায়ণ-মহাভারতে কর্মকারকে কে বিভক্তি অল্প। কবিকঙ্কণে দেখা গেছে: খাওয়াব তোমাকে হে নবাৎ আম্ররসে। অন্যত্র: উজানী নগরকে বাসিবে যেন হিম। এরকম প্রয়োগ বেশি নেই।

বাংলা নির্বস্তুক পদার্থ-বাচক শব্দের কর্মকারকে টা টি'র প্রয়োগবাহুল্য, যথা 'মৃত্যুভয় দূর করো', 'চক্ষুলজ্জা ছাড়ো'। কিন্তু ওরই মধ্যে একটু বিশেষত্বের ঝোঁক দিয়ে বলা চলে: মৃত্যুভয়টা দূর করো, চক্ষুলজ্জাটা ছাড়ো। 'মৃত্যুভয়টাকে দূর করো' বলতেও দোষ নেই।

মানুষের বা জন্তু-জানোয়ারের বেলায় কর্মকারকের চিহ্ন নিয়ে শৈথিল্য করা হয় নি: গোপাল যদি সন্দেশের যোগ্য হয় তা হলে গোপালকেই সন্দেশ দেওয়া যায়। কিন্তু যে বিশেষ্যপদ সাধারণবাচক তার বেলায় কর্মকারকের চিহ্ন কাজে লাগে না, যেমন: রাখাল গোরু চরায়। 'গোরুকে' চরায় না। ময়রা সন্দেশ বানায়, 'সন্দেশকে' বানায় না।

বিপদ এই, একটা নিয়মের নাগাল যেই পাওয়া যায় অমনি জুটে যায় অনিয়মের দৃষ্টান্ত, যথা: যে গাড়োয়ান গোরুকে পীড়ন করে সে তো কশাইয়েরই খুড়তুতো ভাই। এখানে গোরু যদিও সাধারণ বিশেষ্য তবু এখানে কর্মকারকে কে বিভক্তি দ্বারা তার সঙ্গে বিশেষ বিশেষ্যের মতো ব্যবহার করা হল। ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো: এখানে 'ঝি' 'বৌ' বিশেষ বিশেষ্য নয়, সাধারণ বিশেষ্য, তবু কে বিভক্তি গ্রহণ করেছে। এটা বেআইনি বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আইন আছে প্রচ্ছন্ন হয়ে। রাখালসাধারণ গোরু চরিয়ে থাকে, সেই তার ব্যাবসা। কিন্তু গাড়োয়ান গোরুকে যে পীড়ন করে সে একটা বিশেষ ঘটনা, না পিটোতেও পারত। বউয়ের উপকারের জন্যে শাশুড়ি যদি ঝিকে মারে সে একটা বিশেষ ব্যাপার, মারাটা সাধারণ ঘটনা নয়। ব'লে থাকি 'ময়রা মালপো তৈরি করে', 'মালপোকে তৈরি করে' বলিই নে। কিন্তু অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলা অসম্ভব নয় যে: ময়রা মালপোকে করে তোলে জুতোর সুকতলা। মালপো তৈরি করা সাধারণ ময়রা কর্তৃক সাধারণ ব্যাপার; সুকতলার মতো মালপো তৈরি করাটা নিঃসন্দেহ সাধারণ ব্যাপার নয়।

সর্বনামের প্রসঙ্গে করণকারকের নিয়ম পূর্বেই বলা হয়েছে। অন্য বিশেষ্যপদ সম্বন্ধেও প্রায় সেই একই কথা। দ্বারা দিয়ে ক'রে: এই তিনটে শব্দ করণকারকের প্রধান উপকরণ। সর্বনামের সঙ্গে অন্য বিশেষ্যপদের একটা প্রভেদ বিভক্তি নিয়ে; সর্বনামে কে, বিশেষ্যে এ। যথা: হাতে রান্না ভালো ভাতে মারার চেয়ে,

পৃথিবী পুরাবে তুমি ভরতের ধনে। সর্বনামে এই বিভক্তি বিকল্পে র, যেমন: তোমায় দিয়ে। নিম্নের দৃষ্টান্তে কর্মকারকের চিহ্ন দেখি নে, যথা: মন দিয়ে শোনো, হাত দিয়ে খাও, লোক দিয়ে চিঠি পাঠাও। মন দিয়ে কাজ করো, বাজে কাজে হাত দিয়ো না: এখানে মনও নির্বস্তুক, হাতও তাই; এ হাত দৈহিক হাত নয়, এ হাত বলতে বোঝায় চেষ্টা। লোক দিয়ে চিঠি পাঠাও: এ লোক কোনো বিশেষ লোক নয়, সাধারণভাবে যাকে হোক কাউকে দিয়ে চিঠি পাঠাবার কথা হচ্ছে। ঘরামি দিয়ে চাল ছাইতে হবে: এখানে বিকল্পে 'ঘরামিকে দিয়ে'ও হয়। কিন্তু ব্যক্তিবাচক বিশেষ্যে কর্মকারকের কে বিভক্তি থাকাই চাই: রামকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়ো। মানুষ ছাড়া অন্য জীববাচক বিশেষ্য সম্বন্ধেও এই নিয়ম, যেমন: বাঁদরকে দিয়ে চাষ করানো চলে না, ধোবার গাধাকে দিয়ে ঘোড়দৌড় খেলাবে না কি।

করণকারকে 'ক'রে' শব্দ অধিকরণরূপের সঙ্গে যুক্ত হয়: গ্লাসে ক'রে জল খাও, তুলিতে ক'রে আঁকো।

করণকারকে 'দিয়ে' আর 'ক'রে' শব্দে পার্থক্য আছে। 'পাল্কিতে ক'রে' যাওয়া চলে, 'পাল্কি দিয়ে' চলে না। খাবার বেলায় বলি 'হাতে ক'রে খাও'; নেবার বেলায় বলি 'হাত দিয়ে নাও'। একটাতে হাত হচ্ছে উপায়, আর-একটাতে হাত হচ্ছে আধার। পাল্কিতে 'ক'রে' মানুষ যায়, কিন্তু যায় পথ 'দিয়ে'। এখানে পাল্কি উপায়, পথ আধার। কিন্তু অর্থহিসাবে বিকল্পে হাত উপায়ও হতে পারে, আধারও হতে পারে। তাই 'হাত দিয়ে খাও' বলাও চলে, 'হাতে ক'রে খাও' বলতেও দোষ নেই।

ব'লে থাকি: বড়ো রাস্তা দিয়ে যখন যাবে গাড়িতে ক'রে যেয়ো। কোনো সাহেব যদি বলে 'রাস্তায় ক'রে যাবার সময় গাড়ি দিয়ে যেয়ো', বুঝব সে বাঙালি নয়। লোক 'দিয়ে' পাঠাব চিঠি, লোকটা উপায়; ব্যাগে 'ক'রে' সে চিঠি নেবে, ব্যাগটা আধার।

১৭

'হতে' আর 'থেকে' এই দুটো শব্দ বাংলা অপাদানের সম্বল। প্রাচীন হিন্দিতে 'হতে' শব্দের জুড়ি পাওয়া যায় 'হন্তো', নেপালিতে 'ভন্দা', সংস্কৃত 'ভবন্ত'। প্রাচীন রামায়ণে দেখেছি: ঘরে হনে, ভূমি হনে।

অপভ্রংশ প্রাকৃতের অপাদানে পাওয়া যায়: হোংতও হোংতউ। 'থেকে' শব্দটার ধ্বনিসাদৃশ্য পাওয়া যায় নেপালিতে, যেমন: 'তাঁহা দেখি—সেখান থেকে, মাঝ দেখি—মাঝ থেকে। গুজরাটিতে আছে 'থকি'। বাংলায় অপাদানে একটা গ্রাম্য প্রয়োগ

আছে 'ঠেঞে' (ঠাঁই হতে), যথা : তোমার ঠেঞে কিছু আদায় করতে হবে।

একদা পালি ব্যাকরণে পেয়েছিলুম-'অজ্জতগ্গে' শব্দ। এর সংস্কৃত মূল 'অদ্যতঃ অগ্রে'; 'আজ থেকে' শব্দের সঙ্গে এর ধ্বনি ও অর্থের মিল আছে। জানি নে পণ্ডিতদের কাছে এ ইঙ্গিত গ্রাহ্য হবে কি না।

এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে। 'পশুর থেকে মানুষের উৎপত্তি' এ কথা বলা চলে। কিন্তু 'মানুষ থেকে গন্ধ বেরচ্ছে' বলি নে, বলি 'মানুষের গা থেকে' কিংবা 'কাপড় থেকে'। 'বিপিন থেকে টাকা পেয়েছি' বলা চলে না, বলতে হয় 'বিপিনের কাছ থেকে টাকা পেয়েছি'। এর কারণ, অচেতন পদার্থের নামের সঙ্গেই 'থেকে' শব্দের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। তাই 'মেঘ থেকে' বৃষ্টি নামে, 'পাখি থেকে' গান ওঠে না, 'পাখির কণ্ঠ থেকে' গান ওঠে।

কেবল 'থেকে' নয়, 'হতে' শব্দ-প্রয়োগেও ঐ একই কথা। 'অযোধ্যা হতে' রাম নির্বাসিত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি দুঃখ পেয়েছিলেন 'রাবণের কাছ হতে'।

তুলনামূলক অর্থেও ব্যবহৃত হয় : হতে থেকে চেয়ে চাইতে।

অন্য প্রসঙ্গে সম্বন্ধপদের আলোচনা হয়ে গেছে। এক কালে বহুবচনে সম্বন্ধপদের 'দিগের' শব্দের পূর্বেও সম্বন্ধের আর-একটা বিভক্তি থাকত, যেমন 'আমারদিগের'।

বাংলা সম্বন্ধপদের একটা প্রত্যয় আছে 'কার'। এর ব্যবহার সার্বত্রিক নয়। সময়-বাচক ক্রিয়াবিশেষণে 'এখন' 'তখন' 'যখন' 'কখন'এর সঙ্গে 'কার' জোড়া হয়। বিশেষ কোনো 'বেলাকার' 'দিনকার' 'রাতকার'ও চলে। 'আজ' এবং 'কাল' শব্দে কর্মকারকের বিভক্তির সঙ্গে যোগ ক'রে ওর ব্যবহার : আজকেকার কালকেকার। 'পর্শুকার', অমুক 'হপ্তাকার' বা 'বছরকার' হয়, কিন্তু অমুক 'মাসকার' কিংবা অমুক 'ঘণ্টাকার' হয় না। 'সকলকার' হয়, 'সমস্তকার' হয় না। 'সত্যকার' হয়, 'মিথ্যাকার' হয় না। ভিতর-কার বাহিরকার উপরকার নিচেকার এদিককার ওদিককার এধারকার ওধারকার— চলে। ব্যক্তি বা বস্তুবাচক শব্দ সম্পর্কে এর ব্যবহার নেই। 'জন' শব্দ যোগে সংখ্যাবাচক শব্দে 'কার' প্রয়োগ হয় : একজনকার দুজনকার। কিন্তু 'জন' ছাড়া মনুষ্যবাচক আর-কোনো শব্দের সঙ্গে ওর যোগ নেই। 'ইংরেজকার' বলা চলে না।

১৮

হওয়া থাকা আর করা, এই তিন অবস্থাকে প্রকাশ করে ক্রিয়াপদে। আমি ধনী, তুমি পণ্ডিত—এ কথা ইংরেজিতে বলতে গেলে এর সঙ্গে 'হওয়া' ক্রিয়াপদ যোগ

করতে হয়, বাংলায় সেটা উহ্ থাকে। 'রাস্তাটা সোজা', 'পুকুরটা গভীর', যখন বলি তখন সেটাতে তার নিত্য অবস্থা জানায়। কিন্তু 'বর্ষায় পুকুর ঘোলা হয়েছে' এটা আকস্মিক অবস্থা, তাই হওয়ার কথাটা তুলতে হয়। ওর লোভ হয়েছে, মনে হচ্ছে ওর জ্বর হবে— বাক্যগুলিও এইরকম।

সাবেক বাংলায় বিশেষ্য বা সর্বনাম শব্দ -সহযোগে ইংরেজি is ও are -এর অনুরূপ প্রয়োগ পাওয়া যায়: তুমি কে বটো, সে কে বটে, আমি রাজার ঝিয়ারি বটি। অচেতনবাচক শব্দেও চলত, যেমন : ঐ গাছটা কী বটে, এই নদী গঙ্গাই বটে। 'বটে' শব্দটা এখনো ভাষায় আছে, বিশেষ ঝোঁক দেবার জন্যে, যেমন : লোকটা ধনী বটে। আবার ভঙ্গীর কাজেও লাগে, যেমন : বটে, চালাকি পেয়েছ! 'বটে'র সঙ্গে 'কিন্তু'র যোগ হলে ভঙ্গীটা আরও জমে, যেমন : উনি সর্দারি করেন বটে কিন্তু টের পাবেন। ইংরেজিতে স্বভাব বা অবস্থা বোঝাতে is বা are ব্যতীত বিশেষ্যের গতি নেই, বাংলায় তা নয়। ইংরেজিতে বলাই চাই He is lame, কিন্তু বাংলায় যদি বলি 'সে খোঁড়া বটে' তা হলে হয় বোঝাবে, তার খোঁড়া অবস্থাটা একটা বিশেষ আবিষ্কার, নয় ওর সঙ্গে একটা অসংগত ব্যাপারের যোগ আছে। যেমন : ও খোঁড়া বটে কিন্তু দৌড়য় খুব। কিংবা সন্দেহের বিদ্রূপ প্রকাশ করে : তুমি খোঁড়া বটে! অর্থাৎ, খোঁড়া নও যে তা প্রমাণ করতে পারি।

বাংলায় থাকার কথাটা যখন জানাই তখন বলি— আছি বা আছে, ছিলে ছিল বা ছিলুম। 'আছিল' শব্দেরই সংক্ষেপ 'ছিল'। কিন্তু ভবিষ্যতের বেলায় হয় 'থাকব'। বাংলায় ক্রিয়াপদের রূপ প্রধানত এই থাকার ভাবকে আশ্রয় করে। করেছে করছে করেছিল করছিল— শব্দগুলো 'আছি' ক্রিয়াপদকে ভিত্তি ক'রে স্থিতির অর্থকেই মুখ্য করেছে। সংস্কৃত ভাষায় এটা নেই, গৌড়ীয় ভাষায় আছে। হিন্দিতে বলে 'চলা থা', চলেছিল। কাজটা যদিও চলা, তবু থা শব্দে বলা হচ্ছে, চলার অবস্থাতে স্থিতি করেছিল। গতিটা যেন স্থিতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

যে কাজকে নির্দেশ করা হচ্ছে প্রধানত সেই কাজের মূল ধাতুকে দিয়েই ক্রিয়াপদের গড়ন। 'খা' ধাতুতে খাওয়া বোঝায়, খাওয়া কাজের সমস্ত ক্রিয়ারূপ এই ধাতুর যোগেই তৈরি। কিন্তু বাংলা ভাষায় অনেকস্থলে কার্যটা ক্রিয়ার রূপ ধরে নি। ক্ষুধা পাওয়া, তৃষ্ণা পাওয়া, প্রতি দিনের ঘটনা; অথচ বাংলায় সেটা ক্রিয়ারূপ নেয় নি, বিশেষ্যের সঙ্গে জোড়া লাগিয়ে বলতে হয় : ক্ষুধা পেল, তৃষ্ণা পেল। হওয়া উচিত ছিল 'ক্ষুধিল' 'তৃষিল', কাব্যে এইরকম ক্রিয়ারূপের কোনো বাধা নেই। কিন্তু গদ্যবাংলায় ক্রিয়াপদকে অনেক স্থলে গোটা বিশেষ্যপদের ভার বয়ে বেড়াতে হয়।

বাংলায় দুটো ক্রিয়াপদ জুড়ে ক্রিয়াবিশেষণ গড়ার একটা রীতি আছে। তাতে যে ইঙ্গিতের ভাষা তৈরি হয়েছে তার ভাবপ্রকাশের শক্তি অসাধারণ। সামান্য এই কথাটা 'রয়ে বসে কাজ করা' যা বলে তা কোনো বাঁধা সংস্কৃত শব্দে বলাই যায় না। 'উঠেপ'ড়ে' 'উঠেহেঁটে' কিংবা 'নেচেকুঁদে' বেড়ানোতে স্ফূর্তি প্রকাশ পায় সেটার ঠিক উপযুক্ত শব্দ অভিধানে খুঁজে পাওয়া যায় না। এদের স্বজাতীয় শব্দ : ভেড়েফুঁড়ে কেটেছেঁটে বেঁচেবর্তে রয়েসয়ে হেসেখেলে। এমন আরও বিস্তর আছে। অনেক স্থলে ঐ জোড়া শব্দের দুটিতে অর্থের সাম্য থাকে না। বস্তুত ওগুলো শব্দযোজনায় একরকম খেপামি। 'বেয়েছেয়ে দেখা'য় যা বলা হচ্ছে তার সঙ্গে বাওয়া এবং ছাওয়ার কোনো সম্পর্কই নেই। যখন বলি 'নেড়েচেড়ে দেখতে হবে' তখন 'নেড়ে' শব্দের সহচরটিকে ব্যবহার করা হয় অর্থহীন বাটখারার মতো ওজন ভারী করবার জন্যে। চেয়েচিন্তে কেঁদেকেটে : এরা আছে অনুপ্রাসের গাঁঠ বাঁধার কাজে। এঁটেসেঁটে খেটেখুটে খেয়ে-দেয়ে ঠেলেঠুলে : এরা ধ্বনির পুনরাবৃত্তিতে মনকে ঠেলে দেবার কাজ করে।

আর-একরকম ক্রিয়াবিশেষণ আছে পদকে দুনো করে দিয়ে। যেমন, 'জয় হবে হবে' কিংবা 'জয় জয় করছে'। মনটা 'পালাই পালাই' করে। এর মধ্যে খানিকটা অনিশ্চয়তা অর্থাৎ হওয়ার কাছাকাছি ভাব আছে। 'লড়াই লড়াই খেলা' সত্যিকার লড়াই নয় কিন্তু যেন লড়াই। 'হতে হতে হল না' অর্থাৎ হতে গিয়ে হল না। এতে যেমন জোর কমায়, আবার কোনো স্থলে জোর বাড়ায় : দেখতে দেখতে জল বেড়ে গেল, হাতে হাতে ফল পাওয়া। সরে সরে যাওয়া, চলে চলে ক্লান্ত, কেঁদে কেঁদে চোখ লাল, পিছু পিছু চলা, কাছে কাছে থাকা : এই দিয়ে নিরন্তরতার ভাব পাওয়া যায়, কিন্তু একটানা নিরন্তরতা নয়, এর মধ্যে একটা বারংবারত্ব আছে। 'পাতে-পাতেই মাছের মুড়ো দেওয়া হয়েছে' বললে মনে হয় সেটা যেন একে একে পরে পরে গণনীয়। 'পাথরটা পড়ি পড়ি করছে', কোনো কালেই হয়তো পড়বে না, কিন্তু প্রত্যেক মুহূর্তে বারে বারে তার ভাবখানা পড়বার মতো। 'আপনি আপনিই তিনি বকে যাচ্ছেন' বললে কেবল যে স্বগত বকা বোঝায় তা নয়, বোঝায় পুনঃ পুনঃ বকা। এরকম ভাবব্যঞ্জনা কোনো স্পষ্টার্থক বিশেষণের দ্বারা সম্ভব নয়। এ যেন সিনেমায় ছবি নেওয়ার প্রণালীতে পুনঃ পুনঃ অনুকৃতির সমষ্টি।

ক্রিয়ার বিশেষণে অর্থহীন ধ্বনি সম্বন্ধে বাংলা শব্দতত্ত্ব বইখানিতে অনেক দৃষ্টান্ত দেখিয়েছি, যেমন : ফস্ ক'রে, চট্ ক'রে, ধুপ্ ক'রে, ধাঁ ক'রে, সোঁ ক'রে, চ্যাঁচ ক'রে দেওয়া, সাঁট হয়ে বসা, টিপ করে প্রণাম করা। এদের কোনো শব্দই সার্থক নয়, অথচ অর্থবান শব্দের চেয়ে এরা স্পষ্ট করে মনে রেখাপাত করে। ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর, ধু ধু

করছে মাঠ, থই থই করছে জল : এরা এক ধাঁচড়ের ছবি।

শারীরিক বেদনাগুলি ইংরেজি ভাষায় অর্থবান শব্দ দিয়ে বোঝানো হয়, যেমন : throbbing cutting gnawing pricking ইত্যাদি। এরকম দৈহিক উপলব্ধির ভিন্ন ভিন্ন শব্দ বাংলা ভাষায় নেই। বাংলার আছে ধ্বনি : দব্‌দব্ ঝন্‌ঝন্ টন্‌টন্ কন্‌কন্ কুটকুট কর্‌কর্ তিড়িক্‌তিড়িক্ ঘিন্‌ঘিন্ ঝিম্‌ঝিম্ সুড়্‌সুড়্ সির্‌সির্। এই ধ্বনিগুলির সঙ্গে অনুভূতির কোনোই শব্দগত সাদৃশ্য নেই, তবু এই নিরর্থক শব্দগুলির দ্বারা অনুভূতির যেমন স্পষ্ট ধারণা হয় এমন আর কিছুতেই হতে পারে না।

বাংলা ক্রিয়াপদে আর-এক বিশেষত্ব আছে দুটো ক্রিয়ার জোড় দেওয়া, তাদের মধ্যে অর্থের সংগতি না থাকলেও, যেমন : হয়ে যাওয়া, হয়ে পড়া, হতে থাকা, হয়ে ওঠা ; করে যাওয়া, করে ফেলা, করে তোলা, করে দেওয়া, করে চলা, করে ওঠা, করতে থাকা। হয়ে পড়া, করে ফেলা 'র ভাবটা একই ; একটা অক্রিয়, একটা সক্রিয়। আর-একরকম আছে বিশেষ্যের সঙ্গে ক্রিয়ার কিংবা দুই ক্রিয়ার অসংগত যোগ, যেমন : মার খাওয়া, উঠে পড়া, গাল দেওয়া, বসে যাওয়া, ঘুরে মরা, গিয়ে পড়া, খেয়ে বাঁচা, নেড়ে দেওয়া।

১৯

ক্রিয়াপদে দু রকমের অনুজ্ঞা আছে। এক, উপস্থিত ব্যক্তিকে অনুরোধ বা আদেশ করা। আর, উপস্থিত বা অনুপস্থিত কারও সম্বন্ধে ইচ্ছা প্রকাশ করা, যেমন 'ও করুক'।

হোক যাক চলুক বা করুক প্রভৃতি শব্দগুলিতে ক প্রত্যয় পুরোনো ভাষায় সর্বত্র প্রচলিত ছিল না, যথা : জাউ, মন্দ পবন বহু, উদিত হউ চন্দা, মউরগণ নাদ করু।

পূর্বেই বলেছি বাংলা ভাষার প্রধান লক্ষণ, তার ভঙ্গীর প্রাবল্য। উপরোক্ত শ্রেণীর ক্রিয়াপদে একটা অনর্থক গে শব্দের যোগে যে ইঙ্গিত প্রকাশ করা হয় সেটা সহজ শব্দের দ্বারা হয় না, যথা : হোকগে করুকগে মরুকগে। এতে ঔদাসীন্যে ও ক্ষোভে জড়িয়ে যে ভাবটা ব্যক্ত করে সেটা অন্য ভাষায় সহজে বলা যায় না। কেননা গে শব্দের কোনো অর্থ নেই, ওটা একটা মুদ্রা। 'হোকগে' শব্দের ইংরেজি তর্জমা করতে হলে বলতে হয় : Let it happen, I don't care। ওর সঙ্গে 'তুমিও যেমন' যদি যোগ করা যায় তা হলে ভঙ্গিমা আরও প্রবল হয়ে ওঠে। ইংরেজি বাক্যে হয়তো এর কাছাকাছি যায় : Oh let it be, don't bother। মোটের উপর এই

শব্দভঙ্গীর ভাবখানা এই যে, যা হচ্ছে বা করা হচ্ছে সেটা ভালো নয়, সেটা ক্ষতিকর, বা অপ্রিয়, কিন্তু তবু ওটাকে গ্রাহ্য করার দরকার নেই। 'বঙ্কগে' শব্দে এই ভাবাভঙ্গী খুবই স্পষ্ট হয়েছে। এই ছোট্ট বাংলা শব্দটির ইংরেজি প্রতিবাক্য: Hang it, let it go to the dogs।

ইংরেজিতে সাধারণ ব্যবহারের ক্রিয়াপদ অনুজ্ঞায় প্রায়ই এক মাত্রার হয়, যেমন, run stop cut beat shoot march hold throw। যেখানে যুগ্ম ক্রিয়াপদ ব্যবহার হয় সেখানে এক মাত্রার দুটি শব্দ জোড়া লাগে, যেমন: come in, go out, cut down, stand up, run on ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এইরূপ সংক্ষিপ্ত শব্দে আজ্ঞার জোর পৌঁছয়। স্কাউটের বা ফৌজের কুচকাওয়াজে ইংরেজিতে যে-সব আদেশবাক্য আছে এই কারণে সেগুলো জোরালো হয়। যে-সকল শব্দ ব্যঞ্জনবর্ণে শেষ হয় তারা ধাক্কা দেয় জোরে। stand up শব্দ উভয়ে মিলে দুই মাত্রার বটে কিন্তু তাতে দুই ব্যঞ্জনবর্ণের দুটো ঠোকর আছে।

'দাঁড়াও' শব্দটাও দুই মাত্রার, কিন্তু তার আগাগোড়া স্বরবর্ণ, তাদের স্পর্শ মোলায়েম। কথাটা ধাঁ করে ছোটে না।

'তুই' 'তোরা' বর্গের অনুজ্ঞায় এই দুর্বলতা নেই। বোস্ ওঠ্ ছোট্ থাম্ কাট্ মার্ ধর্ খেল্: এগুলি দৌড়দার শব্দ। আদিকালে ভাষায় 'তু' 'তুই' ছিল একমাত্র মধ্যম-পুরুষের সর্বনাম শব্দ। সেটা যদি চলে আসত তা হলে ক্রিয়াপদকে স্বরবর্ণ এমন নরম করে রাখত না, হসন্ত ব্যঞ্জনবর্ণে তাকে তীক্ষ্ণতা দিত। 'করো' হ'ত 'কর্'। 'কোরো' হ'ত 'করিস'। 'দাঁড়া' শব্দ যদিও স্বরবর্ণ বহন করে তবু 'দাঁড়াও' শব্দের চেয়ে তার মধ্যে প্রভুশক্তি বেশি। 'ঘুমো' আর 'ঘুমোও' তুলনা করলে অনুজ্ঞার দিক থেকে প্রথমোক্তটির প্রবলতা মানতে হয়।

চলতি বাংলা ভঙ্গীপ্রধান ভাষা, তার একটা লক্ষণ ক্রিয়াপদের অনুজ্ঞায় অসংগত ভাবে 'না' শব্দের ব্যবহার। এর কাজ হচ্ছে আদেশ বা অনুরোধকে অনুনয়ে নরম করে আনা।

'হোক না' 'করোই না' ক্রিয়াপদে 'না' শব্দে নির্বন্ধ প্রকাশ পায়, কোনো-এক পক্ষের অনিচ্ছাকে যেন ঠেলে দেওয়া। 'না' শব্দের দ্বারা 'হাঁ' প্রকাশ করা আর প্রথমপুরুষ-বাচক 'আপনি'কে মধ্যমপুরুষের অর্থে ব্যবহার একই মনস্তত্ত্বমূলক। যিনি উপস্থিত আছেন যেন তিনি উপস্থিত নেই, তাঁর সঙ্গে মোকাবিলায় কথা বলার স্পর্ধা বক্তার পক্ষে সম্ভব নয়, এই ভাণের দ্বারাই তাঁর উপস্থিতির মূল্য যায় বেড়ে। তেমনি অনুরোধ জানানোর পরক্ষণেই 'না' বলে তার প্রতিবাদ ক'রে অনুরোধের মধ্যে সম্মানের কাকুতি এনে

দেওয়া হয়। 'না' শব্দের ক্রিয়াপদের রূপ বাংলা ভাষার আর-একটি বিশেষত্ব, যথা : আমি নই, তুমি নও, সে নয়, তিনি নন, আমি নেই, তুমি নেই, সে নেই, তিনি নেই ; হই নে, হও না, হন না, হয় নি, হন নি।

বাংলা ক্রিয়াপদে নানারকম শব্দ-যোজনায় নানারকম ভঙ্গী। তার কতকগুলি সার্থক, কতকগুলি নিরর্থক। ক্রিয়াপদে এতরকম ইশারা বোধ হয় আর-কোনো ভাষায় নেই।

পড়ল বা, করলে বা, শব্দে আশঙ্কার সূচনা। কোনো ক্রিয়াবিশেষণ-যোগে এর ভাবটা প্রকাশ হতে পারত না।

এতে যদি ইকার যোগ করা যায় তাতে আর-একরকম ভঙ্গী এসে পড়ে। হলই বা, করলই বা : এর ভঙ্গীতে সুরের বৈচিত্র্য অনুসারে ক্ষমাও বোঝাতে পারে, স্পর্ধাও বোঝাতে পারে, উপেক্ষাও বোঝাতে পারে।

হল বুঝি, করল বুঝি, হল ব'লে, করল ব'লে : আসন্ন অপ্রিয়তার আশঙ্কা।

হল যে, করল যে : উদ্‌বেগ।

হল তো, করলে তো : অপ্রত্যাশিতের সম্বন্ধে বিস্ময়।

আবার ওকেই প্রশ্নের সুরে বদলিয়ে যদি বলা হয় 'হল তো?' তা হলে জানানো হয় : এখন তো আর কোনো নালিশ রইল না?

হোক না, করুক না, হোক্‌গে, করুক্‌গে, মরুক্‌গে : ঔদাসীন্য।

হলই বা, করলই বা, নাই বা হল, নাহয় হল : স্পর্ধার ভাষা।

হবে বা, হবেও বা : দ্বিধা এবং স্বীকার মিশিয়ে।

হবেই হবে, করবেই করবে : সুনিশ্চিত প্রত্যাশা।

করতেই হবে, হতেই হবে, করাই চাই, হওয়াই চাই : ইচ্ছার জোর প্রয়োগ।

হলেই হল : অর্থাৎ হয় যদি তবে আর-কোনো তর্কের দরকার নেই।

হোক্‌গে ছাই, মরুক্‌গে ছাই : প্রবল ঔদাস্য।

২০

অব্যয়। বাংলা ভাষায় প্রশ্নসূচক অব্যয় সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করেছি।

প্রশ্নসূচক কি শব্দের অনুরূপ আর-একটি 'কি' আছে, তাকে দীর্ঘস্বর দিয়ে লেখাই কর্তব্য। এ অব্যয় নয়, এ সর্বনাম। এ তার প্রকৃত অর্থের প্রয়োজন সেরে মাঝে মাঝে খোঁচা দেবার কাজে লাগে, যেমন : কী তোমার ছিরি, কী-যে তোমার বুদ্ধি।

তিনটি আছে যোজক অব্যয় শব্দ : এবং আর ও। 'এবং' সংস্কৃত শব্দ। এর প্রকৃত অর্থ 'এইমতো'। ইংরেজি and শব্দের অর্থে কতদিন এর ব্যবহার চলেছে জানি নে। পুরোনো কাব্যসাহিত্যে 'এবং' শব্দের দেখা পাই নি। আধুনিক কাব্যসাহিত্যেও এর ব্যবহার নেই বললেই হয়। খাঁটি বাংলা যোজক শব্দ 'আর', হিন্দি 'ঔর'। সংস্কৃত 'অপর' শব্দ থেকে এর উদ্ভব। 'এবং' শব্দ তার অর্থের অসংগতি সত্ত্বেও পুরাতন 'আর'কে সাধু ভাষা থেকে প্রায় তাড়িয়ে দিয়েছে। তাড়ানো সহজ হয়েছে তার প্রধান কারণ, স্বাভাবিক বাংলায় দ্বন্দ্বসমাসেই যোজকের কাজ সারা হয়ে থাকে। আমরা বলি : হাতিঘোড়া লোকলস্কর নিয়ে রাজা চলেছেন। আমরা বলি : চৌকিটেবিল আয়না-আলমারিতে ঘর ঠাসা। ইংরেজিতে উভয় স্থলেই একটা and না বসিয়ে চলে না, যথা : The king marches with his elephants, horses and soldiers। The room is full of chairs, tables, clothes-racks and almirahs।

বাংলায় যদি বলি 'রাস্তা দিয়ে চলেছে হাতি আর ঘোড়া', তা হলে বোঝাবে বিশেষ করে ওরাই চলেছে।

'আর' শব্দের আরও কয়েকটি কাজ আছে, যেমন : আর কত খাবে : অর্থাৎ অতিরিক্ত আরও কত খাবে। আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না : অর্থাৎ পুনশ্চ দেখা হবে না।

তোমাকে আর চালাকি করতে হবে না : এ একটা ভঙ্গিওয়ালা কথা। এই শব্দ থেকে 'আর' শব্দটা বাদ দিলেও চলে, কিন্তু তাতে ঝাঁজ মরে যায়।

সাহিত্যে 'ও' শব্দটা 'এবং' শব্দের সমান পর্যায়ে চলেছে। কিন্তু চলতি ভাষায় 'ও' সংস্কৃত 'চ'এর মতো, যথা : আমি যাচ্ছি তুমিও যাবে, ব্যাঙ যায় ব্যাঙ যায় খল্‌সে বলে আমিও যাব।

এক কালে এই 'ও' ছিল 'হ' রূপে, যেমন : সেহ, এহ বাহ্য, এহ তো মানুষ নয়। এই হ অবিকৃত রূপে বাকি আছে সাধু ভাষায় 'কেহ' শব্দে। চলতি ভাষায় 'কেও' থেকে ক্রমে 'কেউ' হয়েছে। পুরাতন সাহিত্যে 'কেহ' পাওয়া যায়, 'তেঁহ' শব্দটা আজ হয়েছে 'তিনি'। 'ওহ' নেই কিন্তু সাধু ভাষায় 'উহা' আছে। 'যেহ' নেই, আছে 'যাহা'। এই শেষ দুটি বিশেষণ অপ্রাণী সম্পর্কে।

যোজক 'ও'র উৎপত্তি ফার্সি উব (অন্ত্যস্থ ব) শব্দ থেকে, সুতরাং and'এর প্রতিশব্দরূপে এর ব্যবহার অবৈধ নয়। কিন্তু তবু ভাষায় ভালো করে মিশ খায় নি। তুমি ও আমি একসঙ্গেই যাব : এ খাঁটি বাংলা নয়। আমরা সহজে বলি : তুমি আমি

একসঙ্গেই যাব। কেউ কেউ মনে করেন 'অপি' থেকে 'ও' হয়েছে, কিন্তু স্বরবিকারের নিয়ম অনুসারে সেটা সম্ভব কি না সন্দেহ করি।

রাজাও চলেছে সন্ন্যাসীও চলেছে: এ খাঁটি বাংলা। কিন্তু 'রাজা ও সন্ন্যাসী চলেছে' কানে ঠিক লাগে না। সে এগোয়ও না পিছোয়ও না: 'ও' শব্দের এই যথার্থ ব্যবহার। সে এগোয় না ও পিছোয় না: এ বাক্যটা দুর্বল।

তুমিও যেমন, হবেও বা: এ-সব জায়গায় 'ও' ভাষাভঙ্গীর সহায়তা করে।

দেখা যায় 'এবং' শব্দটাকে দিয়ে আমরা অনেক স্থানে and শব্দের অনুকরণ করাই। He has a party of enemies and they vilify him in the newspapers এ বাক্যটা ইংরেজি মতে শুদ্ধ, কিন্তু আমরা যখন ওরই তর্জমা করে বলি 'তাঁর একদল শত্রু আছে এবং ওরা খবরের কাগজে তাঁর নিন্দে করে', তখন বোঝা উচিত এটা বাংলারীতি নয়। আমরা এখানে 'এবং' বাদ দিই। He has enemies and they are subsidised by the government এই বাক্যটা তর্জমা করবার সময় ফস্ করে বলা অসম্ভব নয় যে: তাঁর শত্রু আছে এবং তারা সরকারের বেতন-ভোগী। কিন্তু ওটা ঠিক হবে না, 'এবং' পরিত্যাগ করতে হবে। বাক্যের এক অংশে 'থাকা', আর-এক অংশে 'হওয়া', এদের মাঝখানে 'এবং' মধ্যস্থতা করবার অধিকার রাখে না। তিনি হচ্ছেন পাকা জোচ্চোর, এবং তিনি নোট জাল করেন: ইংরেজিতে চলে, বাংলায় চলে না।

'সে দরিদ্র এবং সে মূর্খ' এ চলে, 'সে চরকা কাটে এবং ধান ভেনে খায়' এও চলে। কারণ প্রথম বাক্যের দুই অংশই অস্তিত্ববাচক, শেষ বাক্যের দুই অংশই কর্তৃত্ববাচক। কিন্তু 'সে দরিদ্র এবং সে ধান ভেনে খায়' এ ভালো বাংলা নয়। আমরা বলি: সে দরিদ্র, ধান ভেনে খায়। ইংরেজিতে অনায়াসে বলা চলে: She is poor and lives by husking rice।

প্রয়োগবিশেষে 'যে' সর্বনামশব্দ ধরে অব্যয়রূপ, যেমন: হরি যে গেল না। 'যে' শব্দ 'গেল না' ব্যাপারটা নির্দিষ্ট করে দিল। তিনি বললেন যে, আজই তাঁকে যেতে হবে: 'তাঁকে যেতে হবে' বাক্যটাকে 'যে' শব্দ যেন বেড়া দিয়ে স্বতন্ত্র করে দিলে। শুধু উক্তি নয়, ঘটনাবিশেষকেও নির্দিষ্ট করা তার কাজ, যেমন: মধু যে রোজ বিকেলে বেড়াতে যায় আমি জানতুম না। মধু বিকেলে বেড়াতে যায়, এই ব্যাপারটা 'যে' শব্দের দ্বারা চিহ্নিত হল।

আর-একটা অব্যয় শব্দ আছে 'ই'। 'ও' শব্দটা মিলন জানায়, 'ই' শব্দ জানায় স্বাতন্ত্র্য। 'তুমিও যাবে', অর্থাৎ মিলিত হয়ে যাবে। 'তুমিই যাবে', অর্থাৎ একলা

যাবে। 'সে যাবেই ঠিক করেছে', অর্থাৎ তার যাওয়াটাই একান্ত। 'ও' দেয় জুড়ে, 'ই' ছিঁড়ে আনে।

বক্রোক্তির কাজেও 'ই'কে লাগানো হয়েছে: কী কাণ্ডই করলে, কী বাঁদরামিই শিখেছ। 'কী শোভাই হয়েছে' ভালোভাবে বলা চলে, কিন্তু মন্দভাবে বলা আরও চলে। এর সঙ্গে 'টা' জুড়ে দিলে তীক্ষ্ণতা আরও বাড়ে, যেমন: কী ঠকানটাই ঠকিয়েছে। আমরা সোজা ভাষায় প্রশংসা করে থাকি: কী চমৎকার, কী সুন্দর। ওর সঙ্গে একটু-আধটু ভঙ্গিমা জুড়ে দিলেই হয়ে দাঁড়ায় বিদ্রূপ।

'তা' শব্দটা কোথাও সর্বনাম কোথাও অব্যয়। তুমি যে না বলে যাবে তা হবে না: এখানে না বলে যাওয়ার প্রতিনিধি হচ্ছে তা, অতএব 'সর্বনাম'। তা, তুমি বরং গাড়ি পাঠিয়ে দিয়ো: এই 'তা' অব্যয় এবং অর্থহীন, না থাকলেও চলে। তবু মনে হয় একটুখানি ঠেলা দেবার জন্যে যেন প্রয়োজন আছে। তা, এক কাজ করলে হয়: একটা বিশেষ কাজের দিকটা ধরিয়ে দিল ঐ 'তা'।

'বুঝি', সহজ অর্থ 'বোধ করি'। অথচ বাংলা ভাষায় 'বুঝি' 'বোধ করি' 'বোধ হচ্ছে' বললে সংশয়যুক্ত অনুমান বোঝায়: লোকটা বুঝি কালা, তুমি বুঝি কলকাতায় যাবে। 'তুমি কি যাবে' এই বাক্যে 'কি' অব্যয়ে সুস্পষ্ট প্রশ্ন। কিন্তু 'তুমি বুঝি যাবে' এই প্রশ্নে যাবে কি না সন্দেহ করা হচ্ছে। বাংলা ভাষায় 'বুঝি' শব্দে বুঝি ভাবটাকে অনিশ্চিত করে রাখে। বুঝির সঙ্গে 'বা' জুড়ে দিলে তাতে অনুমানের সুরটা আরও প্রবল হয়।

যদি, যদি বা, যদিই বা, যদিও বা। যদি অন্যায় কর শাস্তি পাবে: এটা একটা সাধারণ বাক্য। যদি বা অন্যায় ক'রে থাকি: এর মধ্যে একটু ফাঁক আছে, অর্থাৎ না করার সম্ভাবনা নেই-যে তা নয়। যদিই বা অন্যায় করে থাকি: অন্যায় করাটা নিশ্চিত বলে ধরে নিলেও আরও কিছু বলবার আছে। যদিও বা অন্যায় করে থাকি: অন্যায় সত্ত্বেও স্পর্ধা আছে মনে।

'তো' অব্যয়শব্দে অনেক স্থলে 'তবু' বোঝায়, যেমন: বেলায় এলে তো খেলে না কেন। কিন্তু, তুমি তো বলেই খালাস, সে তো হেসেই অজ্ঞান, আমি তো ভালো মনে করেই তাকে ডেকেছিলুম, তুমি তো বেশ লোক, সে তো মস্ত পণ্ডিত—এ-সব স্থলে 'তো' শব্দে একটু ভর্ৎসনার বা বিস্ময়ের আভাস লাগে, যথা: তুমি তো গেলে না, সে তো বসেই রইল, তবে তো দেখছি মাটি হল।

'গো' শব্দের প্রয়োগ সম্বোধনে 'তুমি' বর্গের মানুষ সম্বন্ধে, 'তুই' বা 'আপনি' বর্গের নয়: কেন গো, মশায় গো, কী গো, ওগো শুনে যাও, হাঁ গো তোমার হল কী।

সংস্কৃত 'ভোঃ' শব্দের মতো এর বহুল ব্যবহার নেই। হাঁ গো, না গো: মুখের কথায় চলে; মেয়েদের মুখেই বেশি। ভয় কিংবা ঘৃণা -প্রকাশে 'মা গো'। 'বাবা গো' শুধু ভয়-প্রকাশে। 'শোনো' শব্দের প্রভৃতি 'গো' যোগ দিয়ে অনুরোধে মিনতির সুর লাগানো যায়। 'কী গো' 'কেন গো' শব্দে বিদ্রূপ চলে: কেন গো, এত রাগ কেন; কেন গো, তোমার যে দেখি গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল; কী গো, এত রাগ কেন গো মশায়; কী গো, হল কী তোমার। ভয় বা দুঃখ -প্রকাশে মেয়েদের মুখে 'কী হবে গো', কিংবা অনুনয়ে 'একা ফেলে যেয়ো না গো'। 'হাঁগা' 'কেনে গা' গ্রাম্য ভাষায়।

শুধু 'হে' শব্দ আহ্বান অর্থে সাহিত্যেই আছে। মুখের কথায় চলে 'ওহে'। কিংবা প্রশ্নের ভাবে: কে হে, কেন হে, কী হে। অনুজ্ঞায় 'চলো হে'। মাননীয়দের সম্বন্ধে এই 'ওহে'র ব্যবহার নেই। 'তুমি' 'তোমার' সঙ্গেই এর চল, 'আপনি' বা 'তুই' শব্দের সঙ্গে নয়।

'রে' শব্দ অসম্মানে কিংবা স্নেহপ্রকাশে: হাঁ রে, কেন রে, ওরে বেটা ভূত, ওরে হতভাগা, ওরে সর্বনেশে। এর সম্বন্ধ 'তুই' 'তোরা'র সঙ্গে।

'লো' 'লা' মেয়েদের মুখের সম্বোধন। এও 'তুই' শব্দের যোগে। ভদ্রমহল থেকে ক্রমশ এর চলন গেছে উঠে।

অব্যয় শব্দ আরও অনেক আছে, কিন্তু এইখানেই শেষ করা যাক।

২১

ভাষার প্রকৃতির মধ্যে একটা গৃহিণীপনা আছে। নতুন শব্দ বানাবার সময় অনেক স্থলেই একই শব্দে কিছু মালমসলা যোগ ক'রে কিংবা দুটো-তিনটে শব্দ পাশাপাশি আঁট করে দিয়ে তাদের বিশেষ ব্যবহারে লাগিয়ে দেয়, নইলে তার ভাণ্ডারে জায়গা হত না। এই কাজে সংস্কৃত ভাষার নৈপুণ্য অসাধারণ। ব্যবস্থাবন্ধনের নিয়মে তার মতো সতর্কতা দেখা যায় না। বাংলা ভাষায় নিয়মের খবরদারি যথেষ্ট পাকা নয়, কিন্তু সেও কতকগুলো নির্মাণরীতি বানিয়েছে। তার মধ্যে অনেকগুলোকে সমাসের পর্যায়ে ফেলা যায়, যেমন: চটামেজাজ নাকিসুর তোলাউনুন ভোলামন। এগুলো হল বিশেষ্য-বিশেষণের জোড়। বিশেষণগুলোও ক্রিয়াপদকে প্রত্যয়ের শান দিয়ে বসানো। সেও একটা মিতব্যয়িতার কৌশল। বদমেজাজি ভালোমানুষি তিনমহলা, এগারোহাতি (শাড়ি): এখানে জোড়া শব্দের শেষ অংশীদারের পিঠে ইকারের আকারের ছাপ লাগিয়ে দিয়ে তাকে এক শ্রেণীর বিশেষ্য থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে আর-এক শ্রেণীর বিশেষ্যে। অবশেষে সেই বিশেষ্যের

গোড়ার দিকে বিশেষণ যোগ ক'রে তাকে বিশেষত্ব দিয়েছে। অবিকৃত বিশেষ্য-বিশেষণের মিলন ঘটানো হয়েছে সহজেই ; তার দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক। বিশেষ্যের সঙ্গে বিশেষ্য গেঁথে সংস্কৃত বহুব্রীহি মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ের মতো এক-একটা বাক্যাংশকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। যেমন 'পুজোবাড়ি', অর্থাৎ পুজো হচ্ছে যে বাড়িতে সেই বাড়ি। কাঠকয়লা : কাঠ পুড়িয়ে যে কয়লা হয় সেই কয়লা। হাঁটুজল : হাঁটু পর্যন্ত গভীর যে জল সেই জল। মাটকোঠা : মাটি দিয়ে তৈরি হয়েছে যে কোঠা। দুই বিশেষণের যোগে যে সমাস তারও গ্রন্থি ছাড়িয়ে দিলে অর্থের ব্যাখ্যা বিস্তৃত হয়ে পড়ে ; যেমন : কাঁচামিঠে : কাঁচা তবুও মিষ্টি। বাদশাহি-কুঁড়ে : বাদশার সমতুল্য তার কুঁড়েমি। সেয়ানা-বোকা : লোকটাকে বোকার মতো দেখায় কিন্তু আসলে সেয়ানা। বিশেষ্য এবং ক্রিয়া থেকে বিশেষণ-করা শব্দের যোগ, যেমন : পটলচেরা : অর্থাৎ পটল চিরলে যে গড়ন পাওয়া যায় সেই গড়নের। কাঠঠোকরা : কাঠে যে ঠোকর মারে। চুলচেরা : চুল চিরলে সে যত সূক্ষ্ম হয় তত সূক্ষ্ম।

কিন্তু শব্দরচনায় বাংলা ভাষার নিজের বিশেষত্ব আছে, তার আলোচনা করা যাক।

বাংলা ভঙ্গীওয়ালা ভাষা। ভাবপ্রকাশের এরকম সাহিত্যিক রীতি অন্য কোনো ভাষায় আমার জানা নেই।

অর্থহীন ধ্বনিসমবায়ে শব্দরচনার দিকে এই ভাষায় যে ঝোঁক আছে তার আলোচনা পূর্বেই করেছি। আমাদের বোধশক্তি যে শব্দার্থজালে ধরা দিতে চায় না বাংলা ভাষা তাকে সেই অর্থের বন্ধন থেকে ছাড়া দিতে কুণ্ঠিত হয় নি, আভিধানিক শাসনকে লঙ্ঘন ক'রে সে বোবার প্রকাশ-প্রণালীকেও অঙ্গীকার করে নিয়েছে।

ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলিতে তার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছি। পোকা কিল্‌বিল্‌ করছে : এ বাক্যের ভাবটা ছবিটা কোনো স্পষ্ট ভাষায় বলা যায় না। 'খিট্‌খিটে' শব্দের প্রতিশব্দ ইংরেজিতে আছে irritable, peevish, pettish ; কিন্তু 'খিট্‌খিটে' শব্দের মতো এমন তার জোর নেই। নেশায় চুরচুর হওয়া, কট্‌মট্‌ ক'রে তাকানো, ধপাস্‌ ক'রে পড়া, পা টন্‌ টন্‌ করা, গা ম্যাজ্‌ ম্যাজ্‌ করা : ঠিক এ-সব শব্দের ভাব বোঝানো ধাতুপ্রত্যয়ওয়ালা ভাষার কর্ম নয়। ইংরেজিতে বলে creeping sensation, বাংলায় বলে 'গা ছম্‌ছম্‌ করা' ; আমার তো মনে হয় বাংলারই জিত। গুটিকয়েক রঙের বোধকে ধ্বনি দিয়ে প্রকাশ করায় বাংলা ভাষার একটা আকুতি দেখতে পাওয়া যায় : টুকটুকে, টক্‌টকে, দগ্‌দগে লাল ; ধব্‌ধবে, ফ্যাক্‌ফেকে, ফ্যাট্‌ফেটে সাদা ; মিস্‌মিসে, কুচ্‌কুচে কালো।

বাংলায় শব্দের দ্বিত্ব ঘটিয়ে যে ভাবপ্রকাশের রীতি আছে সেও একটা ইশারার ভঙ্গী, যেমন : টাটকা-টাটকা গরম-গরম শীত-শীত মেঘ-মেঘ জ্বর-জ্বর যাব-যাব উঠি-উঠি। অর্থের অসংগতি, অত্যুক্তি, রূপক-ব্যবহার, তাতেও প্রকাশ হয় ভঙ্গীর চাঞ্চল্য ; অন্য ভাষাতেও আছে, কিন্তু বাংলায় আছে প্রচুর পরিমাণে।

আকাশ থেকে পড়া, মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া, হাড় কালী করে দেওয়া, পিটিয়ে লম্বা করা, ভেসে দেওয়া, গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ানো, নাকে তেল দিয়ে ঘুমোনো, তেলে বেগুনে জ্বলা, পিত্তি জ্বলে যাওয়া, হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি, ঘেন্না পিত্তি, বুদ্ধির ঢেঁকি, পাড়া মাথায় করা, তুলো ধুনে দেওয়া, ঘোল খাইয়ে দেওয়া, হেসে কুরুক্ষেত্র, হাসতে হাসতে পেটের নাড়ি ছেঁড়া, কিল খেয়ে কিল চুরি, আদায় কাঁচকলায়, আহ্লাদে আটখানা : এমন বিস্তর আছে।

বাংলায় অনেক জোড়া শব্দ আছে যার এক অংশে অর্থ, অন্য অংশে নিরর্থকতা। তাতে করে অর্থের চারি দিকে একটা ঝাপসা পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা হয়েছে ; সেই জায়গাটাতে যা তা কল্পনা করবার উপায় থাকে।

আমরা বলি 'ওষুধপত্র'। 'ওষুধ' বলতে কী বোঝায় তা জানা আছে, কিন্তু 'পত্রটা' যে কী তার সংজ্ঞা নির্ণয় করা অসম্ভব। ওটুকু অব্যক্তই রেখে দেওয়া হয়েছে, সুতরাং ওতে অনেক কিছুই বোঝাতে পারে। হয়তো ফীভারমিক্শ্চারের সঙ্গে মকরধ্বজ, ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন, থর্মমীটর, কুইনীনের বড়ি, হোমিয়োপ্যাথি ওষুধের বাক্স। হয়তো তাও নয়। হয়তো কেবলমাত্র দু বোতল ডি-গুপ্ত। এমনি 'মালপত্র' 'দলিল-পত্র' 'বিছানাপত্র' প্রভৃতি শব্দে ব্যক্ত অব্যক্তের যুগলমিলন।

আর-একরকম জোড়মেলানো শব্দ আছে যেখানে দুই ভাগেরই এক মানে, কিংবা প্রায় সমান মানে ; যেমন 'লোকলস্কর'। এই 'লস্কর' শব্দে সব জায়গাতেই যে ফৌজ বোঝাবেই তা নয় ; প্রায় ওতে 'লোক' শব্দের অর্থের সঙ্গে অনির্দিষ্ট লোকসংখ্যের ব্যাপকতা বোঝায়। অন্যরকম করে বলতে গেলে হয়তো বলতুম, হাজার হাজার লোক চলেছে ; অথচ গুণে দেখলে হয়তো আড়াইশো'র বেশি লোক পাওয়া যেত না।

খুব 'চড়চাপড়' লাগালে : ওর মধ্যে চড়টা সুনিশ্চিত, চাপড়টা অনিশ্চিত। ওটা কি তবে একবার গালে চড়, একবার পিঠে চাপড়। খুব সম্ভব তা নয়। তবে কি অনেকগুলো চড়। হতেও পারে।

মারাধরা মারধোর : বর্ণিত ঘটনায় শুধু হয়তো মারাই হয়েছিল কিন্তু ধরা হয় নি। কিন্তু 'মারধোর' শব্দের দ্বারা মারটাকে সুনির্দিষ্ট সীমার বাইরে ব্যাপ্ত করা হল। যে উৎপাতটা ঘটেছিল তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলো এই শব্দে

ইঙ্গিতের মধ্যে সেরে দেওয়া হয়েছে।

'কালিকিষ্টি' এটা একটা ভঙ্গীওয়ালা কথা। শুধু 'কালো' বলে যখন মনে তৃপ্তি হয় না তখন তার সঙ্গে 'কিষ্টি' যোগ করে কালিমাকে আরও অবজ্ঞায় ঘনিয়ে তোলা হয়।

ভাবনাচিন্তা আপদবিপদ কাটাছাঁটা হাঁকডাক শব্দে অর্থের বিস্তার করে। শুধু 'চিন্তা' দুঃখজনক, কিন্তু 'ভাবনাচিন্তা' বিচিত্র এবং দীর্ঘায়িত।

স্বতন্ত্র শব্দে 'আপদ' কিংবা 'বিপদ' বলতে যে বিশেষ ঘটনা বোঝায়, যুক্ত শব্দে ঠিক তা বোঝায় না। 'আপদবিপদ' সমষ্টিগত, ওর মধ্যে অনির্দিষ্টভাবে নানাপ্রকার দুর্যোগের সম্ভাবনার সংকেত আছে।

'ধারধোর' শব্দে ধার করার উপরেও আর কিছু অস্পষ্টভাবে উদ্বৃত্ত থাকে। হয়তো, কাউকে ধ'রে পড়া। রূপক অর্থে শুধু 'ছাই' শব্দে তুচ্ছতা বোঝায় যথেষ্ট, এই অর্থে 'ছাই' শব্দের ব্যবহার হয়ে থাকে, যেমন: কী ছাই বকছ। কিন্তু 'ছাইভস্ম কী যে বকছ', এতে প্রলাপের বহর যেন বড়ো করে দেখানো হয়।

'হাঁড়িকুঁড়ি' শব্দ সংক্ষেপে পাকশালার বহুবিধ আয়োজনের ছবি এনে দেয়। এরকম স্থলে তন্নতন্ন বর্ণনার চেয়ে অস্পষ্ট বর্ণনার প্রভাব বেশি। 'মামলা-মকদ্দমা' শব্দটা ব্রিটিশ আদালতের দীর্ঘপ্রলম্বিত বিপত্তির দ্বিপদী প্রতীক। এইজাতীয় শব্দের কতকগুলি নমুনা দেওয়া গেল: মাথামুণ্ডু মালমসলা গোনাগুন্তি চালচলন বাঁধাছাঁদা হাসিতামাশা বিয়েথাওয়া দেওয়াথোওয়া বেঁটেখাটো পাকাপোক্ত মায়াদয়া ছুটোছাটা কুটোকাটা কাঁটাখোঁচা ঘোরাফেরা নাচাকোঁদা জাঁকজমক গড়াপেটা জানাশোনা চাষাভুষো দাবিদাওয়া অদলবদল ছেলেপুলে নাতিপুতি।

২২

চলতি বাংলায় আর-একটি বিশেষত্ব জানিয়ে দিয়ে এ বই শেষ করি। যাঁরা সাধু ভাষায় গদ্যসাহিত্যকে রূপ দিয়েছিলেন স্বভাবতই তাঁদের হাতে বাক্যবিন্যাসের একটা ধারা বাঁধা হয়েছিল।

তার প্রয়োজন নিয়ে তর্ক নেই। আমার বক্তব্য এই যে, এ বাঁধাবাঁধি বাংলা চলতি ভাষার নয়।

কোথায় গেলেন তোমার দাদা, তোমার দাদা কোথায় গেলেন, গেলেন কোথায় তোমার দাদা, দাদা তোমার গেলেন কোথায়, কোথায় গেলেন দাদা তোমার: প্রথম

পাঁচটি বাক্যে 'গেলেন' ক্রিয়াপদের উপর এবং শেষের বাক্যটিতে 'কোথায়' শব্দের উপর ঝোঁক দিয়ে এই সবকটা প্রয়োগই চলে। আশ্চর্য তোমার সাহস, কিংবা, রেখে দাও তোমার চালাকি, একেবারে ভাসিয়ে দিলে কেঁদে: সাধু ভাষার ছাঁদের চেয়ে এতে আরও বেশি জোর পৌঁছয়। যা থাকে অদৃষ্টে, যা করেন ভগবান, সে প'ড়ে আছে পিছনে: এ আমরা কেবল-যে বলি তা নয়, এইটেই বলি সহজে।

বাংলা ভাষার একটা বিপদ তার ক্রিয়াপদ নিয়ে; 'ইল' 'তেছে' 'ছিল' -যোগে বিশেষ বিশেষ কালবাচক ক্রিয়ার সমাপ্তি। ক্রিয়াপদের এই একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি এড়াবার জন্যে লেখকদের সতর্ক থাকতে হয়। বাংলা বাক্যবিন্যাসে যদি স্বাধীনতা না থাকত তা হলে উপায় থাকত না। এই স্বাধীনতা আছে বটে, কিন্তু তাই বলে স্বৈরাচার নেই। 'ভাসিয়ে একেবারে দিলে কেঁদে' কিংবা 'ভাসিয়ে দিলে একেবারে কেঁদে' বলি নে। 'সে প'ড়ে সবার আছে পিছনে' কিংবা 'রেখে চালাকি দাও তোমার' হবার জো নেই। তার কারণ জোড়া ক্রিয়ার জোড় ভাঙা অবৈধ।

চলতি গদ্যের একটা নমুনা দেওয়া যাক। এতে সাধু গদ্যভাষার বাক্যপদ্ধতি অনেকটা ভেঙে দেওয়া হয়েছে—

> কুঞ্জবাবু চললেন মথুরায়। তাঁর ভাই মুকুন্দ যাবে স্টেশন পর্যন্ত। বৈজু দারোয়ান চলেছে মাঠাকরুনের পাল্কির পাশে পাশে, লম্বা বাঁশের লাঠি হাতে, ছিটের মেরজাই গায়ে, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। ঘর সামলাবার জন্যে রয়ে গেছে ভজু সর্দার। টেমি কুকুরটা ঘুমোচ্ছিল সিমেন্টের বস্তার উপর ল্যাজে মাথা গুঁজে, গোলমাল শুনে ছুটে এল এক লাফে। যত ওরা বারণ করে ততই কেঁই-কেঁই ঘেউ-ঘেউ রবে মিনতি জানায়, ঘন ঘন নাড়ে বোঁচা ল্যাজটা। রেল লাইন থেকে শোনা যাচ্ছে মালগাড়ি আসার শব্দ। ডাকগাড়ি আসতে বাকি আছে বিশ মিনিট মাত্র। বিষম ব্যস্ত হয়ে পড়ল মুকুন্দ; সে যাবে কলকাতার দিকে, আজ সেখানে মোহনবাগানের ম্যাচ। ঐ বুঝি দেখা গেল সিগ্ন্যাল-ডাউন। এ দিকে নামল ঝমাঝম্ বৃষ্টি, তার সঙ্গে জোর হাওয়া। বেহারাগুলো পাল্কি নামালো অশথতলায়। হঠাৎ একটি ভিখিরি মেয়ে ছুটে এসে বললে, 'দরজা খোলো মা, একবার মুখখানি দেখে নিই।' দরজা খুলে চমকে উঠলেন গিন্নিঠাকরুন, 'ওমা, ও কে গো! আমাদের বিনোদিনী যে! কে করলে ওর এ দশা!' কুকুরটা ওকে দেখেই লাফিয়ে উঠল, ওর বুকে দুই পা তুলে কাঁই-কাঁই করতে লাগল আনন্দে। বিনোদিনী একবার তার গলা জড়িয়ে ধরল দুই হাতে, তার পরেই ওকে সরিয়ে দিল, জোরে

ঠেলা দিয়ে। গোলেমালে কোথায় মেয়েটি পালালো ঝড়ের আড়ালে, দেখা গেল না। চারি দিকে সন্ধানে ছুটল লোকজন। বড়োবাবু স্বয়ং হাঁকতে থাকলেন 'বিন্নু বিন্নু', মিলল না কোনো সাড়া। মুকুন্দ রইল তার সেকেণ্ড ক্লাসের গাড়িতে, রুমালে মুখ লুকিয়ে একেবারে চুপ। রেলগাড়ি কখন্ গেল বেরিয়ে। বৃষ্টির বিরাম নেই।

২৩

আমাদের দেহের মধ্যে নানাপ্রকার শরীরযন্ত্রে মিলে বিচিত্র কর্মপ্রণালীর যোগে শক্তি পাচ্ছে প্রাণ সমগ্রভাবে। আমরা তাদের বহন করে চলেছি কিছুই চিন্তা না করে। তাদের কোনো জায়গায় বিকার ঘটলে তবেই তার দুঃখবোধে দেহব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ করে চেতনা জেগে ওঠে।

আমাদের ভাষাকেও আমরা তেমনি দিনরাত্রি বহন করে নিয়ে চলেছি। শব্দপুঞ্জে বিশেষ্যে বিশেষণে সর্বনামে বচনে লিঙ্গে সন্ধিপ্রত্যয়ে এই ভাষা অত্যন্ত বিপুল এবং জটিল। অথচ তার কোনো ভার নেই আমাদের মনে, বিশেষ কোনো চিন্তা নেই। তার নিয়মগুলো কোথাও সংগত কোথাও অসংগত, তা নিয়ে পদে পদে বিচার ক'রে চলতে হয় না।

আমাদের প্রাণশক্তি যেমন প্রতিনিয়ত বর্ণে গন্ধে রূপে রসে বোধের জাল বিস্তার করে চলেছে, আমাদের ভাষাও তেমনি সৃষ্টি করছে কত ছবি, কত রস— তার ছন্দে, তার শব্দে। কত রকমের তার জাদুশক্তি। মানুষ যখন কালের নেপথ্যে অন্তর্ধান করে তখনো তার বাণীর লীলা সজীব হয়ে থাকে ইতিহাসের রঙ্গভূমিতে। আলোকের রঙ্গশালায় গ্রহতারার নাট্য চলেছে অনাদিকাল থেকে। তা নিয়ে বিজ্ঞানীর বিস্ময়ের অন্ত নেই। দেশকালে মানুষের ভাষারঙ্গের সীমা তার চেয়ে অনেক সংকীর্ণ, কিন্তু বাণীলোকের রহস্যের বিস্ময়করতা এই নক্ষত্রলোকের চেয়ে অনেক গভীর ও অভাবনীয়। নক্ষত্রলোকের তেজ বহু লক্ষ তারা চলার পথ পেরিয়ে আজ আমাদের চোখে এসে পৌঁছল ; কিন্তু তার চেয়ে আরও অনেক বেশি আশ্চর্য যে, আমাদের ভাষা নীহারিকাচক্রে ঘূর্ণ্যমান সেই নক্ষত্রলোককে স্পর্শ করতে পেরেছে।

—

আমাকে কোনো ভাষাতাত্ত্বিক অনুরোধ করেছিলেন আমার এই প্রকাশোন্মুখ বইখানিতে আমি যেন ভাষাবিজ্ঞানের ভূমিকা করে কাজ আরম্ভ করি। তার যে উত্তর দিয়েছিলুম নিয়ে তা উদ্‌ধৃত করে দিই। সেটা পড়লে পাঠকেরা বুঝবেন আমার বইখানি তত্ত্বের পরিচয় নিয়ে নয়, রূপের পরিচয় নিয়ে।—

আমার পক্ষে যা সবচেয়ে দুঃসাধ্য তাই তুমি আমাকে ফরমাশ করেছ। অর্থাৎ মানুষের মূর্তির ব্যাখ্যা করবার ভার যে নিয়েছে তাকে তুমি মানুষের শরীরবিজ্ঞানের উপদেষ্টার মঞ্চে চড়াতে চাও। অহংকারে মানুষকে নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে অন্ধ করে— মধুসূদনের কাছে আমার প্রার্থনা এই যে, দর্পহরণ করবার প্রয়োজন ঘটবার পূর্বেই তিনি আমাকে যেন কৃপা করেন। আমার এ গ্রন্থে ব্যাকরণের বন্ধুর পথ একেবারেই এড়াতে পারি নি, প্রতি মুহূর্তে পদস্খলনের আশঙ্কায় কম্পান্বিত আছি। ভয় আছে, পাছে আমার স্পর্ধা দেখে তাত্ত্বিকেরা 'হায় কুষ্টি' 'হায় কুষ্টি' ব'লে বক্ষে করাঘাত করতে থাকেন। কোনো কোনো বিখ্যাত রূপশিল্পী শারীরতত্ত্বের যাথাতথ্যে ভুল করেও চিত্রকলায় প্রশংসিত হয়েছেন, আমার বইখানি যদি সেই সৌভাগ্য লাভ করে তা হলেই ধন্য হব। ১৩।১১।৩৮

—

পথের সঞ্চয়

পথের সঞ্চয়

যাত্রার পূর্বপত্র

মাঠের মাঝখানে এই আমাদের আশ্রমের বিদ্যালয়। এখানে আমরা বড়োয় ছোটোয় একসঙ্গে থাকি, ছাত্র ও শিক্ষকে এক ঘরে শয়ন করি, তেমনি এখানে আরও আমাদের সঙ্গী আছে; আকাশ আলোক এবং বাতাসের সঙ্গেও আমরা কোনো আড়ালের সম্পর্ক রাখি নাই। এখানে ভোরের আলো একেবারে আমাদের চোখের উপর আসিয়া পড়ে, আকাশের তারা একেবারে আমাদের মুখের উপর তাকাইয়া থাকে। ঝড় যখন আসে সে একেবারে দিক্‌প্রান্তে ধুলার উত্তরীয় দুলাইয়া বহু দূর হইতে আমাদের খবর দিতে থাকে। কোনো ঋতু যখন আসন্ন হয় তখন তাহার প্রথম সংবাদটি আমাদের গাছের পত্রে পত্রে প্রকাশিত হয়। বিশ্বপ্রকৃতিকে এক মুহূর্ত আমাদের দ্বারের বাহিরে অপেক্ষা করিতে হয় না।

আমাদের ইচ্ছা পৃথিবীর মানুষের সঙ্গেও আমাদের এমনি একটা যোগ থাকে। সর্বমানুষের ইতিহাসে যে-সমস্ত ঋতু আসে-যায়, সূর্যের যে উদয়াস্ত ঘটে, ঝড়-বাদলের যে মাতামাতি চলে, সমস্তকেই যেন আমরা স্পষ্ট করিয়া এবং বড়ো আকাশের মধ্যে বড়ো করিয়া দেখিতে পাই, ইহাই আমাদের মনের বাসনা। আমরা লোকালয় হইতে দূরে আছি বলিয়াই আমাদের এই সুযোগ আছে। পৃথিবীর সমস্ত সংবাদ এখানে কোনো একটি ছাঁচের মধ্যে আসিয়া পড়িতে পায় না, আমরা ইচ্ছা করিলে তাহাকে অবাধে বিশুদ্ধ রূপে গ্রহণ করিতে পারি।

মানুষের জগতের সঙ্গে আমাদের এই মাঠের বিদ্যালয়ের সম্বন্ধটিকে অবারিত করিবার জন্য পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবার প্রয়োজন অনুভব করি। আমরা সেই বড়ো পৃথিবীর নিমন্ত্রণের পত্র পাইয়াছি। কিন্তু, সেই নিমন্ত্রণ তো বিদ্যালয়ের দুই শো ছাত্র মিলিয়া রক্ষা করিতে যাইতে পারিব না। তাই স্থির করিয়াছিলাম, তোমাদের হইয়া আমি একলাই এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আসিব। আমার একলার মধ্যেই তোমাদের সকলের ভ্রমণ সারিয়া লইব। যখন আবার তোমাদের আশ্রমে ফিরিয়া আসিব তখন বাহিরের পৃথিবীটাকে আমার জীবনের মধ্যে অনেকটা পরিমাণে ভরিয়া আনিতে পারিব।

যখন ফিরিব তখন অবকাশমত অনেক কথা হইবে, এখন বিদায়ের সময় দুই-একটা কথা পরিষ্কার করিয়া যাইতে চাই।

আমাকে অনেকেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি য়ুরোপে ভ্রমণ করিতে যাইতেছ কেন।' এ কথার কী জবাব দিব ভাবিয়া পাই না। ভ্রমণ করাই ভ্রমণ করিতে যাইবার উদ্দেশ্য, এমন একটা সরল উত্তর যদি দিই তবে প্রশ্নকর্তারা নিশ্চয় মনে করিবেন, কথাটাকে নিতান্ত হাল্কারকম করিয়া উড়াইয়া দিলাম। ফলাফল বিচার করিয়া লাভ-লোকসানের হিসাব না ধরিয়া দিতে পারিলে, মানুষকে ঠাণ্ডা করা যায় না।

প্রয়োজন না থাকিলে মানুষ অকস্মাৎ কেন বাহিরে যাইবে, এ প্রশ্নটা আমাদের দেশেই সম্ভব। বাহিরে যাইবার ইচ্ছাটাই যে মানুষের স্বভাবসিদ্ধ, এ কথাটা আমরা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। কেবলমাত্র ঘর আমাদিগকে এত বাঁধনে এমন করিয়া বাঁধিয়াছে, চৌকাঠের বাহিরে পা বাড়াইবার সময় আমাদের এত অযাত্রা, এত অবেলা, এত হাঁচি টিক্‌টিকি, এত অশ্রুপাত যে, বাহির আমাদের পক্ষে অত্যন্তই বাহির হইয়া পড়িয়াছে; ঘরের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। আত্মীয়মণ্ডলী আমাদের দেশে এত নীরন্ধ্র নিবিড় যে, পরের মতো পর আমাদের কাছে আর-কিছুই নাই। এইজন্যই অল্প সময়ের জন্যও বাহির হইতে হইলেও সকলের কাছে আমাদের এত বেশি জবাবদিহি করিতে হয়। বাঁধা থাকিয়া থাকিয়া আমাদের ডানা এমনি বদ্ধ হইয়া গিয়াছে যে, উড়িবার আনন্দ যে একটা আনন্দ, এ কথাটা আমাদের দেশে বিশ্বাসযোগ্য নহে।

অল্প বয়সে যখন বিদেশে গিয়াছিলাম তখন তাহার মধ্যে একটা আর্থিক উদ্দেশ্য ছিল, সিভিল সার্ভিসে প্রবেশের বা বারিস্টার হওয়ার চেষ্টা একটা ভালো কৈফিয়ত— কিন্তু, বাহান্ন বৎসর বয়সে সে কৈফিয়ত খাটে না, এখন কোনো পারমার্থিক উদ্দেশ্যের দোহাই দিতে হইবে।

আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ভ্রমণের প্রয়োজন আছে, এ কথাটা আমাদের দেশের লোকেরা মানিয়া থাকে। সেইজন্য কেহ কেহ কল্পনা করিতেছেন, এ বয়সে আমার যাত্রার উদ্দেশ্য তাহাই। এইজন্য তাঁহারা আশ্চর্য হইতেছেন, সে উদ্দেশ্য য়ুরোপে সাধিত হইবে কী করিয়া। এই ভারতবর্ষের তীর্থে ঘুরিয়া এখানকার সাধু-সাধকদের সঙ্গ লাভ করাই একমাত্র মুক্তির উপায়।

আমি গোড়াতেই বলিয়া রাখিতেছি, কেবলমাত্র বাহির হইয়া পড়াই আমার উদ্দেশ্য। ভাগ্যক্রমে পৃথিবীতে আসিয়াছি, পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় যথাসম্ভব সম্পূর্ণ করিয়া যাইব, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। দুইটা চক্ষু পাইয়াছি, সেই দুটা চক্ষু

বিরাটকে যত দিক দিয়া যত বিচিত্র করিয়া দেখিবে ততই সার্থক হইবে।

তবু এ কথাও আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, লাভের প্রতিও আমার লোভ আছে; কেবল সুখ নহে, এই ভ্রমণের সংকল্পের মধ্যে প্রয়োজনসাধনেরও একটা ইচ্ছা গভীরভাবে লুকানো রহিয়াছে।

আমি মনে করি, য়ুরোপের কেহ যদি যথার্থ শ্রদ্ধা লইয়া ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া যাইতে পারেন তবে তাঁহারা তীর্থভ্রমণের ফললাভ করেন। তেমন য়ুরোপীয়ের সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছে, আমি তাঁহাদিগকে ভক্তি করি।

সে ভক্তির কারণ ইহা নহে যে, আমাদের ভারতবর্ষের মাহাত্ম্য তাঁহাদের শ্রদ্ধার মধ্য দিয়া প্রতিফলিত হইয়া আমাদের কাছে উজ্জ্বল হইয়া দেখা দেয়। তাঁহাদেরই হৃদয়ের শক্তি দেখিয়া আমার মন প্রণত হয়। অপরিচয়ের বাধা ভেদ করিয়া সত্যকে স্বীকার ও কল্যাণকে গ্রহণ করিবার ক্ষমতা সর্বদা দেখিতে পাই না। পরের দেশে না গেলে সত্যের মধ্যে সহজে সঞ্চরণ করিবার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। যাহা অভ্যস্ত তাহাকেই বড়ো সত্য বলিয়া মানা ও যাহা অনভ্যস্ত তাহাকেই তুচ্ছ বা মিথ্যা বলিয়া বর্জন করা, ইহাই দীনাত্মার লক্ষণ।

অনভ্যাসের মন্দিরের কপাট ঠেলিয়া যখন আমরা সত্যকে পূজা দিয়া আসিতে পারি, তখন সত্যের প্রতি ভক্তিকে আমরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। আমাদের সেই পূজা স্বাধীন; আমাদের সেই ভক্তি প্রথার দ্বারা অন্ধভাবে চালিত নহে।

য়ুরোপে গিয়া সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে আমরা সত্যকে প্রত্যক্ষ করিব, এই শ্রদ্ধাটি লইয়া যদি আমরা সেখানে যাত্রা করি তবে ভারতবাসীর পক্ষে এমন তীর্থ পৃথিবীতে কোথায় মিলিবে। ভারতবর্ষে আমি শ্রদ্ধাপরায়ণ যে য়ুরোপীয় তীর্থযাত্রীদিগকে দেখিয়াছি আমাদের দুর্গতি যে তাঁহাদের চোখে পড়ে নাই তাহা নহে, কিন্তু সেই ধুলায় তাঁহাদিগকে অন্ধ করিতে পারে নাই; জীর্ণ আবরণের আড়ালেও ভারতবর্ষের অন্তরতম সত্যকে তাঁহারা দেখিয়াছেন।

য়ুরোপেও যে সত্যের কোনো আবরণ নাই তাহা নহে। সে আবরণ জীর্ণ নহে, তাহা সমুজ্জ্বল। এইজন্যই সেখানকার অন্তরতম সত্যটিকে দেখিতে পাওয়া হয়তো আরও কঠিন। বীর প্রহরীদের দ্বারা রক্ষিত, মণিমুক্তার ঝালরের দ্বারা খচিত, সেই পর্দাটাকেই সেখানকার সকলের চেয়ে মূল্যবান পদার্থ মনে করিয়া আমরা আশ্চর্য হইয়া ফিরিয়া আসিতে পারি— তাহার পিছনে যে দেবতা বসিয়া আছেন তাঁহাকে হয়তো প্রণাম করিয়া আসা ঘটিয়া উঠে না।

সেই পর্দাটাই আছে আর তিনি নাই, এমন একটা অদ্ভুত অশ্রদ্ধা লইয়া যদি সেখানে যাই তবে এই পথ-খরচাটার মতো এতবড়ো অপব্যয় আর কিছুই হইতে পারে না।

য়ুরোপীয় সভ্যতা বস্তুগত, তাহার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা নাই, এই একটা বুলি চারি দিকে প্রচলিত হইয়াছে। যে কারণেই হউক, এইরূপ জনশ্রুতি যখন প্রচার লাভ করিতে আরম্ভ করে তখন তাহার আর সত্য হওয়ার প্রয়োজন থাকে না। পাঁচজনে যাহা বলে ষষ্ঠ ব্যক্তির তাহা উচ্চারণ করিতে বাধে না এবং নানা কণ্ঠের আবৃত্তিই তখন যুক্তির স্থান গ্রহণ করিয়া বসে।

এ কথা গোড়াতেই মনে রাখা দরকার, মানবসমাজে যেখানেই আমরা যে-কোনো মঙ্গল দেখি-না কেন, তাহার গোড়াতেই আধ্যাত্মিক শক্তি আছে। অর্থাৎ, মানুষ কখনোই সত্যকে কল দিয়া পাইতে পারে না, তাহাকে আত্মা দিয়াই লাভ করিতে হয়। য়ুরোপে যদি আমরা মানুষের কোনো উন্নতি দেখি তবে নিশ্চয়ই জানিতে হইবে, সে উন্নতির মূলে মানুষের আত্মা আছে— কখনোই তাহা জড়ের সৃষ্টি নহে। বাহিরের বিকাশে আত্মারই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

য়ুরোপে মানুষ মানবাত্মাকে প্রকাশ করিতেছে না, কেবল জড়বস্তুকেই স্তূপাকার করিতেছে, এ কথাও যা আর যদি বলি 'বনস্পতি কেবল শুকনো পাতা ঝরাইয়া মাটি ছাইয়া ফেলে, সে আপনার জীবনকে প্রকাশ করে না'— তবে সেও তেমনি। বস্তুত, বনস্পতির প্রবল প্রাণশক্তিই প্রচুর পল্লব বর্ষণ করে, অবিশ্রাম পরিত্যক্ত মৃত পত্রে তাহার মৃত্যু প্রমাণ করে না। জীবনই প্রতি মুহূর্তে মরিতে পারে— মৃত্যু যখন বন্ধ হইয়া যায় তখনই যথার্থ মৃত্যু।

য়ুরোপে দেখিতেছি, মানুষ নব নব পরীক্ষা ও নব নব পরিবর্তনের পথে চলিতেছে— আজ যাহাকে গ্রহণ করিতেছে কাল তাহাকে সে ত্যাগ করিতেছে। সে কোথাও চুপ করিয়া থাকিতেছে না। অনেকে বলিয়া থাকেন, ইহাতেই তাহার আধ্যাত্মিকতার অভাব প্রমাণ করে।

বিশ্বজগতেও আমরা কেবলই পরিবর্তন ও মৃত্যু দেখিতেছি। তবু কি এই বিশ্ব সম্বন্ধেই ঋষিরা বলেন নাই যে, আনন্দ হইতেই এই সমস্ত-কিছু উৎপন্ন হইতেছে। অমৃতই কি আপনাকে মৃত্যু-উৎসের ভিতর দিয়া নিরন্তর উৎসারিত করিতেছে না।

বাহিরকেই চরম করিয়া দেখিলে ভিতরকে দেখা হয় না এবং বাহিরকেও সত্যরূপে গ্রহণ করা অসম্ভব হয়। য়ুরোপেরও একটা ভিতর আছে, তাহারও একটা আত্মা আছে, এবং সে আত্মা দুর্বল নহে।

য়ুরোপের সেই আধ্যাত্মিকতাকে যখন দেখিব তখনই তাহার সত্যকে দেখিতে পাইব— তখনই এমন একটি পদার্থকে জানিতে পারিব যাহাকে আত্মার মধ্যে গ্রহণ করা যায়, যাহা কেবল বস্তু নহে, যাহা কেবল বিদ্যা নহে, যাহা আনন্দ।

যে কথাটা আমি বলিবার চেষ্টা করিতেছি তাহা সহজে বুঝিবার মতো একটা ঘটনা সম্প্রতি ঘটিয়াছে। দুই হাজার যাত্রী লইয়া আট্‌লান্টিক সমুদ্রে এক জাহাজ পাড়ি দিতেছিল; সেই জাহাজ অর্ধরাত্রে চলমান হিমশৈলে ঠেকিয়া যখন ডুবিবার উপক্রম করিল তখন অধিকাংশ য়ুরোপীয় ও আমেরিকান যাত্রী নিজের জীবন-রক্ষার প্রতি ব্যাকুলতা প্রকাশ না করিয়া স্ত্রীলোক ও বালকদিগকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই প্রকাণ্ড অপমৃত্যুর অভিঘাতে য়ুরোপের বাহিরের আবরণ সরিয়া যাওয়াতে আমরা এক মুহূর্তে তাহার অন্তরতর মানবাত্মার একটি সত্য মূর্তি দেখিতে পাইয়াছি।

যেমনি দেখিয়াছি অমনি তাহার কাছে মাথা প্রণত করিতে আমাদের আর লজ্জা হয় নাই। অমনি আত্মার পরিচয়ে আত্মার আনন্দ উদারভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

এই ঘটনার অনতিকালের মধ্যে আমাদের কয়েকজন বন্ধু ঢাকা হইতে স্টিমারে করিয়া ফিরিতেছিলেন। স্টিমারের আঘাতে পদ্মার মাঝখানে একটা নৌকা ডুবিয়া গেল, তাহার তিনজন আরোহী জলের মধ্যে পড়িল। অনতিদূরে পাশ দিয়া আর-একখানা নৌকা চলিয়া যাইতেছিল— জাহাজের সকল লোকে মিলিয়া চীৎকার করিয়া উদ্ধারের জন্য তাহার মাঝিকে বিস্তর ডাকাডাকি করিল, সে কর্ণপাত মাত্র না করিয়া চলিয়া গেল; বিপদের কোনো আশঙ্কা ছিল না, নিকটেও সে ছিল, কাজটাকে কোনো-মতেই দুঃসাধ্য বলা চলে না।

আমার আর-একদিনের কথা মনে পড়িল। রাত্রে প্রবল ঝড় হইয়া গিয়াছে। সকালবেলা বাতাসের বেগ কমিয়া গেছে, কিন্তু নদী চঞ্চল। গোয়াই নদীর তীরে আমার বোট বাঁধা; হঠাৎ মনে হইল, নদীর মাঝখান দিয়া স্ত্রীলোকের দেহ ভাসিয়া চলিয়াছে, জলের উপরে চুল এলাইয়া পড়িয়াছে, আর কিছুই দেখা যায় না। ঘাটের কাছে যাহারা ছিল আমি সকলকেই ডাকিয়া বলিলাম, 'আমার ছোটো লাইফ-বোটটি বাহিয়া উহাকে উদ্ধার করিয়া আনো, কী জানি হয়তো বাঁচিয়া আছে।' কেহই অগ্রসর হইল না। আমি বলিলাম, 'যে-কেহ যাইবে প্রত্যেককে আমি পাঁচ টাকা পুরস্কার দিব।' তখনি কয়েকজন লোক নৌকা ভাসাইয়া দিয়া তাহাকে তুলিয়া আনিল, এবং মূর্ছিত স্ত্রীলোকটি ক্রমশ চেতনা লাভ করিল। পুরস্কারের আশা না থাকিলে কেহই যাইত না।

আর-একদিন আমি বোটে করিয়া একটা বড়ো বিল দিয়া আসিতেছিলাম। বিলের জল যেখানে নদীতে আসিয়া পড়ে সেখানে মাছ ধরিবার সুবিধা করিবার জন্য জেলেরা বড়ো বড়ো খোঁটা পুঁতিয়া জলের নির্গমনপথকে সংকীর্ণ করিয়া দেয়, তাহাতে জলধারার বেগ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে; এইরূপ স্থানে অনেক বোঝাই নৌকাকে বিপন্ন হইতে দেখিয়াছি। এই সংকীর্ণ পথ পার হইবার কালে আমার বোট কোনোমতে খোঁটার আঘাত বাঁচাইতে গিয়া ভারি একটি সংকটের জায়গায় আটকাইয়া পড়িল। আট-দশ হাত দূরেই জেলেরা মাছ ধরিতেছিল। আমাদের সাহায্য করিবার জন্য তাহাদিগকে ডাকাডাকি করা গেল, তাহারা তাকাইয়াও দেখিল না। বোটের মাঝি পুরস্কার কবুল করিল। তাহারা ডাক বাড়াইবার প্রত্যাশায় বধিরতার ভাণ করিল। ডাক বাড়িয়া যখন বেশ একটা মোটা অঙ্কে উঠিয়াছে তখন জেলেদের শ্রবণশক্তির বাধা হঠাৎ সম্পূর্ণ দূর হইয়া গেল। অথচ তাহাদেরই কৃতকর্মের ফল আমরা ভোগ করিতে বসিয়াছিলাম; আমাদের দেশের কোনো পাঠককে এ কথা বলা বাহুল্য, যদি হাকিমের বোট হইত তাহা হইলে ইহাদের শ্রুতিশক্তির পরীক্ষায় অন্যরূপ ফল দেখা যাইত।

বোলপুরের বাজারে একটা দোকানে যখন আগুন লাগিয়াছিল তখন তোমাদের মনে আছে, আগুন নিবাইবার কাজে চারজন বিদেশী কাবুলি তোমাদের সাহায্য করিয়াছে; পাড়ার লোককে ডাকিয়া সাড়া পাও নাই। মনে আছে, যাহাদের নিকট কলসী চাহিতে গিয়াছিলে তাহারা, পাছে তাহাদের কলস অপবিত্র হইয়া নষ্ট হয়, এজন্য দিতে চাহিল না।

আমরা আমাদের চারি দিকে এই-যে আত্মত্যাগের কার্পণ্য দেখিতে পাই, দৃষ্টান্ত-বাহুল্যের দ্বারা তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে না। কেননা, আমরা মুখে যে যাহাই বলি-না কেন, অন্তত মনে মনে আমাদের চরিত্রের এই দৈন্য সকলেই স্বীকার করিয়া থাকি।

আত্মত্যাগের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার কি কোনো যোগ নাই। এটা কি ধর্মবলেরই একটা লক্ষণ নহে। আধ্যাত্মিকতা কি কেবল জনসঙ্গ বর্জন করিয়া শুচি হইয়া থাকে এবং নাম জপ করে। আধ্যাত্মিক শক্তিই কি মানুষকে বীর্য দান করে না।

টাইটানিক জাহাজ ডোবার ঘটনায়[১] আমরা এক মুহূর্তে অনেকগুলি মানুষকে মৃত্যুর সম্মুখে উজ্জ্বল আলোকে দেখিতে পাইয়াছি। ইহাতে কোনো-একজন মাত্র মানুষের অসামান্যতা প্রকাশ হইয়াছে এমন নহে। সকলের চেয়ে আশ্চর্য এই যে, যাহারা

১ 'টাইটানিক'-ডুবি: ১৪ এপ্রিল ১৯১২

লক্ষ্মীর ক্রোড়ে লালিত ক্রোড়পতি, যাহারা টাকার জোরে চিরকাল নিজেকে অন্ত-সকলের চেয়ে বেশি বলিয়াই মনে করিয়া আসিয়াছে, ভোগে যাহারা বাধা পায় নাই এবং রোগে বিপদে যাহারা আপনাকে বাঁচাইবার সুযোগ অন্ত-সকলের চেয়ে সহজে লাভ করিয়া আসিয়াছে, তাহারা ইচ্ছা করিয়া দুর্বলকে অক্ষমকে বাঁচিবার পথ ছাড়িয়া দিয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়াছে। এরূপ ক্রোড়পতি এ জাহাজে কেবল এক-আধজন মাত্র ছিল না।

আকস্মিক উৎপাতে মানুষের আদিম প্রবৃত্তিই সভ্য সমাজের সংযম ছিন্ন করিয়া দেখা দিতে চায়, ভাবিবার সময় হাতে পাইলে মানুষ আত্মসম্বরণ করিতে পারে। টাইটানিক জাহাজে অন্ধকার রাত্রে কেহ বা নিদ্রার মধ্যে হঠাৎ জাগিয়া, কেহ বা আমোদ প্রমোদের মধ্য হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া, সম্মুখে অপঘাতমৃত্যুর কালো মূর্তি দেখিতে পাইল। তখন যদি ইহাই দেখা যায়, মানুষ পাগলের মতো হইয়া অক্ষমকে ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছে না, তবে বুঝিতে হইবে, এই বীরত্ব আকস্মিক নয়, ব্যক্তিগত নয়; সমস্ত জাতির বহুদিনের তপস্যার সহিত আধ্যাত্মিক শক্তি ভীষণ পরীক্ষায় মৃত্যুর উপরে জয়লাভ করিল।

এই জাহাজডুবিতে একসঙ্গে নিবিড় করিয়া যে শক্তিকে দেখিয়াছি, য়ুরোপে সেই শক্তিকেই কি নানা দিকে নানা আকারে দেখি নাই। দেশহিতের ও লোকহিতের জন্য সর্বস্বত্যাগ ও প্রাণবিসর্জনের দৃষ্টান্ত কি সেখানে প্রত্যহই হাজার হাজার দেখা যায় না। সেই অজস্রসঞ্চিত পুঞ্জীভূত ত্যাগের দ্বারাই কি য়ুরোপীয় সভ্যতা প্রবাল-দ্বীপের মতো মাথা তুলিয়া উঠে নাই।

কোনো সমাজে যথার্থ কোনো উন্নতিই হইতে পারে না যাহার ভিত্তি দুঃখের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। এই দুঃখকে তাহারাই বরণ করিতে পারে না যাহারা মেটেরিয়ালিস্ট, যাহারা জড়বস্তুর দাস। বস্তুতেই যাহাদের চরম আনন্দ, বস্তুকে তাহারা ত্যাগ করিবে কেন। কল্যাণকে তাহারা আপনার প্রাণের চেয়ে কেন বড়ো করিয়া স্বীকার করিবে। শাস্ত্রবিহিত যে পুণ্যকে মানুষ পারলৌকিক বিষয়সম্পত্তির মতোই জানে সেই স্বার্থপর পুণ্যের জন্যও সে দুঃখস্বীকার করিতে পারে— কিন্তু যে পুণ্য শাস্ত্রবিধির সামগ্রী নহে, যাহা তীর্থযাত্রার দুঃখ নহে, যাহা শুভনক্ষত্রযোগের দান নহে, যাহা হৃদয়ের স্বাধীন প্ররোচনা, সেই দুঃখ, সেই মৃত্যুকে কি কখনো কোনো বস্তু-উপাসক গ্রহণ করিতে পারে।

য়ুরোপে দেশের জন্য, মানুষের জন্য, জ্ঞানের জন্য, প্রেমের জন্য, হৃদয়ের স্বাধীন আবেগে, সেই দুঃখকে, সেই মৃত্যুকে আমরা প্রতিদিনই বরণ করিতে দেখিয়াছি।

ইহার মধ্যে সমস্তটাই খাঁটি নহে, ইহার মধ্যে অনেকটা আছে যাহা বাহাদুরি, কিন্তু সেই অপবাদ দিয়া সত্যকে খর্ব করিবার চেষ্টা করা উচিত নহে। কোনো কোনো রাত্রে চন্দ্রের চারি দিকে একটা জ্যোতির চক্র দেখা যায়। আমরা জানি, তাহা চন্দ্র নহে, তাহা ছায়া, তাহা মিথ্যা। কিন্তু, চন্দ্র মাঝখানে না থাকিলে সেই চন্দ্রের ভাণটুকুও থাকিতে পারে না। সকল সমাজেই যেটি শ্রেষ্ঠ পদার্থ তাহাকে ঘিরিয়া, তাহার আলোক ধার করিয়া লইয়া, একটা ভাণের মণ্ডল সৃজিত হইয়া থাকে। কিন্তু, সেই নকলটা আসলের প্রতিবাদ করে না, তাহারই সমর্থন করে। ভণ্ড সন্ন্যাসীকে দেখিয়া আমাদের দেশের সাধুসন্ন্যাসীকে অবিশ্বাস করিয়া বসিলে ঠকিতে হইবে।

য়ুরোপের যাঁহারা অসামান্য লোক তাঁহাদের কথা আমরা বইয়ে পড়িয়াছি, তাঁহাদিগকে কাছে দেখি নাই। কাছে যে দুই-একজনকে দেখিয়াছি য়ুরোপের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহারা স্থান পান নাই। অনেক দিন হইল একটি সুইডেনের মানুষকে দেখিয়াছিলাম, তাঁহার নাম হামারগ্রেন[১]। তিনি সেই দূরদেশে বসিয়া দৈবক্রমে রামমোহন রায়ের কি একটুকু পরিচয় কোনো একটা বইয়ে পাইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার মনে এমন একটি ভক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাঁহার দারিদ্র্য সত্ত্বেও দেশ ছাড়িয়া তিনি বহু কষ্টে সমুদ্র পার হইয়া এই বাংলাদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানকার ভাষা জানিতেন না, মানুষকে চিনিতেন না, তবু বাঙালির বাড়িতেই আশ্রয় লইয়া এই রামমোহন রায়ের দেশকেই তিনি বরণ করিয়া লইলেন। যে অল্প কয়দিন বাঁচিয়াছিলেন, কী দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিয়া, কী নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে, অথচ কী সম্পূর্ণ নম্রতার মধ্যে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, তিনি এই দেশের হিতের জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা কখনোই ভুলিতে পারিবেন না। নিমতলার ঘাটে তাঁহার মৃতদেহ দাহ করা হইয়াছিল; তদুপলক্ষ্যে, হিন্দুর শ্মশান কলুষিত করা হইল বলিয়া, আমাদের কোনো সাপ্তাহিক পত্র ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিল।

ভগিনী নিবেদিতা[২] স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি ভক্তি বহন করিয়া কিরূপ অদ্ভুত আত্মত্যাগের দ্বারা ভারতবর্ষের নিকট আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

১ দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্র-রচনাবলীর দ্বাদশ খণ্ডে 'বিদেশীয় অতিথি এবং দেশীয় আতিথ্য'

২ দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্র-রচনাবলীর অষ্টাদশ খণ্ডে 'ভগিনী নিবেদিতা'

এই দুই দৃষ্টান্তেই আমরা দেখিয়াছি, এই দুটি ভক্ত এমন স্থানে এমন অবস্থার মধ্যে আত্মদান করিয়াছেন যেখানে তাঁহাদের জীবনের কোনো পূর্বাভ্যস্ত সহজ পথ তাঁহাদের সম্মুখে ছিল না; যেখানে তাঁহাদের হৃদয়মনের আজন্মকালের সংস্কার পদে পদে কঠোর বাধা পাইয়াছে; যেখানে কেবল যে তাঁহারা আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন তাহা নহে, পদে পদে আত্মোৎসর্গের পথ তাঁহাদের নিজেকে খনন করিয়া চলিতে হইয়াছে— কেননা, তাঁহাদের প্রবেশ চারি দিকেই অবরুদ্ধ।

সত্যকে ভক্তি করিবার এই ক্ষমতা, এবং সত্যের জন্য দুর্গম বাধা লঙ্ঘন করিয়া দিনের পর দিন আপনাকে অকুণ্ঠিতভাবে নিঃশেষে দান করিবার এই শক্তি, এ যে তাঁহাদের জাতীয় সাধনা হইতেই তাঁহারা পাইয়াছিলেন। এই আশ্চর্য শক্তি কি বস্তু-উপাসনার সাধনা হইতে কেহ কোনোদিন লাভ করিতে পারে। ইহা কি যথার্থই আধ্যাত্মিক নহে। এবং জিজ্ঞাসা করি, এই শক্তি কি আমাদের দেশে যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাই।

কিন্তু, তাই বলিয়া আমাদের দেশে কি আধ্যাত্মিকতা নাই। আমি তাহা বলি না। এখানেও আধ্যাত্মিকতার একটা দিক প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের দেশের যাঁহারা সাধক তাঁহারা কেহ বা জ্ঞানে, কেহ বা ভক্তিতে অখণ্ডস্বরূপকে সমস্ত খণ্ড-পদার্থের মধ্যে সহজেই স্বীকার করিতে পারেন। এইখানে জ্ঞানের দিকে এবং ভাবের দিকে, অনেক কালের চিন্তায় এবং সাধনায়, তাঁহাদের বাধা অনেক পরিমাণে ক্ষয় হইয়া আসিয়াছে। এইজন্য আমাদের দেশের যাঁহারা সাধুপুরুষ তাঁহারা চিৎলোকে বা হৃদয়ধামে অনন্তের সঙ্গে সহজে যোগ উপলব্ধি করিতে পারেন।

আমাদের দেশের মানবপ্রকৃতিতে এই শক্তিটি দেখিবার জন্য যদি কোনো বিদেশী শ্রদ্ধা ও দৃষ্টিশক্তি লইয়া আসেন তবে নিশ্চয়ই তিনি কৃতার্থ হইবেন, এবং সম্ভবত তিনি আপনার প্রকৃতির ভিতরকার একটা অভাব পূরণ করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন।

আমার বলিবার কথা এই যে, আমাদের মধ্যেও তেমনি পূরণ করিবার মতো একটা অভাব আছে, এবং সেই অভাবই আমাদিগকে দুর্বলতার অবসাদের মধ্যে বহুদিন হইতে আকর্ষণ করিতেছে।

এ কথা শুনিলেই আমাদের দেশাভিমানীরা বলিয়া উঠেন, হাঁ, অভাব আছে বটে, কিন্তু তাহা আধ্যাত্মিকতার নহে, তাহা বস্তুজ্ঞানের, তাহা বিষয়বুদ্ধির— য়ুরোপ তাহারই জোরে পৃথিবীর অন্য-সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, তাহা কোনোমতেই হইতে পারে না। কেবল বস্তুসঞ্চয়ের উপরে কোনো জাতিরই উন্নতি দাঁড়াইতে পারে না এবং কেবল বিষয়বুদ্ধির জোরে

কোনো জাতিই বললাভ করে না। প্রদীপে অজস্র তেল ঢালিতে পারিলেও দীপ জ্বলে না এবং সলিতা পাকাইবার নৈপুণ্যে সুদক্ষ হইয়া উঠিলেও দীপ জ্বলে না— যেমন করিয়াই হউক, আগুন ধরাইতেই হইবে।

আজ পৃথিবীকে য়ুরোপ শাসন করিতেছে বস্তুর জোরে, ইহা অবিশ্বাসী নাস্তিকের কথা। তাহার শাসনের মূল শক্তি নিঃসন্দেহই ধর্মের জোর, তাহা ছাড়া আর কিছু হইতেই পারে না।

বৌদ্ধধর্ম বিষয়াসক্তির ধর্ম নহে, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। অথচ ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়কালে এবং তৎপরবর্তী যুগে সেই বৌদ্ধসভ্যতার প্রভাবে এ দেশে শিল্প বিজ্ঞান বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্যশক্তির যেমন বিস্তার হইয়াছিল এমন আর কোনো কালে হয় নাই।

তাহার কারণ এই, মানুষের আত্মা যখন জড়ত্বের বন্ধন হইতে মুক্ত হয় তখনি আনন্দে তাহার সকল শক্তিই পূর্ণ বিকাশের দিকে উদ্যম লাভ করে। আধ্যাত্মিকতাই মানুষের সকল শক্তির কেন্দ্রগত, কেননা তাহা আত্মারই শক্তি। পরিপূর্ণতাই তাহার স্বভাব। তাহা অন্তর বাহির কোনো দিকেই মানুষকে খর্ব করিয়া আপনাকে আঘাত করিতে চাহে না।

য়ুরোপের যে শক্তি, তাহার বাহ্যরূপ যাহাই হউক-না কেন, তাহার আন্তর রূপ যে ধর্মবল সে সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহমাত্র নাই।

এই তাহার ধর্মবল অত্যন্ত সচেতন। তাহা মানুষের কোনো দুঃখ কোনো অভাবকেই উদাসীনভাবে পাশে ঠেলিয়া রাখিতে পারে না। মানুষের সর্বপ্রকার দুর্গতি মোচন করিবার জন্য নিত্যনিয়তই তাহা দুঃসাধ্য চেষ্টায় নিযুক্ত রহিয়াছে। এই চেষ্টার কেন্দ্রস্থলে যে একটি স্বাধীন শুভবুদ্ধি আছে, যে বুদ্ধি মানুষকে স্বার্থত্যাগ করাইতেছে, আরাম হইতে টানিয়া বাহির করিতেছে এবং অকুণ্ঠিত মৃত্যুর মুখে ডাক দিতেছে, তাহাকে শক্তি জোগাইতেছে কে। কোথায় সেই অমৃত আছে যাহা এই উদার মঙ্গলকামনাকে এমন করিয়া সতেজ রাখিয়াছে।

খৃস্টের জীবনবৃক্ষ হইতে যে ধর্মবীজ য়ুরোপের চিত্তক্ষেত্রে পড়িয়াছে তাহাই সেখানে এমন করিয়া ফলবান হইয়া উঠিয়াছে। সেই বীজের মধ্যে যে জীবনীশক্তি আছে, সেটি কী। সেটি দুঃখকে পরম ধন বলিয়া গ্রহণ করা।

স্বর্গের দয়া যে মানুষের প্রেমে মানুষের সমস্ত দুঃখকে আপনার করিয়া লয়, এই কথাটি আজ বহু শত বৎসর ধরিয়া নানা মন্ত্রে অনুষ্ঠানে সংগীতে য়ুরোপ শুনিয়া আসিতেছে। শুনিতে শুনিতে এই আইডিয়াটি তাহার এমন একটি গভীর মর্মস্থানকে

অধিকার করিয়া বসিয়াছে যাহা চেতনারও অন্তরালবর্তী অতিচেতনার দেশ— সেইখানকার গোপন নিস্তব্ধতার মধ্য হইতে মানুষের সমস্ত বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে— সেই অগোচর গভীরতার মধ্যেই মানুষের সমস্ত ঐশ্বর্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

সেইজন্য আজ য়ুরোপে সর্বদা এই একটা আশ্চর্য ঘটনা দেখিতে পাই, যাহারা মুখে খৃস্টধর্মকে অমান্য করে এবং জড়বাদের জয় ঘোষণা করিয়া বেড়ায় তাহারাও সময় উপস্থিত হইলে ধনে প্রাণে আপনাকে এমন করিয়া ত্যাগ করে, নিন্দাকে দুঃখকে এমন বীরের মতো বহন করে যে, তখনি বুঝা যায়, তাহারা নিজের অজ্ঞাতসারেও মৃত্যুর উপরে অমৃতকে স্বীকার করে এবং সুখের উপরে মঙ্গলকেই সত্য বলিয়া মানে।

টাইটানিক জাহাজে যাঁহারা নিজের প্রাণকে নিশ্চিতভাবে অবজ্ঞা করিয়া পরের প্রাণকে রক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই যে নিষ্ঠাবান ও উপাসনারত খৃস্টান তাহা নহে। এমন-কি তাঁহাদের মধ্যে নাস্তিক বা অজ্ঞেয়িকও কেহ কেহ থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা কেবলমাত্র মতান্তরগ্রহণের দ্বারা সমস্ত জাতির ধর্মসাধনা হইতে নিজেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিবেন কী করিয়া। কোনো জাতির মধ্যে যাঁহারা তাপস তাঁহারা সে জাতির সকলের হইয়া তপস্যা করেন। এইজন্য সেই জাতির পনেরো-আনা মূঢ়ও যদি সেই তাপসদের গায়ে ধুলা দেয় তথাপি তাহারাও তপস্যার ফল হইতে একেবারে বঞ্চিত হয় না।

ভগবানের প্রেমে মানুষের ছোটো বড়ো সমস্ত দুঃখ নিজে বহন করিবার শক্তি ও সাধনা আমাদের দেশে পরিব্যাপ্তভাবে দেখিতে পাই না, এ কথা যতই অপ্রিয় হউক, তথাপি ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। প্রেমভক্তির মধ্যে যে ভাবের আবেগ, যে রসের লীলা, তাহা আমাদের যথেষ্ট আছে; কিন্তু প্রেমের মধ্যে যে দুঃখস্বীকার, যে আত্মত্যাগ, যে সেবার আকাঙ্ক্ষা আছে, যাহা বীর্যের দ্বারাই সাধ্য, তাহা আমাদের মধ্যে ক্ষীণ। আমরা যাহাকে ঠাকুরের সেবা বলি তাহা দুঃখপীড়িত মানুষের মধ্যে ভগবানের সেবা নহে। আমরা প্রেমের রসলীলাকেই একান্তভাবে গ্রহণ করিয়াছি, প্রেমের দুঃখলীলাকে স্বীকার করি নাই।

দুঃখকে লাভের দিক দিয়া স্বীকার করার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা নাই; দুঃখকে প্রেমের দিক দিয়া স্বীকার করাই আধ্যাত্মিকতা। কৃপণ ধনসঞ্চয়ের যে দুঃখ ভোগ করে, পারলৌকিক সম্পত্তির লোভে পুণ্যকামী যে দুঃখব্রত গ্রহণ করে, মুক্তিলোলুপ মুক্তির জন্য যে দুঃখসাধন করে এবং ভোগী ভোগের জন্য যে দুঃখকে বরণ করে তাহা কোনোমতেই পরিপূর্ণতার সাধনা নহে। তাহাতে আত্মার অভাবকেই দৈন্যকেই

প্রকাশ করে। প্রেমের জন্য যে দুঃখ তাহাই যথার্থ ত্যাগের ঐশ্বর্য; তাহাতেই মানুষ মৃত্যুকে জয় করে ও আত্মার শক্তিকে ও আনন্দকে সকলের ঊর্ধ্বে মহীয়ান করিয়া তুলে।

এই দুঃখলীলার ক্ষেত্রেই আমরা আপনাকে ছাড়িয়া বিশ্বকে সত্যভাবে গ্রহণ করিতে পারি। সত্যের মূল্যই এই দুঃখ। এই দুঃখসম্পদই মানবাত্মার প্রধান ঐশ্বর্য। এই দুঃখের দ্বারাই তাহার বল প্রকাশ হয় এবং এই দুঃখের দ্বারাই সে আপনাকে এবং অন্যকে লাভ করে। তাই শাস্ত্রে বলে, নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। অর্থাৎ, দুঃখস্বীকার করিবার বল যাহার নাই সে আপনাকে সত্যভাবে উপলব্ধি করিতে পারে না।

ইহার একটা প্রমাণ এই, আমরা নিজের দেশকে নিজে লাভ করিতে পারি নাই। আমাদের দেশের লোক কেহ কাহারও আপন হইল না, দেশ যাহাকে চায় সে সাড়া দেয় না। এখানকার জনসংখ্যা বড়ো কম নয়, কিন্তু সেই সংখ্যাবহুলতায় তাহার শক্তি প্রকাশ না করিয়া তাহার দুর্বলতাই ব্যক্ত করে।

তাহার প্রধান কারণ এই, আমরা দুঃখের দ্বারা পরস্পরকে আপন করিতে পারি নাই। আমরা দেশের মানুষকে কোনো মূল্য দিই নাই— মূল্য না দিয়া পাইব কী করিয়া। মা আপন গর্ভের সন্তানকেও অহরহ সেবাদুঃখের মূল্য দিয়া লাভ করেন। যাহাকেই আমরা সত্য বলিয়া মনের মধ্যে শ্রদ্ধা করি তাহাকেই এই মূল্য আমরা স্বভাবতই দিয়া থাকি, কাহাকেও তাগিদ করিতে হয় না। চারি দিকের মানুষকে আমরা অন্তরের সহিত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই, তাই আপনাকে আনন্দের সহিত ত্যাগ করিতেও পারিলাম না।

মানুষকে এইরূপ সত্য বলিয়া দেখা, ইহা আত্মার সত্যদৃষ্টি অর্থাৎ প্রেমের দ্বারাই ঘটে। তত্ত্বজ্ঞান যখন বলে 'সর্বভূতই এক', সে একটা বাক্যমাত্র; সেই তত্ত্বকথার দ্বারা সর্বভূতকে আত্মবৎ করা যায় না। প্রেম-নামক আত্মার যে চরম শক্তি, যাহার ধৈর্য অসীম, আপনাকে ত্যাগ করাতেই যাহার স্বাভাবিক আনন্দ, সেই সেবাতৎপর প্রেম নহিলে আর-কিছুতেই পরকে আপন করা যায় না; এই শক্তির দ্বারাই দেশপ্রেমিক পরমাত্মাকে সমস্ত দেশের মধ্যে উপলব্ধি করেন, মানবপ্রেমিক পরমাত্মাকে সমস্ত মানবের মধ্যে লাভ করেন।

য়ুরোপের ধর্ম য়ুরোপকে সেই দুঃখপ্রদীপ্ত সেবাপরায়ণ প্রেমের দীক্ষা দিয়াছে। ইহার জোরেই সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন সহজ হইয়াছে। ইহার জোরেই সেখানে দুঃখতপস্যার হোমাগ্নি নিবিতেছে না এবং জীবনের সকল বিভাগেই শত শত তাপস আত্মাহুতির যজ্ঞ করিয়া সমস্ত দেশের চিত্তে অহরহ তেজ সঞ্চার করিতেছেন।

সেই দুঃসহ যজ্ঞহুতাশন হইতে যে অমৃতের উদ্ভব হইতেছে তাহার দ্বারাই সেখানে শিল্প বিজ্ঞান সাহিত্য বাণিজ্য রাষ্ট্রনীতির এমন বিরাট বিস্তার হইতেছে; ইহা কোনো কারখানাঘরে লোহার যন্ত্রে তৈরি হইতেই পারে না; ইহা তপস্যার সৃষ্টি, এবং সেই তপস্যার অগ্নিই মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তি, মানুষের ধর্মবল।

সেইজন্য দেখিতে পাই, বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষ যখন প্রেমের সেই ত্যাগধর্মকে বরণ করিয়া লইয়াছিল তখনি সমাজে তাহার এমন একটি বিকাশ ঘটিয়াছিল যাহা য়ুরোপে সম্প্রতি দেখিতেছি। রোগীদের জন্য ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা, এমন-কি পশুদের জন্যও চিকিৎসালয় এখানে স্থাপিত হইয়াছিল, এবং জীবের দুঃখ-নিবারণের চেষ্টা নানা আকার ধারণ করিয়া দেখা দিয়াছিল; তখন নিজের প্রাণ ও আরাম তুচ্ছ করিয়া ধর্মাচার্যগণ দুর্গম পথ উত্তীর্ণ হইয়া পরদেশীয় ও বর্বরজাতীয়দের সদ্গতির জন্য দলে দলে এবং অকাতরে দুঃখ বহন করিয়াছেন। ভারতবর্ষে সেদিন প্রেম আপনার দুঃখরূপকে বিকাশ করিয়াই ভক্তগণকে বীর্যবান মহৎ মনুষ্যত্বের দীক্ষা দান করিয়াছিল। সেইজন্যই ভারতবর্ষ সেদিন ধর্মের দ্বারা কেবল আপনার আত্মা নহে, পৃথিবীকে জয় করিতে পারিয়াছিল এবং আধ্যাত্মিকতার তেজে ঐহিক পারত্রিক উন্নতিকে একত্র সম্মিলিত করিয়াছিল। তখন য়ুরোপের খৃস্টান সভ্যতা স্বপ্নের অতীত ছিল। ভারতবর্ষের সেই দুঃখব্রত আত্মত্যাগপরায়ণ প্রেমের উজ্জ্বল দীপ্তি কৃত্রিমতা ও ভাবরসাবেশের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছে, কিন্তু তাহা কি নির্বাপিত হইয়াছে। বাহিরে যদি কোথাও তাহার উদ্‌বোধন দেখিতে পায় তবে আপনাকে কি তাহার আবার আপনি মনে পড়িবে না। আজ যাহা পরের ঘরে বিরাজ করিতেছে তাহাকেই কি তাহার আপনার সামগ্রী বলিয়া চেতনা হইবে না। শক্তির আগুন যেখানে প্রচুর পরিমাণে জলে সেখানে ছাইভস্মও প্রভূত হইয়া উঠে, এ কথা মনে রাখিতে হইবে। নির্জীবতার উত্তাপ অল্প, তাহার দায় সামান্য, তাহার দুর্গতির মূর্তিও অতি প্রশান্ত। অশান্তির ক্ষোভ এবং পাপের প্রচণ্ডতা য়ুরোপীয় সমাজে যেমন প্রত্যক্ষ হয় এমন আমাদের দেশে নহে, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে।

কিন্তু, তাহাকে তাহারা উদাসীনভাবে মানিয়া লয় নাই। তাহা তাহাদের চিত্তকে অভিভূত করে নাই, বরঞ্চ নিয়তই জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছে। ম্যালেরিয়ার বাহন মশা হইতে আরম্ভ করিয়া সমাজের ভিতরকার পাপ পর্যন্ত সকল অসুরের সঙ্গেই সেখানে হাতাহাতি লড়াই চলিতেছে, অদৃষ্টের উপর বরাত দিয়া কেহ বসিয়া নাই; নিজের প্রাণকেও সংকটাপন্ন করিয়া বীরের দল সংগ্রাম করিতেছে। সম্প্রতি London Police Courts -নামক একটি আশ্চর্য বই পড়িতেছিলাম। সেই গ্রন্থে

লণ্ডন-রাজধানীর নীচের অন্ধকার তলায় দারিদ্র্যের মালিন্য ও পাপের পঙ্কিলতা উদ্‌ঘাটিত হইয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই চিত্র যতই নিদারুণ হউক, খৃস্টান তাপসের অদ্ভুত ধৈর্য বীর্য ও করুণাপরায়ণ প্রেম সমস্ত বীভৎসতাকে ছাড়াইয়া উঠিয়া উজ্জ্বল দীপ্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। গীতায় একটি আশার বাণী আছে, স্বল্পপরিমাণ ধর্মও মহৎ ভয় হইতে ত্রাণ করে। কোনো সমাজে সেই ধর্মকে যতক্ষণ সজীব দেখা যায় ততক্ষণ সেখানকার ভূরিপরিমাণ দুর্গতির অপেক্ষাও তাহাকে বড়ো করিয়া জানিতে হইবে।

য়ুরোপে দুর্বল জাতির প্রতি ন্যায়ধর্মের ব্যভিচার দেখা যাইতেছে না এমন নহে, কিন্তু তাহাই একান্ত হইয়া নাই। সেই সঙ্গেই সেই নিষ্ঠুর বলদৃপ্ত লুব্ধতার মধ্য হইতেই ধিক্কার ও ভর্ৎসনা উচ্ছ্বসিত হইতেছে। প্রবলের অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে পারেন এবং প্রতিকার করিতে চাহেন এমন সাহসিক বীরও সেখানে অনেক আছেন। দূরবর্তী পরজাতির পক্ষ অবলম্বন করিয়া নির্যাতন সহ্য করিতে কুণ্ঠিত নহেন, এমন দৃঢ়নিষ্ঠ সাধুব্যক্তির সেখানে অভাব নাই। ভারতবাসীরা স্বদেশের রাজ্যশাসনে প্রশস্ত অধিকার লাভ করেন, সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত গুটিকয়েক ভারতবর্ষীয় আমাদের দেশে আছেন— কিন্তু দীক্ষা তাঁহারা কাহাদের কাছে পাইয়াছেন এবং যথার্থ সহায় তাঁহাদের কে। যাঁহারা আত্মীয়দের বিদ্রূপ ও প্রতিকূলতা স্বীকার করিয়া স্বজাতির স্বার্থপরতার ক্ষেত্রকে সংকীর্ণ করিবার জন্য দেশের লোককে ধর্মের দোহাই দিতেছেন, তাঁহারা কোন্ দেশের মানুষ। তাঁহারা সংখ্যায় অল্প কিন্তু সত্যদৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যাইবে, তাঁহারা সংখ্যায় অল্প নহেন। কেননা, তাঁহাদের মধ্যেই তাঁহাদের শেষ নহে। দেশের মধ্যে গোচর এবং অগোচর তাঁহাদের একটি পরম্পরা আছে; তাঁহারা সকলেই এক কাজ করিতেছেন বা এক সময়ে আছেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহারাই সমাজের ভিতরকার ন্যায়শক্তি। তাঁহারাই ক্ষত্রিয়; পৃথিবীর সমস্ত দুর্বলকে ক্ষয় হইতে ত্রাণ করিবার জন্য তাঁহারা সহজ কবচ ধারণ করিয়াছেন। দুঃখ হইতে মানুষকে উদ্ধার করিবার জন্য যিনি দুঃখ বহন করিয়াছিলেন, মৃত্যু হইতে মানুষকে অমৃতলোকে লইয়া যাইবার জন্য যিনি মৃত্যু স্বীকার করিয়াছেন, সেই তাঁহাদের স্বর্গীয় গুরুর অপমানিত রক্তাক্ত দুর্গম পথে তাঁহারা সারি সারি চলিয়াছেন। সমস্ত জাতির চিত্তপ্রান্তরের মাঝখান দিয়া তাঁহারাই অমৃতমন্দাকিনীর ধারা।

আমরা সর্বদাই নিজেকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিয়া থাকি যে, আমরা ধর্মপ্রাণ আধ্যাত্মিক জাতি, বাহিরের বিষয়ে আমাদের মনোযোগ নাই; এইজন্যই বহির্বিষয়েই আমরা দুর্বল হইয়াছি। বাহিরের দৈন্য সম্বন্ধে আমাদের লজ্জাকে এমনি করিয়া আমরা

খর্ব করিতে চাই। আমাদের অনেকেই মুখে আস্ফালন করিয়া বলিয়া থাকেন, দারিদ্র্যই আমাদের ভূষণ।

ঐশ্বর্যকে অধিকার করিবার শক্তি যাহাদের আছে দারিদ্র্য তাহাদেরই ভূষণ। যে ভূষণের কোনো মূল্য নাই তাহা ভূষণই নহে। এইজন্ত ত্যাগের দারিদ্র্যই ভূষণ, অভাবের দারিদ্র্য ভূষণ নহে; শিবের দারিদ্র্যই ভূষণ, অলক্ষ্মীর দারিদ্র্য কদর্য। যাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না বলিয়া নিয়ত অবসাদে মলিন, যাহারা কোনোমতে প্রাণ বাঁচাইতে চায় অথচ প্রাণ বাঁচাইবার কঠিন উপায় গ্রহণ করিবার শক্তি নাই বলিয়া যাহারা বারবার ধুলায় লুটাইয়া পড়ে, দরিদ্র বলিয়াই যাহারা সুযোগ পাইলে অন্ত দরিদ্রকে শোষণ করে এবং অক্ষম বলিয়াই ক্ষমতা পাইলে যাহারা অন্ত অক্ষমকে আঘাত করে, কখনোই দারিদ্র্য তাহাদের ভূষণ নহে।

আমাদের এই-যে দুঃখ দারিদ্র্য অপমান ইহাকে কোনোমতেই আমাদের ধর্মপ্রাণতার পুরস্কার বলিয়া আমরা আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করিতে পারি নাই; তাহাকে ব্যক্তিগত ভক্তিসাধনার মধ্যে বদ্ধ করিয়াছি, তাহার আহ্বানে সমস্ত মানুষকে একত্র করি নাই; যেখানে সমাজশাসনের অন্ধ উৎপাতের দ্বারা বিধিবিধানের পাথরের জাঁতায় মানুষের বিচারশক্তি ও স্বাধীন মঙ্গলবুদ্ধিকে পিষিয়া সমস্তকে একাকার করিয়াছি সেইখানেই ধর্মবোধের সংকীর্ণতা ও অচেতনতাই আমাদিগকে জড়পিণ্ড করিয়া দাসত্বের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে। আমরা এখনো মনে করিতেছি, আইনের দ্বারা আমাদের দুর্গতির প্রতিকার হইবে, রাষ্ট্রশাসনসভায় আসন লাভ করিলে আমরা মানুষ হইয়া উঠিব— কিন্তু জাতীয় সদ্‌গতি কলের সামগ্রী নহে, এবং মানুষের আত্মা যতক্ষণ আপনার ভিতর হইতে তাহার পুরা মূল্য চুকাইয়া দিবার জন্ত প্রস্তুত হইতে না পারিবে ততক্ষণ, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

তাই বলিতেছিলাম, তীর্থযাত্রার মানস করিয়াই যদি য়ুরোপে যাইতে হয় তবে তাহা নিষ্ফল হইবে না। সেখানেও আমাদের গুরু আছেন; সে গুরু সেখানকার মানবসমাজের অন্তরতম দিব্যশক্তি। সর্বত্রই গুরুকে শ্রদ্ধার গুণে সন্ধান করিয়া লইতে হয়; চোখ মেলিলেই তাঁহাকে দেখা যায় না। সেখানেও সমাজের যিনি প্রাণপুরুষ, অন্ধতা ও অহংকার -বশত তাঁহাকে না দেখিয়া ফিরিয়া আসা অসম্ভব নহে; এবং এমন একটা অদ্ভুত ধারণা লইয়া আসাও আশ্চর্য নহে যে— ইংলণ্ডের প্রতাপ পার্লামেন্টের দ্বারা সৃষ্ট হইতেছে— য়ুরোপের ঐশ্বর্য কারখানাঘরে প্রস্তুত হইতেছে এবং পাশ্চাত্য মহাদেশের সমস্ত মাহাত্ম্য যুদ্ধের অস্ত্র, বাণিজ্যের জাহাজ এবং বাষ্পযন্ত্রপুঞ্জের দ্বারা সংঘটিত। নিজের মধ্যে শক্তির সত্য অনুভূতি যাহার নাই অতি সহজেই সে মনে

করিয়া বসে, শক্তি বাহিরেই আছে এবং যদি কোনো সুযোগে আমরাও কেবলমাত্র ঐ জিনিসগুলা দখল করিতে পারি তাহা হইলেই আমাদের অভাবপূরণ হয়। কিন্তু, যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্— এ কথাটি য়ুরোপেরও অন্তরের কথা। য়ুরোপও নিশ্চয়ই জানে, রেলে টেলিগ্রাফে কলে কারখানায় সে বড়ো নহে। এইজন্যই য়ুরোপ বীরের ন্যায় সত্যব্রত গ্রহণ করিয়াছে ; বীরের ন্যায় সত্যের জন্য ধনপ্রাণ উৎসর্গ করিতেছে ; এবং যতই ভুল করিতেছে, যতই ব্যর্থ হইতেছে, ততই দ্বিগুণতর উৎসাহের সহিত নূতন করিয়া উদ্যোগ আরম্ভ করিতেছে— কিছুতেই হাল ছাড়িয়া দিতেছে না। মাঝে মাঝে অমঙ্গল দেখা দিতেছে, সংঘাতে সংঘর্ষে বহ্নি জ্বলিয়া উঠিতেছে, সমুদ্রমন্থনে মাঝে মাঝে বিষও উদ্‌গীর্ণ হইতেছে, কিন্তু মন্থকে তাহারা কোনোমতেই মানিয়া লইতেছে না। অস্ত্র তাহাদের প্রস্তুত, সৈন্যদল তাহাদের নির্ভীক, এবং সত্যের দীক্ষায় তাহারা মৃত্যুঞ্জয়ী বল লাভ করিয়াছে। সত্যের সম্মুখীন হইতে আমরা আলস্য করিয়াছি, সত্যের সাধনায় আমরা উদাসীন, আমরা ঘরগড়া বাঁধা-বাঁধনের মধ্যে আপাদমস্তক আপনাকে জড়াইয়া তাহাকেই সত্য আশ্রয় বলিয়া কল্পনা করিয়াছি। সেইজন্য বিপদের দিন যখন আসন্ন হয়, সত্য পন্থা ব্যতীত যখন আমাদের আর গতি নাই, তখন আমরা কিছুতেই আপনাকে জাগ্রত করিতে পারি না, আপনাকে ত্যাগ করিতে পারি না। তখনো খেলা করাকেই কাজ করা মনে করি, নকল করিয়াই আসলের ফল প্রত্যাশা করি, কৃত্রিম উৎসাহকে উদ্দীপ্ত রাখিতে পারি না, আরব্ধ কর্মকে শেষ করিতে পারি না এবং ভূরিপরিমাণ তাত্ত্বিকতা ও ভাবুকতার জালে জড়িত হইয়া বারম্বার ব্যর্থ হইতে থাকি। সেইজন্য সত্যের দায়িত্বকে বীরের ন্যায় সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করিবার দীক্ষা, সেই সত্যের প্রতি অবিচলিত প্রাণান্তিক নিষ্ঠা, জীবনের সমস্ত শ্রেষ্ঠ সম্পদকে প্রাণপণ দুঃখের মূল্য দিয়া অর্জন করিবার সাধনা, এবং বুদ্ধি হৃদয় ও কর্মে সকল দিক দিয়া মানুষের কল্যাণসাধন ও মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা দ্বারা ভগবানের দুঃসাধ্য সেবাব্রত গ্রহণ করিবার জন্য তীর্থযাত্রীর পক্ষে য়ুরোপে যাত্রা কখনোই নিষ্ফল হইতে পারে না। অবশ্য, যদি তাহার মনে শ্রদ্ধা থাকে এবং সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণতাকেই যদি সে আধ্যাত্মিক সাফল্যের সত্য পরিচয় বলিয়া বিশ্বাস করে।

আমি জানি, য়ুরোপের সঙ্গে এক জায়গায় আমাদের স্বার্থের সংঘাত ঘটিয়াছে এবং সেই সংঘাতে আমাদিগকে অন্তরে বাহিরে অনেক স্থলে গভীর বেদনা পাইতে হইতেছে। সে বেদনা আমাদের আধ্যাত্মিক দৈন্যেরই দুঃখ এবং আমাদের পুঞ্জিত পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত হইলেও তাহা বেদনা। আমাদের পক্ষে এই বেদনার উপলক্ষ্য যাহারা তাহাদের ক্ষুদ্রতা ও নিষ্ঠুরতার পরিচয় আমরা নানা আকারে পাইয়া থাকি।

ইহাও আমরা প্রতিদিন দেখিয়াছি, তাহারা নিজের নীচতাকে উদ্ধত কপটতার দ্বারা গোপন করিয়াছে ও পরজাতীয়ের মাহাত্ম্যকে অজ্ঞতা ও অহংকারের দ্বারা অস্বীকার করিয়াছে। এই কারণেই আমাদের সেই ক্ষতবেদনা লইয়া য়ুরোপের সত্যকে দেখিতে ও তাহাকে গ্রহণ করিতে আমরা অন্তরের মধ্যে বাধা পাইয়া থাকি। তাহাদের ধর্মকেও আমরা অবিশ্বাস করি ও তাহাদের সভ্যতাকে আমরা বস্তুজালজড়িত স্থূল-পদার্থ বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকি। শুধু তাহাই নহে, আমাদের ভয় আছে, পাছে প্রবলের প্রবলতাকেই আমরা সত্যের আসন দিয়া তাহার পূজা করি ও তাহার কাছে ধূলিলুণ্ঠিত হইয়া আপনাকে অপবিত্র করি; পাছে অন্যের গৌরবকে নিজের গৌরবের সহিত গ্রহণ করিতে না পারি; পাছে আত্ম-অবিশ্বাসের অবসাদে নিজের সত্যকে বিসর্জন দিয়া অনুকরণের শূন্যতার মধ্যে পরের কায়ার ছায়া ও পরের ধ্বনির প্রতিধ্বনি হইয়া জগৎ-সংসারে নিজেকে একেবারে ব্যর্থ করিয়া দিই; পাছে এইরূপ একটা অদ্ভুত ভ্রম করিয়া বসি যে, অন্যকে স্বীকার করিতে গিয়া নিজেকে অস্বীকার করিয়া বসাই যথার্থ ঔদার্যের পন্থা।

এই-সমস্ত বিঘ্নবিপদ আছে; সেইজন্যই এই পথে সত্যসন্ধানের যাত্রা তীর্থযাত্রা। সমস্ত অসত্যকে উত্তীর্ণ হইয়াই চলিতে হইবে; বাধার দুঃখকে সহ্য করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে; আত্ম-অভিমানের ব্যর্থ বোঝাকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে হইবে, অথচ আত্মগৌরবের পাথেয়কে একান্ত যত্নে রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। বস্তুত, অত্যন্ত বিঘ্নের দ্বারাই আমরা এই তীর্থযাত্রার পূর্ণ ফললাভের আশা করিতে পারি; কারণ যাহা সহজে পাই তাহা সচেতন হইয়া গ্রহণ করি না; অথচ কোনো মহৎ লাভের যথার্থ সফলতাই চেতনার পূর্ণতর বিকাশ, অর্থাৎ, আমরা যাহা-কিছু সত্যভাবে লাভ করি তাহার দ্বারা আপনাকেই সত্যতররূপে উপলব্ধি করি— তাহা যদি না করি, যদি বাহিরের বস্তুকেই বাহিরে পাই, তবে তাহা মায়া, তাহা মিথ্যা।

বোম্বাই শহর

বোম্বাই শহরটার উপর একবার চোখ বুলাইয়া আসিবার জন্য কাল বিকালে বাহির হইয়াছিলাম। প্রথম ছবিটা দেখিয়াই মনে হইল, বোম্বাই শহরের একটা বিশেষ চেহারা আছে; কলিকাতার যেন কোনো চেহারা নাই, সে যেন যেমন-তেমন করিয়া জোড়াতাড়া দিয়া তৈরি হইয়াছে।

আসল কথা, সমুদ্র বোম্বাই শহরকে আকার দিয়াছে, নিজের অর্ধচন্দ্রাকৃতি বেলাভূমি দিয়া তাহাকে আঁকড়িয়া ধরিয়াছে। সমুদ্রের আকর্ষণ বোম্বাইয়ের সমস্ত রাস্তা-গলির ভিতর দিয়া কাজ করিতেছে। আমার মনে হইতেছে, যেন সমুদ্রটা একটা প্রকাণ্ড হৃৎপিণ্ড, প্রাণধারাকে বোম্বাইয়ের শিরা-উপশিরার ভিতর দিয়া টানিয়া লইতেছে এবং ভরিয়া দিতেছে। সমুদ্র চিরদিন এই শহরটিকে বৃহৎ বাহিরের দিকে মুখ করিয়া রাখিয়া দিয়াছে।

প্রকৃতির সঙ্গে কলিকাতার মিলনের একটি বন্ধন ছিল গঙ্গা। এই গঙ্গার ধারাই সুদূরের বার্তাকে সুদূর রহস্যের অভিমুখে বহিয়া লইয়া যাইবার খোলা পথ ছিল। শহরের এই একটি জানালা ছিল যেখানে মুখ বাড়াইলে বোঝা যাইত, জগৎটা এই লোকালয়ের মধ্যেই বদ্ধ নহে। কিন্তু, গঙ্গার প্রাকৃতিক মহিমা আর রহিল না, তাহাকে দুই তীরে এমনি আঁটাসাঁটা পোশাক পরাইয়াছে, এবং তাহার কোমরবন্ধ এমন কষিয়া বাঁধিয়াছে যে, গঙ্গাও লোকালয়েরই পেয়াদার মূর্তি ধরিয়াছে, গাধাবোট বোঝাই করিয়া পাটের বস্তা চালান করা ছাড়া তাহার যে আর-কোনো বড়ো কাজ ছিল তাহা আর বুঝিবার জো নাই। জাহাজের মাস্তুলের কণ্টকারণ্যে মকরবাহিনীর মকরের শুঁড় কোথায় লজ্জায় লুকাইল।

সমুদ্রের বিশেষ মহিমা এই যে, মানুষের কাজ সে করিয়া দেয় কিন্তু দাসত্বের চিহ্ন সে গলায় পরে না। পাটের কারবার তাহার বিশাল বক্ষের নীলকান্ত মণিটিকে ঢাকিয়া ফেলিতে পারে না। তাই এই শহরের ধারে সমুদ্রের মূর্তিটি অক্লান্ত; যেমন এক দিকে সে মানুষের কাজকে পৃথিবীময় ছড়াইয়া দিতেছে তেমনি আর-এক দিকে সে মানুষের শ্রান্তি হরণ করিতেছে, ঘোরতর কর্মের সম্মুখেই বিরাট একটি অবকাশকে মেলিয়া রাখিয়াছে।

তাই আমার ভারি ভালো লাগিল যখন দেখিলাম, শত শত নরনারী সাজসজ্জা করিয়া সমুদ্রের ধারে গিয়া বসিয়াছে। অপরাহ্নের অবসরের সময় সমুদ্রের ডাক কেহ অমান্য করিতে পারে নাই। সমুদ্রের কোলের কাছে ইহাদের কাজ, এবং সমুদ্রের কোলের কাছে ইহাদের আনন্দ। আমাদের কলিকাতার শহরে এক ইডেন-গার্ডেন আছে, কিন্তু সে কৃপণের ঘরের মেয়ে, তাহার কণ্ঠে আহ্বান নাই। সেই রাজপুরুষের তৈরি বাগান— সেখানে কত শাসন, কত নিষেধ। কিন্তু, সমুদ্র তো কাহারও তৈরি নহে, ইহাকে তো বেড়িয়া রাখিবার জো নাই। এইজন্য সমুদ্রের ধারে বোম্বাই শহরের এমন নিত্যোৎসব। কলিকাতার কোথাও তো সেই অসংকোচ আনন্দের একটুকু স্থান নাই।

সবচেয়ে যাহা দেখিয়া হৃদয় জুড়াইয়া যায় তাহা এখানকার নরনারীর মেলা। নারীবর্জিত কলিকাতার দৈন্যটা যে কতখানি তাহা এখানে আসিলেই দেখা যায়। কলিকাতায় আমরা মানুষকে আধখানা করিয়া দেখি, এইজন্য তাহার আনন্দরূপ দেখি না। নিশ্চয়ই সেই না-দেখার একটা দণ্ড আছে।

নিশ্চয়ই তাহা মানুষের মনকে সংকীর্ণ করিতেছে, তাহার স্বাভাবিক বিকাশ হইতে বঞ্চিত করিতেছে। অপরাহ্ণে স্ত্রীপুরুষ ও শিশুরা সমুদ্রের ধারে একই আনন্দে মিলিত হইয়াছে, সত্যের এই একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক শোভা না দেখিতে পাওয়ার মতো ভাগ্যহীনতা মানুষের পক্ষে আর-কিছুই হইতে পারে না। যে দুঃখ আমাদের অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে তাহা আমাদিগকে অচেতন করিয়া রাখে, কিন্তু তাহার ক্ষতি প্রত্যহই জমা হইতে থাকে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। ঘরের কোণের মধ্যে আমরা নরনারী মিলিয়া থাকি, কিন্তু সে মিলন কি সম্পূর্ণ। বাহিরে মিলিবার যে উদার বিশ্ব রহিয়াছে সেখানে কি সরল আনন্দে একদিনও আমাদের পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ হইবে না।

আমাদের গাড়ি ম্যাথেরান পাহাড়ের উপরে একটা বাগানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ছোটো বাগানটিকে বেষ্টন করিয়া চারি দিকে বেঞ্চ পাতা। সেখানেও দেখি কুলস্ত্রীরা আত্মীয়দের সঙ্গে বসিয়া বায়ুসেবন করিতেছেন। কেবল পার্সি রমণী নহে, কপালে-সিঁদুরের-ফোঁটা-পরা মারাঠি মেয়েরাও বসিয়া আছেন— মুখে কেমন প্রশান্ত প্রসন্নতা। নিজের অস্তিত্বটা যে একটা বিষম বিপদ, সেটাকে চারি দিকের দৃষ্টি হইতে কেমন করিয়া ঠেকাইয়া রাখা যায়, এ ভাবনা লেশমাত্র তাঁহাদের মনে নাই। মনে মনে ভাবিলাম, সমস্ত দেশের মাথার উপর হইতে কত বড়ো একটা সংকোচের বোঝা নামিয়া গিয়াছে এবং তাহাতে এখানকার জীবনযাত্রা আমাদের চেয়ে কত দিকে সহজ ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীর মুক্ত বায়ু ও আলোকে সঞ্চরণ করিবার সহজ অধিকারটি লোপ করিয়া দিলে মানুষ নিজেই নিজের পক্ষে কিরূপ একটা অস্বাভাবিক বিঘ্ন হইয়া উঠে, তাহা আমাদের দেশের মেয়েদের সর্বদা সসংকোচ অসহায়তা দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। রেলোয়ে স্টেশনে আমাদের মেয়েদের দেখিলে, তাহাদের প্রতি সমস্ত দেশের বহুকালের নিষ্ঠুরতা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। ম্যাথেরানের এই বাগানে ঘুরিতে ঘুরিতে আমাদের বীডন-পার্ক্ ও গোলদিঘিকে মনে করিয়া দেখিলাম— তাহার সে কী লক্ষ্মীছাড়া কৃপণতা।

প্রজাপতির দল যখন ফুলের বনে মধু খুঁজিয়া ফেরে তখন তাহারা যে বাবুয়ানা করিয়া বেড়ায় তাহা নহে, বস্তুত তখন তাহারা কাজে ব্যস্ত। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা

আপিসে যাইবার কালো আচকান পরে না। এখানকার জনতায় বেশভূষায় যখন নানা রঙের সমাবেশ দেখি তখন আমার সেই কথা মনে পড়ে। কাজকর্মের ব্যস্ততাকে গায়ে পড়িয়া শ্রীহীন করিয়া তুলিবার যে কোনো একান্ত প্রয়োজন আছে আমার তো তাহা মনে হয় না। ইহাদের পাগড়িতে, পাড়ে, মেয়েদের শাড়িতে, যে বর্ণচ্ছটা দেখিতে পাই তাহাতে একটা জীবনের আনন্দ প্রকাশ পায় এবং জীবনের আনন্দকে জাগ্রত করে। বাংলাদেশ ছাড়াইয়া তাহার পরে অনেক দূর হইতে আমি এইটেই দেখিতে দেখিতে আসিয়াছি। চাষা চাষ করিতেছে কিন্তু তাহার মাথায় পাগড়ি এবং গায়ে একটা মের্‌জাই পরা। মেয়েদের তো কথাই নাই। আমাদের সঙ্গে এখানকার বাহিরের এই প্রভেদটি আমার কাছে সামান্য বলিয়া ঠেকিল না। কারণ, এই প্রভেদটুকু অবলম্বন করিয়া ইহাদের প্রতি আমার মনে একটি শ্রদ্ধার সঞ্চার হইল। ইহারা নিজেকে অবজ্ঞা করে না; পরিচ্ছন্নতা দ্বারা ইহারা নিজেকে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। এটুকু মানুষের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কর্তব্য; এইটুকু আবরণ, এইটুকু সজ্জা প্রত্যেকের না থাকিলে মানুষের রিক্ততা অত্যন্ত কুশ্রী হইয়া দেখা দেয়। আপনার সমাজকে কুদৃশ্য দীনতা হইতে প্রত্যেকেই যদি রক্ষার চেষ্টা না করে তবে কত বড়ো একটা শৈথিল্য সমস্ত দেশকে বিশ্বের চক্ষে অপমানিত করিয়া রাখে, তাহা অভ্যাসের অসাড়তা-বশতই আমরা বুঝিতে পারি না।

আর-একটা জিনিস বোম্বাই শহরে অত্যন্ত বড়ো করিয়া চোখে পড়িল। সে এখানকার দেশী লোকের ধনশালিতা। কত পার্সি মুসলমান ও গুজরাটি বণিকদের নাম এখানকার বড়ো বড়ো বাড়ির গায়ে খোদা দেখিলাম। এত নাম কলিকাতায় কোথাও দেখা যায় না। সেখানকার ধন চাকরিতে ও জমিদারিতে; এইজন্য তাহা বড়ো ম্লান। জমিদারির সম্পদ বদ্ধ জলের মতো; তাহা কেবলই ব্যবহারে ক্ষীণ ও বিলাসে দূষিত হইতে থাকে। তাহাতে মানুষের শক্তির প্রকাশ দেখি না; তাহাতে ধনাগমের নব নব তরঙ্গলীলা নাই। এইজন্য আমাদের দেশে যেটুকু ধনসম্পদ আছে তাহার মধ্যে অত্যন্ত একটা ভীরুতা দেখি। মাড়োয়ারি পার্সি গুজরাটি পাঞ্জাবিদের মধ্যে দানে মুক্তহস্ততা দেখিতে পাই, কিন্তু বাংলাদেশ সকলের চেয়ে অল্প দান করে। আমাদের দেশের চাষার খাতা আমাদের দেশের গোরুর মতো— তাহার চরিবার স্থান নাই বলিলেই হয়। ধন জিনিসটাকে আমাদের দেশ সচেতনভাবে অনুভব করিতেই পারিল না, এইজন্য আমাদের দেশের কৃপণতাও কুশ্রী, বিলাসও বীভৎস। এখানকার ধনীদের জীবনযাত্রা সরল অথচ ধনের মূর্তি উদার, ইহা দেখিয়া আনন্দবোধ হয়।

জলস্থল

আমরা ডাঙার মানুষ, কিন্তু আমাদের চারি দিকে সমুদ্র। জল এবং স্থল এই দুই বিরোধী শক্তির মাঝখানে মানুষ। কিন্তু, মানুষের প্রাণের মধ্যে এ কী সাহস। যে জলের কূল দেখিতে পাই না মানুষ তাহাকেও বাধা বলিয়া মানিল না, তাহার মধ্যে ভাসিয়া পড়িল।

যে জল মানুষের বন্ধু সেই জল ডাঙার মাঝখান দিয়াই বহে। সেই নদীগুলি ডাঙার ভগিনীদের মতো। তাহারা কত দূরের পাথর-বাঁধা ঘাট হইতে কাঁখে করিয়া জল লইয়া আসে; তাহারাই আমাদের তৃষ্ণা দূর করে, আমাদের অন্নের আয়োজন করিয়া দেয়। কিন্তু, আমাদের সঙ্গে সমুদ্রের এ কী বিষম বিরোধ। তাহার অগাধ জলরাশি সাহারার মরুভূমির মতোই পিপাসায় পরিপূর্ণ। আশ্চর্য, তবু সে মানুষকে নিরস্ত করিতে পারিল না। সে যমরাজের নীল মহিষটার মতো কেবলই শিঙ তুলিয়া মাথা ঝাঁকাইতেছে, কিন্তু কিছুতেই মানুষকে পিছু হঠাইতে পারিল না।

পৃথিবীর এই দুইটা ভাগ— একটা আশ্রয়, একটা অনাশ্রয়; একটা স্থির, একটা চঞ্চল; একটা শান্ত, একটা ভীষণ। পৃথিবীর যে সন্তান সাহস করিয়া এই উভয়কেই গ্রহণ করিতে পারিয়াছে সেই তো পৃথিবীর পূর্ণ সম্পদ লাভ করিয়াছে। বিঘ্নের কাছে যে মাথা হেঁট করিয়াছে, ভয়ের কাছে যে পাশ কাটাইয়া চলিয়াছে, লক্ষ্মীকে সে পাইল না। এইজন্য আমাদের পুরাণকথায় আছে, চঞ্চলা লক্ষ্মী চঞ্চল সমুদ্র হইতে উঠিয়াছেন, তিনি আমাদের স্থির মাটিতে জন্মগ্রহণ করেন নাই।

বীরকে তিনি আশ্রয় করিবেন, লক্ষ্মীর এই পণ। এইজন্যই মানুষের সামনে তিনি প্রকাণ্ড এই ভয়ের তরঙ্গ বিস্তার করিয়াছেন। পার হইতে পারিলে তবে তিনি ধরা দিবেন। যাহারা কূলে বসিয়া কলশব্দে ঘুমাইয়া পড়িল, হাল ধরিল না, পাল মেলিল না, পাড়ি দিল না, তাহারা পৃথিবীর ঐশ্বর্য হইতে বঞ্চিত হইল।

আমাদের জাহাজ যখন নীল সমুদ্রের ক্রুদ্ধ হৃদয়কে ফেনিল করিয়া, সগর্বে পশ্চিম-দিগন্তের কূলহীনতার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন এই কথাটাই আমি ভাবিতে লাগিলাম। স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম, য়ুরোপীয় জাতিরা সমুদ্রকে যেদিন বরণ করিল সেইদিনই লক্ষ্মীকে বরণ করিয়াছে। আর, যাহারা মাটি কামড়াইয়া পড়িল তাহারা আর অগ্রসর হইল না, এক জায়গায় আসিয়া থামিয়া গেল।

মাটি যে বাঁধিয়া রাখে। সে অতি স্নেহশীলা মাতার মতো সন্তানকে কোনোমতে দূরে যাইতে দেয় না। শাক-ভাত তরি-তরকারি দিয়া পেট ভরিয়া খাওয়ায়, তাহার

পরে ঘনছায়াতলে শ্যামল অঞ্চলের উপর ঘুম পাড়াইয়া দেয়। ছেলে যদি একটু ঘরের বাহির হইতে চায় তবে তাহাকে অবেলা অযাত্রা প্রভৃতি জুজুর ভয় দেখাইয়া শান্ত করিয়া রাখে।

কিন্তু, মানুষের যে দূরে যাওয়া চাই। মানুষের মন এত বড়ো যে, কেবল কাছটুকুর মধ্যে তাহার চলাফেরা বাধা পায়। জোর করিয়া সেইটুকুর মধ্যে ধরিয়া রাখিতে গেলেই, তাহার অনেকখানি বাদ পড়ে। মানুষের মধ্যে যাহারা দূরে যাইতে পাইয়াছে তাহারাই আপনাকে পূর্ণ করিতে পারিয়াছে। সমুদ্রই মানুষের সম্মুখবর্তী সেই অতিদূরের পথ; দুর্লভের দিকে, দুঃসাধ্যের দিকে সেই তো কেবলই হাত তুলিয়া তুলিয়া ডাক দিতেছে। সেই ডাক শুনিয়া যাহাদের মন উতলা হইল, যাহারা বাহির হইয়া পড়িল, তাহারাই পৃথিবীতে জিতিল। ঐ নীলাম্বুরাশির মধ্যে কৃষ্ণের বাঁশি বাজিতেছে, কূল ছাড়িয়া বাহির হইবার জন্য ডাক।

পৃথিবীর একটা দিকে সমাপ্তির চেহারা, আর-একটা দিকে অসমাপ্তির। ডাঙা তৈরি হইয়া গিয়াছে; এখনো তাহার মধ্যে যেটুকু ভাঙাগড়া চলিতেছে তাহার গতি মৃদুমন্দ, চোখে পড়েই না। সেটুকু ভাঙাগড়ারও প্রধান কারিগর জল। আর, সমুদ্রের গর্ভে এখনো সৃষ্টির কাজ শেষ হয় নাই। সমুদ্রের মজুরি করে যে-সকল নদনদী তাহারা দূর দূরান্তর হইতে ঝুড়ি ঝুড়ি কাদা বালি মাথায় করিয়া আনিতেছে। আর, কত লক্ষ লক্ষ শামুক ঝিনুক প্রবালকীট এই রাজমিস্ত্রির সৃষ্টির উপকরণ অহোরাত্র জোগাইয়া দিতেছে। ডাঙার দিকে দাঁড়ি পড়িয়াছে, অন্তত সেমিকোলন; কিন্তু সমুদ্রের দিকে সমাপ্তির চিহ্ন নাই। দিগন্তব্যাপী অনিশ্চয়তার চিরচঞ্চল রহস্যান্ধকারের মধ্যে কী যে ঘটিতেছে, তাহার ঠিকানা কে জানে। অশান্ত এবং অশ্রান্ত এই সমুদ্র; অনন্ত তাহার উদ্যম।

পৃথিবীর মধ্যে যে জাতি এই সমুদ্রকে বিশেষভাবে বরণ করিয়াছে তাহারা সমুদ্রের এই কূলহীন প্রয়াসকে আপন চরিত্রের মধ্যে পাইয়াছে। তাহারাই এমন কথা বলিয়া থাকে, কোনো-একটা চরম পরিণাম মানবজীবনের লক্ষ্য নহে; কেবল অবিশ্রাম-ধাবমান গতির মধ্যেই আপনাকে প্রসারিত করিয়া চলাই জীবনের উদ্দেশ্য। তাহারা অনিশ্চিতের মধ্যে নির্ভয়ে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কেবলই নব নব সম্পদকে আহরণ করিয়া আনিতেছে। তাহারা কোনো-একটা কোণে বাসা বাঁধিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। দূর তাহাদিগকে ডাকে; দুর্লভ তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতে থাকে। অসন্তোষের ঢেউ দিবারাত্রি হাজার হাজার হাতুড়ি পিটাইয়া তাহাদের চিত্তের মধ্যে কেবলই ভাঙাগড়ায় প্রবৃত্ত আছে। রাত্রি আসিয়া যখন সমস্ত জগতের চোখে পলক টানিয়া দেয় তখনো তাহাদের

কারখানাঘরের দীপচক্ষু নিমেষ ফেলিতে জানে না। ইহারা সমাপ্তিকে স্বীকার করিবে না; বিশ্রামের সঙ্গেই ইহাদের হাতাহাতি লড়াই।

আর, ডাঙার যাহারা বাসা বাঁধিয়াছে তাহারা কেবলই বলে, 'আর নহে, আর দরকার নাই।' তাহারা যে কেবল ক্ষুধার খাদ্যটাকে সংকীর্ণ করিতে চাহে তাহা নহে, তাহারা ক্ষুধাটাকে সুদ্ধ মারিয়া নিকাশ করিয়া দিতে চায়। তাহারা যেটুকু পাইয়াছে তাহাকেই কোনোমতে স্থায়ী করিবার উদ্দেশে কেবলই চারি দিকে সুনিশ্চিতের সনাতন বেড়া বাঁধিয়া তুলিতেছে। তাহারা মাথার দিব্য দিয়া বলিতেছে, 'আর যাই কর, কোনোমতে সমুদ্র পার হইতে চেষ্টা করিয়ো না। কেননা সমুদ্রের হাওয়া যদি লাগে, অনিশ্চিতের স্বাদ যদি পাও, তবে মানুষের মনের মধ্যে অসন্তোষের যে একটা নেশা আছে তাহাকে আর কে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে।' সেই অপরিচিত নূতনের রাগিণী লইয়া কালো সমুদ্রের বাঁশির ডাক কোনো-একটা উতলা হাওয়ায় যাহাতে ঘরের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিতে না পারে, সেইজন্য কৃত্রিম প্রাচীরগুলাকে যত সমুচ্চ করা সম্ভব সেই চেষ্টাই কেবল চলিতেছে।

কিন্তু, এই সমুদ্র ও ডাঙার স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়া, তাহার বিরোধ ঘুচাইবার দিন আসিয়াছে বলিয়া মনে করি। এই দুয়ে মিলিয়াই মানুষের পৃথিবী। এই দুয়ের মধ্যে বিচ্ছেদকে জাগাইয়া রাখিলেই, মানুষের যত-কিছু বিপদ। তবে এতদিন এই বিচ্ছেদ চলিয়া আসিতেছে কেন। সে কেবল ইহারা হরগৌরীর মতো তপস্যার দ্বারা পরস্পরকে পাইবে বলিয়াই। ঐ-যে এক দিকে স্থাণু দিগম্বরবেশে সমাধিস্থ হইয়া বসিয়া আছেন, আর-এক দিকে গৌরী নব নব বসন্তপুষ্পে আপনাকে সাজাইয়া তুলিতেছেন— স্বর্গের দেবতারা ইহাদেরই শুভযোগের অপেক্ষা করিয়া আছেন, নহিলে কোনো মঙ্গল-পরিণাম জন্মলাভ করিবে না।

আমরা ডাঙার লোকেরা ভগবানের সমাপ্তির দিককেই সত্য বলিয়া আশ্রয় করিয়াছি তাহাতে ক্ষতি হইত না; কিন্তু আমরা তাঁহার ব্যাপ্তির দিকটাকে একেবারেই মিথ্যা বলিয়া, মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছি। সত্যকে এক অংশে মিথ্যা বলিলেই তাহাকে অপরাংশেও মিথ্যা করিয়া তোলা হয়। আমরা স্থিতিকে আনন্দকে মানিলাম, কিন্তু শক্তিকে দুঃখকে মানিলাম না। তাই আমরা রানীকে অপমান করাতে রাজার দ্বারে কঁদিয়াও রক্ষা পাইলাম না; সত্য আমাদিগকে শত শত বৎসর ধরিয়া নানা আঘাতেই মারিতেছেন।

সমুদ্রের লোকেরা ভগবানের ব্যাপ্তির দিকটাকেই একেবারে একান্ত সত্য করিয়া ধরিয়া বসিয়া আছে। তাহারা সমাপ্তিকে কোনোমতেই মানিবে না, এই তাহাদের

পণ। এইজন্য বাহিরের দিকে তাহারা যেমন কেবলই আহরণ করিতেছে অথচ সন্তোষ নাই বলিয়া কিছুকেই লাভ করিতেছে না, তেমনি তত্ত্বজ্ঞানের দিকেও তাহারা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, সত্যের মধ্যে গম্যস্থান বলিয়া কোনো পদার্থই নাই, আছে কেবল গমন। কেবলই হইয়া উঠা, কিন্তু কী যে হইয়া উঠা তাহার কোনো ঠিকানা কোনো-খানেই নাই। ইহা এমন একটি সমুদ্রের মতো যাহার কূলও নাই, তলও নাই, আছে কেবল ঢেউ— যাহা পিপাসাও মেটায় না, ফসলও ফলায় না, কেবলই দোলা দেয়।

আমরা দেখিলাম আনন্দকে, আর দুঃখকে বলিলাম মিথ্যা মায়া; উহারা দেখিল দুঃখকে, আর আনন্দকে বলিল মিথ্যা মায়া। কিন্তু, পরিপূর্ণ সত্যের মধ্যে তো কোনোটাই বাদ পড়িতে পারে না; পূর্ব পশ্চিম সেখানে না মিলিলে পূর্বও মিথ্যা হয় পশ্চিমও মিথ্যা হয়। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে— অর্থাৎ আনন্দ হইতেই এই সমস্ত-কিছু জন্মিতেছে— এ কথা যেমন সত্য, 'স তপোঽতপ্যত' অর্থাৎ তপস্যা হইতে, দুঃখ হইতেই সমস্ত-কিছু সৃষ্ট হইতেছে, এ কথা তেমনি সত্য। গায়কের চিত্তে দেশকালের অতীত গানের পূর্ণ আনন্দও যেমন সত্য আবার দেশকালের ভিতর দিয়া গান গাহিয়া প্রকাশ করিবার বেদনাও তেমনি সত্য। এই আনন্দ এবং দুঃখ, এই সমাপ্তি ও ব্যাপ্তি, এই চিরপুরাতন এবং চিরনূতন, এই ধনধান্যপূর্ণ ভূমি ও দুঃখাশ্রুচঞ্চল সমুদ্র, উভয়কে মিলিত করিয়া স্বীকার করাই সত্যকে স্বীকার করা।

এইজন্য দেখিতেছি, যাহারা চরমকে না মানিয়া কেবল বিকাশকেই মানিতেছে তাহারা উন্মত্ত হইয়া উঠিয়া অপঘাতমৃত্যুর অভিমুখে ছুটিতেছে, পদে পদেই তাহাদের জাহাজ কেবল আকস্মিক বিপ্লবের চোরা পাহাড়ের উপর গিয়া ঠেকিতেছে। আর যাহারা বিকাশকে মিথ্যা বলিয়া কেবলমাত্র চরমকেই মানিতে চায়, তাহারা নির্বীর্য ও জীর্ণ হইয়া এক শয্যায় পড়িয়া অভিভূত হইয়া মরিতেছে।

কিন্তু, চলিতে চলিতে একদিন ঐ ডাঙার গাড়ি এবং সমুদ্রের জাহাজ যখন একই বন্দরে আসিয়া পৌঁছিবে এবং দুই পক্ষের মধ্যে পণ্যবিনিময় হইবে তখনি উভয়ে বাঁচিয়া যাইবে। নহিলে কেবলমাত্র আপনার পণ্য দিয়া কেহ আপনার দারিদ্র্য ঘুচাইতে পারে না; বিনিময় না করিতে পারিলে বাণিজ্য চলে না এবং বাণিজ্য না চলিলে লক্ষ্মীর দেখা পাওয়া যায় না।

এই বাণিজ্যের যোগেই মানুষ পরস্পর মিলিবে বলিয়াই, পৃথিবীতে ঐশ্বর্য দিকে দিকে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। একদা জীবরাজ্যে স্ত্রীপুরুষের বিভাগ ঘটাতেই যেমন দেখিতে দেখিতে বিচিত্র সুখদুঃখের আকর্ষণের ভিতর দিয়া প্রাণীদের প্রাণসম্পদ আজ আশ্চর্যরূপে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তেমনি মানুষের প্রকৃতিও কেহ বা দিকে কেহ

বা গতিকে বিশেষভাবে আশ্রয় করাতেই আজ আমরা এমন একটি মিলনকে আশা করিতেছি, মানুষের সত্যতাকে যাহা বিচিত্রভাবে সার্থক করিয়া তুলিবে।

আরব্-সমুদ্র
১৬ জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩১৯

সমুদ্রপাড়ি

বন্দর পার হইয়া জাহাজে গিয়া উঠিলাম। আরও অনেকবার জাহাজে চড়িয়াছি। প্রত্যেক বারেই প্রথমটা কেমন মনের মধ্যে একটা সংকোচ উপস্থিত হয়। সে সংকোচ অপরিচিত স্থানে অপরিচিত মানুষের মধ্যে প্রবেশ করিবার সংকোচ নহে। জাহাজটার সঙ্গে নিজের জীবনের বিচ্ছেদ অত্যন্ত বেশি করিয়া অনুভব করি। এ জাহাজ যাহারা গড়িয়াছে, যাহারা চালাইতেছে, তাহারাই এ জাহাজের প্রভু— আমি টাকা দিয়া টিকিট কিনিয়া এখানে স্থান পাইয়াছি। এই সমুদ্রের চিহ্নহীন পথের উপর দিয়া কত বংশ ধরিয়া ইহাদের কত নাবিক আপনার জীবনের অদৃশ্য রেখা রাখিয়া গিয়াছে; বারম্বার কত শত মৃত্যুর দ্বারা তবে এই পথ ক্রমে সরল হইয়া উঠিতেছে। আমি যে আজ এই জাহাজে দিনে নির্ভয়ে আহার বিহার করিতেছি ও রাত্রে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছি, এই নির্ভয়তা কি শুধু টাকা দিয়া কিনিবার জিনিস। ইহার পশ্চাতে স্তরে স্তরে কত চিন্তা কত সাহসের সঞ্চয় সমুচ্চ হইয়া রহিয়াছে; সেখানে আমাদের কোনো অর্ঘ জমা হয় নাই।

যখন এই ইংরেজ স্ত্রীপুরুষদের দেখি, তাহারা ডেকের উপর খেলিতেছে, ঘুমাইতেছে, হাস্যালাপ করিতেছে, তখন আমি দেখিতে পাই— ইহারা তো কেবলমাত্র জাহাজের উপরে নাই, ইহারা স্বজাতির শক্তির উপর নির্ভর করিয়া আছে। ইহারা নিশ্চয় জানে যাহা করিবার তাহা করা হইয়াছে এবং যাহা করিবার তাহা করা হইবে, সেজন্য ইহাদের সমস্ত জাতি জামিন রহিয়াছে। যদি প্রাণসংশয়-সংকট উপস্থিত হয় তবে কেবল যে কাপ্তেন আছে তাহা নহে, ইহাদের সমস্ত জাতির প্রকৃতিগত উদ্যম ও নিরলস সতর্কতা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। ইহারা সেই দৃঢ় ক্ষেত্রের উপর এমন প্রফুল্লমুখে প্রসন্নচিত্তে সঞ্চরণ করিতেছে, চারি দিকের তরঙ্গের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিতেছে না। এই জায়গায় ইহারা নিজেরা যাহা দিয়াছে তাহাই পাইতেছে— আর আমরা যাহা দিই নাই তাহাই লইতেছি; সুতরাং সমুদ্র পার হইতে হইতে দেনা রাখিয়া রাখিয়া যাইতেছি। তাই জাহাজে

ডেকের উপরে ইংরেজ যাত্রীদের সঙ্গে একত্র মিলিয়া বসিতে আমার মন হইতে কিছুতে সংকোচ ঘুচিতে চায় না।

ডাঙায় বসিয়া অনেক বিলাতি জিনিস ব্যবহার করিয়া থাকি, সেজন্য মনের মধ্যে এমনতরো দৈন্য বোধ হয় না; জাহাজে আমরা আরও যেন কিছু বেশি লইতেছি। এ তো শুধু কলকারখানা নয়, সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আছে। জাহাজ যাহারা চালাইতেছে তাহারা নিজের সাহস দিয়া, শক্তি দিয়া পার করিতেছে; তাহাদের যে মনুষ্যত্বের উপর ভর দিয়া আছি নিজেদের মধ্যে তাহারই যদি কোনো পরিচয় থাকিত তবে যে টাকাটা দিয়া টিকিট কিনিয়াছি তাহার ঝমঝমানির সঙ্গে অন্য মূল্যের আওয়াজটাও মিশিয়া থাকিত। আজ মনের মধ্যে এই বড়ো একটা বেদনা বাজে যে, উহারা প্রাণ দিয়া চালাইতেছে আর আমরা টাকা দিয়া চলিতেছি, ইহার মাঝখানে যে একটা প্রকাণ্ড সমুদ্র পড়িয়া রহিল তাহা আমরা কবে কোন্‌ কালে পার হইতে পারিব! এখনো আরম্ভ করা হয় নাই, এখনো অকাতরে কত প্রাণ দেওয়া বাকি রহিয়াছে— এখনো কত বন্ধন ছিঁড়িতে হইবে, কত সংস্কার দলিতে হইবে, সে কথা যখন ভাবি তখন বুঝিতে পারি, আজ গোটাকয়েক খবরের কাগজের নৌকা বানাইয়া তাহারই খেলার পালের উপর আমরা যে বক্তৃতার ফুঁ লাগাইতেছি তাহাতে আমাদের কিছুই হইবে না।

কূলকিনারার বন্ধন ছাড়াইয়া একেবারে নীল সমুদ্রের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছি। ভয় ছিল, ডাঙার জীব সমুদ্রের দোলা সহিতে পারিব না— কিন্তু, আরব-সমুদ্রে এখনো মৈসুমের মাতামাতি আরম্ভ হয় নাই। কিছু চঞ্চলতা নাই তাহা নহে, কারণ, পশ্চিমের উজান হাওয়া বহিয়াছে, জাহাজের মুখের উপর ঢেউয়ের আঘাত লাগিতেছে, কিন্তু এখনো তাহাতে আমার শরীরের অন্তর্বিভাগে কোনো আন্দোলন উপস্থিত করিতে পারে নাই। তাই সমুদ্রের সঙ্গে আমার প্রথম সম্ভাষণটা প্রণয়সম্ভাষণ দিয়াই শুরু হইয়াছে। মহাসাগর কবির কবিত্বটুকুকে ঝাঁকানি দিয়া নিঃশেষ করিয়া দেন নাই, তিনি যে ছন্দে মৃদঙ্গ বাজাইতেছেন আমার রক্তের নাচ তাহার সঙ্গে দিব্য তাল রাখিয়া চলিতে পারিতেছে। যদি হঠাৎ খেয়াল যায় এবং একবার তাঁহার সহস্র উদ্যত হস্তে তাণ্ডবনৃত্যের রুদ্র বোল বাজাইতে থাকেন, তাহা হইলে আর মাথা তুলিতে পারিব না। কিন্তু, ভাবখানা দেখিয়া মনে হইতেছে, ভীরু ভক্তের উপর এ যাত্রায় তাঁহার সেই অট্টহাস্যের তুমুল পরিহাস প্রয়োগ করিবেন না।

তাই জাহাজের রেলিং ধরিয়া জলের দিকে তাকাইয়া আমার দিন কাটিতেছে। শুক্লপক্ষের শেষ দিকে আমাদের যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। যেমন সমুদ্র তেমনি সমুদ্রের

উপরকার রাত্রি ; স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া দুই অন্তহীনের সুন্দর মিলনটি দেখিতে থাকি ; স্তব্ধের সঙ্গে চঞ্চলের, নীরবের সঙ্গে মুখরের, দিগন্তব্যাপী আলাপ চুপ করিয়া শুনিয়া লই। জাহাজের দুই ধারে অনন্ত ফেনরাশি কাটিয়া কাটিয়া পড়ে, তাহার ভঙ্গীটি আমার দেখিতে বড়ো সুন্দর লাগে। ঠিক মনে হয়, যেন জাহাজটাকে ফুলের বীজকোষের মতো করিয়া তাহার দুই পাশে সাদা পাপড়ি মুহূর্তে মুহূর্তে বিকশিত হইয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে।

সম্মুখে আমার নিস্তব্ধ রাত্রে এই মহাসমুদ্রের সুগম্ভীর কললীলা, আর পশ্চাতে আমার এই জাহাজের যাত্রীদের অবিশ্রাম হাস্যালাপ আমোদ আহ্লাদ। যতবার আমি জাহাজে আসিয়াছি প্রত্যেক বারেই আমার এই কথাটি মনে হইয়াছে যে, আমাদের ক্ষুদ্র জীবনটুকুর চারি দিকেই যে-একটি অক্ষুব্ধ অনন্ত রহিয়াছেন, তাঁহার দিকে এই যাত্রীদের এক মুহূর্তও তাকাইবার অবকাশ নাই। জীবনের প্রতি ইহাদের আসক্তি এত অত্যন্ত বেশি যে, জীবনের গভীর সত্যকে উপলব্ধি করিতে হইলে তাহার নিকট হইতে যতটুকু দূরে যাওয়া আবশ্যক ইহারা এক মুহূর্তের জন্যও ততটুকু দূরে যাইতে পারে না। এইজন্য ইহাদের ধর্মোপাসনা যেন একটা বিশেষ আয়োজনের ব্যাপার, নিজেকে যেন এক জায়গা হইতে বিশেষভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া ক্ষণকালের জন্য আর-এক জায়গায় লইয়া যাইতে হয়। এ জাহাজ যদি ভারতবাসী যাত্রীদের জাহাজ হইত তাহা হইলে দিনের সমস্ত কাজকর্ম-আমোদ-আহ্লাদের অত্যন্ত মাঝখানেই দেখিতে পাইতাম মানুষ অসংকোচে অনন্তকে হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিতেছে ; সমস্ত হাসিগল্পের মাঝে মাঝেই নিতান্ত সহজেই ধর্মসংগীত ধ্বনিত হইয়া উঠিত। সসীমের সঙ্গে অসীম, জীবের সঙ্গে শিব যে একেবারে মিলিয়া আছেন। দুইয়ের সহযোগেই যে সত্য সর্বত্র পরিপূর্ণ, এই চিন্তাটা আমাদের চিত্তের মধ্যে এত সহজ হইয়া আছে যে, এ সম্বন্ধে আমাদের মনে কোনো সংকোচমাত্র নাই। কিন্তু, এই ইংরেজ যাত্রীরা তাহাদের হাস্যালাপের কোনো-একটা ছেদে ধর্মসংগীত গাহিতেছে, এ কথা মনে করিতেই পারি না এবং ইহারা যদি ডেকের উপর জুয়া খেলিতে খেলিতে হঠাৎ কোনো-এক সময়ে চোখ তুলিয়া দেখিতে পায় যে ইহাদের স্বজাতীয় কেহ চৌকিতে বসিয়া উপাসনা করিতেছে, তবে নিশ্চয়ই তাহাকে পাগল বলিয়া মনে করিবে এবং সকলেই মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিবে। এইজন্যই ইহাদের জীবনের মধ্যে আধ্যাত্মিক সচেতনতার একটি সহজ সুনম্র শ্রী দেখিতে পাই না— ইহাদের কাজকর্ম-হাস্যালাপের মধ্যে কেবলই এক-দিক-ঘেঁষা একটা তীব্রতা প্রকাশ পায়।

এই জাহাজটার মধ্যে কী আশ্চর্য আয়োজন। এই-যে জাহাজ দেশকালের সঙ্গে

অহরহ লড়াই করিতে করিতে চলিয়াছে, তাহার সমস্ত রহস্যটা আমাদের গোচর নহে। তাহার লৌহকঠিন হৃৎপিণ্ড উঠিতেছে পড়িতেছে, দিনরাত সেই ধুক্‌ধুক্‌ স্পন্দন অনুভব করিতেছি। যেখানে তাহার জঠরানল জ্বলিয়াছে এবং তাহার নাড়ির মধ্যে উত্তপ্ত বাষ্পের বেগ আলোড়িত হইয়া উঠিতেছে, সেখানকার প্রচণ্ড শক্তির সমস্ত উদ্যোগ আমাদের চোখের আড়ালে রহিয়াছে। আমাদের উপরিতলে এই প্রচুর অবকাশ ও আলস্যের মাঝে মাঝে ঘণ্টাধ্বনি স্নানাহারের সময় জ্ঞাপন করিতেছে। এই-যে দেড়শো-দুইশো যাত্রীর আহারবিহারের আয়োজন— এ কোথায় হইতেছে সেই কথা ভাবি। সেও চোখের আড়ালে। তাহারও শব্দমাত্র শুনি না, গন্ধমাত্র পাই না। আহারের টেবিলে গিয়া যখন বসি, সমস্ত সুসজ্জিত, প্রস্তুত। ভোজ্যসামগ্রীর পরিবেষণের ধারা যেন নদীর প্রবাহের মতো অনায়াসে চলিতে থাকে।

ইহার মধ্যে যেটা বিশেষ করিয়া ভাবিবার কথা সেটা এই যে, ইহারা লেশমাত্র অসুবিধাকেও মানিয়া লইতে চায় না; এতবড়ো একটা সমুদ্রে পাড়ি— নাহয় আহারবিহারে কিছু টানাটানিই হইল, নাহয় মোটামুটি রকমেই কাজ সারিয়া লওয়া গেল। কিন্তু তা নয়; ইহারা কোনো ওজরকেই ওজর বলিয়া গণ্য করিবে না; ইহারা সকল অবস্থাতেই আপনার সকল রকমের দাবিকে সর্বোচ্চ সীমায় টানিয়া রাখিতে চায়। তাহার ফল হয় যে, অবশেষে সেই অসম্ভব দাবিও মেটে। দাবি করিবার সাহস যাহাদের নাই তাহারাই কোনোমতে অভাবের সঙ্গে আপোষ করিয়া দিন কাটায়— তাহারাই বলে, অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ। তাহাতে হয় এই যে, সেই অর্ধের মধ্য হইতেও কেবলই অর্ধ বাদ পড়িয়া যায় এবং পণ্ডিত আপনার পাণ্ডিত্যের মধ্যেই ক্রমাগত পণ্ড হইতে থাকেন।

কিন্তু, সমস্ত সুবিধাই লইব, এ দাবি করিয়া বসিয়া কী প্রকাণ্ড ভার বহন করিতে হয়! প্রত্যেক সামান্য আরামের ব্যবস্থা কত মস্ত জায়গা জুড়িয়া বসে! এই ভার বহন করিবার শক্তি ইহাদের আছে, সেখানে ইহারা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহে। এই উপলক্ষে আমার মনে পড়ে আমাদের বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা। সেখানেও দুশো লোকের জন্য চার বেলাকার খাওয়া জোগাড় করিতে হয়। কিন্তু প্রয়াসের সীমা নাই, ভোর চারটে হইতে রাত্রি একটা পর্যন্ত হাঁকডাকের অবধি দেখি না। অথচ, ইহার মধ্যে নিতান্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু নাই বলিলেও হয়। আয়োজনের ভার যথাসাধ্য কম করা গিয়াছে, কিন্তু আবর্জনার ভার কিছুমাত্র কমে না। গোলমাল বাড়িয়া চলে, ময়লা জমিতে থাকে— ভাতের ফেন, তরকারির খোসা এবং উচ্ছিষ্টাবশেষ লইয়া কী করা যায় তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না। ক্রমে সে সম্বন্ধে ভাবনা পরিহার করিয়া জড়

প্রকৃতির উপর বরাত দিয়া কোনোক্রমে দিন কাটানো যায়। এ কথা কিছুতেই আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি না যে, ইহা কিছুতেই চলিবে না। কারণ, তাহা বলিতে গেলেই ভার বহন করিতে হয়। শেষকালে গোড়ায় গিয়া দেখি, সেই ভার বহন করিবার ভরসা এবং শক্তি আমাদের নাই, এইজন্য আমরা কেবলই দুঃখ এবং অসুবিধা বহন করি কিন্তু দায়িত্ব বহন করিতে চাই না।

একজন উচ্চপদস্থ রেলোয়ে ইঞ্জিনিয়ার আমাদের সহযাত্রী আছেন; তিনি আমাকে বলিতেছিলেন, 'চাবি তালা প্রভৃতি নানা ছোটোখাটো প্রয়োজনের জিনিস আমি রেলোয়েবিভাগের জন্য এই দেশ হইতেই সংগ্রহ করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু, বরাবর দেখিতে পাই, তাহার মূল্য বেশি অথচ জিনিস তেমন ভালো নয়।' এ দিকে পণ্যদ্রব্যের দাম এবং বেতনের পরিমাণ বাড়িয়াই চলিয়াছে অথচ এখানে যে-সমস্ত দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে পৃথিবীর বাজারদরের সঙ্গে তাহা তাল রাখিয়া চলিতে পারিতেছে না। তিনি বলিলেন, য়ুরোপীয় কর্তৃত্বে এ দেশে যে-সমস্ত কারখানা চলিতেছে এ দেশের লোকের উপর তাহার প্রভাব অতি সামান্য। আর, দেশীয় কর্তৃত্বে যেখানে কাজ চলে সেখানে দেখিতে পাই, পুরা কাজ আদায় হয় না— মানুষের যতখানি শক্তি আছে তাহার অধিকাংশকেই খাটাইয়া লইবার যেন তেজ নাই। এইজন্যই মজুরির পরিমাণ অল্প হওয়া সত্ত্বেও মূল্য কমিতে চায় না। কেননা, মানুষ যতগুলি খাটিতেছে শক্তি ততটা খাটিতেছে না।

এ কথাটা শুনিতে অপ্রিয় লাগে, কিন্তু দেশের দিকে তাকাইয়া দেখিলে সর্বত্রই এইটেই চোখে পড়ে। আমাদের দেশে সকল কাজই দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহার একটিমাত্র কারণ, যোলো-আনা মানুষকে আমরা পাই না। এইজন্য আমাদিগকে বেশি লোক লইয়া কারবার করিতে হয়, অথচ বেশি লোককে ঠিক ব্যবস্থামতে চালনা করা এবং তাহাদের পেট ভরাইয়া দেওয়া আমাদের শক্তির অতীত। এইজন্য কাজের চেয়ে কাজের উৎপাত অনেকগুণ বেশি হইয়া উঠে, আয়োজনের চেয়ে আবর্জনাই বাড়ে এবং তরণীতে ছিদ্র ক্রমে এত দেখা দেয় যে দাঁড়-টানার চেয়ে জল-ছেঁচাতেই বেশি শক্তি ব্যয় করিতে হয়— আমাদের দেশে যে-কেহ যে-কোনো কাজে হাত দিয়াছে তাহাকে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে।

আমি সেই ইঞ্জিনিয়ারটিকে বলিলাম, 'তোমাদের দেশে যৌথ কারবার ও কল-কারখানার গুণেই কি জিনিসের মূল্য কম হইতেছে না।' তিনি বলিলেন, তাহা হইতে পারে, কিন্তু কোনো দেশে যৌথ কারবার আগে এবং উন্নতি তাহার পরে, এমন কথা বলা যায় না। মানুষ যখন যৌথ কারবারে মিলিবার উপযুক্ত হয় তখনি যৌথ

কারবার আপনিই ঘটিয়া উঠে। তিনি কহিলেন, 'আমি মাদ্রাজের দিকে দক্ষিণ ভারতে অনেক দেশীয় যৌথ কারবারের উৎপত্তি ও বিলুপ্তি দেখিয়াছি। দেখিতে পাই, অনুষ্ঠানটার প্রতি যে লয়াল্‌টি অর্থাৎ যে নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার প্রয়োজন তাহা কাহারও নাই, প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে নিজের দিকে তাকায়। ইহাতে কখনোই কোনো জিনিস বাঁধিতে পারে না। এই দৃঢ়নিষ্ঠ প্রাণপণ লয়াল্‌টি যদি জাতীয় চরিত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয় তবে সমস্ত সম্মিলিত শুভানুষ্ঠান সম্ভবপর হয়।'

কথাটা আমার মনে লাগিল। অনুষ্ঠানের দ্বারা মঙ্গলসাধন করা যায়, এ কথাটা সত্য নহে— গোড়াতেই মানুষ আছে। আমাদের দেশে একজন মানুষকে আশ্রয় করিয়া এক-একটা কাজ জাগিয়া উঠে; তাহার পরে সেই কাজকে যাহারা গ্রহণ করে তাহারা তাহাকে যতটা আশ্রয় করে ততটা আশ্রয় দেয় না। কারণ, তাহারা কাজের দিকে তেমন করিয়া তাকায় না যেমন করিয়া নিজের দিকে তাকায়। কথায় কথায় তাহাদের মুষ্টি শিথিল হইয়া পড়ে, বাধাকে তাহারা অতিক্রমের চেষ্টা না করিয়া বাধাকে ত্যাগ করিয়া পালাইতে চায়, এবং কেবলই মনে করিতে থাকে, ইহার চেয়ে আর কোনোরূপ অবস্থা হইলে ইহার চেয়ে আরও ভালো ফল পাওয়া যাইত। এমনি করিয়া তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়— একটা হইতে পাঁচটা টুক্‌রা দাঁড়ায় এবং পাঁচটাই ব্যর্থ হয়। ভালোমন্দ বাধাবিপত্তি সমস্তটাকে বীরের মতো স্বীকার করিয়া আরব্ধ কর্মকে একান্ত লয়াল্‌টির সঙ্গে শেষ পর্যন্ত বহন করিবার অধ্যবসায় যতদিন আমাদের সাধারণের চিত্তে না জাগিবে ততদিন সম্মিলিত হিতানুষ্ঠান ও যৌথ বাণিজ্য আমাদের দেশে একেবারে অসম্ভব হইবে।

এই লয়াল্‌টি, ইহা বুদ্ধিগত নহে, ইহা হৃদয়গত, জীবনগত। সমস্ত অপূর্ণতার ভিতর দিয়া মানুষ নিজেকে কিসের জোরে বহন করে। একটা জীবনের গভীর আকর্ষণে। লাভ-লোকসানের সমস্ত হিসাব সেই জীবনের টানের কাছে লঘু। এমনটা যদি না হইত তবে কথায় কথায় সামান্য কারণে, সামান্য ক্ষতিতে, সামান্য অসন্তোষে, মানুষ আত্মহত্যা করিয়া নিষ্কৃতি লইত। সেইরূপ যে কর্মে আমরা জীবনকে নিয়োগ করিয়াছি তাহার প্রতি যদি আমাদের জীবনগত নিষ্ঠা না থাকে, তাহার প্রতি যদি আমাদের একটা বেহিসাবি আকর্ষণ না থাকে, তাহার প্রতি অপরাহত শ্রদ্ধা লইয়া আমরা যদি পরাভবের দলেও দাঁড়াইতে না পারি, যদি মৃত্যুর মুখেও তাহার জয়-পতাকাকে সর্বোচ্চে তুলিয়া ধরিবার বল না পাই, যদি অভিমন্যুর মতো ব্যূহের মধ্য হইতে বাহির হইবার বিদ্যাটাকে আমরা একেবারে অগ্রাহ্য না করি, তাহা হইলে আমরা কিছুই সৃষ্টি করিতে পারিব না, রক্ষা করিতেও পারিব না। 'ইহা

আমাদের অতএব ইহা আমারই' এই কথাটাকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত লাভক্ষতি, সমস্ত হারজিতের মধ্যে প্রাণপণে বলিবার শক্তি সর্বাগ্রে আমাদের চাই ; তাহার পরে যে-কোনো অনুষ্ঠানকেই আশ্রয় করি-না কেন, একদিন না একদিন বিঘ্নসমুদ্র পার হইতে পারিব।

নিরতিশয় কর্মের প্রয়াসের দ্বারা য়ুরোপের জীবন জীর্ণ হইতেছে, এই কথাটা আজকাল পশ্চিমদেশেও শোনা যায় এবং এই কথাটা একেবারে মিথ্যাও নহে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, য়ুরোপ কোনো অভাব কোনো অসুবিধাকেই কিছুমাত্র মানিবে না, এই তাহার পণ। নিজের শক্তির উপরে তাহার অক্ষুণ্ণ বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস থাকাতেই তাহার শক্তি পূর্ণ গৌরবে কাজ করিতেছে এবং অসাধ্য সাধন করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু, তবুও শক্তির সীমা আছে। বাতিও খুব বড়ো করিয়া জ্বালাইব অথচ সলিতাও ক্ষয় করিব না, এ তো কোনোমতেই হয় না।

এইজন্য পাশ্চাত্যদেশে জীবনযাত্রার দাবি এক দিকে যত বাড়িতেছে আর-এক দিকে ততই সে দাহ করিতেছে। আরামকে সুবিধাকে কোথাও খর্ব করিব না পণ করিয়া বসাতে তাহার বোঝা কেবলই প্রকাণ্ড বড়ো হইয়া উঠিতেছে। এই বোঝা তো কোনো-একটা জায়গায় চাপ দিতেছে। যেখানে সেই চাপ পড়িতেছে সেখানে যে পরিমাণে দুঃখ জন্মিতেছে সে পরিমাণে ক্ষতিপূরণ হইতেছে না। এইজন্য ভার-সামঞ্জস্যের প্রয়াস আগ্নেয় ভূমিকম্পের আকারে সমস্ত পীড়িত সমাজের ভিতর হইতে ক্ষণে ক্ষণে মাথা তুলিবার উপক্রম করিতেছে। মানুষের সুবিধাকে সৃষ্টি করিবার জন্য কল কেবলই বাড়িয়া চলিতেছে এবং মানুষের জায়গা কল জুড়িয়া বসিতেছে। কোথায় ইহার অন্ত? মানুষ আপনাকে আপনার অভাবপূরণের যন্ত্র করিয়া তুলিতেছে— কিন্তু, সেই আপনাকে সে পাইবে কোন্ অবসরে? যেমন করিয়াই হউক, এক জায়গায় তাহাকে দাঁড়ি টানিয়া দিয়া বলিতেই হইবে, 'এই রহিল আমার উপকরণ, এখন আমাকে আমার উদ্ধার করা চাই। যাহাতে আমার আবশ্যক তাহা আমাকে অবশ্য জোগাইতে হইবে, কিন্তু এ-সমস্তে আমার আবশ্যক নাই।'

অর্থাৎ, মানুষের উদ্যম যখন কেবলই একটানা চলিতে থাকে তখন সে একটা জায়গায় আসিয়া আপনাকে আপনি ব্যর্থ করিয়া বসে। পূর্ণতার পথ সোজা পথ নহে। সেইজন্য আজ য়ুরোপের যাহা বেদনা আমাদের বেদনা কখনোই তাহা নহে। য়ুরোপ তাহার দেহকে সম্পূর্ণ করিয়া তাহার মধ্যে আত্মাকে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছে। আমাদের আত্মা দেহ হারাইয়া প্রেতের মতো পৃথিবীতে নিষ্ফল হইয়া ফিরিতেছে। সেই আত্মার বাহ্য প্রতিষ্ঠা কোথায়? তাহার মধ্যে যে ঈশ্বরের সাধর্ম্য আছে, সে

আপনার ঐশ্বর্য বিস্তার না করিয়া বাঁচে না। সে যে আপনাকে নানা দিকে প্রকাশ করিতে চায়— রাজ্যে, বাণিজ্যে, সমাজে, শিল্পে, সাহিত্যে, ধর্মে— এখানে সেই প্রকাশের উপকরণ কই? সেই উপকরণের প্রতি তাহার কর্তৃত্ব কোথায়? দেখিতেছি, তাহার কলেবর এক জায়গায় যদি বাঁধে তো আর-এক জায়গায় আলগা হইয়া পড়ে— ক্ষণকালের জন্য যদি তাহা নিবিড় হইয়া দাঁড়ায় তবে পরক্ষণেই বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। তাই আজ যেমন করিয়াই হউক, আমাদিগকে এই দেহতত্ত্ব সাধন করিতে হইবে; যেমন করিয়া হউক, আমাদিগকে এই কথাটা বুঝিতে হইবে যে, কলেবরহীন আত্মা কখনোই সত্য নহে— কেননা, কলেবর আত্মারই একটা দিক। তাহা গতির দিক, শক্তির দিক, মৃত্যুর দিক— কিন্তু তাহারই সহযোগে আত্মার স্থিতি, আনন্দ, অমৃত। এই কলেবরসৃষ্টির অসম্পূর্ণতাতেই আমাদের দেশের শ্রীহীন আত্মা শতাব্দীর পর শতাব্দী হাহাকার করিয়া ফিরিতেছে। বাহিরের সত্যকে দূরে ফেলিয়া আমাদের অন্তরাত্মা কেবলই অবাধে স্বপ্ন সৃষ্টি করিতেছে। সে আপনার ওজন হারাইয়া ফেলিতেছে, এইজন্য তাহার অন্ধ বিশ্বাসের কোনো প্রমাণ নাই, কোনো পরিমাণ নাই; এইজন্য কোথাও বা সত্যকে লইয়া সে মায়ার মতো খেলা করিতেছে, কোথাও বা মায়াকে লইয়া সে সত্যের মতো ব্যবহার করিতেছে।

আরব-সমুদ্র
১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯

যাত্রা

একদিন মানুষ ছিল বুনো, ঘোড়াও ছিল বনের জন্তু। মানুষ ছুটিতে পারিত না, ঘোড়া বাতাসের মতো ছুটিত। কী সুন্দর তাহার ভঙ্গী, কী অবাধ তাহার স্বাধীনতা। মানুষ চাহিয়া দেখিত, আর তাহার ঈর্ষা হইত। সে ভাবিত, 'ঐরকম বিদ্যুৎগামী চারটে পা যদি আমার থাকিত তাহা হইলে দূরকে দূর মানিতাম না, দেখিতে দেখিতে দিগ্‌দিগন্তর জয় করিয়া আসিতাম।' ঘোড়ার সর্বাঙ্গে যে-একটি ছুটিবার আনন্দ দ্রুত তালে নৃত্য করিত সেইটের প্রতি মানুষের মনে মনে ভারি একটা লোভ হইল।

কিন্তু, মানুষ শুধু-শুধু লোভ করিয়া বসিয়া থাকিবার পাত্র নহে। 'কী করিলে ঘোড়ার চারটে পা আমি পাইতে পারি' গাছের তলায় বসিয়া এই কথাই সে ভাবিতে

লাগিল। এমন অদ্ভুত ভাবনাও মানুষ ছাড়া আর-কেহ ভাবে না। 'আমি দুই-পা-ওয়ালা খাড়া জীব, আমার চার পায়ের সংস্থান কি কোনোমতেই হইতে পারে। অতএব, চিরদিন আমি এক-এক পা ফেলিয়া ধীরে ধীরে চলিব আর ঘোড়া তড়্‌বড় করিয়া ছুটিয়া চলিবে, এ বিধানের অন্যথা হইতেই পারে না।' কিন্তু, মানুষের অশান্ত মন এ কথা কোনোমতেই মানিল না।

একদিন সে ফাঁস লাগাইয়া বনের ঘোড়াকে ধরিল। কেশর ধরিয়া তাহার পিঠের উপর চড়িয়া বসিয়া নিজের দেহের সঙ্গে ঘোড়ার চার পা জুড়িয়া লইল। এই চারটে পাকে সম্পূর্ণ নিজের বশ করিতে তাহার বহুদিন লাগিয়াছে, সে অনেক পড়িয়াছে, অনেক মরিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই দমে নাই। ঘোড়ার গতিবেগকে সে ডাকাতি করিয়া লইবেই এই তাহার পণ। তাহারই জিত হইল। মন্দগামী মানুষ দ্রুতগমনকে বাঁধিয়া ফেলিয়া আপনার কাজে খাটাইতে লাগিল।

ডাঙায় চলিতে চলিতে মানুষ এক জায়গায় আসিয়া দেখিল সম্মুখে তাহার সমুদ্র, আর তো এগোইবার জো নাই। নীল জল, তাহার তল কোথায়, তাহার কূল দেখা যায় না। আর, লক্ষ লক্ষ ঢেউ তর্জনী তুলিয়া ডাঙার মানুষদের শাসাইতেছে; বলিতেছে, 'এক পা যদি এগোও তবে দেখাইয়া দিব, এখানে তোমার জারিজুরি খাটিবে না।' মানুষ তীরে বসিয়া এই অকূল নিষেধের দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু, নিষেধের ভিতর দিয়া একটা মস্ত আহ্বানও আসিতেছে। তরঙ্গগুলা অট্টহাস্যে নৃত্য করিতেছে— ডাঙার মাটির মতো কিছুতেই তাহাদিগকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। দেখিলে মনে হয়, লক্ষ লক্ষ ইস্কুলের ছেলে যেন ছুটি পাইয়াছে— চীৎকার করিয়া, মাতামাতি করিয়া, কিছুতেই তাহাদের আশ মিটিতেছে না; পৃথিবীটাকে তাহারা যেন ফুটবলের গোলার মতো লাথি ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া আকাশে উড়াইয়া দিতে চায়। ইহা দেখিয়া মানুষের মন তীরে বসিয়া শান্ত হইয়া পড়িয়া থাকিতে পারে না। সমুদ্রের এই মাতুনি মানুষের রক্তের মধ্যে করতাল বাজাইতে থাকে। বাধাহীন জলরাশির এই দিগন্তবিস্তৃত মুক্তিকে মানুষ আপন করিতে চায়। সমুদ্রের এই দূরত্বজয়ী আনন্দের প্রতি মানুষ লোভ দিতে লাগিল। ঢেউগুলার মতো করিয়াই দিগন্তকে লুঠ করিয়া লইবার জন্ম মানুষের কামনা।

কিন্তু, এমন অদ্ভুত সাধ মিটিবে কী করিয়া; এই তীরের রেখাটা পর্যন্ত মানুষের অধিকারের সীমা— তাহার সমস্ত ইচ্ছাটাকে এই দাঁড়ির কাছে আসিয়া শেষ করিতে হইবে। কিন্তু, মানুষের ইচ্ছাকে যেখানে শেষ করিতে চাওয়া যায় সেইখানেই সে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। কোনোমতেই সে বাধাকে চরম বলিয়া মানিতে চাহিল না।

অবশেষে একদিন বুনো ঘোড়াটার মতোই সমুদ্রের ফেনকেশর ধরিয়া মানুষ তাহার পিঠের উপর চড়িয়া বসিল। ক্রুদ্ধ সাগর পিঠ নাড়া দিল; মানুষ কত ডুবিল, কত মরিল, তাহার সীমা নাই। অবশেষে একদিন মানুষ এই অবাধ্য সাগরকেও আপনার সঙ্গে জুড়িয়া লইল। তাহার এক কূল হইতে আর-এক কূল পর্যন্ত মানুষের পায়ের কাছে আসিয়া মাথা হেঁট করিয়া দিল।

বিশাল সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত মানুষটা যে কিরকম, আজ আমরা জাহাজে চড়িয়া তাহাই অনুভব করিতেছি। আমরা তো এই একটুখানি জীব, তরণীর এক প্রান্তে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছি, কিন্তু দূর দূর বহুদূর পর্যন্ত সমস্ত আমার সঙ্গে মিলিয়াছে। যে দূরকে আজ রেখামাত্রও দেখিতে পাইতেছি না তাহাকেও আমি এইখানে স্থির দাঁড়াইয়া অধিকার করিয়া লইয়াছি। যাহা বাধা তাহাই আমাকে পিঠে করিয়া লইয়া অগ্রসর করিয়া দিতেছে। সমস্ত সমুদ্র আমার, যেন আমারই বিরাট শরীর, যেন তাহা আমার প্রসারিত ডানা। যাহা-কিছু আমাদের বাধা তাহাকেই আমাদের চলিবার পথ, আমাদের মুক্তির উপায় করিয়া লইতে হইবে, আমাদের প্রতি ঈশ্বরের এই আদেশ আছে। যাহারা এই আদেশ মানিয়াছে তাহারাই পৃথিবীতে ছাড়া পাইয়াছে। যাহারা মানে নাই এই পৃথিবীটা তাহাদের পক্ষে কারাগার। নিজের গ্রামটুকু তাহাদিগকে বেড়িয়াছে, ঘরের কোণটুকু তাহাদিগকে বাঁধিয়াছে, প্রত্যেক পা ফেলিতেই তাহাদের শিকল ঝম্‌ঝম্‌ করে।

মনের আনন্দে চলিতেছি। ভয় ছিল, সমুদ্রের দোলা আমার শরীরে সহিবে না। সে ভয় কাটিয়া গেছে। যেটুকু নাড়া খাইতেছি তাহাতে আঘাত করিতেছে না, যেন আদর করিতেছে। সমুদ্র আমাকে কোলে করিয়া বহিয়া চলিয়াছে— রুগ্‌ণ বালককে তাহার পিতা যেমন করিয়া লইয়া যায় তেমনি সাবধানে। এই জন্য এ যাত্রায় এখন পর্যন্ত আমার চলিবার কোনো পীড়া নাই, চলিবার আনন্দই ভোগ করিতেছি।

কেবলমাত্র এই চলিবার আনন্দটুকুই পাইব বলিয়া আমি বাহির হইয়াছি। অনেক দিন হইতে এই চলিবার, এই বাহির হইয়া পড়িবার, একটা বেগ আমাকে উতলা করিয়া তুলিতেছিল। অনেক দিন আমাদের আশ্রমের বাড়িতে দোতলার বারান্দায় একলা বসিয়া যখন আমাদের সামনের শালগাছগুলার উপরের আকাশের দিকে তাকাইয়াছি তখন সেই আকাশ দূরের দিকে তাহার তর্জনী বাড়াইয়া দিয়া আমাকে সংকেত করিয়াছে। যদিও সেই আকাশটি নীরব তবু দেশদেশান্তরের যত অপরিচিত গিরিনদী-অরণ্যের আহ্বান কত দিগ্‌দিগন্তর হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া এই আকাশের নীলিমাকে পরিপূর্ণ করিয়াছে। নিঃশব্দ আকাশ বহুদূরের সেই-সমস্ত মর্মরধ্বনি,

সেই-সমস্ত কলগুঞ্জন, আমার কাছে বহন করিয়া আনিত। আমাকে কেবলই বলিত, 'চলো, চলো, বাহির হইয়া এসো।' সে কোনো প্রয়োজনের চলা নহে, চলার আনন্দেই চলা।

প্রাণ আপনি চায় চলিতে ; সেই তাহার ধর্ম। না চলিলে সে যে মৃত্যুতে গিয়া ঠেকে। এইজন্য নানা প্রয়োজনের ও খেলার ছুতায় সে কেবল চলে। পদ্মার চরে শরতের সময়ে তো হাঁসের দল দেখিয়াছ। তাহারা কোন্ দুর্গম হিমালয়ের শিখরবেষ্টিত নির্জন সরোবরতীরের নীড় ছাড়িয়া কত দিনরাত্রি ধরিয়া উড়িতে উড়িতে এই পদ্মার বালুতটের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। শীতের দিনে বাষ্পে বরফে ভীষণ হইয়া উঠিয়া হিমালয় তাহাদিগকে তাড়া লাগাইয়া দেয়— তাহারা বাসা বদল করিতে চলে। সুতরাং সেই সময়ে হাঁসেদের পক্ষে দক্ষিণপথে যাত্রার একটা প্রয়োজন আছে বটে। কিন্তু, তবু সেই প্রয়োজনের অধিক আর-একটা জিনিস আছে। এই-যে বহু দূরের গিরি নদী পার হইয়া উড়িয়া যাওয়া, ইহাতে এই পাখিদের ভিতরকার প্রাণের বেগ আনন্দলাভ করে। ক্ষণে ক্ষণে বাসা বদল করিবার ডাক পড়ে, তখনি সমস্ত জীবনটা নাড়া খাইয়া আপনাকে আপনি অনুভব করিবার সুযোগ পায়।

আমার ভিতরেও বাসা বদল করিবার ডাক পড়িয়াছিল। যে বেষ্টনের মধ্যে বসিয়া আছি সেখান হইতে আর-একটা কোথাও যাইতে হইবে। চলো, চলো, চলো। ঝরনার মতো চলো, সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো চলো, প্রভাতের পাখির মতো চলো, অরুণোদয়ের আলোর মতো চলো। সেইজন্যই তো পৃথিবী এমন বৃহৎ, জগৎ এমন বিচিত্র, আকাশ এমন অসীম। সেইজন্যই তো বিশ্ব জুড়িয়া অণু পরমাণু নৃত্য করিতেছে এবং অগণ্য নক্ষত্রলোক আপন-আপন আলোকের শিবির লইয়া প্রান্তরচারী বেদুয়িনদের মতো আকাশের ভিতর দিয়া যে কোথায় চলিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। চিরকালের মতো কোনো একই জায়গায় বাসা বাঁধিয়া বসিব, বিশ্বের এমন ধর্মই নহে। সেইজন্যই মৃত্যুর ডাক আর কিছুই নহে, সেই বাসাবদলের ডাক। জীবনকে কোনোমতেই সে কোনো সনাতন প্রাচীরের মধ্যে বদ্ধ হইয়া থাকিতে দিবে না— জীবনকে সেই জীবনের পথে অগ্রসর করিবে বলিয়াই মৃত্যু।

তাই আমি আজ চলিয়াছি ; রূপকথার রাজপুত্র যেমন হঠাৎ একদিন অকারণে সাত সমুদ্র পার হইবার জন্য বাহির হইয়া পড়িত, তেমনি করিয়া আমি আজ বাহিরে চলিয়াছি। রাজকন্যা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, সে ঘুম ভাঙে না ; সোনার কাঠি চাই। একই জায়গায় একই প্রথার মধ্যে বসিয়া বসিয়া জীবনের মধ্যে জড়তা আসে ; সে অচেতন হইয়া পড়ে ; সে কেবল আপনার শয্যাটুকুকেই আঁকড়িয়া থাকে ;

এই বৃহৎ পৃথিবীকে বোধ করিতেই পারে না; তখন সোনার কাঠি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে; তখনি দূরে পাড়ি দেওয়া চাই; তখন এমন একটা চেতনার দরকার যাহা আমাদের চোখের কানের মনের রুদ্ধ দ্বারে কেবলই নূতন-নূতন নূতনের আঘাত দিতে থাকিবে— যাহা আমাদের জীর্ণ পর্দাটাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া চিরনূতনকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিবে। কী বৃহৎ, কী সুন্দর, কী উন্মুক্ত এই জগৎ! কী প্রাণ, কী আলোক, কী আনন্দ! মানুষ এই পৃথিবীকে ঘিরিয়া ফেলিয়া কত রকম করিয়া দেখিতেছে, ভাবিতেছে, গড়িতেছে! তাহার প্রাণের, তাহার মনের, তাহার কল্পনার লীলাক্ষেত্র কোনোখানে ফুরাইয়া গেল না। পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া মানুষের এই-যে মনোলোক ইহার কী অফুরান ও অদ্ভুত বৈচিত্র্য। সেই-সমস্তকে লইয়াই যে আমার এই পৃথিবী। এইজন্যই এই-সমস্তটিকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া প্রত্যক্ষ দেখিবার জন্য মনের মধ্যে আহ্বান আসে।

এই বিপুল বৈচিত্র্যকে তন্ন তন্ন করিয়া নিঃশেষে দেখিবার সাধ্য ও অবকাশ কাহারও নাই। বিশ্বকে দর্শন করিব বলিয়া তাহার সম্মুখে বাহির হইতে পারিলেই দর্শনের ফল পাওয়া যায়। যদিও এক হিসাবে বিশ্ব সর্বত্রই আছে তবু আলস্য ছাড়িয়া, অভ্যাস কাটাইয়া, চোখ মেলিয়া, যাত্রা করিলে তবেই আমাদের দৃষ্টিশক্তির জড়িমা কাটিয়া যায় এবং আমাদের প্রাণ উদ্‌বোধিত হইয়া বিশ্বপ্রাণের স্পর্শ উপলব্ধি করে। যে নিশ্চল, যে নিরুদ্যম, সে লোক সেই জিনিসকেই হারাইয়া বসে যাহা একেবারেই হাতের কাছে আছে। তাই নিকটের ধনকে দুঃখ করিয়া দূরে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেই তাহাকেই অত্যন্ত নিবিড় করিয়া পাওয়া যায়। আমাদের সমস্ত ভ্রমণেরই ভিতরকার আসল উদ্দেশ্যটি এই— যাহা আছেই, যাহা হারাইতে পারেই না, তাহাকেই, কেবলই প্রতি পদে 'আছে আছে আছে' বলিতে বলিতে চলা— পুরাতনকে কেবলই নূতন নূতন নূতন করিয়া সমস্ত মন দিয়া ছুঁইয়া ছুঁইয়া যাওয়া।

লোহিত সমুদ্র
২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯

আনন্দরূপ

আজ সকালে জাহাজের ছাদের উপর রেলিঙ ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। 'আকাশের পাণ্ডুর নীল ও সমুদ্রের নিবিড় নীলিমার মাঝখান দিয়া পশ্চিম দিগন্ত হইতে মৃদুশীতল বাতাস আসিতেছিল। আমার ললাট মাধুর্যে অভিষিক্ত হইল। আমার মন বলিতে লাগিল, 'এই তো তাঁহার প্রসাদসুধার প্রবাহ।'

সকল সময় মন এমন করিয়া বলে না। অনেক সময় বাহিরের সৌন্দর্যকে আমরা বাহিরে দেখি— তাহাতে চোখ জুড়ায়, কিন্তু তাহাকে অন্তরে গ্রহণ করি না। ঠিক যেন অমৃতফলকে আঘ্রাণ করি, তাহার স্বাদ লই না।

কিন্তু সৌন্দর্য যেদিন অন্তরাত্মাকে প্রত্যক্ষ স্পর্শ করে সেইদিন তাহার মধ্য হইতে অসীম একেবারে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তখনি সমস্ত মন এক মুহূর্তে গান গাহিয়া উঠে, 'নহে, নহে, এ শুধু বর্ণ নহে, গন্ধ নহে— এই তো অমৃত, এই তাঁহার বিশ্বব্যাপী প্রসাদের ধারা।'

আকাশ ও সমুদ্রের মাঝখানে প্রভাতের আলোকে এই-যে অনির্বচনীয় মাধুর্য স্তরে স্তরে দিকে দিকে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, ইহা আছে কোন্‌খানে। ইহা কি জলে। ইহা কি বাতাসে। এই ধারণার অতীতকে কে ধারণ করিতে পারে।

ইহাই আনন্দ, ইহাই প্রসাদ। ইহাই দেশে দেশে, কালে কালে, অগণ্য প্রাণীর প্রাণ জুড়াইয়া দিতেছে, মন হরণ করিতেছে— ইহা আর কিছুতেই ফুরাইল না। ইহারই অমৃতস্পর্শে কত কবি কবিতা লিখিল, কত শিল্পী শিল্প রচনা করিল, কত জননীর হৃদয় স্নেহে গলিল, কত প্রেমিকের চিত্ত প্রেমে ব্যাকুল হইয়া উঠিল— সীমার বক্ষ রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভেদ করিয়া এই অসীমের অমৃত-ফোয়ারা কত লীলাতেই যে লোকে লোকে উৎসারিত প্রবাহিত হইয়া চলিল তাহার আর অন্ত দেখি না— অন্ত দেখি না। তাহা আশ্চর্য, পরমাশ্চর্য।

ইহাই আনন্দরূপমমৃতম্‌। রূপ এখানে শেষ কথা নহে, মৃত্যু এখানে শেষ অর্থ নহে। এই-যে রূপের মধ্য দিয়া আনন্দ, মৃত্যুর মধ্য দিয়া অমৃত। শুধুই রূপের মধ্যে আসিয়া মন ঠেকিল, মৃত্যুর মধ্যে আসিয়া চিন্তা ফুরাইল, তবে জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া কী পাইলাম! বস্তুকে দেখিলাম, সত্যকে দেখিলাম না!

আমার কি কেবলই চোখ আছে, কান আছে। আমার মধ্যে কি সত্য নাই, আনন্দ নাই। সেই আমার সত্য দিয়া আনন্দ দিয়া যখন পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে জগতের দিকে চাহিয়া

দেখি তখনি দেখিতে পাই, সম্মুখে আমার এই তরঙ্গিত সমুদ্র— এই প্রবাহিত বায়ু— এই প্রসারিত আলোক— বস্তু নহে, ইহা সমস্তই আনন্দ, সমস্তই লীলা, ইহার সমস্ত অর্থ একমাত্র তাঁহারই মধ্যে আছে; তিনি এ কী দেখাইতেছেন, কী বলিতেছেন, আমি তাহার কীই বা জানি! এই আকাশপ্লাবী আনন্দের সহস্রলক্ষ ধারা যেখানে এক মহাস্রোতে মিলিয়া আবার তাঁহারই এই হৃদয়ের মধ্যে ফিরিয়া যাইতেছে সেইখানে মুহূর্তকালের জন্য দাঁড়াইতে পারিলে এই সমস্ত-কিছুর মহৎ অর্থ, ইহার পরম পরিণামটিকে দেখিতে পাইতাম। এই-যে অচিন্তনীয় শক্তি, এই-যে অবর্ণনীয় সৌন্দর্য, এই-যে অপরিসীম সত্য, এই-যে অপরিমেয় আনন্দ, ইহাকে যদি কেবল মাটি এবং জল বলিয়া জানিয়া গেলাম তবে সে কী ভয়ানক ব্যর্থতা, কী মহতী বিনষ্টি। নহে নহে, এই তো তাঁহার প্রসাদ, এই তো তাঁহার প্রকাশ, এই তো আমাকে স্পর্শ করিতেছে, আমাকে বেষ্টন করিতেছে, আমার চৈতন্যের তারে তারে সুর বাজাইতেছে, আমাকে বাঁচাইতেছে, আমাকে জাগাইতেছে, আমার মনকে বিশ্বের নানা দিক দিয়া ডাক দিতেছে, আমাকে পলে পলে যুগযুগান্তরে পরিপূর্ণ করিতেছে; শেষ নাই, কোথাও শেষ নাই, কেবলই আরও আরও আরও; তবু সেই এক, কেবলই এক, সেই আনন্দময় অমৃতময় এক! সেই অতল অকূল অখণ্ড নিস্তব্ধ নিঃশব্দ সুগম্ভীর এক— কিন্তু, কত তাহার ঢেউ, কত তাহার কলসংগীত!

প্রাণ ভরিয়ে, তৃষা হরিয়ে
মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ!
তব ভুবনে, তব ভবনে
মোরে আরো আরো আরো দাও স্থান!
আরো আলো আরো আলো
মোর নয়নে, প্রভু, ঢালো!
সুরে সুরে বাঁশি পূরে
তুমি আরো আরো আরো দাও তান!
আরো বেদনা, আরো বেদনা,
মোরে আরো আরো দাও চেতনা!
দ্বার ছুটায়ে, বাধা টুটায়ে
মোরে করো ত্রাণ, মোরে করো ত্রাণ!
আরো প্রেমে, আরো প্রেমে
মোর আমি ডুবে যাক নেমে!

সুধাধারে আপনারে
তুমি আরো আরো আরো করো দান।

লোহিত সমুদ্র
২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯

কেবল মানুষই বলে, আশার অন্ত নাই। পৃথিবীর আর-কোনো জীব এমন কথা বলে না। আর-সকল প্রাণী প্রকৃতির একটা সীমার মধ্যে প্রাণ ধারণ করে এবং তাহার মনের সমস্ত আকাঙ্ক্ষাও সেই সীমাকে মানিয়া চলে। জন্তুদের আহার বিহার নিজের প্রাকৃতিক প্রয়োজনের সীমাকে লঙ্ঘন করিতে চায় না। এক জায়গায় তাহাদের সাধ মেটে এবং সেখানে তাহারা ক্ষান্ত হইতে জানে। অভাব পূর্ণ হইলে তাহাদের ইচ্ছা আপনি থামিয়া যায়, তাহার পরে আবার সেই ইচ্ছাকে তাড়না করিয়া জাগাইবার জন্য তাহাদের দ্বিতীয় আর-একটা ইচ্ছা নাই।

মানুষের প্রকৃতিতে আশ্চর্য এই দেখা যায়, একটা ইচ্ছার উপর সওয়ার হইয়া আর-একটা ইচ্ছা চাপিয়া আছে। পেট ভরিয়া গেলে খাইবার ইচ্ছা যখন আপনি মিটিয়া যায়, তখনো সেই ইচ্ছাকে জোর করিয়া জাগাইয়া রাখিবার জন্য মানুষের আর-একটা ইচ্ছা তাগিদ করিতে থাকে। সে কোনোমতে চাটনি খাইয়া, ঔষধ প্রয়োগ করিয়া, আহারের অবসন্ন ইচ্ছাকে প্রয়োজনের ঊর্ধ্বেও চালনা করিতে থাকে।

ইহাতে মানুষের যথেষ্ট ক্ষতি করে। কারণ, ইহা স্বাভাবিক ইচ্ছা নহে। স্বাভাবিক ইচ্ছা সহজেই আপন প্রাকৃতিক স্বভাবের সীমার মধ্যে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। আর, মানুষের এই অস্বাভাবিক ইচ্ছা কিছুতেই তৃপ্তি মানিতে চায় না। তাহার মধ্যে একটা কী আছে যে কেবলই বলিতেছে— আরও, আরও, আরও!

কিন্তু, যাহাতে মানুষের ক্ষতি করিতে পারে সে ইচ্ছা মানুষের থাকে কেন। নিজের এই দুরন্ত ইচ্ছাটার দিকে তাকাইয়াই মানুষ বিশ্বব্যাপারে একটা শয়তানের কল্পনা করিয়াছে। য়িহুদি পুরাণের প্রথম নরনারী যখন স্বর্গোদ্যানে ছিল তখন ঈশ্বর তাহাদের ইচ্ছাকে প্রকৃতির সীমার মধ্যে বাঁধিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, 'ইহার মধ্যেই সন্তুষ্ট থাকিয়ো। প্রাণের রাজ্যই তোমাদের রহিল, জ্ঞানের রাজ্যে লোভ দিয়ো না।' স্বর্গোদ্যানের প্রত্যেক জীবজন্তুই সেই সন্তোষের সীমার মধ্যেই বদ্ধ রহিল; কেবল

মানুষই বলিল, 'যাহা পাওয়া গেছে তাহার চেয়ে আরও পাওয়া চাই।' এই-যে আরো'র দিকে সে পা বাড়াইল এ বড়ো বিষম রাজ্য। এখানে স্বাভাবিক পরিতৃপ্তির কোনো সীমা কোথাও নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া নাই, এইজন্য কোন্ দিকে কত দূর পর্যন্ত যে যাওয়া যায় তাহার পরামর্শদাতা পাওয়া শক্ত। এইজন্য এই অতৃপ্তির পথহীন রাজ্যে মরিবার আশঙ্কা চারি দিকেই বিকীর্ণ। এমন ভয়ানক ক্ষেত্রে মানুষকে দুর্নিবার বেগে যে টানিয়া আনিল মানুষ তাহাকে গালি দিয়া বলিল 'শয়তান'।

কিন্তু, রাগই করি আর যাই করি, জগতে শয়তানকে তো মানিতে পারি না। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, মানুষের এই-যে ইচ্ছার উপরে আরো'র জন্য আরও একটা ইচ্ছা ইহা তাহার বাহিরের দিক হইতে একটা শত্রুর আক্রমণ নহে। ইহাকে মানুষ রিপু বলে বলুক, কিন্তু এই ইচ্ছাই তাহার যথার্থ মানবস্বভাবগত ইচ্ছা। সুতরাং যতক্ষণ এই ইচ্ছাকে সে জয়ী করিতে না পারিবে ততক্ষণ তাহার কিছুতেই শান্তি নাই— ততক্ষণ তাহাকে কেবলই আঘাত খাইয়া খাইয়া ঘুরিয়া মরিতে হইবে।

কিন্তু, এই আরো'র ইচ্ছাকে সে জয়ী করিবে কেমন করিয়া। আহার করিলে পেট তাহার ভরিবেই, ভোগ করিলে এক জায়গায় তাহার নিবৃত্তিতে আসিয়া ঠেকিতেই হইবে— আরো'র ইচ্ছাকে সেখানে কোনো-একটা সীমায় আসিয়া হার মানিতেই হইবে। শুধু হার মানা নয়, সে জায়গায় সে দুঃখ পাইবে এবং দুঃখ ঘটাইবে। ব্যাধি আসিবে, বিকৃতি আসিবে, সে নিজেকে এবং অন্যকে বাধা দিতে থাকিবে। কেননা, প্রকৃতি যেখানে সীমা টানিয়াছেন তাহাকে লঙ্ঘন করিতে গেলেই শাস্তি আছে।

শুধু তাই নয়। প্রকৃতির সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে আমাদের এই আরো'র ইচ্ছাকে দৌড় করাইতে গেলেই পরস্পরের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িতে হয়। যেটুকু আমার আছে তাহার চেয়ে বেশি লইতে গেলেই যেটুকু তোমার আছে তাহার উপর হাত দিতে হয়। তখন, হয় গোপনে ছলনা নয় প্রকাশ্যে গায়ের জোর আশ্রয় করিতে হয়। তখন দুর্বলের মিথ্যাচার ও প্রবলের দৌরাত্ম্যে সমাজ লণ্ডভণ্ড হইতে থাকে।

এমনি করিয়াই পাপ আসে, বিনাশ আসে। কিন্তু, এই পাপ যদি না আসিত তবে মানুষ পথ দেখিতে পাইত না। এই আরো'র অতৃপ্তি যেখানে তাহাকে টানিয়া লইয়া যায় সেখানে যদি পাপের আগুন জ্বলে, তবে ঘোড়াটাকে কোনোমতে বাগ মানাইয়া ফিরাইয়া আনিবার কথা মনে আসে। এইজন্য মনুষ্যলোকে অন্যান্য সকল শিক্ষার উপরে সেই সাধনাটা প্রচলিত যাহাতে ঐ আরো'র ইচ্ছাটাকে বশে আনা যায়। কেননা, মানুষকে ঈশ্বর ঐ একটা ভয়ংকর বাহন দিয়াছেন, ও আমাদের কোথায় লইয়া গিয়া যে ফেলে তাহার ঠিকানা নাই। উহার মুখে লাগাম পরাও, উহাকে চালাইতে

শিখ। কিন্তু তাই বলিয়া উহার দানাপানি একেবারে বন্ধ করিয়া উহাকে মারিয়া ফেলিলে চলিবে না। কেননা, এই আয়ো'র ইচ্ছাই মানুষের যথার্থ বাহন।

প্রয়োজনসাধনের ইচ্ছা জন্তুদের বাহন। এইটে না থাকিলে তাহাদের জীবনযাত্রা একেবারেই চলিত না। এই ইচ্ছাটাই প্রাকৃতিক জীবনের মূল ইচ্ছা। ইহাই দুঃখ দূর করিবার ইচ্ছা। এই ইচ্ছা যেখানে বাধা পায় সেইখানেই জন্তুদের দুঃখ, যেখানে তাহার পূরণ হয় সেইখানেই তাহাদের সুখ। তাই দেখা যায়, জন্তুদের সুখ দুঃখ আছে কিন্তু পাপপুণ্য নাই।

কিন্তু, মানুষের মধ্যে এই-যে আয়ো'র ইচ্ছা ইহা আরামের ইচ্ছা নহে, সুখের ইচ্ছা নহে, বস্তুত ইহা দুঃখেরই ইচ্ছা। মানুষ যে কেবলই প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া আপন জ্ঞান প্রেম ও শক্তি -রাজ্যের উত্তরমেরু ও দক্ষিণমেরু আবিষ্কার করিবার জন্য বারম্বার বাহির হইয়া পড়িতেছে, ইহা তাহার সুখের সাধনা নহে। ইহা তাহার কোনো বর্তমান প্রয়োজন -সাধনের ইচ্ছা নহে।

বস্তুত মানুষের মধ্যে এই-যে দুই স্তরের ইচ্ছা আছে ইহার মধ্যে একটা প্রয়োজনের ইচ্ছা, আর-একটা অপ্রয়োজনের ইচ্ছা। একটা যাহা না হইলে কিছুতেই চলে না তাহার ইচ্ছা, এবং অন্যটা যাহা না হইলে অনায়াসেই চলে তাহার ইচ্ছা। আশ্চর্য এই যে মানুষের মনে এই দ্বিতীয় ইচ্ছাটার শক্তি এমন প্রবল যে, সে যখন জাগিয়া উঠে তখন সে এই প্রথম ইচ্ছাটাকে একেবারে ছারখার করিয়া দেয়। তখন সে সুখ-সুবিধা-প্রয়োজনের কোনো দাবিতেই একেবারে কর্ণপাত করে না। তখন সে বলে, 'আমি সুখ চাহি না, আমি আয়ো'কেই চাই ; সুখ আমার সুখ নহে, আয়ো'ই আমার সুখ।' তখন সে বলে, 'ভূমৈব সুখম্।'

সুখ বলিতে যাহা বুঝায় তাহা ভূমা নহে। ভূমা সুখ নহে, আনন্দ। সুখের সঙ্গে আনন্দের প্রভেদ এই যে, সুখের বিপরীত দুঃখ, কিন্তু আনন্দের বিপরীত দুঃখ নহে। শিব যেমন করিয়া হলাহল পান করিয়াছিলেন, আনন্দ তেমনি করিয়া দুঃখকে অনায়াসেই গ্রহণ করে। এমন-কি, দুঃখের দ্বারাই আনন্দ আপনাকে সার্থক করে, আপনার পূর্ণতাকে উপলব্ধি করে। তাই দুঃখের তপস্যাই আনন্দের তপস্যা।

তাই দেখিতেছি, অন্যান্য জন্তুদের ন্যায় মানুষের নীচের ইচ্ছাটা দুঃখনিবৃত্তির ইচ্ছা, আর উপরের ইচ্ছাটা দুঃখকে আত্মসাৎ করিয়া আনন্দলাভের ইচ্ছা। এই ইচ্ছাই কেবলই আমাদিগকে বলিতেছে, 'নাল্পে সুখমস্তি, ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।'

তাই প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে আপন সহজ বোধটুকু লইয়া জন্তু দুঃখনিবৃত্তিচেষ্টার সনাতন গণ্ডির মধ্যে বদ্ধ হইয়া রহিল। মানুষ তাহার মানসক্ষেত্রে জ্ঞান প্রেম শক্তির কোনো

সীমাতেই বদ্ধ হইতে চাহিল না ; সে বলিল, 'অভ্যাসকে নহে, সংস্কারকে নহে, প্রথাকে নহে, আমি ভূমাকে জানিব।'

তাই যদি হয় তবে এই আরো'র ইচ্ছাকে, এই আনন্দের ইচ্ছাকে, এত করিয়া বশে আনিবার জন্য মানুষের এমন প্রাণপণ চেষ্টার প্রয়োজন কী ছিল। এই প্রকাণ্ড ইচ্ছার প্রবল স্রোতে চোখ বুজিয়া আত্মসমর্পণ করিলেই তো মানুষের মনুষ্যত্ব সার্থক হইত।

ইচ্ছাকে বল্গাবদ্ধ করিবার প্রধান কারণ এই যে, দুটা ইচ্ছার অধিকারনির্ণয় লইয়া মানুষকে বিষম সংকটে পড়িতে হইয়াছে। আমাদের প্রাকৃতিক প্রয়োজনের একটা ক্ষেত্র আছে, সেখানে আমরা সীমাবদ্ধ। সেখানে আমাদের বাসনাকে তাহার সহজ সীমার চেয়ে জোর করিয়া টানিয়া বাড়াইতে গেলেই বিপদ ঘটিবে। এই সীমানার বেড়াটা কিছু পরিমাণে স্থিতিস্থাপক, এইজন্য কিছু দূর পর্যন্ত তাহা টান সয়। দুঃসাহসে ভর করিয়া সেই টান কেবলই বাড়াইতে গেলে রাবণের স্বর্ণলঙ্কা ধ্বংস হয়, ব্যাবিলনের সৌধচূড়া ভাঙিয়া পড়ে ; আমাদের আরো-ইচ্ছার মন্থনদণ্ডকে ঐ দিকেই পাক দিতে গেলে ব্যাধি বিকৃতি ও পাপের বিষ মথিত হইয়া উঠে।

দেখা যাইতেছে, মানুষের অহমের দিকটাই সংকীর্ণ। সেখানে অতিরিক্ত পরিমাণে যাহাই গ্রহণ করিতে চাও তাহাই বোঝা হইয়া উঠে। নিজের সুখ, নিজের স্বার্থ, নিজের ক্ষমতাকে অপরিসীম করিবার চেষ্টা আত্মহত্যার চেষ্টা। ও জায়গায় ভূমার ভর একেবারেই সয় না। আহারে বিহারে স্বার্থসাধনে ভূমা অতি বীভৎস।

এই কারণে মানুষের এই আরো'র ইচ্ছাটা যখন মত্ত হস্তীর মতো তাহার ক্ষণভঙ্গুর অহমের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে তখন তাহার বিষম বিপদ। কেবল যদি তাহাতে নিজের ও অন্যের দুঃখ আনিত তাহা হইলেও কথা ছিল না। কিন্তু, ইহার দুর্গতি তাহার চেয়ে আরও অনেক বেশি। ইহাতে পাপ আনে ; দুঃখের পরিমাপে তাহার পরিমাপ নহে। কারণ, পূর্বেই আভাস দিয়াছি, কেবলমাত্র দুঃখের দ্বারা মানুষের ক্ষতি হয় না— এমন-কি, দুঃখের দ্বারা মানুষের মঙ্গল হইতে পারে— কিন্তু, পাপই মানুষের পরম ক্ষতি।

ইহার উন্টা দিকটাও দেখো। মানুষের প্রয়োজনের ইচ্ছা, অর্থাৎ সীমাবদ্ধ সাংসারিক ইচ্ছা যখন স্বার্থের ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া পরমার্থের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে তখন সেও বড়ো কুৎসিত। তখন সে কেবলই পুণ্যের হিসাব রাখিতে থাকে। যাহা পূর্ণ-আনন্দ, যাহা সকল ফলাফলের অতীত, তাহাকে ফলাফলের অঙ্কে ভাগভাগ করিয়া গণনা করিতে থাকে। এবং সেই গণনার উপর নির্ভর করিয়া মানুষ অহংকৃত হইয়া উঠে, কেবলই বাহ্যিকতার জালে জড়াইয়া পড়ে এবং স্বার্থপর শুচিতাকে কৃপণের

ধনের মতো সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে অত্যন্ত সাবধানে জমা করিয়া তুলিতে থাকে। তখন সে ভূমার ক্ষেত্রে বিজ্ঞ সাংসারিকের মতো নিজের একটা বেড়া তুলিয়া দিয়া বৈষয়িকতার সৃষ্টি করে। ইহাও পাপের আর-এক মূর্তি। ইহা আধ্যাত্মিককে বাহ্যিক ও পরমার্থকে স্বার্থ করিয়া তোলা।

মানুষের মনে এই-যে একটা পাপের বোধ আসে সে জিনিসটা কী তাহা ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, আমাদের যে মহতী ইচ্ছা আমাদিগকে ভূমার দিকে লইয়া যাইবে তাহাকে ঠিক বিপরীত পথে ক্ষুদ্র অহমের অভিমুখে টানিয়া আনিলে কেবল যে দুঃখ ঘটে তাহা নহে— এমন-কি, স্থলবিশেষে দুঃখ না ঘটিতেও পারে— তাহাতে আমরা ভূমাকে হারাই। আমাদের বড়োর দিক, আমাদের সত্যের দিক, নষ্ট হইয়া যায়; জন্তুর পক্ষে তাহাতে কিছুই আসে যায় না, কিন্তু মানুষের পক্ষে তেমন বিনাশ আর-কিছু নাই। এই বিনাশের বোধ সকলের চিত্তে সমান নহে, এমন-কি কারও কারও চিত্তে অত্যন্ত ক্ষীণ। কিন্তু, মোটের উপর সমগ্র মানবের মনে এই পাপের বোধ দুঃখ-বোধের চেয়ে অনেক বড়ো হইয়া আছে। এতই বড়ো যে বহু দুঃখের দ্বারা মানুষ এই পাপকে ক্ষয় করিতে চায়। পাপ-নামক শব্দের দ্বারা মানুষ নিজের যে-একটি গভীরতম দুর্গতিকে ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছে, ইহার দ্বারাই মানুষ আপনার সত্যতম পরিচয় দিয়াছে।

সে পরিচয়টি এই যে, সীমাবদ্ধ প্রকৃতির মধ্যে মানুষের স্বাভাবিক বিহারক্ষেত্র নহে, অনন্তের মধ্যেই মানুষের আনন্দ; অহমের দিকই মানুষের চরম সত্যের দিক নহে, ব্রহ্মের দিকেই তাহার সত্য। মানুষ আপনার মধ্যে যে-একটি পরম ইচ্ছাকে পাইয়াছে, যে ইচ্ছা কোনোমতেই অল্পকে মানিতে চায় না, তাহা দুঃসহ তপস্যার মধ্য দিয়া জ্ঞানে বিজ্ঞানে শিল্পে সাহিত্যে মানুষের চিত্তকে আনন্দময় মুক্তির অভিমুখে কেবলই প্রবাহিত করিয়া চলিয়াছে এবং তাহা প্রেমভক্তি ও পবিত্রতায় মানুষের সমস্ত চেতনাধারাকে এক অপরিসীম অতলস্পর্শ অমৃতপারাবারের মধ্যে উত্তীর্ণ করিয়া দিতেছে। মানুষের সেই পরম গতিকে যাহা-কিছু বাধা দেয়, যাহা তাহাকে বিপরীত দিকে টানে, তাহাই পাপ, তাহাই দুর্গতি, তাহাই তাহার মহতী বিনষ্টি।

লোহিত সমুদ্র
২৩ জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩১৯

অন্তর বাহির

ভোরে ক্যাবিনে বিছানায় যখন প্রথম ঘুম ভাঙিয়া গেল গবাক্ষের ভিতর দিয়া দেখিলাম, সমুদ্রে আজ ঢেউ দিয়াছে; পশ্চিম দিক হইতে বেগে বাতাস বহিতেছে। কান পাতিয়া তরঙ্গের কলশব্দ শুনিতে শুনিতে এক সময় মনে হইল, কোন্‌-একটা অদৃশ্যযন্ত্রে গান বাজিয়া উঠিতেছে। সে গানের শব্দ যে মেঘগর্জনের মতো প্রবল তাহা নহে, তাহা গভীর এবং বিলম্বিত; কিন্তু, যেমন মৃদঙ্গ-করতালের বলবান শব্দের ঘটার মধ্যে বেহালার একটি তারের একটানা তান সকলকে ছাপাইয়া বুকের ভিতরে বাজিতে থাকে, তেমনি সেই ধীর গম্ভীর সুরের অবিরাম ধারা সমস্ত আকাশের মর্মস্থলকে পূর্ণ করিয়া উচ্ছলিত হইতেছিল। শেষকালে এমন হইল, আমার মনের মধ্যে যে সুর শুনিতেছিলাম তাহাই কণ্ঠে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু, এরূপ চেষ্টা একটা দৌরাত্ম্য; ইহাতে সেই বড়ো সুরটির শান্তি নষ্ট করিয়া দেয়; তাই আমি চুপ করিলাম।

একটা কথা আমার মনে হইল, প্রভাতে মহাসমুদ্র আমার মনের যন্ত্রে এই-যে গান জাগাইল তাহা তো বাতাসের গর্জন ও তরঙ্গের কলধ্বনির প্রতিধ্বনি নহে। তাহাকে কিছুতেই এই আকাশব্যাপী জলবাতাসের শব্দের অনুকরণ বলিতে পারি না। তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; তাহা একটি গান; তাহাতে সুরগুলি ফুলের পাপড়ির মতো একটির পরে আর-একটি ধীরে ধীরে স্তরে স্তরে উদ্‌ঘাটিত হইতেছিল।

অথচ আমার মনে হইতেছিল, তাহা স্বতন্ত্র কিছুই নহে, তাহা এই সমুদ্রের বিপুল শব্দোচ্ছ্বাসেরই অন্তরতর ধ্বনি; এই গানই পূজামন্দিরের সুগন্ধি ধূপের ধূমের মতো আকাশকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে পূর্ণ করিয়া কেবলই উপরে উঠিতেছে। সমুদ্রের নিশ্বাসে নিশ্বাসে যাহা উচ্ছ্বসিত হইতেছে তাহার বাহিরে শব্দ, তাহার অন্তরে গান।

বাহিরের সঙ্গে ভিতরের একটা যোগ আছে বটে, কিন্তু সে যোগ অনুরূপতার যোগ নহে; বরঞ্চ দেখিতে পাই, সে যোগ সম্পূর্ণ বৈসাদৃশ্যের যোগ। দুই মিলিয়া আছে, কিন্তু দুইয়ের মধ্যে মিল যে কোন্‌খানে তাহা ধরিবার জো নাই। তাহা অনির্বচনীয় মিল; তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণযোগ্য মিল নহে।

চোখে লাগিতেছে স্পন্দনের আঘাত, আর মনে দেখিতেছি আলো; দেহে ঠেকিতেছে বস্তু, আর চিত্তে জাগিতেছে সৌন্দর্য; বাহিরে ঘটিতেছে ঘটনা, আর অন্তরে ঢেউ খেলাইয়া উঠিতেছে সুখদুঃখ। একটার আয়তন আছে, তাহাকে বিশ্লেষণ করা যায়; আর-একটার আয়তন নাই, তাহা অখণ্ড। এই-যে 'আমি' বলিতে যাহাকে

বুঝি তাহা বাহিরের দিকে কত শব্দ গন্ধ স্পর্শ, কত মুহূর্তের চিন্তা ও অনুভূতি, অথচ এই-সমস্তেরই ভিতর দিয়া যে-একটি জিনিস আপন সমগ্রতায় প্রকাশ পাইতেছে তাহাই আমি এবং তাহা তাহার বাহিরের রূপের প্রতিরূপ মাত্র নহে, বরঞ্চ বাহিরের বৈপরীত্যের দ্বারাই সে ব্যক্ত হইতেছে।

বিশ্বরূপের অন্তরতর এই অপরূপকে প্রকাশ করিবার জন্তই শিল্পীদের গুণীদের এত ব্যাকুলতা। এইজন্ত তাঁহাদের সেই চেষ্টা অনুকরণের ভিতর দিয়া কখনোই সফল হইতে পারে না। অনেক সময়ে অভ্যাসের মোহে আমাদের বোধের মধ্যে জড়তা আসে। তখন, আমরা যাহাকে দেখিতেছি কেবলমাত্র তাহাকেই দেখি। প্রত্যক্ষ রূপ যখন নিজেকেই চরম বলিয়া আমাদের কাছে আত্মপরিচয় দেয় তখন যদি সেই পরিচয়টাকেই মানিয়া লই তবে সেই জড় পরিচয়ে আমাদের চিত্ত জাগে না। তখন পৃথিবীতে আমরা চলি, ফিরি, কাজ করি, কিন্তু পৃথিবীকে আমরা চিত্তদ্বারা গ্রহণ করি না। কারণ, এই পৃথিবীর অন্তরতর অপরূপতাই আমাদের চিত্তের সামগ্রী। অভ্যাসের আবরণ মোচন করিয়া সেই অপরূপতাকে উদ্‌ঘাটিত করিবার কাজেই কবিরা গুণীরা নিযুক্ত।

এইজন্ত তাঁহারা আমাদের অভ্যস্ত রূপটির অনুসরণ না করিয়া তাহাকে খুব একটা নাড়া দিয়া দেন। তাঁহারা এক রূপকে আর-এক রূপের মধ্যে লইয়া গিয়া তাহার চরমতার দাবিকে অগ্রাহ্য করিয়া দেন। চোখে দেখার সামগ্রীকে তাঁহারা কানে শোনার জায়গায় দাঁড় করান, কানে শোনার সামগ্রীকে তাঁহারা চোখে দেখার রেখার মধ্যে রূপান্তরিত করিয়া ধরেন। এমনি করিয়া তাঁহারা দেখাইয়াছেন জগতে রূপ জিনিসটা ধ্রুব সত্য নহে, তাহা রূপকমাত্র; তাহার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে তবেই তাহার বন্ধন হইতে মুক্তি, তবেই আনন্দের মধ্যে পরিত্রাণ।

আমাদের গুণীরা ভৈরোঁতে টোড়িতে সুর বাঁধিয়া বলিলেন, ইহা সকালবেলাকার গান। কিন্তু, তাহার মধ্যে সকালবেলার নবজাগ্রত সংসারের নানাবিধ ধ্বনির কি কোনো নকল দেখিতে পাওয়া যায়। কিছুমাত্র না। তবে ভৈরোঁকে টোড়িকে সকালবেলার রাগিণী বলিবার কী মানে হইল। তাহার মানে এই, সকালবেলাকার সমস্ত শব্দ ও নিঃশব্দতার অন্তরতর সংগীতটিকে গুণীরা তাঁহাদের অন্তঃকরণ দিয়া শুনিয়াছেন। সকালবেলাকার কোনো বহিরঙ্গের সঙ্গে এই সংগীতকে মিলাইবার চেষ্টা করিতে গেলে সে চেষ্টা ব্যর্থ হইবে।

আমাদের দেশের সংগীতের এই বিশেষত্বটি আমার কাছে বড়ো ভালো লাগে। আমাদের দেশে প্রভাত মধ্যাহ্ন অপরাহ্ণ সায়াহ্ন অর্ধরাত্রি ও বর্ষাবসন্তের রাগিণী রচিত

হইয়াছে। সে রাগিণীর সবগুলি সকলের কাছে ঠিক লাগিবে কি না জানি না। অন্তত আমি সারঙ রাগকে মধ্যাহ্নকালের সুর বলিয়া হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করি না। তা হউক, কিন্তু বিশ্বেশ্বরের খাসমহলের গোপন নহবতখানায় যে কালে কালে ঋতুতে ঋতুতে নব নব রাগিণী বাজিতেছে, আমাদের গুণীদের অন্তঃকর্ণে তাহা প্রবেশ করিয়াছে। বাহিরের প্রকাশের অন্তরালে যে-একটি গভীরতর অন্তরের প্রকাশ আছে আমাদের দেশের টোড়ি কানাড়া তাহাই জানাইতেছে।

য়ুরোপের বড়ো বড়ো সংগীতরচয়িতারা নিশ্চয়ই কোনো না কোনো দিক দিয়া তাঁহাদের গানে বিশ্বের সেই অন্তরের বার্তাই প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন; তাঁহাদের রচনার সঙ্গে যদি তেমন করিয়া পরিচয় হয় তবে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। আপাতত য়ুরোপীয় সংগীতসভার বাহির-দেউড়িতে বাজে লোকের ভিড়ের মধ্যে যেটুকু শোনা যায় তাহার সম্বন্ধে দুই-একটা কথা আমার মনে উঠিয়াছে।

আমাদের জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ সন্ধ্যার সময় গান-বাজনা করিয়া থাকেন। যখনি সেরূপ বৈঠক বসে আমিও সেই ঘরের এক কোণে গিয়া বসি। বিলাতি গান আমার স্বভাবত ভালো লাগে বলিয়াই যে আমাকে টানিয়া আনে তাহা নহে। কিন্তু, আমি নিশ্চয় জানি, ভালো জিনিস ভালো লাগার একটা সাধনা আছে। বিনা সাধনায় যাহা আমাদিগকে মুগ্ধ করে তাহা অনেক সময়েই মোহ এবং যাহা নিরস্ত করে তাহাই যথার্থ উপাদেয়। সেইজন্য য়ুরোপীয় সংগীত আমি শুনিবার অভ্যাস করি। যখন আমার ভালো না লাগে তখনো তাহাকে অশ্রদ্ধা করিয়া চুকাইয়া দিই না।

এ জাহাজে একজন যুবক ও দুই-একজন মহিলা আছেন, তাঁহারা বোধ হয় মন্দ গান করেন না। দেখিতে পাই, শ্রোতারা তাঁহাদের গানে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। যেদিন সভা বিশেষ রূপে জমিয়া উঠে সেদিন একটির পর একটি করিয়া অনেকগুলি গান চলিতে থাকে। কোনো গান বা ইংলণ্ডের গৌরবগর্ব, কোনো গান বা হতাশ প্রণয়িনীর বিদায়সংগীত, কোনো গান বা প্রেমিকের প্রেমনিবেদন। সবগুলির মধ্যে একটা বিশেষত্ব আমি এই দেখি, গানের সুরে এবং গায়কের কণ্ঠে পদে পদে খুব একটা জোর দিবার চেষ্টা। সে জোর সংগীতের ভিতরকার শক্তি নহে, তাহা যেন বাহিরের দিক হইতে প্রয়াস। অর্থাৎ, হৃদয়াবেগের উত্থানপতনকে সুরের ও কণ্ঠস্বরের ঝোঁক দিয়া খুব করিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া দিবার চেষ্টা।

ইহাই স্বাভাবিক। আমাদের হৃদয়োচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই আমাদের কণ্ঠস্বরের বেগ কখনো মৃদু কখনো প্রবল হইয়া উঠে। কিন্তু, গান তো স্বভাবের নকল নহে; কেননা, গান আর অভিনয় তো এক জিনিস নয়। অভিনয়কে যদি গানের

সঙ্গে মিলিত করি তবে গানের বিশুদ্ধ শক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া দেওয়া হয়। তাই জাহাজের সেলুনে বসিয়া যখন ইহাদের গান শুনি তখন আমার কেবলই মনে হইতে থাকে, হৃদয়ের ভাবটাকে ইহারা যেন ঠেলা দিয়া, চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিতে চায়।

কিন্তু, সংগীতে তো আমরা তেমন করিয়া বাহিরের দিক দিয়া দেখিতে চাই না। প্রেমিক ঠিকটি কেমন করিয়া অনুভব করিতেছে তাহা তো আমার জানিবার বিষয় নহে। সেই অনুভূতির অন্তরে অন্তরে যে সংগীতটি বাজিতেছে তাহাই আমরা গানে জানিতে চাই। বাহিরের প্রকাশের সঙ্গে এই অন্তরের প্রকাশ একেবারে ভিন্নজাতীয়। কারণ, বাহিরের দিকে যাহা আবেগ, অন্তরের দিকে তাহাই সৌন্দর্য। ঈথরের স্পন্দন ও আলোকের প্রকাশ যেমন স্বতন্ত্র, ইহাও তেমনি স্বতন্ত্র।

আমরা অশ্রুবর্ষণ করিয়া কাঁদি ও হাস্য করিয়া আনন্দ প্রকাশ করি, ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু, দুঃখের গানে গায়ক যদি সেই অশ্রুপাতের ও সুখের গানে হাস্যধ্বনির সহায়তা গ্রহণ করে, তবে তাহাতে সংগীতের সরস্বতীর অবমাননা করা হয় সন্দেহ নাই। বস্তুত যেখানে অশ্রুর ভিতরকার অশ্রুটি ঝরিয়া পড়ে না এবং হাস্যের ভিতরকার হাস্যটি ধ্বনিয়া উঠে না, সেইখানেই সংগীতের প্রভাব। সেইখানে মানুষের হাসিকান্নার ভিতর দিয়া এমন একটা অসীমের মধ্যে চেতনা পরিব্যাপ্ত হয় যেখানে আমাদের সুখদুঃখের সুরে সমস্ত গাছপালা নদীনির্ঝরের বাণী ব্যক্ত হইয়া উঠে এবং আমাদের হৃদয়ের তরঙ্গকে বিশ্বহৃদয়সমুদ্রেরই লীলা বলিয়া বুঝিতে পারি।

কিন্তু, সুরে ও কণ্ঠে জোর দিয়া, ঝোঁক দিয়া, হৃদয়াবেগের নকল করিতে গেলে সংগীতের সেই গভীরতাকে বাধা দেওয়া হয়। সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটার মতো সংগীতের নিজের একটা ওঠানামা আছে, কিন্তু সে তাহার নিজেরই জিনিস; কবিতার ছন্দের মতো সে তাহার সৌন্দর্যনৃত্যের পাদবিক্ষেপ; তাহা আমাদের হৃদয়াবেগের পুতুলনাচের খেলা নহে।

অভিনয়-জিনিসটা যদিও মোটের উপর অন্যান্য কলাবিদ্যার চেয়ে নকলের দিকে বেশি ঝোঁক দেয়, তবু তাহা একেবারে হরবোলার কাণ্ড নহে। তাহাও স্বাভাবিকের পর্দা ফাঁক করিয়া তাহার ভিতর দিকের লীলা দেখাইবার ভার লইয়াছে। স্বাভাবিকের দিকে বেশি ঝোঁক দিতে গেলেই সেই ভিতরের দিকটাকে আচ্ছন্ন করিয়া দেওয়া হয়। রঙ্গমঞ্চে প্রায়ই দেখা যায়, মানুষের হৃদয়াবেগকে অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইবার জন্য অভিনেতারা কণ্ঠস্বরে ও অঙ্গভঙ্গে জবরদস্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, যে ব্যক্তি সত্যকে প্রকাশ না করিয়া সত্যকে নকল করিতে চায় সে মিথ্যা-

সাক্ষ্যদাতার মতো বাড়াইয়া বলে। সংযম আশ্রয় করিতে তাহার সাহস হয় না। আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চে প্রত্যহই মিথ্যাসাক্ষীর সেই গলদ্ঘর্ম ব্যায়াম দেখা যায়। কিন্তু, এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়াছিলাম বিলাতে। সেখানে বিখ্যাত অভিনেতা আর্ভিঙের হ্যাম্‌লেট ও ব্রাইড অফ লামারমুর দেখিতে গিয়াছিলাম। আর্ভিঙের প্রচণ্ড অভিনয় দেখিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। এরূপ অসংযত আতিশয্যে অভিনেতব্য বিষয়ের স্বচ্ছতা একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে; তাহাতে কেবল বাহিরের দিকেই দোলা দেয়, গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করিবার এমন বাধা তো আমি আর কখনো দেখি নাই।

আর্ট-জিনিসটাতে সংযমের প্রয়োজন সকলের চেয়ে বেশি। কারণ, সংযমই অন্তরলোকে প্রবেশের সিংহদ্বার। মানবজীবনের সাধনাতেও, যাঁহারা আধ্যাত্মিক সত্যকে উপলব্ধি করিতে চান তাঁহারাও বাহ্য উপকরণকে সংক্ষিপ্ত করিয়া সংযমকে আশ্রয় করেন। এইজন্য আত্মার সাধনায় এমন একটি অদ্ভুত কথা বলা হইয়াছে: ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। ত্যাগের দ্বারা ভোগ করিবে। আর্টেরও চরম সাধনা ভূমার সাধনা। এইজন্য প্রবল আঘাতের দ্বারা হৃদয়কে মাদকতার দোলা দেওয়া আর্টের সত্য ব্যবসায় নহে। সংযমের দ্বারা তাহা আমাদিগকে অন্তরের গভীরতার মধ্যে লইয়া যাইবে, এই তাহার সত্য লক্ষ্য। যাহা চোখে দেখিতেছি তাহাকেই নকল করিবে না, কিম্বা তাহারই উপর খুব মোটা তুলির দাগা বুলাইয়া তাহাকেই অতিশয় করিয়া তুলিয়া আমাদিগকে ছেলে-ভুলাইবে না।

এই প্রবলতার ঝোঁক দিয়া আমাদের মনকে কেবলই ধাক্কা মারিবার চেষ্টা য়ুরোপীয় আর্টের ক্ষেত্রে সাধারণত দেখিতে পাওয়া যায়। মোটের উপর য়ুরোপ বাস্তবকে ঠিক বাস্তবের মতো করিয়া দেখিতে চায়। এইজন্য যেখানে ভক্তির ছবি আঁকা দেখি সেখানে দেখিতে পাই, হাত দুখানি জোড় করিয়া মাথা আকাশে তুলিয়া চোখের তারা দুটি উল্‌টাইয়া ভক্তির বাহ্য ভঙ্গিমা নিরতিশয় পরিস্ফুট করিয়া আঁকা। আমাদের দেশে যে-সকল ছাত্র বিলাতি আর্টের নকল করিতে যায় তাহারা এইপ্রকার ভঙ্গিমার পন্থায় ছুটিয়াছে। তাহারা মনে করে, বাস্তবের উপর জোরের সঙ্গে ঝোঁক দিলেই যেন আর্টের কাজ সুসিদ্ধ হয়। এইজন্য নারদকে আঁকিতে গেলে তাহারা যাত্রার দলের নারদকে আঁকিয়া বসে— কারণ, ধ্যানের দৃষ্টিতে দেখা তো তাহাদের সাধনা নহে; যাত্রার দলে ছাড়া আর তো কোথাও তাহারা নারদকে দেখে নাই।

আমাদের দেশে বৌদ্ধযুগে একদা গ্রীক শিল্পীরা তাপস বুদ্ধের মূর্তি গড়িয়াছিল। তাহা উপবাসজীর্ণ কৃশ শরীরের যথাযথ প্রতিরূপ; তাহাতে পাঁজরের প্রত্যেক হাড়টির

হিসাব গণিয়া পাওয়া যায়। ভারতবর্ষীয় শিল্পীও তাপস বুদ্ধের মূর্তি গড়িয়াছিল, কিন্তু তাহাতে উপবাসের বাস্তব ইতিহাস নাই। তাপসের আন্তর মূর্তির মধ্যে হাড়গোড়ের হিসাব নাই; তাহা ডাক্তারের সার্টিফিকেট লইবার জন্য নহে। তাহা বাস্তবকে কিছুমাত্র আমল দেয় নাই বলিয়াই সত্যকে প্রকাশ করিতে পারিয়াছে। ব্যবসায়ী আর্টিস্ট্ বাস্তবের সাক্ষী, আর গুণী আর্টিস্ট্ সত্যের সাক্ষী। বাস্তবকে চোখ দিয়া দেখি আর সত্যকে মন দিয়া ছাড়া দেখিবার জো নাই। মন দিয়া দেখিতে গেলেই চোখের সামগ্রীর দৌরাত্ম্যকে খর্ব করিতেই হইবে; বাহিরের রূপটাকে সাহসের সঙ্গে বলিতেই হইবে, 'তুমি চরম নও, তুমি পরম নও, তুমি লক্ষ্য নও, তুমি সামান্য উপলক্ষ্যমাত্র।'

আরব-সমুদ্র
২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯

খেলা ও কাজ

ভূমধ্য-সাগরের প্রথম ঘাট পোর্ট-সৈয়দ। এইখান হইতে আমাদিগকে য়ুরোপের পারে পাড়ি দিতে হইবে। সন্ধ্যার সময় আমরা বন্দরে পৌঁছিলাম। শহরের বাতায়নগুলিতে তখন আলো জ্বলিয়াছে। আরোহীদিগকে ডাঙায় পৌঁছাইয়া দিবার জন্য ছোটো ছোটো নৌকা এবং মোটর-বোট ঝাঁকে ঝাঁকে চারি দিকে আসিয়া আমাদের জাহাজ ঘিরিয়াছে। পোর্ট-সৈয়দের দোকান-বাজার ঘুরিবার জন্য অনেকেই সেখানে নামিলেন। আমি সেই ভিড়ের মধ্যে নামিলাম না। জাহাজের রেলিঙ ধরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। অন্ধকার সমুদ্র এবং অন্ধকার আকাশ—দুইয়ের সংগমস্থলে অল্প একটুখানি জায়গায় মানুষ আপনার আলো কয়টি জ্বালাইয়া রাত্রিকে একেবারে অস্বীকার করিয়া বসিয়াছে।

পোর্ট-সৈয়দে অনেকগুলি নূতন আরোহী উঠিবার কথা। পুরাতনের দল এই সংবাদে বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। আর-সমস্ত নূতনকে মানুষ খুঁজিয়া বাহির করে, কিন্তু নূতন মানুষ! এমন উদ্‌বেগের বিষয় আর-কিছুই নাই। সে কাছে আসিলে তাহার সঙ্গে ভিতরে বাহিরে বোঝাপড়া করিয়া লইতেই হইবে। সে তো কেবলমাত্র কৌতূহলের বিষয় নহে। তাহার মন লইয়া সে অন্যের মনকে ঠেলাঠেলি করে। মানুষের ভিড়ের মতো এমন ভিড় আর নাই।

পোর্ট-সৈয়দে যাহারা জাহাজে চড়িল তাহারা প্রায় সকলেই ফরাসি। আমাদের ডেক এখন মানুষে মানুষে ভরিয়া গিয়াছে। এখন পরস্পরের দেহতরী বাঁচাইয়া চলিতে হইলে রীতিমত মাঝিগিরির প্রয়োজন হয়।

সকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত ডেকের উপর য়ুরোপীয় নরনারীদের প্রতিদিনের কালযাপন আমি আরও কয়েকবার দেখিয়াছি, এবারও দেখিতেছি। প্রথমটাই চোখে পড়ে, ইহারা সর্বদাই চঞ্চল হইয়া আছে। এতটা চাঞ্চল্য আমাদের অভ্যস্ত নহে। আমাদের গরম দেশে আমরা কোনোমতে ঠাণ্ডা থাকিতে চাই— চোখের সামনে অন্য কেহ অস্থিরতা প্রকাশ করিলেও আমাদের গরম বোধ হয়। 'চুপ করো, স্থির থাকো, মিছামিছি কাজ বাড়াইয়ো না' ইহাই আমাদের সমস্ত দেশের অনুশাসন। আর, ইহারা কেবলই বলে, 'একটা-কিছু করা যাক।' এইজন্য ইহারা ছেলে বুড়া সকলে মিলিয়া কেবলই দাপাদাপি করিতেছে। হাসি গল্প খেলা আমোদের বিরাম নাই, অবসান নাই।

অভ্যাসের বাধা সরাইয়া দিয়া আমি যখন এই দৃশ্য দেখি আমার মনে হয়, আমি যেন বাহ্য প্রকৃতির একটা লীলা দেখিতেছি। যেন ঝরনা ঝরিতেছে, যেন নদী চলিতেছে, যেন গাছপালা বাতাসে মাতামাতি করিতেছে। আপনার সমস্ত প্রয়োজন সারিয়াও প্রাণের বেগ আপনাকে নিঃশেষ করিতে পারিতেছে না; তখন সে আপনার সেই উদ্‌বৃত্ত প্রাচুর্যের দ্বারা আপনাকেই আপনি প্রকাশ করিতেছে।

আমরা যখন ছোটো ছেলেকে কোথাও সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই তখন কিছু খেলনার আয়োজন রাখি; নহিলে তাহাকে শান্ত রাখা শক্ত হয়। কেননা, তাহার প্রাণের স্রোত তাহার প্রয়োজনের সীমাকে ছাপাইয়া চলিয়াছে। সেই উচ্ছলিত প্রাণের বেগ আপনার লীলার উপকরণ না পাইলে অধীর হইয়া উঠে। এইজন্যই ছেলেদের বিনা কারণে ছুটাছুটি করিতে হয়, তাহারা যে চেঁচামেচি করে তাহার কোনো অর্থই নাই এবং তাহাদের খেলা দেখিলে বিজ্ঞ ব্যক্তির হাসি আসে এবং কাহারও কাহারও বিরক্তি বোধ হয়। কিন্তু, তাহাদের এই খেলার উৎপাত আমাদের পক্ষে যত বড়ো উপদ্রব হউক, খেলা বন্ধ করিলে উপদ্রব আরও গুরুতর হইয়া উঠে সন্দেহ নাই।

এই-যে য়ুরোপীয় যাত্রীরা জাহাজে চড়িয়াছে, ইহাদের জন্যও কতরকম খেলার আয়োজন রাখিতে হইয়াছে তাহার আর সংখ্যা নাই। আমাদের যদি জাহাজ থাকিত তাহা হইলে তাস পাশা প্রভৃতি অত্যন্ত ঠাণ্ডা খেলা ছাড়া এ-সমস্ত দৌড়ধাপের খেলার ব্যবস্থা করার দিকে আমরা দৃক্‌পাতমাত্র করিতাম না। বিশেষত কয় দিনের জন্য পথ

চলার মুখে এ-সমস্ত অনাবশ্যক বোঝা নিশ্চয়ই বর্জন করিতাম এবং কেহ তাহাতে কিছু মনেও করিত না।

কিন্তু, য়ুরোপীয় যাত্রীদিগকে ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য খেলা চাই। তাহাদের প্রাণের বেগের মধ্যে প্রাত্যহিক ব্যবহারের অতিরিক্ত মস্ত একটা পরিশিষ্ট ভাগ আছে, তাহাকে চুপ করিয়া বসাইয়া রাখিবে কে। তাহাকে নিয়ত ব্যাপৃত রাখা চাই। এইজন্য খেলনার পর খেলনা জোগাইতে হয় এবং খেলার পর খেলা সৃষ্টি করিয়া তাহাকে ভুলাইয়া রাখার প্রয়োজন।

তাই দেখি, ইহারা ছেলেবুড়ো কেবলই ছট্‌ফট্ এবং মাতামাতি করিতেছে। সেটা আমাদের পক্ষে একেবারেই অনাবশ্যক বলিয়া প্রথমটা কেমন অদ্ভুত ঠেকে। মনে ভাবি, বয়স্ক লোকের পক্ষে এ-সমস্ত ছেলেমানুষি নিরর্থক অসংযমের পরিচয়মাত্র। ছেলেদের খেলার বয়স বলিয়াই খেলা তাহাদিগকে শোভা পায়; কাজের বয়সে এতটা খেলার উৎসাহ অত্যন্ত অসংগত।

কিন্তু, যখন নিশ্চয় বুঝিতে পারি য়ুরোপীয়ের পক্ষে এই চাঞ্চল্য এবং খেলার উদ্যম নিতান্তই স্বভাবসংগত, তখন ইহার একটি শোভনতা দেখিতে পাই। ইহা যেন বসন্ত-কালের অনাবশ্যক প্রাচুর্যের মতো। যত ফল ধরিবে তাহার চেয়ে অনেক বেশি মুকুল ধরিয়াছে। কিন্তু, এই অনাবশ্যক ঐশ্বর্য না থাকিলে আবশ্যকে পদে পদে কৃপণতা ঘটিত।

ইহাদের খেলার মধ্যে কিছুমাত্র লজ্জার বিষয় নাই। কেননা, এই খেলা অলসের কালযাপন নহে; কেননা, আমরা দেখিয়াছি, ইহাদের প্রাণের শক্তি কেবলমাত্র খেলা করে না। কর্মক্ষেত্রে এই শক্তির নিরলস উদ্যম, ইহার অপ্রতিহত প্রভাব। কী আশ্চর্য ক্ষমতার সঙ্গে ইহারা সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া বিপুল কর্মজাল বিস্তার করিয়াছে তাহা ভাবিয়া দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। তাহার পশ্চাতে শরীর ও মনের কী অপরিমিত অধ্যবসায় নিযুক্ত। সেখানে কোথাও কিছুমাত্র জড়ত্ব নাই, শৈথিল্য নাই; সতর্কতা সর্বদা জাগ্রত; সুযোগের তিলমাত্র অপব্যয় দেখা যায় না।

যে শক্তি কর্মের উদ্যোগে আপনাকে সর্বদা প্রবাহিত করিতেছে সেই শক্তিই খেলার চাঞ্চল্যে আপনাকে তরঙ্গিত করিতেছে। শক্তির এই প্রাচুর্যকে বিজ্ঞের মতো অবজ্ঞা করিতে পারি না। ইহাই মানুষের ঐশ্বর্যকে নব নব সৃষ্টির মধ্যে বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। ইহা নিজেকে দিকে দিকে অনায়াসে অজস্র ত্যাগ করিতেছে, সেইজন্যই নিজেকে বহুগুণে ফিরিয়া পাইতেছে। ইহাই সাম্রাজ্যে বাণিজ্যে বিজ্ঞানে সাহিত্যে কোথাও কোনো সীমা মানিতেছে না, দুর্লঙ্ঘ্যের রুদ্ধ দ্বারে অহোরাত্র প্রবল বেগে আঘাত করিতেছে।

এই-যে উদ্যত শক্তি, যাহার এক দিকে ক্রীড়া ও অন্য দিকে কর্ম, ইহাই যথার্থ সুন্দর। রমণীর মধ্যে যেখানে আমরা লক্ষ্মীর প্রকাশ দেখিতে পাই সেখানে আমরা এক দিকে দেখি সাজসজ্জা লীলামাধুর্য, আর-এক দিকে দেখি অক্লান্ত কর্মপরতা ও সেবানৈপুণ্য। এই উভয়ের বিচ্ছেদই কুশ্রী। বস্তুত, শক্তিই সৌন্দর্যরূপে আপনাকে প্রকাশ করে, আর শক্তিহীনতাই শৈথিল্য ও অব্যবস্থার মধ্য দিয়া কেবলই কদর্যতার পঙ্কের মধ্যে আপনাকে নিমগ্ন করে। কদর্যতাই মানুষের শক্তির পরাভব; এইখানেই অস্বাস্থ্য, দারিদ্র্য, অন্ধ সংস্কার; এইখানেই মানুষ বলে, 'আমি হাল ছাড়িয়া দিলাম, এখন অদৃষ্টে যাহা করে।' এইখানেই পরস্পরে কেবল বিচ্ছেদ ঘটে, আরব্ধ কর্ম শেষ হয় না, এবং যাহাই গড়িয়া তুলিতে চাই তাহাই বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। শক্তিহীনতাই যথার্থ শ্রীহীনতা।

আমি জাহাজের ডেকের উপরে ইহাদের প্রচুর আমোদ-আহ্লাদের মধ্যেও ইহাই দেখিতে পাই। ইহাদের সমস্ত খেলাধুলার ভিতরে ভিতরে স্বভাবতই একটি বিধান দেখা দেয়। এইজন্য ইহাদের আমোদ-প্রমোদও কোনোমতে বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে না। যথাসময়ে যথাবিহিত ভদ্রবেশ প্রত্যেককেই পরিয়া আসিতে হয়। পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের ভিতরে ভিতরে নিয়ম প্রচ্ছন্ন আছে; সেই নিয়মের সীমা লঙ্ঘন করিবার জো নাই। বিধানের উপরে নির্ভর করিয়া থাকে বলিয়াই ইহাদের আমোদ-আহ্লাদ এমন উচ্ছ্বসিত প্রবল বেগে বিপত্তি বাঁচাইয়া প্রবাহিত হইতে পারে।

এই ডেকের উপরে আর কেহ নহে, কেবল আমাদের দেশের লোকে মিলিত হইয়াছে, সে দৃশ্য আমি মনে মনে কল্পনা না করিয়া থাকিতে পারি না। প্রথমেই দেখা যাইত, কোনো একই ব্যবস্থা দুইজনের মধ্যে খাটিত না। আমাদের অভ্যাস ও আচরণ পরস্পরের সঙ্গে আপনার মিল করিতে জানে না। য়ুরোপীয়দের মধ্যে একটা জায়গা আছে যেখানে ইহারা স্বতন্ত্র, আর-একটা জায়গা আছে যেখানে ইহারা সকলের। যেখানে ইহারা স্বতন্ত্র সে জায়গাটা ইহাদের প্রাইভেট। সেখানটা প্রচ্ছন্ন। সেখানে সকলের অবারিত অধিকার নাই এবং সেই অনধিকারকে সকলেই সহজেই মানিয়া চলে। সেখানে তাহারা নিজের ইচ্ছা ও অভ্যাস অনুসারে আপনার ব্যক্তিগত জীবন বহন করে। কিন্তু, যখনই সেখান হইতে তাহারা বাহির হইয়া আসে তখনই সকলের বিধানের মধ্যে ধরা দেয়— সে জায়গায় কোনোমতেই তাহারা আপনার প্রাইভেট্‌কে টানিয়া আনে না। এই দুই বিভাগ সুস্পষ্ট থাকাতেই পরস্পর মেলামেশা ইহাদের পক্ষে এত সহজ ও সুশৃঙ্খল। আমাদের মধ্যে এই বিভাগ নাই বলিয়া সমস্ত এলোমেলো হইয়া যায়, কেহ কোনোখানে সীমা মানিতে চায় না। আমরা এই ডেক পাইলে নিজের

প্রয়োজন-মত চলিতাম। পোঁটলা-পুঁটলি যেখানে সেখানে ছড়াইয়া রাখিতাম। কেহ বা দাতন করিতাম, কেহ বা যেখানে খুশি বিছানা পাতিয়া পথ রোধ করিয়া নিদ্রা দিতাম, কেহ বা হুঁকার জল ফিরাইতাম ও কলিকাটা উপুড় করিয়া ছাই ও পোড়া তামাক যেখানে হোক একটা জায়গায় ঢালিয়া দিতাম, কেহ বা চাকরকে দিয়া শরীর দলাইয়া সশব্দে তেল মাখিতে থাকিতাম। ঘটিবাটি জিনিসপত্র কোথায় কী পড়িয়া থাকিত তাহার ঠিকানা পাওয়া যাইত না, এবং ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির অন্ত থাকিত না। ইহার মধ্যে যদি কেহ নিয়ম ও শৃঙ্খলা আনিতে চেষ্টামাত্র করিত তাহা হইলে অত্যন্ত অপমান বোধ করিতাম এবং মহা রাগারাগির পালা পড়িয়া যাইত। তাহার পরে অন্য লোকের যে লেখাপড়া কাজকর্ম থাকিতে পারে, কিম্বা মাঝে মাঝে সে তাহার অবসর ইচ্ছা করিতে পারে, সে সম্বন্ধে কাহারও চিন্তামাত্র থাকিত না— হঠাৎ দেখা যাইত, যে বইটা পড়িতেছিলাম সেটা আর-একজন টানিয়া লইয়া পড়িতেছে; আমার দূরবীনটা পাঁচ জনের হাতে হাতে ফিরিতেছে, সেটা আমার হাতে ফিরাইয়া দিবার কোনো তাগিদ নাই; অনায়াসেই আমার টেবিলের উপর হইতে আমার খাতাটা লইয়া কেহ টানিয়া দেখিতেছে, বিনা আহ্বানে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গল্প জুড়িয়া দিতেছে, এবং রসিক ব্যক্তি সময় অসময় বিচার না করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান গাহিতেছে, কণ্ঠে স্বরমাধুর্যের অভাব থাকিলেও কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করিতেছে না। যেখানে যেটা পড়িত সেখানে সেটা পড়িয়াই থাকিত। যদি ফল খাইতাম তবে তাহার খোসা ও বিচি ডেকের উপরেই ছড়ানো থাকিত, এবং ঘটিবাটি চাদর মোজা গলাবন্ধ হাজার বার করিয়া খোঁজাখুঁজি করিতে করিতেই দিন কাটিয়া যাইত।

ইহাতে যে কেবল পরস্পরের অসুবিধা ঘটিত তাহা নহে, সুখ স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য চারি দিক হইতে অন্তর্ধান করিত। ইহাতে আমোদ-আহ্লাদও অব্যাহত হইত না এবং কাজকর্মের তো কথাই নাই। যে শক্তি কর্মের মধ্যে নিয়মকে মানিয়া সফল হয় সেই শক্তিই আমোদ-আহ্লাদের মধ্যে নিয়মকে রক্ষা করিয়া তাহাকে সরস ও সুন্দর করিয়া তোলে। যোদ্ধা যেমন স্বভাবতই আপনার তলোয়ারকে ভালোবাসিয়া ধারণ করে, শক্তিমান তেমনি স্বভাবতই নিয়মকে আন্তরিক প্রীতির সহিত রক্ষা করে। কারণ, ইহাই তাহার অস্ত্র; শক্তি যদি নিয়মকে না মানে তবে আপনাকেই ব্যর্থ করে।

শক্তি এই-যে নিয়মকে মানে সে কেবল নিয়মকে মানিবার জন্য নহে, আপনাকেই মানিবার জন্য। আর, শক্তিহীনতা যখন নিয়মকে মানে তখন সে নিয়মকেই মানে; তাহা সে ভয়ে হোক, লোভে হোক, বা কেবলমাত্র চিরাভ্যাসের জড়ত্ব-বশত হোক,

নিয়মকে নতশিরে হইয়া শিরোধার্য করিয়া লয়। কিন্তু, যেখানে সে বাধ্য নয়, যেখানে কেবল নিজের খাতিরেই নিয়ম স্বীকার করিতে হয়, দুর্বলতা সেইখানেই নিয়মকে ফাঁকি দিয়া নিজেকে ফাঁকি দেয়। সেখানেই তাহার সমস্ত কুশ্রী ও যদৃচ্ছাকৃত।

যে দেশে মানুষকে বাহিরের শাসন চালনা করিয়া আসিয়াছে, যেখানেই মানুষের স্বাধীন শক্তিকে মানুষ শ্রদ্ধা করে নাই এবং রাজা গুরু ও শাস্ত্র বিনা যুক্তিতে মানুষকে তাহার হিতসাধনে বলপূর্বক প্রবৃত্ত করিয়াছে, সেখানেই মানুষ আত্মশক্তির আনন্দে নিয়মপালনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। মানুষকে বাঁধিয়া কাজ করানো একবার অভ্যাস করাইলেই, বাঁধন কাটিয়া আর তাহার কাছে কাজ পাওয়া যায় না। এইজন্য যেখানে আমরা নিয়ম মানি সেখানে দাসের মতো মানি, যেখানে মানি না সেখানে দাসের মতোই ফাঁকি দিই। সেইজন্য যখন আমাদের সমাজের শাসন ছিল তখন জলাশয়ে জল, চতুষ্পাঠীতে শিক্ষা, পান্থশালায় আশ্রয় সহজে মিলিত; যখন সামাজিক বাহ্য শাসন শিথিল হইয়াছে তখন আমাদের রাস্তা নাই, ঘাট নাই, জলাশয়ে জল নাই, সাধারণের অভাব দূর ও লোকের হিতসাধন করিবার কোনো স্বাভাবিক শক্তি কোথাও উদ্‌বোধিত হইয়া কাজ করিতেছে না। হয় আমরা দৈবকে নিন্দা করিতেছি নয় সরকার-বাহাদুরের মুখ চাহিয়া আছি।

কিন্তু, এ-সকল বিষয়ে কোন্‌টা যে কার্য এবং কোন্‌টা কারণ তাহা ঠাহর করিয়া বলা শক্ত। যাহারা বাহিরে নিয়মকে অবাধে শৃঙ্খল করিয়া পরে বাহিরের নিয়ম তাহাদিগকেই বাঁধে; যাহারা নিজের শক্তির প্রাবল্যে সে নিয়মকে কোনোমতেই অন্ধভাবে স্বীকার করিতে পারে না তাহারাই আপনার আনন্দে আপনার নিয়মকে উদ্ভাবিত করিবার অধিকার লাভ করে। নতুবা, এই অধিকারকে হাতে তুলিয়া দিলেই ইহাকে ব্যবহার করা যায় না। স্বাধীনতা বাহিরের জিনিস নহে ভিতরের জিনিস, সুতরাং তাহা কাহারও কাছ হইতে চাহিয়া পাইবার জো নাই। যতক্ষণ নিজের স্বাভাবিক শক্তির দ্বারা আমরা সেই স্বাধীনতাকে লাভ না করি ততক্ষণ নানা আকারে বাহিরের শাসন আমাদের চোখে ঠুলি দিয়া ও গলায় দড়ি বাঁধিয়া চালনা করিবেই। ততক্ষণ আমরা মুখে যাহাই বলি, কাজের বেলায় আপনি আপনা হইতেই যেখানে সুযোগ পাইব সেখানেই অন্যের প্রতি অনুশাসন প্রবর্তিত করিতে চাহিব। রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার-লাভের বেলায় য়ুরোপীয় ইতিহাসের বচন আওড়াইব, আর সমাজনৈতিক গৃহনৈতিক ক্ষেত্রে কেবলই জ্যেষ্ঠ যিনি তিনি কনিষ্ঠের ও প্রবল যিনি তিনি দুর্বলের অধিকারকে সংকুচিত করিতে থাকিব। আমরা যখন কাহারও ভালো করিতে চাহিব সে আমারই নিজের মতে, আমারই নিজের নিয়মে; যাহার ভালো

করিতে চাই তাহাকে তাহার নিজের নিয়মে ভালো হইতে দিতে আমরা সাহস করি না। এমনি করিয়া দুর্বলতাকে আমরা অস্থিমজ্জার মধ্যে পোষণ করিতে থাকি, অথচ সবলের অধিকারকে আমরা বাহিরের দিক হইতে স্বপ্নলব্ধ দৈবসম্পত্তির মতো লাভ করিতে চাই।

এইজন্যই পরম বেদনার সহিত দেখিতেছি, যেখানেই আমরা সম্মিলিত হইয়া কোনো কাজ করিতে গিয়াছি, যেখানেই নিজেদের নিয়মের দ্বারা নিজেদের কোনো প্রতিষ্ঠানকে চালনা করিবার সুযোগ পাইয়াছি, সেখানেই পদে পদে বিচ্ছেদ ও শৈথিল্য প্রবেশ করিয়া সমস্ত ছারখার করিয়া দিতেছে। বাহিরের কোনো শত্রুর হাত হইতে নহে, কিন্তু অন্তরের এই শক্তিহীনতা শ্রীহীনতা হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করা, ইহাই আমাদের একটিমাত্র সমস্যা। যে নিয়ম মানুষের গলার হার তাহাকে পায়ের বেড়ি করিয়া পরিব না, এই কথা একদিন আমাদিগকে সমস্ত মনের সঙ্গে বলিতে হইবে। এই কথা স্পষ্ট করিয়া জানিতে হইবে যে, সত্যকে যেমন করিয়া হউক মানিতেই হইবে— কিন্তু সত্যকে যখন অন্তরের মধ্যে মানি তখনি তাহা আনন্দ, বাহিরে যখন মানি তখনি তাহা দুঃখ। অন্তরে সত্যকে মানিবার শক্তি যখন না থাকে তখনি বাহিরে তাহার শাসন প্রবল হইয়া উঠে। সেজন্য যেন বাহিরকেই ধিক্কার দিয়া নিজেকে অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি দিবার চেষ্টা না করি।

লণ্ডনে

সমুদ্রের পালা শেষ হইল। শেষ দুই দিন প্রবল বেগে বাতাস উঠিল; তাহাতে সমুদ্রের আন্দোলনের সমতালে আমাদের আভ্যন্তরিক আলোড়ন চলিতে লাগিল। আমি ভাবিয়া দেখিলাম, ইহাতে সমুদ্রের অপরাধ নাই, কাপ্তেনেরই দোষ। যেদিন পৌঁছিবার কথা ছিল তাহার দুই দিন পরে পৌঁছিয়াছি। বরুণদেব নিশ্চয়ই এই দুর্বলান্তঃকরণ যাত্রীটির জন্য ঠিকমত হিসাব করিয়া ঝড়-বাতাসের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন— কিন্তু, মানুষের হিসাব ঠিক রহিল না।

মার্সেল্স্ হইতে এক দৌড়ে প্যারিসে আসিয়া এক দিনের মতো হাঁপ ছাড়িলাম। শরীর হইতে সমুদ্রের নিমক সাফ করিয়া ফেলিয়া ডাঙার হাতে আত্মসমর্পণ করিলাম। স্নানাহারের পর একটা মোটর-গাড়িতে চড়িয়া প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায় একবার হুহু করিয়া ঘুরিয়া আসিলাম।

বাহির হইতে দেখিলে মনে হয়, পারিস সমস্ত য়ুরোপের খেলাঘর। এখানে রঙ্গশালার প্রদীপ আর নেবে না। চারি দিকে আমোদ-আহ্লাদের বিরাট আয়োজন। মানুষকে খুশি করিবার জন্য সুন্দরী পারিস-নগরীর কতই সাজসজ্জা। এই কথাই কেবল মনে হয়, মানুষকে খুশি করাটা সহজে সারিবার কোনো চেষ্টা নাই।

যখন পৃথিবীতে রাজাদের একাধিপত্যের দিন ছিল তখন প্রমোদের চূড়ান্ত ছিল কেবল রাজারই ঘরে। এখন সমস্ত মানুষ রাজা। এই সমগ্র মানুষের বিলাসভবনটি কী প্রকাণ্ড ব্যাপার। ইহার জন্য কত দাস যে অহোরাত্র খাটিয়া মরিতেছে তাহার সীমা নাই। ইহার জন্য প্রত্যহ কত জাহাজ, কত রেলগাড়ি বোঝাই করিয়া পৃথিবীর কত দুর্গম দেশ হইতে উপকরণ আসিতেছে তাহার ঠিকানা কে রাখে।

এই মানুষ-রাজার আমোদ এমন প্রকাণ্ড, এমন বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে যে, ইহাকে অলস বিলাসীর প্রমোদের সঙ্গে তুলনা করিতে প্রবৃত্তি হয় না। ইহা প্রবল চিত্তের প্রবল আমোদ; যে সহজে সন্তুষ্ট হইতে চায় না তাহাকে খুশি করিবার দুঃসাধ্য সাধন। বহু লোক ভোগ করিতে করিতে এবং বহু লোক ভোগ জোগাইতে জোগাইতে এই প্রমোদ-পারাবারের মধ্যে তলাইয়া মরিতেছে, কিন্তু তবুও মোটের উপরে ইহার ভিতর হইতে মানুষের যে একটা বিজয়ী শক্তির মূর্তি দেখা যাইতেছে তাহাকে অবজ্ঞা করিতে পারি না।

রবিবারের দিন ক্যালে হইতে সমুদ্রে পাড়ি দিয়া ডোভারে পৌঁছিলাম। সেখানে ইংরেজ যাত্রীর সঙ্গে যখন রেলগাড়িতে চড়িয়া বসিলাম তখন মনের মধ্যে ভারি একটি আরাম বোধ হইল। মনে হইল, আত্মীয়দের মধ্যে আসিয়াছি। ইংরেজের যে ভাষা জানি। মানুষের ভাষা যে আলোর মতো। এই ভাষা যত দূর ছড়ায় তত দূর মানুষের হৃদয় আপনি আপনাকে প্রকাশ করিয়া চলে। ইংরেজের ভাষা যখনি পাইয়াছি তখনি ইংরেজের মন পাইয়াছি। যাহা জানা যায় তাহাতেই আনন্দ। ফ্রান্সে আমার পক্ষে কেবল চোখের জানা ছিল, কিন্তু হৃদয়ের জানা হইতে বঞ্চিত ছিলাম—সেইজন্যই আনন্দের ব্যাঘাত হইতেছিল। ডোভারে পা দিতেই আমার মনে হইল, সেই ব্যাঘাত আমার কাটিয়া গেল; যেখানে দাঁড়াইলাম সেখানে কেবল যে মাটির উপর দাঁড়াইলাম তাহা নহে, মানুষের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

অনেক কাল পরে লণ্ডনে আসিলাম। তখনো লণ্ডনের রাস্তায় যথেষ্ট ভিড় দেখিয়াছি, কিন্তু এখন মোটর-গাড়ির একটা নূতন উপসর্গ জুটিয়াছে। তাহাতে শহরের ব্যস্ততা আরও প্রবলভাবে মূর্তিমান হইয়া উঠিয়াছে। মোটর-রথ, মোটর-বিশ্বরথ (অম্নিবাস), মোটর-মালগাড়ি লণ্ডনের নাড়ীতে নাড়ীতে শতধারায় ছুটিয়া

চলিতেছে। আমি ভাবি, লণ্ডনের সমস্ত রাস্তার ভিতর দিয়া কেবলমাত্র এই চলিবার বেগ পরিমাণে কী ভয়ানক প্রকাণ্ড! যে মনের বেগের ইহা বাহ্যমূর্তি তাহাই বা কী ভীষণ! দেশ-কালকে লইয়া কী প্রচণ্ড বলে ইহারা টানাটানি করিতেছে। পথ দিয়া পদাতিক যাহারা চলিতেছে প্রতিদিন তাহাদের সতর্কতা তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে। মন অন্য যে-কোনো ভাবনাই ভাবুক-না কেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের এই বিচিত্র গতিবিধির সঙ্গে তাহাকে প্রতিনিয়ত আপোষ করিয়া চলিতে হইবে। হিসাবের ভুল হইলেই বিপদ। হিংস্র পশুর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার প্রয়াসে হরিণের সতর্কতাবৃত্তি যেমন প্রখর হইয়া উঠিয়াছে, চারি দিকে ব্যস্ততার তাড়া খাইয়া খাইয়া এখানকার মানুষের সাবধানতা তেমনি অসামান্য তীক্ষ্ণতা লাভ করিতেছে। দ্রুত দেখা, দ্রুত শোনা ও দ্রুত চিন্তা করিয়া কর্তব্য স্থির করিবার শক্তি কেবলই বাড়িয়া উঠিতেছে। দেখিতে শুনিতে ও ভাবিতে যাহার সময় লাগে সেই এখানে হঠিয়া যাইবে।

ক্রমে বন্ধুদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ঘটিতেছে। যে যত্ন ও প্রীতি পাইতেছি তাহা বিদেশীর হাত হইতে পাইতেছি বলিয়া আমার কাছে দ্বিগুণ মূল্যবান হইয়া উঠিতেছে; মানুষ যে মানুষের কত নিকটের তাহা দূরত্বের মধ্য দিয়াই নিবিড়তর করিয়া অনুভব করা যায়।

ইতিমধ্যে একদিন আমি 'নেশন' পত্রের মধ্যাহ্নভোজে আহূত হইয়াছিলাম। নেশন এখানকার উদারপন্থীদের প্রধান সাপ্তাহিক পত্র। ইংলণ্ডে যে-সকল মহাত্মা স্বদেশ ও বিদেশ, স্বজাতি ও পরজাতিকে স্বার্থপরতার ঝুঁটা বাটখারায় মাপিয়া বিচার করেন না, অন্যায়কে যাঁহারা কোনো ছুতায় কোথাও আশ্রয় দিতে চান না, যাঁহারা সমস্ত মানবের অকৃত্রিম বন্ধু, নেশন তাঁহাদেরই বাণী বহন করিবার জন্য নিযুক্ত।

নেশন পত্রের সম্পাদক ও লেখকেরা সপ্তাহে একদিন মধ্যাহ্নভোজে একত্র হন। এখানে তাঁহারা আহার করিতে করিতে আলাপ করেন ও আহারান্তে আগামী সপ্তাহের প্রবন্ধের বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, এরূপ প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রের লেখকেরা সকলেই পাণ্ডিত্যে ও দক্ষতায় অসামান্য ব্যক্তি। সেদিন ইহাদের আলোচনা-ভোজে স্থান পাইয়া আমি বড়োই আনন্দ লাভ করিয়াছি।

ইহাদের মধ্যে বসিয়া আমার বারম্বার কেবল এই কথাই মনে হইতে লাগিল যে, ইহারা সকলেই জানেন ইহাদের প্রত্যেকেরই একটি সত্যকার দায়িত্ব আছে। ইহারা কেবল বাক্য রচনা করিতেছেন না, ইহাদের প্রত্যেক প্রবন্ধ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যতরীর হালটাকে ডাইনে বা বাঁয়ে কিছু-না-কিছু টান দিতেছেই। এমন অবস্থায় লেখক

লেখার মধ্যে আপনার সমস্ত চিত্তকে প্রয়োগ না করিয়া থাকিতে পারেন না। আমাদের দেশে খবরের কাগজে তাহার কোনো প্রয়োজন নাই ; আমরা লেখকের কাছে কোনো দায়িত্ব দাবি করি না, এই কারণে লেখকের শক্তি সম্পূর্ণ আলস্য ত্যাগ করে না ও ফাঁকি দিয়া কাজ সারিয়া দেয়। এইজন্য আমাদের সম্পাদকেরা লেখকদের শিক্ষা ও সতর্কতার কোনো প্রয়োজন দেখেন না, যে-সে লোক যাহা-তাহা লেখেন এবং পাঠকেরা তাহা নির্বিচারে পড়িয়া যান। আমরা সত্যক্ষেত্রে চাষ করিতেছি না বলিয়াই আমাদের মঞ্জরীতে শস্য-অংশ অতি সামান্য দেখা যায়—মনের খাদ্য পুরাপুরি জন্মিতেছে না।

আমাদের দেশে রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনাসভা আমি দেখিয়াছি ; তাহাতে কথার চেয়ে কণ্ঠের জোর কত বেশি! এখানে কিরূপ প্রশান্ত ভাবে এবং কিরূপ প্রণিধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক চলিতে লাগিল। মতের অনৈক্যের দ্বারা বিষয়কে বাধা না দিয়া তাহাকে অগ্রসরই করিয়া দিল। অনেকে মিলিয়া কাজ করিবার অভ্যাস ইহাদের মধ্যে কত সহজ হইয়াছে তাহা এই ক্ষণকালের মধ্যে বুঝিতে পারিলাম। ইহাদের কাজ গুরুতর, অথচ কাজের প্রণালীর মধ্যে অনাবশ্যক সংঘর্ষ ও অপব্যয় লেশমাত্র নাই। ইহাদের রথ প্রকাণ্ড, তাহার গতিও দ্রুত, কিন্তু তাহার চাকা অনায়াসে ঘোরে এবং কিছুমাত্র শব্দ করে না।

বন্ধু

লণ্ডনে আসিয়া একটা হোটেলে আশ্রয় লইলাম ; মনে হইল, এখানকার লোকালয়ের দেউড়িতে আনাগোনার পথে আসিয়া বসিলাম। ভিতরে কী হইতেছে খবর পাই না, লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ও হয় না—কেবল দেখি, মানুষ যাইতেছে আর আসিতেছে। এইটুকুই চোখে পড়ে, মানুষের ব্যস্ততার সীমা পরিসীমা নাই ; এত অত্যন্ত বেশি দরকার কিসের তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এই প্রচণ্ড ব্যস্ততার ধাক্কাটা কোন্‌খানে গিয়া লাগিতেছে, তাহাতে ক্ষতি করিতেছে কি বৃদ্ধি করিতেছে তাহার কোনো হিসাব কেহ রাখিতেছে কি না কিছুই জানি না। ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজে, আহারের স্থানে গিয়া দেখি—এক-একটা ছোটো টেবিল ঘেরিয়া দুই-তিনটি করিয়া স্ত্রীপুরুষ নিঃশব্দে আহার করিতেছে ; পাত্র হাতে দীর্ঘকায় পরিবেশক গম্ভীরমুখে দ্রুতপদে ক্ষিপ্রহস্তে পরিবেষণ করিয়া চলিয়াছে ; কেহ কেহ বা খাইতে খাইতেই খবরের কাগজ পড়া সারিয়া লইতেছে ; তাহার পরে ঘড়িটা খুলিয়া একবার

তাকাইয়া, টুপিটা মাথায় চাপিয়া দিয়া, হন্‌ হন্‌ করিয়া চলিয়া যাইতেছে ; ঘর শূন্য হইতেছে। কেবল আহারের সময় বারকয়েক কয়েকজন মানুষ একত্র হয়, তাহার পরে কে কোথায় যায় কেহ তাহার ঠিকানা রাখে না। আমার কোনো প্রয়োজন নাই ; সকলের দেখাদেখি মিথ্যা এক-একবার ঘড়ি খুলিয়া দেখি, আবার ঘড়ি বন্ধ করিয়া পকেটে রাখি। যখন আহারেরও সময় নয়, নিদ্রারও সময় নহে, তখন হোটেল যেন ডাঙায় বাঁধা নৌকার মতো— তখন যদি সেখানে থাকিতে হয় তবে কেন যে আছি তাহার কোনো কৈফিয়ত ভাবিয়া পাওয়া যায় না। যাহাদের বাসস্থান নাই, কেবল কর্মস্থানই আছে, তাহাদেরই পক্ষে হোটেল মানায়। যাহারা আমার মতো নিতান্ত অনাবশ্যক লোক তাহাদের পক্ষে বাসের আয়োজনটা এমনতরো পাইকারি রকমের হইলে পোষায় না। জানলা খুলিয়া দেখি, জনস্রোত নানা দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। মনে মনে ভাবি, ইহারা যেন কোন্‌-এক অদৃশ্য কারিগরের হাতুড়ি। যে জিনিসটা গড়িয়া উঠিতেছে সেটাও মোটের উপর অদৃশ্য ; মস্ত একটা ইতিহাসের কারখানা ; লক্ষ লক্ষ হাতুড়ি দ্রুত প্রবল বেগে লক্ষ লক্ষ জায়গায় আসিয়া পড়িতেছে। আমি সেই এঞ্জিনের বাহিরে দাঁড়াইয়া চাহিয়া থাকি— ক্ষুধার স্টীমে চালিত সজীব হাতুড়িগুলা দুর্নিবার বেগে ছুটিতেছে, ইহাই দেখিতে পাই।

যাহারা বিদেশী, প্রথম এখানে আসিয়া এখানকার ইতিহাসবিধাতার এই অতি-বিপুল মানুষ-কলের চেহারাটাই তাহাদের চোখে পড়ে। কী দাহ, কী শব্দ, কী চাকার ঘূর্ণি। এই লণ্ডন শহরের সমস্ত গতি, সমস্ত কর্মকে একবার চোখ বুজিয়া ভাবিয়া দেখিতে চেষ্টা করি— কী ভয়ঙ্কর অধ্যবসায়। এই অবিশ্রাম বেগ কোন্‌ লক্ষ্যের অভিমুখে আঘাত করিতেছে এবং কোন্‌ অব্যক্তকে প্রকাশের অভিমুখে জাগাইয়া তুলিতেছে।

কিন্তু, মানুষকে কেবল এই যন্ত্রের দিক হইতে দেখিয়া তো দিন কাটে না। যেখানে সে মানুষ সেখানে তাহার পরিচয় না পাইলে কী করিতে আসিলাম! কিন্তু, মানুষ যেখানে কল সেখানে দৃষ্টি পড়া যত সহজ, মানুষ যেখানে মানুষ সেখানে তত সহজ নহে। ভিতরকার মানুষ আপনি আসিয়া সেখানে ডাকিয়া না লইয়া গেলে প্রবেশ পাওয়া যায় না। কিন্তু, সে তো থিয়েটারের টিকিট কেনার মতো নহে ; সে দাম দিয়া মেলে না, সে বিনা মূল্যের জিনিস।

আমার সৌভাগ্যক্রমে একটি সুযোগ ঘটিয়া গেল— আমি একজন বন্ধু[১]র দেখা

১ উইলিয়ম রোটেন্‌স্টাইন (William Rothenstein)

পাইলাম। বাগানের মধ্যে গোলাপ যেমন একটি বিশেষ জাতের ফুল, বন্ধু তেমনি একটি বিশেষ জাতের মানুষ। এক-একটি লোক আছেন পৃথিবীতে তাঁহারা বন্ধু হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন। মানুষকে সঙ্গদান করিবার শক্তি তাঁহাদের অসামান্য এবং স্বাভাবিক। আমরা সকলেই পৃথিবীতে কাহাকেও না কাহাকেও ভালোবাসি, কিন্তু ভালোবাসিলেও বন্ধু হইবার শক্তি আমাদের সকলের নাই। বন্ধু হইতে গেলে সঙ্গদান করিতে হয়। অন্যান্য সকল দানের মতো এ দানেরও একটা তহবিল দরকার, কেবলমাত্র ইচ্ছাই যথেষ্ট নহে। রত্ন হইতে জ্যোতি যেমন সহজেই ঠিকরিয়া পড়ে তেমনি বিশেষ ক্ষমতাশালী মানুষের জীবন হইতে সঙ্গ আপনি বিচ্ছুরিত হইতে থাকে। প্রীতিতে প্রসন্নতাতে সেবাতে শুভ-ইচ্ছাতে এবং করুণাপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টিতে জড়িত এই-যে সহজ সঙ্গ, ইহার মতো দুর্লভ সামগ্রী পৃথিবীতে অতি অল্পই আছে। কবি যেমন আপনার আনন্দকে ভাষায় প্রকাশ করেন, তেমনি যাঁহারা স্বভাববন্ধু তাঁহারা মানুষের মধ্যে আপন আনন্দকে প্রতিদিনের জীবনে প্রকাশ করিয়া থাকেন।

আমি এখানে যে বন্ধুটিকে পাইলাম তাঁহার মধ্যে এই আনন্দ পাওয়া এবং আনন্দ দেওয়ার অবারিত ক্ষমতা আছে। এইরূপ বন্ধুধনে ধনী লোককে লাভ করার সুবিধা এই যে, একজনকে পাইলেই অনেককে পাওয়া যায়। কেননা, ইঁহাদের জীবনের সকলের চেয়ে প্রধান সঙ্গয় মনের মতো মানুষ-সঞ্চয়।

ইনি একজন সুবিখ্যাত চিত্রকর; ইনি অল্পকাল পূর্বে অল্পদিনের জন্য ভারতবর্ষে গিয়াছিলেন। সেই অল্পকালের মধ্যে ইনি ভারতবর্ষের মর্মস্থানটি দেখিয়া লইয়াছেন। হৃদয় দিয়া দেখা চোখে দেখারই মতো— ইহা বিশ্লেষণের ব্যাপার নহে, সুতরাং ইহাতে বেশি সময় লাগে না। হৃদয়দৃষ্টি সম্বন্ধে কত জন্মান্ধ ভারতবর্ষে জীবন কাটাইয়া দিতেছে; তাহারা আমাদের দেশের সেই আলোকটিকেই দেখিল না যাহাকে দেখিলে আর সমস্তকেই অনায়াসে দেখা যায়। যাহাদের দেখিবার চোখ আছে তাহাদের অল্পকালের পরিচয় অন্ধের চিরজীবনের পরিচয়ের চেয়ে বেশি।

ভারতবর্ষে ইঁহার সঙ্গে আমার ক্ষণকালের জন্য আলাপ হইয়াছিল। ইঁহার সহৃদয়তা সর্বদাই এমন অবাধে প্রকাশ পায় যে তখনি আমার চিত্ত ইঁহার প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। ইঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতে পারিব এই লোভটি য়ুরোপে যাত্রার সময় আমাকে সকলের চেয়ে টানিয়াছিল।

ইঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটিবা মাত্র এক মুহূর্তে হোটেলের দেউড়ি পার হইয়া গেলাম— কেহ আর বাধা দিবার রহিল না। ভিড়ের ঠেলাঠেলিতে যেখানে তামাসা ভালো

করিয়া দেখা যায় না, সেখানে বাপ যেমন ছোটো ছেলেকে নিজের কাঁধের উপর চড়িয়া বসিবার জায়গা করিয়া দেন, তেমনি লণ্ডন শহর দুই-এক জায়গায় আপনার উচ্চ কাঁধের উপর ফাঁকা জায়গা রাখিয়া দিয়াছে; তাহার যে-সব ছেলেরা ভিড়ের লোকের মাথা ছাড়াইয়া আরও দূরের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিতে চায় তাহাদের পক্ষে এই জায়গাগুলির বিশেষ প্রয়োজন আছে। লণ্ডনের হ্যাম্পস্টেড্-হীথ্ সেই জাতের একটি উচ্চ পাহাড়ে প্রান্তর; লণ্ডন এইখানে আপনার হইতে আপনাকে যেন তুলিয়া ধরিয়াছে। এখানে শহরের পাষাণহৃদয়ের একটি প্রান্ত এখনো নবীন ও শ্যামল আছে, এবং তাহার ভয়ংকর আপিসের ভিড়ের মধ্যে এই জায়গাটিতে এখনো তাহার খোলা আকাশের জানলার ধারে একলা বসিবার আসন পাতা আছে।

আমার বন্ধুর বাড়িটির পিছন দিকে ঢালু পাহাড়ের গায়ে ছোটো একটুকরা বাগান আছে। ঐটুকু বাগান আনন্দিত ছোটো ছেলের আঁচলটির মতো ফুলের সৌন্দর্যে ভরিয়া উঠিয়াছে। সেই বাগানের দিকে মুখ করিয়া তাঁহাদের বৈঠকখানা-ঘরের সংলগ্ন একটি লম্বা বারান্দা অপর্যাপ্ত ফুলের স্তবকে আমোদিত গোলাপের লতায় অর্ধপ্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। এই বারান্দায় আমি যখন খুশি একখানা বই হাতে করিয়া বসি, তাহার পরে আর বই পড়িবার কোনো প্রয়োজন বোধ করি না। ইহার দুটি ছোটো ছেলে ও ছোটো মেয়ের মধ্যে বাল্যবয়সের চিরানন্দময় নবীনতার উচ্ছ্বাস দেখিতে আমার ভারি ভালো লাগে। আমাদের দেশের ছেলেদের সঙ্গে ইহাদের আমি একটা গভীর প্রভেদ দেখিতে পাই। আমার মনে হয়, যেন আমরা অত্যন্ত পুরাতন যুগের মানুষ; আমাদের দেশের শিশুরাও যেন কোথা হইতে সেই পুরাতনত্বের বোঝা পিঠে করিয়া এই পৃথিবীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা ভালোমানুষ, তাহাদের গতিবিধি সংযত, তাহাদের বড়ো বড়ো কালো চোখদুটি করুণ— তাহারা বেশি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না, আপনার মনেই যেন তাহার মীমাংসা করিতে থাকে। আর এই-সব ছেলেরা পৃথিবীর নবীনযুগের মহলে জন্মিয়াছে; তাহারা জীবনের নবীনতার আস্বাদে মাতিয়া উঠিয়াছে; তাহাদের সমস্তই ভাবিয়া-চিন্তিয়া করিয়া-কর্মিয়া লইতে হইবে, এইজন্য সব জায়গাতেই তাহাদের চঞ্চল পা ছুটিতে চায় এবং সকল জিনিসেই তাহাদের চঞ্চল হাত গিয়া পড়ে। আমাদের দেশের ছেলেদেরও একটা স্বাভাবিক চঞ্চলতা আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গেই একটা অচঞ্চলতার ভারাকর্ষণ তাহাকে সর্বদাই যেন অনেকটা পরিমাণে স্থির করিয়া রাখিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সেই অদৃশ্য ভারটা নাই বলিয়া ইহাদের জীবন তরুণ ঝরনার মতো কলশব্দে নৃত্য করিতে করিতে কেবলই যেন ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠিতেছে।

আমাদের বন্ধুর গৃহিণীও বন্ধুবৎসলা। তাঁহার স্বামীর বিস্তৃত বন্ধুমণ্ডলী সম্বন্ধে তাঁহাকে স্ত্রীর কর্তব্য পালন করিতে হয়। তাহাদের সেবা যত্ন করা, তাহাদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্বন্ধকে সর্বাংশে সুন্দররূপে হৃত্ত করিয়া তোলা, রোগে শোকে তাহাদের সংবাদ লওয়া ও সান্ত্বনা করা, ইহা তাঁহার সাংসারিক কর্তব্যের একটা প্রধান অঙ্গ। ইহা তো কেবল স্বজনসমাজের আত্মীয়তা নহে, ইহা বন্ধুসমাজের আত্মীয়তা— এই বৃহৎ আত্মীয়তার মর্মস্থলে সাধ্বী স্ত্রীর যে আসন তাহা এ দেশে শূন্য নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি, আমার বন্ধুটি স্বভাববন্ধু— তাঁহার বন্ধুত্বের প্রতিভা অসামান্য। ইহার পক্ষে বন্ধুত্ব জিনিসটি সত্য বলিয়াই ইহাকে বিশেষ যত্নে বন্ধু বাছিয়া লইতে হয়। যে লোক খাঁটি আর্টিস্ট্‌ নয় সে যেমন কেবলমাত্র দস্তুর রক্ষার জন্য ঘর সাজাইবার উপলক্ষ্যে যেমন-তেমন ছবি বাঁধাইয়া দেয়ালে টাঙাইয়া কোনোমতে শূন্য স্থান পূর্ণ করিতে পারে কিন্তু যে লোক খাঁটি আর্টিস্ট্‌, ছবি যাহার পক্ষে সত্যবস্তু, সে স্বভাবতই বাজে ছবি দিয়া ঘর ভরিতে পারে না, সে আপনার স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধির দ্বারা ছবি বাছিয়া লয়— ইনিও তেমনি কেবলমাত্র বাজে পরিচিতবর্গের সামাজিক ভাবের দ্বারা আপনাকে আক্রান্ত করেন নাই। ইহার সঙ্গে যাঁহাদের সম্বন্ধ আছে সকলেই ইহার বন্ধু এবং সকলেই গুণী এবং বিশেষভাবে সমাদরের যোগ্য।

এমনতরো বরেণ্য বন্ধুমণ্ডলীকে যিনি আপনার চার দিকে ধরিয়া রাখিতে পারেন তাঁহার যে বিশেষ গুণের দরকার সে কথা বলাই বাহুল্য। ইনি রসজ্ঞ। মৌমাছি যেমন ফুলের মধুকোষের গোপন রাস্তাটি অনায়াসে বাহির করিতে পারে ইনিও তেমনি রসের পথে অনায়াসে প্রবেশ করেন ; ভালো জিনিসকে একেবারেই দ্বিধাবিহীন জোরের সঙ্গে ধরিতে পারেন। ভালো লাগা এবং ভালো বলার সম্বন্ধে অনেক লোকেরই একটা ভীরুতা আছে, 'পাছে ভুল করিয়া অপদস্থ হই' এ ভয় তাহারা ছাড়িতে পারে না। এইজন্য ভালোকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার বেলায় তাহারা বরাবর অন্য লোকের পিছনে পড়িয়া যায়। ইহার বোধশক্তির মধ্যে একটি যথার্থ প্রবলতা আছে বলিয়াই ইহার সেই ভয় নাই। এমনি করিয়া তিনি যে মৌমাছির মতো কেবলমাত্র মধু-রসটিকেই আহরণ করিতে জানেন তাহা নহে, সেই সঙ্গে ফুলটিকেও ভালোবাসিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। তিনি ভোগী নহেন, তিনি প্রেমিক। এইজন্য তিনি গ্রহণও করেন, তিনি দানও করেন।

অপরিচয় হইতে পরিচয়ের পথ অতি দীর্ঘ। সেই দুঃসাধ্য পথ অতিক্রম করিবার মতো সময় আমার ছিল না। আমার শক্তিও অল্প। বরাবর কোণে থাকা অভ্যাস বলিয়া নিজের জোরে ভিড় ঠেলিয়া-ঠুলিয়া ইপ্সিত জায়গাটিতে পৌঁছানোর চেষ্টা

করিতেও আমি পারি না। তা ছাড়া ইংরেজি ভাষার সদর দরজার চাবিটা আমার হাতে নাই; আমাকে কেবলই বেড়া ডিঙাইয়া চলিতে হয়— তেমন করিয়া পথ চলা একটা ব্যায়াম, তেমনভাবে আপনার স্বভাবকে রক্ষা করিয়া চলা যায় না। নিজেকে অবাধে পরিচিত করিবার শক্তি না থাকিলে অন্যের সহজ পরিচয় পাওয়া সম্ভবপর হয় না। সুতরাং কিছুকাল এখানকার মোটর-গাড়ির দানবরথের চাকা বাঁচাইবার চেষ্টায় শ্রান্ত হইয়া অবশেষে এখানকার পথ হইতেই ফিরিতাম, আমার সেই নদী-বাহুপাশে-ঘেরা বাংলাদেশের শরৎরৌদ্রালোকিত আমন-ধানের খেতের ধারে। এমন সময় প্রবেশ করিলেন বন্ধু, পর্দা তুলিয়া দিলেন। দেখিলাম আসন পাতা, দেখিলাম আলো জ্বলিতেছে; বিদেশীর অপরিচয়ের মস্ত বোঝাটা বাহিরে রাখিয়া, পথিকের ধূলিলিপ্ত বেশ ছাড়িয়া ফেলিয়া, এক মুহূর্তেই ভিড়ের মধ্য হইতে নিভৃতে আসিয়া প্রবেশ করিলাম।

কবি য়েট্‌স্‌

ভিড়ের মাঝখানেও কবি য়েট্‌স্‌[1] চাপা পড়েন না, তাঁহাকে একজন বিশেষ কেহ বলিয়া চেনা যায়। যেমন তিনি তাঁহার দীর্ঘ শরীর লইয়া মাথায় প্রায় সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন, তেমনি তাঁহাকে দেখিলে মনে হয়, ইঁহার যেন সকল বিষয়ে একটা প্রাচুর্য আছে, এক জায়গায় সৃষ্টিকর্তার সৃজনশক্তির বেগ প্রবল হইয়া ইঁহাকে যেন ফোয়ারার মতো চারি দিকের সমতলতা হইতে বিপুলভাবে উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিয়াছে। সেইজন্য দেহে মনে প্রাণে ইঁহাকে এমন অজস্র বলিয়া বোধ হয়।

ইংলণ্ডের বর্তমান কালের কবিদের কাব্য যখন পড়িয়া দেখি তখন ইঁহাদের অনেককেই আমার মনে হয়, ইঁহারা বিশ্বজগতের কবি নহেন। ইঁহারা সাহিত্যজগতের কবি। এ দেশে অনেক দিন হইতে কাব্যসাহিত্যের সৃষ্টি চলিতেছে, হইতে হইতে কাব্যের ভাষা উপমা অলংকার ভঙ্গী বিস্তর জমিয়া উঠিয়াছে। শেষকালে এমন হইয়া উঠিয়াছে যে, কবিদের জন্য কাব্যের মূল প্রস্রবণে যাওয়ার না গেলেও চলে। কবিরা যেন ওস্তাদ হইয়া উঠিয়াছে; অর্থাৎ, প্রাণ হইতে গান করিবার প্রয়োজনবোধই তাহাদের চলিয়া গিয়াছে, এখন কেবল গান হইতেই গানের উৎপত্তি চলিতেছে। যখন ব্যথা হইতে কথা আসে না, কথা হইতেই কথা আসে, তখন কথার কারুকার্য ক্রমশ

১ ডব্লিউ. বি. য়েট্‌স্‌ (W. B. Yeats)

জটিল ও নিপুণতর হইয়া উঠিতে থাকে ; আবেগ তখন প্রত্যক্ষ ও গভীর ভাবে হৃদয়ের সামগ্রী না হওয়াতে সে সরল হয় না ; সে আপনাকে আপনি বিশ্বাস করে না বলিয়াই বলপূর্বক অতিশয়ের দিকে ছুটিতে থাকে ; নবীনতা তাহার পক্ষে সহজ নহে বলিয়াই আপনার অপূর্বতা-প্রমাণের জন্য কেবলই তাহাকে অদ্ভুতের সন্ধানে ফিরিতে হয়।

ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের সঙ্গে সুইন্‌বর্নের তুলনা করিয়া দেখিলেই আমার কথাটা বোঝা সহজ হইবে। যাঁহারা জগতের কবি নহেন, কবিদের কবি, সুইন্‌বর্ন্‌ তাঁহাদের মধ্যে প্রতিভায় অগ্রগণ্য। কথার নৃত্যলীলায় ইহার এমন অসাধারণ নৈপুণ্য যে, তাহারই আনন্দ তাঁহাকে মাতোয়ারা করিয়াছে। ধ্বনি-প্রতিধ্বনির নানাবিধ রঙিন সুতায় তিনি চিত্রবিচিত্র করিয়া ঘোরতর টক্‌টকে রঙের ছবি গাঁথিয়াছেন ; সে-সমস্ত আশ্চর্য কীর্তি, কিন্তু বিশ্বের উপর তাহার প্রশস্ত প্রতিষ্ঠা নহে।

বিশ্বের সঙ্গে হৃদয়ের প্রত্যক্ষ সংঘাতে ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের কাব্যসংগীত বাজিয়া উঠিয়াছিল। এইজন্য তাহা এমন সরল। সরল বলিয়া সহজ নহে। পাঠকেরা সহজে তাহা গ্রহণ করে নাই। কবি যেখানে প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইতে কাব্য লেখেন সেখানে তাঁহার লেখা গাছের ফুলফলের মতো আপনি সম্পূর্ণ হইয়া বিকাশ পায়। সে আপনাকে ব্যাখ্যা করে না ; অথবা নিজেকে মনোরম বা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তুলিবার জন্য সে নিজের প্রতি কোনো জবরদস্তি করিতে পারে না। সে যাহা সে তাহা হইয়াই দেখা দেয় ; তাহাকে গ্রহণ করা, তাহাকে ভোগ করা পাঠকেরই গরজ।

নিজের অনুভূতি ও সেই অনুভূতির বিষয়ের মাঝখানে কোনো মধ্যস্থ-পদার্থের প্রয়োজন ও ব্যবধান না রাখিয়া কোনো কোনো মানুষ জন্মগ্রহণ করেন, বিশ্বজগৎ ও মানবজীবনের রসকে তাঁহারা নিঃসংশয় ভরসার সহিত নিজের হৃদয়ের ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন ; তাঁহারাই নিজের সমসাময়িক কাব্যসাহিত্যের সমস্ত কৃত্রিমতাকে সাহসের সঙ্গে অতিক্রম করিয়া থাকেন।

একদিন ইংরেজি সাহিত্যের কৃত্রিমতার যুগে বার্‌ন্‌স্‌ জন্মিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সমগ্র হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়াছিলেন ও প্রকাশ করিয়াছিলেন। এইজন্য তখনকার বাঁধা দস্তুরের বেড়া ভেদ করিয়া কোথা হইতে যেন স্কটলণ্ডের অবারিত হৃদয় কাব্যসাহিত্যের মাঝখানে আসিয়া অসংকোচে আসন গ্রহণ করিল।

এখনকার কাব্যসাহিত্যের যুগে কবি য়েট্‌স্‌ যে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছেন, তাহারও গোড়াকার কথাটা ঐ। তাঁহার কবিতা তাঁহার সমসাময়িক কাব্যের প্রতিধ্বনির পন্থায় না গিয়া কবির নিজের হৃদয়কে প্রকাশ করিয়াছে। ঐ-যে 'নিজের হৃদয়' বলিলাম ও কথাকে একটু বুঝিয়া লইতে হইবে। হীরার টুকরা যেমন আকাশের

আলোককে প্রকাশ করার দ্বারাই আপনাকে প্রকাশ করে তেমনি মানুষের হৃদয় কেবলমাত্র নিজের ব্যক্তিগত সত্তায় প্রকাশই পায় না, সেখানে সে অন্ধকার। যখনি সে আপনাকে দিয়া আপনার চেয়ে বড়োকে প্রতিফলিত করিতে পারে তখনি সেই আলোকে সে প্রকাশ পায় ও সেই আলোককে সে প্রকাশ করে। কবি য়েট্সের কাব্যে আয়র্লণ্ডের হৃদয় ব্যক্ত হইয়াছে।

এ কথাটাকেও আর-একটু পরিষ্কার করিয়া বলা উচিত। একই সূর্যের আলো নানা মেঘের উপর পড়িয়াছে কিন্তু মেঘখণ্ডগুলির অবস্থা ও অবস্থান অনুসারে তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন রঙ ফলিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু, এই রঙের ভিন্নতা পরস্পরের বিরুদ্ধ নহে; তাহারা আপন আপন বৈচিত্র্যের দ্বারাই সকলের সঙ্গে সকলে মিলিতে পারিয়েছে। রঙ-করা তুলা প্রাণপণে মেঘের নকল করিয়াও মিলিতে পারিত না।

তেমনি আয়র্লণ্ডই বলো, স্কট্‌লণ্ডই বলো, বা অন্য যে-কোনো দেশই বলো, সেখানকার জনসাধারণের চিত্তে বিশ্বজগতের আলো এমন করিয়া পড়ে যাহাতে সে একটা বিশেষ রঙ ফলাইয়া তুলে। বিশ্বমানবের চিদাকাশ এমনি করিয়াই বর্ণবৈচিত্র্যে সুন্দর হইয়া উঠিতেছে।

কবি ভাবের আলোককে কেবল প্রকাশ করেন তাহা নহে, তিনি যে দেশের মানুষ সেই দেশের হৃদয়ের রঙ দিয়া তাহাকে একটু বিশেষ ভাবে সুন্দর করিয়া প্রকাশ করেন। সকলেই যে করিতে পারেন তাহা বলি না, কিন্তু যিনি পারেন তিনি ধন্য। আমাদের দেশে বৈষ্ণব-পদাবলি বাঙালি-কাব্য রূপেই বিশ্বকাব্য। তাহা বিশ্বের জিনিস বিশ্বকে দিতেছে, কিন্তু তাহারই মধ্যে নিজের একটা রস যোগ করিয়া দিতেছে; নিজের একটি রূপের পাত্রে তাহাকে ভরিয়া দিতেছে।

সংসারের রণক্ষেত্রে লড়াই করা যাহার ব্যবসায় তাহাকে কবচ পরিতে হয়; তাহাকে সংসারের সমস্ত আবরণ আচ্ছাদন গ্রহণ করিতে হয়; নহিলে পদে পদে চারি দিক হইতে তাহাকে আঘাত লাগে। কিন্তু, আপনাকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যাহার কাজ, আবরণের অভাবই তাহার যথার্থ সজ্জা। কবি য়েট্সের সঙ্গে আলাপ করিয়া আমার ঐ কথাই মনে হইতেছিল। এই একটি মানুষ, ইনি নিজের চিত্তের অবারিত স্পর্শশক্তি দিয়া জগৎকে গ্রহণ করিতেছেন। মানুষ নানা শিক্ষার ভিতর দিয়া, অভ্যাসের ভিতর দিয়া, অনুকরণের ভিতর দিয়া, যেমন করিয়া চারি দিককে দেখে এ দেখা তেমন দেখা নহে।

যখনি কোনো মানুষ এইপ্রকার অব্যবহিত ভাবে জগৎকে দেখে ও তাহার খবর দেয় তখন দেখিতে পাই মানুষের পুরাতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাহার একটা মিল আছে;

তাহা খাপছাড়া নহে। যাহারা সরল চক্ষে দেখিয়াছে সকলেই এমনি করিয়া দেখিয়াছে। বৈদিক কবিরাও জলে স্থলে প্রাণকে দেখিয়াছেন, হৃদয়কে দেখিয়াছেন। নদী মেঘ উষা অগ্নি ঝড়, বৈজ্ঞানিক সত্যরূপে নহে, ইচ্ছাময় মূর্তিরূপে তাঁহাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মানুষের জীবনের মধ্যে সুখদুঃখের যে অভিজ্ঞতা প্রকাশ পায় তাহাই যেন নানা অপরূপ ছদ্মবেশে ভূলোকে ও দ্যুলোকে আপন লীলা বিস্তার করিয়াছে। যেমন আমাদের চিত্তে তেমনি সমস্ত প্রকৃতিতে। হাসিকান্নার বেদনা, চাওয়া পাওয়া এবং হারানোর খেলা, যেমন আমাদের এই ছোটো হৃদয়টিতে তেমনি তাহাই খুব প্রকাণ্ড করিয়া এই মহাকাশের আলোক-অন্ধকারের রঙ্গমঞ্চে। তাহা এত বৃহৎ যে তাহাকে আমরা একসঙ্গে দেখিতে পাই না বলিয়া আমরা জল দেখি, মাটি দেখি, কিন্তু সমস্তটার ভিতরকার বিপুল খেলাটাকে দেখিতে পাই না। কিন্তু, মানুষ যখন শিক্ষা ও অভ্যাসের ঠুলির ভিতর দিয়া দেখে না, যখন সে আপনার সমস্ত হৃদয় মন জীবন দিয়া দেখে, তখন সে এমন একটা বেদনার লীলাকে সব জায়গাতেই অনুভব করে যে, তাহাকে গল্পের মধ্য দিয়া, রূপকের মধ্য দিয়া ছাড়া প্রকাশ করিতে পারে না। মানুষ যখন জাগতিক ব্যাপারের মধ্যে আপনারই খুব একটা বড়ো পরিচয় পাইতেছিল— এইটে একরকম করিয়া বুঝিতেছিল যে, সমস্ত জগতের মধ্যে যাহা নাই তাহা তাহার নিজের মধ্যেও নাই, যাহা তাহার মধ্যে আছে তাহাই বিপুল আকারে বিশ্বের মধ্যে আছে— তখনি সে কবির দৃষ্টি অর্থাৎ হৃদয়ের দৃষ্টি জীবনের দৃষ্টিতে সমস্তকে দেখিতে পাইয়াছিল; তাহা অক্ষিগোলক ও স্নায়ুশিরা ও মস্তিষ্কের দৃষ্টি নহে। তাহার সত্যতা তথ্যগত নহে; তাহা ভাবগত, বেদনাগত। তাহার ভাষাও সেইরূপ; তাহা সুরের ভাষা, রূপের ভাষা। এই ভাষাই মানবসাহিত্যে সকলের চেয়ে পুরাতন ভাষা। অথচ, আজও যখন কোনো কবি বিশ্বকে আপনার বেদনা দিয়া অনুভব করেন তখন তাঁহার ভাষার সঙ্গে মানুষের পুরাতন ভাষার মিল পাওয়া যায়। এই কারণে বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষের পৌরাণিক কাহিনী আর-কোনো কাজে লাগে না; কেবল কবির ব্যবহারের পক্ষে তাহা পুরাতন হইল না। মানুষের নবীন বিশ্বানুভূতি ঐ কাহিনীর পথ দিয়া আনাগোনা করিয়া ঐখানে আপন চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। অনুভূতির সেই নবীনতা যাহার চিত্তকে উদ্‌বোধিত করে সে ঐ পুরাতন পথটাকে স্বভাবতই ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয়।

কবি য়েট্‌স্‌ আয়র্লণ্ডের সেই পৌরাণিক পথ দিয়া নিজের কাব্যধারাকে প্রবাহিত করিয়াছেন। ইহা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হইয়াছিল বলিয়াই এই পথে তিনি এমন অসাধারণ খ্যাতি উপার্জন করিতে পারিয়াছেন। তিনি তাঁহার জীবনের দ্বারা

এই জগৎকে স্পর্শ করিতেছেন ; চোখের দ্বারা জ্ঞানের দ্বারা নহে। এইজন্য জগৎকে তিনি কেবল বস্তুজগৎ রূপে দেখেন না ; ইহার পর্বতে প্রান্তরে ইনি এমন একটি লীলাময় সত্তাকে অনুভব করেন যাহা ধ্যানের দ্বারাই গম্য। আধুনিক সাহিত্যে অভ্যস্ত প্রণালীর মধ্য দিয়া তাহাকে প্রকাশ করিতে গেলে তাহার রস ও প্রাণ নষ্ট হইয়া যায় ; কারণ, আধুনিকতা জিনিসটা আসলে নবীন নহে, তাহা জীর্ণ ; সর্বদা ব্যবহারে তাহাতে কড়া পড়িয়া গেছে, সর্বত্র তাহা সাড়া দেয় না ; তাহা ছাই-চাপা আগুনের মতো। এই আগুন জিনিসটা ছাইয়ের চেয়ে পুরাতন অথচ তাহা নবীন ; ছাইটা আধুনিক বটে কিন্তু তাহাই জরা। এইজন্য সর্বত্রই দেখিতে পাই, কাব্য আধুনিক ভাষাকে পাশ কাটাইয়া চলিতে চায়।

সকলেই জানেন, কিছুকাল হইতে আয়র্লণ্ডে একটা স্বাদেশিকতার বেদনা জাগিয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ডের শাসন সকল দিক হইতেই আয়র্লণ্ডের চিত্তকে অত্যন্ত চাপা দিয়াছিল বলিয়াই এই বেদনা এক সময়ে এমন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। অনেক দিন হইতে এই বেদনা প্রধানত পোলিটিকাল বিদ্রোহ-রূপেই আপনাকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। অবশেষে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আর-একটা চেষ্টা দেখা দিল। আয়র্লণ্ড আপনার চিত্তের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করিয়া তাহাই প্রকাশ করিতে উদ্যত হইল।

এই উপলক্ষ্যে আমাদের নিজের দেশের কথা মনে পড়ে। আমাদের দেশেও অনেক দিন হইতে পোলিটিকাল অধিকার-লাভের একটা চেষ্টা শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। দেখা গিয়াছে, এই চেষ্টার যাঁহারা নেতা ছিলেন তাঁহাদের অনেকেরই দেশের ভাষাসাহিত্য-আচারব্যবহারের সহিত সংস্রব ছিল না। দেশের জনসাধারণের সঙ্গে তাঁহাদের যোগ ছিল না বলিলেই হয়। দেশের উন্নতিসাধনের জন্য তাঁহাদের যাহা-কিছু কারবার সমস্তই ইংরেজি ভাষায় ও ইংরেজি গবর্মেণ্টের সঙ্গে। দেশের লোককে লইয়া যে দেশের কোনো কাজ করিতে হইবে, সে দিকে তাঁহাদের দৃষ্টিমাত্রই ছিল না।

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে, অন্তত বাংলাদেশে, আমরা সাহিত্যের ভিতর দিয়া নিজের চিত্তকে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান গৌরব এই যে, তিনি বঙ্গসাহিত্যে এমন একটি যুগের প্রবর্তন করিয়াছিলেন যখন বাঙালি আপনার কথা আপনার ভাষায় বলিয়া আনন্দ ও গর্ব অনুভব করিতে পারিয়াছিল। তাহার আগে আমরা স্কুলের বালক ছিলাম ; অভিধান ও ব্যাকরণ মিলাইয়া ইংরেজি ইস্কুলের এক্সেরসাইজ লিখিতাম ; নিজের ভাষা ও সাহিত্যকে অবজ্ঞা করিতাম। হঠাৎ বঙ্গদর্শনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নিজের একটা ক্ষমতা দেখিতে পাইলাম। আমাদেরও যে একটা

সাহিত্য হইতে পারে এবং তাহাতেই যে যথার্থভাবে আমাদের মনের ক্ষুধানিবৃত্তি করিতে পারে ইহা আমরা অনুভব করিলাম। এই-যে শুরু হইল এইখানেই ইহার শেষ হইল না। ইহার আগে চোখ বুজিয়া আমরা বলিয়াছিলাম, আমাদের কিছুই নাই; এখন হইতে খোঁজ পড়িয়া গেল আমাদের কী আছে। বঙ্গদর্শনেই গোড়ার দিকে যাঁহারা কং ও মিল্‌কে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন তাঁহারাই অবশেষে দেশের ধর্মকেই সেই রাজাসন দিবার জন্য দলে-বলে উদ্যোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই উদ্যমের স্রোত নানা শাখা-প্রশাখায় এখনো অগ্রসর হইতেছে। রাজসভায় ভারতবর্ষীয় অমাত্যসংখ্যা বাড়াইতে হইবে, আমাদের এ ইচ্ছা সাধন হওয়া রাজার হাতে; কিন্তু আমাদের মন স্বাধীন হইয়া আপনার পথে আপন সফলতার অভিমুখে অগ্রসর হইবে, এই ইচ্ছা সফল হওয়া আমাদের নিজের শক্তির উপর নির্ভর করে। আমরা যে-কেহ যে-কোনো দিকে নিজের চেষ্টায় নিজের শক্তিকে সার্থক করিতে পারিব, সেই লোকই দেশের আত্মশক্তি-উপলব্ধিকে প্রশস্ত করিয়া দিব। সেই উপলব্ধির আনন্দই আমাদের উন্নতিপথযাত্রার একমাত্র সম্বল।

শক্তি-উপলব্ধির গোড়ায় যে প্রবল অহংকার জাগিয়া উঠে তাহাতে সত্য-উপলব্ধির যথেষ্ট ব্যাঘাত করে। তাহা আমাদের আপনাকে শিখাইবার চেয়ে আপনাকে ভুলাইবার দিকেই বেশি ঝোঁক দেয়। তাহা সাঁচ্চার সঙ্গে ঝুঁটাকে সমান মূল্য দিয়া সাঁচ্চাকে অপমানিত করে। সে এ কথা ভুলিয়া যায় যে, কী আমার নাই এইটে সুনির্দিষ্ট করিয়া জানার দ্বারাতেই কী আমার কাছে সেইটে সুস্পষ্ট করিয়া জানা যায়। সেই সুস্পষ্ট করিয়া জানাই আমাদের শক্তিলাভের একমাত্র পন্থা। অহংকার আত্ম-উপলব্ধির সীমাকে ঝাপসা করিয়া দিয়াই আমাদিগকে দুর্বলতা ও ব্যর্থতার দিকে লইয়া যায়। আত্মগৌরবের প্রতিষ্ঠা সত্যের উপর। সুতরাং অহংকারের দ্বারা তাহাকে কিছুতেই পাওয়া যায় না। সত্যের দুর্গপ্রাচীরে ঠেকিয়া ঠেকিয়া অহংকার যতই পরাস্ত হইতে থাকে ততই আমরা আপনাকে জানিতে থাকি।

আমাদের দেশের মতো আয়র্লণ্ডেও আপনার চিত্তশক্তিকে স্বাতন্ত্র্য দিবার জন্য একটা উদ্যম কিছুকাল হইতে কাজ করিতেছে। সেই উদ্যমের প্রথম প্রকাশের মধ্যে স্বভাবতই বিস্তর ফেনিলতা দেখা দেয়; তাহা অনেকসময় ওজন রাখিতে না পারিয়া অদ্ভুতরূপে হাস্যকর হইয়া উঠে; আয়র্লণ্ডেও যে সেরূপ ঘটিয়াছিল তাহা আইরিশ বিখ্যাত লেখক জর্জ্‌ মুরের Hail and Farewell -নামক বই পড়িলে কতকটা বুঝা যায়।

যাহা হউক, আয়র্লণ্ড নিজের চিত্তবাত্মা প্রকাশ করিবার চেষ্টায় নিজের ভাষা কথা কাহিনী ও পৌরাণিকতাকে অবলম্বন করিবার যে উদ্যোগ করিয়াছে সেই উদ্যোগের মধ্যে এক-একজন অসামান্য লোকের প্রতিভা আপনার যথার্থ ক্ষেত্র পাইয়াছে। কবি য়েট্‌স্ তাঁহাদেরই মধ্যে একজন। ইনি আয়র্লণ্ডের বাণীকে বিশ্বসাহিত্যে জয়যুক্ত করিতে পারিয়াছেন।

য়েট্‌স্ যখন সাহিত্যক্ষেত্রে আয়র্লণ্ডের জয়পতাকা বহন করিয়া আনিলেন তাহার কিছুদিন পূর্ব হইতে আয়র্লণ্ডে সাহিত্যের উদ্যম দুর্বল হইয়াছিল। তখন আয়র্লণ্ডে পোলিটিকাল বিদ্রোহের দিন ঘুচিয়া গিয়া পোলিটিকাল বাঁকা চালের কাল আসিয়াছিল; তখন দেশে ভাবের শক্তিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া কূটবুদ্ধিরই প্রাধান্য ঘটিয়াছিল।

য়েট্‌সের কোনো একজন সমালোচক লিখিতেছেন—

এমন সময়ে রণদূত আর-একবার আসিয়া দেখা দিল; এবার দুর্দাম হৃদয়াবেগের বিদ্যুদ্‌বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কোনো সামাজিক প্রলয়যুগের বজ্রধ্বনি শুনা গেল না। যে সর্বজয়ী মানবাত্মা আপনাকে আপনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, এবং মানুষের জগতে যাহার গোপন অঙ্গুলি সমস্ত বড়ো বড়ো ভাঙাগড়ার রহস্যকে গিয়া স্পর্শ করিতেছে, সেই আত্মতৃপ্ত মানবাত্মার বিরাট বিপুল শান্তি আকাশকে অধিকার করিল। নিজের মধ্যে মানবহৃদয়ের পূর্ণতর বন্ধনমোচন প্রকাশ করিয়া য়েট্‌স্ আর-একবার গভীরতর ও সূক্ষ্মতর শক্তির সহিত বিদ্রোহের বাণীকে জাগ্রত করিলেন। এবার বাহিরের কোলাহল নহে, এবার কবি মানবাত্মার অন্তরের কথা বলিলেন—তাহাই আয়র্লণ্ডের কথা এবং সমস্ত মানুষের কথা। তিনি গভীরভাবে চিন্তা করিলেন এবং পঞ্চাশ বছর পূর্বে যে কবিত্বরীতি প্রচলিত ছিল তাহা পরিহার করিলেন। কিন্তু, তিনি রচনার যে প্রণালীকে অবশেষে সম্পূর্ণতা দান করিলেন তাহা পুরাতন কবিদিগের রচনারীতিরই উৎকর্ষসাধন। তাঁহার কবিত্ব প্রকৃতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি প্রয়োগ করিয়াছে এবং ধ্বনিমাধুর্যের অন্তরতর সংগীতটিকে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে। যে-সকল চিন্তাসামগ্রীকে তিনি তাঁহার প্রথম কালের অতুলনীয় গীতিকাব্যে গাঁথিয়া তুলিয়াছেন তাহা তাঁহার পূর্বতন ঋষি-পিতামহদের নিকট হইতে প্রাপ্ত উত্তরাধিকার; তাহা এই প্রকাশমান বিশ্বপ্রকৃতির হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রকৃতি মানুষ ও দেবতার পরম ঐক্যটিকে উদ্ধার করিয়াছে।

সমালোচক লিখিতেছেন—

It was with the publication of *The Wanderings of Oisin*—in

1889, if I remember aright,— that Yeats sprang into the front rank of contemporary poets, and threatened to add to the august company of the immortals. In the qualities by which he succeeded— an exquisitely delicate music, intensity of imaginative conviction, intimacy with natural and (dare I say ?) supernatural manifestations— he was typically Celtic.

এই imaginative conviction কথাটা য়েট্‌স্‌ সম্বন্ধে অত্যন্ত সত্য। কল্পনা তাঁহার পক্ষে কেবল লীলার সামগ্রী নহে, কল্পনার আলোকে তিনি যাহা দেখিয়াছেন তাহার সত্যতাকে তিনি জীবনে গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন। অর্থাৎ, তাঁহার হাতে কল্পনা-জিনিসটি কেবলমাত্র কবিত্বব্যবসায়ের একটা হাতিয়ার নহে, তাহা তাঁহার জীবনের সামগ্রী ; ইহার দ্বারাই বিশ্বজগৎ হইতে তিনি তাঁহার আত্মার খাদ্য পানীয় আহরণ করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে নিভৃতে যতবার আমার আলাপ হইয়াছে ততবার এই কথাই আমি অনুভব করিয়াছি। তিনি যে কবি তাহা তাঁহার কবিতা পড়িয়া জানিবার সুযোগ এখনো আমার সম্পূর্ণরূপে ঘটে নাই, কিন্তু তিনি যে কল্পনালোকিত হৃদয়ের দ্বারা তাঁহার চতুর্দিককে প্রাণবান্‌রূপে স্পর্শ করিতেছেন তাহা তাঁহার কাছে আসিয়াই আমি অনুভব করিতে পারিতেছি।

৩৭ আল্‌ফ্রেড প্লেস
সাউথ কেন্সিংটন, লণ্ডন
১৯ ভাদ্র ১৩১৯

স্টপ্‌ফোর্ড্‌ ব্রুক

আমার কোনো রচনা পড়িয়া লোকের ভালো লাগিয়াছে, ইহাতে খুশি হওয়া লজ্জার বিষয় বলিয়া মনে করি না। বস্তুত, খুশি হই নাই এ কথা বলার মতো অহংকার আর কিছুই নাই। যখনি কোনো বই ছাপাইয়াছি তখনি তাহার মধ্যে একটা আশা প্রচ্ছন্ন আছে যে, এ বই লোকের ভালো লাগিবে। যদি সেটাকে অহংকার বলা যায় তবে সেই বই-ছাপানোটাই অহংকার।

আমি কোনো-একটা অবকাশের কালে নিজের কতকগুলি কবিতা ও গান ইংরেজি গদ্যে তর্জমা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। ইংরেজি লিখিতে পারি এ অভিমান

আমার কোনোকালেই নাই ; অতএব ইংরেজি রচনায় বাহবা লইবার প্রতি আমার লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু, নিজের আবেগকে বিদেশী ভাষার মুখ হইতে আবার একটুখানি নূতন করিয়া গ্রহণ করিবার যে সুখ তাহা আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। আমি আর-এক বেশ পরাইয়া নিজের হৃদয়ের পরিচয় লইতেছিলাম।

আমি বিলাতে আসার পর এই তর্জমাগুলি যখন আমার বন্ধুর হাতে পড়িল, তিনি বিশেষ সমাদর করিয়া সেগুলি গ্রহণ করিলেন। এবং তাহার কয়েক খণ্ড কপি করাইয়া এখানকার কয়েকজন সাহিত্যিককে পড়িতে দিলেন। আমার এই বিদেশী হাতের ইংরেজিতে আমার এই লেখাগুলি তাঁহাদের ভালো লাগিয়াছে। বোধ হয় তাহার একটা কারণ এই যে, ইংরেজি রচনার শক্তি আমার এতটা প্রবল নহে যাহাতে আমার তর্জমা হইতে বিদেশী রসটুকুকে আমি একেবারে নিঃশেষে নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারি।

স্টপ্‌ফোর্ড্‌ ব্রুকের হাতে আমার এই তর্জমাগুলির একটি কপি পড়িয়াছিল। সেই উপলক্ষ্যে তিনি একদিন আমাকে ডিনারের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি বৃদ্ধ, বোধ করি তাঁহার বয়স সত্তর বছর পার হইয়া গিয়াছে। তাঁহার একটা পায়ের রক্ত-প্রণালীতে প্রদাহের মতো হইয়াছে, চলা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর ; সেই পা একটা চৌকির উপর তিনি তুলিয়া বসিয়া আছেন। বার্ধক্য কোনো কোনো মানুষকে পরাভূত করিয়া পদানত করে, আবার কোনো কোনো মানুষের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করিয়া তাহার সঙ্গে বন্ধুর মতো বাস করে। ইঁহার শরীরমনে বার্ধক্য তাহার জয়পতাকা তুলিতে পারে নাই। আশ্চর্য ইঁহার নবীনতা। আমার বার বার মনে হইতে লাগিল, বৃদ্ধের মধ্যে যখন যৌবনকে দেখা যায় তখনি তাহাকে সকলের চেয়ে ভালো করিয়া দেখা যায়। কেননা, সেই যৌবনই সত্যকার জিনিস ; তাহা শরীরের রক্তমাংসের সহিত জীর্ণ হইতে জানে না ; তাহা রোগতাপকে আপনার জোরেই উপেক্ষা করিতে পারে। তাঁহার দেহের আয়তন বিপুল, তাঁহার মুখশ্রী সুন্দর ; কেবল তাঁহার পীড়িত পায়ের দিকে তাকাইয়া মনে হইল, অর্জুন যখন দ্রোণাচার্যের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তখন প্রণামনিবেদনের স্বরূপ প্রথম তীর তাঁহার পায়ের তলায় ফেলিয়াছিলেন, তেমনি বার্ধক্য তাহার যুদ্ধ-আরম্ভের প্রথম তীরটা ইঁহার পায়ের কাছে নিক্ষেপ করিয়াছে।

বিধাতা যে জীবনটা ইঁহাকে দান করিয়াছেন সেটাকে সকল দিক হইতে আনন্দের সামগ্রী করিয়া দিয়াছেন ; ছবি কবিতা, প্রকৃতির সৌন্দর্য, এবং লোকালয়ে মানব-জীবনের বিচিত্র লীলা, সকলের প্রতিই তাঁহার চিত্তের ঔৎসুক্য প্রবল। চারি দিকের জগতের এই স্পর্শানুভূতি, এই রসগ্রহণের শক্তি তাঁহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে কমিয়া আসে নাই। এই গ্রহণের শক্তিই তো যৌবন।

ইহার ধর্মোপদেশ ও কাব্যসমালোচনা আমি পূর্বেই পড়িয়াছি। সেদিন দেখিলাম, ছবি আঁকাতেও ইহার বিলাস। ইহার আঁকা প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি ঘরের কোণে অনেক জমা হইয়া আছে। এগুলি সব মন হইতে আঁকা। আমার চিত্রশিল্পী বন্ধু এই ছবিগুলি দেখিয়া বিশেষ করিয়া প্রশংসা করিলেন। এ ছবিগুলি যে প্রদর্শনীতে দিবার বা লোকের মনোরঞ্জন করিবার জন্ম তাহা নহে, ইহা নিতান্তই মনের লীলা মাত্র। সেই কথাই আমি ভাবিতেছিলাম— ইহার বয়স অনেক হইয়াছে, লেখাও অনেক লিখিতে হয়, শরীরও সম্পূর্ণ সুস্থ নহে, কিন্তু ইহাতেও ইহার উদ্যমের শেষ হয় নাই। জীবনীশক্তির প্রবলতা এত কাজের সঙ্গে খেলা করিবারও অবকাশ পায়। বস্তুত এই খেলার দ্বারাই প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রয়োজনীয় কাজের চারি দিকে একটা মুক্তির ক্ষেত্রেই মানুষের ঐশ্বর্য। এ দেশে যাঁহারা খ্যাতিলাভ করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকের মধ্যেই সেইটে লক্ষ্য করি। তাঁহারা যেটা লইয়া প্রধানত নিযুক্ত আছেন সেইটেতেই তাঁহাদের জীবনের সমস্ত জায়গা একেবারে ঠাসিয়া ধরে নাই; চারি দিকে খানিকটা ফাঁকা জায়গা আছে, সেইখানে তাঁহাদের বিহার। খুব বড়ো বৈজ্ঞানিককে দেখিয়াছি, তাঁহার প্রধান শখ চীনদেশের চিত্রকলা। ইহাদের জীবনের তহবিলে বাড়তির ভাগ অনেকটা থাকে। ব্যবসায় ইহাদের অনেকের পক্ষেই একটা অংশমাত্র। আপিসঘর ইহাদের বাসগৃহের একটামাত্র ঘর।

অনেক সিঁড়ি ভাঙিয়া উপরের তলার একটি ছোটো কামরায় ইহার সঙ্গে দেখা হইল। অনেকক্ষণ আমাদের দুইজনের নিভৃত আলাপের অবকাশ ঘটিয়াছিল। তাঁহার কথাবার্তা হইতে আমি এইটে বুঝিলাম যে, খৃস্টানধর্মের বাহ্য কাঠামো, যেটাকে ইংরেজি ভাষায় বলে creed, কোনোকালে তাহার যেমনই প্রয়োজন থাক্‌, এখন তাহাতে ধর্মের বিশুদ্ধ রসপ্রবাহের বাধা ঘটাইতেছে। মানুষের মন যখনি আপনার আশ্রয়কে ছাড়াইয়া বাড়িয়া উঠে তখন সেই আশ্রয়ের মতো শত্রু তাহার আর কেহ নাই। এ দেশে ধর্মের প্রতি অনেকের মন যে বিমুখ হইয়াছে তাহার প্রধান কারণ, ধর্মের এই বাহিরের আয়তনটা। তিনি আমাকে বলিলেন, 'তোমার এই কবিতাগুলিতে কোনো ধর্মের কোনো creedএর কোনো গন্ধ নাই; ইহাতে এগুলি আমাদের দেশের লোকের বিশেষ উপকারে লাগিবে বলিয়া আমি মনে করি।'

কথায় কথায় তিনি এক সময়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি জন্মান্তরে বিশ্বাস করি কি না। আমি বলিলাম, আমাদের বর্তমান জন্মের বাহিরের অবস্থা সম্বন্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট কল্পনা আমার মনে নাই এবং সে সম্বন্ধে আমি চিন্তা করা আবশ্যক মনে করি না। কিন্তু, যখন চিন্তা করিয়া দেখি তখন মনে হয়, ইহা কখনো হইতেই

পারে না যে, আমার জীবনধারার মাঝখানে এই মানবজন্মটা একেবারেই খাপছাড়া জিনিস— ইহার আগেও এমন কখনো ছিল না, ইহার পরেও এমন কখনো হইবে না, যে কারণ-বশত জীবনটা বিশেষ দেহ হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে সে কারণটা এই জন্মের মধ্যেই প্রথম আরম্ভ হইয়া এই জন্মের মধ্যেই সম্পূর্ণ শেষ হইয়া গেল। শরীরী জন্ম পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হইতে হইতে আপনাকে পূর্ণতর করিয়া তুলিতেছে, এইটেই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু, পূর্বজন্মে কোনো মানুষ পশু ছিল এবং পরজন্মেই সে পশুদেহ ধরিবে এ কথাও আমি মনে করিতে পারি না। কেননা, প্রকৃতির মধ্যে একটা অভ্যাসের ধারা দেখা যায়; সেই ধারার হঠাৎ অত্যন্ত বিচ্ছেদ ঘটা অসংগত। স্টপ্‌ফোর্ড্‌ ব্রুক বলিলেন, তিনিও জন্মান্তরে বিশ্বাসটাকে সংগত মনে করেন। তাঁহার বিশ্বাস, নানা জন্মের মধ্য দিয়া যখন আমরা একটা জীবনচক্র সমাপ্ত করিব, তখন আমাদের পূর্বজন্মের সমস্ত স্মৃতি সম্পূর্ণ হইয়া জাগ্রত হইবে। এ কথাটা আমার মনে লাগিল। আমার মনে হইল, একটা কবিতা পড়া যখন আমরা শেষ করিয়া ফেলি তখনি তাহার সমস্তর ভাবটা পরম্পরগ্রথিত হইয়া আমাদের মনে উদিত হয়; শেষ না করিলে সকল সময় সেই সূত্রটি পাওয়া যায় না। আমরা প্রত্যেকে একটা অভিপ্রায়কে অবলম্বন করিয়া এক-একটা জন্মমালা গাঁথিয়া চলিয়াছি; গাঁথা শেষ হইলেই যে একেবারেই ফুরাইয়া যায় তাহা নহে, কিন্তু একটা পালা শেষ হইয়া যায়। তখনি সমস্তটাকে স্পষ্ট করিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

এখানকার যে-সকল চিন্তাশীল ও ভাবুক লোকদের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে সকলেরই মধ্যে একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করিয়াছি, তাঁহারা অন্যায় ও অবিচারকে সত্যই ঠেলিয়া ফেলিতে চান। এ কথা বলা বাহুল্য মনে হইতে পারে, কিন্তু বাহুল্য নহে। যে জাতি বহুদূরবিস্তৃত অধীন দেশকে শাসন করে এবং সেই-সকল অধীন দেশের সহিত যাহাদের নানাবিধ স্বার্থের সম্বন্ধ জড়িত, পরজাতির সম্বন্ধে তাহাদের ন্যায়-অন্যায়ের বোধ ম্লান না হইয়া থাকিতে পারে না। অন্য জাতিকে যতদিন সম্ভব অধীনস্থ করিয়া রাখা নানা কারণে যাহার নিজের পক্ষে প্রয়োজনীয়, মানবস্বাধীনতা সম্বন্ধে তাহার ধর্মবোধ কখনোই অক্ষুণ্ণ থাকে না। যে শুভবুদ্ধি-দ্বারা মানুষ স্বজাতির স্বাধীনতাকে শ্রেষ্ঠ মূল্য দিয়া থাকে, অন্যকে অধীন রাখিবার ইচ্ছা যতই প্রবল হয় ততই সেই শুভবুদ্ধিকেই মানুষ দুর্বল করিয়া ফেলে। অথচ, এই শুভবুদ্ধিই জাতীয় উন্নতির পক্ষে মানুষের চরম সম্বল।

এমন অবস্থায় যখন এখানকার মনীষীসম্প্রদায়ের মধ্যে এক দলকে দেখিতে পাই যাঁহারা জাতীয় স্বার্থপরতা অপেক্ষা জাতীয় ন্যায়পরতাকেই সমাদর করিয়া থাকেন,

তখন বুঝিতে পারি, দেহের মধ্যে এক দিকে ব্যাধির প্রবেশদ্বারও যেমন খোলা আছে তেমনি আর-এক দিকে স্বাস্থ্যতত্ত্বও উদ্যমের সহিত কাজ করিতেছে। যতক্ষণ এই জিনিসটি আছে ততক্ষণ আশা আছে। এই শুভবুদ্ধিটিকে এখানকার ভাবুক লোকদের অনেকের মধ্যে অনুভব করা যায়।

এখানে ভাবের ক্ষেত্র এবং কাজের কারখানা পাশাপাশি আছে। এখানে রাষ্ট্রনীতির সিংহাসন ও ধর্মনীতির বেদী পরস্পর নিকটবর্তী। এইজন্য উভয়ের সহযোগে এখানকার দুই চাকার রথ চলিতেছে। মাঝে মাঝে এক-একটা সময় আসে যখন কাজের ধোঁওয়া ভাবের হাওয়াকে একেবারে কালো করিয়া তোলে; তখন এখানে কাব্যে সাহিত্যেও পালোয়ানি আস্ফালনে তাল ঠুকিবার আওয়াজটাই সমস্ত সংগীতকে ঢাকিয়া ফেলিতে চায়; হঠাৎ তখন দেশের রক্তের মধ্যে Jingo-বিষ প্রবল হইয়া উঠে এবং সেই চোখরাঙানির দিনে লোকে মনুষ্যত্বের উচ্চতর সাধনাকে ধর্মভীরু দুর্বলের কাপুরুষতা বলিয়াই গণ্য করে। কিন্তু, সেই উন্মত্ত বিকারের সময়েও ধর্মবুদ্ধি একেবারে হাল ছাড়িয়া দেয় না; সেইজন্য বোয়ার-যুদ্ধের দিনেও এখানেও একদল লোক ছিলেন যাঁহারা সমস্ত দেশের আক্রোশকে বুক পাতিয়া সহ্য করিয়াও ন্যায়ের জয়ধ্বজাকে উপরে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইঁহারাই দেশের হাতে মার খাইয়াও, দেশবিদ্বেষী অপবাদ সহ্য করিয়াও, দেশের পাপক্ষালনের কাজে অপরাজিতচিত্তে নিযুক্ত আছেন।

কিন্তু, ভারতবর্ষে ইংরেজের যে শাসনতন্ত্র আছে সেটা একেবারে ঘোরতর কাজের ক্ষেত্রের মাঝখানে। সেই কাজের বিষকে শোধিত করিতে পারে এমনতরো ভাবের হাওয়া সেখানে প্রবল নহে। এই কারণে এই বিষ ভিতরে ভিতরে সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। যে ইংরেজ অল্পবয়সে কোনোমতে একটা কঠিন পরীক্ষা পাস করিয়া সেখানে রাজ্য চালনা করিতে যান তিনি একেবারে সেখানকার বিষাক্ত তপ্ত হাওয়ার ভিতরে গিয়া প্রবেশ করেন। সেখানে ক্ষমতার মদ অত্যন্ত কড়া, সেলামের মোহ মজ্জার মধ্যে জড়িত হইয়া যায়, এবং প্রেস্টিজের অভিমান ধর্মের কাছেও মাথা হেঁট করিতে চায় না। অথচ, সেইখানেই ইংলণ্ডের সেই ভাবুকমণ্ডলীর সংসর্গ নাই যাঁহারা বিকৃতিনিবারণের বড়ো মন্ত্রগুলিকে সর্বদা আবৃত্তি করিতে পারেন। এইজন্য ভারতবর্ষীয় ইংরেজ আমাদের চিত্তকে এমন করিয়া ঠেলিয়া রাখে; এইজন্য ভারতবর্ষের বড়ো পরিচয়টা কোনোমতেই ভারতবর্ষের ইংরেজ লাভ করে না। আমরা তাহাদের কাছে অত্যন্ত ছোটো; আমাদের সাহিত্য, আমাদের ধর্মান্দোলন, আমাদের স্বদেশহিতৈষিতার সাধনা তাহাদের কাছে একেবারেই নাই। আমরা তাহাদের বাজারের খরিদ্দার, আপিসের কেরানি, বারিস্টারের বাবু, আদালতের আসামি ফরিয়াদি। তাহারা পূর্ণ

মানবচিত্ত দিয়া আমাদের দেখে না, আমাদেরও পূর্ণ মানবপরিচয় তাহারা পায় না। এ অবস্থায় শাসনসংরক্ষণ কাজের ব্যবস্থা সমস্তই খুব পাকা হইতে পারে, কিন্তু তাহার চেয়ে বড়ো জিনিসটা নষ্ট হয়। কারণ, মঙ্গল তো শৃঙ্খলা নহে; এবং মানুষের কাছ হইতে কোনো ভালো জিনিস পাইলে সেই সঙ্গে যদি মানুষকেও না পাই তবে সে দান আমরা সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া গ্রহণ করিতে পারি না; সুতরাং সে দান না দাতাকে ধন্য করে, না গ্রহীতাকে পরিতৃপ্ত করিয়া তোলে।

ইংলণ্ডের ভাবুকসমাজ

বাহিরের ভিড়ের মধ্য হইতে আমি যেন অন্তরের ভিড়ের ভিতরে গিয়া প্রবেশ করিলাম, এইরূপ আমার মনে হইল। এ দেশের যাঁহারা লেখক, যাঁহারা চিন্তাশীল, তাঁহাদের সংস্রবে যতই আসিলাম ততই অনুভব করিতে লাগিলাম, ইঁহাদের চিন্তার পথে ভাবের ঠেলাঠেলি অত্যন্ত প্রবল।

ইহাদের সমাজ সকলের শক্তিকে যে পূর্ণবেগে আকর্ষণ করিতেছে, বাহিরে লোকের ছুটাছুটি, মোটর-যানের হুড়াহুড়িতে তাহা স্পষ্টই চোখে পড়ে। কাহারও সময় নাই; তাড়াতাড়ি কাজ সারিতে হইবে; এ সমাজ কাহাকেও পিছাইয়া পড়িয়া থাকিতে দিবে না; যে একটু পিছাইয়া পড়িবে তাহাকেই হার মানিতে হইবে। এই সম্মুখে ছুটিবার ভয়ংকর ব্যগ্রতা যখন দেখি তখন মনে মনে ভাবি, সম্মুখে সে কে বসিয়া আছে। সে ডাক দেয় কিন্তু দেখা দেয় না। নীল সমুদ্রের মতো বহুদূরে তাহার ঢেউয়ের উপর ঢেউ নিশিদিন হাত তুলিতেছে, কিন্তু কোথায় কোন্ পর্বতশিখরের গুহাগহ্বর হইতে ঝরনাগুলি পাগলের মতো ব্যস্ত হইয়া, ডাহিনে বাঁয়ে নুড়ি পাথরগুলাকে কোনোমতে ঠেলিয়াঠুলিয়া, কাহাকেও কোনো ঠিকানা জিজ্ঞাসা না করিয়া, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছে।

বাহিরের কাজের ক্ষেত্রে এই যেমন হাঁকাহাঁকি দৌড়াদৌড়ি, চিন্তার ক্ষেত্রে ঠিক তেমনিই। কত হাজার হাজার লোক যে ঊর্ধ্বশ্বাসে চিন্তা করিয়া চলিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। দৈনিক কাগজে, সাপ্তাহিকে, মাসিকে, ত্রৈমাসিকে, বক্তৃতাসভায়, শিক্ষাশালায়, পার্লামেন্টে, পুঁথিতে, চটিতে মনের ধারা অবিশ্রাম বহিয়া চলিয়াছে। মানসিক শক্তি যাহার যে রকমের এবং যে পরিমাণে আছে তাহার সমস্তটার উপর টান পড়িয়াছে। 'চাই আরও চাই', দেশের মর্মস্থান হইতে এই একটা ডাক সর্বদা সর্বত্র পৌঁছিতেছে। এত বড়ো একটা ডাকে কাহারও সবুর সহে না, ক্ষণকাল চুপ করিয়া

থাকিতে হইলে মন উতলা হইয়া উঠে। দেশের এই মানসভাণ্ডারে যে লোক একবার একটা কিছু জোগাইয়াছে তাহার আর নিষ্কৃতি নাই; সে লোকের উপর আরো'র তাগিদ পড়িল; খেজুরগাছের মতো বৎসরের পর বৎসরে কাটের পর কাট চলিতে থাকে; কোনো বারে রসের একটু কমতি বা বিরাম পড়িলে সে পাড়াসুদ্ধ লোকের প্রশ্নের বিষয় হইয়া উঠে।

কাজেই এখানকার মনোরাজ্যটা যদি চোখে দেখিবার হইত তবে দেখিতাম, সদর রাস্তায় এবং গলিতে, আপিস-পাড়ায় এবং বারোয়ারি-তলায় হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেছে; ভিড় ঠেলিয়া চলা দায়। সেখানেও কেহ বা পায়ে হাঁটিয়া চলে, কেহ বা মোটরগাড়ি হাঁকায়; কেহ বা মজুরি করে, কেহ বা মহাজনি করিয়া থাকে; কিন্তু সকলেই বিষম ব্যস্ত। ভোরবেলা হইতে রাত দুপুর পর্যন্ত চলাচলের অন্ত নাই।

কথাটা নূতন নহে। আমাদের দেশের তন্দ্রালস নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নেও আমরা অর্ধেক চোখ বুজিয়া আন্দাজ করিতে পারি, এ দেশের চিন্তার হাটে কী ভয়ংকর কোলাহল এবং ঠেলাঠেলি। কিন্তু, সেই ভিড়ের চাপটা নিজের মনের উপর যখন ঠেলা দেয় তখন স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারি তাহার বেগ কতখানি। এ দেশে যাঁহারা মনের কারবার করেন তাঁহাদের কাছে আসিলে সেই বেগটা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

ইঁহাদের সঙ্গে আমার পরিচয় খুব বেশি দিনেরও নয়, খুব অন্তরঙ্গও নয়, ক্ষণকালের দেখাসাক্ষাৎ মাত্র। কিন্তু, সেই সময়টুকুর মধ্যে একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়া আমি বারম্বার বিস্মিত হইয়াছি, সেটা ইঁহাদের মনের ক্ষিপ্রহস্ততা। মন ইলেক্‌ট্রিক আলোর তারের মতো সর্বদা যেন প্রস্তুত হইয়াই আছে, বোতামটি টিপিবা মাত্র তখনি জ্বলিয়া উঠে। আমাদের প্রদীপের আলোর ব্যবহার; সলিতা পাকাইয়া, তেল ঢালিয়া, চক্‌মকি ঠুকিয়া কাজ চালাইয়া থাকি— বিশেষ কোনো তাগিদ নাই, সুতরাং দেরি হইলে কিছুই আসে যায় না। অতএব, আমাদের যেরূপ অভ্যাস তাহাতে আমার পক্ষে এই ইলেক্‌ট্রিক আলোর ক্ষিপ্রতা সম্পূর্ণ নূতন।

এখনকার কালের সুবিখ্যাত লেখক ওয়েল্‌স্[১] সাহেবের দুই একখানি নভেল ও আমেরিকার সভ্যতা সম্বন্ধে একখানা বই পূর্বেই পড়িয়াছিলাম। তাহাতেই জানিতাম, ইঁহার চিন্তাশক্তি ইস্পাতের তরবারির মতো যেমন ঝক্‌মক্ করে তেমনি তাহা খরধার। আমার বন্ধু যেদিন ইঁহার সঙ্গে এক-ডিনারে আমাকে নিমন্ত্রণ করেন সেদিন আমার মনের মধ্যে কেমন একটু ভয় ছিল। আমার মনে ছিল, সংসারে খরতর বুদ্ধি

১ এইচ. জি. ওয়েল্‌স্ (H. G. Wells)

জিনিসটাতে নিশ্চয়ই অনেক কাজ হয়, কিন্তু তাহার সংস্রব হয়তো আরামের নহে।

যাহা হউক, সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ইহার সঙ্গে অনেক ক্ষণের জন্য আলাপ-পরিচয় হইল। প্রথমেই আশ্বস্ত হইলাম যখন দেখা গেল মানুষটি সজারুজাতীয় নহে, সম্পূর্ণ মোলায়েম। দেখিতে পাইলাম, ইহার প্রখরতা চিন্তায়, কিন্তু প্রকৃতিতে নয়। আসল কথা, মানুষের প্রতি ইহার আন্তরিক দরদ আছে, অন্যায়ের প্রতি বিদ্বেষ এবং মানুষের সার্বজনীন উন্নতির প্রতি অনুরাগ আছে; সেইটে থাকিলেই মানুষের মন কেবলমাত্র চিন্তার তুবড়িবাজি করিয়া সুখ পায় না। এই দেশে সেইটে একটা মস্ত জিনিস, মানুষ এখানে সর্বদা প্রত্যক্ষগোচর হইয়া আছে; মানুষের সম্বন্ধে এখানে ঔৎসুক্যের অন্ত নাই। মানুষের প্রতি উদাসীনতার অভাবেই ইহাদের মন এমন প্রচুরশস্যশালী হইয়া উঠিয়াছে। কেননা, শুধু বীজে ও মাটিতে ফসল ভালো হয় না, জমিতে সর্বদা রস থাকা চাই; মানুষের প্রতি মানুষের টানই সেই চিরন্তন রস যাহাতে করিয়া মনের সকলরকম ফসল একেবারে অপর্যাপ্ত হইয়া ফলিয়া উঠে। আমাদের দেশে আমি অনেক শক্তিশালী লোক দেখিয়াছি, মানুষের সঙ্গে তাঁহাদের হৃদয়ের সংস্রব সুগভীর ও সর্বদা বিদ্যমান নহে বলিয়াই তাঁহারা আপনার সাধ্যকে পূর্ণভাবে সাধিত করিয়া তুলিতে পারেন না। মানুষ তাঁহাদের কাছে তেমন করিয়া চাহিতেছে না বলিয়াই মানুষের ধন তাঁহারা পুরা পরিমাণ বাহির করিতে পারিতেছেন না। বিরল-বসতি লোকালয়ে মানুষ নিজের নিতান্ত প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কিছু ফলায় না এবং তাহারও অনেক নষ্ট হয়, ফেলা যায়। আমাদের সেইরূপ বিরলে বাস; মানুষ ছাঁকিয়া বাঁকিয়া আমাদের হৃদয়মনকে আকর্ষণ করিতেছে না। সেইজন্য আমরা অনেকে চিন্তা করিতে পারি, কিন্তু সে চিন্তা আলস্য ঘুচাইয়া আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে না; অনেকের হৃদয় আছে, কিন্তু সে হৃদয় ছেলেপুলে ভাইপো ভাগনের বাহিরে খাটিবার ক্ষেত্র পায় না।

যাহাই হউক, ওয়েল্‌সের সঙ্গে কথা কহিতে গিয়া এইটে বুঝিতে পারিলাম, ইহাদের চিন্তাশীলতা ও রচনাশক্তির অবলম্বন মানুষ; এইজন্য তাহা শিকারীর শিকার-ইচ্ছার মতো কেবলমাত্র শক্তির খেলা নহে। এইজন্য ইহাদের চিন্তার যে তীক্ষ্ণতা তাহা ছুরির তীক্ষ্ণতার মতো নহে—তাহা সজীব তীক্ষ্ণতা, তাহা দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা; তাহার সঙ্গে হৃদয় আছে, জীবন আছে।

আর-একটা জিনিস দেখিয়া বারবার বিস্মিত হইলাম, সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। সে ইহাদের চিন্তার ক্ষিপ্রতা। আমার বন্ধুর সঙ্গে ওয়েল্‌সের যতক্ষণ কথা চলিল

ততক্ষণ পদে পদে কথাবার্তার প্রবাহ উজ্জ্বল চিন্তার কণায় ঝল্‌মল্‌ করিতে লাগিল। কথার সঙ্গে কথার স্পর্শে আপনি স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে থাকে, মুহূর্তকাল বিলম্ব হয় না। ইহাতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদের মন প্রস্তুত হইয়াই আছে। ইহারা যে চিন্তা করিতেছেন তাহা নহে, চারি দিকের ঠেলায় ইহাদের নিয়ত চিন্তা করাইতেছে; তাই ইহাদের মন ছুটিতে ছুটিতেও ভাবিতে পারে এবং ভাবিতে ভাবিতেও কথা কহিয়া যায়। ইহাদের ব্যক্তিগত মনের পশ্চাতে সমস্ত দেশের মন জাগিয়া আছে; চিন্তার ঢেউ, কথার কল্লোল কেবলই নানা দিক হইতে নানা আকারে পরস্পরের চিত্তকে আঘাত করিতেছে। ইহাতে মনকে জাগ্রত ও মুখরিত না করিয়া থাকিতে পারে না।

আমার বন্ধু চিত্রশিল্পী, কথার কারবার তাঁহার নহে। তাঁহার সঙ্গে আমার অনেকদিন অনেক আলাপ হইয়াছে; সর্বদা ইহাই লক্ষ্য করিয়াছি, যে কথাটাই ইহার সম্মুখে উপস্থিত হয় তৎক্ষণাৎ সেটাকে ইনি জোরের সঙ্গে ভাবিতে পারেন ও জোরের সঙ্গে বলিতে পারেন। সে জোর কিছুমাত্র গায়ের জোর নহে, তাহা চিন্তার জোর। ইহার অনুভূতিশক্তিও দ্রুত এবং প্রবল। যেটা ভালো লাগিবার জিনিস সেটাকে ভালো লাগিতে ইহার ক্ষণমাত্র বিলম্ব হয় না, সে সম্বন্ধে ইহাকে আর-কাহারও মুখাপেক্ষা করিতে হয় না; যেটাকে গ্রহণ করিতে হইবে সেটাকে ইনি একেবারেই অসংশয়ে গ্রহণ করেন। মানুষকে ও মানুষের শক্তিকে গ্রহণ করিবার সহজ ক্ষমতা ইহার এমন প্রবল বলিয়াই ইনি ইহার দেশের নানা শক্তিশালী নানা শ্রেণীর লোককে এমন করিয়া বন্ধুত্বপাশে বাঁধিতে পারিয়াছেন। তাঁহারা কেহ বা কবি, কেহ সমালোচক, কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ দার্শনিক, কেহ গুণী, কেহ জ্ঞানী, কেহ রসিক, কেহ রসজ্ঞ; তাঁহারা সকলেই বিনা বাধায় এক ক্ষেত্রে মিলিবার মতো লোক নহেন, কিন্তু তাঁহার মধ্যে সকলেই মিলিতে পারিয়াছেন।

আমার বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিতে গিয়া আমার ইহাই মনে হইতে থাকে, অনেক বিষয়েই ইহাদিগকে এখন আর গোড়া হইতেই ভাবিতে হয় না; ইহারা অনেক কথা অনেক দূর পর্যন্ত ভাবিয়া রাখিয়াছেন। ভাবনার প্রথম ধাক্কাতেই যত বিলম্ব, তখনি জড়ত্ব ভাঙিতে সময় লাগে; কিন্তু যখন তাহা কিছুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে তখন তাহার পক্ষে চলা সহজ। ইহাদের দেশে ভাবনা জিনিসটা চলার মুখেই আছে; তাহার চাকা আপনিই সরে। মানুষের চিন্তার অধিকাংশ বিষয়ই মাঝ-রাস্তায়। এইজন্য ইহাদের কোনো শিক্ষিত লোকের সঙ্গে যখন আলাপ করা যায় তখন একেবারেই সুচিন্তিত কথার ধারা পাওয়া যায়, এবং সেই ধারা দ্রুতগতিশীল।

যেখানে চিন্তার এমন একটা বেগ আছে সেখানে চিন্তার আনন্দ যে কতখানি তাহা সহজেই অনুভব করা যায়। সেই আনন্দ এখানকার শিক্ষিতসমাজের সামাজিকতার একটি প্রধান অঙ্গ। এখানকার সামাজিক মেলামেশার মধ্যে চিত্তের লীলা আপনার বিহারক্ষেত্র রচনা করিতেছে। চিন্তার সঞ্চার কেবল বক্তৃতায় এবং বই লেখায় নহে, তাহা মানুষের সঙ্গে মানুষের দেখা-সাক্ষাতে। অনেক সময় ইঁহাদের আলাপ শুনিতে শুনিতে আমার মনে হইয়াছে, এ-সব কথা লিখিয়া রাখিবার জিনিস, ছড়াইয়া ফেলিবার নহে। কিন্তু, মানুষের মন কৃপণতা করিয়া কোনো বড়ো ফল পাইতে পারে না। যেখানে ছড়াইয়া ফেলিবার যোগ্যতা নাই সেখানে ভালো করিয়া কাজে লাগাইবার যোগ্যতাও নাই। প্রত্যেক বীজের হিসাব রাখিয়া টিপিয়া টিপিয়া পুঁতিতে গেলে বড়ো রকমের চাষ হয় না। দরাজ হাতে ছড়াইয়া ছড়াইয়া চলিতে হয়, তাহাতে অনেকটা নিষ্ফল হইয়াও মোটের উপর লাভ দাঁড়ায়। এইজন্য চিন্তার চর্চায় সেই আনন্দ থাকা চাই যাহাতে সে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি হইয়া জন্মিতে পারে। আমাদের দেশে চিত্তের সেই আনন্দলীলার অভাবটাই সকল দৈন্যের চেয়ে বেশি বলিয়া ঠেকে।

কেম্‌ব্রিজের কলেজ-ভবনে একজন অধ্যাপকের বাড়িতে নিমন্ত্রিত হইয়া আমি দিন দুয়েক বাস করিয়াছিলাম। ইঁহার নাম লোয়েস ডিকিন্সন। ইনিই 'জন্ চীনাম্যানের পত্র' বইখানির লেখক। সে বইখানি যখন প্রথম বাহির হয় তখন আমাদের দেশে প্রাচ্যদেশাভিমানের একটা প্রবল হাওয়া দিয়াছিল। সমস্ত য়ুরোপের চিত্ত যেমন একই সভ্যতাসূত্রের চারি দিকে দানা বাঁধিয়াছে তেমনি করিয়া একদিন সমস্ত এসিয়া এক সভ্যতার বৃন্তের উপর একটি শতদলপদ্ম হইয়া বিশ্ববিধাতার চরণতলে নৈবেদ্যরূপে জাগিয়া উঠিবে, এই কল্পনা ও কামনা আমাদিগকে মাতাইয়া তুলিতেছিল। সেই সময়ে এই 'চীনাম্যানের পত্র' বইখানি অবলম্বন করিয়া আমি এক মস্ত প্রবন্ধ লিখিয়া সভায় পাঠ করিয়াছিলাম।[১] তখন জানিতাম, সে বইখানি সত্যই চীনাম্যানের লেখা। যিনি লেখক তাঁহাকে দেখিলাম; তিনি চীনাম্যান নহেন তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু, তিনি ভাবুক, অতএব তিনি সকল দেশের মানুষ। যে দুইদিন ইঁহার বাসায় ছিলাম ইঁহার সঙ্গে প্রায় নিয়ত আমার কথাবার্তা হইয়াছে। স্রোতের সঙ্গে স্রোত যেমন অনায়াসে মেশে তেমনি অশ্রান্ত আনন্দে তাঁহার চিত্তবেগের টানে আমার চিত্ত ধাবিত হইয়া চলিতেছিল। ইহা বিশেষ কোনো উপার্জন বা লাভের ব্যাপার নহে; ইহা

১ চীনেম্যানের চিঠি: বঙ্গদর্শন, ১৩০৯ আষাঢ়, পৃ. ১৫১-৬২। প্রবন্ধটি "মজুমদার লাইব্রেরির সংসৃষ্ট 'আলোচনা সমিতি'র বিশেষ অধিবেশনে" রবীন্দ্রনাথ পাঠ করিয়াছিলেন।

কোনো বিশেষ বিষয়ের বই পড়া বা কলেজের বক্তৃতা শোনার কাজ করে না; ইহা মনের চলার আনন্দ। যেমন বসন্তে সমস্তই কেবল ফল ও ফুল নহে, তাহার সঙ্গে দক্ষিণের হাওয়া আছে, সেই হাওয়ার উত্তাপে ও আন্দোলনে ফুলের আনন্দবিকাশ সম্পূর্ণ হইতে থাকে, তেমনি এখানকার মনোবিকাশের চারি দিকে যে একটা আলাপের বসন্তহাওয়া বহিতেছে, যাহাতে গন্ধ ব্যাপ্ত হইতেছে ও বীজ ছড়াইয়া পড়িতেছে, যাহাতে প্রাণের ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের উৎসব দিগ্‌দিগন্তরকে মাতাইয়া তুলিতেছে, এই সহৃদয় চিন্তাশীল অধ্যাপকের গ্রন্থমণ্ডিত বাসাটুকুর মধ্যে আমি তাহারই একটা প্রবল স্পর্শ পাইলাম। ইহার সঙ্গে এক সময়ে যখন এখানকার একজন বিখ্যাত গণিত-অধ্যাপক রাসেল সাহেব[১] আসিয়া মিলিত হইলেন তখন তাঁহাদের আলাপের আন্দোলন আমার মনকে পদে পদে অভিহত করিয়া আনন্দিত করিয়া তুলিল। গণিতের তেজে কাহারও মন দগ্ধ হইয়া শুকাইয়া যায়, কাহারও মন আলোকিত হইয়া উঠে। রাসেল সাহেবের মন যেন প্রখর আলোকে দীপ্যমান। সেই চিন্তার আলোকের সঙ্গে সঙ্গে অপর্যাপ্ত হাস্যরশ্মি মিলিত হইয়া আছে, সেইটে আমার কাছে সবচেয়ে সরস লাগিল। রাত্রে আহারের পর আমরা কলেজের বাগানে গিয়া বসিতাম সেখানে একদিন রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত প্রাচীন তরুসভার গভীর নীরবতার মধ্যে এই দুই অধ্যাপক বন্ধুর আলাপ আমি শুনিতেছিলাম। আলাপের বিষয় বহুদূরব্যাপী। তাহার মধ্যে সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, সকলরকম জিনিসই ছিল। আমার কাছে সেই রাত্রির স্মৃতিটি বড়ো রমণীয়। এক দিকে বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির আকাশ-জোড়া নিস্তব্ধতা, আর এক দিকে তাহারই মাঝখান দিয়া মানুষের চঞ্চল মন আপনার তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া সমস্ত বিশ্বকে বাহুবন্ধনে বাঁধিবার জন্য অভিসারে চলিয়াছে। যেন পর্বতমালা স্থির নিশ্চল গাম্ভীর্যের সহিত আকাশ ভেদ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর তাহারই পায়ের কাছটা ঘিরিয়া ঘিরিয়া নির্ঝরিণী ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহাকে কেহই থামাইয়া রাখিতে পারিতেছে না; তাহার কলোচ্ছ্বাস কেবলই প্রশ্ন করিতেছে, এবং গভীর গিরিকন্দরগুলা তাহারই ধ্বনিপ্রতিধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। প্রকৃতি এবং চিত্ত এই দুইয়ের যোগ আমি সেই প্রাচীন বিদ্যালয়ের পুরাতন বাগানে বসিয়া অনুভব করিতেছিলাম। বৃহৎ বিশ্বের নীরবতা মানুষের মধ্যেই বাণী-আকারে আপনাকে অবিশ্রাম প্রকাশ করিতেছে; এই বাণীস্রোতেই বিশ্বের আত্মোপলব্ধি, তাহার নিরন্তর আনন্দ, ইহাই আমি সেদিন নিবিড়রূপে উপলব্ধি করিলাম। আমার মনে হইতে লাগিল, জগতে অন্ধকারের মহাসত্তা অতিবিপুল। অনন্ত আকাশে সেই

১ বার্ট্রাণ্ড রাসেল (Bertrand Russel)

মহান্ধকার আপনাকে আলোকের লীলায় ব্যক্ত করিতেছে; সেই আলোকের আবর্ত চঞ্চল, তাহা সর্বদা কম্পমান; তাহা কোথাও বা শিখায়, কোথাও বা স্ফুলিঙ্গে, কোথাও বা ক্ষণকালের জন্য, কোথাও বা দীর্ঘকালের জন্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে; কিন্তু এই চঞ্চল আলোকমালাই অবিচলিত মহৎ অন্ধকারের বাণী। মানুষের চিত্তের চঞ্চল ধারাটিও তেমনি বিশাল বিশ্বের এক প্রান্ত দিয়া নানা পথে আঁকিয়া-বাঁকিয়া নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া কেবলই বিশ্বকে প্রকাশ করিতে করিতে চলিয়াছে। যেখানে সেই প্রকাশ পরিপূর্ণ ও প্রশস্ত সেইখানেই বিশ্বের চরিতার্থতা আনন্দে ও ঐশ্বর্যের সমারোহে উৎসবময় হইয়া উঠিতেছে। নিস্তব্ধ রাত্রে দুই বন্ধুর মৃদু কণ্ঠের কথাবার্তায় আমি মানুষের মনের মধ্যে সমস্ত বিশ্বের সেই আনন্দ, সেই ঐশ্বর্য অনুভব করিতেছিলাম।

ইংলণ্ডের পল্লীগ্রাম ও পাদ্রি

সকল সময়েই মানুষ যে নিজের যোগ্যতা বিচার করিয়া বৃত্তি অবলম্বন করিবার সুযোগ পায় তাহা নহে— সেইজন্য পৃথিবীতে কর্মরথের চাকা এমন কঠোর স্বরে আর্তনাদ করিতে করিতে চলে। যে মানুষের মুদির দোকান খোলা উচিত ছিল সে ইস্কুল-মাস্টারি করে, পুলিসের দারোগা হওয়ার জন্য যে লোক সৃষ্ট হইয়াছে তাহাকে পাদ্রির কাজ চালাইতে হয়। অন্য ব্যবসায়ে এইরূপ উল্টাপাল্টাতে খুব বেশি ক্ষতি করে না, কিন্তু ধর্মব্যবসায়ে ইহাতে বড়োই অঘটন ঘটাইয়া থাকে। কারণ, ধর্মের ক্ষেত্রে মানুষ যথাসম্ভব সত্য হইতে না পারিলে তাহাতে কেবল যে ব্যর্থতা আনে তাহা নহে, তাহাতে অমঙ্গলের সৃষ্টি করে।

খৃস্টানধর্মের আদর্শের সঙ্গে এ দেশের মানবপ্রকৃতির এক জায়গায় খুব একটা অসামঞ্জস্য আছে, খৃস্টানশাস্ত্রোপদিষ্ট একান্ত নম্রতা ও দাক্ষিণ্য এ দেশের স্বভাব-সংগত নহে। প্রকৃতির সঙ্গে এবং মানুষের সঙ্গে লড়াই করিয়া নিজেকে জয়ী করিবার উত্তেজনা ইহাদের রক্তে প্রাচীনকাল হইতে বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হইয়া আসিয়াছে; সেইজন্য সৈন্যদলে যাহাদের ভর্তি হওয়া উচিত ছিল তাহারা যখন পাদ্রির কাজে নিযুক্ত হয় তখন ধর্মের রঙ শুভ্রতা ত্যাগ করিয়া লাল টক্‌টকে হইয়া উঠে। সেইজন্য য়ুরোপে আমরা সকল সময়ে পাদ্রিদিগকে শান্তির পক্ষে, সার্বজাতিক ন্যায়পরতার পক্ষে দেখিতে পাই না। যুদ্ধবিগ্রহের সময় ইহারা বিশেষভাবে ঈশ্বরকে

নিজেদের দলপতি করিয়া দাঁড় করায় এবং ঈশ্বরোপাসনাকে রক্তপাতের ভূমিকারূপে ব্যবহার করে।

অনেক সময়েই দেখা যায়, ইহারা যাহাদিগকে হীদেন বলে তাহাদের প্রতি সত্যবিচার করিতে ইহারা অক্ষম। যেন তাহারা খৃস্টানের ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী আর-কোনো দেবতার সৃষ্টি, সুতরাং তাহাদিগকে নিন্দিত করিতে পারিলে যেন নিজের ঈশ্বরের গৌরব বৃদ্ধি করা হয়, এই রকমের একটা ভাব তাহাদের মনে আছে। এই বিরুদ্ধতা, এই উগ্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা পাদ্রি অন্য ধর্মের লোককে সর্বদা পীড়া দিয়াছে। তাহারা অস্ত্রধারী সৈন্যদলের মতো অন্যকে আঘাত করিয়া জয় করিতে চাহিয়াছে।

তাই ভারতবর্ষে পাদ্রিদের সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা তাহা এই বিরুদ্ধতার ধারণা। তাহারা যে আমাদের সঙ্গে অত্যন্ত পৃথক, এইটেই আমরা অনুভব করিয়াছি। তাহারা আমাদিগকে খৃস্টান করিতে প্রস্তুত, কিন্তু নিজেদের সঙ্গে আমাদিগকে মিলাইয়া লইতে প্রস্তুত নহে। তাহারা আমাদিগকে জয় করিবে, কিন্তু এক করিবে না। এক জাতির সঙ্গে আর-এক জাতিকে মিলাইবার ভার ইহাদেরই লওয়া উচিত ছিল। যাহাতে পরস্পর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করিয়া সুবিচার করিতে পারে, সেই সেতু বাঁধিয়া দেওয়া তো ইহাদেরই কাজ। কিন্তু, তাহার বিপরীত ঘটিয়াছে। খৃস্টান পাদ্রিরা অখৃস্টান জাতির ধর্ম সমাজ ও আচার-ব্যবহারকে যতদূর সম্ভব কালিমালিপ্ত করিয়া দেশের লোকের কাছে চিত্রিত করিয়াছে। এমন কোনো জাতি নাই যাহার হীনতা বা শ্রেষ্ঠতাকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখানো যায় না। অথচ ইহাই নিশ্চিত সত্য যে, সকল জাতিকেই তাহার শ্রেষ্ঠতার দ্বারা বিচার করিলেই তাহাকে সত্যরূপে জানা যায়। হৃদয়ে প্রেমের অভাব এবং আত্মগরিমাই এই বিচারের বাধা। যাঁহারা ভগবানের প্রেমে জীবনকে উৎসর্গ করেন তাঁহারা এই বাধাকে অতিক্রম করিবেন, ইহাই আশা করা যায়। কিন্তু, অন্য জাতিকে হীন করিয়া দেখাইয়া পাদ্রিরা খৃস্টান অখৃস্টানের মধ্যে যতবড়ো প্রবল ভেদ ঘটাইয়াছে এমন বোধ হয় আর-কেহই করে নাই। অন্যকে দেখিবার বেলায় তাহারা ধর্মব্যবসায়ের সাম্প্রদায়িক কালো চশমা পরিয়াছে। বিজেতা ও বিজিত জাতির মাঝখানে একটা প্রচণ্ড অভিমান স্বভাবতই আছে, তাহা শক্তির অভিমান— সুতরাং পরস্পরের মধ্যে মানুষোচিত মিলনের সেই একটা মস্ত অন্তরায়— পাদ্রিরা সেই অভিমানকে ধর্ম ও সমাজনীতির দিক হইতেও বড়ো করিয়া তুলিয়াছে। কাজেই খৃস্টানধর্মও নানা প্রকারে আমাদের মিলনের একটা বাধা হইয়া উঠিয়াছে, তাহা আমাদের পরস্পরের শ্রেষ্ঠ পরিচয় আবৃত করিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু, এমন সাধারণভাবে কোনো সম্প্রদায় সম্বন্ধে কোনো কথা বলা চলে না, তাহার

প্রমাণ পাইয়াছি। এখানে আসিয়া একজন খৃস্টান পাদ্রির সহিত আমার আলাপ হইয়াছে যিনি পাদ্রির চেয়ে খৃস্টান বেশি— ধর্ম যাঁহার মধ্যে ব্যবসায়িক মূর্তি ধরিয়া উগ্ররূপে দেখা দেয় নাই, সমস্ত জীবনের সহিত সুসম্মিলিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। এমন মানুষকে কেহ মনে করিতে পারে না যে 'ইনি আমাদের পক্ষের লোক নহেন, ইনি অন্য দলের'। ইহাই অত্যন্ত অনুভব করি, ইনি মানুষ— ইনি সত্যকে মঙ্গলকে সকল মানুষের মধ্যে দেখিতে আনন্দ বোধ করেন— তাহা খৃস্টানেরই বিশেষ সম্পত্তি মনে করিয়া ঈর্ষা করেন না। আরও আশ্চর্যের বিষয়, ইঁহার কর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে। সেখানে খৃস্টানের পক্ষে যথার্থ খৃস্টান হইবার মস্ত একটা বাধা আছে— কারণ, সেখানে তিনি রাজা। সেখানে রাষ্ট্রনীতি ধর্মনীতির সপত্নী। অনেক সময়ে তিনিই সুয়োরানী। এইজন্য ভারতবর্ষের পাদ্রি ভারতবাসীর সমগ্র জীবনের সঙ্গে সমবেদনার যোগ রাখিতে পারেন না। একটা মস্ত জায়গায় আমাদের সঙ্গে তাঁহাদের জাতীয় স্বার্থের সংঘাত আছে এবং এক জায়গায় তাঁহারা তাঁহাদের গুরুর উপদেশ শিরোধার্য করিয়া শির নত করিতে পারেন না। তিনি নম্রতা দ্বারা পৃথিবী জয় করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু সেটা স্বর্গরাজ্যের নীতি। ইঁহারা মর্তরাজ্যের অধীশ্বর।

আমি যাঁহার কথা বলিতেছি ইনি রেভারেণ্ড্ এণ্ড্রুস। ভারতবর্ষের লোকের কাছে ইঁহার পরিচয় আছে। তিনি আপনার মধ্যে যে ইংরেজ রাজা আছে তাহাকে একেবারে হার মানাইয়াছেন এবং আমাদের আপন হইবার পবিত্র অধিকার লাভ করিয়াছেন। খৃস্টানধর্ম যেখানে সমগ্র জীবনের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে সেখানে যে কী মাধুর্য এবং উদারতা তাহা ইঁহার মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়াকে আমি বিশেষ সৌভাগ্য বলিয়া গণ্য করি।

ইনিই একদিন আমাকে বলিলেন, 'দেশে ফিরিবার পূর্বে এখানকার গৃহস্থবাড়ি তোমাকে দেখিয়া যাইতে হইবে। শহরে তাহার অনেক রূপান্তর ঘটিয়াছে— পল্লীগ্রামে না গেলে তাহার ঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না।' ইঁহার একজন বন্ধু স্টাফোর্ড্শিয়রে এক পল্লীতে পাদ্রির কাজ করিয়া থাকেন; তাঁহারই বাড়িতে এণ্ড্রুস সাহেব কিছুদিন আমাদের বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

অগস্ট্ মাস এ দেশে গ্রীষ্ম-ঋতুর অধিকারের মধ্যে গণ্য। সে সময়ে শহরের লোক পাড়াগাঁয়ে হাওয়া খাইয়া আসিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠে। আমাদের দেশে এমন অবারিতভাবে আমরা প্রকৃতির সঙ্গ পাই, সেখানে আকাশ এবং আলোক এমন প্রচুররূপে আমাদের পক্ষে সুলভ যে, তাহার সঙ্গে যোগসাধনের জন্য বিশেষ ভাবে আমাদিগের কোনো আয়োজন করিতে হয় না। কিন্তু এখানে প্রকৃতিকে

তাহার ঘোমটা খুলিয়া দেখিবার জন্ত লোকের মনের ঔৎসুক্য কিছুতেই ঘুচিতে চায় না। ছুটির দিনে ইহারা যেখানে একটু খোলা মাঠ আছে সেইখানেই দলে দলে ছুটিয়া যায়— বড়ো ছুটি পাইলেই শহর হইতে বাহির হইয়া পড়ে। এমনি করিয়া প্রকৃতি ইহাদিগকে চলাচলের মুখে রাখিয়াছে, ইহাদিগকে এক জায়গায় স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে দেয় না। ছুটির ট্রেনগুলি একেবারে লোকে পরিপূর্ণ। বসিবার জায়গা পাওয়া যায় না। সেই শহরের উড্ডু মানুষের ঝাঁকের সঙ্গে মিশিয়া আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম।

গম্যস্থানের স্টেশনে আমাদের নিমন্ত্রণকর্তা তাঁহার খোলা গাড়িটি লইয়া আমাদের জন্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন। গাড়িতে যখন চড়িলাম তখন আকাশে মেঘ। ছায়াচ্ছন্ন প্রভাতের আবরণে পল্লীপ্রকৃতি ম্লানমুখে দেখা দিল। অল্প কিছুদূর যাইতেই বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

বাড়িতে গিয়া যখন পৌঁছিলাম গৃহস্বামিনী তাঁহার আগুন-জ্বালা বসিবার ঘরে লইয়া গেলেন। বাড়িটি পুরাতন পাদ্রিনিবাস নহে। ইহা নূতন-তৈরি। গৃহসংলগ্ন ভূমিখণ্ডে বৃদ্ধ তরুশ্রেণী বহুদিনের ধারাবাহিক মানবজীবনের বিলুপ্ত স্মৃতিকে পল্লব-পুঞ্জের অস্ফুট ভাষায় মর্মরিত করিতেছে না। বাগানটি নূতন, বোধ হয় ইহারাই প্রস্তুত করিয়াছেন। ঘন সবুজ তৃণক্ষেত্রের ধারে ধারে বিচিত্র রঙের ফুল ফুটিয়া কাঙাল চক্ষুর কাছে অজস্র সৌন্দর্যের অবারিত অন্নসত্র খুলিয়া দিয়াছে। গ্রীষ্ম-ঋতুতে ইংলণ্ডে ফুলপল্লবের যেমন সরসতা ও প্রাচুর্য এমন তো আমি কোথাও দেখি নাই। এখানে মাটির উপরে ঘাসের আস্তরণ যে কী ঘন ও তাহা কী নিবিড় সবুজ তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না।

বাড়িটির ঘরগুলি পরিপাটি পরিচ্ছন্ন ; লাইব্রেরি সুপাঠ্য গ্রন্থে পরিপূর্ণ; ভিতরে বাহিরে কোথাও লেশমাত্র অযত্নের চিহ্ন নাই। এখানকার ভদ্র গৃহস্থ-ঘরে এই জিনিসটাই বিশেষ করিয়া আমার মনে লাগিয়াছে। ইহাদের ব্যবহারের আরামের ও গৃহসজ্জার উপকরণ আমাদের চেয়ে অনেক বেশি, অথচ ঘরের প্রত্যেক সামান্ত জিনিসটির প্রতি গৃহস্থের চিত্ত সতর্কভাবে জাগ্রত আছে। নিজের চারি দিকের প্রতি শৈথিল্য যে নিজেরই অবমাননা তাহা ইহারা খুব বুঝে। এই জাগ্রত আত্মাদরের ভাবটি ছোটোবড়ো সকল বিষয়েই কাজ করিতেছে। ইহারা নিজের মনুষ্যগৌরবকে খাটো করিয়া দেখে না বলিয়াই নিজের ঘরবাড়িকে যেমন সর্বপ্রযত্নে তাহার উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে, তেমনি নিজের প্রতিবেশকে সমাজকে দেশকে সকল বিষয়ে সকল দিক হইতে সমার্জন করিয়া তুলিবার জন্ত ইহাদের প্রয়াস অহরহ উদ্যত হইয়া রহিয়াছে। ক্রটি

জিনিসটাকে ইহারা কোনো কারণেই কোনো জায়গাতেই বাদ করিতে চায় না।

বিকালের দিকে আমাকে লইয়া গৃহস্বামী উইস সাহেব বেড়াইতে বাহির হইলেন। তখন বৃষ্টি থামিয়াছে, কিন্তু আকাশে মেঘের অবকাশ নাই। এখানকার পুরুষেরা যেমন কালো টুপি মাথায় দিয়া মলিন বর্ণের কোর্তা পরিয়া বেড়ায়, এখানকার দেবতাও সেইরকম অত্যন্ত গম্ভীর ভদ্রবেশে আচ্ছন্ন হইয়া দেখা দিলেন। কিন্তু, এই ঘনগাম্ভীর্যের ছায়াতলেও এখানকার পল্লীশ্রীর সৌন্দর্য ঢাকা পড়িল না। তরুশ্রেণীর বেড়ায় দ্বারা বিভক্ত ঢেউ-খেলানো প্রান্তরের প্রগাঢ় শ্যামলিমা দুই চক্ষুকে স্নিগ্ধতায় অভিষিক্ত করিয়া দিল। জায়গাটা পাহাড়ে বটে কিন্তু পাহাড়ের উগ্র বন্ধুরতা কোথাও নাই— আমাদের দেশের রাগিণীতে যেমন সুরের গায়ে সুর মিড়ের টানে চলিয়া পড়ে, এখানকার মাটির উচ্ছ্বাসগুলি তেমনি ঢালু হইয়া পরস্পর গায়ে গায়ে মিলিয়া রহিয়াছে; ধরিত্রীর সুরবাহারে যেন কোন্ দেবতা নিঃশব্দ রাগিণীতে মেঘমল্লারের গৎ বাজাইতেছেন। আমাদের দেশের যে-সকল প্রদেশ পার্বত্য, সেখানকার যেমন একটা উদ্ধত মহিমা আছে এখানে তাহা দেখা যায় না। চারি দিকে চাহিয়া দেখিলে মনে হয়, বন্য প্রকৃতি এখানে সম্পূর্ণ পোষ মানিয়াছে। যেন মহাদেবের বাহন বৃষ—শরীরটি নধর চিক্কণ, নন্দীর তর্জনী-সংকেত মানিয়া তাহার পায়ের কাছে শিঙ নামাইয়া শান্ত হইয়া পড়িয়া আছে, প্রভুর তপোবিঘ্নের ভয়ে হাম্বাধ্বনিও করিতেছে না।

পথে চলিতে চলিতে উইস সাহেব একজন পথিকের সঙ্গে কিছু কাজের কথা আলাপ করিয়া লইলেন। ব্যাপারটা এই— স্থানীয় চাষী গৃহস্থদিগকে নিজেদের ভিটার চারি দিকে খানিকটা করিয়া বাগান করিতে উৎসাহ দিবার জন্য, ইহারা একটি কমিটি করিয়া উৎকর্ষ অনুসারে পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অল্পদিন হইল পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে এই পথিকটি পুরস্কারের অধিকারী হইয়াছে। উইস সাহেব আমাকে কয়েকটি চাষী গৃহস্থের বাড়ি দেখাইতে লইয়া গেলেন। তাহারা প্রত্যেকেই নিজের কুটীরের চারি দিকে বহু যত্নে খানিকটা করিয়া ফুলের ও তরকারির বাগান করিয়াছে। ইহারা সমস্ত দিন মাঠের কাজে খাটিয়া সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরিয়া এই বাগানের কাজ করে। এমনি করিয়া গাছপালার প্রতি ইহাদের এমন একটা আনন্দের টান হয় যে, এই অতিরিক্ত পরিশ্রম ইহাদের গায়ে লাগে না। ইহার আর-একটি সুফল এই যে, এই উৎসাহ মদের নেশাকে খেদাইয়া রাখে। বাহিরকে রমণীয় করিয়া তুলিবার এই চেষ্টায় নিজের অন্তরকেও ক্রমশ সৌন্দর্যের সুরে বাঁধিয়া তোলা হয়। এখানকার পল্লীবাসীর সঙ্গে উইস সাহেবের হিতানুষ্ঠানের সম্বন্ধ আরও নানা দিক হইতে দেখিয়াছি। এইপ্রকার মঙ্গলব্রতে-নিরত-উৎসর্গ-করা জীবন যে কী সুন্দর তাহা ইহাকে দেখিয়া অনুভব করিয়াছি।

ভগবানের সেবার অমৃতরসে ইহার জীবন পরিপক্ব মধুর ফলের মতো নম্র হইয়া পড়িয়াছে। ইহার ঘরের মধ্যে ইনি একটি পুণ্যের প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিয়াছেন; অধ্যয়ন ও উপাসনার দ্বারা ইহার গার্হস্থ্য প্রতিদিন ধৌত হইতেছে; ইহার আতিথ্য যে কিরূপ সহজ ও সুন্দর তাহা আমি ভুলিতে পারিব না।

এই-যে এক-একটি করিয়া পাদ্রি কয়েকটি গ্রামের কেন্দ্র হইয়া বসিয়া আছেন, ইহার সার্থকতা এবার আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। এই সর্বদেশব্যাপী বৃহৎবদ্ধ চেষ্টার দ্বারা নিতান্ত গণ্ডগ্রামগুলির মধ্যে একটা উন্নতির প্রয়াস জাগ্রত হইয়া আছে। এইরূপে ধর্ম এ দেশে শুভকর্ম-আকারে চারি দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। একটি বৃহৎ ব্যবস্থার সূত্রে এ দেশের সমস্ত লোকালয় মালার মতো গাঁথা হইয়াছে। আমাদের মতো যাহারা এইপ্রকার সর্বজনীন ব্যবস্থার অভাবে পীড়িত হইতেছে তাহারাই জানে ইহা কতবড়ো একটি কল্যাণ।

মানুষ এমন কোনো নিখুঁত ব্যবস্থা চিরকালের মতো পাকা করিয়া গড়িয়া রাখিতে পারে না যাহার মধ্যে কোনো ভণ্ডামি, কোনো অনর্থ, কোনো কালে প্রবেশ করিবার পথ না পায়। এ দেশের ধর্মমত ও ধর্মতন্ত্রের সঙ্গে এখনকার উন্নতিশীল কালের কিছু কিছু অসামঞ্জস্য ঘটিতেছে, এ কথা সকলেই জানে। আমি এখানকার অনেক ভালো লোকের মুখে শুনিয়াছি, ভজনালয়ে যাওয়া তাঁহাদের পক্ষে অসাধ্য হইয়াছে। যে-সকল কথা বিশ্বাস করা অসম্ভব তাহাকে অন্ধভাবে স্বীকার করিবার পাপে তাঁহারা লিপ্ত হইতে চান না। এইরূপে দেশপ্রচলিত ধর্মমত নানা স্থানে জীর্ণ হইয়া পড়াতে ধর্মের আশ্রয়কে তাঁহারা সর্বাংশেই পরিত্যাগ করিয়াছেন। এইরূপ সময়েই নানা কপটাচার বৃদ্ধ ধর্ম-মতকে আশ্রয় করিয়া তাহাকে আরও রোগাতুর করিয়া তোলে। আজকালকার দিনে নিঃসন্দেহই চার্চের মধ্যে এমন অনেক পাদ্রি আসন গ্রহণ করিয়াছেন যাঁহারা যাহা বিশ্বাস করেন না তাহা প্রচার করেন, এবং যাহা প্রচার করেন তাহাকে কায়ক্লেশে বিশ্বাস করিবার জন্য নিজেকে ভোলাইবার আয়োজন করিতে থাকেন। এই মিথ্যা যে সমাজকে নানা প্রকারে আঘাত করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। চিরদিনই গোঁড়ামি ধর্মের সিংহদ্বারকে এমন সংকীর্ণ করিয়া ধরে যাহাতে করিয়া ক্ষুদ্রতাই প্রবেশ করিবার পথ পায়, মহত্ত্ব বাহিরে পড়িয়া থাকে। এইরূপে য়ুরোপে যাঁহারা জ্ঞানে প্রাণে হৃদয়ে মহৎ তাঁহারা অনেকেই য়ুরোপের ধর্মতন্ত্রের বাহিরে পড়িয়া গিয়াছেন। এ অবস্থা কখনোই কল্যাণকর হইতে পারে না।

কিন্তু, য়ুরোপকে তাহার প্রাণশক্তি রক্ষা করিতেছে। তাহা কোনো একটা জায়গায় আটকা পড়িয়া বসিয়া থাকে না। চলা তাহার ধর্ম— প্রবিত্র বেগে সে

আপনার বাধাকে কেবলই আঘাত করিয়া ক্ষয় করিতেছে। খৃস্টান-ধর্মবৃন্ত যে পরিমাণে সংকুচিত হইয়া এই স্রোতের বেগকে বাধা দিতেছে সেই পরিমাণে ঘা খাইয়া তাহাকে প্রশস্ত হইতে হইবে। সেই প্রক্রিয়া প্রত্যহই চলিতেছে; অবশেষে এখনকার মনীষীরা যাহাকে খৃস্টানধর্ম বলিয়া পরিচয় দিতেছেন তাহা নিজের স্থূল আবরণ সম্পূর্ণ পরিহার করিয়াছে। তাহা ত্রিত্ববাদ মানে না, যিশুকে অবতার বলিয়া স্বীকার করে না, খৃস্টানপুরাণ-বর্ণিত অতিপ্রাকৃত ঘটনায় তাহার আস্থা নাই, তাহা মধ্যস্থবাদীও নহে। য়ুরোপের ধর্মপ্রকৃতির মধ্যে একটা খুব আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে। অতএব ইহা নিশ্চিত, য়ুরোপ কখনোই আপনার সনাতন ধর্মমতকে আপনার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির চেয়ে নীচে ঝুলিয়া পড়িতে দিয়া নিজেকে এত বড়ো একটা বোঝায় চিরকাল ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিবে না।

যাহাই হউক, পাদ্রিরা এই-যে ধর্মমতের জাল দিয়া সমস্ত দেশকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছে, ইহাতে সময়ে সময়ে দেশের উন্নতিকে কিছু কিছু বাধা দেওয়া সত্ত্বেও মোটের উপর ইহাতে যে দেশের ভিতরকার উচ্চ সুরকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণদের এই কাজ ছিল। কিন্তু, ব্রাহ্মণের কর্তব্য বর্ণগত হওয়াতে তাহা স্বভাবতই আপন কর্তব্যের দায়িত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে। ব্রাহ্মণের কর্তব্যের আদর্শ যতই উচ্চ হইবে ততই তাহা বিশেষ যোগ্য ব্যক্তির বিশেষ শিক্ষা ও ক্ষমতার উপর নির্ভর করিবে— যখনি সমাজের কোনো বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে এই দায়িত্বকে বংশগত করিয়া দেওয়া হইয়াছে তখনি আদর্শকে যতদূর সম্ভব খর্ব করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণের দ্বারাই মানুষ ব্রাহ্মণ হইতে পারে, এই নিতান্ত স্বভাববিরুদ্ধ মিথ্যার বোঝা আমাদের সমাজ চোখ বুজিয়া বহন করিয়া আসাতেই তাহার ধর্ম প্রাণহীন ও প্রথাগত অন্ধ সংস্কারে পরিণত হইতেছে। যে ব্রাহ্মণকে সমাজ ভক্তি করিতে বাধ্য হইয়াছে সে ব্রাহ্মণ চরিত্রে ও ব্যবহারে ভক্তিভাজন হইবার জন্য নিজেকে বাধ্য মনে করে না; সে কেবলমাত্র পৈতার লাগামের দ্বারা সমাজকে চালনা করিয়া তাহাকে নানা দিকে কিরূপ হীনতার মধ্যে উত্তীর্ণ করিয়া দিতেছে, তাহা অভ্যাসের অন্ধতা-বশতই আমরা বুঝিতে পারি না। এখানে প্রত্যেক পাদ্রিই যে অকৃত্রিম নিষ্ঠার সহিত খৃস্টানধর্মের আদর্শ নিজের জীবনে গ্রহণ করিয়াছে এ কথা আমি বিশ্বাস করি না; কিন্তু ইহারা বংশগত পাদ্রি নহে, সমাজের কাছে ইহাদের জবাবদিহি আছে, নিজের চরিত্রকে আচরণকে ইহারা কলুষিত করিতে পারে না— সুতরাং আর-কিছুই না হোক, সেই নির্মল চরিত্রের, সেই ধর্মনৈতিক সাধনার সুরটিকে যথাসাধ্য দেশের কাছে ইহারা ধরিয়া রাখিয়াছে। শাস্ত্রে যাহাই বলুক, ব্যবহারতঃ

অধার্মিক ব্রাহ্মণকে দিয়া ধর্মকর্ম করাইতে আমাদের সমাজের কিছুমাত্র লজ্জা সংকোচ নাই। ইহাতে ধর্মের সঙ্গে পুণ্যের আন্তরিক বিচ্ছেদ না ঘটিয়া থাকিতে পারে না— ইহাতে আমাদের মনুষ্যত্বকে আমরা প্রত্যহ অবমানিত করিতেছি। এখানে অধার্মিক পাদ্রিকে সমাজ কখনোই ক্ষমা করিবে না; সে পাদ্রি হয়তো ভক্তিমান না হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে চরিত্রবান হইতেই হইবে—এই উপায়েই সমাজ নিজের মনুষ্যত্বের প্রতি সম্মান রক্ষা করিতেছে এবং নিঃসন্দেহই চরিত্রসম্পদে তাহার পুরস্কার লাভ করিতেছে।

তাই বলিতেছিলাম, এখানকার পাদ্রির দল সমস্ত দেশের জন্ত একটা ধর্মনৈতিক মোটা-ভাত মোটা-কাপড়ের ব্যবস্থা করিয়াছে। কিন্তু, সেইটুকুতেই তো সন্তুষ্ট হওয়ার কথা নহে। সমস্ত দেশের সামনে ক্ষণে ক্ষণে যে বড়ো বড়ো ধর্মসমস্যা উপস্থিত হয় খৃস্টের বাণীর সঙ্গে সুর মিলাইয়া পাদ্রিরা তো তাহার মীমাংসা করেন না। দেশের চিত্তের মধ্যে খৃস্টকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবার যে ভার তাঁহারা লইয়াছেন, এইখানে পদে পদে তাহার ব্যত্যয় দেখিতে পাই। যখন বোয়ার-যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল তখন সমস্ত দেশের পাদ্রিরা তাহার কিরূপ বিচার করিয়াছিলেন। এই-যে পারস্যকে দুই টুকরা করিয়া কুটিয়া ফেলিবার জন্ত য়ুরোপের দুই মোটা মোটা গৃহিণী বঁটি পাতিয়া বসিয়াছেন— পাদ্রিরা চুপ করিয়া আছেন কেন। ভারতবর্ষে কুলিসংগ্রহ ব্যাপারে, কুলি খাটাইবার ব্যবস্থায়, সেখানকার শাসনতন্ত্রে, সেখানে দেশীয়দের প্রতি ইংরেজের ব্যবহারে এমন কি কোনো অবিচার ঘটে না যাহাতে খৃস্টের নাম লইয়া তাঁহারা সকলে মিলিয়া দুর্বল অপমানিতের পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে পারেন। তেমন স্বর্গীয় দৃশ্য কি আমরা দেখিয়াছি। ইংরেজিতে 'পয়সায় বেলায় পাকা টাকায় বেলায় বোকা' বলিয়া একটা চলতি কথা আছে, বড়ো বড়ো খৃস্টানদেশের ধর্মনৈতিক আচরণে আমরা তাহার পরিচয় প্রতিদিন পাইতেছি; তাঁহারা ব্যক্তিগত নৈতিক আদর্শকে আঁট করিয়া রাখিতে চান অথচ সমস্ত জাতি বৃহবদ্ধ হইয়া এমন-সকল প্রকাণ্ড পাপাচরণে নির্লজ্জভাবে প্রবৃত্ত হইতেছেন যাহাতে সুদূরব্যাপী দেশ ও কালকে আশ্রয় করিয়া দুর্বিষহ দুঃখদুর্গতির সৃষ্টি করিতেছে; এমন দুর্দিনে অনেক মহাত্মাকে স্বজাতির এই সর্বজনীন সয়তানির বিরুদ্ধে নির্ভয়ে লড়িতে দেখিয়াছি, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে পাদ্রি কয়জন। এমন-কি, গণনা করিলে দেখা যাইবে, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রচলিত খৃস্টানধর্মে আস্থাবান নহেন। অথচ চার্চের চিরপ্রথা-সম্মত কোনো বাহ্য পূজাবিধিতে সামান্ত একটু নড়চড় ঘটাইলে সমস্ত পাদ্রিসমাজে বিষম হুলুস্থুল পড়িয়া যায়। এইজন্তই কি যিশু তাঁহার রক্ত দিয়াছিলেন। জগতের সম্মুখে ইহা কোন্ সুসমাচার প্রচার করিতেছে। খৃস্টানদেশের

পাদ্রির দল স্বজাতির ধর্ম-তহবিলের সিকিপয়সা আধপয়সা আগ্‌লাইয়া বসিয়া আছেন, কিন্তু বড়ো বড়ো 'কোম্পানির কাগজ' ফুঁকিয়া দিবার বেলায় তাঁহাদের হুঁশ নাই। তাঁহারা তাঁহাদের দেবতাকে কড়ির মূল্যে সম্মান করেন ও মোহরের মূল্যে অপমানিত করিয়া থাকেন, ইহাই প্রতিদিন দেখিতেছি। পাদ্রিদের মধ্যে এমন মহদাশয় আছেন যাঁহারা অকৃত্রিম বিশ্ববন্ধু, কিন্তু সে তাঁহাদের ব্যক্তিগত মাহাত্ম্য। কিন্তু, দলের দিকে তাকাইলে এই কথা মনে আসে যে, ধর্মকে দলের হাতে সমর্পণ করিলে তাহাকে খানিকটা পরিমাণে দলিত করা হয়ই। ইহাতেও একপ্রকার জাত তৈরি করা হয়, তাহা বংশগত জাতের চেয়ে অনেক বিষয়ে ভালো হইলেও তাহাতে জাতের বিষ খানিকটা থাকিয়া যায় ও তাহা জমিয়া উঠিতে থাকে। ধর্ম মানুষকে মুক্তি দেয়, এইজন্য ধর্মকে সকলের চেয়ে মুক্ত রাখা চাই ; কিন্তু, ধর্ম যেখানে দলের বেড়ায় আটকা পড়ে সেখানেই ক্রমশ তাহার ছোটো দিকটাই বড়ো দিকের চেয়ে বড়ো হইয়া উঠে, বাহিরের জিনিস অন্তরের জিনিসকে আচ্ছন্ন করে ও যাহা সাময়িক তাহা নিত্যকে পীড়া দিতে থাকে। এইজন্যই সমস্ত দেশ জুড়িয়া পাদ্রির দল বসিয়া থাকা সত্ত্বেও নিদারুণ দস্যুবৃত্তি ও কসাইবৃত্তি করিতে রাষ্ট্রনৈতিক অধিনায়কদের লেশমাত্র সংকোচ বোধ হয় না ; তাঁহাদের সেই পুণ্যজ্যোতি নাই যাহার সম্মুখে এই-সকল বিরাট পাপের কলঙ্ককালিমা সর্বসমক্ষে বীভৎসরূপে উদ্‌ঘাটিত হয়।

সংগীত

আমরা গ্রীষ্ম-ঋতুর অবসানের দিকে এ দেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, এখন এখানে সংগীতের আসর ভাঙিবার মুখে। কোনো বড়ো ওস্তাদের গান বা বাজনার বৈঠক এখন আর নাই। এখানকার নিকুঞ্জে গ্রীষ্মকালে পাখিরা নানা সমুদ্র পার হইয়া আসে, আবার তাহারা সভা ভঙ্গ করিয়া চলিয়া যায়। মানুষের সংগীতও এখানে সকল ঋতুতে বাজে না ; তাহার বিশেষ কাল আছে, সেই সময়ে পৃথিবীর নানা ওস্তাদ নানা দিক হইতে আসিয়া এখানে সংগীতসরস্বতীর পূজা করিয়া থাকে।

আমাদের দেশেও একদিন এইরূপ গীতবাদ্যের পরব ছিল। পূজাপার্বণের সময় বড়ো বড়ো ধনীদের বাড়িতে নানা দেশের গুণীরা আসিয়া জুটিত। সেই-সকল সংগীতসভায় দেশের সাধারণ লোকের প্রবেশ অবারিত ছিল। তখন লক্ষ্মী সরস্বতী একত্র মিলিতেন এবং সংগীতের কাঞ্চনদীক্ষণ সমস্ত দেশের হৃদয়ের উপর দিয়া প্রবাহিত

হইত। সকল দেশেই একদিন বুনিয়াদি ধনীরাই দেশের শিল্প সাহিত্য সংগীতকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিয়াছে। য়ুরোপে এখন গণসাধারণ সেই বুনিয়াদি বংশের স্থান অধিকার করিয়াছে; আমাদের দেশে বারোয়ারি-যাত্রা যেটা ঘটিয়া থাকে সেইটে য়ুরোপের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। বারোয়ারিই এখানে ওস্তাদ আনাইয়া গান শোনে; বারোয়ারির কৃপাতেই নিরন্ন কবির দৈন্য মোচন হয়, এবং চিত্রকর ছবি আঁকিয়া লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ করে। কিন্তু, আমাদের দেশে বর্তমান কালে ধনীদের ধনের কোনো দায়িত্ব নাই; সে ধনের দ্বারা কেবল ল্যাজারাস অস্‌লার হ্যামিল্টন হার্‌মান এবং ম্যাকিন্টশ-বার্‌ন্‌ কোম্পানিরই মুনফা বৃদ্ধি হইয়া থাকে; এ দিকে গণসাধারণেরও না আছে শক্তি, না আছে রুচি। আমাদের দেশে কলাবধূকে লক্ষ্মীও ত্যাগ করিয়াছেন, গণেশের ঘরেও এখনও তাঁহার স্থান হয় নাই।

আমার ভাগ্যক্রমে এবারে আমি লণ্ডনে আসার কয়েক সপ্তাহ পরেই ক্রিস্টল-প্যালাসের গীতশালায় হ্যাণ্ডেল-উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ সংগীতরচয়িতা হ্যাণ্ডেল জর্মান ছিলেন, কিন্তু ইংলণ্ডেই তিনি অধিকাংশ জীবন যাপন করিয়াছিলেন। বাইবেলের কোনো কোনো অংশ ইনি সুরে বসাইয়াছিলেন, সেগুলি এ দেশে বিশেষ আদর পাইয়াছে। এই গীতগুলিই বহুশত যন্ত্রযোগে বহুশত কণ্ঠে মিলিয়া হ্যাণ্ডেল-উৎসবে গাওয়া হইয়া থাকে। চারি হাজার যন্ত্রী ও গায়কে মিলিয়া এবারকার উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল।

এই উৎসবে আমি উপস্থিত ছিলাম। বিরাট সভাগৃহের গ্যালারিতে স্তরে স্তরে গায়ক ও বাদক বসিয়া গিয়াছে। এত বৃহৎ ব্যাপার যে দুর্বিনের সাহায্য ব্যতীত স্পষ্ট করিয়া কাহাকে দেখা যায় না, মনে হয় যেন পুঞ্জ পুঞ্জ মানুষের মেঘ করিয়াছে। স্ত্রী ও পুরুষ গায়কেরা উদারা মুদারা ও তারা সুরের কণ্ঠ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বসিয়াছে। একই রঙের একই রকমের কাপড়; সবসুদ্ধ মনে হয়, প্রকাণ্ড একটা পটের উপর কে যেন লাইনে লাইনে পশমের বুনানি করিয়া গিয়াছে।

চার হাজার কণ্ঠে ও যন্ত্রে সংগীত জাগিয়া উঠিল। ইহার মধ্যে একটি সুর পথ ভুলিল না। চার হাজার সুরের ধারা নৃত্য করিতে করিতে একসঙ্গে বাহির হইল, তাহারা কেহ কাহাকেও আঘাত করিল না। অথচ সমতান নহে, বিচিত্র তানের বিপুল সম্মিলন। এই বহুবিচিত্রকে এমনতরো অনিন্দনীয় সুসম্পূর্ণতায় এক করিয়া তুলিবার মধ্যে যে একটা বৃহৎ শক্তি আছে, আমি তাহাই অনুভব করিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম। এত বড়ো বৃহৎ ক্ষেত্রে অন্তরে বাহিরে এই জাগ্রত শক্তির কোথাও কিছুমাত্র ঔদাস্য নাই, জড়ত্ব নাই। আসন বসন হইতে আরম্ভ করিয়া গীতকলার

পারিপাট্য পর্যন্ত সর্বত্র তাহার অমোঘ বিধান প্রত্যেক অংশটিকে সমগ্রের সঙ্গে মিলাইয়া নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

মাঝে মাঝে ছাপানো প্রোগ্রাম খুলিয়া গানের কথার সঙ্গে সুরকে মিলাইয়া দেখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু, মিল যে দেখিতে পাইয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। এতবড়ো একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার গড়িয়া তুলিলে সেটা যে একটা যন্ত্রের জিনিস হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বাহিরের আয়তন বৃহৎ বিচিত্র ও নির্দোষ হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ভাবের রসটি চাপা পড়িয়াছে। আমার মনে হইল, বৃহৎ বৃহৎ সৈন্যদল যেমন করিয়া চলে এই সংগীতের গতি সেইরূপ ; ইহাতে শক্তি আছে, কিন্তু লীলা নাই।

কিন্তু, তাই বলিয়া সমস্ত য়ুরোপীয় সংগীত পদার্থটাই যে এই শ্রেণীর, তাহা বলিলে সত্য বলা হইবে না। অর্থাৎ, য়ুরোপীয় সংগীতে আকারের নৈপুণ্যই প্রধান, ভাবের রস প্রধান নহে, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। কারণ, ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, সংগীতের রসসুধায় য়ুরোপকে কিরূপ মাতাইয়া তোলে। ফুলের প্রতি মৌমাছির আগ্রহ দেখিলেই বুঝা যাইবে ফুলে মধু আছে, সে মধু আমার গোচর না হইতেও পারে।

য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের দেশের সংগীতের এক জায়গায় মূলতঃ প্রভেদ আছে, সে কথা সত্য। হার্মনি বা স্বরসংগতি য়ুরোপীয় সংগীতের প্রধান বস্তু, আর রাগরাগিণীই আমাদের সংগীতের মুখ্য অবলম্বন। য়ুরোপ বিচিত্রের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছে, আমরা একের দিকে। বিশ্বসংগীতে আমরা দেখিতেছি বিচিত্রের তান সহস্রধারায় উচ্ছ্বসিত হইতেছে, একটি আর-একটির প্রতিধ্বনি নহে, প্রত্যেকেরই নিজের বিশেষত্ব আছে অথচ সমস্তই এক হইয়া আকাশকে পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। হার্মনি, জগতের সেই বহু রূপের বিরাট নৃত্যলীলাকে সুর দিয়া দেখাইতেছে। কিন্তু, নিশ্চয়ই মাঝখানে একটি এক-রাগিণীর গান চলিতেছে ; সেই গানের তানলয়টিকেই ঘিরিয়া ঘিরিয়া নৃত্য আপনার বিচিত্র গতিকে সার্থক করিয়া তুলিতেছে। আমাদের দেশের সংগীত সেই মাঝখানের গানটিকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। সেই গভীর, গোপন, সেই এক— যাহাকে ধ্যানে পাওয়া যায়, যাহা আকাশে স্তব্ধ হইয়া আছে। চিরধাবমান বিচিত্রের সঙ্গে যোগ দিয়া তাল রাখিয়া চলা, ইহাই য়ুরোপীয় প্রকৃতি ; আর চিরনিস্তব্ধ একের দিকে কান পাতিয়া, মন রাখিয়া, আপনাকে শান্ত করা, ইহাই আমাদের স্বভাব।

আমাদের দেশের সংগীতে কি ইহাই আমরা অনুভব করি না। য়ুরোপের সংগীতে দেখিতে পাই, মানুষের সমস্ত ঢেউ-খেলার সঙ্গে তাহার তাল-মানের যোগ আছে,

মানুষের হাসিকান্নার সঙ্গে তাহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ। আমাদের সংগীত মানুষের জীবন-লীলার ভিতর হইতে উঠে না, তাহার বাহির হইতে বহিয়া আসে। য়ুরোপের সংগীতে মানুষ আপনার ঘরের আলো, উৎসবের আলো, নানা রঙের ঝাড়ে লণ্ঠনে বিচিত্র করিয়া জ্বালাইয়াছে; আমাদের সংগীতে দিগন্ত হইতে চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে। সেইজন্য বারবার ইহা অনুভব করিয়াছি, আমাদের সংগীত আমাদের সুখদুঃখকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। আমাদের বিবাহের রাত্রে রশনচৌকিতে সাহানা বাজে। কিন্তু, সেই সাহানার তানের মধ্যে প্রমোদের ঢেউ খেলে কোথায়। তাহার মধ্যে যৌবনের চাঞ্চল্য কিছুমাত্র নাই, তাহা গম্ভীর, তাহার মিড়ের ভাঁজে ভাঁজে করুণা। আমাদের দেশে আধুনিক বিবাহে সানাইয়ের সঙ্গে বিলাতি ব্যাণ্ড্ বাজানো বড়োমানুষি বর্বরতার একটা অঙ্গ। উভয়ের প্রভেদ একেবারে সুস্পষ্ট। বিলাতি ব্যাণ্ডের সুরে মানুষের আমোদ-আহ্লাদের সমারোহ ধরণী কাঁপাইয়া তুলিতেছে; যেমন লোকজনের ভিড়, যেমন হাস্যালাপ, যেমন সাজসজ্জা, যেমন ফুলপাতা-আলোকের ঘটা, ব্যাণ্ডের সুরের উচ্ছ্বাসও ঠিক তেমনি। কিন্তু, বিবাহের প্রমোদসভাকে চারি দিকে বেষ্টন করিয়া যে অন্ধকার রাত্রি নিস্তব্ধ হইয়া আছে, যেখানে লোকলোকান্তরের অনন্ত উৎসব নীরব নক্ষত্রসভায় প্রশান্ত আলোকে দীপ্যমান, সাহানার সুর সেইখানকার বাণী বহন করিয়া প্রবেশ করে। আমাদের সংগীত মানুষের প্রমোদশালার সিংহদ্বারটা ধীরে ধীরে খুলিয়া দেয় এবং জনতার মাঝখানে অসীমকে আহ্বান করিয়া আনে। আমাদের সংগীত একের গান, একলার গান— কিন্তু তাহা কোণের এক নহে, তাহা বিশ্বব্যাপী এক।

হার্মনি অতিমাত্র প্রবল হইলে গীতটিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, এবং গীত যেখানে অত্যন্ত স্বতন্ত্র হইয়া উঠিতে চায় সেখানে হার্মনিকে কাছে আসিতে দেয় না। উভয়ের মধ্যে এই বিচ্ছেদটা কিছুদিন পর্যন্ত ভালো। প্রত্যেকের পূর্ণপরিণত রূপটিকে পাইবার জন্য কিছুকাল প্রত্যেকটিকে স্বাতন্ত্র্যের অবকাশ দেওয়াই উচিত। কিন্তু, তাই বলিয়া চিরকালই তাহাদের আইবুড় থাকাটাকে শ্রেয় বলিতে পারি না। বর ও কন্যা যতদিন যৌবনের পূর্ণতা না পায় ততদিন তাহাদের পৃথক হইয়া বাড়িতে দেওয়াই ভালো, কিন্তু তার পরেও যদি তাহারা মিলিতে না পারে তবে তাহারা অসম্পূর্ণ হইয়া থাকে। গীত ও হার্মনির যে মিলিবার দিন আসিয়াছে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। সেই মিলনের আয়োজনও শুরু হইয়াছে।

গ্রামে হপ্তায় বিশেষ একদিন হাট বসে, বৎসরে বিশেষ একদিন মেলা হয়। সেইদিন পরস্পরের পণ্যবিনিময় করিয়া মানুষের যাহার যাহা অভাব আছে তাহা

মিটাইয়া লয়। মানুষের ইতিহাসেও তেমনি এক-একটা যুগে হাটের দিন আসে; সেদিন যে যার আপন আপন সামগ্রী ঝুড়িতে করিয়া আনিয়া পরের সামগ্রী সংগ্রহ করিতে আসে। সেদিন মানুষ বুঝিতে পারে, একমাত্র নিজের উৎপন্ন জিনিসে মানুষের দৈন্য দূর হয় না; বুঝিতে পারে, নিজের ঐশ্বর্যের একমাত্র সার্থকতা এই যে, তাহাতে পরের জিনিস পাইবার অধিকার জন্মে। এইরূপ যুগকে য়ুরোপের ইতিহাসে রেনেসাঁসের যুগ বলিয়া থাকে। পৃথিবীতে বর্তমান যুগে যে রেনেসাঁসের হাট বসিয়া গেছে এত বড়ো হাট ইহার আগে আর-কোনোদিন বসে নাই। তাহার প্রধান কারণ, আজ পৃথিবীতে চারি দিকের রাস্তা যেমন খোলসা হইয়াছে এমন আর-কোনোদিন ছিল না।

কিছুদিন পূর্বে একজন মনীষী আমাকে বলিয়াছিলেন, য়ুরোপে ভারতবর্ষীয় রেনেসাঁসের একটা কাল আসন্ন হইয়াছে। ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক ভাণ্ডারে যে সম্পদ সঞ্চিত আছে হঠাৎ তাহা য়ুরোপের নজরে পড়িতেছে এবং য়ুরোপ অনুভব করিতেছে, সেগুলিতে তাহার প্রয়োজন আছে। এতদিন ভারতবর্ষের চিত্রশিল্প ও স্থাপত্য য়ুরোপের অবজ্ঞাভাজন হইয়াছিল; এখন তাহার বিশেষ একটি মহিমা য়ুরোপ দেখিতে পাইয়াছে।

অতি অল্পকাল হইল ভারতবর্ষীয় সংগীতের উপরও য়ুরোপের দৃষ্টি পড়িয়াছে। আমি ভারতবর্ষে থাকিতেই দেখিয়াছি, য়ুরোপীয় শ্রোতা তন্ময় হইয়া সুরবাহারে বাগেশ্রী রাগিণীর আলাপ শুনিতেছেন। একদিন দেখিলাম, একজন ইংরেজ শ্রোতা একটি সভায় বসিয়া দুইজন বাঙালি যুবকের নিকট সামবেদের গান শুনিতেছেন। গায়ক দুইজন বেদমন্ত্রে ইমনকল্যাণ ভৈরবী প্রভৃতি বৈঠকি সুর যোগ করিয়া তাঁহাকে সামগান বলিয়া শুনাইতেছেন। তাঁহাকে আমার বলিতে হইল, এ জিনিসটাকে সামগান বলিয়া গ্রহণ করা চলিবে না। দেখিলাম, তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া আমার পক্ষে নিতান্ত বাহুল্য; কারণ, তিনি আমার চেয়ে অনেক বেশি জানেন। আমাকে তিনি বেদমন্ত্র আবৃত্তি করিতে বলিলে আমি অল্প যেটুকু জানি সেই অনুসারে আবৃত্তি করিলাম। তখনি তিনি বলিলেন, এ তো যজুর্বেদের আবৃত্তির প্রণালী। বস্তুত আমি যজুর্বেদের মন্ত্রই আবৃত্তি করিয়াছিলাম। বেদগান হইতে আরম্ভ করিয়া ধ্রুপদ-খেয়ালের রাগ মান লয় তিনি তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান করিয়াছেন— তাঁহাকে সহজে ফাঁকি দিবার জো নাই। ইনি ভারতবর্ষীয় সংগীত সম্বন্ধে বই লিখিতেছেন।

শ্রীমতী মড মেকার্থির লেখা মডার্ন্-রিভিয়ু পত্রিকায় মাঝে মাঝে বাহির হইয়াছে। শিশুকাল হইতেই সংগীতে ইহার অসামান্য প্রতিভা। নয় বৎসর বয়স হইতেই ইনি প্রকাণ্ড সভায় বেহালা বাজাইয়া শ্রোতাদিগকে বিস্মিত করিয়াছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে

ইহার হাতে স্নায়ুঘটিত পীড়া হওয়াতে ইহার বাজনা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইনি ভারতবর্ষে থাকিয়া কিছুকাল বিশেষভাবে দক্ষিণভারতের সংগীত আলোচনা করিয়াছেন; ইনিও সে সম্বন্ধে বই লিখিতে প্রবৃত্ত আছেন।

একদিন ডাক্তার কুমারস্বামীর এক নিমন্ত্রণপত্রে পড়িলাম, তিনি আমাকে রতন দেবীর গান শুনাইবেন। রতন দেবী কে বুঝিতে পারিলাম না; ভাবিলাম কোনো ভারতবর্ষীয় মহিলা হইবেন। দেখিলাম তিনি ইংরেজ মেয়ে, যেখানে নিমন্ত্রিত হইয়াছি সেইখানকার তিনি গৃহস্বামিনী।

মেজের উপর বসিয়া কোলে তম্বুরা লইয়া তিনি গান ধরিলেন। আমি আশ্চর্য হইয়া গেলাম। এ তো 'হিলিমিলি পনিয়া' নহে; রীতিমত আলাপ করিয়া তিনি কানাড়া মালকোষ বেহাগ গান করিলেন। তাহাতে সমস্ত দুরূহ মিড় এবং তান লাগাইলেন, হাতের ইঙ্গিতে তাল দিতে লাগিলেন; বিলাতি সম্মার্জনী বুলাইয়া আমাদের সংগীত হইতে তাহার ভারতবর্ষীয়ত্ব বারো-আনা পরিমাণ ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিলেন না। আমাদের ওস্তাদের সঙ্গে প্রভেদ এই যে ইহার কণ্ঠস্বরে কোথাও যেন কোনো বাধা নাই; শরীরের মুদ্রায় বা গলার স্বরে কোনো কষ্টকর প্রয়াসের লক্ষণ দেখা গেল না। গানের মূর্তি একেবারে অক্ষুণ্ণ অক্লান্ত হইয়া দেখা দিতে লাগিল।

এ দেশে এই যাঁহারা ভারতবর্ষীয় সংগীতের আলোচনায় প্রবৃত্ত আছেন, ইঁহারা যে কেবলমাত্র কৌতূহল চরিতার্থ করিতেছেন তাহা নহে; ইঁহারা ইহার মধ্যে একটা অপূর্ব সৌন্দর্য দেখিতে পাইয়াছেন— সেই রসটিকে গ্রহণ করিবার জন্য, এমন-কি, সম্ভবমত আপনাদের সংগীতের অঙ্গীভূত করিয়া লইবার জন্য ইঁহারা উৎসুক হইয়াছেন। ইঁহাদের সংখ্যা এখনো নিতান্তই অল্প সন্দেহ নাই, কিন্তু আগুন একটা কোণেও যদি লাগে তবে আপনার তেজে চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে।

এখানকার লণ্ডন একাডেমি অফ ম্যুজিকের অধ্যক্ষ ডাক্তার ইয়র্ক্‌ট্রটারের সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছে। তিনি ভারতবর্ষীয় সংগীতের কিছু কিছু পরিচয় পাইয়াছেন। যাহাতে লণ্ডনে এই সংগীত আলোচনার একটা উপায় ঘটে সেজন্য আমার নিকট তিনি বারম্বার ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছেন। যদি কোনো ভারতবর্ষীয় ধনী রাজা কোনো বড়ো ওস্তাদ বীণাবাদককে এখানে কিছুকাল রাখিতে পারেন তাহা হইলে, তাঁহার মতে, বিস্তর উপকার হইতে পারে।

উপকার আমাদেরই সবচেয়ে বেশি। কেননা, আমাদের শিল্পসংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা আমরা হারাইয়াছি। আমাদের জীবনের সঙ্গে তাহার যোগ নিতান্তই ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। নদীতে যখন ভাঁটা পড়ে তখন কেবল পাঁক বাহির হইয়া পড়িতে

থাকে ; আমাদের সংগীতের স্রোতস্বিনীতে জোয়ার উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে বলিয়া, আমরা আজকাল তাহার তলদেশের পঙ্কিলতার মধ্যে লুটাইতেছি। তাহাতে মানের উল্টা কাজ হয়। আমাদের ঘরে ঘরে গ্রামোফোনে যে-সকল সুর বাজিতেছে, থিয়েটার হইতে যে-সকল গান শিখিতেছি, তাহা শুনিলেই বুঝিতে পারিব, আমাদের চিত্তের দারিদ্র্যে কদর্যতা যে কেবল প্রকাশমান হইয়া পড়িয়াছে তাহা নহে, সেই কদর্যতাকেই আমরা অঙ্গের ভূষণ বলিয়া ধারণ করিতেছি। সস্তা খেলো জিনিসকে কেহ একেবারে পৃথিবী হইতে বিদায় করিতে পারে না ; একদল লোক সকল সমাজেই আছে, তাহাদের সংগতি তাহার উর্ধ্বে উঠিতে পারে না— কিন্তু, যখন সেই-সকল লোকেই দেশ ছাইয়া ফেলে তখনি সরস্বতী সস্তা দামের কলের পুতুল হইয়া পড়েন। তখনি আমাদের সাধনা হীনবল হয় এবং সিদ্ধিও তদনুরূপ হইয়া থাকে। সুতরাং এখন গ্রামোফোন ও কন্সর্ট্‌পার্টির আগাছায় দেশ দেখিতে দেখিতে ছাইয়া যাইবে ; যে সোনার ফসলের চাষ দরকার সে ফসল মারা যাইতেছে।

একদিন আমাকে ডাক্তার কুমারস্বামী বলিয়াছিলেন, 'হয়তো এমন সময় আসিবে যখন তোমাদের সংগীতের পরিচয় লইতে তোমাদিগকে য়ুরোপে যাইতে হইবে।' আমাদের দেশের অনেক জিনিসকেই য়ুরোপের হাত হইতে পাইবার জন্য আমরা হাত পাতিয়া বসিয়াছি। আমাদের সংগীতকেও একবার সমুদ্রপার করিয়া তাহার পরে যখন তাহাকে ফিরিয়া পাইব তখনি হয়তো ভালো করিয়া পাইব। আমরা বহুকাল ঘরের কোণে কাটাইয়াছি, এইজন্য কোনো জিনিসের বাজারদর জানি না ; নিজের জিনিসকে যাচাই করিয়া লইব, কোন্‌খানে আমাদের গৌরব তাহা নিশ্চিত করিয়া বুঝিব, সে শক্তি আমাদের নাই।

যেখানে মানুষের সকল চেষ্টাই প্রচুর প্রাণশক্তি হইতে নিরত নানা আকারে উৎসারিত হইতেছে, যেখানে মানুষের সমস্ত সম্পদ জীবনের বৃহৎ কারবারে খাটিতেছে এবং মুনফায় বাড়িয়া চলিয়াছে, সেইখানে আপনাদের সামগ্রীকে না আনিলে, সেই চল্‌তি কারবারের সঙ্গে যোগ দিতে না পারিলে, আমরা আপনার পরিচয় পাইতে পারিব না ; সুতরাং আমাদের অনেক শক্তি কেবল নষ্ট হইতে থাকিবে। পাছে য়ুরোপের সংসর্গে আমরা আপনাকে বিস্মৃত হই, এই ভয়ের কথাই আমরা শুনিয়া আসিতেছি ; কিন্তু তাহা সত্য নহে, তাহার উল্টা কথাই সত্য। এই প্রবল সজীব শক্তির প্রথম সংঘাতে কিছুকালের জন্য আমরা দিশা হারাইয়া থাকি, কিন্তু শেষকালে আমরা নিজের প্রকৃতিকেই জাগ্রততর করিয়া পাই। য়ুরোপের প্রাণবান সাহিত্য আমাদের সাহিত্যের প্রয়াসকে জাগাইয়াছে। তাহা যতই বলবান হইয়া উঠিতেছে

ততই-অনুকরণের হাত এড়াইয়া আমাদিগকে আত্মপ্রকাশের পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। আমাদের শিল্পকলায় সম্প্রতি যে উদ্‌বোধন দেখা যাইতেছে তাহার মূলেও য়ুরোপের প্রাণশক্তির আঘাত রহিয়াছে। আমার বিশ্বাস, সংগীতেও আমাদের সেই বাহিরের সংস্রব প্রয়োজন হইয়াছে। তাহাকে প্রাচীন দপ্তরের লোহার সিন্দুক হইতে মুক্ত করিয়া বিশ্বের হাটে ভাঙাইতে হইবে। য়ুরোপীয় সংগীতের সঙ্গে ভালো করিয়া পরিচয় হইলে তবেই আমাদের সংগীতকে আমরা সত্য করিয়া, বড়ো করিয়া, ব্যবহার করিতে শিখিব। দুঃখের বিষয়, সংগীত আমাদের শিক্ষিত লোকের শিক্ষার অঙ্গ নহে; আমাদের কলেজ-নামক কেরানিগিরির কারখানাঘরে শিল্পসংগীতের কোনো স্থান নাই, এবং আশ্চর্যের কথা এই যে, যে-সকল বিদ্যালয়কে আমরা ন্যাশন্যাল নাম দিয়া স্থাপন করিয়াছি সেখানেও কলাবিদ্যার কোনো আসন পাতা হইল না। মানুষের সামাজিক জীবনে ইহার প্রয়োজন যে কত বড়ো, নোট মুখস্থ করিতে করিতে, ডিগ্রি নিতে নিতে, সেই বোধটুকু পর্যন্ত আমরা সম্পূর্ণ হারাইয়া বসিয়াছি। এইজন্য সংগীত আজ পর্যন্ত সেই-সকল অশিক্ষিত লোকের মধ্যেই বদ্ধ যাহাদের সম্মুখে বিশ্বের প্রকাশ নাই; যাহারা অক্ষম স্ত্রীলোকের মতো নিজের সমস্ত ধনকে গহনা গড়াইয়া রাখিয়াছে, তাহাকে কেবল বহন করিতেই পারে, সর্বতোভাবে ব্যবহার করিতে পারে না; এমন-কি, ব্যবহারের কথার আভাস দিলেই তাহারা আতঙ্কিত হইয়া উঠে— মনে করে, ইহা তাহাদের সর্বস্ব খোওয়াইবার পন্থা।

অতএব, আমাদের ধন যখন আমরা ভালো করিয়া ব্যবহার করিতে পারিলাম না তখন যাহারা পারে তাহারা একদিন ইহাকে নিজের ব্যবসায়ে খাটাইবে, ইহাকে বিশ্বের কাজে লাগাইবার পথে আনিবে। আমাদিগকে সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে, তাহার পরে গর্ব করিব, আমাদের যাহা আছে জগতে এমন আর কাহারও নাই; সেই গর্ব করিবার উপকরণও অন্য লোককে জোগাইয়া দিতে হইবে।

সমাজভেদ

আমরা যখন বিলাতে যাত্রা করি তখন সেটা কেবল দেশ হইতে দেশান্তরে যাওয়া নয়, আমাদের পক্ষে সেটা একটা নূতন সংসারে প্রবেশ করা। জীবনযাত্রার বাহ্য প্রভেদগুলাতে বড়ো-একটা-কিছু আসে-যায় না। আমাদের সঙ্গে বসনে-ভূষণে আহারে-বিহারে বিদেশীর সাদৃশ্য থাকিবে না, সেটা তো ধরা কথা, সুতরাং সেখানে বিশেষ বাধে

না। কিন্তু, কেবল জীবনযাত্রায় নহে, জীবনতত্ত্বে একটা জায়গায় আমাদের গভীরতর অমিল আছে, সেইখানেই দিক্‌নির্ণয় করা হঠাৎ আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে।

জাহাজে উঠিয়াই আমরা প্রথম সেটা অনুভব করিতে শুরু করি। বুঝিতে পারি, এখন হইতে আমাদিগকে আর-এক সংসারের নিয়মে চলিতে হইবে। হঠাৎ এতখানি পরিবর্তন মানুষের পক্ষে অপ্রিয়— এইজন্যই আমরা সেটাকে ভালো করিয়া বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করি না, কোনোমতে মানিয়া চলি কিম্বা মনে মনে বিরক্ত হইয়া বলি, ইহাদের চাল-চলনটা অত্যন্ত বেশি কৃত্রিম।

আসল কথা, ইহাদের সঙ্গে আমাদের সামাজিক অবস্থার যে প্রভেদ আছে সেইটেই গুরুতর। পরিবার এবং পল্লীমণ্ডলীর সীমায় আসিয়া আমাদের সমাজ থামিয়াছে। সেই সীমার মধ্যেই পরস্পরের ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের কতকগুলা বাঁধা নিয়ম আছে। সেই সীমার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই আমাদের কী করিতে আছে এবং কী করিতে নাই তাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে। সেই নিয়মগুলির মধ্যে অনেক কৃত্রিমতাও আছে, অনেক স্বাভাবিকতাও আছে।

কিন্তু, যে সমাজের প্রতি লক্ষ করিয়া এই নিয়মগুলি তৈরি হইয়াছে সেই সমাজের পরিধি বড়ো নহে এবং সে সমাজ আত্মীয়সমাজ। সুতরাং আমাদের আদবকায়দাগুলি ঘোরো রকমের। বাবার সামনে তামাক খাইতে নাই, গুরুঠাকুরের পায়ের ধুলা লইয়া তাঁহাকে দক্ষিণা দেওয়া কর্তব্য, ভাসুরকে দেখিলে মুখ আবৃত করা চাই এবং মামাশ্বশুরের নিকটসংস্রব বর্জনীয়। এই পরিবার বা পল্লীমণ্ডলীর বাহিরে যে নিয়মের ধারা চলিয়াছে তাহা মোটের উপর বর্ণভেদমূলক।

বলিতে গেলে বর্ণাশ্রমের সূত্র আমাদের পল্লীসমাজ ও পরিবারমণ্ডলীকে হারের মতো গাঁথিয়া তুলিয়াছে। আমরা একটা সমাপ্তিতে আসিয়াছি। ভারতবর্ষ তাহার সমাজে সমস্যার একটা সম্পূর্ণ সমাধান করিয়া বসিয়াছে এবং মনে করিয়াছে, এই ব্যবস্থাকে চিরকালের মতো পাকা করিয়া রাখিতে পারিলেই তাহার আর-কোনো ভাবনা নাই। এইজন্য বর্ণাশ্রমসূত্রের দ্বারা পরিবার-সমাজকে বাঁধিয়া রাখিবার বিধানকে সকল দিক হইতে দৃঢ় করিবার দিকেই আধুনিক ভারতবর্ষের সমস্ত চেষ্টা কাজ করিয়াছে।

ভারতবর্ষের সম্মুখে যে সমস্যা ছিল ভারতবর্ষ তাহার একটা-কোনো সমাধানে আসিয়া পৌঁছিতে পারিয়াছিল, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। বিচিত্র জাতির বিরোধকে সে এক রকম করিয়া মিটাইয়াছে, বিচিত্র শ্রেণীর বিরোধকে সে এক রকম করিয়া ঠাণ্ডা করিয়াছে; বৃত্তিভেদের দ্বারা ভারতবর্ষে প্রতিযোগিতার জবযুদ্ধকে নিবৃত্ত

করিয়াছে এবং ধন ও ক্ষমতার পার্থক্য যে অভিমানকে সৃষ্টি করে জাতিভেদের বেড়ার দ্বারা তাহার সংঘাতকে সে ঠেকাইয়াছে। এক দিকে যদিও ভারতবর্ষ সমাজের নেতা ব্রাহ্মণদের সহিত অন্য বর্ণের স্বাতন্ত্র্যকে সর্বপ্রকার উপায়ে অভ্রভেদী করিয়া তুলিয়াছে, অন্য দিকে তেমনি সমস্ত সুখসুবিধা-শিক্ষাদীক্ষাকে সর্বসাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিবার জন্য নানাবিধ ছোটোবড়ো প্রণালী বিস্তারিত করিয়া দিয়াছে। এইজন্য ভারতবর্ষে ধনী যাহা ভোগ করে নানা উপলক্ষ্যে সর্বসাধারণে তাহার অংশ পায় এবং জনসাধারণকে আশ্রয় দিয়া ও পরিতুষ্ট করিয়াই ক্ষমতাশালীর ক্ষমতা খ্যাতিলাভ করে। আমাদের দেশে ধনী-দরিদ্রের প্রচণ্ড সংঘাতের কোনো কারণ নাই, এবং অক্ষমকে আইনের দ্বারা বাঁচাইয়া রাখিবারও বিশেষ প্রয়োজন ঘটে নাই।

পাশ্চাত্যসমাজ পারিবারিক সমাজ নহে; তাহা জনসমাজ, তাহা আমাদের সমাজের চেয়ে ব্যাপ্ত। ঘরের মধ্যে ততটা পরিমাণে সে নাই যতটা পরিমাণে সে বাহিরে আছে। আমাদের দেশে পরিবার বলিতে যে জিনিস বোঝায় তাহা য়ুরোপে বাঁধে নাই বলিয়াই য়ুরোপের মানুষ ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

এই ছড়াইয়া-পড়া সমাজের স্বভাবই এই— এক দিকে তাহার বাঁধন যেমন আলগা আর-এক দিকে তাহা তেমনি বিচিত্র ও দৃঢ় হইয়া পড়ে। তাহা গদ্যরচনার মতো। পদ্য ছন্দের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে বদ্ধ হইয়া চলে বলিয়া তাহার বাঁধনটি সহজ; কিন্তু গদ্য ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এইজন্যই এক দিকে সে স্বাধীন বটে আর-এক দিকে তাহার পদক্ষেপ যুক্তির দ্বারা, চিন্তাবিকাশের বিচিত্র নিয়মের দ্বারা, বড়ো করিয়া বাঁধা।

ইংরেজি সমাজ বিস্তৃত ক্ষেত্রে আছে বলিয়া এবং তাহার সমস্ত কারবারকে বাহিরে প্রসারিত করিয়া ফাঁদিতে হইয়াছে বলিয়াই, নানা সামাজিক বিধানের দ্বারা তাহাকে সকল সময়েই প্রস্তুত থাকিতে হইয়াছে। আটপৌরে কাপড় পরিবার সময় তাহার অল্প। তাহাকে সাজিয়া থাকিতে হয়, কেননা সে আত্মীয়সমাজে নাই। আত্মীয়েরা ক্ষমা করে, সহ্য করে, কিন্তু বাহিরের লোকের কাছে প্রশ্রয় প্রত্যাশা করা যায় না। প্রত্যেককে প্রত্যেক কাজে ঠিক সময়মত চলিতেই হয়, নহিলে পরস্পর পরস্পরের ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে। রেলের লাইন যদি আমার একলার হয় অথবা আমার গুটিকয়েক ভাইবন্ধুর অধিকারে থাকে, তাহা হইলে যেমন খুশি গাড়ি চালাইতে পারি এবং পরস্পরের গাড়িকে ইচ্ছামত যেখানে-সেখানে যখন-তখন দাঁড় করাইয়া রাখিতে পারি। কিন্তু, সাধারণের রেলের রাস্তায় যেখানে বিস্তর গাড়ির আনাগোনা সেখানে পাঁচ মিনিট সময়ের ব্যতিক্রম হইলেই নানা দিকে গোল বাধিয়া যায় এবং তাহা সহ্য করা শক্ত হয়। আমাদের অত্যন্ত ঘোরো সমাজ বলিয়াই অথবা সেই ঘোরো অভ্যাস

আমাদের মজ্জাগত বলিয়াই, পরস্পরের সম্বন্ধে আমাদের ব্যবহারে দেশকালের বন্ধন নিতান্তই আলগা— আমরা যথেচ্ছা জায়গা জুড়িয়া বসি, সময় নষ্ট করি, এবং ব্যবহারের বাঁধাবাঁধিকে আত্মীয়তার অভাব বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকি। ইংরেজি সমাজে ওইখানেই সব-প্রথমে আমাদের বাধে; সেখানে বাহ্য ব্যবহারে আপন ইচ্ছামত যাহা-তাহা করিয়া সকলের কাছ হইতে ক্ষমা প্রত্যাশা করিবার অধিকার কাহারও নাই। গড়ে সকলের যাহাতে সুবিধা সেইটের অনুসরণ করিয়া ইহারা নানা বন্ধন স্বীকার করিয়াছে। ইহাদিগকে দেখাসাক্ষাৎ নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ বেশভূষা আদর-অভ্যর্থনায় নিয়ম পাকা করিয়া রাখিতে হইয়াছে। যাহা বস্তুত আত্মীয়সমাজ নহে সেখানে আত্মীয়সমাজের ঢিলা নিয়ম চালাইতে গেলেই সমস্ত অত্যন্ত বীভৎস হইয়া পড়ে এবং জীবনযাত্রা অসম্ভব হইয়া উঠে।

য়ুরোপের এই ব্যাপক সমাজ এখনও কোনো সমাধানের মধ্যে আসিয়া পৌঁছে নাই। তাহা আচারে ব্যবহারে বাহিরের দিকে একটা বাঁধাবাঁধির মধ্যে আপনাকে সংযত ও শ্রীসম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সমাজের ভিতরকার শক্তিগুলি এখনও আপনাদিগকে কোনো একটা ঐক্যসূত্রে বাঁধিয়া পরস্পরের সংঘাত সম্পূর্ণ বাঁচাইয়া চলিবার ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। য়ুরোপ কেবলই পরীক্ষা পরিবর্তন এবং বিপ্লবের ভিতর দিয়া চলিতেছে। সেখানে স্ত্রীলোকের সঙ্গে পুরুষের, ধর্মসমাজের সঙ্গে কর্মসমাজের, রাজশক্তির সঙ্গে প্রজাশক্তির, কারবারী-দলের সঙ্গে মজুর-দলের কেবলই দ্বন্দ্ব বাধিয়া উঠিতেছে। চন্দ্রমণ্ডলের মতো তাহার যাহা হইবার তাহা হইয়া যায় নাই— এখনও তাহার আগ্নেয়গিরি অগ্নি-উদ্গারের জন্য প্রস্তুত আছে।

কিন্তু, আমরাই সমস্ত সমস্যার সমাধান করিয়া, সমাজব্যবস্থা চিরকালের মতো পাকা করিয়া, মৃতদেহের মতো সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছি, এ কথা বলিলে চলিবে কেন। সময় উত্তীর্ণ হইলেও ব্যবস্থাকে কিছুদিনের মতো খাড়া রাখিতে পারি, কিন্তু অবস্থাকে তো সেইসঙ্গে বাঁধিয়া রাখিতে পারি না। সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে আমরা মুখামুখি হইয়া দাঁড়াইয়াছি, এখন ঘোরো সমাজ লইয়া আর আমাদের চলিতেই পারে না— ইহারা কেবলমাত্র বাপ দাদা খুড়া নহে, ইহারা বাহিরের লোক, ইহারা দেশ-বিদেশের মানুষ; ইহাদের সঙ্গে ব্যবহার করিতে হইলে সতর্ক ও সচেষ্ট হইতেই হইবে; অন্যমনস্ক হইয়া, ঢিলেঢালা হইয়া যদি চলিতে যাই তবে একদিন অচল হইয়া উঠিবেই।

আমরা সনাতন প্রথার দোহাই দিয়া গর্ব করি, কিন্তু এ কথা একেবারেই সত্য নহে যে, ভারতবর্ষের সমাজ ইতিহাসের মধ্য দিয়া উদ্‌ভিন্ন হয় নাই। ভারতবর্ষকেও

অবস্থাভেদে নব নব বিপ্লবের তাড়নায় অগ্রসর হইতে হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই— এবং ইতিহাসে তাহার চিহ্ন পাওয়া যায়। কিন্তু, তাহার চলা একেবারে শেষ হইয়াছে, এখন হইতে অনন্তকাল সে সনাতন হইয়া বসিয়া থাকিবে, এমন অদ্ভুত কথা মুখে উচ্চারণ করিতেও চাই না। এক-একটা বড়ো বড়ো বিপ্লবের পর সমাজের ক্লান্তি আসে; সেই সময় সে দ্বার বন্ধ করিয়া, আলো নিভাইয়া, ঘুমের আয়োজন করে। বৌদ্ধবিপ্লবের পর ভারতবর্ষ শক্ত নিয়মের হুড়কায় সমস্ত দরজা জানলা বন্ধ করিয়া একেবারে স্থির হইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। তাহার ঘুম আসিয়াছিল। কিন্তু ইহাকে অনন্ত ঘুম বলিয়া গর্ব করিলে সেটা হাস্যকর অথচ সকরুণ হইয়া উঠিবে। ঘুম ততক্ষণই ভালো যতক্ষণ রাত্রি থাকে— বাহিরে যতক্ষণ লোকের ভিড় নাই, বড়ো বড়ো দোকান-বাজার যতক্ষণ বন্ধ। কিন্তু, সকালে যখন চারি দিকে হাঁকডাক পড়িয়া গেছে, তুমি চুপচাপ পড়িয়া থাকিলেও আর-কেহ যখন চুপ করিয়া নাই, তখন সনাতন দরজা আটে-ঘাটে বন্ধ করিয়া থাকিলে অত্যন্ত ঠকিতে হইবে।

রাত্রিকালের বিধান সাদাসিধা; তাহার আয়োজন স্বল্প; তাহার প্রয়োজন সামান্য। এইজন্য সমস্ত ব্যবস্থা বেশ সহজেই সম্পূর্ণ করিয়া, নিরুদ্‌বিগ্ন হইয়া চোখ বোজা সম্ভব হয়; তখন যেখানে যেটি রাখি সেখানে সেটি পড়িয়া থাকে, কারণ, নাড়া দিবার কেহ নাই। দিনের বেলাকার ব্যবস্থা তত সহজ নহে; এবং তাহা ভোরের বেলা একবারের মতো সারিয়া ফেলিয়া তাহার পর সমস্ত দিনটা নিশ্চিন্ত হইয়া তামাক খাইতে থাকা চলে না। ঘাড়ের উপর কাজ আসিয়া পড়ে, নূতন নূতন চেষ্টা করিতেই হয়, এবং বাহিরের জীবনস্রোতের সঙ্গে নিজের জীবনযাত্রাকে বনাইতে না পারিলে খাওয়া-দাওয়া কাজকর্ম সমস্তেরই ব্যাঘাত ঘটিতে থাকে।

কিছুকালের জন্য ভারতবর্ষ অত্যন্ত বাঁধা নিয়মের নিশ্চল ব্যবস্থার মধ্যে স্বচ্ছন্দে রাত্রিযাপন করিয়াছে। সেই অবস্থাটা গভীর আরামের বলিয়াই সেটা যে চিরকালই আরামের হইবে তাহা নহে। আঘাত সবচেয়ে কঠিন বেদনাজনক যখন তাহা ঘুমন্ত শরীরের উপর আসিয়া পড়ে। দিনের বেলা সেই আঘাতের সময়। এইজন্য দিনে জাগিয়া থাকাই সবচেয়ে আরামের।

ইচ্ছা করি আর না করি, সর্বাঙ্গে আলস্য জড়াইয়া থাক্‌ আর না থাক্‌, আমাদের জাগিবার সময় আসিয়াছে। আমরা সমাজের ভিতর হইতে ও বাহির হইতে আঘাত পাইতেছি, দুঃখ পাইতেছি। আমরা দৈন্যে দুর্ভিক্ষে পীড়িত। সমাজব্যবস্থায় ভাঙন ধরিয়াছে; একান্নবর্তী পরিবার খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িতেছে; এবং সমাজে ব্রাহ্মণের পদ ক্রমশই এমন খাটো হইয়া আসিতেছে যে, 'ব্রাহ্মণসমাজ' প্রভৃতি সভা-

সমিতির সাহায্যে ব্রাহ্মণ চীৎকারশব্দে আপনাকে ঘোষণা করিয়া আপনার দুর্বলতা সপ্রমাণ করিয়া তুলিতেছে। পল্লীসমাজের পঞ্চায়েত-প্রথা গবর্মেন্টের চাপরাশ গলায় বাঁধিয়া আত্মহত্যা করিয়া ভূত হইয়া পল্লীর বুকে চাপিতেছে; দেশের অন্নে টোলের আর পেট ভরিতেছে না, দুর্ভিক্ষের দায়ে একে একে তাহারা সরকারি অন্নসত্রের শরণাপন্ন হইতেছে; দেশের ধনী-মানীরা জন্মস্থানের বাতি নিবাইয়া দিয়া কলিকাতায় মোটরগাড়ি চড়িয়া ফিরিতেছে; এবং বড়ো বড়ো কুলশীল আপনার যথাসর্বস্ব এবং কন্যাটিকে লইয়া বি.এ.পাস-করা বরের পায়ে বৃথা মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে। এই-সমস্ত দুর্লক্ষণের জন্য কলিযুগকে বিদেশীরাজাকে বা স্বদেশী ইংরেজিনবিশকে গালি দিয়া কোনো ফল নাই। আসল কথা, আমাদের দিনের বেলাকার প্রভু তাঁহার চাপরাশি পাঠাইয়াছেন; আমাদের সনাতন শয়নাগার হইতে সে আমাদিগকে টানিয়া বাহির না করিয়া ছাড়িবে না। জোর করিয়া চোখ বুজিয়া আমরা অকালে রাত্রি সৃজন করিতে পারিব না। যে পৃথিবী আমাদের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাকে আমাদের ঘরে আহ্বান করিয়া আনিতেই হইবে; যদি আদর করিয়া তাহাকে না আনি তবে সে আমাদের দ্বার ভাঙিয়া প্রবেশ করিবে। দ্বার কি এখনি ভাঙে নাই।

অতএব, আবার একবার আমাদিগকে নূতন করিয়া সমস্যাসমাধানের জন্য ভাবিতে হইবে। য়ুরোপের নকল করিয়া সে কাজ চলিবে না; কিন্তু, য়ুরোপের কাছ হইতে শিক্ষা করিতে হইবে। শিক্ষা করা এবং নকল করা একই কথা নহে। বস্তুত, ঠিকভাবে শিক্ষা করিলেই নকল করার ব্যাধি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। অন্যকে সত্যরূপে না জানিলে নিজেকে কখনোই সত্যরূপে জানা যায় না।

কিন্তু, যাহা বলিতেছিলাম সে কথাটা এই যে, আমাদের ঘোরো ঢিলাঢালা অভ্যাস লইয়া য়ুরোপীয় সমাজে আমাদের অত্যন্ত বাধে। কোনোমতেই প্রস্তুত হইয়া উঠিতে পারি না। মনে হয়, সকলেই আমাকে ঠেলিয়া চলিয়া যাইতেছে, কেহ আমার জন্য কিছুমাত্র অপেক্ষা করিতেছে না। আমরা আদর-আবদারের জীব, আত্মীয়সমাজের বাহিরে আমাদের বড়ো বিপত্তি। আমি এখানে আসিয়া ইহা লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, আমাদের ঘরের ছেলের পরের বাড়িতে প্রবেশের অভ্যাস নাই বলিয়াই আমাদের অধিকাংশ ছাত্র এখানে আসিয়া পড়া মুখস্থ করে, কিন্তু এখানকার সমাজের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখে না। এখানকার সমাজ বড়ো বলিয়াই এখানকার সমাজের দায় বেশি। সেই দায় স্বীকার করিলে তবে এখানকার লোকের সঙ্গে সমাজের ক্ষেত্রে আমাদের মিল হইতে পারে। সেই মিল না ঘটিলে এখানকার সবচেয়ে বড়ো শিক্ষা হইতে আমরা বঞ্চিত হইব। কারণ, এখানকার সবচেয়ে বড়ো সত্য এখানকার সমাজ।

বস্তুত, এখানকার সবচেয়ে বড়ো বীরত্ব বড়ো মহত্ব এখানকার সমাজের ক্ষেত্রে, যুদ্ধক্ষেত্রে নহে। প্রশস্ত সমাজের উপযোগী ত্যাগ এবং আত্মসম্মান এখানে পদে পদে প্রকাশ পাইতেছে; এইখানে ইহারা মানুষ হইতেছে এবং নানা পথে মানুষের কাজে আপনাকে দান করিবার জন্য ইহারা প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে। আধুনিক ভারতবর্ষের শিক্ষিত ভদ্রসম্প্রদায় নিজের দেশেও স্কুলের শিক্ষাকেই শিক্ষা বলিয়া গণ্য করে— বৃহৎ সমাজের শিক্ষা হইতে বঞ্চিত; এখানেও আসিয়া যদি তাহারা স্কুলের কারখানার মধ্যে প্রবেশ করিয়া কেবলমাত্র কলের সামগ্রী হইয়া বাহির হইয়া যায়, এখানকার সমাজে প্রত্যক্ষ মনুষ্যত্বের জন্মস্থানে প্রবেশ না করে, তবে বিদেশে আসিয়াও বঞ্চিত হইবে।

সীমার সার্থকতা

এ কথা মাঝে মাঝে শুনিয়াছি যে, কবিত্বের মধ্যে জীবনের সম্পূর্ণ সার্থকতা নাই। ঈশ্বরের সাধনাকে কাব্যালংকারের ক্ষেত্র হইতে সংসারে কর্মের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত না করিলে তাহা সত্যের দৃঢ়তা লাভ করে না।

মাঝে মাঝে অবসাদের দিনে নিজেও এ কথা ভাবিয়াছি। কিন্তু আমি জানি, এরূপ চিন্তা মনের মধ্যে মরীচিকা-বিস্তার মাত্র। মানুষের যে রিপু তাহার কানে মিথ্যামন্ত্র জপ করে, লোভ তাহার মধ্যে অগ্রগণ্য। সে মানুষকে এই কথা বলে, 'তুমি যাহা তাহার মধ্যে সত্য নাই, তাহার বাহিরেই সত্য।'

কিন্তু, উপনিষৎ বলিয়াছেন: মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্। কাহারও ধনে লোভ করিয়ো না। অর্থাৎ, তোমার সীমার বাহিরে যাহা আছে তাহার পশ্চাতে চিত্তকে ও চেষ্টাকে ধাবিত করিয়ো না।

কেন করিব না ওই শ্লোকে সে কথাটাও বলা আছে। উপনিষৎ বলিতেছেন, তিনিই সমস্তকে আচ্ছন্ন করিয়া আছেন; অতএব, যাহার মধ্যে তিনি আছেন, যাহা তাঁহার দান, তাহার মধ্যে কোনো অভাবই নাই। নিজের মধ্যে যখন ঐশ্বর্যকে উপলব্ধি করি না তখনি মনে করি, ঐশ্বর্য পরের মধ্যেই আছে। কিন্তু, যে দীনতাবশত ঐশ্বর্যকে নিজের মধ্যে পাই নাই সেই দীনতাবশতই তাহাকে অন্যত্র পাইবার আশা নাই।

সীমা আছে এ কথা যেমন নিশ্চিত, অসীম আছেন এ কথা তেমনি সত্য। আমরা উভয়কে যখন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি তখনি আমরা মায়ার ফাঁদে পড়ি। তখনি আমরা

এমন একটা ভুল করিয়া বসি যে, আপনার সীমাকে লঙ্ঘন করিলেই বুঝি আমরা অসীমকে পাইব— যেন আত্মহত্যা করিলেই অমরজীবন পাওয়া যায়। যেন আমি না হইয়া আর-কিছু হইলেই আমি ধন্য হইব। কিন্তু, আমি হওয়াও যা আর-কিছু হওয়া যে তাহাই, সে কথা মনে থাকে না। আমার এই আমির মধ্যে যদি ব্যর্থতা থাকে তবে অন্য কোনো আমিত্ব লাভ করিয়া তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইব না। আমার ঘটের মধ্যে ছিদ্র থাকাতে যদি জল বাহির হইয়া যায়, তবে সে জলের দোষ নহে। দুধ ঢালিলেও সেই দশা হইবে, এবং মধু ঢালিলেও তথৈবচ।

জীবনে একটিমাত্র কথা ভাবিবার আছে যে, আমি সত্য হইব। আমি কবি হইব কি কর্মী হইব কি আর-কিছু হইব, সেটা নিতান্তই ব্যর্থ চিন্তা। সত্য হইব এ কথার অর্থই এই, কোথায় আমার সীমা সেটা নিশ্চিতরূপে অবধারণ করিব। দুরাশার প্রলোভনে সেইটে সম্বন্ধে যদি মন স্থির না করি, তবে সত্য ব্যবহার হইতে ভ্রষ্ট হইব।

অহংকারকে যে আমরা রিপু বলি, লোভকে যে আমরা রিপু বলি, তাহার কারণ এই— আমাদের সীমা সম্বন্ধে সে আমাদিগকে ঠিকটা বুঝিতে দেয় না। সে আমাদের আপনাকে জানার তপস্যায় বাধা দিয়া কেবলই বলিতে থাকে, 'তুমি যাহা তুমি তাহার চেয়ে আরও বেশি অথবা অন্য-কিছু।' ইহা হইতে পৃথিবীতে যত দুঃখ, যত বিদ্বেষ, যত কাড়াকাড়ি-হানাহানির সৃষ্টি হইতে থাকে এমন আর কিছুতেই না। যাহা মিথ্যা তাহাকেই গায়ের জোরে সত্য করিতে গিয়া পৃথিবীতে যত-কিছু অমঙ্গলের উৎপত্তি হয়।

সীমাহীনতার প্রতি আমাদের একটা প্রবল আকর্ষণ আছে, সেই আকর্ষণই আমাদের জীবনকে গতিদান করে। সেই আকর্ষণকে অবহেলা করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে মঙ্গল নাই। ভূমাকে আমাদের পাইতেই হইবে, সেই পাওয়াতেই আমাদের সুখ।

কিন্তু, নিজের সীমার মধ্যেই সেই অসীমকে পাইতে হইবে, ইহা ছাড়া গতি নাই। সীমার মধ্যে অসীমকে ধরে না, এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে আমরা অসীমকে খর্ব করিয়া থাকি। এ কথা সত্য, এক সীমার মধ্যে অন্য সীমাবদ্ধ পদার্থ সম্পূর্ণ স্থান পায় না। কিন্তু, অসীমের সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। তিনি একটি বালুকণার মধ্যেও অসীম। এইজন্য একটি বালুকণাকেও যখন সম্পূর্ণরূপে সর্বতোভাবে আয়ত্ত করিতে যাই তখন দেখি, বিশ্বকে আয়ত্ত না করিলে তাহাকে পাইবার জো নাই; কারণ, এক জায়গায় নিখিলের সঙ্গে সে অবিচ্ছেদ্য, তাহার এমন একটা দিক আছে যে দিকটাতে কিছুতেই তাহাকে শেষ করা যায় না।

আমরা নিজের সীমার মধ্যেই অসীমের প্রকাশকে উপলব্ধি করিব, ইহাই আমাদের সাধনা। কারণ, সেই অসীমেরই আনন্দ আমার মধ্যে সীমা রচনা করিয়াছেন; সেই সীমার মধ্যেই তাঁহার বিলাস, তাঁহার বিহার। তাঁহার সেই নিকেতনকে ভাঙিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে বেশি করিয়া পাইব, এমন কথা মনে করাই ভুল।

গোলাপ-ফুলের মধ্যে সৌন্দর্যের একটি অসীমতা আছে তাহার কারণ, সে সম্পূর্ণরূপেই গোলাপ-ফুল— সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ, কোনো অনির্দিষ্টতা নাই। এইজন্যই গোলাপ-ফুলের মধ্যে এমন একটি আবির্ভাব সুস্পষ্ট হইয়াছে যাহা চন্দ্রসূর্যের মধ্যে, যাহা জগতের সমস্ত সুন্দরের মধ্যে। সে সুনিশ্চিত সত্যরূপে গোলাপ-ফুল বলিয়াই সমস্ত জগতের সঙ্গে তাহার আত্মীয়তা সত্য।

বস্তুত অস্পষ্টতাই ব্যর্থতা; সুতরাং সেইখানেই ভূমার প্রকাশ প্রতিহত, ভূমার আনন্দ প্রচ্ছন্ন। তাঁহার আনন্দ রূপগ্রহণের দ্বারাই সার্থক। অসীম যিনি তিনি সীমার মধ্যেই সত্য, সীমার মধ্যেই সুন্দর। এইজন্য জগৎসৃষ্টির ইতিহাসে রূপের বিকাশ কেবলই সুব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে; সীমা হইতে সীমার অভিমুখে চলিয়াছে অসীমের অভিসারযাত্রা। কুঁড়ি হইতে ফুল, ফুল হইতে ফল, কেবলই রূপ হইতে ব্যক্ততর রূপ।

এইজন্যই আপনাকে স্পষ্ট করিয়া পাওয়াই মানুষের সাধনা। স্পষ্ট করিয়া পাওয়ার অর্থ ই সীমাবদ্ধ করিয়া পাওয়া। যখনি নানা পথে নানা দুরাশার বিক্ষিপ্ততা হইতে নিজেকে সংহৃত করিয়া সীমার মধ্যে আপনাকে স্পষ্ট করিয়া দাঁড় করানো যায়, তখনি জীবনের সার্থকতাকে লাভ করি।

সাঁতার যতক্ষণ না শিখি ততক্ষণ এলোমেলো হাত পা ছোঁড়া চলে। ভালো সাঁতার যেমনি শিখি অমনি আমাদের চেষ্টা সীমাবদ্ধ হইয়া আসে এবং তাহা সুন্দর হইয়া প্রকাশ পায়। পাখি যখন ওড়ে তখন সুন্দর দেখিতে হয়, কারণ, তাহার ওড়ার মধ্যে দ্বিধা নাই, তাহা সুনিয়ত অর্থাৎ তাহা আপনার নিশ্চিত সীমাকে পাইয়াছে। এই সীমাকে পাওয়াই সৃষ্টি অর্থাৎ সত্য; এবং সীমার দ্বারা অসীমকে পাওয়াই সৌন্দর্য অর্থাৎ আনন্দ। সীমা হইতে ভ্রষ্ট হওয়াই কদর্যতা, তাহাই নিরানন্দ, তাহাই বিনাশ।

কাব্যালংকার তখনি ব্যর্থ যখনি তাহা মিথ্যা, অর্থাৎ যখনি তাহা আপনার সীমাকে না পাইয়া আর-কিছু হইবার চেষ্টা করিতেছে। তখনি সে ভাণ করে; তখনি সে ছোটোকে বড়ো করিয়া দেখায়, বড়োকে ছোটো করিয়া আনে। তখনি তাহা কথার কথামাত্র, তাহা সৃষ্টি নহে। কিন্তু, কবি যেখানে সত্য, যেখানে সে আপনার অসীমকে আপনার সীমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে, আপনার আনন্দকে আপনার শক্তির মধ্যে মূর্তিদান করে, সেখানে সে সৃষ্টি করে। জগতের সকল সৃষ্টির মধ্যেই

তাহার স্থান। সত্যকর্মী যে কর্মের সৃষ্টি করে, সত্যসাধক যে জীবনের সৃষ্টি করে, সকলেরই সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে আসন লইবার অধিকার তাহার। কার্লাইল প্রভৃতি বাক্যরচকেরা বাক্যের চেয়ে কাজকে যে বড়ো স্থান দিয়াছেন, ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় তাহার অর্থ এই যে, তাঁহারা মিথ্যা বাক্যের চেয়ে সত্য কাজকে গৌরব দান করিতে চান। সেইসঙ্গে এ কথাও বলা উচিত, মিথ্যা কাজের চেয়ে সত্য বাক্য অনেক বড়ো।

আসল কথাই এই, সত্য যে-কোনো আকারেই প্রকাশ পাক্‌-না কেন তাহা একই; তাহাই মানুষের চিরসম্পদ। যেমন টাকা যেখানে সত্য, অর্থাৎ শক্তি যেখানে টাকা-আকারে প্রকাশ পায়, সেখানে সে টাকা কেবলমাত্র টাকা নহে, তাহা অন্নও বটে, বস্ত্রও বটে, শিক্ষাও বটে, স্বাস্থ্যও বটে; তখন সে টাকা সত্য মূল্যের সীমায় সুনির্দিষ্টরূপে বদ্ধ বলিয়াই আপনার নির্দিষ্ট সীমাকে অতিক্রম করে, অর্থাৎ সে আপনার সত্য মূল্যের দ্বারাই আপনার বাহিরের বিবিধ সত্য পদার্থের সহিত যোগযুক্ত হয়। তেমনি সত্য কবিতার সঙ্গে মানুষের সকলপ্রকার সত্য সাধনার যোগ ও সমতুল্যতা আছে। সত্য কবিতা কেবলমাত্র কতকগুলি বাক্যের মধ্যে কবিতা আকারেই থাকে না। তাহা মানুষের প্রাণের মধ্যে মিলিত হইয়া কর্মীর কর্ম ও তাপসের তপস্যার সহিত যুক্ত হইতে থাকে। এ কথা নিঃসন্দেহ যে, কবির কবিতা যদি পৃথিবীতে না থাকিত তবে মানবজীবনের সকলপ্রকার কর্মই অন্যপ্রকার হইত। কারণ, মানুষের সত্য বাক্য চিরদিনই মানুষের সত্য কর্মের সহিত মিশ্রিত হইতেছে, তাহাকে শক্তি দিতেছে, মূর্তি দিতেছে, তাহার পথকে লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর করিতেছে।

অতএব, এই কথাটি আমাদের বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে যে, সত্য সীমাকে পাওয়াই সত্য অসীমকে পাওয়ার একমাত্র পন্থা। নিজের সীমাকে লঙ্ঘন করিলেই নিজের অসীমকে লঙ্ঘন করা হয়। পৃথিবীতে কবিতায় বা কর্মে বা ধর্মসাধনায় যে-কোনো মানুষ সত্য হইয়াছে তাহার সহিত অপর সাধারণের প্রভেদ এই যে, সে অসীমের সীমাকে স্পষ্টরূপে আবিষ্কার করিয়াছে, অন্য সকলে সীমাভ্রষ্ট অস্পষ্টতার মধ্যে যেমন-তেমন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই অস্পষ্টতাই তুচ্ছ। নদী যখন আপন তটসীমাকে পায় তখনি সে অসীম সমুদ্রের অভিমুখে ছুটিয়া যাইতে পারে; যদি সে আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া আরও বড়ো হইবার জন্য আপনার তটকে বিলুপ্ত করিয়া দেয়, তাহা হইলেই তাহার গতি বদ্ধ হইয়া যায় এবং সে তুচ্ছ বিলের মধ্যে, জলার মধ্যে, ছড়াইয়া পড়ে।

এ কথা মনে রাখিতে হইবে, আপনার সত্য সীমার মধ্যে আবদ্ধ হওয়া সংকীর্ণতা

নহে, নিশ্চেষ্টতা নহে। বস্তুত, সেই সীমার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দ্বারাই মানুষ উদার হয়, সেই সীমার মধ্যে বিধৃত হওয়ার দ্বারাই মানুষের চেষ্টা বেগবান হইয়া উঠে। ব্যক্তি ব্যক্তি-হওয়ার দ্বারাই মানুষের মধ্যে গণ্য হয়; জাতি জাতীয়ত্ব-লাভের দ্বারাই সর্বজাতির মধ্যে স্থান পাইতে পারে। যে জাতি জাতীয়তা লাভ করে নাই সে বিশ্বজাতীয়তাকে হারাইয়াছে। যে লোক বড়ো লোক সেই লোকই সকলের চেয়ে বিশেষ করিয়া নিজেকে পাইয়াছে। যে ব্যক্তি নিজেকে পাইয়াছে তাহার আর জড়তার মধ্যে পড়িয়া থাকিবার জো নাই; সে আপনার কাজ পাইয়াছে, সে আপনার স্থান পাইয়াছে, সে আপনার আনন্দ পাইয়াছে; নদীর মতো সে বিনা দ্বিধায় আপনার বেগে আপনিই চলিতে থাকে, তাহার সত্য সীমাই সত্য পরিণামের দিকে তাহাকে সহজে চালনা করিয়া লইয়া যায়।

আবিরাবীর্ম এধি। যিনি প্রকাশস্বরূপ তিনি আমার মধ্যে, আমারই সীমার মধ্যে, প্রকাশিত হউন, ইহাই আমাদের সত্য প্রার্থনা। যদি আমার সীমাকে অবজ্ঞা করি তবে সেই অসীমের প্রকাশকে বাধা দিব। পাহি মাং নিত্যম্। আমাকে সর্বদা রক্ষা করো। আমার সত্যের মধ্যে, সীমার মধ্যে আমাকে রক্ষা করো; আমি যেন সীমার বাহিরে আপনাকে হারাইয়া না ফেলি। আমি যাহা পূর্ণরূপে তাহাই হইয়া যেন তোমার প্রসন্নতাকে, তোমার আনন্দকে সুস্পষ্টরূপে নিজের মধ্যে অনুভব করি। অর্থাৎ, আমার যে সীমার মধ্যে তোমার বিলাস সেই সীমাকেই আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়া আমি যেন নিজের জীবনকে কৃতার্থ করিতে পারি, ইহাই আমার অস্তিত্বের মূলগত অন্তরতর প্রার্থনা।

লণ্ডন

সীমা ও অসীমতা

ধর্ম শব্দের গোড়াকার অর্থ, যাহা ধরিয়া রাখে। religion শব্দের ব্যুৎপত্তি আলোচনা করিলে বুঝা যায় তাহারও মূল অর্থ, যাহা বাঁধিয়া তোলে।

অতএব, এক দিক দিয়া দেখিলে দেখা যায়, মানুষ ধর্মকে বন্ধন বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। ধর্মই মানুষের চেষ্টার ক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ করিয়া সংকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। এই বন্ধনকে স্বীকার করা, এই সীমাকে লাভ করাই মানুষের চরম সাধনা।

কেননা সীমাই সৃষ্টি। সীমারেখা যতই সুবিহিত সুস্পষ্ট হয় সৃষ্টি ততই সত্য ও সুন্দর হইতে থাকে। আনন্দের স্বভাবই এই, সীমাকে উদ্ভিন্ন করিয়া তোলা।

বিধাতার আনন্দ বিধানের সীমায় সমস্ত সৃষ্টিকে বাঁধিয়া তুলিতেছে। কর্মীর আনন্দ, কবির আনন্দ, শিল্পীর আনন্দ— কেবলই স্ফুটতররূপে সীমা রচনা করিতেছে।

ধর্মও মানুষের মনুষ্যত্বকে তাহার সত্য সীমার মধ্যে স্ফুটতর করিয়া তুলিবার শক্তি। সেই সীমাটি যতই সহজ হয়, যতই সুব্যক্ত হয়, ততই তাহা সুন্দর হইয়া উঠিতে থাকে। মানুষ ততই শক্তি ও স্বাস্থ্য ও ঐশ্বর্য লাভ করে, মানুষের মধ্যে আনন্দ ততই প্রকাশমান হইয়া উঠে।

ধর্মের সাহায্যে মানুষ আপনার সীমা খুঁজিতেছে, অথচ সেই ধর্মের সাহায্যেই মানুষ আপনার অসীমকে খুঁজিতেছে। ইহাই আশ্চর্য। বিশ্বসংসারে সমস্ত পূর্ণতার মূলেই আমরা এই দ্বন্দ্ব দেখিতে পাই। যাহা ছোটো করে তাহাই বড়ো করে, যাহা পৃথক করিয়া দেয় তাহাই এক করিয়া আনে, যাহা বাঁধে তাহাই মুক্তিদান করে; অসীমই সীমাকে সৃষ্টি করে এবং সীমাই অসীমকে প্রকাশ করিতে থাকে। বস্তুত, এই দ্বন্দ্ব যেখানেই সম্পূর্ণরূপে একত্র হইয়া মিলিয়াছে সেইখানেই পূর্ণতা। যেখানে তাহাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়া একটা দিকই প্রবল হইয়া ওঠে সেইখানেই যত অমঙ্গল। অসীম যেখানে সীমাকে ব্যক্ত করে না সেখানে তাহা শূন্য, সীমা যেখানে অসীমকে নির্দেশ করে না সেখানে তাহা নিরর্থক। মুক্তি যেখানে বন্ধনকে অস্বীকার করে সেখানে তাহা উন্মত্ততা, বন্ধন যেখানে মুক্তিকে মানে না সেখানে তাহা উৎপীড়ন। আমাদের দেশে মায়াবাদে সমস্ত সীমাকে মায়া বলিয়াছে। কিন্তু, আসল কথা এই, অসীম হইতে বিযুক্ত সীমাই মায়া। তেমনি ইহাও সত্য, সীমা হইতে বিযুক্ত অসীমও মায়া।

যে গান আপনার সুরের সীমাকে সম্পূর্ণরূপে পাইয়াছে সে গান কেবলমাত্র সুরসমষ্টিকে প্রকাশ করে না— সে আপনার নিয়মের দ্বারাই আনন্দকে, সীমার দ্বারাই সীমার চেয়ে বড়োকে ব্যক্ত করে। গোলাপ-ফুল সম্পূর্ণরূপে আপনার সীমাকে লাভ করিয়াছে বলিয়াই সেই সীমার দ্বারা সে একটি অসীম সৌন্দর্যকে প্রকাশ করিতে থাকে। এই সীমার দ্বারা গোলাপ-ফুল প্রকৃতিরাজ্যে একটি বস্তুবিশেষ, কিন্তু ভাবরাজ্যে আনন্দ। এই সীমাই তাহাকে এক দিকে বাঁধিয়াছে, আর-এক দিকে ছাড়িয়াছে।

এইজন্যই দেখিতে পাই, মানুষের সকল শিক্ষারই মূলে সংযমের সাধনা। মানুষ আপনার চেষ্টাকে সংযত করিতে শিখিলেই তবে চলিতে পারে, ভাবনাকে বাঁধিতে পারিলে তবেই ভাবিতে পারে। সেই কারুকরই সুনিপুণ যে লোক কর্মের সীমাকে অর্থাৎ নিয়মকে সম্পূর্ণরূপে জানিয়াছে এবং মানিয়াছে। সেই লোকই নিজের জীবনকে সুন্দর করিতে পারিয়াছে যে তাহাকে সংযত করিয়াছে। এবং সতী স্ত্রী যেমন সতীত্বের সংযমের দ্বারাই আপনার প্রেমের পূর্ণ চরিতার্থতাকে লাভ করে, তেমনি যে

মানুষ পবিত্রচিত্ত, অর্থাৎ যে আপনার ইচ্ছাকে সত্য সীমায় বাঁধিয়াছে, সেই তাঁহাকে পায় যিনি সাধনার চরম ফল, যিনি পরম আনন্দস্বরূপ।

এই ধর্মকে বন্ধনরূপে দুঃখরূপে স্বীকার করা হইয়াছে; বলা হইয়াছে, ধর্মের পথ শাণিত ক্ষুরধারের মতো দুর্গম। সে পথ যদি অসীমবিস্তৃত হইত তবে সকল মানুষই যেমন-তেমন করিয়া চলিতে পারিত, কাহারও কোথাও কোনো বাধাবিপত্তি থাকিত না। কিন্তু, সে পথ সুনিশ্চিত নিয়মের সীমায় দৃঢ়রূপে আবদ্ধ, এইজন্যই তাহা দুর্গম। ধ্রুবরূপে এই সীমা-অনুসরণের কঠিন দুঃখকে মানুষের গ্রহণ করিতেই হইবে। কারণ, এই দুঃখের দ্বারাই আনন্দ প্রকাশমান হইতেছে। এইজন্যই উপনিষদে আছে, তিনি তপস্যার দুঃখের দ্বারাই এই যাহা-কিছু সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন।

কবি কীট্‌স্‌ বলিয়াছেন, সত্যই সৌন্দর্য এবং সৌন্দর্যই সত্য। সত্যই সীমা, সত্যই নিয়ম, সত্যের দ্বারাই সমস্ত বিধৃত হইয়াছে; এই সত্যের অর্থাৎ সীমার ব্যতিক্রম ঘটিলেই সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অসীমের সৌন্দর্য এই সত্যের সীমার মধ্যে প্রকাশিত।

সীমা ও অসীমতাকে যদি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বরুদ্ধ করিয়া দেখি তবে মানুষের ধর্মসাধনা একেবারেই নিরর্থক হইয়া পড়ে। অসীম যদি সীমার বাহিরে থাকেন তবে জগতে এমন কোনো সেতু নাই যাহার দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে। তবে তিনি আমাদের পক্ষে চিরকালের মতোই মিথ্যা।

কিন্তু মানুষের ধর্ম মানুষকে বলিতেছে, 'তুমি আপনার সীমাকে পাইলেই অসীমকে পাইবে। তুমি মানুষ হও; সেই মানুষ হওয়ার মধ্যেই তোমার অনন্তের সাধনা সফল হইবে।' এইখানেই আমাদের অভয়, আমাদের অমৃত। যে সীমার মধ্যে আমাদের সত্য সেই সীমার মধ্যেই আমাদের চরম পরিপূর্ণতা। এইজন্যই উপনিষৎ বলিয়াছেন, ইনিই ইহার পরমা গতি, ইনিই ইহার পরমা সম্পৎ, ইনিই ইহার পরম আশ্রয়, ইনিই ইহার পরম আনন্দ। অসীমতা এবং সীমা, ইনি এবং এই— একেবারেই কাছাকাছি; দুই পাখি একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন।

আমাদের দেশে ভক্তিতত্ত্বের ভিতরকার কথা এই যে, সীমার সঙ্গে অসীমের যে যোগ তাহা আনন্দের যোগ অর্থাৎ প্রেমের যোগ। অর্থাৎ, সীমাও অসীমের পক্ষে যতখানি অসীমও সীমার পক্ষে ততখানি, উভয়ের উভয়কে নহিলে নয়।

মানুষ কখনো কখনো ঈশ্বরকে দূর স্বর্গরাজ্যে সরাইয়া দিয়াছে। অমনি মানুষের ঈশ্বর ভয়ংকর হইয়া উঠিয়াছে। এবং সেই ভয়ংকরকে বশ করিবার জন্য ভয়গ্রস্ত মানুষ নানা মন্ত্রতন্ত্র আচার-অনুষ্ঠান পুরোহিত ও মধ্যস্থের শরণাপন্ন হইয়াছে। কিন্তু, মানুষ

যখন তাঁহাকে অন্তরতর করিয়া জানিয়াছে তখন তাহার ভয় ঘুচিয়াছে, এবং মধ্যস্থকে সরাইয়া দিয়া প্রেমের যোগে তাঁহার সঙ্গে মিলিতে চাহিয়াছে।

মানুষ কখনো কখনো সীমাকে সকলপ্রকার দুর্নাম দিয়া গালি পাড়িতে থাকে। তখন সে স্বভাবকে পীড়ন করিয়া ও সংসারকে পরিত্যাগ করিয়া, অসম্ভব ব্যায়ামের দ্বারা অসীমের সাধনা করিতে প্রবৃত্ত হয়। মানুষ তখন মনে করে, সীমা জিনিসটা যেন তাহার নিজেরই জিনিস, অতএব তাহার মুখে চুনকালি মাখাইলে সেটা আর-কাহারও গায়ে লাগে না। কিন্তু, মানুষ এই সীমাকে কোথা হইতে পাইল। এই সীমার অসীম রহস্য সে কীই বা জানে। তাহার সাধ্য কী সে এই সীমাকে লঙ্ঘন করে।

মানুষ যখন জানিতে পারে সীমাতেই অসীম, তখনি মানুষ বুঝিতে পারে— এই রহস্যই প্রেমের রহস্য; এই তত্ত্বই সৌন্দর্যতত্ত্ব; এইখানেই মানুষের গৌরব; আর, যিনি মানুষের ভগবান, এই গৌরবেই তাঁহারও গৌরব। সীমাই অসীমের ঐশ্বর্য, সীমাই অসীমের আনন্দ; কেননা সীমার মধ্যেই তিনি আপনাকে দান করিয়াছেন এবং আপনাকে গ্রহণ করিতেছেন।

লণ্ডন

শিক্ষাবিধি

এখানে আসিবার সময় আমার একটা সংকল্প ছিল, এখানকার বিদ্যালয়গুলিকে ভালো করিয়া দেখিয়া-শুনিয়া বুঝিয়া লইব— শিক্ষা সম্বন্ধে এখানকার কোনো ব্যবস্থা আমাদের দেশে খাটে কিনা তাহা দেখিয়া যাইব। সামান্য কিছু দেখিয়াছি, কাগজে পত্রে এখানকার শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনাও পড়িয়াছি। পরীক্ষা নানা প্রকারের চলিতেছে, প্রণালী নানা রকমের উদ্ভাবিত হইতেছে। এক দল বলিতেছে, ছেলেদের শিক্ষা যথাসম্ভব সুখকর হওয়া উচিত; আর-এক দল বলিতেছে, ছেলেদের শিক্ষার মধ্যে দুঃখের ভাগ যথেষ্ট পরিমাণে না থাকিলে তাহাদিগকে সংসারের জন্য পাকা করিয়া মানুষ করা যায় না। এক দল বলিতেছে, চোখে-কানে ভাবে-আভাসে শিক্ষার বিষয়গুলিকে প্রকৃতির মধ্যে শোষণ করিয়া লইবার ব্যবস্থাই উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা; আর-এক দল বলিতেছে, সচেষ্টভাবে নিজের শক্তিকে প্রয়োগ করিয়া সাধনার দ্বারা বিষয়গুলিকে আয়ত্ত করিয়া লওয়াই যথার্থ ফলদায়ক। বস্তুত এ দ্বন্দ্ব কোনোদিনই মিটিবে না— কেননা, মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই এ দ্বন্দ্ব সত্য; সুখও

তাহাকে শিক্ষা দেয়, দুঃখও তাহাকে শিক্ষা দেয়; শাসন নহিলেও তাহার চলে না, স্বাধীনতা নহিলেও তাহার রক্ষা নাই; এক দিকে তাহার পড়িয়া-পাওয়া জিনিসের প্রবেশদ্বার খোলা, আর-এক দিকে তাহার খাটিয়া-আনা জিনিসের আনাগোনার পথ উন্মুক্ত। এ কথা বলা সহজ যে, দুইয়ের মাঝখানের পথটিকে পাকা করিয়া চিহ্নিত করিয়া লও; কিন্তু কার্যত তাহা অসাধ্য। কারণ জীবনের গতি কোনোদিনই একেবারে সোজা রেখায় চলে না— অন্তর-বাহিরের নানা বাধায় ও নানা তাগিদে সে নদীর মতো আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলে, কাটা খালের মতো সিধা পড়িয়া থাকে না; অতএব, তাহার মাঝখানের রেখাটি সোজা রেখা নহে, তাহাকেও কেবলই স্থানপরিবর্তন করিতে হয়। এখন তাহার পক্ষে যাহা মধ্যরেখা আর-একসময় তাহাই তাহার পক্ষে চরম প্রান্তরেখা; এক জাতির পক্ষে যাহা প্রান্তপথ আর-এক জাতির পক্ষে তাহাই মধ্যপথ। নানা অনিবার্য কারণে মানুষের ইতিহাসে কখনো যুদ্ধ আসে, কখনো শান্তি আসে; কখনো ধনসম্পদের জোয়ার আসে, কখনো তাহার ভাঁটার দিন উপস্থিত হয়; কখনো নিজের শক্তিতে সে উন্মত্ত হইয়া উঠে, কখনো নিজের অক্ষমতাবোধে সে অভিভূত হইয়া পড়ে। এমন অবস্থায় মানুষ যখন এক দিকে হেলিয়া পড়িতেছে তখন আর-এক দিকে প্রবল টান দেওয়াই তাহার পক্ষে সংশিক্ষা। মানুষের প্রকৃতি যখন সবলভাবে সজীব থাকে তখন আপনার ভিতর হইতেই একটা সহজ শক্তিতে আপনার ভারসামঞ্জস্যের পথ সে বাছিয়া লয়। যে মানুষের নিজের শরীরের উপর দখল আছে সে যখন এক দিক হইতে ধাক্কা খায় তখন সে স্বভাবতই অন্য দিকে ভর দিয়া আপনাকে সামলাইয়া লয়; কিন্তু, মাতাল একটু ঠেলা খাইলেই কাত হইয়া পড়ে এবং সেই অবস্থাতেই পড়িয়া থাকে। য়ুরোপের ছেলেদের মানুষ করিবার পন্থা আপনা-আপনি পরিবর্তিত হইতেছে। ইহাদের চিত্ত যতই নানা ভাবের জ্ঞানের অভিজ্ঞতার সংস্রবে সচেতন হইয়া উঠিতেছে ততই ইহাদের পথের পরিবর্তন দ্রুত হইতেছে।

অতএব, চিত্তের গতি-অনুসারেই শিক্ষার পথ নির্দেশ করিতে হয়। কিন্তু, যেহেতু গতি বিচিত্র এবং তাহাকে সকলে স্পষ্ট করিয়া চোখে দেখিতে পায় না, এইজন্যই কোনোদিনই কোনো একজন বা একদল লোক এই পথ দৃঢ় করিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে না। নানা লোকের নানা চেষ্টার সমবায়ে আপনিই সহজ পথটি অঙ্কিত হইতে থাকে। এইজন্য সকল জাতির পক্ষেই আপন পরীক্ষার পথ খোলা রাখাই সত্যপথ-আবিষ্কারের একমাত্র পন্থা।

কিন্তু, যে দেশে সামাজিক শিক্ষাশালায় বাঁধা প্রথা হইতে এক-চুল সরিয়া গেলে জাত হারাইতে হয় সে দেশে মানুষ হইবার পক্ষে গোড়াতেই একটা প্রকাণ্ড বাধা।

সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিতেছেই এবং ঘটিবেই, কেহ তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না— অথচ ব্যবস্থাকে সনাতন রেখায় পাকা করিয়া রাখিলে মানুষের পক্ষে তেমন দুর্গতির কারণ আর-কিছুই হইতে পারে না। এ কেমনতরো। যেমন, নদী সরিয়া যাইতেছে কিন্তু বাঁধা ঘাট একই জায়গায় পড়িয়া আছে, খেয়ানৌকার পথ একই জায়গায় নির্দিষ্ট ; সে ঘাট ছাড়া অন্য ঘাটে নামিলে ধোবা নাপিত বন্ধ। সুতরাং ঘাট আছে কিন্তু জল পাই না, নৌকা আছে কিন্তু তাহার চলা বন্ধ।

এমন অবস্থায় আমাদের সমাজ আমাদের কালের উপযোগী শিক্ষা আমাদিগকে দিতেছে না ; আমাদিগকে দুই-চারি হাজার বৎসর পূর্বকালের শিক্ষা দিতেছে। অতএব, মানুষ করিয়া তুলিবার পক্ষে সকলের চেয়ে যে বড়ো বিদ্যালয় সেটা আমাদের বন্ধ। আমাদের বর্তমান কালের দিকে তাকাইয়া আমাদের জীবনযাত্রার প্রতি তাহার কোনো দাবি নাই। একদিন আমাদের ইতিহাসের একটা বিশেষ অবস্থায় আমাদের সমাজ মানুষের কাহাকেও ব্রাহ্মণ, কাহাকেও ক্ষত্রিয়, কাহাকেও বৈশ্য বা শূদ্র হইতে বলিয়াছিল। আমাদের প্রতি তাহার এই একটা কালোপযোগী দাবি ছিল, সুতরাং এই দাবির প্রতি লক্ষ রাখিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা বিচিত্র আকারে আপনিই আপনাকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছিল। কারণ, সৃষ্টির নিয়মই তাই ; একটা মূল ভাবের বীজ জীবনের তাগিদে স্বতই আপন শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া বাড়িয়া ওঠে, বাহির হইতে কেহ ডালপালা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া জুড়িয়া দেয় না। আমাদের বর্তমান সমাজের কোনো সজীব দাবি নাই— এখনো সে মানুষকে বলিতেছে, 'ব্রাহ্মণ হও, শূদ্র হও।' যাহা বলিতেছে তাহা সত্যভাবে পালন করা কোনোমতেই সম্ভবপর নহে, সুতরাং মানুষ তাহাকে কেবলমাত্র বাহিরের দিক হইতে মানিয়া লইতেছে। ব্রাহ্মণ হইবার কালে ব্রহ্মচর্য নাই ; মাথা মুড়াইয়া তিন দিনের প্রহসন-অভিনয়ের পর গলায় সূত্রধারণ আছে। তপস্যার দ্বারা পবিত্র জীবনের শিক্ষা ব্রাহ্মণ এখন আর দান করিতে পারে না, কিন্তু পদধূলিদানের বেলায় সে অসংকোচে মুক্তপদ। এ দিকে জাতিভেদের মূল প্রতিষ্ঠা বৃত্তিভেদ একেবারেই ঘুচিয়া গেছে এবং তাহাকে রক্ষা করাও সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়াছে, অথচ বর্ণভেদের বাহ্য বিধিনিষেধ সমস্তই অচল হইয়া বসিয়া আছে। খাঁচাটাকে তাহার সমস্ত লোহার শিক ও শিকল -সমেত মানিতেই হইবে, অথচ পাখিটা মরিয়া গেছে। দানাপানি নিয়ত জোগাইতেছি অথচ তাহা কোনো প্রাণীর খোরাকে লাগিতেছে না। এমনি করিয়া আমাদের সামাজিক জীবনের সঙ্গে সামাজিক বিধির বিচ্ছেদ ঘটিয়া যাওয়াতে আমরা কেবল যে অনাবশ্যক কালবিরোধী ব্যবস্থার দ্বারা বাধাগ্রস্ত হইয়া আছি তাহা নহে, আমরা সামাজিক সত্যরক্ষা করিতে পারিতেছি না। আমরা

মূল্য দিতেছি ও লইতেছি, অথচ তাহার পরিবর্তে কোনো সত্যবস্তু নাই। শিষ্য গুরুকে প্রণাম করিয়া দক্ষিণা চুকাইয়া দিতেছে, কিন্তু গুরু শিষ্যকে গুরুর দেনা শোধ করিবার চেষ্টামাত্র করিতেছে না; এবং গুরু পুরাকালের বিস্মৃত ভাষায় শিষ্যকে উপদেশ দিতেছে, শিষ্যের তাহা গ্রহণ করিবার মতো শ্রদ্ধাও নাই, সাধ্যও নাই, ইচ্ছাও নাই। ইহার ফল হইতেছে এই, সত্যবস্তুর যে কোনো প্রয়োজন আছে এই বিশ্বাসটাই আমরা ক্রমশ হারাইতেছি। এই কথা স্বীকার করিতে আমরা লেশমাত্র লজ্জাও বোধ করি না যে, বাহিরের ঠাট বজায় রাখিয়া গেলেই যথেষ্ট। এমন-কি, এ কথা বলিতেও আমাদের বাধে না যে, ব্যবহারতঃ যথেচ্ছাচার করো কিন্তু প্রকাশ্যতঃ তাহা কবুল না করিলে কোনো ক্ষতি নাই। এমনতরো মিথ্যাচার মানুষকে দায়ে পড়িয়া অবলম্বন করিতে হয়। কারণ, যখন তোমার শ্রদ্ধা অন্য পথে গিয়াছে তখনো সমাজ যদি কঠোর শাসনে আচারকে একই জায়গায় বাঁধিয়া রাখে, তাহা হইলে সমাজের পনেরো-আনা লোক মিথ্যাচারকে অবলম্বন করিতে লজ্জা বোধ করে না। কারণ, মানুষের মধ্যে বীরপুরুষের সংখ্যা অল্প, অতএব সত্যকে প্রকাশ্যে স্বীকার করিবার দণ্ড যেখানে অসহ্যরূপে অতিমাত্র সেখানে কপটতাকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করা আর চলে না। এইজন্য আমাদের দেশে এই একটা অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যহই দেখা যায়, মানুষ একটা জিনিসকে ভালো বলিয়া স্বীকার করিতে অনায়াসে পারে অথচ সেই মুহূর্তেই অম্লানবদনে বলিতে পারে যে 'সামাজিক ব্যবহারে ইহা আমি পালন করিতে পারিব না'। আমরাও এই মিথ্যাচারকে ক্ষমা করি যখন চিন্তা করিয়া দেখি, এ সমাজে নিজের সত্য বিশ্বাসকে কাজে খাটাইবার মাশুল কত অসাধ্যরূপে অতিরিক্ত।

অতএব, সমাজ যেখানে জীবনপ্রবাহের সহিত আপন স্বাস্থ্যকর সামঞ্জস্যের পথ একেবারেই খোলা রাখে নাই, সুতরাং পুরাতনকালের ব্যবস্থা যেখানে পদে পদে বাধাস্বরূপ হইয়া তাহাকে বদ্ধ করিয়া তুলিতেছে, সেখানে মানুষের যে শিক্ষাশালা সকলের চেয়ে স্বাভাবিক ও প্রশস্ত সেটা যে আমাদের পক্ষে নাই তাহা নহে; তাহা তদপেক্ষা ভয়ংকর, তাহা আছে অথচ নাই, তাহা সত্যকে পথ ছাড়িয়া দেয় না এবং মিথ্যাকে জমাইয়া রাখে। এ সমাজ গতিকে একেবারেই স্বীকার করিতে চায় না বলিয়া স্থিতিকে কলুষিত করিয়া তোলে।

সামাজিক বিদ্যালয়ের তো এই বদ্ধ দশা, তাহার পরে রাজকীয় বিদ্যালয়। সেও একটা প্রকাণ্ড ছাঁচে-ঢালা ব্যাপার। দেশের সমস্ত শিক্ষাবিধিকে সে এক ছাঁচে শক্ত করিয়া জমাইয়া দিবে, ইহাই তাহার একমাত্র চেষ্টা। পাছে দেশ আপনার স্বতন্ত্র প্রণালী আপনি উদ্ভাবিত করিতে চায়, ইহাই তাহার সবচেয়ে ভয়ের বিষয়। দেশের

মনঃপ্রকৃতিতে একাধিপত্য বিস্তার করিয়া সে আপনার আইন খাটাইবে, ইহাই তাহার মৎলব। সুতরাং এই বৃহৎ বিস্তার কল কেরানিগিরির কল হইয়া উঠিতেছে। মানুষ এখানে নোটের ছুড়ি কুড়াইয়া ডিগ্রির বস্তা বোঝাই করিয়া তুলিতেছে, কিন্তু তাহা জীবনের খাদ্য নহে। তাহার গৌরব কেবল বোঝাইয়ের গৌরব, তাহা প্রাণের গৌরব নহে।

সামাজিক বিদ্যালয়ের পুরাতন শিকল এবং রাজকীয় বিদ্যালয়ের নূতন শিকল দুইই আমাদের মনকে যে পরিমাণে বাঁধিতেছে সে পরিমাণে মুক্তি দিতেছে না। ইহাই আমাদের একমাত্র সমস্যা। নতুবা নূতন প্রণালীতে কেমন করিয়া ইতিহাস মুখস্থ সহজ হইয়াছে বা অঙ্ক কষা মনোরম হইয়াছে, সেটাকে আমি বিশেষ খাতির করিতে চাই না। কেননা আমি জানি, আমরা যখন প্রণালীকে খুঁজি তখন একটা অসাধ্য শস্তা পথ খুঁজি। মনে করি, উপযুক্ত মানুষকে যখন নিয়মিত ভাবে পাওয়া শক্ত তখন বাঁধা প্রণালীর দ্বারা সেই অভাব পূরণ করা যায় কি না। মানুষ বারবার সেই চেষ্টা করিয়া বারবারই অকৃতকার্য হইয়াছে এবং বিপদে পড়িয়াছে। ঘুরিয়া ফিরিয়া যেমন করিয়াই চলি-না কেন শেষকালে এই অলঙ্ঘ্য সত্যে আসিয়া ঠেকিতেই হয় যে, শিক্ষকের দ্বারাই শিক্ষাবিধান হয়, প্রণালীর দ্বারা হয় না। মানুষের মন চলনশীল, এবং চলনশীল মনই তাহাকে বুঝিতে পারে। এ দেশেও পুরাকাল হইতে আজ পর্যন্ত এক-একজন বিখ্যাত শিক্ষক জন্মিয়াছেন; তাঁহারাই ভগীরথের মতো শিক্ষার পুণ্যস্রোতকে আকর্ষণ করিয়া সংসারের পাপের বোঝা হ্রাস করিয়াছেন ও মৃত্যুর জড়তা দূর করিয়াছেন। তাঁহারাই শিক্ষাসম্বন্ধীয় সমস্ত বাঁধা বিধানের বাধার ভিতর দিয়াও ছাত্রদের মনে প্রাণপ্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। আমাদের দেশেও ইংরেজি শিক্ষার আরম্ভদিনের কথা স্মরণ করিয়া দেখো। ডিরোজিয়ো, কাপ্তেন রিচার্ড্‌সন, ডেভিড হেয়ার, ইহারা শিক্ষক ছিলেন; শিক্ষার ছাঁচ ছিলেন না, নোটের বোঝার বাহন ছিলেন না। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যূহ এমন ভয়ংকর পাকা ছিল না; তখন তাহার মধ্যে আলো এবং হাওয়া-প্রবেশের উপায় ছিল; তখন নিয়মের ফাঁকে শিক্ষক আপন আসন পাতিবার স্থান করিয়া লইতে পারিতেন।

যেমন করিয়া হউক, আমাদের দেশে বিদ্যার ক্ষেত্রকে প্রাচীরমুক্ত করিতেই হইবে। রাজনৈতিক আন্দোলন প্রভৃতি বাহ্য পন্থায় আমরা আমাদের চেষ্টাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়া বিশেষ কোনো ফল পাইতেছি না। সেই শক্তিকে ও উদ্যমকে সফলতার পথে প্রবাহিত করিয়া স্বাধীনভাবে দেশকে শিক্ষাদানের ভার আমাদের নিজেকে লইতে হইবে। দেশের কাজে যাঁহারা আত্মসমর্পণ করিতে চান এইটেই তাঁহাদের সবচেয়ে

প্রধান কাজ। নানা শিক্ষকের নানা পরীক্ষার ভিতর দিয়া আমাদের দেশের শিক্ষার স্রোতকে সচল করিয়া তুলিতে পারিলে তবেই তাহা আমাদের দেশের স্বাভাবিক সামগ্রী হইয়া উঠিবে। তবেই আমরা স্থানে স্থানে ও ক্ষণে ক্ষণে যথার্থ শিক্ষকের দেখা পাইব। তবেই স্বভাবের নিয়মে শিক্ষকপরম্পরা আপনি জাগিয়া উঠিতে থাকিবে। 'জাতীয়' নামের দ্বারা চিহ্নিত করিয়া আমরা কোনো-একটা বিশেষ শিক্ষাবিধিকে উদ্ভাবিত করিয়া তুলিতে পারি না। যে শিক্ষা স্বজাতির নানা লোকের নানা চেষ্টার দ্বারা নানা ভাবে চালিত হইতেছে তাহাকেই জাতীয় বলিতে পারি। স্বজাতীয়ের শাসনেই হউক আর বিজাতীয়ের শাসনে হউক, যখন কোনো-একটা বিশেষ শিক্ষাবিধি সমস্ত দেশকে একটা-কোনো ধ্রুব আদর্শে বাঁধিয়া ফেলিতে চায় তখন তাহাকে জাতীয় বলিতে পারিব না— তাহা সাম্প্রদায়িক, অতএব জাতির পক্ষে তাহা সাংঘাতিক।

শিক্ষা সম্বন্ধে একটা মহৎ সত্য আমরা শিখিয়াছিলাম। আমরা জানিয়াছিলাম, মানুষ মানুষের কাছ হইতেই শিখিতে পারে; যেমন জলের দ্বারাই জলাশয় পূর্ণ হয়, শিখার দ্বারাই শিখা জ্বলিয়া উঠে, প্রাণের দ্বারাই প্রাণ সঞ্চারিত হইয়া থাকে। মানুষকে ছাঁটিয়া ফেলিলেই সে তখন আর মানুষ থাকে না— সে তখন আপিস-আদালতের বা কল-কারখানার প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইয়া উঠে; তখনি সে মানুষ না হইয়া মাস্টারমশায় হইতে চায়; তখনি সে আর প্রাণ দিতে পারে না, কেবল পাঠ দিয়া যায়। গুরুশিষ্যের পরিপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই শিক্ষাকার্য সজীবদেহের শোণিতস্রোতের মতো চলাচল করিতে পারে। কারণ, শিশুদের পালন ও শিক্ষণের যথার্থ ভার পিতা-মাতার উপর। কিন্তু, পিতামাতার সে যোগ্যতা অথবা সুবিধা না থাকাতেই, অন্য উপযুক্ত লোকের সহায়তা অত্যাবশ্যক হইয়া ওঠে। এমন অবস্থায় গুরুকে পিতামাতা না হইলে চলে না। আমরা জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিসকে টাকা দিয়া কিনিয়া বা আংশিক ভাবে গ্রহণ করিতে পারি না; তাহা স্নেহ প্রেম ভক্তির দ্বারাই আমরা আত্মসাৎ করিতে পারি; তাহাই মনুষ্যত্বের পাকযন্ত্রের জারক রস; তাহাই জৈব সামগ্রীকে জীবনের সঙ্গে সম্মিলিত করিতে পারে। বর্তমান কালে আমাদের দেশের শিক্ষায় সেই গুরুর জীবনই সকলের চেয়ে অত্যাবশ্যক হইয়াছে। শিশুবয়সে নির্জীব শিক্ষার মতো ভয়ংকর ভার আর-কিছুই নাই; তাহা মনকে যতটা দেয় তাহার চেয়ে পিষিয়া বাহির করে অনেক বেশি। আমাদের সমাজব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের জীবনকে গতিদান করিবেন; আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের চিত্তের গতিপথকে বাধামুক্ত করিবেন। যেমন করিয়া

হউক, সকল দিকেই আমরা মানুষকে চাই ; তাহার পরিবর্তে প্রণালীর বটিকা গিলাইয়া কোনো কবিরাজ আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না।

চ্যাল্‌ফোর্ড্‌
৩১ শ্রাবণ ১৩১৯

লক্ষ্য ও শিক্ষা

আমার কোনো-এক বন্ধু[১] ফলিত জ্যোতিষ লইয়া আলোচনা করেন। তিনি একবার আমাকে বলিয়াছিলেন যে-সব মানুষ বিশেষ কিছুই নহে, যাহাদের জীবনে হাঁ এবং না জিনিসটা খুব স্পষ্ট করিয়া দাগা নাই, জ্যোতিষের গণনা তাহাদের সম্বন্ধে ঠিক দিশা পায় না। তাহাদের সম্বন্ধে শুভগ্রহ ও অশুভগ্রহের ফল কী তাহা হিসাবের মধ্যে আনা কঠিন। বাতাস যখন জোরে বহে তখন পালের জাহাজ হুহু করিয়া দুই দিনের রাস্তা এক দিনে চলিয়া যাইবে, এ কথা বলিতে সময় লাগে না ; কিন্তু, কাগজের নৌকাটা এলোমেলো ঘুরিতে থাকিবে কি ডুবিয়া যাইবে, কি কী হইবে তাহা বলা যায় না— যাহার বিশেষ কোনো-একটা বন্দর নাই তাহার অতীতই বা কী আর ভবিষ্যৎই বা কী। সে কিসের জন্য প্রতীক্ষা করিবে, কিসের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিবে। তাহার আশা-তাপমানযন্ত্রে দুরাশার উচ্চতম রেখা অন্য দেশের নৈরাশ্যরেখার কাছাকাছি।

আমাদের দেশের বর্তমান সমাজে এই অবস্থাটাই সবচেয়ে সাংঘাতিক অবস্থা। আমাদের জীবনে সুস্পষ্টতা নাই। আমরা যে কী হইতে পারি, কতদূর আশা করিতে পারি, তাহা বেশ মোটা লাইনে বড়ো রেখায় দেশের কোথাও আঁকা নাই। আশা করিবার অধিকারই মানুষের শক্তিকে প্রবল করিয়া তোলে। প্রকৃতির গৃহিণীপনায় শক্তির অপব্যয় ঘটিতে পারে না, এইজন্য আশা যেখানে নাই শক্তি সেখান হইতে বিদায় গ্রহণ করে। বিজ্ঞানশাস্ত্রে বলে, চক্ষুমান প্রাণীরা যখন দীর্ঘকাল গুহাবাসী হইয়া থাকে তখন তাহারা দৃষ্টিশক্তি হারায়। আলোক থাকিবে না অথচ দৃষ্টি থাকিবে এই অসংগতি যেমন প্রকৃতি সহিতে পারে না, তেমনি আশা নাই অথচ শক্তি আছে ইহাও প্রকৃতির পক্ষে অসহ্য। এইজন্য বিপদের মুখে পলায়নের যখন উপায় নাই, পলায়নের শক্তিও তখন আড়ষ্ট হইয়া পড়ে।

১ প্রিয়নাথ সেন। 'প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি' গ্রন্থের "ফলিত জ্যোতিষ" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

এই কারণে দেখা যায়, আশা করিবার ক্ষেত্র বড়ো হইলেই মানুষের শক্তিও বড়ো হইয়া বাড়িয়া ওঠে। শক্তি তখন স্পষ্ট করিয়া পথ দেখিতে পায় এবং জোর করিয়া পা ফেলিয়া চলে। কোনো সমাজ সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস যাহা মানুষকে দিতে পারে তাহা সকলের চেয়ে বড়ো আশা। সেই আশার পূর্ণ সফলতা সমাজের প্রত্যেক লোকেই যে পায় তাহা নহে; কিন্তু নিজের গোচরে এবং অগোচরে সেই আশার অভিমুখে সর্বদাই একটা তাগিদ থাকে বলিয়াই প্রত্যেকের শক্তি তাহার নিজের সাধ্যের শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে। একটা জাতির পক্ষে সেইটেই সকলের চেয়ে মস্ত কথা। লোকসংখ্যার কোনো মূল্য নাই— কিন্তু, সমাজে যতগুলি লোক আছে তাহাদের অধিকাংশের যথাসম্ভব শক্তিসম্পদ কাজে খাটিতেছে, মাটিতে পোঁতা নাই, ইহাই সমৃদ্ধি। শক্তি যেখানে গতিশীল হইয়া আছে সেইখানেই মঙ্গল, ধন যেখানে সজীব হইয়া খাটিতেছে সেইখানেই ঐশ্বর্য।

এই পাশ্চাত্যদেশে লক্ষ্যবেধের আহ্বান সকলেই শুনিতে পাইয়াছে; মোটের উপর সকলেই জানে সে কী চায়; এইজন্য সকলেই আপনার ধনুক বাণ লইয়া প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। যজ্ঞসম্ভবা যাজ্ঞসেনীকে পাইবে, এই আশায় যে লক্ষ্য বহু উচ্চে ঝুলিতেছে তাহাকে বিদ্ধ করিতে সকলেই পণ করিয়াছে। এই লক্ষ্যবেধের নিমন্ত্রণ আমরা পাই নাই। এইজন্য কী পাইতে হইবে সে বিষয়ে অধিক চিন্তা করা আমাদের পক্ষে অনাবশ্যক এবং কোথায় যাইতে হইবে তাহাও আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট করিয়া নির্দিষ্ট নাই।

এইজন্য যখন এমনতরো প্রশ্ন শুনি 'আমরা কী শিখিব— কেমন করিয়া শিখিব— শিক্ষার কোন্ প্রণালী কোথায় কী ভাবে কাজ করিতেছে'— তখন আমার এই কথাই মনে হয়, শিক্ষা জিনিসটা তো জীবনের সঙ্গে সংগতিহীন একটা কৃত্রিম জিনিস নহে। আমরা কী হইব এবং আমরা কী শিখিব, এই দুটা কথা একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন। পাত্র যত বড়ো জল তাহার চেয়ে বেশি ধরে না।

চাহিবার জিনিস আমাদের বেশি কিছু নাই। সমাজ আমাদিগকে কোনো বড়ো ডাক ডাকিতেছে না, কোনো বড়ো ত্যাগে টানিতেছে না— ওঠা-বসা খাওয়া-ছোঁওয়ার কতকগুলা কৃত্রিম নিরর্থক নিয়মপালন ছাড়া আমাদের কাছ হইতে সে আর-কোনো বিষয়ে কোনো কৈফিয়ত চায় না। রাজশক্তিও আমাদের জীবনের সম্মুখে কোনো বৃহৎ সঞ্চরণের ক্ষেত্র অবারিত করিয়া দেয় নাই; সেখানকার কাঁটার বেড়াটুকুর মধ্যে আমরা যেটুকু আশা করিতে পারি তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, এবং সেই বেড়ার ছিদ্র দিয়া আমরা যেটুকু দেখিতে পাই তাহাও অতি যৎসামান্য।

জীবনের ক্ষেত্রকে বড়ো করিয়া দেখিতে পাই না বলিয়াই জীবনকে বড়ো করিয়া তোলা এবং বড়ো করিয়া উৎসর্গ করিবার কথা আমাদের স্বভাবতঃ মনেই আসে না। সে সম্বন্ধে যেটুকু চিন্তা করিতে যাই তাহা পুঁথিগত চিন্তা, যেটুকু কাজ করিতে যাই সেটুকু অন্যের অনুকরণ। আমাদের আরও বিপদ এই যে, যাহারা আমাদের খাঁচার দরজা এক মুহূর্তের জন্য খুলিয়া দেয় না তাহারাই রাত্রিদিন বলে, 'তোমাদের উড়িবার শক্তি নাই।' পাখির ছানা তো বি. এ. পাস করিয়া উড়িতে শেখে না; উড়িতে পায় বলিয়াই উড়িতে শেখে। সে তাহার স্বজনসমাজের সকলকেই উড়িতে দেখে; সে নিশ্চয় জানে, তাহাকে উড়িতেই হইবে। উড়িতে পারা যে সম্ভব, এ সম্বন্ধে কোনোদিন তাহার মনে সন্দেহ আসিয়া তাহাকে দুর্বল করিয়া দেয় না। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, অপরে আমাদের শক্তি সম্বন্ধে সর্বদা সন্দেহ প্রকাশ করে বলিয়াই, এবং সেই সন্দেহকে মিথ্যা প্রমাণ করিবার কোনো ক্ষেত্র পাই না বলিয়াই, অন্তরে অন্তরে নিজের সম্বন্ধেও একটা সন্দেহ বদ্ধমূল হইয়া যায়। এমনি করিয়া আপনার প্রতি যে লোক বিশ্বাস হারায় সে কোনো বড়ো নদী পাড়ি দিবার চেষ্টা পর্যন্তও করিতে পারে না; অতি ক্ষুদ্র সীমানার মধ্যে ডাঙার কাছে কাছে সে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং তাহাতেই সে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট থাকে এবং যেদিন সে কোনো গতিকে বাগবাজার হইতে বরানগর পর্যন্ত উজান ঠেলিয়া যাইতে পারে সেদিন সে মনে করে, 'আমি অবিকল কলম্বসের সমতুল্য কীর্তি করিয়াছি।'

তুমি কেরানির চেয়ে বড়ো, ডেপুটি-মুন্সেফের চেয়ে বড়ো, তুমি যাহা শিক্ষা করিতেছ তাহা হাউইয়ের মতো কোনোক্রমে ইস্কুল-মাস্টারি পর্যন্ত উড়িয়া তাহার পর পেন্সনভোগী জরাজীর্ণতার মধ্যে ছাই হইয়া মাটিতে আসিয়া পড়িবার জন্য নহে, এই মন্ত্রটি জপ করিতে দেওয়ার শিক্ষাই আমাদের দেশে সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা— এই কথাটা আমাদের নিশিদিন মনে রাখিতে হইবে। এইটে বুঝিতে না পারার মূঢ়তাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো মূঢ়তা। আমাদের সমাজে এ কথা আমাদিগকে বোঝায় না, আমাদের ইস্কুলেও এ শিক্ষা নাই।

কিন্তু, যদি কেহ মনে করেন তবে বুঝি দেশের সম্বন্ধে আমি হতাশ হইয়া পড়িয়াছি, তবে তিনি ভুল বুঝিবেন। আমরা কোথায় আছি, কোন্ দিকে চলিতেছি, তাহা সুস্পষ্ট করিয়া জানা চাই। সে জানাটা যতই অপ্রিয় হউক তবু সেটা সর্বাগ্রে আবশ্যক। আমরা এ পর্যন্ত বারবার নিজের দুর্গতি সম্বন্ধে নিজেকে কোনোমতে ভুলাইয়া আরাম পাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এ কথা বলিয়া কোনো লাভ নাই, মানুষকে মানুষ করিয়া তুলিবার পক্ষে আমাদের সনাতন সমাজ বিশ্বসংসারে সকল সমাজের সেরা। এতবড়ো

একটা অদ্ভুত অত্যুক্তি যাহা মানবের ইতিহাসে প্রত্যক্ষতই প্রত্যহ আপনাকে অপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে, তাহাকে আড়ম্বর-সহকারে ঘোষণা করা নিশ্চেষ্টতার গায়ের-জোরি কৈফিয়ত— যে লোক কোনোমতেই কিছু করিবে না এবং নড়িবে না সে এমনি করিয়াই আপনার কাছে ও অন্যের কাছে আপনার লজ্জা রক্ষা করিতে চায়। গোড়াতেই নিজের এই মোহটাকে কঠিন আঘাতে ছিন্ন করিয়া ফেলা চাই। বিষফোড়ার চিকিৎসক যখন অস্ত্রাঘাত করে তখন সেই ক্ষত আপনার আঘাতের মুখকে কেবলই ঢাকিয়া ফেলিতে চায়; কিন্তু সুচিকিৎসক ফোড়ার সেই চেষ্টাকে আমল দেয় না, যতদিন না আরোগ্যের লক্ষণ দেখা দেয় ততদিন প্রত্যহই ক্ষতমুখ খুলিয়া রাখে। আমাদের দেশের প্রকাণ্ড বিষফোড়া বিধাতার কাছ হইতে মস্ত একটা অস্ত্রাঘাত পাইয়াছে; এই বেদনা তাহার প্রাপ্য; কিন্তু প্রতিদিন ইহাকে সে ফাঁকি দিয়া ঢাকিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। সে আপনার অপমানকে মিথ্যা করিয়া লুকাইতে গিয়া সেই অপমানের ফোড়াকে চিরস্থায়ী করিয়া পুষিয়া রাখিবার উদ্যোগ করিতেছে। কিন্তু যতবার সে ঢাকিবে চিকিৎসকের অস্ত্রাঘাত ততবারই তাহার সেই মিথ্যা অভিমানকে বিদীর্ণ করিয়া দিবে। এ কথা তাহাকে একদিন সুস্পষ্ট করিয়া স্বীকার করিতেই হইবে, ফোড়াটা তাহার বাহিরের জোড়া-দেওয়া আকস্মিক জিনিস নহে; ইহা তাহার ভিতরকারই ব্যাধি। দোষ বাহিরের নহে, তাহার রক্ত দূষিত হইয়াছে; নহিলে এমন সাংঘাতিক দুর্বলতা, এমন মোহাবিষ্ট জড়তা মানুষকে এত দীর্ঘকাল এমন করিয়া সকল বিষয়ে পরাভূত করিয়া রাখিতে পারে না। আমাদের নিজের সমাজই আমাদের নিজের মনুষ্যত্বকে পীড়িত করিয়াছে, ইহার বুদ্ধিকে ও শক্তিকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে, সেইজন্যই সে সংসারে কোনোমতেই পারিয়া উঠিতেছে না। এই আপনার সম্বন্ধে আপনার মোহকে জোরের সঙ্গে স্পষ্ট করিয়া ভাঙিতে দেওয়া নৈরাশ্য ও নিশ্চেষ্টতার লক্ষণ নহে। ইহাই চেষ্টার পথকে মুক্তি দিবার উপায় এবং মিথ্যা আশার বাসা ভাঙিয়া দেওয়াই নৈরাশ্যকে যথার্থভাবে নির্বংশ করিবার পন্থা।

আমার বলিবার কথা এই, শিক্ষা কোনো দেশেই সম্পূর্ণতঃ ইস্কুল হইতে হয় না, এবং আমাদের দেশেও হইতেছে না। পরিপাকশক্তি ময়রার দোকানে তৈরি হয় না, খাদ্যই তৈরি হয়। মানুষের শক্তি যেখানে বৃহৎভাবে উদ্যমশীল সেইখানেই তাহার বিদ্যা তাহার প্রকৃতির সঙ্গে মেশে। আমাদের জীবনের চালনা হইতেছে না বলিয়াই আমাদের পুঁথির বিদ্যাকে আমাদের প্রাণের মধ্যে আয়ত্ত করিতে পারিতেছি না।

এ কথা মনে উদয় হইতে পারে, তবে আর আমাদের আশা কোথায়। কারণ, জীবনের চালনাক্ষেত্র তো সম্পূর্ণ আমাদের হাতে নাই ; পরাধীন জাতির কাছে তো শক্তির দ্বার খোলা থাকিতে পারে না।

এ কথা সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। বস্তুত, শক্তির ক্ষেত্র সকল জাতির পক্ষেই কোনো না কোনো দিকে সীমাবদ্ধ। সর্বত্রই অন্তরপ্রকৃতি এবং বাহিরের অবস্থা উভয়ে মিলিয়া আপোষে আপনার ক্ষেত্রকে নির্দিষ্ট করিয়া লয়। এই সীমানির্দিষ্ট ক্ষেত্রই সকলের পক্ষে দরকারি ; কারণ, শক্তিকে বিক্ষিপ্ত করা শক্তিকে ব্যবহার করা নহে। কোনো দেশেই অনুকূল অবস্থা মানুষকে অবারিত স্বাধীনতা দেয় না, কারণ তাহা ব্যর্থতা। ভাগ্য আমাদিগকে যাহা দেয় তাহা ভাগ করিয়াই দেয়— এক দিকে যাহার ভাগে বেশি পড়ে অন্য দিকে তাহার কিছু না কিছু কম পড়িবেই।

অতএব, কী পাইলাম সেটা মানুষের পক্ষে তত বড়ো কথা নয়, সেটাকে কেমন ভাবে গ্রহণ ও ব্যবহার করিব সেইটে যত বড়ো। সামাজিক বা মানসিক যে-কোনো ব্যবস্থায় সেই গ্রহণের শক্তিকে বাধা দেয়, সেই ব্যবহারের শক্তিকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে, তাহাই সর্বনাশের মূল। মানুষ যেখানে কোনো জিনিসকেই পরখ করিয়া লইতে দেয় না, ছোটো বড়ো সকল জিনিসকেই বাঁধা বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতে ও বাঁধা নিয়মের দ্বারা ব্যবহার করিতে বলে, সেখানে অবস্থা যতই অনুকূল হউক-না কেন মনুষ্যত্বকে শীর্ণ হইতেই হইবে। আমাদের অবস্থার সংকীর্ণতা লইয়া আমরা আক্ষেপ করিয়া থাকি, কিন্তু আমাদের অবস্থা যে যথার্থতঃ কী তাহা আমরা জানিই না ; তাহাকে আমরা সকল দিকে পরখ করিয়া দেখি নাই, সেই পরখ করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তিকেই আমরা অপরাধ বলিয়া সর্বাগ্রে দড়িদড়া দিয়া বাঁধিয়াছি ; মানবপ্রকৃতির উপর ভরসা নাই বলিয়া এ কথা একেবারে ভুলিয়া বসিয়াছি যে, মানুষকে ভুল করিতে না দিলে মানুষকে শিক্ষা করিতে দেওয়া হয় না। মানুষকে সাহস করিয়া ভালো হইয়া উঠিবার প্রশস্ত অধিকার দিব না, তাহাকে সনাতন নিয়মে সকল দিকেই খর্ব করিয়া ভালো-মানুষির জেলখানায় চিরজীবন কারাদণ্ড বিধান করিয়া রাখিব, এমনতরো যাহাদের ব্যবস্থা, তাহারা যতক্ষণ নিজের বেড়ি নিজে খুলিয়া না ফেলিবে এবং বেড়িটাকেই নিজের হাত পায়ের চেয়ে পবিত্র ও পরম ধন বলিয়া পূজা করা পরিত্যাগ না করিবে, ততক্ষণ ভাগ্যবিধাতার কোনো বদান্যতায় তাহাদের কোনো স্থায়ী উপকার হইতে পারিবে না।

নিজের অবস্থাকে নিজের শক্তির চেয়ে প্রবল বলিয়া গণ্য করিবার মতো দীনতা আর-কিছু নাই। মানুষের আকাঙ্ক্ষার বেগকে তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থ, ব্যক্তিগত ভোগ,

ব্যক্তিগত মুক্তির ক্ষুদ্র প্রলুব্ধতা হইতে উপরের দিকে জাগাইয়া তুলিতে পারিলেই, তাহার এমন কোনো বাহ্য অবস্থাই নাই যাহার মধ্য হইতে সে বাড়িয়া উঠিতে পারে না; এমন-কি, সে অবস্থায় বাহিরের দারিদ্র্যই তাহাকে বড়ো হইয়া উঠিবার দিকে সাহায্য করে। কাঁঠাল-গাছকে দ্রুতবেগে বাড়াইয়া তুলিবার জন্য আমাদের দেশে তাহার চারাকে বাঁশের চোঙের মধ্যে ঘিরিয়া বাঁধিয়া রাখে। সে চারা আশেপাশে ডালপালা ছড়াইতে পারে না, এইজন্য কোনোমতে চোঙের বেড়াকে ছাড়াইয়া আলোকে উঠিবার জন্য সে আপনার শক্তিকে একাগ্রভাবে চালনা করে এবং সিধা হইয়া আপন বন্ধনকে লঙ্ঘন করে। কিন্তু, সেই চারাটির মজ্জার মধ্যে এই দুর্নিবার বেগটি সজীব থাকা চাই যে, 'আমাকে উঠিতেই হইবে, বাড়িতেই হইবে। আলোককে যদি পাশেই না পাই তবে তাহাকে উপরে খুঁজিতে বাহির হইব, মুক্তিকে যদি এক দিকে না পাই তবে তাহাকে অন্য দিকে লাভ করিবার জন্য চেষ্টা ছাড়িব না।' 'চেষ্টা করাই অপরাধ— যেমন আছি তেমনিই থাকিব' কোনো প্রাণবান জিনিস এমন কথা যখন বলে তখন তাহার পক্ষে বাঁশের চোঙও যেমন অনন্ত আকাশও তেমনি।

মানুষের সকলের চেয়ে যাহা পরম আশার সামগ্রী তাহা কখনো অসাধ্য হইতে পারে না, এ বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ় আছে। আমাদের জাতির মুক্তি যদি পার্শ্বের দিকে না থাকে তবে উপরের দিকে আছেই, এ কথা একমুহূর্ত ভুলিলে চলিবে না। ডালপালা ছড়াইয়া পাশের দিকের বাড়টাকেই আমরা চারি দিকে দেখিতেছি, এইজন্য সেইটেকেই একমাত্র পরমার্থ বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছি; কিন্তু, উচ্চের দিকের গতিও জীবনের গতি, সেখানেও সার্থকতার ফল সম্পূর্ণ হইয়াই ফলে। আসল কথা, এক দিকে হউক বা আর-এক দিকে হউক, ভূমার আকর্ষণকে স্বীকার করিতেই হইবে; আমাদিগকে বড়ো হইতে হইবে, আরও বড়ো হইতে হইবে। সেই বাণী আমাদিগকে কান পাতিয়া শুনিতে হইবে যাহা আমাদিগকে কোণের বাহির করে, যাহা আমাদিগকে অনায়াসে আত্মত্যাগ করিতে শক্তি দেয়, যাহা কেবলমাত্র আপিসের দেয়াল ও চাকরির খাঁচাটুকুর মধ্যে আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে বদ্ধ করিয়া রাখে না। আমাদের জাতীয় জীবনে সেই বেগ যখন সঞ্চারিত হইবে, সেই শক্তি যখন প্রবল হইয়া উঠিবে, তখন প্রতি মুহূর্তেই আমাদের অবস্থাকে আমরা অতিক্রম করিতে থাকিব; তখন আমাদের বাহ্য অবস্থার কোনো সংকোচ আমাদিগকে কিছুমাত্র লজ্জা দিতে পারিবে না।

বর্তমানের ইতিহাসকে সুনির্দিষ্ট করিয়া দেখা যায় না; এইজন্য যখন আলোক আসন্ন তখনো অন্ধকারকে চিরন্তন বলিয়া ভয় হয়। কিন্তু, আমি তো স্পষ্টই মনে করি, আমাদের চিত্তের মধ্যে একটা চেতনার অভিঘাত আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইহার

বেগ ক্রমশই আপনার কাজ করিতে থাকিবে, কখনোই আমাদিগকে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে দিবে না। আমাদের প্রাণশক্তি কোনোমতেই মরিবে না, যে দিক দিয়া হউক তাহাকে বাঁচিতেই হইবে; সেই আমাদের দুর্জয় প্রাণচেষ্টা যেখানে একটু ছিদ্র পাইতেছে সেইখান দিয়াই এখনি আমাদিগকে আলোকের অভিমুখে ঠেলিয়া তুলিতেছে। মানুষের সম্মুখে যে পথ সর্বাপেক্ষা উন্মুক্ত বলিয়াই মানুষ যে পথ ভুলিয়া থাকে, রাজা যে পথে বাধা দিতে পারে না এবং দারিদ্র্য যে পথের পাথেয় হরণ করিতে অক্ষম, স্পষ্ট দেখিতেছি, সেই ধর্মের পথ আমাদের এই সর্বত্রপ্রতিহত চিত্তকে মুক্তির দিকে টানিতেছে। আমাদের দেশে এই পথযাত্রার আহ্বান বারম্বার নানা দিক হইতে নানা কণ্ঠে জাগিয়া উঠিতেছে। এই ধর্মবোধের জাগরণের মতো এত বড়ো জাগরণ জগতে আর-কিছু নাই, ইহাই মূককে কথা বলায়, পঙ্গুকে পর্বত লঙ্ঘন করায়। ইহা আমাদের সমস্ত চিত্তকে চেতাইবে, সমস্ত চেষ্টাকে চালাইবে; ইহা আশার আলোকে এবং আনন্দের সংগীতে আমাদের বহুদিনের বঞ্চিত জীবনকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিবে। মানবজীবনের সেই পরম লক্ষ্য যতই আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকিবে ততই আপনাকে অকৃপণ ভাবে আমরা দান করিতে পারিব, এবং সমস্ত ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষার জাল ছিন্ন হইয়া পড়িবে। আমাদের দেশের এই লক্ষ্যকে যদি আমরা সম্পূর্ণ সচেতনভাবে মনে রাখি তবেই আমাদের দেশের শিক্ষাকে আমরা সত্য আকার দান করিতে পারিব। জীবনের কোনো লক্ষ্য নাই অথচ শিক্ষা আছে, ইহার কোনো অর্থই নাই। আমাদের ভারতভূমি তপোভূমি হইবে, সাধকের সাধনক্ষেত্র হইবে, সাধুর কর্মস্থান হইবে, এইখানেই ত্যাগীর সর্বোচ্চ আত্মোৎসর্গের হোমাগ্নি জ্বলিবে— এই গৌরবের আশাকে যদি মনে রাখি তবে পথ আপনি প্রস্তুত হইবে এবং অকৃত্রিম শিক্ষাবিধি আপনি আপনাকে অঙ্কুরিত পল্লবিত ও ফলবান করিয়া তুলিবে।

চ্যাল্‌ফোর্ড, গ্লস্টরশিয়র
১৯ অগস্ট, ১৯১২

আমেরিকার চিঠি

আজ রবিবার। গির্জার ঘণ্টা বাজিতেছে। সকালে চোখ মেলিয়াই দেখিলাম, বরফে সমস্ত সাদা হইয়া গিয়াছে। বাড়িগুলির কালো রঙের ঢালু ছাদ এই বিশ্বব্যাপী সাদার আবির্ভাবকে বুক পাতিয়া দিয়া বলিতেছে, 'আধো আঁচরে বোসো!' মানুষের চলাচলের রাস্তায় ধুলাকাদার রাজত্ব একেবারে ঘুচাইয়া দিয়া শুভ্রতার নিশ্চল ধারা যেন শতধা হইয়া বহিয়া চলিয়াছে। গাছে একটিও পাতা নাই; শুক্রম্ শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ ডালগুলির উপরের চূড়ায় তাঁহার আশীর্বাদ বর্ষণ করিয়াছেন। রাস্তার দুই ধারের ঘাস যৌবনের শেষ চিহ্নের মতো এখনো সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয় নাই, কিন্তু তাহারা ধীরে ধীরে মাথা হেঁট করিয়া হার মানিতেছে। পাখিরা ডাক বন্ধ করিয়াছে, আকাশে কোথাও কোনো শব্দ নাই। বরফ উড়িয়া উড়িয়া পড়িতেছে, কিন্তু তাহার পদসঞ্চার কিছুমাত্র শোনা যায় না— বর্ষা আসে বৃষ্টির শব্দে, ডালপালার মর্মরে, দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিয়া দিয়া রাজবত্রুন্নতধ্বনিঃ— কিন্তু আমরা সকলেই যখন ঘুমাইতেছিলাম আকাশের তোরণদ্বার তখন নীরবে খুলিয়াছে, সংবাদ লইয়া কোনো দূত আসে নাই, সে কাহারও ঘুম ভাঙাইয়া দিল না। স্বর্গলোকের নিভৃত আশ্রম হইতে নিঃশব্দতা মর্তে নামিয়া আসিতেছেন; তাঁহার ঘর্ঘরনিনাদিত রথ নাই; মাতলি তাঁহার মত্ত ঘোড়াকে বিদ্যুতের কষাঘাতে হাঁকাইয়া আনিতেছে না; ইনি নামিতেছেন ইঁহার সাদা পাখা মেলিয়া দিয়া, অতি কোমল তাহার সঞ্চার, অতি অবাধ তাহার গতি; কোথাও তাহার সংঘর্ষ নাই, কিছুকেই সে কিছুমাত্র আঘাত করে না। সূর্য আবৃত, আলোকের প্রখরতা নাই; কিন্তু, সমস্ত পৃথিবী হইতে একটি অপ্রগল্‌ভ দীপ্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে, এই জ্যোতি যেন শান্তি এবং নম্রতায় সুসম্বৃত, ইহার অবগুণ্ঠনই ইহার প্রকাশ।

স্তব্ধ শীতের প্রভাতে এই অপরূপ শুভ্রতার নির্মল আবির্ভাবকে আমি নত হইয়া নমস্কার করি— ইহাকে আমার অন্তরের মধ্যে বরণ করিয়া লই। বলি, 'তুমি এমনি ধীরে ধীরে ছাইয়া ফেলো; আমার সমস্ত চিন্তা, সমস্ত কল্পনা, সমস্ত কর্ম আবৃত করিয়া দাও। গভীর রাত্রির অসীম অন্ধকার পার হইয়া তোমার নির্মলতা আমার জীবনে নিঃশব্দে অবতীর্ণ হউক, আমার নবপ্রভাতকে অকলঙ্ক শুভ্রতার মধ্যে উদ্‌বোধিত করিয়া তুলুক— বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব— কোথাও কোনো কালিমা কিছুই রাখিয়ো না, তোমার স্বর্গের আলোক যেমন নিরবচ্ছিন্ন শুভ্র আমার জীবনের ধরাতলকে তেমনি একটি অখণ্ড শুভ্রতায় একবার সম্পূর্ণ সমাবৃত করিয়া দাও।'

অন্তকার প্রভাতের এই অতলস্পর্শ শুভ্রতার মধ্যে আমি আমার অন্তরাত্মাকে অবগাহন করাইতেছি। বড়ো শীত, বড়ো কঠিন এই স্নান। নিজেকে যে একেবারে শিশুর মতো নগ্ন করিয়া দিতে হইবে, এবং ডুবিতে ডুবিতে একেবারে কিছুই যে বাকি থাকিবে না— উর্ধ্বে শুভ্র, অধোতে শুভ্র, সম্মুখে শুভ্র, পশ্চাতে শুভ্র, আরম্ভে শুভ্র, অন্তে শুভ্র— শিব এব কেবলম্— সমস্ত দেহমনকে শুভ্রের মধ্যে নিঃশেষে নিবিষ্ট করিয়া দিয়া নমস্কার— নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

বার্ধক্যের কান্তি যে কী মহৎ, কী গভীর সুন্দর, আমি তাহাই দেখিতেছি। যত-কিছু বৈচিত্র্য সমস্ত ধীরে ধীরে নিঃশব্দে ঢাকা পড়িয়া গেল, অনবচ্ছিন্ন একের শুভ্রতা সমস্তকেই আপনার আড়ালে টানিয়া লইল। সমস্ত গান ঢাকা পড়িল, প্রাণ ঢাকা পড়িল, বর্ণচ্ছটার লীলা সাদায় মিলাইয়া গেল। কিন্তু, এ তো মরণের ছায়া নয়। আমরা যাহাকে মরণ বলিয়া জানি সে যে কালো; শুভ্রতা তো আলোকের মতো সাদা নয়, সে যে অমাবস্যার মতো অন্ধকারময়। সূর্যের শুভ্র রশ্মি তাহার লাল নীল সমস্ত ছটাকে একেবারে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে; কিন্তু, তাহাকে তো বিনাশ করে নাই, তাহাকে পরিপূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিয়াছে। আজ নিস্তব্ধতার অন্তর্নিগূঢ় সংগীত আমার চিত্তকে অন্তরে রসপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। আজ গাছপালা তাহার সমস্ত আভরণ খসাইয়া ফেলিয়াছে, একটি পাতাও বাকি রাখে নাই; সে তাহার প্রাণের সমস্ত প্রাচুর্যকে অন্তরের অদৃশ্য গভীরতার মধ্যে সম্পূর্ণ সমাহরণ করিয়া লইয়াছে। বনশ্রী যেন তাহার সমস্ত বাণী নিঃশেষ করিয়া দিয়া নিজের মনে কেবল ওঙ্কারমন্ত্রটি নীরবে জপ করিতেছে। আমার মনে হইতেছে, যেন তাপসিনী গৌরী তাঁহার বসন্তপুষ্পাভরণ ত্যাগ করিয়া শুভ্রবেশে শিবের শুভ্রমূর্তি ধ্যান করিতেছেন। যে কামনা আগুন লাগায়, যে কামনা বিচ্ছেদ ঘটায়, তাহাকে তিনি ক্ষয় করিয়া ফেলিতেছেন। সেই অগ্নিদগ্ধ কামনার সমস্ত কালিমা একটু একটু করিয়া ঐ তো বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে; যত দূর দেখা যায় একেবারে সাদায় সাদা হইয়া গেল, শিবের সহিত মিলনে কোথাও আর বাধা রহিল না। এবার যে শুভপরিণয় আসন্ন, আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডলের পুণ্য-আলোকে যাহার বার্তা লিখিত আছে এই তপস্যার গভীরতার মধ্যে তাহার নিগূঢ় আয়োজন চলিতেছে; উৎসবের সংগীত সেখানে ঘনীভূত হইতেছে, মালাবদলের ফুলের সাজি বিশ্বচক্ষুর অগোচরে সেখানে ভরিয়া ভরিয়া উঠিতেছে। এই তপস্যাকে বরণ করো, হে আমার চিত্ত, আপনাকে নত করিয়া নিস্তব্ধ করিয়া দাও— শুভ্র শান্তি তোমাকে স্তরে স্তরে আবৃত করিয়া স্থিরপ্রতিষ্ঠ গূঢ়তার মধ্যে তোমার সমস্ত চেষ্টাকে আহরণ করিয়া লউক, নির্মলতার দেবদূত আসিয়া একবার এ জীবনের সমস্ত আবর্জনা এক প্রান্ত হইতে

আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া দিক ; তাহার পরে এই তপস্যার শুষ্ক আবরণটি একদিন উঠিয়া যাইবে, একেবারে দিগ্‌দিগন্তর আনন্দকলগীতে পূর্ণ করিয়া দেখা দিবে নূতন জাগরণ, নূতন প্রাণ, নূতন মিলনের মঙ্গলোৎসব।

৯ অগ্রহায়ণ ১৩১৯

ছেলেবেলা

ভূমিকা

গোঁসাইজির কাছ থেকে অনুরোধ এল ছেলেদের জন্তে কিছু লিখি। ভাবলুম ছেলেমানুষ রবীন্দ্রনাথের কথা লেখা যাক। চেষ্টা করলুম সেই অতীতের প্রেত-লোকে প্রবেশ করতে। এখনকার সঙ্গে তার অন্তরবাহিরের মাপ মেলে না। তখনকার প্রদীপে যত ছিল আলো তার চেয়ে ধোঁওয়া ছিল বেশি। বুদ্ধির এলাকায় তখন বৈজ্ঞানিক সার্ভে আরম্ভ হয় নি, সম্ভব-অসম্ভবের সীমাসরহদ্দের চিহ্ন ছিল পরস্পর জড়ানো। সেই সময়টুকুর বিবরণ যে ভাষায় গেঁথেছি সে স্বভাবতই হয়েছে সহজ, যথাসম্ভব ছেলেদেরই ভাবনার উপযুক্ত। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমানুষি কল্পনাজাল মন থেকে কুয়াশার মতো যখন কেটে যেতে লাগল তখনকার কালের বর্ণনার ভাষা বদল করি নি, কিন্তু ভাবটা আপনিই শৈশবকে ছাড়িয়ে গেছে। এই বিবরণটিকে ছেলেবেলাকার সীমা অতিক্রম করতে দেওয়া হয় নি— কিন্তু শেষকালে এই স্মৃতি কিশোর-বয়সের মুখোমুখি এসে পৌঁছিয়েছে। সেইখানে একবার স্থির হয়ে দাঁড়ালে বোঝা যাবে কেমন ক'রে বালকের মনঃপ্রকৃতি বিচিত্র পারিপার্শ্বিকের আকস্মিক এবং অপরিহার্য সমবায়ে ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠেছে। সমস্ত বিবরণটাকেই ছেলে-বেলা আখ্যা দেওয়ার বিশেষ সার্থকতা এই যে, ছেলেমানুষের বৃদ্ধি তার প্রাণশক্তির বৃদ্ধি। জীবনের আদিপর্বে প্রধানত সেইটেরই গতি অনুসরণ-যোগ্য। যে পোষণপদার্থ তার প্রাণের সঙ্গে আপনি মেলে বালক তাই চারি দিক থেকে সহজে আত্মসাৎ করে চলে এসেছে। প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী-দ্বারা তাকে মানুষ করবার চেষ্টাকে সে মেনে নিয়েছে অতি সামান্য পরিমাণেই।

এই বইটির বিষয়বস্তুর কিছু কিছু অংশ পাওয়া যাবে জীবনস্মৃতিতে, কিন্তু তার স্বাদ আলাদা, সরোবরের সঙ্গে ঝরনার তফাতের মতো। সে হল কাহিনী, এ হল কাকলি ; সেটা দেখা দিচ্ছে ঝুড়িতে, এটা দেখা দিচ্ছে গাছে। ফলের সঙ্গে চার দিকের ডালপালাকে মিলিয়ে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কিছুকাল হল একটা কবিতার বইয়ে এর কিছু কিছু চেহারা দেখা দিয়েছিল, সেটা পদ্যের ফিল্‌মে। বইটার নাম 'ছড়ার ছবি'। তাতে বকুনি ছিল কিছু নাবালকের, কিছু সাবালকের। তাতে খুশির প্রকাশ ছিল অনেকটাই ছেলেমানুষি খেয়ালের। এ বইটাতে বালভাষিত গদ্যে।

বালক

বয়স তখন ছিল কাঁচা, হালকা দেহখানা
ছিল পাখির মতো, শুধু ছিল না তার ডানা।
উড়ত পাশের ছাদের থেকে পায়রাগুলোর ঝাঁক,
বারান্দাটার রেলিঙ-'পরে ডাকত এসে কাক।
ফেরিওয়ালা হেঁকে যেত গলির ও পার থেকে
তপ্‌সিমাছের ঝুড়িখানা গামছা দিয়ে ঢেকে।
বেহালাটা হেলিয়ে কাঁধে ছাদের 'পরে দাদা,
সন্ধ্যাতারার সুরে যেন সুর হত তাঁর সাধা।
জুটেছি বউদিদির কাছে ইংরেজি পাঠ ছেড়ে,
মুখখানিতে-ঘের-দেওয়া তাঁর শাড়িটি লালপেড়ে।
চুরি ক'রে চাবির গোছা লুকিয়ে ফুলের টবে
স্নেহের রাগে রাগিয়ে দিতেম নানান উপদ্রবে।
কিশোরী চাটুজ্যে হঠাৎ জুটত সন্ধ্যা হলে,
বাঁ হাতে তার থেলো হুঁকো, চাদর কাঁধে ঝোলে।
দ্রুতলয়ে আউড়ে যেত লবকুশের ছড়া,
থাকত আমার খাতা লেখা, প'ড়ে থাকত পড়া;
মনে মনে ইচ্ছে হত যদিই কোনো ছলে
ভরতি হওয়া সহজ হত এই পাঁচালির দলে,
ভাবনা মাথায় চাপত নাকো ক্লাসে ওঠার দায়ে,
গান শুনিয়ে চলে যেতুম নতুন নতুন গাঁয়ে।
স্কুলের ছুটি হয়ে গেলে বাড়ির কাছে এসে
হঠাৎ দেখি, মেঘ নেমেছে ছাদের কাছে ঘেঁষে।
আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে, রাস্তা ভাসে জলে,
ঐরাবতের শুঁড় দেখা দেয় জল-ঢালা সব নলে।

অন্ধকারে শোনা যেত রিম্‌ঝিমিনি ধারা,
রাজপুত্র তেপান্তরে কোথা সে পথহারা।
ম্যাপে যে-সব পাহাড় জানি, জানি যে-সব গাঙ
কুয়েন্‌লুন আর মিসিসিপি, ইয়াংসিকিয়াঙ—
জানার সঙ্গে আধেক-জানা, দূরের থেকে শোনা,
নানা রঙের নানা সুতোয় সব দিয়ে জাল-বোনা,
নানারকম ধ্বনির সঙ্গে নানান চলাফেরা
সব দিয়ে এক হালকা জগৎ মন দিয়ে মোর ঘেরা—
ভাবনাগুলো তারি মধ্যে ফিরত থাকি থাকি
বানের জলে শ্যাওলা যেমন, মেঘের তলে পাখি।

শান্তিনিকেতন
আষাঢ় ১৩৪৪

ছেলেবেলা

আমি জন্ম নিয়েছিলুম সেকেলে কলকাতায়। শহরে শ্যাকরাগাড়ি ছুটছে তখন ছড়্‌ছড়্‌ করে ধুলো উড়িয়ে, দড়ির চাবুক পড়ছে হাড়-বের-করা ঘোড়ার পিঠে। না ছিল ট্রাম, না ছিল বাস, না ছিল মোটরগাড়ি। তখন কাজের এত বেশি হাঁস্‌ফাঁসানি ছিল না, রয়ে বসে দিন চলত। বাবুরা আপিসে যেতেন কষে তামাক টেনে নিয়ে পান চিবতে চিবতে, কেউ বা পালকি চ'ড়ে কেউ বা ভাগের গাড়িতে। যাঁরা ছিলেন টাকাওয়ালা তাঁদের গাড়ি ছিল তকমা-আঁকা, চামড়ার আধঘোমটাওয়ালা, কোচবাক্সে কোচমান বসত মাথায় পাগড়ি হেলিয়ে, দুই দুই সইস থাকত পিছনে, কোমরে চামর বাঁধা, হেঁইয়ো শব্দে চমক লাগিয়ে দিত পায়ে-চলতি মানুষকে। মেয়েদের বাইরে যাওয়া-আসা ছিল দরজাবন্ধ পালকির হাঁপ-ধরানো অন্ধকারে, গাড়ি চড়তে ছিল ভারী লজ্জা। রোদবৃষ্টিতে মাথায় ছাতা উঠত না। কোনো মেয়ের গায়ে সেমিজ পায়ে জুতো দেখলে সেটাকে বলত মেমসাহেবি; তার মানে, লজ্জাশরমের মাথা খাওয়া। কোনো মেয়ে যদি হঠাৎ পড়ত পরপুরুষের সামনে, ফস্‌ করে তার ঘোমটা নামত নাকের ডগা পেরিয়ে, জিভ কেটে চট্‌ করে দাঁড়াত সে পিঠ ফিরিয়ে। ঘরে যেমন তাদের দরজা বন্ধ, তেমনি বাইরে বেরবার পালকিতেও; বড়োমানুষের ঝিবউদের পালকির উপরে আরও একটা ঢাকা চাপা থাকত মোটা ঘেটাটোপের। দেখতে হত যেন চলতি গোরস্থান। পাশে পাশে চলত পিতলে-বাঁধানো লাঠি হাতে দারোয়ানজি। ওদের কাজ ছিল দেউড়িতে বসে বাড়ি আগলানো, দাড়ি চোমরানো, ব্যাঙ্কে টাকা আর কুটুমবাড়িতে মেয়েদের পৌঁছিয়ে দেওয়া, আর পার্বণের দিনে গিন্নিকে বন্ধ পালকি-সুদ্ধ গঙ্গায় ডুবিয়ে আনা। দরজায় ফেরিওয়ালা আসত বাক্স সাজিয়ে, তাতে শিউনন্দনেরও কিছু মুনফা থাকত। আর ছিল ভাড়াটে গাড়ির গাড়োয়ান, বখরা নিয়ে বনিয়ে থাকতে যে নারাজ হত সে দেউড়ির সামনে বাধিয়ে দিত বিষম ঝগড়া। আমাদের পালোয়ান জমাদার সোভারাম থেকে থেকে বাঁও কষত, মুগুর ভাঁজত মস্ত ওজনের, বসে বসে সিদ্ধি ঘুঁটত, কখনো বা কাঁচা শাক-সুদ্ধ মুলো খেত আরামে আর আমরা তার কানের কাছে চীৎকার করে উঠতুম 'রাধাকৃষ্ণ'; সে যতই হাঁ-হাঁ করে দু হাত তুলত আমাদের জেদ ততই বেড়ে উঠত। ইষ্টদেবতার নাম শোনবার জন্যে ঐ ছিল তার ফন্দি।

তখন শহরে না ছিল গ্যাস, না ছিল বিজলি বাতি; কেরোসিনের আলো পরে যখন এল তার তেজ দেখে আমরা অবাক। সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ঘরে ফরাশ এসে জালিয়ে যেত রেড়ির তেলের আলো। আমাদের পড়বার ঘরে জলত দুই সলতের একটা সেজ।

মাস্টারমশায়[১] মিট্‌মিটে আলোয় পড়াতেন প্যারী সরকারের ফার্স্ট্ বুক। প্রথমে উঠত হাই, তার পর আসত ঘুম, তার পর চলত চোখ-রগড়ানি। বারবার শুনতে হত, মাস্টারমশায়ের অন্য ছাত্র সতীন সোনার টুকরো ছেলে, পড়ায় আশ্চর্য মন, ঘুম পেলে চোখে নস্যি ঘষে। আর আমি? সে কথা ব'লে কাজ নেই। সব ছেলের মধ্যে একলা মুর্খু হয়ে থাকবার মতো বিশ্রী ভাবনাতেও আমাকে চেতিয়ে রাখতে পারত না। রাত্রি ন'টা বাজলে ঘুমের ঘোরে ঢুলু ঢুলু চোখে ছুটি পেতুম। বাহিরমহল থেকে বাড়ির ভিতর যাবার সরু পথ ছিল খড়্‌খড়ির আব্রু-দেওয়া, উপর থেকে ঝুলত মিট্‌মিটে আলোর লণ্ঠন। চলতুম আর মন বলত কী জানি কিসে বুঝি পিছু ধরেছে। পিঠ উঠত শিউরে। তখন ভূত প্রেত ছিল গল্পে-গুজবে, ছিল মানুষের মনের আনাচে-কানাচে। কোন্ দাসী কখন হঠাৎ শুনতে পেত শাঁকচুন্নির নাকি সুর, দড়াম করে পড়ত আছাড় খেয়ে। ঐ মেয়ে-ভূতটা সবচেয়ে ছিল বদমেজাজি, তার লোভ ছিল মাছের 'পরে। বাড়ির পশ্চিম কোণে ঘন-পাতা-ওয়ালা বাদামগাছ, তারই ডালে এক পা আর অন্য পা'টা তেতালার কার্নিসের 'পরে তুলে দাঁড়িয়ে থাকে একটা কোন্ মূর্তি— তাকে দেখেছে বলবার লোক তখন বিস্তর ছিল, মেনে নেবার লোকও কম ছিল না। দাদার এক বন্ধু যখন গল্পটা হেসে উড়িয়ে দিতেন তখন চাকররা মনে করত লোকটার ধর্মজ্ঞান একটুও নেই, দেবে একদিন ঘাড় মটকিয়ে, তখন বিদ্যে যাবে বেরিয়ে। সে সময়টাতে হাওয়ায় হাওয়ায় আতঙ্ক এমনি জাল ফেলে ছিল যে, টেবিলের নীচে পা রাখলে পা সুড়্‌সুড়্ করে উঠত।

তখন জলের কল বসে নি। বেহারা বাঁখে ক'রে কলসী ভ'রে মাঘ-ফাগুনের গঙ্গার জল তুলে আনত। একতলার অন্ধকার ঘরে সারি সারি ভরা থাকত বড়ো বড়ো জালায় সারা বছরের খাবার জল। নীচের তলায় সেই-সব স্যাঁৎসেঁতে এঁধো কুঠুরিতে গা ঢাকা দিয়ে যারা বাসা করে ছিল কে না জানে তাদের মস্ত হাঁ, চোখ দুটো বুকে, কান দুটো কুলোর মতো, পা দুটো উলটো দিকে। সেই ভূতুড়ে ছায়ার সামনে দিয়ে যখন বাড়িভিতরের বাগানে যেতুম, তোলপাড় করত বুকের ভিতরটা, পায়ে লাগাত তাড়া।

১ "মাস্টার অঘোর বাবু" —জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড, পৃ ২৮৬

তখন রাস্তার ধারে ধারে বাঁধানো নালা দিয়ে জোয়ারের সময় গঙ্গার জল আসত। ঠাকুরদার আমল থেকে সেই নালার জলের বরাদ্দ ছিল আমাদের পুকুরে। যখন কপাট টেনে দেওয়া হত ঝরঝর কলকল করে ঝরনার মতো জল ফেনিয়ে পড়ত। মাছগুলো উলটো দিকে সাঁতার কাটবার কসরত দেখাতে চাইত। দক্ষিণের বারান্দার রেলিঙ ধরে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতুম। শেষকালে এল সেই পুকুরের কাল ঘনিয়ে, পড়ল তার মধ্যে গাড়ি গাড়ি রাবিশ। পুকুরটা বুজে যেতেই পাড়াগাঁয়ের সবুজ-ছায়া-পড়া আয়নাটা যেন গেল সরে। সেই বাদামগাছটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু অমন পা ফাঁক করে দাঁড়াবার সুবিধে থাকতেও সেই ব্রহ্মদত্যির ঠিকানা আর পাওয়া যায় না।

ভিতরে বাইরে আলো বেড়ে গেছে।

২

পালকিখানা ঠাকুরমাদের আমলের। খুব দরাজ বহর তার, নবাবি ছাঁদের। ডাণ্ডা দুটো আট আট জন বেহারার কাঁধের মাপের। হাতে সোনার কাঁকন, কানে মোটা মাকড়ি, গায়ে লালরঙের হাতকাটা মেরজাই-পরা বেহারার দল সূর্য-ডোবার রঙিন মেঘের মতো সাবেক ধনদৌলতের সঙ্গে সঙ্গে গেছে মিলিয়ে। এই পালকির গায়ে ছিল রঙিন লাইনে আঁকজোক কাটা, কতক তার গেছে ক্ষয়ে, দাগ ধরেছে যেখানে সেখানে, নারকোলের ছোবড়া বেরিয়ে পড়েছে ভিতরের গদি থেকে। এ যেন একালের নামকাটা আসবাব, পড়ে আছে খাতাঞ্চিখানার বারান্দায় এক কোণে। আমার বয়স তখন সাত-আট বছর। এ সংসারে কোনো দরকারি কাজে আমার হাত ছিল না; আর ঐ পুরানো পালকিটাকেও সকল দরকারের কাজ থেকে বরখাস্ত করে দেওয়া হয়েছে। এইজন্যেই ওর উপরে আমার এতটা মনের টান ছিল। ও যেন সমুদ্রের মাঝখানে দ্বীপ, আর আমি ছুটির দিনের রবিন্‌সন্‌-ক্রুসো, বন্ধ দরজার মধ্যে ঠিকানা হারিয়ে চার দিকের নজরবন্দি এড়িয়ে বসে আছি।

তখন আমাদের বাড়িভরা ছিল লোক, আপন পর কত তার ঠিকানা নেই; নানা মহলের চাকর দাসীর নানা দিকে হৈ হৈ ডাক।

সামনের উঠোন দিয়ে প্যারীদাসী ধামা কাঁখে বাজার করে নিয়ে আসছে তরি-তরকারি, দুখন বেহারা বাঁক কাঁধে গঙ্গার জল আনছে, বাড়ির ভিতরে চলেছে তাঁতিনি নতুন-ফ্যাশান-পেড়ে শাড়ির সওদা করতে, মাইনে-করা যে দিনু স্যাকরা গলির পাশের

ঘরে ব'সে হাপর ফোঁস ফোঁস ক'রে বাড়ির ফরমাশ খাটত সে আসছে খাতাঞ্চিখানায় কানে-পালখের-কলম-গোঁজা কৈলাস মুখুজ্জের কাছে পাওনার দাবি জানাতে; উঠোনে ব'সে টং টং আওয়াজে পুরোনো লেপের তুলো ধুনছে ধুনুরি। বাইরে কানা পালোয়ানের সঙ্গে মুকুন্দলাল দারোয়ান লুটোপুটি করতে করতে কুস্তির প্যাঁচ কষছে। চটাচট শব্দে দুই পায়ে লাগাচ্ছে চাপড়, ডন ফেলছে বিশ-পঁচিশ বার ঘন ঘন। ভিখিরির দল বসে আছে বরাদ্দ ভিক্ষার আশা ক'রে।

বেলা বেড়ে যায়, রোদ্দুর ওঠে কড়া হয়ে, দেউড়িতে ঘণ্টা বেজে ওঠে; পালকির ভিতরকার দিনটা ঘণ্টার হিসাব মানে না। সেখানকার বারোটা সেই সাবেক কালের, যখন রাজবাড়ির সিংহদ্বারে সভাভঙ্গের ডঙ্কা বাজত, রাজা যেতেন স্নানে, চন্দনের জলে। ছুটির দিন দুপুরবেলা যাদের তাঁবেদারিতে ছিলুম তারা খাওয়াদাওয়া সেরে ঘুম দিচ্ছে। একলা বসে আছি। চলেছে মনের মধ্যে আমার অচল পালকি, হাওয়ায় তৈরি বেহারাগুলো আমার মনের নিমক খেয়ে মানুষ। চলার পথটা কাটা হয়েছে আমারই খেয়ালে। সেই পথে চলছে পালকি দূরে দূরে দেশে দেশে, সে-সব দেশের বইপড়া নাম আমারই লাগিয়ে দেওয়া। কখনো বা তার পথটা ঢুকে পড়ে ঘন বনের ভিতর দিয়ে। বাঘের চোখ জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে, গা করছে ছম্‌ছম্‌। সঙ্গে আছে বিশ্বনাথ শিকারী, বন্দুক ছুটল দুম্‌, ব্যাস্‌ সব চুপ। তার পরে এক সময়ে পালকির চেহারা বদলে গিয়ে হয়ে ওঠে ময়ূরপঙ্খি, ভেসে চলে সমুদ্রে, ডাঙা যায় না দেখা। দাঁড় পড়তে থাকে ছপ্‌ছপ্‌ ছপ্‌ছপ্‌, ঢেউ উঠতে থাকে দুলে দুলে ফুলে ফুলে। মাল্লারা বলে ওঠে, সামাল সামাল, ঝড় উঠল। হালের কাছে আবদুল মাঝি, ছুঁচলো তার দাড়ি, গোঁফ তার কামানো, মাথা তার নেড়া। তাকে চিনি, সে দাদাকে এনে দিত পদ্মা থেকে ইলিশমাছ আর কচ্ছপের ডিম।

সে আমার কাছে গল্প করেছিল— একদিন চত্তির মাসের শেষে ডিঙিতে মাছ ধরতে গিয়েছে, হঠাৎ এল কালবৈশাখী। ভীষণ তুফান, নৌকো ডোবে ডোবে। আবদুল দাঁতে রশি কামড়ে ধরে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে, সাঁৎরে উঠল চরে, কাছি ধরে টেনে তুলল তার ডিঙি। গল্পটা এত শিগ্‌গির শেষ হল, আমার পছন্দ হল না। নৌকোটা ডুবল না, অমনিই বেঁচে গেল, এ তো গপ্‌পই নয়। বারবার বলতে লাগলুম 'তার পর'?

সে বললে, 'তার পর সে এক কাণ্ড। দেখি, এক নেকড়ে বাঘ। ইয়া তার গোঁফজোড়া। ঝড়ের সময়ে সে উঠেছিল ও পারে গঞ্জের ঘাটের পাকুড় গাছে। দমকা হাওয়া যেমনি লাগল গাছ পড়ল ভেঙে পদ্মায়। বাঘ ভায়া ভেসে যায় জলের তোড়ে।

খাবি খেতে খেতে উঠল এসে চরে। তাকে দেখেই আমার রশিতে লাগালুম ফাঁস। জানোয়ারটা এতো বড়ো চোখ পাকিয়ে দাঁড়ালো আমার সামনে। সাঁতার কেটে তার জমে উঠেছে খিদে। আমাকে দেখে তার লাল-টকটকে জিভ দিয়ে নাল ঝরতে লাগল। বাইরে ভিতরে অনেক মানুষের সঙ্গে তার চেনাশোনা হয়ে গেছে, কিন্তু আবদুলকে সে চেনে না। আমি ডাক দিলুম 'আও বাচ্ছা'। সে সামনের দু পা তুলে উঠতেই দিলুম তার গলায় ফাঁস আটকিয়ে, ছাড়াবার জন্যে যতই ছটফট করে ততই ফাঁস এঁটে গিয়ে তার জিভ বেরিয়ে পড়ে।'

এই পর্যন্ত শুনেই আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, 'আবদুল, সে মরে গেল নাকি।'

আবদুল বললে, 'মরবে তার বাপের সাধ্যি কী। নদীতে বান এসেছে, বাহাদুরগঞ্জে ফিরতে হবে তো? ডিঙির সঙ্গে জুড়ে বাঘের বাচ্ছাকে দিয়ে গুণ টানিয়ে নিলেম অন্তত বিশ ক্রোশ রাস্তা। গোঁ গোঁ করতে থাকে, পেটে দিই দাঁড়ের খোঁচা, দশ-পনেরো ঘণ্টার রাস্তা দেড় ঘণ্টায় পৌঁছিয়ে দিলে। তার পরেকার কথা আর জিগ্‌গেস কোরো না বাবা, জবাব মিলবে না।'

আমি বললুম, 'আচ্ছা বেশ, বাঘ তো হল, এবার কুমির?'

আবদুল বললে, 'জলের উপর তার নাকের ডগা দেখেছি অনেকবার। নদীর ঢালু ডাঙায় লম্বা হয়ে শুয়ে সে যখন রোদ পোহায়, মনে হয় ভারি বিচ্ছিরি হাসি হাসছে। বন্দুক থাকলে মোকাবিলা করা যেত। লাইসেন্স্ ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু মজা হল। একদিন কাঁচি বেদেনি ডাঙায় বসে দা দিয়ে বাখারি চাঁচছে, তার ছাগলছানা পাশে বাঁধা। কখন নদীর থেকে উঠে কুমিরটা পাঁঠার ঠ্যাঙ ধরে জলে টেনে নিয়ে চলল। বেদেনি একেবারে লাফ দিয়ে বসল তার পিঠের উপর। দা দিয়ে ঐ দানো-গিরগিটির গলায় পোঁচের উপর পোঁচ লাগাল। ছাগলছানা ছেড়ে জন্তুটা ডুবে পড়ল জলে।'

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, 'তার পরে?'

আবদুল বললে, 'তার পরেকার খবর তলিয়ে গেছে জলের তলায়, তুলে আনতে দেরি হবে। আসছে-বার যখন দেখা হবে চর পাঠিয়ে খোঁজ নিয়ে আসব।'

কিন্তু আর তো সে আসে নি, হয়তো খোঁজ নিতে গেছে।

এই তো ছিল পালকির ভিতর আমার সফর; পালকির বাইরে এক-একদিন ছিল আমার মাস্টারি, রেলিঙগুলো আমার ছাত্র। ভয়ে থাকত চুপ। এক-একটা ছিল ভারি দুষ্ট, পড়াশুনোয় কিছুই মন নেই; ভয় দেখাই যে বড়ো হলে কুলিগিরি করতে

হবে। মার খেয়ে আগাগোড়া গায়ে দাগ পড়ে গেছে, দুষ্টুমি থামতে চায় না, কেননা থামলে যে চলে না, খেলা বন্ধ হয়ে যায়। আরও একটা খেলা ছিল, সে আমার কাঠের সিঙ্গিকে নিয়ে। পূজায় বলিদানের গল্প শুনে ঠিক করেছিলুম সিঙ্গিকে বলি দিলে খুব একটা কাণ্ড হবে। তার পিঠে কাঠি দিয়ে অনেক কোপ দিয়েছি। মন্তর বানাতে হয়েছিল, নইলে পুজো হয় না।—

সিঙ্গিমামা কাটুম
আন্দিবোসের বাটুম
উলুকুট ঢুলুকুট ঢ্যাম্‌কুড়্‌কুড়্‌
আখরোট বাখরোট খট খট খটাস
পট পট পটাস।

এর মধ্যে প্রায় সব কথাই ধার-করা, কেবল আখরোট কথাটা আমার নিজের। আখরোট খেতে ভালোবাসতুম। খটাস শব্দ থেকে বোঝা যাবে আমার খাঁড়াটা ছিল কাঠের। আর পটাস শব্দে জানিয়ে দিচ্ছে সে খাঁড়া মজবুত ছিল না।[১]

৩

কাল রাত্তির থেকে মেঘের কামাই নেই। কেবলই চলছে বৃষ্টি। গাছগুলো বোকার মতো জবুস্থবু হয়ে রয়েছে। পাখির ডাক বন্ধ। আজ মনে পড়ছে আমার ছেলেবেলাকার সন্ধেবেলা।

তখন আমাদের ঐ সময়টা কাটত চাকরদের মহলে। তখনও ইংরেজি শব্দের বানান আর মানে-মুখস্থর বুক-ধড়াস সন্ধেবেলায় ঘাড়ে চেপে বসে নি। সেজদাদা[২] বলতেন, আগে চাই বাংলা ভাষার গাঁথুনি, তার পরে ইংরেজি শেখার পত্তন। তাই যখন আমাদের বয়সী ইস্কুলের সব পোড়োরা গড়গড় করে আউড়ে চলেছে I am up আমি হই উপরে, He is down তিনি হন নীচে, তখনও বি-এ-ডি ব্যাড এম-এ-ডি ম্যাড পর্যন্ত আমার বিদ্যে পৌঁছয় নি।

নবাবি জবানিতে চাকর-নোকরদের মহলকে তখন বলা হত তোশাখানা। যদিও সেকেলে আমিরি দশা থেকে আমাদের বাড়ি নেবে পড়েছিল অনেক নীচে, তবু তোশাখানা দফতরখানা বৈঠকখানা নামগুলো ছিল ভিত আঁকড়ে।

১ দ্রষ্টব্য 'কাঠের সিঙ্গি'— ছড়ার ছবি, রবীন্দ্র-রচনাবলী, একবিংশ খণ্ড
২ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেই তোশাখানার দক্ষিণ ভাগে বড়ো একটা ঘরে কাঁচের সেজে রেড়ির তেলে আলো জলছে মিট মিট করে, গণেশমার্কা ছবি আর কালীমায়ের পট রয়েছে দেয়ালে, তারই আশেপাশে টিকটিকি রয়েছে পোকা-শিকারে। ঘরে কোনো আসবাব নেই, মেজের উপরে একখানা ময়লা মাদুর পাতা।

জানিয়ে রাখি আমাদের চাল ছিল গরিবের মতো। গাড়িঘোড়ার বালাই ছিল না বললেই হয়। বাইরে কোণের দিকে তেঁতুল গাছের তলায় ছিল চালাঘরে একটা পালকিগাড়ি আর একটা বুড়ো ঘোড়া। পরনের কাপড় ছিল নেহাত সাদাসিধে। অনেক সময় লেগেছিল পায়ে মোজা উঠতে। যখন ব্রজেশ্বরের ফর্দ এড়িয়ে জলপানে বরাদ্দ হল পাঁউরুটি আর কলাপাতা-মোড়া মাখন, মনে হল আকাশ যেন হাতে নাগাল পাওয়া গেল। সাবেক কালের বড়োমাঁনুষির ভগ্নদশা সহজেই মেনে নেবার তালিম চলছিল।

আমাদের এই মাদুর-পাতা আসরে যে চাকরটি ছিল সর্দার তার নাম ব্রজেশ্বর। চুলে গোঁফে লোকটা কাঁচাপাকা, মুখের উপর টানপড়া শুকনো চামড়া, গম্ভীর মেজাজ, কড়া গলা, চিবিয়ে চিবিয়ে কথা। তার পূর্ব মনিব ছিলেন লক্ষ্মীমন্ত, নামডাকওয়ালা। সেখান থেকে তাকে নাবতে হয়েছে আমাদের মতো হেলায়-মানুষ ছেলেদের খবরদারির কাজে। শুনেছি গ্রামের পাঠশালায় সে গুরুগিরি করেছে। এই গুরুমশায়ি ভাষা আর চাল ছিল তার শেষ পর্যন্ত। বাবুরা 'বসে আছেন' না বলে সে বলত 'অপেক্ষা করে আছেন'। শুনে মনিবরা হাসাহাসি করতেন। যেমন ছিল তার শুমোর তেমনি ছিল তার শুচিবাই। স্নানের সময় সে পুকুরে নেমে উপরকার তেলভাসা জল দুই হাত দিয়ে পাঁচ-সাতবার ঠেলে দিয়ে একেবারে ঝুপ করে দিত ডুব। স্নানের পর পুকুর থেকে উঠে বাগানের রাস্তা দিয়ে ব্রজেশ্বর এমন ভঙ্গীতে হাত বাঁকিয়ে চলত যেন কোনোমতে বিধাতার এই নোংরা পৃথিবীটাকে পাশ কাটিয়ে চলতে পারলেই তার জাত বাঁচে। চাল চলনে কোন্‌টা ঠিক, কোন্‌টা ঠিক নয়, এ নিয়ে খুব ঝোঁক দিয়ে সে কথা কইত। এ দিকে তার ঘাড়টা ছিল কিছু বাঁকা, তাতে তার কথার মান বাড়ত। কিন্তু ওরই মধ্যে একটা খুঁত ছিল গুরুগিরিতে। ভিতরে ভিতরে তার আহারের লোভটা ছিল চাপা। আমাদের পাতে আগে থাকতে ঠিকমত ভাগে খাবার সাজিয়ে রাখা তার নিয়ম ছিল না। আমরা খেতে বসলে একটি একটি করে লুচি আলগোছে দুলিয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করত, 'আর দেব কি।' কোন্ উত্তর তার মনের মতো সেটা বোঝা যেত তার গলার সুরে। আমি প্রায়ই বলতুম, 'চাই নে।' তার পরে আর সে পীড়াপীড়ি করত না। দুধের বাটিটার 'পরেও তার অসামান্য রকমের টান

ছিল, আমার মোটে ছিল না। শেলফওয়ালা একটা খাটো আলমারি ছিল তার ঘরে। তার মধ্যে একটা বড়ো পিতলের বাটিতে থাকত দুধ, আর কাঠের বারকোশে লুচি তরকারি। বিড়ালের লোভ জালের বাইরে বাতাস শুঁকে শুঁকে বেড়াত।

এমনি করে অল্প খাওয়া আমার ছেলেবেলা থেকেই দিব্যি সয়ে গিয়েছিল। সেই কম খাওয়াতে আমাকে কাহিল করেছিল এমন কথা বলবার জো নেই। যে ছেলেরা খেতে কসুর করত না তাদের চেয়ে আমার গায়ের জোর বেশি বই কম ছিল না। শরীর এত বিশ্রী রকমের ভালো ছিল যে, ইস্কুল পালাবার ঝোঁক যখন হয়রান করে দিত তখনও শরীরে কোনোরকম জুলুমের জোরেও ব্যামো ঘটাতে পারতুম না। জুতো জলে ভিজিয়ে বেড়ালুম সারাদিন, সর্দি হল না। কার্তিক মাসে খোলা ছাদে শুয়েছি, চুল জামা গেছে ভিজে, গলার মধ্যে একটু খুস্‌খুস্‌নি কাশিরও সাড়া পাওয়া যায় নি। আর পেট-কামড়ানি বলে ভিতরে ভিতরে বদহজমের যে একটা তাগিদ পাওয়া যায় সেটা বুঝতে পাই নি পেটে, কেবল দরকারমত মুখে জানিয়েছি মায়ের কাছে। শুনে মা মনে মনে হাসতেন, একটুও ভাবনা করতেন বলে মনে হয় নি। তবু চাকরকে ডেকে বলে দিতেন, 'আচ্ছা যা, মাস্টারকে জানিয়ে দে, আজ আর পড়াতে হবে না।' আমাদের সেকেলে মা মনে করতেন, ছেলে মাঝে মাঝে পড়া কামাই করলে এতই কি লোকসান। এখনকার মায়ের হাতে পড়লে মাস্টারের কাছে তো ফিরে যেতেই হত, তার উপরে খেতে হত কানমলা। হয়তো বা মুচকি হেসে গিলিয়ে দিতেন ক্যাস্টর অয়েল। চিরকালের জন্যে আরাম হত ব্যামোটা। দৈবাৎ কখনো আমার জ্বর হয়েছে; তাকে কেউ জ্বর বলত না, বলত গা-গরম। আসতেন নীলমাধব ডাক্তার। থার্মোমিটার তখন চক্ষেও দেখি নি; ডাক্তার একটু গায়ে হাত দিয়েই প্রথম দিনের ব্যবস্থা করতেন ক্যাস্টর অয়েল আর উপোস। জল খেতে পেতুম অল্প একটু, সেও গরম জল। তার সঙ্গে এলাচদানা চলতে পারত। তিন দিনের দিনই মৌরলা মাছের ঝোল আর গলা ভাত উপোসের পরে ছিল অমৃত।

জ্বরে ভোগা কাকে বলে মনে পড়ে না। ম্যালেরিয়া বলে শব্দটা শোনাই ছিল না। ওয়াক-ধরানো ওষুধের রাজা ছিল ঐ তেলটা, কিন্তু মনে পড়ে না কুইনীন। গায়ে কোড়াকাটা ছুরির আঁচড় পড়ে নি কোনোদিন। হাম বা জলবসন্ত কাকে বলে আজ পর্যন্ত জানি নে। শরীরটা ছিল একগুঁয়ে রকমের ভালো। মায়েরা যদি ছেলেদের শরীর এতটা নীরুগী রাখতে চান যাতে মাস্টারের হাত এড়াতে না পারে তা হলে ব্রজেশ্বরের মতো চাকর খুঁজে বের করবেন। খাবার-খরচার সঙ্গে সঙ্গেই সে বাঁচাবে ডাক্তার-খরচা; বিশেষ করে এই কলের আঁতার ময়দা আর এই ভেজাল-

দেওয়া ঘি-ছেলের দিনে। একটা কথা মনে রাখা দরকার, তখনও বাজারে চকোলেট দেখা দেয় নি। ছিল এক পয়সা দামের গোলাপি-রেউড়ি। গোলাপি গন্ধের আমেজ-দেওয়া এই তিলে-ঢাকা চিনির ড্যালা আজও ছেলেদের পকেট চট্‌চটে ক'রে তোলে কি না জানি নে— নিশ্চয়ই এখনকার মানী লোকের ঘর থেকে লজ্জায় দৌড় মেরেছে। সেই ভাজা মশলার ঠোঙা গেল কোথায়। আর সেই সস্তা দামের তিলে গজা? সে কি এখনও টিঁকে আছে। না থাকে তো তাকে ফিরিয়ে আনার দরকার নেই।

ব্রজেশ্বরের কাছে সন্ধেবেলায় দিনে দিনে শুনেছি কৃত্তিবাসের সাতকাণ্ড রামায়ণটা। সেই পড়ার মাঝে মাঝে এসে পড়ত কিশোরী চাটুজ্যে। সমস্ত রামায়ণের পাঁচালি ছিল সুরসমেত তার মুখস্থ। সে হঠাৎ আসন দখল করে কৃত্তিবাসকে ছাপিয়ে দিয়ে হু হু করে আউড়িয়ে যেত তার পাঁচালির পালা। 'ওরে রে লক্ষণ, এ কী অলক্ষণ, বিপদ ঘটেছে বিলক্ষণ।' তার মুখে হাসি, মাথায় টাক ঝক্ ঝক্ করছে, গলা দিয়ে ছড়া-কাটা লাইনের ঝরনা সুর বাজিয়ে চলছে, পদে পদে শব্দের মিলগুলো বেজে ওঠে যেন জলের নিচেকার নুড়ির আওয়াজ। সেই সঙ্গে চলত তার হাত পা নেড়ে ভাব-বাংলানো। কিশোরী চাটুজ্যের সবচেয়ে বড়ো আপসোস ছিল এই যে, দাদাভাই অর্থাৎ কিনা আমি, এমন গলা নিয়ে পাঁচালির দলে ভরতি হতে পারলুম না। পারলে দেশে যা-হয় একটা নাম থাকত।

রাত হয়ে আসত, মাদুর-পাতা বৈঠক যেত ভেঙে। ভূতের ভয় শিরদাঁড়ার উপর চাপিয়ে চলে যেতুম বাড়ির ভিতরে মায়ের ঘরে। মা তখন তাঁর খুড়িকে নিয়ে তাস খেলছেন। পংখের-কাজ-করা ঘর হাতির দাঁতের মতো চক্‌চকে, মস্ত তক্তপোশের উপর জাজিম পাতা। এমন উৎপাত বাধিয়ে দিতুম যে তিনি হাতের খেলা ফেলে দিয়ে বলতেন, 'জ্বালাতন করলে, যাও খুড়ি, ওদের গল্প শোনাও গে।' আমরা বাইরের বারান্দায় ঘটির জলে পা ধুয়ে দিদিমাকে টেনে নিয়ে বিছানায় উঠতুম। সেখানে শুরু হত দৈত্যপুরী থেকে রাজকন্যার ঘুম ভাঙিয়ে আনার পালা। মাঝখানে আমারই ঘুম ভাঙায় কে। রাতের প্রথম পহরে শেয়াল উঠত ডেকে। তখনও শেয়াল-ডাকা রাত কলকাতার কোনো কোনো পুরোনো বাড়ির ভিতের নীচে ফুকরে উঠত।

৪

আমরা যখন ছোটো ছিলুম তখন সন্ধ্যাবেলায় কলকাতা শহর এখনকার মতো এত বেশি সজাগ ছিল না। এখনকার কালে সূর্যের আলোর দিনটা যেমনি ফুরিয়েছে অমনি শুরু হয়েছে বিজলি আলোর দিন। সে সময়টাতে শহরে কাজ কম কিন্তু

বিশ্রাম নেই। উনুনে যেন জ্বলা কাঠ নিভেছে তবু কয়লায় রয়েছে আগুন। তেলকল চলে না, স্টিমারের বাঁশি থেমে থাকে, কারখানাঘর থেকে মজুরের দল বেরিয়ে গেছে, পাটের-গাঁট-টানা গাড়ির মোষগুলো গেছে টিনের চালের নীচে শহরে গোষ্ঠে। সমস্ত দিন যে শহরের মাথা ছিল নানা চিন্তায় তেতে আগুন, এখনও তার নাড়িগুলো যেন দব দব করছে। রাস্তার দু ধারে দোকানগুলোতে কেনাবেচা তেমনি আছে, কেবল সামান্য কিছু ছাই-চাপা। রকম-বেরকমের গোঙানি দিতে দিতে হাওয়াগাড়ি ছুটেছে দশ দিকে ; তাদের দৌড়ের পিছনে গরজের ঠেলা কম।

আমাদের সেকালে দিন ফুরলে কাজকর্মের বাড়তি ভাগ যেন কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়ত শহরের বাতি-নেবানো নীচের তলায়। ঘরে-বাইরে সন্ধ্যার আকাশ থম্ থম্ করত। ইডেন গার্ডেনে গঙ্গার ধারে শৌখিনদের হাওয়া খাইয়ে নিয়ে ফেরবার গাড়িতে সইসদের হৈ হৈ শব্দ রাস্তা থেকে শোনা যেত। চৈৎ-বৈশাখ মাসে রাস্তায় ফেরিওয়ালা হেঁকে যেত 'বরীফ'। হাঁড়িতে বরফ-দেওয়া নোনতা জলে ছোটো ছোটো টিনের চোঙে থাকত যাকে বলা হোত কুলফির বরফ, এখন যাকে বলে আইস কিংবা আইসক্রীম। রাস্তার দিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই ডাকে মন কী রকম করত তা মনই জানে। আর-একটা হাঁক ছিল 'বেলফুল'। বসন্তকালের সেই মালীদের ফুলের ঝুড়ির খবর আজ নেই, কেন জানি নে। তখন বাড়িতে মেয়েদের খোঁপা থেকে বেলফুলের গোড়ে মালার গন্ধ ছড়িয়ে যেত বাতাসে। গা ধুতে যাবার আগে ঘরের সামনে বসে সমুখে হাত-আয়না রেখে মেয়েরা চুল বাঁধত। বিহুনি-করা চুলের দড়ি দিয়ে খোঁপা তৈরি হত নানা কারিগরিতে। তাদের পরনে ছিল ফরাসডাঙার কালাপেড়ে শাড়ি, পাক দিয়ে কুঁচকিয়ে তোলা। নাপতিনি আসত, ঝামা দিয়ে পা ঘসে আলতা পরাত। মেয়েমহলে তারাই লাগত খবর-চালাচালির কাজে। ট্রামের পায়দানের উপর ভিড় করে কলেজ আর আপিস ফেরার দল ফুটবল খেলার ময়দানে ছুটত না। ফেরবার সময় তাদের ভিড় জমত না সিনেমা-হলের সামনে। নাটক-অভিনয়ের একটা ফুর্তি দেখা দিয়েছিল, কিন্তু কী আর বলব, আমরা সে সময়ে ছিলুম ছেলেমানুষ।

তখন বড়োদের আমোদে ছেলেরা দূর থেকেও ভাগ বসাতে পেত না। যদি সাহস করে কাছাকাছি যেতুম তা হলে শুনতে হত 'যাও খেলা করো গে', অথচ ছেলেরা খেলায় যদি উচিতমত গোল করত তা হলে শুনতে হত 'চুপ করো'। বড়োদের আমোদ-আহ্লাদ সবসময় খুব যে চুপচাপে সারা হত তা নয়। তাই দূর থেকে কখনো কখনো ঝরনার ফেনার মতো তার কিছু কিছু পড়ত ছিটকিয়ে আমাদের

দিকে। এ বাড়ির বারান্দায় ঝুঁকে পড়ে তাকিয়ে থাকতুম, দেখতুম ও বাড়ির নাচঘর আলোয় আলোময়। দেউড়ির সামনে বড়ো বড়ো জুড়িগাড়ি এসে জুটেছে। সদর দরজার কাছ থেকে দাদাদের কেউ কেউ অতিথিদের উপরে আগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। গোলাপপাশ থেকে গায়ে গোলাপজল ছিটিয়ে দিচ্ছেন, হাতে দিচ্ছেন ছোটো একটি করে তোড়া। নাটকের থেকে কুলীন মেয়ের ফুঁপিয়ে কান্না কখনো কখনো কানে আসে, তার মর্ম বুঝতে পারি নে। বোঝবার ইচ্ছেটা হয় প্রবল। খবর পেতুম যিনি কাঁদতেন তিনি কুলীন বটে, কিন্তু তিনি আমার ভগ্নীপতি।[১] তখনকার পরিবারে যেমন মেয়ে আর পুরুষ ছিল দুই সীমানায় দুই দিকে, তেমনি ছিল ছোটোরা আর বড়োরা। বৈঠকখানায় ঝাড়-লণ্ঠনের আলোয় চলছে নাচগান, গুড়গুড়ি টানছেন বড়োর দল, মেয়েরা লুকনো থাকতেন ঝরোখার ও পারে, চাপা আলোয় পানের বাটা নিয়ে, সেখানে বাইরের মেয়েরা এসে জমতেন, ফিস্‌ফিস করে চলত গেরস্তালির খবর। ছেলেরা তখন বিছানায়। পিয়ারী কিংবা শংকরী গল্প শোনাচ্ছে, কানে আসছে—

'জোচ্ছনায় যেন ফুল ফুটেছে—'

৫

আমাদের সময়কার কিছু পূর্বে ধনীঘরে ছিল শখের যাত্রার চলন। মিহিগলাওয়ালা ছেলেদের বাছাই করে নিয়ে দল বাঁধার ধুম ছিল। আমার মেজকাকা[২] ছিলেন এই-রকম একটি শখের দলের দলপতি। পালা রচনা করবার শক্তি ছিল তাঁর, ছেলেদের তৈরি করে তোলবার উৎসাহ ছিল। ধনীদের ঘরপোষা এই যেমন শখের যাত্রা তেমনি ব্যাবসাদারী যাত্রা নিয়েও বাংলাদেশের ছিল ভারি নেশা। এ পাড়ায় ও পাড়ায় এক-একজন নামজাদা অধিকারীর অধীনে যাত্রার দল গজিয়ে উঠত। দলকর্তা অধিকারীরা সবাই যে জাতে বড়ো কিংবা লেখাপড়ায় এমন-কিছু তা নয়। তারা নাম করেছে আপন ক্ষমতায়। আমাদের বাড়িতে যাত্রাগান হয়েছে মাঝে মাঝে। কিন্তু রাস্তা নেই, ছিলুম ছেলেমানুষ। আমি দেখতে পেয়েছি তার গোড়াকার জোগাড়যন্তর। বারান্দা জুড়ে বসে গেছে দলবল, চারি দিকে উঠছে তামাকের ধোঁয়া। ছেলেগুলো লম্বা-চুল-ওয়ালা, চোখে-কালি-পড়া, অল্প বয়সে তাদের মুখ গিয়েছে পেকে। পান খেয়ে খেয়ে ঠোঁট

১ যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, শরৎকুমারী দেবীর স্বামী
২ গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বাবুবিলাস' নাটকের লেখক

গিয়েছে কালো হয়ে। সাজগোজের আসবাব আছে রঙকরা টিনের বাক্সোয়। দেউড়ির দরজা খোলা, উঠোনে পিল পিল করে ঢুকে পড়ছে লোকের ভিড়। চার দিকে টগবগ করে আওয়াজ উঠছে, ছাপিয়ে পড়ছে গলি পেরিয়ে চিৎপুরের রাস্তায়। রাত্তির হবে ন'টা, পায়রার পিঠের উপর বাজপাখির মতো হঠাৎ এসে পড়ে শ্যাম, কড়া-পড়া শক্ত হাতের মুঠি দিয়ে আমার কনুই ধরে বলে, 'মা ডাকছে, চলো শোবে চলো।' লোকের সামনে এই টানাহেঁচড়ায় মাথা হেঁট হয়ে যেত, হার মেনে চলে যেতুম শোবার ঘরে। বাইরে চলছে হাঁকডাক, বাইরে জ্বলছে ঝাড়লণ্ঠন, আমার ঘরে সাড়াশব্দ নেই, পিলসুজের উপর টিম টিম করছে পিতলের প্রদীপ। ঘুমের ঘোরে মাঝে-মাঝে শোনা যাচ্ছে নাচের তাল সমে এসে ঠেকতেই ঝমাঝম করতাল।

সব-তাতে মানা করাটাই বড়োদের ধর্ম। কিন্তু একবার কী কারণে তাঁদের মন নরম হয়েছিল, হুকুম বেরল, ছেলেরাও যাত্রা শুনতে পাবে। ছিল নলদময়ন্তীর পালা। আরম্ভ হবার আগে রাত এগারোটা পর্যন্ত বিছানায় ছিলুম ঘুমিয়ে। বারবার ভরসা দেওয়া হল, সময় হলেই আমাদের জাগিয়ে দেবে। উপরওয়ালাদের দস্তুর জানি, কথা কিছুতেই বিশ্বাস হয় না, কেননা তাঁরা বড়ো আমরা ছোটো।

সে রাত্রে নারাজ দেহটাকে বিছানায় টেনে নিয়ে গেলুম। তার একটা কারণ, মা বললেন তিনি স্বয়ং আমাকে জাগিয়ে দেবেন, আর-একটা কারণ ন'টার পরে নিজেকে জাগিয়ে রাখতে বেশ-একটু ঠেলাঠেলির দরকার হত। এক সময়ে ঘুম থেকে উঠিয়ে আমাকে নিয়ে আসা হল বাইরে। চোখে ধাঁধা লেগে গেল। একতলায় দোতলায় রঙিন ঝাড়লণ্ঠন থেকে ঝিলিমিলি আলো ঠিকরে পড়ছে চার দিকে, সাদা বিছানো চাদরে উঠোনটা চোখে ঠেকছে মস্ত। এক দিকে বসে আছেন বাড়ির কর্তারা আর যাঁদের ডেকে আনা হয়েছে। বাকি জায়গাটা যার খুশি যেখান থেকে এসে জমাট করেছে। থিয়েটরে এসেছিলেন পেটে-সোনার-চেন-ঝোলানো নামজাদার দল, আর এই যাত্রার আসরে বড়োয় ছোটোয় ঘেঁষাঘেঁষি। তাদের বেশির ভাগ মানুষই, ভদ্র-লোকেরা যাদের বলে বাজে লোক। তেমনি আবার পালাগানটা লেখানো হয়েছে এমন-সব লিখিয়ে দিয়ে যারা হাত পাকিয়েছে খাগড়া কলমে, যারা ইংরেজি কপিবুকের মকশো করে নি। এর সুর, এর নাচ, এর সব গল্প বাংলাদেশের হাট ঘাট মাঠের পয়দা-করা; এর ভাষা পণ্ডিতমশায় মেজে নি পালিশ করে।

সভায় যখন দাদাদের কাছে এসে বসলুম, রুমালে কিছু কিছু টাকা বেঁধে আমাদের হাতে দিয়ে দিলেন। বাহবা দেবার ঠিক জায়গাটাতে ঐ টাকা ছুঁড়ে দেওয়া ছিল রীতি। এতে যাত্রাওয়ালার ছিল উপরি পাওনা, আর গৃহস্থের ছিল খোশনাম।

রাত ফুরোত, যাত্রা ফুরোতে চাইত না। মাঝখানে নেতিয়ে-পড়া দেহটাকে আড়কোলা করে কে যে কোথায় নিয়ে গেল জানতেও পারি নি। জানতে পারলে সে কি কম লজ্জা। যে মানুষ বড়োদের সমান সারে বসে বকশিশ দিচ্ছে ছুঁড়ে, উঠোনসুদ্ধ লোকের সামনে তাকে কিনা এমন অপমান। ঘুম যখন ভাঙল দেখি মায়ের তক্তপোশে শুয়ে আছি। বেলা হয়েছে বিস্তর, ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর। সূর্য উঠে গেছে অথচ আমি উঠি নি, এ ঘটে নি আর কোনোদিন।

শহরে আজকাল আমোদ চলে নদীর স্রোতের মতো। মাঝে-মাঝে তার ফাঁক নেই। রোজই যেখানে-সেখানে যখন-তখন সিনেমা, যে খুশি ঢুকে পড়ছে সামান্য খরচে। সেকালে যাত্রাগান ছিল যেন শুকনো গাঙে কোশ-দুকোশ অন্তর বালি খুঁড়ে জল তোলা। ঘণ্টা কয়েক তার মেয়াদ, পথের লোক হঠাৎ এসে পড়ে, আঁজলা ভরে তেষ্টা নেয় মিটিয়ে।

আগেকার কালটা ছিল যেন রাজপুত্তুর। মাঝে মাঝে পালপার্বণে যখন মর্জি হত আপন এলেকায় করত দান-খয়রাত। এখনকার কাল সদাগরের পুত্তুর, হরেক রকমের ঝক্‌ঝকে মাল সাজিয়ে বসেছে সদর রাস্তার চৌমাথায়। বড়ো রাস্তা থেকে খদ্দের আসে, ছোটো রাস্তা থেকেও।

৬

চাকরদের বড়োকর্তা ব্রজেশ্বর। ছোটোকর্তা যে ছিল তার নাম শ্যাম— বাড়ি যশোরে, খাঁটি পাড়াগেঁয়ে, ভাষা তার কলকাতায়ি নয়। সে বলত, তেনারা, ওনারা, খাতি হবে, যাতি হবে, মুগির ডাল, কুলির অম্বল। 'দোমনি' ছিল তার আদরের ডাক। তার রঙ ছিল শ্যামবর্ণ, বড়ো বড়ো চোখ, তেল-চুক্‌চুকে লম্বা চুল, মজবুত দোহারা শরীর। তার স্বভাবে কড়া কিছুই ছিল না, মন ছিল সাদা। ছেলেদের 'পরে তার ছিল দরদ। তার কাছে আমরা ডাকাতের গল্প শুনতে পেতুম। তখন ভূতের ভয় যেমন মানুষের মন জুড়ে ছিল তেমনি ডাকাতের গল্প ছিল ঘরে ঘরে। ডাকাতি এখনো কম হয় না— খুনও হয়, জখমও হয়, লুঠও হয়, পুলিসও ঠিক লোককে ধরে না। কিন্তু এ হল খবর, এতে গল্পের মজা নেই। তখনকার ডাকাতি গল্পে উঠেছিল দানা বেঁধে, অনেকদিন পর্যন্ত মুখে মুখে চারিয়ে গেছে। আমরা যখন জন্মেছি তখনো এমন-সব লোক দেখা যেত যারা সমর্থ বয়সে ছিল ডাকাতের দলে। মস্ত মস্ত সব লাঠিয়াল, সঙ্গে সঙ্গে চলে লাঠিখেলার সাকরেদ। তাদের নাম শুনলেই লোকে সেলাম করত। প্রায়ই ডাকাতি

তখন গোঁয়ারের মতো নিছক খুনখারাবির ব্যাপার ছিল না। তাতে যেমন ছিল বুকের পাটা তেমনি দরাজ মন। এ দিকে ভদ্রলোকের ঘরেও লাঠি দিয়ে লাঠি ঠেকাবার আখড়া বসে গিয়েছিল। যারা নাম করেছিল ডাকাতরাও তাদের মানত ওস্তাদ বলে, এড়িয়ে চলত তাদের সীমানা। অনেক জমিদারের ডাকাতি ছিল ব্যাবসা। গল্প শুনেছি, সেই জাতের একজন দল বসিয়ে রেখেছিল নদীর মোহানায়। সেদিন অমাবস্যা, পুজোর রাত্তির, কালী কঙ্কালীর নামে মুণ্ড কেটে মন্দিরে যখন নিয়ে এল জমিদার কপাল চাপড়ে বললে, 'এ যে আমারই জামাই!'

আরও শোনা যেত রঘুডাকাত বিশুডাকাতের কথা। তারা আগে থাকতে খবর দিয়ে ডাকাতি করত, ইতরপনা করত না। দূর থেকে তাদের হাঁক শুনে পাড়ার রক্ত যেত হিম হয়ে। মেয়েদের গায়ে হাত দিতে তাদের ধর্মে ছিল মানা। একবার একজন মেয়ে খাঁড়া হাতে কালী সেজে উল্‌টে ডাকাতের কাছ থেকে প্রণামী আদায় করেছিল।

আমাদের বাড়িতে একদিন ডাকাতের খেলা দেখানো হয়েছিল। মস্ত মস্ত কালো কালো জোয়ান সব, লম্বা লম্বা চুল। ঢেঁকিতে চাদর বেঁধে সেটা দাঁতে কামড়ে ধরে দিলে ঢেঁকিটা টপকিয়ে পিঠের দিকে। ঝাঁকড়া চুলে মানুষ ঝুলিয়ে লাগল ঘোরাতে। লম্বা লাঠির উপর ভর দিয়ে লাফিয়ে উঠল দোতলায়। একজনের দুই হাতের ফাঁক দিয়ে পাখির মতো সুট করে বেরিয়ে গেল। দশ-বিশ কোশ দূরে ডাকাতি সেরে সেই রাত্রেই ভালোমানুষের মতো ঘরে ফিরে এসে শুয়ে থাকা কেমন করে হতে পারে, তাও দেখালে। খুব বড়ো একজোড়া লাঠির মাঝখানে আড়-করা একটা করে পা রাখবার কাঠের টুকরো বাঁধা। এই লাঠিকে বলে রণপা। দুই হাতে দুই লাঠির আগা ধরে সেই পাদানের উপর পা রেখে চললে এক পা ফেলা দশ পা ফেলার সামিল হত, ঘোড়ার চেয়ে দৌড় হত বেশি। ডাকাতি করবার মতলব যদিও মাথায় ছিল না তবু এক সময়ে এই রণপায় চলার অভ্যাস তখনকার শান্তিনিকেতনে ছেলেদের মধ্যে চালাবার চেষ্টা করেছিলুম। ডাকাতি খেলার এই ছবি শ্যামের মুখের গল্পের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে কতবার সন্ধে কাটিয়েছি দু হাতে পাঁজর চেপে ধরে।

ছুটির রবিবার। আগের সন্ধেবেলায় ঝিঁঝি ডাকছিল বাইরের দক্ষিণের বাগানের ঝোপে, গল্পটা ছিল রঘু ডাকাতের। ছায়া-কাঁপা ঘরে মিট্‌মিটে আলোতে বুক করছিল ধুক ধুক। পরদিন ছুটির ফাঁকে পালকিতে চড়ে বসলুম। সেটা চলতে শুরু করল বিনা চলায়, উড়ো ঠিকানায়, গল্পের জালে জড়ানো মনটাকে ভয়ের স্বাদ দেবার জন্যে। নিঝুম অন্ধকারের নাড়িতে যেন তালে তালে বেজে উঠছে বেহারাগুলোর হাই হুই হাই হুই, গা করছে ছম ছম। ধু ধু করে মাঠ, বাতাস কাঁপে

রোদ্দুরে। দূরে ঝিক ঝিক করে কালীদিঘির জল। চিক চিক করে বালি। ডাঙার উপর থেকে ঝুঁকে পড়েছে ফাটল-ধরা ঘাটের দিকে ডালপালা-ছড়ানো পাকুড় গাছ।

গল্পের আতঙ্ক জমা হয়ে আছে না-জানা মাঠের গাছতলায়, ঘন বেতের ঝোপে। যত এগোচ্ছি দুর দুর করছে বুক। বাঁশের লাঠির আগা দুই-একটা দেখা যায় ঝোপের উপর দিকে। কাঁধ বদল করবে বেহারাগুলো ঐখানে। জল খাবে, ভিজে গামছা জড়াবে মাথায়। তার পরে?—

'রে রে রে রে রে রে!'

৭

সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পড়াশুনোর জাঁতাকল চলছেই। ঘর্ঘর শব্দে এই কলে দম দেওয়ার কাজ ছিল আমার সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের হাতে। তিনি ছিলেন কড়া শাসনকর্তা। তম্বুরার তারে অত্যন্ত বেশি টান দিতে গেলে পটাং করে যায় ছিঁড়ে। তিনি আমাদের মনে যতটা বেশি মাল বোঝাই করতে চেয়েছিলেন তার অনেকটাই ডিঙি উলটিয়ে তলিয়ে গেছে, এ কথা এখন আর লুকিয়ে রাখা চলবে না। আমার বিদ্যেটা লোকসানি মাল। সেজদাদা তাঁর বড়ো মেয়েকে শিখিয়ে তুলতে লেগেছিলেন। যথাসময়ে তাকে দিয়েছিলেন লোরেটোতে ভরতি করে। তার পূর্বেই তার ভাষায় প্রথম দখল হয়ে গেছে বাংলায়।

প্রতিভাকে বিলিতি সংগীতে পাকা করে তুললেন। তাতে করে তাকে দিশি গানের পথ ভুলিয়ে দেওয়া হয় নি সে আমরা জানি। তখনকার দিনে ভদ্র পরিবারে হিন্দুস্থানি গানে তার সমান কেউ ছিল না।

বিলিতি সংগীতের গুণ হচ্ছে তাতে সুর সাধানো হয় খুব খাঁটি করে, কান দোরস্ত হয়ে যায়, আর পিয়ানোর শাসনে তালেও ঢিলেমি থাকে না।

এ দিকে বিষ্ণুর কাছে দিশি গান শুরু হয়েছে শিশুকাল থেকে। গানের এই পাঠশালায় আমাকেও ভরতি হতে হল। বিষ্ণু যে গানে হাতেখড়ি দিলেন এখনকার কালের কোনো নামী বা বেনামী ওস্তাদ তাকে ছুঁতে ঘৃণা করবেন। সেগুলো পাড়াগেঁয়ে ছড়ার অত্যন্ত নীচের তলার। দুই-একটা নমুনা দিই—

এক যে ছিল বেদের মেয়ে
এল পাড়াতে
সাধের উলকি পরাতে।

আবার উলকি পরা যেমন-তেমন
লাগিয়ে দিল ভেলকি
ঠাকুরঝি,
উলকির জ্বালাতে কত কেঁদেছি
ঠাকুরঝি।

আরও কিছু ছেঁড়া ছেঁড়া লাইন মনে পড়ে। যেমন—

চন্দ্র সূর্য হার মেনেছে, জোনাক জ্বালে বাতি।
মোগল পাঠান হদ্দ হল,
ফার্সি পড়ে তাঁতি।
...
গণেশের মা, কলাবউকে জ্বালা দিয়ো না,
তার একটি মোচা ফললে পরে
কত হবে ছানাপোনা।

অতি পুরোনো কালের ভুলে-যাওয়া খবরের আমেজ আসে এমন লাইনও পাওয়া যায়। যেমন—

এক যে ছিল কুকুর-চাটা
শেয়ালকাঁটার বন
কেটে করলে সিংহাসন।

এখনকার নিয়ম হচ্ছে প্রথমে হারমোনিয়মে সুর লাগিয়ে সা রে গা মা শাধানো, তার পরে হালকা গোছের হিন্দি গান ধরিয়ে দেওয়া। তখন আমাদের পড়াশুনোর যিনি তদারক করতেন তিনি বুঝেছিলেন, ছেলেমানুষি ছেলেদের মনের আপন জিনিস, আর ঐ হালকা বাংলা ভাষা হিন্দি বুলির চেয়ে মনের মধ্যে সহজে জায়গা করে নেয়। তা ছাড়া, এ ছন্দের দিশি তাল বাঁয়া-তবলার বোলের তোয়াক্কা রাখে না। আপনা-আপনি নাড়িতে নাচতে থাকে। শিশুদের মন-ভোলানো প্রথম সাহিত্য শেখানো মায়ের মুখের ছড়া দিয়ে, শিশুদের মন-ভোলানো গান শেখানোর শুরু সেই ছড়ায়— এইটে আমাদের উপর দিয়ে পরখ করানো হয়েছিল।

তখন হারমোনিয়ম আসে নি এ দেশের গানের জাত মারতে। কাঁধের উপর তম্বুরা তুলে গান অভ্যেস করেছি। কল-টেপা সুরের গোলামি করি নি।

আমার দোষ হচ্ছে, শেখবার পথে কিছুতেই আমাকে বেশি দিন চালাতে পারে নি। ইচ্ছেমত কুড়িয়ে-বাড়িয়ে যা পেয়েছি ঝুলি ভরতি করেছি তাই দিয়েই।

মন দিয়ে শেখা যদি আমার ধাতে থাকত তা হলে এখনকার দিনের ওস্তাদরা আমাকে তাচ্ছিল্য করতে পারত না। কেননা সুযোগ ছিল বিস্তর। যে কয়দিন আমাদের শিক্ষা দেবার কর্তা ছিলেন সেজদাদা ততদিন বিষ্ণুর কাছে আনমনাভাবে ব্রহ্মসংগীত আউড়েছি। কখনো কখনো যখন মন আপনা হতে লেগেছে তখন গান আদায় করেছি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে। সেজদাদা বেহাগে আওড়াচ্ছেন 'অতি-গজ-গামিনী রে', আমি লুকিয়ে মনের মধ্যে তার ছাপ তুলে নিচ্ছি। সন্ধে-বেলায় মাকে সেই গান শুনিয়ে অবাক করা খুব সহজ কাজ ছিল। আমাদের বাড়ির বন্ধু শ্রীকণ্ঠবাবু দিনরাত গানের মধ্যে তলিয়ে থাকতেন। বারান্দায় বসে বসে চামেলির তেল মেখে স্নান করতেন, হাতে থাকত গুড়গুড়ি, অম্বুরি তামাকের গন্ধ উঠত আকাশে, গুন গুন গান চলত, ছেলেদের টেনে রাখতেন চার দিকে। তিনি তো গান শেখাতেন না, গান তিনি দিতেন; কখন তুলে নিতুম জানতে পারতুম না। ফুর্তি যখন রাখতে পারতেন না দাঁড়িয়ে উঠতেন, নেচে নেচে বাজাতে থাকতেন সেতার, হাসিতে বড়ো বড়ো চোখ জ্বল জ্বল করত, গান ধরতেন— ময় ছোড়োঁ ব্রজকী বাসরী। সঙ্গে সঙ্গে আমিও না গাইলে ছাড়তেন না।

তখনকার আতিথ্য ছিল খোলা দরজার। চেনাশোনার খোঁজখবর নেবার বিশেষ দরকার ছিল না। যারা যখন এসে পড়ত তাদের শোবার জায়গাও মিলত, অন্নের থালাও আসত যথানিয়মে। সেই রকমের অচেনা অতিথি একদিন লেপ-মোড়া তম্বুরা কাঁধে করে তাঁর পুঁটুলি খুলে বসবার ঘরের এক পাশে পা ছড়িয়ে দিলেন। কানাই হুঁকোবরদার যথারীতি তাঁর হাতে দিলে হুঁকো তুলে।

সেকালে ছিল অতিথির জন্যে এই যেমন তামাক তেমনি পান। তখনকার দিনে বাড়ি-ভিতরে মেয়েদের সকাল বেলাকার কাজ ছিল ঐ— পান সাজতে হত রাশি রাশি, বাইরের ঘরে যারা আসত তাদের উদ্দেশে। চট্‌পট্‌ পানে চুন লাগিয়ে, কাঠি দিয়ে খয়ের লেপে, ঠিকমত মসলা ভ'রে, লজ দিয়ে মুড়ে সেগুলো বোঝাই হতে থাকত পিতলের গামলায়; উপরে পড়ত খয়েরের ছোপলাগা ভিজে ন্যাকড়ার ঢাকা। ও দিকে বাইরে সিঁড়ির নীচের ঘরটাতে চলত তামাক সাজার ধুম। মাটির গামলায় ছাই-ঢাকা গুল, আলবোলার নলগুলো ঝুলছে নাগলোকের সাপের মতো, তাদের নাড়ির মধ্যে গোলাপ-জলের গন্ধ। বাড়িতে যাঁরা আসতেন সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার মুখে তাঁরা গৃহস্থের প্রথম 'আসুন মশায়' ডাক পেতেন এই অম্বুরি তামাকের গন্ধে। তখন এই একটা বাঁধা নিয়ম ছিল মানুষকে মেনে নেওয়ার।

সেই ভরপুর পানের গামলা অনেক দিন হল সরে পড়েছে, আর সেই হুঁকোবরদার জাতটা সাজ খুলে ফেলে ময়রার দোকানে তিন দিনের বাসি সন্দেশ চটকে চটকে মাখতে লেগেছে।

সেই অজানা গাইয়ে আপন ইচ্ছেমত রয়ে গেলেন কিছুদিন। কেউ প্রশ্নও করলে না। ভোরবেলা মশারি থেকে টেনে বের করে তাঁর গান শুনতেম। নিয়মের শেখা যাদের ধাতে নেই, তাদের শখ অনিয়মের শেখায়। সকাল বেলার সুরে চলত 'বঙশী হমারি রে'।

তার পরে যখন আমার কিছু বয়েস হয়েছে তখন বাড়িতে খুব বড়ো ওস্তাদ এসে বসলেন যদু ভট্ট। একটা মস্ত ভুল করলেন, জেদ ধরলেন আমাকে গান শেখাবেনই; সেইজন্যে গান শেখাই হল না। কিছু কিছু সংগ্রহ করেছিলুম লুকিয়ে-চুরিয়ে— ভালো লাগল কাফি সুরে 'রুম ঝুম বরখে আজু বাদরওয়া', রয়ে গেল আজ পর্যন্ত আমার বর্ষার গানের সঙ্গে দল বেঁধে। মুশকিল হল, এই সময়ে আর-এক অতিথি হাজির হল কিছু না বলে কয়ে। বাঘ-মারা বলে তাঁর খ্যাতি। বাঙালি বাঘ মারে এ কথাটা সেদিন শোনাত খুব অদ্ভুত, কাজেই বেশির ভাগ সময় আটকা পড়ে গেলুম তাঁরই ঘরে। যে বাঘের কবলে পড়েছিলেন বলে আমাদের বুকে চমক লাগিয়েছিলেন সে বাঘের মুখ থেকে তিনি কামড় পান নি, কামড়ের গল্পটা আন্দাজ করে নিয়েছিলেন মিউজিয়মে মরা বাঘের হাঁ থেকে— তখন সে কথা ভাবি নি, এখন সেটা পষ্ট বুঝতে পারছি। তবু তখনকার মতো ঐ বীরপুরুষের জন্য ঘন ঘন পান-তামাকের জোগাড় করতে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। দূর থেকে কানে পৌঁছত কানাড়ার আলাপ।

এই তো গেল গান। সেজদাদার হাতে আমার অস্ত্র বিদ্যের যে গোড়াপত্তন হয়েছিল সেও খুব ফলাও রকমের। বিশেষ কিছু ফল হয় নি, সে স্বভাবদোষে। আমার মতো মানুষকে মনে রেখেই রামপ্রসাদ সেন বলেছিলেন, 'মন, তুমি কৃষিকাজ বোঝো না।' কোনোদিন আবাদের কাজ করা হয় নি।

চাষের আঁচড় কাটা হয়েছিল কোন্ কোন্ খেতে তার খবরটা দেওয়া যাক।

অন্ধকার থাকতেই বিছানা থেকে উঠি, কুস্তির সাজ করি, শীতের দিনে শিরশির করে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতে থাকে। শহরে এক ডাকসাইটে পালোয়ান ছিল, কানা পালোয়ান, সে আমাদের কুস্তি লড়াত। দালানঘরের উত্তর দিকে একটা ফাঁকা জমি, তাকে বলা হয় গোলাবাড়ি। নাম শুনে বোঝা যায়, শহর একদিন পাড়াগাঁটাকে আগা-

গোড়া চাপা দিয়ে বসে নি, কিছু কিছু ফাঁক ছিল। শহরে সভ্যতার শুরুতে আমাদের গোলাবাড়ি গোলা ভরে বছরের ধান জমা করে রাখত, খাস জমির রায়তরা দিত তাদের ধানের ভাগ। এই পাঁচিল ঘেঁষে ছিল কুস্তির চালাঘর। এক হাত আন্দাজ খুঁড়ে মাটি আলগা করে তাতে এক মোন সরষের তেল ঢেলে জমি তৈরি হয়েছিল। সেখানে পালোয়ানের সঙ্গে আমার প্যাঁচ কষা ছিল ছেলেখেলা মাত্র। খুব খানিকটা মাটি মাখামাখি করে শেষকালে গায়ে একটা জামা চড়িয়ে চলে আসতুম। সকালবেলায় রোজ এত ক'রে মাটি ঘেঁটে আসা ভালো লাগত না মায়ের, তাঁর ভয় হত ছেলের গায়ের রঙ মেটে হয়ে যায় পাছে। তার ফল হয়েছিল ছুটির দিনে তিনি লেগে যেতেন শোধন করতে। এখনকার কালের শৌখিন গিন্নিরা রঙ সাফ করবার সরঞ্জাম কৌটোতে করে কিনে আনেন বিলিতি দোকান থেকে, তখন তাঁরা মলম বানাতেন নিজের হাতে। তাতে ছিল বাদাম-বাটা, সর, কমলালেবুর খোসা, আরও কত কী— যদি জানতুম আর মনে থাকত তবে বেগম-বিলাস নাম দিয়ে ব্যাবসা করলে সন্দেশের দোকানের চেয়ে কম আয় হত না। রবিবার দিন সকালে বারান্দায় বসিয়ে দলন-মলন চলতে থাকত, অস্থির হয়ে উঠত মন ছুটির জন্যে। এ দিকে ইস্কুলের ছেলেদের মধ্যে একটা গুজব চলে আসছে যে, জন্মমাত্র আমাদের বাড়িতে শিশুদের ডুবিয়ে দেওয়া হয় মদের মধ্যে, তাতেই রঙটাতে সাহেবি জেল্লা লাগে।

কুস্তির আখড়া থেকে ফিরে এসে দেখি মেডিক্যাল কলেজের এক ছাত্র বসে আছেন মানুষের হাড় চেনাবার বিদ্যে শেখাবার জন্যে। দেয়ালে ঝুলছে আস্ত একটা কঙ্কাল। রাত্রে আমাদের শোবার ঘরের দেয়ালে এটা ঝুলত, হাওয়ায় নাড়া খেলে হাড়গুলো উঠত খট খট করে। তাদের নাড়াচাড়া করে করে হাড়গুলোর শক্ত শক্ত নাম সব জানা হয়েছিল, তাতেই ভয় গিয়েছিল ভেঙে।

দেউড়িতে বাজল সাতটা। নীলকমল[1] মাস্টারের ঘড়ি-ধরা সময় ছিল নিরেট। এক মিনিটের তফাত হবার জো ছিল না। খট্‌খটে রোগা শরীর, কিন্তু স্বাস্থ্য তাঁর ছাত্রেরই মতো, এক দিনের জন্যেও মাথাধরার সুযোগ ঘটল না। বই নিয়ে স্লেট নিয়ে যেতুম টেবিলের সামনে। কালো বোর্ডের উপর খড়ি দিয়ে অঙ্কের দাগ পড়তে থাকত— সবই বাংলায়, পাটীগণিত, বীজগণিত, রেখাগণিত। সাহিত্যে 'সীতার বনবাস' থেকে একদম চড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল 'মেঘনাদবধ' কাব্যে। সঙ্গে ছিল প্রাকৃতবিজ্ঞান। মাঝে মাঝে আসতেন সীতানাথ দত্ত[2], বিজ্ঞানের ভাসা ভাসা খবর পাওয়া যেত জানা জিনিস

১ নীলকমল ঘোষাল —জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড, পৃ ২৮৩

২ সীতানাথ ঘোষ ?

পরখ করে। মাঝে একবার এলেন হেরম্ব তত্ত্বরত্ন। লাগলুম কিছু না বুঝে মুগ্ধবোধ মুখস্থ করে ফেলতে। এমনি করে সারা সকাল জুড়ে নানারকম পড়ার যতই চাপ পড়ে মন ততই ভিতরে ভিতরে চুরি ক'রে কিছু কিছু বোঝা সরাতে থাকে, জালের মধ্যে ফাঁক ক'রে তার ভিতর দিয়ে মুখস্থ বিদ্যে ফসকিয়ে যেতে চায়, আর নীলকমল মাস্টার তাঁর ছাত্রের বুদ্ধি নিয়ে যে মত জারি করতে থাকেন তা বাইরের পাঁচজনকে ডেকে ডেকে শোনাবার মতো হয় না।

বারান্দায় আর-এক ধারে বুড়ো দরজি, চোখে আতশ কাঁচের চশমা, ঝুঁকে প'ড়ে কাপড় সেলাই করছে, মাঝে মাঝে সময় হলে নমাজ পড়ে নিচ্ছে— চেয়ে দেখি আর ভাবি কী সুখেই আছে নেয়ামত। অঙ্ক কষতে মাথা যখন ঘুলিয়ে যায় চোখের উপর স্লেট আড়াল ক'রে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি, দেউড়ির সামনে চন্দ্রভান, লম্বা দাড়ি কাঠের কাঁকই দিয়ে আঁচড়িয়ে তুলছে দুই কানের উপর দুই ভাগে। পাশে বসে আছে কাঁকন-পরা ছিপ্‌ছিপে ছোকরা দরোয়ান, কুটছে তামাক। ঐখানে ঘোড়াটা সকালেই খেয়ে গেছে বালতিতে বরাদ্দ দানা, কাকগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে ঠোকরাচ্ছে ছিটিয়ে-পড়া ছোলা, জনি কুকুরটার কর্তব্যবোধ জেগে ওঠে— ঘেউ ঘেউ করে দেয় তাড়া।

বারান্দায় এক কোণে ঝাঁট দিয়ে জমা করা ধুলোর মধ্যে পুঁতেছিলুম আতার বিচি[1]। কবে তার থেকে কচি পাতা বেরবে দেখবার জন্যে মন ছট্‌ফট্‌ করছে। নীলকমল মাস্টার উঠে গেলেই ছুটে গিয়ে তাকে দেখে আসা চাই, আর দেওয়া চাই জল। শেষ পর্যন্ত আমার আশা মেটে নি। যে ঝাঁটা একদিন ধুলো জমিয়েছিল সেই ঝাঁটাই দিয়েছিল ধুলো উড়িয়ে।

সূর্য উপরে উঠে যায়, অর্ধেক আঙিনায় হেলে পড়ে ছায়া। ন'টা বাজে। বেঁটে কালো গোবিন্দ কাঁধে হলদে রঙের ময়লা গামছা ঝুলিয়ে আমাকে নিয়ে যায় স্নান করাতে। সাড়ে ন'টা বাজতেই রোজকার বরাদ্দ ডাল ভাত মাছের ঝোলের বাঁধা ভোজ। রুচি হয় না খেতে।

ঘণ্টা বাজে দশটার। বড়ো রাস্তা থেকে মন-উদাস-করা ডাক শোনা যায় কাঁচা-আম-ওয়ালার। বাসনওয়ালা ঠং ঠং আওয়াজ দিয়ে চলছে দূরের থেকে দূরে। গলির ধারের বাড়ির ছাতে বড়োবউ ভিজে চুল শুকোচ্ছে রোদ্দুরে, তার দুই মেয়ে কড়ি নিয়ে খেলেই চলেছে, কোনো তাড়া নেই। মেয়েদের তখন ইস্কুল যাওয়ার তাগিদ ছিল না। মনে হত মেয়ে-জন্মটা নিছক সুখের। বুড়ো ঘোড়া পালকিগাড়িতে ক'রে টেনে নিয়ে চলল আমার দশটা-চারটার আন্দামানে। সাড়ে চারটের পর ফিরে আসি ইস্কুল থেকে।

১ দ্রষ্টব্য 'আতার বিচি' —ছড়ার ছবি, রবীন্দ্র-রচনাবলী, একবিংশ খণ্ড

জিম্‌নাস্টিকের মাস্টার এসেছেন। কাঠের ডাণ্ডার উপর ঘণ্টাখানেক ধরে শরীরটাকে উলটপালট করি। তিনি যেতে না যেতে এসে পড়েন ছবি-আঁকার মাস্টার।

ক্রমে দিনের মরচে পড়া আলো মিলিয়ে আসে। শহরের পাঁচমিশালি ঝাপসা শব্দে স্বপ্নের সুর লাগায় ইটকাঠের দৈত্যটার দেহে।

পড়বার ঘরে জ্বলে ওঠে তেলের বাতি। অঘোর মাস্টার এসে উপস্থিত। শুরু হয়েছে ইংরেজি পড়া। কালো কালো মলাটের রীডার যেন ওত পেতে রয়েছে টেবিলের উপর। মলাটটা ঢল্‌ঢলে, পাতাগুলো কিছু ছিঁড়েছে, কিছু দাগি, অজায়গায় হাত পাকিয়েছি নিজের নাম ইংরেজিতে লিখে— তার সবটাই ক্যাপিটল অক্ষর। পড়তে পড়তে ঢুলি, ঢুলতে ঢুলতে চমকে উঠি। যত পড়ি তার চেয়ে না পড়ি অনেক বেশি।...

বিছানায় ঢুকে এতক্ষণ পরে পাওয়া যায় একটুখানি পোড়ো সময়। সেখানে শুনতে শুনতে শেষ হতে পায় না— রাজপুত্তুর চলেছে তেপান্তর মাঠে।

৮

তখনকার কালের সঙ্গে এখনকার কালের তফাত ঘটেছে এ কথা স্পষ্ট বুঝতে পারি যখন দেখতে পাই আজকাল বাড়ির ছাদে না আছে মানুষের আনাগোনা, না আছে ভূতপ্রেতের। পূর্বেই জানিয়েছি, অত্যন্ত বেশি লেখাপড়ার আবহাওয়ায় টিঁকতে না পেরে ব্রহ্মদৈত্য দিয়েছে দৌড়। ছাদের কার্নিসে তার আরামে পা রাখবার গুজব উঠে গিয়ে সেখানে এঁঠো আমের আঁঠি নিয়ে কাকেদের চলেছে ছেঁড়াছেঁড়ি। এ দিকে মানুষের বসতি আটক পড়েছে নীচের তলায় চারকোনা দেয়ালের প্যাক্‌বাক্সে।

মনে পড়ে বাড়ি-ভিতরের পাঁচিল-ঘেরা ছাদ। মা বসেছেন সন্ধেবেলায় মাদুর পেতে, তাঁর সঙ্গিনীরা চার দিকে ঘিরে বসে গল্প করছে। সেই গল্পে খাঁটি খবরের দরকার ছিল না। দরকার কেবল সময়-কাটানো। তখনকার দিনের সময় ভরতি করবার জন্যে নানা দামের নানা মালমসলার বরাদ্দ ছিল না। দিন ছিল না ঠাসবুনুনি করা, ছিল বড়ো-বড়ো-ফাঁক-ওয়ালা জালের মতো। পুরুষদের মজলিসেই হোক, আর মেয়েদের আসরেই হোক, গল্পগুজব হাসিতামাশা ছিল খুবই হালকা দামের। মায়ের সঙ্গিনীদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি ছিলেন ব্রজ আচার্জির বোন, যাঁকে আচার্জিনী বলে ডাকা হত। তিনি ছিলেন এ বৈঠকে দৈনিক খবর সরবরাহ

করবার কাজে। প্রায় আনতেন রাজ্যির বিদকুটে খবর কুড়িয়ে কিংবা বানিয়ে। তাই নিয়ে গ্রহশান্তি-স্বস্ত্যয়নের হিসেব হত খুব ফলাও খরচায়। এই সভায় আমি মাঝে মাঝে টাটকা পুঁথি-পড়া বিদ্যের আমদানি করেছি, শুনিয়েছি সূর্য পৃথিবী থেকে ন কোটি মাইল দূরে। ঋজুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ থেকে স্বয়ং বাল্মীকি-রামায়ণের টুকরো আউড়ে দিয়েছি অনুস্বার-বিসর্গ-সুদ্ধ; মা জানতেন না তাঁর ছেলের উচ্চারণ কত খাঁটি, তবু তার বিদ্যের পাল্লা সূর্যের ন কোটি মাইল রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে তাঁকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। এ-সব শ্লোক স্বয়ং নারদমুনি ছাড়া আর কারও মুখে শোনা যেতে পারে, এ কথা কে জানত বলো।

বাড়ি-ভিতরের এই ছাদটা ছিল আগাগোড়া মেয়েদের দখলে। ভাঁড়ারের সঙ্গে ছিল তার বোঝাপড়া। ওখানে রোদ পড়ত পুরোপুরি, জারক নেবুকে দিত জারিয়ে। ঐখানে মেয়েরা বসত পিতলের গামলা-ভরা কলাইবাটা নিয়ে। টিপে টিপে টপ্‌টপ্‌ করে বড়ি দিত চুল শুকোতে শুকোতে; দাসীরা বাসি কাপড় কেচে মেলে দিয়ে যেত রোদ্দুরে। তখন অনেকটা হালকা ছিল ধোবার কাজ। কাঁচা আম ফালি করে কেটে কেটে আমসি শুকনো হত, ছোটো বড়ো নানা সাইজের নানা-কাজ-করা কালো পাথরের ছাঁচে আমের রস থাকে থাকে জমিয়ে তোলা হত, রোদ-খাওয়া সরষের তেলে মজে উঠত ইঁচড়ের আচার। কেয়াখয়ের তৈরি হত সাবধানে, তার কথাটা আমার বেশি করে মনে রাখবার মানে আছে। যখন ইস্কুলের পণ্ডিতমশায় আমাকে জানিয়ে দিলেন আমাদের বাড়ির কেয়াখয়েরের নাম তাঁর শোনা আছে, অর্থ বুঝতে শক্ত ঠেকল না। যা তাঁর শোনা আছে সেটা তাঁর জানা চাই। তাই বাড়ির সুনাম বজায় রাখবার জন্য মাঝে মাঝে লুকিয়ে ছাদে উঠে দুটো-একটা কেয়াখয়ের— কী বলব— চুরি করতুম বলার চেয়ে বলা ভালো অপহরণ করতুম। কেননা রাজা-মহারাজারাও দরকার হলে, এমন-কি না হলেও, অপহরণ করে থাকেন আর যারা চুরি করে তাদের জেলে পাঠান, শূলে চড়ান। শীতের কাঁচা রৌদ্রে ছাদে বসে গল্প করতে করতে কাক তাড়াবার আর সময় কাটাবার একটা দায় ছিল মেয়েদের। বাড়িতে আমি ছিলুম একমাত্র দেওর, বউদিদি[1]র আমসত্ত-পাহারা, তা ছাড়া আরও পাঁচরকম খুচরো কাজের সাথি। পড়ে শোনাতুম 'বঙ্গাধিপ পরাজয়'[2]। কখনো কখনো আমার উপরে ভার পড়ত

১ কাদম্বরী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী

২ "বইটি যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের জীবনী লইয়া বিরচিত।" —প্রতাপচন্দ্র ঘোষ-প্রণীত প্রথম প্রকাশ: প্রথমখণ্ড ১৭৯১ শক [১৮৬৯], দ্বিতীয়খণ্ড ১৮০০ শক [১৮৭৮]

জাঁতি দিয়ে সুপুরি কাটবার। খুব সরু করে সুপুরি কাটতে পারতুম। আমার অন্য কোনো গুণ যে ছিল, সে কথা কিছুতেই বউঠাকরুন মানতেন না, এমন-কি চেহারারও খুঁত ধরে বিধাতার উপর রাগ ধরিয়ে দিতেন। কিন্তু আমার সুপুরি-কাটা হাতের গুণ বাড়িয়ে বলতে মুখে বাধত না। তাতে সুপুরি কাটার কাজটা চলত খুব দৌড়বেগে। উসকিয়ে দেবার লোক না থাকাতে সরু করে সুপুরি কাটার হাত অনেক দিন থেকে অন্য সরু কাজে লাগিয়েছি।

ছাদে-মেলে-দেওয়া এই-সব মেয়েলি কাজে পাড়াগাঁয়ের একটা স্বাদ ছিল। এই কাজগুলো সেই সময়কার যখন বাড়িতে ছিল ঢেঁকিশাল, যখন হত নারু কোটা, যখন দাসীরা সন্ধেবেলায় বসে উরুতের উপর সলতে পাকাত, আর প্রতিবেশীর ঘরে ডাক পড়ত আটকৌড়ির নেমন্তন্নে। রূপকথা আজকাল ছেলেরা মেয়েদের মুখ থেকে শুনতে পায় না, নিজে নিজে পড়ে ছাপানো বই থেকে। আচার চাটনি এখন কিনে আনতে হয় নতুনবাজার থেকে— বোতলে ভরা, গালা দিয়ে ছিপিতে বন্ধ।

পাড়াগাঁয়ের আরও-একটা ছাপ ছিল চণ্ডীমণ্ডপে। ঐখানে গুরুমশায়ের পাঠশালা বসত। কেবল বাড়ির নয়, পাড়াপ্রতিবেশীর ছেলেদেরও ঐখানেই বিদ্যের প্রথম আঁচড় পড়ত তালপাতায়। আমিও নিশ্চয় ঐখানেই স্বরে-অ স্বরে-আ'র উপর দাগা বুলোতে আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু সৌরলোকের সবচেয়ে দূরের গ্রহের মতো সেই শিশুকে মনে-আনা-ওয়ালা কোনো দুরবীন দিয়েও তাকে দেখবার জো নেই।

তার পরে বই পড়ার কথা প্রথম যা মনে পড়ে সে ষণ্ডামার্ক মুনির পাঠশালার বিষম ব্যাপার নিয়ে, আর হিরণ্যকশিপুর পেট চিরছে নৃসিংহ-অবতার— বোধ করি সীসের ফলকে খোদাই করা তার একখানা ছবিও দেখেছি সেই বইয়ে। আর মনে পড়ছে কিছু কিছু চাণক্যের শ্লোক।[1]

আমার জীবনে বাইরের খোলা ছাদ ছিল প্রধান ছুটির দেশ। ছোটো থেকে বড়ো বয়স পর্যন্ত আমার নানা রকমের দিন ঐ ছাদে নানা ভাবে বয়ে চলেছে। আমার পিতা যখন বাড়ি থাকতেন তাঁর জায়গা ছিল তেতালার ঘরে। চিলেকোঠার আড়ালে দাঁড়িয়ে দূর থেকে কতদিন দেখেছি, তখনো সূর্য ওঠে নি, তিনি সাদা পাথরের মূর্তির মতো ছাদে চুপ করে বসে আছেন, কোলে দুটি হাত জোড়-করা। মাঝে মাঝে তিনি অনেক দিনের জন্য চলে যেতেন পাহাড়ে পর্বতে, তখন ঐ ছাদে যাওয়া ছিল আমার সাত-সমুদ্দুর-পারে যাওয়ার আনন্দ। চিরদিনের নীচেতলায় বারান্দায় বসে বসে রেলিঙের

১ ভুলনীয় 'শিশুবোধক'। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক সংগৃহীত ও কলিকাতা, আহিরিটোলা, হইতে প্রকাশিত।

ফাঁক দিয়ে দেখে এসেছি রাস্তার লোক-চলাচল; কিন্তু ঐ ছাদের উপর যাওয়া লোকবসতির পিল্‌পেগাড়ি পেরিয়ে যাওয়া। ওখানে গেলে কলকাতার মাথার উপর দিয়ে পা ফেলে ফেলে মন চলে যায় যেখানে আকাশের শেষ নীল মিশে গেছে পৃথিবীর শেষ সবুজে। নানা বাড়ির নানা গড়নের উঁচুনিচু ছাদ চোখে ঠেকে, মধ্যে মধ্যে দেখা যায় গাছের ঝাঁকড়া মাথা। আমি লুকিয়ে ছাদে উঠতুম প্রায়ই দুপুর বেলায়। বরাবির এই দুপুর বেলাটা নিয়েছে আমার মন ভুলিয়ে। ও যেন দিনের বেলাকার রাত্তির, বালক সন্ন্যাসীর বিবাগি হয়ে যাবার সময়। খড়খড়ির ভিতর দিয়ে হাত গলিয়ে ঘরের ছিট্‌কিনি দিতুম খুলে। দরজার ঠিক সামনেই ছিল একটা সোফা; সেইখানে অত্যন্ত একলা হয়ে বসতুম। আমাকে পাকড়া করবার চৌকিদার যারা, পেট ভরে খেয়ে তাদের ঝিমুনি এসেছে, গা মোড়া দিতে দিতে শুয়ে পড়েছে মাদুর জুড়ে। রাঙা হয়ে আসত রোদ্দুর, চিল ডেকে যেত আকাশে। সামনের গলি দিয়ে হেঁকে যেত চুড়িওয়ালা। সেদিনকার দুপুরবেলাকার সেই চুপচাপ বেলা আজ আর নেই, আর নেই সেই চুপচাপ বেলার ফেরিওয়ালা।

হঠাৎ তাদের হাঁক পৌঁছত যেখানে বালিশের উপর খোলা চুল এলিয়ে দিয়ে শুয়ে থাকত বাড়ির বৌ, দাসী ডেকে নিয়ে আসত ভিতরে, বুড়ো চুড়িওয়ালা কচি হাত টিপে টিপে পরিয়ে দিত পছন্দমত বেলোয়ারি চুড়ি। সেদিনকার সেই বৌ আজকের দিনে এখনো বৌএর পদ পায় নি, সেকেণ্ড্ ক্লাসে সে পড়া মুখস্থ করছে। আর সেই চুড়িওয়ালা হয়তো আজ সেই গলিতেই বেড়াচ্ছে রিক্‌শ ঠেলে। ছাদটা ছিল আমার কেতাবে-পড়া মরুভূমি, ধু ধু করছে চার দিক। গরম বাতাস হু হু করে ছুটে যাচ্ছে ধুলো উড়িয়ে, আকাশের নীল রঙ এসেছে ফিকে হয়ে।

এই ছাদের মরুভূমিতে তখন একটা ওয়েসিস দেখা দিয়েছিল। আজকাল উপরের তলায় কলের জলের নাগাল নেই। তখন তেতালার ঘরেও তার দৌড় ছিল। লুকিয়ে-ঢোকা নাবার ঘর, তাকে যেন বাংলা দেশের শিশু লিভিংস্টন এইমাত্র খুঁজে বের করলে। কল দিতুম খুলে, ধারাজল পড়ত সকল গায়ে। বিছানার একখানা চাদর নিয়ে গা মুছে সহজ মানুষ হয়ে বসতুম।

ছুটির দিনটা দেখতে দেখতে শেষের দিকে এসে পৌঁছল। নীচের দেউড়ির ঘণ্টায় বাজল চারটে। রবিবারের বিকেল বেলায় আকাশটা বিশ্রী রকমের মুখ বিগড়ে আছে। আসছে-সোমবারের হাঁ-করা মুখের গ্রহণ-লাগানো ছায়া তাকে গিলতে শুরু করেছে। নীচে এতক্ষণে পাহারা-এড়ানো ছেলের খোঁজ পড়ে গেছে।

এখন জলখাবারের সময়। এইটে ছিল ব্রজেশ্বরের একটা লালচিহ্ন-দেওয়া দিনের ভাগ। জলখাবারের বাজার করা ছিল তারই জিম্মায়। তখনকার দিনে দোকানিরা ঘিয়ের দামে শতকরা ত্রিশ-চল্লিশ টাকা হারে মুনফা রাখত না, গন্ধে স্বাদে জলখাবার তখনো বিষিয়ে ওঠে নি। যদি জুটে যেত কচুরি সিঙাড়া, এমন-কি আলুর দম, সেটা মুখে পুরতে সময় লাগত না। কিন্তু যথাসময়ে ব্রজেশ্বর যখন তার বাঁকা ঘাড় আরও বাঁকিয়ে বলত 'দেখো বাবু আজ কী এনেছি', প্রায় দেখা যেত কাগজের ঠোঙায় চীনেবাদাম-ভাজা! সেটাতে আমাদের যে রুচি ছিল না তা নয়, কিন্তু ওর দরের মধ্যেই ছিল ওর আদর। কোনোদিন টুঁ শব্দ করি নি। এমন-কি, যেদিন তালপাতার ঠোঙা থেকে বেরত তিলেগজা সেদিনও না।

দিনের আলো আসছে ঘোলা হয়ে। মন খারাপ নিয়ে একবার ছাদটা ঘুরে আসা গেল, নীচের দিকে দেখলুম তাকিয়ে— পুকুর থেকে পাতিহাঁসগুলো উঠে গিয়েছে। লোকজনের আনাগোনা আরম্ভ হয়েছে ঘাটে, বটগাছের ছায়া পড়েছে অর্ধেক পুকুর জুড়ে, রাস্তা থেকে জুড়িগাড়ির সইসের হাঁক শোনা যাচ্ছে।

৯

দিনগুলো এমনি চলে যায় একটানা। দিনের মাঝখানটা ইস্কুল নেয় খাবলিয়ে, সকালে বিকেলে ছিটকিয়ে পড়ে তারই বাড়তির ভাগ। ঘরে ঢুকতেই ক্লাসের বেঞ্চি-টেবিলগুলো মনের মধ্যে যেন শুকনো কনুইয়ের গুঁতো মারে। রোজই তাদের একই আড়ষ্ট চেহারা।

সন্ধেবেলায় ফিরে যেতুম বাড়িতে। ইস্কুলঘরে তেলের বাতিটা তুলে ধরেছে পরদিনের পড়াতৈরি-পথের সিগ্‌ন্যাল। এক-একদিন বাড়ির আঙিনায় আসে ভালুক-নাচ-ওয়ালা। আসে সাপুড়ে সাপ খেলাতে। এক-একদিন আসে ভোজবাজিওয়ালা, একটু দেয় নতুনের আমেজ।

আমাদের চিৎপুর রোডে আজ আর ওদের ডুগ্‌ডুগি বাজে না। সিনেমাকে দূর থেকে সেলাম ক'রে তারা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। শুকনো পাতার সঙ্গে এক জাতের ফড়িঙ যেমন বেমালুম রঙ মিলিয়ে থাকে আমার প্রাণটা তেমনি শুকনো দিনের সঙ্গে ফ্যাকাশে হয়ে মিলিয়ে থাকত।

তখন খেলা ছিল সামান্য কয়েক রকমের। ছিল মার্বেল, ছিল যাকে বলে ব্যাটবল —ক্রিকেটের অত্যন্ত দূর কুটুম্ব। আর ছিল লাঠিম-ঘোরানো, ঘুড়ি-ওড়ানো। শহরে

ছেলেদের খেলা সবই ছিল এমনি কম্‌জোরি। মাঠজোড়া ফুটবল-খেলার লম্ফঝম্প তখনো ছিল সমুদ্রপারে। এমনি করে একই মাপের দিনগুলো শুকনো খুঁটির বেড়া পুঁতে চলেছিল আমাকে পাকে পাকে ঘিরে।

এমন সময় একদিন বাজল সানাই বারোয়াঁ সুরে। বাড়িতে এল নতুন বৌ[১], কচি শামলা হাতে সরু সোনার চুড়ি। পলক ফেলতেই ফাঁক হয়ে গেল বেড়া, দেখা দিল চেনাশোনার বাহির সীমানা থেকে মায়াবী দেশের নতুন মানুষ। দূরে দূরে ঘুরে বেড়াই, সাহস হয় না কাছে আসতে। ও এসে বসেছে আদরের আসনে, আমি যে হেলাফেলার ছেলেমানুষ।

দুই মহলে বাড়ি তখন ভাগ করা। পুরুষরা থাকে বাইরে, মেয়েরা ভিতর-কোঠায়। নবাবি কায়দা তখনো চলে আসছে। মনে আছে দিদি[২] বেড়াচ্ছিলেন ছাদের উপর নতুন বৌকে পাশে নিয়ে, মনের কথা-বলাবলি চলছিল। আমি কাছে যাবার চেষ্টা করতেই এক ধমক। এ পাড়া যে ছেলেদের দাগকাটা গণ্ডির বাইরের। আবার শুকনো মুখ করে ফিরতে হবে সেই ছ্যাৎলাপড়া পুরোনো দিনের আড়ালে।

হঠাৎ দূর পাহাড় থেকে বর্ষার জল নেমে সাবেক বাঁধের তলা খইয়ে দেয়, এবার তাই ঘটল। বাড়িতে নতুন আইন চালালেন কর্ত্রী। বৌঠাকরুনের জায়গা হল বাড়ি-ভিতরের ছাদের লাগাও ঘরে। সেই ছাদে তাঁরই হল পুরো দখল। পুতুলের বিয়েতে ভোজের পাতা পড়ত সেইখানে। নেমন্তন্নের দিনে প্রধান ব্যক্তি হয়ে উঠত এই ছেলেমানুষ। বৌঠাকরুন রাঁধতে পারতেন ভালো, খাওয়াতে ভালোবাসতেন, এই খাওয়াবার শখ মেটাতে আমাকে হাজির পেতেন। ইস্কুল থেকে ফিরে এলেই তৈরি থাকত তাঁর আপন হাতের প্রসাদ। চিংড়িমাছের চচ্চড়ির সঙ্গে পান্তা ভাত যেদিন মেখে দিতেন অল্প একটু লঙ্কার আভাস দিয়ে, সেদিন আর কথা ছিল না। মাঝে মাঝে যখন আত্মীয়-বাড়িতে যেতেন, ঘরের সামনে তাঁর চটিজুতোজোড়া দেখতে পেতুম না, তখন রাগ করে ঘরের থেকে একটা-কোনো দামি জিনিস লুকিয়ে রেখে ঝগড়ার পত্তন করতুম। বলতে হত, 'তুমি গেলে তোমার ঘর সামলাবে কে। আমি কি চৌকিদার।' তিনি রাগ দেখিয়ে বলতেন, 'তোমাকে আর ঘর সামলাতে হবে না, নিজের হাত সামলিয়ো।'

এ কালের মেয়েদের হাসি পাবে, তাঁরা বলবেন, নিজের ছাড়া সংসারে কি পরের দেওর ছিল না কোনোখানে। কথাটা মানি। এখনকার কালের বয়স সকল দিকেই

১ কাদম্বরী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী

২ 'ন্যোর্দিদি' স্বর্ণকুমারী দেবী

তখনকার থেকে হঠাৎ অনেক বেড়ে গিয়েছে। তখন বড়ো-ছোটো সবাই ছিল ছেলেমানুষ।

এইবার আমার নির্জন বেছুমিনি ছাদে শুরু হল আর-এক পালা— এল মানুষের সঙ্গ, মানুষের স্নেহ। সেই পালা জমিয়ে দিলেন আমার জ্যোতিদাদা[১]।

১০

ছাদের রাজ্যে নতুন হাওয়া বইল, নামল নতুন ঋতু।

তখন পিতৃদেব জোড়াসাঁকোয় বাস ছেড়েছিলেন। জ্যোতিদাদা এসে বসলেন বাইরের তেতলার ঘরে। আমি একটু জায়গা নিলুম তারই একটি কোণে।

অন্দর-মহলের পর্দা রইল না। আজ এ কথা নতুন ঠেকবে না, কিন্তু তখন এত নতুন ছিল যে মেপে দেখলে তার থই পাওয়া যায় না। তারও অনেক কাল আগে, আমি তখন শিশু, মেজদাদা[২] সিভিলিয়ন হয়ে দেশে ফিরেছেন। বোম্বাইয়ে প্রথম তাঁর কাজে যোগ দিতে যাবার সময় বাইরের লোকদের অবাক করে দিয়ে তাদের চোখের সামনে দিয়ে বৌঠাকরুনকে[৩] সঙ্গে নিয়ে গেলেন। বাড়ির বৌকে পরিবারের মধ্যে না রেখে দূর বিদেশে নিয়ে যাওয়া এই তো ছিল যথেষ্ট, তার উপরে যাবার পথে ঢাকাঢাকি নেই— এ যে হল বিষম বেদস্তুর। আপন লোকদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।

বাইরে বেরবার মতো কাপড় তখনও মেয়েদের মধ্যে চলতি হয় নি। এখন শাড়ি জামা নিয়ে যে সাজের চলন হয়েছে তারই প্রথম শুরু করেছিলেন বৌঠাকরুন[৩]।

বেণী দুলিয়ে তখনও ফ্রক ধরে নি ছোটো মেয়েরা। অন্তত আমাদের বাড়িতে। ছোটোদের মধ্যে চলন ছিল পেশোয়াজের। বেথুন ইস্কুল যখন প্রথম খোলা হল আমার বড়দিদির[৪] ছিল অল্প বয়স। সেখানে মেয়েদের পড়াশোনার পথ সহজ করবার প্রথম দলের ছিলেন তিনি। ধবধবে তাঁর রঙ। এ দেশে তার তুলনা পাওয়া যেত না। শুনেছি পালকিতে করে স্কুলে যাবার সময় পেশোয়াজ-পরা তাঁকে চুরি-করা ইংরেজ মেয়ে মনে করে পুলিসে একবার ধরেছিল।

আগেই বলেছি সেকালে বড়ো ছোটোর মধ্যে চলাচলের সাঁকোটা ছিল না। কিন্তু

১ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

২ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩ 'মেজো বৌঠাকরুন' জ্ঞানদানন্দিনী দেবী

৪ সৌদামিনী দেবী

এই-সকল পুরোনো কায়দার ভিড়ের মধ্যে জ্যোতিদাদা এসেছিলেন নির্জলা নতুন মন নিয়ে। আমি ছিলুম তাঁর চেয়ে বারো বছরের ছোটো। বয়সের এত দূর থেকে আমি যে তাঁর চোখে পড়তুম এই আশ্চর্য। আরও আশ্চর্য এই যে, তাঁর সঙ্গে আলাপে জ্যাঠামি ব'লে কখনও আমার মুখ চাপা দেন নি। তাই কোনো কথা ভাবতে আমার সাহসে অকুলোন হয় নি। আজ ছেলেদের মধ্যেই আমার বাস। পাঁচরকম কথা পাড়ি, দেখি তাদের মুখ বোজা। জিজ্ঞেসা করতে এদের বাধে। বুঝতে পারি, এরা সব সেই বুড়োদের কালের ছেলে যে কালে বড়োরা কইত কথা আর ছোটোরা থাকত বোবা। জিজ্ঞাসা করবার সাহস নতুন কালের ছেলেদের ; আর বুড়োকালের ছেলেরা সব-কিছু মেনে নেয় ঘাড় গুঁজে।

ছাদের ঘরে এল পিয়ানো। আর এল একালের বার্নিশকরা বৌবাজারের আসবাব। বুকের ছাতি উঠল ফুলে। গরিবের চোখে দেখা দিল হাল-আমলের সস্তা আমিরি।

এইবার ছুটল আমার গানের ফোয়ারা। জ্যোতিদাদা পিয়ানোর উপর হাত চালিয়ে নতুন নতুন ভঙ্গিতে ঝমাঝম সুর তৈরি করে যেতেন, আমাকে রাখতেন পাশে। তখনি তখনি সেই ছুটে-চলা সুরে কথা বসিয়ে বেঁধে রাখবার কাজ ছিল আমার।

দিনের শেষে ছাদের উপর পড়ত মাদুর আর তাকিয়া। একটা রুপার রেকাবিতে বেলফুলের গোড়ে মালা ভিজে রুমালে, পিরিচে একগ্লাস বরফ-দেওয়া জল আর বাটাতে ছাঁচিপান।

বৌঠাকরুন গা ধুয়ে চুল বেঁধে তৈরি হয়ে বসতেন। গায়ে একখানা পাতলা চাদর উড়িয়ে আসতেন জ্যোতিদাদা, বেহালাতে লাগাতেন ছড়ি, আমি ধরতুম চড়া সুরের গান। গলায় যেটুকু সুর দিয়েছিলেন বিধাতা তখনও তা ফিরিয়ে নেন নি। সূর্য-ডোবা আকাশে ছাদে ছাদে ছড়িয়ে যেত আমার গান। হু হু করে দক্ষিণে বাতাস উঠত দূর সমুদ্র থেকে, তারায় তারায় যেত আকাশ ভ'রে।

ছাদটাকে বৌঠাকরুন একেবারে বাগান বানিয়ে তুলেছিলেন। পিল্লের উপরে সারি সারি লম্বা পাম গাছ, আশেপাশে চামেলি গন্ধরাজ রজনীগন্ধা করবী দোলনচাঁপা। ছাদ-জখমের কথা মনেই আনেন নি, সবাই ছিলেন খেয়ালি।

প্রায় আসতেন অক্ষয় চৌধুরী। তাঁর গলায় সুর ছিল না সে কথা তিনিও জানতেন, অন্যেরা আরও বেশি জানত। কিন্তু তাঁর গাবার জেদ কিছুতে থামত না। বিশেষ করে বেহাগ রাগিণীতে ছিল তাঁর শখ। চোখ বুজে গাইতেন, যারা শুনত তাদের মুখের ভাব দেখতে পেতেন না। হাতের কাছে আওয়াজওয়ালা কিছু পেলেই দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে পটাপট শব্দে তাকেই বাঁয়া-তবলার বদলি করে নিতেন।

মলাট-বাঁধানো বই থাকলে ভালোই চলত। ভাবে ভোর মানুষ, তাঁর ছুটির দিনের সঙ্গে কাজের দিনের তফাত বোঝা যেত না।

সন্ধেবেলায় সভা যেত ভেঙে। আমি চিরকাল ছিলুম রাত-জাগিয়ে ছেলে। সকলে শুতে যেত, আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াতুম, ব্রহ্মদত্যির চেলা। সমস্ত পাড়া চুপচাপ। চাঁদনি রাতে ছাদের উপর সারি সারি গাছের ছায়া যেন স্বপ্নের আলপনা। ছাদের বাইরে সিসু গাছের মাথাটা বাতাসে দুলে উঠছে, ঝিল্‌মিল্‌ করছে পাতাগুলো। জানি নে কেন সবচেয়ে চোখে পড়ত সামনের গলির ঘুমন্ত বাড়ির ছাদে একটা ঢালু-পিঠ-ওয়ালা বেঁটে চিলেকোঠা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিসের দিকে যেন আঙুল বাড়িয়ে রয়েছে।

রাত একটা হয়, দুটো হয়। সামনের বড়ো রাস্তায় রব ওঠে, 'বলো হরি হরিবোল।'

১১

খাঁচায় পাখি পোষার শখ তখন ঘরে ঘরে ছিল। সবচেয়ে খারাপ লাগত পাড়ার কোনো বাড়ি থেকে পিঁজরেতে-বাঁধা কোকিলের ডাক। বৌঠাকরুন জোগাড় করেছিলেন চীনদেশের এক শ্যামা পাখি। কাপড়ের ঢাকার ভিতর থেকে তার শিস উঠত ফোয়ারার মতো। আরও ছিল নানা জাতের পাখি, তাদের খাঁচাগুলো ঝুলত পশ্চিমের বারান্দায়। রোজ সকালে একজন পোকাওয়ালা পাখিদের খোরাক জোগাত। তার ঝুলি থেকে বেরত ফড়িঙ, ছাতুখোর পাখিদের জন্যে ছাতু।

জ্যোতিদাদা আমার সকল তর্কের জবাব দিতেন। কিন্তু মেয়েদের কাছে এতটা আশা করা যায় না। একবার বৌঠাকরুনের মর্জি হয়েছিল খাঁচায় কাঠবিড়ালি পোষা। আমি বলেছিলুম কাজটা অন্যায় হচ্ছে, তিনি বলেছিলেন গুরুমশায়গিরি করতে হবে না। এ'কে ঠিক জবাব বলা চলে না। কাজেই কথা-কাটাকাটির বদলে লুকিয়ে দুটি প্রাণীকে ছেড়ে দিতে হল। তার পরেও কিছু কথা শুনেছিলুম, কোনো জবাব করি নি।

আমাদের মধ্যে একটা বাঁধা ঝগড়া ছিল কোনোদিন যার শেষ হল না, সে কথা বলছি।

উমেশ ছিল চালাক লোক। বিলিতি দরজির দোকান থেকে যত-সব ছাঁটাকাটা নানা রঙের রেশমের ফালি জলের দরে কিনে আনত, তার সঙ্গে নেটের টুকরো আর খেলো লেস মিলিয়ে মেয়েদের জামা বানানো হত। কাগজের প্যাকেট খুলে সাবধানে মেলে ধরত মেয়েদের চোখে, বলত 'এই হচ্ছে আজকের দিনের ফ্যাশন'। ঐ মন্ত্রটার টান মেয়েরা সামলাতে পারত না। আমাকে কী দুঃখ দিত বলতে পারি নে। বারবার

অস্থির হয়ে আপত্তি জানিয়েছি, জবাবে শুনেছি জ্যাঠামি করতে হবে না। আমি বৌঠাকরুনকে জানিয়েছি, এর চেয়ে অনেক ভালো, অনেক ভদ্র, সেকেলে রাঙা কালাপেড়ে শাড়ি কিংবা ঢাকাই। আমি ভাবি আজকালকার জর্জেট-জড়ানো বৌদিদিদের রঙ-করা পুতুল-গড়া রূপ দেখে দেওরদের মুখে কি কোনো কথা সরছে না। উমেশের সেলাই-করা ঢাকনি -পরা বৌঠাকরুন যে ছিলেন ভালো। চেহারার উপর এত বেশি জালিয়াতি তখন ছিল না।

তর্কে বৌঠাকরুনের কাছে বরাবর হেরেছি, কেননা তিনি তর্কের জবাব দিতেন না। আর হেরেছি দাবাখেলায়, সে খেলায় তাঁর হাত ছিল পাকা।

জ্যোতিদাদার কথা যখন উঠে পড়েছে তখন তাঁকে ভালো করে চিনিয়ে দিতে আরও কিছু বলার দরকার হবে। শুরু করতে হবে আরও-একটু আগেকার দিনে।

জমিদারির কাজ দেখতে প্রায় তাঁকে যেতে হত শিলাইদহে। একবার যখন সেই দরকারে বেরিয়েছিলেন আমাকেও নিয়েছিলেন সঙ্গে। তখনকার পক্ষে এটা ছিল বেদস্তুর, অর্থাৎ যাকে লোকে বলতে পারত 'বাড়াবাড়ি হচ্ছে'। তিনি নিশ্চয় ভেবে-ছিলেন, ঘর থেকে এই বাইরে চলাচল এ একটা চলতি ক্লাসের মতো। তিনি বুঝে নিয়েছিলেন, আমার ছিল আকাশে-বাতাসে-চ'রে-বেড়ানো মন— সেখান থেকে আমি খোরাক পাই আপনা হতেই। তার কিছুকাল পরে জীবনটা যখন আরও উপরের ক্লাসে উঠেছিল আমি মানুষ হচ্ছিলুম এই শিলাইদহে।

পুরোনো নীলকুঠি[১] তখনো খাড়া ছিল। পদ্মা ছিল দূরে। নীচের তলায় কাছারি, উপরের তলায় আমাদের থাকবার জায়গা। সামনে খুব মস্ত একটা ছাদ। ছাদের বাইরে বড়ো বড়ো ঝাউগাছ, এরা একদিন নীলকর সাহেবের ব্যাবসার সঙ্গে বেড়ে উঠেছিল। আজ কুঠিয়াল সাহেবের দাবরাব একেবারে থম থম করছে। কোথায় নীলকুঠির যমের দূত সেই দেওয়ান, কোথায় লাঠি-কাঁধে কোমর-বাঁধা পেয়াদার দল, কোথায় লম্বা-টেবিল-পাতা খানার ঘর যেখানে ঘোড়ায় চ'ড়ে সদর থেকে সাহেবরা এসে রাতকে দিন করে দিত— ভোজের সঙ্গে চলত জুড়ি-নৃত্যের ঘূর্ণিপাক, রক্তে ফুটতে থাকত শ্যাম্পেনের নেশা, হতভাগা রায়তদের দোহাই-পাড়া কান্না উপর-ওয়ালাদের কানে পৌঁছত না, সদর জেলখানা পর্যন্ত তাদের শাসনের পথ লম্বা হয়ে চলত। সেদিনকার আর যা-কিছু সব মিথ্যে হয়ে গেছে, কেবল সত্য হয়ে আছে দুই সাহেবের দুটি গোর। লম্বা লম্বা ঝাউগাছগুলি দোলাদুলি করে বাতাসে, আর

১ তুলনীয় 'জন্মদিনে', ১১-সংখ্যক কবিতা। রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চবিংশ খণ্ড

সেদিনকার স্বারভয়ের নাড়ি-নাতনিরা কখনো কখনো দুপুররাত্রে দেখতে পায় সাহেবের ভূত বেড়াচ্ছে কুঠিবাড়ির পোড়ো বাগানে।

একলা থাকার মন নিয়ে আছি। ছোটো একটি কোণের ঘর, যত বড়ো ঢালা ছাদ তত বড়ো ফলাও আমার ছুটি। অজানা ভিন দেশের ছুটি, পুরোনো দিঘির কালো জলের মতো তার থই পাওয়া যায় না। বউ-কথা-কও ডাকছে তো ডাকছেই, উড়ো ভাবনা ভাবছি তো ভাবছিই। এই সঙ্গে সঙ্গে আমার খাতা ভরে উঠতে আরম্ভ করেছে পদ্যে। সেগুলো যেন ঝ'রে পড়বার মুখে মাঘের প্রথম ফসলের আমের বোল— ঝরেও গেছে।

তখনকার দিনে অল্প বয়সের ছেলে, বিশেষত মেয়ে, যদি অক্ষর গুনে দু ছত্র পদ্য লিখত তা হলে দেশের সমজদাররা ভাবত, এমন যেন আর হয় না, কখনো হবে না।

সে-সব মেয়ে-কবিদের নাম দেখেছি, কাগজে তাদের লেখাও বেরিয়েছে। তার পরে সেই অতি সাবধানে চোদ্দো অক্ষর বাঁচিয়ে লেখা ভালো ভালো কথা আর কাঁচা কাঁচা মিল যেই গেল মিলিয়ে, অমনি তাদের সেই নাম-মোছা পটে আজকালকার মেয়েদের সারি সারি নাম উঠছে ফুটে।

ছেলেদের সাহস মেয়েদের চেয়ে অনেক কম, লজ্জা অনেক বেশি। সেদিন ছোটো বয়সের ছেলে-কবি কবিতা লিখেছে মনে পড়ে না, এক আমি ছাড়া। আমার চেয়ে বড়ো বয়সের এক ভাগনে[১] একদিন বাৎলিয়ে দিলেন চোদ্দো অক্ষরের ছাঁচে কথা ঢাললে সেটা জমে ওঠে পদ্যে। স্বয়ং দেখলুম এই জাদুবিদ্যের ব্যাপার। আর হাতে হাতে সেই চোদ্দো অক্ষরের ছাঁদে পদ্মও ফুটল; এমন-কি তার উপরে ভ্রমরও বসবার জায়গা পেল। কবিদের সঙ্গে আমার তফাত গেল ঘুচে, সেই অবধি এই তফাত ঘুচিয়েই চলেছি।

মনে আছে, ছাত্রবৃত্তির নীচের ক্লাসে যখন পড়ি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্‌ গোবিন্দবাবু গুজব শুনলেন যে, আমি কবিতা লিখি। আমাকে ফরমাশ করলেন লিখতে, ভাবলেন নর্মাল-স্কুলের নাম উঠবে জ্বলজ্বলিয়ে। লিখতে হল, শোনাতেও হল ক্লাসের ছেলেদের, শুনতে হল যে এ লেখাটা নিশ্চয় চুরি। নিন্দুকরা জানতে পারে নি, তার পরে যখন সেয়ানা হয়েছি তখন ভাব-চুরিতে হাত পাকিয়েছি। কিন্তু এ চোরাই মালগুলো দামি জিনিস।

মনে পড়ে পয়ারে ত্রিপদীতে মিলিয়ে একবার একটা কবিতা বানিয়েছিলুম, তাতে এই দুঃখ জানিয়েছিলুম যে, সাঁতার দিয়ে পদ্ম তুলতে গিয়ে নিজের হাতের ঢেউয়ে পদ্মটা

১ জ্যোতিঃপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

সরে সরে যায়, তাকে ধরা যায় না। অক্ষয়বাবু তাঁর আত্মীয়দের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে এই কবিতা শুনিয়ে বেড়ালেন ; আত্মীয়রা বললেন, ছেলেটির লেখবার হাত আছে।

বৌঠাকরুনের ব্যবহার ছিল উলটো। কোনোকালে আমি যে লিখিয়ে হব, এ তিনি কিছুতে মানতেন না। কেবলই খোঁটা দিয়ে বলতেন, কোনোকালে বিহারী চক্রবর্তীর মতো লিখতে পারব না। আমি মন-মরা হয়ে ভাবতুম, তাঁর চেয়ে অনেক নীচের ধাপের মার্কা যদি মিলত তা হলে মেয়েদের সাজ নিয়ে তাঁর খুদে দেওর-কবির অপছন্দ অমন করে উড়িয়ে দিতে তাঁর বাধত।

জ্যোতিদাদা ঘোড়ায় চড়তে ভালোবাসতেন। বৌঠাকরুনকেও ঘোড়ায় চড়িয়ে চিৎপুরের রাস্তা দিয়ে ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে যেতেন এমন ঘটনাও সেদিন ঘটেছিল। শিলাইদহে আমাকে দিলেন এক টাট্টু ঘোড়া। সে জন্তুটা কম দৌড়বাজ ছিল না। আমাকে পাঠিয়ে দিলেন রথতলার মাঠে ঘোড়া দৌড় করিয়ে আনতে।[1] সেই এবড়ো-খেবড়ো মাঠে পড়ি-পড়ি করতে করতে ঘোড়া ছুটিয়ে আনতুম। আমি পড়ব না, তাঁর মনে এই জোর ছিল বলেই আমি পড়ি নি। কিছুকাল পরে কলকাতার রাস্তাতেও আমাকে ঘোড়ায় চড়িয়েছিলেন। সে টাট্টু নয়, বেশ মেজাজি ঘোড়া। একদিন সে আমাকে পিঠে নিয়ে দেউড়ির ভিতর দিয়ে সোজা ছুটে গিয়েছিল উঠোনে যেখানে সে দানা খেত। পরদিন থেকে তার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

বন্দুক-ছোঁড়া জ্যোতিদাদা অভ্যস্ত করেছিলেন, সে কথা পূর্বেই জানিয়েছি। বাঘ-শিকারের ইচ্ছা ছিল তাঁর মনে। বিশ্বনাথ শিকারী একদিন খবর দিল, শিলাইদহের জঙ্গলে বাঘ এসেছে। তখনি বন্দুক বাগিয়ে তিনি তৈরি হলেন। আশ্চর্যের কথা এই, আমাকেও নিলেন সঙ্গে। একটা মুশকিল কিছু ঘটতে পারে, এ যেন তাঁর ভাবনার মধ্যেই ছিল না।

ওস্তাদ শিকারী ছিল বটে বিশ্বনাথ। সে জানত, মাচানের উপর থেকে শিকার করাটা মরদের কাজ নয়। বাঘকে সামনে ডাক দিয়ে লাগাত গুলি। একবারও ফসকায় নি তার তাক।[1]

ঘন জঙ্গল। সেরকম জঙ্গলের ছায়াতে আলোতে বাঘ চোখেই পড়তে চায় না। একটা মোটা বাঁশগাছের গায়ে কঞ্চি কেটে কেটে মইয়ের মতো বানানো হয়েছে। জ্যোতিদাদা উঠলেন বন্দুক হাতে। আমার পায়ে জুতোও নেই, বাঘটা

১ দ্রষ্টব্য ১১-সংখ্যক কবিতা —জন্মদিনে। রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঁচিশ খণ্ড

তাড়া করলে তাকে যে ছুতোপেটা করব তারও উপায় ছিল না। বিশ্বনাথ ইশারা করলে। জ্যোতিদাদা অনেকক্ষণ দেখতেই পান না। তাকিয়ে তাকিয়ে শেষকালে ঝোপের মধ্যে বাঘের গায়ের একটা দাগ তাঁর চশমাপরা চোখে পড়ল। মারলেন গুলি। দৈবাৎ লাগল সেটা তার শিরদাঁড়ায়। সে আর উঠতে পারল না। কাঠকুটো যা সামনে পায় কামড়ে ধ'রে লেজ আছড়ে ভীষণ গর্জাতে লাগল। ভেবে দেখলে মনে সন্দেহ লাগে। অতক্ষণ ধরে বাঘটা মরবার জন্যে সবুর করে ছিল, সেটা ওদের মেজাজে নেই বলেই জানি। তাকে আগের রাত্রে তার খাবার সঙ্গে ফিকির করে আফিম লাগায় নি তো! এত ঘুম কেন।

আরও একবার বাঘ এসেছিল শিলাইদহের জঙ্গলে। আমরা দুই ভাই যাত্রা করলুম তার খোঁজে, হাতির পিঠে চ'ড়ে। আখের খেত থেকে পট পট করে আখ উপড়িয়ে চিবতে চিবতে পিঠে ভূমিকম্প লাগিয়ে চলল হাতি ভারিক্কি চালে। সামনে এসে পড়ল বন। হাঁটু দিয়ে চেপে, শুঁড় দিয়ে টেনে গাছগুলোকে পেড়ে ফেলতে লাগল মাটিতে। তার আগেই বিশ্বনাথের ভাই চামরুর কাছে গল্প শুনেছিলুম, সর্বনেশে ব্যাপার হয় বাঘ যখন লাফ দিয়ে হাতির পিঠে চ'ড়ে থাবা বসিয়ে ধরে। তখন হাতি গাঁ গাঁ শব্দে ছুটতে থাকে বনজঙ্গলের ভিতর দিয়ে, পিঠে যারা থাকে গুঁড়ির ধাক্কায় তাদের হাত পা মাথার হিসেব পাওয়া যায় না। সেদিন হাতির উপর চ'ড়ে ব'সে শেষ পর্যন্ত মনের মধ্যে ছিল ঐ হাড়গোড়-ভাঙার ছবিটা। ভয় করাটা চেপে রাখলুম লজ্জায়। বেপরোয়া ভাব দেখিয়ে চাইতে লাগলুম এ দিকে, ও দিকে। যেন বাঘটাকে একবার দেখতে পেলে হয়। ঢুকে পড়ল হাতি ঘন জঙ্গলের মধ্যে। এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল। মাহুত তাকে চেতিয়ে তোলবার চেষ্টাও করল না। দুই শিকারী প্রাণীর মধ্যে বাঘের 'পরেই তার বিশ্বাস ছিল বেশি। জ্যোতিদাদা বাঘটাকে ঘায়েল করে মরিয়া করে তুলবেন, নিশ্চয় এটাই ছিল তার সবচেয়ে ভাবনার কথা। হঠাৎ বাঘটা ঝোপের ভিতর থেকে দিল এক লাফ। যেন মেঘের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল একটা বজ্রওয়ালা ঝড়ের ঝাপটা। আমাদের বিড়াল কুকুর শেয়াল -দেখা নজর—এ যে ঘাড়ে-গর্দানে একটা একরাশ মুরদ, অথচ তার ভার নেই যেন। খোলা মাঠের ভিতর দিয়ে দুপুরবেলার রৌদ্রে চলল সে দৌড়ে। কী সুন্দর সহজ চলনের বেগ। মাঠে ফসল ছিল না। ছুটন্ত বাঘকে ভরপুর করে দেখবার জায়গা এই বটে— সেই রৌদ্রঢালা হলদে রঙের প্রকাণ্ড মাঠ।

আর-একটা কথা বাকি আছে, শুনতে মজা লাগতে পারে। শিলাইদহে মালী

ফুল তুলে এনে ফুলদানিতে সাজিয়ে দিত। আমার মাথায় খেয়াল গেল ফুলের রঙিন রস দিয়ে কবিতা লিখতে।[১] টিপে টিপে যে রসটুকু পাওয়া যায় সে কলমের মুখে উঠতে চায় না। ভাবতে লাগলুম, একটা কল তৈরি করা চাই। ছেঁদাওয়ালা একটা কাঠের বাটি, আর তার উপরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চালাবার মতো একটা হামান-দিস্তের নোড়া হলেই চলবে। সেটা ঘোরানো যাবে দড়িতে-বাঁধা একটা চাকায়। জ্যোতিদাদাকে দরবার জানালুম। হয়তো মনে মনে তিনি হাসলেন, বাইরে সেটা ধরা পড়ল না। হুকুম করলেন, ছুতোর এল কাঠকোঠ নিয়ে। কল তৈরি হল। ফুলে-ভরা কাঠের বাটিতে দড়িতে-বাঁধা নোড়া যতই ঘোরাতে থাকি ফুল পিষে কাদা হয়ে যায়, রস বেরয় না। জ্যোতিদাদা দেখলেন, ফুলের রস আর কলের চাপে ছন্দ মিলল না। তবু আমার মুখের উপর হেসে উঠলেন না।

জীবনে এই একবার এঞ্জিনিয়ারি করতে নেবেছিলুম। যে যা নয় নিজেকে তাই যখন কেউ ভাবে তার মাথা হেঁট করে দেবার এক দেবতা তৈরি থাকেন, শাস্ত্রে এমন কথা আছে। সেই দেবতা সেদিন আমার এঞ্জিনিয়ারির দিকে কটাক্ষ করেছিলেন, তার পর থেকে যন্ত্রে হাত লাগানো আমার বন্ধ, এমন-কি সেতারে এসরাজেও তার চড়াই নি।

জীবনস্মৃতিতে লিখেছি, ফ্লটিলা কোম্পানির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাংলাদেশের নদীতে স্বদেশী জাহাজ চালাতে গিয়ে কী করে জ্যোতিদাদা নিজেকে ফতুর করে দিলেন। বৌঠাকরুনের মৃত্যু হয়েছে তার আগেই।[২] জ্যোতিদাদা তাঁর তেতালার বাসা ভেঙে চলে গেলেন। শেষকালে বাড়ি বানালেন রাঁচির এক পাহাড়ের উপর।[৩]

১২

এইবার তেতলা ঘরের আর এক পালা আরম্ভ হল আমার সংসার নিয়ে।...

একদিন গোলাবাড়ি, পালকি, আর তেতলার ছাদের খালি ঘরে আমার ছিল যেন বেদের বাসা— কখনো এখানে, কখনো ওখানে। বৌঠাকরুন এলেন ছাদের ঘরে বাগান দিল দেখা। উপরের ঘরে এল পিয়ানো, নতুন নতুন সুরের ফোয়ারা ছুটল।

১ দ্রষ্টব্য ১৯-সংখ্যক কবিতা —জন্মদিনে। রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চবিংশ খণ্ড

২ ৮ বৈশাখ, ১২৯১

৩ 'শান্তিধাম', রাঁচির মোরাবাদী পাহাড়ে

পূর্বদিকের চিলেকোঠার ছায়ায় জ্যোতিদাদার কফি খাওয়ার সরঞ্জাম হত সকালে। সেই সময়ে পড়ে শোনাতেন তাঁর কোনো-একটা নতুন নাটকের প্রথম খসড়া। তার মধ্যে কখনো কখনো কিছু জুড়ে দেবার জন্যে আমাকেও ডাক পড়ত আমার অত্যন্ত কাঁচা হাতের লাইনের জন্যে। ক্রমে রোদ এগিয়ে আসত— কাক-গুলো ডাকাডাকি করত উপরের ছাদে বসে রুটির টুকরোর 'পরে লক্ষ করে। দশটা বাজলে ছায়া যেত ক'য়ে, ছাতটা উঠত তেতে।

দুপুরবেলায় জ্যোতিদাদা যেতেন নীচের তলায় কাছারিতে। বৌঠাকরুন ফলের খোসা ছাড়িয়ে কেটে কেটে যত্ন করে রুপোর রেকাবিতে সাজিয়ে দিতেন। নিজের হাতের মিষ্টান্ন কিছু কিছু থাকত তার সঙ্গে, আর তার উপরে ছড়ানো হত গোলাপের পাপড়ি। গেলাসে থাকত ডাবের জল কিংবা ফলের রস কিংবা কচি তালশাঁস বরফে-ঠাণ্ডা-করা। সমস্তটার উপর একটা ফুলকাটা রেশমের রুমাল ঢেকে মোরাদাবাদি খুঞ্চেতে করে জলখাবার বেলা একটা-দুটোর সময় রওনা করে দিতেন কাছারিতে।

তখন বঙ্গদর্শনের[1] ধুম লেগেছে; সূর্যমুখী আর কুন্দনন্দিনী আপন লোকের মতো আনাগোনা করছে ঘরে ঘরে। কী হল কী হবে, দেশসুদ্ধ সবার এই ভাবনা।

বঙ্গদর্শন এলে পাড়ায় দুপুর বেলায় কারও ঘুম থাকত না। আমার সুবিধে ছিল, কাড়াকাড়ি করবার দরকার হত না; কেননা আমার একটা গুণ ছিল, আমি ভালো পড়ে শোনাতে পারতুম। আপন মনে পড়ার চেয়ে আমার পড়া শুনতে বৌঠাকরুন ভালোবাসতেন। তখন বিজলিপাখা ছিল না, পড়তে পড়তে বৌঠাকরুনের হাতপাখার হাওয়ার একটা ভাগ আমি আদায় করে নিতুম।

১৩

মাঝে মাঝে জ্যোতিদাদা যেতেন হাওয়া বদল করতে গঙ্গার ধারের বাগানে। বিলিতি সওদাগরির ছোঁওয়া লেগে গঙ্গার ধার তখনো জাত খোওয়ায় নি। মুষড়ে যায় নি তার দুই ধারে পাখির বাসা, আকাশের আলোয় লোহার কলের শুঁড়গুলো ফুঁসে দেয় নি কালো নিশ্বাস।

গঙ্গার ধারের প্রথম যে বাসা আমার মনে পড়ে, ছোটো সে দোতলা বাড়ি। নতুন বর্ষা নেমেছে। মেঘের ছায়া ভেসে চলেছে স্রোতের উপর ঢেউ খেলিয়ে, মেঘের ছায়া কালো হয়ে ঘনিয়ে রয়েছে ও পারে বনের মাথায়। অনেকবার এইরকম দিনে নিজে গান

১ প্রকাশ ১২৭৯ বৈশাখ [ইং ১৮৭২ এপ্রিল]

তৈরি করেছি, সেদিন তা হল না। বিদ্যাপতির পদটি জেগে উঠল আমার মনে, 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর।' নিজের সুর দিয়ে ঢালাই করে রাগিণীর ছাপ মেরে তাকে নিজের করে নিলুম। গঙ্গার ধারে সেই সুর দিয়ে মিনে-করা এই বাদল-দিন আজও রয়ে গেছে আমার বর্ষাগানের সিন্ধুকটাতে। মনে পড়ে, থেকে থেকে বাতাসের ঝাপটা লাগছে গাছগুলোর মাথার উপর, ঝুটোপুটি বেধে গেছে ডালে-পালায়, ডিঙিনৌকাগুলো সাদা পাল তুলে হাওয়ার মুখে ঝুঁকে পড়ে ছুটেছে, ঢেউগুলো ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে ঝপ ঝপ শব্দে পড়ছে ঘাটের উপর। বৌঠাকরুন ফিরে এলেন; গান শোনালুম তাঁকে; ভালো লাগল বলেন নি, চুপ করে শুনলেন। তখন আমার বয়স হবে ষোলো কি সতেরো। যা-তা তর্ক নিয়ে কথা-কাটাকাটি তখনো চলে, কিন্তু ঝাঁজ কমে গিয়েছে।

তার কিছুদিন পরে বাসা বদল করা হল মোরান সাহেবের বাগানে। সেটা রাজবাড়ি বললেই হয়। রঙিন কাঁচের জানলা দেওয়া উঁচুনিচু ঘর, মার্বল পাথরে বাঁধা মেজে, ধাপে ধাপে গঙ্গার উপর থেকেই সিঁড়ি উঠেছে লম্বা বারান্দায়। এখানে রাত জাগবার ঘোর লাগত আমার মনে, সেই সাবরমতী নদীর ধারের পায়চারি[১]র সঙ্গে এখানকার পায়চারির তাল মেলানো চলত। সে বাগান আজ আর নেই, লোহার দাঁত কড়মড়িয়ে তাকে গিলে ফেলেছে ডাণ্ডির কারখানা।

ঐ মোরান-বাগানের কথায় মনে পড়ে এক-একদিন রান্নার আয়োজন বকুলগাছ-তলায়। সে রান্নায় মসলা বেশি ছিল না, ছিল হাতের গুণ। মনে পড়ে পইতের সময় বৌঠাকরুন আমাদের দুই ভাইয়ের হবিষ্যান্ন রেঁধে দিতেন, তাতে পড়ত গাওয়া ঘি। ঐ তিন দিন তার স্বাদে, তার গন্ধে, মুগ্ধ করে রেখেছিল লোভীদের।

আমার একটা বড়ো মুশকিল ছিল, শরীরটাকে সহজে রোগে ধরত না। বাড়ির আর-আর যে-সব ছেলে রোগে পড়তে জানত তারা পেত তাঁর হাতের সেবা। তারা শুধু যে তাঁর সেবা পেত তা নয়, তাঁর সময় জুড়ে বসত। আমার ভাগ যেত কমে।

সেদিনকার সেই তেতালার দিন মিলিয়ে গেল তাঁকে সঙ্গে নিয়ে। তার পরে আমার এল তেতালার বসতি, আগেকার সঙ্গে এর ঠিক জোড়-লাগানো চলে না।

ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছি যৌবনের সদর দরজায়। আবার ফিরতে হল সেই ছেলেবেলার সীমানার দিকে।

এবার ষোলো বছর বয়সের হিসাব দিতে হচ্ছে। তার আরম্ভের মুখেই দেখা

১ জীবনস্মৃতির 'আমেদাবাদ' পরিচ্ছেদে উল্লিখিত —রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড

দিয়েছে ভারতী[১]। আজকাল দেশে চার দিকেই ফুটে ফুটে উঠছে কাগজ বের করবার টগ্‌বগানি। বুঝতে পারি সে নেশার জোর, যখন ফিরে তাকাই সেদিনকার খেপামির দিকে। আমার মতো ছেলে যার না ছিল বিদ্যে, না ছিল সাধ্যি, সেও সেই বৈঠকে জায়গা জুড়ে বসল, অথচ সেটা কারও নজরে পড়ল না— এর থেকে জানা যায়, চার দিকে ছেলেমানুষি হাওয়ার যেন ঘুর লেগেছিল। দেশে একমাত্র পাকা হাতের কাগজ তখন দেখা দিয়েছিল বঙ্গদর্শন। আমাদের এ ছিল কাঁচাপাকা; বড়দাদা[২] যা লিখছেন তা লেখাও যেমন শক্ত বোঝাও তেমনি, আর তারই মধ্যে আমি লিখে বসলুম এক গল্প[৩]— সেটা যে কী বকুনির বিনুনি নিজে তার যাচাই করবার বয়স ছিল না, বুঝে দেখবার চোখ যেন অন্যদেরও তেমন ক'রে খোলে নি।

এইখানে বড়দাদার কথাটা বলে নেবার সময় এল। জ্যোতিদাদার আসর ছিল তেতালার ঘরে, আর বড়দাদার ছিল আমাদের দক্ষিণের বারান্দায়। এক সময়ে তিনি ডুবেছিলেন আপন-মনে ভারি ভারি তত্ত্বকথা নিয়ে, সে ছিল আমাদের নাগালের বাইরে। যা লিখতেন, যা ভাবতেন, তা শোনাবার লোক ছিল কম। যদি কেউ রাজি হয়ে ধরা দিত তাকে উনি ছাড়তে চাইতেন না, কিংবা সে ওঁকে ছাড়ত না— ওঁর উপর যা দাবি করত সে কেবল তত্ত্বকথা শোনা নিয়ে নয়। একটি সঙ্গী বড়দাদার জুটেছিলেন, তাঁর নাম জানি নে, তাঁকে সবাই ডাকত ফিলজফার ব'লে। অন্য দাদারা তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করতেন কেবল তাঁর মটনচপের 'পরে লোভ নিয়ে নয়, দিনের পর দিন তাঁর নানা রকমের জরুরি দরকার নিয়ে। দর্শনশাস্ত্র ছাড়া বড়দাদার শখ ছিল গণিতের সমস্যা বানানো। অঙ্কচিহ্নওয়ালা পাতাগুলো দক্ষিণে হাওয়ায় উড়ে বেড়াত বারান্দাময়। বড়দাদা গান গাইতে পারতেন না, বিলিতি বাঁশি বাজাতেন, কিন্তু সে গানের জন্য নয়— অঙ্ক দিয়ে এক-এক রাগিণীতে গানের সুর মেপে নেবার জন্যে। তার পরে এক সময়ে ধরলেন 'স্বপ্নপ্রয়াণ' লিখতে। তার গোড়ায় শুরু হল ছন্দ বানানো। সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিকে বাংলা ভাষার ধ্বনির বাটখারায় ওজন করে করে সাজিয়ে তুলতেন— তার অনেকগুলো রেখেছেন, অনেকগুলি রাখেন নি, ছেঁড়া পাতায় ছড়াছড়ি গেছে। তার পরে কাব্য লিখতে লাগলেন; যত লিখে রাখতেন তার চেয়ে ফেলে দিতেন অনেক বেশি। যা লিখতেন তা সহজে পছন্দ হত না। তাঁর সেই-সব ফেলাছড়া লাইনগুলো কুড়িয়ে রাখবার মতো বুদ্ধি আমাদের ছিল না। যেমন যেমন

১ প্রকাশ ১২৮৪ শ্রাবণ [ইং ১৮৭৭]

২ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩ রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গল্প 'ভিখারিণী' —ভারতী, ১২৮৪ শ্রাবণ-ভাদ্র

লিখতেন শুনিয়ে যেতেন, শোনবার লোক জমত তাঁর চার দিকে। আমরা বাড়িসুদ্ধ সবাই মেতে গিয়েছিলুম এই কাব্যের রসে। পড়ার মাঝে মাঝে উচ্চহাসি উঠত উথলিয়ে। তাঁর হাসি ছিল আকাশ-ভরা; সেই হাসির ঝোঁকের মাথায় কেউ যদি হাতের কাছে থাকত তাকে চাপড়িয়ে অস্থির করে তুলতেন।

জোড়াসাঁকোর বাড়ির প্রাণের একটি ঝরনাতলা ছিল এই দক্ষিণের বারান্দা, শুকিয়ে গেল এর স্রোত, বড়দাদা চলে গেলেন শান্তিনিকেতন আশ্রমে। আমার কেবল মাঝে মাঝে মনে পড়ে, ঐ বারান্দার সামনেকার বাগানে মন-কেমন-করা শরতের রোদ্দুর ছড়িয়ে পড়েছে, আমি নতুন গান তৈরি করে গাচ্ছি 'আজি শরততপনে প্রভাতস্বপনে কী জানি পরান কী যে চায়'। আর মনে আসে একটি তপ্ত দিনের ঝাঁ ঝাঁ দুই প্রহরের গান 'হেলাফেলা সারাবেলা এ কী খেলা আপন-মনে'।

বড়দাদার আর-একটি অভ্যাস ছিল চোখে পড়বার মতো, সে তাঁর সাঁতার কাটা। পুকুরে নেমে কিছু না হবে তো পঞ্চাশ বার এপার-ওপার করতেন। পেনেটির বাগানে যখন ছিলেন তখন গঙ্গা পেরিয়ে চলে যেতেন অনেক দূর পর্যন্ত। তাঁর দেখাদেখি সাঁতার আমরাও শিখেছি ছেলেবেলা থেকে। শেখা শুরু করেছিলুম নিজে নিজেই। পায়জামা ভিজিয়ে নিয়ে টেনে টেনে ভরে তুলতুম বাতাসে। জলে নামলেই সেটা কোমরের চার দিকে হাওয়ার কোমরবন্দর মতো ফুলে উঠত। তার পরে আর ডোববার জো থাকত না। বড়োবয়সে যখন শিলাইদহের চরে থাকতুম তখন একবার সাঁতার দিয়ে পদ্মা পেরিয়েছিলুম। কথাটা শুনতে যতটা তাক-লাগানো আসলে ততটা নয়। মাঝে মাঝে চরা-পড়া সেই পদ্মার টান ছিল না তাকে সমীহ করবার মতো; তবু ডাঙার লোকের কাছে ভয়-লাগানো গল্পটা শোনাবার মতো বটে, শুনিয়েওছি অনেকবার। ছেলেবেলায় যখন গিয়েছি ড্যালহৌসি পাহাড়ে, পিতৃদেব আমাকে একা-একা ঘুরে বেড়াতে কখনো মানা করেন নি। পায়ে-চলা রাস্তায় আমি ফলাওয়ালা লাঠি হাতে এক পাহাড় থেকে আর-এক পাহাড়ে উঠে যেতুম। তার সকলের চেয়ে মজা ছিল মনে মনে ভয় বানিয়ে তোলা। একদিন ওৎরাই পথে যেতে যেতে পা পড়েছিল গাছের তলায় রাশ-করা শুকনো পাতার উপর। পা একটু হড়কে যেতেই লাঠি দিয়ে ঠেকিয়ে দিলুম। কিন্তু না ঠেকাতেও তো পারতুম। ঢালু পাহাড়ে গড়াতে গড়াতে অনেকদূর নীচে ঝরনার মধ্যে পড়তে কতক্ষণ লাগত। কী যে হতে পারত সেটা এতখানি করে মা'র কাছে বলেছি। তা ছাড়া ঘন পাইনের বনে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ ভালুকের সঙ্গে দেখা হলেও হতে পারত, এও একটা শোনাবার মতো জিনিস ছিল বটে। ঘটবার মতো কিছুই ঘটে নি, কাজেই অঘটন সব জমিয়েছিলুম মনে।

আমার সাঁতার দিয়ে পদ্মা পার হওয়ার গল্পও এ-সব গল্পের থেকে খুব বেশি তফাত নয়।

সতেরো বছরে পড়লুম যখন, ভারতীর সম্পাদকি বৈঠক থেকে আমাকে সরে যেতে হল।

এই সময়ে আমার বিলেত যাওয়া ঠিক হয়েছে। আর সেই সঙ্গে পরামর্শ হল, জাহাজে চড়বার আগে মেজদাদার সঙ্গে গিয়ে আমাকে বিলিতি চালচলনের গোড়াপত্তন করে নিতে হবে। তিনি তখন জজিয়তি করছেন আমেদাবাদে; মেজবৌঠাকরুন আর তাঁর ছেলেমেয়ে আছেন ইংলণ্ডে, ফর্লো নিয়ে মেজদাদা তাঁদের সঙ্গে যোগ দেবেন এই অপেক্ষায়।

শিকড়সুদ্ধ আমাকে উপড়ে নিয়ে আসা হল এক খেত থেকে আর-এক খেতে। নতুন আবহাওয়ার সঙ্গে বোঝাপড়া শুরু হল। গোড়াতে সব-তাতেই খটকা দিতে লাগল লজ্জা। নতুন লোকের সঙ্গে আলাপে নিজের মানরক্ষা করব কী করে এই ছিল ভাবনা। যে অচেনা সংসারের সঙ্গে মাখামাখিও সহজ ছিল না, আর পথ ছিল না যাকে এড়িয়ে যাওয়ার, আমার মতো ছেলের মন সেখানে কেবলই হুঁচট খেয়ে মরত।

আমেদাবাদে একটা পুরনো ইতিহাসের ছবির মধ্যে আমার মন উড়ে বেড়াতে লাগল। জজের বাসা ছিল শাহিবাগে, বাদশাহি আমলের রাজবাড়িতে। দিনের বেলায় মেজদাদা চলে যেতেন কাজে; বড়ো বড়ো ফাঁকা ঘর হাঁ হাঁ করছে, সমস্ত দিন ভূতে-পাওয়ার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি। সামনে প্রকাণ্ড চাতাল, সেখান থেকে দেখা যেত সাবরমতী নদী হাঁটুজল লুটিয়ে নিয়ে এঁকেবেঁকে চলেছে বালির মধ্যে। চাতালটার কোথাও কোথাও চৌবাচ্ছার পাথরের গাঁথনিতে যেন খবর জমা হয়ে আছে বেগমদের স্নানের আমিরিআনার।

কলকাতায় আমরা মানুষ, সেখানে ইতিহাসের মাথাতোলা চেহারা কোথাও দেখি নি। আমাদের চাহনি খুব কাছের দিকের বেঁটে সময়টাতেই বাঁধা। আমেদাবাদে এসে এই প্রথম দেখলুম চলন্তি ইতিহাস থেমে গিয়েছে, দেখা যাচ্ছে তার পিছন-ফেরা বড়ো ঘরোয়ানা। তার সাবেক দিনগুলো যেন যক্ষের ধনের মতো মাটির নীচে পোঁতা। আমার মনের মধ্যে প্রথম আভাস দিয়েছিল 'ক্ষুধিত পাষাণ'[১]-এর গল্পের।

সে আজ কত শত বৎসরের কথা। নহবৎখানায় বাজছে রোশনচৌকি দিনরাত্রে আট প্রহরের রাগিণীতে, রাস্তায় তালে তালে ঘোড়ার খুরের শব্দ উঠছে, ঘোড়সওয়ার তুর্কি ফৌজের চলছে কুচকাওয়াজ, তাদের বর্শার ফলায় রোদ উঠছে ঝক্‌ঝকিয়ে।

১ দ্রষ্টব্য রবীন্দ্র-রচনাবলী, তিন খণ্ড

বাদশাহি দরবারের চার দিকে চলেছে সর্বনেশে কানাকানি ফুস্‌ফাস্‌। অন্দরমহলে খোলা তলোয়ার হাতে হাবসি খোজারা পাহারা দিচ্ছে। বেগমদের হামামে ছুটছে গোলাবজলের ফোয়ারা, উঠছে বাজুবন্ধ-কাঁকনের ঝন্‌ঝনি। আজ স্থির দাঁড়িয়ে শাহিবাগ, ভুলে-যাওয়া গল্পের মতো; তার চার দিকে কোথাও নেই সেই রঙ, নেই সেই-সব ধ্বনি— শুকনো দিন, রস-ফুরিয়ে-যাওয়া রাত্রি।

পুরনো ইতিহাস ছিল তার হাড়গুলো বের করে; তার মাথায় খুলিটা আছে, মুকুট নেই। তার উপরে খোলস মুখোস পরিয়ে একটা পুরোপুরি মূর্তি মনের জাদুঘরে সাজিয়ে তুলতে পেরেছি তা বললে বেশি বলা হবে। চালচিত্তির খাড়া করে একটা খসড়া মনের সামনে দাঁড় করিয়েছিলুম, সেটা আমার খেয়ালেরই খেলনা। কিছু মনে থাকে, অনেকখানি ভুলে যাই ব'লে এইরকম জোড়াতাড়া দেওয়া সহজ হয়। আশি বছর পরে এসে নিজেরই যে-একখানা রূপ সামনে আজ দেখা দিয়েছে আসলের সঙ্গে তার সবটা লাইনে লাইনে মেলে না, অনেকখানি সে মনগড়া।

এখানে কিছুদিন থাকার পর মেজদাদা মনে করলেন, বিদেশকে যারা দেশের রস দিতে পারে সেইরকম মেয়েদের সঙ্গে আমাকে মিলিয়ে দিতে পারলে হয়তো ঘরছাড়া মন আরাম পাবে। ইংরেজি ভাষা শেখবারও সেই হবে সহজ উপায়। তাই কিছুদিনের জন্যে বোম্বাইয়ের কোনো গৃহস্থঘরে আমি বাসা নিয়েছিলুম। সেই বাড়ির কোনো-একটি এখনকার কালের পড়াশুনোওয়ালা মেয়ে[১] ঝক্‌ঝকে করে মেজে এনেছিলেন তাঁর শিক্ষা বিলেত থেকে। আমার বিদ্যে সামান্যই, আমাকে হেলা করলে দোষ দেওয়া যেতে পারত না। তা করেন নি। পুঁথিগত বিদ্যা ফলাবার মতো পুঁজি ছিল না, তাই সুবিধে পেলেই জানিয়ে দিতুম যে কবিতা লেখবার হাত আমার আছে। আদর আদায় করবার ঐ ছিল আমার সবচেয়ে বড়ো মূলধন। যাঁর কাছে নিজের এই কবিআনার জানান দিয়েছিলেম তিনি সেটাকে মেপেজুখে নেন নি, মেনে নিয়েছিলেন। কবির কাছ থেকে একটা ডাকনাম চাইলেন, দিলেম জুগিয়ে— সেটা ভালো লাগল তাঁর কানে। ইচ্ছে করেছিলেম সেই নামটি আমার কবিতার ছন্দে জড়িয়ে দিতে। বেঁধে দিলুম সেটাকে কাব্যের গাঁথুনিতে; শুনলেন সেটা ভোর-বেলাকার ভৈরবী সুরে; বললেন, 'কবি, তোমার গান শুনলে আমি বোধ হয় আমার মরণদিনের থেকেও প্রাণ পেয়ে জেগে উঠতে পারি।' এর থেকে বোঝা যাবে, মেয়েরা যাকে আদর জানাতে চায় তার কথা একটু মধু মিশিয়ে বাড়িয়েই বলে, সেটা খুশি ছড়িয়ে দেবার জন্যেই।

১ অন্নপূর্ণা তরখড়কর বা আনা তরখড়, ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্গ'এর কন্যা

মনে পড়ছে তাঁর মুখেই প্রথম শুনেছিলুম আমার চেহারার তারিফ। সেই বাহবায় অনেক সময় গুণপনা থাকত। যেমন, একবার আমাকে বিশেষ ক'রে বলেছিলেন, 'একটা কথা আমার রাখতেই হবে, তুমি কোনো দিন দাড়ি রেখো না, তোমার মুখের সীমানা যেন কিছুতেই ঢাকা না পড়ে।' তাঁর এই কথা আজ পর্যন্ত রাখা হয় নি, সে কথা সকলেরই জানা আছে। আমার মুখে অবাধ্যতা প্রকাশ পাবার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

আমাদের ঐ বটগাছটাতে কোনো কোনো বছরে হঠাৎ বিদেশী পাখি এসে বাসা বাঁধে। তাদের ডানার নাচ চিনে নিতে নিতেই দেখি তারা চলে গেছে। তারা অজানা সুর নিয়ে আসে দূরের বন থেকে। তেমনি জীবনযাত্রার মাঝে মাঝে জগতের অচেনা মহল থেকে আসে আপন-মানুষের দূতী, হৃদয়ের দখলের সীমানা বড়ো করে দিয়ে যায়। না ডাকতেই আসে, শেষকালে একদিন ডেকে আর পাওয়া যায় না। চলে যেতে যেতে বেঁচে-থাকার চাদরটার উপরে ফুলকাটা কাজের পাড় বসিয়ে দেয়, বরাবরের মতো দিনরাত্রির দাম দিয়ে যায় বাড়িয়ে।

১৪

যে মূর্তিকার আমাকে বানিয়ে তুলেছেন তাঁর হাতের প্রথম কাজ বাংলাদেশের মাটি দিয়ে তৈরি। একটা চেহারার প্রথম আদল দেখা দিল— সেটাকেই বলি ছেলেবেলা, সেটাতে মিশোল বেশি নেই। তার মালমসলা নিজের মধ্যেই জমা ছিল, আর কিছু কিছু ছিল ঘরের হাওয়া আর ঘরের লোকের হাতে। অনেক সময়ে এইখানেই গড়নের কাজ থেমে যায়। এর উপরে লেখাপড়া-শিক্ষার কারখানাঘরে যাদের বিশেষ রকম গড়ন-পিটন ঘটে তারা বাজারে বিশেষ মার্কার দাম পায়।

আমি দৈবক্রমে ঐ কারখানাঘরের প্রায় সমস্তটাই এড়িয়ে গিয়েছিলুম। মাস্টার পণ্ডিত যাঁদের বিশেষ করে রাখা হয়েছিল তাঁরা আমাকে তরিয়ে দেবার কাজে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য মশায় ছিলেন আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মশায়ের পুত্র, বি. এ. পাস-করা। তিনি বুঝে নিয়েছিলেন, লেখাপড়া-শেখার বাঁধা রাস্তায় এ ছেলেকে চালানো যাবে না। মুশকিল এই যে, পাস-করা ভদ্রলোকের ছাঁচে ছেলেদের ঢালাই করতেই হবে, এ কথাটা তখনকার দিনের মুরুব্বিরা তেমন জোরের সঙ্গে ভাবেন নি। সেকালে কলেজি বিদ্যায় একই বেড়াজালে ধনী অধনী সকলকেই টেনে আনবার তাগিদ ছিল না। আমাদের বংশে তখন ধন ছিল না কিন্তু নাম ছিল, তাই

রীতিটা টিঁকে গিয়েছিল। লেখাপড়ার গরজটা ছিল ঢিলে। ছাত্রবৃত্তির নীচের ক্লাস থেকে এক সময়ে আমাদের চালান করা হয়েছিল ডিক্রুজ সাহেবের বেঙ্গল একাডেমিতে। আর-কিছু না হোক, ভদ্রতা রক্ষার মতো ইংরেজি বচন সড়গড় হবে, অভিভাবকদের এই ছিল আশা। ল্যাটিন শেখার ক্লাসে আমি ছিলুম বোবা আর কালা, সকলরকম একসেসাইজের খাতাই থাকত বিধবার থান কাপড়ের মতো আগাগোড়াই সাদা। আমার পড়া না করবার অদ্ভুত জেদ দেখে ক্লাসের মাস্টার ডিক্রুজ সাহেবের কাছে নালিশ করেছিলেন। ডিক্রুজ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, পড়াশোনা করবার জন্যে আমরা জন্মাই নি, মাসে মাসে মাইনে চুকিয়ে দেবার জন্যেই পৃথিবীতে আমাদের আসা। জ্ঞানবাবু কতকটা সেইরকমই ঠিক করেছিলেন। কিন্তু এরই মধ্যে তিনি একটা পথ কেটেছিলেন। আমাকে আগাগোড়া মুখস্থ করিয়ে দিলেন কুমারসম্ভব। ঘরে বন্ধ রেখে আমাকে দিয়ে ম্যাকবেথ তর্জমা করিয়ে নিলেন। এ দিকে রামসর্বস্ব পণ্ডিতমশায় পড়িয়ে দিলেন শকুন্তলা। ক্লাসের পড়ার বাইরে আমাকে দিয়েছিলেন ছেড়ে, কিছু ফল পেয়েছিলেন। আমার ছেলেবয়সের মন গড়বার এই ছিল মালমসলা, আর ছিল বাংলা বই যা তা, তার বাছবিচার ছিল না।

উঠলুম বিলেতে গিয়ে, জীবনগঠনে আরম্ভ হল বিদিশি কারিগরি— কেমিস্ট্রিতে যাকে বলে যৌগিক বস্তুর সৃষ্টি। এর মধ্যে ভাগ্যের খেলা এই দেখতে পাই যে, গেলুম রীতিমত নিয়মে কিছু বিদ্যা শিখে নিতে; কিছু কিছু চেষ্টা হতে লাগল, কিন্তু হয়ে উঠল না। মেজবোঠান ছিলেন, ছিল তাঁর ছেলেমেয়ে, জড়িয়ে রইলুম আপন ঘরের জালে। ইস্কুলমহলের আশেপাশে ঘুরেছি; বাড়িতে মাস্টার পড়িয়েছেন, দিয়েছি ফাঁকি। যেটুকু আদায় করেছি সেটা মানুষের কাছাকাছি থাকার পাওনা। নানা দিক থেকে বিলেতের আবহাওয়ার কাজ চলতে লাগল মনের উপর।

পালিত সাহেব[১] আমাকে ছাড়িয়ে নিলেন ঘরের বাঁধন থেকে। একটি ডাক্তারের বাড়িতে বাসা নিলুম। তাঁরা আমাকে ভুলিয়ে দিলেন যে, বিদেশে এসেছি। মিসেস স্কট আমাকে যে স্নেহ করতেন সে একেবারে খাঁটি। আমার জন্যে সকল সময়েই মায়ের মতো ভাবনা ছিল তাঁর মনে। আমি তখন লণ্ডন য়ুনিভর্সিটিতে ভরতি হয়েছি, ইংরেজি সাহিত্য পড়াচ্ছেন হেনরি মর্লি। সে তো পড়ার বই থেকে চালান দেওয়া শুকনো মাল নয়। সাহিত্য তাঁর মনে, তাঁর গলার সুরে প্রাণ পেয়ে উঠত— আমাদের সেই মরমে পৌঁছত যেখানে প্রাণ চায় আপন

১ তারকনাথ পালিত

খোরাক, মাঝখানে রসের কিছুই লোকসান হত না। বাড়িতে এসে ক্ল্যারেণ্ডন প্রেসের বইগুলি থেকে পড়বার বিষয় উলটে-পালটে বুঝে নিতুম। অর্থাৎ নিজের মাস্টারি করার কাজটা নিজেই নিয়েছিলুম। নাহক থেকে থেকে মিসেস স্কট মনে করতেন, আমার মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে। ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। তিনি জানতেন না, ছেলেবেলা থেকে আমার শরীরে ব্যামো হবার গেট বন্ধ। প্রতিদিন ভোরবেলায় বরফ-গলা জলে স্নান করেছি। তখনকার ডাক্তারি মতে এরকম অনিয়মে বেঁচে থাকাটা যেন শাস্ত্র ডিঙিয়ে চলা।

আমি য়ুনিভর্সিটিতে পড়তে পেরেছিলুম তিন মাস মাত্র। কিন্তু আমার বিদেশের শিক্ষা প্রায় সমস্তটাই মানুষের ছোঁওয়া লেগে। আমাদের কারিগর সুযোগ পেলেই তাঁর রচনায় মিলিয়ে দেন নূতন নূতন মালমসলা। তিন মাসে ইংরেজের হৃদয়ের কাছাকাছি থেকে সেই মিশোলটি ঘটেছিল। আমার উপরে ভার পড়েছিল রোজ সন্ধেবেলায় রাত এগারোটা পর্যন্ত পালা ক'রে কাব্যনাটক ইতিহাস পড়ে শোনানো। ঐ অল্প সময়ের মধ্যে অনেক পড়া হয়ে গেছে। সেই পড়া ক্লাসের পড়া নয়। সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের মিলন। বিলেতে গেলেম, ব্যারিস্টর হই নি। জীবনের গোড়াকার কাঠামোটাকে নাড়া দেবার মতো ধাক্কা পাই নি, নিজের মধ্যে নিয়েছি পূর্ব-পশ্চিমের হাত মেলানো— আমার নামটার মানে পেয়েছি প্রাণের মধ্যে।

—

সভ্যতার সংকট

সভ্যতার সংকট

আজ আমার বয়স আশি বৎসর পূর্ণ হল, আমার জীবনক্ষেত্রের বিস্তীর্ণতা আজ আমার সম্মুখে প্রসারিত। পূর্বতম দিগন্তে যে জীবন আরম্ভ হয়েছিল তার দৃশ্য অপর প্রান্ত থেকে নিঃসক্ত দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি এবং অনুভব করতে পারছি যে, আমার জীবনের এবং সমস্ত দেশের মনোবৃত্তির পরিণতি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে; সেই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে গভীর দুঃখের কারণ আছে।

বৃহৎ মানববিশ্বের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় আরম্ভ হয়েছে সেদিনকার ইংরেজ জাতির ইতিহাসে। আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে উদ্‌ঘাটিত হল একটি মহৎ সাহিত্যের উচ্চশিখর থেকে ভারতের এই আগন্তুকের চরিত্রপরিচয়। তখন আমাদের বিদ্যালাভের পথ্য-পরিবেশনে প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য ছিল না। এখনকার যে বিদ্যা জ্ঞানের নানা কেন্দ্র থেকে বিশ্বপ্রকৃতির পরিচয় ও তার শক্তির রহস্য নতুন নতুন করে দেখাচ্ছে তার অধিকাংশ ছিল তখন নেপথ্যে অগোচরে। প্রকৃতিতত্ত্বে বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা ছিল অল্পই। তখন ইংরেজি ভাষার ভিতর দিয়ে ইংরেজি সাহিত্যকে জানা ও উপভোগ করা ছিল মার্জিতমনা বৈদগ্ধ্যের পরিচয়। দিনরাত্রি মুখরিত ছিল বার্কের বাগ্মিতায়, মেকলের ভাষাপ্রবাহের তরঙ্গভঙ্গে; নিয়তই আলোচনা চলত সেক্স্‌পিয়ারের নাটক নিয়ে, বায়্‌রনের কাব্য নিয়ে এবং তখনকার পলিটিক্সে সর্বমানবের বিজয়ঘোষণায়। তখন আমরা স্বজাতির স্বাধীনতার সাধনা আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু অন্তরে অন্তরে ছিল ইংরেজ জাতির ঔদার্যের প্রতি বিশ্বাস। সে বিশ্বাস এত গভীর ছিল যে একসময় আমাদের সাধকেরা স্থির করেছিলেন যে, এই বিজিত জাতির স্বাধীনতার পথ বিজয়ী জাতির দাক্ষিণ্যের দ্বারাই প্রশস্ত হবে। কেননা, একসময় অত্যাচারপ্রপীড়িত জাতির আশ্রয়স্থল ছিল ইংলণ্ডে। যারা স্বজাতির সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণপণ করছিল তাদের অকুণ্ঠিত আসন ছিল ইংলণ্ডে। মানবমৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয় দেখেছি ইংরেজ-চরিত্রে, তাই আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে ইংরেজকে হৃদয়ের উচ্চাসনে বসিয়েছিলেম। তখনো সাম্রাজ্যমদমত্ততায় তাদের স্বভাবের দাক্ষিণ্য কলুষিত হয় নি।

আমার যখন বয়স অল্প ছিল ইংলণ্ডে গিয়েছিলেম, সেইসময় জন্‌ ব্রাইটের মুখ থেকে পার্লামেন্টে এবং তার বাহিরে কোনো কোনো সভায় যে বক্তৃতা শুনেছিলেম তাতে শুনেছি চিরকালের ইংরেজের বাণী। সেই বক্তৃতায় হৃদয়ের ব্যাপ্তি জাতিগত সকল সংকীর্ণ সীমাকে অতিক্রম করে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল সে আমার আজ

পর্যন্ত মনে আছে এবং আজকের এই শ্রীভ্রষ্ট দিনেও আমার পূর্বস্মৃতিকে রক্ষা করছে। এই পরনির্ভরতা নিশ্চয়ই আমাদের শ্লাঘার বিষয় ছিল না। কিন্তু এর মধ্যে এইটুকু প্রশংসার বিষয় ছিল যে, আমাদের আবহমান কালের অনভিজ্ঞতার মধ্যেও মনুষ্যত্বের যে-একটি মহৎ রূপ সেদিন দেখেছি, তা বিদেশীয়কে আশ্রয় ক'রে প্রকাশ পেলেও, তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করবার শক্তি আমাদের ছিল ও কুণ্ঠা আমাদের মধ্যে ছিল না। কারণ, মানুষের মধ্যে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তা সংকীর্ণভাবে কোনো জাতির মধ্যে বদ্ধ হতে পারে না, তা কৃপণের অবরুদ্ধ ভাণ্ডারের সম্পদ নয়। তাই, ইংরেজের যে সাহিত্যে আমাদের মন পুষ্টিলাভ করেছিল আজ পর্যন্ত তার বিজয়শঙ্খ আমার মনে মন্দ্রিত হয়েছে।

'সিভিলিজেশন', যাকে আমরা সভ্যতা নাম দিয়ে তর্জমা করেছি, তার যথার্থ প্রতিশব্দ আমাদের ভাষায় পাওয়া সহজ নয়। এই সভ্যতার যে রূপ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল মনু তাকে বলেছেন সদাচার। অর্থাৎ, তা কতকগুলি সামাজিক নিয়মের বন্ধন। সেই নিয়মগুলির সম্বন্ধে প্রাচীনকালে যে ধারণা ছিল সেও একটি সংকীর্ণ ভূগোলখণ্ডের মধ্যে বদ্ধ। সরস্বতী ও দৃশদ্‌বতী নদীর মধ্যবর্তী যে দেশ ব্রহ্মাবর্ত নামে বিখ্যাত ছিল সেই দেশে যে আচার পারম্পর্যক্রমে চলে এসেছে তাকেই বলে সদাচার। অর্থাৎ, এই আচারের ভিত্তি প্রথার উপরেই প্রতিষ্ঠিত— তার মধ্যে যত নিষ্ঠুরতা, যত অবিচারই থাক্‌। এই কারণে প্রচলিত সংস্কার আমাদের আচার-ব্যবহারকেই প্রাধান্য দিয়ে চিত্তের স্বাধীনতা নির্বিচারে অপহরণ করেছিল। সদাচারের যে আদর্শ একদা মনু ব্রহ্মাবর্তে প্রতিষ্ঠিত দেখেছিলেন সেই আদর্শ ক্রমশ লোকাচারকে আশ্রয় করলে। আমি যখন জীবন আরম্ভ করেছিলুম তখন ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে এই বাহ্য আচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেশের শিক্ষিত মনে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। রাজনারায়ণবাবু কর্তৃক বর্ণিত তখনকার কালের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের ব্যবহারের বিবরণ পড়লে সে কথা স্পষ্ট বোঝা যাবে। এই সদাচারের স্থলে সভ্যতার আদর্শকে আমরা ইংরেজ জাতির চরিত্রের সঙ্গে মিলিত করে গ্রহণ করেছিলেম। আমাদের পরিবারে এই পরিবর্তন, কী ধর্মমতে কী লোকব্যবহারে, ন্যায়বুদ্ধির অনুশাসনে পূর্ণভাবে গৃহীত হয়েছিল। আমি সেই ভাবের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলুম এবং সেই সঙ্গে আমাদের স্বাভাবিক সাহিত্যানুরাগ ইংরেজকে উচ্চাসনে বসিয়েছিল। এই গেল জীবনের প্রথম ভাগ। তার পর থেকে ছেদ আরম্ভ হল কঠিন দুঃখে। প্রত্যহ দেখতে পেলুম— সভ্যতাকে যারা চরিত্র-উৎস থেকে উৎসারিতরূপে স্বীকার করেছে, রিপুর প্রবর্তনায় তারা তাকে কী অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পারে।

নিভৃতে সাহিত্যের রসসম্ভোগের উপকরণের বেষ্টন হতে একদিন আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। সেদিন ভারতবর্ষের জনসাধারণের যে নিদারুণ দারিদ্র্য আমার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হল তা হৃদয়বিদারক। অন্ন বস্ত্র পানীয় শিক্ষা আরোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীরমনের পক্ষে যা-কিছু অত্যাবশ্যক তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধ হয় পৃথিবীর আধুনিক-শাসনচালিত কোনো দেশেই ঘটে নি। অথচ এই দেশ ইংরেজকে দীর্ঘকাল ধরে তার ঐশ্বর্য জুগিয়ে এসেছে। যখন সভ্যজগতের মহিমাধ্যানে একান্তমনে নিবিষ্ট ছিলেম তখন কোনোদিন সভ্যনামধারী মানব-আদর্শের এতবড়ো নিষ্ঠুর বিকৃত রূপ কল্পনা করতেই পারি নি; অবশেষে দেখছি, একদিন এই বিকারের ভিতর দিয়ে বহুকোটি জনসাধারণের প্রতি সভ্যজাতির অপরিসীম অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদাসীন্য।

যে যন্ত্রশক্তির সাহায্যে ইংরেজ আপনার বিশ্বকর্তৃত্ব রক্ষা করে এসেছে তার যথোচিত চর্চা থেকে এই নিঃসহায় দেশ বঞ্চিত। অথচ চক্ষের সামনে দেখলুম জাপান যন্ত্রচালনার যোগে দেখতে দেখতে সর্বতোভাবে কিরকম সম্পদ্‌বান হয়ে উঠল। সেই জাপানের সমৃদ্ধি আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি, দেখেছি সেখানে স্বজাতির মধ্যে তার সভ্য শাসনের রূপ। আর দেখেছি রাশিয়ার মস্কাও নগরীতে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের আরোগ্যবিস্তারের কী অসামান্য অকৃপণ অধ্যবসায়— সেই অধ্যবসায়ের প্রভাবে এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের মূর্খতা ও দৈন্য ও আত্মাবমাননা অপসারিত হয়ে যাচ্ছে। এই সভ্যতা জাতিবিচার করে নি, বিশুদ্ধ মানবসম্বন্ধের প্রভাব সর্বত্র বিস্তার করেছে। তার দ্রুত এবং আশ্চর্য পরিণতি দেখে একই কালে ঈর্ষা এবং আনন্দ অনুভব করেছি। মস্কাও শহরে গিয়ে রাশিয়ার শাসনকার্যের একটি অসাধারণতা আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল— দেখেছিলেম, সেখানকার মুসলমানদের সঙ্গে রাষ্ট্র-অধিকারের ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে অমুসলমানদের কোনো বিরোধ ঘটে না; তাদের উভয়ের মিলিত স্বার্থসম্বন্ধের ভিতরে রয়েছে শাসনব্যবস্থার যথার্থ সত্য ভূমিকা। বহুসংখ্যক পরজাতির উপরে প্রভাব চালনা করে এমন রাষ্ট্রশক্তি আজ প্রধানত দুটি জাতির হাতে আছে— এক ইংরেজ, আর-এক সোভিয়েট রাশিয়া। ইংরেজ এই পরজাতীয়ের পৌরুষ দলিত করে দিয়ে তাকে চিরকালের মতো নির্জীব করে রেখেছে। সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে রাষ্ট্রিক সম্বন্ধ আছে বহুসংখ্যক মরুচর মুসলমান জাতির। আমি নিজে সাক্ষ্য দিতে পারি, এই জাতিকে সকল দিকে শক্তিমান করে তোলবার জন্য তাদের অধ্যবসায় নিরন্তর। সকল বিষয়ে তাদের সহযোগী ক'রে রাখবার জন্য সোভিয়েট গভর্নমেন্টের চেষ্টার প্রমাণ আমি দেখেছি এবং সে সম্বন্ধে কিছু পড়েছি। এইরকম গভর্নমেন্টের প্রভাব কোনো অংশে অসম্মানকর নয় এবং তাতে মনুষ্যত্বের হানি করে না। সেখানকার

শাসন বিদেশীয় শক্তির নিদারুণ নিষ্পেষণী যন্ত্রের শাসন নয়। দেখে এসেছি, পারস্যদেশ একদিন দুই য়ুরোপীয় জাতির জাঁতার চাপে যখন পিষ্ট হচ্ছিল তখন সেই নির্মম আক্রমণের য়ুরোপীয় দংষ্ট্রাঘাত থেকে আপনাকে মুক্ত করে কেমন করে এই নবজাগ্রত জাতি আত্মশক্তির পূর্ণতাসাধনে প্রবৃত্ত হয়েছে। দেখে এলেম, জরথুস্ট্রিয়ানদের সঙ্গে মুসলমানদের এক কালে যে সাংঘাতিক প্রতিযোগিতা ছিল বর্তমান সভ্যশাসনে তার সম্পূর্ণ উপশম হয়ে গিয়েছে। তার সৌভাগ্যের প্রধান কারণ এই যে, সে য়ুরোপীয় জাতির চক্রান্তজাল থেকে মুক্ত হতে পেরেছিল। সর্বান্তঃকরণে আজ আমি এই পারস্যের কল্যাণ কামনা করি। আমাদের প্রতিবেশী আফগানিস্থানের মধ্যে শিক্ষা এবং সমাজনীতির সেই সার্বজনীন উৎকর্ষ যদিচ এখনো ঘটে নি কিন্তু তার সম্ভাবনা অক্ষুণ্ন রয়েছে, তার একমাত্র কারণ— সভ্যতাগর্বিত কোনো য়ুরোপীয় জাতি তাকে আজও অভিভূত করতে পারে নি। এরা দেখতে দেখতে চার দিকে উন্নতির পথে, মুক্তির পথে, অগ্রসর হতে চলল।

ভারতবর্ষ ইংরেজের সভ্যশাসনের জগদ্দল পাথর বুকে নিয়ে তলিয়ে পড়ে রইল নিরুপায় নিশ্চলতার মধ্যে। চৈনিকদের মতন এতবড়ো প্রাচীন সভ্য জাতিকে ইংরেজ স্বজাতির স্বার্থসাধনের জন্য বলপূর্বক অহিফেনবিষে জর্জরিত করে দিলে এবং তার পরিবর্তে চীনের এক অংশ আত্মসাৎ করলে। এই অতীতের কথা যখন ক্রমশ ভুলে এসেছি তখন দেখলুম উত্তর-চীনকে জাপান গলাধঃকরণ করতে প্রবৃত্ত; ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনীতিপ্রবীণেরা কী অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদ্ধত্যের সঙ্গে সেই দস্যুবৃত্তিকে তুচ্ছ বলে গণ্য করেছিল। পরে এক সময়ে স্পেনের প্রজাতন্ত্র-গভর্নমেণ্টের তলায় ইংলণ্ড কিরকম কৌশলে ছিদ্র করে দিলে, তাও দেখলাম এই দূর থেকে। সেই সময়েই এও দেখেছি, একদল ইংরেজ সেই বিপদগ্রস্ত স্পেনের জন্য আত্মসমর্পণ করেছিলেন। যদিও ইংরেজের এই ঔদার্য প্রাচ্য চীনের সংকটে যথোচিত জাগ্রত হয় নি, তবু য়ুরোপীয় জাতির প্রজাস্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য যখন তাদের কোনো বীরকে প্রাণপাত করতে দেখলুম তখন আবার একবার মনে পড়ল, ইংরেজকে একদা মানবহিতৈষীরূপে দেখেছি এবং কী বিশ্বাসের সঙ্গে ভক্তি করেছি। য়ুরোপীয় জাতির স্বভাবগত সভ্যতার প্রতি বিশ্বাস ক্রমে কী করে হারানো গেল তারই এই শোচনীয় ইতিহাস আজ আমাকে জানাতে হল। সভ্যশাসনের চালনায় ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে যে দুর্গতি আজ মাথা তুলে উঠেছে সে কেবল অন্ন বস্ত্র শিক্ষা এবং আরোগ্যের শোকাবহ অভাব মাত্র নয়; সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ, যার কোনো তুলনা দেখতে পাই নি ভারতবর্ষের বাইরে মুসলমান স্বায়ত্তশাসন-চালিত দেশে।

আমাদের বিপদ এই যে, এই দুর্গতির জন্যে আমাদেরই সমাজকে একমাত্র দায়ী করা হবে। কিন্তু এই দুর্গতির রূপ যে প্রত্যহই ক্রমশ উৎকট হয়ে উঠেছে, সে যদি ভারত-শাসনযন্ত্রের ঊর্ধ্বস্তরে কোনো-এক গোপন কেন্দ্রে প্রশ্রয়ের দ্বারা পোষিত না হত তা হলে কখনোই ভারত-ইতিহাসের এতবড়ো অপমানকর অসভ্য পরিণাম ঘটতে পারত না। ভারতবাসী যে বুদ্ধিসামর্থ্যে কোনো অংশে জাপানের চেয়ে ন্যূন, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই দুই প্রাচ্যদেশের সর্বপ্রধান প্রভেদ এই, ইংরেজশাসনের দ্বারা সর্বতোভাবে অধিকৃত ও অভিভূত ভারত, আর জাপান এইরূপ কোনো পাশ্চাত্য জাতির পক্ষছায়ার আবরণ থেকে মুক্ত। এই বিদেশীয় সভ্যতা, যদি একে সভ্যতা বলো, আমাদের কী অপহরণ করেছে তা জানি; সে তার পরিবর্তে দণ্ড হাতে স্থাপন করেছে যাকে নাম দিয়েছে Law and Order, বিধি এবং ব্যবস্থা, যা সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস, যা দারোয়ানি মাত্র। পাশ্চাত্য জাতির সভ্যতা-অভিমানের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা অসাধ্য হয়েছে। সে তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারে নি। অর্থাৎ, মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ সবচেয়ে মূল্যবান এবং যাকে যথার্থ সভ্যতা বলা যেতে পারে তার কৃপণতা এই ভারতীয়দের উন্নতির পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে দিয়েছে। অথচ, আমার ব্যক্তিগত সৌভাগ্যক্রমে মাঝে মাঝে মহদাশয় ইংরেজের সঙ্গে আমার মিলন ঘটেছে। এই মহত্ত্ব আমি অন্য কোনো জাতির কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখতে পাই নি। এঁরা আমার বিশ্বাসকে ইংরেজ জাতির প্রতি আজও বেঁধে রেখেছেন। দৃষ্টান্তস্থলে এণ্ড্রুজের নাম করতে পারি; তাঁর মধ্যে যথার্থ ইংরেজকে, যথার্থ খৃস্টানকে, যথার্থ মানবকে বন্ধুভাবে অত্যন্ত নিকটে দেখবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল। আজ মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষণীতে স্বার্থসম্পর্কহীন তাঁর নির্ভীক মহত্ত্ব আরও জ্যোতির্ময় হয়ে দেখা দিয়েছে। তাঁর কাছে আমার এবং আমাদের সমস্ত জাতির কৃতজ্ঞতার নানা কারণ আছে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে একটি কারণে আমি তাঁর কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ। তরুণবয়সে ইংরেজি সাহিত্যের পরিবেশের মধ্যে যে ইংরেজ জাতিকে আমি নির্মল শ্রদ্ধা একদা সম্পূর্ণচিত্তে নিবেদন করেছিলেম, আমার শেষবয়সে তিনি তারই জীর্ণতা ও কলঙ্ক-মোচনে সহায়তা করে গেলেন। তাঁর স্মৃতির সঙ্গে এই জাতির মর্মগত মাহাত্ম্য আমার মনে ধ্রুব হয়ে থাকবে। আমি এঁদের নিকটতম বন্ধু বলে গণ্য করেছি এবং সমস্ত মানবজাতির বন্ধু বলে মান্য করি। এঁদের পরিচয় আমার জীবনে একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদরূপে সঞ্চিত হয়ে রইল। আমার মনে হয়েছে, ইংরেজের মহত্ত্বকে এঁরা সকলপ্রকার নৌকোডুবি থেকে উদ্ধার করতে পারবেন। এঁদের যদি না দেখতুম এবং না জানতুম তা হলে পাশ্চাত্য জাতির সম্বন্ধে

আমার নৈরাশ্য কোথাও প্রতিবাদ পেত না।

এমনসময় দেখা গেল, সমস্ত য়ুরোপে বর্বরতা কিরকম নখদন্ত বিকাশ করে বিভীষিকা বিস্তার করতে উদ্যত। এই মানবপীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে। আমাদের হতভাগ্য নিঃসহায় নীরন্ধ্র অকিঞ্চনতার মধ্যে আমরা কি তার কোনো আভাস পাই নি।

ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্‌ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে। জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি— পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ! কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর-একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।

এই কথা আজ বলে যাব, প্রবলপ্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে; নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে যে—

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্‌ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥

ঐ মহামানব আসে,
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে।
সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক,
এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয়শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নবজীবনের আশ্বাসে।
'জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়'
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
১ বৈশাখ ১৩৪৮

গ্রন্থপরিচয়

[রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশের তারিখ ও রচনা-সংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য নিম্নে মুদ্রিত হইল।]

'ছড়া' ১৩৪৮ সালের ভাদ্র মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হইলেও গ্রন্থটির মুদ্রণ তাঁহার জীবদ্দশাতেই শুরু হইয়াছিল।

শান্তিনিকেতন-আশ্রমে এক পাঠসভায়, এরূপ "নূতন কবিতা" সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর ছাত্রদের যাহা বলিয়াছিলেন তাহার অনুলিপি ১৩৪৭ বৈশাখের প্রবাসীতে 'নূতন কবিতা' নামে মুদ্রিত হয়; উক্ত সংখ্যার ৫৩-৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এই কবিতাগুলির ভাষা ও ছন্দ প্রসঙ্গে 'ছড়ার ছবি' গ্রন্থের ভূমিকাটিও (রবীন্দ্র-রচনাবলী, একবিংশ খণ্ড) স্মরণযোগ্য।

প্রথম কবিতার একটি অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত পাঠ 'শনিবারের চিঠি'তে কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত হয়। কবিতাটির উক্ত পূর্বতন পাঠ এখানে সংকলিত হইল—

ছড়া

সুবলদাদা আনল টেনে আদমদিঘির পাড়ে,
লাল বাঁদরের নাচন সেথায় রামছাগলের ঘাড়ে।
মনিব মিঞা বাঁদরটাকে খাওয়ায় শালিধান্য।
রামছাগলের গম্ভীরতা কেউ করে না মান্য।
দাড়িটা তার নড়ে কেবল, বাজে রে ডুগডুগি—
কাৎলা মারে লেজের ঝাপট, জল ওঠে বুগ্‌বুগি।

রামছাগলের মোটা গলার ভ্যাভ্যা রবের ডাকে
সুড়্‌সুড়ি দেয় থেকে থেকে চৌকিদারের নাকে।
হাঁচির পরে বারে বারে যতই হাঁচি ছাড়ে
বাতাস জুড়ে ঘন ঘন কোদাল যেন পাড়ে।
দত্তবাড়ির ঘাটের কাছে যেমনি হাঁচি পড়া
আঁৎকে উঠে কাঁখের থেকে বৌ ফেলে দেয় ঘড়া।
কাকেরা হয় হতবুদ্ধি, বকের ভাঙে ধ্যান,
এজলাসেতে চমকে ওঠেন হরিমোহন সেন।

হাঁচির ধাক্কা এতখানি, এটা গুজব মিথ্যে—
এই নিয়ে সব কলেজ-পড়া বিজ্ঞানীদের চিত্তে
অল্প কিছু লাগল ধাঁধা। রাগল অপর পক্ষে ;
বললে, 'ফিজিক্‌স্‌ পড়ে কেবল ধুলো লাগায় চক্ষে।
অন্য দেশে অসম্ভব যা পুণ্য ভারতবর্ষে
সম্ভব নয় বলিস যদি প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ সে।'
এই নিয়ে দুই দলে মিলে ইঁট পাটকেল ছোঁড়া—
হায় রে কারও ভাঙল কপাল, কেউ বা হল খোঁড়া।
গোলদিঘি লালদিঘি জুড়ে বীরপুরুষের বড়াই—
সমুদ্দুরের এ পারেতে এরেই বলে লড়াই।
সিন্ধুপারে মৃত্যুদূতের চলছে নাচানাচি,
বাংলাদেশের তেঁতুলবনে চৌকিদারের হাঁচি।
সত্য হোক বা আজগুবি হোক— আদমদিঘির পাড়ে
বাঁদর চড়ে বসে আছে রামছাগলের ঘাড়ে।
ছেলেরা সব হাততালি দেয়, বাজে রে ডুগ্‌ডুগি—
গভীর জলে কাৎলা খেলায়, জল ওঠে বুগ্‌বুগি।

—শনিবারের চিঠি, ১৩৪৮ ভাদ্র, পৃ ৫৯৩

কবির হাতে লেখা, 'ছড়া'র পঞ্চম কবিতার একটি পাণ্ডুলিপিতে উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় কবিতার পূর্বাভাস পাওয়া যায়। নিম্নে উহা সংকলিত হইল—

চলচ্চিত্র

মাথার থেকে ধানী রঙের ওড়নাখানা সরে যায়,
চীনের টবে হাস্নুহানায় গন্ধে বাতাস ভরে যায়।
তিনটে পাঠান মালী আছে নবাবজাদার বাগানে,
দুয়ারে তার ডালকুত্তো চীৎকারে রাত-জাগানে।
ধানশ্রীতে সানাই বাজে কুঞ্জবাবুর ফটকে,
দেউড়িতে ভিড় জমে গেছে নাটক দেখার চটকে।
কোমর-ঘেরা আঁচলখানা, হাতে পানের কৌটা,
ঘোষপাড়াতে হন্‌হনিয়ে চলে নাপিত-বউটা।

গাছে চড়ে রাখাল ছোঁড়া জোগায় কাঁচা সুপুরি,
দুবেলা পান বাঁধা আছে, আরো আছে উপুরি।
সের পঁচিশেক কয়লা ছিল কলুবুড়ির ধামাতে
জলের মধ্যে উলটে গেল ঘাটের ধারে নামাতে।
মাছ এল তাই কাৎলাপাড়া খয়রাহাটি ঝেঁটিয়ে,
মোটা মোটা চিংড়ি ওঠে পাঁকের তলা ঘেঁটিয়ে।
চিনির পানা খেয়ে খুশি, ডিগবাজি খায় কাৎলা—
চাঁদা মাছের চ্যাপটা জঠর রইল না আর পাৎলা।
শেষে দেখি ইলিশ মাছের মিষ্টিতে আর রুচি নাই,
চিতল মাছের মুখটা দেখেই প্রশ্ন তারে পুছি নাই।
ননদকে ভাজ বললে, তুমি মিথ্যে এ মাছ কোট, ভাই,
রাঁধতে গিয়ে দেখি এ যে মিঠাই-গজার ছোটো ভাই।

রোদের তাপে হাওয়া কাঁপে, মাঠের বালি তেতে যায়।
পাকুড়তলার ঘাটে গোরু দিঘিতে জল খেতে যায়।
ডিঙি চলে ধিকি ধিকি, নদীর ধারা ঝিরি—
দুপুর-রোদে আকাশে চিল ডাক দিয়ে যায় চিঁহি।
লখা চলে ছাতা মাথায় গৌরী কনের বর—
ড্যাং ড্যাডাড্যাং বাদ্যি বাজে, চড়কডাঙায় ঘর।

হাঁটুজলে পার হয়ে যায় মরা নদীর সোঁতা,
পাড়ির কাছে পাঁকে ডিঙি আধখানা রয় পোঁতা।
এনামেলের বাসন-ভরা চলেছে এক বাঁকা,
কামার পিটোয় ঝুমঝুমিয়ে গোরুর গাড়ির চাকা।
মাঠের পারে ধক্‌ধকিয়ে চল্‌তি গাড়ির ধোঁওয়া
আকাশ বেয়ে ছেঁটে চলে কালো বাঘের রোঁওয়া।
কাঁসারিটা বাজিয়ে কাঁসা জাগায় গলিটাকে,
কুকুরগুলোর অসহ্য হয়— আর্তনাদে ডাকে।
ভিজে চুলের ঝুঁটি বেঁধে বসে আছেন কন্তে,
মোচার ঘণ্ট বানাতে চান কোন্ মানুষের জন্যে।

গামলা চেটে পরখ করে গাইটা খড়ি-বাঁধা,
উঠোনের এক কোণে জমা কয়লাগুঁড়োর গাদা।
ভালুক নাচের ডুগ্‌ডুগি ওই বাজছে ও পাড়াতে,
কোন্‌-দিশী ওই বেদের মেয়ে নাচায় লাঠি হাতে।
অশথতলায় পাটল গোরু আরামে চোখ বোজে,
ছাগলছানা ঘুরে বেড়ায় কচি ঘাসের খোঁজে।
হঠাৎ কখন বাদুলে মেঘ জুটল দলে দলে,
পশলা কয়েক বৃষ্টি হতেই মাঠ ভাসালো জলে।
মাথায় তুলে কচুর পাতা সাঁওতালি সব মেয়ে
উচ্চহাসির রোল তুলে যায় গাঁয়ের পথে ধেয়ে।
মাথায় চাদর বেঁধে নিয়ে হাট ভেঙে যায় হাটুরে,
ভিজে কাঠের আঁটি বেঁধে চলছে ছুটে কাঠুরে।

বিজুলি যায় সাপ খেলিয়ে লক্‌লকি,
বাঁশের পাতা চমকে ওঠে ঝক্‌ঝকি।
চড়কডাঙায় ঢাক বাজে ওই ড্যাড্যাং ড্যাং।
মাঠে মাঠে মক্‌মকিয়ে ডাকে ব্যাঙ।

২৭।৩।১৯৪০

—সকলিতা, ১৩৫০, পৃ ৮১৯

সপ্তম কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক "২১।১১।৩৯" তারিখে অঙ্কিত ও "সাহিত্যে অবচেতন চিত্তের সৃষ্টি" কবিকৃত এই মন্তব্য-সংবলিত একটি কৌতুকচিত্র-সহ 'অবচেতনার অবদান' নামে ১৩৪৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'শনিবারের চিঠি'তে প্রথম মুদ্রিত হয়। কবিতাটির মুখবন্ধ-স্বরূপ নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি বাক্য উক্ত মাসিক পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল—

অবচেতন মনের কাব্যরচনা অভ্যাস করছি। সচেতন বুদ্ধির পক্ষে বচনের অসংলগ্নতা দুঃসাধ্য। ভাবী যুগের সাহিত্যের প্রতি লক্ষ ক'রে হাত পাকাতে প্রবৃত্ত হলেম। তারই এই নমুনা। কেউ কিছুই বুঝতে যদি না পারেন, তা হলেই আশাজনক হবে।

—শনিবারের চিঠি, ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ, পৃ ২১৫

'ছড়া'র অন্যান্য কয়েকটি কবিতার সাময়িক পত্রে প্রথম প্রকাশের সূচী নিয়ে প্রদত্ত হইল—

গ্রন্থে সংখ্যা	পত্রিকায় শিরোনাম	পত্রিকা	কাল
৩	পরিস্থিতি	প্রবাসী	১৩৪৭ বৈশাখ
৪	মামলা	প্রবাসী	১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ
৫	চলচ্চিত্র	আনন্দবাজার পত্রিকা	১৩৪৭ শারদীয়া
৬	শ্রাদ্ধ	প্রবাসী	১৩৪৬ চৈত্র
৯	রবিবারী সংস্করণ	বঙ্গলক্ষ্মী	১৩৪৭ বৈশাখ

শেষ লেখা

'শেষ লেখা' রবীন্দ্রনাথের পরলোকগমনের অব্যবহিত পরে ১৩৪৮ সালের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত হয়।

এই কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের রচিত সর্বশেষ কবিতাগুলি সংকলিত হইয়াছে। শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর -লিখিত গ্রন্থের বিজ্ঞপ্তিটি নিম্নে মুদ্রিত হইল—

এই গ্রন্থের নামকরণ পিতৃদেব করিয়া যাইতে পারেন নাই।

'শেষ লেখা'র কয়েকটি কবিতা তাঁহার স্বহস্তলিখিত; অনেকগুলি শয্যাশায়ী অবস্থায় মুখে মুখে রচিত, নিকটে যাঁহারা থাকিতেন তাঁহারা সেইগুলি লিখিয়া লইতেন, পরে তিনি সেগুলি সংশোধন করিয়া মুদ্রণের অনুমতি দিতেন।

'সমুখে শান্তি-পারাবার' গানটি 'ডাকঘর' নাটিকার অভিনয়ের জন্ত লিখিত হইয়াছিল। এই অভিনয়ের সংকল্প কার্যে পরিণত হয় নাই; গানটি তাঁহার দেহান্তের পর গীত হয়, পূজনীয় পিতৃদেব এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদনুসারে ইহা তাঁহার পরলোকযাত্রার পর (২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮) সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতন মন্দিরে ও ৩২শে শ্রাবণ শ্রাদ্ধবাসরে শান্তিনিকেতনে গীত হয়।

ভ্রমক্রমে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে 'সমুখে শান্তি-পারাবার' গানটির ষষ্ঠ পংক্তিতে 'জ্যোতি ধ্রুবতারকার' স্থলে 'জ্যোতির ধ্রুবতারকা' পাঠ এবং 'দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে' কবিতাটির চতুর্থ পংক্তিতে 'কষ্টের বিকৃত ভান' স্থলে 'কষ্টের বিকৃত ভাল' পাঠ ছাপা হইয়াছে। প্রথম ভ্রমটি শ্রীনলিনীকান্ত সরকার সর্বপ্রথম অনুমান করেন ও এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

'বিবাহের পঞ্চম বরষে' কবিতাটি শ্রীমতী নন্দিতা দেবীর বিবাহের পঞ্চম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে রচিত।

'তব জন্মদিবসের দানের উৎসবে' কবিতাটি শ্রীমতী নন্দিতা দেবীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে রচিত।

'দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে' কবিতাটি তিনি মুখে মুখে বলিয়াছিলেন এবং পরে সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন।

'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি' কবিতাটিও এইরূপ মুখে মুখে রচিত, কিন্তু এটি সংশোধন করিবার অবসর ও সুযোগ তাঁহার হয় নাই।

—বিজ্ঞপ্তি, শেষ লেখা

'শেষ লেখা'র যে-সকল কবিতা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাদের প্রথম প্রকাশের সূচী নিম্নে প্রদত্ত হইল—

গ্রন্থে সংখ্যা	পত্রিকায় শিরোনাম	পত্রিকার নাম	কাল
১		বিশ্বভারতী নিউজ	১৯৪১ অগস্ট
২	অনন্ত আমি	প্রবাসী	১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ[১]
৪	শূন্য চৌকি	বঙ্গলক্ষ্মী	১৩৪৮ বৈশাখ
৬		প্রবাসী	১৩৪৮ জ্যৈষ্ঠ[২]
৭	জীবন	প্রবাসী	১৩৪৮ জ্যৈষ্ঠ
৮	পঞ্চম বার্ষিকী	প্রবাসী	১৩৪৮ জ্যৈষ্ঠ
৯	ধূলি	প্রবাসী	১৩৪৮ আষাঢ়
১০		প্রবাসী	১৩৪৮ শ্রাবণ[৩]
১১	কঠিনেরে ভালোবাসিলাম	জয়শ্রী	১৩৪৮ আষাঢ়
১৪	রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ কবিতা	আনন্দবাজার পত্রিকা	১৩৪৮ শ্রাবণ ২৪

৪ ও ৫ -সংখ্যক কবিতায় উল্লিখিত "চৌকি" বা "আসনখানি" প্রসঙ্গে শ্রীপ্রতিমা ঠাকুরের 'নির্বাণ' গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ প্রণিধানযোগ্য বিবেচনায় উদ্‌ধৃত হইল—

এই অসুখের সময় যে চৌকিতে তিনি [রবীন্দ্রনাথ] সব সময়ে বসতেন তার একটু ইতিহাস এখানে লিখলে বোধ হয় অবান্তর হবে না। তিনি যখন দক্ষিণ-আমেরিকায় বক্তৃতা দিতে যান[৪] [ইং ১৯২৪ সাল] সেই সময় সেখানকার প্রসিদ্ধ লেখিকা ম্যাডাম ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো[৫]র তিনি অতিথি হন, ইনি বাবামশায়ের একজন অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন।… আমেরিকায় শরীর খারাপ হতে বাবামশায় সত্বরে চলে আসবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।… অনেক হাঙ্গামা ক'রে জাহাজ তো ঠিক হল, ভিক্টোরিয়া Cabin de luxe রিজার্ভ করে দিলেন পাছে বাবামশায়ের সমুদ্রপথে কোনো কষ্ট বা অসুবিধে হয়। তাতেও তিনি সন্তুষ্ট

১ প্রবাসী অনুসারে কবিতাটির বাংলা রচনা তারিখ ২৫ বৈশাখ, ১৩৪৭।

২ 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধের উপসংহার-স্বরূপ মুদ্রিত হইয়াছিল।

৩ কবিতাটি প্রবাসী অনুসারে "শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়, আই. সি. এস্.-কে বাঁকুড়ায় প্রেরিত।"

৪ দ্রষ্টব্য 'যাত্রী'র গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী, উনবিংশ খণ্ড।

৫ কবি ইঁহার বাংলা নামকরণ করিয়াছিলেন, বিজয়া। 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থটি সেই নামে ইঁহাকেই উৎসর্গীকৃত। রবীন্দ্র-রচনাবলীর চতুর্দশ খণ্ড দ্রষ্টব্য।

হতে না পেয়ে তাঁর নিজের ড্রইংরুমের একখানি আরাম-চেয়ার জাহাজে তুলে দিলেন।... সেই চৌকিখানি সেবার নানা দেশ ঘুরে অবশেষে উত্তরায়ণে পৌঁছেছিল। অনেকদিন আর তিনি ওই চৌকি ব্যবহার করেন নি, আমাদের কাছেই পড়ে ছিল। আজ আবার ব্যামোর মধ্যে দেখলুম ঐ চৌকিখানিতে বসা তিনি পছন্দ করছেন, সমস্ত দিনই প্রায় ঘুম বা বিশ্রামান্তে ওই আসনের উপর বসে থাকতেন।

—নির্বাণ, প্রথম সংস্করণ, পৃ ৫৯-৬০

চৌকিখানি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে।

১৫-সংখ্যক কবিতাটি ১৩৪৮ সালের ৩২ শ্রাবণ তারিখে শান্তিনিকেতন আশ্রমে 'আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধবাসর' উপলক্ষ্যে প্রথম মুদ্রিত হয় ও শ্রাদ্ধের 'অনুষ্ঠান পদ্ধতি'র সহিত সর্বসাধারণে বিতরিত হয়। উক্ত মুদ্রিত পত্রীর পাদটীকা অংশ প্রাসঙ্গিকবোধে নিম্নে মুদ্রিত হইল—

বিগত ৩০শে জুলাই, ১৯৪১ (১৪ই শ্রাবণ, ১৩৪৮), বুধবার, প্রাতে সাড়ে নয় ঘটিকার অস্ত্রোপচারের অব্যবহিত পূর্বে গুরুদেব এই কবিতাটি মুখে মুখে রচনা করেন, ইহা পরিমার্জিত করিবার সুযোগ তাঁহার ঘটে নাই। ইহাই তাঁহার শেষ রচনা।

মুক্তির উপায়

'মুক্তির উপায়' নাটকটি 'অলকা' মাসিক পত্রের প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যাতে (১৩৪৫ আশ্বিন) মুদ্রিত হইয়াছিল, গ্রন্থাকারে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে।

গল্পগুচ্ছের 'মুক্তির উপায়' গল্পটি অবলম্বনে নাটকটি রচিত। এই গল্পটি রবীন্দ্র-রচনাবলীর ষোড়শ খণ্ডে মুদ্রিত আছে।

লিপিকা

'লিপিকা' ১৩২৯ [ইং ১৯২২ অগস্ট] সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৩৫২ সালের পৌষ মাসে প্রকাশিত সংস্করণে ১৩২৭ বৈশাখের ভারতী হইতে একটি নূতন রচনা সংকলিত হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে লিপিকার শেষে সংযোজনরূপে উহা মুদ্রিত হইল।

লিপিকার সমুদয় রচনা ১৩২৪-২৯ বঙ্গাব্দের মধ্যে তৎকালীন বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার একটি সূচী নিম্নে দেওয়া হইল—

রচনার নাম	পত্রিকা	কাল
তোতা-কাহিনী	সবুজপত্র	১৩২৪ মাঘ
স্বর্গ-মর্ত	সবুজপত্র	১৩২৫ ফাল্গুন

রচনার নাম	পত্রিকা	কাল
ঘোড়া[১]	সবুজপত্র	১৩২৬ বৈশাখ
প্রথম শোক[২]	সবুজপত্র	১৩২৬ আষাঢ়
কর্তার ভূত	প্রবাসী	১৩২৬ শ্রাবণ
অস্পষ্ট[৩]	সবুজপত্র	১৩২৬ শ্রাবণ
বাণী[৪]	সবুজপত্র	১৩২৬ ভাদ্র
পায়ে চলার পথ	প্রবাসী	১৩২৬ আশ্বিন
প্রশ্ন	ভারতী	১৩২৬ আশ্বিন
মেঘলা দিনে[৫]	ভারতী	১৩২৬ আশ্বিন
পুরোনো বাড়ি	মানসী ও মর্মবাণী	১৩২৬ আশ্বিন
আগমনী	আগমনী	১৩২৬ মহালয়া
মেঘদূত	প্রবাসী	১৩২৬ কার্তিক
বাঁশি	সবুজপত্র	১৩২৬ কার্তিক
কৃতঘ্ন শোক	ভারতী	১৩২৬ কার্তিক
সতেরো বছর	ভারতী	১৩২৬ কার্তিক
সন্ধ্যা ও প্রভাত	মানসী ও মর্মবাণী	১৩২৬ কার্তিক
একটি চাউনি	প্রবাসী	১৩২৬ অগ্রহায়ণ
একটি দিন	প্রবাসী	১৩২৬ অগ্রহায়ণ
গলি[৬]	সবুজপত্র	১৩২৬ অগ্রহায়ণ
সওগাত	শান্তিনিকেতন	১৩২৬ পৌষ
মুক্তি	শান্তিনিকেতন	১৩২৬ পৌষ
প্রাণমন[৭]	সবুজপত্র	১৩২৬ ফাল্গুন
গল্প[৮]	প্রবাসী	১৩২৭ বৈশাখ
রথযাত্রা	আদুর	১৩২৭ বৈশাখ
কণিকা	ভারতী	১৩২৭ বৈশাখ
সুয়োরানীর সাধ	পার্বণী	১৩২৭ আশ্বিন
নতুন পুতুল	প্রবাসী	১৩২৮ ভাদ্র
নামের খেলা	মোসলেম ভারত	১৩২৮ ভাদ্র
পট	সবুজপত্র	১৩২৮ ভাদ্র
রাজপুত্তুর	ভারতী	১৩২৮ আশ্বিন

রচনার নাম	পত্রিকা	কাল
স্থূল স্বর্গ	প্রবাসী	১৩২৮ কার্তিক
মীমু	ভারতী	১৩২৮ কার্তিক
সিদ্ধি	সবুজপত্র	১৩২৮ মাঘ-ফাল্গুন
বিদূষক	ভারতী	১৩২৯ বৈশাখ
উপসংহার	ভারতী	১৩২৯ বৈশাখ
পরীর পরিচয়	বঙ্গবাণী	১৩২৯ বৈশাখ
প্রথম চিঠি	শান্তিনিকেতন	১৩২৯ বৈশাখ
পুনরাবৃত্তি	প্রবাসী	১৩২৯ জ্যৈষ্ঠ

অঙ্ক-চিহ্নিত রচনাগুলির পত্রিকায়-মুদ্রিত শিরোনাম: ১ মুক্তির ইতিহাস ২ কথিকা ৩ কথিকা ৪ কথিকা ৫ অকস্মাৎ ৬ কথিকা ৭ আমার কথা ৮ গল্প বল।

রবীন্দ্রনাথের অন্য বহু রচনায় যেমন এ ক্ষেত্রেও তেমনি সাময়িকের ও পুস্তকের পাঠে বহু স্থলে মিল নাই। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, 'মেঘলা দিনে' ও 'প্রাণমন' লিপিকায় পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে; পক্ষান্তরে 'মুক্তি' কথিকাটির লিপিকায় গৃহীত পাঠ পূর্ববর্তী পাঠ হইতে সংস্কৃত ও সংক্ষিপ্ত।

রবীন্দ্রনাথ পুনশ্চ কাব্যের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, 'লিপিকা'য় প্রথম তিনি বাংলা গদ্যকবিতা লিখিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু "ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয় নি— বোধকরি ভীরুতাই তার কারণ।" লিপিকার প্রথম ভাগের অধিকাংশ রচনাই উক্ত বক্তব্যের লক্ষ্য বলিয়া মনে হয়। লিপিকার প্রথম মুদ্রণকালে ঐরূপ রচনায় বাক্যের মাঝে মাঝে ছন্দের বিরামস্থলগুলিতে বেশি ফাঁক দেখানো হইয়াছিল। গ্রন্থে সংকলনের পূর্বে, লিপিকার একটি রচনার বাক্যাবলীকে আবৃত্তির ছন্দ-অনুযায়ী ভাঙিয়া সাজানোর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ভারতীতে। এই স্থলে উহা যথাযথ উদ্ধৃত করা গেল—

প্রশ্ন

শ্মশান হতে বাপ ফিরে এল।

তখন সাত বছরের ছেলেটি— গা খোলা, গলায় সোনার তাবিজ,— একলা গলির উপরকার জান্‌লার ধারে,

কি ভাবচে তা সে আপনি জানেনা।

সকালের রৌদ্র সামনের বাড়ির নীম গাছটির আগডালে দেখা দিয়েছে;

কাঁচা-আমওয়ালা গলির মধ্যে এসে হাঁক দিয়ে দিয়ে ফিরে গেল।
বাবা এসে খোকাকে কোলে নিলে ; খোকা জিজ্ঞাসা করলে "মা কোথায় ?"
বাবা উপরের দিকে মাথা তুলে বল্লে, "স্বর্গে।"

সে রাত্রে শোকে শ্রান্ত বাপ,
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ক্ষণে ক্ষণে গুমরে উঠ্‌ছে।
দুয়ারে লণ্ঠনের মিট্‌মিটে আলো, দেয়ালের গায়ে একজোড় টিক্‌টিকি।
সাম্‌নে খোলা ছাদ, কখন্‌ খোকা সেইখানে এসে দাঁড়াল।
চারদিকে আলো-নেবানো বাড়িগুলো যেন দৈত্যপুরীর পাহারাওয়ালা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমচ্চে।
উলঙ্গগায়ে খোকা আকাশের দিকে তাকিয়ে।
তার দিশাহারা মন কাকে জিজ্ঞাসা করচে, "কোথায় স্বর্গের রাস্তা ?"
আকাশে তার কোনো সাড়া নেই ;
কেবল তারায় তারায় বোবা অন্ধকারের চোখের জল।

—ভারতী, ১৩২৬ আশ্বিন

লিপিকার প্রথমাংশের কয়েকটি রচনার পূর্বতন রূপ পাওয়া যায় ১২৯২ বৈশাখের ভারতীতে প্রকাশিত 'পুষ্পাঞ্জলি'-নামক রবীন্দ্রনাথের একটি পুরাতন রচনায়। উক্ত রচনাটি সপ্তদশ খণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলীতে গ্রন্থপরিচয়ের 'জীবনস্মৃতি' অংশে (পৃ ৪৮৫-৯৫) আদ্যোপান্ত মুদ্রিত হইয়াছে।

সে

'সে' ১৩৪৪ সালের বৈশাখ মাসে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিকে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং চিত্রিত করিয়াছিলেন। বর্তমান সংস্করণে উক্ত চিত্রের অনেকগুলিই পুনর্মুদ্রিত হইল।

নবপর্যায় 'সন্দেশ' পত্রিকায় ১৩৩৮ সালের আশ্বিনে কার্তিকে এবং অগ্রহায়ণে এই গ্রন্থের প্রথম দ্বিতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ের কোনো কোনো অংশের পূর্বতন পাঠ প্রকাশিত হয়। রংমশাল পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (১৩৪৩ কার্তিক, পৃ ১-৬) যাহা মুদ্রিত হয় প্রায় তাহাই 'সে' গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে সংকলিত হইয়াছে ; ভূমিকাংশটি (রংমশালের পাঠ) 'সে' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে ঈষৎ রূপান্তরিত ভাবে

গ্রথিত আছে। ২২৮-২৯ পৃষ্ঠার 'এক ছিল মোটা কেঁদো বাঘ' কবিতাটি ১৩৪১ বৈশাখের 'মুকুল' পত্রিকায় (নবপর্যায়, পৃ ১-২) 'বাঘের শুচিতা' নামে প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল।

গল্পসল্প

'গল্পসল্প' ১৩৪৮ সালের বৈশাখ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার নামপত্রখানি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অঙ্কিত।

দু-একটিমাত্র বাদে গল্পসল্পের সমস্ত রচনা রবীন্দ্রজীবনের শেষ বৎসরের ফসল। ইহার প্রবেশক কবিতাটি ('আমারে পড়েছে আজ ডাক') ১৩৪৭ বৈশাখের 'ভাইবোন' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়; উহাতে গ্রন্থে-সংকলিত পাঠের অতিরিক্ত এই দুইটি ছত্র সর্বশেষে ছিল—

যদি বল 'কথাগুলো যেন dry bones'
রাগব না, ছুটি নিয়ে যাও ভাইবোনs।

গল্প ও কবিতাগুলির রচনাকাল নিম্নে সংকলিত হইল—

বিজ্ঞানী	৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১
পাঁচটা না বাজতেই	১ মার্চ ১৯৪১
রাজার বাড়ি	৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১
খেলনা খোকার হারিয়ে গেছে	২ মার্চ ১৯৪১
বড়ো খবর	১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১
পালের সঙ্গে দাঁড়ের বুঝি	জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪
চণ্ডী	১০ মার্চ ১৯৪১
যেমন পাজি তেমনি বোকা	১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০
রাজরানী	১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১
আসিল দিয়াড়ি হাতে	৩ মার্চ ১৯৪১
মুনশি	১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১
ভীষণ লড়াই তার	৮ মার্চ ১৯৪১
ম্যাজিশিয়ান	১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১
যেটা যা হয়েই থাকে	১১ মার্চ ১৯৪১
পরী	২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

যেটা তোমায় লুকিয়ে জানা	১১ মার্চ ১৯৪১
আরও-সত্য	২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১
আমি যখন ছোটো ছিলুম	২ মার্চ ১৯৪১
ম্যানেজার বাবু	২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১
তুমি ভাবো এই-যে বোঁটা	৩ ডিসেম্বর ১৯৪০
বাচস্পতি	২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১
যার যত নাম আছে	৯ মার্চ ১৯৪১
পান্নালাল	২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১
মাটি থেকে গড়া হয়	১১ মার্চ ১৯৪১
চন্দনী	২ মার্চ ১৯৪১
দিনখাটুনির শেষে	১০ মার্চ ১৯৪১
ধ্বংস	৬ মার্চ ১৯৪১
মানুষ সবার বড়ো	৫ মার্চ ১৯৪১
ভালোমানুষ	৭ মার্চ ১৯৪১
মণিরাম সত্যই স্থায়না	২৩ জানুয়ারি ১৯৪১
মুক্তকুন্তলা	২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১
'দাদা হব' ছিল বিষম শখ	১২ মার্চ ১৯৪১

বাংলাভাষা-পরিচয়

'বাংলাভাষা-পরিচয়' ইংরেজি ১৯৩৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় -কর্তৃক প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থপ্রকাশের পূর্বে ইহার 'ভূমিকা'টি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় (১৩৪৫) মুদ্রিত হয়। পত্রিকায়-মুদ্রিত 'ভূমিকা'র কিয়দংশ (ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ) গ্রন্থপ্রকাশকালে উহার উপসংহাররূপে সংকলিত হইয়াছে। উক্ত উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ নিজের যে পত্রাংশ উদ্‌ধৃত করিয়াছেন তাহা শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্যকে লিখিত হইয়াছিল।

পথের সঞ্চয়

'পথের সঞ্চয়' ১৩৪৬ সালের ভাদ্র মাসে প্রথম মুদ্রিত হয়। ১৩৫৪ সালের বৈশাখে উক্ত গ্রন্থের যে পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ বাহির হয় রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে তাহাই মুদ্রিত

হইল। ১৯১২ সালে বিদেশযাত্রার প্রারম্ভে ও পথে এবং ইংলণ্ড্ ও আমেরিকায় পরিভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ যে-সকল প্রবন্ধ রচনা করেন ইহা তাহারই সমষ্টি।

এই গ্রন্থের প্রথম মুদ্রণে, প্রবাসকালে লিখিত প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র হইতে কয়েকটি নির্বাচিত রচনা "পরিবর্তিত আকারে" প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্তমান সংস্করণে নূতন প্রবন্ধ যোগ করা হইয়াছে বলিয়া, সমস্ত রচনাই মূলপাঠ অনুসারে মুদ্রিত হইল। যে-কয়টি চিঠি প্রথম সংস্করণের পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়াছিল সেগুলি বর্তমান সংস্করণ হইতে বর্জিত হইয়াছে; রবীন্দ্রনাথের 'চিঠিপত্র' গ্রন্থমালায় যথাস্থানে প্রকাশিত হইবে। এই-জাতীয় অন্যান্য বহু বিলাতের চিঠি ইতিপূর্বেই 'চিঠিপত্র' চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ১৯১২ সালে কবির প্রবাসচিন্তার সমষ্টিরূপে পরিকল্পিত 'পথের সঞ্চয়'এর এই দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে, ১৯২০ সালে লিখিত 'বিলাত-যাত্রীর পত্র'[১] বর্জিত হইয়াছে; ইহাও 'চিঠিপত্র' গ্রন্থমালায় মুদ্রিত হইবে।

বর্তমান সংস্করণে মুদ্রিত প্রবন্ধগুলি সমস্তই বাংলা ১৩১৯ সালে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে মুদ্রিত। নিম্নে প্রকাশসূচী দেওয়া গেল—

রচনা	পত্রিকা	কাল
যাত্রার পূর্বপত্র	তত্ত্ববোধিনী	আষাঢ়
বোম্বাই শহর	তত্ত্ববোধিনী	আষাঢ়
জলস্থল	প্রবাসী	শ্রাবণ
সমুদ্রপাড়ি	তত্ত্ববোধিনী	শ্রাবণ
যাত্রা	তত্ত্ববোধিনী	শ্রাবণ
আনন্দরূপ	তত্ত্ববোধিনী	শ্রাবণ
দুই ইচ্ছা	প্রবাসী	শ্রাবণ
অন্তর বাহির	ভারতী	শ্রাবণ
খেলা ও কাজ	তত্ত্ববোধিনী	ভাদ্র
লণ্ডনে	প্রবাসী	ভাদ্র
বন্ধু	ভারতী	কার্তিক
কবি য়েট্‌স্	প্রবাসী	কার্তিক
স্টপ্‌ফোর্ড্ ব্রুক[২]	প্রবাসী	কার্তিক

১ প্রথমসংস্করণ পথের সঞ্চয়ে 'বিচিত্র' নামে মুদ্রিত

২ 'বিলাতের চিঠি' এই নামে প্রবাসীতে মুদ্রিত।

রচনা	পত্রিকা	কাল
ইংলণ্ডের ভাবুকসমাজ	তত্ত্ববোধিনী	কার্তিক
ইংলণ্ডের পল্লীগ্রাম ও পাদ্রি	তত্ত্ববোধিনী	পৌষ
সংগীত	ভারতী	অগ্রহায়ণ
সমাজভেদ	তত্ত্ববোধিনী	আশ্বিন
সীমার সার্থকতা	তত্ত্ববোধিনী	আশ্বিন
সীমা ও অসীমতা	তত্ত্ববোধিনী	কার্তিক
শিক্ষাবিধি	প্রবাসী	আশ্বিন
লক্ষ্য ও শিক্ষা	তত্ত্ববোধিনী	অগ্রহায়ণ
আমেরিকার চিঠি	তত্ত্ববোধিনী	ফাল্গুন

ছেলেবেলা

'ছেলেবেলা' ১৩৪৭ সালের ভাদ্র মাসে গ্রন্থাকারে প্রথম মুদ্রিত হয়।

ইংরেজি ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে মংপু-বাসের সময়ে রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলার জীবনীচিত্র গদ্যছন্দে প্রথম লিখিতে শুরু করেন বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্রসদনে-রক্ষিত পাণ্ডুলিপিতে দুইটি কবিতা পাওয়া গিয়াছে; নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল—

পালকি

প্রপিতামহী-আমলের সেই পালকিখানা
নবাবি-যুগের অভিমান মেলে আছে
আয়ত তার আসনে,
ষোলো বেহারার কাঁধের মাপের ভাণ্ডায়।
এ দিকে, এ কালের বরখাস্ত-করা
নাম্-কাটা অপমানের নানা দাগ
তার সকল গায়ে।
সে প'ড়ে থাকত দালানের বারান্দার এক ধার ঘেঁষে
ঠেলামারা ব্যস্ত কালকে পথ ছেড়ে দিয়ে।
আমার ভলিয়ে-যাওয়া ডুবসাঁতার ছিল ওরই গভীরে
ছুটির দিনে, দরজা বন্ধ ক'রে।

খুঁজে বের করার অতীত ছিলেম আমি
এতেই ছিল আমার খুশি,
এক মুহূর্তে পেরিয়ে যেতুম
সতর্ক সংসারের সকল নজরবন্দির বাইরে।

বাইরে বাড়িভরা লোক,
সামনের আঙিনায় চলছেই আনাগোনা।
যখন আটটা-ন'টা বেলা
এই আঙিনায় ভিখিরি জমেছে মুষ্টিভিক্ষার চালের জন্যে,
প্যারীবুড়ি ধামা কাঁখে হাত দুলিয়ে আনছে তরিতরকারি,
বাঁক কাঁধে নিয়ে চলেছে দুখন বেহারা
গঙ্গার জল ঘড়ায় ভ'রে—
অন্দরমহলে তাঁতিনি যাচ্ছে
নতুন-ফ্যাশান শাড়ির সওদা করতে,
স্যাকরা আসছে পাওনার দাবি জানাতে
খাতাঞ্চিখানায়,
পুরনো লেপের তুলো ধুনতে
এসেছে ধুনুরি—
দেউড়িতে মাঝে মাঝে বাজছে ঘণ্টা।

আমি একলা,
এইটুকু সীমানার অসীমে আমি একেশ্বর।
মনে মনে চলেছে সেই পালকি—
বাহক নেই, পথ নেই
দিনরাতের চিহ্ন-হীন অবকাশে।
বালকের ইচ্ছাভ্রমণের বাহন ঐ পালকি,
ও তার গল্পের জগতের অচল গতির পক্ষিরাজ।

আগের সন্ধেবেলায়
ঝিঁঝিঁ ডাকছিল বাইরের ঝোপে,

রোঘো ডাকাতের গল্প জমেছিল
ছায়া-কাঁপা ঘরে মিট্‌মিটে আলোতে—
দেয়ালে টিক টিক করে চলছিল ঘড়ি।
ছুটির দিনের জাদু লাগল।
বিনা চলায় চলল আমার পালকি
অদৃশ্ত ঠিকানায় ভয়ের খোঁজে।
নিঃশব্দের শিরায় শিরায় তাল দিতে লাগল
বেহারাগুলোর হাঁইহুঁই হাঁইহুঁই।

ধূ ধূ করে মাঠ,
বাতাস কাঁপে রোদ্‌দুরে,
আকাশের রসহীন জিভ যেন তৃষ্ণায় করছে হাঁ হাঁ।
দূরে ঝিক ঝিক করে কালীদিঘির জল
চিক চিক করে বালি—
ডাঙার উপর থেকে হেলে পড়েছে ফাটল-ধরা ঘাটের দিকে
প্রকাণ্ড পাকুড় গাছ।

ঐ অখ্যাত ভূবৃত্তান্তে
জমা হয়ে আছে ঝাঁকড়া চুল নিয়ে গল্পের আতঙ্ক
গাছের তলায়, ঝোপের মধ্যে।
এগোচ্ছি কাছে, দুর দুর করছে বুক,
ভয় পাচ্ছি পুলকিত মনে।
বাঁশের লাঠির পিতল-বাঁধানো আগাগুলো
দেখা যাচ্ছে দুটো-একটা ঝোপের উপর দিকে।
কাঁধ বদল করবে বেহারাগুলো ঐখেনে,
জল খাবে—
তার পরে?
রেরেরেরে রেরেরেরে!

দেউড়িতে ঘণ্টা বাজল— এক দুই তিন,
একালের সময় এসে পড়ল

পালকির পাঁজি ভিজিয়ে,
চিৎপুর রোডে পাহারাওয়ালা
দাঁড়িয়ে আছে গরুটাকে দাঁড়িয়ে দিয়ে।[১]

মংপু
২৪ এপ্রিল ১৯৪০

বাল্যদশা

ভদ্র ঘরের ছেলে,
ছাঁচে-ঢালা পালিশ-করা সংসার।
অসমান নেই কোথাও কিছু,
হঠাৎ চমক লাগে না কোনোখানে।
দিনগুলো চলে লম্বা সারে পোষা পশুর মতো
একটার পিছনে আর-একটা দড়ি দিয়ে বাঁধা।

মল্লিকদের বাড়ি ঘণ্টা বাজে।
নিয়মনিষ্ঠ মাস্টার আসে ঠিক সময়ে
সাতটা বাজতেই।
নিয়মভীতু আমি পড়ি ফার্স্ট্‌ বুক রীডার—
কালো মলাটটা চিলে,
পাতাগুলো অনিচ্ছুক হাতের অবহেলায় দাগ-পড়া।
নিজের বুদ্ধি নিয়ে রোজই শুনি একই বিচার,
মন্তব্যটা স্মরণীয় হয় চড়ে চাপড়ে।
পাশের বারান্দায় বুড়ো দর্জি, চোখে চশমা,
ঝুঁকে প'ড়ে কাপড় সেলাই করছে একমনে—
দেখি তাকে আর ভাবি, সুখে আছে নেয়ামত।
দেউড়ির সামনে চন্দ্রভান লম্বা দাড়ি
কাঠের কাঁকুই দিয়ে আঁচড়ে তুলছে
দুই কানে দুই ভাগে,
কাছে বসে আছে কাঁকন-পরা ছোকরা দরোয়ান

১ ছেলেবেলার ২ পরিচ্ছেদের আরম্ভাংশ ও ৩ পরিচ্ছেদের শেষাংশের সহিত কবিতাটি তুলনীয়।

কুটছে দোক্তা।
উঠোনে ঘোড়া ছুটো সকালেই খেয়ে গেছে
বালতিতে বরাদ্দর দানা।
কাকগুলো ঠোকরাচ্ছে ছিটিয়ে-পড়া ছোলা,
জনি কুকুরটা খামকা অনাবশ্যক কর্তব্যবুদ্ধিতে
সশব্দে দিচ্ছে এসে তাড়া।

সূর্য উপরে উঠে যায়, অর্ধেক আঙিনায় পড়ে বাঁকা ছায়া,
ন'টা বাজে।
বেঁটে কালো গোবিন্দ, কাঁধে হলদে রঙের গামছা,
নিয়ে যায় স্নান করাতে।
সাড়ে ন'টা বাজতেই দৈনিক অন্নের পুনরাবৃত্তি—
খেতে হয় না রুচি।
নির্মম ঘণ্টা বাজে দশটায়।
মন-উদাস-করা হাঁক শোনা যায় দূরে
কাঁচা আম -ওয়ালার।
বাসনওয়ালা ঠং ঠং আওয়াজ দিয়ে চলেছে গলি বেয়ে
দূরের থেকে দূরে।
বড়োবউদিদি পাশের বাড়িতে
ভিজে চুল এলিয়ে দিয়েছে পিঠে,
পশমের গলাবন্ধ বুনছে মাথা নিচু করে।
ছাতের উপর কুসুম আর মণি
কড়ি নিয়ে খেলেই যাচ্ছে,
কোনো তাড়া নেই।
বুড়ো ঘোড়া আমাকে টেনে নিয়ে যায় পালকিগাড়িতে
আমার দৈনিক নির্বাসনে।
সমস্ত পথে দুর্ভাবনার অটল সহচর
মাস্টারমশায়ের
রক্ত-সম্মাসীন ক্ষমাহীন মূর্তি।

ফিরে আসি ইস্কুল থেকে।
বিরস দিনের মরচে-পড়া আলো মিলিয়ে আসে
ইটকাঠের জটিল জঙ্গলে।
বিশ্রামহীন শহরের পাঁচমিশেলি ঝাপসা শব্দ
স্বপ্নের সুর লাগায়
তন্দ্রাজড়িম প্রকাণ্ড বাস্তুকলেবরে।
পড়বার ঘরে জ্বলে ওঠে তেলের বাতি,
অনবচ্ছিন্ন শাসনবিধির তর্জনী-শিখা—
পরদিনের পড়া চাই।
কঠিন গাঁঠ বেঁধে দেয় সন্ধ্যা
এ দিনের বেরঙা অভ্যাসের সঙ্গে ও দিনের।
পড়তে পড়তে ঢুলি, ঢুলতে ঢুলতে চমকে উঠি।
বিছানায় ঢোকার আগে একটুখানি থাকে পোড়ো অবকাশ,
সেখানে শুনতে শুনতে শোনা শেষ হয় না—
রাজপুত্র চলেছে তেপান্তর পার হতে।

একদিন বাজল সানাই বারোঁয়া সুরে।
শুকনো ডাঙায় প্লাবন নেমে
ঢেকে দিল তার ক্যাকাসে চেহারা।
বাড়িতে এলো নতুন বউ,
কচি বয়সের লাবণ্যে ঢলঢল।
কাঁচা-শামলা রঙের হাতে সরু সোনার চুড়ি।
মলিন দিনশ্রেণীর কালো-ছাপ-লাগা পাঁচিল
ফুঁকাক হয়ে গেল জাদুমন্ত্রে,
দেখা দিল অপূর্ব দেশের অপরূপ রাজকন্যা।
ছম ছম করতে লাগল সন্ধ্যা,
কাঁপতে লাগল অদ্ভুত আলোয়।
ঘুরে বেড়াই, সাহস হয় না কাছে আসতে।
ও দিকে থাকে অভাবনীয়, এ দিকে থাকে উপেক্ষিত।

রাত হয়ে আসে।
স্বরূপসর্দার হাঁক দিয়ে যায়।
ছেঁড়া শেলাই-করা দড়িতে-ঝোলানো মশারি,
তার ভিতরের আকাশ ভরে ওঠে
গোধূলিলগ্নের সিঁদুরি রঙে,
চেলির রাঙা অন্ধকারে।[২]

মংপু
২৮।৪।৪০

শেষের কবিতাটি শ্রীমৈত্রেয়ী দেবীর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে (প্রথম সংস্করণ, পৃ ২৪১-৪৪) উদ্‌ধৃত হইয়াছে। "মল্লিকদের বাড়ি ঘণ্টা বাজে" পংক্তিটির পরে সেখানে তিনটি অতিরিক্ত পংক্তি পাওয়া যায়—

অন্দর মহল থেকে দুধ আসে এক বাটি,
আমার তখন দুধ-বিতৃষ্ণার বয়েস—
খেতেই হয় যে ক'রেই হোক।

"একদিন বাজল সানাই বারোয়াঁ সুরে" হইতে শেষ পঙ্‌ক্তিকয়টিকে রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে পাণ্ডুলিপির এক স্থলে 'বধূ' নামে স্বতন্ত্র কবিতা বলিয়াও নির্দেশ দিয়াছিলেন।

আলোচ্য গ্রন্থটির প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-রচনাবলীর সপ্তদশ খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থপরিচয়ের 'জীবনস্মৃতি' অংশ প্রণিধানযোগ্য। এই গ্রন্থে উল্লিখিত অনেক তথ্যের পূর্ণতর পরিচয় সেখানে পাওয়া যাইবে।

ছেলেবেলার 'ভূমিকা'য় উল্লিখিত "গোঁসাইজি" শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ে সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী।

সভ্যতার সংকট

'সভ্যতার সংকট' ১৩৪৮ সালের পয়লা বৈশাখ তারিখে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে পুস্তিকা-আকারে বিতরণ করা হইয়াছিল। এই অশীতিবর্ষপূর্তি-উৎসবই রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় সর্বশেষ জন্মোৎসব। নববর্ষের সায়াহ্নলগ্নে, উত্তরায়ণ-

২ ছেলেবেলার ৭ পরিচ্ছেদের শেষাংশের সহিত কবিতাটি তুলনীয়।

প্রাঙ্গণে সমবেত আশ্রমবাসী ও অতিথি-অভ্যাগতের সমক্ষে পঠিত এই অভিভাষণই কবিজীবনের সর্বশেষ অভিভাষণ। কবির উপস্থিতিতে শ্রীক্ষিতিমোহন সেন সেদিন ইহা পাঠ করিয়াছিলেন; তৎপূর্বে মুখবন্ধস্বরূপে আশ্রমবাসীদের সম্বোধন করিয়া কবি যাহা বলেন, 'নির্বাণ' গ্রন্থে তাহা মুদ্রিত আছে।[১] উপসংহারে 'ঐ মহামানব আসে' গানটি সভায় গীত হইয়াছিল।

১ শ্রীপ্রতিমা ঠাকুর-প্রণীত নির্বাণ, প্রথম সংস্করণ, পৃ ৫৪-৫৫

সংশোধন। পৃ ২৫, শেষ ছত্রে '১৯৪০' স্থলে: ১৯৩৯

বর্ণানুক্রমিক সূচী

অন্তর বাহির	...	৫০২
অলস মনের আকাশেতে	...	৩
অস্পষ্ট	...	১৩৫
আগমনী	...	১৬৮
আজ হল রবিবার, খুব মোটা বহরের	...	৩০
আনন্দরূপ	...	৪৯৫
আমার এ জন্মদিন-মাঝে আমি হারা	...	৪৭
আমারে পড়েছে আজ ডাক	...	৩০১
আমি যখন ছোটো ছিলুম, ছিলুম তখন ছোটো		৩৩৭
আমেরিকার চিঠি	...	৫৮০
আরও-সত্য	...	৩৩৫
আরো একবার যদি পারি	...	৪২
আলো যার মিটমিটে	...	৩১৯
আসিল দিয়াড়ি হাতে রাজার ঝিয়ারি	...	৩২৪
ইংলণ্ডের পল্লীগ্রাম ও পাদ্রি	...	৫৩৯
ইংলণ্ডের ভাবুকসমাজ	...	৫৩৩
উপসংহার	...	১৪২
এক ছিল মোটা কেঁদো বাঘ	...	২২৮
একটি চাউনি	...	১০৩
একটি দিন	...	১০৪
ঐ মহামানব আসে	...	৪৩, ৬৪১
ওরে পাখি, থেকে থেকে ভুলিস কেন সুর	...	৪০
কণিকা	...	১৭৯
কদমাগঞ্জ উজাড় ক'রে	...	৬
কবি য়েট্স্	...	৫২১
কর্তার ভূত	...	১২৯
কৃতজ্ঞ শোক	...	১০৫
খেলনা খোকার হারিয়ে গেছে, মুখটা শুকোনো		৩১৩
খেলা ও কাজ	...	৫০৭

খেঁদুবাবুর এঁধো পুকুর, মাছ উঠেছে ভেসে	...	২০
গলদাচিংড়ি তিংড়িমিংড়ি	...	২৪
গলি	...	১০২
গল্প	...	১০৯
গুরুপদে মন করো অর্পণ	...	৬৯
গেছো বাবা	...	২০০
ঘোড়া	...	১২৬
চণ্ডী	...	৩১৭
চন্দনী	...	৩৪৮
চলচ্চিত্র	...	৬৪৪
ছড়া	...	৬৪৩
ছেঁড়া মেঘের আলো পড়ে	...	১৬
জলস্থল	...	৪৭৯
জীবন পবিত্র জানি	...	৪৩
ঝিনেদার জমিদার কালাচাঁদ রায়রা	...	১০
তব জন্মদিবসের দানের উৎসবে	...	৪৯
তুমি ভাব এই-যে বোঁটা	...	৩৪১
তোতাকাহিনী	...	১৩২
তোমার সৃষ্টিতে কভু শক্তিরে কর না অপমান		২৩০
তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি	...	৫০
'দাদা হব' ছিল বিষম শখ	...	৩৬১
দিন-খাটুনির শেষে	...	৩৫২
দুই ইচ্ছা	...	৪৯৭
দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে	...	৫০
ধ্বংস	...	৬৫৩
নতুন পুতুল	...	১৩৯
নামের খেলা	...	১১৩
পট	...	১৩৭
পথিক হে, পথিক হে	...	১৭৭
পত্নী	...	৩৩৩

পরীর পরিচয় ... ১৫৭
পান্নালাল ... ৩৪৫
পালকি ... ৬৫৬
পালের সঙ্গে দাঁড়ের বুঝি গোপন রেষারেষি ... ৩১৬
পায়ে চলার পথ ... ৯৩
পায়ে পড়ি শোনো ভাই গাইয়ে ... ২৭৫
পুনরাবৃত্তি ... ১৪৪
পুরোনো বাড়ি ... ১০১
পাঁচটা না বাজতেই ভুলুরাম শর্মা সে ... ৩১০
প্রথম চিঠি ... ১৫২
প্রথম দিনের সূর্য ... ৪৯
প্রথম শোক ... ১০৬
প্রপিতামহী-আমলের সেই পালকিখানা ... ৬৫৬
প্রশ্ন ... ১০৭, ৬৫১
প্রাণ ভরিয়ে, তৃষা হরিয়ে ... ৪৯৬
প্রাণমন ... ১৬২
বড়ো খবর ... ৩১৪
বন্ধু ... ৫১৬
বয়স তখন ছিল কাঁচা, হালকা দেহখানা ... ৫৮৭
বাচস্পতি ... ৩৪২
বাণী ... ৯৫
বাণীর মুরতি গড়ি ... ৪৬
বালক ... ৫৮৭
বাল্যদশা ... ৬৫৯
বাসাখানি গায়ে-লাগা আর্মানি গির্জার ... ১৪
বাঁশি ... ৯৯
বিজ্ঞানী ... ৩০৫
বিদূষক ... ১২৪
বিবাহের পঞ্চম বরষে ... ৪৫
বোম্বাই শহর ... ৪৭৫

ভদ্র ঘরের ছেলে	...	৬৫৯
ভালোমানুষ	...	৩৫৬
ভীষণ লড়াই তার উঠোন-কোণের	...	৩২৮
ভুল স্বর্গ	...	১১৬
মণিরাম সত্যই স্বাম্না	...	৩৫৮
মাঝরাতে ঘুম এল, লার্ড কেটে দিতে	...	৩৬
মাটি থেকে গড়া হয়, পুন হয় মাটি	...	৩৪৮
মাটির প্রদীপখানি আছে	...	১৭২
মাথার থেকে ধানী রঙের	...	৬৪৪
মানুষ সবার বড়ো জগতের ঘটনা	...	৩৫৪
মার্ মার্ মার্ রবে মার্ গাঁট্টা	...	২৭৫
মীনু	...	১১১
মুক্তকুন্তলা	...	৩৫৯
মুক্তি	...	১৫৫
মুনশি	...	৩২৫
মেঘদূত	...	৯৭
মেঘলা দিনে	...	৯৪
মেঘের ফুরোল কাজ এইবার	...	১৮৩
ম্যাজিশিয়ান	...	৩২৯
ম্যানেজারবাবু	...	৩৩৮
যাত্রা	...	৪৯০
যাত্রার পূর্বপত্র	...	৪৫৯
যার যত নাম আছে সব গড়া-পেটা	...	৩৪৪
যেটা তোমায় লুকিয়ে-জানা সেটাই আমার পেয়ার		৩৩৪
যেটা যা হয়েই থাকে সেটা তো হবেই	...	৩৩২
যেমন পাজি তেমনি বোকা	...	৩২০
রথযাত্রা	...	১৫৩
রাজপুত্তুর	...	১১৯
রাজরানী	...	৩২১
রাজার বাড়ি	...	৩১১

রাত্রিরে কেন হল মর্জি ... ২৬
রাহুর মতন মৃত্যু ... ৩৯
রিপোর্ট্ ... ১৭৪
রূপনারানের কূলে ... ৪৮
রৌদ্রতাপ ঝাঁঝাঁ করে ... ৪১
লক্ষ্য ও শিক্ষা ... ৫৭১
লণ্ডনে ... ৫১৩
শিক্ষাবিধি ... ৫৬৭
শেষ পারানির খেয়ায় তুমি ... ২৯৯
শোন্ রে শোন্ অবোধ মন ... ৮৪
সওগাত ... ১৫৪
সংগীত ... ৫৪৭
সতেরো বছর ... ১০৫
সন্ধ্যা ও প্রভাত ... ১০০
সমাজভেদ ... ৫৫৪
সমুখে শান্তিপারাবার ... ৩৯
সমুদ্রপাড়ি ... ৪৮৩
সিউড়িতে হরেরাম মৈত্রির ... ৩২
সিদ্ধি ... ১৪৮
সীমা ও অসীমতা ... ৫৬৪
সীমার সার্থকতা ... ৫৬০
সুবলদাদা আনল টেনে আদমদিঘির পাড়ে ... ৫, ৬৪৩
সুয়োরানীর সাধ ... ১২২
সুঁদরবনের কেঁদো বাঘ ... ২৩১
স্টপ্‌ফোর্ড্ ব্রুক ... ৫২৮
স্বর্গ-মর্ত ... ১৭২
হৈ রে হৈ মায়হাট্টা ... ২৭৬

রবীন্দ্র রচনাবলী

সপ্তবিংশ খণ্ড

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

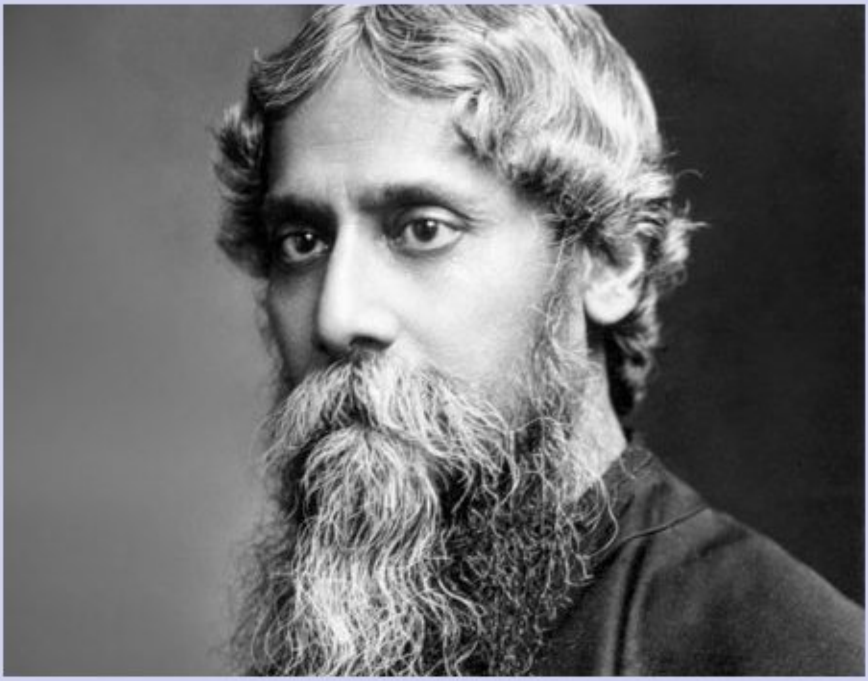

রবীন্দ্র-রচনাবলী

সপ্তবিংশ খণ্ড

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

VISVA BHARATI
216085
LIBRARY

বিশ্বভারতী

১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট। কলিকাতা ১৬

প্রকাশ ২৫ বৈশাখ ১৩৭২

পুনর্মুদ্রণ আশ্বিন ১৩৮১ : ১৮৯৬ শক

মূল্য : কাগজের-মলাট আঠাশ টাকা

রেক্সিন-বাঁধাই পঁয়ত্রিশ টাকা

© বিশ্বভারতী ১৯৭৪

প্রকাশক রণজিৎ রায়

বিশ্বভারতী। ১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট। কলিকাতা ১৬

মুদ্রক শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য

তাপসী প্রেস। ৩০ বিধান সরণী। কলিকাতা ৬

সূচী

চিত্রসূচী ৷৶০

নিবেদন ৷৶০

কবিতা ও গান

স্ফুলিঙ্গ ১

উপন্যাস ও গল্প

গল্পগুচ্ছ ৬৭

প্রবন্ধ

আত্মপরিচয় ১৮৭

সাহিত্যের স্বরূপ ২৪৯

মহাত্মা গান্ধী ২৮৭

আশ্রমের রূপ ও বিকাশ ৩১৩

বিশ্বভারতী ৩৪১

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম ৪২৯

সমবায়নীতি ৪৪৭

খৃষ্ট ৪৮৫

পল্লীপ্রকৃতি ৫১৩

গ্রন্থপরিচয় ৬০১

বর্ণানুক্রমিক সূচী ৬৪১

চিত্রসূচী

রবীন্দ্রনাথ : সিংহল ১৯৩৪ মুখপাত

পাণ্ডুলিপি চিত্র প্রবেশক : স্ফুলিঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্র ১

কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত পত্র :

পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লিখিত ২৪৮

নিবেদন

রবীন্দ্র-রচনাবলীর ছাব্বিশটি খণ্ড এবং দুই খণ্ড অচলিত সংগ্রহ প্রকাশের পর কিছুকাল গত হয়েছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় মুদ্রিত বিবিধ রচনা সংকলন করে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়; পূর্ব-প্রকাশিত গ্রন্থে প্রাসঙ্গিক নূতন রচনাও সংযোগ করা হয়েছে।

এযাবৎ রবীন্দ্র-রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয় নি অথচ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে এরূপ রচনা এই খণ্ডে সংগৃহীত হল।

যে-সব রচনা এপর্যন্ত রবীন্দ্র-রচনাবলীব অন্তর্ভুক্ত হল না পরবর্তী এক বা ততোধিক খণ্ডে সেগুলি সংগৃহীত হবে।

২৫ বৈশাখ ১৩৭২

কবিতা ও গান

স্ফুলিঙ্গ

স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেলো
ক্ষণকালের ছন্দ।
উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেলো
সেই তারি আনন্দ॥

স্ফুলিঙ্গ

১

অজানা ভাষা দিয়ে
পড়েছ ঢাকা তুমি, চিনিতে নারি প্রিয়ে!
কুহেলী আছে ঘিরি,
মেঘের মতো তাই দেখিতে হয় গিরি।

২

অতিথি ছিলাম যে বনে সেথায়
গোলাপ উঠিল ফুটে—
'ভুলো না আমায়' বলিতে বলিতে
কখন পড়িল লুটে।

৩

অত্যাচারীর বিজয়তোরণ
ভেঙেছে ধুলার 'পর,
শিশুরা তাহারই পাথরে আপন
গড়িছে খেলার ঘর।

৪

অনিত্যের যত আবর্জনা
পূজার প্রাঙ্গণ হতে
প্রতিক্ষণে করিয়ো মার্জনা।

৫

অনেক তিয়াষে করেছি ভ্রমণ,
জীবন কেবলই খোঁজা।

অনেক বচন করেছি রচন,
জমেছে অনেক বোঝা।
যা পাই নি তারি লইয়া সাধনা
যাব কি সাগরপার ?
যা পাই নি তারি বহিয়া বেদনা
ছিঁড়িবে বীণার তার ?

৬

অনেক মালা গেঁথেছি মোর
কুঞ্জতলে,
সকালবেলার অতিথিরা
পরল গলে।
সন্ধেবেলা কে এল আজ
নিয়ে ডালা !
গাঁথব কি হায় ঝরা পাতায়
শুকনো মালা !

৭

অন্ধকারের পার হতে আনি
প্রভাতসূর্য মন্ত্রিল বাণী,
জাগালো বিচিত্রেরে
এক আলোকের আলিঙ্গনের ঘেরে।

৮

অন্নহারা গৃহহারা চায় ঊর্ধ্বপানে,
ডাকে ভগবানে।
যে দেশে সে ভগবান মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে
সাড়া দেন বীর্যরূপে দুঃখে কষ্টে ভয়ে,
সে দেশের দৈন্য হবে ক্ষয়,
হবে তার জয়।

৯

অন্নের লাগি মাঠে
লাঙলে মানুষ মাটিতে আঁচড় কাটে।
কলমের মুখে আঁচড় কাটিয়া
খাতার পাতায় তলে
মনের অন্ন ফলে।

১০

অপরাজিতা ফুটিল,
লতিকার
গর্ব নাহি ধরে—
যেন পেয়েছে লিপিকা
আকাশের
আপন অক্ষরে।

১১

অপাকা কঠিন ফলের মতন,
কুমারী, তোমার প্রাণ
ঘন সংকোচে রেখেছে আগলি
আপন আত্মদান।

১২

অবসান হল রাতি।
নিবাইয়া ফেলো কালিমামলিন
ঘরের কোণের বাতি।
নিখিলের আলো পূর্ব-আকাশে
জ্বলিল পুণ্যদিনে—
এক পথে যারা চলিবে তাহারা
সকলেরে নিক চিনে।

১৩

অবোধ হিয়া বুঝে না বোঝে,
করে সে এ কী ভুল—
তারার মাঝে কাঁদিয়া খোঁজে
ঝরিয়া-পড়া ফুল।

১৪

অমলধারা ঝরনা যেমন
স্বচ্ছ তোমার প্রাণ,
পথে তোমার জাগিয়ে তুলুক
আনন্দময় গান।
সম্মুখেতে চলবে যত
পূর্ণ হবে নদীর মতো,
দুই কূলেতে দেবে ভ'রে
সফলতার দান।

১৫

অস্তরবিরে দিল মেঘমালা
আপন স্বর্ণরাশি,
উদিত শশীর তরে বাকি রহে
পাণ্ডুবরন হাসি।

১৬

আকাশে-ছড়ায়ে বাণী
অজানার বাঁশি বাজে বুঝি।
শুনিতে না পায় জন্তু,
মানুষ চলেছে সুর খুঁজি।

১৭

আকাশে যুগল তারা
চলে সাথে সাথে
অনন্তের মন্দিরেতে
আলোক মেলাতে।

১৮

আকাশে সোনার মেঘ
কত ছবি আঁকে,
আপনার নাম তবু
লিখে নাহি রাখে।

১৯

আকাশের আলো মাটির তলায়
লুকায় চুপে,
ফাগুনের ডাকে বাহিরিতে চায়
কুসুমরূপে।

২০

আকাশের চুম্বনবৃষ্টিরে
ধরণী কুসুমে দেয় ফিরে।

২১

আগুন জ্বলিত যবে
আপন আলোতে
সাবধান করেছিলে
মোরে দূর হতে।

নিবে গিয়ে ছাইচাপা
আছে মৃতপ্রায়,
তাহারই বিপদ হতে
বাঁচাও আমায়।

২২

আজ গড়ি খেলাঘর,
কাল তারে ভুলি—
ধূলিতে যে লীলা তারে
মুছে দেয় ধূলি।

২৩

আঁধার নিশার
গোপন অন্তরাল,
তাহারই পিছনে
লুকায়ে রচিলে
গোপন ইন্দ্রজাল।

২৪

আপন শোভার মূল্য
পুষ্প নাহি বোঝে,
সহজে পেয়েছে যাহা
দেয় তা সহজে।

২৫

আপনার রুদ্ধদ্বার-মাঝে
অন্ধকার নিয়ত বিরাজে।
আপন-বাহিরে মেলো চোখ,
সেইখানে অনন্ত আলোক।

২৬

আপনারে দীপ করি জ্বালো,
আপনার যাত্রাপথে
আপনিই দিতে হবে আলো।

২৭

আপনারে নিবেদন
সত্য হয়ে পূর্ণ হয় যবে
সুন্দর তখনি মূর্তি লভে।

২৮

আপনি ফুল লুকায়ে বনছায়ে
গন্ধ তার চালে দখিনবায়ে।

২৯

আমি অতি পুরাতন,
এ খাতা হালের
হিসাব রাখিতে চাহে
নূতন কালের।
তবুও ভরসা পাই—
আছে কোনো গুণ,
ভিতরে নবীন থাকে
অমর ফাগুন।
পুরাতন চাঁপাগাছে
নূতনের আশা
নবীন কুসুমে আনে
অমৃতের ভাষা।

৩০

আমি বেসেছিলেম ভালো
সকল দেহে মনে
এই ধরণীর ছায়া আলো
আমার এ জীবনে।
সেই-যে আমার ভালোবাসা
লয়ে আকুল অকূল আশা
ছড়িয়ে দিল আপন ভাষা
আকাশনীলিমাতে।
রইল গভীর সুখে দুখে,
রইল সে-যে কুঁড়ির বুকে
ফুল-ফোটানোর মুখে মুখে
ফাগুনচৈত্ররাতে।
রইল তারি রাখী বাঁধা
ভাবী কালের হাতে।

৩১

আয় রে বসন্ত, হেথা
কুসুমের সুষমা জাগা রে
শান্তিস্নিগ্ধ মুকুলের
হৃদয়ের গোপন আগারে।
ফলেরে আনিবে ডেকে
সেই লিপি যাস রেখে,
সুবর্ণের তুলিখানি
পর্ণে পর্ণে যতনে লাগা রে।

৩২

আলো আসে দিনে দিনে,
রাত্রি নিয়ে আসে অন্ধকার।
মরণসাগরে মিলে
সাদা কালো গঙ্গাযমুনার।

৩৩

আলো তার পদচিহ্ন
আকাশে না রাখে—
চলে যেতে জানে, তাই
চিরদিন থাকে।

৩৪

আশার আলোকে
জ্বলুক প্রাণের তারা,
আগামী কালের
প্রদোষ-আঁধারে
ফেলুক কিরণধারা।

৩৫

আসা-যাওয়ার পথ চলেছে
উদয় হতে অস্তাচলে,
কেঁদে হেসে নানান বেশে
পথিক চলে দলে দলে।
নামের চিহ্ন রাখিতে চায়
এই ধরণীর ধুলা জুড়ে,
দিন না যেতেই রেখা তাহার
ধুলার সাথে যায় যে উড়ে।

৩৬

ঈশ্বরের হাস্যমুখ দেখিবারে পাই
যে আলোকে ভাইকে দেখিতে পায় ভাই।
ঈশ্বরপ্রণামে তবে হাতজোড় হয়
যখন ভাইয়ের প্রেমে মিলাই হৃদয়।

৩৭

ঊর্মি, তুমি চঞ্চলা
নৃত্যদোলায় দাও দোলা,
বাতাস আসে কী উচ্ছ্বাসে—
তরণী হয় পথ-ভোলা।

৩৮

এই যেন ভক্তের মন
বট অশ্বত্থের বন।
রচে তার সমুদার কায়াটি
ধ্যানঘন গম্ভীর ছায়াটি,
মর্মরে বন্দনমন্ত্র জাগায় রে
বৈরাগী কোন্ সমীরণ।

৩৯

এই সে পরম মূল্য
আমার পূজার—
না পূজা করিলে তবু
শান্তি নাই তার।

৪০

এক যে আছে বুড়ি
জন্মদিনে দিলেম তারে
রঙিন সুরের ঘুড়ি।
পাঠ্যপুঁথির পাতাগুলো
অবাক্ হয়ে রয়,
বৃদ্ধা মেয়ের উধাও চিত্ত
ফেরে আকাশ-ময়।

কণ্ঠে ওঠে গুন্‌গুনিয়ে
নারে গায়া পাখা।
পানে পানে জাল বোনা হয়
ম্যাট্রিকের এই বাঁধা।

৪১

এখনো অঙ্কুর যাহা
তারি পথপানে
প্রত্যহ প্রভাতে রবি
আশীর্বাদ আনে।

৪২

এমন মানুষ আছে
পায়ের ধুলো নিতে এলে
রাখিতে হয় দৃষ্টি মেলে
জুতো সরায় পাছে।

৪৩

এসেছিনু নিয়ে শুধু আশা,
চলে গেনু দিয়ে ভালোবাসা।

৪৪

'এসো মোর কাছে'
শুকতারা গাহে গান।
প্রদীপের শিখা
নিবে চ'লে গেল,
মানিল সে আহ্বান।

৪৫

'ওগো তারা, জাগাইয়ো ভোরে'
কুঁড়ি তারে কহে ঘুমঘোরে।
তারা বলে, 'যে তোরে জাগায়
মোর জাগা ঘোচে তার পায়।'

৪৬

ওড়ায় আনন্দে পাখি
শূন্যে দিকে দিকে
বিনা অক্ষরের বাণী
যায় লিখে লিখে।
মন মোর ওড়ে যবে
জাগে তার ধ্বনি,
পাখার আনন্দ সেই
বহিল লেখনী।

৪৭

কঠিন পাথর কাটি
মূর্তিকর গড়িছে প্রতিমা।
অসীমেরে রূপ দিক্‌
জীবনের বাধাময় সীমা।

৪৮

'কথা চাই' 'কথা চাই' হাঁকে
কথার বাজারে ;
কথাওয়ালা আসে ঝাঁকে ঝাঁকে
হাজারে হাজারে।
প্রাণে তোর বাণী যদি থাকে
মৌনে ঢাকিয়া রাখ্‌ তাকে
মুখর এ হাটের মাঝারে।

৪৯

কমল ফুটে অগম জলে,
তুলিবে তারে কেবা।
সবার তরে পায়ের তলে
তৃণের রহে সেবা।

৫০

কল্লোলমুখর দিন
ধায় রাত্রি-পানে।
উচ্ছল নির্ঝর চলে
সিন্ধুর সন্ধানে।
বসন্তে অশান্ত ফুল
পেতে চায় ফল।
স্তব্ধ পূর্ণতার পানে
চলিছে চঞ্চল।

৫১

কহিল তারা, 'জ্বালিব আলোখানি।
আঁধার দূর হবে না-হবে,
সে আমি নাহি জানি।'

৫২

কাছে থাকি যবে
ভুলে থাকো,
দূরে গেলে যেন
মনে রাখো।

৫৩

কাছের রাত্রি দেখিতে পাই
মানা।
দূরের চাঁদ চিরদিনের
জানা।

৫৪

কাঁটার সংখ্যা
ঈর্ষাভরে
ফুল যেন নাহি
গণনা করে।

৫৫

কালো মেঘ আকাশের তারাদের ঢেকে
মনে ভাবে, জিত হল তার।
মেঘ কোথা মিলে যায় চিহ্ন নাহি রেখে,
তারাগুলি রহে নির্বিকার।

৫৬

কী পাই, কী জমা করি,
কী দেবে, কে দেবে—
দিন মিছে কেটে যায়
এই ভেবে ভেবে।
চ'লে তো যেতেই হবে—
'কী যে দিয়ে যাব'
বিদায় নেবার আগে
এই কথা ভাবো।

৫৭

কী যে কোথা হেথা-হোথা যায় ছড়াছড়ি,
কুড়িয়ে যতনে বাঁধি দিয়ে দড়াদড়ি।
তবুও কখন শেষে
বাঁধন যায় যে ফেঁসে,
ধুলায় ভোলার দেশে
যায় গড়াগড়ি—
হায় রে, রয় না তার দাম কড়া কড়ি।

৫৮

কীর্তি যত গড়ে তুলি
ধূলি তারে করে টানাটানি।
গান যদি রেখে যাই
তাহারে রাখেন বীণাপাণি।

৫৯

কুসুমের শোভা
কুসুমের অবসানে
মধুরস হয়ে
লুকায় ফলের প্রাণে।

৬০

কোথায় আকাশ
কোথায় ধূলি
সে কথা পরান
গিয়েছে ভুলি।
তাই ফুল খোঁজে
তারার কোলে,
তারা খুঁজে ফিরে
ফুলের দলে।

৬১

কোন্ খ'সে-পড়া তারা
মোর প্রাণে এসে খুলে দিল আজি
সুরের অশ্রুধারা।

৬২

ক্লান্ত মোর লেখনীর
এই শেষ আশা—
নীরবের ধ্যানে তার
ডুবে যাবে ভাষা।

৬৩

ক্ষণকালের গীতি
চিরকালের স্মৃতি।

৬৪

ক্ষণিক ধ্বনির স্বত-উচ্ছ্বাসে
সহসা নির্ঝরিণী
আপনারে লয় চিনি।
চকিত ভাবের কচিৎ বিকাশে
বিস্মিত মোর প্রাণ
পায় নিজ সন্ধান।

৬৫

ক্ষুদ্র-আপন - মাঝে
পরম আপন রাজে,
খুলুক দুয়ার তারই।
দেখি আমার ঘরে
চিরদিনের তরে
যে মোর আপনারই।

৬৬

ক্ষুভিত সাগরে নিভৃত তরীর গেহ,
রজনী দিবস বহিছে তীরের স্নেহ।
দিকে দিকে যেথা বিপুল জলের রোল
গোপনে সেথায় এনেছে ধরার কোল।
উত্তাল ঢেউ তারা যে দৈত্য-ছেলে
পুত্তলী ভেবে লাফ দেয় বাহু মেলে।
তার হাত হতে বাঁচায়ে আনিলে তুমি,
ভূমির শিশুরে ফিরে পেল পুন ভূমি।

৬৭

গত দিবসের ব্যর্থ প্রাণের
        যত ধুলা, যত কালি,
প্রতি উষা দেয় নবীন আশায়
        আলো দিয়ে প্রক্ষালি।

৬৮

গাছ দেয় ফল
        ঋণ ব'লে তাহা নহে।
নিজের সে দান
        নিজেরই জীবনে বহে।
পথিক আসিয়া
লয় যদি ফলভার
প্রাপ্যের বেশি
        সে সৌভাগ্য তার।

৬৯

গাছগুলি মুছে-ফেলা,
        গিরি ছায়া-ছায়া—

মেঘে আর কুয়াশায়
রচে একি মায়া।
মুখ-ঢাকা ঝরনার
শুনি আকুলতা—
সব যেন বিধাতার
চুপিচুপি কথা।

৭০

গাছের কথা মনে রাখি,
ফল করে সে দান।
ঘাসের কথা যাই ভুলে, সে
শ্যামল রাখে প্রাণ।

৭১

গাছের পাতায় লেখন লেখে
বসন্তে বর্ষায়—
ঝ'রে পড়ে, সব কাহিনী
ধুলায় মিশে যায়।

৭২

গানখানি মোর দিনু উপহার—
ভার যদি লাগে, প্রিয়ে,
নিয়ো তবে মোর নামখানি বাদ দিয়ে।

৭৩

গিরিবক্ষ হতে আজি
ঘুচুক কুঝাটি-আবরণ,
নূতন প্রভাতসূর্য
এনে দিক্‌ নবজাগরণ।

মৌন তার ভেঙে যাক,
জ্যোতির্ময় ঊর্ধ্বলোক হতে
বাণীর নির্ঝরধারা
প্রবাহিত হোক শতস্রোতে।

৭৪

গোঁড়ামি সত্যেরে চায়
মুঠায় রক্ষিতে—
যত জোর করে, সত্য
মরে অলক্ষিতে।

৭৫

ঘড়িতে দম দাও নি তুমি ভুলে।
ভাবিছ ব'সে, সূর্য বুঝি
সময় গেল ভুলে!

৭৬

ঘন কাঠিন্য রচিয়া শিলাস্তূপে
দূর হতে দেখি আছে দুর্গরূপে।
বন্ধুর পথ করিনু অতিক্রম—
নিকটে আসিনু, ঘুচিল মনের ভ্রম!
আকাশে হেথায় উদার আমন্ত্রণ,
বাতাসে হেথায় সখার আলিঙ্গন,
অজানা প্রবাসে যেন চিরজানা বাণী
প্রকাশ করিল আত্মীয়গৃহখানি।

৭৭

চলার পথের যত বাধা
পথবিপথের যত ধাঁধা

পদে পদে ফিরে ফিরে মারে,
পথের বীণার তারে তারে
তারি টানে সুর হয় বাঁধা
রচে যদি দুঃখের ছন্দ
দুঃখের-অতীত আনন্দ
তবেই রাগিণী হবে সাধা।

৭৮

চলিতে চলিতে চরণে উছলে
চলিবার ব্যাকুলতা—
নূপুরে নূপুরে বাজে বনতলে
মনের অধীর কথা।

৭৯

চলে যাবে সত্তারূপ
সৃজিত যা প্রাণেতে কায়াতে,
রেখে যাবে মায়ারূপ
রচিত যা আলোতে ছায়াতে।

৮০

চাও যদি সত্যরূপে
দেখিবারে মন্দ—
ভালোর আলোতে দেখো,
হোয়ো নাকো অন্ধ।

৮১

চাঁদিনী রাত্রি, তুমি তো যাত্রী
চীন-লণ্ঠন দুলারে
চলেছ সাগরপারে।

আমি যে উদাসী একেলা প্রবাসী,
নিয়ে গেলে মন ভুলায়ে
দূর জানালার ধারে।

৮২

চাঁদেরে করিতে বন্দী
মেঘ করে অভিসন্ধি,
চাঁদ বাজাইল মায়াশঙ্খ।
মন্ত্রে কালি হল গত,
জ্যোৎস্নায় ফেনার মতো
মেঘ ভেসে চলে অকলঙ্ক।

৮৩

চাষের সময়ে
যদিও করি নি হেলা,
ভুলিয়া ছিলাম
ফসল কাটার বেলা।

৮৪

চাহিছ বারে বারে
আপনারে ঢাকিতে—
মন না মানে মানা,
মেলে ডানা আঁখিতে।

৮৫

চাহিছে কীট মৌমাছির
পাইতে অধিকার—
করিল নত ফুলের শির
দারুণ প্রেম তার।

৮৬

চৈত্রের সেতারে বাজে
বসন্তবাহার,
বাতাসে বাতাসে উঠে
তরঙ্গ তাহার।

৮৭

চোখ হতে চোখে
খেলে কালো বিদ্যুৎ—
হৃদয় পাঠায়
আপন গোপন দূত।

৮৮

জন্মদিন আসে বারে বারে
মনে করাবারে—
এ জীবন নিত্যই নূতন
প্রতি প্রাতে আলোকিত
পুলকিত
দিনের মতন।

৮৯

আনার বাঁশি হাতে নিয়ে
না-জানা
বাজান তাঁহার নানা সুরের
বাজানা।

৯০

জাপান, তোমার সিন্ধু অধীর,
প্রান্তর তব শান্ত,
পর্বত তব কঠিন নিবিড়,
কানন কোমল কান্ত।

২১

জীবনদেবতা তব
দেহে মনে অন্তরে বাহিরে
আপন পূজার ফুল
আপনি ফুটান ধীরে ধীরে।
মাধুর্যে সৌরভে তারি
অহোরাত্র রহে যেন ভরি
তোমার সংসারখানি,
এই আমি আশীর্বাদ করি।

২২

জীবনযাত্রার পথে
ক্লান্তি ভুলি, তরুণ পথিক,
চলো নির্ভীক।
আপন অন্তরে তব
আপন যাত্রার দীপালোক
অনির্বাণ হোক।

২৩

জীবনরহস্য যায়
মরণরহস্য-মাঝে নামি,
মুখর দিনের আলো
নীরব নক্ষত্রে যায় থামি।

২৪

জীবনে তব প্রভাত এল
নব-অরুণকান্তি।
তোমারে ঘেরি মেলিয়া থাক্
শিশিরে-ধোওয়া শান্তি।

মাধুরী তব মধ্যদিনে
শক্তিরূপ ধরি
কর্মপটু কল্যাণের
করুক দূর ক্লান্তি।

১৫

জীবনের দীপে তব
আলোকের আশীর্বচন
আঁধারের অচৈতন্যে
সঞ্চিত করুক জাগরণ।

১৬

জ্বালো নবজীবনের
নির্মল দীপিকা,
মর্তের চোখে ধরো
স্বর্গের লিপিকা।
আঁধারগহনে রচো
আলোকের বীথিকা,
কলকোলাহলে আনো
অমৃতের গীতিকা।

১৭

ঝরনা উথলে ধরার হৃদয় হতে
তপ্তবারির স্রোতে—
গোপনে লুকানো অশ্রু কী লাগি
বাহিরিল এ আলোতে।

৯৮

ভালিতে রেখেছি তব
অচেনা কুসুম নব।
দাও মোরে, আমি আমার ভাষায়
বরণ করিয়া লব।

৯৯

ডুবারি যে সে কেবল
ডুব দেয় তলে।
যে জন পারের যাত্রী
সেই ভেসে চলে।

১০০

তপনের পানে চেয়ে
সাগরের ঢেউ
বলে, 'ওই পুতলিরে
এনে দে-না কেউ।'

১০১

তব চিত্তগগনের
দূর দিক্‌সীমা
বেদনার রাঙা মেঘে
পেয়েছে মহিমা।

১০২

তরঙ্গের বাণী সিন্ধু
চাহে বুঝাবারে।
ফেনায়ে কেবলই লেখে,
মুছে বারে বারে।

১০৩

তারাগুলি সারারাতি
কানে কানে কয়,
সেই কথা ফুলে ফুলে
ফুটে বনময়।

১০৪

তুমি বসন্তের পাখি বনের ছায়ারে
করো ভাষা দান।
আকাশ তোমার কণ্ঠে চাহে গাহিবারে
আপনারই গান।

১০৫

তুমি বাঁধছ নূতন বাসা,
আমার ভাঙছে ভিত।
তুমি খুঁজছ লড়াই, আমার
মিটেছে হার-জিত।
তুমি বাঁধছ সেতারে তার,
থামছি সমে এসে—
চক্ররেখা পূর্ণ হল
আরম্ভে আর শেষে।

১০৬

তুমি যে তুমিই, ওগো
সেই তব ঋণ
আমি মোর প্রেম দিয়ে
শুধি চিরদিন।

১০৭

তোমার মঙ্গলকার্য
তব ভৃত্য-পানে
অযাচিত যে প্রেমেরে
ডাক দিয়ে আনে,
যে অচিন্ত্য শক্তি দেয়,
যে অক্লান্ত প্রাণ,
সে তাহার প্রাপ্য নহে—
সে তোমারি দান।

১০৮

তোমার সঙ্গে আমার মিলন
বাধল কাছেই এসে।
তাকিয়ে ছিলেম আসন মেলা—
অনেক দূরের থেকে এলে,
আঙিনাতে বাড়িয়ে চরণ
ফিরলে কঠিন হেসে—
তীরের হাওয়ায় তরী উধাও
পারের নিরুদ্দেশে।

১০৯

তোমারে হেরিয়া চোখে,
মনে পড়ে শুধু এই মুখখানি
দেখেছি স্বপ্নলোকে।

১১০

দিগন্তে ওই বৃষ্টিহারা
মেঘের দলে জুটি
লিখে দিল— আজ ভুবনে
আকাশ ভরা ছুটি।

১১১

দিগন্তে পথিক মেঘ
চ'লে যেতে যেতে
ছায়া দিয়ে নামটুকু
লেখে আকাশেতে।

১১২

দিগ্‌বলয়ে
নব শশীলেখা
টুক্‌রো যেন
মানিকের রেখা।

১১৩

দিনের আলো নামে যখন
ছায়ার অতলে
আমি আসি ঘট ভরিবার ছলে
একলা দিঘির জলে।
তাকিয়ে থাকি, দেখি সঙ্গীহারা
একটি সন্ধ্যাতারা
ফেলেছে তার ছায়াটি এই
কমল-সাগরে।

ডোবে না সে, নেবে না সে,
ঢেউ দিলে সে যায় না তবু স'রে—
যেন আমার বিফল রাতের
চেয়ে থাকার স্মৃতি
কালের কালো পটের 'পরে
রইল আঁকা নিতি।
মোর জীবনের ব্যর্থ দীপের
অগ্নিরেখার বাণী
ওই যে ছায়াখানি।

১১৪

দিনের প্রহরগুলি হয়ে গেল পার
বহি কর্মভার।
দিনান্ত ভরিছে তরী রঙিন মায়ায়
আলোর ছায়ায়।

১১৫

দিবসরজনী তন্দ্রাবিহীন
মহাকাল আছে জাগি—
যাহা নাই কোনোখানে,
যারে কেহ নাহি জানে,
সে অপরিচিত কল্পনাতীত
কোন্ আগামীর লাগি।

১১৬

দুই পারে দুই কূলের আকুল প্রাণ,
মাঝে সমুদ্র অতল বেদনাগান।

১১৭

দুঃখ এড়াবার আশা
নাই এ জীবনে।
দুঃখ সহিবার শক্তি
যেন পাই মনে।

১১৮

দুঃখশিখার প্রদীপ জেলে
খোঁজো আপন মন,
হয়তো সেথা হঠাৎ পাবে
চিরকালের ধন।

১১৯

দুখের দশা শ্রাবণরাতি—
বাদল না পায় মানা,
চলেছে একটানা।
সুখের দশা যেন সে বিদ্যুৎ
ক্ষণহাসির দূত।

১২০

দূর সাগরের পারের পবন
আসবে যখন কাছের কূলে
রঙিন আগুন জ্বালবে ফাগুন,
মাতবে অশোক সোনার ফুলে।

১২১

দোয়াতখানা উলটি ফেলি
পটের 'পরে
'রাতের ছবি এঁকেছি' ব'লে
গর্ব করে।

১২২

ধরণীর খেলা খুঁজে
শিশু শুকতারা
তিমিররজনীতীরে
এল পথহারা।
উষা তারে ডাক দিয়ে
ফিরে নিয়ে যায়,
আলোকের ধন বুঝি
আলোকে মিলায়।

১২৩

নববর্ষ এল আজি
দুর্যোগের ঘন অন্ধকারে ;
আনে নি আশার বাণী,
দেবে না সে করুণ প্রশ্রয়।
প্রতিকূল ভাগ্য আসে
হিংস্র বিভীষিকার আকারে ;
তখনি সে অকল্যাণ
যখনি তাহারে করি ভয়।
যে জীবন বহিয়াছি
পূর্ণ মূল্যে আজ হোক কেনা ;
দুর্দিনে নির্ভীক বীর্যে
শোধ করি তার শেষ দেনা।

১২৪

না চেয়ে যা পেলে তার যত দায়
পুরাতে পারো না তাও,
কেমনে বহিবে চাও যত কিছু
সব যদি তার পাও !

১২৫

নিমীলনয়ন ভোর-বেলাকার
অরুণকপোলতলে
রাতের বিদায়চুম্বনটুকু
শুকতারা হয়ে জ্বলে।

১২৬

নিরলস অবকাশ শূন্য শুধু,
শান্তি তাহা নয়—
যে কর্মে রয়েছে সত্য
তাহাতে শান্তির পরিচয়।

১২৭

নূতন জন্মদিনে
পুরাতনের অন্তরেতে
নূতনে লও চিনে।

১২৮

নূতন যুগের প্রত্যূষে কোন্
প্রবীণ বুদ্ধিমান
নিত্যই শুধু সূক্ষ্ম বিচার করে—
যাবার লগ্ন, চলার চিন্তা
নিঃশেষে করে দান
সংশয়ময় তলহীন গহ্বরে।
নির্ঝর যথা সংগ্রামে নামে
দুর্গম পর্বতে,
অচেনার মাঝে ঝাঁপ দিয়ে পড়্
দুঃসাহসের পথে,
বিঘ্নই তোর স্পর্ধিত প্রাণ
জাগায়ে তুলিবে যে রে—
জয় করি তবে জানিয়া লইবি
অজানা অদৃষ্টেরে।

১২৯

নূতন সে পলে পলে
অতীতে বিলীন,
যুগে যুগে বর্তমান
সেই তো নবীন।
তৃষ্ণা বাড়াইয়া তোলে
নূতনের সুরা,
নবীনের চিরসুধা
তৃপ্তি করে পুরা।

১৩০

পদ্মের পাতা পেতে আছে অঞ্জলি
রবির করের লিখন ধরিবে বলি।
সায়াহ্নে রবি অস্তে নামিবে যবে
সে ক্ষণলিখন তখন কোথায় রবে!

১৩১

পরিচিত সীমানায়
বেড়া-ঘেরা থাকি ছোটো বিশ্বে;
বিপুল অপরিচিত
নিকটেই রয়েছে অদৃশ্যে।
সেথাকার বাঁশিরবে
অনামা ফুলের মৃদুগন্ধে
জানা না-জানার মাঝে
বাণী ফিরে ছায়াময় ছন্দে।

১৩২

পশ্চিমে রবির দিন
হলে অবসান
তখনো বাজুক কানে
পুরবীর গান।

১৩৩

পাখি যবে গাহে গান,
জানে না, প্রভাত-রবিরে সে তার
প্রাণের অর্ঘ্যদান।
ফুল ফুটে বনমাঝে—
সেই তো তাহার পূজানিবেদন
আপনি সে জানে না যে।

১৩৪

পায়ে চলার বেগে
পথের-বিঘ্ন-হরণ-করা
শক্তি উঠুক জেগে।

১৩৫

পাষাণে পাষাণে তব শিখরে শিখরে
লিখেছ, হে গিরিরাজ, অজানা অক্ষরে
কত যুগযুগান্তের প্রভাতে সন্ধ্যায়
ধরিত্রীর ইতিবৃত্ত অনন্ত-অধ্যায়।
মহান সে গ্রন্থপত্র, তারি এক দিকে
কেবল একটি ছত্রে রাখিবে কি লিখে—
তব শৃঙ্গশিলাতলে দুদিনের খেলা,
আমাদের ক'জনের আনন্দের মেলা।

১৩৬

পুরানো কালের কলম লইয়া হাতে
লিখি নিজ নাম নূতন কালের পাতে।
নবীন লেখক তারি 'পরে দিনরাতি
লেখে নানামত আপন নামের পাতি।
নূতনে পুরাণে মিলায়ে রেখার পাকে
কালের খাতায় সদা হিজিবিজি থাকে।

১৩৭

পুষ্পের মুকুল
নিয়ে আসে অরণ্যের
আশ্বাস বিপুল।

১৩৮

পেয়েছি যে-সব ধন,
যার মূল্য আছে,
ফেলে যাই পাছে।
যার কোনো মূল্য নাই,
জানিবে না কেও,
তাই থাকে চরম পাথেয়।

১৩৯

প্রথম আলোর আভাস লাগিল গগনে;
তৃণে তৃণে উষা সাজালো শিশিরকণা।
যারে নিবেদিল তাহারি পিপাসী কিরণে
নিঃশেষ হল রবি-অভ্যর্থনা।

১৪০

প্রভাতরবির ছবি আঁকে ধরা
সূর্যমুখীর ফুলে।
তৃপ্তি না পায়, মুছে ফেলে তায়—
আবার ফুটায়ে তুলে।

১৪১

প্রভাতের ফুল ফুটিয়া উঠুক
সুন্দর পরিমলে।
সন্ধ্যাবেলায় হোক সে ধন্য
মধুরসে-ভরা ফলে।

১৪২

প্রেমের আদিম জ্যোতি আকাশে সঞ্চরে
শুভ্রতম তেজে,
পৃথিবীতে নামে সেই নানা রূপে রূপে
নানা বর্ণে সেজে।

১৪৩

প্রেমের আনন্দ থাকে
শুধু স্বল্পক্ষণ,
প্রেমের বেদনা থাকে
সমস্ত জীবন।

১৪৪

ফাগুন এল দ্বারে,
কেহ যে ঘরে নাই—
পরান ডাকে কারে
ভাবিয়া নাহি পাই।

১৪৫

ফাগুন কাননে অবতীর্ণ,
ফুলদল পথে করে কীর্ণ।
অনাগত ফলে নাই দৃষ্টি,
নিমেষে নিমেষে অনাসৃষ্টি।

১৪৬

ফুল কোথা থাকে গোপনে,
গন্ধ তাহারে প্রকাশে।
প্রাণ ঢাকা থাকে স্বপনে,
গান যে তাহারে প্রকাশে।

১৪৭

ফুল ছিঁড়ে লয়
হাওয়া,
সে পাওয়া মিথ্যে
পাওয়া—

আনমনে তার
পুষ্পের ভার
ধুলায় ছড়িয়ে
যাওয়া।

যে সেই ধুলায়
ফুলে
হার গেঁথে লয়
ভুলে
হেলায় সে ধন
হয় যে ভূষণ
তাহারি মাথার
চুলে।

শুধায়ো না মোর
গান
কারে করেছিনু
দান—
পথধুলা-'পরে
আছে তারি তরে
যার কাছে পাবে
মান।

১৪৮

ফুলের অক্ষরে প্রেম
লিখে রাখে নাম আপনার—
ঝ'রে যায়, ফেরে সে আবার।
পাথরে পাথরে লেখা
কঠিন স্বাক্ষর দুরাশার
ভেঙে যায়, নাহি ফেরে আর।

১৪৯

ফুলের কলিকা প্রভাতরবির
প্রসাদ করিছে লাভ,
কবে হবে তার হৃদয় ভরিয়া
ফলের আবির্ভাব।

১৫০

বইল বাতাস,
পাল তবু না জোটে—
ঘাটের শানে
নৌকো মাথা কোটে।

১৫১

'বউ কথা কও' 'বউ কথা কও'
যতই গায় সে পাখি
নিজের কথাই কুঞ্জবনের
সব কথা দেয় ঢাকি।

১৫২

বড়ো কাজ নিজে বহে
আপনার ভার।
বড়ো দুঃখ নিয়ে আসে
সান্ত্বনা তাহার।
ছোটো কাজ, ছোটো ক্ষতি,
ছোটো দুঃখ যত—
বোঝা হয়ে চাপে, প্রাণ
করে কণ্ঠাগত।

১৫৩

বড়োই সহজ
রবিরে ব্যঙ্গ করা,
আপন আলোকে
আপনি দিয়েছে ধরা।

১৫৪

বরষার রাতে জলের আঘাতে
পড়িতেছে যূথী ঝরিয়া।
পরিমলে তারি সজল পবন
করুণায় উঠে ভরিয়া।

১৫৫

বরষে বরষে শিউলিতলায়
ব'স অঞ্জলি পাতি,
ঝরা ফুল দিয়ে মালাখানি লহ গাঁথি;
এ কথাটি মনে জানো—
দিনে দিনে তার ফুলগুলি হবে ম্লান,
মালার রূপটি বুঝি
মনের মধ্যে রবে কোনোখানে
যদি দেখ তারে খুঁজি।

সিন্দুকে রহে বন্ধ,
হঠাৎ খুলিলে আভাসেতে পাও
পুরানো কালের গন্ধ।

১৫৬

বর্ষণগৌরব তার
গিয়েছে চুকি,
রিক্তমেঘ দিক্প্রান্তে
ভয়ে দেয় উঁকি।

১৫৭

বসন্ত, আনো মলয়সমীর,
ফুলে ভরি দাও ডালা—
মোর মন্দিরে মিলনরাতির
প্রদীপ হয়েছে আলা।

১৫৮

বসন্ত, দাও আনি,
ফুল জাগাবার বাণী—
তোমার আশায় পাতায় পাতায়
চলিতেছে কানাকানি।

১৫৯

বসন্ত পাঠায় দূত
রহিয়া রহিয়া
যে কাল গিয়েছে তার
নিশ্বাস বহিয়া।

১৬০

বসন্ত যে লেখা লেখে
বনে বনান্তরে
নামুক তাহারই মন্ত্র
লেখনীর 'পরে।

১৬১

বসন্তের আসরে ঝড়
যখন ছুটে আসে
মুকুলগুলি না পায় ডর,
কচি পাতারা হাসে।

কেবল জানে জীর্ণ পাতা
ঝড়ের পরিচয়—
ঝড় তো তারি মুক্তিদাতা,
তারি বা কিসে ভয়।

১৬২

বসন্তের হাওয়া যবে অরণ্য মাতায়
নৃত্য উঠে পাতায় পাতায়।
এই নৃত্যে সুন্দরকে অর্ঘ্য দেয় তার,
'ধন্য তুমি' বলে বার বার।

১৬৩

বস্তুতে রয় রূপের বাঁধন,
ছন্দ সে রয় শক্তিতে,
অর্থ সে রয় ব্যক্তিতে।

১৬৪

বহু দিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশিরবিন্দু।

১৬৫

বাতাস শুধায়, 'বলো তো, কমল,
তব রহস্য কী যে।'
কমল কহিল, 'আমার মাঝারে
আমি রহস্য নিজে।'

১৬৬

বাতাসে তাহার প্রথম পাপড়ি
খসায়ে ফেলিল যেই,
অমনি জানিয়ো, শাখায় গোলাপ
থেকেও আর সে নেই।

১৬৭

বাতাসে নিবিলে দীপ
দেখা যায় তারা,
আঁধারেও পাই তবে
পথের কিনারা।
সুখ-অবসানে আসে
সন্তোগের সীমা,
দুঃখ তবে এনে দেয়
শান্তির মহিমা।

১৬৮

বায়ু চাহে মুক্তি দিতে,
বন্দী করে গাছ –
দুই বিরুদ্ধের যোগে
মঞ্জরীর নাচ।

১৬৯

বাহির হতে বহিয়া আনি
সুখের উপাদান –
আপনা-মাঝে আনন্দের
আপনি সমাধান।

১৭০

বাহিরে বস্তুর বোঝা,
ধন বলে তায়।
কল্যাণ সে অন্তরের
পরিপূর্ণতায়।

১৭১

বাহিরে যাহারে খুঁজেছিনু দ্বারে দ্বারে
পেয়েছি ভাবিয়া হারায়েছি বারে বারে—
কত রূপে রূপে কত-না অলংকারে
অন্তরে তারে জীবনে লইব মিলায়ে,
বাহিরে তখন দিব তার সুধা বিলায়ে।

১৭২

বিকেলবেলার দিনান্তে মোর
পড়ন্ত এই রোদ
পুবগগনের দিগন্তে কি
জাগায় কোনো বোধ?
লক্ষকোটি আলোবছর-পারে
সৃষ্টি করার যে বেদনা
মাতায় বিধাতারে
হয়তো তারি কেন্দ্র-মাঝে
যাত্রা আমার হবে—
অস্তবেলার আলোতে কি
আভাস কিছু রবে?

১৭৩

বিচলিত কেন মাধবীশাখা,
মঞ্জরী কাঁপে থরথর।
কোন্ কথা তার পাতায় ঢাকা
চুপি চুপি করে মরমর।

১৭৪

বিদায়রথের ধ্বনি
দূর হতে ওই আসে কানে।
ছিন্নবন্ধনের শুধু
কোনো শব্দ নাই কোনোখানে

১৭৫

বিধাতা দিলেন মান
বিদ্রোহের বেলা,
অন্ধ ভক্তি দিনু যবে
করিলেন হেলা।

১৭৬

বিমল আলোকে আকাশ সাজিবে,
শিশিরে ঝলিবে ক্ষিতি,
হে শেফালি, তব বীণায় বাজিবে
শুভ্রপ্রাণের গীতি।

১৭৭

বিশ্বের হৃদয়-মাঝে
কবি আছে সে কে!
কুসুমের লেখা তার
বারবার লেখে—
অতৃপ্ত হৃদয়ে তাহা
বারবার মোছে,
অশান্ত প্রকাশব্যথা
কিছুতে না ঘোচে।

১৭৮

বুদ্ধির আকাশ যবে সত্যে সমুজ্জ্বল,
প্রেমরসে অভিষিক্ত হৃদয়ের ভূমি—
জীবনতরুতে ফলে কল্যাণের ফল,
মাধুরীর পুষ্পগুচ্ছে উঠে সে কুসুমি।

১৭৯

বেছে লব সব-সেরা,
ফাঁদ পেতে থাকি—
সব-সেরা কোথা হতে
দিয়ে যায় ফাঁকি।
আপনারে করি দান
থাকি করজোড়ে—
সব-সেরা আপনিই
বেছে লয় মোরে।

১৮০

বেদনা দিবে যত
অবিরত দিয়ো গো।
তবু এ ম্লান হিয়া
কুড়াইয়া নিয়ো গো।
যে ফুল আনমনে
উপবনে তুলিলে
কেন গো হেলাভরে
ধুলা-'পরে ভুলিলে।
বিঁধিয়া তব হারে
গেঁথো তারে প্রিয় গো।

১৮১

বেদনায় অশ্রু-উর্মিগুলি
গহনের তল হতে
রত্ন আনে তুলি।

১৮২

ভজনমন্দিরে তব
পূজা যেন নাহি রয় থেমে,
মানুষে কোরো না অপমান।
যে ঈশ্বরে ভক্তি করো,
হে সাধক, মানুষের প্রেমে
তাঁরি প্রেম করো সপ্রমাণ।

১৮৩

ভেসে-যাওয়া ফুল
ধরিতে নারে,
ধরিবারই ঢেউ
ছুটায় তারে।

১৮৪

ভোলানাথের খেলার তরে
খেলনা বানাই আমি।
এই বেলাকার খেলাটি তার
ওই বেলা যায় থামি।

১৮৫

মনের আকাশে তার
দিক্‌সীমানা বেয়ে
বিবাগি স্বপনপাখি
চলিয়াছে ধেয়ে।

১৮৬

মর্তজীবনের
　　শুধিব যত ধার
অমরজীবনের
　　লভিব অধিকার।

১৮৭

মাটিতে দুর্ভাগার
　　ভেঙেছে বাসা,
আকাশে সমুচ্চ করি
　　গাঁথিছে আশা।

১৮৮

মাটিতে মিশিল মাটি,
　　যাহা চিরন্তন
রহিল প্রেমের স্বর্গে
　　অন্তরের ধন।

১৮৯

মান অপমান উপেক্ষা করি দাঁড়াও,
কণ্টকপথ অকুণ্ঠপদে মাড়াও,
　　ছিন্ন পতাকা ধূলি হতে লও তুলি
রুদ্রের হাতে লাভ করো শেষ বর,
আনন্দ হোক দুঃখের সহচর,
　　নিঃশেষ ত্যাগে আপনারে যাও ভুলি।

১৯০

মানুষেরে করিবারে স্তব
　　সত্যের কোরো না পরাভব।

১৯১

মিছে ডাকো— মন বলে, আজ না—
গেল উৎসবরাতি,
ম্লান হয়ে এল বাতি,
বাজিল বিসর্জন-বাজনা।
সংসারে যা দেবার
মিটিয়ে দিনু এবার,
চুকিয়ে দিয়েছি তার খাজনা।
শেষ আলো, শেষ গান,
জগতের শেষ দান
নিয়ে যাব— আজ কোনো কাজ না।
বাজিল বিসর্জন-বাজনা।

১৯২

মিলন-সুলগনে,
কেন বল্‌,
নয়ন করে তোর
ছলছল্‌
বিদায়দিনে যবে
ফাটে বুক
সেদিনও দেখেছি তো
হাসিমুখ।

১৯৩

মুকুলের বক্ষোমাঝে
কুসুম আঁধারে আছে বাঁধা,
সুন্দর হাসিয়া বহে
প্রকাশের সুন্দর এ বাধা।

১২৪

মুক্ত যে ভাবনা মোর
ওড়ে ঊর্ধ্ব-পানে
সেই এসে বসে মোর গানে।

১২৫

মুহূর্ত মিলায়ে যায়
তবু ইচ্ছা করে—
আপন স্বাক্ষর রবে
যুগে যুগান্তরে।

১২৬

মৃতেরে যতই করি স্ফীত
পারি না করিতে সঞ্জীবিত।

১২৭

মৃত্তিকা খোরাকি দিয়ে
বাঁধে বৃক্ষটারে,
আকাশ আলোক দিয়ে
মুক্ত রাখে তারে।

১২৮

মৃত্যু দিয়ে যে প্রাণের
মূল্য দিতে হয়
সে প্রাণ অমৃতলোকে
মৃত্যু করে জয়।

১২৯

যখন গগনতলে
আঁধারের দ্বার গেল খুলি
সোনার সংগীতে ঊষা
চয়ন করিল তারাগুলি।

২০০

যখন ছিলেম পথেরই মাঝখানে
মনটা ছিল কেবল চলার পানে
বোধ হত তাই, কিছুই তো নাই কাছে—
পাবার জিনিস সামনে দূরে আছে।
লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছব এই ঝোঁকে
সমস্ত দিন চলেছি এক-রোখে।
দিনের শেষে পথের অবসানে
মুখ ফিরে আজ তাকাই পিছু-পানে।
এখন দেখি পথের ধারে ধারে
পাবার জিনিস ছিল সারে সারে—
সামনে ছিল যে দূর সুমধুর
পিছনে আজ নেহারি সেই দূর।

২০১

যত বড়ো হোক ইন্দ্রধনু সে
সুদূর-আকাশে-আঁকা,
আমি ভালোবাসি মোর ধরণীর
প্রজাপতিটির পাখা।

২০২

যা পায় সকলই জমা করে,
প্রাণের এ লীলা রাত্রিদিন।
কালের তাণ্ডবলীলাভরে
সকলই শূন্যেতে হয় লীন।

২০৩

যা রাখি আমার তরে
মিছে তারে রাখি,

আমিও রব না যবে
সেও হবে ফাঁকি।
যা রাখি সবার তরে
সেই শুধু রবে—
মোর সাথে ডোবে না সে,
রাখে তারে সবে।

২০৪

যাওয়া-আসার একই যে পথ
জান না তা কি অন্ধ?
যাবার পথ রোধিতে গেলে
আসার পথ বন্ধ।

২০৫

যুগে যুগে জলে রৌদ্রে বায়ুতে
গিরি হয়ে যায় ঢিবি।
মরণে মরণে নূতন আয়ুতে
তৃণ রহে চিরজীবী।

২০৬

যে আঁধারে ভাইকে দেখিতে নাহি পায়
সে আঁধারে অন্ধ নাহি দেখে আপনায়।

২০৭

যে করে ধর্মের নামে
বিদ্বেষ সঞ্চিত
ঈশ্বরকে অর্ঘ্য হতে
সে করে বঞ্চিত।

২০৮

যে ছবিতে ফোটে নাই
সবগুলি রেখা

সেও তো, হে শিল্পী, তব
নিজ হাতে লেখা।
অনেক মুকুল ঝরে,
না পায় গৌরব—
তারাও রচিছে তব
বসন্ত উৎসব।

২০৯

যে ঝুম্‌কোফুল ফোটে পথের ধারে
অন্যমনে পথিক দেখে তারে।
সেই ফুলেরই বচন নিল তুলি
হেলায় ফেলায় আমার লেখাগুলি।

২১০

যে তারা আমার তারা
সে নাকি কখন্‌ ভোরে
আকাশ হইতে নেমে
খুঁজিতে এসেছে মোরে।
শত শত যুগ ধরি
আলোকের পথ ঘুরে
আজ সে না জানি কোথা
ধরার গোধূলিপুরে।

২১১

যে ফুল এখনো কুঁড়ি
তারি জন্মশাখে
রবি নিজ আশীর্বাদ
প্রতিদিন রাখে।

২১২

যে বন্ধুরে আজও দেখি নাই
তাহারই বিরহে ব্যথা পাই।

২১৩

যে ব্যথা ভুলিয়া গেছি,
পরানের তলে
স্বপনতিমিরতটে
তারা হয়ে জ্বলে।

২১৪

যে ব্যথা ভুলেছে আপনার ইতিহাস
ভাষা তার নাই, আছে দীর্ঘশ্বাস।
সে যেন রাতের আঁধার দ্বিপ্রহর—
পাখি-গান নাই, আছে ঝিল্লিস্বর।

২১৫

যে যায় তাহারে আর
ফিরে ডাকা বৃথা।
অশ্রুজলে স্মৃতি তার
হোক পল্লবিতা।

২১৬

যে রত্ন সবার সেরা
তাহারে খুঁজিয়া ফেরা
ব্যর্থ অন্বেষণ।
কেহ নাহি জানে, কিসে
ধরা দেয় আপনি সে
এসে ততক্ষণ।

২১৭

রজনী প্রভাত হল—
পাখি, ওঠো জাগি,
আলোকের পথে চলো
অমৃতের লাগি।

২১৮

রাখি যাহা তার বোঝা
কাঁধে চেপে রহে।
দিই যাহা তার ভার
চরাচর বহে।

২১৯

রাতের বাদল মাতে
তমালের শাখে;
পাখির বাসায় এসে
'জাগো জাগো' ডাকে।

২২০

রূপে ও অরূপে গাঁথা
এ ভুবনখানি—
ভাব তারে সুর দেয়,
সত্য দেয় বাণী।
এসো মাঝখানে তার,
আনো ধ্যান আপনার
ছবিতে গানেতে যেথা
নিত্য কানাকানি।

২২১

লুকায়ে আছেন যিনি
জীবনের মাঝে
আমি তাঁরে প্রকাশিব
সংসারের কাজে।

২২২

শুষ্ক পথের পুষ্পিত তৃণগুলি
ওই কি স্মরণমূরতি রচিলে ধূলি—
দূর ফাগুনের কোন্ চরণের
সুকোমল অঙ্গুলি!

২২৩

লেখে স্বর্গে মর্তে মিলে
ত্রিপদীর শ্লোক—
আকাশ প্রথম পদে
লিখিল আলোক,
ধরণী শ্যামল পত্রে
বুলাইল তুলি
লিখিল আলোর মিল
নির্মল শিউলি।

২২৪

শরতে শিশিরবাতাস লেগে
জল ভ'রে আসে উদাসী মেঘে।
বরষন তবু হয় না কেন,
ব্যথা নিয়ে চেয়ে রয়েছে যেন।

২২৫

শিকড় ভাবে, 'সেয়ানা আমি,
অবোধ যত শাখা।
ধূলি ও মাটি সেই তো খাঁটি,
আলোকলোক ফাঁকা।'

২২৬

শূন্য ঝুলি নিয়ে হায়
ভিক্ষু মিছে ফেরে,
আপনারে দেয় যদি
পায় সকলেরে।

২২৭

শূন্য পাতার অন্তরালে
লুকিয়ে থাকে বাণী,
কেমন করে আমি তারে
বাইরে ডেকে আনি।
যখন থাকি অন্যমনে
দেখি তারে হৃদয়কোণে,
যখন ডাকি দেয় সে ফাঁকি—
পালায় ঘোমটা টানি।

২২৮

শেষ বসন্তরাত্রে
যৌবনরস রিক্ত করিনু
বিরহবেদনপাত্রে।

২২৯

শ্যামলঘন বকুলবন-
ছায়ে ছায়ে

যেন কী সুর বাজে মধুর
পায়ে পায়ে।

২৩০

শ্রাবণের কালো ছায়া
নেমে আসে তমালের বনে
যেন দিক্‌ললনার
গলিত-কাজল-বরিষনে।

২৩১

সখার কাছেতে প্রেম
চান ভগবান,
দাসের কাছেতে নতি
চাহে শয়তান।

২৩২

সংসারেতে দারুণ ব্যথা
লাগায় যখন প্রাণে
'আমি যে নাই' এই কথাটাই
মনটা যেন জানে।
যে আছে সে সকল কালের,
এ কাল হতে ভিন্ন—
তাহার গায়ে লাগে না তো
কোনো ক্ষতের চিহ্ন।

২৩৩

সত্যেরে যে জানে, তারে
সগর্বে ভাণ্ডারে রাখে ভরি।
সত্যেরে যে ভালোবাসে
বিনম্র অন্তরে রাখে ধরি।

২৩৪

সন্ধ্যাদীপ মনে দেয় আনি
পথচাওয়া নয়নের বাণী।

২৩৫

সন্ধ্যারবি মেঘে দেয়
নাম সই ক'রে।
লেখা তার মুছে যায়,
মেঘ যায় সরে।

২৩৬

সফলতা লভি যবে
মাথা করি নত,
জাগে মনে আপনার
অক্ষমতা যত।

২৩৭

সব-কিছু জড়ো ক'রে
সব নাহি পাই।
যারই মাঝে সত্য আছে
সব যে সেথাই।

২৩৮

সব চেয়ে ভক্তি যার
অস্ত্রদেবতারে
অস্ত্র যত জয়ী হয়
আপনি সে হারে।

২৩৯

সময় আসন্ন হলে
আমি যাব চলে,
হৃদয় রহিল এই শিশু চারাগাছে—
এর ফুলে, এর কচি পল্লবের নাচে
অনাগত বসন্তের
আনন্দের আশা রাখিলাম
আমি হেথা নাই থাকিলাম।

২৪০

সারা রাত তারা
যতই জ্বলে
রেখা নাহি রাখে
আকাশতলে।

২৪১

সিদ্ধিপারে গেলেন যাত্রী,
ঘরে বাইরে দিবারাত্রি
আস্ফালনে হলেন দেশের মুখ্য।
বোঝা তাঁর ওই উষ্ট্র বইল,
মরুর শুষ্ক পথে সইল
নীরবে তার বন্ধন আর দুঃখ।

২৪২

সুখেতে আসক্তি যার
আনন্দ তাহারে করে ঘৃণা।
কঠিন বীর্যের তারে
বাঁধা আছে সম্ভোগের বীণা।

২৪৩

সুন্দরের কোন্ মন্ত্রে
মেঘে মায়া ঢালে,
ভরিল সন্ধ্যার খেয়া
সোনার খেয়ালে।

২৪৪

সে লড়াই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে লড়াই
যে যুদ্ধে ভাইকে মারে ভাই।

২৪৫

সেই আমাদের দেশের পদ্ম
তেমনি মধুর হেসে
ফুটেছে, ভাই, অন্য নামে
অন্য সুদূর দেশে।

২৪৬

সেতারের তারে
ধানশি
মিড়ে মিড়ে উঠে
বাজিয়া।
গোধূলির রাগে
মানসী
সুরে যেন এল
সাজিয়া।

২৪৭

সোনায় রাঙায় মাখামাখি,
রঙের বাঁধন কে দেয় রাখি
পথিক রবির স্বপন ঘিরে।

পেরোয় যখন তিমিরনদী
তখন সে রঙ মিলায় যদি
প্রভাতে পায় আবার ফিরে।
অস্ত-উদয়-রথে-রথে
যাওয়া-আসার পথে পথে
দেয় সে আপন আলো ঢালি।
পায় সে ফিরে মেঘের কোণে,
পায় ফাগুনের পারুলবনে
প্রতিদানের রঙের-ডালি।

২৪৮

স্তব্ধ যাহা পথপার্শ্বে, অচৈতন্য, যা রহে না জেগে,
ধূলিবিলুণ্ঠিত হয় কালের চরণঘাত লেগে।
যে নদীর ক্লান্তি ঘটে মধ্যপথে সিন্ধু-অভিসারে
অবরুদ্ধ হয় পঙ্কভারে।
নিশ্চল গৃহের কোণে নিভৃতে স্তিমিত যেই বাতি
নির্জীব আলোক তার লুপ্ত হয় না ফুরাতে রাতি।
পান্থের অন্তরে জ্বলে দীপ্ত আলো জাগ্রত নিশীথে
জানে না সে আঁধারে মিশিতে।

২৪৯

স্তব্ধতা উচ্ছ্বসি উঠে গিরিশৃঙ্গরূপে,
ঊর্ধ্বে খোঁজে আপন মহিমা।
গতিবেগ সরোবরে থেমে চায় চুপে
গভীরে খুঁজিতে নিজ সীমা।

২৫০

ছিন্ন মেঘ তীব্র তপ্ত
আকাশেরে ঢাকে,
আকাশ তাহার কোনো
চিহ্ন নাহি রাখে।

তপ্ত মাটি তৃপ্ত যবে
হয় তার জলে
নম্র নমস্কার তারে
দেয় ফুলে ফলে।

২৫১

স্মৃতিকাপালিনী পূজারতা, একমনা,
বর্তমানেরে বলি দিয়া করে
অতীতের অর্চনা।

২৫২

হাসিমুখে শুকতারা
লিখে গেল ভোররাতে
আলোকের আগমনী
আঁধারের শেষপাতে।

২৫৩

হিমাদ্রির ধ্যানে যাহা
স্তব্ধ হয়ে ছিল রাত্রিদিন,
সপ্তর্ষির দৃষ্টিতলে
বাক্যহীন শুভ্রতায় লীন,
সে তুষারনির্ঝরিণী
রবিকরস্পর্শে উচ্ছ্বসিতা
দিগ্‌দিগন্তে প্রচারিছে
অন্তহীন আনন্দের গীতা।

২৫৪

হে উষা, নিঃশব্দে এসো,
আকাশের তিমিরগুণ্ঠন
করো উন্মোচন।

হে প্রাণ, অন্তরে থেকে
মুকুলের বাহ্য আবরণ
করো উন্মোচন।
হে চিত্ত, জাগ্রত হও,
জড়ত্বের বাধা নিশ্চেতন
করো উন্মোচন।
ভেদবুদ্ধি-তামসের
মোহযবনিকা, হে আত্মন্,
করো উন্মোচন।

২৫৫

হে তরু, এ ধরাতলে
রহিব না যবে
তখন বসন্তে নব
পল্লবে পল্লবে
তোমার মর্মরধ্বনি
পথিকেরে কবে,
'ভালো বেসেছিল কবি
বেঁচে ছিল যবে।'

২৫৬

হে পাখি, চলেছ ছাড়ি
তব এ পারের বাসা,
ও পারে দিয়েছ পাড়ি—
কোন্ সে নীড়ের আশা?

২৫৭

হে প্রিয়, দুঃখের বেশে
আস যবে মনে
তোমারে আনন্দ ব'লে
চিনি সেই ক্ষণে।

২৫৮

হে বনস্পতি, যে বাণী ফুটিছে
পাতায় কুসুমে ডালে,
সেই বাণী মোর অন্তরে আসি
ফুটিতেছে সুরে তালে।

২৫৯

হে সুন্দর, খোলো তব নন্দনের দ্বার—
মর্তের নয়নে আনো মূর্তি অমরার।
অরূপ করুক লীলা রূপের লেখায়,
দেখাও চিত্তের নৃত্য রেখায় রেখায়।

২৬০

হেলাভরে ধুলার 'পরে
ছড়াই কথাগুলো।
পায়ের তলে পলে পলে
গুঁড়িয়ে সে হয় ধুলো।

উপন্যাস ও গল্প

গল্পগুচ্ছ

গল্পগুচ্ছ

বদনাম

প্রথম

ক্রিং ক্রিং ক্রিং সাইকেলের আওয়াজ ; সদর দরজার কাছে লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন ইন্‌স্‌পেক্টার বিজয়বাবু। গায়ে ছাটা কোর্তা, কোমরে কোমরবন্ধ, হাফ-প্যান্টপরা, চলনে কেজো লোকের দাপট। দরজার কড়া নাড়া দিতেই গিন্নি এসে খুলে দিলেন।

ইন্‌স্‌পেক্টার ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই ঝংকার দিয়ে উঠলেন— "এমন করে তো আর পারি নে, রাত্তিরের পর রাত্তির খাবার আগলে রাখি! তুমি কত চোর ডাকাত ধরলে, সাধু সজ্জনও বাদ গেল না, আর ঐ একটা লোক অনিল মিত্তিরের পিছন পিছন তাড়া করে বেড়াচ্ছ, সে থেকে থেকে তোমার সামনে এসে নাকের উপর বুড়ো আঙুল নাড়া দিয়ে কোথায় দৌড় মারে তার ঠিকানা নেই। দেশসুদ্ধ লোক তোমার এই দশা দেখে হেসে খুন, এ যেন সার্কাসের খেলা হচ্ছে।"

ইন্‌স্‌পেক্টার বললেন, "আমার উপরে ওর নেকনজর আছে কী ভাগ্যিস। ও জেলে খালাস আসামীই বটে, তবু পুলিসে না রিপোর্ট্ করে কোথাও যাবার হুকুম নেই, তাই আমাকে সেদিন চিঠিতে জানিয়ে গেল— 'ইন্‌স্‌পেক্টারবাবু, ভয় পাবেন না, সভার কাজ সেরেই আমি ফিরে আসছি।' কোথায় সভা তার কোনো সন্ধান নেই। পুলিসে ও যেন ভেলকি খেলছে।"

স্ত্রী সৌদামিনী বললে, "শোনো তবে আজ রাত্তিরের খবর দিই, শুনলে তোমার তাক লেগে যাবে। লোকটার কী আস্পর্ধা, কী বুকের পাটা! রাত্তির তখন দুটো, আমি তোমার খাবার আগলে বসে আছি, একটু ঝিমুনি এসেছে। হঠাৎ চমকে দেখি সেই তোমাদের অনিল ডাকাত, আমাকে প্রণাম করে বললে, 'দিদি, আজ ভাইফোঁটার দিন, মনে আছে? ফোঁটা নিতে এসেছি। আমার আপন দিদি এখন চট্টগ্রামে কী সব চক্রান্ত করছে। কিন্তু ফোঁটা আমি চাই, ছাড়ব না, এই বললুম।'··· সত্যি কথা তোমাকে বলব। আমার মনের মধ্যে উছলে উঠল স্নেহ। মনে হল এক রাত্তিরের জন্তে আমি ভাইকে পেয়েছি। সে বললে, 'দিদি, আজ তিনদিন কোনোমতে আধপেটা

খেয়ে বনে জঙ্গলে ঘুরেছি। আজ তোমার হাতের ফোঁটা তোমার হাতের অন্ন নিয়ে আবার আমি উধাও হব।' তোমার জন্যে যে ভাত বাড়া ছিল তাই আমি তাকে আদর করে খাওয়ালুম। বললুম, 'এই বেলা তুমি পালাও, তাঁর আসবার সময় হয়েছে।' লোকটা বললে, 'কোনো ভয় নেই, তিনি আমারই সন্ধানে চিতলবেড়ে গেছেন, ফিরতে অন্তত তিনটে বাজবে। আমি রয়ে বসে তোমার পায়ের ধুলো নিয়ে যেতে পারব।' বলে তোমারই জন্যে সাজা পান টপ করে মুখে নিলে তুলে। তার পরে বললে কিনা— 'ইন্‌স্‌পেক্টারবাবু হাভানা চুরুট খেয়ে থাকেন; তারই একটা আমাকে দাও, আমি খেতে খেতে যাব যেখানে আমার সব দলের লোক আছে; তারা আজ সভা করবে।' তোমার ঐ ডাকাত অনায়াসে, নির্ভয়ে, সেই জায়গাটার নাম আমাকে বলে দিলে।"

ইন্‌স্‌পেক্টারবাবু বললেন, "নামটা কী শুনতে পারি কি।"

সদু বললে, "তুমি এমন প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞেস করলে এর থেকে প্রমাণ হয় তোমার ডাকাত আমাকে চিনেছিল কিন্তু তুমি আজও আমাকে চেনো নি। যা হোক, আমি তাকে তোমার বহু শখের একটি হাভানা চুরুট দিয়েছি। সে জ্বালিয়ে দিব্যি সুস্থ মনে পায়ের ধুলো নিয়ে চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে চলে গেল।"

বিজয় বসে ছিলেন, লাফ দিয়ে উঠে বললেন, "বলো সে কোন্‌ দিকে গেল, কোথায় তাদের সভা হচ্ছে।"

সদু উঠে ঘাড় বেঁকিয়ে বললে, "কী! এমন কথা তোমার মুখ দিয়ে বের হল! আমি তোমার স্ত্রী হয়েছি, তাই বলে কি পুলিসের চরের কাজ করব। তোমার ঘরে এসে আমি যদি ধর্ম খুইয়ে বসি, তবে তুমিই বা আমাকে বিশ্বাস করবে কী করে।"

ইন্‌স্‌পেক্টার চিনতেন তাঁর স্ত্রীকে ভালো করে। খুব শক্ত মেয়ে, এর জিদ কিছুতেই নরম হবে না। হতাশ হয়ে বসে নিশ্বেস ফেলে বললেন, "হায় রে, এমন সুযোগটাও কেটে গেল!"

বসে বসে তাঁর নবাবি ছাঁদের গোঁফ-জোড়াটাতে তা দিতে লাগলেন, আর থেকে থেকে ফুঁসে উঠলেন অধৈর্যে। তাঁর জন্য তৈরি দ্বিতীয় দফার খিচুড়ি তাঁর মুখে রুচল না।

এই গেল এই গল্পের প্রথম পালা।

দ্বিতীয়

সদু স্বামীকে বললে, "কী গো, তুমি যে নৃত্য জুড়ে দিয়েছ! আজ তোমার মাটিতে পা পড়ছে না। ডিস্ট্রিক্ট পুলিসের সুপারিন্টেণ্ডেন্টের নাগাল পেয়েছ নাকি।"

"পেয়েছি বৈকি।"

"কিরকম শুনি।"

"আমাদের যে চর, নিতাই চক্রবর্তী, সে ওদের ওখানে চরগিরি করে। তার কাছে শোনা গেল আজ মোচকাঠির জঙ্গলে ওদের একটা মস্ত সভা হবে। সেটাকে ঘেরাও করবার বন্দোবস্ত হচ্ছে। ভারী জঙ্গল, আমরা আগে থাকতে লুকিয়ে সার্ভেয়ার পাঠিয়ে তন্ন তন্ন করে সার্ভে করে নিয়েছি। কোথাও আর লুকিয়ে পালাবার ফাঁক থাকবে না।"

"তোমাদের বুদ্ধির ফাঁকের মধ্য দিয়ে বড়ো বড়ো ফুটোই থাকবে। অনেক বার তো লোক হাসিয়েছ, আর কেন। এবারে ক্ষান্ত দাও।"

"সে কি কথা সদু। এমন সুযোগ আর পাব না।"

"আমি তোমাকে বলছি, আমার কথা শোনো— ও মোচকাঠির জঙ্গল ও-সব বাজে কথা। সে তোমাদেরই ঘরের আনাচে কানাচে ঘুরছে। তোমাদের মুখের উপরে তুড়ি মেরে দেবে দৌড়, এ আমি তোমাকে বলে দিলুম।"

"তা, তুমি যদি লুকিয়ে তাদের ঘরের খবর দাও, তা হলে সবই সম্ভব হবে।"

"দেখো, অমন চালাকি কোরো না। বোকামি করতে হয় পেট ভরে করো, অনেক বার করেছ, কিন্তু নিজের ঘরের বউকে নিয়ে—"

কথাটা চাপা পড়ল চোখের উপর আঁচল চাপার সঙ্গে।

"সদু, আমি দেখেছি যে এই একটা বিষয়ে তোমার ঠাট্টাটুকুও সয় না।"

"তা সত্যি, পুলিসের ঠাট্টাতেও যে গায়ে দাঁত বসে। এখন কিছু খেয়ে নেবে কি না বলো।"

"তা নেব, সময় আছে, সব একেবারে পাকাপাকি ঠিকঠাক হয়ে গেছে।"

"দেখো, আমি সত্যি কথাই বলব। তোমরা যা কানাকানি কর তা যদি জানতে পারতুম তা হলে ওদের কাছে ফাঁস করে দেওয়া কর্তব্য মনে করতুম।"

"সর্বনাশ, কিছু শুনেছ নাকি তুমি।"

"তোমাদের সংসারে চোখ কান খুলে রাখতেই হয়, কিছু কানে যায় বৈকি।"

"কানে যায়, আর তার পরে?"

"আর তার পরে চণ্ডীদাস বলেছেন 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিয়া দিল প্রাণ'।"

"তোমার ঐ ঠাট্টাতেই তুমি জিতে যাও, কোন্‌টা যে তোমার আসল কথা ধরা যায় না।"

"তা বুঝবার বুদ্ধিই যদি থাকত তবে এই পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টরি কাজ তুমি করতে না। এর চেয়ে বড়ো কাজেই সরকার বাহাদুর তোমাকে লাগিয়ে দিতেন বিশ্বহিতৈষীর পদে, বক্তৃতা দিতে দিতে দেশে-বিদেশে জাল ফেলতে।"

"সর্বনাশ, তা হলে সেই যে মেয়েটির গুজব শোনা যাচ্ছে, সে দেখি আমার আপন ঘরেরই ভিতরকার।"

"ঐ দেখো, কুকুরটা চেঁচিয়ে মরছে। তাকে খাইয়ে ঠাণ্ডা করে আসি।"

ইন্‌স্‌পেক্টারবাবু মহা খাপ্পা হয়ে বললেন, "আমি এক্ষুনি গিয়ে লাগাব ঐ কুকুরটাকে আমার পিস্তলের গুলি।"

সদু তার স্বামীর কাপড় ধরে টেনে বললে, "না, কক্‌খনো তুমি যেতে পারবে না।"

"কেন।"

"তুমি সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই একেবারে টুঁটি ক্যাঁক্ করে চেপে ধরবে। ও বড়ো বদমাইস কুকুর। ও কেবল আমাকেই চেনে।"

"একটা খবর পেয়েছি সদু, সেই অনিল লোকটা হরবোলা, ও সব জন্তুরই নকল করতে পারে। রোজ রাত্রি ছুটোর সময়ে ঐ-যে তোমায় ডাক দিচ্ছে না তাই বা বলি কী করে।"

সদু একেবারে জ্বলে উঠে বললে, "অ্যাঁ, শেষকালে আমাকে সন্দেহ! এই রইল তোমার ঘরকন্না পড়ে, আমি চললুম আমার ভগ্নীপতির বাড়িতে।"

এই বলে সে উঠে পড়ল।

"আরে, কোথায় যাও! ভালো মুশকিল! নিজের ঘরের স্ত্রীকে ঠাট্টা করব না, আমি ঠাট্টার জন্যে পরের ঘরের মেয়ে কোথায় খুঁজে পাই। পেলেই বা শান্তি রক্ষা হবে কী করে।"

ব'লে ওকে জোর করে ধরে বসালেন।

সদু কেবলই চোখ মুছতে লাগল।

"আহা, কী করছ, কাঁদ কেন, সামান্য একটা ঠাট্টা নিয়ে!"

"না, তোমার এই ঠাট্টা আমার সইবে না, আমি বলে রাখছি।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, ব্যস্— রইল, এখন তুমি আরামে নিশ্চিন্ত হয়ে তোমার কুকুরকে খাইয়ে এসো। ও আবার কাটলেট নইলে খায় না, পুডিং না হলে পেট ওর ভরে না। সামান্য কুকুর নিয়ে তুমি অত বাড়াবাড়ি কর কেন আমি বুঝতেই পারি না।"

সদু বললে, "তোমরা পুরুষমানুষ বুঝবে না। পুত্রহীনা মেয়ের বুকে যে স্নেহ জমে

থাকে সে যে-কোনো একটা প্রাণীকে পেলে তাকে বুকের কাছে টেনে নেয়। ওকে একদিন না দেখলে আমার মনে কেবলই ভয় হতে থাকে, কে ওকে কোন্ দিক থেকে ধরে নিয়ে গেল। তাই তো আমি ওকে এত যত্নে ঢেকেঢুকে রাখি।

"কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি সদু, কোনো জানোয়ার এত আদরে বেশি দিন বাঁচতে পারে না।"

"তা, যতদিন বাঁচে ভালো করেই বাঁচুক।"

বিজয়বাবু বিশ্রাম করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে পুলিসের দলবল জুটল, চলল সবাই আলাদা আলাদা রাস্তায় মোচকাঠির দিকে। বহু দূরের পথ, প্রায় রাত পুইয়ে গেল যেতে-আসতে।

পরের দিন বেলা সাতটার সময় মুখ শুকিয়ে ইন্‌স্‌পেক্টার বাড়িতে এসে কেদারাটার উপরে ধপাস করে বসে পড়লেন। বললেন, "সদু, বড়ো ফাঁকি দিয়েছে! তোমার কথাই সত্যি। পুলিসের লোক ঘেরাও করলে বন, সে বনে জনমানব নেই। হৈ হৈ লাগিয়ে দিলে; চীৎকার করে বলতে লাগলে, 'কোথায় আছ বের হও, নইলে আমরা গুলি চালাব।' অনেকগুলো ফাঁকা গুলি চলল, কোনো সাড়া নেই। পুলিসের লোক খুব সাবধানে বনের মধ্যে ঢুকে তল্লাস করলে। তখন ভোর হয়ে এসেছে। রব উঠল, 'ধর্ সেই নিতাইকে, বদমাইসকে।' নিতাইয়ের আর টিকি দেখা যায় না। একখানা চিঠি পাওয়া গেল, কেবল এই কটি কথা—'আসামী নিরাপদ। দিদিকে আমার প্রণাম জানাবেন। অনিল।' দেখো দেখি কী কাণ্ড, এর মধ্যে আবার তোমার নাম জড়ানো কেন, শেষকালে"—

"শেষকালে আবার কী। পুলিসের ঘরের গিন্নি কি আসামীর ঘরের দিদি হতেই পারে না। সংসারের সব সম্বন্ধই কি সরকারী থানের ছাপ-মারা। আমি আর কিছু বলব না। এখন তুমি একটু শোও, একটু ঘুমোও।"

ঘুম ভাঙল তখন বেলা দুপুর। স্নান করে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিজয় বসে বসে পান চিবোতে চিবোতে বললেন, "লোকটার চালাকির কথা কী আর তোমাকে বলব। ও দলবল নিয়ে চার দিকে প্রোপাগাণ্ডা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে, ও ভোর রাত্তিরে কুম্ভক যোগ করে শূন্যে আসন করে— এটা নাকি অনেকের স্বচক্ষে দেখা। গ্রামের লোকের বিশ্বাস জন্মিয়ে দিয়েছে— ও একজন সিদ্ধপুরুষ, বাবা ভোলানাথের চিহ্নিত। ওর গায়ে হাত দেবে হিন্দুর ঘরে আজ এমন লোক নেই। তারা আপন ঘরের দাওয়ায় ওর জন্ত খাবার রেখে দেয়— রীতিমত নৈবেদ্য। সকাল-বেলা উঠে দেখে তার

কোনো চিহ্ন নেই। হিন্দু পাহারাওয়ালারা তো ওর কাছে ঘেঁষতেই চায় না। একজন দারোগা সাহস করে হিজলাকান্দির ডাকার পরে ওকে গ্রেপ্তার করেছিল। হপ্তা খানেকের মধ্যে তার স্ত্রী বসন্ত হয়ে মারা গেল। এর পরে আর প্রমাণের অভাব রইল না। সেইজন্য এবারে যখন মোচকাঠিতে ওর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না, পাহারাওয়ালারা ঠিক করলে যে ও যখন খুশি আপনাকে লোপ করে দিতে পারে। ও তার একটি সাক্ষীও রেখে গেছে— একটা জলা জায়গায় পায়ের দাগ দেখা গেল, দু-হাত অন্তর এক-একটি পদক্ষেপ— দেড় হাত লম্বা। হিন্দু পাহারাওয়ালারা সেই পায়ের দাগের উপরে ভক্তিভরে লুটিয়ে পড়ে আর-কি! এই লোককে সম্পূর্ণ মন দিয়ে ধরপাকড় করা শক্ত হয়ে উঠেছে। ভাবছি মুসলমান পাহারাওয়ালা আনাব, কিন্তু দেশের হাওয়ার গুণে মুসলমানকে যদি ছোঁয়াচ লাগে তবে আরো সর্বনাশ হবে। খবরের কাগজওয়ালারা মোচকাঠিতে সংবাদদাতা পাঠাতে শুরু করলে। কোন্ পলাতকার এই লম্বা পা, তা নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা হল। এখন এ লোকটাকে কী করা যায়। এই কিছুদিন জেলে খালাস পেয়েছিল, সেই সুযোগে দেশের হাওয়ায় যেন গাঁজার ধোঁওয়া লাগিয়ে দিলে। এ দিকে পিছনে প্রোপাগাণ্ডা চলছেই, নানা-রকম ছায়া নানা জায়গায় দেখা যায়। এক জায়গায় মহাদেবের একগাছি চুল পাওয়া গেছে বলে আমার ভক্ত কনেস্টবল অত্যন্ত গদ্গদ হয়ে উঠেছে। সেটা যে শণের দড়ি সে কথা বিচার করবার সাহসই হল না। ক'দিনের মধ্যে চারদিকে একেবারে গুজবের ঝড় উঠে গেল। মোচকাঠিতে ঐ পায়ের চিহ্নের উপরে মন্দির বানাবে ব'লে একজন ধনী মাড়োয়ারি ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে বসেছে। একজন ভক্ত পাওয়া গেল, তিনি ছিলেন এক সময়ে ডিস্ট্রিক্ট্ জজ। তাঁর কাছে বসে অনিল-ডাকাত শিবসংহিতার ব্যাখ্যা শুরু করে দিলে— লোকটার পড়াশুনা আছে। এমনি করে ভক্তি ছড়িয়ে যেতে লাগল। এবারকার জেলের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে পর ওর নামে সাক্ষী জোগাড় করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। অনিল-ডাকাতকে নিয়ে এই তো আমার এক মস্ত সমস্যা বাধল।

"সদু, তুমি জান বোধ হয় এ দিকে আর-এক সংকট বেধেছে। আমার মামাতো ভাই গিরিশ সে হাতিবাঁধা পরগনায় পুলিসের দারোগাগিরি করে। কর্তব্যের খাতিরে একজন কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলের হাতে হাতকড়ি লাগিয়েছিল। সেই অবধি গ্রামের লোকেরা তাকে জাতে ঠেলবার মন্ত্রণা করছে। এ দিকে তার মেয়ের বিয়ের বয়স পেরিয়ে যায়, যে পাত্রই জোটে তাকে ভাঙিয়ে দেয় গ্রামের লোক। পাত্র যদি জোটে তবে পুরুত জোটে না। দূর গ্রাম থেকে পুরুতের সন্ধান পেল, কিন্তু হঠাৎ দেখা

গেল সে কখন দিয়েছে দৌড়। এবারে একটা কিনারা পাওয়া গেছে। বৃন্দাবন থেকে এক বাবাজি এসে হঠাৎ আমার হেড কনেস্টবলের বাড়িতে আড্ডা দিলে, সদ্ব্রাহ্মণ খাইয়ে-দাইয়ে আমরা সবাই মিলে তাঁকে খুশি করাচ্ছি। তাঁকে রাজি করানো গেছে। এখন গ্রামের লোকের হাত থেকে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সদু, তুমিও এ কাজে সাহায্য করো।"

"ওমা, করব না তো কী! ও তো আমার কর্তব্য। আহা, তোমাদের গিরিশের মেয়ে, আমাদের মিনু। সে তো কোনো অপরাধ করে নি। তার বিয়ে তো হওয়াই চাই। আনো তোমার বৃন্দাবনবাসীকে, আমি জানি ঐ-সব স্বামীজিদের কী করে আদর-যত্ন করতে হয়।"

এলেন বৃন্দাবনবাসী। বুকে লুটিয়ে পড়ছে সাদা দাড়ি, নারদ মুনির মতো। সদু ভক্তিতে গদগদ হয়ে পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল, পাড়ার লোক তার প্রণামের ঘটা দেখে হেসে বাঁচে না। প্রবীণা প্রতিবেশিনী মুচকে হেসে বললেন, "সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রতি তোমার এত ভক্তি হঠাৎ জেগে উঠল কী করে।"

সদু হেসে বললে, "দরকার পড়লেই ভক্তি উথলে ওঠে। বাবাঠাকুরেরা পায়ের ধুলো নিলে গলে যান। মিনুর বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত আমার ভক্তিটাকে টিকিয়ে রাখতে হবে।"

ঘন ঘন শাঁখ বেজে উঠল, উলুর সঙ্গে বর আসার শব্দ এল চার দিক থেকে। কনেকে একটি চেলী-জড়ানো পুঁটুলির মতো করে এয়োর দল নিয়ে এল ছাঁদনাতলায়। নির্বিঘ্নে কাজ সমাধা হল। বর কনে বাবাজিকে প্রণাম করে অন্দরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল, তখন বাবাজি আশীর্বাদ শেষ করে বিজয়বাবুকে আর সভার সবাইকে বললেন, "মশায়, আমার খবরটা এবারে দিয়ে যাই। পুরুতের কাজ আমার পেশা নয়। আমার যা পেশা সে আপনার সমস্ত দারোগা-কনেস্টবলদের ভালো করেই জানা আছে। এখন আপনাদের পুরুতের দক্ষিণা দেবার সময় এসেছে। সে পর্যন্ত আমার আর সবুর সইবে না। অতএব আপনারা বিদায় করবার আগেই আমি বিদায় নিলেম।"

এই ব'লে সন্ন্যাসী সকলের সামনে দাড়ি গোঁফ টেনে ফেলে তিন লাফে চণ্ডী-মণ্ডপের পাঁচিল ডিঙিয়ে উধাও।

সভার লোকেরা হাঁ করে চেয়ে রইল। বিজয়বাবুর মুখে কথা নেই।

বিয়ের ভোজ শেষ হয়ে গেছে, পাড়াপড়শী গেছে যে যার ঘরে। বরবধূ বাসর

ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছে। সদু স্বামীকে বললে, "তুমি ভাবছ কী, যেমন করে হোক কাজ তো উদ্ধার হয়ে গেছে। সন্ন্যাসী উধাও হয়ে গিয়ে তোমাদেরই তো কাজ হালকা করে দিয়ে গেল। এখন বাসিবিয়ের আয়োজন করতে হবে, চোর-ডাকাতের পিছনে সময় নষ্ট কোরো না। কিন্তু সেই মেয়েটির কোনো খোঁজ পেলে কি।"

"দুঃখের কথা বলব কী, এখন একটি মেয়ের জায়গায় রোজ আমার থানায় সামনে পঁচিশটি মেয়ের আমদানি হচ্ছে চাল কলা নৈবেদ্য নিয়ে। এখন কোন্‌টি যে কে খোঁজ করা শক্ত হয়ে উঠল।"

"সে কী, তোমার দরজায় এত মেয়ের আমদানি তো ভালো নয়। ওখানে তুমি কি বাবাজি সেজে বসেছ নাকি।"

"না, লোকটার চালাকির কথা শোনো একবার, অবাক হবে। একদিন হঠাৎ কিষণলাল এসে খবর দিলে আফিসের সামনের রাস্তায় একটি পাথর বেরিয়েছে। তার গায়ে পাড়ার মেয়েরা এসে সিঁদুর লাগাচ্ছে, চন্দন মাখাচ্ছে; কেউ চাইতে এসেছে সন্তান, কেউ স্বামীসৌভাগ্য, কেউ আমারই সর্বনাশ। এই ভিড় পরিষ্কার করতে গেলেই খবরের কাগজে মহা হাঁউমাউ করে উঠবে যে এইবার হিন্দুর ধর্ম গেল। আমার হিন্দু পাহারাওয়ালারাও তাকে পাঁচ সিকা করে প্রণামী দেয়। ব্যাবসা খুব জমে উঠল। টাকাগুলো কে আদায় করছে অবশেষে সেটার দিকে চোখ পড়ল। একদিন দেখা গেল— না আছে পাথরটা, না আছে টাকার থালা। আর সেই পাগলা গোছের লোকটা সেও তার সাজ বদলে কোথায় যে গা-ঢাকা দিল সে সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত গুজব শোনা যেতে লাগল। মুশকিল এই— হিন্দুধর্মের পাহারাওয়ালারা হাংগার-স্ট্রাইকের ভয় দেখাতে থাকে। এই নিয়ে যদি শান্তিভঙ্গ হয় তা হলে আবার সকলের কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে প্রাণ বেরিয়ে যাবে। এখন কোন্‌ দিক সামলাই! আর-এক উৎপাত ঘটেছে, একদিন ছেদীলাল এসে পড়ল পুলিসের থানার দরজায় দড়াম করে। হাঁউমাউ করে বললে যে, ভোলানাথের একশিঙওয়ালা ভূতীবাবা ষাঁড়ের মতো গর্জাতে গর্জাতে তাকে এসে তাড়া করেছিল। সে তো কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে সন্ন্যাসী হয়ে। গাছতলায় বসে বসে গাঁজা খাচ্ছে। এখন লোক পাওয়া শক্ত হয়েছে। আর ওর সঙ্গে আমরা পেরে উঠি নে, কেননা মেয়েরা ওর সহায়। ও তাদের সব বশ করে নিয়েছে।"

সদু হেসে বললে, "ওর গল্প যতই শুনি আমারই তো মন টলমল করে ওঠে।"

"দেখো, সর্বনাশ কোরো না যেন।"

"না, তোমার ভয় নেই, আমার এত সৌভাগ্য নয়। মেয়েদের চাতুরী দিয়ে ঘরকন্না

চালাতে হয়, সেটা দেশের সেবায় লাগালে ঐ স্ত্রীবুদ্ধি ষোলো-আনা কাজে লাগতে পারে। পুরুষরা বোকা, তারা আমাদের বলে সরলা, অবলা— এই নামের আড়ালেই আমরা সাধ্বীপনা করে থাকি আর ঐ খোকার বাবারা মুগ্ধ হয়ে যায়। আমরা অবলা অখলা, কুকুরের গলায় শিকলের মতো এই খ্যাতি আমরা গলায় পরে থাকি, আর তোমরা আমাদের পিছন পিছন টেনে নিয়ে বেড়াও। তার চেয়ে সত্যি কথা বল-না কেন— সুযোগ পেলে তোমরাও ঠকাতে জান, সুযোগ পেলে আমরাও ঠকাতে জানি। আমরা এত বোকা নই যে শুধু ঠকবই আর ঠকাব না। বুড়িগুলো বলে থাকে 'সত্ বড়ো লক্ষ্মী,' অর্থাৎ রাঁধতে বাড়তে ঘর নিকোতে সতুর ক্লান্তি নেই। এইটুকু বেড়ার মধ্যে আমাদের সুনাম। দেশের লোক না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে আর যাঁরা মানুষের মতো মানুষ তাঁদের হাতে হাতকড়ি পড়ছে, আমরা রেঁধে বেড়ে বাসন মেজে করছি সতীসাধ্বীগিরি! আমরা অলক্ষ্মী হয়ে যদি কাজের মতন একটা-কিছু করতে পারি তা হলে আমাদের রক্ষা, এই আমি তোমাকে বলে রাখলুম। আমাদের ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে দেখো তো দেখবে— হয়তো আছে কোথাও কিছু কলঙ্কের চিহ্ন, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই আছে জ্বলন্ত আগুনের দাগা। নিছক আরামের খেলার দাগ নয়। মেরেছি, কিন্তু মরেছি তার অনেক আগে। সংসারে মেয়েরা দুঃখের কারবার করতেই এসেছে। সেই দুঃখ কেবল আমি ঘরকন্নার কাজে ফুঁকে দিতে পারব না। আমি চাই সেই দুঃখের আগুনে জ্বালিয়ে দেব দেশের যত জমানো আঁস্তাকুড়। লোকে বলবে না সতী, বলবে না সাধ্বী। বলবে দজ্জাল মেয়ে। এই কলঙ্কের-তিলক-আঁকা ছাপ পড়বে তোমার সতুর কপালে, আর তুমি যদি মানুষের মতো মানুষ হও তবে তার গুমোর বুঝতে পারবে।"

"তোমার মুখে ওরকম কথা আমি ঢের শুনেছি, তার পরে দেখেছি সংসার যেমন চলে তেমনি চলছে। মাঝে মাঝে মন খোলসা করা দরকার, তাই শুনি আর হাভানা চুরুট টানি।"

"যাই হোক-না কেন, আমি জানি আমি যাই করি শেষ পর্যন্ত তুমি আমাকে ক্ষমা করবেই আর সেই ক্ষমাই যথার্থ পুরুষমানুষের লক্ষণ, যেন শ্রীকৃষ্ণর বুকে ভৃগুর পায়ের চিহ্ন। তোমার সেই ক্ষমার কাছেই তো আমি হার মেনে আছি। মিথ্যা স্তব করব না— পুলিসের কাজে তোমার খবরদারির শেষ নেই, কিন্তু আমাকে তুমি চোখ বুজে বিশ্বাস করে এসেছ, যদিও সব সময়ে সেই বিশ্বাসের যোগ্যতা আমার ছিল না। আমি এইজন্যই তোমাকে ভক্তি করি, আমার ভক্তি শাস্ত্রমতে গড়া নয়।"

"সত্ আর কেন, পেট ভরে যা বলবার সে তো বলে গেলে, এখন তোমার ঐ

কুকুরটাকে খাওয়াতে যাও, বড্ড চেঁচাচ্ছে— ও আমাকে ঘুমোতে দেবে না। আমি ভাবছি আমাকে এবারে ছুটির দরখাস্ত দিতে হবে।"

সদু হেসে বললে, "তুমি ইন্‌স্‌পেক্টরি ছেড়ে দিয়ে গাছতলায় বাবাজি সেজে বোসো, তোমার আয় যাবে বেড়ে, আমিও তার কিছু বখরা পাব।"

"সব তাতেই তুমি যেমন নিশ্চিন্ত হয়ে থাক, আমার ভালো লাগে না।"

"ও আমার স্বভাব, তোমার খুনী ডাকাতদের জন্য আমি চিন্তা করতে পারব না। একা তোমার চিন্তাতেই আমার দিন চলে গেল। সমস্ত দেশের লোকের হাসিতে যোগ না দিয়ে আমি করব কী। তোমার এই পুলিসের থানায় স্বদেশীদের নিয়ে অনেক চোখের জল বয়ে গেছে, এত দিনে লোকেরা একটু হেসে বাঁচছে। এইজন্যই অনিলবাবুকে সবাই দু হাত তুলে আশীর্বাদ করছে, তুমি ছাড়া। আমি দুশ্চিন্তার ভান করব কী করে বলো দেখি।"

তৃতীয়

"দেখো, সদু, এবারে আমি তোমার শরণাপন্ন।"

সদু বললে, "কবে তুমি আমার শরণাপন্ন নও, শুনি। এইজন্য তো তোমাকে সবাই স্ত্রৈণ বলে। দু জাতের স্ত্রৈণ আছে। এক দল পুরুষ স্ত্রীর জোরের কাছে হার না মেনে থাকতে পারে না, তারা কাপুরুষ। আর-এক দল আছে তারা সত্যিকার পুরুষ, তাই তারা স্ত্রীর কাছে অসংশয়ে হার মেনেই নেয়। তারা অবিশ্বাস করতে জানেই না, কেননা তারা বড়ো। এই দেখো-না আমার কত বড়ো সুবিধে— তোমাকে যখন খুশি যেমন খুশি ঠকাতে পারি, তুমি চোখ বুজে সব নাও।"

"সদু, কী পষ্ট পষ্ট তোমার কথাগুলি গো।"

"সে তোমারই গুণে কর্তা, সে তোমারই গুণে।"

"এবারে কাজের কথাটা শুনে নাও— ও-সব আলোচনা পরে হবে। এবারে একটা সরকারী কাজে তোমার সাহায্য চাই। নইলে আমার আর মান থাকে না। পুলিসের লোকরা নিশ্চয়ই জেনেছে এই কাছাকাছি কোথায় এক জায়গায় একজন মেয়ে আছে। সেই এখানকার খবর কেমন করে পায় আর ওকে সাবধানে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। সে আচ্ছা জাঁহাবাজ মেয়ে। ওরা বলছে সে এই পাড়ারই কোনো বিধবা মেয়ে। যেমন করে হোক তার সন্ধান নিয়ে তার সঙ্গে তোমাকে ভাব করতে হবে।"

সদু বললে, "শেষকালে আমাকেও তোমাদের চরের কাজে লাগাবে! আচ্ছা,

তাই হবে, মেয়েকে দিয়ে মেয়ে ধরার কাজে লাগা যাবে, নইলে তোমার মুখ রক্ষা হবে না। আমি এই ভার নিলুম। দুদিনের মধ্যে সমস্ত রহস্য ভেদ হয়ে যাবে।"

"পরশু হল শিবরাত্রি, খবর পেয়েছি অনিল-ডাকাত সিদ্ধেশ্বরী তলার মন্দিরে জপতপ করে রাত কাটাবে। তার মনে তো ভয়-ডর কোথাও নেই। এ দিকে ও ভারি ধার্মিক কিনা, ও মেয়েটা থাকবে তার কিরকম তান্ত্রিক মতের স্ত্রী হয়ে।"

"তোমরা পুলিসের লোক আড়ালে আড়ালে থেকো, আমি ধরে দেব। কিন্তু রাত্রি একটার আগে যেয়ো না। তাড়াহুড়ো করলে সব ফসকে যাবে।"

অমাবস্যার রাত, একটা বেজেছে। পায়ের-জুতো-খোলা দুটো একটা লোক অন্ধকারে নিঃশব্দে এ দিকে ও দিকে বেড়াচ্ছে। বিজয়বাবু মন্দিরের দরজার কাছে।

একজন চুপিচুপি তাঁকে ইশারা করে ডাকলে, আস্তে আস্তে বললে, "সেই ঠাকরুনটি আজ মন্দিরের মধ্যে এসেছেন তাতে সন্দেহমাত্র নেই। তিনি বিখ্যাত কোনো যোগিনী ভৈরবী। দিনের বেলা কারো চোখেই পড়েন না। রাত্রি একটার পর শুনেছি নটরাজের সঙ্গে তাঁর নৃত্য। একটা লোক দৈবাৎ দেখেছিল, সে পাগল হয়ে বেড়াচ্ছে চারি দিকে। হুজুর, আমরা মন্দিরে গিয়ে ঐ ঠাকরুনের গায়ে হাত দিতে পারব না। এমন-কি, চোখে দেখতেও পারব না— এ বলে রাখছি। আমরা ব্যারাকে ফিরে যাব ঠিক করেছি। আপনি একলা যা পারেন করবেন।"

একে একে তারা সবাই চলে গেল। নিঃশব্দ— বিজয়বাবু যত বড়ো একেলে লোক হোন না কেন, তাঁর যে ভয় করছিল না এ কথা বলা যায় না। তাঁর বুক দুর্‌দুর্‌ করছে তখন। দরজার কাছ থেকে মেয়েলি গলায় গুন্‌ গুন্‌ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে:

ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং!

বিজয়ের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগল। ভাবলেন কী করা যায়। এক সময়ে সাহসে ভর করে দিলেন দরজায় ধাক্কা। ভাঙা দরজা খুলে গেল। ভিতরে একটি মাটির প্রদীপ মিট্‌মিট্‌ করে জ্বলছে, দেখলেন শিবলিঙ্গের সামনে তাঁর স্ত্রী জোড়হাত করে বসে, আর অনিল এক পাশে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে। নিজের স্ত্রীকে দেখে সাহস হল মনে, বললেন— "সদু, অবশেষে তোমার এই কাজ!"

"হ্যাঁ, আমিই সেই মেয়ে যাকে তোমরা এতদিন খুঁজে বেড়াচ্ছ। নিজের পরিচয় দেব বলেই আজ এসেছি এখানে। তুমি তো জান আমাদের দেশে দৈবাৎ দুই-একজন সত্যিকার পুরুষ দেখা যায়। তোমাদের একমাত্র চেষ্টা এঁদের একেবারে নির্জীব করে দিতে। আমরা দেশের মেয়েরা যদি এই-সব সুসন্তানদের আপন প্রাণ দিয়ে রক্ষা না

করি তবে আমাদের নারীধর্মকে ধিক্। তোমার অগোচরে নানা কৌশলে এতদিন এই কাজ করে এসেছি। যাঁর কোনো হুকুম কখনো ঠেলতে পারি নি, সকলের চেয়ে কঠিন আজকের এই হুকুম— এও আমাকে মানতে হবে। এই আমার দেবতাকে আজ তোমার হাতেই ছেড়ে দিয়ে আমি সরে দাঁড়াব। জানি আমার চেয়ে বড়ো রক্ষক তাঁর মাথার উপরে আছেন। দুদিন পরেই সমাজের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কল্কিকম নিন্দায় ভরে উঠবে তা আমি জানি। এই লাঞ্ছনা আমি মাথায় করে নেব। কখনো মনে কোরো না চাতুরী করে তোমার স্ত্রীকে বাঁচিয়ে এই মানুষকে আলাদা নালিশে জড়াতে পারবে। আমি চিরদিন তাঁর পিছন পিছন থেকে শাস্তির শেষ পালা পর্যন্ত যাব। তুমি সুখে থেকো। তোমার ভয় নেই, ইচ্ছা করলেই তুমি নূতন সঙ্গিনী পাবে। আর যা কর আমাকে দয়া কোরো না। আমার চেয়ে অনেক বড়ো যাঁরা তাঁদের তুমি তা কর নি। সেই নিষ্ঠুরতার অংশ নিয়ে মাথা উঁচু করেই আমি তোমার কাছ থেকে বিদায় নেব। প্রাণপণে তোমার সেবা করেছি ভালোবেসে, প্রাণপণে তোমাকে বঞ্চনা করেছি কর্তব্যবোধে, এই তোমাকে জানিয়ে গেলুম। এর পরে হয়তো আর সময় পাব না।”

সদুর কথায় বাধা দিয়ে অনিল বলে উঠল, “বিজয়বাবু, আজ আমি ধরা দেব বলেই স্থির করে এসেছিলুম। আমার আর কোনো ভাবনা নেই। আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। আপনি সদুর কথায় ভড়কাবেন না। ও একটি আসাধারণ মেয়ে, জন্মেছে আমাদের দেশে, একেবারে খাপছাড়া সমাজে। খুব ভালো করেই চিনেছি আমি ওকে, চিনি বলেই আপনাকে বলছি ও নিষ্কলঙ্ক। যে কঠিন কর্তব্য আমরা মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়েছি সেখানে ভালোবাসার কোনো ফাঁক নেই, আছে কেবল আপনাকে জলাঞ্জলি দেওয়া। বিশ্বসংসারের লোক সদু সম্বন্ধে কিছু জানবে না, আপনার কোনো ভয় নেই। ওকে নিয়ে আপনি মন্দিরের সুরঙ্গ পথ দিয়ে বাড়ি ফিরুন। আর আমি অন্য দিক থেকে পুলিসের হাতে এখুনি ধরা দিচ্ছি। এইসঙ্গে একটি কথা আপনাদের জানিয়ে রাখি, আমাকে আপনারা বাঁধতে পারবেন না। রবিঠাকুরের একটা গান আমার কণ্ঠস্থ—

আমারে বাঁধবি তোরা সেই বাঁধন কি
তোদের আছে!”

হঠাৎ গেয়ে উঠল বিদেশী গলায়, মন্দিরের ভিত থর থর করে কেঁপে উঠল গলার জোরে। অবাক হয়ে গেলেন ইন্‌স্‌পেক্টারবাবু।

“এই গান অনেক বার গেয়েছি, আবার গাইব, তার পরে চলব আফগানিস্থানের

রাস্তা দিয়ে, যেমন করে হোক পথ করে নেব। আপনাদের সঙ্গে এই আমার কথা রইল। আর পনেরো দিন পরে খবরের কাগজে বড়ো বড়ো অক্ষরে বের হবে, অনিল বিপ্লবী পলাতক। আজ প্রণাম হই।"

হঠাৎ বিজয়ের হাত কেঁপে উঠল, টর্চ্‌টা মাটিতে পড়ে গেল হাত থেকে। মুখের উপরে দুই হাত চেপে বসে পড়লেন। প্রদীপটাও দমকা বাতাসে শেষ হয়ে গেছে আগেই।

১১-২১ জুন ১৯৪১ আষাঢ় ১৩৪৮

প্রগতিসংহার

এই কলেজে ছেলেমেয়েদের মেলামেশা বরঞ্চ কিছু বাড়াবাড়ি ছিল। এরা প্রায় সবাই ধনী ঘরের— এরা পয়সার ফেলাছড়া করতে ভালোবাসে। নানারকম বাজে খরচ করে মেয়েদের কাছে দরাজ হাতের নাম কিনত। মেয়েদের মনে ঢেউ তুলত, তারা বুক ফুলিয়ে বলত— 'আমাদেরই কলেজের ছেলে এরা'। সরস্বতী পুজো তারা এমনি ধুম করে করত যে, বাজারে গাঁদা ফুলের আকাল পড়ে যেত। এ ছাড়া চোখ-টেপাটেপি ঠাট্টা তামাসা চলেইছে। এই তাদের মাঝখানে একটা সংঘ তেড়েফুঁড়ে উঠে মেলামেশা ছারখার করে দেবার জো করলে।

সংঘের হাল ধরে ছিল সুরীতি। নাম দিল 'নারীপ্রগতিসংঘ'। সেখানে পুরুষের ঢোকবার দরজা ছিল বন্ধ। সুরীতির মনের জোরের ধাক্কায় এক সময়ে যেন পুরুষ-বিদ্রোহের একটা হাওয়া উঠল। পুরুষরা যেন বেজাত, তাদের সঙ্গে জলচল বন্ধ। কদর্য তাদের ব্যবহার।

এবার সরস্বতী পুজোতে কোনো ধুমধাম হল না। সুরীতি ঘরে ঘরে গিয়ে মেয়েদের বলেছে জাঁক-জমকের হুল্লোড়ে তারা যেন এক পয়সা না দেয়। সুরীতির স্বভাব খুব কড়া, মেয়েরা তাকে ভয় করে। তা ছাড়া নারীপ্রগতিসংঘে দিব্যি গালিয়ে নিয়েছে যে-কোনো পালপার্বণে তারা কিছুমাত্র বাজে খরচ করতে পারবে না। তার বদলে যাদের পয়সা আছে পূজা-আর্চায় তারা যেন দেয় গরিব ছাত্রীদের বেতনসাহায্য বাবদ কিছু-কিঞ্চিৎ।

ছেলেরা এই বিদ্রোহে মহা খাপা হয়ে উঠল। বললে, 'তোমাদের বিয়ের সময় আমরা গাধার পিঠে বরকে চড়িয়ে যদি না নিয়ে আসি, তবে আমাদের নাম নেই।'

মেয়েরা বললে, 'এরকম জুড়ি গাধা, একটার পিঠে আর-একটা, আমাদের সংসারে কোনো কাজে লাগবে না। সে জুটি আমরা তোমাদের দরবারে গলায় মালা দিয়ে আর রক্তচন্দন কপালে পরিয়ে পাঠিয়ে দেব। তাদের আদর করে দলে টেনে নিয়ো।'

যাই হোক, এ কলেজে ছেলেতে মেয়েতে একটা ছাড়াছাড়ি হবার জো হল। ছেলেরা কেউ কাছে এসে কথা বলতে গেলেই মেয়েরা নাক তুলে বলতে আরম্ভ করলে 'এ বড্ড গায়ে-পড়া'। ছেলেদের কেউ কেউ মেয়েদের পাশে বসে সিগারেট খেত— এখন সেটা তাদের মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে ফেলে দেয়। ছেলেদের উপর রূঢ় ব্যবহার

করা ছিল যেন মেয়েদের আত্মগরিমা। কোনো ছেলে যাদে মেয়েদের জন্ত জায়গা করে দিতে এগিয়ে এলে বিদ্রোহিণী বলে উঠত— 'এইটুকু অনুগ্রহ করবার কী দরকার ছিল! ভিড়ের মধ্যে আমরা কারো চেয়ে স্বতন্ত্র অধিকারের সুযোগ চাই নে।'

ওদের সংঘের একটা বুলি ছিল— ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে বুদ্ধিতে কম। দৈবাৎ প্রায়ই পরীক্ষার ফলে তার প্রমাণ হতে থাকত। কোনো পুরুষ যদি পরীক্ষায় তাদের ডিঙিয়ে প্রথম হত, তা হলে সে একটা চোখের জলের ব্যাপার হয়ে উঠত। এমন-কি, তার প্রতি বিশেষ পক্ষপাত করা হয়েছে, স্পষ্ট করে এমন নালিশ জানাতেও সংকোচ করত না।

আগে ক্লাসে যাবার সময়ে মেয়েরা খোঁপায় দুটো ফুল গুঁজে যেত, বেশভূষায় কিছু-না-কিছু বাহার করত। এখন তা নিয়ে এদের সংঘে ধিক্ ধিক্ রব ওঠে। পুরুষের মন ভোলাবার জন্তে মেয়েরা সাজবে, গয়না পরবে, এ অপমান মেয়েরা অনেকদিন ইচ্ছে করে মেনে নিয়েছে, কিন্তু আর চলবে না। পরনে মেরজা খদ্দর চলিত হল। সুরীতি তার গয়নাগুলো দিদিমাকে দিয়ে বললে—'এগুলো তোমার দান-খয়রাতে লাগিয়ে দিয়ো, আমার দরকার নেই, তোমার পুণ্যি হবে।' বিধাতা যাকে যেরকম রূপ দিয়েছেন তার উপরে রঙ চড়ানো অসভ্যতা। এ-সমস্ত মধ্য আফ্রিকার শোভা পায়। মেয়েরা যদি তাকে বলত— 'দেখ্ সুরীতি, অত বাড়াবাড়ি করিস নে। রবি ঠাকুরের চিত্রাঙ্গদা পড়েছিস তো? চিত্রাঙ্গদা লড়াই করতে জানত, কিন্তু পুরুষের মন ভোলাবার বিদ্যে তার জানা ছিল না, সেখানেই তার হার হল।' শুনে সুরীতি জলে উঠত, বলত— 'ও আমি মানি নে। এমন অপমানের কথা আর হতে পারে না।'

এদের মধ্যে কোনো কোনো মেয়ের আত্মবিদ্রোহ দেখা দিল। তারা বলতে লাগল, মেয়ে-পুরুষের এইরকম ঘেঁষাঘেষি তফাৎ করে দেওয়া এখনকার কালের উলটো চাল। বিরুদ্ধবাদিনীরা বলত, পুরুষেরা যে বিশেষ করে আমাদের সমাদর করবে, আমাদের চৌকি এগিয়ে দেবে, আমাদের রুমাল কুড়িয়ে দেবে, এই তো যা হওয়া উচিত। সুরীতি তাকে অপমান বলবে কেন। আমরা তো বলি এই আমাদের সম্মান। পুরুষদের কাছ থেকে আমাদের সেবা আদায় করা চাই। একদিন ছিল যখন মেয়েরা ছিল সেবিকা, দাসী। এখন পুরুষেরা এসে মেয়েদের স্তবস্তুতি করে— এই সমাদর, সুরীতি যাই বলুক, আমরা ছাড়তে পারব না। এখন পুরুষ আমাদের দাস।'

এইরকম গোলমাল ভিতরে ভিতরে জেগে উঠল সকলের মধ্যে। বিশেষ করে সলিলার এই নীরস ক্লাসের রীতি ভালো লাগত না। সে ধনী ঘরের মেয়ে, বিরক্ত হয়ে

চলে গেল দার্জিলিঙে ইংরেজি কলেজে। এমনি করে দুটো-একটি মেয়ে খসে যেতেও শুরু করেছিল, কিন্তু সুরীতির মন কিছুতেই টলল না।

মেয়েদের মধ্যে, বিশেষত সুরীতির, এই গুমর ছেলেদের অসহ্য হয়ে উঠল। তারা নানারকম করে ওর উপর উৎপাত শুরু করলে। গণিতের মাস্টার ছিলেন খুব কড়া। তিনি কোনোরকম ছ্যাবলামি সহ্য করতেন না। তাঁরই ক্লাসে একদিন মহা গোলমাল বেধে গেল। সুরীতির ডেস্কে তার বাপের হাতের অক্ষরে লেখা লেফাফা— খুলবামাত্রই তার মধ্য থেকে একটা আরসোলা ফর্‌ফর্‌ করে বেরিয়ে এল। মহা চেঁচামেচি বেধে গেল। সে জন্তুটা ভয় পেয়ে পাশের মেয়ের খোঁপার উপরে আশ্রয় নিলে। সে এক বিষম হাঁউমাউ কাণ্ড। গণিতের মাস্টার বেণীবাবু খুব কড়া কটাক্ষপাত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু আরসোলার ফর্‌ফরানির উপরে তাঁর শাসন খাটবে কী করে। সেই চেঁচামেচিতে ক্লাসের মানরক্ষা আর হয় না। আর-একদিন— সুরীতির নোট বইয়ের পাতায় পাতায় ছেলেরা নস্যি দিয়েছে ভরে, খুব কড়া নস্যি। বইটা খুলতেই ঘোরতর হাঁচির ছোঁয়াচে উৎপাত বেধে গেল। সে গুঁড়ো পাশের মেয়েদের নাকে ঢুকে পড়ল। সকলকে নাকের জলে চোখের জলে করে দিলে। আর ঘন ঘন হ্যাঁচ্চো শব্দে পড়াশুনা বন্ধ হয় আর-কি। মাস্টার আড়চোখে দেখেন— দেখে তাঁরও হাসি চাপা শক্ত হয়ে ওঠে।

একদিন রব উঠল কোনো মহারাজা কলেজ দেখতে আসবেন, বিশেষ করে মেয়েদের ক্লাস। কানে কানে গুজব রটল— তাঁর এই দেখতে আসার লক্ষ্য ছিল বধূ জোগাড় করা। একদল মেয়ে ভান করলে যে, তাদের যেন অপমান করা হচ্ছে। কিন্তু ওরই ভিতরে দেখা গেল সেদিনকার খোঁপায় কিছু শিল্পকাজ, সেদিনকার পাড়ে কিছু রঙ। লোকটি তো যে-সে নয়, সে ক্রোড়পতি। মেয়েদের মনের মধ্যে একটা হুড়োমুড়ি ছিল সকলের আগে তাঁর চোখে পড়বার। তার পরে ক্লাস তো হয়ে গেল। একটা দূত এসে জানালে যে তাঁর পছন্দ ঐ সুরীতিকেই। সুরীতি জানে, এ রাজার তহবিলে অগাধ টাকার জোরে পুরুষ জাতির সমস্ত নীচতা কোথায় তলিয়ে যায়। ভান করলে এ প্রস্তাবে সে যে কেবল রাজি নয় তা নয়, বরঞ্চ সে অপমানিত বোধ করছে। কেননা, মেয়েদের ক্লাস তো গোহাটা নয়, যে, ব্যবসায়ী এসে গোরু বাছাই করে নিয়ে যাবে। কিন্তু মনে-মনে ছিল আর-একটু সাধ্যসাধনার প্রত্যাশা। ঠিক এমন সময় খবর পাওয়া গেল, মহারাজা তাঁর সমস্ত পাগড়ি-টাগড়ি-সমেত অন্তর্ধান করেছেন। তিনি বলে গিয়েছেন, বাঙালি মেয়েদের মধ্যে একটাকেও বাছাই করে নেবার যোগ্য তিনি দেখলেন না। এর চেয়ে তাঁদের পশ্চিমের বেদের মেয়েরাও অনেক ভালো।

ক্লাস-সুদ্ধ মেয়েরা একেবারে জ্বলে উঠল। বললে, কে বলেছিল তাঁকে আমাদের এই অপমান করতে আসতে! সেদিন তাদের সাজসজ্জার মধ্যে যে একটু কারিগরি দেখা গিয়েছিল সেটা লজ্জা দিতে লাগল। এমন সময়ে প্রকাশ পেল— মহারাজাটি তাদেরই একজন পুরোনো ছাত্র। বাপ-মায়ের বিষয়-সম্পত্তি জুয়ো খেলে উড়িয়ে দিয়ে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে টাকাওয়ালা মেয়ে। মেয়েদের মাথা হেঁট হয়ে গেল। সুরীতি বার বার করে বলতে লাগল— সে একটুও বিশ্বাস করে নি। সে প্রথম থেকেই কেবল যে বিশ্বাস করে নি তা নয়, সে কলেজের প্রিন্সিপাল্‌কে এই পড়ার ব্যাঘাত নিয়ে নালিশ করতে পর্যন্ত তৈরি ছিল। হয়তো ছিল, কিন্তু তার তো কোনো দলিল পাওয়া গেল না।

এমনি করে একটার পর আর-একটা উৎপাত চলতেই লাগল। এই সমস্ত উপদ্রবের প্রধান পাণ্ডা ছিল নীহার।

একবার ডিগ্রি নিতে যাচ্ছিল যখন সুরীতি, তার পাশে এসে নীহার বললে, "কী গো গরবিনী, মাটিতে যে পা পড়ছে না!"

সুরীতি মুখ বেঁকিয়ে বললে, "দেখুন, আপনি আমার নাম নিয়ে ঠাট্টা করবেন না।"

নীহার বললে, "তুমি বিদুষী হয়ে একে ঠাট্টা বলো, এ যে বিশুদ্ধ ক্লাসিক্যাল সাহিত্য থেকে কোটেশন করা! এমন সম্মান কি আর কোনো নামে হতে পারে!"

"আমাকে আপনার সম্মান করতে হবে না।"

"সম্মান না করে বাঁচি কী করে! হে বিকচকমলায়তলোচনা, হে পরিণতশরচ্চন্দ্র-বদনা, হে স্মিতহাস্যজ্যোৎস্নাবিকাশিনী, তোমাকে আদরের নামে ডেকে যে তৃপ্তির শেষ হয় না।"

"দেখুন, আপনি আমাকে রাস্তার মধ্যে যদি এরকম অপমান করেন, আমি প্রিন্সিপালের কাছে নালিশ করব।"

"নালিশ করতে হয় কোরো, তবে অপমানের একটা সংজ্ঞা ঠিক করে দিয়ো। এর মধ্যে কোন্‌ শব্দটা অপমানের? বল তো আমি আরো চড়িয়ে দিতে পারি। বলব— হে নিখিলবিশ্বহৃদয়-উন্মাদিনী"—

রাগে লাল হয়ে সুরীতি দ্রুতপদে চলে গেল। তার পিছন দিকে খুব একটা হাসির ধ্বনি উঠল। ডাক পড়তে লাগল, "ফিরে চাও হে রোষারুণলোচনা, হে যৌবনমদমত্তমাতঙ্গিনী"—

তার পরের দিন ক্লাস আরম্ভ হবার মুখেই রব উঠল, "হে সরস্বতী-চরণকমলদল-বিহারিণী-গুঞ্জনমত্ত-মধুব্রতা, পূর্ণচন্দ্রনিভাননী"—

সুরীতি রেগে গিয়ে পাশের ঘরে সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্‌ গোবিন্দবাবুকে বললে, "দেখুন, আমাকে কথায় কথায় অপমান করলে আমি থাকব না।"

তিনি এসে বললেন ক্লাসের ছেলেদের, "তোমরা কেন ওকে এত উপদ্রব করছ।"

নীহার বললে, "এ'কে কি উপদ্রব বলে! যদি কেউ নালিশ করতে পারে, তবে পূর্ণচন্দ্রই করতে পারতেন যে তাঁকে আমি ঠাট্টা করেছি। আমাদের ক্লাসে যোগেশ বলে— ওগুলো বাদ দিয়ে শুধু ওকে নিভাননা বললেই হয়, কেননা কলমের নিজের মতন সুতীক্ষ্ণ ওর মুখ। শুনে বরং আমি বলেছিলুম 'ছি, এরকম করে বলতে নেই, ওঁরা হলেন বিদুষী'— কথাটা চাপা দিয়েছিলুম। কিন্তু পূর্ণচন্দ্রনিভাননাতে আমি তো দোষের কিছু দেখি নি।"

ছেলেরা বললে, "আপনি বিচার করে দেখুন, আমরা মনের আনন্দে আউড়ে গিয়েছিলুম— হে সরস্বতীচরণকমলদলবিহারিণী গুঞ্জনমত্তমধুব্রতা! প্রথমত কথাটা নিন্দার নয়, দ্বিতীয়ত সেটা যে ওরই প্রতি লক্ষ করে বলা এত বড়ো অহংকার ওর কেন হল। ঘরেতে আরো তো ছাত্রী আছে, তারা তো ছিল খুশি।"

সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্‌ বললেন, "অস্থানে অসময়ে এরকম সম্ভাষণগুলো লোকে পরিহাস বলেই নেয়। দরকার কী বলা!"

"দেখুন স্যার, মন যখন উতলা হয়ে ওঠে তখন কি সময় অসময়ের বিচার থাকে। তা ছাড়া আমাদের এ সম্ভাষণ যদি পরিহাসই হয়, তা হলে তো এটা কেউ গায়ে না নিয়ে হেসে উড়িয়ে দিতে পারতেন। আর আপনার কলেজে এত বড়ো বড়ো সব বিদুষী, এ'রা কি পরিহাসের উত্তরে পরিহাস করতেও জানেন না? এদের দন্তরুচিকৌমুদীতে কি হাস্যমাধুরী জাগবে না। তা হলে আমরা সব তৃষিত সুধাপিপাসু পুরুষগুলো বাঁচি কী করে।"

এইরকম কথা-কাটাকাটির পালা চলত যখন তখন। সুরীতি অস্থির হয়ে উঠল— তার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য আর টেকে না। সে ঠাট্টা করতে জানে না, অথচ কড়া জবাব করবার ভাষাও তার আসে না। সে মনে মনে জলে পুড়ে মরে। সুরীতির এই দুর্গতিতে দয়া হয় এমন পুরুষও ছিল ওদের মধ্যে, কিন্তু তারা ঠাঁই পায় না।

আর-একদিন হঠাৎ কী খেয়াল গেল, যখন সুরীতি কলেজে আসছিল তখন রাস্তার ওপার থেকে নীহার তাকে ডেকে উঠল— "হে কনকচম্পকদামগৌরী!"

লোকটা পড়াশুনা করেছে বিস্তর, তার ভাষা শিখবার যেন একটা নেশা ছিল। যখন তখন অকারণে সংস্কৃত আওড়াত, তার ধ্বনিটা লাগত ভালো। পাঠ্য পুস্তকের পড়ায় সুরীতি তাকে এগিয়ে থাকত, মুখস্থ বিদ্যেয় সে ছিল ওস্তাদ। কিন্তু

পাঠ্যের বাইরে ছিল নীহারের প্রচুর পড়াশুনা। সুরীতি একেবারে প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে ছুটে গোবিন্দবাবুর ঘরে গিয়ে বললে, "রাস্তায় ঘাটে এরকম সম্ভাষণ আমার সহ্য হয় না।"

নীহার বললে, "আমার অন্যায় হয়েছে। কাল থেকে ওকে বলব 'মণীপুষ্পিতবর্ণা', কিন্তু সেটা কি বড্ড বেশি প্রিয়াজিষ্টিক হবে না।"

সুরীতি প্রায় কাঁদতে কাঁদতে ছুটে চলে গেল।

নীহারের চরিত্রে একটা নিরেট নিষ্ঠুরতা ছিল। যথোপযুক্ত ঘুষ দিয়ে তবে সেটাকে শান্ত করা যেত। এ কথা সবাই জানে।

একদিন নীহার জাপানি খেলনা— কট্‌কটে-আওয়াজ করা কাঠের ব্যাঙ দিয়ে ছেলেদের পকেট ভর্তি করে আনলে। ঠিক যে সময়ে প্লেটোর দার্শনিকতত্ত্ব ব্যাখ্যা করবার পালা এল— সমস্ত ক্লাসে কট্‌কট্ কট্‌কট্ শব্দ পড়ে গেল। শব্দটা যে কোথা থেকে হচ্ছে তাও স্পষ্ট বোঝা শক্ত। সেদিন কট্‌কটে ব্যাঙের শব্দে প্লেটোর কণ্ঠ একেবারে ডুবে গেল। শেষকালে খানাতল্লাসি করে দেখা গেল, দশটা কাঠের ব্যাঙ সুরীতির ডেস্কের ভিতরে।

সে চীৎকার করে বলে উঠল, "এ কখনো আমার নয়। অন্যরা কেউ আমার ডেস্কে দুষ্টুমি করে ভরে রেখেছে।"

ছেলেরা মহা তেরিয়া হয়ে বলে উঠল, "আমাদের উপর এরকম অন্যায় দোষ দিলে আমরা সইতে পারব না। এরকম ছেলেমানুষি খেলবার শখ কখনো পুরুষদের হতেই পারে না। এ-সমস্ত মেয়েদেরই খুকির ধর্ম।"

কিছুক্ষণ ক্লাসঘর নীরব। তার পরে হঠাৎ অপর কোণ থেকে অদ্ভুত শব্দ উঠল, একসঙ্গে সব ছেলেরা পা ঘষতে শুরু করেছে সিমেন্টের উপর। এতগুলো জুতো ঘষার শব্দে একটা উৎকট কন্‌সার্টের সৃষ্টি হল। ক্রমশ মাত্রা ছাড়িয়ে গেল, সুরীতির পক্ষে আর চুপ করে বসে থাকা চলল না। কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরে রইল, এক সময়ে হঠাৎ দড়াম করে একটা শব্দ হওয়ার পর ছেলেরা উঃ হুঃ শব্দে সানাইয়ের আওয়াজ নকল করতে লাগল।

তখন সুরীতি বলে উঠল, "স্যর, অনুগ্রহ করে ওদের গোলমাল করতে বারণ করবেন কি! আমরা এখানে পড়তে এসেছি, কিন্তু সংগীতচর্চার জায়গা এটা নয়। যদি কারো ক্লাস করতে ইচ্ছে না হয়, তবে ক্লাস ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত।"

সঙ্গে সঙ্গে চার দিক থেকে রব উঠল 'শেম' 'শেম' এবং লেফ্‌ট্ রাইট মার্চ্ করতে করতে ছেলেরা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সেদিনকার মতো ক্লাস আর জমল না।

মেয়েরা যখন ক্লাস থেকে বেরিয়ে কমনরুমে বসেছে, একটি পিয়ন এসে খবর দিল— সুরীতিকে সেক্রেটারিবাবু ডেকেছেন। মেয়েরা সব কানাকানি করতে লাগল। সুরীতি সেক্রেটারির ঘরে ঢুকে দেখলে সেখানে তাদের সেদিনকার প্রফেসার বসে আছেন আর নীহার পাশে দাঁড়িয়ে। সেক্রেটারি সুরীতিকে বললেন, "ছেলেরা নালিশ করেছে তোমার আজকের ব্যবহারে তারা অপমান বোধ করেছে। তোমার দিক থেকে যদি কিছু বলবার থাকে তো বলো।"

সুরীতি বললে, "সার, ওরা যে প্রফেসারের সঙ্গে অপমানজনক ব্যবহার করল, আমাদের সঙ্গে অভদ্রতা করল, তাতে কি আমাদেরই অপমান হয় না।"

যাই হোক, সেক্রেটারি ও প্রফেসার উভয় পক্ষের কথা শুনে বিবেচনা করে নীহারকে বললেন, "সব দিক থেকে প্রমাণ হল ক্লাসে তুমিই প্রথম উৎপাত শুরু কর এবং তুমিই ছিলে দলের অগ্রণী। এ ক্ষেত্রে তোমারই ক্ষমা চাওয়া উচিত।"

নীহার বললে, "সার, আমার দ্বারা এটা সম্ভব নয়, তার চেয়ে অনুমতি দিন— আমি কলেজ ছাড়তে রাজি।"

সেক্রেটারি বললেন, "তোমাকে সময় দিচ্ছি, ভালো করে ভেবে দেখো।"

সে তথাস্তু ব'লে খাতাপত্র নিয়ে উঠে পড়ল। সেদিন ক্লাসের শেষে ছেলেমেয়েরা বাইরে নেমে দেখলে, নোটিশ বোর্ডে নোটিশ টাঙানো রয়েছে— আজ থেকে পুজোর ছুটি আরম্ভ হল।

সলিলার সঙ্গে নীহারের ছিল বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। সে নীহারকে প্রস্তাব করলে, "তুমিও দার্জিলিঙে চলে এসো।"

নীহার বললে, "আমার বাপ তো তোমার বাপের মতো লক্ষপতি নয়। দার্জিলিঙে পড়াশুনা করি এমন শক্তি কোথায়।"

শুনে সে মেয়ে বললে, "আচ্ছা, আমি দেব তোমার খরচ।"

নীহারের এই গুণ ছিল, তাকে যা দেওয়া যায় তা পকেটে করে নিতে একটুও ইতস্তত করে না। সে ধনী ছাত্রীর খরচায় দার্জিলিঙে যাওয়াই ঠিক করলে।

এ দিকে যত অহংকারই সুরীতির থাক্‌, নীহারের মনের টান যে সলিলার দিকে সেটা তার মনে বাজল। নীহার ধনী মেয়ের আশ্রয়ে সুরীতির প্রতি আরো বেশি যখন-তখন যা-তা বলতে লাগল। সে বলত, 'পুরুষের কাছে ভদ্রতার দাবি করতে পারে সেই মেয়েরাই, যারা মেয়েদের স্বভাব ছাড়ে নি।' পুরুষের কাছ থেকে এই অনাদর সুরীতি ঘাড় বেঁকিয়ে অগ্রাহ্য করবারই ভান করত। কিন্তু তার মনের ভিতরে এই

নীহারের মন পাবার ইচ্ছাটা যে ছিল না, তা বলা যায় না। নীহার ধনী মেয়ের কাছ থেকে মালোহারা নিত, তাতে ছেলেরা কেউ কেউ ঈর্ষা ক'রে ও কেউ কেউ ঘৃণা ক'রে নীহারকে বলত 'ঘরজামাই'। নীহার তা গ্রাহ্যই করত না। তার দরকার ছিল পয়সার। যতক্ষণ পর্যন্ত তার ফিরপোর দোকানে বন্ধুদের নিয়ে পিক্‌নিক্ করবার খরচ চলত এবং নানাপ্রকার শৌখিন ও দরকারী জিনিসের সরবরাহ সুসাধ্য হয়ে উঠত, ততদিন পর্যন্ত সেই মেয়ের আশ্রিত হয়ে থাকতে তার কিছুমাত্র সংকোচ হত না। দরকার হলেই নীহার সলিলার কাছে টাকা চেয়ে পাঠাত। এই যে তার একজন পুরুষ পোষ্য ছিল, তার প্রতিভার উপর সলিলার খুব বিশ্বাস ছিল। মনে করেছিল এক সময়ে নীহার একটা মস্ত নাম করবে। সমস্ত বিশ্বের কাছে তার প্রতিভার যে একটা অকুণ্ঠিত দাবি আছে— নীহার সেটার আভাস দিতে ছাড়ত না, সলিলাও তা মেনে নিত।

সলিলা দার্জিলিঙে থাকতে থাকতেই এক সময়ে তার ডবল নিমোনিয়া হল, চিকিৎসার ত্রুটি হল না, কিন্তু যমদূতকে ঠেকিয়ে রাখতে পারলে না। মৃত্যু হল সলিলার। শেষ পর্যন্ত নীহার তাকিয়ে ছিল হয়তো উইলে তার নামে কিছু দিয়ে যাবে। কিন্তু তার কোনো চিহ্ন মিলল না, তখন সলিলার উপরে বিষম রাগ হল। বিশেষত যখন সে শুনল সলিলা তার দাসীকে দিয়ে গিয়েছে একশো টাকা, তখন সে সলিলাকে ধিক্কার দিয়ে বলে উঠল— কিরকম নীচতা। ইংরেজিতে যাকে বলে 'মীন্‌নেস'!

যে মেয়েকে নীহার স্তব করে বলত 'জগদ্ধাত্রী', পুরুষ-পালনের পালা তিনি সাঙ্গ করে নীহারকে নৈরাশ্যের ধাক্কা দিয়ে চলে গেলেন। দার্জিলিঙের খরচ আর তো চলে না, আবার নীহার ফিরে এল কলকাতার মেসে। ছেলেরা একদফা খুব হাসাহাসি করে নিলে। নীহারের তাতে গায়ে বাজত না। ওর আশা ছিল দ্বিতীয় আর-একটি জগদ্ধাত্রী জুটে যাবে। একজন বিখ্যাত উড়িয়া গণৎকার তাকে গনে বলেছিল কোনো বড়ো ধনী মেয়ের প্রসাদ সে লাভ করবে। সেই গণনাফলের দিকে উৎসুকচিত্তে সে তাকিয়ে রইল। জগদ্ধাত্রী কোন্ রাস্তা দিয়ে যে এসে পড়েন তা তো বলা যায় না। অত্যন্ত টানাটানির দশায় পড়ে গেল।

দার্জিলিং-ফেরত নীহারকে হঠাৎ কলেজে দেখে সুরীতিও আশ্চর্য হয়ে গেল— বললে, "আপনি হিমালয় থেকে ফিরলেন কবে।"

নীহার হেসে বললে, "ওগো সীমন্তিনী, কিছু হাওয়া খেয়ে আসা গেল। কালিদাস বলেছেন: মন্দাকিনীনির্ঝরশীকরাণাং বোঢ়া মুহুঃ কম্পিতদেবদারুঃ। ঐ দেবদারুর

চেয়ে ঢের বেশি কাঁপিয়ে দিয়েছিল বাংলাদেশের রোগা হাড়, এই দেখো-না কম্বল জড়িয়ে ভুটিয়া সেজে এসেছি।"

সুরীতি হেসে বললে, "কেন, সাজ তো মন্দ হয় নি আর আপনার চেহারাও তো দেখাচ্ছে ভালো, ভুটিয়া বকুর সাজসজ্জাতে আপনাকে ভালো মানিয়েছে।"

নীহার বললে, "খুশি হলুম, এখন তো আর শীতের থেকে রক্ষা পাবার কথা ভাবতে হবে না, এখন কী দিয়ে তোমাদের চোখ ভোলাব এইটেই হচ্ছে সমস্যা— সেটা আরো শক্ত কথা।"

সুরীতি। তা চোখ ভোলাবার দরকার কী। পুরুষমানুষের সহায়তা করে তার বিদ্যে, তুমি জান তো তোমার মধ্যে তার অভাব নেই।

নীহার। এইটে তোমাদের ভুল। নিউটন বলেছিলেন তিনি জ্ঞানসমুদ্রের নুড়ি কুড়িয়েছেন, আমি তো কেবলমাত্র বালুর কণা সংগ্রহ করেছি।

সুরীতি। বাস্ রে! এবার পাহাড় থেকে দেখছি তুমি অনেকখানি বিনয় সংগ্রহ করে এনেছ, এ তো তোমার কখনো ছিল না।

নীহার। দেখো, এ শিক্ষা আমার স্বয়ং কালিদাসের কাছ থেকে, যিনি বলেছেন: প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্‌বাহুরিব বামনঃ।

সুরীতি। এই-সব সংস্কৃত শ্লোকের জ্বালায় হাঁপিয়ে উঠলুম, একটু বিশুদ্ধ বাংলা বলো।

এর মধ্যে আশ্চর্যের কথা এই যে, সলিলার মৃত্যুর উল্লেখমাত্রও সে করল না।

এ দিকে ক্লাসের ঘণ্টার শব্দে দুজনকেই দ্রুত চলে যেতে হল, কিন্তু সংস্কৃত শ্লোকগুলো সুরীতির মনের ভিতরে দেবদারুর মতোই মুহুর্মুহু কম্পিত হতে লাগল। সে দেখেছে আজকাল নীহারের ঠাট্টা আর সংস্কৃত শ্লোক আওড়ানো অন্য মেয়েরা খুব পছন্দ করে। তারা তাই নিয়ে ওকে প্রশংসা করে, তাই সেও বুঝেছে ওতে পরিহাসের কড়া স্বাদ নেই। সেইজন্য ইদানীং নীহারের হঠাৎ সংস্কৃত আবৃত্তিকে ভালো লাগাবার চেষ্টা করত।

এমন সময়ে একটা ঘটনা ঘটল যাতে ছাত্রছাত্রীদের মিলেমিশে কাজ করবার একটা সুযোগ হল। সর্বন ইউনিভার্সিটির একজন ভারতপ্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত আসবেন কলকাতা ইউনিভার্সিটির নিমন্ত্রণে। ছেলেমেয়েরা ঠিক করেছিল পথের মধ্যে থেকে তারাই তাঁকে অভ্যর্থনা করার গৌরব সর্বপ্রথমে লুটে নেবে। আগে ভাগে অধ্যাপকের কাছে গিয়ে তাঁকে ওদের প্রগতিসংঘের নিমন্ত্রণ জানালে। তিনি ফরাসী সৌজন্যের আতিশয্যে এই নিমন্ত্রণ স্বীকার করে নিলেন। তার পরে কে তার অভিনন্দন পাঠ

করবে, সেটা ওরা ভালো করে ভেবে পাচ্ছিল না। কেউ বলছিল সংস্কৃত ভাষায় বলবে, কেউ বলছিল ইংরেজি ভাষাই যথেষ্ট— কিন্তু তা কারো মনঃপূত হল না। ফরাসী পণ্ডিতকে ফরাসী ভাষায় সম্মান প্রকাশ করাই উপযুক্ত ঠিক করল। কিন্তু করবে কে। বাইরের লোক পাওয়া যায়, কিন্তু সেটাতে তো সম্মান রক্ষা হয় না। এমন সময়ে নীহাররঞ্জন বলে উঠল, আমার উপর যদি ভার দাও, আমি কাজ চালিয়ে নিতে পারব এবং ভালোরকমেই পারব।"

মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল যাদের নীহাররঞ্জনের উপর বিশেষ টান, তারা বললে— দেখা যাক্-না।

সুরীতির বিশেষ আপত্তি, সে বললে— একটা ভাঁড়ামি হয়ে উঠবে।

দলের মেয়েরা বললে, "আমরা বিদেশী, যদি বা আমাদের ভাষায় কিংবা বক্তৃতায় কোনো ত্রুটি হয় তা ফরাসী অধ্যাপক নিশ্চয়ই হাসিমুখে মেনে নেবেন। ওঁরা তো আর ইংরেজ নন, ইংরেজরা বিদেশীদের কাছ থেকেও নিজেদের আদবকায়দার স্খলন সইতে পারেন না, এমন ওঁদের অহংকার। কিন্তু ফরাসীদের তা নয়, বরঞ্চ যদি কিছু অসম্পূর্ণ থাকে সেটা হেসে গ্রহণ করবে। দেখা যাক্-না— নীহাররঞ্জনের বিদ্যের দৌড় কতদূর। শুনেছি ও ঘরে বসে বসে ফরাসী পড়ার চর্চা করে।"

নীহাররঞ্জনের বাড়ি চন্দননগরে। প্রথম বয়সে ফরাসী স্কুলে তার বিদ্যাশিক্ষা, সেখানে ওর ভাষার দখল নিয়ে খুব খ্যাতি পেয়েছিল, এ-সব কথা ওর কলকাতার বন্ধু-মহল কেউ জানত না। যা হোক, সে তো কোমর বেঁধে দাঁড়ালো। কী আশ্চর্য, অভিনন্দন যখন পড়ল তার ভাষার ছটায় ফরাসী পণ্ডিত এবং তাঁর দু-একজন অনুচর আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তাঁরা বললেন— এরকম মার্জিত ভাষা ফ্রান্সের বাইরে কখনো শোনেন নি। বললেন, এ ছেলেটির উচিত প্যারিসে গিয়ে ডিগ্রি অর্জন করে আসা। তার পর থেকে ওদের কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলীতে ধন্য ধন্য রব উঠল; বললে— কলেজের নাম রক্ষা হল, এমন-কি, কলকাতা ইউনিভার্সিটিকেও ছাড়িয়ে গেল খ্যাতিতে।

এর পরে নীহারকে অবজ্ঞা করা কারো সাধ্যের মধ্যে রইল না। 'নীহারদা' 'নীহারদা' গুঞ্জনধ্বনিতে কলেজ মুখরিত হয়ে উঠল। প্রগতিসংঘের প্রথম নিয়মটা আর টেকে না। পুরুষদের মন ভোলাবার জন্য রঙিন কাপড়-চোপড় পরা ওরা ত্যাগ করেছিল। নব-প্রথমে সে নিয়মটি ভাঙল সুরীতি, রঙ লাগালো তার আঁচলায়। আগেকার বিরুদ্ধ ভাব কাটিয়ে নীহাররঞ্জনের কাছে ঘেঁষতে তার সংকোচ বোধ হতে লাগল, কিন্তু সে সংকোচ বুঝি টেকে না।

দেখলে অন্য মেয়েরা সব তাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কেউ-বা ওকে চায়ে নিমন্ত্রণ করছে, কেউ-বা বাঁধানো টেনিসন এক সেট লুকিয়ে ওর ডেস্কের মধ্যে উপহার রেখে যাচ্ছে। কিন্তু সুরীতি পড়ছে পিছিয়ে। একজন মেয়ে নীহারকে যখন নিজের হাতের কাজ-করা সুন্দর একটি টেবিল-ঢাকা দিলে, তখন সুরীতির প্রথম মনে বিঁধল, ভাবল, 'আমি যদি এই-সব মেয়েলি শিল্পকার্যের চর্চা করতাম।' সে যে কোনোদিন সুঁচের মুখে সুতো পরায় নি, কেবল বই পড়েছে। সেই তার পাণ্ডিত্যের অহংকার আজ তার কাছে খাটো হয়ে যেতে লাগল। 'কিছু-একটা করতে পারতুম যেটাতে নীহারের চোখ ভুলতে পারত—সে আর হয় না। অন্য মেয়েরা তাকে নিয়ে কত সহজে সামাজিকতা করে। সুরীতির খুব ইচ্ছে সেও তার মধ্যে ভরতি হতে পারত যদি, কিন্তু কিছুতেই খাপ খায় না। তার ফল হল এই— তার আত্মনিবেদন অন্য মেয়েদের চেয়েও আরো যেন জোর পেয়ে উঠল। সে নীহারের জন্য কোনো অছিলায় নিজের কোনো একটা ক্ষতি করতে পারলে কৃতার্থ হত। একেবারে প্রগতিসংঘের পালের হাওয়া বদলে গেল।

অন্য মেয়েরা ক্রমে নিয়মিতভাবে তাদের পড়াশুনায় লেগে গেল, কিন্তু সুরীতি তা পেরে উঠল না। একদিন ডেস্কের উপর থেকে দৈবাৎ নীহারের ফাউন্‌টেনপেনটি মেজের উপর গড়িয়ে পড়েছিল, সর্বাগ্রে সেটা সে তুলে ওকে দিলে। এর চেয়ে অবনতি সুরীতির আর কোনোদিন হয় নি। একদিন নীহার বক্তৃতায় বলেছিল— তার মধ্যে ফরাসী নাট্যকারের কোটেশন ছিল— 'সব সুন্দর জিনিসের একটা অবগুণ্ঠন আছে, তার উপরে পরুষদৃষ্টির হাওয়া লাগলে তার সৌকুমার্য নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের দেশে মেয়েরা যে • পারতপক্ষে পুরুষদের কাছে দেখা দিত না, তার প্রধান কারণ এই যে, দেখা দেওয়ার দ্বারা মেয়েদের মূল্য কমে যায়। তাদের কমনীয়তার উপরে দাগ পড়তে থাকে।' অন্য মেয়েরা এই কথা নিয়ে বিরুদ্ধ তর্কে উত্তেজিত হয়ে উঠল। তারা বললে, এমনতরো করে ঢেকেঢুকে কমনীয়তা রক্ষা করবার চেষ্টা করা অত্যন্ত বিড়ম্বনা। সংসারে পরুষস্পর্শ, কী স্ত্রী, কী পুরুষ, সকলেরই পক্ষে সমান আবশ্যক। আশ্চর্য এই, আর কেউ নয়, স্বয়ং সুরীতি উঠে নীহারের কথার সমর্থন করলে।

এই এক সমর্থনের ধাক্কায় তার চালচলন সম্পূর্ণ বদলে যাবার জো হল। এখন সে পরামর্শ নিতে যায় নীহারের কাছে। যখন শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক সিনেমাতে দেখানো হয়, তখন তাও কি মেয়েরা কোনো পুরুষ অভিভাবকের সঙ্গে গিয়ে দেখে আসতে পারে না। নীহার কড়া হুকুম জারি করলে— তাও না। কোনোক্রমে নিয়মের ব্যতিক্রম হলে নিয়ম আর রক্ষা করা যায় না। •

প্রত্যেকবারেই সুরীতি ভালো কিছু দেখবার থাকলে সিনেমাতে যেত। এখন তার কী হল! এত বড়ো আত্মত্যাগ তো কল্পনা করা যায় না, এমন-কি, আজকালকার দিনে যে সামাজিক নিমন্ত্রণে স্ত্রীপুরুষের একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া চলত, সেখানে সে যাওয়া ছেড়ে দিলে। সনাতনীরা খুব তার প্রশংসা করতে লাগল। প্রগতিসংঘ থেকে সে নিজেই আপনার নাম কাটিয়ে নিলে।

সুরীতি চাকরি নেবে, নীহারের অনুমতি চাইল— স্কুলে পুরুষ ছাত্র খুব ছোটো বয়সের হলেও তাদের পড়ানো চলে কি না।

নীহার বললে, না, তাও চলে না। তার ফল হল সে অর্ধেক মাইনে স্বীকার করে মাস্টারি নিয়ে বললে, তার বাকি বেতন থেকে ছেলেদের আলাদা পড়াবার লোক রাখা হোক। স্কুলের সেক্রেটারিবাবু অবাক।

সুরীতির মনের টান ক্রমশ দুঃসহ হয়ে উঠতে লাগল। এক সময়ে কোনোরকম করে আভাস দিয়েছিল, তাদের বিয়ে হতে পারে কি না। একদিন যে সমাজের নিয়মকে সুরীতি মানত না, সেই সমাজের নিয়ম অনুসারে শুনতে পেল ওদের বিয়ে হতে পারে না কোনোমতেই। অথচ এই পুরুষের আনুগত্য রক্ষা করে চিরকাল মাথা নিচু করে চলতে পারে তাতে অপরাধ নেই, কেননা বিধাতার সেই বিধান।

প্রায়ই সে শুনতে পেত— নীহারের অবস্থা ভালো নয়, পড়বার বই তাকে ধার করে পড়তে হয়। তখন সুরীতি নিজের জলপানি থেকে ওকে যথেষ্ট সাহায্য করতে লাগল। নীহারের তাতে কোনো লজ্জা ছিল না। মেয়েদের কাছ থেকে পুরুষদের যেন অর্ঘ্য নেবার অধিকার আছে। অথচ তার বিদ্যার অভিমানের অন্ত ছিল না। একবার একটি কলেজে বাংলা অধ্যাপকের পদ খালি ছিল। সুরীতির অনুরোধে নীহারকে সে পদে গ্রহণ করবার প্রস্তাবে অনুকূল আলোচনা চলছিল। তাতে নীহারের নাম নিয়ে কমিটিতে এই আলোচনায় তার অহংকারে ঘা লাগল।

সুরীতি নীহারকে বললে, "এ তোমার অন্যায় অভিমান। স্বয়ং ভাইসরয় নিযুক্ত করবার সময়েও কাউন্সিলের মেম্বারদের মধ্যে তা নিয়ে কথাবার্তা চলে।"

নীহার বললে, "তা হতে পারে, কিন্তু আমাকে যেখানে গ্রহণ করবে সেখানে বিনা তর্কেই গ্রহণ করবে। এ না হলে আমার মান বাঁচবে না। আমি বাংলা ভাষায় এম. এ.তে সব-প্রথম পদবী পেয়েছি। আমি অমন করে কমিটি থেকে ছাঁট দিয়ে নেওয়া পদ নিতে পারব না।"

এ পদ যদি নিত তা হলে সুরীতির কাছ থেকে অর্থসাহায্যের প্রয়োজন চলে যেত নীহারের। পদকে সে অগ্রাহ্য করলে, কিন্তু এই প্রয়োজনকে না। সুরীতির জলখাবার

প্রায় বন্ধ হয়ে এল। বাড়ির লোকে ওর ব্যবহারে এবং চেহারায় অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠল।

ছেলেবেলা থেকেই ওর শরীর ভালো নয়, তার উপরে এই কষ্ট করা— এ তপস্যা কার জন্য সে কথা যখন তারা ধরতে পারলে তখন তারা নীহারকে গিয়ে বললে, "হয় তুমি একে বিবাহ করো, নয় এর সঙ্গ ত্যাগ করো।"

নীহার বললে, "বিবাহ করা তো চলবেই না— আর ত্যাগের কথা আমাকে বলছেন কেন, সঙ্গ ইচ্ছে করলেই তো তিনি ত্যাগ করতে পারেন, আমার তাতে কিছুমাত্র আপত্তি নেই।"

সুরীতি সে কথা জানত। সে জানত নীহারের কাছে তার কোনো মূল্যই নেই, নিজের সুবিধাটুকু ছাড়া। সেই সুবিধাটুকু বন্ধ হলে তাকে অনায়াসে পথের কুকুরের মতো খেদিয়ে দিতে পারে। এ জেনেও যতরকমে পারে সুবিধে দিয়ে, বই কিনে দিয়ে, নতুন খদ্দরের থান তাকে উপহার দিয়ে, যেমন করে পারে তাকে এই সুবিধার স্বার্থবন্ধনে বেঁধে রাখলে। অন্য গতি ছিল না ব'লে এই অসম্মান সুরীতি স্বীকার করে নিলে।

এক সময়ে মফস্বলে বেশি মাইনের প্রিন্সিপালের পদ পেয়েছিল। তখন তার কেবল এই মনের ভিতরে বাজত, 'আমি তো খুব আরামে আছি, কিন্তু তিনি তো ওখানে গরিবের মতো পড়ে থাকেন— এ আমি সহ্য করব কী করে।' অবশেষে একদিন বিনা কারণে কাজ ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় অল্প বেতনে এক শিক্ষয়িত্রীর পদ নিলে। সেই বেতনের বারো-আনা যেত নীহাররঞ্জনের পেট ভরাতে, তার শখের জিনিস কিনে দিতে। এই ক্ষতিতেই ছিল তার আনন্দ। সে জানত মন ভোলাবার কোনো বিদ্যে তার জানাই ছিল না। এই কারণেই তার ত্যাগ এমন অপরিমিত হয়ে উঠল। এই ত্যাগেই সে অন্য মেয়েদের ছাড়িয়ে যেতে চেয়েছিল। তা ছাড়া আজকাল উল্‌টো প্রগতির কথা সে ক্রমাগত শুনে আসছে যে, মেয়েরা পুরুষের জন্য ত্যাগ করবে আপনাকে এইটাই হচ্ছে বিধাতার বিধান। পুরুষের জন্য যে মেয়ে আপনাকে না উৎসর্গ করে সে মেয়েই নয়। এই-সমস্ত মত তাকে পেয়ে বসল।

কলকাতায় যে বাসা সে ভাড়া করল খুব অল্প ভাড়ায়— স্যাঁৎসেঁতে, রোগের আড্ডা। তার ছাদে বের হবার জো নেই, কলতলায় কেবলই জল গড়িয়ে পড়ছে। তার উপরে যা কখনো জীবনে করে নি তাই করতে হল— নিজের হাতে রান্না করতে আরম্ভ করল। অনেক বিদ্যে তার জানা ছিল, কিন্তু রান্নার বিদ্যে সে কখনো শেখে নি।

যে অখাদ্য অপথ্য তৈরি হত, তা দিয়ে জোর করে পেট ভরাত। কিন্তু স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়ল। মাঝে মাঝে কাজ কামাই করতে বাধ্য হল ডাক্তারের সার্টিফিকেট নিয়ে। এত ঘন ঘন ফাঁক পড়ত কাজে যে অধ্যক্ষরা তাকে আর ছুটি মঞ্জুর করতে পারলেন না। তখন ধরা পড়ল ভিতরে ভিতরে তাকে ক্ষয়রোগে ধরেছে। বাসা থেকে তাকে সরানো দরকার, আত্মীয়-স্বজনরা মিলে তাঁকে একটা প্রাইভেট হাসপাতালে ভরতি করে দিলে। কেউ জানত না কিছু টাকা তার গোপনে সঞ্চিত ছিল, সেই টাকা থেকেই তার বরাদ্দ-মতন দেয় নীহারের কাছে গিয়ে পৌঁছত। নীহার সব অবস্থাই জানত, তবু তার প্রাপ্য ব'লে এই টাকা সে অনায়াসে হাত পেতে নিতে লাগল। অথচ একদিন হাসপাতালে সুরীতিকে দেখতে যাবার অবকাশ সে পেত না। সুরীতি উৎসুক হয়ে থাকত জানলার দিকে কান পেতে, কিন্তু কোনো পরিচিত পায়ের ধ্বনি কোনোদিন কানে এল না। অবশেষে একদিন তার টাকার থলি নিঃশেষে শেষ হয়ে গেল আর সেইসঙ্গে তার চরম আত্মনিবেদন।

১১-২১ জুন ১৯৪১ আশ্বিন ১৩৪৮

শেষ পুরস্কার

খসড়া

সেদিন আই. এ. এবং ম্যাট্রিক ক্লাসের পুরস্কারবিতরণের উৎসব। বিমলা ব'লে এক ছাত্রী ছিল, সুন্দরী ব'লে তার খ্যাতি। তারই হাতে পুরস্কারের ভার। চার দিকে তার ভিড় জমেছে আর তার মনে অহংকার জমে উঠেছে খুব প্রচুর পরিমাণে। একটি মুখচোরা ভালোমানুষ ছেলে কোণে দাঁড়িয়ে ছিল। সাহস করে একটু কাছে এল যেই, দেখা গেল তার পায়ে হয়েছে ঘা, ময়লা কাপড়ের ব্যাণ্ডেজ জড়ানো। তাকে দেখে বিমলা নাক তুলে বললে, "ও এখানে কেন বাপু, ওর যাওয়া উচিত হাসপাতালে।"

ছেলেটি মন-মরা হয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল। বাড়িতে গিয়ে তার স্কুলঘরের কোণে বসে কাঁদছে, জলখাবারের থালা হাতে তার দিদি এসে বললে, "ও কী হচ্ছে জগদীশ, কাঁদছিস কেন।"

তখন তার অপমানের কথা শুনে মৃণালিনী রাগে জ্বলে উঠল; বললে, "ওর বড়ো রূপের অহংকার, একদিন ঐ মেয়ে যদি তোর এই পায়ের তলায় এসে না বসে তা হলে আমার নাম মৃণালিনী নয়।"

এই গেল ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়। দিদি এখন ইন্‌স্পেক্‌ট্রেস্ অব স্কুল্‌স্। এসেছেন পরিদর্শন করতে। তিনি তাঁর ভাইয়ের এই দুঃখের কাহিনী মেয়েদের শোনালেন। শুনে মেয়েরা ছি ছি করে উঠল; বললে, কোনো মেয়ে কখনো এমন নিষ্ঠুর কাজ করতে পারে না— তা সে যত বড়ো রূপসীই হোক-না কেন।

মৃণালিনী মাসি বললেন, জগতে যা সত্য হওয়া উচিত নয়, তাও কখনো কখনো সত্য হয়।

আজ আবার পুরস্কারবিতরণের উৎসব। আরম্ভ হবার কিছু আগেই মৃণালিনী মাসি মেয়েদের জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, সেদিন সেই-যে ভালোমানুষ ছেলেটিকে অপমান করে বিদায় করা হয়েছিল, সে আজ কী হলে তোমরা খুশি হও।"

কেউ বললে, কবি; কেউ বললে, বিপ্লবী; বাইরে থেকে নিমন্ত্রিত একটি মেয়ে বললে, হাইকোর্টের জজ।

ঘণ্টা বাজলো, সবাই প্রস্তুত হয়ে বসল। যিনি প্রাইজ দেবেন তিনি এসে প্রবেশ করলেন, জগদীশপ্রসাদ— হাইকোর্টের জজ। তিনি বসতেই সেই নিমন্ত্রিত মেয়ে যে মজঃফরপুর মেয়েদের হাইস্কুলে তৃতীয় বর্গে অঙ্ক কষাত, সে এসে প্রণাম করে তাঁর পায়ে ফুলের মালা দিয়ে চন্দনের ফোঁটা লাগিয়ে দিলে। জগদীশপ্রসাদ শশব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, "এ আবার কিরকমের সম্মান।"

মাসি বললেন, "নতুনরকমের বলছ কেন— অতি পুরাতন। আমাদের দেশে দেবতাদের পুজো আরম্ভ হয় পায়ের দিক থেকে। আজ তোমার সেই পদের সম্মান করা হল।"

এইবার পরিচয়গুলো সমাপ্ত করা যাক। এই মেয়েটি এককালকার রূপসী ছাত্রী বিমলাদিদি, বোর্ডিং স্কুলের অহংকারের সামগ্রী ছিল। পিতার মৃত্যুর পরে আজ ক্লাস পড়াবার ভার নিয়েছে ; আর এ দিক ও দিক থেকে কিছু টিউশনি করে কাজ চালায়। যে পা'কে একদিন সে ঘৃণা করেছিল সেই পা'কে অর্ঘ্য দেবার জন্ত আজ তার বিশেষ করে নিমন্ত্রণ হয়েছে। মৃণালিনী মাসি— সেই সেদিনকার দিদি। আর সেই তার ভাই জগদীশপ্রসাদ, হাইকোর্টের জজ।

এটা গল্পের মতো শোনাচ্ছে, কিন্তু কখনো কখনো গল্পও সত্যি হয়। আর যে লোকটা এই ইতিহাসটা লিখছে সে হচ্ছে অবিনাশ, সেদিন সে লম্বা লম্বা পা ফেলে বড়ো বড়ো পরীক্ষা ডিঙিয়ে চলত— সেও উপস্থিত ছিল সেই প্রথমবারকার পুরস্কারের উৎসবে। সেদিন নানারকম খেলা হয়েছিল— হাইজাম্প্, লম্বা দৌড়, রশি-টানাটানি —তার মধ্যে এই অবিনাশ আবৃত্তি করেছিল রবিঠাকুরের 'পঞ্চনদীর তীরে'। কবিতার ছন্দের জোর যত, তার গলায় ছিল জোর চার গুণ বেশি। সেই-ই সব চেয়ে বড়ো পুরস্কার পেয়েছিল। আজ সে জজের অনুগ্রহে সেরেস্তাদারের সেরেস্তায় হেড-কেরানির পদ পেয়েছে।

৫-৬ মে ১৯৪১ শ্রাবণ ১৩৪৯

মুসলমানীর গল্প

খসড়া

তখন অরাজকতার চরগুলো কণ্টকিত করে রেখেছিল রাষ্ট্রশাসন, অপ্রত্যাশিত অত্যাচারের অভিঘাতে দোলায়িত হত দিন রাত্রি। দুঃস্বপ্নের জাল জড়িয়েছিল জীবনযাত্রার সমস্ত ক্রিয়াকর্মে, গৃহস্থ কেবলই দেবতার মুখ তাকিয়ে থাকত, অপদেবতার কাল্পনিক আশঙ্কায় মানুষের মন থাকত আতঙ্কিত। মানুষ হোক আর দেবতাই হোক কাউকে বিশ্বাস করা কঠিন ছিল, কেবলই চোখের জলের দোহাই পাড়তে হত। শুভ কর্ম এবং অশুভ কর্মের পরিণামের সীমারেখা ছিল ক্ষীণ। চলতে চলতে পদে পদে মানুষ হোঁচট খেয়ে খেয়ে পড়ত দুর্গতির মধ্যে।

এমন অবস্থায় বাড়িতে রূপসী কন্যার অভ্যাগম ছিল যেন ভাগ্যবিধাতার অভিসম্পাত। এমন মেয়ে ঘরে এলে পরিজনরা সবাই বলত 'পোড়ারমুখী বিদায় হলেই বাঁচি'। সেইরকমেরই একটা আপদ এসে জুটেছিল তিন-মহলার তালুকদার বংশীবদনের ঘরে।

কমলা ছিল সুন্দরী, তার বাপ মা গিয়েছিল মারা, সেইসঙ্গে সেও বিদায় নিলেই পরিবার নিশ্চিন্ত হত। কিন্তু তা হল না, তার কাকা বংশী অত্যন্ত স্নেহে অত্যন্ত সতর্কভাবে এতকাল তাকে পালন করে এসেছে।

তার কাকি কিন্তু প্রতিবেশিনীদের কাছে প্রায়ই বলত, "দেখ্‌ তো ভাই, মা বাপ ওকে রেখে গেল কেবল আমাদের মাথায় সর্বনাশ চাপিয়ে। কোন্‌ সময় কী হয় বলা যায় না। আমার এই ছেলেপিলের ঘর, তারই মাঝখানে ও যেন সর্বনাশের মশাল জ্বালিয়ে রেখেছে, চারি দিক থেকে কেবল দুষ্টলোকের দৃষ্টি এসে পড়ে। ঐ একলা ওকে নিয়ে আমার ভরাডুবি হবে কোন্‌দিন, সেই ভয়ে আমার ঘুম হয় না।"

এতদিন চলে যাচ্ছিল একরকম করে, এখন আবার বিয়ের সম্বন্ধ এল। সেই ধুমধামের মধ্যে আর তো ওকে লুকিয়ে রাখা চলবে না। ওর কাকা বলত, "সেই-জন্যই আমি এমন ঘরে পাত্র সন্ধান করছি যারা মেয়েকে রক্ষা করতে পারবে।"

ছেলেটি মোচাখালির পরমানন্দ শেঠের মেজো ছেলে। অনেক টাকার তবিল চেপে বসে আছে, বাপ ম'লেই তার চিহ্ন পাওয়া যাবে না। ছেলেটি ছিল বেজায় শৌখিন— বাজপাখি উড়িয়ে, জুয়ো খেলে, বুলবুলের লড়াই দিয়ে খুব বুক ঠুকেই

টাকা ওড়াবার পথ খোলসা করেছিল। নিজের সম্পদের গর্ব ছিল তার খুব, অনেক ছিল মাল। মোটামোটা ভোজপুরী পালোয়ান ছিল, সব বিখ্যাত লাঠিয়াল। সে বলে বেড়াত, সমস্ত তল্লাটে কোন্ ভগ্নীপতির পুত্র আছে যে ওর গায়ে হাত দিতে পারে। মেয়েদের সম্বন্ধে সে ছেলেটি বেশ একটু শৌখিন ছিল— তার এক স্ত্রী আছে আর একটি নবীন বয়েসের সন্ধানে সে ফিরছে। কমলার রূপের কথা তার কানে উঠল। শেঠবংশ খুব ধনী, খুব প্রবল। ওকে ঘরে নেবে এই হল তাদের পণ।

কমলা কেঁদে বলে, "কাকামণি, কোথায় আমাকে ভাসিয়ে দিচ্ছ।"

"তোমাকে রক্ষা করবার শক্তি থাকলে চিরদিন তোমাকে বুকে করে রাখতুম জানো তো মা!"

বিবাহের সম্বন্ধ যখন হল তখন ছেলেটি খুব বুক ফুলিয়ে এল আসরে, বাজনাবাদ্যি সমারোহের অন্ত ছিল না। কাকা হাত জোড় করে বললে, "বাবাজি, এত ধুমধাম করা ভালো হচ্ছে না, সময় খুব খারাপ।"

শুনে সে আবার ভগ্নীপতির পুত্রদের আস্পর্ধা করে বললে, "দেখা যাবে কেমন সে কাছে ঘেঁষে।"

কাকা বললে, "বিবাহ-অনুষ্ঠান পর্যন্ত মেয়ের দায় আমাদের, তার পর মেয়ে এখন তোমার— তুমি ওকে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছবার দায় নাও। আমরা এ দায় নেবার যোগ্য নই, আমরা দুর্বল।"

ও বুক ফুলিয়ে বললে, "কোনো ভয় নেই।"

ভোজপুরী দারোয়ানরা গোঁফ চাড়া দিয়ে দাঁড়ালে সব লাঠি হাতে।

কন্যা নিয়ে চললেন বর সেই বিখ্যাত মাঠের মধ্যে, তালডিহির মাঠ। মধুমোল্লার ছিল ডাকাতের সর্দার। সে তার দলবল নিয়ে রাত্রি যখন দুই প্রহর হবে, মশাল জ্বালিয়ে হাঁক দিয়ে এসে পড়ল। তখন ভোজপুরীদের বড়ো কেউ বাকি রইল না। মধুমোল্লার ছিল বিখ্যাত ডাকাত, তার হাতে পড়লে পরিত্রাণ নেই।

কমলা ভয়ে চতুর্দোলা ছেড়ে ঝোপের মধ্যে লুকোতে যাচ্ছিল এমন সময় পিছনে এসে দাঁড়ালো বৃদ্ধ হবির খাঁ, তাকে সবাই পয়গম্বরের মতোই ভক্তি করত। হবির সোজা দাঁড়িয়ে বললে, "বাবাসকল তফাত যাও, আমি হবির খাঁ।"

ডাকাতরা বললে, "খাঁ সাহেব, আপনাকে তো কিছু বলতে পারব না কিন্তু আমাদের ব্যাবসা মাটি করলেন কেন।"

যাই হোক তাদের ভঙ্গ দিতেই হল।

হবির এসে কমলাকে বললে, "তুমি আমার কন্যা। তোমার কোনো ভয় নেই, এখন এই বিপদের জায়গা থেকে চলো আমার ঘরে।"

কমলা অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে উঠল। হবির বললে, "বুঝেছি, তুমি হিন্দু ব্রাহ্মণের মেয়ে, মুসলমানের ঘরে যেতে সংকোচ হচ্ছে। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো— যারা যথার্থ মুসলমান, তারা ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকেও সম্মান করে, আমার ঘরে তুমি হিন্দুবাড়ির মেয়ের মতোই থাকবে। আমার নাম হবির খাঁ। আমার বাড়ি খুব নিকটে, তুমি চলো, তোমাকে আমি খুব নিরাপদে রেখে দেব।"

কমলা ব্রাহ্মণের মেয়ে, সংকোচ কিছুতে যেতে চায় না। সেই দেখে হবির বলল, "দেখো, আমি বেঁচে থাকতে এই তল্লাটে কেউ নেই যে তোমার ধর্মে হাত দিতে পারে। তুমি এসো আমার সঙ্গে, ভয় কোরো না।"

হবির খাঁ কমলাকে নিয়ে গেল তার বাড়িতে। আশ্চর্য এই, মুসলমান বাড়ির আট-মহলা বাড়ির এক মহলে আছে শিবের মন্দির আর হিন্দুয়ানির সমস্ত ব্যবস্থা।

একটি বৃদ্ধ হিন্দু ব্রাহ্মণ এল। সে বললে, "মা, হিন্দুর ঘরের মতো এ-জায়গা তুমি জেনো, এখানে তোমার জাত রক্ষা হবে।"

কমলা কেঁদে বললে, "দয়া করে কাকাকে খবর দাও তিনি নিয়ে যাবেন।"

হবির বললে, "বাছা, ভুল করছ, আজ তোমার বাড়িতে কেউ তোমাকে ফিরে নেবে না, তোমাকে পথের মধ্যে ফেলে দিয়ে যাবে। নাহয় একবার পরীক্ষা করে দেখো।"

হবির খাঁ কমলাকে তার কাকার খিড়কির দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বললে, "আমি এখানেই অপেক্ষা করে রইলুম।"

বাড়ির ভিতর গিয়ে কাকার গলা জড়িয়ে ধরে কমলা বললে, "কাকামণি, আমাকে তুমি ত্যাগ কোরো না।"

কাকার দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

কাকি এসে দেখে বলে উঠল, "দূর করে দাও, দূর করে দাও অলক্ষ্মীকে। সর্বনাশিনী, বেজাতের ঘর থেকে ফিরে এসেছিস, আবার তোর লজ্জা নেই!"

কাকা বললে, "উপায় নেই মা! আমাদের যে হিন্দুর ঘর, এখানে তোমাকে কেউ ফিরে নেবে না, মাঝের থেকে আমাদেরও জাত যাবে।"

মাথা হেঁট করে রইল কমলা কিছুক্ষণ, তার পর ধীর পদক্ষেপে খিড়কির দরজা পার হয়ে হবিরের সঙ্গে চলে গেল। চিরদিনের মতো বন্ধ হল তার কাকার ঘরে ফেরার কপাট।

হবির খাঁর বাড়িতে তার আচার ধর্ম পালন করবার ব্যবস্থা রইল। হবির খাঁ বললে, "তোমার মহলে আমার ছেলেরা কেউ আসবে না, এই বুড়ো ব্রাহ্মণকে নিয়ে তোমার পূজা-অর্চা, হিন্দুঘরের আচার-বিচার, মেনে চলতে পারবে।"

এই বাড়ি সম্বন্ধে পূর্বকালের একটু ইতিহাস ছিল। এই মহলকে লোকে বলত রাজপুতানীর মহল। পূর্বকালের নবাব এনেছিলেন রাজপুতের মেয়েকে কিন্তু তাকে তার জাত বাঁচিয়ে আলাদা করে রেখেছিলেন। সে শিবপূজা করত, মাঝে মাঝে তীর্থভ্রমণেও যেত। তখনকার অভিজাত বংশীয় মুসলমানেরা ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুকে শ্রদ্ধা করত। সেই রাজপুতানী এই মহলে থেকে যত হিন্দু বেগমদের আশ্রয় দিত, তাদের আচার-বিচার থাকত অক্ষুণ্ণ। শোনা যায় এই হবির খাঁ সেই রাজপুতানীর পুত্র। যদিও সে মায়ের ধর্ম নেয় নি, কিন্তু সে মাকে পূজা করত অন্তরে। সে মা তো এখন আর নেই, কিন্তু তার স্মৃতি-রক্ষাকল্পে এইরকম সমাজবিতাড়িত অত্যাচারিত হিন্দু মেয়েদের বিশেষভাবে আশ্রয় দান করার ব্রত তিনি নিয়েছিলেন।

কমলা তাদের কাছে যা পেল তা সে নিজের বাড়িতে কোনোদিন পেত না। সেখানে কাকি তাকে 'দূর ছাই' করত— কেবলই শুনত সে অলক্ষ্মী, সে সর্বনাশী, সঙ্গে এনেছে সে দুর্ভাগ্য, সে ম'লেই বংশ উদ্ধার পায়। তার কাকা তাকে লুকিয়ে মাঝে মাঝে কাপড়-চোপড় কিছু দিতেন, কিন্তু কাকির ভয়ে সেটা গোপন করতে হত। রাজপুতানীর মহলে এসে সে যেন মহিষীর পদ পেলে। এখানে তার আদরের অন্ত ছিল না। চারি দিকে তার দাসদাসী, সবই হিন্দু ঘরের ছিল।

অবশেষে যৌবনের আবেগ এসে পৌঁছল তার দেহে। বাড়ির একটি ছেলে লুকিয়ে লুকিয়ে আনাগোনা শুরু করল কমলার মহলে, তার সঙ্গে সে মনে-মনে বাঁধা পড়ে গেল।

তখন সে হবির খাঁকে একদিন বললে, "বাবা, আমার ধর্ম নেই, আমি যাকে ভালোবাসি সেই ভাগ্যবানই আমার ধর্ম। যে ধর্ম চিরদিন আমাকে জীবনের সব ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করেছে, অবজ্ঞার আঁস্তাকুড়ের পাশে আমাকে ফেলে রেখে দিয়েছে, সে ধর্মের মধ্যে আমি তো দেবতার প্রসন্নতা কোনোদিন দেখতে পেলুম না। সেখানকার দেবতা আমাকে প্রতিদিন অপমানিত করেছে সে কথা আজও আমি ভুলতে পারি নে। আমি প্রথম ভালোবাসা পেলুম, বাপজান, তোমার ঘরে। জানতে পারলুম হতভাগিনী মেয়েরও জীবনের মূল্য আছে। যে দেবতা আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন সেই ভালোবাসার সম্মানের মধ্যে তাঁকেই আমি পুজো করি, তিনিই আমার

দেবতা— তিনি হিন্দুও নন, মুসলমানও নন। তোমার মেজো ছেলে করিম, তাকে আমি মনের মধ্যে গ্রহণ করেছি— আমার ধর্মকর্ম ওরই সঙ্গে বাঁধা পড়েছে। তুমি মুসলমান করে নাও আমাকে, তাতে আমার আপত্তি হবে না— আমার নাহয় দুই ধর্মই থাকল।"

এমনি করে চলল ওদের জীবনযাত্রা, ওদের পূর্বতন পরিজনদের সঙ্গে আর দেখা-সাক্ষাতের কোনো সম্ভাবনা রইল না। এ দিকে হবির খাঁ কমলা যে ওদের পরিবারের কেউ নয়, সে কথা ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করলে— ওর নাম হল মেহেরজান।

ইতিমধ্যে ওর কাকার দ্বিতীয় মেয়ের বিবাহের সময় এল। তার বন্দোবস্তও হল পূর্বের মতো, আবার এল সেই বিপদ। পথের মধ্যে হুঙ্কার দিয়ে এসে পড়ল সেই ডাকাতের দল। শিকার থেকে একবার তারা বঞ্চিত হয়েছিল সে দুঃখ তাদের ছিল, এবার তার শোধ নিতে চায়।

কিন্তু তারই পিছন পিছন আর এক হুঙ্কার এল, "খবরদার!"

"ঐরে, হবির খাঁর চেলারা এসে সব নষ্ট করে দিলে।"

কন্যাপক্ষরা যখন কন্যাকে পালকির মধ্যে ফেলে রেখে যে যেখানে পেল দৌড় মারতে চায় তখন তাদের মাঝখানে দেখা দিল হবির খাঁয়ের অর্ধচন্দ্র-আঁকা পতাকা বাঁধা বর্শার ফলক। সেই বর্শা নিয়ে দাঁড়িয়েছে নির্ভয়ে একটি রমণী।

সরলাকে তিনি বললেন, "বোন, তোর ভয় নেই। তোর জন্য আমি তাঁর আশ্রয় নিয়ে এসেছি যিনি সকলকে আশ্রয় দেন! যিনি কারো জাত বিচার করেন না।—

"কাকা, প্রণাম তোমাকে। ভয় নেই, তোমার পা ছোঁব না। এখন এ'কে তোমার ঘরে নিয়ে যাও, একে কিছুতে অস্পৃশ্য করে নি। কাকিকে বোলো অনেক দিন তাঁর অনিচ্ছুক অন্নবস্ত্রে মানুষ হয়েছি, সে ঋণ যে আমি এমন করে আজ শুধতে পারব তা ভাবি নি। ওর জন্যে একটি রাঙা চেলী এনেছি, সে এই নাও, আর একটি কিংখাবের আসন। আমার বোন যদি কখন দুঃখে পড়ে তবে মনে থাকে যেন তার মুসলমান দিদি আছে, তাকে রক্ষা করবার জন্যে।"

২৪-২৫ জুন ১৯৪১ আষাঢ় ১৩৪৮

ভিখারিনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

কাশ্মীরের দিগন্তব্যাপী জলদস্পর্শী শৈলমালার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটিরগুলি আঁধার আঁধার ঝোপঝাপের মধ্যে প্রচ্ছন্ন। এখানে সেখানে শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষচ্ছায়ার মধ্য দিয়া একটি-দুইটি শীর্ণকায় চঞ্চল ক্রীড়াশীল নির্ঝর গ্রাম্য কুটিরের চরণ সিক্ত করিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপলগুলির উপর দ্রুত পদক্ষেপ করিয়া এবং বৃক্ষচ্যুত ফুল ও পত্রগুলিকে তরঙ্গে তরঙ্গে উলটপালট করিয়া, নিকটস্থ সরোবরে লুটাইয়া পড়িতেছে। দূরব্যাপী নিস্তরঙ্গ সরসী— লাজুক উষার রক্তরাগে, সূর্যের হেমময় কিরণে, সন্ধ্যার স্তরবিন্যস্ত মেঘমালার প্রতিবিম্বে, পূর্ণিমার বিগলিত জ্যোৎস্নাধারায় বিভাসিত হইয়া শৈললক্ষ্মীর বিমল দর্পণের ন্যায় সমস্ত দিনরাত্রি হাস্য করিতেছে। ঘনবৃক্ষবেষ্টিত অন্ধকার গ্রামটি শৈলমালার বিজন ক্রোড়ে আঁধারের অবগুণ্ঠন পরিয়া পৃথিবীর কোলাহল হইতে একাকী লুকাইয়া আছে। দূরে দূরে হরিৎ শস্যময় ক্ষেত্রে গাভী চরিতেছে, গ্রাম্য বালিকারা সরসী হইতে জল তুলিতেছে, গ্রামের আঁধার কুঞ্জে বসিয়া অরণ্যের ম্রিয়মাণ কবি বউকথাকও মর্মের বিষণ্ণ গান গাহিতেছে। সমস্ত গ্রামটি যেন একটি কবির স্বপ্ন।

এই গ্রামে দুইটি বালক-বালিকার বড়োই প্রণয় ছিল। দুইটিতে হাত ধরাধরি করিয়া গ্রাম্যশ্রীর ক্রোড়ে খেলিয়া বেড়াইত; বকুলের কুঞ্জে কুঞ্জে দুইটি অঞ্চল ভরিয়া ফুল তুলিত; শুকতারা আকাশে ডুবিতে না ডুবিতে, উষার জলদমালা লোহিত না হইতে হইতেই সরসীর বক্ষে তরঙ্গ তুলিয়া ছিন্ন কমলদুটির ন্যায় পাশাপাশি সাঁতার দিয়া বেড়াইত। নীরব মধ্যাহ্নে স্নিগ্ধতরুচ্ছায় শৈলের সর্বোচ্চ শিখরে বসিয়া ষোড়শ-বর্ষীয় অমরসিংহ ধীর গম্ভীর স্বরে রামায়ণ পাঠ করিত, দুর্দান্ত রাবণ-কর্তৃক সীতাহরণ পাঠ করিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিত। দশমবর্ষীয়া কমলদেবী তাহার মুখের পানে স্থির হরিণনেত্র তুলিয়া নীরবে শুনিত, অশোকবনে সীতার বিলাপকাহিনী শুনিয়া পল্লবরেখা অশ্রুসলিলে সিক্ত করিত। ক্রমে গগনের বিশাল প্রাঙ্গণে তারকার দীপ জ্বলিলে, সন্ধ্যার অন্ধকার-অঞ্চলে জোনাকি ফুটিয়া উঠিলে, দুইটিতে হাত ধরাধরি করিয়া কুটিরে ফিরিয়া আসিত। কমলদেবী বড়ো অভিমানিনী ছিল; কেহ তাহাকে কিছু বলিলে সে অমরসিংহের বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিত। অমর তাহাকে সান্ত্বনা দিলে, তাহার

অশ্রুজল মুছাইয়া দিলে, আদর করিয়া তাহার অশ্রুসিক্ত কপোল চুম্বন করিলে, বালিকার সকল যন্ত্রণা নিভিয়া যাইত। পৃথিবীর মধ্যে তাহার আর কেহই ছিল না; কেবল একটি বিধবা মাতা ছিল আর স্নেহময় অমরসিংহ ছিল, তাহারাই বালিকাটির অভিমান সান্ত্বনা ও ক্রীড়ার স্থল।

বালিকার পিতা গ্রামের মধ্যে সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মচারী বলিয়া সকলেই তাঁহাকে মান্য করিত। সম্পদের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া এবং সম্ভ্রমের সুদূর চন্দ্রলোকে অবস্থান করিয়া কমল গ্রামের বালিকাদের সহিত কখনো মিশে নাই, বাল্যকাল হইতে তাহার সাধের সঙ্গী অমরসিংহের সহিত খেলিয়া বেড়াইত। অমরসিংহ সেনাপতি অজিতসিংহের পুত্র, অর্থ নাই কিন্তু উচ্চবংশজাত— এই নিমিত্ত কমল ও অমরের বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে। একবার মোহনলাল নামে একজন ধনীর পুত্রের সহিত কমলের বিবাহের প্রস্তাব হয়, কিন্তু কমলের পিতা তাহার চরিত্র ভালো নয় জানিয়া তাহাতে সম্মত হন নাই।

কমলের পিতার মৃত্যু হইল। ক্রমে তাঁহার বিষয়সম্পত্তি ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া গেল। ক্রমে তাঁহার প্রস্তরনির্মিত অট্টালিকাটি আস্তে আস্তে ভাঙিয়া গেল। ক্রমে তাঁহার পারিবারিক সম্ভ্রম অল্পে অল্পে বিনষ্ট হইল এবং ক্রমে তাঁহার রাশি রাশি বন্ধু একে একে সরিয়া পড়িল। অনাথা বিধবা জীর্ণ অট্টালিকা ত্যাগ করিয়া একটি ক্ষুদ্র কুটিরে বাস করিলেন। সম্পদের সুখময় স্বর্গ হইতে দারুণ দারিদ্র্যে নিপতিত হইয়া বিধবা অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন। সম্ভ্রম রক্ষা করিবার উপায় দূরে থাক, জীবনরক্ষারও কোনো সম্বল নাই— আদরিণী কন্যাটি কী করিয়া দারিদ্র্যদুঃখ সহ্য করিবে? স্নেহময়ী মাতা ভিক্ষা করিয়াও কমলকে কোনোমতে দারিদ্র্যের রৌদ্র ভোগ করিতে দেন নাই।

অমরের সহিত কমলের শীঘ্রই বিবাহ হইবে। বিবাহের আর দুই-এক সপ্তাহ অবশিষ্ট আছে। অমর গ্রামের পথে বেড়াইতে বেড়াইতে কমলকে তাহার ভবিষ্যৎ-জীবনের কত কী সুখের কাহিনী শুনাইত— বড়ো হইলে দুইজনে ঐ শৈলশিখরে কত খেলা খেলিবে, ঐ সরসীর জলে কত সাঁতার দিবে, ঐ বকুলের কুঞ্জে কত ফুল তুলিবে, চুপিচুপি গম্ভীরভাবে তাহারই পরামর্শ করিত। বালিকা অমরের মুখে তাহাদের ভবিষ্যৎ-ক্রীড়ার গল্প শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বিহ্বল নেত্রে অমরের মুখের পানে চাহিয়া থাকিত। এইরূপে যখন এই দুইটি বালক-বালিকা কল্পনার অস্ফুট জ্যোৎস্নাময় স্বর্গে খেলা করিতেছিল তখন রাজধানী হইতে সংবাদ আসিল যে, রাজ্যের সীমায় যুদ্ধ বাধিয়াছে। সেনানায়ক অজিতসিংহ যুদ্ধে যাইবেন এবং যুদ্ধশিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার পুত্র অমরসিংহকেও সঙ্গে লইবেন।

সন্ধ্যা হইয়াছে, শৈলশিখরের বৃক্ষছায়ায় অমর ও কমল দাঁড়াইয়া আছে। অমরসিংহ কহিতেছেন, "কমল, আমি তো চলিলাম, এখন রামায়ণ শুনিবি কার কাছে।"

বালিকা ছলছল নেত্রে মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

"দেখ্ কমল, এই অস্তমান সূর্য আবার কাল উঠিবে, কিন্তু তোর কুটিরদ্বারে আমি আর আঘাত দিতে যাইব না। তবে বল্ দেখি, আর কাহার সহিত খেলা করিবি।"

কমল কিছুই কহিল না, নীরবে চাহিয়া রহিল।

অমর কহিল, "সখী, যদি তোর অমর যুদ্ধক্ষেত্রে মরিয়া যায়, তাহা হইলে—"

কমল ক্ষুদ্র বাহু দুটিতে অমরের বক্ষ জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল; কহিল, "আমি যে তোমাকে ভালোবাসি অমর, তুমি মরিবে কেন।"

অশ্রুসলিলে বালকের নেত্র ভরিয়া গেল; তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, "কমল আয়, অন্ধকার হইয়া আসিতেছে— আজ এই শেষবার তোকে কুটিরে পৌঁছাইয়া দিই।"

দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া কুটিরের অভিমুখে চলিল। গ্রামের বালিকারা জল তুলিয়া গান গাইতে গাইতে গৃহে ফিরিয়া আসিতেছে, বনশ্রেণীর মধ্যে অলক্ষিতভাবে একটির পর আর-একটি পাপিয়া গাহিয়া গাহিয়া সারা হইতেছে, আকাশময় তারকা ফুটিয়া উঠিল। অমর কেন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে এই অভিমানে কমল কুটিরে গিয়া মাতার বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। অমর অশ্রুসলিলে শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া আসিল।

অমর পিতার সহিত সেই রাত্রেই গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিল। গ্রামের শেষ প্রান্তের শৈলশিখরোপরি উঠিয়া একবার ফিরিয়া চাহিল; দেখিল— শৈলগ্রাম জ্যোৎস্নালোকে ঘুমাইতেছে, চঞ্চল নির্ঝরিণী নাচিতেছে, ঘুমন্ত গ্রামের সকল কোলাহল স্তব্ধ, মাঝে মাঝে দুই-একটি রাখালের গানের অস্ফুট স্বর গ্রামশৈলের শিখরে গিয়া মিশিতেছে। অমর দেখিল কমলদেবীর লতাপাতাবেষ্টিত ক্ষুদ্র কুটিরটি অস্ফুট জ্যোৎস্নায় ঘুমাইতেছে। ভাবিল ঐ কুটিরে হয়তো এতক্ষণে শূন্যহৃদয়া মর্মপীড়িতা বালিকাটি উপাধানে ক্ষুদ্র মুখখানি লুকাইয়া নিদ্রাশূন্য নেত্রে আমার জন্য কাঁদিতেছে। অমরের নেত্র অশ্রুতে পূরিয়া গেল।

অজিতসিংহ কহিলেন, "রাজপুত-বালক! যুদ্ধযাত্রার সময় কাঁদিতেছিস!"

অমর অশ্রু মুছিয়া ফেলিল।

শীতকাল। দিবা অবসান হইয়া আসিতেছে। গাঢ় অন্ধকারময় মেঘরাশি উপত্যকা শৈলশিখর কুটির বন নির্ঝর দুর্গ শস্যক্ষেত্র একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে, অবিশ্রান্ত

বরফ পড়িতেছে, তরল তুষারে সমস্ত শৈল আচ্ছন্ন হইয়াছে, পত্রহীন শীর্ণ বৃক্ষসকল শ্বেত মস্তকে স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান। দারুণ তীব্র শীতে হিমালয়গিরিও যেন অবসন্ন হইয়া গিয়াছে। এই শীতসন্ধ্যার বিষণ্ণ অন্ধকারের মধ্য দিয়া, গাঢ় বাষ্পময় স্তম্ভিত মেঘরাশি ভেদ করিয়া, একটি ম্লানমুখশ্রী ছিন্নবসনা দরিদ্র-বালিকা অশ্রুময় নেত্রে শৈলের পথে পথে ভ্রমণ করিতেছে। তুষারে পদতল প্রস্তরের ন্যায় অসাড় হইয়া গিয়াছে, শীতে সমস্ত শরীর কাঁপিতেছে, মুখ নীলবর্ণ, পার্শ্ব দিয়া দুই একটি নীরব পান্থ চলিয়া যাইতেছে। হতভাগিনী কমল করুণনেত্রে এক-একবার তাহাদের মুখের দিকে চাহিতেছে। কী বলিতে গিয়া বলিতেছে না, আবার অশ্রুসলিলে অঞ্চল সিক্ত করিয়া তুষারস্তরে পদচিহ্ন অঙ্কিত করিতেছে।

কুটিরে রুগ্‌ণা মাতা অনাহারে শয্যাগত। সমস্ত দিন বালিকা এক মুষ্টিও আহার করিতে পায় নাই, প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত পথে পথে ভ্রমণ করিতেছে। সাহস করিয়া ভীতিবিহ্বলা বালা কাহারো কাছে ভিক্ষা চাহিতে পারে নাই— বালিকা কখনো ভিক্ষা করে নাই, কী করিয়া ভিক্ষা করিতে হয় জানে না, কাহাকে কী বলিতে হয় জানে না। আলুলিত কুন্তলরাশির মধ্যে সেই ক্ষুদ্র করুণ মুখখানি দেখিলে, দারুণ শীতে কম্পমান তাহার সেই ক্ষুদ্র দেহখানি দেখিলে, পাষাণও বিগলিত হইত।

ক্রমে অন্ধকার ঘনীভূত হইল। নিরাশ বালিকা ভগ্নহৃদয়ে শূন্য অঞ্চলে কুটিরে ফিরিয়া যাইতেছে— কিন্তু অসাড় পা আর উঠে না; অনাহারে দুর্বল, পথশ্রমে ক্লান্ত, নিরাশায় ম্রিয়মাণ, শীতে অবসন্ন বালিকা আর চলিতে পারে না, অবশ হইয়া পথ-প্রান্তে তুষারশয্যায় শুইয়া পড়িল। শরীর ক্রমে আরো অবসন্ন হইতে লাগিল। বালিকা বুঝিল ক্রমে সে অবসন্ন হইয়া তুষারে চাপা পড়িয়া মরিবে। মাকে স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল; জোড়হস্তে কহিল, "মা ভগবতী, আমাকে মারিয়া ফেলিয়ো না, আমাকে রক্ষা করো, আমি মরিলে যে আমার মা কাঁদিবে, আমার অমর কাঁদিবে।"

ক্রমে বালিকা অচেতন হইয়া পড়িল। কমল আলুলিতকুন্তলে শিথিল-অঞ্চলে তুষারে অর্ধমগ্না হইয়া বৃক্ষচ্যুত মলিন ফুলটির মতো পথপ্রান্তে পড়িয়া রহিল। তুষারের উপর তুষার পড়িতে লাগিল, বালিকার বক্ষের উপর তুষারের কণা পড়িতেছে ও গলিতেছে। এবং ক্রমে জমিয়া যাইতেছে। এই আঁধার রাত্রিতে একজন পান্থও পথ দিয়া যাইতেছে না। বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। রাত্রি বাড়িতে লাগিল। বরফ জমিতে লাগিল। বালিকা একাকিনী শৈলপথে পড়িয়া রহিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কমলের মাতা ভগ্ন কুটিরে রোগশয্যায় শয়ান। জীর্ণ গৃহ ভেদ করিয়া শীতের বাতাস তীব্রবেগে গৃহে প্রবেশ করিতেছে। বিধবা তৃণশয্যায় শুইয়া থরথর করিয়া কাঁপিতেছেন। গৃহ অন্ধকার, প্রদীপ জ্বালিবার লোক নাই। কমল প্রাতে ভিক্ষা করিতে গিয়াছে, এখনো ফিরিয়া আসে নাই। ব্যাকুল বিধবা প্রত্যেক পদশব্দে কমল আসিতেছে বলিয়া চমকিয়া উঠিতেছেন। কমলকে খুঁজিবার জন্য বিধবা কতবার উঠিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু পারেন নাই। কত কী আশঙ্কায় আকুল হইয়া মাতা দেবতার নিকট কাতর ক্রন্দনে প্রার্থনা করিয়াছেন; অশ্রুজলে কতবার কহিয়াছেন, 'আমি হতভাগিনী, আমার মরণ হইল না কেন। কখনো ভিক্ষা করিতে জানে না যে বালিকা, তাহাকেও আজ অনাথার মতো দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইতে হইল? ক্ষুদ্র বালিকা অধিক দূর চলিতে পারে না— সে এই অন্ধকারে, তুষারে, বৃষ্টিতে কী করিয়া বাঁচিবে।'

উঠিতে পারেন না— অথচ কমলকে দেখিতে পাইতেছেন না, বিধবা বক্ষে করাঘাত করিয়া অধীর ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। দুই-একজন প্রতিবাসী বিধবাকে দেখিতে আসিয়াছিল; বিধবা তাহাদের চরণ জড়াইয়া ধরিয়া সজল নয়নে কাতরভাবে মিনতি করিলেন, "আমার পথহারা কমল কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, একবার তাহাকে খুঁজিতে যাও।"

তাহারা বলিল, "এই তুষারে, অন্ধকারে, আমরা ঘরের বাহিরে যাইতে পারি না।"

বিধবা কাঁদিয়া কহিলেন,"একবার যাও— আমি অনাথ, দরিদ্র, অর্থ নাই, তোমাদের কী দিব বলো। ক্ষুদ্র বালিকা, সে পথ চিনে না, সে আজ সমস্ত দিন কিছু খায় নাই— তাহাকে মাতার ক্রোড়ে আনিয়া দেও— ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করিবেন।"

কেহ শুনিল না। সে বৃষ্টিবজ্রে কে বাহির হইবে। সকলেই নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া গেল।

ক্রমে রাত্রি বাড়িতে লাগিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া দুর্বল বিধবা ক্লান্ত হইয়া গিয়াছেন, নির্জীবভাবে শয্যায় পড়িয়া আছেন, এমন সময়ে বাহিরে পদশব্দ শুনা গেল। বিধবা চকিত নেত্রে দ্বারের দিকে চাহিয়া ক্ষীণস্বরে কহিলেন, "কমল, মা, আইলি?"

একজন বাহির হইতে রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "ঘরে কে আছে।"

গৃহ হইতে কমলের মাতা উত্তর দিলেন। সে শাখাদীপ[১] হস্তে গৃহে প্রবেশ করিল

১ পার্বত্য লোক চীড়বৃক্ষের শাখা জ্বালাইয়া মশালের ন্যায় ব্যবহার করে।

এবং কমলের মাতাকে কী কহিল, শুনিবামাত্র বিধবা চীৎকার করিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এ দিকে তুষারক্লিষ্ট কমল ক্রমে ক্রমে চেতন লাভ করিল, চক্ষু মেলিয়া চাহিল দেখিল— একটি প্রকাণ্ড গুহা, ইতস্তত বৃহৎ শিলাখণ্ড বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, গাঢ় ধূম্র মেঘে গুহা পূর্ণ, সেই মেঘের অন্ধকার ভেদ করিয়া শাখাদীপের আলোকদীপ্ত কতকগুলি কঠোর শ্মশ্রুপূর্ণ মুখ কমলের মুখের দিকে চাহিয়া আছে। প্রাচীরে কুঠার কৃপাণ প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র লম্বিত আছে, কতকগুলি সামান্য গার্হস্থ্য উপকরণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। বালিকা সভয়ে চক্ষু নিমীলিত করিল।

আবার চক্ষু মেলিয়া চাহিল। একজন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি।"

বালিকা উত্তর দিতে পারিল না, বালিকার বাহু ধরিয়া সবেগে নাড়াইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুই।"

কমল ভীতিকম্পিত মৃদুস্বরে কহিল, "আমি কমল।"

সে মনে করিয়াছিল এই উত্তরেই তাহারা তাহার সমস্ত পরিচয় পাইবে।

একজন জিজ্ঞাসা করিল, "আজ সন্ধ্যার দুর্যোগের সময় পথে ভ্রমণ করিতেছিলে কেন।"

বালিকা আর থাকিতে পারিল না, কাঁদিয়া উঠিল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "আজ আমার মা সমস্ত দিন আহার করিতে পান নাই—"

সকলে হাসিয়া উঠিল— তাহাদের নিষ্ঠুর অট্টহাস্যে গুহা প্রতিধ্বনিত হইল, বালিকার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল, কমল সভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিল। দস্যুদের হাস্য বজ্রধ্বনির ন্যায় বালিকার বক্ষে গিয়া বাজিল; সে সভয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "আমাকে আমার মায়ের কাছে লইয়া যাও।"

আবার সকলে মিলিয়া হাসিয়া উঠিল। ক্রমে তাহারা কমলের নিকট হইতে তাহার বাসস্থান, পিতামাতার নাম, প্রভৃতি জানিয়া লইল। অবশেষে একজন কহিল, "আমরা দস্যু, তুই আমাদের বন্দিনী। তোর মাতার নিকট বলিয়া পাঠাইতেছি, সে যদি নির্ধারিত অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না দেয় তবে তোকে মারিয়া ফেলিব।"

কমল কাঁদিয়া কহিল, "আমার মা অর্থ কোথায় পাইবেন। তিনি অতি দরিদ্র। তাঁহার আর কেহ নাই— আমাকে মারিয়ো না, আমাকে মারিয়ো না, আমি কাহারো কিছু করি নাই।"

আবার সকলে হাসিয়া উঠিল।

কমলের মাতার নিকটে একজন দূত প্রেরিত হইল। সে গিয়া কহিল, "তোমার কন্যা বন্দিনী হইয়াছে— আজ হইতে তৃতীয় দিবসে আমি আসিব— যদি পাঁচশত মুদ্রা দিতে পারো তবে মুক্ত করিয়া দিব, নচেৎ তোমার কন্যা নিশ্চিত হত হইবে।"

এই সংবাদ শুনিয়াই কমলের মাতা মূর্ছিত হইয়া পড়েন।

দরিদ্র বিধবা অর্থ পাইবেন কোথায়। একে একে সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। বিবাহ হইলে কমলকে দিবেন বলিয়া কতকগুলি অলংকার রাখিয়া দিয়াছিলেন, সেগুলি বিক্রয় করিলেন। তথাপি নির্দিষ্ট অর্থের চতুর্থাংশও হইল না। আর কিছুই নাই। অবশেষে বক্ষের বস্ত্র মোচন করিলেন, সেখানে তাঁহার মৃত স্বামীর একটি অঙ্গুরীয়ক রাখিয়া দিয়াছিলেন— মনে করিয়াছিলেন, সুখ হউক, দুঃখ হউক, দারিদ্র্যই বা হউক, কখনো সেটি ত্যাগ করিবেন না, চিরকাল বক্ষের মধ্যে লুকাইয়া রাখিবেন— মনে করিয়াছিলেন, এই অঙ্গুরীয়কটি তাঁহার চিতানলের সঙ্গী হইবে— কিন্তু অশ্রুময়নেত্রে তাহাও বাহির করিলেন।

সে অঙ্গুরীটিও যখন তিনি বিক্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহার বুকের এক-একখানি অস্থিও ভাঙিয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু কেহই কিনিতে চাহিল না।

অবশেষে বিধবা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা চাহিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। একদিন গেল, দুইদিন গেল, তিনদিন যায়, কিন্তু নির্দিষ্ট অর্থের অর্ধেকও সংগৃহীত হয় নাই। আজ সেই দস্যু আসিবে। আজ যদি তাহার হস্তে অর্থ দিতে না পারেন, তবে বিধবার সংসারের যে একমাত্র বন্ধন আছে তাহাও ছিন্ন হইবে।

কিন্তু অর্থ পাইলেন না। ভিক্ষা করিলেন, দ্বারে দ্বারে রোদন করিলেন, সম্পদের সময় যাহারা তাঁহার স্বামীর সামান্য অনুচর ছিল তাহাদের নিকটও অঞ্চল পাতিলেন— কিন্তু নির্দিষ্ট অর্থের অর্ধেকও সংগৃহীত হইল না।

ভয়বিহ্বলা কমল গুহার কারাগারে কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা হইল। সে ভাবিতেছে তাহার অমরসিংহ থাকিলে কোনো দুর্ঘটনা ঘটিত না। অমরসিংহ যদিও বালক, কিন্তু সে জানিত অমরসিংহ সকলই করিতে পারে। দস্যুরা তাহাকে মাঝে মাঝে ভয় দেখাইয়া যায়। দস্যুদের দেখিলেই সে ভয়ে অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া ফেলিত। এই অন্ধকার কারাগৃহে, এই নিষ্ঠুর দস্যুদিগের মধ্যে একজন যুবা ছিল। সে কমলের প্রতি তেমন কর্কশভাবে ব্যবহার করিত না। সে ব্যাকুল বালিকাকে স্নেহের সহিত কত কী

কথা জিজ্ঞাসা করিত, কিন্তু কমল ভয়ে কোনো কথারই উত্তর দিত না, দস্যু কাছে সরিয়া বসিলে সে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া যাইত। ঐ যুবাটি দস্যুপতির পুত্র। সে একবার কমলকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, দস্যুর সহিত বিবাহ করিতে কি তাহার কোনো আপত্তি আছে। এবং মাঝে মাঝে প্রলোভন দেখাইত যে, যদি কমল তাহাকে বিবাহ করে তবে সে তাহাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিবে। কিন্তু ভীরু কমল কোনো কথারই উত্তর দিত না। একদিন গেল ও দুইদিন গেল, বালিকা সভয়ে দেখিল দস্যুরা মদ্যপান করিয়া ছুরিকা শানাইতেছে।

এ দিকে বিধবার গৃহে দস্যুদের দূত প্রবেশ করিল, বিধবাকে জিজ্ঞাসা করিল অর্থ কোথায়? বিধবা ভিক্ষা করিয়া যাহা-কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন সকলই দস্যুর পদতলে রাখিয়া কহিলেন, "আমার আর কিছুই নাই, যাহা-কিছু ছিল সকলই দিলাম, এখন তোমাদের কাছে ভিক্ষা চাহিতেছি আমার কমলকে আনিয়া দেও।"

দস্যু সে মুদ্রাগুলি সক্রোধে ছড়াইয়া ফেলিল। কহিল, "মিথ্যা প্রতারণা করিয়া পার পাইবি না, নির্দিষ্ট অর্থ না দিলে নিশ্চয় আজি তোর কন্যা হত হইবে। তবে চলিলাম— আমাদের দলপতিকে বলিয়া আসি যে, নির্দিষ্ট অর্থ পাইবে না, তবে এখন নরশোণিতে মহাকালীর পূজা দেও।"

বিধবা কত মিনতি করিলেন, কত কাঁদিলেন, কিছুতেই দস্যুর পাষাণহৃদয় গলাইতে পারিলেন না। দস্যু গমনোদ্যত হইলে কহিলেন, "যাইয়ো না, আর একটু অপেক্ষা করো, আমি আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।"

এই বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মোহনলালের সহিত কমলের বিবাহের প্রস্তাব হয়। কিন্তু তাহা সম্পন্ন না হাওয়াতে মোহন মনে-মনে কিছু ক্রুদ্ধ হইয়া আছে। কমলের সমুদয় বৃত্তান্ত মোহনলাল প্রাতেই শুনিতে পাইয়াছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ কুলপুরোহিতকে ডাকাইয়া শীঘ্র বিবাহের উত্তম দিন আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন।

গ্রামের মধ্যে মোহনের ন্যায় ধনী আর কেহ ছিল না; আকুল বিধবা অবশেষে তাঁহার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মোহন উপহাসের স্বরে হাসিয়া কহিলেন, "এ কী অপূর্ব ব্যাপার! এত দিনের পর দরিদ্রের কুটিরে যে পদার্পণ হইল?"

বিধবা।. উপহাস করিয়ো না। আমি দরিদ্র, তোমার কাছে ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছি।

মোহন। কী হইয়াছে।

বিধবা আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন।

মোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা, আমাকে কী করিতে হইবে।"

বিধবা। কমলের প্রাণরক্ষা করিতে হইবে।

মোহন। কেন, অমরসিংহ এখানে নাই ?

বিধবা উপহাস বুঝিতে পারিলেন। কহিলেন, "মোহন, যদি বাসস্থান অভাবে আমাকে বনে বনে ভ্রমণ করিতে হইত, অনাহারে ক্ষুধার জ্বালায় যদি পাগল হইয়া মরিতাম, তথাপি তোমার কাছে একটি তৃণও প্রার্থনা করিতাম না। কিন্তু আজ যদি বিধবার একমাত্র ভিক্ষা পূর্ণ না করো, তবে তোমার নিষ্ঠুরতা চিরকাল মনে থাকিবে।"

মোহন। আইস, তবে তোমাকে একটি কথা বলি। কমল দেখিতে কিছু মন্দ নহে, আর তাহাকে যে আমার পছন্দ হয় নাই এমনও নহে, তবে তাহার সহিত আমার বিবাহের আর তো কোনো আপত্তি দেখিতেছি না। তোমার কাছে ঢাকিয়া কী করিব, বিনা কারণে ভিক্ষা দিবার মতো আমার অবস্থা নহে।

বিধবা। অগ্রেই যে অমরের সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

মোহন কিছু উত্তর না দিয়া হিসাবের খাতা খুলিয়া লিখিতে বসিলেন। যেন কেহই ঘরে নাই, যেন কাহারো সহিত কিছু কথা হয় নাই। এ দিকে সময় বহিয়া যায়, দস্যু আছে কি গিয়াছে তাহার ঠিক নাই। বিধবা কাঁদিয়া কহিলেন, "মোহন, আর আমাকে যন্ত্রণা দিয়ো না, সময় অতীত হইতেছে।"

মোহন। রোসো, কাজ সারিয়া ফেলি।

অবশেষে যদি বিধবা বিবাহের প্রস্তাবে সম্মত না হইতেন, তাহা হইলে সমস্ত দিনে কাজ সারা হইত কি না সন্দেহস্থল। বিধবা মোহনলালের নিকট অর্থ লইয়া দস্যুকে দিলেন, সে চলিয়া গেল। সেই দিনই ভয়ে আশঙ্কায় ত্রস্তা হরিণীটির ন্যায় বিহ্বলা বালিকা মাতার ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিল এবং তাঁহার বাহুপাশে মুখখানি প্রচ্ছন্ন করিয়া অনেকক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া মনের বেগ শান্ত করিল।

কিন্তু অনাথিনী বালিকা এক দস্যুর হস্ত হইতে আর-এক দস্যুর হস্তে পড়িল।

কত বৎসর গত হইয়া গেল। যুদ্ধের অগ্নি নির্বাপিত হইয়াছে। সৈনিকেরা দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে ও অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে ভূমি কর্ষণ করিতেছে। বিধবা

সংবাদ পাইলেন যে, অজিতসিংহ হত ও অমর কারারুদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু কন্যাকে এ সংবাদ শুনান নাই।

মোহনের সহিত বালিকার বিবাহ হইয়া গেল।

মোহনের ক্রোধ কিছুমাত্র নিবৃত্ত হইল না। তাহার প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি বিবাহ করিয়াই তৃপ্ত হয় নাই। সে নির্দোষী অবলা বালার প্রতি অনর্থক পীড়ন করিত। কমল মাতৃক্রোড়ের স্নিগ্ধ স্নেহচ্ছায়া হইতে এই নিষ্ঠুর কারাগৃহে আসিয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে, অভাগিনী কাঁদিতেও পায় না। বিন্দুমাত্র অশ্রু নেত্রে দেখা দিলে মোহনের ভর্ৎসনার ভয়ে ত্রস্ত হইয়া মুছিয়া ফেলিত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শৈলশিখরের নিষ্কলঙ্ক তুষারদর্পণের উপর উষার রক্তিম মেঘমালা স্তরে স্তরে সজ্জিত হইল। ঘুমন্ত বিধবা দ্বারে আঘাত শুনিয়া জাগিয়া উঠিলেন। দ্বার খুলিয়া দেখিলেন, সৈনিকবেশে অমরসিংহ দাঁড়াইয়া আছেন। বিধবা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অমর তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কমল, কমল কোথায়।"

শুনিলেন, স্বামীর আলয়ে।

মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তিনি কত কী আশা করিয়াছিলেন— ভাবিয়াছিলেন কত দিনের পর দেশে ফিরিয়া যাইতেছেন, যুদ্ধের উন্মত্ত ঝটিকা হইতে প্রণয়ের শান্তিময় স্নিগ্ধ নীড়ে ঘুমাইতে যাইতেছেন, তিনি যখন অতর্কিতভাবে দ্বারে গিয়া দাঁড়াইবেন তখন হর্ষবিহ্বলা কমল ছুটিয়া গিয়া তাঁহার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িবে। বাল্যকালের সুখময় স্থান সেই শৈলশিখরের উপর বসিয়া কমলকে যুদ্ধ-গৌরবের কথা শুনাইবেন, অবশেষে কমলের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া প্রণয়ের কুসুমকুঞ্জে সমস্ত জীবন সুখের স্বপ্নে কাটাইবেন। এমন সুখের কল্পনায় যে কঠোর বজ্র পড়িল, তাহাতে তিনি দারুণ অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু মনে তাঁহার যতই তোলপাড় হইয়াছিল, প্রশান্ত মুখশ্রীতে একটিমাত্র রেখাও পড়ে নাই।

মোহন কমলকে তাহার মাতৃ-আলয়ে রাখিয়া বিদেশে চলিয়া গেলেন। পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে কমল-পুষ্পকলিকাটি ফুটিয়া উঠিল। ইহার মধ্যে কমল একদিন বকুলবনে মালা গাঁথিতে গিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই, দূর হইতেই শূন্যমনে ফিরিয়া আসিয়াছিল।

আর-একদিন সে বাল্যকালের খেলেনাগুলি বাহির করিয়াছিল— আর খেলিতে পারিল না, নিরাশার নিশ্বাস ফেলিয়া সেগুলি তুলিয়া রাখিল। অবলা ভাবিয়াছিল যে, যদি অমর ফিরিয়া আসে তবে আবার দুইজনে মালা গাঁথিবে, আবার দুইজনে খেলা করিবে। কতকাল তাহার বাল্যসখা অমরকে দেখিতে পায় নাই, মর্মপীড়িতা কমল এক-একবার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিত। এক-একদিন রাত্রিকালে গৃহে কমলকে কেহ দেখিতে পাইত না, কমল কোথায় হারাইয়া গিয়াছে— খুঁজিয়া খুঁজিয়া অবশেষে তাহার বাল্যের ক্রীড়াস্থল সেই শৈলশিখরের উপর গিয়া দেখিত— ম্লানবদনা বালিকা অসংখ্যতারাখচিত অনন্ত আকাশের পানে নেত্র পাতিয়া আলুলিতকেশে শুইয়া আছে।

কমল মাতার জন্য, অমরের জন্য কাঁদিত বলিয়া মোহন বড়োই রুষ্ট হইয়াছিল এবং তাহাকে মাতৃ-আলয়ে পাঠাইয়া ভাবিয়াছিল যে, 'দিনকতক অর্থাভাবে কষ্ট পাক্, তাহার পরে দেখিব কে কাহার জন্য কাঁদিতে পারে।'

মাতৃভবনে কমল লুকাইয়া কাঁদে। নিশীথবায়ুতে তাহার কত বিষাদের নিশ্বাস মিশাইয়া গিয়াছে, বিজন শয্যায় সে যে কত অশ্রুবারি মিশাইয়াছে, তাহা তাহার মাতা একদিনও জানিতে পারেন নাই।

একদিন কমল হঠাৎ শুনিল তাহার অমর দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার কত দিনকার কত কী ভাব উথলিয়া উঠিল। অমরসিংহের বাল্যকালের মুখখানি মনে পড়িল। দারুণ যন্ত্রণায় কমল কতক্ষণ কাঁদিল। অবশেষে অমরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত বাহির হইল।

সেই শৈলশিখরের উপরে সেই বকুলতরুচ্ছায়ায় মর্মাহত অমর বসিয়া আছেন।' এক-একটি করিয়া ছেলেবেলাকার সকল কথা মনে পড়িতে লাগিল। কত জ্যোৎস্না-রাত্রি, কত অন্ধকার সন্ধ্যা, কত বিমল উষা, অস্ফুট স্বপ্নের মতো তাঁহার মনে একে একে জাগিতে লাগিল। সেই বাল্যকালের সহিত তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের অন্ধকারময় মরুভূমির তুলনা করিয়া দেখিলেন— সঙ্গী নাই, সহায় নাই, আশ্রয় নাই, কেহ ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবে না, কেহ তাঁহার মর্মের দুঃখ শুনিয়া মমতা প্রকাশ করিবে না— অনন্ত আকাশে কক্ষচ্ছিন্ন অনন্ত ধূমকেতুর ন্যায়, তরঙ্গাকুল অসীম সমুদ্রের মধ্যে ঝটিকাতাড়িত একটি ভগ্ন ক্ষুদ্র তরণীর ন্যায়, একাকী নীরব সংসারে উদাস হইয়া বেড়াইবেন।

ক্রমে দূর গ্রামের কোলাহলের অস্ফুট ধ্বনি থামিয়া গেল, নিশীথের বায়ু আঁধার বকুলকুঞ্জের পত্র মর্মরিত করিয়া বিষাদের গম্ভীর গান গাহিল। অমর গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে, শৈলের সমুচ্চ শিখরে একাকী বসিয়া দূর নির্ঝরের মৃদু বিষণ্ণ ধ্বনি, নিরাশ হৃদয়ের

দীর্ঘনিশ্বাসের ন্যায় সমীরণের হু-হু শব্দ, এবং নিশীথের মর্মভেদী একতানবাহী যে-একটি গম্ভীর ধ্বনি আছে, তাহাই শুনিতেছিলেন। তিনি দেখিতেছিলেন অন্ধকারের সমুদ্রতলে সমস্ত জগৎ ডুবিয়া গিয়াছে, দূরস্থ শ্মশানক্ষেত্রে দুই-একটি চিতানল জ্বলিতেছে, দিগন্ত হইতে দিগন্ত পর্যন্ত নীরন্ধ্র স্তম্ভিত মেঘে আকাশ অন্ধকার।

সহসা শুনিলেন উচ্ছ্বসিত স্বরে কে কহিল, "ভাই অমর"—

এই অমৃতময়, স্নেহময়, স্বপ্নময় স্বর শুনিয়া তাঁহার স্মৃতির সমুদ্র আলোড়িত হইয়া উঠিল। ফিরিয়া দেখিলেন— কমল। মুহূর্তের মধ্যে নিকটে আসিয়া বাহুপাশে তাঁহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া কহিল, "ভাই অমর"—

অচলহৃদয় অমরও অন্ধকারে অশ্রু বিসর্জন করিলেন, আবার সহসা চকিতের ন্যায় দূরে সরিয়া গেলেন। কমল অমরকে কত কী কথা বলিল, অমর কমলকে দুই-একটি উত্তর দিলেন। সরলা আসিবার সময়ে যেরূপ উৎফুল্লহৃদয়ে হাসিতে হাসিতে আসিয়াছিল যাইবার সময় সেইরূপ ম্রিয়মাণ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

কমল ভাবিয়াছিল সেই ছেলেবেলাকার অমর ফিরিয়া আসিয়াছে, আর আমি সেই ছেলেবেলাকার কমল কাল হইতে আবার খেলা করিতে আরম্ভ করিব। যদিও অমর মর্মের গভীরতলে সাংঘাতিক আহত হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি কমলের উপর কিছুই ক্রুদ্ধ হন নাই বা অভিমান করেন নাই। তাঁহার জন্য বিবাহিতা বালিকার কর্তব্যকর্মে বাধা না পড়ে এই নিমিত্ত তিনি তাহার পরদিন কোথায় যে চলিয়া গেলেন তাহা কেহই স্থির করিতে পারিল না।

বালিকার সুকুমার হৃদয়ে দারুণ বজ্র পড়িল। অভিমানিনী কতদিন ধরিয়া ভাবিয়াছে যে, এত দিনের পর সে বাল্যসখা অমরের কাছে ছুটিয়া গেল, অমর কেন তাহাকে উপেক্ষা করিল। কিছুই ভাবিয়া পায় নাই। একদিন তাহার মাতাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, মাতা তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, কিছুকাল রাজসভায় আড়ম্বর-রাশির মধ্যে থাকিয়া সেনাপতি অমরসিংহ পর্ণকুটিরবাসিনী ভিখারিনী ক্ষুদ্র বালিকাটিকে ভুলিয়া যাইবেন তাহাতে অসম্ভব কী আছে। এই কথায় দরিদ্র বালিকার অন্তরতম দেশে শেল বিঁধিয়াছিল। অমরসিংহ তাহার প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিল মনে করিয়া কমল কষ্ট পায় নাই। হতভাগিনী ভাবিত, 'আমি দরিদ্র, আমার কিছুই নাই, আমার কেহই নাই, আমি বুদ্ধিহীনা ক্ষুদ্র বালিকা, তাঁহার চরণরেণুরও যোগ্য নহি, তবে তাঁহাকে ভাই বলিব কোন্ অধিকারে! তাঁহাকে ভালোবাসিব কোন্ অধিকারে। আমি দরিদ্র কমল, আমি কে যে তাঁহার স্নেহ প্রার্থনা করিব!'

সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া কাটিয়া যায়, প্রভাত হইলেই সেই শৈলশিখরে উঠিয়া ম্রিয়মাণ বালিকা কত কী ভাবিতে থাকে, তাহার মর্মের নিভৃত তলে যে বাণ বিদ্ধ হইয়াছিল তাহা যদিও সে মর্মেই লুকাইয়া রাখিয়াছিল— পৃথিবীর কাহাকেও দেখায় নাই— তথাপি ঐ মর্মে-লুক্কায়িত বাণ ধীরে ধীরে তাহার হৃদয়ের শোণিত ক্ষয় করিতে লাগিল।

বালিকা আর কাহারো সহিত কথা কহিত না, মৌন হইয়া সমস্তদিন সমস্তরাত্রি ভাবিত। কাহারো সহিত মিশিত না। হাসিত না, কাঁদিত না। এক-একদিন সন্ধ্যা হইলেও দেখা যাইত পথপ্রান্তের বৃক্ষতলে মলিন ছিন্ন অঞ্চলে মুখ ঝাঁপিয়া দীনহীন কমল বসিয়া আছে। বালিকা ক্রমে দুর্বল ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। আর উঠিতে পারে না— বাতায়নে একাকিনী বসিয়া থাকিত, দেখিত দূর শৈলশিখরের উপর বকুলপত্র বায়ুভরে কাঁপিতেছে। দেখিত রাখালেরা সন্ধ্যার সময় উদাস-ভাবোদ্দীপক স্বরে মৃদু মৃদু গান করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া আসিতেছে।

বিধবা অনেক চেষ্টা করিয়াও বালিকার কষ্টের কারণ বুঝিতে পারেন নাই এবং তাহার রোগের প্রতিকার করিতেও পারেন নাই। কমল নিজেই বুঝিতে পারিত যে, সে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতেছে। তাহার আর কোনো বাসনা ছিল না, কেবল দেবতার কাছে প্রার্থনা করিত যে 'যাবার সময় যেন অমরকে দেখিতে পাই'।

কমলের পীড়া গুরুতর হইল। মূর্ছার পর মূর্ছা হইতে লাগিল। শিয়রে বিধবা নীরব, কমলের গ্রাম্য সঙ্গিনী বালিকারা চারি ধার ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দরিদ্র বিধবার অর্থ নাই যে চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করিতে পারেন। মোহন দেশে নাই এবং দেশে থাকিলেও তাহার নিকট হইতে কিছু আশা করিতে পারিতেন না। তিনি দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া সর্বস্ব বিক্রয় করিয়া কমলের পথ্যাদি জোগাইতেন। চিকিৎসকদের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া ভিক্ষা চাহিতেন যে, তাহারা কমলকে একবার দেখিতে আসুক। অনেক মিনতিতে চিকিৎসক কমলকে আজ রাত্রে দেখিতে আসিবে বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

অন্ধকার রাত্রের তারাগুলি ঘোর নিবিড় মেঘে ডুবিয়া গিয়াছে, বজ্রের ঘোরতর গর্জন শৈলের প্রত্যেক গুহায় গুহায় প্রতিধ্বনিত হইতেছে এবং অবিরল বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ চকিতচ্ছটা শৈলের প্রত্যেক শৃঙ্গে শৃঙ্গে আঘাত করিতেছে। মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। প্রচণ্ড বেগে ঝটিকা বহিতেছে। শৈলবাসীরা অনেক দিন এরূপ ঝড় দেখেন নাই। দরিদ্র বিধবার ক্ষুদ্র কুটির টলমল করিতেছে, জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া বৃষ্টিধারা গৃহে প্রবাহিত হইতেছে এবং গৃহপার্শ্বে নিষ্প্রভ প্রদীপশিখা ইতস্তত কাঁপিতেছে। বিধবা এই ঝড়ে চিকিৎসকের আসিবার আশা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

হতভাগিনী নিরাশহৃদয়ে নিরাশাব্যঞ্জক স্থির দৃষ্টিতে কমলের মুখের পানে চাহিয়া আছেন ও প্রত্যেক শব্দে চিকিৎসকের আশায় চকিত হইয়া দ্বারের দিকে চাহিতেছেন। একবার কমলের মূর্ছা ভাঙিল, মূর্ছা ভাঙিয়া মাতার মুখের দিকে চাহিল। অনেক দিনের পর কমলের চক্ষে জল দেখা দিল— বিধবা কাঁদিতে লাগিলেন, বালিকারা কাঁদিয়া উঠিল।

সহসা অশ্বের পদধ্বনি শুনা গেল, বিধবা শশব্যস্তে উঠিয়া কহিলেন চিকিৎসক আসিয়াছেন। দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইলে চিকিৎসক গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার আপাদমস্তক বসনে আবৃত, বৃষ্টিধারায় সিক্ত বসন হইতে বারিবিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে। চিকিৎসক বালিকার তৃণশয্যার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। অবশ বিষাদময় নেত্র চিকিৎসকের মুখের পানে তুলিয়া কমল দেখিল সে চিকিৎসক নয়, সে সেই সৌম্যগম্ভীর-মূর্তি অমরসিংহ।

বিহ্বলা বালিকা প্রেমপূর্ণ স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, বিশাল নেত্র ভরিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল এবং প্রশান্ত হাস্যে কমলের বিবর্ণ মুখশ্রী উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

কিন্তু এই রুগ্‌ণ শরীরে অত আহ্লাদ সহিল না। ধীরে ধীরে অশ্রুসিক্ত নেত্র নিমীলিত হইয়া গেল, ধীরে ধীরে বক্ষের কম্পন থামিয়া গেল, ধীরে ধীরে প্রদীপ নিভিয়া গেল। শোকবিহ্বলা সঙ্গিনীরা বসনের উপর ফুল ছড়াইয়া দিল। অশ্রুহীন নেত্রে, দীর্ঘশ্বাসশূন্য বক্ষে, অন্ধকারময় হৃদয়ে, অমরসিংহ ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

শোকবিহ্বলা বিধবা সেই দিন অবধি পাগলিনী হইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন এবং সন্ধ্যা হইলে প্রত্যহ সেই ভগ্নাবশিষ্ট কুটিরে একাকিনী বসিয়া কাঁদিতেন।

শ্রাবণ-ভাদ্র ১২৮৪

করুণা

ভূমিকা

গ্রামের মধ্যে অনূপকুমারের ন্যায় ধনবান আর কেহই ছিল না। অতিথিশালানির্মাণ, দেবালয়প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণীখনন প্রভৃতি নানা সৎকর্মে তিনি ধনব্যয় করিতেন। তাঁহার সিন্ধুক-পূর্ণ টাকা ছিল, দেশবিখ্যাত যশ ছিল ও রূপবতী কন্যা ছিল। সমস্ত যৌবনকাল ধন উপার্জন করিয়া অনূপ বৃদ্ধ বয়সে বিশ্রাম করিতেছিলেন। এখন কেবল তাঁহার একমাত্র ভাবনা ছিল যে, কন্যার বিবাহ দিবেন কোথায়। সৎপাত্র পান নাই ও বৃদ্ধ বয়সে একমাত্র আশ্রয়স্থল কন্যাকে পরগৃহে পাঠাইতে ইচ্ছা নাই— তজ্জন্যও আজ কাল করিয়া আর তাঁহার দুহিতার বিবাহ হইতেছে না।

সঙ্গিনী-অভাবে করুণার কিছুমাত্র কষ্ট হইত না। সে এমন কাল্পনিক ছিল, কল্পনার স্বপ্নে সে সমস্ত দিন-রাত্রি এমন সুখে কাটাইয়া দিত যে, মুহূর্তমাত্রও তাহাকে কষ্ট অনুভব করিতে হয় নাই। তাহার একটি পাখি ছিল, সেই পাখিটি হাতে করিয়া অন্তঃপুরের পুষ্করিণীর পাড়ে কল্পনার রাজ্য নির্মাণ করিত। কাঠবিড়ালির পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটাছুটি করিয়া, জলে ফুল ভাসাইয়া, মাটির শিব গড়িয়া, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটাইয়া দিত। এক-একটি গাছকে আপনার সঙ্গিনী ভগ্নী কন্যা বা পুত্র কল্পনা করিয়া তাহাদের সত্য-সত্যই সেইরূপ যত্ন করিত তাহাদিগকে খাবার আনিয়া দিত, মালা পরাইয়া দিত, নানা প্রকার আদর করিত এবং তাদের পাতা শুকাইলে, ফুল ঝরিয়া পড়িলে, অতিশয় ব্যথিত হইত। সন্ধ্যাবেলা পিতার নিকট যা-কিছু গল্প শুনিত, বাগানে পাখিটিকে তাহাই শুনানো হইত। এইরূপে করুণা তাহার জীবনের প্রত্যূষকাল অতিশয় সুখে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার পিতা ও প্রতিবাসীরা মনে করিতেন যে, চিরকালই বুঝি ইহার এইরূপে কাটিয়া যাইবে।

কিছু দিন পরে করুণার একটি সঙ্গী মিলিল। অনূপের অনুগত কোনো একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মরিবার সময় তাঁহার অনাথ পুত্র নরেন্দ্রকে অনূপকুমারের হস্তে সঁপিয়া যান। নরেন্দ্র অনূপের বাটীতে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিত, পুত্রহীন অনূপ নরেন্দ্রকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। নরেন্দ্রের মুখশ্রী বড়ো প্রীতিজনক ছিল না কিন্তু সে কাহারো সহিত মিশিত না, খেলিত না ও কথা কহিত না বলিয়া, ভালোমানুষ বলিয়া তাহার বড়োই সুখ্যাতি হইয়াছিল। পল্লীময় রাষ্ট্র হইয়াছিল যে, নরেন্দ্রের মতো শান্ত শিষ্ট সুবোধ

বালক আর নাই এবং পাড়ায় এমন বৃদ্ধ ছিল না যে তাহার বাড়ির ছেলেদের প্রত্যেক কাজেই নরেন্দ্রের উদাহরণ উত্থাপন না করিত।

কিন্তু আমি তখনই বলিয়াছিলাম যে, 'নরেন্দ্র, তুমি বড়ো ভালো ছেলে নও।' কে জানে নরেন্দ্রের মুখশ্রী আমার কোনোমতে ভালো লাগিত না। আসল কথা এই, অমন বাল্যবৃদ্ধ গম্ভীর সুবোধ শান্ত বালক আমার ভালো লাগে না।

অনূপকুমারের স্থাপিত পাঠশালায় রঘুনাথ সার্বভৌম নামে এক গুরুমহাশয় ছিলেন। তিনি নরেন্দ্রকে অপরিমিত ভালোবাসিতেন, নরেন্দ্রকে প্রায় আপনার বাড়িতে লইয়া যাইতেন এবং অনূপের নিকট তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন।

এই নরেন্দ্রই করুণার সঙ্গী। করুণা নরেন্দ্রের সহিত সেই পুষ্করিণীর পাড়ে গিয়া কাদার ঘর নির্মাণ করিত, ফুলের মালা গাঁথিত এবং পিতার কাছে যে-সকল গল্প শুনিয়াছিল তাহাই নরেন্দ্রকে শুনাইত, কাল্পনিক বালিকার যত কল্পনা সব নরেন্দ্রের উপর ন্যস্ত হইল। করুণা নরেন্দ্রকে এত ভালোবাসিত যে কিছুক্ষণ তাহাকে না দেখিতে পাইলে ভালো থাকিত না, নরেন্দ্র পাঠশালে গেলে সে সেই পাখিটি হাতে করিয়া গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিত, দূর হইতে নরেন্দ্রকে দেখিলে তাড়াতাড়ি তাহার হাত ধরিয়া সেই পুষ্করিণীর পাড়ে সেই নারিকেল গাছের তলায় আসিত, ও তাহার কল্পনারচিত কত কী অদ্ভুত কথা শুনাইত।

নরেন্দ্র ক্রমে কিছু বড়ো হইলে কলিকাতায় ইংরাজি বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইল। কলিকাতার বাতাস লাগিয়া পল্লীগ্রামের বালকের কতকগুলি উৎকট রোগ জন্মিল। শুনিয়াছি স্কুলের বেতন ও পুস্তকাদি ক্রয় করিবার ব্যয় যাহাকিছু পাইত তাহাতে নরেন্দ্রের তামাকের খরচটা বেশ চলিত। প্রতি শনিবারে দেশে যাইবার নিয়ম আছে। কিন্তু নরেন্দ্র তাহার সঙ্গীদের মুখে শুনিল যে, শনিবারে যদি কলিকাতা ছাড়িয়া যাওয়া হয় তবে গলায় দড়ি দিয়া মরাটাই বা কী মন্দ! বালক বাটীতে গিয়া অনূপকে বুঝাইয়া দিল যে, সপ্তাহের মধ্যে দুই দিন বাড়িতে থাকিলে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। অনূপ নরেন্দ্রের বিদ্যাভ্যাসে অনুরাগ দেখিয়া মনে-মনে ঠিক দিয়া রাখিলেন যে, বড়ো হইলে সে ডিপুটি ম্যাজিস্টর হইবে।

তখন দুই-এক মাস অন্তর নরেন্দ্র বাড়িতে আসিত। কিন্তু এ আর সে নরেন্দ্র নহে। পানের পিকে ওষ্ঠাধর প্লাবিত করিয়া, মাথায় চাদর বাঁধিয়া, দুই পার্শ্বের দুই সঙ্গীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া, কন্স্টেবলদের ভীতিজনক যে নরেন্দ্র প্রদোষে কলিকাতার গলিতে গলিতে মারামারি খুঁজিয়া বেড়াইত, গাড়িতে ভদ্রলোক দেখিলে কদলীর অনুকরণে বৃদ্ধ অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিত, নিরীহ পান্থ বেচারিদিগের দেহে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া নির্দোষীর

মতো আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিত, এ সে নরেন্দ্র নহে— অতি নিরীহ, আসিয়াই অনূপকে ঢীপ্‌ করিয়া প্রণাম করে। কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিলে মৃদুস্বরে, নতমুখে, অতি দীনভাবে উত্তর দেয় এবং যে পথে অনূপ সর্বদা যাতায়াত করেন সেইখানে একটি ওয়েব্‌স্টার ডিক্‌সনারী বা তৎসদৃশ অন্য কোনো দীর্ঘকায় পুস্তক খুলিয়া বসিয়া থাকে।

নরেন্দ্র বহুদিনের পর বাড়ি আসিলে করুণা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। নরেন্দ্রকে ডাকিয়া লইয়া কত কী গল্প শুনাইত। বালিকা গল্প শুনাইতে যত উৎসুক, শুনিতে তত নহে। কাহারো কাছে কোনো নূতন কথা শুনিলেই যতক্ষণ না নরেন্দ্রকে শুনাইতে পাইত, ততক্ষণ উহা তাহার নিকট বোঝা-স্বরূপ হইয়া থাকিত। কিন্তু করুণার এইরূপ ছেলেমানুষিতে নরেন্দ্রের বড়োই হাসি পাইত, কখনো কখনো সে বিরক্ত হইয়া পলাইবার উদ্যোগ করিত। নরেন্দ্র সঙ্গীদের নিকটে করুণার কথাপ্রসঙ্গে নানাবিধ উপহাস করিত।

নরেন্দ্র বাড়ি আসিলে পণ্ডিতমহাশয় সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যগ্র হইয়া পড়েন। এমন-কি, সেদিন সন্ধ্যার সময়েও গৃহ হইতে নির্গত হইয়া বাঁশঝাড়ময় পল্লীপথ দিয়া রাম-নাম জপিতে জপিতে নরেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, নরেন্দ্রকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া নানাবিধ কুশলসংবাদ লইতেন। এই পণ্ডিতের কথা শুনিয়া দুই-একজন সঙ্গী নরেন্দ্রকে তাঁহার টিকি কাটিতে পরামর্শ দিয়াছিল, এ বিষয় লইয়া গম্ভীর ভাবে অনেক পরামর্শ ও অনেক ষড়যন্ত্র চলিয়াছিল, কিন্তু দেশে নরেন্দ্রের তেমন দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল না বলিয়া পণ্ডিতমহাশয়ের টিকিটি নির্বিঘ্নে ছিল।

এই রূপে দেশে আদর ও বিদেশে আমোদ পাইয়া নরেন্দ্র বাড়িতে লাগিল। নরেন্দ্রের বাল্যকাল অতীত হইল।

অনূপ এখন অতিশয় বৃদ্ধ, চক্ষে দেখিতে পান না, শয্যা হইতে উঠিতে পারেন না, এক মুহূর্তও করুণাকে কাছ-ছাড়া করিতেন না। অনূপের জীবনের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে; তিনি নরেন্দ্রকে কলিকাতা হইতে ডাকাইয়া আনিয়াছেন, অন্তিম কালে নরেন্দ্র ও পণ্ডিতমহাশয়কে ডাকাইয়া তাঁহাদের হস্তে কন্যাকে সমর্পণ করিয়া গেলেন।

অনূপের মৃত্যুর পর সার্বভৌমমহাশয় নিজে পৌরোহিত্য করিয়া নরেন্দ্রের সহিত করুণার বিবাহ দিলেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমি যাহা মনে করিয়াছিলাম তাহাই হইয়াছে। নরেন্দ্র যে কিরূপ লোক তাহা এতদিনে পাড়ার লোকেরা টের পাইল, আর হতভাগিনী করুণাকে যে কষ্ট পাইতে

হইবে তাহা এতদিনে তাহারা বুঝিতে পারিল। কিন্তু পণ্ডিতমহাশয় দুয়ের কোনো-টাই বুঝিলেন না।

করুণা আজকাল কিছু মনের কষ্টে আছে। মনের উল্লাসে বিজন কাননে সে খেলা করিবে, বক্ষে করিয়া লইয়া পাখির সঙ্গে কত কী কথা কহিবে, কোলের উপর রাশি রাশি ফুল রাখিয়া পাদুটি ছড়াইয়া আপন মনে গুন্‌ গুন্‌ করিয়া গান গাইতে গাইতে মালা গাঁথিবে, যাহাকে ভালোবাসে তাহার মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া অস্ফুট আহ্লাদে বিহ্বল ও অস্ফুট ভাবে ভোর হইয়া যাইবে— সেই বালিকা বড়ো কষ্ট পাইয়াছে। তাহার মনের মতো কিছুই হয় না। অভাগিনী যে নরেন্দ্রকে এত ভালোবাসে— যাহাকে দেখিলে খেলা ভুলিয়া যায়, মালা ফেলিয়া দেয়, পাখি রাখিয়া দিয়া ছুটিয়া আসে, সে কেন করুণাকে দেখিলে যেন বিরক্ত হয়। করুণা হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে কী বলিতে আসে, সে কেন ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মুখ ভার করিয়া থাকে। করুণা তাহাকে কাছে বসিতে কত মিনতি করে, সে কেন কোনো ছল করিয়া চলিয়া যায়। নরেন্দ্র তাহার সহিত এমন নির্জীবভাবে এমন নীরসভাবে কথাবার্তা কয়, সকল কথায় এমন বিরক্তভাবে উত্তর দেয়, সকল কাজে এমন প্রভুভাবে আদেশ করে যে, বালিকার খেলা ঘুরিয়া যায় ও মালা গাঁথা সাঙ্গ হয় বুঝি— বালিকার আর বুঝি পাখির সহিত গান গাওয়া হইয়া উঠে না।

মূল কথাটা এই, নরেন্দ্র ও করুণায় কখনোই বনিতে পারে না। দুইজনে দুই বিভিন্ন উপাদানে নির্মিত। নরেন্দ্র করুণার সেই ভালোবাসার কত কী অসংলগ্ন কথার মধ্যে কিছুই মিষ্টতা পাইত না, তাহার সেই প্রেমে-মাখানো অতৃপ্ত স্থির দৃষ্টি-মধ্যে ঢলঢল লাবণ্য দেখিতে পাইত না, তাহার সেই উচ্ছ্বসিত নির্ঝরিণীর ন্যায় অধীর সৌন্দর্যের মিষ্টতা নরেন্দ্র কিছুই বুঝিত না। কিন্তু সরলা করুণা, সে অত কী বুঝিবে! সে ছেলে-বেলা হইতেই নরেন্দ্রের গুণ ছাড়া দোষের কথা কিছুই শুনে নাই। কিন্তু করুণায় একি দায় হইল। তাহার কেমন কিছুতেই আশ মিটে না, সে আশ মিটাইয়া নরেন্দ্রকে দেখিতে পায় না, সে আশ মিটাইয়া মনের সকল কথা নরেন্দ্রকে বলিতে পারে না— সে সকল কথাই বলে অথচ মনে করে যেন কোনো কথাই বলা হইল না।

একদিন নরেন্দ্রকে বেশ পরিবর্তন করিতে দেখিয়া করুণা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইতেছ।"

নরেন্দ্র কহিলেন, "কলিকাতায়।"

করুণা। কলিকাতায় কেন যাইবে।

নরেন্দ্র ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "কাজ না থাকিলে কখনো যাইতাম না।"

একটা বিড়ালশাবক ছুটিয়া গেল। করুণা তাহাকে ধরিতে গেল, অনেক ক্ষণ ছুটাছুটি করিয়া ধরিতে পারিল না। অবশেষে ঘরে ছুটিয়া আসিয়া নরেন্দ্রের কাঁধে হাত রাখিয়া কহিল, "আজ যদি তোমাকে কলিকাতায় যাইতে না দিই ?"

নরেন্দ্র কাঁধ হইতে হাত ফেলিয়া দিয়া কহিল, "সরো, দেখো দেখি, আর একটু হলেই ভিক্যান্টাবুটি ভাঙিয়া ফেলিতে আর কি।"

করুণা। দেখো, তুমি কলিকাতায় যাইয়ো না। পণ্ডিতমহাশয় তোমাকে যাইতে দিতে নিষেধ করেন।

নরেন্দ্র কিছুই উত্তর না দিয়া শিস্ দিতে দিতে চুল আঁচড়াইতে লাগিলেন। করুণা ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল ও এক শিশি এসেন্স্ আনিয়া নরেন্দ্রের চাদরে খানিকটা ঢালিয়া দিল।

নরেন্দ্র কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। করুণা দুই একবার বারণ করিল, কিছু হাঁ হুঁ না দিয়া লক্ষ্ণৌ ঠুংরি গাইতে গাইতে নরেন্দ্র প্রস্থান করিলেন।

যতক্ষণ নরেন্দ্রকে দেখা যায় করুণা চাহিয়া রহিল। নরেন্দ্র চলিয়া গেলে পর সে বালিশে মুখ লুকাইয়া কাঁদিল। কিয়ৎক্ষণ কাঁদিয়া মনের বেগ শান্ত হইতেই চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া পাখিটি হাতে করিয়া লইয়া অন্তঃপুরের বাগানে মালা গাঁথিতে বসিল।

বালিকা স্বভাবত এমন প্রফুল্লহৃদয় যে, বিষাদ অধিকক্ষণ তাহার মনে তিষ্ঠিতে পারে না। হাসির লাবণ্যে তাহার বিশাল নেত্র দুটি এমন মগ্ন যে রোদনের সময়ও অশ্রুর রেখা ভেদ করিয়া হাসির কিরণ জ্বলিতে থাকে। যাহা হউক, করুণার চপল ব্যবহারে পাড়ার মেয়েমহলে বেহায়া বলিয়া তাহার বড়োই অখ্যাতি জন্মিয়াছিল— 'বুড়াধাড়ি মেয়ে'র অতটা বাড়াবাড়ি তাহাদের ভালো লাগিত না। এ-সকল নিন্দার কথা করুণা বাড়ির পুরাতন দাসী ভবির কাছে সব শুনিতে পাইত। কিন্তু তাহাতে তাহার আইল গেল কী ? সে তেমনি ছুটাছুটি করিত, সে ভবির গলা ধরিয়া তেমনি করিয়াই হাসিত, সে পাখির কাছে মুখ নাড়িয়া তেমনি করিয়াই গল্প করিত। কিন্তু এই প্রফুল্ল হৃদয় একবার যদি বিষাদের আঘাতে ভাঙিয়া যায়, এই হাস্যময় অজ্ঞান শিশুর মতো চিন্তাশূন্য সরল মুখশ্রী একবার যদি দুঃখের অন্ধকারে মলিন হইয়া যায়, তবে বোধ হয় বালিকা আহত লতাটির ন্যায় জন্মের মতো ম্রিয়মাণ ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, বর্ষার সলিলসেকে— বসন্তের বায়ুবীজনে আর বোধ হয় সে মাথা তুলিতে পারে না।

নরেন্দ্র অনুপের যে অর্থ পাইয়াছিলেন, তাহাতে পল্লিগ্রামে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিতেন। অনুপের জীবদ্দশায় খেতের ধান, পুকুরের মাছ ও বাগানের শাক-

সজি ফলমূলে দৈনিক আহারব্যয় যৎসামান্ত ছিল। ঘটা করিয়া দুর্গোৎসব সম্পন্ন হইত, নিয়মিত পূজা-অর্চনা দানধ্যান ও আতিথ্যের ব্যয় ভিন্ন আর কোনো ব্যয়ই ছিল না। অনূপের মৃত্যুর পর অতিথিশালাটি বাবুর্চিখানা হইয়া দাঁড়াইল। ব্রাহ্মণগুলার জালায় গোটা চারেক দরোয়ান রাখিতে হইল, তাহারা প্রত্যেক ভট্টাচার্যকে রীতিমত অর্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা করিত এবং প্রত্যেক ভট্টাচার্য বিধিমতে নরেন্দ্রকে উচ্ছিন্ন যাইবার ব্যবস্থা করিয়া যাইত। নরেন্দ্র গ্রামে নিজ ব্যয়ে একটি ডিস্‌পেন্‌সরি স্থাপন করিলেন। শুনিয়াছি নহিলে সেখানে ব্রাণ্ডি কিনিবার অন্য কোনো সুবিধা ছিল না। গবর্নমেণ্টের সস্তা দোকান হইতে রায়বাহাদুরের খেলানা কিনিবার জন্ম ঘোড়দৌড়ের চাঁদা পুস্তকে হাজার টাকা সই করিয়াছিলেন এবং এমন আরো অনেক সৎকার্য করিয়াছিলেন যাহা লইয়া অমৃতবাজারের একজন পত্রপ্রেরক ভারি ধুমধাম করিয়া এক পত্র লেখে। তাহার প্রতিবাদ ও তাহার পুনঃপ্রতিবাদের সময় অমূলক অপবাদ দেওয়া যে ভদ্রলোকের অকর্তব্য ইহা লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক হয়।

নরেন্দ্রকে পল্লীর লোকেরা জাতিচ্যুত করিল, কিন্তু নরেন্দ্র সে দিকে কটাক্ষপাতও করিলেন না। নরেন্দ্রের একজন সমাজসংস্কারক বন্ধু তাঁহার 'মরাল করেজ' লইয়া সভায় তুমুল আন্দোলন করিলেন।

নরেন্দ্র বাগবাজারে এক বাড়ি ভাড়া করিয়াছেন ও কাশীপুরে এক বাগান ক্রয় করিয়াছেন। একদিন বাগবাজারের বাড়িতে সকালে বসিয়া নরেন্দ্র চা খাইতেছেন।— নরেন্দ্রের সকাল ও আমাদের সকালে অনেক তফাত, সেদিন শনিবারে কুঠি যাইবার সময় দেখিয়া আসিলাম, নরেন্দ্রের নাক ডাকিতেছে। দুইটার সময় ফিরিয়া আসিবার কালে দেখি চোখ রগড়াইতেছেন, তখনো আন্তরিক ইচ্ছা আর-এক ঘুম দেন। যাহাই হউক নরেন্দ্র চা খাইতেছেন এমন সময়ে সমাজসংস্কারক গদাধরবাবু, কবিতাকুসুমমঞ্জরী-প্রণেতা কবিবর স্বরূপচন্দ্রবাবু, আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথম অভ্যর্থনা সমাপ্ত হইলে সকলে চেয়ারে উপবিষ্ট হইলেন।

নানাবিধ কথোপকথনের পর গদাধরবাবু কহিলেন, "দেখুন মশায়, আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের দশা বড়ো শোচনীয়।"

এই সময়ে নরেন্দ্র শোচনীয় শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন, স্বরূপচন্দ্রবাবু কহিলেন— 'deplorable'। নরেন্দ্রের পক্ষে উভয় কথাই সমান ছিল, কিন্তু নরেন্দ্র এই প্রতিশব্দটি শুনিয়া শোচনীয় শব্দের অর্থ টা যেন জল বুঝিয়া গেলেন। গদাধরবাবু কহিলেন, "এখন আমাদিগের উচিত তাহাদের অন্তঃপুরের প্রাচীর ভাঙিয়া দেওয়া।"

অমনি নরেন্দ্র গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "কিন্তু এটা কতদূর হতে পারে তাই দেখা

যাক। তেমন সুবিধা পাইলে অন্তঃপুরের প্রাচীর অনেক সময় ভাঙিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে বটে, কিন্তু পুলিসের লোকেরা তাহাতে বড়োই আপত্তি করিবে। ভাঙিয়া ফেলা দূরে থাক্‌, একবার আমি অন্তঃপুরের প্রাচীর লঙ্ঘন করিতে গিয়াছিলাম, ম্যাজিস্ট্রেট তাতে আমার উপর বড়ো সন্তুষ্ট হয় নাই।"

অনেক তর্কের পর গদাধর ও স্বরূপে মিলিয়া নরেন্দ্রকে বুঝাইয়া দিল যে, সত্যসত্যই অন্তঃপুরের প্রাচীর ভাঙিয়া ফেলিবার প্রস্তাব হইতেছে না— তাহার তাৎপর্য এই যে, স্ত্রীলোকদের অন্তঃপুর হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়া।

গদাধরবাবু কহিলেন, "কত বিধবা একাদশীর যন্ত্রণায় রোদন করিতেছে, কত কুলীন-পত্নী স্বামী জীবিত-সত্ত্বেও বৈধব্যজ্বালা সহ্য করিতেছে।"

স্বরূপবাবু কহিলেন, "এ বিষয়ে আমার অনেক কবিতা আছে, কাগজওয়ালারা তার বড়ো ভালো সমালোচনা করেছে। দেখো নরেন্দ্রবাবু, শরৎকালের জ্যোৎস্নারাত্রে কখনো ছাতে শুয়েছ? চাঁদ যখন ঢলঢল হাসি ঢালতে ঢালতে আকাশে ভেসে যায় তখন তাকে দেখেছ? আবার সেই হাস্যময় চাঁদকে যখন ঘোর অন্ধকারে মেঘে আচ্ছন্ন করে ফেলে তখন মনের মধ্যে কেমন একটা কষ্ট উপস্থিত হয়, তা কি কখনো সহ্য করেছ। তা যদি করে থাকো তবে বলো দেখি স্ত্রীলোকের কষ্ট দেখলে সেইরূপ কষ্ট হয় কি না।"

নরেন্দ্রের সম্মুখে এতগুলি প্রশ্ন একে একে খাড়া হইল, নরেন্দ্র ভাবিয়া আকুল। অনেকক্ষণের পর কহিলেন, "আমার এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"

গদাধরবাবু কহিলেন, "এখন কথা হচ্ছে যে, স্ত্রীলোকদের কষ্টমোচনে আমরা যদি দৃষ্টান্ত না দেখাই তবে কে দেখাইবে। এসো, আজ থেকেই এ বিষয়ের চেষ্টা করা যাক।"

নরেন্দ্রের তাহাতে কোনো আপত্তি ছিল না। তিনি মনে-মনে কেবল ভাবিতে লাগিলেন, এখন কাহার অন্তঃপুরের প্রাচীর ভাঙিতে হইবে। গদাধরবাবু কহিলেন, "স্মরণ থাকতে পারে মোহিনী নামে এক বিধবার কথা সেদিন বলেছিলুম, আমাদের প্রথম পরীক্ষা তাহার উপর দিয়াই চলুক। এ বিষয়ে যা-কিছু বাধা আছে তা আলোচনা করে দেখা যাক। যেমন এক একটা পোষা পাখি শৃঙ্খলমুক্ত হলেও স্বাধীনতা পেতে চায় না, তেমনি সেই বিধবাটিও স্বাধীনতার সহস্র উপায় থাকিতেও অন্তঃপুরের কারাগার হইতে মুক্ত হইতে চায় না। সুতরাং আমাদের প্রথম কর্তব্য তাহাকে স্বাধীনতার সুমিষ্ট আস্বাদ জানাইয়া দেওয়া।"

নরেন্দ্র কহিলেন সকল দিক ভাবিয়া দেখিলে এ বিষয়ে কাহারো কোনোপ্রকার

আপত্তি থাকিতে পারে না। সে বিধবার ভরণপোষণ বাসস্থান ইত্যাদি সমুদয় বন্দোবস্তের ভার নরেন্দ্র নিজ স্কন্ধে লইতে স্বীকৃত হইলেন। ক্রমে ত্রিভঙ্গচন্দ্র বিশ্বম্ভর ও অনন্তজয়বাবু আসিলেন, ক্রমে সন্ধ্যাও হইল, প্লেট আসিল, বোতল আসিল। গদাধরবাবু স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে অনেক বক্তৃতা দিয়া ও স্বরূপবাবু জ্যোৎস্না-রাত্রির বিষয়ে নানাবিধ কবিতাময় উদাহরণ প্রয়োগ করিয়া শুইয়া পড়িলেন, ত্রিভঙ্গচন্দ্র ও বিশ্বম্ভরবাবু স্খলিত স্বরে গান জুড়িয়া দিলেন, নরেন্দ্র ও অনন্তজয় কাহাকে যে গালাগালি দিতে লাগিলেন বুঝা গেল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র

মহেন্দ্র এতদিন বেশ ভালো ছিল। ইস্কুলে ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছে, কলেজে এলে, বি.এ. পাস করিয়াছে, মেডিকাল কলেজে তিন চার বৎসর পড়িয়াছে, আর কিছুদিন পড়িলেই পাস হইত— কিন্তু বিবাহ হওয়ার পর হইতেই অমন হইয়া গেল কেন। আমাদের সঙ্গে আর দেখা করিতে আসে না, আমরা গেলে ভালো করিয়া কথা কয় না— এ-সব তো ভালো লক্ষণ নয়। সহসা এরূপ পরিবর্তন যে কেন হইল আমরা ভিতরে ভিতরে তাহার সন্ধান লইয়াছি। মূল কথাটা এই, কন্যাকর্তাদিগের নিকট হইতে অর্থ লইয়া মহেন্দ্রের পিতা যে কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দেন তাহা মহেন্দ্রের বড়ো মনোনীত হয় নাই। মনোনীত না হইবারই কথা বটে। তাহার নাম রজনী ছিল, বর্ণও রজনীর ন্যায় অন্ধকার; তাহার গঠনও যে কিছু উৎকৃষ্ট ছিল তাহা নয়; কিন্তু মুখ দেখিলে তাহাকে অতিশয় ভালো মানুষ বলিয়া বোধ হয়। বেচারি কখনো কাহারো কাছে আদর পায় নাই, পিত্রালয়ে অতিশয় উপেক্ষিত হইয়াছিল। বিশেষত তাহার রূপের দোষে বর পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া যাহার তাহার কাছে তাহাকে নিগ্রহ সহিতে হইত। কখনো কাহারো সহিত মুখ তুলিয়া কথা কহিতে সাহস করে নাই। একদিন আয়না খুলিয়া কপালে টিপ পরিতেছিল বলিয়া কত লোকে কত রকম ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়াছিল; সেই অবধি উপহাসের ভয়ে বেচারি কখনো আয়নাও খুলে নাই, কখনো বেশভূষাও করে নাই। স্বামী-আলয়ে আসিল। সেখানে স্বামীর নিকট হইতে এক মুহূর্তের নিমিত্তও আদর পাইল না, বিবাহরাত্রের পরদিন হইতে মহেন্দ্র তাহার কাছে শুইত না। এ দিকে মহেন্দ্র এমন বিদ্বান, এমন মৃদুস্বভাব, এমন সদ্‌বন্ধু ছিল, এমন আমোদদায়ক সহচর ছিল, এমন সজ্জন লোক ছিল

যে, সেও সকলকে ভালোবাসিত, তাহাকেও সকলে ভালোবাসিত। রজনীর কপাল-দোষে সে মহেন্দ্রও বিগড়াইয়া গেল। মহেন্দ্র পিতাকে কখনো অভক্তি করে নাই, কিন্তু বিবাহের পরদিনেই পিতাকে যাহা বলিবার নয় তাহাই বলিয়া তিরস্কার করিয়াছে। পিতা ভাবিলেন তাঁহারই বুঝিবার ভুল, কলেজে পড়িলেই ছেলেরা যে অবাধ্য হইয়া যাইবে ইহা তো কথাই আছে।

রজনীর সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিয়া আমার অতিশয় কষ্ট হইয়াছিল। আমি মহেন্দ্রকে গিয়া বুঝাইলাম। আমি বলিলাম, 'রজনীর ইহাতে কী দোষ আছে। তাহার কুরূপের জন্য সে কিছু দোষী নহে, দ্বিতীয়ত তাহার বিবাহের জন্য তোমার পিতাই দোষী। তবে বিনা অপরাধে বেচারিকে কেন কষ্ট দাও।' মহেন্দ্র কিছুই বুঝিল না বা আমাকেও বুঝাইল না, কেবল বলিল তাহার অবস্থায় যদি পড়িতাম তবে আমিও ঐরূপ ব্যবহার করিতাম। এ কথা যে মহেন্দ্র অতি ভুল বুঝিয়াছিল তাহা বুঝাইবার কোনো প্রয়োজন নাই, কারণ আমার সহিত গল্পের অতি অল্পই সম্বন্ধ আছে।

এ সময়ে মহেন্দ্রের কলেজ ছাড়িয়া দেওয়াটা ভালো হয় নাই। পোড়ো জমিতে কাঁটাগাছ জন্মায়, অব্যবহৃত লৌহে মরিচা পড়ে, মহেন্দ্র এমন অবস্থায় কাজকর্ম ছাড়িয়া বসিয়া থাকিলে অনেক কুফল ঘটিবার সম্ভাবনা। আমি আপনি মহেন্দ্রের কাছে গেলাম, সকল কথা বুঝাইয়া বলিলাম, মহেন্দ্র বিরক্ত হইল, আমি আস্তে আস্তে চলিয়া আসিলাম।

একটা-কিছু আমোদ নহিলে কি মানুষ বাঁচিতে পারে। মহেন্দ্র যেরূপ কৃতবিদ্য, লেখাপড়ায় সে তো অনেক আমোদ পাইতে পারে। কিন্তু পরীক্ষা দিয়া দিয়া বইগুলার উপর মহেন্দ্রের এমন একটা অরুচি জন্মিয়াছে যে, কলেজ হইতে টাটকা বাহির হইয়াই আর-একটা কিছু নূতন আমোদ পাইলেই তাহার পক্ষে ভালো হইত। মহেন্দ্র এখন একটু-আধটু করিয়া শেরী খায়। কিন্তু তাহাতে কী হানি হইল। কিন্তু হইল বৈকি। মহেন্দ্রও তাহা বুঝিত— এক-একবার বড়ো ভয় হইত, এক-একবার অনুতাপ করিত, এক-একবার প্রতিজ্ঞা করিত, আবার এক-একদিন খাইয়াও ফেলিত এবং খাইবার পক্ষে নানাবিধ যুক্তিও ঠিক করিত। ক্রমে ক্রমে মহেন্দ্র অধোগতির গহ্বরে এক-এক সোপান করিয়া নামিতে লাগিলেন। মদটা মহেন্দ্রের এখন খুব অভ্যস্ত হইয়াছে। আমি কখনো জানিতাম না এমন-সকল সামান্য বিষয় হইতে এমন গুরুতর ব্যাপার ঘটিতে পারে। আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে সেই ভালো মানুষ মহেন্দ্র, স্কুলে যে ধীরে ধীরে কথা কহিত, মৃদু মৃদু হাসিত, অতি সন্তর্পণে চলাফিরা করিত, সে আজ মাতাল

হইয়া অমন যা-তা বকিতে থাকিবে, সে অমন বৃদ্ধ পিতার মুখের উপর উত্তর প্রত্যুত্তর করিবে। সর্বাপেক্ষা অসম্ভব মনে করিতাম যে, ছেলেবেলা আমার সঙ্গে মহেন্দ্রের এত ভাব ছিল, সে আজ আমাকে দেখিলেই বিরক্ত হইবে, আমাকে দেখিলেই ভয় করিবে যে 'বুঝি ঐ আবার লেক্‌চার দিতে আসিয়াছে'। কিন্তু আমি আর তাহাকে কিছু বুঝাইতে যাইতাম না। কাজ কী। কথা মানিবে না যখন, কেবল বিরক্ত হইবে মাত্র, তখন তাহাকে বুঝাইয়া আর কী করিব। কিন্তু তাহাও বলি, মহেন্দ্র হাজার মাতাল হউক তাহার অন্য কোনো দোষ ছিল না, আপনার ঘরে বসিয়াই মাতাল হইত, কখনো ঘরের বাহির হইত না। কিন্তু অল্প দিন হইল মহেন্দ্রের চাকর শম্ভু আসিয়া আমাকে কহিল যে, বাবু বিকাল হইলে বাহির হইয়া যান আর অনেক রাত্রি হইলে বাড়ি ফিরিয়া আসেন। এই কথা শুনিয়া আমার বড়ো কষ্ট হইল, খোঁজ লইলাম, দেখিলাম দূষ্য কিছু নয়— মহেন্দ্র তাহাদের বাগানের ঘাটে বসিয়া থাকে। কিন্তু তাহার কারণ কী। এখনো তো বিশেষ কিছু সন্ধান পাই নাই।

সংস্কারক মহাশয় যে বিধবা মোহিনীর কথা বলিতেছিলেন, সে মহেন্দ্রের বাড়ির পাশেই থাকিত। মহেন্দ্রের বাড়িও আসিত, মহেন্দ্রও রোগ-বিপদে সাহায্য করিতে তাহাদের বাড়ি যাইত। মোহিনীকে দেখিতে বেশ ভালো ছিল—কেমন উজ্জ্বল চক্ষু, কেমন প্রফুল্ল ওষ্ঠাধর, সমস্ত মুখের মধ্যে কেমন একটি মিষ্ট ভাব ছিল, তাহা বলিবার নয়।

যাহা হউক, মোহিনীকে স্বাধীনতার আলোকে আনিবার জন্য নানাবিধ ষড়যন্ত্র চলিতেছে। মোহিনীকে একাদশী করিতে হয়, মোহিনী মাছ খাইতে পায় না, মোহিনীর প্রতি সমাজের এই-সকল অন্যায় অত্যাচার দেখিয়া গদাধরবাবু অত্যন্ত কাতর আছেন। স্বরূপবাবু মোহিনীর উদ্দেশে নানা সংবাদপত্রে ও মাসিক পত্রিকায় নানাবিধ প্রেমের কবিতা লিখিয়া ফেলিলেন, তাহার মধ্যে আমাদের বাংলা সমাজকে ও দেশাচারকে অনেক গালি দিলেন ও অবশেষে সমস্ত মানবজাতির উপর বিষম ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। তিনি নিজে বড়ো বিষণ্ণ হইয়া গেলেন ও সমস্ত দিন রাত্রি অনেক নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্রের কাশীপুরস্থ বাগানের পাশেই মোহিনীর বাড়ি। যে ঘাটে মোহিনী জল আনিতে যাইত, নরেন্দ্র সেখানে দিন কতক আনাগোনা করিতে লাগিলেন। এই-সকল দেখিয়া মোহিনী বড়ো ভালো বুঝিল না, সে আর সে ঘাটে জল আনিতে যাইত না। সে তখন হইতে মহেন্দ্রের বাগানের ঘাটে জল তুলিতে ও স্নান করিতে যাইত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মোহিনীর ও মহেন্দ্রের মনের কথা

'এমন করিলে পারিয়া উঠা যায় না। মহেন্দ্রের বাড়ি ছাড়িয়া দিলাম ভাবিলাম দূর হোক্ গে, ও দিকে আর মন দিব না। মহেন্দ্র আমাদের বাড়িতে আসিলে আমি রান্নাঘরে গিয়া লুকাইতাম, কিন্তু আজকাল মহেন্দ্র আবার ঘাটে গিয়া বসিয়া থাকে, কী দায়েই পড়িলাম, তাহার জন্য জল আনা বন্ধ হইবে নাকি। আচ্ছা, নাহয় ঘাটেই বসিয়া থাকিল, কিন্তু অমন করিয়া তাকাইয়া থাকে কেন। লোকে কী বলিবে। আমার বড়ো লজ্জা করে। মনে করি ঘাটে আর যাইব না, কিন্তু না যাইয়া কী করি। আর কেনই বা না যাইব। সত্য কথা বলিতেছি, মহেন্দ্রকে দেখিলে আমার নানান ভাবনা আইসে, কিন্তু সে-সব ভাবনা ভুলিতেও ইচ্ছা করে না। বিকাল বেলা একবার যদি মহেন্দ্রকে দেখিতে পাই তাহাতে হানি কী। হানি হয় হউক গে, আমি তো না দেখিয়া বাঁচিব না। কিন্তু মহেন্দ্রকে জানিতে দিব না যে তাহাকে ভালোবাসি, তাহা হইলে সে আমার প্রতি যাহা খুশি তাহাই করিবে। আর এ-সকল ভালোবাসা-বাসির কথা রাষ্ট্র হওয়াও কিছু নয়'— এই তো গেল মোহিনীর মনের কথা।

মহেন্দ্র ভাবে— 'আমি তো রোজ ঘাটে বসিয়া থাকি, কিন্তু মোহিনী তো একদিনও আমার দিকে ফিরিয়া চায় না। আমি যেদিকে থাকি, সেদিক দিয়াও যায় না, আমাকে দেখিলে শশব্যস্তে ঘোমটা টানিয়া দেয়, পথে আমাকে দেখিলে প্রান্তভাগে সরিয়া যায়, মোহিনীর বাড়িতে গেলে কোথায় পলাইয়া যায়— এমন করিলে বড়ো কষ্ট হয়। আগে জানিতাম মোহিনী আমাকে ভালোবাসে। ভালো না বাসুক, যত্ন করে। কিন্তু আজকাল অমন করে কেন। এ কথা মোহিনীকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। জিজ্ঞাসা করিতে কী দোষ আছে। মোহিনীকে তো আমি কত কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি। মোহিনীর বাড়ির সকলে আমাকে এত ভালোবাসে যে, মোহিনীর সহিত কথাবার্তা কহিলে কেহ তো কিছু মনে করে না।'

একদিন বিকালে মোহিনী জল তুলিতে আসিল। মহেন্দ্র যেমন ঘাটে বসিয়া থাকিত, তেমনি বসিয়া আছে। বাগানে আর কেহ লোক নাই। মোহিনী জল তুলিয়া চলিয়া যায়। মহেন্দ্র কম্পিত স্বরে ধীরে ধীরে ডাকিল, 'মোহিনী!' মোহিনী যেন শুনিতে পাইল না, চলিয়া গেল। মহেন্দ্র ফিরিয়া আর ডাকিতে সাহস করিল না। আর-একদিন মোহিনী বাড়ি ফিরিয়া যাইতেছে, মহেন্দ্র সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন; মোহিনী তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া দিল। মহেন্দ্র ধীরে ধীরে ঘর্মাক্তললাট হইয়া

কত কথা কহিল, কত কথা বাধিয়া গেল, কোনো কথাই ভালো করিয়া বুঝাইয়া বলিতে পারিল না।

মোহিনী শশব্যস্তে কহিল, "সরিয়া যান, আমি জল লইয়া যাইতেছি।"

সেইদিন মহেন্দ্র বাড়ি গিয়াই একটা কী সামান্য কথা লইয়া পিতার সহিত ঝগড়া করিল, নির্দোষী রজনীকে অকারণ অনেকক্ষণ ধরিয়া তিরস্কার করিল, শম্ভু চাকরটাকে দুই-তিন বার মারিতে উদ্যত হইল ও মদের মাত্রা আরো খানিকটা বাড়াইল। কিছু দিনের মধ্যে গদাধরের সহিত মহেন্দ্রের আলাপ হইল, তাহার দিন চারেক পরে স্বরূপবাবুর সহিত সখ্যতা জন্মিল, তাহার সপ্তাহ খানেক পরে নরেন্দ্রের সহিত পরিচয় হইল ও মাসেকের মধ্যে মহেন্দ্র নরেন্দ্রের সভায় সন্ধ্যাগমে নিত্য অতিথিরূপে হাজির হইতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পণ্ডিতমহাশয়ের দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ

পূর্বে রঘুনাথ সার্বভৌম মহাশয়ের একটি টোল ছিল। অর্থাভাবে অল্প দিনেই টোলটি উঠিয়া যায়। গ্রামের বর্ধিষ্ণু জমিদার অনূপকুমার যে পাঠশালা স্থাপন করেন, অল্প বেতনে তিনি তাহার গুরুমহাশয়ের পদে নিযুক্ত হন কিন্তু গুরুমহাশয়ের পদে আসীন হইয়া তাঁহার শান্তপ্রকৃতির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই।

পণ্ডিতমহাশয় বলিতেন, তাঁহার বয়স সবে চল্লিশ বৎসর। এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া শপথ করিয়া বলা যায় তাঁহার বয়স আটচল্লিশ বৎসরের ন্যূন নয়। সাধারণ পণ্ডিতদের সহিত তাঁহার আর কোনো বিষয় মিল ছিল না— তিনি খুব টস্‌টসে রসিক পুরুষ ছিলেন না বা খট্‌খটে ঘট-পট-বাগীশ ছিলেন না, দলাদলির চক্রান্ত করিতেন না, শাস্ত্রের বিচার লইয়া বিবাদে লিপ্ত থাকিতেন না, বিদায়-আদায়ের কোনো আশাই রাখিতেন না। কেবল মিল ছিল প্রশস্ত উদরটিতে, নস্যের ডিবাটিতে, ক্ষুদ্র টিকিটিতে ও শ্মশ্রুবিহীন মুখে। পাঠশালার বালকেরা প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা তাঁহার বাড়িতেই পড়িয়া থাকিত। এই বালকদের জন্য তাঁহার অনেক সন্দেশ খরচ হইত; সন্দেশের লোভ পাইয়া বালকেরা ছিনা জোঁকের মতো তাঁহার বাড়ির মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিত। পণ্ডিতমশাই বড়োই ভালোমানুষ ছিলেন এবং দুষ্ট বালকেরা তাঁহার উপর বড়োই অত্যাচার করিত। পণ্ডিতমহাশয়ের নিদ্রাটি এমন অভ্যস্ত ছিল

যে, তিনি শুইলেই ঘুমাইতেন, বসিলেই ঢুলিতেন ও দাঁড়াইলেই হাই তুলিতেন। এই সুবিধা পাইয়া বালকেরা তাঁহার নস্যের ডিবা, চটিজুতা ও চশমার ঠুঙিটি চুরি করিয়া লইত। একে তো পণ্ডিতমহাশয় অতিশয় আলগা লোক, তাহাতে পাঠশালার দুষ্ট বালকেরা তাঁহার বাটীতে কিছুমাত্র শৃঙ্খলা রাখিত না। পাঠশালায় যাইবার সময় কোনোমতে তাঁহার চটিজুতা খুঁজিয়া পাইতেন না, অবশেষে শূন্যপদেই যাইতেন। একদিন সকালে উঠিয়া দৈবাৎ দেখিতে পাইলেন তাঁহার শয়নগৃহে বোলতায় চাক করিয়াছে, ভয়ে বিব্রত হইয়া সে ঘরই পরিত্যাগ করিলেন; সে ঘরে তিন পরিবার বোলতায় তিনটি চাক বাঁধিল, ইঁদুরে গর্ত করিল, মাকড়সা প্রাসাদ নির্মাণ করিল এবং লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র পিপীলিকা সার বাঁধিয়া গৃহময় রাজপথ বসাইয়া দিল। বালীর পক্ষে ঋষ্যমূখ পর্বত যেরূপ, পণ্ডিতমহাশয়ের পক্ষে এই ঘরটি সেরূপ হইয়া পড়িয়াছিল। পাঠশালায় গমনে অনিচ্ছুক কোনো বালক যদি সেই গৃহে লুকাইত তবে আর পণ্ডিতমহাশয় তাহাকে ধরিতে পারিতেন না।

গৃহের এইরূপ আলগা অবস্থা দেখিয়া পণ্ডিতমহাশয় অনেক দিন হইতে একটি গৃহিণীর চিন্তায় আছেন। পূর্বকার গৃহিণীটি বড়ো প্রচণ্ড স্ত্রীলোক ছিলেন। নিরীহ-প্রকৃতি সার্বভৌম মহাশয় দিল্লীশ্বরের ন্যায় তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতেন। স্ত্রী নিকটে থাকিলে অন্য স্ত্রীলোক দেখিয়া চক্ষু মুদিয়া থাকিতেন। একবার একটি অষ্টমবর্ষীয়া বালিকার দিকে চাহিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার পত্নী সেই বালিকাটির মৃত পিতৃপিতামহ প্রপিতামহের নামোল্লেখ করিয়া যথেষ্ট গালি বর্ষণ করেন ও সার্বভৌম মহাশয়ের মুখের নিকট হাত নাড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, 'তুমি মরো, তুমি মরো, তুমি মরো!' পণ্ডিতমহাশয় মরণকে বড়ো ভয় করিতেন, মরণের কথা শুনিয়া তাঁহার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর দৈনিক গালি না পাইয়া অভ্যাসদোষে দিনকতক বড়ো কষ্ট অনুভব করিতেন।

যাহা হউক, অনেক কারণে পণ্ডিতমহাশয় বিবাহের চেষ্টায় আছেন। পণ্ডিত-মহাশয়ের একটা কেমন অভ্যাস ছিল যে, তিনি সহস্রমিষ্টান্নের লোভ পাইলেও কাহারো বিবাহসভায় উপস্থিত থাকিতেন না। কাহারো বিবাহের সংবাদ শুনিলে সমস্ত দিন মন খারাপ হইয়া থাকিত। পণ্ডিতমহাশয়ের এক ভট্টাচার্যবন্ধু ছিলেন; তাঁহার মনে ধারণা ছিল যে তিনি বড়োই রসিক, যে ব্যক্তি তাঁহার কথা শুনিয়া না হাসিত তাহার উপরে তিনি আন্তরিক চটিয়া যাইতেন। এই রসিক বন্ধু মাঝে মাঝে আসিয়া ভট্টাচার্যীয় ভঙ্গি ও স্বরে সার্বভৌম মহাশয়কে কহিতেন, "ওহে ভায়া, শাস্ত্রে আছে—

যাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাবদর্ধোভবেৎ পুমান্।
যন্ন বালৈঃ পরিবৃতং শ্মশানমিব তদ্‌গৃহম্।

কিন্তু তোমাতে তদ্‌বৈপরীত্যই লক্ষিত হচ্ছে। কারণ কিনা, যখন তোমার ব্রাহ্মণী বিদ্যমান ছিলেন তখন তুমি ভয়ে আশঙ্কায় অর্ধেক হয়ে গিয়েছিলে, স্ত্রীবিয়োগের পর আবার দেখতে দেখতে শরীর দ্বিগুণ হয়ে উঠল। অপরন্তু শাস্ত্রে যে লিখছে বালকের দ্বারা পরিবৃত না হইলে গৃহ শ্মশানসমান হয়, কিন্তু বালক-কর্তৃক পরিবৃত হওয়া প্রযুক্তই তোমার গৃহ শ্মশানসমান হয়েছে।"

এই বলিয়া সমীপস্থ সকলকে চোখ টিপিতেন ও সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসিলে পর তিনি সন্তোষের সহিত মুহুর্মুহু নস্য লইতেন।

ওপারের একটি মেয়ের সঙ্গে সার্বভৌম মহাশয়ের সম্বন্ধ হইয়াছে। এ কয়দিন পণ্ডিতমহাশয় বড়ো মনের স্ফূর্তিতে আছেন। পাঠশালার ছুটি হইয়াছে। আজ পাত্র দেখিতে আসিবে, পাড়ার কোনো দুষ্ট লোকের পরামর্শ শুনিয়া পণ্ডিতমহাশয় নরেন্দ্রের নিকট হইতে এক জোড়া ফুল মোজা, জরির পোশাক ও পাগড়ি চাহিয়া আনিলেন। পাড়ার দুষ্ট লোকেরা এই-সকল বেশ পরাইয়া তাঁহাকে সঙ সাজাইয়া দিল। ক্ষুদ্রপরিসর পাগড়িটি পণ্ডিতমহাশয়ের বিশাল মস্তকের টিকির অংশটুকু অধিকার করিয়া রহিল মাত্র, চার পাঁচটা বোতাম ছিঁড়িয়া কষ্টে-সৃষ্টে পণ্ডিতমহাশয়ের উদরের বেড়ে চাপকান কুলাইল। অনেকক্ষণের পর বেশভূষা সমাপ্ত হইলে পর সার্বভৌম মহাশয় দর্পণে একবার মুখ দেখিলেন। জরির পোশাকের চাকচিক্য দেখিয়া তাঁহার মন বড়ো তৃপ্ত হইল। কিন্তু সেই ঢলঢলে জুতা পরিয়া, আঁট সাঁট চাপকান গায়ে দিয়া চলিতেও পারেন না, নড়িতেও পারেন না, জড়ভরতের মতো এক স্থানে বসিয়াই রহিলেন। মাথা একটু নিচু করিলেই মনে হইতেছে পাগড়ি বুঝি খসিয়া পড়িবে। ঘাড়-বেদনা হইয়া উঠিল, তথাপি যথাসাধ্য মাথা উঁচু করিয়া রাখিলেন। ঘণ্টাখানেক এইরূপ বেশে থাকিয়া তাঁহার মাথা ধরিয়া উঠিল, মুখ শুকাইয়া গেল, অনর্গল ঘর্ম প্রবাহিত হইতে লাগিল, প্রাণ কণ্ঠাগত হইল। পল্লীর ভদ্রলোকেরা আসিয়া অনেক বুঝাইয়া-সুঝাইয়া তাঁহার বেশ পরিবর্তন করাইল।

ভট্টাচার্যমহাশয় তাঁহার অব্যবস্থিত গৃহ পরিষ্কৃত ও সজ্জিত করিবার নিমিত্ত নানা খোশামোদ করিয়া নিধিরাম ভট্টকে আহ্বান করিয়াছেন। এই নিধিরামের উপর পণ্ডিতমহাশয়ের অতিরিক্ত ভক্তি ছিল। তিনি বলিতেন, গার্হস্থ্য ব্যাপার সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে নিধি তাঁহার পুরাতন গৃহিণীর সমান, মকদ্দমার নানাবিধ জটিল তর্কে সে স্বয়ং মেজেস্টোর সাহেবকেও ঘোল পান করাইতে পারে এবং সকল বিষয়ের সংবাদ

রাখিতে ও চতুরতাপূর্বক সকল কাজ সম্পন্ন করিতে সে কালেজের ছেলেদের সমানই হউক বা কিছু কমই হউক।

চতুরতাভিমানী লোকেরা আপনার অভাব লইয়া গর্ব করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি গার্হস্থ্য ব্যবস্থার চতুরতা জানাইতে চায় সে আপনার দারিদ্র্য লইয়া গর্ব করে, অর্থাৎ 'অর্থের অভাব সত্ত্বেও কেমন সুচারুরূপে সংসারের শৃঙ্খলা সম্পাদন করিতেছি'। নিধি তাঁহার মূর্খতা লইয়া গর্ব করিতেন। গল্পবাগীশ লোক মাত্রেই পণ্ডিতমহাশয়ের প্রতি বড়ো অনুকূল। কারণ, নীরবে সকল প্রকারের গল্প শুনিয়া যাইতে ও বিশ্বাস করিতে পল্লীতে পণ্ডিতমহাশয়ের মতো আর কেহই ছিল না। এই গুণে বশীভূত হইয়া নিধি মাসের মধ্যে প্রায় দুই শত বার করিয়া তাঁহার এক বিবাহের গল্প শুনাইতেন। গল্পের ডালপালা ছাঁটিয়া-ছুটিয়া দিলে সারমর্ম এইরূপ দাঁড়ায়— নিধিরাম ভট্ট বর্ণপরিচয় পর্যন্ত শিখিয়াই লেখাপড়ায় দাঁড়ি দিয়াছিলেন, কিন্তু চালাকির জোরে বিদ্যার অভাব পূরণ করিতেন। নিধির বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে, কিন্তু এমন শ্বশুর পৃথিবীতে নাই যে নিধির মতো গোমূর্খকে জানিয়া শুনিয়া কন্যা সম্প্রদান করে। অনেক কৌশলে ও পরিশ্রমে পাত্রী স্থির হইল। আজ জামাতাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছে। অদ্বিতীয় চতুর নিধি দাদার সহিত পরামর্শ করিয়া একটি পালকি আনাইল এবং চাপকান ও শামলা পরিয়া গুটিকতক কাগজের তাড়া হাতে করিয়া কন্যা-কর্তাদিগের সম্মুখেই পালকিতে চড়িলেন। দাদা কহিলেন, 'ও নিধি, আজ যে তোমাকে দেখতে এয়েচেন।' নিধি কহিলেন, 'না দাদা, আজ সাহেব সকাল-সকাল আসবে, ঢের কাজ ঢের লেখাপড়া আছে, আজ আর হচ্ছে না।' কন্যাকর্তারা জানিয়া গেল যে, নিধি কাজ কর্ম করে, লেখাপড়াও জানে। তাহার পরদিনেই বিবাহ হইয়া গেল। নিধি ইহার মধ্যে একটি কথা চাপিয়া যায়, আমরা সেটি সন্ধান পাইয়াছি— পাড়ার একটি এন্‌ট্রেন্স ক্লাসের ছাত্র তাহাকে বলিয়া দিয়াছিল যে, 'যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কোন্ কলেজে পড়, তবে বলিয়ো বিশপ্‌স্ কলেজে।' দৈবক্রমে বিবাহসভায় ঐ প্রশ্ন করায় নিধি গম্ভীর ভাবে উত্তর দিয়াছিল বিষাক্ত কালেজে। ভাগ্যে কন্যাকর্তারা নিধির মূর্খতাকে রসিকতা মনে করে তাই সে যাত্রায় সে মানে মানে রক্ষা পায়।

নিধি আসিয়াই মহা গোলযোগ বাধাইয়া দিলেন। 'ওরে ও'— 'ওরে তা'— এ ঘরে একবার, ও ঘরে একবার— এটা ওল্‌টাইয়া, ওটা পাল্‌টাইয়া— দুই-একটা বাসন ভাঙিয়া, দুই-একটা পুঁথি ছিঁড়িয়া— পাড়া-সুদ্ধ তোলপাড় করিয়া তুলিলেন। কোনো কাজই করিতেছেন না অথচ মহা গোল, মহা ব্যস্ত। চটিজুতা চট্ চট্ করিয়া এ ঘর ও ঘর, এ বাড়ি ও বাড়ি, এ পাড়া ও পাড়া করিতেছেন— কোনোখানেই

দাঁড়াইতেছেন না, ঊর্ধ্বশ্বাসে ইহাকে দু-একটি উহাকে দুই-একটি কথা বলিয়া আবার সট্‌ সট্‌ করিয়া গুরুমহাশয়ের বাড়ি প্রবেশ করিতেছেন। ফলটা এই সন্ধ্যার সময় গিয়া দেখিব— সার্বভৌম মহাশয়ের বাড়ি যে-কে-সেই, তবে পূর্বে এক দিনে যাহা পরিষ্কৃত হইত এখন এক সপ্তাহেও তাহা হইবে না। যাহা হউক, গৃহ পরিষ্কার করিতে গিয়া একটি গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়াছিল— ঝাঁটার আঘাতে, লোকজনের কোলাহলে, তিন-ঘর বোলতা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। নিধিরামের নাক মুখ ফুলিয়া উঠিল— চটি জুতা ফেলিয়া, টিকি উড়াইয়া, কোঁচার কাপড়ে পা জড়াইতে জড়াইতে, চৌকাটে হুঁচুট খাইতে খাইতে, পণ্ডিতমশায়কে গালি দিতে দিতে গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। এক সপ্তাহ ধরিয়া বাড়ির ঘরে ঘরে বিশৃঙ্খল বোলতার দল উড়িয়া বেড়াইত। বেচারি পণ্ডিতমহাশয় দশ দিন আর অরক্ষিত গৃহে বোলতার ভয়ে প্রবেশ করেন নাই, প্রতিবাসীর বাটীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। পরে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন ও যাইবার সময় ঘটী ঘড়া ইত্যাদি যে-সকল দ্রব্য বাড়িতে দেখিয়া গিয়াছিলেন, আসিবার সময় তাহা আর দেখিতে পাইলেন না।

অদ্য বিবাহ হইবে। পণ্ডিতমহাশয় কাল সমস্ত রাত স্বপ্ন দেখিয়াছেন। বহুকালের পুরানো সেই ঝাঁটাগাছটি স্বপ্নে দেখিতে পাইয়াছিলেন, এটি তাঁহার শুভ লক্ষণ বলিয়া মনে হইল। হাসিতে হাসিতে প্রত্যুষেই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াছেন। চেলীর জোড় পরিয়া চন্দনচর্চিত কলেবরে ভাবে ভোর হইয়া বসিয়া আছেন। থাকিয়া থাকিয়া সহসা পণ্ডিতমহাশয়ের মনে একটি দুর্ভাবনার উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন, সকলই তো হইল, এখন নৌকায় উঠিবেন কী করিয়া। অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতে লাগিলেন; বিশ-বাইশ ছিলিম তাম্রকূট ভস্ম হইলে ও দুই-এক ডিবা নস্য ফুরাইয়া গেলে পর একটা সদুপায় নির্ধারিত হইল। তিনি ঠিক করিলেন যে নিধিরামকে সঙ্গে লইবেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল নিধিরাম সঙ্গে থাকিলে নৌকা ডুবিবার কোনো সম্ভাবনাই নাই। নিধির অন্বেষণে চলিলেন। সেদিনকার দুর্ঘটনার পরে নিধি 'আর পণ্ডিতমহাশয়ের বাড়িমুখা হইব না' বলিয়া স্থির করিয়াছিল, অনেক খোশামোদে স্বীকৃত হইল। এইবার নৌকায় উঠিতে হইবে। সার্বভৌমমহাশয় তীরে দাঁড়াইয়া নস্য লইতে লাগিলেন। আমাদের নিধিরামও নৌকাকে বড়ো কম ভয় করিতেন না, যদি কন্যাকর্তাদের বাড়িতে আহারের প্রলোভন না থাকিত তাহা হইলে প্রাণান্তেও নৌকায় উঠিতেন না। অনেক কষ্টে পাঁচ-ছয়-জন মাঝিতে ধরাধরি করিয়া তাঁহাদিগকে কোনোক্রমে তো নৌকায় তুলিল। নৌকা ছাড়িয়া দিল। নৌকা যতই নড়েচড়ে পণ্ডিতমহাশয় ততই ছটফট করেন, পণ্ডিতমহাশয় যতই ছটফট করেন নৌকা ততই

টল্‌মল্‌ করে; মহা হাঙ্গাম, মাঝিরা বিব্রত, পণ্ডিতমহাশয় চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন ও মাঝিদিগকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন যে, যদিই পাড়ি দিতে হইল তবে যেন ধার ধার দিয়া দেওয়া হয়। নিধিরামের মুখে কথাটি নাই। তিনি এমন অবস্থায় আছেন যে, একটু বাতাস উঠিলে বা একটু মেঘ দেখা দিলেই নৌকার মাস্তুলটা লইয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িবেন। পণ্ডিতমহাশয় আকুল ভাবে নিধির মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। দুই-এক জায়গায় তরঙ্গবেগে নৌকা একটু টল্‌মল্‌ করিল, নিধি লাফাইয়া উঠিল, পণ্ডিতমহাশয় নিধিকে জড়াইয়া ধরিলেন। তখনো তাঁহার বিশ্বাস ছিল নিধিকে আশ্রয় করিয়া থাকিলে প্রাণহানির কোনো সম্ভাবনা নাই। নিধি সার্বভৌমমহাশয়ের বাহুপাশ ছাড়াইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, পণ্ডিতমহাশয় ততই প্রাণপণে আঁটিয়া ধরিতে লাগিলেন। শীর্ণকায় নিধি দারুণ নিষ্পেষণে রুদ্ধশ্বাস হইয়া যায় আর-কি, রোষে বিরক্তিতে যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে লাগিল। এইরূপ গোলযোগ করিতে করিতে নৌকা তীরে লাগিল। মাঝিরা এরূপ নৌকাযাত্রা আর কখনো দেখে নাই। তাহারা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল, কণ্ঠাগতপ্রাণ নিধি নিশ্বাস লইয়া বাঁচিলেন, পণ্ডিতমহাশয় এক ঘটী জল খাইয়া বাঁচিলেন।

বিবাহের সন্ধ্যা উপস্থিত। পণ্ডিতমহাশয় টিকিযুক্ত শিরে টোপর পরিয়া গদির উপর বসিয়া আছেন। অনাহারে, নৌকার পরিশ্রমে ও অভ্যাসদোষে দারুণ ঢুলিতেছেন। মাথার উপর হইতে মাঝে মাঝে টোপর খসিয়া পড়িতেছে। পার্শ্ববর্তী নিধি মাঝে মাঝে এক-একটি গুঁতা মারিতেছে; সে এমন গুঁতা যে তাহাতে মৃত ব্যক্তিরও চৈতন্য হয়, সেই গুঁতা খাইয়া পণ্ডিতমহাশয় আবার ধড়্‌ফড়িয়া উঠিতেছেন ও শিরচ্যুত টোপরটি মাথায় পরিয়া মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে চারি দিক অবলোকন করিতেছেন, সভাময় চোখ-টেপাটেপি করিয়া হাসি চলিতেছে। লগ্ন উপস্থিত হইল, বিবাহের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল। পণ্ডিতমহাশয় দেখিলেন, পুরোহিতটি তাঁহারই টোল-আউট শিষ্য। শিষ্য মহা লজ্জায় পড়িয়া গেল। পণ্ডিতমহাশয় কানে কানে কহিলেন, তাহাতে আর লজ্জা কী! এবং লজ্জা করিবার যে কোনো প্রয়োজন নাই এ কথা তিনি স্কন্দ ও কল্কিপুরাণ হইতে উদাহরণ প্রয়োগ করিয়া প্রমাণ করিলেন। সার্বভৌমমহাশয় বিবাহ-আসনে উপবিষ্ট হইলেন। পুরোহিত মন্ত্র বলিবার সময় একটা ভুল করিল। সংস্কৃতে ভুল পণ্ডিতমহাশয়ের সহ্য হইল না, অমনি মুগ্ধবোধ ও পাণিনি হইতে গণ্ডা আষ্টেক সূত্র আওড়াইয়া ও তাহা ব্যাখ্যা করিয়া পুরোহিতের ভ্রম সংশোধন করিয়া দিলেন। পুরোহিত অপ্রস্তুত হইয়া ও ভেবাচেকা খাইয়া আরো কতকগুলি ভুল করিল। পণ্ডিতমহাশয় দেখিলেন যে, তিনি টোলে তাহাকে যাহা

শিখাইয়াছিলেন পুরোহিত বাবাজি চাল-কলার সহিত তাহা নিঃশেষে হজম করিয়াছেন। বিবাহ হইয়া গেল। উঠিবার সময় সার্বভৌমমহাশয় কিরূপ বেগতিকে পায়ে পা জড়াইয়া তাঁহার শ্বশুরের ঘাড়ে পড়িয়া গেলেন, উভয়ে বিবাহসভায় ভূমিসাৎ হইলেন। বরের কাপড় ছিঁড়িয়া গেল, টোপর ভাঙিয়া গেল। শ্বশুরের শূলবেদনা ছিল, স্থূলকায় ভট্টাচার্যমহাশয় তাঁহার উদর চাপিয়া পড়াতে তিনি বিষম চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সাত-আট জন ধরাধরি করিয়া উভয়কে তুলিল, সভাশুদ্ধ লোক হাসিতে লাগিল, পণ্ডিতমহাশয় মর্মান্তিক অপ্রস্তুত হইলেন ও দুই-একটি কী কথা বলিলেন তাহার অর্থ বুঝা গেল না। একবার দৈবাৎ অপ্রস্তুত হইলে পদে পদে অপ্রস্তুত হইতেই হইবে। অন্তঃপুরে গিয়া গোলেমালে পণ্ডিতমহাশয় তাঁহার শাশুড়ির পা মাড়াইয়া দিলেন, তাঁহার শাশুড়ি 'নাঃ— কিছু হয় নাই' বলিলেন ও অন্দরে গিয়া সিক্ত বস্ত্রখণ্ড তাঁহার পায়ের আঙুলে বাঁধিয়া আসিলেন। আহার করিবার সময় দৈবক্রমে গলায় জল বাধিয়া গেল, আধঘণ্টা ধরিয়া কাশিতে কাশিতে নেত্র অশ্রুজলে ভরিয়া গেল। বাসর-ঘরে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একটা আরশুলা আসিয়া তাঁহার গায়ে উড়িয়া বসিল। অমনি লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া, হাত পা ছড়াইয়া, মুখ বিকটাকার করিয়া তাঁহার শালীদের ঘাড়ের উপর গিয়া পড়িলেন। আবার দুইটি-চারিটি কান-মলা খাইয়া ঠিক স্থানে আসিয়া বসিলেন। একটা কথা ভুলিয়া গিয়াছি, স্ত্রী আচার করিবার সময় পণ্ডিতমহাশয় এমন উপর্যুপরি হাঁচিতে লাগিলেন যে চারি দিকের মেয়েরা বিব্রত হইয়া পড়িল। বাসর-ঘরের বিপদ হইতে কী করিয়া উদ্ধার হইবেন এ বিষয়ে পণ্ডিতমহাশয় অনেক ভাবিয়াছিলেন; সহসা নিধিকে মনে পড়িয়াছিল, কিন্তু নিধির বাসর-ঘরে যাইবার কোনো উপায় ছিল না। যাহা হউক, ভালোমানুষ বেচারি অতিশয় গোলে পড়িয়াছিলেন। শুনিয়াছি দুটি-একটি কী কথার উত্তর দিতে গিয়া স্মৃতি ও বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এবং যখন তাঁহাকে গান করিতে অনুরোধ করে, অনেক পীড়াপীড়ির পর গাহিয়াছিলেন 'কোথায় তারিণী মা গো বিপদে তারহ সুতে'। এই তিনি মনের সঙ্গে গাহিয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভট্টাচার্যমহাশয় রাগিণীর দিকে বড়ো একটা নজর করেন নাই, যে সুরে তিনি পুঁথি পড়িতেন সেই সুরেই গানটি গাহিয়াছিলেন। যাহা হউক, অনেক কষ্টে বিবাহরাত্রি অতিবাহিত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র নরেন্দ্রদের দলে মিশিয়াছে বটে, কিন্তু এখনো মহেন্দ্রের আচার-ব্যবহারে এমন একটি মহত্ত্ব জড়িত ছিল যে, নরেন্দ্র তাহার সহিত ভালো করিয়া কথা কহিতে সাহস

করিত না। এমন-কি, সে থাকিলে নরেন্দ্র কেমন একটা অসুখ অনুভব করিত, সে চলিয়া গেলে কেমন একটু শান্তিলাভ করিত। অলক্ষিতভাবে নরেন্দ্রের মন মহেন্দ্রের মোহিনীশক্তির পদানত হইয়াছিল।

মহেন্দ্র বড়ো মৃদুস্বভাব লোক— হাসিবার সময় মুচকিয়া হাসে, কথা কহিবার সময় মৃদুস্বরে কথা কহে, আবার অধিক লোকজন থাকিলে মূলেই কথা কহে না। সে কাহারো কথায় সায় দিতে হইলে 'হাঁ' বলিত বটে, কিন্তু সায় দিবার ইচ্ছা না থাকিলে 'হাঁ'ও বলিত না, 'না'ও বলিত না। এ মহেন্দ্র নরেন্দ্রের মনের উপর যে অমন আধিপত্য স্থাপন করিবে তাহা কিছু আশ্চর্যের বিষয় বটে।

মহেন্দ্রের সহিত গদাধরের বড়ো ভাব হইয়াছিল। ঘরে বসিয়া উভয়ে মিলিয়া দেশাচারের বিরুদ্ধে নিদারুণ কাল্পনিক সংগ্রাম করিতেন। স্বাধীনবিবাহ বিধবাবিবাহ প্রভৃতি প্রসঙ্গে মহেন্দ্র সংস্কারকমহাশয়ের সহিত উৎসাহের সহিত যোগ দিতেন, কিন্তু বহুবিবাহনিবারণ-প্রসঙ্গে তাঁহার তেমন উৎসাহ থাকিত না। এ ভাবের তাৎপর্য যদিও গদাধরবাবু বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু আমরা এক রকম বুঝিয়া লইয়াছি।

গদাধর ও স্বরূপের সঙ্গে মহেন্দ্রের যেমন বনিয়া গিয়াছিল, এমন নরেন্দ্র ও তাহার দলবলের সহিত হয় নাই। মহেন্দ্র ইহাদের নিকট ক্রমে তাহার দুই-একটি করিয়া মনের কথা বলিতে লাগিল, অবশেষে মোহিনীর সহিত প্রণয়ের কথাটাও অবশিষ্ট রহিল না। এই প্রণয়ের কথাটা শুনিয়া স্বরূপবাবু অত্যন্ত উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন মহেন্দ্র তাঁহার প্রণয়ের অন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছেন; অনেক দুঃখ করিয়া অনেক কবিতা লিখিলেন এবং আপনাকে একজন উপন্যাস নাটকের নায়ক কল্পনা করিয়া মনে-মনে একটু তৃপ্ত হইলেন।

গদাধর কোনো প্রকারে মোহিনীর পারিবারিক অধীনতাশৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া তাহাকে মুক্ত বায়ুতে আনয়ন করিবার জন্য মহেন্দ্রকে অনুরোধ করিলেন। তিনি কহেন, গৃহ হইতে আমাদের স্বাধীনতা শিক্ষা করা উচিত, প্রথমে পারিবারিক অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিতে শিখিলে ক্রমশ আমরা স্বাধীনতাপথে অগ্রসর হইতে পারিব। ইংরাজি শাস্ত্রে লেখে : Charity begins at home। তেমনি গৃহ হইতে স্বাধীনতার শুরু। সংস্কারকমহাশয় নিজে বাল্যকাল হইতেই ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আসিতেছেন। বারো বৎসর বয়সে পিতার সহিত বিবাদ করিয়া তিনি গৃহ হইতে নিরুদ্দেশ হন, ষোলো বৎসর বয়সে শিক্ষকের সহিত বিবাদ করিয়া ক্লাস ছাড়িয়া আসেন, কুড়ি বৎসর বয়সে তাঁহার স্ত্রীর সহিত মনান্তর হয় এবং তাহাকে তাঁহার বাপের বাড়ি পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হন এবং এইরূপে স্বাধীনতার সোপানে সোপানে উঠিয়া সম্প্রতি ত্রিশ

বৎসর বয়সে নিজে সমস্ত কুসংস্কার ও প্রেজুডিসের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া অসভ্য বঙ্গদেশের নির্দয় দেশাচারসমূহকে বক্তৃতায় ঝটিকায় ভাঙিয়া ফেলিবার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু গদাধরের সহিত মহেন্দ্রের মতের ঐক্য হইল না, এমন-কি, মহেন্দ্র মনে-মনে একটু অসন্তুষ্ট হইল। গদাধর আর অধিক কিছু বলিল না; ভাবিল, 'আরো দিনকতক যাক, তাহার পরে পুনরায় এই কথা তুলিব।'

আরো দিনকতক গেল, মহেন্দ্র এখন নরেন্দ্রদের দলে সম্পূর্ণরূপে যোগ দিয়াছে। মহেন্দ্রের মনে আর মনুষ্যত্বের কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই। গদাধর আর-একবার পূর্বকার কথা পাড়িল, মহেন্দ্রের তাহাতে কোনো আপত্তি হইল না।

মহেন্দ্রের নামে কলঙ্ক ক্রমে রাষ্ট্র হইতে লাগিল। কিন্তু মহেন্দ্রের হৃদয়ে এতটুকু লোকলজ্জা অবশিষ্ট ছিল না যে, এই অপবাদে তাহার মন তিলমাত্র ব্যথিত হইতে পারে।

মহেন্দ্রের ভগিনী পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়েরা ইহাতে কিছু কষ্ট পাইল বটে, কিন্তু হতভাগিনী রজনীর হৃদয়ে যেমন আঘাত লাগিল এমন আর কাহারো নয়। যখন মহেন্দ্র মদ খাইয়া এলোমেলো বকিতে থাকে তখন রজনীর কী মর্মান্তিক ইচ্ছা হয় যে, আর কেহ সেখানে না আসে। যখন মহেন্দ্র মাতাল অবস্থায় টলিতে টলিতে আইসে রজনী তাহাকে কোনো ক্রমে ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেয়, তখন তাহার কতই-না ভয় হয় পাছে আর কেহ দেখিতে পায়। অভাগিনী মহেন্দ্রকে কোনো কথা বলিতে, পরামর্শ দিতে বা বারণ করিতে সাহস করিত না, তাহার যতদূর সাধ্য কোনোমতে মহেন্দ্রের দোষ আর কাহাকেও দেখিতে দিত না। মহেন্দ্রের অসম্বৃত অবস্থায় রজনীর ইচ্ছা করিত তাহাকে বুক দিয়া ঢাকিয়া রাখে, যেন আর কেহ দেখিতে না পায়। কেহ তাহার সাক্ষাতে মহেন্দ্রের নিন্দা করিলে সে তাহার প্রতিবাদ করিতে সাহস করিত না, অন্তরালে গিয়া ক্রন্দন করা ভিন্ন তাহার আর কোনো উপায় ছিল না। সে তাহার মহেন্দ্রের জন্য দেবতার কাছে কত প্রার্থনা করিয়াছে, কিন্তু মহেন্দ্র তাহার মত্ত অবস্থায় রজনীর মরণ ভিন্ন কিছুই প্রার্থনা করে নাই। রজনী মনে মনে কহিত, 'রজনীর মরিতে কতক্ষণ, কিন্তু রজনী মরিলে তোমাকে কে দেখিবে।'

একদিন রাত্রি দুইটার সময় টলিতে টলিতে মহেন্দ্র ঘরে আসিয়া ভূমিতলে শুইয়া পড়িল। রজনী জাগিয়া জানালায় বসিয়া ছিল, সে তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া বসিল। মহেন্দ্র তখন অচৈতন্য। রজনী ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে কতক্ষণের পর মহেন্দ্রের মাথা কোলে তুলিয়া লইল। আর কখনো সে মহেন্দ্রের মাথা কোলে রাখে নাই; সাহসে বুক বাঁধিয়া আজ রাখিল। একটি পাখা লইয়া ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিল।

ভোরের সময় মহেন্দ্র জাগিয়া উঠিল ; পাখা দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া কহিল, 'এখানে কী করিতেছ। ঘুমাও গে না!' রজনী ভয়ে থতমত খাইয়া উঠিয়া গেল। মহেন্দ্র আবার ঘুমাইয়া পড়িল। প্রভাতের রৌদ্র মুক্ত বাতায়ন দিয়া মহেন্দ্রের মুখের উপর পড়িল, রজনী আস্তে আস্তে জানালা বন্ধ করিয়া দিল।

রজনী মহেন্দ্রকে যত্ন করিত, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে করিতে সাহস করিত না। সে গোপনে মহেন্দ্রের খাবার গুছাইয়া দিত, বিছানা বিছাইয়া দিত এবং সে অল্পস্বল্প যাহা-কিছু মাসহারা পাইত তাহা মহেন্দ্রের খাদ্য ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য কিনিতেই ব্যয় করিত, কিন্তু এ-সকল কথা কেহ জানিতে পাইত না। গ্রামের বালিকারা, প্রতিবেশিনীরা, এত লোক থাকিতে নির্দোষী রজনীরই প্রতি কার্যে দোষারোপ করিত, এমন-কি, বাড়ির দাসীরাও মাঝে মাঝে তাহাকে দুই-এক কথা শুনাইতে ত্রুটি করিত না, কিন্তু রজনী তাহাতে একটি কথাও কহিত না— যদি কহিতে পারিত তবে অত কথা শুনিতেও হইত না।

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হইবে। মেঘ করিয়াছে, একটু বাতাস নাই, গাছে গাছে পাতায় পাতায় হাজার হাজার জোনাকি-পোকা মিট্‌ মিট্‌ করিতেছে। মোহিনীদের বাড়িতে একটি মানুষ আর জাগিয়া নাই, এমন সময়ে তাহাদের খিড়কির দরজা খুলিয়া দুইজন তাহাদের বাগানে প্রবেশ করিল। একজন বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া রহিল, আর-একজন গৃহে প্রবেশ করিল। যিনি বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া রহিলেন তিনি গদাধর, যিনি গৃহে প্রবেশ করিলেন তিনি মহেন্দ্র। দুইজনেরই অবস্থা বড়ো ভালো নহে, গদাধরের এমন বক্তৃতা করিবার ইচ্ছা হইতেছে যে তাহা বলিবার নহে এবং মহেন্দ্রের পথের মধ্যে এমন শয়ন করিবার ইচ্ছা হইতেছে যে কী বলিব। ঘোরতর বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল, গদাধর দাঁড়াইয়া ভিজিতে লাগিলেন। পরোপকারের জন্য কী কষ্ট না সহ্য করা যায়, এমন-কি, এখনই যদি বজ্র পড়ে গদাধর তাহা মাথায় করিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু এই কথাটা অনেক ক্ষণ ভাবিয়া দেখিলেন যে, এখনই তাহাতে তিনি প্রস্তুত নহেন ; বাঁচিয়া থাকিলে পৃথিবীর অনেক উপকার করিতে পারিবেন। বৃষ্টিবজ্রের সময় বৃক্ষতলে দাঁড়ানো ভালো নয় জানিয়া একটি ফাঁকা জায়গায় গিয়া বসিলেন, বৃষ্টি দ্বিগুণ বেগে পড়িতে লাগিল।

এ দিকে মহেন্দ্র পা টিপিয়া টিপিয়া মোহিনীর ঘরের দিকে চলিল, যতই সাবধান হইয়া চলে ততই খস্‌ খস্‌ শব্দ হয়। ঘরের সম্মুখে গিয়া আস্তে আস্তে দরজায় ধাক্কা মারিল, ভিতর হইতে দিদিমা বলিয়া উঠিলেন, "মোহিনী! দেখ্‌ তো বিড়াল বুঝি!"

দিদিমার গলা শুনিয়া মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি সরিবার চেষ্টা দেখিলেন। সরিতে গিয়া একরাশি হাঁড়ি-কলসির উপর গিয়া পড়িলেন। হাঁড়ির উপর কলসি পড়িল, কলসির উপর হাঁড়ি পড়িল এবং কলসি হাঁড়ি উভয়ের উপর মহেন্দ্র পড়িল। হাঁড়িতে কলসিতে, থালায় ঘটিতে দারুণ ঝন্ ঝন্ শব্দ বাধাইয়া দিল এবং কলসি হইতে ঘড় ঘড় শব্দে জল গড়াইতে লাগিল। বাড়ির ঘরে ঘরে 'কী হইল' 'কী হইল' শব্দ উপস্থিত হইল। মা উঠিলেন, পিসি উঠিলেন, দিদি উঠিলেন, খোকা কাঁদিয়া উঠিল, দিদিমা বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে পোড়ারমুখা বিড়ালের মরণ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন— মোহিনী প্রদীপ হস্তে বাহিরে আসিল। দেখিল মহেন্দ্র ; তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া কহিল, "পালাও! পালাও!"

মহেন্দ্র পলাইবার উদ্যোগ করিল ও মোহিনী তাড়াতাড়ি প্রদীপ নিভাইয়া ফেলিল। দিদিমা চক্ষে কম দেখিতেন বটে, কিন্তু কানে বড়ো ঠিক ছিলেন। মোহিনীর কথা শুনিতে পাইলেন, তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কহিলেন, "কাহাকে পলাইতে বলিতেছিস মোহিনী।"

দিদিমা অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু পলায়নের ধুপ্ধাপ্ শব্দ শুনিতে পাইলেন। দেখিতে দেখিতে বাড়িসুদ্ধ লোক জমা হইল।

মহেন্দ্র তো অন্য পথ দিয়া পলায়ন করিল। এ দিকে গদাধর বাগানে বসিয়া ভিজিতেছিলেন, অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া একটু তন্দ্রা আসিতেই শুইয়া পড়িলেন। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন যেন তিনি বক্তৃতা করিতেছেন, আর হাততালির ধ্বনিতে সভা প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে, সভায় গভর্নর জেনেরাল উপস্থিত ছিলেন, তিনি বক্তৃতা-অন্তে পরম তুষ্ট হইয়া আপনি উঠিয়া শেক্হ্যান্ড্ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় তাঁহার পৃষ্ঠে দারুণ এক লাঠির আঘাত লাগিল। ধড়্ফড়িয়া উঠিলেন ; একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে কী করিতেছিস। কে তুই।"

গদাধর জড়িত স্বরে কহিলেন, "দেশ ও সমাজ -সংস্কারের জন্য প্রাণ দেওয়া সকল মনুষ্যেরই কর্তব্য। ডাল ও ভাত সঞ্চয় করাই যাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য, তাহারা গলায় দড়ি দিয়া মরিলেও পৃথিবীর কোনো অনিষ্ট হয় না। দেশ-সংস্কারের জন্য রাত্রি নাই, দিবা নাই, আপনার বাড়ি নাই, পরের বাড়ি নাই, সকল সময়ে সর্বত্রই কোনো বাধা মানিবে না, কোনো বিঘ্ন মানিবে না— কেবল ঐ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। যে না করে সে পশু, সে পশু, সে পশু! অতএব"—

আর অধিক অগ্রসর হইতে হইল না ; প্রহারের চোটে তাঁহার এমন অবস্থা হইল যে, আর অল্পক্ষণ থাকিলে শরীর-সংস্কারের আবশ্যকতা হইত। অতিশয় বাড়াবাড়ি

দেখিয়া গদাধর বক্তৃতা-ছন্দ পরিত্যাগ করিয়া গোঙানিচ্ছন্দে তাঁহার মৃত পিতা, মাতা, কনেস্টেবল, পুলিস ও দেশের লোককে ডাকাডাকি আরম্ভ করিলেন। তাহারা বুঝিল যে, অধিক গোলযোগ করিলে তাহাদেরই বাড়ির নিন্দা হইবে, এইজন্য আস্তে আস্তে তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিল।

মোহিনীর উপরে তাহার বাড়িসুদ্ধ লোকের বড়োই সন্দেহ হইল। রাত্রে কে আসিয়াছিল এবং কাহাকে সে পলাইতে কহিল, এই কথা বাহির করিয়া লইবার জন্য তাহার প্রতি দারুণ নিগ্রহ আরম্ভ হইল, কিন্তু সে কোনোমতে কহিল না। কিন্তু এ কথা ছাপা থাকিবার নহে। মহেন্দ্র পলাইবার সময় তাহার চাদর ও জুতা ফেলিয়া আসিয়াছিল, তাহাতে সকলে বুঝিতে পারিল যে মহেন্দ্রেরই এই কাজ। এই তো পাড়াময় টী টী পড়িয়া গেল! পুকুরের ঘাটে, গ্রামের পথে, ঘরের দাওয়ায়, বৃদ্ধদের চণ্ডীমণ্ডপে এই এক কথারই আলোচনা হইতে লাগিল। মোহিনীর ঘর হইতে বাহির হওয়া দায় হইল, সকলেই তাহার পানে কটাক্ষ করিয়া কথা কয়। না কহিলেও মনে হয় তাহারই কথা হইতেছে। পথে কাহারো হাস্যমুখ দেখিলে তাহার মনে হইত তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই হাসি তামাসা চলিতেছে। অথচ মোহিনীর ইহাতে কোনো দোষ ছিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র যখন বাড়ি আসিয়া পৌঁছিলেন তখনো অনেক রাত আছে। নেশা অনেক ক্ষণ ছুটিয়া গেছে। মহেন্দ্রের মনে এক্ষণে দারুণ অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছে। ঘৃণায় লজ্জায় বিরক্তিতে ম্রিয়মাণ হইয়া শুইয়া পড়িল। একে একে কত কী কথা মনে পড়িতে লাগিল; শৈশবের এক-একটি স্মৃতি বজ্রের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইতে লাগিল। যৌবনের নবোন্মেষের সময় ভবিষ্যৎ-জীবনের কী মধুময় চিত্র তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল— কত মহান আশা, কত উদার কল্পনা তাঁহার উদ্দীপ্ত হৃদয়ের শিরায় শিরায় জড়িত বিজড়িত ছিল। যৌবনের সুখস্বপ্নে তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহার নাম মাতৃভূমির ইতিহাসে গৌরবের অক্ষয় অক্ষরে লিখিত থাকিবে, তাঁহার জীবন তাঁহার স্বদেশীয় ভ্রাতাদের আদর্শস্বরূপ হইবে এবং ভবিষ্যৎকাল আদরে তাঁহার যশ বক্ষে পোষণ করিতে থাকিবে। কিন্তু সে হৃদয়ের, সে আশার, সে কল্পনার আজ কী পরিণাম হইল। তাঁহার যশ কলঙ্কিত হইয়াছে, চরিত্র সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছে, হৃদয় দারুণ বিকৃত হইয়া গিয়াছে। কালি হইতে তাঁহাকে দেখিলে গ্রামের কুলবধূগণ সংকোচে সরিয়া যাইবে, বন্ধুরা লজ্জায় নতশির হইবে, শত্রুদের অধর ঘৃণার হাস্যে কুটিল হইবে,

বৃদ্ধেরা তাঁহার শৈশবের এই অনপেক্ষিত পরিণামে দুঃখ করিবে, যুবকেরা অন্তরালে তাঁহার নামে তীব্র উপহাস বিদ্রূপ করিবে— সর্বাপেক্ষা, তিনি যে নিরপরাধিনী বিধবার পবিত্র নামে কলঙ্ক আরোপ করিলেন তাহার আর মুখ রাখিবার স্থান থাকিবে না। মহেন্দ্র মর্মভেদী কষ্টে শয্যায় পড়িয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল।

মহেন্দ্রের রোদন দেখিয়া রজনীর কী কষ্ট হইতে লাগিল, রজনীই তাহা জানে। মনে-মনে কহিল, 'তোমার কী হইয়াছে বলো, যদি আমার প্রাণ দিলেও তাহার প্রতিকার হয় তবে আমি তাহাও দিব।' রজনী আর থাকিতে পারিল না, ধীরে ধীরে ভয়ে ভয়ে মহেন্দ্রের কাছে আসিয়া বসিল। কত বার মনে করিল যে, পায়ে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিবে যে, কী হইয়াছে। কিন্তু সাহস করিয়া পারিল না, মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল।

মহেন্দ্র মনের আবেগে তাড়াতাড়ি শয্যা হইতে উঠিয়া গেল। রজনী ভাবিল সে কাছে আসাতেই বুঝি মহেন্দ্র চলিয়া গেল। আর থাকিতে পারিল না; কাতর স্বরে কহিল, "আমি চলিয়া যাইতেছি, তুমি শোও!"

মহেন্দ্র তাহার কিছুই উত্তর না দিয়া অন্যমনে চলিয়া গেল।

ধীরে ধীরে বাতায়নে গিয়া বসিল। তখন মেঘমুক্ত চতুর্থীর চন্দ্রমা জ্যোৎস্না বিকীর্ণ করিতেছেন। বাতায়নের নিম্নে পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর ধারের পরস্পরসংলগ্ন অন্ধকার নারিকেলকুঞ্জের মস্তকে অস্ফুট জ্যোৎস্নার রজতরেখা পড়িয়াছে। অস্ফুট জ্যোৎস্নায় পুষ্করিণীতীরের ছায়াময় অন্ধকার গম্ভীরতর দেখাইতেছে। জ্যোৎস্নাময় গ্রাম যতদূর দেখা যাইতেছে, এমন শান্ত, এমন পবিত্র, এমন ঘুমন্ত যে মনে হয় এখানে পাপ তাপ নাই, দুঃখ যন্ত্রণা নাই— এক স্নেহহাস্যময় জননীর কোলে যেন কতকগুলি শিশু এক সঙ্গে ঘুমাইয়া রহিয়াছে। মহেন্দ্রের মন ঘোর উদাস হইয়া গিয়াছে। সে ভাবিল 'সকলেই কেমন ঘুমাইতেছে, কাহারো কোনো দুঃখ নাই, কষ্ট নাই। কাল সকালে আবার নিশ্চিন্তভাবে উঠিবে, আপনার আপনার কাজকর্ম করিবে। কেহ এমন কাজ করে নাই যাহাতে পৃথিবী বিদীর্ণ হইলে সে মুখ লুকাইয়া বাঁচে, এমন কাজ করে নাই যাহাতে প্রতি মুহূর্তে তীব্রতম অনুতাপে তাহার মর্মে মর্মে শেল বিদ্ধ হয়। আমিও যদি এইরূপ নিশ্চিন্তভাবে ঘুমাইতে পারিতাম, নিশ্চিন্তভাবে জাগিতে পারিতাম! আমার যদি মনের মতো বিবাহ হইত, গৃহস্থের মতো বিনা দুঃখে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে পারিতাম, স্ত্রীকে কত ভালোবাসিতাম, সংসারের কত উপকার করিতাম! কেমন সহজে দিনের পর রাত্রি, রাত্রের পর দিন কাটিয়া যাইত, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ও সমস্ত দিন ঘুমাইয়া এই বিরক্তিময় জীবন বহন করিতে হইত না। আহা— কেমন

জ্যোৎস্না, কেমন রাত্রি, কেমন পৃথিবী! আঁধার নারিকেলবৃক্ষগুলি মাথায় একটু একটু জ্যোৎস্না মাখিয়া অত্যন্ত গম্ভীরভাবে পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিয়া আছে; যেন তাহাদের বুকের ভিতর কী একটি কথা লুকানো রহিয়াছে। তাহাদের আঁধার ছায়া আঁধার পুষ্করিণীর জলের মধ্যে নিদ্রিত।'

মহেন্দ্র কতক্ষণ দেখিতে লাগিল, দেখিয়া দেখিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল— 'আমার ভাগ্যে পৃথিবী ভালো করিয়া ভোগ করা হইল না।'

মহেন্দ্র সেই রাত্রেই গৃহত্যাগ করিতে মনস্থ করিল, ভাবিল পৃথিবীতে যাহাকে ভালোবাসিয়াছে সকলকেই ভুলিয়া যাইবে। ভাবিল সে এ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো উপকার করিতে পারে নাই, কিন্তু এখন হইতে পরোপকারের জন্য তাহার স্বাধীন জীবন উৎসর্গ করিবে। কিন্তু গৃহে রজনীকে একাকিনী ফেলিয়া গেলে সে নিরপরাধিনী যে কষ্ট পাইবে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কিসে হইবে। এ কথা ভাবিলে অনেকক্ষণ ভাবা যাইত, কিন্তু মহেন্দ্রের ভাবিতে ইচ্ছা হইল না— ভাবিল না।

মহেন্দ্র তাহার নিজ দোষের যত-কিছু অপবাদ-যন্ত্রণা সমুদয় অভাগিনী রজনীকে সহিতে দিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল। বায়ু স্তম্ভিত, গ্রামপথ আঁধার করিয়া দুই ধারে বৃক্ষশ্রেণী স্তব্ধ-গম্ভীর-বিষণ্ণভাবে দাঁড়াইয়া আছে। সেই আঁধার পথ দিয়া ঝটিকাময়ী নিশীথিনীতে বায়ুতাড়িত ক্ষুদ্র একখানি মেঘখণ্ডের ন্যায় মহেন্দ্র যে দিকে ইচ্ছা চলিতে লাগিলেন।

রজনী ভাবিল যে, সে কাছে আসাতেই বুঝি মহেন্দ্র অন্যত্র চলিয়া গেল। বাতায়নে বসিয়া জ্যোৎস্নাসুপ্ত পুষ্করিণীর জলের পানে চাহিয়া চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

করুণা ভাবে এ কী দায় হইল, নরেন্দ্র বাড়ি ফিরিয়া আসে না কেন। অধীর হইয়া বাড়ির পুরাতন চাকরানী ভবির কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, নরেন্দ্র কেন আসিতেছেন না। সে হাসিয়া কহিল, সে তাহার কী জানে।

করুণা কহিল, "না, তুই জানিস।"

ভবি কহিল, "ওমা, আমি কী করিয়া বলিব।"

করুণা কোনো কথায় কর্ণপাত করিল না। ভবির বলিতেই হইবে নরেন্দ্র কেন আসিতেছে না। কিন্তু অনেক পীড়াপীড়িতেও ভবির কাছে বিশেষ কোনো উত্তর

পাইল না। করুণা অতিশয় বিরক্ত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল ও প্রতিজ্ঞা করিল যে, যদি মঙ্গলবারের মধ্যে নরেন্দ্র না আসেন তবে তাহার যতগুলি পুতুল আছে সব জলে ফেলিয়া দিবে। ভবি বুঝাইয়া দিল যে, পুতুল ভাঙিয়া ফেলিলেই যে নরেন্দ্রের আসিবার বিশেষ কোনো সুবিধা হইবে তাহা নহে, কিন্তু তাহার কথা শুনে কে। না আসিলে ভাঙিয়া ফেলিবেই ফেলিবে।

বাস্তবিক নরেন্দ্র অনেক দিন দেশে আসে নাই। কিন্তু পাড়ার লোকেরা বাঁচিয়াছে, কারণ আজকাল নরেন্দ্র যখনই দেশে আসে তখনই গোটা দুই-তিন কুকুর এবং তদপেক্ষা বিরক্তিজনক গোটা দুই-চার সঙ্গী তাহার সঙ্গে থাকে। তাহারা দুই-তিন দিনের মধ্যে পাড়াসুদ্ধ বিব্রত করিয়া তুলে। আমাদের পণ্ডিতমহাশয় এই কুকুরগুলা দেখিলে বড়োই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেন।

যাহা হউক, পণ্ডিতমহাশয়ের বিবাহের কথাটা লইয়া পাড়ায় বড়ো হাসিতামাসা চলিতেছে। কিন্তু ভট্টাচার্যমহাশয় বিশ বাইশ ছিলিম তামাকের ধুঁয়ায়, গোটাকতক নস্যের টিপে এবং নবগৃহিণীর অভিমানকুঞ্চিত ভ্রূমেঘনিক্ষিপ্ত দুই-একটি বিদ্যুতালোকের আঘাতে সকল কথা তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দেন। নিধিরাম ব্যতীত পণ্ডিতমহাশয়কে বাটী হইতে কেহ বাহির করিতে পারিত না। পণ্ডিতমহাশয় আজকাল একখানি দর্পণ ক্রয় করিয়াছেন, চশমাটি সোনা দিয়া বাঁধাইয়াছেন, দূরদেশ হইতে শুভ্রশুভ্র উপবীত আনয়ন করিয়াছেন। তাঁহার পত্নী কাত্যায়নী পাড়ার মেয়েদের কাছে গল্প করিয়াছে যে, মিন্‌সা নাকি আজকাল মৃদু হাসি হাসিয়া উদরে হাত বুলাইতে বুলাইতে রসিকতা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করেন। কিন্তু পণ্ডিতমশায়ের নামে পূর্বে কখনো এরূপ কথা উঠে নাই। আমরা পণ্ডিতমহাশয়ের রসিকতার যে দুই-একটা নিদর্শন পাইয়াছি তাহার মর্মার্থ বুঝা আমাদের সাধ্য নহে। তাহার মধ্যে প্রকৃতি, পুরুষ, মহৎ, অহংকার, প্রমা, অবিদ্যা, রজ্জুতে সর্পভ্রম, পর্বতোবহ্নিমান ধূমাৎ ইত্যাদি নানাবিধ দার্শনিক হাঙ্গামা আছে। পণ্ডিতমহাশয়ের বেদান্তসূত্র ও সাংখ্যের উপর মাকড়সায় জাল বিস্তার করিয়াছে, আজকাল জয়দেবের গীতগোবিন্দ লইয়া পণ্ডিত-মহাশয় ভাবে ভরপুর হইয়া আছেন। এই তো গেল পণ্ডিতমহাশয়ের অবস্থা।

আর আমাদের কাত্যায়নী ঠাকুরানীটি দিন কতক আসিয়াই পাড়ার মেয়েমহল একেবারে সরগরম করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার মতো গল্পগুজব করিতে পাড়ায় আর কাহারো সামর্থ্য নাই। হাত-পা নাড়িয়া চোখ-মুখ ঘুরাইয়া চতুর্দশ ভুবনের সংবাদ দিতেন। একজন তাঁহার নিকট কলিকাতা শহরটা কী প্রকার তাহারই সংবাদ লইতে গিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে বুঝাইয়া দেন যে, সেখানে বড়ো বড়ো মাঠ, সাহেবরা

চাষ করে, রাস্তার দু ধার সিপাহি শাস্ত্রির গোরার পাহারা, ঘরে ঘরে গোরু কাটে ইত্যাদি। আরো অনেক সংবাদ দিয়াছিলেন, সকল কথা আমার মনেও নাই। কাত্যায়নীর পতিভক্তি অতিরিক্ত ছিল এবং এই পতিভক্তি-সংক্রান্ত নিন্দার কথা তাঁহার কাছে যত শুনিতে পাইব এমন আর কাহারো কাছে নয়। পাড়ার সকল মেয়ের নাড়ীনক্ষত্র পর্যন্ত অবগত ছিলেন। তাঁহার আর-একটি স্বভাব ছিল যে, তিনি ঘণ্টায় ঘণ্টায় সকলকে মনে করাইয়া দিতেন যে, মিছামিছি পরের চর্চা তাঁর কোনোমতে ভালো লাগে না আর বিন্দু, হারার মা ও বোসেদের বাড়ির বড়োবউ যেমন বিশ্বনিন্দুক এমন আর কেহ নয়। কিন্তু তাহাও বলি, কাত্যায়নী ঠাকুরানীকে দেখিতে মন্দ ছিল না— তবে চলিবার, বলিবার, চাহিবার ভাবগুলি কেমন এক প্রকারের। তা হউক গে, অমন এক-একজনের স্বাভাবিক হইয়া থাকে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্রের অনেকগুলি দোষ জুটিয়াছে সত্য, কিন্তু করুণাকে সে-সকল কথা কে বলে বলো দেখি। সে বেচারি কেমন বিশ্বস্তচিত্তে স্বপ্ন দেখিতেছে, তাহার সে স্বপ্ন ভাঙাইবার প্রয়োজন কী। কিন্তু সে অত শত বুঝেও না, অত কথায় কানও দেয় না। কিন্তু রাত দিন শুনিতে শুনিতে দুই-একটা কথা মনে লাগিয়া যায় বৈকি। করুণার অমন প্রফুল্ল মুখ, সেও দুই-একবার মলিন হইয়া যায়— নয় তো কী! কিন্তু নরেন্দ্রকে পাইলেই সে সকল কথা ভুলিয়া যায়, জিজ্ঞাসা করিতে মনেই থাকে না, অবসরই পায় না। তাহার অন্যান্য এত কথা কহিবার আছে যে, তাহাই ফুরাইয়া উঠিতে পারে না, তো, অন্য কথা! কিন্তু করুণার এ ভাব আর অধিক দিন থাকিবে না তাহা বলিয়া রাখিতেছি। নরেন্দ্র যেরূপ অন্যায় আরম্ভ করিয়াছে তাহা আর বলিবার নহে। নরেন্দ্র এখন আর কলিকাতায় বড়ো একটা যাতায়াত করে না। করুণাকে ভালোবাসিয়া যে যায় না, সে ভ্রম যেন কাহারো না হয়। কলিকাতায় সে যথেষ্ট ঋণ করিয়াছে, পাওনাদারদের ভয়ে সে কলিকাতা ছাড়িয়া পলাইয়াছে।

দিনে দিনে করুণার মুখ মলিন হইয়া আসিতেছে। নরেন্দ্র যখন কলিকাতায় থাকিত, ছিল ভালো। চব্বিশ ঘণ্টা চোখের সামনে থাকিলে কাহাকেই বা না চিনা যায়? নরেন্দ্রের স্বভাব করুণার নিকট ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল। করুণার কিছুই তাহার ভালো লাগিত না। সর্বদাই খিট্‌খিট্‌ সর্বদাই বিরক্ত। এক মুহূর্তও ভালো মুখে কথা কহিতে জানে না— অধীরা করুণা যখন হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া তাহার

নিকট আসে, তখন সে সহসা এমন বিরক্ত হইয়া উঠে যে করুণার মন একেবারে দমিয়া যায়। নরেন্দ্র সর্বদাই এমন রুষ্ট থাকে যে করুণা তাহাকে সকল কথা বলিতে সাহস করে না, সকল সময় তাহার কাছে যাইতে ভয় করে, পাছে সে বিরক্ত হইয়া তিরস্কার করিয়া উঠে। তদ্ভিন্ন সন্ধ্যাবেলা তাহার নিকট কাহারো ঘেঁষিবার জো ছিল না, সে মাতাল হইয়া যাহা ইচ্ছা তাই করিত। যাহা হউক, করুণার মুখ দিনে দিনে মলিন হইয়া আসিতে লাগিল। অলীক কল্পনা বা সামান্য অভিমান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে করুণার চক্ষে প্রায় জল দেখি নাই— এইবার ঐ অভাগিনী আন্তরিক মনের কষ্টে কাঁদিল। ছেলেবেলা হইতেই সে কখনো অনাদর উপেক্ষা সহ্য করে নাই, আজ আদর করিয়া তাহার অভিমানের অশ্রু মুছাইবার আর কেহই নাই। অভিমানের প্রতিদানে তাহাকে এখন বিরক্তি সহ্য করিতে হয়। যাহা হউক, করুণা আর বড়ো একটা খেলা করে না, বেড়ায় না, সেই পাখিটি লইয়া অন্তঃপুরের বাগানে বসিয়া থাকে। নরেন্দ্র মাঝে মাঝে কলিকাতায় গেলে দেখিয়াছি এক-একদিন করুণা সমস্ত জ্যোৎস্নারাত্রি বাগানের সেই বাঁধা ঘাটটির উপরে শুইয়া আছে, কত কী ভাবিতেছে জানি না— ক্রমে তাহার নিদ্রাহীন নেত্রের সম্মুখ দিয়া সমস্ত রাত্রি প্রভাত হইয়া গিয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্র যেমন অর্থ ব্যয় করিতে লাগিল, তেমনি ঋণও সঞ্চয় করিতে লাগিল। সে নিজে এক পয়সাও সঞ্চয় করিতে পারে নাই, টাকার উপর তাহার তেমন মায়াও জন্মে নাই, তবে এক— পরিবারের মুখ চাহিয়া লোকে অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা করে, তা নরেন্দ্রের সে-সকল খেয়ালই আসে নাই। একটু-আধটু করিয়া যথেষ্ট ঋণ সঞ্চিত হইল। অবশেষে এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ঘর হইতে দুটা-একটা জিনিস বন্ধক রাখিবার প্রয়োজন হইল।

করুণার শরীর অসুস্থ হইয়াছে। অনর্থক কতকগুলা অনিয়ম করিয়া তাহার পীড়া উপস্থিত হইয়াছে। নরেন্দ্র কহিল সে দিবারাত্র এক পীড়া লইয়া লাগিয়া থাকিতে পারে না; তাই বিরক্ত হইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল। এ দিকে করুণার তত্ত্বাবধান করে কে তাহার ঠিক নাই; পণ্ডিতমহাশয় যথাসাধ্য করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতেই বা কী হইবে। করুণা কোনো প্রকার ঔষধ খাইতে চায় না, কোনো নিয়ম পালন করে না। করুণার পীড়া বিলক্ষণ বাড়িয়া উঠিল; পণ্ডিতমহাশয় মহা বিব্রত

হইয়া নরেন্দ্রকে আসিবার জন্য এক চিঠি লিখিলেন। নরেন্দ্র আসিল, কিন্তু করুণার পীড়াবৃদ্ধির সংবাদ পাইয়া নয়, কলিকাতায় গিয়া তাহার এত ঋণবৃদ্ধি হইয়াছে যে চারি দিক হইতে পাওনাদারেরা তাহার নামে নালিশ আরম্ভ করিয়াছে, গতিক ভালো নয় দেখিয়া নরেন্দ্র সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

নরেন্দ্রের এবার কিছু ভয় হইয়াছে, দেশে ফিরিয়া আসিয়া ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া আছে। এবং মদের পাত্রের মধ্যে মনের সমুদয় আশঙ্কা ডুবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। আর কাহারো সঙ্গে দেখা করে নাই, কথা কহে নাই, তাহার সে ঘরটিতে কাহারো প্রবেশ করিবার জো নাই। নরেন্দ্র যেরূপ রুষ্ট ও যেরূপ কথায় কথায় বিরক্ত হইয়া উঠিতেছে, চাকর-বাকরেরা তাহার কাছে ঘেঁষিতেও সাহস করে না। পীড়িতা করুণা খাতাদি গুছাইয়া ধীরে ধীরে সে ঘরে প্রবেশ করিল; নরেন্দ্র মহা রুক্ষ হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, কে তাহাকে সে ঘরে আসিতে কহিল। এ কথার উত্তর আর কী হইতে পারে। তাহার পরে পিশাচ যাহা করিল তাহা কল্পনা করিতেও কষ্ট বোধ হয়— পীড়িতা করুণাকে এমন নিষ্ঠুর পদাঘাত করে যে, সে সেইখানেই মূর্ছিত হইয়া পড়িল। নরেন্দ্র সে ঘর হইতে অন্যত্র চলিয়া গেল।

অল্প দিনের মধ্যে করুণার এমন আকার পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে যে, তাহাকে দেখিলে সহসা চিনিতে পারা যায় না। তাহার সে শীর্ণ বিবর্ণ বিষণ্ণ মুখখানি দেখিলে এমন মায়া হয় যে, কী বলিব! নরেন্দ্র এবার তাহার উপর যত দূর অত্যাচার করিবার তাহা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সরলা সমস্তই নীরবে সহ্য করিতেছে, একটি কথা কহে নাই, নরেন্দ্রের নিকটে এক মুহূর্তের জন্য রোদনও করে নাই। একদিন কেবল অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া অনেক ক্ষণ নরেন্দ্রের মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আমি তোমার কী করিয়াছি।"

নরেন্দ্র তাহার উত্তর না দিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়।

দশম পরিচ্ছেদ

একবার ঋণের আবর্ত মধ্যে পড়িলে আর রক্ষা নাই। যখনই কেহ নালিশের ভয় দেখাইত, নরেন্দ্র তখনই তাড়াতাড়ি অন্যের নিকট হইতে অপরিমিত সুদে ঋণ করিয়া পরিশোধ করিত। এইরূপে আসল অপেক্ষা সুদ বাড়িয়া উঠিল। নরেন্দ্র এবার অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িল। নালিশ দায়ের হইল, সমনও বাহির হইল। একদিন প্রাতঃকালে শুভ মুহূর্তে নরেন্দ্রের নিদ্রা ভঙ্গ হইল ও ধীরে ধীরে শ্রীঘরে বাস করিতে চলিলেন।

বেচারি করুণা না খাওয়া, না দাওয়া, কাঁদিয়া-কাটিয়া একাকার করিয়া দিল। কী করিতে হয় কিছুই জানে না, অধীর হইয়া বেড়াইতে লাগিল। পণ্ডিতমহাশয় এ কুসংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কী করিতে হইবে সে বিষয়ে তাঁর করুণা অপেক্ষা অধিক জানিবার কথা নহে। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া নিধিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন; নিধি জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া ধার শুধিতে পরামর্শ দিল। এখন বিক্রয় করে কে। সে স্বয়ং তাহার ভার লইল। করুণার অলংকার অল্পই ছিল— পূর্বেই নরেন্দ্র তাহার অধিকাংশ বন্ধক দিয়াছে ও বিক্রয় করিয়াছে, যাহা-কিছু অবশিষ্ট ছিল সমস্ত আনিয়া দিল। নিধি সেই সমুদয় অলংকার ও অন্যান্য গার্হস্থ্য দ্রব্য অধিকাংশ নিজে যৎসামান্য মূল্যে, কোনো কোনোটা বা বিনা মূল্যেই গ্রহণ করিল ও অবশিষ্ট বিক্রয় করিল। পণ্ডিতমহাশয় তো কাঁদিতে বসিলেন, ভয়ে কষ্টে করুণা অধীর হইয়া উঠিল। বিক্রয় করিয়া যাহা-কিছু পাওয়া গেল তাহাতে পণ্ডিতমহাশয় নিজের সঞ্চিত অর্থের অধিকাংশ দিয়া দেয়-অর্থ কোনো প্রকারে পূরণ করিয়া দিলেন। নরেন্দ্র কারাগার হইতে মুক্ত হইল, কিন্তু ঋণ হইতে মুক্ত হইল না। তদ্‌ভিন্ন এই ঘটনায় তাহার কিছুমাত্র শিক্ষাও হইল না। যেরকম করিয়াই হউক-না কেন, এখন মদ নহিলে তাহার আর চলে না। করুণার প্রতি কিছুমাত্র সদয় হয় নাই, করুণা গার্হস্থ্য দ্রব্যাদি কেন অমন করিয়া বিক্রয় করিল তাহাই লইয়া নরেন্দ্র করুণাকে যথেষ্ট পীড়ন করিয়াছে।

গদাধর ও স্বরূপ এখানে আসিয়াও জুটিয়াছে। সেবারকার প্রহারের পরও গদাধরের অন্তঃপুরসংস্কার প্রিয়তা কিছুমাত্র কমে নাই, বরং বৃদ্ধি পাইয়াছে। যেখানেই যাউক-না কেন সেখানেই তাহার ঐ চিন্তা, নরেন্দ্রের দেশেও তাঁহার সেই উদ্দেশ্যেই আগমন। ইচ্ছা আছে এখানেও দুই-একটি সৎ উদাহরণ রাখিয়া যাইবেন। পূর্ব-পরিচিত বন্ধুদের পাইয়া নরেন্দ্র বিলক্ষণ আমোদ করিতে লাগিলেন। স্বরূপ ও গদাধরের নিকট আরো অনেক ঋণ করিলেন। তাহারা জানিত না যে নরেন্দ্র লক্ষ্মী-ভ্রষ্ট হইয়াছে, সুতরাং বিশ্বস্তচিত্তে কিঞ্চিৎ সুদের আশা করিয়া ধার দিল।

গদাধরের হস্তে এইবার একটি কাজ পড়িয়াছে। নরেন্দ্রের মুখে সে কাত্যায়নী ঠাকুরানীর সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিতে পাইয়াছে, শুনিয়া সে মহা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে এত বয়সের তারতম্য কোনো হৃদয়সম্পন্ন মনুষ্য সহ্য করিতে পারে না— বিশেষত সমাজসংস্কারই যাহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, হৃদয়ের প্রধান আশা, অবকাশের প্রধান ভাবনা, কার্যক্ষেত্রের প্রধান কার্য, তাহারা সমাজের এ-সকল অন্যায় অবিচার কোনোমতেই সহ্য করিতে পারে না। ইহা সংশোধনের জন্য, এ প্রকার অন্যায়রূপে বিবাহিত স্ত্রীলোকদিগের কষ্ট নিবারণের জন্য সংস্কারকদিগের সকল

প্রকার ত্যাগ স্বীকার করা কর্তব্য, এবং আমাদের কাত্যায়নী দেবীর উদ্ধারের জন্য গদাধর সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতেই প্রস্তুত আছেন। আর, যখন স্বরূপবাবু তাঁহার ক্ষুদ্র কবিতাবলী পুস্তকাকারে মুদ্রিত করেন, তাহার মধ্যে 'রাহুগ্রাসে চন্দ্র' নামে একটি কবিতা পাঠ করিয়াছিলাম। তাহাতে, যে বিধাতা কুসুমে কীট, চন্দ্রে কলঙ্ক, কোকিলে কুরূপ দিয়াছেন, তাঁহাকে যথেষ্ট নিন্দা করিয়া একটি বিবাহবর্ণনা লিখিত ছিল; আমরা গোপনে সন্ধান লইয়া শুনিয়াছিলাম যে, তাহা কাত্যায়নী ঠাকুরানীকেই লক্ষ্য করিয়া লিখিত হয়। অনেক সমালোচক নাকি তাহাতে অশ্রুসম্বরণ করিতে পারেন নাই।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সমস্ত দিন মেঘ-মেঘ করিয়া আছে, বিন্দু-বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছে, বাদলার আর্দ্র বাতাস বহিতেছে। আজ করুণা মন্দিরে মহাদেবের পূজা করিতে গিয়াছে। কাঁদিয়া-কাটিয়া প্রার্থনা করিল— যেন তাহাকে আর অধিক দিন এরূপ কষ্টভোগ করিতে না হয়; এবার তাহার যে সন্তান হইবে সে যেন পুত্র হয়, কন্যা না হয়; নারীজন্মের যন্ত্রণা যেন আর কেহ ভোগ না করে। করুণা প্রার্থনা করিল— তাহার মরণ হউক, তাহা হইলে নরেন্দ্র স্বেচ্ছামতে অকণ্টকে সুখ ভোগ করিতে পাইবে।

এই দুঃখের সময় নরেন্দ্রের এক পুত্র জন্মিল। অর্থের অনটনে সমস্ত খরচপত্র চলিবে কী করিয়া তাহার ঠিক নাই। নরেন্দ্রের পূর্বকার চাল কিছুমাত্র বিগড়ায় নাই। সেই সন্ধ্যাকালে গদাধর ও স্বরূপের সহিত বসিয়া তেমনি মদটি খাওয়া আছে— তেমনি ঘড়িটি, ঘড়ির চেনটি, ফিন্‌ফিনে ধুতিটি, এসেন্সটুকু, আতরটুকু, সমস্তই আছে— কেবল নাই অর্থ। করুণার গার্হস্থ্যপটুতা কিছুমাত্র নাই; তাহার সকলই উল্টাপাল্টা, গোলমাল। গুছাইয়া কী করিয়া খরচপত্র করিতে হয় তাহার কিছুই জানে না, হিসাব-পত্রের কোনো সম্পর্কই নাই, কী করিতে যে কী করে তাহার ঠিক নাই। করুণা যে কী গোলে পড়িয়াছে তাহা সেই জানে। নরেন্দ্র তাহাকে কোনো সাহায্য করে না, কেবল মাঝে মাঝে গালাগালি দেয় মাত্র— নিজে যে কী দরকার, কী অদরকার, কী করিতে হইবে, কী না করিতে হইবে, তাহার কিছুই ভাবিয়া পায় না। করুণা রাত দিন ছেলেটি লইয়া থাকে বটে, কিন্তু কী করিয়া সন্তান পালন করিতে হয় তাহার কিছু যদি জানে।

ভবি বলিয়া বাড়ির যে পুরাতন দাসী ছিল সে করুণার এই দুর্দশায় বড়ো কষ্ট পাইতেছে। করুণাকে সে নিজহস্তে মানুষ করিয়াছে, এই জন্য তাহাকে সে অত্যন্ত

ভালোবাসে। নরেন্দ্রের অন্যায়াচরণ দেখিয়া সে মাঝে মাঝে নরেন্দ্রকে খুব মুখনাড়া দিয়া আসিত, হাত মুখ নাড়িয়া যাহা না বলিবার তাহা বলিয়া আসিত। নরেন্দ্র মহা রুষ্ট হইয়া কহিত, "তুই বাড়ি হইতে দূর হইয়া যা!"

সে কহিত, "তোমার মতো পিশাচের হস্তে করুণাকে সমর্পণ করিয়া কোন্ প্রাণে চলিয়া যাই?"

অবশেষে নরেন্দ্র উঠিয়া দুই-চারিটি পদাঘাত করিলে পরে সে গর্ গর্ করিয়া বকিতে বকিতে কখনো বা কাঁদিতে কাঁদিতে সেখান হইতে চলিয়া যাইত।

ভবিই বাড়ির গিন্নি, সেই বাড়ির সমস্ত কাজকর্ম করিত, করুণাকে কোনো কাজ করিতে দিত না। করুণার এই অসময়ে সে যাহা করিবার তাহা করিয়াছে। ভবির আর কেহ ছিল না। যাহা-কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল, সমস্ত করুণার জন্য ব্যয় করিত। করুণা যখন একলা পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিত তখন সে তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিত। করুণাও ভবিকে বড়ো ভালোবাসিত; যখন মনের কষ্টের উচ্ছ্বাস চাপিয়া রাখিতে পারিত না, তখন দুই হস্তে ভবির গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া এমন কাঁদিয়া উঠিত যে, ভবিও আর অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিত না, সে শিশুর মতো কাঁদিয়া একাকার করিয়া দিত। ভবি না থাকিলে করুণা ও নরেন্দ্রের কী হইত বলিতে পারি না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

স্বরূপবাবু কহেন যে, পৃথিবী তাঁহাকে ক্রমাগতই জ্বালাতন করিয়া আসিয়াছে, এই নিমিত্ত মানুষকে তিনি পিশাচ জ্ঞান করেন। কিন্তু আমরা যতদূর জানি তাহাতে তিনিই দেশের লোককে জ্বালাতন করিয়া আসিতেছেন। তিনি যাহার সহিত কোনো সংশ্রবে আসিয়াছেন তাহাকেই অবশেষে এমন গোলে ফেলিয়াছেন যে, কী বলিব।

স্বরূপবাবু সর্বদা এমন কবিত্বচিন্তায় মগ্ন থাকেন যে, অনেক ডাকাডাকিতেও তাঁহার উত্তর পাওয়া যায় না ও সহসা 'অ্যাঁ' বলিয়া চমকিয়া উঠেন। হয়তো অনেক সময়ে কোনো পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া আছেন, অথচ যে সম্মুখে পশ্চাতে পার্শ্বে মানুষ আছে তাহা টেরও পান নাই, অথবা যাহারা দাঁড়াইয়া আছে তাহারা টের পায় নাই যে তিনি টের পাইতেছেন। ঘরে বসিয়া আছেন এমন সময়ে হয়তো থাকিয়া থাকিয়া বাহিরে চলিয়া যান। জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, জানালার ভিতর দিয়া তিনি এক খণ্ড মেঘ দেখিতে পাইয়াছিলেন, তেমন সুন্দর মেঘ

কখনো দেখেন নাই। কখনো কখনো তিনি যেখানে বসিয়া থাকেন, ভুলিয়া দুই-এক খণ্ড তাঁহার কবিতা-লিখা কাগজ ফেলিয়া যান, নিকটস্থ কেহ সে কাগজ তাঁহার হাতে তুলিয়া দিলে তিনি 'ও ! এ কিছুই নহে' বলিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলেন। বোধ হয় তাঁহার কাছে তাহার আর একখানা নকল থাকে। কিন্তু লোকে বলে যে, না, অনেক বড়ো বড়ো কবির ঐরূপ অভ্যাস আছে। মনের ভুল এমন আর কাহারো দেখি নাই। কাগজপত্র কোথায় যে কী ফেলেন তাহার ঠিক নাই, এইরূপ কাগজপত্র যে কত হারাইয়া ফেলিয়াছেন তাহা কে বলিতে পারে! কিন্তু সুখের বিষয়, ঘড়ি টাকা বা অন্য কোনো বহুমূল্য দ্রব্য কখনো হারান নাই। স্বরূপবাবুর আর-একটি রোগ আছে, তিনি যে-কোনো কবিতা লিখেন তাহার উপরে বন্ধনীচিহ্নের মধ্যে 'বিজন কাননে' বা 'গভীর নিশীথে লিখিত' বলিয়া লিখা থাকে। কিন্তু আমি বেশ জানি যে, তাহা তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্তানগণ -দ্বারা পরিবৃত গৃহে দিবা দ্বিপ্রহরের সময় লিখিত হইয়াছে। যাহা হউক, আমাদের স্বরূপবাবু বড়ো প্রেমিক ব্যক্তি। তিনি যত শীঘ্র প্রেমে বাঁধা পড়েন এত আর কেহ নয় ; ইহাতে তিনিও কষ্ট পান আর অনেককেই কষ্ট দেন।

স্বরূপবাবু দিবারাত্রি নরেন্দ্রের বাড়িতে আছেন। মাঝে মাঝে আড়ালে-আবডালে করুণাকে দেখিতে পান, কিন্তু তাহাতে বড়ো গোলযোগ বাধিয়াছে। তাঁহার মন অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছে, ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতেছে ও রাত্রে ঘুম হইতেছে না। তিনি ঘোর উনবিংশ শতাব্দীতে জন্মিয়াছেন— সুতরাং এখন তাঁহাকে কোকিলেও ঠোকরায় না, চন্দ্রকিরণও দগ্ধ করে না বটে, কিন্তু হইলে হয় কী— পৃথিবী তাঁহার চক্ষে অরণ্য, শ্মশান হইয়া গিয়াছে। ফুল শুকাইতেছে আবার ফুটিতেছে, সূর্য অস্ত যাইতেছে আবার উঠিতেছে, দিবস আসিতেছে ও যাইতেছে, মানুষ শুইতেছে ও যাইতেছে, সকলই যেমন ছিল তেমনি আছে, কিন্তু হায়! তাঁহার হৃদয়ে আর শান্তি নাই, দেহে বল নাই, নয়নে নিদ্রা নাই, হৃদয়ে সুখ নাই— এক কথায়, যাহাতে যাহা ছিল তাহাতে আর তাহা নাই! স্বরূপ কতকগুলি কবিতা লিখিয়া ফেলিল, তাহাতে যাহা লিখিবার সমস্তই লিখিল। তাহাতে ইঙ্গিতে করুণার নাম পর্যন্ত গাঁথিয়া দিল। এবং সমস্ত ঠিক্‌ঠাক্ করিয়া মধ্যস্থ-নামক কাগজে পাঠাইয়া দিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

নিধি নরেন্দ্রের বাড়িতে মাঝে মাঝে আইসে। কিন্তু আমরা যে ঘটনার সূত্র অবলম্বন করিয়া আসিতেছি সে সূত্রের মধ্যে কখনো পড়ে নাই, এইবার পড়িয়াছে। স্বরূপবাবু তাঁহার অভ্যাসানুসারে ইচ্ছাপূর্বক বা দৈবক্রমেই হউক, এক খণ্ড কাগজ ঘরে

ফেলিয়া গিয়াছেন, নিধি সে কাগজটি কুড়াইয়া পাইয়াছে। সে কাগজটিতে গুটিদুয়েক কবিতা লিখা আছে। অন্য লোক হইলে সে কবিতাগুলির সরল অর্থটি বুঝিয়া পড়িত ও নিশ্চিন্ত থাকিত, কিন্তু বুদ্ধিমান নিধি সেরূপ লোকই নহে। যদি বা তাহার কোনো গূঢ় অর্থ না থাকিত তথাপি নিধি তাহা বাহির করিতে পারিত। তবু ইহাতে তো কিছু ছিল। নিধির সে কবিতাগুলি বড়ো ভালো ঠেকিল না। ট্যাঁকে গুঁজিয়া রাখিল ও ভাবিল ইহার নিগূঢ় তাহাকে জানিতে হইবে। অমন বুদ্ধিমান লোকের কাছে কিছুই ঢাকা থাকে না, ইঙ্গিতে সকলই বুঝিয়া লইল। চতুরতাভিমানী লোকেরা নিজবুদ্ধির উপর অসন্দিগ্ধরূপে নির্ভর করিয়া এক-এক সময়ে যেমন সর্বনাশ ঘটায়, এমন আর কেহই নহে।

'দিদি, কেমন আছ দেখিতে আসিয়াছি' বলিয়া নিধি করুণার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। নিধি ছেলেবেলা হইতেই অনূপের অন্তঃপুরে যাইত ও করুণার মাকে মা বলিয়া ডাকিত। নিধি এখন মাঝে মাঝে প্রায়ই করুণা কেমন আছে দেখিতে আইসে। একদিন নরেন্দ্র কলিকাতায় গিয়াছে। নরেন্দ্র কবে কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিবে, করুণা স্বরূপবাবুর নিকট ভবিকে জানিয়া আসিতে কহিল। নিধি আড়াল হইতে শুনিতে পাইল, মনে মনে কহিল 'হুঁ হুঁ— বুঝিয়াছি, এত লোক থাকিতে স্বরূপবাবুকে জিজ্ঞাসা করিতে পাঠানো কেন! গদাধরবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেও তো চলিত।'

একদিন করুণা ভবিকে কী কথা বলিতেছিল, দূর হইতে নিধি শুনিতে পাইল না, কিন্তু মনে হইল করুণা যেন একবার 'স্বরূপবাবু' বলিয়াছিল— আর-একটি প্রমাণ জুটিল। আর একদিন নরেন্দ্র স্বরূপ ও গদাধর বাগানে বসিয়াছিল, করুণা সহসা জানালা দিয়া সেই দিক পানে চাহিয়া গেল, নিধি স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে করুণা স্বরূপেরই দিকে চাহিয়াছিল। নিধি এই তো তিনটি অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছে, ইহা অন্য লোকের নিকট যাহাই হউক কিন্তু নিধির নিকট ইহা সমস্তই পরিষ্কার প্রমাণ। শুদ্ধ ইহাই যথেষ্ট নহে, করুণা যে দিনে দিনে শীর্ণ বিবর্ণ হইয়া যাইতেছে, নিধি স্পষ্ট বুঝিতে পারিল তাহার কারণ আর কিছুই নয়— স্বরূপের ভাবনা।

এখন স্বরূপের নিকট কথা আদায় করিতে হইবে, এই ভাবিয়া নিধি ধীরে ধীরে তাহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। হঠাৎ গিয়া কহিল, "করুণা তো, ভাই, তোমার জন্য একেবারে পাগল।"

স্বরূপ একেবারে চমকিয়া উঠিল। আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কী করিয়া জানিলে।"

নিধি মনে মনে কহিল, 'হুঁ-হুঁ, আমি তোমাদের ভিতরকার কথা কী করিয়া সন্ধান পাইলাম ভাবিয়া ভয় পাইতেছ? পাইবে বৈকি, কিন্তু নিধিরামের কাছে কিছুই এড়াইতে পায় না।' কহিল, "জানিলাম, এক রকম করিয়া।"

বলিয়া চোখ টিপিতে টিপিতে চলিয়া গেল। তাহার পরদিন গিয়া আবার স্বরূপকে কহিল, "করুণার সহিত তুমি যে গোপনে গোপনে দেখাসাক্ষাৎ করিতেছ ইহা নরেন্দ্র যেন টের না পায়।"

স্বরূপ কহিল, "সেকি! করুণার সহিত একবারও তো আমার দেখাসাক্ষাৎ কথা-বার্তা হয় নাই।"

নিধি মনে মনে কহিল, 'নিশ্চয় দেখাসাক্ষাৎ হইয়াছিল, নহিলে এত করিয়া ভাঁড়াইবার চেষ্টা করিবে কেন।' ইহাও একটি প্রমাণ হইল, কিন্তু আবার স্বরূপ যদি বলিত যে 'হাঁ দেখাসাক্ষাৎ হইয়াছিল' তবে তাহাও একটি প্রমাণ হইত।

যাহা হউক, নিধির মনে আর সন্দেহ রহিল না। এমন একটি নিগূঢ় বার্তা নিধি আপনার বুদ্ধিকৌশলে জানিতে পারিয়াছে, এ কথা কি সে আর গোপনে রাখে। তাহার বুদ্ধির পরিচয় লোকে না পাইলে আর হইল কী। 'তুমি যাহা মনে করিতেছ তাহা নয়, আমি ভিতরকার কথা সকল জানি'— চতুরতাভিমানী লোকেরা ইহা বুঝাইতে পারিলে বড়োই সন্তুষ্ট হয়। নিধির কাছে যদি বল যে, 'রামহরিবাবু বড়ো সৎলোক' অমনি নিধি চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, 'কী বলিতেছ। কে সৎলোক। রামহরিবাবু? ও'— এমন করিয়া বলিবে যে তুমি মনে করিবে, এ বুঝি রামহরিবাবুর ভিতরকার কী একটা দোষ জানে। পীড়াপীড়ি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে কহিবে, 'সে অনেক কথা।' নিধি সম্প্রতি যে গুপ্ত খবর পাইয়াছে তাহা পরামর্শ দিবার ছলে নরেন্দ্রকে বলিবে, এইরূপ মনে মনে স্থির করিল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

কয়দিন ধরিয়া ছোটো ছেলেটির পীড়া হইয়াছে। তাহা হইবে না তো কী। কিছুরই তো নিয়ম নাই। করুণা ডাক্তার ডাকাইয়া আনিল, ডাক্তার আসিয়া কহিল পীড়া শক্ত হইয়াছে। করুণা তো দিন রাত্রি তাহাকে কোলে করিয়া বসিয়া রহিল। পীড়া বাড়িতে লাগিল, করুণা কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা হইল। গ্রামের নেটিব ডাক্তার কপালীচরণ-বাবু পীড়ার তত্ত্বাবধান করিতেছেন, তাঁহাকে কি দিবার সময় তিনি কহিলেন, 'থাক্, থাক্, পীড়া অগ্রে সারুক।' পণ্ডিতমহাশয় বুঝিলেন, নরেন্দ্রদের দুরবস্থা শুনিয়া দয়ার্দ্র

ডাক্তারটি বুঝি ফি লইতে রাজি নহেন। দুই বেলা তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিলেন, তিনিও অম্লানবদনে আসিলেন।

নরেন্দ্র এক্ষণে বাড়িতে নাই। ও পাড়ার পিতৃমাতৃহীন নাবালক জমিদারটি সম্প্রতি সাবালক হইয়া উঠিয়া জমিদারি হাতে লইয়াছেন, নরেন্দ্র তাঁহাকেই পাইয়া বসিয়াছেন। তাঁহারই স্কন্ধে চাপিয়া নরেন্দ্র দিব্য আরামে আমোদ করিতেছেন এবং গদাধর ও স্বরূপকে তাঁহারই হস্তে গচ্ছিত রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু গদাধর ও স্বরূপকে যে শীঘ্র তাঁহার স্কন্ধ হইতে নড়াইবেন, তাহার জো নাই— গদাধরের একটি উদ্দেশ্য আছে, স্বরূপেরও এক উদ্দেশ্য আছে।

ছেলেটির পীড়া অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। ডাক্তার ডাকিতে একজন লোক পাঠানো হইল। ডাক্তারটি তাহার হস্ত দিয়া, তাঁহার দু বেলার যাতায়াতের দরুন যাহা পাওনা আছে সমস্ত হিসাব সমেত এক বিল পাঠাইয়া দিলেন। ছেলেটি অবশ হইয়া পড়িয়াছে, করুণা তাহাকে কোলে করিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া আছে। সকল কর্মে নিপুণ নিধি মাঝে মাঝে তাহার নাড়ি দেখিতেছে, কহিল নাড়ি অতিশয় ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। আকুলহৃদয়ে সকলেই ডাক্তারের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে, এমন সময় বিল লইয়া সেই লোকটি ফিরিয়া আসিল। সকলেই সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'ডাক্তার কই?' সে সেই বিল হাজির করিল। সকলেই তো অবাক। মুখ চোখ শুকাইয়া পণ্ডিতমহাশয় তো ঘামিতে লাগিলেন; নিধির হাত ধরিয়া কহিলেন, "এখন উপায় কী।"

নিধি কহিল, "টাকার জোগাড় করা হউক।"

সহসা টাকা কোথায় পাওয়া যাইবে। এ দিকে পীড়ার অবস্থা ভালো নহে, যত কালবিলম্ব হয় ততই খারাপ হইবে। মহা গোলযোগ পড়িয়া গেল, করুণা বেচারি কাঁদিতে লাগিল। পণ্ডিতমহাশয় বিব্রত হইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন, হাতে যাহা-কিছু ছিল আনিলেন। কাত্যায়নী ঠাকুরানীটি টাকা বাহির করিয়া দিবার সময় অনেক আপত্তি করিয়াছিলেন। পণ্ডিতমহাশয় বিস্তর কাকুতি মিনতি করিয়া তবে টাকা বাহির করেন। ভবি তাহার শেষ সম্বল বাহির করিয়া দিল।

অনেক কষ্টে অবশেষে ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন রোগীর মুমূর্ষু অবস্থা। ডাক্তারটি অম্লান বদনে কহিলেন, "ছেলে বাঁচিবে না।"

এমন সময় টলিতে টলিতে নরেন্দ্র ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ঘরে ঢুকিয়া ঘরে যে কিসের গোলমাল কিছুই ভালো করিয়া বুঝিতে পারিল না। কিছুক্ষণ শূন্যনেত্রে পণ্ডিতমহাশয়ের দিকে চাহিয়া রহিল, অবশেষে কী বিড় বিড় করিয়া বকিয়া

পণ্ডিতমহাশয়কে জড়াইয়া ধরিয়া মারিতে আরম্ভ করিল— পণ্ডিতমহাশয়ও মহা গোলযোগে পড়িয়া গেলেন। ডাক্তার ছাড়াইতে গেলেন, তাঁহার হাতে এমন একটি কামড় দিল যে রক্ত পড়িতে লাগিল। এইরূপ গোলযোগ করিয়া সেইখানে শুইয়া পড়িল।

ক্রমে শিশুর মুখ নীল হইয়া আসিল। করুণা সমস্ত গোলমালে অর্ধ-হতজ্ঞান হইয়া বালিশে ঠেস দিয়া পড়িয়াছে। ক্রমে শিশুর মৃত্যু হইল, কিন্তু দুর্বল করুণা তখন একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

আহা, বিষণ্ণ করুণাকে দেখিলে এমন কষ্ট হয় যে, ইচ্ছা করে প্রাণ দিয়াও তাহার মনের যন্ত্রণা দূর করি। কতদিন তাহাকে আর হাসিতে দেখি নাই। ভালো করিয়া আহার করে না, স্নান করে না, ঘুমায় না ; মলিন, বিবর্ণ, ম্রিয়মাণ, শীর্ণ ; জ্যোতিহীন চক্ষু বসিয়া গিয়াছে ; মুখশ্রী এমন দীন করুণ হইয়া গিয়াছে যে, দেখিলে মনে হয় না যে এ বালিকা কখনো হাসিতে জানিত। ভবির হস্তে যাহা-কিছু অর্থ ছিল সমস্ত প্রায় ফুরাইয়া গিয়াছে, কী করিয়া সংসার চলিবে তাহার কিছুই ঠিক নাই। পণ্ডিতমহাশয়ের সাহায্যে কোনোমতে দিন চলিতেছে।

নিধি স্বরূপের উল্লেখ করিয়া নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, "সে বাবুটি কী করে বলিতে পারো।"

নরেন্দ্র। কেন বলো দেখি।

নিধি। ও লোকটিকে আমার তো বড়ো ভালো ঠেকে না।

নরেন্দ্র। কেন, কী হইয়াছে।

নিধি। না, কিছুই হয় নাই, তবে কিনা— সে কথা থাক্ — বাবুটির বাড়ি কোথায়।

নরেন্দ্র। কলিকাতা।

নিধি। আমিও তাহাই ঠাওরাইয়াছিলাম, নহিলে এমন স্বভাব হইবে কেন।

নরেন্দ্র। কেন, কী হইয়াছে, বলোই-না।

নিধি। আমি সে কথা বলিতে চাহি না। কিন্তু উহাকে বাড়ি হইতে বাহির করিয়া দেও।

নরেন্দ্র অধীর হইয়া উঠিয়া কহিল, "কী কথা বলিতেই হইবে।"

নিধি কহিল, "যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার আর চারা নাই, কিন্তু সাবধান থাকিয়ো, ও লোকটি আর যেন বাড়ির ভিতরের দিকে না যায়।"

নরেন্দ্র। সেকি কথা, স্বরূপ তো বাড়ির ভিতরে যায় নাই।

নিধি। সে কি তোমাকে বলিয়া গিয়াছে।

নরেন্দ্র অবাক হইয়া নিধির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নিধি কহিল, "আমি তো ভাই, আমার কাজ করিলাম, এখন তোমার যাহা কর্তব্য হয় করো।"

নরেন্দ্র ভাবিল, এ-সকল তো বড়ো ভালো লক্ষণ নয়।

স্বরূপ কয়দিন ধরিয়া ভাবিয়াছে যে, করুণা তাহার জন্য একেবারে পাগল এ কথা নিধি সহসা তাহাকে কেন কহিল; বুঝিল, নিশ্চয় করুণা তাহাকে দিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছে। স্বরূপ ভাবিল, 'তবে আমিও তাহার প্রেমে পাগল এ কথাও তো তাহাকে জানানো উচিত।' স্থির করিল, সুবিধা পাইলে নিজে গিয়া জানাইবে।

জ্যোৎস্না রাত্রি। ছেলেবেলা করুণা যেখানে দিন-রাত্রি খেলা করিয়া বেড়াইত সেই বাগানের ঘাটের উপর সে শুইয়া আছে, অতি ধীরে ধীরে বাতাসটি গায়ে লাগিতেছে। সেই জ্যোৎস্নারাত্রির সঙ্গে, সেই মৃদু বাতাসটির সঙ্গে, সেই নারিকেল-বনটির সঙ্গে তাহার ছেলেবেলাকার কথা এমন জড়িত ছিল, যেন তাহারা তার ছেলে-বেলাকারই একটি অংশ। সেই দিনকার কথাগুলি, শ্মশানে বায়ু-উচ্ছ্বাসের ন্যায় করুণার প্রাণের ভিতর গিয়া হু হু করিতে লাগিল। যন্ত্রণায় করুণার বুক ফাটিয়া, বুকের বাঁধন যেন ছিঁড়িয়া অশ্রুর স্রোত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

বাগানে আর দুইজন লোক লুকাইয়া আছে, নরেন্দ্র ও স্বরূপ। নরেন্দ্র চুপিচুপি স্বরূপের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছে, দেখিবে স্বরূপ কী করে।

করুণা সহসা দেখিল একজন লোক আসিতেছে। চমকিয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল, "কেও।"

স্বরূপ কহিল, "আমি স্বরূপচন্দ্র। নিধিকে দিয়া যে কথা বলিয়া পাঠানো হইয়াছিল তাহা কি স্মরণ নাই!"

করুণা তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া চলিয়া যাইতেছে, এমন সময়ে নরেন্দ্র আর না থাকিতে পারিয়া বাহির হইয়া পড়িল। করুণা তাড়াতাড়ি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। নরেন্দ্র ভাবিল তাহাকে দেখিতে পাইয়াই করুণা ভয়ে পলাইয়া গেল বুঝি।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্র কহিল, "হতভাগিনী, বাহির হইয়া যা!"

করুণা কিছুই কহিল না।

"এখনই দূর হইয়া যা!"

করুণা নরেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নরেন্দ্র বড়ো রুষ্ট হইল, অপ্রসন্ন হইয়া কঠোর ভাবে করুণার হস্ত ধরিল। করুণা কহিল, "কোথায় যাইব।"

নরেন্দ্র করুণার কেশগুচ্ছ ধরিয়া নিষ্ঠুর ভাবে প্রহার করিতে লাগিল; কহিল, "এখনই দূর হইয়া যা।"

ভবি ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "কোথায় দূর হইয়া যাইবে।"

এবং স্মরণ করাইয়া দিল যে, ইহা তাহার পিতার বাটী নহে।

নরেন্দ্র তাহাকে উচ্চতর স্বরে কহিল, "তুই কী করিতে আইলি।"

ভবি মাঝে পড়িয়া করুণাকে ছাড়াইয়া লইল ও কহিল, "আমার প্রাণ থাকিতে কেমন তুমি করুণাকে অনূপের বাটী হইতে বাহির করিতে পারো দেখি!"

নরেন্দ্র ভবিকে যতদূর প্রহার করিবার করিল ও অবশেষে শাসাইয়া গেল যে, "পুলিসে খবর পাঠাইয়া দিই গে।"

ভবি কহিল, "ইহা তো আর মগের মুলুক নহে।"

নরেন্দ্র চলিয়া গেলে পর করুণা ভবির গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "ভবি, আমাকে রাস্তা দেখাইয়া দে, আমি চলিয়া যাই।"

ভবি করুণাকে বুকে টানিয়া লইয়া কহিল, "সেকি মা, কোথায় যাইবে। আমি যতদিন বাঁচিয়া আছি ততদিন আর তোমাকে কোনো ভাবনা ভাবিতে হইবে না।"

বলিতে বলিতে ভবি কাঁদিয়া ফেলিল। করুণা আর একটি কথা বলিতে পারিল না, তাহার বিছানার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, বাহুতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। সমস্ত দিন করুণা কিছু খাইল না, ভবি আসিয়া কত সাধ্যসাধনা করিল, কিন্তু কোনোমতে তাহাকে খাওয়াইতে পারিল না।

সমস্ত দিন তো কোনো প্রকারে কাটিয়া গেল। সন্ধ্যা হইল, পল্লীর কুটীরে কুটীরে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালা হইয়াছে, পূজার বাড়িতে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিতেছে। সমস্ত দিন করুণা তাঁহার সেই শয্যাতেই পড়িয়া আছে, রাত্রি হইলে পর সে ধীরে ধীরে উঠিয়া অন্তঃপুরের সেই বাগানটিতে চলিয়া গেল। সেখানে কতক্ষণ ধরিয়া বসিয়া রহিল, রাত্রি আরো গভীরতর হইয়া আসিয়াছে। পৃথিবীকে ঘুম পাড়াইয়া নিশীথের বায়ু অতি ধীর পদক্ষেপে চলিয়া যাইতেছে; এমন শান্ত ঘুমন্ত গ্রাম যে মনে হয় না এ গ্রামে এমন কেহ আছে যে এমন রাত্রে মর্মভেদী যন্ত্রণায় অধীর হইয়া মরণকে আহ্বান করিতেছে!

করুণার বিজন ভাবনায় সহসা ব্যাঘাত পড়িল। করুণা সহসা দেখিল নরেন্দ্র আসিতেছে। বেচারি ভয়ে থতমত খাইয়া উঠিয়া বসিল। নরেন্দ্র আসিয়া অতি

কর্কশ স্বরে কহিল, "আমি উঁহাকে প্রতি ঘরে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, উনি কিনা বাগানে আসিয়া বসিয়া আছেন! আজ রাত্রে যে বড়ো বাগানে আসিয়া বসা হইয়াছে? স্বরূপ তো এখানে নাই।"

করুণা মনে করিল এইবার উত্তর দিবে, নিরপরাধিনীর উপর কেন নরেন্দ্রের এইরূপ সংশয় হইল— জিজ্ঞাসা করিবে— কিন্তু কী কথা বলিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। নরেন্দ্রের ভাব দেখিয়া সে ভয়ে আকুল হইয়া একটি কথাও বলিতে পারিল না।

নরেন্দ্র কহিল, "আয়, বাড়িতে আর এক মুহূর্তও থাকিতে পাইবি না।"

করুণা একটি কথাও কহিল না, কিসের অলক্ষিত আকর্ষণে যেন সে অগ্রসর হইতে লাগিল। একবার সে মনে করিল বলিবে 'ভবির সহিত দেখা করিয়াই যাই', কিন্তু একটি কথাও বলিতে পারিল না। গৃহের দ্বার পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিল, ব্যাকুল হৃদয়ে দেখিল সম্মুখে দিগন্তপ্রসারিত মাঠে জনপ্রাণী নাই। মনে করিল— সে নরেন্দ্রের পায়ে ধরিয়া বলিবে তাহার বড়ো ভয় হইতেছে, সে যাইতে পারিবে না, সে পথ ঘাট কিছুই চিনে না। কিন্তু মুখে কথা সরিল না। ধীরে ধীরে দ্বারের বাহিরে গেল। নরেন্দ্র কহিল, "কালি সকালে তোকে যদি গ্রামের মধ্যে দেখিতে পাই তবে পুলিসের লোক ডাকাইয়া বাহির করিয়া দিব।"

দ্বার রুদ্ধ হইল, ভিতর হইতে নরেন্দ্র তালা বন্ধ করিল। করুণার মাথা ঘুরিতে লাগিল, করুণা আর দাঁড়াইতে পারিল না, অবসন্ন হইয়া প্রাচীরের উপর পড়িয়া গেল।

কতক্ষণের পর উঠিল। মনে করিল, ভবির সহিত একবার দেখা হইল না? কতক্ষণ পর্যন্ত শূন্য নয়নে বাড়ির দিকে চাহিয়া রহিল। প্রাচীরের বাহির হইয়া দেখিল— তাহার সেই বাগানের গাছপালা নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। দেখিল— দ্বিতীয় তলের যে গৃহে তাহার পিতা থাকিতেন, যে গৃহে সে তাহার পিতার সহিত কতদিন খেলা করিয়াছে, সে গৃহের দ্বার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত, ভিতরে একটি ভগ্ন খাট পড়িয়া আছে, তাহার সম্মুখে নিস্তেজ একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। কতক্ষণের পর নিশ্বাস ফেলিয়া করুণা ফিরিয়া দাঁড়াইল। গ্রামের পথে চলিতে আরম্ভ করিল। কতক দূর গিয়া আর একবার ফিরিয়া চাহিল, দেখিল সেই বিজন কক্ষে একটিমাত্র মুমূর্ষু প্রদীপ জ্বলিতেছে। ছেলেবেলা যাহারা করুণাকে সুখে খেলা করিতে দেখিয়াছে তাহারা সকলেই আপন কুটীরে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছে। তাহাদের সেই কুটীরের সম্মুখ দিয়া ধীরে ধীরে করুণা চলিয়া গেল। আর একবার ফিরিয়া চাহিল, দেখিল তাহার পিতার কক্ষে এখনো সেই প্রদীপটি জ্বলিতেছে।

সেই গভীর নীরব নিশীথে অসংখ্য তারকা নিমেষহীন স্থির নেত্রে নিয়ে চাহিয়া দেখিল— দিগন্তপ্রসারিত জনশূন্য অন্ধকার মাঠের মধ্য দিয়া একটি রমণী একাকিনী চলিয়া যাইতেছে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

পণ্ডিতমহাশয় সকালে উঠিয়া দেখিলেন কাত্যায়নী ঠাকুরানী গৃহে নাই। ভাবিলেন গৃহিণী বুঝি পাড়ার কোনো মেয়েমহলে গল্প ফাঁদিতে গিয়াছেন। অনেক বেলা হইল, তথাপি তাহার দেখা নাই। তা, মাঝে মাঝে প্রায়ই তিনি এরূপ করিয়া থাকেন। কিন্তু পণ্ডিতমহাশয় আর বেশিক্ষণ স্থির থাকিতে পারিলেন না, যেখানে যেখানে ঠাকুরানীর যাইবার সম্ভাবনা ছিল খোঁজ লইতে গেলেন। মেয়েরা চোখ-টেপাটিপি করিয়া হাসিতে লাগিল; কহিল, 'মিন্‌সা এক দণ্ড আর কাত্যায়নী-পিসিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না! কোথায় গিয়াছে বুঝি, তাই খুঁজিতে বাহির হইয়াছেন। কিন্তু পুরুষ-মানুষের অতটা ভালো দেখায় না।' তাহার মানে, তাঁহাদের স্বামীরা অতটা করেন না, কিন্তু যদি করিতেন তবে বড়ো সুখের হইত।

যেখানে কাত্যায়নীর যাইবার সম্ভাবনা ছিল সেখানে তো পণ্ডিতমহাশয় খুঁজিয়া পাইলেন না, যেখানে সম্ভাবনা ছিল না সেখানেও খুঁজিতে গেলেন— সেখানেও পাইলেন না। এই তো পণ্ডিতমহাশয় ব্যাকুল হইয়া মুহুর্মুহু নস্য লইতে লাগিলেন। ঊর্ধ্বশ্বাসে নিধিদের বাড়ি গিয়া পড়িলেন।

নিধি জিজ্ঞাসা করিল, ঘোষেদের বাড়ি দেখিয়াছেন? মিত্রদের বাড়ি দেখিয়াছেন? দত্তদের বাড়ি খোঁজ লইয়াছেন? এইরূপে মুখুজ্জে চাটুজ্জে বাঁড়ুজ্জে ইত্যাদি যত বাড়ি জানিত প্রায় সকলগুলিরই উল্লেখ করিল, কিন্তু সকল-তাতেই অমঙ্গল উত্তর পাইয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য ভাবিতে লাগিল। অবশেষে নিধি নিজে নরেন্দ্রের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল। শূন্য গৃহ যেন হাঁ হাঁ করিতেছে। বিষণ্ণ বাড়ির চারি দিক যেন কেমন অন্ধকার হইয়া আছে, একটা কথা কহিলে দশটা প্রতিধ্বনি যেন ধমক দিয়া উঠিতেছে। একটা চাকর রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে সোপানের উপর পড়িয়া পড়িয়া ঘুমাইতেছিল, নিধি তাহাকে জাগাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "গদাধরবাবু কোথায়।"

সে কহিল, "কাল রাত্রে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, আজও আসেন নাই— বোধ হয় কলিকাতায় গিয়া থাকিবেন।"

নিধি ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিতমহাশয়কে কহিল, "যদি খুঁজিতে হয় তো কলিকাতায় গিয়া খোঁজো গে।"

পণ্ডিতমহাশয় তো এ কথার ভাবই বুঝিতে পারিলেন না। নিধি কহিল, "গদাধর নামে একটি বাবু আসিয়াছেন, দেখিয়াছ?"

পণ্ডিতমহাশয় শূন্যগর্ভ একটি হাঁ দিয়া গেলেন। নিধি কহিল, "সেই ভদ্রলোকটির সঙ্গে কাত্যায়নীপিসি কলিকাতা ভ্রমণ করিতে গিয়াছেন।"

পণ্ডিতমহাশয়ের মুখ শুকাইয়া গেল, কিন্তু তিনি এ কথা কোনোক্রমেই বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না। তিনি কহিলেন, তিনি নন্দীদের বাড়ি ভালো করিয়া দেখেন নাই, সেখানেই নিশ্চয় আছেন। এই বলিয়া নন্দী আদি করিয়া আর-একবার সমস্ত বাড়ি অন্বেষণ করিয়া আসিলেন, কোথাও সন্ধান পাইলেন না। ম্লানবদনে বাড়িতে ফিরিয়া আসিলেন।

নিধি কহিল, "আমি তো পূর্বেই বলিয়াছিলাম যে, এরূপ ঘটিবে।"

কিন্তু তিনি পূর্বে কোনোদিন এ সম্বন্ধে কোনো কথা বলেন নাই।

সিন্দুক খুলিতে গিয়া পণ্ডিতমহাশয় দেখিলেন, কাত্যায়নী ঠাকুরানী শুদ্ধ যে নিজে গিয়াছেন এমন নহে, যত-কিছু গহনাপত্র টাকাকড়ি ছিল তাহার সমস্ত লইয়া গিয়াছেন। দ্বার রুদ্ধ করিয়া পণ্ডিতমহাশয় সমস্ত দিন কাঁদিলেন।

নিধি কহিল, "এ সমস্তই নরেন্দ্রের ষড়যন্ত্রে ঘটিয়াছে, তাহার নামে নালিশ করা হউক, আমি সাক্ষী তৈয়ার করিয়া দিব।"

নিধি এরূপ একটা কাজ হাতে পাইলেই বাঁচিয়া যায়। পণ্ডিতমহাশয় কহিলেন, যাহা তাঁহার ভাগ্যে ছিল হইয়াছে, তাই বলিয়া তিনি নরেন্দ্রের নামে নালিশ করিতে পারেন না।

নিধিকে লইয়া পণ্ডিতমহাশয় কলিকাতায় আসিলেন। একদিন দুই প্রহরের রৌদ্রে পণ্ডিতমহাশয়ের শ্রান্ত স্থূল দেহ কালীঘাটের ভিড়ের তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছে, এমন সময়ে সম্মুখে একটি সেকেন্‌ড্‌ ক্লাসের গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। পণ্ডিতমহাশয়ের মন্দির দেখা হইয়াছে, কালীঘাট হইতে চলিয়া যাইবেন তাহার চেষ্টা করিতেছেন। গাড়ি দেখিয়া তাহা অধিকার করিবার আশায় কোনোপ্রকারে ভিড় ঠেলিয়া-ঠুলিয়া সেই দিকে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন গাড়ি হইতে প্রথমে একটি বাবু ও তাঁহার পরে একটি রমণী হাসিতে হাসিতে, পান চিবাইতে চিবাইতে, গাড়ি হইতে নামিলেন ও হেলিতে-দুলিতে মন্দিরাভিমুখে চলিলেন। পণ্ডিতমহাশয় সে রমণীকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। সে রমণীটি তাঁহারই কাত্যায়নী ঠাকুরানী!

তাড়াতাড়ি ছুটিয়া তাহার পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন— কাত্যায়নী তাঁহার উচ্চতম স্বরে কহিলেন, "কে রে মিন্‌সে। গায়ের উপর আসিয়া পড়িস যে! মরণ আর-কি!"

এইরূপ অনেকক্ষণ ধরিয়া নানা গালাগালি বর্ষণ করিয়া অবশেষে পণ্ডিতমহাশয় তাঁহার 'চোখের মাথা' খাইয়াছেন কি না ও বুড়া বয়সে এরূপ অসদাচরণ করিতে লজ্জা করেন কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। পণ্ডিতমহাশয় দুইটি প্রশ্নের কোনোটির উত্তর না দিয়া হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, মনে হইল যেন এখনি মূর্ছিত হইয়া পড়িবেন। কাত্যায়নীর সঙ্গে যে বাবু ছিলেন তিনি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার স্টীকের বাড়ি পণ্ডিতমহাশয়কে দুই একটা গোঁজা মারিয়া ও বিজাতীয় ভাষায় যথেষ্ট মিষ্ট সম্ভাষণ করিয়া, ইংরাজি অর্ধস্ফুট স্বরে 'পাহারাওয়ালা পাহারাওয়ালা' করিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন।

পাহারাওয়ালা আসিল ও পণ্ডিতমহাশয়কে ঘিরিয়া দশ সহস্র লোক জমা হইল। বাবু কহিলেন, এই লোকটি তাঁহার পকেট হইতে টাকা তুলিয়া লইয়াছে।

পণ্ডিতমহাশয় ভয়ে আকুল হইলেন ও কাঁদো-কাঁদো স্বরে কহিলেন, "না বাবা, আমি লই নাই। তবে তোমার ভ্রম হইয়া থাকিবে, আর কেহ লইয়া থাকিবে।"

'চোর চোর' বলিয়া একটা ভারি কলরব উঠিল, চারি দিকে কতকগুলা ছোঁড়া জমিল, কেহ তাঁহার টিকি ধরিয়া টানিতে লাগিল, কেহ তাঁহাকে চিমটি কাটিতে লাগিল— পণ্ডিতমহাশয় থতমত খাইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার ট্যাঁকে যত টাকা ছিল সমস্ত লইয়া বাবুটিকে কহিলেন, "বাবা, তোমার টাকা হারাইয়া থাকে যদি, তবে এই লও। আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, তোমার পায়ে পড়িতেছি— আমাকে রক্ষা করো।"

ইহাতে তাঁহার দোষ অধিকতর সপ্রমাণ হইল, পাহারাওয়ালা তাঁহার হাত ধরিল। এমন সময়ে নিধি চোখ মুখ রাঙাইয়া ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। নিধির এক-স্থট চাপকান পেণ্টুলুন ছিল, কলিকাতায় সে চাপকান-পেণ্টুলুন ব্যতীত ঘর হইতে বাহির হইত না। চাপকান-পেণ্টুলুন-পরা নিধি আসিয়া যখন গম্ভীর স্বরে কহিল 'কোন্ হ্যায় রে!' তখন অমনি চারি দিক স্তব্ধ হইয়া গেল। নিধি পকেট হইতে এক টুকরা কাগজ ও পেন্সিল বাহির করিয়া পাহারাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিল তাহার নম্বর কত ও সে কোন্ থানায় থাকে, এবং উত্তর না পাইতে পাইতে সম্মুখস্থ ছ্যাকরা গাড়ির কোচম্যানকে জিজ্ঞাসা করিল, "লালদিঘির এণ্ড্রু-সাহেবের বাড়ি জানো?"

পাহারাওয়ালা ভাবিল না জানি এণ্ড্রুসাহেব কে হইবে ও দাড়ি চুলকাইতে চুলকাইতে 'বাবু বাবু' করিতে লাগিল। নিধি তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সেই বাবুটিকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, আপনার বাড়ি কোথায়। নাম কী।"

বাবুটি গোলমালে সট্‌ করিয়া সরিয়া পড়িলেন এবং সে পাহারাওয়ালাটিও অধিক উচ্চবাচ্য না করিয়া ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া পড়িল।

ভিড় চুকিয়া গেল, নিধি ধরাধরি করিয়া পণ্ডিতমহাশয়কে একটি গাড়িতে লইয়া গিয়া তুলিল এবং সেই রাত্রেই দেশে যাত্রা করিল। বেচারি পণ্ডিতমহাশয় লজ্জায় দুঃখে কষ্টে বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন।

নিধি কহিল, কাত্যায়নীর নামে গহনা ও টাকা-চুরির নালিশ করা যাক। পণ্ডিত-মহাশয় কোনোমতে সম্মত হইলেন না।

দেশে ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিতমহাশয় করুণার সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিলেন। তিনি কহিলেন, "এ গ্রামে থাকিয়া আর কী করিব। শূন্য গৃহ ত্যাগ করে কাশী চলিলাম। বিশ্বেশ্বরের চরণে এ প্রাণ বিসর্জন করিব।"

এই বলিয়া পণ্ডিতমহাশয় ঘর দুয়ার সমস্ত বিক্রয় করিয়া কাশী চলিলেন। পাড়ার সমস্ত বালকেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, অশ্রুপূর্ণনয়নে তিনি সকলকে আদর করিলেন। এমন একটি বালক ছিল না যে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলে নাই।

এইরূপে কাঁদিতে কাঁদিতে পণ্ডিতমহাশয় গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। অনেক লোক দেখিয়াছি কিন্তু তেমন ভালোমানুষ আর দেখিলাম না।

নরেন্দ্রের বাড়িঘর সমস্ত নিলামে বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। নরেন্দ্র গ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে। কোথায় আছে কে জানে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র চলিয়া গেলে রজনী মনে করিল, 'আমিই বুঝি মহেন্দ্রের চলিয়া যাইবার কারণ!'

মহেন্দ্রের মাতা মনে করিলেন যে, রজনী বুঝি মহেন্দ্রের উপর কোনো কর্কশ ব্যবহার করিয়াছে; আসিয়া কহিলেন, "পোড়ারমুখী ভালো এক ডাকিনীকে ঘরে আনিয়াছিলাম!"

রজনীর শ্বশুর আসিয়া কহিলেন, "রাক্ষসী, তুই এ সংসার ছারখার করিয়া দিলি!"

রজনীর ননদ আসিয়া কহিলেন, "হতভাগিনীর সহিত দাদার কী কুক্ষণেই বিবাহ হইয়াছিল!"

রজনী একটি কথাও বলিল না। রজনীর নিজেরই যে আপনার প্রতি দারুণ ঘৃণা জন্মিয়াছিল, সেই ঘৃণার যন্ত্রণায় সে মনে করিল— বুঝি ইহার একটি কথাও অন্যায় নহে।

সে মনে করিল, যে তিরস্কার তাহাকে করা হইতেছে সে তিরস্কার বুঝি তাহার যথার্থই পাওয়া উচিত। রজনী কাহাকেও কিছু বলিল না, একবার কাঁদিলও না। এ কয়দিন তাহার মুখশ্রী অতিশয় গম্ভীর— অতিশয় শান্ত— যেন মনে-মনে কী একটি সংকল্প করিয়াছে, মনে-মনে কী একটি প্রতিজ্ঞা বাঁধিয়াছে।

এই দুই মাস হইল মহেন্দ্র বিদেশে গিয়াছে— এই দুই মাস ধরিয়া রজনী যেন কী একটা ভাবিতেছিল, এত দিনে সে ভাবনা যেন শেষ হইল, তাই রজনীর মুখ অতি গম্ভীর অতি শান্ত দেখাইতেছে।

সন্ধ্যা হইলে ধীরে ধীরে সে মোহিনীর বাড়িতে গেল। মোহিনীর সহিত দেখা হইল, থতমত খাইয়া দাঁড়াইল। যেন কী কথা বলিতে গিয়াছিল, বলিতে পারিল না, বলিতে সাহস করিল না। মোহিনী অতি স্নেহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কী রজনী। কি বলিতে আসিয়াছিস।"

রজনী ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে কহিল, "দিদি, আমার একটি কথা রাখতে হবে।"

মোহিনী আগ্রহের সঙ্গে কহিল, "কী কথা বলো।"

রজনী কতবার 'না বলি' 'না বলি' করিয়া অনেক পীড়াপীড়ির পর আস্তে আস্তে কহিল মোহিনীকে একটি চিঠি লিখিতে হইবে। কাহাকে লিখিতে হইবে। মহেন্দ্রকে। কী লিখিতে হইবে। না, তিনি বাড়িতে ফিরিয়া আসুন, তাঁহাকে আর অধিক দিন যন্ত্রণা ভোগ করিতে হবে না। রজনী তাহার দিদির বাড়িতে থাকিবে। বলিতে বলিতে রজনী কাঁদিয়া ফেলিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যাহ্ন। রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। রাশি রাশি ধূলি উড়াইয়া গ্রামের পথ দিয়া মাঝে মাঝে দুই-একটা গোরুর গাড়ি মন্থর গমনে যাইতেছে। দুই-একজন মাত্র পথিক নিভৃত পথে হন্ হন্ করিয়া চলিয়াছে। স্তব্ধ মধ্যাহ্নে কেবল একটি গ্রাম্য বাঁশির স্বর শুনা যাইতেছে, বোধ হয় কোনো রাখাল মাঠে গোরু ছাড়িয়া দিয়া গাছের ছায়ায় বসিয়া বাজাইতেছে।

করুণা সমস্ত রাত চলিয়া চলিয়া শ্রান্ত হইয়া গাছের তলায় পড়িয়া আছে। করুণা যে কোনো কুটীরে আতিথ্য লইবে, কাহারো কাছে কোনো প্রার্থনা করিবে, সে স্বভাবেরই নয়। কী করিলে কি হইবে, কী বলিতে হয়, কী কহিতে হয়, তাহার কিছু যদি ভাবিয়া পায়। লোক দেখিলে সে ভয়ে আকুল হইয়া পড়ে। এক-একজন করিয়া পথিক চলিয়া যাইতেছে, করুণার ভয় হইতেছে— 'এইবার এই বুঝি আমার

কাছে আসিবে, ইহার বুঝি কোনো দুরভিসন্ধি আছে!' বেলা প্রায় তিন প্রহর হইবে, এখনো পর্যন্ত করুণা কিছু আহার করে নাই। পথশ্রমে, ধুলায়, অনিদ্রায়, অনাহারে, ভাবনায় করুণা একদিনের মধ্যে এমন পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, এমন বিষণ্ণ বিবর্ণ মলিন শীর্ণ হইয়া গিয়াছে যে দেখিলে সহসা চিনা যায় না।

ঐ একজন পথিক আসিতেছে। দেখিয়া ভালো মনে হইল না। করুণার দিকে তার ভারি নজর— বিদ্যাসুন্দরের মালিনী-মাসির সম্পর্কের একটা গান ধরিল— কিন্তু এই জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বিপ্রহর রসিকতা করিবার ভালো অবসর নয় বুঝিয়া সে তো গান গাইতে গাইতে পিছনে ফিরিয়া চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেল। আর-একজন, আর-একজন, আর-একজন— এইরূপ এক এক করিয়া কত পথিক চলিয়া গেল। এ পর্যন্ত করুণা ভদ্র পথিক একজনও দেখিতে পায় নাই। কিন্তু কী সর্বনাশ। ঐ একজন প্যাণ্টলুন-চাপকান-ধারী আসিতেছে। অনেক সময়ে ভদ্রলোকদের (ভদ্র কথা সাধারণ অর্থে যেরূপে ব্যবহৃত হয়) যত ভয় হয় এত আর কাহাদেরও নয়। ঐ দেখো, করুণা যে গাছের তলায় বসিয়াছিল সেই দিকেই আসিতেছে। করুণা তো ভয়ে আকুল, মাটির দিকে চাহিয়া থরথর কাঁপিতে লাগিল। পথিকটি তো, বলা নয় কহা নয়, অতি শান্ত ভাবে আসিয়া, সেই গাছের তলাটিতে আসিয়া বসিল কেন। বসিতে কি আর জায়গা ছিল না। পথের ধারে কি আর গাছ ছিল না।

পথিকটি স্বরূপবাবু। স্বরূপবাবুর স্ত্রীলোকদিগের প্রতি যে একটা স্বাভাবিক টান ছিল তাহারই আকর্ষণ এড়াইতে না পারিয়া গাছের তলায় আসিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন না যে করুণাকে সেখানে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু যখন করুণাকে দেখিলেন, চিনিলেন। তখন তাঁহার বিস্ময়ের ও আনন্দের অবধি রহিল না। করুণা দেখে নাই পথিকটি কে। সে ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে, সেখান হইতে উঠিয়া যাইবে-যাইবে মনে করিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না। কিছুক্ষণ তো বিস্ময় ও আনন্দের তোড় সামলাইতে গেল, তার পর স্বরূপ অতি মধুর গদ্‌গদ স্বরে কহিলেন, "করুণা!"

করুণা এই সম্বোধন শুনিয়া একেবারে চমকিয়া উঠিল, পথিকের দিকে চাহিল, দেখিল স্বরূপবাবু! তাহার চেয়ে একটা সাপ যদি দেখিত করুণা কম ভয় পাইত।

করুণা কিছুই উত্তর দিল না। স্বরূপ অনেক কথা বলিতে লাগিল, এ কয় রাত্রি সে করুণার জন্যে কত কষ্ট পাইয়াছিল তাহার সমস্ত বর্ণনা করিল। সেই সুখরাত্রে তাহাদের প্রেমালাপের যখন সবে সূত্রপাত হইয়াছিল, এমন সময়ে ভঙ্গ হওয়াতে অনেক দুঃখ করিল। সে অতি হতভাগ্য, বিধাতা তাহাকে চিরজীবন দুঃখী করিবার জন্যই বুঝি সৃষ্টি করিয়াছেন— তাহার কোনো আশাই সফল হয় না। অবশেষে,

করুণা নরেন্দ্রের বাড়ি হইতে যে বাহির হইয়া আসিয়াছে, ইহা লইয়া অনেক আনন্দ প্রকাশ করিল। কহিল— আরো ভালোই হইয়াছে, তাহাদের দুইজনের যে প্রেম, যে স্বর্গীয় প্রেম, তাহা নিষ্কণ্টকে ভোগ করিতে পারিবে। আরো এমন অনেক কথা বলিল, তাহা যদি লিখিয়া লওয়া যাইত তাহা হইলে অনেক বড়ো বড়ো নভেলের রাজপুত ক্ষত্রিয় বা অন্যান্য মহা মহা নায়কের মুখে স্বচ্ছন্দে বসানো যাইত। কিন্তু করুণা তাহার রসাস্বাদন করিতে পারে নাই।

স্বরূপ এলাহাবাদে যাইবে, তাই স্টেশনে যাইতেছিল। পথের মধ্যে এই-সকল ঘটনা। স্বরূপ প্রস্তাব করিল করুণা তাহার সঙ্গে পশ্চিমে চলুক, তাহা হইলে আর কোনো ভাবনা ভাবিতে হবে না।

করুণা কাল রাত্রি হইতে ভাবিতেছিল কোথায় যাইবে, কী করিবে। কিছুই ভাবিয়া পায় নাই। আজিকার দিন তো প্রায় যায়-যায়— রাত্রি আসিবে, তখন কী করিবে, কত প্রকার লোক পথ দিয়া যাওয়া-আসা করিতেছে, এই-সকল নানান ভাবনার সময় এ প্রস্তাবটা করুণার মন্দ লাগিল না। ছেলেবেলা হইতে যে চিরকাল গৃহের বাহিরে কখনো যায় নাই, সে এই অনাবৃত পৃথিবীর দৃষ্টি কী করিয়া সহিবে বলো। সে একটা আশ্রয় পাইলে, লোকের চোখের আড়াল হইতে পারিলে বাঁচে। তার মনে হইতেছে, যেন সকলেই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। তাহা ছাড়া করুণা এমন শ্রান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে যে আর সে সহিতে পারে না। একবার মনে করিল স্বরূপের প্রস্তাবে সায় দিয়া যাইবে। কিন্তু স্বরূপের উপর তাহার এমন একটা ভয় আছে যে পা আর উঠিতে চায় না। করুণা ভাবিল, 'এই গাছের তলায় নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া থাকি, না খাইয়া না দাইয়া মরিয়া যাইব।' কিন্তু রক্তমাংসের শরীরে কত সহিবে বলো— এ ভাবনা আর বেশিক্ষণ স্থান পাইল না। স্বরূপের প্রস্তাবে সম্মত হইল। সন্ধ্যা হইল।

করুণা ও স্বরূপ এখন ট্রেনের মধ্যে।

বিংশ পরিচ্ছেদ

স্বরূপ ও করুণা কাশীতে আছে। করুণার দুরবস্থা বলিবার নহে। সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকিয়া সে যে কী অবস্থায় দিন যাপন করিতেছে তাহা সেই জানে। স্বরূপের ভ্রম অনেক দিন হইল ভাঙিয়াছে, এখন বুঝিয়াছে করুণা তাহাকে ভালোবাসে না। সে ভাবিতেছে 'একি উৎপাত! এত করিয়া আনিলাম, গাড়িভাড়া দিলাম— সকলই ব্যর্থ হইল!' সে যে বিরক্ত হইয়াছে তাহা আর বলিবার নহে। সে মনে করিয়াছিল

এতদিন কবিতায় যাহা লিখিয়া আসিয়াছে, কল্পনায় চিত্র করিয়াছে, আজ সেই প্রেমের সুখ উপভোগ করিবে। কিন্তু সে কাছে আসিলে করুণা ভয়ে জড়োসড়ো আড়ষ্ট হইয়া মরিয়া যায়, তাহার সঙ্গে কথাই কহে না। স্বরূপ ভাবিল, 'একি উৎপাত! এ গলগ্রহ বিদায় করিতে পারিলে যে বাঁচি।' ভাবিল দিন-কতক কাছে থাকিতে থাকিতেই ভালোবাসা হইবে। স্বরূপ তো তাহার যথাসাধ্য করিল, কিন্তু করুণার ভালোবাসার কোনো চিহ্ন দেখিল না।

করুণা বেচারির তো আরাম বিশ্রাম নাই। এক তো সর্বক্ষণ পরের বাড়িতে অচেনা পুরুষের সঙ্গে আছে বলিয়া সর্বদাই আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইতেছে। তাহা ছাড়া স্বরূপের ভাব-গতিক দেখিয়া সে তো ভয়ে আকুল— সে কাছে বসিয়া গান গায়, কবিতা শুনাইতে থাকে, মনের দুঃখ নিবেদন করে, অবশেষে মহা রুক্ষভাবে গাড়িভাড়ার টাকার জন্য নালিশ করিবে বলিয়া শাসাইতে আরম্ভ করিয়াছে। করুণা যে কী করিবে কিছুই ভাবিয়া পায় না, ভয়ে বেচারি সারা হইতেছে। স্বরূপ রাত দিন খিট্ খিট্ করে, এমন-কি, করুণাকে মাঝে মাঝে ধম্‌কাইতে আরম্ভ করিয়াছে। করুণার কিছু বলিবার মুখ নাই, সে শুধু কাঁদিতে থাকে।

এইরূপে কত দিন যায়, স্বরূপের এলাহাবাদে যাইবার সময় হইয়াছে। সে ভাবিতেছে, 'এখন করুণাকে লইয়া কী করি। এইখানে কি ফেলিয়া যাইব। না, এত করিয়া আনিলাম, গাড়িভাড়া দিলাম, এতদিন রাখিলাম, অবশেষে কি ফেলিয়া যাইব। আরো দিন-কতক দেখা যাক।'

অনেক ভাবিয়া-সাবিয়া করুণাকে তো ডাকিল। করুণা ভাবিল, 'যাইব কি না। কিন্তু না যাইয়াই বা কী করি। এখানে কোথায় থাকিব। এত দূর দেশে অচেনা জায়গায় কার কাছে যাইব। দেশে থাকিতাম তবু কথা থাকিত।'

করুণা চলিল। উভয়ে স্টেশনে গিয়া উপস্থিত হইল। গাড়ি ছাড়িতে এখনো দেরি আছে। জিনিসপত্র পুঁটুলি-বোঁচকা লইয়া যাত্রিগণ মহা কোলাহল করিতেছে। কানে-কলম-গোঁজা রেলওয়ে ক্লার্ক্‌গণ ভারি উঁচু চালে ব্যস্তভাবে ইতস্তত ফর্ ফর্ করিয়া বেড়াইতেছেন। পান সোডাওয়াটার নানাপ্রকার মিষ্টান্নের বোঝা লইয়া ফেরিওয়ালারা আগামী গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিতেছে। এইরূপ তো অবস্থা। এমন সময়ে একজন পুরুষ করুণার পাশে সেই বেঞ্চে আসিয়া বসিল।

করুণা উঠিয়া যাইবে-যাইবে করিতেছে, এমন সময়ে তাহার পার্শ্বস্থ পুরুষ বিস্ময়ের স্বরে কহিয়া উঠিল, "মা, তুমি যে এখানে!"

করুণা পণ্ডিতমহাশয়ের স্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ কিছু বলিতে

পারিল না। অনেকক্ষণ নির্জল নয়নে চাহিয়া চাহিয়া, কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "সার্বভৌমমহাশয়, আমার ভাগ্যে কী ছিল!"

পণ্ডিতমহাশয় তো আর অশ্রুসম্বরণ করিতে পারেন না। গদ্‌গদ স্বরে কহিলেন, "মা, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, তাহার জন্য আর ভাবিয়ো না। আমি প্রয়াগে যাইতেছি, আমার সঙ্গে আইস। পৃথিবীতে আর আমার কেহই নাই— যে কয়টা দিন বাঁচিয়া আছি ততদিন আমার কাছে থাকো, ততদিন আর তোমার কোনো ভাবনা নাই।"

করুণা অধীর উচ্ছ্বাসে কাঁদিতে লাগিল। এমন সময়ে নিধি আসিয়া উপস্থিত হইল। নিধি পণ্ডিতমহাশয়ের খরচে কাশী দর্শন করিতে আসিয়াছেন। পণ্ডিতমহাশয় তজ্জন্য নিধির কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ আছেন। তিনি বলেন, নিধির ঋণ তিনি এ জন্মে শোধ করিতে পারিবেন না। করুণাকে দেখিয়া একেবারে চমকিয়া উঠিল; কহিল, "ভট্টাচার্যমহাশয়, একটা কথা আছে।"

পণ্ডিতমহাশয় শশব্যস্তে উঠিয়া গেলেন। নিধি কহিল, "ঐ বাবুটিকে দেখিতেছেন?"

পণ্ডিতমহাশয় চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন— স্বরূপ। নিধি কহিল, "দেখিলেন! করুণার ব্যবহারটা একবার দেখিলেন! ছি-ছি, স্বর্গীয় কর্তার নামটা একেবারে ডুবাইল!"

পণ্ডিতমহাশয় অনেকক্ষণ হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, অবশেষে হাত উল্‌টাইয়া আস্তে আস্তে কহিলেন—

"স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং
দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।"

নিধি কহিল, "আহা, নরেন্দ্র এমন ভালো লোক ছিল। ঐ রাক্ষসীই তো তাহাকে নষ্ট করিয়াছে।"

নরেন্দ্র যে ভালো লোক ছিল সে বিষয়ে পণ্ডিতমহাশয়ের সংশয় ছিল না, এখন যে খারাপ হইয়া গিয়াছে তাহারও প্রমাণ পাইয়াছেন, কিন্তু এতক্ষণে কেন যে খারাপ হইয়া গিয়াছে তাহার কারণটা জানিতে পারিলেন। পণ্ডিতমহাশয়ের স্ত্রীজাতির উপর দারুণ ঘৃণা জন্মাইল। পণ্ডিতমহাশয় ভাবিলেন, আর না— স্ত্রীলোকেই তাঁহার সর্বনাশ করিয়াছে, স্ত্রীজাতিকে আর বিশ্বাস করিবেন না।

নিধি লাল হইয়া কহিল, "দেখুন দেখি, মহাশয়, পাপাচরণ করিবার আর কি স্থান নাই। এই কাশীতে!"

এ কথা পণ্ডিতমহাশয় এতক্ষণ ভাবেন নাই। শুনিয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ একদৃষ্টে অবাক হইয়া নিধির মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন; ভাবিলেন, 'সত্যই তো!'

একটা ঘণ্টা বাজিল, মহা ছুটাছুটি চেঁচামেচি পড়িয়া গেল। পণ্ডিতমহাশয় বেঞ্চের কাছে বোঁচকা ফেলিয়া আসিয়াছিলেন, তাড়াতাড়ি লইতে গেলেন। এমন সময় স্বরূপ তাড়াতাড়ি করুণাকে ডাকিতে আসিল— পণ্ডিতমহাশয়কে দেখিয়া সট্‌ করিয়া সরিয়া পড়িল। করুণা কাতরস্বরে পণ্ডিতমহাশয়কে কহিল, "সার্বভৌমমহাশয়, আমাকে ফেলিয়া যাইবেন না।"

পণ্ডিতমহাশয় কহিলেন, "মা, অনেক প্রতারণা সহিয়াছি— মনে করিয়াছি বৃদ্ধবয়সে আর কোনো দিকে মন দিব না— দেবসেবায় কয়েকটি দিন কাটাইয়া দিব।"

করুণা কাঁদিতে কাঁদিতে পণ্ডিতমহাশয়ের পা জড়াইয়া ধরিল; কহিল, "আমাকে ছাড়িয়া যাইবেন না— আমাকে ছাড়িয়া যাইবেন না।"

পণ্ডিতমহাশয়ের নেত্রে অশ্রু পূরিয়া আসিল; ভাবিলেন, 'যাহা অদৃষ্টে আছে হইবে— ইহাকে তো ছাড়িয়া যাইতে পারিব না।'

নিধি ছুটিয়া আসিয়া মহা একটা ধমক দিয়া কহিল, "এখানে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে কী হইবে। গাড়ি যে চলিয়া যায়!"

এই বলিয়া পণ্ডিতমহাশয়ের হাত ধরিয়া হড়্‌ হড়্‌ করিয়া টানিয়া একটা গাড়ির মধ্যে পূরিয়া দিল।

করুণা অন্ধকার দেখিতে লাগিল। মাথা ঘুরিয়া মুখচক্ষু বিবর্ণ হইয়া সেইখানে মূর্ছিত হইয়া পড়িল। স্বরূপের দেখাসাক্ষাৎ নাই, সে গোলেমালে অনেকক্ষণ হইল গাড়িতে উঠিয়া পড়িয়াছে। অগ্নিময় অঙ্কুশের তাপে আর্তনাদ করিয়া লৌহময় গজ হন্‌ হন্‌ করিয়া অগ্রসর হইল। স্টেশনে আর বড়ো লোক নাই।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

এই সময়ে মহেন্দ্রের নিকট হইতে যে-সকল পত্র পাইয়াছিলাম, তাহার একখানি নিম্নে উদ্‌ধৃত করিয়া দিলাম—

ভাই! যে কষ্টে, যে লজ্জায়, যে আত্মগ্লানির যন্ত্রণায় পাগল হইয়া দেশ পরিত্যাগ করিলাম তাহা তোমার কাছে গোপন করি নাই। সেই আঁধার রাত্রে বিজন পথ দিয়া যখন যাইতেছিলাম— কোনো কারণ নাই, কোনো উদ্দেশ্য নাই, কোনো গম্য স্থান নাই— তখন কেন যাইতেছি, কোথায় যাইতেছি কিছুই ভাবি নাই। মনে করিয়াছিলাম এ পথের যেন অন্ত নাই, এমনি করিয়াই যেন আমাকে চিরজীবন চলিতে হইবে—

চলিয়া, চলিয়া, চলিয়া তবু পথ ফুরাইবে না— রাত্রি পোহাইবে না। মনের ভিতর কেমন এক প্রকার ঔদাস্যের অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল, তাহা বলিবার নহে। কিন্তু রাত্রের অন্ধকার যত হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল, দিনের কোলাহল যতই জাগ্রত হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই আমার মনের আবেগ কমিয়া আসিল। তখন ভালো করিয়া সমস্ত ভাবিবার সময় আসিল। কিন্তু তখনো দেশে ফিরিবার জন্য এক তিলও ইচ্ছা হয় নি। কত দেশ দেখিলাম, কত স্থানে ভ্রমণ করিলাম, কত দিন কত মাস চলিয়া গেল, কিন্তু কী দেখিলাম কী করিলাম কিছু যদি মনে আছে! চোকের উপর কত পর্বত নদী অরণ্য মন্দির অট্টালিকা গ্রাম উঠিত, কিন্তু সে-সকল যেন কী। কিছুই নয়। যেন স্বপ্নের মতো, যেন মায়ার মতো, যেন মেঘের পর্বত-অরণ্যের মতো। চোখের উপর পড়িত তাই দেখিতাম, আর কিছুই নহে। এইরূপ করিয়া যে কত দিন গেল তাহা বলিতে পারি না— আমার মনে হইয়াছিল এক বৎসর হইবে, কিন্তু পরে গণনা করিয়া দেখিলাম চার মাস। ক্রমে ক্রমে আমার মন শান্ত হইয়া আসিয়াছে। এখন ভবিষ্যৎ ও অতীত ভাবিবার অবসর পাইলাম। আমি এখন লাহোরে আসিয়াছি। এখানকার একজন বাঙালিবাবুর বাড়িতে আশ্রয় লইলাম, ও অল্প অল্প করিয়া ডাক্তারি করিতে আরম্ভ করিলাম। এখন আমার মন্দ আয় হইতেছে না। কিন্তু আয়ের জন্য ভাবি না ভাই, আমার হৃদয়ে যে নূতন মনস্তাপ উত্থিত হইয়াছে তাহাতে যে আমাকে কী অস্থির করিয়া তুলিয়াছে বলিতে পারি না। আমার নিজের উপর যে কী ঘৃণা হইয়াছে তাহা কী করিয়া প্রকাশ করিব। যখন দেশে ছিলাম তখন রজনীর জন্যে একদিনও ভাবি নাই, যখন দেশ ছাড়িয়া আসিলাম তখনো এক মুহূর্তের জন্য রজনীর ভাবনা মনে উদিত হয় নাই, কিন্তু দেশ হইতে যত দূরে গিয়াছি— যত দিন চলিয়া গিয়াছে— হতভাগিনী রজনীর কথা ততই মনে পড়িয়াছে— আপনাকে ততই মনে পড়িয়াছে— আপনাকে ততই নিষ্ঠুর পিশাচ বলিয়া মনে হইয়াছে। আমার ইচ্ছা করে এখনই দেশে ফিরিয়া যাই, তাহাকে যত্ন করি, তাহাকে ভালোবাসি, তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। সে হয়তো এতদিনে আমার কলঙ্কের কথা শুনিয়াছে। আমি তাহার কাছে কী বলিয়া দাঁড়াইব। না ভাই, আমি তাহা পারিব না।…

মহেন্দ্র

আমি দেখিতেছি, যে-সকল বাহ্য কারণে মহেন্দ্রের রজনীর উপর বিরাগ ছিল, সে-সকল কারণ হইতে দূরে থাকিয়া মহেন্দ্র একটু ভাবিবার অবসর পাইয়াছে। যতই তাহার আপনার নিষ্ঠুরাচরণ মনে উদিত হইয়াছে ততই রজনীর উপর মমতা তাহার দৃঢ়মূল

হইয়াছে। মহেন্দ্র এখন ভাবিয়াই পাইতেছে না তাহাকে কেন ভালোবাসে নাই— এমন মৃদু, কোমল, স্নিগ্ধ স্বভাব, তাহাকে ভালোবাসে না এমন পিশাচ আছে! কেন, তাহাকে দেখিতেই বা কী মন্দ! মন্দ? কেন, অমন সুন্দর স্নেহপূর্ণ চক্ষু! অমন কোমল ভাবব্যঞ্জক মুখশ্রী! ভাব লইয়া রূপ, না, বর্ণ লইয়া? রজনীর যাহা-কিছু ভালো তাহাই মহেন্দ্রের মনে পড়িতে লাগিল, আর তাহার যাহা-কিছু মন্দ তাহাও মহেন্দ্র ভালো বলিয়া দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। ক্রমে রজনীকে যতই ভালো বলিয়া বুঝিল, আপনাকে ততই পিশাচ বলিয়া মনে হইল।

মহেন্দ্রের সেখানে বিলক্ষণ পসার হইয়াছে। মাসে প্রায় দুই শত টাকা উপার্জন করিত। কিন্তু প্রায় সমস্তই রজনীর কাছে পাঠাইয়া দিত, নিজের জন্য এত অল্প টাকা রাখিয়া দিত যে, আমি ভাবিয়া পাই না কী করিয়া তাহার খরচ চলিত!

অনেক দিন হইয়া গেছে মহেন্দ্রের বাড়ি আসিতে বড়োই ইচ্ছা হয়, কিন্তু সকল কথা মনে উঠিলে আর ফিরিয়া আসিতে পা সরে না। মহেন্দ্র একটা চিঠি পাইয়াছে, পাইয়া অবধি বড়োই অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। ইহা সেই মোহিনীর চিঠি। চিঠির শেষ ভাগে লিখা আছে— 'আপনি যদি রজনীকে নিতান্তই দেখিতে না পারেন, যদি রজনী এখানে আছে বলিয়া আপনি নিতান্তই আসিতে না চান তবে আপনার আশঙ্কা করিবার বিশেষ কোনো কারণ নাই, সে তাহার দিদির বাড়ি চলিয়া যাইবে। রজনী লিখিতে জানে না বলিয়া আমি তাহার হইয়া লিখিয়া দিলাম। সে লিখিতে জানিলেও হয়তো আপনাকে লিখিতে সাহস করিত না।'

ইহার মৃদু তিরস্কার মহেন্দ্রের মর্মের মধ্যে বিদ্ধ হইয়াছে। সে স্থির করিয়াছে, দেশে ফিরিয়া যাইবে।

রজনীর শরীর দিনে দিনে ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে। মুখ বিবর্ণ ও বিষণ্ণতর হইতেছে। একদিন সন্ধ্যাবেলা সে মোহিনীর গলা ধরিয়া বলিল, "দিদি, আর আমি বেশিদিন বাঁচিব না।"

মোহিনী কহিল, "সেকি রজনী, ও কথা বলিতে নাই।"

রজনী বলিল, "হাঁ দিদি, আমি জানি, আর আমি বেশিদিন বাঁচিব না। যদি এর মধ্যে তিনি না আসেন তবে তাঁকে এই টাকাগুলি দিয়ো। তিনি আমাকে মাসে মাসে টাকা পাঠাইয়া দিতেন, কিন্তু আমার খরচ করিবার দরকার হয় নাই, সমস্ত জমাইয়া রাখিয়াছি।"

মোহিনী অতিশয় স্নেহের সহিত রজনীর মুখ তাহার বুকে টানিয়া লইয়া বলিল, "চুপ কর্, ও-সব কথা বলিস নে।"

মোহিনী অনেক কষ্টে অশ্রুসম্বরণ করিয়া মনে মনে কহিল, 'মা ভগবতি, আমি যদি এর দুঃখের কারণ হয়ে থাকি, তবে আমার তাতে কোনো দোষ নাই।'

হাত-অবসর পাইলেই রজনীর শাশুড়ি রজনীকে লইয়া পড়িতেন, নানা জন্তর সহিত তাহার রূপের তুলনা করিতেন, আর বলিতেন যে বিবাহের সম্বন্ধ হওয়া অবধিই তিনি জানিতেন যে এইরূপ একটা দুর্ঘটনা হইবে— তবে জানিয়া শুনিয়া কেন যে বিবাহ দিলেন সে কথা উত্থাপন করিতেন না। রজনী না থাকিলে মহেন্দ্রবিয়োগে তাঁহার মাতার অধিকতর কষ্ট হইত, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই-যে মাঝে মাঝে মন খুলিয়া তিরস্কার করিতে পান, ইহাতে তাঁহার মন অনেকটা ভালো আছে। মহেন্দ্রের মাতার স্বভাব যত দূর জানি তাহাতে তো এক-একবার আমার মনে হয়— এই-যে তিরস্কার করিবার তিনি সুযোগ পাইয়াছেন ইহাতে বোধ হয় মহেন্দ্রের বিয়োগও তিনি ভাগ্য বলিয়া মানেন। মহেন্দ্রের অবস্থান কালে, রজনী যেদিন কোনো দোষ না করিত সেদিন মহেন্দ্রের মাতা মহা মুশকিলে পড়িয়া যাইতেন। অবশেষে ভাবিয়া ভাবিয়া দুই বৎসরের পুরানো কথা লইয়া তাহার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া আসিতেন। কিন্তু এই ঘটনায় পর তাঁহার তিরস্কারের ভাণ্ডার সর্বদাই মজুত রহিয়াছে, অবসর পাইলেই হয়।

ইতিমধ্যে মহেন্দ্রের মা মহেন্দ্রকে এক লোভনীয় পত্র পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার 'বাবা'কে তিনি নিশ্চিন্ত হইতে কহিয়াছেন ও সংবাদ দিয়াছেন যে, তাঁহার জন্য একটি সুন্দরী কন্যা অনুসন্ধান করা যাইতেছে। এই চিঠি পাইয়া মহেন্দ্রের আপনার উপর দ্বিগুণ লজ্জা উপস্থিত হইয়াছে— 'তবে সকলেই মনে করিয়াছে আমি রূপের কাঙাল! রজনী দেখিতে ভালো নয় বলিয়াই আমি তাহার উপর নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছি? লোকের কাছে মুখ দেখাইব কোন্ লজ্জায়।'

কিন্তু রজনীর আজকাল অল্প তিরস্কারই অত্যন্ত মনে লাগে, আগেকার অপেক্ষাও সে কেমন ভীত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার শরীর যতই খারাপ হইতেছে ততই সে ভয়ে ত্রস্ত ও তিরস্কারে অধিকতর ব্যথিত হইয়া পড়িতেছে, ক্রমাগত তিরস্কার শুনিয়া শুনিয়া আপনাকে সত্য-সত্যই দোষী বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে। মোহিনী প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা তাহার কাছে আসিত— প্রত্যহ তাহাকে যথাসাধ্য যত্ন করিত ও প্রত্যহ দেখিত সে দিনে দিনে অধিকতর দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। একদিন রজনী সংবাদ পাইল মহেন্দ্র বাড়ি ফিরিয়া আসিতেছে। আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু

তাহার কিসের আহ্লাদ! মহেন্দ্র তো তাহাকে সেই ঘৃণাচক্ষে দেখিবে। তাহা হউক, কিন্তু তাহার জন্ত মহেন্দ্র যে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে কষ্ট পাইতেছে এ আত্মগ্লানির যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইল— যে কারণেই হউক, মহেন্দ্র যে বিদেশে গিয়া কষ্ট পাইতেছে ইহা রজনীর অতিশয় কষ্টকর হইয়াছিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

কাশীর স্টেশনে করুণা-সংক্রান্ত যে-সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছিল, একজন ভদ্রলোক তাহা সমস্ত পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। স্বরূপকে দেখিয়া তিনি কেমন লজ্জিত ও সংকুচিত হইয়া সরিয়া গিয়াছিলেন। যখন দেখিলেন সকলে চলিয়া গেল এবং করুণা মূর্ছিত হইয়া পড়িল তখন তিনি তাহাকে একটা গাড়িতে তুলিয়া তাঁহার বাসাবাড়িতে লইয়া যান— তাঁহার কোথায় যাইবার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু যাওয়া হইল না। করুণার মুখ দেখিয়া, এমন কে আছে যে তাহাকে দোষী বলিয়া সন্দেহ করিতে পারে? মহেন্দ্রও তাহাকে সন্দেহ করে নাই। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম— সেই ভদ্রলোকটি মহেন্দ্র।

লাহোর হইতে আসিবার সময় একবার কাশীতে আসিয়াছিলেন। কলিকাতার ট্রেনের জন্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময়ে এই-সমস্ত ঘটনা ঘটে। করুণা চেতনা পাইলে মহেন্দ্র তাহাকে তাঁহার সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। মহেন্দ্রের মুখে এমন দয়ার ভাব প্রকাশ পাইতেছিল যে, করুণা শীঘ্রই সাহস পাইল। কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাকে কহিল এবং ঠিক সে যেমন করিয়া ভবিকে জিজ্ঞাসা করিত তেমন করিয়া মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, কেন নরেন্দ্র তাহার উপর অমন রাগ করিল। মহেন্দ্র বালিকার সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না— কিন্তু এই প্রশ্ন শুনিয়া তাহার চক্ষে জল আসিয়াছিল। নরেন্দ্রকে মহেন্দ্র বেশ চেনে, সে সমস্ত ঘটনা বেশ বুঝিতে পারিল। পণ্ডিতমহাশয় যে কেন তাহাকে অমন করিয়া ফেলিয়া গেলেন তাহাও করুণা ভাবিয়া পাইতেছিল না, অনেকক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া তাহাও মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল। মহেন্দ্র তাহার যথার্থ কারণ যাহা বুঝিয়াছিলেন তাহা গোপন করিয়া নানারূপে বুঝাইয়া দিলেন।

এখন করুণাকে লইয়া যে কী করিবে মহেন্দ্র তাহাই ভাবিতে লাগিল। অবশেষে স্থির হইল তাহাদের বাড়িতেই লইয়া যাইবে। মহেন্দ্র করুণার নিকট তাহার বাড়ির বর্ণনা করিল। কহিল— তাহাদের বাড়ির সামনেই একটি প্রাচীর-দেওয়া বাগান আছে, বাগানের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে, পুষ্করিণীর উপরে একটি বাঁধানো শানের

ঘাট। কহিল— তাহাদের বাড়িতে গেলে করুণা তাহার একটি দিদি পাইবে, তেমন স্নেহশালিনী— তেমন কোমলহৃদয়— তেমন ক্ষমাশীলা (আরো অসংখ্য বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছিল) দিদি কেহই কখনো পায় নাই। করুণা অমনি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল সেখানে কি ভবির দেখা পাইবে! মহেন্দ্র ভবির সন্ধান করিবে বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন করুণা তাঁহাকে ভ্রাতার মতো দেখিবে কি না, করুণার তাহাতে কোনো আপত্তি ছিল না। যাহা হউক, এতদিন পরে করুণার মুখ প্রফুল্ল দেখিলাম, এতদিন পরে সে তবু আশ্রয় পাইল। কিন্তু বারবার করুণা মহেন্দ্রকে পণ্ডিতমহাশয়ের তাহার উপর রাগ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছে।

অবশেষে তাহারা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। কাশী পরিত্যাগ করিয়া চলিল। কে কী বলিবে, কে কী করিবে, কখন কী হইবে— এই-সমস্ত ভাবিতে ভাবিতে ও যদি কেহ কিছু বলে তবে তাহার কী উত্তর দিবে, যদি কেহ কিছু করে তবে তাহার কী প্রতিবিধান করিবে, যদি কখনো কিছু হয় তবে সে অবস্থায় কিরূপ ব্যবহার করিবে— এই-সমস্ত ঠিক করিতে করিতে মহেন্দ্র গ্রামের রাস্তায় গিয়া পৌঁছিল। লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া, সংকোচে অভিভূত হইয়া, পথিকদিগের চক্ষু এড়াইয়া ও কোনোমতে পথ পার হইয়া গৃহের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইল।

কতবার সাত-পাঁচ করিয়া পরে প্রবেশ করিল। দাদাবাবুকে দেখিয়াই ঝি ঝাঁটা রাখিয়া ছুটিয়া বড়োমা'কে খবর দিতে গেল। বড়োমা তখন রজনীর সুমুখে বসিয়া রজনীর রূপের ব্যাখ্যান করিতেছিলেন, এমন সময়ে খবর পাইলেন যে আর-একটি নূতন বধূ লইয়া তাহার 'বাবা' ঘরে আসিয়াছেন।

মহেন্দ্রের ও করুণার সহিত সকলের সাক্ষাৎ হইল, যখন সকলে মিলিয়া উলু দিবার উদ্‌যোগ করিতেছেন এমন সময়ে মহেন্দ্র তাঁহাদিগকে করুণা-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিল। সে-সমস্ত বৃত্তান্ত মহেন্দ্রের মাতার বড়ো ভালো লাগে নাই। মহেন্দ্রের সম্মুখে কিছু বলিলেন না, কিন্তু সেই রাত্রে মহেন্দ্রের পিতার সহিত তাঁহার ভারি একটা পরামর্শ হইয়া গিয়াছিল ও অবশেষে রজনী পোড়ারমুখীই যে এই-সমস্ত বিপত্তির কারণ তাহা অবধারিত হইয়া গিয়াছিল। এই কথাটা লইয়া মহেন্দ্রের পিতার অতিরিক্ত আনা-দুয়েকের তামাকু ব্যয় হইয়াছিল ও দুই-চারিজন বৃদ্ধ বিজ্ঞ প্রতিবাসীদিগের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল, কিন্তু আর অধিক কিছু দুর্ঘটনা হয় নাই।

রজনী তাহার দিদির বাড়ি যাইবার সমস্তই বন্দোবস্ত করিয়াছিল, তাঁহার শ্বশুর

শাশুড়িরা এই বন্দোবস্তে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু রজনী বড়ো দুর্বল বলিয়া এখনো সমাধা হইয়া উঠে নাই। এই খবরটি আসিয়াই মহেন্দ্র তাঁহার মাতার নিকট হইতে শুনিতে পাইলেন। আশ্চর্যের স্বরে কহিলেন, "দিদির বাড়ি যাইবে, তার অর্থ কী। আমি আসিলাম আর অমনি দিদির বাড়ি যাইবে!"

মহেন্দ্রের মা'ও অবাক, মহেন্দ্রের পিতা কিছুক্ষণ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন— পরে ঠুঙি হইতে চশমা বাহির করিয়া পরিলেন এবং মহেন্দ্রকে দেখিতে লাগিলেন— যেন তিনি মিলাইয়া দেখিতে চান যে এ মহেন্দ্রের সহিত পূর্বকার মহেন্দ্রের কোনো আদল আছে কি না! এ মহেন্দ্র ঝুঁটা মহেন্দ্র কি না! মহেন্দ্র অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া তৎক্ষণাৎ রজনীর ঘরে চলিয়া গেলেন ও কর্তা গৃহিণীতে মিলিয়া ফুস্ ফুস্ করিয়া মহাপরামর্শ করিতে লাগিলেন।

রজনী মহেন্দ্রকে দেখিয়া মহা শশব্যস্ত হইয়া পড়িল, কেমন অপ্রস্তুত হইয়া গেল। সে মনে করিতে লাগিল, মহেন্দ্র তাহাকে দেখিয়া কি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে! তাহার তাড়াতাড়ি বলিবার ইচ্ছা হইল যে, 'আমি এখনই যাইতেছি, আমার সমস্তই প্রস্তুত হইয়াছে।' যখন সে এই গোলমালে পড়িয়া কী করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না, তখন মহেন্দ্র ধীরে ধীরে তাহার পার্শ্বে গিয়া বসিল। কী ভাগ্য! বিষণ্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি নাকি আজই দিদির বাড়ি যাবে। কেন রজনী।"

আর কি উত্তর দিবার জো আছে।— "আমি তোমার কাছে অনেক অপরাধ করিয়াছি, আমি তোমাকে কষ্ট দিয়াছি, কিন্তু তাহা কি ক্ষমা করিবে না।"

ওকি মহেন্দ্র! অমন করিয়া বলিয়ো না, রজনীর বুক ফাটিয়া যাইতেছে— "বলো, তাহা কি ক্ষমা করিবে না।"

রজনীর উত্তর দিবার কি ক্ষমতা আছে। সে পূর্ণ উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া উঠিল। মহেন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "একবার বলো ক্ষমা করিলে।"

রজনী ভাবিল— সেকি কথা। মহেন্দ্র কেন ক্ষমা চাহিতেছেন। সে জানিত তাহারই সমস্ত দোষ, সেই মহেন্দ্রের নিকট অপরাধী, কেননা তাহার জন্যই মহেন্দ্র এত কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, গৃহ ত্যাগ করিয়া কত বৎসর বিদেশে কাল যাপন করিয়াছেন, সে কোথায় মহেন্দ্রের নিকট ক্ষমা চাহিবে— তাহা না হইয়া একি বিপরীত! ক্ষমা চাহিবে কী, সে নিজেই ক্ষমা চাহিতে সাহস করে নাই। সে কি ক্ষমার যোগ্য। মহেন্দ্র রজনীর দুর্বল মস্তক কোলে তুলিয়া লইল। রজনী ভাবিল, 'এই সময়ে যদি মরি তবে কী সুখে মরি!' তাহার কেমন সংকোচ বোধ হইতে লাগিল, মহেন্দ্রের ক্রোড় তাহার নিকট যেন ভিখারির নিকট সিংহাসন।

মহেন্দ্র তাহাকে কত কী কথা বলিল, সে-সকল কথার উত্তর দিতে পারিল না। সে ভাবিল 'এ মধুর স্বপ্ন চিরস্থায়ী নহে— এই মুহূর্তে মরিতে পাইলে কী সুখী হই! কিন্তু এ অবস্থা কতক্ষণ রহিবে!' রজনীর এ সংকোচ শীঘ্র দূর হইল। রজনী তাহার কোলে মাথা রাখিয়া কতক্ষণ কত কী কথা কহিল— কত অশ্রুজল, কত কথা, কত হাসি, সে বলিবার নহে।

মহেন্দ্র যখন উঠিয়া যাইতে চাহিল তখন রজনী তাহাকে আর-একটু বসিয়া থাকিতে অনুরোধ করিল, যাহা আর কখনো করিতে সাহস করে নাই। রজনীর একি পরিবর্তন! যে সুখ সে কখনো আশা করে নাই, আপনাকে যে সুখ পাইবার যোগ্য বলিয়া মনে করে নাই, সেই সুখ সহসা পাইয়াছে— আহ্লাদে তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল— সে কী করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না।

সেই সন্ধ্যাবেলাই সে মোহিনীর বাড়িতে গেল, তাড়াতাড়ি তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে বসিল। মোহিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন রজনী, কী হয়েছে।"

সে মনে করিল মহেন্দ্র না জানি আবার কী অন্যায়াচরণ করিয়াছে।

রজনী তাহাকে সকল কথা বলিতে লাগিল— শুনিয়া মোহিনীও আহ্লাদে কাঁদিতে লাগিল। রজনীর দুই-এক মাসের মধ্যে যে কোনো ব্যাধি বা দুর্বলতা হইয়াছিল তাহার কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না। আর কখনো রজনীর ঘরকন্নার কাজে এত উৎসাহ কেহ দেখে নাই— শাশুড়ি মহা উগ্রভাবে কহিলেন, "হয়েছে, হয়েছে, ঢের হয়েছে, আর গিন্নিপনা করে কাজ নেই, দুদিন উপোস করে আছেন, সবে আজ ভাত খেয়েছেন, ওঁর গিন্নিপনা দেখে আর বাঁচি নে।"

এইখানে একটা কথা বলা আবশ্যক— রজনী যে দুদিন উপোস করিয়াছিল সে দুদিন কাজ করিতে পারে নি বলিয়া তাহার শাশুড়ি মহা বক্তৃতা দিয়াছিলেন ও ভবিষ্যতে যখনই রজনীর দোষের অভাব পড়িবে সেই দুই দিনের কথা লইয়া আবার বক্তৃতা যে দিবেন ইহাও নিশ্চিত, এ বিষয়ে কোনো পাঠকের সন্দেহ উপস্থিত না হয়।

দেখিতে দেখিতে করুণার সহিত রজনীর মহা ভাব হইয়া গেল। দুইজনের ফুস্‌ফুস্‌ করিয়া মহা মনের কথা পড়িয়া গেল— তাহাদের কথা আর ফুরায় না। তাহাদের স্বামীদের কত দিনকার সামান্য যত্ন, সামান্য আদরটুকু তাহারা মনের মধ্যে গাঁথিয়া রাখিয়াছে— তাহাই কত মহান ঘটনার মতো বলাবলি করিত। কিন্তু এ বিষয়ে তো দুইজনেরই ভাণ্ডার অতি সামান্য, তবে কী যে কথা হইত তাহারাই জানে। হয়তো

সে-সব কথা লিখিলে পাঠকেরা তাহার গাম্ভীর্য বুঝিতে পারিবেন না, হয়তো হাসিবেন, হয়তো মনে করিবেন এ-সব কোনো কাজেরই কথা নয়। কিন্তু সে বালিকারা যে-সকল কথা লইয়া অতি গুপ্তভাবে অতি সাবধানে আন্দোলন করিয়াছে তাহাই লইয়া যে সকলে হাসিবে, সকল কথা তুচ্ছভাবে উড়াইয়া দিবে তাহা মনে করিলে কষ্ট হয়। কিন্তু করুণার সঙ্গে রজনী পারিয়া উঠে না— সে এক কথা সাতবার করিয়া বলিয়া, সব কথা একেবারে বলিতে চেষ্টা করিয়া, কোনো কথাই ভালো করিয়া বুঝাইতে না পারিয়া রজনীর এক প্রকার মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। তাহারই কথা ফুরায় নাই তো কেমন করে সে রজনীর কথা শুনিবে! তাহার কি একটা-আধটা কথা। তাহার পাখির কথা, তাহার ভবির কথা, তাহার কাঠবিড়ালির গল্প— সে কবে কী স্বপ্ন দেখিয়াছিল— তাহার পিতার নিকট দুই রাজার কী গল্প শুনিয়াছিল— এ-সমস্ত কথা তাহার বলা আবশ্যক। আবার বলিতে বলিতে যখন হাসি পাইত তখন তাহাই বা থামায় কে। আর, কেন যে হাসি পাইল তাহাই বা বুঝে কাহার সাধ্য। রজনী-বেচারির বড়ো বেশি কথা বলিবার ছিল না, কিন্তু বেশি কথা নীরবে শুনিবার এমন আর উপযুক্ত পাত্র নাই। রজনী কিছুতেই বিরক্ত হইত না, তবে এক-এক সময়ে অন্যমনস্ক হইত বটে— তা, তাহাতে করুণার কী ক্ষতি। করুণার বলা লইয়া বিষয়।

করুণাকে লইয়া মহেন্দ্রের মাতা বড়ো ভাবিত আছেন। তাঁহার বয়স বড়ো কম নহে, পঞ্চান্ন বৎসর— এই পঞ্চান্ন বৎসরের অভিজ্ঞতায় তিনি ভদ্রলোকের ঘরে এমন বেহায়া মেয়ে কখনো দেখেন নাই, আবার তাঁহার প্রতিবেশিনীরা তাহাদের বাপের বয়সেও এমন মেয়ে কখনো দেখে নাই বলিয়া স্পষ্ট স্বীকার করিয়া গেল। মহেন্দ্রের পিতা তামাকু খাইতে খাইতে কহিতেন যে, ছেলেমেয়েরা সবাই খৃস্টান হইয়া উঠিল। মহেন্দ্রের মাতা কহিতেন সে কথা মিছা নয়, মহেন্দ্রের মাতা মাঝে মাঝে রজনীকে সম্বোধন করিয়া করুণার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া কহিতেন, 'আজ বাগানে বড়ো গলা বাহির করা হইতেছিল! লজ্জা করে না!' কিন্তু তাহাতে করুণা কিছুই সাবধান হয় নাই। কিন্তু এ তো করুণার শান্ত অবস্থা, করুণা যখন মনের সুখে তাহার পিতৃভবনে থাকিত তখন যদি এই পঞ্চান্ন বৎসরের অভিজ্ঞ গৃহিণী তাহাকে দেখিতেন তবে কী করিতেন বলিতে পারি না।

আবার এক-একবার যখন বিষণ্ন ভাব করুণার মনে আসিত তখন তাহার মূর্তি সম্পূর্ণ বিপরীত। আর তাহার কথা নাই, হাসি নাই, গল্প নাই, সে এক জায়গায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে— রজনী পাশে বসিয়া 'লক্ষ্মী দিদি আমার' বলিয়া কত সাধাসাধি করিলে উত্তর নাই। করুণা প্রায় মাঝে মাঝে এমনি বিষণ্ন হইত, কতক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়া

কাঁদিয়া তবে সে শান্ত হইত। একদিন কাঁদিতে কাঁদিতে মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, "নরেন্দ্র কোথায়।"

মহেন্দ্র কহিল, "আমি তো জানি না।"

করুণা কহিল, "কেন জান না।"

কেন জানে না সে কথা মহেন্দ্র ঠিক করিয়া বলিতে পারিল না, তবে নরেন্দ্রের সন্ধান করিতে স্বীকার করিল।

কিন্তু নরেন্দ্রের অধিক সন্ধান করিতে হইল না। নরেন্দ্র কেমন করিয়া তাহার সন্ধান পাইয়াছে। একদিন করুণা যখন রজনীর নিকট দুই রাজার গল্প করিতে ভারি ব্যস্ত ছিল, এমন সময়ে ডাকে তাহার নামে একখানি চিঠি আসিল। এ পর্যন্তও তাহার বয়সে সে কখনো নিজের নামের চিঠি দেখে নাই। এ চিঠি পাইয়া করুণার মহা আহ্লাদ হইল, সে জানিত চিঠি পাওয়া এক মহা কাণ্ড, রাজা-রাজড়াদেরই অধিকার। আস্ত চিঠি ছিঁড়িয়া খুলিতে তাহার কেমন মায়া হইতে লাগিল, আগে সকলকে দেখাইয়া অনেক অনিচ্ছার সহিত লেফাফা খুলিল, চিঠি পড়িল, চিঠি পড়িয়া তাহার মুখ শুখাইয়া গেল, থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে চিঠি মহেন্দ্রকে দিল।

নরেন্দ্র লিখিতেছেন— 'তিন শত টাকা আমার প্রয়োজন, না পাইলে আমার সর্বনাশ, না পাইলে আমি আত্মহত্যা করিয়া মরিব। ইতি।'

করুণা কাঁদিয়া উঠিল। করুণা মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, "কী হবে।"

মহেন্দ্র কহিল কোনো ভাবনা নাই, এখনি টাকা লইয়া সে যাইতেছে। নরেন্দ্রের ঠিকানা চিঠিতে লিখা ছিল, সেই ঠিকানা-উদ্দেশে মহেন্দ্র চলিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র দেশে আসিয়া অবধি মোহিনীর বড়ো খোঁজ-খপর পাওয়া যায় না। মহেন্দ্র তো তাহার কোনো কারণ খুঁজিয়া পায় না— 'একদিন কী অপরাধ করিয়াছিলাম তাহার জন্য কি দুইজনের এ জন্মের মতো ছাড়াছাড়ি হইবে?' সে মনে করিল হয়তো মোহিনী রাগ করিয়াছে, হয়তো মোহিনী তাহাকে ভালোবাসে না। পাঠকেরা শুনিলে বোধ হয় সন্তুষ্ট হইবেন না যে, মহেন্দ্র এখনো মোহিনীকে ভালোবাসে। কিন্তু মহেন্দ্রের সে ভালোবাসার পক্ষে যে যুক্তি কত, তাহা শুনিলে কাহারো আর কথা কহিবার জো থাকিবে না। সে বলে, 'মানুষকে ভালোবাসিতে দোষ কী। আমি তো মোহিনীকে তেমন ভালোবাসি না, আমি তাহাকে ভগিনীর মতো, বন্ধুর মতো ভালোবাসি— আমি কখনো তাহার অধিক তাহাকে ভালোবাসি না।' এই কথা এত

বিশেষ করিয়া ও এত বার বার বলিত যে তাহাতেই বুঝা যাইত তদপেক্ষাও অধিক ভালোবাসে। সে আপনার মনকে ভ্রান্ত করিতে চেষ্টা করিত, সুতরাং ঐ এক কথা তাহাকে বার বার বিশেষ করিয়া বলিতে হইত। ঐ এক কথা বার বার বলিয়া তাহার মনকে বিশ্বাস করাইতে চাহিত, তাহার মন এক-একবার অল্প-অল্প বিশ্বাস করিত। সে বলিত, 'আপনার ভগিনীর মতো, বন্ধুর মতো যদি মোহিনী মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসে তাহাতে দোষ কী। বরং না আসিলেই দোষ। কেন, মোহিনী তো আর-সকলের সঙ্গেই দেখা করিতে পারে, তবে আমার সঙ্গে দেখা করিতে পারিবে না কেন। যেন সত্য-সত্যই আমাদের মধ্যে কোনো সমাজবিরুদ্ধ ভাব আছে— কিন্তু তাহা তো নাই, নিশ্চয় তাহা নাই, তাহা থাকা অসম্ভব। আমি রজনীকে প্রেমের ভাবে ভালোবাসি, সকলের অপেক্ষা ভালোবাসি— আমি মোহিনীকে কেবল ভগিনীর মতো ভালোবাসি।' মহেন্দ্র এইরূপে মনের মধ্যে সকল কথা তোলাপাড়া করিত। এমন-কি, রজনীকেও তাহার এই-সকল যুক্তি বুঝাইয়াছিল। রজনীর বুঝিতে কিছুই গোল বাধে নাই, সে বেশ স্পষ্টই বুঝিয়াছিল। সে নিজে গিয়া মোহিনীকে ঐ-সমস্ত কথা বুঝাইল, মোহিনী বিশেষ কিছুই উত্তর দিল না। মনে-মনে কহিল, 'সকলের মন জানি না, কিন্তু আমার নিজের মনের উপর আমার বিশ্বাস নাই।' মোহিনী ভাবিল— আর না, আর এখানে থাকা শ্রেয় নহে। মোহিনী কাশী যাইবার সমস্ত বন্দোবস্ত করিল, বাড়ির লোকেরা তাহাতে অসম্মত হইল না।

কাশী যাইবার সময় করুণা ও রজনীর সহিত একবার দেখা করিল। করুণা কহিল, "তুমি কাশী যাইতেছ, যদি আমাদের পণ্ডিতমহাশয়ের সঙ্গে দেখা হয় তবে তাঁহাকে বলিয়ো আমি ভালো আছি।"

করুণা জানিত যে, পণ্ডিতমহাশয় নিশ্চয় তাহার কুশলসংবাদ পাইবার জন্য আকুল আছেন।

করুণা যাহা মনে করিয়াছিল তাহা মিথ্যা নহে। নিধির পীড়াপীড়িতে রেলের গাড়িতে চড়িয়া পণ্ডিতমহাশয়ের এমন অনুতাপ হইয়াছিল যে অনেকবার তিনি চীৎকার করিয়া গাড়ি থামাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। 'গারোয়ান' যখন কিছুতেই ব্রাহ্মণের দোহাই মানিল না, তখন তিনি ক্ষান্ত হন। কিন্তু বার বার কাতরস্বরে নিধিকে বলিতে লাগিলেন 'কাজটা ভালো হইল না'। দুই-চার-বার এইরূপ বলিতেই নিধি মহা বিরক্ত হইয়া বিলক্ষণ একটি ধমক দিয়া উঠিল। পণ্ডিতমহাশয় নিধিকে আর-কিছু বলিতে সাহস করিলেন না; কিন্তু গাড়ির কোণে বসিয়া এক ডিবা নস্য সমস্ত নিঃশেষ করিয়াছিলেন ও তাঁহার চাদরের এক অংশ অশ্রুজলে সম্পূর্ণরূপে ভিজাইয়া ফেলিয়াছিলেন। কেবল

গাড়িতে নয়, যেখানে গিয়াছেন নিধিকে বার-বার ঐ এক কথা বলিয়া বিরক্ত করিয়াছেন। কাশীতে ফিরিয়া আসিয়া যখন করুণাকে দেখিতে পাইলেন না, তখন তাঁহার আর অনুতাপের পরিসীমা রহিল না। নিধিকে ঐ এক কথা বলিয়া এমন বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, সে একদিন কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার সমস্ত উদ্যোগ করিয়াছিল।

মোহিনী কহিল, "তোমাদের পণ্ডিতমহাশয়কে তো আমি চিনি না, যদি চিনাশুনা হয়, তবে বলিব।"

করুণা একেবারে অবাক হইয়া গেল। পণ্ডিতমহাশয়কে চিনে না! সে জানিত পণ্ডিতমহাশয়কে সকলেই চিনে। সে মোহিনীকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিল কোন্ পণ্ডিতমহাশয়ের কথা কহিতেছে, কিন্তু তাহাতেও যখন মোহিনী পণ্ডিতমহাশয়কে চিনিল না তখন করুণা নিরাশ ও অবাক হইয়া গেল।

কাঁদিতে কাঁদিতে রজনীর কাছে বিদায় লইয়া মোহিনী কাশী চলিয়া গেল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

বর্ষা কাল। দুই দিন ধরিয়া বাদলার বিরাম নাই। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, কলিকাতার রাস্তায় ছাতির অরণ্য পড়িয়া গিয়াছে। সসংকোচ পথিকদের সর্বাঙ্গে কাদা বর্ষণ করিতে করিতে গাড়ি ছুটিতেছে।

মহেন্দ্র নরেন্দ্রের সন্ধানে বাহির হইয়াছেন। বড়ো রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করাইয়া একটি অতি সংকীর্ণ অন্ধকার গলির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দুটা-একটা খোলার ঘর ভাঙিয়া-চুরিয়া পড়িতেছে ও তাহার দুই প্রৌঢ়া অধিবাসিনী অনেকক্ষণ ধরিয়া বকাবকি করিয়া অবশেষে চুলাচুলি করিবার বন্দোবস্ত করিতেছে। ভাঙা হাঁড়ি, পচা ভাত, আমের আঁটি ও পৃথিবীর আবর্জনা গলির যেখানে সেখানে রাশীকৃত রহিয়াছে।

একটি দুর্গন্ধ পুষ্করিণীর তীরে আস্তাবল-রক্ষকের মহিলারা আঁচল ভরিয়া তাঁহাদের আহারের জন্য উদ্ভিজ্জ সঞ্চয় করিতেছেন। হুঁচট খাইতে খাইতে— কখনো-বা এক-হাঁটু কাদায় কখনো-বা এক-হাঁটু ঘোলা জলে জুতা ও পেন্টলুন্‌টাকে পেন্সন দিবার কল্পনা করিতে করিতে— সর্বাঙ্গে কাদামাখা দুই-চারিটা কুকুরের নিকট হইতে অশ্রান্ত তিরস্কার শুনিতে শুনিতে মহেন্দ্র গোবর-আচ্ছাদিত একটি অতি মুমূর্ষু বাটীতে গিয়া পৌঁছিলেন। দ্বারে আঘাত করিলেন, জীর্ণ শীর্ণ দ্বার বিরক্ত রোগীর মতো মৃদু আর্তনাদ করিতে করিতে খুলিয়া গেল। নরেন্দ্র গৃহে ছিলেন, কিন্তু বৎসর-কয়েকের মধ্যে পুলিসের কনস্টেবল ছাড়া

নরেন্দ্রের গৃহে আর-কোনো অতিথি আসে নাই— এইজন্য দ্বার খুলিবার শব্দ শুনিয়াই নরেন্দ্র অন্তর্ধান করিয়াছেন।

দ্বার খুলিয়াই মহেন্দ্র আবর্জনা ও দুর্গন্ধ -ময় এক প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিলেন। সে প্রাঙ্গণের এক পাশে একটা কূপ আছে, সে কূপের কাছে কতকগুলা আমের আঁটি হইতে ছোটো ছোটো চারা উঠিয়াছে। সে কূপের উপরে একটা পেয়ারা গাছ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। প্রাঙ্গণ পার হইয়া সংকুচিত মহেন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিলেন। এমন নিম্ন ও এমন স্যাঁৎসেঁতে ঘর বুঝি মহেন্দ্র আর কখনো দেখে নাই, ঘর হইতে এক প্রকার ভিজা ভাপসা গন্ধ বাহির হইতেছে। বৃষ্টির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ভগ্ন জানালায় একটা ছিন্ন দরমার আচ্ছাদন রহিয়াছে। সে গৃহের দেয়ালে যে এক কালে বালি ছিল, সে পাড়ায় এইরূপ একটা প্রবাদ আছে মাত্র। এক জায়গায় ইঁটের মধ্যে একটি গর্তে খানিকটা তামাক গোঁজা আছে। গৃহসজ্জার মধ্যে একখানি অবিশ্বাসজনক তক্তা (যদি তাহার প্রাণ থাকিত তবে তাহা ব্যবহার করিলে পশু-নৃশংসতানিবারিণী সভায় অনেক টাকা জরিমানা দিতে হইত)— তাহার উপরে মললিপ্ত মসীবর্ণ একখানি মাদুর ও তদুপযুক্ত বালিশ ও সর্বোপরি স্বকার্যে অক্ষম দীনহীন একটি মশারি।

গৃহে প্রবেশ করিয়া মহেন্দ্র একটি দাসীকে দেখিতে পাইলেন। সে দাসীটি তাঁহাকে দেখিয়াই ঈষৎ হাসিতে হাসিতে মৃদু ভর্ৎসনার স্বরে কহিল, "কেন গো বাবু, মানুষের গায়ের উপর না পড়িলেই কি নয়।"

মহেন্দ্র তাহার নিকট হইতে অন্তত দুই হস্ত ব্যবধানে ছিলেন ও তাহার দুর্গন্ধ বস্ত্র ও ভয়জনক মুখশ্রী দেখিয়া আরো দুই হস্ত ব্যবধানে যাইবার সংকল্প করিতেছিলেন। কিন্তু মহেন্দ্রের যে তাহার কাছে যাওয়াই লক্ষ্য ছিল, ইহা কল্পনা করিয়া সে দাসীটি মনে-মনে মহা পরিতৃপ্ত হইয়াছিল। যাহা হউক, এই দাসী গিয়া ভীত নরেন্দ্রকে অনেক আশ্বাস দিয়া ডাকিয়া আনিল। নরেন্দ্র মহেন্দ্রকে দেখিয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য হইল না, সে যেন তাঁহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল।

কিন্তু মহেন্দ্র নরেন্দ্রকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল— এমন পরিবর্তন সে আর কাহারো দেখে নাই। অনাবৃত দেহ, অল্পপরিসর জীর্ণ মলিন বস্ত্রে হাঁটু পর্যন্ত আচ্ছাদিত। মুখশ্রী অত্যন্ত বিকৃত হইয়া গিয়াছে, চক্ষু জ্যোতিহীন, কেশপাশ অপরিচ্ছন্ন ও বিশৃঙ্খল, সর্বদাই হাত থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, বর্ণ এমন মলিন হইয়া গিয়াছে যে আশ্চর্য হইতে হয়— তাহাকে দেখিলেই কেমন এক প্রকার ঘৃণা ও সংকোচ উপস্থিত হয়। নরেন্দ্র অতি শান্তভাবে মহেন্দ্রকে তাঁহার নিজের ও তাঁহার সংক্রান্ত সমস্ত লোকের

কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, কাজকর্ম কিরূপ চলিতেছে তাহাও খোঁজ লইলেন। মহেন্দ্র নরেন্দ্রের এই অতি শান্তভাব দেখিয়া অত্যন্ত অবাক হইয়া গিয়াছেন— মহেন্দ্রকে দেখিয়া নরেন্দ্র কিছুমাত্র লজ্জা বা সংকোচ বোধ করেন নাই।

মহেন্দ্র আর কিছু না বলিয়া নরেন্দ্রের চিঠিটি তাহার হস্তে দিল। সে অবিচলিত ভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "হাঁ মশায়, সম্প্রতি অবস্থা মন্দ হওয়াতে কিছু দেনা হইয়াছে, তাই বড়ো জড়াইয়া পড়িয়াছি।"

মহেন্দ্র কহিলেন, "তা, আপনার স্ত্রীর নিকট সাহায্য চাহিবার অর্থ কী। উপার্জনের ভার তো আপনার হাতে। আর, তিনি অর্থ পাইবেন কোথা।"

নির্লজ্জ নরেন্দ্র কহিল, "সেকি কথা! আমি সন্ধান লইয়াছি, আজকাল সে খুব উপার্জন করিতেছে। দিনকতক স্বরূপবাবু তাহাকে পালন করিয়াছিলেন, শুনিলাম আজকাল আর কোনো বাবুর আশ্রয়ে আছে।"

মহেন্দ্র ইচ্ছাপূর্বক কথাটার মন্দ অর্থ না লইয়া কিঞ্চিৎ দৃঢ় স্বরে কহিলেন, "আপনি জানেন তিনি আমার বাটীতেই আছেন।"

নরেন্দ্র কহিলেন, "আপনারই বাটীতে? সে তো ভালোই।"

মহেন্দ্র কহিলেন, "কিন্তু তাঁহার কাছে অর্থ থাকিবার তো কোনো সম্ভাবনা নাই।"

নরেন্দ্র কহিলেন, "তা যদি হয়, তবে আমার চিঠির উত্তরে সে কথা লিখিয়া দিলেই হইত।"

মহেন্দ্র যেরূপ ভালো মানুষ, অধিক গোলযোগ করা তাঁহার কর্ম নয়। বকাবকি করিতে আরম্ভ করিলে তাহার আর অন্ত হইবে না জানিয়া মহেন্দ্র প্রস্তাব করিলেন— নরেন্দ্র যদি তাঁহার কু-অভ্যাসগুলি পরিত্যাগ করেন তবে তিনি তাঁহার সাহায্য করিবেন।

নরেন্দ্র আকাশ হইতে পড়িল; কহিল, "কু-অভ্যাস কী মশায়! নূতন কু-অভ্যাস তো আমার কিছুই হয় নাই, আমার যা অভ্যাস আছে সে তো আপনি সমস্ত জানেন।"

এই কথায় ভালোমানুষ মহেন্দ্র কিছু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল, সে তেমন ভালো উত্তর দিতে পারিল না। নরেন্দ্র পূর্বে এত কথা কহিতে জানিত না, বিশেষ মহেন্দ্রের কাছে কেমন একটু সংকোচ অনুভব করিত— সম্প্রতি দেখিতেছি সে ভারি কথা কাটাকাটি করিতে শিখিয়াছে। তাহার স্বভাব আশ্চর্য বদল হইয়া গিয়াছে।

মহেন্দ্র শীঘ্র শীঘ্র তাহার সহিত মীমাংসা করিয়া লইয়া তাহাকে টাকা দিলেন ও কহিলেন, ভবিষ্যতে নরেন্দ্র যেন তাঁহার স্ত্রীকে অন্যায় ভয় দেখাইয়া চিঠি না লেখেন।

মহেন্দ্র সেই আর্দ্র বাষ্পময় ঘর হইতে বাহির হইয়া বাঁচিলেন ও পথের মধ্যে একটা ডাক্তারখানা হইতে একশিশি কুইনাইন কিনিয়া লইয়া যাইবেন বলিয়া নিশ্চয় করিলেন। দ্বারের নিকট দাসীটি বসিয়াছিল, সে মহেন্দ্রকে দেখিয়া অতি মধুর দুই-তিনটি হাস্য ও কটাক্ষ বর্ষণ করিল ও মনে-মনে ঠিক দিয়া রাখিল— সেই কটাক্ষের প্রভাবে, মলয়-সমীরণে, চন্দ্রকিরণে মহেন্দ্র বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবে।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

আজকাল রজনী ভারি গিন্নি হইয়াছে। এখন তাহার হাতে টাকাকড়ি আসে। পাড়ার অধিকাংশ বৃদ্ধা ও প্রৌঢ়া গৃহিণীরা রজনীর শাশুড়ির সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া শিঙ ভাঙিয়া রজনীর দলে মিশিয়াছেন। তাঁহারা ঘণ্টাখানেক ধরিয়া রজনীর কাছে দেশের লোকের নিন্দা করিয়া, উঠিয়া যাইবার সময় হাই তুলিতে তুলিতে পুনশ্চ নিবেদনের মধ্যে আবশ্যকমত টাকাটা-শিকিটা ধার করিয়া লইতেন এবং রজনীর স্বামীর, রজনীর উচ্চবংশের ও চোখের জল মুছিতে মুছিতে রজনীর মৃত লক্ষ্মীস্বভাবা মাতার প্রশংসা করিয়া শীঘ্র সে ধারগুলি শুধিতে না হয় এমন বন্দোবস্ত করিয়া যাইতেন। কিন্তু এই পিসি-মাসি শ্রেণীর মধ্যে করুণার দুর্নাম আর ঘুচিল না। ঘুচিবে কিরূপে বলো। মাসি যখন সন্তোষজনকরূপে ভূমিকাটি শেষ করিয়া রজনীর কাছে কাজের কথা পাড়িবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে হয়তো করুণা কোথা হইতে তাড়াতাড়ি আসিয়া রজনীকে টানিয়া লইয়া বাগানে চলিল। মাঝে মাঝে তাঁহারা করুণার ব্যবহার দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, 'তুমি কেমন-ধারা গা ?' সে যে কেমন-ধারা করুণা তাহার কোনো হিসাব দিতে চেষ্টা করিত না। কোনো পিসির বিশেষ কথা, বিশেষ অঙ্গভঙ্গি বা বিশেষ মুখশ্রী দেখিলে এক-এক সময় তাহার এমন হাসি পাইত যে, সে সামলাইয়া উঠা দায় হইত, সে রজনীর গলা ধরিয়া মহা হাসির কল্লোল তুলিত— রজনী-সুদ্ধ বিব্রত হইয়া উঠিত। তাহা ছাড়া রজনীর গিন্নিপনা দেখিয়া সে এক-এক সময়ে হাসিয়া আর বাঁচিত না।

কিছুদিন হইতে মহেন্দ্র দেখিতেছেন বাড়িটা যেন শান্ত হইয়াছে। করুণার আমোদ আহ্লাদ থামিয়াছে। কিন্তু সে শান্তি প্রার্থনীয় নহে— হাস্যময়ী বালিকা হাসিয়া খেলিয়া বাড়ির সর্বত্র যেন উৎসবময় করিয়া রাখিত— সে একদিনের জন্য নীরব হইলে বাড়িটা যেন শূন্য-শূন্য ঠেকিত, কী যেন অভাব বোধ হইত। কয়দিন হইতে করুণা এমন বিষণ্ণ হইয়া গিয়াছিল— সে এক জায়গায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত, কাঁদিত, কিছুতেই প্রবোধ মানিত না। করুণা যখন এইরূপ বিষণ্ণ হইয়া থাকে তখন রজনীর

বড়ো কষ্ট হয়— সে বালিকার হাসি আহ্লাদ না দেখিতে পাইলে সমস্ত দিন তাহার কেমন কোনো কাজই হয় না।

নরেন্দ্রের বাড়ি যাইবে বলিয়া করুণা মহেন্দ্রকে ভারি ধরিয়া পড়িয়াছে। মহেন্দ্র বলিল, সে বাড়ি অনেক দূরে। করুণা বলিল, তা হোক্। মহেন্দ্র কহিল, সে বাড়ি বড়ো খারাপ। করুণা কহিল, তা হোক্! মহেন্দ্র কহিল, সে বাড়িতে থাকিবার জায়গা নাই। করুণা উত্তর দিল, তা হোক্! সকল আপত্তির বিরুদ্ধে এই 'তা হোক্' শুনিয়া মহেন্দ্র ভাবিলেন, নরেন্দ্রকে একটি ভালো বাড়িতে আনাইবেন ও সেইখানে করুণাকে লইয়া যাইবেন। নরেন্দ্রের সন্ধানে চলিলেন।

বাড়িভাড়া দিবার সময় হইয়াছে বলিয়াই হউক বা মহেন্দ্র তাঁহার বাড়ির ঠিকানা জানিতে পারিয়াছে বলিয়াই হউক, নরেন্দ্র সে বাড়ি হইতে উঠিয়া গিয়াছেন। মহেন্দ্র তাঁহার বৃথা অন্বেষণ করিলেন, পাইলেন না।

এই বার্তা শুনিয়া অবধি করুণার আর হাসি নাই। বিশেষ অবস্থায়, বিশেষ সময়ে সহসা এক-একটা কথা শুনিলে যেমন বুকে আঘাত লাগে, করুণার তেমনি আঘাত লাগিয়াছে। কেন, এতদিনেও কি করুণার সহিয়া যায় নাই। নরেন্দ্র করুণার উপর কত শত দুর্ব্যবহার করিয়াছে, আর আজ তাহার এক স্থানান্তর সংবাদ পাইয়াই কি তাহার এত লাগিল। কে জানে, করুণার বড়ো লাগিয়াছে। বোধ হয় ক্রমাগত জ্বালাতন হইয়া হইয়া তাহার হৃদয় কেমন জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল,আজ এই একটি সামান্য আঘাতেই ভাঙিয়া পড়িল। বোধ হয় এবার বেচারি করুণা বড়োই আশা করিয়াছিল যে বুঝি নরেন্দ্রের সহিত আবার দেখা-সাক্ষাৎ হইবে। তাহাতে নিরাশ হইয়া সে পৃথিবীর সমুদয় বিষয়ে নিরাশ হইয়াছে, হয়তো এই এক নিরাশা হইতেই তাহার বিশ্বাস হইয়াছে তাহার আর কিছুতেই সুখ হইবে না! করুণার মন একেবারে ভাঙিয়া পড়িল— যে ভাবনা করুণার মতো বালিকার মনে আসা প্রায় অসম্ভব, সেই মরণের ভাবনা তাহার মনে হইল। তাহার মনে হইল, এ সংসারে সে কেমন শ্রান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, সে আর পারিয়া ওঠে না, এখন তাহার মরণ হইলে বাঁচে। এখন আর অধিক লোকজন তাহার কাছে আসিলে তাহার কেমন কষ্ট হয়। সে মনে করে, 'আমাকে এইখানে একলা রাখিয়া দিক, আপনার মনে একলা পড়িয়া থাকিয়া মরি।' সে সকল লোকের নানা জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়া উঠিতে আর পারে না। সে সকল বিষয়েই কেমন বিরক্ত উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে। রজনী বেচারি কত কাঁদিয়া তাহাকে কত সাধ্য সাধনা করিয়াছে, কিন্তু এই আহত লতাটি জন্মের মতো ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছে— বর্ষার সলিলসেকে, বসন্তের বায়ুবীজনে, আর সে মাথা তুলিতে পারিবে না।

কিন্তু একি সংবাদ! মহেন্দ্র নরেন্দ্রের সন্ধান আবার পাইয়াছে শুনিতেছি। মহেন্দ্র করুণা ও নরেন্দ্রের জন্য একটি ভালো বাড়ি ভাড়া করিয়াছে। নরেন্দ্র মহেন্দ্রের ব্যয়ে সে বাড়িতে বাস করিতে সহজেই স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু একবার মন ভাঙিয়া গেলে তাহাতে আর স্ফূর্তি হওয়া সহজ নহে— করুণা এই সংবাদ শুনিল, কিন্তু তাহার অবসন্ন মন আর তেমন জাগিয়া উঠিল না। করুণা মহেন্দ্রদের বাড়ি হইতে বিদায় হইল— যাইবার দিন রজনী করুণার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কতই কাঁদিতে লাগিল। করুণা চলিয়া গেলে সে বাড়ি যেন কেমন শূন্য-শূন্য হইয়া গেল। সেই যে করুণা গেল, আর সে ফিরিল না। সে বাড়িতে সেই অবধি করুণার সেই সুমধুর হাসির ধ্বনি একদিনের জন্যও আর শুনা গেল না।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

পীড়িত অবস্থায় করুণা নরেন্দ্রের নিকট আসিল। মহেন্দ্র প্রায় মাঝে মাঝে করুণাকে দেখিতে আসিতেন; করুণা কখনো খারাপ থাকিত, কখনো ভালো থাকিত। এমনি করিয়া দিন চলিয়া যাইতেছে। নরেন্দ্র করুণাকে মনে মনে ঘৃণা করিত, কেবল মহেন্দ্রের ভয়ে এখনো তাহার উপর কোনো অসদ্‌ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে নাই। কিন্তু নরেন্দ্র প্রায় বাড়িতে থাকিত না— দুই-এক দিন বাদে যে অবস্থায় বাড়িতে আসিত, তখন করুণার কাছে না আসিলেই ভালো হইত। তাহার অবর্তমানে পীড়িতা করুণাকে দেখিবার কেহ লোক নাই। কেবল সেই দাসীটি মাঝে মাঝে আসিয়া বিরক্তির স্বরে কহিত, "তোমার কি ব্যামো কিছুতেই সারবে না গা। কী যন্ত্রণা!"

নরেন্দ্রের উপর এই দাসীটির মহা আধিপত্য ছিল। নরেন্দ্র যখন মাঝে মাঝে বাড়ি হইতে চলিয়া যাইত, তখন ইহার যত ঈর্ষা হইত, এত আর কাহারো নয়। এমন-কি, নরেন্দ্র বাড়ি ফিরিয়া আসিলে তাহাকে মাঝে মাঝে ঝাঁটাইতে ত্রুটি করিত না। মাঝে মাঝে নরেন্দ্রের উপর ইহার অভিমানই বা দেখে কে। করুণার উপরেও ইহার ভারি আক্রোশ ছিল, করুণাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া জ্বালাতন করিয়া মারিত। মাঝে মাঝে নরেন্দ্রের সহিত ইহার মহা মারামারি বাধিয়া যাইত— দুজনেই দুজনের উপর গালাগালি ও কিল চাপড় বর্ষণ করিয়া কুরুক্ষেত্র বাধাইয়া দিত। কিন্তু এইরূপ জনশ্রুতি আছে, নরেন্দ্র তাহার বিপদের দিনে ইহার সাহায্যে দিনযাপন করিতেন।

নরেন্দ্রের ব্যবহার ক্রমেই স্ফূর্তি পাইতে লাগিল। যখন তখন আসিয়া মাতলামি করিত, সেই দাসীটির সহিত ভারি ঝগড়া বাধাইয়া দিত। করুণা এই-সমস্তই দেখিতে

পাইত, কিন্তু তাহার কেমন একপ্রকারের ভাব হইয়াছে— সে মনে করে যাহা হইতেছে হউক, যাহা যাইতেছে চলিয়া যাক। দাসীটা মাঝে মাঝে নরেন্দ্রের উপর রাগিয়া করুণার নিকট গর্ গর্ করিয়া মুখ নাড়িয়া যাইত; করুণা চুপ করিয়া থাকিত, কিছুই উত্তর দিত না। নরেন্দ্র আবশ্যকমত গৃহসজ্জা বিক্রয় করিতে লাগিল। অবশেষে তাহাতেও কিছু হইল না— অর্থসাহায্য চাহিয়া মহেন্দ্রকে একখানা চিঠি লিখিবার জন্য করুণাকে পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করিল। করুণা বেচারি কোথায় একটু নিশ্চিন্ত হইতে চায়, কোথায় সে মনে করিতেছে 'যে যাহা করে করুক— আমাকে একটু একেলা থাকিতে দিক', না, তাহাকে লইয়াই এই-সমস্ত হাঙ্গাম! সে কী করে, মাঝে মাঝে লিখিয়া দিত। কিন্তু বার বার এমন কী করিয়া লিখিবে। মহেন্দ্রের নিকট হইতে বার বার অর্থ চাহিতে তাহার কেমন কষ্ট হইত, তদ্ভিন্ন সে জানিত অর্থ পাইলেই নরেন্দ্র তাহা দুষ্কর্মে ব্যয় করিবে মাত্র।

একদিন সন্ধ্যার সময় নরেন্দ্র আসিয়া মহেন্দ্রকে চিঠি লিখিবার জন্য করুণাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। করুণা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "পায়ে পড়ি, আমাকে আর চিঠি লিখিতে বলিয়ো না।"

সেই সময় সেই দাসীটি আসিয়া পড়িল, সেও নরেন্দ্রের সঙ্গে যোগ দিল— কহিল, "তুমি অমন একগুঁয়ে মেয়ে কেন গা! টাকা না থাকলে গিলবে কী।"

নরেন্দ্র ক্রুদ্ধভাবে কহিল, "লিখিতেই হইবে।"

করুণা নরেন্দ্রের পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "ক্ষমা করো, আমি লিখিতে পারিব না।"

"লিখিবি না? হতভাগিনী, লিখিবি না?"

ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া নরেন্দ্র করুণাকে প্রহার করিতে লাগিল। এমন সময় সহসা দ্বার খুলিয়া পণ্ডিতমহাশয় প্রবেশ করিলেন; তিনি তাড়াতাড়ি গিয়া নরেন্দ্রকে ছাড়াইয়া দিলেন, দেখিলেন দুর্বল করুণা মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছে।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

পূর্বেই বলিয়াছি, পণ্ডিতমহাশয় নিধির টানাটানিতে গাড়িতে উঠিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন কখনোই ভালো ছিল না। তিনি প্রায়ই মাঝে মাঝে মনে করিতেন, তাঁহার স্নেহভাগিনী করুণার দশা কী হইল! এইরূপ অনুতাপে যখন কষ্ট পাইতেছিলেন এমন সময়ে দৈবক্রমে মোহিনীর সহিত সত্য-সত্যই তাঁহার সাক্ষাৎ হয়।

তাহার নিকট করুণার সমস্ত সংবাদ পাইয়া আর থাকিতে পারিলেন না,

তাড়াতাড়ি কলিকাতায় আসিলেন। প্রথমে মহেন্দ্রের কাছে গেলেন, সেখানে নরেন্দ্রের বাড়ির সন্ধান লইলেন— বাড়িতে আসিয়াই নরেন্দ্রের ঐ নিষ্ঠুর অত্যাচার দেখিতে পাইলেন।

সেই মূর্ছার পর হইতে করুণার বার বার মূর্ছা হইতে লাগিল। পণ্ডিতমহাশয় মহা অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি যে কী করিবেন কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। এই সময়ে তিনি নিধির অভাব অত্যন্ত অনুভব করিতে লাগিলেন। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া তিনি তাড়াতাড়ি মহেন্দ্রকে ডাকিতে গেলেন। মহেন্দ্র ও রজনী উভয়েই আসিল। মহেন্দ্র যথাসাধ্য চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। করুণা মাঝে মাঝে রজনীর হাত ধরিয়া অতি ক্ষীণ স্বরে কথা কহিত ; পণ্ডিতমহাশয় যখন অনুতপ্তহৃদয়ে করুণার নিকট আপনাকে ধিক্কার দিতেন, যখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেন, ‘মা, আমি তোকে অনেক কষ্ট দিয়াছি’, তখন করুণা অশ্রুপূর্ণনেত্রে অতি ধীরস্বরে তাঁহাকে বারণ করিত। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করিত ‘নরেন্দ্রকে ডাকিয়া দিবে ?’ সে কহিত, “কাজ নাই।”

সে জানিত নরেন্দ্র কেবল বিরক্ত হইবে মাত্র।

আজ রাত্রে করুণার পীড়া বড়ো বাড়িয়াছে। শিয়রে বসিয়া রজনী কাঁদিতেছে। আর পণ্ডিতমহাশয় কিছুতেই ঘরের মধ্যে স্থির থাকিতে না পারিয়া বাহিরে গিয়া শিশুর ন্যায় অধীর উচ্ছ্বাসে কাঁদিতেছেন। নরেন্দ্র গৃহে নাই। আজ করুণা একবার নরেন্দ্রকে ডাকিয়া আনিবার জন্য মহেন্দ্রকে অনুরোধ করিল। নরেন্দ্র যখন গৃহে আসিলেন, তাঁহার চক্ষু লাল, মুখ ফুলিয়াছে, কেশ ও বস্ত্র বিশৃঙ্খল। হতবুদ্ধিপ্রায় নরেন্দ্রকে করুণার শয্যার পার্শ্বে সকলে বসাইয়া দিল। করুণা কম্পিত হস্তে নরেন্দ্রের হাত ধরিল, কিন্তু কিছু কহিল না।

আশ্বিন ১২৮৪ - ভাদ্র ১২৮৫

প্রবন্ধ

আত্মপরিচয়

আত্মপরিচয়

১

আমার জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে আমি অনুরুদ্ধ হইয়াছি। এখানে আমি অনাবশ্যক বিনয় প্রকাশ করিয়া জায়গা জুড়িব না। কিন্তু গোড়াতে এ কথা বলিতেই হইবে, আত্মজীবনী লিখিবার বিশেষ ক্ষমতা বিশেষ লোকেরই থাকে, আমার তাহা নাই। না থাকিলেও ক্ষতি নাই, কারণ, আমার জীবনের বিস্তারিত বর্ণনায় কাহারো কোনো লাভ দেখি না।

সেইজন্য এ স্থলে আমার জীবনবৃত্তান্ত হইতে বৃত্তান্তটা বাদ দিলাম। কেবল, কাব্যের মধ্য দিয়া আমার কাছে আজ আমার জীবনটা যেভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট সংক্ষেপে লিখিবার চেষ্টা করিব। ইহাতে যে অহমিকা প্রকাশ পাইবে সেজন্য আমি পাঠকদের কাছে বিশেষ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করি।

আমার সুদীর্ঘকালের কবিতা লেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই— এ একটা ব্যাপার, যাহার উপরে আমার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। যখন লিখিতেছিলাম তখন মনে করিয়াছি, আমিই লিখিতেছি বটে, কিন্তু আজ জানি কথাটা সত্য নহে। কারণ, সেই খণ্ডকবিতাগুলিতে আমার সমগ্র কাব্যগ্রন্থের তাৎপর্য সম্পূর্ণ হয় নাই— সেই তাৎপর্যটি কী তাহাও আমি পূর্বে জানিতাম না। এইরূপে পরিণাম না জানিয়া আমি একটির সহিত একটি কবিতা যোজনা করিয়া আসিয়াছি— তাহাদের প্রত্যেকের যে ক্ষুদ্র অর্থ কল্পনা করিয়াছিলাম, আজ সমগ্রের সাহায্যে নিশ্চয় বুঝিয়াছি, সে অর্থ অতিক্রম করিয়া একটি অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য তাহাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছিল। তাই দীর্ঘকাল পরে একদিন লিখিয়াছিলাম—

এ কী কৌতুক নিত্যনূতন
ওগো কৌতুকময়ী!
আমি যাহা-কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই।

অন্তরমাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।
কী বলিতে চাই সব ভুলে যাই,
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,
সংগীতস্রোতে কূল নাহি পাই—
কোথা ভেসে যাই দূরে।

বিশ্ববিধির একটা নিয়ম এই দেখিতেছি যে, যেটা আসন্ন, যেটা উপস্থিত, তাহাকে সে খর্ব করিতে দেয় না। তাহাকে এ কথা জানিতে দেয় না যে, সে একটা সোপানপরম্পরার অঙ্গ। তাহাকে বুঝাইয়া দেয় যে, সে আপনাতে আপনি পর্যাপ্ত। ফুল যখন ফুটিয়া উঠে তখন মনে হয়, ফুলই যেন গাছের একমাত্র লক্ষ্য— এমনি তাহার সৌন্দর্য, এমনি তাহার সুগন্ধ যে, মনে হয় যেন সে বনলক্ষ্মীর সাধনার চরমধন। কিন্তু সে যে ফল ফলাইবার উপলক্ষমাত্র সে কথা গোপনে থাকে— বর্তমানের গৌরবেই সে প্রফুল্ল, ভবিষ্যৎ তাহাকে অভিভূত করিয়া দেয় না। আবার ফলকে দেখিলে মনে হয়, সেই যেন সফলতার চূড়ান্ত; কিন্তু ভাবী তরুর জন্য সে যে বীজকে গর্ভের মধ্যে পরিণত করিয়া তুলিতেছে, এ কথা অন্তরালেই থাকিয়া যায়। এমনি করিয়া প্রকৃতি ফুলের মধ্যে ফুলের চরমতা, ফলের মধ্যে ফলের চরমতা রক্ষা করিয়াও তাহাদের অতীত একটি পরিণামকে অলক্ষ্যে অগ্রসর করিয়া দিতেছে।

কাব্যরচনাসম্বন্ধেও সেই বিশ্ববিধানই দেখিতে পাই— অন্তত আমার নিজের মধ্যে তাহা উপলব্ধি করিয়াছি। যখন যেটা লিখিতেছিলাম তখন সেইটেকেই পরিণাম বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। এইজন্য সেইটুকু সমাধা করার কাজেই অনেক যত্ন ও অনেক আনন্দ আকর্ষণ করিয়াছে। আমিই যে তাহা লিখিতেছি এবং একটা-কোনো বিশেষ ভাব অবলম্বন করিয়া লিখিতেছি, এ সম্বন্ধেও সন্দেহ ঘটে নাই। কিন্তু আজ জানিয়াছি, সে-সকল লেখা উপলক্ষমাত্র— তাহারা যে অনাগতকে গড়িয়া তুলিতেছে সেই অনাগতকে তাহারা চেনেও না। তাহাদের রচয়িতার মধ্যে আর-একজন কে রচনাকারী আছেন, যাঁহার সম্মুখে সেই ভাবী তাৎপর্য প্রত্যক্ষ বর্তমান। ফুৎকার বাঁশির এক-একটা ছিদ্রের মধ্য দিয়া এক-একটা সুর জাগাইয়া তুলিতেছে এবং নিজের কর্তৃত্ব উচ্চস্বরে প্রচার করিতেছে, কিন্তু কে সেই বিচ্ছিন্ন সুরগুলিকে রাগিণীতে বাঁধিয়া তুলিতেছে? ফুঁ সুর জাগাইতেছে বটে, কিন্তু ফুঁ তো বাঁশি বাজাইতেছে না।

সেই বাঁশি যে বাজাইতেছে তাহার কাছে সমস্ত রাগরাগিণী বর্তমান আছে, তাহার অগোচরে কিছুই নাই।

বলিতেছিলাম বসি এক ধারে
আপনার কথা আপন জনারে,
শুনাতেছিলাম ঘরের দুয়ারে
ঘরের কাহিনী যত;
তুমি সে ভাষারে দহিয়া অনলে
ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে
নবীন প্রতিমা নব কৌশলে
গড়িলে মনের মতো।

এই শ্লোকটার মানে বোধ করি এই যে, যেটা লিখিতে যাইতেছিলাম সেটা সাদা কথা, সেটা বেশি কিছু নহে— কিন্তু সেই সোজা কথা, সেই আমার নিজের কথার মধ্যে এমন একটা সুর আসিয়া পড়ে, যাহাতে তাহা বড়ো হইয়া ওঠে, ব্যক্তিগত না হইয়া বিশ্বের হইয়া ওঠে। সেই-যে সুরটা, সেটা তো আমার অভিপ্রায়ের মধ্যে ছিল না। আমার পটে একটা ছবি দাগিয়াছিলাম বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে-সঙ্গে যে-একটা রঙ ফলিয়া উঠিল, সেই রঙ ও সে রঙের তুলি তো আমার হাতে ছিল না।

নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায়
ভরা আনন্দে ছুটে চলে যায়,
নূতন বেদনা বেজে উঠে তায়
নূতন রাগিণীভরে।
যে কথা ভাবি নি বলি সেই কথা,
যে ব্যথা বুঝি না জাগে সেই ব্যথা,
জানি না এনেছি কাহার বারতা
কারে শুনাবার তরে।

আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি যখন আমার একটা ক্ষুদ্র কথা বলিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলাম তখন কে একজন উৎসাহ দিয়া কহিলেন, 'বলো বলো, তোমার কথাটাই বলো। ঐ কথাটার জন্যই সকলে হাঁ করিয়া তাকাইয়া আছে।' এই বলিয়া তিনি শ্রোতৃবর্গের দিকে চাহিয়া চোখ টিপিলেন; স্নিগ্ধ কৌতুকের সঙ্গে একটুখানি হাসিলেন এবং আমারই কথার ভিতর দিয়া কী-সব নিজের কথা বলিয়া লইলেন।

কে কেমন বোঝে অর্থ তাহার,
কেহ এক বলে, কেহ বলে আর,
আমারে শুধায় বৃথা বার বার—
দেখে তুমি হাস বুঝি।
কে গো তুমি, কোথা রয়েছ গোপনে
আমি মরিতেছি খুঁজি।

শুধু কি কবিতা-লেখার একজন কর্তা কবিকে অতিক্রম করিয়া তাহার লেখনী চালনা করিয়াছেন? তাহা নহে। সেইসঙ্গে ইহাও দেখিয়াছি যে, জীবনটা যে গঠিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার সমস্ত সুখদুঃখ, তাহার সমস্ত যোগবিয়োগের বিচ্ছিন্নতাকে কে একজন একটি অখণ্ড তাৎপর্যের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিতেছেন। সকল সময়ে আমি তাঁহার আনুকূল্য করিতেছি কি না জানি না, কিন্তু আমার সমস্ত বাধা-বিপত্তিকেও, আমার সমস্ত ভাঙাচোরাকেও তিনি নিয়তই গাঁথিয়া জুড়িয়া দাঁড় করাইতেছেন। কেবল তাই নয়, আমার স্বার্থ, আমার প্রবৃত্তি, আমার জীবনকে যে অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেছে তিনি বারে বারে সে সীমা ছিন্ন করিয়া দিতেছেন— তিনি সুগভীর বেদনার দ্বারা, বিচ্ছেদের দ্বারা. বিপুলের সহিত, বিরাটের সহিত তাহাকে যুক্ত করিয়া দিতেছেন। সে যখন একদিন হাট করিতে বাহির হইয়াছিল তখন বিশ্বমানবের মধ্যে সে আপনার সফলতা চায় নাই— সে আপনার ঘরের সুখ ঘরের সম্পদের জন্যই কড়ি সংগ্রহ করিয়াছিল। কিন্তু সেই মেঠো পথ, সেই ঘোরো সুখদুঃখের দিক হইতে কে তাহাকে জোর করিয়া পাহাড়-পর্বত অধিত্যকা-উপত্যকার দুর্গমতার মধ্য দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

এ কী কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী!
যে দিকে পান্থ চাহে চলিবারে
চলিতে দিতেছ কই?
গ্রামের যে পথ ধায় গৃহপানে,
চাষিগণ ফিরে দিবা-অবসানে,
গোঠে ধায় গোরু, বধূ জল আনে
শতবার যাতায়াতে—
একদা প্রথম প্রভাতবেলায়
সে পথে বাহির হইনু হেলায়,

মনে ছিল দিন কাজে ও খেলায়
কাটায়ে ফিরিব রাতে।
পদে পদে তুমি ভুলাইলে দিক,
কোথা যাব আজি নাহি পাই ঠিক,
ক্লান্তহৃদয় ভ্রান্ত পথিক
এসেছি নূতন দেশে।
কখনো উদার গিরির শিখরে
কভু বেদনার তমোগহ্বরে
চিনি না যে পথ সে পথের 'পরে
চলেছি পাগলবেশে।

এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি 'জীবনদেবতা' নাম দিয়াছি। তিনি যে কেবল আমার এই ইহজীবনের সমস্ত খণ্ডতাকে ঐক্যদান করিয়া বিশ্বের সহিত তাহার সামঞ্জস্যস্থাপন করিতেছেন, আমি তাহা মনে করি না। আমি জানি, অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন— সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে। সেইজন্য এই জগতের তরুলতা-পশুপক্ষীর সঙ্গে এমন একটা পুরাতন ঐক্য অনুভব করিতে পারি, সেইজন্য এতবড়ো রহস্যময় প্রকাণ্ড জগৎকে অনাত্মীয় ও ভীষণ বলিয়া মনে হয় না।

আজ মনে হয় সকলেরি মাঝে
তোমারেই ভালোবেসেছি;
জনতা বাহিয়া চিরদিন ধরে
শুধু তুমি আমি এসেছি।
চেয়ে চারি দিক পানে
কী যে জেগে ওঠে প্রাণে—
তোমার-আমার অসীম মিলন
যেন গো সকলখানে।
কত যুগ এই আকাশে যাপিনু
সে কথা অনেক ভুলেছি,

তারায় তারায় যে আলো কাঁপিছে
সে আলোকে দোঁহে দুলেছি।

তৃণরোমাঞ্চ ধরণীর পানে
আশ্বিনে নব আলোকে
চেয়ে দেখি যবে আপনার মনে
প্রাণ ভরি উঠে পুলকে।
মনে হয় যেন জানি
এই অকথিত বাণী—
মূক মেদিনীর মর্মের মাঝে
জাগিছে যে ভাবখানি।
এই প্রাণে-ভরা মাটির ভিতরে
কত যুগ মোরা যেপেছি,
কত শরতের সোনার আলোকে
কত তৃণে দোঁহে কেঁপেছি।...
লক্ষ বরষ আগে যে প্রভাত
উঠেছিল এই ভুবনে
তাহার অরুণকিরণকণিকা
গাঁথ নি কি মোর জীবনে?
সে প্রভাতে কোন্‌খানে
জেগেছিনু কে বা জানে?
কী মুরতি-মাঝে ফুটালে আমারে
সেদিন লুকায়ে প্রাণে?
হে চির-পুরানো, চিরকাল মোরে
গড়িছ নূতন করিয়া।
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর,
রবে চিরদিন ধরিয়া।

তত্ত্ববিদ্যায় আমার কোনো অধিকার নাই। দ্বৈতবাদ-অদ্বৈতবাদের কোনো তর্ক উঠিলে আমি নিরুত্তর হইয়া থাকিব। আমি কেবল অনুভবের দিক দিয়া বলিতেছি, আমার মধ্যে আমার অন্তর্দেবতার একটি প্রকাশের আনন্দ রহিয়াছে— সেই আনন্দ সেই প্রেম

আমার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আমার বুদ্ধিমন, আমার নিকট প্রত্যক্ষ এই বিশ্বজগৎ, আমার অনাদি অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ পরিপ্লুত করিয়া আছে। এ লীলা তো আমি কিছুই বুঝি না, কিন্তু আমার মধ্যেই নিয়ত এই এক প্রেমের লীলা। আমার চোখে যে আলো ভালো লাগিতেছে, প্রভাত-সন্ধ্যার যে মেঘের ছটা ভালো লাগিতেছে, তৃণতরুলতার যে শ্যামলতা ভালো লাগিতেছে, প্রিয়জনের যে মুখচ্ছবি ভালো লাগিতেছে— সমস্তই সেই প্রেমলীলার উদ্বেল তরঙ্গমালা। তাহাতেই জীবনের সমস্ত সুখদুঃখের সমস্ত আলো-অন্ধকারের ছায়া খেলিতেছে।

আমার মধ্যে এই যাহা গড়িয়া উঠিতেছে এবং যিনি গড়িতেছেন, এই উভয়ের মধ্যে যে একটি আনন্দের সম্বন্ধ, যে-একটি নিত্যপ্রেমের বন্ধন আছে, তাহা জীবনের সমস্ত ঘটনার মধ্য দিয়া উপলব্ধি করিলে সুখদুঃখের মধ্যে একটি শান্তি আসে। যখন বুঝিতে পারি, আমার প্রত্যেক আনন্দের উচ্ছ্বাস তিনি আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন, আমার প্রত্যেক দুঃখবেদনা তিনি নিজে গ্রহণ করিয়াছেন, তখন জানি যে, কিছুই ব্যর্থ হয় নাই, সমস্তই একটা জগদ্‌ব্যাপী সম্পূর্ণতার দিকে ধন্য হইয়া উঠিতেছে।

এইখানে আমার একটি পুরাতন চিঠি হইতে একটা জায়গা উদ্‌ধৃত করিয়া দিই—

ঠিক যাকে সাধারণে ধর্ম বলে, সেটা যে আমি আমার নিজের মধ্যে সুস্পষ্ট দৃঢ়রূপে লাভ করতে পেরেছি, তা বলতে পারি নে। কিন্তু মনের ভিতরে ভিতরে ক্রমশ যে একটা সজীব পদার্থ সৃষ্ট হয়ে উঠেছে, তা অনেক সময় অনুভব করতে পারি। বিশেষ কোনো একটা নির্দিষ্ট মত নয়— একটা নিগূঢ় চেতনা, একটা নূতন অন্তরিন্দ্রিয়। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমি ক্রমশ আপনার মধ্যে আপনার একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারব— আমার সুখ-দুঃখ, অন্তর-বাহির, বিশ্বাস-আচরণ, সমস্তটা মিলিয়ে জীবনটাকে একটা সমগ্রতা দিতে পারব। শাস্ত্রে যা লেখে তা সত্য কি মিথ্যা বলতে পারি নে; কিন্তু সে-সমস্ত সত্য অনেক সময় আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী, বস্তুত আমার পক্ষে তার অস্তিত্ব নেই বললেই হয়। আমার সমস্ত জীবন দিয়ে যে জিনিসটাকে সম্পূর্ণ আকারে গড়ে তুলতে পারব সেই আমার চরমসত্য। জীবনের সমস্ত সুখদুঃখকে যখন বিচ্ছিন্ন ক্ষণিকভাবে অনুভব করি তখন আমাদের ভিতরকার এই অনন্ত সৃজনরহস্য ঠিক বুঝতে পারি নে— প্রত্যেক কথাটা বানান করে পড়তে হলে যেমন সমস্ত পদটার অর্থ এবং ভাবের ঐক্য বোঝা যায় না; কিন্তু নিজের ভিতরকার এই সৃজনশক্তির অখণ্ড ঐক্যসূত্র যখন একবার অনুভব করা যায় তখন এই সৃজ্যমান অনন্ত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে নিজের যোগ উপলব্ধি করি; বুঝতে পারি, যেমন গ্রহনক্ষত্র-চন্দ্রসূর্য জ্বলতে জ্বলতে ঘুরতে ঘুরতে চিরকাল ধরে তৈরি হয়ে উঠছে, আমার ভিতরেও তেমনি অনাদিকাল ধরে একটা সৃজন

চলছে; আমার সুখ-দুঃখ বাসনা-বেদনা তার মধ্যে আপনার আপনার স্থান গ্রহণ করছে। এই থেকে কী হয়ে উঠবে জানি নে, কারণ আমরা একটি ধূলিকণাকেও জানি নে। কিন্তু নিজের প্রবহমান জীবনটাকে যখন নিজের বাইরে অনন্ত দেশকালের সঙ্গে যোগ করে দেখি তখন জীবনের সমস্ত দুঃখগুলিকেও একটা বৃহৎ আনন্দসূত্রের মধ্যে গ্রথিত দেখতে পাই— আমি আছি, আমি হচ্ছি, আমি চলছি, এইটেকে একটা বিরাট ব্যাপার বলে বুঝতে পারি, আমি আছি এবং আমার সঙ্গে সঙ্গেই আর-সমস্তই আছে, আমাকে ছেড়ে এই অসীম জগতের একটি অণুপরমাণুও থাকতে পারে না, আমার আত্মীয়দের সঙ্গে আমার যে যোগ, এই সুন্দর শরৎপ্রভাতের সঙ্গে তাঁর চেয়ে কিছুমাত্র কম ঘনিষ্ঠ যোগ নয়— সেইজন্যই এই জ্যোতির্ময় শূন্য আমার অন্তরাত্মাকে তার নিজের মধ্যে এমন করে পরিব্যাপ্ত করে নেয়। নইলে সে কি আমার মনকে তিলমাত্র স্পর্শ করতে পারত? নইলে তাকে কি আমি সুন্দর বলে অনুভব করতেম?… আমার সঙ্গে অনন্ত জগৎ-প্রাণের যে চিরকালের নিগূঢ় সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধের প্রত্যক্ষগম্য বিচিত্র ভাষা হচ্ছে বর্ণগন্ধগীত। চতুর্দিকে এই ভাষার অবিশ্রাম বিকাশ আমাদের মনকে লক্ষ্য-অলক্ষ্যভাবে ক্রমাগতই আন্দোলিত করছে, কথাবার্তা দিনরাত্রিই চলছে।

এই পত্রে আমার অন্তর্নিহিত যে সৃজনশক্তির কথা লিখিয়াছি, যে শক্তি আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখকে সমস্ত ঘটনাকে ঐক্যদান তাৎপর্যদান করিতেছে, আমার রূপরূপান্তর জন্মজন্মান্তরকে একসূত্রে গাঁথিতেছে, যাহার মধ্য দিয়া বিশ্বচরাচরের মধ্যে ঐক্য অনুভব করিতেছি, তাহাকেই 'জীবনদেবতা' নাম দিয়া লিখিয়াছিলাম—

ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম?
দুঃখসুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়,
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ
দলিতদ্রাক্ষা-সম।
কত যে বরন, কত যে গন্ধ,
কত যে রাগিণী, কত যে ছন্দ,
গাঁথিয়া গাঁথিয়া করেছি বয়ন
বাসরশয়ন তব—

গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা
প্রতিদিন আমি করেছি রচনা
তোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়া
মুরতি নিত্যনব।

আশ্চর্য এই যে, আমি হইয়া উঠিতেছি, আমি প্রকাশ পাইতেছি। আমার মধ্যে কী অনন্ত মাধুর্য আছে, যেজন্য আমি অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অগণ্য সূর্যচন্দ্রগ্রহতারকার সমস্ত শক্তি দ্বারা লালিত হইয়া, এই আলোকের মধ্যে আকাশের মধ্যে চোখ মেলিয়া দাঁড়াইয়াছি— আমাকে কেহ ত্যাগ করিতেছে না। মনে কেবল এই প্রশ্ন উঠে, আমি আমার এই আশ্চর্য অস্তিত্বের অধিকার কেমন করিয়া রক্ষা করিতেছি— আমার উপরে যে প্রেম, যে আনন্দ অশ্রান্ত রহিয়াছে, যাহা না থাকিলে আমার থাকিবার কোনো শক্তিই থাকিত না, আমি তাহাকে কি কিছুই দিতেছি না?

আপনি বরিয়া লয়েছিলে মোরে
না জানি কিসের আশে।
লেগেছে কি ভালো, হে জীবননাথ,
আমার রজনী আমার প্রভাত
আমার নর্ম আমার কর্ম
তোমার বিজন বাসে?
বরষা শরতে বসন্তে শীতে
ধ্বনিয়াছে হিয়া যত সংগীতে
শুনেছ কি তাহা একেলা বসিয়া
আপন সিংহাসনে?
মানসকুসুম তুলি অঞ্চলে
গেঁথেছ কি মালা, পরেছ কি গলে,
আপনার মনে করেছ ভ্রমণ
মম যৌবনবনে?

কী দেখিছ বঁধু মরমমাঝারে
রাখিয়া নয়ন দুটি?
করেছ কি ক্ষমা যতেক আমার
স্খলন পতন ত্রুটি?

পূজাহীন দিন, সেবাহীন রাত,
কত বার বার ফিরে গেছে নাথ,
অর্ঘ্যকুসুম ঝরে পড়ে গেছে
বিজন বিপিনে ফুটি।
যে সুরে বাঁধিলে এ বীণার তার
নামিয়া নামিয়া গেছে বার বার,
হে কবি, তোমার রচিত রাগিণী
আমি কি গাহিতে পারি?
তোমার কাননে সেচিবারে গিয়া
ঘুমায়ে পড়েছি ছায়ায় পড়িয়া,
সন্ধ্যাবেলায় নয়ন ভরিয়া
এনেছি অশ্রুবারি।

যদি এমন হয় যে, আমার বর্তমান জীবনের মধ্যে এই জীবনদেবতার সেবার সম্ভাবনা যতদূর ছিল তাহা নিঃশেষ হইয়া গিয়া থাকে, যে আগুন তিনি জ্বালাইয়া রাখিতে চান আমার বর্তমান জীবনের ইন্ধন যদি ছাই হইয়া গিয়া আর তাহা রক্ষা করিতে না পারে, তবে এ আগুন তিনি কি নিবিতে দিবেন? এ অনাবশ্যক ছাই ফেলিয়া দিতে কতক্ষণ? কিন্তু তাই বলিয়া এই জ্যোতিঃশিখা মরিবে কেন? দেখা তো গিয়াছে, ইহা অবহেলার সামগ্রী নহে। অন্তরে অন্তরে তো বুঝা গিয়াছে, ইহার উপরে অনিমেষ আনন্দের দৃষ্টির অবসান নাই।

এখনি কি শেষ হয়েছে প্রাণেশ,
যা-কিছু আছিল মোর—
যত শোভা যত গান যত প্রাণ,
জাগরণ ঘুমঘোর?
শিথিল হয়েছে বাহুবন্ধন,
মদিরাবিহীন মম চুম্বন,
জীবনকুঞ্জে অভিসারনিশা
আজি কি হয়েছে ভোর?
ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা,
আনো নব রূপ, আনো নব শোভা,

নূতন করিয়া লহো আরবার
　　চিরপুরাতন মোরে।
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায়
　　নবীন জীবনডোরে।

নিজের জীবনের মধ্যে এই-যে আবির্ভাবকে অনুভব করা গেছে— যে আবির্ভাব অতীতের মধ্য হইতে অনাগতের মধ্যে প্রাণের পালের উপরে প্রেমের হাওয়া লাগাইয়া আমাকে কাল-মহানদীর নূতন নূতন ঘাটে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছেন, সেই জীবনদেবতার কথা বলিলাম।

এই জীবনযাত্রার অবকাশকালে মাঝে মাঝে শুভমুহূর্তে বিশ্বের দিকে যখন অনিমেষদৃষ্টি মেলিয়া ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিয়াছি তখন আর এক অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। নিজের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির এক অবিচ্ছিন্ন যোগ, এক চিরপুরাতন একাত্মকতা আমাকে একান্তভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। কতদিন নৌকায় বসিয়া সূর্যকরোদ্দীপ্ত জলে স্থলে আকাশে আমার অন্তরাত্মাকে নিঃশেষে বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছি; তখন মাটিকে আর মাটি বলিয়া দূরে রাখি নাই, তখন জলের ধারা আমার অন্তরের মধ্যে আনন্দগানে বহিয়া গেছে। তখনি এ কথা বলিতে পারিয়াছি—

হই যদি মাটি, হই যদি জল,
হই যদি তৃণ, হই ফুলফল,
জীবসাথে যদি ফিরি ধরাতল
　　কিছুতেই নাই ভাবনা,
যেথা যাব সেথা অসীম বাঁধনে
　　অন্তবিহীন আপনা।

তখনি এ কথা বলিয়াছি—

আমারে ফিরায়ে লহো, অয়ি বসুন্ধরে,
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে
বিপুল অঞ্চলতলে। ওগো মা মৃণ্ময়ি,
তোমার মৃত্তিকা-মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই,
দিগ্‌বিদিকে আপনাকে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মতো।

এ কথা বলিতে কুণ্ঠিত হই নাই—

তোমার মৃত্তিকা-সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্তচরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনীদিন
যুগযুগান্তর ধরি ; আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্র ফুল ফল গন্ধরেণু।

আমার স্বাতন্ত্র্যগর্ব নাই— বিশ্বের সহিত আমি আমার কোনো বিচ্ছেদ স্বীকার করি না।

মানব-আত্মার দম্ভ আর নাহি মোর
চেয়ে তোর স্নিগ্ধশ্যাম মাতৃমুখ-পানে ;
ভালোবাসিয়াছি আমি ধূলিমাটি তোর।

আশা করি, পাঠকেরা ইহা হইতে এ কথা বুঝিবেন, আমি আত্মাকে বিশ্বপ্রকৃতিকে বিশ্বেশ্বরকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কোঠায় খণ্ড খণ্ড করিয়া রাখিয়া আমার ভক্তিকে বিভক্ত করি নাই।

আমি, কি আত্মার মধ্যে কি বিশ্বের মধ্যে, বিস্ময়ের অন্ত দেখি না। আমি জড় নাম দিয়া, সসীম নাম দিয়া, কোনো জিনিসকে এক পাশে ঠেলিয়া রাখিতে পারি নাই। এই সীমার মধ্যেই, এই প্রত্যক্ষের মধ্যেই, অনন্তের যে প্রকাশ তাহাই আমার কাছে অসীম বিস্ময়াবহ। আমি এই জলস্থল তরুলতা পশুপক্ষী চন্দ্রসূর্য দিনরাত্রির মাঝখান দিয়া চোখ মেলিয়া চলিয়াছি, ইহা আশ্চর্য। এই জগৎ তাহার অণুতে পরমাণুতে, তাহার প্রত্যেক ধূলিকণায় আশ্চর্য। আমাদের পিতামহগণ যে অগ্নিবায়ু-সূর্যচন্দ্র-মেঘবিদ্যুৎকে দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা যে সমস্তজীবন এই অচিন্তনীয় বিশ্বমহিমার মধ্য দিয়া সজীব ভক্তি ও বিস্ময় লইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, বিশ্বের সমস্ত স্পর্শ ই তাঁহাদের অন্তরবীণায় নব নব স্তবসংগীত ঝংকৃত করিয়া তুলিয়াছিল—ইহা আমার অন্তঃকরণকে স্পর্শ করে। সূর্যকে যাহারা অগ্নিপিণ্ড বলিয়া উড়াইয়া দিতে চায় তাহারা যেন জানে যে, অগ্নি কাহাকে বলে! পৃথিবীকে যাহারা 'জলরেখাবলয়িত' মাটির গোলা বলিয়া স্থির করিয়াছে তাহারা যেন মনে করে যে, জলকে জল বলিলেই সমস্ত জল বোঝা গেল এবং মাটিকে মাটি বলিলেই সে মাটি হইয়া যায়!

প্রকৃতিসম্বন্ধে আমার পুরাতন তিনটি পত্র হইতে তিন জায়গা তুলিয়া দিব—

…এমন সুন্দর দিনরাত্রিগুলি আমার জীবন থেকে প্রতিদিন চলে যাচ্ছে— এর সমস্তটা গ্রহণ করতে পারছি নে! এই সমস্ত রঙ, এই আলো এবং ছায়া, এই আকাশ-ব্যাপী নিঃশব্দ সমারোহ, এই দ্যুলোকভূলোকের মাঝখানের সমস্ত-শূন্য-পরিপূর্ণ-করা শান্তি এবং সৌন্দর্য— এর জন্যে কি কম আয়োজনটা চলছে! কতবড়ো উৎসবের ক্ষেত্রটা! এতবড়ো আশ্চর্য কাণ্ডটা প্রতিদিন আমাদের বাইরে হয়ে যাচ্ছে, আর আমাদের ভিতরে ভালো করে তার সাড়াই পাওয়া যায় না! জগৎ থেকে এতই তফাতে আমরা বাস করি! লক্ষ লক্ষ যোজন দূর থেকে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে অনন্ত অন্ধকারের পথে যাত্রা করে একটি তারার আলো এই পৃথিবীতে এসে পৌঁছয়, আর আমাদের অন্তরে এসে প্রবেশ করতে পারে না! মনটা যেন আরো শতলক্ষ যোজন দূরে! রঙিন সকাল এবং রঙিন সন্ধ্যাগুলি দিগ্‌বধূদের ছিন্ন কণ্ঠহার হতে এক-একটি মানিকের মতো সমুদ্রের জলে খসে খসে পড়ে যাচ্ছে, আমাদের মনের মধ্যে একটাও এসে পড়ে না!… যে পৃথিবীতে এসে পড়েছি, এখানকার মানুষগুলি সব অদ্ভুত জীব। এরা কেবলই দিনরাত্রি নিয়ম এবং দেয়াল গাঁথছে— পাছে দুটো চোখে কিছু দেখতে পায় এইজন্যে পর্দা টাঙিয়ে দিচ্ছে— বাস্তবিক পৃথিবীর জীবগুলো ভারি অদ্ভুত। এরা যে ফুলের গাছে এক-একটি ঘেরাটোপ পরিয়ে রাখে নি, চাঁদের নীচে চাঁদোয়া খাটায় নি, সেই আশ্চর্য! এই স্বেচ্ছা-অন্ধগুলো বন্ধ পালকির মধ্যে চড়ে পৃথিবীর ভিতর দিয়ে কী দেখে চলে যাচ্ছে!

…এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলেম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধ উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি কত দূরদূরান্তর দেশদেশান্তরের জলস্থল ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতেম, তখন শরৎসূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে-একটি আনন্দরস, যে-একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড বৃহৎ-ভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই-যে মনের ভাব, এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যসনাথ আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে, এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থর থর করে কাঁপছে।

…এই পৃথিবীটি আমার অনেক দিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালোবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকাল নতুন।… আমি বেশ মনে করতে পারি, বহুযুগ পূর্বে তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন— তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলেম। তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলছে এবং অবোধ মাতার মতো আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলছে। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলেম— নবশিশুর মতো একটা অন্ধ জীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলেম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলেম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদ্‌গত হত। যখন ঘনঘটা করে বর্ষার মেঘ উঠত তখন তার ঘনশ্যামচ্ছটায় আমার সমস্ত পল্লবকে একটি পরিচিত করতলের মতো স্পর্শ করত। তার পরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে। আমার বসুন্ধরা এখন একখানি রৌদ্রপীতহিরণ্য অঞ্চল প'রে ঐ নদীতীরের শস্যক্ষেত্রে বসে আছেন— আমি তাঁর পায়ের কাছে, কোলের কাছে গিয়ে লুটিয়ে পড়ছি। অনেক ছেলের মা যেমন অর্ধমনস্ক অথচ নিশ্চল সহিষ্ণুভাবে আপন শিশুদের আনাগোনার প্রতি তেমন দৃক্‌পাত করেন না, তেমনি আমার পৃথিবী এই দুপুরবেলায় ঐ আকাশপ্রান্তের দিকে চেয়ে বহু আদিমকালের কথা ভাবছেন— আমার দিকে তেমন লক্ষ করছেন না, আর আমি কেবল অবিশ্রাম বকেই যাচ্ছি।

প্রকৃতি তাহার রূপরস বর্ণগন্ধ লইয়া, মানুষ তাহার বুদ্ধিমন তাহার স্নেহপ্রেম লইয়া, আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে— সেই মোহকে আমি অবিশ্বাস করি না, সেই মোহকে আমি নিন্দা করি না। তাহা আমাকে বদ্ধ করিতেছে না, তাহা আমাকে মুক্তই করিতেছে; তাহা আমাকে আমার বাহিরেই ব্যাপ্ত করিতেছে। নৌকার গুণ নৌকাকে বাঁধিয়া রাখে নাই, নৌকাকে টানিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। জগতের সমস্ত আকর্ষণপাশ আমাদিগকে তেমনি অগ্রসর করিতেছে। কেহ-বা দ্রুত চলিতেছে বলিয়া সে আপন গতিসম্বন্ধে সচেতন, কেহ-বা মন্দগমনে চলিতেছে বলিয়া মনে করিতেছে বুঝি-বা সে এক জায়গায় বাঁধাই পড়িয়া আছে। কিন্তু সকলকেই চলিতে

হইতেছে— সকলই এই জগৎসংসারের নিরন্তর টানে প্রতিদিনই ন্যূনাধিক পরিমাণে আপনার দিক হইতে ব্রহ্মের দিকে ব্যাপ্ত হইতেছে। আমরা যেমনই মনে করি, আমাদের ভাই, আমাদের প্রিয়, আমাদের পুত্র আমাদিগকে একটি জায়গায় বাঁধিয়া রাখে নাই; যে জিনিসটাকে সন্ধান করিতেছি, দীপালোক কেবলমাত্র সেই জিনিসটাকে প্রকাশ করে তাহা নহে, সমস্ত ঘরকে আলোকিত করে— প্রেম প্রেমের বিষয়কে অতিক্রম করিয়াও ব্যাপ্ত হয়। জগতের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া, প্রিয়জনের মাধুর্যের মধ্য দিয়া ভগবানই আমাদিগকে টানিতেছেন— আর-কাহারো টানিবার ক্ষমতাই নাই। পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়াই সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া, জগতের এই রূপের মধ্যেই সেই অপরূপকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা, ইহাকেই তো আমি মুক্তির সাধনা বলি। জগতের মধ্যে আমি মুগ্ধ, সেই মোহেই আমার মুক্তিরসের আস্বাদন।—

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্যবন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানাবর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দিরমাঝে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তারি মাঝখানে।
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।

আমি বালকবয়সে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' লিখিয়াছিলাম— তখন আমি নিজে ভালো করিয়া বুঝিয়াছিলাম কি না জানি না— কিন্তু তাহাতে এই কথা ছিল যে, এই বিশ্বকে গ্রহণ করিয়া, এই সংসারকে বিশ্বাস করিয়া, এই প্রত্যক্ষকে শ্রদ্ধা করিয়া আমরা যথার্থভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে পারি। যে জাহাজে অনন্তকোটি

লোক যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছে তাহা হইতে লাফ দিয়া পড়িয়া সাঁতারের জোরে সমুদ্র পার হইবার চেষ্টা সফল হইবার নহে।

হে বিশ্ব, হে মহাতরী, চলেছ কোথায় ?
আমারে তুলিয়া লও তোমার আশ্রয়ে।
একা আমি সাঁতারিয়া পারিব না যেতে।
কোটি কোটি যাত্রী ওই যেতেছে চলিয়া—
আমিও চলিতে চাই উহাদেরি সাথে।
যে পথে তপন শশী আলো ধরে আছে
সে পথ করিয়া তুচ্ছ, সে আলো ত্যজিয়া
আপনারি ক্ষুদ্র এই খদ্যোত-আলোকে
কেন অন্ধকারে মরি পথ খুঁজে খুঁজে।
পাখি যবে উড়ে যায় আকাশের পানে
মনে করে এনু বুঝি পৃথিবী ত্যজিয়া ;
যত ওড়ে, যত ওড়ে, যত উর্ধ্বে যায়,
কিছুতে পৃথিবী তবু পারে না ছাড়িতে—
অবশেষে শ্রান্তদেহে নীড়ে ফিরে আসে।

পরিণত বয়সে যখন 'মালিনী' নাট্য লিখিয়াছিলাম, তখনো এইরূপ দূর হইতে নিকটে, অনির্দিষ্ট হইতে নির্দিষ্টে, কল্পনা হইতে প্রত্যক্ষের মধ্যেই ধর্মকে উপলব্ধি করিবার কথা বলিয়াছি—

বুঝিলাম ধর্ম দেয় স্নেহ মাতারূপে,
পুত্ররূপে স্নেহ লয় পুন ; দাতারূপে
করে দান, দীনরূপে করে তা গ্রহণ ;
শিষ্যরূপে করে ভক্তি, গুরুরূপে করে
আশীর্বাদ ; প্রিয়া হয়ে পাষাণ অন্তরে
প্রেম-উৎস লয় টানি, অনুরক্ত হয়ে
করে সর্বত্যাগ। ধর্ম বিশ্বলোকালয়ে
ফেলিয়াছে চিত্তজাল, নিখিল ভুবন
টানিতেছে প্রেমক্রোড়ে— সে মহাবন্ধন
ভরেছে অন্তর মোর আনন্দবেদনে।

নিজের সম্বন্ধে আমার যেটুকু বক্তব্য ছিল, তাহা শেষ হইয়া আসিল, এইবার শেষ কথাটা বলিয়া উপসংহার করিব—

মর্তবাসীদের তুমি যা দিয়েছ, প্রভু,
মর্তের সকল আশা মিটাইয়া তবু
রিক্ত তাহা নাহি হয়। তার সর্বশেষ
আপনি খুঁজিয়া ফিরে তোমারি উদ্দেশ।
নদী ধায় নিত্যকাজে; সর্বকর্ম সারি
অন্তহীন ধারা তার চরণে তোমারি
নিত্য জলাঞ্জলিরূপে ঝরে অনিবার
কুসুম আপন গন্ধে সমস্ত সংসার
সম্পূর্ণ করিয়া তবু সম্পূর্ণ না হয়—
তোমারি পূজায় তার শেষ পরিচয়।
সংসারে বঞ্চিত করি তব পূজা নহে।
কবি আপনার গানে যত কথা কহে
নানা জনে লহে তার নানা অর্থ টানি,
তোমাপানে ধায় তার শেষ অর্থখানি!

আমার কাব্য ও জীবন সম্বন্ধে মূলকথাটা কতক কবিতা উদ্‌ধৃত করিয়া, কতক ব্যাখ্যা দ্বারা বোঝাইবার চেষ্টা করা গেল। বোঝাইতে পারিলাম কি না জানি না— কারণ, বোঝানো-কাজটা সম্পূর্ণ আমার নিজের হাতে নাই— যিনি বুঝিবেন তাঁহার উপরেও অনেকটা নির্ভর করিবে। আশঙ্কা আছে, অনেক পাঠক বলিবেন, কাব্যও হেঁয়ালি রহিয়া গেল, জীবনটাও তথৈবচ। বিশ্বশক্তি যদি আমার কল্পনায় আমার জীবনে এমন বাণীরূপে উচ্চারিত হইয়া থাকেন যাহা অন্যের পক্ষে দুর্বোধ তবে আমার কাব্য আমার জীবন পৃথিবীর কাহারো কোনো কাজে লাগিবে না— সে আমারই ক্ষতি, আমারই ব্যর্থতা। সেজন্য আমাকে গালি দিয়া কোনো লাভ নাই, আমার পক্ষে তাহার সংশোধন অসম্ভব— আমার অন্য কোনো গতি ছিল না।

বিশ্বজগৎ যখন মানবের হৃদয়ের মধ্য দিয়া, জীবনের মধ্য দিয়া, মানবভাষায় ব্যক্ত হইয়া উঠে তখন তাহা কেবলমাত্র প্রতিধ্বনি-প্রতিচ্ছায়ার মতো দেখা দিলে বিশেষ কিছু লাভ নাই। কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়দ্বারা আমরা জগতের যে পরিচয় পাইতেছি তাহা জগৎপরিচয়ের কেবল সামান্য একাংশমাত্র— সেই পরিচয়কে আমরা ভাবুকদিগের, কবিদিগের, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদিগের চিত্তের ভিতর দিয়া কালে কালে নবতররূপে

গভীরতররূপে সম্পূর্ণ করিয়া লইতেছি। কোন্ গীতিকাব্যরচয়িতার কোন্ কবিতা ভালো, কোন্‌টা মাঝারি, তাহাই খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখানো সমালোচকের কাজ নহে। তাঁহার সমস্ত কাব্যের ভিতর দিয়া বিশ্ব কোন্ বাণীরূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে তাহাই বুঝিবার যোগ্য। কবিকে উপলক্ষ করিয়া বীণাপাণি বাণী, বিশ্বজগতের প্রকাশশক্তি, আপনাকে কোন্ আকারে ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাই দেখিবার বিষয়।

জগতের মধ্যে যাহা অনির্বচনীয় তাহা কবির হৃদয়দ্বারে প্রত্যহ বারংবার আঘাত করিয়াছে, সেই অনির্বচনীয় যদি কবির কাব্যে বচন লাভ করিয়া থাকে— জগতের মধ্যে যাহা অপরূপ তাহা কবির মুখের দিকে প্রত্যহ আসিয়া তাকাইয়াছে, সেই অপরূপ যদি কবির কাব্যে রূপলাভ করিয়া থাকে— যাহা চোখের সম্মুখে মূর্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে তাহা যদি কবির কাব্যে ভাবরূপে আপনাকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে— যাহা অশরীরভাবরূপে নিরাশ্রয় হইয়া ফিরে তাহাই যদি কবির কাব্যে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া সম্পূর্ণতালাভ করিয়া থাকে— তবেই কাব্য সফল হইয়াছে এবং সেই সফল কাব্যই কবির প্রকৃত জীবনী। সেই জীবনীর বিষয়ীভূত ব্যক্তিটিকে কাব্যরচয়িতার জীবনের সাধারণ ঘটনাবলীর মধ্যে ধরিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা।

বাহির হইতে দেখো না এমন করে,
আমায় দেখো না বাহিরে।
আমায় পাবে না আমার দুখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজো না আমার বুকে,
আমায় দেখিতে পাবে না আমার মুখে,
কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহি রে।…
যে আমি স্বপনমুরতি গোপনচারি,
যে আমি আমারে বুঝিতে বোঝাতে নারি,
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি,
সেই আমি কবি, এসেছ কাহারে ধরিতে?
মানুষ-আকারে বদ্ধ যে জন ঘরে,
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের ভরে,
যাহারে কাঁপায় স্তুতিনিন্দার জরে,
কবিরে খুঁজিছ তাহারি জীবনচরিতে?

১৩১১

২

অকালে যাহার উদয় তাহার সম্বন্ধে মনের আশঙ্কা ঘুচিতে চায় না। আপনাদের কাছ হইতে আমি যে সমাদর লাভ করিয়াছি সে একটি অকালের ফল— এইজন্য ভয় হয় কখন সে বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়ে।

অন্যান্য সেবকদের মতো সাহিত্যসেবক কবিদেরও খোরাকি এবং বেতন এই দুই রকমের প্রাপ্য আছে। তাঁরা প্রতিদিনের ক্ষুধা মিটাইবার মতো কিছু কিছু যশের খোরাকি প্রত্যাশা করিয়া থাকেন— নিতান্তই উপবাসে দিন চলে না। কিন্তু এমন কবিও আছেন তাঁহাদের আপ-খোরাকি বন্দোবস্ত— তাঁহারা নিজের আনন্দ হইতে নিজের খোরাক জোগাইয়া থাকেন, গৃহস্থ তাঁহাদিগকে একমুঠা মুড়িমুড়কিও দেয় না।

এই তো গেল দিনের খোরাক— ইহা দিন গেলে জোটে এবং দিনের সঙ্গে ইহার ক্ষয় হয়। তার পরে বেতন আছে। কিন্তু সে তো মাস না গেলে দাবি করা যায় না। সেই চিরদিনের প্রাপ্যটা, বাঁচিয়া থাকিতেই আদায় করিবার রীতি নাই। এই বেতনটার হিসাব চিত্রগুপ্তের খাতাঞ্চিখানাতেই হইয়া থাকে। সেখানে হিসাবের ভুল প্রায় হয় না।

কিন্তু বাঁচিয়া থাকিতেই যদি আগাম শোধের বন্দোবস্ত হয় তবে সেটাতে বড়ো সন্দেহ জন্মায়। সংসারে অনেক জিনিস ফাঁকি দিয়া পাইয়াও সেটা রক্ষা করা চলে। অনেকে পরকে ফাঁকি দিয়া ধনী হইয়াছে এমন দৃষ্টান্ত একেবারে দেখা যায় না তাহা নহে। কিন্তু যশ জিনিসটাতে সে সুবিধা নাই। উহার সম্বন্ধে তামাদির আইন খাটে না। যেদিন ফাঁকি ধরা পড়িবে সেইদিনই ওটি বাজেয়াপ্ত হইবে। মহাকালের এমনি বিধি। অতএব জীবিতকালে কবি যে সম্মানলাভ করিল সেটি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইবার জো নাই।

শুধু এই নয়। বাঁচিয়া থাকিতেই যদি মাহিনা চুকাইয়া লওয়া হয় তবে সেটা সম্পূর্ণ কবির হাতে গিয়া পড়ে না। কবির বাহির-দরজায় একটা মানুষ দিনরাত আড্ডা করিয়া থাকে, সে দালালি আদায় করিয়া লয়। কবি যতবড়ো কবিই হউক, তাহার সমস্তটাই কবি নয়। তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে-একটি অহং লাগিয়া থাকে, সকল-তাতেই সে আপনার ভাগ বসাইতে চায়। তাহার বিশ্বাস, কৃতিত্ব সমস্ত তাহারই এবং কবিত্বের গৌরব তাহারই প্রাপ্য। এই বলিয়া সে থলি ভর্তি করিতে থাকে। এমনি করিয়া পূজার নৈবেদ্য পুরুত চুরি করে। কিন্তু মৃত্যুর পরে ঐ অহং-পুরুষটার বালাই থাকে না, তাই পাওনাটি নিরাপদে যথাস্থানে গিয়া পৌঁছে।

অহংটাই পৃথিবীর মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো চোর। সে স্বয়ং ভগবানের সামগ্রীও নিজের বলিয়া দাবি করিতে কুণ্ঠিত হয় না। এইজন্যই তো ঐ দুর্বৃত্তটাকে দাবাইয়া রাখিবার জন্য এত অনুশাসন। এইজন্যই তো মনু বলিয়াছেন—সম্মানকে বিষের মতো জানিবে, অপমানই অমৃত। সম্মান যেখানেই লোভনীয় সেখানেই সাধ্যমত তাহার সংস্রব পরিহার করা ভালো।

আমার তো বয়স পঞ্চাশ পার হইল। এখন বনে যাইবার ডাক পড়িয়াছে। এখন ত্যাগেরই দিন। এখন নূতন সঞ্চয়ের বোঝা মাথায় করিলে তো কাজ চলিবে না। অতএব এই পঞ্চাশের পরেও ঈশ্বর যদি আমাকে সম্মান জুটাইয়া দেন তবে নিশ্চয় বুঝিব, সে কেবল ত্যাগ-শিক্ষারই জন্য। এ সম্মানকে আমি আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিব না। এই মাথার বোঝা আমাকে সেইখানেই নামাইতে হইবে যেখানে আমার মাথা নত করিবার স্থান। অতএব এটুকু আমি আপনাদিগকে ভরসা দিতে পারি যে, আপনারা আমাকে যে সম্মান দিলেন তাহাকে আমার অহংকারের উপকরণরূপে ব্যবহার করিয়া অপমানিত করিব না।

আমাদের দেশে বর্তমানকালে পঞ্চাশ পার হইলে আনন্দ করিবার কারণ আছে—কেননা দীর্ঘায়ু বিরল হইয়া আসিয়াছে। যে দেশের লোক অল্পবয়সেই মারা যায়, প্রাচীন বয়সের অভিজ্ঞতার সম্পদ হইতে সে দেশ বঞ্চিত হয়। তারুণ্য তো ঘোড়া আর প্রবীণতাই সারথি। সারথিহীন ঘোড়ায় দেশের রথ চালাইলে কিরূপ বিষম বিপদ ঘটিতে পারে আমরা মাঝে তাহার পরিচয় পাইয়াছি। অতএব এই অল্পায়ুর দেশে যে মানুষ পঞ্চাশ পার হইয়াছে তাহাকে উৎসাহ দেওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু কবি তো বৈজ্ঞানিক দার্শনিক ঐতিহাসিক বা রাষ্ট্রনীতিবিৎ নহে। কবিত্ব মানুষের প্রথমবিকাশের লাবণ্যপ্রভাত। সম্মুখে জীবনের বিস্তার যখন আপনার সীমাকে এখনো খুঁজিয়া পায় নাই, আশা যখন পরমরহস্যময়ী— তখনই কবিত্বের গান নব নব সুরে জাগিয়া উঠে। অবশ্য, এই রহস্যের সৌন্দর্যটি যে কেবল প্রভাতেরই সামগ্রী তাহা নহে, আয়ু-অবসানের দিনান্তকালেও অনন্তজীবনের পরমরহস্যের জ্যোতির্ময় আভাস আপনার গভীরতর সৌন্দর্য প্রকাশ করে। কিন্তু সেই রহস্যের স্তব্ধ গাম্ভীর্য গানের কলোচ্ছ্বাসকে নীরব করিয়াই দেয়। তাই বলিতেছি, কবির বয়সের মূল্য কী?

অতএব বার্ধক্যের আরম্ভে যে আদর লাভ করিলাম তাহাকে প্রবীণ বয়সের প্রাপ্য অর্ঘ্য বলিয়া গণ্য করিতে পারি না। আপনারা আমার এ বয়সেও তরুণের প্রাপ্যই আমাকে দান করিয়াছেন। তাহাই কবির প্রাপ্য। তাহা শ্রদ্ধা নহে, ভক্তি নহে,

তাহা হৃদয়ের প্রীতি। মহত্ত্বের হিসাব করিয়া আমরা মানুষকে ভক্তি করি, যোগ্যতার হিসাব করিয়া তাহাকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকি, কিন্তু প্রীতির কোনো হিসাবকিতাব নাই। সেই প্রেম যখন যজ্ঞ করিতে বসে তখন নির্বিচারে আপনাকে রিক্ত করিয়া দেয়।

বুদ্ধির জোরে নয়, বিদ্যার জোরে নয়, সাধুত্বের গৌরবে নয়, যদি অনেক কাল বাঁশি বাজাইতে বাজাইতে তাহারই কোনো একটা সুরে আপনাদের হৃদয়ের সেই প্রীতিকে পাইয়া থাকি তবে আমি ধন্য হইয়াছি— তবে আমার আর সংকোচের কোনো কথা নাই। কেননা, আপনাকে দিবার বেলায় প্রীতির যেমন কোনো হিসাব থাকে না, তেমনি যে লোক ভাগ্যক্রমে তাহা পায় নিজের যোগ্যতার হিসাব লইয়া তাহারও কুণ্ঠিত হইবার কোনো প্রয়োজন নাই। যে মানুষ প্রেম দান করিতে পারে ক্ষমতা তাহারই— যে মানুষ প্রেম লাভ করে তাহার কেবল সৌভাগ্য।

প্রেমের ক্ষমতা যে কতবড়ো আজ আমি তাহা বিশেষরূপে অনুভব করিতেছি। আমি যাহা পাইয়াছি তাহা শস্তা জিনিস নহে। আমরা ভৃত্যকে যে বেতন চুকাইয়া দিই তাহা তুচ্ছ, স্তুতিবাদককে যে পুরস্কার দিই তাহা হেয়। সেই অবজ্ঞার দান আমি প্রার্থনা করি নাই, আপনারাও তাহা দেন নাই। আমি প্রেমেরই দান পাইয়াছি। সেই প্রেমের একটি মহৎ পরিচয় আছে। আমরা যে জিনিসটার দাম দিই তাহার ত্রুটি সহিতে পারি না— কোথাও ফুটা বা দাগ দেখিলে দাম ফিরাইয়া লইতে চাই। যখন মজুরি দিই তখন কাজের ভুলচুকের জন্য জরিমানা করিয়া থাকি। কিন্তু প্রেম অনেক সহ্য করে, অনেক ক্ষমা করে; আঘাতকে গ্রহণ করিয়াই সে আপনার মহত্ত্ব প্রকাশ করে।

আজ চল্লিশ বৎসরের ঊর্ধ্বকাল সাহিত্যের সাধনা করিয়া আসিয়াছি— ভুলচুক যে অনেক করিয়াছি এবং আঘাতও যে বারম্বার দিয়াছি তাহাতে কোনোই সন্দেহ থাকিতে পারে না। আমার সেই-সমস্ত অপূর্ণতা, আমার সেই-সমস্ত কঠোরতা-বিরুদ্ধতার ঊর্ধ্বে দাঁড়াইয়া আপনারা আমাকে যে মাল্য দান করিয়াছেন তাহা প্রীতির মাল্য ছাড়া আর-কিছুই হইতে পারে না। এই দানেই আপনাদের যথার্থ গৌরব এবং সেই গৌরবেই আমি গৌরবান্বিত।

যেখানে প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়ম প্রবল সেখানে প্রাকৃতিক প্রাচুর্যের প্রয়োজন আছে। যেখানে অনেক জন্মে সেখানে মরেও বেশি— তাহার মধ্য হইতে কিছু টিকিয়া যায়। কবিদের মধ্যে যাঁহারা কলানিপুণ, যাঁহারা আর্টিস্ট্, তাঁহারা মানসিক নির্বাচনের নিয়মে সৃষ্টি করেন, প্রাকৃতিক নির্বাচনকে কাছে ঘেঁষিতে দেন না। তাঁহারা যাহা-কিছু প্রকাশ করেন তাহা সমস্তটাই একেবারে সার্থক হইয়া উঠে।

আমি জানি, আমার রচনার মধ্যে সেই নিরতিশয় প্রাচুর্য আছে যাহা বহুপরিমাণে ব্যর্থতা বহন করে। অমরত্বের তরণীতে স্থান বেশি নাই, এইজন্য বোঝাকে যতই সংহত করিতে পারিব বিনাশের পারের ঘাটে পৌঁছিবার সম্ভাবনা ততই বেশি হইবে। মহাকালের হাতে আমরা যত বেশি দিব ততই বেশি সে লইবে ইহা সত্য নহে। আমার বোঝা অত্যন্ত ভারী হইয়াছে— ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে ইহার মধ্যে অনেকটা অংশে মৃত্যুর মার্কা পড়িয়াছে। যিনি অমরত্বরথের রথী তিনি সোনার মুকুট, হীরার কণ্ঠি, মানিকের অঙ্গদ ধারণ করেন, তিনি বস্তা মাথায় করিয়া লন না।

কিন্তু আমি কারুকরের মতো সংহত অথচ মূল্যবান গহনা গড়িয়া দিতে পারি নাই। আমি, যখন যাহা জুটিয়াছে তাহা লইয়া কেবল মোট বাঁধিয়া দিয়াছি; তাহার দামের চেয়ে তাহার ভার বেশি। অপব্যয় বলিয়া যেমন একটা ব্যাপার আছে অপসঞ্চয়ও তেমনি একটি উৎপাত। সাহিত্যে এই অপরাধ আমার ঘটিয়াছে। যেখানে মালচালানের পরীক্ষাশালা সেই কস্টম্‌হৌসের হাত হইতে ইহার সমস্তগুলি পার হইতে পারিবে না। কিন্তু সেই লোকসানের আশঙ্কা লইয়া ক্ষোভ করিতে চাই না। যেমন এক দিকে চিরকালটা আছে তেমনি আর-এক দিকে ক্ষণকালটাও আছে। সেই ক্ষণকালের প্রয়োজনে, ক্ষণকালের উৎসবে, এমন-কি, ক্ষণকালের অনাবশ্যক ফেলাছড়ার ব্যাপারেও যাহা জোগান দেওয়া গেছে, তাহার স্থায়িত্ব নাই বলিয়া যে তাহার কোনো ফল নাই তাহা বলিতে পারি না। একটা ফল তো এই দেখিতেছি, অন্তত প্রাচুর্যের দ্বারাতেও বর্তমানকালের হৃদয়টিকে আমার কবিত্বচেষ্টা কিছু পরিমাণে জুড়িয়া বসিয়াছে এবং আমার পাঠকদের হৃদয়ের তরফ হইতে আজ যাহা পাইলাম তাহা যে অনেকটা পরিমাণে সেই দানের প্রতিদান তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু এই দানও যেমন ক্ষণস্থায়ী তাহার প্রতিদানও চিরদিনের নহে। আমি যে ফুল ফুটাইয়াছি তাহারও বিস্তর ঝরিবে, আপনারা যে মালা দিলেন তাহারও অনেক শুকাইবে। বাঁচিয়া থাকিতেই কবি যাহা পায় তাহার মধ্যে ক্ষণকালের এই দেনাপাওনা শোধ হইতে থাকে। অদ্যকার সম্বর্ধনার মধ্যে সেই ক্ষণকালের হিসাবনিকাশের অঙ্ক যে প্রচুরপরিমাণে আছে তাহা আমি নিজেকে ভুলিতে দিব না।

এই ক্ষণকালের ব্যবসায়ে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অনেক ফাঁকি চলে। বিস্তর ব্যর্থতা দিয়া ওজন ভারী করিয়া তোলা যায়— যতটা মনে করা যায় তাহার চেয়ে বলা যায় বেশি— দর অপেক্ষা দস্তুরের দিকে বেশি দৃষ্টি পড়ে, অনুভবের চেয়ে অনুকরণের

মাত্রা অধিক হইয়া উঠে। আমার সুদীর্ঘকালের সাহিত্য-কারবারে সেই-সকল ফাঁকি জ্ঞানে অজ্ঞানে অনেক জমিয়াছে সে কথা আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে।

কেবল একটি কথা আজ আমি নিজের পক্ষ হইতে বলিব, সেটি এই যে, সাহিত্যে আজ পর্যন্ত আমি যাহা দিবার যোগ্য মনে করিয়াছি তাহাই দিয়াছি, লোকে যাহা দাবি করিয়াছে তাহাই জোগাইতে চেষ্টা করি নাই। আমি আমার রচনা পাঠকদের মনের মতো করিয়া তুলিবার দিকে চোখ না রাখিয়া আমার মনের মতো করিয়াই সভায় উপস্থিত করিয়াছি। সভার প্রতি ইহাই যথার্থ সম্মান। কিন্তু এরূপ প্রণালীতে আর যাহাই হউক, শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত বাহবা পাওয়া যায় না, আমি তাহা পাইও নাই। আমার যশের ভোজে আজ সমাপনের বেলায় যে মধুর জুটিয়াছে, বরাবর এ রসের আয়োজন ছিল না। যে ছন্দে যে ভাষায় একদিন কাব্যরচনা আরম্ভ করিয়াছিলাম তখনকার কালে তাহা আদর পায় নাই এবং এখনকার কালেও যে তাহা আদরের যোগ্য তাহা আমি বলিতে চাই না। কেবল আমার বলিবার কথা এই যে, যাহা আমার তাহাই আমি অন্যকে দিয়াছিলাম— ইহার চেয়ে সহজ সুবিধার পথ আমি অবলম্বন করি নাই। অনেক সময়ে লোককে বঞ্চনা করিয়াই খুশি করা যায়— কিন্তু সেই খুশিও কিছুকাল পরে ফিরিয়া বঞ্চনা করে— সেই সুলভ খুশির দিকে লোভদৃষ্টিপাত করি নাই।

তাহার পরে আমার রচনায় অপ্রিয় বাক্যও আমি অনেক বলিয়াছি এবং অপ্রিয় বাক্যের যাহা নগদ-বিদায় তাহাও আমাকে বার বার পিঠ পাতিয়া লইতে হইয়াছে। আপনার শক্তিতেই মানুষ আপনার সত্য উন্নতি করিতে পারে, মাগিয়া পাতিয়া কেহ কোনোদিন স্থায়ী কল্যাণ লাভ করিতে পারে না, এই নিতান্ত পুরাতন কথাটিও দুঃসহ গালি না খাইয়া বলিবার সুযোগ পাই নাই। এমন ঘটনা উপরি-উপরি অনেকবারই ঘটিল। কিন্তু যাহাকে আমি সত্য বলিয়া জানিয়াছি তাহাকে হাটে বিকাইয়া দিয়া লোকপ্রিয় হইবার চেষ্টা করি নাই। আমার দেশকে আমি অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করি, আমার দেশের যাহা শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাহার তুলনা আমি কোথাও দেখি নাই; এইজন্য দুর্গতির দিনের যে-কোনো ধূলিজঞ্জাল সেই আমাদের চিরসাধনার ধনকে কিছুমাত্র আচ্ছন্ন করিয়াছে তাহার প্রতি আমি লেশমাত্র মমতা প্রকাশ করি নাই— এইখানে আমার শ্রোতা ও পাঠকদের সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে আমার মতের গুরুতর বিরোধ ঘটিয়াছে। আমি জানি, এই বিরোধ অত্যন্ত কঠিন এবং ইহার আঘাত অতিশয় মর্মান্তিক; এই অনৈক্যে বন্ধুকে শত্রু ও আত্মীয়কে পর বলিয়া আমরা কল্পনা করি। কিন্তু এইরূপ

আঘাত দিবার যে আঘাত তাহাও আমি সহ্য করিয়াছি। আমি অপ্রিয়তাকে কৌশলে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করি নাই।

এইজন্যই আজ আপনাদের নিকট হইতে যে সমাদর লাভ করিলাম তাহাকে এমন দুর্লভ বলিয়া শিরোধার্য করিয়া লইতেছি। ইহা স্তুতিবাক্যের মূল্য নহে, ইহা প্রীতিরই উপহার। ইহাতে যে ব্যক্তি মান পায় সেও সম্মানিত হয়, আর যিনি মান দেন তাঁহারও সম্মানবৃদ্ধি হয়। যে সমাজে মানুষ নিজের সত্য আদর্শকে বজায় রাখিয়া নিজের সত্য মতকে খর্ব না করিয়াও শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারে সেই সমাজই যথার্থ শ্রদ্ধাভাজন— যেখানে আদর পাইতে হইলে মানুষ নিজের সত্য বিকাইয়া দিতে বাধ্য হয় সেখানকার আদর আদরণীয় নহে। কে আমার দলে, কে আমার দলে নয়, সেই বুঝিয়া যেখানে স্তুতি-সম্মানের ভাগ বণ্টন হয় সেখানকার সম্মান অস্পৃশ্য ; সেখানে যদি ঘৃণা করিয়া লোক গায়ে ধুলা দেয় তবে সেই ধুলাই যথার্থ ভূষণ, যদি রাগ করিয়া গালি দেয় তবে সেই গালিই যথার্থ সম্বর্ধনা।

সম্মান যেখানে মহৎ, যেখানে সত্য, সেখানে নম্রতায় আপনি মন নত হয়। অতএব আজ আপনাদের কাছ হইতে বিদায় হইবার পূর্বে এ কথা অন্তরের সহিত আপনাদিগকে জানাইয়া যাইতে পারিব যে, আপনাদের প্রদত্ত এই সম্মানের উপহার আমি দেশের আশীর্বাদের মতো মাথায় করিয়া লইলাম— ইহা পবিত্র সামগ্রী, ইহা আমার ভোগের পদার্থ নহে, ইহা আমার চিত্তকে বিশুদ্ধ করিবে ; আমার অহংকারকে আলোড়িত করিয়া তুলিবে না।

ফাল্গুন ১৩১৮

৩

সকল মানুষেরই 'আমার ধর্ম' বলে একটা বিশেষ জিনিস আছে। কিন্তু সেইটিকেই সে স্পষ্ট করে জানে না। সে জানে আমি খৃস্টান, আমি মুসলমান, আমি বৈষ্ণব, আমি শাক্ত ইত্যাদি। কিন্তু সে নিজেকে যে ধর্মাবলম্বী বলে জন্মকাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত নিশ্চিন্ত আছে সে হয়তো সত্য তা নয়। নাম গ্রহণেই এমন একটা আড়াল তৈরি করে দেয় যাতে নিজের ভিতরকার ধর্মটা তার নিজের চোখেও পড়ে না।

কোন্‌ ধর্মটি তার? যে ধর্ম মনের ভিতরে গোপনে থেকে তাকে সৃষ্টি করে তুলছে। জীবজন্তুকে গড়ে তোলে তার অন্তর্নিহিত প্রাণধর্ম। সেই প্রাণধর্মটির কোনো খবর রাখা জন্তুর পক্ষে দরকারই নেই। মানুষের আর-একটি প্রাণ আছে, সেটা শারীর-প্রাণের চেয়ে বড়ো— সেইটে তার মনুষ্যত্ব। এই প্রাণের ভিতরকার সৃজনীশক্তিই হচ্ছে তার ধর্ম। এইজন্যে আমাদের ভাষায় 'ধর্ম' শব্দ খুব একটা অর্থপূর্ণ শব্দ। জলের জলত্বই হচ্ছে জলের ধর্ম, আগুনের আগুনত্বই হচ্ছে আগুনের ধর্ম। তেমনি মানুষের ধর্মটিই হচ্ছে তার অন্তরতম সত্য।

মানুষের প্রত্যেকের মধ্যে সত্যের একটি বিশ্বরূপ আছে, আবার সেইসঙ্গে তার একটি বিশেষ রূপ আছে। সেইটেই হচ্ছে তার বিশেষ ধর্ম। সেইখানেই সে ব্যক্তি সংসারের বিচিত্রতা রক্ষা করছে। সৃষ্টির পক্ষে এই বিচিত্রতা বহুমূল্য সামগ্রী। এইজন্যে একে সম্পূর্ণ নষ্ট করবার শক্তি আমাদের হাতে নেই। আমি সাম্যনীতিকে যতই মানি নে কেন, তবু অন্য-সকলের সঙ্গে আমার চেহারার বৈষম্যকে আমি কোনোমতেই লুপ্ত করতে পারি নে। তেমনি সাম্প্রদায়িক সাধারণ নাম গ্রহণ করে আমি যতই মনে করি-না কেন যে, আমি সম্প্রদায়ের সকলেরই সঙ্গে সমান ধর্মের, তবু আমার অন্তর্যামী জানেন মনুষ্যত্বের মূলে আমার ধর্মের একটি বিশিষ্টতা বিরাজ করছে। সেই বিশিষ্টতাতেই আমার অন্তর্যামীর বিশেষ আনন্দ।

কিন্তু পূর্বেই বলেছি, যেটা বাইরে থেকে দেখা যায় সেটা আমার সাম্প্রদায়িক ধর্ম। সেই সাধারণ পরিচয়েই লোকসমাজে আমার ধর্মগত পরিচয়। সেটা যেন আমার মাথার উপরকার পাগড়ি। কিন্তু যেটা আমার মাথার ভিতরকার মগজ, যেটা অদৃশ্য, যে পরিচয়টি আমার অন্তর্যামীর কাছে ব্যক্ত, হঠাৎ বাইরে থেকে কেউ যদি বলে, তার উপরকার প্রাণময় রহস্যের আবরণ ফুটো হয়ে সেটা বেরিয়ে পড়েছে, এমন-কি, তার উপাদান বিশ্লেষণ করে তাকে যদি বিশেষ একটা শ্রেণীর মধ্যে বদ্ধ করে দেয়, তা হলে চমকে উঠতে হয়।

২৭।১৫

আমার সেই অবস্থা হয়েছে। সম্প্রতি কোনো কাগজে একটি সমালোচনা বেরিয়েছে, তাতে জানা গেল আমার মধ্যে একটি ধর্মতত্ত্ব আছে এবং সেই তত্ত্বটি একটি বিশেষ শ্রেণীর।

হঠাৎ কেউ যদি আমাকে বলত আমার প্রেতমূর্তিটা দেখা যাচ্ছে, তা হলে সেটা যেমন একটা ভাবনার কথা হত এও তার চেয়ে কম নয়। কেননা মানুষের মর্তলীলা সাঙ্গ না হলে প্রেতলীলা শুরু হয় না। আমার প্রেতটি দেখা দিয়েছে এ কথা বললে এই বোঝায় যে, আমার বর্তমান আমার পক্ষে আর সত্য নয়, আমার অতীতটাই আমার পক্ষে একমাত্র সত্য। আমার ধর্ম আমার জীবনেরই মূলে। সেই জীবন এখনো চলছে— কিন্তু মাঝে থেকে কোনো-এক সময়ে তার ধর্মটা এমনি থেমে গিয়েছে যে, তার উপরে টিকিট মেরে তাকে জাদুঘরে কৌতূহলী দর্শকদের চোখের সম্মুখে ধরে রাখা যায়, এই সংবাদটা বিশ্বাস করা শক্ত।

কয়েক বৎসর পূর্বে অন্য একটি কাগজে অন্য একজন লেখক আমার রচিত ধর্মসংগীতের একটি সমালোচনা বের করেছিলেন। তাতে বেছে বেছে আমার কাঁচাবয়সের কয়েকটি গান দৃষ্টান্তস্বরূপ চেপে ধরে তিনি তাঁর ইচ্ছামত সিদ্ধান্ত গড়ে তুলেছিলেন। যেখানে আমি থামি নি সেখানে আমি থেমেছি এমন ভাবের একটা ফোটোগ্রাফ তুললে মানুষকে অপদস্থ করা হয়। চলতি ঘোড়ার আকাশে-পা-তোলা ছবির থেকে প্রমাণ হয় না যে, বরাবর তার পা আকাশেই তোলা ছিল এবং আকাশেই তোলা আছে। এইজন্যে চলার ছবি ফোটোগ্রাফে হাস্যকর হয়, কেবলমাত্র আর্টিস্টের তুলিতেই তার রূপ ধরা পড়ে।

কিন্তু কথাটা হয়তো সম্পূর্ণ সত্য নয়। হয়তো যার মূলটা চেতনার অগোচরে তার ডগার দিকের কোনো-একটা প্রকাশ বাইরে দৃশ্যমান হয়েছে। সেইরকম দৃশ্যমান হবামাত্র বাইরের জগতের সঙ্গে তার একটা ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে। যখনই সেই ব্যবহার আরম্ভ হয় তখনই জগৎ আপনার কাজের সুবিধার জন্য তাকে কোনো-একটা বিশেষ শ্রেণীর চিহ্নে চিহ্নিত করে তবে নিশ্চিন্ত হয়। নইলে তার দাম ঠিক করা বা প্রয়োজন ঠিক করা চলে না।

বাইরের জগতে মানুষের যে পরিচয় সেইটেতেই তার প্রতিষ্ঠা। বাইরের এই পরিচয়টি যদি তার ভিতরের সত্যের সঙ্গে কোনো অংশে না মেলে তা হলে তার অস্তিত্বের মধ্যে একটা আত্মবিচ্ছেদ ঘটে। কেননা মানুষ যে কেবল নিজের মধ্যে আছে তা নয়, সকলে তাকে যা জানে সেই জানার মধ্যেও সে অনেকখানি আছে। 'আপনাকে জানো' এই কথাটাই শেষ কথা নয়, 'আপনাকে জানাও'

এটাও খুব বড়ো কথা। সেই আপনাকে জানাবার চেষ্টা জগৎ জুড়ে রয়েছে। আমার অন্তর্নিহিত ধর্মতত্ত্বও নিজের মধ্যে নিজেকে ধারণ করে রাখতে পারে না— নিশ্চয়ই আমার গোচরে ও অগোচরে নানারকম করে বাইরে নিজেকে জানিয়ে চলেছে।

এই জানিয়ে চলার কোনোদিন শেষ নেই। এর মধ্যে যদি কোনো সত্য থাকে তা হলে মৃত্যুর পরেও শেষ হবে না। অতএব চুপ করে গেলে ক্ষতি কী এমন কথা উঠতে পারে। নিজের কাব্যপরিচয় সম্বন্ধে তো চুপ করেই সকল কথা সহ্য করতে হয়। তার কারণ, সেটা রুচির কথা। রুচির প্রমাণ তর্কে হতে পারে না। রুচির প্রমাণ কালে। কালের ধৈর্য অসীম, রুচিকেও তার অনুসরণ করতে হয়। নিজের সমস্ত পাওনা সে নগদ আদায় করবার আশা করতে পারে না। কিন্তু যদি আমার কোনো একটা ধর্মতত্ত্ব থাকে তবে তার পরিচয় সম্বন্ধে কোনো ভুল রেখে দেওয়া নিজের প্রতি এবং অন্যের প্রতি অন্যায় আচরণ করা। কারণ যেটা নিয়ে অন্যের সঙ্গে ব্যবহার চলছে, যার প্রয়োজন এবং মূল্য সত্যভাবে স্থির হওয়া উচিত, সেটা নিয়ে কোনো যাচনদার যদি এমন-কিছু বলেন যা আমার মতে সংগত নয়, তবে চুপ করে গেলে নিতান্ত অবিনয় হবে।

অবশ্য এ কথা মানতে হবে যে ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার যা-কিছু প্রকাশ সে হচ্ছে পথ-চল্‌তি পথিকের নোটবইয়ের টোকা কথার মতো। নিজের গম্যস্থানে পৌঁছে যাঁরা কোনো কথা বলেছেন তাঁদের কথা একেবারে সুস্পষ্ট। তাঁরা নিজের কথাকে নিজের বাইরে ধরে রেখে দেখতে পান। আমি আমার তত্ত্বকে তেমন করে নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখি নি। সেই তত্ত্বটি গড়ে উঠতে উঠতে বেড়ে চলতে চলতে নানা রচনায় নিজের যে-সমস্ত চিহ্ন রেখে গেছে সেইগুলিই হচ্ছে তার পরিচয়ের উপকরণ। এমন অবস্থায় মুশকিল এই যে, এই উপকরণগুলিকে সমগ্র করে তোলবার সময় কে কোন্‌গুলিকে মুড়োর দিকে বা ল্যাজার দিকে কেমন করে সাজাবেন সে তাঁর নিজের সংস্কারের উপর নির্ভর করে।

অন্যে যেমন হয় তা করুন, কিন্তু আমিও এই উপকরণগুলিকে নিজের হাতে জোড়া দিয়ে দেখতে চাই এর থেকে কোন্ ছবিটি ফুটে বেরোয়।

কথা উঠেছে আমার ধর্ম বাঁশির তানেই মোহিত, তার ঝোঁকটা প্রধানত শান্তির দিকেই, শক্তির দিকে নয়। এই কথাটাকে বিচার করে দেখা আমার নিজের জন্যেও দরকার।

কারো কারো পক্ষে ধর্ম জিনিসটা সংসারের রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাবার ভদ্র পথ। নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে এমন-একটা ছুটি নেওয়া যে ছুটিতে লজ্জা নেই, এমন-কি, গৌরব আছে। অর্থাৎ, সংসার থেকে জীবন থেকে যে-যে অংশ বাদ দিলে কর্মের দায় চোকে, ধর্মের নামে সেই সমস্তকে বাদ দিয়ে একটা হাঁফ ছাড়তে পারার জায়গা পাওয়াকে কেউ কেউ ধর্মের উদ্দেশ্য মনে করেন। এঁরা হলেন বৈরাগী। আবার ভোগীর দলও আছেন। তাঁরা সংসারের কতকগুলি বিশেষ রসসম্ভোগকে আধ্যাত্মিকতার মধ্যে চোলাই করে নিয়ে তাই পান করে জগতের আর-সমস্ত ভুলে থাকতে চান। অর্থাৎ একদল এমন-একটি শান্তি চান যে শান্তি সংসারকে বাদ দিয়ে, আর অন্যদল এমন-একটি স্বর্গ চান যে স্বর্গ সংসারকে ভুলে গিয়ে। এই দুই দলই পালাবার পথকেই ধর্মের পথ বলে মনে করেন।

আবার এমন দলও আছেন যাঁরা সমস্ত সুখদুঃখ সমস্ত বিধাবন্ধ -সমেত এই সংসারকেই সত্যের মধ্যে জেনে চরিতার্থতা লাভ করাকেই ধর্ম বলে জানেন। সংসারকে সংসারের মধ্যেই ধরে দেখলে তার সেই পরম অর্থটি পাওয়া যায় না যে অর্থ তাকে সর্বত্র ওতপ্রোত করে এবং সকল দিকে অতিক্রম করে বিরাজ করছে। অতএব কোনো অংশে সত্যকে ত্যাগ করা নয় কিন্তু সর্বাংশে সেই সত্যের পরম অর্থ টিকে উপলব্ধি করাকেই তাঁরা ধর্ম বলে জানেন।

ইস্কুল পালানোর দুটো লক্ষ্য থাকতে পারে। এক, কিছু না-করা; আর-এক, মনের মতো খেলা করা। ইস্কুলের মধ্যে যে একটা সাধনার দুঃখ আছে সেইটে থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যেই এমন করে প্রাচীর লঙ্ঘন, এমন করে দরোয়ানকে ঘুষ দেওয়া। কিন্তু আবার ঐ সাধনার দুঃখকে স্বীকার করবারও দু-রকম দিক আছে। একদল ছেলে আছে তারা নিয়মকে শাসনের ভয়ে মানে, আর-এক দল ছেলে অভ্যস্ত নিয়ম-পালনটাতেই আশ্রয় পায়— তারা প্রতিদিন ঠিক দস্তুরমত, ঠিক সময়মত, উপরওয়ালার আদেশমত যন্ত্রবৎ কাজ করে যেতে পারলে নিশ্চিন্ত হয় এবং তাতে যেন একটা-কিছু লাভ হল বলে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে। কিন্তু এই দুই দলেরই ছেলে নিয়মকেই চরম বলে দেখে, তার বাইরে কিছুকে দেখে না।

কিন্তু এমন ছেলেও আছে ইস্কুলের সাধনার দুঃখকে স্বেচ্ছায়, এমন-কি, আনন্দে যে গ্রহণ করে, যেহেতু ইস্কুলের অভিপ্রায়কে সে মনের মধ্যে সত্য করে উপলব্ধি করেছে। এই অভিপ্রায়কে সত্য করে জানছে বলেই সে যে মুহূর্তে দুঃখকে পাচ্ছে সেই মুহূর্তে দুঃখকে অতিক্রম করছে, যে মুহূর্তে নিয়মকে মানছে সেই মুহূর্তে তার মন তার থেকে মুক্তিলাভ করছে। এই মুক্তিই সত্যকার মুক্তি। সাধনা থেকে এড়িয়ে গিয়ে মুক্তি

হচ্ছে নিজেকে ফাঁকি দেওয়া। জ্ঞানের পরিপূর্ণতার একটি আনন্দচ্ছবি এই ছেলেটি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে বলেই উপস্থিত সমস্ত অসম্পূর্ণতাকে, সমস্ত দুঃখকে, সমস্ত বন্ধনকে সে সেই আনন্দেরই অন্তর্গত করে জানছে। এ ছেলের পক্ষে পালানো একেবারে অসম্ভব। তার যে আনন্দ দুঃখকে স্বীকার করে সে আনন্দ কিছু না করার চেয়ে বড়ো, সে আনন্দ খেলা করার চেয়ে বড়ো। সে আনন্দ শান্তির চেয়ে বড়ো, সে আনন্দ বাঁশির তানের চেয়ে বড়ো।

এখন কথা হচ্ছে এই যে, আমি কোন্ ধর্মকে স্বীকার করি। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে, আমি যখন 'আমার ধর্ম' কথাটা ব্যবহার করি তখন তার মানে এ নয় যে আমি কোনো একটা বিশেষ ধর্মে সিদ্ধিলাভ করেছি। যে বলে আমি খৃস্টান সে যে খৃস্টের অনুরূপ হতে পেরেছে তা নয়— তার ব্যবহারে প্রত্যহ খৃস্টানধর্মের বিরুদ্ধতা বিস্তর দেখা যায়। আমার কর্ম, আমার বাক্য কখনো আমার ধর্মের বিরুদ্ধে যে চলে না এতবড়ো মিথ্যা কথা বলতে আমি চাই নে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, আমার ধর্মের আদর্শটি কী।

বাইরে আমার রচনার মধ্যে এর উত্তর নানা জায়গাতেই আছে। অন্তরেও যখন নিজেকে এই প্রশ্ন করি তখন আমার অন্তরাত্মা বলে— আমি তো কিছুকেই ছাড়বার পক্ষপাতী নই, কেননা সমস্তকে নিয়েই আমি সম্পূর্ণ।

আমি যে সব নিতে চাই রে—
আপনাকে ভাই মেলব যে বাইরে।

যখন কোনো অংশকে বাদ দিয়ে তবে সত্যকে সত্য বলি তখন তাকে অস্বীকার করি। সত্যের লক্ষণই এই যে, সমস্তই তার মধ্যে এসে মেলে। সেই মেলার মধ্যে আপাতত যতই অসামঞ্জস্য প্রতীয়মান হোক তার মূলে একটা গভীর সামঞ্জস্য আছে, নইলে সে আপনাকে আপনি হনন করত। অতএব, সামঞ্জস্য সত্যের ধর্ম বলে বাদসাদ দিয়ে গোঁজামিলন দিয়ে একটা ঘর-গড়া সামঞ্জস্য গড়ে তুললে সেটা সত্যকে বাধাগ্রস্ত করে তোলে। এক সময়ে মানুষ ঘরে বসে ঠিক করেছিল যে, পৃথিবী একটা পদ্মফুলের মতো— তার কেন্দ্রস্থলে সুমেরু পর্বতটি যেন বীজকোষ— চারিদিকে এক-একটি পাপড়ির মতো এক-একটি মহাদেশ প্রসারিত। এরকম কল্পনা করবার মূল কথাটা হচ্ছে এই যে, সত্যের একটি সুষমা আছে— সেই সুষমা না থাকলে সত্য আপনাকে আপনি ধারণ করে রাখতে পারে না। এ কথাটা যথার্থ। কিন্তু এই সুষমাটা বৈষম্যকে বাদ দিয়ে নয়— বৈষম্যকে গ্রহণ করে এবং অতিক্রম করে— শিব যেমন সমুদ্রমন্থনের সমস্ত বিষকে পান করে তবে শিব।* তাই সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা করে

তবে শিব। তাই সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা করে পৃথিবীটি বস্তুত যেমন, অর্থাৎ নানা অসমান অংশে বিভক্ত, তাকে তেমনি করেই জানবার সাহস থাকা চাই। ছাঁট-দেওয়া সত্য এবং ঘর-গড়া সামঞ্জস্যের প্রতি আমার লোভ নেই। আমার লোভ আরো বেশি, তাই আমি অসামঞ্জস্যকেও ভয় করি নে।

যখন বয়স অল্প ছিল তখন নানা কারণে লোকালয়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না, তখন নিভৃতে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গেই ছিল আমার একান্ত যোগ। এই যোগটি সহজেই শান্তিময়, কেননা এর মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই, বিরোধ নেই, মনের সঙ্গে মনের— ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার সংঘাত নেই। এই অবস্থা ঠিক শিশুকালেরই সত্য অবস্থা। তখন অন্তঃপুরের অন্তরালে শান্তি এবং মাধুর্যেরই দরকার। বীজের দরকার মাটির বুকের মধ্যে বিরাট পৃথিবীর পর্দার আড়ালে শান্তিতে রস শোষণ করা। ঝড়বৃষ্টিরৌদ্রছায়ার ঘাতপ্রতিঘাত তখন তার জন্যে নয়। তেমনি এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় ধর্মবোধের যে আভাস মেলে সে হচ্ছে বৃহতের আস্বাদনে। এইখানে শিশু কেবল তাঁকেই দেখে যিনি কেবল শান্তম্, তাঁরই মধ্যে বেড়ে ওঠে যিনি কেবল সত্যম্।

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নিজের প্রকৃতির মিলটা অনুভব করা সহজ, কেননা সে দিক থেকে কোনো চিত্ত আমাদের চিত্তকে কোথাও বাধা দেয় না। কিন্তু এই মিলটাতেই আমাদের তৃপ্তির সম্পূর্ণতা কখনোই ঘটতে পারে না। কেননা আমাদের চিত্ত আছে, সেও আপনার একটি বড়ো মিল চায়। এই মিলটা বিশ্বপ্রকৃতির ক্ষেত্রে সম্ভব নয়, বিশ্বমানবের ক্ষেত্রেই সম্ভব। সেইখানে আপনাকে ব্যাপ্ত করে আপনার বড়ো-আমির সঙ্গে আমরা মিলতে চাই। সেইখানে আমরা আমাদের বড়ো পিতাকে, সখাকে, স্বামীকে, কর্মের নেতাকে, পথের চালককে চাই। সেইখানে কেবল আমার ছোটো-আমিকে নিয়েই যখন চলি তখন মনুষ্যত্ব পীড়িত হয়; তখন মৃত্যু ভয় দেখায়, ক্ষতি বিমর্ষ করে, তখন বর্তমান ভবিষ্যৎকে হনন করতে থাকে, দুঃখশোক এমন একান্ত হয়ে ওঠে যে তাকে অতিক্রম করে কোথাও সান্ত্বনা দেখতে পাই নে। তখন প্রাণপণে কেবলই সঞ্চয় করি, ত্যাগ করবার কোনো অর্থ দেখি নে, ছোটো ছোটো ঈর্ষাদ্বেষে মন জর্জরিত হয়ে ওঠে— তখন—

শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি
শরমের ডালি,
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের,
ধূমাঙ্কিত কালি।

এই বড়ো-আমিকে চাওয়ার আবেগ ক্রমে আমার কবিতার মধ্যে যখন ফুটতে লাগল, অর্থাৎ অঙ্কুররূপে বীজ যখন মাটি ফুঁড়ে বাইরের আকাশে দেখা দিলে, তারই উপক্রম দেখি, 'সোনার তরী'র 'বিশ্বনৃত্যে'—

বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে
কে বাজাবে সেই বাজনা।
উঠিবে চিত্ত করিয়া নৃত্য
বিস্মৃত হবে আপনা।
টুটিবে বন্ধ, মহা আনন্দ,
নব সংগীতে নূতন ছন্দ,
হৃদয়সাগরে পূর্ণচন্দ্র
জাগাবে নবীন বাসনা।

কিন্তু এতেও বাজনার সুর। যদিও এ সুর মন্দ্র বটে, কিন্তু মধুর মন্দ্র। যাই হোক কবিতার গতিটা এখানে প্রকৃতির ধাপ থেকে মানুষের ধাপে উঠছে। বিরাটের চিন্ময়তার পরিচয় লাভ করছে। তাই ঐ কবিতাতেই আছে—

ওই কে বাজায় দিবসনিশায়
বসি অন্তর-আসনে
কালের যন্ত্রে বিচিত্র সুর—
কেহ শোনে, কেহ না শোনে।
অর্থ কী তার ভাবিয়া না পাই,
কত গুণী জ্ঞানী চিন্তিছে তাই,
মহান মানবমানস সদাই
উঠে পড়ে তারি শাসনে।

বিশ্বমানবের ইতিহাসকে যে একজন চিন্ময় পুরুষ সমস্ত বাধাবিঘ্ন ভেদ করে দুর্গম বন্ধুর পথ দিয়ে চালনা করছেন এখানে তাঁরই কথা দেখি। এখন হতে নিরবচ্ছিন্ন শান্তির পালা শেষ হল।

কিন্তু বিরোধ-বিপ্লবের ভিতর দিয়ে মানুষ যে ঐক্যটি খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই ঐক্যটি কী। সেই হচ্ছে শিবম্। এই-যে মঙ্গল এর মধ্যে একটা মস্ত দ্বন্দ্ব। অঙ্কুর এখানে দুই ভাগ হয়ে বাড়তে চলেছে, সুখদুঃখ, ভালোমন্দ। মাটির মধ্যে যেটি ছিল সেটি এক, সেটি শান্তম্, সেখানে আলো-আঁধারের লড়াই ছিল না। লড়াই যেখানে বাধল সেখানে শিবকে যদি না জানি তবে সেখানকার সত্যকে জানা হবে না। এই শিবকে

আনার বেদনা বড়ো তীব্র। এইখানে 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্'। কিন্তু এই বড়ো বেদনার মধ্যেই আমাদের ধর্মবোধের যথার্থ জন্ম। বিশ্বপ্রকৃতির বৃহৎ-শান্তির মধ্যে তার গর্ভবাস। আমার নিজের সম্বন্ধে নৈবেদ্যে'র দুটি কবিতায় এ কথা বলা আছে।

১

মাতৃস্নেহবিগলিত স্তন্যক্ষীররস
পান করি হাসে শিশু আনন্দে অলস—
তেমনি বিহ্বল হর্ষে ভাবরসরাশি
কৈশোরে করেছি পান, বাজায়েছি বাঁশি
প্রমত্ত পঞ্চম সুরে— প্রকৃতির বুকে
লালনললিত চিত্ত শিশুসম সুখে
ছিনু শুয়ে, প্রভাত-শর্বরী-সন্ধ্যা-বধূ
নানা পাত্রে আনি দিত নানাবর্ণ মধু
পুষ্পগন্ধে-মাখা। আজি সেই ভাবাবেশ
সেই বিহ্বলতা যদি হয়ে থাকে শেষ,
প্রকৃতির স্পর্শমোহ গিয়ে থাকে দূরে—
কোনো দুঃখ নাহি। পল্লী হতে রাজপুরে
এবার এনেছ মোরে, দাও চিত্তে বল।
দেখাও সত্যের মূর্তি কঠিন নির্মল।

২

আঘাত-সংঘাত মাঝে দাঁড়াইনু আসি।
অঙ্গদ কুণ্ডল কণ্ঠী অলংকাররাশি
খুলিয়া ফেলেছি দূরে। দাও হস্তে তুলি
নিজহাতে তোমার অমোঘ শরগুলি,
তোমার অক্ষয় তূণ। অস্ত্রে দীক্ষা দেহ
রণগুরু। তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে।
করো মোরে সম্মানিত নব-বীরবেশে,

দুরূহ কর্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন অলংকার। ধন্য করো দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন
কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন।

যে শ্রেয় মানুষের আত্মাকে দুঃখের পথে দ্বন্দ্বের পথে অভয় দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলে সেই শ্রেয়কে আশ্রয় করেই প্রিয়কে পাবার আকাঙ্ক্ষাটি 'চিত্রা'র 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটির মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে। বাঁশির সুরের প্রতি ধিক্‌কার দিয়েই সে কবিতার আরম্ভ—

যেদিন জগতে চলে আসি,
কোন্ মা আমারে দিলি শুধু এই খেলাবার বাঁশি।
বাজাতে বাজাতে তাই মুগ্ধ হয়ে আপনার সুরে
দীর্ঘদিন দীর্ঘরাত্রি চলে গেনু একান্ত সুদূরে
ছাড়ায়ে সংসারসীমা।

মাধুর্যের যে শান্তি এ কবিতার লক্ষ্য তা নয়। এ কবিতায় যার অভিসার সে কে?

কে সে? জানি না কে। চিনি নাই তারে—
শুধু এইটুকু জানি— তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তরপানে
ঝড়ঝঞ্ঝা-বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর-প্রদীপখানি। শুধু জানি, যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বানগীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরানে
সংকট-আবর্তমাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি, মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সংগীতের মতো। দহিয়াছে অগ্নি তারে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে,
সর্ব প্রিয়বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোমহুতাশন—

হৃৎপিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্তপদ্ম অর্ঘ্য-উপহারে
ভক্তিভরে জন্মশোধ শেষ পূজা পূজিয়াছে তারে
মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ।

এর পর থেকে বিরাটচিত্তের সঙ্গে মানবচিত্তের ঘাত-প্রতিঘাতের কথা ক্ষণে ক্ষণে আমার কবিতার মধ্যে দেখা দিতে লাগল। দুইয়ের এই সংঘাত যে কেবল আরামের, কেবল মাধুর্যের তা নয়। অশেষের দিক থেকে যে আহ্বান এসে পৌঁছয় সে তো বাঁশির ললিত সুরে নয়। তাই সেই সুরের জবাবেই আছে—

রে মোহিনী, রে নিষ্ঠুরা, ওরে রক্তলোভাতুরা
কঠোর স্বামিনী,
দিন মোর দিনু তোরে শেষে নিতে চাস হ'রে
আমার যামিনী?
জগতে সবারি আছে সংসারসীমার কাছে
কোনোখানে শেষ,
কেন আসে মর্মচ্ছেদি সকল সমাপ্তি ভেদি
তোমার আদেশ?
বিশ্বজোড়া অন্ধকার সকলেরি আপনার
একেলার স্থান,
কোথা হতে তারো মাঝে বিদ্যুতের মতো বাজে
তোমার আহ্বান?

এ আহ্বান এ তো শক্তিকেই আহ্বান; কর্মক্ষেত্রেই এর ডাক; রস-সম্ভোগের কুঞ্জকাননে নয়— সেইজন্যেই এর শেষ উত্তর এই—

হবে, হবে, হবে জয় হে দেবী, করি নে ভয়,
হব আমি জয়ী।
তোমার আহ্বানবাণী সফল করিব রানী,
হে মহিমাময়ী।
কাঁপিবে না ক্লান্তকর, ভাঙিবে না কণ্ঠস্বর,
টুটিবে না বীণা
নবীন প্রভাত লাগি দীর্ঘরাত্রি র'ব জাগি—
দীপ নিবিবে না।

কর্মভার নবপ্রাতে নবসেবকের হাতে
করি যাব দান,
মোর শেষ কণ্ঠস্বরে যাইব ঘোষণা করে
তোমার আহ্বান।

আমার ধর্ম আমার উপচেতন-লোকের অন্ধকারের ভিতর থেকে ক্রমে ক্রমে চেতন-লোকের আলোতে যে উঠে আসছে এই লেখাগুলি তারই স্পষ্ট ও অস্পষ্ট পায়ের চিহ্ন। সে চিহ্ন দেখলে বোঝা যায় যে, পথ সে চেনে না এবং সে জানে না ঠিক কোন্ দিকে সে যাচ্ছে। পথটা সংসারের কি অতিসংসারের তাও সে বোঝে নি। যাকে দেখতে পাচ্ছে তাকে নাম দিতে পারছে না, তাকে নানা নামে ডাকছে। যে লক্ষ্য মনে রেখে সে পা ফেলছিল বার বার, হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে দেখছে, আর-একটা দিকে কে তাকে নিয়ে চলছে।

পদে পদে তুমি ভুলাইলে দিক,
কোথা যাব আজি নাহি পাই ঠিক,
ক্লান্তহৃদয় ভ্রান্ত পথিক
এসেছি নূতন দেশে।
কখনো উদার গিরির শিখরে
কভু বেদনার তমোগহ্বরে
চিনি না যে পথ সে পথের 'পরে
চলেছি পাগল বেশে।

এই আবছায়া রাস্তায় চলতে চলতে যে একটি বোধ কবির সামনে ক্ষণে ক্ষণে চমক দিচ্ছিল তার কথা তখনকার একটা চিঠিতে আছে, সেই চিঠির দুই-এক অংশ তুলে দিই—

কে আমাকে গভীর গম্ভীর ভাবে সমস্ত জিনিস দেখতে বলছে, কে আমাকে অভিনিবিষ্ট স্থির কর্ণে সমস্ত বিশ্বাতীত সংগীত শুনতে প্রবৃত্ত করছে, বাইরের সঙ্গে আমার সূক্ষ্ম ও প্রবলতম যোগসূত্রগুলিকে প্রতিদিন সজাগ সচেতন করে তুলছে? ...

আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম পাই সে কখনোই আমার ধর্ম হয়ে ওঠে না। তার সঙ্গে কেবলমাত্র একটা অভ্যাসের যোগ জন্মে। ধর্মকে নিজের মধ্যে উদ্ভূত করে তোলাই মানুষের চিরজীবনের সাধনা। চরম বেদনায় তাকে জন্মদান করতে হয়,

নাড়ির শোণিত দিয়ে তাকে প্রাণদান করতে চাই, তার পরে জীবনে সুখ পাই আর না-পাই আনন্দে চরিতার্থ হয়ে মরতে পারি।

এমনি করে ক্রমে ক্রমে জীবনের মধ্যে ধর্মকে স্পষ্ট করে স্বীকার করবার অবস্থা এসে পৌঁছল। যতই এটা এগিয়ে চলল ততই পূর্ব জীবনের সঙ্গে আসন্ন জীবনের একটা বিচ্ছেদ দেখা দিতে লাগল। অনন্ত আকাশে বিশ্ব-প্রকৃতির যে শান্তিময় মাধুর্য-আসনটা পাতা ছিল, সেটাকে হঠাৎ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে বিরোধ-বিক্ষুব্ধ মানবলোকে রুদ্রবেশে কে দেখা দিল। এখন থেকে দ্বন্দ্বের দুঃখ, বিপ্লবের আলোড়ন। সেই নূতন বোধের অভ্যুদয় যে কী রকম ঝড়ের বেশে দেখা দিয়েছিল এই সময়কার 'বর্ষশেষ' কবিতার মধ্যে সেই কথাটি আছে—

হে দুর্দম, হে নিশ্চিত, হে নূতন, নিষ্ঠুর নূতন,
সহজ প্রবল।
জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুর্দিকে
বাহিরায় ফল—
পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব আকারে
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ—
প্রণমি তোমারে।
তোমারে প্রণমি আমি, হে ভীষণ, সুস্নিগ্ধ শ্যামল,
অক্লান্ত অম্লান'।
সদ্যোজাত মহাবীর, কী এনেছ করিয়া বহন
কিছু নাহি জানো।
উড়েছে তোমার ধ্বজা মেঘরন্ধ্রচ্যুত তপনের
জলদর্চিরেখা—
করজোড়ে চেয়ে আছি ঊর্ধ্বমুখে, পড়িতে জানি না
কী তাহাতে লেখা।
হে কুমার, হাস্যমুখে তোমার ধনুকে দাও টান
ঝনন রনন,
বক্ষের পঞ্জর ভেদি অন্তরেতে হউক কম্পিত
সুতীব্র স্বনন।

হে কিশোর, তুলে লও তোমার উদার জয়ভেরী
করহ আহ্বান।
আমরা দাঁড়াব উঠে, আমরা ছুটিয়া বাহিরিব,
অর্পিব পরান।
চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিব না দিক,
গনিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার,
উদ্দাম পথিক।

রাত্রির প্রান্তে প্রভাতের যখন প্রথম সঞ্চার হয় তখন তার আভাসটা যেন কেবল অলংকার রচনা করতে থাকে। আকাশের কোণে কোণে মেঘের গায়ে গায়ে নানা-রকম রঙ ফুটতে থাকে, গাছের মাথার উপরটা ঝিক্‌মিক্‌ করে, ঘাসে শিশিরগুলো ঝিল্‌মিল্‌ করতে শুরু করে, সমস্ত ব্যাপারটা প্রধানত আলংকারিক। কিন্তু তাতে করে এটুকু বোঝা যায় যে রাতের পালা শেষ হয়ে দিনের পালা আরম্ভ হল। বোঝা যায় আকাশের অন্তরে অন্তরে সূর্যের স্পর্শ লেগেছে; বোঝা যায় সুপ্তরাত্রির নিভৃত গম্ভীর পরিব্যাপ্ত শান্তি শেষ হল, জাগরণের সমস্ত বেদনা সপ্তকে সপ্তকে মিড় টেনে এখনই অশান্ত সুরের ঝংকারে বেজে উঠবে। এমনি করে ধর্মবোধের প্রথম উন্মেষটা সাহিত্যের অলংকারেই প্রকাশ পাচ্ছিল, তা মানসপ্রকৃতির শিখরে শিখরে কল্পনার মেঘে মেঘে নানাপ্রকার রঙ ফলাচ্ছিল, কিন্তু তারই মধ্য থেকে পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল যে বিশ্বপ্রকৃতির অখণ্ড শান্তি এবার বিদায় হল, নির্জনে অরণ্যে পর্বতে অজ্ঞাতবাসের মেয়াদ ফুরোল, এবারে বিশ্বমানবের রণক্ষেত্রে ভীষ্মপর্ব। এই সময়ে বঙ্গদর্শনে 'পাগল'[১] বলে যে গদ্য প্রবন্ধ বের হয়েছিল সেইটে পড়লে বোঝা যাবে, কী কথাটা কল্পনার অলংকারের ভিতর দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করছে।—

আমি জানি, সুখ প্রতিদিনের সামগ্রী, আনন্দ প্রত্যহের অতীত। সুখ শরীরের কোথাও পাছে ধুলা লাগে বলিয়া সংকুচিত, আনন্দ ধুলায় গড়াগড়ি দিয়া নিখিলের সঙ্গে আপনার ব্যবধান ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দেয়। এইজন্য সুখের পক্ষে ধুলা হেয়, আনন্দের পক্ষে ধুলা ভূষণ। সুখ, কিছু পাছে হারায় বলিয়া ভীত। আনন্দ, যথাসর্বস্ব বিতরণ করিয়া পরিতৃপ্ত। এইজন্য সুখের পক্ষে রিক্ততা দারিদ্র্য, আনন্দের পক্ষে দারিদ্র্যই ঐশ্বর্য। সুখ, ব্যবস্থার বন্ধনের মধ্যে আপনার শ্রীটুকুকে সতর্কভাবে

১ দ্র বিচিত্র প্রবন্ধ, রচনাবলী ৫

রক্ষা করে। আনন্দ, সংহারের মুক্তির মধ্যে আপন সৌন্দর্যকে উদারভাবে প্রকাশ করে। এইজন্য সুখ বাহিরের নিয়মে বদ্ধ, আনন্দ সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনার নিয়ম আপনিই সৃষ্টি করে। সুখ, সুধাটুকুর জন্য তাকাইয়া বসিয়া থাকে। আনন্দ, দুঃখের বিষয়কে অনায়াসে পরিপাক করিয়া ফেলে। এইজন্য, কেবল ভালোটুকুর দিকেই সুখের পক্ষপাত— আর, আনন্দের পক্ষে ভালোমন্দ দুই-ই সমান।

এই সৃষ্টির মধ্যে একটি পাগল আছেন, যাহা-কিছু অভাবনীয়, তাহা খামখা তিনিই আনিয়া উপস্থিত করেন।...নিয়মের দেবতা সংসারের সমস্ত পথকে পরিপূর্ণ চক্রপথ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন, আর এই পাগল তাহাকে আক্ষিপ্ত করিয়া কুণ্ডলী-আকার করিয়া তুলিতেছেন। এই পাগল আপনার খেয়ালে সরীসৃপের বংশে পাখি এবং বানরের বংশে মানুষ উদ্‌ভাবিত করিতেছেন। যাহা হইয়াছে, যাহা আছে, তাহাকেই চিরস্থায়িরূপে রক্ষা করিবার জন্য সংসারে একটা বিষম চেষ্টা রহিয়াছে— ইনি সেটাকে ছারখার করিয়া দিয়া, যাহা নাই তাহারই জন্য পথ করিয়া দিতেছেন। ইহার হাতে বাঁশি নাই, সামঞ্জস্য সুর ইহার নহে, বিষাণ বাজিয়া উঠে, বিধিবিহিত যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যায়, এবং কোথা হইতে একটি অপূর্বতা উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসে।...

আমাদের প্রতিদিনের একরঙা তুচ্ছতার মধ্যে হঠাৎ ভয়ংকর, তাহার জ্বলজ্জটাকলাপ লইয়া দেখা দেয়। সেই ভয়ংকর, প্রকৃতির মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত উৎপাত, মানুষের মধ্যে একটা অসাধারণ পাপ আকারে জাগিয়া উঠে। তখন কত সুখমিলনের জাল লণ্ডভণ্ড, কত হৃদয়ের সম্বন্ধ ছারখার হইয়া যায়। হে রুদ্র, তোমার ললাটের যে ধ্বকধ্বক অগ্নিশিখার স্ফুলিঙ্গমাত্রে অন্ধকারে গৃহের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে, সেই শিখাতেই লোকালয়ে সহস্রের হাহাধ্বনিতে নিশীথরাত্রে গৃহদাহ উপস্থিত হয়। হায়, শম্ভু, তোমার নৃত্যে, তোমার দক্ষিণ ও বাম পদক্ষেপে সংসারে মহাপুণ্য ও মহাপাপ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। সংসারের উপরে প্রতিদিনের জড়হস্তক্ষেপে যে একটা সামান্যতার একটানা আবরণ পড়িয়া যায়, ভালোমন্দ দুয়েরই প্রবল আঘাতে তুমি তাহাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতে থাক ও প্রাণের প্রবাহকে অপ্রত্যাশিতের উত্তেজনায় ক্রমাগত তরঙ্গিত করিয়া শক্তির নব নব লীলা ও সৃষ্টির নব নব মূর্তি প্রকাশ করিয়া তোলো। পাগল, তোমার এই রুদ্র আনন্দে যোগ দিতে আমার ভীত হৃদয় যেন পরাঙ্মুখ না হয়। সংহারের রক্ত-আকাশের মাঝখানে তোমার রবিকরোদ্দীপ্ত তৃতীয় নেত্র যেন ধ্রুবজ্যোতিতে আমার অন্তরের অন্তরকে উদ্‌ভাসিত করিয়া তোলে। নৃত্য করো, হে উন্মাদ নৃত্য করো। সেই নৃত্যের ঘূর্ণবেগে আকাশের লক্ষকোটিযোজনব্যাপী উজ্জ্বলিত নীহারিকা যখন ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকিবে, তখন আমার বক্ষের মধ্যে ভয়ের

আক্ষেপে যেন এই রুদ্রসংগীতের তাল কাটিয়া না যায়। হে মৃত্যুঞ্জয়, আমাদের সমস্ত ভালো এবং সমস্ত মন্দের মধ্যে তোমারই জয় হউক।

আমাদের এই খেপা দেবতার আবির্ভাব যে ক্ষণে ক্ষণে তাহা নহে, সৃষ্টির মধ্যে ইহার পাগলামি অহরহ লাগিয়াই আছে— আমরা ক্ষণে ক্ষণে তাহার পরিচয় পাই মাত্র। অহরহই জীবনকে মৃত্যু নবীন করিতেছে ভালোকে মন্দ উজ্জ্বল করিতেছে, তুচ্ছকে অভাবনীয় মূল্যবান করিতেছে। যখন পরিচয় পাই, তখনই রূপের মধ্যে অপরূপ, বন্ধনের মধ্যে মুক্তির প্রকাশ আমাদের কাছে জাগিয়া উঠে।

তার পরে আমার রচনায় বার বার এই ভাবটা প্রকাশ পেয়েছে— জীবনে এই দুঃখবিপদ-বিরোধমৃত্যুর বেশে অসীমের আবির্ভাব—

কহ মিলনের এ কি রীতি এই,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
তার সমারোহভার কিছু নেই
নেই কোনো মঙ্গলাচরণ ?
তব পিঙ্গলছবি মহাজট
সে কি চূড়া করি বাঁধা হবে না ?
তব বিজয়োদ্ধত ধ্বজপট
সে কি আগে-পিছে কেহ ব'বে না ?
তব মশাল-আলোকে নদীতট
আঁখি মেলিবে না রাঙাবরন ?
ত্রাসে কেঁপে উঠিবে না ধরাতল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
তাঁর কতমত ছিল আয়োজন
ছিল কতশত উপকরণ।
তাঁর লটপট করে বাঘছাল,
তাঁর বৃষ রহি রহি গরজে,

তাঁর বেষ্টন করি জটাজাল
যত ভুজঙ্গদল তরঙ্গে।
তাঁর ববম্‌ববম্‌ বাজে গাল
দোলে গলায় কপালাভরণ,
তাঁর বিষাণে ফুকারি উঠে তান
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।...

যদি কাজে থাকি আমি গৃহমাঝ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
তুমি ভেঙে দিয়ো মোর সব কাজ
কোরো সব লাজ অপহরণ।
যদি স্বপনে মিটায়ে সব সাধ
আমি শুয়ে থাকি সুখশয়নে,
যদি হৃদয়ে জড়ায়ে অবসাদ
থাকি আধজাগরূক নয়নে—
তবে শঙ্খে তোমার তুলো নাদ
করি প্রলয়শ্বাস ভরণ,
আমি ছুটিয়া আসিব ওগো নাথ,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

'খেয়া'তে 'আগমন' বলে যে কবিতা আছে, সে কবিতায় যে মহারাজ এলেন তিনি কে? তিনি যে অশান্তি। সবাই রাত্রে দুয়ার বন্ধ করে শান্তিতে ঘুমিয়ে ছিল, কেউ মনে করে নি তিনি আসবেন। যদিও থেকে থেকে দ্বারে আঘাত লেগেছিল, যদিও মেঘগর্জনের মতো ক্ষণে ক্ষণে তাঁর রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি স্বপ্নের মধ্যেও শোনা গিয়েছিল তবু কেউ বিশ্বাস করতে চাচ্ছিল না যে, তিনি আসছেন, পাছে তাদের আরামের ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু দ্বার ভেঙে গেল— এলেন রাজা।

ওরে দুয়ার খুলে দে রে,
বাজা শঙ্খ বাজা।
গভীর রাতে এসেছে আজ
আঁধার ঘরের রাজা।

বজ্র ডাকে শূন্যতলে,
বিদ্যুতেরি ঝিলিক ঝলে,
ছিন্নশয়ন টেনে এনে
আঙিনা তোর সাজা,
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এল
দুঃখরাতের রাজা।

ঐ 'খেয়া'তে 'দান' বলে একটি কবিতা আছে। তার বিষয়টি এই যে, ফুলের মালা চেয়েছিলুম, কিন্তু কী পেলুম।

এ তো মালা নয় গো, এ যে
তোমার তরবারি।
জ্বলে ওঠে আগুন যেন,
বজ্র-হেন ভারী—
এ যে তোমার তরবারি।

এমন যে দান এ পেয়ে কি আর শান্তিতে থাকবার জো আছে। শান্তি যে বন্ধন যদি তাকে অশান্তির ভিতর দিয়ে না পাওয়া যায়।

আজকে হতে জগৎমাঝে
ছাড়ব আমি ভয়,
আজ হতে মোর সকল কাজে
তোমার হবে জয়—
আমি ছাড়ব সকল ভয়।
মরণকে মোর দোসর করে
রেখে গেছ আমার ঘরে,
আমি তারে বরণ করে
রাখব পরানময়।
তোমার তরবারি আমার
করবে বাঁধন ক্ষয়।
আমি ছাড়ব সকল ভয়।

এমন আরো অনেক গান উদ্‌ধৃত করা যেতে পারে যাতে বিরাটের সেই অশান্তির সুর লেগেছে। কিন্তু সেইসঙ্গে এ কথা মানতেই হবে সেটা কেবল মাঝের কথা, শেষের কথা নয়। চরম কথাটা হচ্ছে শান্তং শিবমদ্বৈতম্। রুদ্রতাই যদি রুদ্রের চরম

পরিচয় হত তা হলে সেই অসম্পূর্ণতায় আমাদের আত্মা কোনো আশ্রয় পেত না— তা হলে জগৎ রক্ষা পেত কোথায়। তাই তো মানুষ তাঁকে ডাকছে, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্— রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তার দ্বারা আমাকে রক্ষা করো। চরম সত্য এবং পরম সত্য হচ্ছে ঐ প্রসন্ন মুখ। সেই সত্যই হচ্ছে সকল রুদ্রতার উপরে। কিন্তু এই সত্যে পৌঁছতে গেলে রুদ্রের স্পর্শ নিয়ে যেতে হবে। রুদ্রকে বাদ দিয়ে যে প্রসন্নতা, অশান্তিকে অস্বীকার করে যে শান্তি, সে তো স্বপ্ন, সে সত্য নয়।

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি,
সে কি সহজ গান।
সেই সুরেতে জাগব আমি
দাও মোরে সেই কান।
ভুলব না আর সহজেতে,
সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে
মৃত্যুমাঝে ঢাকা আছে
যে অন্তহীন প্রাণ।
সে ঝড় যেন সই আনন্দে
চিত্তবীণার তারে
সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত
নাচাও যে ঝংকারে।
আরাম হতে ছিন্ন করে
সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায়
শান্তি সুমহান।

'শারদোৎসব' থেকে আরম্ভ করে 'ফাল্গুনী' পর্যন্ত যতগুলি নাটক লিখেছি, যখন বিশেষ করে মন দিয়ে দেখি তখন দেখতে পাই, প্রত্যেকের ভিতরকার ধুয়োটা ঐ একই। রাজা বেরিয়েছেন সকলের সঙ্গে মিলে শারদোৎসব করবার জন্যে। তিনি খুঁজছেন তাঁর সাথি। পথে দেখলেন ছেলেরা শরৎপ্রকৃতির আনন্দে যোগ দেবার জন্যে উৎসব করতে বেরিয়েছে। কিন্তু একটি ছেলে ছিল— উপনন্দ— সমস্ত খেলাধুলো ছেড়ে সে তার প্রভুর ঋণ শোধ করবার জন্যে নিভৃতে বসে একমনে কাজ করছিল। রাজা বললেন, তাঁর সত্যকার সাথি মিলেছে, কেননা ঐ ছেলেটির সঙ্গেই শরৎপ্রকৃতির

সত্যকার আনন্দের যোগ— ঐ ছেলেটি দুঃখের সাধনা দিয়ে আনন্দের ঋণ শোধ করছে— সেই দুঃখেরই রূপ মধুরতম। বিশ্বই যে এই দুঃখতপস্যায় রত; অসীমের যে দান সে নিজের মধ্যে পেয়েছে অশ্রান্ত প্রয়াসের বেদনা দিয়ে সেই দানের সে শোধ করছে। প্রত্যেক ঘাসটি নিরলস চেষ্টার দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করছে, এই প্রকাশ করতে গিয়েই সে আপন অন্তর্নিহিত সত্যের ঋণ শোধ করছে। এই যে নিরন্তর বেদনায় তার আত্মোৎসর্জন, এই দুঃখই তো তার শ্রী, এই তো তার উৎসব, এতেই তো সে শরৎপ্রকৃতিকে সুন্দর করেছে, আনন্দময় করেছে। বাইরে থেকে দেখলে একে খেলা মনে হয়, কিন্তু এ তো খেলা নয়, এর মধ্যে লেশমাত্র বিরাম নেই। যেখানে আপন সত্যের ঋণশোধে শৈথিল্য, সেখানেই প্রকাশে বাধা, সেইখানেই কদর্যতা, সেইখানেই নিরানন্দ। আত্মার প্রকাশ আনন্দময়। এইজন্যেই সে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করতে পারে— ভয়ে কিম্বা আলস্যে কিম্বা সংশয়ে এই দুঃখের পথকে যে লোক এড়িয়ে চলে জগতে সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। শারদোৎসবের ভিতরকার কথাটাই এই— ও তো গাছতলায় বসে বসে বাঁশির সুর শোনবার কথা নয়।

'রাজা' নাটকে সুদর্শনা আপন অরূপ রাজাকে দেখতে চাইলে; রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে ভুল রাজার গলায় দিলে মালা; তার পরে সেই ভুলের মধ্যে দিয়ে, পাপের মধ্যে দিয়ে, যে অগ্নিদাহ ঘটালে, যে বিষম যুদ্ধ বাধিয়ে দিলে, অন্তরে বাহিরে যে ঘোর অশান্তি জাগিয়ে তুললে, তাতেই তো তাকে সত্য মিলনে পৌঁছিয়ে দিলে। প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টির পথ। তাই উপনিষদে আছে, তিনি তাপের দ্বারা তপ্ত হয়ে এই সমস্ত-কিছু সৃষ্টি করলেন। আমাদের আত্মা যা সৃষ্টি করছে তাতে পদে পদে ব্যথা। কিন্তু তাকে যদি ব্যথাই বলি তবে শেষ কথা বলা হল না, সেই ব্যথাতেই সৌন্দর্য, তাতেই আনন্দ।

যে বোধে আমাদের আত্মা আপনাকে জানে সে বোধের অভ্যুদয় হয় বিরোধ অতিক্রম করে, আমাদের অভ্যাসের এবং আরামের প্রাচীরকে ভেঙে ফেলে। যে বোধে আমাদের মুক্তি, দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি— দুঃখের দুর্গম পথ দিয়ে সে তার জয়ভেরী বাজিয়ে আসে আতঙ্কে সে দিগ্‌দিগন্ত কাঁপিয়ে তোলে, তাকে শত্রু বলেই মনে করি, তার সঙ্গে লড়াই করে তবে তাকে স্বীকার করতে হয়— কেননা, নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। 'অচলায়তনে' এই কথাটাই আছে।

মহাপঞ্চক। তুমি কি আমাদের গুরু।

দাদাঠাকুর। হাঁ। তুমি আমাকে চিনবে না কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু? তুমি আমাদের সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে এ কোন্ পথ দিয়ে এলে। তোমাকে কে মানবে।

দাদাঠাকুর। আমাকে মানবে না জানি, কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু? তবে এই শত্রুবেশে কেন।

দাদাঠাকুর। এই তো আমার গুরুর বেশ। তুমি যে আমার সঙ্গে লড়াই করবে— সেই লড়াই আমার গুরুর অভ্যর্থনা। ··

মহাপঞ্চক। আমি তোমাকে প্রণাম করব না।

দাদাঠাকুর। আমি তোমার প্রণাম গ্রহণ করব না— আমি তোমাকে প্রণত করব।

মহাপঞ্চক। তুমি আমাদের পূজা নিতে আস নি।

দাদাঠাকুর। আমি তোমাদের পূজা নিতে আসি নি, অপমান নিতে এসেছি।

আমি তো মনে করি আজ য়ুরোপে যে যুদ্ধ বেধেছে সে ঐ গুরু এসেছেন বলে। তাঁকে অনেক দিনের টাকার প্রাচীর, মানের প্রাচীর, অহংকারের প্রাচীর ভাঙতে হচ্ছে। তিনি আসবেন বলে কেউ প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু তিনি যে সমারোহ করে আসবেন তার জন্যে আয়োজন অনেকদিন থেকে চলছিল। য়ুরোপের সুদর্শনা যে মেকি রাজা সুবর্ণের রূপ দেখে তাকেই আপন স্বামী বলে ভুল করেছিল— তাই তো হঠাৎ আগুন জ্বলল, তাই তো সাত রাজার লড়াই বেধে গেল— তাই তো যে ছিল রানী তাকে রথ ছেড়ে, তার সম্পদ ছেড়ে, পথের ধুলোর উপর দিয়ে হেঁটে মিলনের পথে অভিসারে যেতে হচ্ছে। এই কথাটাই 'গীতালি'র একটি গানে আছে—

এক হাতে ওর কৃপাণ আছে
আর-এক হাতে হার।
ও যে ভেঙেছে তোর দ্বার।
আসে নি ও ভিক্ষা নিতে,
লড়াই করে নেবে জিতে
পরানটি তোমার।
ও যে ভেঙেছে তোর দ্বার।
মরণেরি পথ দিয়ে ওই
আসছে জীবনমাঝে
ও যে আসছে বীরের সাজে।

আধেক নিয়ে ফিরবে না যে
যা আছে সব একেবারে
করবে অধিকার।
ও যে ভেঙেছে তোর দ্বার।

এই-যে দ্বন্দ্ব, মৃত্যু এবং জীবন, শক্তি এবং প্রেম, স্বার্থ এবং কল্যাণ— এই-যে বিপরীতের বিরোধ, মানুষের ধর্মবোধই যার সত্যকার সমাধান দেখতে পায়— যে সমাধান পরম শান্তি, পরম মঙ্গল, পরম এক, এর সম্বন্ধে বার বার আমি বলেছি। 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থ থেকে তার কিছু কিছু উদ্ধার করে দেখানো যেতে পারত। কিন্তু যেখানে আমি স্পষ্টত ধর্মব্যাখ্যা করেছি সেখানে আমি নিজের অন্তরতম কথা না বলতেও পারি, সেখানে বাইরের শোনা কথা নিয়ে ব্যবহার করা অসম্ভব নয়। সাহিত্যরচনায় লেখকের প্রকৃতি নিজের অগোচরে নিজের পরিচয় দেয় সেটা তাই অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ। তাই কবিতা ও নাটকেরই সাক্ষ্য নিচ্ছি।

জীবনকে সত্য বলে জানতে গেলে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় চাই। যে মানুষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েছে, জীবনের 'পরে তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই বলে জীবনকে সে পায় নি। তাই সে জীবনের মধ্যে বাস করেও মৃত্যুর বিভীষিকায় প্রতিদিন মরে। যে লোক নিজে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বন্দী করতে ছুটেছে, সে দেখতে পায়, যাকে সে ধরেছে সে মৃত্যুই নয়, সে জীবন। যখন সাহস করে তার সামনে দাঁড়াতে পারি নে, তখন পিছন দিকে তার ছায়াটা দেখি। সেইটে দেখে ভরিয়ে ভরিয়ে মরি। নির্ভয়ে যখন তার সামনে গিয়ে দাঁড়াই তখন দেখি, যে সর্দার জীবনের পথে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায় সেই সর্দারই মৃত্যুর তোরণদ্বারের মধ্যে আমাদের বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। 'ফাল্গুনী'র গোড়াকার কথাটা হচ্ছে এই যে, যুবকেরা বসন্ত-উৎসব করতে বেরিয়েছে। কিন্তু এ উৎসব তো শুধু আমোদ করা নয়, এ তো অনায়াসে হবার জো নেই। জরার অবসাদ, মৃত্যুর ভয় লঙ্ঘন করে তবে সেই নবজীবনের আনন্দে পৌঁছনো যায়। তাই যুবকেরা বললে, আনব সেই জরা বুড়োকে বেঁধে, সেই মৃত্যুকে বন্দী করে। মানুষের ইতিহাসে তো এই লীলা এই বসন্তোৎসব বারে বারে দেখতে পাই। জরা সমাজকে ঘনিয়ে ধরে, প্রথা অচল হয়ে বসে, পুরাতনের অত্যাচার নূতন প্রাণকে দলন করে নির্জীব করতে চায়— তখন মানুষ মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, বিপ্লবের ভিতর দিয়ে নববসন্তের উৎসবের আয়োজন করে। সেই আয়োজনই তো য়ুরোপে চলছে। সেখানে নূতন যুগের বসন্তের হোলিখেলা আরম্ভ হয়েছে। মানুষের ইতিহাস আপন চিরনবীন অমর মূর্তি প্রকাশ করবে বলে মৃত্যুকে

তলব করেছে। মৃত্যুই তার প্রসাধনে নিযুক্ত হয়েছে। তাই 'ফাল্গুনী'তে বাউল বলছে—

যুগে যুগে মানুষ লড়াই করেছে, আজ বসন্তের হাওয়ায় তারই ঢেউ।··· যারা ম'রে অমর, বসন্তের কচি পাতায় তারাই পত্র পাঠিয়েছে। দিগ্‌দিগন্তে তারা রটাচ্ছে— 'আমরা পথের বিচার করি নি, আমরা পাথেয়ের হিসাব রাখি নি, আমরা ছুটে এসেছি, আমরা ফুটে বেরিয়েছি। আমরা যদি ভাবতে বসতুম, তা হলে বসন্তের দশা কী হত।'

বসন্তের কচি পাতায় এই যে পত্র, এ কাদের পত্র? যে-সব পাতা ঝরে গিয়েছে তারাই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আপন বাণী পাঠিয়েছে। তারা যদি শাখা আঁকড়ে থাকতে পারত, তা হলে জরাই অমর হত – তা হলে পুরাতন পুঁথির তুলট কাগজে সমস্ত অরণ্য হলদে হয়ে যেত, সেই শুকনো পাতার সর সর শব্দে আকাশ শিউরে উঠত। কিন্তু পুরাতনই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আপন চিরনবীনতা প্রকাশ করে, এই তো বসন্তের উৎসব। তাই বসন্ত বলে— যারা মৃত্যুকে ভয় করে, তারা জীবনকে চেনে না; তারা জরাকে বরণ করে জীবন্মৃত হয়ে থাকে, প্রাণবান বিশ্বের সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে।—

চন্দ্রহাস। এ কী, এ যে তুমি।··· সেই আমাদের সর্দার। বুড়ো কোথায়।

সর্দার। কোথাও তো নেই।

চন্দ্রহাস। কোথাও না?··· তবে সে কী।

সর্দার। সে স্বপ্ন।

চন্দ্রহাস। তবে তুমিই চিরকালের?

সর্দার। হাঁ।

চন্দ্রহাস। আর আমরাই চিরকালের?

সর্দার। হাঁ।

চন্দ্রহাস। পিছন থেকে যারা তোমাকে দেখলে তারা যে তোমাকে কত লোকে কত রকম মনে করলে তার ঠিক নেই।··· তখন তোমাকে হঠাৎ বুড়ো বলে মনে হল। তার পর গুহার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলে। এখন মনে হচ্ছে যেন তুমি বালক। যেন তোমাকে এই প্রথম দেখলুম। এ তো বড়ো আশ্চর্য, তুমি বারে বারেই প্রথম, তুমি ফিরে ফিরেই প্রথম।

মানুষ তার জীবনকে সত্য করে, বড়ো করে, নূতন করে পেতে চাচ্ছে। তাই মানুষের সভ্যতায় তার যে জীবনটা বিকশিত হয়ে উঠছে, সে তো কেবলই মৃত্যুকে ভেদ করে। মানুষ বলেছে –

মরতে মরতে মরণটারে
শেষ করে দে একেবারে,
তার পরে সেই জীবন এসে
আপন আসন আপনি লবে।

মানুষ জেনেছে—

নয় এ মধুর খেলা,
তোমায় আমায় সারাজীবন
সকাল-সন্ধ্যাবেলা।
কতবার যে নিবল বাতি,
গর্জে এল ঝড়ের রাতি,
সংসারের এই দোলায় দিলে
সংশয়েরি ঠেলা।
বারে বারে বাঁধ ভাঙিয়া,
বন্যা ছুটেছে,
দারুণ দিনে দিকে দিকে,
কান্না উঠেছে।
ওগো রুদ্র, দুঃখে সুখে,
এই কথাটি বাজল বুকে—
তোমার প্রেমে আঘাত আছে
নাইকো অবহেলা।

আমার ধর্ম কী, তা যে আজও আমি সম্পূর্ণ এবং সুস্পষ্ট করে জানি, এমন কথা বলতে পারি নে— অনুশাসন-আকারে তত্ত্ব-আকারে কোনো পুঁথিতে-লেখা ধর্ম সে তো নয়। সেই ধর্মকে জীবনের মর্মকোষ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে, উদ্‌ঘাটিত ক'রে, স্থির ক'রে দাঁড় করিয়ে দেখা ও জানা আমার পক্ষে অসম্ভব— কিন্তু অলস শান্তি ও সৌন্দর্যরসভোগ যে সেই ধর্মের প্রধান লক্ষ্য বা উপাদান নয়, এ কথা নিশ্চয় জানি। আমি স্বীকার করি, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে এবং আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি— কিন্তু সেই আনন্দ দুঃখকে-বর্জন-করা আনন্দ নয়, দুঃখকে-আত্মসাৎ-করা আনন্দ। সেই আনন্দের যে মঙ্গলরূপ তা অমঙ্গলকে অতিক্রম করেই, তাকে ত্যাগ করে নয়, তার যে অখণ্ড অদ্বৈত রূপ তা সমস্ত বিভাগ ও বিরোধকে পরিপূর্ণ করে তুলে, তাকে অস্বীকার করে নয়।

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো
সেই তো তোমার আলো।
সকল দ্বন্দ্ববিরোধমাঝে জাগ্রত যে ভালো
সেই তো তোমার ভালো।
পথের ধুলায় বক্ষ পেতে রয়েছে যেই গেহ
সেই তো তোমার গেহ।
সমরঘাতে অমর করে রুদ্র নিঠুর স্নেহ
সেই তো তোমার স্নেহ।
সব ফুরালে বাকি রহে অদৃশ্য যেই দান
সেই তো তোমার দান।
মৃত্যু আপন পাত্র ভরি বহিছে যেই প্রাণ
সেই তো তোমার প্রাণ।
বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি
সেই তো তোমার ভূমি।
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি
সেই তো আমার তুমি॥

সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্। শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্। ইহুদী পুরাণে আছে— মানুষ একদিন অমৃতলোকে বাস করত। সে লোক স্বর্গলোক। সেখানে দুঃখ নেই, মৃত্যু নেই। কিন্তু যে স্বর্গকে দুঃখের ভিতর দিয়ে, মন্দের সংঘাত দিয়ে, না জয় করতে পেরেছি সে স্বর্গ তো জ্ঞানের স্বর্গ নয়— তাকে স্বর্গ বলে জানিই নে। মায়ের গর্ভের মধ্যে মাকে পাওয়া যেমন মাকে পাওয়াই নয়, তাঁকে বিচ্ছেদের মধ্যে পাওয়াই পাওয়া।

গর্ভ ছেড়ে মাটির 'পরে
যখন পড়ে,
তখন ছেলে দেখে আপন মাকে।
তোমার আদর যখন ঢাকে
জড়িয়ে থাকি তারি নাড়ীর পাকে,
তখন তোমায় নাহি জানি।
আঘাত হানি

তোমারি আচ্ছাদন হতে যেদিন দূরে ফেলাও টানি
সে বিচ্ছেদে চেতনা দেয় আনি—
দেখি বদনখানি।

তাই সেই অচেতন স্বর্গলোকে জ্ঞান এল। সেই জ্ঞান আসতেই সত্যের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদ ঘটল। সত্যমিথ্যা-ভালোমন্দ-জীবনমৃত্যুর দ্বন্দ্ব এসে স্বর্গ থেকে মানুষকে লজ্জা-দুঃখ-বেদনার মধ্যে নির্বাসিত করে দিলে। এই দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে যে অখণ্ড সত্যে মানুষ আবার ফিরে আসে তার থেকে তার আর বিচ্যুতি নেই। কিন্তু এই-সমস্ত বিপরীতের বিরোধ মিটতে পারে কোথায়? অনন্তের মধ্যে। তাই উপনিষদে আছে, সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্। প্রথমে সত্যের মধ্যে জড় জীব সকলেরই সঙ্গে এক হয়ে মানুষ বাস করে— জ্ঞান এসে বিরোধ ঘটিয়ে মানুষকে সেখান থেকে টেনে স্বতন্ত্র করে— অবশেষে সত্যের পরিপূর্ণ অনন্ত রূপের ক্ষেত্রে আবার তাকে সকলের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। ধর্মবোধের প্রথম অবস্থায় শান্তম্, মানুষ তখন আপন প্রকৃতির অধীন— তখন সে সুখকেই চায়, সম্পদকেই চায়, তখন শিশুর মতো কেবল তার রসভোগের তৃষ্ণা, তখন তার লক্ষ্য প্রেয়। তার পরে মনুষ্যত্বের উদ্‌বোধনের সঙ্গে তার দ্বিধা আসে; তখন সুখ এবং দুঃখ, ভালো এবং মন্দ, এই দুই বিরোধের সমাধান সে খোঁজে— তখন দুঃখকে সে এড়ায় না, মৃত্যুকে সে ডরায় না। সেই অবস্থায় শিবম্, তখন তার লক্ষ্য শ্রেয়। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়— শেষ হচ্ছে প্রেম আনন্দ। সেখানে সুখ ও দুঃখের, ভোগ ও ত্যাগের, জীবন ও মৃত্যুর গঙ্গাযমুনা-সংগম। সেখানে অদ্বৈতম্। সেখানে কেবল যে বিচ্ছেদের ও বিরোধের সাগর পার হওয়া, তা নয়। সেখানে তরী থেকে তীরে ওঠা। সেখানে যে আনন্দ সে তো দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তিতে নয়, দুঃখের ঐকান্তিক চরিতার্থতায়। ধর্মবোধের এই-যে যাত্রা এর প্রথমে জীবন, তার পরে মৃত্যু, তার পরে অমৃত। মানুষ সেই অমৃতের অধিকার লাভ করেছে। কেননা জীবের মধ্যে মানুষই শ্রেয়ের ক্ষুরধারনিশিত দুর্গম পথে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করেছে। সে সাবিত্রীর মতো যমের হাত থেকে আপন সত্যকে ফিরিয়ে এনেছে। সে স্বর্গ থেকে মর্তলোকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তবেই অমৃতলোককে আপনার করতে পেরেছে। ধর্মই মানুষকে এই দ্বন্দ্বের তুফান পার করিয়ে দিয়ে এই অদ্বৈতে অমৃতে আনন্দে প্রেমে উত্তীর্ণ করিয়ে দেয়। যারা মনে করে তুফানকে এড়িয়ে পালানোই মুক্তি তারা পারে যাবে কী করে। সেইজন্যেই তো মানুষ প্রার্থনা করে, অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়। 'গময়' এই কথার মানে এই যে, পথ পেরিয়ে যেতে হবে, পথ এড়িয়ে যাবার জো নেই।

আমার রচনার মধ্যে যদি কোনো ধর্মতত্ত্ব থাকে তবে সে হচ্ছে এই যে, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ-উপলব্ধিই ধর্মবোধ যে প্রেমের এক দিকে দ্বৈত অর এক দিকে অদ্বৈত, এক দিকে বিচ্ছেদ আর-এক দিকে মিলন, এক দিকে বন্ধন আর-এক দিকে মুক্তি। যার মধ্যে শক্তি এবং সৌন্দর্য, রূপ এবং রস, সীমা এবং অসীম এক হয়ে গেছে; যা বিশ্বকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে অতিক্রম করে এবং বিশ্বের অতীতকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে গ্রহণ করে; যা যুদ্ধের মধ্যেও শান্তকে মানে, মন্দের মধ্যেও কল্যাণকে জানে এবং বিচিত্রের মধ্যেও এককে পূজা করে। আমার ধর্ম যে আগমনীর গান গায় সে এই—

ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়,
তোমারি হউক জয়।
তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়।
হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে,
বন্ধন হোক ক্ষয়।
তোমারি হউক জয়।
এসো দুঃসহ, এসো এসো নির্দয়,
তোমারি হউক জয়।
এসো নির্মল, এসো এসো নির্ভয়,
তোমারি হউক জয়।
প্রভাতসূর্য, এসেছ রুদ্রসাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে,
অরুণবহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে,
মৃত্যুর হোক লয়।
তোমারি হউক জয়।

আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৪

৪

নিজের সত্য পরিচয় পাওয়া সহজ নয়। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতরকার মূল ঐক্যসূত্রটি ধরা পড়তে চায় না। বিধাতা যদি আমার আয়ু দীর্ঘ না করতেন, সত্তর বৎসরে পৌঁছবার অবকাশ না দিতেন, তা হলে নিজের সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করবার অবকাশ পেতাম না। নানাখানা করে নিজেকে দেখেছি, নানা কাজে প্রবর্তিত করেছি, ক্ষণে ক্ষণে তাতে আপনার অভিজ্ঞান আপনার কাছে বিক্ষিপ্ত হয়েছে। জীবনের এই দীর্ঘ চক্রপথ প্রদক্ষিণ করতে করতে বিদায়কালে আজ সেই চক্রকে সমগ্ররূপে যখন দেখতে পেলাম তখন একটা কথা বুঝতে পেরেছি যে, একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র। আমার চিত্ত নানা কর্মের উপলক্ষে ক্ষণে ক্ষণে নানা জনের গোচর হয়েছে। তাতে আমার পরিচয়ের সমগ্রতা নেই। আমি তত্ত্বজ্ঞানী শাস্ত্রজ্ঞানী গুরু বা নেতা নই— একদিন আমি বলেছিলাম, 'আমি চাই নে হতে নববঙ্গে নবযুগের চালক'— সে কথা সত্য বলেছিলাম। শুভ্র নিরঞ্জনের যাঁরা দূত তাঁরা পৃথিবীর পাপক্ষালন করেন, মানবকে নির্মল নিরাময় কল্যাণব্রতে প্রবর্তিত করেন, তাঁরা আমার পূজ্য; তাঁদের আসনের কাছে আমার আসন পড়ে নি। কিন্তু সেই এক শুভ্র জ্যোতি যখন বহুবিচিত্র হন, তখন তিনি নানা বর্ণের আলোকরশ্মিতে আপনাকে বিচ্ছুরিত করেন, বিশ্বকে রঞ্জিত করেন, আমি সেই বিচিত্রের দূত। আমরা নাচি নাচাই, হাসি হাসাই, গান করি, ছবি আঁকি— যে আবিঃ বিশ্বপ্রকাশের অহৈতুক আনন্দে অধীর আমরা তাঁরই দূত। বিচিত্রের লীলাকে অন্তরে গ্রহণ করে তাকে বাইরে লীলায়িত করা— এই আমার কাজ। মানবকে গম্যস্থানে চালাবার দাবি রাখি নে, পথিকদের চলার সঙ্গে চলার কাজ আমার। পথের দুই ধারে যে ছায়া, যে সবুজের ঐশ্বর্য, যে ফুল পাতা, যে পাখির গান, সেই রসের রসদে জোগান দিতেই আমরা আছি। যে বিচিত্র বহু হয়ে খেলে বেড়ান দিকে দিকে, সুরে গানে, নৃত্যে চিত্রে, বর্ণে বর্ণে, রূপে রূপে, সুখদুঃখের আঘাতে-সংঘাতে, ভালো-মন্দের দ্বন্দ্বে— তাঁর বিচিত্র রসের বাহনের কাজ আমি গ্রহণ করেছি, তাঁর রঙ্গশালার বিচিত্র রূপকগুলিকে সাজিয়ে তোলবার ভার পড়েছে আমার উপর, এই‍ই আমার একমাত্র পরিচয়। অন্য বিশেষণও লোকে আমাকে দিয়েছেন— কেউ বলেছেন তত্ত্বজ্ঞানী, কেউ আমাকে ইস্কুল-মাস্টারের পদে বসিয়েছেন। কিন্তু বাল্যকাল থেকেই কেবলমাত্র খেলার ঝোঁকেই ইস্কুল-মাস্টারকে এড়িয়ে এসেছি— মাস্টারি পদটাও আমার নয়। বাল্যে নানা সুরের ছিদ্র-করা বাঁশি হাতে যখন পথে বেরলুম

তখন ভোরবেলায় অস্পষ্টের মধ্যে স্পষ্ট ফুটে উঠতে চাচ্ছিল, সেইদিনের কথা মনে পড়ে। সেই অন্ধকারের সঙ্গে আলোর প্রথম শুভদৃষ্টি; প্রভাতের বাণীবন্যা সেদিন আমার মনে তার প্রথম বাঁধ ভেঙেছিল, দোল লেগেছিল চিত্তসরোবরে। ভালো করে বুঝি বা না বুঝি, বলতে পারি বা না পারি, সেই বাণীর আঘাতে বাণীই জেগেছে। বিশ্বে বিচিত্রের লীলায় নানা সুরে চঞ্চল হয়ে উঠছে নিখিলের চিত্ত, তারই তরঙ্গে বালকের চিত্ত চঞ্চল হয়েছিল, আজও তার বিরাম নেই। সত্তর বৎসর পূর্ণ হল, আজও এ চপলতার জন্য বন্ধুরা অনুযোগ করেন, গাম্ভীর্যের ত্রুটি ঘটে। কিন্তু বিশ্বকর্মার ফর্মাশের যে অন্ত নেই। তিনি যে চপল, তিনি যে বসন্তের অশান্ত সমীরণে অরণ্যে অরণ্যে চিরচঞ্চল। গাম্ভীর্যে নিজেকে গড়খাই করে আমি তো দিন খোওয়াতে পারি নে। এই সত্তর বৎসর নানা পথ আমি পরীক্ষা করে দেখেছি, আজ আমার আর সংশয় নেই, আমি চঞ্চলের লীলাসহচর। আমি কী করেছি, কী রেখে যেতে পারব সে কথা জানি নে। স্থায়িত্বের আবদার করব না। খেলেন তিনি কিন্তু আসক্তি রাখেন না—যে খেলাঘর নিজে গড়েন তা আবার নিজেই ঘুচিয়ে দেন। কাল সন্ধ্যাবেলায় এই আম্রকাননে যে আল্পনা দেওয়া হয়েছিল চঞ্চল তা এক রাত্রের ঝড়ে ধুয়ে মুছে দিয়েছেন, আবার তা নতুন করে আঁকতে হল। তাঁর খেলাঘরের যদি কিছু খেলনা জুগিয়ে দিয়ে থাকি তা মহাকাল সংগ্রহ করে রাখবেন এমন আশা করি নে। ভাঙা খেলনা আবর্জনার স্তূপে যাবে। যতদিন বেঁচে আছি সেই সময়টুকুর মতোই মাটির ভাঁড়ে যদি কিছু আনন্দরস জুগিয়ে থাকি সেই যথেষ্ট। তার পরের দিন রসও ফুরোবে, ভাঁড়ও ভাঙবে, কিন্তু তাই বলে ভোজ তো দেউলে হবে না। সত্তর বৎসর পূর্ণ হবার দিন, আজ আমি রসময়ের দোহাই দিয়ে সবাইকে বলি যে, আমি কারো চেয়ে বড়ো কি ছোটো সেই ব্যর্থ বিচারে খেলার রস নষ্ট হয়; পরিমাপকের দল মাপকাঠি নিয়ে কলরব করছে, তাদেরকে ভোলা চাই। লোকালয়ে খ্যাতির যে হরির লুঠ ধুলোয় ধুলোয় লোটায় তা নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে চাই নে। মজুরির হিসেব নিয়ে চড়া গলায় তর্ক করবার বুদ্ধি যেন আমার না ঘটে।

এই আশ্রমের কর্মের মধ্যেও যেটুকু প্রকাশের দিক তাই আমার, এর যে যন্ত্রের দিক যন্ত্রীরা তা চালনা করছেন। মানুষের আত্মপ্রকাশের ইচ্ছাকে আমি রূপ দিতে চেয়েছিলাম। সেইজন্যেই তার রূপভূমিকার উদ্দেশে একটি তপোবন খুঁজেছি। নগরের ইটকাঠের মধ্যে নয়, এই নীলাকাশ উদয়াস্তের প্রাঙ্গণে এই সুকুমার বালক-বালিকাদের লীলাসহচর হতে চেয়েছিলাম। এই আশ্রমে প্রাণসম্মিলনের যে কল্যাণময় সুন্দর রূপ জেগে উঠছে সেটিকে প্রকাশ করাই আমার কাজ। এর বাইরের

কাজও কিছু প্রবর্তন করেছি, কিন্তু সেখানে আমার চরম স্থান নয়, এর যেখানটিতে রূপ সেখানটিতে আমি। গ্রামের অব্যক্ত বেদনা যেখানে প্রকাশ খুঁজে ব্যাকুল আমি তার মধ্যে। এখানে আমি শিশুদের যে ক্লাস করেছি সেটা গৌণ। প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে শিশুদের সুকুমার জীবনের এই-যে প্রথম আরম্ভ-রূপ এদের জ্ঞানের অধ্যবসায়ের আদি সূচনায় যে উষারুণদীপ্তি, যে নবোদ্‌গত উদ্যমের অঙ্কুর, তাকেই অবারিত করবার জন্য আমার প্রয়াস— না হলে আইনকানুন-সিলেবাসের জঞ্জাল নিয়ে মরতে হত। এই-সব বাইরের কাজ গৌণ, সেজন্য আমার বন্ধুরা আছেন। কিন্তু লীলাময়ের লীলায় ছন্দ মিলিয়ে এই শিশুদের নাচিয়ে গাইয়ে, কখনো ছুটি দিয়ে, এদের চিত্তকে আনন্দে উদ্‌বোধিত করার চেষ্টাতেই আমার আনন্দ, আমার সার্থকতা। এর চেয়ে গম্ভীর আমি হতে পারব না। শঙ্খঘণ্টা বাজিয়ে যাঁরা আমাকে উচ্চ মঞ্চে বসাতে চান, তাঁদের আমি বলি, আমি নিচেকার স্থান নিয়েই জন্মেছি, প্রবীণের প্রধানের আসন থেকে খেলার ওস্তাদ আমাকে ছুটি দিয়েছেন। এই ধুলো-মাটি-ঘাসের মধ্যে আমি হৃদয় ঢেলে দিয়ে গেলাম, বনস্পতি-ওষধির মধ্যে। যারা মাটির কোলের কাছে আছে, যারা মাটির হাতে মানুষ, যারা মাটিতেই হাঁটতে আরম্ভ করে শেষকালে মাটিতেই বিশ্রাম করে, আমি তাদের সকলের বন্ধু, আমি কবি।

শান্তিনিকেতন
২৫ বৈশাখ ১৩৩৮

জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮

৫

বটগাছের দেহগঠনের উপকরণ অন্যান্য বনস্পতির মূল উপকরণ থেকে অভিন্ন। সকল উদ্ভিদেরই সাধারণ ক্ষেত্রে সে আপন খাদ্য আহরণ করে থাকে। সেই-সকল উপকরণকে এবং খাদ্যকে আমরা ভিন্ন নাম দিতে পারি, নানা শ্রেণীতে তাদের বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি। কিন্তু অসংখ্য উদ্ভিদ্‌রূপের মধ্যে বিশেষ গাছকে বটগাছ করেই গড়ে তুলছে যে প্রবর্তনা, তন্দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং, সেই অদৃশ্যকে সেই নিগূঢ়কে কী নাম দেব জানি নে। বলা যেতে পারে সে তার স্বাভাবিকী বলক্রিয়া। এ কেবল ব্যক্তিগত শ্রেণীগত পরিচয়কে জ্ঞাপন করবার স্বভাব নয়, সেই পরিচয়কে নিরন্তর অভিব্যক্ত করবার স্বভাব। সমস্ত গাছের সত্তায় সে পরিব্যাপ্ত, কিন্তু সেই রহস্যকে কোথাও ধরা-ছোঁওয়া যায় না। ন্যাজিয়েকস্য সদৃশে ন রূপম্— সেই একের বেগ দেখা যায়,

তার কাজ দেখা যায়, তার রূপ দেখা যায় না। অসংখ্য পথের মাঝখানে অভ্রান্ত নৈপুণ্যে একটিমাত্র পথে সে আপন আশ্চর্য স্বাতন্ত্র্য সংগোপনে রক্ষা করে চলেছে; তার নিদ্রা নেই; তার স্খলন নেই।

নিজের ভিতরকার এই প্রাণময় রহস্যের কথা আমরা সহজে চিন্তা করি নে, কিন্তু আমি তাকে বার বার অনুভব করেছি। বিশেষভাবে আজ যখন আয়ুর প্রান্তসীমায় এসে পৌঁচেছি তখন তার উপলব্ধি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

জীবনের যেটা চরম তাৎপর্য, যা তার নিহিতার্থ, বাইরে যা ক্রমাগত পরিণামের দিকে রূপ নিচ্ছে, তাকে বুঝতে পারছি সে প্রাণস্য প্রাণঃ, সে প্রাণের অন্তরতর প্রাণ। আমার মধ্যে সে যে সহজে যাত্রার পথ পেয়েছে তা নয়, পদে পদে তার প্রতিকূলতা ঘটেছে। এই জীবনযন্ত্র যে-সকল মাল-মসলা দিয়ে তৈরি, গুণী তার থেকে আপন সুর সব সময়ে নিখুঁত করে বাজিয়ে তুলতে পারেন নি। কিন্তু জেনেছি, মোটের উপর আমার মধ্যে তাঁর যা অভিপ্রায় তার প্রকৃতি কী। নানা দিকের নানা আকর্ষণে মাঝে মাঝে ভুল করে বুঝেছি, বিক্ষিপ্ত হয়েছে আমার মন অন্য পথে, মাঝে মাঝে হয়তো অন্য পথের শ্রেষ্ঠত্বগৌরবই আমাকে ভুলিয়েছে। এ কথা ভুলেছি প্রেরণা অনুসারে প্রত্যেক মানুষের পথের মূল্যগৌরব স্বতন্ত্র। 'নটীর পূজা' নাটিকায় এই কথাটাই বলবার চেষ্টা করেছি। বুদ্ধদেবকে নটী যে অর্ঘ্য দান করতে চেয়েছিল সে তার নৃত্য। অন্য সাধকেরা তাঁকে দিয়েছিল যা ছিল তাদেরই অন্তরতর সত্য, নটী দিয়েছে তার সমস্ত জীবনের অভিব্যক্ত সত্যকে। মৃত্যু দিয়ে সেই সত্যের চরম মূল্য প্রমাণ করেছে। এই নৃত্যকে পরিপূর্ণ করে জাগিয়ে তুলেছিল তার প্রাণমনের মধ্যে তার প্রাণের প্রাণ।

আমার মনে সন্দেহ নেই আমার মধ্যে সেইরকম সৃষ্টিসাধনকারী একাগ্র লক্ষ্য নির্দেশ করে চলেছেন একটি গূঢ় চৈতন্য, বাধার মধ্যে দিয়ে, আত্মপ্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে। তাঁরই প্রেরণায় অর্ঘ্যপাত্রে জীবনের নৈবেদ্য আপন ঐক্যকে বিশিষ্টতাকে সমগ্রভাবে প্রকাশ করে তুলতে পারে যদি তার সেই সৌভাগ্য ঘটে। অর্থাৎ যদি তার গুহাহিত প্রবর্তনার সঙ্গে তার অবস্থা তার সংস্থানের অনুকূল সামঞ্জস্য ঘটতে পারে, যদি বাজিয়ের সঙ্গে বাজনার একাত্মকতায় ব্যবধান না থাকে। আজ পিছন ফিরে দেখি যখন, তখন আমার প্রাণযাত্রার ঐক্যে সেই অভিব্যক্তকে বাইরের দিক থেকে অনুসরণ করতে পারি; সেইসঙ্গে অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করতে পারি তাকে জীবনের কেন্দ্রস্থলে যে অদৃশ্য পুরুষ একটি সংকল্পধারায় জীবনের তথ্যগুলিকে সত্যসূত্রে গ্রথিত করে তুলছে।

আমাদের পরিবারে আমার জীবনরচনায় যে ভূমিকা ছিল তাকে অনুধাবন করে দেখতে হবে। আমি যখন জন্মেছিলুম তখন আমাদের সমাজের যে-সকল প্রথার মধ্যে অর্থের চেয়ে অভ্যাস প্রবল তার গতায়ু অতীতের প্রাচীরবেষ্টন ছিল না আমাদের ঘরের চারি দিকে। বাড়িতে পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত পূজার দালান শূন্য পড়ে ছিল, তার ব্যবহার-পদ্ধতির অভিজ্ঞতামাত্র আমার ছিল না। সাম্প্রদায়িক গুহাচর যে-সকল অনুকল্পনা, যে-সমস্ত কৃত্রিম আচারবিচার মানুষের বুদ্ধিকে বিজড়িত করে আছে, বহু শতাব্দী জুড়ে নানা স্থানে নানা অদ্ভুত আকারে এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির দুর্বারতম বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে, পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা ও তিরস্কৃতির লাঞ্ছনাকে মজ্জাগত অন্ধসংস্কারে পরিণত করে তুলেছে, মধ্যযুগের অবসানে যার প্রভাব সমস্ত সভ্যদেশ থেকে হয় সরে গিয়েছে নয় অপেক্ষাকৃত নিষ্কণ্টক হয়েছে, কিন্তু যা আমাদের দেশে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত থেকে কী রাষ্ট্রনীতিতে কী সমাজব্যবহারে মারাত্মক সংঘাতরূপ ধরেছে, তার চলাচলের কোনো চিহ্ন সদরে বা অন্দরে আমাদের ঘরে কোনোখানে ছিল না। এ কথা বলবার তাৎপর্য এই যে, জন্মকাল থেকে আমার যে প্রাণরূপ রচিত হয়ে উঠেছে তার উপরে কোনো জীর্ণ যুগের শাস্ত্রীয় অবলেপন ঘটে নি। তার রূপকারকে আপন নবীন সৃষ্টিকার্যে প্রাচীন অনুশাসনের উদ্যত তর্জনীর প্রতি সর্বদা সতর্ক লক্ষ রাখতে হয় নি।

এই বিশ্বরচনায় বিস্ময়করতা আছে, চারি দিকেই আছে অনির্বচনীয়তা; তার সঙ্গে মিশ্রিত হতে পারে নি আমার মনে কোনো পৌরাণিক বিশ্বাস, কোনো বিশেষ পার্বণবিধি। আমার মনের সঙ্গে অবিমিশ্র যোগ হতে পেরেছে এই জগতের। বাল্যকাল থেকে অতি নিবিড়ভাবে আনন্দ পেয়েছি বিশ্বদৃশ্যে। সেই আনন্দবোধের চেয়ে সহজ পূজা আর কিছু হতে পারে না, সেই পূজার দীক্ষা বাইরে থেকে নয়, তার মন্ত্র নিজেই রচনা করে এসেছি।

বাল্যবয়সের শীতের ভোরবেলা আজও আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। রাত্রের অন্ধকার যেই পাণ্ডুবর্ণ হয়ে এসেছে আমি তাড়াতাড়ি গায়ের লেপ ফেলে দিয়ে উঠে পড়েছি। বাড়ির ভিতরের প্রাচীর-ঘেরা বাগানের পূর্বপ্রান্তে এক-সার নারকেলের পাতার ঝালর তখন অরুণ-আভায় শিশিরে ঝলমল করে উঠেছে। একদিনও পাছে এই শোভার পরিবেশন থেকে বঞ্চিত হই সেই আশঙ্কায় পাতলা জামা গায়ে দিয়ে বুকের কাছে দুই হাত চেপে ধরে শীতকে উপেক্ষা করে ছুটে যেতুম। উত্তর দিকে ঢেঁকিশালের গায়ে ছিল একটা পুরোনো বিলিতি আমড়ার গাছ, অন্য কোণে ছিল কুলগাছ জীর্ণ পাতকুয়োর ধারে— কুপথ্যলোলুপ ‘ মেয়েরা দুপুরবেলায় তার তলায়

ভিড় করত। মাঝখানে ছিল পূর্বযুগের দীর্ঘ ফাটলের রেখা নিয়ে শেওলায়-চিহ্নিত শান-বাঁধানো চানকা। আর ছিল অযত্নে উপেক্ষিত অনেকখানি ফাঁকা জায়গা, নাম করবার যোগ্য আর-কোনো গাছের কথা মনে পড়ে না। এই তো আমার বাগান, এই ছিল আমার যথেষ্ট। এইখানে যেন ভাঙা-কানা-ওয়ালা পাত্র থেকে আমি পেতুম পিপাসার জল। সে জল লুকিয়ে ঢেলে দিত আমার ভিতরকার এক দরদী। বস্তু যা পেয়েছি তার চেয়ে রস পেয়েছি অনেক বেশি। আজ বুঝতে পারি এজন্যেই আমার আসা। আমি সাধু নই, সাধক নই, বিশ্বরচনার অমৃত-স্বাদের আমি যাচনদার, বার বার বলতে এসেছি 'ভালো লাগল আমার'। বিকেলে ইস্কুল থেকে ফিরে এসে গাড়ি থেকে নামবামাত্র পুবের দিকে তাকিয়ে দেখেছি তেতলার ছাদের উপরকার আকাশে নিবিড় হয়ে ঘনিয়ে এসেছে ঘননীলবর্ণ মেঘের পুঞ্জ। মুহূর্তমাত্রে সেই মেঘপুঞ্জের চেয়ে ঘনতর বিস্ময় আমার মনে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। এক দিকে দূরে মেঘমেদুর আকাশ, অন্য দিকে ভূতলে-নতুন-আসা বালকের মন বিস্ময়ে আনন্দিত। এই আশ্চর্য মিল ঘটাবার প্রয়োজন ছিল, নইলে ছন্দ মেলে না। জগতে কাজ করবার লোকের ডাক পড়ে, চেয়ে দেখার লোকেরও আহ্বান আছে। আমার মধ্যে এই চেয়ে-দেখার ঔৎসুক্যকে নিত্য পূর্ণ করবার আবেগ আমি অনুভব করেছি। এ দেখা তো নিষ্ক্রিয় আলস্যপরতা নয়। এই দেখা এবং দেখানোর তালে তালেই সৃষ্টি।

ঋগ্‌বেদে একটি আশ্চর্য বচন আছে—

অভ্রাতৃব্যো অনাত্বমনাপিরিন্দ্র জনুষা সনাদসি। যুধেদাপিত্বমিচ্ছসে।

হে ইন্দ্র, তোমার শত্রু নেই, তোমার নায়ক নেই, তোমার বন্ধু নেই, তবু প্রকাশ হবার কালে যোগের দ্বারা বন্ধুত্ব ইচ্ছা কর।

যতবড়ো ক্ষমতাশালী হোন-না কেন সত্যভাবে প্রকাশ পেতে হলে বন্ধুতা চাই, আপনাকে ভালো লাগানো চাই। ভালো লাগাবার জন্য নিখিল বিশ্বে তাই তো এত অসংখ্য আয়োজন। তাই তো শব্দের থেকে গান জাগছে, রেখার থেকে রূপের অপরূপতা। সে যে কী আশ্চর্য সে আমরা ভুলে থাকি।

এ কথা বলব, সৃষ্টিতে আমার ডাক পড়েছে, এইখানেই, এই সংসারের অনাবশ্যক মহলে। ইন্দ্রের সঙ্গে আমি যোগ ঘটাতে এসেছি যে যোগ বন্ধুত্বের যোগ। জীবনের প্রয়োজন আছে অন্নে বস্ত্রে বাসস্থানে, প্রয়োজন নেই আনন্দরূপে অমৃতরূপে। সেইখানে জায়গা নেয় ইন্দ্রের সখারা।

অন্তি সন্তং ন জহাতি
অন্তি সন্তং ন পশ্যতি।

দেবস্য পশ্য কাব্যং
ন মমার ন জীর্যতি।

কাছে আছেন তাঁকে ছাড়া যায় না, কাছে আছেন তাঁকে দেখা যায় না, কিন্তু দেখো সেই দেবের কাব্য; সে কাব্য মরে না, জীর্ণ হয় না।

জন্তুদের উপর সৃষ্টিকর্তার ক্রিয়া অব্যবহিত। তার থেকে তারা সরে এসে তাঁকে দেখতে পায় না। কেবলমাত্র নিয়মের সম্বন্ধে মানুষের সঙ্গে তাঁর যদি সম্বন্ধ হত তা হলে সেই জন্তুদের মতোই কেবল অপরিহার্য ঘটনার ধারার দ্বারা বেষ্টিত হয়ে মানুষ তাঁকে পেত না। কিন্তু দেবতার কাব্যে নিয়মজালের ভিতর থেকেই নিয়মের অতীত যিনি তিনি আবির্ভূত। সেই কাব্যে কেবলমাত্র আছে তাঁর বিশুদ্ধ প্রকাশ।

এই প্রকাশের কথায় ঋষি বলেছেন—

অবির্ বৈ নাম দেবতর্ তেনাস্তে পরীবৃতা।
তস্যা রূপেণেমে বৃক্ষা হরিতা হরিতস্রজঃ।

সেই দেবতার নাম অবি, তাঁর দ্বারা সমস্তই পরিবৃত— এই-যে সব বৃক্ষ, তাঁরই রূপের দ্বারা এরা হয়েছে সবুজ, পরেছে সবুজের মালা।

ঋষি কবি দেখতে পেয়েছিলেন কবির প্রকাশকে কবির দৃষ্টিতেই। সবুজের মালা-পরা এই আবির আবির্ভাবের এমন কোনো কারণ দেখানো যায় না যার অর্থ আছে প্রয়োজনে। বলা যায় না কেন খুশি করে দিলেন। এই খুশি সকল পাওনার উপরের পাওনা। এর উপরে জীবিকাপ্রয়াসী জন্তুর কোনো দাবি নেই। ঋষি কবি বলেছেন, বিশ্বস্রষ্টা তাঁর অর্ধেক দিয়ে সৃষ্টি করেছেন নিখিল জগৎ। তার পরে ঋষি প্রশ্ন করেছেন, তদস্যার্ধং কতমঃ স কেতুঃ, তাঁর বাকি সেই অর্ধেক যায় কোন্ দিকে কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর জানি। সৃষ্টি আছে প্রত্যক্ষ, এই সৃষ্টির একটি অতীত ক্ষেত্র আছে অপ্রত্যক্ষ। বস্তুপুঞ্জকে উত্তীর্ণ হয়ে সেই মহা অবকাশ না থাকলে অনির্বচনীয়কে পেতুম কোন্‌খানে। সৃষ্টির উপরে অসৃষ্টের স্পর্শ নামে সেইখানেই, আকাশ থেকে পৃথিবীতে যেমন নামে আলোক। অত্যন্ত কাছের সংস্রবে কাব্যকে পাই নে, কাব্য আছে রূপকে ধ্বনিকে পেরিয়ে যেখানে আছে স্রষ্টার সেই অর্ধেক যা বস্তুতে আবদ্ধ নয়। এই বিরাট অবাস্তবে ইন্দ্রের সঙ্গে ইন্দ্রসখার ভাবের মিলন ঘটে। ব্যক্তের বীণাযন্ত্র আপন বাণী পাঠায় অব্যক্তে।

নানা কাজে আমার দিন কেটেছে, নানা আকর্ষণে আমার মন চারি দিকে ধাবিত হয়েছে। সংসারের নিয়মকে জেনেছি, তাকে মানতেও হয়েছে, মূঢ়ের মতো তাকে উচ্ছৃঙ্খল কল্পনায় বিকৃত করে দেখি নি; কিন্তু এই-সমস্ত ব্যবহারের মাঝখান দিয়ে

বিশ্বের সঙ্গে আমার মন যুক্ত হয়ে চলে গেছে সেইখানে যেখানে সৃষ্টি গেছে সৃষ্টির অতীতে; এই যোগে সার্থক হয়েছে আমার জীবন।

একদিন আমি বলেছিলুম—

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।

ঋগ্‌বেদের কবি বলেছেন—

অসুনীতে পুনরস্মাসু চক্ষুঃ
পুনঃ প্রাণমিহ নো ধেহি ভোগম্।
জ্যোক্ পশ্যেম সূর্যমুচ্চরন্তম্
অনুমতে মৃড়য়া নঃ স্বস্তি।

প্রাণের নেতা আমাকে আবার চক্ষু দিয়ো, আবার দিয়ো প্রাণ, দিয়ো ভোগ, উচ্চরন্ত সূর্যকে আমি সর্বদা দেখব, আমাকে স্বস্তি দিয়ো।

এই তো বন্ধুর কথা, বন্ধুর প্রকাশ ভালো লেগেছে। এর চেয়ে স্তবগান কি আর-কিছু আছে। দেবস্য পশ্য কাব্যম্। মন বলছে কাব্যকে দেখো, এ দেখার অন্ত চিন্তা করা যায় না।

এখানে এই প্রশ্ন উঠতে পারে, তাঁর সঙ্গে কি আমার কর্মের যোগ হয় নি।

হয়েছে, তার প্রমাণ আছে। কিন্তু সে লোহালক্কড়ে বাঁধা যন্ত্রশালার কর্ম নয়। কর্মরূপে সেও কাব্য। একদিন শান্তিনিকেতনে আমি যে শিক্ষাদানের ব্রত নিয়েছিলুম তার সৃষ্টিক্ষেত্র ছিল বিধাতার কাব্যক্ষেত্রে; আহ্বান করেছিলুম এখানকার জল স্থল আকাশের সহযোগিতা। জ্ঞানসাধনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলুম আনন্দের বেদীতে। ঋতুদের আগমনী গানে ছাত্রদের মনকে বিশ্বপ্রকৃতির উৎসবপ্রাঙ্গণে উদ্‌বোধিত করেছিলুম।

এখানে প্রথম থেকেই বিরাজিত ছিল সৃষ্টির স্বত-উদ্ভাবনার তত্ত্ব। আমার মনে যে সজীব সমগ্রতার পরিকল্পনা ছিল, তার মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিকে রাখতে চেয়েছিলুম সম্মানিত করে। তাই বিজ্ঞানকে আমার কর্মক্ষেত্রে যথাসাধ্য সমাদরের স্থান দিতে চেয়েছি।

বেদে আছে—

যস্মাদৃতে ন সিধ্যতি যজ্ঞো বিপশ্চিতশ্চন স ধীনাং যোগমিন্বতি।

অর্থাৎ, যাঁকে বাদ দিয়ে বড়ো বড়ো জ্ঞানীদেরও যজ্ঞ সিদ্ধ হয় না তিনি বুদ্ধি-যোগের দ্বারাই মিলিত হন, মন্ত্রের যোগে নয়, জাদুমূলক অনুষ্ঠানের যোগে নয়। তাই ধী এবং আনন্দ এই দুই শক্তিকে এখানকার সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত করতে চিরদিন চেষ্টা করেছি।

এখানে যেমন আহ্বান করেছি প্রকৃতির সঙ্গে আনন্দের যোগ, তেমনি একান্ত ইচ্ছা করেছি এখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগকে অন্তঃকরণের যোগ করে তুলতে। কর্মের ক্ষেত্রে যেখানে অন্তঃকরণের যোগধারা কৃশ হয়ে ওঠে সেখানে নিয়ম হয়ে ওঠে একেশ্বর। সেখানে সৃষ্টিপরতার জায়গায় নির্মাণপরতা আধিপত্য স্থাপন করে। ক্রমশই সেখানে যন্ত্রীর যন্ত্র কবির কাব্যকে অবজ্ঞা করবার অধিকার পায়। কবির সাহিত্যিক কাব্য যে ছন্দ ও ভাষাকে আশ্রয় করে প্রকাশ পায় সে একান্তই তার নিজের আয়ত্তাধীন। কিন্তু যেখানে বহু লোককে নিয়ে সৃষ্টি সেখানে সৃষ্টিকার্যের বিশুদ্ধতা-রক্ষা সম্ভব হয় না। মানবসমাজে এইরকম অবস্থাতেই আধ্যাত্মিক তপস্যা সাম্প্রদায়িক অনুশাসনে মুক্তি হারিয়ে পাথর হয়ে ওঠে। তাই এইটুকু মাত্র আশা করতে পারি যে ভবিষ্যতে প্রাণহীন দলীয় নিয়মজালের জটিলতা এই আশ্রমের মূল-তত্ত্বকে একেবারে বিলুপ্ত করে দেবে না।

জানি নে আর কখনো উপলক্ষ হবে কি না, তাই আজ আমার আশি বছরের আয়ুঃক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে নিজের জীবনের সত্যকে সমগ্রভাবে পরিচিত করে যেতে ইচ্ছা করেছি। কিন্তু সংকল্পের সঙ্গে কাজের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য কখনোই সম্ভবপর হয় না। তাই নিজেকে দেখতে হয় অন্তর্দিকের প্রবর্তনা ও বহির্দিকের অভিমুখিতা থেকে। আমি আশ্রমের আদর্শ-রূপে বার বার তপোবনের কথা বলেছি। সে তপোবন ইতিহাস বিশ্লেষণ করে পাই নি। সে পেয়েছি কবির কাব্য থেকেই। তাই স্বভাবতই সে আদর্শকে আমি কাব্যরূপেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছি। বলতে চেয়েছি 'পশ্য দেবস্য কাব্যম্', মানবরূপে দেবতার কাব্যকে দেখো। আবাল্যকাল উপনিষদ আবৃত্তি করতে করতে আমার মন বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতাকে অন্তর্দৃষ্টিতে মানতে অভ্যাস করেছে। সেই পূর্ণতা বস্তুর নয়, সে আত্মার; তাই তাকে স্পষ্ট জানতে গেলে বস্তুগত আয়োজনকে লঘু করতে হয়। যাঁরা প্রথম অবস্থায় আমাকে এই আশ্রমের মধ্যে দেখেছেন তাঁরা নিঃসন্দেহ জানেন এই আশ্রমের স্বরূপটি আমার মনে কিরকম ছিল। তখন উপকরণবিরলতা ছিল এর বিশেষত্ব। সরল জীবনযাত্রা এখানে চার দিকে বিস্তার করেছিল সত্যের বিশুদ্ধ স্বচ্ছতা। খেলাধুলায় গানে অভিনয়ে ছেলেদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ অবারিত হত নবনবোন্মেষশালী আত্মপ্রকাশে। যে শান্তকে শিবকে অদ্বৈতকে ধ্যানে অন্তরে আহ্বান করেছি তখন তাঁকে দেখা সহজ ছিল কর্মে। কেননা, কর্ম ছিল সহজ, দিনপদ্ধতি ছিল সরল, ছাত্রসংখ্যা ছিল স্বল্প, এবং অল্প যে-কয়জন শিক্ষক ছিলেন আমার সহযোগী তাঁরা অনেকেই বিশ্বাস করতেন, এতস্মিন্ খলু অক্ষরে আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ— এই অক্ষরপুরুষে আকাশ ওতপ্রোত। তাঁরা বিশ্বাসের

সঙ্গেই বলতে পারতেন, তমেবৈকং জানথ আত্মানম্— সেই এককে জানো, সর্বব্যাপী আত্মাকে জানো, আত্মন্যেব, আপন আত্মাতেই, প্রথাগত আচার-অনুষ্ঠানে নয় মানবপ্রেমে, শুভকর্মে, বিষয়বুদ্ধিতে নয় আত্মার প্রেরণায়। এই আধ্যাত্মিক শ্রদ্ধার আকর্ষণে তখনকার দিনকৃত্যের অর্থ দৈন্যে ছিল ধৈর্যশীল ত্যাগধর্মের উজ্জ্বলতা।

সেই একদিন তখন বালক ছিলাম। জানি নে কোন্ উদয়পথ দিয়ে প্রভাতসূর্যের আলোক এসে সমস্ত মানবসম্বন্ধকে আমার কাছে অকস্মাৎ আত্মার জ্যোতিতে দীপ্তিমান করে দেখিয়েছিল। যদিও সে আলোক প্রাত্যহিক জীবনের মলিনতায় অনতিবিলম্বে বিলীন হয়ে গেল, তবু মনে আশা করেছিলুম পৃথিবী থেকে অবসর নেবার পূর্বে একদিন নিখিল মানবকে সেই এক আত্মার আলোকে প্রদীপ্তরূপে প্রত্যক্ষ দেখে যেতে পারব। কিন্তু অন্তরের উদয়াচলে সেই জ্যোতিপ্রবাহের পথ নানা কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তা হোক, তবু জীবনের কর্মক্ষেত্রে আনন্দের সঞ্চিত সম্বল কিছু দেখে যেতে পারলুম। এই আশ্রমে একদিন যে যজ্ঞভূমি রচনা করেছি সেখানকার নিঃস্বার্থ অনুষ্ঠানে সেই মানবের আতিথ্য রক্ষা করতে পেরেছি যাকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে 'অতিথিদেবো ভব'। অতিথির মধ্যে আছেন দেবতা। কর্মসফলতার অহংকার মনকে অধিকার করে নি তা বলতে পারি নে, কিন্তু সেই দুর্বলতাকে অতিক্রম করে উদ্‌বেল হয়েছে আত্মোৎসর্গের চরিতার্থতা। এখানে দুর্লভ সুযোগ পেয়েছি বুদ্ধির সঙ্গে শুভবুদ্ধিকে নিষ্কাম সাধনায় সম্মিলিত করতে।

সকল জাতির সকল সম্প্রদায়ের আমন্ত্রণে এখানে আমি শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত রাখবার শুভ অবকাশ ব্যর্থ করি নি। বার বার কামনা করেছি—

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

শান্তিনিকেতন
১ বৈশাখ ১৩৪৭

জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭

ওঁ

বোলপুর

বিনয় সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন —

আমার কাছে আমার ছবি একখানিও নাই, অন্যত্র হইতে সংগ্রহ করাও আমার পক্ষে সহজসাধ্য নহে। Hop Sing কোম্পানী আমার ছবি তুলিয়াছিলেন তাঁহাদের কাছে পাইতে পারেন।

আমার জীবনের ঘটনা বিশেষ কিছুই নাই এবং আমার জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করিবার যোগ্য নহে।

আমার জন্মের তারিখ ৬ই মে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ। বাল্যকালে ইস্কুল পালাইয়া কাটাইয়াছি। কিন্তুই লেখার ঝোঁক ছিল নিতান্ত শিশুকাল হইতে কেবল লিখিতেছি। যখন আমার বয়স ১৬ সেই সময় ভারতী পত্রিকা বাহির হয়। প্রথমতঃ এই পত্রিকায় আমার গদ্য লেখার আরম্ভ হয়।

আমার ১৭ বছর বয়সে মেজদাদার সঙ্গে বিলাত যাই — এই সুযোগে ইংরাজি শিক্ষার সুবিধা হইয়াছিল। ও লণ্ডনে ইউনিভার্সিটি কলেজে কিছুকাল অধ্যাপক হেনরি মর্লির ক্লাসে ইংরাজি সাহিত্য চর্চ্চা করিয়াছিলাম।

এক বৎসরের কিছু ঊর্দ্ধকাল বিলাতে থাকিয়া দেশে ফিরিয়া আসি। তাহার অনতিকাল পরে এক কাব্য লিখিতে সুরু করি — দেশে আমার খ্যাতির আরম্ভ হয়। অল্পকালের মধ্যে সন্ধ্যা সঙ্গীত; প্রভাত সঙ্গীত; প্রকৃতির প্রতিশোধ প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার ২৩

বাইশ বৎসর বয়সে শ্রীমতী মৃণালিনী দেবীর সহিত আমার বিবাহ হয়।

ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল, মানসী, চিত্রা ও চৈতালী, সোনার তরী প্রভৃতি কাব্যগুলি পরে পরে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাদের প্রকাশের তারিখ ঠিক আমার মনে নাই।

সোনার তরী কবিতাগুলি প্রায় সাধনা পত্রিকায় লিখিত হইয়াছিল। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ তিন বৎসর এই কাগজের সম্পাদক ছিলেন — চতুর্থ বৎসরে তাহার সম্পূর্ণ ভার আমাকে লইতে হইয়াছিল। সাধনা পত্রিকায় অধিকাংশ লেখা আমাকে লিখিতে হইত এবং অন্য লেখকদের রচনাতেও আমার হাত ভূরিপরিমাণে ছিল।

এই সময়েই বিষয়কর্মের ভার আমার প্রতি অর্পিত হওয়াতে সর্বদাই আমাকে জলপথে ও স্থলপথে পল্লীগ্রামে ভ্রমণ করিতে হইত — কতকটা সেই অভিজ্ঞতার উৎসাহে আমাকে ছোট গল্প রচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল।

সাধনা বাহির হইবার পূর্বেই হিতবাদী কাগজ বাহির হয়। যাঁহারা ইহার উদ্যোক্তা ও প্রবর্তক ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয় প্রধান ছিলেন। কৃষ্ণকমলবাবু সম্পাদক ছিলেন, সেই পত্রে প্রতি সপ্তাহেই আমি ছোট গল্প সমালোচনা ও সাহিত্যপ্রবন্ধ লিখিতাম। আমার ছোট গল্প লেখার সূত্রপাত ঐখানেই, ছয় সপ্তাহকাল লিখিয়াছিলাম।

সাধনা চারিবৎসর চলিয়াছিল। বন্ধ হইবার কিছুদিন পরে একবৎসর ভারতীর সম্পাদক ছিলাম, এই উপলক্ষেও গল্প ও প্রবন্ধ প্রভৃতি কতকগুলি লিখিতে হয়।

আমার পরলোকগত বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সহিত সম্প্রতি অধুনালুপ্ত বঙ্গদর্শন পুনঃপ্রকাশিত করিবার জন্য সম্পাদকতার গ্রহণ করি। এই উপলক্ষেই চোখের বালি উপন্যাস লেখায় প্রবৃত্ত হই, ইতিপূর্বে ভারতীতে বৌঠাকুরাণীর হাট লিখিয়াছিলাম তাহাই আমার প্রথম বড় গল্প।

এই সময়েই আমি বোলপুর শান্তিনিকেতন আশ্রমে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নামে বিদ্যালয় স্থাপন করি। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তখন আমার সহায় ছিলেন - তখন তাঁহার মধ্যে পূর্ব্বেকার খৃষ্টীয়ান সংস্কারও কোনোদিন লোপ হয় - তিনি তখন এক একদিকে গোঁড়া হিন্দু অন্যদিকে রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানধর্ম্মের মধ্যে বিভক্ত ছিলেন। [illegible] বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা আমার না থাকাতে উপাধ্যায়ের সাহায্যে আমার কাজ বিশেষ সম্পন্ন হইয়াছিল। বিদ্যালয় স্থাপনের দুই এক বৎসর চলার পর ১৩০৯ সালে আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়।

তদবধি প্রায় দশবৎসর বিদ্যালয় তাহার একরকম চালাইয়া আসিয়াছি। এক্ষণে বিদ্যালয় দশের হাতে আছে।

উপাধ্যায় মোহিতচন্দ্র সেন মহাশয়ের সহিত আমার আলাপ করাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি আমার বিদ্যালয়ের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন - কিছুকাল ধরিয়া তিনি অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি আমার কাব্যগ্রন্থাবলী বিষয় অনুসারে ভাগ করিয়াছিলেন। সেই গ্রন্থে বিশেষ ভাব অনুসারে আমার সমস্ত কবিতাকে কি ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া তিনি প্রকাশ করিয়াছেন।

— ০ —

আমার জীবন ও কাব্যের ইতিহাস সংক্ষেপে উপরে লিখিয়া দিলাম। সন তারিখের কোনো ঠিক দিলাম না। আমার মাতা অতি অল্পকালেই মারা গিয়াছিলেন - তখন বোধ হয় আমার বয়স ১১।১২ বৎসর হইবে। তাঁহার মৃত্যুর দুই একমাস পূর্ব্বে আমার

পিতা আমাকে সঙ্গে করিয়া অমৃত-
সর হইতে ড্যালহৌসী পর্ব্বতে ভ্রমণ
করিতে যান — সেই আমার হিমা-
লয়ের সহিত প্রথম পরিচয়।
সেই ভ্রমণটি আমার জীবনের মধ্যে
বিশেষ রকমে প্রভাব বিস্তার করিয়া
ছিল। সেই তিন মাস পিতৃদেবের
সহিত একত্র সহবাসকালে তাঁহার
নিকট হইতে ইংরাজি ও সংস্কৃতভাষা
শিক্ষা করিতাম এবং মুখে মুখে
জ্যোতিষশাস্ত্র আলোচনা ও নক্ষত্র
পরিচয় আমার সময় কাটিত।
এইবার স্কুলের বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্ত
প্রকৃতির মধ্যে, ভিতরকার স্বাধীনতার স্বাদ পাইয়া-
ছিলাম তাহাতেই বাহিরে আমার
বিদ্যালয়ের সহিত, আমার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন
হইয়া গেল। এই শেষবয়সে বিদ্যা-
লয় স্থাপন করিয়া তাহার শোধ দিতেছি।
এখন আমার আর পালাইবার
পথ নাই — ছাত্ররাও যাহাতে
সর্ব্বদা পালাইবার পথ না
খোঁজে সেইদিকে আমার দৃষ্টি।
ইতি ২৮শে ভাদ্র ১৩১৪

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাহিত্যের স্বরূপ

সাহিত্যের স্বরূপ

সাহিত্যের স্বরূপ

কবিতা ব্যাপারটা কী, এই নিয়ে দু-চার কথা বলবার জন্যে ফরমাশ এসেছে।

সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে বিচার পূর্বেই কোথাও কোথাও করেছি। সেটা অন্তরের উপলব্ধি থেকে; বাইরের অভিজ্ঞতা বা বিশ্লেষণ থেকে নয়। কবিতা জিনিসটা ভিতরের একটা তাগিদ, কিসের তাগিদ সেই কথাটাই নিজেকে প্রশ্ন করেছি। যা উত্তর পেয়েছি সেটাকে সহজ করে বলা সহজ নয়। ওস্তাদমহলে এই বিষয়টা নিয়ে যে-সব বাঁধা বচন জমা হয়ে উঠেছে, কথা উঠলেই সেইগুলোই এগিয়ে আসতে চায়; নিজের উপলব্ধ অভিমতকে পথ দিতে গেলে ঐগুলোকে ঠেকিয়ে রাখা দরকার।

গোড়াতেই গোলমাল ঠেকায় 'সুন্দর' কথাটা নিয়ে। সুন্দরের বোধকেই বোধগম্য করা কাব্যের উদ্দেশ্য এ কথা কোনো উপাচার্য আওড়াবামাত্র অভ্যস্ত নির্বিচারে বলতে ঝোঁক হয়, তা তো বটেই। প্রমাণ সংগ্রহ করতে গিয়ে ধোঁকা লাগায়, ভাবতে বসি সুন্দর বলে কাকে। কনে দেখবার বেলায় বরের অভিভাবক যে আদর্শ নিয়ে কনেকে দাঁড় করিয়ে দেখে, হাঁটিয়ে দেখে, চুল খুলিয়ে দেখে, কথা কইয়ে দেখে, সে আদর্শ কাব্য-যাচাইয়ের কাজে লাগাতে গেলে পদে পদেই বাধা পাওয়া যায়। দেখতে পাই, ফল্‌স্টাফের সঙ্গে কন্দর্পের তুলনা হয় না, অথচ সাহিত্যের চিত্রভাণ্ডার থেকে কন্দর্পকে বাদ দিলে লোকসান নেই, লোকসান আছে ফল্‌স্টাফকে বাদ দিলে। দেখা গেল, সীতার চরিত্র রামায়ণে মহিমান্বিত বটে, কিন্তু স্বয়ং বীর হনুমান— তার যত বড়ো লাঙ্গুল তত বড়োই সে মর্যাদা পেয়েছে। এইরকম সংশয়ের সময়ে কবির বাণী মনে পড়ে, Truth is beauty, অর্থাৎ সত্যই সৌন্দর্য। কিন্তু সত্যে তখনই সৌন্দর্যের রস পাই, অন্তরের মধ্যে যখন পাই তার নিবিড় উপলব্ধি— জ্ঞানে নয়, স্বীকৃতিতে। তাকেই বলি বাস্তব। সর্বগুণাধার যুধিষ্ঠিরের চেয়ে হঠকারী ভীম বাস্তব, রামচন্দ্র যিনি শাস্ত্রের বিধি মেনে ঠাণ্ডা হয়ে থাকেন তাঁর চেয়ে লক্ষ্মণ বাস্তব— যিনি অন্যায় সহ্য করতে না পেরে অগ্নিশর্মা হয়ে তার অশাস্ত্রীয় প্রতিকার করতে উদ্যত। আমাদের কালো-কোলো আধবুড়ো নীলমণি চাকরটা, যে মানুষ এক বুঝতে আর বোঝে, এক করতে আর

করে, বকলে ঈষৎ হেসে বলে 'ভুল হয়ে গেছে,' সে বেনারসি-জোড় প'রে বরবেশে এলে দৃশ্যটা কিরকম হয় সে কথা তুচ্ছ, কিন্তু সে অনেক বেশি বাস্তব অনেক নামজাদার চেয়ে এই প্রসঙ্গে তাঁদের নাম উল্লেখ করতে কুণ্ঠা হচ্ছে। অর্থাৎ, যদি কবিতা লেখা যায় তবে এ'কে তার নায়ক বা উপনায়ক করলে ঢের বেশি উপাদেয় হবে কোনো বাগ্মীপ্রবর গণনায়ককে করার চেয়ে। খুব বেশি চেনা হলেই যে বাস্তব হয় তা নয়, কিন্তু যাকে চিনি অল্প তবু যাকে অপরিহার্যরূপে হাঁ বলেই মানি সেই আমার পক্ষে বাস্তব। ঠিক কী গুণে যে, তা বিশ্লেষণ করে বলা কঠিন। বলা যেতে পারে, তারা জৈব, তারা organic ; তাদের আত্মসাৎ করতে রুচি বা ইচ্ছার বাধা থাকতে পারে, অন্য বাধা নেই। যেমন ভোজ্য পদার্থ, তাদের কোনোটা তিতো, কোনোটা মিষ্টি, কোনোটা কটু ; ব্যবহারে তাদের সম্বন্ধে আদরণীয়তার তারতম্য থাকলেও তাদের সকলেরই মধ্যে একটা সাম্য আছে— তারা জৈবিক, দেহতন্তুর নির্মাণে তারা কাজে লাগবার উপযোগী। শরীরের পক্ষে তারা হাঁ-এর দলে, স্বীকৃতির দলে, না-এর দলে নয়।

সংসারে আমাদের সকলেরই চার দিকে এই হাঁ-ধর্মীর মণ্ডলী আছে— এই বাস্তবদের আবেষ্টন ; তাদের সকলকে নিজের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে আমাদের সত্তা আপনাকে বিচিত্র করেছে, বিস্তীর্ণ হয়েছে ; তারা কেবল মানুষ নয়, তারা কুকুর বেড়াল ঘোড়া টিয়েপাখি কাকাতুয়া, তারা আসশেওড়ার-বেড়া-দেওয়া পানাপুকুর, তারা গোঁসাইপাড়ার পোড়ো বাগানে ভাঙাপাঁচিল-ঘেঁষা পালতে-মাদার, গোয়ালঘরের আঙিনায় খড়ের গাদার গন্ধ, পাড়ার মধ্য দিয়ে হাটে যাওয়ার গলি রাস্তা, কামারশালার হাতুড়ি-পেটার আওয়াজ, বহুপুরোনো ভেঙেপড়া ইঁটের পাঁজা যার উপরে অশথগাছ গজিয়ে উঠেছে, রাস্তার ধারের আমড়াতলায় পাড়ার প্রৌঢ়দের তাসপাশার আড্ডা, আরো কত কী— যা কোনো ইতিহাসে স্থান পায় না, কোনো ভূচিত্রের কোণে আঁচড় কাটে না। এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে পৃথিবীর চারি দিক থেকে নানা ভাষায় সাহিত্যলোকের বাস্তবের দল। ভাষার বেড়া পেরিয়ে তাদের মধ্যে যাদের সঙ্গে পরিচয় হয় খুশি হয়ে বলি 'বাঃ বেশ হল', অর্থাৎ মিলছে প্রাণের সঙ্গে, মনের সঙ্গে। তাদের মধ্যে রাজাবাদশা আছে, দীনদুঃখীও আছে, সুপুরুষ আছে, সুন্দরী আছে, কানা খোঁড়া কুঁজো কুৎসিতও আছে ; এইসঙ্গে আছে অদ্ভুত সৃষ্টিছাড়া, কোনো কালে বিধাতার হাত পড়ে নি যাদের উপরে, প্রাণীতত্ত্বের সঙ্গে শরীরতত্ত্বের সঙ্গে যাদের অস্তিত্বের অমিল, প্রচলিত রীতিপদ্ধতির সঙ্গে যাদের অমানান বিস্তর। আর আছে তারা যারা ঐতিহাসিকতার ভড়ং ক'রে আসরে নামে, কারো-বা মোগলাই পাগড়ি, কারো-বা যোধপুরী পায়জামা, কিন্তু যাদের বারো-আনা জাল ইতিহাস, প্রমাণপত্র চাইলে যারা নির্লজ্জভাবে বলে বসে 'কেয়ার

করি নে প্রমাণ— পছন্দ হয় কি না দেখে যাও'। এ ছাড়া আছে ভাবাবেগের বাস্তবতা — দুঃখ-সুখ বিচ্ছেদ-মিলন লজ্জা-ভয় বীরত্ব-কাপুরুষতা। এরা তৈরি করে সাহিত্যের বায়ুমণ্ডল— এইখানে রৌদ্রবৃষ্টি, এইখানে আলো-অন্ধকার, এইখানে কুয়াশার বিড়ম্বনা, মরীচিকার চিত্রকলা। বাইরে থেকে মানুষের এই আপন ক'রে-নেওয়া সংগ্রহ, ভিতর থেকে মানুষের এই আপনার-সঙ্গে-মেলানো সৃষ্টি, এই তার বাস্তবমণ্ডলী— বিশ্বলোকের মাঝখানে এই তার অন্তরঙ্গ মানবলোক— এর মধ্যে সুন্দর অসুন্দর, ভালো মন্দ, সংগত অসংগত, সুরওয়ালা এবং বেসুরো, সবই আছে; যখনই নিজের মধ্যেই তারা এমন সাক্ষ্য নিয়ে আসে যে তাদের স্বীকার করতে বাধ্য হই, তখনই খুশি হয়ে উঠি। বিজ্ঞান ইতিহাস তাদের অসত্য বলে বলুক, মানুষ আপন মনের একান্ত অনুভূতি থেকে তাদের বলে নিশ্চিত সত্য। এই সত্যের বোধ দেয় আনন্দ, সেই আনন্দেই তার শেষ মূল্য। তবে কেমন করে বলব, সুন্দরবোধকে বোধগম্য করাই কাব্যের উদ্দেশ্য।

বিষয়ের বাস্তবতা-উপলব্ধি ছাড়া কাব্যের আর-একটা দিক আছে, সে তার শিল্পকলা। যা যুক্তিগম্য তাকে প্রমাণ করতে হয়, যা আনন্দময় তাকে প্রকাশ করতে চাই। যা প্রমাণযোগ্য তাকে প্রমাণ করা সহজ, যা আনন্দময় তাকে প্রকাশ করা সহজ নয়। 'খুশি হয়েছি' এই কথাটা বোঝাতে লাগে সুর, লাগে ভাবভঙ্গি। এই কথাকে সাজাতে হয় সুন্দর ক'রে মা যেমন করে ছেলেকে সাজায়, প্রিয় যেমন সাজায় প্রিয়াকে, বাসের ঘর যেমন সাজাতে হয় বাগান দিয়ে, বাসরঘর যেমন সজ্জিত হয় ফুলের মালায়। কথার শিল্প তার ছন্দে, ধ্বনির সংগীতে, বাণীর বিন্যাসে ও বাছাই-কাজে। এই খুশির বাহন অকিঞ্চিৎকর হলে চলে না, যা অত্যন্ত অনুভব করি সেটা যে অবহেলার জিনিস নয় এই কথা প্রকাশ করতে হয় কারুকাজে।

অনেক সময়ে এই শিল্পকলা শিল্পিতকে ডিঙিয়ে আপনার স্বাতন্ত্র্যকেই মুখ্য করে তোলে। কেননা, তার মধ্যেও আছে সৃষ্টির প্রেরণা। লীলায়িত অলংকৃত ভাষার মধ্যে অর্থকে ছাড়িয়েও একটা বিশিষ্ট রূপ প্রকাশ পায়— সে তার ধ্বনিপ্রধান গীতধর্মে। বিশুদ্ধ সংগীতের স্বরাজ তার আপন ক্ষেত্রেই, ভাষার সঙ্গে শরিকিয়ানা করবার তার জরুরি নেই। কিন্তু ছন্দে, শব্দবিন্যাসের ও ধ্বনিঝংকারের তির্যক ভঙ্গিতে, যে সংগীতরস প্রকাশ পায় অর্থের কাছে অগত্যা তার জবাবদিহি আছে। কিন্তু ছন্দের নেশা, ধ্বনি-প্রসাধনের নেশা, অনেক কবির মধ্যে মৌতাতি উগ্রতা পেয়ে বসে; গদ্গদ আবিলতা নামে ভাষায়— স্ত্রৈণ স্বামীর মতো তাদের কাব্য কাপুরুষতার দৌর্বল্যে অশ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠে।

শেষ কথা হচ্ছে: Truth is beauty। কাব্যে এই ট্রুথ রূপের ট্রুথ, তথ্যের

নয়। কাব্যের রূপ যদি ট্রুথ-রূপে অত্যন্ত প্রতীতিযোগ্য না হয় তা হলে তথ্যের আদালতে সে অনিন্দনীয় প্রমাণিত হলেও কাব্যের দরবারে সে নিন্দিত হবে। মন ভোলাবার আসরে তার অলংকারপুঞ্জ যদি-বা অত্যন্ত গুঞ্জরিত হয়, অর্থাৎ সে যদি মুখর ভাষায় সুন্দরের গোলামি করে, তবু তাতে তার অবাস্তবতা আরো বেশি করেই ঘোষণা করে। আর এতেই যারা বাহবা দিয়ে ওঠে, রূঢ় শোনালেও বলতে হবে, তাদের মনের ছেলেমানুষি ঘোচে নি।

শেষকালে একটা কথা বলা দরকার বোধ করছি। ভাবগতিকে বোধ হয়, আজকাল অনেকের কাছেই বাস্তবের সংজ্ঞা হচ্ছে 'যা-তা'। কিন্তু আসল কথা, বাস্তবই হচ্ছে মানুষের জ্ঞাত বা অজ্ঞাত -সারে নিজের বাছাই-করা জিনিস। নির্বিশেষে বিজ্ঞানে সমান মূল্য পায় যা-তা। সেই বিশ্বব্যাপী যা-তা থেকে বাছাই হয়ে যা আমাদের আপন স্বাক্ষর নিয়ে আমাদের চার-পাশে এসে ঘিরে দাঁড়ায় তারাই আমাদের বাস্তব। আর যে-সব অসংখ্য জিনিস নানা মূল্য নিয়ে নানা হাটে যায় ছড়াছড়ি, বাস্তবের মূল্য-বর্জিত হয়ে তারা আমাদের কাছে ছায়া।

পাড়ায় মদের দোকান আছে, সেটাকে ছন্দে বা অছন্দে কাব্যরচনায় ভুক্ত করলেই কোনো কোনো মহলে সস্তা হাততালি পাওয়ার আশা আছে। সেই মহলের বাসিন্দারা বলেন, বহুকাল ইন্দ্রলোকে সুরাপান নিয়েই কবিরা মাতামাতি করেছেন, ছন্দোবন্ধে শুঁড়ির দোকানের আমেজমাত্র দেন নি— অথচ শুঁড়ির দোকানে হয়তো তাঁদের আনাগোনা যথেষ্ট ছিল। এ নিয়ে অপক্ষপাতে আমি বিচার করতে পারি— কেননা, আমার পক্ষে শুঁড়ির দোকানে মদের আড্ডা যত দূরে ইন্দ্রলোকের সুধাপান-সভা তার চেয়ে কাছে নয়, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ পরিচয়ের হিসাবে। আমার বলবার কথা এই যে, লেখনীর জাদুতে, কল্পনার পরশমণিস্পর্শে, মদের আড্ডাও বাস্তব হয়ে উঠতে পারে, সুধাপানসভাও। কিন্তু সেটা হওয়া চাই। অথচ দিনক্ষণ এমন হয়েছে যে, ভাঙা ছন্দে মদের দোকানে মাতালের আড্ডায় অবতারণা করলেই আধুনিকের মার্কা মিলিয়ে যাচনদার বলবে 'হাঁ, কবি বটে', বলবে 'একেই তো বলে রিয়ালিজ্‌ম্‌'।— আমি বলছি, বলে না। রিয়ালিজ্‌মের দোহাই দিয়ে এরকম সস্তা কবিত্ব অত্যন্ত বেশি চলিত হয়েছে। আর্ট্‌ এত সস্তা নয়। ধোবার বাড়ির ময়লা কাপড়ের ফর্দ নিয়ে কবিতা লেখা নিশ্চয়ই সম্ভব, বাস্তবের ভাষায় এর মধ্যে বস্তা-ভরা আদিরস করুণরস এবং বীভৎসরসের অবতারণা করা চলে। যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দুইবেলা বকাবকি চুলোচুলি, তাদের কাপড়দুটো এক ঘাটে একসঙ্গে আছাড় খেয়ে খেয়ে নির্মল হয়ে উঠছে, অবশেষে সওয়ার হয়ে চলেছে একই গাধার পিঠে, এ বিষয়টা মধ্য চতুষ্পদীতে দিব্য

মামামলই হতে পারে। কিন্তু বিষয়-বাছাই নিয়ে তার রিয়ালিজ্‌ম্‌ নয়, রিয়ালিজ্‌ম্‌ ফুটবে রচনার জাদুতে। সেটাতেও বাছাইয়ের কাজ যথেষ্ট থাকা চাই, না যদি থাকে তবে অমনতরো অকিঞ্চিৎকর আবর্জনা আর কিছুই হতে পারে না। এ নিয়ে বকাবকি না করে সম্পাদকের প্রতি আমার অনুরোধ এই যে, প্রমাণ করুন, রিয়ালিস্টিক কবিতা কবিতা বটে, কিন্তু রিয়ালিস্টিক ব'লে নয়, কবিতা বলেই। পূর্বোক্ত বিষয়টা যদি পছন্দ না হয় তো আর-একটা বিষয় মনে করিয়ে দিচ্ছি— বহু দিনের বহুপদাহত ঢেঁকির আত্মকথা। প্রাচীন যুগে অশোক গাছে সুন্দরীর পদস্পর্শ-ব্যাপারের চেয়েও হয়তো একে বেশি মর্যাদা দিতে পারবেন, বিশেষত যদি চরণপাত বেছে বেছে অসুন্দরীদের হয়। আর যদি শুকিয়ে-পড়া খেজুর গাছের উপর কিছু লিখতে চান তা হলে বলতে পারবেন, ঐ গাছ আপন রসের বয়সে কত ভিন্ন ভিন্ন জীবনে কত ভিন্ন ভিন্ন রকমের নেশায় সঞ্চার করেছে— তার মধ্যে হাসিও ছিল, কান্নাও ছিল, ভীষণতাও ছিল। সেই নেশা যে শ্রেণীর লোকের তার মধ্যে রাজাবাদশা নেই, এমন-কি, এম. এ. পরীক্ষার্থী অন্যমনস্ক তরুণ যুবকও নেই যার হাতে কব্জী-ঘড়ি, চোখে চশমা এবং অঙ্গুলিকর্ষণে চুলগুলো পিছনের দিকে তোলা। বলতে বলতে আর-একটা কাব্যবিষয় মনে পড়ল। একটুকু-তলানি-ওয়ালা লেবেল-উঠে-যাওয়া চুলের তেলের নিস্ছিপি একটা শিশি, চলেছে সে তার হারা জগতের অন্বেষণে, সঙ্গে সাথি আছে একটা দাঁতভাঙা চিরুনি আর শেষ ক্ষয় ক্ষয়ে-যাওয়া সাবানের পাতলা টুকরো। কাব্যটির নাম দেওয়া যেতে পারে 'আধুনিক রূপকথা'। তার ভাঙা ছন্দে এই দীর্ঘনিশ্বাস জেগে উঠবে যে, কোথাও পাওয়া গেল না সেই খোয়ানো জগৎ। এই সুযোগে সেদিনকার দেউলে অতীতের এই তিনটি উদ্‌বৃত্ত সামগ্রী বিশ্ববিধি ও বিধাতাকে বেশ একটু বিদ্রূপ করে নিতে পারে; বলতে পারে, 'শৌখিন মরীচিকার ছদ্মবেশ প'রে বাবুয়ানার অভিনয় করত ঐ মহাকালের নাট্যমঞ্চের সঙ— আজ নেপথ্যে উঁকি মারলে তাকে আর চেনাই যায় না; এমন ফাঁকির জগতে সত্য যদি কাউকে বলা যায় তবে তার প্রতীক বাজার-ঘরের বাইরেকার আমরা ক'টিই, এই তলানি-তেলের শিশি, এই দাঁতভাঙা চিরুনি আর ক্ষয়ে-যাওয়া পাতলা সাবানের টুকরো; আমরা নীরস, আমরা ঝাঁটানি-মালের ঝুড়ি থেকে আধুনিকতার রসদ জোগাই। আমাদের কথা ফুরোয় যেই, দেখা যায়, নটে গাছটি মুড়িয়েছে।' কালের গোয়ালঘরের দরজা খোলা, তার গোরুতে দুধ দেয় না, কিন্তু নটে গাছটি মুড়িয়ে খায়। তাই আজ মানুষের সব আশাভরসা-ভালোবাসার মুড়োনো নটে গাছটার এত দাম বেড়ে গেছে কবিদের হাটে। গোরুটাও হাড়-বেরকরা, শিঙভাঙা, কাকের-ঠোকর-খাওয়া-ক্ষতপৃষ্ঠ,

গাড়োয়ানের মোচর খেয়ে খেয়ে গ্রন্থিশিথিল-ল্যাজ-ওয়ালা হওয়া চাই। লেখকের অনবধানে এ যদি সুস্থ সুন্দর হয় তা হলে ভিক্টোরীয়-যুগবর্তী অপবাদে লাঞ্ছিত হয়ে আধুনিক সাহিত্যক্ষেত্রে তাড়া খেয়ে মরতে যাবে সমালোচকের কশাইখানায়।

বৈশাখ ১৩৪৫

সাহিত্যের মাত্রা

বর্তমান যুগে পূর্ব যুগের থেকে মানুষের প্রকৃতির পরিবর্তন হয়েছে, তা নিয়ে তর্ক হতে পারে না। এখনকার মানুষ জীবনের যে-সব সমস্যা পূরণ করতে চায় তার চিন্তাপ্রণালী প্রধানত বৈজ্ঞানিক, তার প্রবৃত্তি বিশ্লেষণের দিকে, এইজন্যে তার মননবস্তু জমে উঠেছে বিচিত্র রূপে এবং প্রভূত পরিমাণে। কাব্যের পরিধির মধ্যে তার সম্পূর্ণ স্থান হওয়া সম্ভবপর নয়। সাবেক কালে তাঁতি যখন কাপড় তৈরি করত তখন চরকায় সুতো কাটা থেকে আরম্ভ করে কাপড় বোনা পর্যন্ত সমস্তই সরল গ্রাম্য জীবনযাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলত। বিজ্ঞানের প্রসাদে আধুনিক বাণিজ্যপদ্ধতিতে চলছে প্রভূত পণ্য-উৎপাদন। তার জন্যে প্রকাণ্ড ফ্যাক্টরির দরকার। চার দিকের মানবসংসারের সঙ্গে তার সহজ মিল নেই। এইজন্যে এক-একটা কারখানার শহর পরিস্ফীত হয়ে উঠছে, ধোঁয়াতে কালিতে যন্ত্রের গর্জনে ও আবর্জনায় তারা জড়িত বেষ্টিত, সেইসঙ্গে গুচ্ছ গুচ্ছ বিস্ফোটকের মতো দেখা দিয়েছে মজুর-বস্তি। এক দিকে বিরাট যন্ত্রশক্তি উদ্‌গার করছে অপরিমিত বস্তুপিণ্ড, অন্য দিকে মলিনতা ও কঠোরতা শব্দে গন্ধে দৃশ্যে স্তূপে স্তূপে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে। এর প্রবলত্ব ও বৃহত্ত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কারখানাঘরের সেই প্রবলত্ব ও বৃহত্ত্ব সাহিত্যে দেখা দিয়েছে উপন্যাসে, তার ভূরি আনুষঙ্গিকতা নিয়ে। ভালো লাগুক মন্দ লাগুক, আধুনিক সভ্যতা আপন কারখানা-হাটের জন্যে সুপরিমিত স্থান নির্দেশ করতে পারছে না। এই অপ্রাণপদার্থ বহু শাখায় প্রকাণ্ড হয়ে উঠে প্রাণের আশ্রয়কে দিচ্ছে কোণঠাসা করে। উপন্যাসসাহিত্যেরও সেই দশা। মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়েছে। বলতে পার, বর্তমানে এটা অপরিহার্য; তাই বলে বলতে পার না, এটা সাহিত্য। হাটের জায়গা প্রশস্ত করবার জন্যে মানুষকে ঘর ছাড়তে হয়েছে, তাই বলে বলতে পার না, সেটাই লোকালয়।

এখনকার মানুষের প্রবৃত্তি বুদ্ধিগত সমস্যার অভিমুখে, সে কথা অস্বীকার করব না। তার চিন্তায় বাক্যে ব্যবহারে এই বুদ্ধির আলোড়ন চলছে। চলবৃএর 'ক্যাণ্টরবরি

টেল্‌স্‌'এ তখনকার কালের মানবসংসারের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। এখনকার মানুষের মধ্যে যে সেই পরিচয় একেবারেই নেই তা নয়। অনুভাবের দিকে অনেক পরিমাণে আছে, কিন্তু চিন্তায় মানুষ তার সেদিনকার গণ্ডি অনেক দূর ছাড়িয়ে গেছে। অতএব ইদানীন্তন সাহিত্যে যখন মানুষ দেখা দেয়, তখন ভাবে চলায় বলায় সেদিনকার নকল করলে সম্পূর্ণ অসংগত হবে। তার জীবনে চিন্তার বিষয় সর্বদা উদ্‌গত হয়ে উঠবেই। অতএব, আধুনিক উপন্যাস চিন্তাপ্রবল হয়ে দেখা দেবে আধুনিক কালের তাগিদেই। তা হোক, তবু সাহিত্যের মূলনীতি চিরন্তন। অর্থাৎ রসসম্ভোগের যে নিয়ম আছে তা মানুষের নিত্যস্বভাবের অন্তর্গত। যদি মানুষ গল্পের আসরে আসে তবে সে গল্পই শুনতে চাইবে, যদি প্রকৃতিস্থ থাকে। এই গল্পের বাহন কী, না, সজীব মানব-চরিত্র। আমরা তাকে একান্ত সত্যরূপে চিনতে চাই, অর্থাৎ আমার মধ্যে যে ব্যক্তিটা আছে সে সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিরই পরিচয় নিতে উৎসুক। কিন্তু কালের গতিকে আমার সেই ব্যক্তি হয়তো অতিমাত্র আচ্ছন্ন হয়ে গেছে পলিটিক্‌সে। তাই হয়তো সাহিত্যেও ব্যক্তিকে সে গৌণ ক'রে দিয়ে আপন মনের মতো পলিটিক্‌সের বচন শুনতে পেলে পুলকিত হয়ে ওঠে। এমনতরো মনের অবস্থায় সাহিত্যের যথোচিত যাচাই তার কাছ থেকে গ্রহণ করতে পারি নে। অবশ্য গল্পে পলিটিক্‌স্‌প্রবণ কোনো ব্যক্তির চরিত্র যদি আঁকতে হয় তবে তার মুখে পলিটিক্‌সের বুলি দিতেই হবে, কিন্তু লেখকের আগ্রহটা যেন বুলি জোগান দেওয়ার দিকে না ঝুঁকে প'ড়ে চরিত্ররচনের দিকেই নিবিষ্ট থাকে। চরিত্র-সৃষ্টিকে গৌণ রেখে বুলির ব্যবস্থাকেই মুখ্য করা এখনকার সাহিত্যে যে এত বেশি চড়াও হয়ে উঠেছে তার কারণ, আধুনিক কালে জীবনসমস্যার জটিল গ্রন্থি আলগা করার কাজে এই যুগের মানুষ অত্যন্ত বেশি ব্যস্ত। এইজন্যে তাকে খুশি করতে দরকার হয় না যথার্থ সাহিত্যিক হবার। প্রহ্লাদ বর্ণমালা শেখবার শুরুতেই ক অক্ষরের ধ্বনি কানে আসবামাত্র কৃষ্ণকে স্মরণ করেই অভিভূত হয়ে পড়ল। তাকে বোঝানো আবশ্যক যে, বিশুদ্ধ বর্ণমালার তরফ থেকে বিচার করে দেখলে দেখা যাবে, ক অক্ষর কৃষ্ণ শব্দেও যেমন আছে তেমনি কোকিলেও আছে, কাকেও আছে, কলকাতাতেও আছে। সাহিত্যে তত্ত্বকথাও তেমনি, তা নৈর্ব্যক্তিক; তাকে নিয়ে বিহ্বল হয়ে পড়লে চরিত্রের বিচার আর এগোতে চায় না। সেই চরিত্ররূপই রসসাহিত্যের, অরূপ তত্ত্ব রসসাহিত্যের নয়।

মহাভারত থেকে একটা দৃষ্টান্ত দিই। মহাভারতে নানা কালে নানা লোকের হাত পড়েছে সন্দেহ নেই। সাহিত্যের দিক থেকে তার উপরে অবান্তর আঘাতের অন্ত ছিল না, অসাধারণ মজবুত গড়ন বলেই টিকে আছে। এটা স্পষ্টই দেখা যায়, ভীষ্মের চরিত্র ধর্মনীতিপ্রবণ— যথাস্থানে আভাসে ইঙ্গিতে, যথাপরিমাণ আলোচনায়, বিরুদ্ধ চরিত্র ও

অবস্থার সঙ্গে দ্বন্দ্বে এই পরিচয়টি প্রকাশ করলে ভীষ্মের ব্যক্তিরূপ তাতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠবার কথা। কাব্য পড়বার সময় আমরা তাই চাই। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কোনো-এক কালে আমাদের দেশে চরিত্রনীতি সম্বন্ধে আগ্রহ বিশেষ কারণে অতিপ্রবল ছিল। এইজন্যে পাঠকের বিনা আপত্তিতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ইতিহাসকে শরশয্যাশায়ী ভীষ্ম দীর্ঘ এক পর্ব জুড়ে নীতিকথায় প্লাবিত করে দিলেন। তাতে ভীষ্মের চরিত্র গেল তলিয়ে প্রভূত সদুপদেশের তলায়। এখনকার উপন্যাসের সঙ্গে এর তুলনা করো। মুশকিল এই যে, এই-সকল নীতিকথা তখনকার কালের চিত্তকে যেরকম সচকিত করেছিল এখন আর তা করে না। এখনকার বুলি অন্য, সেও কালে পুরাতন হয়ে যাবে। পুরাতন না হলেও সাহিত্যে যে-কোনো তত্ত্ব প্রবেশ করবে, সাময়িক প্রয়োজনের প্রাবল্য সত্ত্বেও, সাহিত্যের পরিমাণ লঙ্ঘন করলে তাকে মাপ করা চলবে না। ভগবদ্‌গীতা আজও পুরাতন হয় নি, হয়তো কোনো কালেই পুরাতন হবে না। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে থমকিয়ে রেখে সমস্ত গীতাকে আবৃত্তি করা সাহিত্যের আদর্শ অনুসারে নিঃসন্দেহই অপরাধ। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রকে গীতার ভাবের দ্বারা ভাবিত করার সাহিত্যিক প্রণালী আছে, কিন্তু সংকথার প্রলোভনে তার ব্যতিক্রম হয়েছে বললে গীতাকে খর্ব করা হয় না।

যুদ্ধকাণ্ড পর্যন্ত রামায়ণে রামের যে দেখা পাওয়া গেছে সেটাতে চরিত্রই প্রকাশিত। তার মধ্যে ভালো দিক আছে, মন্দ দিক আছে, আত্মখণ্ডন আছে। দুর্বলতা যথেষ্ট আছে। রাম যদিও প্রধান নায়ক তবু শ্রেষ্ঠতার কোনো কাল-প্রচলিত বাঁধা নিয়মে তাঁকে অস্বাভাবিকরূপে সুসংগত করে সাজানো হয় নি, অর্থাৎ কোনো-একটা শাস্ত্রীয় মতের নিখুঁত প্রমাণ দেবার কাজে তিনি পাঠক-আদালতে সাক্ষীরূপে দাঁড়ান নি। পিতৃসত্য রক্ষা করার উৎসাহে পিতার প্রাণনাশ যদি-বা শাস্ত্রিক বুদ্ধি থেকে ঘটে থাকে, বালিকে বধ না শাস্ত্রনৈতিক না ধর্মনৈতিক। তার পরে বিশেষ উপলক্ষে রামচন্দ্র সীতা সম্বন্ধে লক্ষ্মণের উপরে যে বক্রোক্তি প্রয়োগ করেছিলেন সেটাতেও শ্রেষ্ঠতার আদর্শ বজায় থাকে নি। বাঙালি সমালোচক যেরকম আদর্শের ষোলো-আনা উৎকর্ষ যাচাই করে সাহিত্যে চরিত্রের সত্যতা বিচার করে থাকে সে আদর্শ এখানে খাটে না। রামায়ণের কবি কোনো-একটা মতসংগতির লজিক দিয়ে রামের চরিত্র বানান নি, অর্থাৎ সে চরিত্র স্বভাবের, সে চরিত্র সাহিত্যের, সে চরিত্র ওকালতির নয়।

কিন্তু উত্তরকাণ্ড এল বিশেষ কালের বুলি নিয়ে; কাঁচপোকা যেমন তেলাপোকাকে মারে তেমনি করে চরিত্রকে দিলে মেরে। সামাজিক প্রয়োজনের গুরুতর তাগিদ এসে পড়ল, অর্থাৎ তখনকার দিনের প্রব্‌লেম। সে যুগে ব্যবহারের যে আটঘাট বাঁধবার দিন এল তাতে রাবণের ঘরে দীর্ঘকাল বাস করা সত্ত্বেও সীতাকে বিনা

প্রতিবাদে ঘরে তুলে নেওয়া আর চলে না। সেটা যে অন্যায় এবং লোকমতকে অগ্রগণ্য করে সীতাকে বনে পাঠানোর এবং অবশেষে তাঁর অগ্নিপরীক্ষার যে প্রয়োজন আছে, সামাজিক সমস্যার এই সমাধান চরিত্রের ঘাড়ে ভূতের মতো চেপে বসল। তখনকার সাধারণ শ্রোতা সমস্ত ব্যাপারটাকে খুব একটা উঁচুদরের সামগ্রী বলেই কবিকে বাহবা দিয়েছে। সেই বাহবার জোরে ঐ জোড়াতাড়া খণ্ডটা এখনো মূল রামায়ণের সজীব দেহে সংলগ্ন হয়ে আছে।

আজকের দিনের একটা সমস্যার কথা মনে করে দেখা যাক। কোনো পতিব্রতা হিন্দু স্ত্রী মুসলমানের ঘরে অপহৃত হয়েছে। তার পরে তাকে পাওয়া গেল। সনাতনী ও অধুনাতনী লেখক এই প্রব্‌লেম্‌টাকে নিয়ে আপন পক্ষের সমর্থনরূপে তাঁদের নভেলে লম্বা লম্বা তর্ক স্তূপাকার করে তুলতে পারেন। এরকম অত্যাচার কাব্যে গর্হিত কিন্তু উপন্যাসে বিহিত, এমনতরো একটা রব উঠেছে। খাঁটি হিঁদুয়ানি রক্ষার ভার হিন্দু মেয়েদের উপর কিন্তু হিন্দু পুরুষদের উপর নয়, সমাজে এটা দেখতে পাই। কিন্তু হিঁদুয়ানি যদি সত্য পদার্থ ই হয় তবে তার ব্যত্যয় মেয়েতেও যেমন দোষাবহ পুরুষেও তেমনি। সাহিত্যনীতিও সেইরকম জিনিস। সর্বত্রই তাকে আপন সত্য রক্ষা করে চলতে হবে। চরিত্রের প্রাণগত রূপ সাহিত্যে আমরা দাবি করবই; অর্থনীতি সমাজনীতি রাষ্ট্রনীতি চরিত্রের অনুগত হয়ে বিনীতভাবে যদি না আসে, তবে তার বুদ্ধিগত মূল্য যতই থাক্‌, তাকে নিন্দিত করে দূর করতে হবে। নভেলে কোনো-একজন মানুষকে ইন্‌টেলেকচুয়েল প্রমাণ করতে হবে অথবা ইন্‌টেলেকচুয়েলের মনোরঞ্জন করতে হবে বলেই বইখানাকে এম. এ. পরীক্ষার প্রশ্নোত্তরপত্র করে তোলা চাই, এমন কোনো কথা নেই। গল্পের বইয়ে যাঁদের থিসিস পড়ার রোগ আছে, আমি বলব, সাহিত্যের পদ্মবনে তাঁরা মত্ত হস্তী। কোনো বিশেষ চরিত্রের মানুষ মুসলমানের ঘর থেকে প্রত্যাহৃত স্ত্রীকে আপন স্বভাব অনুসারে নিতেও পারে, না নিতেও পারে, গল্পের বইয়ে তার নেওয়াটা বা না-নেওয়াটা সত্য হওয়া চাই, কোনো প্রব্‌লেমের দিক থেকে নয়।

প্রাণের একটা স্বাভাবিক ছন্দোমাত্রা আছে, এই মাত্রার মধ্যেই তার স্বাস্থ্য, সার্থকতা, তার শ্রী। এই মাত্রাকে মানুষ জবর্দস্তি করে ছাড়িয়ে যেতেও পারে। তাকে বলে পালোয়ানি, এই পালোয়ানি বিস্ময়কর কিন্তু স্বাস্থ্যকর নয়, সুন্দর তো নয়ই। এই পালোয়ানি সীমালঙ্ঘন করবার দিকে তাল ঠুকে চলে, দুঃসাধ্য-সাধনও করে থাকে, কিন্তু এক জায়গায় এসে ভেঙে পড়ে। আজ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এই ভাঙনের আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠেছে। সভ্যতা স্বভাবকে এত দূরে ছাড়িয়ে গেছে যে

কেবলই পদে পদে তাকে সমস্যা ভেঙে ভেঙে চলতে হয়, অর্থাৎ কেবলই সে করছে পালোয়ানি। প্রকাণ্ড হয়ে উঠছে তার সমস্ত বোঝা এবং স্তূপাকার হয়ে পড়ছে তার আবর্জনা। অর্থাৎ, মানবের প্রাণের লয়টাকে দানবের লয়ে সাধনা করা চলছে। আজ হঠাৎ দেখা যাচ্ছে কিছুতেই তাল পৌঁচচ্ছে না শমে। এতদিন দুন-চৌদুনের বাহাদুরি নিয়ে চলছিল মানুষ, আজ অন্তত অর্থনীতির দিকে বুঝতে পারছে বাহাদুরিটা সার্থকতা নয়— যন্ত্রের ঘোড়দৌড়ে একটা একটা করে ঘোড়া পড়ছে মুখ থুবড়িয়ে। জীবন এই আর্থিক বাহাদুরির উত্তেজনায় ও অহংকারে এতদিন ভুলে ছিল যে, গতিমাত্রার জটিল অতিকৃতির দ্বারাই জীবনযাত্রার আনন্দকে সে পীড়িত করছে, অসুস্থ হয়ে পড়েছে আধুনিক অতিকায় সংসার, প্রাণের ভারসাম্যতত্ত্বকে করেছে অভিভূত।

পশ্চিম-মহাদেশের এই কায়াবহুল অসংগত জীবনযাত্রার ধাক্কা লেগেছে সাহিত্যে। কবিতা হয়েছে রক্তহীন, নভেলগুলো উঠেছে বিপরীত মোটা হয়ে। সেখানে তারা সৃষ্টির কাজকে অবজ্ঞা ক'রে ইন্‌টেলেক্‌চুয়েল কসরতের কাজে লেগেছে। তাতে শ্রী নেই, তাতে পরিমিতি নেই, তাতে রূপ নেই, আছে প্রচুর বাক্যের পিণ্ড। অর্থাৎ, এটা দানবিক ওজনের সাহিত্য, মানবিক ওজনের নয়; বিস্ময়কররূপে ইন্‌টেলেক্‌চুয়েল; প্রয়োজন-সাধকও হতে পারে, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত, প্রাণবান নয়। পৃথিবীর অতিকায় জন্তুগুলো আপন অস্থিমাংসের বাহুল্য নিয়ে মরেছে, এরাও আপন অতিমিতির দ্বারাই মরছে। প্রাণের ধর্ম সুমিতি, আর্টের ধর্মও তাই। এই সুমিতিতেই প্রাণের স্বাস্থ্য ও আনন্দ, এই সুমিতিতেই আর্টের শ্রী ও সম্পূর্ণতা। লোভ পরিমিতিকে লঙ্ঘন করে, আপন আতিশয্যের সীমা দেখতে পায় না; লোভ 'উপকরণবতাং জীবিতং' বা তাকেই জীবিত বলে, অমৃতকে বলে না। উপকরণের বাহাদুরি তার বহুলতায়, অমৃতের সার্থকতা তার অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্যে। আর্টেরও অমৃত আপন সুপরিমিত সামঞ্জস্যে। তার হঠাৎ-নবাবি আপন ইন্‌টেলেক্‌চুয়েল অত্যাড়ম্বরে; সেটা যথার্থ আভিজাত্য নয়, সেটা স্বল্পায়ু মরণধর্মী। মেঘদূত কাব্যটি প্রাণবান, আপনার মধ্যে ওর সামঞ্জস্য সুপরিমিত। ওর মধ্যে থেকে একটা তত্ত্ব বের করা যেতে পারে, আমিও এমন কাজ করেছি, কিন্তু সে তত্ত্ব অদৃশ্যভাবে গৌণ। রঘুবংশকাব্যে কালিদাস স্পষ্টই আপন উদ্দেশ্যের কথা ভূমিকায় স্বীকার করেছেন। রাজধর্মের কিসে গৌরব, কিসে তার পতন, কবিতায় এইটের তিনি দৃষ্টান্ত দিতে চেয়েছেন। এইজন্য সমগ্রভাবে দেখতে গেলে রঘুবংশকাব্য আপন ভারবাহুল্যে অভিভূত, মেঘদূতের মতো তাতে রূপের সম্পূর্ণতা নেই। কাব্য হিসাবে কুমারসম্ভবের যেখানে থামা উচিত সেখানেই ও থেমে গেছে, কিন্তু লজিক হিসাবে প্রবলেম হিসাবে ওখানে থামা চলে না। কার্তিক জন্মগ্রহণের পরে স্বর্গ উদ্ধার

করলে তবেই প্রব্লেমের শান্তি হয়। কিন্তু আর্টে দরকার নেই প্রব্লেমকে ঠাণ্ডা করা, নিজের রূপটিকে সম্পূর্ণ করাই তার কাজ। প্রব্লেমের গ্রন্থি-মোচন ইন্‌টেলেক্‌টের বাহাদুরি, কিন্তু রূপকে সম্পূর্ণতা দেওয়া সৃষ্টিশক্তিমতী কল্পনার কাজ। আর্ট্ এই কল্পনার এলেকায় থাকে, লজিকের এলেকায় নয়।

তোমার চিঠিতে তুমি আমার লেখা গোরা ঘরে-বাইরে প্রভৃতি নভেলের উল্লেখ করেছ। নিজের লেখার সমালোচনা করবার অধিকার নেই, তাই বিস্তারিত করে কিছু বলতে পারব না। আমার এই দুটি নভেলে মনস্তত্ত্ব রাষ্ট্রতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের আলোচনা আছে সে কথা কবুল করতেই হবে। সাহিত্যের তরফ থেকে বিচার করতে হলে দেখা চাই যে, সেগুলি জায়গা পেয়েছে না জায়গা জুড়েছে। আহার্য জিনিস অন্তরে নিয়ে হজম করলে দেহের সঙ্গে তার প্রাণগত ঐক্য ঘটে। কিন্তু ঝুড়িতে করে যদি মাথায় বহন করা যায় তবে তাতে বাহ্য প্রয়োজন সাধন হতে পারে, কিন্তু প্রাণের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য হয় না। গোরা-গল্পে তর্কের বিষয় যদি ঝুড়িতে করে রাখা হয়ে থাকে তবে সেই বিষয়গুলির দাম যতই হোক-না, সে নিন্দনীয়। আলোচনার সামগ্রীগুলি গোরা ও বিনয়ের একান্ত চরিত্রগত প্রাণগত উপাদান যদি না হয়ে থাকে তবে প্রব্লেমে ও প্রাণে, প্রবন্ধে ও গল্পে, জোড়াতাড়া জিনিস সাহিত্যে বেশিদিন টিঁকবে না। প্রথমত আলোচ্য তত্ত্ববস্তুর মূল্য দেখতে দেখতে কমে আসে, তার পরে সে যদি গল্পটাকে জীর্ণ করে ফেলে তা হলে সবসুদ্ধ জড়িয়ে সে আবর্জনারূপে সাহিত্যের আঁস্তাকুড়ে জমে ওঠে। ইব্‌সেনের নাটকগুলি তো একদিন কম আদর পায় নি, কিন্তু এখনই কি তার রঙ ফিকে হয়ে আসে নি। কিছুকাল পরে সে কি আর চোখে পড়বে। মানুষের প্রাণের কথা চিরকালের আনন্দের জিনিস; বুদ্ধিবিচারের কথা বিশেষ দেশকালে যত নতুন হয়েই দেখা দিক, দেখতে দেখতে তার দিন ফুরোয়। তখনো সাহিত্য যদি তাকে ধরে রাখে তা হলে মৃতের বাহন হয়ে তার দুর্গতি ঘটে। প্রাণ কিছু পরিমাণে অপ্রাণকে বহন করেই থাকে -- যেমন আমাদের বসন, আমাদের ভূষণ, কিন্তু প্রাণের সঙ্গে রফা করে চলবার জন্যে তার ওজন প্রাণকে যেন ছাড়িয়ে না যায়। য়ুরোপে অপ্রাণের বোঝা প্রাণের উপর চেপেছে অতিপরিমাণে; সেটা সইবে না। তার সাহিত্যেও সেই দশা। আপন প্রবল গতিবেগে য়ুরোপ এই প্রভূত বোঝা আজও বইতে পারছে, কিন্তু বোঝার চাপে এই গতির বেগ ক্রমশ কমে আসবে তাতে সন্দেহ নেই। অসংগত অপরিমিত প্রকাণ্ডতা প্রাণের কাছ থেকে এত বেশি মাশুল আদায় করতে থাকে যে, একদিন তাকে দেউলে করে দেয়।

শ্রাবণ ১৩৪০

২৭।১৮

সাহিত্যে আধুনিকতা

সাহিত্যের প্রাণধারা বয় ভাষার নাড়ীতে, তাকে নাড়া দিলে মূল রচনার হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়। এরকম সাহিত্যে বিষয়বস্তুটা নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে, যদি তার সজীবতা না থাকে। এবারে আমারই পুরোনো তর্জমা ঘাঁটতে গিয়ে এ কথা বারবার মনে হয়েছে। তুমি বোধ হয় জান, বাছুর মরে গেলে তার অভাবে গাভী যখন দুধ দিতে চায় না তখন মরা বাছুরের চামড়াটা ছাড়িয়ে নিয়ে তার মধ্যে খড় ভরতি করে একটা কৃত্রিম মূর্তি তৈরি করা হয়, তারই গন্ধে এবং চেহারার সাদৃশ্যে গাভীর স্তনে দুগ্ধ-ক্ষরণ হতে থাকে। তর্জমা সেইরকম মরা বাছুরের মূর্তি— তার আহ্বান নেই, ছলনা আছে। এ নিয়ে আমার মনে লজ্জা ও অনুতাপ জন্মায়। সাহিত্যে আমি যা কাজ করেছি তা যদি ক্ষণিক ও প্রাদেশিক না হয় তবে যার গরজ সে যখন হোক আমার ভাষাতেই তার পরিচয় লাভ করবে। পরিচয়ের অন্য কোনো পন্থা নেই। যথাপথে পরিচয়ের যদি বিলম্ব ঘটে তবে যে বঞ্চিত হয় তারই ক্ষতি, রচয়িতার তাতে কোনো দায়িত্ব নেই।

প্রত্যেক বড়ো সাহিত্যে দিন ও রাত্রির মতো পর্যায়ক্রমে প্রসারণ ও সংকোচনের দশা ঘটে, মিল্টনের পর ড্রাইডেন-পোপের আবির্ভাব হয়। আমরা প্রথম যখন ইংরেজি সাহিত্যের সংস্রবে আসি তখন সেটা ছিল ওদের প্রসারণের যুগ। য়ুরোপে ফরাসিবিপ্লব মানুষের চিত্তকে যে নাড়া দিয়েছিল সে ছিল বেড়া ভাঙবার নাড়া। এইজন্যে দেখতে দেখতে তখন সাহিত্যের আতিথেয়তা প্রকাশ পেয়েছিল বিশ্বজনীনরূপে। সে যেন রসসৃষ্টির সার্বজনিক যজ্ঞ। তার মধ্যে সকল দেশেরই আগন্তুক অবাধে আনন্দভোগের অধিকার পায়। আমাদের সৌভাগ্য এই যে, ঠিক সেই সময়েই য়ুরোপের আহ্বান আমাদের কানে এসে পৌঁছল— তার মধ্যে ছিল সর্বমানবের মুক্তির বাণী। আমাদের তো সাড়া দিতে দেরি হয় নি। সেই আনন্দে আমাদেরও মনে নবসৃষ্টির প্রেরণা এল। সেই প্রেরণা আমাদেরও জাগ্রত মনকে পথনির্দেশ করলে বিশ্বের দিকে। সহজেই মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছিল যে কেবল বিজ্ঞান নয়, সাহিত্যসম্পদও আপন উদ্ভবস্থানকে অতিক্রম ক'রে সকল দেশ ও সকল কালের দিকে বিস্তারিত হয়; তার দাক্ষিণ্য যদি সীমাবদ্ধ হয়, যদি তাতে আতিথ্যধর্ম না থাকে, তবে স্বদেশের লোকের পক্ষে সে যতই উপভোগ্য হোক-না কেন, সে দরিদ্র। আমরা নিশ্চিত জানি যে, যে ইংরাজি সাহিত্যকে আমরা পেয়েছি সে দরিদ্র নয়, তার সম্পত্তি স্বজাতিক লোহার সিন্দুকে দলিলবদ্ধ হয়ে নেই।

একদা ফরাসিবিপ্লবকে যাঁরা ক্রমে ক্রমে আগিয়ে নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা ছিলেন বৈশ্বমানবিক আদর্শের প্রতি বিশ্বাসপরায়ণ। ধর্মই হোক, রাজশক্তিই হোক, যা-কিছু ক্ষমতালুব্ধ, যা-কিছু ছিল মানুষের মুক্তির অন্তরায়, তারই বিরুদ্ধে ছিল তাঁদের অভিযান। সেই বিশ্বকল্যাণ-ইচ্ছার আবহাওয়ায় জেগে উঠেছিল যে সাহিত্য সে মহৎ; সে মুক্তদ্বার-সাহিত্য সকল দেশ, সকল কালের মানুষের জন্য; সে এনেছিল আলো, এনেছিল আশা। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানের সাহায্যে য়ুরোপের বিষয়বুদ্ধি বৈশ্যযুগের অবতারণা করলে। স্বজাতির ও পরজাতির মর্মস্থল বিদীর্ণ করে ধনস্রোত নানা প্রণালী দিয়ে য়ুরোপের নবোদ্ভূত ধনিকমণ্ডলীর মধ্যে সঞ্চারিত হতে লাগল। বিষয়বুদ্ধি সর্বত্র সর্ব বিভাগেই ভেদবুদ্ধি, তা ঈর্ষাপরায়ণ। স্বার্থসাধনার বাহন যারা তাদেরই ঈর্ষা, তাদেরই ভেদনীতি অনেক দিন থেকেই য়ুরোপের অন্তরে অন্তরে গুমরে উঠছিল; সেই বৈনাশিক শক্তি হঠাৎ সকল বাধা বিদীর্ণ করে আগ্নেয় স্রাবে য়ুরোপকে ভাসিয়ে দিলে। এই যুদ্ধের মূলে ছিল সমাজধ্বংসকারী রিপু, উদার মনুষ্যত্বের প্রতি অবিশ্বাস। সেইজন্যে এই যুদ্ধের যে দান তা দানবের দান, তার বিষ কিছুতেই মরতে চায় না, তা শান্তি আনলে না।

তার পর থেকে য়ুরোপের চিত্ত কঠোরভাবে সংকুচিত হয়ে আসছে— প্রত্যেক দেশই আপন দরজার আগলের সংখ্যা বাড়াতে ব্যাপৃত। পরস্পরের বিরুদ্ধে যে সংশয়, যে নিষেধ প্রবল হয়ে উঠছে তার চেয়ে অসভ্যতার লক্ষণ আমি তো আর কিছু দেখি নে। রাষ্ট্রতন্ত্রে একদিন আমরা য়ুরোপকে জনসাধারণের মুক্তিসাধনার তপোভূমি বলেই জানতুম— অকস্মাৎ দেখতে পাই, সমস্ত যাচ্ছে বিপর্যস্ত হয়ে। সেখানে দেশে দেশে জনসাধারণের কণ্ঠে ও হাতে পায়ে শিকল দৃঢ় হয়ে উঠছে; হিংস্রতায় যাদের কোনো কুণ্ঠা নেই তারাই রাষ্ট্রনেতা। এর মূলে আছে ভীরুতা, যে ভীরুতা বিষয়বুদ্ধির। ভয়, পাছে ধনের প্রতিযোগিতায় বাধা পড়ে, পাছে অর্থভাণ্ডারে এমন ছিদ্র দেখা দেয় যার মধ্য দিয়ে ক্ষতির দুর্গ্রহ আপন প্রবেশপথ প্রশস্ত করতে পারে। এইজন্যে বড়ো বড়ো শক্তিমান পাহারাওয়ালাদের কাছে দেশের লোক আপন স্বাধীনতা, আপন আত্মসম্মান বিকিয়ে দিতে প্রস্তুত আছে। এমন-কি, স্বজাতির চিরাগত সংস্কৃতিকে খর্ব হতে দেখেও শাসনতন্ত্রের বর্বরতাকে শিরোধার্য করে নিয়েছে। বৈশ্যযুগের এই ভীরুতায় মানুষের আভিজাত্য নষ্ট করে দেয়, তার ইতরতার লক্ষণ নির্লজ্জভাবে প্রকাশ পেতে থাকে।

পণ্যহাটের তীর্থযাত্রী অর্থলুব্ধ য়ুরোপ এই-যে আপন মনুষ্যত্বের খর্বতা মাথা হেঁট করে স্বীকার করছে, আত্মরক্ষার উপায়রূপে নির্মাণ করছে আপন কারাগার, এর প্রভাব কি ক্রমে ক্রমে তার সাহিত্যকে অধিকার করছে না। ইংরেজি সাহিত্যে একদা আমরা বিদেশীরা যে নিঃসংকোচ আমন্ত্রণ পেয়েছিলুম আজ কি তা আর আছে। এ কথা বলা

বাহুল', প্রত্যেক দেশের সাহিত্য মুখ্যভাবে আপন পাঠকদের জন্য; কিন্তু তার মধ্যে সেই স্বাভাবিক দাক্ষিণ্য আমরা প্রত্যাশা করি যাতে সে দূর-নিকটের সকল অতিথিকেই আসন জোগাতে পারে। যে সাহিত্যে সেই আসন প্রসারিত সেই সাহিত্যই মহৎ সাহিত্য, সকল কালেরই মানুষ সেই সাহিত্যের স্থায়িত্বকে সুনিশ্চিত করে তোলে; তার প্রতিষ্ঠাভিত্তি সর্বমানবের চিত্তক্ষেত্রে।

আমাদের সমসাময়িক বিদেশী সাহিত্যকে নিশ্চিত প্রত্যয়ের সঙ্গে বিচার করা নিরাপদ নয়। আধুনিক ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধে আমি যেটুকু অনুভব করি সে আমার সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা থেকে, তার অনেকখানিই হয়তো অজ্ঞতা। এ সাহিত্যের অনেক অংশের সাহিত্যিক মূল্য হয়তো যথেষ্ট আছে, কালে কালে তার যাচাই হতে থাকবে। আমি যা বলতে পারি তা আমার ব্যক্তিগত বোধশক্তির সীমানা থেকে। আমি বিদেশীর তরফ থেকে বলছি— অথবা তাও নয়, একজনমাত্র বিদেশী কবির তরফ থেকে বলছি— আধুনিক ইংরেজি কাব্যসাহিত্যে আমার প্রবেশাধিকার অত্যন্ত বাধাগ্রস্ত। আমার এ কথার যদি কোনো ব্যাপক মূল্য থাকে তবে এই প্রমাণ হবে যে, এই সাহিত্যের অন্য নানা গুণ থাকতে পারে কিন্তু একটা গুণের অভাব আছে যাকে বলা যায় সার্বভৌমিকতা, যাতে ক'রে বিদেশ থেকে আমিও একে অকুণ্ঠিতচিত্তে মেনে নিতে পারি। ইংরেজের প্রাক্তন সাহিত্যকে তো আনন্দের সঙ্গে মেনে নিয়েছি, তার থেকে কেবল যে রস পেয়েছি তা নয়, জীবনের যাত্রাপথে আলো পেয়েছি। তার প্রভাব আজও তো মন থেকে দূর হয় নি। আজ দ্বারুদ্ধ য়ুরোপের দুর্গমতা অনুভব করছি আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যে। তার কঠোরতা আমার কাছে অনুদার ব'লে ঠেকে। বিদ্রূপপরায়ণ বিশ্বাসহীনতার কঠিন জমিতে তার উৎপত্তি; তার মধ্যে এমন উদ্‌বৃত্ত দেখা যাচ্ছে না ঘরের বাইরে যার অকৃপণ আহ্বান। এ সাহিত্য বিশ্ব থেকে আপন হৃদয় প্রত্যাহরণ করে নিয়েছে; এর কাছে এমন বাণী পাই নে যা শুনে মনে করতে পারি যেন আমারই বাণী পাওয়া গেল চিরকালীন দৈববাণীরূপে। দুই-একটি ব্যতিক্রম যে নেই তা বললে অন্যায় হবে।

আমাদের দেশের তরুণদের মধ্যে কাউকে কাউকে দেখেছি যাঁরা আধুনিক ইংরেজি কাব্য কেবল যে বোঝেন তা নয়, সম্ভোগও করেন। তাঁরা আমার চেয়ে আধুনিক কালের অধিকতর নিকটবর্তী বলেই য়ুরোপের আধুনিক সাহিত্য হয়তো তাঁদের কাছে দূরবর্তী নয়। সেইজন্য তাঁদের সাক্ষ্যকে আমি মূল্যবান বলেই শ্রদ্ধা করি। কেবল একটা সংশয় মন থেকে যায় না। নূতন যখন পূর্ববর্তী পুরাতনকে উদ্ধতভাবে উপেক্ষা ও প্রতিবাদ করে তখন দুঃসাহসিক তরুণের মন তাকে যে বাহবা দেয় সকল সময়ে তার

মধ্যে নিত্যসত্যের প্রামাণিকতা মেলে না। নূতনের বিদ্রোহ অনেক সময় একটা স্পর্ধামাত্র। আমি এই বলি, বিজ্ঞানে মানুষের কাছে প্রাকৃতিক সত্য আপন নূতন নূতন জ্ঞানের ভিত্তি অবারিত করে, কিন্তু মানুষের আনন্দলোক যুগে যুগে আপন সীমানা বিস্তার করতে পারে কিন্তু ভিত্তি বদল করে না। যে সৌন্দর্য, যে প্রেম, যে মহত্ত্বে মানুষ চিরদিন স্বভাবতই উদ্‌বোধিত হয়েছে তার তো বয়সের সীমা নেই; কোনো আইন্‌স্টাইন এসে তাকে তো অপ্রতিপন্ন করতে পারে না, বলতে পারে না 'বসন্তের পুষ্পোচ্ছ্বাসে যার অকৃত্রিম আনন্দ সে সেকেলে ফিলিস্টাইন'। যদি কোনো বিশেষ যুগের মানুষ এমন সৃষ্টিছাড়া কথা বলতে পারে, যদি সুন্দরকে বিদ্রূপ করতে তার ওষ্ঠাধর কুটিল হয়ে ওঠে, যদি পূজনীয়কে অপমানিত করতে তার উৎসাহ উগ্র হতে থাকে, তা হলে বলতেই হবে, এই মনোভাব চিরন্তন মানবস্বভাবের বিরুদ্ধ। সাহিত্য সর্ব দেশে এই কথাই প্রমাণ করে আসছে যে, মানুষের আনন্দনিকেতন চিরপুরাতন। কালিদাসের মেঘদূতে মানুষ আপন চিরপুরাতন বিরহ-বেদনারই স্বাদ পেয়ে আনন্দিত। সেই চিরপুরাতনের চিরনূতনত্ব বহন করছে মানুষের সাহিত্য, মানুষের শিল্পকলা। এইজন্যেই মানুষের সাহিত্য, মানুষের শিল্পকলা সর্বমানবের। তাই বারে বারে এই কথা আমার মনে হয়েছে, বর্তমান ইংরেজি কাব্য উদ্ধতভাবে নূতন, পুরাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী-ভাবে নূতন। যে তরুণের মন কালাপাহাড়ি সে এর নব্যতার মদির রসে মত্ত, কিন্তু এই নব্যতাই এর ক্ষণিকতার লক্ষণ। যে নবীনতাকে অভ্যর্থনা করে বলতে পারি যে—

জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন ন তিরপিত ভেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ন ন গেল—

তাকে যেন সত্যই নূতন ব'লে ভ্রম না করি, সে আপন সত্যজন্মমুহূর্তেই আপন জরা সঙ্গে নিয়েই এসেছে, তার আয়ুঃস্থানে যে শনি সে যত উজ্জ্বলই হোক তবু সে শনিই বটে।

মাঘ ১৩৪১

কাব্য ও ছন্দ

গদ্যকাব্য নিয়ে সন্দিগ্ধ পাঠকের মনে তর্ক চলছে। এতে আশ্চর্যের বিষয় নেই।

ছন্দের মধ্যে যে বেগ আছে সেই বেগের অভিঘাতে রসগর্ভ বাক্য সহজে হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে, মনকে দুলিয়ে তোলে— এ কথা স্বীকার করতে হবে।

শুধু তাই নয়। যে সংসারের ব্যবহারে গদ্য নানা বিভাগে নানা কাজে খেটে মরছে কাব্যের জগৎ তার থেকে পৃথক্। পদ্যের ভাষাবিশিষ্টতা এই কথাটাকে স্পষ্ট করে; স্পষ্ট হলেই মনটা তাকে স্বক্ষেত্রে অভ্যর্থনা করবার জন্যে প্রস্তুত হতে পারে। গেরুয়াবেশে সন্ন্যাসী জানান দেয়, সে গৃহীর থেকে পৃথক; ভক্তের মন সেই মুহূর্তেই তার পায়ের কাছে এগিয়ে আসে— নইলে সন্ন্যাসীর ভক্তির ব্যবসায়ে ক্ষতি হবার কথা।

কিন্তু বলা বাহুল্য, সন্ন্যাসধর্মের মুখ্য তত্ত্বটা তার গেরুয়া কাপড়ে নয়, সেটা আছে তার সাধনার সত্যতায়। এই কথাটা যে বোঝে, গেরুয়া কাপড়ের অভাবেই তার মন আরো বেশি করে আকৃষ্ট হয়। সে বলে, আমার বোধশক্তির দ্বারাই সত্যকে চিনব, সেই গেরুয়া কাপড়ের দ্বারা নয়— যে কাপড়ে বহু অসত্যকে চাপা দিয়ে রাখে।

ছন্দটাই যে ঐকান্তিকভাবে কাব্য তা নয়। কাব্যের মূল কথাটা আছে রসে; ছন্দটা এই রসের পরিচয় দেয় আনুষঙ্গিক হয়ে।

সহায়তা করে দুই দিক থেকে। এক হচ্ছে, স্বভাবতই তার দোলা দেবার শক্তি আছে; আর-এক হচ্ছে, পাঠকের চিরাভ্যস্ত সংস্কার। এই সংস্কারের কথাটা ভাববার বিষয়। একদা নিয়মিত অংশে বিভক্ত ছন্দই সাধু কাব্যভাষায় একমাত্র পাংক্তেয় বলে গণ্য ছিল। সেই সময়ে আমাদের কানের অভ্যাসও ছিল তার অনুকূলে। তখন ছন্দে মিল রাখাও ছিল অপরিহার্য।

এমন সময়ে মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে আমাদের সংস্কারের প্রতিকূলে আনলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ। তাতে রইল না মিল। তাতে লাইনের বেড়াগুলি সমান ভাগে সাজানো বটে, কিন্তু ছন্দের পদক্ষেপ চলে ক্রমাগতই বেড়া ডিঙিয়ে। অর্থাৎ এর ভঙ্গি পদ্যের মতো কিন্তু ব্যবহার গদ্যের চালে।

সংস্কারে অনিত্যতার আর-একটা প্রমাণ দিই। এক সময়ে কুলবধূর সংজ্ঞা ছিল, সে অন্তঃপুরচারিণী। প্রথম যে কুলস্ত্রীরা অন্তঃপুর থেকে অসংকোচে বেরিয়ে এলেন তাঁরা সাধারণের সংস্কারকে আঘাত করাতে তাঁদেরকে সন্দেহের চোখে দেখা ও অপ্রকাশ্যে বা প্রকাশ্যে অপমানিত করা, প্রহসনের নায়িকারূপে তাঁদেরকে অট্টহাস্যের বিষয় করা,

প্রচলিত হয়ে এসেছিল। সেদিন যে মেয়েরা সাহস করে বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরুষছাত্রদের সঙ্গে একত্রে পাঠ নিতেন তাঁদের সম্বন্ধে কাপুরুষ আচরণের কথা জানা আছে।

ক্রমশই সংস্কার পরিবর্তন হয়ে আসছে। কুলস্ত্রীরা আজ অসংশয়িতভাবে কুলস্ত্রীই আছেন, যদিও অন্তঃপুরের অবরোধ থেকে তাঁরা মুক্ত।

তেমনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের মিলবর্জিত অসমানতাকে কেউ কাব্যরীতির বিরোধী বলে আজ মনে করেন না। অথচ পূর্বতন বিধানকে এই ছন্দে বহু দূরে লঙ্ঘন করে গেছে।

কাজটা সহজ হয়েছিল, কেননা তখনকার ইংরেজি-শেখা পাঠকেরা মিল্‌টন-শেক্‌স্‌পীয়রের ছন্দকে শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

অমিত্রাক্ষর ছন্দকে জাতে তুলে নেবার প্রসঙ্গে সাহিত্যিক সনাতনীরা এই কথা বলবেন যে, যদিও এই ছন্দ চোদ্দ অক্ষরের গণ্ডিটা পেরিয়ে চলে তবু সে পয়ারের লয়টাকে অমান্য করে না।

অর্থাৎ, লয়কে রক্ষা করার দ্বারা এই ছন্দ কাব্যের ধর্ম রক্ষা করেছে, অমিত্রাক্ষর সম্বন্ধে এইটুকু বিশ্বাস লোকে আঁকড়ে রয়েছে। তারা বলতে চায়, পয়ারের সঙ্গে এই নাড়ির সম্বন্ধটুকু না থাকলে কাব্য কাব্যই হতে পারে না। কী হতে পারে এবং হতে পারে না তা হওয়ার উপরেই নির্ভর করে, লোকের অভ্যাসের উপর করে না— এ কথাটা অমিত্রাক্ষর ছন্দই পূর্বে প্রমাণ করেছে। আজ গদ্যকাব্যের উপরে প্রমাণের ভার পড়েছে যে, গদ্যেও কাব্যের সঞ্চরণ অসাধ্য নয়।

অশ্বারোহী সৈন্যও সৈন্য, আবার পদাতিক সৈন্যও সৈন্য— কোন্‌খানে তাদের মূলগত মিল? যেখানে লড়াই ক'রে জেতাই তাদের উভয়েরই সাধনার লক্ষ্য।

কাব্যের লক্ষ্য হৃদয় জয় করা— পদ্যের ঘোড়ায় চড়েই হোক, আর গদ্যে পা চালিয়েই হোক। সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির সক্ষমতার দ্বারাই তাকে বিচার করতে হবে। হার হলেই হার, তা সে ঘোড়ায় চড়েই হোক আর পায়ে হেঁটেই হোক। ছন্দে-লেখা রচনা কাব্য হয় নি, তার হাজার প্রমাণ আছে; গদ্যরচনাও কাব্য নাম ধরলেও কাব্য হবে না, তার ভূরি ভূরি প্রমাণ জুটতে থাকবে।

ছন্দের একটা সুবিধা এই যে, ছন্দের স্বতই একটা মাধুর্য আছে; আর কিছু না হয় তো সেটাই একটা লাভ। সস্তা সন্দেশে ছানার অংশ নগণ্য হতে পারে কিন্তু অন্তত চিনিটা পাওয়া যায়।

কিন্তু সহজে সন্তুষ্ট নয় এমন একগুঁয়ে মানুষ আছে, যারা চিনি দিয়ে আপনাকে ভোলাতে লজ্জা পায়। মন-ভোলানো মালমসলা বাদ দিয়েও কেবলমাত্র খাঁটি মাল দিয়েই তারা জিতবে, এমনতরো তাদের জিদ। তারা এই কথাই বলতে চায়, আসল

কাব্য জিনিসটা একান্তভাবে ছন্দ-অছন্দ নিয়ে নয়, তার গৌরব তার আন্তরিক সার্থকতায়।

গদ্যই হোক, পদ্যই হোক, রচনামাত্রেই একটা স্বাভাবিক ছন্দ থাকে। পদ্যে সেটা সুপ্রত্যক্ষ, গদ্যে সেটা অন্তর্নিহিত। সেই নিগূঢ় ছন্দটিকে পীড়ন করলেই কাব্যকে আহত করা হয়। পদ্যছন্দবোধের চর্চা বাঁধা নিয়মের পথে চলতে পারে কিন্তু গদ্যছন্দের পরিমাণবোধ মনের মধ্যে যদি সহজে না থাকে তবে অলংকার-শাস্ত্রের সাহায্যে এর দুর্গমতা পার হওয়া যায় না। অথচ অনেকেই মনে রাখেন না যে, যেহেতু গদ্য সহজ, সেই কারণেই গদ্যছন্দ সহজ নয়। সহজের প্রলোভনেই মারাত্মক বিপদ ঘটে, আপনি এসে পড়ে অসতর্কতা। অসতর্কতাই অপমান করে কলালক্ষ্মীকে, আর কলালক্ষ্মী তার শোধ তোলেন অকৃতার্থতা দিয়ে। অসতর্ক লেখকদের হাতে গদ্যকাব্য অবজ্ঞা ও পরিহাসের উপাদান স্তূপাকার করে তুলবে, এমন আশঙ্কার কারণ আছে। কিন্তু এই সহজ কথাটা বলতেই হবে, যেটা যথার্থ কাব্য সেটা পদ্য হলেও কাব্য, গদ্য হলেও কাব্য।

সবশেষে এই একটি কথা বলবার আছে, কাব্য প্রাত্যহিক সংসারের অপরিমার্জিত বাস্তবতা থেকে যত দূরে ছিল এখন তা নেই। এখন সমস্তকেই সে আপন রসলোকে উত্তীর্ণ করতে চায়— এখন সে স্বর্গারোহণ করবার সময়েও সঙ্গের কুকুরটিকে ছাড়ে না।

বাস্তব জগৎ ও রসের জগতের সমন্বয় সাধনে গদ্য কাজে লাগবে; কেননা গদ্য শুচিবায়ুগ্রস্ত নয়।

১২ নভেম্বর ১৯৩৬ পৌষ ১৩৪৩

গদ্যকাব্য

কতকগুলি বিষয় আছে যার আবহাওয়া অত্যন্ত সূক্ষ্ম, কিছুতেই সহজে প্রতিভাত হতে চায় না। ধরা-ছোঁওয়ার বিষয় নিয়ে তর্কে আঘাত-প্রতিঘাত করা চলে। কিন্তু বিষয়বস্তু যখন অনির্বচনীয়ের কোঠায় এসে পড়ে তখন কী উপায়ে বোঝানো চলে তা স্পষ্ট কি না। তাকে ভালোলাগা মন্দলাগার একটা সহজ ক্ষমতা ও বিস্তৃত অভিজ্ঞতা থাকা চাই। বিজ্ঞান আয়ত্ত করতে হলে সাধনার প্রয়োজন। কিন্তু রুচি এমন একটা জিনিস যাকে বলা যেতে পারে সাধনদুর্লভ, তাকে পাওয়ার বাঁধা পথ ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। সহজ ব্যক্তিগত রুচি-অনুযায়ী বলতে পারি যে, এই আমার ভালো লাগে।

সেই রুচির সঙ্গে যোগ দেয় নিজের স্বভাব, চিন্তার অভ্যাস সমাজের পরিবেষ্টন ও শিক্ষা। এগুলি যদি ভদ্র ব্যাপক ও সূক্ষ্মবোধশক্তিমান হয় তা হলে সেই রুচিকে সাহিত্যপথের আলোক ব'লে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু রুচির শুভসম্মিলন কোথাও সত্য পরিণামে পৌঁচেছে কি না তাও মেনে নিতে অন্য পক্ষে রুচিচর্চার সত্য আদর্শ থাকা চাই। সুতরাং রুচিগত বিচারের মধ্যে একটা অনিশ্চয়তা থেকে যায়। সাহিত্যক্ষেত্রে যুগে যুগে তার প্রমাণ পেয়ে আসছি। বিজ্ঞান দর্শন সম্বন্ধে যে মানুষ যথোচিত চর্চা করে নি সে বেশ নম্রভাবেই বলে, 'মতের অধিকার নেই আমার।' সাহিত্য ও শিল্পে রসসৃষ্টির সভায় মতবিরোধের কোলাহল দেখে অবশেষে হতাশ হয়ে বলতে ইচ্ছে হয়, ভিন্নরুচির্হি লোকঃ। সেখানে সাধনার বালাই নেই ব'লে স্পর্ধা আছে অবারিত, আর সেইজন্যেই রুচিভেদের তর্ক নিয়ে হাতাহাতিও হয়ে থাকে। তাই বররুচির আক্ষেপ মনে পড়ে, অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্ শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ। স্বয়ং কবির কাছে অধিকারীর ও অনধিকারীর প্রসঙ্গ সহজ। তাঁর লেখা কার ভালো লাগল, কার লাগল না, শ্রেণীভেদ এই যাচাই নিয়ে। এই কারণেই চিরকাল ধরে যাচনদারের সঙ্গে শিল্পীদের ঝগড়া চলেছে। স্বয়ং কবি কালিদাসকেও এ নিয়ে দুঃখ পেতে হয়েছে, সন্দেহ নেই; শোনা যায় নাকি, মেঘদূতে স্থূলহস্তাবলেপের প্রতি ইঙ্গিত আছে। যে-সকল কবিতায় প্রথাগত ভাষা ও ছন্দের অনুসরণ করা হয় সেখানে অন্তত বাইরের দিক থেকে পাঠকদের চলতে ফিরতে বাধে না। কিন্তু কখনো কখনো বিশেষ কোনো রসের অনুসন্ধানে কবি অভ্যাসের পথ অতিক্রম করে থাকে। তখন অন্তত কিছুকালের জন্য পাঠকের আরামের ব্যাঘাত ঘটে ব'লে তারা নূতন রসের আমদানিকে অস্বীকার করে শান্তি স্থাপন করে। চলতে চলতে যে পর্যন্ত পথ চিহ্নিত হয়ে না যায় সে পর্যন্ত পথকর্তার বিরুদ্ধে পথিকদের একটা ঝগড়ার সৃষ্টি হয়ে ওঠে। সেই অশান্তির সময়টাতে কবি স্পর্ধা প্রকাশ করে; বলে, 'তোমাদের চেয়ে আমার মতই প্রামাণিক।' পাঠকরা বলতে থাকে, যে লোকটা জোগান দেয় তার চেয়ে যে লোক ভোগ করে তারই দাবির জোর বেশি। কিন্তু ইতিহাসে তার প্রমাণ হয় না। চিরদিনই দেখা গেছে, নূতনকে উপেক্ষা করতে করতেই নূতনের অভ্যর্থনার পথ প্রশস্ত হয়েছে।

কিছুদিন থেকে আমি কোনো কোনো কবিতা গদ্যে লিখতে আরম্ভ করেছি। সাধারণের কাছ থেকে এখনই যে তা সমাদর লাভ করবে এমন প্রত্যাশা করা অসংগত। কিন্তু সদ্য সমাদর না পাওয়াই যে তার নিষ্ফলতার প্রমাণ তাও মানতে পারি নে। এই দ্বন্দ্বের স্থলে আত্মপ্রত্যয়কে সম্মান করতে কবি বাধ্য। আমি অনেক দিন ধরে

রসসৃষ্টির সাধনা করেছি, অনেককে হয়তো আনন্দ দিতে পেরেছি, অনেককে হয়তো-বা দিতে পারি নি। তবু এই বিষয়ে আমার বহু দিনের সঞ্চিত যে অভিজ্ঞতা তার দোহাই দিয়ে দুটো-একটা কথা বলব; আপনারা তা সম্পূর্ণ মেনে নেবেন, এমন কোনো মাথার দিব্য নেই।

তর্ক এই চলেছে, গদ্যের রূপ নিয়ে কাব্য আত্মরক্ষা করতে পারে কি না। এতদিন যে রূপেতে কাব্যকে দেখা গেছে এবং সে দেখার সঙ্গে আনন্দের যে অনুষঙ্গ, তার ব্যতিক্রম হয়েছে গদ্যকাব্যে। কেবল প্রসাধনের ব্যত্যয় নয়, স্বরূপেতে তার ব্যাঘাত ঘটেছে। এখন তর্কের বিষয় এই যে, কাব্যের স্বরূপ ছন্দোবদ্ধ সজ্জার 'পরে একান্ত নির্ভর করে কি না। কেউ মনে করেন, করে; আমি মনে করি, করে না। অলংকরণের বহিরাবরণ থেকে মুক্ত করে কাব্য সহজে আপনাকে প্রকাশ করতে পারে, এ বিষয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে একটি দৃষ্টান্ত দেব। আপনারা সকলেই অবগত আছেন, জবালাপুত্র সত্যকামের কাহিনী অবলম্বন করে আমি একটি কবিতা রচনা করেছি। ছান্দোগ্য উপনিষদে এই গল্পটি সহজ গদ্যের ভাষায় পড়েছিলাম, তখন তাকে সত্যিকার কাব্য ব'লে মেনে নিতে একটুও বাধে নি। উপাখ্যানমাত্র—কাব্য-বিচারক একে বাহিরের দিকে তাকিয়ে কাব্যের পর্যায়ে স্থান দিতে অসম্মত হতে পারেন; কারণ এ তো অনুষ্টুভ ত্রিষ্টুভ বা মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত হয় নি। আমি বলি, হয় নি বলেই শ্রেষ্ঠ কাব্য হতে পেরেছে, অপর কোনো আকস্মিক কারণে নয়। এই সত্যকামের গল্পটি যদি ছন্দে বেঁধে রচনা করা হত তবে হালকা হয়ে যেত।

সপ্তদশ শতাব্দীতে নাম-না-জানা কয়েকজন লেখক ইংরেজিতে গ্রীক ও হিব্রু বাইবেল অনুবাদ করেছিলেন। এ কথা মানতেই হবে যে, সলোমনের গান, ডেভিডের গাথা সত্যিকার কাব্য। এই অনুবাদের ভাষার আশ্চর্য শক্তি এদের মধ্যে কাব্যের রস ও রূপকে নিঃসংশয়ে পরিস্ফুট করেছে। এই গানগুলিতে গদ্যছন্দের যে মুক্ত পদক্ষেপ আছে তাকে যদি পদ্যপ্রথার শিকলে বাঁধা হত তবে সর্বনাশই হত।

যজুর্বেদে যে উদাত্ত ছন্দের সাক্ষাৎ আমরা পাই তাকে আমরা পদ্য বলি না, বলি মন্ত্র। আমরা সবাই জানি যে, মন্ত্রের লক্ষ্য হল শব্দের অর্থকে ধ্বনির ভিতর দিয়ে মনের গভীরে নিয়ে যাওয়া। সেখানে সে যে কেবল অর্থবান তা নয়, ধ্বনিমানও বটে। নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, এই গদ্যমন্ত্রের সার্থকতা অনেকে মনের ভিতর অনুভব করেছেন, কারণ তার ধ্বনি থামলেও অনুরণন থামে না।

একদা কোনো-এক অসতর্ক মুহূর্তে আমি আমার গীতাঞ্জলি ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করি। সেদিন বিশিষ্ট ইংরেজ সাহিত্যিকেরা আমার অনুবাদকে তাঁদের সাহিত্যের

অঙ্গস্বরূপ গ্রহণ করলেন। এমন-কি, ইংরেজি গীতাঞ্জলিকে উপলক্ষ ক'রে এমন-সব প্রশংসাবাদ করলেন যাকে অত্যুক্তি মনে করে আমি কুণ্ঠিত হয়েছিলাম। আমি বিদেশী, আমার কাব্যে মিল বা ছন্দের কোনো চিহ্নই ছিল না, তবু যখন তাঁরা তার ভিতর সম্পূর্ণ কাব্যের রস পেলেন তখন সে কথা তো স্বীকার না করে পারা গেল না। মনে হয়েছিল, ইংরেজি গদ্যে আমার কাব্যের রূপ দেওয়ায় ক্ষতি হয় নি, বরঞ্চ পদ্যে অনুবাদ করলে হয়তো তা ধিক্‌কৃত হত, অশ্রদ্ধেয় হত।

মনে পড়ে, একবার শ্রীমান সত্যেন্দ্রকে বলেছিলুম, 'ছন্দের রাজা তুমি, অ-ছন্দের শক্তিতে কাব্যের স্রোতকে তার বাঁধ ভেঙে প্রবাহিত করো দেখি।' সত্যেনের মতো বিচিত্র ছন্দের স্রষ্টা বাংলায় খুব কমই আছে। হয়তো অভ্যাস তাঁর পথে বাধা দিয়েছিল তাই তিনি আমার প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি। আমি স্বয়ং এই কাব্যরচনায় চেষ্টা করেছিলুম 'লিপিকা'য় ; অবশ্য পদ্যের মতো পদ ভেঙে দেখাই নি। 'লিপিকা' লেখার পর বহুদিন আর গদ্যকাব্য লিখি নি। বোধ করি সাহস হয় নি বলেই।

কাব্যভাষার একটা ওজন আছে, সংযম আছে; তাকেই বলে ছন্দ। গদ্যের বাছবিচার নেই, সে চলে বুক ফুলিয়ে। সেইজন্যেই রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি প্রাত্যহিক ব্যাপার প্রাঞ্জল গদ্যে লেখা চলতে পারে। কিন্তু গদ্যকে কাব্যের প্রবর্তনায় শিল্পিত করা যায়। তখন সেই কাব্যের গতিতে এমন-কিছু প্রকাশ পায় যা গদ্যের প্রাত্যহিক ব্যবহারের অতীত। গদ্য বলেই এর ভিতরে অতিমাধুর্য-অতিলালিত্যের মাদকতা থাকতে পারে না। কোমলে কঠিনে মিলে একটা সংযত রীতির আপনা-আপনি উদ্ভব হয়। নটীর নাচে শিক্ষিতপটু অলংকৃত পদক্ষেপ। অপর পক্ষে, ভালো চলে এমন কোনো তরুণীর চলনে ওজন-রক্ষার একটি স্বাভাবিক নিয়ম আছে। এই সহজ সুন্দর চলার ভঙ্গিতে একটা অশিক্ষিত ছন্দ আছে, যে ছন্দ তার রক্তের মধ্যে, যে ছন্দ তার দেহে। গদ্যকাব্যের চলন হল সেইরকম— অনিয়মিত উচ্ছৃঙ্খল গতি নয়, সংযত পদক্ষেপ।

আজকেই মোহাম্মদী পত্রিকায় দেখছিলুম কে-একজন লিখেছেন যে, রবিঠাকুরের গদ্যকবিতার রস তিনি তাঁর সাদা গদ্যেই পেয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ লেখক বলেছেন যে 'শেষের কবিতা'য় মূলত কাব্যরসে অভিষিক্ত জিনিস এসে গেছে। তাই যদি হয় তবে কি জেনানা থেকে বার হবার জন্যে কাব্যের জাত গেল। এখানে আমার প্রশ্ন এই, আমরা কি এমন কাব্য পড়ি নি যা গদ্যের বক্তব্য বলেছে, যেমন ধরুন ব্রাউনিঙে। আবার ধরুন, এমন গদ্যও কি পড়ি নি যার মাঝখানে কবিকল্পনার রেশ পাওয়া গেছে। গদ্য ও পদ্যের ভাশুর-ভাদ্রবউ সম্পর্ক আমি মানি না। আমার কাছে

তারা ভাই আর বোনের মতো, তাই যখন দেখি গদ্যে পদ্যের রস ও পদ্যে গদ্যের গাম্ভীর্যের সহজ আদানপ্রদান হচ্ছে তখন আমি আপত্তি করি নে।

রুচিভেদ নিয়ে তর্ক করে কিছু লাভ হয় না। এইমাত্রই বলতে পারি, আমি অনেক গদ্যকাব্য লিখেছি যার বিষয়বস্তু অপর কোনো রূপে প্রকাশ করতে পারতুম না। তাদের মধ্যে একটা সহজ প্রাত্যহিক ভাব আছে; হয়তো সজ্জা নেই কিন্তু রূপ আছে এবং এইজন্যেই তাদেরকে সত্যকার কাব্যগোত্রীয় ব'লে মনে করি। কথা উঠতে পারে, গদ্যকাব্য কী। আমি বলব, কী ও কেমন জানি না, জানি যে এর কাব্যরস এমন একটা জিনিস যা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করবার নয়। যা আমাকে বচনাতীতের আস্বাদ দেয় তা গদ্য বা পদ্য রূপেই আসুক, তাকে কাব্য ব'লে গ্রহণ করতে পরাঙ্মুখ হব না।

শান্তিনিকেতন। ২৯ আগস্ট ১৯৩৯ মাঘ ১৩৪৬

সাহিত্যবিচার

সূক্ষ্মদৃষ্টি জিনিসটা যে রস আহরণ করে সেটা সকল সময় সার্বজনিক হয় না। সাহিত্যের এটাই হল অপরিহার্য দৈন্য। তাকে পুরস্কারের জন্য নির্ভর করতে হয় ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির উপরে। তার নিম্ন-আদালতে বিচার সেও যেমন বৈজ্ঞানিক বিধি-নির্দিষ্ট নয়, তার আপিল-আদালতের রায়ও তথৈবচ। এ স্থলে আমাদের প্রধান নির্ভরের বিষয় বহুসংখ্যক শিক্ষিত রুচির অনুমোদনে। কিন্তু কে না জানে যে, শিক্ষিত লোকের রুচির পরিধি তৎকালীন বেষ্টনীর দ্বারা সীমাবদ্ধ, সময়ান্তরে তার দশান্তর ঘটে। সাহিত্যবিচারের মাপকাঠি একটা সজীব পদার্থ। কালক্রমে সেটা বাড়ে এবং কমে, কৃশ হয় এবং স্থূল হয়েও থাকে। তার সেই নিত্যপরিবর্তমান পরিমাণবৈচিত্র্য দিয়েই সে সাহিত্যকে বিচার করতে বাধ্য, আর-কোনো উপায় নেই। কিন্তু বিচারকেরা সেই হ্রাসবৃদ্ধিকে অনিত্য বলে স্বীকার করেন না; তাঁরা বৈজ্ঞানিক ভঙ্গি নিয়ে নির্বিকার অবিচলতার ভান করে থাকেন; কিন্তু এ বিজ্ঞান মেকি বিজ্ঞান, খাঁটি নয়— ঘরগড়া বিজ্ঞান, শাশ্বত নয়। উপস্থিতমত যখন একজন বা এক সম্প্রদায়ের লোক সাহিত্যিকের উপরে কোনো মত জাহির করেন তখন সেই ক্ষণিক চলমান আদর্শের অনুসারে সাহিত্যিকের দণ্ড-পুরস্কারের ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে থাকে। তার বড়ো আদালত নেই; তার ফাঁসির দণ্ড হলেও সে একান্ত মনে আশা করে যে, বেঁচে থাকতে থাকতে

হয়তো ফাঁস যাবে ছিঁড়ে ; গ্রহের গতিকে কখনো যায়, কখনো যায় না। সমালোচনায় এই অধ্রুব অনিশ্চয়তা থেকে স্বয়ং শেক্‌স্‌পীয়রও নিষ্কৃতি লাভ করেন নি। পণ্যের মূল্যনির্ধারণকালে ঝগড়া করে তর্ক করে, কিম্বা আর পাঁচজনের নজির তুলে তার সমর্থন করা জলের উপর ভিত গাড়া। জল তো স্থির নয়, মানুষের রুচি স্থির নয়, কাল স্থির নয়। এ স্থলে ধ্রুব আদর্শের ভান না করে সাহিত্যের পরিমাপ যদি সাহিত্য দিয়েই করা যায় তা হলে শান্তি রক্ষা হয়। অর্থাৎ জজের রায় স্বয়ং যদি শিল্পনিপুণ হয় তা হলে মানদণ্ডই সাহিত্যভাণ্ডারে সসম্মানে রক্ষিত হবার যোগ্য হতে পারে।

সাহিত্যবিচারমূলক গ্রন্থ পড়বার সময় প্রায়ই কমবেশি পরিমাণে যে জিনিসটি চোখে পড়ে সে হচ্ছে বিচারকের বিশেষ সংস্কার ; এই সংস্কারের প্রবর্তনা ঘটে তাঁর দলের সংস্রবে, তাঁর শ্রেণীর টানে, তাঁর শিক্ষার বিশেষত্ব নিয়ে। কেউ এ প্রভাব সম্পূর্ণ এড়াতে পারেন না। বলা বাহুল্য, এ সংস্কার জিনিসটা সর্বকালের আদর্শের নির্বিশেষ অনুবর্তী নয়। জজের মনে ব্যক্তিগত সংস্কার থাকেই, কিন্তু তিনি আইনের দণ্ডের সাহায্যে নিজেকে খাড়া রাখেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সাহিত্যে এই আইন তৈরি হতে থাকে বিশেষ কালের বা বিশেষ দলের, বিশেষ শিক্ষার বা বিশেষ ব্যক্তির তাড়নায়। এ আইন সর্বজনীন এবং সর্বকালের হতে পারে না। সেইজন্যেই পাঠক-সমাজে বিশেষ বিশেষ কালে এক-একটা বিশেষ মরসুম দেখা দেয়, যথা টেনিসনের মরসুম, কিপ্‌লিঙের মরসুম। এমন নয় যে, ক্ষুদ্র একটা দলের মনেই সেটা ধাক্কা মারে, বৃহৎ জনসংঘ এই মরসুমের দ্বারা চালিত হতে থাকে, অবশেষে কখন একসময় ঋতুপরিবর্তন হয়ে যায়। বৈজ্ঞানিক সত্যবিচারে এরকম ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্ব কেউ প্রশ্রয় দেয় না। এই বিচারে আপন বিশেষ সংস্কারের দোহাই দেওয়াকে বিজ্ঞানে মূঢ়তা বলে। অথচ সাহিত্যে এই ব্যক্তিগত ছোঁয়াচ লাগাকে কেউ তেমন নিন্দা করে না। সাহিত্যে কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা মন্দ, সেটা অধিকাংশ স্থলেই যোগ্য বা অযোগ্য বিচারকের বা তার সম্প্রদায়ের আশ্রয় নিয়ে আপনাকে ঘোষণা করে। বর্তমানকালে বিশ্বান্তার মমত্ব বা অহংকার সর্বজনীন আদর্শের ভান করে দণ্ডনীতি প্রবর্তন করতে চেষ্টা করছে। এও যে অনেকটা বিদেশী নকলের ছোঁয়াচ লাগা মরসুম হতে পারে, পক্ষপাতী লোকে এটা স্বীকার করতে পারেন না। সাহিত্যে এইরকম বিচারকের অহংকার ছাপার অক্ষরের বত্রিশ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। অবশ্য যারা শ্রেণীগত বা দলগত বা বিশেষকালগত মমত্বের দ্বারা সম্পূর্ণ অভিভূত নয়, তাদের বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত নিরাসক্ত। কিন্তু তারা যে কে তা কে স্থির করবে, যে সর্বে দিয়ে ভূত ঝাড়ায় সেই সর্বেকেই ভূতে পায়। আমরা বিচারকের শ্রেষ্ঠতা নিরূপণ করি নিজের মতের শ্রেষ্ঠতার

অভিমানে। মোটের উপর নিরাপদ হচ্ছে ভান না করা, সাহিত্যের সমালোচনাকেই সাহিত্য করে তোলা। সেরকম সাহিত্য মতের একান্ত সত্যতা নিয়ে চরম মূল্য পায় না। তার মূল্য তার সাহিত্যরসেই।

সমালোচকদের লেখায় কটাক্ষে এমন আভাস পেয়ে থাকি, যেন আমি, অন্তত কোথাও কোথাও, আধুনিকের পদক্ষেপের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবার কাঁচা চেষ্টা করছি এবং সেটা আমার কাব্যের স্বভাবের সঙ্গে মিশ খাচ্ছে না। এই উপলক্ষে এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্যটা বলে নিই।

আমার মনে আছে, যখন আমি 'কণিকা' লিখেছিলেম তখন একদল পাঠকের ধাঁধা লেগেছিল। তখন যদি আধুনিকের রেওয়াজ থাকত তা হলে কারো বলতে বাধত না যে, ঐ-সব লেখায় আমি আধুনিকের সাজ পরতে শুরু করেছি। মানুষের বিচারবুদ্ধির ঘাড়ে তার ভূতগত সংস্কার চেপে বসে। মনে আছে, কিছুকাল পূর্বে কোনো সমালোচক লিখেছিলেন, হাস্যরস আমার রচনামহলের বাইরের জিনিস। তাঁর মতে সেটা হতে বাধ্য, কেননা লিরিক-কবিদের মধ্যে স্বভাবতই হাস্যরসের অভাব থাকে। তৎসত্ত্বেও আমার 'চিরকুমারসভা' ও অন্যান্য প্রহসনের উল্লেখ তাঁকে করতে হয়েছে, কিন্তু তাঁর মতে তার হাস্যরসটা অগভীর, কারণ— কারণ আর কিছু বলতে হবে না, কারণ তাঁর সংস্কার, যে সংস্কার যুক্তিতর্কের অতীত।...

আমি অনেক সময় খুঁজি সাহিত্যে কার হাতে কর্ণধারের কাজ দেওয়া যেতে পারে, অর্থাৎ কার হাল ডাইনে-বাঁয়ের ঢেউয়ে দোলাদুলি করে না। একজনের নাম খুব বড়ো করে আমার মনে পড়ে, তিনি হচ্ছেন প্রমথ চৌধুরী। প্রমথর নাম আমার বিশেষ করে মনে আসবার কারণ এই যে, আমি তাঁর কাছে ঋণী। সাহিত্যে ঋণ গ্রহণ করবার ক্ষমতাকে গৌরবের সঙ্গে স্বীকার করা যেতে পারে। অনেককাল পর্যন্ত যারা গ্রহণ করতে এবং স্বীকার করতে পারে নি তাদের আমি অশ্রদ্ধা করে এসেছি। তাঁর যেটা আমার মনকে আকৃষ্ট করেছে সে হচ্ছে তাঁর চিত্তবৃত্তির বাহুল্যবর্জিত আভিজাত্য, সেটা উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পায় তাঁর বুদ্ধিপ্রবণ মননশীলতায়— এই মননধর্ম মনের সে তুঙ্গশিখরেই অনাবৃত থাকে যেটা ভাবালুতার বাষ্পস্পর্শহীন। তাঁর মনের সচেতনতা আমার কাছে আশ্চর্যের বিষয়। তাই অনেকবার ভেবেছি, তিনি যদি বঙ্গসাহিত্যের চালকপদ গ্রহণ করতেন তা হলে এ সাহিত্য অনেক আবর্জনা হতে রক্ষা পেত। এত বেশি নির্বিকার তাঁর মন যে, বাঙালি পাঠক অনেক দিন পর্যন্ত তাঁকে স্বীকার করতেই পারে নি। মুশকিল এই যে, বাঙালি কাউকে কোনো-একটা দলে না টানলে তাকে বুঝতেই পারে না। আমার নিজের কথা যদি বল, সত্য-

আলোচনাসভায় আমার উক্তি অলংকারের ঝংকারে মুখরিত হয়ে ওঠে। এ কথাটা অত্যন্ত বেশি জানা হয়ে গেছে, সেজন্য আমি লজ্জিত এবং নিরুত্তর। অতএব, সমালোচনার আসরে আমার আসন থাকতেই পারে না। কিন্তু রসের অসংযম প্রমথ চৌধুরীর লেখায় একেবারেই নেই। এ-সকল গুণেই মনে মনে তাঁকে জজের পদে বসিয়েছিলুম। কিন্তু বুঝতে পারছি, বিলম্ব হয়ে গেছে। তার বিপদ এই যে, সাহিত্যে অরক্ষিত আসনে যে খুশি চ'ড়ে বসে। তার ছত্রদণ্ড ধরবার লোক পিছনে পিছনে জুটে যায়।

এখানেই আমার শেষ কথাটা বলে নিই। আমার রচনায় যাঁরা মধ্যবিত্ততার সন্ধান করে পান নি ব'লে নালিশ করেন তাঁদের কাছে আমার একটা কৈফিয়ত দেবার সময় এল। পলিমাটি কোনো স্থায়ী কীর্তির ভিত বহন করতে পারে না। বাংলার গাঙ্গেয় প্রদেশে এমন কোনো সৌধ পাওয়া যায় না যা প্রাচীনতার স্পর্ধা করতে পারে। এ দেশে আভিজাত্য সেই শ্রেণীর। আমরা যাদের বনেদীবংশীয় বলে আখ্যা দিই তাদের বনেদ বেশি নীচে পর্যন্ত পৌঁছয় নি। এরা অল্প কালের পরিসরের মধ্যে মাথা তুলে ওঠে, তার পরে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে বিলম্ব করে না। এই আভিজাত্য সেইজন্য একটা আপেক্ষিক শব্দ মাত্র। তার সেই ক্ষণভঙ্গুর ঐশ্বর্যকে বেশি উচ্চে স্থাপন করা বিড়ম্বনা, কেননা সেই কৃত্রিম উচ্চতা কালের বিদ্রূপের লক্ষ্য হয় মাত্র। এই কারণে আমাদের দেশের অভিজাতবংশ তার মনোবৃত্তিতে সাধারণের সঙ্গে অত্যন্ত স্বতন্ত্র হতে পারে না। এ কথা সত্য,এই স্বল্পকালীন ধনসম্পদের আত্মসচেতনতা অনেক সময়েই দুঃসহ অহংকারের সঙ্গে আপনাকে জনসম্প্রদায় থেকে পৃথক রাখবার আড়ম্বর করে। এই হাস্যকর বক্ষস্ফীতি আমাদের বংশে, অন্তত আমাদের কালে, একেবারেই ছিল না। কাজেই আমরা কোনোদিন বড়োলোকের প্রহসন অভিনয় করি নি। অতএব, আমার মনে যদি কোনো স্বভাবগত বিশেষত্বের ছাপ প'ড়ে থাকে তা বিত্তপ্রাচুর্য কেন, বিত্তসচ্ছলতারও নয়। তাকে বিশেষ পরিবারের পূর্বাপর সংস্কৃতির মধ্যে ফেলা যেতে পারে এবং এরকম স্বাতন্ত্র্য হয়তো অন্য পরিবারেও কোনো বংশগত অভ্যাসবশত আত্মপ্রকাশ করে থাকে। বস্তুত এটা আকস্মিক। আশ্চর্য এই যে, সাহিত্যে এই মধ্যবিত্ততার অভিমান সহসা অত্যন্ত মেতে উঠেছে। কিছুকাল পূর্বে 'তরুণ' শব্দটা এইরকম ফণা তুলে ধরেছিল। আমাদের দেশে সাহিত্যে এইরকম জাতে-ঠেলাঠেলি আরম্ভ হয়েছে হালে। আমি যখন মস্কৌ গিয়েছিলুম, চেকভের রচনা সম্বন্ধে আমার অনুকূল অভিরুচি ব্যক্ত করতে গিয়ে হঠাৎ ঠোকর খেয়ে দেখলুম, চেকভের লেখায় সাহিত্যের মেলবন্ধনে জাতিচ্যুতিদোষ ঘটেছে, সুতরাং তাঁর নাটক স্টেজের মঞ্চে

পঙ্‌ক্তি পেল না। সাহিত্যে এই মনোভাব এত বেশি কৃত্রিম যে শুনতে পাই, এখন আবার হাওয়া বদল হয়েছে। এক সময়ে মাসের পর মাস আমি পল্লীজীবনের গল্প রচনা করে এসেছি। আমার বিশ্বাস, এর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে পল্লীজীবনের চিত্র এমন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হয় নি। তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লেখকের অভাব ছিল না, তাঁরা প্রায় সকলেই প্রতাপসিংহ বা প্রতাপাদিত্যের ধ্যানে নিবিষ্ট ছিলেন। আমার আশঙ্কা হয়, এক সময়ে 'গল্পগুচ্ছ' বুর্জোয়া লেখকের সংসর্গদোষে অসাহিত্য ব'লে অস্পৃশ্য হবে। এখনই যখন আমার লেখার শ্রেণীনির্ণয় করা হয় তখন এই লেখাগুলির উল্লেখমাত্র হয় না, যেন ওগুলির অস্তিত্বই নেই। জাতে-ঠেলাঠেলি আমাদের রক্তের মধ্যে আছে তাই ভয় হয়, এই আগাছাটাকে উপড়ে ফেলা শক্ত হবে।

কিছুকাল থেকে আমি দুঃসহ রোগদুঃখ ভোগ করে আসছি, সেইজন্য যদি ব'লে বসি 'যাঁরা আমার শুশ্রূষায় নিযুক্ত তাঁরাও মুখে কালো রঙ মেখে অস্বাস্থ্যের বিকৃত চেহারা ধারণ করে এলে তবেই সেটা আমার পক্ষে আরামের হতে পারে', তা হলে মনোবিকারের আশঙ্কা কল্পনা করতে হবে। প্রকৃতির মধ্যে একটা নির্মল প্রসন্নতা আছে। ব্যক্তিগত জীবনে অবস্থার বিপ্লব ঘটে, কিন্তু তাতে এই বিশ্বজনীন দানের মধ্যে বিকৃতি ঘটে না— সেই আমাদের সৌভাগ্য। তাতে যদি আপত্তি করার একটা দল পাকাই তা হলে বলতে হয়, যাঁরা নিঃস্ব তাঁদের জন্যে মরুভূমিতে উপনিবেশ স্থাপন করা উচিত, নইলে তাঁদের মনের তুষ্টি অসম্ভব। নিঃস্ব শ্রেণীর পাঠকদের জন্য সাহিত্যেও কি মরু-উপনিবেশ স্থাপন করতে হবে।…

শান্তিনিকেতন। ১৩৪১ ? আষাঢ় ১৩৪৮

সাহিত্যের মূল্য

সেদিন অনিলের সঙ্গে সাহিত্যের মূল্যের আদর্শের নিরন্তর পরিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেম; সেইসঙ্গে বলেছিলেম যে, ভাষা সাহিত্যের বাহন, কালে কালে সেই ভাষার রূপান্তর ঘটতে থাকে। সেজন্য তার ব্যঞ্জনার অন্তরঙ্গতায় কেবলই তারতম্য ঘটতে থাকে। কথাটা আর-একটু পরিষ্কার করে বলা আবশ্যক।

আমার মতো গীতিকবিরা তাদের রচনায় বিশেষভাবে রসের অনির্বচনীয়তা নিয়ে কারবার করে থাকে। যুগে যুগে লোকের মুখে এই রসের স্বাদ সমান থাকে না, তার আদরের পরিমাণ ক্রমশই শুষ্ক নদীর জলের মতো তলায় গিয়ে ঠেকে। এইজন্য রসের

ব্যাবসা সর্বদা ফেল হবার মুখে থেকে যায়। তার গৌরব নিয়ে গর্ব করতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু এই রসের অবতারণা সাহিত্যের একমাত্র অবলম্বন নয়। তার আর-একটা দিক আছে, যেটা রূপের সৃষ্টি। যেটাতে আনে প্রত্যক্ষ অনুভূতি, কেবলমাত্র অনুমান নয়, আভাস নয়, ধ্বনির ঝংকার নয়। বাল্যকালে একদিন আমার কোনো বইয়ের নাম দিয়েছিলেম 'ছবি ও গান'। ভেবে দেখলে দেখা যাবে, এই দুটি নামের দ্বারাই সমস্ত সাহিত্যের সীমা নির্ণয় করা যায়। ছবি জিনিসটা অতিমাত্রায় গূঢ় নয়— তা স্পষ্ট দৃশ্যমান। তার সঙ্গে রস মিশ্রিত থাকলেও তার রেখা ও বর্ণবিন্যাস সেই রসের প্রলেপে ঝাপসা হয়ে যায় না। এইজন্য তার প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর। সাহিত্যের ভিতর দিয়ে আমরা মানুষের ভাবের আকৃতি অনেক পেয়ে থাকি এবং তা ভুলতেও বেশি সময় লাগে না। কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে মানুষের মূর্তি যেখানে উজ্জ্বল রেখায় ফুটে ওঠে সেখানে ভোলবার পথ থাকে না। এই গতিশীল জগতে যা-কিছু চলছে ফিরছে তারই মধ্যে বড়ো রাজপথ দিয়ে সে চলাফেরা করে বেড়ায়। সেই কারণে শেক্‌স্‌পীয়রের লুক্রিস এবং ভিনস অ্যাণ্ড্ অ্যাডোনিসের কাব্যের স্বাদ আমাদের মুখে আজ রুচিকর না হতে পারে, সে কথা সাহস করে বলি বা না বলি; কিন্তু লেডি ম্যাক্‌বেথ অথবা কিং লীয়র অথবা অ্যাণ্টনি ও ক্লিয়োপেট্রা এদের সম্বন্ধে এমন কথা যদি কেউ বলে তা হলে বলব, তার রসনায় অস্বাস্থ্যকর বিকৃতি ঘটেছে, সে স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। শেক্‌স্‌পীয়র মানব-চরিত্রের চিত্রশালার দ্বারোদ্‌ঘাটন করে দিয়েছেন, সেখানে যুগে যুগে লোকের ভিড় জমা হবে। তেমনি বলতে পারি, কুমারসম্ভবের হিমালয়-বর্ণনা অত্যন্ত কৃত্রিম, তাতে সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিমর্যাদা হয়তো আছে, তার রূপের সত্যতা একেবারেই নেই; কিন্তু সখী-পরিবৃতা শকুন্তলা চিরকালের। তাকে দুষ্মন্ত প্রত্যাখ্যান করতে পারেন কিন্তু কোনো যুগের পাঠকই পারেন না। মানুষ উঠেছে জেগে; মানুষের অভ্যর্থনা সকল কালে ও সকল দেশেই সে পাবে। তাই বলছি, সাহিত্যের আসরে এই রূপসৃষ্টির আসন ধ্রুব। কবিকঙ্কণের সমস্ত বাক্যরাশি কালে কালে অনাদৃত হতে পারে, কিন্তু রইল তার ভাঁড়ুদত্ত। মিড্‌সামার নাইট্‌স্ ড্রীম নাট্যের মূল্য কমে যেতে পারে, কিন্তু ফল্‌স্টাফের প্রভাব বরাবর থাকবে অবিচলিত।

জীবন মহাশিল্পী। সে যুগে যুগে দেশে দেশান্তরে মানুষকে নানা বৈচিত্র্যে মূর্তিমান করে তুলছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের চেহারা আজ বিস্মৃতির অন্ধকারে অদৃশ্য, তবুও বহুশত আছে যা প্রত্যক্ষ, ইতিহাসে যা উজ্জ্বল। জীবনের এই সৃষ্টিকার্য যদি সাহিত্যে যথোচিত নৈপুণ্যের সঙ্গে আশ্রয় লাভ করতে পারে তবেই তা অক্ষয় হয়ে থাকে। সেইরকম সাহিত্যই ধন্য— ধন্য ডন কুইক্‌সট, ধন্য রবিন্‌সন ক্রুসো। আমাদের ঘরে ঘরে রয়ে

গেছে; আঁকা পড়ছে, জীবনশিল্পীর রূপরচনা। কোনো-কোনোটা ঝাপসা, অসম্পূর্ণ এবং অসমাপ্ত, আবার কোনো-কোনোটা উজ্জ্বল। সাহিত্যে যেখানেই জীবনের প্রভাব সমস্ত বিশেষ কালের প্রচলিত কৃত্রিমতা অতিক্রম করে সজীব হয়ে ওঠে সেইখানেই সাহিত্যের অমরাবতী। কিন্তু জীবন যেমন মূর্তিশিল্পী তেমনি জীবন রসিকও বটে। সে বিশেষ ক'রে রসেরও কারবার করে। সেই রসের পাত্র যদি জীবনের স্বাক্ষর না পায়, যদি সে বিশেষ কালের বিশেষত্বমাত্র প্রকাশ করে বা কেবলমাত্র রচনা-কৌশলের পরিচয় দিতে থাকে তা হলে সাহিত্যে সেই রসের সঞ্চয় বিকৃত হয় বা শুষ্ক হয়ে মারা যায়। যে রসের পরিবেশনে মহারসিক জীবনের অকৃত্রিম আস্বাদনের দান থাকে সে রসের ভোজে নিমন্ত্রণ উপেক্ষিত হবার আশঙ্কা থাকে না। 'চরণনখরে পড়ি দশ চাঁদ কাঁদে' এই লাইনের মধ্যে বাক্‌চাতুরী আছে, কিন্তু জীবনের স্বাদ নেই। অপর পক্ষে—

তোমার ওই মাথার চূড়ায় যে রঙ আছে উজ্জ্বলি
সে রঙ দিয়ে রাঙাও আমার বুকের কাঁচলি—

এর মধ্যে জীবনের স্পর্শ পাই, একে অসংশয়ে গ্রহণ করা যেতে পারে।

শান্তিনিকেতন। দুপুর। ২৫ এপ্রিল ১৯৪১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮

সাহিত্যে চিত্রবিভাগ

আমরা পূর্বেই বলেছি যে, সাহিত্যে চিত্রবিভাগ যদি জীবনশিল্পীর স্বাক্ষরিত হয় তবে তার রূপের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সংশয় থাকে না। জীবনের আপন কল্পনার ছাপ নিয়ে আঁকা হয়েছে যে-সব ছবি তারই রেখায় রেখায় রঙে রঙে সকল দেশে সকল কালে মানুষের সাহিত্য পাতায় পাতায় ছেয়ে গেছে। তার কোনোটা-বা ফিকে হয়ে এসেছে; ভেসে বেড়াচ্ছে ছিন্নপত্র তার আপন কালের স্রোতের সীমানায়, তার বাইরে তাদের দেখতেই পাওয়া যায় না। আর কতকগুলি আছে চিরকালের মতন সকল মানুষের চোখের কাছে সমুজ্জ্বল হয়ে। আমরা একটি ছবির সঙ্গে পরিচিত আছি, সে রামচন্দ্রের। তিনি প্রজারঞ্জনের জন্যে নিরপরাধা সীতাকে বনবাস দিয়েছিলেন। এত বড়ো মিথ্যা ছবি খুব অল্পই আছে সাহিত্যের চিত্রশালায়। কিন্তু যে লক্ষ্মণ আপন হৃদয়ের বেদনার সঙ্গে অমিল হলে অধৈর্যের সঙ্গে উড়িয়ে দিতেন শাস্ত্রের উপদেশ এবং দাদার পন্থার অনুসরণ, অথচ

চিরাভ্যস্ত সংস্কারের বন্ধনকে কাটাতে না পেরে নিষ্ঠুর আঘাত করতে বাধ্য হয়েছেন আপন শুভবুদ্ধিকে, যার মতন কঠিন আঘাত জগতে আর নেই— সেই সর্বত্যাগী লক্ষ্মণের ছবি তাঁর দাদার ছবিকে ছাপিয়ে চিরকাল সাহিত্যে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। ও দিকে দেখো ভীষ্মকে, তাঁর গুণগানের অন্ত নেই, অথচ কৌরবসভার চিত্রশালায় তাঁর ছবির ছাপ পড়ল না। তিনি বসে আছেন একজন নিষ্কর্মা ধর্ম-উপদেশ-প্রতীক মাত্র হয়ে। ও দিকে দেখো কর্ণকে, বীরের মতন উদার, অথচ অতিসাধারণ মানুষের মতন বার বার ক্ষুদ্রাশয়তায় আত্মবিস্মৃত। এ দিকে দেখো বিদুরকে, সে নিখুঁত ধার্মিক ; এত নিখুঁত যে, সে কেবল কথাই কয় কিন্তু কেউ তার কথা মানতেই চায় না। অপর পক্ষে স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্র ধর্মবুদ্ধির বেদনায় প্রতি মুহূর্তে পীড়িত অথচ স্নেহে দুর্বল হয়ে এমন অন্ধভাবে সেই বুদ্ধিকে ভাসিয়ে দিয়েছেন যে যদিচ জেনেছেন অধর্মের এই পরিণাম তাঁর স্নেহাস্পদের পক্ষে দারুণ শোচনীয়, তবু কিছুতে আপনার দোলায়িত চিত্তকে দৃঢ়ভাবে সংযত করতে পারেন নি। এই হল স্বয়ং জীবনের কল্পিত ছবি— মনুসংহিতার শ্লোকের উপরে উপদেশের দাগা বুলোনো নয়। এই ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য হারালেন, প্রাণাধিক সন্তানদের হারালেন, কিন্তু সাহিত্যের সিংহাসনে এই দিক্‌ভ্রান্ত অন্ধ তিনি চিরকালের জন্যে স্থির রইলেন।

রূপসাহিত্যে তাই যখন দেখি, কবি তাঁর নায়কের পরিমাণ বাড়িয়ে বলবার জন্যে বাস্তবের সীমা লঙ্ঘন করেছেন, আমরা তখন স্বতই সেটাকে শোধন করে নিই। আমাদের সত্যলোকের ভীম কখনোই তালগাছ উপড়ে লড়াই করেন নি, এক গদাই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট। রূপের রাজ্যে মানুষ ছেলে ভুলিয়েছিল যে যুগে মানুষ ছেলেমানুষ ছিল। তার পর থেকে জনশ্রুতি চলে এসেছে বটে কিন্তু কানের হাতে ছাঁকাই পড়ে মনের মধ্যে তার সত্য রূপটুকু রয়ে গেছে। তাই হনুমানের সমুদ্রলঙ্ঘন এখনো কানে শুনি কিন্তু আর চোখে দেখতে পাই নে, কেননা আমাদের দৃষ্টির বদল হয়ে গেছে।

রসের ভোজেও এই কথা খাটে। সেখানে সেই ভোজে, যেখানে জীবনের রহস্যের পরিবেশন, সেখানে রসের বিকৃতি নেই। শিশু কৃষ্ণ চাঁদ দেখবার জন্ত কান্না ধরলে পর যে সাহিত্যে তার সামনে আয়না ধ'রে তার নিজের ছবি দেখিয়ে তাকে সান্ত্বনা করেছিল সেখানে এই রচনানৈপুণ্যে ভক্তরা যতই হায় হায় করে উঠুক, শিশুবাৎসল্যের এই রসের কৃত্রিমতা কোনো দেশের অভ্যাসের আসরে যদি-বা মূল্য পায়, মহাকালের পণ্যশালায় এর কোনো মূল্য নেই। এই কাব্যের কৃত্রিমতার স্বাদ যদি বদল করতে চাও তা হলে এই কবিতাটি পড়ো—

দধিমন্থধ্বনি শুনইতে নীলমণি
আওল সঙ্গে বলরাম।
যশোমতি হেরি মুখ পাওল মরমে সুখ,
চুম্বয়ে চান্দ-বয়ান ॥
কহে, শুন যাদুমণি, তোরে দিব ক্ষীর ননী,
খাইয়া নাচহ মোর আগে।
নবনী-লোভিত হরি মায়ের বদন হেরি
কর পাতি নবনীত মাগে ॥
রানী দিল পুরি কর, খাইতে রঙ্গিমাধর
অতি সুশোভিত ভেল তায়
খাইতে খাইতে নাচে, কটিতে কিঙ্কিণী বাজে,
হেরি হরষিত ভেল মায় ॥

নন্দ দুলাল নাচে ভালি।
ছাড়িল মন্থনদণ্ড, উথলিল মহানন্দ,
সঘনে দেই করতালি ॥
দেখো দেখো রোহিণী, গদ গদ কহে রানী,
যাদুয়া নাচিছে দেখো মোর।
ঘনরাম দাসে কয়, রোহিণী আনন্দময়,
দুহুঁ ভেল প্রেমে বিভোর ॥

এ যে আমাদের ঘরের ছেলে, এ চাঁদ তো নয়। এ রস যুগে যুগে আমাদের মনে সঞ্চিত হয়েছে। মা চিরকাল একে লোভ দেখিয়ে নাচিয়েছে, 'চাঁদ' দেখিয়ে ভোলায় নি।

রসের সৃষ্টিতে সর্বত্রই অত্যুক্তির স্থান আছে, কিন্তু সে অত্যুক্তিও জীবনের পরিমাণ রক্ষা করে তবে নিষ্কৃতি পায়। সেই অত্যুক্তি যখন বলে 'পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে' তখন মন বলে, এই মিথ্যে কথার চেয়ে সত্য কথা আর হতে পারে না। রসের অত্যুক্তিতে যখন ধ্বনিত হয় 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়ে জুড়ন ন গেল' তখন মন বলে, যে হৃদয়ের মধ্যে প্রিয়তমকে অনুভব করি সেই হৃদয়ে যুগযুগান্তরের কোনো সীমাচিহ্ন পাওয়া যায় না। এই অনুভূতিকে অসম্ভব অত্যুক্তি ছাড়া আর কী দিয়ে ব্যক্ত করা যেতে পারে। রসসৃষ্টির সঙ্গে রূপসৃষ্টির এই প্রভেদ;

রূপ আপন সীমা রক্ষা করেই সত্যের আসন পায়, আর রস সেই আসন পায় বাস্তবকে অনায়াসে উপেক্ষা ক'রে।

তাই দেখি, সাহিত্যের চিত্রশালায় যেখানে জীবনশিল্পীর নৈপুণ্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সেখানে মৃত্যুর প্রবেশদ্বার রুদ্ধ। সেখানে লোকখ্যাতির অনিশ্চয়তা চিরকালের জন্যে নির্বাসিত। তাই বলছিলেম, সাহিত্যে যেখানে সত্যকার রূপ জেগে উঠেছে সেখানে ভয় নেই। চেয়ে দেখলে দেখা যায়, কী প্রকাণ্ড সব মূর্তি, কেউ-বা নীচ শকুনির মতো, মন্থরার মতো, কেউ-বা মহৎ ভীষ্মের মতো, দ্রৌপদীর মতো— আশ্চর্য মানুষের অমর কীর্তি জীবনের চির-স্বাক্ষরিত। সাহিত্যের এই অমরাবতীতে যাঁরা সৃষ্টিকর্তার আসন নিয়েছেন তাঁদের কারো-বা নাম জানা আছে, কারো-বা নেই, কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে তাঁদের স্পর্শ রয়ে গেছে। তাঁদের দিকে যখন তাকাই তখনই সংশয় জাগে নিজের অধিকারের প্রতি।

আজ জন্মদিনে এই কথাই ভাববার— রসের ভোজে কিংবা রূপের চিত্রশালায় কোন্‌খানে আমার নাম কোন্ অক্ষরে লেখা পড়েছে। লোকখ্যাতির সমস্ত কোলাহল পেরিয়ে এই কথাটি যদি দৈববাণীর যোগে কানে এসে পৌঁছতে পারত তা হলেই আমার জন্মদিনের আয়ু নিশ্চিত নির্ণীত হত। আজ তা বহুতর অনুমানের দ্বারা জড়িত বিজড়িত।

শান্তিনিকেতন। বৈশাখ ১৩৪৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮

সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা

আমরা যে ইতিহাসের দ্বারাই একান্ত চালিত, এ কথা বার বার শুনেছি এবং বার বার ভিতরে ভিতরে খুব জোরের সঙ্গে মাথা নেড়েছি। এ তর্কের মীমাংসা আমার নিজের অন্তরেই আছে, যেখানে আমি আর-কিছু নই, কেবলমাত্র কবি। সেখানে আমি সৃষ্টিকর্তা, সেখানে আমি একক, আমি মুক্ত; বাহিরের বহুতর ঘটনাপুঞ্জের দ্বারা জালবদ্ধ নই। ঐতিহাসিক পণ্ডিত আমার সেই কাব্যসৃষ্টির কেন্দ্র থেকে আমাকে টেনে এনে ফেলে যখন, আমার সেটা অসহ্য হয়। একবার যাওয়া যাক কবিজীবনের গোড়াকার সূচনায়।

শীতের রাত্রি— ভোরবেলা, পাণ্ডুবর্ণ আলোক অন্ধকার ভেদ করে দেখা দিতে শুরু করেছে। আমাদের ব্যবহার গরিবের মতো ছিল। শীতবস্ত্রের বাহুল্য একেবারেই

ছিল না। গায়ে একখানামাত্র জামা দিয়ে গরম লেপের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতুম। কিন্তু এমন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। অন্যান্য সকলের মতো আমি আরামে অন্তত বেলা ছটা পর্যন্ত গুটিসুটি মেরে থাকতে পারতুম। কিন্তু আমার উপায় ছিল না। আমাদের বাড়ির ভিতরের বাগান সেও আমারই মতো দরিদ্র। তার প্রধান সম্পদ ছিল পুবদিকের পাঁচিল ঘেঁষে এক সার নারকেল গাছ। সেই নারকেল গাছের কম্পমান পাতায় আলো পড়বে, শিশিরবিন্দু ঝলমল করে উঠবে, পাছে আমার এই দৈনিক দেখার ব্যাঘাত হয় এইজন্য আমার ছিল এমন তাড়া। আমি মনে ভাবতুম, সকালবেলাকার এই আনন্দের অভ্যর্থনা সকল বালকেরই মনে আগ্রহ জাগাত। এই যদি সত্য হত তা হলে সর্বজনীন বালকস্বভাবের মধ্যে এর কারণের সহজ নিষ্পত্তি হয়ে যেত। আমি যে অন্যদের থেকে এই অত্যন্ত ঔৎসুক্যের বেগে বিচ্ছিন্ন নই, আমি যে সাধারণ এইটে জানতে পারলে আর কোনো ব্যাখ্যার দরকার হত না। কিন্তু কিছু বয়েস হলেই দেখতে পেলুম, আর কোনো ছেলের মনে কেবলমাত্র গাছপালার উপরে আলোকের স্পন্দন দেখবার জন্য এমন ব্যগ্রতা একেবারেই নেই। আমার সঙ্গে যারা একত্রে মানুষ হয়েছে তারা এ পাগলামির কোঠায় কোনোখানেই পড়ত না তা আমি দেখলুম। শুধু তারা কেন, চারদিকে এমন কেউ ছিল না যে অসময়ে শীতের কাপড় ছেড়ে আলোর খেলা একদিনও দেখতে না পেলে নিজেকে বঞ্চিত মনে করত। এর পিছনে কোনো ইতিহাসের কোনো ছাঁচ নেই। যদি থাকত তা হলে সকালবেলায় সেই লক্ষ্মীছাড়া বাগানে ভিড় জমে যেত, একটা প্রতিযোগিতা দেখা দিত কে সর্বাগ্রে এসে সমস্ত দৃশ্যটাকে অন্তরে গ্রহণ করেছে। কবি যে সে এইখানেই। স্কুল থেকে এসেছি সাড়ে চারটের সময়। এসেই দেখেছি আমাদের বাড়ির তেতলার ঊর্ধ্বে ঘননীল মেঘপুঞ্জ, সে যে কী আশ্চর্য দেখা। সে একদিনের কথা আমার আজও মনে আছে, কিন্তু সেদিনকার ইতিহাসে আমি ছাড়া কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই মেঘ সেই চক্ষে দেখে নি এবং পুলকিত হয়ে যায় নি। এইখানে দেখা দিয়েছিল একলা রবীন্দ্রনাথ। একদিন স্কুল থেকে এসে আমাদের পশ্চিমের বারান্দায় দাঁড়িয়ে এক অতি আশ্চর্য ব্যাপার দেখেছিলুম। ধোপার বাড়ি থেকে গাধা এসে চরে খাচ্ছে ঘাস— এই গাধাগুলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যনীতির বানানো গাধা নয়, এ আমাদের সমাজের চিরকালের গাধা, এর ব্যবহারে কোনো ব্যতিক্রম হয় নি আদিকাল থেকে— আর-একটি গাভী সস্নেহে তার গা চেটে দিচ্ছে। এই-যে প্রাণের দিকে প্রাণের টান আমার চোখে পড়েছিল আজ পর্যন্ত সে অবিস্মরণীয় হয়ে রইল। কিন্তু এ কথা আমি নিশ্চিত জানি, সেদিনকার

সমস্ত ইতিহাসের মধ্যে এক রবীন্দ্রনাথ এই দৃশ্য মুগ্ধ চোখে দেখেছিল। সেদিনকার ইতিহাস আর কোনো লোককে ঐ দেখার গভীর তাৎপর্য এমন করে বলে দেয় নি। আপন সৃষ্টিক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ একা, কোনো ইতিহাস তাকে সাধারণের সঙ্গে বাঁধে নি। ইতিহাস যেখানে সাধারণ সেখানে ব্রিটিশ সব্‌জেক্ট্‌ ছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিল না। সেখানে রাষ্ট্রিক পরিবর্তনের বিচিত্র লীলা চলছিল, কিন্তু নারকেল গাছের পাতায় যে আলো ঝিলমিল করছিল সেটা ব্রিটিশ গবর্মেন্টের রাষ্ট্রিক আমদানি নয়। আমার অন্তরাত্মার কোনো রহস্যময় ইতিহাসের মধ্যে সে বিকশিত হয়েছিল এবং আপনাকে আপনার আনন্দরূপে নানা ভাবে প্রত্যহ প্রকাশ করছিল। আমাদের উপনিষদে আছে : ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি— আত্মা পুত্রস্নেহের মধ্যে সৃষ্টিকর্তারূপে আপনাকে প্রকাশ করতে চায়, তাই পুত্রস্নেহ তার কাছে মূল্যবান। সৃষ্টিকর্তা যে তাকে সৃষ্টির উপকরণ কিছু-বা ইতিহাস জোগায়, কিছু-বা তার সামাজিক পরিবেষ্টন জোগায়, কিন্তু এই উপকরণ তাকে তৈরি করে না। এই উপকরণগুলি ব্যবহারের দ্বারা সে আপনাকে স্রষ্টারূপে প্রকাশ করে। অনেক ঘটনা আছে যা জানার অপেক্ষা করে, সেই জানাটা আকস্মিক। এক সময়ে আমি যখন বৌদ্ধ কাহিনী এবং ঐতিহাসিক কাহিনীগুলি জানলুম তখন তারা স্পষ্ট ছবি গ্রহণ ক'রে আমার মধ্যে সৃষ্টির প্রেরণা নিয়ে এসেছিল। অকস্মাৎ 'কথা ও কাহিনী'র গল্পধারা উৎসের মতো নানা শাখায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সেই সময়কার শিক্ষায় এই-সকল ইতিবৃত্ত জানবার অবকাশ ছিল, সুতরাং বলতে পারা যায় 'কথা ও কাহিনী' সেই কালেরই বিশেষ রচনা। কিন্তু এই 'কথা ও কাহিনী'র রূপ ও রস একমাত্র রবীন্দ্রনাথের মনে আনন্দের আন্দোলন তুলেছিল, ইতিহাস তার কারণ নয়। রবীন্দ্রনাথের অন্তরাত্মাই তার কারণ— তাই তো বলেছে, আত্মাই কর্তা। তাকে নেপথ্যে রেখে ঐতিহাসিক উপকরণের আড়ম্বর করা কোনো কোনো মনের পক্ষে গর্বের বিষয়, এবং সেইখানে সৃষ্টিকর্তার আনন্দকে সে কিছু পরিমাণে আপনার দিকে অপহরণ করে আনে। কিন্তু এ সমস্তই গৌণ, সৃষ্টিকর্তা জানে। সন্ন্যাসী উপগুপ্ত বৌদ্ধ ইতিহাসের সমস্ত আয়োজনের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের কাছে এ কী মহিমায়, এ কী করুণায়, প্রকাশ পেয়েছিল। এ যদি যথার্থ ঐতিহাসিক হত তা হলে সমস্ত দেশ জুড়ে 'কথা ও কাহিনী'র ছবির লুট পড়ে যেত। আর দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি তার পূর্বে এবং তার পরে এ-সকল চিত্র ঠিক এমন করে দেখতে পায় নি। বস্তুত, তারা আনন্দ পেয়েছে এই কারণে, কবির এই সৃষ্টিকর্তৃত্বের বৈশিষ্ট্য থেকে। আমি একদা যখন বাংলাদেশের নদী বেয়ে তার প্রাণের লীলা অনুভব

করেছিলুম তখন আমার অন্তরাত্মা আপন আনন্দে সেই-সকল সুখদুঃখের বিচিত্র আভাস অন্তঃকরণের মধ্যে সংগ্রহ করে মাসের পর মাস বাংলার যে পল্লীচিত্র রচনা করেছিল, তার পূর্বে আর কেউ তা করে নি। কারণ, সৃষ্টিকর্তা তাঁর রচনাশালায় একলা কাজ করেন। সে বিশ্বকর্মারই মতন আপনাকে দিয়ে রচনা করে। সেদিন কবি যে পল্লীচিত্র দেখেছিল নিঃসন্দেহ তার মধ্যে রাষ্ট্রিক ইতিহাসের আঘাত-প্রতিঘাত ছিল। কিন্তু তার সৃষ্টিতে মানবজীবনের সেই সুখদুঃখের ইতিহাস যা সকল ইতিহাসকে অতিক্রম করে বরাবর চলে এসেছে কৃষিক্ষেত্রে, পল্লীপার্বণে, আপন প্রাত্যহিক সুখদুঃখ নিয়ে— কখনো-বা মোগলরাজত্বে কখনো-বা ইংরেজরাজত্বে তার অতি সরল মানবস্ব-প্রকাশ নিত্য চলেছে— সেইটেই প্রতিবিম্বিত হয়েছিল 'গল্পগুচ্ছে', কোনো সামন্ততন্ত্র নয়, কোনো রাষ্ট্রতন্ত্র নয়। এখনকার সমালোচকেরা যে বিস্তীর্ণ ইতিহাসের মধ্যে অবাধে সঞ্চরণ করেন তার মধ্যে অন্তত বারো-আনা পরিমাণ আমি জানিই নে। বোধ করি, সেইজন্যই আমার বিশেষ করে রাগ হয়। আমার মন বলে, 'দূর হোক গে তোমার ইতিহাস।' হাল ধরে আছে আমার সৃষ্টির তরীতে সেই আত্মা যার নিজের প্রকাশের জন্য পুত্রের স্নেহ প্রয়োজন, জগতের নানা দৃশ্য নানা সুখদুঃখকে যে আত্মসাৎ করে বিচিত্র রচনার মধ্যে আনন্দ পায় ও আনন্দ বিতরণ করে। জীবনের ইতিহাসের সব কথা তো বলা হল না, কিন্তু সে ইতিহাস গৌণ। কেবলমাত্র সৃষ্টিকর্তা মানুষের আত্মপ্রকাশের কামনায় এই দীর্ঘ যুগযুগান্তর তারা প্রবৃত্ত হয়েছে। সেইটেকেই বড়ো করে দেখো যে ইতিহাস সৃষ্টিকর্তা-মানুষের সারথ্যে চলেছে বিরাটের মধ্যে— ইতিহাসের অতীতে সে, মানবের আত্মার কেন্দ্রস্থলে। আমাদের উপনিষদে এ কথা জেনেছিল এবং সেই উপনিষদের কাছ থেকে আমি যে বাণী গ্রহণ করেছি সে আমিই করেছি, তার মধ্যে আমারই কর্তৃত্ব।

শান্তিনিকেতন। মে ১৯৪১ আশ্বিন ১৩৪৮

সত্য ও বাস্তব

মানুষ আপনাকে ও আপনার পরিবেষ্টন বাছাই করে নেয় নি। সে তার পড়ে-পাওয়া ধন। কিন্তু সঙ্গে আছে মানুষের মন; সে এতে খুশি হয় না। সে চায় মনের-মতোকে। মানুষ আপনাকে পেয়েছে আপনিই, কিন্তু মনের-মতোকে অনেক সাধনায় বানিয়ে নিতে হয়। এই তার মনের-মতোর ধারাকে দেশে দেশে মানুষ নানা রূপ দিয়ে বহন করে এসেছে। নিজের স্বভাবদত্ত পাওনার চেয়ে এর মূল্য তার কাছে

অনেক বেশি। সে সম্পূর্ণ রূপ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে নি ; তাই আপনার সৃষ্টিতে আপনার সম্পূর্ণতা বরাবর সে অর্জন করে নিজেকে পূর্ণ করেছে। সাহিত্যে শিল্পে এই-যে তার মনের মতো রূপ, এরই মূর্তি নিয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন জীবনের মধ্যে সে আপনার সম্পূর্ণ সত্য দেখতে পায়, আপনাকে চেনে। বড়ো বড়ো মহাকাব্যে মহানাটকে মানুষ আপনার পরিচয় সংগ্রহ করে নিয়ে চলেছে, আপনাকে অতিক্রম করে আপনার তৃপ্তির বিষয় খুঁজেছে। সেই তার শিল্প, তার সাহিত্য। দেশে দেশে মানুষ আপনার সত্য প্রকৃতিকে আপনার অসত্য দীনতার হাত থেকে রক্ষা করে এসেছে। মানুষ আপনার দৈন্যকে, আপনার বিকৃতিকে বাস্তব জানলেও সত্য বলে বিশ্বাস করে না। তার সত্য তার নিজের সৃষ্টির মধ্যে সে স্থাপন করে। রাজ্যসাম্রাজ্যের চেয়েও তার মূল্য বেশি। যদি সে কোনো অবস্থায় কোনো কারণে অবজ্ঞাভরে তার গৌরবকে উপহাস করে তবে সমস্ত সমাজকে নামিয়ে দেয়। সাহিত্যশিল্পকে যারা কৃত্রিম ব'লে অবজ্ঞা করে তারা সত্যকে জানে না। বস্তুত, প্রাত্যহিক মানুষ তার নানা জোড়াতাড়া-লাগা আবরণে, নানা বিকারে কৃত্রিম ; সে চিরকালের পরিপূর্ণতার আসন পেয়েছে সাহিত্যের তপোবনে, ধ্যানের সম্পদে। যেখানে মানুষের আত্মপ্রকাশে অশ্রদ্ধা সেখানে মানুষ আপনাকে হারায়। তাকে বাস্তব নাম দিতে পারি, কিন্তু মানুষ নিছক বাস্তব নয়। তার অনেকখানি অবাস্তব, অর্থাৎ তা সত্য। তা সত্যের সাধনার দিকে নানা পন্থায় উৎসুক হয়ে থাকে। তার সাহিত্য, তার শিল্প, একটা বড়ো পন্থা। তা কখনো কখনো বাস্তবের রাস্তা দিয়ে চললেও পরিণামে সত্যের দিকে লক্ষ নির্দেশ করে।

শান্তিনিকেতন। জুন ১৯৪১ আষাঢ় ১৩৪৮

মহাত্মা গান্ধী

মহাত্মা গান্ধী

মহাত্মা গান্ধী

ভারতবর্ষের একটি সম্পূর্ণ ভৌগোলিক মূর্তি আছে। এর পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিম-প্রান্ত এবং উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত যে-একটি সম্পূর্ণতা বিদ্যমান, প্রাচীন কালে তার ছবি অন্তরে গ্রহণ করার ইচ্ছে দেশে ছিল, দেখতে পাই। একসময়, দেশের মনে নানা কালে নানা স্থানে যা বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল তা সংগ্রহ করে, এক করে দেখবার চেষ্টা, মহাভারতে খুব সুস্পষ্ট ভাবে জাগ্রত দেখি। তেমনি ভারতবর্ষের ভৌগোলিক স্বরূপকে অন্তরে উপলব্ধি করবার একটি অনুষ্ঠান ছিল, সে তীর্থভ্রমণ। দেশের পূর্বতম অঞ্চল থেকে পশ্চিমতম অঞ্চল এবং হিমালয় থেকে সমুদ্র পর্যন্ত সর্বত্র এর পবিত্র পীঠস্থান রয়েছে, সেখানে তীর্থ স্থাপিত হয়ে একটি ভক্তির ঐক্যজালে সমস্ত ভারতবর্ষকে মনের ভিতরে আনবার সহজ উপায় সৃষ্টি করেছে।

ভারতবর্ষ একটি বৃহৎ দেশ। একে সম্পূর্ণ ভাবে মনের ভিতর গ্রহণ করা প্রাচীন কালে সম্ভবপর ছিল না। আজ সার্ভে করে, মানচিত্র এঁকে, ভূগোলবিবরণ গ্রথিত করে ভারতবর্ষের যে ধারণা মনে আনা সহজ হয়েছে, প্রাচীন কালে তা ছিল না। এক হিসাবে সেটা ভালোই ছিল। সহজ ভাবে যা পাওয়া যায় মনের ভিতরে তা গভীর ভাবে মুদ্রিত হয় না। সেইজন্য কৃচ্ছ্রসাধন করে ভারত-পরিক্রমা দ্বারা যে অভিজ্ঞতা লাভ হত তা সুগভীর, এবং মন থেকে সহজে দূর হত না।

মহাভারতের মাঝখানে গীতা প্রাচীনের সেই সমন্বয়তত্ত্বকে উজ্জ্বল করে। কুরুক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে এই-যে খানিকটা দার্শনিক ভাবে আলোচনা, এটাকে কাব্যের দিক থেকে অসংগত বলা যেতে পারে; এমনও বলা যেতে পারে যে, মূল মহাভারতে এটা ছিল না। পরে যিনি বসিয়েছেন তিনি জানতেন যে, উদার কাব্যপরিধির মধ্যে, ভারতের চিত্তভূমির মাঝখানে এই তত্ত্বকথার অবতারণা করার প্রয়োজন ছিল। সমস্ত ভারতবর্ষকে অন্তরে বাহিরে উপলব্ধি করবার প্রয়াস ছিল ধর্মানুষ্ঠানেরই অন্তর্গত। মহাভারতপাঠ যে আমাদের দেশে ধর্মকর্মের মধ্যে গণ্য হয়েছিল তা কেবল তত্ত্বের দিক থেকে নয়, দেশকে উপলব্ধি করার জন্যও এর কর্তব্যতা আছে। আর, তীর্থযাত্রীরাও

ক্রমাগত ঘুরে ঘুরে দেশকে স্পর্শ করতে করতে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভাবে ক্রমশ এর ঐক্যরূপ মনের ভিতরে গ্রহণ করবার চেষ্টা করেছেন।

এ হল পুরাতন কালের কথা।

পুরাতন কালের পরিবর্তন হয়েছে। আজকাল দেশের মানুষ আপনার প্রাদেশিক কোণের ভিতর সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকে। সংস্কার ও লোকাচারের জালে আমরা জড়িত, কিন্তু মহাভারতের প্রশস্ত ক্ষেত্রে একটা মুক্তির হাওয়া আছে। এই মহাকাব্যের বিরাট প্রাঙ্গণে মনস্তত্ত্বের কত পরীক্ষা। যাকে আমরা সাধারণত নিন্দনীয় বলি, সেও এখানে স্থান পেয়েছে। যদি আমাদের মন প্রস্তুত থাকে, তবে অপরাধ দোষ সমস্ত অতিক্রম করে মহাভারতের বাণী উপলব্ধি করতে পারা যেতে পারে। মহাভারতে একটা উদাত্ত শিক্ষা আছে; সেটা নঞর্থক নয়, সদর্থক, অর্থাৎ তার মধ্যে একটা হাঁ আছে। বড়ো বড়ো সব বীরপুরুষ আপন মাহাত্ম্যের গৌরবে উন্নতশির, তাঁদেরও দোষ ত্রুটি রয়েছে, কিন্তু সেই-সমস্ত দোষ ত্রুটিকে আত্মসাৎ করেই তাঁরা বড়ো হয়ে উঠেছেন। মানুষকে যথার্থ ভাবে বিচার করবার এই প্রকাণ্ড শিক্ষা আমরা মহাভারত থেকে পাই।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের যোগ হবার পর থেকে আরো কিছু চিন্তনীয় বিষয় এসে পড়েছে যেটা আগে ছিল না। পুরাকালের ভারতে দেখি স্বভাবত বা কার্যত যারা পৃথক তাদের আলাদা শ্রেণীতে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। তবু খণ্ডিত করেও একটা ঐক্যসাধনের প্রচেষ্টা ছিল। সহসা পশ্চিমের সিংহদ্বার ভেদ করে শত্রুর আগমন হল। আর্যরা ঐ পথেই এসে একদিন পঞ্চনদীর তীরে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন এবং তার পরে বিন্ধ্যাচল অতিক্রম করে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষে নিজেদের পরিব্যাপ্ত করেছিলেন। ভারত তখন গান্ধার প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক প্রদেশ-সুদ্ধ একটি সমগ্র সংস্কৃতিতে পরিবেষ্টিত থাকায়, বাইরের আঘাত লাগে নি। তার পরে একদিন এল বাইরের থেকে সংঘাত। সে সংঘাত বিদেশীয়; তাদের সংস্কৃতি পৃথক। যখন তারা এল তখন দেখা গেল যে, আমরা একত্র ছিলুম, অথচ এক হই নি। তাই সমস্ত ভারতবর্ষে বিদেশী আক্রমণের একটা প্লাবন বয়ে গেল। তার পর থেকে আমাদের দিন কাটছে দুঃখ ও অপমানের গ্লানিতে। বিদেশী আক্রমণের সুযোগ নিয়ে একে অন্যের সঙ্গে যোগ দিয়ে নিজের প্রভাব বিস্তার করেছে কেউ, কেউ-বা খণ্ড খণ্ড জায়গায় বিশৃঙ্খল ভাবে বিদেশীদের বাধা দেবার চেষ্টা করেছে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করবার জন্যে। কিছুতেই তো সফলকাম হওয়া গেল না। রাজপুতনায়, মারাঠায়, বাংলাদেশে, যুদ্ধবিগ্রহ অনেক কাল শান্ত হয় নি। এর কারণ এই যে, যত বড়ো দেশ ঠিক তত বড়ো

ঐক্য হল না; দুর্ভাগ্যের ভিতর দিয়ে আমরা অভিজ্ঞতা লাভ করলেম বহু শতাব্দী পরে। বিদেশী আক্রমণের পথ প্রশস্ত হল এই অনৈক্যের সুবিধা নিয়ে। নিকটের শত্রুর পর হুড়্‌মুড়্‌ করে এসে পড়ল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বিদেশী শত্রু তাদের বাণিজ্যতরী নিয়ে; এল পর্টুগীজ, এল ওলন্দাজ, এল ফ্রেঞ্চ্‌, এল ইংরেজ। সকলে এসে সবলে ধাক্কা মারলে; দেখতে পেল যে, এমন কোনো বেড়া নেই যেটা দুর্লঙ্ঘ্য। আমাদের সম্পদ সম্বল সব দিতে লাগলুম, আমাদের বিদ্যাবুদ্ধির ক্ষীণতা এল, চিত্তের দিক দিয়ে সম্বলহীন রিক্ত হয়ে পড়লুম। এমনি করেই বাইরের নিঃস্বতা ভিতরেও নিঃস্বতা আনে।

এইরকম দুঃসময়ে আমাদের সাধক পুরুষদের মনে যে চিন্তার উদয় হয়েছিল সেটা হচ্ছে, পরমার্থের প্রতি লক্ষ রেখে ভারতের স্বাতন্ত্র্য উদ্‌বোধিত করার একটা আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা। তখন থেকে আমাদের সমস্ত মন গেছে পারমার্থিক পুণ্য-উপার্জনের দিকে। আমাদের পার্থিব সম্পদ পৌঁছয় নি সেখানে যেখানে যথার্থ দৈন্য ও শিক্ষার অভাব। পারমার্থিক সম্বলটুকুর লোভে যে পার্থিব সম্বল খরচ করি সেটা যায় মোহান্ত ও পাণ্ডাদের গর্বস্ফীত জঠরের মধ্যে। এতে ভারতের ক্ষয় ছাড়া বৃদ্ধি হচ্ছে না।

বিপুল ভারতবর্ষের বিরাট জনসমাজের মধ্যে আর-এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁরা জপ তপ ধ্যান ধারণা করার জন্যে মানুষকে পরিত্যাগ করে দারিদ্র্য ও দুঃখের হাতে সংসারকে ছেড়ে দিয়ে চলে যান। এই অসংখ্য উদাসীনমণ্ডলীর এই মুক্তিকামীদের অন্ন জুটিয়েছে তারা যারা এদের মতে মোহগ্রস্ত সংসারাসক্ত। একবার কোনো গ্রামের মধ্যে এইরকম এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁকে বলেছিলুম, 'গ্রামের মধ্যে দুষ্কৃতিকারী, দুঃখী, পীড়াগ্রস্ত যারা আছে, এদের জন্যে আপনারা কিছু করবেন না কেন।' আমার এই প্রশ্ন শুনে তিনি বিস্মিত ও বিরক্ত হয়েছিলেন; বললেন, 'কী! যারা সাংসারিক মোহগ্রস্ত লোক, তাদের জন্যে ভাবতে হবে আমায়! আমি একজনা সাধক, বিশুদ্ধ আনন্দের জন্যে ঐ সংসার ছেড়ে এসেছি, আবার ওর মধ্যে নিজেকে জড়াব!' এই কথাটি যিনি বলেছিলেন, তাঁকে এবং তাঁরই মতো অন্য সকল সংসারে-বীতস্পৃহ উদাসীনদের ডেকে জিগ্যেস করতে ইচ্ছে হয় যে, তাঁদের তৈলচিক্কণ নধর কান্তির পরিপুষ্টি সাধন করল কে। যাদেরকে ওঁরা পাপী ও হেয় ব'লে ত্যাগ করে এসেছেন সেই সংসারী লোকই ওঁদের অন্ন জুটিয়েছে। পরলোকের দিকে ক্রমাগত দৃষ্টি দিয়ে কতখানি শক্তির অপচয় হয়েছে তা বলা যায় না। বহু শতাব্দী ধরে ভারতের এই দুর্বলতা চলে আসছে। এর যা শাস্তি, ইহলোকের বিধাতা সে শাস্তি আমাদের দিয়েছেন। তিনি আমাদের হুকুম দিয়ে পাঠিয়েছেন সেবার দ্বারা,

ত্যাগের দ্বারা, এই সংসারের উপযোগী হতে হবে। সে হুকুমের অবমাননা করেছি, সুতরাং শাস্তি পেতেই হবে।

সম্প্রতি ইউরোপে স্বাতন্ত্র্যপ্রতিষ্ঠার একটা চেষ্টা চলেছে। ইতালি এক সময়ে বিদেশীর কবলে ধিক্‌কৃত জীবন যাপন করেছিল; তার পরে ইতালির ত্যাগী যাঁরা, যাঁরা বীর, ম্যাজিনি ও গ্যারিবল্ডি, বিদেশীর অধীনতা-জাল থেকে মুক্তিদান করে নিজেদের দেশকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও দেখেছি এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করবার জন্যে কত দুঃখ, কত চেষ্টা, কত সংগ্রাম হয়েছে। মানুষকে মনুষ্যোচিত অধিকার দেবার জন্যে পাশ্চাত্য দেশে কত লোক আপনাদের বলি দিয়েছে। বিভাগ সৃষ্টি করে পরস্পরকে যে অপমান করা হয়, সেটার বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যে আজও বিদ্রোহ চলছে। ও দেশের কাছে জনসাধারণ, সর্বসাধারণ, মানগৌরবের অধিকারী; কাজেই রাষ্ট্রতন্ত্রের যাবতীয় অধিকার সর্বসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। ও-দেশের আইনের কাছে ধনী দরিদ্র ব্রাহ্মণ শূদ্রের প্রভেদ নেই। একতাবদ্ধ হয়ে স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার শিক্ষা আমরা পাশ্চাত্যের ইতিহাস থেকে পেয়েছি। সমস্ত ভারতবাসী যাতে আপন দেশকে আপনি নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার পায়, এই যে ইচ্ছে এটা আমরা পশ্চিম থেকে পেয়েছি। এতদিন ধরে আমরা নিজেদের গ্রাম ও প্রতিবাসীদের নিয়ে খণ্ড খণ্ড ভাবে ছোটোখাটো ক্ষুদ্র পরিধির ভিতর কাজ করেছি ও চিন্তা করেছি। গ্রামে জলাশয় ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের সার্থক মনে করেছি, এবং এই গ্রামকেই আমরা জন্মভূমি বা মাতৃভূমি বলেছি। ভারতকে মাতৃভূমি বলে স্বীকার করার অবকাশ হয় নি। প্রাদেশিকতার জালে জড়িত ও দুর্বলতায় অভিভূত হয়ে আমরা যখন পড়েছিলুম তখন রানাডে, সুরেন্দ্রনাথ, গোখলে প্রমুখ মহদাশয় লোকেরা এলেন জনসাধারণকে গৌরব দান করার জন্যে। তাঁদের আরব্ধ সাধনাকে যিনি প্রবল শক্তিতে দ্রুত বেগে আশ্চর্য সিদ্ধির পথে নিয়ে গেছেন সেই মহাত্মার কথা স্মরণ করতে আমরা আজ এখানে সমবেত হয়েছি— তিনি হচ্ছেন মহাত্মা গান্ধী।

অনেকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, ইনিই কি প্রথম এলেন। তার পূর্বে কংগ্রেসের ভিতরে কি আরো অনেকে কাজ করেন নি। কাজ করেছেন সত্য, কিন্তু তাঁদের নাম করলেই দেখতে পাই যে, কত ম্লান তাদের সাহস, কত ক্ষীণ তাঁদের কণ্ঠধ্বনি।

আগেকার যুগে কংগ্রেসওয়ালারা আমলাতন্ত্রের কাছে কখনো নিয়ে যেতেন আবেদন-নিবেদনের ডালা, কখনো-বা করতেন চোখরাঙানির মিথ্যে ভান। ভেবেছিলেন তাঁরা যে, কখনো তীক্ষ্ণ কখনো সুমধুর বাক্যবাণ নিক্ষেপ করে তাঁরা ম্যাজিনি-গ্যারিবল্ডির সমগোত্রীয় হবেন। সে ক্ষীণ অবাস্তব শৌর্য নিয়ে আজ আমাদের

গৌরব করার মতো কিছুই নেই। আজ যিনি এসেছেন তিনি রাষ্ট্রীয় স্বার্থের কলুষ থেকে মুক্ত। রাষ্ট্রতন্ত্রের অনেক পাপ ও দোষের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড দোষ হল এই স্বার্থান্বেষণ। হোক-না রাষ্ট্রীয় স্বার্থ খুব বড়ো স্বার্থ, তবু স্বার্থের যা পঙ্কিলতা তা তার মধ্যে না এসে পারেই না। পোলিটিশ্যান ব'লে একটা জাত আছে তাদের আদর্শ বড়ো আদর্শের সঙ্গে মেলে না। তারা অনবরত মিথ্যা বলতে পারে; তারা এত হিংস্র যে নিজেদের দেশকে স্বাতন্ত্র্য দেবার অছিলায় অন্য দেশ অধিকার করার লোভ ত্যাগ করতে পারে না। পাশ্চাত্য দেশে দেখি, এক দিকে তারা দেশের জন্যে প্রাণ দিতে পেরেছে, অন্য দিকে আবার দেশের নাম করে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়েছে।

পাশ্চাত্য দেশ একদিন যে মুষল প্রসব করেছে আজ তারই শক্তি ইউরোপের মস্তকের উপর উদ্যত হয়ে আছে। আজকে এমন অবস্থা হয়েছে যে সন্দেহ হয়, আজ বাদে কাল ইউরোপীয় সভ্যতা টিকবে কি না। তারা যাকে পেট্রিয়টিজ্‌ম্ বলছে সেই পেট্রিয়টিজ্‌মই তাদের নিঃশেষে মারবে। তারা যখন মরবে তখন অবশ্য আমাদের মতো নির্জীব ভাবে মরবে না, ভয়ংকর অগ্নি উৎপাদন করে একটা ভীষণ প্রলয়ের মধ্যে তারা মরবে।

আমাদের মধ্যেও অসত্য এসেছে; দলাদলির বিষ ছড়িয়েছেন পোলিটিশ্যানের জাতীয় যাঁরা। আজ এই পলিটিক্স্‌ থেকেই ছাত্রছাত্রীর মধ্যেও দলাদলির বিষ প্রবেশ করেছে। পোলিটিশ্যানরা কেজো লোক। তাঁরা মনে করেন যে, কার্য উদ্ধার করতে হলে মিথ্যার প্রয়োজন আছে। কিন্তু বিধাতার বিধানে সে ছলচাতুরী ধরা পড়বে। পোলিটিশ্যানদের এ-সব চতুর বিষয়ীদের, আমরা প্রশংসা করতে পারি কিন্তু ভক্তি করতে পারি না। ভক্তি করতে পারি মহাত্মাকে, যাঁর সত্যের সাধনা আছে। মিথ্যার সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি সত্যের সার্বভৌমিক ধর্মনীতিকে অস্বীকার করেন নি। ভারতের যুগসাধনায় এ একটা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। এই একটি লোক যিনি সত্যকে সকল অবস্থায় মেনেছেন, তাতে আপাতত সুবিধে হোক বা না হোক; তাঁর দৃষ্টান্ত আমাদের কাছে মহৎ দৃষ্টান্ত। পৃথিবীতে স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্য লাভের ইতিহাস রক্তধারায় পঙ্কিল, অপহরণ ও দস্যুবৃত্তির দ্বারা কলঙ্কিত। কিন্তু পরস্পরকে হনন না করে, হত্যাকাণ্ডের আশ্রয় না নিয়েও যে স্বাধীনতা লাভ করা যেতে পারে, তিনি তার পথ দেখিয়েছেন। লোকে অপহরণ করেছে, বিজ্ঞান দস্যুবৃত্তি করেছে দেশের নামে। দেশের নাম নিয়ে এই-যে তাদের গৌরব এ গর্ব টিকবে না তো। আমাদের মধ্যে এমন লোক খুব কমই আছেন যাঁরা হিংস্রতাকে মন থেকে দূর করে দেখতে পারেন। এই হিংসাপ্রবৃত্তি স্বীকার না করেও আমরা জয়ী হব, এ কথা আমরা মানি

কি। মহাত্মা যদি বীরপুরুষ হতেন কিংবা লড়াই করতেন তবে আমরা এমনি করে আজ ওঁকে স্মরণ করতুম না। কারণ, লড়াই করার মতো বীরপুরুষ এবং বড়ো বড়ো সেনাপতি পৃথিবীতে অনেক জন্মগ্রহণ করেছেন। মানুষের যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ, নৈতিক যুদ্ধ। ধর্মযুদ্ধের ভিতরেও নিষ্ঠুরতা আছে, তা গীতা ও মহাভারতে পেয়েছি। তার মধ্যে বাহুবলেরও স্থান আছে কি না এ নিয়ে শাস্ত্রের তর্ক তুলব না। কিন্তু এই যে একটা অনুশাসন, মরব তবু মারব না, এবং এই করেই জয়ী হব— এ একটা মস্ত বড়ো কথা, একটা বাণী। এটা চাতুরী কিংবা কার্যোদ্ধারের বৈষয়িক পরামর্শ নয়। ধর্মযুদ্ধ বাইরে জেতবার জন্য নয়, হেরে গিয়েও জয় করবার জন্য। অধর্মযুদ্ধে মরাটা মরা। ধর্মযুদ্ধে মরার পরেও অবশিষ্ট থাকে; হার পেরিয়ে থাকে জিত, মৃত্যু পেরিয়ে অমৃত। যিনি এই কথাটা নিজের জীবনে উপলব্ধি করে স্বীকার করেছেন, তাঁর কথা শুনতে আমরা বাধ্য।

এর মূলে একটা শিক্ষার ধারা আছে। ইউরোপে আমরা স্বাধীনতার কলুষ ও স্বাদেশিকতার বিষাক্ত রূপ দেখতে পাই। অবশ্য, আরম্ভে তারা অনেক ফল পেয়েছে, অনেক ঐশ্বর্য লাভ করেছে। সেই পাশ্চাত্য দেশে খৃস্টধর্মকে শুধু মৌখিক ভাবে গ্রহণ করেছে। খৃস্টধর্মে মানবপ্রেমের বড়ো উদাহরণ আছে; ভগবান মানুষ হয়ে মানুষের দেহে যত দুঃখ পাপ সব আপন দেহে স্বীকার করে নিয়ে মানুষকে বাঁচিয়েছেন— এই ইহলোকেই, পরলোকে নয়। যে সকলের চেয়ে দরিদ্র তাকে বস্ত্র দিতে হবে, যে নিরন্ন তাকে অন্ন দিতে হবে এ কথা খৃস্টধর্মে যেমন সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে এমন আর কোথাও নয়।

মহাত্মাজি এমন একজন খৃস্টসাধকের সঙ্গে মিলতে পেরেছিলেন, যাঁর নিয়ত প্রচেষ্টা ছিল মানবের ন্যায্য অধিকারকে বাধামুক্ত করা। সৌভাগ্যক্রমে সেই ইউরোপীয় ঋষি টলস্টয়ের কাছ থেকে মহাত্মা গান্ধী খৃস্টানধর্মের অহিংস্রনীতির বাণী যথার্থ ভাবে লাভ করেছিলেন। আরো সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এ বাণী এমন একজন লোকের যিনি সংসারের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফলে এই অহিংস্রনীতির তত্ত্ব আপন চরিত্রে উদ্ভাবিত করেছিলেন। মিশনারি অথবা ব্যবসায়ী প্রচারকের কাছে মানবপ্রেমের বাঁধা বুলি তাঁকে শুনতে হয় নি। খৃস্টবাণীর এই একটি বড়ো দান আমাদের পাবার অপেক্ষা ছিল। মধ্যযুগে মুসলমানদের কাছ থেকেও আমরা একটি দান পেয়েছি। দাদূ, কবীর, রজ্জব প্রভৃতি সাধুরা প্রচার করে গিয়েছেন যে— যা নির্মল, যা মুক্ত, যা আত্মার শ্রেষ্ঠ সামগ্রী, তা রুদ্ধদ্বার মন্দিরে কৃত্রিম অধিকারীবিশেষের জন্যে পাহারা-দেওয়া নয়; তা নির্বিচারে সর্ব মানবেরই সম্পদ। যুগে যুগে এইরূপই ঘটে। যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা

সমস্ত পৃথিবীর দানকে আপন মাহাত্ম্য দ্বারাই গ্রহণ করেন, এবং গ্রহণ করার দ্বারা তাকে সত্য করে তোলেন। আপন মাহাত্ম্য দ্বারাই পৃথুরাজা পৃথিবীকে দোহন করেছিলেন রত্ন আহরণ করবার জন্যে। যাঁরা শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ তাঁরা সকল ধর্ম ইতিহাস ও নীতি থেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দান গ্রহণ করেন।

খৃস্টবাণীর শ্রেষ্ঠ নীতি বলে যে, যারা নম্র তারা জয়ী হয়; আর খৃস্টানজাতি বলে, নিষ্ঠুর ঔদ্ধত্যের দ্বারা জয়লাভ করা যায়। এর মধ্যে কে জয়ী হবে ঠিক করে জানা যায় নি; কিন্তু উদাহরণ-স্বরূপ দেখা যায় যে, ঔদ্ধত্যের ফলে ইউরোপে কী মহামারীই না হচ্ছে। মহাত্মা নম্র অহিংস্রনীতি গ্রহণ করেছেন, আর চতুর্দিকে তাঁর জয় বিস্তীর্ণ হচ্ছে। তিনি যে নীতি তাঁর সমস্ত জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন, সম্পূর্ণ পারি বা না পারি, সে নীতি আমাদের স্বীকার করতেই হবে। আমাদের অন্তরে ও আচরণে রিপু ও পাপের সংগ্রাম আছে, তা সত্ত্বেও পুণ্যের তপস্যার দীক্ষা নিতে হবে সত্যব্রত মহাত্মার নিকটে। আজকের দিন স্মরণীয় দিন, কারণ সমস্ত ভারতে রাষ্ট্রীয় মুক্তির দীক্ষা ও সত্যে দীক্ষা এক হয়ে গেছে সর্বসাধারণের কাছে।

শান্তিনিকেতন অগ্রহায়ণ ১৩৪৪

১৬ আশ্বিন ১৩৪৩

গান্ধীজি

আজ মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিবসে আশ্রমবাসী আমরা সকলে আনন্দোৎসব করব। আমি আরম্ভের সুরটুকু ধরিয়ে দিতে চাই।

আধুনিক কালে এইরকমের উৎসব অনেকখানি বাহ্য অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়েছে। খানিকটা ছুটি ও অনেকখানি উত্তেজনা দিয়ে এটা তৈরি। এইরকম চাঞ্চল্যে এই-সকল উপলক্ষের গভীর তাৎপর্য অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করবার সুযোগ বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়।

ক্ষণজন্মা লোক যাঁরা তাঁরা শুধু বর্তমান কালের নন। বর্তমানের ভূমিকার মধ্যে ধরাতে গেলে তাঁদের অনেকখানি ছোটো করে আনতে হয়, এমনি করে বৃহৎকালের পরিপ্রেক্ষিতে যে শাশ্বত মূর্তি প্রকাশ পায় তাকে খর্ব করি। আমাদের আশু প্রয়োজনের আদর্শে তাঁদের মহত্ত্বকে নিঃশেষিত করে বিচার করি। মহাকালের পটে যে ছবি ধরা পড়ে, বিধাতা তার থেকে প্রাত্যহিক জীবনের আত্মবিরোধ ও আত্মখণ্ডনের অনিবার্য কুটিল ও বিচ্ছিন্ন রেখাগুলি মুছে দেন, যা আকস্মিক ও ক্ষণকালীন তাকে বিলীন

করেন ; আমাদের প্রণম্য যাঁরা তাঁদের একটি সংহত সম্পূর্ণ মূর্তি সংসারে চিরন্তন হয়ে থাকে। যাঁরা আমাদের কালে জীবিত তাঁদেরকেও এই ভাবে দেখবার প্রয়াসেই উৎসবের সার্থকতা।

আজকের দিনে ভারতবর্ষে যে রাষ্ট্রিক বিরোধ পরশুদিন হয়তো তা থাকবে না, সাময়িক অভিপ্রায়গুলি সময়ের স্রোতে কোথায় লুপ্ত হবে। ধরা যাক্, আমাদের রাষ্ট্রিক সাধনা সফল হয়েছে, বাহিরের দিক থেকে চাইবার আর কিছুই নেই, ভারতবর্ষ মুক্তিলাভ করল— তৎসত্ত্বেও আজকের দিনের ইতিহাসের কোন্ আত্মপ্রকাশটি ধূলির আকর্ষণ বাঁচিয়ে উপরে মাথা তুলে থাকবে সেইটিই বিশেষ করে দেখবার যোগ্য। সেই দিক থেকে যখন দেখতে যাই তখন বুঝি, আজকের উৎসবে যাঁকে নিয়ে আমরা আনন্দ করছি তাঁর স্থান কোথায়, তাঁর বিশিষ্টতা কোন্‌খানে। কেবলমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজনসিদ্ধির মূল্য আরোপ করে তাঁকে আমরা দেখব না, যে দৃঢ়শক্তির বলে তিনি আজ সমগ্র ভারতবর্ষকে প্রবল ভাবে সচেতন করেছেন সেই শক্তির মহিমাকে আমরা উপলব্ধি করব। প্রচণ্ড এই শক্তি সমস্ত দেশের বুকজোড়া জড়ত্বের জগদ্দল পাথরকে আজ নাড়িয়ে দিয়েছে ; কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের যেন রূপান্তর জন্মান্তর ঘটে গেল। ইনি আসবার পূর্বে, দেশ ভয়ে আচ্ছন্ন, সংকোচে অভিভূত ছিল ; কেবল ছিল অন্যের অনুগ্রহের জন্য আবদার-আবেদন, মজ্জায় মজ্জায় আপনার 'পরে আস্থাহীনতার দৈন্য।

ভারতবর্ষের বাহির থেকে যারা আগন্তুকমাত্র তাদেরই প্রভাব হবে বলশালী, দেশের ইতিহাস বেয়ে যুগপ্রবাহিত ভারতের প্রাণধারা চিন্তধারা সেইটেই হবে ম্লান, যেন সেইটেই আকস্মিক— এর চেয়ে দুর্গতির কথা আর কী হতে পারে। সেবার দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা, মৈত্রীর দ্বারা, দেশকে ঘনিষ্ঠভাবে উপলব্ধি করবার বাধা ঘটাতে যথার্থই আমরা পরবাসী হয়ে পড়েছি। শাসনকর্তাদের শিক্ষাপ্রণালী রাষ্ট্রব্যবস্থা, ওদের তলোয়ার বন্দুক নিয়ে, ভারতে ওরাই হল মুখ্য ; আর আমরাই হলুম গৌণ— মোহাভিভূত মনে এই কথাটির স্বীকৃতি অল্প কাল পূর্ব পর্যন্ত আমাদের সকলকে তামসিকতায় জড়বুদ্ধি করে রেখেছিল। স্থানে স্থানে লোকমান্য তিলকের মতো জনকতক সাহসী পুরুষ জড়ত্বকে প্রাণপণে আঘাত করেছেন, এবং আত্মশ্রদ্ধার আদর্শকে জাগিয়ে তোলবার কাজে ব্রতী হয়েছেন, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে এই আদর্শকে বিপুল ভাবে প্রবল প্রভাবে প্রয়োগ করলেন মহাত্মা গান্ধী। ভারতবর্ষের স্বকীয় প্রতিভাকে অন্তরে উপলব্ধি করে তিনি অসামান্য তপস্যার তেজে নূতন যুগগঠনের কাজে নামলেন। আমাদের দেশে আত্মপ্রকাশের ভয়হীন অভিযান এতদিনে যথোপযুক্ত রূপে আরম্ভ হল।

এত কাল আমাদের নিঃসাহসের উপরে দুর্গ বেঁধে বিদেশী বণিকরাজ সাম্রাজ্যিকতার

ব্যাবসা চালিয়েছে। অস্ত্রশস্ত্র সৈন্যসামন্ত ভালো করে দাঁড়াবার জায়গা পেত না যদি আমাদের দুর্বলতা তাকে আশ্রয় না দিত। পরাভবের সবচেয়ে বড়ো উপাদান আমরা নিজের ভিতর থেকেই জুগিয়েছি। এই আমাদের আত্মকৃত পরাভব থেকে মুক্তি দিলেন মহাত্মাজি; নববীর্যের অনুভূতির বন্যাধারা ভারতবর্ষে প্রবাহিত করলেন। এখন শাসনকর্তারা উদ্যত হয়েছেন আমাদের সঙ্গে রফানিষ্পত্তি করতে; কেননা তাঁদের পরশাসনতন্ত্রের গভীরতর ভিত্তি টলেছে, যে ভিত্তি আমাদের বীর্যহীনতায়। আমরা অনায়াসে আজ জগৎসমাজে আমাদের স্থান দাবি করছি।

তাই আজ আমাদের জানতে হবে, যে মানুষ বিলেতে গিয়ে রাউণ্ড্ টেব্ল্ কন্‌ফারেন্সে তর্কযুদ্ধে যোগ দিয়েছেন, যিনি খদ্দর চরকা প্রচার করেন, যিনি প্রচলিত চিকিৎসাশাস্ত্রে বৈজ্ঞানিক-যন্ত্রপাতিতে বিশ্বাস করেন বা করেন না— এই-সব মতামত ও কর্মপ্রণালীর মধ্যে যেন এই মহাপুরুষকে সীমাবদ্ধ করে না দেখি। সাময়িক যে-সব ব্যাপারে তিনি জড়িত তাতে তাঁর ত্রুটিও ঘটতে পারে, তা নিয়ে তর্কও চলতে পারে —কিন্তু এহ বাহ্য। তিনি নিজে বারংবার স্বীকার করেছেন, তাঁর ভ্রান্তি হয়েছে; কালের পরিবর্তনে তাঁকে মত বদলাতে হয়েছে। কিন্তু এই-যে অবিচলিত নিষ্ঠা যা তাঁর সমস্ত জীবনকে অচলপ্রতিষ্ঠ করে তুলেছে, এই-যে অপরাজেয় সংকল্পশক্তি, এ তাঁর সহজাত, কর্ণের সহজাত কবচের মতো— এই শক্তির প্রকাশ মানুষের ইতিহাসে চিরস্থায়ী সম্পদ। প্রয়োজনের সংসারে নিত্যপরিবর্তনের ধারা বয়ে চলেছে, কিন্তু সকল প্রয়োজনকে অতিক্রম করে যে মহাজীবনের মহিমা আজ আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত হল তাকেই যেন আমরা শ্রদ্ধা করতে শিখি।

মহাত্মাজির জীবনের এই তেজ আজ সমগ্র দেশে সঞ্চারিত হয়েছে, আমাদের ম্লানতা মার্জনা করে দিচ্ছে। তাঁর এই তেজোদীপ্ত সাধকের মূর্তিই মহাকালের আসনকে অধিকার করে আছেন। বাধা-বিপত্তিকে তিনি মানেন নি, নিজের ভ্রমে তাঁকে খর্ব করে নি, সাময়িক উত্তেজনার ভিতরে থেকেও তার ঊর্ধ্বে তাঁর মন অপ্রমত্ত। এই বিপুল চরিত্রশক্তির আধার যিনি তাঁকেই আজ তাঁর জন্মদিনে আমরা নমস্কার করি।

পরিশেষে আমার বলবার কথা এই যে, পূর্বপুরুষের পুনরাবৃত্তি করা মনুষ্যধর্ম নয়। জীবজন্তু তাদের জীর্ণ অভ্যাসের বাসাকে আঁকড়ে ধরে থাকে; মানুষ যুগে যুগে নব নব সৃষ্টিতে আত্মপ্রকাশ করে, পুরাতন সংস্কারে কোনোদিন তাকে বেঁধে রাখতে পারে না। মহাত্মাজি ভারতবর্ষের বহুযুগব্যাপী অন্ধতা মূঢ় আচারের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ এক দিক থেকে জাগিয়ে তুলেছেন, আমাদের সাধনা হোক সকল দিক থেকেই তাকে

প্রবল করে তোলা। জাতিভেদ, ধর্মবিরোধ, মূঢ় সংস্কারের আবর্তে যত দিন আমরা চালিত হতে থাকব ততদিন কার সাধ্য আমাদের মুক্তি দেয়। কেবল ভোটের সংখ্যা এবং পরস্পরের স্বত্বের চুলচেরা হিসাব গণনা করে কোনো জাত দুর্গতি থেকে উদ্ধার পায় না। যে জাতির সামাজিক ভিত্তি বাধায় বিরোধে শতছিদ্র হয়ে আছে, যারা পঞ্জিকায় ঝুড়ি ঝুড়ি আবর্জনা বহন করে বেড়ায়, বিচারশক্তিহীন মূঢ় চিত্তে বিশেষ ক্ষণের বিশেষ জলে পুরুষানুক্রমিক পাপক্ষালন করতে ছোটে, যারা আত্মবুদ্ধি-আত্মশক্তির অবমাননাকে আপ্তবাক্যের নাম দিয়ে আদরে পোষণ করছে, তারা কখনো এমন সাধনাকে স্থায়ী ও গভীর ভাবে বহন করতে পারে না যে সাধনায় অন্তরে বাহিরে পরদাসত্বের বন্ধন ছেদন করতে পারে, যার দ্বারা স্বাধীনতার দুরূহ দায়িত্বকে সকল শত্রুর হাত থেকে দৃঢ় শক্তিতে রক্ষা করতে পারে। মনে রাখা চাই, বাহিরের শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করতে তেমন বীর্যের দরকার হয় না, আপন অন্তরের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করাতেই মনুষ্যত্বের চরম পরীক্ষা। আজ যাঁকে আমরা শ্রদ্ধা করছি এই পরীক্ষায় তিনি জয়ী হয়েছেন; তাঁর কাছ থেকে সেই দুরূহ সংগ্রামে জয়ী হবার সাধনা যদি দেশ গ্রহণ না করে তবে আজ আমাদের প্রশংসাবাক্য, উৎসবের আয়োজন সম্পূর্ণই ব্যর্থ হবে। আমাদের সাধনা আজ আরম্ভ হল মাত্র। দুর্গম পথ আমাদের সামনে পড়ে রয়েছে।

শান্তিনিকেতন
১৫ আশ্বিন ১৩৩৮

অগ্রহায়ণ ১৩৩৮

চৌঠা আশ্বিন

সূর্যের পূর্ণগ্রাসের লগ্নে অন্ধকার যেমন ক্রমে ক্রমে দিনকে আচ্ছন্ন করে তেমনি আজ মৃত্যুর ছায়া সমস্ত দেশকে আবৃত করছে। এমন সর্বদেশব্যাপী উৎকণ্ঠা ভারতের ইতিহাসে ঘটে নি, পরম শোকে এই আমাদের মহৎসান্ত্বনা। দেশের আপামর সাধারণকে আজকের দিনের বেদনা স্পর্শ করেছে। যিনি সুদীর্ঘকাল দুঃখের তপস্যার মধ্য দিয়ে সমস্ত দেশকে যথার্থ ভাবে, গভীর ভাবে আপন করে নিয়েছেন, সেই মহাত্মা আজ আমাদের সকলের হয়ে মৃত্যুব্রত গ্রহণ করলেন।

দেশকে অস্ত্রশস্ত্র সৈন্যসামন্ত নিয়ে যারা বাহুবলে অধিকার করে, যত বড়ো হোক-না তাদের প্রতাপ, যেখানে দেশের প্রাণবান সত্তা সেখানে তাদের প্রবেশ অবরুদ্ধ।

দেশের অন্তরে সূচ্যগ্রপরিমাণ ভূমি জয় করবে এমন শক্তি নেই তাদের। অস্ত্রের জোরে ভারতবর্ষকে অধিকার করেছে কত বিদেশী কতবার। মাটিতে রোপণ করেছে তাদের পতাকা, আবার সে পতাকা মাটিতে পড়ে ধুলো হয়ে গেছে।

অস্ত্রশস্ত্রের কাঁটাবেড়া দিয়ে যারা বিদেশে আপন স্বত্বকে স্থায়ী করবার দুরাশা মনে লালন করে, একদিন কালের আহ্বানে যে মুহূর্তে তারা নেপথ্যে সরে দাঁড়ায়, তখনই ইঁটকাঠের ভগ্নস্তূপে পুঞ্জীভূত হয় তাদের কীর্তির আবর্জনা। আর যাঁরা সত্যের বলে বিজয়ী তাঁদের আধিপত্য তাঁদের আয়ুকে অতিক্রম করে দেশের মর্মস্থানে বিরাজ করে।

দেশের সমগ্র চিত্তে যাঁর এই অধিকার তিনি সমস্ত দেশের হয়ে আজ আরো একটি জয়যাত্রায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, চরম আত্মোৎসর্গের পথে। কোন্ দুরূহ বাধা তিনি দূর করতে চান, যার জন্যে তিনি এত বড়ো মূল্য দিতে কুণ্ঠিত হলেন না, সেই কথাটি আজ আমাদের স্তব্ধ হয়ে চিন্তা করবার দিন।

আমাদের দেশে একটি ভয়ের কারণ আছে। যে পদার্থ মানসিক তাকে আমরা বাহ্যিক দক্ষিণা দিয়ে সুলভ সম্মানে বিদায় করি। চিহ্নকে বড়ো করে তুলে সত্যকে খর্ব করে থাকি। আজ দেশনেতারা স্থির করেছেন যে দেশের লোকেরা উপবাস করবে। আমি বলি, এতে দোষ নেই, কিন্তু ভয় হয়; মহাত্মাজি যে প্রাণপণ মূল্যের বিনিময়ে সত্যকে লাভ করবার চেষ্টা করছেন তার তুলনায় আমাদের কৃত্য নিতান্ত লঘু এবং বাহ্যিক হয়ে পাছে লজ্জা বাড়িয়ে তোলে। হৃদয়ের আবেগকে কোনো একটা অস্থায়ী দিনের সামান্য দুঃখের লক্ষণে ক্ষীণ রেখায় চিহ্নিত করে কর্তব্য মিটিয়ে দেবার মতো দুর্ঘটনা যেন না ঘটে।

আমরা উপবাসের অনুষ্ঠান করব, কেননা মহাত্মাজি উপবাস করতে বসেছেন— এই দুটোকে কোনো অংশেই যেন একত্রে তুলনা করবার মূঢ়তা কারো মনে না আসে। এ দুটো একেবারেই এক জিনিস নয়। তাঁর উপবাস, সে তো অনুষ্ঠান নয়, সে একটি বাণী, চরম ভাষার বাণী। মৃত্যু তাঁর সেই বাণীকে সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে, বিশ্বের কাছে, ঘোষণা করবে চিরকালের মতো। সেই বাণীকেই যদি গ্রহণ করা আমাদের কর্তব্য হয় তবে তা যথোচিত ভাবে করতে হবে। তপস্যার সত্যকে তপস্যার দ্বারাই অন্তরে গ্রহণ করা চাই।

আজ তিনি কী বলছেন সেটা চিন্তা করে দেখো। পৃথিবীময় মানব-ইতিহাসের আরম্ভকাল থেকে দেখি এক দল মানুষ আর-এক দলকে নীচে ফেলে তার উপর দাঁড়িয়ে নিজের উন্নতি প্রচার করে। আপন দলের প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত করে অন্ত

দলের দাসত্বের উপরে। মানুষ দীর্ঘ কাল ধরে এই কাজ করে এসেছে। কিন্তু তবু বলব এটা অমানুষিক। তাই দাসনির্ভরতার ভিত্তির উপরে মানুষের ঐশ্বর্য স্থায়ী হতে পারে না। এতে কেবল যে দাসেদের দুর্গতি হয় তা নয়, প্রভুদেরও এতে বিনাশ ঘটায়। যাদের আমরা অপমানিত করে পায়ের তলায় ফেলি তারাই আমাদের সম্মুখপথে পদক্ষেপের বাধা। তারা গুরুভারে আমাদের নীচের দিকে টেনে রাখে। যাদের আমরা হীন করি তারা ক্রমশই আমাদের হেয় করে। মানুষ-খেগো সভ্যতা রোগে জীর্ণ হবে, মরবে। মানুষের দেবতার এই বিধান। ভারতবর্ষে মানুষোচিত সম্মান থেকে যাদের আমরা বঞ্চিত করেছি তাদের অগৌরবে আমরা সমস্ত ভারতবর্ষের অগৌরব ঘটিয়েছি।

আজ ভারতে কত সহস্র লোক কারাগারে রুদ্ধ, বন্দী। মানুষ হয়ে পশুর মতো তারা পীড়িত, অবমানিত। মানুষের এই পুঞ্জীভূত অবমাননা সমস্ত রাজ্যশাসনতন্ত্রকে অপমানিত করছে, তাকে গুরুভারে দুরূহ করছে। তেমনি আমরাও অসম্মানের বেড়ার মধ্যে বন্দী করে রেখেছি সমাজের বৃহৎ এক দলকে। তাদের হীনতার ভার বহন করে আমরা এগোতে পারছি নে। বন্দীদশা শুধু তো কারাপ্রাচীরের মধ্যে নয়। মানুষের অধিকার-সংক্ষেপ করাই তো বন্ধন। সম্মানের খর্বতার মতো কারাগার তো নেই। ভারতবর্ষে সেই সামাজিক কারাগারকে আমরা খণ্ডে খণ্ডে বড়ো করেছি। এই বন্দীর দেশে আমরা মুক্তি পাব কী করে। যারা মুক্তি দেয় তারাই তো মুক্ত হয়।

এতদিন এইভাবে চলছিল; ভালো করে বুঝি নি আমরা কোথায় তলিয়ে ছিলাম। সহসা ভারতবর্ষ আজ মুক্তির সাধনায় জেগে উঠল। পণ করলাম, চিরদিন বিদেশী শাসনে মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করে রাখার এ ব্যবস্থা আর স্বীকার করব না। বিধাতা ঠিক সেই সময় দেখিয়ে দিলেন কোথায় আমাদের পরাভবের অন্ধকার গহ্বরগুলো। আজ ভারতে মুক্তিসাধনার তাপস যাঁরা তাঁদের সাধনা বাধা পেল তাদেরই কাছ থেকে যাদের আমরা অকিঞ্চিৎকর করে রেখেছি। যারা ছোটো হয়ে ছিল তারাই আজ বড়োকে করেছে অকৃতার্থ। তুচ্ছ বলে যাদের আমরা মেরেছি তারাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো মার মারছে।

এক ব্যক্তির সঙ্গে আর-এক ব্যক্তির শক্তির স্বাভাবিক উচ্চনীচতা আছে। জাতিবিশেষের মধ্যেও তেমন দেখা যায়। উন্নতির পথে সকলে সমান দূর এগোতে পারে নি। সেইটেকে উপলক্ষ করে সেই পশ্চাদ্‌বর্তীদেরকে অপমানের দুর্লঙ্ঘ্য বেড়া তুলে দিয়ে স্থায়ী ভাবে যখনই পিছিয়ে রাখা যায় তখনই পাপ জমা হয়ে ওঠে। তখনই অপমানবিষ দেশের এক অঙ্গ থেকে সর্ব অঙ্গে সঞ্চারিত হতে থাকে। এমনি

করে মানুষের সম্মান থেকে যাদের নির্বাসিত করে দিলুম তাদের আমরা হারালুম। আমাদের দুর্বলতা ঘটল সেইখানেই, সেইখানেই শনির রন্ধ্র। এই রন্ধ্র দিয়েই ভারতবর্ষের পরাভব তাকে বারে বারে নত করে দিয়েছে। তার ভিতের গাঁথুনি আল্‌গা, আঘাত পাবা মাত্র ভেঙে ভেঙে পড়েছে। কালক্রমে যে ভেদ দূর হতে পারত তাকে আমরা চেষ্টা করে, সমাজরীতির দোহাই দিয়ে, স্থায়ী করে তুলেছি। আমাদের রাষ্ট্রিক মুক্তিসাধনা কেবলই ব্যর্থ হচ্ছে এই ভেদবুদ্ধির অভিশাপে।

যেখানেই এক দলের অসম্মানের উপর আর-এক দলের সম্মানকে প্রতিষ্ঠিত করা হয় সেইখানেই ভার-সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে বিপদ ঘটে। এর থেকেই বোঝা যায়, সাম্যই মানুষের মূলগত ধর্ম। য়ুরোপে এক রাষ্ট্রজাতির মধ্যে অন্য ভেদ যদি বা না থাকে, শ্রেণীভেদ আছে। শ্রেণীভেদে সম্মান ও সম্পদের পরিবেশন সমান হয় না। সেখানে তাই ধনিকের সঙ্গে কর্মিকের অবস্থা যতই অসমান হয়ে উঠছে ততই সমাজ টলমল করছে। এই অসাম্যের ভারে সেখানকার সমাজব্যবস্থা প্রত্যহই পীড়িত হচ্ছে। যদি সহজে সাম্য স্থাপন হয় তবেই রক্ষা, নইলে নিষ্কৃতি নেই। মানুষ যেখানেই মানুষকে পীড়িত করবে সেখানেই তার সমগ্র মনুষ্যত্ব আহত হবেই; সেই আঘাত মৃত্যুর দিকেই নিয়ে যায়।

সমাজের মধ্যেকার এই অসাম্য, এই অসম্মানের দিকে, মহাত্মাজি অনেক দিন থেকে আমাদের লক্ষ নির্দেশ করেছেন। তবুও তেমন একান্ত চেষ্টায় এই দিকে আমাদের সংস্কারকার্য প্রবর্তিত হয় নি। চরখা ও খদ্দরের দিকে আমরা মন দিয়েছি, আর্থিক দুর্গতির দিকে দৃষ্টি পড়েছে, কিন্তু সামাজিক পাপের দিকে নয়। সেইজন্যেই আজ এই দুঃখের দিন এল। আর্থিক দুঃখ অনেকটা এসেছে বাইরে থেকে, তাকে ঠেকানো একান্ত কঠিন না হতে পারে। কিন্তু যে সামাজিক পাপের উপর আমাদের সকল শত্রুর আশ্রয় তাকে উৎপাটন করতে আমাদের বাজে, কেননা তার উপরে আমাদের মমত্ব। সেই প্রশ্রয়প্রাপ্ত পাপের বিরুদ্ধে আজ মহাত্মা চরম যুদ্ধ ঘোষণা করে দিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এই রণক্ষেত্রে তাঁর দেহের অবসান ঘটতেও পারে। কিন্তু সেই লড়াইয়ের ভার তিনি আমাদের প্রত্যেককে দান করে যাবেন। যদি তাঁর হাত থেকে আজ আমরা সর্বান্তঃকরণে সেই দান গ্রহণ করতে পারি তবেই আজকের দিন সার্থক হবে। এত বড়ো আহ্বানের পরেও যারা একদিন উপবাস ক'রে তার পরদিন হতে উদাসীন থাকবে, তারা দুঃখ থেকে যাবে দুঃখে, দুর্ভিক্ষ থেকে দুর্ভিক্ষে। সামান্য কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা সত্যসাধনার অবমাননা যেন না করি।

মহাত্মাজির এই ব্রত আমাদের শাসনকর্তাদের সংকল্পকে কী পরিমাণে ও কী ভাবে

আঘাত করবে জানি নে। আজ সেই পোলিটিকাল তর্ক-অবতারণার দিন নয়। কেবল একটা কথা বলা উচিত বলে বলব। দেখতে পাচ্ছি, মহাত্মাজির এই চরম উপায়-অবলম্বনের অর্থ অধিকাংশ ইংরেজ বুঝতে পারছেন না। না পারবার একটা কারণ এই যে, মহাত্মাজির ভাষা তাঁদের ভাষা নয়। আমাদের সমাজের মধ্যে সাংঘাতিক বিচ্ছেদ ঘটাবার বিরুদ্ধে মহাত্মাজির এই প্রাণপণ প্রয়াস তাঁদের প্রয়াসের প্রচলিত পদ্ধতির সঙ্গে মেলে না বলেই এটাকে এত অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে। একটা কথা তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে পারি— আয়র্লণ্ড্ যখন ব্রিটিশ ঐক্যবন্ধন থেকে স্বতন্ত্র হবার চেষ্টা করেছিল তখন কী বীভৎস ব্যাপার ঘটেছিল। কত রক্তপাত, কত অমানুষিক নিষ্ঠুরতা। পলিটিক্‌সে এই হিংস্র পদ্ধতিই পশ্চিম-মহাদেশে অভ্যস্ত। সেই কারণে আয়র্লণ্ডে রাষ্ট্রিক প্রয়াসের এই রক্তাক্ত মূর্তি তো কারো কাছে, অন্তত অধিকাংশ লোকের কাছে, আর যাই হোক, অদ্ভুত বলে মনে হয় নি। কিন্তু অদ্ভুত মনে হচ্ছে মহাত্মাজির অহিংস্র আত্মত্যাগী প্রয়াসের শান্তমূর্তি। ভারতবর্ষের অবমানিত জাতির প্রতি মহাত্মাজির মমতা নেই, এত বড়ো অমূলক কথা মনে স্থান দেওয়া সম্ভব হয়েছে তার কারণ এই যে, এই ব্যাপারে তিনি আমাদের রাজসিংহাসনের উপর সংকটের ঝড় বইয়ে দিয়েছেন। রাজপুরুষদের মন বিকল হয়েছে বলেই এমন কথা তাঁরা কল্পনা করতে পেরেছেন। এ কথা বুঝতে পারেন নি, রাষ্ট্রিক অস্ত্রাঘাতে হিন্দুসমাজকে দ্বিখণ্ডিত হতে দেখা হিন্দুর পক্ষে মৃত্যুর চেয়ে কম বিপদের নয়। একদা বাহির থেকে কোনো তৃতীয় পক্ষ এসে যদি ইংলণ্ডে প্রটেস্টাণ্ট্‌ ও রোমান-ক্যাথলিকদের এইভাবে সম্পূর্ণ বিভক্ত করে দিত তা হলে সেখানে একটা নরহত্যার ব্যাপার ঘটা অসম্ভব ছিল না। এখানে হিন্দুসমাজের পরম সংকটের সময় মহাত্মাজির দ্বারা সেই বহুপ্রাণঘাতক যুদ্ধের ভাষান্তর ঘটেছে মাত্র। প্রটেস্টাণ্ট্‌ ও রোমান-ক্যাথলিকদের মধ্যে বহুদীর্ঘকাল যে অধিকারভেদ এসেছিল, সমাজই আজ স্বয়ং তার সমাধান করেছে; সেজন্যে তুর্কির বাদশাকে ডাকে নি। আমাদের দেশের সামাজিক সমস্যা সমাধানের ভার আমাদের 'পরেই থাকার প্রয়োজন ছিল।

রাষ্ট্রব্যাপারে মহাত্মাজি যে অহিংস্রনীতি এতকাল প্রচার করেছেন আজ তিনি সেই নীতি নিজের প্রাণ দিয়ে সমর্থন করতে উদ্যত, এ কথা বোঝা অত্যন্ত কঠিন বলে আমি মনে করি নে।

শান্তিনিকেতন কার্তিক ১৩৩৯

৪ আশ্বিন ১৩৩৯

মহাত্মাজির পুণ্যব্রত

যুগে যুগে দৈবাৎ এই সংসারে মহাপুরুষের আগমন হয়। সব সময় তাঁদের দেখা পাই নে। যখন পাই সে আমাদের সৌভাগ্য। আজকের দিনে দুঃখের অন্ত নেই; কত পীড়ন, কত দৈন্য, কত রোগ শোক তাপ আমরা নিত্য ভোগ করছি; দুঃখ জমে উঠেছে রাশি রাশি। তবু সব দুঃখকে ছাড়িয়ে গেছে আজ এক আনন্দ। যে মাটিতে আমরা বেঁচে আছি, সঞ্চরণ করছি, সেই মাটিতেই একজন মহাপুরুষ, যাঁর তুলনা নেই, তিনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছেন।

যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা যখন আসেন, আমরা ভালো করে চিনতে পারি নে তাঁদের। কেননা, আমাদের মন ভীরু অস্বচ্ছ, স্বভাব শিথিল, অভ্যাস দুর্বল। মনেতে সেই সহজ শক্তি নেই যাতে করে মহৎকে সম্পূর্ণ বুঝতে পারি, গ্রহণ করতে পারি। বারে বারে এমন ঘটেছে, যাঁরা সকলের বড়ো তাঁদেরই সকলের চেয়ে দূরে ফেলে রেখেছি।

যাঁরা জ্ঞানী, গুণী, কঠোর তপস্বী, তাঁদের বোঝা সহজ নয়; কেননা আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি সংস্কার তাঁদের সঙ্গে মেলে না। কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে কঠিন লাগে না, সেটা ভালোবাসা। যে মহাপুরুষ ভালোবাসা দিয়ে নিজের পরিচয় দেন, তাঁকে আমাদের ভালোবাসায় আমরা একরকম করে বুঝতে পারি। সেজন্যে ভারতবর্ষে এই এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল যে, এবার বুঝেছি। এমনটি সচরাচর ঘটে না। যিনি আমাদের মধ্যে এসেছেন তিনি অত্যন্ত উচ্চ, অত্যন্ত মহৎ। তবু তাঁকে স্বীকার করেছি, তাঁকে জেনেছি। সকলে বুঝেছে 'তিনি আমার'। তাঁর ভালোবাসায় উচ্চ-নীচের ভেদ নেই, মূর্খ-বিদ্বানের ভেদ নেই, ধনী-দরিদ্রের ভেদ নেই। তিনি বিতরণ করেছেন সকলের মধ্যে সমান ভাবে তাঁর ভালোবাসা। তিনি বলেছেন, সকলের কল্যাণ হোক, সকলের মঙ্গল হোক। যা বলেছেন, শুধু কথায় নয় বলেছেন দুঃখের বেদনায়। কত পীড়া, কত অপমান তিনি সয়েছেন। তাঁর জীবনের ইতিহাস দুঃখের ইতিহাস। দুঃখ অপমান ভোগ করেছেন কেবল ভারতবর্ষে নয়, দক্ষিণ-আফ্রিকায় কত মার তাঁকে মৃত্যুর ধারে এনে ফেলেছে। তাঁর দুঃখ নিজের বিষয়সুখের জন্যে নয়, স্বার্থের জন্যে নয়, সকলের ভালোর জন্যে। এই-যে এত মার খেয়েছেন, উল্টে কিছু বলেন নি কখনো, রাগ করেন নি। সমস্ত আঘাত মাথা পেতে নিয়েছেন। শত্রুরা আশ্চর্য হয়ে গেছে ধৈর্য দেখে, মহত্ত্ব দেখে। তাঁর সংকল্প সিদ্ধ হল, কিন্তু জোর-জবরদস্তিতে নয়। ত্যাগের দ্বারা, দুঃখের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা তিনি জয়ী হয়েছেন। সেই তিনি আজ ভারতবর্ষের দুঃখের বোঝা নিজের দুঃখের বেগে ঠেলবার জন্যে দেখা দিয়েছেন।

তোমরা সকলে তাঁকে দেখেছ কি না জানি না। কারো কারো হয়তো তাঁকে দেখার সৌভাগ্য ঘটেছে। কিন্তু তাঁকে জান সকলেই, সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁকে জানে। সবাই জান, সমস্ত ভারতবর্ষ কিরকম করে তাঁকে ভক্তি দিয়েছে; একটি নাম দিয়েছে— মহাত্মা। আশ্চর্য, কেমন করে চিনলে। মহাত্মা অনেককেই বলা হয়, তার কোনো মানে নেই। কিন্তু এই মহাপুরুষকে যে মহাত্মা বলা হয়েছে, তার মানে আছে। যার আত্মা বড়ো, তিনিই মহাত্মা। যাদের আত্মা ছোটো, বিষয়ে বদ্ধ, টাকাকড়ি ঘরসংসারের চিন্তায় যাদের মন আচ্ছন্ন, তারা দীনাত্মা। মহাত্মা তিনিই, সকলের সুখ দুঃখ যিনি আপনার করে নিয়েছেন, সকলের ভালোকে যিনি আপনার ভালো বলে জানেন। কেননা, সকলের হৃদয়ে তাঁর স্থান, তাঁর হৃদয়ে সকলের স্থান। আমাদের শাস্ত্রে ঈশ্বরকে বলে মহাত্মা, মর্তলোকে সেই দিব্য ভালোবাসা সেই প্রেমের ঐশ্বর্য দৈবাৎ মেলে। সেই প্রেম যার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তাঁকে আমরা মোটের উপর এই বলে বুঝেছি যে, তিনি হৃদয় দিয়ে সকলকে ভালোবেসেছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ বুঝতে পারি না, ভালো করে চিনতে একটু বাধা লাগে। বাঁকা হয়ে গেছে আমাদের মন। সত্যকে স্বীকার করতে ভীরুতা দ্বিধা সংশয় আমাদের জাগে। বিনা ক্লেশে যা মানতে পারি তাই মানি, কঠিনটাকে সরিয়ে রেখে দিই এক পাশে। তাঁর সকলের চেয়ে বড়ো সত্যটাকে নিতে পারলুম না। এইখানেই তাঁকে মারলুম। তিনি এসেছেন, ফিরে গেলেন, শেষ পর্যন্ত তাঁকে নিতে পারলুম না।

খৃস্টানশাস্ত্রে পড়েছি, আচারনিষ্ঠ য়িহুদিরা যিশুখৃস্টকে শত্রু বলে মেরেছিল। কিন্তু মার কি শুধু দেহের। যিনি প্রাণ দিয়ে কল্যাণের পথ খুলে দিতে আসেন, সেই পথকে বাধাগ্রস্ত করা সেও কি মার নয়। সকলের চেয়ে বড়ো মার সেই। কী অসহ্য বেদনা অনুভব করে তিনি আজকের দিনে মৃত্যুব্রত গ্রহণ করেছেন। সেই ব্রতকে যদি আমরা স্বীকার করে না নিই, তবে কি তাঁকে আমরা মারলুম না। আমাদের ছোটো মনের সংকোচ, ভীরুতা, আজ লজ্জা পাবে না? আমরা কি তাঁর সেই বেদনাকে মর্মের মধ্যে ঠিক জায়গায় অনুভব করতে পারব না। গ্রহণ করতে পারব না তাঁর দান? এত সংকোচ, এত ভীরুতা আমাদের? সে ভীরুতার দৃষ্টান্ত তো তার মধ্যে কোথাও নেই। সাহসের অন্ত নেই তাঁর; মৃত্যুকে তিনি তুচ্ছ করেছেন। কঠিন কারাগার, তার সমস্ত লোহার শিকল নিয়ে তাঁর ইচ্ছাকে ঠেকাতে পারে নি। সেই তিনি এসেছেন আজ আমাদের মাঝখানে। আমরা যদি ভয়ে পিছিয়ে পড়ি, তবে লজ্জা রাখবার ঠাঁই থাকবে না। তিনি আজ মৃত্যুব্রত গ্রহণ করেছেন ছোটো-বড়োকে এক করবার জন্যে। তাঁর সেই সাহস, তাঁর সেই শক্তি, আসুক আমাদের বুদ্ধিতে, আমাদের কাজে। আমরা

যেন আজ গলা ছেড়ে বলতে পারি, 'তুমি যেয়ো না, আমরা গ্রহণ করলাম তোমার ব্রত।' তা যদি না পারি, এত বড়ো জীবনকে যদি ব্যর্থ হতে দিই, তবে তার চেয়ে বড়ো সর্বনাশ আর কী হতে পারে।

আমরা এই কথাই বলে থাকি যে, বিদেশীরা আমাদের শত্রুতা করছে; কিন্তু তার চেয়ে বড়ো শত্রু আছে আমাদের মজ্জার মধ্যে, সে আমাদের ভীরুতা। সেই ভীরুতাকে জয় করার জন্যে বিধাতা আমাদের শক্তি পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁর জীবনের মধ্য দিয়ে; তিনি আপন অভয় দিয়ে আমাদের ভয় হরণ করতে এসেছেন। সেই তাঁর দান-স্বত্ব তাঁকে আজ কি আমরা ফিরিয়ে দেব। এই কৌপীনধারী আমাদের দ্বারে দ্বারে আঘাত করে ফিরেছেন, তিনি আমাদের সাবধান করেছেন কোন্‌খানে আমাদের বিপদ। মানুষ যেখানে মানুষের অপমান করে, মানুষের ভগবান সেইখানেই বিমুখ। শত শত বছর ধরে মানুষের প্রতি অপমানের বিষ আমরা বইয়ে দিয়েছি ভারতবর্ষের নাড়ীতে নাড়ীতে। হীনতার অসহ্য বোঝা চাপিয়ে দিয়েছি শত শত নত মস্তকের উপরে; তারই ভারে সমস্ত দেশ আজ ক্লান্ত, দুর্বল। সেই পাপে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি নে। আমাদের চলবার রাস্তায় পদে পদে পঙ্ককুণ্ড তৈরি করে রেখেছি; আমাদের সৌভাগ্যের অনেকখানি তলিয়ে যাচ্ছে তারই মধ্যে। এক ভাই আর-এক ভাইয়ের কপালে স্বহস্তে কলঙ্ক লেপে দিয়েছে, মহাত্মা সইতে পারেন নি এই পাপ।

সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে শোনো তাঁর বাণী। অনুভব করো, কী প্রচণ্ড তাঁর সংকল্পের জোর। আজ তপস্বী উপবাস আরম্ভ করেছেন, দিনের পর দিন তিনি অন্ন নেবেন না। তোমরা দেবে না তাঁকে অন্ন? তাঁর বাণীকে গ্রহণ করাই তাঁর অন্ন, তাই দিয়ে তাঁকে বাঁচাতে হবে। অপরাধ অনেক করেছি, পাপ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। ভাইয়ের সঙ্গে ব্যবহার করেছি দাসের মতো, পশুর মতো। সেই অপমানে সমস্ত পৃথিবীর কাছে ছোটো করে রেখেছে আমাদের। যদি তাদের প্রাপ্য সম্মান দিতাম তা হলে আজ এত দুর্গতি হত না আমাদের। পৃথিবীর অন্য সব সমাজকে লোকে সম্মান করে, ভয় করে, কেননা তারা পরস্পর ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ। আমাদের এই হিন্দুসমাজকে আঘাত করতে, অপমান করতে, কারো মনে ভয় নেই, বার বার তার প্রমাণ পাই। কিসের জোরে তাদের এই স্পর্ধা সে কথাটা যেন এক মুহূর্ত না ভুলি।

যে সম্মান মহাত্মাজি সবাইকে দিতে চেয়েছেন, সে সম্মান আমরা সকলকে দেব। যে পারবে না দিতে, ধিক্‌ তাকে। ভাইকে ভাই বলে গ্রহণ করতে বাধা দেয় যে সমাজ, ধিক্‌ সেই জীর্ণ সমাজকে। সব চেয়ে বড়ো ভীরুতা তখনই প্রকাশ পায় যখন সত্যকে চিনতে পেরেও মানতে পারি নে। সে ভীরুতার ক্ষমা নেই।

অভিশাপ অনেক দিন থেকে আছে দেশের উপর। সেইজন্যে প্রায়শ্চিত্ত করতে বসেছেন একজন। সেই প্রায়শ্চিত্তে সকলকে মিলতে হবে, সেই মিলনেই আমাদের চিরমিলন শুরু হবে। মৃত্যুর বৃহৎ পাত্রে তাঁর প্রায়শ্চিত্ত তিনি আমাদের সকলের সামনে ধরলেন, এগিয়ে দিলেন আমাদের হাতের কাছে। গ্রহণ করো সকলে, ক্ষালন করো পাপ। মঙ্গল হবে। তাঁর শেষ কথা আজ আমি তোমাদের শোনাতে এসেছি। তিনি দূরে আছেন, কিন্তু তিনি দূরে নেই। তিনি আমাদের অন্তরেই আছেন। যদি জীবন দিতে হয় তাঁকে আমাদের জন্যে তবে অন্ত থাকবে না পরিতাপের।

মাথা হেঁট হয়ে যাবে আমাদের। তিনি আমাদের কাছে যা চেয়েছেন, তা দুরূহ, দুঃসাধ্য ব্রত। কিন্তু তার চেয়ে দুঃসাধ্য কাজ তিনি করেছেন, তার চেয়ে কঠিন ব্রত তাঁর। সাহসের সঙ্গে যেন গ্রহণ করতে পারি তাঁর দেওয়া ব্রত। যাকে আমরা ভয় করছি সে কিছুই নয়। সে মায়া, মিথ্যা। সে সত্য নয়; মানব না আমরা তাকে। বলো আজ সবাই মিলে, আমরা মানব না সেই মিথ্যাকে। বলো, আজ সমস্ত হৃদয় দিয়ে বলো, ভয় কিসের। তিনি সমস্ত ভয় হরণ করে বসে আছেন। মৃত্যুভয়কে জয় করেছেন। কোনো ভয় যেন আজ থাকে না আমাদের। লোকভয়, রাজভয়, সমাজভয়, কিছুতেই যেন সংকুচিত না হই আমরা। তাঁর পথে তাঁরই অনুবর্তী হয়ে চলব, পরাভব ঘটতে দেব না তাঁর। সমস্ত পৃথিবী আজ তাকিয়ে আছে। যাদের মনে দরদ নেই তারা উপহাস করছে। এত বড়ো ব্যাপারটা সত্যই উপহাসের বিষয় হবে, যদি আমাদের উপরে কোনো ফল না হয়। সমস্ত পৃথিবী আজ বিস্মিত হবে, যদি তাঁর শক্তির আগুন আমাদের সকলের মনের মধ্যে জ্বলে ওঠে; যদি সবাই বলতে পারি, 'জয় হোক তপস্বী, তোমার তপস্যা সার্থক হোক।' এই জয়ধ্বনি সমুদ্রের এক পার থেকে পৌঁছবে আর-এক পারে; সকলে বলবে, সত্যের বাণী অমোঘ। ধন্য হবে ভারতবর্ষ। আজকের দিনেও এত বড়ো সার্থকতায় যে বাধা দেবে সে অত্যন্ত হেয়; তাকে তোমরা ভয়ে যদি মান তবে তার চেয়ে হেয় হবে তোমরা।

জয় হোক সেই তপস্বীর যিনি এই মুহূর্তে বসে আছেন মৃত্যুকে সামনে নিয়ে, ভগবানকে অন্তরে বসিয়ে, সমস্ত হৃদয়ের প্রেমকে উজ্জ্বল করে জ্বালিয়ে। তোমরা জয়ধ্বনি করো তাঁর, তোমাদের কণ্ঠস্বর পৌঁছক তাঁর আসনের কাছে। বলো, 'তোমাকে গ্রহণ করলেম, তোমার সত্যকে স্বীকার করলেম।'

আমি কীই বা বলতে পারি। আমার ভাষায় জোর কোথায়। তিনি যে ভাষায় বলেছেন সে কানে শোনবার নয়, সে প্রাণে শোনবার; মানুষের সেই চরম ভাষা, নিশ্চয়ই তোমাদের অন্তরে পৌঁচেছে।

আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো সৌভাগ্য, পর যখন আপন হয়। সকলের চেয়ে বড়ো বিপদ, আপন যখন পর হয়। ইচ্ছে করেই যাদের আমরা হারিয়েছি, ইচ্ছে করেই আজ তাদের ফিরে ডাকো ; অপরাধের অবসান হোক, অমঙ্গল দূর হয়ে যাক। মানুষকে গৌরবদান করে মনুষ্যত্বের সগৌরব অধিকার লাভ করি।

শান্তিনিকেতন কার্তিক ১৩৩৯

৫ আশ্বিন ১৩৩৯

ব্রত উদ্‌যাপন

গভীর উদ্‌বেগের মধ্যে, মনে আশা নিয়ে, পুনা অভিমুখে যাত্রা করলেম। দীর্ঘ পথ, যেতে যেতে আশঙ্কা বেড়ে ওঠে, পৌঁছে কী দেখা যাবে। বড়ো স্টেশনে এলেই আমার সঙ্গী দুজনে খবরের কাগজ কিনে দেন, উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে দেখি। সুখবর নয়। ডাক্তারেরা বলছে, মহাত্মাজির শরীরের অবস্থা danger zone-এ পৌঁচেছে। দেহেতে মেদ বা মাংসের উদ্‌বৃত্ত এমন নেই যে দীর্ঘকালের ক্ষয় সহ্য হয়, অবশেষে মাংসপেশী ক্ষয় হতে আরম্ভ করেছে। apoplexy হয়ে অকস্মাৎ প্রাণহানি ঘটতে পারে। সেইসঙ্গে কাগজে দেখছি, দিনের পর দিন দীর্ঘকাল ধরে জটিল সমস্যা নিয়ে তাঁকে স্বপক্ষ প্রতিপক্ষের সঙ্গে গুরুতর আলোচনা চালাতে হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত হিন্দুসমাজের অন্তর্গত রূপেই অনুন্নত সমাজকে রাষ্ট্রনৈতিক বিশেষ অধিকার দেওয়া বিষয়ে দুই পক্ষকে তিনি রাজি করেছেন। দেহের সমস্ত যন্ত্রণা দুর্বলতাকে জয় করে তিনি অসাধ্য সাধন করেছেন; এখন বিলেত হতে এই ব্যবস্থা মঞ্জুর হওয়ার উপর সব নির্ভর করছে। মঞ্জুর না হওয়ার কোনো সংগত কারণ থাকতে পারে না; কেননা প্রধানমন্ত্রীর কথাই ছিল, অনুন্নত সমাজের সঙ্গে একযোগে হিন্দুরা যে ব্যবস্থা মেনে নেবে তাকে তিনিও স্বীকার করতে বাধ্য।

আশানৈরাশ্যে আন্দোলিত হয়ে ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর প্রাতে আমরা কল্যাণ স্টেশনে পৌঁছলেম। সেখানে শ্রীমতী বাসন্তী ও শ্রীমতী উর্মিলার সঙ্গে দেখা হল। তাঁরা অন্য গাড়িতে কলকাতা থেকে কিছু পূর্বে এসে পৌঁচেছেন। কালবিলম্ব না করে আমাদের ভাবী গৃহস্বামিনীর প্রেরিত মোটরগাড়িতে চড়ে পুনার পথে চললেম।

পুনার পার্বত্য পথ রমণীয়। পুনরায় যখন পৌঁছলেম, তখন সামরিক অভ্যাসের পালা চলেছে— অনেকগুলি armoured car, machine gun, এবং পথে পথে

সৈন্যদলের কুচকাওয়াজ চোখে পড়ল। অবশেষে শ্রীযুক্ত বিঠলভাই থ্যাকারসে মহাশয়ের প্রাসাদে গাড়ি থামল। তাঁর বিধবা পত্নী সৌম্যসহাস্য মুখে আমাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে চললেন। সিঁড়ির দু পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা গান করে অভিনন্দন জানালেন।

গৃহে প্রবেশ করেই বুঝেছিলেম, গভীর একটি আশঙ্কায় হাওয়া ভারাক্রান্ত। সকলের মুখেই দুশ্চিন্তার ছায়া। প্রশ্ন করে জানলেম, মহাত্মাজির শরীরের অবস্থা সংকটাপন্ন। বিলাত হতে তখনো খবর আসে নি। প্রধানমন্ত্রীর নামে আমি একটি জরুরি তার পাঠিয়ে দিলেম।

দরকার ছিল না পাঠাবার। শীঘ্রই জনরব কানে এল, বিলাত থেকে সম্মতি এসেছে। কিন্তু জনরব সত্য কি না তার প্রমাণ পাওয়া গেল বহু ঘণ্টা পরে।

মহাত্মাজির মৌনাবলম্বনের দিন আজ। একটার পরে কথা বলবেন। তাঁর ইচ্ছা, সেই সময়ে আমি কাছে থাকি। পথে যেতে যারবেদা জেলের খানিক দূরে আমাদের মোটরগাড়ি আটকা পড়ল; ইংরেজ সৈনিক বললে, কোনো গাড়ি এগোতে দেবার হুকুম নেই। আজকের দিনে জেলখানায় প্রবেশের পথ ভারতবর্ষে প্রশস্ত বলেই তো জানি। গাড়ির চতুর্দিকে নানা লোকের ভিড় জমে উঠল।

আমাদের পক্ষ হতে লোক জেলের কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি নিতে খানিক এগিয়ে যেতেই শ্রীমান দেবদাস এসে উপস্থিত, জেল-প্রবেশের ছাড়পত্র তাঁর হাতে। পরে শুনলেম, মহাত্মাজি তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। কেননা তাঁর হঠাৎ মনে হয়, পুলিস কোথাও আমাদের গাড়ি আটকেছে— যদিও তার কোনো সংবাদ তাঁর জানা ছিল না।

লোহার দরজা একটার পর একটা খুলল, আবার বন্ধ হয়ে গেল। সামনে দেখা যায় উঁচু দেয়ালের ঔদ্ধত্য, বন্দী আকাশ, সোজা-লাইন-করা বাঁধা রাস্তা, দুটো চারটে গাছ।

দুটো জিনিসের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে বিলম্বে ঘটেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট পেরিয়ে ঢুকেছি সম্প্রতি। জেলখানায় প্রবেশে আজ বাধা ঘটলেও অবশেষে এসে পৌঁছনো গেল।

বাঁ দিকে সিঁড়ি উঠে, দরজা পেরিয়ে, দেয়ালে-ঘেরা একটি অঙ্গনে প্রবেশ করলেম। দূরে দূরে দু-সারি ঘর। অঙ্গনে একটি ছোটো আমগাছের ঘনছায়ায় মহাত্মাজি শয্যাশায়ী।

মহাত্মাজি আমাকে দুই হাতে বুকের কাছে টেনে নিলেন, অনেকক্ষণ রাখলেন। বললেন, কত আনন্দ হল।

শুভ সংবাদের জোয়ার বেয়ে এসেছি, এজন্যে আমার ভাগ্যের প্রশংসা করলেন তাঁর কাছে। তখন বেলা দেড়টা। বিলাতের খবর ভারতময় রাষ্ট্র হয়ে গেছে; রাজনৈতিকের দল তখন সিমলায় দলিল নিয়ে প্রকাণ্ড সভায় আলোচনা করছিলেন, পরে শুনলেম। খবরের কাগজওয়ালারাও জেনেছে। কেবল যাঁর প্রাণের ধারা প্রতি মুহূর্তে শীর্ণ হয়ে মৃত্যুসীমায় সংলগ্ন-প্রায় তাঁর প্রাণসংকট-মোচনের যথেষ্ট সত্বরতা নেই। অতি দীর্ঘ লাল ফিতের জটিল নির্মমতায় বিস্ময় অনুভব করলেম। সওয়া চারটে পর্যন্ত উৎকণ্ঠা প্রতিক্ষণ বেড়ে চলতে লাগল। শুনতে পাই, দশটার সময় খবর পুনায় এসেছিল।

চতুর্দিকে বন্ধুরা রয়েছেন। মহাদেব, বল্লভভাই, রাজাগোপালাচারী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, এঁদের লক্ষ্য করলেম। শ্রীমতী কস্তুরীবাঈ এবং সরোজিনীকে দেখলেম। জওহরলালের পত্নী কমলাও ছিলেন।

মহাত্মাজির স্বভাবতই শীর্ণ শরীর শীর্ণতম, কণ্ঠস্বর প্রায় শোনা যায় না। জঠরে অম্ল জমে উঠেছে, তাই মধ্যে মধ্যে সোডা মিশিয়ে জল খাওয়ানো হচ্ছে। ডাক্তারদের দায়িত্ব অতিমাত্রায় পৌঁচেছে।

অথচ চিত্তশক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয় নি। চিন্তার ধারা প্রবহমাণ, চৈতন্য অপরিশ্রান্ত। প্রায়োপবেশনের পূর্ব হতেই কত দুরূহ ভাবনা, কত জটিল আলোচনায় তাঁকে নিরত ব্যাপৃত হতে হয়েছে। সমুদ্রপারের রাজনৈতিকদের সঙ্গে পত্রব্যবহারে মনের উপর কঠোর ঘাত-প্রতিঘাত চলেছে। উপবাসকালে নানান দলের প্রবল দাবি তাঁর অবস্থার প্রতি মমতা করে নি, তা সকলেই জানেন। কিন্তু মানসিক জীর্ণতার কোনো চিহ্নই তো নেই। তাঁর চিন্তার স্বাভাবিক স্বচ্ছ প্রকাশধারায় আবিলতা ঘটে নি। শরীরের কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়েও আত্মার অপরাজিত উদ্যমের এই মূর্তি দেখে আশ্চর্য হতে হল। কাছে না এলে এমন করে উপলব্ধি করতেম না, কত প্রচণ্ড শক্তি এই ক্ষীণদেহ পুরুষের।

আজ ভারতবর্ষের কোটি প্রাণের মধ্যে পৌঁছল মৃত্যুর বেদীতল-শায়ী এই মহৎ প্রাণের বাণী। কোনো বাধা তাকে ঠেকাতে পারল না— দূরত্বের বাধা, ইটকাঠ-পাথরের বাধা, প্রতিকূল পলিটিক্‌সের বাধা। বহু শতাব্দীর জড়ত্বের বাধা আজ তার সামনে ধূলিসাৎ হল।

মহাদেব বললেন, আমার জন্যে মহাত্মাজি একান্তমনে অপেক্ষা করছিলেন। আমার উপস্থিতি দ্বারা রাষ্ট্রিক সমস্যার মীমাংসা-সাধনে সাহায্য করতে পারি এমন অভিজ্ঞতা আমার নেই। তাঁকে যে তৃপ্তি দিতে পেরেছি, এই আমার আনন্দ।

সকলে ভিড় করে দাঁড়ালে তাঁর পক্ষে কষ্টকর হবে মনে করে আমরা সরে গিয়ে বসলেম। দীর্ঘকাল অপেক্ষা করছি কখন খবর এসে পৌঁছবে। অপরাহ্ণের রৌদ্র আড়

হয়ে পড়েছে ইঁটের প্রাচীরের উপর। এখানে ওখানে দু-চারজন শুভ্র-খদ্দর-পরিহিত পুরুষ নারী শান্ত ভাবে আলোচনা করছেন।

লক্ষ্য করবার বিষয়, কারাগারের মধ্যে এই জনতা। কারো ব্যবহারে প্রশ্রয়জনিত শৈথিল্য নেই। চরিত্রশক্তি বিশ্বাস আনে, জেলের কর্তৃপক্ষ তাই শ্রদ্ধা করেই এঁদেরকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে মেলামেশা করতে দিতে পেরেছেন। এঁরা মহাত্মাজির প্রতিশ্রুতির প্রতিকূলে কোনো সুযোগ গ্রহণ করেন নি। আত্মমর্যাদার দৃঢ়তা এবং অচাঞ্চল্য এঁদের মধ্যে পরিস্ফুট। দেখলেই বোঝা যায়, ভারতের স্বরাজ্য-সাধনার যোগ্য সাধক এঁরা।

অবশেষে জেলের কর্তৃপক্ষ গবর্মেণ্টের ছাপ-মারা মোড়ক হাতে উপস্থিত হলেন। তাঁর মুখেও আনন্দের আভাস পেলুম। মহাত্মাজি গম্ভীর ভাবে ধীরে ধীরে পড়তে লাগলেন। সরোজিনীকে বললেম, এখন ওঁর চার পাশ থেকে সকলের সরে যাওয়া উচিত। মহাত্মাজি পড়া শেষ করে বন্ধুদের ডাকলেন। শুনলেম, তিনি তাঁদের আলোচনা করে দেখতে বললেন। এবং নিজের তরফ থেকে জানালেন, কাগজটা ডাক্তার আম্বেদকরকে দেখানো দরকার; তাঁর সমর্থন পেলে তবেই তিনি নিশ্চিন্ত হবেন।

বন্ধুরা এক পাশে দাঁড়িয়ে চিঠিখানি পড়লেন। আমাকেও দেখালেন। রাষ্ট্রবুদ্ধির রচনা সাবধানে লিখিত, সাবধানেই পড়তে হয়। বুঝলেম মহাত্মাজির অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ নয়। পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জ্রুর 'পরে ভার দেওয়া হল চিঠিখানার বক্তব্য বিশ্লেষণ করে মহাত্মাজিকে শোনাবেন। তাঁর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায় মহাত্মাজির মনে আর কোনো সংশয় রইল না। প্রায়োপবেশনের ব্রত উদ্‌যাপন হল।

প্রাচীরের কাছে ছায়ায় মহাত্মাজির শয্যা সরিয়ে আনা হল। চতুর্দিকে জেলের কম্বল বিছিয়ে সকলে বসলেন। লেবুর রস প্রস্তুত করলেন শ্রীমতী কমলা নেহেরু। Inspector-General of Prisons— যিনি গবর্মেণ্টের পত্র নিয়ে এসেছেন— অনুরোধ করলেন, রস যেন মহাত্মাজিকে দেন শ্রীমতী কস্তুরীবাঈ নিজের হাতে। মহাদেব বললেন 'জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো' গীতাঞ্জলির এই গানটি মহাত্মাজির প্রিয়। সুর ভুলে গিয়েছিলেম। তখনকার মতো সুর দিয়ে গাইতে হল। পণ্ডিত শ্যামশাস্ত্রী বেদ পাঠ করলেন। তার পর মহাত্মাজি শ্রীমতী কস্তুরীবাঈয়ের হাত হতে ধীরে ধীরে লেবুর রস পান করলেন। পরিশেষে সবরমতী-আশ্রমবাসীগণ এবং সমবেত সকলে 'বৈষ্ণব জন কো' গানটি গাইলেন। ফল ও মিষ্টান্ন বিতরণ হল, সকলে গ্রহণ করলেম।

জেলের অবরোধের ভিতর মহোৎসব। এমন ব্যাপার আর কখনো ঘটে নি।

প্রাণোৎসর্গের যজ্ঞ হল জেলখানায়, তার সফলতা এইখানেই রূপ ধারণ করলে। মিলনের এই অকস্মাৎ আবির্ভূত অপরূপ মূর্তি, একে বলতে পারি যজ্ঞসম্ভবা।

রাত্রে পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জ্রু প্রমুখ পুনার সমবেত বিশিষ্ট নেতারা এসে আমাকে ধরলেন, পরদিন মহাত্মাজির বার্ষিকী উৎসবসভায় আমাকে সভাপতি হতে হবে; মালব্যজিও বোম্বাই হতে আসবেন। মালব্যজিকেই সভাপতি করে আমি সামান্য দু-চার কথা লিখে পড়ব, এই প্রস্তাব করলেম। শরীরের দুর্বলতাকেও অস্বীকার করে শুভদিনের এই বিরাট জনসভায় যোগ দিতে রাজি না হয়ে পারলেম না।

বিকালে শিবাজিমন্দির-নামক বৃহৎ মুক্ত অঙ্গনে বিরাট জনসভা। অতি কষ্টে ভিতরে প্রবেশ করলেম। ভাবলেম, অভিমন্যুর মতো প্রবেশ তো হল, বেরোবার কী উপায়। মালব্যজি উপক্রমণিকায় সুন্দর করে বোঝালেন তাঁর বিশুদ্ধ হিন্দি ভাষায় যে, অস্পৃশ্যবিচার হিন্দুশাস্ত্রসংগত নয়। বহু সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করে তাঁর যুক্তি প্রমাণ করলেন। আমার কণ্ঠ ক্ষীণ, সাধ্য নেই এত বড়ো সভায় আমার বক্তব্য শ্রুতিগোচর করতে পারি। মুখে মুখে দু-চারটি কথা বললেম, পরে রচনা পাঠ করবার ভার নিলেন পণ্ডিতজির পুত্র গোবিন্দ মালব্য। ক্ষীণ অপরাহ্ণের আলোকে অদৃষ্টপূর্ব রচনা অনর্গল অমন সুস্পষ্ট কণ্ঠে পড়ে গেলেন, এতে বিস্মিত হলেম।

আমার সমগ্র রচনা কাগজে আপনারা দেখে থাকবেন। সভায় প্রবেশ করবার অনতিপূর্বে তার পাণ্ডুলিপি জেলে গিয়ে মহাত্মাজির হাতে দিয়ে এসেছিলেম।

মতিলাল নেহেরুর পত্নী কিছু বললেন তাঁর ভ্রাতা-ভগিনীদের উদ্দেশ করে, সামাজিক সাম্যবিধানের ব্রত রক্ষায় তাঁদের যেন একটুও ত্রুটি না ঘটে। শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ অন্যান্য নেতারাও অন্তরের ব্যথা দিয়ে দেশবাসীকে সামাজিক অশুচি দূর করতে আবাহন করলেন। সভায় সমবেত বিরাট জনসংঘ হাত তুলে অস্পৃশ্যতা-নিবারণের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন। বোঝা গেল, সকলের মনে আজকের বাণী পৌঁচেছে। কিছুদিন পূর্বেও এমন দুরূহ সংকল্পে এত সহস্র লোকের অনুমোদন সম্ভব ছিল না।

আমার পালা শেষ হল। পরদিন প্রাতে মহাত্মাজির কাছে অনেকক্ষণ ছিলেম। তাঁর সঙ্গে এবং মালব্যজির সঙ্গে দীর্ঘকাল নানা বিষয়ে আলোচনা হল। একদিনেই মহাত্মাজি অপ্রত্যাশিত বল লাভ করেছেন। কণ্ঠস্বর তাঁর দৃঢ়তর, blood pressure প্রায় স্বাভাবিক। অতিথি অভ্যাগত অনেকেই আসছেন প্রণাম করে আনন্দ জানিয়ে যেতে। সকলের সঙ্গেই হেসে কথা কইছেন। শিশুরা ফল ফুল নিয়ে আসছে, তাদের

নিয়ে তাঁর কী আনন্দ। বন্ধুদের সঙ্গে সামাজিক সাম্যবিধান প্রসঙ্গে নানাবিধ আলোচনা চলছে। এখন তাঁর প্রধান চিন্তার বিষয় হিন্দুমুসলমানের বিরোধ-ভঞ্জন।

আজ যে-মহাত্মার জীবন আমাদের কাছে বিরাট ভূমিকায় উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল, তাতে সর্বমানুষের মধ্যে মহামানুষকে প্রত্যক্ষ করবার প্রেরণা আছে। সেই প্রেরণা সার্থক হোক ভারতবর্ষের সর্বত্র।

মুক্তিসাধনার সত্য পথ মানুষের ঐক্যসাধনায়। রাষ্ট্রিক পরাধীনতা আমাদের সামাজিক সহস্র ভেদবিচ্ছেদকে অবলম্বন করেই পুষ্ট।

জড়প্রথার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে দিয়ে উদার ঐক্যের পথে মানবসভ্যতা অগ্রসর হবে, সেইদিন আজ সমাগত।

অগ্রহায়ণ ১৩৩৯

আশ্রমের রূপ ও বিকাশ

আশ্রমের রূপ ও বিকাশ

প্রাচীন ভারতের তপোবন জিনিসটির ঠিক বাস্তব রূপ কী তার স্পষ্ট ধারণা আজ অসম্ভব। মোটের উপর এই বুঝি যে আমরা যাদের ঋষিমুনি বলে থাকি অরণ্যে ছিল তাঁদের সাধনার স্থান। সেইসঙ্গেই ছিল স্ত্রী পরিজন নিয়ে তাঁদের গার্হস্থ্য। এই-সকল আশ্রমে কাম ক্রোধ রাগ দ্বেষের আলোড়ন যথেষ্ট ছিল, পুরাণের আখ্যায়িকায় তার বিবরণ মেলে।

কিন্তু তপোবনের যে চিত্রটি স্থায়ীভাবে রয়ে গেছে পরবর্তী ভারতের চিত্তে ও সাহিত্যে, সেটি হচ্ছে কল্যাণের নির্মল সুন্দর মানসমূর্তি, বিলাসমোহমুক্ত বলবান আনন্দের মূর্তি। অব্যবহিত পারিপার্শ্বিকের জটিলতা আবিলতা অসম্পূর্ণতা থেকে পরিত্রাণের আকাঙ্ক্ষা এই কাম্যলোক সৃষ্টি করে তুলেছিল ইতিহাসের অস্পষ্ট স্মৃতির উপকরণ নিয়ে। পরবর্তীকালে কবিদের বেদনার মধ্যে যেন দেশব্যাপী একটি নির্বাসন-দুঃখের আভাস পাওয়া যায়, কালিদাসের রঘুবংশে তার সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে। সেই নির্বাসন তপোবনের উপকরণবিরল শান্ত সুন্দর যুগের থেকে ভোগৈশ্বর্যজালে বিজড়িত তামসিক যুগে।

কালিদাসের বহুকাল পরে জন্মেছি, কিন্তু এই ছবি রয়ে গেছে আমারও মনে। যৌবনে নিভৃতে ছিলুম পদ্মাবক্ষে সাহিত্যসাধনায়। কাব্যচর্চার মাঝখানে কখন এক সময়ে সেই তপোবনের আহ্বান আমার মনে এসে পৌঁচেছিল। ভাববিলীন তপোবন আমার কাছ থেকে রূপ নিতে চেয়েছিল আধুনিককালের কোনো একটি অনুকূল ক্ষেত্রে। যে প্রেরণা কাব্যরূপ-রচনায় প্রবৃত্ত করে, এর মধ্যে সেই প্রেরণাই ছিল—কেবলমাত্র বাণীরূপ নয়, প্রত্যক্ষরূপ।

অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে আমার মনে এই কথাটি জেগে উঠেছিল, ছেলেদের মানুষ করে তোলবার জন্যে যে-একটা যন্ত্র তৈরি হয়েছে, যার নাম ইস্কুল, সেটার ভিতর দিয়ে মানবশিশুর শিক্ষার সম্পূর্ণতা হতেই পারে না। এই শিক্ষার জন্যে আশ্রমের দরকার, যেখানে আছে সমগ্রজীবনের সজীব ভূমিকা।

তপোবনের কেন্দ্রস্থলে আছেন গুরু। তিনি যন্ত্র নন, তিনি মানুষ। নিষ্ক্রিয়ভাবে মানুষ নন, সক্রিয়ভাবে ; কেননা মনুষ্যত্বের লক্ষ্য-সাধনে তিনি প্রবৃত্ত। এই তপস্যার গতিমান ধারায় শিষ্যদের চিত্তকে গতিশীল করে তোলা তাঁর আপন সাধনারই অঙ্গ।

শিষ্যদের জীবন এই যে প্রেরণা পাচ্ছে সে তাঁর অব্যবহিত সঙ্গ থেকে। নিত্যজাগরূক মানবচিত্তের এই সঙ্গ জিনিসটিই আশ্রমের শিক্ষায় সব চেয়ে মূল্যবান উপাদান— অধ্যাপনার বিষয় নয়, পদ্ধতি নয়, উপকরণ নয়। গুরুর মন প্রতি মুহূর্তে আপনাকে পাচ্ছে বলেই আপনাকে দিচ্ছে। পাওয়ার আনন্দ দেওয়ার আনন্দেই নিজের সত্যতা সপ্রমাণ করে, যেমন যথার্থ ঐশ্বর্যের পরিচয় ত্যাগের স্বাভাবিকতায়।

পণ্য উৎপাদন ব্যাপারটাকে বিপুল ও দ্রুত করবার জন্যেই আধুনিককালে যন্ত্রযোগে ভূরি উৎপাদনের প্রবর্তন। পণ্যবস্তু প্রাণবান নয়, হাইড্রলিক জাঁতার চাপে তাদের কোনো কষ্ট নেই। কিন্তু শিক্ষা ব্যাপারটা ভূরি উৎপাদনের যান্ত্রিক চেষ্টায় নীরস নৈর্ব্যক্তিক প্রণালীতে মানুষের মনকে পীড়িত করবেই। ধরে নিতে হবে আশ্রমের শিক্ষা সেই শিক্ষার কারখানাঘর হবে না। এখানে প্রত্যেক ছাত্রের মনের উপর শিক্ষকের প্রাণগত স্পর্শ থাকবে, তাতে উভয় পক্ষেরই আনন্দ।

একদা একজন জাপানী ভদ্রলোকের বাড়িতে ছিলাম, বাগানের কাজে তাঁর ছিল বিশেষ শখ। তিনি বলেছিলেন, আমি বৌদ্ধ, মৈত্রীর সাধক। আমি ভালোবাসি গাছপালা, ওদের মধ্যে এই ভালোবাসার অনুভূতি প্রবেশ করে, ওদের কাছ থেকে সেই ভালোবাসারই পাই প্রতিদান। কেবলমাত্র নিপুণ মালীর সঙ্গে প্রকৃতির এই স্বতঃ-আনন্দের যোগ থাকে না। বলা বাহুল্য মানুষ-মালীর সম্বন্ধে এ কথা সম্পূর্ণ সত্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মনের সঙ্গে মন মিলতে থাকলে আপনি জাগে খুশি। সেই খুশি সৃজন-শক্তিশীল। আশ্রমের শিক্ষাদান এই খুশির দান। যাঁদের মনে কর্তব্যবোধ আছে কিন্তু খুশি নেই তাঁদের দোসরা পথ।

পুরাকালে আমাদের দেশের গৃহস্থ ধনের দায়িত্ব স্বীকার করতেন। যথাকালে যথাস্থানে যথাপাত্রে দান করার দ্বারা তিনি নিজেকেই জানতেন সার্থক। তেমনি যিনি জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, জ্ঞান বিতরণের দায়িত্ব তিনি স্বতই গ্রহণ করতেন। তিনি জানতেন, যা পেয়েছেন তা দেবার সুযোগ না পেলে পাওয়াই থাকে অসম্পূর্ণ। গুরুশিষ্যের মধ্যে এই পরস্পরসাপেক্ষ সহজ সম্বন্ধকেই আমি বিদ্যাদানের প্রধান মাধ্যম বলে জেনেছি।

আরো একটি কথা আমার মনে ছিল। গুরুর অন্তরে ছেলেমানুষটি যদি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় তা হলে তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য হন। শুধু সামীপ্য নয়, উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই। নইলে দেনা-পাওনায় নাড়ীর যোগ থাকে না। নদীর সঙ্গে যদি প্রকৃত শিক্ষকের তুলনা করি তবে বলব, কেবল ডাইনে বাঁয়ে কতকগুলো বুড়ো বুড়ো উপনদী-যোগেই তিনি পূর্ণ নন।

তাঁর প্রথম আরম্ভের লীলাচঞ্চল কলহাস্যমুখর ঝরনার প্রবাহ পাথরগুলোর মধ্যে হারিয়ে যায় নি। যিনি জাত-শিক্ষক ছেলেদের ডাক পেলেই তাঁর আপন ভিতরকার আদিম ছেলেটা আপনি ছুটে আসে। মোটা গলার ভিতর থেকে উচ্ছ্বসিত হয় প্রাণে-ভরা কাঁচা হাসি। ছেলেরা যদি কোনো দিক থেকেই তাঁকে স্বশ্রেণীর জীব বলে চিনতে না পারে, যদি মনে করে লোকটা যেন প্রাগৈতিহাসিক মহাকায় প্রাণী, তবে থাবার আড়ম্বর দেখে নির্ভয়ে সে তাঁর কাছে হাত বাড়াতেই পারবে না। সাধারণত আমাদের গুরুরা প্রবীণতা সপ্রমাণ করতেই চান, প্রায়ই ওটা শস্তায় কর্তৃত্ব করবার প্রলোভনে, ছেলেদের আঙিনায় চোপদার না নিয়ে এগোলে সম্ভ্রম নষ্ট হবার ভয়ে তাঁরা সতর্ক। তাই পাকা শাখায় কচি শাখায় ফুল ফোটাবার ফল ফলাবার মর্মগত সহযোগ রুদ্ধ হয়ে থাকে।

আর-একটা গুরুতর কথা আমার মনে ছিল। ছেলেরা বিশ্বপ্রকৃতির অত্যন্ত কাছের সামগ্রী। আরামকেদারায় তারা আরাম চায় না, গাছের ডালে তারা চায় ছুটি। বিরাট প্রকৃতির অন্দরে আদিম প্রাণের বেগ নিগূঢ়ভাবে চঞ্চল, শিশুর প্রাণে সেই বেগ গতিসঞ্চার করে। জীবনের আরম্ভে অভ্যাসের দ্বারা অভিভূত হবার আগে কৃত্রিমতার জাল থেকে ছুটি পাবার জন্যে ছেলেরা ছট্‌ফট্ করতে থাকে, সহজ প্রাণলীলার অধিকার তারা দাবি করে বয়স্কদের শাসন এড়িয়ে। আরণ্যক ঋষিদের মনের মধ্যে ছিল চিরকালের ছেলে, তাই কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অপেক্ষা না রেখে তাঁরা বলেছিলেন, যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্— এই যা-কিছু সমস্তই প্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পিত হচ্ছে। এ কি বর্গ্‌সঁ-এর বচন। এ মহান শিশুর বাণী। বিশ্বপ্রাণের এই স্পন্দন লাগতে দাও ছেলেদের দেহে মনে, শহরের বোবা কালা মরা দেওয়ালগুলোর বাইরে। আমাদের আশ্রমের ছেলেরা এই প্রাণময়ী প্রকৃতিকে কেবল যে খেলায় ধুলায় নানা রকম করে কাছে পেয়েছে তা নয়, আমি গানের রাস্তা দিয়ে নিয়ে গেছি তাদের মনকে প্রকৃতির রঙমহলে।

তার পরে আশ্রমের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার কথা। মনে পড়ছে, কাদম্বরীতে একটি বর্ণনা আছে— তপোবনে আসছে সন্ধ্যা, যেন গোষ্ঠে-ফিরে-আসা পাটলী হোমধেনুটির মতো। শুনে মনে পড়ে যায় সেখানে গোরু চরানো, গো দোহন, সমিধ্ আহরণ, অতিথি-পরিচর্যা, আশ্রম-বালকবালিকাদের দিনকৃত্য। এই-সব কর্মপর্যায়ের দ্বারা তপোবনের সঙ্গে তাদের নিত্য-প্রবাহিত জীবনের যোগধারা। প্রাণায়ামের ফাঁকে ফাঁকে কেবলি যে সামমন্ত্র আবৃত্তি তা নয়, সহকারিতার সখ্য বিস্তারে সকলে মিলে আশ্রমের সৃষ্টিকার্য পরিচালন; তাতে করে আশ্রম হত আশ্রমবাসীদের নিজ

হাতের সম্মিলিত রচনা, কর্মসমবায়ে। আমাদের আশ্রমে এই সতত-উদ্যমশীল কর্ম-সহযোগিতা কামনা করেছি। মাস্টারমশায় গোরু চরাবার কাজে ছেলেদের লাগালে তারা খুশি হত সন্দেহ নেই, দুর্ভাগ্যক্রমে এ যুগে তা সম্ভব হবে না। তবু শরীর মন খাটাবার কাজ বিস্তর আছে যা এ যুগে মানাত। কিন্তু হায় রে, পড়া মুখস্থ সর্বদাই থাকে বাকি, পাতা ভরে রয়েছে কন্‌জুগেশন্‌ অফ ইংরেজি ভর্ব্‌স্‌। তা হোক, আমি যে বিদ্যানিকেতনের কল্পনা করেছি পড়ামুখস্থর কড়া পাহারা ঠেলেঠুলে তার মধ্যে পরস্পরের সেবা এবং পরিবেশ-রচনার কাজকে প্রধান স্থান দিয়েছি।

আশ্রমের শিক্ষাকে যথার্থভাবে সফল করতে হলে জীবনযাত্রাকে যথাসম্ভব উপকরণবিরল করে তোলা অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে। মানুষের প্রকৃতিতে যেখানে জড়তা আছে সেখানে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা কুশ্রী উচ্ছৃঙ্খল এবং মলিন হতে থাকে, সেখানে তার স্বাভাবিক বর্বরতা প্রকাশে বাধা পায় না। ধনীসমাজে আন্তরিক শক্তির অভাব থাকলেও বাহ্যিক উপকরণ-প্রাচুর্যে কৃত্রিম উপায়ে এই দীনতাকে চাপা দিয়ে রাখা যায়। আমাদের দেশে প্রায় সর্বত্রই ধনীগৃহে সদর-অন্দরের প্রভেদ দেখলে এই প্রকৃতিগত তামসিকতা ধরা পড়ে।

আপনার চার দিককে নিজের চেষ্টায় সুন্দর সুশৃঙ্খল ও স্বাস্থ্যকর করে তুলে একত্র বাসের সতর্ক দায়িত্বের অভ্যাস বাল্যকাল থেকেই সহজ করে তোলা চাই। একজনের শৈথিল্য অন্যের অসুবিধা অস্বাস্থ্য ও ক্ষতির কারণ হতে পারে এই বোধটি সভ্য জীবনযাত্রার ভিত্তিগত। সাধারণত আমাদের দেশের গার্হস্থ্যের মধ্যে এই বোধের ত্রুটি সর্বদাই দেখা যায়।

সহযোগিতার সভ্যনীতিকে সচেতন করে তোলা আশ্রমের শিক্ষার প্রধান সুযোগ। এই সুযোগটিকে সফল করবার জন্যে শিক্ষার প্রথম বর্গে উপকরণ-লাঘব অত্যাবশ্যক। একান্ত বস্তুপরায়ণ স্বভাবে প্রকাশ পায় চিত্তবৃত্তির স্থূলতা। সৌন্দর্য এবং সুব্যবস্থা মনের জিনিস। সেই মনকে মুক্ত করা চাই কেবল আলস্য এবং অনৈপুণ্য থেকে নয়, বস্তুলুব্ধতা থেকে। রচনাশক্তির আনন্দ ততই সত্য হয় যতই তা জড় বাহুল্যের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। বিচিত্র উপকরণকে সুবিহিতভাবে ব্যবহার করবার সুযোগ উপযুক্ত বয়সে ও অবস্থায় লাভ করবার সুযোগ অনেকের ঘটতে পারে, কিন্তু বাল্যকাল থেকেই ব্যবহার্য বস্তুগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত করবার আত্মশক্তিমূলক শিক্ষাটা আমাদের দেশে অত্যন্ত উপেক্ষিত হয়ে থাকে। সেই বয়সেই প্রতিদিন অল্প কিছু সামগ্রী যা হাতের কাছে পাওয়া যায় তাই দিয়েই সৃষ্টির আনন্দকে সুন্দর করে উদ্ভাবিত করবার চেষ্টা যেন

নিরলস হতে পারে এবং সেইসঙ্গেই সাধারণের সুখ স্বাস্থ্য সুবিধা -বিধানের কর্তব্যে ছাত্রেরা যেন আনন্দ পেতে শেখে এই আমার কামনা।

আমাদের দেশে ছেলেদের আত্মকর্তৃত্বের বোধকে অসুবিধাজনক আপদজনক ও ঔদ্ধত্য মনে করে সর্বদা দমন করা হয়। এতে করে পরনির্ভরতার লজ্জা তাদের চলে যায়, পরের প্রতি দাবির আবদার তাদের বেড়ে যায়, ভিক্ষুকতার ক্ষেত্রেও তাদের অভিমান প্রবল হতে থাকে, আর পরের ত্রুটি নিয়ে কলহ করেই তারা আত্মপ্রসাদ লাভ করে। এই লজ্জাকর দীনতা চার দিকে সর্বদাই দেখা যাচ্ছে। এর থেকে মুক্তি পাওয়াই চাই। ছাত্রদের স্পষ্ট বোঝা উচিত, যেখানে নালিশ কথায় কথায় মুখর হয়ে ওঠে সেখানে সঞ্চিত আছে নিজেরই লজ্জার কারণ, আত্মসম্মানের বাধা। ত্রুটি সংশোধনের দায় নিজে গ্রহণ করার উদ্যম যাদের আছে, খুঁতখুঁত করার কাপুরুষতায় তারা ধিক্কার বোধ করে। আমার মনে আছে ছাত্রদের প্রাত্যহিক কাজে যখন আমার যোগ ছিল তখন একদল বয়স্ক ছাত্র আমার কাছে নালিশ করেছিল যে, অন্নভরা বড়ো বড়ো ধাতুপাত্র পরিবেশনের সময় মেঝের উপর দিয়ে টানতে টানতে তার তলা ক্ষয়ে গিয়ে ঘর-ময় নোংরামির সৃষ্টি হয়। আমি বললুম, তোমরা পাচ্ছ দুঃখ, অথচ স্বয়ং এর সংশোধনের চিন্তামাত্র তোমাদের মনে আসে না, তাকিয়ে আছ আমি এর প্রতিবিধান করব। এই সামান্য কথাটা তোমাদের বুদ্ধিতে আসছে না যে, ঐ পাত্রটার নীচে একটা বিড়ে বেঁধে দিলেই ঘর্ষণ নিবারণ হয়। তার একমাত্র কারণ, তোমরা জান নিষ্ক্রিয়ভাবে ভোক্তৃত্বের অধিকারই তোমাদের আর কর্তৃত্বের অধিকার অন্যের। এইরকম ছেলেই বড়ো হয়ে সকল কর্মেই কেবল খুঁতখুঁতের বিস্তার ক'রে নিজের মজ্জাগত অকর্মণ্যতার লজ্জাকে দশ দিকে গুঞ্জরিত করে তোলে।

এই বিদ্যালয়ের প্রথম থেকেই আমার মনে ছিল আশ্রমের নানা ব্যবস্থায় মধ্যে যথাসম্ভব পরিমাণে ছাত্রদের কর্তৃত্বের অবকাশ দিয়ে অক্ষম কলহপ্রিয়তার ঘৃণ্যতা থেকে তাদের চরিত্রকে রক্ষা করব।

উপকরণের বিরলতা নিয়ে অসংগত ক্ষোভের সঙ্গে অসন্তোষ-প্রকাশের মধ্যেও চরিত্রদৌর্বল্য প্রকাশ পায়। আয়োজনের কিছু অভাব থাকাই ভালো, অভ্যস্ত হওয়া চাই স্বল্পে, অনায়াসে প্রয়োজনের জোগান দেওয়ার দ্বারা ছেলেদের মনটাকে আদুরে করে তোলা তাদের ক্ষতি করা। সহজেই তারা যে এত কিছু চায় তা নয়, তারা আত্মতৃপ্ত; আমরাই বয়স্কলোকের চাওয়াটা কেবলি তাদের উপর চাপিয়ে তাদেরকে বস্তুর নেশা-গ্রস্ত করে তুলি। গোড়া থেকেই শিক্ষার প্রয়োজন এই কথা ভেবে যে, কত অল্প নিয়ে চলতে পারে। শরীর-মনের শক্তির সম্যক্‌রূপে চর্চা সেইখানেই ভালো করে

সম্ভব যেখানে বাইরের সহায়তা অনতিশয়। সেখানে মানুষের আপনার সৃষ্টি-উদ্যম আপনি জাগে। যাদের না জাগে প্রকৃতি তাদেরকে আবর্জনার মতো ঝেঁটিয়ে ফেলে দেয়। আত্মকর্তৃত্বের প্রধান লক্ষণ সৃষ্টিকর্তৃত্ব। সেই মানুষই যথার্থ স্বরাট্ যে আপনার রাজ্য আপনি সৃষ্টি করে। আমাদের দেশের মেয়েদের হাতে অতিলালিত ছেলেরা মনুষ্যোচিত সেই আত্মপ্রবর্তনার চর্চা থেকে প্রথম হতেই বঞ্চিত। তাই আমরা অন্যদের শক্ত হাতের চাপে অন্যদের ইচ্ছার নমুনায় রূপ নেবার জন্যে অত্যন্ত কাদামাখাভাবে প্রস্তুত। তাই আপিসের নিম্নতম বিভাগে আমরা আদর্শ কর্মচারী।

এই উপলক্ষে আর-একটা কথা আমার বলবার আছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শরীর-তন্ত্রর শৈথিল্য বা অন্য যে কারণবশতই হোক আমাদের মানসপ্রকৃতিতে ঔৎসুক্যের অত্যন্ত অভাব। একবার আমেরিকা থেকে জল-তোলা বায়ুচক্র আনিয়েছিলুম। প্রত্যাশা করেছিলুম প্রকাণ্ড এই যন্ত্রটার ঘূর্ণিপাখার চালনা দেখতে ছেলেদের আগ্রহ হবে। কিন্তু দেখলুম অতি অল্প ছেলেই ওটার দিকে ভালো করে তাকালে। ওরা নিতান্তই আলগাভাবে ধরে নিলে ও একটা জিনিস মাত্র। কেবল একজন নেপালী ছেলে ওটাকে মন দিয়ে দেখেছে। টিনের বাক্স কেটে সে ওর একটা নকলও বানিয়েছে। মানুষের প্রতি আমাদের ছেলেদের ঔৎসুক্য দুর্বল, গাছপালা পশুপাখির প্রতিও। স্রোতের শ্যাওলার মতো ওদের মন ভেসে বেড়ায়, চার দিকের জগতে কোনো কিছুকেই আঁকড়ে ধরে না।

নিরৌৎসুক্যই আন্তরিক নির্জীবতা। আজকের দিনে যে-সব জাতি সমস্ত পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করেছে সমস্ত পৃথিবীর সব কিছুরই উপরে তাদের ঔৎসুক্যের অন্ত নেই। কেবলমাত্র নিজের দেশের মানুষ ও বস্তু সম্বন্ধে নয়, এমন দেশ নেই এমন কাল নেই এমন বিষয় নেই যার প্রতি তাদের মন ধাবিত না হচ্ছে। মন তাদের সর্বতোভাবে বেঁচে আছে— তাদের এই সজীব চিত্তশক্তি জয়ী হল সর্বজগতে।

পূর্বেই আভাস দিয়েছি আশ্রমের শিক্ষা পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকবার শিক্ষা। মরা মন নিয়েও পড়া মুখস্থ করে পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর উর্ধ্বশিখরে ওঠা যায়; আমাদের দেশে প্রত্যহ তার পরিচয় পাই। তারাই আমাদের দেশের ভালো ছেলে যাদের মন গ্রন্থের পত্রচর, ছাপার অক্ষরে একান্ত আসক্ত, বাইরের প্রত্যক্ষ জগতের প্রতি যাদের চিত্তবিক্ষেপের কোনো আশঙ্কা নেই। এরা পদবী অধিকার করে, জগৎ অধিকার করে না। প্রথম থেকে আমার সংকল্প এই ছিল, আমার আশ্রমের ছেলেরা চারি দিকের জগতের অব্যবহিত সম্পর্কে উৎসুক হয়ে থাকবে— সন্ধান করবে, পরীক্ষা করবে, সংগ্রহ করবে। অর্থাৎ এখানে এমন-সকল শিক্ষক সমবেত হবেন যাঁদের দৃষ্টি বইয়ের

সীমানা পেরিয়ে গেছে, যাঁরা চক্ষুষ্মান, যাঁরা সন্ধানী, যাঁরা বিশ্বকুতূহলী, যাঁদের আনন্দ প্রত্যক্ষ জ্ঞানে এবং সেই জ্ঞানের বিষয়বিস্তারে, যাঁদের প্রেরণাশক্তি সহযোগীমণ্ডল সৃষ্টি করে তুলতে পারে।

সব শেষে বলব আমি যেটাকে সব চেয়ে বড়ো মনে করি এবং যেটা সব চেয়ে দুর্লভ। তাঁরাই শিক্ষক হবার উপযুক্ত যাঁরা ধৈর্যবান, ছেলেদের প্রতি স্নেহ যাঁদের স্বাভাবিক। শিক্ষকদের নিজের চরিত্র সম্বন্ধে যথার্থ বিপদের কথা এই যে, যাদের সঙ্গে তাঁদের ব্যবহার, ক্ষমতায় তারা তাঁদের সমকক্ষ নয়। তাদের প্রতি সামান্য কারণে অসহিষ্ণু হওয়া এবং বিদ্রূপ করা অপমান করা শাস্তি দেওয়া অনায়াসেই সম্ভব। যাকে বিচার করা যায় তার যদি কোনোই শক্তি না থাকে তবে অবিচার করাই সহজ হয়ে ওঠে। ক্ষমতা ব্যবহার করবার স্বাভাবিক যোগ্যতা যাদের নেই অক্ষমের প্রতি অবিচার করতে কেবল যে তাদের বাধা থাকে না তা নয়, তাদের আনন্দ থাকে। ছেলেরা অবোধ হয়ে দুর্বল হয়ে মায়ের কোলে আসে, এইজন্যে তাদের রক্ষার প্রধান উপায় মায়ের মনে অপর্যাপ্ত স্নেহ। তৎসত্ত্বেও স্বাভাবিক অসহিষ্ণুতা ও শক্তির অভিমান স্নেহকে অতিক্রম করেও ছেলেদের 'পরে অন্যায় অত্যাচারে প্রবৃত্ত করে, ঘরে ঘরে তার প্রমাণ দেখা যায়। ছেলেদের মানুষ হবার পক্ষে এমন বাধা অল্পই আছে। ছেলেদের কঠিন দণ্ড ও চরম দণ্ড দেবার দৃষ্টান্ত দেখলে আমি শিক্ষকদেরই দায়ী করে থাকি। পাঠশালায় মূর্খতার জন্যে ছাত্রদের 'পরে যে নির্যাতন ঘটে তার বারো-আনা অংশ গুরুমশায়ের নিজেরই প্রাপ্য। বিদ্যালয়ের কাজে আমি যখন নিজে ছিলুম তখন শিক্ষকের কঠোর বিচার থেকে ছাত্রকে রক্ষা করা আমার দুঃসাধ্য সমস্যা ছিল। অপ্রিয়তা স্বীকার করে আমাকে এ কথা বোঝাতে হয়েছে, শিক্ষার কাজটাকে বলের দ্বারা সহজ করবার জন্যেই যে শিক্ষক আছেন তা নয়। আজ পর্যন্ত মনে আছে চরম শাসন থেকে এমন অনেক ছাত্রকে রক্ষা করেছি যার জন্যে অনুতাপ করতে হয় নি। রাষ্ট্রতন্ত্রেই কী আর শিক্ষাতন্ত্রেই কী, কঠোর শাসন-নীতি শাসয়িতারই অযোগ্যতার প্রমাণ।

আষাঢ় ১৩৪৩

২

শিলাইদহে পদ্মাতীরে সাহিত্যচর্চা নিয়ে নিভৃতে বাস করতুম। একটা সৃষ্টির সংকল্প নিয়ে সেখান থেকে এলেম শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে।

তখন আশ্রমের পরিধি ছিল ছোটো। তার দক্ষিণ সীমানায় দীর্ঘ সার-বাঁধা শালগাছ। মাধবীলতা-বিতানে প্রবেশের দ্বার। পিছনে পুব দিকে আমবাগান, পশ্চিম দিকে কোথাও-বা তাল, কোথাও-বা জাম, কোথাও-বা ঝাউ, ইতস্তত গুটিকয়েক নারকেল। উত্তরপশ্চিম প্রান্তে প্রাচীন দুটি ছাতিমের তলায় মার্বেল পাথরে বাঁধানো একটি নিরলংকৃত বেদী। তার সামনে গাছের আড়াল নেই, দিগন্ত পর্যন্ত অবারিত মাঠ, সে মাঠে তখনো চাষ পড়ে নি। উত্তর দিকে আমলকীবনের মধ্যে অতিথিদের জন্যে দোতলা কোঠা আর তারই সংলগ্ন রান্নাবাড়ি প্রাচীন কদমগাছের ছায়ায়। আর-একটি মাত্র পাকা বাড়ি ছিল একতলা, তারই মধ্যে ছিল পুরানো আমলের বাঁধানো তত্ত্ববোধিনী এবং আরো-কিছু বইয়ের সংগ্রহ। এই বাড়িটিকেই পরে প্রশস্ত করে এবং এর উপরে আর-একতলা চড়িয়ে বর্তমান গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। আশ্রমের বাইরে দক্ষিণের দিকে বাঁধ তখন ছিল বিস্তৃত এবং জলে ভরা। তার উত্তরের উঁচু পাড়িতে বহুকালের দীর্ঘ তালশ্রেণী। আশ্রম থেকে দেখা যেত বিনা বাধায়। আশ্রমের পূর্ব সীমানায় বোলপুরের দিকে ছায়াশূন্য রাঙামাটির রাস্তা গেছে চলে। সে রাস্তায় লোকচলাচল ছিল সামান্য। কেননা শহরে তখনো ভিড় জমে নি, বাড়িঘর সেখানে অল্পই। ধানের কল তখনো আকাশে মলিনতা ও আহার্যে রোগ বিস্তার করতে আরম্ভ করে নি। চারি দিকে বিরাজ করত বিপুল অবকাশ নীরব নিস্তব্ধ।

আশ্রমের রক্ষী ছিল বৃদ্ধ দ্বারী, সর্দার ঋজু দীর্ঘ প্রাণসার তার দেহ। হাতে তার লম্বা পাকাবাঁশের লাঠি, প্রথম বয়সের দস্যুবৃত্তির শেষ নিদর্শন। মালী ছিল হরিশ, দ্বারীর ছেলে। অতিথিভবনের একতলায় থাকতেন দ্বিপেন্দ্রনাথ তাঁর কয়েকজন অনুচর-পরিচর নিয়ে। আমি সস্ত্রীক আশ্রয় নিয়েছিলুম দোতলার ঘরে।

এই শান্ত জনবিরল শালবাগানে অল্প কয়েকটি ছেলে নিয়ে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সহায়তায় বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ করেছিলুম। আমার পড়াবার জায়গা ছিল প্রাচীন জামগাছের তলায়।

ছেলেদের কাছে বেতন নেওয়া হত না, তাদের যা-কিছু প্রয়োজন সমস্ত আমিই জুগিয়েছি। একটা কথা ভুলেছিলুম যে সেকালে রাজস্বের ষষ্ঠ ভাগের বরাদ্দ ছিল তপোবনে, আর আধুনিক চতুষ্পাঠীর অবলম্বন সামাজিক ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে

নিত্যপ্রবাহিত দানদক্ষিণা। অর্থাৎ এগুলি সমাজেরই অঙ্গ, এদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে কোনো ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র চেষ্টার প্রয়োজন ছিল না। অথচ আমার আশ্রম ছিল একমাত্র আমারি ক্ষীণ শক্তির উপরে নির্ভর করে। গুরুশিষ্যের মধ্যে আর্থিক দেনাপাওনার সম্বন্ধ থাকা উচিত নয় এই মত একদা সত্য হয়েছিল যে সহজ উপায়ে, বর্তমান সমাজে সেটা প্রচলিত না থাকা সত্ত্বেও মতটাকে রক্ষা করবার চেষ্টা করতে গেলে কর্মকর্তার আত্মরক্ষা অসাধ্য হয়ে ওঠে, এই কথাটা অনেকদিন পর্যন্ত বহু দুঃখে আমার দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছে। আমার সুযোগ হয়েছিল এই যে, ব্রহ্মবান্ধব এবং তাঁর খৃস্টান শিষ্য রেবাচাঁদ ছিলেন সন্ন্যাসী। এই কারণে অধ্যাপনার আর্থিক ও কর্ম -ভার লঘু হয়েছিল তাঁদের দ্বারা। এই প্রসঙ্গে আর-একজনের কথা সর্বাপেক্ষা আমার মনে জাগছে, তাঁর কথা কোনোদিন ভুলতে পারি নে। গোড়া থেকে বলা যাক।

এই সময়ে দুটি তরুণ যুবক, তাঁদের বালক বললেই হয়, এসে পড়লেন আমার কাছে। অজিতকুমার চক্রবর্তী তাঁর বন্ধু কবি সতীশচন্দ্র রায়কে নিয়ে এলেন আমাদের জোড়াসাঁকো বাড়িতে, আমার একতলার বসবার ঘরে। সতীশের বয়স তখন উনিশ, বি.এ. পরীক্ষা তাঁর আসন্ন। তার পূর্বে তাঁর একটি কবিতার খাতা অজিত আমাকে পড়বার জন্যে দিয়েছিলেন। পাতায় পাতায় খোলসা করেই জানাতে হয়েছে আমার মত। সব কথা অনুকূল ছিল না। আর-কেউ হলে এমন বিস্তারিত বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হতুম না। সতীশের লেখা পড়ে বুঝেছিলুম তাঁর অল্প বয়সের রচনায় অসামান্যতা অনুজ্জ্বলভাবে প্রচ্ছন্ন। যাঁর ক্ষমতা নিঃসন্দিগ্ধ, দুটো একটা মিষ্ট কথায় তাঁকে বিদায় করা তাঁর অসম্মাননা। আমার মতের যে অংশ ছিল অপ্রিয় অজিত তাতে অসহিষ্ণু হয়েছিলেন, কিন্তু সৌম্যমূর্তি সতীশ স্বীকার করে নিয়েছিলেন প্রসন্নভাবে।

আমার মনের মধ্যে তখন আশ্রমের সংকল্পটা সব সময়েই ছিল মুখর হয়ে। কথাপ্রসঙ্গে তার একটা ভবিষ্যৎ ছবি আমি এঁদের সামনে উৎসাহের সঙ্গে উজ্জ্বল করে ধরেছিলুম। দীপ্তি দেখা দিল সতীশের মুখে। আমি তাঁকে আহ্বান করি নি আমার কাজে। আমি জানতুম তাঁর সামনে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরের দুই বড়ো ধাপ বাকি। তার শেষভাগে ছিল জীবিকার আশ্বাসবাণী আইনপরীক্ষায়।

একদিন সতীশ এসে বললেন, যদি আমাকে গ্রহণ করেন আমি যোগ দিতে চাই আপনার কাজে। আমি বললুম, পরীক্ষা দিয়ে পরে চিন্তা কোরো। সতীশ বললেন, দেব না পরীক্ষা। কারণ পরীক্ষা দিলেই আত্মীয়স্বজনের ধাক্কায় সংসারযাত্রার ঢালু পথে আমাকে গড়িয়ে নিয়ে চলবে।

কিছুতে তাঁকে নিরস্ত করতে পারলে না। দারিদ্র্যের ভার অবহেলায় মাথায় করে

নিয়ে যোগ দিলেন আশ্রমের কাজে। বেতন অস্বীকার করলেন। আমি তাঁর অগোচরে তাঁর পিতার কাছে যথাসাধ্য মাসিক বৃত্তি পাঠিয়ে দিতুম। তাঁর পরনে ছিল না জামা, একটা চাদর ছিল গায়ে, তার পরিধেয়তা জীর্ণ। যে ভাবরাজ্যে তিনি সঞ্চরণ করতেন সেখানে তাঁর জীবন পূর্ণ হত প্রতিক্ষণে প্রকৃতির রসভাণ্ডার থেকে। আত্মভোলা মানুষ, যখন তখন ঘুরে বেড়াতেন যেখানে সেখানে। প্রায় তার সঙ্গে থাকত ছেলেরা, চলতে চলতে তাঁর সাহিত্যসম্ভোগের আস্বাদন পেত তারাও। সেই অল্প বয়সে ইংরেজি সাহিত্যে সুগভীর অভিনিবেশ তাঁর মতো আর কারো মধ্যে পাই নি। যে-সব ছাত্রকে পড়াবার ভার ছিল তাঁর 'পরে তারা ছিল নিতান্তই অর্বাচীন। ইংরেজি ভাষার সোপানশ্রেণীর সব নীচেকার পইঠা পার করে দেওয়াই ছিল তাঁর কাজ, কিন্তু কেজো সীমার মধ্যে বদ্ধ সংকীর্ণ নৈপুণ্য ছিল না তাঁর মাস্টারিতে। সাহিত্যের তিনি রসজ্ঞ সাধক ছিলেন, সেইজন্যে তিনি যা পাঠ দিতেন তা জমা করবার নয়, তা হজম করবার, তা হয়ে উঠত ছেলেদের মনের খাদ্য। তিনি দিতেন তাদের মনকে অবগাহন-স্নান, তার গভীরতা অত্যাবশ্যকের চেয়ে অনেক বেশি। ভাষাশিক্ষার মধ্যে একটা অনিবার্য শাসন থাকে, সেই শাসনকে অতিক্রম করে দিতে পারতেন সাহিত্যের উদার মুক্তি। এক বৎসরের মধ্যে হল তাঁর মৃত্যু। তার বেদনা আজও রয়ে গেছে আমার মনে। আশ্রমে যারা শিক্ষক হবে তারা মুখ্যত হবে সাধক, আমার এই কল্পনাটি সম্পূর্ণ সত্য করেছিলেন সতীশ।

তার পরের পর্বে এসেছিলেন জগদানন্দ। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল সাধনা পত্রে তাঁর প্রেরিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পড়ে। এই-সকল প্রবন্ধের প্রাঞ্জল ভাষা ও সহজ বক্তব্যপ্রণালী দেখে তাঁর প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হয়েছিল। তাঁর সাংসারিক অভাবমোচনের জন্য আমি তাঁকে প্রথমে আমাদের জমিদারির কাজে নিযুক্ত করেছিলেম। তার প্রধান কারণ জমিদারি দপ্তরে বেতনের কৃপণতা ছিল না। কিন্তু তাঁকে এই অযোগ্য আসনে বন্দী করে রাখতে আমার মনে বেদনা দিতে লাগল। আমি তাঁকে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনার কাজে আমন্ত্রণ করলুম। যদিও এই কার্যে আয়ের পরিমাণ অল্প ছিল তবুও আনন্দের পরিমাণ তাঁর পক্ষে ছিল প্রচুর। তার কারণ শিক্ষাদানে তাঁর স্বভাবের ছিল অকৃত্রিম তৃপ্তি। ছাত্রদের কাছে সর্বতোভাবে আত্মদানে তাঁর একটুও কৃপণতা ছিল না। সুগভীর করুণা ছিল বালকদের প্রতি। শাস্তি উপলক্ষেও তাদের প্রতি লেশমাত্র নির্মমতা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। একজন ছাত্রকে কোনো শিক্ষক তার একবেলার আহার বন্ধ করে দণ্ডবিধান করেছিলেন। এই শাসনবিধির নিষ্ঠুরতায় তাঁকে অশ্রু বর্ষণ করতে দেখেছি। তাঁর

বিজ্ঞানের ভাণ্ডার খোলা ছিল ছাত্রদের সম্মুখে যদিও তা তাদের পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্গত ছিল না। এই আত্মদানের অকার্পণ্য যথার্থ শিক্ষকের যথার্থ পরিচয়। তিনি আপনার আপনকে কখনো ছাত্রদের কাছ থেকে দূরে রাখেন নি। আত্মমর্যাদার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টায় তিনি ছাত্রদের সেবায় কখনো লাইন টেনে চলতেন না। তাঁর অধ্যাপকের উচ্চ অধিকার তাঁর সদয় ব্যবহারের আবরণে কখনো অতিপ্রত্যক্ষ ছিল না। বস্তুত সকল বিষয়েই তিনি ছেলেদের সখা ছিলেন। তাঁর ক্লাসে গণিতশিক্ষায় কোনো ছাত্র কিছুমাত্র পিছিয়ে পড়ে পরীক্ষায় যদি অকৃতার্থ হত সে তাঁকে অত্যন্ত আঘাত করত। শিক্ষার উচ্চ আদর্শ রক্ষার জন্য তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা ছিল। অমনোযোগী বালকদের প্রতি তাঁর তর্জন গর্জন শুনতে অতিশয় ভয়জনক ছিল কিন্তু তাঁর স্নেহ তাঁর ভর্ৎসনাকে ভিতরে ভিতরে প্রতিবাদ করে চলত, ছাত্ররা তা প্রত্যহ অনুভব করেছে। যে শিক্ষকেরা আশ্রমের সৃষ্টিকার্যে আপনাকে সর্বতোভাবে উৎসর্গ করেছিলেন, জগদানন্দ তার মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁর অভাব ও বেদনা আশ্রম কদাচ ভুলতে পারবে না।

সতীশের বন্ধু অজিতকুমার যথার্থ শিক্ষকের পদে উচ্চ স্থান অধিকার করেছিলেন। তাঁর বিদ্যা ছিল ইংরেজি সাহিত্যে ও দর্শনে বহুব্যাপ্ত। এই জ্ঞানের রাজ্যে তিনি ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ছাত্র। তিনিও নির্বিচারে ছাত্রদের কাছে তাঁর জ্ঞানের সঞ্চয় উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তাঁর ছাত্রেরা সর্বদাই তাঁর শিক্ষকতা থেকে উচ্চ অঙ্গের সাহিত্যরস আস্বাদনের অবকাশ পেয়েছিল। যদিও তাদের বয়স অল্প ও যোগ্যতার সীমা সংকীর্ণ তবুও তিনি কখনো তাদের কাছ থেকে নিজের পদের অভিমানে নির্লিপ্ত ছিলেন না। সতীশের মতো দারিদ্র্যে তাঁর ঔদাসীন্য ছিল না তবুও তিনি তা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আমাদের আশ্রম-নির্মাণ-কার্যে ইনি একজন নিপুণ স্থপতি ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

মাঝখানে অতি অল্প সময়ের জন্য এসেছিলেন আমার এক আত্মোৎসর্গপরায়ণ বন্ধু মোহিতচন্দ্র সেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেখানকার খ্যাতি প্রতিপত্তি সমস্ত ত্যাগ করে যোগ দিয়েছিলেন শিক্ষার এমন নিম্ন স্তরে লোকখ্যাতির দিক থেকে যা তাঁর যোগ্য ছিল না। কিন্তু তাতেই তিনি প্রভূত আনন্দ পেয়েছিলেন। কারণ শিক্ষকতা ছিল তাঁর স্বভাবসংগত। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়ে শিক্ষাব্রত অকালে সমাপ্ত হয়ে গেল। তাঁর অকৃপণতা ছিল আর্থিক দিকে এবং পারমার্থিক দিকে। প্রথম যেদিন আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল সেদিন তিনি আশ্রমের আদর্শের সম্বন্ধে যে সম্মান প্রকাশ করেছিলেন আমার আনন্দের পক্ষে তাই যথেষ্ট ছিল। অবশেষে বিদায় নেবার সময়ে তিনি বললেন, যদি আমি

আপনার এখানকার কাজে যোগদান করতে পারতুম তবে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করতুম। কিন্তু সম্প্রতি তা সম্ভব না হওয়াতে কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধার অঞ্জলি দান করে গেলুম। এই বলে আমার হাতে একটি কাগজের মোড়ক দিয়ে গেলেন। পরে খুলে দেখলেম হাজার টাকার একখানি নোট। পরীক্ষকরূপে যা পেয়েছিলেন সমস্তই তিনি তাঁর শ্রদ্ধার নিদর্শনরূপে দান করে গেলেন। কিন্তু কেবল সেই একদিনের দান নয়, তার পর থেকে প্রতিদিন তিনি নিবেদন করেছেন তাঁর শ্রদ্ধার অর্ঘ্য একান্ত অনুপযুক্ত বেতন রূপে।

এঁদের অনেক পরে আশ্রমের সাধনাক্ষেত্রে দেখা দিলেন নন্দলাল। ছোটো বড়ো সমস্ত ছাত্রের সঙ্গে এই প্রতিভাসম্পন্ন আর্টিস্টের একাত্মকতা অতি আশ্চর্য। তাঁর আত্মদান কেবলমাত্র শিক্ষকতায় নয়, সর্বপ্রকার বদান্যতায়। ছাত্রদের রোগে, শোকে, অভাবে তিনি তাদের অকৃত্রিম বন্ধু। তাঁকে যারা শিল্পশিক্ষা উপলক্ষে কাছে পেয়েছে তারা ধন্য হয়েছে।

তার পর থেকে নানা কর্মী, নানা বন্ধু আশ্রমের সাধনাক্ষেত্রে সমবেত হয়েছেন এবং আপন আপন শক্তি ও স্বভাবের বিশিষ্টতা অনুসারে আশ্রমের গঠনকার্যে ক্রমশ বিচিত্র উপকরণ জুগিয়ে এসেছেন। সৃষ্টিকার্যে এই বৈচিত্র্যের প্রয়োজন আছে। নতুন নতুন কালের প্রেরণায় নতুন নতুন রূপ আপনাকে ব্যক্ত করতে থাকে এবং এই উপায়েই কালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে তবে সে আপনার শক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। সেই পরিবর্তমান আদর্শের অনুবৃত্তির দ্বারা পুরাতন কালের ভিত্তির উপরেই নতুন কালের সৃষ্টি সম্পূর্ণতা লাভ করে। এই নিয়ে কোনো আক্ষেপ করা বৃথা। বস্তুত প্রাচীনকালের ছন্দে নতুনকাল তাল ভঙ্গ করলে সৃষ্টির সংগতি রক্ষা হয় না।

আষাঢ় ১৩৪৮

৩

'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছি, আমার বয়স যখন অল্প ছিল তখনকার স্কুলের রীতিপ্রকৃতি এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের আচরণ আমার পক্ষে নিতান্ত দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। তখনকার শিক্ষাবিধির মধ্যে কোনো রস ছিল না, কিন্তু সেইটেই আমার অসহিষ্ণুতার একমাত্র কারণ নয়। কলকাতা শহরে আমি প্রায় বন্দী অবস্থায় ছিলেম। কিন্তু বাড়িতে তবুও বন্ধনের ফাঁকে ফাঁকে বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে আমার একটা আনন্দের সম্বন্ধ জন্মে গিয়েছিল। বাড়ির দক্ষিণ দিকের পুকুরের জলে সকাল-সন্ধ্যার ছায়া এপার-

ওপার করত— হাঁসগুলো দিত সাঁতার, গুগলি তুলত জলে ডুব দিয়ে, আষাঢ়ের জলে-ভরা নীলবর্ণ পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ সারবাঁধা নারকেলগাছের মাথার উপরে ঘনিয়ে আনত বর্ষার গম্ভীর সমারোহ। দক্ষিণের দিকে যে বাগানটা ছিল ঐখানেই নানা রঙে ঋতুর পরে ঋতুর আমন্ত্রণ আসত উৎসুক দৃষ্টির পথে আমার হৃদয়ের মধ্যে।

শিশুর জীবনের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির এই যে আদিম কালের যোগ, প্রাণমনের বিকাশের পক্ষে এর যে কত বড়ো মূল্য তা আশা করি ঘোরতর শাহরিক লোককেও বোঝাবার দরকার নেই। ইস্কুল যখন নীরস পাঠ্য, কঠোর শাসনবিধি ও প্রভুত্বপ্রিয় শিক্ষকদের নির্বিচার অন্যায় নির্মমতায় বিশ্বের সঙ্গে বালকের সেই মিলনের বৈচিত্র্যকে চাপা দিয়ে তার দিনগুলিকে নির্জীব নিরালোক নিষ্ঠুর করে তুলেছিল তখন প্রতিকারহীন বেদনায় মনের মধ্যে ব্যর্থ বিদ্রোহ উঠেছিল একান্ত চঞ্চল হয়ে। যখন আমার বয়স তেরো তখন এডুকেশন-বিভাগীয় দাঁড়ের শিকল ছিন্ন করে বেরিয়ে পড়েছিলেম। তার পর থেকে যে বিদ্যালয়ে হলেম ভর্তি তাকে যথার্থ ই বলা যায় বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে আমার ছুটি ছিল না, কেননা অবিশ্রাম কাজের মধ্যেই পেয়েছি ছুটি। কোনো কোনো দিন পড়েছি রাত দুটো পর্যন্ত। তখনকার অপ্রখর আলোকের যুগে রাত্রে সমস্ত পাড়া নিস্তব্ধ, মাঝে মাঝে শোনা যেত 'হরিবোল' শ্মশানযাত্রীদের কণ্ঠ থেকে। ভেরেণ্ডা তেলের সেজের প্রদীপে দুটো সলতের মধ্যে একটা সলতে নিবিয়ে দিতুম, তাতে শিখার তেজ হ্রাস হত কিন্তু হত আয়ুবৃদ্ধি। মাঝে মাঝে অন্তঃপুর থেকে বড়-দিদি এসে জোর করে আমার বই কেড়ে নিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিতেন বিছানায়। তখন আমি যে-সব বই পড়বার চেষ্টা করেছি কোনো কোনো গুরুজন তা আমার হাতে দেখে মনে করেছেন স্পর্ধা। শিক্ষার কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে যখন শিক্ষায় স্বাধীনতা পেলুম তখন কাজ বেড়ে গেল অনেক বেশি অথচ ভার গেল কমে।

তার পরে সংসারে প্রবেশ করলেম; রথীন্দ্রনাথকে পড়াবার সমস্যা এল সামনে। তখন প্রচলিত প্রথায় তাকে ইস্কুলে পাঠালে আমার দায় হত লঘু এবং আত্মীয়বান্ধবেরা সেইটেই প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু বিশ্বক্ষেত্র থেকে যে শিক্ষালয় বিচ্ছিন্ন সেখানে তাকে পাঠানো আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। আমার ধারণা ছিল, অন্তত জীবনের আরম্ভকালে নগরবাস প্রাণের পুষ্টি ও মনের প্রথম বিকাশের পক্ষে অনুকূল নয়। বিশ্বপ্রকৃতির অন্তঃপ্রেরণা থেকে বিচ্ছেদ তার একমাত্র কারণ নয়। শহরে যানবাহন ও প্রাণযাত্রার অন্যান্য নানাবিধ সুযোগ থাকে, তাতে সম্পূর্ণ দেহচালনা ও চারি দিকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভে শিশুরা বঞ্চিত হয়; বাহ্য বিষয়ে আত্মনির্ভর চিরদিনের মতো তাদের শিথিল হয়ে যায়। প্রশ্রয়প্রাপ্ত যে-সব বাগানের গাছ উপর থেকেই জলসেচনের

সুযোগ পায় তারা উপরে উপরেই মাটির সঙ্গে সংলগ্ন থাকে, গভীর ভূমিতে শিকড় চালিয়ে দিয়ে স্বাধীনজীবী হবার শিক্ষা তাদের হয় না; মানুষের পক্ষেও সেইরকম। দেহটাকে সম্যক্‌রূপে ব্যবহার করবার যে শিক্ষা প্রকৃতি আমাদের কাছে দাবি করে এবং নাগরিক 'ভদ্দর' শ্রেণীর রীতির কাছে যেটা উপেক্ষিত অবজ্ঞাভাজন তার অভাব দুঃখ আমার জীবনে আজ পর্যন্ত আমি অনুভব করি। তাই সে সময়ে আমি কলকাতা শহর প্রায় বর্জন করেছিলেম। তখন সপরিজনে থাকতেম শিলাইদহে। সেখানে আমাদের জীবনযাপনের পদ্ধতি ছিল নিতান্তই সাদাসিধে। সেটা সম্ভব হয়েছিল তার কারণ, যে সমাজে আমরা মানুষ সে সমাজে প্রচলিত প্রাণযাত্রার রীতি ও আদর্শ এখানে পৌঁছতে পারত না, এমন-কি, তখনকার দিনে নগরবাসী মধ্যবিত্ত লোকেরাও যে-সকল আরামে ও আড়ম্বরে অভ্যস্ত তাও ছিল আমাদের থেকে বহু দূরে। বড়ো শহরে পরস্পরের অনুকরণে ও প্রতিযোগিতায় যে অভ্যাসগুলি অপরিহার্যরূপে গড়ে ওঠে সেখানে তার সম্ভাবনা মাত্র ছিল না।

শিলাইদহে বিশ্বপ্রকৃতির নিকটসান্নিধ্যে রথীন্দ্রনাথ যেরকম ছাড়া পেয়েছিল সেরকম মুক্তি তখনকার কালের সম্পন্ন অবস্থার গৃহস্থেরা আপন ঘরের ছেলেদের পক্ষে অনুপযোগী বলেই জানত এবং তার মধ্যে যে বিপদের আশঙ্কা আছে তারা ভয় করত তা স্বীকার করতে। রথী সেই বয়সে ডিঙি বেয়েছে নদীতে। সেই ডিঙিতে করে চলতি স্টীমার থেকে সে প্রতিদিন রুটি নামিয়ে আনত, তাই নিয়ে স্টীমারের সারঙ আপত্তি করেছে বার বার। চরে বনঝাউয়ের জঙ্গলে সে বেরোত শিকার করতে— কোনোদিন-বা ফিরে এসেছে সমস্ত দিন পরে অপরাহ্নে। তা নিয়ে ঘরে উদ্‌বেগ ছিল না তা বলতে পারি নে, কিন্তু সে উদ্‌বেগ থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্যে বালকের স্বাধীন সঞ্চরণ খর্ব করা হয় নি। যখন রথীর বয়স ছিল ষোলোর নীচে তখন আমি তাকে কয়েকজন তীর্থযাত্রীর সঙ্গে পদব্রজে কেদারনাথ-ভ্রমণে পাঠিয়েছি, তা নিয়ে ভর্ৎসনা স্বীকার করেছি আত্মীয়দের কাছ থেকে, কিন্তু এক দিকে প্রকৃতির ক্ষেত্রে অন্য দিকে সাধারণ দেশবাসী-দের সম্বন্ধে যে কষ্টসহিষ্ণু অভিজ্ঞতা আমি তার শিক্ষার অত্যাবশ্যক অঙ্গ বলে জানতুম তার থেকে তাকে স্নেহের ভীরুতাবশত বঞ্চিত করি নি।

শিলাইদহে কুঠিবাড়ির চার দিকে যে জমি ছিল প্রজাদের মধ্যে নতুন ফসল প্রচারের উদ্দেশ্যে সেখানে নানা পরীক্ষায় লেগেছিলেম। এই পরীক্ষাব্যাপারে সরকারি কৃষিবিভাগের বিশেষজ্ঞদের সহায়তা অত্যধিক পরিমাণেই মিলেছিল। তাঁদের আদিষ্ট উপাদানের তালিকা দেখে চিচেস্টরে যারা এগ্রিকালচারাল্‌ কলেজে পাস করে নি এমন-সব চাষিরা হেসেছিল; তাদেরই হাসিটা টিঁকেছিল শেষ পর্যন্ত। মরার লক্ষণ

আসন্ন হলেও শ্রদ্ধাবান রোগীরা যেমন করে চিকিৎসকের সমস্ত উপদেশ অক্ষুণ্ণ রেখে পালন করে, পঞ্চাশ বিঘে জমিতে আলু চাষের পরীক্ষায় সরকারি কৃষিতত্ত্বপ্রবীণদের নির্দেশ সেইরকম একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করেছি। তাঁরাও আমার ভরসা জাগিয়ে রাখবার জন্যে পরিদর্শনকার্যে সর্বদাই যাতায়াত করেছেন। তারই বহুব্যয়সাধ্য ব্যর্থতার প্রহসন নিয়ে বন্ধুবর জগদীশচন্দ্র আজও প্রায় মাঝে মাঝে হেসে থাকেন। কিন্তু তাঁরও চেয়ে প্রবল অট্টহাস্য নীরবে ধ্বনিত হয়েছিল চামরু-নাম-ধারী এক-হাত-কাটা সেই রাজবংশী চাষির ঘরে, যে ব্যক্তি পাঁচ কাঠা জমির উপযুক্ত বীজ নিয়ে কৃষিতত্ত্ববিদের সকল উপদেশই অগ্রাহ্য করে আমার চেয়ে প্রচুরতর ফল লাভ করেছিল। চাষবাস-সম্বন্ধীয় যে-সব পরীক্ষা-ব্যাপারের মধ্যে বালক বেড়ে উঠেছিল তারই একটা নমুনা দেবার জন্যে এই গল্পটা বলা গেল; পাঠকেরা হাসতে চান হাসুন, কিন্তু এ কথা যেন মানেন যে শিক্ষার অঙ্গরূপে এই ব্যর্থতাও ব্যর্থ নয়। এত বড়ো অদ্ভুত অপব্যয়ে আমি যে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম তার কুইক্‌সটিত্বের মূল্য চামরুকে বোঝাবার সুযোগ হয় নি, সে এখন পরলোকে।

এরই সঙ্গে সঙ্গে পুঁথিগত বিদ্যার আয়োজন ছিল সে কথা বলা বাহুল্য। এক পাগলা মেজাজের চালচুলোহীন ইংরেজ শিক্ষক হঠাৎ গেল জুটে। তার পড়াবার কায়দা খুবই ভালো, আরো ভালো এই যে কাজে ফাঁকি দেওয়া তার ধাতে ছিল না। মাঝে মাঝে মদ খাবার দুর্নিবার উত্তেজনায় সে পালিয়ে গেছে কলকাতায়, তার পর মাথা হেঁট করে ফিরে এসেছে লজ্জিত অনুতপ্ত চিত্তে। কিন্তু কোনোদিন শিলাইদহে মত্ততায় আত্মবিস্মৃত হয়ে ছাত্রদের কাছে শ্রদ্ধা হারাবার কোনো কারণ ঘটায় নি। ভৃত্যদের ভাষা বুঝতে পারত না, সেটাকে অনেক সময়ে সে মনে করেছে ভৃত্যদেরই অসৌজন্য। তা ছাড়া সে আমার প্রাচীন মুসলমান চাকরকে তার পিতৃদত্ত ফটিক নামে কোনোমতেই ডাকত না। তাকে অকারণে সম্বোধন করত সুলেমান। এর মনস্তত্ত্বরহস্য কী জানি নে। এতে বার বার অসুবিধা ঘটত। কারণ চাষিঘরের সেই চাকরটি বরাবরই ভুলত তার অপরিচিত নামের মর্যাদা।

আরো কিছু বলবার কথা আছে। লরেন্সকে পেয়ে বসল রেশমের চাষের নেশায়। শিলাইদহের নিকটবর্তী কুমারখালি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে রেশম-ব্যবসায়ের একটা প্রধান আড্ডা ছিল। সেখানকার রেশমের বিশিষ্টতা খ্যাতিলাভ করেছিল বিদেশী হাটে। সেখানে ছিল রেশমের মস্ত বড়ো কুঠি। একদা রেশমের তাঁত বন্ধ হল সমস্ত বাংলাদেশে, পূর্বস্মৃতির স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে কুঠি রইল শূন্য পড়ে। যখন পিতৃঋণের প্রকাণ্ড বোঝা আমার পিতার সংসার চেপে ধরল বোধ করি তারই কোনো এক সময়ে তিনি

রেলওয়ে কোম্পানিকে এই কুঠি বিক্রি করেন। সে সময়ে গোরাই নদীর উপরে ব্রিজ তৈরি হচ্ছে। এই সেকেলে প্রাসাদের প্রভূত ইট পাথর ভেঙে নিয়ে সেই কোম্পানি নদীর বেগ ঠেকাবার কাজে সেগুলো জলাঞ্জলি দিলে। কিন্তু যেমন বাংলার তাঁতির দুর্দিনকে কেউ ঠেকাতে পারলে না, যেমন সাংসারিক দুর্যোগে পিতামহের বিপুল ঐশ্বর্যের ধ্বংস কিছুতে ঠেকানো গেল না— তেমনি কুঠিবাড়ির ভগ্নাবশেষ নিয়ে নদীর ভাঙন রোধ মানলে না; সমস্তই গেল ভেসে; সুসময়ের চিহ্নগুলোকে কালস্রোত যেটুকু রেখেছিল নদীর স্রোতে তাকে দিলে ভাসিয়ে।

নরেন্দ্রের কানে গেল রেশমের সেই ইতিবৃত্ত। ওর মনে লাগল, আর একবার সেই চেষ্টার প্রবর্তন করলে ফল পাওয়া যেতে পারে; দুর্গতি যদি খুব বেশি হয় অন্তত আলুর চাষকে ছাড়িয়ে যাবে না। চিঠি লিখে যথারীতি বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে সে খবর আনালে। কীটদের আহার জোগাবার জন্যে প্রয়োজন ভেরেণ্ডা গাছের। তাড়াতাড়ি জমানো গেল কিছু গাছ কিন্তু নরেন্দ্রের সবুর সইল না। রাজশাহি থেকে গুটি আনিয়ে পালনে প্রবৃত্ত হল অচিরাৎ। প্রথমত বিশেষজ্ঞদের কথাকে বেদবাক্য বলে মানলে না, নিজের মতে নতুন পরীক্ষা করতে করতে চলল। কীটগুলোর ক্ষুদে ক্ষুদে মুখ, ক্ষুদে ক্ষুদে গ্রাস, কিন্তু ক্ষুধার অবসান নেই। তাদের বংশবৃদ্ধি হতে লাগল খাদ্যের পরিমিত আয়োজনকে লঙ্ঘন করে। গাড়ি করে দূর দূর থেকে অনবরত পাতার জোগান চলল। নরেন্দ্রের বিছানাপত্র, তার চৌকি টেবিল, খাতা বই, তার টুপি পকেট কোর্তা— সর্বত্রই হল গুটির জনতা। তার ঘর দুর্গম হয়ে উঠল দুর্গন্ধের ঘন আবেষ্টনে। প্রচুর ব্যয় ও অক্লান্ত অধ্যবসায়ের পর মাল জমল বিস্তর, বিশেষজ্ঞেরা বললেন অতি উৎকৃষ্ট, এ জাতের রেশমের এমন সাদা রঙ হয় না। প্রত্যক্ষ দেখতে পাওয়া গেল সফলতার রূপ— কেবল একটুখানি ত্রুটি রয়ে গেল। নরেন্দ্র বাজার যাচাই করে জানলে তখনকার দিনে এ মালের কাটতি অল্প, তার দাম সামান্য। বন্ধ হল ভেরেণ্ডা পাতার অনবরত গাড়ি-চলাচল, অনেকদিন পড়ে রইল ছালাভরা গুটিগুলো; তার পরে তাদের কী ঘটল তার কোনো হিসেব আজ কোথাও নেই। সেদিন বাংলাদেশে এই গুটিগুলোর উৎপত্তি হল অসময়ে। কিন্তু যে শিক্ষালয় খুলেছিলেম তার সময় পালন তারা করেছিল।

আমাদের পণ্ডিত ছিলেন শিবধন বিদ্যার্ণব। বাংলা আর সংস্কৃত শেখানো ছিল তাঁর কাজ, আর তিনি ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ থেকে উপনিষদের শ্লোক ব্যাখ্যা করে আবৃত্তি করাতেন। তাঁর বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণে পিতৃদেব তাঁর প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন। বাল্যকাল থেকে প্রাচীন ভারতবর্ষের তপোবনের যে আদর্শ আমার মনে ছিল তার কাজ এমনি করে শুরু হয়েছিল কিন্তু তার মূর্তি সম্যক্ উপাদানে গড়ে ওঠে নি।

দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষা সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে যে মতটি সক্রিয় ছিল মোটের উপর সেটি হচ্ছে এই যে, শিক্ষা হবে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার নিকট অঙ্গ, চলবে তার সঙ্গে এক তালে এক সুরে, সেটা ক্লাসনামধারী খাঁচার জিনিস হবে না। আর যে বিশ্বপ্রকৃতি প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে আমাদের দেহে মনে শিক্ষাবিস্তার করে সেও এর সঙ্গে হবে মিলিত। প্রকৃতির এই শিক্ষালয়ের একটা অঙ্গ পর্যবেক্ষণ আর একটা পরীক্ষা, এবং সকলের চেয়ে বড়ো তার কাজ প্রাণের মধ্যে আনন্দসঞ্চার। এই গেল বাহ্য প্রকৃতি। আর আছে দেশের অন্তঃপ্রকৃতি, তারও বিশেষ রস আছে, রঙ আছে, ধ্বনি আছে। ভারতবর্ষের চিরকালের যে চিত্ত সেটার আশ্রয় সংস্কৃত ভাষায়। এই ভাষার তীর্থপথ দিয়ে আমরা দেশের চিন্ময় প্রকৃতির স্পর্শ পাব, তাকে অন্তরে গ্রহণ করব, শিক্ষার এই লক্ষ্য মনে আমার দৃঢ় ছিল। ইংরেজি ভাষার ভিতর দিয়ে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় আমরা জানতে পারি, সেগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার একটা আনন্দ আছে, সে রঞ্জিত করে আমাদের মনের আকাশকে; তার মধ্যে আছে একটি গভীর বাণী, বিশ্বপ্রকৃতির মতোই সে আমাদের শান্তি দেয় এবং চিন্তাকে মর্যাদা দিয়ে থাকে।

যে শিক্ষাতত্ত্বকে আমি শ্রদ্ধা করি তার ভূমিকা হল এইখানে। এতে যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন ছিল, কেননা এর পথ অনভ্যস্ত এবং চরম ফল অপরীক্ষিত। এই শিক্ষাকে শেষ পর্যন্ত চালনা করবার শক্তি আমার ছিল না, কিন্তু এর 'পরে নিষ্ঠা আমার অবিচলিত। এর সমর্থন ছিল না দেশের কোথাও। তার একটা প্রমাণ বলি। এক দিকে অরণ্যবাসে দেশের উন্মুক্ত বিশ্বপ্রকৃতি আর-এক দিকে গুরুগৃহবাসে দেশের শুদ্ধতম উচ্চতম সংস্কৃতি— এই উভয়ের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে তপোবনে একদা যে নিয়মে শিক্ষা চলত আমি কোনো-এক বক্তৃতায় তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ব্যাখ্যা করেছিলেম। বলেছিলেম, আধুনিক কালে শিক্ষার উপাদান অনেক বাড়াতে হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার রূপটি তার রসটি তৈরি হয়ে উঠবে প্রকৃতির সহযোগে, এবং যিনি শিক্ষা দান করবেন তাঁর অন্তরঙ্গ আধ্যাত্মিক সংসর্গে। শুনে সেদিন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেছিলেন, এ কথাটি কবিজনোচিত, কবি এর অত্যাবশ্যকতা যতটা কল্পনা করেছেন আধুনিক কালে ততটা স্বীকার করা যায় না। আমি প্রত্যুত্তরে তাঁকে বলেছিলেম, বিশ্বপ্রকৃতি ক্লাসে ডেস্কের সামনে বসে মাস্টারি করেন না, কিন্তু জলে স্থলে আকাশে তাঁর ক্লাস খুলে আমাদের মনকে তিনি যে প্রবল শক্তিতে গড়ে তোলেন কোনো মাস্টার কি তা পারে। আরবের মানুষকে কি আরবের মরুভূমিই গড়ে তোলে নি— সেই মানুষই বিচিত্র ফলশস্যশালিনী নীলনদীতীরবর্তী ভূমিতে যদি জন্ম নিত তা হলে কি তার

প্রকৃতি অন্যরকম হত না। যে প্রকৃতি সজীব বিচিত্র, আর যে শহর নির্জীব পাথরে-বাঁধানো, চিত্ত-গঠন সম্বন্ধে তাদের প্রভাবের প্রবল প্রভেদ নিঃসংশয়।

এ কথা নিশ্চিত জানি, যদি আমি বাল্যকাল থেকে অধিকাংশ সময়ই শহরে আবদ্ধ থাকতেম তবে তার প্রভাবটা প্রচুর পরিমাণেই প্রকাশ পেত আমার চিন্তায় আমার রচনায়। বিদ্যায় বুদ্ধিতে সেটা বিশেষভাবে অনুভব করা যেত কি না জানি নে, কিন্তু ধাত হত অন্যপ্রকারের। বিশ্বের অযাচিত দান থেকে যে পরিমাণে নিয়ত বঞ্চিত হতেম সেই পরিমাণে বিশ্বকে প্রতিদানের সম্পদে আমার স্বভাবে দারিদ্র্য থেকে যেত। এইরকম আন্তরিক জিনিসটার বাজারদর নেই বলেই এর অভাব সম্বন্ধে যে মানুষ স্বচ্ছন্দে নিশ্চেতন থাকে সেরকম বেদনাহীন হতভাগ্য যে কৃপাপাত্র তা অন্তর্যামী জানেন। সংসারযাত্রায় সে যেমনি কৃতকৃত্য হোক, মানবজন্মের পূর্ণতায় সে চিরদিন থেকে যায় অকৃতার্থ।

সেইদিনই আমি প্রথম মনে করলেম, শুধু মুখের কথায় ফল হবে না; কেননা এ-সব কথা এখনকার কালের অভ্যাসবিরুদ্ধ। এই চিন্তাটা কেবলই মনের মধ্যে আন্দোলিত হতে লাগল যে এই আদর্শকে যতটা পারি কর্মক্ষেত্রে রচনা করে তুলতে হবে। তপোবনের বাহ্য অনুকরণ যাকে বলা যেতে পারে তা অগ্রাহ্য, কেননা এখনকার দিনে তা অসংগত, তা মিথ্যে। তার ভিতরকার সত্যটিকে আধুনিক জীবন-যাত্রার আধারে প্রতিষ্ঠিত করা চাই।

তার কিছুকাল পূর্বে শান্তিনিকেতন আশ্রম পিতৃদেব জনসাধারণকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। বিশেষ নিয়ম পালন করে অতিথিরা যাতে দুই-তিনদিন আধ্যাত্মিক শান্তির সাধনা করতে পারেন এই ছিল তাঁর সংকল্প। এজন্য উপাসনা-মন্দির লাইব্রেরি ও অন্যান্য ব্যবস্থা ছিল যথোচিত। কদাচিৎ সেই উদ্দেশ্যে কেউ কেউ এখানে আসতেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক আসতেন ছুটি যাপন করবার সুযোগে এবং বায়ুপরিবর্তনের সাহায্যে শারীরিক আরোগ্যসাধনায়।

আমার বয়স যখন অল্প পিতৃদেবের সঙ্গে ভ্রমণে বের হয়েছিলেম। ঘর ছেড়ে সেই আমার প্রথম বাহিরে যাত্রা। ইটকাঠের অরণ্য থেকে অবারিত আকাশের মধ্যে বৃহৎ মুক্তি এই প্রথম আমি ভোগ করেছি। প্রথম বললে সম্পূর্ণ ঠিক বলা হয় না। এর পূর্বে কলকাতায় একবার যখন ডেঙ্গুজ্বর সংক্রামক হয়ে উঠেছিল তখন আমার গুরুজনদের সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলেম গঙ্গার ধারে লালাবাবুদের বাগানে। বসুন্ধরার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সুদূরব্যাপ্ত আস্তরণের একটি প্রান্তে সেদিন আমার বসবার আসন জুটেছিল। সমস্ত দিন বিরাটের মধ্যে মনকে ছাড়া দিয়ে আমার বিস্ময়ের এবং

আনন্দের ক্লান্তি ছিল না। কিন্তু তখনো আমি আমাদের পূর্বনিয়মে ছিলেম বন্দী, অবাধে বেড়ানো ছিল নিষিদ্ধ। অর্থাৎ কলকাতায় ছিলেম ঢাকা খাঁচায় পাখি, কেবল চলার স্বাধীনতা নয় চোখের স্বাধীনতাও ছিল সংকীর্ণ; এখানে রইলুম দাঁড়ের পাখি, আকাশ খোলা চারি দিকে কিন্তু পায়ে শিকল। শান্তিনিকেতনে এসেই আমার জীবনে প্রথম সম্পূর্ণ ছাড়া পেয়েছি বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে। উপনয়নের পরেই আমি এখানে এসেছি। উপনয়ন-অনুষ্ঠানে ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের মধ্যে চেতনাকে পরিব্যাপ্ত করবার যে দীক্ষা পেয়েছিলেম পিতৃদেবের কাছ থেকে, এখানে বিশ্বদেবতার কাছ থেকে পেয়েছিলেম সেই দীক্ষাই। আমার জীবন নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকত প্রথম বয়সে এই সুযোগ যদি আমার না ঘটত। পিতৃদেব কোনো নিষেধ বা শাসন দিয়ে আমাকে বেষ্টন করেন নি। সকালবেলায় অল্প কিছুক্ষণ তাঁর কাছে ইংরেজি ও সংস্কৃত পড়তেম, তার পরে আমার অবাধ ছুটি। বোলপুর শহর তখন স্ফীত হয়ে ওঠে নি। চালের কলের ধোঁয়া আকাশকে কলুষিত আর তার দুর্গন্ধ সমল করে নি মলয় বাতাসকে। মাঠের মাঝখান দিয়ে যে লাল মাটির পথ চলে গেছে তাতে লোক-চলাচল ছিল অল্পই। বাঁধের জল ছিল পরিপূর্ণ প্রসারিত, চার দিক থেকে পলি-পড়া চাষের জমি তাকে কোণ-ঠেসা করে আনে নি। তার পশ্চিমের উঁচু পাড়ির উপর অক্ষুণ্ণ ছিল ঘন তালগাছের শ্রেণী। যাকে আমরা খোয়াই বলি, অর্থাৎ কাঁকুরে জমির মধ্যে দিয়ে বর্ষার জলধারার আঁকাবাঁকা উঁচুনিচু খোদাই পথ, সে ছিল নানা জাতের নানা আকৃতির পাথরে পরিকীর্ণ; কোনোটাতে শির-কাটা পাতার ছাপ, কোনোটা লম্বা আঁশওয়ালা কাঠের টুকরোর মতো, কোনোটা স্ফটিকের দানা সাজানো, কোনোটা অগ্নিগলিত মসৃণ। মনে আছে ১৮৭০ খৃস্টাব্দের ফরাসিপ্রশীয় যুদ্ধের পরে একজন ফরাসি সৈনিক আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল; সে ফরাসি রান্না রেঁধে খাওয়াত আমার দাদাদের আর তাঁদের ফরাসি ভাষা শেখাত। তখন আমার দাদারা একবার বোলপুরে এসেছিলেন, সে ছিল সঙ্গে। একটা ছোটো হাতুড়ি নিয়ে আর একটা থলি কোমরে ঝুলিয়ে সে এই খোয়াইয়ে দুর্লভ পাথর সন্ধান করে বেড়াত। একদিন একটা বড়োগোছের স্ফটিক সে পেয়েছিল, সেটাকে আংটির মতো বাঁধিয়ে কলকাতার কোন্ ধনীর কাছে বেচেছিল আশি টাকায়। আমিও সমস্ত দুপুরবেলা খোয়াইয়ে প্রবেশ করে নানারকম পাথর সংগ্রহ করেছি, ধন উপার্জনের লোভে নয় পাথর উপার্জন করতেই। মাঠের জল চুঁইয়ে সেই খোয়াইয়ের এক জায়গায় উপরের ডাঙা থেকে ছোটো ঝরনা ঝরে পড়ত। সেখানে জমেছিল একটি ছোটো জলাশয়, তার সাদাটে ঘোলা জল আমার পক্ষে ডুব দিয়ে স্নান করবার মতো যথেষ্ট গভীর। সেই ডোবাটা

উপচিয়ে ক্ষীণ স্বচ্ছ জলের স্রোত ঝির্ ঝির্ করে বয়ে যেত নানা শাখাপ্রশাখায়, ছোটো ছোটো মাছ সেই স্রোতে উজানমুখে সাঁতার কাটত। আমি জলের ধার বেয়ে বেয়ে আবিষ্কার করতে বেরতুম সেই শিশুভূবিভাগের নতুন নতুন বালখিল্য গিরিনদী। মাঝে মাঝে পাওয়া যেত পাড়ির গায়ে গহ্বর। তার মধ্যে নিজেকে প্রচ্ছন্ন করে অচেনা জিওগ্রাফির মধ্যে ভ্রমণকারীর গৌরব অনুভব করতুম। খোয়াইয়ের স্থানে স্থানে যেখানে মাটি জমা সেখানে বেঁটে বেঁটে বুনো জাম বুনো খেজুর, কোথাও-বা ঘন কাশ লম্বা হয়ে উঠেছে। উপরে দূরমাঠে গোরু চরছে, সাঁওতালরা কোথাও করছে চাষ, কোথাও চলেছে পথহীন প্রান্তরে আর্তস্বরে গোরুর গাড়ি, কিন্তু এই খোয়াইয়ের গহ্বরে জনপ্রাণী নেই। ছায়ায় রৌদ্রে বিচিত্র লাল কাঁকরের এই নিভৃত জগৎ, না দেয় ফল, না দেয় ফুল, না উৎপন্ন করে ফসল; এখানে না আছে কোনো জীব-জন্তুর বাসা; এখানে কেবল দেখি কোনো আর্টিস্ট-বিধাতার বিনা কারণে একখানা যেমন-তেমন ছবি আঁকবার শখ; উপরে মেঘহীন নীল আকাশ রৌদ্রে পাণ্ডুর, আর নীচে লাল কাঁকরের রঙ পড়েছে মোটা তুলিতে নানারকমের বাঁকাচোরা বন্ধুর রেখায়, সৃষ্টিকর্তার ছেলেমানুষি ছাড়া এর মধ্যে আর কিছুই দেখা যায় না। বালকের খেলার সঙ্গেই এর রচনার ছন্দের মিল; এর পাহাড়, এর নদী, এর জলাশয়, এর গুহাগহ্বর সবই বালকের মনেরই পরিমাপে। এইখানে একলা আপন মনে আমার বেলা কেটেছে অনেকদিন, কেউ আমার কাজের হিসাব চায় নি, কারো কাছে আমার সময়ের জবাব-দিহি ছিল না। এখন এ খোয়াইয়ের সে চেহারা নেই। বৎসরে বৎসরে রাস্তা-মেরামতের মসলা এর উপর থেকে চেঁচে নিয়ে একে নগ্ন দরিদ্র করে দিয়েছে, চলে গেছে এর বৈচিত্র্য, এর স্বাভাবিক লাবণ্য। তখন শান্তিনিকেতনে আর-একটি রোমান্টিক অর্থাৎ কাহিনীরসের জিনিস ছিল। যে সর্দার ছিল এই বাগানের প্রহরী, এককালে সেই ছিল ডাকাতের দলের নায়ক। তখন সে বৃদ্ধ, দীর্ঘ তার দেহ, মাংসের বাহুল্য মাত্র নেই, শ্যামবর্ণ, তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি, লম্বা বাঁশের লাঠি হাতে, কণ্ঠস্বরটা ভাঙা ভাঙা গোছের। বোধ হয় সকলে জানেন, আজ শান্তিনিকেতনে যে অতিপ্রাচীন যুগল ছাতিম গাছ মালতীলতায় আচ্ছন্ন, এককালে মস্ত মাঠের মধ্যে ঐ দুটি ছাড়া আর গাছ ছিল না। ঐ গাছতলা ছিল ডাকাতের আড্ডা। ছায়াপ্রত্যাশী অনেক ক্লান্ত পথিক এই ছাতিমতলায় হয় ধন নয় প্রাণ নয় দুইই হারিয়েছে সেই শিথিল রাষ্ট্রশাসনের কালে। এই সর্দার সেই ডাকাতি-কাহিনীর শেষ পরিচ্ছেদের শেষ পরিশিষ্ট বলেই খ্যাত। বামাচারী তান্ত্রিক শাক্তের এই দেশে মা-কালীর খর্পরে এ যে নররক্ত জোগায় নি তা আমি বিশ্বাস করি নে। আশ্রমের সম্পর্কে কোনো রক্তচক্ষু রক্ততিলকলাঞ্ছিত ভদ্র বংশের

শাক্তকে জানতুম যিনি মহামাংসপ্রসাদ ভোগ করেছেন বলে জনশ্রুতি কানে এসেছে।

একদা এই দুটিমাত্র ছাতিমগাছের ছায়া লক্ষ্য করে দূরপথযাত্রী পথিকেরা বিশ্রামের আশায় এখানে আসত। আমার পিতৃদেবও রায়পুরের ভুবন সিংহের বাড়িতে নিমন্ত্রণ সেরে পালকি করে যখন একদিন ফিরছিলেন তখন মাঠের মাঝখানে এই দুটি গাছের আহ্বান তাঁর মনে এসে পৌচেছিল। এইখানে শান্তির প্রত্যাশায় রায়পুরের সিংহদের কাছ থেকে এই জমি তিনি দানগ্রহণ করেছিলেন। একখানি একতলা বাড়ি পত্তন করে এবং রুক্ষ রিক্ত ভূমিতে অনেকগুলি গাছ রোপণ করে সাধনার জন্ত এখানে তিনি মাঝে মাঝে আশ্রয় গ্রহণ করতেন। সেই সময়ে প্রায়ই তাঁর ছিল হিমালয়ে নির্জনবাস। যখন রেললাইন স্থাপিত হল তখন বোলপুর স্টেশন ছিল পশ্চিমে যাবার পথে, অন্ত লাইন তখন ছিল না। তাই হিমালয়ে যাবার মুখে বোলপুরে পিতা তাঁর প্রথম যাত্রা-ভঙ্গ করতেন। আমি যে বারে তাঁর সঙ্গে এলুম সে বারেও ড্যালহৌসি পাহাড়ে যাবার পথে তিনি বোলপুরে অবতরণ করেন। আমার মনে পড়ে সকালবেলায় সূর্য ওঠবার পূর্বে তিনি ধ্যানে বসতেন অসমাপ্ত জলশূন্ত পুষ্করিণীর দক্ষিণ পাড়ির উপরে। সূর্যাস্তকালে তাঁর ধ্যানের আসন ছিল ছাতিমতলায়। এখন ছাতিম গাছ বেষ্টন করে অনেক গাছপালা হয়েছে, তখন তার কিছুই ছিল না, সামনে অবারিত মাঠ পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত ছিল একটানা। আমার 'পরে কটি বিশেষ কাজের ভার ছিল। ভগবদ্‌গীতা-গ্রন্থে কতকগুলি শ্লোক তিনি চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন, আমি প্রতিদিন কিছু কিছু তাই কপি করে দিতুম তাঁকে। তার পরে সন্ধ্যাবেলা খোলা আকাশের নীচে বসে সৌরজগতের গ্রহমণ্ডলের বিবরণ বলতেন আমাকে, আমি শুনতুম একান্ত ঔৎসুক্যের সঙ্গে। মনে পড়ে আমি তাঁর মুখের সেই জ্যোতিষের ব্যাখ্যা লিখে তাঁকে শুনিয়েছিলুম। এই বর্ণনা থেকে বোঝা যাবে শান্তিনিকেতনের কোন্ ছবি আমার মনের মধ্যে কোন্ রসে ছাপা হয়ে গেছে। প্রথমত সেই বালকবয়সে এখানকার প্রকৃতির কাছ থেকে যে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেম —এখানকার অনবরুদ্ধ আকাশ ও মাঠ, দূর হতে প্রতিভাত নীলাভ শাল ও তাল শ্রেণীর সমুচ্চ শাখাপুঞ্জে শ্যামলা শান্তি, স্মৃতির সম্পদরূপে চিরকাল আমার স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তার পরে এই আকাশে এই আলোকে দেখেছি সকালে বিকালে পিতৃদেবের পূজার নিঃশব্দ নিবেদন, তার গভীর গাম্ভীর্য। তখন এখানে আর কিছুই ছিল না, না ছিল এত গাছপালা, না ছিল মানুষের এবং কাজের এত ভিড়, কেবল দূরব্যাপী নিস্তব্ধতার মধ্যে ছিল একটি নির্মল মহিমা।

তার পরে সেদিনকার বালক যখন যৌবনের প্রৌঢ়বিভাগে তখন বালকদের শিক্ষার

তপোবন তাকে দূরে খুঁজতে হবে কেন। আমি পিতাকে গিয়ে জানালেম, শান্তিনিকেতন এখন প্রায় শূন্য অবস্থায়, সেখানে যদি একটি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করতে পারি তা হলে তাকে সার্থকতা দেওয়া হয়। তিনি তখনই উৎসাহের সঙ্গে সম্মতি দিলেন। বাধা ছিল আমার আত্মীয়দের দিক থেকে। পাছে শান্তিনিকেতনের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে যায় এই ছিল তাঁদের আশঙ্কা। এখনকার কালের জোয়ার-জলে নানা দিক থেকে ভাবের পরিবর্তন আবর্ত রচনা করে আসবে না এ আশা করা যায় না— যদি তার থেকে এড়াবার ইচ্ছা করি তা হলে আদর্শকে বিশুদ্ধ রাখতে গিয়ে তাকে নির্জীব করে রাখতে হয়। গাছপালা জীবজন্তু প্রভৃতি প্রাণবান বস্তু মাত্রেরই মধ্যে একই সময়ে বিকৃতি ও সংস্কৃতি চলতেই থাকে, এই বৈপরীত্যের ক্রিয়াকে অত্যন্ত ভয় করতে গেলে প্রাণের সঙ্গে ব্যবহার বন্ধ রাখতে হয়। এই তর্ক নিয়ে আমার সংকল্পসাধনে কিছুদিন প্রবল-ভাবেই ব্যাঘাত চলেছিল।

এই তো বাইরের বাধা। অপর দিকে আমার আর্থিক সংগতি নিতান্ত সামান্য ছিল, আর বিদ্যালয়ের বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ছিলই না। সাধ্যমত কিছু কিছু আয়োজন করছি আর এই কথা নিয়ে আমার আলাপ এগোচ্ছে নানা লোকের সঙ্গে, এমনি অগোচরভাবে ভিৎপত্তন চলছিল। কিন্তু বিদ্যালয়ের কাজে শান্তিনিকেতন আশ্রমকে তখন আমার অধিকারে পেয়েছিলেম। এই সময়ে একটি তরুণ যুবকের সঙ্গে আমার আলাপ হল, তাকে বালক বললেই হয়। বোধ করি আঠারো পেরিয়ে সে উনিশে পড়েছে। তার নাম সতীশচন্দ্র রায়, কলেজে পড়ে, বি. এ. ক্লাসে। তার বন্ধু অজিতকুমার চক্রবর্তী সতীশের লেখা কবিতার খাতা কিছুদিন পূর্বে আমার হাতে দিয়ে গিয়েছিল। পড়ে দেখে আমার সন্দেহমাত্র ছিল না যে, এই ছেলেটির প্রতিভা আছে, কেবলমাত্র লেখবার ক্ষমতা নয়। কিছুদিন পরে বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে সতীশ এলেন আমার কাছে। শান্ত নম্র স্বল্পভাষী সৌম্যমূর্তি, দেখে মন স্বতই আকৃষ্ট হয়। সতীশকে আমি শক্তিশালী বলে জেনেছিলেম বলেই তার রচনায় যেখানে শৈথিল্য দেখেছি স্পষ্ট করে নির্দেশ করতে সংকোচ বোধ করি নি। বিশেষভাবে ছন্দ নিয়ে তার লেখার প্রত্যেক লাইন ধরে আমি আলোচনা করেছি। অজিত আমার কঠোর বিচারে বিচলিত হয়েছিল কিন্তু সতীশ সহজেই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে নিতে পারলে। অল্প দিনেই সতীশের যে পরিচয় পাওয়া গেল আমাকে তা বিস্মিত করেছিল। যেমন গভীর তেমনি বিস্তৃত ছিল তার সাহিত্যরসের অভিজ্ঞতা। ব্রাউনিঙের কবিতা সে যেরকম করে আত্মগত করেছিল এমন দেখা যায় না। শেক্সপীয়রের রচনায় যেমন ছিল তার অধিকার তেমনি আনন্দ। আমার এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল যে, সতীশের কাব্যরচনায় একটা বলিষ্ঠ

নাট্যপ্রকৃতির বিকাশ দেখা দেবে, এবং সেই দিক থেকে সে একটা সম্পূর্ণ নতুন পথের প্রবর্তন করবে বাংলাসাহিত্যে। তার স্বভাবে একটি দুর্লভ লক্ষণ দেখেছি, যদিও তার বয়স কাঁচা তবু নিজের রচনার 'পরে তার অন্ধ আসক্তি ছিল না। সেগুলিকে আপনার থেকে বাইরে রেখে সে দেখতে পারত, এবং নির্মমভাবে সেগুলিকে বাইরে ফেলে দেওয়া তার পক্ষে ছিল সহজ। তাই তার সেদিনকার লেখার কোনো চিহ্ন অনতিকাল পরেও আমি দেখি নি। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যেত, তার কবিস্বভাবের যে বৈশিষ্ট্য ছিল তাকে বলা যেতে পারে বহিরাশ্রয়িতা বা অব্‌জেক্‌টিভিটি। বিশ্লেষণ ও ধারণা শক্তি তার যথেষ্ট ছিল, কিন্তু স্বভাবের যে পরিচয় আমাকে তার দিকে অত্যন্ত আকর্ষণ করেছিল সে তার মনের স্পর্শচেতনা। যে জগতে সে জন্মেছিল তার কোথাও ছিল না তার ঔদাসীন্য। একই কালে ভোগের দ্বারা এবং ত্যাগের দ্বারা সর্বত্র আপন অধিকার প্রসারিত করবার শক্তি নিয়েই সে এসেছিল। তার অনুরাগ ছিল আনন্দ ছিল নানা দিকে ব্যাপক কিন্তু তার আসক্তি ছিল না। মনে আছে আমি তাকে একদিন বলেছিলেম, তুমি কবি ভর্তৃহরি, এই পৃথিবীতে তুমি রাজা এবং তুমি সন্ন্যাসী।

সে সময়ে আমার মনের মধ্যে নিয়ত ছিল শান্তিনিকেতন আশ্রমের সংকল্পনা। আমার নতুন-পাওয়া বালক-বন্ধুর সঙ্গে আমার সেই আলাপ চলত। তার স্বাভাবিক ধ্যানদৃষ্টিতে সমস্তটাকে সে দেখতে পেত প্রত্যক্ষ। উতঙ্কের যে উপাখ্যানটি সে লিখেছিল তাতে সেই ছবিটিকে সে আঁকতে চেষ্টা করেছে।

অবশেষে আনন্দের উৎসাহ সে আর সম্বরণ করতে পারলে না। সে বললে, আমাকে আপনার কাজে নিন। খুব খুশি হলেম কিন্তু কিছুতে তখন রাজি হলেম না। অবস্থা তাদের ভালো নয় জানতেম। বি. এ. পাস করে এবং পরে আইনের পরীক্ষা দিয়ে সে সংসার চালাতে পারবে, তার অভিভাবকদের এই ইচ্ছা ছিল সন্দেহ নেই। তখনকার মতো আমি তাকে ঠেকিয়ে রেখে দিলেম।

এমন সময় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। আমার নৈবেদ্যের কবিতাগুলি প্রকাশ হচ্ছিল তার কিছুকাল পূর্বে। এই কবিতাগুলি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তাঁর সম্পাদিত Twentieth Century পত্রিকায় এই রচনাগুলির যে প্রশংসা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন সেকালে সেরকম উদার প্রশংসা আমি আর কোথাও পাই নি। বস্তুত এর অনেক কাল পরে এই-সকল কবিতার কিছু অংশ এবং খেয়া ও গীতাঞ্জলি থেকে এই জাতীয় কবিতার ইংরেজি অনুবাদের যোগে যে সম্মান পেয়েছিলেম তিনি আমাকে সেইরকম অকুণ্ঠিত সম্মান দিয়েছিলেন সেই সময়েই। এই পরিচয় উপলক্ষেই তিনি জানতে পেরেছিলেন আমার সংকল্প, এবং খবর পেয়েছিলেন যে,

শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়-স্থাপনের প্রস্তাবে আমি পিতার সম্মতি পেয়েছি। তিনি আমাকে বললেন, এই সংকল্পকে কার্যে প্রতিষ্ঠিত করতে বিলম্ব করবার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি তাঁর কয়েকটি অনুগত শিষ্য ও ছাত্র নিয়ে আশ্রমের কাজে প্রবেশ করলেন। তখনই আমার তরফে ছাত্র ছিল রথীন্দ্রনাথ ও তার কনিষ্ঠ শমীন্দ্রনাথ। আর অল্প কয়েকজনকে তিনি যোগ করে দিলেন। সংখ্যা অল্প না হলে বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণতা অসম্ভব হত। তার কারণ, প্রাচীন আদর্শ অনুসারে আমার এই ছিল মত যে, শিক্ষাদানব্যাপারে গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ হওয়া উচিত আধ্যাত্মিক। অর্থাৎ শিক্ষা দেওয়াটা গুরুর আপন সাধনারই প্রধান অঙ্গ। বিদ্যার সম্পদ যে পেয়েছে তার নিজেরই নিঃস্বার্থ দায়িত্ব সেই সম্পদ দান করা। আমাদের সমাজে এই মহৎ দায়িত্ব আধুনিক কাল পর্যন্ত স্বীকৃত হয়েছে। এখন তার লোপ হচ্ছে ক্রমশই।

তখন যে কয়টি ছাত্র নিয়ে বিদ্যালয়ের আরম্ভ হল তাদের কাছ থেকে বেতন বা আহার্য-ব্যয় নেওয়া হত না, তাদের জীবনযাত্রার প্রায় সমস্ত দায় নিজের স্বল্প সম্বল থেকেই স্বীকার করেছি। অধ্যাপনার অধিকাংশ ভার যদি উপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রেবাচাঁদ— তাঁর এখনকার উপাধি অণিমানন্দ— বহন না করতেন তা হলে কাজ চালানো একেবারে অসাধ্য হত। তখনকার আয়োজন ছিল দরিদ্রের মতো, আহার-ব্যবহার ছিল দরিদ্রের আদর্শে। তখন উপাধ্যায় আমাকে যে গুরুদেব উপাধি দিয়েছিলেন আজ পর্যন্ত আশ্রমবাসীদের কাছে আমাকে সেই উপাধি বহন করতে হচ্ছে। আশ্রমের আরম্ভ থেকে বহুকাল পর্যন্ত তার আর্থিক ভার আমার পক্ষে যেমন দুর্বহ হয়েছে, এই উপাধিটিও তেমনি। অর্থকৃচ্ছ্র এবং এই উপাধি কোনোটাকেই আরামে বহন করতে পারি নে কিন্তু দুটো বোঝাই যে ভাগ্য আমার স্কন্ধে চাপিয়েছেন তাঁর হাতের দানস্বরূপ এই দুঃখ এবং লাঞ্ছনা থেকে শেষ পর্যন্তই নিষ্কৃতি পাবার আশা রাখি নে।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সূচনার মূল কথাটা বিস্তারিত করে জানালুম। এইসঙ্গে উপাধ্যায়ের কাছে আমার অপরিশোধনীয় কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।[১] তার পরে সেই কবি-বালক সতীশের কথাটাও শেষ করে দিই।

১ কেহ কেহ এমন কথা লিখেছেন যে, উপাধ্যায় ও রেবাচাঁদ খৃস্টান ছিলেন, তাই নিয়ে পিতৃদেব আপত্তি করেছিলেন। এ কথা সত্য নয়। আমি নিজে জানি এই কথা তুলে আমাদের কোনো আত্মীয় তাঁর কাছে অভিযোগ করেছিলেন। তিনি কেবল এই কথাটি বলেছিলেন, তোমরা কিছু ভেবো না। ওখানকার জন্যে কোনো ভয় নেই। আমি ওখানে শান্তং শিবমদ্বৈতমের প্রতিষ্ঠা করে এসেছি।

বি. এ. পরীক্ষা তার আসন্ন হয়ে এল। অধ্যাপকেরা তার কাছে আশা করেছিল খুব বড়ো রকমেরই কৃতিত্ব। ঠিক সেই সময়েই সে পরীক্ষা দিল না। তার ভয় হল সে পাস করবে। পাস করলেই তার উপরে সংসারের যে-সমস্ত দাবি চেপে বসবে তার পীড়ন ও প্রলোভন থেকে মুক্তি পাওয়া পাছে তার পক্ষে অসাধ্য হয় এইজন্যেই সে পিছিয়ে গেল শেষ মুহূর্তে। সংসারের দিক থেকে জীবনে সে একটা মস্ত ট্র্যাজিডির পত্তন করলে। আমি তার আর্থিক অভাব কিছু পরিমাণে পূরণ করবার যতই চেষ্টা করেছি কিছুতেই তাকে রাজি করতে পারি নি। মাঝে মাঝে গোপনে তাদের বাড়িতে পাঠিয়েছি টাকা। কিন্তু সে সামান্য। তখন আমার বিক্রি করবার যোগ্য যা-কিছু ছিল প্রায় সব শেষ হয়ে গেছে— অন্তঃপুরের সম্বল এবং বাইরের সম্বল। কয়েকটা আয়জনক বইয়ের বিক্রয়স্বত্ব কয়েক বৎসরের মেয়াদে দিয়েছি পরের হাতে। হিসাবের দুর্বোধ জটিলতায় সে মেয়াদ অতিক্রম করতে অতি দীর্ঘকাল লেগেছে। সমুদ্রতীরবাসের লোভে পুরীতে একটা বাড়ি করেছিলুম। সে বাড়ি একদিনও ভোগ করবার পূর্বে আশ্রমের ক্ষুধার দাবিতে বিক্রি হয়ে গেল। তার পরে যে সম্বল বাকি রইল তাকে বলে উচ্চহারের সুদে দেনা করবার ক্রেডিট। সতীশ জেনেশুনেই এখানকার সেই অগাধ দারিদ্র্যের মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছিল প্রসন্ন মনে। কিন্তু তার আনন্দের অবধি ছিল না— এখানকার প্রকৃতির সংসর্গের আনন্দ, সাহিত্যসম্ভোগের আনন্দ, প্রতি মুহূর্তে আত্মনিবেদনের আনন্দ।

এই অপর্যাপ্ত আনন্দ সে সঞ্চার করত তার ছাত্রদের মনে। মনে পড়ে কতদিন তাকে পাশে নিয়ে শালবীথিকায় পায়চারি করেছি নানা তত্ত্বের আলোচনা করতে করতে— রাত্রি এগারোটা দুপুর হয়ে যেত— সমস্ত আশ্রম হত নিস্তব্ধ নিদ্রামগ্ন। তারই কথা মনে করে আমি লিখেছি—

কতদিন এই পাতা-ঝরা
বীথিকায়, পুষ্পগন্ধে বসন্তের আগমনী-ভরা
সায়াহ্নে দুজনে মোরা ছায়াতে অঙ্কিত চন্দ্রালোকে
ফিরেছি গুঞ্জিত আলাপনে। তার সেই মুগ্ধ চোখে
বিশ্ব দেখা দিয়েছিল নন্দনমন্দার রঙে রাঙা।
যৌবনতুফান-লাগা সেদিনের কত নিদ্রাভাঙা
জ্যোৎস্না-মুগ্ধ রজনীর সৌহার্দ্যের সুধারসধারা
তোমার ছায়ার মাঝে দেখা দিল, হয়ে গেল সারা।

গভীর আনন্দক্ষণ কতদিন তব মঞ্জরীতে
একান্ত মিশিয়াছিল একখানি অখণ্ড সংগীতে
আলোকে আলাপে হাস্যে, বনের চঞ্চল আন্দোলনে,
বাতাসের উদাস নিশ্বাসে।—

এমন অবিমিশ্র শ্রদ্ধা, অবিচলিত অকৃত্রিম প্রীতি, এমন সর্বভারবাহী সর্বত্যাগী সৌহার্দ্য জীবনে কত যে দুর্লভ তা এই সত্তর বৎসরের অভিজ্ঞতায় জেনেছি। তাই সেই আমার কিশোর বন্ধুর অকাল তিরোভাবের বেদনা আজ পর্যন্ত কিছুতেই ভুলতে পারি নি।

এই আশ্রমবিদ্যালয়ের সুদূর আরম্ভ-কালের প্রথম সংকল্পন, তার দুঃখ তার আনন্দ তার অভাব তার পূর্ণতা, তার প্রিয় সঙ্গ, প্রিয় বিচ্ছেদ, নিষ্ঠুর বিরুদ্ধতা ও অযাচিত আনুকূল্যের অল্পই কিছু আভাস দিলেম এই লেখায়। তার পরে শুধু আমাদের ইচ্ছা নয়, কালের ধর্ম কাজ করছে; এনেছে কত পরিবর্তন, কত নতুন আশা ও ব্যর্থতা, কত সুহৃদের অভাবনীয় আত্মনিবেদন, কত অজানা লোকের অহৈতুক শত্রুতা, কত মিথ্যা নিন্দা ও প্রশংসা, কত দুঃসাধ্য সমস্যা— আর্থিক ও পারমার্থিক। পারিতোষিক পাই বা না পাই, নিজের ক্ষতি করেছি সাধ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত— অবশেষে ক্লান্ত দেহ ও জীর্ণ স্বাস্থ্য নিয়ে আমারও বিদায় নেবার দিন এল— প্রণাম করে যাই তাঁকে যিনি সুদীর্ঘ কঠোর দুর্গম পথে আমাকে এতকাল চালনা করে নিয়ে এসেছেন। এই এতকালের সাধনার বিফলতা প্রকাশ পায় বাইরে, এর সার্থকতার সম্পূর্ণ প্রমাণ থেকে যায় অলিখিত ইতিহাসের অদৃশ্য অক্ষরে।

আশ্বিন ১৩৪০

বিশ্বভারতী

২৭।২৩

॥ যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্ ॥

বিশ্বভারতী

১

মানব সংসারে জ্ঞানালোকের দিয়ালি-উৎসব চলিতেছে। প্রত্যেক জাতি আপনার আলোটিকে বড়ো করিয়া জ্বালাইলে তবে সকলে মিলিয়া এই উৎসব সমাধা হইবে। কোনো জাতির নিজের বিশেষ প্রদীপখানি যদি ভাঙিয়া দেওয়া যায়, অথবা তাহার অস্তিত্ব ভুলাইয়া দেওয়া যায় তবে তাহাতে সমস্ত জগতের ক্ষতি করা হয়।

এ কথা প্রমাণ হইয়া গেছে যে, ভারতবর্ষ নিজেরই মানসশক্তি দিয়া বিশ্বসমস্যা গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছে এবং আপন বুদ্ধিতে তাহার সমাধানের চেষ্টা পাইয়াছে। সেই শিক্ষাই আমাদের দেশের পক্ষে সত্য শিক্ষা যাহাতে করিয়া আমাদের দেশের নিজের মনটিকে সত্য আহরণ করিতে এবং সত্যকে নিজের শক্তির দ্বারা প্রকাশ করিতে সক্ষম করে। পুনরাবৃত্তি করিবার শিক্ষা মনের শিক্ষা নহে, তাহা কলের দ্বারাও ঘটিতে পারে।

ভারতবর্ষ যখন নিজের শক্তিতে মনন করিয়াছে তখন তাহার মনের ঐক্য ছিল— এখন সেই মন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে। এখন তাহার মনের বড়ো বড়ো শাখাগুলি একটি কাণ্ডের মধ্যে নিজেদের বৃহৎ যোগ অনুভব করিতে ভুলিয়া গেছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এক-চেতনাসূত্রের বিচ্ছেদই সমস্ত দেহের পক্ষে সাংঘাতিক। সেইরূপ, ভারতবর্ষের যে মন আজ হিন্দু বৌদ্ধ জৈন শিখ মুসলমান খৃস্টানের মধ্যে বিভক্ত ও বিশ্লিষ্ট হইয়া আছে সে মন আপনার করিয়া কিছু গ্রহণ করিতে বা আপনার করিয়া কিছু দান করিতে পারিতেছে না। দশ আঙুলকে যুক্ত করিয়া অঞ্জলি বাঁধিতে হয়— নেবার বেলাও তাহার প্রয়োজন, দেবার বেলাও। অতএব ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় বৈদিক পৌরাণিক বৌদ্ধ জৈন মুসলমান প্রভৃতি সমস্ত চিত্তকে সম্মিলিত ও চিত্তসম্পদকে সংগৃহীত করিতে হইবে; এই নানা ধারা দিয়া ভারতবর্ষের মন কেমন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে তাহা জানিতে হইবে। এইরূপ উপায়েই ভারতবর্ষ আপনার নানা বিভাগের মধ্য দিয়া আপনার সমগ্রতা উপলব্ধি করিতে পারিবে। তেমনি করিয়া আপনাকে বিস্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট করিয়া না জানিলে, যে শিক্ষা সে গ্রহণ করিবে তাহা ভিক্ষার মতো গ্রহণ করিবে। সেরূপ ভিক্ষাজীবিতায় কখনো কোনো জাতি সম্পদশালী হইতে পারে না।

দ্বিতীয় কথা এই যে, শিক্ষার প্রকৃত ক্ষেত্র সেইখানেই যেখানে বিদ্যার উদ্ভাবনা চলিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ বিদ্যার উৎপাদন, তাহার গৌণ কাজ সেই বিদ্যাকে দান করা। বিদ্যার ক্ষেত্রে সেই-সকল মনীষীদিগকে আহ্বান করিতে হইবে যাঁহারা নিজের শক্তি ও সাধনা -দ্বারা অনুসন্ধান আবিষ্কার ও সৃষ্টির কার্যে নিবিষ্ট আছেন। তাঁহারা যেখানেই নিজের কাজে একত্র মিলিত হইবেন সেইখানে স্বভাবতই জ্ঞানের উৎস উৎসারিত হইবে, সেই উৎসধারার নির্ঝরিণীতটেই দেশের সত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইবে। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের নকল করিয়া হইবে না।

তৃতীয় কথা এই যে, সকল দেশেই শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীণ জীবনযাত্রার যোগ আছে। আমাদের দেশে কেবলমাত্র কেরানিগিরি ওকালতি ডাক্তারি ডেপুটিগিরি দারোগাগিরি মুন্সেফি প্রভৃতি ভদ্রসমাজে প্রচলিত কয়েকটি ব্যবসায়ের সঙ্গেই আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ যোগ। যেখানে চাষ হইতেছে, কলুর ঘানি ও কুমারের চাক ঘুরিতেছে, সেখানে এ শিক্ষার কোনো স্পর্শও পৌঁছায় নাই। অন্য কোনো শিক্ষিত দেশে এমন দুর্যোগ ঘটিতে দেখা যায় না। তাহার কারণ, আমাদের নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের মাটির উপরে নাই, তাহা পরগাছার মতো পরদেশীয় বনস্পতির শাখায় ঝুলিতেছে। ভারতবর্ষে যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র, তাহার কৃষিতত্ত্ব, তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা, তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠাস্থানের চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গো-পালন করিবে, কাপড় বুনিবে এবং নিজের আর্থিক সম্বল -লাভের জন্য সমবায়প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র শিক্ষক ও চারি দিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে।

এইরূপ আদর্শ বিদ্যালয়কে আমি 'বিশ্বভারতী' নাম দিবার প্রস্তাব করিয়াছি।

বৈশাখ ১৩২৬

২

বর্তমান কালে আমাদের দেশের উপরে যে শক্তি, যে শাসন, যে ইচ্ছা কাজ করছে, সমস্তই বাইরের দিক থেকে। সে এত প্রবল যে তাকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করে আমরা কোনো ভাবনাও ভাবতে পারি নে। এতে করে আমাদের মনের মনীষা প্রতিদিন ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। আমরা অন্যের ইচ্ছাকে বহন করি, অন্যের শিক্ষাকে গ্রহণ করি,

অন্তের বাণীকে আবৃত্তি করি, তাতে করে প্রকৃতিস্থ হতে আমাদের বাধা দেয়। এইজন্যে মাঝে মাঝে যে চিত্তক্ষোভ উপস্থিত হয় তাতে কল্যাণের পথ থেকে আমাদের ভ্রষ্ট করে। এই অবস্থায় একদল লোক গর্হিত উপায়ে বিদ্বেষবুদ্ধিকে তৃপ্তিদান করাকেই কর্তব্য বলে মনে করে, আর-এক দল লোক চাটুকারবৃত্তি বা চরবৃত্তির দ্বারা যেমন করে হোক অপমানের অন্ন খুঁটে খাবার জন্যে রাষ্ট্রীয় আবর্জনাকুণ্ডের আশেপাশে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। এমন অবস্থায় বড়ো করে দৃষ্টি করা বা বড়ো করে সৃষ্টি করা সম্ভবপর হয় না; মানুষ অন্তরে বাহিরে অত্যন্ত ছোটো হয়ে যায়, নিজের প্রতি শ্রদ্ধা হারায়।

যে ফলের চারাগাছকে বাইরে থেকে ছাগলে মুড়িয়ে খাবার আশঙ্কা আছে সেই চারাকে বেড়ার মধ্যে রাখার দরকার হয়। সেই নিভৃত আশ্রয়ে থেকে গাছ যখন বড়ো হয়ে ওঠে তখন সে ছাগলের নাগালের উপর উঠে যায়। প্রথম যখন আশ্রমে বিদ্যালয়-স্থাপনের সংকল্প আমার মনে আসে তখন আমি মনে করেছিলুম, ভারতবর্ষের মধ্যে এইখানে একটি বেড়া-দেওয়া স্থানে আশ্রয় নেব। সেখানে বাহ্য শক্তির দ্বারা অভিভূতির থেকে রক্ষা করে আমাদের মনকে একটু স্বাতন্ত্র্য দেবার চেষ্টা করা যাবে। সেখানে চাঞ্চল্য থেকে, রিপুর আক্রমণ থেকে মনকে মুক্ত রেখে বড়ো করে শ্রেয়ের কথা চিন্তা করব এবং সত্য করে শ্রেয়ের সাধনা করতে থাকব।

আজকাল আমরা রাষ্ট্রনৈতিক তপস্যাকেই মুক্তির তপস্যা বলে ধরে নিয়েছি। দল বেঁধে কান্নাকেই সেই তপস্যার সাধনা বলে মনে করেছিলুম। সেই বিরাট কান্নার আয়োজনে অন্য-সকল কাজকর্ম বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। এইটেতে আমি অত্যন্ত পীড়াবোধ করেছিলুম।

আমাদের দেশে চিরকাল জানি, আত্মার মুক্তি এমন একটা মুক্তি যেটা লাভ করলে সমস্ত বন্ধন তুচ্ছ হয়ে যায়। সেই মুক্তিটাই, সেই স্বার্থের বন্ধন রিপুর বন্ধন থেকে মুক্তিটাই, আমাদের লক্ষ্য; সেই কথাটাকে কান দিয়ে শোনা এবং সত্য বলে জানার একটা জায়গা আমাদের থাকা চাই। এই মুক্তিটা যে কর্মহীনতা শক্তিহীনতার রূপান্তর তা নয়। এতে যে নিরাসক্তি আনে তা তামসিক নয়; তাতে মনকে অভয় করে, কর্মকে বিশুদ্ধ করে, লোভ মোহকে দূর করে দেয়।

তাই বলে এ কথা বলি নে যে, বাইরের বন্ধনে কিছুমাত্র শ্রেয় আছে; বলি নে যে, তাকে অলংকার করে গলায় জড়িয়ে রেখে দিতে হবে। সেও মন্দ, কিন্তু অন্তরে যে মুক্তি তাকে এই বন্ধন পরাভূত ও অপমানিত করতে পারে না। সেই মুক্তির তিলক ললাটে যদি পরি তা হলে রাজসিংহাসনের উপরে মাথা তুলতে পারি এবং বণিকের ভূরি-সঞ্চয়কে তুচ্ছ করার অধিকার আমাদের জন্মে।

যাই হোক, আমার মনে এই কথাটি ছিল যে, পাশ্চাত্য দেশে মানুষের জীবনের একটা লক্ষ্য আছে; সেখানকার শিক্ষা দীক্ষা সেই লক্ষ্যের দিকে মানুষকে নানা রকমে বল দিচ্ছে ও পথ নির্দেশ করছে। তারই সঙ্গে সঙ্গে অবান্তরভাবে এই শিক্ষাদীক্ষায় অন্য দশ রকম প্রয়োজনও সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশে জীবনের বড়ো লক্ষ্য আমাদের কাছে জাগ্রত হয়ে ওঠে নি, কেবলমাত্র জীবিকার লক্ষ্যই বড়ো হয়ে উঠল।

জীবিকার লক্ষ্য শুধু কেবল অভাবকে নিয়ে, প্রয়োজনকে নিয়ে; কিন্তু জীবনের লক্ষ্য পরিপূর্ণতাকে নিয়ে— সকল প্রয়োজনের উপরে সে। এই পরিপূর্ণতার আদর্শ সম্বন্ধে য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু কোনো একটা আদর্শ আছে যা কেবল পেট ভরাবার না, টাকা করবার না, এ কথা যদি না মানি, তা হলে নিতান্ত ছোটো হয়ে যাই।

এই কথাটা মানব, মানতে শেখাব, এই মনে করেই এখানে প্রথমে বিদ্যালয়ের পত্তন করেছিলুম। তার প্রথম সোপান হচ্ছে বাইরে নানাপ্রকার চিত্তবিক্ষেপ থেকে সরিয়ে এনে মনকে শান্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা। সেইজন্যে এই শান্তির ক্ষেত্রে এসে আমরা আসন গ্রহণ করলুম।

আজ এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদের অনেকেই এর আরম্ভ-কালের অবস্থাটা দেখেন নি। তখন আর যাই হোক, এর মধ্যে ইস্কুলের গন্ধ ছিল না বললেই হয়। এখানে যে আহ্বানটি সব চেয়ে বড়ো ছিল সে হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতির আহ্বান, ইস্কুলমাস্টারের আহ্বান নয়। ছাত্রদের সঙ্গে তখন বেতনের কোনো সম্বন্ধ ছিল না, এমন-কি, বিছানা তৈজসপত্র প্রভৃতি সমস্ত আমাকেই জোগাতে হত।

কিন্তু আধুনিক কালে এত উজান-পথে চলা সম্ভবপর নয়। কোনো-একটা ব্যবস্থা যদি এক জায়গায় থাকে এবং সমাজের অন্য জায়গায় তার কোনো সামঞ্জস্যই না থাকে তা হলে তাতে ক্ষতি হয় এবং সেটা টিঁকতে পারে না। সেইজন্যে এই বিদ্যালয়ের আকৃতিপ্রকৃতি তখনকার চেয়ে এখন অনেক বদল হয়ে এসেছে। কিন্তু হলেও, সেই মূল জিনিসটা আছে। এখানে বালকেরা যতদূর সম্ভব মুক্তির স্বাদ পায়। আমাদের বাহ্য মুক্তির লীলাক্ষেত্র হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতি, সেই ক্ষেত্র এখানে প্রশস্ত।

তার পরে ইচ্ছা ছিল, এখানে শিক্ষার ভিতর দিয়ে ছেলেদের মনের দাসত্ব মোচন করব। কিন্তু শিক্ষাপ্রণালী যে জালে আমাদের দেশকে আপাদমস্তক বেঁধে ফেলেছে তার থেকে একেবারে বেরিয়ে আসা শক্ত। দেশে বিদেশে শিক্ষার যে-সব সিংহদ্বার আছে আমাদের বিদ্যালয়ের পথ যদি সেই দিকে পৌঁছে না দেয় তা হলে কী জানি কী

হয় এই ভয়টা মনের ভিতর ছিল। পুরোপুরি সাহস করে উঠতে পারি নি, বিশেষত আমার শক্তিও যৎসামান্য, অভিজ্ঞতাও তদ্রূপ। সেইজন্যে এখানকার বিদ্যালয়টি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হয়েছিল। সেই গণ্ডিটুকুর মধ্যে যতটা পারি স্বাতন্ত্র্য রাখতে চেষ্টা করেছি। এই কারণেই আমাদের বিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসনাধীনে আনতে পারি নি।

পূর্বেই বলেছি, সকল বড়ো দেশেই বিদ্যাশিক্ষার নিম্নতর লক্ষ্য ব্যবহারিক সুযোগ-লাভ, উচ্চতর লক্ষ্য মানবজীবনে পূর্ণতা-সাধন। এই লক্ষ্য হতেই বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক উৎপত্তি। আমাদের দেশের আধুনিক বিদ্যালয়গুলির সেই স্বাভাবিক উৎপত্তি নেই। বিদেশী বণিক ও রাজা তাঁদের সংকীর্ণ প্রয়োজন-সাধনের জন্য বাইরে থেকে এই বিদ্যালয়গুলি এখানে স্থাপন করেছিলেন। এমন-কি, তখনকার কোনো কোনো পুরনো দপ্তরে দেখা যায়, প্রয়োজনের পরিমাণ ছাপিয়ে শিক্ষাদানের জন্যে শিক্ষককে কর্তৃপক্ষ তিরস্কার করেছেন।

তার পরে যদিচ অনেক বদল হয়ে এসেছে তবু কৃপণ প্রয়োজনের দাসত্বের দাগা আমাদের দেশের সরকারি শিক্ষার কপালে-পিঠে এখনো অঙ্কিত আছে। আমাদের অভাবের সঙ্গে, অন্নচিন্তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বলেই এই বিদ্যাশিক্ষাকে যেমন করে হোক বহন করে চলেছি। এই ভয়ংকর জবরদস্তি আছে বলেই শিক্ষাপ্রণালীতে আমরা স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করতে পারছি নে।

এই শিক্ষাপ্রণালীর সকলের চেয়ে সাংঘাতিক দোষ এই যে, এতে গোড়া থেকে ধরে নেওয়া হয়েছে যে আমরা নিঃস্ব। যা-কিছু সমস্তই আমাদের বাইরে থেকে নিতে হবে — আমাদের নিজের ঘরে শিক্ষার পৈতৃক মূলধন যেন কানাকড়ি নেই। এতে কেবল যে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে তা নয়, আমাদের মনে একটা নিঃস্ব-ভাব জন্মায়। আত্মাভিমানের তাড়নায় যদি-বা মাঝে মাঝে সেই ভাবটাকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করি তা হলেও সেটাও কেমনতরো বেসুরো রকম আস্ফালনে আত্মপ্রকাশ করে। আজকালকার দিনে এই আস্ফালনে আমাদের আন্তরিক দীনতা কিছুই ঘোচে নি, কেবল সেই দীনতাটাকে হাস্যকর ও বিরক্তিকর করে তুলেছি।

যাই হোক, মনের দাসত্ব যদি ঘোচাতে চাই তা হলে আমাদের শিক্ষার এই দাসভাবটাকে ঘোচাতে হবে। আমাদের আশ্রমে শিক্ষার যদি সেই মুক্তি দিতে না পারি তা হলে এখানকার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে।

কিছুকাল পূর্বে শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের মনে একটি সংকল্পের উদয় হয়েছিল। আমাদের টোলের চতুষ্পাঠীতে কেবলমাত্র সংস্কৃত শিক্ষাই দেওয়া

হয় এবং অন্য-সকল শিক্ষাকে একেবারে অবজ্ঞা করা হয়। তার ফলে সেখানকার ছাত্রদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আমাদের দেশের শিক্ষাকে মূল-আশ্রয়-স্বরূপ অবলম্বন করে তার উপর অন্য-সকল শিক্ষার পত্তন করলে তবেই শিক্ষা সত্য ও সম্পূর্ণ হয়। জ্ঞানের আধারটিকে নিজের করে তার উপকরণ পৃথিবীর সর্বত্র হতে সংগ্রহ ও সঞ্চয় করতে হবে। শাস্ত্রীমহাশয় তাঁর এই সংকল্পটিকে কাজে পরিণত করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কিন্তু নানা বাধায় তখন তিনি তা পারেন নি। এই অধ্যবসায়ের টানে কিছুদিন তিনি আশ্রম ত্যাগ করে গিয়েছিলেন।

তার পর তাঁকে পুনরায় আশ্রমে আহ্বান করে আনা গেল। এবার তাঁকে ক্লাস পড়ানো থেকে নিষ্কৃতি দিলুম। তিনি ভাষাতত্ত্বের চর্চায় প্রবৃত্ত রইলেন। আমার মনে হল, এইরকম কাজই হচ্ছে শিক্ষার যজ্ঞক্ষেত্রে যথার্থ যোগ্য। যাঁরা যথার্থ শিক্ষার্থী তাঁরা যদি এইরকম বিদ্যার সাধকদের চারি দিকে সমবেত হন তা হলে তো ভালোই; আর যদি আমাদের দেশের কপাল-দোষে সমবেত না হন তা হলেও এই যজ্ঞ ব্যর্থ হবে না। কথার মানে এবং বিদেশের বাঁধা বুলি মুখস্থ করিয়ে ছেলেদের তোতাপাখি করে তোলার চেয়ে এ অনেক ভালো।

এমনি করে কাজ আরম্ভ হল। এই আমাদের বিশ্বভারতীর প্রথম বীজবপন।

বিশ-পঞ্চাশ লক্ষ টাকা কুড়িয়ে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পত্তন করবার সাধ্য আমাদের নেই। কিন্তু সেজন্যে হতাশ হতেও চাই নে। বীজের যদি প্রাণ থাকে তা হলে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়ে আপনি বেড়ে উঠবে। সাধনার মধ্যে যদি সত্য থাকে তা হলে উপকরণের অভাবে ক্ষতি হবে না।

আমাদের আসনগুলি ভরে উঠেছে। সংস্কৃত পালি প্রাকৃতভাষা ও শাস্ত্র-অধ্যাপনার জন্য বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় একটিতে বসেছেন, আর-একটিতে আছেন সিংহলের মহাস্থবির; ক্ষিতিমোহনবাবু সমাগত; আর আছেন ভীমশাস্ত্রী-মহাশয়। ওদিকে এণ্ড্রুজের চারি দিকে ইংরেজি-সাহিত্যপিপাসুরা সমবেত। ভীমশাস্ত্রী এবং দিনেন্দ্রনাথ সংগীতের অধ্যাপনার ভার নিয়েছেন, আর বিষ্ণুপুরের নকুলেশ্বর গোস্বামী তাঁর সুরবাহার নিয়ে এঁদের সঙ্গে যোগ দিতে আসছেন। শ্রীমান নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দিতে প্রস্তুত হয়েছেন। দূর দেশ হতেও তাঁদের ছাত্র এসে জুটছে। তা ছাড়া আমাদের যার যতটুকু সাধ্য আছে কিছু কিছু কাজ করতে প্রবৃত্ত হব। আমাদের একজন বিহারী বন্ধু সত্বর আসছেন। তিনি পারসি ও উর্দু শিক্ষা দেবেন, ও ক্ষিতিমোহনবাবুর সহায়তায় প্রাচীন হিন্দিসাহিত্যের চর্চা করবেন। মাঝে মাঝে অন্যত্র হতে অধ্যাপক এসে আমাদের উপদেশ দিয়ে যাবেন এমনও আশা আছে।

শিশু দুর্বল হয়েই পৃথিবীতে দেখা দেয়। সত্য যখন সেইরকম শিশুর বেশে আসে তখনই তার উপরে আস্থা স্থাপন করা যায়। একেবারে দাড়িগোঁফ-সুদ্ধ যদি কেউ জন্মগ্রহণ করে তা হলে জানা যায় সে একটা বিকৃতি। বিশ্বভারতী একটা মস্ত ভাব, কিন্তু সে অতি ছোটো দেহ নিয়ে আমাদের আশ্রমে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু ছোটোর ছদ্মবেশে বড়োর আগমন পৃথিবীতে প্রতিদিনই ঘটে, অতএব আনন্দ করা যাক, মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠুক। একান্তমনে এই আশা করা যাক যে, এই শিশু বিধাতার অমৃতভাণ্ডার থেকে অমৃত বহন করে এনেছে; সেই অমৃতই একে ভিতর থেকে বাঁচাবে বাড়াবে, এবং আমাদেরও বাঁচাবে ও বাড়িয়ে তুলবে।

১৮ আষাঢ় ১৩২৬ শ্রাবণ ১৩২৬

শান্তিনিকেতন

৩

আজ বিশ্বভারতী-পরিষদের প্রথম অধিবেশন। কিছুদিন থেকে বিশ্বভারতীর এই বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হয়েছে। আজ সর্বসাধারণের হাতে তাকে সমর্পণ করে দেব। বিশ্বভারতীর যাঁরা হিতৈষীবৃন্দ ভারতের সর্বত্র ও ভারতের বাইরে আছেন, এর ভাবের সঙ্গে যাঁদের মনের মিল আছে, যাঁরা একে গ্রহণ করতে দ্বিধা করবেন না, তাঁদেরই হাতে আজ একে সমর্পণ করে দেব।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, হঠাৎ আজ আমাদের মধ্যে কয়েকজন হিতৈষী বন্ধু সমাগত হয়েছেন, যাঁরা দেশে ও দেশের বাইরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। সকলে জানেন, আজ এখানে ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ডাক্তার নীলরতন সরকার এবং ডাক্তার শিশিরকুমার মৈত্র উপস্থিত আছেন। আমাদের আরো সৌভাগ্য যে, সমুদ্রপার থেকে এখানে একজন মনীষী এসেছেন, যাঁর খ্যাতি সর্বত্র বিস্তৃত। আজ আমাদের কর্মে যোগদান করতে পরমসুহৃদ আচার্য সিল্‌ভ্যাঁ লেভি মহাশয় এসেছেন। আমাদের সৌভাগ্য যে, আমাদের এই প্রথম অধিবেশনে, যখন আমরা বিশ্বের সঙ্গে বিশ্বভারতীর যোগসাধন করতে প্রবৃত্ত হয়েছি সেই সভাতে, আমরা এঁকে পাশ্চাত্য দেশের প্রতিনিধি রূপে পেয়েছি। ভারতবর্ষের চিত্তের সঙ্গে এঁর চিত্তের সম্বন্ধবন্ধন অনেক দিন থেকে স্থাপিত হয়েছে। ভারতবর্ষের আতিথ্য তিনি আশ্রমে আমাদের মধ্যে লাভ করুন। যে-সকল সুহৃদ আজ এখানে উপস্থিত আছেন তাঁরা আমাদের হাত থেকে এর ভার

গ্রহণ করুন। এই বিশ্বভারতীকে আমরা কিছুদিন লালনপালন করলুম, একে বিশ্বের হাতে সমর্পণ করবার এই সময় এসেছে। একে এঁরা প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করুন, এর সঙ্গে আপনার চিত্তের সম্বন্ধ স্থাপন করুন। এই কামনা নিয়ে আমি আচার্য শীল মহাশয়কে সকলের সম্মতিক্রমে বরণ করেছি; তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করে কর্ম সম্পন্ন করুন, বিশ্বের প্রতিনিধি রূপে আমাদের হাত থেকে একে গ্রহণ করে বিশ্বের সম্মুখে স্থাপন করুন। তিনি এ বিষয়ে যেমন করে বুঝবেন তেমন আর কেউ পারবেন না। তিনি উদার দৃষ্টিতে জ্ঞানরাজ্যকে দেখেছেন। কেবল অসাধারণ পাণ্ডিত্য থাকলেই তা হতে পারে না, কারণ অনেক সময়ে পাণ্ডিত্যের দ্বারা ভেদবুদ্ধি ঘটে। কিন্তু তিনি আত্মিক দৃষ্টিতে জ্ঞানরাজ্যের ভিতরের ঐক্যকে গ্রহণ করেছেন। আজকের দিনে তাঁর চেয়ে বিশ্বভারতীকে গ্রহণ করবার যোগ্য আর কেউ নেই। আনন্দের সহিত তাঁর হাতে একে সমর্পণ করছি। তিনি আমাদের হয়ে সকলের সামনে একে উপস্থিত করুন এবং তাঁর চিত্তে যদি বাধা না থাকে তবে নিজে এতে স্থান গ্রহণ করুন, একে আপনার করে বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত করুন।

বিশ্বভারতীর মর্মের কথাটি আগে বলি, কারণ অনেকে হয়তো ভালো করে তা জানেন না। কয়েক বৎসর পূর্বে আমাদের পরমসুহৃদ বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের মনে সংকল্প হয়েছিল যে, আমাদের দেশে সংস্কৃতশিক্ষা যাকে বলা হয় তার অনুষ্ঠান ও প্রণালীর বিস্তারসাধন করা দরকার। তাঁর খুব ইচ্ছা হয়েছিল যে, আমাদের দেশে টোল ও চতুষ্পাঠী রূপে যে-সকল বিদ্যায়তন আছে তার অধিকারকে প্রসারিত করতে হবে। তাঁর মনে হয়েছিল যে, যে কালকে আশ্রয় করে এদের প্রতিষ্ঠা সে কালে এদের উপযোগিতার কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু কালের পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে গবর্মেন্টের দ্বারা যে-সব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলি এই দেশের নিজের সৃষ্টি নয়। কিন্তু আমাদের দেশের প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের পুরাকালের এই বিদ্যালয়গুলির মিল আছে; এরা আমাদের নিজের সৃষ্টি। এখন কেবল দরকার এদের ভিতর দিয়ে নূতন যুগের স্পন্দন, তার আহ্বান, প্রকাশ পাওয়া; না যদি পায় তো বুঝতে হবে তারা সাড়া দিচ্ছে না, মরে গেছে। এই সংকল্প মনে রেখে তিনি নিজের গ্রামে যান; সে সূত্রে তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ তখনকার মতো বিযুক্ত হওয়াতে দুঃখিত হয়েছিলুম, যদিও আমি জানতুম যে ভিতরকার দিক দিয়ে সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। তার পর নানা বাধায় তিনি গ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করতে পারেন নি। তখন আমি তাঁকে আশ্বাস দিলাম, তাঁর ইচ্ছাসাধন এখানেই হবে, এই স্থানই তাঁর প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। এমনিভাবে বিশ্বভারতীর আরম্ভ হল।

গাছের বীজ ক্রমে ক্রমে প্রাণের নিয়মে বিস্তৃতি লাভ করে। সে বিস্তার এমন করে ঘটে যে, সেই বীজের সীমার মধ্যে তাকে আর ধরেই না। তেমনি প্রথমে যে শিক্ষার আয়তনকে মনে করেছিলাম দেশের প্রয়োজনের মধ্যেই অবরুদ্ধ থাকবে, ক্রমে তা বৃহৎ আকাশে মুক্তিলাভের চেষ্টা করতে লাগল। যে অনুষ্ঠান সত্য তার উপরে দাবি সমস্ত বিশ্বের; তাকে বিশেষ প্রয়োজনে খর্ব করতে চাইলে তার সত্যতাকেই খর্ব করা হয়। এবার পশ্চিমে গিয়ে দেখেছি যে, পূর্ব-মহাদেশ কী সম্পদ দিতে পারে তা সকলে জানতে চাচ্ছে। আজ মানুষকে বেদনা পেতে হয়েছে। সে পুরাকালে যে আশ্রয়কে নির্মাণ করেছিল তার ভিত্তি বিদীর্ণ হয়ে গেছে। তাতে করে মানুষের মনে হয়েছে, এ আশ্রয় তার অভাবকে পূর্ণ করবার উপযোগী নয়। পশ্চিমের মনীষীরাও এ কথা বুঝতে পেরেছেন, এবং মানুষের সাধনা কোন্ পথে গেলে সে অভাব পূর্ণ হবে তাঁদের তা উপলব্ধি করবার ইচ্ছা হয়েছে।

কোনো জাতি যদি স্বাজাত্যের ঔদ্ধত্য-বশত আপন ধর্ম ও সম্পদকে একান্ত আপন বলে মনে করে তবে সেই অহংকারের প্রাচীর দিয়ে সে তার সত্য সম্পদকে বেষ্টন করে রাখতে পারবে না। যদি সে তার অহংকারের দ্বারা সত্যকে কেবলমাত্র স্বকীয় করতে যায় তবে তার সে সত্য বিনষ্ট হয়ে যাবে। আজ পৃথিবীর সর্বত্র এই বিশ্ববোধ উদ্‌বুদ্ধ হতে যাচ্ছে। ভারতবর্ষে কি এই যুগের সাধনা স্থান পাবে না? আমরা কি এ কথাই বলব যে, মানবের বড়ো অভিপ্রায়কে দূরে রেখে ক্ষুদ্র অভিপ্রায় নিয়ে আমরা থাকতে চাই? তবে কি আমরা মানুষের যে গৌরব তার থেকে বঞ্চিত হব না? স্বজাতির অচল সীমানার মধ্যে আপনাকে সংকীর্ণভাবে উপলব্ধি করাই কি সব চেয়ে বড়ো গৌরব?

এই বিশ্বভারতী ভারতবর্ষের জিনিস হলেও একে সমস্ত মানবের তপস্যার ক্ষেত্র করতে হবে। কিন্তু আমাদের দেবার কী আছে। কল্যাণরূপী শিব তাঁর ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বেরিয়েছেন। সে ঝুলিতে কে কী দান করবে? শিব সমস্ত মানুষের কাছে সেই ঝুলি নিয়ে এসেছেন। আমাদের কি তাঁকে কিছু দেবার নেই? হাঁ, আমাদের দেবার আছে, এই কথা ভেবেই কাজ করতে হবে। এইজন্যই ভারতের ক্ষেত্রে বিশ্বভারতীকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।

৮ পৌষ ১৩২৮ মাঘ ১৩২৮

শান্তিনিকেতন

৪

কোনো জিনিসের আরম্ভ কী করে হয় তা বলা যায় না। সেই আরম্ভকালটি রহস্যে আবৃত থাকে। আমি চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত পদ্মার বোটে কাটিয়েছি, আমার প্রতিবেশী ছিল বালিচরের চক্রবাকের দল। তাদের মধ্যে বসে বসে আমি বই লিখেছি। হয়তো চিরকাল এইভাবেই কাটাতুম। কিন্তু মন হঠাৎ কেন বিদ্রোহী হল, কেন ভাবজগৎ থেকে কর্মজগতে প্রবেশ করলাম ?

আমি বাল্যকালের শিক্ষাব্যবস্থায় মনে বড়ো পীড়া অনুভব করেছি। সেই ব্যবস্থায় আমাকে এত ক্লেশ দিত আঘাত করত যে বড়ো হয়েও সে অন্যায় ভুলতে পারি নি। কারণ প্রকৃতির বক্ষ থেকে, মানবজীবনের সংস্পর্শ থেকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে শিশুকে বিদ্যালয়ের কলের মধ্যে ফেলা হয়। তার অস্বাভাবিক পরিবেষ্টনের নিষ্পেষণে শিশুচিত্ত প্রতিদিন পীড়িত হতে থাকে। আমরা নর্মাল ইস্কুলে পড়তাম। সেটা ছিল মল্লিকদের বাড়ি। সেখানে গাছপালা নেই, মার্বেলের উঠান আর ইটের উঁচু দেওয়াল যেন আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকত। আমরা, যাদের শিশুপ্রকৃতির মধ্যে প্রাণের উদ্যম সতেজ ছিল, এতে বড়োই দুঃখ পেতাম। প্রকৃতির সাহচর্য থেকে দূরে থেকে আর মাস্টারদের সঙ্গে প্রাণগত যোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে আমাদের আত্মা যেন শুকিয়ে যেত। মাস্টাররা সব আমাদের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করত।

প্রাণের সম্বন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই-যে বিদ্যা লাভ করা যায় এটা কখনো জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারে না।

আমি এ বিষয়ে কখনো কখনো বক্তৃতাও দিয়েছিলেম। কিন্তু যখন দেখলাম যে আমার কথাগুলি শ্রুতিমধুর কবিত্ব হিসাবেই সকলে নিলেন এবং যাঁরা কথাটাকে মানলেন তাঁরা এটাকে কাজে খাটাবার কোনো উদ্যোগ করলেন না, তখন আমার ভাবকে কর্মের মধ্যে আকার দান করবার জন্য আমি নিজেই কৃতসংকল্প হলাম। আমার আকাঙ্ক্ষা হল, আমি ছেলেদের খুশি করব, প্রকৃতির গাছপালাই তাদের অন্যতম শিক্ষক হবে, জীবনের সহচর হবে— এমনি করে বিদ্যার একটি প্রাণনিকেতন নীড় তৈরি করে তুলব।

তখন আমার ঘাড়ে মস্ত একটা দেনা ছিল; সে দেনা আমার সম্পূর্ণ স্বকৃত নয়, কিন্তু তার দায় আমারই একলার। দেনার পরিমাণ লক্ষ টাকারও অধিক ছিল। আমার এক পয়সার সম্পত্তি ছিল না, মাসিক বরাদ্দ অতি সামান্য। আমার বইয়ের কপিরাইট প্রভৃতি আমার সাধ্যায়ত্ত সামগ্রীর কিছু কিছু সওদা করে অসাধ্যসাধনে লেগে গেলাম।

আমার ডাক দেশের কোথাও পৌঁছয় নি। কেবল ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে পাওয়া গিয়েছিল, তিনি তখনো রাজনীতিক্ষেত্রে নামেন নি। তাঁর কাছে আমার এই সংকল্প খুব ভালো লাগল, তিনি এখানে এলেন। কিন্তু তিনি আসবার আগেই কাজ আরম্ভ করে দিয়েছিলাম। আমি পাঁচ-ছয়টি ছেলে নিয়ে জামগাছতলায় তাদের পড়াতাম। আমার নিজের বেশি বিদ্যে ছিল না। কিন্তু আমি যা পারি তা করেছি। সেই ছেলে-কয়টিকে নিয়ে রস দিয়ে ভাব দিয়ে রামায়ণ মহাভারত পড়িয়েছি— তাদের কাঁদিয়েছি হাসিয়েছি, ঘনিষ্ঠভাবে তাদের সঙ্গে যুক্ত থেকে তাদের মানুষ করেছি।

এক সময়ে নিজের অনভিজ্ঞতায় খেদে আমার হঠাৎ মনে হল যে, একজন হেডমাস্টারের নেহাত দরকার। কে যেন একজন লোকের নাম করে বললে, 'অমুক লোকটি একজন ওস্তাদ শিক্ষক, যাকে তাঁর পাসের সোনার কাঠি ছুঁইয়েছেন সেই পাস হয়ে গেছে।'— তিনি তো এলেন, কিন্তু কয়েক দিন সব দেখেশুনে বললেন, 'ছেলেরা গাছে চড়ে, চেঁচিয়ে কথা কয়, দৌড়য়, এ তো ভালো না।' আমি বললাম, 'দেখুন, আপনার বয়সে তো কখনো তারা গাছে চড়বে না। এখন একটু চড়তেই দিন-না। গাছ যখন ডালপালা মেলেছে তখন সে মানুষকে ডাক দিচ্ছে। ওরা ওতে চড়ে পা ঝুলিয়ে থাকলোই-বা।' তিনি আমার মতিগতি দেখে বিরক্ত হলেন। মনে আছে, তিনি কিণ্ডারগার্টেন-প্রণালীতে পড়াবার চেষ্টা করতেন। তাল গোল, বেল গোল, মানুষের মাথা গোল ইত্যাদি সব পাঠ শেখাতেন। তিনি ছিলেন পাসের ধুরন্ধর পণ্ডিত, ম্যাট্রিকের কর্ণধার। কিন্তু এখানে তাঁর বনল না, তিনি বিদায় নিলেন। তার পর থেকে আর হেডমাস্টার রাখি নি।

এ সামান্য ব্যাপার নয়, পৃথিবীতে অল্প বিদ্যালয়েই ছেলেরা এত বেশি ছাড়া পেয়েছে। আমি এ নিয়ে মাস্টারদের সঙ্গে লড়াই করেছি। আমি ছেলেদের বললাম, 'তোমরা আশ্রম-সম্মিলনী করো, তোমাদের ভার তোমরা নাও।' আমি কিছুতে আমার সংকল্প ত্যাগ করি নি— আমি ছেলেদের উপর জবরদস্তি হতে দিই নি। তারা গান গায়, গাছে চড়ে, ছবি আঁকে, পরস্পরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ও বাধামুক্ত সম্বন্ধে যুক্ত হয়ে আছে।

এখানকার শিশুশিক্ষার আর-একটা দিক আছে। সেটা হচ্ছে— জীবনের গভীর ও মহৎ তাৎপর্য ছোটো ছেলেদের বুঝতে দেওয়া। আমাদের দেশের সাধনার মন্ত্র হচ্ছে, যা মহৎ তাতেই সুখ, অল্পে সুখ নেই। কিন্তু একা রাজনীতিই এখন সেই বড়ো মহত্তের স্থান সমস্তটাই জুড়ে বসে আছে। আমার কথা এই যে, সব চেয়ে বড়ো যে আদর্শ মানুষের আছে তা ছেলেদের জানতে দিতে হবে। তাই আমরা এখানে সকালে

সন্ধ্যায় আমাদের প্রাচীন তপোবনের মহৎ কোনো বাণী উচ্চারণ করি, স্থির হয়ে কিছুক্ষণ বসি। এতে আর-কিছু না হোক, একটা স্বীকারোক্তি আছে। এই অনুষ্ঠানের দ্বারা ছোটো ছেলেরা একটা বড়ো জিনিসের ইশারা পায়। হয়তো তারা উপাসনায় বসে হাত-পা নাড়ছে, চঞ্চল হয়ে উঠছে, কিন্তু এই আসনে বসবার একটা গভীর তাৎপর্য দিনে দিনে তাদের মনের মধ্যে গিয়ে পৌঁছয়।

এখানে ছেলেরা জীবনের আরম্ভকালকে বিচিত্র রসে পূর্ণ করে নেবে, এই আমার অভিপ্রায় ছিল। প্রকৃতির সঙ্গে নিত্যযোগে গানে অভিনয়ে ছবিতে আনন্দরস আস্বাদনের নিত্যচর্চায় শিশুদের মগ্ন চৈতন্যে আনন্দের স্মৃতি সঞ্চিত হয়ে উঠবে, এইটেকেই লক্ষ্য করে কাজ আরম্ভ করা গেল।

কিন্তু শুধু এটাকেই চরম লক্ষ্য বলে এই বিদ্যালয় স্বীকার করে নেয় নি। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করবার আমার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল, বাঙালির ছেলেরা এখানে মানুষ হবে, রূপে রসে গন্ধে বর্ণে চিত্রে সংগীতে তাদের হৃদয় শতদলপদ্মের মতো আনন্দে বিকশিত হয়ে উঠবে। কিন্তু আমার মনের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে এর উদ্দেশ্যও গভীরতর হল। এখানকার এই বাঙালির ছেলেরা তাদের কলহাস্যের দ্বারা আমার মনে একটি ব্যাকুল চঞ্চলতার সৃষ্টি করল। আমি স্তব্ধ হয়ে বসে এদের আনন্দপূর্ণ কণ্ঠস্বর শুনেছি। দূর থেকে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে হয়েছে যে, এই আনন্দ, এ যে নিখিল মানবচিত্ত থেকে বিনিঃসৃত অমৃত-উৎসের একটি ধারা। আমি এই শিশুদের মধ্যে সেই স্পর্শ পেয়েছি। বিশ্বচিত্তের বসুন্ধরার সমস্ত মানবসন্তান যেখানে আনন্দিত হচ্ছে সেই বিরাট ক্ষেত্রে আমি হৃদয়কে বিস্তৃত করে দিয়েছি। যেখানে মানুষের বৃহৎ প্রাণময় তীর্থ আছে, যেখানে প্রতিদিন মানুষের ইতিহাস গড়ে উঠছে, সেখানে আমার মন যাত্রা করেছে। পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত ইংরেজি লিখি নি, ইংরেজি যে ভালো করে জানি তা ধারণা ছিল না। মাতৃভাষাই তখন আমার সম্বল ছিল। যখন ইংরেজি চিঠি লিখতাম তখন অজিত বা আর-কাউকে দিয়ে লিখিয়েছি। আমি তেরো বছর পর্যন্ত ইস্কুলে পড়েছি, তার পর থেকে পলাতক ছাত্র। পঞ্চাশ বছর বয়সের সময় যখন আমি আমার লেখার অনুবাদ করতে প্রবৃত্ত হলাম তখন গীতাঞ্জলির গানে আমার মনে ভাবের একটা উদ্‌বোধন হয়েছিল বলে সেই গানগুলিই অনুবাদ করলাম। সেই তর্জমার বই আমার পশ্চিম-মহাদেশ-যাত্রার যথার্থ পাথেয়স্বরূপ হল। দৈবক্রমে আমার দেশের বাইরেকার পৃথিবীতে আমার স্থান হল, ইচ্ছা করে নয়। এই সম্মানের সঙ্গে সঙ্গে আমার দায়িত্ব বেড়ে গেল।

যতক্ষণ বীজ বীজই থাকে ততক্ষণ সে নিজের মধ্যেই থাকে। তার পরে যখন

অঙ্কুরিত হয়ে বৃক্ষরূপে আকাশে বিস্তৃতি লাভ করে তখন সে বিশ্বের জিনিস হয়। এই বিদ্যালয় বাংলার একপ্রান্তে কয়েকটি বাঙালির ছেলে নিয়ে তার ক্ষুদ্র সামর্থ্যের মধ্যে কোণ আঁকড়ে পড়ে ছিল। কিন্তু সব সজীব পদার্থের মতো তার অন্তরে পরিণতির একটা সময় এল। তখন সে আর একান্ত সীমাবদ্ধ মাটির জিনিস রইল না, তখন সে উপরের আকাশে মাথা তুলল, বড়ো পৃথিবীর সঙ্গে তার অন্তরের যোগসাধন হল ; বিশ্ব তাকে আপন বলে দাবি করল।

আধুনিক কালের পৃথিবীর ভৌগোলিক সীমা ভেঙে গেছে, মানুষ পরস্পরের নিকটতর হয়েছে, এই সত্যকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। মানুষের এই মিলনের ভিত্তি হবে প্রেম, বিদ্বেষ নয়। মানুষ বিষয়ব্যবহারে আজ পরস্পরকে পীড়ন করছে, বঞ্চিত করছে, এ কথা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু সত্যসাধনায় পূর্ব-পশ্চিম নেই। বুদ্ধদেবের শিক্ষা ভারতবর্ষের মাটিতে উদ্ভূত হয়ে চীনদেশে গিয়ে মানবচিত্তকে আঘাত করল এবং ক্রমে সমস্ত এশিয়াকে অধিকার করল। চিরন্তন সত্যের মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের ভেদ নেই। এই বিশ্বভারতীতে সেই সত্যসাধনার ক্ষেত্রকে আমার গড়ে তুলতে হবে। পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের দেওয়া-নেওয়ার সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া দরকার। আমরা এতদিন পর্যন্ত ইংরেজি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্কুলবয়' ছিলাম, কেবলই পশ্চিমের কাছে হাত পেতে পাঠ শিখে নিয়েছি। কিন্তু পশ্চিমের সঙ্গে আমাদের আদানপ্রদানের সম্বন্ধ হয় নি। সাহসপূর্বক য়ুরোপকে আমি আমাদের শিক্ষাকেন্দ্রে আমন্ত্রণ করে এসেছি। এখানে এইরূপে সত্যসম্মিলন হবে, জ্ঞানের তীর্থক্ষেত্র গড়ে উঠবে। আমরা রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে খুব মৌখিক বড়াই করে থাকি, কিন্তু অন্তরে আমাদের আত্মবিশ্বাস নেই, যথেষ্ট দীনতা আছে। যেখানে মনের ঐশ্বর্যের প্রকৃত প্রাচুর্য আছে সেখানে কার্পণ্য সম্ভবপর হয় না। আপন সম্পদের প্রতি যে জাতির যথার্থ আশা ও বিশ্বাস আছে অন্যকে বিতরণ করতে তার সংকোচ হয় না, সে পরকে ডেকে বিলোতে চায়। আমাদের দেশে তাই গুরুর কণ্ঠে এই আহ্বানবাণী এক সময় ঘোষিত হয়েছিল— আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা।

আমরা সকলের থেকে দূরে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিদ্যার নির্জন কারাবাসে রুদ্ধ হয়ে থাকতে চাই। কারারক্ষী যা দয়া করে খেতে দেবে তাই নিয়ে টিঁকে থাকবার মতলব করেছি। এই বিচ্ছিন্নতার থেকে ভারতবর্ষকে মুক্তিদান করা সহজ ব্যাপার নয়। সেবা করবার ও সেবা আদায় করবার, দান করবার ও দান গ্রহণ করবার সম্বন্ধকে আমাদের তৈরি করে তুলতে হবে। বিশ্বের জ্ঞানজগৎ থেকে ভারতবর্ষ একঘরে হয়ে আছে, তাকে শিক্ষার ছিটে-ফোঁটা দিয়ে চিরকেলে পাঠশালার পোড়ো করে রাখা হয়েছে। আমরা পৃথিবীর জ্ঞানধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিগত অবমাননা থেকে মুক্তি পেতে চাই।

ভারতবর্ষ তার আপন মনকে জানুক এবং আধুনিক সকল লাঞ্ছনা থেকে উদ্ধার লাভ করুক। রামানুজ শংকরাচার্য বুদ্ধদেব প্রভৃতি বড়ো বড়ো মনীষীরা ভারতবর্ষে বিশ্বসমস্যার যে সমাধান করবার চেষ্টা করেছিলেন তা আমাদের জানতে হবে। জোরাস্তেরীয় ইসলাম প্রভৃতি এশিয়ার বড়ো বড়ো শিক্ষাসাধনার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। ভারতবর্ষের কেবল হিন্দুচিত্তকে স্বীকার করলে চলবে না। ভারতবর্ষের সাহিত্য শিল্পকলা স্থপতিবিজ্ঞান প্রভৃতিতেও হিন্দুমুসলমানের সংমিশ্রণে বিচিত্র সৃষ্টি জেগে উঠেছে। তারই পরিচয়ে ভারতবর্ষীয়ের পূর্ণ পরিচয়। সেই পরিচয় পাবার উপযুক্ত কোনো শিক্ষাস্থানের প্রতিষ্ঠা হয় নি বলেই তো আমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ ও দুর্বল।

ভারতের বিরাট সত্তা বিচিত্রকে আপনার মধ্যে একত্র সম্মিলিত করবার চেষ্টা করছে। তার সেই তপস্যাকে উপলব্ধি করবার একটা সাধনক্ষেত্র আমাদের চাই তো। বিশ্বভারতীতে সেই কাজটি হতে পারে। বিশ্বের হাটে যদি আমাদের বিদ্যার যাচাই না হয় তবে আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ হল না। ঘরের কোণে বসে আত্মীয়স্বজনে বৈঠকে যে অহংকার নিবিড় হতে থাকে সেটা সত্য পদার্থ নয়। মানুষের জ্ঞানচর্চার বৃহৎ ক্ষেত্রের সঙ্গে যোগ হলেই তবে আমাদের বিদ্যার সার্থকতা হবে। বিশ্বভারতীর এই লক্ষ্য সার্থক হোক।

২০ ফাল্গুন ১৩২৮ ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২৯

শান্তিনিকেতন

৫

আপনারা যাঁরা আজ এখানে সমবেত হয়েছেন, আপনাদের সকলের সঙ্গে ক্রমশ আমাদের যোগ ঘনিষ্ঠ হবে, সাক্ষাৎসম্বন্ধ স্থাপিত হবে। বিশ্বভারতীর ভিতরকার আদর্শ ক্রমে দিনে দিনে আপনাদের কাছে পরিস্ফুট হবে। বিশ্বভারতীর সব প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন যেমন জেগে উঠতে থাকবে তেমন তেমন তার মধ্য দিয়ে এর ভিতরকার রূপটি আপনাদের কাছে জাগতে থাকবে। বাইরে থেকে এ সম্বন্ধে কথা বলতে কুণ্ঠা বোধ হয়, কারণ ভিতরের বড়ো আইডিয়ালকে বাইরে আকার দান করতে গেলে দুইয়ের মধ্যে অসামঞ্জস্য থেকে যাবেই। বাইরের অসম্পূর্ণতার সঙ্গে কোনো আইডিয়ালের ভিতরের মহত্ত্বের মধ্যেকার ব্যবধান যখন চোখে পড়ে তখন গোড়াকার বাক্যাড়ম্বরের পরে তা অনেকের কাছে হতাশার ও লজ্জার কারণ হয়। আইডিয়ালকে প্রকাশ করে

তোলা কারো একলার সাধ্য নয়, কারণ তা দু-একজনের বিশেষ সময়কার কর্ম নয়। প্রথমে যে অনুধাবনায় আরম্ভ হয় সেই প্রথম ধাক্কাই তার যথার্থ পরিচয় নয়। হৃদয় কর্ম ও জীবন দিয়ে নানা কর্মীর সহায়তায় তা ফুটে উঠতে থাকে। তার প্রথমকার চেহারা ভিতরকার সেই সত্যটিকে যথার্থ ব্যক্ত করতে পারে না। এইজন্যই এই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কিছু বলতে আমি কুণ্ঠিত হই।

বিশ্বভারতী যে ভাব ও আদর্শকে পোষণ করছে, যে পূর্ণসত্যটিকে অন্তরে ধারণ করে রয়েছে, তা বাইরে থেকে সমাগত অতিথিরা এবং এর কর্মভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা অনেকে নানা অসম্পূর্ণতার মধ্য দিয়েও গ্রহণ করেছেন ও শ্রদ্ধা করেছেন। এতে আমাদের উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে। স্বদেশের সকলের সঙ্গে এর যথার্থ আন্তরিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নি। এমন-কি, এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত হয়ে রয়েছেন তাঁরাও অনেকে ভিতরের সত্যমূর্তিটিকে না দেখে এর পদ্ধতি অনুষ্ঠান উপকরণ-সংগ্রহ প্রভৃতি বাহ্যরূপটিকে দেখছেন, সেখানে আপনার অধিকার নিয়ে আক্ষেপ করছেন। এর কারণ হচ্ছে যে, আমি যে ভাবটিকে প্রকাশ করতে চাই বর্তমান কালে সকলের চিত্ত সে দিকে নেই। তাঁরা কতকগুলি আকস্মিক ও আধুনিক চেষ্টায় নিযুক্ত আছেন, বড়ো প্রয়োজনের সমাদর করতে তাঁদের মন চাচ্ছে না। কিংবা হয়তো আমার নিজের অক্ষমতা ও দুর্ভাগ্য এর কারণ হতে পারে। হয়তো আমার নিজের জীবনের যা লক্ষ্য অন্যদের কাছ থেকে তার স্বীকৃতি পাবার আমার শক্তি নেই। যার ডাক পড়ে, যার আপনার থেকে আদেশ আসে তারই তাতে গরজ আর দায়িত্ব আছে। যদি সে তার জীবনের উদ্দেশ্য সকলের কাছে এমন করে না ধরতে পারে যাতে করে তা অপরের গ্রহণযোগ্য হয় তবে তারই নিজের অক্ষমতা প্রকাশ পায়। হয়তো আমারই চরিত্রের এমন অসম্পূর্ণতা আছে যাতে আমার আপনার কর্ম দেশের কর্ম হয়ে উঠতে পারছে না। কিন্তু আমার আশা আছে যে, সমস্তই নিষ্ফল হয় নি। কারণ প্রতিষ্ঠানটিকে তো শুধু আমার একলার জিনিস বলতে পারি না। সেখানে যারা মিলিত হয়েছে তাদের দ্বারা সৃজনকার্য নিরন্তর চলেছে। সেখানে দিনে দিনে যে আবহাওয়া তৈরি হয়ে উঠছে, প্রতি শিশুটি পর্যন্ত তাদের অবকাশমুখরিত সংগীত অভিনয় কলহাস্যের দ্বারাও তার সহায়তা করছে। প্রত্যেকটি শিশু প্রত্যেকটি ছাত্র ও অধ্যাপক না বুঝেও অগোচরে সত্যসাধনায় সহযোগিতা করছেন। তাঁদের দ্বারা যেটুকু কর্ম পরিব্যক্ত হচ্ছে তার উপর আমার বিশ্বাস আছে; আশা আছে যে, একদিন এর বীজ নিঃসন্দেহ পরিপূর্ণ বৃক্ষ-রূপে উপরের আকাশে মাথা তুলবে।

আমার মনে হয়েছে যে, আমাদের এই প্রদেশবাসীদের মধ্যে যে-সব ছাত্রের উৎসাহ ও কৌতূহল আছে তারা কেন এই বৃক্ষের ফল ভোগ করবে না। বিশ্বভারতীতে

আমরা যে চিন্তা করছি, যে সত্য সন্ধান করছি, সেখানে স্বদেশী ও বিদেশী পণ্ডিতেরা যে তত্ত্বালোচনায় ব্যাপৃত আছেন, তাঁরা যা-কিছু দিচ্ছেন, ছোটো জায়গায় সেই উৎপন্ন পদার্থের নিঃশেষ হয়ে গেলে তার অপব্যয় হবে। তা অল্প পরিধিতে বদ্ধ থাকলে তাতে সকলের গ্রহণ করবার সুযোগ হয় না। যদিচ শান্তিনিকেতনই আমার কেন্দ্রস্থল তবুও সেখানে যারা সমাগত হবে, যাদের হাতে-কলমে কাজ করাতে হবে তারাই যে শুধু আইডিয়াল গ্রহণ করবার যথার্থ যোগ্য তা তো নয়। তাই আমার মনে হয়েছে এবং অনেক ছাত্র ও ছাত্রবন্ধুরা আমাকে বলেছেন যে, বিশ্বভারতীতে যে সৃষ্টি হচ্ছে, যে সত্য আবিষ্কৃত হচ্ছে, তা যাতে কলকাতার ছাত্রমণ্ডলীও জানতে পারে, যাতে তারাও উপলব্ধি করতে পারে যে, সেখানে জীবনের সাধনা হচ্ছে, শুধু পুঁথিগত বিদ্যার চর্চা হচ্ছে না, সেজন্য সংগীত শিল্প সাহিত্যের নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তার পরিচয়ের ব্যবস্থা করা উচিত। আমি এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলুম, কিন্তু অতি সসংকোচে; কারণ দেশের ছাত্রদের সঙ্গে আমার তেমন পরিচয় নেই। ভয় হয়েছিল যে, যে লোকেরা এত কাল এত ভুল বুঝে এসেছে হয়তো তারা বিদ্রূপ করবে। বড়ো আইডিয়ালকে নিয়ে বিদ্রূপ করার মতো এত সহজ জিনিস আর নেই। যে খুব ছোটো সেও কোনো বড়ো জিনিসে ধুলো দিতে পারে, তাকে বিকৃত করতে পারে।

এই আইডিয়ালের সঙ্গে এখনকার কালের যোগ নেই, এই কথা অনুভব করেছিলাম বলেই আমি বিশ বছর পর্যন্ত নিভৃত কোণে ছিলুম। এত গোপনে আমার কাজ করে গেছি যে, আমার পরমাত্মীয়েরাও জানেন নি, বোঝেন নি। আমি কী লক্ষ্য নিয়ে কেন অন্য-সব কাজ ছেড়ে দিয়ে অবকাশ ত্যাগ করে কোন্ ভাকে কোন্ আনন্দে এই কাজে লিপ্ত হয়েছি আমার সহকর্মীরাও অনেকে তা পুরোপুরি জানে না। তৎসত্ত্বে আমি আমার বিদ্যালয়ের ছেলেদের মধ্যে যে আনন্দের ছবি, যে স্বাধীন বিকাশের প্রমাণ পেয়েছি তাতে নিশ্চিত জেনেছি যে, এরা এখান থেকে কিছু পেয়েছে। এই-সকল কারণেই আমি এতদিন বাহিরে বেরিয়ে আসি নি।

বিশ্বভারতীকে দুইভাবে দেখা যেতে পারে— প্রথম হচ্ছে শান্তিনিকেতনে তার যে কাজ হচ্ছে সেই কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করা; দ্বিতীয়ত শান্তিনিকেতনের কর্মানুষ্ঠানের ফল বাইরে থেকে ভোগ করা, তার সঙ্গে বাইরে থেকে যুক্ত হওয়া। বিশ্বভারতীর আইডিয়ালের সঙ্গে যাঁর সহানুভূতি আছে তিনি সেই প্রতিষ্ঠানের সভ্য হয়ে তার আদর্শ-পোষণের ভার নিতে পারেন। তিনি তার জন্য চিন্তা করবেন, চেষ্টা করে গড়ে তুলবেন, তাকে আঘাত থেকে রক্ষা করবেন। এটা হল এর দায়িত্বের দিক এবং আত্মীয়সমাজের লোকেদের কাজ। এর জন্য বিশ্বভারতীর দ্বার উদ্‌ঘাটিত

রয়েছে। কিন্তু লোকে তো এ কথা বলতে পারে যে, আমাদের এ-সব ভালো লাগে না, বিদেশ থেকে কেন এ-সব অধ্যাপকদের আনানো; ভারতবর্ষ তো আপনার পরিধির মধ্যেই বেশ ছিল। যাঁরা এ কথা বলেন তাঁদের সঙ্গেও আমাদের কোনো বাদপ্রতিবাদ নেই। তাঁরা এই প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কলকাতার এই 'বিশ্বভারতী সম্মিলনী'র সভ্য হতে পারেন, তাতে কারো আপত্তি নেই। যদি আমরা কিছু গান সংগ্রহ করে আনি তবে তাঁরা যে তা শুনবেন না এমন কোনো কথা নেই, কিম্বা আমাদের যদি কিছু বলবার থাকে তবে তাও তাঁরা শুনতে আসতে পারেন— এই যেমন ক্ষিতিমোহনবাবু সেদিন কবীর সম্বন্ধে বললেন, বা আজ যে আচার্য লেভির বিদায়ের পূর্বে তাঁকে সংবর্ধনা করা হল। এই পণ্ডিত বিদেশী হলেও তো এঁকে বিশেষ কোনো দেশের লোক বলা চলে না— ইনি আমাদের আপনার লোক হয়ে গেছেন, আমাদের দেশকে গভীরভাবে হৃদয়ে গ্রহণ করেছেন। এঁর সঙ্গে যে পরিচয়সাধন হল এতে করে তো কেউ কোনো আঘাত পান নি।

বর্তমান যুগে ইতিহাস হঠাৎ যেন নতুন দিকে বাঁক নেবার চেষ্টা করছে। কেন। আপনার জাতির একান্ত উৎকর্ষের জন্য যারা নিয়ত চেষ্টা করছে হঠাৎ তাদের মধ্যে মুষলপর্ব কেন দেখা দিলে। পূর্বে বলেছি, মানুষের সত্য হচ্ছে, আপনাকে অনেকের মধ্যে লাভ করলে তবেই সে আপনাকে লাভ করে। এতদিন ছোটো সীমার মধ্যে এই সত্য কাজ করছিল। ভৌগোলিক বেষ্টন যতদিন পর্যন্ত সত্য ছিল ততদিন সেই বেষ্টনের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার জাতির সকলের সঙ্গে মিলনে নিজেকে সত্য বলে অনুভব করায় যারা বড়ো হয়েছে। কিন্তু বর্তমান যুগে সে বেড়া ভেঙে গেছে; জলে স্থলে দেশে দেশে যে-সকল বাধা মানুষকে বাহির থেকে বিভক্ত করেছিল সে-সব ক্রমশ অপসারিত হচ্ছে। আজ আকাশপথে পর্যন্ত মানুষ চলাচল করছে। আকাশযানের উৎকর্ষ ক্রমে ঘটবে, তখন পৃথিবীর সমস্ত স্থূল বাধা মানুষ ডিঙিয়ে চলে যাবে, দেশগত সীমানার কোনো অর্থই থাকবে না।

ভূগোলের সীমা ক্ষীণ হয়ে মানুষ পরস্পরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এতবড়ো সত্যটা আজও বাহিরের সত্য হয়েই রইল, মনের ভিতরে এ সত্য স্থান পেলে না। পুরাতন যুগের অভ্যাস আজও তাকে জড়িয়ে আছে, সে যে সাধনার পাথেয় নিয়ে পথে চলতে চায় তা অতীত যুগের জিনিস; সুতরাং তা বর্তমান যুগের সামনের পথে চলবার প্রতিকূলতা করতে থাকবে।

বর্তমান যুগে যে সত্যের আবির্ভাব হয়েছে তার কাছে সত্যভাবে না গেলে মার খেতে হবে। তাই আজ মারামারি বেধেছে— নানা জাতির মিলনের ক্ষেত্রেও আনন্দ

নেই, শান্তি নেই। কাটাকাটি মারামারি সন্দেহ হিংসা যে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে তাতেই বুঝছি যে, সত্যের সাধনা হচ্ছে না। যে সত্য আজ মানবসমাজদ্বারে অতিথি তাঁর অভ্যর্থনার সাধনা বিশ্বভারতী গ্রহণ করেছে।

দারিদ্র্য যতই হোক, বাইরে থেকে দুর্গতি তার যতই হোক, এই ভার নেবার অধিকার ভারতবর্ষের আছে। এ কথা আজ বোলো না, 'তুমি দরিদ্র পরাধীন, তোমার মুখে এ-সব কথা কেন।' আমাদেরই তো এই কথা। ধনের গৌরব তো এ সত্যকে স্বীকার করতে চায় না। ধনসম্পদ তো ভেদ সৃষ্টি করে, সত্যসম্পদই ভেদকে অতিক্রম করবার শক্তি রাখে। ধনকে যে মানুষ চরম আশ্রয় বলে বিশ্বাস করে না, যে মৈত্রেয়ীর মতো বলতে পেরেছে, যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্, সেই তো ধনঞ্জয়, সেই তো ধনের বেড়া ভেঙে মানবাত্মার অধিকারকে সর্বত্র উদ্‌ঘাটিত করতে পারে। সেই অধিকারকে বিশ্বভারতী স্বীকার করুক। দেশবিদেশের তাপস এই বিশ্বভারতীতে আসন গ্রহণ করুন। আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা, এই কথা আমরা আশ্রমে বসে বলব। ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক ঐক্যসাধনার যে তপস্যা করেছেন সেই তপস্যাকে এই আধুনিক যুগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে তবেই আমাদের সমস্ত অগৌরব দূর হবে— বাণিজ্য করে নয়, লড়াই করে নয়, সত্যকে স্বীকার করার দ্বারাই তা হবে। মনুষ্যত্বের সেই পূর্ণগৌরবসাধনের আয়োজনে বিশ্বভারতী আজ হতে নিযুক্ত হোক, এই আমাদের সংকল্প।

১ ভাদ্র ? ১৩২৯ পৌষ ১৩২৯

কলিকাতা

৬

বিশ্বভারতী সম্বন্ধে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, আমার মনে এর ভাবটি সংকল্পটি কোনো একটি বিশেষ সময়ে যে ভেবেচিন্তে উদিত হয়েছে এমন নয়। এই সংকল্পের বীজ আমার মগ্ন চৈতন্যের মধ্যে নিহিত ছিল, তা ক্রমে অগোচরে অঙ্কুরিত হয়ে জেগে উঠেছে। এর কারণ আমার নিজের জীবনের মধ্যেই রয়েছে। বাল্যকাল থেকে আমি যে জীবন অতিবাহিত করে এসেছি তার ভিতর থেকে এই প্রতিষ্ঠানের আদর্শটি জাগ্রত হয়ে উঠেছে।

আপনারা জানেন যে, আমি যথোচিতভাবে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থার সঙ্গে যোগ রক্ষা করে চলি নি। আমার পরিবারে আমি যে ভাবে মানুষ হয়েছি তাতে করে

আমাকে সংসার থেকে দূরে নিয়ে গিয়েছিল, আমি একান্তবাসী ছিলাম। মানবসমাজের সঙ্গে আমার বাল্যকাল থেকে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল না, আমি তার প্রান্তে মানুষ হয়েছি। 'জীবনস্মৃতি'তে এর বিবরণ পড়ে থাকবেন। আমি সমাজের থেকে দূরে বাস করতুম বলে তার দিকে বাতায়নের পথ দিয়ে দৃষ্টিপাত করেছি। তাই আমার কাছে দূরের দুর্লভ জিনিসের প্রতি আকর্ষণ খুব গভীর ছিল। কলকাতা শহরে আমার বাস ছিল, কাজেই ইঁটকাঠপাথরের মধ্যে আমার গতিবিধি সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ ছিল। আমাদের চারি দিকেই বাড়িগুলি মাথা তুলে থাকত, আর তাদের মাঝখানে অল্প পরিধির মধ্যে সামান্য কয়েকটি গাছপালা আর একটি পুষ্করিণী ছিল। কিন্তু দূরে আমাদের পাড়ার বাইরে বেশি বড়ো বাড়ি ছিল না, একটু পাড়াগাঁ গোছের ভাব ছিল।

সে সময় আমাকে বাইরের প্রকৃতি ডাক দিয়েছিল। মনে আছে মধ্যাহ্নে লুকিয়ে একলা ছাদের কোণটি গ্রহণ করতুম। উন্মুক্ত নীলাকাশ, চিলের ডাক, আর পাড়ার গলির জনতার বিচিত্র ছোটো ছোটো কলধ্বনির মধ্য দিয়ে বাড়ির ছাদের উপর থেকে যে জীবনযাত্রার খণ্ড খণ্ড ছবি পেতুম তা আমার হৃদয়কে আলোড়িত করেছিল। এর মধ্যে মানবপ্রকৃতিরও একটা ডাক ছিল। দূর থেকে কখনো-বা লোকালয়ের উপর রাত্রের ঘুম-পাড়ানো সুর, কখনো-বা প্রভাতের ঘুম-জাগানো গান, আর উৎসব-কোলাহলের নানারকম ধ্বনি আমার হৃদয়কে উতলা করে দিয়েছিল। বর্ষার নবমেঘাগমে আকাশের লীলাবৈচিত্র্য আর শরতের শিশিরে ছোটো বাগানটিতে ঘাস ও নারিকেলরাজির ঝলমলানি আমার কাছে অপূর্ব হয়ে দেখা দিত। মনে আছে অতি প্রত্যূষে সূর্যোদয়ের আবির্ভাবের সঙ্গে তাল রাখবার জন্য তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে তার অপেক্ষা করেছি। সকালের সেই শিশিরের উপর সোনার আলো আমার হৃদয়ে নিবিড় গভীর আনন্দবেদনার সঞ্চার করেছে। বিশ্বজগৎ যেন আমাকে বার বার করে আহ্বান করে বলেছে, 'তুমি আমার আপনার। আমার মধ্যে যে সত্য আছে তা সকলের সঙ্গে যোগের প্রতীক্ষা রাখে, কিন্তু তবুও তোমার-আমায় এই বিরহের মধ্যেও মাধুর্য রয়েছে।' তখনো এই বহির্বিশ্বের উপলব্ধি আমার মনের ভিতরে অস্পষ্টভাবে ঘনিয়ে উঠেছে। ছোটো ঘরের ভিতরকার মানুষটিকে বাইরের ডাক গভীরভাবে মুগ্ধ করেছিল।

তার পর আমার মনে আছে যে, প্রথম যখন আমাদের শহরে ডেঙ্গুজ্বর দেখা দিল, এই ব্যাধি আমার কাছে বেরিয়ে পড়বার মস্ত সুযোগের মতো এল। গঙ্গার ধারে পেনেটির বাগানে আমরা বাস করতে লাগলুম। এই প্রথম অপেক্ষাকৃত নিকটভাবে প্রকৃতির স্পর্শ পেলাম। এ যে কত মনোহর তা ব্যক্ত করতে পারি না। আপনারা

অনেকে পল্লীগ্রাম থেকে আসছেন, অনেকেরই পল্লীর সঙ্গে অতিনিকট সম্বন্ধ। আপনারা তাঁর শ্যামল শস্যক্ষেত্র ও বনরাজি দেখে থাকবেন, কিন্তু আমার মনোভাব ঠিক উপলব্ধি করতে পারবেন না। ইটকাঠের কারাগার থেকে বহিরাকাশে মুক্তি পেয়ে প্রকৃতির সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয় লাভ করা যে কত মূল্যবান তা আমার জীবনে যেমন বুঝেছিলুম অল্পলোকের ভাগ্যেই তা ঘটে। সকালে কুঠির পানসি দক্ষিণ দিকে যেত, সন্ধ্যায় তা উত্তরগামী হত। নদীর দু ধারে এই জনতার ধারা, জলের সঙ্গে মানুষের এই জীবনযাত্রার যোগ, গ্রামবাসীদের এই স্নান পান তর্পণ, এই-সকল দৃশ্য আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল। গ্রামগুলি যেন গঙ্গার দুই পারকে আঁকড়ে রয়েছে, পিপাসার জলকে স্তন্যরসের মতো গ্রহণ করে নিয়েছে। আমার গঙ্গার ধারে এই প্রথম যাওয়া। আর সে সময়ে সেখানকার সূর্যের উদয়াস্ত যে আমার কাছে কী অপরূপ লেগেছিল তা কী বলব। এই-যে বিশ্বজগতে প্রতি মুহূর্তে অনির্বচনীয় মহিমা উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে আমরা তার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও অতি-পরিচয়ের জন্য তা আমাদের কাছে ম্লান হয়ে যায়। ওঅর্ড্‌স্‌ওঅর্থের কবিতায় আপনারা তার উল্লেখ দেখেছেন। কেজো মানুষের কাছে বিশ্বপ্রকৃতির অপূর্বতা একেবারে 'না' হয়ে গেছে, নেই বললেই হয়। তার রহস্য মাধুর্য তার মনে তেমন সাড়া দেয় না। আকাশে দিনের পর দিন যেন আশ্চর্য একটি কাব্যগ্রন্থের পাতার পর পাতা উদ্‌ঘাটন করে বিশ্বকবির মর্মকথাটি বার বার প্রকাশ করতে থাকে। আমরা মাঝখান থেকে অতিপরিচয়ের অন্তরালে তার রস থেকে বঞ্চিত হই। তাই প্রকৃতির রসধারার স্পর্শে আমার মন সে সময়ে যেরকম উৎসুক হয়ে উঠেছিল আজও তার প্রবলতা ক্ষীণ হয়ে যায় নি, এ কথাটা বলার দরকার আছে। এতটা আমি ভূমিকাস্বরূপ বললুম। যে যে ঘটনা আমার জীবনকে নানা সম্পর্কের মধ্য দিয়ে একটা বিশেষ দিকে চালনা করছিল এই সময়কার জীবনযাত্রা তার মধ্যে সর্বপ্রধান ব্যাপার।

এমনি আর-একটি অনুকূল ঘটনা ঘটল যখন আমি পদ্মানদীর তীরে গিয়ে বাস করতে লাগলুম। পদ্মাতটের সেই আম জাম ঝাউ বেত আর সর্ষের খেত, ফাল্গুনের মৃদু সৌগন্ধে ভারাক্রান্ত বাতাস, নির্জন চরে কলধ্বনিমুখরিত বুনো হাঁসের বসতি, সন্ধ্যা-তারায়-জলজল-করা নদীর স্বচ্ছ গভীরতা, এ-সব আমার সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা স্থাপন করেছিল। তখন পল্লীগ্রামে মানুষের জীবন ও প্রকৃতির সৌন্দর্যে সম্মিলিত জগতের সঙ্গে পরিচয় লাভ করে আমার গভীর আনন্দ পাবার উপলক্ষ হয়েছিল।

অল্প বয়সে আমি আর-একটি জিনিস পেয়েছি। মানুষের থেকে দূরে বাস করলেও এবং উন্মুক্ত প্রকৃতির কোল থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কাটিয়ে থাকলেও আমি বাড়িতে আত্মীয়-

বন্ধুদের সংগীত সাহিত্য শিল্পকলার চর্চার আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হয়েছি। এটি আমার জীবনের খুব বড়ো কথা। আমি শিশুকাল থেকে পলাতক ছাত্র। মাস্টারকে বরাবর ভয় করে এড়িয়ে চলেছি। কিন্তু বিশ্বসংসারের যে-সকল অদৃশ্য মাস্টার অলক্ষ্যে থেকে পাঠ শিখিয়ে দেন তাঁদের কাছে কোনোরকমে আমি পড়া শিখে নিয়েছি। আমাদের বাড়িতে নিয়ত ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যের ও সংগীতের আলোচনা হত, আমি এ-সবের মধ্যে বেড়ে উঠেছি। এই-সকল বিদ্যা যথার্থভাবে শিক্ষালাভ না করলেও এ থেকে ভিতরে ভিতরে আশপাশ হতে নানা উপায়ে মনে মনে আনন্দরস সঞ্চয় করতে পেরেছি। আমার বড়দাদা তখন 'স্বপ্নপ্রয়াণ' লিখতে নিরত ছিলেন। বনস্পতি যেমন স্বচ্ছন্দে প্রচুর ফুল ফুটিয়ে ফল ধরিয়ে ইতস্তত বিস্তর খসিয়ে ঝরিয়ে ফেলে দেয়, তাতে তার কোনো অনুশোচনা নেই, তেমনি তিনি খাতায় যতটি লেখা রক্ষা করতেন তার চেয়ে ছেঁড়া কাগজে বাতাসে ছড়াছড়ি যেত অনেক বেশি। আমাদের চলাফেরার রাস্তা সেই-সব বিক্ষিপ্ত ছিন্নপত্রে আকীর্ণ হয়ে গেছে। সেই-সকল অবারিত সাহিত্য-রচনার ছিন্নপত্রের স্তূপ আমার চিত্তধারায় পলিমাটির সঞ্চয় রেখে দিয়ে গিয়েছিল।

তার পর আপনারা জানেন, আমি খুব অল্পবয়স থেকেই সাহিত্যচর্চায় মন দিয়েছি, আর তাতে করে নিন্দা খ্যাতি যা পেয়েছি তারই মধ্য দিয়ে লেখনী চালিয়ে গিয়েছি। তখন একটি বড়ো সুবিধা ছিল যে, সাহিত্যক্ষেত্রে এত প্রকাশ্যতা ছিল না, সাহিত্যের এত বড়ো বাজার বসে নি, ছোটো হাটেই পসরা দেওয়া-নেওয়া চলত। তাই আমার বাল্যরচনা আপন কোণটুকুতে কোনো লজ্জা পায় নি। আত্মীয়বন্ধুদের যা একটু-আধটু প্রশংসা ও উৎসাহ লাভ করেছি তাই যথেষ্ট মনে করেছি। তার পরে ক্রমে বঙ্গসাহিত্যের প্রসার হল, তার চর্চা ব্যাপকতা লাভ করল। সাহিত্যক্ষেত্র জনতায় আক্রান্ত হল। দেখতে দেখতে রাত্রির আকাশে তারার আবির্ভাবের মতো সাহিত্যাকাশ অসংখ্য লেখকের দ্বারা খচিত হয়ে দেখা দিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমার সাহিত্যচর্চার মধ্যে বরাবর সেই নির্জনতাই ছিল। এই বিরলবাসই আমার একান্ত আপনার জিনিস ছিল। অতিরিক্ত প্রকাশ্যতার আঘাতে আমি কখনো সুস্থ বোধ করি নি। আমি চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর পর্যন্ত পদ্মাতীরের নিরালা আবাসটিতে আপন খেয়ালে সাহিত্যরচনা করেছি। আমার কাব্যসৃষ্টির যা-কিছু ভালো-মন্দ তা সে সময়েই লেখা হয়েছে।

যখন এমনি সাহিত্যের মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে কাল কাটাচ্ছি তখন আমার অন্তরে একটি আহ্বান একটি প্রেরণা এল যার জন্য বাইরে বেরিয়ে আসতে আমার মন ব্যাকুল হল। যে কর্ম করবার জন্য আমার আকাঙ্ক্ষা হল তা হচ্ছে শিক্ষাদানকার্য। এটা খুব বিস্ময়কর ব্যাপার, কারণ শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যে আমার যোগ ছিল না তা তো আগেই

বলেছি। কিন্তু এই ভারই যে আমাকে গ্রহণ করতে হল তার কারণ হচ্ছে, আমার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল যে, আমাদের শিক্ষাপ্রণালীতে গুরুতর অভাব রয়েছে, তা দূর না হলে শিক্ষা আমাদের জীবন থেকে স্বতন্ত্র হয়ে সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস হয়ে থাকবে। আমি এ কথা বলছি না যে, এই গুরুতর অভাব শুধু আমাদের দেশেই আছে— সকল দেশেই ন্যূনাধিক পরিমাণে শিক্ষা সর্বাঙ্গীণ হতে পারছে না— সর্বত্রই বিদ্যাশিক্ষাকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট ব্যাপার করে ফেলা হয়।

তখন আমার মনে একটি দূরকালের ছবি জেগে উঠল। যে তপোবনের কথা পুরাণকথায় পড়া যায় ইতিহাস তাকে কতখানি বাস্তব সত্য বলে গণ্য করবে জানি না, কিন্তু সে বিচার ছেড়ে দিলেও একটা কথা আমার নিজের মনে হয়েছে যে, তপোবনের শিক্ষাপ্রণালীতে খুব একটি বড়ো সত্য আছে। যে বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির কোলে আমাদের জন্ম তার শিক্ষকতা থেকে বঞ্চিত বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে মানুষ সম্পূর্ণ শিক্ষা পেতে পারে না। বনস্থলীতে যেমন এই প্রকৃতির সাহচর্য আছে তেমনি অপর দিকে তপস্বী মানুষের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাসম্পদ সেই প্রকৃতির মাঝখানে বসে যখন লাভ করা যায় তখনই যথার্থ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের মধ্যে বাস করে বিদ্যাকে গুরুর কাছ থেকে পাওয়া যায়। শিক্ষা তখন মানবজীবন থেকে বঞ্চিত হয়ে একান্ত ব্যাপার হয় না। বনের ভিতর থেকে তপোবনের হোমধেনু দোহন করে অগ্নি প্রজ্বলিত করে নানা ভাবে প্রকৃতির সঙ্গে নিত্যযুক্ত হয়ে যে জীবনযাপনের ব্যবস্থা প্রাচীন কালে ছিল তার মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল। যাদের গুরুরূপে বরণ করা হয় তাদের সঙ্গে এইরূপ জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে একত্র মানুষ হয়ে ওঠার মধ্যে খুব একটা বড়ো শিক্ষা আছে। এতে করে শিক্ষা ও জীবনের মধ্যে যথার্থ যোগ স্থাপিত হয়, গুরুশিষ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ সত্য ও পূর্ণ হয়, বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির সঙ্গে মিলন মধুর ও স্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। তাই আমার মনে হয়েছিল যে তখনকার দিনে তপোবনের মধ্যে মানবজীবনের বিকাশ একটি সহজ ব্যাপার ছিল বটে, কিন্তু তার সময়টি এখনো উত্তীর্ণ হয়ে যায় নি; তার মধ্যে যে সত্য ও সৌন্দর্য আছে তা সকল কালের। বর্তমান কালেও তপোবনের জীবন আমাদের আয়ত্তের অগম্য হওয়া উচিত নয়।

এই চিন্তা যখন আমার মনে উদিত হয়েছিল তখন আমি শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনার ভার নিলুম। সৌভাগ্যক্রমে তখন শান্তিনিকেতন আমার পক্ষে তপোবনের ভাবে পূর্ণ ছিল। আমি বাল্যকালে আমার পিতৃদেবের সঙ্গে এখানে কালযাপন করেছি। আমি প্রত্যক্ষভাবে জানি যে, তিনি কী পূর্ণ আনন্দে বিশ্বের সঙ্গে পরমাত্মার সঙ্গে চিত্তের যোগসাধনের দ্বারা সত্যকে জীবনে একান্তভাবে উপলব্ধি করেছেন। আমি দেখেছি।

যে, এই অনুভূতি তাঁর কাছে বাহিরের জিনিস ছিল না। তিনি রাত্রি দুটোর সময় উন্মুক্ত ছাদে বসে তারাখচিত রাত্রিতে নিমগ্ন হয়ে অন্তরে অমৃতরস গ্রহণ করেছেন, আর প্রতিদিন বেদীতলে বসে প্রাণের পাত্রটি পূর্ণ করে সুধাধারা পান করেছেন। যিনি সমস্ত বিশ্বকে পূর্ণ করে রয়েছেন তাঁকে বিশ্বছবির মধ্যে উপলব্ধি করা, এটি মহর্ষির জীবনে প্রত্যক্ষ সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। আমার মনে হল যে, যদি ছাত্রদের মহর্ষির সাধনস্থল এই শান্তিনিকেতনে এনে বসিয়ে দিতে পারি তবে তাদের সঙ্গে থেকে নিজের যেটুকু দেবার আছে তা দিতে পারলে বাকিটুকুর জন্ম আমাকে ভাবতে হবে না, প্রকৃতিই তাদের হৃদয়কে পূর্ণ করে সকল অভাব মোচন করে দিতে পারবে। প্রকৃতির সঙ্গে এই যোগের জন্ম সকলের চিত্তেই যে ন্যূনাধিক ক্ষুধার অংশ আছে তার নিবৃত্তি করবার চেষ্টা করতে হবে, যে স্পর্শ থেকে মানুষ বঞ্চিত হয়েছে তাকে জোগাতে হবে।

তখন আমার সঙ্গী-সহায় খুবই অল্প। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় আমায় ভালোবাসতেন আর আমার সংকল্পে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি আমার কাজে এসে যোগ দিলেন। তিনি বললেন, 'আপনি মাস্টারি করতে না জানেন, আমি সে ভার নিচ্ছি।' আমার উপর ভার রইল ছেলেদের সঙ্গ দেওয়া। আমি সন্ধ্যাবেলায় তাদের নিয়ে রামায়ণ মহাভারত পড়িয়েছি, হাস্য-করুণ রসের উদ্রেক করে তাদের হাসিয়েছি কাঁদিয়েছি। তা ছাড়া নানা গল্প বানিয়ে বলতাম, দিনের পর দিন একটি ছোটো গল্পকে টেনে টেনে লম্বা করে পাঁচ-সাত দিন ধরে একটি ধারা অবলম্বন করে চলে যেতাম। তখন মুখে মুখে গল্প তৈরি করবার আমার শক্তি ছিল। এই-সব বানানো গল্পের অনেকগুলি আমার 'গল্পগুচ্ছে' স্থান পেয়েছে। এমনি ভাবে ছেলেদের মন যাতে অভিনয়ে গল্পে গানে, রামায়ণ-মহাভারত-পাঠে সরস হয়ে ওঠে তার চেষ্টা করেছি।

আমি জানি, ছেলেদের এমনি ভাবে মনের ধারা ঠিক করে দেওয়া, একটা অ্যাটিচুড তৈরি করে তোলা খুব বড়ো কথা। মানুষের যে এতবড়ো বিশ্বের মধ্যে এতবড়ো মানবসমাজে জন্ম হয়েছে, সে যে এতবড়ো উত্তরাধিকার লাভ করেছে, এইটার প্রতি তার মনের অভিমুখিতাকে খাঁটি করে তোলা দরকার। আমাদের দেশের এই দুর্গতির দিনে আমাদের অনেকের পক্ষেই শিক্ষার শেষ লক্ষ্য হয়েছে চাকরি, বিশ্বের সঙ্গে যে আনন্দের সম্বন্ধের দ্বারা বিশ্বসম্পদকে আত্মগত করা যায় তা থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। কিন্তু মানুষকে আপন অধিকারটি চিনে নিতে হবে। সে যেমন প্রকৃতির সঙ্গে চিত্তের সামঞ্জস্য সাধন করবে তেমন তাকে বিরাট মানববিশ্বের সঙ্গে সম্মিলিত হতে হবে।

আমাদের দেশবাসীরা 'ভূমৈব সুখম্' এই ঋষিবাক্য ভুলে গেছে। ভূমৈব সুখং— তাই জ্ঞানতপস্বী মানব দুঃসহ ক্লেশ স্বীকার করেও উত্তর-মেরুর দিকে অভিযানে যাচ্ছে, আফ্রিকার অভ্যন্তরপ্রদেশে দুর্গম পথে যাত্রা করছে, প্রাণ হাতে করে সত্যের সন্ধানে ধাবিত হচ্ছে। তাই কর্ম জ্ঞান ও ভাবের সাধনপথের পথিকেরা দুঃখের পথ অতিবাহন করতে নিষ্ক্রান্ত হয়েছে; তাঁরা জেনেছেন যে, ভূমৈব সুখং— দুঃখের পথেই মানুষের সুখ। আজ আমরা সে কথা ভুলেছি, তাই অত্যন্ত ক্ষুদ্র লক্ষ্য ও অকিঞ্চিৎকর জীবনযাত্রার মধ্যে আত্মাকে প্রচ্ছন্ন করে দিয়ে দেশের প্রায় সকল লোকেরই কাল কাটছে।

তাই শিক্ষালয় স্থাপন করবার সময়ে প্রথমেই আমার এ কথা মনে হল যে, আমাদের ছাত্রদের জীবনকে মানসিক ক্ষীণতা থেকে ভীরুতা থেকে উদ্ধার করতে হবে। যে গঙ্গার ধারা গিরিশিখর থেকে উত্থিত হয়ে দেশদেশান্তরে বহমান হয়ে চলেছে মানুষ তার জলকে সংসারের ছোটো বড়ো সকল কাজেই লাগাতে পারে। তেমনি যে পাবনী বিদ্যাধারা কোনো উত্তুঙ্গ মানবচিত্তের উৎস থেকে উদ্ভূত হয়ে অসীমের দিকে প্রবাহিত হয়ে চলছে, যা পূর্ব-পশ্চিম-বাহিনী হয়ে দিকে দিকে নিরন্তর স্বতঃ-উৎসারিত হচ্ছে, তাকে আমরা ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির পরিধির মধ্যে বাঁধ বেঁধে ধরে রেখে দেখব না; কিন্তু যেখানে তা পূর্ণ মানবজীবনকে সার্থক করে তুলেছে, তার সেই বিরাট বিশ্বরূপটি যেখানে পরিস্ফুট হয়েছে সেখানে আমরা অবগাহন করে শুদ্ধ নির্মল হব।

'স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।' সৃষ্টিকর্তা তপস্যা করছেন, তপস্যা করে সমস্ত সৃজন করছেন। প্রতি অণুপরমাণুতে তাঁর সেই তপস্যা নিহিত। সেজন্য তাদের মধ্যে নিরন্তর সংঘাত, অগ্নিবেগ, চক্রপথের আবর্তন। সৃষ্টিকর্তার এই তপঃসাধনার সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও তপস্যার ধারা চলেছে, সেও চুপ করে বসে নেই। কেননা মানুষও সৃষ্টিকর্তা, তার আসল হচ্ছে সৃষ্টির কাজ। সে যে সংগ্রহ করে সঞ্চয় করে এই তার বড়ো পরিচয় নয়, সে ত্যাগের দ্বারা প্রকাশ করে এই তার সত্য পরিচয়। তাই বিধাতার এই বিশ্বতপঃক্ষেত্রে তারও তপঃসাধনা। মানুষ হচ্ছে তপস্বী, এই কথাটি উপলব্ধি করতে হবে। উপলব্ধি করতে হলে সকল কালের সকল দেশের তপস্যার প্রয়াসকে মানবের সত্য ধর্ম বলে বড়ো করে জানতে হবে।

আজকার দিনে যে তপঃক্ষেত্রে বিশ্বের সর্ব জাতির ও সর্ব দেশের মানবের তপস্যার আসন পাতা হয়েছে আমাদেরও সকল ভেদবুদ্ধি ভুলে গিয়ে সেখানে পৌঁছতে হবে।

আমি যখন বিশ্বভারতী স্থাপিত করলুম তখন এই সংকল্পই আমার মনে কাজ করছিল। আমি বাঙালি বলে আমাদের সাহিত্যরসের চর্চা কেবল বাংলাসাহিত্যের মধ্যেই পরিসমাপ্ত হবে? আমি কি বিশ্বসংসারে জন্মাই নি। আমারই জন্য জগতের যত দার্শনিক যত কবি যত বৈজ্ঞানিক তপস্যা করছেন, এর যথার্থোপলব্ধির মধ্যে কি কম গৌরব আছে?

আমার মুখে এই কথা অহমিকার মতো শোনাতে পারে। আজকের কথাপ্রসঙ্গে তবু আমার বলা দরকার যে, য়ুরোপে আমি যে সম্মান পেয়েছি তা রাজামহারাজারা কোনো কালে পায় নি। এর দ্বারা একটা কথার প্রমাণ হচ্ছে যে, মানুষের অন্তর-প্রদেশের বেদনা-নিকেতনে জাতিবিচার নেই। আমি এমন-সব লোকের কাছে গিয়েছি যাঁরা মানুষের গুরু, কিন্তু তাঁরা স্বচ্ছন্দে নিঃসংকোচে এই পূর্বদেশবাসীর সঙ্গে শ্রদ্ধার আদানপ্রদান করেছেন। আমি কোথায় যে মানুষের মনে সোনার কাঠি ছোঁয়াতে পেরেছি, কেন যে য়ুরোপের মহাদেশ-বিভাগে এরা আমাকে আত্মীয়রূপে সমাদর করেছে, সে কথা ভেবে আমি নিজেই বিস্মিত হই। এমনি ভাবেই স্যর জগদীশ বসুও যেখানে নিজের মধ্যে সত্যের উৎসধারার সন্ধান পেয়েছেন এবং তা মানুষকে দিতে পেরেছেন সেখানে সকল দেশের জ্ঞানীরা তাঁকে আপনার বলেই অভ্যর্থনা করে নিয়েছেন।

পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে নিরন্তর বিদ্যার সমাদর হচ্ছে। ফরাসি ও জর্মনদের মধ্যে বাইরের ঘোর রাষ্ট্রনৈতিক যুদ্ধ বাধলেও উভয়ের মধ্যে বিদ্যার সহযোগিতার বাধা কখনো ঘটে নি। আমরাই কেন শুধু চিরকেলে 'স্কুলবয়' হয়ে একটু একটু করে মুখস্থ করে পাঠ শিখে নিয়ে পরীক্ষার আসরে নামব, তার পর পরীক্ষাপাস করেই সব বিস্মৃতির গর্তে ডুবিয়ে বসে থাকব। কেন সকল দেশের তাপসদের সঙ্গে আমাদের তপস্যার বিনিময় হবে না। এই কথা মনে রেখেই আমি বিশ্বভারতীতে আমাদের সাধনার ক্ষেত্রে য়ুরোপের অনেক মনস্বী ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করেছিলুম। তাঁরা একজনও সেই আমন্ত্রণের অবজ্ঞা করেন নি। তাঁদের মধ্যে একজনের সঙ্গে অন্তত আমাদের চাক্ষুষ পরিচয়ও হয়েছে। তিনি হচ্ছেন প্রাচ্যতত্ত্ববিদ ফরাসি পণ্ডিত সিল্ভ্যাঁ লেভি। তাঁর সঙ্গে যদি আপনাদের নিকটসম্বন্ধ ঘটত তা হলে দেখতেন যে, তাঁর পাণ্ডিত্য যেমন অগাধ তাঁর হৃদয় তেমনি বিশাল। আমি প্রথমে সংকোচের সঙ্গে অধ্যাপক লেভির কাছে গিয়ে আমার প্রস্তাব জানালুম। তাঁকে বললুম যে আমার ইচ্ছা যে, ভারতবর্ষে আমি এমন বিদ্যাক্ষেত্র স্থাপন করি যেখানে সকল পণ্ডিতের সমাগম হবে, যেখানে ভারতীয় সম্পদের একত্র-সমাবেশের চেষ্টা হবে। সে সময় তাঁর হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বক্তৃতা দেবার

নিমন্ত্রণ এসেছিল। হার্ভার্ড পৃথিবীর বড়ো বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে অন্যতম। কিন্তু আমাদের বিশ্বভারতীর নামধাম কেউ জানে না; অথচ এই অখ্যাতনামা আশ্রমের আতিথ্য লেভি-সাহেব অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করলেন।

আপনারা মনে করবেন না যে তিনি এখানে এসে শ্রদ্ধা হারিয়েছেন। তিনি বার বার বলেছেন, 'এ যেন আমার পক্ষে স্বর্গে বাস।' তিনি যেমন বড়ো পণ্ডিত ছিলেন, তাঁর তদনুরূপ যোগ্য ছাত্র যে অনেক পাওয়া গিয়েছিল তাও বলা যায় না, কিন্তু তিনি অবজ্ঞা করেন নি, তিনি ভাবের গৌরবেই কর্মগৌরব অনুভব করেছেন; তাই এখানে এসে তৃপ্ত হতে পেরেছেন। এই প্রসঙ্গে আপনাদের এই সংবাদ জানা দরকার যে, ফ্রান্স জর্মনি সুইজারল্যাণ্ড অষ্ট্রিয়া বোহিমিয়া প্রভৃতি য়ুরোপীয় দেশ থেকে অজস্র পরিমাণ বই দানরূপে শান্তিনিকেতন লাভ করেছে।

বিশ্বকে সহযোগীরূপে পাবার জন্য শান্তিনিকেতনে আমরা সাধ্যমত আসন পেতেছি, কিন্তু এক হাতে যেমন তালি বাজে না তেমনি এক পক্ষের দ্বারা এই চিত্তসমবায় সম্ভবপর হয় না। যেখানে ভারতবর্ষ এক জায়গায় নিজেকে কোণঠেসা করে রেখেছে সেখানে কি সে তার রুদ্ধ দ্বার খুলবে না? ক্ষুদ্র বুদ্ধির দ্বারা বিশ্বকে একঘরে করে রাখার স্পর্ধাকে নিজের গৌরব বলে জ্ঞান করবে?

আমার ইচ্ছা বিশ্বভারতীতে সেই ক্ষেত্রটি তৈরি হয় যেখানে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধ স্বাভাবিক কল্যাণজনক ও আত্মীয়জনোচিত হয়। ভারতবর্ষকে অনুভব করতে হবে যে, এমন একটি জায়গা আছে যেখানে মানুষকে আত্মীয় বলে গ্রহণ করাতে অগৌরব বা দুঃখের কারণ নেই, যেখানে মানুষের পরস্পরের সম্পর্কটি পীড়াজনক নয়। আমার পাশ্চাত্য বন্ধুরা আমাকে কখনো কখনো জিজ্ঞাসা করেছেন, 'তোমাদের দেশের লোকে কি আমাদের গ্রহণ করবে।' আমি তার উত্তরে জোরের সঙ্গে বলেছি, 'হ্যা নিশ্চয়ই, ভারতীয়েরা আপনাদের কখনো প্রত্যাখ্যান করবে না।' আমি জানি যে, বাঙালির মনে বিদ্যার গৌরববোধ আছে, বাঙালি পাশ্চাত্যবিদ্যাকে অস্বীকার করবে না। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নানা ভেদ ও মতবাদ সত্ত্বেও ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশেই সর্বদেশীয় বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধা বাঙালির রক্তের জিনিস হয়ে গেছে। যারা অতি দরিদ্র, যাদের কষ্টের সীমা নেই, তারাও বিদ্যাশিক্ষার দ্বারা ভদ্র পদবী লাভ করবে বলে আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশেই করে। বাঙালি যদি শিক্ষিত না হতে পারে তবে সে ভদ্রসমাজেই উঠতে পারল না। তাই তো বাঙালির বিধবা মা ধান ভেনে সুতো কেটে প্রাণপাত করে ছেলেকে শিক্ষা দিতে ব্যগ্র হয়। তাই আমি মনে করেছিলুম যে, বাঙালি বিদ্যা ও বিদ্বানকে অবজ্ঞা করবে না; তাই আমি পাশ্চাত্য জ্ঞানীদের বলে

এসেছিলাম যে, 'তোমরা নিঃসংকোচে নির্ভয়ে আমাদের দেশে আসতে পার, তোমাদের অভ্যর্থনার ত্রুটি হবে না।'

আমার এই আশ্বাসবাক্যের সত্য পরীক্ষা বিশ্বভারতীতেই হবে। আশা করি এইখানে আমরা প্রমাণ করতে পারব যে, বৃহৎ মানবসমাজে যেখানে জ্ঞানের যজ্ঞ চলছে সেখানে সত্যহোমানলে আহুতি দেবার অধিকার আমাদেরও আছে; সমস্ত দেশ ও কালের জ্ঞানসম্পদ আমরা আপনার বলে দাবি করতে পারি এই গৌরব আমাদের। মানুষের হাত থেকে বর ও অর্ঘ্য গ্রহণের যে স্বাভাবিক অধিকার প্রত্যেক মানুষেরই আছে কোনো মোহবশত আমরা তার থেকে লেশমাত্র বঞ্চিত নই। আমাদের মধ্যে সেই বর্বরতা নেই যা দেশকালপাত্রনিরপেক্ষ জ্ঞানের আলোককে আত্মীয়রূপে স্বীকার করে না, তাকে অবজ্ঞা করে লজ্জা পায় না, প্রত্যাখ্যান করে নিজের দৈন্য অনুভব করতে পারে না।

৪ ভাদ্র ১৩২৯ সেপ্টেম্বর ১৯২২

কলিকাতা

৭

প্রত্যেক মুহূর্তেই আমাদের মধ্যে একটি প্রেরণা আছে নিজেকে বিকশিত করবার। বিকাশই হচ্ছে বিশ্বজগতের গোড়াকার কথা। সৃষ্টির যে লীলা, তার এক দিকে আবরণ আর-এক দিকে প্রকাশ। প্রকাশের যে আনন্দ, দেশকালের মধ্যে দিয়ে সে আপন আবরণ মোচনের দ্বারা আপনাকে উপলব্ধি করছে। উপনিষদ বলছেন— 'হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্,' হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ আবৃত হয়ে আছে। কিন্তু একান্তই যদি আবৃত হয়ে থাকত তা হলে পাত্রকেই জানতুম, সত্যকে জানতুম না। সত্য যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে এ কথা বলবারও জোর থাকত না। কিন্তু যেহেতু সৃষ্টির প্রক্রিয়াই হচ্ছে সত্যের প্রকাশের প্রক্রিয়া সেইজন্যে উপনিষদের ঋষি মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে এমন করে বলতে পেরেছেন, 'হে সূর্য, তোমার আলোকের আবরণ খোলো, আমি সত্যকে দেখি।'

মানুষ যে এমন কথা বলতে পেরেছে তার কারণ এই, মানুষ নিজের মধ্যেই দেখছে যে, প্রত্যক্ষ যে অবস্থার মধ্যে সে বিরাজমান সেইটেই তার চরম নয়। তার লোভ আছে এবং লোভ চরিতার্থ করবার প্রবল বাসনা আছে; কিন্তু তার অন্তরাত্মা বলছে,

লোভের আবরণ থেকে মনুষ্যত্বকে মুক্তি দিতে চাই। অর্থাৎ যে পদার্থটা তার মধ্যে অতিরিক্ত-মাত্রায় প্রবল হয়ে আছে সেটাকে সে আপন মনুষ্যত্বের প্রকাশ বলে স্বীকার করে না, বাধা বলেই স্বীকার করে। যা আছে তাই সত্য, যা প্রতীয়মান তাই প্রতীতির যোগ্য, মানুষ এ কথা বলে নি। পশুবৎ বর্বর মানুষের মধ্যে বাহুশক্তি যতই প্রবল থাক্, তার সত্য যে ক্ষীণ অর্থাৎ তার প্রকাশ যে বাধাগ্রস্ত এ কথা মানুষ প্রথম থেকেই কোনোরকম করে উপলব্ধি করেছিল বলেই সে যাকে সভ্যতা বলে সে পদার্থটা তার কাছে নিরর্থক হয় নি।

সভ্যতা-শব্দটার আসল মানে হচ্ছে, সভার মধ্যে আপনাকে পাওয়া, সকলের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করা। সভা-শব্দের ধাতুগত অর্থ এই যে, যেখানে আভা যেখানে আলোক আছে। অর্থাৎ মানুষের প্রকাশের আলো একলা নিজের মধ্যে নয়, সকলের সঙ্গে মিলনে। যেখানে এই মিলনতত্ত্বের যতটুকু খর্বতা সেইখানেই মানুষের সত্য সেই পরিমাণেই আচ্ছন্ন। এইজন্যেই মানুষ কেবলই আপনাকে আপনি বলছে— 'অপাবৃণু', খুলে ফেলো, তোমার একলা-আপনের ঢাকা খুলে ফেলো, তোমার সকল-আপনের সত্যে প্রকাশিত হও; সেইখানেই তোমার দীপ্তি, সেইখানেই তোমার মুক্তি।

বীজ যখন অঙ্কুররূপে প্রকাশিত হয় তখন ত্যাগের দ্বারা হয়। সে ত্যাগ নিজেকেই ত্যাগ। সে আপনাকে বিদীর্ণ করে তবে আপনার সত্যকে মুক্তি দিতে পারে। তেমনি, যে আপন সকলের তাকে পাবার জন্যে মানুষেরও ত্যাগ করতে হয় যে আপন তার একলার, তাকে। এইজন্যে ঈশোপনিষদ বলেছেন, যে মানুষ আপনাকে সকলের মধ্যে ও সকলকে আপনার মধ্যে পায় 'ন ততো বিজুগুপ্সতে'— সে আর গোপন থাকে না। অসত্যে গোপন করে, সত্যে প্রকাশ করে। তাই আমাদের প্রার্থনা, 'অসতো মা সদ্গময়'— অসত্য থেকে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও; 'আবিরাবীর্ম এধি'— হে প্রকাশস্বরূপ, আমার মধ্যে তোমার আবির্ভাব হোক।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, প্রকাশ হচ্ছে আপনাকে দান। আপনাকে দিতে গিয়ে তবে আপনাকে প্রকাশ করি, আপনাকে জানতে পাই। আপনাকে দেওয়া এবং আপনাকে জানা একসঙ্গেই ঘটে। নির্বাপিত প্রদীপ আপনাকে দেয় না, তাই আপনাকে পায় না। যে মানুষ নিজেকে সঞ্চয় ক'রে সকলের চেয়ে বড়ো হয় সেই প্রচ্ছন্ন, সেই অবরুদ্ধ; যে মানুষ নিজেকে দান ক'রে সকলের সঙ্গে এক হতে চায় সেই প্রকাশিত, সেই মুক্ত।

সওগাদ, তার উপরে নানা রঙের চিত্র-করা রুমাল ঢাকা। যতক্ষণ রুমাল আছে ততক্ষণ দেওয়া হয় নি, ততক্ষণ সমস্ত জিনিসটা আমার নিজের দিকেই টানা। ততক্ষণ মনে হয়েছে, ঐ রুমালটাই মহামূল্য। ততক্ষণ আসল জিনিসের মানে

পাওয়া গেল না, তার দাম বোঝা গেল না। যখন দান করবার সময় এল, রুমাল যখন খোলা গেল, তখনই আসলের সঙ্গে বিশ্বের পরিচয় হল, সব সার্থক হল।

আমাদের আত্মনিবেদন যখন পূর্ণ হয় তখনই নিজেকে সম্পূর্ণ পাই। নইলে আমার আপন-নামক যে বিচিত্র ঢাকাখানা আছে সেইটেই চরম বলে বোধ হয়, সেইটেকেই কোনোরকমে বাঁচাবার প্রাণপণ চেষ্টা মনে জাগতে থাকে। সেইটে নিয়েই যত ঈর্ষা, যত ঝগড়া, যত দুঃখ। যারা মূঢ় তারা সেইটেরই রঙ দেখে ভুলে যায়। নিজের যেটা সত্য রূপ সেইটেই হচ্ছে বিশ্বের সঙ্গে মিলনের রূপ।

আজ নববর্ষের দিন আমাদের আশ্রমের ভিতরকার সত্যকে প্রত্যক্ষ করবার দিন। যে তপস্যা এখানে স্থান পেয়েছে তার সৃষ্টিশক্তিটি কী তা আমাদের জানতে হবে। এর বাইরের একটা ব্যবস্থা আছে, এর ঘরবাড়ি তৈরি হচ্ছে, এর আইনকানুন চলছে, সে আমরা সকলে মিলে গড়ছি। কিন্তু এর নিজের ভিতরকার একটি তত্ত্ব আছে যা নিজেকে নিজে ক্রমশ উদ্‌ঘাটিত করছে, এবং সেই নিয়ত উদ্‌ঘাটিত করার প্রক্রিয়াই হচ্ছে তার সৃষ্টি। তাকে যদি আমরা স্পষ্ট করে দেখতে পাই তা হলেই আমাদের আত্মনিবেদনের উৎসাহ সম্পূর্ণ হতে পারে। সত্য যখন আমাদের কাছে অস্পষ্ট থাকে তখন আমাদের ত্যাগের ইচ্ছা বল পায় না।

সত্য আমাদের ত্যাগ করতে আহ্বান করে। কেননা ত্যাগের দ্বারাই আমাদের আত্মপ্রকাশ হয়। আমাদের আশ্রমের মধ্যেও সেই আহ্বান পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। সেই আহ্বানকে আমরা 'বিশ্বভারতী' নাম দিয়েছি।

স্বজাতির নামে মানুষ আত্মত্যাগ করবে এমন একটি আহ্বান কয়েক শতাব্দী ধরে পৃথিবীতে খুব প্রবল হয়ে উঠেছিল। অর্থাৎ স্বজাতিই মানুষের কাছে এতদিন মনুষ্যত্বের সবচেয়ে বড়ো সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। তার ফল হয়েছিল এই যে, এক জাতি অন্য জাতিকে শোষণ করে নিজে বড়ো হয়ে ওঠবার জন্যে পৃথিবী জুড়ে একটা দস্যুবৃত্তি চলছিল। এমন-কি, যে-সব মানুষ স্বজাতির নামে জাল জালিয়াতি অত্যাচার নিষ্ঠুরতা করতে কুণ্ঠিত হয় নি, মানুষ নির্লজ্জভাবে তাদের নামকে নিজের ইতিহাসে সমুজ্জ্বল করে রেখেছে। অর্থাৎ যে ধর্মবিধি সর্বজনীন তাকেও স্বজাতির বেদীর কাছে অপমানিত করা মানুষ ধর্মেরই অঙ্গ বলে মনে করেছে। স্বজাতির গণ্ডিসীমার মধ্যে এই ত্যাগের চর্চা; এর আশুফল খুব লোভনীয় বলেই ইতিহাসে দেখা দিয়েছে। তার কারণ ত্যাগই সৃষ্টিশক্তি; সেই ত্যাগ যতটুকু পরিধির পরিমাণেই সত্য হয় ততটুকু পরিমাণেই সে সার্থকতা বিস্তার করে। এইজন্যে নেশনের ইতিহাসে ত্যাগের দৃষ্টান্ত মহদ্দৃষ্টান্ত বলেই সপ্রমাণ হয়েছে।

২৭।২৫

কিন্তু সত্যকে সংকীর্ণ করে কখনোই মানুষ চিরকাল সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে না। এক জায়গায় এসে তাকে ঠেকতেই হবে; যদি কেবল উপরিতলের মাটি উর্বরা হয় তবে বনস্পতি দ্রুত বেড়ে ওঠে; কিন্তু অবশেষে তার শিকড় নীরস তলায় গিয়ে ঠেকে, তখন হঠাৎ একদিন তার ডালপালা মুষড়ে যেতে আরম্ভ করে। মানুষের কর্তব্যবুদ্ধি স্বজাতির সীমার মধ্যে আপন পূর্ণখাদ্য পায় না, তাই হঠাৎ একদিন সে আপনার প্রচুর ঐশ্বর্যের মাঝখানেই দারিদ্র্যে এসে উত্তীর্ণ হয়। তাই যে য়ুরোপ নেশনসৃষ্টির প্রধান ক্ষেত্র সেই য়ুরোপ আজ নেশনের বিভীষিকায় আর্ত হয়ে উঠেছে।

যুদ্ধ এবং সন্ধির ভিতর দিয়ে যে নিদারুণ দুঃখ য়ুরোপকে আলোড়িত করে তুলেছে তার অর্থ হচ্ছে এই যে, নেশনরূপের মধ্যে মানুষ আপন সত্যকে আবৃত করে ফেলেছে; মানুষের আত্মা বলছে, 'অপাবৃণু'— আবরণ উদ্‌ঘাটন করো। মনুষ্যত্বের প্রকাশ আচ্ছন্ন হয়েছে বলে স্বজাতির নামে পাপাচরণ সম্বন্ধে মানুষ এতদিন এমন স্পষ্ট ঔদ্ধত্য করতে পেরেছে, এবং মনে করতে পেরেছে যে, তাতে তার কোনো ক্ষতি হয় নি, লাভই হয়েছে। অবশেষে আজ নেশন যখন আপনার মুষল আপনি প্রসব করতে আরম্ভ করেছে তখন য়ুরোপে নেশন আপনার মূর্তি দেখে আপনি আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে।

নূতন যুগের বাণী এই যে, আবরণ খোলো, হে মানব, আপন উদার রূপ প্রকাশ করো। আজ নববর্ষের প্রথম দিনে আমাদের আশ্রমের মধ্যে আমরা সেই নবযুগের বাণীকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করব। আমাদের আশ্রমকে আজ আমরা সর্বপ্রকার ভেদবুদ্ধির আবরণ-মুক্ত করে দেখি, তা হলেই তার সত্যরূপ দেখতে পাব।

আমাদের এখানে নানা দেশ থেকে নানা জাতির অতিথি এসেছে। তারা যদি অন্তরের মধ্যে কোনো বাধা না পায় তবে তাদের এই আসার দ্বারাতেই আপনি এখানে নবযুগের একটি মিলনতীর্থ তৈরি হয়ে উঠবে। বাংলাদেশে নানা নদী এসে সমুদ্রে পড়েছে, সেই বহু নদীর সমুদ্রসংগম থেকেই বাংলাদেশ আপনি একটি বিশেষ প্রকৃতি লাভ করে তৈরি হয়ে উঠেছে। আমাদের আশ্রম যদি তেমনি আপন হৃদয়কে প্রসারিত করে দেয় এবং যদি এখানে আগন্তুকেরা সহজেই আপনার স্থানটি পায় তা হলে এই আশ্রম সকলের সেই সম্মিলনের দ্বারা আপনিই আপনার সত্যরূপকে লাভ করবে। তীর্থযাত্রীরা যে ভক্তি নিয়ে আসে, যে সত্যদৃষ্টি নিয়ে আসে, তার দ্বারাই তারা তীর্থস্থানকে সত্য করে তোলে। আমরা যারা এই আশ্রমে এসেছি, আমরা এখানে যে সত্যকে উপলব্ধি করব বলে শ্রদ্ধাপূর্বক প্রত্যাশা করি সেই শ্রদ্ধার দ্বারা সেই প্রত্যাশা দ্বারাই সেই সত্য এখানে সমুজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পাবে। আমরা এখানে কোন্ মন্ত্রের রূপ দেখব বলে নিয়ত প্রত্যাশা করব। সে মন্ত্র হচ্ছে এই যে— 'যত্র বিশ্বং

ভবত্যেকনীড়ম্'। দেশে দেশে আমরা মানুষকে তার বিশেষ স্বাজাতিক পরিবেষ্টনের মধ্যে খণ্ডিত করে দেখেছি, সেখানে মানুষকে আপন ব'লে উপলব্ধি করতে পারি নে। পৃথিবীর মধ্যে আমাদের এই আশ্রম এমন-একটি জায়গা হয়ে উঠুক যেখানে ধর্ম ভাষা এবং জাতিগত সকলপ্রকার পার্থক্য সত্ত্বেও আমরা মানুষকে তার বাহ্যভেদমুক্তরূপে মানুষ বলে দেখতে পাই। সেই দেখতে পাওয়াই নূতন যুগকে দেখতে পাওয়া। সন্ন্যাসী পূর্বাকাশে প্রথম অরুণোদয় দেখবে বলে জেগে আছে। যখনই অন্ধকারের প্রান্তে আলোকের আরক্ত রেখাটি দেখতে পায় তখনই সে জানে যে, প্রভাতের জয়ধ্বজা তিমিররাত্রির প্রাকারের উপর আপন কেতন উড়িয়েছে। আমরা তেমনি করে ভারতের এই পূর্বপ্রান্তে এই প্রান্তরশেষে যেন আজ নববর্ষের প্রভাতে ভেদবাধার তিমির-মুক্ত মানুষের রূপ আমাদের এখানে সমাগত অতিথি বন্ধু সকলের মধ্যে উজ্জ্বল করে দেখতে পাই। সেই দেখতে পাওয়া থেকেই যেন মনের মধ্যে শ্রদ্ধা করতে পারি যে, মানবের ইতিহাসে নবযুগের অরুণোদয় আরম্ভ হয়েছে।

১ বৈশাখ ১৩৩০ ভাদ্র ১৩৩০

শান্তিনিকেতন

৮

অল্প কিছুকাল হল কালিঘাটে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে আমাদের পুরোনো আদিগঙ্গাকে দেখলাম। তার মস্ত দুর্গতি হয়েছে। সমুদ্রে আনাগোনার পথ তার চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে গেছে। যখন এই নদীটির ধারা সজীব ছিল তখন কত বণিক আমাদের ভারত ছাড়িয়ে সিংহল গুজরাট ইত্যাদি দেশে নিজেদের বাণিজ্যের সম্বন্ধ বিস্তার করেছিল। এ যেন মৈত্রীর ধারার মতো মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের বাধাকে দূর করেছিল। তাই এই নদী পুণ্যনদী বলে গণ্য হয়েছিল। তেমনি ভারতের সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি যত বড়ো বড়ো নদনদী আছে সবগুলি সেকালে পবিত্র বলে গণ্য হয়েছিল। কেন। কেননা এই নদীগুলি মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ-স্থাপনের উপায়স্বরূপ ছিল। ছোটো ছোটো নদী তো ঢের আছে— তাদের ধারার তীব্রতা থাকতে পারে; কিন্তু না আছে গভীরতা, না আছে স্থায়িত্ব। তারা তাদের জলধারায় এই বিশ্বমৈত্রীর রূপকে ফুটিয়ে তুলতে পারে নি। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনে তারা সাহায্য করে নি। সেইজন্ত তাদের জল মানুষের কাছে তীর্থোদক হল না। যেখান দিয়ে বড়ো বড়ো নদী বয়ে গিয়েছে সেখানে কত বড়ো বড়ো নগর

হয়েছে— সে-সব দেশ সভ্যতার কেন্দ্রভূমি হয়ে উঠেছে। এই-সব নদী বয়ে মানুষের জ্ঞানের সাধনার সম্পদ নানা জায়গায় গিয়েছে। আমাদের দেশের চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপকেরা যখন জ্ঞান বিতরণ করেন, অধ্যাপকপত্নী তাদের অন্নপানের ব্যবস্থা করে থাকেন; এই গঙ্গাও তেমনি একসময়ে যেমন ভারতের সাধনার ক্ষেত্র ধীরে ধীরে বিস্তারিত করেছিল, তেমনি আর-এক দিক দিয়ে সে তার ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর করেছিল। সেইজন্য গঙ্গার প্রতি মানুষের এত শ্রদ্ধা।

তা হলে আমরা দেখলাম, এই পবিত্রতা কোথায়? না, কল্যাণময় আহ্বানে ও সুযোগে মানুষ বড়ো ক্ষেত্রে এসে মানুষের সঙ্গে মিলেছে— আপনার স্বার্থবুদ্ধির গণ্ডির মধ্যে একা একা বদ্ধ হয়ে থাকে নি। এ ছাড়া নদীর জলের মধ্যে এমন কোনো ধর্ম নেই যাতে করে তা পবিত্র হতে পারে।

কিন্তু যখনই তার ধারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হল, সমুদ্রের সঙ্গে তার অবাধ সম্বন্ধ নষ্ট হল, তখনই তার গভীরতাও কমে গেল। গঙ্গা দেখলাম, কিন্তু চিত্ত খুশি হল না। যদিও এখনো লোকে তাকে শ্রদ্ধা করে, সেটা তাদের অভ্যাসমাত্র। জলে তার আর সেই পুণ্যরূপ নেই। আমাদের ভারতের জীবনেও ঠিক এই দশাই ঘটেছে। এক সময় পৃথিবীর সমস্ত দেশকে ভারত তার পুণ্যসাধনার পথে আহ্বান করেছিল, ভারতে সব দেশ থেকে লোক বড়ো সত্যকে লাভ করার জন্যে এসে মিলেছিল। ভারতও তখন নিজের শ্রেষ্ঠ যা তা সমস্ত বিশ্বে বিলিয়ে দিয়েছিল। সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে নিজের যোগ স্থাপন করেছিল বলে ভারত পুণ্যক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। গয়া আমাদের কাছে পুণ্যক্ষেত্র কেন হল। না, তার কারণ বুদ্ধদেব এখানে তপস্যা করেছিলেন, আর সেই তাঁর তপস্যার ফল ভারত সমস্ত বিশ্বে বণ্টন করে দিয়েছে। যদি তার পরিবর্তন হয়ে থাকে, আজ যদি সে আর অমৃত-অন্ন পরিবেশনের ভার না নেয়, তবে গয়াতে আর কিছুমাত্র পুণ্য অবশিষ্ট নেই। কিছু আছে যদি মনে করি তো বুঝতে হবে তা আমাদের আগেকার অভ্যাস। গয়ার পাণ্ডারা কি গয়াকে বড়ো করতে পারে, না তার মন্দির পারে?

আমাদের এ কথা মনে রাখতে হবে, পুণ্যধর্ম মাটিতে বা হাওয়ায় নেই। চিন্তার দ্বারা, সাধনার দ্বারা পুণ্যকে সমর্থন করতে হবে। আমাদের আশ্রমে সে বাধা অনেক দূর হয়েছে। আপনা-আপনি বিদেশের অতিথিরা এখানে এসে তাঁদের আসন পাতছেন। তাঁরা বলছেন যে, তাঁরা এখানে এসে তৃপ্তি পেয়েছেন। এমনি করেই ভারতের গঙ্গা আমাদের আশ্রমের মধ্যে বইল। দেশবিদেশের অতিথিদের চলাচল হতে লাগল। তাঁরা আমাদের জীবনে জীবন মেলাচ্ছেন। এই আশ্রমকে অবলম্বন

করে তাঁদের চিত্ত প্রসারিত হচ্ছে। এর চেয়ে আর সফলতা কিছু নেই। তীর্থে মানুষ উত্তীর্ণ হয় বলেই তার নাম তীর্থ। এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে এসে সকলে উত্তীর্ণ হয় না; সমস্ত পথিক যেখানে আসে চলে যাবার জন্যে, থাকবার জন্যে নয়। যেমন কলকাতার বড়োবাজার— সেখানে এসে প্রীতি মেলে না, বিরাম মেলে না, সেখানে এসে যাত্রা শেষ হয় না; সেখানে লাভলোকসানের কথা ছাড়া আর কথা নেই। আমি কলকাতায় জন্মেছি— সেখানে আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছি না। সেখানে আমার বাড়ি আছে, তবু সেখানে কিছু নিজের আছে বলে মনে করতে পারছি না। মানুষ যদি নিজের সেই আশ্রয়টি খুঁজে না পেলে তো মনুমেণ্ট দেখে, বড়ো বড়ো বাড়িঘর দেখে তার কী হবে। ওখানে কার আহ্বান আছে। বণিকরাই কেবল সেখানে থাকতে পারে। ও তীর্থক্ষেত্র নয়। এ ছাড়া আমাদের যেগুলো তীর্থক্ষেত্র আছে সেখানে কী হয়। সেখানে যারা পুণ্যপিপাসু তারা পাণ্ডাদের পায়ে টাকা দিয়ে আসে। সেখানে তো সব দেশের মানুষ মেলবার জন্যে ভিতরকার আহ্বান পায় না।

কাল একটি পত্র পেলাম। আমাদের সুরুলের পল্লীবিভাগের যিনি অধ্যক্ষ তিনি জাহাজ থেকে আমাকে চিঠি লিখেছেন। তিনি লিখেছেন যে, জাহাজের লোকেরা তাসখেলা ও অন্যান্য এত ছোটোখাটো আমোদপ্রমোদ নিয়ে দিন কাটায় যে তিনি বিস্মিত হয়ে আমাকে লিখেছেন যে, কেমন করে তারা এর মধ্যে থাকে। যে জীবনে কোনো বড়ো প্রকাশ নেই, ক্ষুদ্র কথায় যে জীবন ভরে উঠেছে, বিশ্বের দিকে যে জীবনের কোনো প্রবাহ নেই, তারা কেমন করে তার মধ্যে থাকে, কী করে তারা মনে তৃপ্তি পায়।

শ্রীযুক্ত এল্‌ম্‌হার্স্ট্‌ এই-যে বেদনা অনুভব করেছেন তার কারণ কী। কারণ এই যে. তিনি আশ্রমে যে কার্যের ভার নিয়েছেন তাতে করে তাঁকে বৃহতের ক্ষেত্রে এসে দাঁড়াতে হয়েছে। তিনি তাঁর কর্মকে অবলম্বন করে সমস্ত গ্রামবাসীদের কল্যাণক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়েছেন। এ কাজ তাঁর আপনার স্বার্থের জন্যে নয়। তিনি সমস্ত গ্রামবাসীদের মানুষ বলে শ্রদ্ধা করে সকলের সঙ্গে মেলবার সুযোগ পেয়েছিলেন বলে এ জায়গা তাঁর কাছে তীর্থ হয়ে উঠেছে। এই-যে আশেপাশের গরিব অজ্ঞ, এদের মধ্যে যাবার তিনি পথ পেয়েছিলেন। সেইজন্যে তাঁর সঙ্গে যে-সমস্ত বড়ো বড়ো ধনী ছিলেন— তাঁদের কেউ-বা জজ, কেউ-বা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁদের তিনি মনে মনে অত্যন্ত অকৃতার্থ বলে বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁরা এখানে প্রভূত ক্ষমতা পেলেও, সমস্ত দেশবাসীর সহিত অব্যাহত মিলনের পথটি খুঁজে পান নি। তাঁরা ভারতে কোনো তীর্থে এসে পৌঁছলেন না। তাঁদের কেউ-বা রাজভক্তায় এসে ঠেকলেন, কেউ-বা

লোহার সিন্ধুকে এসে ঠেকলেন, তাঁরা পুণ্যতীর্থে এসে ঠেকলেন না। আমাদের সাহেব সুহৃদ্‌ এসে এর তীর্থের রূপটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আমরা এখানে থেকেও যদি সেটি উপলব্ধি করতে না পারি তবে আমাদের মতো অকৃতার্থ আর কেউ নেই। তাই বলছি, আমাদের এখানে কর্মের মধ্যে, এর জ্ঞানের সাধনার মধ্যে যেন কল্যাণকে উপলব্ধি করতে পারি। এ জায়গা শুধু পাঠশালা নয়, এই জায়গা তীর্থ। দেশবিদেশ থেকে লোকেরা এখানে এসে যেন বলতে পারে— আঃ বাঁচলাম, আমরা ক্ষুদ্র সংসারের বাইরে এসে বিশ্বের ও বিশ্বদেবতার দর্শন লাভ করলাম।

৫ বৈশাখ ১৩৩০ অগ্রহায়ণ ১৩৩০
শান্তিনিকেতন

৯

আমাদের অভাব বিস্তর, আমাদের নালিশের কথাও অনেক আছে।' সেই অভাবের বোধ জাগাবার ও দূর করবার জন্যে, নালিশের বৃত্তান্ত বোঝাবার ও তার নিষ্পত্তি করবার জন্যে যাঁরা অকৃত্রিম উৎসাহ ও প্রাজ্ঞতার সঙ্গে চেষ্টা করছেন তাঁরা দেশের হিতকারী; তাঁদের 'পরে আমাদের শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ থাক্‌।

কিন্তু কেবলমাত্র অপমান ও দারিদ্র্যের দ্বারা দেশের আত্মপরিচয় হয় না, তাতে আমাদের প্রচ্ছন্ন করে। যে নক্ষত্রের আলোক নিবে গেছে অন্ধকারই তার পক্ষে একমাত্র অভিশাপ নয়, নিখিল জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে তার অপ্রকাশই হচ্ছে তার সবচেয়ে বড়ো অবমাননা। অন্ধকার তাকে কেবল আপনার মধ্যেই বদ্ধ করে, আলোক তাকে সকলের সঙ্গে যোগযুক্ত করে রাখে।

ভারতের যেখানে অভাব যেখানে অপমান সেখানে সে বিশ্বের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন। এই অভাবই যদি তার একান্ত হত, ভারত যদি মধ্য-আফ্রিকা-খণ্ডের মতো সত্যই দৈন্যপ্রধান হত, তা হলে নিজের নিরবচ্ছিন্ন কালিমার মধ্যেই অব্যক্ত হয়ে থাকা ছাড়া তার আর গতি ছিল না।

কিন্তু কৃষ্ণপক্ষই ভারতের একমাত্র পক্ষ নয়, শুক্লপক্ষের আলোক থেকে বিধাতা তাকে বঞ্চিত করেন নি। সেই আলোকের যোগেই সে আপন পূর্ণিমার গৌরব নিখিলের কাছে উদ্‌ঘাটিত করবার অধিকারী।

বিশ্বভারতী ভারতের সেই আলোকসম্পদের বার্তা বহন ও ঘোষণা করবার ভার নিয়েছে। যেখানে ভারতের ক্ষমাবস্থা সেখানে তার কার্পণ্য। কিন্তু একমাত্র সেই

কার্পণ্যকে স্বীকার করেই কি সে বিশ্বের কাছে লজ্জিত হয়ে থাকবে। যেখানে তার পূর্ণিমা সেখানে তার দাক্ষিণ্য থাকা চাই তো। এই দাক্ষিণ্যেই তার পরিচয়, সেইখানেই নিখিল বিশ্ব তার নিমন্ত্রণ স্বীকার করে নেবেই।

যার ঘরে নিমন্ত্রণ চলে না সেই তো একঘরে, সমাজে সেই চিরলাঞ্ছিত। আমরা বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে বলতে চাই, ভারতে বিশ্বের সেই নিমন্ত্রণ বন্ধ হবার কারণ নেই। যারা অবিশ্বাসী, যারা একমাত্র তার অভাবের দিকেই সমস্ত দৃষ্টি রেখেছে, তারা বলে, যতক্ষণ না রাজ্যে স্বাতন্ত্র্য, বাণিজ্যে সমৃদ্ধি লাভ করব ততক্ষণ অবজ্ঞা করে ধনীরা আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবেই না। কিন্তু এমন কথা বলায় শুধু স্বদেশের অপমান তা নয়, এতে সর্বমানবের অপমান। বুদ্ধদেব যখন অকিঞ্চনতা গ্রহণ করেই সত্যপ্রচারের ভার নিয়েছিলেন তখন তিনি এই কথাই সপ্রমাণ করেছিলেন যে, সত্য আত্মমহিমাতেই গৌরবান্বিত। সূর্য আপন আলোকেই স্বপ্রকাশ ; স্যাকরার দোকানে সোনার গিল্টি না করালে তার মূল্য হবে না, ঘোরতর বেনের মুখেও এ কথা শোভা পায় না।

যে স্বদেশাভিমান আমরা পশ্চিমের কাছ থেকে ধার করে নিয়েছি তারই মধ্যে রাজ্যবাণিজ্যগত সম্পদের প্রতি একান্ত বিশ্বাসপরতার অশুচিতা রয়ে গেছে। সেইজন্যেই আজকের দিনে ভারতবাসীও এমন কথাও বলতে লজ্জা বোধ করে না যে রাষ্ট্রীয় গৌরব সর্বাগ্রে, তার পরে সত্যের গৌরব। কোনো কোনো পাশ্চাত্য মহাদেশে দেখে এসেছি, ধনের অভিমানেই সেখানকার সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা সাধনাকে রাহুগ্রস্ত করে রেখেছে। সেখানে বিপুল ধনের ভারাকর্ষণে মানুষের মাথা মাটির দিকে ঝুঁকে পড়েছে। পশ্চিমকে খোঁটা দিয়ে স্বজাতিদম্ভ প্রকাশ করবার বেলায় আমরা যে মুখে সর্বদাই পশ্চিমের এই বস্তুলুব্ধতার নিন্দা করে থাকি সেই মুখেই যখন সত্যসম্পদকে শক্তিসম্পদের পশ্চাদ্‌বর্তী করে রাখবার প্রস্তাব করে থাকি তখন নিশ্চয়ই আমাদের অশুভগ্রহ কুটিল হাস্য করে। যেমন কোনো কোনো শুচিতাভিমানী ব্রাহ্মণ অপাংক্তেয়ের বাড়িতে যে মুখে আহার করে আসে বাইরে এসে সেই মুখেই তার নিন্দা করে, এও ঠিক সেইমত।

বিশ্বভারতীর কণ্ঠ দিয়ে এই কথাই আমরা বলতে চাই যে, ভারতবর্ষে সত্যসম্পদ বিনষ্ট হয় নি। না যদি হয়ে থাকে তা হলে সত্যের দায়িত্ব মানতেই হবে। ধনবানের ধন ধনীর একমাত্র নিজের হতে পারে, কিন্তু সত্যবানের সত্য বিশ্বের। সত্যলাভের সঙ্গে সঙ্গেই তার নিমন্ত্রণ-প্রচার আছেই। ঋষি যখনই বুঝলেন 'বেদাহমেতম্'— আমি একে জেনেছি, তখনই তাঁকে বলতে হল, 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'— তোমরা অমৃতের পুত্র, তোমরা সকলে শুনে যাও।

তোমরা সকলে শুনে যাও, পিতামহদের এই নিমন্ত্রণবাণী যদি আজ ভারতবর্ষে নীরব

হয়ে থাকে তবে সাম্রাজ্যে স্বাধীনতা, বাণিজ্যে সমৃদ্ধি; কিছুতেই আমাদের আর গৌরব দিতে পারে না। ভারতে সত্যধন যদি লুপ্ত হয়ে থাকে তবেই বিশ্বের প্রতি তার নিমন্ত্রণের অধিকারও লুপ্ত হয়ে গেছে। আজকের দিনে যারা ভারতের নিমন্ত্রণে বিশ্বাস করে না তারা ভারতের সত্যেও বিশ্বাস করে না। আমরা বিশ্বাস করি। বিশ্বভারতী সেই বিশ্বাসকে আমাদের স্বদেশবাসীর কাছে প্রকাশ করুক ও সর্বদেশবাসীর কাছে প্রচার করুক। বিশ্বভারতীতে ভারতের নিমন্ত্রণবাণী বিশ্বের কাছে ঘোষিত হোক। বিশ্বভারতীতে ভারত আপনার সেই সম্পদকে উপলব্ধি করুক, যে সম্পদকে সর্বজনের কাছে দান করার দ্বারাই লাভ করা যায়।

পৌষ ১৩৩০

১০

আমি যখন এই শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করে এখানে ছেলেদের আনলুম তখন আমার নিজের বিশেষ কিছু দেবার বা বলবার মতো ছিল না। কিন্তু আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, এখানকার এই প্রভাতের আলো, শ্যামল প্রান্তর, গাছপালা যেন শিশুদের চিত্তকে স্পর্শ করতে পারে। কারণ প্রকৃতির সাহচর্যে তরুণ চিত্তে আনন্দসঞ্চারের দরকার আছে; বিশ্বের চারি দিককার রসাস্বাদ করা ও সকালের আলো সন্ধ্যার সূর্যাস্তের সৌন্দর্য উপভোগ করার মধ্য দিয়ে শিশুদের জীবনের উন্মেষ আপনার থেকেই হতে থাকে। আমি চেয়েছিলুম যে তারা অনুভব করুক যে, বসুন্ধরা তাদের ধাত্রীর মতো কোলে করে মানুষ করছে। তারা শহরের যে ইটকাঠপাথরের মধ্যে বর্ধিত হয় সেই জড়তার কারাগার থেকে তাদের মুক্তি দিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে আমি আকাশ-আলোর অঙ্কশায়ী উদার প্রান্তরে এই শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলুম। আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, শান্তিনিকেতনের গাছপালা-পাখিই এদের শিক্ষার ভার নেবে। আর সেইসঙ্গে কিছু কিছু মানুষের কাছ থেকেও এরা শিক্ষা লাভ করবে। কারণ, বিশ্বপ্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে যে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে তাতে করে শিশুচিত্তের বিষম ক্ষতি হয়েছে। এই যোগবিচ্ছেদের দ্বারা যে স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি হয় তাতে করে মানুষের অকল্যাণ হয়েছে। পৃথিবীতে এই দুর্ভাগ্য অনেক দিন থেকে চলে এসেছে। তাই আমার মনে হয়েছিল যে, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে যোগস্থাপন করবার একটি অনুকূল ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে। এমনি করে এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়।

তখন আমার নিজের সহায় সম্বল কিছু ছিল না, কারণ আমি নিজে যথাবয়

ইস্কুলমাস্টারকে এড়িয়ে চলেছি। বই-পড়া বিদ্যা ছেলেদের শেখাব এমন দুঃসাহস ছিল না। কিন্তু আমাকে বাল্যকাল থেকে বিশ্বপ্রকৃতির বাণী মুগ্ধ করেছিল, আমি তার সঙ্গে একান্ত আত্মীয়তার যোগ অনুভব করেছি। বই পড়ার চেয়ে যে তার কত বেশি মূল্য, তা যে কতখানি শক্তি ও প্রেরণা দান করে, তা আমি নিজে জানি। আমি কতখানি একা মাসের পর মাস বুনো হাঁসের পাড়ায় জীবন যাপন করেছি। এই বালুচরদের সঙ্গে জীবনযাপনকালে প্রকৃতির যা-কিছু দান তা আমি যতই অঞ্জলি ভরে গ্রহণ করেছি ততই আমি পেয়েছি, আমার চিত্ত ভরপুর হয়ে গেছে। তাই শিশুরা যে এখানে আনন্দে দৌড়চ্ছে, গাছে চড়ছে, কলহাস্তে আকাশ মুখর করে তুলছে— আমার মনে হয়েছে যে, এরা এমন-কিছু লাভ করেছে যা দুর্লভ। তাদের বিদ্যার কী মার্কা মারা হল এটাই সবচেয়ে বড়ো কথা নয়; কিন্তু তাদের চিত্তের পেয়ালা বিশ্বের অমৃতরসে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, আনন্দে উপচে উঠেছে, এই ব্যাপারটি বহুমূল্য। এই হাসিগান-আনন্দে গল্পে ভিতরে ভিতরে তাদের মনের পরিপুষ্টি হয়েছে। অভিভাবকেরা হয়তো তা বুঝবেন না, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকেরা হয়তো তার জন্য পাসের নম্বর দিতে রাজি হবেন না, কিন্তু আমি জানি এ অতি আদরণীয়। প্রকৃতির কোলে থেকে সরস্বতীকে মাতৃরূপে লাভ করা, এ পরম সৌভাগ্যের কথা। এমনি করে আমার বিদ্যালয়ের সূত্রপাত হল।

তার পর একটি দ্বার খুলে যাওয়াতে ভিতরের কপাটগুলি উদ্‌ঘাটিত হতে লাগল। আসলে খোলবার জিনিস একটি, কিন্তু পাবার জিনিস বহু। কিন্তু প্রথম দ্বারটি বন্ধ থাকলে ভিতরে প্রবেশ করবার উপায় থাকে না। প্রকৃতির আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হবার মধ্যে যে কৃত্রিম শিক্ষা সেটাই হল গোড়াকার সেই বন্ধনদশা যা ছিন্ন না করলে রসভাণ্ডারে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। তাই মানুষের মুক্তির উপায় হচ্ছে, প্রকৃতিকে ধাত্রী বলে স্বীকার করে নিয়ে তাঁরই আশ্রয়ে শিক্ষকতা লাভ করা। এই মুক্তির আদর্শ নিয়েই এই শিক্ষাকেন্দ্রের পত্তন হল।

এখানকার এই মুক্ত বায়ুতে আমরা যে মুক্তি পেয়ে গেলুম আজ তা গর্ব করে বলবার আছে। এতে করে আমাদের যে কত বন্ধনদশা ঘুচল, কত যে সংকীর্ণ সংস্কার দূর হল, তা বলে শেষ করা যায় না। এখানে আমরা সব মানুষকে আপনার বলে স্বীকার করতে শিখেছি, এখানে মানুষের পরস্পরের সম্বন্ধ ক্রমশ সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে।

এটি যে পরম সৌভাগ্যের কথা তা আমাদের জানতে হবে। কারণ এ কথা আগেই বলেছি যে, মানুষের মধ্যে একটি মস্ত পীড়া হচ্ছে, তার লোকালয়ে

একান্তভাবে অবরোধ। বিশ্বপ্রকৃতির থেকে বিচ্ছেদ তার চিত্তশক্তিকে খর্ব করে দিচ্ছে। কিন্তু তার চেয়েও মানুষের মধ্যে আর-একটি অস্বাভাবিকতা আছে, তা হচ্ছে এই যে, মানুষই মানুষের পরম শত্রু। এটি খুব সাংঘাতিক কথা। এর মধ্যে যে তার কতখানি চিত্তসংকোচ আছে তা আমরা অভ্যাসবশত জানতে পারি না। স্বাজাত্যের দম্ভে আমরা কোণঠেসা হয়ে গেছি, বিশ্বের বিস্তীর্ণ অধিকারে আপনাদের বঞ্চিত করেছি। এই ভীষণ বাধাকে অপসারিত করতে হবে; আমাদের জানতে হবে যে, যেখানে মানুষের চিত্তসম্পদ আছে সেখানে দেশবিদেশের ভেদ নেই, ভৌগোলিক ভাগবিভাগ নেই। পর্বত অরণ্য মরু, এরা মানুষের আত্মাকে কারারুদ্ধ করতে পারে না।

বাংলার যে মাটির ফসলে ধান হচ্ছে, যে মাটিতে গাছ বেড়ে উঠছে, সেই উপরিতলের মাটি হল বাংলাদেশের; কিন্তু এ কথা জানতে হবে যে, নীচেকার ভূমি পৃথিবীর সর্বত্র পরিব্যাপ্ত আছে, সুতরাং এ জায়গায় সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে তার গভীরতম নাড়ীর যোগ। এই তার ধাত্রীভূমিটি যদি সার্বভৌমিক না হত তবে এমন করে বাংলার শ্যামলতা দেখা দিত না। মাটি তুলে নিয়ে টবের ছোটো জায়গাতেও তো গাছ লাগানো যায়, কিন্তু তাতে করে যথেষ্ট ফল লাভ হয় না। বড়ো জায়গার যে মাটি তাতেই যথার্থ ফসল উৎপন্ন হয়। ঠিক তেমনি অন্তরের ক্ষেত্রে আমরা যেখানে বিশ্বকে অস্বীকার করছি, বলছি যে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও বড়ো হওয়া যায়, সেখানেই আমরা মস্ত ভুল করছি।

পৃথিবীতে যেখানে সভ্যতার নানা ধারা এসে মিলিত হয়েছে সেখানেই জ্ঞানের তীর্থভূমি বিরচিত হয়েছে। সেখানে নানা দিক থেকে নানা জাতির সমাবেশ হওয়াতে একটি মহামিলন ঘটেছে। গ্রীস রোম প্রভৃতি বড়ো সভ্যতার মধ্যে নানা জ্ঞানধারার সম্মিলন ছিল, তাই তা একঘরে হয়ে ইতিহাসে প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে নি। ভারতবর্ষের সভ্যতাতেও তেমনি আর্য দ্রাবিড় পারসিক প্রভৃতি নানা বিচিত্র জাতির মিলন হয়েছিল। আমাদের এই সমন্বয়কে মানতে হবে। পৃথিবীর ইতিহাসে যারা বর্বর তারাই সবচেয়ে স্বতন্ত্র; তারা নূতন লোকদের স্বদেশে প্রবেশ করতে দেয় নি, বর্ণ ভাষা প্রভৃতির বৈষম্য যখনই দেখেছে তখনই তা রোষের বলে বিষবাণ প্রয়োগ করে মারতে গিয়েছে।

আজকার দিনে বিশ্বমানবকে আপনার বলে স্বীকার করবার সময় এসেছে। আমাদের অন্তরের অপরিমেয় প্রেম ও জ্ঞানের দ্বারা এই কথা জানতে হবে যে, মানুষ শুধু কোনো বিশেষ জাতির অন্তর্গত নয়; মানুষের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় হচ্ছে, সে মানুষ।

আজকার দিনে এই কথা বলবার সময় এসেছে যে, মানুষ সর্বদেশের সর্বকালের। তার মধ্যে কোনো জাতীয়তা বা বর্ণভেদ নেই। সেই পরিচয়সাধন হয় নি বলেই মানুষ আজ অপরের বিত্ত আহরণ করে বড়ো হতে চায়। সে আপনাকে মারছে, অন্যকে মারতে তার হাত কম্পিত হচ্ছে না— সে এতবড়ো অপকর্ম করতে সাহস পাচ্ছে।

ভারতবর্ষ তার আত্মরক্ষা করবার সপক্ষে কি পাশ্চাত্য দেশের নজির টেনে আনবে। আমরা কি এ কথা ভুলে গেছি যে, য়ুরোপ ও আমেরিকা আপন আপন ন্যাশনালিজ্‌মের ভিত্তিপত্তন করে যে বিরাট প্রাচীর নির্মাণ করেছে আমাদের দেশে তেমন ভিত্তিপত্তন কখনো হয় নি। ভারতবর্ষ এই কথা বলেছিল যে, যিনি বিশ্বকে আপনার বলে উপলব্ধি করতে পেরেছেন তিনিই যথার্থ সত্যকে লাভ করেছেন। তিনি অপ্রকাশ থাকেন না; 'ন ততো বিজুগুপ্সতে', তিনি সর্বলোকে সর্বকালে প্রকাশিত হন। কিন্তু যারা অপ্রকাশ, যারা অন্যকে স্বীকার করল না, তারা কখনো বড়ো হতে পারল না, ইতিহাসে তারা কোনো বড়ো সত্যকে রেখে যেতে পারল না। তাই কার্থেজ ইতিহাসে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কার্থেজ বিশ্বের সমস্ত ধনরত্ন দোহন করতে চেয়েছিল। সুতরাং সে এমন-কিছু সম্পদ রেখে যায় নি যার দ্বারা ভবিষ্যৎ যুগের মানুষের পাথেয় রচনা হয়। তাই ভেনিসও কোনো বাণী রেখে যেতে পারল না। সে কেবলই বেনের মতো নিয়েছে, জমিয়েছে, কিছুই দিয়ে যেতে পারল না। কিন্তু মানুষ যখনই বিশ্বে আপনার জ্ঞানের ও প্রেমের অধিকার বিস্তৃত করতে পেরেছে তখনই সে আপন সত্যকে লাভ করেছে, বড়ো হয়েছে।

প্রথমে আমি শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করে এই উদ্দেশ্যে ছেলেদের এখানে এনেছিলুম যে, বিশ্বপ্রকৃতির উদার ক্ষেত্রে আমি এদের মুক্তি দেব। কিন্তু ক্রমশ আমার মনে হল যে, মানুষে মানুষে যে ভীষণ ব্যবধান আছে তাকে অপসারিত করে মানুষকে সর্বমানবের বিরাট লোকে মুক্তি দিতে হবে। আমার বিদ্যালয়ের পরিণতির ইতিহাসের সঙ্গে সেই আন্তরিক আকাঙ্ক্ষাটি অভিব্যক্ত হয়েছিল। কারণ বিশ্বভারতী নামে যে প্রতিষ্ঠান তা এই আহ্বান নিয়ে স্থাপিত হয়েছিল যে, মানুষকে শুধু প্রকৃতির ক্ষেত্রে নয়, কিন্তু মানুষের মধ্যে মুক্তি দিতে হবে। নিজের ঘরের নিজের দেশের মধ্যে যে মুক্তি তা হল ছোটো কথা; তাতে করে সত্য খণ্ডিত হয়, আর সেজন্যই জগতে অশান্তির সৃষ্টি হয়। ইতিহাসে বারে বারে পদে পদে এই সত্যের বিচ্যুতি হয়েছে বলে মানুষ পীড়িত হয়েছে, বিদ্রোহানল জ্বালিয়েছে। মানুষে মানুষে যে সত্য, 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি', এই কথার মধ্যে যে বিশ্বজনীন সত্য আছে তা মানুষ মানে নি, স্বদেশের গণ্ডিতে আপনাদের আবদ্ধ করেছে। মানুষ

যে পরিমাণে এই ঐক্যকে স্বীকার করেছে সে পরিমাণে সে যথার্থ সত্যকে পেয়েছে, আপনার পূর্ণপরিচয় লাভ করেছে।

এ কথা আজকার দিনে যদি আমরা না উপলব্ধি করি তবে কি তার দণ্ড নেই। মানুষের এই বড়ো সত্যের অপলাপ হলে যে বিষম ক্ষতি, তা কি আমাদের জানতে হবে না। মানুষ মানুষকে পীড়া দেয় এত বড়ো অন্যায় আচরণ আমাদের নিবারণ করতে হবে, বিশ্বভারতীতে আমরা সেই সত্য স্বীকার করব বলে এসেছি। অন্যেরা যে কাজেরই ভার নিন-না— বণিক বাণিজ্যবিস্তার করুন, ধনী ধন সঞ্চয় করুন, কিন্তু এখানে সর্বমানবের যোগসাধনের সেতু রচিত হবে। অতিথিশালার দ্বার খুলবে, যার চৌমাথায় দাঁড়িয়ে আমরা সকলকে আহ্বান করতে কুণ্ঠিত হব না। এই মিলনক্ষেত্রে আমাদের ভারতীয় সম্পদকে ভুললে চলবে না, সেই ঐশ্বর্যের প্রতি একান্ত আস্থা স্থাপন করে তাকে শ্রদ্ধায় গ্রহণ করতে হবে। বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীতে যে প্রাসাদসৌধ নির্মাণ করেছিলেন আজ তো তার কোনো চিহ্ন নেই; ঐতিহাসিকেরা তাঁর গোষ্ঠীগোত্রের আজ পর্যন্ত মীমাংসা করতে পারল না। কিন্তু কালিদাস যে কাব্য রচনা করে গেছেন তার মধ্যে কোনো স্থানবিচার নেই; তা তো শুধু ভারতীয় নয়, তা যে চিরন্তন সর্বদেশের সর্বকালের সম্পদ হয়ে রইল। যখন সবাই বলবে যে, এটা আমার, আমি পেলুম, তখনই তা যথার্থ দেওয়া হল। এই-যে দেবার অধিকার লাভ করা এর জন্য উৎসাহ চাই, সাধনার উদ্যম চাই। আমাদের কৃপণতা করলে চলবে না। কোনো বড়ো সম্পদকে গ্রহণ ও প্রচার করতে হলে বিপুল আনন্দে সমস্ত আঘাত অপমান সহ্য করে অকাতরে সব ত্যাগ করতে হবে। পৃথিবীর দেয়ালি-উৎসবে ভারতের যে প্রদীপ জ্বলবে সেই প্রদীপশিখার যেন অস্বীকৃতি না ঘটে, বিদ্রূপের দ্বারা যেন তাকে আচ্ছন্ন না করি। আত্মপ্রকাশের পথ অবারিত হোক, ত্যাগের দ্বারা আনন্দিত হও।

আজকার উৎসবের দিনে আমাদের এই প্রার্থনা যে, সকল অন্ধকার ও অসত্য থেকে আমাদের জ্যোতিতে নিয়ে যাও— সোনা-হীরা-মাণিক্যের জ্যোতি নয়, কিন্তু অধ্যাত্ম-লোকের জ্যোতিতে নিয়ে যাও। ভারতবর্ষ আজ এই প্রার্থনা জানাচ্ছে যে, তাকে মৃত্যু থেকে অমৃতলোকে নিয়ে যাও। আমরা অকিঞ্চন হলেও তবু আমাদের কণ্ঠ থেকে সকল মানুষের জন্য এই প্রার্থনা ধ্বনিত হোক। আনন্দস্বরূপ, তোমার প্রকাশ পূর্ণ হোক। রুদ্র, তোমার রুদ্রতার মধ্যে অনেক দুঃখদারিদ্র্য আছে— আমরা যেন বলতে পারি যে, সেই ঘন মেঘের আবরণ ভেদ করেও তোমার দক্ষিণ মুখ দেখেছি। 'বেদাহম্' —জেনেছি। 'আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ'— অন্ধকারেরই ওপার থেকে দেখেছি জ্যোতির রূপ। তাই অন্ধকারকে আর ভয় করি নে। যে অন্ধকার নিজেদের ছোটো

গণ্ডির মধ্যেই আমাদের ছোটো পরিচয়ে আবদ্ধ করে তাকে স্বীকার করি নে। যে আলো সকলের কাছে আমাদের প্রকাশ করে এবং সকলকে আমাদের কাছে প্রকাশ করে আমরা তারই অভিনন্দন করি।

৭ পৌষ ১৩৩০ মাঘ ১৩৩০

শান্তিনিকেতন

১১

আজ আমার আর-একবার আশ্রম থেকে দূরে যাবার সময় উপস্থিত হয়েছে, হয়তো কিছু দীর্ঘকালের জন্যে এবার বিদেশে আমাকে কাটাতে হবে। যাবার পূর্বে আর-একবার এই আশ্রম সম্বন্ধে, এই কর্ম সম্বন্ধে আমাদের যা কথা আছে তা সুস্পষ্ট করে বলে যেতে চাই।

আজ আমার চোখের সামনে আমাদের আশ্রমের এই বর্তমান ছবি— এই ছাত্রনিবাস কলাভবন গ্রন্থাগার অতিথিশালা, সব স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। ভাবছি, কী করে এর আরম্ভ, এর পরিণাম কোথায়। সকলের চেয়ে এইটেই আশ্চর্য যে, যে লোক একেবারে অযোগ্য— মনে করবেন না এ কোনোরকম কৃত্রিম বিনয়ের কথা— তাকে দিয়ে এই কাজ সাধন করে নেবার বিধান। ছাত্রদের যেদিন এখানে আহ্বান করলুম সেদিন আমার হাতে কেবল যে অর্থ ছিল না তা নয়, একটা বড়ো ঋণভারে তখন আমি একান্ত বিপন্ন। তা শোধ করবার কোনো উপায় আমার ছিল না। তার পরে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে আমার যে কত অক্ষমতা ছিল তা সকলেই জানেন। আমি ভালো করে পড়ি নি, আমাদের দেশে যে শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত ছিল তার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। সব রকমের অযোগ্যতা এবং দৈন্য নিয়ে কাজে নেমেছিলুম। এর আরম্ভ অতি ক্ষীণ এবং দুর্বল ছিল, গুটি-পাঁচেক ছাত্র ছিল। ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন নিতুম না; ছেলেদের অন্নবস্ত্র, প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী যেমন করে হোক আমাকেই জোগাতে হত, অধ্যাপকদের সাংসারিক অভাব মোচন করতে হত। বৎসরের পর বৎসর যায়, অর্থাভাব সমানই রইল, বিদ্যালয় বাড়তে লাগল। দেখা গেল, বেতন না নিলে বিদ্যালয় রক্ষা করা যায় না। বেতনের প্রবর্তন হল; কিন্তু অভাব দূর হল না। আমার গ্রন্থের স্বত্ব কিছু কিছু করে বিক্রয় করতে হল। এদিকে ওদিকে দু-একটা যা সম্পত্তি ছিল তা গেল, অলংকার বিক্রয় করলুম— নিজের সংসারকে রিক্ত করে কাজ চালাতে হল। কী দুঃসাহসে তখন প্রবৃত্ত হয়েছিলুম

জানি নে। স্বপ্নের ঘোরে যে মানুষ দুর্গম পথে ঘুরে বেরিয়েছে সে যেমন জেগে উঠে কেঁপে ওঠে, আজ পিছন দিকে যখন তাকিয়ে দেখি তখন আমারও সেই রকমের হৃৎকম্প হয়।

অথচ এটি সামান্যই একটি বিদ্যালয় ছিল। কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারটি নিয়েই আবাল্য-কালের সাহিত্যসাধনাও আমাকে অনেক পরিমাণে বর্জন করতে হল। এর কারণ কী, এত আকর্ষণ কিসের। এই প্রশ্নের যে উত্তর আমার মনে আসছে সেটা আপনাদের কাছে বলি। অতি গভীরভাবে নিবিড়ভাবে এই বিশ্বপ্রকৃতিকে শিশুকাল থেকে আমি ভালোবেসেছি। আমি খুব প্রবলভাবেই অনুভব করেছি যে, শহরের জীবনযাত্রা আমাদের চার দিকে যন্ত্রের প্রাচীর তুলে দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছে। এখানকার আশ্রমে, প্রকৃতির প্রাণনিকেতনের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে, বসন্ত-শরতের পুষ্পোৎসবে ছেলেদের যে স্থান করে দিয়েছি তারই আনন্দে দুঃসাধ্য ত্যাগের মধ্যে আমাকে ধরে রেখেছিল। প্রকৃতি মাতা যে অমৃত পরিবেশন করেন সেই অমৃত গানের সঙ্গে মিলিয়ে নানা আনন্দ-অনুষ্ঠানের মধ্যে ফলিয়ে এদের সকলকে বিতরণ করেছি। এরই সফলতা প্রতিদিন আমাকে উৎসাহ দিয়েছে। আর যে একটি কথা অনেকদিন থেকে আমার মনে জেগে ছিল সে হচ্ছে এই যে, ছাত্র ও শিক্ষকের সম্বন্ধ অত্যন্ত সত্য হওয়া দরকার। মানুষের পরস্পরের মধ্যে সকল প্রকার ব্যাপারেই দেনাপাওনার সম্বন্ধ। কখনো বেতন দিয়ে, কখনো ত্যাগের বিনিময়ে, কখনো-বা জবরদস্তির দ্বারা মানুষ এই দেওয়া-নেওয়ার প্রবাহকে দিনরাত চালিয়ে রাখছে। বিদ্যা যে দেবে এবং বিদ্যা যে নেবে তাদের উভয়ের মাঝখানে যে সেতু সেই সেতুটি হচ্ছে ভক্তিস্নেহের সম্বন্ধ। সেই আত্মীয়তার সম্বন্ধ না থেকে যদি কেবল শুষ্ক কর্তব্য বা ব্যবসায়ের সম্বন্ধই থাকে তা হলে যারা পায় তারা হতভাগ্য, যারা দেয় তারাও হতভাগ্য। সাংসারিক অভাব মোচনের জন্য বাহিরের দিক থেকে শিক্ষককে বেতন নিতে হয়, কিন্তু তাঁর অন্তরের সম্বন্ধ সত্য হওয়া চাই। এ আদর্শ আমাদের বিদ্যালয়ে সেদিন অনেক দূর পর্যন্ত চালাতে পেরেছিলুম। তখন শিক্ষকেরা ছাত্রদের সঙ্গে একসঙ্গে বেড়িয়েছেন, খেলা করেছেন, তাদের সঙ্গে তাঁদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ছিল। ভাষা কি ইতিহাস কি ভূগোল নূতন উৎকৃষ্ট প্রণালীতে কী শিখিয়েছি না-শিখিয়েছি জানি নে, কিন্তু যে জিনিসটাকে কোনো বিদ্যালয়ে কেউ অত্যাবশ্যক বলে মনে করে না, অথচ যা সবচেয়ে বড়ো জিনিস, আমাদের বিদ্যালয়ে তার স্থান হয়েছে মনে করে আনন্দে অন্যসকল অভাব ভুলে ছিলুম।

ক্রমে আমাদের সেই অতি ছোটো বিদ্যালয় বড়ো হয়েছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য

প্রদেশ থেকে আপনারা অনেকে সমাগত হয়েছেন, ছাত্ররাও বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এসেছে। ক্রমে এর সীমা আরো দূরে প্রসারিত হল, বিদেশ থেকে বন্ধুরা এসে এই কাজে যোগ দিলেন। যা প্রচ্ছন্ন ছিল তা কোনোদিন যে এমন ব্যাপকভাবে প্রকাশমান হবে তা কখনো ভাবি নি।

আমরা চেষ্টা করি নি, আমরা প্রত্যাশা করি নি। চিরদিন অল্প আয়োজন এবং অল্প শক্তিতেই আমরা একান্তে কাজ করেছি। তবু আমাদের এই প্রতিষ্ঠান যেন নিজেরই অন্তর্গূঢ় স্বভাব অনুসরণ করে বিশ্বের ক্ষেত্রে নিজেকে ব্যক্ত করেছে। পাশ্চাত্য দেশের যে-সব মনীষী এখানে এসেছিলেন— লেভি, উইণ্টারনিট্‌জ, লেস্‌নি, তাঁরা যে এমন-কিছু এখানে পেয়েছিলেন যা বাংলাদেশের কোণের মধ্যে বদ্ধ নয়, তা থেকে বুঝতে পারি এখানে কোনো একটি সত্যের প্রকাশ হয়েছে। তাঁরা যে আনন্দ যে শ্রদ্ধা যে উৎসাহ অনুভব করে গেছেন তা যে এখানে আমাদের সকলের মধ্যে স্ফূর্তি পাচ্ছে তা নয়, তৎসত্ত্বেও এখানকার বাতাসের মধ্যে এমন কোনো একটা সার্থকতা আছে যার স্পর্শে দূরাগত অতিথিরা অন্তরঙ্গ সুহৃদ হয়ে উঠেছেন, যাঁরা কিছুদিনের জন্যে এসেছিলেন তাঁদের সঙ্গে চিরকালের যোগ ঘটেছে।

আজ ভেদবুদ্ধি ও বিদ্বেষবুদ্ধি সমস্ত পৃথিবীতে আগুন লাগিয়েছে, মানুষে মানুষে এমন জগদ্‌ব্যাপী পরম শত্রুতার সংঘাত প্রাচীন ইতিহাসে নেই। দেশে-দেশান্তরে এই আগুন ছড়িয়ে গেল। প্রাচ্য মহাদেশে আমরা বহু শতাব্দী ঘুমিয়ে ছিলুম, আমরা যে জাগলুম সে এরই আঘাতে। জাপান মার খেয়ে জেগেছে। ভারতবর্ষ থেকে প্রেমের দৌত্য একদিন তাকে জাগিয়েছিল, আজ লোভ এসে ঘা দিয়ে ভয়ে তাকে জাগিয়েছে। লোভের দন্তের ঘা খেয়ে যে জাগে সে অন্যকেও ভয় দেখায়। জাপান কোরিয়াকে মারলে, চীনকে মারতে গিয়েছিল।

মানুষের আজ কী অসহ্য বেদনা। দাসত্বের ব্রতী হয়ে কত কলে সে ক্লিষ্ট হচ্ছে— মানুষের পূর্ণতা সর্বত্র পীড়িত। মনুষ্যত্বের এই-যে খর্বতা, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যন্ত্রদেবতার এই-যে পূজা, এই-যে আত্মহত্যা, পৃথিবীর কোথাও একে নিরস্ত করবার প্রয়াস কি থাকবে না। আমরা দরিদ্র, অন্য জাতির অধীন তাই বলেই কি মানুষ তার সত্য সম্পদ আমাদের কাছ থেকে নেবে না। যদি সাধনা সত্য হয়, অন্তরে আমাদের বাণী থাকে, তবে মাথা হেঁট করে সকলকে নিতেই হবে।

একদিন বুদ্ধ বললেন, 'আমি সমস্ত মানুষের দুঃখ দূর করব।' দুঃখ তিনি সত্যই দূর করতে পেরেছিলেন কি না সেটি বড়ো কথা নয়; বড়ো কথা হচ্ছে, তিনি এটি ইচ্ছা করেছিলেন, সমস্ত জীবের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। ভারতবর্ষ

ধনী হোক প্রবল হোক, এ তাঁর তপস্যা ছিল না ; সমস্ত মানুষের জন্য তিনি সাধনা করেছিলেন। আজ ভারতের মাটিতে আবার সেই সাধনা জেগে উঠুক সেই ইচ্ছাকে ভারতবর্ষ থেকে কি দূর করে দেওয়া চলে। আমি যে বিশ্বভারতীকে এই ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত করতে পারি নি সে আমার নিজেরই দৈন্য— আমি যদি সাধক হতুম সে একাগ্রতার শক্তি যদি আমার থাকত, তবে সব আপনিই হত। আজ অত্যন্ত নম্রভাবে সানুনয়ে আপনাদের জানাচ্ছি, আমি অযোগ্য, তাই এ কাজ আমার একলার নয়, এ সাধনা আপনাদের সকলের। এ আপনাদের গ্রহণ করতে হবে।

বিদেশে যখন যাই তখন সর্বমানুষের সম্বন্ধে আমাদের দেশে চৈতন্যের যে ক্ষীণতা আছে তা ভুলে যাই, ভারতের যজ্ঞক্ষেত্রে সকলকে আহ্বান করি। ফিরে এসে দেখি, এখানে সে বৃহৎ ভূমিকা কোথায়, বৃহৎ জগতের মাঝখানে যে আমরা আছি সে দৃষ্টি কোথায়। আমার শক্তি নেই, কিন্তু মনে ভরসা ছিল, বিশ্বের মর্মস্থান থেকে যে ডাক এসেছে তা অনেকেই শুনতে পাবে, অনেকে একত্র মিলিত হবে। সেই বোধের বাধা আমাদের আশ্রম থেকে যেন সর্বপ্রযত্নে দূর করি, রিপুর প্রভাব-জনিত যে দুঃখ তা থেকে যেন বাঁচি। হয়তো আমাদের সাধনা সিদ্ধ হবে, হয়তো হবে না। আমি গীতার কথা অন্তরের সঙ্গে মানি— ফলে লোভ করলে আপনাকে ভোলাব, অন্যকে ভোলাব। আমাদের কাজ বাইরে থেকে খুবই সামান্য— কটিই বা আমাদের ছাত্র, কটিই বা বিভাগ, কিন্তু অন্তরের দিক থেকে এর অধিকারের সীমা নেই। আমাদের সকলের সম্মিলিত চিত্ত সেই অধিকারকে দৃঢ় করুক, সেই অধিকারকে অবলম্বন করে বিচিত্র কল্যাণের সৃষ্টি করুক— সেই সৃষ্টির আনন্দ এবং তপোদুঃখ আমাদের হোক। ছোটো ছোটো মতের অনৈক্য, স্বার্থের সংঘাত ভুলে গিয়ে সাধনাকে আমরা বিশুদ্ধ রাখব, সেই উৎসাহ আমাদের আসুক। আমার নিজের চিত্তের তেজ যদি বিশুদ্ধ ও উজ্জ্বল থাকত তা হলে আমি গুরুর আসন থেকে এই দাবি করতুম। কিন্তু আমি আপনাদের সঙ্গে এক পথেরই পথিক মাত্র ; আমি চালনা করতে পারি নে, চাই নে। আপনারা জানেন, আমার যা দেবার তা দিয়েছি, কৃপণতা করি নি। তাই আপনাদের কাছ থেকে ভিক্ষা করবার অধিকার আমার আজ হয়েছে।

১৭ ভাদ্র ১৩৩১ কার্তিক ১৩৩১

শান্তিনিকেতন

১২

একদিন আমাদের এখানে যে উদ্যোগ আরম্ভ হয়েছিল সে অনেক দিনের কথা। আমাদের একটি পূর্বতন ছাত্র সেদিনকার ইতিহাসের একটি খণ্ডকালকে কয়েকটি চিঠিপত্র ও মুদ্রিত বিবরণীর ভিতর দিয়ে আমার সামনে এনে দিয়েছিল। সেই ছাত্রটি এই বিদ্যায়তনের প্রতিষ্ঠা থেকেই এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। কাল রাত্রে সেদিনকার ইতিকথার ছিন্নলিপি যখন পড়ে দেখছিলুম তখন মনে পড়ল, কী ক্ষীণ আরম্ভ, কত তুচ্ছ আয়োজন। সেদিন যে মূর্তি এই আশ্রমের শালবীথিচ্ছায়ায় দেখা দিয়েছিল, আজকের দিনের বিশ্বভারতীর রূপ তার মধ্যে এতই প্রচ্ছন্ন ছিল যে, সে কারো কল্পনাতেও আসতে পারত না। এই অনুষ্ঠানের প্রথম সূচনা-দিনে আমরা আমাদের পুরাতন আচার্যদের আহ্বানমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেম— যে মন্ত্রে তাঁরা সকলকে ডেকে বলেছিলেন, 'আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা'; বলেছিলেন, 'জলধারাসকল যেমন সমুদ্রের মধ্যে এসে মিলিত হয় তেমনি করে সকলে এখানে মিলিত হোক।' তাঁদেরই আহ্বান আমাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হল, কিন্তু ক্ষীণকণ্ঠে। সেদিন সেই বেদমন্ত্র-আবৃত্তির ভিতরে আমাদের আশা ছিল, ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আজ যে প্রাণের বিকাশ আমরা অনুভব করছি, সুস্পষ্টভাবে সেটা আমাদের গোচর ছিল না। এই বিদ্যালয়ের প্রচ্ছন্ন অন্তঃস্তর থেকে সত্যের বীজ আমার জীবিতকালের মধ্যেই অঙ্কুরিত হয়ে বিশ্বভারতী রূপে বিস্তার লাভ করবে, ভরসা করে এই কল্পনাকে সেদিন মনে স্থান দিতে পারি নি। কোনো একদিন বিরাট ভারতবর্ষ এই আশ্রমের মধ্যে আসন পাতবে, এই ভারতবর্ষ— যেখানে নানা জাতি নানা বিদ্যা নানা সম্প্রদায়ের সমাবেশ, সেই ভারতবর্ষের সকলের জন্যই এখানে স্থান প্রশস্ত হবে, সকলেই এখানে আতিথ্যের অধিকার পাবে, এখানে পরস্পরের সম্মিলনের মধ্যে কোনো বাধা কোনো আঘাত থাকবে না, এই সংকল্প আমার মনে ছিল। তখন একান্ত মনে এই ইচ্ছা করেছিলেম যে, ভারতবর্ষের আর সর্বত্রই আমরা বন্ধনের রূপ দেখতে পাই, কিন্তু এখানে আমরা মুক্তির রূপকেই যেন স্পষ্ট দেখি। যে বন্ধন ভারতবর্ষকে জর্জরিত করেছে সে তো বাইরে নয়, সে আমাদেরই ভিতরে। যাতেই বিচ্ছিন্ন করে তাই যে বন্ধন। যে কারারুদ্ধ সে বিচ্ছিন্ন বলেই বন্দী। ভেদবিভেদের প্রকাণ্ড শৃঙ্খলের অসংখ্য চক্র সমস্ত ভারতবর্ষকে ছিন্নবিচ্ছিন্নতায় পীড়িত ক্লিষ্ট করে রেখেছে, আত্মীয়তার মধ্যে মানুষের যে মুক্তি সেই মুক্তিকে প্রত্যেক পদে বাধা দিচ্ছে, পরস্পর-বিভিন্নতাই ক্রমে পরস্পর-বিরোধিতার দিকে আমাদের আকর্ষণ করে নিয়ে যাচ্ছে। এক প্রদেশের সঙ্গে অন্ত প্রদেশের অনৈক্যকে আমরা

রাষ্ট্রনৈতিক বক্তৃতামঞ্চে বাক্যকুহেলিকার মধ্যে ঢাকা দিয়ে রাখতে চাই, কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে পরস্পর সম্বন্ধে ঈর্ষা অবজ্ঞা আত্মপর-ভেদবুদ্ধি কেবলই যখন কণ্টকিত হয়ে ওঠে তখন সেটার সম্বন্ধে আমাদের লজ্জাবোধ পর্যন্ত থাকে না। এমনি করে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার আশা দূরে থাক্‌, পরস্পরের মধ্যে পরিচয়ের পথও সুগভীর ঔদাসীন্যের দ্বারা বাধাগ্রস্ত।

যে অন্ধকারে ভারতবর্ষে আমরা পরস্পরকে ভালো করে দেখতে পাই নে সেইটেই আমাদের সকলের চেয়ে দুর্বলতার কারণ। রাতের বেলায় আমাদের ভয়ের প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে ওঠে, অথচ সকালের আলোতে সেটা দূর হয়ে যায়। তার প্রধান কারণ, সকালে আমরা সকলকে দেখতে পাই, রাত্রে আমরা নিজেকে স্বতন্ত্র করে দেখি। ভারতবর্ষে সেই রাত্রি চিরন্তন হয়ে রয়েছে। মুসলমান বলতে কী বোঝায় তা সম্পূর্ণ ক'রে আপনার ক'রে, অর্থাৎ রামমোহন রায় যেমন ক'রে জানতেন, তা খুব অল্প হিন্দুই জানেন। হিন্দু বলতে কী বোঝায় তাও বড়ো ক'রে আপনার ক'রে, অর্থাৎ দারাশিকো একদিন যেমন ক'রে বুঝেছিলেন, তাও অল্প মুসলমানই জানেন। অথচ এইরকম গভীর ভাবে জানার ভিতরেই পরস্পরের ভেদ ঘোচে।

কিছুকাল থেকে আমরা কাগজে পড়ে আসছি, পঞ্জাবে অকালি শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি প্রবল ধর্ম-আন্দোলন জেগে উঠেছে, যার প্রবর্তনায় তারা দলে দলে নির্ভয়ে বধ-বন্ধনকে স্বীকার করেছে। কিন্তু অন্য শিখদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য কোথায়, কোন্‌খানে তারা এত প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে, ও কোন্‌ সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবশত তারা সেই আঘাতের সঙ্গে প্রাণান্তকর সংগ্রাম করে জয়ী হয়েছে সে-সম্বন্ধে আমাদের দরদের কথা দূরে থাক্‌, আমাদের জিজ্ঞাসাবৃত্তি পর্যন্ত জাগে নি। অথচ কেবলমাত্র কথার জোরে এদের নিয়ে রাষ্ট্রীয় ঐক্যতন্ত্র সৃষ্টি করব বলে কল্পনা করতে কোথাও আমাদের বাধে না। দাক্ষিণাত্যে যখন মোপ্‌লা-দৌরাত্ম্য নিষ্ঠুর হয়ে দেখা দিল তখন সে-সম্বন্ধে বাংলাদেশে আমরা সে পরিমাণেও বিচলিত হই নি যতটা হলে তাদের ধর্ম সমাজ ও আর্থিক কারণ-ঘটিত তথ্য জানবার জন্য আমাদের জ্ঞানগত উত্তেজনা জন্মাতে পারে। অথচ এই মালাবারের হিন্দু ও মোপ্‌লাদের নিয়ে মহাজাতিক ঐক্য স্থাপন করা সম্বন্ধে অন্তত বাক্যগত সংকল্প আমরা সর্বদাই প্রকাশ করে থাকি।

আমাদের শাস্ত্রে বলে, অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানের বন্ধনই বন্ধন। এ কথা সকল দিকেই খাটে। যাকে জানি নে তার সম্বন্ধেই আমরা যথার্থ বিচ্ছিন্ন। কোনো বিশেষ দিনে তাকে গলা জড়িয়ে আলিঙ্গন করতে পারি, কেননা সেটা বাহ্য; তাকে বন্ধু সম্ভাষণ করে অশ্রুপাত করতে পারি, কেননা সেটাও বাহ্য; কিন্তু 'উৎসবে ব্যসনে

চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে রাজদ্বারে শ্মশানে চ' আমরা সহজ প্রীতির অনিবার্য আকর্ষণে তাদের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করতে পারি নে। কারণ যাদের আমরা নিবিড়ভাবে জানি তারাই আমাদের জ্ঞাতি। ভারতবর্ষের লোক পরস্পরের সম্বন্ধে যখন মহাজ্ঞাতি হবে তখনই তারা মহাজাতি হতে পারবে।

সেই জানবার সোপান তৈরি করার দ্বারা মেলবার শিখরে পৌঁছবার সাধনা আমরা গ্রহণ করেছি। একদা যেদিন সুহৃদ্বর বিধুশেখর শাস্ত্রী ভারতের সর্ব সম্প্রদায়ের বিদ্যাগুলিকে ভারতের বিদ্যাক্ষেত্রে একত্র করবার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন তখন আমি অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহ বোধ করেছিলেম। তার কারণ, শাস্ত্রীমশায় প্রাচীন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের শিক্ষাধারার পথেই বিদ্যালাভ করেছিলেন। হিন্দুদের সনাতন শাস্ত্রীয় বিদ্যার বাহিরে যে-সকল বিদ্যা আছে তাকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করতে পারলে তবেই যে আমাদের শিক্ষা উদারভাবে সার্থক হতে পারে, তাঁর মুখে এ কথার সত্য বিশেষভাবে বল পেয়ে আমার কাছে প্রকাশ পেয়েছিল। আমি অনুভব করেছিলেম, এই ঔদার্য, বিদ্যার ক্ষেত্রে সকল জাতির প্রতি এই সসম্মান আতিথ্য, এইটিই হচ্ছে যথার্থ ভারতীয়। সেই কারণেই ভারতবর্ষ পুরাকালে যখন গ্রীক-রোমকদের কাছ থেকে জ্যোতির্বিদ্যার বিশেষ পন্থা গ্রহণ করেছিলেন তখন ম্লেচ্ছগুরুদের ঋষিকল্প বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন নি। আজ যদি এ সম্বন্ধে আমাদের কিছুমাত্র কৃপণতা ঘটে থাকে তবে জানতে হবে, আমাদের মধ্যে সেই বিশুদ্ধ ভারতীয় ভাবের বিকৃতি ঘটেছে।

এ দেশের নানা জাতির পরিচয়ের উপর ভারতের যে আত্মপরিচয় নির্ভর করে এখানে কোনো-এক জায়গায় তার তো সাধনা থাকা দরকার। শান্তিনিকেতনে সেই সাধনার প্রতিষ্ঠা ধ্রুব হোক, এই ভাবনাটি এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আমাদের লক্ষ্যে ও অলক্ষ্যে বিরাজ করছে। কিন্তু আমার সাধ্য কী। সাধ্য থাকলেও এ যদি আমার একলারই সৃষ্টি হয় তা হলে এর সার্থকতা কী। যে দীপ পথিকের প্রত্যাশায় বাতায়নে অপেক্ষা করে থাকে সেই দীপটুকু জ্বেলে রেখে দিয়ে আমি বিদায় নেব, এইটুকুমাত্রই আমার ভরসা ছিল।

তার পরে অসংখ্য অভাব দৈন্য বিরোধ ও ব্যাঘাতের ভিতর দিয়ে দুর্গম পথে একে বহন করে এসেছি। এর অন্তর্নিহিত সত্য ক্রমে আপনার আবরণ মোচন করতে করতে আজ আমাদের সামনে অনেকটা পরিমাণে সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করেছে। আমাদের আনন্দের দিন এল। আজ আপনারা এই-যে সমবেত হয়েছেন, এ আমাদের কত বড়ো সৌভাগ্য। এর সদস্য, যাঁরা নানা কর্মে ব্যাপৃত, এর

সঙ্গে তাঁদের যোগ ক্রমে ক্রমে যে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, এ আমাদের কত বড়ো সৌভাগ্য।

এই কর্মানুষ্ঠানটিকে বহুকাল একলা বহন করার পর যেদিন সকলের হাতে সমর্পণ করলুম সেদিন মনে এই দ্বিধা এসেছিল যে, সকলে একে শ্রদ্ধা করে গ্রহণ করবেন কি না। অন্তরায় অনেক ছিল, এখনো আছে। তবুও সংশয় ও সংকোচ থাকা সত্ত্বেও একে সম্পূর্ণভাবেই সকলের কাছে নিবেদন করে দিয়েছি। কেউ যেন না মনে করেন, এটা একজন লোকের কীর্তি, এবং তিনি এটাকে নিজের সঙ্গেই একান্ত করে জড়িয়ে রেখেছেন। যাকে এত দীর্ঘকাল এত করে পালন করে এসেছি তাকে যদি সাধারণের কাছে শ্রদ্ধেয় করে থাকি সে আমার সবচেয়ে বড়ো সৌভাগ্য। সেদিন আজ এসেছে বলি নে, কিন্তু সে দিনের সূচনাও কি হয় নি। যেমন সেই প্রথম দিনে আজকের দিনের সম্ভাবনা কল্পনা করতে সাহস পাই নি, অথচ এই ভবিষ্যৎকে গোপনে সে বহন করেছিল, তেমনি ভারতবর্ষের দূর ইতিহাসে এই বিশ্বভারতীর যে পূর্ণ অভিব্যক্তি হবে তা প্রত্যয় করব না কেন। সেই প্রত্যয়ের দ্বারাই এর প্রকাশ বল পেয়ে ধ্রুব হয়ে ওঠে, এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। এর প্রমাণ আরম্ভ হয়েছে যখন দেখতে পাচ্ছি আপনারা এর ভার গ্রহণ করেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে এটা বড়ো কথা, আবার আমার দিক থেকেও এ তো কম কথা নয়। কোনো একজন মানুষের পক্ষে এর ভার দুঃসহ। এই ভারকে বহন করবার অনুকূলে আমার আন্তরিক প্রত্যয় ও প্রত্যাশার আনন্দ যদিও আমাকে বল দিয়েছে, তবু আমার শক্তির দৈন্য কোনো-দিনই ভুলতে অবকাশ পাই নি। কত অভাব কত অসামর্থ্যের দ্বারা এত কাল প্রত্যহ পীড়িত হয়ে এসেছি, বাইরের অকারণ প্রতিকূলতা একে কত দিক থেকে ক্ষুণ্ন করেছে। তবু এর সমস্ত ত্রুটি অসম্পূর্ণতা, এর সমস্ত দারিদ্র্য সত্ত্বেও আপনারা একে শ্রদ্ধা করে পালন করবার ভার নিয়েছেন, এতে আমাকে যে কত দয়া করেছেন তা আমিই জানি। সেজন্য ব্যক্তিগতভাবে আজ আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।

এই প্রতিষ্ঠানের বাহ্যায়তনটিকে সুচিন্তিত বিধি-বিধান দ্বারা সুসবদ্ধ করবার ভার আপনারা নিয়েছেন। এই নিয়ম-সংঘটনের কাজ আমি যে সম্পূর্ণ বুঝি তা বলতে পারি নে, শরীরের দুর্বলতা-বশত সব সময়ে এতে আমি যথেষ্ট মন দিতেও অক্ষম হয়েছি। কিন্তু নিশ্চিত জানি, এই অঙ্গবন্ধনের প্রয়োজন আছে। জলের পক্ষে জলাশয়ের উপযোগিতা কে অস্বীকার করবে। সেইসঙ্গে এ কথাও মনে রাখা চাই যে, চিত্ত দেহে বাস করে বটে কিন্তু দেহকে অতিক্রম করে। দেহ বিশেষ সীমায় বদ্ধ, কিন্তু চিত্তের বিচরণক্ষেত্র সমস্ত বিশ্বে। দেহব্যবস্থা অতিজটিলতার দ্বারা চিত্তব্যাপ্তির

বাধা যাতে না ঘটায় এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। এই প্রতিষ্ঠানের কায়া-রূপটির পরিচয় সম্প্রতি আমার কাছে সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণ নয়, কিন্তু এর চিত্তরূপটির প্রসার আমি বিশেষ করেই দেখেছি। তার কারণ, আমি আশ্রমের বাইরে ঘুরে ঘুরে বারবার ভ্রমণ করে থাকি। কতবার মনে হয়েছে, যাঁরা এই বিশ্বভারতীর যজ্ঞকর্তা তাঁরা যদি আমার সঙ্গে এসে বাইরের জগতে এর পরিচয় পেতেন তা হলে জানতে পারতেন কোন্ বৃহৎ ভূমির উপরে এর আশ্রয়। তা হলে বিশেষ দেশকাল ও বিধি-বিধানের অতীত এর মুক্তরূপটি দেখতে পেতেন। বিদেশের লোকের কাছে ভারতের সেই প্রকাশ সেই পরিচয়ের প্রতি প্রভূত শ্রদ্ধা দেখেছি যা ভারতের ভূ-সীমানার মধ্যে বদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না, যা আলোর মতো দীপকে ছাড়িয়ে যায়। এর থেকে এই বুঝেছি, ভারতের এমন-কিছু সম্পদ আছে যার প্রতি দাবি সমস্ত বিশ্বের। জাত্যভিমানের প্রবল উগ্রতা মন থেকে নিরস্ত করে নম্রভাবে সেই দাবি পূরণ করবার দায়িত্ব আমাদের। যে ভারত সকল কালের সকল লোকের, সেই ভারতে সকল কাল ও সকল লোককে নিমন্ত্রণ করবার ভার বিশ্বভারতীর।

কিছুদিন হল যখন দক্ষিণ-আমেরিকায় গিয়ে রুগ্ণকক্ষে বদ্ধ ছিলাম তখন প্রায় প্রত্যহ আগন্তুকের দল প্রশ্ন নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। তাঁদের সকল প্রশ্নের ভিতরকার কথাটা এই যে, পৃথিবীকে দেবার মতো কোন্ ঐশ্বর্য ভারতবর্ষের আছে। ভারতের ঐশ্বর্য বলতে এই বুঝি, যা-কিছু তার নিজের লোকের বিশেষ ব্যবহারে নিঃশেষ করবার নয়। যা নিয়ে ভারত দানের অধিকার, আতিথ্যের অধিকার পায়; যার জোরে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সে নিজের আসন গ্রহণ করতে পারে; অর্থাৎ যাতে তার অভাবের পরিচয় নয়, তার পূর্ণতারই পরিচয়— তাই তার সম্পদ। প্রত্যেক বড়ো জাতির নিজের বৈষয়িক ব্যাপার একটা আছে, সেটাতে বিশেষভাবে তার আপন প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। তার সৈন্যসামন্ত-অর্থসামর্থ্যে আর কারো ভাগ চলে না। সেখানে দানের দ্বারা তার ক্ষতি হয়। ইতিহাসে ফিনিসীয় প্রভৃতি এমন-সকল ধনী জাতির কথা শোনা যায় যারা অর্থ-অর্জনেই নিরন্তর নিযুক্ত ছিল। তারা কিছুই দিয়ে যায় নি, রেখে যায় নি; তাদের অর্থ যতই থাক্, তাদের ঐশ্বর্য ছিল না। ইতিহাসের জীর্ণ পাতার মধ্যে তারা আছে, মানুষের চিত্তের মধ্যে নেই। ইজিপ্ট গ্রীস রোম প্যালেস্টাইন চীন প্রভৃতি দেশ শুধু নিজের ভোজ্য নয় সমস্ত পৃথিবীর ভোগ্য সামগ্রী উৎপন্ন করেছে। বিশ্বের তৃপ্তিতে তারা গৌরবান্বিত। সেই কারণে সমস্ত পৃথিবীর প্রশ্ন এই, ভারতবর্ষ শুধু নিজেকে নয়, পৃথিবীকে কী দিয়েছে। আমি আমার সাধ্যমত কিছু বলবার চেষ্টা করেছি এবং দেখেছি, তাতে তাদের আকাঙ্ক্ষা বেড়ে গেছে। তাই

আমার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে যে, আজ ভারতবর্ষের কেবল যে ভিক্ষার ঝুলিই সম্বল তা নয়, তার প্রাঙ্গণে এমন একটি বিশ্বযজ্ঞের স্থান আছে যেখানে অক্ষয় আত্ম-দানের জন্য সকলকে সে আহ্বান করতে পারে।

সকলের জন্য ভারতের যে বাণী তাকেই আমরা বলি বিশ্বভারতী। সেই বাণীর প্রকাশ আমাদের বিদ্যালয়টুকুর মধ্যে নয়। শিব আসেন দরিদ্র ভিক্ষুকের মূর্তি ধরে, কিন্তু একদিন প্রকাশ হয়ে পড়ে সকল ঐশ্বর্য তাঁর মধ্যে। বিশ্বভারতী এই আশ্রমে দীন ছদ্মবেশে এসেছিল ছোটো বিদ্যালয়-রূপে। সেই তার লীলার আরম্ভ, কিন্তু সেখানেই তার চরম সত্য নয়। সেখানে সে ছিল ভিক্ষুক, মুষ্টিভিক্ষা আহরণ করছিল। আজ সে দানের ভাণ্ডার খুলতে উদ্যত। সেই ভাণ্ডার ভারতের। বিশ্বপৃথিবী আজ অঙ্গনে দাঁড়িয়ে বলছে, 'আমি এসেছি।' তাকে যদি বলি, 'আমাদের নিজের দায়ে ব্যস্ত আছি, তোমাকে দেবার কথা ভাবতে পারি নে'— তার মতো লজ্জা কিছুই নেই। কেননা দিতে না পারলেই হারাতে হয়।

এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই যে, বর্তমান যুগে সমস্ত পৃথিবীর উপরে য়ুরোপ আপন প্রভাব বিস্তার করেছে। তার কারণ আকস্মিক নয়, বাহ্যিক নয়। তার কারণ, যে বর্বরতা আপন প্রয়োজনটুকুর উপরেই সমস্ত মন দেয়, সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে, য়ুরোপ তাকে অনেক দূরে ছাড়িয়ে গেছে। সে এমন কোনো সত্যের নাগাল পেয়েছে যা সর্বকালীন সর্বজনীন, যা তার সমস্ত প্রয়োজনকে পরিপূর্ণ করে অক্ষয়ভাবে উদ্‌বৃত্ত থাকে। এই হচ্ছে তার বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানকে প্রকাশের দ্বারাই পৃথিবীতে সে আপনার অধিকার পেয়েছে। যদি কোনো কারণে য়ুরোপের দৈহিক বিনাশও ঘটে তবু এই সত্যের মূল্যে মানুষের ইতিহাসে তার স্থান কোনোদিন বিলুপ্ত হতে পারবে না। মানুষকে চিরদিনের মতো সে সম্পদশালী করে দিয়েছে, এই তার সকলের চেয়ে বড়ো গৌরব, এই তার অমরতা। অথচ এই য়ুরোপ যেখানে আপনার লোভকে সমস্ত মানুষের কল্যাণের চেয়ে বড়ো করেছে সেখানেই তার অভাব প্রকাশ পায়, সেখানেই তার খর্বতা, তার বর্বরতা। তার একমাত্র কারণ এই যে, বিচ্ছিন্নভাবে কেবল আপনটুকুর মধ্যে মানুষের সত্য নেই— পশুধর্মেই সেই বিচ্ছিন্নতা; বিনাশশীল দৈহিক প্রাণ ছাড়া যে পশুর আর কোনো প্রাণ নেই। যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা আপনার জীবনে সেই অনির্বাণ আলোককেই জ্বালেন, যার দ্বারা মানুষ নিজেকে সকলের মধ্যে উপলব্ধি করতে পারে।

পশ্চিম-মহাদেশ তার পলিটিক্সের দ্বারা বৃহৎ পৃথিবীকে পর করে দিয়েছে, তার বিজ্ঞানের দ্বারা বৃহৎ পৃথিবীকে নিমন্ত্রণ করেছে। বৃহৎকালের মধ্যে ইতিহাসের উদার

রূপ যদি আমরা দেখতে পাই তা হলে দেখব, আন্তর্জাতিক পলিটিক্সের দিকে য়ুরোপের আত্মাবমাননা, সেখানে তার অন্ধকার; বিজ্ঞানের দিকেই তার আলোক জ্বলেছে, সেখানেই তার যথার্থ আত্মপ্রকাশ; কেননা বিজ্ঞান সত্য, আর সত্যই অমরতা দান করে। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানেই য়ুরোপকে সার্থকতা দিয়েছে, কেননা বিজ্ঞান বিশ্বকে প্রকাশ করে; আর তার সর্বভুক্ ক্ষুধিত পলিটিক্স তার বিনাশকেই সৃষ্টি করছে, কেননা পলিটিক্সের শোণিতরক্ত-উত্তেজনায় সে নিজেকে ছাড়া আর সমস্তকেই অস্পষ্ট ও ছোটো করে দেখে; সুতরাং সত্যকে খণ্ডিত করার দ্বারা অশান্তির চক্রবাত্যায় আত্মহত্যাকে আবর্তিত করে তোলে।

আমরা অত্যন্ত ভুল করব যদি মনে করি, সীমাবিহীন অহমিকা-দ্বারা, জাত্যভিমানে আবিল ভেদবুদ্ধি -দ্বারাই য়ুরোপ বড়ো হয়েছে। এমন অসম্ভব কথা আর হতে পারে না। বস্তুত সত্যের জোরেই তার জয়যাত্রা, রিপুর আকর্ষণেই তার অধঃপতন— যে রিপুর প্রবর্তনায় আমরা আপনাকে সব দিতে চাই, বাহিরকে বঞ্চিত করি।

এখন নিজের প্রতি আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো প্রশ্ন এই যে, আমাদের কি দেবার জিনিস কিছু নেই। আমরা কি আকিঞ্চন্যের সেই চরম বর্বরতায় এসে ঠেকেছি যার কেবল অভাবই আছে, ঐশ্বর্য নেই। বিশ্বসংসার আমাদের দ্বারে এসে অভুক্ত হয়ে ফিরলে কি আমাদের কোনো কল্যাণ হতে পারে। দুর্ভিক্ষের অন্ন আমাদের উৎপাদন করতে হবে না, এমন কথা আমি কখনোই বলি নে, কিন্তু ভাণ্ডারে যদি আমাদের অমৃত থাকে তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আমরা বাঁচতে পারব?

এই প্রশ্নের উত্তর যিনিই যেমন দিন-না, আমাদের মনে যে উত্তর এসেছে বিশ্বভারতীর কাজের ভিতর তারই পূর্ণ অভিব্যক্তি হতে থাক্, এই আমাদের সাধনা। বিশ্বভারতী এই বেদমন্ত্রের দ্বারাই আপন পরিচয় দিতে চায়— 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্'। যে আত্মীয়তা বিশ্বে বিস্তৃত হবার যোগ্য সেই আত্মীয়তার আসন এখানে আমরা পাতব। সেই আসনে জীর্ণতা নেই, মলিনতা নেই, সংকীর্ণতা নেই।

এই আসনে আমরা সবাইকে বসাতে চেয়েছি; সে কাজ কি এখনই আরম্ভ হয় নি। অন্য দেশ থেকে যে-সকল মনীষী এখানে এসে পৌঁচেছেন, আমরা নিশ্চয় জানি তাঁরা হৃদয়ের ভিতরে আহ্বান অনুভব করেছেন। আমার সুহৃদ্‌বর্গ, যাঁরা এই আশ্রমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত, তাঁরা সকলেই জানেন, আমাদের দূরদেশের অতিথিরা এখানে ভারতবর্ষেরই আতিথ্য পেয়েছেন, পেয়ে গভীর তৃপ্তিলাভ করেছেন। এখান থেকে আমরা যে-কিছু পরিবেশন করছি তার প্রমাণ সেই অতিথিদের কাছেই।

তাঁরা আমাদের অভিনন্দন করেছেন। আমাদের দেশের পক্ষ থেকে তাঁরা আত্মীয়তা পেয়েছেন, তাঁদের পক্ষ থেকেও আত্মীয়তার সম্বন্ধ সত্য হয়েছে।

আমি তাই বলছি, কাজ আরম্ভ হয়েছে। বিশ্বভারতীর যে সত্য তা ক্রমশ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে। এখানে আমরা ছাত্রদের কোন্ বিষয় পড়াচ্ছি, পড়ানো সকলের মনের মতো হচ্ছে কি না, সাধারণ কলেজের আদর্শে উচ্চশিক্ষা-বিভাগ খোলা হয়েছে বা জ্ঞানানুসন্ধান-বিভাগে কিছু কাজ হচ্ছে, এ-সমস্তকেই যেন আমরা আমাদের ধ্রুব পরিচয়ের জিনিস বলে না মনে করি। এ-সমস্ত আজ আছে কাল না থাকতেও পারে। আশঙ্কা হয় পাছে যা ছোটো তাই বড়ো হয়ে ওঠে, পাছে একদিন আগাছাই ধানের খেতকে চাপা দেয়। বনস্পতির শাখায় কোনো বিশেষ পাখি বাসা বাঁধতে পারে, কিন্তু সেই বিশেষ পাখির বাসাই বনস্পতির একান্ত বিশেষণ নয়। নিজের মধ্যে বনস্পতি সমস্ত অরণ্যপ্রকৃতির যে সত্যপরিচয় দেয় সেইটেই তার বড়ো লক্ষণ।

পূর্বেই বলেছি, ভারতের যে প্রকাশ বিশ্বের শ্রদ্ধেয় সেই প্রকাশের দ্বারা বিশ্বকে অভ্যর্থনা করব, এই হচ্ছে আমাদের সাধনা। বিশ্বভারতীর এই কাজে পশ্চিম-মহাদেশে আমি কী অভিজ্ঞতা লাভ করেছি সে কথা বলতে আমি কুণ্ঠিত হই। দেশের লোকে অনেকে হয়তো সেটা শ্রদ্ধাপূর্বক গ্রহণ করবেন না, এমন-কি, পরিহাসরসিকেরা বিদ্রূপও করতে পারেন। কিন্তু সেটাও কঠিন কথা নয়। আসলে ভাবনার কথাটা হচ্ছে এই যে, বিদেশে আমাদের দেশ যে শ্রদ্ধা লাভ করে, পাছে সেটাকে কেবলমাত্র অহংকারের সামগ্রী করে তোলা হয়। সেটা আনন্দের বিষয়, সেটা অহংকারের বিষয় নয়। যখন অহংকার করি তখন বাইরের লোকদের আরো বাইরে ফেলি, যখন আনন্দ করি তখনই তাদের নিকটের বলে জানি। বারম্বার এটা দেখেছি, বিদেশের যে-সব মহদাশয় লোক আমাদের ভালোবেসেছেন, আমাদের অনেকে তাঁদের বিষয়সম্পত্তির মতো গণ্য করেছেন। তাঁরা আমাদের জাতিকে যে আদর করতে পেরেছেন সেটুকু আমরা ষোলো-আনা গ্রহণ করেছি, কিন্তু আমাদের তরফে তার দায়িত্ব স্বীকার করি নি। তাঁদের ব্যবহারে তাঁদের জাতির যে গৌরব প্রকাশ হয় সেটা স্বীকার করতে অক্ষম হয়ে আমরা নিজের গভীর দৈন্যের প্রমাণ দিয়েছি। তাঁদের প্রশংসা-বাক্যে আমরা নিজেদের মহৎ বলে স্পর্ধিত হয়ে উঠি; এই শিক্ষাটুকু একেবারেই ভুলে যাই যে, পরের মধ্যে যেখানে শ্রেষ্ঠতা আছে সেটাকে অকুণ্ঠিত আনন্দে স্বীকার করা ও প্রকাশ করার মধ্যে মহত্ত্ব আছে। আমাকে এইটেতেই সকলের চেয়ে নম্র করেছে যে, ভারতের যে পরিচয় অন্য দেশে আমি বহন করে নিয়ে গেছি কোথাও তা অবমানিত হয় নি। আমাকে যাঁরা সম্মান করেছেন তাঁরা আমাকে উপলক্ষ করে

ভারতবর্ষকেই শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। যখন আমি পৃথিবীতে না থাকব তখনো যেন তার ক্ষয় না ঘটে, কেননা এ সম্মান ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত নয়। বিশ্বভারতীকে গ্রহণ করে ভারতের অমৃতরূপকে প্রকাশের ভার আপনারা গ্রহণ করেছেন। আপনাদের চেষ্টা সার্থক হোক, অতিথিশালা দিনে দিনে পূর্ণ হয়ে উঠুক, অভ্যাগতরা সম্মান পান, আনন্দ পান, হৃদয় দান করুন, হৃদয় গ্রহণ করুন, সত্যের ও প্রীতির আদানপ্রদানের দ্বারা পৃথিবীর সঙ্গে ভারতের যোগ গভীর ও দূরপ্রসারিত হোক, এই আমার কামনা।

৮ই পৌষ ১৩৩২ ফাল্গুন ১৩৩২
শান্তিনিকেতন

১৩

বাংলাদেশের পল্লীগ্রামে যখন ছিলাম, সেখানে এক সন্ন্যাসিনী আমাকে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি কুটিরনির্মাণের জন্য আমার কাছে ভূমি ভিক্ষা নিয়েছিলেন— সেই ভূমি থেকে যে ফসল উৎপন্ন হত তাই দিয়ে তাঁর আহার চলত, এবং দুই-চারিটি অনাথ শিশুদের পালন করতেন। তাঁর মাতা ছিলেন সংসারে— তাঁর মাতার অবস্থাও ছিল সচ্ছল— কন্যাকে ঘরে ফিরিয়ে নেবার জন্যে তিনি অনেক চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু কন্যা সম্মত হন নি। তিনি আমাকে বলেছিলেন, নিজের ঘরের অন্নে আত্মাভিমান জন্মে— মন থেকে এই ভ্রম কিছুতে ঘুচতে চায় না যে, এই অন্নের মালেক আমিই, আমাকে আমিই খাওয়াচ্ছি। কিন্তু দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে যে অন্ন পাই সে অন্ন ভগবানের— তিনি সকল মানুষের হাত দিয়ে সেই অন্ন আমাকে দেন, তার উপরে আমার নিজের দাবি নেই, তাঁর দয়ার উপর ভরসা।

বাংলাদেশকে বাংলা ভাষার ভিতর চিরজীবন আমি সেবা করেছি, আমার পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সের মধ্যে অন্তত পঞ্চাশ বৎসর আমি সাহিত্যের সাধনা করে সরস্বতীর কাছ থেকে যা-কিছু বর লাভ করেছি সমস্তই বাংলাদেশের ভাণ্ডারে জমা করে দিয়েছি। এইজন্য বাংলাদেশের কাছ থেকে আমি যতটুকু স্নেহ ও সম্মান লাভ করেছি তার উপরে আমার নিজের দাবি আছে— বাংলাদেশ যদি কৃপণতা করে, যদি আমাকে আমার প্রাপ্য না দেয়, তা হলে অভিমান করে আমি বলতে পারি যে, আমার কাছে বাংলাদেশ ঋণী রয়ে গেল।

কিন্তু বাংলার বাইরে বা বিদেশে যে সমাদর, যে প্রীতি লাভ করি তার উপরে আমার আত্মাভিমানের দাবি নেই। এইজন্য এই দানকেই ভগবানের দান বলে আমি গ্রহণ করি। তিনি আমাকে দয়া করেন, নতুবা অপরেরা আমাকে দয়া করেন এমন কোনো হেতু নেই।

ভগবানের এই দানে মন নম্র হয়, এতে অহংকার জন্মে না। আমরা নিজের পকেটের চার-আনার পয়সা নিয়েও গর্ব করতে পারি, কিন্তু ভগবান আকাশ ভরে যে সোনার আলো ঢেলে দিয়েছেন, কোনো কালেই যার মূল্য শোধ করতে পারব না, সেই আলোর অধিকার নিয়ে কেবল আনন্দই করতে পারি, কিন্তু গর্ব করতে পারি নে। পরের দত্ত সমাদরও সেইরকম অমূল্য— সেই দান আমি নম্রশিরেই গ্রহণ করি, উদ্ধতশিরে নয়। এই সমাদরে আমি বাংলাদেশের সন্তান বলে উপলব্ধি করবার সুযোগ লাভ করি নি। বাংলাদেশের ছোটো ঘরে আমার গর্ব করবার স্থান ছিল, কিন্তু ভারতের বড়ো ঘরে আমার আনন্দ করবার স্থান।

আমার প্রভু আমাকে তাঁর দেউড়িতে কেবলমাত্র বাঁশি বাজাবার ভার দেন নি— শুধু কবিতার মালা গাঁথিয়ে তিনি আমাকে ছুটি দিলেন না। আমার যৌবন যখন পার হয়ে গেল, আমার চুল যখন পাকল, তখন তাঁর অঙ্গনে আমার তলব পড়ল। সেখানে তিনি শিশুদের মা হয়ে বসে আছেন। তিনি আমাকে হেসে বললেন, 'ওরে পুত্র, এতদিন তুই তো কোনো কাজেই লাগলি নে, কেবল কথাই গেঁথে বেড়ালি। বয়স গেল, এখন যে কয়টা দিন বাকি আছে, এই শিশুদের সেবা কর্।'

কাজ শুরু করে দিলুম— সেই আমার শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের কাজ। কয়েক-জন বাঙালির ছেলেকে নিয়ে মাস্টারি শুরু করে দিলুম। মনে অহংকার হল, এ আমার কাজ, এ আমার সৃষ্টি। মনে হল, আমি বাংলাদেশের হিতসাধন করছি, এ আমারই শক্তি।

কিন্তু এ যে প্রভুরই আদেশ— যে প্রভু কেবল বাংলাদেশের নন— সেই কথা যাঁর কাজ তিনিই স্মরণ করিয়ে দিলেন। সমুদ্রপার হতে এলেন বন্ধু এণ্ড্রুজ, এলেন বন্ধু পিয়ার্সন। আপন লোকের বন্ধুত্বের উপর দাবি আছে, সে বন্ধুত্ব আপন লোকেরই সেবায় লাগে। কিন্তু যাঁদের সঙ্গে নাড়ীর সম্বন্ধ নেই, যাঁদের ভাষা স্বতন্ত্র, ব্যবহার স্বতন্ত্র, তাঁরা যখন অনাহূত আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন তখনই আমার অহংকার ঘুচে গেল, আমার আনন্দ জন্মাল। যখন ভগবান পরকে আপন করে দেন, তখন সেই আত্মীয়তার মধ্যে তাঁকেই আত্মীয় বলে জানতে পারি।

আমার মনে গর্ব জন্মেছিল যে, আমি স্বদেশের জন্য অনেক করছি— আমার অর্থ,

আমার সামর্থ্য আমি স্বদেশকে উৎসর্গ করছি। আমার সেই গর্ব চূর্ণ হয়ে গেল যখন বিদেশী এলেন এই কাজে। তখনই বুঝলুম, এও আমার কাজ নয়, এ তাঁরই কাজ, যিনি সকল মানুষের ভগবান। এই-যে বিদেশী বন্ধুদের অযাচিত পাঠিয়ে দিলেন, এঁরা আত্মীয়স্বজনদের হতে বহু দূরে পৃথিবীর প্রান্তে ভারতের প্রান্তে এক খ্যাতিহীন প্রান্তরের মাঝখানে নিজেদের সমস্ত জীবন ঢেলে দিলেন; একদিনের জন্যও ভাবলেন না, যাদের জন্য তাঁদের আত্মোৎসর্গ তারা বিদেশী, তারা পূর্বদেশী, তারা শিশু, তাঁদের ঋণ শোধ করবার মতো অর্থ তাদের নেই, শক্তি তাদের নেই, মান তাদের নেই। তাঁরা নিজে পরম পণ্ডিত, কত সম্মানের পদ তাঁদের জন্য পথ চেয়ে আছে, কত উর্ধ্ব বেতন তাঁদের আহ্বান করছে, সমস্ত তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেছেন— অকিঞ্চনভাবে, স্বদেশীর সম্মান ও স্নেহ হতে বঞ্চিত হয়ে, রাজপুরুষদের সন্দেহ -দ্বারা অনুধাবিত হয়ে গ্রীষ্ম এবং রোগের তাপে তাপিত হয়ে তাঁরা কাজে প্রবৃত্ত হলেন। এ কাজের বেতন তাঁরা নিলেন না, দুঃখই নিলেন। তাঁরা আপনাকে বড়ো করলেন না, প্রভুর আদেশকে বড়ো করলেন, প্রেমকে বড়ো করলেন, কাজকে বড়ো করে তুললেন।

এই তো আমার 'পরে ভগবানের দয়া— তিনি আমার গর্বকে ছোটো করে দিতেই আমার সাধনা বড়ো করে দিলেন। এখন এই সাধনা কি ছোটো বাংলাদেশের সীমার মধ্যে আর ধরে। বাংলার বাহির থেকে ছেলেরা আসতে লাগল। আমি তাদের ডাক দিই নি, ডাকলেও আমার ডাক এত দূরে পৌঁছত না। যিনি সমুদ্রপার থেকে নিজের কণ্ঠে তাঁর সেবকদের ডেকেছেন তিনিই স্বহস্তে তাঁর সেবাক্ষেত্রের সীমানা মিটিয়ে দিতে লাগলেন।

আজ আমাদের আশ্রমে প্রায় ত্রিশ জন গুজরাটের ছেলে এসে বসেছে। সেই ছেলেদের অভিভাবকেরা আমার আশ্রমের পরম হিতৈষী। তাঁরা আমাদের সর্বপ্রকারে যত আনুকূল্য করেছেন, এমন আনুকূল্য ভারতের আর কোথাও পাই নি। অনেক দিন আমি বাঙালির ছেলেকে এই আশ্রমে মানুষ করেছি— কিন্তু বাংলাদেশে আমার সহায় নেই। সেও আমার বিধাতার দয়া। যেখানে দাবি বেশি সেখান থেকে যা পাওয়া যায় সে তো খাজনা পাওয়া। যে খাজনা পায় সে যদি-বা রাজাও হয় তবু সে হতভাগ্য, কেননা সে তার নীচের লোকের কাছ থেকেই ভিক্ষা পায়; যে দান পায় সে উপর থেকে পায়, সে প্রেমের দান, জবরদস্তির আদায়-ওয়াশিল নয়। বাংলাদেশের বাহির থেকে আমার আশ্রম যে আনুকূল্য পেয়েছে, সেই তো আশীর্বাদ— সে পবিত্র। সেই আনুকূল্যে এই আশ্রম সমস্ত বিশ্বের সামগ্রী হয়েছে।

আজ তাই আত্মাভিমান বিসর্জন করে বাংলাদেশাভিমান বর্জন করে বাইরে

আশ্রমজননীর জন্য ভিক্ষা করতে বাহির হয়েছি। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। সেই শ্রদ্ধার দানের দ্বারা আশ্রমকে সকলে গ্রহণ করবেন, সকলের সামগ্রী করবেন, তাকে বিশ্বলোকে উত্তীর্ণ করবেন। এই বিশ্বলোকেই অমৃতলোক। যা-কিছু আমাদের অভিমানের গণ্ডির, আমাদের স্বার্থের গণ্ডির মধ্যে থাকে তাই মৃত্যুর অধিকারবর্তী। যা সকল মানুষের তাই সকল কালের। সকলের ভিক্ষার মধ্য দিয়ে আমাদের আশ্রমের উপরে বিধাতার অমৃত বর্ষিত হোক, সেই অমৃত-অভিষেকে আমরা, তাঁর সেবকেরা, পবিত্র হই, আমাদের অহংকার ধৌত হোক, আমাদের শক্তি প্রবল ও নির্মল হোক— এই কামনা মনে নিয়ে সকলের কাছে এসেছি; সকলের মধ্য দিয়ে বিধাতা আমাদের উপর প্রসন্ন হোন, আমাদের বাক্য মন ও চেষ্টাকে তাঁর কল্যাণসৃষ্টির মধ্যে দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করুন।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩

১৪

বহুকাল আগে নদীতীরে সাহিত্যচর্চা থেকে জানি নে কী আহ্বানে এই প্রান্তরে এসেছিলেম। তার পর ত্রিশ বৎসর অতীত হয়ে গেল। আয়ুর প্রতি আর অধিক দাবি আছে বলে মনে করি নে। হয়তো আগামী কালে আর কিছু বলবার অবকাশ পাব না। অন্তরের কথা আজ তাই বলবার ইচ্ছা করি।

উদ্যোগের যখন আরম্ভ হয়, কেন হয় তা বলা যায় না। বীজ থেকে গাছ কেন হয় কে জানে। দুয়ের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য নেই। প্রাণের ভিতর যখন আহ্বান আসে তখন তার চরম অর্থ কেউ জানে না। দুঃসময়ে এখানে এসেছি, দুঃখের মধ্যে দৈন্যের মধ্যে দিয়ে মৃত্যুশোক বহন করে দীর্ঘকাল চলেছি— কেন তা ভেবে পাই নে। ভালো করে বলতে পারি নে কিসের টানে এই শূন্য প্রান্তরের মধ্যে এসেছিলেম।

মানুষ আপনাকে বিশুদ্ধভাবে আবিষ্কার করে এমন কর্মের যোগে যার সঙ্গে সাংসারিক দেনাপাওনার হিসাব নেই। নিজেকে নিজের বাইরে উৎসর্গ করে দিয়ে তবে আমরা আপনাকে পাই। বোধ করি সেই ইচ্ছেই ছিল, তাই সেদিন সহসা আমার প্রকৃতিগত চিরাভ্যস্ত রচনাকার্য থেকে অনেক পরিমাণে ছুটি নিয়েছিলুম।

সেদিন আমার সংকল্প ছিল, বালকদের এমন শিক্ষা দেব যা শুধু পুঁথির শিক্ষা নয়; প্রান্তরযুক্ত অবারিত আকাশের মধ্যে যে মুক্তির আনন্দ তারই সঙ্গে মিলিয়ে যতটা

পারি তাদের মানুষ করে তুলব'। শিক্ষা দেবার উপকরণ যে আমি সঞ্চয় করেছিলেম তা নয়। সাধারণ শিক্ষা আমি পাই নি, তাতে আমি অভিজ্ঞ ছিলুম না। আমার আনন্দ ছিল প্রকৃতির অন্তরলোকে, গাছপালা আকাশ আলোর সহযোগে। শিশু বয়স থেকে এই আমার সত্যপরিচয়। এই আনন্দ আমি পেয়েছিলুম বলে দিতেও ইচ্ছে ছিল। ইস্কুলে আমরা ছেলেদের এই আনন্দ-উৎস থেকে নির্বাসিত করেছি। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে শিক্ষক বহুধাশক্তিযোগাৎ রূপরসগন্ধবর্ণের প্রবাহে মানুষের জীবনকে সরস ফলবান করে তুলছেন তার থেকে ছিন্ন করে ইস্কুলমাস্টার বেতের ডগায় বিরস শিক্ষা শিশুদের গিলিয়ে দিতে চায়। আমি স্থির করলেম, শিশুদের শিক্ষার মধ্যে প্রাণরস বহানো চাই; কেবল আমাদের স্নেহ থেকে নয়, প্রকৃতির সৌন্দর্যভাণ্ডার থেকে প্রাণের ঐশ্বর্য তারা লাভ করবে। এই ইচ্ছাটুকু নিয়েই অতি ক্ষুদ্র আকারে আশ্রমবিদ্যালয়ের শুরু হল, এইটুকুকে সত্য করে তুলে আমি নিজেকে সত্য করে তুলতে চেয়েছিলুম।

আনন্দের ত্যাগে স্নেহের যোগে বালকদের সেবা করে হয়তো তাদের কিছু দিতে পেরেছিলুম, কিন্তু তার চেয়ে নিজেই বেশি পেয়েছি। সেদিনও প্রতিকূলতার অন্ত ছিল না। এইভাবে কাজ আরম্ভ করে ক্রমশ এই কাজের মধ্যে আমার মন অগ্রসর হয়েছে। সেই ক্ষীণ প্রারম্ভ আজ বহুদূর পর্যন্ত এগোল। আমার সংকল্প আজ একটা রূপ লাভ করেছে। প্রতিদিন আমাকে দুঃখের যে প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে চলতে হয়েছে তার হিসাব নেব না। বারম্বার মনে ভেবেছি, আমার সত্যসংকল্পের সাধনায় কেন সবাইকে পাব না, কেন একলা আমাকে চলতে হবে। আজ সে ক্ষোভ থেকে কিছু মুক্ত হয়েছি, তাই বলতে পারছি, এ দুর্বল চিত্তের আক্ষেপ। যার বাইরের সমারোহ নেই, উত্তেজনা নেই, জনসমাজে যার প্রতিপত্তির আশা করা যায় না, যার একমাত্র মূল্য অন্তরের বিকাশে, অন্তর্যামীর সমর্থনে, তার সম্বন্ধে এ কথা জোর করে বলা চলে না, অপর লোকে কেন এর সম্বন্ধে উদাসীন। উপলব্ধি যার, দায় শুধু তারই। অন্যে অংশগ্রহণ না করলে নালিশ চলবে না। যার উপরে ভার পড়েছে তাকেই হিসেব চুকিয়ে দিয়ে চলে যেতে হবে; অংশী যদি জোটে তো ভালো, আর না যদি জোটে তো জোর খাটবে না। সমস্তই দিয়ে ফেলবার দাবি যদি অন্তর থেকে আসে তবে বলা চলবে না, এর বদলে পেলুম কী। আদেশ কানে পৌঁছলেই তা মানতে হবে।

আমাদের কাজ সত্যকে রূপ দেওয়া। অন্তরে সত্যকে স্বীকার করলে বাহিরেও তাকে প্রকাশ করা চাই। সম্পূর্ণরূপে সংকল্পকে সার্থক করেছি এ কথা কোনো কালেই বলা চলবে না— কঠিন বাধার ভিতর দিয়ে তাকে দেহ দিয়েছি। এ ভাবনা

যেন না করি, আমি যখন যাব তখন কে একে দেখবে, এর ভবিষ্যতে কী আছে কী নেই। এইটুকু সান্ত্বনা বহন করে যেতে চাই, যতটুকু পেরেছি তা করেছি, মনে যা পেয়েছি দুর্ভর হলেও কর্মে তাকে গ্রহণ করা হল। তার পরে সংসারের লীলায় এই প্রতিষ্ঠান নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে কী ভাবে বিকাশ পাবে তা কল্পনাও করতে পারি নে। লোভ হতে পারে, আমি যে ভাবে এর প্রবর্তন করেছি অবিকল সেই ভাবে এর পরিণতি হতে থাকবে। কিন্তু সেই অংহকৃত লোভ ত্যাগ করাই চাই। সমাজের সঙ্গে কালের সঙ্গে যোগে কোন্ রূপরূপান্তরের মধ্য দিয়ে আপন প্রাণবেগে ভাবী কালের পথে এই প্রতিষ্ঠানের যাত্রা, আজ কে তা নির্দিষ্ট করে দিতে পারে। এর মধ্যে আমার ব্যক্তিগত যা আছে ইতিহাস তাকে চিরদিন স্বীকার করবে, এমন কথনো হতেই পারে না। এর মধ্যে যা সত্য আছে তারই জয়যাত্রা অপ্রতিহত হোক। সত্যের সেই সঞ্জীবন-মন্ত্র এর মধ্যে যদি থাকে তবে বাইরের অভিব্যক্তির দিকে যে রূপ এ গ্রহণ করবে আজকের দিনের ছবির সঙ্গে তার মিল হবে না বলেই ধরে নিতে পারি। কিন্তু 'মা গৃধঃ'— নিজের হাতে গড়া আকারের প্রতি লোভ কোরো না। যা-কিছু ক্ষুদ্র, যা আমার অহমিকার সৃষ্টি, আজ আছে কাল নেই, তাকে যেন আমরা পরমাশ্রয় বলে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পাকা করে গড়বার আয়োজন না করি। প্রতি মুহূর্তের সত্য চেষ্টা সত্য কর্মের মধ্য দিয়েই আমাদের প্রতিষ্ঠান আপন সজীব পরিচয় দেবে, সেইখানেই তার চিরন্তন জীবন। জনসুলভ স্থূল সমৃদ্ধির পরিচয় দিতে প্রয়াস করে ব্যবসায়ীর মন সে না কিনুক ; আন্তরিক গরিমায় তার যথার্থ শ্রী প্রকাশ পাবে। আদর্শের গভীরতা যেন নিরন্তর সার্থকতায় তাকে আত্মসৃষ্টির পথে চালিত করে। এই সার্থকতার পরিমাপ কালের উপর নির্ভর করে না, কেননা সত্যের অনন্ত পরিচয় আপন বিশুদ্ধ প্রকাশক্ষণে।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭

১৫

আমার মধ্য-বয়সে আমি এই শান্তিনিকেতনে বালকদের নিয়ে এক বিদ্যালয় স্থাপন করতে ইচ্ছা করি। মনে তখন আশঙ্কা ও উদ্‌বেগ ছিল, কারণ কর্মে অভিজ্ঞতা ছিল না। জীবনের অভ্যাস ও তদুপযোগী শিক্ষার অভাব, অধ্যাপনাকর্মে নিপুণতার অভাব সত্ত্বেও আমার সংকল্প দৃঢ় হয়ে উঠল। কারণ চিন্তা করে দেখলেম যে, আমাদের দেশে

এক সময়ে যে শিক্ষাদান-প্রথা বর্তমান ছিল, তার পুনঃপ্রবর্তন বিশেষ প্রয়োজন। সেই প্রথাই যে পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এমন অন্ধ পক্ষপাত আমার মনে ছিল না, কিন্তু এই কথা আমার মনকে অধিকার করে যে, মানুষ বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবসংসার এই দুইয়ের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছে, অতএব এই দুইকে একত্র সমাবেশ করে বালকদের শিক্ষায়তন গড়লে তবেই শিক্ষার পূর্ণতা ও মানবজীবনের সমগ্রতা হয়। বিশ্বপ্রকৃতির যে আহ্বান, তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে পুঁথিগত বিদ্যা দিয়ে জোর করে শিক্ষার আয়োজন করলে শুধু শিক্ষাবস্তুকেই জমানো হয়, যে মন তাকে গ্রহণ করবে তার অবস্থা হয় ভারবাহী জন্তুর মতো। শিক্ষার উদ্দেশ্য তাতে ব্যর্থ হয়।

আমার বাল্যকালের অভিজ্ঞতা ভুলি নি। আমার বালক-মনে প্রকৃতির প্রতি সহজ অনুরাগ ছিল, তার থেকে নির্বাসিত করে বিদ্যালয়ের নীরস শিক্ষাবিধিতে যখন আমার মনকে যন্ত্রের মতো পেষণ করা হয় তখন কঠিন যন্ত্রণা পেয়েছি। এভাবে মনকে ক্লিষ্ট করলে, এই কঠিনতায় বালক-মনকে অভ্যস্ত করলে, তা মানসিক স্বাস্থ্যের অনুকূল হতে পারে না। শিক্ষার আদর্শকেই আমরা ভুলে গেছি। শিক্ষা তো শুধু সংবাদ-বিতরণ নয়; মানুষ সংবাদ বহন করতে জন্মায় নি, জীবনের মূলে যে লক্ষ্য আছে তাকেই গ্রহণ করা চাই। মানবজীবনের সমগ্র আদর্শকে জ্ঞানে ও কর্মে পূর্ণ করে উপলব্ধি করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

আমার মনে হয়েছিল, জীবনের কী লক্ষ্য এই প্রশ্নের মীমাংসা যেন শিক্ষার মধ্যে পেতে পারি। আমাদের দেশের পুরাতন শিক্ষাপ্রণালীতে তার আভাস পাওয়া যায়। তপোবনের নিভৃত তপস্যা ও অধ্যাপনার মধ্যে যে শিক্ষাসাধনা আছে তাকে আশ্রয় করে শিক্ষক ও ছাত্র জীবনের পূর্ণতা লাভ করেছিলেন। শুধু পরা বিদ্যা নয়, শিক্ষাকল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ জ্যোতিষ প্রভৃতি অপরা বিদ্যার অনুশীলনেও যেমন প্রাচীন কালে গুরুশিষ্য একই সাধনক্ষেত্রে মিলিত হয়েছিলেন, তেমনি সহযোগিতার সাধনা যদি এখানে হয় তবেই শিক্ষার পূর্ণতা হবে।

বর্তমানে সেই সাধনা আমরা কতদূর গ্রহণ করতে পারি তা বলা কঠিন। আজ আমাদের চিত্তবিক্ষেপের অভাব নেই। কিন্তু এই-যে প্রাচীন কালের শিক্ষাসমবায়, এ কোনো বিশেষ কাল ও সম্প্রদায়ের অভিমত নয়। মানবচিত্তবৃত্তির মূলে সেই এক কথা আছে— মানুষ বিচ্ছিন্ন প্রাণী নয়, সব মানুষের সঙ্গে যোগে সে যুক্ত, তাতেই তার জীবনের পূর্ণতা, মানুষের এই ধর্ম। তাই যে দেশেই যে কালেই মানুষ যে বিদ্যা ও কর্ম উৎপন্ন করবে সে সব-কিছুতে সর্বমানবের অধিকার আছে। বিদ্যায় কোনো জাতিবর্ণের ভেদ নেই। মানুষ সর্বমানবের সৃষ্ট ও উদ্ভূত সম্পদের অধিকারী, তার

জীবনের মূলে এই সত্য আছে। মানুষ জন্মগ্রহণ-সূত্রে যে শিক্ষার মধ্যে এসেছে তা এক জাতির দান নয়। কালে কালে নিখিলমানবের কর্মশিক্ষার ধারা প্রবাহিত হয়ে একই চিত্তসমুদ্রে মিলিত হয়েছে। সেই চিত্তসাগরতীরে মানুষ জন্মলাভ করে, তারই আহ্বানমন্ত্র দিকে দিকে ঘোষিত।

আদিকালের মানুষ একদিন আগুনের রহস্য ভেদ করল, তাকে ব্যবহারে লাগাল। আগুনের সত্য কোনো বিশেষ কালে আবদ্ধ রইল না, সর্বমানব এই আশ্চর্য রহস্যের অধিকারী হল। তেমনি পরিধেয় বস্ত্র, ভূ-কর্ষণ প্রভৃতি প্রথম যুগের আবিষ্কার থেকে শুরু করে মানুষের সর্বত্র চেষ্টা ও সাধনার মধ্য দিয়ে যে জ্ঞানসম্পদ আমরা পেলেম তা কোনো বিশেষ জাতির বা কালের নয়। এই কথা আমরা সম্যক্‌ উপলব্ধি করি না। আমাদের তেমনি দান চাই যা সর্বমানব গ্রহণ করতে পারে।

সর্বমানবের ত্যাগের ক্ষেত্রে আমরা জন্মেছি। ব্রহ্ম যিনি, সৃষ্টির মধ্যেই আপনাকে উৎসর্গ করে তাঁর আনন্দ, তাঁর সেই ত্যাগের ক্ষেত্রে জীবসকল জীবিত থাকে, এবং তাঁরই মধ্যে প্রবেশ করে ও বিলীন হয়— এ যেমন অধ্যাত্মলোকের কথা, তেমনি চিত্তলোকেও মানুষ মহামানবের ত্যাগের লোকে জন্মলাভ করেছে ও সঞ্চরণ করছে, এই কথা উপলব্ধি করতে হবে; তবেই আনুষঙ্গিক শিক্ষাকে আমরা পূর্ণতা ও সর্বাঙ্গীণতা দান করতে পারব।

আমার তাই সংকল্প ছিল যে, চিত্তকে বিশেষ জাতি ও ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ না করে শিক্ষার ব্যবস্থা করব; দেশের কঠিন বাধা ও অন্ধ সংস্কার সত্ত্বেও এখানে সর্ব-দেশের মানবচিত্তের সহযোগিতায় সর্বকর্মযোগে শিক্ষাসত্র স্থাপন করব; শুধু ইতিহাস ভূগোল সাহিত্য-পাঠে নয়, কিন্তু সর্বশিক্ষার মিলনের দ্বারা এই সত্যসাধনা করব। এ অত্যন্ত কঠিন সাধনা কারণ চারি দিকে দেশে এর প্রতিকূলতা আছে। দেশবাসীর যে আত্মাভিমান ও জাতি-অভিমানের সংকীর্ণতা তার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে।

আমরা যে এখানে পূর্ণ সফলতা লাভ করেছি তা বলতে পারি না, কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্নিহিত সেই সংকল্পটি আছে, তা স্মরণ করতে হবে। শুধু কেবল আনুষঙ্গিক কর্মপদ্ধতি নিয়ে ব্যস্ত থাকলে তার জটিল জাল বিস্তৃত করে বাহ্যিক শৃঙ্খলা-পারিপাট্যের সাধন সম্ভব হতে পারে, কিন্তু আদর্শের খর্বতা হবে।

প্রথম যখন অল্প বালক নিয়ে এখানে শিক্ষায়তন খুলি তখনো ফললাভের প্রতি প্রলোভন ছিল না। তখন সহায়ক হিসাবে কয়েকজন কর্মীকে পাই— যেমন, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, কবি সতীশচন্দ্র, জগদানন্দ। এঁরা তখন একটি ভাবের ঐক্যে মিলিত

ছিলেন। তখনকার হাওয়া ছিল অন্যরূপ। কেবলমাত্র বিধিনিষেধের জালে জড়িত হয়ে থাকতেম না, অল্প ছাত্র নিয়ে তাদের সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগে আমাদের প্রাত্যহিক জীবন সত্য হয়ে উঠত। তাদের সেবার মধ্যে আমরা একটি গভীর আনন্দ, একটি চরম সার্থকতা উপলব্ধি করতেম। তখন অধ্যাপকদের মধ্যে অসীম ধৈর্য দেখেছি। মনে পড়ে, যে-সব বালক দুরন্তপনায় দুঃখ দিয়েছে তাদের বিদায় দিই নি, বা অন্যভাবে পীড়া দিই নি। যতদিন আমার নিজের হাতে এর ভার ছিল ততদিন বার বার তাদের ক্ষমা করেছি; অধ্যাপকদের ক্ষমা করেছি। সেই-সকল ছাত্র পরে কৃতিত্বলাভ করেছে।

তখন বাহ্যিক ফললাভের চিন্তা ছিল না, পরীক্ষার মার্কা-মারা করে দেবার ব্যস্ততা ছিল না, সকল ছাত্রকে আপন করবার চেষ্টা করেছি। তখন বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কিত ছিল না, তার থেকে নির্লিপ্ত ছিল। তখনকার ছাত্রদের মনে এই অনুষ্ঠানের প্রতি সুগভীর নিষ্ঠা লক্ষ্য করেছি।

এইভাবে বিদ্যালয় অনেকদিন চলেছিল। এর অনেক পরে এর পরিধির বিস্তার হয়। সৌভাগ্যক্রমে তখন স্বদেশবাসীর সহায়তা পাই নি; তাদের অহৈতুক বিরুদ্ধতা ও অকারণ বিদ্বেষ একে আঘাত করেছে, কিন্তু তার প্রতি দৃক্‌পাত করি নি এবং এই-যে কাজ শুরু করলেম তার প্রচারেরও চেষ্টা করি নি। মনে আছে, আমার বন্ধুবর মোহিত সেন এই বিদ্যালয়ের বিবরণ পেয়ে আকৃষ্ট হন, আমাদের আদর্শ তাঁর মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। তিনি বলেন, 'আমি কিছু করতে পারলেম না, বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরি আমার জীবিকা—এখানে এসে কাজ করতে পারলে ধন্য হতাম। তা হল না। এবার পরীক্ষায় কিছু অর্জন করেছি, তার থেকে কিছু দেব এই ইচ্ছা।' এই বলে তিনি এক হাজার টাকার একটি নোট আমাকে দেন। বোধ হয় আমার প্রদেশবাসীর এই প্রথম ও শেষ সহানুভূতি। এইসঙ্গেই উল্লেখ করতে হবে আমার প্রতি প্রীতিপরায়ণ ত্রিপুরাধিপতির আনুকূল্য। আজও তাঁর বংশে তা প্রবাহিত হয়ে আসছে।

মোহিতবাবু অনেকদিন এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে আন্তরিকভাবে যুক্ত ছিলেন এবং আমার কী প্রয়োজন তার সন্ধান নিতেন। তিনি অনুমতি চাইলেন, এই বিদ্যালয়ের বিষয়ে কিছু কাগজে লেখেন। আমি তাতে আপত্তি জানাই। বললেম, 'গুটিকতক ছেলে নিয়ে গাছপালার মধ্যে বসেছি, কোনো বড়ো ঘরবাড়ি নেই, বাইরের দৃশ্য দীন, সর্বসাধারণ একে ভুল বুঝবে।'

এই অল্প অধ্যাপক ও ছাত্র নিয়ে আমি বহুকষ্টে আর্থিক দুরবস্থা ও দুর্গতির চরম সীমায় উপস্থিত হয়ে যে ভাবে এই বিদ্যালয় চালিয়েছি তার ইতিহাস রক্ষিত হয় নি।

কঠিন চেষ্টার দ্বারা ঋণ করে প্রতিদিনের প্রয়োজন জোগাতে সর্বস্বান্ত হয়ে দিন কাটিয়েছি, কিন্তু পরিতাপ ছিল না। কারণ গভীর সত্য ছিল এই দৈন্যদশার অন্তরালে। যাক, এ আলোচনা বৃথা। কর্মের যে ফল তা বাইরের বিধানে দেখানো যায় না, প্রাণশক্তির যে রসসঞ্চার তা গোপন গূঢ়, তা ডেকে দেখাবার জিনিস নয়। সেই গভীর কাজ সকলপ্রকার বিরুদ্ধতার মধ্যেও এখানে চলেছিল।

এই নির্মম বিরুদ্ধতার উপকারিতা আছে— যেমন জমির অনুর্বরতা কঠিন প্রযত্নের দ্বারা দূর করে তবে ফসল ফলাতে হয়, তবেই তার উৎপাদনী শক্তি হয়, তার রসসঞ্চার হয়। দুঃখের বিষয়, বাংলার চিত্তক্ষেত্র অনুর্বর, কোনো প্রতিষ্ঠানকে স্থায়ী করবার পক্ষে তা অনুকূল নয়। বিনা কারণে বিদ্বেষের দ্বারা পীড়া দেয় যে দুর্বুদ্ধি তা গড়া জিনিসকে ভাঙে, সংকল্পকে আঘাত করে, শ্রদ্ধার সঙ্গে কিছুকে গ্রহণ করে না। এখানকার এই-যে প্রচেষ্টা রক্ষিত হয়েছে, তা কঠিনতাকে প্রতিহত করেই বেঁচেছে। অর্থবর্ষণের প্রশ্রয় পেলে হয়তো এর আত্মসত্য রক্ষা করা দুরূহ হত, অনেক জিনিস আসত খ্যাতির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে যা বাঞ্ছনীয় নয়। তাই এই অখ্যাতির মধ্য দিয়ে এই বিদ্যালয় বেঁচে উঠেছে।

এক সময় এল, যখন এর পরিধি বাড়বার দিকে গেল। বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় বললেন, দেশের যে টোল চতুষ্পাঠী আছে তা সংকীর্ণ, তা একালের উপযোগী নয়, তাকে বিস্তৃত করে পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করে দেশের শিক্ষাপ্রণালীকে কালোপযোগী করতে হবে। আমারও এই কথাটা মনে লেগেছিল। আমার তখনকার বিদ্যালয় শুধু বালকদের শিক্ষায়তন ছিল, এতবড়ো বৃহৎ অনুষ্ঠানের কথা মনে হয় নি এবং তাতে সফলকাম হব বলেও ভাবি নি। শাস্ত্রীমশায় তখন কাশীতে সংস্কৃত মাসিকপত্রের সম্পাদন, ও সাহিত্যচর্চা করছিলেন। তিনি এখানে এসে জুটলেন। তখন পালিভাষা ও শাস্ত্রে তিনি প্রবীণ ছিলেন না, প্রথম আমার অনুরোধেই তিনি এই শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করতে ব্রতী হলেন।

ধীরে ধীরে এখানকার কাজ আরম্ভ হল। আমার মনে হল যে, দেশের শিক্ষা-প্রণালীর ব্যাপকতাসাধন করতে হবে। তখন এমন কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না যেখানে সর্বদেশের বিদ্যাকে গৌরবের স্থান দেওয়া হয়েছে। সব য়ুনিভার্সিটিতে শুধু পরীক্ষাপাসের জন্যই পাঠ্যবিধি হয়েছে, সেই শিক্ষাব্যবস্থা স্বার্থসাধনের হীনতায় পীড়িত, বিদ্যাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণের কোনো চেষ্টা নেই। তাই মনে হল, এখানে মুক্তভাবে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শাসনের বাইরে এমন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলব যেখানে সর্ববিদ্যার মিলনক্ষেত্র হবে। সেই সাধনার ভার যাঁরা গ্রহণ করলেন, ধীরে ধীরে তাঁরা এসে জুটলেন।

আমার শিশু-বিদ্যালয়ের বিস্তৃতি সাধন হল— সভাসমিতি মন্ত্রণাসভা ডেকে নয়, অল্পপরিসর প্রারম্ভ থেকে ধীরে ধীরে এর বৃদ্ধি হল। তার পর কালক্রমে কী করে এর কর্মপরিধি ব্যাপ্ত হল তা সকলে জানেন।

আমাদের কাজ যে কিছু সফল হয়েছে আমাদের কর্মীদের চোখে তার স্পষ্ট প্রতিরূপ ধরা পড়ে না, তারা সন্দিগ্ধ হয়, বাহ্যিক ফলে অসন্তোষ প্রকাশ করে। তাই এক-একবার আমাদের কর্মে সার্থকতা কোথায় তা দেখতে ইচ্ছা হয়, নইলে পরিতুষ্টি হয় না। এবার কলকাতা থেকে আসবার পর নিকটবর্তী গ্রামের লোকেরা আমায় নিয়ে গেল— তাদের মধ্যে গিয়ে বড়ো আনন্দ হল, মনে হল এই তো ফললাভ হয়েছে; এই জায়গায় শক্তি প্রসারিত হল, হৃদয়ে হৃদয়ে তা বিস্তৃত হল। পরীক্ষায় ফল ছোটো কথা— এই তো ফললাভ, আমরা মানুষের মনকে জাগাতে পেরেছি। মানুষ বুঝেছে, আমরা তাদের আপন। গ্রামবাসীদের সরল হৃদয়ে এখানকার প্রভাব সঞ্চারিত হল, তাদের আত্মশক্তির উদ্‌বোধন হল।

আমার মরবার আগে এই ব্যাপার দেখে খুশি হয়েছি। এই-যে এরা ভালোবেসে ডাকল, এরা আমাদের কাছে থেকে শ্রদ্ধা ও শক্তি পেয়েছে। এ জনতা ডেকে 'মহতী সভা' করা নয়, খবরের কাগজের লক্ষগোচর কিছু ব্যাপার নয়। কিন্তু এই গ্রামবাসীর ডাক, এ আমার হৃদয়ে স্পর্শ করল। মনে হল, দীপ জ্বলেছে, হৃদয়ে হৃদয়ে তার শিখা প্রদীপ্ত হল, মানুষের শক্তির আলোক হৃদয়ে হৃদয়ে উদ্‌ভাসিত হল।

এই-যে হল, এ কোনো একজনের কৃতিত্ব নয়। সকল কর্মীর চেষ্টা চিন্তা ও ত্যাগের দ্বারা, সকলের মিলিত কর্ম এই সমগ্রকে পুষ্ট করেছে। তাই ভরসার কথা, এ কৃত্রিম উপায়ে হয় নি। কোনো ব্যক্তিবিশেষকে আশ্রয় করে এ কাজ হয় নি। ভয় নেই, প্রাণশক্তির সঞ্চার হয়েছে, আমাদের অবর্তমানে এই অনুষ্ঠান জীর্ণ ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না।

আমরা জনসাধারণকে আপন সংকল্পের অন্তর্গত করতে পেরেছি— এই প্রতিষ্ঠান তার অভিমুখে চলেছে। অল্প পরিমাণে এক জায়গাতেই আমরা ভারতের সমস্যার সমাধান করব। রাজনীতির ঔদ্ধত্যে নয়, সহজভাবে দেশবাসীদের আত্মীয়রূপে বরণ করে তাদের নিয়ে এখানে কাজ করব। তাদের ভোটাধিকার নিয়ে বিশ্ববিজয়ী হতে না পারি, তাদের সঙ্গে চিত্তের আদানপ্রদান হবে, তাদের সেবায় নিযুক্ত হব। তারাও দেবে, আমাদের কাছ থেকে নেবে, এই সর্বভারতের কাজ এখানে হবে।

এক সময়ে আমার কাছে প্রশ্ন আসে, তৎকালীন স্বদেশী আন্দোলনে কেন যোগ দিচ্ছি না। আমি বলি, সকলের মধ্যে যে উত্তেজনা, আমার কাজকে তা অগ্রসর করবে

না। শুধু একটি বিশেষ প্রণালীর দ্বারাই যে সত্যসাধনা হয় আমি তা মনে করি না। তাই আমি বলি যে, এই প্রশ্নের উত্তর যখন এখানে পূর্ণ হয়ে উঠবে তখন একদিন তা সকলের গোচর হবে। যা আমি সত্য বলে মনে করেছি সে উত্তরের জোগান হয়তো এখান থেকেই হবে।

সেই অপেক্ষায় ছিলুম। সত্যের মধ্যে সংকীর্ণতা নেই— সকল বিভাগে মনুষ্যত্বের সাধনা প্রসারিত। দল বাড়াবার সংকীর্ণ চেষ্টার মধ্যে সেই সত্যের খর্বতা হয়।

আধুনিক কালের মানুষের ধারণা যে, বিজ্ঞাপনের দ্বারা সংকল্পের ঘোষণা করতে হয়। দেখি যে আজকাল কখনো কখনো বিশ্বভারতীর কর্ম নিয়ে পত্রলেখকেরা সংবাদ-পত্রে লিখে থাকেন। এতে ভয় পাই, এ দিকে লক্ষ হলে সত্যের চেয়ে খ্যাতিকে বড়ো করা হয়। সত্য স্বল্পকে অবজ্ঞা করে না, অবাস্তবকে ভয় করে, তাই খ্যাতির কোলাহলকে আশ্রয় করতে সে কুণ্ঠিত। কিন্তু আধুনিক কালের ধর্ম, ব্যাপ্তির দ্বারা কাজকে বিচার করা, গভীরতার দ্বারা নয়। তার পরিণাম হয় গাছের ডালপালার পরিব্যাপ্তির মতো, তাতে ফল হয় কম।

আমি এক সময়ে নিভৃতে দুঃখ পেয়েছি অনেক, কিন্তু তাতে শান্তি ছিল। আমি খ্যাতি চাই নি, পাই নি; বরং অখ্যাতিই ছিল। মনু বলেছেন— সম্মানকে বিষের মতো জানবে। অনেক কাল কর্মের পুরস্কার-স্বরূপে সম্মানের দাবি করি নি। একলা আপনার কাজ করেছি, সহযোগিতার আশা ছেড়েই দিয়েছি। আশা করলে পাবার সম্ভাবনা ছিল না। তেমন স্থলে বাহ্যিকভাবে না পাওয়াই স্বাস্থ্যজনক।

বিশ্বভারতীর এই প্রতিষ্ঠান যে যুগে যুগে সার্থক হতেই থাকবে, তা বলে নিজেকে ভুলিয়ে কী হবে। মোহমুক্ত মনে নিরাশী হয়েই যথাসাধ্য কাজ করে যেতে পারি যেন। বিধাতা আমাদের কাছে কাজ দাবি করেন কিন্তু আমরা তাঁর কাছে ফল দাবি করলে তিনি তার হিসাব গোপনে রাখেন, নগদ মজুরি চুকিয়ে দিয়ে আমাদের প্রয়াসের অবমাননা করেন না। তা ছাড়া আজ আমরা যে সংকল্প করেছি আগামী কালেও যে অবিকল তারই পুনরাবৃত্তি চলবে, কালের সে ধর্ম নয়। ভাবী কালের দিকে আমরা পথ তৈরি করে দিতে পারি, কিন্তু গম্য স্থানকে আমার আজকের দিনের রুচি ও বুদ্ধি দিয়ে একেবারে পাকা করে দেব, এ হতেই পারে না। যদি অন্ধ মমতায় তাই করে দিই তা হলে সে আমাদের মৃত সংকল্পের সমাধিস্থান হবে। আমাদের যে চেষ্টা বর্তমানে জন্মগ্রহণ করে, সময় উপস্থিত হলে তার অন্ত্যেষ্টি-সংকার

হবে, তার দ্বারা সত্যের দেহ-মুক্তি হবে, কিন্তু তার পরে নবজন্মে তার নবদেহ-ধারণের আহ্বান আসবে এই কথা মনে রেখে—

নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্।
কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দেশং ভৃতকো যথা॥

৯ পৌষ ১৩৩৯ জানুয়ারি ১৯৩৩
শান্তিনিকেতন

১৬

প্রৌঢ় বয়সে একদা যখন এই বিদ্যায়তনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেম তখন আমার সম্মুখে ভাসছিল ভবিষ্যৎ, পথ তখন লক্ষ্যের অভিমুখে, অনাগতের আহ্বান তখন ধ্বনিত— তার ভাবরূপ তখনো অস্পষ্ট, অথচ এক দিক দিয়ে তা এখনকার চেয়ে অধিকতর পরিস্ফুট ছিল। কারণ তখন যে আদর্শ মনে ছিল তা বাস্তবের অভিমুখে আপন অখণ্ড আনন্দ নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল। আজ আমার আয়ুষ্কাল শেষপ্রায়, পথের অন্ত প্রান্তে পৌঁছিয়ে পথের আরম্ভসীমা দেখবার সুযোগ হয়েছে, আমি সেই দিকে গিয়েছি— যেমনতর সূর্য যখন পশ্চিম-অভিমুখে অস্তাচলের তটদেশে তখন তার সামনে থাকে উদয়দিগন্ত, যেখানে তার প্রথম যাত্রারম্ভ।

অতীত কাল সম্বন্ধে আমরা যখন বলি তখন আমাদের হৃদয়ের পূর্বরাগ অত্যুক্তি করে, এমন বিশ্বাস লোকের আছে। এর মধ্যে কিছু সত্য আছে, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নেই। যে দূরবর্তী কালের কথা আমরা স্মরণ করি তার থেকে যা-কিছু অবান্তর তা তখন স্বতই মন থেকে ঝরে পড়েছে। বর্তমান কালের সঙ্গে যত-কিছু আকস্মিক, যা-কিছু অসংগত সংযুক্ত থাকে তা তখন স্খলিত হয়ে ধূলিবিলীন; পূর্বে নানা কারণে যার রূপ ছিল বাধাগ্রস্ত তার সেই বাধার কঠোরতা আজ আর পীড়া দেয় না। এইজন্য গতকালের যে চিত্র মনের মধ্যে প্রকাশ পায় তা সুসম্পূর্ণ, যাত্রারম্ভের সমস্ত উৎসাহ স্মৃতিপটে তখন ঘনীভূত। তার মধ্যে এমন অংশ থাকে না যা প্রতিবাদরূপে অন্য অংশকে খণ্ডিত করতে থাকে। এইজন্যই অতীত স্মৃতিকে আমরা নিবিড়ভাবে মনে অনুভব করে থাকি। কালের দূরত্বে, যা যথার্থ সত্য তার বাহ্যরূপের অসম্পূর্ণতা ঘুচে যায়, সাধনার কল্পমূর্তি অক্ষুন্ন হয়ে দেখা দেয়।

প্রথম যখন এই বিদ্যালয় আরম্ভ হয়েছিল তখন, এর আয়োজন কত সামান্য ছিল,

সেকালে এখানে যারা ছাত্র ছিল তারা তা জানে। ' আজকের তুলনায় তার উপকরণ-বিরলতা, সকল বিভাগেই তার অকিঞ্চনতা, অত্যন্ত বেশি ছিল। কটি বালক ও দুই-এক জন অধ্যাপক নিয়ে বড়ো আমগাছতলায় আমাদের কাজের সূচনা করেছি। একান্তই সহজ ছিল তাদের জীবনযাত্রা— এখনকার সঙ্গে তার প্রভেদ গুরুতর। এ কথা বলা অবশ্যই ঠিক নয় যে, এই প্রকাশের ক্ষীণতাতেই সত্যের পূর্ণতর পরিচয়। শিশুর মধ্যে আমরা যে রূপ দেখি তার সৌন্দর্যে আমাদের মনে আনন্দ জাগায়, কিন্তু তার মধ্যে প্রাণরূপের বৈচিত্র্য ও বহুধাশক্তি নেই। তার পূর্ণ মূল্য ভাবী কালের প্রত্যাশার মধ্যে। তেমনি আশ্রমের জীবনযাত্রার যে প্রথম উপক্রম, বর্তমানে সে ছিল ছোটো, ভবিষ্যতেই সে ছিল বড়ো। তখন যা ইচ্ছা করেছিলাম তার মধ্যে কোনো সংশয় ছিল না। তখন আশা ছিল অমৃতের অভিমুখে, যে সংসার উপকরণ-বহুলতায় প্রতিষ্ঠিত তা পিছনে রেখেই সকলে এসেছিলেন। যাঁরা এখানে আমার কর্মসঙ্গী ছিলেন, অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন তাঁরা। আজ মনে পড়ে, কী কষ্টই না তাঁরা এখানে পেয়েছেন, দৈহিক সাংসারিক কত দীনতাই না তাঁরা বহন করেছেন। প্রলোভনের বিষয় এখানে কিছুই ছিল না, জীবনযাত্রার সুবিধা তো নয়ই, এমন-কি, খ্যাতিরও না— অবস্থার ভাবী উন্নতির আশা মরীচিকারূপেও তখন দূরদিগন্তে ইন্দ্রজাল বিস্তার করে নি। কেউ তখন আমাদের কথা জানত না, জানাতে ইচ্ছাও করি নি। এখন যেমন সংবাদপত্রের নানা ছোটোবড়ো জয়ঢাক আছে যা সামান্য ঘটনাকে শব্দায়িত ক'রে রটনা করে, তার আয়োজনও তখন এমন ব্যাপক ছিল না। এই বিদ্যালয়ের কথা ঘোষণা করতে অনেক বন্ধু ইচ্ছাও করেছেন, কিন্তু আমরা তা চাই নি। লোকচক্ষুর অগোচরে, বহু দুঃখের ভিতর দিয়ে সে ছিল আমাদের যথার্থ তপস্যা। অর্থের এত অভাব ছিল যে, আজ জগদ্‌ব্যাপী দুঃসময়েও তা কল্পনা করা যায় না। আর সে কথা কোনোকালে কেউ জানবেও না, কোনো ইতিহাসে তা লিখিত হবে না। আশ্রমের কোনো সম্পত্তি ছিল না, সহায়তা ছিল না— চাইও নি। এইজন্যই, যাঁরা তখন এখানে কাজ করেছেন তাঁরা অন্তরে দান করেছেন, বাইরে কিছু নেন নি। যে আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে এখানে এসেছি তার বোধ সকলেরই মনে যে স্পষ্ট বা প্রবল ছিল তা নয়, কিন্তু অল্প পরিসরের মধ্যে তা নিবিড় হতে পেরেছিল। ছাত্রেরা তখন আমাদের অত্যন্ত নিকটে ছিল, অধ্যাপকেরাও পরস্পর অত্যন্ত নিকটে ছিলেন— পরস্পরের সুহৃৎ ছিলেন তাঁরা। আমাদের দেশের তপোবনের আদর্শ আমি নিয়েছিলাম। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সে আদর্শের রূপের পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু তার মূল সত্যটি ঠিক আছে— সেটি হচ্ছে, জীবিকার আদর্শকে স্বীকার করে তাকে সাধনার

আদর্শের অনুগত করা। এক সময়ে এটা অনেকটা সুসাধ্য হয়েছিল, যখন জীবনযাত্রার পরিধি ছিল অনতিবৃহৎ। তাই বলেই সেই স্বল্পায়তনের মধ্যে সহজ জীবনযাত্রাই শ্রেষ্ঠ আদর্শ, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। উচ্চতর সংগীতে নানা ত্রুটি ঘটতে পারে; একতারায় ভুলচুকের সম্ভাবনা কম, তাই বলে একতারাই শ্রেষ্ঠ এমন নয়। বয়স্ক কর্ম যখন বহুবিস্তৃত হয়ে বন্ধুর পথে চলতে থাকে তখন তার সকল ভ্রমপ্রমাদ সত্ত্বেও যদি তার মধ্যে প্রাণ থাকে তবে তাকেই শ্রদ্ধা করতে হবে। শিশু অবস্থার সহজতাকে চিরকাল বেঁধে রাখবার ইচ্ছা ও চেষ্টার মতো বিড়ম্বনা আর কী আছে। আমাদের কর্মের মধ্যেও সেই কথা। যখন একলা ছোটো কার্যক্ষেত্রের মধ্যে ছিলুম তখন সব কর্মীদের মনে এক অভিপ্রায়ের প্রেরণা সহজেই কাজ করত। ক্রমে ক্রমে যখন এ আশ্রম বড়ো হয়ে উঠল তখন একজনের অভিপ্রায় এর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পাবে এ সম্ভব হতে পারে না। অনেকে এখানে এসেছেন, বিচিত্র তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা— সকলকে নিয়েই আমি কাজ করি, কাউকে বাছাই করি নে, বাদ দিই নে; নানা ভুলত্রুটি ঘটে, নানা বিদ্রোহ-বিরোধ ঘটে— এ-সব নিয়েই জটিল সংসারে জীবনের যে প্রকাশ ঘাতাভিঘাতে সর্বদা আন্দোলিত তাকে আমি সম্মান করি। আমার প্রেরিত আদর্শ নিয়ে সকলে মিলে একতারা-যন্ত্রে গুঞ্জরিত করবেন এমন অতি সরল ব্যবস্থাকে আমি নিজেই শ্রদ্ধা করি নে। আমি যাকে বড়ো বলে জানি, শ্রেষ্ঠ বলে যা বরণ করেছি, অনেকের মধ্যে তার প্রতি নিষ্ঠার অভাব আছে জানি, কিন্তু তা নিয়ে নালিশ করতে চাই নে। আজ আমি বর্তমান থাকা সত্ত্বেও এখানকার যা কর্ম তা নানা বিরোধ ও অসংগতির মধ্য দিয়ে প্রাণের নিয়মে আপনি তৈরি হয়ে উঠছে; আমি যখন থাকব না, তখনো অনেক চিত্তের সমবেত উদ্যোগে যা উদ্‌ভাবিত হতে থাকবে তাই হবে সহজ সত্য। কৃত্রিম হবে যদি কোনো এক ব্যক্তি নিজের আদেশ-নির্দেশে একে বাধ্য করে চালায়— প্রাণধর্মের মধ্যে স্বতোবিরোধিতাকেও স্বীকার করে নিতে হয়।

অনেক দিন পরে আজ এ আশ্রমকে সমগ্র করে দেখতে পাচ্ছি; দেখছি, আপন নিয়মে এ আপনি গড়ে উঠেছে। গঙ্গা যখন গঙ্গোত্রীর মুখে তখন একটিমাত্র তার ধারা। তার পর ক্রমে বহু নদনদীর সহিত যতই সে সংগত হল, সমুদ্রের যত নিকটবর্তী হল, কত তার রূপান্তর ঘটেছে। সেই আদিম স্বচ্ছতা আর তার নেই, কত আবিলতা প্রবেশ করেছে তার মধ্যে, তবু কেউ বলে না গঙ্গার উচিত ফিরে যাওয়া, যেহেতু অনেক মলিনতা ঢুকেছে তার মধ্যে, সে সরল গতি আর তার নেই। সব নিয়ে যে সমগ্রতা সেইটিই বড়ো— আশ্রমও স্বতোধাবিত হয়ে সেই পথেই

চলেছে, অনেক মানুষের চিত্তসম্মিলনে আপনি গড়ে উঠছে। অবশ্য এর মধ্যে একটা ঐক্য এনে দেয় মূলগত একটা আদিম বেগ; তারও প্রয়োজন আছে, অথচ এর গতি প্রবল হয় সকলের সম্মিলনে। নিত্যকালের মতো কিছুই কল্পনা করা চলে না— তবে এর মূলগত একটি গভীর তত্ত্ব বরাবর থাকবে এ কথা আমি আশা করি— সে কথা এই যে, এটা বিদ্যাশিক্ষার একটা খাঁচা হবে না, এখানে সকলে মিলে একটি প্রাণলোক সৃষ্টি করবে। এমনতরো স্বর্গলোক কেউ রচনা করতে পারে না যার মধ্যে কোনো কলুষ নেই, দুঃখজনক কিছু নেই; কিন্তু বন্ধুরা জানবেন যে, এর মধ্যে যা নিন্দনীয় সেইটাই বড়ো নয়। চোখের পাতা ওঠে, চোখের পাতা পড়ে; কিন্তু পড়াটাই বড়ো নয়, সেটাকে বড়ো বললে অন্ধতাকে বড়ো বলতে হয়। যাঁরা প্রতিকূল, নিন্দার বিষয় তাঁরা পাবেন না এমন নয়— নিন্দনীয়তার হাত থেকে কেউই রক্ষা পেতে পারে না। কিন্তু তাকে পরাস্ত করে উত্তীর্ণ হয়েও টিকে থাকাতেই প্রাণের প্রমাণ। আমাদের দেহের মধ্যে নানা শত্রু নানা রোগের বীজাণু— তাকে আলাদা করে যদি দেখি তো দেখব প্রত্যেক মানুষ বিকৃতির আলয়। কিন্তু আসলে রোগকে পরাস্ত করে যে স্বাস্থ্যকে দেখা যাচ্ছে সেইটেই সত্য। দেহের মধ্যে যেমন লড়াই চলছে, প্রত্যেক অনুষ্ঠানের মধ্যেই তেমনি ভালোমন্দের একটা দ্বন্দ্ব আছে— কিন্তু সেটা পিছন দিকের কথা। এর মধ্যে স্বাস্থ্যের তত্ত্বটাই বড়ো।

আমি এমন কথা কখনো বলি নি, আজও বলি নে যে, আমি যে কথা বলব তাই বেদবাক্য— সেরকম অধিনেতা আমি নই। অসাধারণ তত্ত্ব তো আমি কিছু উদ্‌ভাবন করি নি; সাধকেরা যে অখণ্ড পরিপূর্ণ জীবনের কথা বলেন সে কথা যেন সকলে স্বীকার করে নেন। এই একটি কথা ধ্রুব হয়ে থাক্‌। তার পরে পরিবর্তমান পরিবর্ধমান সৃষ্টির কাজ সকলে মিলেই হবে। মানুষের দেহে যেমন অস্থি, এই অনুষ্ঠানের মধ্যেও তেমনি একটি যান্ত্রিক দিক আছে। এই অনুষ্ঠান যেন প্রাণবান হয়, কিন্তু যন্ত্রই যেন মুখ্য না হয়ে ওঠে; হৃদয়-প্রাণ-কল্পনার সঞ্চরণের পথ যেন থাকে। আমি কল্পনা করি, এখানকার বিদ্যালয়ের আস্বাদন এক সময়ে যাঁরা পেয়েছেন, এখানকার প্রাণের সঙ্গে প্রাণকে মিলিয়েছেন, অনেক সময় হয়তো তাঁরা এখানে অনেক বাধা পেয়েছেন, দুঃখ পেয়েছেন, কিন্তু দূরে গেলেই পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে পান এখানে যা বড়ো যা সত্য। আমার বিশ্বাস, সেই দৃষ্টিমান্ অনেক ছাত্র ও কর্মী নিশ্চয়ই আছেন, নইলে অস্বাভাবিক হত। এক সময়ে তাঁরা এখানে নানা আনন্দ পেয়েছেন, সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন— এর প্রতি তাঁদের মমতা থাকবে না এ হতেই পারে না। আমি আশা করি, কেবল নিষ্ক্রিয় মমতা দ্বারা নয়, এই অনুষ্ঠানের অন্তর্বর্তী হয়ে যদি তাঁরা এর শুভ ইচ্ছা করেন,

তবে এর প্রাণের ধারা অব্যাহত থাকতে পারবে, যন্ত্রের কঠিনতা বড়ো হয়ে উঠতে পারবে না। এক সময়ে এখানে যাঁরা ছাত্র ছিলেন, যাঁরা এখানে কিছু পেয়েছেন কিছু দিয়েছেন, তাঁরা যদি অন্তরের সঙ্গে একে গ্রহণ করেন তবেই এ প্রাণবান হবে। এইজন্য আজ আমার এই ইচ্ছা প্রকাশ করি যে, যাঁরা জীবনের অর্ঘ্য এখানে দিতে চান, যাঁরা মমতা দ্বারা একে গ্রহণ করতে চান, তাঁদের অন্তর্বর্তী করে নেওয়া যাতে সহজ হয় সেই প্রণালী যেন আমরা অবলম্বন করি। যাঁরা একদা এখানে ছিলেন তাঁরা সম্মিলিত হয়ে এই বিদ্যালয়কে পূর্ণ করে রাখুন এই আমার অনুরোধ। অন্য-সব বিদ্যালয়ের মতো এ আশ্রম যেন কলের জিনিস না হয়— তা করব না বলেই এখানে এসেছিলাম। যন্ত্রের অংশ এসে পড়েছে, কিন্তু সবার উপরে প্রাণ যেন সত্য হয়। সেইজন্যই আহ্বান করি তাঁদের যাঁরা এক সময়ে এখানে ছিলেন, যাঁদের মনে এখনো সেই স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে আছে। ভবিষ্যতে যদি আদর্শের প্রবলতা ক্ষীণ হয়ে আসে তবে সেই পূর্বতনেরা যেন একে প্রাণধারায় সঞ্জীবিত করে রাখেন, নিষ্ঠা দ্বারা শ্রদ্ধা দ্বারা এর কর্মকে সফল করেন— এই আশ্বাস পেলেই আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারি।

৮ পৌষ ১৩৪১ ফাল্গুন ১৩৪১
শান্তিনিকেতন

১৭

এই আশ্রম-বিদ্যালয়ের কোথা থেকে আরম্ভ, কোন্ সংকল্প নিয়ে কিসের অভিমুখে এ চলেছে, সে কথা প্রতি বর্ষে একবার করে ভাববার সময় আসে— বিশেষ করে আমার— কেননা অনুভব করি, আমার বলবার সময় আর বেশি নেই। এর ইতিহাস বিশেষ নেই; যে কাজের ভার নিয়েছিলাম তা নিজের প্রকৃতিসংগত নয়। পূর্বে সমাজ থেকে দূরে কোণে মানুষ হয়েছি, আমি যে পরিবারে মানুষ হয়েছিলাম, লোকসমাজের সঙ্গে সংযোগ ছিল তার অল্প। যখন সাহিত্যে প্রবৃত্ত হলাম সে সময়ও নিভৃতে নদীতীরে কাটিয়েছি। এমন সময় এই বিদ্যালয়ের আহ্বান এল। এই কথাটা অনুভব করেছিলাম, শহরের খাঁচায় আবদ্ধ হয়ে মানবশিশু নির্বাসনদণ্ড ভোগ করে, তার শিক্ষাও বিদ্যালয়ে সংকীর্ণ পরিধিতে সীমাবদ্ধ। গুরুর শাসনে তারা অনেক দুঃখ পায়, এ সম্বন্ধে আমার নিজেরও অভিজ্ঞতা আছে। কখনো ভাবি নি, আমার দ্বারা এর কোনো উপায় হবে। তবু একদিন নদীতীর ছেড়ে এখানে এসে

আহ্বান করলুম ছেলেদের। এখানকার কাজে প্রথমে যে উৎসাহ এসেছিল সেটা সৃষ্টির আনন্দ; শিক্ষাকে লোকহিতের দিক থেকে জনসেবার অঙ্গ করে দেখা যায়— সেদিক থেকে আমি এখানে কাজ আরম্ভ করি নি। প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে মানুষ হয়ে এখানকার ছেলেদের মন বিকশিত হবে, আবরণ ঘুচে যাবে, কল্পনায় এই রূপ দেখতে পেতাম। যখন জানলুম, এ কাজের ভার নেবার আর কেউ নেই, তখন অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও এ ভার আমি নিয়েছিলাম। আমি মনে করেছিলাম, আমার ছেলেরা প্রাণবান হবে, তাদের মধ্যে ঔৎসুক্য জাগরিত হবে। তারা বেশি পাসমার্কা পেয়ে ভালো করে পাস করবে এ লোভ ছিল না— তারা আনন্দিত হবে, প্রকৃতির শুশ্রূষায় শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হবে এই ইচ্ছাই মনে ছিল। অল্প কয়েকটি ছেলে নিয়ে গাছের তলায় এই লক্ষ্য নিয়েই কাজ আরম্ভ করেছিলাম। প্রকৃতির অবাধ সঙ্গ লাভ করবার উন্মুক্ত ক্ষেত্র এখানেই ছিল; শিক্ষায় যাতে তারা আনন্দ পায়, উৎসাহ বোধ করে, সেজন্য সর্বদা চেষ্টা করেছি, ছেলেদের রামায়ণ মহাভারত পড়ে শুনিয়েছি; অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় তখন এখানে আসতেন, তিনি তা শুনতে ছাত্র হয়ে আসতে পারবেন না বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। ছেলেদের জন্য নানারকম খেলা মনে মনে আবিষ্কার করেছি, একত্র হয়ে তাদের সঙ্গে অভিনয় করেছি, তাদের জন্য নাটক রচনা করেছি। সন্ধ্যার অন্ধকারে যাতে তারা দুঃখ না পায় এজন্য তাদের চিত্তবিনোদনের নূতন নূতন উপায় সৃষ্টি করেছি— তাদের সমস্ত সময়ই পূর্ণ করে রাখবার চেষ্টা করেছি। আমার নাটক গান তাদের জন্যই আমার রচনা। তাদের খেলাধুলোয়ও তখন আমি যোগ দিয়েছি। এই-সব ব্যবস্থা অন্যত্র শিক্ষাবিধির অন্তর্গত নয়। অন্য বিদ্যালয়ে ক্রিয়াপদ শব্দরূপ হয়তো বিশুদ্ধভাবে মুখস্থ করানো হচ্ছে— অভিভাবকের দৃষ্টিও সেই দিকেই। আমাদের হয়তো সে দিকে কিছু ত্রুটি হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু এ কথা বলতেই হবে যে, এখানে ছাত্রদের সহজ মুক্তির আনন্দ দিয়েছি। সর্বদা তাদের সঙ্গী হয়ে ছিলাম— মাত্র দশটা-পাঁচটা নয়, শুধু তাদের নির্দিষ্ট পাঠের মধ্যে নয়— তাদের আপন অন্তরের মধ্যে তাদের জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছি। কোনো নিয়ম দ্বারা তারা পিষ্ট না হয়, এই আমার মনে অভিপ্রায় ছিল। এই চেষ্টায় সঙ্গী পেয়েছিলুম কিশোর কবি সতীশচন্দ্রকে— শিক্ষাকে তিনি আনন্দে সরস করে তুলতে পেরেছিলেন, সেক্সপীয়রের মতো কঠিন বিষয়কেও তিনি অধ্যাপনার গুণে শিশুদের মনে মুদ্রিত করে দিতে পেরেছিলেন। তার পরে ক্রমশ নানা ঋতু-উৎসবের প্রচলন হয়েছে; আপনার অজ্ঞাতসারে প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের আনন্দের যোগ এই উৎসবের সহযোগে গড়ে উঠবে এই আমার লক্ষ্য ছিল।

ছাত্রসংখ্যা তখন অল্প ছিল; এও একটা সুযোগ ছিল, নইলে আমার পক্ষে একলা এর ভার গ্রহণ করা অসম্ভব হত। সকল ছাত্র-শিক্ষকে মিলে তখন এক হয়ে উঠেছিলেন, কাজেই সকলকে এক অভিপ্রায়ে চালিত করা সহজ হয়েছিল।

ক্রমে বিদ্যালয় বড়ো হয়ে উঠেছে। আমি যখন এর জন্য দায়ী ছিলুম তখন অনেক সংকট এসেছে, সবই সহ্য করেছি; অনেক সময় বহুসংখ্যক ছাত্রকে বিদায় করতে হয়েছে, তার যা আর্থিক ক্ষতি যেমন করে পারি বহন করেছি। কেবল এইটুকু লক্ষ্য রেখেছি, যেন ছাত্র শিক্ষক এক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে চলেন। ক্রমে যেটা সহজ পন্থা বিদ্যালয় সেই দিকেই চলেছে বলে মনে হয়— শিক্ষার যে-সব প্রণালী সাধারণত প্রচলিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি, সেইগুলিই বলবান হয়ে ওঠে, তার নিজের ধারা বদলে গিয়ে হাই-ইস্কুলের চলতি ছাঁচের প্রভাব প্রবল হয়ে ওঠে, কেননা সেই দিকেই ঝোঁক দেওয়া সহজ; সফলতার আদর্শ প্রচলিত আদর্শের দিকে ঝুঁকে পড়ে। মাঝখানে এল কনস্টিট্যুশন, ঠিক হল বিদ্যালয় ব্যক্তির অধীনে থাকবে না, সর্বসাধারণের রুচিই একে পরিচালিত করবে। আমার কবিপ্রকৃতি বলেই হয়তো, কনস্টিট্যুশন, নিয়মের কাঠামো– যাতে প্রাণধর্মের চেয়ে কৃত্রিম উপায়ের উপর বেশি জোর, তা আমি বুঝতে পারি নে; সৃষ্টির কার্যে এটা বাধা দেয় বলেই আমার মনে হয়। যাই হোক, কনস্টিট্যুশনে নির্ভর রেখে আমি এর মধ্য থেকে অবকাশ নিয়েছি, কিন্তু এ কথা তো ভুলতে পারি নে যে, এ বিদ্যালয়ের কোনো বিশেষত্ব যদি অবশিষ্ট না থাকে তবে নিজেকে বঞ্চিত করা হয়। সাধ্যের বেশি অনেক আমাকে এর জন্য দিতে হয়েছে, কেউ সে কথা জানে না— কত দুঃসহ কষ্ট আমাকে স্বীকার করতে হয়েছে। অত্যন্ত দুঃখে যাকে গড়ে তুলতে হয়েছে সে যদি এমন হয় যা আরো ঢের আছে, অর্থাৎ তার সার্থকতার মানদণ্ড যদি সাধারণের অনুগত হয়, তবে কী দরকার ছিল এমন সমূহ ক্ষতি স্বীকার করবার? বিদ্যালয় যদি একটা হাই-ইস্কুলে মাত্র পর্যবসিত হয় তবে বলতে হবে ঠকলুম। আমার সঙ্গে যাঁরা এখানে শিক্ষকতা আরম্ভ করেছিলেন, এখানকার আদর্শের মধ্যে যাঁরা ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছিলেন, তাঁদের অনেকেই আজ পরলোকে। পরবর্তী যাঁরা এখন এসেছেন তাঁদের শিক্ষকতার আদর্শ, দূর থেকে ছাত্রদের পরিচালনা করা, এটা আমার সময় ছিল না। এরকম করে দূরত্ব রেখে অন্তঃকরণকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব হয় না। এতে হয়তো খুব দক্ষ পরিচালনা হতে পারে কিন্তু তার চেয়ে বড়ো জিনিসের অভাব ঘটতে থাকে। এখন অনেক ছাত্র অনেক বিভাগ হয়েছে, সকলই বিচ্ছিন্ন অবস্থায় চলছে। কর্মী সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে চিন্তার ক্ষেত্রে সেবার ক্ষেত্রে এক করে দেখতে পাচ্ছেন না— বিচ্ছেদ জন্মাচ্ছে।

আমার বক্তব্য এই যে, সকল বিভাগই যদি এক প্রাণক্রিয়ার অন্তর্গত না হয় তবে এ ভার বহন করা কঠিন। আমি যতদিন আছি ততদিন হয়তো এ বিচ্ছেদ ঠেকাতে পারি, কিন্তু আমার অবর্তমানে কার আদর্শে চলবে? আমি এই বিদ্যালয়ের জন্য অনেক দুঃখ স্বীকার করে নিয়েছি— আশা করি আমার এই উদ্‌বেগ প্রকাশ করবার অধিকার আছে। এমন প্রতিষ্ঠান নেই যার মধ্যে কিছু নিন্দনীয় নেই, কিন্তু দরদী তা বুক দিয়ে চাপা দেয়; এমন অনুষ্ঠান নেই যার দুঃখ নেই, বন্ধু তা আনন্দের সঙ্গে বহন করে। দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে সকলে একত্র হয়ে যেন আমরা আদর্শের বিশুদ্ধি রক্ষা করি, বিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য বিস্মৃত না হই।

ক্রমে বিদ্যালয়ের মধ্যে আর-একটা আইডিয়া প্রবেশ করেছিল— সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশ্বের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগ। এতে নানা লাভক্ষতি হয়েছে, কিন্তু পেয়েছি আমি কয়েকজন বন্ধু যাঁরা এখানে ত্যাগের অর্ঘ্য এনেছেন, আমার কর্মকে, আমাকে ভালোবেসেছেন। নানা নিন্দা তাঁরা শুনেছেন। বাইরে আমরা অতি দরিদ্র, কী দেখাতে পারি— তবুও বন্ধুরূপে সাহায্য করেছেন। শ্রীনিকেতনকে যিনি রক্ষা করছেন তিনি একজন বিদেশী— কী না তিনি দিয়েছেন। এণ্ড্রুজ দরিদ্র তবু তিনি যা পেরেছেন দিয়েছেন— আমরা তাঁকে কত আঘাত দিয়েছি, কিন্তু কখনো তাতে ক্ষুণ্ণ হয়ে তিনি আমাদের ক্ষতি করেন নি। লেস্‌নি-সাহেব আমাদের পরম বন্ধু, পরম হিতৈষী। কেউ কেউ আজ পরলোকে। এই অকৃত্রিম সৌহার্দ্য সকল ক্ষতির দুঃখে সান্ত্বনা। একান্তমনে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি এই বিদেশী বন্ধুদের কাছে।

৮ পৌষ ১৩৪২ ভাদ্র ১৩৪৯

শান্তিনিকেতন

১৮

য়ুরোপে সর্বত্রই আছে বিজ্ঞানসাধনার প্রতিষ্ঠান— ব্যাপক তার আয়োজন, বিচিত্র তার প্রয়াস। আধুনিক য়ুরোপের শক্তিকেন্দ্র বিজ্ঞানে, এইজন্যে তার অনুশীলনের উদ্যোগ সহজেই সর্বজনের সমর্থন পেয়েছে। কিন্তু য়ুরোপীয় সংস্কৃতি কেবলমাত্র বিজ্ঞান নিয়ে নয়— সাহিত্য আছে, সংগীত আছে, নানাবিধ কলাবিদ্যা আছে, জনহিতকর প্রচেষ্টা আছে। এদের কেন্দ্র নানা জায়গাতেই রূপ নিয়েছে জাতির স্বাভাবিক প্রবর্তনায়।

এই-সকল কেন্দ্রের প্রধান সার্থকতা কেবল তার কর্মফল নিয়ে নয়। তার চেয়ে বড়ো সিদ্ধি সাধকদের আত্মার বিকাশে। নানা প্রকারে সেই বিকাশের প্রবর্তনা ও আনুকূল্য যদি দেশের মধ্যে থাকে তবেই দেশের অন্তরাত্মা জেগে উঠতে পারে। মানুষের প্রকৃতিতে উর্ধ্বদেশে আছে তার নিষ্কাম কর্মের আদেশ, সেইখানে প্রতিষ্ঠিত আছে সেই বেদী যেখানে অন্য কোনো আশা না রেখে সে সত্যের কাছে বিশুদ্ধভাবে আত্মসমর্পণ করতে পারে — আর কোনো কারণে নয়, তাতে তার আত্মারই পূর্ণতা হয় ব'লে।

আমাদের দেশে এখানে সেখানে দূরে দূরে গুটিকয়েক বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সেখানে বাঁধা নিয়মে যান্ত্রিক প্রণালীতে ডিগ্রি বানাবার কারখানাঘর বসেছে। এই শিক্ষার সুযোগ নিয়ে ডাক্তার এঞ্জিনিয়র উকিল প্রভৃতি ব্যবসায়ীদের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। কিন্তু সমাজে সত্যের জন্য কর্মের জন্য নিষ্কাম আত্মনিয়োগের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা হয় নি। প্রাচীন কালে ছিল তপোবন; সেখানে সত্যের অনুশীলন এবং আত্মার পূর্ণতা-বিকাশের জন্য সাধকেরা একত্র হয়েছেন, রাজস্বের ষষ্ঠ অংশ দিয়ে এই-সকল আশ্রমকে রক্ষা করা রাজাদের কর্তব্য ছিল। সকল সভ্য দেশেই জ্ঞানের তাপস কর্মের ব্রতীদের জন্যে তপোভূমি রচিত হয়েছে।

আমাদের দেশে সাধনা বলতে সাধারণত মানুষ আধ্যাত্মিক মুক্তির সাধনা, সন্ন্যাসের সাধনা ধরে নিয়ে থাকে। আমি যে সংকল্প নিয়ে শান্তিনিকেতনে আশ্রম-স্থাপনায় উদ্যোগ করেছিলুম, সাধারণ মানুষের চিত্তোৎকর্ষের সুদূর বাইরে তার লক্ষ্য ছিল না। যাকে সংস্কৃতি বলে তা বিচিত্র; তাতে মনের সংস্কার সাধন করে, আদিম খনিজ অবস্থার অনুজ্জ্বলতা থেকে তার পূর্ণ মূল্য উদ্ভাবন করে নেয়। এই সংস্কৃতির নানা শাখাপ্রশাখা; মন যেখানে সুস্থ সবল, মন সেখানে সংস্কৃতির এই নানাবিধ প্রেরণাকে আপনিই চায়।

ব্যাপকভাবে এই সংস্কৃতি-অনুশীলনের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করে দেব, শান্তিনিকেতন-আশ্রমে এই আমার অভিপ্রায় ছিল। আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকের পরিধির মধ্যে জ্ঞানচর্চার যে সংকীর্ণ সীমা নির্দিষ্ট আছে কেবলমাত্র তাই নয়, সকলরকম কারুকার্য শিল্পকলা নৃত্যগীতবাদ্য নাট্যাভিনয় এবং পল্লীহিতসাধনের জন্যে যে-সকল শিক্ষা ও চর্চার প্রয়োজন সমস্তই এই সংস্কৃতির অন্তর্গত বলে স্বীকার করব। চিত্তের পূর্ণবিকাশের পক্ষে এই-সমস্তেরই প্রয়োজন আছে বলে আমি জানি। খাদ্যে নানা প্রকারের প্রাণীন পদার্থ আমাদের শরীরে মিলিত হয়ে আমাদের দেয় স্বাস্থ্য, দেয় বল; তেমনি যে-সকল শিক্ষণীয় বিষয়ে মনের প্রাণীন পদার্থ আছে তার সবগুলিরই

সমবায় হবে আমাদের আশ্রমের সাধনায়— এই কথাই আমি অনেক কাল চিন্তা করেছি।

পদ্মার বোটে ছিল আমার নিভৃত নিবাস। সেখান থেকে আশ্রমে চলে এসে আমার আসন নিলুম গুটি-পাঁচ-ছয় ছেলের মাঝখানে। কেউ না মনে করেন, তাদের উপকার করাই ছিল আমার লক্ষ্য। ক্লাস-পড়ানো কাজে উপকার করার সম্বল আমার ছিল না। বস্তুত সাধনা করার আগ্রহ আমাকে পেয়ে বসেছিল, আমার নিজেরই জন্যে। নিজেকে দিয়ে-ফেলার দ্বারা নিজেকে পাওয়ার লোভ আমাকে দখল করেছিল। ছোটো ছেলেদের পড়াবার কাজে দিনের পরে দিন আমার কেটেছে, তার মধ্যে খ্যাতির প্রত্যাশা বা খ্যাতির স্বাদ পাবার উপায় ছিল না। সব চেয়ে নিম্নশ্রেণীর ইস্কুলমাস্টারি। ঐ কটি ছোটো ছেলে আমার সমস্ত সময় নিলে, অর্থ নিলে, সামর্থ্য নিলে— এইটেই আমার সার্থকতা। এই-যে আমার সাধনার সুযোগ ঘটল, এতে করে আমি আপনাকেই পেতে লাগলুম। এই আত্মবিকাশ, এ কেবল সাধনার ফলে, বৃহৎ মানবজীবনের সংগমক্ষেত্রে। আপনাকে সরিয়ে ফেলতে পারলেই বৃহৎ মানুষের সংসর্গ পাওয়া যায়, এই সামান্য ছেলে-পড়ানোর মধ্যেও। এতে খ্যাতি নেই, স্বার্থ নেই, সেইজন্যেই এতে বৃহৎ মানুষের স্পর্শ আছে।

সকলে জানেন, আমি মানুষের কোনো চিত্তবৃত্তিকে অস্বীকার করি নি। বাল্যকাল থেকে আমার কাব্যসাধনার মধ্যে যে আত্মপ্রকাশের প্রবল ইচ্ছা জাগ্রত ছিল মানুষের সকল চিত্তবৃত্তির 'পরেই তার ছিল অভিমুখিতা। মানুষের কোনো চিৎশক্তির অনুশীলন-কেই আমি চপলতা বা গাম্ভীর্যহানির দাগা দিই নি।

বহু বৎসর আমি নদীতীরে নৌকাবাসে সাহিত্যসাধনা করেছি, তাতে আমার নিরতিশয় শান্তি ও আনন্দ ছিল। কিন্তু মানুষ শুধু কবি নয়। বিশ্বলোকে চিত্তবৃত্তির যে বিচিত্র প্রবর্তনা আছে তাতে সাড়া দিতে হবে সকল দিক থেকে; বলতে হবে ওঁ— আমি জেগে আছি।

এখানে এলুম যখন তখন আমার কর্মচেষ্টায় বাইরের প্রকাশ অতি দীন ছিল। সে সম্বন্ধে এইটুকুমাত্রই বলতে পারি, সেই উপকরণবিরল অতি ছোটো ক্ষেত্রের মধ্যে আপনাকে দেওয়ার দ্বারা ও আপনাকে পাওয়ার দ্বারা যে আনন্দ তারই মধ্য দিয়ে এই আশ্রমের কাজ শুরু হয়েছে।

দিনে দিনে এই কাজের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে। আজ সে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে সর্বসাধারণের দৃষ্টির সামনে। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি, আমাদের দেশের দৃষ্টি প্রায়ই অনুকূল নয়। কিন্তু তাতে ক্ষতি হয় নি, তাতে কর্মের মূল্যই বেড়েছে।

যাঁরা সংকীর্ণ কর্তব্যসীমার মধ্যেও এই বিদ্যায়তনে কাজ করেছেন তাঁদেরও সহযোগিতা শ্রদ্ধার সঙ্গে সকৃতজ্ঞ চিত্তে আমার স্বীকার্য।

এখানে যাঁরা এসেছেন তাঁরা একে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছেন কি না জানি না। কিন্তু তাঁদের উদ্দেশে এই প্রতিষ্ঠানকে আমি সমর্পণ করেছি।

বহুদিন এই আশ্রমে আমরা প্রচ্ছন্ন ছিলাম। মাটির ভিতরে বীজের যে অজ্ঞাতবাস প্রাণের স্ফুরণের জন্য তার প্রয়োজন আছে। এই অজ্ঞাতবাসের পর্ব দীর্ঘকাল চলেছিল। আজ যদি এই প্রতিষ্ঠান লোকচক্ষুর গোচর হয়ে থাকে তবে সেই প্রকাশ্য দৃষ্টিপাতের ঘাতসংঘাত ভালোমন্দ লাভক্ষতি সমস্ত স্বীকার করে নিতে হবে— কখনো পীড়িত মনে, কখনো উৎসাহের সঙ্গে।

যাঁরা উপদেষ্টা পরামর্শদাতা বা অতিথি ভাবে এখানে আসেন তাঁদের জানিয়ে রাখি, আমাদের এই বিদ্যায়তনে ব্যবসায়বুদ্ধি নেই। এখানে ক্ষণে ক্ষণে উত্তেজিত জনমতের অনুবর্তন করে জনতার মন রক্ষা করি নি, এবং সেই কারণে যদি আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকি তবে সে আমাদের সৌভাগ্য। আমরা কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে শ্রেয়কে বরণ করবার প্রয়াস রাখি। কর্মের সাধনাকে মনুষ্যত্বসাধনার সঙ্গে এক বলে জানি। আমাদের এখানে সাধনার আসন পাতা রয়েছে। সকল স্থলেই যে সেই আসন সাধকেরা অধিকার করেছেন এমন গর্ব করি নে। কিন্তু এখানকার আবহাওয়ার মধ্যে একটি আহ্বান আছে— আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা।

আমাদের মনে বিশ্বাস হয়েছে, আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয় নি, যদিও ফসলের পূর্ণপরিণত রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। যাঁরা আমাদের সুদীর্ঘ এবং দুরূহ প্রয়াসের মধ্যে এমন কিছু দেখতে পেয়েছেন যার সর্বকালীন মূল্য আছে, তাঁদের সেই অনুকূল দৃষ্টি থেকে আমরা বর লাভ করেছি। তাঁদের দৃষ্টির সেই আবিষ্কার শক্তি জাগিয়েছে আমাদের কর্মে। দূরের থেকে এসেছেন মনীষীরা অতিথিরা, ফিরেছেন বন্ধুরূপে, তাঁদের আশ্বাস ও আনন্দ সঞ্চিত হয়েছে আশ্রমের সম্পদভাণ্ডারে।

বহুদিনের ত্যাগের দ্বারা, চেষ্টার দ্বারা এই আশ্রমকে দেশের বেদীমূলে স্থাপন করবার জন্য নৈবেদ্যসংরচনকার্য আমার আয়ুর সঙ্গে সঙ্গেই একরকম শেষ করে এনেছি। দূরের অতিথি-অভ্যাগতদের অনুমোদনের দ্বারা আমাদের কাছে এই কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, এখানে প্রাণশক্তি রয়েছে। ফুলে ফলে বাইরের ফসলের কিছু-একটা প্রকাশ এঁরা দেখেছেন, তা ছাড়া তাঁরা এর অন্তরের ক্রিয়াকেও দেখেছেন। দূরের সেই অতিথিরা মনীষীরা আমাদের পরম বন্ধু, কারণ তাঁদের আশ্বাস আমরা পেয়েছি। আমাদের এই আশ্রমের কর্মেতে আমি যে আপনাকে সমর্পণ করেছি তা সার্থক হবে যদি আমার এই

সৃষ্টি আমি যাবার পূর্বে দেশকে সঁপে দিতে পারি। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্ যেমন, তেমনি শ্রদ্ধয়া আদেয়ম্। যেমন শ্রদ্ধায় দিতে চাই, তেমনি শ্রদ্ধায় একে গ্রহণ করতে হবে। এই দেওয়া-নেওয়া যেদিন পূর্ণ হবে সেদিন আমার সারা জীবনের কর্মসাধনার এই ক্ষেত্র পূর্ণতার রূপ লাভ করবে।

৮ পৌষ ১৩৪৫ মাঘ ১৩৪৫

শান্তিনিকেতন

১৯

অনেক দিন পরে আজ আমি তোমাদের সম্মুখে এই মন্দিরে উপস্থিত হয়েছি। অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গেই আজ এসেছি। এ কথা জানি যে, দীর্ঘকালের অনুপস্থিতির ব্যবধানে আমার বহুকালের অনেক সংকল্পের গ্রন্থি শিথিল হয়ে এসেছে। যে কারণেই হোক, তোমাদের মন এখন আর প্রস্তুত নেই আশ্রমের সকল অনুষ্ঠানের সকল কর্তব্যকর্মের অন্তরের উদ্দেশ্যটি গ্রহণ করতে, এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই। এর জন্যে শুধু তোমরা নও, আমরা সকলেই দায়ী।

আজ মনে পড়ছে চল্লিশ বৎসর পূর্বের একটি দিনের কথা। বাংলার নিভৃত এক প্রান্তে আমি তখন ছিলাম পদ্মানদীর নির্জন তীরে। মন যখন সে দিকে তাকায়, দেখতে পায় যেন এক দূর যুগের প্রত্যূষের আভা। কখন এক উদ্‌বোধনের মন্ত্র হঠাৎ এল আমার প্রাণে। তখন কেবলমাত্র কবিতা লিখে দিন কাটিয়েছি; অধ্যয়ন ও সাহিত্যালোচনার মধ্যে ডুবেছিলাম, তারই সঙ্গে ছিল বিষয়কর্মের বিপুল বোঝা।

কেন সেই শান্তিময় পল্লীশ্রীর স্নিগ্ধ আবেষ্টন থেকে টেনে নিয়ে এল আমাকে এই রৌদ্রদগ্ধ মরুপ্রান্তরে তা বলতে পারি না।

এখানে তখন বাইরে ছিল সব দিকেই বিরলতা ও বিজনতা, কিন্তু সব সময়েই মনের মধ্যে ছিল একটি পরিপূর্ণতার আশ্বাস। একাগ্রচিত্তে সর্বদা আকাঙ্ক্ষা করেছি, বর্তমান কালের তুচ্ছতা ইতরতা প্রগল্‌ভতা সমস্ত দূর করতে হবে। যাদের শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করেছি, ভারতের যুগান্তরব্যাপী সাধনার অমৃত উৎসে তাদের পৌঁছে দিতে পারব, এই আশাই ছিল অন্তরের গভীরে।

কতদিন এই মন্দিরের সামনের চাতালে দুটি-একটি মাত্র উপাসক নিয়ে সমবেত হয়েছি— অবিরত চেষ্টা ছিল সুপ্ত প্রাণকে জাগাবার। তারই সঙ্গে আরো চেষ্টা ছিল

ছেলেদের মনে তাদের স্বাধীন কর্মশক্তি ও মননশক্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করতে। কোনোদিনই খণ্ডভাবে আমি শিক্ষা দিতে চাই নি। ক্লাসের বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থায় তাদের শিক্ষার সমগ্রতাকে আমি কখনো বিপর্যস্ত করি নি।

সেদিনের সে আয়োজন অন্ধ-অনুষ্ঠানের দ্বারা ম্লান ছিল না, অপমানিত ছিল না অভ্যাসের ক্লান্তিতে। এমন কোনো কাজ ছিল না যার সঙ্গে নিবিড় যোগ ছিল না আশ্রমের কেন্দ্রস্থলবর্তী শ্রদ্ধার একটি মূল উৎসের সঙ্গে। স্নানপান-আহারে সেদিনের সমগ্র জীবনকে অভিষিক্ত করেছিল এই উৎস। শান্তিনিকেতনের আকাশবাতাস পূর্ণ ছিল এরই চেতনায়। সেদিন কেউ একে অবজ্ঞা করে অন্যমনস্ক হতে পারত না।

আজ বার্ধক্যের ভাঁটার টানে তোমাদের জীবন থেকে দূরে পড়ে গেছি। প্রথম যে আদর্শ বহন করে এখানে এসেছিলুম, আমার জীর্ণ শক্তির অপটুতা থেকে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে নিজের হাতে বহন করবার আনন্দিত উদ্যম কোথাও দেখতে পাচ্ছি নে। মনে হয়, এ যেন বর্তমান কালেরই বৈশিষ্ট্য। সব-কিছুকে সন্দেহ করা, অপমান করা, এতেই যেন তার স্পর্ধা। তারই তো বীভৎস লক্ষণ মারীবিস্তার করে ফুটে উঠেছে দেশে বিদেশে আজকের দিনের রাষ্ট্রে সমাজে, বিদ্রূপ করছে তাকে যা মানব-সভ্যতার চিরদিনের সাধনার সামগ্রী।

চল্লিশ বৎসর পূর্বে যখন এখানে প্রথম আসি তখন আশ্রমের আকাশ ছিল নির্মল। কেবল তাই নয়, তখন বিষবাষ্প ব্যাপ্ত হয় নি মানবসমাজের দিগ্‌দিগন্তে।

আজ আবার আসছি তোমাদের সামনে যেন বহুদূরের থেকে। আর-একবার মনে পড়ছে এই আশ্রমে প্রথম প্রবেশ করবার দীর্ঘ বন্ধুর পথ। বিরুদ্ধ ভাগ্যের নির্মমতা ভেদ করে সেই-যে পথযাত্রা চলেছিল সম্মুখের দিকে তার দুঃসহ দুঃখের ইতিহাস কেউ জানবে না। আজ এসেছি সেই দুঃখস্মৃতির ভিতর দিয়ে। উৎকণ্ঠিত মনে তোমাদের মধ্যে খুঁজতে এলাম তার সার্থকতা। আধুনিক যুগের শ্রদ্ধাহীন স্পর্ধা-দ্বারা এই তপস্যাকে মন থেকে প্রত্যাখ্যান কোরো না— একে স্বীকার করে নাও।

ইতিহাসে বিপর্যয় বহু ঘটেছে, সভ্যতার বহু কীর্তিমন্দির যুগে যুগে বিধ্বস্ত হয়েছে, তবু মানুষের শক্তি আজও সম্পূর্ণ লোপ পায় নি। সেই ভরসার 'পরে ভর করে মজ্জমান তরী-উদ্ধারচেষ্টা করতে হবে, নতুন হাওয়ায় পালে সে আবার যাত্রা শুরু করবে। কালের স্রোত বর্তমান যুগের নবীন কর্ণধারদেরকেও ভিতরে ভিতরে যে এগিয়ে নিয়ে চলেছে তা সব সময় তাঁদের অনুভূতিতে পৌঁছয় না। একদিন যখন প্রগল্‌ভ তর্কের এবং বিদ্রূপমুখর অট্টহাস্যের ভিতর দিয়ে তাঁদেরও বয়সের অঙ্ক বেড়ে

যাবে তখন সংশয়তক্ষ বন্ধ্যা বুদ্ধির অভিমান প্রাণে শান্তি দেবে না। অমৃত-উৎসের অন্বেষণ তখন আরম্ভ হবে জীবনে।

সেই আশা-পথের পথিক আমরা, নূতন প্রভাতের উদ্‌বোধনমন্ত্র শ্রদ্ধার সঙ্গে গান করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি, যে শ্রদ্ধায় আছে অপরাজেয় বীর্য, নাস্তিবাদের অন্ধকারে যার দৃষ্টি পরাহত হবে না, যে ঘোষণা করবে—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

৮ শ্রাবণ ১৩৪৭ ভাদ্র ১৩৪৭
শান্তিনিকেতন

পরিশিষ্ট

এই আশ্রমের গুরুর অনুজ্ঞায় ও আপনাদের অনুমতিতে আমাকে যে সভাপতির ভার দেওয়া হল তাহা আমি শিরোধার্য করে নিচ্ছি। আমি এ ভারের সম্পূর্ণ অযোগ্য। কিন্তু আজকের এই প্রতিষ্ঠান বিপুল ও বহুযুগব্যাপী। তাই ব্যক্তিগত বিনয় পরিহার করে আমি এই অনুষ্ঠানে ব্রতী হলাম। বহু বৎসর ধরে এই আশ্রমে একটা শিক্ষার কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এই ধরনের এডুকেশনাল এক্স্‌পেরিমেণ্ট দেশে খুব বিরল। এই দেশ তো আশ্রম-সংঘ-বিহারের দেশ। কোথাও কোথাও 'গুরুকুল'-এর মতো দু-একটা এমনি বিদ্যালয় থাকলেও, এটি এক নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত। এর স্থান আর কিছুতেই পূর্ণ হতে পারে না। এখানে খোলা আকাশের নীচে প্রকৃতির ক্রোড়ে মেঘরৌদ্রবৃষ্টি-বাতাসে বালকবালিকারা লালিতপালিত হচ্ছে। এখানে শুধু বহিরঙ্গ-প্রকৃতির আবির্ভাব নয়, কলাসৃষ্টির দ্বারা অন্তরঙ্গ-প্রকৃতিও পারিপার্শ্বিক অবস্থায় জেগে উঠেছে। এখানকার বালকবালিকারা এক-পরিবারভুক্ত হয়ে আচার্যদের মধ্যে রয়েছে। একজন বিশ্বপ্রাণ পার্সনালিটি এখানে সর্বদাই এর মধ্যে জাগ্রত রয়েছেন। এমনিভাবে এই বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। আজ সেই ভিত্তির প্রসার ও পূর্ণাঙ্গতা সাধন হতে চলল। আজ এখানে বিশ্বভারতীর অভ্যুদয়ের দিন। 'বিশ্বভারতী'র কোষানুযায়িক অর্থের দ্বারা আমরা বুঝি যে, যে 'ভারতী' এতদিন অলক্ষিত হয়ে কাজ করছিলেন আজ তিনি প্রকট হলেন। কিন্তু এর মধ্যে আর-একটি ধ্বনিগত অর্থও আছে— বিশ্ব ভারতের কাছে এসে পৌঁছবে, সেই বিশ্বকে ভারতীয় করে নিয়ে আমাদের রক্তরাগে অনুরঞ্জিত ক'রে, ভারতের মহাপ্রাণে অনুপ্রাণিত ক'রে আবার সেই প্রাণকে বিশ্বের কাছে উপস্থিত করব। সেই ভাবেই বিশ্বভারতীর নামের সার্থকতা আছে।

একটা কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। ভারতের মহাপ্রাণ কোন্‌টা। যে মহাপ্রাণ লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছে তাকে ধরতে গিয়ে আমরা যদি বিশ্বের সঙ্গে কারবার স্থাপন ও আদানপ্রদান না করি তবে আমাদের আত্মপরিচয় হবে না। Each can realize himself only by helping others as a whole to realize themselves এ যেমন সত্য, এর converse অর্থাৎ others can realize themselves by helping each individual to realize himself ও তেমনি সত্য। অপরে আমার লক্ষ্যের পথে, যাবার পথে যেমন মধ্যবর্তী, তেমনি আমিও তার মধ্যবর্তী;

কারণ আমাদের উভয়কে যেখানে ব্রহ্ম বেষ্টন করে আছেন সেখানে আমরা এক, একটি মহা ঐক্যে অন্তরঙ্গ হয়ে আছি। এ ভাবে দেখতে গেলে, বিশ্বভারতীতে ভারতের প্রাণ কী তার পরিচয় পেতে হবে, তাতে করে জগতের যে পরিচয় ঘটবে তার রূপে আত্মাকে প্রতিফলিত দেখতে পাব।

আমি আজ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। আজ জগৎ জুড়ে একটি সমস্যা রয়েছে। সর্বত্রই একটা বিদ্রোহের ভাব দেখা যাচ্ছে— সে বিদ্রোহ প্রাচীন সভ্যতা, সমাজতন্ত্র, বিদ্যাবুদ্ধি, অনুষ্ঠান, সকলের বিরুদ্ধে। আমাদের আশ্রম দেবালয় প্রভৃতি যা-কিছু হয়েছিল তা যেন সব ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে। বিদ্রোহের অনল জ্বলছে, তা অর্ডার-প্রগ্রেসকে মানে না, রিফর্ম চায় না, কিছুই চায় না। যে মহাযুদ্ধ হয়ে গেল এই বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে তার চেয়ে বড়ো যুদ্ধ চলে আসছে, গত মহাযুদ্ধ তারই একটা প্রকাশ মাত্র। এই সমস্যার পূরণ কেমন করে হবে, শান্তি কোথায় পাওয়া যাবে। সকল জাতিই এর উত্তর দেবার অধিকারী। এই সমস্যায় ভারতের কী বলবার আছে, দেবার আছে?

আমরা এত কালের ধ্যানধারণা থেকে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তার দ্বারা এই সমস্যা পূরণ করবার কিছু আছে কি না। য়ুরোপে এ সম্বন্ধে যে চেষ্টা হচ্ছে সেটা পোলিটিকাল অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশনের দিক দিয়ে হয়েছে। সেখানে রাজনৈতিক ভিত্তির উপর ট্রীটি, কন্‌ভেন্‌শন, প্যাক্ট্‌-এর ভিতর দিয়ে শান্তিস্থাপনের চেষ্টা হচ্ছে। এ হবে এবং হবার দরকারও আছে। দেখছি সেখানে মাল্‌টিপ্‌ল্‌ অ্যালায়েন্স হয়েও হল না, বিরোধ ঘটল। আর্‌বিট্রেশন কোর্ট এবং হেগ-কন্‌ফারেন্সে হল না, শেষে লীগ অব নেশন্‌স্‌-এ গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। তার অবলম্বন হচ্ছে limitation of armaments। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, এ ছাড়া আরো অন্য দিকে চেষ্টা করতে হবে; কেবল রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক দিকে এর চেষ্টা হওয়া দরকার। Universal simultaneous disarmament of all nations -এর জন্য নূতন হিউম্যানিজ্‌মের রিলিজ্যাস মুভ্‌মেন্ট্‌ হওয়া উচিত। তার ফলস্বরূপ যে মেশিনারি হবে তা পার্লামেন্ট বা ক্যাবিনেটের ডিপ্লোম্যাসির অধীনে থাকবে না। পার্লামেন্টসমূহের জয়েন্ট্‌ সিটিং তো হবেই, সেইসঙ্গে বিভিন্ন People-এরও কন্‌ফারেন্স্‌ হলে তবেই শান্তির প্রতিষ্ঠা হতে পারে। কিন্তু একটা জিনিস আবশ্যক হবে— mass-এর life, mass-এর religion। বর্তমান কালে কেবলমাত্র individual salvation-এ চলবে না; সর্বমুক্তিতেই এখন মুক্তি, না হলে মুক্তি নেই। ধর্মের এই mass life -এর দিকটা সমাজে স্থাপন করতে হবে।

ভারতের এ সম্বন্ধে কী বাণী হবে। ভারতও শান্তির অনুধাবন করেছে, চীনদেশও

করেছে। চীনে সামাজিক দিক দিয়ে তার চেষ্টা হয়েছে। যদি social fellowship of man with man হয় তবেই international peace হবে, নয় তো হবে না। কন্‌ফ্যুসিয়সের গোড়ার কথাই এই যে, সমাজ একটা পরিবার, শান্তি সামাজিক ফেলোশিপ-এর উপর স্থাপিত; সমাজে যদি শান্তি হয় তবেই বাইরে শান্তি হতে পারে। ভারতবর্ষে এর আর-একটা ভিত্তি দেওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে অহিংসা মৈত্রী শান্তি। প্রত্যেক individual-এ বিশ্বরূপদর্শন এবং তারই ভিতর ব্রহ্মের ঐক্যকে অনুভব করা; এই ভাবের মধ্যে যে peace আছে ভারতবর্ষ তাকেই চেয়েছে। ব্রহ্মের ভিত্তিতে আত্মাকে স্থাপন করে যে peace compact হবে তাতেই শান্তি আনবে। এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় চীনদেশের সোশ্যাল ফেলোশিপ এবং ভারতের আত্মার শান্তি এই দুইই চাই, নতুবা লীগ অব নেশন্‌স্‌-এ কিছু হবে না। গ্রেট ওঅর -এর থেকেও বিশালতর যে দ্বন্দ্ব জগৎ জুড়ে চলছে তার জন্য ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে বিশ্বভারতীকে বাণী দিতে হবে।

ভারতবর্ষ দেখেছে যে, রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে যে State আছে তা কিছু নয়। সে বলেছে যে, নেশনের বাইরেও মহা সত্য আছে, সনাতন ধর্মেই তার স্বাজাত্য রয়েছে। যেখানে আত্মার বিকাশ ও ব্রহ্মের আবির্ভাব সেখানেই তাহার দেশ। ভারতবর্ষ ধর্মের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এই extra-territorial nationality-তে বিশ্বাস করেছে। এই ভাবের অনুসরণ করে লীগ অব নেশন্‌স্‌ -এর ন্যাশনালিটির ধারণাকে সংশোধিত করতে হবে। তেমনি আত্মার দিক দিয়ে extra-territorial sovereigntyর ভাবকে স্থান দিতে হবে। এমনিভাবে Federation of the World স্থাপিত হতে পারে, এখনকার সময়ের উপযোগী করে লীগ অব নেশন্‌স্‌-এ এই extra-territorial nationalityর কথা উত্থাপন করা যেতে পারে। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় দিক দিয়ে এই বাণী দেবার আছে। আমরা দেখতে পাই যে, বৌদ্ধ প্রচারকগণ এই ভাবটি প্রচার করেছিলেন যে, প্রত্যেক রাজার code এমন হওয়া উচিত যা শুধু নিজের জাতির নয়, অপর সব জাতির সমানভাবে হিতসাধন করতে পারবে। ভারতের ইতিহাসে এই বিধিটি সর্বদা রক্ষিত হয়েছে, তার রাজারা জয়ে পরাজয়ে, রাজচক্রবর্তী হয়েও, এমনি করে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধকে স্বীকার করেছেন।

সামাজিক জীবন সম্বন্ধে ভারতবর্ষের মেসেজ্‌ কী। আমাদের এখানে গ্রুপ ও কম্যুনিটির স্থান খুব বেশি। এরা intermediary body between state and individual। রোম প্রভৃতি দেশে রাষ্ট্রব্যবস্থার ফলে স্টেট ও ইন্‌ডিভিজুয়ালে বিরোধ বেধেছিল; শেষে ইন্‌ডিভিজুয়ালিজ্‌মের পরিণতি হল অ্যানার্কিতে, এবং স্টেট

মিলিটারি সোশ্যালিজ্‌মে গিয়ে দাঁড়াল। আমাদের দেশের ইতিহাসে গ্রামে বর্ণাশ্রমে এবং ধর্মসংঘের ভিতরে কম্যুনিটির জীবনকেই দেখতে পাই। বর্ণাশ্রমে যেমন প্রতি ব্যক্তির কিছু প্রাপ্য ছিল, তেমনি তার কিছু দেয়ও ছিল, তাকে কতকগুলি নির্ধারিত কর্তব্য পালন করতে হত। Community in the Individual যেমন আছে তেমনি the Individual in the Communityও আছে। প্রত্যেকের ব্যক্তিজীবনে গ্রুপ পার্সনালিটি এবং ইনডিভিজুয়াল পার্সনালিটি জাগ্রত আছে, এই উভয়েরই সমান প্রয়োজন আছে। গ্রুপ পার্সনালিটির ভিতর ইন্‌ডিভিজুয়ালের স্বাধিকারকে স্থান দেওয়া দরকার। আমাদের দেশে ত্রুটি রয়ে গেছে যে, আমাদের ইনডিভিজুয়াল পার্সনালিটির বিকাশ হয় নি, co-ordination of power in the stateও হয় নি। আমরা ইনডিভিজুয়াল পার্সনালিটির দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, ব্যূহবদ্ধ শত্রুর হাতে আমাদের লাঞ্ছিত হতে হয়েছে।

আজকাল য়ুরোপে group principle-এর দরকার হচ্ছে। সেখানে political organization, economic organization, এ-সবই group গঠন করার দিকে যাচ্ছে। আমাদেরও এই পথে সমস্যাপূরণ করবার আছে। আমাদের যেমন য়ুরোপের কাছ থেকে স্টেটের centralization ও organization নেবার আছে তেমনি য়ুরোপকেও group principle দেবার আছে। আমরা সে দেশ থেকে economic organization-কে গ্রহণ করে আমাদের village community-কে গড়ে তুলব। কৃষিই আমাদের জীবনযাত্রার প্রধান অবলম্বন, সুতরাং ruralization-এর দিকে আমাদের চেষ্টাকে নিয়োগ করতে হবে। অবশ্য আমি সেজন্য বলছি না যে, town life-কে develop করতে হবে না ; তারও প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমাদের ভূমির সঙ্গে প্রাণের যোগ-সাধন করতে হবে। ভূমির সঙ্গে ownership-এর সম্বন্ধ হলে তবে স্বাধীনতা থাকতে পারে। কারখানার জীবনও দরকার আছে, কিন্তু ভূমি ও বাস্তর সঙ্গে individual ownership-এর যোগকে ছেড়ে না দিয়ে large-scale production আনতে হবে। বড়ো আকারে energyকে আনতে হবে, কিন্তু দেখতে হবে, কলের energy মানুষের আত্মাকে পীড়িত অভিভূত না করে, যেন জড় না করে দেয়। সমবায়প্রণালীর দ্বারা হাতের কলকেও দেশে স্থান দিতে হবে। এমনিভাবে economic organization-এ ভারতকে আত্মপরিচয় দিতে হবে। আমাদের স্ট্যাণ্ডার্ড অব লাইফ এত নিম্ন স্তরে আছে যে, আমরা decadent হয়ে মরতে বসেছি। যে প্রণালীতে efficient organization-এর নির্দেশ করলাম তাকে না ছেড়ে বিজ্ঞানকে আমাদের প্রয়োজনসাধনে লাগাতে হবে। আমাদের বিশ্বভারতীতে তাই,

রাষ্ট্রনীতি সমাজধর্ম ও অর্থনীতির যে যে ইন্‌স্টিট্যুশন পৃথিবীতে আছে, সে সবকেই স্টাডি করতে হবে, এবং আমাদের দৈন্য কেন ও কোথায় তা বুঝে নিয়ে আমাদের অভাব পূরণ করতে হবে। কিন্তু এতে করে নিজের প্রাণকে ও সৃজনীশক্তিকে যেন বাইরের চাপে নষ্ট না করি। যা-কিছু গ্রহণ করব তাকে ভারতের ছাঁচে ঢেলে নিতে হবে। আমাদের সৃজনীশক্তির দ্বারা তারা coined into our flesh and blood হয়ে যাওয়া চাই।

ভিন্ন ভিন্ন জাতির স্কীম অব লাইফ আছে কিন্তু তাদের ইতিহাস ও ভূপরিচয়ের মধ্যেও একটি বৃহৎ ঐক্য আছে, এই বিভিন্নতার মধ্যেও এক জায়গায় unity of human race আছে। তাদের সেই ইতিহাস ও ভূগোলের বিভিন্ন environment-এর জন্য যে life values সৃষ্ট হয়েছে, পরস্পরের যোগাযোগের দ্বারা তাদের বিস্তৃতি হওয়া প্রয়োজন। এই লাইফ-স্কীমগুলির আদান-প্রদানে বিশ্বে তাদের বৃহৎ লীলাক্ষেত্র তৈরি হবে।

আমাদের জাতীয় চরিত্রে কী কী অভাব আছে, কী কী আমাদের বাইরে থেকে আহরণ করতে হবে। আমাদের মূল ত্রুটি হচ্ছে, আমরা বড়ো একপেশে— ইমোশনাল। আমাদের ভিতরে will ও intellect -এর মধ্যে, সব্‌জেক্‌টিভিটি ও অব্‌জেক্‌টিভিটির মধ্যে চিরবিচ্ছেদ ঘটেছে। আমরা হয় খুব সব্‌জেক্‌টিভ্‌, নয়তো খুব যুনিভার্সাল। অনেক সময়েই আমরা যুনিভার্সালিজ্‌মের বা সাম্যের চরম সীমায় চলে যাই, কিন্তু differentiation-এ যাই না। আমাদের অব্‌জেক্‌টিভিটির পূর্ণ বিকাশ হওয়া দরকার। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও অব্‌জার্‌ভেশনের ভিতর দিয়ে মনের সত্যানুবর্তিতাকে ও শৃঙ্খলাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আমাদের intellect-এর character-এর অভাব আছে, সুতরাং আমাদের intellectual honesty-র প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। তা হলেই দেখব যে, কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয়েছে। অন্য দিকে আমাদের moral ও personal responsibilityর বোধকে জাগাতে হবে, Law, Justice ও Equality-র যা লুপ্ত হয়ে গেছে তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে— এ-সকল বিষয়ে আমাদের শিক্ষা আহরণ করতে হবে। আমাদের মধ্যে বিশ্বকে না পেলে আমরা নিজেকে পাব না। তাই বিশ্বরূপকে প্রতিষ্ঠিত করে আমরা আত্মপরিচয় লাভ করব এবং আমাদের বাণী বিশ্বকে দেব।

এ দেশে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, কিন্তু সেখান থেকে cast iron ও rigid standardized product তৈরি হচ্ছে। শান্তিনিকেতনে natural-ness-এর স্থান হয়েছে, আশা করি বিশ্বভারতীতে সেই spontaneityর বিকাশের দিকে দৃষ্টি থাকবে। য়ুনিভার্সিটিকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলা যেতে পারে। এশিয়ার

genius য়ুনিভার্সাল হিউম্যানিজ্‌মের দিকে, অতএব ভারতের এবং এশিয়ার interest-এ এরূপ একটি য়ুনিভার্সিটির প্রয়োজন আছে। পূর্বে যে সংঘ ও বিহারের দ্বারা ভারতের সার্থকতা-সাধন হয়েছিল, তাদেরই এ যুগের উপযোগী করে, সেই পুরাতন আরণ্যককে বিশ্বভারতী-রূপে এখানে পত্তন করা হয়েছে।[১]

৮ পৌষ ১৩২৮। শান্তিনিকেতন মাঘ ১৩২৮

১ বিশ্বভারতী পরিষদ্‌-সভার প্রতিষ্ঠা-উৎসবে সভাপতি ব্রজেন্দ্রনাথ শীল -কর্তৃক প্রবন্ধ জ্ঞাপন

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম

প্রতিষ্ঠাদিবসের উপদেশ

হে সৌম্য মানবকগণ, অনেককাল পূর্বে আমাদের এই দেশ, এই ভারতবর্ষ, সকল বিষয়ে যথার্থ বড়ো ছিল— তখন এখানকার লোকেরা বীর ছিলেন; তাঁরাই আমাদের পূর্বপুরুষ।

যথার্থ বড়ো কাহাকে বলে? আমাদের পূর্বপুরুষেরা কী হলে আপনাদের বড়ো মনে করতেন? আজকাল আমাদের মনে তাঁদের সেই বড়ো ভাবটি নেই বলেই ধনকেই আমরা বড়ো হবার উপায় মনে করি, ধনীকেই আমরা বলি বড়োমানুষ। তাঁরা তা বলতেন না। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে যাঁরা বড়ো ছিলেন সেই ব্রাহ্মণরা ধনকে তুচ্ছ করতেন। তাঁদের বেশভূষা বিলাসিতা কিছুই ছিল না। অথচ বড়ো বড়ো রাজারা এসে তাঁদের কাছে মাথা নত করতেন।

যে মানুষ কাপড়চোপড় জুতোছাতা নিয়ে নিজেকে বড়ো মনে করে, ভেবে দেখো দেখি সে কত ছোটো। জুতো কি মানুষকে বড়ো করতে পারে। দামি জুতো দামি কাপড় কি আমাদের কোনো গুণের পরিচয় দেয়। আমাদের প্রাচীনকালে যে-সব ঋষিদের পায়ে জুতো ছিল না, গায়ে পোশাক ছিল না, তাঁরা কি সাহেবের বাড়ির জুতো এবং বিলাতি দোকানের কাপড় পরা আমাদের চেয়ে অনেক বড়ো ছিলেন না। আজ যদি আমাদের সেই যাজ্ঞবল্ক্য, সেই বশিষ্ঠ ঋষি খালি গায়ে খালি পায়ে তাঁদের সেই জ্যোতির্ময় দৃষ্টি, তাঁদের সেই পিঙ্গল জটাভার নিয়ে আমাদের মাঝখানে এসে দাঁড়ান, তা হলে সমস্ত দেশের মধ্যে এমন কোন্ রাজা এমন কত বড়ো সাহেব আছেন যিনি তাঁর জুতো ফেলে দিয়ে মাথার তাজ নামিয়ে, সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলা নিয়ে নিজেকে কৃতার্থ না মনে করেন। আজ এমন কে আছে যে তার গাড়িজুড়ি অট্টালিকা এবং সোনার চেন নিয়ে তাঁদের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে।

তাঁরাই আমাদের পিতামহ ছিলেন, সেই পূজ্য ব্রাহ্মণদের আমরা নমস্কার করি। কেবল মাথা নত ক'রে নমস্কার করা নয়— তাঁরা যে শিক্ষা দিয়েছেন তাই গ্রহণ করি, তাঁরা যে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তার অনুসরণ করি। তাঁদের মতো হবার চেষ্টা করাই হচ্ছে তাঁদের প্রতি ভক্তি করা।

তাঁরা বড়ো হয়েছিলেন কী গুণে। তাঁরা সত্যকে সকলের চেয়ে বড়ো বলে জানতেন— মিথ্যার কাছে তাঁরা মাথা নিচু করেন নি। সত্য কী তাই জানবার জন্যে সমস্ত জীবন তাঁরা কঠিন তপস্যা করতেন— কেবল আমোদ-প্রমোদ করেই জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া তাঁদের লক্ষ্য ছিল না। যাতে সত্য জানবার কিছুমাত্র ব্যাঘাত করত তাকে তাঁরা অনায়াসে পরিত্যাগ করতেন। মনে সত্য জানবার অবিশ্রাম চেষ্টা করতেন, মুখে সত্য বলতেন, এবং সত্য বলে যা জানতেন কাজেও তাই পালন করতেন, সেজন্যে কাউকে ভয় করতেন না। আমরা টাকাকড়ি জুতোছাতা পাবার জন্যে যেরকম প্রাণপণ খেটে মরি, তাঁরা সত্যকে পাবার জন্যে তার চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট স্বীকার করতেন। সেইজন্যে তাঁরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি বড়ো ছিলেন।

তাঁরা অভয় ছিলেন, ধর্ম ছাড়া আর-কিছুকেই ভয় করতেন না। তাঁদের মনের মধ্যে এমন-একটি তেজ ছিল, সর্বদাই এমন-একটি আনন্দ ছিল যে, তাঁরা কোনো রাজা-মহারাজার অন্যায় শাসনকে গ্রাহ্য করতেন না, এমন-কি, মৃত্যুকেও তাঁরা ভয় করতেন না। তাঁরা এটা বেশ জানতেন যে, তাঁদের কাছ থেকে কেড়ে নেবার তো কিছু নেই— বেশভূষা ধনসম্পদ গেলে তো তাঁদের কোনো ক্ষতিই হয় না। তাঁদের যা-কিছু আছে সব মনের মধ্যে। তাঁরা যে সত্য জানতেন তা তো দস্যু কিম্বা রাজা হরণ করতে পারত না। তাঁরা নিশ্চয় জানতেন মৃত্যু ভয়ের বিষয় নয়। মৃত্যুতে এই শরীরটা মাত্র যায়, কিন্তু অন্তরের জিনিস যায় না।

তাঁরা সকলের মঙ্গলের জন্যে ভালোর জন্যে চিন্তা করতেন, কিসে সকলের ভালো হবে সেইটে তাঁরা ধ্যান করতেন এবং যাতে ভালো হয় সেইটে তাঁরা ব্যবস্থা করতেন। কার কী করা উচিত সেইটে সকলে তাঁদের কাছে জানতে আসত। কিসে ঘরের লোকের মঙ্গল হয় তাই জানবার জন্য গৃহস্থ লোকেরা তাঁদের কাছে আসত— কিসে প্রজাদের ভালো হয় তাই পরামর্শ নেবার জন্যে রাজারা তাঁদের কাছে আসত। পৃথিবীর সকলের ভালোর জন্য তাঁরা সমস্ত আমোদ-প্রমোদ সমস্ত বিলাসিতা ত্যাগ করে চিন্তা করতেন।

কিন্তু তখন কি কেবল ব্রাহ্মণ-ঋষিরাই ছিলেন। তা নয়। রাজারাও ছিলেন, রাজার সৈন্যসামন্ত ছিল। রাজ্যের প্রয়োজনে তাঁদের যুদ্ধবিগ্রহ করতে হত। কিন্তু যুদ্ধের সময়েও তাঁরা ধর্ম ভুলতেন না। যে-লোকের হাতে অস্ত্র নেই তাকে মারতেন না, শরণাপন্নকে বধ করতেন না, রথের উপর চড়ে নীচের লোকদের উপর অস্ত্র চালাতেন না। সৈন্যে-সৈন্যেই যুদ্ধ চলত, কিন্তু শত্রুপক্ষের দেশের নিরীহ প্রজাদের ঘরদুয়োর জ্বালিয়ে দিতেন না। রাজার ছেলের যখন বড়ো বয়স হত তখন রাজা

আপনার সমস্ত টাকাকড়ি রাজত্ব ছেলের হাতে দিয়ে সত্য জানবার জন্য, ঈশ্বরের প্রতি সমস্ত মন দেবার জন্যে বনে চলে যেতেন। তখন আর তাঁদের হীরা-মুক্তো ছাতা-জুতো লোকজন কিছুই থাকত না। রাজ্যেশ্বর রাজা ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দীনহীনের মতো সমস্ত ছেড়ে যেতেন। তাঁরা জানতেন রাজ্য টাকাকড়ি বাইরের জিনিস, তাতেই যে মানুষ বড়ো হয় তা নয়, বড়ো হবার জিনিস ভিতরে। তবে ধর্মনিয়মমতে রাজত্ব করা রাজার কর্তব্য, সুতরাং সেজন্যে প্রাণ দেওয়া দরকার হলে তাও দিতেন— কিন্তু যুবরাজ বড়ো হয়ে উঠলে যখন সে কর্তব্যের শেষ হয় তখন আর তাঁরা রাজত্ব আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকতেন না।

গৃহস্থদেরও ঐরকম নিয়ম ছিল। যখন জ্যেষ্ঠ পুত্র বড়ো হয়ে উঠত তখন তারই হাতে সমস্ত সংসার দিয়ে তাঁরা দরিদ্র বেশে তপস্যা করতে চলে যেতেন। যতদিন সংসারে থাকতে হত ততদিন প্রাণপণে তাঁরা সংসারের কাজ করতেন। আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী অতিথি অভ্যাগত দরিদ্র অনাথ কাউকেই ভুলতেন না— প্রাণপণে নিজের সুখ নিজের স্বার্থ দূরে রেখে তাদেরই সেবা করতেন— তার পরে সময় উত্তীর্ণ হলেই আর ধনসম্পদ ঘরদুয়ারের প্রতি তাকাতেন না।

তখন যাঁরা বাণিজ্য করতেন তাঁদেরও ধর্মপথে সত্যপথে চলতে হত। কাউকে ঠকানো, অন্যায় সুদ নেওয়া, কৃপণের মতো সমস্ত ধন কেবল নিজের জন্যেই জড়ো করে রাখা, এ তাঁদের দ্বারা হত না।

যাঁরা রাজত্ব করতেন, যাঁরা বাণিজ্য করতেন, যাঁরা কর্ম করতেন, তাঁদের সকলের জন্যই ব্রাহ্মণেরা চিন্তা করতেন। যাতে সমাজে ধর্ম থাকে, সত্য থাকে, শৃঙ্খলা থাকে, যাতে ভালো হয়, এই তাঁদের একান্ত লক্ষ্য ছিল। সেইজন্য তাঁদের আদর্শে তাঁদের উপদেশে তখনকার সকল লোকেই ভালো হয়ে চলতে পারত। সমস্ত সমাজের মধ্যে সেইজন্যে এত উন্নতি এত শ্রী ছিল।

সেই তখনকার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরা যে-শিক্ষা যে-ব্রত অবলম্বন করে বড়ো হয়ে উঠেছিলেন, বীর হয়ে উঠেছিলেন, সেই শিক্ষা সেই ব্রত গ্রহণ করবার জন্যেই তোমাদের এই নির্জন আশ্রমের মধ্যে আমি আহ্বান করেছি। তোমরা আমার কাছে এসেছ— আমি সেই প্রাচীন ঋষিদের সত্যবাক্য তাঁদের উজ্জ্বল চরিত মনের মধ্যে সর্বদা ধারণ করে রেখে তোমাদের সেই মহাপুরুষদের পথে চালনা করতে চেষ্টা করব— আমাদের ব্রতপতি ঈশ্বর আমাকে সেই বল সেই ক্ষমতা দান করুন। যদি আমাদের চেষ্টা সফল হয় তবে তোমরা প্রত্যেকে বীরপুরুষ হয়ে উঠবে— তোমরা ভয়ে কাতর হবে না, দুঃখে বিচলিত হবে না, ক্ষতিতে ম্রিয়মাণ হবে না, ধনের গর্বে স্ফীত হবে না; মৃত্যুকে

গ্রাহ্য করবে না, সত্যকে জানতে চাইবে, মিথ্যাকে মন থেকে কথা থেকে কাজ থেকে দূর করে দেবে, সর্বদা জগতের সকল স্থানেই মনে এবং বাইরে এক ঈশ্বর আছেন এইটে নিশ্চয় জেনে আনন্দমনে সকল দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত থাকবে। কর্তব্যকর্ম প্রাণপণে করবে, সংসারের উন্নতি ধর্মপথে থেকে করবে, অথচ যখন কর্তব্যবোধে ধনসম্পদ ও সংসার ত্যাগ করতে হবে তখন কিছুমাত্র ব্যাকুল হবে না। তা হলে তোমাদের দ্বারা ভারতবর্ষ আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠবে— তোমরা যেখানে থাকবে সেইখানেই মঙ্গল হবে, তোমরা সকলের ভালো করবে এবং তোমাদের দেখে সকলে ভালো হবে।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা কিরূপ শিক্ষা ও ব্রত অবলম্বন করতেন? তাঁরা বাল্যকালে গৃহ ছেড়ে নির্জনে গুরুর বাড়িতে যেতেন। সেখানে খুব কঠিন নিয়মে নিজেকে সংযত করে থাকতে হত। গুরুকে একান্তমনে ভক্তি করতেন, গুরুর সমস্ত কাজ করে দিতেন। গুরুর জন্যে কাঠ কাটা, জল তুলে আনা, তাঁর গোরু চরানো, তাঁর জন্যে গ্রাম থেকে ভিক্ষে করে আনা, এই-সমস্ত তাঁদের কাজ ছিল, তা তাঁরা যত বড়ো ধনীর পুত্র হোন-না। শরীর-মনকে একেবারে পবিত্র রাখতে হবে— তাঁদের শরীরে ও মনে কোনো-রকম দোষ একেবারে স্পর্শ করত না। গেরুয়া বস্ত্র পরতেন, কঠিন বিছানায় শুতেন, পায়ে জুতো নেই, মাথায় ছাতা নেই— সাজসজ্জা বড়োমানুষি কিছুমাত্র নেই। সমস্ত মনের সমস্ত চেষ্টা কেবল শিক্ষালাভে, কেবল সত্যের সন্ধানে, কেবল নিজের দুষ্প্রবৃত্তি-দমনে, নিজের ভালো গুণকে ফুটিয়ে তুলতে নিযুক্ত থাকত।

তোমাদের সেইরকম কষ্ট স্বীকার করে সেই কঠিন নিয়মে, সকলপ্রকার বড়োমানুষিকে তুচ্ছ করে দিয়ে এখানে গুরুগৃহে বাস করতে হবে। গুরুকে সর্বতোভাবে শ্রদ্ধা করবে, মনে বাক্যে কাজে তাঁকে লেশমাত্র অবজ্ঞা করবে না। শরীরকে পবিত্র করে রাখবে— কোনো দোষ যেন স্পর্শ না করে। মনকে গুরু-উপদেশের সম্পূর্ণ অধীন করে রাখবে।

আজ থেকে তোমরা সত্যব্রত গ্রহণ করলে। মিথ্যাকে কায়মনোবাক্যে দূরে রাখবে। প্রথমত সত্য জানবার জন্য সবিনয়ে সমস্ত মন বুদ্ধি ও চেষ্টা দান করবে, তার পরে যা সত্য ব'লে জানবে তা নির্ভয়ে সতেজে পালন ও ঘোষণ করবে।

আজ থেকে তোমাদের অভয়ব্রত। ধর্মকে ছাড়া জগতে তোমাদের ভয় করবার আর কিছুই নেই। বিপদ না, মৃত্যু না, কষ্ট না— কিছুই তোমাদের ভয়ের বিষয় নয়। সর্বদা দিবারাত্রি প্রফুল্লচিত্তে প্রসন্নমুখে শ্রদ্ধার সঙ্গে সত্য-লাভে ধর্ম-লাভে নিযুক্ত থাকবে।

আজ থেকে তোমাদের পুণ্যব্রত। যা-কিছু অপবিত্র কলুষিত, যা-কিছু প্রকাশ করতে লজ্জা বোধ হয়, তা সর্বপ্রযত্নে প্রাণপণে শরীর-মন থেকে দূর করে প্রভাতের

শিশিরসিক্ত ফুলের মতো পুণ্যে ধর্মে বিকশিত হয়ে থাকবে।

আজ থেকে তোমাদের মঙ্গলব্রত। যাতে পরস্পরের ভালো হয় তাই তোমাদের কর্তব্য। সেজন্যে নিজের সুখ নিজের স্বার্থ বিসর্জন।

এক কথায় আজ থেকে তোমাদের ব্রহ্মব্রত। এক ব্রহ্ম তোমাদের অন্তরে বাহিরে সর্বদা সকল স্থানেই আছেন। তাঁর কাছ থেকে কিছুই লুকোবার জো নেই। তিনি তোমাদের মনের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে দেখছেন। যখন যেখানে থাক, শয়ন কর, উপবেশন কর, তাঁর মধ্যেই আছ, তাঁর মধ্যেই সঞ্চরণ করছ। তোমার সর্বাঙ্গে তাঁর স্পর্শ রয়েছে —তোমার সমস্ত ভাবনা তাঁরই গোচরে রয়েছে। তিনিই তোমাদের একমাত্র ভয়, তিনিই তোমাদের একমাত্র অভয়।

প্রত্যহ অন্তত একবার তাঁকে চিন্তা করবে। তাঁকে চিন্তা করবার মন্ত্র আমাদের বেদে আছে। এই মন্ত্র আমাদের ঋষিরা দ্বিজেরা প্রত্যহ উচ্চারণ ক'রে জগদীশ্বরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হতেন। সেই মন্ত্র, হে সৌম্য, তুমিও আমার সঙ্গেসঙ্গে একবার উচ্চারণ করো :

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

৭ পৌষ ১৩০৮ মাঘ ১৩০৮

প্রথম কার্যপ্রণালী

বিনয়সম্ভাষণমেতৎ—

আপনার প্রতি আমি যে ভার অর্পণ করিয়াছি আপনি তাহা ব্রতস্বরূপে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহাতে আমি বড়ো আনন্দলাভ করিয়াছি। একান্তমনে কামনা করি, ঈশ্বর আপনাকে এই ব্রতপালনের বল ও নিষ্ঠা দান করুন।

আমি আপনাকে পূর্বেই বলিয়াছি, বালকদিগের অধ্যয়নের কাল একটি ব্রতযাপনের কাল। মনুষ্যত্বলাভ স্বার্থ নহে, পরমার্থ— ইহা আমাদের পিতামহেরা জানিতেন। এই মনুষ্যত্বলাভের ভিত্তি যে শিক্ষা তাহাকে তাঁহারা ব্রহ্মচর্যব্রত বলিতেন। এ কেবল পড়া মুখস্থ করা এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া নহে— সংযমের দ্বারা, ভক্তিশ্রদ্ধার দ্বারা, শুচিতা দ্বারা, একাগ্র নিষ্ঠা দ্বারা সংসারাশ্রমের জন্য এবং সংসারাশ্রমের অতীত ব্রহ্মের সহিত অনন্ত যোগ সাধনের জন্য প্রস্তুত হইবার সাধনাই ব্রহ্মচর্যব্রত।

ইহা ধর্মব্রত। পৃথিবীতে অনেক জিনিসই কেনাবেচার সামগ্রী বটে, কিন্তু ধর্ম পণ্যদ্রব্য নহে। ইহা এক পক্ষে মঙ্গল ইচ্ছার সহিত দান ও অপর পক্ষে বিনীত ভক্তির সহিত

গ্রহণ করিতে হয়। এইজন্য প্রাচীন ভারতে শিক্ষা পণ্যদ্রব্য ছিল না। এখন যাঁহারা শিক্ষা দেন তাঁহারা শিক্ষক, তখন যাঁহারা শিক্ষা দিতেন তাঁহারা গুরু ছিলেন। তাঁহারা শিক্ষার সঙ্গে এমন একটি জিনিস দিতেন যাহা গুরুশিষ্যের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ ব্যতীত দানপ্রতিগ্রহ হইতেই পারে না।

ছাত্রদিগের সহিত এইরূপ পারমার্থিক সম্বন্ধ স্থাপনই শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু এ কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, উদ্দেশ্য যত উচ্চ হইবে তাহার উপায়ও তত দুরূহ ও দুর্লভ হইবে। এ-সব কার্য ফরমাসমতো চলে না। শিক্ষক পাওয়া যায়, গুরু সহজে পাওয়া যায় না। এইজন্য যথাসম্ভব লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ধৈর্যের সহিত সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে হয়। সমস্ত অবস্থা বিবেচনায় যতটা মঙ্গলসাধন সম্ভবপর তাহাই শিরোধার্য করিয়া লইতে হইবে এবং নিজের অযোগ্যতা স্মরণ করিয়া নিজেকে প্রত্যহ সাধনার পথে অগ্রসর করিতে হইবে।

মঙ্গলব্রত গ্রহণ করিলে বাধাবিরোধ-অশান্তির জন্য মনকে প্রস্তুত করিতে হয়— অনেক অন্যায় আঘাতও ধৈর্যের সহিত সহ্য করিতে হইবে। সহিষ্ণুতা ক্ষমা ও কল্যাণ-ভাবের দ্বারা সমস্ত বিরোধ-বিপ্লবকে জয় করিতে হইবে।

ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে স্বদেশের প্রতি বিশেষরূপে ভক্তিশ্রদ্ধাবান্ করিতে চাই। পিতামাতায় যেরূপ দেবতার বিশেষ আবির্ভাব আছে— তেমনি আমাদের পক্ষে আমাদের স্বদেশে, আমাদের পিতৃপিতামহদিগের জন্ম ও শিক্ষা -স্থানে দেবতার বিশেষ সত্তা আছে। পিতামাতা যেমন দেবতা তেমনি স্বদেশও দেবতা। স্বদেশকে লঘুচিত্তে অবজ্ঞা, উপহাস, ঘৃণা - এমন-কি, অন্যান্য দেশের তুলনায় ছাত্ররা যাহাতে খর্ব করিতে না শেখে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে চাই। আমাদের স্বদেশীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলিয়া আমরা কখনো সার্থকতা লাভ করিতে পারিব না। আমাদের দেশের যে বিশেষ মহত্ব ছিল সেই মহত্বের মধ্যে নিজের প্রকৃতিকে পূর্ণতা দান করিতে পারিলেই আমরা যথার্থভাবে বিশ্বজনীনতার মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে পারিব— নিজেকে ধ্বংস করিয়া অন্যের সহিত মিলাইয়া দিয়া কিছুই হইতে পারিব না— অতএব, বরঞ্চ অতিরিক্তমাত্রায় স্বদেশাচারের অনুগত হওয়া ভালো তথাপি মুগ্ধভাবে বিদেশীর অনুকরণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করা কিছু নহে।

ব্রহ্মচর্য-ব্রতে ছাত্রদিগকে কাঠিন্য অভ্যাস করিতে হইবে। বিলাস ও ধনাভিমান পরিত্যাগ করিতে হইবে। ছাত্রদের মন হইতে ধনের গৌরব একেবারে বিলুপ্ত করিতে চাই। যেখানে তাহার কোনো লক্ষণ দেখা যাইবে সেখানে তাহা একেবারে নষ্ট করা কর্তব্য হইবে। আমার মনে হইয়াছে…র পুত্র…র শৌখিন দ্রব্যের প্রতি কিঞ্চিৎ

আসক্তি আছে— সেটা দমন করিতে হইবে। বেশভূষা সম্বন্ধে বিলাসিতা পরিত্যাগ করিতে হইবে। কেহ দারিদ্র্যকে যেন লজ্জাজনক ঘৃণাজনক না মনে করে। অশনে বসনেও শৌখিনতা দূর করা চাই।

দ্বিতীয়ত নিষ্ঠা। উঠা বসা পড়া খেলা স্নান আহার ও সর্বপ্রকার পরিচ্ছন্নতা ও শুচিতা সম্বন্ধে সমস্ত নিয়ম একান্ত দৃঢ়তার সহিত পালনীয়। ঘরে বাহিরে শয্যায় বসনে ও শরীরে কোনোপ্রকার মলিনতা প্রশ্রয় দেওয়া না হয়। যেখানে কোনো ছাত্রের কাপড় কম আছে সেখানে সে যেন কাপড়-কাচা সাবান দিয়া স্বহস্তে প্রত্যহ নিজের কাপড় কাচে, ও ব্যবহার্য গাড়ু মাজিয়া পরিষ্কার রাখে। এবং ঘরের যে অংশে তাহার বিছানা কাপড়চোপড় ও বই প্রভৃতি থাকে সে অংশ যেন প্রত্যহ যথাসময়ে যথানিয়মে পরিষ্কার তকতকে করিয়া রাখে। ছেলেরা প্রত্যহ পর্যায়ক্রমে তাহাদের অধ্যাপকদের ঘরও পরিষ্কার করিয়া গুছাইয়া রাখিলে ভালো হয়। অধ্যাপকদের সেবা করা ছাত্রদের অবশ্যকর্তব্যের মধ্যে নির্ধারিত করা চাই।

তৃতীয়ত ভক্তি। অধ্যাপকদের প্রতি ছাত্রদের নির্বিচারে ভক্তি থাকা চাই। তাঁহারা অন্যায় করিলেও তাহা বিনা বিদ্রোহে নম্রভাবে সহ্য করিতে হইবে। কোনো-মতে তাঁহাদের সমালোচনা বা নিন্দায় যোগ দিতে পারিবে না। অধ্যাপকেরা যদি কখনো পরস্পরের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন তবে সে সময়ে কোনো ছাত্র সেখানে উপস্থিত না থাকে তৎপ্রতি যত্নবান হইতে হইবে। কোনো অধ্যাপক ছাত্রদের সমক্ষে অন্য অধ্যাপকদের প্রতি অবজ্ঞাজনক ব্যবহার, অসহিষ্ণুতা বা রোষ প্রকাশ না করেন সে দিকে সকলের মনোযোগ থাকা কর্তব্য। ছাত্রগণ অধ্যাপকদিগকে প্রত্যহ প্রণাম করিবে। অধ্যাপকগণ পরস্পরকে নমস্কার করিবেন। পরস্পরের প্রতি শিষ্টাচার ছাত্রদের নিকট যেন আদর্শস্বরূপ বিদ্যমান থাকে।

বিলাসত্যাগ, আত্মসংযম, নিয়মনিষ্ঠা, গুরুজনে ভক্তি সম্বন্ধে আমাদের দেশের প্রাচীন আদর্শের প্রতি ছাত্রদের মনোযোগ অনুকূল অবসরে আকর্ষণ করিতে হইবে।

যাঁহারা (ছাত্র বা অধ্যাপক) হিন্দুসমাজের সমস্ত আচার যথাযথ পালন করিতে চান তাঁহাদিগকে কোনোপ্রকারে বাধা দেওয়া বা বিদ্রূপ করা এ বিদ্যালয়ের নিয়ম-বিরুদ্ধ। রন্ধনশালায় বা আহারস্থানে হিন্দু-আচার-বিরুদ্ধ কোনো অনিয়মের দ্বারা কাহাকেও ক্লেশ দেওয়া হইবে না।

আহ্নিক। ছাত্রদিগকে গায়ত্রীমন্ত্র মুখস্থ করাইয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। আমি যে ভাবে গায়ত্রী ব্যাখ্যা করি তাহা সংক্ষেপে নিম্নে লিখিলাম :

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ—

এই অংশ গায়ত্রীর ব্যাহৃতি নামে খ্যাত। চারি দিক হইতে আহরণ করিয়া আনার নাম ব্যাহৃতি। প্রথম ধ্যানকালে ভূর্লোক ভুবর্লোক ও স্বর্লোক অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বজগৎকে মনের মধ্যে আহরণ করিয়া আনিতে হইবে— তখনকার মতো মনে করিতে হইবে আমি সমস্ত বিশ্বজগতের মধ্যে দাঁড়াইয়াছি— আমি এখন কেবলমাত্র কোনো বিশেষ দেশবাসী নহি। বিশ্বজগতের মধ্যে দাঁড়াইয়া বিশ্বজগতের যিনি সবিতা, যিনি সৃষ্টিকর্তা, তাঁহারই বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করিতে হইবে। মনে করিতে হইবে এই ধারণাতীত বিপুল বিশ্বজগৎ এই মুহূর্তে এবং প্রতি মুহূর্তেই তাঁহা হইতে বিকীর্ণ হইতেছে। তাঁহার এই-যে অসীম শক্তি যাহার দ্বারা ভূর্ভুবঃস্বর্লোক অবিশ্রাম প্রকাশিত হইতেছে, আমার সহিত তাঁহার অব্যবহিত সম্পর্ক কী সূত্রে। কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিব। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ— যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তিসকল প্রেরণ করিতেছেন, সেই ধীসূত্রেই তাঁহাকে ধ্যান করিব। সূর্যের প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষভাবে কিসের দ্বারা জানি। সূর্য আমাদিগকে যে কিরণ প্রেরণ করিতেছে সেই কিরণের দ্বারা। সেইরূপ বিশ্বজগতের সবিতা আমাদের মধ্যে অহরহ যে ধীশক্তি প্রেরণ করিতেছেন, যে শক্তি থাকার দরুন আমি নিজেকে ও বাহিরের সমস্ত বিশ্বব্যাপারকে উপলব্ধি করিতেছি— সেই ধীশক্তি তাঁহারই শক্তি এবং সেই ধীশক্তি দ্বারাই তাঁহারই শক্তি প্রত্যক্ষভাবে অন্তরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অন্তরতম রূপে অনুভব করিতে পারি। বাহিরে যেমন ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের সবিতা রূপে তাঁহাকে জগৎচরাচরের মধ্যে উপলব্ধি করি, অন্তরের মধ্যেও সেইরূপ আমার ধীশক্তির অবিশ্রাম প্রেরয়িতা বলিয়া তাঁহাকে অব্যবহিতভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। বাহিরে জগৎ এবং আমার অন্তরে ধী, এ দুইই একই শক্তির বিকাশ— ইহা জানিলে জগতের সহিত আমার চেতনার এবং আমার চেতনার সহিত সেই সচ্চিদানন্দের ঘনিষ্ঠ যোগ অনুভব করিয়া সংকীর্ণতা হইতে স্বার্থ হইতে ভয় হইতে বিষাদ হইতে মুক্তি লাভ করি। গায়ত্রীমন্ত্রে বাহিরের সহিত অন্তরের ও অন্তরের সহিত অন্তরতমের যোগসাধন করে— এইজন্যই আর্যসমাজে এই মন্ত্রের এত গৌরব :

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥

ব্রহ্মধারণার পক্ষে এই মন্ত্রই আমি বালকদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সরল বলিয়া মনে করি। ঈশ্বর জলে স্থলে অগ্নিতে ওষধি-বনস্পতিতে সর্বত্র আছেন, এই কথা মনে করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করা শান্তিনিকেতনের দিগন্তপ্রসারিত মাঠের মধ্যে অত্যন্ত সহজ। সেখানকার নির্মল আলোক আকাশ এবং প্রান্তর বিশ্বেশ্বরের দ্বারা পরিপূর্ণ, এ কথা

মনে করিয়া ভক্তি করা ছেলেদের পক্ষেও কঠিন নহে। এইজন্য গায়ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে এই মন্ত্রটিও ছেলেরা শিক্ষা করে। গায়ত্রী সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্বেও এই মন্ত্রটি তাহারা ব্যবহার করিতে পারে।

ছাত্রগণ পাঠ আরম্ভ করিবার পূর্বে সকলে সমস্বরে 'ওঁ পিতা নোঽসি' উচ্চারণপূর্বক প্রণাম করে। ঈশ্বর যে আমাদের পিতা এবং তিনিই যে আমাদিগকে পিতার ন্যায় জ্ঞান শিক্ষা দিতেছেন, ছাত্রদিগকে তাহা প্রত্যহ স্মরণ করা চাই। অধ্যাপকেরা উপলক্ষমাত্র, কিন্তু যথার্থ যে জ্ঞানশিক্ষা তাহা আমাদের বিশ্বপিতার নিকট হইতে পাই। তাহা পাইতে হইলে চিত্তকে সর্বপ্রকার পাপ মলিনতা হইতে মুক্ত করিতে হয়, সে জ্ঞান পাইতে হইলে ভক্তিসহকারে ঈশ্বরের কাছে প্রত্যহ প্রার্থনা করিতে হয়— সেইজন্যই ঐ মন্ত্রে আছে

বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব—
যদ্‌ভদ্রং তন্ন আসুব।

'হে দেব, হে পিত, আমাদের সমস্ত পাপ দূর করো, যাহা ভদ্র তাহাই আমাদিগকে প্রেরণ করো।'

ব্রহ্মচারীদের পক্ষে জীবনের প্রতিদিনকে সকলপ্রকার শারীরিক মানসিক পাপ হইতে নির্মল করিবার জন্য মনুষ্যত্বলাভের জন্য প্রস্তুত হইবার ইহাই প্রকৃষ্ট মন্ত্র—

যদ্‌ভদ্রং তন্ন আসুব।

বক্তৃতা দিতে অনেক সময়েই চিত্তবিক্ষেপ ঘটায়। অধ্যাত্মসাধনায় ভাবান্দোলনের মূল্য যে অধিক তাহা আমি মনে করি না। ভাবাবেশের অভ্যাস মাদকসেবনের ন্যায় চিত্তদৌর্বল্যজনক। গভীর তত্ত্বগর্ভ সংক্ষিপ্ত প্রাচীন মন্ত্রের ন্যায় ধ্যানের সহায় কিছুই নাই। সাধনার পথে যত অগ্রসর হওয়া যায় এই-সকল মন্ত্রের অন্তরের মধ্যে ততই গভীরতর রূপে প্রবেশ করা যায়— ইহারা কোথাও যেন বাধা দেয় না। এইজন্য আমি ছাত্রদিগকে উপনিষদের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া থাকি। মন্ত্র যাহাতে মুখস্থ কথার মতো না হইয়া যায় সেজন্য তাহাদিগকে মাঝে মাঝে ব্যাখ্যা করিয়া স্মরণ করাইয়া দিয়া থাকি। কিছুকাল আমার অনুপস্থিতিবশত নূতন ছাত্রদিগকে মন্ত্র বুঝাইয়া দিবার অবকাশ পাই নাই। আপনার সঙ্গে যে ছাত্রদিগকে লইয়া যাইবেন তাহাদিগকে যদি আহ্নিকের জন্য উপনিষদের কোনো মন্ত্র বুঝাইয়া বলিয়া দেন তো ভালোই হয়।

এক্ষণে, আপনার কার্যপ্রণালীর কথা বিবৃত করিয়া বলা যাক।

মনোরঞ্জনবাবু, জগদানন্দবাবু ও সুবোধবাবুকে[১] লইয়া একটি সমিতি স্থাপিত হইবে। মনোরঞ্জনবাবু তাহার সভাপতি হইবেন। আপনি উক্ত সমিতির নির্দেশমতে বিদ্যালয়ের কার্যসম্পাদন করিতে থাকিবেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শয্যা হইতে গাত্রোত্থান স্নান আহ্নিক আহার পড়া খেলা ও শয়ন সম্বন্ধে কাল নির্ধারণ তাঁহারা করিয়া দিবেন— যাহাতে সেই নিয়ম পালিত হয় আপনি তাহাই করিবেন।

বিদ্যালয়ের ভৃত্যনিয়োগ, তাহাদের বেতননির্ধারণ বা তাহাদিগকে অবসর দান, তাঁহাদের পরামর্শমত আপনি করিবেন।

মাস শেষে আগামী মাসের একটি আনুমানিক বাজেট সমিতির নিকট হইতে পাস করাইয়া লইবেন। বাজেটের অতিরিক্ত খরচ করিতে হইলে তাঁহাদের লিখিত সম্মতি লইবেন।

খাতায় প্রত্যহ তাঁহাদের সহি লইবেন। সপ্তাহ অন্তর সপ্তাহের হিসাব ও মাসান্তে মাসকাবার তাঁহাদের স্বাক্ষরসহ আমাকে দিতে হইবে।

সমিতির প্রস্তাবিত কোনো নিয়মের পরিবর্তন খাতায় লিখিয়া লইয়া আমাকে জানাইবেন।

সায়াহ্নে ছেলেদের খেলা শেষ হইয়া গেলে সমিতির নিকট আপনার সমস্ত মন্তব্য জানাইবেন ও খাতায় সহি লইবেন।

ভাণ্ডারের ভার আপনার উপর। জিনিসপত্র ও গ্রন্থ প্রভৃতি সমস্ত আপনার জিম্মায় থাকিবে। জিনিসপত্রের তালিকায় আপনি সমিতির স্বাক্ষর লইবেন। কোনো জিনিস নষ্ট হইলে, হারাইলে বা বাড়িলে তাঁহাদের স্বাক্ষরসহ তাহা জমাখরচ করিয়া লইবেন।

আহারের সময় উপস্থিত থাকিয়া ছাত্রদের ভোজন পর্যবেক্ষণ করিবেন।

ছাত্রদের স্বাস্থ্যের প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখিবেন।

তাহাদের জিনিসপত্রের পারিপাট্য, তাহাদের ঘর শরীর ও বেশভূষার নির্মলতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি মনোযোগী হইবেন।

ছাত্রদের চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহজনক কিছু লক্ষ্য করিলেই সমিতিকে জানাইয়া তাহা আরম্ভেই সংশোধন করিয়া লইবেন।

বিদ্যালয়ের ভিতরে বাহিরে, রান্নাঘরে ও তাহার চতুর্দিকে, পায়খানার কাছে কোনোরূপ অপরিষ্কার না থাকে আপনি তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন।

১ মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদানন্দ রায় ও সুবোধচন্দ্র মজুমদার

গোশালায় গোরু মহিষ ও তাঁহাদের খাদ্যের ও ভৃত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

বিদ্যালয়ের সংলগ্ন ফুল ও তরকারির বাগান আপনার হাতে। সেজন্য বীজ ক্রয়, সার সংগ্রহ ও মধ্যে মধ্যে ঠিকা লোক নিয়োগ সমিতিকে জানাইয়া করিতে পারিবেন।

শান্তিনিকেতনের আশ্রমের সহিত বিদ্যালয়ের সংস্রব প্রার্থনীয় নহে।[১] জিনিসপত্র ক্রয়, বাজার করা ও বাগান তৈরির সহায়তায় মাঝে মাঝে আশ্রমের মালীদের প্রয়োজন হইতে পারে— কিন্তু অন্যান্য ভৃত্যদের সহিত যোগরক্ষা না করাই শ্রেয়।

ঠিকা লোক প্রভৃতির প্রয়োজন হইলে সর্দারকে বা মালীদিগকে, রবীন্দ্র সিংহকে বা তাহার সহকারীকে জানাইয়া সংগ্রহ করিবেন।

শান্তিনিকেতনে ঔষধ লইতে রোগী আসিলে তাহাদিগকে হোমিওপ্যাথি ঔষধ দিবেন। যে যে ঔষধের যখন প্রয়োজন হইবে আমাকে তালিকা করিয়া দিলে আমি আনাইয়া দিব।

শান্তিনিকেতন-আশ্রম-সম্পর্কীয় কেহ বিদ্যালয়ের প্রতি কোনোপ্রকার হস্তক্ষেপ করিলে— বা সেখানকার ভৃত্যদের কোনো দুর্ব্যবহারে বিরক্ত হইলে আমাকে জানাইবেন।

জাপানী ছাত্র হোরির আহারাদি ও সর্বপ্রকার স্বচ্ছন্দতার জন্য আপনি বিশেষরূপে মনোযোগী হইবেন।

মনোরঞ্জনবাবু ও শিক্ষকদের বিনা অনুমতিতে শান্তিনিকেতনের অতিথি-অভ্যাগতগণ স্কুল পরিদর্শন বা অধ্যাপনের সময় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। আপনি যথাসম্ভব বিনয়ের সহিত তাঁহাদিগকে এই নিয়ম জ্ঞাপন করিবেন।

অভিভাবকদের অনুমতি ব্যতীত কোনো ছাত্রকে বিদ্যালয়ের বাহিরে কোথাও যাইতে দিবেন না।

বাহিরের লোককে ছাত্রদের সহিত মিশিতে দিবেন না।

---

১ বাংলা ১২৬৯ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের জমির পাট্টা লইয়াছিলেন; ১২৯৪ সালে 'নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার জন্য একটি আশ্রম সংস্থাপনের অভিপ্রায়ে' ও তাহার অনুকূল কার্যসম্পাদনার্থে মহর্ষি এই সম্পত্তি ট্রস্টীদিগের হাতে অর্পণ করেন ও এই আশ্রমের ব্যয়নির্বাহার্থে আর্থিক ব্যবস্থা করিয়া দেন। 'এই ট্রস্টের উদ্দিষ্ট আশ্রমধর্মের উন্নতির জন্য ট্রস্টীগণ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় ও পুস্তকালয় সংস্থাপন করিতে পারিবেন।' পরে ১৩০৮ সালে মহর্ষির অনুমতিক্রমে তাঁহার ধর্মদীক্ষাবার্ষিকীতে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন; এ ক্ষেত্রে 'আশ্রম' বলিতে উক্ত ট্রস্ট অনুযায়ী পূর্বাগত ব্যবস্থা, ও 'বিদ্যালয়' বলিতে নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্যাশ্রম বুঝিতে হইবে। পরে আশ্রম ও বিদ্যালয় সাধারণত সমার্থক হইয়াছে।—

অধ্যাপকগণ ভৃত্যদের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইলে আপনাকে জানাইবেন— আপনি সমিতিতে জানাইয়া তাহার প্রতিকার করিবেন।

আহারাদির ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হইলে অধ্যাপকগণ ছাত্রদের সমক্ষে বা ভৃত্যদের নিকটে তাহার কোনো আলোচনা না করিয়া আপনাকে জানাইবেন, আপনি সমিতির নিকট তাঁহাদের নালিশ উত্থাপন করিবেন।

বিশেষ নির্দিষ্ট দিনে ছাত্রগণ যাহাতে অভিভাবকগণের নিকট পোস্টকার্ড লেখে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। বন্ধ-চিঠি লেখা নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের পক্ষে নিষিদ্ধ জানিবেন।

পোস্টকার্ড কাগজ কলম বহি প্রভৃতি কেনার হিসাব রাখিয়া অভিভাবকদের নিকট হইতে পত্র লিখিয়া মূল্য আদায় করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

সমিতি, বিদ্যালয় সম্বন্ধে অভিভাবকদের নিকট জ্ঞাপনীয় বিষয় যাহা স্থির করিবেন আপনি তাহা তাঁহাদিগকে পত্রের দ্বারা জানাইবেন।

কোনো বিশেষ ছাত্র সম্বন্ধে আহারাদির বিশেষ বিধি আবশ্যক হইলে সমিতিকে জানাইয়া আপনি তাহা প্রবর্তন করিবেন।

কোনো ছাত্রের অভিভাবক কোনো বিশেষ খাদ্যসামগ্রী পাঠাইলে অন্য ছাত্রদিগকে না দিয়া তাহা একজনকে খাইতে দেওয়া হইতে পারিবে না।

গোশালায় গোরু-মহিষ যে দুধ দিবে তাহা ছাত্রদের কুলাইয়া অবশিষ্ট থাকিলে অধ্যাপকগণ পাইবেন, এ নিয়ম আপনার অবগতির জন্য লিখিলাম।

শান্তিনিকেতন-আশ্রমের অতিথি প্রভৃতি কেহ কোনো বই পড়িতে লইলে তাহা যথাসময়ে তাঁহার নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া লইতে হইবে।

কাহাকেও কলিকাতায় বই লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না। বিশেষ প্রয়োজন হইলে আমার বিশেষ অনুমতি লইতে হইবে।

মাসের মধ্যে একদিন থালা ঘটিবাটি প্রভৃতি জিনিসপত্র গণনা করিয়া লইবেন।

ছাত্রদের অভিভাবক উপস্থিত হইলে মনোরঞ্জনবাবুর অনুমতি লইয়া নির্দিষ্ট সময়ে ছাত্রদের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া লইবেন।

—

উপস্থিতমত এই নিয়মগুলি লিখিয়া দিলাম। ক্রমশ আবশ্যকমত ইহার অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হইবে।

কিন্তু প্রধানত নিয়মের সাহায্যেই বিদ্যালয়-চালনায় প্রতি আমার বিশেষ আস্থা নাই। কারণ, শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়টি পড়া গিলাইবার কলমাত্র নহে। বস্তু-

উৎসারিত মঙ্গল ইচ্ছার সহায়তা ব্যতীত ইহার উদ্দেশ্য সফল হইবে না।

এই বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণকে আমি আমার অধীনস্থ বলিয়া মনে করি না। তাঁহারা স্বাধীন শুভবুদ্ধির দ্বারা কর্তব্য সম্পন্ন করিয়া যাইবেন ইহাই আমি আশা করি এবং ইহার জন্যই আমি সর্বদা প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। কোনো অনুশাসনের কৃত্রিম শক্তির দ্বারা আমি তাঁহাদিগকে পুণ্যকর্মে বাহ্যিকভাবে প্রবৃত্ত করিতে ইচ্ছা করি না। তাঁহাদিগকে আমার বন্ধু বলিয়া এবং সহযোগী বলিয়াই জানি। বিদ্যালয়ের কর্ম যেমন আমার, তেমনি তাঁহাদেরও কর্ম— এ যদি না হয় তবে এ বিদ্যালয়ের বৃথা প্রতিষ্ঠা।

আমি যে ভাবোৎসাহের প্রেরণায় সাহিত্যিক ও আর্থিক ক্ষতি এবং শারীরিক মানসিক নানা কষ্ট স্বীকার করিয়া এই বিদ্যালয়ের কর্মে আত্মোৎসর্গ করিয়াছি সেই ভাবাবেগ আমি সকলের কাছে আশা করি না। অনতিকালপূর্বে এমন সময় ছিল যখন আমি নিজের কাছ হইতেও ইহা আশা করিতে পারিতাম না। কিন্তু আমি অনেক চিন্তা করিয়া সুস্পষ্ট বুঝিয়াছি যে, বাল্যকালে ব্রহ্মচর্য-ব্রত, অর্থাৎ আত্মসংযম, শারীরিক ও মানসিক নির্মলতা, একাগ্রতা, গুরুভক্তি এবং বিদ্যাকে মনুষ্যত্বলাভের উপায় বলিয়া জানিয়া শান্ত সমাহিত ভাবে শ্রদ্ধার সহিত গুরুর নিকট হইতে সাধনা-সহকারে তাহা দুর্লভ ধনের ন্যায় গ্রহণ করা— ইহাই ভারতবর্ষের পথ এবং ভারতবর্ষের একমাত্র রক্ষার উপায়।

কিন্তু এই মত ও এই আগ্রহ আমি যদি অন্যের মনে সঞ্চার করিয়া না দিতে পারি তবে সে আমার অক্ষমতা ও দুর্ভাগ্য— অন্যকে সেজন্য আমি দোষ দিতে পারি না। নিজের ভাব জোর করিয়া কাহারো উপর চাপানো যায় না— এবং এ-সকল ব্যাপারে কপটতা ও ভান সর্বাপেক্ষা হেয়।

আমার মনের মধ্যে একটি ভাবের সম্পূর্ণতা জাগিতেছে বলিয়া অনুষ্ঠিত ব্যাপারের সমস্ত ত্রুটি দৈন্য অপূর্ণতা অতিক্রম করিয়াও আমি সমগ্রভাবে আমার আদর্শকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই— বর্তমানের মধ্যে ভবিষ্যৎকে, বীজের মধ্যে বৃক্ষকে উপলব্ধি করিতে পারি— সেইজন্য সমস্ত খণ্ডতা দীনতা সত্ত্বেও, ভাবের তুলনায় কর্মের যথেষ্ট অসংগতি থাকিলেও আমার উৎসাহ ও আশা ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে না। যিনি আমার কাজকে খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রতিদিনের মধ্যে বর্তমানের মধ্যে দেখিবেন, নানা বাধা-বিরোধ ও অভাবের মধ্যে দেখিবেন, তাঁহার উৎসাহ আশা সর্বদা সজাগ না থাকিতে পারে। সেইজন্য আমি কাহারো কাছে বেশি কিছু দাবি করি না, সর্বদা আমার উদ্দেশ্য লইয়া অন্যকে বলপূর্বক উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করি না— কালের উপর, সত্যের উপরে, বিধাতার উপরে সম্পূর্ণ ধৈর্যের সহিত নির্ভর করিয়া থাকি। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক

নিয়মে অন্তরের ভিতর হইতে অলক্ষ্য শক্তিতে যাহার বিকাশ হয় তাহাই যথার্থ এবং তাহার উপরেই নির্ভর করা যায়। ক্রমাগত বাহিরের উত্তেজনায়, কতক লজ্জায়, কতক ভাবাবেগে, কতক অনুকরণে যাহার উৎপত্তি হয় তাহার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না এবং অনেক সময়ে তাহা হইতে কুফল উৎপন্ন হয়।

আমি আশা করিয়া আছি যে, অধ্যাপকগণ, আমার অনুশাসনে নহে, অন্তরস্থ কল্যাণবীজের সহজ বিকাশে ক্রমশই আগ্রহের সহিত আনন্দের সহিত ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সঙ্গে নিজের জীবনকে একীভূত করিতে পারিবেন। তাঁহারা প্রত্যহ যেমন ছাত্রদের সেবা ও প্রণাম গ্রহণ করিবেন তেমনি আত্মত্যাগ ও আত্মসংযমের দ্বারা ছাত্রদের নিকটে আপনাদিগকে প্রকৃত ভক্তির পাত্র করিয়া তুলিবেন। পক্ষপাত অবিচার অধৈর্য, অল্প কারণে অকস্মাৎ রোষ, অভিমান, অপ্রসন্নতা, ছাত্র বা ভৃত্যদের সম্বন্ধে চপলতা, লঘুচিত্ততা, ছোটোখাটো অভ্যাসদোষ, এ-সমস্ত প্রতিদিনের প্রাণপণ যত্নে পরিহার করিতে থাকিবেন। নিজেরা ত্যাগ ও সংযম অভ্যাস না করিলে ছাত্রদের নিকট তাঁহাদের সমস্ত উপদেশ নিষ্ফল হইবে— এবং ব্রহ্মচর্যাশ্রমের উজ্জ্বলতা ম্লান হইয়া যাইতে থাকিবে। ছাত্রেরা বাহিরে ভক্তি ও মনে মনে উপেক্ষা করিতে যেন না শেখে।

আমার ইচ্ছা, গুরুদের সেবা ও অতিথিদের প্রতি আতিথ্য প্রভৃতি কার্যে রথীর দ্বারা বিদ্যালয়ে আদর্শ স্থাপন করা হয়। এ-সমস্ত কার্যে যথার্থ গৌরব আছে, অবমান নাই— এই কথা যেন ছাত্রদের মনে মুদ্রিত হয়। সকলেই যেন আগ্রহের সহিত অগ্রসর হইয়া এই-সমস্ত সেবাকার্যে প্রবৃত্ত হয়। অভ্যাগতদের অভিবাদন, তাঁহাদের সহিত শিষ্টালাপ ও তাঁহাদের প্রতি সযত্ন ব্যবহার যেন সকল ছাত্রকে বিশেষরূপে অভ্যাস করানো হয়। বিদ্যালয়ের নিকটে কোনো আগন্তুক উপস্থিত হইলে তাহাকে যেন বিনয়ের সহিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে শেখে— ছাত্রগণ ভৃত্যদের প্রতি যেন অবজ্ঞা প্রকাশ না করে এবং তাহারা পীড়াগ্রস্ত হইলে যেন তাহাদের সংবাদ লয়। ছাত্রদের মধ্যে কাহারো পীড়া হইলে তাহাকে যথাসময়ে ঔষধ ও পথ্য সেবন করানো ও তাহার অন্যান্য শুশ্রূষার ভার যেন ছাত্রদের প্রতি অর্পিত হয়। ভৃত্যদের দ্বারা যত অল্প কাজ করানো যাইতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আপনি যদি সংগত ও সুবিধা-জনক মনে করেন তবে গোশালায় গাভীগুলির তত্ত্বাবধানের ভার ছাত্রদের প্রতি কিয়ৎপরিমাণে অর্পণ করিতে পারেন। দুইটি হরিণ আছে, ছাত্রগণ যদি তাহাদিগকে স্বহস্তে আহারাদি দিয়া পোষ মানাইতে পারে তবে ভালো হয়। আমার ইচ্ছা কয়েকটি পাখি মাছ ও ছোটো জন্তু আশ্রয়ে রাখিয়া ছাত্রদের প্রতি তাহাদের পালনের

ভার দেওয়া হয়। পাখি খাঁচায় না রাখিয়া প্রত্যহ আহারাদি দিয়া ধৈর্যের সহিত মুক্ত পাখিদিগকে বশ করানোই ভালো। শান্তিনিকেতনে কতকগুলি পায়রা আশ্রয় লইয়াছে, চেষ্টা করিলে ছাত্ররা তাহাদিগকে ও কাঠবিড়ালিদিগকে বশ করাইতে পারে। লাইব্রেরি গোছানো, ঘর পরিপাটি রাখা, বাগানের যত্ন করা, এ-সমস্ত কাজের ভার যথাসম্ভব ছাত্রদের প্রতিই অর্পণ করা উচিত জানিবেন।

জাপানী ছাত্র হোরির সেবাভার রথী প্রভৃতি কোনো বিশেষ ছাত্রের উপর দিবেন। এন্ট্রেন্স পরীক্ষার ব্যস্ততায় আপাতত তাহার যদি একান্ত সময়াভাব ঘটে তবে আর কোনো ছাত্রের উপর অথবা পালা করিয়া বয়স্ক ছাত্রদের উপর দিবেন। তাহারা যেন যথাসময়ে স্বহস্তে হোরিকে পরিবেশন করে। প্রাতঃকালে তাহার বিছানা ঠিক করিয়া দেয়— যথাসময়ে তাহার তত্ত্ব লইতে থাকে— নাবার ঘরে ভৃত্যেরা তাহার আবশ্যকমত জল দিয়াছে কি না পর্যবেক্ষণ করে। প্রথম দুই-একদিন রথীর দ্বারা এই কাজ করাইলে অন্য ছাত্রেরা কোনোপ্রকার সংকোচ অনুভব করিবে না।

ছাত্ররা যখন খাইতে বসিবে তখন পালা করিয়া একজন ছাত্র পরিবেশন করিলে ভালো হয়। ব্রাহ্মণ পরিবেশক না হইলে আপত্তিজনক হইতে পারে। অতএব সে সম্বন্ধে বিহিত ব্যবস্থাই কর্তব্য হইবে।

রবিবারে মাঝে মাঝে চড়িভাতি করিয়া ছেলেরা স্বহস্তে রন্ধনাদি করিলে ভালো হয়।

সম্প্রতি নানা উদ্‌বেগের মধ্যে আছি, এজন্য সকল কথা ভালোরূপ চিন্তা করিয়া লিখিতে পারিলাম না। আপনি সেখানকার কাজে যোগদান করিলে একে একে অনেক কথা আপনার মনে উদয় হইবে, তখন অধ্যাপকগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া আপনার মন্তব্য আমাকে জানাইবেন।

আপনার প্রতি আমার কোনো আদেশ-নির্দেশ নাই; আপনি সমবেদনার দ্বারা, শ্রদ্ধা ও প্রীতির দ্বারা আমার হৃদয়ের ভাব অনুভব করিবেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত কল্যাণ-কামনার দ্বারা কর্তব্যের শাসনে স্বাধীনভাবে ধরা দিবেন এবং

যদ্‌যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।

ইতি ২৭শে কার্তিক ১৩০৯

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সমবায়নীতি

ভূমিকা

মাতৃভূমির যথার্থ স্বরূপ গ্রামের মধ্যেই ; এইখানেই প্রাণের নিকেতন ; লক্ষ্মী এইখানেই তাঁহার আসন সন্ধান করেন।

সেই আসন অনেককাল প্রস্তুত হয় নাই। ধনপতি কুবের দেশের লোকের মনকে টানিয়াছে শহরের যক্ষপুরীতে। শ্রীকে তাঁহার অন্নক্ষেত্রে আবাহন করিতে আমরা বহুকাল ভুলিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে দেশ হইতে সৌন্দর্য গেল, স্বাস্থ্য গেল, বিদ্যা গেল, আনন্দ গেল, প্রাণও অবশিষ্ট আছে অতি অল্পই। আজ পল্লীর জলাশয় শুষ্ক, বায়ু দূষিত, পথ দুর্গম, ভাণ্ডার শূন্য, সমাজবন্ধন শিথিল, ঈর্ষা কলহ কদাচার লোকালয়ের জীর্ণতাকে প্রতিমুহূর্তে জীর্ণতর করিয়া তুলিতেছে। সময় আর অধিক নাই। শ্রীহীন অনাদৃত দেশে যমরাজের শাসন দিনে দিনে রুদ্রমূর্তিতে প্রবল হইয়া উঠিল।

আজ যাঁহারা জীবধাত্রী পল্লিভূমির রিক্তস্তনে স্তন্য সঞ্চার করিবার ব্রত লইয়াছেন, তাঁহার নিরানন্দ অন্ধকার ঘরে আলো আনিবার জন্য প্রদীপ জ্বালিতেছেন, মঙ্গলদাতা বিধাতা তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ; ত্যাগের দ্বারা, তপস্যা-দ্বারা, সেবা-দ্বারা, পরস্পর মৈত্রীবন্ধন -দ্বারা, বিক্ষিপ্ত শক্তির একত্র সমবায়ের দ্বারা ভারতবাসীর বহুদিনসঞ্চিত মূঢ়তা ও ঔদাসীন্যজনিত অপরাধরাশির সঙ্গে সঙ্গে রুষ্ট দেবতার অভিশাপকে সেই সাধকেরা দেশ হইতে তিরস্কৃত করুন এই আমি একান্তমনে কামনা করি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সমবায়নীতি

সমবায় ১

সকল দেশেই গরিব বেশি, ধনী কম। তাই যদি হয় তবে কোন্ দেশকে বিশেষ করিয়া গরিব বলিব। এ কথার জবাব এই, যে দেশে গরিবের পক্ষে রোজগার করিবার উপায় অল্প, রাস্তা বন্ধ। যে দেশে গরিব ধনী হইবার ভরসা রাখে সে দেশে সেই ভরসাই একটা মস্ত ধন। আমাদের দেশে টাকার অভাব আছে, এ কথা বলিলে সবটা বলা হয় না। আসল কথা, আমাদের দেশে ভরসার অভাব। তাই, যখন আমরা পেটের জ্বালায় মরি তখন কপালের দোষ দিই; বিধাতা কিম্বা মানুষ যদি বাহির হইতে দয়া করেন তবেই আমরা রক্ষা পাইব, এই বলিয়া ধুলার উপর আধ-মরা হইয়া পড়িয়া থাকি। আমাদের নিজের হাতে যে কোনো উপায় আছে, এ কথা ভাবিতেও পারি না।

এইজন্যই আমাদের দেশে সকলের চেয়ে দরকার, হাতে ভিক্ষা তুলিয়া দেওয়া নয়, মনে ভরসা দেওয়া। মানুষ না খাইয়া মরিবে— শিক্ষার অভাবে, অবস্থার গতিকে হীন হইয়া থাকিবে, এটা কখনোই ভাগ্যের দোষ নয়, অনেক স্থলেই এটা নিজের অপরাধ। দুর্দশার হাত হইতে উদ্ধারের কোনো পথই নাই, এমন কথা মনে করাই মানুষের ধর্ম নয়। মানুষের ধর্ম জয় করিবার ধর্ম, হার মানিবার ধর্ম নয়। মানুষ যেখানে আপনার সেই ধর্ম ভুলিয়াছে সেইখানেই সে আপনার দুর্দশাকে চিরদিনের সামগ্রী করিয়া রাখিয়াছে। মানুষ দুঃখ পায় দুঃখকে মানিয়া লইবার জন্য নয়, কিন্তু নূতন শক্তিতে নূতন নূতন রাস্তা বাহির করিবার জন্য। এমনি করিয়াই মানুষের এত উন্নতি হইয়াছে। যদি কোনো দেশে এমন দেখা যায় যে সেখানে দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষ অচল হইয়া পড়িয়া দৈবের পথ তাকাইয়া আছে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, মানুষ সে দেশে মানুষের হিসাবে খাটো হইয়া গেছে।

মানুষ খাটো হয় কোথায়। যেখানে সে দশ জনের সঙ্গে ভালো করিয়া মিলিতে পারে না। পরস্পরে মিলিয়া যে মানুষ সেই মানুষই পুরা, একলা-মানুষ টুকরা মাত্র। এটা তো দেখা গেছে, ছেলেবেলায় একলা পড়িলে ভূতের ভয় হইত। বস্তুত এই

ভূতের ভয়টা একলা-মানুষের নিজের দুর্বলতাকেই ভয়। আমাদের বারো-আনা ভয়ই এই ভূতের ভয়। সেটার গোড়াকার কথাই এই যে, আমরা মিলি নাই, আমরা ছাড়া-ছাড়া হইয়া আছি। ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে, দারিদ্র্যের ভয়টাও এই ভূতের ভয়, এটা কাটিয়া যায় যদি আমরা দল বাঁধিয়া দাঁড়াইতে পারি। বিদ্যা বলো, টাকা বলো, প্রতাপ বলো, ধর্ম বলো, মানুষের যা-কিছু দামী এবং বড়ো, তাহা মানুষ দল বাঁধিয়াই পাইয়াছে। বালি-জমিতে ফসল হয় না, কেননা, তাহা আঁট বাঁধে না; তাই তাহাতে রস জমে না, ফাঁক দিয়া সব গলিয়া যায়। তাই সেই জমির দারিদ্র্য ঘোচাইতে হইলে তাহাতে পলিমাটি পাতা-পচা প্রভৃতি এমন-কিছু যোগ করিতে হয় যাহাতে তার ফাঁক বোজে, তার আঁটা হয়। মানুষেরও ঠিক তাই; তাদের মধ্যে ফাঁক বেশি হইলেই তাদের শক্তি কাজে লাগে না, থাকিয়াও না থাকার মতো হয়।

মানুষ যে পরস্পর মিলিয়া তবে সত্য মানুষ হইয়াছে তার গোড়াকার একটা কথা বিচার করিয়া দেখা যাক। মানুষ কথা বলে, মানুষের ভাষা আছে। জন্তুর ভাষা নাই। মানুষের এই ভাষার ফলটা কী। যে মনটা আমার নিজের মধ্যে বাঁধা সেই মনটাকে অন্যের মনের সঙ্গে ভাষার যোগে মিলাইয়া দিতে পারি। কথা কওয়ার জোরে আমার মন দশজনের হয়, দশজনের মন আমার হয়। ইহাতেই মানুষ অনেকে মিলিয়া ভাবিতে পারে। তার ভাবনা বড়ো হইয়া উঠে। এই বড়ো ভাবনার ঐশ্বর্যেই মানুষের মনের গরিবিয়ানা ঘুচিয়াছে।

তার পরে মানুষ যখন এই ভাষাকে অক্ষরে লিখিয়া রাখিতে শিখিল তখন মানুষের সঙ্গে মানুষের মনের যোগ আরো অনেক বড়ো হইয়া উঠিল। কেননা, মুখের কথা বেশি দূর পৌঁছায় না। মুখের কথা ক্রমে মানুষ ভুলিয়া যায়; মুখে মুখে এক কথা আর হইয়া উঠে। কিন্তু লেখার কথা সাগর পর্বত পার হইয়া যায়, অথচ তার বদল হয় না। এমনি করিয়া যত বেশি মানুষের মনের যোগ হয় তার ভাবনাও তত বড়ো হইয়া উঠে; তখন প্রত্যেক মানুষ হাজার হাজার মানুষের ভাবনার সামগ্রী লাভ করে। ইহাতেই তার মন ধনী হয়।

শুধু তাই নয়, অক্ষরে লেখা ভাষায় মানুষের মনের যোগ সজীব মানুষকেও ছাড়াইয়া যায়, যে মানুষ হাজার বছর আগে জন্মিয়াছিল তার মনের সঙ্গে আর আজকের দিনের আমার মনের আড়াল ঘুচিয়া যায়। এত বড়ো মনের যোগে তবে মানুষ যাকে বলে সভ্যতা তাই ঘটিয়াছে। সভ্যতা কী। আর কিছু নয়, যে অবস্থায় মানুষের এমন-একটি যোগের ক্ষেত্র তৈরি হয় যেখানে প্রতি মানুষের শক্তি সকল

মানুষকে শক্তি দেয় এবং সকল মানুষের শক্তি প্রতি মানুষকে শক্তিমান করিয়া তোলে।

আজ আমাদের দেশটা যে এমন বিষম গরিব তার প্রধান কারণ, আমরা ছাড়া-ছাড়া হইয়া নিজের নিজের দায় একলা বহিতেছি। ভারে যখন ভাঙিয়া পড়ি তখন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার জো থাকে না। য়ুরোপে যখন প্রথম আগুনের কল বাহির হইল তখন অনেক লোক, যারা হাত চালাইয়া কাজ করিত, তারা বেকার হইয়া পড়িল। কলের সঙ্গে শুধু-হাতে মানুষ লড়িবে কী করিয়া? কিন্তু য়ুরোপে মানুষ হাল ছাড়িয়া দিতে জানে না। সেখানে একের জন্য অন্যে ভাবিতে শিখিয়াছে; সে দেশে কোথাও ভাবনার কোনো কারণ ঘটিলেই সেই ভাবনার দায় অনেকে মিলিয়া মাথা পাতিয়া লয়। তাই বেকার কারিগরদের জন্য সেখানে মানুষ ভাবিতে বসিয়া গেল। বড়ো বড়ো মূলধন নহিলে তো কল চলে না; তবে যার মূলধন নাই সে কি কেবল কারখানায় সস্তা মাহিনায় মজুরি করিয়াই মরিবে এবং মজুরি না জুটিলে নিরুপায়ে না খাইয়া শুকাইতে থাকিবে? যেখানে সভ্যতার জোর আছে, প্রাণ আছে, সেখানে দেশের কোনো-এক দল লোক উপবাসে মরিবে বা দুর্গতিতে তলাইয়া যাইবে ইহা মানুষ সহ্য করিতে পারে না; কেননা, মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগে সকলের ভালো হওয়া, ইহাই সভ্যতার প্রাণ। এইজন্য য়ুরোপে যাঁরা কেবল গরিবদের জন্য ভাবিতে লাগিলেন তাঁরা এই বুঝিলেন যে, যারা একলার দায় একলাই বহিয়া বেড়ায় তাদের লক্ষ্মীশ্রী কোনো উপায়েই হইতে পারে না, অনেক গরিব আপন সামর্থ্য এক জায়গায় মিলাইতে পারিলে সেই মিলনই মূলধন। পূর্বেই বলিয়াছি, অনেকের ভাবনার যোগ ঘটিয়া সভ্য মানুষের ভাবনা বড়ো হইয়াছে। তেমনি অনেকের কাজের যোগ ঘটিলে কাজ আপনিই বড়ো হইয়া উঠিতে পারে। গরিবের সংগতিলাভের উপায় এই-যে মিলনের রাস্তা য়ুরোপে ইহা ক্রমেই চওড়া হইতেছে। আমার বিশ্বাস, এই রাস্তাই পৃথিবীতে সকলের চেয়ে বড়ো উপার্জনের রাস্তা হইবে।

২ আমাকে এক পাড়াগাঁয়ে মাঝে মাঝে যাইতে হয়। সেখানে বারান্দায় দাঁড়াইয়া দক্ষিণের দিকে চাহিয়া দেখিলে দেখা যায়, পাঁচ-ছয় মাইল ধরিয়া খেতের পরে খেত চলিয়া গেছে। ঢের লোকে এই-সব জমি চাষ করে। কারো-বা দুই বিঘা জমি, কারো-বা চার, কারো-বা দশ। জমির ভাগগুলি সমান নয়, সীমানা আঁকাবাঁকা। এই জমির যখন চাষ চলিতে থাকে তখন প্রথমেই এই কথা মনে হয়, হালের গোরু কোথাও-বা জমির পক্ষে যথেষ্ট, কোথাও-বা যথেষ্টর চেয়ে বেশি, কোথাও-বা তার চেয়ে কম। চাষার অবস্থার গতিকে কোথাও-বা চাষ যথাসময়ে আরম্ভ হয়, কোথাও

সময় বহিয়া যায়। তার পরে আঁকাবাঁকা সীমানায় হাল বারবার ঘুরাইয়া লইতে গোরুর অনেক পরিশ্রম মিছা নষ্ট হয়। যদি প্রত্যেক চাষা কেবল নিজের ছোটো জমিটুকুকে অন্য জমি হইতে সম্পূর্ণ আলাদা করিয়া না দেখিত, যদি সকলের জমি এক করিয়া সকলে একযোগে মিলিয়া চাষ করিত, তবে অনেক হাল কম লাগিত, অনেক বাজে মেহন্নত বাঁচিয়া যাইত। ফসল কাটা হইলে সেই ফসল প্রত্যেক চাষার ঘরে ঘরে গোলায় তুলিবার জন্য স্বতন্ত্র গাড়ির ব্যবস্থা ও স্বতন্ত্র মজুরি আছে; প্রত্যেক গৃহস্থের স্বতন্ত্র গোলাঘর রাখিতে হয় এবং স্বতন্ত্রভাবে বেচিবার বন্দোবস্ত করিতে হয়। যদি অনেক চাষী মিলিয়া এক গোলায় ধান তুলিতে পারিত ও এক জায়গা হইতে বেচিবার ব্যবস্থা করিত তাহা হইলে অনেক বাজে খরচ ও বাজে পরিশ্রম বাঁচিয়া যাইত। যার বড়ো মূলধন আছে তার এই সুবিধা থাকাতেই সে বেশি মুনফা করিতে পারে, খুচরো খুচরো কাজের যে-সমস্ত অপব্যয় এবং অসুবিধা তাহা তার বাঁচিয়া যায়।

যত অল্প সময়ে যে যত বেশি কাজ করিতে পারে তারই জিত। এইজন্যই মানুষ হাতিয়ার দিয়া কাজ করে। হাতিয়ার মানুষের একটা হাতকে পাঁচ-দশটা হাতের সমান করিয়া তোলে। যে অসভ্য শুধু হাত দিয়া মাটি আঁচড়াইয়া চাষ করে তাহাকে হলধারীর কাছে হার মানিতেই হইবে। চাষবাস, কাপড়-বোনা, বোঝা-বহা, চলাফেরা, তেল বাহির করা, চিনি তৈরি করা প্রভৃতি সকল কাজেই মানুষ গায়ের জোরে জেতে নাই, কল-কৌশলেই জিতিয়াছে। লাঙল, তাঁত, গোরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, ঘানি প্রভৃতি সমস্তই মানুষের সময়ের পরিমাণ কমাইয়া কাজের পরিমাণ বাড়াইয়াছে। ইহাতেই মানুষের এত উন্নতি হইয়াছে, নহিলে মানুষের সঙ্গে বনমানুষের বেশি তফাত থাকিত না।

এইরূপে হাতের সঙ্গে হাতিয়ারে মিলিয়া আমাদের কাজ চলিতেছিল। এমন সময় বাষ্প ও বিদ্যুতের যোগে এখনকার কালের কল-কারখানার সৃষ্টি হইল। তাহার ফল হইয়াছে এই যে, যেমন একদিন হাতিয়ারের কাছে শুধু-হাতকে হার মানিতে হইয়াছে তেমনি কলের কাছে আজ শুধু-হাতিয়ারকে হার মানিতে হইল। ইহা লইয়া যতই কান্নাকাটি করি, কপাল চাপড়াইয়া মরি, ইহার আর উপায় নাই।

এ কথা আজ আমাদের চাষীদেরও ভাবিবার দিন আসিয়াছে। নহিলে তাহারা বাঁচিবে না। কিন্তু এ-সব কথা পরের কারখানাঘরের দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া ভাবা যায় না। নিজে হাতে-কলমে ব্যবহার করিলে তবে স্পষ্ট বোঝা যায়। য়ুরোপ-আমেরিকার সকল চাষীই এই পথেই দৃঢ় করিয়া চলিয়াছে। তাহারা কলে আবাদ করে, কলে ফসল কাটে, কলে আঁটি বাঁধে, কলে গোলা বোঝাই করে। ইহার

সুবিধা কী তাহা সামান্য একটু ভাবিয়া দেখিলে বোঝা যায়। ভালো করিয়া চাষ দিবার জন্য অনেক সময় বৃষ্টির অপেক্ষা করিতে হয়। একদিন বৃষ্টি আসিল, সেদিন অনেক কষ্টে হাল-লাঙলে অল্প জমিতে অল্প একটু আঁচড় দেওয়া হইল। ইহার পরে দীর্ঘকাল যদি ভালো বৃষ্টি না হয় তাহা হইলে সে বৎসর নাবী বুনানি হইয়া বর্ষার জলে হয়তো কাঁচা ফসল তলাইয়া যায়। তার পরে ফসল কাটিবার সময় দুর্গতি ঘটে। কাটিবার লোক কম, বাহির হইতে মজুরের আমদানি হয়। কাটিতে কাটিতে বৃষ্টি আসিলে কাটা ফসল মাঠে পড়িয়া নষ্ট হইতে থাকে। কলের লাঙল, কলের ফসল-কাটা যন্ত্র থাকিলে সুযোগমাত্রকে অবিলম্বে ও পুরাপুরি আদায় করিয়া লওয়া যায়। দেখিতে দেখিতে চাষ সারা ও ফসল কাটা হইতে থাকে। ইহাতে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা অনেক পরিমাণে বাঁচে।

কিন্তু কল চালাইতে হইলে জমি বেশি এবং অর্থ বেশি চাই। অতএব গোড়াতেই যদি এই কথা বলিয়া আশা ছাড়িয়া বসিয়া থাকি যে, আমাদের গরিব চাষীদের পক্ষে ইহা অসম্ভব, তাহা হইলে এই কথাই বলিতে হইবে, আজ এই কলের যুগে আমাদের চাষী ও অন্যান্য কারিগরকে পিছন হঠিতে হঠিতে মস্ত একটা মরণের গর্তে গিয়া পড়িতে হইবে।

যাহাদের মনে ভরসা নাই তাহারা এমন কথাই বলে এবং এমনি করিয়াই মরে। তাহাদিগকে ভিক্ষা দিয়া, সেবাশুশ্রূষা করিয়া, কেহ বাঁচাইতে পারে না। ইহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে, যাহা একজনে না পারে তাহা পঞ্চাশ জনে জোট বাঁধিলেই হইতে পারে। তোমরা যে পঞ্চাশ জনে চিরকাল পাশাপাশি পৃথক্ পৃথক্ চাষ করিয়া আসিতেছ, তোমরা তোমাদের সমস্ত জমি হাল-লাঙল গোলাঘর পরিশ্রম একত্র করিতে পারিলেই গরিব হইয়াও বড়ো মূলধনের সুযোগ আপনিই পাইবে। তখন কল আনাইয়া লওয়া, কলে কাজ করা, কিছুই কঠিন হইবে না। কোনো চাষীর গোয়ালে যদি তার নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক সের মাত্র দুধ বাড়তি থাকে, সে দুধ লইয়া সে ব্যাবসা করিতে পারে না। কিন্তু এক-শো দেড়-শো চাষী আপন বাড়তি দুধ একত্র করিলে মাখন-তোলা কল আনাইয়া ঘিয়ের ব্যাবসা চালাইতে পারে। য়ুরোপে এই প্রণালীর ব্যাবসা অনেক জায়গায় চলিতেছে। ডেনমার্ক্ প্রভৃতি ছোটো-ছোটো দেশে সাধারণ লোকে এইরূপে জোট বাঁধিয়া মাখন পনির ক্ষীর প্রভৃতির ব্যবসায় খুলিয়া দেশ হইতে দারিদ্র্য একেবারে দূর করিয়া দিয়াছে। এই-সকল ব্যবসায়ের যোগে সেখানকার সামান্য চাষী ও সামান্য গোয়ালা সমস্ত পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে আপন বৃহৎ সম্বন্ধ বুঝিতে পারিয়াছে।* এমনি করিয়া শুধু টাকায় নয়, মনে

ও শিক্ষায় সে বড়ো হইয়াছে। এমনি করিয়া অনেক গৃহস্থ অনেক মানুষ একজোট হইয়া জীবিকানির্বাহ করিবার যে উপায় তাহাকেই য়ুরোপে আজকাল কোঅপারেটিভ-প্রণালী এবং বাংলায় 'সমবায়' নাম দেওয়া হইয়াছে। আমার কাছে মনে হয়, এই কোঅপারেটিভ-প্রণালীই আমাদের দেশকে দারিদ্র্য হইতে বাঁচাইবার একমাত্র উপায়। আমাদের দেশ কেন, পৃথিবীর সকল দেশেই এই প্রণালী একদিন বড়ো হইয়া উঠিবে। এখনকার দিনে ব্যাবসা-বাণিজ্যে মানুষ পরস্পর পরস্পরকে জিতিতে চায়, ঠকাইতে চায়; ধনী আপন টাকার জোরে নির্ধনের শক্তিকে সস্তা দামে কিনিয়া লইতে চায়; ইহাতে করিয়া টাকা এবং ক্ষমতা কেবল এক-এক জায়গাতেই বড়ো হইয়া উঠে এবং বাকি জায়গায় সেই বড়ো টাকার আওতায় ছোটো শক্তিগুলি মাথা তুলিতে পারে না। কিন্তু সমবায়-প্রণালীতে চাতুরী কিম্বা বিশেষ একটা সুযোগে পরস্পর পরস্পরকে জিতিয়া বড়ো হইতে চাহিবে না। মিলিয়া বড়ো হইবে। এই প্রণালী যখন পৃথিবীতে ছড়াইয়া যাইবে তখন রোজগারের হাটে আজ মানুষে মানুষে যে একটা ভয়ংকর রেষারেষি আছে তাহা ঘুচিয়া গিয়া এখানেও মানুষ পরস্পরের আন্তরিক সুহৃদ্ হইয়া, সহায় হইয়া, মিলিতে পারিবে।

আজ আমাদের দেশে অনেক শিক্ষিত লোকে দেশের কাজ করিবার জন্য আগ্রহ বোধ করেন। কোন্ কাজটা বিশেষ দরকারি এ প্রশ্ন প্রায়ই শোনা যায়। অনেকে সেবা করিয়া, উপবাসীকে অন্ন দিয়া, দরিদ্রকে ভিক্ষা দিয়া দেশের কাজ করিতে চান। গ্রাম জুড়িয়া যখন আগুন লাগিয়াছে তখন ফুঁ দিয়া আগুন নেবানোর চেষ্টা যেমন ইহাও তেমনি। আমাদের দুঃখের লক্ষণগুলিকে বাহির হইতে দূর করা যাইবে না, দুঃখের কারণগুলিকে ভিতর হইতে দূর করিতে হইবে। তাহা যদি করিতে চাই তবে দুটি কাজ আছে। এক, দেশের সর্বসাধারণকে শিক্ষা দিয়া পৃথিবীর সকল মানুষের মনের সঙ্গে তাহাদের মনের যোগ ঘটাইয়া দেওয়া— বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহাদের মনটা গ্রাম্য এবং একঘরে হইয়া আছে, তাহাদিগকে সর্বমানবের জাতে তুলিয়া গৌরব দিতে হইবে, ভাবের দিকে তাহাদিগকে বড়ো মানুষ করিতে হইবে— আর-এক, জীবিকার ক্ষেত্রে তাহাদিগকে পরস্পর মিলাইয়া পৃথিবীর সকল মানুষের সঙ্গে তাহাদের কাজের যোগ ঘটাইয়া দেওয়া। বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সাংসারিক দিকে তাহারা দুর্বল ও একঘরে হইয়া আছে। এখানেও তাহাদিগকে মানুষের বড়ো সংসারের মহাপ্রাঙ্গণে ডাক দিয়া আনিতে হইবে, অর্থের দিকে তাহাদিগকে বাড়োমানুষ করিতে হইবে। অর্থাৎ শিকড়ের দ্বারা যাহাতে মাটির দিকে তাহারা প্রশস্ত অধিকার পায় এবং ডালপালার দ্বারা বাতাস ও আলোকের দিকে

তাহারা পরিপূর্ণরূপে ব্যাপ্ত হইতে পারে, তাহাই করা চাই। তাহার পরে ফলফুল আপনিই ফলিতে থাকিবে, কাহাকেও সেজন্য ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতে হইবে না।

শ্রাবণ ১৩২৫

সমবায় ২

মানুষের ধর্মই এই যে, সে অনেকে মিলে একত্র বাস করতে চায়। একলা-মানুষ কখনোই পূর্ণমানুষ হতে পারে না; অনেকের যোগে তবেই সে নিজেকে ষোলো-আনা পেয়ে থাকে।

দল বেঁধে থাকা, দল বেঁধে কাজ করা মানুষের ধর্ম বলেই সেই ধর্ম সম্পূর্ণভাবে পালন করাতেই মানুষের কল্যাণ, তার উন্নতি। লোভ ক্রোধ মোহ প্রভৃতিকে মানুষ রিপু অর্থাৎ শত্রু বলে কেন। কেননা, এই-সমস্ত প্রবৃত্তি ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়-বিশেষের মনকে দখল ক'রে নিয়ে মানুষের জোট বাঁধার সত্যকে আঘাত করে। যার লোভ প্রবল সে আপনার নিজের লাভকেই বড়ো করে দেখে, এই অংশে সে অন্য সকলকে খাটো করে দেখে; তখন অন্যের ক্ষতি করা, অন্যকে দুঃখ দেওয়া তার পক্ষে সহজ হয়। এইরকম যে-সকল প্রবৃত্তির মোহে আমরা অন্যের কথা ভুলে যাই, তারা যে কেবল অন্যের পক্ষেই শত্রু তা নয়, তারা আমাদের নিজেরই রিপু; কেননা, সকলের যোগে মানুষ নিজের যে পূর্ণতা পায়, এই প্রবৃত্তি তারই বিঘ্ন করে।

স্বধর্মের আকর্ষণে মানুষ এই-যে অনেকে এক হয়ে বাস করে, তারই গুণে প্রত্যেক মানুষ বহুমানুষের শক্তির ফল লাভ করে। চার পয়সা খরচ করে কোনো মানুষ একলা নিজের শক্তিতে একখানা সামান্য চিঠি চাটগাঁ থেকে কন্যাকুমারীতে কখনোই পাঠাতে পারত না; পোস্ট অফিস জিনিসটি বহু মানুষের সংযোগ-সাধনের ফল, সেই ফল এতই বড়ো যে তাতে চিঠি পাঠানো সম্বন্ধে দরিদ্রকেও লক্ষপতির দুর্লভ সুবিধা দিয়েছে। এই একমাত্র পোস্ট অফিসের যোগে ধর্মে অর্থে শিক্ষায় পৃথিবীর সকল মানুষের কী প্রভূত উপকার করছে হিসাব করে তার সীমা পাওয়া যায় না। ধর্মসাধনা জ্ঞানসাধনা সম্বন্ধে প্রত্যেক সমাজেই মানুষের সম্মিলিত চেষ্টায় কত-যে অনুষ্ঠান চলছে তা বিশেষ করে বলবার কোনো দরকার নেই; সকলেরই তা জানা আছে।

তা হলেই দেখা যাচ্ছে যে, যে-সকল ক্ষেত্রে সমাজের সকলে মিলে প্রত্যেকের হিতসাধনের সুযোগ আছে সেইখানেই সকলের এবং প্রত্যেকের কল্যাণ।

যেখানেই অজ্ঞান বা অন্যায় -বশত সেই সুযোগে কোনো বাধা ঘটে সেইখানেই যত অমঙ্গল।

পৃথিবীর প্রায় সকল সমাজেই একটা জায়গায় এই বাধা ঘটে। সে হচ্ছে অর্থোপার্জনের কাজে। এইখানে মানুষের লোভ তার সামাজিক শুভবুদ্ধিকে ছাড়িয়ে চলে যায়। ধনে বা শক্তিতে অন্যের চেয়ে আমি বড়ো হব, এই কথা যেখানেই মানুষ বলেছে সেইখানেই মানুষ নিজেকে আঘাত করেছে; কেননা, পূর্বেই বলেছি কোনো মানুষই একলা নিজেতে নিজে সম্পূর্ণ নয়। সত্যকে যে আঘাত করা হয়েছে তার প্রমাণ এই যে, অর্থ নিয়ে, প্রতাপ নিয়ে, মানুষে মানুষে যত লড়াই, যত প্রবঞ্চনা।

অর্থ-উপার্জন শক্তি-উপার্জন যদি সমাজভুক্ত লোকের পরস্পরের যোগে হতে পারত তা হলে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই সকল ব্যক্তির সম্মিলিত প্রয়াসের প্রভূত ফল সহজ নিয়মে লাভ করতে পারত। ধনীর উপরে বরাবর এই একটি ধর্ম-উপদেশ চলে আসছে যে, তুমি দান করবে। তার মানেই হচ্ছে ধর্ম এবং বিদ্যা প্রভৃতির ন্যায় ধনেও কল্যাণের দাবি খাটে, না খাটাই অধর্ম। কল্যাণের দাবি হচ্ছে স্বার্থের দাবির বিপরীত এবং স্বার্থের দাবির চেয়ে তা উপরের জিনিস। দানের যে উপদেশ আছে তাতে ধনীর স্বার্থকে সাধারণের কল্যাণের সঙ্গে জড়িত করবার চেষ্টা করা হয়েছে বটে, কিন্তু কল্যাণকে স্বার্থের অনুবর্তী করা হয়েছে, তাকে পুরোবর্তী করা হয় নি। সেইজন্য দানের দ্বারা দারিদ্র্য দূর না হয়ে বরঞ্চ তা পাকা হয়ে ওঠে।

ধর্মের উপদেশ ব্যর্থ হয়েছে বলেই, সকল সমাজেই ধন ও দৈন্যের দ্বন্দ্ব একান্ত হয়ে রয়েছে বলেই, যাঁরা এই অকল্যাণকর ভেদকে সমাজ থেকে দূর করতে চান তাঁদের অনেকেই জবর্দস্তির দ্বারা লক্ষ্যসাধন করতে চান। তাঁরা দস্যুবৃত্তি ক'রে, রক্তপাত ক'রে ধনীর ধন অপহরণ ক'রে সমাজে আর্থিক সাম্য স্থাপন করতে চেষ্টা করেন। এ-সমস্ত চেষ্টা বর্তমান যুগে পশ্চিম মহাদেশে প্রায় দেখতে পাওয়া যায়। তার কারণ হচ্ছে, পশ্চিমের মানুষের গায়ের জোরটা বেশি, সেইজন্যেই গায়ের জোরের উপর তার আস্থা বেশি; কল্যাণসাধনেও সে গায়ের জোর না খাটিয়ে থাকতে পারে না। তার ফলে অর্থও নষ্ট হয়, ধর্মও নষ্ট হয়। রাশিয়ায় সোভিয়েট-রাষ্ট্রনীতিতে তার দৃষ্টান্ত দেখতে পাই।

অতএব ধর্মের দোহাই বা গায়ের জোরের দোহাই এই দুয়ের কোনোটাই মানব-সমাজের দারিদ্র্য-মোচনের পন্থা নয়। মানুষকে দেখানো চাই যে, বড়ো মূলধনের সাহায্যে অর্থসম্ভোগকে ব্যক্তিগত স্বার্থের সীমার মধ্যে একান্ত আটকে রাখা সম্ভব হবে না। আজকের দিনে যদি কোনো ক্রোরপতি উটের ডাক বসিয়ে কেবলমাত্র তাঁর নিজের চিঠি-চালাচালির বন্দোবস্ত করতে চান তা হলে সামান্য চাষার চেয়েও তাঁকে

ঠকতে হবে; অথচ পূর্বকালে এমন এক দিন ছিল যখন ধনীরই ছিল উটের ডাক, আর চাষীর কোনো ডাক ছিল না। সেদিন ধনীকে তাঁর গুরুঠাকুর এসে যদি ধর্ম-উপদেশ দিতেন তবে হয়তো তিনি তাঁর নিজের চিঠিপত্রের সঙ্গে গ্রামের আরো কয়েকজনের চিঠিপত্রের ভারবহন করতে পারতেন, কিন্তু তাতে করে দেশে পত্রচালনার অভাব প্রকৃতভাবে দূর হতে পারত না। সাধারণের দারিদ্র্য-হরণের শক্তি ধনীর ধনে নেই। সে আছে সাধারণের শক্তির মধ্যেই। এই কথাটা জানা চাই, এবং তার দৃষ্টান্ত সকলের কাছে সুস্পষ্ট হওয়া চাই। কৃত্রিম উপায়ে ধনবণ্টন করে কোনো লাভ নেই, সত্য উপায়ে ধন উৎপাদন করা চাই। জনসাধারণে যদি নিজের অর্জনশক্তিকে একত্র মেলাবার উদ্যোগ করে তবে এই কথাটা স্পষ্ট দেখিয়ে দিতে পারে যে, যে মূলধনের মূল সকলের মধ্যে তার মূল্য ব্যক্তিবিশেষের মূলধনের চেয়ে অসীমগুণে বেশি। এইটি দেখাতে পারলেই তবে মূলধনকে নিরস্ত্র করা যায়, অস্ত্রের জোরে করা যায় না। মানুষের মনে ধনভোগ করার ইচ্ছা আছে, সেই ইচ্ছাকে কৃত্রিম উপায়ে দলন করে মেরে ফেলা যায় না। সেই ইচ্ছাকে বিরাট্‌ভাবে সার্থক করার দ্বারাই তাকে তার সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করা যেতে পারে।

মানুষের ইতিহাসে এক দিকে রাজশক্তি অন্য দিকে প্রজাশক্তি এই দুই শক্তির দ্বন্দ্ব আছে। রাজার প্রতি ধর্ম-উপদেশ ছিল যে, প্রজার মঙ্গলসাধনই তাঁর কর্তব্য। সে কথা কেউ-বা শুনতেন, কেউ-বা আধাআধি শুনতেন, কেউ-বা একেবারেই শুনতেন না। এমন অবস্থা এখনো পৃথিবীতে অনেক দেশে আছে। অধিকাংশ স্থলেই এই অবস্থায় রাজা নিজের সুখসম্ভোগ, নিজের প্রতাপবৃদ্ধিকেই মুখ্য করে প্রজার মঙ্গলসাধনকে গৌণ করে থাকেন। এই রাজতন্ত্র উঠে গিয়ে আজ অনেক দেশে গণতন্ত্র বা ডিমক্রাসির প্রাদুর্ভাব হয়েছে। এই ডিমক্রাসির লক্ষ্য এই যে, প্রত্যেক প্রজার মধ্যে যে আত্ম-শাসনের ইচ্ছা ও শক্তি আছে তারই সমবায়ের দ্বারা রাষ্ট্রশাসনশক্তিকে অভিব্যক্ত করে তোলা। আমেরিকার যুক্তরাজ্য এই ডিমক্রাসির বড়াই করে থাকে।

কিন্তু যেখানে মূলধন ও মজুরির মধ্যে অত্যন্ত ভেদ আছে সেখানে ডিমক্রাসি পদে পদে প্রতিহত হতে বাধ্য। কেননা, সকলরকম প্রতাপের প্রধান বাহক হচ্ছে অর্থ। সেই অর্থ-অর্জনে যেখানে ভেদ আছে সেখানে রাজপ্রতাপ সকল প্রজার মধ্যে সমান-ভাবে প্রবাহিত হতেই পারে না। তাই 'য়ুনাইটেড স্টেটস্‌'এ রাষ্ট্রচালনার মধ্যে ধনের শাসনের পদে পদে পরিচয় পাওয়া যায়। টাকার জোরে সেখানে লোকমত তৈরি হয়, টাকার দৌরাত্ম্যে সেখানে ধনীর স্বার্থের সর্বপ্রকার প্রতিকূলতা দলিত হয়। একে জনসাধারণের স্বায়ত্তশাসন বলা চলে না।

এইজন্যে, যথেষ্টপরিমাণ স্বাধীনতাকে সর্বসাধারণের সম্পদ্ করে তোলবার মূল উপায় হচ্ছে ধন-অর্জনে সর্বসাধারণের শক্তিকে সম্মিলিত করা। তা হলে ধন টাকা-আকারে কোনো একজনের বা এক সম্প্রদায়ের হাতে জমা হবে না ; কিন্তু লক্ষপতি ক্রোরপতিরা আজ ধনের যে ফল ভোগ করবার অধিকার পায় সেই ফল সকলেই ভোগ করতে পাবে। সমবায়-প্রণালীতে অনেকে আপন শক্তিকে যখন ধনে পরিণত করতে শিখবে তখনই সর্বমানবের স্বাধীনতার ভিত্তি স্থাপিত হবে।

এই সমবায়-প্রণালীতে ধন উৎপাদন করার আলোচনা ও পরীক্ষা আমাদের দেশে সম্প্রতি আরম্ভ হয়েছে। আমাদের দেশে এর প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। দারিদ্র্য থেকে রক্ষা না পেলে আমরা সকলরকম যমদূতের হাতে মার খেতে থাকব। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই ধন নিহিত হয়ে আছে, এই সহজ কথাটি বুঝলে এবং কাজে খাটালে তবেই আমরা দারিদ্র্য থেকে বাঁচব।

* দেশের সমস্ত গ্রামকে নিজের সর্বপ্রকার প্রয়োজনসাধনক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে। এজন্য কতকগুলি পল্লী নিয়ে এক একটি মণ্ডলী স্থাপন করা দরকার, সেই মণ্ডলীর প্রধানগণ যদি গ্রামের সমস্ত কর্মের ও অভাবমোচনের ব্যবস্থা করে মণ্ডলীকে নিজের মধ্যে পর্যাপ্ত করে তুলতে পারে তবেই স্বায়ত্তশাসনের চর্চা দেশের সর্বত্র সত্য হয়ে উঠবে। নিজের পাঠশালা, শিল্পশিক্ষালয়, ধর্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক্-স্থাপনের জন্য পল্লীবাসীদের শিক্ষা সাহায্য ও উৎসাহ দান করতে হবে। এমনি ক'রে দেশের পল্লীগুলি আত্মনির্ভরশীল ও ব্যূহবদ্ধ হয়ে উঠলেই আমরা রক্ষা পাব। কিভাবে বিশিষ্ট পল্লীসমাজ গড়ে তুলতে হবে, এই হচ্ছে আমাদের প্রধান সমস্যা।…

ফাল্গুন ১৩২৯

ভারতবর্ষে সমবায়ের বিশিষ্টতা

বহুদিন পূর্বে, এখানে আজ যারা উপস্থিত আছেন তাঁরা যখন অনেকেই বালক ছিলেন বা জন্মান নি, তখন একদা ভেবেছিলাম যে, পূর্বকালে আমাদের সমাজদেহে প্রাণক্রিয়ার একটা বিশেষ প্রণালী সুস্থ ও অব্যাহত ভাবে কাজ করছিল। পাশ্চাত্য মহাদেশে এক-একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে প্রাণশক্তিকে সংহত করে জনচিত্ত আর্থিক ও পারমার্থিক ও বুদ্ধিগত ঐশ্বর্য সৃষ্টি করছে। সেই-সকল কেন্দ্র থেকেই তাদের শক্তির যথার্থ উৎস। ভারতবর্ষে সর্বজনচিত্ত ধর্মে কর্মে ভোগে গ্রামে গ্রামে সর্বত্র প্রবাহিত

হয়েছিল। সেইজন্তেই নানা কালে বিদেশী নানা রাজশক্তির আঘাত অভিঘাত তার পক্ষে মর্মান্তিক হয়ে ওঠে নি। এমন গ্রাম ছিল না যেখানে সর্বজনসুলভ প্রাথমিক শিক্ষার পাঠশালা ছিল না। গ্রামের সম্পন্ন ব্যক্তিদের চণ্ডীমণ্ডপগুলি ছিল এই-সকল পাঠশালার অধিষ্ঠানস্থল। চার-পাঁচটি গ্রামের মধ্যে অন্তত একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন যাঁর ব্রত ছিল বিদ্যার্থীদের বিদ্যাদান করা। সমাজধর্মের আবহমান আদর্শের বিশুদ্ধতা রক্ষার ভার তাঁদের উপরই ছিল। তখনকার কালে ঐশ্বর্যের ভোগ একান্ত সংকীর্ণভাবে ব্যক্তিগত ছিল না। এক-একটি মূল ঐশ্বর্যের ধারা থেকে সর্বসাধারণের নানা ব্যবহারের বহুশাখাবিভক্ত ইরিগেশন-ক্যানালগুলি নানা দিকে প্রসারিত হত। তেমনি জ্ঞানীর জ্ঞানভাণ্ডার সকলের কাছে অবারিত ছিল। গুরু শুধু বিদ্যাদানই করতেন না, ছাত্রদের কাছ হতে খাওয়া-পরার মূল্য পর্যন্ত নিতেন না। এমনি ভাবে সর্বাঙ্গীণ প্রাণশক্তি গ্রামে গ্রামে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। তাই তখন জলের অভাব হয় নি, অন্নের অভাব হয় নি, মানুষের চিত্তকে উপবাসী থাকতে হয় নি। সেইটাতে আঘাত করলে যখন ইউরোপীয় আদর্শে নগরগুলিই দেশের মর্মস্থান হয়ে উঠতে লাগল। আগে গ্রামে গ্রামে একটি সর্বস্বীকৃত সহজ ব্যবস্থায় ধনী দরিদ্র পণ্ডিত মূর্খ সকলের মধ্যেই যে একটা সামাজিক যোগ ছিল বাইরের আঘাতে এই সামাজিক স্নায়ুজাল খণ্ড খণ্ড হওয়াতে গ্রামে গ্রামে আমাদের প্রাণদৈন্য ঘটল। একদিন যখন বাংলাদেশের গ্রামের সঙ্গে আমার নিত্যসংস্রব ছিল তখন এই চিন্তাটিই আমার মনকে আন্দোলিত করেছে। সেদিন স্পষ্ট চোখের সামনে দেখেছি যে, যে ব্যাপক ব্যবস্থায় আমাদের দেশের জনসাধারণকে সকলরকমে মানুষ করে রেখেছিল আজ তাতে ব্যাঘাত হচ্ছে, দেশের সর্বত্র প্রাণের রস সহজে সঞ্চারিত হবার পথগুলি আজ অবরুদ্ধ। আমার মনে হয়েছিল যতদিন পর্যন্ত এই সমস্যার সমাধান না হয় ততদিন আমাদের রাষ্ট্রীয় উন্নতির চেষ্টা ভিত্তিহীন, আমাদের মঙ্গল সুদূরপরাহত। এই কথাই আমি তখন (১৩১১ সালে) 'স্বদেশী সমাজ' -নামক বক্তৃতায় বলেছি।[১] কিন্তু কেবলমাত্র কথার দ্বারা শ্রোতার চিত্তকে জাগরিত করে আমাদের দেশে ফল অল্পই পাওয়া যায়, তাই কেজো বুদ্ধি আমার না থাকা সত্ত্বেও কোনো কোনো গ্রাম নিয়ে সেগুলিকে ভিতরের দিক থেকে সচেতন করার কাজে আমি নিজে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। তখন আমার সঙ্গে কয়েকজন তরুণ যুবক সহযোগীরূপে ছিলেন। এই চেষ্টার ফলে একটি জিনিস আমার শিক্ষা হয়েছে সেটি এই— দারিদ্র্য হোক, অজ্ঞান হোক, মানুষ যে গভীর দুঃখ ভোগ করে তার মূলে

১ 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ রবীন্দ্র-রচনাবলী তৃতীয় খণ্ডে এবং 'সমূহ' ও 'স্বদেশী সমাজ' গ্রন্থে সংকলিত।

সত্যের ত্রুটি। মানুষের ভিতরে যে সত্য তার মূল হচ্ছে তার ধর্মবুদ্ধিতে; এই বুদ্ধির জোরে পরস্পরের সঙ্গে মানুষের মিলন গভীর হয়, সার্থক হয়। এই সত্যটি যখনই বিকৃত হয়ে যায়, দুর্বল হয়ে পড়ে, তখনই তার জলাশয়ে জল থাকে না, তার ক্ষেত্রে শস্য সম্পূর্ণ ফলে না, সে রোগে মরে, অজ্ঞানে অন্ধ হয়ে পড়ে। মনের যে দৈন্যে মানুষ আপনাকে অন্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে সেই দৈন্যেই সে সকল দিকেই মরতে বসে, তখন বাইরের দিক থেকে কেউ তাকে বাঁচাতে পারে না।

গ্রামে আগুন লাগল। দেখা গেল, সে আগুন সমস্ত গ্রামকে ভস্ম করে তবে নিবল। এটি হল বাইরের কথা। ভিতরের কথা হচ্ছে, অন্তরের যোগে মানুষে মানুষে ভালো করে মিলতে পারল না; সেই অমিলের ফাঁক দিয়েই আগুন বিস্তীর্ণ হয়। সেই অমিলের ফাঁকেই বুদ্ধিকে জীর্ণ করে, সাহসকে কাবু করে, সকলরকম কর্মকেই বাধা দেয়, এইজন্যেই পূর্ব থেকে কাছে কোথাও জলাশয় প্রস্তুত ছিল না; এইজন্যেই জলন্ত ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে সকলে কেবল হাহাকারেই কণ্ঠ মিলিয়েছে, আর কিছুতেই তাদের শক্তির মিল হয় নি।

পর্বে পর্বে মানবসভ্যতা এগিয়েছে। প্রত্যেক পর্বেই মানুষ প্রশস্ততর করে এই সত্যটাকেই আবিষ্কার করেছে। মানুষ যখন অরণ্যের মধ্যে ছিল তখন তার পরস্পরের মিলনের প্রাকৃতিক বাধা ছিল। পদে পদে সে বাইরের দিকে অবরুদ্ধ ছিল। এইজন্যে তার ভিতরের দিকের অবরোধও ঘোচে নি। অরণ্যের থেকে যখন সে নদীতে এসে পৌঁছল সে এমন-একটা বেগবান পথ পেলে যাতে দূরে দূরে তার যোগ বাইরের দিকে ও সেই সুযোগে ভিতরের দিকে প্রসারিত হতে থাকল। অর্থাৎ এই উপায়ে মানুষ আপন সত্যকে বড়ো করে পেতে চলল। অরণ্যের বাইরে এই নদীর মুক্ত তীরে সভ্যতার এক নূতন অধ্যায়। প্রাচীন ভারতে গঙ্গা সভ্যতাকে পরিণতি ও বিস্তৃতি দেওয়ার পুণ্যকর্ম করেছে। পঞ্চনদের জলধারায় অভিষিক্ত ভূখণ্ডকে একদা ভারতবাসী পুণ্যভূমি বলে জানত, সেও এইজন্যেই। গঙ্গাও আপন জলধারার উপর দিয়ে মানুষের যোগের ধারাকে, সেইসঙ্গেই তার জ্ঞান ধর্ম কর্মের ধারাকেও, ভারতের পশ্চিমগিরিতট থেকে আরম্ভ করে পূর্বসমুদ্রতট পর্যন্ত প্রসারিত করেছে। সে কথা আজও ভারতবর্ষ ভুলতে পারে নি।

সভ্যতার আরণ্যপর্বে দেখি মানুষ বনের মধ্যে পশুপালনদ্বারা জীবিকানির্বাহ করছে; তখন ব্যক্তিগতভাবে লোকে নিজের নিজের ভোগের প্রয়োজন সাধন করেছে। যখন কৃষিবিদ্যা আয়ত্ত হল তখন বহু লোকের অন্নকে বহু লোকে সমবেত হয়ে উৎপন্ন করতে লাগল। এই নিয়মিতভাবে প্রচুর অন্ন-উৎপাদনের দ্বারাই বহু লোকের

একত্র অবস্থিতি সম্ভবপর হল। এইরূপে বহু লোকের মিলনেই মানবের সত্য, সেই মিলনেই তার সভ্যতা।

এক কালে জনকরাজা ছিলেন ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার প্রতিনিধি। তিনি এই সভ্যতার অন্নময় ও জ্ঞানময় দুটি ধারাকে নিজের মধ্যে মিলিয়েছিলেন। কৃষি ও ব্রহ্মজ্ঞান, অর্থাৎ আর্থিক ও পারমার্থিক। এই দুয়ের মধ্যেই ঐক্যসাধনার দুই পথ। সীতা তো জনকের শরীরিণী কন্যা ছিলেন না। মহাভারতের দ্রৌপদী যেমন যজ্ঞসম্ভবা রামায়ণের সীতা তেমনি কৃষিসম্ভবা। হলবিদারণ-রেখায় জনক তাকে পেয়েছিলেন। এই সীতাই, এই কৃষিবিদ্যাই, আর্যাবর্ত থেকে দাক্ষিণাত্যে রাক্ষসদমন বীরের সঙ্গিনী হয়ে সে-সময়কার সভ্যতার ঐক্যবন্ধনে আর্য-অনার্য সকলকে বেঁধে উত্তরে দক্ষিণে ব্যাপ্ত হয়েছিল।

অন্নসাধনার ক্ষেত্রে কৃষিই মানুষকে ব্যক্তিগত খণ্ডতার থেকে বৃহৎ সম্মিলিত সমাজের ঐক্যে উত্তীর্ণ করতে পেরেছিল। ধর্মসাধনায় ব্রহ্মবিদ্যার সেই একই কাজ। যখন প্রত্যেক স্তবকারী আপন স্তবমন্ত্র ও বাহ্যপূজাবিধির মায়াগুণে আপন দেবতার উপরে বিশেষ প্রভাব-বিস্তারের আশা করত— তখন দেবত্ববোধের ভিতর দিয়ে মানুষ আত্মায় আত্মায় এবং আত্মায় পরমাত্মায় মিলনের ঐক্যবোধ সুগভীর ও সুবিস্তীর্ণ করে লাভ করেছিল।

বৈজ্ঞানিক মহলে এক কালে প্রত্যেক জীবের স্বতন্ত্র সৃষ্টির মত প্রচলিত ছিল। জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে তখন মানুষের ধারণা ছিল খণ্ডিত। ডারুইন যখন জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি মূলগত ঐক্য আবিষ্কার ও প্রচার করলেন তখন এই একটি সত্যের আলোক বৈজ্ঞানিক ঐক্যবুদ্ধির পথ জড়ে জীবে অবারিত করে দিলে।

যেমন জ্ঞানের ক্ষেত্রে তেমনি ভাবের ক্ষেত্রে তেমনি কর্মের ক্ষেত্রে সর্বত্রই সত্যের উপলব্ধি ঐক্যবোধে নিয়ে যায় এবং ঐক্যবোধের দ্বারাই সকল-প্রকার ঐশ্বর্যের সৃষ্টি হয়। বিশ্বব্যাপারে ঐক্যবোধের যোগে য়ুরোপে জ্ঞান ও শক্তির আশ্চর্য উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। এই ক্ষেত্রে এত উন্নতি মানুষের ইতিহাসে কোথাও আর-কখনো হয়েছে বলে আমরা জানি নে। এই উৎকর্ষলাভের আর-একটি কারণ এই যে, য়ুরোপের জ্ঞানসমৃদ্ধিকে পরিপূর্ণ করবার কাজে য়ুরোপের সকল দেশের চিত্তই মিলিত হয়েছে।

আবার অন্য দিকে দেখতে পাই, রাষ্ট্রিক ও আর্থিক প্রতিযোগিতায় য়ুরোপ মানুষের ঐক্যমূলক মহাসত্যকে একেবারেই অস্বীকার করেছে। তাই এই দিকে বিনাশের যজ্ঞহুতাশনে য়ুরোপ যেরকম প্রচণ্ড বলে ও প্রকাণ্ড পরিমাণে নররক্তের আহুতি দিতে বসেছে মানুষের ইতিহাসে কোনোদিন এমন কখনোই হয় নি। সত্যবিদ্রোহের মহাপাপে

সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আজ আর শান্তি নেই। জগৎ জুড়ে সর্বত্রই মানুষের রাষ্ট্রিক ও আর্থিক চিত্ত মিথ্যায়, কপটতায়, নরঘাতী নিষ্ঠুরতায় নির্লজ্জভাবে কলুষিত। দেখে মনে হয়, সত্যবিচ্যুত মানুষ একটা বিশ্বব্যাপী আত্মসংহারের আয়োজনে তার সমস্ত ধনজন জ্ঞান ও শক্তি নিয়ে প্রবৃত্ত হয়েছে।

সামাজিক দিকে মানুষ ধর্মকে স্বীকার করেছে, কিন্তু আর্থিক দিকে করে নি। অর্থের উৎপাদন অধিকার ও ভোগ সম্বন্ধে মানুষ নিজেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলেই জানে; এইখানেই সে আপন অহমিকা, আপন আত্মম্ভরিতাকে ক্ষুণ্ণ করতে অনিচ্ছুক। এইখানে তার মনের ভাবটা একলা-মানুষের ভাব, এইখানে তার নৈতিক দায়িত্ববোধ ক্ষীণ।

এই নিয়ে যখন আমরা বিপ্লবোন্মত্ত ভাব ধারণ করি তখন সাধারণত ধনিক ও শ্রমিকদের সম্বন্ধ নিয়েই উত্তেজনা প্রকাশ করি। কিন্তু অন্য ব্যবসায়ীদের সম্বন্ধেও এ কথা সম্পূর্ণ খাটে, অনেক সময়ে সে কথা ভুলে যাই। একজন আইনজীবী হয়তো একখানা দলিল মাত্র পড়ে কিম্বা আদালতে দাঁড়িয়ে গরিব মক্কেলের কাছে পাঁচ-সাত শো, হাজার, দু হাজার টাকা দাবি করেন; সেখানে তাঁরা অন্যপক্ষের অজ্ঞতা-অক্ষমতার ট্যাক্‌সো যথাসম্ভব শুষে আদায় করে নেন। কারখানার মালিক ধনিকেরাও ঠিক তাই করেন। পরস্পরের পেটের দায়ের অসাম্যের উপরেই তাঁদের শোষণের জোর। আমাদের দেশে কন্যাপক্ষের কাছে বরপক্ষ অসংগত পরিমাণে পণ দাবি করে; তার কারণ, বিবাহ করার অবশ্যকৃত্যতা সম্বন্ধে কন্যা ও বরের অবস্থার অসাম্য। কন্যার বিবাহ করতেই হবে, বরের না করলেও চলে, এই অসাম্যের উপর চাপ দিয়েই এক পক্ষ অন্য পক্ষের উপর দণ্ড দাবি করতে বাধা পায় না। এ স্থলে ধর্মোপদেশ দিয়ে ফল হয় না, পরস্পরের ভিতরকার অসাম্য দূর করাই প্রকৃষ্ট পন্থা।

বর্তমান যুগে ধনোপার্জনের অধ্যবসায়ে প্রকৃতির শক্তিভাণ্ডারের নানা রুদ্ধ কক্ষ খোলবার নানা চাবি যখন থেকে বিজ্ঞান খুঁজে পেয়েছে তখন থেকে যারা সেই শক্তিকে আয়ত্ত করেছে এবং যারা করে নি তাদের মধ্যে অসাম্য অত্যন্ত অধিক হয়ে উঠেছে। এক কালে পণ্য-উৎপাদনের শক্তি, তার উপকরণ ও তার মুনফা ছিল অল্পপরিমিত সুতরাং তার দ্বারা সমাজের সামঞ্জস্য নষ্ট হতে পারে নি। কিন্তু এখন ধন জিনিসটা সমাজের অন্য সকল সম্পদ্‌কেই ছাড়িয়ে গিয়ে এমন একটা বিপুল অসাম্য সৃষ্টি করছে যাতে সমাজের প্রাণ পীড়িত, মানবপ্রকৃতি অভিভূত হয়ে পড়ছে। ধন আজ যেন মানবশক্তির সীমা লঙ্ঘন করে দানবশক্তি হয়ে দাঁড়ালো, মনুষ্যত্বের বড়ো বড়ো দাবি তার কাছে হীনবল হয়েছে। যন্ত্রসহায় পুঞ্জীভূত ধন আর সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক

শক্তির মধ্যে এমন অতিশয় অসামঞ্জস্য যে, সাধারণ মানুষকে পদে পদে হার মানতে হচ্ছে। এই অসামঞ্জস্যের সুযোগটা যাদের পক্ষে তারাই অপর পক্ষকে একেবারে অন্তিম মাত্রা পর্যন্ত দলন করে নিজের অতিপুষ্টি সাধন করে এবং ক্রমশই স্ফীত হয়ে উঠে সমাজদেহের ভারসামঞ্জস্যকে নষ্ট করতে থাকে।

সমাজের ভিত্তিই হচ্ছে সামঞ্জস্য। তাই যখনই সেই সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে এমন-সকল রিপু প্রবল হয় – এমন-সকল ব্যবস্থাবিপর্যয় ঘটে যা সমাজবিরুদ্ধ, যাতে করে অল্প লোকে বহু লোকের সংস্থানকে নষ্ট করে, তাদের সকলকে আপন ব্যক্তিগত ঐশ্বর্যবৃদ্ধির উপায়রূপে ব্যবহার করতে থাকে, তখন হয় সমাজ সেই অত্যাচারে জীর্ণ হয়ে বহু লোকের দুঃখ ও দাস্য -ভারে আধ-মরা হয়ে থাকে নয় তার আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

য়ুরোপে এই বিদ্রোহের বেগ অনেক দিন থেকেই ক্রমে বেড়ে উঠছে। য়ুরোপে সকল-রকম অসামঞ্জস্য আপন সংশোধনের জন্যে সর্বপ্রথমেই মার-কাটের পথ নেবার দিকেই ঝোঁকে।

তার কারণ য়ুরোপীয়ের রক্তের মধ্যে একটা সংহারের প্রবৃত্তি আছে। দেশে বিদেশে অকারণে পশুপক্ষী ধ্বংস করে তারা এই হিংসাবৃত্তির তৃপ্তি করে বেড়ায়; সেইজন্যেই যখন কোনো-একটা বিশেষ অবস্থার ক্রিয়া তাদের পছন্দ না হয় তখন সেই অবস্থার মূলে যে আইডিয়া আছে তার উপরে হস্তক্ষেপ করবার আগেই তারা মানুষকে মেরে উজাড় করে দিতে চায়। বাতাসে যখন রোগের বীজ ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন সেই বীজ যে মানুষকে পেয়ে বসেছে সেই মানুষটাকে মেরে ফেলে রোগের বীজ মরে না। বর্তমান কালে সমাজে অতি পরিমাণে যে আর্থিক অসামঞ্জস্য প্রশ্রয় পেয়ে চলেছে তার মূলে আছে লোভ। লোভ মানুষের চিরদিনই আছে। কিন্তু যে পরিমাণে থাকলে সমাজের বিশেষ ক্ষতি করে না, বরঞ্চ তার কাজে লাগে, সেই সাধারণ সীমা খুব বেশি ছাড়িয়ে যায় নি। কিন্তু এখন সেই লোভের আকর্ষণ প্রচণ্ড প্রবল; কেননা, লাভের আয়তন প্রকাণ্ড বড়ো হয়েছে। অর্থ-উৎপাদনের উপায়গুলি আগেকার চেয়ে বহুশক্তিসম্পন্ন। যতক্ষণ পর্যন্ত লোভের কারণগুলি বাইরে আছে ততক্ষণ এক মানুষের মধ্যে সেটাকে তাড়া করলে সে আর-এক মানুষের উপর চাপবে; এমন-কি, যে লোকটা আজ তাড়া করছে সেই লোকটারই কাঁধে কাল ভর দিয়ে বসবার আশঙ্কা খুবই আছে। লোভটাকে অপরিমিতরূপে তৃপ্ত করবার উপায় এক জায়গায় বেশি করে সংহত হলেই সেটা তার আকর্ষণশক্তির প্রবলতায় লোকচিত্তকে কেবলই বিচলিত করতে থাকে। সেটাকে যথাসম্ভব সকলের

মধ্যে চারিয়ে দিতে পারলে তবে সেই আন্দোলন থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয়। অনেক মানুষের মধ্যে যে অর্থকরী শক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে বড়ো মূলধন তাদের নিজের আয়ত্ত করে বড়ো ব্যাবসা ফাঁদে; এই সংঘবদ্ধ শক্তির কাছে বিচ্ছিন্ন শক্তিকে হার মানতে হয়। এর একটিমাত্র উপায় বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলি যদি স্বতঃই একত্রিত হতে পারে এবং সম্মিলিত ভাবে ধন উৎপাদন করে। তা হলে ধনের স্রোতটা সকলের মধ্যে প্রবাহিত হতে পারে। ধনীকে মেরে এ কাজ সম্পন্ন হয় না, ধনকে সকলের মধ্যে মুক্তিদানের দ্বারাই হতে পারে, অর্থাৎ ঐক্যের সত্য অর্থনীতির মধ্যেও প্রচলিত হতে পারলে তবেই অসাম্যগত বিরোধ ও দুর্গতি থেকে মানুষ রক্ষা পেতে পারে।

প্রাচীন যুগে অতিকায় জন্তুসকল এক দেহে প্রভূত মাংস ও শক্তি পুঞ্জিভূত করেছিল। মানুষ অতিকায় রূপ ধরে তাদের পরাস্ত করে নি। ছোটো ছোটো দুর্বল মানুষ পৃথিবীতে এল। এক বৃহৎ জীবের শক্তিকে তারা পরাস্ত করতে পারল বহু বিচ্ছিন্ন জীবের শক্তির মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি ক'রে। আজ প্রত্যেক মানুষ বহু মানুষের অন্তর ও বাহ্য-শক্তির ঐক্যে বিরাট্, শক্তিসম্পন্ন। তাই মানুষ পৃথিবীতে জীবলোক জয় করছে।

আজ কিছুকাল থেকে মানুষ অর্থনীতির ক্ষেত্রেও এই সত্যকে আবিষ্কার করেছে। সেই নূতন আবিষ্কারেরই নাম হয়েছে সমবায়-প্রণালীতে ধন-উপার্জন। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, অতিকায় ধনের শক্তি বহুকায়ায় বিভক্ত হয়ে ক্রমে অন্তর্ধান করবে এমন দিন এসেছে। আর্থিক অসাম্যের উপদ্রব থেকে মানুষ মুক্তি পাবে মার-কাট করে নয়, খণ্ড খণ্ড শক্তির মধ্যে ঐক্যের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে। অর্থাৎ অর্থনীতিতে যে মানবনীতির স্থান ছিল না বলেই এত অশান্তি ছিল সেখানে সেই মানবসত্যের আবির্ভাব হচ্ছে। একদা দুর্বল জীব প্রবল জীবের রাজ্যে জয়ী হয়েছে, আজও দুর্বল হবে জয়ী— প্রবলকে মেরে নয়, নিজের শক্তিকে ঐক্যদ্বারা প্রবলরূপে সত্য ক'রে। সেই জয়ধ্বজা দূর হতে আমি দেখতে পাচ্ছি। সমবায়ের শক্তি দিয়ে আমাদের দেশের সেই জয়ের আগমনী সূচিত হচ্ছে।

আমার পূর্ববর্তী বক্তা ডেনমার্কের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু একটি কথা তিনি ভুলেছেন, ভারতবর্ষের অবস্থা ও ডেনমার্কের অবস্থা ঠিক সমান নয়। ডেনমার্ক্ আজ dairy farm-এ যে উন্নতি করেছে তার মূলে শুধু সমবায় নয়; সেখানকার গবর্মেন্টের ইচ্ছায় ও চেষ্টায় dairy farm-এর উন্নতির জন্ত প্রজাসাধারণের শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা হয়েছে। ডেনমার্কের মতো স্বাধীন দেশেই সরকারের তরফ থেকে সাধারণকে এমন সাহায্য করা সম্ভব।

ডেনমার্কের একটি মস্ত সুবিধা এই যে, সে দেশ রণসজ্জার বিপুল ভারে পীড়িত নয়। তার সমস্ত অর্থই প্রজার বিচিত্র কল্যাণের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে নিযুক্ত হতে পারে। প্রজার শিক্ষা স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সম্পদের জন্যও আমাদের রাজস্বের ভারমোচন আমাদের ইচ্ছাধীন নয়। প্রজাহিতের জন্য রাজস্বের যে উদ্‌বৃত্ত থাকে তা শিক্ষাবিধান প্রভৃতি কাজের জন্য যৎসামান্য। এখানেও আমাদের সমস্যা হচ্ছে রাজশক্তির সঙ্গে প্রজাশক্তির নিরতিশয় অসাম্য। প্রজার শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতি কল্যাণের জন্যে সমবায়-প্রণালীর দ্বারাই, নিজের শক্তি-উপলব্ধি-দ্বারাই অসামাজনিত দৈন্যদুর্গতির উপর ভিতর থেকে জয়ী হতে হবে। এই কথাটি আমি বহুকাল থেকে বারবার বলেছি, আজও বার-বার বলতে হবে।

আমাদের দেশে একদিন ছিল ধনীর ধনের উপর সমাজের দাবি। ধনী তার ধনের দায়িত্ব লোকমতের প্রভাবে স্বীকার করতে বাধ্য হত। তাতে তখনকার দিনে কাজ চলেছে, সমাজ বেঁচেছে। কিন্তু সেই দানদাক্ষিণ্যের প্রথা থাকাতে সাধারণ লোকে আত্মবশ হতে শিখতে পারে নি। তারা অনুভব করে নি যে, গ্রামের অন্ন ও জল, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, ধর্ম ও আনন্দ তাদের প্রত্যেকের শুভ-ইচ্ছার সমবায়ের উপরেই নির্ভর করে। সেই কারণেই আজ যখন আমাদের সমাজনীতির পরিবর্তন হয়েছে, ধনের ভোগ যখন একান্ত ব্যক্তিগত হল, ধনের দায়িত্ব যখন লোকহিতে সহজভাবে নিযুক্ত নয়, তখন লোক আপন হিতসাধন করতে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়েছে। আজ ধনীরা শহরে এসে ধন-ভোগ করছে বলেই গ্রামের সাধারণ লোকেরা আপন ভাগ্যের কার্পণ্য নিয়ে হাহাকার করছে। তাদের বাঁচবার উপায় যে তাদেরই নিজের হাতে এ কথা বিশ্বাস করবার শক্তি তাদের নেই। গোড়ায় অন্নের ক্ষেত্রে এই বিশ্বাস যদি জাগিয়ে তুলতে পারা যায়, এই বিশ্বাসকে সার্থকভাবে প্রমাণ করা যায়, তা হলেই দেশ ক্রমে সকল দিকেই বাঁচবে। অতএব সমবায়রীতির দ্বারা এই সত্যকে সাধারণের মধ্যে প্রচার করা আমাদের আজকের দিনের কর্তব্য। লঙ্কায় বহুখাদ্যখাদক দশমুণ্ডধারী বহু-অর্থ-গৃধ্নু দশ-হাত-ওয়ালা রাবণকে মেরেছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বানরের সংঘবদ্ধ শক্তি। একটি প্রেমের আকর্ষণে সেই সংঘটি বেঁধেছিল। আমরা যাঁকে রামচন্দ্র বলি তিনিই প্রেমের দ্বারা দুর্বলকে এক করে তাদের ভিতর প্রচণ্ড শক্তিবিকাশ করেছিলেন। আজ আমাদের উদ্ধারের জন্যে সেই প্রেমকে চাই, সেই মিলনকে চাই।

২ জুলাই ১৯২৭ শ্রাবণ ১৩৩৪

সমবায়নীতি

সভ্যতার বিশেষ অবস্থায় নগর আপনিই গ্রামের চেয়ে প্রাধান্য লাভ করে। দেশের প্রাণ যে নগরে বেশি বিকাশ পায় তা নয়; দেশের শক্তি নগরে বেশি সংহত হয়ে ওঠে, এই তার গৌরব।

সামাজিকতা হল লোকালয়ের প্রাণ। এই সামাজিকতা কখনোই নগরে জমাট বাঁধতে পারে না। তার একটা কারণ এই যে, নগর আয়তনে বড়ো হওয়াতে মানুষের সামাজিক সম্বন্ধ সেখানে স্বভাবতই আলগা হয়ে থাকে। আর-একটা কারণ এই যে, নগরে ব্যবসায় ও অন্যান্য বিশেষ প্রয়োজন ও সুযোগের অনুরোধে জনসংখ্যা অত্যন্ত মস্ত হয়ে ওঠে। সেখানে মুখ্যত মানুষ নিজের আবশ্যককে চায়, পরস্পরকে চায় না। এইজন্যে শহরে এক পাড়াতেও যারা থাকে তাদের মধ্যে চেনাশুনো না থাকলেও লজ্জা নেই। জীবনযাত্রার জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে এই বিচ্ছেদ ক্রমেই বেড়ে উঠছে। বাল্যকালে দেখেছি আমাদের পাড়ার লোকে আমাদের বাড়িতে আত্মীয়ভাবে নিয়তই মেলামেশা করত। আমাদের পুকুরে আশপাশের সকল লোকেরই স্নান, প্রতিবেশীরা আমাদের বাগানে অনেকেই হাওয়া খেতে আসতেন এবং পূজার ফুল তুলতে কারো বাধা ছিল না। আমাদের বারান্দায় চৌকি পেতে যে যখন খুশি তামাক দাবি করত। বাড়িতে ক্রিয়াকর্মের ভোজে ও আমোদ-আহ্লাদে পাড়ার সকল লোকেরই অধিকার এবং আনুকূল্য ছিল। তখনকার ইমারতে দালানের সংলগ্ন একাধিক আঙিনার ব্যবস্থা কেবল যে আলোছায়ার অবাধ প্রবেশের জন্য তা নয়, সর্বসাধারণের অবাধ প্রবেশের জন্যে। তখন নিজের প্রয়োজনের মাঝখানে সকলের প্রয়োজনের জায়গা রাখতে হত; নিজের সম্পত্তি একেবারে কষাকষি করে নিজেরই ভোগের মাপে ছিল না। ধনীর ভাণ্ডারের এক দরজা ছিল তার নিজের দিকে, এক দরজা সমাজের দিকে। তখন যে ছিল ধনী তার সৌভাগ্য চারি দিকের লোকের মধ্যে ছিল ছড়ানো। তখন যাকে বলত ক্রিয়াকর্ম তার মানেই ছিল রবাহূত অনাহূত সকলকেই নিজের ঘরের মধ্যে স্বীকার করার উপলক্ষ।

এর থেকে বুঝতে পারি, বাংলাদেশের গ্রামের যে সামাজিক প্রকৃতি শহরেও সেদিন তা স্থান পেয়েছে। শহরের সঙ্গে পাড়াগাঁয়ের চেহারার মিল তেমন না থাকলেও চরিত্রের মিল ছিল। নিঃসন্দেহই পুরাতন কালে আমাদের দেশের বড়ো বড়ো নগরগুলি ছিল এই শ্রেণীর। তারা আপন নাগরিকতার অভিমান সত্ত্বেও গ্রামগুলির সঙ্গে জ্ঞাতিত্ব স্বীকার করত। কতকটা যেন বড়ো ঘরের সদর-অন্দরের মতো। সদরে

ঐশ্বর্য এবং আড়ম্বর বেশি বটে, কিন্তু আরাম এবং অবকাশ অন্দরে; উভয়ের মধ্যে হৃদয়সম্বন্ধের পথ খোলা।

এখন তা নেই, এ আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। দেখতে দেখতে গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে নগর একান্ত নগর হয়ে উঠল, তার খিড়কির দরজা দিয়েও গ্রামের আনাগোনার পথ রইল না। একেই বলে 'ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ'; গ্রামগুলি শহরকে চারি দিকেই ঘিরে আছে, তবু শত যোজন দূরে।

এরকম অস্বাভাবিক অসামঞ্জস্য কখনোই কল্যাণকর হতে পারে না। বলা আবশ্যক এটা কেবল আমাদের দেশেরই আধুনিক লক্ষণ নয়, এটা বর্তমান কালেরই সাধারণ লক্ষণ। বস্তুত পাশ্চাত্য হাওয়ায় এই সামাজিক আত্মবিচ্ছেদের বীজ ভেসে এসে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। এতে যে কেবল মানবজাতির সুখ ও শান্তি নষ্ট করে তা নয়, এটা ভিতরে ভিতরে প্রাণঘাতক। অতএব এই সমস্যার কথা আজ সকল দেশের লোককেই ভাবতে হবে।

য়ুরোপীয় ভাষায় যাকে সভ্যতা বলে সে সভ্যতা সাধারণ প্রাণকে শোষণ ক'রে বিশেষ শক্তিকে সংহত ক'রে তোলে, সে যেন বাঁশগাছে ফুল ধরার মতো, সে ফুল সমস্ত গাছের প্রাণকে নিঃশেষিত করে। বিশিষ্টতা বাড়তে বাড়তে এক-ঝোঁকা হয়ে ওঠে; তারই কেন্দ্রবহির্গত ভারে সমস্তটার মধ্যে ফাটল ধরতে থাকে, শেষকালে পতন অনিবার্য। য়ুরোপে সেই ফাটল ধরার লক্ষণ দেখতে পাই নানা আকারের আত্ম-বিদ্রোহে। কু-ক্লু-ক্স্-ক্ল্যান, সোভিয়েট, ফ্যাসিস্ট্, কর্মিক বিদ্রোহ, নারী-বিপ্লব প্রভৃতি বিবিধ আত্মঘাতীরূপে সেখানকার সমাজের গ্রন্থিভেদের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

ইংরেজিতে যাকে বলে এক্স্‌প্লইটেশন, অর্থাৎ শোষণনীতি, বর্তমান সভ্যতার নীতিই তাই। ন্যূনাংশিক বৃহদাংশিককে শোষণ করে বড়ো হতে চায়; তাতে ক্ষুদ্র-বিশিষ্টের স্ফীতি ঘটে, বৃহৎ-সাধারণের পোষণ ঘটে না। এতে করে অসামাজিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বেড়ে উঠতে থাকে।

পূর্বেই আভাস দিয়েছি, নগরগুলি দেশের শক্তির ক্ষেত্র, গ্রামগুলি প্রাণের ক্ষেত্র। আর্থিক রাষ্ট্রিক বা জনপ্রভুত্বের শক্তিচর্চায় জন্য বিশেষ বিধিব্যবস্থা আবশ্যক। সেই বিধি সামাজিক বিধি নয়, এই বিধানে মানবধর্মের চেয়ে যন্ত্রধর্ম প্রবল। এই যন্ত্রব্যবস্থাকে আয়ত্ত যে করতে পারে সেই শক্তি লাভ করে। এই কারণে নগর প্রধানত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র, এখানে সহযোগিতাবৃত্তি যথোচিত উৎসাহ পায় না।

শক্তি-উদ্‌ভাবনার জন্যে অহমিকা ও প্রতিযোগিতার প্রয়োজন আছে। কিন্তু যখনই তা পরিমাণ লঙ্ঘন করে তখনই তার ক্রিয়া সাংঘাতিক হয়। আধুনিক

সভ্যতায় সেই পরিমিতি অনেক দূর ছাড়িয়ে গেছে। কেননা, এ সভ্যতা বিরলাঙ্গিক নয়, বহুলাঙ্গিক। এর প্রকাশ ও রক্ষার জন্যে বহু আয়োজনের দরকার; একে ব্যয় করতে হয় বিস্তর। এই সভ্যতায় সম্বলের স্বল্পতা একটা অপরাধেরই মতো, কেননা বিপুল উপকরণের ভিত্তির উপরেই এ দাঁড়িয়ে আছে; যেখানেই অর্থদৈন্য সেখানেই এর বিরুদ্ধতা। বিদ্যাই হোক, স্বাস্থ্যই হোক, আমোদ-আহ্লাদ হোক, রাস্তাঘাট আইন-আদালত যানবাহন অশন-আসন যুদ্ধচালনা শান্তিরক্ষা সমস্তই বহুধনসাধ্য। এই সভ্যতা দরিদ্রকে প্রতিক্ষণেই অপমানিত করে। কেননা, দারিদ্র্য একে বাধাগ্রস্ত করতে থাকে।

এই কারণে ধন বর্তমানকালে সকল প্রভাবের নিদান এবং সকলের চেয়ে সমাদৃত। বস্তুত আজকালকার দিনের রাষ্ট্রনীতির মূলে রাজপ্রতাপের লোভ নেই, ধন-অর্জনের জন্য বাণিজ্যবিস্তারের লোভ। সভ্যতা যখন এখনকার মতো এমন বহুলাঙ্গিক ছিল না তখন পণ্ডিতের গুণীর বীরের দাতার কীর্তিমানের সমাদর ধনীর চেয়ে অনেক বেশি ছিল; সেই সমাদরের দ্বারা যথার্থভাবে মনুষ্যত্বের সম্মান করা হত। তখন ধনসঞ্চয়ীদের 'পরে সাধারণের অবজ্ঞা ছিল। এখনকার সমস্ত সভ্যতাই ধনের পরাশ্রিত (parasite)। তাই শুধু ধনের অর্জন নয়, ধনের পূজা প্রবল হয়ে উঠেছে। অপদেবতার পূজায় মানুষের শুভবুদ্ধিকে নষ্ট করে, আজ পৃথিবী জুড়ে তার প্রমাণ দেখা যাচ্ছে। মানুষ মানুষের এত বড়ো প্রবল শত্রু আর কোনো দিন ছিল না, কারণ ধনলোভের মতো এমন নিষ্ঠুর এবং অন্যায়পরায়ণ প্রবৃত্তি আর নেই। আধুনিক সভ্যতায় অসংখ্যবাহুচালনায় এই লোভই সর্বত্র উন্মথিত এবং এই লোভপরিতৃপ্তির আয়োজন তার অন্য-সকল উদ্যোগের চেয়ে পরিমাণে বেড়ে চলেছে।

কিন্তু এ কথা নিশ্চয়ই জানতে হবে যে, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। কারণ, লোভ সামাজিকতার প্রতিকূল প্রবৃত্তি। যাতেই মানুষের সামাজিকতাকে দুর্বল করে তাতেই পদে পদে আত্মবিচ্ছেদ ঘটায়, অশান্তির আগুন কিছুতেই নিবতে দেয় না, শেষকালে মানুষের সমাজস্থিতি বিভক্ত হয়ে পঞ্চত্ব পায়।

পাশ্চাত্য দেশে আজ দেখতে পাচ্ছি, যারা ধন-অর্জন করেছে এবং যারা অর্জনের বাহন তাদের মধ্যে কোনোমতেই বিরোধ মিটছে না। মেটবার উপায়ও নেই। কেননা, যে মানুষ টাকা করছে তারও লোভ যতখানি যে মানুষ টাকা জোগাচ্ছে তারও লোভ তার চেয়ে কম নয়। সভ্যতার সুযোগ যথেষ্টপরিমাণে ভোগ করবার জন্যে প্রচুর ধনের আবশ্যকতা উভয়পক্ষেই। এমন স্থলে পরস্পরের মধ্যে ঠেলাঠেলি কোনো এক জায়গায় এসে থামবে, এমন আশা করা যায় না।

লোভের উত্তেজনা, শক্তির উপাসনা, যে অবস্থায় সমাজে কোনো কারণে অসংযত হয়ে দেখা দেয় সে অবস্থায় মানুষ আপন সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্ব-সাধনার দিকে মন দিতে পারে না; সে প্রবল হতে চায়, পরিপূর্ণ হতে চায় না। এইরকম অবস্থাতেই নগরের আধিপত্য হয় অপরিমিত, আর গ্রামগুলি উপেক্ষিত হতে থাকে। তখন যত-কিছু সুবিধা সুযোগ, যত-কিছু ভোগের আয়োজন, সমস্ত নগরেই পুঞ্জিত হয়। গ্রামগুলি দাসের মতো অন্ন জোগায়, এবং তার পরিবর্তে কোনোমতে জীবনধারণ করে মাত্র। তাতে সমাজের মধ্যে এমন-একটা ভাগ হয় যাতে এক দিকে পড়ে তীব্র আলো, আর-এক দিকে গভীর অন্ধকার। য়ুরোপের নাগরিক সভ্যতা মানুষের সর্বাঙ্গীণতাকে এই রকমে বিচ্ছিন্ন করে। প্রাচীন গ্রীসের সমস্ত সভ্যতা তার নগরে সংহত ছিল; তাতে ক্ষণকালের জন্য ঐশ্বর্যসৃষ্টি করে সে লুপ্ত হয়েছে। প্রভু এবং দাসের মধ্যে তার ছিল একান্ত ভাগ। প্রাচীন ইটালি ছিল নাগরিক। কিছুকাল সে প্রবলভাবে শক্তির সাধনা করেছিল। কিন্তু শক্তির প্রকৃতি সহজেই অসামাজিক— সে শক্তিমান ও শক্তির বাহনকে একান্ত বিভক্ত করে দেয়, তাতে ক'রে অল্পসংখ্যক প্রভু বহুসংখ্যক দাসের পরাশ্রিত হয়ে পড়ে, এই পারাশিত্য মনুষ্যত্বের ভিত্তি নষ্ট করে।

পাশ্চাত্য মহাদেশের সভ্যতা নাগরিক; সেখানকার লোকে কেবল নিজের দেশে নয়, জগৎ জুড়ে মানবলোককে আলো-অন্ধকারে ভাগ করছে। তাদের এত বেশি আকাঙ্ক্ষা যে, সে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি সহজে তাদের নিজের অধিকারের মধ্যে হতেই পারে না। ইংলণ্ডের মানুষ যে ঐশ্বর্যকে সভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গ বলে জানে তাকে লাভ ও রক্ষা করতে গেলে ভারতবর্ষকে অধীনরূপে পেতেই হবে; তাকে ত্যাগ করতে হলে আপন অতিভোগী সভ্যতার আদর্শকে খর্ব না করে তার উপায় নেই। যে শক্তিসাধনা তার চরম লক্ষ্য সেই সাধনার উপকরণরূপে তার পক্ষে দাস-জাতির প্রয়োজন আছে। আজ তাই সমস্ত ব্রিটিশ জাতি সমস্ত ভারতবর্ষের পরাশিতরূপে বাস করছে। এই কারণেই য়ুরোপের বড়ো বড়ো জাতি এশিয়া-আফ্রিকাকে ভাগাভাগি করে নেবার জন্যে ব্যস্ত; নইলে তাদের ভোগবহুল সভ্যতাকে আধ-পেটা থাকতে হয়। এই কারণে বৃহদাংশিকের উপর ন্যূনাংশিকের পারাশিত্য তাদের নিজের দেশেও বড়ো হয়ে উঠেছে। অতিভোগের সম্বল সর্বসাধারণের মধ্যে সমতুল্য হতেই পারে না, অল্পলোকের সঞ্চয়কে প্রভূত করতে গেলে বহুলোককে বঞ্চিত হতেই হয়। পাশ্চাত্য দেশে এই সমস্যাই আজ সবচেয়ে উগ্রভাবে উদ্যত। সেখানে কর্মিক ও ধনিকে যে বিরোধ, তার মূলে এই অপরিমিত ভোগের জন্য সংহত লোভ। তাতে করেই ধনিক ও ধনের বাহনে একান্ত বিভাগ, যেমন বিভাগ বিদেশীয় প্রভুজাতির সঙ্গে দাস-জাতির।

তারা অত্যন্ত পৃথক্। এই অত্যন্ত পার্থক্য মানবধর্মবিরুদ্ধ; মানবের পক্ষে মানবিক ঐক্য যেখানেই পীড়িত সেইখানেই বিনাশের শক্তি প্রকাশ্য বা গোপন ভাবে বড়ো হয়ে ওঠে। এইজন্যেই মানবসমাজের প্রভু প্রত্যক্ষভাবে মারে দাসকে, কিন্তু দাস প্রভুকে অপ্রত্যক্ষভাবে তার চেয়ে বড়ো মার মারে; সে ধর্মবুদ্ধিকে বিনাশ করতে থাকে। মানবের পক্ষে সেইটে গোড়া ঘেঁষে সাংঘাতিক; কেননা অন্নের অভাবে মরে পশু, ধর্মের অভাবে মরে মানুষ।

ঈসপের গল্পে আছে, সতর্ক হরিণ যে দিকে কানা ছিল সেই দিকেই সে বাণ খেয়ে মরেছে। বর্তমান মানবসভ্যতায় কানা দিক হচ্ছে তার বৈষয়িক দিক। আজকের দিনে দেখি, জ্ঞান-অর্জনের দিকে য়ুরোপের একটা বৃহৎ ও বিচিত্র সহযোগিতা, কিন্তু বিষয়-অর্জনের দিকে তার দারুণ প্রতিযোগিতা। তার ফলে বর্তমান যুগে জ্ঞানের আলোক য়ুরোপের এক প্রদীপে সহস্রশিখায় জ্বলে উঠে আধুনিক কালকে অত্যুজ্জ্বল করে তুলেছে। জ্ঞানের প্রভাবে য়ুরোপ পৃথিবীর অন্যান্য সকল মহাদেশের উপর মাথা তুলেছে। মানুষের জ্ঞানের যজ্ঞে আজ য়ুরোপীয় জাতিই হোতা, সেই পুরোহিত; তার হোমানলে সে বহু দিক থেকে বহু ইন্ধন একত্র করছে, এ যেন কখনো নিববে না, এমন এর আয়োজন এবং প্রভাব। মানুষের ইতিহাসে জ্ঞানের এমন বহুব্যাপক সমবায়নীতি আর কখনো দেখা যায় নি। ইতিপূর্বে প্রত্যেক দেশ স্বতন্ত্রভাবে নিজের বিদ্যা নিজে উদ্‌ভাবন করেছে। গ্রীসের বিদ্যা প্রধানত গ্রীসের, রোমের বিদ্যা রোমের, ভারতের চীনেরও তাই। সৌভাগ্যক্রমে য়ুরোপীয় মহাদেশের দেশপ্রদেশগুলি ঘন-সন্নিবিষ্ট, তাদের প্রাকৃতিক বেড়াগুলি দুর্লঙ্ঘ্য নয়— অতিবিস্তীর্ণ মরুভূমি বা উত্তুঙ্গ গিরিমালা-দ্বারা তারা একান্ত পৃথক্‌কৃত হয় নি। তার পরে এক সময়ে এক ধর্ম য়ুরোপের সকল দেশকেই অধিকার করেছিল; শুধু তাই নয়, এই ধর্মের কেন্দ্রস্থল অনেক কাল পর্যন্ত ছিল এক রোমে।

এক লাটিন ভাষা অবলম্বন করে অনেক শতাব্দী ধরে য়ুরোপের সকল দেশ বিদ্যালোচনা করেছে। এই ধর্মের ঐক্য থেকেই সমস্ত মহাদেশ জুড়ে বিদ্যার ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ধর্মের বিশেষ প্রকৃতিও ঐক্যমূলক, এক খৃস্টের প্রেমই তার কেন্দ্র এবং সর্বমানবের সেবাই সেই ধর্মের অনুশাসন। অবশেষে লাটিনের ধাত্রীশালা থেকে বেরিয়ে এসে য়ুরোপের প্রত্যেক দেশ আপন ভাষাতেই বিদ্যার চর্চা করতে আরম্ভ করলে। কিন্তু সমবায়নীতি অনুসারে নানা দেশের সেই বিদ্যা এক প্রণালীতে সঞ্চারিত ও একই ভাণ্ডারে সঞ্চিত হতে আরম্ভ করলে। এর থেকেই জন্মালো পাশ্চাত্য সভ্যতা, সমবায়মূলক জ্ঞানের সভ্যতা— বিদ্যার ক্ষেত্রে বহু প্রত্যয়ের সংযোগে একান্বীকৃত

সভ্যতা। আমরা প্রাচ্য সভ্যতা কথাটা ব্যবহার করে থাকি, কিন্তু এ সভ্যতা এশিয়ার ভিন্ন ভিন্ন দেশের চিত্তের সমবায়-মূলক নয়; এর যে পরিচয় সে নেতিবাচক, অর্থাৎ এ সভ্যতা য়ুরোপীয় নয় এইমাত্র। নতুবা আরবের সঙ্গে চীনের বিদ্যা শুধু মেলে নি যে তা নয়, অনেক বিষয় তারা পরস্পরের বিরুদ্ধ। সভ্যতার বাহ্যিক রূপ ও আন্তরিক প্রকৃতি তুলনা করে দেখলে ভারতীয় হিন্দুর সঙ্গে পশ্চিম-এশিয়া-বাসী সেমেটিকের অত্যন্ত বৈষম্য। এই উভয়ের চিত্তের ঐশ্বর্য পৃথক্‌ ভাণ্ডারে জমা হয়েছে। এই জ্ঞান-সমবায়ের অভাবে এশিয়ার সভ্যতা প্রাচীন কালের ইতিহাসে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে খণ্ডিত। ঐতিহাসিক সংঘাতে কোনো কোনো অংশে কিছু-কিছু দেনা-পাওনা হয়ে গেছে, কিন্তু এশিয়ার চিত্ত এক কলেবর ধারণ করে নি। এইজন্য যখন 'প্রাচ্য সভ্যতা' শব্দ ব্যবহার করি তখন আমরা স্বতন্ত্রভাবে নিজের নিজের সভ্যতাকেই দেখতে পাই।

এশিয়ার এই বিচ্ছিন্ন সভ্যতা বর্তমান কালের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি, য়ুরোপ পেরেছে; তার কারণ সমবায়নীতি মনুষ্যত্বের মূলনীতি, মানুষ সহযোগিতার জোরেই মানুষ হয়েছে। সভ্যতা শব্দের অর্থই হচ্ছে মানুষের একত্র সমাবেশ।

কিন্তু এই য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যেই কোন্‌খানে বিনাশের বীজ-রোপণ চলেছে? যেখানে তার মানবধর্মের বিরুদ্ধতা, অর্থাৎ যেখানে তার সমবায় ঘটতে পারে নি। সে হচ্ছে তার বিষয়ব্যাপারের দিক। এইখানে য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশ স্বতন্ত্র ও পরস্পরবিরুদ্ধ। এই বৈষয়িক বিরুদ্ধতা অস্বাভাবিক পরিমাণে প্রকাণ্ড হয়েছে, তার কারণ বিজ্ঞানের সাহায্যে বিষয়ের আয়োজন ও আয়তন আজ অত্যন্ত বিপুলীকৃত। তার ফলে য়ুরোপীয় সভ্যতায় একটা অদ্ভুত পরস্পরবিরুদ্ধতা জেগেছে। এক দিকে দেখছি মানুষকে বাঁচাবার বিদ্যা সেখানে প্রত্যহ দ্রুতবেগে অগ্রসর— ভূমিতে উর্বরতা, দেহে আরোগ্য, জীবনযাত্রায় জড় বাধার উপর কর্তৃত্ব মানুষ এমন করে আর কোনোদিন লাভ করে নি; এরা যেন দেবলোক থেকে অমৃত আহরণ করতে বসেছে। আবার আর-এক দিক ঠিক এর বিপরীত। মৃত্যুর এমন বিরাট সাধনা এর আগে কোনোদিন দেখা যায় নি। পাশ্চাত্যের প্রত্যেক দেশ এই সাধনায় মহোৎসাহে প্রবৃত্ত। এত বড়ো আত্মঘাতী অধ্যবসায় এর আগে মানুষ কোনোদিন কল্পনাও করতে পারত না। জ্ঞানসমবায়ের ফলে য়ুরোপ যে প্রচণ্ড শক্তিকে হস্তগত করেছে আত্মবিনাশের জন্য সেই শক্তিকেই য়ুরোপ ব্যবহার করবার জন্যে উদ্যত। মানুষের সমবায়নীতি ও অসমবায়নীতির বিরুদ্ধফলের এমন প্রকাণ্ড দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আর দেখি নি। জ্ঞানের অন্বেষণে বর্তমান

যুগে মানুষ বাঁচাবার পথে চলেছে, আর বিষয়ের অন্বেষণে মারবার পথে। শেষ পর্যন্ত কার জয় হবে সে কথা বলা শক্ত হয়ে উঠল।

কেউ কেউ বলেন, মানুষের ব্যবহার থেকে যন্ত্রগুলোকে একেবারে নির্বাসিত করলে তবে আপদ মেটে। এ কথা একেবারেই অশ্রদ্ধেয়। চতুষ্পদ পশুদের আছে চার পা, হাত নেই; জীবিকার জন্যে যতটুকু কাজ আবশ্যক তা তারা একরকম করে চালিয়ে নেয়। সেই কোনো একরকমে চালানোতেই দৈন্য ও পরাভব। মানুষ ভাগ্যক্রমে পেয়েছে দুটো হাত, কেবলমাত্র কাজ করবার জন্যে। তাতে তার কাজের শক্তি বিস্তর বেড়ে গেছে। সেই সুবিধাটুকু পাওয়াতে জীবজগতে অন্য-সব জন্তুর উপরে সে জয়ী হয়েছে; আজ সমস্ত পৃথিবী তার অধিকারে। তার পর থেকে যখনই কোনো উপায়ে মানুষ যন্ত্রসাহায্যে আপন কর্মশক্তিকে বাড়ায় তখনই জীবনের পথে তার জয়যাত্রা এগিয়ে চলে। এই কর্মশক্তির অভাবের দিকটা পশুদের দিক, এর পূর্ণতাই মানুষের। মানুষের এই শক্তিকে খর্ব করে রাখতে হবে এমন কথা কোনোমতেই বলা চলে না, বললেও মানুষ শুনবে না। মানুষের কর্মশক্তির বাহন যন্ত্রকে যে জাতি আয়ত্ত করতে পারে নি সংসারে তার পরাভব অনিবার্য, যেমন অনিবার্য মানুষের কাছে পশুর পরাভব।

শক্তিকে খর্ব করব না, অথচ সংহত শক্তি-দ্বারা মানুষকে আঘাত করা হবে না, এই দুইয়ের সামঞ্জস্য কী করে হতে পারে সেইটেই ভেবে দেখবার বিষয়।

শক্তির উপায় ও উপকরণগুলিকে যখন বিশেষ এক জন বা এক দল মানুষ কোনো সুযোগে নিজের হাতে নেয় তখনই বাকি লোকদের পক্ষে মুশকিল ঘটে। রাষ্ট্রতন্ত্রে একদা সকল দেশেই রাজশক্তি একজনের এবং তারই অনুচরদের মধ্যে প্রধানত সংকীর্ণ হয়ে ছিল। এমন অবস্থায় সেই একজন বা কয়েকজনের ইচ্ছাই আর-সকলের ইচ্ছাকে অভিভূত করে রাখে। তখন অন্যায় অবিচার শাসনবিকার থেকে মানুষকে বাঁচাতে গেলে শক্তিমানদের কাছে ধর্মের দোহাই পাড়তে হত। কিন্তু 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী'। অধিকাংশ স্থলেই শক্তিমানের কান ধর্মের কাহিনী শোনবার পক্ষে অনুকূল নয়। তাই কোনো কোনো দেশের প্রজারা জোর করে রাজার শক্তি হরণ করেছে। তারা এই কথা বলেছে যে, 'আমাদেরি সকলের শক্তি নিয়ে রাজার শক্তি। সেই শক্তিকে এক জায়গায় সংহত করার দ্বারাই আমরা বঞ্চিত হই। যদি সেই শক্তিকে আমরা প্রত্যেকে ব্যবহার করবার উপায় করতে পারি, তা হলে আমাদের শক্তি-সমবায়ে সেটা আমাদের সম্মিলিত রাজত্ব হয়ে উঠবে।' ইংলণ্ডে সেই সুযোগ ঘটেছে। অন্যান্য অনেক দেশে যে ঘটে নি তার কারণ, শক্তিকে ভাগ করে নিয়ে তাকে কর্মে মিলিত করবার শিক্ষা ও চিত্তবৃত্তি সকল জাতির নেই।

অর্থশক্তি সম্বন্ধেও এই কথাটাই খাটে। আজকালকার দিনে অর্থশক্তি বিশেষ ধনীসম্প্রদায়ের মুঠোর মধ্যে আটকা পড়েছে। তাতে অল্প লোকের প্রতাপ ও অনেক লোকের দুঃখ। অথচ বহু লোকের কর্মশক্তিকে নিজের হাতে সংগ্রহ করে নিতে পেরেছে বলেই ধনবানের প্রভাব। তার মূলধনের মানেই হচ্ছে বহু লোকের কর্মশ্রম তার টাকার মধ্যে রূপক মূর্তি নিয়ে আছে। সেই কর্মশ্রমই হচ্ছে সত্যকার মূলধন, এই কর্মশ্রমই প্রত্যক্ষভাবে আছে শ্রমিকদের প্রত্যেকের মধ্যে। তারা যদি ঠিকমত করে বলতে পারে যে 'আমরা আমাদের ব্যক্তিগত শক্তিকে এক জায়গায় মেলাব' তা হলে সেই হয়ে গেল মূলধন। স্বভাবের দোষে ও দুর্বলতায় কোনো বিষয়েই যাদের মেলবার ও মেলাবার সাধ্য নেই তাদের দুঃখ পেতেই হবে। অন্যকে গাল পেড়ে বা ডাকাতি করে তাদের স্থায়ী সুবিধা হবে না।

বিষয়ব্যাপারে মানুষ অনেক কাল থেকে আপন মনুষ্যত্বকে উপেক্ষা করে আসছে। এই ক্ষেত্রে সে আপন শক্তিকে একান্তভাবে আপনারই লোভের বাহন করেছে। সংসারে তাই এইখানেই মানুষের দুঃখ ও অপমান এত বিচিত্র ও পরিব্যাপ্ত। এইখানেই অসংখ্য দাসকে বল্গায় বেঁধে ও চাবুক মেরে ধনের রথ চালানো হচ্ছে। আর্তরা ও আর্তবন্ধুরা কেবল ধর্মের দোহাই পেড়েছে, বলেছে 'অর্থও জমাতে থাকো, ধর্মকেও খুইয়ো না'। কিন্তু শক্তিমানের ধর্মবুদ্ধির দ্বারা দুর্বলকে রক্ষা করার চেষ্টা আজও সম্পূর্ণ সফল হতে পারে নি। অবশেষে একদিন দুর্বলকে এই কথা মনে আনতে হবে যে, 'আমাদেরই বিচ্ছিন্ন বল বলীর মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে তাকে বল দিয়েছে। বাইরে থেকে তাকে আক্রমণ করে তাকে ভাঙতে পারি, কিন্তু তাকে জুড়তে পারি নে; জুড়তে না পারলে কোনো ফল পাওয়া যায় না। অতএব আমাদের চেষ্টা করতে হবে আমাদের সকলের কর্মশ্রমকে মিলিত ক'রে অর্থশক্তিকে সর্বসাধারণের জন্যে লাভ করা।'

একেই বলে সমবায়নীতি। এই নীতিতেই মানুষ জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হয়েছে, লোকব্যবহারে এই নীতিকেই মানুষের ধর্মবুদ্ধি প্রচার করছে। এই নীতির অভাবেই রাষ্ট্র ও অর্থের ক্ষেত্রে পৃথিবী জুড়ে মানুষের এত দুঃখ, এত ঈর্ষা দ্বেষ মিথ্যাচার নিষ্ঠুরতা, এত অশান্তি।

পৃথিবী জুড়ে আজ শক্তির সঙ্গে শক্তির সংঘাত অগ্নিকাণ্ড করে বেড়াচ্ছে। ব্যক্তিগত লোভ আজ জগৎব্যাপী বেদীতে নরমেধযজ্ঞে প্রবৃত্ত। একে যদি ঠেকাতে না পারি তবে মানব-ইতিহাসে মহাবিনাশের সৃষ্টি হবেই হবে। শক্তিশালীরা একত্রে মিলে এর প্রতিরোধ কখনোই করতে পারবে না, অশক্তেরা মিললে তবেই এর প্রতিকার হবে। কারণ, বৈষয়িক ব্যাপারে জগতে শক্ত-অশক্তের যে ভেদ সেইটেই আজ বড়ো

সাংঘাতিক। জ্ঞানী-অজ্ঞানীর ভেদ আছে, কিন্তু জ্ঞানের অধিকার নিয়ে মানুষ প্রাচীর তোলে না, বুদ্ধি ও প্রতিভা দলবাঁধা শক্তিকে বরণ করে না। কিন্তু ব্যক্তিগত অপরিমিত ধনলাভ নিয়ে দেশে দেশে ঘরে ঘরে যে-সব ভেদের প্রাচীর উঠছে তাকে স্বীকার করতে গেলে মানুষকে পদে পদে কপাল ঠুকতে, মাথা হেঁট করতে হবে। পূর্বে এই পার্থক্য ছিল, কিন্তু এর প্রাচীর এত অভ্রভেদী ছিল না। সাধারণত লাভের পরিমাণ ও তার আয়োজন এখনকার চেয়ে অনেক পরিমিত ছিল ; সুতরাং মানুষের সামাজিকতা তার ছায়ায় আজকের মতো এমন অন্ধকারে পড়ে নি, লাভের লোভ সাহিত্য কলাবিদ্যা রাষ্ট্রনীতি গার্হস্থ্য সমস্তকেই এমন করে আচ্ছন্ন ও কলুষিত করে নি। অর্থচেষ্টার বাহিরে মানুষে মানুষে মিলনের ক্ষেত্র আরো অনেক প্রশস্ত ছিল।

তাই আজকের দিনের সাধনায় ধনীরা প্রধান নয়, নির্ধনেরাই প্রধান। বিরাট্‌কায় ধনের পায়ের চাপ থেকে সমাজকে, মানুষের সুখশান্তিকে বাঁচাবার ভার তাদেরই 'পরে। অর্থোপার্জনের কঠিন-বেড়া-দেওয়া ক্ষেত্রে মনুষ্যত্বের প্রবেশপথ নির্মাণ তাদেরই হাতে। নির্ধনের দুর্বলতা এতদিন মানুষের সভ্যতাকে দুর্বল ও অসম্পূর্ণ করে রেখেছিল, আজ নির্ধনকেই বললাভ ক'রে তার প্রতিকার করতে হবে।

আজ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে য়ুরোপে সমবায়নীতি অগ্রসর হয়ে চলেছে। সেখানে সুবিধা এই যে, মানুষে মানুষে একত্র হবার বুদ্ধি ও অভ্যাস সেখানে আমাদের দেশের চেয়ে অনেক বেশি। আমরা, অন্তত হিন্দুসমাজের লোকে, এই দিকে দুর্বল। কিন্তু এটা আশা করা যায় যে, যে মিলনের মূলে অন্নবস্ত্রের আকাঙ্ক্ষা সে মিলনের পথ দুঃসহ দৈন্যদুঃখের তাড়নায় এই দেশেও ক্রমশ সহজ হতে পারে। নিতান্ত যদি না পারে তবে দারিদ্র্যের হাত থেকে কিছুতেই আমাদের রক্ষা করতে পারবে না। না যদি পারে তা হলে কাউকে দোষ দেওয়া চলবে না।

এ কথা মাঝে মাঝে শোনা যায় যে, এক কালে আমাদের জীবনযাত্রা যেরকম নিতান্ত স্বল্পোপকরণ ছিল তেমনি আবার যদি হতে পারে তা হলে দারিদ্র্যের গোড়া কাটা যায়। তার মানে, সম্পূর্ণ অধঃপাত হলে আর পতনের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু তাকে পরিত্রাণ বলে না।

এক কালে যা নিয়ে মানুষ কাজ চালিয়েছে চিরদিন তাই নিয়ে চলবে, মানুষের ইতিহাসে এমন কথা লেখে না। মানুষের বুদ্ধি যুগে যুগে নূতন উদ্‌ভাবনার দ্বারা নিজেকে যদি প্রকাশ না করে তবে তাকে সরে পড়তে হবে। নূতন কাল মানুষের কাছে নূতন অর্ঘ্য দাবি করে ; যারা জোগান বন্ধ করে তারা বরখাস্ত হয়। মানুষ আপনার এই উদ্‌ভাবনী শক্তির জোরে নূতন নূতন সুযোগ সৃষ্টি করে। তাতেই

পূর্বযুগের চেয়ে তার উপকরণ আপনিই বেড়ে যায়। যখন হাল-লাঙল ছিল না তখনো বনের ফলমূল খেয়ে মানুষের একরকম করে চলে যেত; এ দিকে তার কোনো অভাব আছে এ কথা কেউ মনেও করত না। অবশেষে হাল-লাঙলের উৎপত্তি হবা মাত্র সেইসঙ্গে জমিজমা চাষ-আবাদ গোলাগঞ্জ আইনকানুন আপনি সৃষ্টি হতে থাকল। এর সঙ্গে উপদ্রব জমেছে অনেক— অনেক মার-কাট, অনেক চুরি-ডাকাতি, জাল-জালিয়াতি, মিথ্যাচার। এ-সমস্ত কী করে ঠেকানো যায় সে কথা সেই মানুষকেই ভাবতে হবে যে মানুষ হাল-লাঙল তৈরি করেছে। কিন্তু গোলমাল দেখে যদি হাল-লাঙলটাকেই বাদ দিতে পরামর্শ দাও তবে মানুষের কাঁধের উপর মুণ্ডটাকে উল্টো ক'রে বসাতে হয়। ইতিহাসে দেখা গেছে, কোনো কোনো জাতের মানুষ নূতন সৃষ্টির পথে এগিয়ে না গিয়ে পুরানো সঞ্চয়ের দিকেই উল্টো মুখ করে স্থাণু হয়ে বসে আছে; তারা মৃতের চেয়ে খারাপ, তারা জীবন্মৃত। এ কথা সত্য, মৃতের খরচ নাই। কিন্তু তাই বলে কে বলবে মৃত্যুই দারিদ্র্যসমস্যার ভালো সমাধান। অতীত কালের সামান্য সম্বল নিয়ে বর্তমান কালে কোনোমতে বেঁচে থাকা মানুষের নয়। মানুষের প্রয়োজন অনেক, আয়োজন বিস্তর, সে আয়োজন জোগাবার শক্তিও তার বহুধা। বিলাস বলব কাকে? ভেরেণ্ডার তেলের প্রদীপ ছেড়ে কেরোসিনের লণ্ঠনকে, কেরোসিনের লণ্ঠন ছেড়ে বিজলি-বাতি ব্যবহার করাকে বলব বিলাস? কখনোই নয়। দিনের আলো শেষ হলেই কৃত্রিম উপায়ে আলো জ্বালাকেই যদি অনাবশ্যক বোধ করি, তা হলেই বিজলি-বাতিকে বর্জন করব। কিন্তু যে প্রয়োজনে ভেরেণ্ডা তেলের প্রদীপ একদিন সন্ধ্যাবেলায় জ্বালতে হয়েছে সেই প্রয়োজনেরই উৎকর্ষসাধনের জন্য বিজলি-বাতি। আজ একে যদি ব্যবহার করি তবে সেটা বিলাস নয়, যদি না করি সেটাই দারিদ্র্য। একদিন পায়ে-হাঁটা মানুষ যখন গোরুর গাড়ি সৃষ্টি করলে তখন সেই গাড়িতে তার ঐশ্বর্য প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সেই গোরুর গাড়ির মধ্যেই আজকের দিনের মোটরগাড়ির তপস্যা প্রচ্ছন্ন ছিল। যে মানুষ সেদিন গোরুর গাড়িতে চড়েছিল সে যদি আজ মোটরগাড়িতে না চড়ে তবে তাতে তার দৈন্যই প্রকাশ পায়। যা এক কালের সম্পদ তাই আর-এক কালের দারিদ্র্য। সেই দারিদ্র্যে ফিরে যাওয়ার দ্বারা দারিদ্র্যের নিবৃত্তি শক্তিহীন কাপুরুষের কথা।

এ কথা সত্য, আধুনিক কালে মানুষের যা-কিছু সুযোগের সৃষ্টি হয়েছে তার অধিকাংশই ধনীর ভাগ্যে পড়ে। অর্থাৎ অল্পলোকেরই ভোগে আসে, অধিকাংশ লোকই বঞ্চিত হয়। এর দুঃখ সমস্ত সমাজের। এর থেকে বিস্তর রোগ তাপ

অপরাধের সৃষ্টি হয়, সমস্ত সমাজকেই প্রতি ক্ষণে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে। ধনকে খর্ব ক'রে এর নিষ্পত্তি নয়, ধনকে বলপূর্বক হরণ করেও নয়, ধনকে বদান্যতা যোগে দান করেও নয়। এর উপায় ধনকে উৎপন্ন করার শক্তি যথাসম্ভব সকলের মধ্যে জাগরূক করা, অর্থাৎ সমবায়নীতি সাধারণের মধ্যে প্রচার করা।

এ কথা আমি বিশ্বাস করি নে, বলের দ্বারা বা কৌশলের দ্বারা ধনের অসাম্য কোনোদিন সম্পূর্ণ দূর হতে পারে। কেননা, শক্তির অসাম্য মানুষের অন্তর্নিহিত। এই শক্তির অসাম্যের বাহ্যপ্রকাশ নানা আকারে হতেই হবে। তা ছাড়া স্বভাবের বৈচিত্র্যও আছে, কেউ-বা টাকা জমাতে ভালোবাসে, কারো-বা জমাবার প্রবৃত্তি নেই, এমনি করে ধনের বন্ধুরতা ঘটে। মানবজীবনের কোনো বিভাগেই একটানা সমতলতা একাকারতা সম্ভবও নয় শোভনও নয়। তাতে কল্যাণও নেই। কারণ, প্রাকৃতিক জগতেও যেমন মানবজগতেও তেমনি, সম্পূর্ণ সাম্য উদ্যমকে স্তব্ধ করে দেয়, বুদ্ধিকে অলস করে। অপর পক্ষে অতিবন্ধুরতাও দোষের। কেননা, তাতে যে ব্যবধান সৃষ্টি করে তার দ্বারা মানুষে মানুষে সামাজিকতার যোগ অতিমাত্রায় বাধা পায়। যেখানেই তেমন বাধা সেই গহ্বরেই অকল্যাণ নানা মূর্তি ধ'রে বাসা বাঁধে। পূর্বেই বলেছি, আজকের দিনে এই অসাম্য অপরিমিত হয়েছে, তাই অশান্তিও সমাজনাশের জন্য চার দিকে বিরাট আয়োজনে প্রবৃত্ত।

বর্তমান কাল বর্তমান কালের মানুষের জন্যে বিদ্যা স্বাস্থ্য ও জীবিকা নির্বাহের জন্যে যে সকল সুযোগ সৃষ্টি করেছে সেগুলি যাতে অধিকাংশের পক্ষেই দুর্লভ না হয় সর্বসাধারণের হাতে এমন উপায় থাকা চাই। কোনোমতে খেয়ে-পরে টিকে থাকতে পারে এতটুকু মাত্র ব্যবস্থা কোনো মানুষের পক্ষেই শ্রেয় নয়, তাতে তার অপমান। যথেষ্ট পরিমাণে উদ্‌বৃত্ত অর্থ, উদ্‌বৃত্ত অবকাশ মনুষ্যত্বচর্চার পক্ষে প্রত্যেক মানুষের প্রয়োজন।

আজ সভ্যতার গৌরবরক্ষার ভার অল্প লোকেরই হাতে। কিন্তু এই অল্প লোকের পোষণ-ভার বহুসংখ্যক লোকের অনিচ্ছুক শ্রমের উপর। তাতে বিপুলসংখ্যক মানুষকে জ্ঞানে ভোগে স্বাস্থ্যে বঞ্চিত হয়ে মূঢ় বিকলচিত্ত হয়ে জীবন কাটাতে হয়। এত অপরিমিত মূঢ়তা ক্লেশ অস্বাস্থ্য আত্মাবমাননার বোঝা লোকালয়ের উপর চেপে রয়েছে; অভ্যাস হয়ে গেছে বলে, একে অপরিহার্য জেনেছি বলে, এর প্রকাণ্ডপরিমাণ অনিষ্টকে আমরা চিন্তার বিষয় করি নে। কিন্তু আর উদাসীন থাকবার সময় নেই। আজ পৃথিবী জুড়ে চার দিকেই সামাজিক ভূমিকম্প মাথা-নাড়া দিয়ে উঠেছে। সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ পুঞ্জীভূত শক্তির অতিভারেই এমনতরো দুর্লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। আজ শক্তিকে মুক্তি দিতে হবে।

আমাদের এই গ্রামপ্রতিষ্ঠিত কৃষিপ্রধান দেশে একদিন সমবায়নীতি অনেকটা পরিমাণে প্রচলিত ছিল। কিন্তু তখন মানুষের জীবনযাত্রা ছিল বিরলাজিক। প্রয়োজন অল্প থাকাতে পরস্পরের যোগ ছিল সহজ। তখনো স্বভাবতই ধনীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প ছিল; কিন্তু এখন ধনীরা আত্মসম্ভোগের দ্বারা যেমন বাধা রচনা করেছে তখন ধনীরা তেমনি আত্মত্যাগের দ্বারা যোগ রচনা করেছিল। আজ আমাদের দেশে ব্যয়ের বৃদ্ধি ও আয়ের সংকীর্ণতা বেড়ে গেছে বলেই ধনীর ত্যাগ দুঃসাধ্য হয়েছে। সে ভালোই হয়েছে; এখন সর্বসাধারণকে নিজের মধ্যেই নিজের শক্তিকে উদ্ভাবিত করতে হবে, তাতেই তার স্থায়ী মঙ্গল। এই পথ অনুসরণ করে আজ ভারতবর্ষে জীবিকা যদি সমবায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তবে ভারতসভ্যতার ধাত্রীভূমি গ্রামগুলি আবার বেঁচে উঠবে ও সমস্ত দেশকে বাঁচাবে। ভারতবর্ষে আজ দারিদ্র্যই বহুবিস্তৃত, পুঞ্জধনের অভ্রভেদী জয়স্তম্ভ আজও দিকে দিকে স্বল্পধনের পথরোধ করে দাঁড়ায় নি। এইজন্যই সমবায়নীতি ছাড়া আমাদের উপায় নেই, আমাদের দেশে তার বাধাও অল্প। তাই একান্তমনে কামনা করি ধনের মুক্তি আমাদের দেশেই সম্পূর্ণ হোক এবং এখানে সর্বজনের চেষ্টার পবিত্র সম্মিলনতীর্থে অন্নপূর্ণার আসন ধ্রুবপ্রতিষ্ঠা লাভ করুক।

১৩৩৫

পরিশিষ্ট

রাষ্ট্রনীতি যেমন একান্ত নেশন-স্বাতন্ত্র্যে, জীবিকাও তেমনি একান্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে আবদ্ধ। এখানে তাই এত প্রতিযোগিতা, ঈর্ষা, প্রতারণা, মানুষের এত হীনতা। কিন্তু মানুষ যখন মানুষ তখন তার জীবিকাও কেবল শক্তিসাধনার ক্ষেত্র না হয়ে মনুষ্যত্বসাধনার ক্ষেত্র হয়, এইটেই উচিত ছিল। জীবিকার ক্ষেত্রেও মানুষ কেবল আপন অন্ন পাবে তা নয়, আপন সত্য পাবে, এই তো চাই। কয়েক বছর পূর্বে যেদিন সমবায়মূলক জীবিকার কথা প্রথম শুনি, আমার মনে জটিল সমস্যার একটা গাঁঠ যেন অনেকটা খুলে গেল। মনে হল যে, জীবিকার ক্ষেত্রে স্বার্থের স্বাতন্ত্র্য মানুষের সত্যকে এতদিন অবজ্ঞা করে এসেছিল, সেখানে স্বার্থের সম্মিলন সত্যকে আজ প্রমাণ করবার ভার নিয়েছে। এই কথাই বোঝাতে বসেছে যে, দারিদ্র্য মানুষের অসম্মিলনে, ধন তার সম্মিলনে। সকল দিকেই মানবসভ্যতার এইটেই গোড়াকার সত্য; মনুষ্যলোকে এ সত্যের কোথাও সীমা থাকতে পারে এ আমি বিশ্বাস করি নে।

জীবিকায় সমবায়তত্ত্ব এই কথা বলে যে, সত্যকে পেলেই মানুষের দৈন্য ঘোচে, কোনো-একটা বাহ্য কর্মের প্রক্রিয়ায় ঘোচে না। এই কথায় মানুষ সম্মানিত হয়েছে। এই সমবায়তত্ত্ব একটা আইডিয়া, একটা আচার নয়; এইজন্য বহু কর্মধারা এর থেকে সৃষ্ট হতে পারে। মনের সঙ্গে পদে পদেই এর মুকাবিলা। ইংরাজি ভাষায় যাকে আঁধা গলি বলে, জীবিকাসাধনার পক্ষে এ সেরকম পথ নয়। বুঝেছিলুম, এই পথ দিয়ে কোনো-একটি বিশেষ আকারের অন্ন নয়, স্বয়ং অন্নপূর্ণা আসবেন, যাঁর মধ্যে অন্নের সকল-প্রকার রূপ এক সত্যে মিলেছে।

আমার কোনো কোনো আত্মীয় তখন সমবায়তত্ত্বকে কাজে খাটাবার আয়োজন করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় আমার মন আন্দোলিত হচ্ছিল, এমন সময় আয়র্লণ্ডের কবি ও কর্মবীর A. E. -রচিত *National Being* বইখানি আমার হাতে পড়ল। সমবায়জীবিকার একটা বৃহৎ বাস্তব রূপ স্পষ্ট চোখের সামনে দেখলুম। তার সার্থকতা যে কত বিচিত্র, মানুষের সমগ্র জীবনযাত্রাকে কেমন করে সে পূর্ণ করতে পারে, আমার কাছে তা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অন্নব্রহ্মও যে ব্রহ্ম, তাকে সত্য পন্থায় উপলব্ধি করলে মানুষ যে বড়ো সিদ্ধি পায়, অর্থাৎ কর্মের মধ্যে বুঝতে পারে যে অন্যের সঙ্গে বিচ্ছেদেই তার বন্ধন, সহযোগেই তার মুক্তি— এই কথাটি আইরিশ কবি-সাধকের গ্রন্থে পরিস্ফুট।

নিশ্চয় অনেকে আমাকে বলবেন, এ-সব শক্ত কথা। সমবায়ের আইডিয়াটাকে বৃহৎভাবে কাজে খাটানো অনেক চেষ্টায়, অনেক পরীক্ষায়, অনেক ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে গিয়ে তবে অনেক দিনে যদি সম্ভব হয়। কথাটা শক্ত বৈকি। কোনো বড়ো সামগ্রীই সস্তা দামে পাওয়া যায় না। দুর্লভ জিনিসের সুখসাধ্য পথকেই বলে ফাঁকির পথ। চরকায় স্বরাজ পাওয়া যায় এ কথা অনেকে বলছেন, অনেকে বিশ্বাসও করছেন, কিন্তু যিনি স্পষ্ট করে বুঝেছেন এমন লোকের সঙ্গে আজও আমার দেখা হয় নি। কাজেই তর্ক চলে না; দেশে তর্ক চলছেও না, রাগারাগি চলছে। যাঁরা তর্কে নামেন তাঁরা হিসাব করে দেখিয়ে দেন, কত চরকায় কত পরিমাণ সুতো হয়, আর কত সুতোয় কতটা পরিমাণ খদ্দর হতে পারে। অর্থাৎ তাঁদের হিসাব-মতে দেশে এতে কাপড়ের দৈন্য কিছু ঘুচবে। তা হলে গিয়ে ঠেকে দৈন্য দূর করার কথায়।

কিন্তু দৈন্য জিনিসটা জটিল মিশ্র জিনিস। আর, এ জিনিসটার উৎপত্তির কারণ আছে আমাদের জ্ঞানের অভাবে, বুদ্ধির ত্রুটিতে, প্রথার দোষে ও চরিত্রের দুর্বলতায়। মানুষের সমস্ত জীবনযাত্রাকে এক করে ধরে তবে ভিতরে বাহিরে এর প্রতিকার করা যেতে পারে। কাজেই প্রশ্ন কঠিন হলে তার উত্তরটা সহজ হতে পারে না। যদি গোরা ফৌজ কামান বন্দুক দিয়ে আক্রমণ করে তবে দিশি সেপাই তীর ধনুক দিয়ে তাদের ঠেকাতে পারে না। কেউ কেউ বলেছেন, কেন পারবে না। দেশসুদ্ধ লোক মিলে গোরাদের গায়ে যদি থুথু ফেলে তবে কামান বন্দুক সমেত তাদের ভাসিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এই থুথু-ফেলাকে বলা যেতে পারে দুঃখগম্য তীর্থের সুখসাধ্য পথ। আধুনিক কালের বিজ্ঞানাভিমানী যুদ্ধপ্রণালীর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশের পক্ষে এমন নিখুঁত অথচ সরল উপায় আর নেই, এ কথা মানি। আর এও না হয় আপাতত মেনে নেওয়া গেল যে, এই উপায়ে সরকারি থুৎকারপ্লাবনে গোরাদের ভাসিয়ে দেওয়া অসম্ভব নয়; তবু মানুষের চরিত্র যারা জানে তারা এটাও জানে যে, তেত্রিশ কোটি লোক একসঙ্গে থুথু ফেলবেই না। ...

আয়র্লণ্ডে সার্ হরেস্ প্ল্যাঙ্কেট যখন সমবায়-জীবিকা-প্রবর্তনে প্রথম লেগেছিলেন তখন কত বাধা কত ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে গিয়েছিলেন, কত নূতন নূতন পরীক্ষা তাঁকে করতে হয়েছিল; অবশেষে বহু চেষ্টার পরে সফলতার কিরকম শুরু হয়েছে *National Being* বই পড়লে তা বোঝা যাবে। আগুন ধরতে দেরি হয়, কিন্তু যখন ধরে তখন ছড়িয়ে যেতে বিলম্ব হয় না। শুধু তাই নয়, আসল সত্যের স্বরূপ এই যে, তাকে যে দেশের যে কোণেই পাওয়া ও প্রতিষ্ঠিত করা যায় সকল দেশেরই

সমস্যা সে সমাধান করে। সার্ হরেস্ প্ল্যাঙ্কেট যখন আয়র্লণ্ডে সিদ্ধিলাভ করলেন তখন তিনি একই কালে ভারতবর্ষের জন্যও সিদ্ধিকে আবাহন করে আনলেন। এমনি করেই কোনো সাধক ভারতবর্ষের একটিমাত্র পল্লীতেও দৈন্য দূর করবার মূলগত উপায় যদি চালাতে পারেন তা হলে তিনি তেত্রিশ কোটি ভারতবাসীকেই চিরকালের সম্পদ দিয়ে যাবেন। আয়তন পরিমাপ করে যারা সত্যের যাথার্থ্য বিচার করে তারা সত্যকে বাহ্যিক ভাবে জড়ের শামিল করে দেখে; তারা জানে না যে, অতি ছোটো বীজের মধ্যেও যে প্রাণটুকু থাকে সমস্ত পৃথিবীকে অধিকার করবার পরোয়ানা সে নিয়ে আসে।

ভাদ্র ১৩৩২

খৃষ্ট

খৃষ্ট

যিশুচরিত

বাউল সম্প্রদায়ের একজন লোককে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'তোমরা সকলের ঘরে খাও না?' সে কহিল, 'না।' কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল, 'যাহারা আমাদের স্বীকার করে না আমরা তাহাদের ঘরে খাই না।' আমি কহিলাম, 'তারা স্বীকার না করে নাই করিল, তোমরা স্বীকার করিবে না কেন।' সে লোকটি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সরল ভাবে কহিল, 'তা বটে, ঐ জায়গাটাতে আমাদের একটু প্যাঁচ আছে।'

আমাদের সমাজে যে ভেদবুদ্ধি আছে তাহারই দ্বারা চালিত হইয়া কোথায় আমরা অন্ন গ্রহণ করিব আর কোথায় করিব না তাহারই কৃত্রিম গণ্ডিরেখা-দ্বারা আমরা সমস্ত পৃথিবীকে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছি। এমন-কি, যে-সকল মহাপুরুষ সমস্ত পৃথিবীর সামগ্রী, তাঁহাদিগকেও এইরূপ কোনো-না-কোনো একটা নিষিদ্ধ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া পর করিয়া রাখিয়াছি। তাঁহাদের ঘরে অন্ন গ্রহণ করিব না বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়া আছি। সমস্ত জগৎকে অন্ন বিতরণের ভার দিয়া বিধাতা যাঁহাদিগকে পাঠাইয়াছেন আমরা স্পর্ধার সঙ্গে তাঁহাদিগকেও জাতে ঠেলিয়াছি।

মহাত্মা যিশুর প্রতি আমরা অনেকদিন এইরূপ একটা বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়াছি। আমরা তাঁহাকে হৃদয়ে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক।

কিন্তু এজন্য একলা আমাদিগকেই দায়ী করা চলে না। আমাদের খৃষ্টের পরিচয় প্রধানত সাধারণ খৃষ্টান মিশনরিদের নিকট হইতে। খৃষ্টকে তাঁহারা খৃষ্টানি-দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া আমাদের কাছে ধরিয়াছেন। এ পর্যন্ত বিশেষভাবে তাঁহাদের ধর্মমতের দ্বারা আমাদের ধর্মসংস্কারকে তাঁহারা পরাভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং আত্মরক্ষার চেষ্টায় আমরা লড়াই করিবার জন্যই প্রস্তুত হইয়া থাকি।

লড়াইয়ের অবস্থায় মানুষ বিচার করে না! সেই মত্ততার উত্তেজনায় আমরা খৃষ্টানকে আঘাত করিতে গিয়া খৃষ্টকেও আঘাত করিয়াছি। কিন্তু যাঁহারা জগতের মহাপুরুষ, শত্রু কল্পনা করিয়া তাঁহাদিগকে আঘাত করা আত্মঘাতেরই নামান্তর।

বস্তুত শত্রুর প্রতি রাগ করিয়া আমাদেরই দেশের উচ্চ আদর্শকে খর্ব করিয়াছি— আপনাকে ক্ষুদ্র করিয়া দিয়াছি।

সকলেই জানেন ইংরাজি শিক্ষার প্রথমাবস্থায় আমাদের সমাজে একটা সংকটের দিন উপস্থিত হইয়াছিল। তখন সমস্ত সমাজ টলমল, শিক্ষিতের মন আন্দোলিত। ভারতবর্ষে পূজার্চনা সমস্তই বয়ঃপ্রাপ্ত শিশুর খেলামাত্র— এ দেশে ধর্মের কোনো উচ্চ আদর্শ, ঈশ্বরের কোনো সত্য উপলব্ধি কোনো কালে ছিল না— এই বিশ্বাসে তখন আমরা নিজেদের সম্বন্ধে লজ্জা অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। এইরূপে হিন্দু সমাজের কূল যখন ভাঙিতেছিল, শিক্ষিতদের মন যখন ভিতরে ভিতরে বিদীর্ণ হইয়া দেশের দিক হইতে ধসিয়া পড়িতেছিল, স্বদেশের প্রতি অন্তরের অশ্রদ্ধা যখন বাহিরের আক্রমণের সম্মুখে আমাদিগকে দুর্বল করিয়া তুলিতেছিল, সেই সময়ে খৃষ্টান মিশনরি আমাদের সমাজে যে বিভীষিকা আনয়ন করিয়াছিল তাহার প্রভাব এখনো আমাদের হৃদয় হইতে সম্পূর্ণ দূর হয় নাই।

কিন্তু সেই সংকট আজ আমাদের কাটিয়া গিয়াছে। সেই ঘোরতর দুর্যোগের সময় রামমোহন রায় বাহিরের আবর্জনা ভেদ করিয়া আমাদের দেশের নিত্য সম্পদ সংশয়াকুল স্বদেশবাসীর নিকট উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিলেন। এখন ধর্মসাধনায় আমাদের ভিক্ষাবৃত্তির দিন ঘুচিয়াছে। এখন হিন্দুধর্ম কেবলমাত্র কতকগুলি অদ্ভুত কাহিনী এবং বাহ্য-আচার-রূপে আমাদের নিকট প্রকাশমান নহে। এখন আমরা নির্ভয়ে সকল ধর্মের মহাপুরুষদের মহাবাণী-সকল গ্রহণ করিয়া আমাদের পৈতৃক ঐশ্বর্যকে বৈচিত্র্যদান করিতে পারি।

কিন্তু দুর্গতির দিনে মানুষ যখন দুর্বল থাকে তখন সে এক দিকের আতিশয্য হইতে রক্ষা পাইলে আর-এক দিকের আতিশয্যে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। বিকারের জ্বরে মানুষের দেহের তাপ যখন উপরে চড়ে তখনো ভয় লাগাইয়া দেয় আবার যখন নীচে নামিতে থাকে তখনো সে ভয়ানক। আমাদের দেশের বর্তমান বিপদ আমাদের পূর্বতন বিপদের উল্টা দিকে উন্মত্ত হইয়া ছুটিতেছে।

আমাদের দেশের মহত্ত্বের মূর্তিটি প্রকাশ করিয়া দিলেও তাহা গ্রহণ করিবার বাধা আমাদের শক্তির জীর্ণতা। আমাদের অধিকার পাকা হইল না, কিন্তু আমাদের অহংকার বাড়িল। পূর্বে একদিন ছিল যখন আমরা কেবল সংস্কারবশত আমাদের সমাজ ও ধর্মের সমস্ত বিকারগুলিকে পুঞ্জীভূত করিয়া তাহার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া বসিয়াছিলাম। এখন অহংকারবশতই সমস্ত বিকৃতিকে জোর করিয়া স্বীকার করাকে আমরা বলিষ্ঠতার লক্ষণ বলিয়া মনে করি। ঘরে ঝাঁট দিব না, কোনো আবর্জনাকেই

বাহিরে ফেলিব না, যেখানে যাহা-কিছু আছে সমস্তকেই গায়ে মাখিয়া লইব, ধুলামাটির সঙ্গে মণিমাণিক্যকে নির্বিচারে একত্রে রক্ষা করাকেই সমন্বয়নীতি বলিয়া গণ্য করিব— এই দশা আমাদের ঘটিয়াছে। ইহা বস্তুত তামসিকতা। নির্জীবতাই যেখানে যাহা-কিছু আছে সমস্তকেই সমান মূল্যে রক্ষা করে। তাহার কাছে ভালোও যেমন মন্দও তেমন, ভুলও যেমন সত্যও তেমনি।

জীবনের ধর্মই নির্বাচনের ধর্ম। তাহার কাছে নানা পদার্থের মূল্যের তারতম্য আছেই। সেই অনুসারে সে গ্রহণ করে, ত্যাগ করে। এবং যাহা তাহার পক্ষে যথার্থ শ্রেয় তাহাকেই সে গ্রহণ করে এবং বিপরীতকেই বর্জন করিয়া থাকে।

পশ্চিমের আঘাত খাইয়া আমাদের দেশে যে জাগরণ ঘটিয়াছে তাহা মুখ্যত জ্ঞানের দিকে। এই জাগরণের প্রথম অবস্থায় আমরা নিজের সম্বন্ধে বার বার ইহাই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলাম যে, আমরা জ্ঞানে যাহা বুঝি ব্যবহারে তাহার উল্টা করি। ইহাতে ক্রমে যখন আত্মধিক্কারের সূত্রপাত হইল তখন নিজের বুদ্ধির সঙ্গে ব্যবহারের সামঞ্জস্য-সাধনের অতি সহজ উপায় বাহির করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের যাহা-কিছু আছে সমস্তই ভালো, তাহার কিছুই বর্জনীয় নহে, ইহাই প্রমাণ করিতে বসিয়াছি।

এক দিকে আমরা জাগিয়াছি। সত্য আমাদের দ্বারে আঘাত করিতেছেন তাহা আমরা জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু দ্বার খুলিয়া দিতেছি না— সাড়া দিতেছি, কিন্তু পাদ্য-অর্ঘ্য আনিয়া দিতেছি না। ইহাতে আমাদের অপরাধ প্রতিদিন কেবল বাড়িয়া চলিতেছে। কিন্তু সেই অপরাধকে ঔদ্ধত্যের সহিত অস্বীকার করিবার যে অপরাধ সে আরো গুরুতর। লোকভয়ে এবং অভ্যাসের আলস্যে সত্যকে আমরা যদি দ্বারের কাছে দাঁড় করাইয়া লজ্জিত হইয়া বসিয়া থাকিতাম তাহা হইলেও তেমন ক্ষতি হইত না, কিন্তু 'তুমি সত্য নও— যাহা অসত্য তাহাই সত্য' ইহাই প্রাণপণ শক্তিতে প্রমাণ করিবার জন্য যুক্তির কুহক বিস্তার করার মতো এত বড়ো অপরাধ আর কিছুই হইতে পারে না। আমরা ঘরের পুরাতন জঞ্জালকে বাঁচাইতে গিয়া সত্যকে বিনাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছি না।

এই চেষ্টার মধ্যে যে দুর্বলতা প্রকাশ পায় তাহা মূলত চরিত্রের দুর্বলতা। চরিত্র অসাড় হইয়া আছে বলিয়াই আমরা কাজের দিকটাতে আপনাকে ও সকলকে ফাঁকি দিতে উদ্যত। যে-সকল আচার বিচার বিশ্বাস পূজাপদ্ধতি আমাদের দেশের শতসহস্র নরনারীকে জড়তা মূঢ়তা ও নানা দুঃখে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে, যাহা আমাদিগকে কেবলই ছোটো করিতেছে, ব্যর্থ করিতেছে, বিচ্ছিন্ন করিতেছে, জগতে আমাদিগকে

সকলের কাছে অপমানিত ও সকল আক্রমণে পরাভূত করিতেছে, কোনোমতেই আমরা সাহস করিয়া স্পষ্ট করিয়া তাহাদের অকল্যাণরূপ দেখিতে এবং ঘোষণা করিতে চাহি না— নিজের বুদ্ধির চোখে সূক্ষ্ম ব্যাখ্যার ধুলা ছড়াইয়া নিশ্চেষ্টতার পথে স্পর্ধা করিয়া পদচারণ করিতে চাই। ধর্মবুদ্ধি চরিত্রবল যখন জাগিয়া উঠে তখন সে এই-সকল বিড়ম্বনা-সৃষ্টিকে প্রবল পৌরুষের সহিত অবজ্ঞা করে। মানুষের যে-সকল দুঃখ-দুর্গতি সম্মুখে স্পষ্ট বিদ্যমান তাহাকে সে হৃদয়হীন ভাবুকতার সূক্ষ্ম কারুকার্যে মনোরম করিয়া তোলার অধ্যবসায়কে কিছুতেই আর সহ্য করিতে পারে না।

ইহা হইতেই আমাদের প্রয়োজন বুঝা যাইবে। জ্ঞানবৃদ্ধির দ্বারা আমাদের সম্পূর্ণ বলবৃদ্ধি হইতেছে না। আমাদের মনুষ্যত্বকে সমগ্রভাবে উদ্‌বোধিত করিয়া তোলার অভাবে আমরা নির্ভীক পৌরুষের সহিত পূর্ণশক্তিতে জীবনকে মঙ্গলের সরল পথে প্রবাহিত করিতে পারিতেছি না।

এই দুর্গতির দিনে সেই মহাপুরুষেরাই আমাদের সহায় যাঁহারা কোনো কারণেই কোনো প্রলোভনেই আপনাকে এবং অন্যকে বঞ্চনা করিতে চান নাই, যাঁহারা প্রবল বলে মিথ্যাকে অস্বীকার করিয়াছেন এবং সমস্ত পৃথিবীর লোকের নিকট অপমানিত হইয়াও সত্যকে যাঁহারা নিজের জীবন দিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহাদের চরিত চিন্তা করিয়া সমস্ত কৃত্রিমতা কুটিলতর্ক ও প্রাণহীন বাহ্য-আচারের জটিল বেষ্টন হইতে চিত্ত মুক্তিলাভ করিয়া রক্ষা পায়।

যিশুর চরিত আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব যাঁহারা মহাত্মা তাঁহারা সত্যকে অত্যন্ত সরল করিয়া সমস্ত জীবনের সামগ্রী করিয়া দেখেন— তাঁহারা কোনো নূতন পন্থা, কোনো বাহ্য প্রণালী, কোনো অদ্ভুত মত প্রচার করেন না। তাঁহারা অত্যন্ত সহজ কথা বলিবার জন্য আসেন— তাঁহারা পিতাকে পিতা বলিতে ও ভাইকে ভাই ডাকিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা এই অত্যন্ত সরল বাক্যটি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলিয়া যান যে, যাহা অন্তরের সামগ্রী তাহাকে বাহিরের আয়োজনে পুঞ্জীকৃত করিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। তাঁহারা মনকে জাগাইতে বলেন, তাঁহারা দৃষ্টিকে সরল করিয়া সম্মুখে লক্ষ করিতে বলেন, অন্ধ অভ্যাসকে তাঁহারা সত্যের সিংহাসন হইতে অপসারিত করিতে আদেশ করেন। তাঁহারা কোনো অপরূপ সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আনেন না, কেবল তাঁহাদের দীপ্ত নেত্রের দৃষ্টিপাতে আমাদের জীবনের মধ্যে তাঁহারা সেই চিরকালের আলোক নিক্ষেপ করেন যাহার আঘাতে আমাদের দুর্বল জড়তার সমস্ত ব্যর্থ জাল-বুনানির মধ্য হইতে আমরা লজ্জিত হইয়া জাগিয়া উঠি।

জাগিয়া উঠিয়া আমরা কী দেখি? আমরা মানুষকে দেখিতে পাই। আমরা

নিজের সত্যমূর্তি সম্মুখে দেখি। মানুষ যে কত বড়ো সে কথা আমরা প্রতিদিন ভুলিয়া থাকি; স্বরচিত ও সমাজরচিত শত শত বাধা আমাদিগকে চারি দিক হইতে ছোটো করিয়া রাখিয়াছে, আমরা আমাদের সমস্তটা দেখিতে পাই না। যাঁহারা আপনার দেবতাকে ক্ষুদ্র করেন নাই, পূজাকে কৃত্রিম করেন নাই, লোকাচারের দাসত্বচিহ্ন ধুলায় ফেলিয়া দিয়া যাঁহারা আপনাকে অমৃতের পুত্র বলিয়া সগৌরবে ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহারা মানুষের কাছে মানুষকে বড়ো করিয়া দিয়াছেন। ইহাকেই বলে মুক্তি দেওয়া। মুক্তি স্বর্গ নহে, সুখ নহে। মুক্তি অধিকারবিস্তার, মুক্তি ভূমাকে উপলব্ধি।

সেই মুক্তির আহ্বান বহন করিয়া নিত্যকালের রাজপথে ঐ দেখো কে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহাকে অনাদর করিয়ো না, আঘাত করিয়ো না, 'তুমি আমাদের কেহ নও' বলিয়া আপনাকে হীন করিয়ো না। 'তুমি আমাদের জাতির নও' বলিয়া আপনার জাতিকে লজ্জা দিয়ো না। সমস্ত জড়সংস্কারজাল ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া আইস, ভক্তিনম্র চিত্তে প্রণাম করো, বলো— 'তুমি আমাদের অত্যন্ত আপন, কারণ, তোমার মধ্যে আমরা আপনাকে সত্যভাবে লাভ করিতেছি।'

যে সময়ে কোনো দেশে কোনো মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন সে সময়কে আমরা তাঁহার আবির্ভাবের অনুকূল সময় বলিয়া গণ্য করি। এ কথা এক দিক হইতে সত্য হইলেও, এ সম্বন্ধে আমাদের ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে। সাধারণত যে লক্ষণগুলিকে আমরা অনুকূল বলিয়া মনে করি তাহার বিপরীতকেই প্রতিকূল বলিয়া গণ্য করা চলে না। অভাব অত্যন্ত কঠোর হইলে মানুষের লাভের চেষ্টা অত্যন্ত জাগ্রত হয়। অতএব একান্ত অভাবকেই লাভসম্ভাবনার প্রতিকূল বলা যাইতে পারে না। বাতাস যখন অত্যন্ত স্থির হয় তখনই ঝড়কে আমরা আসন্ন বলিয়া থাকি। বস্তুত মানুষের ইতিহাসে আমরা বরাবর দেখিয়া আসিতেছি— প্রতিকূলতা যেমন আনুকূল্য করে এমন আর কিছুতেই নহে। যিশুর জন্মগ্রহণকালের প্রতি লক্ষ করিলেও আমরা এই সত্যটির প্রমাণ পাইব।

মানুষের প্রতাপ ও ঐশ্বর্য যখন চোখে দেখিতে পাই তখন আমাদের মনের উপর তাহার প্রভাব যে কিরূপ প্রবল হইয়া উঠে তাহা বর্তমান যুগে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি। সে আপনার চেয়ে বড়ো যেন আর কাহাকেও স্বীকার করিতে চায় না। মানুষ এই ঐশ্বর্যের প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া কেহ বা ভিক্ষাবৃত্তি, কেহ বা দাস্যবৃত্তি, কেহ বা দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সমস্ত জীবন কাটাইয়া দেয়— এক মুহূর্ত অবকাশ পায় না।

যিশু যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন রোম-সাম্রাজ্যের প্রতাপ অভ্রভেদী হইয়া উঠিয়াছিল। যে কেহ যে দিকে চোখ মেলিত এই সাম্রাজ্যেরই গৌরবচূড়া সকল দিক হইতেই চোখে পড়িতে থাকিত; ইহারই আয়োজন উপকরণ সকলের চিত্তকে অভিভূত করিয়া দিতেছিল। রোমের বিদ্যাবুদ্ধি বাহুবল ও রাষ্ট্রীয় শক্তির মহাজালে যখন বিপুল সাম্রাজ্য চারি দিকে আবদ্ধ, সেই সময়ে সাম্রাজ্যের এক প্রান্তে দরিদ্র ইহুদি মাতার গর্ভে এই শিশু জন্মগ্রহণ করিলেন।

তখন রোম-সাম্রাজ্যে ঐশ্বর্যের যেমন প্রবল মূর্তি, ইহুদিসমাজে লোকাচার ও শাস্ত্রশাসনেরও সেইরূপ প্রবল প্রভাব।

ইহুদিদের ধর্ম স্বজাতির মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ। তাহাদের ঈশ্বর জিহোভা বিশেষভাবে তাহাদিগকে বরণ করিয়া লইয়াছেন এইরূপ তাহাদের বিশ্বাস। তাঁহার নিকট তাহারা কতকগুলি সত্যে বদ্ধ, এই সত্যগুলি বিধিরূপে তাহাদের সংহিতায় লিখিত। এই বিধি পালন করাই ঈশ্বরের আদেশ-পালন।

বিধির অচল গণ্ডির মধ্যে নিয়ত বাস করিতে গেলে মানুষের ধর্মবুদ্ধি কঠিন ও সংকীর্ণ না হইয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু ইহুদিদের সনাতন-আচার-নিষ্পেষিত চিত্তে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিবার উপায় ঘটিয়াছিল। মাঝে মাঝে তাহাদের পাথরের প্রাচীর ভেদ করিয়া তাহাদের মধ্যে এক-একজন ঋষি আসিয়া দেখা দিতেন। ধর্মের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি বহন করিয়াই তাঁহাদের অভ্যুদয়। তাঁহারা স্মৃতিশাস্ত্রের মৃতপত্র-মর্মরকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া অমৃতবাণী প্রচার করিতেন। এই ইসায়া জেরেমায়া প্রভৃতি ইহুদি ঋষিগণ পরমদুর্গতির দিনে আলোক জ্বালাইয়াছেন, তাঁহাদের তীব্র জ্বালাময় বাক্যের বজ্রবর্ষণে স্বজাতির বদ্ধ জীবনের বহুদিনসঞ্চিত কলুষরাশি দগ্ধ করিয়াছেন।

শাস্ত্র ও আচারধর্মের দ্বারাই ইহুদিদের সমস্ত জীবন নিয়মিত। যদিচ তাহারা সাহসিক যোদ্ধা ছিল, তবু রাষ্ট্ররক্ষা-ব্যাপারে তাহাদের পটুত্ব প্রকাশ পায় নাই। এই-জন্য রাষ্ট্র সম্বন্ধে বিদেশী প্রতিবেশীদের হাতে তাহারা দুর্গতিলাভ করিয়াছিল।

যিশুর জন্মের কিছুকাল পূর্ব হইতে ইহুদিদের সমাজে ঋষি-অভ্যুদয় বন্ধ ছিল। কালের গতি প্রতিহত করিয়া, প্রাণের প্রবাহ অবরুদ্ধ করিয়া, পুরাতনকে চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টায় তখন সকলে নিযুক্ত ছিল। বাহিরকে একেবারে বাহিরে ঠেকাইয়া, সমস্ত দ্বার জানালা বন্ধ করিয়া, দেয়াল গাঁথিয়া তুলিবার দলই তখন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। নবসংকলিত তাল্‌মদ্‌ শাস্ত্রে বাহ্য আচারবন্ধনের আয়োজন পাকা হইল, এবং ধর্মপালনের মূলে যে-একটি মুক্ত বুদ্ধি ও স্বাধীনতা-তত্ত্ব আছে তাহাকে স্থান দেওয়া হইল না।

জড়ত্বের চাপ যতই কঠোর হউক মনুষ্যত্বের বীজ একেবারে মরিতে চায় না। অন্তরাত্মা যখন পীড়িত হইয়া উঠে, বাহিরে যখন সে কোনো আশার মূর্তি দেখিতে পায় না, তখন তাহার অন্তর হইতেই আশ্বাসের বাণী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে— সেই বাণীকে সে হয়তো সম্পূর্ণ বোঝে না, অথচ তাহাকে প্রচার করিতে থাকে। এই সময়টাতে ইহুদিরা আপনা-আপনি বলাবলি করিতেছিল, মর্তে পুনরায় স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার কাল আসিতেছে। তাহারা মনে করিতেছিল, তাহাদেরই দেবতা তাহাদের জাতিকেই এই স্বর্গরাজ্যের অধিকার দান করিবেন— ঈশ্বরের বরপুত্র ইহুদি জাতির সত্যযুগ পুনরায় আসন্ন হইয়াছে।

এই আসন্ন শুভ মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে এই ভাবটিও জাতির মধ্যে কাজ করিতেছিল। এইজন্য মরুস্থলীতে বসিয়া অভিষেকদাতা যোহন্ যখন ইহুদিদিগকে অনুতাপের দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও জর্ডনের তীর্থজলে দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন তখন দলে দলে পুণ্যকামীগণ তাঁহার নিকট আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। ইহুদিরা ঈশ্বরকে প্রসন্ন করিয়া পৃথিবীতে আপনাদের অপমান ঘুচাইতে চাহিল, ধরাতলের রাজত্ব এবং সকলের শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিবার আশ্বাসে তাহারা উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

এমন সময়ে যিশুও মর্তলোকে ঈশ্বরের রাজ্যকে আসন্ন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্য যিনি স্থাপন করিতে আসিবেন তিনি কে? তিনি তো রাজা, তাঁহাকে তো রাজপদ গ্রহণ করিতে হইবে। রাজপ্রভাব না থাকিলে সর্বত্র ধর্মবিধি প্রবর্তন করিবে কী করিয়া। একবার কি মরুস্থলীতে মানবের মঙ্গল ধ্যান করিবার সময় যিশুর মনে এই দ্বিধা উপস্থিত হয় নাই। ক্ষণকালের জন্য কি তাঁহার মনে হয় নাই রাজপীঠের উপরে ধর্মসিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিলে তবেই তাঁহার ক্ষমতা অপ্রতিহত হইতে পারে? কথিত আছে, শয়তান তাঁহার সম্মুখে রাজ্যের প্রলোভন বিস্তার করিয়া তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। সেই প্রলোভনকে নিরস্ত করিয়া তিনি জয়ী হইয়াছিলেন। এই প্রলোভনের কাহিনীকে কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দিবার হেতু নাই। রোমের জয়পতাকা তখন রাজ-গৌরবে আকাশে আন্দোলিত হইতেছিল এবং সমস্ত ইহুদি জাতি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সুখস্বপ্নে নিবিষ্ট হইয়াছিল। এমন অবস্থায় সমস্ত জনসাধারণের সেই অন্তরের আন্দোলন যে তাঁহারও ধ্যানকে গভীরভাবে আঘাত করিতে থাকিবে ইহাতে আশ্চর্যের কথা কিছুই নাই।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, এই সর্বব্যাপী মায়াজালকে ছেদন করিয়া তিনি ঈশ্বরের সত্যরাজ্যকে সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিলেন। ধনমানের মধ্যে তাহাকে দেখিলেন

না, মহা-সাম্রাজ্যের দৃপ্ত প্রতাপের মধ্যে তাহাকে দেখিলেন না; বাহ্য উপকরণহীন দারিদ্র্যের মধ্যে তাহাকে দেখিলেন এবং সমস্ত বিষয়ী লোকের সম্মুখে একটা অদ্ভুত কথা অসংকোচে প্রচার করিলেন যে, যে নম্র পৃথিবীর অধিকার তাহারই। তিনি চরিত্রের দিক দিয়া এই যেমন একটা কথা বলিলেন, উপনিষদের ঋষিরা মানুষের মনের দিক দিয়া ঠিক এই প্রকারই অদ্ভুত একটা কথা বলিয়াছেন; যাহারা ধীর তাহারাই সকলের মধ্যে প্রবেশের অধিকার লাভ করে। ধীরাঃ সর্বমেবাবিশন্তি।

যাহা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ এবং যাহা সর্বজনের চিত্তকে অভিভূত করিয়া বর্তমান, তাহাকে সম্পূর্ণ ভেদ করিয়া, সাধারণ মানবের সংস্কারকে অতিক্রম করিয়া, ঈশ্বরের রাজ্যকে এমন-একটি সত্যের মধ্যে তিনি দেখিলেন যেখানে সে আপনার আন্তরিক শক্তিতে আপনি প্রতিষ্ঠিত— বাহিরের কোনো উপাদানের উপর তাহার আশ্রয় নহে। সেখানে অপমানিতেরও সম্মান কেহ কাড়িতে পারে না, দরিদ্রেরও সম্পদ কেহ নষ্ট করিতে পারে না। সেখানে যে নত সেই উন্নত হয়, যে পশ্চাদ্‌বর্তী সেই অগ্রগণ্য হইয়া উঠে। এ কথা তিনি কেবল কথায় রাখিয়া যান নাই। যে দোর্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাটের রাজদণ্ড অনায়াসে তাঁহার প্রাণবিনাশ করিয়াছে তাহার নাম ইতিহাসের পাতার এক প্রান্তে লেখা আছে মাত্র। আর যিনি সামান্য চোরের সঙ্গে একত্রে ক্রুসে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, মৃত্যুকালে সামান্য কয়েকজন ভীত অখ্যাত শিষ্য যাঁহার অনুবর্তী, অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাধ্যমাত্র যাঁহার ছিল না, তিনি আজ মৃত্যুহীন গৌরবে সমস্ত পৃথিবীর হৃদয়ের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন এবং আজও বলিতেছেন, 'যাহারা দীন তাহারা ধন্য; কারণ, স্বর্গরাজ্য তাহাদের। যাহারা নম্র তাহারা ধন্য; কারণ, পৃথিবীর অধিকার তাহারাই লাভ করিবে।'

এইরূপে স্বর্গরাজ্যকে যিশু মানুষের অন্তরের মধ্যে নির্দেশ করিয়া মানুষকেই বড়ো করিয়া দেখাইয়াছেন। তাহাকে বাহিরের উপকরণের মধ্যে স্থাপিত করিয়া দেখাইলে মানুষের বিশুদ্ধ গৌরব খর্ব হইত। তিনি আপনাকে বলিয়াছেন মানুষের পুত্র। মানবসন্তান যে কে তাহাই তিনি প্রকাশ করিতে আসিয়াছেন।

তাই তিনি দেখাইয়াছেন, মানুষের মনুষ্যত্ব সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্যেও নহে, আচারের অনুষ্ঠানেও নহে; কিন্তু মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ আছে এই সত্যেই সে সত্য। মানবসমাজে দাঁড়াইয়া ঈশ্বরকে তিনি পিতা বলিয়াছেন। পিতার সঙ্গে পুত্রের যে সম্বন্ধ তাহা আত্মীয়তার নিকটতম সম্বন্ধ— আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ। তাহা আদেশ-পালনের ও অঙ্গীকার-রক্ষার বাহ্য সম্পর্ক নহে। ঈশ্বর পিতা এই চিরন্তন সম্বন্ধের দ্বারাই মানুষ মহীয়ান, আর কিছুর দ্বারা নহে। তাই ঈশ্বরের পুত্ররূপে মানুষ সকলের

চেয়ে বড়ো, সাম্রাজ্যের রাজারূপে নহে। তাই শয়তান আসিয়া যখন তাঁহাকে বলিল 'তুমি রাজা' তিনি বলিলেন, 'না, আমি মানুষের পুত্র।' এই বলিয়া তিনি সমস্ত মানুষকে সম্মানিত করিয়াছেন।

তিনি এক জায়গায় ধনকে নিন্দা করিয়াছেন, বলিয়াছেন ধন মানুষের পরিত্রাণের পথে প্রধান বাধা। ইহা একটা নিরর্থক বৈরাগ্যের কথা নহে। ইহার ভিতরকার অর্থ এই যে, ধনী ধনকেই আপনার প্রধান অবলম্বন বলিয়া জানে— অভ্যাসের মোহ-বশত ধনের সঙ্গে সে আপনার মনুষ্যত্বকে মিলাইয়া ফেলে। এমন অবস্থায় তাহার প্রকৃত আত্মশক্তি আবৃত হইয়া যায়। যে আত্মশক্তিকে বাধামুক্ত করিয়া দেখে সে ঈশ্বরের শক্তিকেই দেখিতে পায় এবং সেই দেখার মধ্যেই তাহার যথার্থ পরিত্রাণের আশা। মানুষ যখন যথার্থভাবে আপনাকে দেখে তখনই আপনার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখে; আর আপনাকে দেখিতে গিয়া যখন সে কেবল ধনকে দেখে, মানকে দেখে, তখনই আপনাকে অবমানিত করে এবং সমস্ত জীবনযাত্রার দ্বারা ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতে থাকে।

মানুষকে এই মানবপুত্র বড়ো দেখিয়াছেন বলিয়াই মানুষকে যন্ত্ররূপে দেখিতে চান নাই। বাহ্য ধনে যেমন মানুষকে বড়ো করে না তেমনি বাহ্য আকারে মানুষকে পবিত্র করে না। বাহিরের স্পর্শ বাহিরের খাদ্য মানুষকে দূষিত করিতে পারে না; কারণ, মানুষের মনুষ্যত্ব যেখানে, সেখানে তাহার প্রবেশ নাই। যাহারা বলে বাহিরের সংস্রবে মানুষ পতিত হয় তাহারা মানুষকে ছোটো করিয়া দেয়। এইরূপে মানুষ যখন ছোটো হইয়া যায় তখন তাহার সংকল্প, তাহার ক্রিয়াকর্ম, সমস্তই ক্ষুদ্র হইয়া আসে; তাহার শক্তি হ্রাস হয় এবং সে কেবলই ব্যর্থতার মধ্যে ঘুরিয়া মরে। এইজন্যই মানবপুত্র আচার ও শাস্ত্রকে মানুষের চেয়ে বড়ো হইতে দেন নাই এবং বলিয়াছেন, বলি-নৈবেদ্যের দ্বারা ঈশ্বরের পূজা নহে, অন্তরের ভক্তির দ্বারাই তাঁহার ভজনা। এই বলিয়াই তিনি অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করিলেন, অনাচারীর সহিত একত্রে আহার করিলেন, এবং পাপীকে পরিত্যাগ না করিয়া তাহাকে পরিত্রাণের পথে আহ্বান করিলেন।

শুধু তাই নয়, সমস্ত মানুষের মধ্যে তিনি আপনাকে এবং সেই যোগে ভগবানকে উপলব্ধি করিলেন। তিনি শিষ্যদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'দরিদ্রকে যে খাওয়ায় সে আমাকেই খাওয়ায়, বস্ত্রহীনকে যে বস্ত্র দেয় সে আমাকেই বসন পরায়।' ভক্তিবৃত্তিকে বাহ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা সংকীর্ণরূপে চরিতার্থ করিবার উপদেশ ও দৃষ্টান্ত তিনি দেখান নাই। ঈশ্বরের ভজনা ভক্তিরসসম্ভোগ করার উপায়মাত্র নহে। তাঁহাকে ফুল দিয়া, নৈবেদ্য দিয়া, বস্ত্র দিয়া, স্বর্ণ দিয়া, ফাঁকি দিলে যথার্থ আপনাকেই

ফাঁকি দেওয়া হয়; ভক্তি লইয়া খেলা করা হয় মাত্র এবং এইরূপ খেলায় যতই সুখ হউক তাহা মনুষ্যত্বের অবমাননা। যিশুর উপদেশ যাঁহারা সত্যভাবে গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা কেবলমাত্র পূজার্চনা-দ্বারা দিনরাত কাটাইয়া দিতে পারেন না; মানুষের সেবা তাঁহাদের পূজা, অতি কঠিন তাঁহাদের ব্রত। তাঁহারা আরামের শয্যা ত্যাগ করিয়া, প্রাণের মমতা বিসর্জন দিয়া, দূর দেশ-দেশান্তরে নরখাদকদের মধ্যে, কুষ্ঠ-রোগীদের মধ্যে, জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন— কেননা, যাঁহার নিকট হইতে তাঁহারা দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন তিনি মানবপুত্র, তাঁহার আবির্ভাবে মানবের প্রতি ঈশ্বরের দয়া সুস্পষ্ট প্রকাশমান হইয়াছে। কারণ, এই মহাপুরুষ সর্বপ্রকারে মানবের মাহাত্ম্য যেমন করিয়া প্রচার করিয়াছেন এমন আর কে করিয়াছেন?

তাঁহাকে তাঁর শিষ্যেরা দুঃখের মানুষ বলেন। দুঃখস্বীকারকে তিনি মহৎ করিয়া দেখাইয়াছেন। ইহাতেও তিনি মানুষকে বড়ো করিয়াছেন। দুঃখের উপরেও মানুষ যখন আপনাকে প্রকাশ করে তখনই মানুষ আপনার সেই বিশুদ্ধ মনুষ্যত্বকে প্রচার করে যাহা আগুনে পোড়ে না যাহা অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন হয় না।

সমস্ত মানুষের প্রতি প্রেমের দ্বারা যিনি ঈশ্বরের প্রেম প্রচার করিয়াছেন, সমস্ত মানুষের দুঃখভার স্বেচ্ছাপূর্বক গ্রহণ করিবার উপদেশ তাঁহার জীবন হইতে আপনিই নিঃশ্বসিত হইয়া উঠিবে ইহাতে আর আশ্চর্য কী আছে। কারণ, স্বেচ্ছায় দুঃখবহন করিতে অগ্রসর হওয়াই প্রেমের ধর্ম। দুর্বলের নির্জীব প্রেমই ঘরের কোণে ভাবাবেশের অশ্রুজলপাতে আপনাকে আপনি আর্দ্র করিতে থাকে। যে প্রেমের মধ্যে যথার্থ জীবন আছে সে আত্মত্যাগের দ্বারা, দুঃখস্বীকারের দ্বারা গৌরব লাভ করে। সে গৌরব অহংকারের গৌরব নহে; কারণ, অহংকারের মদিরায় নিজেকে মত্ত করা প্রেমের পক্ষে অনাবশ্যক— তাহার নিজের মধ্যে স্বত-উৎসারিত অমৃতের উৎস আছে।

মানুষের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ— যিশুর এই বাণী কেবলমাত্র তত্ত্বকথারূপে কোনো-একটি শাস্ত্রের শ্লোকের মধ্যে বন্দী হইয়া বাস করিতেছে না। তাঁহার জীবনের মধ্যে তাহা একান্ত সত্য হইয়া দেখা দিয়াছিল বলিয়াই আজ পর্যন্ত তাহা সজীব বনস্পতির মতো নব নব শাখা প্রশাখা বিস্তার করিতেছে। মানবচিত্তের শত সহস্র সংস্কারের বাধা প্রতিদিনই সে ক্ষয় করিবার কাজে নিযুক্ত আছে। ক্ষমতার মদে মাতাল প্রতিদিন তাহাকে অপমান করিতেছে, জ্ঞানের গর্বে উদ্ধত প্রতিদিন তাহাকে উপহাস করিতেছে, শক্তি-উপাসক তাহাকে অক্ষমের দুর্বলতা বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে, কঠোর বিষয়ী তাহাকে কাপুরুষের ভাবুকতা বলিয়া উড়াইয়া দিতেছে— তবু সে নম্র হইয়া নীরবে মানুষের গভীরতম চিত্তে ব্যাপ্ত হইতেছে, দুঃখকেই আপনার সহায় এবং

সেবাকে আপনার সঙ্গিনী করিয়া লইয়াছে— যে পর তাহাকে আপন করিতেছে, যে পতিত তাহাকে তুলিয়া লইতেছে, যাহার কাছ হইতে কিছুই পাইবার নাই তাহার কাছে আপনাকে নিঃশেষে উৎসর্গ করিয়া দিতেছে। এমনি করিয়া মানবপুত্র পৃথিবীকে, সকল মানুষকেই বড়ো করিয়া তুলিয়াছেন— তাহাদের অনাদর দূর করিয়াছেন, তাহাদের অধিকার প্রশস্ত করিয়াছেন, তাহারা যে তাহাদের পিতার ঘরে বাস করিতেছে এই সংবাদের দ্বারা অপমানের সংকোচ মানবসমাজ হইতে অপসারিত করিয়াছেন— ইহাকেই বলে মুক্তিদান করা।

২৫ ডিসেম্বর ১৯১০ ভাদ্র ১৩১৮

শান্তিনিকেতন

খৃস্টধর্ম

সম্প্রদায় এই বলে অহংকার করে যে, সত্য আর-সকলকে ত্যাগ করে তাকেই আশ্রয় করেছে। সেই অহংকারে সে সত্যের মর্যাদা যতই ভোলে নিজের বাহ্যরূপকে ততই পল্লবিত করতে থাকে। ধনের অহংকার ধনীর যতই বাড়ে ধনেরই আড়ম্বর তার ততই বিস্তৃত হয়, মনুষ্যত্বের গৌরব তার ততই খর্ব হয়ে যায়।

বিষয়ীলোক বিষয়কে নিয়ে অহংকার করে তাতে ক্ষতি হয় না; কারণ, বিষয়কে আপনার মধ্যে বদ্ধ রাখাই তার লক্ষ্য। কিন্তু সম্প্রদায় যখন তার সত্যটিকে আপন অহংকারের বিষয় করে তোলে, তখন সেই সত্য সে দান করতে এলে অন্যের পক্ষে তা গ্রহণ করা কঠিন হয়।

খৃষ্টান খৃষ্টধর্মকে নিয়ে যখনই অহংকার করে তখনই বুঝতে পারি তার মধ্যে এমন খাদ মিশিয়েছে যা তার ধর্ম নয়, যা তার আপনি। এইজন্যে সে যখন দাতাবৃত্তি করতে আসে তখন তার হাত থেকে ভিক্ষুকের মতো সত্যকে গ্রহণ করতে আমরা লজ্জা বোধ করি। অহংকারের প্রতিঘাতে অহংকার জেগে ওঠে— এবং যে অহংকার অহংকৃতের দানগ্রহণে কুণ্ঠিত সে নিন্দনীয় নয়।

এইজন্যেই মানুষকে সাম্প্রদায়িক খৃষ্টানের হাত থেকে খৃষ্টকে, সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের হাত থেকে বিষ্ণুকে, সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মের হাত থেকে ব্রহ্মকে উদ্ধার করে নেবার জন্যে বিশেষ ভাবে সাধনা করতে হয়।

আমাদের আশ্রমে আমরা সম্প্রদায়ের উপর রাগ করে সত্যের সঙ্গে বিরোধ করব

না। আমরা খৃষ্টধর্মের মর্মকথা গ্রহণ করবার চেষ্টা করব— খৃষ্টানের জিনিস বলে নয়, মানবের জিনিস বলে।

বেদে ঈশ্বরের একটি নাম 'আবিঃ'; অর্থাৎ, আবির্ভাবই তাঁর স্বভাব, সৃষ্টিতে তিনি আপনাকে প্রকাশ করছেন সেই তাঁর ধর্ম। ভারতবর্ষের ঋষিরা দেখেছেন, জলে স্থলে শূন্যে সেই তাঁর নিরন্তর আনন্দধারা।

বদ্ধ ঘরে কেরোসিন জ্বলছে, সমস্ত রাত সেখানে অনেকে মিলে ঘুমোচ্ছে, দূষিত বাষ্পে ঘর ভরা— তখন যদি দরজা জানলা খুলে দিয়ে বদ্ধ-আকাশকে অসীম-আকাশের সঙ্গে যুক্ত করা যায় তা হলে সমস্ত সঞ্চিত তাপ এবং গ্লানি তখনি দূর হয়ে যায়। তেমনি আপনার বদ্ধ চিত্তকে ভূর্লোক ভুবর্লোক স্বর্লোকে পরম চৈতন্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে দিলেই তার চারি দিকের পাপসঞ্চয় সহজেই বিলীন হয়— এই মুক্তির সাধনা ভারতবর্ষের।

ভারতবর্ষ যেমন ব্রহ্মের প্রকাশকে সর্বত্র উপলব্ধি ক'রে আপন চৈতন্যকে সর্বত্র ব্যাপ্ত করবার সাধনা করেছে, তেমনি ঈশ্বরের যে প্রকাশ মানবে সেইটির মধ্যে বিশেষভাবে আপন অনুভূতি প্রীতি ও চেষ্টাকে ব্যাপ্ত করার প্রতি খৃষ্টধর্মের লক্ষ।

বিশ্বে তাঁর প্রকাশ সরল, কিন্তু মানুষের মধ্যে প্রকাশে বিরোধ আছে। কারণ, সেখানে ইচ্ছার মধ্যে ইচ্ছার প্রকাশ। যতক্ষণ না প্রেম জাগে ততক্ষণ এই ইচ্ছা পরম-ইচ্ছাকে বাধা দিতে থাকে।

অভাব হতে জীব দুঃখ পায়, কিন্তু এই বিরোধ হতে মানুষের অকল্যাণ। দুঃখ পশুও পায়, কিন্তু এই অকল্যাণ বিশেষ ভাবে মানুষের। যে অংশে মানুষ পশু সে অংশে অভাবের দুঃখ তাকে কষ্ট দেয়, যে অংশে মানুষ মানুষ সে অংশে অকল্যাণের আঘাত তার অন্য-সকল আঘাতের চেয়ে বেশি। তাই মানুষের পশু-অংশ বলে, 'সঞ্চয় করে করে আমি অভাবের দুঃখ দূর করব'; মানুষের মানুষ-অংশ বলে, 'ত্যাগ করে করে আমার ক্ষুদ্র ইচ্ছাকে পরম-ইচ্ছায় উৎসর্গ করব— বাসনাকে দগ্ধ করে প্রেমে সমুজ্জ্বল করে তুলব। সেই প্রেমেই আমার মধ্যে পরম-ইচ্ছার পূর্ণ প্রকাশ।'

সকল দুঃখের চেয়ে বড়ো দুঃখ মানুষের এই যে, তার বড়ো তার ছোটোর দ্বারা নিত্য পীড়া পাচ্ছে। এই তার পাপ। সে আপনার মধ্যে আপনার সেই বড়োকে প্রকাশ করতে পাচ্ছে না, সেই বাধাই তার কলুষ।

অন্নবস্ত্রের ক্লেশ সহ্য করা সহজ। কিন্তু আপনার ভিতরে আপনার সেই বড়ো কষ্ট পাচ্ছেন প্রকাশের অভাবে, এ কি মানুষ সইতে পারে। মানুষের ইতিহাসে এত যুদ্ধ কেন। কিসের খেদে উন্মত্ত হয়ে মানুষ আপন শতবৎসরের পুরাতন ব্যবস্থাকে ধূলিসাৎ

করে দিয়ে আবার নূতন সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হয়। তার কান্না এই যে, আমার ছোটো আমার বড়োকে ঠেকিয়ে রাখছে।

এই ব্যথা যখন মানুষের মধ্যে এত সত্য তখন নিশ্চয়ই তার ঔষধ আছে। সে ঔষধ কোনো স্নানে পানে, বাহ্যিক কোনো আচারে অনুষ্ঠানে নয়। মানুষের মধ্যে ভূমার প্রকাশ যে কেমন করে বাধাহীন হতে পারে, যাঁরা মহামানুষ তাঁরা আপন জীবনের মধ্যে দিয়ে তাই দেখিয়ে দিয়ে গেছেন।

তাঁরা এই একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়েছেন যে, মানুষ আপনার চেয়ে আপনি বড়ো; সেইজন্যে মানুষ মৃত্যুকে দুঃখকে ক্ষতিকে অগ্রাহ্য করতে পারে। এ যদি ক্ষণে ক্ষণে নিদারুণ স্পষ্টরূপে দেখতে না পেতুম তা হলে ক্ষুদ্র মানুষের মধ্যে যে বিরাট রয়েছেন এ কথা বিশ্বাস করতুম কেমন করে।

মানুষের সেই বড়োর সঙ্গে মানুষের ছোটোর নিয়ত সংঘাতে যে দুঃখ জন্মাচ্ছে সেই দুঃখ পান করছেন কে। সেই বড়ো, সেই শিব। রাগ কাকে মারছে। চিরদিন ক্ষমা যে করে তার উপরেই সমস্ত মার গিয়ে পড়ছে। লোভ কার ধন হরণ করছে। যে কেবলই ক্ষতিস্বীকার করে এবং চোরাই মাল ফিরে আসবে বলে ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে থাকে। পাপ কাকে কাঁদাতে চায়। যার প্রেমের অবধি নেই, পাপ যে তাকেই কাঁদাচ্ছে।

এ যে আমরা চারি দিকে প্রত্যক্ষ দেখি। দুর্বৃত্ত সন্তান অন্য সকলকে যে আঘাত দেয় সেই আঘাতে আপন মাকেই সকলের চেয়ে ব্যথিত করে, তাই তো দুষ্প্রবৃত্তির পাপ এতই বিষম। অকল্যাণের দুঃখ জগতের সকল দুঃখের বাড়া; কেননা, সেই দুঃখে যিনি কাঁদছেন তিনি যে বড়ো, তিনি যে প্রেম। খৃষ্টধর্ম জানাচ্ছে, সেই পরমব্যথিতই মানুষের ভিতরকার ভগবান।

এই কথাটা বিশেষ কোনো ঐতিহাসিক কাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে বিশেষ দেশকাল-পাত্রের মধ্যে ক্ষুদ্র করে দেখলে সত্যকে তার আপন গৃহ থেকে নির্বাসিত করে কারাশৃঙ্খলে বেঁধে মারবার চেষ্টা করা হবে।

আসল সত্য এই যে, আমার মধ্যে যিনি বড়ো, যিনি আমার হাতে চিরদিন দুঃখ পেয়ে আসছেন, তিনি বলছেন, 'জগতের সমস্ত পাপ আমাকেই মারে, কিন্তু আমাকে মারতে পারে না। আজ পর্যন্ত সব চেয়ে বড়ো চোর কি সব ধন হরণ করতে পেরেছে। মানুষের পরম সম্পদের কি ক্ষয় হল। বিশ্বাসঘাতক আছে, কিন্তু সংসারে বিশ্বাস মরে নি। হিংসক আছে, কিন্তু ক্ষমাকে সে মারতে পারলে না।'

সেই বড়ো যিনি, তিনি তাঁর বেদনায় অমর। কিন্তু সেই ব্যথাই যদি চরম সত্য

হত তা হলে কি রক্ষা ছিল। বড়োর মধ্যে আনন্দের অমৃত আছে বলেই তো বেদনা সহ্য হল। ছোটো কি লেশমাত্র ব্যথা সইতে পারে। সে কি তিলমাত্র কিছু ছাড়তে পারে। কেন পারে না। তার আছে কী যে পারবে। তার প্রেম কোথায়, আনন্দ কোথায়।

আমরা তো ভারে ভারে কলুষ এনে জমাচ্ছি। যে বড়ো সে ক্রমাগত তাই ক্ষালন করছে— আপন রক্ত দিয়ে, দুঃখ দিয়ে, অশ্রু দিয়ে। প্রতিদিন এই হচ্ছে ঘরে ঘরে। বড়ো বলছেন, 'আমায় মারো, মারো, মারো! তোমার মার আমি ছাড়া আর কেউ সইবে না।' তখন আমরা কেঁদে বলছি, 'তোমাকে আর মারব না— তুমি যে আমার চেয়ে বেশি। তোমার প্রকাশে ধুলো দিয়েছি— অশ্রুজলে সব ধোব। আজ হতে বসলুম তোমার আসনে, তোমার দুঃখ আমি বইব। তুমি নাও, নাও, নাও, আমার সব নাও; তুমি ভালোবেসেছ, আমিও বাসব।' এমনি করে তবে বিরোধ মেটে। তিনি যখন শাস্তি নেন তখন সেই শাস্তির দারুণ দুঃখ আর সহ্য হয় না, তবেই তো পাপের মূল মরে; নরকদণ্ডে তো মরে না।

যিনি বড়ো তিনি যে প্রেমিক। ছোটোকে নিয়ে তাঁর প্রেমের সাধ্যসাধনা। আকাশের আলো দিয়ে, পৃথিবীর লক্ষ্মীশ্রী দিয়ে, মানুষের প্রেমের সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে তিনি আমাকে সাধছেন। আপনার সেই বড়োটিকে দেখে মন মুগ্ধ হয়েছে বলেই কবি কবিতা লিখেছে, শিল্পী কারু রচনা করেছে, কর্মী কর্মে আপনাকে ঢেলে দিয়েছে। মানুষের সকল রচনা এই বলেছে— 'তোমার মতো এমন সুন্দর আর দেখলুম না। ক্ষুধা লোভ কাম ক্রোধ এ-যে সব কালো— কিন্তু তুমি কী সুন্দর, কী পবিত্র তুমি, তুমি আমার।'

মানুষের মধ্যে মানুষের এই যে বড়োর আবির্ভাব, যিনি মানুষের হাতের সমস্ত আঘাত সহ্য করছেন এবং যাঁর সেই বেদনা মানুষের পাপের একেবারে মূলে গিয়ে বাজছে— এই আবির্ভাব তো ইতিহাসের বিশেষ কোনো একটি প্রান্তে নয়। সেই মানুষের দেবতা মানুষের অন্তরেই— তাঁর সঙ্গে বিরোধেই মানুষের পাপ, তাঁরই সঙ্গে যোগেই মানুষের পাপের নিবৃত্তি। মানুষের সেই বড়ো, নিরন্ত আপনার প্রাণ উৎসর্গ ক'রে মানুষের ছোটোকে প্রাণদান করছেন।

রূপকের আকারে এই সত্য খৃষ্টধর্মে প্রকাশ হচ্ছে।

২৫ ডিসেম্বর ১৯১৪ পৌষ ১৩২১

শান্তিনিকেতন

খৃষ্টোৎসব

তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর, তুমি তাই এসেছ নীচে।
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হত যে মিছে।

দুইয়ের মধ্যে একের যে প্রকাশ তাই হল যথার্থ সৃষ্টির প্রকাশ। নানা বিরোধে যেখানে এক বিরাজমান সেখানেই মিলন, সেখানেই এককে যথার্থভাবে উপলব্ধি করা যায়। আমাদের দেশের শাস্ত্রে তাই, এক ছাড়া দুইকে মানতে চায় নি। কারণ, দুইয়ের মধ্যে একের যে ভেদ তার অবকাশকে পূর্ণ করে দেখলেই এককে যথার্থভাবে পাওয়া যায়। এইটিই হচ্ছে সৃষ্টির লীলা। উপরের সঙ্গে নীচের যে মিলন, বিশ্বকর্মার কর্মের সঙ্গে ক্ষুদ্র আমাদের কর্মের যে মিলন, বিশ্বে নিরন্তর তারই লীলা চলছে। তার দ্বারা সব পূর্ণ হয়ে রয়েছে।

যাঁরা বিচ্ছেদের মধ্যে সত্যের এই অখণ্ড রূপকে এনে দেন তাঁরা জীবনে নিয়ত আনন্দবার্তা বহন করে এনেছেন। ইতিহাসে এই-সকল মহাপুরুষ বলেছেন যে, কোনোখানে ফাঁক নেই, প্রেমের ক্রিয়া নিত্য চলেছে। মানুষের মনের দ্বার উদ্‌ঘাটিত যদি না'ও হয় তবু এই প্রক্রিয়ার বিরাম নেই। তার অস্ফুট চিত্তকমলের উপর আলোকপাত হয়েছে, তাকে উদ্‌বোধিত করবার প্রয়াসের বিশ্রাম নেই। মানুষ জানুক বা নাই জানুক, সমস্ত আকাশ ব্যাপ্ত করে সেই অস্ফুট কুঁড়িটির বিকাশের জন্যে আলোকের মধ্যেও প্রেমের প্রতীক্ষা আছে।

তেমনি ভাবে এক মহাপুরুষ বিশেষ করে তাঁর জীবন দিয়ে এই কথা বলেছিলেন যে, লোকলোকান্তরে যিনি তাঁর অভ্রচুম্বিত আলোকমালার প্রাসাদ সৃষ্টি করেছেন সেই বিচিত্র বিশ্বের অধিপতিই আমার পিতা, আমার কোনো ভয় নেই। এই বিরাট আকাশের তলে যাঁর প্রতাপে পৃথিবী ঘূর্ণ্যমান হচ্ছে তাঁর শক্তির অন্ত নেই, তা অতিপ্রচণ্ড— তার তুলনায় আমরা মানুষ কত নগণ্য সামান্য জীব। কিন্তু আমাদের ভয় নেই; এই-সকলের অন্তর্যামী-নিয়ন্তা আমারই পরম আত্মীয়, আমারই পিতা। বিশ্বের মূলে এই পরম সম্বন্ধ যা শূন্যকে পূর্ণতা দান করছে, মৃত্যুশোকের উপর আনন্দধারা প্রবাহিত করছে, সেই মধুর সম্বন্ধটি আজ আমাদের অন্তরে অনুভব করতে হবে। আমাদের পরম পিতা যিনি তিনি বলছেন যে, 'ভয় নেই, সূর্যচন্দ্রের মধ্যে আমার অখণ্ড রাজত্ব, আমার অমোঘ নিয়ম অলঙ্ঘ্য, কিন্তু তুমি যে আমারই, তোমাকে আমার চাই।' যুগে যুগে এই মাভৈঃ বাণী যাঁরা পৃথিবীতে আনয়ন করেন তাঁরা আমাদের প্রণম্য।

২৭।৩৩

এমনি করেই একজন মানবসন্তান একদিন বুঝেছিলেন যে, আমরা সকলে বিশ্ব-পিতার সন্তান, আমাদের অন্তরে যে প্রেমের পিপাসা আছে তা তাঁকে স্পর্শ করেছে এ কথা হতেই পারে না যে, আমাদের বেদনা-আকাঙ্ক্ষার কোনো লক্ষ্য নেই, কারণ তিনি সত্যই আমাদের পরমসখা হয়ে তাঁর সাড়া দিয়ে থাকেন। তাই সাহস করে মানুষ তাঁকে আনন্দদায়িনী মা, মানবাত্মার কল্যাণবিধায়ক পিতারূপে জেনেছে। মানুষ যেখানে বিশ্বকে কেবল বাহিরের নিয়মযন্ত্রের অধীন বলে জানছে সেখানে সে কেবলই আপনাকে দুর্বল অশক্ত করছে, কিন্তু যেখানে সে প্রেমের বলে সমস্ত বিশ্বলোকে আত্মীয়তার অধিকার বিস্তার করেছে সেখানেই সে যথার্থ ভাবে আপনার স্বরূপকে উপলব্ধি করেছে।

এই বার্তা ঘোষণা করতে একদিন মহাত্মা যিশু লোকালয়ের দ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি তো অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যোদ্ধবেশে আসেন নি, তিনি তো বাহুবলের পরিচয় দেন নি— তিনি ছিন্ন চীর প'রে পথে পথে ঘুরেছিলেন। তিনি সম্পদবান্‌ ও প্রতাপশালীদের কাছ থেকে আঘাত অপমান প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি যে বার্তা নিয়ে এসেছিলেন তার বদলে বাইরের কোনো মজুরি পান নি, কিন্তু তিনি পিতার আশীর্বাদ বহন করেছিলেন। তিনি নিষ্কিঞ্চন হয়ে দ্বারে দ্বারে এই বার্তা বহন করে এনেছিলেন যে, ধনের উপর আশ্রয় করলে চলবে না, পরম আশ্রয় যিনি তিনি বিশ্বকে পূর্ণ করে রয়েছেন। তিনি দেশ কাল পূর্ণ করে বিরাজমান। তিনি 'পরম আনন্দঃ পরমাগতিঃ' এই কথা উপলব্ধি করবার জন্য যে ত্যাগের দরকার যারা তা শেখে নি তারা মৃত্যুর ভয়ে, ক্ষতির ভয়ে, প্রাণকে বুকে করে নিয়ে ফিরেছে— অন্তরের ভয় লোভ মোহের দ্বারা শ্রদ্ধাহীনতা প্রকাশ করেছে। এই মহাপুরুষ তাই আপনার জীবনে ত্যাগের দ্বারা মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত হয়ে মানুষের কাছে এই বাণী এনে দিয়েছিলেন। তাই তিনি মানবাত্মার পরম পথকে উন্মুক্ত করবার জন্য একদিন দরিদ্র বেশে পথে বার হয়েছিলেন। যে-সব সরল প্রকৃতির মানুষ তাঁর অনুগমন করেছিল তারা সম্পূর্ণরূপে তাঁর বাণীর মর্ম বুঝতে পারে নি। তারা কিসের স্পর্শ পেয়েছিল জানি নে, কিন্তু ভক্তিভরে তাদের মাথা অবনত হয়ে গিয়েছিল। তাদের মাথা নিচুই ছিল— কারণ তাদের পরিচয় নাম ধাম কেউ জানত না, তারা সামান্য ধীবর ছিল। তারা বিশুর বাণীর প্রেরণা অনুভব করেছিল, একটি অব্যক্ত মধুর রসে তাদের অন্তর আপ্লুত হয়েছিল। এমনি করে যাদের কিছু নেই তারা পেয়ে গেল। কিন্তু যারা গর্বিত তারা এই পরমা বার্তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

এই মহাত্মার বাণী যে তাঁর ধর্মাবলম্বীরাই গ্রহণ করেছিল তা নয়। তারা বারে

বারে ইতিহাসে তাঁর বাণীর অবমাননা করেছে, রক্তের চিহ্নের দ্বারা ধরাতল রঞ্জিত করে দিয়েছে— তারা যিশুকে এক বার নয়, বার-বার ক্রুশেতে বিদ্ধ করেছে। সেই খৃষ্টান নাস্তিকদের অবিশ্বাস থেকে যিশুকে বিচ্ছিন্ন করে তাঁকে আপন শ্রদ্ধার দ্বারা দেখলেই যথার্থ ভাবে সম্মান করা হবে। খৃষ্টের আত্মা তাই আজ চেয়ে আছে। বড়ো বড়ো গির্জায় তাঁর বাণী প্রচারিত হবে বলে তিনি পথে পথে ফেরেন নি, কিন্তু যার অন্তরে ভক্তিরস বিশুষ্ক হয়ে যায় নি তারই কাছে তিনি তাঁর সমস্ত প্রত্যাশা নিয়ে একদিন উপনীত হয়েছিলেন। তিনি সেদিনকার কালের সব চেয়ে অখ্যাত দরিদ্র অভাজনদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বিশ্বের অধিপতিকে বলেছিলেন যে 'পিতা নোঽসি'— তুমি আমাদের পিতা।

মানুষ জীবন ও মৃত্যুকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে, এই দুয়ের মধ্যে সে একের মিল দেখে না। যেমন তার দেহে পিঠের দিকে চোখ নেই বলে কেবল সামনেরই অঙ্গকে মেনে নেওয়া বিষম ভুল, তেমনি জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে আপাত-অনৈক্যকেই সত্য বলে জানলে জীবনকে খণ্ডিত করে দেখা হয়। এই মিথ্যা মায়া থেকে যাঁরা মুক্তিলাভ ক'রে অমৃতকে সর্বত্র দেখেছেন তাঁদের আমরা প্রণাম করি। তাঁরা মৃত্যুর দ্বারা অমৃতকে লাভ করেছেন, এই মর্তলোকেই অমরাবতী সৃজন করেছেন। অমর ধামের তেমন এক যাত্রী একদিন পৃথিবীতে অমর লোকের বাণী নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, সেই কথা স্মরণ করে আমরাও যেন মৃত্যুর তমোরাশির উপর অমৃত আলোর সম্পাত দেখতে পাই। রাত্রিতে সূর্য অস্তমিত হলে মূঢ় যে সে ভাবে যে, আলো বুঝি নির্বাপিত হল, সৃষ্টি লোপ পেল। এমন সময় সে অন্তরীক্ষে চেয়ে দেখে যে সূর্য অপসারিত হলে লোকলোকান্তরের জ্যোতির্ধাম উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে— মহারাজার এক দরবার ছেড়ে আর-এক দরবারে আলোর সংগীত ধ্বনিত হচ্ছে। সেই সংগীতে আমাদেরও নিমন্ত্রণ বেজে উঠেছে। মহা আলোকের মিলনে যেন আমরা পূর্ণ করে দেখি। জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানকার এই অখণ্ড যোগসূত্র যেন আমরা না হারাই। যে মহাপুরুষ তাঁর জীবনের মধ্যেই অমৃতলোকের পরিচয় দিয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর দ্বারা অমৃতরূপ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল, আজ তাঁর মৃত্যুর অন্তর্নিহিত সেই পরম সত্যটিকে যেন আমরা স্পষ্ট আকারে দেখতে পাই।

২৫ ডিসেম্বর ১৯২৩ চৈত্র ১৩৩০

শান্তিনিকেতন

মানবসম্বন্ধের দেবতা

এই সংসারে একটা জিনিস অস্বীকার করতে পারি নে যে, আমরা বিধানের বন্ধনে আবদ্ধ। আমাদের জীবন, আমাদের অস্তিত্ব বিশ্বনিয়মের দ্বারা দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রিত। এ-সমস্ত নিয়মকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করতেই হবে, নইলে নিষ্কৃতি নেই। নিয়মকে যে পরিমাণে জানি ও মানি সেই পরিমাণেই স্বাস্থ্য পাই, সম্পদ পাই, ঐশ্বর্য পাই। কিন্তু জীবনে একটা সত্য আছে যা এই নিয়মের মধ্যে আপনাকে দেখতে পায় না। কেননা, নিয়মের মধ্যে পাই বন্ধন, আত্মার মধ্যে চাই সম্বন্ধকে। বন্ধন এক-তরফা, সম্বন্ধে দুই পক্ষের সমান যোগ। যদি বলি বিশ্বব্যাপারে আমার আত্মার কোনো অসীম সম্বন্ধের ক্ষেত্র নেই, শুধু কতকগুলি বাহ্যসম্পর্কসূত্রেই সে ক্ষণকালের জন্য জড়িত— তা হলে জানব তার মধ্যে যে-একটি গভীর ধর্ম আছে নিখিলের মধ্যে তার কোনো নিত্যকালীন সাড়া নেই। কেননা, তার মধ্যে যা আছে তা কেবল সত্তার নিয়ম নয়, সত্তার আনন্দ। এই যে তার আনন্দ এ কি কেবল সংকীর্ণভাবে তারই মধ্যে। অসীমের মধ্যে কোথাও তার প্রতিষ্ঠা নেই? এর সত্যটা তা হলে কোন্‌খানে। সত্যকে আমরা একের মধ্যে খুঁজি। হাত থেকে লাঠি পড়ে গেল, গাছ থেকে ফল পড়ল, পাহাড়ের উপর থেকে ঝরনা নীচে নেমে এল, এ-সমস্ত ঘটনাকে যেই এক তত্ত্বের মধ্যে দেখতে পেলে অমনি মানুষের মন বললে 'সত্যকে দেখেছি'। যতক্ষণ এই ঘটনাগুলি আমাদের কাছে বিচ্ছিন্ন ততক্ষণ আমাদের কাছে তারা নিরর্থক। তাই বৈজ্ঞানিক বলেন, তথ্যগুলি বহু, কিন্তু তারা সত্য হয়েছে অবিচ্ছিন্ন ঐক্যে।

এই তো গেল বস্তুরাজ্যের নিয়মক্ষেত্র, কিন্তু অধ্যাত্মরাজ্যের আনন্দক্ষেত্রে কি এই ঐক্যতত্ত্বের কোনো স্থান নেই।

আমরা আনন্দ পাই বন্ধুতে, সন্তানে, প্রকৃতির সৌন্দর্যে। এগুলি ঘটনার দিক থেকে বহু, কিন্তু কোনো অসীম সত্যে কি এদের চরম ঐক্য নেই। এ প্রশ্নের উত্তর বৈজ্ঞানিক দেন না, দেন সাধক। তিনি বলেন, 'বেদাহমেতম্‌, আমি যে এঁকে দেখেছি, রসো বৈ সঃ, তিনি যে রসের স্বরূপ— তিনি যে পরিপূর্ণ আনন্দ।' নিয়মের বিধাতাকে তো পদে পদেই দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু ঋষি যাঁকে বলছেন 'স নো বন্ধুর্জনিতা', কে সেই বন্ধু, কে সেই পিতা। যিনি সত্যদ্রষ্টা তিনি 'হৃদা মনীষা মনসা' সকল বন্ধুর ভিতর দিয়ে সেই এক বন্ধুকে, সকল পিতার মধ্য দিয়ে সেই এক পিতাকে দেখছেন। বৈজ্ঞানিকের উত্তরে প্রশ্নের যেটুকু বাকি থাকে তার উত্তর তিনিই দেন। তখন আত্মা বলে, 'আমার জগৎকে পেলুম, আমি বাঁচলুম।' আমাদের অন্তরাত্মার এই প্রশ্নের উত্তর যাঁরা

দিয়েছেন তাঁদেরই মধ্যে একজনের নাম যিশুখৃষ্ট। তিনি বলেছেন, 'আমি পুত্র, পুত্রের মধ্যেই পিতার আবির্ভাব।' পুত্রের সঙ্গে পিতার শুধু কার্যকারণের যোগ নয়, পুত্রে পিতারই আত্মস্বরূপের প্রকাশ। খৃষ্ট বলেছেন, 'আমাতে তিনি আছেন', প্রেমিক-প্রেমিকা যেমন বলতে পারে 'আমাদের মধ্যে কোনো ফাঁক নেই'। অন্তরের সম্বন্ধ যেখানে নিবিড়, বিশুদ্ধ, সেখানেই এমন কথা বলতে পারা যায়; সেখানেই মহাসাধক বলেন, 'পিতাতে আমাতে একাত্মতা।' এ কথাটি নূতন না হতে পারে, এ বাণী হয়তো আরো অনেকে বলেছেন। কিন্তু যে বাণী সফল হল জীবনের ক্ষেত্রে, নানা ফল ফলালো, তাকে নমস্কার করি। খৃষ্ট বলেছিলেন, 'আমার মধ্যে আমার পিতারই প্রকাশ। এই ভাবের কথা ভারতবর্ষেও উচ্চারিত হয়েছে, কিন্তু সেটি শাস্ত্রবচনের সীমানা উত্তীর্ণ হয়ে প্রাণের সীমায় যতক্ষণ না পৌছয় ততক্ষণ সে কথা বন্ধ্যা। যতই বড়ো ভাষায় তাকে স্বীকার করি ব্যবহারের দৈন্যে তাকে ততই বড়ো আকারে অপমানিত করি। খৃষ্টান সম্প্রদায় পদে পদে তা করে থাকেন। কথার বেলায় যাকে তারা বলে 'প্রভু', সেবার বেলায় তাকে দেয় ফাঁকি। সত্য কথার দাম দিতে হয় সত্য সেবাতেই। যদি সেই দিকেই দৃষ্টি রাখি তবে বলতে হয় যে, খৃষ্টের জন্ম ব্যর্থ হয়েছে; বলতে হয়, ফুল ফুটেছে সুন্দর, তার মাধুর্য উপভোগ করেছি, কিন্তু পরিণামে তাতে ফল ধরল না। এ দিকে চোখে দেখেছি বটে হিংসা রিপুর প্রাবল্য খৃষ্টীয় সমাজে। তৎসত্ত্বেও মানুষের প্রতি প্রেম, লোকহিতের জন্য আত্মত্যাগ খৃষ্টীয় সমাজে সাফল্য দেখিয়েছে— এ কথাটি সাম্প্রদায়িকতার মোহে পড়ে যদি না মানি তবে সত্যকেই অস্বীকার করা হবে। খৃষ্টানের ধর্মবুদ্ধি প্রতিদিন বলছে— মানুষের মধ্যে ভগবানের সেবা করো, তাঁর নৈবেদ্য নিরন্নের অন্নথালিতে, বস্ত্রহীনের দেহে। এই কথাটিই খৃষ্টধর্মের বড়ো কথা। খৃষ্টানরা বিশ্বাস করেন— খৃষ্ট আপন মানবজন্মের মধ্যে ভগবান ও মানবের একাত্মতা প্রতিপন্ন করেছেন।

ধনী তাঁর গ্রামের লোকের জলাভাবকে উপেক্ষা করে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা দিলেন পুত্রের অন্নপ্রাশনে দেবমন্দিরে দেবপ্রতিমার গলায় রত্নহার পরাতে। এই কথাটি তাঁর হৃদয়ে পৌছয় নি যে, যেখানে সূর্যের তেজ সেখানে দীপশিখা আনা মূঢ়তা, যেখানে গভীর সমুদ্র সেখানে জলগণ্ডূষ দেওয়া বালকোচিত। অথচ মানুষের তৃষ্ণার মধ্য দিয়ে ভগবান যে জল চাইছেন সে চাওয়া অতি স্পষ্ট, অতি তীব্র; সেই চাওয়ার প্রতি বধির হয়ে এরা দেবালয়ে রত্নালংকারের জোগান দেয়।

পুত্রের মধ্যে পিতাকে বিড়ম্বিত ক'রে দানের দ্বারা তাঁকে ভোলাবার চেষ্টায় মানুষ তাঁকে দ্বিগুণ অপমানিত করতে থাকে। দেখেছি ধনী মহিলা পাণ্ডার দুই পা সোনার

মোহর দিয়ে ঢাকা দিয়ে মনে করেছে স্বর্গে পৌঁছবার পুরা মাশুল চুকিয়ে দেওয়া হল; অথচ সেই মোহরের জন্য দেবতা যেখানে কাঙাল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সেই মানুষের প্রতি দৃষ্টিই পড়ল না।

আজ প্রাতে আমাদের আশ্রমবন্ধু অ্যানড্রুজের চিঠি পেলুম। তিনি যে কাজ করতে গেছেন সে তাঁর আত্মীয়স্বজনের কাজ নয়, বরং তাদের প্রতিকূল। বাহ্যত যারা তাঁর অনাত্মীয়, যারা তাঁর স্বজাতীয় নয়, তাদের জন্য তিনি কঠিন দুঃখ সইছেন, স্বজাতীয়দের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম করে দুঃখপীড়া পাচ্ছেন। এবার সেখানে যাবা মাত্র তিনি দেখলেন বসন্তমারীতে বহু ভারতীয় পীড়িত, মৃত্যুগ্রস্ত; তাঁর কাজ হল তাদের সেবা করা। মারীর মধ্যে ভারতীয় বণিক্‌দের এই যে তিনি সেবা করেছেন, এতে কিসে তাঁকে বল দিয়েছে। মানবসন্তানের সেবায় বিশ্বপিতার সেবার উপদেশ খৃষ্টানদেশের মধ্যে এতকাল ধরে এত গভীররূপে প্রবেশ করেছে যে সেখানে আজ যাঁরা নিজেকে নাস্তিক বলে প্রচার করেন তাঁদেরও নাড়ির রক্তে এই বাণী বহমান। তাঁরাও মানুষের জন্য প্রাণান্তকর দুঃখ স্বীকার করাকে আপন ধর্ম বলে প্রমাণ করেছেন। এ ফল কোন্‌ বৃক্ষে ফলল। কে এতে রসসঞ্চার করে। এ প্রশ্নের উত্তরে এ কথা অস্বীকার করতে পারি নে যে, সে খৃষ্টধর্ম।

লক্ষ্যে অলক্ষ্যে বিবিধ আকারে এই ধর্ম পশ্চিম মহাদেশে কাজ করছে। যাকে সেখানকার লোকে হিউম্যান ইণ্টরেস্ট অর্থাৎ মানবের প্রতি ঔৎসুক্য বলে তা জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইউরোপে যেমন জাগরূক তেমন আর কোথাও দেখি নি। সে দেশে সর্বত্রই মানুষকে সেখানকার লোকে সম্পূর্ণরূপে চেনবার জন্য তথ্য অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে। যারা নরমাংস খায় তাদেরও মধ্যে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, 'তুমি মানুষ, তুমি কী কর, তুমি কী ভাব।' আর আমরা? আমাদের পাশের লোকেরও খবর নিই নে। তাদের সম্বন্ধে না আছে কৌতূহল, না আছে শ্রদ্ধা। উপেক্ষা ও অবজ্ঞায় কুহেলিকায় আচ্ছন্ন করে দিয়ে অধিকাংশ প্রতিবেশীর সম্বন্ধে অজ্ঞান হয়ে আছি। কেন এমন হয়। মানুষকে যথোচিত মূল্য দিই নে বলেই আজকের দিনে আমাদের এই দুর্দশা। খৃষ্ট বাঁচিয়েছেন পৃথিবীর অনেককে, বাঁচিয়েছেন মানুষের ঔদাসীন্য থেকে মানুষকে। আজকে যারা তাঁর নাম নেয় না, তাঁকে অপমান করতেও কুণ্ঠিত হয় না, তারাও তাঁর সে বাণীকে কোনো-না কোনো আকারে গ্রহণ করেছে।

মানুষ যে বহুমূল্য, তার সেবাতেই যে ভগবানের সেবা সার্থক, এই কথা ইউরোপ যেখানে মানে নি সেখানেই সে মার খেয়েছে। এ কথার মূল্য যে পরিমাণে ইউরোপ দিয়েছে সেই পরিমাণেই সে উন্নত হয়েছে। মানুষের প্রতি খৃষ্টধর্ম যে অসীম শ্রদ্ধা

জাগরূক করেছে আমরা যেন নিরভিমানচিত্তে তাকে গ্রহণ করি এবং যে মহাপুরুষ সে সত্যের প্রচার করেছিলেন তাঁকে প্রণাম করি।

২৫ ডিসেম্বর ১৯২৬
শান্তিনিকেতন

বৈশাখ ১৩৪০

বড়োদিন

যাঁকে আমরা পরম মানব বলে স্বীকার করি তাঁর জন্ম ঐতিহাসিক নয়, আধ্যাত্মিক। প্রভাতের আলো সদ্য-প্রভাতের নয়, সে চিরপ্রভাতের। আমরা যখনই তাকে দেখি তখনই সে নূতন, কিন্তু তবু সে চিরন্তন। নব নব জাগরণের মধ্যে দিয়ে সে প্রকাশ করে অনাদি আলোককে। জ্যোতির্বিদ্ জানেন নক্ষত্রের আলো যেদিন আমাদের চোখে এসে পৌঁছয় তার বহু যুগ পূর্বেই সে যাত্রা করেছে। তেমনি সত্যের দূতকে যেদিন আমরা দেখতে পাই সেইদিন থেকেই তাঁর বয়সের আরম্ভ নয়—সত্যের প্রেরণা রয়েছে মহাকালের অন্তরে। কোনো কালে অন্ত নেই তাঁর আগমনের এই কথা যেন জানতে পারি।

বিশেষ দিনে বিশেষ পূজা-অনুষ্ঠান করে যাঁরা নরোত্তম তাঁদের শ্রদ্ধা জানানো সুলভে মূল্য চুকিয়ে দেওয়া। তিন শত চৌষট্টি দিন অস্বীকার করে তিন-শত-পঁয়ষট্টি-তম দিনে তাঁর স্তব দ্বারা আমরা নিজের জড়ত্বকে সান্ত্বনা দিই। সত্যের সাধনা এ নয়, দায়িত্বকে অস্বীকার করা মাত্র। এমনি করে মানুষ নিজেকে ভোলায়। নামগ্রহণের দ্বারা কর্তব্য রক্ষা করি, সত্যগ্রহণের দুরূহ অধ্যবসায় পিছনে পড়ে যায়। কর্মের মধ্যে তাঁকে স্বীকার করলেম না, স্তবের মধ্যে সহজ নৈবেদ্য দিয়েই খালাস। যাঁরা এলেন বাহ্যিকতা থেকে আমাদের মুক্তি দিতে তাঁদেরকে বন্দী করলেম বাহ্যিক অনুষ্ঠানের পুনরাবৃত্তির মধ্যে।

আজ আমি লজ্জা বোধ করেছি এমন করে একদিনের জন্যে আনুষ্ঠানিক কর্তব্য সমাধা করবার কাজে আহূত হয়ে। জীবন দিয়ে যাঁকে অঙ্গীকার করাই সত্য, কথা দিয়ে তাঁর প্রাপ্য চুকিয়ে দেওয়া নিরতিশয় ব্যর্থতা।

আজ তাঁর জন্মদিন এ কথা বলব কি পঞ্জিকার তিথি মিলিয়ে। অন্তরে যে দিন ধরা পড়ে না সে দিনের উপলব্ধি কি কালগণনায়। যেদিন সত্যের নামে ত্যাগ করেছি, যেদিন অকৃত্রিম প্রেমে মানুষকে ভাই বলতে পেরেছি, সেইদিনই পিতার পুত্র আমাদের

জীবনে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেইদিনই বড়োদিন— যে-তারিখেই আসুক। আমাদের জীবনে তাঁর জন্মদিন দৈবাৎ আসে, কিন্তু ক্রুশে বিদ্ধ তাঁর মৃত্যু সে তো আসে দিনের পর দিন। জানি আজ বিশেষ দিনে দেশে দেশে গির্জায় গির্জায় তাঁর স্তবধ্বনি উঠছে, যিনি পরমপিতার বার্তা এনেছেন মানবসন্তানের কাছে— আর সেই গির্জার বাইরে রক্তাক্ত হয়ে উঠছে পৃথিবী ভ্রাতৃহত্যায়। দেবালয়ে স্তবমন্ত্রে তাঁকে আজ যারা ঘোষণা করছে তারাই কামানের গর্জনে তাঁকে অস্বীকার করছে, আকাশ থেকে মৃত্যুবর্ষণ করে তাঁর বাণীকে অতি ভীষণ ব্যঙ্গ করছে। লোভ আজ নিদারুণ, দুর্বলের অন্নগ্রাস আজ লুণ্ঠিত, প্রবলের সামনে দাঁড়িয়ে খৃষ্টের দোহাই দিয়ে মার বুকে পেতে নিতে সাহস নেই যাদের তারাই আজ পূজাবেদীর সামনে দাঁড়িয়ে মৃত্যুশূলবিদ্ধ সেই কারুণিকের জয়ধ্বনি করছে অভ্যস্ত বচন আবৃত্তি করে। তবে কিসের উৎসব আজ। কেমন করে জানব খৃষ্ট জন্মেছেন পৃথিবীতে। আনন্দ করব কা নিয়ে। এক দিকে যাঁকে মারছি নিজের হাতে, আর-এক দিকে পুনরুজ্জীবন প্রচার করব শুধুমাত্র কথায়। আজও তিনি মানুষের ইতিহাসে প্রতিমুহূর্তে ক্রুশে বিদ্ধ হচ্ছেন।

তিনি ডেকেছিলেন মানুষকে পরমপিতার সন্তান বলে, ভাইকে মিলতে বলেছিলেন ভাইয়ের সঙ্গে। প্রাণোৎসর্গ করলেন এই মানবসত্যের বেদীতে। চিরদিনের জন্যে এই মিলনের আহ্বান রেখে গেলেন আমাদের কাছে।

তাঁর আহ্বানকে আমরা যুগে যুগে প্রত্যাখ্যান করেছি। বেড়েই চলল তাঁর বাণীর প্রতিবাদ করবার অতি বিপুল আয়োজন।

বেদমন্ত্রে আছে তিনি আমাদের পিতা : পিতা নোঽসি। সেইসঙ্গে প্রার্থনা আছে : পিতা নো বোধি। তিনি যে পিতা এই বোধ যেন আমাদের মনে জাগে। সেই পিতার বোধ যিনি দান করতে এসেছিলেন তিনি ব্যর্থ হয়ে, উপহসিত হয়ে, ফিরছেন আমাদের দ্বারের বাইরে— সেই কথাকে গান গেয়ে স্তব করে চাপা যেন না দিই। আজ পরিতাপ করবার দিন, আনন্দ করবার নয়। আজ মানুষের লজ্জা সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত ক'রে। আজ আমাদের উদ্ধত মাথা ধুলায় নত হোক, চোখ দিয়ে অশ্রু বয়ে যাক। বড়োদিন নিজেকে পরীক্ষা করবার দিন, নিজেকে নম্র করবার দিন।

২৫ ডিসেম্বর ১৯৩২ মাঘ ১৩৩৯

শান্তিনিকেতন

খৃষ্ট

আমাদের এই ভূলোককে বেষ্টন করে আছে ভুবর্লোক, আকাশমণ্ডল, যার মধ্য দিয়ে আমাদের প্রাণের নিশ্বাসবায়ু সমীরিত হয়। ভূলোকের সঙ্গে সঙ্গে এই ভুবর্লোক আছে বলেই আমাদের পৃথিবী নানা বর্ণসম্পদে গন্ধসম্পদে সংগীতসম্পদে সমৃদ্ধ— পৃথিবীর ফল শস্য সবই এই ভুবর্লোকের দান। এক সময় পৃথিবী যখন দ্রবপ্রায় অবস্থায় ছিল তখন তার চার দিকে বিষবাষ্প ছিল ঘন হয়ে, সূর্যকিরণ এই আচ্ছাদন ভালো করে ভেদ করতে পারত না। ভূগর্ভের উত্তাপ অসংযত হয়ে জলস্থলকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। ক্রমশ এই তাপ শান্ত হয়ে গেলে আকাশ নির্মল হয়ে এল, মেঘপুঞ্জ হল ক্ষীণ, সূর্যকিরণ পৃথিবীর ললাটে আশীর্বাদটিকা পরিয়ে দেবার অবকাশ পেল। ভুবর্লোককে আচ্ছন্ন করেছিল যে কালিমা তা অপসারিত হলে পৃথিবী হল সুন্দর, জীবজন্তু হল আনন্দিত। মানবলোকসৃষ্টিও এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। মানবচিত্তের আকাশমণ্ডলকে মোহ-কালিমা থেকে নির্মুক্ত করবার জন্য, সমাজকে শোভন বাসযোগ্য করবার জন্য, মানুষকে চলতে হয়েছে দুঃখস্বীকারের কাঁটাপথ দিয়ে। অনেক সময় সে চেষ্টায় মানুষ ভুল করেছে, কালিমা শোধন করতে গিয়ে অনেক সময় তাকে ঘনীভূত করেছে। পৃথিবী যখন তার সৃষ্টি-উপাদানের সামঞ্জস্য পায় নি তখন কত বন্যা, ভূকম্প, অগ্নি-উচ্ছ্বাস, বায়ুমণ্ডলে কত আবিলতা। কত স্বার্থপরতা, হিংস্রতা, লুব্ধতা, দুর্বলকে পীড়ন আজও চলেছে; আদিম কালে রিপুর অন্ধবেগের পথে শুভবুদ্ধির বাধা আরো অল্প ছিল। এই যে বিষনিশ্বাসে মানুষের ভুবর্লোক আবিল মেঘাচ্ছন্ন, এই যে কালিমা আলোককে অবরুদ্ধ করে, তাকে নির্মল করবার চেষ্টায় কত সমাজতন্ত্র ধর্মতন্ত্র মানুষ রচনা করেছে। যতক্ষণ এই চেষ্টা শুধু নিয়ম-শাসনে আবদ্ধ থাকে ততক্ষণ তা সফল হতে পারে না। নিয়মের বল্‌গায় প্রমত্ত রিপুর উচ্ছৃঙ্খলতাকে কিছু পরিমাণে দমন করতে পারে; কিন্তু তার ফল বাহ্যিক।

মানুষ নিয়ম মানে ভয়ে; এই ভয়টাতে প্রমাণ করে তার আত্মিক দুর্বলতা। ভয়দ্বারা চালিত সমাজে বা সাম্রাজ্যে মানুষকে পশুর তুল্য অপমানিত করে। বাহিরের এই শাসনে তার মনুষ্যত্বের অমর্যাদা। মানবলোকে এই ভয়ের শাসন আজও আছে প্রবল।

মানুষের অন্তরের বায়ুমণ্ডল মলিনতামুক্ত হয় নি বলেই তার এই অসম্মান সম্ভবপর হয়েছে। মানুষের অন্তরলোকের মোহাবরণ মুক্ত করবার জন্যে যুগে যুগে মহৎ প্রাণের অভ্যুদয় হয়েছে। পৃথিবীর একটা অংশ আছে, যেখানে তার সোনা-রুপার

খনি, যেখানে মানুষের অশনবসনের আয়োজনের ক্ষেত্র; সেই স্থূল ভূমিকে আমাদের স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু সেই স্থূল মৃত্তিকাভাণ্ডারই তো পৃথিবীর মাহাত্ম্যভাণ্ডার নয়। যেখানে তার আলোক বিচ্ছুরিত, যেখানে নিশ্বসিত তার প্রাণ, যেখানে প্রসারিত তার মুক্তি, সেই ঊর্ধ্বলোক থেকেই প্রবাহিত হয় তার কল্যাণ; সেইখান থেকেই বিকশিত হয় তার সৌন্দর্য। মানবপ্রকৃতিতেও আছে স্থূলতা, যেখানে তার বিষয়বুদ্ধি, যেখানে তার অর্জন এবং সঞ্চয়; তারই প্রতি আসক্তিই যদি কোনো মূঢ়তায় সর্বপ্রধান হয়ে ওঠে তা হলে শান্তি থাকে না, সমাজ বিষবাষ্পে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আজ তারই পরিচয় পাচ্ছি, আজ বিশ্বব্যাপী লুব্ধতা প্রবল হয়ে উঠে মানুষে মানুষে হিংস্রবুদ্ধির আগুন জ্বালিয়ে তুলেছে। এমন দিনে স্মরণ করি সেই মহাপুরুষদের যাঁরা মানুষকে সোনারুপার ভাণ্ডারের সন্ধান দিতে আসেন নি, দুর্বলের বুকের উপর দিয়ে প্রবলের ইস্পাত-বাঁধানো বড়ো রাস্তা পাকা করবার মন্ত্রণাদাতা যাঁরা নন— মানুষের সব চেয়ে বড়ো সম্পদ যে মুক্তি সেই মুক্তি দান করা যাঁদের প্রাণপণ ব্রত।

এমন মহাপুরুষ নিশ্চয়ই পৃথিবীতে অনেক এসেছেন, আমরা তাঁদের সকলের নামও জানি না। কিন্তু নিশ্চয়ই এমন অনেক আছেন এখনো যাঁরা এই পৃথিবীকে মার্জনা করছেন, আমাদের জীবনকে সুন্দর উজ্জ্বল করছেন। বিজ্ঞানে জেনেছি, জন্তুরা যে বিষনিশ্বাস পরিত্যাগ করে গাছপালা সে নিশ্বাস গ্রহণ ক'রে প্রাণদায়ী অক্সিজেন প্রশ্বসিত করে দেয়। তেমনি মানুষের চরিত্র প্রতিনিয়ত যে বিষ উদ্‌গার করছে নিয়ত তা নির্মল হচ্ছে পবিত্রজীবনের সংস্পর্শে। এই শুভচেষ্টা মানবলোকে যাঁরা জাগ্রত রাখছেন তাঁদের যিনি প্রতীক, যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব এই বাণী যাঁর মধ্যে উজ্জ্বল পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, তাঁকে প্রণাম করার যোগেই সেই সাধুদের সকলকে একসঙ্গে প্রণাম জানাই— যাঁরা আত্মোৎসর্গের দ্বারা পৃথিবীতে কল্যাণ বিতরণ করছেন।

আজকের দিন যাঁর জন্মদিন বলে খ্যাত সেই যিশুর নিকটই উপস্থিত করি জগতে যাঁরা প্রণম্য তাঁদের সকলের উদ্দেশে প্রণাম। আমরা মানবের পরিপূর্ণ কল্যাণরূপ দেখতে পেয়েছি কয়েকজনের মধ্যে। এই কল্যাণের দূত আমাদের ইতিহাসে অল্পই এসেছেন, কিন্তু পরিমাণ দিয়ে কল্যাণের বিচার তো হতে পারে না।

ভারতবর্ষে উপনিষদের বাণী মানুষকে বল দিয়েছে। কিন্তু সে তো মন্ত্র, ধ্যানের বিষয়। যাঁদের জীবনে রূপ পেয়েছে সেই বাণী তাঁরা যদি আমাদের আপন হয়ে আমাদের প্রত্যক্ষ হয়ে আসেন তবে সে আমাদের মস্ত সুযোগ। কেননা শাস্ত্রবাক্য তো কথা বলে না, মানুষ বলে। আজকে আমরা যাঁর কথা স্মরণ করছি তিনি অনেক

আঘাত পেয়েছেন, বিরুদ্ধতা শত্রুতার সম্মুখীন হয়েছেন, নিষ্ঠুর মৃত্যুতে তাঁর জীবনান্ত হয়েছিল। এই যে পরম দুঃখের আলোকে মানুষের মনুষ্যত্ব চিরকালের মতো দেদীপ্যমান হয়ে আছে এ তো বইপড়া ব্যাপার নয়। এখানে দেখছি মানুষকে দুঃখের আগুনে উজ্জ্বল। এ'কে উপলব্ধি করা সহজ; শাস্ত্রবাক্যকে তো আমরা ভালোবাসতে পারি নে। সহজ হয় আমাদের পথ, যদি আমরা ভালোবাসতে পারি তাঁদের যাঁরা মানুষকে ভালোবেসেছেন। বুদ্ধ যখন অপরিমেয় মৈত্রী মানুষকে দান করেছিলেন তখন তো তিনি কেবল শাস্ত্র প্রচার করেন নি, তিনি মানুষের মনে জাগ্রত করেছিলেন ভক্তি। সেই ভক্তির মধ্যেই যথার্থ মুক্তি। খৃষ্টকে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে ভালোবাসতে পেরেছেন তাঁরা শুধু একা বসে রিপু দমন করেন নি, তাঁরা দুঃসাধ্য সাধন করেছেন। তাঁরা গিয়েছেন দূর-দূরান্তরে, পর্বত সমুদ্র পেরিয়ে মানবপ্রেম প্রচার করেছেন। মহাপুরুষেরা এইরকম আপন জীবনের প্রদীপ জ্বালান; তাঁরা কেবল তর্ক করেন না, মত প্রচার করেন না। তাঁরা আমাদের দিয়ে যান মানুষরূপে আপনাকে।

খৃষ্টের প্রেরণা মানবসমাজে আজ ছোটো বড়ো কত প্রদীপ জ্বালিয়েছে, অনাথ-পীড়িতদের দুঃখ দূর করবার জন্যে তাঁরা অপরিসীম ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছেন। কী দানবতা আজ চার দিকে, কলুষে পৃথিবী আচ্ছন্ন— তবু বলতে হবে: স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। এই বিরাট কলুষনিবিড়তার মধ্যে দেখা যায় না তাঁদের যাঁরা মানবসমাজের পুণ্যের আকর। কিন্তু তাঁরা নিশ্চয়ই আছেন— নইলে পৃথিবী অভিশপ্ত হত, সমস্ত সৌন্দর্য ম্লান হয়ে যেত, সমস্ত মানবলোক অন্ধকারে অবলুপ্ত হত।

২৫ ডিসেম্বর ১৯৩৬ চৈত্র ১৩৪৩

শান্তিনিকেতন

পল্লীপ্রকৃতি

পল্লীপ্রকৃতি

পল্লীর উন্নতি

হিতসাধনমণ্ডলীর সভায় কথিত

সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় বাষ্পের প্রভাব যখন বেশি তখন গ্রহনক্ষত্রে ল্যাজামুড়োর প্রভেদ থাকে না। আমাদের দেশে সেই দশা— তাই সকলকেই সব কাজে লাগতে হয়, কবিকেও কাজের কথায় টানে। অতএব আমি আজকের এই সভায় দাঁড়ানোর জন্যে যদি ছন্দোভঙ্গ হয়ে থাকে তবে ক্ষমা করতে হবে।

এখানকার আলোচ্য কথাটি সোজা। দেশের হিত করাটা যে দেশের লোকেরই কর্তব্য সেইটে এখানে স্বীকার করতে হবে। এ কথাটা দুর্বোধ নয়। কিন্তু নিতান্ত সোজা কথাও কপালদোষে কঠিন হয়ে ওঠে সেটা পূর্বে পূর্বে দেখেছি। খেতে বললে মানুষ যখন মারতে আসে তখন বুঝতে হবে সহজটা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেইটেই সব চেয়ে মুশকিলের কথা।

আমার মনে পড়ে এক সময়ে যখন আমার বয়স অল্প ছিল, সুতরাং সাহস বেশি ছিল, সে সময়ে বলেছিলুম যে বাঙালির ছেলের পক্ষে বাংলা ভাষার ভিতর দিয়ে শিক্ষা পাওয়ার দরকার আছে। শুনে সেদিন বাঙালির ছেলের বাপদাদার মধ্যে অনেকেই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

আর-একদিন বলেছিলুম, দেশের কাজ করবার জন্য দেশের লোকের যে অধিকার আছে সেটা আমরা আত্ম-অবিশ্বাসের মোহে বা সুবিধার খাতিরে অন্যের হাতে তুলে দিলে যথার্থপক্ষে নিজের দেশকে হারানো হয়। সামর্থ্যের স্বল্পতা-বশত যদি-বা আমাদের কাজ অসম্পূর্ণও হয়, তবু সে ক্ষতির চেয়ে নিজশক্তি-চালনার গৌরব ও সার্থকতার লাভ অনেক পরিমাণে বেশি। এত বড়ো একটা সাদা কথা লোক ডেকে যে বলতে বসেছিলুম তাতে মনের মধ্যে কিছু লজ্জা বোধ করেছিলুম। কিন্তু বলা হয়ে গেলে পরে লাঠি হাতে দেশের লোকে আমার সেটুকু লজ্জা চুরমার করে দিয়েছিল।

দেশের লোককে দোষ দিই নে। সত্য কথাও খামকা শুনলে রাগ হতে পারে। অন্যমনস্ক মানুষ যখন গর্তর মধ্যে পড়তে যাচ্ছে তখন হঠাৎ তাকে টেনে ধরলে সে

হঠাৎ মারতে আসে। যেই, সময় পেলেই, দেখতে পায় সামনে গর্ত আছে, তখন রাগ কেটে যায়। আজ সময় এসেছে, গর্ত চোখে পড়েছে, আজ আর সাবধান করবার দরকারই নেই।

দেশের লোককে দেশের কাজে লাগতে হবে এ কথাটা আজ স্বাভাবিক হয়েছে। তার প্রধান কারণ, দেশ যে দেশ এই উপলব্ধিটা আমাদের মনে আগেকার চেয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সুতরাং দেশকে সত্য বলে জানবামাত্রই তার সেবা করবার উদ্যমও আপনি সত্য হল, সেটা এখন আর নীতি-উপদেশ মাত্র নয়।

যৌবনের আরম্ভে যখন বিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা অল্প অথচ আমাদের শক্তি উদ্যত, তখন আমরা নানা বৃথা অনুকরণ করি, নানা বাড়াবাড়িতে প্রবৃত্ত হই। তখন আমরা পথও চিনি নে, ক্ষেত্রও চিনি নে, অথচ ছুটে চলবার তেজ সামলাতে পারি নে। সেই সময়ে আমাদের যাঁরা চালক তাঁরা যদি আমাদের ঠিকমত কাজের পথে লাগিয়ে দেন তা হলে অনেক বিপদ বাঁচে। কিন্তু তাঁরা এ পর্যন্ত এমন কথা বলেন নি যে, 'এই আমাদের কাজ, এসো আমরা কোমর বেঁধে লেগে যাই।' তাঁরা বলেন নি 'কাজ করো', তাঁরা বলেছেন 'প্রার্থনা করো'। অর্থাৎ ফলের জন্যে আপনার প্রতি নির্ভর না করে বাইরের প্রতি নির্ভর করো।

তাঁদের দোষ দিতে পারে নে। সত্যের পরিচয়ের আরম্ভে আমরা সত্যকে বাইরের দিকেই একান্ত করে দেখি, 'আত্মানং বিদ্ধি' এই উপদেশটা অনেক দেরিতে কানে পৌঁছয়। একবার বাইরেটা ঘুরে তবে আপনার দিকে আমরা ফিরে আসি। বাইরের থেকে চেয়ে পাব এই ইচ্ছা করার যেটুকু প্রয়োজন ছিল তার সীমা আমরা দেখতে পেয়েছি, অতএব তার কাজ হয়েছে। তার পরে প্রার্থনা করার উপলক্ষে আমাদের একত্রে জুটতে হয়েছিল, সেটাতেও উপকার হয়েছে। সুতরাং যে পথ দিয়ে এসেছি আজ সে পথটা এক জায়গায় এসে শেষ হয়েছে বলেই যে তার নিন্দা করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। সে পথ না চুকোলে এ পথের সন্ধান পাওয়া যেত না।

এতদিন দেশ আকাশের দিকে তাকিয়ে কেবল হাঁক দিয়েছে 'আয় বৃষ্টি হেনে'। আজ বৃষ্টি এল। আজও যদি হাঁকতে থাকি তা হলে সময় চলে যাবে। অনেকটা বর্ষণ ব্যর্থ হবে, কেননা ইতিমধ্যে জলাশয় খুঁড়ে রাখি নি। একদিন সমস্ত বাংলা ব্যেপে স্বদেশপ্রেমের বান ডেকে এল। সেটাকে আমরা পুরোপুরি ব্যবহারে লাগাতে পারলুম না। মনে আছে দেশের নামে হঠাৎ একদিন ঘণ্টা কয়েক ধরে খুব এক পসলা টাকার বর্ষণ হয়ে গেল, কিন্তু সে টাকা আজ পর্যন্ত দেশ গ্রহণ করতে পারল না

কত বৎসর ধরে কেবলমাত্র চাইবার জন্যই প্রস্তুত হয়েছি, কিন্তু নেবার জন্যে প্রস্তুত হই নি। এমনতরো অদ্ভুত অসামর্থ্য কল্পনা করাও কঠিন।

আজ এই সভায় যাঁরা উপস্থিত তাঁরা অনেকেই যুবক ছাত্র, দেশের কাজ করবার জন্যে তাঁদের আগ্রহ পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, অথচ এই আগ্রহকে কাজে লাগাবার কোনো ব্যবস্থাই কোথাও নেই। সমাজ যদি পরিবার প্রভৃতি নানা তন্ত্রের মধ্যে আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকে চালনা করবার নিয়মিত পথ করে না দিত, তা হলে স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ কিরকম বীভৎস হত— প্রবীণের সঙ্গে নবীনের, প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর সম্বন্ধ কিরকম উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠত। তা হলে মানুষের ভালো জিনিসও মন্দ হয়ে দাঁড়াত। তেমনি দেশের কাজ করবার জন্যে আমাদের বিভিন্ন প্রকৃতিতে যে বিভিন্ন রকমের শক্তি ও উদ্যম আছে তাদের যথাভাবে চালনা করবার যদি কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা দেশে না থাকে তবে আমাদের সেই সৃজনশক্তি প্রতিরুদ্ধ হয়ে প্রলয়শক্তি হয়ে উঠবে। তাকে সহজে পথ ছেড়ে না দিলে সে গোপন পথ আশ্রয় করবেই। গোপন পথে আলোক নেই, খোলা হাওয়া নেই, সেখানে শক্তির বিকার না হয়ে থাকতে পারে না। একে কেবলমাত্র নিন্দা করা, শাসন করা, এর প্রতি সদ্‌বিচার করা নয়। এই শক্তিকে চালনা করবার পথ করে দিতে হবে। এমন পথ যাতে শক্তির কেবলমাত্র অসদ্‌ব্যয় হবে না তা নয়, অপব্যয়ও যেন না হতে পারে। কারণ, আমাদের মূলধন অল্প। সুতরাং সেটা খাটাবার জন্যে আমাদের বিহিত রকমের শিক্ষা ও ধৈর্য চাই। শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি চাই এই কথা যেমন বলা, অমনি তার পরদিনেই কারখানা খুলে বসে সর্বনাশ ছাড়া আমরা অন্য কোনোরকমের মাল তৈরি করতে পারি নে। এ যেমন, তেমনি যে করেই হোক মরিয়া হয়ে দেশের কাজ করলেই হল এমন কথা যদি আমরা বলি, তবে দেশের সর্বনাশেরই কাজ করা হবে। কারণ, সে অবস্থায় শক্তির কেবলই অপব্যয় হতে থাকবে। যতই অপব্যয় হয় মানুষের অন্ধতা ততই বেড়ে ওঠে। তখন পথের চেয়ে বিপথের প্রতিই মানুষের শ্রদ্ধা বেশি হয়। তাতে করে কেবল যে কাজের দিক থেকেই আমাদের লোকসান হয় তা নয়, যে ন্যায়ের শক্তি যে ধর্মের তেজ সমস্ত ক্ষতির উপরেও আমাদের অমোঘ আশ্রয় দান করে তাকে সুদ্ধ নষ্ট করি। কেবল যে গাছের ফলগুলোকেই নাস্তানাবুদ করে দিই তা নয়, তার শিকড়গুলোকে সুদ্ধ কেটে দিয়ে বসে থাকি। কেবল যে দেশের সম্পদকে ভেঙেচুরে দিই তা নয়, সেই ভগ্নাবশেষের উপরে শয়তানকে ডেকে এনে রাজা করে বসাই।

অতএব যে শুভ ইচ্ছা আপন সাধনার প্রশস্ত পথ থেকে প্রতিরুদ্ধ হয়েছে বলেই অপব্যয় ও অসদ্‌ব্যয়ের দ্বারা দেশের বক্ষে আপন শক্তিকে শক্তিশেলরূপে হানছে তাকে

আজ ফিরিয়ে না দিয়ে সত্য পথে আহ্বান করতে হবে। আজ আকাশ কালো করে যে দুর্যোগের চেহারা দেখছি, আমাদের ফসলের খেতের উপরে তার ধারাকে গ্রহণ করতে পারলে তবেই এটি শুভযোগ হয়ে উঠবে।

বস্তুত ফসলাভের আয়োজনে দুটো ভাগ আছে। একটা ভাগ আকাশে, একটা ভাগ মাটিতে। এক দিকে মেঘের আয়োজন, এক দিকে চাষের। আমাদের নব শিক্ষায়, বৃহৎ পৃথিবীর সঙ্গে নূতন সংস্পর্শে, চিত্তাকাশের বায়ুকোণে ভাবের মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। এই উপরের হাওয়ায় আমাদের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা এবং কল্যাণসাধনার একটা রসগর্ভশক্তি জমে উঠছে। আমাদের বিশেষ করে দেখতে হবে শিক্ষার মধ্যে এই উচ্চভাবের বেগ সঞ্চার যাতে হয়। আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিষয়শিক্ষা। আমরা নোট নিয়েছি, মুখস্থ করেছি, পাস করেছি। বসন্তের দক্ষিণ হাওয়ার মতো আমাদের শিক্ষা মনুষ্যত্বের কুঞ্জে কুঞ্জে নতুন পাতা ধরিয়ে ফুল ফুটিয়ে তুলছে না। আমাদের শিক্ষার মধ্যে কেবল যে বস্তুপরিচয় এবং কর্মসাধনের যোগ নেই তা নয়, এর মধ্যে সংগীত নেই, চিত্র নেই, শিল্প নেই, আত্মপ্রকাশের আনন্দময় উপায়-উপকরণ নেই। এ যে কত বড়ো দৈন্য তার বোধশক্তি পর্যন্ত আমাদের লুপ্ত হয়ে গেছে। উপবাস করে করে ক্ষুধাটাকে পর্যন্ত আমরা হজম করে ফেলেছি। এইজন্যেই শিক্ষা সমাধা হলে আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একটা পরিণতির শক্তিপ্রাচুর্য জন্মে না। সেইজন্যেই আমাদের ইচ্ছাশক্তির মধ্যে দৈন্য থেকে যায়। কোনোরকম বড়ো ইচ্ছা করবার তেজ থাকে না। জীবনের কোনো সাধনা গ্রহণ করবার আনন্দ চিত্তের মধ্যে জন্মায় না। আমাদের তপস্যা দারোগাগিরি ডেপুটিগিরিকে লঙ্ঘন করে অগ্রসর হতে অক্ষম হয়ে পড়ে। মনে আছে একদা কোনো-এক স্বাদেশিক সভায় এক পণ্ডিত বলেছিলেন যে, ভারতবর্ষের উত্তরে হিমগিরি, মাঝখানে বিন্ধ্যগিরি, দুইপাশে দুই ঘাটগিরি, এর থেকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে বিধাতা ভারতবাসীকে সমুদ্রযাত্রা করতে নিষেধ করছেন। বিধাতা যে ভারতবাসীর প্রতি কত বাম তা এই-সমস্ত নূতন নূতন কেরানিগিরি ডেপুটিগিরিতে প্রমাণ করছে। এই গিরি উত্তীর্ণ হয়ে কল্যাণের সমুদ্রযাত্রায় আমাদের পদে পদে নিষেধ আসছে। আমাদের শিক্ষার মধ্যে এমন একটি সম্পদ্ থাকা চাই যা কেবল আমাদের তথ্য দেয় না, সত্য দেয়; যা কেবল ইন্ধন দেয় না, অগ্নি দেয়। এই তো গেল উপরের দিকের কথা।

তার পরে মাটির কথা, যে মাটিতে আমরা জন্মেছি। এই হচ্ছে সেই গ্রামের মাটি, যে আমাদের মা, আমাদের ধাত্রী, প্রতিদিন যার কোলে আমাদের দেশ জন্মগ্রহণ করছে। আমাদের শিক্ষিত লোকদের মন মাটি থেকে দূরে দূরে ভাবের আকাশে উড়ে

বেড়াচ্ছে— বর্ষণের যোগের বান্না তবে এই মাটির সঙ্গে আমাদের মিলন সার্থক হবে। যদি কেবল হাওয়ায় এবং বাষ্পে সমস্ত আয়োজন ঘুরে বেড়ায় তবে নূতন যুগের নববর্ষা বৃথা এল। বর্ষণ যে হচ্ছে না তা নয়, কিন্তু মাটিতে চাষ দেওয়া হয় নি। ভাবের রসধারা যেখানে গ্রহণ করতে পারলে ফসল ফলবে, সে দিকে এখনো কারো দৃষ্টি পড়ছে না। সমস্ত দেশের ধূসর মাটি, এই শুষ্ক তপ্ত দগ্ধ মাটি, তৃষ্ণায় চৌচির হয়ে ফেটে গিয়ে কেঁদে ঊর্ধ্বপানে তাকিয়ে বলছে, 'তোমাদের ঐ যা-কিছু ভাবের সমারোহ, ঐ যা-কিছু জ্ঞানের সঞ্চয়, ও তো আমারই জন্যে— আমাকে দাও, আমাকে দাও। সমস্ত নেবার জন্যে আমাকে প্রস্তুত করো। আমাকে যা দেবে তার শতগুণ ফল পাবে।' এই আমাদের মাটির উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস আজ আকাশে গিয়ে পৌঁচেছে, এবার সুবৃষ্টির দিন এল বলে, কিন্তু সেইসঙ্গে চাষের ব্যবস্থা চাই যে।

গ্রামের উন্নতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব আমার উপর এই ভার। অনেকে অন্তত মনে মনে আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'তুমি কে হে, শহরের পোষ্যপুত্র, গ্রামের খবর কী জান।' আমি কিন্তু এখানে বিনয় করতে পারব না। গ্রামের কোলে মানুষ হয়ে বাঁশবনের ছায়ায় কাউকে খুড়ো কাউকে দাদা বলে ডাকলেই যে গ্রামকে সম্পূর্ণ জানা যায় এ কথা সম্পূর্ণ মানতে পারি নে। কেবলমাত্র অলস নিশ্চেষ্ট জ্ঞান কোনো কাজের জিনিস নয়। কোনো উদ্দেশ্যের মধ্য দিয়ে জ্ঞানকে উত্তীর্ণ করে নিয়ে গেলে তবেই সে জ্ঞান যথার্থ অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়। আমি সেই রাস্তা দিয়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। তার পরিমাণ অল্প হতে পারে, কিন্তু তবুও সেটা অভিজ্ঞতা, সুতরাং তার মূল্য বহুপরিমাণ অলস জ্ঞানের চেয়েও বেশি।

আমার দেশ আপন শক্তিতে আপন কল্যাণের বিধান করবে এই কথাটা যখন কিছুদিন উচ্চৈঃস্বরে আলোচনা করা গেল তখন বুঝলুম কথাটা যাঁরা মানছেন তাঁরা স্বীকার করার বেশি আর কিছু করবেন না, আর যাঁরা মানছেন না তাঁরা উদ্যম-সহকারে যা-কিছু করবেন সেটা কেবল আমার সম্বন্ধে, দেশের সম্বন্ধে নয়। এইজন্য দায়ে পড়ে নিজের সকলপ্রকার অযোগ্যতা সত্ত্বেও কাজে নামতে হল। যাতে কয়েকটি গ্রাম নিজের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক উন্নতি প্রভৃতির ভার সমবেত চেষ্টায় নিজেরা গ্রহণ করে আমি সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলুম। দুই-একটি শিক্ষিত ভদ্রলোককে ডেকে বললুম, 'তোমাদের কোনো দুঃসাহসিক কাজ করতে হবে না— একটি গ্রামকে বিনা যুদ্ধে দখল করো।' এজন্য আমি সকলপ্রকার সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলুম এবং সৎপরামর্শ দেবারও ত্রুটি করি নি। কিন্তু আমি কৃতকার্য হতে পারি নি।

তার প্রধান কারণ, শিক্ষিত লোকের মনে অশিক্ষিত জনসাধারণের প্রতি একটা

অস্থিমজ্জাগত অবজ্ঞা আছে। যথার্থ শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর গ্রামবাসীদের সংসর্গ করা তাদের পক্ষে কঠিন। আমরা ভদ্রলোক, সেই ভদ্রলোকদের সমস্ত দাবি আমরা নীচের লোকদের কাছ থেকে আদায় করব, এ কথা আমরা ভুলতে পারি নে। আমরা তাদের হিত করতে এসেছি, এটাকে তারা পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করে এক মুহূর্তে আমাদের পদানত হবে, আমরা যা বলব তাই মাথায় করে নেবে, এ আমরা প্রত্যাশা করি। কিন্তু ঘটে উল্টো। গ্রামের চাষীরা ভদ্রলোকদের বিশ্বাস করে না। তারা তাদের আবির্ভাবকে উৎপাত এবং তাদের মতলবকে মন্দ বলে গোড়াতেই ধরে নেয়। দোষ দেওয়া যায় না, কারণ, যারা উপরে থাকে তারা অকারণে উপকার করবার জন্যে নীচে নেমে আসে এমন ঘটনা তারা সর্বদা দেখে না— উল্টোটাই দেখতে পায়। তাই, যাদের বুদ্ধি কম তারা বুদ্ধিমানকে ভয় করে। গোড়াকার এই অবিশ্বাসকে এই বাধাকে নম্রভাবে স্বীকার করে নিয়ে যারা কাজ করতে পারে, তারাই এ কাজের যোগ্য। নিম্নশ্রেণীর অকৃতজ্ঞতা অশ্রদ্ধাকে বহন করেও আপনাকে তাদের কাজে উৎসর্গ করতে পারে, এমন লোক আমাদের দেশে অল্প আছে। কারণ নীচের কাছ থেকে সকলপ্রকারে সম্মান ও বাধ্যতা দাবি করা আমাদের চিরদিনের অভ্যাস।

আমি যাঁদের প্রতি নির্ভর করেছিলুম তাঁদের দ্বারা কিছু হয় নি, কখনো কখনো বরঞ্চ উৎপাতই হয়েছে। আমি নিজে সশরীরে এ কাজের মধ্যে প্রবেশ করতে পারি নি, কারণ আমি আমার অযোগ্যতা জানি। আমার মনে এদের প্রতি অবজ্ঞা নেই, কিন্তু আমার আজন্মকালের শিক্ষা ও অভ্যাস আমার প্রতিকূল।

যাই হোক, আমি পারি নি তার কারণ আমাতেই বর্তমান, কিন্তু পারবার বাধা একান্ত নয়। এবং আমাদের পারতেই হবে। প্রথম ঝোঁকে আমাদের মনে হয় 'আমিই সব করব'। রোগীকে আমি সেবা করব, যার অন্ন নেই তাকে খাওয়াব, যার জল নেই তাকে জল দেব। একে বলে পুণ্যকর্ম, এতে লাভ আমারই। এতে অপর পক্ষের সম্পূর্ণ লাভ নেই, বরঞ্চ ক্ষতি আছে। তা ছাড়া, আমি ভালো কাজ করব এ দিকে লক্ষ না করে যদি ভালো করব এই দিকেই লক্ষ করতে হয় তা হলে স্বীকার করতেই হবে, বাইরে থেকে একটি একটি করে উপকার করে আমরা দুঃখের ভার লাঘব করতে পারি নে। এইজন্যে উপকার করব না, উপকার ঘটাব, এইটেই আমাদের লক্ষ্য হওয়া চাই। যার অভাব আছে তার অভাব মোচন করে শেষ করতে পারব না, বরঞ্চ বাড়িয়ে তুলব, কিন্তু তার অভাবমোচনের শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে।

আমি যে গ্রামের কাজে হাত দিয়েছিলুম সেখানে জলের অভাবে গ্রামে অগ্নিকাণ্ড

হলে গ্রাম রক্ষা করা কঠিন হয়। অথচ বারবার শিক্ষা পেয়েও তারা গ্রামে সামান্য একটা কুয়ো খুঁড়তেও চেষ্টা করে নি। আমি বললুম, 'তোরা যদি কুয়ো খুঁড়িস তা হলে বাঁধিয়ে দেবার খরচ আমি দেব।' তারা বললে, 'এ কি মাছের তেলে মাছ ভাজা ?'

এ কথা বলবার একটু মানে আছে। আমাদের দেশে পুণ্যের লোভ দেখিয়ে জলদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অতএব যে লোক জলাশয় দেয় গরজ একমাত্র তারই। এইজন্যেই যখন গ্রামের লোক বললে 'মাছের তেলে মাছ ভাজা' তখন তারা এই কথাই জানত যে, এ ক্ষেত্রে যে মাছটা ভাজা হবার প্রস্তাব হচ্ছে সেটা আমারই পারত্রিক ভোজের, অতএব এটার তেল যদি তারা জোগায় তবে তাদের ঠকা হল। এই কারণেই বছরে বছরে তাদের ঘর জ্বলে যাচ্ছে, তাদের মেয়েরা প্রতিদিন তিন বেলা দু-তিন মাইল দূর থেকে জল বয়ে আনছে, কিন্তু তারা আজ পর্যন্ত বসে আছে যার পুণ্যের গরজ সে এসে তাদের জল দিয়ে যাবে।

যেমন ব্রাহ্মণের দারিদ্র্য-মোচনের দ্বারা অন্যের পারলৌকিক স্বার্থসাধন যদি হয়, তবে সমাজে ব্রাহ্মণের দারিদ্র্যের মূল্য অনেক বেড়ে যায়। তেমনি সমাজে জল বলো, অন্ন বলো, বিদ্যা বলো, স্বাস্থ্য বলো, যে-কোনো অভাব-মোচনের দ্বারা ব্যক্তিগত পুণ্যসঞ্চয় হয়, সে অভাব নিজের দৈন্যে নিজে লজ্জিত হয় না, এমন-কি, তার এক-প্রকার অহংকার থাকে। সেই অহংকার ক্ষুব্ধ হওয়াতেই মানুষ বলে ওঠে, এ কি মাছের তেলে মাছ ভাজা!

এতদিন এমনি করে একরকম চলে এসেছিল। কিন্তু এখন আর চলবে না। তার দুটো কারণ দেখা যাচ্ছে। প্রথমত বিষয়বুদ্ধিটা আজকাল ইহলোকেই আবদ্ধ হয়ে উঠছে, পারলৌকিক বিষয়বুদ্ধি অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে এখন অন্তঃপুরের দুই-একটা কোণে মেয়েমহলে স্থান নিয়েছে। পরকালের ভোগসুখের বিশেষ একটা উপায়রূপে পুণ্যকে এখন অল্প লোকেই বিশ্বাস করে। তার পরে দ্বিতীয় কারণ এই, যারা নিজেদের ইহকালের সুবিধা উপলক্ষেও পল্লীর শ্রীবৃদ্ধিসাধন করতে পারত তারা এখন শহরে শহরে দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ছে। কৃতী শহরে যায় কাজ করতে, ধনী শহরে যায় ভোগ করতে, জ্ঞানী শহরে যায় জ্ঞানের চর্চা করতে, রোগী শহরে যায় চিকিৎসা করাতে। এটা ভালো কি মন্দ সে তর্ক করা মিথ্যা— এতে ক্ষতিই হোক আর যাই হোক এ অনিবার্য। অতএব যারা নিজের পরকাল বা ইহকালের গরজে পল্লীর হিত করতে পারত তারা অধিকাংশই পল্লী ছেড়ে অন্যত্র যাবেই।

*এমন অবস্থায় সভা ডেকে নাম সই করে একটা কৃত্রিম হিতৈষিতা-বৃত্তির উপর বরাত দিয়ে আমরা যে পল্লীর উপকার করব এমন আশা যেন না করি। আজ এই

কথা পল্লীকে বুঝতেই হবে যে, তোমাদের অন্নদান জলদান বিদ্যাদান স্বাস্থ্যদান কেউ করবে না। ভিক্ষার উপরে তোমাদের কল্যাণ নির্ভর করবে এতবড়ো অভিশাপ তোমাদের উপর যেন না থাকে। আজ গ্রামে পথ নেই, জল শুকিয়েছে, মন্দির ভেঙে গেছে, যাত্রা গান সমস্ত বন্ধ, তার একমাত্র কারণ এতদিন যে লোক দেবে এবং যে লোক নেবে এই দুই ভাগে গ্রাম বিভক্ত ছিল। এক দল আশ্রয় দিয়ে খ্যাতি ও পুণ্য পেয়েছে, আর-এক দল আশ্রয় নিয়ে অনায়াসে আরাম পেয়েছে। তাতে তারা অপমান বোধ করে নি, কারণ তারা জানত এতে অপর পক্ষেরই লাভ পরিমাণে অনেক বেশি। কারণ মর্তে যে ওজনে দান করি স্বর্গে তার চেয়ে অনেক বড়ো ওজনে প্রতিদান প্রত্যাশা করি। এখন, যখন সেই অপর পক্ষের পারত্রিক লাভের খাতা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে, এবং যখন তারা নিজে গ্রামে বাস করলে নিজের গরজে জল বিদ্যা স্বাস্থ্যের যে ব্যবস্থা করতে বাধ্য হত তাও উঠে গেছে, তখন আত্মহিতের জন্য গ্রামের আত্মশক্তির উদ্‌বোধন ছাড়া তাকে কোনোমতেই কোনো দয়ার বা কোনো বাহ্যব্যবস্থায় বাঁচানো যেতেই পারে না। আজ আমাদের পল্লীগ্রামগুলি নিঃসহায় হয়েছে, এইজন্য আজই তাদের সত্য সহায় লাভ করবার দিন এসেছে। আমরা যেন পুনর্বার তাতে বাধা দিতে না বসি। আমরা যেন হঠাৎ সেবা করবার একটা সাময়িক উত্তেজনা নিয়ে সেবার দ্বারা আবার তাদের দুর্বলতা বাড়িয়ে তুলতে না থাকি।

দুর্বলতা যে কিরকম মজ্জাগত তার একটা দৃষ্টান্ত দিই। আমি আমাদের শান্তিনিকেতন আশ্রম থেকে কিছু দূরে এক জায়গায় একলা বাস করছিলুম। হঠাৎ রাত্রে আমাদের বিদ্যালয়ের কয়েকজন ছেলে লাঠি হাতে আমার কাছে এসে উপস্থিত। তাদের জিজ্ঞাসা করাতে বললে, একটা ডাকাতির গুজব শোনা গেছে, তাই তারা আমাকে রক্ষা করতে এসেছে। পরে শোনা গেল ব্যাপারখানা এই— কোনো ধনীর এক পেয়াদা তরলাবস্থায় রাত্রে পথ দিয়ে চলছিল, চৌকিদারের অবস্থাও সেইরূপ ছিল। সে অপর লোকটাকে চোর বলে ধরাতে একটা মারামারি বাধে। দু-চার জন লোক যোগ দেয় অথবা গোলমাল করে। অমনি বোলপুর শহরে রটে গেল যে, পাঁচশো ডাকাত বাজার লুঠ করতে আসছে। বোলপুরে কেউ-বা দরজায় কুলুপ এঁটে দিলে, কেউ-বা টাকাকড়ি নিয়ে মাঠের মধ্যে গিয়ে লুকোলো, কেউ-বা শান্তিনিকেতনে সস্ত্রীক এসে আশ্রয় নিলে। অথচ শান্তিনিকেতনের ছেলেরা সেই রাত্রে লাঠি হাতে করে বোলপুরে ছুটল। এর কারণ এই, বোলপুরের লোক নিজের শক্তিকে অনুভব করে না। এইজন্য সামান্য দুই-চার জন মানুষ মিথ্যা ভয় দেখিয়ে সমস্ত

বোলপুর লণ্ডভণ্ড করে যেতে পারত। শান্তিনিকেতনের বালকদের শক্তি তাদের বাহুতে নয়, তাদের অন্তরে।

বোলপুর বাজারে যখন আগুন লাগল তখন কেউ যে কারো সাহায্য করবে তার চেষ্টা পর্যন্ত দেখা গেল না। এক ক্রোশ দূর থেকে আশ্রমের ছেলেরা যখন তাদের আগুন নিবিয়ে দিলে, তখন নিজের কলসিটা পর্যন্ত দিয়ে কেউ তাদের সাহায্য করে নি, সে কলসি তাদের জোর করে কেড়ে নিতে হয়েছিল। এর কারণ, পুণ্য আমরা বুঝি, এমন-কি, গ্রাম্য আত্মীয়তার ভাবও আমাদের বেশি কম থাকতে পারে, কিন্তু সাধারণ হিত আমরা বুঝি নে এবং এইটে বুঝি নে যে সকলের শক্তির মধ্যে আমার নিজের অজের শক্তি আছে।

আমার প্রস্তাব এই যে, বাংলাদেশের যেখানে হোক একটি গ্রাম আমরা হাতে নিয়ে তাকে আত্মশাসনের শক্তিতে সম্পূর্ণ উদ্‌বোধিত করে তুলি। সে গ্রামের রাস্তা-ঘাট, তার ঘরবাড়ির পারিপাট্য, তার পাঠশালা, তার সাহিত্যচর্চা ও আমোদ-প্রমোদ, তার রোগীপরিচর্যা ও চিকিৎসা, তার বিবাদনিষ্পত্তি প্রভৃতি সমস্ত কার্যভার সুবিহিত নিয়মে গ্রামবাসীদের দ্বারা সাধন করাবার উদ্যোগ আমরা করি। যাঁরা এ কাজে প্রবৃত্ত হবেন তাঁদের প্রস্তুত করবার জন্যে আপাতত কলকাতায় একটা নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা আবশ্যক। এই বিদ্যালয়ে স্বেচ্ছাব্রতী শিক্ষকদের দ্বারা প্রজাস্বত্বসম্বন্ধীয় আইন, জমি-জরিপ ও রাস্তাঘাট ড্রেনপুকুর ঘরবাড়ি তৈরি, হঠাৎ কোনো সাংঘাতিক আঘাত প্রভৃতির উপস্থিতমত চিকিৎসা ও কৃষিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে মোটামুটি শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকা কর্তব্য। পাশ্চাত্য দেশে গ্রাম প্রভৃতির আর্থিক ও অন্যান্য উন্নতি সম্বন্ধে আজকাল যে-সব চেষ্টার উদয় হয়েছে সে সম্বন্ধে সকলপ্রকার সংবাদ এই বিদ্যালয়ে সংগ্রহ করা দরকার হবে। পল্লীগ্রামে নানা স্থানেই দাতব্য চিকিৎসালয় এবং মাইনর ও এন্‌ট্রেন্স্‌ স্কুল আছে। যাঁরা পল্লীগঠনের ভার গ্রহণ করবেন তাঁরা যদি এইরকম একটা কাজ নিয়ে পল্লীর চিত্ত ক্রমে উদ্‌বোধিত করার চেষ্টা করেন তবে তাঁরা সহজেই ফললাভ করতে পারবেন এই আমার বিশ্বাস। অকস্মাৎ অকারণে পল্লীর হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশলাভ করা দুঃসাধ্য। ডাক্তার এবং শিক্ষকের পক্ষে গ্রামের লোকের সঙ্গে যথার্থভাবে ঘনিষ্ঠতা করা সহজ। তাঁরা যদি ব্যবসায়ের সঙ্গে লোকহিতকে মিলিত করতে পারেন, তবে পল্লী সম্বন্ধে যে সমস্ত সমস্যা আছে তার সহজ মীমাংসা হয়ে যাবে। এই মহৎ উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে একদল যুবক প্রস্তুত হতে থাকুন, তাঁদের প্রতি এই আমার অনুরোধ।

২৮ মার্চ ১৯১৫ বৈশাখ ১৩২২

ভূমিলক্ষ্মী

মাতার কাছে ছোটো ছেলে যেমন আবদার করে, মাটির কাছে আমরা তেমনি বরাবর আবদার করিয়া আসিয়াছি। কত হাজার বছর ধরিয়া এই মাটি আমাদের দাবি মিটাইয়া আসিয়াছে। আর যাহাই হউক আমরা কখনো অন্নের অভাব অনুভব করি নাই, কিন্তু আজকাল যেন আমাদের সেই অন্নের অভাব ঘটিয়াছে। মাটি আমাদের এখনকার দিনের সকল আবদার মিটাইতে পারিল না বলিয়া মাটির উপরে আমাদের অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে।

কিছুকাল হইল বোলপুরের কাছে এক গ্রামে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। এক চাষী-গৃহস্থের বাড়িতে যাইতেই সে আমাদিগকে বসিবার আসন দিল। নানা কথার পরে সে অনুরোধ করিল যে, অন্তত তাহার একটি ছেলেকে আমাদের বিদ্যালয়ে চাকরি দিতে হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমার তো চাষের কাজ আছে, তবে অমন জোয়ান ছেলেকে সাত-আট টাকা মাহিনায় অন্য কাজে কেন পাঠাইতে চাও।' সে বলিল, 'হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, চাষে আমাদের কুলায় না। একদিন ছিল যখন ইহাতেই আমাদের অভাব স্বচ্ছন্দে মিটিত, কিন্তু এখন সেদিন গিয়াছে।'

ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে চাষী ঠিকমত করিয়া বুঝাইয়া বলিতে পারিত না। কিন্তু আসল কথা, একদিন এমন ছিল যখন খাদ্য যেখানে উৎপন্ন হইত সেইখানকার প্রয়োজনেই তাহার খরচ হইত। তখন দেশে রেলের রাস্তা খোলে নাই। গোরুর গাড়ি এবং নৌকার যোগে বেশি পরিমাণ ফসল বেশি দূরে সহজে যাইতে পারিত না। তার পরে পৃথিবীর দেশ-বিদেশের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যের সম্বন্ধ এমন বহুবিস্তৃত ছিল না, সুতরাং তখন মাল-চালানের পথও ছিল সংকীর্ণ, মাল কিনিবার লোকও ছিল অল্প। তাই মাটির কাছে আমাদের দাবি বেশি ছিল না, আর সেই দাবি মিটাইবার আয়োজনও সহজ ছিল। তখন চাষ চলিত না এমন বিস্তর জমি দেশে পড়িয়া থাকিত। আমারই বয়সে দেখিয়াছি— একদিন যে জমি চাষীকে গছাইয়া দিলে সে সেটাকে অত্যাচার মনে করিত, এখন সেই জমি দাম দিয়া মেলে না। তখন দুর্ভিক্ষের দিনে চাষী আপন জমিজমা ফেলিয়া অনায়াসে চলিয়া যাইত, প্রজা পত্তন করা কঠিন হইত। এখন চাষী প্রাণপণে জমি আঁকড়িয়া থাকে, কেমনা জমির দাম বিস্তর বাড়িয়া গিয়াছে।

অথচ চাষী বলিতেছে, জমিতে তাহার অভাব মিটে না। তাহার একটা মস্ত কারণ এই যে, চাষীর অভাব অনেক বাড়িয়া গেছে। ছাতা জুতা কাপড় আসবাব

তাহার দ্বারের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, বুঝিয়াছে সেগুলি নইলে নয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশ-বিদেশের খরিদ্দার আসিয়া তাহার দ্বারে ঘা দিয়াছে। তাহার ফসল জাহাজ বোঝাই হইয়া সমুদ্রপারে চলিয়া যাইতেছে। তাই, দেশে চাষের জমি পড়িয়া থাকা অসম্ভব হইয়াছে, অথচ সমস্ত জমি চষিয়াও সমস্ত প্রয়োজন মিটিতেছে না।

জমিও পড়িয়া রহিল না, ফসলেরও দর বাড়িয়া চলিল, অথচ সম্বৎসর দুইবেলা পেট ভরিবার মতো খাবার জোটে না, আর চাষী ঋণে ডুবিয়া থাকে, ইহার কারণ কী ভাবিয়া দেখিতে হইবে। এমন কেন হয়— যখনি দুর্বৎসর আসে অমনি দেখা যায় কাহারো ঘরে উদ্‌বৃত্ত কিছুই নাই। কেন এক ফসল নষ্ট হইলেই আর-এক ফসল না ওঠা পর্যন্ত হাহাকারের অন্ত থাকে না।

এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, যখন মাটির উপরে আমাদের দাবি সামান্য ছিল, যখন অল্প ফসল পাইলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হইত, তখনো যে নিয়মে চাষবাস চলিত এখনো সেই নিয়মেই চলিতেছে— প্রয়োজন অনেক বেশি হইয়াছে, অথচ প্রণালী সমানই আছে। জমি যখন বিস্তর পড়িয়া থাকিত তখন একই জমিতে প্রতি বৎসরে চাষ দিবার দরকার ছিল না, জমি বদল করিয়া জমির তেজ অক্ষুণ্ণ রাখা সহজ ছিল। এখন কোনো জমি পড়িয়া থাকিতে পায় না। অথচ চাষের প্রণালী যেমন ছিল তেমনই আছে।

চাষের গোরু সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই খাটে। যখন দেশে পোড়ো জমির অভাব ছিল না, তখন চরিয়া খাইয়া গোরু সহজেই সুস্থ সবল থাকিত। আজ প্রায় সকল জমি চষিয়া ফেলা হইল; রাস্তার পাশে, আলের উপরে, যেটুকু ঘাস জন্মে সেইটুকু মাত্র গোরুর ভাগ্যে জোটে, অথচ তাহার আহারের বরাদ্দ পূর্বাপর প্রায় সমানই আছে। ইহাতে জমিও নিস্তেজ হইতেছে, গোরুও নিস্তেজ হইতেছে এবং গোরুর কাছ হইতে যে সার পাওয়া যায় তাহাও নিস্তেজ হইতেছে।

মনে করো কোনো গৃহস্থের যদি গৃহস্থালির প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় চাল-ডালের বাঁধা বরাদ্দ অনেক দিন হইতে ঠিক সমানভাবে চলিয়া আসে, অথচ ইতিমধ্যে বৎসরে বৎসরে পরিবারের জনসংখ্যা বাড়িয়া চলে, তবে পূর্বে ঠাকুরদাদা এবং ঠাকুরুনদিদি যেমন হৃষ্টপুষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের নাতি-নাতনিদের তেমন চেহারা আর থাকিবে না, ইহাদের হাড় বাহির হইয়া যাইবে, বাড়িবার মধ্যে লিভার পিলে বাড়িয়া উঠিবে। তখন দৈবকে কিম্বা কলিকালকে দোষ দিলে চলিবে কেন। ভাঁড়ার হইতে চাল-ডাল আরো বেশি বাহির করিতে হইবে।

আমাদের চাষী বলে, মাটি হইতে বাপদাদার আমল ধরিয়া যাহা পাইয়া

আসিতেছি তাহার বেশি পাইব কী করিয়া। এ কথা চাষীর মুখে শোভা পায়, পূর্বপ্রথা অনুসরণ করিয়া চলাই তাহাদের শিক্ষা। কিন্তু এমন কথা বলিয়া আমরা নিষ্কৃতি পাইব না। এই মাটিকে এখনকার প্রয়োজন-অনুসারে বেশি করিয়া ফলাইতে হইবে— নহিলে আধপেটা খাইয়া, জ্বরে অজীর্ণরোগে মরিতে কিম্বা জীবন্মৃত হইয়া থাকিতে হইবে।

এই মাটির উপরে মন এবং বুদ্ধি খরচ করিলে এই মাটি হইতে যে আমাদের দেশের মোট চাষের ফসলের চেয়ে অনেক বেশি আদায় করা যায় তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। আজকাল চাষকে মূর্খের কাজ বলা চলে না, চাষের বিদ্যা এখন মস্ত বিদ্যা হইয়া উঠিয়াছে। বড়ো বড়ো কলেজে এই বিদ্যার আলোচনা চলিতেছে, সেই আলোচনার ফলে ফসলের এত উন্নতি হইতেছে যে তাহা আমরা কল্পনা করিতে পারি না।

তাই বলিতেছি, গ্রামটুকুকে ফসল জোগান দিতাম যে প্রণালীতে, সমস্ত পৃথিবীকে ফসল জোগান দিতে হইলে সে প্রণালী খাটিবে না। কেহ কেহ এমন কথা মনে করেন যে, আগেকার মতন ফসল নিজের প্রয়োজনের জন্যই খাটানো ভালো, ইহা বাহিরে চালান দেওয়া উচিত নহে। সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে ব্যবহার বন্ধ করিয়া, একঘরে হইয়া দুই বেলা দুই মুঠা ভাত বেশি করিয়া খাইয়া নিদ্রা দিলেই তো আমাদের চলিবে না। সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে দেনাপাওনা করিয়া তবে আমরা মানুষ হইতে পারিব। যে জাতি তাহা না করিবে বর্তমান কালে সে টিঁকিতে পারিবে না। আমাদের ধনধান্য, ধর্মকর্ম, জ্ঞানধ্যান সমস্তই আজ বিশ্বপৃথিবীর সঙ্গে যোগসাধনের উপযোগী করিতেই হইবে; যাহা কেবলমাত্র আমাদের নিজের ঘরে নিজের গ্রামে চলিবে তাহা চলিবেই না। সমস্ত পৃথিবী আমাদের দ্বারে আসিয়া হাঁক দিয়াছে, অয়মহং ভোঃ! তাহাতে সাড়া না দিলে শাপ লাগিবে, কেহ আমাদিগকে বাঁচাইতে পারিবে না। প্রাচীনকালের গ্রাম্যতার গণ্ডীর মধ্যে আর আমাদের ফিরিবার রাস্তা নাই।

তাই আমাদের দেশের চাষের ক্ষেত্রের উপরে সমস্ত পৃথিবীর জ্ঞানের আলো ফেলিবার দিন আসিয়াছে। আজ শুধু একলা চাষীর চাষ করিবার দিন নাই, আজ তাহার সঙ্গে বিদ্বানকে, বৈজ্ঞানিককে যোগ দিতে হইবে। আজ শুধু চাষীর লাঙলের ফলার সঙ্গে আমাদের দেশের মাটির সংযোগ যথেষ্ট নয়— সমস্ত দেশের বুদ্ধির সঙ্গে, বিদ্যার সঙ্গে, অধ্যবসায়ের সঙ্গে, তাহার সংযোগ হওয়া চাই। এই কারণে বীরভূম জেলা হইতে এই যে 'ভূমিলক্ষ্মী' কাগজখানি বাহির হইয়াছে ইহাতে উৎসাহ

অনুভব করিতেছি। বস্তুত লক্ষ্মীর সঙ্গে সরস্বতীকে না মিলাইয়া দিলে আজকালকার দিনে কৃষিলক্ষ্মীর যথার্থ সাধনা হইতে পারিবে না। এইজন্য যাঁহারা এই পত্রিকার উদ্যোগী তাঁহাদিগকে আমার অভিনন্দন জানাইতেছি এবং এই কামনা করিতেছি তাঁহাদের এই শুভ দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের জেলায় জেলায় ব্যাপ্ত হইয়া দেশের কৃষিক্ষেত্র এবং চিত্তক্ষেত্রকে এককালে সফল করিয়া তুলুক।

আশ্বিন ১৩২৫

শ্রীনিকেতন

সাংবৎসরিক উৎসবোপলক্ষে কথিত

'বসন্তের বাণী অরণ্যের সব জায়গাতেই প্রবাহিত হচ্ছে দক্ষিণ সমীরণে; হয়তো কোনো গাছ নির্জীব, এই আহ্বানের সে জবাব দিলে না— সে তার পত্রপুষ্প বিকশিত করলে না, সে মূর্ছিত হয়েই রইল। যে গাছের অন্তরে রসের ধারা আছে, বসন্তের রস-উৎসবের নিমন্ত্রণে সে পত্রপুষ্পে বিকশিত হয়ে ওঠে। বিশ্বপ্রাণের আহ্বানে যখন বিশেষ প্রাণের মধ্যে তরঙ্গ ওঠে তখনই তো উৎসব।

আমাদের দেশেও নিয়ত ডাক পড়ছে, দৈববাণী আকাশে বাতাসে নিয়তই নিশ্বসিত। যেখানে সে বাণী সাড়া পায়, প্রাণ জেগে ওঠে, সেখানেই আমাদের উৎসবক্ষেত্র রচিত হয়, সৃষ্টিকার্যের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিত্ত আপনাকে উপলব্ধি করতে থাকে।

আমাদের শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে একদিন এই আহ্বানধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়েছে। সেই আহ্বানকে যে পরিমাণে স্বীকার করা হয়েছে সেই পরিমাণে আমাদের সকলকে উপলক্ষ করে একটি সৃষ্টির সূচনা হল। কোথায় যে তার শেষ তা কেউ বলতে পারে না। সূর্যকিরণসম্পাতে পর্বতশিখরে নিশ্চল কঠিন তুষার যেদিন গলে যায়, সেদিনকার স্রোতের ধারা যে কোন্ কোন্ দেশকে ফলশালী করে সাগরে গিয়ে পৌঁছবে সেদিন তা কেউ নিশ্চিত জানে না। কিন্তু গতি যেই সঞ্চারিত হয় অমনি সে তার আপন বেগে আপনার ভাগ্যকে বহন করে চলে। কত বিচিত্র শাখায় যে তার পরিণতি হবে সে তার অগোচর, এইটুকুতেই তার সার্থকতা যে তার রুদ্ধ শক্তি মুক্তি পেয়েছে। সেই মুক্তির একটি রূপ আমাদের এই প্রান্তরে একদা দেখা দিয়েছিল। এখানে একদিন আমরা কোনো-একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানের পত্তন করেছিলাম, তাই নিয়ে আত্মাভিমানের

ছোটো কথাটি আজকের কথা নয়। আমাদের আনন্দ হচ্ছে এই যে, এইখানে পরম ইচ্ছার সঙ্গে আমাদের ইচ্ছার মিলন হবার চেষ্টা জেগেছে; সেই মিলনসাধনের তপোভূমি প্রস্তুত।

আজ তপস্যার দীক্ষাগ্রহণের স্মরণের দিন। আজ মনকে নম্র করো, আপনার মধ্যে যে দীনতা রয়েছে তার বন্ধন ছিন্ন করো— আনন্দে এবং গৌরবে। আজকে বিচার করে দেখতে হবে, যে কাজের ভার নিয়েছি তার প্রকৃতি কী। আমাদের উদ্‌বৃত্তটুকু নিয়ে আমরা দাতাবৃত্তি করতে চাই নি। দেশের মধ্যে যে প্রাণশক্তি মূর্ছিত হয়ে পড়েছে তাকে সতেজ করবার সংকল্প আমাদের। এই প্রাণের দৈন্যই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো অপমান— বাইরের অপমান তারই আনুষঙ্গিক।

পশ্চিম মহাদেশে আমরা দেখেছি যে, সেখানে মানুষ বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রে আপন শক্তিকে সংহত করে। প্রধানত সেখানকার শহরগুলিই তার প্রাণের আধার। কিন্তু আমাদের প্রাচ্য দেশে, বিশেষ করে ভারতবর্ষে ও চীনে, প্রাণ পরিব্যাপ্ত হয়ে ছিল গ্রামে গ্রামে সকল দেশে। সামাজিক দায়িত্ববোধের স্বতশ্চেষ্ট স্নায়ুজাল সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ছিল। কিন্তু আমাদের কোন্‌ ভাগ্যদোষে সমাজের সেই ব্যাপক ব্যবস্থার সূত্র ছিন্ন হয়ে গেল! রাজশক্তি আমাদের সেই সমাজশক্তির স্বাধীন স্ফূর্তিকে চার দিক থেকে নিরস্ত করে দিলে। তার প্রাণের প্রবাহ আপনার যে খাদে সহজে সঞ্চরণ করত, ব্যাবসা বাণিজ্য ও শাসনকার্যের সুবিধা করবার জন্যে তারই মাঝে মাঝে বাঁধ তুলে দিয়ে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিলে। এই বাঁধগুলিই হচ্ছে শহর। এ আমাদের দেশের প্রাণপ্রকৃতির মূলে ঘা দিয়েছে। শহরের সমারোহ আপন কৃত্রিম আলোর তীব্রতায় দেখতেই দিচ্ছে না, তার বাহিরে ঘন দুঃখের ছায়া কিরূপ অন্তহীন। অন্ন নেই, জল নেই, স্বাস্থ্য নেই, শিক্ষা নেই, আনন্দ নেই, আলোর পর আলো একে একে নিবল। যদি দেখতুম যা হারিয়েছি, শহরে তা বহুগুণিত আকারে ফিরে পেলুম, তা হলেও সান্ত্বনা থাকত। কিন্তু যা পাওয়া গেল সে তো কল-কারখানার জিনিস, আপিস-আদালতের জিনিস, বেচাকেনার জিনিস, সে তো স্বপ্রকাশ প্রাণের জিনিস নয়। তাতে সুবিধা আছে, কিন্তু শক্তির স্বকীয়তা নেই। দেশ সেখানে আপনাকে উপলব্ধি করে না— সেখানে যেটুকু মহিমা, সে তার নিজের মহিমা নয়। এই পরকীয়ের অভিসারে সে আপন কুল খোয়াতে বসেছে।

এ দুর্গতি কিসে দূর হবে।

ছোটো ছোটো আনুকূল্যের দ্বারা তো হবে না। বাইরের থেকে একটা একটা অভাবের তালিকা প্রস্তুত করে দেখা, সমস্তাকে খণ্ড করে দেখা। যে মূলের থেকে তারা সকল অভাব শাখায় প্রশাখায় ছড়াচ্ছে, সে হচ্ছে প্রতিহত চিত্তধারায় জড়তা।

মানুষের চিত্ত যেখানে সবল থাকে সেখানে সে আপনার নিহিতার্থকে আপন শক্তির যোগে উদ্‌বোধিত করে। তার থেকে সে যা-কিছু ফল পায়, সে ফল তত মূল্যবান নয় যেমন মূল্যবান তার এই সচেষ্ট আত্মশক্তির উপলব্ধি। এতেই তার সকলের চেয়ে বড়ো আনন্দ, কেননা মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো পরিচয় হচ্ছে, সে সৃষ্টিকর্তা। আমাদের এই আপন সৃষ্টিশক্তির মধ্যে আমরা বিশ্বস্রষ্টার স্পর্শ পাই। তার সঙ্গে সহযোগিতাতেই আমাদের গৌরব, আমাদের কল্যাণ। যেখানে সেই সহযোগিতার বিচ্ছেদ, সেইখানেই আমাদের যত-কিছু দুর্গতি। যেখানে বিশ্বসৃষ্টিতে আমাদের কাজের বিধান নেই, কেবল ভোগের বরাদ্দ, সেইখানে তো আমরা পশু। মানুষ আপন ভাগ্যকে আপনি গড়ে তোলে, সেই তার আপন জগৎ। আত্মকর্তৃত্বের, আত্মসৃষ্টির সেই জগৎ যদি হারিয়ে থাকি, তবে সবই হারিয়েছি। মানুষের মধ্যে যিনি ঈশ্বর আছেন তাঁর উদ্‌বোধন করতে হবে। আমরা এই গ্রামের দ্বারে এসে সেই দেবতাকে ডাকছি, অন্তরের মধ্যে রুদ্ধদ্বার হয়ে রয়েছেন বলে যাঁর পূজা হচ্ছে না। মানুষ জড়ের মতন হয়ে রয়েছে, শুষ্ক কাষ্ঠের মতন, যার ফল নেই, ফুল নেই। মনুষ্যত্বের এত বড়ো অবমাননা তো আর হতে পারে না।

প্রশ্নকারী বলতে পারেন, তেত্রিশ কোটির তোমরা কী করতে পার। কিন্তু বিধাতা তো তেত্রিশ কোটির ভার আমাদের হাতে দেন নি? তিনি শুধু একটি প্রশ্ন করেন, 'তুমি কী করছ। যে কার্যক্ষেত্র তোমার, সেখানে তুমি নিজেকে সত্য করেছ কি না।' তেত্রিশ কোটির কী করতে পারি, এ প্রশ্ন যাঁরা করেন তাঁরা সত্যকাজের পথকে রুদ্ধ করেন। দুঃসাধ্যসাধনের চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু অসাধ্যসাধনের চেষ্টা মূঢ়তা। যারা আমাদের চার দিকে রয়েছে তাদের মধ্যে যদি সত্যকার আগুন জ্বালতে পারি, তবে সে আগুন আপনি আপনার শিখার পতাকাকে বহন করে চলবে। আমাদের সাধনাকে যদি ছোটো জায়গায় সার্থক করে তুলি, তা হলে বিশ্বের বিধাতা স্বয়ং সেখানে আসেন, এই ক্ষুদ্র চেষ্টার মধ্যে তাঁর শক্তি দান করেন। সংখ্যায় আয়তনে বিশ্বাস কোরো না। সত্য ক্ষুদ্রায়তন হলেও দিগ্‌বিজয়ী। আপনার অন্তরের দীনতাকে দূর করো; তপস্যাকে সার্থক করে তোলো; তা হলে এ ক্ষুদ্র চেষ্টা দেশের সর্বত্র প্রসারিত হবে— শাখা থেকে প্রশাখায় বিস্তৃত হবে, বৃহৎ বনস্পতি হয়ে ছায়াদান করতে পারবে, ফলদান করতে পারবে।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

পল্লীপ্রকৃতি

মৌমাছি মৌচাক রচনা করলে, তার গোড়াকার কথাটা তাদের অন্নের ব্যবস্থা। ফুলে ফুলে কণা কণা মধু; কোনো ঋতু উদার, কোনো ঋতু কৃপণ, যে মৌমাছিরা দল বেঁধে সংগ্রহ আর দল বেঁধে সঞ্চয় করতে পারলে, মৌচাকে পত্তন হল তাদের লোকালয়। লোকালয় বলতে কেবলমাত্র অনেকে একত্র জমা হওয়ার গণিতরূপ নয়, ব্যবহারনীতি-দ্বারা এই একত্র জমা হওয়ার একটা কল্যাণরূপ।

অনেকে ভোগ করবার থেকে যেটা আরম্ভ হল অনেকে ত্যাগ করবার দিকে সেটা নিয়ে গেল। নিজের জন্য কাজ করার চেয়ে সকলের জন্যে কাজ করাটা হয়ে উঠল বড়ো, সকলের প্রাণযাত্রার মধ্যেই নিজের প্রাণের সার্থকতা বোধ জন্মাল— এরই থেকে বর্তমান কালকে ছাড়িয়ে অনাগত কালকে সত্য বলে উপলব্ধি করা সম্ভব হল; যে দান নিজের আয়ু-কালের মধ্যে নিজের কাছে পৌঁছবে না, সে দানেও কৃপণতা রইল না; লোকালয় বলতে এমন একটি আশ্রয় বোঝাল যেখানে নিজের সঙ্গে পরের, বর্তমানের সঙ্গে ভাবীকালের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ প্রসারিত। এই হল অন্নব্রহ্মের তত্ত্ব, অর্থাৎ অন্ন যেই বৃহৎ হয়েছে অমনি সে স্থূলভাবে অন্নকে ছাড়িয়ে এমন-একটি সত্যকে প্রকাশ করেছে যা মহান। আদিমকালে পশুশিকার করে মানুষ জীবিকানির্বাহ করত, তাতে লোকালয় জমে উঠতে পারে নি। অনিশ্চিত অন্ন-আহরণের চেষ্টায় সকলে একা একা ঘুরে বেড়িয়েছে। তখন তাদের স্বভাব ছিল হিংস্র, দস্যুবৃত্তি ছিল ব্যবসায়, ব্যবহার ছিল অসামাজিক।

মানুষের অন্নব্যবস্থা সুনিশ্চিত ও প্রচুর হতে পেরেছে বড়ো বড়ো নদীর কূলে— যেমন নীলনদী, ইয়াংসিকিয়াং, অক্সাস, য়ুফ্রেটিস, গঙ্গা, যমুনা— সেইখানে জন্মেছে বড়ো বড়ো সভ্যতা, অর্থাৎ লোকালয়বন্ধনের সুব্যবস্থা। পলিমাটিতে কৃষিকর্ষণ করে মানুষ যখন একই জায়গায় বৎসরে বৎসরে প্রচুর ফসল ফলিয়ে তুললে তখনি অনেক লোক এক স্থানে স্থায়ীভাবে আবাস পত্তন করতে পারল— তখনি পরস্পরকে বঞ্চিত করার চেয়ে পরস্পরকে আনুকূল্য করায় মানুষ সফলতা দেখতে পেলে। একত্র মেলবার যে সামাজিক মনোবৃত্তি ভিতরে ভিতরে মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, অন্নসংস্থানের সুযোগের দ্বারা সেইটে জোর পেয়ে উঠল। মানুষ ক্ষুন্নিবৃত্তির ক্ষুধিমাতার নিমন্ত্রণ পেলে, একত্র সবাই পাত পেড়ে বসল, তখন পরস্পরের ভ্রাতৃত্বের সন্ধান মিলল, বহুপ্রাণ এক-অন্নের দ্বারা এক প্রাণের সম্বন্ধ স্বীকার করল। তখন দেখতে পেলে পরস্পরের যোগ কেবলমাত্র

সুযোগ নয়, তাতে আনন্দ। এই আনন্দে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিস্বীকার, এমন-কি, মৃত্যুস্বীকারও সম্ভবপর হয়।

পৃথিবী আমাদের যে অন্ন দিয়ে থাকে সেটা শুধু পেট ভরাবার নয়; সেটাতে আমাদের চোখ জুড়োয়, আমাদের মন ভোলে। আকাশ থেকে আকাশে সূর্যকিরণের যে স্বর্ণরাগ, দিগন্ত থেকে দিগন্তে পাকা ফসল-খেতে তারই সঙ্গে সুর মেলে এমন সোনার রাগিণী। সেই রূপ দেখে মানুষ কেবল ভোজনের কথাই ভাবে না; সে উৎসবের আয়োজন করে, সে দেখতে পায় লক্ষ্মীকে যিনি একই কালে সুন্দরী এবং কল্যাণী। ধরণীর অন্নভাণ্ডারে কেবল যে আমাদের ক্ষুধানিবৃত্তির আশা তা নয়, সেখানে আছে সৌন্দর্যের অমৃত। গাছের ফল আমাদেরকে ডাক দেয় শুধু পুষ্টিকর শস্তপিণ্ড দিয়ে নয়, রূপ রস বর্ণ গন্ধ দিয়ে। ছিনিয়ে নেবার হিংস্রতার ডাক এতে নেই, এতে আছে একত্র-নিমন্ত্রণের সৌহার্দ্যের ডাক। পৃথিবীর অন্ন যেমন সুন্দর, মানুষের সৌহার্দ্য তেমনি সুন্দর। একলা যে অন্ন খাই তাতে আছে পেট ভরানো, পাঁচজনে মিলে যে অন্ন খাই তাতে আছে আত্মীয়তা। এই আত্মীয়তার যজ্ঞক্ষেত্রে অন্নের থালি হয় সুন্দর, পরিবেশন হয় সুশোভন, পরিবেশ হয় সুপরিচ্ছন্ন।

দৈন্যে মানুষের দাক্ষিণ্য সংকুচিত করে, অথচ দাক্ষিণ্যেই সমাজের প্রতিষ্ঠা। তাই ধরণীর অন্নভাণ্ডারের প্রাঙ্গণেই বাঁধা হয়েছে মানুষের গ্রাম। মানুষের মধ্যে যা অমৃত তার প্রকাশ হল এই মিলন থেকে— তার ধর্মনীতি, সাহিত্য, সংগীত, শিল্পকলা, তার বিচিত্র আয়োজনপূর্ণ অনুষ্ঠান। এই মিলন থেকে মানুষ গভীরভাবে আত্মপরিচয় পেলে, আপন পরিপূর্ণতার রূপ তার কাছে দেখা দিল।

গ্রামের সঙ্গে সঙ্গে নগরেরও উদ্ভব। সেখানে রাষ্ট্রশাসনের শক্তি পুঞ্জীভূত; সেখানে সৈনিকের দুর্গ, বণিকের পণ্যশালা, বিদ্যাদান ও বিদ্যা-অর্জনের উদ্দেশে বহু স্থান থেকে এক স্থানে শিক্ষক ও ছাত্রের সমাবেশ, দূর পৃথিবীর সঙ্গে জানাশোনা দেনা-পাওনার যোগ। সেখানে মাটির বুকের 'পরে জগদ্দল পাথর, জীবিকা সেখানে কঠিন, শক্তির সঙ্গে শক্তির প্রতিযোগিতা। সেখানে সকল মানুষকে হার মানিয়ে একলা-মানুষ বড়ো হতে চাচ্ছে। বাড়াবাড়ি না হলে তারও ফল মন্দ নয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যদি অতিশয় চাপা পড়ে তা হলে ব্যক্তিগত শক্তির উৎকর্ষ ঘটে না। সমান-মাথা-ওয়ালা ঝোপগুলোর চাপে বনস্পতি বেঁটে হয়ে থাকে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অত্যাকাঙ্ক্ষা অগ্নিবাণের ঠেলায় জনসঙ্ঘের সাধারণ আশ্রয়ভূমিকে উঁচুর দিকে উৎক্ষিপ্ত করে, উৎকর্ষের আদর্শ বেড়ে ওঠে, পরস্পরের নকলে ও রেষারেষিতে মানুষের শক্তির চর্চা অত্যন্ত সচেষ্ট হয়ে থাকে, জ্ঞানের ও কর্মের ক্ষেত্রে নবনবোন্মেষ সম্ভবপর হয়, নানা দেশের নানা জাতির চিত্ত-

সমবায়ে বিস্তার আয়তন প্রশস্ত হয়ে ওঠে। শহরে, যেখানে সমাজের চাপ অতিঘনিষ্ঠ নয়, সেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সুযোগ পায়, মানসশক্তি একটা সাধারণ আদর্শের অচ্ছেদ্য সমতলতা ছাড়িয়ে উঠতে থাকে। এই কারণেই বুদ্ধির জড়তা ও সংকীর্ণতা সকল দেশেই সকল কালেই গ্রাম্যতার নামান্তর হয়ে আছে।

শহরে মানুষ আপন কর্মোদ্যমকে কেন্দ্রীভূত করে; তার প্রয়োজন আছে। আমাদের দেহে প্রাণশক্তি যেমন এক দিকে ব্যাপ্ত, তেমনি আবার এক এক জায়গায় তা বিশেষ ও বিচিত্র -ভাবে সংহত। নিম্নশ্রেণীর জীবদেহে এই মর্মস্থানগুলি সংহত হয়ে ওঠে নি। দেহবিকাশের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক ফুস্ফুস্ হৃৎপিণ্ড পাকযন্ত্র বিশেষ বিশেষ দেহ-ক্রিয়ার স্বতন্ত্র যন্ত্র হয়ে উঠল। এইগুলিকে শহরের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

শহরগুলি লোকালয়ের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনসাধনের কেন্দ্র, মানুষের উদ্যম এক এক স্থানে বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে সংহত হয়ে তাদের সৃষ্টি করেছে। পূর্বকালে ধনসৃষ্টি প্রভৃতির প্রয়োজন-সাধনে যন্ত্রের হাত ছিল অতি সামান্যই। তখনকার যন্ত্রগুলির সঙ্গে মানুষের শরীর-মনের যোগ সর্বক্ষণ অব্যবহিত ছিল। সেইজন্যে তার থেকে যা উৎপন্ন হতে পারত তা ছিল পরিমিত, আর তার মুনফা বিকট প্রকাণ্ড ছিল না। সুতরাং তখন পণ্যরচনায় কর্মশক্তির আনন্দটা ছিল প্রধান, কর্মফলের লোভটা তার চেয়ে খুব বড়ো হয়ে ওঠে নি। তাই তখনকার নগরগুলি মানুষের কীর্তির আনন্দরূপ গ্রহণ করতে পারত।

অন্যান্য সকল রিপুর মতোই লোভটা সমাজবিরোধী প্রবৃত্তি। এইজন্যেই মানুষ তাকে রিপু বলেছে। বাইরে থেকে ডাকাত যেমন লোকালয়ের রিপু, ভিতর থেকে লোভটা তেমনি। যতক্ষণ এই রিপু পরিমিত থাকে ততক্ষণ এতে করে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কর্মোদ্যম বাড়িয়ে তোলে, অথচ সমাজনীতিকে সেটা ছাপিয়ে যায় না। কিন্তু লোভের কারণটা যদি অত্যন্ত প্রবল ও তার চরিতার্থতার উপায় অত্যন্ত বিপুল শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তবে সমাজনীতি আর তাকে সহজে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। আধুনিক কালে যন্ত্রের সহযোগে কর্মের শক্তি যেমন বহুগুণিত, তেমনি তার লাভ বহু অঙ্কের, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তার লোভ। এতে করেই ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্গে সমাজস্বার্থের সামঞ্জস্য টলমল করে উঠছে। দেখতে দেখতে চারি দিকে কেবল লড়াই ব্যাপ্ত হয়ে চলেছে। এইরকম অবস্থায় গ্রামের সঙ্গে শহরের একান্নবর্তিতা চলে যায়, শহর গ্রামকে কেবল শোষণ করে, কিছু ফিরিয়ে দেয় না।

আজ গ্রামের আলো নিবল। শহরে কৃত্রিম আলো জ্বলল— সে আলোয় সূর্য চন্দ্র নক্ষত্রের সংগীত নেই। প্রতি সূর্যোদয়ে যে প্রণতি ছিল, সূর্যাস্তে যে আরতির প্রদীপ

জলত, সে আজ সুপ্ত, ম্লান। শুধু-যে জলাশয়ের জল শুকোলো তা নয়, হৃদয় শুকোলো। জীবনের আনন্দে মাঠের ফুলের মতো যে-সব নৃত্যগীত আপনি জেগে উঠত তারা জীর্ণ হয়ে ধুলায় মিলিয়ে গেল। প্রাণের ঔদার্য এতকাল আপনিই আপনার সহজ আনন্দের সুন্দর উপকরণ আপনিই সৃষ্টি করেছে— আজ সে গেল বোবা হয়ে, আজ তাকে কলে-তৈরি আমোদের আশ্রয় নিতে হচ্ছে— যতই নিচ্ছে ততই নিজের সৃষ্টিশক্তি আরো অসাড় হয়ে যাচ্ছে।

বেশি দিনের কথা নয়, নবাবি আমলে দেখা গেছে, তখনকার বড়ো বড়ো আমলা যাঁরা রাজদরবারে রাজধানীতে পুষ্ট, জন্মগ্রামের সমাজ-বন্ধনকে তাঁরা অনুরাগের সঙ্গে স্বীকার করেছেন। তাঁরা অর্জন করেছেন শহরে, ব্যয় করেছেন গ্রামে। মাটি থেকে জল একবার আকাশে গিয়ে আবার মাটিতেই ফিরে এসেছে— নইলে মাটি বন্ধ্যা মরু হয়ে যেত। আজকালকার দিনে গ্রামের থেকে যে প্রাণের ধারা শহরে চলে যাচ্ছে, গ্রামের সঙ্গে তার দেনা-পাওনার যোগ আর থাকছে না।

আজ ধূমকেতু উড়িয়ে কলের শৃঙ্গ বাজল, মানুষকে দলে দলে তার স্নিগ্ধ সমাজস্থিতি থেকে লোভ দেখিয়ে বের করে নিলে। মানুষ আবার ফিরল তার প্রথম আরম্ভের অবস্থায় — সেই আরণ্যক যুগের বর্বর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই প্রবল দেহ নিয়ে আজ দেখা দিল; আপন আপন স্বতন্ত্র ভোগের দুর্গ বেঁধে মানুষ অন্যকে শোষণ ও নিজেকে পোষণ করতে লাগল; তখনকার কালের দস্যুবৃত্তি দেহান্তর ধারণ করলে। গ্রামে একদিন অনেক মানুষ মিলেছিল, সকলে মিলে সংগ্রহ সঞ্চয় ও ভোগ করবার জন্যে। এখন সংখ্যায় তার চেয়ে অনেক বেশি মানুষ একত্র মিলল, কিন্তু প্রত্যেকেই নিজের ভোগের কেন্দ্র নিজে। তাই সমাজের সহজ বিধানের চেয়ে পুলিসের পাহারা কড়া হয়ে উঠল— আত্মীয়তার জায়গায় আইনের জটিলতা বাইরের শিকল পাকা করে তুলছে। নিজেরা প্রত্যেকেই যেখানে নিজের ভোগের কেন্দ্র, সেখানে আমরা হয় পরের দাসত্ব করি নয় নিজের, কিন্তু দুই-ই দাসত্ব। এই কর্মপাশবদ্ধ মানুষের সংখ্যা আজ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যারা মিলল, অন্তরের ক্ষেত্রে তাদের মিল নেই বলে এই-সব পরদাস ও আত্মদাসদের মনে ঈর্ষা বিদ্বেষ প্রবল; প্রতিযোগিতার মন্থনদণ্ডে মিথ্যা ও হিংসাকে এরা নানা আকারে কেবলই মথিত করে তুলছে। ধনী দরিদ্রে অন্তত আমাদের দেশে বিচ্ছেদ অতিমাত্র ছিল না— তার একটা কারণ, ধনের সম্মান অন্য-সব সম্মানের নীচে ছিল; আর-একটা কারণ, ধনী আপন ধনের দায়িত্ব স্বীকার করত। অর্থাৎ, ধন তখন অসামাজিক ছিল না, তখন প্রত্যেকের ধনে সমস্ত সমাজ ধনী হয়ে উঠত। তখন মান অপমান ও ভোগের তারতম্য ধনকে আশ্রয় করে স্পর্ধিত

আত্মম্ভরিতার সঙ্গে মানুষের পরস্পরের সম্বন্ধের পথ রুদ্ধ করে নি। আজ অন্নব্রহ্ম লোভের অন্ন হয়ে ছোটো হয়ে যেতেই একদিন যা সমাজ বেঁধেছে আজ তাই সমাজ ভাঙছে— রক্তে ভাসাচ্ছে পৃথিবী, দাসত্বে জীর্ণ করছে মানুষের মন। আজ তাই ধন-অধনের উৎকট অসামঞ্জস্য দূর করবার জন্যে চার দিকেই উত্তেজনা।

এখনকার কালের সাধনা, লোকালয়কে আবার সমগ্র করে তোলা। বিশিষ্টে সাধারণে, শক্তিতে সৌহার্দ্যে, শহরে গ্রামে মিলিয়ে সম্পূর্ণ করা। বিপ্লবের দ্বারা এই পূর্ণতা ঘটবে না। বিপ্লবকে যারা বাহন করে তারা এক অসামঞ্জস্য থেকে আর-এক অসামঞ্জস্যে লাফ দিয়ে চলে, তারা সত্যকে ছেঁটে ফেলে সহজ করতে চায়। তারা ভোগকে রাখে তো ত্যাগকে তাড়ায়, ত্যাগকে রাখে তো ভোগকে দেশছাড়া করে— মানবপ্রকৃতিকে পঙ্গু করে তবে তাকে শাসনে আনতে চায়। আমরা এই কথা বলি যে, সত্যকে সমগ্রভাবে না নিতে পারলে মানবস্বভাবকে বঞ্চিত করা হয়— বঞ্চিত করলেই তার থেকে রোগ, তার থেকে অশান্তি। এমন-কি, ঐ যে কলের কথা বলছিলুম— তাকে দিয়ে আমরা বিস্তর অকার্য করছি বলেই যে তাকে বাদ দেওয়া চলে এ কথা বলা যায় না। এই যন্ত্রও আমাদের প্রাণশক্তির অঙ্গ। এ একেবারেই মানুষের জিনিস। হাতকে দিয়ে ডাকাতি করেছি বলে যে তাকে কেটে ফেললে মঙ্গল হয় তা নয়, সেই হাতকে দিয়েই প্রায়শ্চিত্ত করাতে হবে। নিজেকে পঙ্গু করে ভালো হবার সাধনা কাপুরুষতার সাধনা। মানুষের শক্তি নানা দিকে বিকাশ খোঁজে, তার কোনোটিকে অবজ্ঞা করবার অধিকার আমাদের নেই।

আদিমকাল থেকে মানুষ যন্ত্র তৈরি করতে চেষ্টা করেছে। প্রকৃতির কোনো-একটা শক্তিরহস্য যেই সে আবিষ্কার করে, অমনি যন্ত্র দিয়ে তাকে বন্দী করে তাকে আপনার ব্যবহারের করে নেয়। এর থেকেই তার সভ্যতায় এক-একটা নূতন পর্যায়ের আরম্ভ। প্রথম যেদিন সে লাঙল তৈরি করে মাটির উর্বরতাশক্তিকে কর্ষণ করতে পারলে, সেদিন তার জীবনযাত্রার ইতিহাসে কত বড়ো পর্দা উঠে গেল। সেই উন্মীলিত আবরণ কেবল যে তার অন্নশালাকে বৃহৎ করে অবারিত করলে তা নয়— এতদিন তার মনের যে অনেক কক্ষ অন্ধকার ছিল, তার মধ্যে আলো এনে ফেললে। এই সুযোগে সে নানা দিকেই বড়ো হয়ে উঠল। একদিন পশুচর্ম ছিল মানুষের দেহের আচ্ছাদন— যেদিন চরকায় তাঁতে সে প্রথম কাপড় বুনলে, সেদিন কেবল যে সে সহজে দেহ ঢাকতে পারলে তা নয়, এতে তার শক্তিকে বড়ো করে উদ্‌বোধিত করাতে বহুদূর পর্যন্ত তার প্রভাব বিস্তৃত হল। তাই শুধু মানুষের দেহ নয়, আজকের দিনের মানুষের মন হচ্ছে কাপড়-পরা মন— মানুষ যে মানবলোক সৃষ্টি করছে কাপড়টা তার একটা বড়ো

উপাদান। আজকের দিনে আমাদের দেশে আমরা ন্যাশনাল কাপড়টা খাটো করছি, কিন্তু ও দিকে ন্যাশনাল পতাকাটা বেড়ে চলল। তার মানে কাপড়টা কেবল একটা আচ্ছাদন নয়, ওটা একটা ভাষা। অর্থাৎ কাপড়ে মানুষের মন নিজেকে প্রকাশ করবার একটা নূতন উপাদান পেলে। এ কথা সবাই জানে, পাথরের যুগ থেকে মানুষ যখন লোহার যুগে এল তখন কেবল যে তার বাহুশক্তির বৃদ্ধি হল তা নয়, তার আন্তরিক শক্তি প্রসার পেলে। পশুর চার পায়ের অবস্থা থেকে যেদিন মানুষ দুই হাত দুই পায়ের অবস্থায় এল তখনই এর গোড়া-পত্তন। দুই হাত থাকাতে পৃথিবীর সঙ্গে ব্যবহারের ক্ষমতা মানুষের বেড়ে গেছে— এই তার দেহশক্তির বিশেষত্ব থেকে তার মনের শক্তি বিশেষত্ব পেলে। সেইদিন থেকে হাতের সাহায্যেই মানুষ হাতিয়ার তৈরি করে হাতকেই বহুগুণিত করে চলেছে। তাতে করেই বিশ্বের সঙ্গে তার ব্যবহার কেবলই বেড়ে উঠছে, তার থেকেই তার মনের রুদ্ধদ্বার নানা দিকে খুলে যাচ্ছে। কোনো সন্ন্যাসী যদি বলেন যে, বিশ্বের সঙ্গে ব্যবহারের শক্তিকে সংকুচিত করতে হবে, তা হলে গোড়ায় মানুষের হাত দুটোকেই অপরাধী করতে হয়। ঘোরতর সন্ন্যাসী ততদূর পর্যন্তই যায়। সে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে থাকে ; বলে, 'সংসারের সঙ্গে আমার কোনো ব্যবহারই নেই, আমি মুক্ত।' হাতের শক্তিকে খানিক দূর পর্যন্তই এগোতে দেব, তার বেশি এগোতে দেব না— এটা হচ্ছে ন্যূনাধিক পরিমাণে সেই ঊর্ধ্ববাহুত্বের বিধান। এত বড়ো শাসনের অধিকার পৃথিবীতে কার আছে। বিশ্বকর্মা মানুষকে যতদূর পর্যন্ত এগিয়ে আসবার জন্যে আহ্বান করেন তাকে ততদূর পর্যন্ত এগোতে দেব না— বিধাতৃদত্ত শক্তিকে পঙ্গু করবার এমন স্পর্ধা কোন্ সমাজবিধাতার মুখে শোভা পায়! শক্তির ব্যবহারের পন্থাই আমরা সমাজকল্যাণের অনুগত করে নিয়মিত করতে পারি, কিন্তু শক্তির প্রকাশের পন্থা আমরা অবরুদ্ধ করতে পারি নে।

মানুষ যেমন একদিন হাল লাঙলকে, চরকা তাঁতকে, তীর ধনুককে, চক্রবান যানবাহনকে গ্রহণ ক'রে তাকে নিজের জীবনযাত্রার অনুগত করেছিল, আধুনিক যন্ত্রকেও আমাদের সেইরকম করতে হবে। যন্ত্রে যারা পিছিয়ে আছে যন্ত্রে অগ্রবর্তীদের সঙ্গে তারা কোনোমতেই পেরে উঠবে না। যে কারণে চার-পা-ওয়ালা জীব দুই-পা-ওয়ালা জীবের সঙ্গে পেরে ওঠে নি, এও সেই একই কারণ।

আজকের দিনে যন্ত্রের সাহায্যে একজন লোক ধনী আর হাজার লোক তার ভৃত্য, এর থেকে এই প্রমাণ হয় যে, যন্ত্রের দ্বারা একজন লোক হাজার লোকের চেয়ে শক্তিশালী হয়। সেটাতে যদি দোষ থাকে তবে বিদ্যা-অর্জনেও দোষ আছে। বিদ্যার সাহায্যে বিদ্বান্ অনেক বেশি শক্তিশালী হয় অবিদ্বানের চেয়ে। এ স্থলে আমাদের

এই কথাই বলতে হবে— যন্ত্র এবং তার মূলীভূত বিদ্যায় যে প্রভূত শক্তি উৎপন্ন হয় সেটা ব্যক্তি বা দল-বিশেষে সংহত না হয়ে যেন সর্বসাধারণে ব্যাপ্ত হয়। শক্তি ব্যক্তিবিশেষে একান্ত হয়ে উঠে মানুষকে যেন বিচ্ছিন্ন না করে— শক্তি যেন সর্বদাই নিজের সামাজিক দায়িত্ব স্বীকার করতে পারে।

প্রকৃতির দান এবং মানুষের জ্ঞান এই দুইয়ে মিলেই মানুষের সভ্যতা নানা মহলে বড়ো হয়েছে— আজও এই দুটোকেই সহযোগীরূপে চাই। মানুষের জ্ঞান যেখানে কোনো পুরোনো অভ্যস্ত রীতির মধ্যে আপন সম্পদকে ভাণ্ডারজাত করে ঘুমিয়ে পড়ে সেখানে কল্যাণ নেই। কেননা, সে জমা নিয়ত ক্ষয় হচ্ছে, তাই এক যুগের মূলধন ভেঙে ভেঙে আমরা বহুযুগ ধরে দিন চালাতে পারব না। আজ আমাদের দিন চলছেও না।

বিজ্ঞান মানুষকে মহাশক্তি দিয়েছে। সেই শক্তি যখন সমস্ত সমাজের হয়ে কাজ করবে তখনই সত্যযুগ আসবে। আজ সেই পরম যুগের আহ্বান এসেছে। আজ মানুষকে বলতে হবে, 'তোমার এ শক্তি অক্ষয় হোক; কর্মের ক্ষেত্রে, ধর্মের ক্ষেত্রে জয়ী হোক।' মানুষের শক্তি দৈবশক্তি, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা নাস্তিকতা।

মানুষের শক্তির এই নূতনতম বিকাশকে গ্রামে গ্রামে আনা চাই। এই শক্তিকে সে আবাহন করে আনতে পারে নি বলেই গ্রামে জলাশয়ে আজ জল নেই, ম্যালেরিয়ার প্রকোপে দুঃখশোক পাপতাপ বিনাশমূর্তি ধরছে, কাপুরুষতা পুঞ্জীভূত। চার দিকে যা দেখছি এ তো পরাভবেরই দৃশ্য। পরাভবের অবসাদে মানুষ নড়তে পারছে না, তাই এত দিকে তার এত অভাব। মানুষ বলছে, 'পারলুম না।' শুষ্ক জলাশয় থেকে, নিষ্ফল ক্ষেত্র থেকে, শ্মশানভূমিতে যে চিতা নিবতে চায় না তার শিখা থেকে কান্না উঠছে, 'পারলুম না, হার মেনেছি।' এ যুগের শক্তিকে যদি গ্রহণ করতে পারি তা হলেই জিতব, তা হলেই বাঁচব।

এইটেই আমাদের শ্রীনিকেতনের বাণী। আমাদের ফসল-খেতে কিছু বিলিতি বেগুন কিছু আলু ফলিয়েছি, চিরকেলে তাঁত চালিয়ে গোটাকতক সতরঞ্চ বুনিয়েছি— আমাদের বাঁচবার পক্ষে এই যথেষ্ট নয়। যে বড়ো শক্তিকে আমাদের পক্ষভুক্ত করতে পারি নি সেই আমাদের পক্ষে দানবশক্তি; আজকের এই অল্পকিছু সংগ্রহ যা আমাদের সামনে রয়েছে সেই দানবের সঙ্গে লড়াই করবার যথোচিত উপকরণ তা নয়।

পুরাণে পড়েছি, একদিন দৈত্যদের সঙ্গে সংগ্রামে দেবতারা হেরে যাচ্ছিলেন। তখন তাঁরা আপনাদের গুরুপুত্রকে দৈত্যগুরুর কাছে পাঠিয়েছিলেন। যাতে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় সেই বিদ্যা দেবলোকে আনাই ছিল তাঁদের সংকল্প।

তাঁরা অবজ্ঞা করে বলেন নি যে, 'দানবী বিদ্যাকে আমরা চাই নে।' দানবদের কাছ থেকে বিদ্যা নিয়ে তাঁরা দানবপুরী বানাতে ইচ্ছা করেন নি, সেই বিদ্যা নিয়ে তাঁরা স্বর্গকেই রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। দানবের ব্যবহার স্বর্গের ব্যবহার না হতে পারে, কিন্তু যে বিদ্যা দানবকে শক্তি দিয়েছে সেই বিদ্যাই দেবতাকেও শক্তি দেয়— বিদ্যার মধ্যে জাতিভেদ নেই।

আজকের দিনে আমাদের দেশে সর্বদাই শুনতে পাই, য়ুরোপের বিদ্যা আমরা চাই নে, এ বিদ্যায় শয়তানি আছে। এমন কথা আমরা বলব না। বলব না, শক্তি আমাদের মারছে, অতএব অশক্তিই আমাদের শ্রেয়। শক্তির মার নিবারণ করতে গেলে শক্তিকে গ্রহণ করতে হয়, তাকে ত্যাগ করলে মার বাড়ে বৈ কমে না। সত্যকে অস্বীকার করলেই সত্য আমাদেরকে বিনাশ করে, তখন তার প্রতি অভিমান করে বলা মূঢ়তা যে 'সত্যকে চাই নে'।

উপনিষদ্‌ বলেন, যিনি এক তিনি 'বর্ণাননেকান্‌ নিহিতার্থো দধাতি'— নানা জাতির লোককে তাদের নিহিতার্থ দান করেন। নিহিতার্থ, অর্থাৎ প্রজারা যা চায় প্রজাপতি সেটা তাদের অন্তরেই প্রচ্ছন্ন করে রেখেছেন। মানুষকে সেটা আবিষ্কার করে নিতে হয়, তা হলেই দানের জিনিস তার নিজের জিনিস হয়ে ওঠে। যুগে যুগে এই নিহিতার্থ প্রকাশ পেয়েছে। এই-যে নিহিতার্থ তিনি দিয়েছেন, এ 'বহুধা শক্তিযোগাৎ'— বহুধা শক্তির যোগে। নিহিতার্থের সঙ্গে সেই বহুদিক্‌গামী শক্তিকে পাই। আজকের যুগের য়ুরোপীয় সাধকেরা মানুষের সেই নিহিতার্থের একটা বিশেষ সন্ধান পেয়েছেন— তারই যোগে বিশেষ শক্তিকে পেয়েছেন। সেই শক্তি আজ বহুধা হয়ে বিশ্বকে নূতন করে জয় করতে বেরিয়েছে। কিন্তু এই শক্তি, এই অর্থ যাঁর, তিনি সকল বর্ণের লোকের পক্ষেই এক— একোঽবর্ণঃ। সেই শক্তির অর্থ যে-কোনো বিশেষ কালে বিশেষ জাতির কাছে ব্যক্ত হোক-না কেন, তা সকল কালের সকল জাতির পক্ষেই এক। বিজ্ঞানের সত্য যে পণ্ডিত যখনই আবিষ্কার করুন, জাতিনির্বিশেষে তা এক। অতএব এই শক্তি-আবিষ্কার আমাদের সকলকে এক করবার সহায়তা করে যেন। বিজ্ঞান যেখানে সত্য সেখানে বস্তুতই সে সকল জাতির মানুষকে ঐক্য দান করছে। কিন্তু তার শক্তির ভাগাভাগি নিয়ে মানুষ হানাহানি করে থাকে; সেই বিরোধ সত্যের বা শক্তির মধ্যে নয়, আমাদের চরিত্রে যে অসত্য, যে অশক্তি, তারই মধ্যে। সেইজন্যে এই শ্লোকেরই শেষে আছে— সনোবুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু। তিনি আমাদের সকলকে, সকলের শক্তিকে, শুভবুদ্ধি-দ্বারা যোগযুক্ত করুন।

৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮ বৈশাখ ১৩৩৫

দেশের কাজ

শ্রীনিকেতন বাৎসরিক উৎসবে কথিত

আমাদের শাস্ত্রে বলে ছটি রিপুর কথা— কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য। তাকেই রিপু বলে, যাতে আত্মবিস্মৃতি আনে। এমনি করে নিজেকে হারানোই মানুষের সর্বনাশ করে, এই রিপুই জাতির পতন ঘটায়। এই ছটি রিপুর মধ্যে চতুর্থটির নাম মোহ। সে অন্ধতা আনে দেশের চিত্তে, অসাড়তা আনে তার প্রাণে, নিরুদ্যম করে দেয় তার আত্মকর্তৃত্বকে। মানবস্বভাবের মূলে যে সহজাত শক্তি আছে তার প্রতি বিশ্বাস সে ভুলিয়ে দেয়। এই বিহ্বলতার নামই মোহ। আর এই মোহেরই উল্টো হচ্ছে মদ— অহংকারের মত্ততা। মোহ আমাদের আত্মশক্তিতে বিস্মৃতি আনে, আমরা যা তার চেয়ে নিজেকে হীন করে দেখি; আর গর্ব, সে আপনাকে অসত্যভাবে বড়ো করে তোলে। এ জগতে অনেক অভ্যুদয়শালী মহাজাতির পতন হয়েছে অহংকারে অন্ধ হয়ে। স্পর্ধার বেগে তারা সত্যের সীমা লঙ্ঘন করেছে। আমাদের মরণ কিন্তু উল্টো পথে— আমাদের আচ্ছন্ন করেছে অবসাদের কুয়াশায়।

একটা অবসাদ এসে আমাদের শক্তিকে ভুলিয়ে দিয়েছে। এককালে আমরা অনেক কর্ম করেছি, অনেক কীর্তি রেখেছি, সে কথা ইতিহাস জানে। তার পর কখন অন্ধকার ঘনিয়ে-এল ভারতবাসীর চিত্তে, আমাদের দেহে মনে অসাড়তা এনে দিলে। মনুষ্যত্বের গৌরব যে আমাদের অন্তর্নিহিত, সেটাকে রক্ষা করবার জন্যে যে আমাদের প্রাণপণ করতে হবে, সে আমাদের মনে রইল না। একেই বলে মোহ। এই মোহে আমরা নিজের মরার পথ বাধামুক্ত করেছি, তার পর যাদের আত্মম্ভরিতা প্রবল, আমাদের মার আসছে তাদেরই হাত দিয়ে। আজ বলতে এসেছি, আত্মাকে অবমানিত করে রাখা আর চলবে না। আমরা বলতে এসেছি যে, আজ আমরা নিজের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করলেম। একদিন সেই দায়িত্ব নিয়েছিলেম, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস রক্ষা করেছিলেম। তখন জলাশয়ে জল ছিল, মাঠে শস্য ছিল, তখন পুরুষকার ছিল মনে। এখন সমস্ত দূর হয়েছে। আবার একবার নিজেকে নিজের দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে।

কোনো উপায় নেই এত বড়ো মিথ্যা কথা যেন না বলি। বাহির থেকে দেখলে তো দেখা যায় কিছু পরিমাণেও বেঁচে আছি। কিছু আগুনও যদি ছাই-চাপা পড়ে

থাকে তাকে জাগিয়ে তোলা যায়। এ কথা যদি নিশ্চেষ্ট হয়ে স্বীকার না করি, তবে বুঝব এটাই মোহ। অর্থাৎ, যা নয় তাই মনে করে বসা।

একটা ঘটনা শুনেছি— হাঁটুজলে মানুষ ডুবে মরেছে ভয়ে। আচমকা সে মনে করেছিল পায়ের তলায় মাটি নেই। আমাদেরও সেইরকম। মিথ্যে ভয় দূর করতে হবে, যেমনি হোক পায়ের তলায় খাড়া দাঁড়াবার জমি আছে এই বিশ্বাস দৃঢ় করব, সেই আমাদের ব্রত। এখানে এসেছি সেই ব্রতের কথা ঘোষণা করতে। বাইরে থেকে উপকার করতে নয়, দয়া দেখিয়ে কিছু দান করবার জন্যে নয়। যে প্রাণস্রোত তার আপনার পুরাতন খাত ফেলে দূরে সরে গেছে, বাধামুক্ত করে তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। এসো, একত্রে কাজ করি।

সং বো মনাংসি সংব্রতা সমাকৃতীর্নমামসি।
অমী যে বিব্রতা স্থন তান্ বঃ সং নময়ামসি ॥

এই ঐক্য যাতে স্থাপিত হয়, তারই জন্যে অক্লান্ত চেষ্টা চাই। ঘরে ঘরে কত বিরোধ। বিচ্ছিন্নতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে আমাদের ঐশ্বর্যকে আমরা ধূলি-স্খলিত করে দিয়েছি। সর্বনেশে ছিদ্রগুলোকে রোধ করতে হবে আপনার সব-কিছু দিয়ে।

আমরা পরবাসী। দেশে জন্মালেই দেশ আপন হয় না। যতক্ষণ দেশকে না জানি, যতক্ষণ তাকে নিজের শক্তিতে জয় না করি, ততক্ষণ সে দেশ আপনার নয়। আমরা এই দেশকে আপনি জয় করি নি। দেশে অনেক জড় পদার্থ আছে, আমরা তাদেরই প্রতিবেশী। দেশ যেমন এই-সব বস্তুপিণ্ডের নয়, দেশ তেমনি আমাদেরও নয়। এই জড়ত্ব— একেই বলে মোহ। যে মোহাভিভূত সেই তো চিরপ্রবাসী। সে জানে না সে কোথায় আছে। সে জানে না তার সত্যসম্বন্ধ কার সঙ্গে। বাইরের সহায়তার দ্বারা নিজের সত্য বস্তু কখনোই পাওয়া যায় না। আমার দেশ আর কেউ আমাকে দিতে পারবে না। নিজের সমস্ত ধন-মন-প্রাণ দিয়ে দেশকে যখনই আপন বলে জানতে পারব তখনই দেশ আমার স্বদেশ হবে। পরবাসী স্বদেশে যে ফিরেছি তার লক্ষণ এই যে, দেশের প্রাণকে নিজের প্রাণ বলেই জানি। পাশেই প্রত্যক্ষ মরছে দেশের লোক রোগে উপবাসে, আর আমি পরের উপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে মঞ্চের উপর চড়ে দেশাত্মবোধের বাগ্‌বিস্তার করছি, এত বড়ো অবাস্তব অপদার্থতা আর কিছু হতেই পারে না।

রোগপীড়িত এই বৎসরে এই সভায় আজ আমরা বিশেষ করে এই ঘোষণা করছি যে, গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে হবে, অবিরোধে একব্রত সাধনার দ্বারা। রোগজীর্ণ শরীর কর্তব্য পালন করতে পারে না। এই ব্যাধি যেমন দারিদ্র্যের বাহন,

তেমনি আবার দারিদ্র্যও ব্যাধিকে পালন করে। আজ নিকটবর্তী বারোটি গ্রাম একত্র করে রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। এই কাজে গ্রামবাসীর সচেষ্ট মন চাই। তারা যেন সবলে বলতে পারে, 'আমরা পারি, রোগ দূর আমাদের অসাধ্য নয়।' যাদের মনের তেজ আছে তারা দুঃসাধ্য রোগকে নির্মূল করতে পেরেছে, ইতিহাসে তা দেখা গেল।

আমাদের মনে রাখতে হবে, যারা নিজেদের রক্ষা করতে পারে না, দেবতা তাদের সহায়তা করেন না। দেবাঃ দুর্বলঘাতকাঃ। দুর্বলতা অপরাধ। কেননা, তা বহুল পরিমাণে আত্মকৃত, সম্পূর্ণ আকস্মিক নয়। দেবতা এই অপরাধ ক্ষমা করেন না। অনেক মার খেয়েছি, দেবতার কাছে এই শিক্ষার অপেক্ষায়। চৈতন্যের দুটি পন্থা আছে। এক হচ্ছে মহাপুরুষদের মহাবাণী। তাঁরা মানবপ্রকৃতির গভীরতলে চৈতন্যকে উদ্‌বোধিত করে দেন। তখন বহুধা শক্তি সকল দিক থেকেই জেগে ওঠে, তখন সকল কাজই সহজ হয়। আবার দুঃখের দিনও শুভদিন। তখন বাহিরের উপর নির্ভরের মোহ দূর হয়, তখন নিজের মধ্যে নিজের পরিত্রাণ খুঁজতে প্রাণপণে উদ্যত হয়ে উঠি। একান্ত চেষ্টায় নিজের কাছে কী করে আনুকূল্য দাবি করতে হয় অন্য দেশে তার দৃষ্টান্ত দেখতে পাচ্ছি।

ইংলণ্ড আজ যখন দৈন্যের দ্বারা আক্রান্ত তখন সে ঘোষণা করেছে, দেশের লোকে যথাসাধ্য নিজের উৎপন্ন দ্রব্যই নিজেরা ব্যবহার করবে। পথে পথে ঘরে ঘরে এই ঘোষণা যে, দেশজাত পণ্যদ্রব্যই আমাদের মুখ্য অবলম্বন। বহুদিনের বহু-অন্ন-পুষ্ট জাতের মধ্যে যখনই বেকার-সমস্যা উপস্থিত হল তখনই দেশের ধন নিরন্নদের বাঁচাতে লেগেছে। এর থেকে দেখা যায় সেখানে দেশের লোকের সকলের চেয়ে বড়ো সম্পদ্‌ দেশব্যাপী আত্মীয়তা। তাদের উপরে আনুকূল্য রয়েছে সদাজাগ্রত। তাতে মনের মধ্যে ভরসা হয়। আমরা বেকার হয়ে মরছি অথচ কেউ আমাদের খবর নেবে না, এ কোনোমতেই হতে পারে না, এই তাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এই বিশ্বাসে তাদের এত ভরসা। আমাদের ভরসা নেই। মারী, রোগ, দুর্ভিক্ষ, জাতিকে অবসন্ন করে দিয়েছে। কিন্তু প্রেমের সাধনা কই, সেবার উদ্যোগ কোথায়। যে বৃহৎ স্বার্থবুদ্ধিতে বড়ো রকম করে আত্মরক্ষা করতে হয় সে আমাদের কোথায়।

চোখ বুজে অনেক তুচ্ছ বিষয়ে আমরা বিদেশীর অনেক নকল করেছি, আজ দেশের প্রাণান্তিক দৈন্যের দিনে একটা বড়ো বিষয়ে ওদের অনুবর্তন করতে হবে— কোমর বেঁধে বলতে চাই, কিছু সুবিধার ক্ষতি, কিছু আরামের ব্যাঘাত হলেও নিজের দ্রব্য নিজে ব্যবহার করব। আমাদের অতি ক্ষুদ্র সম্বল যথাসাধ্য রক্ষা করতে হবেই।

বিদেশে প্রভূত পরিমাণ অর্থ চলে যাচ্ছে, সব তার ঠেকাবার শক্তি আমাদের হাতে এখন নেই, কিন্তু একান্ত চেষ্টায় যতটা রক্ষা করা সম্ভব তাতে যদি শৈথিল্য করি তবে সে অপরাধের ক্ষমা নেই।

দেশের উৎপাদিত পদার্থ আমরা নিজে ব্যবহার করব। এই ব্রত সকলকে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে আপন করে উপলব্ধি করবার এ একটি প্রকৃষ্ট সাধনা। যথেষ্ট উদ্‌বৃত্ত অন্ন যদি আমাদের থাকত— অন্তত এতটুকুও যদি থাকত যাতে দেশের অজ্ঞান দূর হয়, রোগ দূর হয়, দেশের জলকষ্ট পথকষ্ট বাসকষ্ট দূর হয়, দেশের স্ত্রীমারী শিশুমারী দূর হতে পারত, তা হলে দেশের অভাবের দিকেই দেশকে এমন একান্তভাবে নিবিষ্ট হতে বলতুম না। কিন্তু আত্মঘাত এবং আত্মগ্লানি থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে সমস্ত চেষ্টাকে যদি উদ্যত না করি, অন্ধকার বহু দুঃখ বহু অবমাননার শিক্ষা যদি ব্যর্থ হয়, তবে মানুষের কাছ থেকে ঘৃণা ও দেবতার কাছ থেকে অভিশাপ আমাদের জন্যে নিত্য নির্দিষ্ট হয়ে থাকবে, যে পর্যন্ত আমাদের জীর্ণ হাড় কখানা ধুলার মধ্যে মিশিয়ে না যায়।

৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২ চৈত্র ১৩৩৮

উপেক্ষিতা পল্লী

শ্রীনিকেতন বার্ষিক উৎসবের অভিভাষণ

সং বো মনাংসি সংব্রতা সমাকূতীর্নমামসি।
অমী যে বিব্রতা স্থন তান্ বঃ সং নময়ামসি।

এখানে তোমরা, যাহাদের মন বিব্রত, তাহাদিগকে এক সংকল্পে এক আদর্শে এক ভাবে একব্রত ও অবিরোধ করিতেছি, তাহাদিগকে সংনত করিয়া ঐক্য প্রাপ্ত করিতেছি।

সহৃদয়ং সাংমনস্যমবিদ্বেষং কৃণোমি বঃ।
অন্যো অন্যমভিহর্যত বৎসং জাতমিবাঘ্ন্যা।

তোমাদিগকে পরস্পরের প্রতি সহৃদয়, সংপ্রীতিযুক্ত ও বিদ্বেষহীন করিতেছি। ধেনু যেমন স্বীয় নবজাত বৎসকে প্রীতি করে, তেমনি তোমরা পরস্পরে প্রীতি করো।

মা ভ্রাতা ভ্রাতরং দ্বিক্ষন্ মা স্বসারমুত স্বসা।
সম্যঞ্চঃ সব্রতা ভূত্বা বাচং বদত ভদ্রয়া।

ভাই যেন ভাইকে দ্বেষ না করে, ভগ্নী যেন ভগ্নীকে দ্বেষ না করে। এক-গতি ও সব্রত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে কল্যাণবাণী বলো।

আজ যে বেদমন্ত্র-পাঠে এই সভার উদ্‌বোধন হল অনেক সহস্র বৎসর পূর্বে ভারতে তা উচ্চারিত হয়েছিল। একটি কথা বুঝতে পারি, মানুষের পরস্পর মিলনের জন্যে এই মন্ত্রে কী আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে।

পৃথিবীতে কতবার কত সভ্যতার অভ্যুদয় হয়েছে এবং আবার তাদের বিলয় হল। জ্যোতিষ্কের মতো তারা মিলনের তেজে সংহত হয়ে প্রদীপ্ত হয়েছিল। প্রকাশ পেয়েছিল নিখিল বিশ্বে, তার পরে আলো এল ক্ষীণ হয়ে; মানবসভ্যতার ইতিহাসে তাদের পরিচয় মগ্ন হল অন্ধকারে। তাদের বিলুপ্তির কারণ খুঁজলে দেখা যায় ভিতর থেকে এমন কোনো রিপুর আক্রমণ এসেছে যাতে মানুষের সম্বন্ধকে লোভে বা মোহে শিথিল করে দিয়েছে। যে সহজ প্রয়োজনের সীমায় মানুষ সুস্থভাবে সংযতভাবে পরস্পরের যোগে সামাজিকতা রক্ষা করতে পারে, ব্যক্তিগত দুরাকাঙ্ক্ষা সেই সীমাকে নিরন্তর লঙ্ঘন করবার চেষ্টায় মিলনের বাঁধ ভেঙে দিতে থাকে।

বর্তমানে আমরা সভ্যতার যে প্রবণতা দেখি তাতে বোঝা যায় যে, সে ক্রমশই প্রকৃতির সহজ নিয়ম পেরিয়ে বহুদূরে চলে যাচ্ছে। মানুষের শক্তি জয়ী হয়েছে প্রকৃতির শক্তির উপরে, তাতে লুঠের মাল যা জমে উঠল তা প্রভূত। এই জয়ের ব্যাপারে প্রথম গৌরব পেল মানুষের বুদ্ধিবীর্য, কিন্তু তার পিছন-পিছন এল দুর্বাসনা। তার ক্ষুধা তৃষ্ণা স্বভাবের নিয়মের মধ্যে সন্তুষ্ট রইল না, সমাজে ক্রমশই অস্বাস্থ্যের সঞ্চার করতে লাগল, এবং স্বভাবের অতিরিক্ত উপায়ে চলেছে তার আরোগ্যের চেষ্টা। বাগানে দেখতে পাওয়া যায় কোনো কোনো গাছ ফলফুল-উৎপাদনের অতিমাত্রায় নিজের শক্তিকে নিঃশেষিত করে মারা যায়— তার অসামান্যতার অস্বাভাবিক গুরুভারই তার সর্বনাশের কারণ হয়ে ওঠে। প্রকৃতিকে অতিক্রমণ কিছুদূর পর্যন্ত সয়, তার পরে আসে বিনাশের পালা। য়িহুদীদের পুরাণে বেব্‌ল্‌-এর জয়স্তম্ভ-রচনার উল্লেখ আছে, সেই স্তম্ভ যতই অতিরিক্ত উপরে চড়ছিল ততই তার উপর লাগছিল নীচে নামাবার নিশ্চিত আকর্ষণ।

মানুষ আপন সভ্যতাকে যখন অভ্রভেদী করে তুলতে থাকে তখন জয়ের স্পর্ধায় বস্তুর লোভে ভুলতে থাকে যে সীমার নিয়মের দ্বারা তার অভ্যুত্থান পরিমিত। সেই সীমায় সৌন্দর্য, সেই সীমায় কল্যাণ। সেই যথোচিত সীমার বিরুদ্ধে নিরতিশয় ঔদ্ধত্যকে বিশ্ববিধান কখনোই ক্ষমা করে না। প্রায় সকল সভ্যতায় অবশেষে এসে পড়ে এই

ঔদ্ধত্য এবং নিয়ে আসে বিনাশ। প্রকৃতির নিয়মসীমায় যে সহজ স্বাস্থ্য ও আরোগ্যতত্ত্ব আছে তাকে উপেক্ষা করেও কী করে মানুষ স্বরচিত প্রকাণ্ড জটিলতার মধ্যে কৃত্রিম প্রণালীতে জীবনযাত্রার সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে এই হয়েছে আধুনিক সভ্যতার দুরূহ সমস্যা। মানবসভ্যতার প্রধান জীবনীশক্তি তার সামাজিক শ্রেয়োবুদ্ধি, যার প্রেরণায় পরস্পরের জন্যে পরস্পর আপন প্রবৃত্তিকে সংযত করে। যখন লোভের বিষয়টা কোনো কারণে অত্যুগ্র হয়ে ওঠে তখন ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় অসাম্য সৃষ্টি করতে থাকে। এই অসাম্যকে ঠেকাতে পারে মানুষের মৈত্রীবোধ, তার শ্রেয়োবুদ্ধি। যে অবস্থায় সেই বুদ্ধি পরাভূত হয়েছে তখন ব্যবস্থা-বুদ্ধির দ্বারা মানুষ তার অভাব পূরণ করতে চেষ্টা করে। সেই চেষ্টা আজ সকল দিকেই প্রবল। বর্তমান সভ্যতা প্রাকৃত বিজ্ঞানের সঙ্গে সন্ধি করে আপন জয়যাত্রায় প্রবৃত্ত হয়েছিল, সেই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হৃদয়বান মানুষের চেয়ে হিসাব-করা ব্যবস্থাযন্ত্র বেশি প্রাধান্য লাভ করে। একদা যে ধর্মসাধনায় রিপুদমন করে মৈত্রীপ্রচারই সমাজের কল্যাণের মুখ্য উপায় বলে গণ্য হয়েছিল আজ তা পিছনে সরে পড়েছে, আজ এগিয়ে এসেছে যান্ত্রিক ব্যবস্থার বুদ্ধি। তাই দেখতে পাই এক দিকে মনের মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রজাতিগত বিদ্বেষ, ঈর্ষা, হিংস্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অপর দিকে অন্যোন্যজাতিক শান্তি-স্থাপনার জন্যে গড়ে তোলা লীগ অফ নেশন্‌স্‌। আমাদের দেশেও এই মনোবৃত্তির ছোঁয়াচ লেগেছে; যা-কিছুতে একটা জাতিকে অন্তরে বাহিরে খণ্ড বিখণ্ড করে, যে-সমস্ত যুক্তিহীন মূঢ় সংস্কার মনের শক্তিকে জীর্ণ করে দিয়ে পরাধীনতার পথ প্রশস্ত করতে থাকে, তাকে ধর্মের নামে, সনাতন পবিত্র প্রথার নামে, সযত্নে সমাজের মধ্যে পালন করব, অথচ রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা লাভ করব ধার-করা রাষ্ট্রিক বাহ্য-বিধি-দ্বারা, পার্লামেন্টিক শাসনতন্ত্র নাম-ধারী একটা যন্ত্রের সহায়তায়, এমন দুরাশা মনে পোষণ করি— তার প্রধান কারণ, মানুষের আত্মার চেয়ে উপকরণের উপরে শ্রদ্ধা বেড়ে গেছে। উপকরণ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির কোঠায় পড়ে, শ্রেয়োবুদ্ধির সঙ্গে তার সম্বন্ধ কম। সেই কারণেই যখন লোভরিপুর অতিপ্রাবল্যে ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার টানাটানিতে মানবসম্বন্ধের আন্তরিক জোড়গুলি খুলে গেছে তখন বাইরে থেকে জটিল ব্যবস্থার দড়াদড়ি দিয়ে তাকে জুড়ে রাখবার সৃষ্টি চলেছে। সেটা নৈর্ব্যক্তিকভাবে বৈজ্ঞানিক। এ কথা মনে রাখতেই হবে, মানবিক সমস্যা যান্ত্রিক প্রণালীর দ্বারা সমাধান করা অসম্ভব।

বর্তমান সভ্যতায় দেখি, এক জায়গায় এক দল মানুষ অন্ন-উৎপাদনের চেষ্টায় নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছে, আর-এক জায়গায় আর-এক দল মানুষ স্বতন্ত্র থেকে সেই অন্নে প্রাণ ধারণ করে। চাঁদের যেমন এক পিঠে অন্ধকার, অন্য পিঠে

আলো, এ সেইরকম। এক দিকে দৈন্য মানুষকে পশু করে রেখেছে— অন্য দিকে ধনের সন্ধান, ধনের অভিমান, ভোগবিলাস-সাধনের প্রয়াসে মানুষ উন্মত্ত। অন্নের উৎপাদন হয় পল্লীতে, আর অর্থের সংগ্রহ চলে নগরে। অর্থ-উপার্জনের সুযোগ ও উপকরণ যেখানেই কেন্দ্রীভূত, স্বভাবত সেখানেই আরাম আরোগ্য আমোদ ও শিক্ষার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোককে ঐশ্বর্যের আশ্রয় দান করে। পল্লীতে সেই ভোগের উচ্ছিষ্ট যা-কিছু পৌঁছয় তা যৎকিঞ্চিৎ। গ্রামে অন্ন উৎপাদন করে বহু লোকে, শহরে অর্থ উৎপাদন ও ভোগ করে অল্পসংখ্যক মানুষ; অবস্থার এই কৃত্রিমতায় অন্ন এবং ধনের পথে মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে প্রকাণ্ড বিচ্ছেদ ঘটেছে। এই বিচ্ছেদের মধ্যে যে সভ্যতা বাসা বাঁধে তার বাসা বেশিদিন টিঁকতেই পারে না। গ্রীসের সভ্যতা নগরে সংহত হয়ে আকস্মিক ঐশ্বর্যের দীপ্তিতে পৃথিবীকে বিস্মিত করেছিল, কিন্তু নগরে একান্ত কেন্দ্রীভূত তার শক্তি স্বল্পায়ু হয়ে বিলুপ্ত হয়েছে।

আজ য়ুরোপ থেকে রিপুবাহিনী ভেদশক্তি এসে আমাদের দেশে মানুষকে শহরে ও গ্রামে বিচ্ছিন্নভাবে বিভক্ত করেছে। আমাদের পল্লী মগ্ন হয়েছে চিরদুঃখের অন্ধকারে। সেখান থেকে মানুষের শক্তি বিক্ষিপ্ত হয়ে চলে গেছে অন্যত্র। কৃত্রিম ব্যবস্থায় মানবসমাজের সর্বত্রই এই-যে প্রাণশোষণকারী বিদীর্ণতা এনেছে, একদিন মানুষকে এর মূল্য শোধ করতে দেউলে হতে হবে। সেই দিন নিকটে এল। আজ পৃথিবীর আর্থিক সমস্যা এমনি দুরূহ হয়ে উঠেছে যে, বড়ো বড়ো পণ্ডিতেরা তার যথার্থ কারণ এবং প্রতিকার খুঁজে পাচ্ছে না। টাকা জমছে অথচ তার মূল্য যাচ্ছে কমে, উপকরণ-উৎপাদনের ত্রুটি নেই অথচ তা ভোগে আসছে না। ধনের উৎপত্তি এবং ধনের ব্যাপ্তির মধ্যে যে ফাটল লুকিয়ে ছিল আজ সেটা উঠেছে মস্ত হয়ে। সভ্যতার ব্যবসায়ে মানুষ কোনো-এক জায়গায় তার দেনা শোধ করছিল না, আজ সেই দেনা আপন প্রকাণ্ড কবল বিস্তার করেছে। সেই দেনাকেও রক্ষা করব অথচ আপনাকেও বাঁচাব এ হতেই পারে না। মানুষের পরস্পরের মধ্যে দেনাপাওনার সহজ সামঞ্জস্য সেখানেই চলে যায় যেখানে সম্বন্ধের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। পৃথিবীতে ধন-উৎপাদক এবং অর্থসঞ্চয়িতার মধ্যে সেই সাংঘাতিক বিচ্ছেদ বৃহৎ হয়ে উঠেছে। তার একটা সহজ দৃষ্টান্ত ঘরের কাছেই দেখতে পাই। বাংলার চাষী পাট উৎপাদন করতে রক্ত জল করে মরছে, অথচ সেই পাটের অর্থ বাংলাদেশের নিদারুণ অভাব-মোচনের জন্যে লাগছে না। এই যে গায়ের জোরে দেনাপাওনার স্বাভাবিক পথ রোধ করা, এই জোর একদিন আপনাকেই আপনি মারবে। এইরকম অবস্থা ছোটো বড়ো নানা কৃত্রিম উপায়ে পৃথিবীর সর্বত্রই পীড়া সৃষ্টি করে বিনাশকে আহ্বান করছে।

সমাজে যারা আপনার প্রাণকে নিঃশেষিত করে দান করছে প্রতিদানে তারা প্রাণ ফিরে পাচ্ছে না, এই অন্যায় ঋণ চিরদিনই জমতে থাকবে এ কখনো হতেই পারে না।

অন্তত ভারতবর্ষে এমন একদিন ছিল যখন পল্লীবাসী, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে দেশের জনসাধারণ, কেবল যে দেশের ধনের ভাগী ছিল তা নয়, দেশের বিদ্যাও তারা পেয়েছে নানা প্রণালী দিয়ে। এরা ধর্মকে শ্রদ্ধা করেছে, অন্যায় করতে ভয় পেয়েছে, পরস্পরের প্রতি সামাজিক কর্তব্যসাধনের দায়িত্ব স্বীকার করেছে। দেশের জ্ঞান ও ধর্মের সাধনা ছিল এদের সকলের মাঝখানে, এদের সকলকে নিয়ে। সেই দেওয়া-নেওয়ার সর্বব্যাপী সম্বন্ধ আজ শিথিল। এই সম্বন্ধ-ত্রুটির মধ্যেই আছে অবশ্যম্ভাবী বিপ্লবের সূচনা। এক ধারেই সব-কিছু আছে, আর-এক ধারে কোনো কিছুই নেই, এই ভারসামঞ্জস্যের ব্যাঘাতেই সভ্যতার নৌকো কাত হয়ে পড়ে। একান্ত অসাম্যেই আনে প্রলয়। ভূগর্ভ থেকে সেই প্রলয়ের গর্জন সর্বত্র শোনা যাচ্ছে।

এই আসন্ন বিপ্লবের আশঙ্কার মধ্যে আজ বিশেষ করে মনে রাখবার দিন এসেছে যে, যারা বিশিষ্ট সাধারণ বলে গর্ব করে তারা সর্বসাধারণকে যে পরিমাণেই বঞ্চিত করে তার চেয়ে অধিক পরিমাণে নিজেকেই বঞ্চিত করে— কেননা, শুধু কেবল ঋণই যে পুঞ্জীভূত হচ্ছে তা নয়, শাস্তিও উঠছে জমে। পরীক্ষায়-পাস-করা পুঁথিগত বিদ্যার অভিমানে যেন নিশ্চিন্ত না থাকি। দেশের জনসাধারণের মন যেখানে অজ্ঞানে অন্ধকার সেখানে কণা কণা জোনাকির আলো গর্তে পড়ে মরবার বিপদ থেকে আমাদের বাঁচাতে পারবে না। আজ পল্লী আমাদের আধমরা ; যদি এমন কল্পনা করে আশ্বাস পাই যে, অন্তত আমরা আছি পুরো বেঁচে, তবে ভুল হবে, কেননা মুমূর্ষুর সঙ্গে সজীবের সহযোগ মৃত্যুর দিকেই টানে।

৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪ চৈত্র ১৩৪০

অরণ্যদেবতা

শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ ও বৃক্ষরোপণ -উৎসবে কথিত

সৃষ্টির প্রথম পর্বে পৃথিবী ছিল পাষাণী, বন্ধ্যা, জীবের প্রতি তার করুণার কোনো লক্ষণ সেদিন প্রকাশ পায় নি। চারি দিকে অগ্নি-উদ্গীরণ চলেছিল, পৃথিবী ছিল ভূমিকম্পে বিচলিত। এমন সময় কোন্ সুযোগে বনলক্ষ্মী তাঁর দূতীগুলিকে প্রেরণ করলেন পৃথিবীর এই অঙ্গনে, চারি দিকে তাঁর তৃণশষ্পের অঞ্চল বিস্তীর্ণ হল, নগ্ন পৃথিবীর

লজ্জা রক্ষা হল। ক্রমে ক্রমে এল তরুলতা প্রাণের আতিথ্য বহন করে। তখনো জীবের আগমন হয় নি; তরুলতা জীবের আতিথ্যের আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়ে তার ক্ষুধার জন্য এনেছিল অন্ন, বাসের জন্য দিয়েছিল ছায়া। সকলের চেয়ে তার বড়ো দান অগ্নি; সূর্যতেজ থেকে অরণ্য অগ্নিকে বহন করেছে, তাকে দান করেছে মানুষের ব্যবহারে। আজও সভ্যতা অগ্নিকে নিয়েই অগ্রসর হয়ে চলেছে।

মানুষ অমিতাচারী। যতদিন সে অরণ্যচর ছিল ততদিন অরণ্যের সঙ্গে পরিপূর্ণ ছিল তার আদানপ্রদান; ক্রমে সে যখন নগরবাসী হল তখন অরণ্যের প্রতি মমত্ববোধ সে হারাল; যে তার প্রথম সুহৃদ্‌, দেবতার আতিথ্য যে তাকে প্রথম বহন করে এনে দিয়েছিল, সেই তরুলতাকে নির্মমভাবে নির্বিচারে আক্রমণ করলে ইটকাঠের বাসস্থান তৈরি করবার জন্য। আশীর্বাদ নিয়ে এসেছিলেন যে শ্যামলা বনলক্ষ্মী তাঁকে অবজ্ঞা করে মানুষ অভিসম্পাত বিস্তার করলে। আজকে ভারতবর্ষের উত্তর-অংশ তরুবিরল হওয়াতে সে অঞ্চলে গ্রীষ্মের উৎপাত অসহ হয়েছে। অথচ পুরাণপাঠক মাত্রেই জানেন যে, এক কালে এই অঞ্চল ঋষিদের অধ্যুষিত মহারণ্যে পূর্ণ ছিল, উত্তর ভারতের এই অংশ এক সময় ছায়াশীতল সুরম্য বাসস্থান ছিল। মানুষ গৃধ্নুভাবে প্রকৃতির দানকে গ্রহণ করেছে; প্রকৃতির সহজ দানে কুলোয় নি, তাই সে নির্মমভাবে বনকে নির্মূল করেছে। তার ফলে আবার মরুভূমিকে ফিরিয়ে আনবার উদ্যোগ হয়েছে। ভূমির ক্রমিক ক্ষয়ে এই-যে বোলপুরে ডাঙার কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে, বিনাশ অগ্রসর হয়ে এসেছে— এক সময়ে এর এমন দশা ছিল না, এখানে ছিল অরণ্য— সে পৃথিবীকে রক্ষা করেছে ধ্বংসের হাত থেকে, তার ফলমূল খেয়ে মানুষ বেঁচেছে। সেই অরণ্য নষ্ট হওয়ায় এখন বিপদ আসন্ন। সেই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হলে আবার আমাদের আহ্বান করতে হবে সেই বরদাত্রী বনলক্ষ্মীকে— আবার তিনি রক্ষা করুন এই ভূমিকে, দিন তাঁর ফল, দিন তাঁর ছায়া।

এ সমস্যা আজ শুধু এখানে নয়, মানুষের সর্বগ্রাসী লোভের হাত থেকে অরণ্যসম্পদ্‌কে রক্ষা করা সর্বত্রই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকাতে বড়ো বড়ো বন ধ্বংস করা হয়েছে; তার ফলে এখন বালু উড়িয়ে আসছে ঝড়, কৃষিক্ষেত্রকে নষ্ট করছে, চাপা দিচ্ছে। বিধাতা পাঠিয়েছিলেন প্রাণকে, চারি দিকে তারই আয়োজন করে রেখে-ছিলেন— মানুষই নিজের লোভের দ্বারা মরণের উপকরণ জুগিয়েছে। বিধাতার অভিপ্রায়কে লঙ্ঘন করেই মানুষের সমাজে আজ এত অভিসম্পাত। লুব্ধ মানুষ অরণ্যকে ধ্বংস করে নিজেরই ক্ষতিকে ডেকে এনেছে; বায়ুকে নির্মল করবার ভার যে গাছপালার উপর, যার পত্র ঝরে গিয়ে ভূমিকে উর্বরতা দেয়, তাকেই সে নির্মূল

করেছে। বিধাতার যা-কিছু কল্যাণের দান, আপনার কল্যাণ বিস্মৃত হয়ে মানুষ তাকেই নষ্ট করেছে।

আজ অনুতাপ করবার সময় হয়েছে। আমাদের যা সামান্য শক্তি আছে তাই দিয়ে আমাদের প্রতিবেশে মানুষের কল্যাণকারী বনদেবতার বেদী নির্মাণ করব এই পণ আমরা নিয়েছি। আজকের উৎসবের তাই দুটি অঙ্গ। প্রথম, হলকর্ষণ— হলকর্ষণে আমাদের প্রয়োজন অন্নের জন্য, শস্যের জন্য; আমাদের নিজেদের প্রতি কর্তব্যের পালনের জন্য এই হলকর্ষণ। কিন্তু এর দ্বারা বসুন্ধরার যে অনিষ্ট হয় তা নিবারণ করবার জন্য আমরা কিছু ফিরিয়ে দিই যেন। ধরণীর প্রতি কর্তব্যপালনের জন্য, তার ক্ষতবেদনা নিবারণের জন্য আমাদের বৃক্ষরোপণের এই আয়োজন। কামনা করি, এই অনুষ্ঠানের ফলে চারি দিকে তরুচ্ছায়া বিস্তীর্ণ হোক, ফলে শস্যে এই প্রতিবেশ শোভিত আনন্দিত হোক।

১৭ ভাদ্র ১৩৪৫ কার্তিক ১৩৪৫

অভিভাষণ

শ্রীনিকেতন শিল্পভাণ্ডার -উদ্‌বোধন

আজ প্রায় চল্লিশ বছর হল শিক্ষা ও পল্লীসংস্কারের সংকল্প মনে নিয়ে পদ্মাতীর থেকে শান্তিনিকেতন আশ্রমে আমার আসন বদল করেছি। আমার সম্বল ছিল স্বল্প, অভিজ্ঞতা ছিল সংকীর্ণ, বাল্যকাল থেকেই একমাত্র সাহিত্যচর্চায় সম্পূর্ণ নিবিষ্ট ছিলেম।

কর্ম উপলক্ষে বাংলা পল্লীগ্রামের নিকট-পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘটেছিল। পল্লীবাসীদের ঘরে পানীয় জলের অভাব স্বচক্ষে দেখেছি, রোগের প্রভাব ও যথোচিত অন্নের দৈন্য তাদের জীর্ণ দেহ ব্যাপ্ত করে লক্ষগোচর হয়েছে। অশিক্ষায় জড়তাপ্রাপ্ত মন নিয়ে তারা পদে পদে কিরকম প্রবঞ্চিত ও পীড়িত হয়ে থাকে তার প্রমাণ বার বার পেয়েছি। সেদিনকার নগরবাসী ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায় যখন রাষ্ট্রিক প্রগতির উজান পথে তাঁদের চেষ্টা-চালনায় প্রবৃত্ত ছিলেন তখন তাঁরা চিন্তাও করেন নি যে জনসাধারণের পুঞ্জীভূত নিঃসহায়তার বোঝা নিয়ে অগ্রসর হবার আশার চেয়ে তলিয়ে যাবার আশঙ্কাই প্রবল।

একদা আমাদের রাষ্ট্রযজ্ঞ ভঙ্গ করবার মতো একটা আত্মবিপ্লবের দুর্যোগ দেখা দিয়েছিল। তখন আমার মতো অনধিকারীকেও অগত্যা পাবনা প্রাদেশিক রাষ্ট্রসংসদের

সভাপতিপদে বরণ করা হয়েছিল। সেই উপলক্ষে তখনকার অনেক রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটেছে। তাঁদের মধ্যে কোনো কোনো প্রধানদের বলেছিলেম, দেশের বিরাট জনসাধারণকে অন্ধকার নেপথ্যে রেখে রাষ্ট্ররঙ্গভূমিতে যথার্থ আত্মপ্রকাশ চলবে না। দেখলুম সে কথা স্পষ্ট ভাষায় উপেক্ষিত হল। সেইদিনই আমি মনে মনে স্থির করেছিলুম কবিকল্পনার পাশেই এই কর্তব্যকে স্থাপন করতে হবে, অন্যত্র এর স্থান নেই।

তার অনেক পূর্বেই আমার অল্প সামর্থ্য এবং অল্প কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে পল্লীর কাজ আরম্ভ করেছিলুম। তার ইতিহাসের লিপি বড়ো অক্ষরে ফুটে উঠতে সময় পায় নি। সে কথার আলোচনা এখন থাক্।

আমার সেদিনকার মনের আক্ষেপ কেবল যে কোনো কোনো কবিতাতেই প্রকাশ করেছিলুম তা নয়, এই লেখনীবাহন কবিকে অকস্মাৎ টেনে এনেছিল দুর্গম কাজের ক্ষেত্রে। দরিদ্রের একমাত্র শক্তি ছিল মনোরথ।

খুব বড়ো একটা চাষের ক্ষেত্র পাব এমন আশাও ছিল না, কিন্তু বীজবপনের একটুখানি জমি পাওয়া যেতে পারে এটা অসম্ভব মনে হয় নি।

বীরভূমের নীরস কঠোর জমির মধ্যে সেই বীজবপন কাজের পত্তন করেছিলুম। বীজের মধ্যে যে প্রত্যাশা সে থাকে মাটির নীচে গোপনে। তাকে দেখা যায় না বলেই তাকে সন্দেহ করা সহজ। অন্তত তাকে উপেক্ষা করলে কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। বিশেষত আমার একটা দুর্নাম ছিল আমি ধনীসন্তান, তার চেয়ে দুর্নাম ছিল আমি কবি। মনের ক্ষোভে অনেকবার ভেবেছি যাঁরা ধনীও নন কবিও নন সেই-সব যোগ্য ব্যক্তিরা আজ আছেন কোথায়। যাই হোক, অজ্ঞাতবাস পর্বটাই বিরাটপর্ব। বহুকাল বাইরে পরিচয় দেবার চেষ্টাও করি নি। করলে তার অসম্পূর্ণ নির্ধন রূপ অশ্রদ্ধেয় হত।

কর্মের প্রথম উদ্যোগকালে কর্মসূচী আমার মনের মধ্যে সুস্পষ্ট নির্দিষ্ট ছিল না। বোধ করি আরম্ভের এই অনির্দিষ্টতাই কবিস্বভাবসুলভ। সৃষ্টির আরম্ভমাত্রই অব্যক্তের প্রান্তে। অবচেতন থেকে চেতনলোকে অভিব্যক্তিই সৃষ্টির স্বভাব। নির্মাণকার্যের স্বভাব অন্যরকম। প্ল্যান থেকেই তার আরম্ভ, আর বরাবর সে প্ল্যানের গা ঘেঁষে চলে। একটু এ দিক - ও দিক করলেই কানে ধরে তাকে শায়েস্তা করা হয়। যেখানে প্রাণ-শক্তির লীলা সেখানে আমি বিশ্বাস করি স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে। আমার পল্লীর কাজ সেই পথে চলেছে; তাতে সময় লাগে বেশি, কিন্তু শিকড় নামে গভীরে।

প্ল্যান ছিল না বটে, কিন্তু দুটো-একটা সাধারণ নীতি আমার মনে ছিল, সেটা একটু ব্যাখ্যা করে বলি। আমার 'সাধনা' যুগের রচনা যাঁদের কাছে পরিচিত তাঁরা

জানেন রাষ্ট্রব্যবহারে পরনির্ভরতাকে আমি কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করেছি। স্বাধীনতা পাবার চেষ্টা করব স্বাধীনতার উল্টো পথ দিয়ে এমনতরো বিড়ম্বনা আর হতে পারে না।

এই পরাধীনতা বলতে কেবল পরজাতির অধীনতা বোঝায় না। আত্মীয়ের অধীনতাতেও অধীনতার গ্লানি আছে। আমি প্রথম থেকেই এই কথা মনে রেখেছি যে, পল্লীকে বাইরে থেকে পূর্ণ করবার চেষ্টা কৃত্রিম, তাতেব র্তমানকে দয়া করে ভাবীকালকে নিঃস্ব করা হয়। আপনাকে আপন হতে পূর্ণ করবার উৎস মরুভূমিতেও পাওয়া যায়, সেই উৎস কখনো শুষ্ক হয় না।

পল্লীবাসীদের চিত্তে সেই উৎসেরই সন্ধান করতে হবে। তার প্রথম ভূমিকা হচ্ছে তারা যেন আপন শক্তিকে এবং শক্তির সমবায়কে বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাসের উদ্‌বোধনে আমরা যে ক্রমশ সফল হচ্ছি তার একটা প্রমাণ আছে আমাদের প্রতিবেশী গ্রামগুলিতে সম্মিলিত আত্মচেষ্টায় আরোগ্য-বিধানের প্রতিষ্ঠা।

এই গেল এক, আর-একটা কথা আমার মনে ছিল, সেটাও খুলে বলি।

সৃষ্টিকাজে আনন্দ মানুষের স্বভাবসিদ্ধ, এইখানেই সে পশুদের থেকে পৃথক এবং বড়ো। পল্লী যে কেবল চাষবাস চালিয়ে আপনি অল্প পরিমাণে খাবে এবং আমাদের ভূরিপরিমাণে খাওয়াবে তা তো নয়। সকল দেশেই পল্লীসাহিত্য পল্লীশিল্প পল্লীগান পল্লীনৃত্য নানা আকারে স্বতঃস্ফূর্তিতে দেখা দিয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে আধুনিক কালে বাহিরে পল্লীর জলাশয় যেমন শুকিয়েছে, কলুষিত হয়েছে, অন্তরে তার জীবনের আনন্দ-উৎসেরও সেই দশা। সেইজন্যে যে রূপসৃষ্টি মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, শুধু তার থেকে পল্লীবাসীরা যে নির্বাসিত হয়েছে তা নয়, এই নিরন্তর নীরসতার জন্যে তারা দেহে-প্রাণেও মরে। প্রাণে সুখ না থাকলে প্রাণ আপনাকে রক্ষার জন্যে পুরো পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করে না, একটু আঘাত পেলেই হাল ছেড়ে দেয়। আমাদের দেশের যে-সকল নকল বীরেরা জীবনের আনন্দপ্রকাশের প্রতি পালোয়ানের ভঙ্গিতে ভ্রূকুটি করে থাকেন, তাকে বলেন শৌখিনতা, বলেন বিলাস, তাঁরা জানেন না সৌন্দর্যের সঙ্গে পৌরুষের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ— জীবনে রসের অভাবে বীর্যের অভাব ঘটে। শুকনো কঠিন কাঠে শক্তি নেই, শক্তি আছে পুষ্পপল্লবে আনন্দময় বনস্পতিতে। যারা বীর জাতি তারা যে কেবল লড়াই করেছে তা নয়, সৌন্দর্যরস সম্ভোগ করেছে তারা, শিল্পরূপে সৃষ্টিকাজে মানুষের জীবনকে তারা ঐশ্বর্যবান করেছে, নিজেকে শুকিয়ে মারার অহংকার তাদের নয়— তাদের গৌরব এই যে, অন্য শক্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাদের আছে সৃষ্টিকর্তার আনন্দরূপসৃষ্টির সহযোগিতা করবার শক্তি।

আমার ইচ্ছা ছিল সৃষ্টির এই আনন্দপ্রবাহে পল্লীর শুষ্কচিত্তভূমিকে অভিষিক্ত

করতে সাহায্য করব, নানা দিকে তার আত্মপ্রকাশের নানা পথ খুলে যাবে। এই রূপসৃষ্টি কেবল ধনলাভ করবার অভিপ্রায়ে নয়, আত্মলাভ করবার উদ্দেশে।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। কাছের কোনো গ্রামে আমাদের মেয়েরা সেখানকার মেয়েদের সূচিশিল্পশিক্ষার প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁদের কোনো একজন ছাত্রী একখানি কাপড়কে সুন্দর করে শিল্পিত করেছিল। সে গরিব ঘরের মেয়ে। তার শিক্ষয়িত্রীরা মনে করলেন ঐ কাপড়টি যদি তাঁরা ভালো দাম দিয়ে কিনে নেন তা হলে তার উৎসাহ হবে এবং উপকার হবে। কেনবার প্রস্তাব শুনে মেয়েটি বললে, 'এ আমি বিক্রি করব না।' এই-যে আপন মনের সৃষ্টির আনন্দ, যার দাম সকল দামের বেশি, একে অকেজো বলে উপেক্ষা করব নাকি? এই আনন্দ যদি গভীরভাবে পল্লীর মধ্যে সঞ্চার করা যায় তা হলেই তার যথার্থ আত্মরক্ষার পথ করা যায়। যে বর্বর কেবলমাত্র জীবিকার গণ্ডিতে বাঁধা, জীবনের আনন্দ-প্রকাশে যে অপটু, মানবলোকে তার অসম্মান সকলের চেয়ে শোচনীয়।

আমাদের কর্মব্যবস্থায় আমরা জীবিকার সমস্যাকে উপেক্ষা করি নি, কিন্তু সৌন্দর্যের পথে আনন্দের মহার্ঘতাকেও স্বীকার করেছি। তাল ঠোকার স্পর্ধাকেই আমরা বীরত্বের একমাত্র সাধনা বলে মনে করি নি। আমরা জানি, যে গ্রীস একদা সভ্যতার উচ্চচূড়ায় উঠেছিল তার নৃত্যগীত চিত্রকলা নাট্যকলায় সৌসাম্যের অপরূপ ঔৎকর্ষ্য কেবল বিশিষ্ট সাধারণের জন্যে ছিল না, ছিল সর্বসাধারণের জন্যে। এখনো আমাদের দেশে অকৃত্রিম পল্লীহিতৈষী অনেকে আছেন যাঁরা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পল্লীর প্রতি কর্তব্যকে সংকীর্ণ করে দেখেন। তাঁদের পল্লীসেবার বরাদ্দ কৃপণের মাপে, অর্থাৎ তাঁদের মনে যে পরিমাণ দয়া সে পরিমাণ সম্মান নেই। আমার মনের ভাব তার বিপরীত। সচ্ছলতার পরিমাপে সংস্কৃতির পরিমাপ একেবারে বর্জনীয়। তহবিলের ওজন-দরে মনুষ্যত্বের সুযোগ বণ্টন করা বণিগ্‌বৃত্তির নিকৃষ্টতম পরিচয়। আমাদের অর্থসামর্থ্যের অভাব-বশত আমার ইচ্ছাকে কর্মক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে প্রচলিত করতে পারি নি— তা ছাড়া যাঁরা কর্ম করেন তাঁদেরও মনোবৃত্তিকে ঠিকমত তৈরি করতে সময় লাগবে। তার পূর্বে হয়তো আমারও সময়ের অবসান হবে, আমি কেবল আমার ইচ্ছা জানিয়ে যেতে পারি।

যাঁরা স্থূল পরিমাণের পূজারি তাঁরা প্রায় বলে থাকেন যে, আমাদের সাধনক্ষেত্রের পরিধি নিতান্ত সংকীর্ণ, সুতরাং সমস্ত দেশের পরিমাণের তুলনায় তার ফল হবে অকিঞ্চিৎকর। এ কথা মনে রাখা উচিত— সত্য প্রতিষ্ঠিত আপন শক্তিমহিমায়, পরিমাণের দৈর্ঘ্যে প্রস্থে নয়। দেশের যে অংশকে আমরা সত্যের দ্বারা গ্রহণ করি

সেই অংশেই অধিকার করি সমগ্র ভারতবর্ষকে। সূক্ষ্ম একটি সলতে যে শিখা বহন করে সমস্ত বাতির জ্বলা সেই সলতেরই মুখে।

আজকের দিনের প্রদর্শনীতে শ্রীনিকেতনের একটিমাত্র বিশেষ কর্মপ্রচেষ্টার পরিচয় দেওয়া হল। এই চেষ্টা ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়েছে এবং ক্রমশ পল্লবিত হচ্ছে। চারি দিকের গ্রামের সহযোগিতার মধ্যে একে পরিব্যাপ্ত করতে এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে সময় লেগেছে, আরো লাগবে। তার কারণ আমাদের কাজ কারখানা-ঘরের নয়, জীবনের ক্ষেত্রে এর অভ্যর্থনা। অর্থ না হলে একে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয় বলেই আমরা আশা করি এই-সকল শিল্পকাজ আপন উৎকর্ষের দ্বারাই কেবল যে সম্মান পাবে তা নয়, আত্মরক্ষার সম্বল লাভ করবে।

সবশেষে তোমাদের কাছে আমার চরম আবেদন জানাই। তোমরা রাষ্ট্রপ্রধান। একদা স্বদেশের রাজারা দেশের ঐশ্বর্যবৃদ্ধির সহায়ক ছিলেন। এই ঐশ্বর্য কেবল ধনের নয়, সৌন্দর্যের। অর্থাৎ, কুবেরের ভাণ্ডার এর জন্যে নয়, এর জন্যে লক্ষ্মীর পদ্মাসন।

তোমরা স্বদেশের প্রতীক। তোমাদের দ্বারে আমার প্রার্থনা, রাজার দ্বারে নয়, মাতৃভূমির দ্বারে। সমস্ত জীবন দিয়ে আমি যা রচনা করেছি দেশের হয়ে তোমরা তা গ্রহণ করো। এই কার্যে এবং সকল কার্যেই দেশের লোকের অনেক প্রতিকূলতা পেয়েছি। দেশের সেই বিরোধী বুদ্ধি অনেক সময়ে এই বলে আস্ফালন করে যে, শান্তিনিকেতনে শ্রীনিকেতনে আমি যে কর্মমন্দির রচনা করেছি আমার জীবিতকালের সঙ্গেই তার অবসান। এ কথা সত্য হওয়া যদি সম্ভব হয় তবে তাতে কি আমার অগৌরব, না তোমাদের? তাই আজ আমি তোমাদের এই শেষ কথা বলে যাচ্ছি, পরীক্ষা করে দেখো এ কাজের মধ্যে সত্য আছে কি না, এর মধ্যে ত্যাগের সঞ্চয় পূর্ণ হয়েছে কি না। পরীক্ষায় যদি প্রসন্ন হও তা হলে আনন্দিত মনে এর রক্ষণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করো, যেন একদা আমার মৃত্যুর তোরণদ্বার দিয়েই প্রবেশ ক'রে তোমাদের প্রাণশক্তি একে শাশ্বত আয়ু দান করতে পারে।

২২ অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ পৌষ ১৩৪৫

শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ

শ্রীনিকেতনের কর্মীদের সভায় কথিত

আমার যা বলবার ছিল তা অনেকবার বলেছি, কিছু বাকি রাখি নি। তখন শরীরে শক্তি ছিল, মনে ভাবের প্রবাহ ছিল অবারিত। এখন অস্বাস্থ্য ও জরাতে আমার শক্তিকে খর্ব করেছে, এখন আমার কাছে তোমরা বেশি কিছু প্রত্যাশা কোরো না।

আমি এখানে অনেক দিন পরে এসেছি। তোমাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়— আমার উপস্থিতি ও সঙ্গমাত্র তোমাদের দিতে পারি। প্রথম যখন এই বাড়ি কিনলুম তখন মনে কোনো বিশেষ সংকল্প ছিল না। এইটুকু মাত্র তখন মনে হয়েছিল যে, শান্তিনিকেতন লোকালয়ের থেকে বিচ্ছিন্ন। দূর দেশ থেকে সমাগত ভদ্রলোকের ছেলেদের পাস করবার মতো বিদ্যাদানের ব্যবস্থা সেখানে আছে, আর সেই উপলক্ষে শিক্ষাবিভাগের বরাদ্দ বিস্তার কিছু বেশি দেবার চেষ্টা হয় মাত্র।

শান্তিনিকেতনের কাজের মধ্যেও আমার মনে আর-একটি ধারা বইছিল। শিলাইদা পতিসর এই-সব পল্লীতে যখন বাস করতুম তখন আমি প্রথম পল্লীজীবন প্রত্যক্ষ করি। তখন আমার ব্যবসায় ছিল জমিদারি। প্রজারা আমার কাছে তাদের সুখ-দুঃখ নালিশ-আবদার নিয়ে আসত। তার ভিতর থেকে পল্লীর ছবি আমি দেখেছি। এক দিকে বাইরের ছবি— নদী, প্রান্তর, ধানখেত, ছায়াতরুতলে তাদের কুটীর— আর-এক দিকে তাদের অন্তরের কথা। তাদের বেদনাও আমার কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে পৌঁছত।

আমি শহরের মানুষ, শহরে আমার জন্ম। আমার পূর্বপুরুষেরা কলকাতার আদিম বাসিন্দা। পল্লীগ্রামের কোনো স্পর্শ আমি প্রথম-বয়সে পাই নি। এইজন্য যখন প্রথম আমাকে জমিদারির কাজে নিযুক্ত হতে হল তখন মনে দ্বিধা উপস্থিত হয়েছিল, হয়তো আমি এ কাজ পারব না, হয়তো আমার কর্তব্য আমার কাছে অপ্রিয় হতে পারে। জমিদারির কাজকর্ম, হিসাবপত্র, খাজনা-আদায়, জমা-ওয়াশীল— এতে কোনোকালেই অভ্যস্ত ছিলুম না; তাই অজ্ঞতার বিভীষিকা আমার মনকে আচ্ছন্ন করেছিল। সেই অঙ্ক ও সংখ্যার বাঁধনে জড়িয়ে পড়েও প্রকৃতিস্থ থাকতে পারব এ কথা তখন ভাবতে পারি নি।

কিন্তু কাজের মধ্যে যখন প্রবেশ করলুম, কাজ তখন আমাকে পেয়ে বসল।

আমার স্বভাব এই যে, যখন কোনো দায় গ্রহণ করি তখন তার মধ্যে নিজেকে নিমগ্ন করে দিই, প্রাণপণে কর্তব্য সম্পন্ন করি, ফাঁকি দিতে পারি নে। এক সময় আমাকে মাস্টারি করতে হয়েছিল, তখন সেই কাজ সমস্ত মন দিয়ে করেছি, তাতে নিমগ্ন হয়েছি এবং তার মধ্যে আনন্দ পেয়েছি। যখন আমি জমিদারির কাজে প্রবৃত্ত তখন তার জটিলতা ভেদ করে রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে চেষ্টা করেছি। আমি নিজে চিন্তা করে যে-সকল রাস্তা বানিয়েছিলুম তাতে আমি খ্যাতিলাভ করেছিলুম। এমন-কি, পার্শ্ববর্তী জমিদারেরা আমার কাছে তাঁদের কর্মচারী পাঠিয়ে দিতেন, কী প্রণালীতে আমি কাজ করি তাই জানবার জন্যে।

আমি কোনোদিন পুরাতন বিধি মেনে চলি নি। এতে আমার পুরাতন কর্মচারীরা বিপদে পড়ল। তারা জমিদারির কাগজপত্র এমন ভাবে রাখত যা আমার পক্ষে দুর্গম। তারা আমাকে যা বুঝিয়ে দিত তাই বুঝতে হবে, এই তাদের মতলব। তাদের প্রণালী বদলে দিলে কাজের ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, এই ছিল তাদের ভয়। তারা আমাকে বলত যে, যখন মামলা হবে তখন আদালতে নতুন ধারার কাগজপত্র গ্রহণ করবে না, সন্দেহের চোখে দেখবে। কিন্তু যেখানে কোনো বাধা সেখানে আমার মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, বাধা আমি মানতে চাই নে। আমি আদ্যোপান্ত পরিবর্তন করেছিলুম, তাতে ফলও হয়েছিল ভালো।

প্রজারা আমাকে দর্শন করতে আসত, তাদের জন্য সর্বদাই আমার দ্বার ছিল অবারিত— সন্ধ্যা হোক, রাত্রি হোক, তাদের কোনো মানা ছিল না। এক-এক সময় সমস্ত দিন তাদের দরবার নিয়ে দিন কেটে গেছে, খাবার সময় কখন অতীত হয়ে যেত টের পেতেম না। আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে এ কাজ করেছি। যে ব্যক্তি বালককাল থেকে ঘরের কোণে কাটিয়েছে, তার কাছে গ্রামের অভিজ্ঞতা এই প্রথম। কিন্তু কাজের দুরূহতা আমাকে তৃপ্তি দিয়েছে, উৎসাহিত করেছে, নূতন পথনির্মাণের আনন্দ আমি লাভ করেছি।

যতদিন পল্লীগ্রামে ছিলেম ততদিন তাকে তন্ন তন্ন করে জানবার চেষ্টা আমার মনে ছিল। কাজের উপলক্ষে এক গ্রাম থেকে আর-এক দূর গ্রামে যেতে হয়েছে, শিলাইদা থেকে পতিসর, নদীনালা-বিলের মধ্য দিয়ে— তখন গ্রামের বিচিত্র দৃশ্য দেখেছি। পল্লীবাসীদের দিনকৃত্য, তাদের জীবনযাত্রার বিচিত্র চিত্র দেখে প্রাণ ঔৎসুক্যে ভরে উঠত। আমি নগরে পালিত, এসে পড়লুম পল্লীশ্রীর কোলে— মনের আনন্দে কৌতূহল মিটিয়ে দেখতে লাগলুম। ক্রমে এই পল্লীর দুঃখদৈন্য আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল, তার জন্যে কিছু করব এই আকাঙ্ক্ষায় আমার মন ছট্‌ফট্‌ করে

উঠেছিল। তখন আমি যে জমিদারি-ব্যবসায় করি, নিজের আয়-ব্যয় নিয়ে ব্যস্ত, কেবল বণিক্-বৃত্তি করে দিন কাটাই, এটা নিতান্তই লজ্জার বিষয় মনে হয়েছিল। তার পর থেকে চেষ্টা করতুম— কী করলে এদের মনের উদ্‌বোধন হয়, আপনাদের দায়িত্ব এরা আপনি নিতে পারে। আমরা যদি বাইরে থেকে সাহায্য করি তাতে এদের অনিষ্টই হবে। কী করলে এদের মধ্যে জীবনসঞ্চার হবে, এই প্রশ্নই তখন আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। এদের উপকার করা শক্ত, কারণ এরা নিজেকে বড়ো অশ্রদ্ধা করে। তারা বলত, 'আমরা কুকুর, কষে চাবুক মারলে তবে আমরা ঠিক থাকি।'

আমি সেখানে থাকতে একদিন পাশের গ্রামে আগুন লাগল। গ্রামের লোকেরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল, কিছু করতে পারে না। তখন পাশের গ্রামের মুসলমানেরা এসে তাদের আগুন নেবাল। কোথাও জল নেই, তাদের ঘরের চাল ভেঙে আগুন নিবারণ করতে হল।

নিজের ভালো তারা বোঝে না, ঘরভাঙার জন্য আমার লোকেরা তাদের মারধর করেছিল। মেরে ধরে এদের উপকার করতে হয়।

অগ্নিকাণ্ড শেষ হয়ে গেলে তারা আমার কাছে এসে বললে, 'ভাগ্যিস বাবুরা আমাদের ঘর ভাঙলে, তাই বাঁচতে পেরেছি!' তখন তারা খুব খুশি, বাবুরা মারধর করাতে তাদের উপকার হয়েছে তা তারা মেনে নিল, যদিও আমি সেটাতে লজ্জা পেয়েছি।

আমার শহুরে বুদ্ধি। আমি ভাবলুম, এদের গ্রামের মাঝখানে ঘর বানিয়ে দেব; এখানে দিনের কাজের পর তারা মিলবে; খবরের কাগজ, রামায়ণ-মহাভারত পড়া হবে; তাদের একটা ক্লাবের মতো হবে। সন্ধ্যাবেলায় তাদের নিরানন্দ জীবনের কথা ভাবতে আমার মন ব্যথিত হত; সেই একঘেয়ে কীর্তনের একটি পদের কেউ পুনরাবৃত্তি করছে, এইমাত্র।

ঘর বাঁধা হল, কিন্তু সেই ঘর ব্যবহার হল না। মাস্টার নিযুক্ত করলুম, কিন্তু নানা অজুহাতে ছাত্র জুটল না।

তখন পাশের গ্রাম থেকে মুসলমানেরা আমার কাছে এসে বললে, ওরা যখন ইস্কুল নিচ্ছে না তখন আমাদের একজন পণ্ডিত দিন, আমরা তাকে রাখব, তার বেতন দেব, তাকে খেতে দেব।

এই মুসলমানদের গ্রামে যে পাঠশালা তখন স্থাপিত হয়েছিল তা সম্ভবত এখনো থেকে গিয়েছে। অন্য গ্রামে যা করতে চেয়েছিলুম তা কিছুই হয় নি। আমি দেখলুম যে, নিজের উপর নিজের আস্থা এরা হারিয়েছে।

প্রাচীন কাল থেকে আমাদের দেশে পরের উপর নির্ভর করবার ব্যবস্থা চলে আসছে। একজন সম্পন্ন লোক গ্রামের পালক ও আশ্রয়; চিকিৎসা, শিক্ষার ভার, তাঁরই উপর ছিল। এক সময় এই ব্যবস্থার আমি প্রশংসা করেছি। যারা ধনী, ভারতবর্ষের সমাজ তাদের উপর এইভাবে পরোক্ষ ট্যাক্স বসিয়েছে। সে ট্যাক্স তারা মেনে নিয়েছে; পুকুরের পঙ্কোদ্ধার, মন্দিরনির্মাণ, তারাই করেছে। ব্যক্তিবিশেষ নিজের সম্পত্তির সম্পূর্ণ ভোগ নিজের ইচ্ছামত করতে পারে নি। কিন্তু ইউরোপের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যনীতিতে এর কোনো বাধা নেই। গ্রামের এই-সব কর্তব্যসম্পাদনেই ছিল তাদের সম্মান; এখনকার মতো খেতাব দেওয়ার প্রথা ছিল না, সংবাদপত্রে তাদের স্তবগান বেরত না। লোকে খাতির করে তাদের বাবু বা মশায় বলত, এর চেয়ে বড়ো খেতাব তখন বাদশা বা নবাবরাও দিতে পারত না। এইরকমে সমস্ত গ্রামের শ্রী নির্ভর করত সম্পন্ন গৃহস্থদের উপর। আমি এই ব্যবস্থার প্রশংসা করেছি, কিন্তু এ কথাও সত্য যে এতে আমাদের স্বাবলম্বনের শক্তি ক্ষীণ হয়ে গেছে।

আমার জমিদারিতে নদী বহুদূরে ছিল, জলকষ্টের অন্ত ছিল না। আমি প্রজাদের বললুম, 'তোরা কুয়ো খুঁড়ে দে, আমি বাঁধিয়ে দেব।' তারা বললে, 'এ যে মাছের তেলে মাছ ভাজবার ব্যবস্থা হচ্ছে। আমরা কুয়ো খুঁড়ে দিলে, আপনি স্বর্গে গিয়ে জলদানের পুণ্যফল আদায় করবেন আমাদের পরিশ্রমে!' আমি বললুম, 'তবে আমি কিছুই দেব না।' এদের মনের ভাব এই যে 'স্বর্গে এর জমাখরচের হিসাব রাখা হচ্ছে— ইনি পাবেন অনন্ত পুণ্য, ব্রহ্মলোক বা বিষ্ণুলোকে চলে যাবেন, আর আমরা সামান্য জল মাত্র পাব!'

আর-একটি দৃষ্টান্ত দিই। আমাদের কাছারি থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত উঁচু করে রাস্তা বানিয়ে দিয়েছিলুম। রাস্তার পাশে যে-সব গ্রাম তার লোকদের বললুম, 'রাস্তা রক্ষা করবার দায়িত্ব তোমাদের।' তারা যেখানে রাস্তা পার হয় সেখানে গোরুর গাড়ির চাকায় রাস্তা ভেঙে যায়, বর্ষাকালে দুর্গম হয়। আমি বললুম, 'রাস্তায় যে খাদ হয় তার জন্যে তোমরাই দায়ী, তোমরা সকলে মিলে সহজেই ওখানটা ঠিক করে দিতে পারো।' তারা জবাব দিলে, 'বাঃ, আমরা রাস্তা করে দেব আর কুষ্টিয়া থেকে বাবুদের যাতায়াতের সুবিধা হবে!' অপরের কিছু সুবিধা হয় এ তাদের সহ্য হয় না। তার চেয়ে তারা নিজেরা কষ্টভোগ করে সেও ভালো। এদের ভালো করা বড়ো কঠিন।

আমাদের সমাজে যারা দরিদ্র তারা অনেক অপমান সয়েছে, যারা শক্তিমান তারা অনেক অত্যাচার করেছে, তার ছবি আমি নিজেই দেখেছি। অন্য দিকে এই-সব

শক্তিমানেরাই গ্রামের সকল পূর্তকাজ করে দিয়েছে। অত্যাচার ও আনুকূল্য এই দুইয়ের ভিতর দিয়ে পল্লীবাসীর মন অসহায় ও আত্মসম্মানহীন হয়ে পড়েছে। এরা মনে করে এদের দুর্দশা পূর্বজন্মের কর্মফল, আবার জন্মান্তরে ভালো ঘরে জন্ম হলে তাদের ভালো হতে পারে, কিন্তু বর্তমান জীবনের দুঃখদৈন্য থেকে কেউ তাদের বাঁচাতে পারবে না। এই মনোবৃত্তি তাদের একান্ত অসহায় করে তুলেছে।

একদিন ধনীরা জলদান, শিক্ষার ব্যবস্থা, পুণ্য কাজ বলে মনে করত। ধনীদের কল্যাণে গ্রাম ভালো ছিল। যেই তারা গ্রাম থেকে শহরে বাস করতে আরম্ভ করেছে অমনি জল গেল শুকিয়ে, কলেরা ম্যালেরিয়া গ্রামকে আক্রমণ করলে, গ্রামে গ্রামে আনন্দের উৎস বন্ধ হয়ে গেল। আজকার গ্রামবাসীদের মতো নিরানন্দ জীবন আর কারো কল্পনাও করা যায় না। যাদের জীবনে কোনো সুখ কোনো আনন্দ নেই তারা হঠাৎ কোনো বিপদ বা রোগ হলে রক্ষা পায় না। বাইরে থেকে এরা অনেক অত্যাচার অনেক দিন ধরে সহ্য করেছে। জমিদারের নায়েব, পেয়াদা, পুলিস, সবাই এদের উপর উৎপাত করেছে, এদের কান মলে দিয়েছে।

এই-সব কথা যখন ভেবে দেখলুম তখন এর কোনো উপায় ভেবে পেলুম না। যারা বহুযুগ থেকে এইরকম দুর্বলতার চর্চা করে এসেছে, যারা আত্মনির্ভরে একেবারেই অভ্যস্ত নয়, তাদের উপকার করা বড়োই কঠিন। তবুও আরম্ভ করেছিলুম কাজ। তখনকার দিনে এই কাজে আমার একমাত্র সহায় ছিলেন কালীমোহন। তাঁর রোজ দু-বেলা জ্বর আসত। ঔষধের বাক্স খুলে আমি নিজেই তাঁর চিকিৎসা করতুম। মনে করতুম তাঁকে বাঁচাতে পারব না।

আমি কখনো গ্রামের লোককে অশ্রদ্ধা করি নি। যারা পরীক্ষায় পাস ক'রে নিজেদের শিক্ষিত ও ভদ্রলোক মনে করে তারা এদের প্রতি অশ্রদ্ধাপরায়ণ। শ্রদ্ধা করতে তারা জানে না। আমাদের শাস্ত্রে বলে, শ্রদ্ধয়া দেয়ম্, দিতে যদি হয় তবে শ্রদ্ধা করে দিতে হবে।

এইরকমে আমি কাজ আরম্ভ করেছিলুম। কুঠিবাড়িতে বসে দেখতুম, চাষীরা হাল-বলদ নিয়ে চাষ করতে আসত; তাদের ছোটো ছোটো টুকরো টুকরো জমি। তারা নিজের নিজের জমি চাষ করে চলে যেত, আমি দেখে ভাবতেম— অনেকটা শক্তি তাদের অপব্যয় হচ্ছে। আমি তাদের ডেকে বললুম, 'তোমরা সমস্ত জমি একসঙ্গে চাষ করো; সকলের যা সম্বল আছে, সামর্থ্য আছে তা একত্র করো; তা হলে অনায়াসে ট্রাক্টর দিয়ে তোমাদের জমি চাষ করা চলবে। সকলে একত্র কাজ করলে জমির সামান্য তারতম্যে কিছু যায়-আসে না; যা লাভ হবে তা তোমরা ভাগ করে নিতে পারবে। তোমাদের সমস্ত ফসল গ্রামে এক জায়গায় রাখবে,

সেখান থেকে মহাজনেরা উপযুক্ত মূল্য দিয়ে কিনে নিয়ে যাবে।' শুনে তারা বললে, খুব ভালো কথা, কিন্তু করবে কে। আমার যদি বুদ্ধি ও শিক্ষা থাকত তা হলে বলতুম, আমি এই দায়িত্ব নিতে রাজি আছি। ওরা আমাকে জানত। কিন্তু উপকার করব বললেই উপকার করা যায় না। অশিক্ষিত উপকারের মতো এমন সর্বনেশে আর-কিছুই নেই। আমাদের দেশে এক সময় শহরের যুবক ছাত্রেরা গ্রামের উপকার করতে লেগে গিয়েছিলেন। গ্রামের লোক তাদের উপহাস করত; বলত, 'ঐ রে চার-আনার বাবুরা আসছে!' কী করে তারা এদের উপকার করবে— না জানে তাদের ভাষা, না আছে তাদের মনের সঙ্গে পরিচয়।

তখন থেকে আমার মনে হয়েছে যে, পল্লীর কাজ করতে হবে। আমি আমার ছেলেকে আর সন্তোষকে পাঠালুম কৃষিবিদ্যা আর গোষ্ঠবিদ্যা শিখে আসতে। এইরকম নানাভাবে চেষ্টা ও চিন্তা করতে লাগলুম।

ঠিক সেই সময় এই বাড়িটা কিনেছিলুম। ভেবেছিলুম, শিলাইদহে যা কাজ আরম্ভ করেছি, এখানেও তাই করব। ভাঙা বাড়ি, সবাই বলত ভুতুড়ে বাড়ি। এর পিছনে আমাকে অনেক টাকা খরচ করতে হয়েছে। তার পর কিছুদিন চুপ করে বসে ছিলুম। অ্যাণ্ড্রুজ বললেন, 'বেচে ফেলুন।' আমি মনে ভাবলুম, যখন কিনেছি, তখন তার একটা-কিছু তাৎপর্য আছে— আমার জীবনের যে দুটি সাধনা, এখানে হয়তো তার একটি সফল হবে। কবে হবে, কেমন করে হবে, তখন তা জানতুম না। অনুর্বর ক্ষেত্রেও বীজ পড়লে দেখা যায় হঠাৎ একটি অঙ্কুর বেরিয়েছে, কোনো শুভলগ্নে। কিন্তু তখন তার কোনো লক্ষণ দেখা যায় নি। সব জিনিসেরই তখন অভাব। তার পর, আস্তে আস্তে বীজ অঙ্কুরিত হতে চলল।

এই কাজে আমার বন্ধু এল্‌ম্‌হার্স্ট্‌ আমাকে খুব সাহায্য করেছেন। তিনিই এই জায়গাকে একটি স্বতন্ত্র কর্মক্ষেত্র করে তুললেন। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে একে জড়িয়ে দিলে ঠিক হত না। এল্‌ম্‌হার্স্টের হাতে এর কাজ অনেকটা এগিয়ে গেল।

গ্রামের কাজের দুটো দিক আছে। কাজ এখান থেকে করতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাও করতে হবে। এদের সেবা করতে হলে শিক্ষালাভ করা চাই।

সবশেষে একটি কথা তোমাদের বলতে চাই— চেষ্টা করতে হবে যেন এদের ভিতর থেকে, আমাদের অলক্ষ্যে একটা শক্তি কাজ করতে থাকে। যখন আমি 'স্বদেশী সমাজ'[১] লিখেছিলুম তখন এই কথাটি আমার মনে জেগেছিল। তখন আমার

১ বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১৩১১। রবীন্দ্র-রচনাবলী ৩। স্বদেশী সমাজ (১৩৬৯)

বলবার কথা ছিল এই যে, সমগ্র দেশ নিয়ে চিন্তা করবার দরকার নেই। আমি একলা সমস্ত ভারতবর্ষের দায়িত্ব নিতে পারব না। আমি কেবল জয় করব একটি বা দুটি ছোটো গ্রাম। এদের মনকে পেতে হবে, এদের সঙ্গে একত্র কাজ করবার শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। সেটা সহজ নয়, খুব কঠিন কৃচ্ছ্রসাধন। আমি যদি কেবল দুটি-তিনটি গ্রামকেও মুক্তি দিতে পারি অজ্ঞতা অক্ষমতার বন্ধন থেকে, তবে সেখানেই সমগ্র ভারতের একটি ছোটো আদর্শ তৈরি হবে— এই কথা তখন মনে জেগেছিল, এখনো সেই কথা মনে হচ্ছে।

এই কখানা গ্রামকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করতে হবে— সকলে শিক্ষা পাবে, গ্রাম জুড়ে আনন্দের হাওয়া বইবে, গান-বাজনা কীর্তন-পাঠ চলবে, আগের দিনে যেমন ছিল। তোমরা কেবল কখানা গ্রামকে এইভাবে তৈরি করে দাও। আমি বলব এই কখানা গ্রামই আমার ভারতবর্ষ। তা হলেই প্রকৃতভাবে ভারতকে পাওয়া যাবে।

ভাদ্র ১৩৪৬

হলকর্ষণ

শ্রীনিকেতন হলকর্ষণ -উৎসবে কথিত

পৃথিবী একদিন যখন সমুদ্রস্নানের পর জীবধাত্রীরূপ ধারণ করলেন তখন তাঁর প্রথম যে প্রাণের আতিথ্যক্ষেত্র সে ছিল অরণ্যে। তাই মানুষের আদিম জীবনযাত্রা ছিল অরণ্যচররূপে। পুরাণে আমরা দেখতে পাই, এখন যে-সকল দেশ মরুভূমির মতো, প্রখর গ্রীষ্মের তাপে উত্তপ্ত, সেখানে এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত দণ্ডক নৈমিষ খাণ্ডব ইত্যাদি বড়ো বড়ো সুনিবিড় অরণ্য ছায়া বিস্তার করেছিল। আর্য ঔপনিবেশিকেরা প্রথম আশ্রয় পেয়েছিলেন এই-সব অরণ্যে, জীবিকা পেয়েছিলেন এরই ফলে মূলে, আর আত্মজ্ঞানের সূচনা পেয়েছিলেন এরই জনবিরল শান্তির গভীরতায়।

জীবনযাত্রার প্রথম অবস্থায় মানুষ জীবিকানির্বাহের জন্য পশুহত্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিল। তখন সে জীবজননী ধরিত্রীর বিদ্রোহাচরণ করেছে। এই বর্বরতার যুগে মানুষের মনে মৈত্রীর স্থান ছিল না। হিংস্রতা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

তখন অরণ্য মানুষের পথ রোধ করে নিবিড় হয়ে থাকত। সে ছিল এক দিকে আশ্রয়, অন্য দিকে বাধা। যারা এই দুর্গমতার মধ্যে একত্র হবার চেষ্টা করেছে

তারা অগত্যা ছোটো সীমানায় ছোটো ছোটো দল বেঁধে বাস করেছে। এক দল অন্য দলের প্রতি সংশয় ও বিদ্বেষের উদ্দীপনাকে নিরন্তর জ্বালিয়ে রেখেছে। এইরকম মনোবৃত্তি নিয়ে তাদের ধর্মানুষ্ঠান হয়েছে নরঘাতক। মানুষ মানুষের সবচেয়ে নিদারুণ শত্রু হয়ে উঠেছে, সেই শত্রুতার আজও অবসান হয় নি। এই-সব দুষ্প্রবেশ্য বাসস্থান ও পশুচারণভূমির অধিকার হতে পরস্পরকে বঞ্চিত করবার জন্য তারা ক্রমাগত নিরন্তর লড়াই করে এসেছে। পৃথিবীতে যে-সব জন্তু টিঁকে আছে তারা স্বজাতিহত্যার দ্বারা এরকম পরস্পর ধ্বংসসাধনের চর্চা করে না।

এই দুর্লঙ্ঘ্যতায় বেষ্টিত আদিম লোকালয়ে দস্যুবৃত্তি ও ঘোর নির্দয়তার মধ্যে মানুষের জীবনযাত্রা আরম্ভ হয়েছিল এবং হিংস্রশক্তিকেই নৃত্যে গানে শিল্পকলায় ধর্মানুষ্ঠানে সকলের চেয়ে তারা গৌরব দিয়েছিল। তার পর কখনো দৈবক্রমে কখনো বুদ্ধি খাটিয়ে মানুষ সভ্যতার অভিমুখে আপনার যাত্রাপথ আবিষ্কার করে নিয়েছে। এই দিকে তার প্রথম সহায়-আবিষ্কার আগুন। সেই যুগে আগুনের আশ্চর্য ক্ষমতাতে মানুষ প্রকৃতির শক্তির যে প্রভাব দেখেছিল, আজও নানা দিকে তার ক্রিয়া চলেছে। আজও আগুন নানা মূর্তিতে সভ্যতার প্রধান বাহন। এই আগুন ছিল ভারতীয় আর্যদের ধর্মানুষ্ঠানের প্রথম মার্গ।

তার পর এল কৃষি। কৃষির মধ্য দিয়ে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেছে। পৃথিবীর গর্ভে যে জননশক্তি প্রচ্ছন্ন ছিল সেই শক্তিকে আহ্বান করেছে। তার পূর্বে আহার্যের আয়োজন ছিল স্বল্প পরিমাণে এবং দৈবায়ত্ত। তার ভাগ ছিল অল্প লোকের ভোগে, এইজন্য তাতে স্বার্থপরতাকে শান দিয়েছে এবং পরস্পর হানাহানিকে উদ্যত করে রেখেছে। সেই সঙ্গে জাগল ধর্মনীতি। কৃষি সম্ভব করেছে জনসমবায়। কেননা, বহু লোক একত্র হলে যা তাদের ধারণ করে রাখতে পারে তাকেই বলে ধর্ম। ভেদবুদ্ধি বিদ্বেষবুদ্ধিকে দমন করে শ্রেয়োবোধ ঐক্যবোধকে জাগিয়ে তোলবার ভার ধর্মের 'পরে। জীবিকা যত সহজ হয় ততই ধর্মের পক্ষে সহজ হয় প্রীতিমূলক ঐক্যবন্ধনে বাঁধা। বস্তুত মানবসভ্যতায় কৃষিই প্রথম পত্তন করেছে সাত্ত্বিকতার ভূমিকা। সভ্যতার সোপানে আগুনের পরেই এসেছে কৃষি। একদিন কৃষিক্ষেত্রে ভূমিকে মানুষ আহ্বান করেছিল আপন সখ্যে, সেই ছিল তার একটা বড়ো যুগ। সেই দিন সখ্যধর্ম মানুষের সমাজে প্রশস্ত স্থান পেয়েছে।

ভারতবর্ষে প্রাচীন যুগে আরণ্যক সমাজ শাখায় শাখায় বিভক্ত ছিল। তখন যাগযজ্ঞ ছিল বিশেষ দলের বিশেষ ফললাভের কামনায়। ধনসম্পদ্ ও শত্রুজয়ের আশায় বিশেষ মন্ত্রের বিশেষ শক্তি কল্পনা করে তারই সহযোগে বিশেষ পদ্ধতির যজ্ঞানুষ্ঠান

তখন গৌরব পেত। কিন্তু যেহেতু এর লক্ষ্য ছিল বাহ্য ফললাভ, এইজন্যে এর মধ্যে বিষয়বুদ্ধিই ছিল মুখ্য; প্রতিযোগিতার সংকীর্ণ সীমায় ছিল এর মূল্য। বৃহৎ ঐক্যবুদ্ধি এর মধ্যে মুক্তি পেত না।

তার পরে এল এক যুগ, তাকে জনক রাজর্ষির যুগ নাম দিতে পারি। তখন দেখা গেল দুই বিদ্যার আবির্ভাব। ব্যাবহারিক দিকে কৃষিবিদ্যা, পারমার্থিক দিকে ব্রহ্মবিদ্যা। কৃষিবিদ্যায় জনসমাজকে দিলে ব্যক্তিগত স্বার্থের সংকীর্ণ সীমা থেকে বহুল পরিমাণে মুক্তি, সম্ভব করলে সমাজের বহু লোকের মধ্যে জীবিকার মিলন। আর ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যাত্মক্ষেত্রে ঘোষণা করলে— আত্মবৎ সর্বভূতেষু য পশ্যতি স পশ্যতি।

কৃষিবিদ্যাকে সেদিন আর্যসমাজ কত বড়ো মূল্যবান্ বলে জেনেছিল তার আভাস পাই রামায়ণে। হলকর্ষণরেখাতেই সীতা পেয়েছিলেন রূপ, অহল্যা ভূমিকে হলযোগ্য করেছিলেন রাম। এই হলকর্ষণই একদিন অরণ্য পর্বত ভেদ করে ভারতের উত্তরকে দক্ষিণকে এক করেছিল।

যে অনার্য রাক্ষসেরা আর্যদের শত্রু ছিল, তাদের শক্তিকে পরাভূত করে তাদের হাত থেকে এই নূতন বিদ্যাকে রক্ষা করতে, উদ্ধার করতে বিস্তর প্রয়াস করতে হয়েছিল।

পৃথিবীর দান গ্রহণ করবার সময় লোভ বেড়ে উঠল মানুষের। অরণ্যের হাত থেকে কৃষিক্ষেত্র জয় করে নিলে, অবশেষে কৃষিক্ষেত্রের একাধিপত্য অরণ্যকে হটিয়ে দিতে লাগল। নানা প্রয়োজনে গাছ কেটে কেটে পৃথিবীর ছায়াবস্ত্র হরণ করে তাকে দিতে লাগল নগ্ন করে। তাতে তার বাতাসকে করতে লাগল উত্তপ্ত, মাটি উর্বরতার ভাণ্ডার দিতে লাগল নিঃস্ব করে। অরণ্যের-আশ্রয়-হারা আর্যাবর্ত আজ তাই খরসূর্যতাপে দুঃসহ।

এই কথা মনে রেখে কিছুদিন পূর্বে আমরা যে অনুষ্ঠান করেছিলুম সে হচ্ছে বৃক্ষরোপণ, অপব্যয়ী সন্তান -কর্তৃক লুণ্ঠিত মাতৃভাণ্ডার পূরণ করবার কল্যাণ-উৎসব।

আজকার অনুষ্ঠান পৃথিবীর সঙ্গে হিসাব-নিকাশের উপলক্ষে নয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলবার, পৃথিবীর অন্নসত্রে একত্র হবার যে বিদ্যা মানবসভ্যতার মূলমন্ত্র যার মধ্যে, সেই কৃষিবিদ্যার প্রথম উদ্ভাবনের আনন্দস্মৃতিরূপে গ্রহণ করব এই অনুষ্ঠানকে।

কৃষিযুগের পরে সম্প্রতি এসেছে সদর্পে যন্ত্রবিদ্যা। তার লৌহবাহু কখনো মানুষকে প্রচণ্ডবেগে মারছে অগণিত সংখ্যায়, কখনো তার প্রাঙ্গণে পণ্যদ্রব্য দিচ্ছে ঢেলে প্রভূত পরিমাণে। মানুষের অসংযত লোভ কোথাও আপন সীমা খুঁজে পাচ্ছে না। একদিন মানুষের জীবিকা যখন ছিল সংকীর্ণ সীমায় পরিমিত, তখন মানুষ ছিল

পরস্পরের নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতা তখন তারা সর্বদাই মারের অস্ত্র নিয়ে ছিল উদ্যত। সে মার আজ আরো দারুণ হয়ে উঠল। আজ তার ধনের উৎপাদন যতই হচ্ছে অপরিমিত তার লোভ ততই তাকে ছাড়িয়ে চলেছে, অস্ত্রশস্ত্রে সমাজ হয়ে উঠছে কণ্টকিত। আগেকার দিনে পরস্পর ঈর্ষায় মানুষকে মানুষ মারত, কিন্তু তার মারবার অস্ত্র ছিল দুর্বল, তার হত্যার পরিমাণ ছিল যৎসামান্য। নইলে এত দীর্ঘ যুগের ইতিহাসে এত দিনে একটা পৃথিবীব্যাপী কবরস্থান সমুদ্রের এক তীর থেকে আর-এক তীর অধিকার করে থাকত। আজ যন্ত্রবিদ্যা মানুষের হাতে অস্ত্র দিয়েছে বহুশত শতঘ্নী, আর যুদ্ধের শেষে হত্যার হিসাব ছাড়িয়ে চলেছে প্রভূত শতসংখ্যা। আত্মশত্রু আত্মঘাতী মানুষ ধ্বংসবন্যার স্রোতে গা ভাসান দিয়েছে। মানুষের আরম্ভ আদিম বর্বরতায়, তারও প্রেরণা ছিল লোভ; মানুষের চরম অধ্যায় সর্বনেশে বর্বরতায়, সেখানেও লোভ মেলেছে আপন করাল কবল। জ্বলে উঠেছে প্রকাণ্ড একটা চিতা— সেখানে মানুষের সঙ্গে সঙ্গে সহমরণে চলেছে তার ন্যায়নীতি, তার বিদ্যাসম্পদ্, তার ললিতকলা।

যন্ত্রযুগের বহুপূর্ববর্তী সেই দিনের কথা আজ আমরা স্মরণ করব যখন পৃথিবী স্বহস্তে সন্তানকে পরিমিত অন্ন পরিবেশন করেছেন, যা তার স্বাস্থ্যের পক্ষে, তার তৃপ্তির পক্ষে যথেষ্ট— যা এত বীভৎস রকমে উদ্‌বৃত্ত ছিল না, যার স্তূপের উপরে কুশ্রী লোলুপতায় মানুষ নির্লজ্জভাবে নির্দয় আত্মবিস্মৃত হয়ে লুটোপুটি হানাহানি করতে পারে।

১২ ভাদ্র ১৩৪৬ আশ্বিন ১৩৪৬

পল্লীসেবা

শ্রীনিকেতন বার্ষিক উৎসবে কথিত

এক সময়ে আমি যখন ইংলণ্ডে গিয়েছিলাম আমার সুযোগ হয়েছিল কিছুকাল এক পল্লীতে এক চাষী গৃহস্থের ঘরে বাস করবার। আমি শহরবাসী হলেও সেখানকার পল্লীতে আমার কোনো অসুবিধা হয় নি, আমি আনন্দেই ছিলুম। সেই সময়ে ইংলণ্ডের পল্লীবাসীদের মধ্যে একটা বিষয় লক্ষ্য করেছিলুম। দেখেছিলুম তারা সব সময়েই অসন্তুষ্ট; গ্রামের ভিতর তাদের চিত্তের সম্পূর্ণ পুষ্টি নেই, তারা কবে লণ্ডনে যাবে এইজন্য দিন-রাত্রি তাদের উদ্‌বেগ। জিজ্ঞাসা করে বুঝলুম— য়ুরোপীয় সভ্যতার

সমস্ত আয়োজন শিক্ষা আরোগ্যবিধান প্রভৃতি সমস্ত বন্দোবস্ত সংহত বড়ো বড়ো শহরে, এইজন্য শহর গ্রামবাসীর চিত্তকে আকর্ষণ করে, গ্রামে তারা বোধ করে বঞ্চিত।

তবে য়ুরোপে শহর ও গ্রামের এই-যে ভাগ তা প্রধানত পরিমাণগত, শহরে যা বহুল পরিমাণে পাওয়া যায় গ্রামে সেটা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া সম্ভব হয় না।

য়ুরোপে নগরই সমস্ত ঐশ্বর্যের পীঠস্থান, এটাই য়ুরোপীয় সভ্যতার লক্ষণ। এইজন্যই গ্রাম থেকে শহরে চিত্তধারা আকৃষ্ট হয়ে চলছে। কিন্তু এটা লক্ষ্য করতে হবে যে, শহর ও গ্রামের চিত্তধারার মধ্যে, শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে, কোনো বিরোধ নেই; যে-কেউ গ্রাম থেকে শহরে যাবামাত্র তার যোগ্যতা থাকলে সেখানে সে স্থানলাভ করতে পারে, শহরে নিজেকে বিদেশী মনে করবার কোনো কারণ ঘটে না। এই কথাটা আমার মনে লেগেছিল। আমাদের সঙ্গে এর প্রভেদটা লক্ষ্য করবার বিষয়।

একদিন আমাদের দেশের যা-কিছু ঐশ্বর্য, যা প্রয়োজনীয়, সবই বিস্তৃত ছিল গ্রামে গ্রামে— শিক্ষার জন্য, আরোগ্যের জন্য, শহরের কলেজে হাসপাতালে ছুটতে হত না। শিক্ষার যা আয়োজন আমাদের তখন ছিল তা গ্রামে গ্রামে শিক্ষালয়ের মধ্যে বিস্তৃত ছিল। আরোগ্যের যা উপকরণ জানা ছিল তা ছিল হাতের কাছে, বৈদ্য-কবিরাজ ছিলেন অদূরবর্তী, আর তাঁদের আরোগ্য-উপকরণ ছিল পরিচিত ও সহজলভ্য। শিক্ষা আনন্দ প্রভৃতির ব্যবস্থা যেন একটা সেচনপদ্ধতির যোগে সমস্ত দেশে পরিব্যাপ্ত ছিল, একটা বড়ো ইমারতের মধ্যে বদ্ধ করে বিদেশী ব্যাকরণের নিয়মের মধ্য দিয়ে ছাত্রদের পরিচালিত করবার রীতি ছিল না। সংস্কৃতিসম্পদ্‌ যা ছিল তা সমস্ত দেশের মনোভূমিকে নিয়ত উর্বরা করেছে— পল্লী ও শহরের মাঝখানে এমন কোনো ভেদ ছিল না যার খেয়াপার করবার জন্য বড়ো বড়ো জাহাজ প্রয়োজন। দেশবাসীর মধ্যে পরস্পর মিলনের কোনো বাধা ছিল না, শিক্ষা আনন্দ সংস্কৃতির ঐক্যটি সমস্ত দেশে সর্বত্র প্রসারিত ছিল।

ইংরেজ যখন এ দেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলে তখন দেশের মধ্যে এক অদ্ভুত অস্বাভাবিক ভাগের সৃষ্টি হল। ইংরেজের কাজ-করবার বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রে সংহত হতে লাগল, ভাগ্যবান কৃতীর দল সেখানে জমা হতে লাগল। সেই ভাগেরই ফল আজ আমরা দেখছি। পল্লীবাসীরা আছে সুদূর মধ্যযুগে, আর নগরবাসীরা আছে বিংশ শতাব্দীতে। দুয়ের মধ্যে ভাবের কোনো ঐক্য নেই, মিলনের কোনো ক্ষেত্র নেই, দুয়ের মধ্যে এক বিরাট বিচ্ছেদ।

এই বিচ্ছেদেরই নিদর্শন দেখেছিলুম যখন আমাদের ছাত্ররা এক সময় গোলামখানায় আর প্রবেশ করবেন না বলে পল্লীর উপকার করতে লেগেছিলেন। তারা পল্লীবাসীদের

সঙ্গে মিলিত হতে পারে নি, পল্লীর লোকেরা তাদের সম্পূর্ণ করে গ্রহণ করতে পারে নি। কী করে মিলবে। মাঝখানে যে বৈতরণী। শিক্ষিতদের দান পল্লীবাসী গ্রহণ করবে কোন্ আধারে। তাদের চিত্তভূমিকাই যে প্রস্তুত হয় নি। যে জ্ঞানের মধ্যে সমস্ত মঙ্গলচেষ্টার বীজ নিহিত সেই জ্ঞানের দিকেই পল্লীবাসীদের শহরবাসীদের থেকে পৃথক করে রাখা হয়েছে। অন্য কোনো দেশে পল্লীতে শহরে জ্ঞানের এমন পার্থক্য রাখা হয় নি, পৃথিবীর অন্যত্র নবযুগের নায়ক যাঁরা নিজেদের দেশকে নূতন করে গড়ে তুলছেন তাঁরা জ্ঞানের এমন পঙ্‌ক্তিভেদ কোথাও করেন নি, পরিবেশনের পাত্র একই। আমাদের দেশে একই ভাবে-যে সমস্ত দেশকে অনুপ্রাণিত করা যাবে এমন উপায় নেই। আমি তাই যাঁরা এখানে গ্রামের কাজ করতে আসেন তাঁদের বলি, শিক্ষাদানের ব্যবস্থা যেন এমন ভাব মনে রেখে না করা হয় যে, ওরা গ্রামবাসী, ওদের প্রয়োজন স্বল্প, ওদের মনের মতো করে যা-হয়-একটা গেঁয়ো ব্যবস্থা করলেই চলবে। গ্রামের প্রতি এমন অশ্রদ্ধা প্রকাশ যেন আমরা না করি। দেশের মধ্যে এই-যে প্রকাণ্ড বিচ্ছেদ এ'কে দূর করে জ্ঞানবিজ্ঞান, কী পল্লী কী নগর, সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে— সর্বসাধারণের কাছে সুগম করে দিতে হবে। গ্রামের লোকেরা থাকুক তাদের ভূত-প্রেত-ওঝা, তাদের অশিক্ষা অস্বাস্থ্য নিরানন্দ নিয়ে, তাদের জন্য শিক্ষার একটুখানি যে-কোনোরকম আয়োজন করলেই যথেষ্ট, এরকম অসম্মান যেন গ্রামবাসীদের না করি। এই অসম্মান জন্মায় শিক্ষার ভেদ থেকে। মন অহংকৃত হয়; বলে, 'ওরা চালিত হবে, আমরা চালনা করব দূর থেকে, উপর থেকে।' এর ফলে অনেক সময় শিক্ষিত পল্লীহিতৈষীরা চাষীদের কাছে এমন-সব বিষয়ে মুখস্থ-করা উপদেশ দিতে আসেন হয়তো যে বিষয়ে চাষীরা তাঁদের চেয়ে ভালোই জানে। এর একটা দৃষ্টান্ত দিই।

এক সময়ে আমার মনে হয়েছিল যে শিলাইদহে আলুর চাষ বিস্তৃত ভাবে প্রচলন করব। আমার প্রস্তাব শুনে কৃষিবিভাগের কর্তৃপক্ষ বললেন যে, আমার নির্দিষ্ট জমিতে আলুর চাষ করতে হলে একশো মণ সার দরকার হবে ইত্যাদি। আমি কৃষিবিভাগের প্রকাণ্ড তালিকা -অনুসারে কাজ করলুম, ফসলও ফলল, কিন্তু ব্যয়ের সঙ্গে আয়ের কোনোই সামঞ্জস্য রইল না। এ-সব দেখে আমার এক চাষী প্রজা বললে, 'আমার 'পরে ভার দিন বাবু।' সে কৃষিবিভাগের তালিকাকে অবজ্ঞা করেও প্রচুর ফসল ফলিয়ে আমাকে লজ্জিত করলে।

আমাদের শিক্ষিত লোকদের জ্ঞান যে নিষ্ফল হয়, অভিজ্ঞতা যে পল্লীবাসীর কাজে লাগে না, তার কারণ আমাদের অহমিকা, যাতে আমাদের মিলতে দেয় না, ভেদকে জাগিয়ে রাখে। তাই আমি বারংবার বলি, গ্রামবাসীদের অসম্মান কোরো না, যে

শিক্ষায় আমাদের প্রয়োজন তা শুধু শহরবাসীদের জন্য নয়, সমস্ত দেশের মধ্যে তার ধারাকে প্রবাহিত করতে হবে। সেটা যদি শুধু শহরের লোকদের জন্য নির্দিষ্ট থাকে তবে তা কখনো সার্থক হতে পারে না। মনে রাখতে হবে শ্রেষ্ঠত্বের উৎকর্ষে সকল মানুষেরই জন্মগত অধিকার। গ্রামে গ্রামে আজ মানুষকে এই অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। আজ আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো দরকার শিক্ষার সাম্য। অর্থের দিক দিয়ে এর ব্যাঘাত আছে জানি, কিন্তু এ ছাড়া কোনো পথও নেই। নূতন যুগের দাবি মেটাতেই হবে।

আমরা নিজেরা অক্ষম, আমাদের সাধ্য সংকীর্ণ, তবু সেই স্বল্প ক্ষমতা নিয়েই এই কখানি গ্রামের মধ্যে আমরা একটা আদর্শকে স্থাপনা করবার চেষ্টা করেছি। বহু বৎসর অভাবের সঙ্গে সংগ্রাম করে আমরা গ্রামবাসীদের অনুকূল করেছি। ক্ষেত্র এখন প্রস্তুত, আমাদের সামনে যে বড়ো আদর্শ, বড়ো উদ্দেশ্য আছে, তার কথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই; এই মিলনের আদর্শকে যেন আমরা মনে জাগরূক রাখতে পারি।

৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০ ফাল্গুন ১৩৪৬

অভিভাষণ

বিশ্বভারতী সম্মিলনী

আজকার বক্তৃতার গোড়াতে বক্তামহাশয় বলেছেন যে আমরা মাটি থেকে উৎপন্ন আমাদের যা-কিছু প্রয়োজনীয় পদার্থ যে পরিমাণে লাভ করছি মাটিকে সে পরিমাণে ফিরিয়ে না দিয়ে তাকে দরিদ্র করে দিচ্ছি। আমাদের দেশে একটা কথা আছে যে সংসারটা একটা চক্রের মতো। আমাদের জীবনের, আমাদের সংসারের গতি চক্রপথে চলে। মাটি থেকে যে প্রাণের উৎস উৎসারিত হচ্ছে তা যদি চক্রপথে মাটিতে না ফেরে তবে তাতে প্রাণকে আঘাত করা হয়। পৃথিবীর নদী বা সমুদ্র থেকে জল বাষ্পাকারে উপরে উঠে, তার পর আকাশে তা মেঘের আকার ধারণ করে বৃষ্টিরূপে আবার নীচে নেমে আসে। যদি প্রকৃতির এই জলবাতাসের গতি বাধা পায় তবে চক্র সম্পূর্ণ হয় না, আর অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি উৎপাত এসে জোটে। মাটিতে ফসল ফলানো সম্বন্ধে এই চক্ররেখা পূর্ণ হচ্ছে না বলে আমাদের চাষের মাটির দারিদ্র্য বেড়ে চলেছে, কিন্তু এই প্রক্রিয়াটি যে কতদিন থেকে চলছে তা আমরা জানি না। গাছপালা জীবজন্তু প্রকৃতির কাছ থেকে যে সম্পদ্ পাচ্ছে তা তারা ফিরিয়ে দিয়ে আবর্তন-গতিকে

সম্পূর্ণতা দান করছে, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে মানুষকে নিয়ে। মানুষ তার ও প্রকৃতির মাঝখানে আর-একটি জগৎকে সৃষ্টি করেছে যাতে প্রকৃতির সঙ্গে তার আদান ও প্রদানের যোগ-প্রতিযোগে বিঘ্ন ঘটছে। সে ইঁটকাঠের প্রকাণ্ড ব্যবধান তুলে দিয়ে মাটির সঙ্গে আপনার বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে। মানুষের মতো বুদ্ধিজীবী প্রাণীর পক্ষে এই-সকল আয়োজন উপকরণ অনিবার্য সে কথা মানি; তবুও এ কথা তাকে ভুললে চলবে না যে, মাটির প্রাণ থেকে যে তার প্রাণময় সত্তার উদ্‌ভব হয়েছে, গোড়াকার এই সত্যকে লঙ্ঘন করলে সে দীর্ঘকাল টিঁকতে পারে না। মানুষ প্রাণের উপকরণ যদি মাটিকে ফিরিয়ে দেয় তবেই মাটির সঙ্গে তার প্রাণের কারবার ঠিকমত চলে, তাকে ফাঁকি দিতে গেলেই নিজেকে ফাঁকি দেওয়া হয়। মাটির খাতায় যখন দীর্ঘকাল কেবল খরচের অঙ্কই দেখি আর জমার বড়ো-একটা দেখতে পাই নে তখন বুঝতে পারি দেউলে হতে আর বড়ো বেশি বাকি নেই।

বক্তামহাশয় বলেছেন প্রাচীনকালে পৃথিবীর বড়ো বড়ো সভ্যতা আবির্ভূত হয়ে আবার নানা বাধা পেয়ে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সভ্যতাগুলির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ জনতাবহুল শহরের প্রাদুর্ভাব হয়েছে এবং তাতে করে পূর্বে যে মাটিতে অন্নবস্ত্রের সংস্থান হত অথচ তা দরিদ্র হত না, সে মাটি শহরে মানুষদের দাবিদাওয়া সম্পূর্ণরূপে মিটাতে পারল না। এমনি করে সভ্যতাগুলির ক্রমে ক্রমে পতন হতে লাগল। অবশ্য আধুনিককালে অন্তর্বাণিজ্য হওয়াতে শহরবাসীদের অনেক সুবিধা হয়েছে। এক জায়গাকার মাটি দেউলে হয়ে গেলেও অন্য জায়গার অতিরিক্ত ফসলের আমদানি হচ্ছে। এমনি করে খাওয়া-দাওয়া সচ্ছন্দে চলছে কিন্তু মাটিকে অবহেলা করলে মানুষকে নিশ্চয়ই একদিন কোনোখানে এসে ঠেকতে হবে।

যেমন প্রাণের চক্র-আবর্তনের কথা বলা হয়েছে তেমনি মনেরও চক্র-আবর্তন আছে, সেটাকেও অব্যাহত রাখতে হবে সে কথা মনে রাখা চাই। আমরা সমাজের সন্তান, তার থেকে যে দান গ্রহণ করে মনকে পরিপুষ্ট করছি তা যদি তদনুরূপ না ফিরিয়ে দিই, তবে খেয়ে খেয়ে সব নষ্ট করে ফেলব। মানুষের সমাজ কত চিন্তা কত ত্যাগ কত তপস্যায় তৈরি, কিন্তু যদি কখনো সমাজে সেই চিন্তা ও ত্যাগের স্রোতের আবর্তন অবরুদ্ধ হয়ে যায়, মানুষের মন যদি নিশ্চেষ্ট হয়ে প্রথার অনুসরণ করে, তা হলে সমাজকে ক্রমাগত সে ফাঁকি দেয়; এবং সে সমাজ কখনো প্রাণবান্ প্রাণপ্রদ হতে পারে না, চিত্তশক্তির দিক থেকে সে সমাজ দেউলে হতে থাকে। ভারতবর্ষে সমাজের ক্ষেত্র ও বিস্তৃতি হচ্ছে পল্লীগ্রামে। যদি তার পল্লীসমাজ নূতন চেষ্টা চিন্তা ও অধ্যবসায়ে না প্রবৃত্ত হয় তবে তা নির্জীব হয়ে যাবে।

২৭।৩১

বক্তামহাশয় বলেছেন যে ধানের খড় গাড়ি-বোঝাই হয়ে গ্রাম থেকে শহরে চলে যাচ্ছে, আর তাতে করে কৃষকের ধানখেত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, এবং শহরের উচ্ছিষ্ট গঙ্গা বেয়ে সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছে বলে তা মাটির থেকে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

আমাদের মনের চিন্তা ও চেষ্টা ঠিক এমনি করেই শহরের দিকেই কেবল আকৃষ্ট হচ্ছে বলে আমাদের পল্লীসমাজ তার মানসিক প্রাণ ফিরে পাচ্ছে না। যে পল্লীগ্রামের অভিজ্ঞতা আমার আছে, আমি দেখেছি সেখানে কী নিরানন্দ বিরাজ করছে। সেখানে যাত্রা কীর্তন রামায়ণগান সব লোপ পেয়েছে, কারণ যে লোকেরা তার ব্যবস্থা করত তারা গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছে, তাদের শিক্ষা-দীক্ষা এখন সে পন্থায় চলে না, তার গতি অন্য দিকে। পল্লীবাসীরা আমাদের লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা প্রাণবান্ হতে পারছে না, তাদের মানসিক প্রাণ গানে গল্পে গাথায় সজীব হয়ে উঠছে না। প্রাণরক্ষার জন্য যে জৈব পদার্থ দরকার, মনের ক্ষেত্রে তা পড়ছে না। প্রাণের সহজ সরল আমোদ-আহ্লাদই হচ্ছে সেই জৈব পদার্থ, তাদের দ্বারাই চিত্তক্ষেত্র উর্বর হয়। অথচ শহরে যথার্থ সামাজিকতা আমরা পাই নে। সেখানে গলিতে গলিতে ঘরে ঘরে কত ব্যবধানের প্রাচীর তাকে নিরন্তর প্রতিহত করে। শহরের মধ্যে মানুষের স্বাভাবিক আত্মীয়ভাবন্ধন সম্ভবপর হয় না, গ্রামেই মানবসমাজের প্রাণের বাধাহীন বিকাশ হতে পারে। আজকাল ভদ্রলোকদের পক্ষে গ্রামে যাওয়া নাকি কঠিন হয়ে পড়েছে, কারণ তাঁরা বলেন যে সেখানে খাওয়া-দাওয়া জোটে না, আর মনের বেঁচে থাকবার মতো খোরাক দুষ্প্রাপ্য, অথচ যাঁরা এই অনুযোগ করেন তাঁরাই গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করাতে তা মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে।

গ্রামের এই দুর্দশার কথা কেউ ভালো করে ভাবছেন না, আর ভেবে দেখলেও স্পষ্ট আকারে ব্যক্ত করছেন না। কেবল বিদেশীর সঙ্গ ত্যাগ করার মধ্যে বাঁচনের রাস্তা নেই। বাঁচতে হলে পল্লীবাসীদের সহবাস করতে হবে। পল্লীগ্রামে যে কী ভীষণ দুর্গতি প্রশ্রয় পাচ্ছে তা খুব কম লোকেই জানেন। সেখানে কোনো কোনো সম্প্রদায়ের কাছে প্রাচীন ধর্ম এমন বিকৃত বীভৎস আকার ধারণ করেছে যে সে-সব কথা খুলে বলা যায় না।

এল্‌ম্‌হার্স্ট সাহেব আজকার বক্তৃতায় প্রশ্ন করেছেন যে প্রাণরক্ষার উপায় বিধান কোন্ পথে হওয়া দরকার। আমারও প্রশ্ন এই যে সামাজিক স্বাস্থ্য ও প্রাণরক্ষার পথ কোন্ দিকে। একটা কথা ভেবে দেখা দরকার যে গ্রামে যারা মদ খায় তারা হাড়ি ডোম মুচি প্রভৃতি দরিদ্র শ্রেণীরই লোক। মধ্যবিত্ত লোকেরা দেশী মদ তো খায়ই না, বিলাতি মদও খুব অল্পই খেয়ে থাকে। এর কারণ হচ্ছে যে, দরিদ্র লোকদের মধ্য

খাওয়া দরকার হয়ে পড়ে। তাদের অবসাদ আসে— তারা সারাদিন পরিশ্রম করে। সঙ্গে কাপড়ে বেঁধে যে ভাত নিয়ে যায় তাই ভিজিয়ে দুপুর বারোটা-একটার সময়ে খায়, তার পর খিদে নিয়ে বাড়ি ফেরে। যখন দেহপ্রাণে অবসাদ আসে তখন তা প্রচুর ও ভালো খাদ্যে দূর হতে পারে, কিন্তু তা তাদের জোটে না। এই অভাব-পূরণ হয় না বলে তারা তিন-চার পয়সার ধেনো মদ খায়, তাতে কিছুক্ষণের জন্য অন্তত তারা নিজেদের রাজা-বাদশার মতো মনে করে সন্তুষ্ট হয়— তার পর তারা বাড়ি যায়। আচার ও চরিত্রের বিকৃতির মূলেও এই তত্ত্ব।

আমি যে পল্লীর কথা জানি সেখানে সর্বদা নিরানন্দের আবহাওয়া বইছে; সেখানে মন পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যকর খোরাকের দ্বারা সতেজ হতে পারছে না। কাজেই নানা উত্তেজনা ও দুর্নীতিতে লোকের মন নিযুক্ত থাকে। মন যদি কথকতা পূজা-পার্বণ রামায়ণগান প্রভৃতি নিয়ে সচেষ্ট থাকে তবে তাতে করে তার আনন্দরসের নিত্য জোগান হয় কিন্তু এখন সে-সকলের ব্যবস্থা নেই, তাই মন নিরন্তর উপবাসী থাকে এবং তার ক্লান্তি দূর করবার জন্য মানসিক মত্ততার দরকার হয়ে পড়ে। মনে করবেন না যে, জবরদস্তি করে, ধর্ম উপদেশ দিয়ে এই উভয়রূপ মদ বন্ধ করা যাবে। চিত্তের মূলদেশে আত্মা যেখানে ক্ষুধিত হয়ে মরতে বসেছে সেই গোড়াকার দুর্বলতার মধ্যেই যত গলদ রয়েছে, তাই বাইরেও নানা রোগ দেখা দিচ্ছে। পল্লীগ্রাম চিত্ত ও দেহের খাদ্য থেকে আজ বঞ্চিত হয়েছে, সেখানে এই উভয় খাদ্যের সরবরাহ করতে হবে।

অপর দিকে আমরা শহরে অন্যরূপ মত্ততা ও উন্মাদনা নিয়ে আছি। আমাদের এই বিকৃতির কারণ হচ্ছে যে আমরা দেশের সমগ্র অভাব উপলব্ধি করি না, তাই অল্প-পরিসরের মধ্যে উন্মাদনার আশ্রয়ে কর্তব্যবুদ্ধিকে শান্ত করি। উচ্চৈঃস্বরে রাগ করি, ভাষায় লেখায় বা অন্য আকারে তাকে প্রকাশ করি। কিন্তু আমরা যতক্ষণ যথার্থভাবে দেশের লোকের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে না পারব, তাদের জ্ঞানের আলোক বিতরণ না করব, তাদের জন্য প্রাণপণ ব্রত গ্রহণ না করব, পূর্ণ আত্মত্যাগ না করব, ততক্ষণ মনের এই গ্লানি ও অসন্তোষ দূর হবে না। তাই ক্ষুব্ধ কর্তব্যবুদ্ধিকে প্রশান্ত করবার জন্য আমরা নানা উন্মাদনা নিয়ে থাকি, বক্তৃতা করি, চোখ রাঙাই— আর আমার মতো যারা কাব্যরচনা করতে পারেন তারা কেউ কেউ স্বদেশী গান তৈরি করি। অথচ নিজের গ্রামের পঙ্কিলতা দূর হল না, সেখানে চিত্তের ও দেহের খাদ্যসামগ্রীর ব্যবস্থা হল না। তাই হাড়িডোমেরা মদ খেয়ে চলেছে আর আমাদেরও মত্ততার অন্ত নেই।

কিন্তু এমন ফাঁকি চলবে না। প্রতিদিন আপনাকে দেশে ঢেলে দিতে হবে, পল্লীবাসীদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। আমি একদল ছেলেকে জানি তারা নন্‌-কো-অপারেশনের তাড়নায় পল্লীসেবা করতে এসেছিল। যতদিন তাদের কলকাতার সঙ্গে যোগ ছিল, কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল, ততদিন কাজ চলেছিল, তার পর সব বন্ধ হয়ে গেল।

তাঁরা হাড়িডোমের ঘরে কি তেমন করে সমস্ত মন দিয়ে ঢুকতে পেরেছেন। পাড়াগাঁয়ের প্রতিদিনের প্রয়োজনের কথা মনে রেখে তাঁরা কি দীর্ঘকালসাধ্য উদ্যোগে প্রবৃত্ত হতে পেরেছেন। এতে যে উন্মাদনা নেই, মন লাগে না। কিন্তু কর্তব্যবুদ্ধির কোনোরূপ খাদ্য তো চাই, সেই খাদ্য প্রতিদিন জোগাবার সাধ্য যদি আমাদের না থাকে তা হলে কাজেই মত্ততা নিয়ে নিজেদের বীরপুরুষ মহাপুরুষ বলে কল্পনা করতে হয়।

আজকাল আমরা সমাজের তিন স্তরে তিনরকমের মদ খাচ্ছি— সত্যিকারের মদ, দুর্নীতির মানসিক মদ, আর কর্তব্যবুদ্ধি প্রশান্ত করবার মতো মদ। হাড়িডোমদের মধ্যে একরকম মদ, গ্রামের উচ্চস্তরের মধ্যে আর-একরকম মদ, আর শহরের শিক্ষিত-সাধারণের মধ্যেও একপ্রকারের মদ। তার কারণ সমাজে সব দিকেই খাদ্যের জোগানে কম পড়েছে।

১৩২৯

সমবায়ে ম্যালেরিয়া-নিবারণ

অ্যান্টি-ম্যালেরিয়া সোসাইটিতে কথিত

ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমাদের এই কাজ উপলক্ষে কী করে মিলন হল একটু বলে রাখি। আমি নিজে অবশ্য ডাক্তার নই, এবং ম্যালেরিয়া-নিবারণ সম্বন্ধে আমার মতের কোনো মূল্য নেই। আপনারা সকলে জানেন আমাদের যে 'বিশ্বভারতী' বলে একটা অনুষ্ঠান আছে, তার অন্তর্গত ক'রে শান্তিনিকেতনের চারি দিকে যে-সমস্ত গ্রাম আছে সে গ্রামগুলির সঙ্গে আমাদের যোগ রক্ষা করবার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। আমাদের আশ্রমে আমরা প্রধানত বিদ্যাচর্চা করে থাকি বটে, কিন্তু আমার বরাবর এই মত— বিদ্যাকে, স্কুল-কলেজগুলিকে জীবনের সমগ্র ক্ষেত্র হতে বিচ্ছিন্ন করলে পরে আমাদের অন্তরের সঙ্গে মিশ খায় না, তাকে জীবনের

বন্ধ করা যায় না। এইজন্য আমরা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি -অনুসারে চেষ্টা করছি চারি দিকের গ্রামের লোকের জীবনযাত্রার সঙ্গে আমাদের বিদ্যানুশীলনের কর্মকে একত্র করতে। এই কাজ আমাদের চলছিল। এখানে এই সভাগৃহে আমাদের এ সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা হয়েছে। যাঁরা সে সভাক্ষেত্রে ছিলেন তাঁরা জানেন কিরকম ভাবে আমাদের কাজ হচ্ছে। এই কাজ হাতে নিয়ে প্রথমে দেখা গেল— রোগের ছবি। আমরা অব্যবসায়ী, আমাদের তখনো সাহস ছিল না যে দেশের লোককে বলি যে, যাঁরা অভিজ্ঞ গ্রামের রোগনিবারণ কাজে তাঁরা সহায়তা করুন। নিজেরাই যেমন করে পারি চেষ্টা করেছি। এ সম্বন্ধে বিদেশী লোকের কাছে সাহায্য পেয়েছি, সে কথা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করছি। আমরা আমেরিকার একটি মহিলাকে সহায়-রূপে পেয়েছি। তিনি ডাক্তার নন, যুদ্ধের সময় রোগীর শুশ্রূষা করাতে কতকটা পরিমাণে হাতে কলমে জ্ঞান হয়েছে, সেইটাকে মাত্র নিয়ে তিনি রোগীদের ঘরে ঘরে এক-হাঁটু কাদা ভেঙে গিয়েছেন, অতি দরিদ্রের ঘরে গিয়ে সেবা করেছেন, পথ্য দিয়েছেন— অত্যন্ত ক্ষত ঘা, যা দেখে ভদ্রসমাজের লোকের ঘৃণা হয়, সে-সমস্ত নিজের হাতে ধুইয়ে দিয়েছেন— যারা অন্ত্যজ জাতি তাদের ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছেন, পথ্য খাইয়েছেন— আজ পর্যন্ত তিনি কাজ করছেন, অসহ্য গরমে শরীরের গ্লানি সত্ত্বেও অত্যন্ত দুঃসাধ্য কর্মও তিনি ছাড়েন নি। শরীর যখন ভেঙে পড়ল, শিলং গিয়ে কিছুদিন ছিলেন, ফিরে এসে আবার শরীর নষ্ট করেছেন। এমন করে তাঁকে পেয়েছি। তাঁকে দেশে যেতে হবে, যে-কয়টা দিন আছেন প্রাণপাত করে সেবা করছেন।

আর-একজন সহৃদয় ইংরেজ এল্‌ম্‌হার্স্ট্‌, তিনি এক পয়সা না নিয়ে নিজের খরচে বিদেশ থেকে নিজে টাকা সংগ্রহ করে সে টাকা সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। তিনি দিনরাত চতুর্দিকের গ্রামগুলির দুরবস্থা কী করে মোচন হতে পারে, এর জন্য কী-না করেছেন বলে শেষ করা যায় না। যে দুজনের সহায়তা পেয়েছি সে দুজন বিদেশ থেকে এসেছেন, এঁদের নিয়ে কাজ করছি।

এইটে আপনারা বুঝতে পারেন, পতঙ্গে মানুষে লড়াই। আমাদের রোগশত্রুর বাহনটি যে ক্ষেত্র অধিকার করে আছে সে অতি বিস্তীর্ণ। এই বিস্তীর্ণ জায়গায় পতঙ্গের মতো এত ক্ষুদ্র শত্রুর নাগাল পাওয়া যায় না। অন্তত ২।৪ জন লোকের দ্বারা তা হওয়া দুঃসাধ্য, সকলে সমবেতভাবে কাজ না করলে কিছুই হতে পারে না। আমরা হাৎড়াচ্ছিলাম, চেষ্টা-মাত্র করছিলাম, এমন সময় আমার একজন ভূতপূর্ব ছাত্র, মেডিকেল কলেজে পড়ে, আমার কাছে এসে বললে, 'গোপালবাবু খুব বড়ো জীবাণু-তত্ত্ব-বিদ্, এমন-কি, ইউরোপে পর্যন্ত তাঁর নাম বিখ্যাত। তিনি খুব বড়ো ডাক্তার,

যথেষ্ট অর্থোপার্জন করেন। আপনারা ম্যালেরিয়ার সহিত লড়াই করতে যাচ্ছেন, তিনি সে কাজ আরম্ভ করেছেন ; নিজের ব্যবসায়ে ক্ষতি করে একটা পণ নিয়েছেন— যতদূর পর্যন্ত সম্ভব বাংলাদেশকে তার প্রবলতম শত্রুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য চেষ্টা করবেন।' যখন এ কথা শুনলাম, আমার মন আকৃষ্ট হল। আমাদের এই কাজে তাঁর সহায়তা দাবি করতে সংকল্প করলুম। মশা মারবার অস্ত্র পাব এজন্য নয় ; মনে হল এমন একজন দেশের লোকের খবর পাওয়া গেল যিনি কোনোরকম রাগ-দ্বেষে উত্তেজনায় নয়, বাহিরের তাড়নায় নয়, কিন্তু একান্তভাবে কেবলমাত্র দেশের লোককে বাঁচাবার উপলক্ষে, নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে, নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, এমন করে কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন— এইরূপ দৃষ্টান্ত বড়ো বিরল। আমার মনে খুব ভক্তির উদ্রেক হল বলে আমি বললাম, তাঁর সঙ্গে দেখা করে এ বিষয় আলোচনা করতে চাই। এমন সময় তিনি স্বয়ং এসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন, তাঁর কাছে শুনলাম তিনি কী ভাবে কাজ আরম্ভ করেছেন। তখন এ কথা আমার মনে উদয় হল, যদি এঁর কাজের সঙ্গে আমাদের কাজ জড়িত করতে পারি তা হলে কৃতার্থ হব, কেবল সফলতার দিক থেকে নয়— এঁর মতো লোকের সঙ্গে যোগ দেওয়া একটা গৌরবের বিষয়।

আপনারা দেখেছেন, যুদ্ধের পর এই-যে জার্মানি-অস্ট্রিয়ার প্রতিভা ম্লান হয়ে যাচ্ছে, অনাহারে দৈহিক দুর্বলতা তার কারণ। যখন ব্লকেড-দ্বারা খাবার বন্ধ করা হয়েছিল সে সময় অনাহারে অনেক মানুষ মরেছে সেইটাই বড়ো কথা নয়। যে-সমস্ত শিশুর দুধ খাওয়ার দরকার ছিল, যে-সমস্ত প্রসূতির পুষ্টিকর খাদ্যের দরকার ছিল, তারা তা না পাওয়ায় এই যুগের শিশুরা অপরিপুষ্ট হয়ে পৃথিবীতে এল। এর ফলে এরা বড়ো হলে তেমন বুদ্ধিশক্তির জোর নিয়ে দাঁড়াতে পারবে না। কাজেই এই হিসাবে দেখতে গেলে মাথা-গণতি অনুসারে লোকসংখ্যা হয় না, যাদের মাথা আছে তাদের কার্যকারিতা কতদূর তা দেখতে হবে। শুধু সংখ্যাগণনা ঠিক গণনা নয়। বাংলাদেশে আমরা ভাবছি না— যেখানে আমাদের স্বাস্থ্যের মূল উৎস সেখানে সব শুকিয়ে যাচ্ছে। আমরা রোগের বোঝা ঘাড়ে করে নিয়ে রক্তের মধ্যে চিরদুর্বলতা বহন করে আছি। প্রতি বৎসর কত লোক জন্মাচ্ছে, কত লোক মরছে, সংখ্যা কত বৃদ্ধি হচ্ছে, এটা বড়ো কথা নয় ; যারা টিঁকে রইল তারা মানুষের মতো রইল কি না সেইটে বড়ো কথা। তাদের কার্যকারিতা, মাথা খাটাবার শক্তি, আছে কি না সেইটে বড়ো কথা। নতুবা জীবন্মৃতের দল যদি অধিকাংশ হয়, তার বোঝা জাতি বইতে পারবে না। শারীরিক দুর্বলতা থেকে মানসিক দুর্বলতা আসে। ম্যালেরিয়া

রক্তের মধ্যে অস্বাস্থ্য উৎপাদন করে, সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যেও বল পাই না। যার প্রাণের প্রাচুর্য আছে সে প্রাণ দিতে পারে। যার কেবল কোনোরকমে বেঁচে থাকা চলে, জীবনধারণের জন্ত যা দরকার তার বেশি যার একটু উদ্‌বৃত্ত হয় না, তার প্রাণে বদান্ততা থাকে না। প্রাণের বদান্ততা না থাকলে বড়ো সভ্যতার সৃষ্টি হতে পারে না। যেখানে প্রাণের কৃপণতা সেখানে ক্ষুদ্রতা আসবে। প্রাণের শক্তির এত বড়ো ক্ষয় কোনো সভ্য দেশে কখনো হয় নি। একটা কথা মনে রাখতে হবে, দুর্গতির কারণ সব দেশেই আছে। কিন্তু মানুষের মনুষ্যত্ব কী। না, সেই দুর্গতির কারণকে অনিবার্য বলে মনে না করে, যখন যাতে কষ্ট পাচ্ছি চেষ্টা-দ্বারা তাকে দূর করতে পারি, এ অভিমান মনে রাখা। আমরা এতদিন পর্যন্ত বলেছি, ম্যালেরিয়া দেশব্যাপী, তার সঙ্গে কী করে লড়াই করব, লক্ষ লক্ষ মশা রয়েছে তাদের তাড়াব কী করে, গভর্মেণ্ট আছে সে কিছু করবে না— আমরা কী করব! সে কথা বললে চলবে না। যখন আমরা মরছি, লক্ষ লক্ষ মরছি— কত লক্ষ না মরেও মরে রয়েছে— যে করেই হোক এর যদি প্রতিকার না করতে পারি আমাদের কিছুতেই পরিত্রাণ নেই। ম্যালেরিয়া অন্ত ব্যাধির আকর। ম্যালেরিয়া থেকে যক্ষ্মা অজীর্ণ প্রভৃতি নানারকম ব্যামো সৃষ্টি হয়। একটা বড়ো দ্বার খোলা পেলে যমদূতেরা হুড়্ হুড়্ করে ঢুকে পড়ে, কী করে পারব তাদের সঙ্গে লড়াই করতে। গোড়াতে দরজা বন্ধ করা চাই, তবে যদি বাঙালি জাতিকে আমরা বাঁচাতে পারি।

আর-একটা কথা আছে, সেইটে আপনারা ভাববেন। এই-যে নিজের প্রতি অবিশ্বাস এ যদি কোনো-এক জায়গায় মানুষ দূর করতে পারে— সমস্ত অমঙ্গল, এতদিন পর্যন্ত আমরা যা বিধিলিপি বলে মেনে আসছি, যদি এর উল্টা কথা কোনো উপলক্ষে বলতে পারি— মস্ত কাজ হয়। শত্রু যত বড়োই হোক, তাকে মানব না, মশাকে রাখব না, যেমন করে পারি উচ্ছেদ করব— এ সাহস যদি হয়, তবে কেবল মশা নয়, তার চেয়ে বড়ো শত্রু নিজেদের দীনতার উপর জয়লাভ করব।

আর-একটা কথা— পরস্পরের মিলনের নানা উপলক্ষ চাই। এমন অনেক উপলক্ষ চাই যাতে আমাদের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মিলতে পারে। দেশ বলতে যা বুঝি সকলে তা বোঝে না, স্বরাজ কী অনেকে তা বোঝে না। কিন্তু মিলন বলতে যা বুঝি, এমন কেউ নেই যে তা বোঝে না। কিন্তু যদি কোনো-একটা গ্রামের সকলে মিলে কিছু পরিমাণেও রোগ কমাতে পারি, তবে বিদ্বান্ মূর্খ সকলের মেলবার এমন সহজ ক্ষেত্র আর হতে পারে না। গোপালবাবু এ কাজ আরম্ভ করেছেন। এই-যে ইনি মণ্ডলদের নাম করলেন, শুনে সুখী হলাম এঁরা একযোগে এক মাটিতে দাঁড়িয়ে

অতি ক্ষুদ্র শত্রু মশা মারবার জন্ত সকলে মিলে লেগেছেন। এর মতো সুলক্ষণ আর নেই। কারণ, প্রত্যেকের হিতের জন্তে সকলেই দায়ী এবং পরের হিতই নিজের সকলের চেয়ে বড়ো হিত, এই শিক্ষার উপলক্ষ আমাদের দেশে যত বেশি হয় ততই ভালো। একটি গ্রামের মধ্যে একটা রাস্তা গিয়েছে, দেখা গেল গোরুর গাড়ি চলায় তার একটা জায়গায় গর্ত হয়েছে— ৪।৫ হাতের বেশি নয়— বর্ষার সময় তাতে এক-হাঁটুর উপর কাদা জমে আর সেই কাদার মধ্য দিয়ে স্ত্রী-পুরুষ বালক-বৃদ্ধ হাটবাজার করতে যায়। নিকটবর্তী গ্রামের লোক, যারা সবচেয়ে কষ্ট পায়, তারাও এ কথা বলে না 'কোদাল দিয়ে খানিকটা মাটি ফেলে জায়গাটা সমান করে দিই', তার কারণ তারা ঠকতে ভয় পায়। তারা ভাবে, 'আমরাই খাটব অথচ তার সুবিধে আমরা ছাড়াও অন্ত সবাই পাবে, এর চেয়ে নিজেরা দুঃখ ভোগ করি সেও ভালো।' আমি পূর্বেও আপনাদের কাছে বলেছি— একটা গ্রামে বৎসর-বৎসর আগুন লাগত, গ্রামে কুয়া ছিল না, আমি তাদের বললুম, 'তোমরা কুয়ো খোঁড়ো, আমি সে কুয়ো বাঁধিয়ে দেব।' তারা বললে, 'বাবু, মাছের তেলে মাছ ভাজতে চাও! অর্থাৎ, অর্ধেক খাটুনি আমাদের, অথচ জলদানের পুণ্যটা সম্পূর্ণ তোমার! তার চেয়ে ইহলোকে আমরা জলাভাবে মরি সেও ভালো, কিন্তু পরলোকে তুমি যে সস্তায় সদ্‌গতি লাভ করবে সে সইতে পারব না।'

দেশের মধ্যে এরকম ভাব রয়েছে। ভদ্রলোকের মধ্যেও আছে অন্ত নানা আকারে, সে কথা আলোচনা করতে সাহস করি না। গোপালবাবু যে কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন তাতে লোকে এই কথা বুঝতে পারবে যে, পাশের লোকের বাড়ির ডোবায় যে মশা জন্মায় তারা বিনা পক্ষপাতে আমারও রক্ত শোষণ করে, অতএব তার ডোবার সংস্কার করা আমারও কাজ।

গোপালবাবু মহৎ কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন, লোভ ক্রোধ বিদ্বেষের উত্তেজনা -বর্জিত নির্মল শুভবুদ্ধি তাঁকে এই কাজে আকৃষ্ট করেছে। মহত্ত্বের এই দৃষ্টান্তটি মশকবধের চেয়েও আমাদের কাছে কম মূল্যবান নয়। এইজন্ত আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

২৯ অগস্ট ১৯২৩ ভাদ্র ১৩৩০

ম্যালেরিয়া

অ্যান্টি-ম্যালেরিয়া সোসাইটিতে কথিত

এই-যে ম্যালেরিয়া-নিবারণী সভা ও চেষ্টা, আজকে ওঁদের যে-বিষয়ক বিবরণের জন্য এই সভা আহূত হয়েছে, এতে আমাকে সভাপতিরূপে বরণ করেছেন। এ কথা আপনাদের অবিদিত নয় যে, আমার কোনো অধিকার নাই এখানে আসন গ্রহণ করবার। একমাত্র যদি থাকে সে এই বলতে পারি আমার শরীর অসুস্থ— আমি রোগী, কিন্তু ম্যালেরিয়া-রোগী নই, সুতরাং সে দিক থেকেও আমার বলবার কথা কিছু নাই। একটা আসল কথা এই— এই ম্যালেরিয়া-নিবারণী সভার মধ্যে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ কেহ আছেন, তাঁরা ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে বহু রচনা চারি দিকে ছড়িয়ে রেখেছেন— এ বিষয়ে তাঁরা কাজ করেন, সুতরাং ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে আমার বক্তব্য অত্যুক্তি না'ও হতে পারে। যা হোক, আমার যা বলবার দু-একটা কথায় বলে বিদায় নেব, আপনারা ক্ষমা করবেন। আমি অসুস্থ শরীর নিয়ে এসেছি, কারণ এ আহ্বানকে অশ্রদ্ধা করতে পারি নাই।

আমার পূর্ববর্তী বক্তার যা বলবার কথা তার ভিতর অনেক ভাববার বিষয় আছে। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি যে-সমুদয় ব্যাধি আমাদের আক্রমণ করেছে তার একটি মাত্র কারণ নয়, প্রশ্নটি বহু জটিল, সহজে এর উত্তর দেওয়া যেতে পারে না। এক দিক থেকে ম্যালেরিয়া নিবারণ করতে গিয়ে আর-এক দিকে ছেঁদা বেরুতে পারে— এ কথা যা বলেছেন অন্যায় বলেন নি, অর্থাৎ সমস্ত ক্ষমতা আমাদের হাতে নাই। সব দিক থেকে আটঘাট বেঁধে ম্যালেরিয়াকে না ঢুকতে দেওয়া, তাড়া করে বের করে দেওয়া, এর সব দিক আমাদের হাতে নাই। এ কথা সত্য, মস্ত সত্য যে, পূর্বে যেখানে আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া ছিল না সেখানে ম্যালেরিয়া এসেছে। তার একটা কারণ রেলওয়ে এ দেশে তখন ছিল না, স্বাভাবিক জল-নিকাশের পথ রুদ্ধ ছিল না। মশা উৎপন্ন হওয়ার একটা প্রধান কারণ এই দাঁড়িয়েছে যে, রেলওয়ে লাইন দু ধারের গ্রামগুলিকে অত্যন্ত আঘাত করছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। আরো ঘটনা ঘটেছে— যাঁরা বাণিজ্যের দিকে, প্রভুত্বের দিকে, লাভের দিকে তাকাচ্ছেন, তাঁদের লোভের দরুন অসহ্য দুঃখ এ দেশে উপস্থিত হয়েছে, বন্যা ম্যালেরিয়া দুর্ভিক্ষ জেগে উঠেছে, এটা খুব বড়ো সমস্যা তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বক্তামহাশয় একটা বিষয়ে ভুল করেছেন। আমাদের মাননীয় বন্ধু ডাক্তার গোপালচন্দ্র চ্যাটার্জি যে কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন এ যদি

শুধু মশা মারার কাজ হত তা হলে আমি একে বড়ো ব্যাপার বলে মনে করতুম না। দেশে মশা আছে এটা বড়ো সমস্যা নয়, বড়ো কথা এই— দেশের লোকের মনে জড়তা আছে। সেটা আমাদের দোষ, বড়োরকম দুঃখ-বিপদের মূল কারণ সেখানে। ওঁরা এ কাজ হাতে নিয়েছেন, সেজন্ত ওঁদের কাজ সকলের চেয়ে বড়ো বলে মনে করি। গোপালবাবু উপকার করবেন ব'লে কোমর বেঁধে আসেন নি। কোনো-একজন ব্যক্তি বলতে পারে না, 'আমি কুইনাইন দিয়ে বা ইন্‌জেকশন করে দেশের সকল রোগ ম্যালেরিয়া কালাজ্বর নিবারণ করব।' এমন কথা বলবার দোষ আছে, কারণ তাঁরা কতদিন পৃথিবীতে থাকবেন। আজ বাদে কাল চলে যেতে কতক্ষণ। কতরকম ব্যাধি-বিপদ আছে! যদি ব্যক্তিগত কয়েকজন লোকের উদ্যমকে একমাত্র উপায় বলে গ্রহণ করি তা হলে আমাদের দুর্গতির অন্ত থাকবে না। আমাদের দেশে দুর্ভাগ্যক্রমে সকলরকম দুর্গতি-নিবারণের জন্ত আমরা বাহিরের লোকের সহায়তা বরাবর অপেক্ষা করেছি। এমন দিন ছিল যখন রাজপুরুষদের মুখাপেক্ষী হয়ে দেশ ছিল না, এমন সময় ছিল যখন দেশের জলাভাব দেশের লোক নিবারণ করেছে— অন্তান্ত অভাবও দেশের লোক নিবারণ করেছে। কিন্তু তার ভিতর একটা দুর্বলতা ছিল বলে আমরা আজ পর্যন্ত দুঃখের হাত এড়াতে পারছি না। যারা সেকালে কীর্তি অর্জন করতে উৎসুক ছিল, যাঁরা উচ্চপদস্থ ছিলেন, তাঁদের উপর দেশের লোক দাবি করেছে। তাঁরা মহাশয় ব্যক্তি— তাঁদের উপর জল দেবার, মন্দির দেবার, অতিথিশালা করে দেবার, আরো অন্তান্ত অভাব মোচন করবার দাবি করেছি— তাঁদের পুরস্কার ছিল ইহকালে কীর্তি ও পরকালে সদ্‌গতি। এখনকার দিনে তার ফল এই দেখতে পাই গ্রামের লোকেরা এখন পর্যন্ত তাকিয়ে থাকে কে এসে তাদের জলদান করবে— জলদান পুণ্যকর্ম, সে পুণ্যকর্ম কে করবে। অর্থাৎ, তাদের বলবার কথা এই— 'আমাকে জলদান-দ্বারা তুমি আমার উপকার করছ সেটা বড়ো কথা নয়, তুমি যে পরকালে পুরস্কার পাবে সেজন্ত তুমি করবে।' এই-যে তার প্রতি দাবি, এবং তাকে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা, সেটা আজ পর্যন্ত গভীরভাবে আমাদের দেশে আছে। এই একটা অসত্যের সৃষ্টি হয়েছে— সর্বসাধারণ সকলে একত্র সম্মিলিত হয়ে নিজের অভাব নিজেরা দূর করবার জন্ত কখনো সংকল্প করে না। এমন দিন ছিল যখন দেশে উপকারী সুহৃদ লোকের অভাব ছিল না, সুতরাং সহজেই তখন গ্রামের উন্নতি হয়েছে, অভাব দূর হয়েছে। কিন্তু এখন সে দিনের পরিবর্তন হয়েছে, নূতন অবস্থার উপযোগী চিত্তবৃত্তি এখনো আমরা পেলুম না— এখনো যদি আমরা পুণ্যকর্মী কোনো সুহৃদের উপর ভার দিই, দেশের জলাভাব, দেশের রোগ তাপ সে এসে দূর করুক, তা হলে আমাদের পরিত্রাণ নেই। এখানে

বলবার কথা এই, 'তোমরা দুঃখ পাচ্ছ, সে দুঃখ যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের শক্তিতে দূর করতে না পারবে ততক্ষণ যদি কোনো বন্ধু বাহির থেকে বন্ধুতা করতে আসে তাকে শত্রু বলে জেনো। কারণ তোমার ভিতর যে অভাব আছে সে তাকে চিরন্তন করে দেয়, বাহিরের অভাব দূর করবার চেষ্টা-দ্বারা। গোপালবাবু যে ব্যবস্থা করেছেন, যাকে পল্লীসেবা বলা হয়েছে, তার অর্থ তোমরা একত্র সমবেত হয়ে তোমাদের নিজের চেষ্টায় তোমাদের দুঃখ দূর করো। এ কথা তিনি বলেছেন, কিন্তু তারা (গ্রামের লোক) বিশ্বাস করতে পারে নাই যে নিজের চেষ্টায় দুঃখ দূর করা যায়। সাধারণ লোকের এমন অভিজ্ঞতা কোনো কালে ছিল না। পূর্বে অসাধারণ লোকেরা তাদের উপকার করেছে— তাদের তারা খুব সম্মান করেছে। এখনো দেখি সে দিকে তারা তাকাচ্ছে এবং আমার বিশ্বাস তাদের কেউ গোপালবাবুর উপর ক্রুদ্ধও হতে পারে এইজন্য— 'ইনি আমাদের দিয়ে করাচ্ছেন কেন, নিজে আমাদের ঔষধপত্র দিয়ে পুণ্যসঞ্চয় করলেই তো পারেন।' একটা প্রচলিত গল্প আছে— একজন মা-কালীকে মানত করেছিল মোষ দেবে। অনেকদিন অপেক্ষা করে মা-কালী মোষ না পেয়ে দেখা দিলেন, তখন সে বললে, 'মোষ দিতে পারব না, একটা ছাগল দেব।' আচ্ছা, তাই সই। তার পর ছাগল দেয় না। আবার দেখা দিলেন; লোকটি বলল, 'মা, ছাগল পাই না, একটা ফড়িং দেব।' 'আচ্ছা, তাই দাও।' তখন সে বললে, 'এতই যদি মা তোমার দয়া, তবে একটা ফড়িং নিজে ধরে খাও-না কেন।' এও তাই, আমাদেরও সেরকম অবস্থা। আমি পূর্বেও অনেকবার বলেছি, সে ঘটনাটি এই— আমাদের একটা গ্রামের সঙ্গে যোগ ছিল, গ্রামবাসীদের ফি বৎসর বড়ো জলাভাব হত। আমি বললাম, 'তোমরা কুয়া খোঁড়ো, আমি বাঁধিয়ে দেবার খরচ দেব।' তারা বললে, 'মহাশয়, আপনি কি মাছের তেল দিয়ে মাছ ভাজতে চান? আমরা খরচ দিয়ে কুয়া খুঁড়ব আর স্বর্গে যাবেন আপনি।' আমি বললাম, 'তোমরা যতক্ষণ কুয়া না খোঁড় আমি কিছুই দেব না।' কুয়া হল না। গ্রামে প্রতি বৎসর আগুন লাগছে, তাদের পাড়ার মেয়েরা ৪।৫ মাইল দূরে বালি ভেঙে অসহ্য রৌদ্রে জল নিয়ে আসে, ঘরে অতিথি এলে একঘটি জল দিতে প্রাণে কষ্ট হয়, কিন্তু কয়জনে মিলে সামান্য একটা কুয়ো খুঁড়তে পারবে না। কেহ বলছে, 'কোন্ জায়গায় দেব, ওর বাড়ির দুই হাত দূরে, ওর বাড়ির কাছে পড়ে; আর-একজন যে জিতল, আমার চেয়ে দুই হাত জিতল— এটা সহ্য হয় না।' নিজেদের পরস্পর চেষ্টা-দ্বারা পরস্পর কল্যাণের প্রবৃত্তি কারো মনে জেগে উঠে না, সকলের যাতে কল্যাণ হয় সে চেষ্টা আমাদের দেশে হল না, তাতে দুর্গতির একশেষ হয়েছে। আমি দেখেছি— একটা গ্রামে মস্ত রাস্তা করে দেওয়া হয়েছিল, ক্রমাগত গোরুর গাড়ি

যাওয়ার এক জায়গায় একটা খাদ হয়, বর্ষার সময় হাঁটু পর্যন্ত কাদা হয়, যাওয়া-আসায় বড়ো কষ্ট হত। তার দু পাশে দুখানি বড়ো গ্রাম, দু ঘণ্টা কাজ করলে এটা ভরাট করা যেতে পারে। কিন্তু তারা বললে, তারা দু ঘণ্টা কাজ করবে, আর যারা কুষ্টিয়া থেকে কি অন্য জায়গা থেকে আসবে তারা কিছু করবে না— তারা সুবিধা পাবে! নিজে শত অসুবিধা ভোগ করবে তবু পরের সুবিধা সহ্য করতে পারবে না— দূরের লোক তাদের ঠকালো ক্রমাগত এই ভয়। অন্যে পরিশ্রম না ক'রে আমার পরিশ্রমের সুবিধা ভোগ করবে, আমার পরিশ্রমের ফলে সকলের কল্যাণ হবে— এটা তারা সহ্য করতে পারে না। না করতে পারার কারণ এই— কর্মের পুরস্কার মনে মনে কল্পনা। নিজের পুরস্কার কামনা ক'রে কর্মের প্রতি যে ঝোঁক জন্মে সে কর্ম হীনকর্ম। সর্বসাধারণের কল্যাণ হোক, নাহয় আমার পরিশ্রম হল, এ কথা তারা বুঝতে পারে না। দুঃখ দিয়ে এ কথা বুঝিয়ে দিতে হবে। বলতে হবে, মরতে হয় তারা মরুক, মৃত্যুদূতের কানমলা খেয়ে যদি তাদের চৈতন্য হয় তাও ভালো। গ্রামে গ্রামে ঔষধ পথ্য দিয়ে গোপালবাবু সরে যাবেন এ কথা তিনি বলেন নি বটে— যাকে সেবা বলে তিনি তাই করছেন, বেশি দিন তা করবেন না। যেই তারা বুঝবে এই প্রণালীতে উপকার হয়, অমনি ওঁরা সরে আসবেন তাদের উপর ভার দিয়ে।

গাঁয়ে না গেলে বুঝতে পারবেন না ম্যালেরিয়া কী ভীষণ প্রভাব বিস্তার করেছে। অনেকের যকৃৎ-পিলেতে পেট ভর্তি হয়ে আছে, সুতরাং ম্যালেরিয়া দূর করতে হবে— বেশি করে বুঝাবার দরকার নাই। আমরা অনেকে জানি ম্যালেরিয়া কিরকম গোপনে ধীরে ধীরে মানুষকে জীবন্মৃত করে রাখে। এ দেশে অনেক জিনিস হয় না; অনেক জিনিস আরম্ভ করি, শেষ হতে চায় না; অনেক কাজেই দুর্বলতা দেখতে পাই— পরীক্ষা করলে দেখা যায় ম্যালেরিয়া শরীরের মধ্য থেকে তেজ কেড়ে নিয়েছে। চেষ্টা করবার ইচ্ছাও হয় না। সকলেই জানেন বাংলাদেশের কাজকর্মে পশ্চিম থেকে লোক আসে। যেখানে বাংলার জেলে ছিল সেখানে হিন্দুস্থানি জেলে এসেছে। বাংলাদেশে ম্যালেরিয়ায় প্রাণ নিস্তেজ, কাজেই উৎসাহ নেই। প্রভুরা বলেন বটে, চালাকি করছে, ঘন ঘন তামাক খাচ্ছে, মজুরেরা কাজ করে না, আফিসে কেরানিরা কাজে মন দেয় না। জোয়ান জোয়ান সাহেব, তোমরা বুঝবে কী করে— ওরা চালাকি করে না; ম্যালেরিয়ায় যারা জীর্ণ, নিয়ত কাজ করবার, কাজে মন দেবার শক্তি তাদের নাই; মশার কামড় খেয়ে ওদের এরকম অবস্থা হয়েছে। কিছুদিন এ দেশে থাকো, এটা ভালো করে বুঝতে পারবে।

তাই বলে আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকো না, মহাপুরুষের দিকে তাকিয়ে থেকো

না। সাহস করো— আমাদের দুঃখ আমরা নিবারণ করতে পারব, শুধু সাহস চাই। কোনো-একটা জায়গায় কোনো-একটা কর্মে যদি একবার জয়পতাকা খুলে দিতে পারো— সাহস আসবে। ম্যালেরিয়ায় কত লোক মরছে রিপোর্ট্ দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন। আমি শুনেছি তার খুব পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো জিনিস হচ্ছে বিশ্বাস। বাংলাদেশ থেকে মশা দূর করা সম্পূর্ণ না হোক, এতটা পরিমাণেও যদি হয় অনেক উন্নতি হবে। এতে যে কেবল মশা মরবে তা নয়, জড়তা মরবে। নিজের প্রতি নিজের যে বিশ্বাস সেই চিরন্তন ভিত্তি, চিরকেলে ভিত্তি ; কিন্তু মশা চিরকাল থাকবে ওঁর উপর যদি মশা মারবার ভার দিই। শক্তি যদি দেশের মধ্যে জাগে, গ্রামের লোক যদি বলে— 'আমরা কারো দিকে তাকাব না। যে-কোনো পুণ্যলোভী উপকার করবে তাকে অবজ্ঞা করব, ভিক্ষা করব তবু তেমন লোকের উপকার চাইব না। কলিকাতা থেকে যারা আসবে তাদের বলব তোমরা আমাদের ভারি সুহৃদ্ নাম করতে এসেছ, কাগজে বড়ো বড়ো রিপোর্ট্ লিখবে, তাই দেখে সকলে বাহবা দিবে। কোনোদিন তো দেখি নি তোমরা আমাদের উপকার করেছ। বরাবর জানি ভদ্রলোক সুদ নেয়, ভদ্রলোক ওকালতি করে, সর্বনাশ করে— জমিদার আছে, তারাও ভদ্রলোক, বরাবর রক্ত শোষণ করছে— গোমস্তা পাইক রয়েছে, তারা উৎপীড়ন করছে— এই তো ভদ্রলোকের পরিচয়। হঠাৎ আজ উপকার করতে এলে কেন।' যদি এ কথা বলে তবে খুশি হই, সে কথা বলতে হবে।

আমাদের বিশ্বভারতীর একটা ব্যবস্থা আছে— তার চারি দিকে যে-সমস্ত পল্লী আছে সেগুলিকে আমরা নীরোগ করবার জন্য কিছু চেষ্টা করেছি। এটুকু তাদের বুঝিয়েছি যে, 'ভদ্রলোক হয়ে জন্মেছি সে আমাদের অপরাধ নয়, তোমাদের সঙ্গে আমাদের প্রাণের মিল আছে।' সে কথা তারা বিশ্বাস করেছে, তাদের মধ্যে গিয়ে যা দেখেছি তাতে আমাদের চৈতন্য হয়েছে। আমরা যে সমস্ত বড়ো বিল্ডিং করতে চেষ্টা করছি, পলিটিক্যাল বা রাষ্ট্রনৈতিক জয়স্তম্ভ করবার চেষ্টা করছি, মাল-মসলার চেষ্টা করছি— কিসের উপর। বালির উপর— প্রাণ নাই, জীর্ণ জরাজীর্ণ অস্থিমজ্জায় দুর্বলতা প্রবেশ করেছে ; নৈতিক নয়, বাস্তবিক, শারীরিক, কিন্তু সে মানসিক শক্তিকে নষ্ট করে। এক-আধজন এই বহুব্যাপী বিশ্বব্যাপী প্রাণহীনতাকে দূর করতে চেষ্টা করছেন বটে, কিন্তু বাংলা এখনো রোগ-তাপ-দুঃখ ক্লিষ্ট, জয়স্তম্ভ থাকবে না, কাত হয়ে পড়ে যাবে, একে রক্ষা করতে পারবে না, ধীরে ধীরে চেষ্টা করতে হবে নইলে টি কবে না। দুর্বলতা এক রূপে না এক রূপে আপনাকে প্রকাশ করবে। দুর্বলতার একটা কুশ্রী আকার আছে। সে হচ্ছে, আর-একজন গিয়ে সফলতা লাভ করবে, বড়ো কাজ করবে,

এতে দুর্বলের মনে ঈর্ষা হয়— কী করে তাকে ছোটো করা যায় প্রাণপণে সে চেষ্টা করে। আমি কারো দোষ দিই না। পিলে যকৃৎ ভিতরে বড়ো হলে হৃদয় বড়ো হতে পারে না। পিলে বড়ো হয়েছে, যকৃৎ বড়ো হয়েছে, অন্তরে তারা জায়গা করেছে, হৃদয়ের জায়গা ছোটো, এইজন্য বরাবর দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশে সকলের চেয়ে বড়ো কর্মী নিজে, আর কেহ নয়। মনে শান্তি নাই, তার কারণ ভিতরকার ঈর্ষা। যে নিজে কিছু করতে পারছে না তার ভিতরে মাৎসর্য ফুটে ওঠে। আমি পারছি না, অমুক পারছে, চেষ্টা করছে, তখন 'ওর নাড়ীনক্ষত্র আমি জানি' এ কথা বললে অন্তঃকরণ শান্ত হয়— সুস্থ হয়। আমাদের দেশে এমন কর্মী কেহ নাই যার সম্বন্ধে আমরা এইরকম ভাব কোনো-না-কোনো আকারে মনে পোষণ না করে থাকি, তার কীর্তি কিছু-না-কিছু খর্ব না করতে চাই। এর কারণ সেই ম্যালেরিয়ার ভিতরে— দেহের শক্তি মনের শক্তিকে নষ্ট করেছে। তা হলে আপনারা বলতে পারেন, 'আগে দেহে শক্তি সঞ্চয় করুন।' তা নয়, মানুষকে ভাগ করা যায় না; দেহ মন আত্মায় সে এক, আগে এইটে পরে ঐটে বলা চলে না। মনে জোর দিলে দেহে জোর পাই, দেহে জোর দিলে মনে জোর পাই, আবার দেহমনে জোর দিলে ধীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়— দেহ মন আত্মা একসঙ্গে গাঁথা। যে মন্ত্রে দেহের রোগ দূর হবে সে মন্ত্রে মনের যে দীনতা পরনির্ভরতা তাও দূর হবে। আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন এই-যে রেলওয়ে হয়েছে, ফলে জল-নিকাশের পথ বন্ধ হয়েছে— মস্ত মস্ত কারবারী লোক, তারা কিভাবে আমাদের দিকে তাকায়, কী দুঃখ আমরা ভোগ করছি তারা কি সেটা বোঝে। বন্যায় দেশ ভেসে যাচ্ছে তার একমাত্র কারণ, তারা লাভের উপর লাভ করে যাচ্ছে, গলা পর্যন্ত যারা লাভ করেছে তাদের পরিত্রাণের আশা নাই। তারা এই-সমস্ত রেলওয়ে লাইন খুলছে। আমরা কে। আমরা 'থামো থামো' বললেই কি রেলওয়ে থামবে। না ক্রমাগত বুকের উপর দিয়ে চলে যাবে? মস্ত মস্ত কারবারী তারা এই-সমস্ত করছে, আমরা কেঁদে কী করব। তবে কী হবে। সমস্ত গ্রামের লোক যদি বোঝে আমরা কেউ কিছু নয়, এটা নয়; যখন তারা বুঝবে এই কো-অপারেটিভ সোসাইটি একটা মস্ত বড়ো জিনিস— ইচ্ছা করলে সকলে মিলে মিশে মরতে পারে, তখন তারা সকলে মিলে এই দুর্গতির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে, সকলে কণ্ঠ তুলে বলতে পারে, 'ভাঙব তোমার রেলওয়ে লাইন। আমরা মরব আর তোমরা লাভ করবে?' এখন বলতে পারবে না। (আপনারা করতালি দেবেন না।) এর জন্যে অনেক ভিত্তি গাড়তে হবে, অনেক দূর গভীর করে— এটা সকলের চেয়ে বড়ো কাজ। আমি অনেকবার বলেছি— কবি বলে আমার কথা শোনে নাই— আমি বলেছি সমাজের ভিতর থেকে সমাজের শক্তিকে জাগাতে হবে, পরস্পর সকলের

সমবেত চেষ্টা-দ্বারা শক্তি লাভ করবে। এ সম্বন্ধে চেষ্টাও করেছি, পল্লী-সমিতি বলে সমিতি গড়ে তুলেছি, এ বিষয়ে আমার মাথা ততটা খেলাতে পারি নাই। আজ দেখে আনন্দ হয়েছে— এতদিনে আমরা বুঝতে পেরেছি কোন্ জায়গায় আমাদের গলদ। গগনস্পর্শী পার্লিয়ামেণ্ট্ হলে হবে না। আমাদের অভাব এখানে নয়। আমাদের অভাব ভিতরে— যার উপর গড়তে পারব। একবার মুষ্টিমেয় কলেজে-পড়া উপাধিধারী কয়েকজন ভেবেছিল, 'আমাদের চেষ্টার উপর, উত্তমের উপর দাঁড় করাতে পারব।' মরে গিয়েছে— সমস্ত দেশ ক্রমে ক্রমে জীবন্মৃত হয়েছে তা নয়— যথার্থ মরেছে। সেদিন আমাদের একদল লোক চিত্রকলা অভ্যাস করতে গ্রামের চিত্রকলা দেখতে গিয়েছিল। তারা এসে বললে, 'আমাদের আর অন্নে রুচি হয় না; দেখলাম একেবারে উজাড় হয়েছে— একটা গ্রামে, বড়ো গ্রামে, বড়ো বড়ো বাড়ি পড়ে রয়েছে। চার ঘর কায়স্থ রয়েছে। এখনো বেঁচে আছে কী করে জিজ্ঞাসা করায় বলল, আমরা বৎসরের মধ্যে দুবার আসানসোল কি বর্ধমানে গিয়ে সম্বৎসরের কাপড়-চোপড় নিয়ে আসি। যে কয়দিন বেঁচে আছি এমনি ভাবে যাবে, যখন মৃত্যুর পরওয়ানা আসবে যাব। এক জায়গায় দেখলাম— সমস্ত বড়ো বাড়ি। যারা ৫০।১০০ বৎসর পূর্বে বর্ধিষ্ণু লোক ছিল এখন সেখানে তাদের রথ পড়ে আছে, দেবতা অচল।' এইটা শুনাব না মনে করেছিলাম। আপনাদের মধ্যে অনেকে ধর্মপ্রাণ আছেন, তাঁরা বলবেন, 'আমরা গিয়ে দেবতার রথ চালাব।' আমি বলি সে চলবে না, দেবতা তোমাদের হাতের টানে চলবে না, দেবতা তার নিজের শক্তির রথে চলবে, গ্রামের লোকের নিজের শক্তির রথে চলবে, সে রথ বাঁশ কেটে করতে হবে তা নয়, সে পিতলের রথ— আশ্চর্য কারুকার্য— মোটা মোটা বাঁশ দিয়ে তা চালালে চলবে না, ঠাকুর তাতে চলে না, ঠাকুর চান আমাদের হৃদয়ের সেবা দিয়ে তাঁর রথ তৈয়ারি হোক— তাঁর রূপের অন্ত নাই। তাঁকে মেরে ফেলে মুমূর্ষুর গঙ্গাযাত্রার মতো তাঁকে কি টেনে নিয়ে যেতে হবে। তা তো নয়। কোথায় প্রাণ, যে প্রাণপ্রাচুর্যের ভিতর সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে, যে সৃষ্টি সম্পদে জ্ঞানে প্রেমে কর্মে সকল দিকে বিকশিত হয়, বসন্তের মতো নূতন প্রাণ চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ে। সে প্রাণশক্তির প্রাচুর্য যেখানে, দেবতা সেখানে চলেন। নইলে তাঁর ভাঙা রথ যত জোরেই টানো দেবতা চলবেন না। বাংলার সর্বত্র দেবতার ভাঙা রথ পড়ে আছে, দেবতা যদি চলত আমাদের এ দশা হত না, আমরা এমন করে মৃতকল্প হয়ে পড়ে থাকতুম না, এমন করে ঘরের আলো নিভে যেত না। এত দুর্গতি কেন। আমাদের রথ আমরা তৈয়ার করি নাই। যা ছিল তারও চাকা ভেঙে গেছে। এমন কেহ নাই তাকে ব্যবহারে চালাতে পারে। ছোটোখাটো একটা-কিছু তৈয়ারি ক'রে উপস্থিতমত চালিয়ে দেওয়া,

বিষয়ী লোকের কথা। ছোটোখাটো লাভের কথায় হানি আছে। সর্বকালের দিকে তাকিয়ে কাজ করতে হবে, বড়োকে ভূমাকে লক্ষ্য করতে হবে। সমস্ত আত্মা দিয়ে, সমস্ত শক্তি দিয়ে তবে তাকে পাব, তবে তিনি তৃপ্ত হবেন, প্রসন্ন হবেন। তিনি প্রসন্ন হলে সকল তাপ দূর হয়ে যাবে। সেইজন্ত সকলের চেয়ে বড়ো কাজ— ওঁরা যা করেছেন— উদ্‌বোধন, পল্লীর শক্তির উদ্‌বোধন। এরা একদিন দাঁড়িয়ে বলবে, 'কাউকে মানব না, যেখানে অন্যায় পাপ দুঃখ শোক সেখানে তাকে তাড়া করে যাব।' আজকে মশা থেকে আরম্ভ হয়েছে, এ কাজে আমাদের রায়বাহাদুর লেগেছেন। আমি ইন্‌জেক্‌শন করতে জানি না, কী পরিমাণ কুইনাইন দিতে হয় জানি না, কিন্তু এটা জানি এবং এইজন্ত বহুকাল অরণ্যে রোদন করেছি— কারো মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে তা হয় না, তাতে ভগবান প্রসন্ন হন না, সে পথ আপনার ঘরের ভিতরকার হলেও যখনই তাতে নির্ভর করেছ তখনই দুঃখ প্রাপ্ত হয়েছ, কেননা তিনি অন্তরের ভিতর আছেন, আমার অন্তরের মধ্যে যে অনন্ত শক্তি তাকে জাগাতে হবে, তিনি জাগলে সব দূর হয়ে যাবে, সব দুঃখ তাপ একসঙ্গে দূর হয়ে যাবে। কেউ কবি হতে পারে, কেউ ডাক্তার হতে পারে, কেউ ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে— যার যেরকম শক্তি, যার যেরকম শিক্ষা, সকলরকম চিত্তবৃত্তির সকলরকম শক্তির দরকার আছে। অনন্ত শক্তির উৎস যিনি তাঁর বহুধা শক্তি -দ্বারা তিনি বিশ্বকে পালন করেন। কেবল ইকনমিক্‌স্‌ নয়, কেবল পলিটিক্‌স্‌ নয়— বহুধা শক্তি, সে বৃহৎ শক্তিকে যদি আমাদের সমাজের ভিতর, নিজের ভিতর স্বীকার করো তা হলে অনন্ত শক্তির উদ্‌বোধন হবে— একটা ছোটো কাজ ক'রে, একটা কথা ব'লে কিছু হবে না। আমাদের সৌন্দর্যবোধ থেকে আরম্ভ হয়ে, কী করে অন্ন অর্জন করতে হয়, কী করে চাষ করতে হয়, ফসল ফলাতে হয়, সব বিষয়ে দেশের মধ্যে আত্মনির্ভরতা জাগাতে হবে। কবিকে যখন সভাপতির আসনে বসিয়েছেন তখন আমি বলব এবং এটা বলবার কথা— বসন্তকালের বাঁশি এই-যে সে শুধু একটা ফুলকে জাগিয়ে দেয় না, একটা গাছের পাতাকে ফোটায় না, দখিন-হাওয়ায় পাখিরা জেগে ওঠে, লতাপাতা ফোটে, গাছের ফল ফুল সমস্ত আনন্দ-উৎসবে শক্তির উৎসবে উৎফুল্ল ও আনন্দিত হয়। সেই বসন্তের বাণীকে আমি আপনাদের কাছে উপস্থিত করছি।

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১

প্রতিভাষণ

ময়মনসিংহে জনসাধারণের অভিনন্দনের উত্তরে

মহারাজ, ময়মনসিংহের পুরবাসিগণ ও পুরমহিলাগণ, আমি আজ আমার সমস্ত হৃদয় পূর্ণ করে আপনাদের প্রীতিসুধা সম্ভোগ করছি।

আমি নিজেকে প্রশ্ন করলুম— তুমি কেন আজকের দিনে পূর্ববঙ্গে ভ্রমণের জন্যে এসেছ, কোন্ সাহসে তুমি বের হয়েছ। কী করতে পারো তুমি তোমার হীনশক্তিতে। এ প্রশ্নের আমার একটা খুবই সহজ উত্তর আছে। তা এই যে, আমি কোনো কাজের দাবি রাখি নে। যদি আমি কোনোদিন আনন্দ দিয়ে থাকি আমার সাহিত্যে আমার কাব্যের মধ্য দিয়ে, তবে তারই প্রতিদানস্বরূপ আপনাদের প্রীতির অর্ঘ্য সংগ্রহ করে যেতে পারি। বাংলাদেশ থেকে শেষ বিদায় গ্রহণ করবার পূর্বে এটুকু পুরস্কার যদি নিয়ে যেতে পারি তো সেই আমার সার্থকতা। আমি কোনো কর্ম করেছি কি না এ কথার দরকার নেই। আপনাদের এ আতিথ্যের বরমাল্যই আমার যথেষ্ট। এ খুব সহজ উত্তর, কিন্তু এ উত্তর সম্পূর্ণ সত্য নয়। আর-এক দিন এসেছিল যেদিন সমস্ত বাংলাদেশে মানবের চিত্ত উদ্‌বোধিত হয়েছিল। সেদিন আমিও তার মধ্যে ছিলুম— শুধু কবিরূপে নয়— আমি গান রচনা করেছিলুম, কাব্য রচনা করেছিলুম, বাংলাদেশে যে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল সাহিত্যে তারই রূপ প্রকাশ করে দেশকে কিছু দিয়েছিলুম। কিন্তু কেবলমাত্র সেইটুকুই আমার কাজ নয়। একটি কথা সেদিন আমি অনুভব করেছিলুম, দেশের কাছে তা বলেও'ছিলাম— সে কথাটি এই যে, যখন সমস্ত দেশের হৃদয় উদ্‌বোধিত হয়ে ওঠে তখন কেবলমাত্র ভাবসম্ভোগের দ্বারা সেই মহামুহূর্তগুলি সমাপ্ত করে দেওয়ার মতো অপব্যয় আর কিছু নেই। যখন বর্ষা নাবে তখন কেবলমাত্র বর্ষণের স্নিগ্ধ আনন্দসম্ভোগই যথেষ্ট নয়, সে বর্ষণ কৃষককে ডাক দিয়ে বলে— বৃষ্টিকে কাজে লাগাতে হবে। সেদিন আমি এ কথা দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলুম— আপনাদের মধ্যে অনেকের তা মনে থাকতে পারে অথবা বিস্মৃতও হয়ে থাকতে পারেন— 'কাজের সময় এসেছে, ভাবাবেগে চিত্ত অনুকূল হয়েছে। এখনই কর্ম করবার উপযুক্ত সময়। কেবলমাত্র ভাবাবেগ স্থায়ী হতে পারে না। ক্ষণকালের যে ভাবাবেগ তা দেশের সকলের চিত্তকে, সকলের হৃদয়কে সম্মিলিত করতে পারে না। কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকের শক্তি ব্যাপ্ত হলে পরই কর্মের সূত্র-দ্বারা যথার্থ ঐক্য স্থাপিত হয়। কর্মের দিন এসেছে।' এই কথা আমি

বলেছিলুম সেদিন। কিরূপ কর্ম। বাংলার পল্লী-সব আর্ত নিরন্ন, নিরানন্দ, তাদের স্বাস্থ্য দূর হয়ে গেছে— আমাদের তপস্যা করতে হবে সেই পল্লীতে নতুন প্রাণ আনবার জন্যে, সেই কাজে আমাদের ব্রতী হতে হবে। এ কথা স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা আমি করেছিলুম, শুধু কাব্যে ভাব প্রকাশ করি নি। কিন্তু দেশ সে কথা স্বীকার করে নেয় নি সেদিন। আমি যে তখন কেবলমাত্র ভাবুকতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিলাম এ কথা সত্য নয়। তারও আগে, প্রায় ত্রিশ বছর আগেই, আমি পল্লীর কর্মের কথা বলেছিলুম— যে পল্লী বাংলাদেশের প্রাণনিকেতন সেইখানেই রয়েছে কর্মের যথার্থ ক্ষেত্র, সেইখানেই কর্মের সার্থকতা লাভ হয়। এই কাজের কথা একদিন আমি বলেছিলুম, নিজে তার কিছু সূত্রপাতও করেছিলুম। যখন বসন্তের দক্ষিণ-হাওয়া বইতে আরম্ভ করে তখন কেবলমাত্র পাখির গানই যথেষ্ট নয়। অরণ্যের প্রত্যেকটি গাছ তখন নিজের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করে, তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ উৎসর্গ করে দেয়। সেই বিচিত্র প্রকাশেই বসন্তের উৎসব পরিপূর্ণ হয়— সেই শক্তি-অভিব্যক্তির দ্বারাই সমস্ত অরণ্য একটি আনন্দের ঐক্য লাভ করে, পূর্ণতায় ঐক্য সাধিত হয়। পাতা যখন ঝরে যায়, বৃক্ষ যখন আধমরা হয়ে পড়ে তখন প্রত্যেক গাছ আপন দীনতায় স্বতন্ত্র থাকে, কিন্তু যখন তাদের মধ্যে প্রাণশক্তির সঞ্চার হয় তখন নব পুষ্প নব কিশলয়ের বিকাশে উৎসবের মধ্যে সব এক হয়ে যায়। আমাদের জাতীয় ঐক্যসাধনেরও সেই উপায়, সেই একমাত্র পন্থা। যদি আনন্দের দক্ষিণ-হাওয়া সকলের অন্তরের মধ্যে এক বাণী উদ্‌বোধিত করে তা হলেও যতক্ষণ সেই উদ্‌বোধনের বাণী আমাদের কর্মে প্রবৃত্ত না করে ততক্ষণ উৎসব পূর্ণ হতে পারে না। প্রকৃতির মধ্যে এই-যে উৎসবের কথা বললুম তা কর্মের উৎসব। আমগাছ যে আপনার মঞ্জরী বিকশিত করে তা তার সমস্ত মজ্জা থেকে, প্রাণের সমস্ত চেষ্টা দিয়ে। কর্মের এই চাঞ্চল্য বসন্তকালে পূর্ণ হয়। মাধবীলতায়ও এই কর্মশক্তির পূর্ণরূপ দেখতে পাই। বসন্তকালে সমস্ত অরণ্য এক হয়ে যায় বিচিত্র সৌন্দর্যের তানে, আনন্দের সংগীতে। তেমনি আমরা দেখতে পাই সব বড়ো বড়ো দেশে তাদের যে ঐক্য তা বাইরের ঐক্য নয়, ভাবের ঐক্য নয়— বিচিত্র কর্মের মধ্যে তাদের ঐক্য। জাতির সকলকে বলদান, ধনদান, জ্ঞানদান, স্বাস্থ্যদান— এই বিচিত্র কর্মচেষ্টার সমন্বয় হয়েছে যেখানে সেইখানেই যথার্থ ঐক্যের রূপ দেখতে পাওয়া যায়। শুধু কবির গানে নয়, সাহিত্যের রসে নয়— কর্মের বিচিত্র ক্ষেত্র যখন সচেষ্ট হয় তখনই সমস্ত দেশের লোক এক হয়। আমাদের দেশও সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করছে। বক্তৃতার মিথ্যা উত্তেজনায় শুধু বাক্যে শুধু মুখে 'ভাই' বললে ঐক্য স্থাপিত হয় না। ঐক্য কর্মের মধ্যে। এই

কথাই আমি বলেছিলুম, যখন মনে হয়েছিল যে, সময় এসেছে। সময় এসেছিল, সে শুভ সময় চলে গিয়েছে। তখন আমার যৌবন ছিল; সব বিরুদ্ধতার সামনে দাঁড়িয়েই আমি এ কথা বলেছিলুম, কেউ গ্রহণ করলে বা না-করলে তা ভ্রূক্ষেপ না ক'রে।

আবার দিন এসেছে— দেশের লোকের চিত্তে জাগরণের লক্ষণ দেখা দিয়েছে, অনুকূল অবসর এসেছে— এমন সময়ে বয়সের ভগ্নাবশেষের অন্তরালে কী করে চুপ করে বসে থাকি। আবার স্মরণ করিয়ে দেবার সময় এসেছে যে, যদি মনের মধ্যে যথার্থই আনন্দ উপলব্ধি করে থাকো তবে কেবলমাত্র বাক্যবিন্যাসের দ্বারা ভাবরসসম্ভোগে তা অপব্যয় কোরো না। যে অনুকূল সময় এসেছে তাকে ফিরিয়ে দিয়ো না তোমার দ্বার থেকে, সকলে মিলে সৃষ্টির কাজে প্রবৃত্ত হও। সম্মিলিত দেশের সৃষ্টির মধ্যেই দেশের আত্মা তার গৌরবের স্থান লাভ করেন। বিশ্ববিধাতা বিশ্বকর্মা আপনার মহিমায় প্রতিষ্ঠিত কোথায়। তাঁর বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে। তেমনি দেশের আত্মার স্থানও দেশের যত সৃষ্টির কাজের মধ্যে, ভাবসম্ভোগে নয়। সেই বিচিত্র সৃষ্টির শক্তি কি জেগেছে আজ আমাদের মধ্যে— যে শক্তিতে দেশের অন্নদৈন্য, স্বাস্থ্যের দৈন্য, জ্ঞানের দৈন্য, সব ঘুচে যাবে? বসন্তকালের অরণ্যে যেমন তরুলতা সব ঐশ্বর্যে পূর্ণ হয়ে ওঠে, তেমনি কর্মের বিকাশে সমস্ত দেশে একটি বিচিত্র রূপ ব্যাপ্ত হয়ে যায়। সেই লক্ষণ কি দেখতে পাই আমরা। আমি তো সায় পাই নে অন্তরে। ভাবাবেগ আছে, কিন্তু তার মধ্যে কর্মের প্রবর্তনা অতি অল্প। কিছু কাজ যে হয় নি তা বলছি নে, কিন্তু সে বড়ো অল্প। আবার সেজন্যে পুরোনো কথা স্মরণ করিয়ে দেবার সময় এসেছে। কিন্তু আমার সময় গিয়েছে, স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়েছে, আর অধিক দিন বাকি নেই আমার। তথাপি আমি বেরিয়েছি— পুরস্কারের জন্যে নয়, বরমাল্য নেবার জন্যে নয়, করতালি-লাভের জন্যে নয়, সম্মানের ট্যাক্স আদায় করবার জন্যে নয়— দেশকে আপনারা জানতে চাচ্ছেন কর্ম-দ্বারা, এইটুকু দেখে যাব আমি। জীবনের অবসানকালে আমি দেখে যেতে চাই যে, সর্বত্র কর্মশক্তি উদ্যত হয়েছে। তা যদি না দেখতে পাই তবে জানব যে, আমাদের যে ভাবাবেগ তা সত্য নয়। যেখানে চিত্তের সত্য-উদ্‌বোধন হয় সেখানে সত্যকর্ম আপনি প্রকাশ পায়। দেশের মধ্যে কর্ম না দেখে আমাদের চিত্ত বিষণ্ণ হয়েছে। মরুভূমির মধ্যে আমরা কী দেখতে পাই। খর্বাকৃতি কাঁটাগাছ, মনসাগাছ দূরে দূরে ছড়ানো রয়েছে; তাদের মধ্যে কোনো ঐক্য নেই, আছে বিরুদ্ধ রূপ আর চিত্তের দৈন্য। মরুভূমিতে প্রাণশক্তি কর্মচেষ্টাকে বড়ো করে তুলতে পারে নি, সমস্ত উদ্ভিদ সেখানে দৈন্যে কণ্টকিত। এখনো কি তাই দেখব আমাদের মধ্যে

বসন্তের দক্ষিণসমীরণ কি বইল না। মরুভূমির যে প্রাণের দৈন্য বিরোধে·বিদ্বেষে ভেদে বিভেদে সব কণ্টকিত, তাই দেখব এখনো? তা হলে যে সব ব্যর্থ হবে, মরুভূমিতে বারিসেচন যেমন ব্যর্থ হয়। নেব আমরা এই শুভদিনকে, কেবল হৃদয় দিয়ে নয়, বুদ্ধি দিয়ে নয়— কর্মের মধ্যে চার দিকে তাকে বেঁধে নেব, কখনো যেতে দেব না— এই আমাদের পণ হোক। আমার কাজের পরিচয় দেবার অবকাশ নেই, কিন্তু অল্প কাজের মধ্যে সফলতার যে লক্ষণ দেখেছি, তাতে যে আনন্দ পেয়েছি, সেই আনন্দ আপনাদের কাছে ব্যক্ত করতে চাই। পূর্বকালে এমন একদিন ছিল যখন আমাদের গ্রামে গ্রামে প্রাণের প্রাচুর্য পূর্ণরূপে ছিল। গ্রামে গ্রামে জলাশয়-খনন, অতিথিশালা-স্থাপন, নানা উৎসবের আনন্দ, শিক্ষাদানের ব্যবস্থা— এ-সবই ছিল। সেই ছিল প্রাণের লক্ষণ। আজকের দিনে কেন জল দূষিত হয়ে গেছে, শুষ্ক হয়ে গেছে। কেন তৃষ্ণার্তের কান্না গ্রীষ্মের রৌদ্রতপ্ত আকাশ ভেদ করে ওঠে। কেন এত ক্ষুধা, অজ্ঞানতা, মারী। সমস্ত দেশের স্বাভাবিক প্রাণচেষ্টার গতি রুদ্ধ হয়ে গেছে। যেমন আমরা দেখতে পাই, যেখানে নদীস্রোতের প্রবাহ ছিল সেখানে নদী যদি শুষ্ক হয়ে যায় বা স্রোত অন্য দিকে চলে যায় তবে দুকূল মারীতে দুর্ভিক্ষে পীড়িত হয়ে পড়ে। তেমনি এক সময়ে পল্লীর হৃদয়ে যে প্রাণশক্তি অজস্র ধারায় শাখায় প্রশাখায় প্রবাহিত হত আজ তা নির্জীব হয়ে গেছে, এইজন্যেই ফসল ফলছে না। দেশবিদেশের অতিথিরা ফিরে যাচ্ছেন আমাদের দৈন্যকে উপহাস করে। চার দিকে এইজন্যেই বিভীষিকা দেখছি। যদি সেদিন না ফেরাতে পারি, তবে শহরের মধ্যে বক্তৃতা দিয়ে, নানা অনুষ্ঠান করে কিছু ফল হবে না। প্রাণের ক্ষেত্র যেখানে, জাতি যেখানে জন্মলাভ করেছে, সমাজের ব্যবস্থা হয় যেখানে, সেই পল্লীর প্রাণকে প্রকাশিত করো— তা হলেই আমি বিশ্বাস করি সমস্ত সমস্যা দূর হবে। যখন কোনো রোগীর গায়ে ব্যথা, ফোড়া প্রভৃতি নানা রকমের লক্ষণ দেখা যায় তখন রোগের প্রত্যেকটি লক্ষণকে একে একে দূর করা যায় না। দেহের সমস্ত রক্ত দূষিত হলেই নানা লক্ষণ দেখা দেয়। একটা সম্প্রদায়ের ভিতরে যদি বিরোধ ভেদ বিদ্বেষ প্রভৃতি রোগলক্ষণ দেখা দেয় তবে তাদের বাইরে থেকে স্বতন্ত্র আকারে দূর করা যায় না। দূষিত রক্তকে বিশুদ্ধ করে স্বাস্থ্যসঞ্চার করতে হবে, তবেই সমস্ত সমাজদেহের বিরোধ বিদ্বেষ দৈন্য দুর্গতি সব দূর হয়ে যাবে। এই কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে আমি আজকে এসেছি। অনুকূল সময় এসেছে, বসন্তসমীরণ বইতে আরম্ভ হয়েছে— আমি অনুভব করছি যে, মনে করিয়ে দেবার দিন এসেছে। দ্বিতীয় বার যেন এ সময় আমরা নষ্ট না করি, যথার্থ কর্মে যেন আমরা ব্রতী হই। দারিদ্র্যের মাঝখানে, অপমানের মাঝখানে, দেশের

তৃষ্ণার মাঝখানে, প্রত্যাশকভাবে সকলে মিল কাজ করতে হবে। এর বেশি কিছু বলতে চাই নে আজ। কালকে হয়তো আপনারা এ কথা ভুলেও যেতে পারেন, অথবা বলতে পারেন যে আমি খুব ভালো করে বলেছি। এইটুকুই যদি আমার পুরস্কার হয় তবে আমি বঞ্চিত হলাম। আমি আজ যা বলছি তা আমার প্রাণ দিয়ে, আয়ুক্ষয় ক'রে। আমার যে স্বল্পাবশিষ্ট আয়ু তাই আমি দিচ্ছি আমার প্রতি নিশ্বাসে। এর পরিবর্তে আমি চাই সত্যিকার কর্মী। পল্লীপ্রাণের বিচিত্র অভাব দূর করবার জন্যে যারা ব্রতী তাদের পাশে আমি আপনাদের আহ্বান করছি। তাদের আপনারা একলা ফেলে রাখবেন না, অসহায় করে রাখবেন না, তাদের আনুকূল্য করুন। কেবল বাক্য-রচনায় আপনাদের শক্তি নিঃশেষিত হলে, আমাকে যতই প্রশংসা করুন, বরমাল্য দিন, তাতে উপযুক্ত প্রত্যর্পণ হবে না। আমি দেশের জন্যে আপনাদের কাছে ভিক্ষা চাই। শুধু মুখের কথায় আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না। আমি চাই ত্যাগের ভিক্ষা, তা যদি না দিতে পারেন তবে জীবন ব্যর্থ হবে, দেশ সার্থকতা লাভ করতে পারবে না, আপনাদের উত্তেজনা যতই বড়ো হোক-না কেন। আমার স্বল্পাবশিষ্ট নিশ্বাস ব্যয় করে এ কথা বলছি— আপনাদের মনোরঞ্জনের জন্যে, স্তুতিলাভের জন্যে কিছু বলছি না—দেশের জন্যে আমার ভিক্ষাপাত্র ভরে দিন ত্যাগ দিয়ে, কর্মশক্তি দিয়ে। এই ব'লে আজ আপনাদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করি।

ফেব্রুয়ারি ১৯২৬ বৈশাখ ১৩৩৩

বাঙালির কাপড়ের কারখানা ও হাতের তাঁত

বাংলাদেশের কাপড়ের কারখানা সম্বন্ধে যে প্রশ্ন এসেছে তার উত্তরে একটি মাত্র বলবার কথা আছে, এগুলিকে বাঁচাতে হবে। আকাশ থেকে বৃষ্টি এসে আমাদের ফসলের খেত দিয়েছে ডুবিয়ে, তার জন্যে আমরা ভিক্ষা করতে ফিরছি— কার কাছে। সেই খেতটুকু ছাড়া যার অন্নের আর-কোনো উপায় নেই, তারই কাছে। বাংলাদেশের সবচেয়ে সাংঘাতিক প্লাবন, অক্ষমতার প্লাবন, ধনহীনতার প্লাবন। এ দেশের ধনীরা ঋণগ্রস্ত, মধ্যবিত্তেরা চির দুশ্চিন্তায় মগ্ন, দরিদ্রেরা উপবাসী। তার কারণ, এ দেশের ধনের কেবলই ভাগ হয়, গুণ হয় না।

আজকের দিনের পৃথিবীতে যারা সক্ষম তারা যন্ত্রশক্তিতে শক্তিমান। যন্ত্রের দ্বারা তারা আপন অঙ্গের বহুবিস্তার ঘটিয়েছে, তাই তারা জয়ী। এক দেহে তারা বহুদেহ।

তাদের জনসংখ্যা মাথা গ'ণে নয়, যন্ত্রের দ্বারা তারা আপনাকে বহুগুণিত করেছে। এই বহুলাঙ্গ মানুষের যুগে আমরা বিরলাঙ্গ হয়ে অন্য দেশের ধনের তলায় শীর্ণ হয়ে পড়ে আছি।

সংখ্যাহীন উমেদারের দেশে কেবল যে অন্নের টানাটানি ঘটে তা নয়, হৃদয়ের ঔদার্য থাকে না। প্রভুমুখপ্রত্যাশী জীবিকার সংকীর্ণ ক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা বিদ্বেষ কণ্টকিত হয়ে ওঠে। পাশের লোকের উন্নতি সইতে পারি নে। বড়োকে ছোটো করতে চাই। একখানাকে সাতখানা করতে লাগি। মানুষের যে-সব প্রবৃত্তি ভাঙন ধরাবার সহায় সেইগুলিই প্রবল হয়। গড়ে তোলবার শক্তি কেবলই খোঁচা খেয়ে খেয়ে মরে।

দশে মিলে অন্ন উৎপাদন করবার যে যান্ত্রিক প্রণালী তাকে আয়ত্ত করতে না পারলে যন্ত্ররাজদের কনুইয়ের ধাক্কা খেয়ে বাসা ছেড়ে মরতে হবে। মরতেই বসেছি। বাহিরের লোক অন্নের ক্ষেত্রের থেকে ঠেলে ঠেলে বাঙালিকে কেবলি কোণ-ঠ্যাসা করছে। বহুকাল থেকে আমরা কলম হাতে নিয়ে একা একা কাজ করে মানুষ— যারা সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করতে অভ্যস্ত, আজ ডাইনে বাঁয়ে কেবলই তাদের রাস্তা ছেড়ে দিয়ে চলি, নিজের রিক্ত হাতটাকে কেবলই খাটাচ্ছি পরীক্ষার কাগজ, দরখাস্ত এবং ভিক্ষার পত্র লিখতে।

একদিন বাঙালি শুধু কৃষিজীবী এবং মসীজীবী ছিল না। ছিল সে যন্ত্রজীবী। মাড়াইকল চালিয়ে দেশ-দেশান্তরকে সে চিনি জুগিয়েছে। তাঁত-যন্ত্র ছিল তার ধনের প্রধান বাহন। তখন শ্রী ছিল তার ঘরে, কল্যাণ ছিল গ্রামে গ্রামে।

অবশেষে আরো বড়ো যন্ত্রের দানব-তাঁত এসে বাংলার তাঁতকে দিলে বেকার করে। সেই অবধি আমরা দেবতার অনিশ্চিত দয়ার দিকে তাকিয়ে কেবলই মাটি চাষ করে মরছি— মৃত্যুর চর নানা বেশে নানা নামে আমাদের ঘর দখল করে বসল।

তখন থেকে বাংলাদেশের বুদ্ধিমানদের হাত বাঁধা পড়েছে কলম-চালনায়। ঐ একটিমাত্র অভ্যাসেই তারা পাকা, দলে দলে তারা চলেছে আপিসের বড়োবাবু হবার রাস্তায়। সংসারসমুদ্রে হাবুডুবু খেতে খেতে কলম আঁকড়িয়ে থাকে, পরিত্রাণের আর-কোনো অবলম্বন চেনে না। সন্তানের প্রবাহ বেড়ে চলে; তার জন্যে যারা দায়িক তারা উপরে চোখ তুলে ভক্তিভরে বলে, 'জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি।'

আহার তিনি দেন না, যদি স্বহস্তে আহারের পথ তৈরি না করি। আজ এই কলের যুগে কলই সেই পথ। অর্থাৎ, প্রকৃতির গুপ্ত ভাণ্ডারে যে শক্তি পুঞ্জিত তাকে আত্মসাৎ করতে পারলে তবেই এ যুগে আমরা টি্ঁকতে পারব।

এ কথা মানি—যন্ত্রের বিপদ আছে। দেবাসুরে সমুদ্রমন্থনের মতো সে বিষও উদ্গার করে। পশ্চিম-মহাদেশের কল-তলাতেও দুর্ভিক্ষ আজ গুঁড়ি মেরে আসছে। তা ছাড়া, অসৌন্দর্য, অশান্তি, অসুখ, কারখানায় অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যেরই শামিল হয়ে উঠল। কিন্তু এজন্য প্রকৃতিদত্ত শক্তিসম্পদ্‌কে দোষ দেব না, দোষ দেব মানুষের রিপুকে। খেজুরগাছ, তালগাছ বিধাতার দান; তাড়িখানা মানুষের সৃষ্টি। তালগাছকে মারলেই নেশার মূল মরে না। যন্ত্রের বিষদাঁত যদি কোথাও থাকে, তবে সে আছে আমাদের লোভের মধ্যে। রাশিয়া এই বিষদাঁতটাকে সজোরে ওপড়াতে লেগেছে, কিন্তু সেইসঙ্গে যন্ত্রকে সুদ্ধ টান মারে নি। উল্টো, যন্ত্রের সুযোগকে সর্বজনের পক্ষে সম্পূর্ণ সুগম করে দিয়ে লোভের কারণটাকেই সে ঘুচিয়ে দিতে চায়।

কিন্তু এই অধ্যবসায়ে সবচেয়ে তার বাধা ঘটছে কোন্‌খানে। যন্ত্রের সম্বন্ধে যেখানে সে অপটু ছিল সেখানেই। একদিন জারের সাম্রাজ্য-কালে রাশিয়ার প্রজা ছিল আমাদের মতো অক্ষম। তারা মুখ্যত ছিল চাষী। সেই চাষের প্রণালী ও উপকরণ ছিল আমাদেরই মতো আদ্যকালের। তাই আজ রাশিয়া ধনোৎপাদনের যন্ত্রটাকে যখন সর্বজনীন করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত, তখন যন্ত্র যন্ত্রী ও কর্মী আনাতে হচ্ছে যন্ত্রদক্ষ কারবারী দেশ থেকে। তাতে বিস্তর ব্যয় ও বাধা। রাশিয়ার অনভ্যস্ত হাত ছুটো এবং তার মন না চলে দ্রুতগতিতে, না চলে নিপুণভাবে।

অশিক্ষায় ও অনভ্যাসে আজ বাংলাদেশের মন এবং অঙ্গ যন্ত্র-ব্যবহারে মূঢ়। এই ক্ষেত্রে বোম্বাই আমাদেরকে যে পরিমাণে ছাড়িয়ে গেছে সেই পরিমাণেই আমরা তার পরোপজীবী হয়ে পড়েছি। বঙ্গ-বিভাগের সময় এই কারণেই আমাদের ব্যর্থতা ঘটেছিল, আবার যে-কোনো উপলক্ষে পুনশ্চ ঘটতে পারে। আমাদের সমর্থ হতে হবে, সক্ষম হতে হবে— মনে রাখতে হবে যে, আত্মীয়মণ্ডলীর মধ্যে নিঃস্ব কুটুম্বের মতো কৃপাপাত্র আর কেউ নেই।

সেই বঙ্গবিভাগের সময়ই বাংলাদেশে কাপড় ও সুতোর কারখানার প্রথম সূত্রপাত। সমস্ত দেশের মন বড়ো ব্যবসায় বা যন্ত্রের অভ্যাসে পাকা হয় নি; তাই সেগুলি চলছে নানা বাধার ভিতর দিয়ে মন্থরগমনে। মন তৈরি করে তুলতেই হবে, নইলে দেশ অসামর্থ্যের অবসাদে তলিয়ে যাবে।

ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের মধ্যে বাংলাদেশ সর্বপ্রথমে যে ইংরেজি বিদ্যা গ্রহণ করেছে সে হল পুঁথির বিদ্যা। কিন্তু যে ব্যাবহারিক বিদ্যায় সংসারে মানুষ জয়ী হয়, য়ুরোপের সেই বিদ্যাই সব-শেষে বাংলাদেশে এসে পৌঁছল। আমরা য়ুরোপের বৃহস্পতি গুরুর কাছ থেকে প্রথম হাতে-খড়ি নিয়েছি, কিন্তু য়ুরোপের শুক্রাচার্য জানেন

কী করে মার বাঁচানো যায়— সেই বিদ্যার জোরেই দৈত্যেরা স্বর্গ দখল করে নিয়েছিল। শুক্রাচার্যের কাছে পাঠ নিতে আমরা অবজ্ঞা করেছি— সে হল হাতিয়ার-বিদ্যার পাঠ। এইজন্যে পদে পদে হেরেছি, আমাদের কঙ্কাল বেরিয়ে পড়ল।

বোম্বাই প্রদেশে এ কথা বললে ক্ষতি হয় না যে, 'চরখা ধরো'। সেখানে লক্ষ লক্ষ কলের চরখা পশ্চাতে থেকে তার অভাব পূরণ করছে। বিদেশী কলের কাপড়ের বন্যার বাঁধ বাঁধতে পেরেছে ঐ কলের চরখায়। নইলে একটিমাত্র উপায় ছিল নাগাসন্ন্যাসী সাজা। বাংলাদেশে হাতের চরখাই যদি আমাদের একমাত্র সহায় হয় তা হলে তার জরিমানা দিতে হবে বোম্বাইয়ের কলের চরখার পায়ে। তাতে বাংলার দৈন্যও বাড়বে, অক্ষমতাও বাড়বে। বৃহস্পতি গুরুর কাছে যে বিদ্যা লাভ করেছি— তাকে পূর্ণতা দিতে হবে শুক্রাচার্যের কাছে দীক্ষা নিয়ে। যন্ত্রকে নিন্দা করে যদি নির্বাসনে পাঠাতে হয়, তা হলে যে মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে সেই নিন্দা রটাই তাকে সুদ্ধ বিসর্জন দিয়ে হাতে-লেখা পুঁথির চলন করতে হবে। এ কথা মানব যে, মুদ্রাযন্ত্রের অপক্ষপাত দাক্ষিণ্যে অপাঠ্য এবং কুপাঠ্য বইয়ের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। তবু ওর আশ্রয় যদি ছাড়তে হয় তবে আর-কোনো একটা প্রবলতর যন্ত্রেরই সঙ্গে চক্রান্ত করে সেটা সম্ভব হতে পারবে।

যাই হোক, বাংলাদেশেও একদিন বিষম ব্যর্থতার তাড়নায় 'বঙ্গলক্ষ্মী' নাম নিয়ে কাপড়ের কল দেখা দিয়েছিল। সাংঘাতিক মার খেয়েও আজও সে বেঁচে আছে। তার পরে দেখা দিল 'মোহিনী' মিল; একে একে আরো কয়েকটি কারখানা মাথা তুলেছে।

এদের যেমন করে হোক রক্ষা করতে হবে— বাঙালির উপর এই দায় রয়েছে। চাষ করতে করতে যে কেবল ফসল ফলে তা নয়, চাষের জমিও তৈরি করে। কারখানাকে যদি বাঁচাই তবে কেবল যে উৎপন্ন দ্রব্য পাব তা নয়, দেশে কারখানার জমিও গড়ে উঠবে।

বাংলার মিল থেকে যে কাপড় উৎপন্ন হচ্ছে, যথাসম্ভব একান্তভাবে সেই কাপড়ই বাঙালি ব্যবহার করবে ব'লে যেন পণ করে। একে প্রাদেশিকতা বলে না, এ আত্মরক্ষা। উপবাসক্লিষ্ট বাঙালির অন্নপ্রবাহ যদি অন্য প্রদেশের অভিমুখে অনায়াসে বইতে থাকে এবং সেইজন্য বাঙালির দুর্বলতা যদি বাড়তে থাকে, তবে মোটের উপর তাতে সমস্ত ভারতেরই ক্ষতি। আমরা সুস্থ সমর্থ হয়ে দেহরক্ষা করতে যদি পারি তবেই আমাদের শক্তির সম্পূর্ণ চালনা সম্ভব হতে পারে। সেই শক্তি নিরশনক্ষীণতায় অবমর্দিত হলে তাতে, শুধু ভারতকে কেন, পৃথিবীকেই বঞ্চিত করা হবে।

বাঙালির ঔদাসীন্যকে ধাক্কা দিয়ে দূর করা চাই। আমাদের কোন্ কারখানায় কিরকম সামগ্রী উৎপন্ন হচ্ছে বার বার সেটা আমাদের সামনে আনতে হবে। কলকাতায় ও অন্যান্য প্রাদেশিক নগরীর মিউনিসিপ্যালিটির কর্তব্য হবে প্রদর্শনীর সাহায্যে বাংলার সমস্ত উৎপন্নদ্রব্যের সংবাদ নিয়ত প্রচার করা, এবং বাঙালি যুবকদের মনে সেই উৎসাহ জাগানো যাতে বিশেষ করে তারা বাঙালির হাতের ও কলের জিনিস ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়।

অবশেষে উপসংহারে একটা কথা বলতে ইচ্ছা করি। বোম্বাইয়ের যে-সমস্ত কারখানা দক্ষিণ-আফ্রিকার কয়লায় কল চালিয়ে কাপড় বিক্রি করছে, তাদের কাপড় কেনায় যদি আমাদের দেশাত্মবোধে বাধা না লাগে, তবে আমাদের বাংলাদেশের তাঁতিদের কেন নির্মম হয়ে মারি। বাঙালি দক্ষিণ-আফ্রিকার কোনো উপকরণ ব্যবহার করে না, করে বিলিতি সুতো। তারা বিলাতের আমদানি কোনো কল চালিয়ে কাপড় বোনে না, নিজেদের হাতের শ্রম ও কৌশল তাদের প্রধান অবলম্বন, আর যে তাঁতে বোনে সেও দিশি তাঁত। এখন যদি তুলনায় হিসাব করে দেখা যায়, আমাদের তাঁতের কাপড়ের ও বোম্বাই মিলের কাপড়ের কতটা অংশ বিদেশী, তা হলে কী প্রমাণ হবে। তা ছাড়া কেবলই কি পণ্যের হিসাবটাই বড়ো হবে, শিল্পের দাম তার তুলনায় তুচ্ছ? সেটাকে আমরা মূঢ়ের মতো বধ করতে বসেছি। অথচ যে যন্ত্রের বাড়ি তাকে মারলুম সেটা কি আমাদেরই যন্ত্র। সেই যন্ত্রের চেয়ে বাংলাদেশের বহু যুগের শিক্ষাপ্রাপ্ত গরিবের হাত দুখানা কি অকিঞ্চিৎকর। আমি জোর করেই বলব, পুজোর বাজারে আমাকে যদি কিনতে হয় তবে আমি নিশ্চয়ই বোম্বাইয়ের বিলিতি যন্ত্রের কাপড় ছেড়ে ঢাকার দিশি তাঁতের কাপড় অসংকোচে এবং গৌরবের সঙ্গেই কিনব। সেই কাপড়ের সুতোয় বাংলাদেশের বহু যুগের প্রেম এবং আপন কৃতিত্ব গাঁথা হয়ে আছে।

অবশ্য, সস্তা দামের যদি গরজ থাকে তা হলে মিলের কাপড় কিনতে হবে, কিন্তু সেজন্য যেন বাংলাদেশের বাইরে না যাই। যাঁরা শৌখিন কাপড় বোম্বাই মিল থেকে বেশি দাম দিয়ে কিনতে প্রস্তুত, তাঁরা কেন যে তার চেয়ে অল্পদামে তেমনি শৌখিন শান্তিপুরি কাপড় না কেনেন তার যুক্তি খুঁজে পাই নে। একদিন ইংরেজ বণিক বাংলাদেশের তাঁতকে মেরেছিল, তাঁতির হাতের নৈপুণ্যকে আড়ষ্ট করে দিয়েছিল। আজ আমাদের নিজের দেশের লোকে তার চেয়ে বড়ো বজ্র হানলে। যে হাত তৈরি হতে কতকাল লেগেছে সেই হাতকে অপটু করতে বেশি দিন লাগে না। কিন্তু স্বদেশের এই বহুকালের অর্চিত কারুলক্ষ্মীকে চিরদিনের মতো বিসর্জন দিতে কি কারো ব্যথা লাগবে না। আমি পুনর্বার বলছি, কাপড়ের বিদেশী যন্ত্রে

বিদেশী কয়লায় বিদেশী মিশাল যতটা, বিলিতি সুতো সত্ত্বেও তাঁতের কাপড়ে তার চেয়ে স্বল্পতর। আরো গুরুতর কথা এই যে, আমাদের তাঁতের সঙ্গে বাংলা শিল্প আছে বাঁধা। এই শিল্পের দাম অর্থের দামের চেয়ে কম নয়।

এ কথা বলা বাহুল্য বাংলা তাঁতে স্বদেশী মিলের বা চরখার সুতো ব্যবহার করেও তাকে বাজারে চলন-যোগ্য দামে বিক্রি করা যদি সম্ভবপর হয়, তবে তার চেয়ে ভালো আর কিছুই হতে পারে না। স্বদেশী চরখার উৎপাদনশক্তি যখন সেই অবস্থায় পৌঁছবে তখন তাঁতিকে অনুনয়-বিনয় করতেই হবে না; কিন্তু যদি না পৌঁছয়, তবে বাঙালি তাঁতিকে ও বাংলার শিল্পকে বিলিতি লৌহযন্ত্র ও বিদেশী কয়লার বেদীতে বলিদান করব না।

আশ্বিন ১৩৩৮

জলোৎসর্গ

ভুবনডাঙার জলাশয়-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে কথিত

আজকের অনুষ্ঠানসূচীর শেষভাগে আছে আমার অভিভাষণ। কিন্তু যে বেদমন্ত্রগুলি এইমাত্র পড়া হল তার পরে আমি আর কিছু বলা ভালো মনে করি না। সেগুলি এত সহজ, এমন সুন্দর, এমন গম্ভীর যে, তার কাছে আমাদের ভাষা পৌঁছয় না। জলের শুচিতা, তার সৌন্দর্য, তার প্রাণবত্তার অকৃত্রিম আনন্দে এই মন্ত্রগুলি নির্মল উৎসের মতো উৎসারিত।

আমাদের মাতৃভূমিকে সুজলা সুফলা বলে স্তব করা হয়েছে। কিন্তু এই দেশেই যে জল পবিত্র করে সে স্বয়ং হয়েছে অপবিত্র, পঙ্কবিলীন— যে করে আরোগ্যবিধান সেই আজ রোগের আকর। দুর্ভাগ্য আক্রমণ করেছে আমাদের প্রাণের মূলে, আমাদের জলাশয়ে, আমাদের শস্যক্ষেত্রে। সমস্ত দেশ হয়ে উঠেছে তৃষার্ত, মলিন, রুগ্‌ণ, উপবাসী। ঋষি বলেছেন— হে জল, যেহেতু তুমি আনন্দদাতা, তুমি আমাদের অন্নলাভের যোগ্য করো। সর্ববিধ দোষ ও মালিন্য -দূরকারী এই জল মাতার ন্যায় আমাদের পবিত্র করুক।— জলের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশ আনন্দের যোগ্যতা, অন্নলাভের যোগ্যতা, রমণীয় দৃষ্টি-লাভের যোগ্যতা প্রতিদিন হারিয়ে ফেলছে। নিজের চারি দিককে অমলিন অন্নবান্ অনাময় করে রাখতে পারে না যে বর্বরতা, তা রাজারই হোক আর প্রজারই হোক, তার গ্লানিতে সমস্ত দেশ লাঞ্ছিত। অথচ একদিন দেশে

জল ছিল প্রচুর, আজ গ্রামে গ্রামে পাঁকের তলায় কবরস্থ মৃত জলাশয়গুলি তার প্রমাণ দিচ্ছে, আর তাদেরই প্রেত মারীর বাহন হয়ে মারছে আমাদের।

দেশে রাজনৈতিক প্রচেষ্টা ও রাষ্ট্রচিন্তা আলোড়িত। কিন্তু আমাদের দেশাত্মবোধ দেশের সঙ্গে আপন প্রাণাত্মবোধের পরিচয় আজও ভালো করে দিল না। অন্য সকল লজ্জার চেয়ে এই লজ্জার কারণকেই এখানে আমরা সব চেয়ে দুঃখকর বলে এসেছি। অনেক দিন পরে দেশের এই প্রাণান্তিক বেদনা সম্বন্ধে দেশের চেতনার উদ্রেক হয়েছে। ধরণীর যে অন্তঃপুরগত সম্পদ্, যাতে জীবজন্তুর আনন্দ, যাতে তার প্রাণ, তাকে ফিরে পাবার সাধনা আমাদের সকল সাধনার গোড়ায়, এই সহজ কথাটি স্বীকার করবার শুভদিন বোধ হচ্ছে আজ অনেক কাল পরে এসেছে।

যে জলকষ্ট সমস্ত দেশকে অভিভূত করেছে তার সবচেয়ে প্রবল দুঃখ মেয়েদের ভোগ করতে হয়। মাতৃভূমির মাতৃত্ব প্রধানত আছে তার জলে— তাই মন্ত্রে আছে : আপো অস্মান্ মাতরঃ শুন্ধয়ন্তু। জল মায়ের মতো আমাদের পবিত্র করুক। জলাভাবে দেশে যেন মাতৃত্বের ক্ষতি হয়, সেই ক্ষতি মেয়েদের দেয় বেদনা। পদ্মাতীরের পল্লীতে থাকবার সময় দেখেছি চার-পাঁচ মাইল তফাত থেকে মধ্যাহ্নরৌদ্র মাথায় নিয়ে তপ্ত বালুর উপর দিয়ে মেয়েরা বারে বারে জল বহন করে নিয়ে চলেছে। তৃষিত পথিক এসে যখন এই জল চায় তখন সেই দান কী মহার্ঘ দান!

অথচ বারে বারে বন্যা এসে মারছে আমাদের দেশকেই। হয় মরি জলের অভাবে নয় বাহুল্যে। প্রধান কারণ এই যে, পলি ও পাঁকে নদীগর্ভ ও জলাশয়তল বহুকাল থেকে অবরুদ্ধ ও অগভীর হয়ে এসেছে। বর্ষণজাত জল যথেষ্ট পরিমাণে ধারণ করবার শক্তি তাদের নেই। এই কারণে যথোচিত আধার-অভাবে সমস্ত দেশ দেবতার অযাচিত দানকে অস্বীকার করতে থাকে, তারই শাপ তাকে ডুবিয়ে মারে।

আমাদের বিশ্বভারতীর সেবাব্রতীগণ নিজেদের ক্ষুদ্র সামর্থ্য-অনুসারে নিকটবর্তী পল্লীগ্রামের অভাব দূর করবার চেষ্টা করছেন। এদের মধ্যে একজনের নাম করতে পারি, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি এই সম্মুখের বিস্তীর্ণ জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার করতে কী অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, অনেকেই তা জানেন। বহুকাল পূর্বে রায়পুরের জমিদার ভুবনচন্দ্র সিংহ ভুবনডাঙার এই জলাশয় প্রতিষ্ঠা করে গ্রামবাসীদের জল দান করেছিলেন। তখনকার দিনে এই জলদানের প্রসার যে কিরকম ছিল তা অনুমান করতে পারি যখন জানি এই বাঁধ ছিল পঁচাশি বিঘে জমি নিয়ে।

সেই ভুবনচন্দ্র সিংহের উত্তরবংশীয় দেশবিখ্যাত লর্ড্ সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ যদি আজ বেঁচে থাকতেন তবে তাঁর পূর্বপুরুষের লুপ্তপ্রায় কীর্তি গ্রামকে ফিরে দেবার জন্যে নিঃসন্দেহ তাঁর কাছে যেতুম। কিন্তু আমার বিশ্বাস, স্বয়ং গ্রামবাসীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে জনশক্তিসমবায়ের দ্বারা এই-যে জলাশয়ের উদ্ধার ঘটেছে তার গৌরব আরো বেশি। এইরকম সমবেত চেষ্টাই আমরা সমস্ত দেশের হয়ে কামনা করি।

এখানে ক্রমে শুষ্ক ধূলি এসে জলরাশিকে আক্রমণ করেছিল চার দিক থেকে। আত্মঘাতিনী মাটি আপন বুকের সরসতা হারিয়ে রিক্তমূর্তি ধারণ করেছিল। আবার আজ সে দেখা দিল স্নিগ্ধ রূপ নিয়ে। বন্ধুরা অনেকে অক্লান্ত যত্নে নানাভাবে সহায়তা করেছেন আমাদের এই কাজে। সিউড়ির কর্তৃপক্ষীয়েরাও তাতে যোগ দিয়েছিলেন। আমাদের শক্তির অনুপাতে জলাশয়ের আয়তন অনেক খর্ব করতে হয়েছে। আয়তন এখন হয়েছে একুশ বিঘে। তবু চোখ জুড়িয়ে দিয়ে জলের আনন্দরূপ গ্রামের মধ্যে অবতীর্ণ হল।

এই জলপ্রসার সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের আভায় রঞ্জিত হয়ে নূতন যুগের হৃদয়কে আনন্দিত করবে। তাই জেনে আজ কবিহৃদয় থেকে একে অভ্যর্থনা করছি। এই জল চিরস্থায়ী হোক, গ্রামবাসীকে পালন করুক, ধরণীকে অভিষিক্ত করে শস্যদান করুক। এর অজস্র দানে চার দিক স্বাস্থ্যে সৌন্দর্যে পূর্ণ হয়ে উঠুক।

৭ ভাদ্র ১৩৪৩ কার্তিক ১৩৪৩

সম্ভাষণ

শান্তিনিকেতনে সম্মিলিত রবিবাসরের সদস্যদের প্রতি

আপনাদের এখানে আমি আহ্বান করেছি, দেখবার জন্য বোঝবার জন্য যে, আমি কী ভাবে এখানে দিন কাটাই। আমি এখানে কবি নই। এ কবির ক্ষেত্র নয়। সাহিত্য নিয়ে আমি এখানে কারবার করি নে। আমার এই কার্যক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে যে বাণী এখানে প্রকাশ পেয়েছে, যে আলোকপ্রভা এখানে দীপ্তি দিয়েছে, তার ভিতর সমস্ত দেশের অভাব ও ভাবনার উত্তর রয়েছে। এখানে আমার সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠতা নয়, এখানে আমার কর্মই রূপ পেয়েছে। এখানে আমার এই কর্মের ক্ষেত্রে আমি এতদিন কী করেছি না করেছি তারই পরিচয় আপনারা পাবেন।

আমার গত জীবনের আনন্দ উৎসাহ সাহিত্য, সবই পল্লীজীবনের আবেষ্টনীর মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল। আমার জীবনের অনেকদিন নগরের বাইরে পল্লীগ্রামের সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়ে কেটেছে, তখনই আমি আমাদের দেশের সত্যিকার রূপ কোথায় তা অনুভব করতে পেরেছি। যখন আমি পদ্মানদীর তীরে গিয়ে বাস করেছিলাম, তখন গ্রামের লোকদের অভাব অভিযোগ, এবং কতবড়ো অভাগা যে তারা, তা নিত্য চোখের সম্মুখে দেখে আমার হৃদয়ে একটা বেদনা জেগেছিল। এই-সব গ্রামবাসীরা যে কত অসহায় তা আমি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলাম। তখন পল্লীগ্রামের মানুষের জীবনের যে পরিচয় পেয়েছিলাম তাতে এই অনুভব করেছিলাম যে, আমাদের জীবনের ভিত্তি রয়েছে পল্লীতে। আমাদের দেশের মা, দেশের ধাত্রী, পল্লীজননীর স্তন্যরস শুকিয়ে গিয়েছে। গ্রামের লোকদের খাদ্য নেই, স্বাস্থ্য নেই, তারা শুধু একান্ত অসহায়ভাবে করুণ নয়নে চেয়ে থাকে। তাদের সেই বেদনা, সেই অসহায় ভাব আমার অন্তরকে একান্তভাবে স্পর্শ করেছিল। তখন আমি আমার গল্পে কবিতায় প্রবন্ধে সেই অসহায়দের সুখ দুঃখ ও বেদনার কথা এঁকে এঁকে প্রকাশ করেছিলাম। আমি এ কথা নিশ্চয় করেই বলতে পারি, তার আগে সাহিত্যে কেউ ঐ পল্লীর নিঃসহায় অধিবাসীদের বেদনার কথা, গ্রাম্য জীবনের কথা প্রকাশ করেন নি। তার অনেক পরিচয় আপনারা আমার গল্পে ও কবিতায় পেয়ে থাকবেন।

সে সময় থেকেই আমার মনে এই চিন্তা হয়েছিল, কেমন করে এই-সব অসহায় অভাগাদের প্রাণে মানুষ হবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিতে পারি। এই-যে এরা মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ শিক্ষা হতে বঞ্চিত, এই-যে এরা খাদ্য হতে বঞ্চিত, এই-যে এরা একবিন্দু পানীয় জল হতে বঞ্চিত, এর কি প্রতিকারের কোনো উপায় নেই! আমি স্বচক্ষে দেখেছি, পল্লীগ্রামের মেয়েরা ঘট কাঁখে করে তপ্ত বালুকার মধ্য দিয়ে এক ক্রোশ দূরের জলাশয় হতে জল আনতে ছুটেছে। এই দুঃখদুর্দশার চিত্র আমি প্রত্যহ দেখতাম। এই বেদনা আমার চিত্তকে একান্তভাবে স্পর্শ করেছিল। কী ভাবে কেমন করে এদের এই মরণদশার হাত থেকে বাঁচাতে পারা যায় সেই ভাবনা ও সেই চিন্তা আমাকে বিশেষভাবে অভিভূত করেছিল। তখন কেবলই মনে হত জনকতক ইংরাজি-জানা লোক ভারতবর্ষের উপর— যেখানে এত দুঃখ, এত দৈন্য, এত হাহাকার ও শিক্ষার অভাব সেখানে কেমন করে রাষ্ট্রীয় সৌধ নির্মাণ করবে। পল্লীজীবনকে উপেক্ষা করে এ কী করে সম্ভব হয় তা ভেবেই উঠতে পারি নি। সেবার পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনে যখন দুই বিরুদ্ধ পক্ষের সৃষ্টি

হল তখন আমাকে তাঁরা তাঁদের গোলযোগের মীমাংসার জন্য সভাপতির পদে বরণ করেছিলেন। আমার অভিভাষণ শুনে দুই পক্ষই আমার খুবই প্রশংসা করে বললেন, আপনি ঠিক আমাদেরই পক্ষের কথা বলেছেন; আমি কিন্তু জানতাম, আমি কারুর কথাই বলি নি। আমার জীবনের মধ্যে পল্লীগ্রামের দুঃখ-দুর্দশার যে চিত্রটি গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল, আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল, বিচলিত করেছিল, আমার সেই হৃদয়ের কাজ সেখান হতেই শুরু করবার একটা উপলক্ষ পেয়েছিলাম।

আমার অন্তর্নিহিত গ্রামসংস্কারের আভাস সে সময় হতেই বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। নদীর তীরে সেই পল্লীবাসের সময়ে নৌকা যখন ভেসে চলত তখন দু ধারে দেখতাম পল্লীগ্রামের লোকের কত যে অভাব-অভিযোগ! সে শুধু অনুভব করেছি এবং বেদনায় চিত্ত ব্যথিত হয়েছে। ভেবেছি এই-যে আমাদের সম্মুখে অভাব ও অভিযোগের উত্তুঙ্গ শিখর দাঁড়িয়ে রয়েছে, একে কি আমাদের ভয়ের চক্ষেই কেবল দেখতে হবে। পারব না একে কখনো উত্তীর্ণ হতে? সে সময়ে দিনরাত স্বপ্নের মতো এই অভাব ও অভিযোগ দূর করবার জন্য আগ্রহ ও উত্তেজনা আমার চিত্তকে অধিকার করেছিল; যত বড়ো দায়িত্বই হোক-না কেন তাই গ্রহণ করব এই আনন্দেই অভিভূত হয়েছিলাম। আমার প্রজারা বিনা বাধায় আমার কাছে এসে তাদের অভাব-অভিযোগ জানাত, কোনো সংকোচ বা ভয় তারা করত না, আমি সে সময়ে প্রজাদের মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার করতে চেষ্টা করেছিলাম।

এমনি সময়ে আমার অন্তরের মধ্যে একটা প্রেরণা জেগে উঠল। নূতন একটা কর্মের দিকে আমার চিত্ত ধাবিত হল, মনে হল, শিক্ষার ভিতর দিয়ে সমস্ত দেশের সেবা করব। এ বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না। আমার ভাগ্যদেবতা কেবলই আমাকে ছলনা করেছেন, করুণা করেন নি, তাই তিনি আমাকে ছলনা করে নিয়ে এলেন শিক্ষাদানকার্যের ভিতর। আবার মনে হল মহর্ষির সাধনস্থল শান্তিনিকেতনে যদি ছাত্রদের এনে ফেলতে পারি তবে তাদের শিক্ষা দেওয়ার ভার তেমন কঠিন হয়তো হবে না। আমার ভাগ্যদেবতা বললেন— মুক্ত আলোকে প্রকৃতির এই সৌন্দর্যের মধ্যে এদের নিয়ে যদি ছেড়ে দাও— এদের যদি খুশি করে দাও তবেই হবে, প্রকৃতিই উহাদের হৃদয়কে পূর্ণ করে দেবে, কর্মসূচী করতে হবে না, কিছুই ভাবতে হবে না। আমার কবিচিত্ত এই নূতন প্রেরণা পেয়ে ব্যাকুল হয়ে উঠল। প্রথমে পাঁচ-সাতটি ছাত্র নিয়ে কাজ আরম্ভ করে দিলাম। শিক্ষার ব্যবস্থার সঙ্গে কোনো যোগ ছিল না, কোনো ধারণাই ছিল না। আমি তাদের কাছে রামায়ণ-মহাভারতের গল্প বলেছি, নানা গল্প

ও কাহিনী রচনা করে হাসিয়েছি কাঁদিয়েছি, তাদের চিত্তকে সরস করবার জন্য চেষ্টা করেছি। আমার যা-কিছু সামান্য সম্বল ছিল তাই নিয়ে এ কাজে নেমে পড়েছিলাম। তখন এমন কথা মনেও আসে নি যে, কত বড়ো দুর্গম পথে আমি অগ্রসর হয়েছি। ঈশ্বর যখন কাকেও কোনো কাজের ভার দেন তখন তাকে ছলনাই করেন, বুঝতে দেন না যে পরে কোথায় কোন্ পথে তাকে এগিয়ে যেতে হবে। আমার ভাগ্যদেবতাও আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে ক্রমশ এমনভাবে আমাকে জড়িয়ে ফেললেন, এমন দুর্গম পথে আমাকে টেনে নিয়ে চললেন যে, আর সেখান থেকে ভীরুর মতো ফেরবার সম্ভাবনা রইল না। এখন আমাকে এই বিরাট এই বৃহৎ কর্মক্ষেত্রের ভার বহন করতে হচ্ছে। কোনো উপায় নেই আর তাকে অস্বীকার করবার।…

আজ আপনারা সাহিত্যিকরা এখানে এসেছেন ; আপনাদের সহজে ছাড়ছি নে— আপনাদের দেখে যেতে হবে আমাদের এই অনুষ্ঠান। দেখে যেতে হবে দেশের উপেক্ষিত এই গ্রাম, বাপ-মায়ের তাড়ানো সন্তানের মতো এই গ্রামবাসীদের, এই উপেক্ষিত হতভাগারা কেমন করে ছিন্ন বস্ত্র নিয়ে অর্ধাশনে দিন কাটায়। আপনাদের নিজের চোখে দেখতে হবে, কত বড়ো কর্তব্যের গুরুভার আমাদের ও আপনাদের উপর রয়েছে। এদের দাবি পূর্ণ করবার শক্তি নেই— আমাদের এর চেয়ে লজ্জা ও অপমানের কথা আর কী আছে! কোথায় আমাদের দেশের প্রাণ, সত্যিকার অভাব অভিযোগ কোথায়, তা আপনাদের দেখে যেতে হবে। আবার সত্যিকার কাজ কোথায় তাও আপনারা দেখে যান। আমি আমার জীবনে অনেক নিন্দা সয়েছি, অনেক নিন্দা এখনো আমার ভাগ্যে আছে। আমি ধনীসন্তান, দরিদ্রের অভাব জানি না, বুঝতে পারি না— এ অভিযোগ যে কত বড়ো মিথ্যা তা আপনারা আজ উপলব্ধি করুন। দরিদ্র-নারায়ণের সেবা তাঁরাই করেন যাঁরা খবরের কাগজে নাম প্রকাশ করেন। আমি গদ্যে পদ্যে ছন্দে অনেক-কিছু লিখেছি, তার কোনোটার মিল আছে, কোনোটার মিল নেই। সে-সব বেঁচে থাক্ বা না থাক্, তার বিচার ভবিষ্যতের হাতে। কিন্তু আমি ধনীর সন্তান, দরিদ্রের অভাব জানি নে, বুঝি নে, পল্লী-উন্নয়নের কোনো সন্ধানই জানি নে, এমন কথা আমি মেনে নিতে রাজি নই।

আমি ধনী নই, আমার যা সাধ্য ছিল, আমার যে সম্পত্তি ছিল, যে সামান্য সম্বল ছিল, আমি এই অপমানিতের জন্য তা দিয়েছি। আমি অভাজন, বক্তৃতা দিয়ে রাষ্ট্রমঞ্চে দাঁড়িয়ে গর্ব প্রকাশ করবার মতো আমার কিছুই নেই। একদিন সেই নদীপথে যেতে যেতে অসহায় গ্রামবাসীদের যে চেহারা দেখেছি তা আমি ভুলতে পারি নি, তাই আজ এখানে এই মহাব্রতের অনুষ্ঠান করেছি। তার পর এ কাজ একার নয়। এই

কর্ম বহু লোককে নিয়ে। বহু লোককে নিয়ে একে গড়ে তুলতে হয়। সাহিত্য-রচনা একলার জিনিস, সমালোচনা তার দূর হতেও চলে। কিন্তু এই-যে ব্রত, এই-যে কর্মের অনুষ্ঠান, যা আমি গড়ে তুলছি, যে কাজের ভার আমি গ্রহণ করেছি— তার সমালোচনা দূর হতে চলে না। একে দরদ দিয়ে দেখতে হয়, অনুভব করতে হয়। আজ আপনারা কবি রবীন্দ্রনাথকে নয়, তার কর্মের অনুষ্ঠানকে প্রত্যক্ষ করুন, দেখে লিখুন, সকলকে জানিয়ে দিন কত বড়ো দুঃসাধ্য কাজের ভিতর আমাকে জড়িয়ে ফেলতে হয়েছে।

আমি পল্লীপ্রকৃতির সৌন্দর্যের যে চিত্র এঁকেছি তা শুধু পল্লীপ্রকৃতির বাহিরের সৌন্দর্য ; তার ভিতরকার সত্যরূপ যে কী শোচনীয়, কী দুর্দশাগ্রস্ত তা আজ আপনারা প্রত্যক্ষ করুন। আমাকে এখানে আপনারা বিচার করবেন কবিরূপে নয়, কর্মীরূপে ; এবং সে কর্মের পরিচয় আপনারা এখনই দেখতে পাবেন।

এই-যে কর্মের ধারা আমি এখানে প্রবর্তন করেছি, এই কার্যের, এই প্রতিষ্ঠানের ভার দেশের লোকের কি গ্রহণ করা উচিত নয়।… আজ আপনাদের আমি আমার এই কর্মক্ষেত্রে নিমন্ত্রণ করে এনেছি, কবিতা শোনাবার জন্যে বা কাব্য-আলোচনার জন্যে নয়। আজ আপনারা দেখে যান এবং বুঝে যান বাংলার প্রকৃত কর্মক্ষেত্র কোথায়। তাই এখানে আজ বার বার একই কথা বলেছি। আপনারা যদি আমার এই কর্মানুষ্ঠানকে প্রকৃতভাবে উপলব্ধি করতে পারেন— তবেই হবে তার প্রকৃত সার্থকতা।

৩০ ফাল্গুন ১৩৪৩ চৈত্র ১৩৪৩

অভিভাষণ

বাঁকুড়ার জনসভায় কথিত

পঞ্চাশ-ষাট বছর পূর্বে বাংলার অখ্যাত এক প্রান্তে দিন কেটেছে। স্বদেশের কাছে কি বিদেশের কাছে অজ্ঞাত ছিলুম। তখন মনের যে স্বাধীনতা ভোগ করেছি সে যেন আকাশের মতন। এই আকাশ বাহবা দেয় না, তেমনি বাধাও দেয় না। বকশিশ যখন জোটে নি বকশিশের দিকে তখন মন যায় নি। এই স্বাধীনতায় গান গেয়েছি আপন-মনে। সে যুগে যশের হাটে দেনাপাওনার দর ছিল কম, কাজেই লোভ ছিল স্বল্প। আজকের দিনের মতো ঠেলাঠেলি ভিড় ছিল না। সেটা আমার পক্ষে ছিল

ভালো, কলমের উপর ফরমাশের জোর ছিল ক্ষীণ। পালে যে হাওয়া লাগত সে হাওয়া নিজের ভিতরকার খেয়ালের হাওয়া। প্রশংসার মশাল কালের পথে বেশি দূর পথ দেখাতে পারে না— অনেক সময়ে তার আলো কমে, তেল ফুরিয়ে আসে। জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ কালে বিশেষ সাময়িক আবেগ জাগে— সামাজিক বা রাষ্ট্রিক বা ধর্মসম্প্রদায়গত। সেই জনসাধারণের তাগিদ যদি অত্যন্ত বেশি করে কানে পৌঁছয় তা হলে সেটা ঝোড়ো হাওয়ার মতো ভাবীকালের যাত্রাপথের দিক ফিরিয়ে দেয়। কবিরা অনেক সময়ে বর্তমানের কাছ থেকে ঘুষ নিয়ে ভাবীকালকে বঞ্চনা করে। এক-একটা সময় আসে যখন ঘুষের বাজার খুব লোভনীয় হয়ে ওঠে, দেশাত্মবোধ, সম্প্রদায়ী বুদ্ধি তাদের তহবিল খুলে বসে। তখন নগদ-বিদায়ের লোভ সামলানো শক্ত হয়। অন্য দেশের সাহিত্যে এর সংক্রামকতা দেখেছি, জনসাধারণের ফরমাশ বাহবা দিয়ে জনপ্রিয়কে যে উঁচু ডাঙায় চড়িয়ে দিয়েছে, স্রোতের বদল হয়ে সে ডাঙায় ভাঙন ধরতে দেরি হয় না।

আমার জীবনের আরম্ভকালে এই দেশের হাওয়ায় জনসাধারণের ফরমাশ বেগ পায় নি, অন্তত আমাদের ঘরে পৌঁছয় নি। অখ্যাত বংশের ছেলে আমরা। তোমরা শুনে হাসবে, সত্যই অখ্যাত বংশের ছেলে ছিলেম আমরা। আমার পিতার খুব নাম শুনেছ, কিন্তু এক সময় আমাদের গৃহে নিমন্ত্রণের পথ ছিল গোপনে। আমরা যে অল্প লোককে জানতুম সমাজে তাঁদের নামডাক ছিল না। আমি যখন এসেছি আমাদের পরিবারে তখন আমাদের অর্থসম্বল হয়ে এসেছে রিক্তজলা সৈকতিনী। থাকতুম গরিবের মতো, কিন্তু নিজেকে জানি নি গরিব বলে। আমার মরাইয়ে আজ যা-কিছু ফসল জমেছে তার বীজ বোনা হয়েছে সেই প্রথম বয়সে। প্রথম ফসল অঙ্কুরিত হয় মাটির মধ্যে ভূগর্ভে। ভোরের বেলায় চাষী তার বীজ ছড়ায় আপন-মনে। অঙ্কুরিত না হলে সে বীজ-ছড়ানোর বিচার হয় না। ফসল কী পরিমাণ হয়েছে প্রত্যক্ষ জেনে মহাজন তবে দাদন দিতে আসে। যে মহাজনের খেতের উপর নজর পড়ে নি তাদের ঋণের আশ্বাস আমি পাই নি। একান্তে নিভৃতে যা ছড়িয়েছি, ভাবিও নি ধরণী তা গ্রহণ করেছিলেন।

একসময়ে অঙ্কুর দেখা দিল। মহাজন তার মূল্য ধরে দিলে আপন-আপন বিচার অনুসারে। সেই সময়কার কথা বলি। বাল্যকালে দিন কেটেছে শহরে খাঁচার মধ্যে, বাড়ির মধ্যে। শহরবাসীর মধ্যেও ঘুরে-ফিরে বেড়াবার যে স্বাধীনতা থাকে আমার তাও ছিল না। একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকার কোণের এক ঘরে ছিলেম বন্দী। সেই ঘরের খোলা জানালা দিয়ে দেখেছি বাগান, সামনে পুকুর। লোকেরা স্নান করতে আসছে, স্নান সেরে ফিরে যাচ্ছে। পুব দিকে বটগাছ, ছায়া পড়েছে তার পশ্চিমে

সূর্যোদয়ের সময়। সূর্যাস্তের সময় সে ছায়া অপহরণ করে নিয়েছে। বহির্জগতের এই স্বল্প পরিচয় আমার মধ্যে একটা সৌন্দর্যের আবেশ সৃষ্টি করত। জানলার ফাঁক দিয়ে যা আমার চোখে পড়ত তাতেই যেটুকু পেতুম তার চেয়ে যা পাই নি তাই বড়ো হয়ে উঠেছে কাঙাল মনের মধ্যে। সেই না-পাওয়ার একটি বেদনা ছিল বাংলার পল্লীগ্রামের দিগন্তের দিকে চেয়ে।

সেই সময় অকস্মাৎ পেনেটির বাগানে আসতে পেরেছিলুম ডেঙ্গুজ্বরের প্রভাবে বাড়ির লোক অসুস্থ হওয়ায়। সেই গঙ্গার ধারের স্নিগ্ধ শ্যামল আতিথ্য আমায় নিবিড়ভাবে স্পর্শ করল। গঙ্গার স্রোতে ভেসে যেত মেঘের ছায়া; ভাঁটার স্রোতে জোয়ারের স্রোতে চলত নৌকো পণ্য নিয়ে, যাত্রী নিয়ে। বাগানের খিড়কির পুকুরপাড়ে কত গাছ, যে-সব গাছে ছিল বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ের বিশেষ পরিচয়। পুকুরে আসত-যেত যারা সেই-সব পল্লীবাসী-পল্লীবাসিনীদের সঙ্গে একরকমের চেনাশোনা হল — নিকট থেকে নাই হোক, অসংসক্ত অন্তরাল থেকে।

তার পর পল্লীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিল পূর্ববঙ্গে— ঠিক পূর্ববঙ্গে নয়, নদীয়া এবং রাজসাহী জেলার সন্নিকটে। সেখানে পল্লীগ্রামের নদীপথ বেয়ে নানান জায়গায় ভ্রমণ করতে হয়েছে আমাকে। পল্লীগ্রামকে অন্তরঙ্গভাবে জানবার, তার আনন্দ ও দুঃখকে সন্নিকটভাবে অনুভব করবার সুযোগ পেলেম এই প্রথম।

লোকে অনেক সময়ই আমার সম্বন্ধে সমালোচনা করে ঘরগড়া মত নিয়ে। বলে, 'উনি তো ধনী-ঘরের ছেলে। ইংরেজিতে যাকে বলে, রুপোর চাম্‌চে মুখে নিয়ে জন্মেছেন। পল্লীগ্রামের কথা উনি কী জানেন।' আমি বলতে পারি, আমার থেকে কম জানেন তাঁরা যাঁরা এমন কথা বলেন। কী দিয়ে জানেন তাঁরা। অভ্যাসের জড়তার ভিতর দিয়ে জানা কি যায়? যথার্থ জানায় ভালোবাসা। কুঁড়ির মধ্যে যে কীট জন্মেছে সে জানে না ফুলকে। জানে, বাইরে থেকে যে পেয়েছে আনন্দ। আমার যে নিরন্তর ভালোবাসার দৃষ্টি দিয়ে আমি পল্লীগ্রামকে দেখেছি তাতেই তার হৃদয়ের দ্বার খুলে গিয়েছে। আজ বললে অহংকারের মতো শোনাবে, তবু বলব আমাদের দেশের খুব অল্প লেখকই এই রসবোধের চোখে বাংলাদেশকে দেখেছেন। আমার রচনাতে পল্লীপরিচয়ের যে অন্তরঙ্গতা আছে, কোনো বাঁধাবুলি দিয়ে তার সত্যতাকে উপেক্ষা করলে চলবে না। সেই পল্লীর প্রতি যে একটা আনন্দময় আকর্ষণ আমার যৌবনের মুখে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল আজও তা যায় নি।

কলকাতা থেকে নির্বাসন নিয়েছি শান্তিনিকেতনে। চারি দিকে তার পল্লীর আবেষ্টনী। কিন্তু সে তার একটা বিশেষ দৃশ্য। পুকুর-নদী বিল-খালের যে বাংলাদেশ

এ সে নয়। এর একটা রুক্ষ শুষ্কতা আছে, সেই শুষ্ক আবরণের মধ্যে আছে মাধুর্যরস; সেখানকার মানুষ যারা— সাঁওতাল— সত্যপরতায় তারা ঋজু এবং সরলতায় তারা মধুর। ভালোবাসি তাদের আমি। আমার বিপদ হয়েছে এখন— অখ্যাত ছিলেম যখন, অনায়াসে পল্লীর মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছি। কোনো বেষ্টন ছিল না— 'ঐ কবি আসছেন' 'ঐ রবিঠাকুর আসছেন' ধ্বনি উঠত না। তখন কত লোক এসেছে, সরল মনে কথা বলেছে। কত বাউল, কত মুসলমান প্রজা, তাদের সঙ্গে একান্ত হৃদ্যতায় আলাপ-পরিচয় হয়েছে— সম্ভব ছিল তখন। ভয় করে নি তারা। তখন এত খ্যাতিলাভ করি নি, বড়ো দাড়িতে এত রজতচ্ছটা বিস্তার হয় নি। এত সহজে চেনা যেত না আমাকে, ছিল অনতিপরিচয়ের সহজ স্বাধীনতা।

এই তো একটা জায়গায় এলুম, বাঁকুড়ায়। প্রাদেশিক শহর বটে কিন্তু পল্লীগ্রামের চেহারা এর। পল্লীগ্রামের আকর্ষণ রয়েছে এর মধ্যে। সাবেক দিন যদি থাকত তো এরই আঙিনায় আঙিনায় ঘুরে বেড়াতে পারতুম। এ দেশের এক নূতন দৃশ্য— শুষ্ক নদী বর্ষায় ভরে ওঠে, অন্যসময় থাকে শুধু বালিতে ভরা। রাস্তার দুই ধারে শালের ছায়াময় বন। পেরিয়ে এলুম মোটরে পল্লীশ্রীর ভিতর দিয়ে, দেখতে পাই নি বিশেষ কিছুই। এমনতরো দেখা এড়িয়ে যাবার উপায় তো আর নেই। কেবলই চেষ্টা, কী করে দৃষ্টিকে ছিনিয়ে নিতে পারে উপলক্ষ থেকে। যেন উপলক্ষটা কিছুই নয়, শুধু লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার উপায়। কিন্তু এই উপলক্ষই তো হল আসল জিনিস। এরই জন্যে তো লক্ষ্য আনন্দে পূর্ণ হয়। আগে তীর্থ ছিল লক্ষ্য, আর সারা পথ ছিল তার উপলক্ষ। তীর্থের যাত্রীরা কৃচ্ছ্রসাধনার ভিতর দিয়ে তীর্থের মহিমাকে পেতেন; তীর্থ সম্পূর্ণরূপে আকর্ষণ করত তাঁদের। টাইম্-টেব্‌ল্ নিয়ে যারা চলাফেরা করে দুর্ভাগ্য তারা, চোখ রইল তাদের উপবাসী। পূর্বকালে ভারতের ভূগোলবিবরণের পাঠ ছিল তীর্থে তীর্থে। শীর্ষদেশে হিমালয়, পূর্বপার্শ্বে বঙ্গোপসাগর, অপর পার্শ্বে আরব সাগর —এ-সমস্তই তীর্থে তীর্থে চিহ্নিত। এই পাঠ নিতে হয়েছে পদব্রজে। সে শিক্ষা নেমে এসেছে ব্ল্যাক্‌বোর্ডে। আমার পক্ষেও। আমি পল্লীর পরিচয় হারিয়েছি নিজে পরিচিত হয়ে। বাইরে বেরোনো আমার পক্ষে দায়, শরীরেও কুলোয় না। আমার পল্লীর ভালোবাসা বিস্তৃত করতে পারতুম, আরো অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারতুম, কিন্তু সম্মানের দ্বারা আমি পরিবেষ্টিত, সে পরিবেষ্টন আর ভেদ করতে পারব না। আমার সেই শিলাইদহের জীবন হারিয়ে গেছে।

১৮ ফাল্গুন ১৩৪৬ বৈশাখ ১৩৪৭

গ্রন্থপরিচয়

রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশের তারিখ ও রচনা-সংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য নিম্নে মুদ্রিত হইল। রচনা-শেষে সাময়িক পত্রে প্রকাশের কাল মুদ্রিত। যে ক্ষেত্রে দুইটি সময়ের উল্লেখ আছে, প্রথমটি রচনা অথবা ভাষণদানের কাল বুঝিতে হইবে।

স্ফুলিঙ্গ

'স্ফুলিঙ্গ' ১৩৫২ সালের ২৫ বৈশাখ প্রকাশিত হয়। ২৫ বৈশাখ ১৩৫৬ সালে ইহার পুনর্মুদ্রণ এবং ১৩৬৭ সালের চৈত্র মাসে ইহার পরিবর্ধিত শতবর্ষপূর্তি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সংকলিত কবিতাগুলি প্রথম ছত্রের বর্ণানুক্রমে সন্নিবিষ্ট। রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে এই পরিবর্ধিত সংস্করণটিই অন্তর্ভুক্ত হইল।

১৩৩৪ সালে লেখন প্রকাশিত হয়। লেখনের সগোত্র আরো বহু কবিতা রবীন্দ্রনাথের নানা পাণ্ডুলিপিতে, বিভিন্ন পত্রিকায় এবং তাঁহার স্নেহভাজন বা আশীর্বাদপ্রার্থীদের সংগ্রহে বিক্ষিপ্ত হইয়া ছিল। কেহ কেহ তাঁহাদের সংগ্রহের কবিতাগুলি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এই কবিতাসমষ্টি হইতে সংকলন করিয়া 'স্ফুলিঙ্গ'র প্রকাশ।

লেখন প্রকাশের পূর্বে উহার নাম 'স্ফুলিঙ্গ' থাকিবে এইরূপ ভাবা হইয়াছিল। পরে আলোচ্য সংকলনটির নাম 'স্ফুলিঙ্গ' রাখা হয় এবং প্রবেশক-স্বরূপে 'স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেল' লেখনের এই কবিতাটি গৃহীত হয়।

প্রবাসীতে (কার্তিক ১৩৩৫) লেখন গ্রন্থ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন স্ফুলিঙ্গর সগোত্র বলিয়াই তাহার অংশ-বিশেষ নীচে মুদ্রিত হইল।

লেখন

যখন চীনে জাপানে গিয়েছিলেম প্রায় প্রতিদিনই স্বাক্ষরলিপির দাবি মেটাতে হত। কাগজে, রেশমের কাপড়ে, পাখায় অনেক লিখতে হয়েছে। সেখানে তারা আমার বাংলা লেখাই চেয়েছিল, কারণ বাংলাতে এক দিকে আমার, আবার আর-এক দিকে সমস্ত বাঙালি জাতিরই স্বাক্ষর। এমনি করে যখন-তখন পথে-ঘাটে যেখানে-সেখানে দু-চার লাইন কবিতা লেখা আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। এই লেখাতে আমি আনন্দও পেতুম। দু-চারটি বাক্যের মধ্যে এক-একটি ভাবকে নিবিষ্ট করে দিয়ে

তার যে একটি বাহুল্যবর্জিত রূপ প্রকাশ পেত তা আমার কাছে বড়ো লেখার চেয়ে অনেক সময় আরো বেশি আদর পেয়েছে। আমার নিজের বিশ্বাস বড়ো বড়ো কবিতা পড়া আমাদের অভ্যাস বলেই কবিতার আয়তন কম হলে তাকে কবিতা বলে উপলব্ধি করতে আমাদের বাধে। অতিভোজনে যারা অভ্যস্ত, জঠরের সমস্ত জায়গাটা বোঝাই না হলে আহারের আনন্দ তাদের অসম্পূর্ণ থাকে; আহার্যের শ্রেষ্ঠতা তাদের কাছে খাটো হয়ে যায় আহারের পরিমাণ পরিমিত হওয়াতেই। আমাদের দেশে পাঠকদের মধ্যে আয়তনের উপাসক অনেক আছে— সাহিত্য সম্বন্ধেও তারা বলে, নাস্নে সুখমস্তি— নাট্য-সম্বন্ধেও তারা রাত্রি তিনটে পর্যন্ত অভিনয় দেখার দ্বারা টিকিট কেনার সার্থকতা বিচার করে।

জাপানে ছোটো কাব্যের অমর্যাদা একেবারেই নেই। ছোটোর মধ্যে বড়োকে দেখতে পাওয়ার সাধনা তাদের— কেননা তারা জাত-আর্টিস্ট। সৌন্দর্য-বস্তুকে তারা গজের মাপে বা সেরের ওজনে হিসাব করবার কথা মনেই করতে পারে না। সেইজন্যে জাপানে যখন আমার কাছে কেউ কবিতা দাবি করেছে, দুটি-চারটি লাইন দিতে আমি কুণ্ঠিত হই নি। তার কিছুকাল পূর্বেই আমি যখন বাংলাদেশে গীতাঞ্জলি প্রভৃতি গান লিখছিলুম, তখন আমার অনেক পাঠকই লাইন গণনা করে আমার শক্তির কার্পণ্যে হতাশ হয়েছিলেন —এখনো সে-দলের লোকের অভাব নেই।

এইরকম ছোটো ছোটো লেখায় একবার আমার কলম যখন রস পেতে লাগল তখন আমি অনুরোধনিরপেক্ষ হয়েও খাতা টেনে নিয়ে আপন-মনে যা-তা লিখেছি…।

—রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪, পৃ ৫২৭-২৮; লেখন (১৩৬৮)

লেখন-এর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "এই লেখনগুলি সুরু হয়েছিল চীনে জাপানে।" কিন্তু চীনে জাপানে যাইবার পূর্বেও কবিকে 'স্বাক্ষরলিপির দাবি' মিটাইতে হইয়াছে।

স্ফুলিঙ্গের কবিতাগুলির অধিকাংশের রচনাকাল নির্ণয় করা দুরূহ। বিভিন্ন স্বাক্ষরসংগ্রহে যে তারিখ পাওয়া যায় তাহাই যে উহার রচনাকাল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। বহু কবিতা লেখন কাব্য-প্রকাশের পরবর্তীকালে রচিত, কতকগুলি লেখনের সমসাময়িক, বহু পুরাতন পাণ্ডুলিপি হইতেও কয়েকটি কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। ২১, ৮০, ৯৯, ১৭৯, ২৩৮ ও ২৫৭ -সংখ্যক কবিতা গীতিমাল্যের পাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত: বিলাতের নার্সিংহোমে বা সমুদ্রবক্ষে, ১৯১৩ সালে রচিত অনেকগুলি লেখন এই খাতায় আছে; তাহার অধিকাংশ লেখন গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে, অবশিষ্টগুলি স্ফুলিঙ্গে সংকলিত।

৩০-সংখ্যক কবিতা মূলত পরিশেষ-ধৃত 'দিনাবসান' কবিতার (২৫ বৈশাখ ১৩৩৩) অঙ্গীভূত ছিল; পরিশেষে সংকলনের কালে বর্জিত। অধুনা প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের বৈকালী-কাব্যে (আষাঢ় ১৩৮১) ৪০-সংখ্যক কবিতার চতুর্থ স্তবক -রূপেও পাওয়া যাইবে। উক্ত গ্রন্থে গ্রন্থপরিচয় অংশে এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বলা হইয়াছে।

১১৫-সংখ্যক কবিতাটিকে সেঁজুতি গ্রন্থের (রচনাবলী দ্বাবিংশ খণ্ড) 'প্রতীক্ষা' কবিতার পূর্বাভাস বলা চলে; ১২৮-সংখ্যক কবিতাটির গীতরূপ 'ওরে নূতন যুগের ভোরে' প্রচলিত গীতবিতানের প্রথম খণ্ডে বা অখণ্ড গীতবিতান গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট। ১৪৭-সংখ্যক কবিতাটি মহুয়া কাব্যের (রচনাবলী পঞ্চদশ খণ্ড) উৎসর্গপত্রের 'শুধায়ো না, কবে কোন্ গান' কবিতাটির পূর্বতন পাঠ।

১০২ ও ১১৬-সংখ্যক কবিতাকে লেখনের দুটি কবিতার রূপান্তর বলা যায়। কোনো-এক সময়ে লেখনের 'কুন্দকলি ক্ষুদ্র বলি নাই দুঃখ নাই তার লাজ' কবিতাটি কাটিয়া এই গ্রন্থের ১২৩-সংখ্যক কবিতাটি লেখা হয়। ১৬৮ ও ২৫২ -সংখ্যক কবিতা-দুটিকে লেখনে-মুদ্রিত দুটি ইংরেজি লেখার পাঠান্তর বলা চলে। লেখনের অন্তর্গত বাংলা কবিতাগুলি রচনাবলী চতুর্দশ খণ্ডে ছাপা হইয়াছে। উক্ত খণ্ডে লেখনের প্রথম পৃষ্ঠায় ইংরেজি কবিতার নিদর্শনমাত্র দেওয়া হইয়াছে।

৪৯, ৬৪, ৭৪, ১০৬, ১২১, ১২৫, ১৫৩, ১৬৩, ১৬৫, ১৬৮, ১৭০, ১৭৫, ১৯৪, ১৯৭, ২১৪, ২৩১, ২৩৩, ২৪৯ ও ২৫১ -সংখ্যক কবিতাগুলির ইংরেজিমাত্র লেখনে আছে।

৭৮, ৮৩, ৮৪, ৮৬, ১০০, ১০১, ১০৩, ১১২, ১২০, ১৪৪, ১৫১, ১৫৪, ১৫৯, ১৭৩, ১৮৫, ১৯২, ২২৪, ২২৯, ২৩০, ২৪৬ ও ২৫৩ -সংখ্যক কবিতা রবীন্দ্রনাথ ছন্দ গ্রন্থে (রচনাবলী একবিংশ খণ্ড) উদাহরণস্বরূপে ব্যবহার করিয়াছেন।

১৬-সংখ্যক কবিতাটি কবির অঙ্কিত একখানি চিত্রের পরিচয়।

১৪৩-সংখ্যক কবিতাটি 'একটি ফরাসী কবিতার অনুবাদ'। মূল কবিতার রচয়িতা জাঁ-পীয়ের ফ্লরিয়ঁ (জন্ম ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দ)।

রবীন্দ্র-শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত স্ফুলিঙ্গের পরিবর্ধিত সংস্করণে নূতন-সংযোজিত কবিতার সংখ্যা ৬২। ইহার অধিকাংশই রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত।

রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তের পাণ্ডুলিপি ব্যতীত শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী মহাশয়ের হস্তাক্ষরে 'স্ফুলিঙ্গ'-নামাঙ্কিত একখানি খাতা দেখা যায়। উহাতে ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে লেখনে প্রকাশিত বহু কবিতারও পাঠান্তর বা যথাযথ রূপ সংকলিত আছে। এই খাতা হইতেও, অদ্যাবধি কোনো গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই এরূপ কতকগুলি কবিতা, স্ফুলিঙ্গ

গ্রন্থে লওয়া হইয়াছে। এ স্থলে সংখ্যা দ্বারা সেগুলির নির্দেশ করা যাইতেছে।—
১, ২, ২০, ২৩, ৪৫, ৫২, ৬০, ৬৩, ৬৬, ৭৪, '৫, ৮১, ৮৭, ৯৭, ৯৮, ১৫৭, ১৫৮, ১৮১, ১৯০, ১৯৬, ২১২, ২১৩, ২২২, ২৩৪, ২৫৬ ও ২৫৮।

৪০-সংখ্যক কবিতাটি কবি আপন দৌহিত্রী কুমারী নন্দিতার উদ্দেশে কৌতুক করিয়া লেখেন; ৬৬-সংখ্যক কবিতাটি কোন্ বিদেশ-যাত্রার কালে জাহাজে লেখা হইয়াছিল তাহা শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীর প্রতিলিপি-খাতা হইতে জানা যায় নাই।

৮২-সংখ্যক কবিতা এবং ১৬১-সংখ্যক কবিতার পাঠান্তর পূর্বে প্রবাসী পত্রের বৈশাখ ১৩৩৫ সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল।

২৫৯-সংখ্যক কবিতা সম্পর্কে জানা যায় যে, কবি ইহা শান্তিনিকেতন-স্থিত কলাভবন-সংগ্রহশালা নন্দনের নামকরণে লিখিয়াছেন।

স্ফুলিঙ্গের কবিতাগুলি যাঁহাদের আনুকূল্যে পাওয়া গিয়াছে তাঁহাদের নাম স্বতন্ত্র স্ফুলিঙ্গ গ্রন্থে মুদ্রিত আছে।

গল্পগুচ্ছ

ইতিপূর্বে রবীন্দ্র-রচনাবলী চতুর্দশ খণ্ড হইতে চতুর্বিংশ খণ্ডের মধ্যে গল্পগুচ্ছের তিনটি খণ্ডের অন্তর্গত সমুদয় গল্প সাময়িক পত্রে প্রকাশকালের অনুক্রম যতদূর জানা গিয়াছে, তদনুসারে (কার্তিক ১২৯১ হইতে কার্তিক ১৩৪০) মুদ্রিত।

'খাতা' 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ' 'উলুখড়ের বিপদ' এবং 'প্রতিবেশিনী' এই চারটি গল্প সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল কি না জানিতে পারা যায় নাই। এইজন্য গ্রন্থাকারে প্রকাশের তারিখ-অনুসারে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

রচনাবলীর কোন্ খণ্ডে গল্পগুচ্ছের কোন্ গল্পগুলি অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইল।—

চতুর্দশ খণ্ড

ঘাটের কথা, রাজপথের কথা, মুকুট[1]

পঞ্চদশ খণ্ড

দেনাপাওনা, পোস্টমাস্টার, গিন্নি, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, ব্যবধান, তারাপ্রসন্নের কীর্তি

১ গল্পগুচ্ছ চতুর্থ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। বালক পত্রিকার বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে (১২৯২) প্রকাশিত। ইহা ছোটো উপন্যাস বলিয়াও বিবেচিত হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ-কৃত নাট্যরূপ 'মুকুট' (১৯০৮)।

ষোড়শ খণ্ড

খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, সম্পত্তি-সমর্পণ, দালিয়া, কঙ্কাল, মুক্তির উপায়

সপ্তদশ খণ্ড

ত্যাগ, একরাত্রি, একটা আষাঢ়ে গল্প, জীবিত ও মৃত, স্বর্ণমৃগ, রীতিমত নভেল, জয়-পরাজয়, কাবুলিওয়ালা, ছুটি, সুভা, মহামায়া, দানপ্রতিদান

অষ্টাদশ খণ্ড

সম্পাদক, মধ্যবর্তিনী, অসম্ভব কথা, শাস্তি, একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প, সমাপ্তি, সমস্যাপূরণ, খাতা

ঊনবিংশ খণ্ড

অনধিকার প্রবেশ, মেঘ ও রৌদ্র, প্রায়শ্চিত্ত, বিচারক, নিশীথে, আপদ, দিদি

বিংশ খণ্ড

মানভঞ্জন, ঠাকুরদা, প্রতিহিংসা, ক্ষুধিত পাষাণ, অতিথি, ইচ্ছাপূরণ

একবিংশ খণ্ড

দুরাশা, পুত্রযজ্ঞ, ডিটেকটিভ, অধ্যাপক, রাজটিকা, মণিহারা, দৃষ্টিদান

দ্বাবিংশ খণ্ড

সদর ও অন্দর, উদ্ধার, দুর্বুদ্ধি, ফেল, শুভদৃষ্টি, যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ, উলুখড়ের বিপদ, প্রতিবেশিনী, নষ্টনীড়, দর্পহরণ, মাল্যদান, কর্মফল, মাস্টারমশাই, গুপ্তধন, রাসমণির ছেলে, পণরক্ষা

ত্রয়োবিংশ খণ্ড

হালদারগোষ্ঠী, হৈমন্তী, বোষ্টমী, স্ত্রীর পত্র, ভাইফোঁটা, শেষের রাত্রি, অপরিচিতা, তপস্বিনী, পয়লা নম্বর, পাত্র ও পাত্রী

চতুর্বিংশ খণ্ড

নামঞ্জুর গল্প, সংস্কার, বলাই, চিত্রকর, চোরাই ধন

পঞ্চবিংশ খণ্ড

রবিবার, শেষকথা, ল্যাবরেটরি, ছোটো গল্প

গল্পগুচ্ছ চতুর্থ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে তিনসঙ্গীর অন্তর্গত তিনটি গল্প 'রবিবার' 'শেষ কথা' ও 'ল্যাবরেটরি', 'শেষ কথা'র পাঠান্তর ছোটো গল্প; 'বদনাম' 'প্রগতিসংহার' 'শেষ পুরস্কার' 'মুসলমানীর গল্প' নামে কয়েকটি নূতন সংকলন। 'মুকুট' এবং রবীন্দ্রনাথের

প্রথম দিকের দুটি গল্প— 'ভিখারিনী', 'করুণা'। 'মুকুট', একমাত্র ছুটির পড়া পুস্তকে, পরে রচনাবলী চতুর্দশ খণ্ডে সংকলিত। গল্পগুচ্ছ চতুর্থ খণ্ডের অন্তর্গত যে গল্পগুলি ইতিপূর্বে রচনাবলীর অন্যান্য খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে সেগুলি ব্যতীত বাকিগুলি রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে সন্নিবেশিত হইল।

বদনাম : প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৮

"শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়াদি গ্রীষ্মের জন্য বন্ধ হইয়াছে ; এবার এ অঞ্চলে ভীষণ অনাবৃষ্টি— অসহ্য গরম ;··· সন্ধ্যার পর বারান্দায় আনিয়া কবিকে বসানো হয়, মাঝে মাঝে নূতন নূতন গল্পের প্লট বলেন। তাহারই একটি 'বদনাম' নামে প্রকাশিত হয়।"

—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রজীবনী ৪র্থ (অগ্রহায়ণ ১৩৭১), পৃ ২৭৭

"প্রথম আমি মেয়েদের পক্ষ নিয়ে 'স্ত্রীর পত্র'[১] গল্পে বলি। বিপিন পাল তার প্রতিবাদ করেন।[২] কিন্তু পারবেন কেন? তার পর আমি যখনই সুবিধা পেয়েছি বলেছি। এবারেও সুবিধে পেলুম, ছাড়ব কেন, সদুর মুখ দিয়ে কিছু বলিয়ে নিলুম।"

—রবীন্দ্রনাথের উক্তি, ১৭ মে ১৯৪১। রানী চন্দ। আলাপচারি রবীন্দ্রনাথ

"গুরুদেবকে প্রায়ই বলতে শুনতাম, 'দেখ্— একরকম ভালোবাসা আছে যা তুলে ধরে, বড়ো করে। আর একরকম ভালোবাসা আছে, যেটা মারে, চাপা দিয়ে দেয়। আমাদের দেশের মেয়েরা বেশির ভাগ ঐ শেষের ভালোবাসাটাই জানে। তাদের ভালোবাসা দিয়ে তারা লতার মতো জড়িয়ে থাকে, পুরুষকে বাড়তে দিতে পারে না ; তা কেন হবে?'

এই নিয়ে পর পর কয়েকটি গল্পই লিখলেন তিনি। 'শেষ কথা', 'ল্যাবরেটরি', সব শেষে রোগশয্যায় পড়েও লিখলেন 'বদনাম' গল্পটি।···সদুকে নিয়ে বদনাম গল্পটি যে লিখলেন, সে সময়ে ছিল আর-এক ভাব। তখন তিনি রোগশয্যায়, গল্প লিখবেন, নিজে লিখতে পারেন না, একসঙ্গে বেশি ভাবতেও পারেন না, কষ্ট হয়, কপাল ঘেমে ওঠে। অল্প অল্প করে বলতেন, লিখে নিতাম। কখনও-বা স্নান হচ্ছে তাঁর, কি খাচ্ছেন, কি চোখ বুজে বিশ্রাম নিচ্ছেন, হঠাৎ হঠাৎ ডেকে পাঠাতেন। এক লাইন কি দু লাইন কথা··· বললেন, 'লিখে রাখ্— মনে পড়ল কথা কয়টা। পরে সদুর মুখে এক জায়গায় জুড়ে দেওয়া যাবে।' "

—শ্রীরানী চন্দ। গুরুদেব, পৃ ১২৫

১ রবীন্দ্র-রচনাবলী ত্রয়োবিংশ খণ্ড

২ বিপিনচন্দ্র পাল-রচিত 'মৃণালের কথা', নারায়ণ, অগ্রহায়ণ ১৩২১। রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' লইয়া তৎকালে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ আন্দোলন হয়। গল্পটি সবুজ পত্রে (শ্রাবণ ১৩২১) প্রকাশিত হইয়াছিল।

'বদনাম' গল্পটির রচনাকাল ভুলক্রমে ১১-২১ জুন মুদ্রিত হইয়াছে। ১১-২১ জুনের পরিবর্তে ১৫-২২ মে হইবে।

প্রগতিসংহার : আনন্দবাজার পত্রিকা (শারদীয়া), ৩ আশ্বিন ১৩৪৮
পূর্বনাম—কাপুরুষ

শেষ পুরস্কার : বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩৪৯

"এটি ঠিক গল্প নয়, গল্পের কাঠামো মাত্র। রবীন্দ্রনাথের শেষ অসুখের সময় এটি কল্পিত হয়েছিল। এটিকে সম্পূর্ণ রূপ দেবার তাঁর ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে নি।" —সম্পাদক, বিশ্বভারতী পত্রিকা

মুসলমানীর গল্প : ঋতুপত্র, বর্ষা-সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৬২

"এই লেখাটি পূর্ণাঙ্গ ছোট গল্প নয়। গল্পের খসড়া মাত্র।…এটিই তাঁর শেষ গল্প-রচনার চেষ্টা।" —সম্পাদক, ঋতুপত্র

শেষ অসুস্থতার সময়েও মুখে মুখে রবীন্দ্রনাথ যে গল্পের প্লট বলিয়া যাইতেন তাহার বিবরণ এই স্থলে সংকলনযোগ্য—

"এ দিকে গরম বেড়ে চলেছে, সন্ধ্যার সময় গরমের তাপ কমলে তাঁকে বারান্ডায় বসিয়ে দেওয়া হত। সেই সময় তাঁর মাথায় অনেক কিছু গল্পের প্লট ঘুরত এবং অনেক রকমের প্লট মুখে-মুখে বলে যেতেন…। এই অসুখের মধ্যেও তাঁর সাহিত্য-জীবনের গতিরোধ হয় নি, সে নিজের আনন্দ-স্রোতে ভেসে চলেছিল, মাঝে-মাঝে রোগের গ্লানির বাধা পড়ত তার গতির মুখে, কিন্তু সে-বাধা ভাসিয়ে দিয়ে তাঁর সৃষ্টি চলত আপন বেগে। সাহিত্যচর্চায় তাঁর বিরাম ছিল না…।

একদিন দুপুরে আহারাদির পর ঘুমিয়ে উঠেছেন, আমি পাশের ঘরে ছিলুম, হঠাৎ সুধাকান্ত[1] এসে আমাকে ডাকলেন, "বউ'দি, আপনার ডাক পড়েছে।" ঘুম থেকে তখনি উঠেছেন, বেলা তিনটা আন্দাজ হবে, কাছে বসতেই গল্প বলে যেতে লাগলেন…এক টুকরো কাগজ-কলম জোগাড় করে লিখে নিলুম। সেই প্লট থেকে আমূল পরিবর্তিত হয়ে উৎপত্তি হল 'বদনাম' গল্পের। এইরকম করেই খেলার ছলে গল্প বলতে বলতে 'প্রগতি-সংহার' তৈরি হয়ে উঠেছিল।…একদিন আবার দুপুরে ঘুম ভাঙবার পর আমার ডাক পড়ল। আজ তাঁর শরীর কিছু সুস্থ ছিল, মনও ছিল প্রফুল্ল। আমাকে বললেন, "তুমি এই সময় এলে তোমাকে গল্প বলবার সুবিধা হয়, সকালে আমি বড়ো ক্লান্ত থাকি।" আমি দেখলুম গল্প মাথায় ঘুরছে। কাগজ-কলম নিয়ে বসলুম। দূরে সুধাকান্ত ব'সে গল্পটা উপভোগ করতে লাগলেন। আজ তাঁর মন বেশ তাজা, তাই রসিয়ে গল্পটি[2], বলতে লাগলেন, আমি তাঁর মুখের কথাগুলি একটির পর একটি লিখে নিলুম।"

—প্রতিমা ঠাকুর। নির্বাণ (১৩৬২), পৃ ৩৫-৩৬

১ সুধাকান্ত রায়চৌধুরী ২ মুসলমানীর গল্প

শেষ অসুস্থতার সময় মুখে মুখে বলিয়া লেখানো গল্পগুলি স্বভাবতই কবি বারংবার সংশোধন করিবার প্রযত্ন করিতেন। গল্পগুলির যে রচনাকাল উল্লিখিত তাহাতে প্রথম রচনা ও শেষ সংশোধনের তারিখ সংকলন করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে।

ইতিপূর্বে রচনাবলীর চতুর্দশ খণ্ড হইতে চতুর্বিংশ খণ্ডে কার্তিক ১২৯১ হইতে কার্তিক ১৩৪০-এর মধ্যে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের রচিত প্রায় সকল ছোটোগল্প সংকলিত হইয়াছে। রচনাবলী পঞ্চবিংশ খণ্ডে সংকলিত হইয়াছে আশ্বিন ১৩৪৬, ফাল্গুন ১৩৪৬ এবং আশ্বিন ১৩৪৭-এ প্রকাশিত গল্প তিনটি। বর্তমান খণ্ডে সংকলিত হইল আষাঢ় ১৩৪৮, আশ্বিন ১৩৪৮, শ্রাবণ ১৩৪৯ এবং আষাঢ় ১৩৬২তে প্রকাশিত গল্প ও গল্পের খসড়াগুলি।

প্রকাশকালের ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়া এই পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের প্রায় সকল গল্পগুলি সংকলিত করার চেষ্টা হইয়াছে। ইহার পর অচলিত পুরাতন রচনার সংকলন। এই পর্যায়ে দুইটি মাত্র রচনা 'ভিখারিনী' ও 'করুণা'।

ভিখারিনী : ভারতী, শ্রাবণ-ভাদ্র ১২৮৪

গল্পগুচ্ছ চতুর্থ খণ্ড ভিন্ন রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয় নাই।

"ষোলো বছর বয়সের···আরম্ভের মুখেই দেখা দিয়েছে ভারতী।···আমার মতো ছেলে, যার না ছিল বিদ্যে, না ছিল সাধ্যি, সেও সেই বৈঠকে জায়গা জুড়ে বসল অথচ সেটা কারও নজরে পড়ল না, এর থেকে জানা যায় চার দিকে ছেলেমানুষি হাওয়ার যেন ঘুর লেগেছিল।···আমি লিখে বসলুম এক গল্প, সেটা যে কী বকুনির বিনুনী নিজে তার যাচাই করবার বয়স ছিল না, বুঝে দেখবার চোখ যেন অন্যদেরও তেমন করে খোলে নি।" —রবীন্দ্রনাথ। ছেলেবেলা

করুণা : ভারতী, আশ্বিন ১২৮৪ - ভাদ্র ১২৮৫

গল্পগুচ্ছ চতুর্থ খণ্ড ভিন্ন অন্য কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয় নাই।

"কেবল বৈষ্ণব পদাবলী নহে, তখন বাংলা সাহিত্যে যে-কোনো বই বাহির হইত আমার লুব্ধ হস্ত এড়াইতে পারিত না।· এই-সব বই পড়িয়া জ্ঞানের দিক হইতে আমার যে অকাল পরিণতি হইয়াছিল বাংলা গ্রাম্য ভাষায় তাহাকে বলে জ্যাঠামি— প্রথম বৎসরের ভারতীতে প্রকাশিত আমার বাংলা রচনা 'করুণা' নামক গল্প তাহার নমুনা।" —রবীন্দ্রনাথ। জীবনস্মৃতির খসড়া

শরৎকুমারী চৌধুরানী 'ভারতীর ভিটা' প্রবন্ধে লিখিতেছেন, ছোটগল্প প্রথম যেটি প্রকাশিত হয়[১] তাহা রবিবাবুর, পরে তাঁহার একটি গল্প[২] ধারাবাহিকরূপে বাহির হইতে থাকে।"

রবীন্দ্রনাথের ষোড়শ-সপ্তদশ বৎসর বয়সে রচিত বা মুদ্রিত এই লেখাটি সম্পর্কে দ্রষ্টব্য কতকগুলি বিস্তারিত আলোচনা—

রবীন্দ্রনাথের একখানি উপেক্ষিত উপন্যাস : শ্রীস্মরণকুমার আচার্য।

দেশ, ১৯ শ্রাবণ ১৩৬৯

করুণা : শ্রীকানাই সামন্ত। রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ, কার্তিক ১৩৬৯

রবীন্দ্র-উপন্যাসের প্রথম পর্যায় (১৩৭৬/অংশবিশেষ) : শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ

ভারতীতে 'করুণা' প্রকাশিত হইবার সাত বৎসর পর রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথ বসুর নিকট সম্ভবত করুণা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জানিতে চাহিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ বসু করুণা সম্বন্ধে বিস্তৃত সমালোচনা লেখেন।[৩]

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'প্রাগৈতিহাসিক' রচনাগুলি সম্বন্ধে যথেষ্ট বিতৃষ্ণা ও ঔদাসীন্য পোষণ করিতেন।—

"এক সময়ে বালক ছিলুম, তখনকার রচনায় স্বাভাবিক অপরিণতি দোষের নয়, কিন্তু সাহিত্যসভায় তাকে প্রকাশ্যতা দিলে তাকে লজ্জা দেওয়া হয়। তার লজ্জার কারণ আর কিছু নয়, তার মধ্যে যে একটা বয়স্কের অভিমান দেখা দেয় সেটা হাস্যকর; কেননা সেটা কৃত্রিম। স্বাভাবিক হবার শক্তি পরিণত বয়সের, সে বয়সে ভুলচুক থাকতে পারে নানারকমের, কিন্তু অক্ষম অনুকরণের দ্বারা নিজেকে পরের মুখোশে হাস্যকর করে তোলা তার ধর্ম নয়— অন্তত আমি তাই অনুভব করি।"

—রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ ১। 'ভূমিকা'; অপিচ দ্র. কবির ভণিতা

"ভারতীর পত্রে পত্রে আমার বাল্যলীলার অনেক লজ্জা ছাপার কালীর কালিমায় অঙ্কিত হইয়া আছে। কেবলমাত্র কাঁচা লেখার জন্য লজ্জা নহে— উদ্ধত অবিনয়, অদ্ভুত আতিশয্য ও সাড়ম্বর কৃত্রিমতার জন্য লজ্জা।"

—রবীন্দ্রনাথ। 'ভারতী' জীবনস্মৃতি

১ ভিখারিনী ২ করুণা

৩ দ্র. বিশ্বভারতী পত্রিকা, দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা

রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য গল্পগুচ্ছ চতুর্থ খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়ে মুদ্রিত। এই খণ্ডের সংকলন ও গ্রন্থপরিচয় রচনা করেন শ্রীপুলিনবিহারী সেন।

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর প্রকাশিত প্রবন্ধ ও অভিভাষণ -সমন্বিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি গ্রন্থ-প্রকাশের কাল অনুযায়ী রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে সংকলিত হইয়াছে।

আত্মপরিচয়

কয়েকটি প্রবন্ধের সমষ্টিরূপে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ১ বৈশাখ ১৩৫০। ১-সংখ্যক প্রবন্ধটি 'বঙ্গভাষার লেখক' (১৩১১) গ্রন্থে প্রথম মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্রনাথের সহিত দ্বিজেন্দ্রলালের যে বিরোধ এক সময়ে বাংলা সাময়িক সাহিত্যকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল, এই প্রবন্ধ হইতেই একরূপ তাহার সূচনা। দ্বিজেন্দ্রলাল এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের 'দম্ভ ও অহমিকা'র সন্ধান পাইয়াছিলেন[১]। বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের আহ্বানে রবীন্দ্রনাথ এই অভিযোগের উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার এক অংশ মূল প্রবন্ধের পরিপূরকরূপে নিম্নে মুদ্রিত হইল—

আমি মনে জানি, অহংকার প্রকাশ করিবার অভিপ্রায় আমার ছিল না।

বহুদিন হইল জর্মন কবিশ্রেষ্ঠ গ্যয়টের কোনো রচনার ইংরেজি তর্জমাতে একটা কথা পড়িয়াছিলাম, যতদূর মনে পড়ে, তাহার ভাবখানা এই যে, বাগানের মধ্যে যে শক্তি গোলাপ হইয়া ফোটে সেই একই শক্তি মানুষের মনে ও বাক্যে কাব্য হইয়া প্রকাশ পায়।

এই বিশ্বশক্তিকে নিজের জীবনের মধ্যে ও রচনার মধ্যে অনুভব করা অহংকার নহে। বরঞ্চ অহংকারের ঠিক উল্টা। কেননা, এই বিশ্বশক্তি কোনো ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ সম্পত্তি নহে, তাহা সকলের মধ্যেই কাজ করিতেছে।

তাই যদি হয় তবে এতবড়ো একটা অত্যন্ত সাধারণ কথাকে বিশেষ ভাবে বলিতে বসা কেন?

ইহার উত্তর এই যে, অত্যন্ত সাধারণ কথায়ও যখন জীবনের বিশেষ অবস্থায় বিশেষ উপলব্ধি হয় তখন তাহা আমাদিগকে হঠাৎ একটা আলোকের মতো চমৎকৃত করিয়া দেয়। যাহা সাধারণ তাহাকেই বিশেষ করিয়া যখন জানিতে পাই তখন তাহার

১ কাব্যের উপভোগ: বঙ্গদর্শন, মাঘ ১৩১৪

বিস্ময় বড়ো বেশি করিয়া আঘাত করে। মৃত্যুর মতো অত্যন্ত বিশ্বব্যাপী নিশ্চিত ও পুরাতন পদার্থেরও বিশেষ পরিচয় আমাদিগকে একটা সদ্যোনূতন আবির্ভাবের মতো চমক লাগাইয়া দেয়। এইজন্য বিশেষ অবস্থায় সাধারণ কথাকেও বিশেষ করিয়া বলিবার আকাঙ্ক্ষা মনে উদয় হইয়া থাকে। বস্তুত সাহিত্যের বারো-আনা কথাই নিতান্ত জানা কথাকেই নিজের মধ্যে নূতন করিয়া জানিয়া নিজের মতো নূতন করিয়া বলা।

সম্প্রতি অধ্যাপক কেয়ার্ডের একটি গ্রন্থে পড়িতেছিলাম :

Though man is essentially self-conscious, he always *is* more than he *thinks* or *knows*, and his thinking and knowing are ruled by ideas of which he is at first unaware, but which, nevertheless, affect everything he says or does. Of these ideas we may, therefore, expect to find some indication even in the earliest stage of his development, but we cannot expect that in that stage they will appear in their proper form or be known for what they really are.

যে আইডিয়া সম্বন্ধে আমরা প্রথমে অচেতন ছিলাম তাহাই যে আমাদিগকে বলাইয়াছে ও করাইয়াছে এবং আমাদের অপরিণত অবস্থারও কথা ও কাজকে আমাদের অজ্ঞাতসারে সেই আইডিয়ারই শক্তি প্রবর্তিত করিয়াছে— আমার ক্ষুদ্র আত্মজীবনীতে এই কথাটার উপলব্ধিকে আমি কোনো-এক রকম করিয়া বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। কথাটা সত্য কি মিথ্যা সে কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু ইহা অহংকার নহে, কারণ, ইহা কাহারও একলার সামগ্রী নহে। তবে কিনা যখন নানা কারণে নিজের জীবন-বিকাশের মধ্যে এই আইডিয়াকে স্পষ্ট করিয়া প্রত্যক্ষ করা যায় তখন তাহাকে নিতান্ত সাধারণ কথা ও জানা কথা বলিয়া আর উপেক্ষা করিতে পারি না।

—রবীন্দ্রবাবুর বক্তব্য। বঙ্গদর্শন, মাঘ ১৩১৪

"নিজের কথা বলামাত্রের মধ্যেই অহমিকা আছে। আত্মজীবনী লিখতে গেলে সেই আত্মাকে বাদ দিয়ে লেখা চলে না, সেই অনিবার্য অহমিকার জন্যই আমি উক্ত লেখার আরম্ভে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেম— এটাকে ইচ্ছাপূর্বক অহংকার করতে বসে মাপ চাওয়ার বিড়ম্বনা বলে মনে করবেন না।"

— রবীন্দ্রনাথ। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে লেখা পত্রের অংশ[১], ২৩ বৈশাখ ১৩১২

১ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ২ (আশ্বিন ১৩৬৮)

প্রবন্ধটির কতকাংশ রচনাবলী চতুর্থ খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়ে 'চিত্রা'র জীবনদেবতা-তত্ত্ব ব্যাখ্যার জন্য উদ্‌ধৃত হইয়াছে।

বর্তমান খণ্ডের ১৯৫, ২০১ ও ২০২ পৃষ্ঠায় উক্ত প্রবন্ধের অন্তর্গত যে পত্রগুলির উল্লেখ রহিয়াছে তাহা ছিন্নপত্র ও ছিন্নপত্রাবলীতে সংকলিত। ছিন্নপত্র-ছিন্নপত্রাবলীর পাঠে এবং বর্তমান প্রবন্ধের অন্তর্গত পাঠে স্থানে স্থানে ভিন্নতা আছে।

আলোচ্য প্রবন্ধের অন্তর্গত পত্রগুলি 'ছিন্নপত্র' বা 'ছিন্নপত্রাবলীর' কোন্ কোন্ সংখ্যার অন্তর্গত নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল।

রচনাবলীর পৃষ্ঠা	ছিন্নপত্র[১]র সংখ্যা	ছিন্নপত্রাবলী[১]র সংখ্যা
১৯৫	—	২৩৮
২০১	৫২	৫৫
	৬৪	৭০
২০২	৬৭	৭৪

২-সংখ্যক প্রবন্ধটি ভারতী পত্রে (ফাল্গুন ১৩১৮) 'অভিভাষণ' নামে প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশত্তম বর্ষ পূর্ণ হওয়ার উপলক্ষে 'দেশের প্রতিভূ-স্বরূপ' বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ১৩১৮ সালের ১৪ মাঘ কলিকাতা টাউন-হলে কবিসংবর্ধনা করেন। এই অনুষ্ঠানের অনুষঙ্গরূপে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে একটি আনন্দ সম্মিলন (২০ মাঘ ১৩১৮) অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, প্রবন্ধটি সেখানে পঠিত হয়।

৩-সংখ্যক প্রবন্ধটি 'আমার ধর্ম' নামে সবুজ পত্রে (আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৪) প্রকাশিত হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মমতের কোনো-একটি সমালোচনার[২] উত্তরে এই প্রবন্ধটি লিখিত হয়। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধর্মসংগীতে অন্য যে-একটি সমালোচনার উল্লেখ[৩] আছে, তাহা বিপিনচন্দ্র পাল -কর্তৃক লিখিত।[৪]

১ ছিন্নপত্র : শ্রাবণ ১৩৬৭, ছিন্নপত্রাবলী : বৈশাখ ১৩৭০

২ "ধর্মপ্রচারে রবীন্দ্রনাথ", প্রবর্তক, দ্বিতীয় বর্ষ, নবম সংখ্যা; পুনর্মুদ্রণ নারায়ণ, আষাঢ় ১৩২৪। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, "ধর্মপ্রচারে রবীন্দ্রনাথ", প্রবর্তক, দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা ; এবং রবীন্দ্রনাথের "আমার ধর্ম" প্রবন্ধের প্রত্যুত্তরে লিখিত "রবীন্দ্রনাথের ধর্ম", প্রবর্তক, দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বাবিংশ সংখ্যা।

৩ বর্তমান খণ্ড রচনাবলী, পৃ ২১৪

৪ "রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত", বিজয়া ১৩২০

" 'আমার ধর্ম' লেখাটা ছাপাখানায় চলে গেছে— সেখানকার কালী সংগ্রহ করে যখন ফিরবে তখন তোমাকে দিতে আমার কোনো বাধা নেই। ইতি ১৯ আশ্বিন ১৩২৪" —রবীন্দ্রনাথ। সুরীতি দেবীকে লেখা পত্রাংশ[1]

৪-সংখ্যক প্রবন্ধটি সপ্ততিতম জন্মোৎসবে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণের কবিকর্তৃক সংশোধিত অনুলিপি। অভিভাষণটি প্রবাসীতে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮) প্রকাশিত হয়।

আত্মপরিচয়ের অন্তর্গত ৫-সংখ্যক প্রবন্ধটি রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে কবিতাংশ বাদে 'অবতরণিকা' রূপে মুদ্রিত। সেইজন্য প্রবন্ধটি বর্তমান খণ্ডে সংকলিত হইল না। প্রবন্ধটি বিচিত্রা গ্রন্থেও সংক্ষিপ্ত আকারে মুদ্রিত হইয়াছে।

এই খণ্ডের আত্মপরিচয় অংশে ৫-সংখ্যক প্রবন্ধটি মূলত উক্ত গ্রন্থের ৬-সংখ্যক প্রবন্ধ।

'আশি বছরের আয়ুঃক্ষেত্রে' প্রবেশ উপলক্ষে প্রবন্ধটি (বর্তমান খণ্ডের ৫-সংখ্যক প্রবন্ধ) লেখা হইয়াছিল। প্রবন্ধটি প্রবাসীতে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭) 'জন্মদিনে' নামাঙ্কিত হইয়া প্রকাশিত হয়।

সাহিত্যের স্বরূপ

সাহিত্য-সম্বন্ধীয় এই গ্রন্থটির অন্তর্গত রচনাসমূহের অনেকগুলিই যথার্থ প্রবন্ধ নয়; কতকগুলি চিঠি এবং অভিভাষণ।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের ১-সংখ্যক গ্রন্থ হিসাবে প্রথম প্রকাশ ১ বৈশাখ ১৩৫০। ঐ বৎসর আশ্বিনে পুনর্মুদ্রণ-কালে এই গ্রন্থে 'সাহিত্যের মাত্রা' এবং 'সাহিত্যে আধুনিকতা' প্রবন্ধ দুইটি নূতন সংযোজিত হয়।

রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে 'কাব্যে গদ্যরীতি' পত্রনিবন্ধটি ব্যতীত সম্পূর্ণ গ্রন্থটিই পুনর্মুদ্রিত হইল। উক্ত পত্রনিবন্ধটি ছন্দ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত[2]।

সংকলিত প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই ইতিপূর্বে কোনো গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নাই। সাময়িক পত্রে এগুলির প্রথম প্রকাশ-তারিখ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ এখানে দেওয়া হইল—

১ বিশ্বভারতী পত্রিকা, বর্ষ ২১ সংখ্যা ৪ : বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭২

২ রবীন্দ্র-রচনাবলী ২১, পৃ ৪১৯-৪২২, ৪২৩-৪২৪

পত্রনিবন্ধটির প্রথমাংশ রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৬শ খণ্ডে 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের গ্রন্থপরিচয়রূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

সাহিত্যের স্বরূপ : কবিতা, বৈশাখ ১৩৪৫

সাহিত্যের মাত্রা : পরিচয়, শ্রাবণ ১৩৪০
পত্রটি শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লেখা।

সাহিত্যে আধুনিকতা : পরিচয়, মাঘ ১৩৪১
শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লেখা পত্রখানি 'ছিন্নপত্র' নামে প্রকাশিত হয়।

কাব্য ও ছন্দ : কবিতা, পৌষ ১৩৪৩
'গদ্যকাব্য' নামে প্রকাশিত।

গদ্যকাব্য : প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৬
শান্তিনিকেতনে অভিভাষণের অনুলিপি।

সাহিত্যবিচার : কবিতা, আষাঢ় ১৩৪৮
পত্রখানি শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্তকে লিখিত। সাহিত্যের স্বরূপ গ্রন্থে পত্রখানির রচনাকাল ১৩৪৭ সাল দেওয়া আছে। শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ঐ সাল সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। বস্তুত বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা[১] গ্রন্থে ভূমিকারূপে ব্যবহৃত এই পত্রখানিতে রচনাকাল ১০ আষাঢ় ১৩৪৮ রহিয়াছে। ১৯৪১ সালে প্রকাশিত লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা' বইখানি পাঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পত্রখানি লেখেন।

সাহিত্যের মূল্য : প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮ ও কবিতা, আষাঢ় ১৩৪৮
শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত পত্রখানি তাঁহাকে লেখা বলিয়া জানাইয়াছেন। শ্রীবিশপতি চৌধুরী -লিখিত উপন্যাস-সাহিত্য সম্বন্ধীয় একটি সমালোচনা পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ এই পত্রখানি লেখেন, শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্তের নিকট হইতে এই তথ্য জানা যায়।

পত্রটির রচনা-তারিখ ২৫ এপ্রিল ১৯৪১। ২৪ এপ্রিল এই পত্রের বিষয়বস্তু লইয়া কবি যে আলোচনা করেন তাহা 'আলাপচারি-রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে।[২]

সাহিত্যে চিত্রবিভাগ : প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮

১ শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত। বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা।
২ রানী চন্দ। আলাপচারি-রবীন্দ্রনাথ (১৩৬৮), পৃ ৯২-৯৫

সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা : কবিতা, আশ্বিন ১৩৪৮

পত্রটি বুদ্ধদেব বসুকে লেখা।

"কিছুকাল হইতে কবির মনে সাহিত্য সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জাগিতেছে। রবীন্দ্রনাথের সহিত বুদ্ধদেবের বিচিত্র বিষয়ের আলোচনা হয়। তবে প্রধানত যাহা তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা সাহিত্য ও চিত্র সম্বন্ধে কবির অভিমত।" —শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রজীবনী ৪

সত্য ও বাস্তব : প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৮

'সাহিত্য, শিল্প' নামে প্রকাশিত।

মহাত্মা গান্ধী

মহাত্মাজি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নানা উপলক্ষে যাহা বলিয়াছেন ও লিখিয়াছেন বিভিন্ন সাময়িক পত্র ও পুস্তিকা হইতে সংকলিত হইয়া প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ২৯ মাঘ ১৩৫৪ সালে।

'মহাত্মা গান্ধী' গ্রন্থে প্রবেশক রূপে মুদ্রিত 'শিশুতীর্থ' কবিতাটির অংশ 'পুনশ্চ'[১] কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। এই কবিতাংশ এবং 'গান্ধী মহারাজ' কবিতাটি ব্যতীত মূল গ্রন্থটির আর সকল রচনাই বর্তমান খণ্ডে গৃহীত হইল।

নিম্নে 'গান্ধী মহারাজ' কবিতাটি[২] মুদ্রিত হইল।

গান্ধী মহারাজ

গান্ধী মহারাজের শিষ্য
কেউ-বা ধনী, কেউ-বা নিঃস্ব,
এক জায়গায় আছে মোদের মিল—
গরিব মেরে ভরাই নে পেট,
ধনীর কাছে হই নে তো হেঁট,
আতঙ্কে মুখ হয় না কভু নীল।
ষণ্ডা যখন আসে তেড়ে
উঁচিয়ে ঘুষি ডাণ্ডা নেড়ে

১ রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৬

২ প্রকাশ : প্রবাসী। ফাল্গুন ১৩৪৭

আমরা হেসে বলি জোয়ানটাকে,
'ওই যে তোমার চোখ-রাঙানো
খোকাবাবুর ঘুম-ভাঙানো,
ভয় না পেলে ভয় দেখাবে কাকে।'
সিধে ভাষায় বলি কথা,
স্বচ্ছ তাহার সরলতা,
ডিপ্লম্যাসির নাইকো অসুবিধে।
গারদখানার আইনটাকে
খুঁজতে হয় না কথার পাকে,
জেলের দ্বারে যায় সে নিয়ে সিধে।
দলে দলে হরিণবাড়ি
চলল যারা গৃহ ছাড়ি
ঘুচল তাদের অপমানের শাপ—
চিরকালের হাতকড়ি যে,
ধুলায় খসে পড়ল নিজে,
লাগল ভালে গান্ধীরাজের ছাপ।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
১০ ডিসেম্বর ১৯৪০

মহাত্মা গান্ধী : প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৪৪

১৩৪৩ সালে মহাত্মাজির জন্মোৎসব উপলক্ষে শান্তিনিকেতন-মন্দিরে ১৬ আশ্বিন তারিখে প্রদত্ত ভাষণ। ভাষণটি শ্রীক্ষিতীশ রায় ও শ্রীপ্রভাত গুপ্ত -কর্তৃক অনুলিখিত ও বক্তাকর্তৃক সংশোধিত।

গান্ধীজি : প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৮

১৩৩৮ সালে মহাত্মাজির জন্মোৎসবে শান্তিনিকেতনে ১৫ আশ্বিন তারিখে প্রদত্ত অভিভাষণ 'মহাত্মা গান্ধী' নামে প্রবাসী পত্রে প্রকাশিত হয়।

চৌঠা আশ্বিন : বিচিত্রা, কার্তিক ১৩৩৯

৪ আশ্বিন ১৩৩৯ তারিখে শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত ভাষণ। হিন্দু অনুন্নত শ্রেণীর পৃথক

নির্বাচন স্বীকার করিয়া হিন্দুসমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিচ্ছেদকে আইনত স্থায়ী করিবার যে চেষ্টা হয় সেই অকল্যাণের প্রতিবিধান-কল্পে ১৩৩৯ সালের চৌঠা আশ্বিন মহাত্মাজি পুণার য়েরবাদা জেলে অনশন আরম্ভ করেন। সেই সংকট-কালে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন-আশ্রমবাসীদের নিকট ভাষণদান করেন।

ভাষণটি '৪ঠা আশ্বিন' পুস্তিকা হইতে প্রবাসী পত্রেও পুনর্মুদ্রিত হয় (কার্তিক ১৩৩৯)।

মহাত্মাজির পুণ্যব্রত : প্রবাসী, কার্তিক ১৩৩৯

মহাত্মাজির অনশন (২০ মে ১৯৩২) উপলক্ষে ৫ আশ্বিন ১৩৩৯ তারিখে শান্তিনিকেতনে আহূত পল্লীবাসীদের নিকট প্রদত্ত ভাষণ। 'মহাত্মাজির শেষ ব্রত' শিরোনামে ভাষণটি প্রকাশিত এবং স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে মুদ্রিত ও বিতরিত হয়।

মহাত্মা গান্ধীর নিকট রবীন্দ্রনাথের টেলিগ্রাম—

"It is well worth sacrificing precious life for the sake of India's unity and her social integrity. Though we cannot anticipate what effect it may have upon our rulers who may not understand its immense importance for our people, we feel certain that the supreme appeal of such self-offering to the conscience of our own countrymen will not be in vain. I fervently hope that we will not callously allow such national tragedy to reach its extreme length. Our sorrowing hearts will follow your sublime penance with reverence and love." 19-9-32

রবীন্দ্রনাথের নিকট মহাত্মাজির টেলিগ্রাম—

"Have always experienced God's mercy. Very early this morning I wrote seeking your blessing if you could approve action, and behold I have it in abundance in your message just received. Thank you." 20-9-32

রবীন্দ্রনাথের নিকট মহাত্মা গান্ধীর পত্র—

Dear Gurudev,

This is early morning 3 o'clock of Tuesday. I enter the fiery gate at noon— if you can bless the effort, I want it. You have

been to me a true friend because you have been a candid friend often speaking your thoughts aloud. I had looked forward to a firm opinion from you one way or the other. But you have refused to criticise Though it can now only be during my fast, I will yet prize your criticism, if your heart condemns my action. I am not too proud to make an open confession of my blunder, whatever the cost of the confession, if I find myself in error. If your heart approves of the action I want your blessing. It will sustain me. I hope I have made myself clear. My love. 20-9-32

10-30 a.m.

Just as I was handing this to the Superintendent, I got your loving and magnificent wire. It will sustain me in the midst of the storm I am about to enter. I am sending you a wire. Thank you.

M. K. G.

—Rabindranath Tagore, *Mahatmaji and the Depressed Humanity.*

ব্রত-উদ্‌যাপন : বিচিত্রা, অগ্রহায়ণ ১৩৩৯

মহাত্মাজির অনশন-সময়ে তাঁহাকে দর্শন করিবার আগ্রহে রবীন্দ্রনাথ য়েরবাদা জেলে গমন করেন এবং তাঁহার ব্রত-উদ্‌যাপন-কালে উপস্থিত থাকেন। পুণা হইতে ফিরিয়া শান্তিনিকেতনে আশ্রমবাসীদের নিকট ভাষণটি দান করেন।

ভাষণটি 'পুণা ভ্রমণ' নামে বিচিত্রা পত্রে প্রকাশিত হয়।

মহাদেব দেশাই-এর নিকট টেলিগ্রাম—

"Gurudeva eager start Poona if Mahatmaji has no objection. Wire health and if compromise reached."

Amiya Chakravarty,
23-9-32.

রবীন্দ্রনাথের নিকট মহাত্মাজির টেলিগ্রাম—

"Have read your loving message to Mahadev also Amiya's. You have put fresh heart in me. Do indeed come if your health

permits. Mahadev will send you daily wires. Talks about settlement still proceeding. Love Will wire again if necessary."

23-9-32

—Rabindranath Tagore, *Mahatmaji and the Depressed Humanity.*

'চৌঠা আশ্বিন', 'মহাত্মাজির পুণ্যব্রত' এবং 'ব্রত-উদ্‌যাপন' প্রবন্ধ তিনটি *Mahatmaji and the Depressed Humanity* (December 1932) পুস্তিকায় ইতিপূর্বে সংকলিত হয়।

আশ্রমের রূপ ও বিকাশ

বিশ্বভারতী পুস্তিকামালার অন্তর্গত হইয়া ১৩৪৮ সালের আষাঢ় মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন ইহাতে প্রবন্ধ ছিল দুইটি। শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের পঞ্চাশদ্‌বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আরো একটি প্রবন্ধ যোগ করিয়া ইহার পরিবর্ধিত সংস্করণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ৭ পৌষ ১৩৫৮ সালে। রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে এই পরিবর্ধিত সংস্করণের অন্তর্গত প্রবন্ধ তিনটিই সন্নিবেশিত হইল।

পরিবর্ধিত সংস্করণের প্রথম প্রবন্ধটি 'আশ্রমের শিক্ষা' নামে ১৩৪৩ সালের আষাঢ় সংখ্যা প্রবাসীতে মুদ্রিত হয়, এবং নিউ এডুকেশন ফেলোশিপ-প্রকাশিত 'শিক্ষার ধারা' পুস্তিকায় (১৩৪৩) অন্তর্ভুক্ত হয়। ভিন্ন পাঠে রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষা' গ্রন্থের ১৩৫১ ও তৎপরবর্তী সংস্করণেও ইহা মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধটি 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' (আষাঢ় ১৩৪৮) পুস্তিকায়ও অন্তর্গত।

দ্বিতীয় প্রবন্ধটি 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' (আষাঢ় ১৩৪৮) পুস্তিকায় প্রথম প্রকাশিত ও তাহার কিছুকাল পূর্বে লিখিত।

তৃতীয় প্রবন্ধটি 'আশ্রম বিদ্যালয়ের সূচনা' নামে ১৩৪০ সালের আশ্বিন সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি শান্তিনিকেতনে পঠিত। ইতিপূর্বে উহা কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

বিশ্বভারতী

শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের পঞ্চাশদ্‌বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রথম প্রকাশিত হয় ৭ পৌষ ১৩৫৮ সালে।

বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ১৩৪৭ সাল পর্যন্ত কুড়ি বৎসরের অধিককাল

শান্তিনিকেতন-আশ্রমবিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্বন্ধে' রবীন্দ্রনাথ যে-সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন, বিভিন্ন সাময়িক পত্র হইতে এই গ্রন্থে তাহার অধিকাংশই সংকলিত। এগুলি ইতিপূর্বে কোনো পুস্তকে প্রকাশিত হয় নাই। রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে বিশ্বভারতীর অন্তর্গত সকল রচনাই গৃহীত হইল।

১৩০৮ সালের ৭ পৌষ শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত হয়; ১৩২৮ সালের ৮ পৌষ বিশ্বভারতী পরিষদ্ সভার প্রতিষ্ঠা।

আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পূর্ব হইতেই শান্তিনিকেতনে 'সর্বমানবের যোগসাধনের সেতু' রচনার কল্পনা রবীন্দ্রনাথের মনকে ক্রমশ অধিকার করিতে থাকে; শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ও ছাত্রদিগকে লিখিত কোনো কোনো পত্রে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

"সিকাগো। ৩ মার্চ [১৯১৩]।··· এখানে মানুষের শক্তির মূর্তি যে পরিমাণে দেখি পূর্ণতার মূর্তি সে পরিমাণে দেখতে পাই নে।··· মানুষের শক্তির যতদূর বাড় হবার তা হয়েছে, এখন সময় হয়েছে যখন যোগের জন্যে সাধনা করতে হবে। আমাদের বিদ্যালয়ে আমরা কি সেই যুগসাধনার প্রবর্তন করতে পারব না? মনুষ্যত্বকে বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত করে তার আদর্শ কি আমরা পৃথিবীর সামনে ধরব না?··· মানুষকে তার সফলতার সুরটি ধরিয়ে দেবার সময় এসেছে। আমাদের শান্তিনিকেতনের পাখিদের কণ্ঠে সেই সুরটি কি ভোরের আলোয় ফুটে উঠবে না?"···

—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১৩২০। প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০, কষ্টিপাথর।

"লস এঞ্জেলস্। ১১ অক্টোবর ১৯১৬।··· তার পরে এও আমার মনে আছে যে, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের সূত্র করে তুলতে হবে— ঐখানে সার্বজাতিক মনুষ্যত্বচর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে— স্বাজাতিক সংকীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসছে— ভবিষ্যতের জন্য যে বিশ্বজাতিক মহামিলনযজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তার প্রথম আয়োজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে। ঐ জায়গাটিকে সমস্ত জাতিগত ভূগোলবৃত্তান্তের অতীত করে তুলব এই আমার মনে আছে— সর্বমানবের প্রথম জয়ধ্বজা ঐখানে রোপণ হবে।"— চিঠিপত্র ২।

"··· বিশ্বভারতীর উদ্যোগ। গত [১৩২৫] ৮ই পৌষে তাহার সূচনা হয় এবং গত বৎসরই চিত্র, সংগীত প্রভৃতি কলা এবং সংস্কৃত, পালি ইংরেজি প্রভৃতি সাহিত্যের অধ্যাপনার কাজ আরম্ভ হয়।" "গত বৎসর [১৩২৫] ৮ই পৌষে আশ্রমের বার্ষিক উৎসবের দিনে বিশ্বভারতী স্থাপিত হয়, এবং বর্তমান বৎসরের [১৩২৬] ১৮ই আষাঢ় ইহার নিয়মানুযায়ী কার্যের আরম্ভ হয়।" "বিগত ২৩ ডিসেম্বর [১৯২১] ৮ পৌষ

[১৩২৮] বিশ্বভারতীর সাংবৎসরিক···সভায় বিশ্বভারতী পরিষদ্ গঠিত হয় এবং বিশ্বভারতীর জন্ত যে সংস্থিতি (constitution) প্রণীত হইয়াছে তাহা গৃহীত হয়"— এই তারিখই বর্তমানে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাদিবস বলিয়া স্বীকৃত; এই দিন "সর্বসাধারণের হাতে তাকে সমর্পণ" করা হয়।

বিশ্বভারতীর সূচনা হইবার পর, রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে নিমন্ত্রিত হইয়া The Centre of Indian Culture প্রভৃতি প্রবন্ধে শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার আদর্শ ব্যাখ্যা করেন (১৯১৯)। "আমাদের দেশে শিক্ষার আদর্শ কী হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে আমার প্রবন্ধ আমি কলিকাতায় এবং অন্য অনেক শহরে পাঠ করিয়াছি। বিষয়টি এত বড়ো যে আমাদের এই ছোটো পত্রপুটে তাহা ধরিবে না। সংক্ষেপে তাহার মর্মটুকু এখানে বলি।" এই 'মর্ম' শান্তিনিকেতন পত্রের ১৩২৬ বৈশাখ সংখ্যায় 'বিশ্বভারতী' নামে প্রকাশিত হয়; উহাই বর্তমান গ্রন্থের ১-সংখ্যক প্রবন্ধ।

"গত [১৩২৬] ১৮ই আষাঢ় আশ্রমের অধিপতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সভাপতিত্বে প্রারম্ভোৎসব সমাধা করিয়া বিশ্বভারতীর কার্য আরম্ভ করা হইয়াছে।" এই কার্যারম্ভের দিনে রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা দেন তাহার সারসংকলন বর্তমান গ্রন্থের ২-সংখ্যক প্রবন্ধরূপে মুদ্রিত হইল; প্রথমে ইহা শান্তিনিকেতন পত্রের ১৩২৬ শ্রাবণ সংখ্যায় 'বিশ্বভারতী' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল।

"বিগত ২৩ ডিসেম্বর [১৯২১] ৮ পৌষ [১৩২৮] বোলপুরে শান্তিনিকেতন-আশ্রমের আম্রকুঞ্জে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নূতন শিক্ষার কেন্দ্র বিশ্বভারতীর সাংবৎসরিক সভায় অধিবেশন হয়। সেই সভায় বিশ্বভারতী পরিষদ্ গঠিত হয় এবং বিশ্বভারতীর জন্ত যে সংস্থিতি (constitution) প্রণীত হইয়াছে তাহা গৃহীত হয়। ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য সিল্‌ভ্যাঁ লেভি, ম্যাডাম লেভি, রাজগুরু ধর্মাধার মহাস্থবির, ডাক্তার মিস্ ক্রামরিশ্, শ্রীযুক্ত উইলিয়াম পিয়ার্সন, শ্রীযুক্তা স্নেহলতা সেন, শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী, শ্রীমতী প্রতিমা দেবী, শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায়, স্যর নীলরতন সরকার, দিল্লীর সেণ্ট ষ্টিফেন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত এস্ কে রুদ্র, শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র ঠাকুর, শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, ডাক্তার শিশিরকুমার মৈত্র প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।···সর্বপ্রথমে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়কে সভাপতিত্বে বরণ করিবার প্রস্তাব করেন···।"—

"আমি ইচ্ছা করি আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় কিছু বলুন। আমাদের কী

কর্তব্য, এই বিশ্বভারতীর সঙ্গে তাঁর চিত্তের যোগ কোথায়, তা আমরা শুনতে চাই। আমি এই সুযোগ গ্রহণ করে আপনাদের অনুমতিক্রমে তাঁকে সভাপতির পদে বরণ করলুম।"

এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা করেন তাহা এই গ্রন্থের ৩-সংখ্যক প্রবন্ধ রূপে মুদ্রিত হইল— পূর্বে তাহা শান্তিনিকেতন পত্রের ১৩২৮ মাঘ সংখ্যায় 'বিশ্বভারতী পরিষদ্-সভার প্রতিষ্ঠা' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল।

সভাপতি রূপে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের অভিভাষণের 'সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ প্রতিবেদন' শান্তিনিকেতন পত্রের ১৩২৮ মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত পূর্বোল্লিখিত বিবরণ হইতে পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল।

৪-সংখ্যক রচনাটি 'আলোচনা : বিশ্বভারতীর কথা' নামে ১৩২৯ ভাদ্র ও আশ্বিন -সংখ্যা শান্তিনিকেতন পত্রে প্রকাশিত হয়— "গত ২০শে ফাল্গুন বিশ্বভারতীর কয়েকটি নবাগত ছাত্র আচার্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্বন্ধে কিছু শুনিতে চাহিলে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম।" এই আলোচনার পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "আমি চাই, তোমরা বিশ্বভারতীর নূতন ছাত্রেরা খুব উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গে এখানকার আদর্শকে সমর্থন করে কাজ করে যাবে, যাতে আমি তোমাদের সহযোগিতা লাভ করি। আমার অনুরোধ যে, তোমরা এখানকার তপস্যাকে শ্রদ্ধা করে চলবে, যাতে এই প্রাণ-দিয়ে-গড়ে-তোলা প্রতিষ্ঠানটি অশ্রদ্ধার আঘাতে ভেঙে না পড়ে।"

'বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচার -কল্পে কলিকাতায় বিশ্বভারতী সম্মিলনী নামে যে একটি সভা স্থাপিত হয়', ১৩২৯ সালে তাহার একটি অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর আদর্শ ব্যাখ্যা করেন, ৫-সংখ্যক রচনা সেই বক্তৃতার অনুলিপি ; 'বিশ্বভারতী সম্মিলনী : লেভি-সাহেবের বিদায়-সম্বর্ধনার পরে আলোচনাসভা' নামে ইহা শান্তিনিকেতন পত্রের ১৩২৯ পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২৯ সংখ্যা শান্তিনিকেতন পত্রে 'আশ্রম সংবাদ'-এ প্রকাশিত সিলভ্যাঁ লেভি -সম্পর্কিত বিবরণ হইতে বক্তৃতার তারিখটি অনুমিত।

১৯২২ সালের ২১ অগস্ট রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্রসভায় বিশ্বভারতী সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দেন, ৬-সংখ্যক রচনা তাহার অনুলিপি। *Presidency College Magazine*-এ (VOL IX NO. 1, September 1922) তাহা

'বিশ্বভারতী' নামে প্রকাশিত হয়। ঐ সংখ্যায় WELCOME, RABINDRANATH -শীর্ষক রচনায় এই বক্তৃতার আনুষঙ্গিক বিবরণ মুদ্রিত আছে।

৭-সংখ্যক রচনা, ১৩৩০ সালের নববর্ষে শান্তিনিকেতন মন্দিরে নববর্ষের উৎসবে আচার্যের উপদেশ; ১৩৩০ ভাদ্র সংখ্যা শান্তিনিকেতন পত্রে 'নববর্ষে মন্দিরের উপদেশ' আখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৮-সংখ্যক প্রবন্ধ শান্তিনিকেতন-মন্দিরে ৫ বৈশাখ ১৩৩০ তারিখে কথিত আচার্যের উপদেশের অনুলিপি— শান্তিনিকেতন পত্রের ১৩৩০ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই রচনাটি প্রবাসীর ১৩৩০ মাঘ সংখ্যায় কষ্টিপাথর-বিভাগে 'তীর্থ' নামে অংশত মুদ্রিত হয়।

৯-সংখ্যক রচনা 'বিশ্বভারতী' নামে ১৩৩০ পৌষ সংখ্যা শান্তিনিকেতন পত্রে প্রকাশিত।

১৩৩০ সালে শান্তিনিকেতনে ৭ পৌষের উৎসবে রবীন্দ্রনাথ যে উপদেশ দেন তাহা এই গ্রন্থের ১০-সংখ্যক প্রবন্ধ রূপে প্রকাশিত। প্রথমে উহা শান্তিনিকেতন পত্রের ১৩৩০ মাঘ সংখ্যায় '৭ই পৌষ : দ্বিতীয় ব্যাখ্যান' আখ্যায় মুদ্রিত হয়।

১১-সংখ্যক রচনা, 'দক্ষিণ আমেরিকা যাইবার জন্য কলিকাতায় আসিবার পূর্ব-রাত্রে (১১ ভাদ্র ১৩৩১) শান্তিনিকেতন আশ্রমে কথিত' 'যাত্রার পূর্বকথা' নামে ১৩৩১ কার্তিক সংখ্যা প্রবাসীতে মুদ্রিত হয়।

১৩৩২ সালের ৯ পৌষ শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী পরিষদের বার্ষিক সভায় রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন ১২-সংখ্যক রচনা তাহার অনুলিপি। ১৩৩২ ফাল্গুন সংখ্যা শান্তিনিকেতন পত্রের ক্রোড়পত্ররূপে, পরে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে ইহা প্রচারিত হয়।

১৩-সংখ্যক রচনা ১৩৩৩ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ভারতী পত্রে প্রকাশিত হয়, ও ১৩৩৩ শ্রাবণ সংখ্যা প্রবাসীতে কষ্টিপাথর-বিভাগে ('ভিক্ষা') উদ্ধৃত হয়।

১৪-সংখ্যক রচনা একটি আলোচনার অনুলিপি; প্রথমে ১৩৩৭ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা বিচিত্রায় 'কর্মের স্বাধিত্ব' নামে প্রকাশিত হয়।

১৩৩৯ সালের ৯ পৌষ শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর বার্ষিক পরিষদ্-সভায় রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ ১৫-সংখ্যক প্রবন্ধ রূপে মুদ্রিত। ইহা প্রথমে *Visva-*

Bharati News-এর January 1933, Paush Utsav Number-এর 'আচার্যদেবের অভিভাষণ' আখ্যায় প্রকাশিত হয়।

১৩৪১ সালের ৮ পৌষ শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর বার্ষিক পরিষদ্‌-সভায় আচার্যের অভিভাষণ বর্তমান গ্রন্থের ১৬-সংখ্যক প্রবন্ধ। ইহা পূর্বে ১৩৪১ ফাল্গুন সংখ্যা প্রবাসী পত্রে 'ধারাবাহী' প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশ রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বিশ্বভারতীর বার্ষিক পরিষদে ১৩৪২ সালের ৮ পৌষ তারিখে রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা দেন তাহা এই গ্রন্থের ১৭-সংখ্যক রচনা। এই বক্তৃতার অন্য একটি অনুলিপি 'বিশ্বভারতী বিদ্যায়তন' নামে বিশ্বভারতী পত্রিকায় ১৩৪৯ ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

১৮-সংখ্যক রচনা, ১৩৪৫ সালের ৮ পৌষ তারিখে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর বার্ষিক পরিষদে প্রতিষ্ঠাতা-আচার্যের অভিভাষণ— পূর্বে ১৩৪৫ মাঘ সংখ্যা প্রবাসীতে 'বিশ্বভারতী' নামে মুদ্রিত হইয়াছিল।

১৩৪৭ সালের ৮ শ্রাবণ তারিখে শান্তিনেকেতন-মন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনায় রবীন্দ্রনাথ যে উপদেশ দেন এই গ্রন্থের ১৯-সংখ্যক রচনা তাহার অনুলিপি; ইহা ১৩৪৭ ভাদ্র সংখ্যা প্রবাসীতে 'আশ্রমের আদর্শ' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বিশ্বভারতীর সূচনা কার্যারম্ভ প্রভৃতি সংক্রান্ত যে-সকল তারিখ ও বিবরণ উদ্‌ধৃত হইয়াছে সেগুলি শান্তিনিকেতন পত্রে প্রকাশিত বিশ্বভারতী বার্ষিক প্রতিবেদন, ও অন্যান্য বিবরণী হইতে গৃহীত।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের পঞ্চাশদ্‌বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রথম প্রকাশিত হয় ৭ পৌষ ১৩৫৮ সালে।

প্রতিষ্ঠা দিবসের উপদেশ: ১৩০৮ সালের ৭ই পৌষ আশ্রমবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-দিবসে রবীন্দ্রনাথ ছাত্রগণের প্রতি যে উপদেশ দেন তাহা সমসাময়িক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (মাঘ ১৮২৩ শক) 'শান্তিনিকেতনে একাদশ সাম্বৎসরিক উৎসব'-বিবরণের অন্তর্গত হইয়া প্রকাশিত হয়। "সর্বপ্রথমে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যালয় সম্বন্ধে কিছু বলিলেন। পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানবকদিগকে

ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করিলেন।", উপদেশান্তে "বক্তা গায়ত্রী মন্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দিলেন।"

উপদেশটি পূর্বে শ্রীসুধীরচন্দ্র কর -প্রণীত 'শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষ' গ্রন্থে (১৩৩৬) পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল।

প্রথম কার্যপ্রণালী : শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পর-বৎসরেই লিখিত রবীন্দ্রনাথের এই পত্রখানি শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের সৌজন্যে আমাদের হস্তগত হইয়াছে; 'রবীন্দ্রজীবনী'কার অনুমান করেন, 'ইহাই শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রথম constitution বা বিধি'। এই প্রসঙ্গে ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় লিখিয়াছেন— 'শান্তিনিকেতনের কাজে ১৯০৮ সালে যোগ দিই। কী আদর্শ লইয়া রবীন্দ্রনাথ এই আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন এবং কীভাবে তিনি ইহার পরিচালনা চাহেন এখানে আসিয়া তাহা জানিতে চাহিলে তিনি একখানি সুদীর্ঘ পত্র আনিয়া আমাকে দেন। পত্রখানি কুড়িপৃষ্ঠাব্যাপী, এবং আগাগোড়া নিজের হাতে লেখা। তাহাতে ছাত্রদের প্রতিদিনকার কর্তব্যগুলি রীতিমতো হিসাব করিয়া-করিয়া লেখা। তখন বিদ্যালয়ের একেবারে প্রাথমিক পর্ব। তখনই যে তাঁহার অন্তরে শিক্ষাজীবনের পরিপূর্ণ মূর্তিটি দেখা দিয়াছিল এই পত্রে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। পত্রখানি লেখা কবিগুরুর পত্নীবিয়োগের মাত্র দিন-দশেক পূর্বে— খুব উদ্‌বেগের একটি সময়ে, পত্রশেষে তাহার উল্লেখও করিয়াছেন। তবু এই পত্রে যে সূক্ষ্ম বিচার ও খুঁটিনাটির দিকে দৃষ্টি দেখি তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়।'

পত্রখানি কুঞ্জলাল ঘোষ মহাশয়কে লিখিত। 'স্মৃতি' গ্রন্থে মুদ্রিত (পৃ ১১), শান্তিনিকেতনের তৎকালীন অধ্যাপক মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক লিখিত, সমসাময়িক একটি পত্রে এই চিঠিখানির উল্লেখ আছে—

"কুঞ্জবাবু শীঘ্রই বোলপুরে যাইবেন। আশা করিতেছি তাঁহার নিকট হইতে নানা বিষয়ে সাহায্য পাইবেন। অধ্যাপনা-কার্যেও তিনি আপনাদের সহায় হইতে পারিবেন। আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত তিনি এই কার্যে ব্রতী হইতে উদ্যত হইয়াছেন। ইঁহার সম্বন্ধে যত লোকের নিকট হইতে সন্ধান লইয়াছি সকলেই একবাক্যে ইঁহার প্রশংসা করিয়াছেন।

"বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে আমি বিস্তারিত করিয়া ইঁহাকে লিখিয়াছিলাম। এই লেখা আপনারাও পড়িয়া দেখিবেন— যাহাতে তদনুসারে ইনি চলিতে পারেন আপনারা ইঁহাকে সেইরূপ সাহায্য করিতে পারেন।

"বিদ্যালয়ের কর্তৃত্বভার আমি আপনাদের তিন জনের উপর দিলাম— আপনি,

জগদানন্দ ও সুবোধ। এই অধ্যক্ষসভার সভাপতি আপনি ও কার্যসম্পাদক কুঞ্জবাবু। হিসাবপত্র তিনি আপনাদের দ্বারা পাস করাইয়া লইবেন এবং সকল কাজেই আপনাদের নির্দেশমতো চলিবেন। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত নিয়মাবলী তাঁহাকে লিখিয়া দিয়াছি, আপনারা তাহা দেখিয়া লইবেন।"

১৩১০ সালের ২৬ জ্যৈষ্ঠ তারিখে আলমোড়া হইতে লিখিত একটি পত্রে কুঞ্জলাল ঘোষ মহাশয়ের পরিচয়-স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—

"বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাভার একজন কড়া লোকের হাতে না দিলে ক্রমে বিপদ আসন্ন হইতে পারে। ইহাই অনুভব করিয়া কুঞ্জবাবুর হস্তে ভার সমর্পণ করিয়াছি। তিনি ভাবুক লোক নহেন কাজের লোক— সুতরাং ভাবের দিকে বেশি ঝোঁক না দিয়া তিনি কাজের দিকে কড়াক্কড়ী করেন— তাহাতে তিনি লোকের কাছে অপ্রিয় হইয়া পড়েন কিন্তু বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ও স্থায়িত্বের পক্ষে এরূপ লোকের প্রয়োজন অনুভব করি। আমার সঙ্গেও তাঁহার স্বভাবের ঐক্য নাই— থাকিলে আনন্দ পাইতাম কাজ পাইতাম না।"

পত্রখানি যে কুঞ্জলাল ঘোষকে লিখিত শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাহা অনুমান করেন, তিনিই বর্তমান মন্তব্যে সংকলিত পত্র দুইখানির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

সমবায়নীতি

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের শততম সংখ্যারূপে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৬০ সালের চৈত্র মাসে। সমবায়নীতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে যে-সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন ও ভাষণদান করিয়াছিলেন এই গ্রন্থে সেগুলি সংকলিত। রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে গ্রন্থখানির সকল প্রবন্ধই অন্তর্ভুক্ত হইল।

সাময়িক পত্রে রচনাগুলির প্রকাশের সূচী দেওয়া হইল—

সমবায় ১ : ভাণ্ডার, শ্রাবণ ১৩২৫
সমবায় ২ : বঙ্গবাণী, ফাল্গুন ১৩২৯
ভারতবর্ষে সমবায়ের বিশিষ্টতা : ভাণ্ডার, শ্রাবণ ১৩৩৪
সমবায়নীতি : পুস্তিকাকারে প্রকাশ, ২১ মাঘ ১৩৩৫
পরিশিষ্ট। 'চরকা' প্রবন্ধের[১] অংশ : সবুজপত্র, ভাদ্র ১৩৩২

১ কালান্তর : রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪

ভূমিকা-রূপে ব্যবহৃত রবীন্দ্রনাথের বাণী শ্রীসুধীরচন্দ্র কর -লিখিত 'লোকসেবক রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে (মাসিক বসুমতী, অগ্রহায়ণ ১৩৬০) অংশত প্রকাশিত হয়। বিশ্বভারতী সমবায় কেন্দ্রীয় কোষের কর্মীদের প্রতি আশীর্বাণীরূপে ইহা প্রেরিত হইয়াছিল (১৯২৮); অন্যতম কর্মী শ্রীনন্দলাল চন্দ্রের সৌজন্যে এই তথ্য এবং এই রচনার পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে।

এই তালিকায় উল্লিখিত 'ভাণ্ডার' বঙ্গীয় সমবায়-সংগঠন-সমিতির মুখপত্র। সমবায় ১ প্রবন্ধ ইহার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

সমবায় ২ নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় -প্রণীত গ্রন্থের ভূমিকা-রূপে কল্পিত— তাঁহার 'জাতীয় ভিত্তি' (১৩৩৮) গ্রন্থে ভূমিকা-রূপে ইহা মুদ্রিত হয়। 'বঙ্গবাণী'তে প্রকাশিত প্রবন্ধের অতিরিক্ত এক অনুচ্ছেদ ঐ ভূমিকায় (ও বর্তমান গ্রন্থে) মুদ্রিত হইয়াছে।

১৯২৭ সালের "২রা জুলাই আন্তর্জাতিক সমবায় উৎসবের দিনে কলিকাতায় [অ্যালবার্ট হলে] বঙ্গীয় সমবায়-সংগঠন-সমিতি -কর্তৃক অনুষ্ঠিত উৎসবের সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা দেন", শ্রীহিরণকুমার সান্যাল ও সজনীকান্ত দাস -লিখিত তাহার অনুলিপি বক্তা-কর্তৃক সংশোধিত হইয়া ভাণ্ডার পত্রে 'ভারতবর্ষে সমবায়ের বিশিষ্টতা' নামে মুদ্রিত হয়।

শ্রীনিকেতনে ১৩৩৫ সালের ২৭ মাঘ সর্ ড্যানিয়েল হ্যামিলটনের সভাপতিত্বে বর্ধমান বিভাগীয় সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হয়— রবীন্দ্রনাথ তাহার উদ্‌বোধনকালে যে প্রবন্ধ রচনা করেন তাহা ঐ উপলক্ষে 'সমবায়নীতি' নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় (২৭ মাঘ ১৩৩৫)।

পরিশিষ্টে ('চরকা' প্রবন্ধে) রবীন্দ্রনাথ যে লিখিয়াছেন 'আমার কোনো কোনো আত্মীয় তখন সমবায়তত্ত্বকে কাজে খাটাবার আয়োজন করছিলেন', নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহাদের অন্যতম।

'জনসাধারণের নিজের অর্জনশক্তিকে মেলাবার উদ্যোগ', 'অনেক মানুষ একজোট হইয়া জীবিকানির্বাহ করিবার উপায়', যাহাতে মানুষ 'মিলিয়া বড়ো হইবে', 'শুধু টাকায় নয়, মনে ও শিক্ষায় বড়ো হইবে'— সমবায়ের এই মূলতত্ত্ব দেশের উন্নতির পন্থারূপে রবীন্দ্রনাথের আরো অনেক রচনায় আলোচিত হইয়াছে— নিজের

জমিদারিতে ও পরে বিশ্বভারতীতে তাহা কার্যতঃও প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, 'রবীন্দ্রজীবনী'তে তাহার বিবরণ আছে—"রবীন্দ্রনাথ যখন প্রজাদের মধ্যে··· সমবায়শক্তি জাগরূক করিবার কথা ভাবিতেছিলেন তখন বাংলাদেশে সরকারী কো-অপারেটিভ আন্দোলন আরম্ভ হয় নাই"। সমবায়-সমিতি-রূপে পরিকল্পিত 'হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানি' প্রতিষ্ঠার সময়েও তিনি উহার সহিত বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন।

এই পুস্তকে সমবায়নীতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে লিখিত রচনাদিই মুদ্রিত হইল। পরিশিষ্ট ব্যতীত অন্য রচনাগুলি পূর্বে রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থে নিবদ্ধ হয় নাই।

খৃষ্ট

খৃষ্ট-জন্মোৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত ভাষণ, এবং নানা প্রবন্ধে চিঠিপত্রে অথবা অভিভাষণে খৃষ্ট ও খৃষ্টধর্ম প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি যতদূর সংগৃহীত হইয়াছে মূলতঃ তাহারই সংকলন হিসাবে গ্রন্থখানি প্রথম প্রকাশিত হয় ২৫ ডিসেম্বর ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে।

রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে খৃষ্ট গ্রন্থের মূল প্রবন্ধ ও অভিভাষণগুলিই সংকলিত হইল, 'খৃষ্ট-প্রসঙ্গ'র রচনাংশগুলি অন্তর্ভুক্ত হইল না।

'মানবপুত্র' পুনশ্চ গ্রন্থের (রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৬) অন্তর্গত হইয়াছে, সেজন্য বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত হইল না।

'বড়োদিন' ও 'পূজালয়ের অন্তরে ও বাহিরে' ইতিপূর্বে রচনাবলীর কোনো খণ্ডে সংকলিত না হওয়ায় নিম্নে মুদ্রিত হইল।

বড়োদিন[১]

একদিন যারা মেরেছিল তাঁরে গিয়ে
রাজার দোহাই দিয়ে
এ যুগে তারাই জন্ম নিয়েছে আজি ;
মন্দিরে তারা এসেছে ভক্ত সাজি—
ঘাতক সৈন্যে ডাকি
'মারো মারো' ওঠে হাঁকি।

১ প্রবাসী, মাঘ ১৩৩৬। চতুর্থ বর্ষ প্রথম সংখ্যা 'ছায়াপথ' পত্রে ভিন্নতর পাঠ মুদ্রিত

পার্জনে মিশে পূজামন্ত্রের স্বর—
মানবপুত্র তীব্র ব্যথায় কহেন, 'হে ঈশ্বর!
এ পানপাত্র নিদারুণ বিষে ভরা
দূরে ফেলে দাও, দূরে ফেলে দাও ত্বরা।'

বড়োদিন। ১৯৩৯

পূজালয়ের অন্তরে ও বাহিরে[1]

গির্জাঘরের ভিতরটি স্নিগ্ধ,
সেখানে বিরাজ করে স্তব্ধতা,
রঙিন কাচের ভিতর দিয়ে সেখানে প্রবাহিত রমণীয় আলো।
এইখানে আমাদের প্রভুকে দেখি তাঁর ন্যায়াসনে,
মুখশ্রীতে বিষাদ-দুঃখ,
বিচারকের বিরাট মহিমায় তিনি মুকুটিত।
তিনি যেন বলছেন,
"তোমরা যারা চলে যাচ্ছ,
তোমাদের কাছে এ কি কিছুই নয়।
তাকাও দেখি, বলো দেখি,
কোনো দুঃখ কি আছে আমার দুঃখের তুল্য।"
পুণ্য দীক্ষা-অনুষ্ঠান শেষ হল।
মনে জাগল তাঁর প্রেমের গৌরব, তাঁর আশ্বাসবাণী—
"এসো আমার কাছে, যারা কর্মক্লিষ্ট,
এসো যারা ভারাক্রান্ত,
আমি তোমাদের বিরাম দেব।"
এই বাক্যে শান্তি এবং আনন্দ আনল আমাদের মনে,
ক্ষণকালের জন্য সঙ্গ পেলুম তাঁর স্বর্গলোকে।
শুনলুম, "ঊর্ধ্বে তোলো তোমার হৃদয়কে।"
উত্তর দিলুম, "প্রভু, আমরা হৃদয় তুলে ধরেছি তোমারই দিকে।"
চলে এলুম বাইরে।

১ 'চার্ল্‌স্ অ্যাণ্ড্রুজের রচিত কবিতার অনুবাদ।' ১৩৪৭ আষাঢ় সংখ্যা 'সমসাময়িক' পত্রে প্রকাশিত।

গির্জাঘর থেকে ফেরবার পথে
দেখা গেল সেই দীর্ঘ জনশ্রেণী।
তারা দেহকে পীড়ন ক'রে চলেছে
ক্লান্ত আক্রান্ত গুরুভারে,
তাদের জন্যে নেই স্বর্গ, নেই হৃদয়কে ঊর্ধ্বে উদ্‌বাহন,
ঈশ্বরের সুন্দর সৃষ্টিতে নেই তাদের রোমাঞ্চিত আনন্দ,
নেই তাদের শান্তি, নেই বিশ্রাম।
কেবল আরামহীন পরিশ্রম দিনের পর দিন,
ক্ষুধিত তৃষার্ত তারা, ছিন্ন বসন, জীর্ণ আবাস,
পরিপোষণহীন দেহ।
এ দিকে তাঁর বিষণ্ন দুঃখাভিভূত মুখশ্রী,
উদার বিচারের মহিমায় তিনি মুকুটিত।
গম্ভীর অভিযোগে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন—
"আমার এই ভাইদের মধ্যে তুচ্ছতমের প্রতি যে নির্মমতা
সে আমারই প্রতি।"

২২ এপ্রিল ১৯৪০
মংপু। দার্জিলিং

অজিতকুমার চক্রবর্তী 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' (১৩১৮) গ্রন্থে লিখিয়াছেন : "১৩১৬ সালে মহাপুরুষদিগের জন্ম কিংবা মৃত্যু দিনে তাঁহাদিগের চরিত ও উপদেশ -আলোচনার জন্য [শান্তিনিকেতনে] উৎসব করা স্থির হইল। খৃষ্টমাসে প্রথম খৃষ্টোৎসব হইল। তার পরে চৈতন্য ও কবীরের উৎসব হইয়াছিল। সকল মহাপুরুষকেই ভালো করিয়া জানিবার ও বুঝিবার সংকল্প হইতেই এ অনুষ্ঠানের সৃষ্টি।"

এই সময় হইতে শান্তিনিকেতনে নিয়মিতভাবে খৃষ্ট-জন্মদিনে উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

যিশুচরিত : তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র ১৮৩৩ শক (১৩১৮)

'শান্তিনিকেতন আশ্রমে ১৯১০ খৃষ্টাব্দের খৃষ্টোৎসবের দিনে কথিত বক্তৃতার সারমর্ম।' অজিতকুমার চক্রবর্তী -প্রণীত 'খৃষ্ট' গ্রন্থের ভূমিকা-রূপে এই রচনা ব্যবহৃত।

খৃষ্টধর্ম : সবুজপত্র, পৌষ ১৩২১

'খৃষ্টজন্মদিনে শান্তিনিকেতন আশ্রমে কথিত।'

খৃষ্টোৎসব : শান্তিনিকেতন পত্র, চৈত্র ১৩৩০

মানবসম্বন্ধের দেবতা : বিচিত্রা, বৈশাখ ১৩৪০

এই অভিভাষণ প্রথমে 'খৃষ্টোৎসব' নামে ১৩৩৮ আষাঢ়-শ্রাবণ সংখ্যা মুক্তধারা পত্রে প্রকাশিত হয় ; পরে ঈষৎ পরিবর্তিত রূপে 'মানবসম্বন্ধের দেবতা' নামে বিচিত্রা পত্রে প্রকাশ পায় ; তাহাই এই গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত।

বড়োদিন : প্রবাসী, মাঘ ১৩৩৯

২৫ ডিসেম্বর ১৯৩৯ তারিখে খ্রীস্টদিবসের উদ্‌যাপন-উদ্দেশে রচিত গান।

খৃষ্ট : প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪৩

৩-সংখ্যক ভাষণ শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত -কর্তৃক, ৫-সংখ্যক ভাষণ শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী -কর্তৃক, ৪ ও ৬ -সংখ্যক ভাষণ শ্রীপুলিনবিহারী সেন -কর্তৃক অনুলিখিত এবং সমস্তই বক্তা-কর্তৃক সংশোধিত। ২-সংখ্যক প্রবন্ধটিও বক্তা-কর্তৃক সংশোধিত অনুলিপি হওয়া সম্ভব। ৮-সংখ্যক 'বক্তৃতার সারমর্ম' বক্তা-কর্তৃক বিস্তারিত আকারে পুনর্লিখিত বলিয়া অনুমিত।

পল্লীপ্রকৃতি

রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীনিকেতনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য -সূচক প্রবন্ধ ভাষণ ও পত্রাদির সংকলন। শ্রীনিকেতন-প্রতিষ্ঠার (২৩ মাঘ ১৩২৮) সাংবাৎসরিক উৎসবোপলক্ষে রবীন্দ্র-শতপূর্তি বর্ষে প্রথম প্রকাশিত হয় ২৩ মাঘ ১৩৬৮ সালে।

ভারতবর্ষে পল্লীসমস্যা ও পল্লীসংস্কার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা ও প্রবন্ধাবলী পল্লীপ্রকৃতি গ্রন্থে সংকলিত।

এই গ্রন্থের প্রবেশকরূপে ব্যবহৃত 'ফিরে চল্ মাটির টানে' গানটি, তৃতীয় ভাগের অন্তর্গত পত্রগুলি এবং দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্গত 'শিক্ষার বিকিরণ' প্রবন্ধটি রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে গৃহীত হইল না। প্রবন্ধটি শিক্ষা গ্রন্থের অন্তর্গত। রচনাবলীর পরবর্তী কোনো খণ্ডে, 'শিক্ষা'র যে প্রবন্ধগুলি রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয় নাই সেইগুলির সহিত, উক্ত প্রবন্ধটিও যুক্ত হইবে।

গ্রন্থের প্রথম ভাগের অন্তর্গত 'সভাপতির অভিভাষণ' 'কর্মযজ্ঞ' 'পল্লীসেবা' 'গ্রামবাসীদের প্রতি' প্রবন্ধগুলি ইতিপূর্বে বিভিন্ন গ্রন্থের অন্তর্গত হইয়া রবীন্দ্র-রচনাবলীর পূর্ববর্তী কয়েকটি খণ্ডে সন্নিবিষ্ট আছে বলিয়া বর্তমান খণ্ড রচনাবলী ভুক্ত হইল না।

এই খণ্ডে সংকলিত রচনাগুলির অধিকাংশই পূর্বে কোনো গ্রন্থভুক্ত হয় নাই, সাময়িক পত্রে নিবদ্ধ ছিল। সাময়িক পত্রে প্রকাশের সূচী দেওয়া হইল :

পল্লীর উন্নতি	প্রবাসী। বৈশাখ ১৩২২
ভূমিলক্ষ্মী	ভূমিলক্ষ্মী। আশ্বিন ১৩২৫
শ্রীনিকেতন	প্রবাসী। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪
পল্লীপ্রকৃতি	বিচিত্রা। বৈশাখ ১৩৩৫
দেশের কাজ	প্রবাসী। চৈত্র ১৩৩৮
উপেক্ষিতা পল্লী	প্রবাসী। চৈত্র ১৩৪০
অরণ্যদেবতা	প্রবাসী। কার্তিক ১৩৪৫
অভিভাষণ[১]	বিচিত্রা। পৌষ ১৩৪৫
শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ	প্রবাসী। ভাদ্র ১৩৪৬
হলকর্ষণ	প্রবাসী। আশ্বিন ১৩৪৬
পল্লীসেবা	প্রবাসী। ফাল্গুন ১৩৪৬

॥ ২ ॥

অভিভাষণ	শান্তিনিকেতন পত্র। ১৩২৯
সমবায়ে ম্যালেরিয়া-নিবারণ	সংহতি। ভাদ্র ১৩৩০
ম্যালেরিয়া	বঙ্গবাণী। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১
প্রতিভাষণ[২]	প্রবাসী। বৈশাখ ১৩৩৩
বাঙালীর কাপড়ের কারখানা ও হাতের তাঁত	প্রবাসী। কার্তিক ১৩৩৮
জলোৎসর্গ[৩]	প্রবাসী। কার্তিক ১৩৪৩
সম্ভাষণ[৪]	বিচিত্রা। চৈত্র ১৩৪৩
অভিভাষণ[৫]	প্রবাসী। বৈশাখ ১৩৪৭

প্রধান রচনাগুলি প্রথম ভাগে মুদ্রিত; দ্বিতীয় ভাগে প্রাসঙ্গিক বিবিধ রচনার সংগ্রহ।

১ 'শ্রীনিকেতন' নামে মুদ্রিত
২ 'পূর্ববঙ্গে বক্তৃতা' নামে মুদ্রিত
৩ 'রবিবাসরের অভিভাষণ' নামে মুদ্রিত
৪ 'অভিভাষণ' নামে মুদ্রিত
৫ 'কবির উত্তর' নামে মুদ্রিত

পল্লীর উন্নতি। কর্মযজ্ঞ: বঙ্গীয়-হিতসাধন-মণ্ডলীতে রবীন্দ্রনাথের দুইটি বক্তৃতা।

ভূমিলক্ষ্মী: 'ভূমিলক্ষ্মী' পত্রিকায় প্রকাশিত এই রচনা প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩৩৫ কষ্টিপাথর বিভাগ হইতে সংকলিত।

অভিভাষণ: ১৩৪৫ সালের ২২ অগ্রহায়ণ কলিকাতায় ২১০ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট ভবনে শ্রীনিকেতন শিল্পভাণ্ডারের উদ্‌বোধন করেন সুভাষচন্দ্র বসু, এই উপলক্ষে পঠিত রবীন্দ্রনাথের মুদ্রিত অভিভাষণ। তিনি সভায় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। এই অভিভাষণে, 'তোমরা রাষ্ট্রপ্রধান' বা 'তোমরা স্বদেশের প্রতীক' এই উক্তির লক্ষ্য কন্‌গ্রেস-সভাপতি সুভাষচন্দ্র।

শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ: শ্রীনিকেতনের কর্মীদের সভায় কথিত বর্তমান ভাষণে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছেন কালীমোহন ঘোষ, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, সি. এফ. অ্যাণ্ড্রুজ ও এল. কে. এলম্‌হার্স্ট্।

এই প্রবন্ধে যে 'ভাঙা বাড়ি', 'ভুতুড়ে বাড়ি'-র কথা বলা হইয়াছে (পৃ ৫৫৭), হেমলতা দেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি পত্র সেই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

পত্রখানি হেমলতা দেবীর একটি প্রবন্ধের সহিত 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকায় (আশ্বিন ১৩৪৬) প্রকাশিত হইয়াছিল।

নিম্নে রবীন্দ্রনাথের পত্রখানি হেমলতা দেবীর প্রবন্ধের শেষাংশ-সহ মুদ্রিত হইল।—

...তাঁর [রবীন্দ্রনাথ] ভ্রাতুষ্পুত্র আমার স্বর্গীয় স্বামীর [দ্বিপেন্দ্রনাথ] উপর ভার দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি তাঁর বিদ্যালয়ের। দখল নেওয়ার আদেশ এসেছিল তাঁরই কাছে। দখল নিতে গিয়ে দেখেন, বাড়িটির বহু খিলান ফাটা, ছাদ দিয়ে জল পড়ে, দেওয়ালের গায়ে ফাটল হয়ে গাছ বেরিয়েছে নানারকম। বললেন, অনেক টাকা খরচ না করলে এ বাড়ি বাস-যোগ্য হবে না। আমাকে বললেন, সেই খবর কবিকে চিঠি লিখে জানাতে।

খবর পেয়ে উত্তরে কবি যে পত্র লেখেন সেই পত্রখানি—

508, W. High Street
Urbana Illinois
২৩শে অগ্রহায়ণ ১৩১৯

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

বৌমা— তোমাদের কাছে স্কুলের বাড়ির বর্ণনা শুনে বোঝা গেল, আমার ভাগ্যের কিছু পরিবর্তন হয় নি। কেনাবেচার বাজারে আমাকে চিরদিন ঠকতেই হবে— ঠকার সীমা

যদি ঐ টাকার থলির মধ্যেই বদ্ধ থাকে তা হলেও তেমন ক্ষতি নেই, কাঁড়া তা হলে ঐখানেই কেটে যায়। যা হোক, কাজ যখন সম্পূর্ণ সমাপ্ত হয়ে গেছে তখন লোকসানের দিকেই সমস্ত ঝোঁকটা দিয়ে পরিতাপ করে কোনো ফল নেই— ওর মধ্যে যতটুকু লাভ আছে, তা যত সামান্যই হোক, সেইটেকেই প্রচুর জ্ঞান করে তাকে যথাযোগ্য ব্যবহারে লাগাবার চেষ্টা করা কর্তব্য— ওর দেয়াল ফাটা, ওর গাছগুলো বুড়ো, ওর চারি দিকে জঙ্গল এ বলে মন ভারী করে বসে থাকলে ঠকাটিকে কেবল দ্বিগুণ বাড়িয়ে তোলা হবে। যে আটহাজার টাকা আমার গেছে, সে তো গেছেই— কিন্তু তার বদলে যেটুকু পেয়েছি তাকে পেয়েছি বলেই গণ্য করতে হবে। আমার ফিরে যাওয়া পর্যন্ত ওটাকে কী রকমে কাজে লাগাতে পারা যেতে পারে তা এতদূর থেকে বলা এবং ব্যবস্থা করা আমার পক্ষে শক্ত। তোমরা সকলে পরামর্শ করে যেরকম ভালো বোধ কর তাই করো। আর কিছু না হোক, জমি অনেকটা আছে ওর মধ্যে, কিছু কিছু চাষ হতে পারে না কি? সন্তোষের গোয়ালঘরের কল্যাণে গোবরের সারের তো অভাব হবে না। এখন থেকে ফল গাছগুলোর গোড়া খুঁড়ে ওতে যথেষ্ট পরিমাণ সার দিতে পারলে হয়তো আমের সময় ছেলেদের জন্য কিছু আম পাওয়া যেতে পারে।…

হলকর্ষণ: শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত একখানি চিঠি এই অভিভাষণ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—

"আজ স্কুলে হলচালন উৎসব হবে। লাঙল ধরতে হবে আমাকে। বৈদিক মন্ত্র-যোগে কাজটা করতে হবে ব'লে এর অসম্মানের অনেকটা হ্রাস হবে। বহু হাজার বৎসর পূর্বে এমন একদিন ছিল যখন হাল-লাঙল কাঁধে করে মানুষ মাটিকে জয় করতে বেরিয়েছিল, তখন হলধরকে দেবতা বলে দেখেছে, তার নাম দিয়েছে বলরাম। এর থেকে বুঝবে নিজের যন্ত্রধারী স্বরূপকে মানুষ কতখানি সম্মান করেছে। বিষ্ণুকে বলেছে চক্রধারী, কেননা এই চক্র হচ্ছে বস্তুজগতে মানুষের বিজয়রথের বাহন। মাটি থেকে মানুষ ফসল আদায় করেছে এটা তার বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা হচ্ছে হাল-লাঙলের উদ্‌ভাবন। এমন জন্তু আছে যে আপনার দাঁত দিয়ে পৃথিবী বিদীর্ণ ক'রে খাদ্য উদ্ধার করে; মানুষের গৌরব হচ্ছে সে আপন দেহের উপর চূড়ান্ত নির্ভর করে না, তার নির্ভর যন্ত্র-উদ্‌ভাবনী বুদ্ধির উপর। এরই সাহায্যে শারীর কর্মে একজন মানুষ হয়েছে বহু মানুষ। গৌরবে বহুবচন। আজ আমরা একটা মিথ্যে কথা প্রায় বলে থাকি— dignity of labour, অর্থাৎ শারীর শ্রমের সম্মান। অন্তরে অন্তরে মানুষ এটাকে আত্মাবমাননা বলেই জানে। আজ আমাদের উৎসবে আমরা হাল-লাঙলের অভিবাদন

যদি করে থাকি তবে সেটা আপন উদ্‌ভাবন-কৌশলের আদিম প্রকাশ ব'লে। সেইখানে খতম করতে বলা মনুষ্যত্বকে অপমানিত করা। চরকাকে যদি চরম আশ্রয় বলি তা হলে চরকাই তার প্রতিবাদ করবে— আপন দেহশক্তির সহজ সীমাকে মানুষ মানে না এই কথাটা নিয়ে চরকা পৃথিবীতে এসেছে— সেই চরকার দোহাই দিয়েই কি মানুষের বুদ্ধিকে বেড়ার মধ্যে আটকাতে হবে। আজ দেখলুম একটা বাংলা কাগজ এই বলে আক্ষেপ করছে যে, বেহারের ইংরেজ মহাজন কলের লাঙলের সাহায্যে চাষ শুরু করেছে, তাতে করে আমাদের চাষীদের সর্বনাশ হবে। লেখকের মত এই যে, আমাদের চাষীদের আধপেটা খাওয়াবার জন্যে মানুষের বুদ্ধিশক্তিকে অনন্তকাল নিষ্ক্রিয় করে রেখে দিতে হবে। লেখক এ কথা ভুলে গেছেন যে, চাষীরা বস্তুত মরছে নিজের জড়বুদ্ধি ও নিরুদ্যমের আক্রমণে। শান্তিনিকেতনে শিক্ষাব্যাপারে আমি আর-আর অনেক প্রকারের আয়োজন করেছি— কিন্তু যে শিক্ষার সাহায্যে মানুষ একান্ত দৈহিক শ্রমপরতার অসম্মান থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে তার আয়োজন করতে পারলুম না এই দুঃখ অনেক দিন থেকে আমাকে বাজছে। দেহের সীমা থেকে যে বিজ্ঞান আমাদের মুক্তি দিচ্ছে আজ য়ুরোপীয় সভ্যতা তাকে বহন করে এনেছে— একে নাম দেওয়া যাক বলরামদেবের সভ্যতা। তুমি জানো বলরামদেবের একটু মদ খাবারও অভ্যাস আছে, এই সভ্যতাতেও শক্তিমত্ততা নেই তা বলতে পারি নে, কিন্তু সেই ভয়ে শক্তিহীনতাকেই শ্রেয় গণ্য করতে হবে এমন মূঢ়তা আমাদের না হোক। ইতি ২৫ শ্রাবণ ১৩৩৬"

—পথে ও পথের প্রান্তে

•

এই গ্রন্থের প্রথমভাগে মুদ্রিত অপর সকল রচনাই শ্রীনিকেতন বার্ষিক উৎসবে (৬ ফেব্রুয়ারি) বা হলকর্ষণ ও বৃক্ষরোপণ-উৎসবে কথিত ভাষণের অনুলিপি। 'পল্লীপ্রকৃতি', অনুরূপ অনুলিপি অবলম্বনে কবি-কর্তৃক পরিবর্ধিত আকারে লিখিত হয় (মুদ্রণকালে আরো পরিবর্তন হয়)।

অভিভাষণ: কলিকাতায় বিশ্বভারতী-সম্মিলনীতে এল. কে. এল্‌ম্‌হার্স্ট্‌ Robbery of the Soil[১] সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন, এই সভায় সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ।

১ শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত -কৃত অনুবাদ 'মাটির উপর দস্যুবৃত্তি', শান্তিনিকেতন পত্র, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২৯

সমবায়ে ম্যালেরিয়া-নিবারণ : "বিশ্বভারতী সম্মিলনী ও অ্যান্টি-ম্যালেরিয়াল সোসাইটির উদ্যোগে ২৯শে আগস্ট [১৯২৩] তারিখে কলিকাতার রামমোহন লাইব্রেরি গৃহে আহূত সভায় সভাপতির বক্তৃতা।" 'সংহতি'-সম্পাদক মুরলীধর বসু অনুগ্রহপূর্বক এই বক্তৃতার প্রতিলিপি 'সংহতি' হইতে আমাদের দেন ; তিনি আমাদের জানাইয়াছিলেন যে, এই অনুলিপি বক্তা-কর্তৃক সংশোধিত।

ম্যালেরিয়া : "অ্যান্টি-ম্যালেরিয়া কো-অপারেটিভ সোসাইটির চতুর্থ বার্ষিক সভায় সভাপতি রূপে প্রদত্ত বক্তৃতা। অ্যাল্‌ফ্রেড থিয়েটার হল। ২৩।২। [১৯] ২৪।" অনুলিপি-পাঠে মনে হয় যে উহা বক্তা-কর্তৃক সংশোধিত নহে। তৎসত্ত্বেও প্রসঙ্গানুরোধে যৎসামান্য আক্ষরিক সংশোধনে পুনর্মুদ্রিত হইল। বর্তমান প্রসঙ্গে 'সমাধান' প্রবন্ধের (১৩৩০) অংশবিশেষ উদ্‌ধৃতিযোগ্য —

"সৌভাগ্যক্রমে অনেককাল পরে একটা সদৃষ্টান্ত আমাদের হাতের কাছে এসেছে। সেটা সম্বন্ধে আলোচনা করলে আমার কথাটা পরিষ্কার হবে।— বাংলাদেশ ম্যালেরিয়ায় মরছে। সে মার কেবল দেহের মার নয়, এই রোগে সমস্ত দেশটাকে মনমরা করে দিয়েছে। আমাদের মানসিক অবসাদ, চারিত্রিক দৈন্য, অধ্যবসায়ের অভাব এই রোগজীর্ণতার ফল। ম্যালেরিয়া থেকে যদি আমরা উদ্ধার পাই তা হলে কেবল যে আমরা সংখ্যা হিসাবে বাড়ব তা নয়, শক্তি হিসাবে বেড়ে উঠব। তখন কেবল যে দুইজনের কাজ একজনে করতে পারব তাও নয়, এমন প্রকৃতির কাজ এমন ধরনে করতে পারব যা এখন পারি নে। অর্থাৎ, কেবল যে কাজের পরিমাণ বাড়বে তা নয়, কাজের উৎকর্ষ বাড়বে। তাতে সমস্ত দেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। এ কথা সকলেই জানি, সকলেই মানি— কিন্তু সেইসঙ্গে এতকাল এই কথাই মনে লেগে রয়েছে যে, বাংলাদেশ থেকে ম্যালেরিয়া দূর করে দেওয়া বা এই রোগের হ্রাস করা অসম্ভব। বাংলাদেশ ক্রমে ক্রমে নির্মানুষ হতে পারে, কিন্তু নির্মশক হবে কী করে ? অতএব অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।

"এমন সময়ে একজন সাহসিক বলে উঠলেন, দেশ থেকে মশা তাড়াবার ভার আমি নিলুম। এত বড়ো কথা বলবার ভরসাকেই তো আমি যথেষ্ট মনে করি। এই গুরু-মানা অবতার-মানা দেশে এত বড়ো বুকের পাটা তো দেখতে পাওয়া যায় না। এক-একটি গ্রাম নিয়ে তিনি কাজ আরম্ভ করেছেন। একটি গ্রামেও যদি তিনি ফল পান তা হলে সমস্ত দেশব্যাপী ব্যাধির মূলে কুঠারাঘাত করা হবে।

"এইটুকুমাত্র কাজই তাঁর যথার্থ কাজ, মহৎ কাজ। কোনো একটিমাত্র জায়গায় যদি তিনি দেখিয়ে দিতে পারেন যে, বিশেষ উপায়ে রোগের বাহনকে দূর করে দেওয়া যেতে

পারে তা হলেই হল।"

"স্বহস্তে তিনি নিজের চেষ্টায় সমস্ত অলস দেশকে নীরোগ করে দেবেন এটা কল্যাণকর নয়। দৃষ্টান্ত-দ্বারা তিনি যেটা প্রমাণ করবেন সেইটেকে দেশ স্বয়ং গ্রহণ করলে তবেই সে উপস্থিত বিপদ থেকে রক্ষা পাবে এবং ভাবী বিপদের বিরুদ্ধে চিরকালের মতো প্রস্তুত হবে। নইলে বারে বারে নূতন নূতন ডাক্তার গোপাল চাটুজ্জের জন্যে তাকে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে হবে, আর ইতিমধ্যে তার পিলে-যকৃতের সাংঘাতিক উন্নতি-সাধনে সে পৃথিবীর সকল দেশকে ছাড়িয়ে যাবে।

"ম্যালেরিয়া যেমন শরীরের, অবুদ্ধি তেমনি মনের একটা বিষম ব্যাধি। এতে মানুষের মূল্য কমিয়ে দেয়। অর্থাৎ গুনতি হিসাবে তার পরিমাণ বাড়লেও গুণের হিসাবে অত্যন্ত কমে যায়। স্বরাজ বলো, সভ্যতা বলো, মানুষের যা-কিছু মূল্যবান ঐশ্বর্য সমস্তই এই গুণের হিসেবের উপরেই নির্ভর করে। বালুর পরিমাণ যতই বেশি হোক-না কেন, তাতে মাটির গুণ নেই ব'লেই ফসল ফলাতে পারে না। ভারতবর্ষের ত্রিশ কোটি মানুষের মন পরিমাণ হিসাবে প্রভূত, কিন্তু যোগ্যতা হিসাবে কতই স্বল্প। এই অযোগ্যতায়, এই অবুদ্ধির, জগদ্দল পাথরটাকে ভারতবর্ষের মনের উপর থেকে ঠেলে না ফেললে বিধাতা আমাদের কোনো বর দিলেও তা সফল হবে না, এ যদি সত্য হয় তবে আমাদের কোমর বেঁধে বলতেই হবে এই আমাদের কাজ। এ কাজ প্রত্যেক কর্মীকে তাঁর হাতের কাছ থেকেই শুরু করতে হবে। যেখানেই যতটুকুই সফলতা লাভ করবেন সেই সফলতা সমস্ত দেশের। আয়তন থেকে যাঁরা সফলতার বিচার করেন তাঁরা ক্ষুণ্ণ হবেন, সত্যতা থেকে যাঁরা বিচার করেন তাঁরা জানেন যে সত্য বামনরূপে এসে বলির কাছ থেকে ত্রিভুবন অধিকার করে নিতে পারেন।"[১]

প্রতিভাষণ : ১৩২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রবীন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গভ্রমণে যান, এই সময় ময়মনসিংহেও গিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে জনসাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে যে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হইয়াছিল তাহার উত্তর।

বাঙালির কাপড়ের কারখানা ও হাতের তাঁত : এই প্রবন্ধ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অনুরোধক্রমে রচিত, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রজীবনী'তে এই সংবাদ

১ রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, গ্রন্থপরিচয়, পৃ ৫১৬-১৭

দিয়াছেন। 'বাংলার তাঁতি' নামে ১৩৩৮ কার্তিক সংখ্যা 'বিচিত্রা'তেও প্রকাশিত হইয়াছিল। মোহিনী মিল -কর্তৃক প্রবন্ধটি পুস্তিকাকারেও প্রচারিত হয়।

জলোৎসর্গ: "এবারকার বর্ষামঙ্গলে একটু নূতনত্ব ছিল। চিরপ্রচলিত প্রথাকে লঙ্ঘন করে এবার উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল আশ্রমের বাইরে নিকটবর্তী ভুবনডাঙা গ্রামে [৭ ভাদ্র ১৩৪৩]। সেখানকার একমাত্র সম্বল একটি বৃহৎ জলাশয় বহুকাল যাবৎ পঙ্কোদ্ধারের অভাবে লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছিল। গ্রামবাসীদের জলাভাবের অন্ত ছিল না। বিশ্বভারতীর শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কর্মীদের উদ্যোগে এবং গ্রামবাসীদের সহযোগে অধুনা এই পুকুরটিকে খনন ক'রে নির্মল জলের সম্বল ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এই জলাশয়-প্রতিষ্ঠা এবার আমাদের বর্ষামঙ্গল-উৎসবের একটি অঙ্গরূপে পরিগণিত হয়, তাই ভুবনডাঙা গ্রামের প্রান্তে এই জলাশয়ের তীরেই উৎসবের মণ্ডপ রচিত হয়।...সর্বশেষে কবি...নব-উৎসারিত জলকে অভিনন্দিত ক'রে একটি অভিভাষণ দ্বারা উৎসবকে সুসম্পূর্ণ এবং সমাপ্ত করলেন।"[১]

সম্ভাষণ: অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে, ৩০ ফাল্গুন ১৩৪৩ তারিখে, সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান 'রবিবাসর' শান্তিনিকেতনে এক অধিবেশনে সমবেত হন, তদুপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলেন তাহার অনুলিপির একাংশ।

অভিভাষণ: ১৩৪৬ সালের ফাল্গুন মাসে রবীন্দ্রনাথ বাঁকুড়ায় যান। জনসভায় অভিনন্দনের উত্তরে এই ভাষণ।

এই গ্রন্থে সংকলিত অনেকগুলি রচনাই বক্তৃতার অনুলিপি, অধিকাংশ স্থলে কবি-কর্তৃক সংশোধিত— কোনো-কোনো ক্ষেত্রে সে কথা সাময়িক পত্রে উল্লিখিত; অপর কোনো-কোনো স্থলে তাহা অনুমান করা যায়। তবে কতক সংকলন যে যথোচিত অথবা সংশোধিত অনুলিপি নহে তাহাও সহজেই বুঝা যায়— বিষয়গুণে এগুলিও রক্ষিত হইল।

পল্লীপ্রকৃতি গ্রন্থ সংকলন করিয়াছেন শ্রীপুলিনবিহারী সেন; বিস্তারিত গ্রন্থপরিচয়ও তিনি রচনা করেন। বর্তমান প্রসঙ্গে অন্যান্য বিবরণ স্বতন্ত্রমুদ্রিত পল্লীপ্রকৃতির গ্রন্থপরিচয় অংশে দ্রষ্টব্য।

১ শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত, 'শান্তিনিকেতনে বর্ষামঙ্গল', প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৩। প্রবন্ধটিতে অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণ আছে।

১৩১৭ সালে 'বৈকলী' পত্রের সহকারী সম্পাদক পদ্মিনীমোহন নিয়োগী -কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে তাঁহার যে সংক্ষিপ্ত জীবনকথা লিপিবদ্ধ করেন, রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে সেই চিঠিটি স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। পত্রটি 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট।

এই পত্রে উল্লিখিত রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীবিয়োগের কাল, ১৩০৭ স্থলে ১৩০৯ হইবে।

এই খণ্ড সংকলনের কাজে সহায়তা করিয়াছেন শ্রীঅমিয়কুমার সেন।

বর্ণানুক্রমিক সূচী

অজানা ভাষা দিয়ে	...	১
অতিথি ছিলাম যে বনে সেথায়	...	১
অত্যাচারীর বিজয়তোরণ	...	১
অনিত্যের যত আবর্জনা	...	১
অনেক তিয়াষে করেছি ভ্রমণ	...	১
অনেক মালা গেঁথেছি মোর	...	২
অন্ধকারের পার হতে আনি	...	২
অন্নহারা গৃহহারা চায় ঊর্ধ্বপানে	...	২
অন্নের লাগি মাঠে	...	৩
অপরাজিতা ফুটিল	...	৩
অপাকা কঠিন ফলের মতন	...	৩
অবসান হল রাতি	...	৩
অবোধ হিয়া বুঝে না বোঝে	...	৪
অভিভাষণ	...	৫৪৭, ৫৬৪, ৫৯৬
অমলধারা ঝরনা যেমন	...	৪
অরণ্যদেবতা	...	৫৪৫
অস্তরবিরে দিল মেঘমালা	...	৪
আকাশে ছড়ায়ে বাণী	...	৪
আকাশে যুগল তারা	...	৫
আকাশে সোনার মেঘ	...	৫
আকাশের আলো মাটির তলায়	...	৫
আকাশের চুম্বনবৃষ্টিরে	...	৫
আগুন জ্বলিত যবে	...	৫
আজ গড়ি খেলাঘর	...	৬
আত্মপরিচয়	...	১৮৭
আঁধার নিশার	...	৬
আপন শোভার মূল্য	...	৬

আপনার রুদ্ধদ্বার-মাঝে ...	৬
আপনারে দীপ করি জ্বালো ...	৭
আপনারে নিবেদন ...	৭
আপনি ফুল লুকায়ে বনছায়ে ...	৭
আমি অতি পুরাতন ...	৭
আমি বেসেছিলেম ভালো ...	৮
আয় রে বসন্ত, হেথা ...	৮
আলো আসে দিনে দিনে ...	৮
আলো তার পদচিহ্ন ...	৯
আশার আলোকে ...	৯
আশ্রমের রূপ ও বিকাশ ...	৩১৩
আসা-যাওয়ার পথ চলেছে ...	৯
ঈশ্বরের হাস্যমুখ দেখিবারে পাই ...	৯০
উপেক্ষিতা পল্লী ...	৫৪১
ঊর্মি, তুমি চঞ্চলা ...	১০
এই যেন ভক্তের মন ...	১০
এই সে পরম মূল্য ...	১০
এক যে আছে বুড়ি ...	১০
একদিন যারা মেরেছিল তাঁরে গিয়ে ...	৬২৮
এখনো অঙ্কুর যাহা ...	১১
এমন মানুষ আছে ...	১১
এসেছিনু নিয়ে শুধু আশা ...	১১
এসো মোর কাছে ...	১১
ওগো তারা, জাগাইয়ো ভোরে ...	১২
ওড়ার আনন্দে পাখি ...	১২
কঠিন পাথর কাটি ...	১২
‘কথা চাই’ ‘কথা চাই’ হাঁকে ...	১২
কমল ফুটে অগম জলে ...	১৩
করুণা ...	১১৭
কল্লোলমুখর দিন ...	১৩

কহিল তারা, জালিস'আলোখানি	...	১৩
কাছে থাকি যবে	...	১৩
কাছের রাতি দেখিতে পাই	...	১৪
কাঁটার সংখ্যা	...	১৪
কাব্য ও ছন্দ	...	২৬৬
কালো মেঘ আকাশের তারাদের ঢেকে	...	১৪
কী পাই, কী জমা করি	...	১৪
কী যে কোথা হেথা-হোথা যায় ছড়াছড়ি	...	১৫
কীর্তি যত গড়ে তুলি	...	১৫
কুসুমের শোভা	...	১৫
কোথায় আকাশ	...	১৫
কোন্ খ'সে-পড়া তারা	...	১৬
ক্লান্ত মোর লেখনীর	...	১৬
ক্ষণকালের গীতি	...	১৬
ক্ষণিক ধ্বনির স্বত-উচ্ছ্বাসে	...	১৬
ক্ষুদ্র-আপন - মাঝে	...	১৬
ক্ষুভিত সাগরে নিভৃত তরীর গেহ	...	১৭
খৃষ্ট	...	৪৮৫, ৫০৯
খৃষ্টধর্ম	...	৪৯৭
খৃষ্টোৎসব	...	৫০১
গত দিবসের ব্যর্থ প্রাণের	...	১৭
গদ্যকাব্য	...	২৬৮
গাছ দেয় ফল	...	১৭
গাছগুলি মুছে-ফেলা	...	১৭
গাছের কথা মনে রাখি	...	১৮
গাছের পাতায় লেখন লেখে	...	১৮
গানখানি মোর দিনু উপহার	...	১৮
গান্ধী মহারাজ	...	৬১৫
গান্ধী মহারাজের শিষ্য	...	৬১৫
গান্ধীজি	...	২৯৫

গিরিবক্ষ হতে আজি	...	১৮
গির্জাঘরের ভিতরটি স্নিগ্ধ	...	৬২৯
গোঁড়ামি সত্যেরে চায়	...	১৯
ঘড়িতে দম দাও নি তুমি মূলে	...	১৯
ঘন কাঠিন্য রচিয়া শিলাস্তূপে	...	১৯
চলার পথের যত বাধা	...	১৯
চলিতে চলিতে চরণে উছলে	...	২০
চলে যাবে সত্তারূপ	...	২০
চাও যদি সত্যরূপে	...	২০
চাঁদিনী রাত্রি, তুমি তো যাত্রী	...	২০
চাঁদেরে করিতে বন্দী	...	২১
চাষের সময়ে	...	২১
চাহিছ বারে বারে	...	২১০
চাহিছে কীট মৌমাছির	...	২১
চৈত্রের সেতারে বাজে	...	২২
চোখ হতে চোখে	...	২২
চৌঠা আশ্বিন	...	২৯৮
জন্মদিন আসে বারে বারে	...	২২
জলোৎসর্গ	...	৫৯০
জানার বাঁশি হাতে নিয়ে	...	২২
জাপান, তোমার সিন্ধু অধীর	...	২২
জীবনদেবতা তব	...	২৩
জীবনযাত্রার পথে	...	২৩
জীবনরহস্য যায়	...	২৩
জীবনে তব প্রভাত এল	...	২৩
জীবনের দীপে তব	...	২৪
জ্বালো নব জীবনের	...	২৪
ঝরনা উথলে ধরার হৃদয় হতে	...	২৪
ডালিতে দেখেছি তব	...	২৫
ডুবারি যে সে কেবল	...	২৫

তপনের পানে চেয়ে	...	২৫
তব চিত্তগগনের	...	২৫
তরঙ্গের বাণী সিন্ধু	...	২৫
তারাগুলি সারারাতি	...	২৬
তুমি বসন্তের পাখি বনের ছায়ারে	...	২৬
তুমি বাঁধছ নূতন বাসা	...	২৬
তুমি যে তুমিই, ওগো	...	২৬
তোমার মঙ্গলকার্য	...	২৭
তোমার সঙ্গে আমার মিলন	...	২৭
তোমারে হেরিয়া চোখে	...	২৭
দিগন্তে ওই বৃষ্টিহারা	...	২৭
দিগন্তে পথিক মেঘ	...	২৮
দিগ্‌বলয়ে	...	২৮
দিনের আলো নামে যখন	...	২৮
দিনের প্রহরগুলি হয়ে গেল পার	...	২৯
দিবসরজনী তন্দ্রাবিহীন	...	২৯
দুই পারে দুই কূলের আকুল প্রাণ	...	২৯
দুঃখ এড়াবার আশা	...	২৯
দুঃখশিখার প্রদীপ জেলে	...	২৯
দুখের দশা শ্রাবণরাতি	...	৩০
দূর সাগরের পারের পবন	...	৩০
দেশের কাজ	...	৫৩৮
দোয়াতখানা উলটি ফেলি	...	৩০
ধরণীর খেলা খুঁজে	...	৩০
নববর্ষ এল আজি	...	৩১
না চেয়ে যা পেলে তার যত দায়	...	৩১
নিমীলনয়ন ভোর-বেলাকার	...	৩১
নিরুদ্যম অবকাশ শূন্য শুধু	...	৩১
নূতন জন্মদিনে	...	৩২
নূতন যুগের প্রত্যূষে কোন্	...	৩২

নূতন সে পলে পলে	…	৩২
পদ্মের পাতা পেতে আছে অঞ্জলি	…	৩৩
পরিচিত সীমানার	…	৩৩
পরিশিষ্ট	…	৪২৩, ৪৮১
পল্লীপ্রকৃতি	…	৫১৩, ৫৩০
পল্লীর উন্নতি	…	৫১৫
পল্লীসেবা	…	৫৬১
পশ্চিমে রবির দিন	…	৩৩
পাখি যবে গাহে গান	…	৩৩
পায়ে চলার বেগে	…	৩৪
পাষাণে পাষাণে তব শিখরে শিখরে	…	৩৪
পুরানো কালের কলম লইয়া হাতে	…	৩৪
পুষ্পের মুকুল	…	৩৪
পূজালয়ের অন্তরে ও বাহিরে	…	৬২৯
পেয়েছি যে-সব ধন	…	৩৫
প্রগতিসংহার	…	৮২
প্রতিভাষণ	…	৫৮১
প্রথম আলোর আভাস লাগিল গগনে	…	৩৫
প্রভাতরবির ছবি আঁকে ধরা	…	৩৫
প্রভাতের ফুল ফুটিয়া উঠুক	…	৩৫
প্রেমের আদিম জ্যোতি আকাশে সঞ্চরে	…	৩৫
প্রেমের আনন্দ থাকে	…	৩৬
ফাগুন এল দ্বারে	…	৩৬
ফাগুন কাননে অবতীর্ণ	…	৩৬
ফুল কোথা থাকে গোপনে	…	৩৬
ফুল ছিঁড়ে লয়	…	৩৬
ফুলের অক্ষরে প্রেম	…	৩৭
ফুলের কলিকা প্রভাতরবির	…	৩৮
বইল বাতাস	…	৩৮
‘বউ কথা কও’ ‘বউ কথা কও’	…	৩৮

বড়ো কাজ নিজে বহে	...	৩৮
বড়োদিন	...	৫০৭, ৬২৮
বড়োই সহজ	...	৩৯
বদনাম	...	৬৯
বরষার রাতে জলের আঘাতে	...	৩৯
বরষে বরষে শিউলিতলায়	...	৩৯
বর্ষণ-গৌরব তার	...	৩৯
বসন্ত, আনো মলয়সমীর	...	৪০
বসন্ত, দাও আনি	...	৪০
বসন্ত পাঠায় দূত	...	৪০
বসন্ত যে লেখা লেখে	...	৪০
বসন্তের আসরে ঝড়	...	৪০
বসন্তের হাওয়া যবে অরণ্য মাতায়	...	৪১
বস্তুতে রয় রূপের বাঁধন	...	৪১
বহুদিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে	...	৪১
বাঙালির কাপড়ের কারখানা ও হাতের তাঁত	...	৫৮৫
বাতাস শুধায়, বলো তো কমল	...	৪১
বাতাসে তাহার প্রথম পাপড়ি	...	৪২
বাতাসে নিবিলে দীপ	...	৪২
বায়ু চাহে মুক্তি দিতে	...	৪২
বাহির হতে বহিয়া আনি	...	৪২
বাহিরে বস্তুর বোঝা	...	৪৩
বাহিরে যাহারে খুঁজেছিনু দ্বারে দ্বারে	...	৪৩
বিকেল বেলার দিনান্তে মোর	...	৪৩
বিচলিত কেন মাধবীশাখা	...	৪৩
বিদায়রথের ধ্বনি	...	৪৪
বিধাতা দিলেন মান	...	৪৪
বিমল আলোকে আকাশ সাজিবে	...	৪৪
বিশ্বভারতী	...	৩৪১
বিশ্বের হৃদয়-মাঝে	...	৪৪

বুদ্ধির আকাশ যবে সত্যে সমুজ্জ্বল	...	৪৫
বেছে লব সব-সেরা	...	৪৫
বেদনা দিবে যত	...	৪৫
বেদনার অশ্রু-উর্মিগুলি	...	৪৬
ব্রত-উদ্‌যাপন	...	৩০৭
ভজনমন্দিরে তব	...	৪৬
ভারতবর্ষে সমবায়ের বিশিষ্টতা	...	৪৬০
ভিখারিনী	...	১০৩
ভূমিলক্ষ্মী	...	৫২৪
ভেসে-যাওয়া ফুল	...	৪৬
ভোলানাথের খেলার তরে	...	৪৬
মনের আকাশে তার	...	৪৬
মর্তজীবনের	...	৪৭
মহাত্মা গান্ধী	...	২৮৭, ২৮৯
মহাত্মাজির পুণ্যব্রত	...	৩০৩
মাটিতে দুর্ভাগার	...	৪৭
মাটিতে মিশিল মাটি	...	৪৭
মান অপমান উপেক্ষা করি দাঁড়াও	...	৪৭
মানবসম্বন্ধের দেবতা	...	৫০৪
মানুষেরে করিবারে স্তব	...	৪৭
মিছে ডাকো— মন বলে, আজ না	...	৪৮
মিলন-সুলগনে	...	৪৮
মুকুলের বক্ষোমাঝে	...	৪৮
মুক্ত যে ভাবনা মোর	...	৪৯
মুসলমানীর গল্প	...	৯৮
মুহূর্ত মিলায়ে যায়	...	৪৯
ম্যালেরিয়া	...	৫৭৩
মৃতেরে যতই করি স্ফীত	...	৪৯
মৃত্তিকা খোরাকি দিয়ে	...	৪৯
মৃত্যু দিয়ে যে প্রাণের	...	৪৯

যখন গগনতলে ... ৪৯
যখন ছিলেম পথেরই মাঝখানে ... ৫০
যত বড়ো হোক ইন্দ্রধনু সে ... ৫০
যা পায় সকলই জমা করে .. ৫০
যা রাখি আমার তরে ... ৫০
যাওয়া-আসার একই যে পথ ... ৫১
যিশুচরিত ... ৪৮৭
যুগে যুগে জলে রৌদ্রে বায়ুতে ... ৫১
যে আঁধারে ভাইকে দেখিতে নাহি পায় ... ৫১
যে করে ধর্মের নামে ... ৫১
যে ছবিতে ফোটে নাই ... ৫১
যে ঝুমকো ফুল ফোটে পথের ধারে ... ৫২
যে তারা আমার তারা ... ৫২
যে ফুল এখনো কুঁড়ি ... ৫২
যে বন্ধুরে আজও দেখি নাই ... ৫৩
যে ব্যথা ভুলিয়া গেছি ... ৫৩
যে ব্যথা ভুলেছে আপনার ইতিহাস ... ৫৩
যে যায় তাহারে আর ... ৫৩
যে রত্ন সবার সেরা ... ৫৩
রজনী প্রভাত হল ... ৫৪
রাখি যাহা তার বোঝা ... ৫৪
রাতের বাদল মাতে ... ৫৪
রূপে ও অরূপে গাঁথা ... ৫৪
লুকায়ে আছেন যিনি ... ৫৫
লুপ্ত পথের পুষ্পিত তৃণগুলি ... ৫৫
লেখে স্বর্গে মর্তে মিলে ... ৫৫
শরতে শিশিরবাতাস লেগে ... ৫৫
শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম ... ৪২৯
শিকড় ভাবে, সেয়ানা আমি ... ৫৬
শূন্য ঝুলি নিয়ে হায় ... ৫৬

শূন্য পাতার অন্তরালে	...	৫৬
শেষ পুরস্কার	...	৯৬
শেষ বসন্তরাত্রে	...	৫৬
শ্যামলঘন বকুলবন	...	৫৬
শ্রাবণের কালো ছায়া	...	৫৭
শ্রীনিকেতন	...	৫২৭
শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ	...	৫৫২
সখার কাছেতে প্রেম	...	৫৭
সংসারেতে দারুণ ব্যথা	...	৫৭
সত্য ও বাস্তব	...	২৮৪
সত্যেরে যে জানে, তারে	...	৫৭
সন্ধ্যাদীপ মনে দেয় আনি	...	৫৮
সন্ধ্যারবি মেঘে দেয়	...	৫৮
সফলতা লভি যবে	...	৫৮
সব-কিছু জড়ো ক'রে	...	৫৮
সব চেয়ে ভক্তি যার	...	৫৮
সময় আসন্ন হলে	...	৫৯
সমবায় ১	...	৪৫১
সমবায় ২	...	৪৫৭
সমবায়নীতি	...	৪৪৭, ৪৬৮
সমবায়ে ম্যালেরিয়া-নিবারণ	...	৫৬৮
সম্ভাষণ	...	৫৯২
সারা রাত তারা	...	৫৯
সাহিত্যবিচার	...	২৭২
সাহিত্যে আধুনিকতা	...	২৬২
সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা	...	২৮১
সাহিত্যে চিত্রবিভাগ	...	২৭৮
সাহিত্যের মাত্রা	...	২৫৬
সাহিত্যের মূল্য	...	২৭৬
সাহিত্যের স্বরূপ	...	২৪৯, ২৫১

সিদ্ধিপারে গেলেন যাত্রী	...	৫৯
সুখেতে আসক্তি যার	...	৫৯
সুন্দরের কোন্ মন্ত্রে	...	৬০
সে লড়াই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে লড়াই	...	৬০
সেই আমাদের দেশের পদ্ম	...	৬০
সেতারের তারে	...	৬০
সোনায় রাঙায় মাখামাখি	...	৬০
স্তব্ধ যাহা পথপার্শ্বে, অচৈতন্য	...	৬১
স্তব্ধতা উচ্ছ্বসি উঠে গিরিশৃঙ্গরূপে	...	৬১
স্নিগ্ধ মেঘ তীব্র তপ্ত	...	৬১
স্মৃতিকাপালিনী পূজারতা, একমনা	...	৬২
হলকর্ষণ	...	৫৫৮
হাসিমুখে শুকতারা	...	৬২
হিমাদ্রির ধ্যানে যাহা	...	৬২
হে উষা, নিঃশব্দে এসো	...	৬২
হে তরু, এ ধরাতলে	...	৬৩
হে পাখি, চলেছ ছাড়ি	...	৬৩
হে প্রিয়, দুঃখের বেশে	...	৬৩
হে বনস্পতি, যে বাণী ফুটিছে	...	৬৪
হে সুন্দর, খোলো তব নন্দনের দ্বার	...	৬৪
হেলাভরে ধুলার 'পরে	...	৬৪